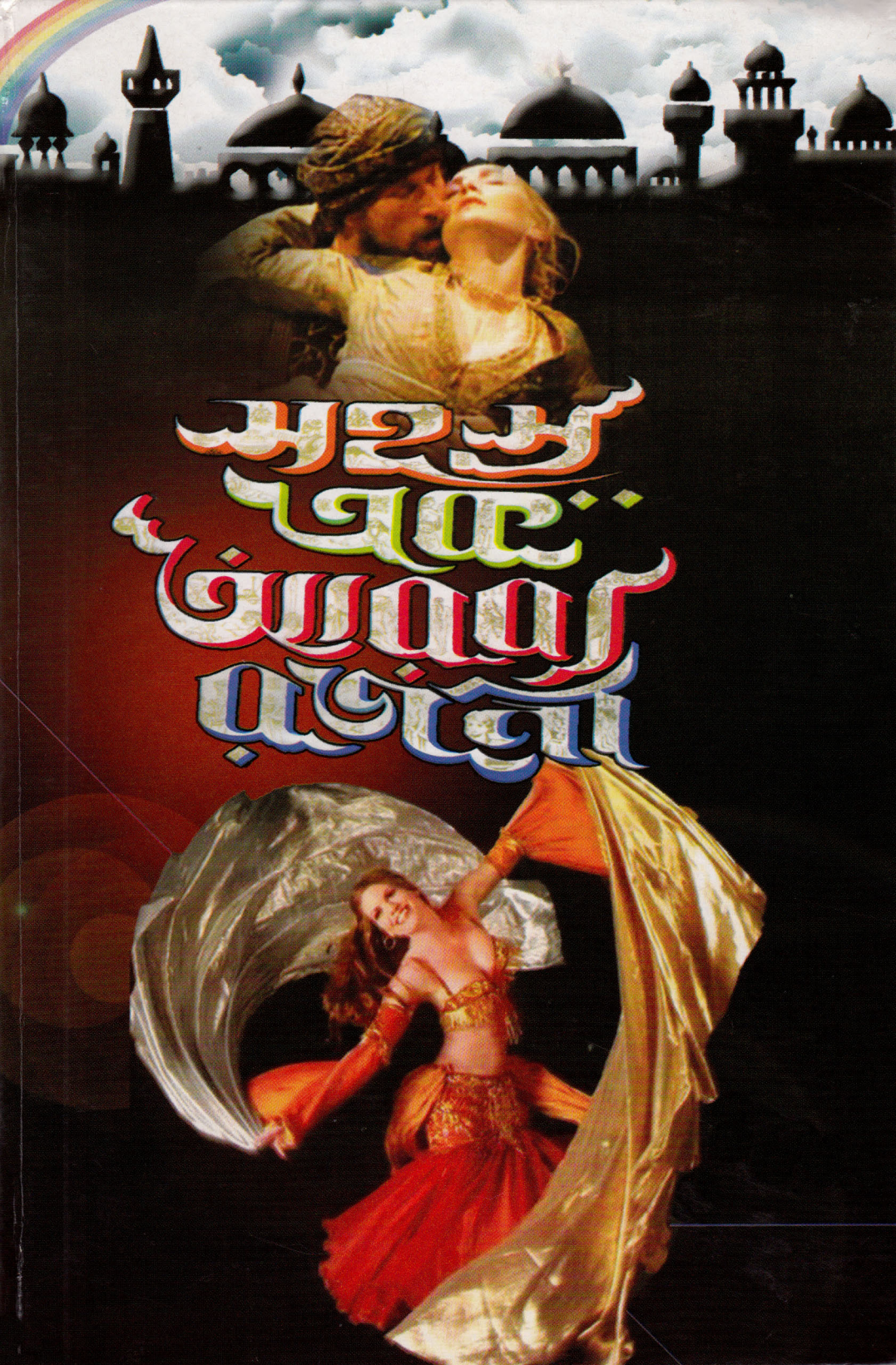
মহুয়ার
একটি
বাঙালি
বউ

১

সময় এক আবর্ত রজনী

মাধুমী

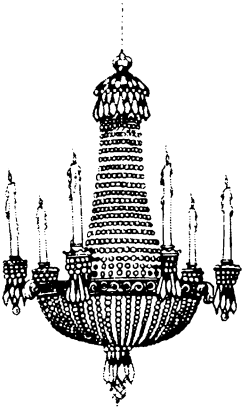

সহস্র এক আরব রজনী

কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

মৌসুমী প্রকাশনী ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

ডঃ জে. সি. মারদ্রুস

সহস্র এক আরব রজনী

অসংক্ষেপিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

প্রথম খণ্ড

ভাষান্তর : ক্ষিতীশ সরকার

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সত্য চক্রবর্তী

ভূমিকা

'সহস্র এক আরব্য রজনী' বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ। পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষাতেই এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে রস পিপাসু পাঠকের সমাদর লাভ করে আসছে। কালে আর জলে ধুয়ে এ-গ্রন্থ আজও চির অম্লান। শাশ্বত সাহিত্যের এই-ই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অদ্যাবধি অগণিত প্রকাশক 'আরব্য রজনী'র কিছু কিছু অংশ অতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে আসছেন। কিন্তু সেগুলি সবই ছোটদের জন্য লেখা কিছু কিছু গল্পাংশ মাত্র। সে-সব 'গল্প' পড়ে 'সহস্র এক আরব্য রজনী'র অপার সাহিত্য-সৌন্দর্য অনুমান করা সম্ভব নয়। আরবী ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থ 'আলিফ লায়লা' কিন্তু আদৌ ছোটদের জন্য রচিত নয়।

সারা পৃথিবীতে এ-গ্রন্থ যত ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে ড: জে. সি. মারদ্রুস-এর অনুবাদই শ্রেষ্ঠ। স্পেক্‌টেটর পত্রিকার মতে : The Nursury version of the 'Arabian Nights' serve their purpose, but very pale shades of their originals; prudery Prevented Lane's version for adults form being substantially better, and Burton's was still far from being a complete success. Dr. Mardrus's translation into French was the first European rendering which faithfully reflected its original.

ভাষান্তর করার জন্য আমি ড: মারদ্রুসের অনুবাদই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি। এই প্রথম 'সহস্র এক আরব্য রজনী'র পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে।

বাংলা ভাষায় আমরা আরবী ফার্সী হিব্রু প্রভৃতি বিদেশী বহু শব্দ আকছার ব্যবহার করি। বহুকালের ব্যবহারে সেগুলো আজ আর বিদেশী বলেও মনে হয় না। এই গ্রন্থে আমি সেইসব শব্দের যথাযোগ্য ব্যবহার করে তৎকালীন আরবীয় সৌরভে পরিবেশ গড়ে তোলার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।

বিনীত

ক্ষিতীশ সরকার

১৫/৯/১৯৮২

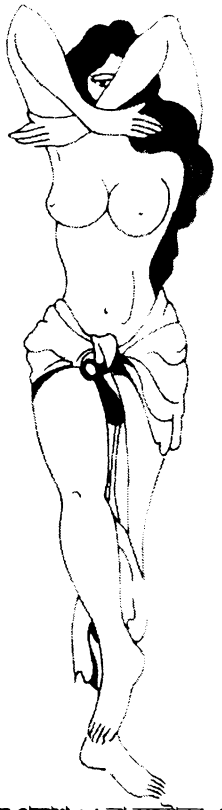

প্রথম প্রকাশ : ১লা অক্টোবর, ১৯৮২

পরিমার্জিত শোভন সংস্করণ

জুন, ২০১১

প্রকাশক

দেবকুমার বসু

মৌসুমী প্রকাশনী

১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

কম্পোজ

বর্ণায়ন

৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রক

পপুলার এন্টারপ্রাইজ

৩৫এ/৩ বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কল-৬৭

দাম : ২০০ টাকা

বাদশাহ শারিয়ার ও তার ভাই বাদশাহ শাহজামানের কাহিনী
গাধা, বলদ আর গৃহস্বামীর উপাখ্যান
সওদাগর আর আফ্রিদি দৈত্য
প্রথম শেখের কাহিনী
দ্বিতীয় শেখের কাহিনী
তৃতীয় শেখের কাহিনী
ধীবর আর আফ্রিদি দৈত্য
উজির, সুলতান য়ুনান হেকিম রায়ান
সিনবাদ আর বাজপাখি
শাহজাদা আর রাক্ষসী
শাহজাদা আর রঙিন মাছ
কুলি-ছেলে আর তিন কন্যা
প্রথম কালান্দর ফকিরের কাহিনী
দ্বিতীয় কালান্দর ফকিরের কাহিনী
তৃতীয় কালান্দর ফকিরের কাহিনী
বড় বোন জুবেদার কাহিনী
মেজো বোন আমিনার কাহিনী
একটি স্ত্রীলোকের খণ্ডিত দেহ, তিনটি আপেল ও নিগ্রো রাইহান
উজির সামস অল-দিন তার ভাই নূর অল-দিন ও হাসান বদর অল-দিন
দর্জি, কুঁজো, ইহুদী হেকিম, বাবুর্চি, খ্রীস্টান দালাল
খ্রীস্টান দালালের কাহিনী
বাবুর্চির কাহিনী
ইহুদী হেকিমের কাহিনী
দর্জির কাহিনী
খোঁড়া যুবক আর নাপিতের কাহিনী
বাগদাদের নাপিতের কাহিনী
নাপিতের প্রথম ভাই বাকবুক
নাপিতের দ্বিতীয় ভাই অল হাদ্দার
নাপিতের তৃতীয় ভাই বাকবক
নাপিতের চতুর্থ ভাই অল-কুজ
নাপিতের পঞ্চম ভাই অল-আসার
নাপিতের ষষ্ঠ ভাই শাক্কাশিক
কুঁজোর কাহিনীর শেষাংশ
মধুমিতা আর আলী নূর-এর কাহিনী
ঘানিম আইয়ুব আর কুৎ-অল-এর কাহিনী
প্রথম সুদানী নিগ্রো খোজা
দ্বিতীয় সুদানী নিগ্রো খোজা
ঘানিমের কাহিনীর শেষাংশ
উমর অল নুমান, তার পুত্র সারকান ও দু-অল মাকানের কাহিনী
আজিজ আর আজিজার কাহিনী
শাহজাদা তাজ অল-মূলক ও শাহজাদী দুনিয়া
দু-অল মাকানের পুত্র কান মা-কানা
হাসিস খোরের কাহিনী

পশু-পাখিদের উপাখ্যান ঃ

রাজহাঁস ও ময়ূর-ময়ূরী
মেষ-পালক ও মেয়ে
কচ্ছপ ও বক
নেকড়ে ও খেঁক শিয়াল
ইঁদুর আর নেউল
কাক ও কাঠবিড়ালী

আলী ইবন বকর ও সুন্দরী সামস অল-নাহারের কাহিনী
কামার-অল জামান ও শাহজাদী বদর-এর কাহিনী
খুশ বাহার ও খুশ নাহারের কাহিনী
আলা অল-দিন আবু সামাতের কাহিনী

বিদুষী হাফিজার কাহিনী
কবি আবু নবাসের দুঃসাহসিক কীর্তি

সিন্দবাদের কাহিনী ঃ

- সিন্দবাদের প্রথম সমুদ্র-যাত্রা
- সিন্দবাদের দ্বিতীয় সমুদ্র-যাত্রা
- সিন্দবাদের তৃতীয় সমুদ্র-যাত্রা
- সিন্দবাদের চতুর্থ সমুদ্র-যাত্রা
- সিন্দবাদের পঞ্চম সমুদ্র-যাত্রা
- সিন্দবাদের ষষ্ঠ সমুদ্র-যাত্রা
- সিন্দবাদের সপ্তম ও শেষ সমুদ্র-যাত্রা

সুন্দরী জুমুরুদ এবং আলী শার-এর কাহিনী
নানা রঙের ছয় কন্যার কাহিনী
তাম্র নগরীর কাহিনী
ইবন অল-মনসুর এবং দুই নারীর কাহিনী
কসাই ওয়ার্দার ও উজির-কন্যার কাহিনী
জামালিকার কাহিনী

- (বুলুকিয়ার কাহিনী
- খুব সুরৎ নওজোয়ান সাদ-এর কাহিনী)

কয়েকটি মজার মজার চুটকী গল্প ঃ

- হাসি-তামাশায় হারুন অল-রসিদ
- ছাত্র ও শিক্ষক
- আজব বটুয়া
- মহব্বতের বিচারক হারুন অল-রসিদ
- কে ভালো—উঠতি বয়সের ছোকরা, না—মাঝ-বয়সী মরদ?
- শসা-শাহজাদা
- পলিত-কেশ
- সমস্যা-সমাধান

আবু নবাস এবং জুবেদার জলকেলী
আবু নবাসের কবির লড়াই
গর্দভ
আইনের প্যাঁচে জুবেদা
স্ত্রী না পুরুষ?
বখরা
মাদ্রাসার মৌলভী
শেমিজের কারুকর্ম
পেয়ালার বাণী
বাক্সের মধ্যে খলিফা
মুদ্যোফরাশ
সুর্মার কাহিনী
ছেলে অথবা মেয়ে
আজব খলিফা
গুলাবীর কাহিনী
কালো ঘোড়ার আশ্চর্য যাদু কাহিনী
ধূর্ত ডিলাইলাহ ও তার জালিয়াৎ কন্যা জাইনাবের কাহিনী
যুদর এবং তার আশ্চর্য থলের কাহিনী
আবু কাইর ও আবু শাইর-এর কাহিনী
আবদাল্লার কাহিনী
পীত যুবকের কাহিনী
আনারকলি ও বদর বাসিমের কাহিনী
মিশরের ফাল্লাহ্ এবং তার ফর্সা ছেলেমেয়েরা
খলিফা ও জেলের কাহিনী
বসরাহর হাসানের দুঃসাহসিক অভিযান
স্ত্রীলোকের চাতুরী
আবু অল হাসানের কাহিনী
জাইন মাওয়াসিফের কাহিনী
কুঁড়ের বাদশার কাহিনী
নওজোয়ান নূর ও বীরাঙ্গনা মিরিয়ামের কাহিনী
সপ্তম হীরক-কন্যার কাহিনী
আলা অল-দিন ও আশ্চর্য চিরাগ বাতি
জ্ঞানের সন্ধানে
গোলাপ-সুন্দরী ফরিজাদের কাহিনী
কামর ও হালিমার কাহিনী
হারাম-আকিলের কাহিনী
সুলতান মহম্মদের ন্যায় বিচার
শেখ হাসান আবদাল্লার কাহিনী
আবু কাশেমের অঙ্গবাস
চরসের নেশায়
ভ্রষ্টা নারী এবং তার নওজোয়ান নাগর
বৃদ্ধ কাজীর তরুণী বিবি

সুন্দরী নূরের পাণিপ্রার্থীরা
মুতাবাকিল আল্লাহর বিত্ত বৈভব
সুলতান মামুদের কাহিনী
বসরাহর আবু কাশেম
তিন কুলজী-বিদ্যা-বিশারদের কাহিনী
সুলতান মামুদের বাঁদর
তিন পাগলের কাহিনী ঃ
প্রথম পাগল
দ্বিতীয় পাগল
তৃতীয় পাগল
আলিবাবা ও চল্লিশ চোর
বাগদাদের বড় সেতুর উপরে অল-রসিদ
সিদিনুমানের কাহিনী
কাঠুরিয়া যুবরাজ
বৃদ্ধ শেখের কাহিনী
খঞ্জ মাদ্রাসা শিক্ষকের কাহিনী
অন্ধ ভিখারীর কাহিনী
গবেটচন্দরের কাহিনী
তিন বোনের কাহিনী
তিন কন্যার কাহিনী
ফেরিওলার তিন কন্যা
দামাসকাসের রূপবান সওদাগর
হাবিব হাবিবার কাহিনী
সর্দারের নষ্টচরিত্রা বিবি
নফর ফিরুজের বিবি ও সুলতান
অপরিণামদর্শী সিরিয়া সওদাগরের শিক্ষা
হারুন অল রসিদের গ্রন্থপাঠ
শাহজাদা হীরার কাহিনী
গোহা ও তার ইয়ার-বন্ধুরা
তুফা অল কুল্‌বের কাহিনী
অল মালিক বাইবারসের দরবারে ঃ
প্রথম সর্দারের কাহিনী
দ্বিতীয় সর্দারের কাহিনী
তৃতীয় সর্দারের কাহিনী
চতুর্থ সর্দারের কাহিনী
পঞ্চম সর্দারের কাহিনী
ষষ্ঠ সর্দারের কাহিনী
সপ্তম সর্দারের কাহিনী
অষ্টম সর্দারের কাহিনী
নবম সর্দারের কাহিনী
দশম সর্দারের কাহিনী
একাদশ সর্দারের কাহিনী
দ্বাদশ সর্দারের কাহিনী
চীন শাহজাদীর বাগানের সমুদ্র-গোলাপ
দজ্জাল বিবির অত্যাচারে দেশত্যাগী
মারুফ-মুচির ভাগ্য-বিবর্তন
আলেকজান্দ্রা শহরের ধনী যুবকের কাহিনী
ফিন্দের দুই বীরাঙ্গনা কন্যা
ফতিমার কাহিনী
সম্রাট হজ্‌র-এর কাহিনী
আয়েশা কথিত কাহিনী
খলিফা ওমর ইবন অল খাতাবের কাহিনী
কুফার কবি মহম্মদ কথিত কাহিনী
পরান্নভোজী তুফেনের কাহিনী
খলিফা অল হাদীর অন্তিম দশা
অভিশপ্ত কণ্ঠহার
মশুলের গায়ক ইশাকের রোজনামচা
অল মামুন ও জুবেদা বেগমের কাহিনী
জাফরের অন্তিম দশা
শাহজাদা জুঁই আর শাহজাদী বাদামের
প্রেম উপাখ্যান

'সহস্র এক আরব্য রজনী' সম্পর্কে

আনন্দবাজার পত্রিকা (২১.৩.১৯৮৩)

বাংলায় ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্ত বা আংশিক আকারে আরব্য রজনী পড়েছি। এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বইটি পড়লাম। পড়ে যৎপরোনাস্তি আনন্দবিহ্বল হয়েছি। শ্রীসরকার যে এত চমৎকার সুললিত ফিক্‌শনি বাংলা গদ্য লিখতে পারেন, জানার সুযোগ এতদিন দেন নি। কেন দেন নি?

তার চেয়ে অবাক হওয়ার মতো ঘটনা, এই অতিকায় বইটির পেছনে তাঁর নিষ্ঠা, শ্রম এবং প্রযত্ন। কোথাও তাড়াহুড়া নেই, ফাঁকি নেই। পাতার পর পাতা দিলরুবা নামক পারসিক বীণার স্বপ্নাচ্ছন্ন ঝংকার। অনুবাদ মুলানুগ কিনা এ প্রশ্ন আদৌ ওঠে না এ ক্ষেত্রে। শ্রীসরকার অনবদ্য ভঙ্গিতে মায়াদণ্ডের মতো তাঁর কতকথাসুলভ গদ্য থেকে মায়াবিস্তার করেছেন। সেই সঙ্গে চিত্রশিল্পী শ্রীসত্য চক্রবর্তীর প্রশংসা না করলে অপরাধ হবে। শ্রীক্ষিতীশ সরকারের যাদুকর গদ্যকে এই প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী আশ্চর্য দক্ষতায় ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন।

SAHASRA-EK-ARABYA-RAJANI

Rendered into Bengali
By
Kshitish Sarkar

সহস্র একক আরব্য রজনী

এক সময়ে শসন বংশের এক প্রবল পরাক্রান্ত শাহেনশা প্রাচ্যের এক বিশাল সল্‌তানিয়তের শাসক ছিলেন। তাঁর ছিলো বিরাট সৈন্যবাহিনী, অগণিত ক্রীতদাস, আর ছিলো পেয়ারা প্রজাবৃন্দ। তাঁর দুই পুত্র।

বড়টি দীর্ঘকায়, সুঠামদেহী, যোদ্ধা। আর ছোটটি ছিলো বেঁটে-খাটো, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় জাঁদরেল। দু'জনেই দুর্ধর্ষ ঘোড়সোয়ার। বড়টির তাগদ আর বুদ্ধি ছোটর তুলনায় কিছু বেশী। হুকুমতে তার জুড়ি ছিলো না কেউ। প্রজাদের সুখ-দুঃখ, অভাব অভিযোগ দরদ দিয়ে বুঝতো। সেই কারণে, প্রজারাও তাকে জান প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। তার নাম ছিলো বাদশাহ শারিয়ার। আর ছোট ভাইয়ের নাম বাদশাহ শাহজামান। সে শাসন করতো সমরখন্দের আল্‌-আজম প্রদেশ। সেও ভারি পাক্কা শাসক—প্রজারা খুব ভালোবাসতো তাকে।

এই ভাবে বছর কুড়ি কেটে গেছে। খ্যাতি প্রতিপত্তিতে দু'জনেই তখন শীর্ষে। অনেককাল ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা নাই। বাদশাহ শারিয়ারের মন উতলা হয়ে উঠলো ভাইকে দেখার জন্য। উজিরকে ডেকে ফরমাশ করলো, একবার শাহজামানের কাছে যাও। গিয়ে বলো, আমি একবার দেখতে চাই তাকে। কেন জানি না, মনটা আমার অস্থির হয়ে উঠেছে, তাকে দেখার জন্যে। তাড়াতাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে —নিয়ে এসো তাকে।

উজির করজোড়ে বললো, যো হুকুম, জাঁহাপনা।

লোকলস্কর নিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করে রওনা হয়ে গেলো উজির। দু'দিনের পথ। আল্লাহর দোয়ায় নিরাপদে শাহজামানের দরবারে পৌঁছে বাদশাহ শারিয়ারের অভিপ্রায় পেশ করলো।

শাহজামান বললো; আমি আজই সব ব্যবস্থা করে রওনা হচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বাদশাহের প্রাসাদে সাজো সাজো রব পড়ে গেলো। ভালো ভালো তাঁবু, দামি দামি উট, গাধা, খচ্চর নেওয়া হলো। বাছাই করা হলো ক্রীতদাস, পালোয়ান। তারপর উজিরকে শাসকের ক্ষমতায় বসিয়ে রওনা হলো দাদার দেশে।

বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে এসেছে। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর। শাহজামানের হঠাৎ মনে পড়লো, দাদাকে যে জিনিসটা উপহার দেবে ভেবেছিলো, সেইটেই সঙ্গে নিতে ভুল হয়ে গেছে। তাই আবার ফিরতে হলো প্রাসাদে। হারেমে ঢুকেই সোজা চলে এলো খাস বেগমের ঘরে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই থমকে গেলো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। সারা দুনিয়া আঁধার হয়ে গেলো তার সামনে। তার খাস বেগম একেবারে বিবস্ত্রা, একটা আবলুস-কালো নিগ্রো ক্রীতদাসের সঙ্গে জড়াজড়ি করে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। হায় খোদা, একী দেখালে আমাকে? আমার এতোদিনের এতো ভালোবাসা, সব কি মিথ্যে? মাত্র কয়েকঘণ্টা, প্রাসাদ ছেড়ে গেছি আমি, তার মধ্যে এই কাণ্ড! না জানি, বড়ভাইয়ের কাছে থাকার কালে, আরও কত কী ঘটতো! খাপ থেকে তলোয়ার খুলে, প্রচণ্ড এক কোপে দু'জনকেই দু'খানা করে ফেললো শাহজামান।

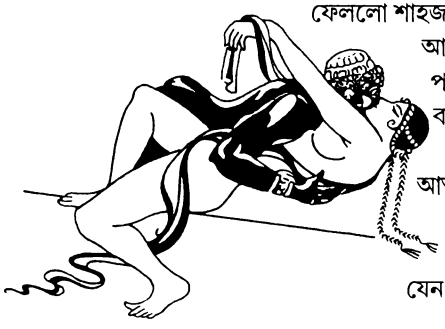

আর কালবিলম্ব না করে আবার দাদার উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়লো। দু'দিন দু'রাত্রি চলার পর বড়ভাইয়ের শহরে পৌঁছলো সে।

ভাইকে পেয়ে বাদশাহ শারিয়ার আনন্দে আত্মহারা। সারা প্রাসাদে হৈচৈ পড়ে গেলো। ভাইকে বুকে জড়িয়ে আদর করলো। কতকাল পরে দেখা। কত কথা জমা হয়ে আছে। সব যেন একনাগাড়ে বলতে চায় শারিয়ার।

কিন্তু শাহজামানের মুখে কোনও হাসি নাই। বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে তার দেহে, মনে। বড় ভাইয়ের আনন্দে তাল দিতে পারলো না সে। কোনরকমে হুঁ, না বলে কথার জবাব দিতে থাকলো। তার মনে তখন সেই একই প্রশ্ন। এতো প্রেম, ভালোবাসা পায়ে দলে, কী করে সে পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করতে পারলো? দুনিয়ায় কি ভালোবাসা , বিশ্বাসের কোনও দাম নাই?

চিন্তায় চিন্তায় চোয়াল দু'টো তুবড়ে ঝুলে পড়েছে। সারা দেহটা যেন বৈশাখী ঝড়ে বিধ্বস্ত এক শাল গাছ। শাহজামানকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে শারিয়ার ভাবে, নিজের দেশ ছেড়ে এসে ভাই বোধ হয় স্বস্তি পাচ্ছে না। নানা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সেদিন আর কথা না বাড়িয়ে বিশ্রাম করতে বলে চলে গেলো। পরদিন সকালে আবার এলো ভাইকে দেখতে। দেখলো, সেই একই অবস্থা। খানাপিনা প্রায় করেনি বললেই চলে। শারিয়ার জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে তোমার, ভাই? কাল থেকে লক্ষ্য করছি, তুমি ভীষণ চিন্তিত। তোমার মুখে হাসি দেখিনি একবারও। কী ব্যাপার, খুলে বলো তো।

শাহজামান বললো, বুকের ভেতরটা হু হু করে পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন, সেকথা বলতে পারবো না এখন।

বেগমের সেই জঘন্য ব্যভিচারের কথা বলবেই বা কী করে?

শারিয়ার বুঝলো, নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে প্রসঙ্গে আর না গিয়ে বললো, চলো, শিকারে যাই। দেখবে দেহমন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

শাহজামান বললো, তুমি একাই যাও, দাদা। আমার কিছুই ভালো লাগছে না। শিকারে গেলেও ভালো লাগবে না। বরং তোমার আনন্দ মাটি করে দেবো।

শারিয়ার আর ঘাঁটাঘাঁটি করলো না তাকে। একাই বেরিয়ে পড়লো শিকার সন্ধানে। সঙ্গে গেলো লটবহর, লোক-লস্কর। এলাহি ব্যাপার।

প্রাসাদের যে ঘরে শাহজামানকে থাকতে দেওয়া হয়েছিলো, সে-ঘরের জানালা দিয়ে ওপাশের বাগিচা দেখা যায়। নানা ফুলের গাছে ভরা। মাঝখানে সান বাঁধানো বিরাট এক চৌবাচ্চা। তার মাঝখানে এক জলের ফোয়ারা। অবিরাম ধারা-বর্ষণ করে চলেছে। বড় সুন্দর, বড় মনোরম।

প্রাসাদের পিছনের দরজা খুলে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে কিলবিল করে বেরিয়ে এলো কুড়িটা ক্রীতদাসী আর কুড়িটা ক্রীতদাস। আর তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলো স্বয়ং বেগম সাহেবা। সবাই বিবস্ত্র, নগ্ন হয়ে জোড়ায় জোড়ায় গিয়ে বসলো—বাগিচার নানা জায়গায়। হঠাৎ কঁকিয়ে উঠলো বেগম, মাসুদ ও মাসুদ।

একটা দৈত্যের মতো নিগ্রো ছুটে গেলো বেগমের দিকে। দু'হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এসে আলতোভাবে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিলো বেগমকে। তারপর নিগ্রোটার ওই বিশাল বপুর উথাল পাথাল পেষণে পিষ্ট হতে থাকলো বেগমের কুসুম-কোমল দেহটা। এইভাবে চলতে থাকে সুরত সারা রাত ধরে। বেগমের ইঙ্গিতে তার দাসদাসীরাও একই রঙ্গে মেতে ওঠে।

এই দৃশ্য দেখে নিজের মনে খানিকটা সান্ত্বনা পায় শাহজামান। হায় খোদা, দাদার দুর্ভাগ্য তো দেখছি আমার চেয়েও বেশী। বুকটা ঈষৎ হাল্কা বোধ করলো। একটু সরাব নিলো, একটু খানা খেলো। ধীরে-ধীরে চাঙ্গা হতে লাগলো দেহ-মন।

এদিকে বাদশাহ শারিয়ার শিকার শেষে, প্রাসাদে ফিরে ভাইয়ের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে গেলো। দেখে খুশি হলো, ভাই তার বিষণ্ণদশা কাটিয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

পরদিন সকালে এসে শারিয়ার প্রশ্ন করে, কেমন করে আবার খুশ মেজাজ ফিরে পেলে, ভাই?

শাহজামান বললো, তবে বলি শোনো, কেন আমি অমন বিষাদে ডুবে গিয়েছিলাম। যখন তুমি তোমার উজিরকে পাঠালে আমার কাছে, আনন্দে নেচে উঠলো আমার মন। কতকাল বাদে তোমার সাথে মিলবো, খুশি না হয়ে পারি! লোকলস্কর সঙ্গে করে তোমার শহরের পথে পা বাড়ালাম। কিন্তু কিছু দূর আসার পর মনে পড়লো, একটা দরকারি জিনিস সঙ্গে নিতে ভুলে গেছি। আবার ফিরতে হলো প্রাসাদে। কিন্তু প্রাসাদে এসে, হারেমে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে তামাম দুনিয়া বরবাদ হয়ে গেলো আমার কাছে। আমার খাস বেগম, আমাকে ছেড়ে একটা দিন সে থাকতে পারতো না। আমার অদর্শন সইতে পারতো না একদম। সেই বেগমকে দেখলাম, বিবস্ত্রা, উলঙ্গ হয়ে এক নিগ্রো ক্রীতদাসকে জড়িয়ে ধরে আমারই পালঙ্কে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মাথায় খুন চেপে গেলো। তলোয়ারের এক কোপে দু'জনকে দু'খানা করে দিয়ে এসেছি।

কেন এতো ভেঙে পড়েছিলাম আমি, সেকথা শুনলে। কিন্তু কী করে সব শোক তাপ ভুলে আবার খোশ-মেজাজ ফিরে পেলাম সেকথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, দাদা। বলতে পারবো না।

শাহজামানের এ কথা শুনে অধৈর্য হয়ে পড়লো শারিয়ার। হায় আল্লাহ, তোমাকে এতো করে বলছি, তবু কেন বলতে চাইছো না? সঙ্কোচ করার কোনো কারণ নাই, তুমি খুলে বলো, দেখি।

শাহজামান খুলে বললো সব। শুনে অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলো শারিয়ার। তারপর বললো, নিজের চোখে দেখতে চাই আমি। তুমি হয়তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খোয়াব দেখেছো, ভাই।

শাহজামান হেসে বলে, না দাদা, ঘুম আমার ছিলো না চোখে। ওই ঘটনার পর, নাওয়া খাওয়া ঘুম কিছুই করিনি আমি। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে নিজের চোখে একদিন দেখো। আবার তুমি ঢ্যাড়া দিয়ে দাও, তুমি আবার শিকারে যাবে। আসলে কিন্তু যাবে না। আমার ঘরে এসে লুকিয়ে থাকবে। দেখো, যেন কেউ টের না পায়। তারপর নিজের চোখেই দেখতে পাবে, ওদের সব কাণ্ডকারখানা।

তিল মাত্র দেরী না করে তখুনি ঢ্যাড়া পিটিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হলো। বাদশাহ যাবেন শিকারে। আবার সাজো সাজো রব। লটবহর, লোকলস্কর নিয়ে রওনা হলো বাদশাহ শারিয়ার। বাদশাহর খাস নোকর ছিলো দু'টি। খুব বিশ্বাসী। ওদের বললো, আজ রাতে আমি তাঁবুর বাইরে যাবো। কিন্তু সাবধান, কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে। যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, স্রেফ ভাগিয়ে দিবি। বলবি, বাদশাহর তবিয়ৎ আচ্ছা নাই, দেখা হবে না। তার বারণ আছে। তা সে স্বয়ং উজিরও যদি আসে, তাকেও এই একই কথা বলে ফিরিয়ে দিবি, বুঝলি?

রাত যখন ঘনিয়ে এলো, এক ফকিরের ছদ্মবেশে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো শারিয়ার। হন হন করে হেঁটে চলে এলো প্রাসাদের খিড়কীর দরজার কাছে। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে, টুক করে ঢুকে পড়লো। তারপর সোজা শাহজামানের ঘরে। সেই জানালার পাশে বসে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো বাগিচার দিকে।

ঘণ্টাখানেক বাদে হারেমের পিছনের দরজা খুলে গেলো। আর হুড়মুড় করে বেড়িয়ে এলো কুড়ি জোড়া দাসদাসী। আর এলো বেগম। আবার সেই ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি। হুবহু এক। শারিয়ার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এই ব্যভিচারিণীকে সে এতোকাল বিশ্বাস করেছে, ভালোবেসেছে! ঘৃণায় রিরি করে ওঠে সারা শরীর।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে, ওরা আবার ঢুকে পড়ে হারেমে। ইত্যাকার দৃশ্য দেখে শারিয়ারের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে থাকে। শাহজামানকে বললো, ঢের হয়েছে, চলো ভাই

এই নরক থেকে, এই পাপপুরী থেকে আমরা কেটে পড়ি। এমন দেশে যেতে চাই, যেখানে এই সব অনাচার, ব্যভিচার নাই, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা নাই। আমাদের মতো আর কোন হতভাগ্যের সন্ধান মেলে কিনা তাও একবার খুঁজে পেতে দেখি।

শাহজামানেরও সেই কথা। এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই প্রতারণার দুনিয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভালো।

সেই রাতেই প্রাসাদের খিড়কীর দরজা দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়লো তারা। দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলতে থাকে। অবশেষে একদিন এক সমুদ্রের উপকূলে এসে হাজির হলো। নির্জন সৈকত। কাছের এক বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে থাকে তারা।

ঘণ্টাখানেক কেটেছে। হঠাৎ নজরে পড়লো, দূরে সমুদ্রের মাঝখানে এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমশ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ঐ কুণ্ডলীটা এক বিকটাকার আফ্রিদি দৈত্যের রূপ ধারণ করলো। এই না দেখে দু'ভাইয়ের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। দৈত্যটা কূলের দিকে এগিয়ে আসছে। উপায়ন্তর না দেখে গুঁড়ি বেয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসলো দু'জনে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ওদের গাছের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগলো আফ্রিদি। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেলো। আরো কাছে আসতেই নজরে পড়লো, তার মাথায় বিরাট একটা বাক্স। গাছের তলায় এসে বাক্সটা নামিয়ে বসে পড়লো সে। বাক্সটার ভেতর থেকে একটা লোহার সিন্দুক বের করলো। সিন্দুকটা খুললো। কী আশ্চর্য! তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো বেহেস্তের পরীর মতো পরমা সুন্দরী এক যুবতী। কী তার রূপের ছটা! গাছের তলাটা আলোয় ঝলমল করে উঠলো। কাব্য করে বলতে গেলে বলা যায় :

তার রূপের আলো সকালবেলার সূর্য ওঠার মতো।
আঁধার রাতেও আসে যদি, দিনের আলো দেখি।
দেহটা কি সূর্যকণায় গড়া?
মরি মরি, ধার করা রহস্যের ওড়নায় ঢাকা,
তার চোখের হাসির ঝিলিকে,
নিরন্তর বন্দী হয়ে আছে বুঝি চাঁদ।
তামাম দুনিয়ার যত পৌরুষপ্রেম পায়ে থাকে তার!

মুগ্ধ নয়নে, অনেকক্ষণ ধরে, দৈত্যটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো তার রূপ, যৌবন। তারপর আদর করে বলতে লাগলো, বুকের কলিজা, তোমার শাদীর দিনে তোমাকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছি। সেই দিন থেকে আমার চোখে ঘুম নাই। দুস্তর সাহারা সমুদ্র ঘুরে বেড়িয়েছি তোমাকে মাথায় করে। আজ আমি বড় ক্লান্ত। ঘুমে চোখ আমার বুজে আসছে। একটু ঘুমুতে চাই।

এই বলে মেয়েটির কোলে মাথা রেখেই নাক ডাকাতে লাগলো।

একা একা বসে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে, মাথার ওপরে গাছের ডালে শাহজামানদের দু'জনকে দেখতে পায় মেয়েটি। আফ্রিদির মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। ইশারা করলো ওদের, হাতছানি দিয়ে ডাকলো। নিচে নেমে আসতে বললো। আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলো, দৈত্যের ঘুম এখন ভাঙবে না, তোমরা নির্ভয়ে নিচে নামতে পারো।

গাছের ওপর থেকে ওরাও ইশারাতেই জানালো, খোদা তোমার ভালো করবেন। কিন্তু তুমি আমাদের মাফ করো। না হলে আমরা মরে যাবো।

যুবতী ভরসা দিলো। খোদার নামে হলফ করে জানালো, তাদের কোন ক্ষতি হবে না। তড়িঘড়ি নেমে আসার জন্যে হুকুম করলো। আর জানালো, তার হুকুম যদি তামিল না করে তারা, তবে আখেরে ভালো হবে না। আফ্রিদিকে জাগিয়ে শায়েস্তা করা হবে। গলা টিপে মেরে ফেলবে সে। এখনো সময় আছে, ওরা নেমে এসে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুক। না হলে সে দৈত্যকে জাগাতে বাধ্য হবে। আর তার পরিণাম অবধারিত মৃত্যু।

গাছের ডালে বসে, অসহায়ের মতো এ ওর দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে দুই ভাই। শারিয়ার জানায়, তুমি আমার ছোট ভাই, তুমি আগে নামো। শাহজামান জানায়, না, তা হয় না। চলো দু'জনে একসঙ্গেই নামবো। মরতে হয় দু'জনে এক সঙ্গেই মরবো। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না।

ওরা ভয়ে ভয়ে নেমে এসে দাঁড়ালো মেয়েটির পাশে। আর তৎক্ষণাৎ মেয়েটি মাটির উপর শুয়ে পড়ে ডাকলো, তোমরা এক এক করে এসে আমার দেহের জ্বালা জুড়িয়ে দাও। তোমাদের একজন চলে এসো এখুনি। আর দেরি করো না। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। সইতে পারছি না এই যন্ত্রণা। এসো। চটপট।

কিন্তু কে আগে যাবে! এ ওকে ঠেলে। বড় বলে, তুমি ছোট, তুমি আগে যাও। ছোট বলে, তা হয় না। তুমি বড়, তোমার পর আমার পালা।

কারো মুখে ভাষা নাই। চোখের ইশারাতেই বলাবলি করতে থাকে তারা। মেয়েটি বিরক্ত হয়। ক্রুদ্ধ হয়। তর্জনী নাচিয়ে জানায়, চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে কী কথা হচ্ছে তোমাদের? আমি আর এক লহমা দেরি করবো না কিন্তু! এক্ষুনি আসবে তো এসো, না হলে আফ্রিদিকে ডাকছি।

দৈত্যের হাতে প্রাণে মারা যাবার ভয়ে দু'ভাই-ই পর পর যুবতীর সম্ভোগের শিকার হলো। যে ভাবে চাইলো সেই ভাবে খুশি করতে হলো তাকে।

ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো মেয়েটির। বললো, তোমরা দু'জনেই জব্বর কায়দা-কানুন জানো, দেখছি!

সেমিজের পকেট থেকে একটা ছোট্ট থলে বের করলো মেয়েটি। থলেটার ভেতর থেকে তুলে ধরলো একটা আংটির ছড়া। বললো, জানো, এগুলো কী? এই চেনে একশো সত্তরটি আংটি রয়েছে। এই মুখপোড়া আফ্রিদিটার চোখে ধুলো দিয়ে যাদের দিয়ে আমার কাম হাসিল করিয়েছি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা করে আংটি নিয়ে এই চেনে গেঁথে রেখেছি। এগুলো আমার স্মৃতি চিহ্ন। তোমাদের কাছেও চাইছি দু'টো আংটি। দাও, এর সঙ্গে গেঁথে রাখবো। পরে যখন দেখবো, তোমাদের সঙ্গে আজকের এই সুখ-সম্ভোগের কথা মনে পড়বে আমার।

এ কথা শুনে স্তম্ভিত হলো ওরা। দু'জনেই একটা করে আংটি খুলে দিলো রূপসীর হাতে। মেয়েটি বললো, জানো, এই শয়তান দৈত্যটা আমার শাদীর রাতে চুরি করে নিয়ে এসেছে আমাকে। এই লোহার সিন্দুকে কয়েদ করে, সিন্দুকটাকে আবার ঐ বাক্সটায় ভরে, লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে, মাথায় করে ঘুরেছে নির্জন মরুপ্রান্তরে, জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে। কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। শেষে, ঐ সমুদ্রের তলায় নেমে গিয়ে অন্য পুরুষের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে আমাকে। কিন্তু ও ব্যাটা জানে না, আমরা—মেয়েরা যা চাইবো, যেন-তেন-প্রকারেণ তা পূরণ করবোই। কেউ কখনো তা রোধ করতে পারেনি, পারবে না। তাহলে কবির ভাষায় শোনো ঃ

ওগো বন্ধু, বিশ্বাস করো না তাকে।
মুচকি হেসে উপেক্ষা করো তার ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা।
দয়িতের জন্যে ছলাকলা,

আর প্রতারণা—কিছুই অসাধ্য নয় তার।
গাল ভরা মিথ্যা বলে ভালোবাসার অভিনয়ে পটিয়সী সে।
একান্ত নিবিষ্ট মনে যখন সে পশমের কারুকার্যে রত,
তখনো আচ্ছন্ন থাকে পরকীয়া প্রেমে
মনে রেখো সেই কথা—ইউসুফের,
কান পেতে শোনো সেই আদমের মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন—
আজও শোনা যায়.....

শাহজাদাদের চৈতন্য উদয় হয়। এই ভয়ঙ্কর দৈত্যের এমন দুর্ভেদ্য সুরক্ষাকে কলা দেখিয়ে এই সুন্দরী কলাবতী যেভাবে তার কাম হাসিল করে চলেছে তা কল্পনাতীত! এর তুলনায় তাদের বেগমদের প্রহরা কিছুই নয়। এই ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পেলো ওরা। আর কালবিলম্ব না করে তক্ষুনি নিজের নিজের শহরে ফিরে গেলো।

প্রাসাদে পা দিয়েই বাদশাহ শারিয়ার নিজের হাতে বেগমের গর্দান নিলো। হারেমে যত দাসদাসী ছিলো সবাইকে কোতল করার হুকুম দিলো। তারপর উজিরকে ডেকে বললো, আজ থেকে প্রতি সন্ধ্যায় একটি কুমারী মেয়ে চাই আমার শোবার ঘরে। সারা রাত ধরে তাকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করবো আমি। আর ভোর বেলায় নিজের হাতে হত্যা করবো তাকে। যাতে সে অন্য পুরুষের অঙ্কশায়িনী না হতে পারে। উজির, এখন তোমার কাজ হলো—প্রতি রাত্রে একটি করে কুমারী মেয়ে জোগাড় করে আনা।

বাদশাহর হুকুমে তিনটি বছর ধরে প্রতি রাত্রে একটি করে মেয়ে জোগাড় করে আনতে থাকে উজির। দেশব্যাপী নিদারুণ আতঙ্ক। যাদের ঘরে ডাগর মেয়ে ছিলো তারা প্রাণ ভয়ে দেশান্তরী হতে লাগলো। যারা পালাতে পারলো না—তাদের মেয়েরা বাদশাহর এই নারকীয় নৃশংস খেয়ালের শিকার হতে লাগলো। আদরের দুলালীকে বুকে আড়াল করে খানা খন্দে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে প্রান্তরে পালিয়ে বেড়াতে থাকে প্রজারা। যে বাদশাহকে একদিন আল্লাহর পয়গম্বর জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা জানাতো সেই বাদশাহর নাম শুনে আজ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা। তার সর্বনাশ, তার মৃত্যু কামনা করতে থাকে নিয়ত।

কিন্তু বাদশাহর রোষ থেকে রক্ষা পাওয়া শক্ত। পাহাড় পর্বত প্রান্তরে পালিয়ে থাকা মানুষের বুক থেকেও ছিনিয়ে নিয়ে আসে তাদের আদরের কন্যা। এইভাবে তামাম দেশের কুমারী কন্যা নিঃশেষ হয়ে গেলো।

অবশেষে একদিন সারা দেশ চষে বেড়িয়েও একটি ডাগর কুমারী মেয়ে জোগাড় হলো না। সারাদিন পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে শূন্য হাতে ফিরে এলো উজির। বাড়ি ফিরে বিষণ্ণ মনে বসে বসে নিজের নসীবের কথা চিন্তা করতে থাকে। খালি হাতে বাদশাহর সামনে দাঁড়ানো মানেই গর্দান বাড়িয়ে দেওয়া।

উজিরের দুই কন্যা। দু'টিই পরমা সুন্দরী। রূপের চেয়ে গুণ আরও অনেক বেশী। রুচি, প্রকৃতি, বিদ্যা-বুদ্ধি, বিচক্ষণতায় তাদের জুড়ি নাই। বড় কন্যার নাম শাহরাজাদ। আর ছোটটির নাম দুনিয়াজাদ। শাহরাজাদ ইতিহাসে পণ্ডিত। সেকালের নবাব-বাদশাহদের কাহিনী, নানা দেশের বিচিত্র কিংবদন্তী তার ঠোঁটস্থ। হাজার হাজার গল্প-গাথা পড়েছে সে। তার বিনম্র ব্যবহার, আর সুললিত কণ্ঠের গানে মুগ্ধ হয় সবাই।

বাবাকে ওইভাবে বিষণ্ণ, চিন্তিত দেখে বড় মেয়ে শাহরাজাদ জিজ্ঞেস করে, আব্বাজান, তোমাকে আজ এমন চিন্তায় উদ্বিগ্ন দেখছি কেন? কী হয়েছে? কোন বিপদ আপদ ঘটেছে কি? তুমি তো জানো, আব্বাজান, কবি বলেছেন : কোন কিছুর জন্যেই শোকে দুঃখে কাতর

হয়ে ভেঙে পড়া উচিত নয়। কারণ, সুখ যেমন চিরদিন থাকে না তেমনি দুঃখও চিরস্থায়ী নয়।

মেয়ের কথা শুনে একটু ভালো লাগে। বাদশাহর নৃশংস খামখেয়ালীপনার আদ্যোপান্ত সব কাহিনী বললো উজির।

শাহরাজাদ বললো, খোদা ভরসা, আব্বাজান, আজ রাতেই তুমি আমার শাদী করিয়ে দাও বাদশাহ শারিয়ারের সঙ্গে। আমি যদি সাচ্চা মুসলমানের মেয়ে হয়ে থাকি তবে বেঁচে থাকবো। আর যদি মরতেই হয় তবে এমন কাজ করে মরবো যাতে বাদশাহর ভয়ে কোন মানুষকে দেশ ছেড়ে পালাতে না হয়।

মেয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলো উজির, আল্লাহ্ তোমার ভালো করবেন, মা। এই বিপদের দিনে একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমার আসল পরিচয় কখনও ফাঁস করো না তার কাছে।

শাহরাজাদ বললো, তা আমি খুব ভালো করেই জানি, আব্বাজান।

উজির বললো, সেই গাধা, বলদ আর গৃহস্বামীর উপাখ্যান শুনেছো? তা হলে বলি, শোনো।

অনেকদিন আগে এক ধনী পশুপালক বাস করতো বিস্তীর্ণ উর্বর শস্যক্ষেত্রের পাশে, এক নদীর ধারে। একটা গাধা আর একটা বলদ ছিলো তার খামারে। একদিন বলদটা গোয়ালে ঢুকে দেখে, গাধাটা যবের ভুষি মাখানো জাবনা খেয়ে, পেটটা ডাঁই করে, বিচালি পাতা গদির ওপর শুয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে।

রোজ গাধাটার পিঠে চড়ে খামারের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে আসে মনিব। তারপরই গাধার ছুটি। খেয়ে দেয়ে ঘুমানো ছাড়া আর কোন কাজ করতে হয় না।

বলদের প্রবেশে গাধার নিদ্রাভঙ্গ হয়। দুঃখ করে বলদটা বলে, তোমার কী সুখ ভায়া। দিব্যি খাচ্ছো-দাচ্ছো আর ঘুমোচ্ছ। এরকম সুস্বাদু দানাপানি আমরা চোখেও দেখিনা।

এই সময় ওদের মনিব গোয়ালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। বলদের কথা শুনে ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলো। বলদ বলতে লাগলো, আমার মতো তো তোমাকে খেটে খেতে হয় না ভাই। এই দ্যাখো, খেটে খেটে শরীরটা আমার কেমন হাড় জির-জিরে হয়ে গেছে। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার দেহটা কেমন নাদুস-নুদুস হচ্ছে। কখনো-সখনো তোমার পিঠে চেপে একটু আধটু ঘুরে আসে মনিব। তারপর সারাদিন তোমার ছুটি। খেয়ে দেয়ে নাক ডাকাও। আর আমার দ্যাখো, সেই যে সাত সকালে ঘাড়ে জোয়াল চাপায়, সন্ধ্যার আগে আর রেহাই নাই।

বলদের কথা শুনে গাধার বড় দুঃখ হলো। বললো, শোনো, তোমাকে আমি একটা ফন্দি শিখিয়ে দিই। কাল সকালে চাকরটা যখন তোমাকে হালে নিয়ে যেতে আসবে তখন তুমি কিছুতেই উঠবে না। কিন্তু চাকরটা খুব মারবে। তা মারুক। তুমি সহজে যেতে চাইবে না। কিন্তু চাকর ব্যাটা তোমাকে ছাড়বে না। মেরে ধরে মাঠে নিয়ে যাবেই। তুমি কিন্তু জোয়াল ঘাড়ে নেবে না। জোর করে চাপাবে চাকরটা। কিন্তু দু-এক পা টেনেই ধপাস করে মাটিতে শুয়ে পড়বে। আবার খুব মারবে। কিন্তু তুমি উঠবে না। তখন ওরা ভাববে, তোমার কোন অসুখ-বিসুখ করেছে। দেখবে, তখন তুমি রেহাই পেয়ে যাবে।

ওদের সব কথাই শুনে নিলো মনিব। তার পরদিন লক্ষ্য করলো, গাধা যে সব ফিকির শিখিয়ে দিয়েছিলো, বলদটা ঠিক ঠিক সেই ভাবেই অভিনয় করে যেতে থাকলো। দানাপানি খেলো না। লাঠিপেটা করেও মাঠে নেওয়া যায় না। জোয়াল কাঁধে চাপাতেই মাটিতে শুয়ে পড়ে। মনিব তখন নোকরটাকে বললো, মনে হচ্ছে, বলদটার কোন অসুখ-বিসুখ করেছে। তুই এক কাজ কর, বলদটাকে গোয়ালে রেখে গাধাটাকে নিয়ে এসে জোড়।

মনিবের কথা মতো, গাধাটাকে এনে হালে জুড়ে সারাদিন ঠাঠা রোদে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটালো চাকরটা। দিনের শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ নিয়ে যখন গোয়ালে ফিরে এলো, তখন বলদ

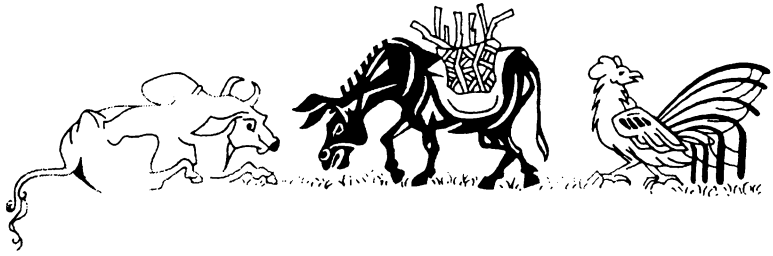

তাকে দু-হাত তুলে দোয়া জানাতে থাকে। খোদা, তোমার ভালো করবেন, ভাই। তোমার বুদ্ধিতে আজ একটু আরাম পেয়েছি।

গাধা কিন্তু গম্ভীর। কোনও জবাব দিলো না। নিজের বোকামির জন্যে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো।

পরদিন নোকর এসে আবার গাধাকে নিয়ে গিয়ে হালে জুড়লো। সারাদিন ধরে আবার সেই হাড়ভাঙা খাটুনি। জোয়ালের ঘষায় অনভ্যস্ত ঘাড়ের ছালচামড়া উঠে ঘা হয়ে গেলো। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা টনটন করতে থাকে। হালের জোয়াল টানতে টানতে চোখে জল আসে। ভাবে তার সুখের দিনগুলো সব ফুরিয়ে গেলো। এখন কি সারাটা জীবন এই জোয়াল টানতে হবে তাকে?

সন্ধ্যাবেলায় গোয়ালে ফিরে গাধাটা কোনও কথাবার্তা না বলে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। বলদ কাছে মুখ বাড়িয়ে বলে, কি ভায়া, অমন মন-মরা হয়ে শুয়ে পড়লে কেন? একটু এসো, গল্প-সল্প করি।

গাধা বললো, কী আর বলবো ভাই। তোমার দুঃখে আমি মুষড়ে পড়েছি। এতোকাল একসাথে আছি আমরা, কিন্তু আজ যা শুনলাম.... মনিব আর রাখবে না তোমাকে—

—সেকি! রাখবে না মানে? বলদটা আঁৎকে ওঠে। তবে কী করবে আমাকে? মেরে-টেরে ফেলবে না তো? কী শুনেছো, বলো না, ভাই—

—কষাই-এর কাছে বেচে দেবে। লোকটাকে বলছিলো, মনিব, বলদটা বোধহয় বাঁচবে নারে। ওটা যদি মরে যায়, আমার অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে। তার চেয়ে কষাই-এর কাছে বেচেই দিই, কী বলো? তবু যাহোক মোটামুটি ভালোই দাম পাওয়া যাবে। মনিবের এই কথা শুনাতক আমি কাঁদছি ভাই। কী করে এতো বড় দুঃসংবাদ দেবো তোমাকে, তাই ভেবে আমি কূল পাচ্ছিলাম না। এতোকাল আমরা একসাথে আছি, এতোদিনের প্রাণের ভালোবাসা আমাদের। আজ যদি তোমাকে ওরা কষাই-এর হাতে তুলে দেয় তা হলে আমি বাঁচবো কী নিয়ে? এবার বাঁচার একটা উপায় বের করো ভাই।

বলদ কৃতজ্ঞ হয়ে বললো, খবরটা জানিয়ে তুমি আমার জান বাঁচালে ভাই। কী বলে তোমাকে সুক্রিয়া জানাবো, ভেবে পাচ্ছি না। কাল সকালেই আমি টগবগিয়ে উঠে দাঁড়াবো। আজ থেকেই আমি পেটপুরে দানাপানি খাবো। ফুর্তিসে হাল টেনে মনিবকে বুঝিয়ে দেবো, অসুখ-ফসুক আমার সেরে গেছে।

এই বলে বলদটা উঠে গিয়ে জাবনা খেতে শুরু করলো। এদিকে গোয়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে মালিক বলদ আর গাধার সব কথাবার্তা শুনে নিলো।

পরদিন সকালে নোকরটা গোয়ালে ঢুকে অবাক। বলদটা উঠে দাঁড়িয়ে চনমন করছে। গাধাকে রেখে আজ আবার সে বলদটাকে নিয়ে রওনা হলো। গাধা হাসলো।

মালিক তার বৌকে বললো, চলো, আজ মাঠে যাই। তোমাকে একটা মজা দেখাবো।

ওরা দু'জনে মাঠে এসে একপাশে বসলো। চাকরটা বলদটাকে নিয়ে হালে জুড়তেই টগবগিয়ে উঠলো। অন্যদিনের চেয়ে আরও জোরে হুড় হুড় করে টানতে লাগলো হাল। এই না দেখে মালিক তো হেসে খুন। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। কী ব্যাপার কিছুই ঠাওর করতে পারে না বৌটা। জিজ্ঞেস করে, ওগো, কী হলো তোমার? অমন হাসছো কেন?

—হাসছি কেন? মালিক বললো, সে তোমাকে আমি বলতে পারবো না, বৌ। শুনলে তুমি হাসতে হাসতে মরে যাবে।

বৌটি কিন্তু সে কথায় আমল দিলো না। রেগে গিয়ে বললো, ওসব বাজে কথা রাখো। তুমি আমাকে দেখে হাসছো। ঠাট্টা করছো। আমি এমন কিছু করেছি, যা দেখে আমাকে নিয়ে তামাশা করছো তুমি।

মালিক তখন মেয়ের নামে হলফ করে বলে, তুমি বিশ্বাস করো, বিবিজান, তোমাকে দেখে না। হাসির অন্য কারণ আছে। গোড়া থেকে সব বলতে গেলে হাসতে হাসতে আমি মরে যাবো। আমার বয়স এখন কত জানি না। একশো কুড়ি বছর ধরে তোমার সঙ্গে ঘর করছি আমি। বুড়ো হয়েছি। একদিকে তুমি যেমন আমার চাচার মেয়ে, আর একদিকে তুমি আমার আদরের বিবিজান। আমার ছেলেমেয়েদের তুমি মা। তোমাকে আমি জান দিয়ে ভালোবাসি। তুমি আমার কলিজা। তোমার মনে যখন সন্দেহ জেগেছে, আমি তোমাকে তামাশা করে হাসছি, তখন সব কথাই বলবো। শুনলে বুঝবে, কেন হাসছি আমি। তাতে যদি হাসতে হাসতে দম ফেটে আমি মরে যাই সে ভি আচ্ছা! ঠিক আছে, ছেলেমেয়েদের ডাকো, পাড়াপড়শীদের খবর দাও, মাতব্বর মৌলভীদের সালাম জানাও। তারা সবাই আসুক। তাদের সাক্ষী রেখে আমার বিষয় সম্পত্তি উইল করি আগে। তারপর তোমাকে সব বলবো।

এরপর ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শী, মোড়ল-মৌলভী সবাই এসে জমায়েত হলো। সব বৃত্তান্ত শুনে সবাই মিলে বৌটাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, এমন একগুঁয়েমির ফল ভালো হয় না। তোমার স্বামী বুড়ো হয়েছে। এখন যদি আল্লা না করুন, কোন একটা কিছু ঘটেই যায় তাহলে কি তোমার আনন্দ হবে? তোমার একপাল ছেলেমেয়ের বাবা সে। এতোকাল ধরে একসাথে ঘর করছো। হাজার হলেও সে তো তোমার স্বামী। আজ যদি এই তুচ্ছ কারণে সে বেচারী মারা যায় তোমার কী দশা হবে, ভাবো।

কিন্তু ভোবি ভুলবার নয়। বৌটা তার গোঁ ধরেই বসে রইলো। না না, তোমরা জানো না, ও আমাকে ঠাট্টাতামাশা করে হেসেছে। কেন হেসেছে বলতেই হবে। না শুনে আমি ছাড়বো না; ছাড়বো না। এই আমার শেষ কথা।

অগত্যা মালিক গোয়ালের ওপাশে বাগানের মধ্যে একটা কবর খোঁড়ালো। মরার পরে এই কবরে তাকে সমাহিত করা হবে। উদ্দেশ্য এই রকম। তারপর তার হাসার গুপ্ত রহস্য বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলো।

একটা জবরদস্ত তাগড়াই মোরগ ছিলো মালিকের। আর ছিলো একটা মাদি কুকুর। পঞ্চাশটা মুরগীর সঙ্গে বাস করতো ঐ একটা মোরগ। সবাইকেই খুশি রাখতো ঐ একটা মোরগ। তার পরিবারের সবাই বেশ হাসি-খুশি। কারো কোন অভিযোগ ছিলো না।

হঠাৎ মালিকের কানে এলো, কুকুরটা খুব বকাবকি করছে মোরগটাকে। আমাদের

মালিক যখন মরতে বসেছে সেই সময় তোমার নাচনকোদনটা একটু থামাও না। লজ্জাশরম বলেও তো কিছু একটা থাকা দরকার।

মোরগটা হৈহল্লা করে দিন কাটায়। কারো সাতে পাঁচে নাই। কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে না। সে এসবের কোনই খোঁজ রাখে না। কুকুরটার কাছে মালিক আর তার বিবির কাহিনী শুনলো সব। তারপর দুঃখ করে বললো, হায় আল্লাহ্, আমাদের মালিক সাদামাটা মানুষ, বুদ্ধিশুদ্ধি বলে কিছু নাই। দ্যাখো, আমার পঞ্চাশটা বিবি। এতোগুলো মুরগী নিয়ে আমি ঘর করি। কত ভালোভাবে খুশি করে রেখেছি সবাইকে, কোন ঝগড়া বিবাদ দেখেছো কখনও? সবগুলোকে এক খাঁচায়, কেমন কব্জায় রেখেছি বলো? আর আমার মালিকের একটা মাত্র বিবি। সেই একটাকেই বাগ মানাতে পারে না? খুব সোজা পথে সব ঠাণ্ডা করা যায়। একটা জামের ডালের ছড়ি দিয়ে ঘা কতক দিলেই আপ্‌সে সব ঠিক হয়ে যেতো।

মোরগের কথা শুনে মালিকের চৈতন্য হয়। কথাটা তো মন্দ বলেনি মোরগটা। মালিক উঠে গিয়ে বিবিকে বললো, তুমি আমার শোবার ঘরে এসো। তোমাকে সেই গুপ্ত রহস্য বলবো।

এই বলে বাগানের দিকে চলে গেলো মালিক। একটু বাদে একটা জামের ডালের লাঠি হাতে নিয়ে ফিরে এলো। বিবি তখন শোবার ঘরে। লাঠিটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজার ছিটকিনি তুলে দিলো। কাছে এসে এক ঘুসিতে মাটিতে ফেলে দিলো বৌটাকে। তারপর এলোপাথাড়ি পেটাতে শুরু করলো সেই জামের লাঠিটা দিয়ে।

—ও বাবাগো, মলাম গো। বলে ছটফট করতে থাকে বৌটা। কিন্তু মালিক পিটিয়ে চলে সমানে। বৌটা ওর পা-দু'টো জড়িয়ে ধরে কাকুতি মিনতি করে, আর মেরো না আমাকে, আর মেরো না, গো। আমি জানতে চাই না তোমার গুপ্ত কথা। আমাকে ছেড়ে দাও, বাঁচাও। আর তোমার কথার অবাধ্য হবো না। বেয়াড়াপনা করবো না। আমাকে আর মেরো না।

জামের ডালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে লাগলো ওর স্বামী।

একটুক্ষণ পরে স্বামীর সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে পাড়াপড়শী, আত্মীয়স্বজন সবাইকে জানালো বৌটা, আমি খুব খুশি, আমার আর কিছু জানার নাই। কোন সন্দেহ নাই।

সবাই খুশি হয়ে ফিরে গেলো। এরপর তারা আরও বহুকাল সুখে সচ্ছন্দে ঘর সংসার করেছিলো।

এই বলে উজির থামলো। শাহরাজাদ বললো, আব্বাজান, আমার ইচ্ছার কথা তোমাকে বলেছি। এবার তোমার অভিপ্রায় কী, বলো।

আর কালক্ষেপ না করে কন্যাকে শাদীর সজ্জায় সাজতে বললো তার বাবা। বাদশাহকে গিয়ে জানালো, আজকের রাতের পাত্রী পাওয়া গেছে। এখুনি হাজির করছি হুজুরের খাস মহলে।

এদিকে শাহরাজাদ তার ছোট বোন দুনিয়াজাদকে সব বুঝিয়ে বললো, আমি বাদশাহর কাছে এক রাতের বেগম হতে যাচ্ছি। তোকে আমি ডেকে পাঠাবো। যাবি। বাদশাহর সঙ্গে আমার শাদী হবে। তারপর তার যা খেয়াল হয় করবে। সব কাজ কারবার শেষ হয়ে গেলে ঘুমুতে যাবার মুখে তুই আমার কাছে আব্দার ধরবি, দিদি গল্প শোনাও। না হলে আমার ঘুম আসবে না। তখন আমি শুরু করবো কিস্‌সা। এই চালেই মাৎ করতে হবে বাদশাহকে। আর যদি না পারি তো খোদার যা ইচ্ছা, তাই হবে।

একটু বাদে উজির এসে শাহরাজাদকে নিয়ে গেলো বাদশাহ শারিয়ারের খাস মহলে। শাদীর সাজে অপরূপ দেখাচ্ছিলো তাকে। কিন্তু শারিয়ার তার মুখের দিকে চেয়েও দেখলো না একবার। পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়লো। উজিরের দিকে চোখ রেখে বললো, , হুম্, তা হলে আজকের রাতের খোরাকটা এসে গেছে দেখছি।

শাহরাজাদের বুকটা কেঁপে উঠলো।

নিজেকে শক্ত রেখে মাথা নুইয়ে গলায় বিনয় ঢেলে বললো উজির, জি, হুজুর।

বাদশাহ যখন শাহরাজাদকে শয্যাকক্ষে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে। বাদশাহ সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করে, আহা কাঁদছো কেন সুন্দরী? ভয় কী? কিছু ভয় নাই। তুমি আমার বেগম হয়েছো। ভয় কী তোমার? বলো কী চাই তোমার?

—জাঁহাপনা, শাহরাজাদ অনুরোধ করে, আমার ছোট একটি বোন আছে। নেহাতই ছেলেমানুষ। ছোট থেকে একসঙ্গে আমাদের দিন কেটেছে। দিন রাত্রের কোনও সময়েই আমরা ছেড়ে থাকিনি। তাই খুব মন খারাপ লাগছে। আমাকে ছাড়া সে রাতে ঘুমুবে কী করে? খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তাকে।

—এই কথা। এ আর এমন কি, আমি এখুনি হুকুম করছি। তোমার বোনকে নিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুনিয়াজাদ এলো। দিদিকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলো। শাহরাজাদ তাকে শান্ত করলো—আদর দিয়ে, চুমু দিয়ে। শয্যার এক পাশে শুইয়ে দিলো। শারিয়ার শুয়েছিলো এতক্ষণ। তন্দ্রা এসেছিলো বোধহয়। দুনিয়াজাদের কান্নায় কেটে গেলো তন্দ্রা। উঠে বসলো। শাহরাজাদকে কাছে টেনে নিলো। তার অপাপবিদ্ধ কুমারী দেহটা আজ ভালুকের থাবায় ছিন্নভিন্ন হতে থাকলো। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইলো শাহরাজাদ। শুধু আল্লার কাছে আর্জি জানায় মনে মনে—এই পাশবিক অত্যাচার সহ্য করার শক্তি যেন আমার থাকে খোদা।

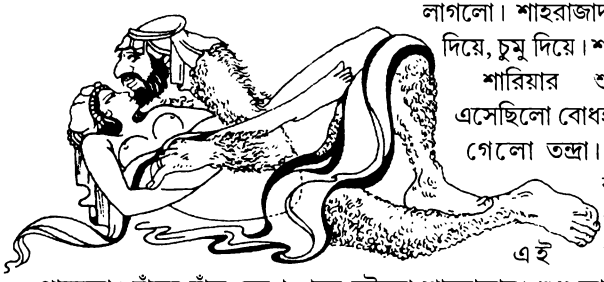

কিছুক্ষণ বাদে জানোয়ারটার কবল থেকে দেহটা মুক্ত করে বোন দুনিয়াজাদের পাশে গিয়ে ধুঁকতে লাগলো শাহরাজাদ। দিদিকে জড়িয়ে ধরে দুনিয়াজাদ আব্দার করে, এবার তোমার গল্প শোনাও দিদি, তোমার ঐ মজার মজার গল্পগুলো শুনে আমি কী যে আনন্দ পাই—সত্যি, এমন সুন্দর সুন্দর গল্প তুমি কী করে বলতে পারো, দিদি। তোমার গল্প একবার যে শুনেছে সে জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না। বলো না, দিদি। রোজ রাতে তোমার গল্প শুনেছি, আজ বলবে না?

শাহরাজাদ বললো, কিন্তু বোন, রোজ রাতের সঙ্গে আজকের রাতটা যে আলাদা। আজ আমি বাদশাহের বেগম। এখন তার হুকুম, তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ছাড়া তো কিছুই করা সম্ভব নারে পাগ্‌লি। তবে জাঁহাপনা যদি শুনতে চান, আমি শোনাতে পারি।

একথা শুনে শারিয়ারের কৌতূহল বাড়ে। কী এমন মজার কিস্‌সা! শোনাই যাক। বলে, ঠিক আছে শোনাও দেখি তোমার গল্প। আমিও শুনি। কিন্তু সকাল হবার আগে গল্প থামাবে। আমাকে ঘুমুতে হবে।

—তাহলে শুনুন, জাঁহাপনা। শাহরাজাদ শুরু করে। কোন এক সময়ে এক কোটিপতি ধনী ব্যবসায়ী ছিলো। তামাম দুনিয়ায় যতো ধনী ছিলো তাদের সকলের সেরা সে। এক সময়ে বাণিজ্যের অন্বেষণে ঘোড়ায় চেপে নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে থাকে সে। একদিন মধ্যাহ্ন সূর্যের খরতাপে দগ্ধ হয়ে শ্রান্ত হয়ে এক বিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায় এসে বসলো সেই সওদাগর।

খাবারের ডিবেটা বের করে খান কয়েক চাপাটি একটু শব্জী আর একটা ফল নিয়ে খানা শেষ করলো। হাত মুখ ধুয়ে মুখ তুলতেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে

এক বিশাল আফ্রিদি দৈত্য। হাতে তার শাণিত খাঁড়া। বলে, উঠে দাঁড়াও, আমি তোমাকে খুন করবো।

ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বণিক বললো, আমার কী গুনাহ্?

—তুমি আমার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেছো।

—আমি? কী করে?

—হ্যাঁ তুমি। হুঙ্কার ছাড়ে আফ্রিদি। খাওয়ার সময় একটা ফল খেয়ে আঁটিটা ছুঁড়ে দিয়েছিলে। সেই আঁটির ঘায়ে আমার প্রাণের বাছা প্রাণ হারিয়েছে। আমি তোমাকে রেহাই দেবো না। জানের বদলে জান নেবো।

সওদাগর তখন জোড় হাতে আবেদন করে, তুমি দানব শ্রেষ্ঠ। আমি জীবনে কখনও মিথ্যাচার করিনি। সজ্ঞানে কোন পাপ করিনি। যাই হোক, আমার অজ্ঞাতসারেই যদি তোমার পুত্রের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকি তবে যে শাস্তি দেবে মাথা পেতে নেবো। কিন্তু তার আগে আমার আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। তুমি সেই অনুমতি আমাকে দাও, এই আমার মিনতি। অগাধ বিষয় সম্পত্তি আমার। আমার মৃত্যুর আগে তার একটা বিলি ব্যবস্থা করা দরকার। সেজন্যেও একবার দেশে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমার জাত ব্যবসা বাণিজ্য করা। সেই হেতু কিছু দেনা পাওনা থেকে যায়। সেগুলো মিটিয়ে আসাও আমার কর্তব্য। কোন ঋণ রেখে আমি মরতে চাই না। মরতে আমি আদৌ ভয় পাই না। কারণ এক সময় না এক সময় মৌত আসবেই জীবনে। কেউ তা এড়াতে পারবে না। সে চাই—দু'দিন আগে হোক আর পিছে হোক। তাই মৌত-এ আমার কোন ভয় নাই। আমাকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দাও কিছুদিনের' জন্য। আমি দেশে যাই। সেখানকার কাজকাম সমাধা করে আবার এখানে ফিরে আসবো। তখন তোমার যা বিধান হয় সেই শাস্তি আমাকে দিও, মাথা পেতে নেবো। আল্লার নামে হলফ করে বলছি, আমি ফিরে আসবো—আসবো—আসবো।

দৈত্য বিশ্বাস করে ছেড়ে দিলো বণিককে। দেশে ফিরে এসে যা যা দায়দায়িত্ব ছিলো, এক এক করে সমাধা করতে লাগলো। বিবি আর বাচ্চাদের কাছে সব খুলে বললো নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো তারা। বিষয় সম্পত্তি যাকে যা দেবার সাধ ছিলো সেইভাবে দানপত্র তৈরি করে দিলো। এই সব করতে করতে বছরের প্রায় তিনভাগই কেটে গেলো। বাকী ক'টা দিন বৌ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটিয়ে আবার একদিন সেই দৈত্য-সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। তার শোকে ছেলেমেয়ে বৌ, পাড়াপড়শী সবাই আকুলভাবে কাঁদতে লাগলো।

চলতে চলতে একদিন সেই বিশাল বৃক্ষটার নিচে এসে দাঁড়ালো বণিক। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলো। এমন সময় দেখলো, শিকল বাঁধা একটা বুনো রামছাগলকে সামনে করে এক জোয়ান শেখ এগিয়ে আসছে তার দিকে।

বণিকের সামনে পৌঁছে সালাম জানালো শেখ। জিজ্ঞেস করলো, এই দৈত্যদানবের রাজ্যে বসে কী করছেন সওদাগর সাহেব?

বণিক তখন তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বললো তাকে। সব শুনে শেখ তো অবাক। বললো, খোদা মেহেরবান, কিন্তু সত্য রক্ষার জন্যে আপনার এই কাহিনী বিশ্বাস করবে না দুনিয়ার মানুষ।

শেখ নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকে বণিককে। খোদা ভরসা, তিনিই রক্ষা করবেন। দুশ্চিন্তা, ভয় মুছে ফেলুন মন থেকে।

এই সময় আর এক শেখের আগমন হলো সেখানে। তার সঙ্গে ছিলো দুটি

গ্রে-হাউন্ড জাতের কুকুর। তারও সেই একই প্রশ্ন। এই দৈত্যদানবের আস্তানায় কেন এসেছে সে? বণিকের দুর্ভাগ্যের কাহিনী সেও শুনলো। এই সময়ে আরও এক শেখ এসে হাজির হলো সেখানে। তার সঙ্গে ছিলো ছাই রঙের এক মাদি খচ্চর। যথারীতি একই প্রশ্ন তারও। সব শুনে তো তাজ্জব সবাই।

এমন সময়ে সামনের তপ্ত বালুকায় ঘূর্ণী ঝড় উঠলো। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এলো। একটা বালির স্তম্ভ খাড়াই উঠে যেতে থাকলো ঊর্ধ্ব মুখে। ক্রমশ বৃক্ষটার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে সেটা। ধীরে ধীরে সেই বিশাল বালুকারাশির গগনচুম্বী স্তম্ভটা এক বিকটাকৃতি আফ্রিদি দৈত্যের রূপ ধারণ করে দাঁড়ালো ওদের সামনে। শাণিত তলোয়ার উঁচিয়ে গর্জে উঠলো, উঠে এসো সওদাগর। তোমাকে আমি কোতল করবো। তুমি আমার জানের কলজে—প্রাণের বাছাকে মেরেছো।

সওদাগর তখন কান্না, ভয়ে ভেঙে পড়লো। তার দুঃখে তিন শেখও মুহ্যমান। প্রথম শেখ বুকে সাহস বেঁধে উঠে দাঁড়ালো। দৈত্যটার সামনে এসে একটা সালাম ঠুকে বললো, তুমি দানব-কুল শ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি আমার এই বুনো রামছাগলের কাহিনী শোনাতে চাই। শুনে যদি ভালো লাগে তবে সওদাগরের গোস্তাকি মাফ করে দিও, এই আমার আর্জি।

আফ্রিদি তখন বললো, ঠিক আছে, আমার যদি ভালো লাগে তবে সওদাগরের তিন ভাগ অপরাধের এক ভাগ আমি রেহাই দিয়ে দেবো।

প্রথম শেখ তখন বলতে শুরু করে। শোনো, দৈত্য সম্রাট, এই যে বুনো রামছাগলটা দেখছো, আসলে কিন্তু এটা কোনও জন্তু জানোয়ার না। এ হচ্ছে আমার চাচার মেয়ে—আমার শাদী করা বিবি। তিরিশটা বছর এক সঙ্গে ঘর করেছি। ছোটবেলা থেকেই যাদুকরী ছিলো সে। নানা রকম যাদুবিদ্যা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতো আমাকে।

একে নিয়ে তিরিশ বছর ঘর করলাম, কিন্তু দুঃখ যে, একটা ছেলেপুলে হলো না আমাদের। তাই আমি আমার বাড়ির দাসীকে রক্ষিতা করে তার গর্ভে একটা ছেলে তৈরি করলাম। ছেলের বয়েস যখন পনেরো, তখন একদিন কাজের ধান্দায় ভিনদেশে যেতে হয়েছিলো আমাকে। আমার অবর্তমানে আমার এই বিবি, যাদু করে, ছেলেটাকে বাছুর, আর মাকে গাই গরু বানিয়ে রেখে দিলো। কিছুদিন বাদে ঘরে ফিরে বিবিকে জিজ্ঞেস করলাম, ছেলে আর তার মা কোথায়। তখন সে আমাকে মিথ্যে করে বললো, দাসীটা মরে গেছে। আর ছেলেটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে বলতে পারে না।

বিবির কথা শুনে আমি শোকে দুঃখে ভেঙে পড়লাম। সারাটা বছর কেঁদে কেঁদে কাটালাম। তারপর আমাদের পরবের দিন বক্‌রি-ঈদ এসে গেলো। এই দিনটা আমরা কোরবানী করি গরু, ছাগল, মোষ যার যা ইচ্ছে। পছন্দসই একটা গরু নিয়ে আসতে বললাম আমার নোকরটাকে। নিয়ে এলো সে একটা গাই। জবাই করার জন্য ছুরি নিয়ে যখন এগিয়ে গেলাম তার কাছে, দেখি, তার চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরছে। আর অদ্ভুতভাবে গোঙাচ্ছে। আমার কেমন মায়া হলো। পারলাম না। নোকরটার হাতে ছুরি দিয়ে বললাম, নে, তুই কর। আমি পারবো না।

তখন কী জানতাম গাইটা আসলে গাই না। ও আমার দাসী—রক্ষিতা, আমার ছেলের মা। যাই হোক, নোকরটা জবাই করলো ওকে। আর কী আশ্চর্য, গরুটা আর গরু নাই, আমার সেই দাসী-রক্ষিতার ধড় আর মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে পড়ে আছে। দুঃখ হলো খুব। যাই হোক, নোকরটাকে বললাম, যা একটা তাগড়াই দেখে বাছুর নিয়ে আয়। নোকর আমার কথা মতো নিয়ে এলো একটা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর। কিন্তু বাছুরটাকে আনতেই সে লুটিয়ে পড়লো

আমার পায়ের কাছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, কী যেন সে বলতে চায়, পারছে না। মুখে ভাষা নাই, কি করে সে বলবে, আমাকে মেরো না, আমি তোমার একমাত্র ছেলে।

আমার মনের মধ্যে কী যে হলো, বোঝাতে পারবো না। নোকরটাকে বললাম, বাছুরটাকে আর মারবো না রে। তুই অন্য গরু নিয়ে আয়।

গল্পটা এই অবধি বলা হয়েছে, শাহরাজাদ দেখলো, রাতের আঁধার কেটে যাচ্ছে। চুপ করে গেলো সে।

ছোট বোন দুনিয়াজাদ প্রশংসা-গদগদ হয়ে বললো, কি মিষ্টি তোমার গল্প দিদি। আর কি সুন্দর করেই না বলতে পারো।

শাহরাজাদ বলে, তা ঠিক। কিন্তু আসল গল্প তো শুরুই হয়নি, বোন। শাহজাদার কৃপায় যদি বেঁচে থাকি, তবে কাল রাতে আবার বাকীটা শোনাবো। এখন ঘুমিয়ে পড়ো।

দুনিয়াজাদ ঘুমিয়ে পড়লো। বাদশাহ শারিয়ার ভাবলো, ভারি মজার গল্প তো! শেষটুকু না শুনে তো মেয়েটাকে হত্যা করা যায় না।

এরপর শাহরাজাদ ঘুমে ঢলে পড়লো বাদশাহ শারিয়ারের কোলে। শারিয়ারেরও চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। শাহরাজাদকে বুকে জড়িয়ে সেও ঘুমিয়ে পড়ে তখুনি।

যখন ঘুম ভাঙে, বেলা তখন অনেক। নিজেকে তৈরি করে নিয়ে দরবারে গিয়ে ঢুকলো বাদশাহ্। উজির, আমির, ওমরাহ্ উঠে দাঁড়িয়ে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করলো বাদশাহকে। উজিরের পাশে এক ক্রীতদাস-এর হাতে একটা সোনার থালা। সেই থালার ওপরে তুলোট কাগজে জড়ানো একটা পান্না। সেটা তুলে নিয়ে বাদশাহর সামনে খুলে ধরলো উজির। এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সারারাত ধরে উপভোগ করে সকাল বেলায় নিজের হাতে মেয়েটার গর্দান নেয় বাদশাহ। প্রতিদিন। আজ তিন বছর ধরে এই একই নারকীয় কাণ্ড করে চলেছে বাদশাহ। আর প্রতিদিন দরবারে এসে সেই হত্যাকাণ্ডের, দরবারী কায়দায়, ঘোষণা করা হয়। ঐ পান্নায় সেই ফরমানই লেখা থাকে। বাদশাহর ইঙ্গিতে পাঠ করে শোনায় উজির।

উজির জানতো, রোজকার মতো আজ সকালেও হত্যা করেছে মেয়েটিকে। আর আজকের মেয়ে তারই নিজেরই মেয়ে। আদরের দুলালী। কান্নায় চোখ বুজে আসে। কিন্তু বাদশাহর মনে কোন সন্দেহ জাগে, এই আশঙ্কায় প্রাণ-পণে শক্ত করে রাখে নিজেকে। পান্নাটা তুলে নিয়ে খুলতে যায়। বাদশাহ হাতের ইশারায় থামিয়ে দেয় উজিরকে। দরকার নাই। আর যা যা আছে নিয়ে এসো।

অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকে উজির, একি অদ্ভুত কথা! সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। তবে কি তার নয়নের মণি, আদরের ধন, শাহরাজাদ এখনো বেঁচে আছে?

সারাদিন ধরে দরবারে নানা কাজ শেষ করে বাদশাহ ফিরে এলো খাসমহলে। নিজের শয়নকক্ষে। তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে।

রাত্রে আবার আব্দার ধরলো দুনিয়াজাদ। দিদি, সেই সওদাগর আর আফ্রিদির কাহিনীটা শোনাও এবার।

নিশ্চয় শোনাবো, বোন। কিন্তু সবই নির্ভর করছে জাঁহাপনার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর।

শারিয়ার হাসলো। নাও, শুরু করো, আমারও শুনতে খুব ইচ্ছে।

—শাহরাজাদ বলতে আরম্ভ করে। যখন সেই প্রথম শেখ দেখলো, বাছুরটা কাঁদছে, তখন সে তার নোকরটাকে বললো, তুই এক কাজ কর। বাছুরটাকে খোঁয়াড়ে রেখে অন্য একটা গরু নিয়ে আয়।

এই অস্বাভাবিক কাহিনী শুনতে শুনতে আফ্রিদি দৈত্য তো অবাক!

প্রথম শেখ বলে চলে, আমার চাচার মেয়ে, আমার বিবি এই রামছাগলটা তখন দাঁড়িয়েছিলো পাশেই। বললো, না না, এই বাছুরটাকেই জবাই করো আজ। দেখছো না, কেমন মোটাসোটা, তাগড়াই। বেশ ভালো মাংস হবে।

কিন্তু আমার মন সায় দিলো না। বড় মায়া হলো। নোকরটাকে বললাম, যা, তুই আর একটা ভালো দেখে নিয়ে আয়।

পরদিন বাড়িতে বসে আছি, নোকরটা ছুটতে ছুটতে এসে বললো, একটা ভালো খবর আছে, মালিক। আমার লেড়কী যাদুবিদ্যা আর ঝাড়ফুঁকের মন্তর-তন্তর শিখেছিলো এক বুড়ির কাছে। সেই বুড়িটা এখন আমার বাড়িতেই থাকে। কাল যখন তুমি আমাকে বললে, বাছুরটাকে নিয়ে যা, তখন ওকে নিয়ে সোজা চলে গেলাম আমার লেড়কীর কাছে। বাছুরটাকে দেখা মাত্র মেয়ে আমার, নাকাব দিয়ে মুখখানা ঢেকে ফেললো। বুঝতে পারলাম না। আমি ছাড়া অন্য কোন পর-পুরুষ তো ছিলো না সেখানে! তবে কেন সে শরম করলো! বাছুরটাকে দেখতে দেখতে প্রথমে সে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো। কিন্তু তারপর কেঁদে ফেললো। আমাকে বললো, বাপজান, তুমি এই বাছুরটাকে নিয়ে এলে কেন আমার কাছে? তোমার মনে কি কোন সন্দেহ হয়েছে? ও যে আসলে একটা বাছুর না, মানুষের ছেলে, সে কথা কি জানতে?

—কী বলছিস তুই? কোথায় মানুষের ছেলে? আর ওকে দেখতে দেখতে কেনই বা কাঁদলি, আর হাসলিই বা কেন? কি ব্যাপার?

তখন মেয়ে বললো, এই বাছুরটা আমাদের মালিকের ছেলে। ওর সৎমা যাদু করে ওকে বাছুর বানিয়ে রেখেছে।শুধু ওকে না, ওর মাকেও গাই করে রেখেছিলো সে। তোমরা তাকে আজ জবাই করেছো? বাছুরটা যখন বললো, তার বিমাতা তাকে আর মাকে যাদু করে বাছুর আর গাই করে রেখেছে তখন আমি হেসেছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম, তার মাকে তোমরা আজ জবাই করে মেরেছো তখন আমি কেঁদেছি।

আমার লেড়কীর কথা শুনে তো আমি থ। এ আবার কি ভুতুড়ে কাণ্ড। এমন আবার হয় নাকি! সারাটা রাত ঘুম নাই চোখে। কখন সকাল হবে, কখন তোমাকে জানাবো, সেই জন্যে ছটফট করছি।

নোকরের এই কথা শোনামাত্র তাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। আনন্দে তখন আমি এমনই আত্মহারা যে, এমন সুখবর যে এনে দিলো তাকে যে একটু দারুপানি খাওয়াবো, তাও বেমালুম ভুলে গেলাম। তখন আমার শুধু এক চিন্তা, কতক্ষণে আমার জানের কলিজা—প্রাণের বাছাকে দেখতে পাবো।

নোকরের বাড়ি পৌঁছতেই ওর সুন্দরী মেয়ে আমাকে আপ্যায়ন করে বসালো। আর বাছুরটা এসে আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়লো। মেয়েটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যা বলেছো মা তাকি সত্যি?

মেয়েটি অবাক হলো। বললো, ওমা, সত্যি হবে না কেন? ও আপনার ছেলে, মালিক।

আমি বললাম, তোমার কথাই যদি ঠিক হয় মা, আর তুমি যদি আমার ছেলেকে আবার ফিরিয়ে দিতে পারো, তবে তুমি যা চাও তাই দেবো আমি। তোমার বাবা আমার যে সব গরু ছাগল মোষ দেখাশোনা করে, সব তোমার হবে। আমার গোলায় দানা-শস্য যা মজুত আছে, সব দেবো তোমাকে।

মেয়েটি বললো, মালিক, আপনার এই সব মূল্যবান বিষয় সম্পত্তি আমি নিতে পারি দু'টো শর্তে। প্রথম শর্ত হলো, আপনার ছেলের সঙ্গে আমার শাদী দিতে হবে। আর পরের

শর্ত হলো, আপনার ঐ ডাইনী বিবিকে যাদু মন্ত্র দিয়ে আমার ইচ্ছে মতো একটা জানোয়ার বানিয়ে রাখবো আমি। যাদুবিদ্যা বড় বিদ্যা। তা শিখে তার অপব্যবহার করা মস্ত পাপ। আর এই জন্যেই তাকে শাস্তি দিতে চাই আমি। আপনি যদি রাজি থাকেন, বলুন মালিক, আমি এখুনি আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

—শোনো, দৈত্য সম্রাট, তখন আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছো। নোকরের মেয়ের শর্তে রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, তুমি যা বলবে তাই হবে, মা। তুমি এখন আমার ছেলেকে মানুষ করে দাও। তার সঙ্গে আজই তোমার শাদী দিয়ে দেবো। তুমি আমার ঘরে যাবে। সব বিষয় সম্পত্তি তোমার হবে। তোমার কথা মতোই সব হবে। তুমি যা চাও তাই হবে। আমার বিবিকে তুমি যা বানাতে চাও তাই বানিয়ে রেখো। কোন আপত্তি করবো না। শুধু আমার ছেলেকে আবার মানুষ করে দাও।

আমার কথা শোনার পর, একটা ছোট্ট তামার বাসন নিয়ে এলো সে। পানিতে ভরা। বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়তে লাগলো সেই পানির ওপর। তারপর সেই পানিটুকু হাতে নিয়ে বাছুরটার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকলো, খোদা যদি তোমায় বাছুর বানিয়ে থাকে তবে তুমি বাছুরই থাকবে। আর যদি কোন ডাইনী তোমাকে যাদু করে বাছুর বানিয়ে রাখে তবে, আল্লার দোয়ায়, তোমার আসল চেহারায় ফিরে এসো।

কি আশ্চর্য, বাছুরটা ধীরে ধীরে একটা মানুষের চেহারা ফিরে পেতে লাগলো। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, তোমার এই দশা কে করেছিলো, বাপজান?

তখন সে গোড়া থেকে সব বৃত্তান্ত বলতে লাগলো। এই বুনো রামছাগলটা—আমার চাচার মেয়ে—কি করে তাকে আর তার মাকে বাছুর আর গাই বানিয়ে রেখেছিলো তার বিস্তারিত কাহিনী শোনালো। আমি তাকে আদর করতে করতে বললাম, তোমার সৎমা এমন শয়তানী করেছিলো যে, না জেনে, হয়তো তোমাকে নিজের হাতেই কোরবানী করে ফেলতাম আমি। কিন্তু খোদা মেহেরবান, তিনিই তোমাকে বাঁচিয়েছেন। আর তোমাকে ফিরে পেলাম আজ। এই মা-জননীর দয়ায়। আমি তাকে কথা দিয়েছি, বাপজান, তোমার সঙ্গে তার আমি শাদী করিয়ে দেবো।

সেই দিনই শাদী দিলাম ছেলের। নোকরের মেয়েকে ছেলের বৌ করে ঘরে নিয়ে এলাম। তার যাদুমন্ত্রে আমার চাচার মেয়ে—আমার তিরিশ বছরের বিবি বুনো রামছাগল হয়ে গেলো। ছেলে বৌয়ের হাতে সংসার তুলে দিয়ে এখন আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। এখন আমার পথের সাথী আমার চাচার মেয়ে—আমার তিরিশ বছরের ঘর-করা বিবি—এই বুনো রামছাগল।

এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখি, বটবৃক্ষের নিচে বসে কাঁদছে এই সওদাগর। মায়া হলো। কাছে এলাম। শুনলাম তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। তারপর অপেক্ষায় ছিলাম। কী ঘটে, দেখে যাই।

আফ্রিদি দৈত্য খুশিতে লাফিয়ে উঠলো। বড় মজাদার কিস্‌সা। যাও, তোমার জন্যে সওদাগরের একভাগ গুনাহ্ মাফ করে দিলাম আমি।

এরপর দ্বিতীয় শেখ—সেই দুই গ্রে-হাউন্ড কুকুরের মালিক—এগিয়ে এসে সালাম জানালো আফ্রিদিকে। আমার কাহিনী যদি শোনো, দৈত্য সম্রাট, থ হয়ে যাবে তুমি।

এতক্ষণ যে কাহিনী শুনলে, তার চেয়েও মজাদার। আমার গল্প শুনে যদি তোমার ভালো লাগে তবে বেচারী সওদাগরের আর একটু অপরাধ মাফ করে দিও।

আফ্রিদি ঘাড় নেড়ে বললো, তাই হবে, শেখ সাহেব, অবশ্য তোমার গল্প যদি সত্যই আমার ভালো লাগে।

এবার দ্বিতীয় শেখ তার কাহিনী শুরু করে ঃ

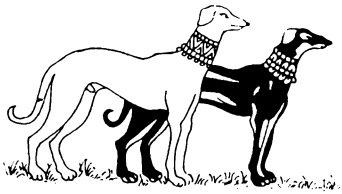

—এই যে দু'টি গ্রে-হাউন্ড কুকুর দেখছো, আফ্রিদি সম্রাট, আসলে কিন্তু এ দু'টো কুকুর না। আমার সহোদর বড় দুই ভাই। আমি সবার ছোট। আমাদের আব্বাজান মারা যাওয়ার সময় তিন ভাইয়ের জন্যে তিন হাজার সোনার মোহর রেখে যান। আমার অংশের মোহর নিয়ে আমি একটা দোকান করলাম। আমার দুই ভাই—এরাও দু'জনে দু'টো দোকান করলো। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আমার এক ভাই এক সওদাগর দলের সঙ্গে বছরখানেকের জন্য বিদেশে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে গেলো।

বছরখানেক বাদে ফিরে এলো সে শূন্য হাতে। বাণিজ্য করতে গিয়ে সব খুইয়ে এসেছে সে। আমি তাকে বললাম, বাণিজ্যে যাওয়ার আগে পইপই করে বারণ করেছিলাম তোমাকে। শুনলে না। আল্লাহর ইচ্ছে বোধ হয় এই ছিলো। তাই আজ তোমার ভাগ্যের এই হাল। আর সেই কারণেই আমার বারণও তোমার ভালো লাগেনি সেদিন।

যাই-হোক সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিয়ে আমার দোকানে নিয়ে এলাম তাকে। ভালো করে গা হাত-পা সাফ করে গোসল করলো সে। আমার দামী পোশাক দিলাম পরতে। তারপর সঙ্গে বসে খানাপিনা সারলাম দু'ভাই। অনেক কথার ফাঁকে তাকে বললাম, দেখ ভাই, এই এক বছরে বেচাকেনা করে মোটামুটি ভালোই লাভ দাঁড়িয়েছে। আসল যা ছিলো তাই আছে। উপরন্তু লাভ হয়েছে হাজার দিনার। এক কাজ কর। এই লাভের অর্ধেকটা তুমি নাও। আবার দোকান সাজাও। দেখবে, ওতেই বেশ চলে যাবে। কী দরকার বেশি লোভ বাড়িয়ে?

আমার কথা মতো আবার সে দোকান করে কেনা-বেচা করতে লাগলো। এই ভাবে দিন কাটে। একদিন আমার দুই ভাই আমার কাছে এলো। বললো, সওদাগরের একটা দল বাণিজ্যে যাচ্ছে। আমরাও যাবো ঠিক করেছি। দোকানের কেনা বেচায় খাওয়া-পরা চলে যাবে ঠিকই, কিন্তু বড়লোক হওয়া যাবে না। আমরা বড়লোক হতে চাই। দেশের কত লোক বাণিজ্যে গিয়ে ধনী হয়ে ফিরে এসেছে, আমরাও যাবো। আমাদের ইচ্ছে, তুমিও সঙ্গে চলো।

আমি তাদের কথায় 'না' করে দিয়ে বললাম, একবার গিয়েও আক্কেল হয়নি, সব খুইয়ে এলে, আবার যেতে চাও কোন্ লজ্জায়!

আমার ধমকানিতে সেদিন তারা ফিরে গেলো। কিন্তু মাঝে মাঝেই এসে নানা রকম গল্প বলে লোভ দেখাতে লাগলো। কত লোক পথের ভিখিরি থেকে বড়লোক হয়ে দেশে ফিরেছে, তার লম্বা ফিরিস্তি শোনাতে লাগলো আমাকে। কিন্তু বার বার নিষেধ করতে লাগলাম তাদের। ওসব শুনতে গেলে সোনার গাঁ, কাছে গেলে কিছুই না।

তবু ওরা হাল ছাড়ে না। সেদিন ফিরে যায়। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আবার ফিরে আসে। আবার আমি তাদের ফিরিয়ে দিই। এভাবে ছ'টা বছর পার হয়ে গেলো। অবশেষে তাদের প্রস্তাবে রাজি হলাম আমি। বললাম, এই ক'বছরে যার যা লাভ হয়েছে, নিয়ে এসো।

গুনে দেখা গেলো, ছয় হাজার দিনার লাভ দাঁড়িয়েছে। ঠিক হলো বাণিজ্যের জন্যে

তিন হাজার দিনার সঙ্গে নেবো। আর বাকী তিন হাজার মাটিতে পুঁতে রেখে যাবো। কে জানে, বিদেশ বিভুঁই, কিছু বলা যায় না। যদি দিনারগুলো খোয়া যায়, তবে দেশে ফিরে পথে বসতে হবে।

আমার কথায় দু'জনেই সায় দিলো। এর পরে প্রত্যেক ভাই এক হাজার দিনার সঙ্গে নিলাম। নানা ধরনের মনোহারী জিনিসপত্র সওদা করে বাক্স-প্যাটরা বোঝাই করলাম। তারপর নৌকায় বোঝাই করে, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পাল তুলে দিলাম।

মাসখানেক কেটে গেছে। একদিন এক বন্দরে নোঙর করলাম আমরা। একদিনের জন্যে। দশ দিনার লাভে একটা সওদা করে আবার ভাসিয়ে দিলাম নৌকো। অন্য কোনও বড় শহরে যাবো আমরা। আরও কয়েকদিন কেটে গেলো। এক বন্দরে ভেড়ালাম নৌকো। সেই বন্দরেই আলাপ হলো একটি রূপবতী নারীর সঙ্গে। যেমন তার রূপ তেমনি তার যৌবন। কিন্তু বড্ড গরীব। ছেঁড়া ময়লা পোশাকে লজ্জা ঢাকতে পারছে না সে। তার উদ্দাম যৌবন পথচারীর বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। মেয়েটিই এগিয়ে এলো, আমায় কিছু সাহায্য করবে, মালিক? আমি বড় গরীব। তার বদলে তোমরা যা বলবে, করে দেবো। আমি তোমাদের সওদা বয়ে নিয়ে যেতে পারি শহরে। কেনা-বেচাও করে দিতে পারি, যদি চাও। আমি খানা পাকাতে পারি।

আমি প্রশ্ন করলাম, কোথায় থাকো তুমি, আর কে আছে তোমার?

ও বললো, থাকি এই শহরেই। আর আপনজন বলতে কেউই নাই আমার। পথে পথে ঘুরি। যদি কেউ খেতে দেয় খাই। যদি কেউ আশ্রয় দেয়, রাত কাটাই। না হলে দীন দুনিয়ার মালিক আছেন ওপরে, তাঁর ইচ্ছায় দিন কেটে যায় কোন রকমে।

মেয়েটি গরীব হলে কি হয়, কথাবার্তা শুনে মনে হলো, ভালো বংশের মেয়ে। আমার দিকে আরও একটু এগিয়ে এসে বললে, আমাকে সাহায্য করলে তা ফেল্‌না যাবে না তোমার। কোনও-না-কোনও ভাবে আমি তোমার উপকারে আসবো। আমাকে একটু আশ্রয় দাও, দেখো, তোমার ভালো হবে।

মেয়েটির কথায়—বিশেষ করে ওর বলার ঢং-এ কেমন মায়া হলো আমার। বললাম, ঠিক আছে, তুমি আমার নৌকায় এসো। আমার কাছেই থাকবে। কাজকাম যা করতে ইচ্ছে হয় করবে, না হয় করবে না। সে জন্যে কিছু এসে যাবে না। আশ্রয় দিচ্ছি বলেই যে তোমাকে কিছু ফেরৎ দিতে হবে, সে কথা মনে রেখো না।

মেয়েটি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো, এই যদি তোমার মনের কথা, তা হলে আমাকে শাদী করে নাও না কেন?

কেন জানি না, খুব ভালো লাগলো ওর কথাগুলো। তাছাড়া ওর দেহে আছে রূপ-যৌবন। এই নিঃসঙ্গ পরবাসে একটি সুন্দরী যুবতীর সঙ্গ কে না চায়! রাজি হয়ে গেলাম তার কথায়। নৌকায় তুলে নিলাম তাকে। ছেঁড়া-ময়লা পোশাক-আশাক ছুঁড়ে দিলাম জলে। গরম পানি করে ঘষে মেজে সাফ করলাম ওর সারা দেহ। আচ্ছা করে গোসল করালাম তাকে। তারপর দামী শাড়ি পরালাম, সুরমা এঁকে দিলাম চোখে। আতরের সুবাসে মদির হয়ে উঠলো ওর দেহ। মখমলের গদীর বিছানায় বসালাম তাকে। দু'জনে এক সঙ্গে বসে খানাপিনা করলাম। গল্প করলাম অনেক। ওর জীবনের নানা বিচিত্র কাহিনী শোনালো আমাকে। আমিও শোনালাম আমার জীবনের কাহিনী। এইভাবে দু'জনে দু'জনার কাছাকাছি হয়ে এলাম আরও। সেই রাতে আমরা মধুযামিনী করলাম। আকাশে আধখানা চাঁদ।

নিচে নীল জল। চারদিক নিস্তব্ধ-নিশুতি। শুধু মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ তুলে উড়ে যাচ্ছে দু-একটা রাতচরা পাখি। আমরা দু'জনে নৌকার কিনারে বসে চাঁদনী রাতের এই মনমাতানো রূপে মুগ্ধ হতে থাকলাম। ওর হাতে আমার হাত। রাত্রির মুখে ভাষা নাই। আমরাও হারিয়ে ফেলেছি আমাদের ভাষা। রাত যখন গভীর হতে থাকে আমাদের দু'জনের অন্তরঙ্গতাও গভীরতর হতে থাকে আরও। দিনের তাপে উত্তপ্ত হাওয়ায় এখন হিমের আমেজ লাগছে। কেমন শীত শীত মনে হতে, ওর নরম উষ্ণ বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজে দিই। দু'হাতে জড়িয়ে ধরি ক্ষীণ কটি। তারপর কোন রকমে উঠে আসতে পারি শোবার ঘরে। মখমলের নরম গদি আর আমার বুকের চাপে হারিয়ে যেতে থাকে ওর থরথর নরম দেহ।

দিনে দিনে ভালোবাসা আরও গভীর হয়। শেষে এমন হলো, এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারি না তাকে। এই ব্যাপারটা খুব ভালো চোখে দেখলো না আর দুই ভাই। তাদের বয়েস হয়ে গেছে। কোন সুন্দরী রূপসী মেয়ে তাকায় না তাদের দিকে। আমার বয়েস কম। স্বাস্থ্য ভালো। যৌবনের জোয়ার আছে শরীরে। তাই তাদের হিংসে। আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না তারা। সদাসর্বদা এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। আমাদের আড়ালে দু'ভাই শলাপরামর্শ করে। আমার সৌভাগ্যে—কাতর হয়ে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলো। শকুনীর মতো চোখ দিয়ে উঁকি মারতে লাগলো আমাদের ঘরে। কী ভাবে আমি তাকে আদর করি, কী ভাবে আমাকে সে আদর করে, কী করে আমরা দু'জনে দু'জনের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকি—সেই সব একান্ত আপন, একান্ত গোপন দৃশ্য দেওয়ালের ফুটোয় চোখ রেখে দেখে দেখে বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করতো তারা। আর আমার নারী ভাগ্যের ঈর্ষায়, আক্রোশে ফেটে পড়তো। আমায় হত্যা করে আমার ধনদৌলত হাতিয়ে নেবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো তারা। বুঝলাম, শয়তান ভর করেছে ওদের ওপর।

একদিন গভীর রাত্রে আমি আমার বিবিকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় চুপি চুপি ঘরে ঢুকে আমাদের দু'জনকে তুলে নিয়ে গিয়ে দরিয়ার মধ্যে ফেলে দিলো ওরা। তৎক্ষণাৎ আমার বিবি এক বিশাল জিনির রূপ ধারণ করলো। আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে কূলের দিকে চললো। একটা দ্বীপে গিয়ে নামালো আমাকে। তারপর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো নিমেষে। যে দিকে তাকাই ঘন অন্ধকার। কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। সারারাত সেই নির্জন দ্বীপে, নিরন্ধ্র অন্ধকারে একা বসে রইলাম আমি। সে ফিরে এলো সকালে।

বললো, আমাকে চিনতে পারো? বলো তো, কে আমি?

আমি হতভম্ব হয়ে তার এই বিশাল রূপ দেখতে থাকি।

ও বললো, আমি তোমার বিবি। আমি তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছি আজ রাতে। আমি হচ্ছি এক জিনি-আহ্। প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছি তোমাকে। আল্লাহরও সেইরূপ ইচ্ছে ছিলো। আল্লাহ্‌তে আমার গভীর বিশ্বাস। আর এও বিশ্বাস করি, তার ইচ্ছা ছাড়া দুনিয়াতে কোন কিছুই করা সম্ভব না। আমি যখন এক ভিখারিণীর বেশ ধরে তোমার দয়া ভিক্ষা করেছিলাম তখন তুমি আমাকে তোমার বিবি করে নিয়েছিলে। আজ আমি তোমার জান বাঁচাতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কিন্তু তোমার শয়তান ভাই দু'টোকে আমি হত্যা করবো।

তার কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম আমি। অন্তর দিয়ে ধন্যবাদ জানালাম তাকে। কিন্তু আমার ভাইদের হত্যা করবে শুনে বিচলিত হয়ে পড়লাম। শুরু থেকে শেষ

পর্যন্ত ভাইদের সব বৃত্তান্ত খুলে বললাম তাকে। সব শুনে সে বললো, আজ রাতেই উড়ে গিয়ে ওদের নৌকোটা ডুবিয়ে দেবো আমি। নৌকো ডুবে গেলে তারাও মরে যাবে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, খোদা তোমার সহায়, তুমি তা নিশ্চয়ই করতে পারো। কিন্তু আমার অনুরোধ, আর যাই করো, জানে মেরো না ওদের। হাজার হলেও ওরা আমার ভাই। জানো তো একটা প্রবাদ আছে : মূর্খের উপকার করলে সে তার মর্ম বোঝে না। উল্টে সে তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। দুষ্ট লোকেরা দুষ্টই থেকে যায়। চেষ্টা করেও সৎ হতে পারে না। সেইটেই তাদের বড় শাস্তি।

না, না, জিনি চিৎকার করে ওঠে, ওদের কোন রেহাই নাই। মৃত্যুই একমাত্র পাওনা।

এই বলে আমাকে কাঁধে তুলে আকাশপথে উড়তে থাকে। উড়তে উড়তে এক সময়ে এসে নামালো সে আমার বাড়ির দরজায়।

বাড়িতে ঢুকেই পুঁতে রাখা দিনারগুলো তুলে নিলাম। তারপর দোকানে গেলাম। দেখলাম, যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম তেমনটি রয়েছে সব। সন্ধ্যেবেলা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি ফিরে দেখি, ঘরের দাওয়ায় দু'টো গ্রেহাউন্ড কুকুর শিকলে বাঁধা। কাছে যেতেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো তারা। আমার কামিজের খুঁট ধরে টানতে লাগলো। কিছুই বুঝতে পারছি না, কি ব্যাপার! এমন সময় আমার বিবি সেই জিনি এসে বললো, এই দুই রত্ন তোমার দুই ভাই।

জিজ্ঞেস করলাম, কি করে হলো এই দশা?

ও বললো, আমার ছোট বোন, যাদুবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত সে। বলেছে, দশ বছরের মধ্যে ওদের কেউ মানুষের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

দশ বছর পুরো হয়ে গেছে। এখন আমি আমার সেই শালীর সন্ধানে বেরিয়েছি। তার দেখা পেলে অনুরোধ জানাবো, আমার এই ভাই দু'টোকে যদি সে আবার মানুষ করে দেয়। এই আমার ইচ্ছে। আমার শালীর সন্ধানে যেতে যেতে এইখানে এই বটবৃক্ষের নিচে এদের সঙ্গে আমার দেখা। এদের মুখেই শুনলাম, এই সওদাগরের দুর্ভাগ্যের কাহিনী। তাই অপেক্ষা করছিলাম। দেখে যাই, কী ঘটে!

দ্বিতীয় শেখ বললো, আমার কাহিনী তো শুনলে আফ্রিদি সম্রাট। এখন বলো কেমন লাগলো তোমার।

চমৎকার— চমৎকার, এমন চমৎকার কাহিনী আমি কখনও শুনিনি। সওদাগরের আরও একভাগ দোষ মাফ করে দিলাম আমি।

এবার সেই খচ্চরটার মালিক—তৃতীয় শেখ এগিয়ে এসে সালাম জানালো আফ্রিদিকে। আফ্রিদি বললো, তোমার আবার কি কাহিনী? শোনাও দেখি।

তৃতীয় শেখ বললো, শোনো, আফ্রিদি সম্রাট, আমার কাহিনী আরও মজাদার। এই যে খচ্চরটা দেখছো, এ হচ্ছে আমার বিবি। কাজের তাগিদে, এক সময়, বছরখানেকের জন্যে বিদেশে গিয়েছিলাম। কাজকাম শেষ করে ঘরে ফিরলাম একদিন। রাত তখন অনেক, বাড়িতে ঢুকেই বিবির সঙ্গে দেখা করার জন্যে অন্দরে গেলাম। ঘরে ঢুকতে গিয়েই মাথাটা ঘুরে গেলো। দেখি, এক নিগ্রো নফরের কোলে মাথা দিয়ে আমার এই বিবিজান বেশ রসালাপে মত্ত। মুখে চলেছে হাসি মস্করা এবং আদি রসের খেউড়। আর হাতে চলেছে শৃঙ্গার। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হয়ে উঠছে দু'জনে। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে থাকলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার ওপর নজর পড়লো আমার বিবির। আর তখুনি তড়াৎ করে উঠে একটা জলের বাটি তুলে

নিয়ে ছুটে এলো আমার দিকে। আমাকে যে কখন দেখে নিয়েছে, বুঝতে পারিনি। জলের বাটিটার ওপর বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়ালো। আর সেই জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলো আমার গায়ে। আর কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা কুকুর হয়ে গেলাম। তখন সে আমাকে তাড়িয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলো।

সারা শহর ঘুরে ঘুরে শেষে এক কষাই-এর দোকানে এসে ফেলে দেওয়া কিছু মাংসের হাড়গোড় চিবুতে লাগলাম। দারুণ খিদে পেয়েছিলো আমার। কষাই-এর প্রাণে বোধহয় দয়া হলো। বাড়ি ফেরার সময় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো সে।

কষাই-এর কন্যা, আমাকে দেখামাত্র, নাকাব দিয়ে মুখখানা ঢেকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো বাবাকে। তুমি তো জানো বাপজান, পর-পুরুষের সামনে আমি কখনও বেরোই না, তবে একে নিয়ে অন্দরমহলে ঢুকেছো কেন? এতো আর সত্যি সত্যি কুকুর না। একজন পুরুষ মানুষ। একটা শয়তান মেয়েমানুষ ওকে যাদুমন্ত্র দিয়ে কুকুর বানিয়ে দিয়েছে। তুমি যদি বলো, এখনি আমি ওকে আবার মানুষ করে দিতে পারি।

কষাই বললো, তা হলে মা, তুমি আর দেরি করো না। ওকে এখুনি মানুষ করে দাও। আহা, বেচারার কি কষ্ট!

তখন একটা বাটিতে খানিকটা জল নিয়ে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়লো সে। তারপর জলটুকু হাতে নিয়ে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে আবার কি যেন সব বিড়বিড় করে আওড়ালো। ধীরে ধীরে আমার দেহ রূপান্তরিত হয়ে গেলো আমার আগের চেহারায়। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেলো আমার মন। মেয়েটির হাতে ছোট্ট একটা চুম্বন করে বললাম, আমাকে যে শয়তানী যাদু করে রাস্তার কুকুর বানিয়ে কষ্ট দিয়েছে তাকে আমি শায়েস্তা করতে চাই। মন্ত্র দিয়ে তুমি তাকে খচ্চর বানিয়ে দিতে পারো, সুন্দরী?

নিশ্চয়ই পারি। এ আর এমন কঠিন কি কাজ!

তখন কষাই-কন্যা ছোট্ট একটা পাত্রে খানিকটা জল এনে মন্ত্র পড়ে আমার হাতে দিয়ে বললো, যখন তোমার বিবি ঘুমিয়ে থাকবে তখন তার গায়ে এই পানি ছিটিয়ে দিয়ে মনে মনে যা কামনা করবে সে তাই হয়ে যাবে।

দৈত্য সম্রাট, এই যে খচ্চরটা দেখছো, এ আমার সেই যাদুকরী বিবি।

তখন আফ্রিদি রসিকতা করে জিজ্ঞেস করে, কি গো, তোমার স্বামী যা সব বললো, ঠিক?

তারপর তৃতীয় শেখের দিকে ফিরে বললো, তোমার কাহিনী শুনে খুব খুশি হলাম, শেখ। সওদাগরকে সব গুনাহ্ থেকে মাফ করে দিলাম। যাও সওদাগর, তোমার ছুটি, তোমাকে খালাস করে দিলাম।

এমন সময় শাহরাজাদ দেখলো, ভোর হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে। কনিষ্ঠা দুনিয়াজাদ আনন্দে গদগদ হয়ে বলে, কি সুন্দর গল্প, দিদি! আর কি মিষ্টি করেই না বলতে পারো তুমি!

এ আর এমন কি? শাহরাজাদ বললো, যদি বেঁচে থাকি তো কাল রাতে আরও মজার কাহিনী শোনাবো।

বাদশাহ ভাবে, বাকী গল্পগুলো না শুনে তো ওকে মারা যায় না!

এরপর শাহরাজাদ আর শারিয়ার আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। দরবারের

সময় সমাগত। শারিয়ার শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লো। নিজেকে তৈরি করে নিয়ে চলে গেলো দরবারে। সারাদিন নানা কাজের ব্যস্ততায় কাটে। রাত্রে আবার ফিরে আসে খাসমহলে। শাহরাজাদের শয্যাকক্ষে।

দুনিয়াজাদ আব্দার ধরে, এবার তোমার কাহিনী শুরু করো, দিদি!

শাহরাজাদ বলে, এখুনি শুরু করছি, বোন। তারপর শুনুন জাঁহাপনা, সেই তৃতীয় শেখ তার গল্প শেষ করতে আফ্রিদি খুশি হয়ে বললো, তোমার গল্প শুনে খুব ভালো লাগলো, শেখ। সওদাগরের সব অপরাধ মাফ করে দিলাম আমি।

নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দে সওদাগর তখন কেঁদে ফেলেছে। তিন শেখকে বুকে জড়িয়ে ধরে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালো সে। পরে সবাই যে যার দেশের পথে পা বাড়ালো।

কিন্তু এ কাহিনী, শাহরাজাদ বলতে থাকে, সেই ধীবর আর আফ্রিদি দৈত্যের কাহিনীর কাছে কিছু না।

শারিয়ার কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে, শোনাও দেখি, কেমন সে কাহিনী?

শাহরাজাদ শুরু করে।

এক সময়ে এক বৃদ্ধ ধীবর তার স্ত্রী আর তিনটি পুত্র কন্যা নিয়ে এক নদীর ধারে বাস করতো। ফি দিনে মাত্র পাঁচবার জাল ফেলতো সে জলে। তার বেশি কোনদিন ফেলতো না। একদিন দুপুর বেলায় নদীর ধারে এসে জালের প্যাঁটরাটা নামিয়ে জলে ছড়িয়ে দিলো জাল। কিছুক্ষণ বাদে জালটা যখন গুটিয়ে তুলতে থাকে তখন মনে হলো, কি যেন একটা ভারী জিনিস জালে বেধেছে। আশায় আশায় কূলে তুললো জাল। হা আল্লাহ্, একটা গাছের গুঁড়ি। জালটা গুটিয়ে নিয়ে আবার ছত্রাকারে ছড়িয়ে ফেলে জলে। এবার তুলে দেখলো জালে জড়িয়ে গেছে একটা মরা গাধা। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আল্লাহ্‌র বোধহয় এই রকমই ইচ্ছা। তা না হলে এমনটা হবে কেন? গাধাটাকে জাল থেকে ছাড়িয়ে আবার জলে ফেলে জাল। এবার গুটাতে গিয়ে আর গুটাতে পারে না। পেল্লাই ভারী। টেনে তোলা দায়। যাই হোক, কায়দা কসরৎ করে তুললো। মনে আশা, এবার বুঝি বিরাট মাছ আটকেছে। কিন্তু তুলে দেখে, মস্ত বড় একটা মাটির জালা। কাদায় ভর্তি। বিরক্ত হয়ে জালটা দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার ফেললো জাল। এবার পেলো কিছু ভাঙা পাত্র আর কাচের টুক্‌রো।

তখন সে দু'হাত তুলে খোদাতালার কাছে ক্ষোভ জানাতে থাকে। হায় খোদা, আজ আমার বরাতে কিছুই জুটলো না! চারবার জাল ফেললাম। কিছুই পেলাম না। এবার শেষ বার। দেখি তোমার কি দয়া হয়!

এই বলে শেষবারের মতো ফেললো জালখানা। গুটাতে গিয়ে মনে হলো, কোন পাথরের চাই-এ আটকে গেছে। অনেক কসরৎ করে শেষ পর্যন্ত তুলে আনলো ওপরে। ধীবর দেখলো, একটা তামার জালা। জালাটার মুখ সিলমোহর করা। মোহরের ছাপটা পড়ে দেখলো, দাউদের পুত্র শাহেনশাহ্ সুলেমানের নাম অঙ্কিত করা আছে!

ধীবরের মনে আশার সঞ্চার হলো। যাক্, এমন একটা জিনিস পাওয়া গেলো যা বিক্রি করে কিছু পয়সা হয়তো পাওয়া যাবে। অন্তত দশটা দিনার তো পাওয়া যাবেই। জালাটা একটু নেড়েচেড়ে দেখতে চাইলো। কিন্তু বেজায় ভারী। নাড়ানো শক্ত। ধীবর ভাবে, আগে দেখতে হবে জালাটার মধ্যে কি জিনিস আছে। অনেক গল্প কাহিনীতে শুনেছে, সেকালের বাদশাহরা ঘড়াঘড়া সোনার মোহর মাটির তলায় পুঁতে রাখতো। সেরকম যদি কিছু হয়? আর ভাবতে পারে না সে। আঃ, তা হলে কি হবে! এক্কেবারে রাতারাতি বড়লোক।

যাই হোক, জালার মুখটা আগে খোলা দরকার। একটা ছুরি দিয়ে সীলমোহরটা খুলে ফেললো। কিন্তু মুখের ঢাকনাটা আর কিছুতেই খুলতে পারে না সে। অনেক চেষ্টা করে এক সময়ে খুলে ফেললো। ঢাকনাটা তুলতেই একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লাগলো ভিতর থেকে। আকাশের দিকে উঠে যেতে থাকে। ক্রমশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো চারদিক। তারপর দেখলো, সেই বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা এক বিকটাকার আফ্রিদি দৈত্যের রূপ ধারণ করছে। তার পা দু'টো যেন জাহাজের মাস্তুল। আর হাত দু'টো বিশ্রী রকমের লম্বা-গাঁইতির মতো। মাথাটা আকাশ-ছোঁয়া একটা প্রকাণ্ড গোলক। আকর্ণ বিস্তৃত গুহাসদৃশ মুখের হাঁ। আর শ্বেত পাথরের নুড়ির মতো তার দাঁতগুলো। বাঁশের চোঙার মতো নাকের ফুটো। চোখ দু'টো জ্বলন্ত পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ। মাথা ভর্তি উলুখাগড়ার জঙ্গল।

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ধীবরের দাঁতকপাটি লেগে গেলো। সারা দেহ অবশ, অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। চোখ খুলে দেখার সাহস হলো না আর।

ধীবরকে দেখেই চিৎকার করে ওঠে আফ্রিদি। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছু মানি না আমি। সুলেমান আল্লাহ্র পয়গম্বর।

এবার সে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলতে লাগলো, তুমি আল্লাহ্র পয়গম্বর, দুনিয়ার মালিক, মেহেরবান সুলেমান, তুমি আমাকে হত্যা করো না—এই আমার ভিক্ষা। আর কখনও তোমার অবাধ্য হবো না আমি। কখনও বিদ্রোহ করবো না।

এবার ধীবর বললো, আফ্রিদি সম্রাট, বাদশাহ সুলেমানের ভয়ে তুমি কাঁপছো কেন? সুলেমান তো সেই কবে আঠারোশো বছর আগে মারা গেছে। তারপর দুনিয়ায় কত কাণ্ড ঘটে গেছে; তা জানো? কিন্তু ব্যাপার কী? কি কারণে বাদশাহ্ সুলেমান তোমাকে ঐ জালার মধ্যে পুরে বন্দী করে রেখেছিলো? কী তোমার গোস্তাকি?

এ কথা শুনে আফ্রিদির ধড়ে প্রাণ এলো। এবার সে আশ্বস্ত হয়ে বললো, শোনো জেলের পো, আল্লাহ্ ছাড়া কিছুতে বিশ্বাস নাই আমার। তোমার জন্যে আমি একটা সুখবর এনেছি তার কাছ থেকে।

ধীবর বললো, কী সুখবর?

—তোমার মৃত্যু। আফ্রিদি হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, এবং সে মৃত্যু বিশ্রী রকমের বীভৎস!

ধীবর-এর বুক শুকিয়ে যায়। বলে, খবরটা জানাবার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু দৈত্য শিরোমণি, কী কারণে তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছো, কী আমার গোস্তাকী! বহুকালের বন্দী দশা থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করলাম আজ। এই কি আমার অপরাধ?

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করে আফ্রিদি বললো, এখন বলো, কী ধরনের মৃত্যু তুমি চাও?

—কিন্তু আমার দোষ কী? কী আমার অপরাধ?

তখন দৈত্যটা বললো, তা হলে আগাগোড়া সব কাহিনী শোনো আমার। তাহলেই তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।

ধীবর বললো, সংক্ষেপে বলো, শুনি।

আফ্রিদি বলতে থাকে। তুমি বোধহয় জানো, আমি সক্-হর-অল্ জিনি। দাউদের পুত্র শাহেনশাহ সুলেমানের এক বিদ্রোহী নফর। এক সময় সুলেমান তার দুর্ধর্ষ উজির আশফ-ইবন-বারাখ্যাকে পাঠিয়েছিলো আমাকে শায়েস্তা করার জন্য। আমার অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও আমাকে কাবু করে ফেলেছিলো সে। বিশ্বাস করো, তখন আমার নিজেকে এত ক্ষুদ্র, এত হেয় মনে হয়েছিলো তা বলার নয়। সুলেমান আমাকে খুব ভালোভাবেই বলেছিলো, তোমার সব বেয়াদপি মাফ করে দেবো আমি। তুমি আমার অনুগত বান্দা হয়ে থাকো। আমি কিন্তু তার কথা শুনলাম না। বললাম, না, তা হয় না। তখন একটা তামার জালা এনে, তার মধ্যে আমাকে পুরে, সীসের পাত দিয়ে জালার মুখটা এঁটে দিলো। বাদশাহ সুলেমানের মোহর এঁকে দিয়ে জালাটা ফেলে দিয়ে গেলো এই দরিয়ায়।

জলের তলায় তামার জালায় বন্দী আমি। মুক্তি প্রতীক্ষায় দিন গুনি। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, একশো বছরের মধ্যে যদি কেউ মুক্ত করে আমাকে তবে সারা জীবনের মতো তাকে আমি দুধে-ভাতে রাখবো। ধনদৌলতে ভরে দেবো তার ঘর। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কেউই এলো না আমাকে মুক্ত করতে। আমার বন্দীদশার প্রথম একশো বছর পার হয়ে গেলো। আমি আবার প্রতিজ্ঞা করলাম, এই চলতি একশো বছরের মধ্যে যদি কেউ মুক্ত করে আমাকে, তাকে দেবো আমি সারা দুনিয়ার হীরে-জহরৎ, মণি-মুক্তা—যতো আছে। কিন্তু কেউ এলো না। এইভাবে চারশো বছর কেটে গেলো। কেউ আমাকে এই মুক্ত আলো হাওয়ার জগতে ফিরিয়ে আনলো না। আমি পড়ে রইলাম দরিয়ার তলায়, বন্দী হয়ে। আবার আমি হলফ করলাম, এবার আমাকে যে মুক্তি দেবে তাকে আমি দেবো তিনটি বর। সে যা কামনা করবে, তাই পাবে। তবু কেউ এলো না। তখন আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। সেই দুর্ভেদ্য জালার মধ্যে লাফাতে ঝাঁপাতে লাগলাম। রাগে ক্ষোভে সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে আমার। এবার আমি শপথ নিলাম, যে ব্যাটা মুক্ত করবে আমাকে, তাকে নির্ঘাৎ হত্যা করবো।

তোমার দুর্ভাগ্য, তুমিই এলে। তুমিই আলোর মুখ দেখালে আমাকে। ঠিক। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ধীবর। কোন উপায় নাই। আর প্রতিজ্ঞা পালন আমাকে করতেই হবে। মৃত্যু তোমার অবধারিত। মরতে তোমাকে হবেই। এখন ঠিক কর, কী ধরনের মৃত্যু তুমি চাও?

দৈত্যের কাহিনী শুনে ধীবরের বুক দুরু দুরু করে। এই আমার নসীবে লেখা ছিলো? আমি তো জীবনে সজ্ঞানে কখনও কোনও পাপ করিনি। উপায়ন্তর না দেখে করজোড়ে প্রাণ ভিক্ষা করতে লাগলো ধীবর। তুমি আফ্রিদি সম্রাট, তোমার মহিমা অপার, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। খোদা তোমার ভালো করবেন।

আফ্রিদি কিন্তু সে কথায় কান দিলো না। বললো, আমার সময় নষ্ট করো না। এখন ঠিক কর, কী রকম মৃত্যু তোমার কাম্য।

ধীবর বললো, অমি কোন দোষ করিনি। আমাকে যদি হত্যা করো, আল্লাহ্ তোমাকে রেহাই দেবেন না। তোমার চেয়ে শক্তিমান কাউকে পাঠাবেন তিনি। তার হাতে তোমার মৃত্যু হবে।

কিন্তু আফ্রিদির সেই এক কথা। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যে আমাকে মুক্তি দেবে আমি তাকে হত্যা করবো। তুমি সেই লোক। তোমাকে আমি ছাড়তে পারি না।

ধীবর তখন মরিয়া হয়ে চিৎকার করে ওঠে। এই ভাবেই কি উপকারীর প্রতিদান দাও তোমরা? প্রবাদ শুনেছি :

দুধ দিয়ে কাল-সাপ পুষো নাকো ঘরে।
একদিন তারই বিষে উপকারী মরে।।

—থাক থাক, ঢের হয়েছে, দৈত্যটা চড়া গলায় হুঙ্কার ছাড়ে, মেলাই বকেছো। এবার থামো। নাও চটপট তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমার জান নেবো।

ধীবর দেখলো, সব চেষ্টা বিফল হয়ে গেলো, আর কোন গতি নাই। কিন্তু আল্লাহ্ আফ্রিদিকে অসীম শক্তি আর মানুষকে কিছু বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছে। দেহের বলের চেয়ে বুদ্ধির বল অনেক বড়। সেই রকম একটা বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলতে না পারলে শয়তানটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

হঠাৎ একটা ফন্দি এলো ধীবরের মাথায়। বললো, তুমি তো আমাকে হত্যা করবেই।

—কোন সন্দেহ নাই।

—কিন্তু কী অপরাধে?

আফ্রিদি এবারে ক্রুদ্ধ। বার বার এক কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। তোমাকে তো অনেকবার বললাম, আমি হলফ করেছি—যে আমাকে মুক্ত করবে তাকেই আমি হত্যা করবো। আমি ঐ তামার জালায় বন্দী ছিলাম। আজ তুমি জালার মুখ খুলে দিয়ে আমাকে মুক্ত করেছো।

ধীবর বললো, জালা আমি পানি থেকে তুলেছি, ঠিকই। এবং তার মোহর ভেঙে ঢাকনাও খুলেছি—তাও ঠিক। কিন্তু একটা কথা বলি দৈত্য মশায়, তোমার ঐ বিশাল বপুটা ঐ জালার মধ্যে আঁটে? কেউ বিশ্বাস করবে এই আজগুবি কথা? তোমার একখানা ঠ্যাং-এর অর্ধেক ঢুকবে না ওর ভেতর। তা আবার বলছো গোটা শরীরটা নিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছো এতোটা কাল? এমন আষাঢ়ে গল্প তো আরব্য-রজনীর কাহিনীতেও শুনিনি কখনও।

ধীবরের কথা শুনে দৈত্য তো রেগে কাঁই। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দু' হাত দিয়ে ধীবরের গলাটা টিপে ধরতে যায়। বলে, মুখ সামলে কথা বলো বলছি। একেবারে শেষ করে দেবো। আমি মিথ্যে কথা বলেছি? আমি মিথ্যেবাদী? আমি ছিলাম না ঐ তামার জালাটায়! এতো বড় কথা! এই দ্যাখো, কেমন করে এর মধ্যে আমার দেহটা ঢোকে একবার চোখ মেলে দ্যাখো।

এই বলে আর কালক্ষেপ না করে জালাটার মধ্যে আস্তে আস্তে নিজের দেহটা গুটিয়ে নিয়ে ঢোকাতে লাগলো। এইভাবে পুরো দেহটা যখন ঢুকে গেলো, তক্ষুনি ধীবর সেই সীসের ঢাকনাটা এঁটে দিলো জালার মুখে।

এমন সময় প্রভাতের আগমনে শাহরাজাদ থামলো।

পরদিন চতুর্থ রাত্রির কাহিনী শুরু হলো।

শাহরাজাদ বলতে থাকে, তারপর শুনুন জাঁহাপনা, ধীবর সেই সীসের ঢাকনা জালার মুখে এঁটে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আফ্রিদিকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, ওহে, শয়তানের বাচ্চা এবার তুমি বেছে নাও, কী ধরনের মৃত্যু তুমি চাও। না হলে আমি তোমাকেও আবার ঐ দরিয়ার জলে ডুবিয়ে দেবো। আর এই দরিয়ার পাড়েই ঘর বেঁধে বাস করবো। যাতে না অন্য কোনও ধীবর তোমাকে তুলে তার নিজের মৃত্যু ডেকে আনে। আমি ঢ্যাঁড়া পিটে আশেপাশের পাঁচটা গ্রামের লোককে জানিয়ে দেবো তোমার শয়তানী। তোমাকে মুক্ত করা মানেই নির্ঘাৎ মৃত্যু। এই কথা চাউর করে দেবো সারা দেশে। ভয়ে কেউ ধারে কাছে ঘেঁসবে না এই দরিয়ার। দেখি, কে তোমাকে মুক্ত করে। হা—হা—হা—।

জালার মধ্যে নিজের বোকামির জন্যে ছটফট করতে থাকে আফ্রিদি। প্রাণপণে

চেষ্টা করে বেরিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু সুলেমানের মোহর-আঁটা জালার মুখ খোলার বা ভাঙার ক্ষমতা কোন দৈত্যের নাই।

অনেক কাকুতি মিনতি করলো আফ্রিদি। তোমাকে কথা দিচ্ছি ধীবর ভাই, আমি তোমার কোন ক্ষতি তো করবোই না, বরং দুনিয়ার ধনদৌলতে ভরে দেব তোমাকে। আমাকে ছেড়ে দাও ভাই।

ধীবর কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করে না। তোমাকে যে বিশ্বাস করবে সে-ই মরবে। তুমি কি জানো না, সেই বাদশাহ্ উনানের উজির আর হেকিম রায়ানের কিস্সা? শোনোনি কখনও?

জালার ভিতর থেকে আফ্রিদি বলে, না ভাই! বলো দেখি শুনি।

—ধীবর বলতে শুরু করে। তবে শোনো ঃ পুরাকালে রুম দেশে ফার শহরে এক প্রবল প্রতাপ সুলতান প্রজাপালন করতো। হাজার হাজার সৈন্য সামন্ত, লোক-লস্কর দাসদাসী আর অঢেল ধনদৌলত ছিলো তার। কিন্তু মনে কোন শান্তি ছিলো না। সারা দেহে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি। কত না ডাক্তার কবরেজ দেখিয়েছে। কিন্তু কেউ সারাতে পারে নি। কত শত জড়িবড়ি খেয়েছে। কত রকমের মলম মালিশ লাগিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

একদিন এক বৃদ্ধ হেকিম এলো বাদশাহ্র কাছে। শুধু বয়সে না, জ্ঞানেগুণেও সে বৃদ্ধ। তার নাম রায়ান। নানা ভাষায়, নানা বিদ্যায় তার তুল্য পণ্ডিত সে তল্লাটে কেউ ছিলো কিনা সন্দেহ! গ্রীক, পার্শি, ল্যাটিন, আরবি—নানা ভাষার কিতাব পড়তে পারতো সে। নানা দেশের নানা বিদ্যা রপ্ত করেছিলো। গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ বেশ ভালো ভাবে শিখেছিলো।

সুলতান য়ুনানের দরবারে এসে সালাম জানালো রায়ান—আমি আপনার ব্যাধির খবর পেয়ে এসেছি। শুনেছি, আপনার ব্যাধি নাকি দুরারোগ্য। কোন ওষুধেই নাকি তা সারানো যায় না। কিন্তু আমি আপনাকে সারিয়ে তুলবো। শুধু এই জন্যেই এ শহরে আমি এসেছি। আপনি সারা দেশের সুলতান। আমি এক নগণ্য হেকিম। আমাকে আপনি জানেন না, চেনেন না। আমার দেওয়া দাওয়াই আপনি খাবেন কেন? আমি দেবোও না। না, খাওয়ার বা লাগাবার কোন ওষুধ দেবো না আপনাকে।

তবে, সুলতান কৌতূহলী হয়, কী করে সারাবে শুনি? যাই হোক, যদি সারাতে পারো আমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি, তাহলে যা চাও—অঢেল ধনদৌলত পাবে। শুধু তুমি না, তোমার ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনি—বংশানুক্রমে মাসোহারা পাবে আমার কাছ থেকে। তোমাকে আমার সভার প্রধান পারিষদ করে রাখবো। তুমি হবে আমার আপনজন। বন্ধু।

এই বলে বাদশাহ্ য়ুনান সূক্ষ্ম কারুকার্য করা, মূল্যবান একখানা শাল উপহার দিলো রায়ানকে। তোমার যেমন ইচ্ছে সেইভাবে আমার চিকিৎসা করতে পারো, কোন আপত্তি নাই। আমার শুধু একমাত্র আশা, তুমি আমার রোগ সারিয়ে দেবে।

রায়ান ভরসা দিলো, আপনি নিশ্চিত থাকুন, হুজুর। আমি আপনাকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলবো।

অনেক দিন বাদে সুলতানের মুখে হাসি দেখা গেলো, তাহলে আর দেরি করে কী লাভ? কাল থেকেই শুরু করো, বন্ধু।

রায়ান মাথা নুইয়ে সম্মতি জানালো, তাই হবে জাঁহাপনা।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নিজের বাসায় ফিরে এলো রায়ান। ভাড়া করা একটা ঘর। শহরে এসেই এই ঘরটা ভাড়া করেছে। তার যতো সব গাছ-গাছড়া, জড়িবড়ি আর মোটা মোটা বইপত্তরে ঘরটা ভরে গেছে।

প্রথমে একটা ওষুধ বানালো রায়ান। তারপর একটা ফাঁপা বাঁশের লাঠির মধ্যে

পুরলো সেই গাছ-গাছড়ায় তৈরি খানিকটা ওষুধ। লাঠিটার মাথায় হাতল লাগিয়ে দিলো। এবার তৈরি করলো একটা পোলো বল। ভেতরে পুরে দিলো খানিকটা ওষুধ।

পরদিন সকালে সেই ছড়ি আর বল নিয়ে প্রাসাদে এলো রায়ান। আভূমি আনত হয়ে সুলতানকে কুর্নিশ করলো। তারপর বললো, আজ থেকে আপনাকে ঘোড়ায় চেপে পোলো খেলতে হবে। এই নিন আপনার ছড়ি আর বল। ঘোড়ায় চেপে ছড়িটা মুঠো করে ধরে পোলো খেলতে থাকবেন। যতক্ষণ না সারা শরীরে দর দর করে ঘাম ঝরে ততক্ষণ খেলবেন। তারপর প্রাসাদে গিয়ে বেশ ভালো করে গোসল করবেন। আর কিছু করতে হবে না আপনাকে। এই আপনার চিকিৎসা। এতেই আপনি সেরে উঠবেন।

রায়ানের কথা মতো বাদশাহ্ য়ুনান তার আমির-অমাত্য-ওমরাহ-উজির-নাজির সমভিব্যাহারে ময়দানের দিকে রওনা হলো। সঙ্গে ধন্বন্তরী রায়ান।

ময়দানে পৌঁছে কী করে ছড়িটা ধরতে হবে—নিজের হাতে ধরে শিখিয়ে দিলো রায়ান। ঘোড়ার পিঠে চেপে শক্ত মুঠিতে ছড়িটা ধরে পোলো খেলতে লাগলো সুলতান। এক সময় ঘেমে নেয়ে গেলো সারা শরীর।

রায়ান থামিয়ে দিলো। আজ এখানেই থামান। এবার প্রাসাদে ফিরে গিয়ে হামামে ঢুকে পড়ুন।

সেদিন রাত্রে সুলতানের সুখ নিদ্রা হলো। সকালে উঠে মনে হলো, দেহের জড়তা যেন অনেকটা কেটে গেছে। খুশি খুশি মেজাজ। ফুর্তি ফুর্তি ভাব।

রায়ান আসতেই সাদরে ডেকে কাছে বসালো। বললো, অনেকটা আরাম বোধ করছি।

সেদিনও তাকে এক মূল্যবান পোশাক উপহার দিলো সুলতান। তারপর সদলবলে রওনা হয়ে গেলো ময়দানের দিকে।

এইভাবে আরও কয়েকটা দিন কাটলো। বাদশাহ দেখলো, তার দেহ থেকে কুষ্ঠের ক্ষতগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। দারুণ আনন্দ হলো মনে।

রায়ান প্রতিদিনই দরবারে আসে। বাদশাহর সঙ্গে দেখা করে। খুশি হয়ে রোজই মূল্যবান সামগ্রী উপহার দেয় বাদশাহ্।

একদিন লক্ষ্য করলো বাদশাহ্, তার শরীরে আর কোন কুষ্ঠব্যাধি নাই। রায়ানকে ডেকে অনেক ধনদৌলত, মূল্যবান পোশাক-আশাক—অনেক কিছু দান করে দিলো। তার মনে আজ আনন্দের সীমা নাই।

তার এই দান-ধ্যান উজিরের সহ্য হলো না। হিংসায় কাতর সে। সুলতানের বিশ্বস্ত অমাত্য। প্রয়োজন হলে নিজের জানকেও কবুল করতে পারে সুলতানের জন্যে। সে কথা জানেনও তিনি। অথচ তার ওপর কোন নজর নাই বাদশাহর। কোথাকার কে এক গুপ্তচর! তাকে নিয়ে এতো মাতামাতি—

পরদিন সকালে খুস মেজাজে দরবারে এসে বসলো বাদশাহ্। তার দুই পাশে আমি-অমাত্য-উজির—সবাই নত মস্তকে দণ্ডায়মান। একটু পরে রায়ান এলো। বাদশাহ্ শশব্যস্ত হয়ে উঠে এলো সিংহাসন ছেড়ে। বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো তার পাশের আসনে। সে আসনে সমমর্যাদার কোন সুলতান ছাড়া বসতে পায় না।

বাদশাহর এবংবিধ আচারে ক্ষুব্ধ হলো অনেকেই। চাপা গুঞ্জন উঠলো দরবারে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস নেই কারও।

সেই হিংসা-কাতর উজির ফুঁসতে লাগলো। ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকলো।

সব মানুষই কাউকে না কাউকে হিংসা করে। কেউ প্রকাশ্যে কেউ মনে মনে। যারা দৃঢ়চেতা তারা প্রকাশ্যে করে। আর যারা হীনমন্য তারা করে মনে মনে।

সেই উজির বাদশাহর সামনে এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে বললো, জাঁহাপনার শতায়ু কামনা করি, বাদশাহ চিরজীবী হোন, প্রার্থনা করি। এই অধমের একটা ছোট্ট আর্জি আছে আপনার দরবারে। কথাটা বলবো বলবো করেও বলতে পারি না। কিন্তু আমি আপনার একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত নোকর। না বলাও গুনাহ্।

উজিরের এই ভণিতায় বিরক্ত হয়ে বাদশাহ্ কিছু রুষ্টভাবেই বললো, সোজাসুজি খুলে বলো। কী বলতে চাও?

—আমার গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, যে লোক দানের যোগ্য নয় তাকে দান মানে অপাত্রে দান। যে গ্রহীতা শ্রদ্ধা না করে দান গ্রহণ করে সে পরম শত্রু।

—হেয়াঁলী রাখো, বাদশাহ্ গর্জে ওঠে, কে সেই লোক, নাম বলো।

উজির তখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, এই হেকিম রায়ান। তার যা প্রাপ্য নয় তাই তাকে আপনি দিচ্ছেন। আর সে অকৃতজ্ঞভাবে আত্মসাৎ করছে। ও আপনার পরম শত্রু। এইভাবে দিতে থাকলে আপনার আস্ত খাজাঞ্চিখানাই ও গিলে ফেলবে।

—থামো। ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় উজিরকে। কার সম্বন্ধে কী ভাবে কথা বলতে হয় তাও ভুলে গেছো দেখছি। তামাম দুনিয়ায় যদি একজনও পরম প্রিয় আপনজন থাকে আমার তা সে এই রায়ান। সে আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে। আমার দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি সারিয়েছে। তার বদলে কতটুকু দিয়েছি তাকে! আমার সল্-তানিয়ৎটাই যদি তাকে দিয়ে দিই তাও এমন কিছু বেশি দেওয়া হয় না। তার পাওনা শোধ করা যায় না। তার ঋণ পরিশোধ হয় না। না না, এসব কথা তোমার মুখে সাজে না উজির। তুমি হিংসায় জ্বলছো। তোমার দিল সাফা করো। বাদশাহ্ সিনবাদকে নিয়ে ঠিক এই ধরনের একটা কাহিনী শুনেছিলাম—কোন এক পারিষদের কাছে।

এই সময় সুলতানের অনুমতি নিয়ে দরবার ছেড়ে চলে গেলো রায়ান।

শাহরাজাদ দেখলো প্রভাত সমাগত। এবার সে থামলো। দুনিয়াজাদ খুশিতে গদগদ হয়ে বলে, বাঃ মিষ্টি, কী সুন্দর তোমার গল্প দিদি।

শাহরাজাদ বলে। এর চেয়েও ভালো কাহিনী শোনাতে পারি বোন, যদি বেঁচে থাকি।

শারিয়ার ভাবে, বাকী গল্পগুলো শোনার জন্যে আরও কিছুদিন ওকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

পরদিন পঞ্চম রজনীতে শাহেনশাহ্ শারিয়ারের অনুমতি নিয়ে আবার গল্প শুরু করে শাহরাজাদ। শুনুন শাহজাদা, সেই বাদশাহ য়ুনান তার উজিরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো, তোমার দিল সাফা করো উজির। তুমি হিংসায় জ্বলছো। তোমরা হয়তো চাও, রায়ানকে আমি হত্যা করি। এবং বাদশাহ সিন্বাদ যেমন তার প্রাণ-প্রিয় বাজপাখীটাকে হত্যা করে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়েছিলো, তেমনি আমিও দগ্ধ হতে থাকি।

উজির জানতে চাইলো, সিন্বাদের সেই কাহিনী আমি শুনিনি জাঁহাপনা। যদি মেহেরবানী করে শোনান, বুঝতে পারি।

য়ুনান বলতে শুরু করে। এক সময়ে ফার শহরে এক প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ্ বাস করতো। তার নাম শাহেনশাহ সিন্বাদ। খেলাধূলা, শিকার এবং অশ্বারোহণে ভারি ওস্তাদ ছিলো

সে। তার একটা পোষা, শিকারী বাজপাখী ছিলো। দিবারাত্র তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো সেই পাখীটা। কোনও সময়ই সঙ্গ ছাড়া করতো না। এমন কি, রাতের বেলাতেও যদি শিকারে বেরুতো, পাখীটাকে হাতের মুঠোটায় বসিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতো। জিগরিদোস্তের মতো ভালোবাসতো তাকে। অর্থাৎ প্রাণের বন্ধু। তার গলায় শিক্‌লি দিয়ে বাঁধা থাকতো একটা সোনার পেয়ালা। জলটল খাওয়ার জন্যে।

একদিন সিন্‌বাদের কাছে এসে তার বাজপাখীর প্রধান পরিচারক জানালো, আজকের এই দিনটা শিকারের পক্ষে বহুৎ আচ্ছা। যাবেন নাকি, শাহজাদা?

সিন্‌বাদ বললো, ঠিক আছে, তোমরা সব গুছিয়ে নাও, যাবো।

লোক-লস্কর আর তার প্রাণ-প্রিয় বাজপাখীকে নিয়ে রওনা হলো সিন্‌বাদ শিকার সন্ধানে।

বেশ কিছু দূরে এক পাহাড়ের উপত্যকায় উপস্থিত হলো এক সময়। শিকারের জাল পাতা হলো, চারদিক বেষ্টন করে। দেখা গেলো, একটা রামছাগল ধরা পড়েছে জালে। সিন্‌বাদ সবাইকে হুঁসিয়ার করে দিলো, সাবধান ছাগলটা যেন না পালায়। যে ওকে পালাতে দেবে তাকে আমি জবাই করবো।

জালটাকে গুটিয়ে জন্তুটাকে কাছে আনা হলো। রামছাগলটা সিন্‌বাদের সামনে এসে, পিছনের পা দু'টোয় ভর দিয়ে খাড়া হয়ে, সামনের পা দু'টো করজোড়ের ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে পড়লো। সিন্‌বাদের মনে হলো, ছাগলটা বুঝে সালাম জানাতে চায়। মজা লাগলো। প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠে হাততালি দিয়ে উঠলো। বুঝিবা একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ তড়াক করে একটা লাফ দিয়ে সিন্‌বাদের কাঁধের পাশ দিয়ে শোঁ করে বেরিয়ে গেলো। বেশ কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়েই চোঁ দৌড়। একেবারে হাওয়া। ব্যাপারটা পলকের মধ্যে ঘটে গেলো। এমনটা যে ঘটতে পারে কেউ ভাবতেই পারেনি। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও দারুণ ক্ষিপ্রতায় ঘোড়ার পিঠে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাড়া করে চললো ছাগলটাকে। শুধু তার চিৎকার শোনা গেলো, আমার হাত থেকে পালিয়ে কেউ কখনও নিস্তার পায়নি। তুমি পাবে? যেমন করে পারি ধরবোই তোকে।

তীরবেগে ছুটে চললো তার ঘোড়া। শেষে নাগালে পেলো রামছাগলটাকে। ছাগলটাও ছুটছে, ঘোড়াও তার পিছনে পিছনে। উভয়েরই ক্ষিপ্রগতি। ছাগলটাকে ধরি ধরি করেও ধরা যায় না। এমন সময় বাজপাখীটা উড়ে গিয়ে ছাগলটার সামনে থেকে গোঁত্তা মেরে ধারালো ঠোঁট দু'টো ঢুকিয়ে দিলো ওর চোখের মধ্যে। যন্ত্রণায় ছটফট করে ছিটকে পড়ে গেলো ছাগলটা। গড়াতে গড়াতে আটকে গেলো একটা ঝোপের সঙ্গে। তামার দস্তানা পরা হাতের এক মুষ্ঠাঘাত করলো সিনবাদ। সাত হাত দূরে ছিটকে পড়লো রামছাগলটা। আর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

ছাল চামড়া ছাড়িয়ে ছাগলটাকে জিনের নিচে ঝুলিয়ে রওনা হলো। সিনবাদ আর তার ঘোড়া উভয়েই তখন দারুণ পিপাসার্ত। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। প্রাণ যায় যায়, এমন অবস্থা। খর রৌদ্র-তাপে ধরিত্রী দগ্ধ হচ্ছে তখন। যে দিকে তাকাও ধূ ধূ করে উত্তপ্ত বালুকা রাশি। কোথাও জলের সন্ধান নাই।

এইভাবে যেতে যেতে পথের একটা বাঁক ঘুরতেই সিনবাদ দেখলো, অদূরে একটা

বিশাল বৃক্ষ। আর তার নিচে একটা পুকুর। কিন্তু পুকুরের জল যেন কেমন থকথকে পুরু। গোলা ময়দার মতো। চামড়ার দস্তানা পরা হাতে বাজপাখীর গলা থেকে সোনার পেয়ালাটা খুলে নিয়ে পুকুর থেকে এক পেয়ালা জল ভরে এনে পাখীটার মুখের সামনে তুলে ধরলো সিনবাদ। কিন্তু কী আশ্চর্য, এক ঝাপটায় পেয়ালাটা ছিটকে ফেলে দিলো পাখীটা। পেয়ালাটা আবার ভরে নিয়ে এলো। আবার ওর মুখের সামনে তুলে ধরলো। এবারও এক ঝাপটায় ছুঁড়ে দিলো পেয়ালাটা। এবার বিরক্ত হলো সিনবাদ। যাই হোক আবার ভরে আনলো জল। এবার সে ঘোড়ার মুখের কাছে ধরতে গেলো। কিন্তু সেই একই ঘটনা—পাখার ঝাপটায় পাখীটা আবার ফেলে দিলো পেয়ালাটা। এবার সিনবাদ ক্রুদ্ধ, কুপিত হলো। তলোয়ার বের করে দু'টো পাখাই কেটে ফেললো পাখীটার। নিজে নিজেই বলতে লাগলো, ওটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নিজেও খাবে না, খেতেও দেবে না কাউকে।

পাখীটার দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই তার। মাথা উঁচু করে ইশারায় দেখিয়ে দিলো সেই বিশাল বৃক্ষটা। সিনবাদ এবার ভালো করে লক্ষ্য করে, গাছটার ডালে জড়ানো অসংখ্য ময়াল সাপ। তাদের মুখ থেকে বিষ মেশানো লালা ঝরে ঝরে পড়ছে পুকুরের জলে। এই দৃশ্য দেখে ব্যথায় মথিত হতে লাগলো সিনবাদের হৃদয়। অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকলো সমস্ত সত্তা।

প্রাসাদে ফিরে এসে ছালছাড়ানো ছাগলটাকে বাবুর্চির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, পাকাও।

সিনবাদের হাতের মুঠির ওপর বসে বাজপাখীটা তখনও ধুঁকছিলো। একটুক্ষণ পরে ঝপ করে পড়ে গেলো নিচে। সিনবাদ তুলে দেখলো, সব শেষ।

অনুতাপের অনলে পুড়তে লাগলো সিনবাদ। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে সে। আর কেউ না, আর কেউ না, আমি—আমি নিজেই তাকে খুন করেছি আমার প্রাণের দোস্ত, আমার কলিজা....

বাদশাহ য়ুনান থামলো।

উজির বললো, কিন্তু জাঁহাপনা আপনার এ কাহিনীর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আপনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন, সিনবাদ তার পরম সুহৃদ, উপকারী বন্ধু সেই বাজপাখীটাকে হত্যা করে পরে অনুতপ্ত হয়েছিলো। কিন্তু ওই রায়ান আপনার পরম সুহৃদ-উপকারী বন্ধু আদপেই না। ও হচ্ছে ফন্দীবাজ, দারুণ শয়তান। কিন্তু হুজুর এখন ভালো মন্দ বিচার করতে পারছেন না। রায়ানের মোহে আপনি আচ্ছন্ন। আপনার মোহ কেটে গেলে আপনা থেকেই বুঝতে পারবেন। এখন আপনাকে হাজার বোঝালেও বুঝবেন না।

সেই উজির আর বাদশাহ পুত্রের কাহিনী কি জানেন আপনি? উজির যেমন তার বাদশাহ পুত্রের অনিষ্ট করতে গিয়ে নিজেই ধ্বংস হয়েছিলো। তেমনি আপনিও একদিন নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনবেন।

এক বাদশাহর এক পুত্র ছিলো। ঘোড়ায় চড়া আর শিকারে তার ভীষণ ঝোঁক। বাদশাহ তার এক উজিরকে দেখাশোনার ভার দিয়েছিলো। সারা দিনরাত বাদশাহ পুত্রের সহচর হয়ে থাকাই তার একমাত্র কাজ।

কিন্তু একাজ সম্মানজনক বলে মনে করতে পারলো না উজির। এ হলো গরু চরানো রাখালের কাজ। আর সে কিনা সুলতানের উজির! ফিকির খুঁজতে লাগলো, কী করে এ থেকে অব্যাহতি পাবে সে। আবার গিয়ে বসবে দরবারে—

একদিন বাদশাহপুত্র উজির সমভিব্যাহারে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। টগবগিয়ে ছুটে চলেছে দু'জনের ঘোড়া। শাহজাদা আগে আগে আর উজির পিছনে। যেতে যেতে দেখলো, কিছু দূরে তাদের সামনে রাস্তার ওপর বসে আছে এক আজব জানোয়ার। এর আগে কখনও দেখেনি শাহজাদা। উজির চিৎকার করে উঠলো, শিগ্গির ধরুন শাহজাদা, শিগ্গির ধরুন। দেখুন যেন পালাতে না পারে।

তৎক্ষণাৎ আরও জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়া করলো শাহজাদা। কিন্তু জানোয়ারটাকে ধরতে পারলো না। মরুপ্রান্তরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

শাহজাদা ততক্ষণে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কোন্ পথে ফেরা যাবে, কিছুই ঠাওর করতে পারছে না।

দিশাহারা হয়ে একটা অচেনা পথ ধরে চলেছে সে। এমন সময় দেখলো, কিছুটা দূরে পথের ধারে বসে একটি মেয়ে অঝোরে কাঁদছে। মেয়েটি সুন্দরী—রূপবতী যুবতী। কাছে এসে শাহজাদা জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি সুন্দরী? কাঁদছো কেন? কী হয়েছে তোমার?

মেয়েটি বলে, আমি হিন্দের শাহজাদী। এই মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমার দলের লোকজনদের খুঁজে পাচ্ছি না।

মেয়েটির কথা শুনে বড় মায়া হলো শাহজাদার। ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো তাকে। যেতে যেতে এক সময় দেখলো একটা ছোট্ট জরাজীর্ণ পোড়ো বাড়ি। মেয়েটি বললো, মালিক একটু থামো, আমার 'ছোটঘর' পেয়েছে, আমি এখুনি আসছি।

মেয়েটি নেমে সেই বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেলো। শাহজাদা অপেক্ষা করতে থাকে। অনেকক্ষণ কেটে গেলো। কিন্তু মেয়েটি আর ফেরে না।

ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে পায়ে বাড়িটার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ে শাহজাদা। নিজেকে আড়াল করে নেয় একটা দেওয়ালের পাশে। জানলার ফুটোতে চোখ রেখে দেখলো, সেই মেয়েটা এক রাক্ষসীর রূপ ধারণ করেছে। ঘরে ছিলো আরও দুটি রাক্ষস-রাক্ষুসী। বুড়ো-বুড়ি। মেয়েটা বলছে তোমাদের জন্যে আজ একটা নাদুস-নুদুস মালপোয়া নিয়ে এসেছি।

বুড়ি রাক্ষসীটা বললো, তাকে ভেতরে নিয়ে আয় মা। আজ আমরা পেট পুরে ফলার খাবো।

এ কথা শুনে শাহজাদার বুক কেঁপে ওঠে। হাত পা হিম হয়ে যেতে থাকে। শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো। কোনরকমে সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো।

এদিকে সেই রাক্ষসী মেয়েটাও বেরিয়ে এসেছে। আবার সেই আগের চেহারা। সুন্দরী রূপবতী-যুবতী। শাহজাদাকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে সে হাসলো। বললো, অমন করে ভয়ে কাঁপছো কেন তুমি?

শাহজাদা বললো আমার মনে হচ্ছে শত্রুর আস্তানায় এসে পড়েছি আমি।

—তুমি না বলেছিলে, তুমি বাদশাহর ছেলে!

—হ্যাঁ।

—তবে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের বশ করছো না কেন?

শাহজাদা বললো, পয়সার লোভে ভুলবে না। আমাকে মেরে আমার দেহটা ছিঁড়ে খাবে ওরা।

মেয়েটি আঁৎকে উঠলো। তবে কি শাহজাদা সব জেনে ফেলেছে? সব শুনে ফেলেছে তাদের কথাবার্তা? তাহলে তো ওকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না ঘরে। সে এখন এখানে একা। শাহজাদার কাছে মারাত্মক শিকারাস্ত্র আছে। যদি তার বুকে বসিয়ে দেয়—একা রুখতে পারবে না সে।

নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে মেয়েটি বললো, তাহলে খোদাই একমাত্র ভরসা। তার নাম জপ করো। তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। সব বিপদ কেটে যাবে।

দু-হাত একত্র করে, হাঁটু গেড়ে বসে, মুদ্রিত নয়নে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায় শাহজাদা। চোখ মেলে দেখে মেয়েটি হাওয়া হয়ে গেছে।

অনেক পথ ঘুরে ঘুরে অবশেষে প্রাসাদে ফিরতে পারলো শাহজাদা। বাবার কাছে আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত খুলে বললো।

সব শুনে বাদশাহ উজিরের গর্দান নেবার হুকুম দিলো।

উজির তার কাজে গাফিলতি করেছিলো। জেনেশুনে শাহজাদাকে রাক্ষস-পুরীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। এই অপরাধে উজিরের প্রাণদণ্ড হয়েছিলো।

এই কাহিনী বলে বাদশাহ য়ুনানের উজির বললো, আমার যদি কোন বদ মতলব থাকে আমিও আপনার কাছে সমুচিত দণ্ড পাবো। এবং সে দণ্ড মাথা পেতে নিতে হবে আমাকে, আমি জানি। এবং এসব জেনেশুনেও আপনাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি—আপনি যাকে আপাতত বন্ধু বলে মনে করছেন, মুক্ত হস্তে উপঢৌকন দিয়ে তাকে খুশি করার চেষ্টা করছেন, সে আপনার পরম শত্রু। অন্য দেশের গুপ্তচর। আপনার প্রাণনাশের ফিকির খুঁজছে সে। তার অসাধ্য কিছুই নাই। সামান্য একটা লাঠি হাতে ধরিয়ে আপনার দুরারোগ্য ব্যাধি সে সারিয়ে দিয়েছে। যাদুমন্ত্রের মতো। যদি মনে করে, অতি তুচ্ছভাবেই সে আপনার মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক! ঠিক বলেছো। বড় জব্বর কথা বলেছো। তুমি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তোমার কথাই ঠিক। তোমার কথাই আমার শোনা দরকার। কি জানি, লোকটা হয়তো বা গুপ্তচর। হয়তো সে আমার মরণ ফাঁদ তৈরি করছে—ভেতরে ভেতরে। তার অসাধ্য কিছুই নাই। হয়তো কোন অলৌকিক কায়দায় আমার মৃত্যুও ঘটাতে পারে সে। হয়তো বা কোন একটা কিছু শুঁকতে দিয়েই আমাকে মেরে ফেলতে পারে। কে জানে তার মনে কী আছে? তা হলে—তা হলে এখন আমার কী করা উচিৎ, উজির?

—আপনার সামনে তাকে হাজির হতে হুকুম করুন জাঁহাপনা। তারপর, এখানে এলে তার গর্দান নিয়ে নিন। ব্যাস, পথের কাঁটা সাফ হয়ে যাবে। আপনাকে খতম করার আগে তাকেই আগে খতম করে দিন আপনি। এই হচ্ছে একমাত্র শাহী কায়দা।

বাদশাহর হুকুমে দূত গেলো হেকিম রায়ানের কাছে। তড়ি-ঘড়ি রায়ান এসে হাজির। বেচারী জানেও না তার মৌৎ এতো কাছে। এমনটাই হয়। মৃত্যু হঠাৎই আসে জীবনে। আগে থেকে শমন পাঠিয়ে আসে না বড় একটা। তাই মৃত্যুর আগমনে বিচলিত না হয়ে সহজভাবে নিয়তিকে মেনে নেওয়াই ভালো। কবির ভাষায় :

'শিশুর সারল্য নিয়ে, ফুল্ল মনে
নির্দ্বিধায় পথ চলো।
এই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, স্থল-জল-অন্তরীক্ষ, দিনরাত্রি
নিরন্তর নিয়ন্ত্রিত যার ইশারায়,
জন্মের প্রদোষকালে লিখেছেন তিনি,
তোমার ভাগ্যের বিধান।
কপালে যা লেখা আছে খণ্ডাতে পারো না তুমি,
তাই নির্দ্বিধায়, শিশুর সারল্য নিয়ে পথ চলো!

আমার বিমুগ্ধ প্রাণ উদাস মাতাল হয় তার নাম গানে,
নিজেকে উজাড় করে নৈবেদ্য সাজাই;
বিনিময়ে কণামাত্র করুণার প্রত্যাশায় অভিভূত থাকি।
শুধু এইটুকু দয় করো প্রভু,
তোমার দয়ার দান বহিবার বল যেন পাই।
তোমাকে বন্দনা করি—মুখে নাই ভাষা,
সুললিত কণ্ঠ নাই—সেই গান গাই।
দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব ছেড়ে খোলা মনে পথ চলো,
তিনিই নিতান্ত নির্ভর।
মুছে ফেলো সব দুঃখ ভয়,
তিনিই তোমার ধাতা।
ভাগ্যের অমোঘ লিপি লিখেছেন তিনি,
যা ঘটে ঘটুক,
মেনে নাও ফুল্ল মনে,
নির্দ্বিধায় মাথা পেতে দাও।।'

বাদশাহ য়ুনান রায়ানকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি জানো রায়ান, কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি?

—আপনার মনের কথা একমাত্র খোদা জানেন, আমি কেমন করে জানবো, জাঁহাপনা?

—তোমাকে আজ ডাকা হয়েছে তোমার গর্দান নেবার জন্যে।

—কেন আমাকে হত্যা করবেন? কী আমার অপরাধ?

—ওরা আমার পারিষদরা বলছে, তুমি নাকি গুপ্তচর। আমাকে হত্যা করতে এসেছো। সুতরাং, আমাকে বাঁচতে হলে তোমাকে আগে হত্যা করতে হবে।

এই বলে বাদশাহ জল্লাদকে হুকুম করলো, এই বিশ্বাসঘাতকের গর্দান নাও।

তখন সেই হতভাগ্য রায়ান কাতরভাবে মিনতি করতে লাগলো, আমাকে বাঁচান জাঁহাপনা, আল্লাহ আপনার ভালো করবেন। আমাকে মারবেন না হুজুর। এ পাপ আপনার সইবে না। আমি আপনার দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে নতুন জীবন এনে দিয়েছি, আর আপনি কিনা আমাকে হত্যা করবেন?

বাদশাহ য়ুনান বললো, আমি তোমার উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়েছি। এখন যতক্ষণ না তোমাকে হত্যা করছি আমার শান্তি নাই। একটা তুচ্ছ লাঠি হাতের মুঠোয় ধরিয়ে তুমি আমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়েছো, সুতরাং তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। হয়তো বা একটা ফুলের গন্ধ শুঁকতে দিয়ে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে! কিংবা অন্য কোন উপায়েও মারতে পারো।

রায়ান মরিয়া হয়ে চিৎকার করে ওঠে, এই কী আমার পুরস্কার? এই ভাবেই কী আপনার জীবনদাতাকে পুরস্কার দেবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন?

কিন্তু বাদশাহ তার সিদ্ধান্তে অনড়।—মৃত্যুই তোমার একমাত্র পথ। অন্য কোন পথ খোলা নাই রায়ান।

রায়ান বুঝলো, বাদশাহ তাকে মারতেই বদ্ধপরিকর। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে থাকে। গায়ে পড়ে সেধে এসে অন্যের উপকার সে কেন করতে এলো? কেন এই দুর্মতি হলো তার?

এর পর জল্লাদ এসে তার চোখ বেঁধে দিলো। খাপ থেকে তলোয়ার বের করলো। বাদশাহর কাছ থেকে সরে আসতে বললো সে। কিন্তু রায়ান তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদছে। ভয়ে পিছনে সরতে থাকে সে।—দোহাই হুজুর, আমাকে ছেড়ে দিন। আল্লাহ আপনার ভালো করবেন। আমাকে বিনা দোষে হত্যা করলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না। আপনার সর্বনাশ হবে।

বাদশাহ তখনও বললো, আমি যা হুকুম দিয়েছি তার নড়চড় হবে না।

—হায় খোদা, এই কি আমার পুরস্কার? এতো সেই শয়তান কুমীরের প্রতিশ্রুতির মতো হলো।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো, কী সেই কুমীরের শয়তানি শুনি?

—না, আমার মরার সময় আর আপনাকে সে সব কাহিনী শোনাতে ভালো লাগছে না। আমাকে বাঁচান, আপনার ভালো হবে। অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে থাকে রায়ানের দু'গাল বেয়ে।

এমন সময় বাদশাহর কিছু প্রিয় পাত্র দাঁড়িয়ে আর্জি পেশ করলো, জাঁহাপনা, এই হেকিমকে ছেড়ে দিন, এই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের মনে হয়, লোকটা খারাপ না। তাছাড়া সে আপনার ঐ দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে আপনাকে নতুনভাবে জীবনদান করেছে।

কিন্তু বাদশাহ বললো, ওর ক্ষমতা অনেক। সে তুচ্ছ উপায়ে যেমন আমার রোগ সারিয়েছে তেমনি আবার কোন তুচ্ছ উপায়ে আমাকে মেরেও ফেলতে পারে। হয়তো আমাকে মারার জন্যেই কেউ তাকে পাঠিয়েছে এখানে। হয়তো আমাকে মারতে পারলে অনেক বড় ইনাম সে পাবে। আমি একটু শান্তিতে বাঁচতে চাই। মাথায় দুশ্চিন্তা রেখে ঘুমুতে পারবো না। ওকে মেরে ফেলা ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই।

এ কথা শুনে রায়ান আবার হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। একটু পরে বললো, বাদশাহ, আপনি যখন আমাকে হত্যাই করবেন তখন আমার একটা শেষ আর্জি আছে। আমাকে একবার আমার বাসায় যেতে দিন। আমার জিনিসপত্রগুলো একেবারে অগোছালো করে রেখে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। সেগুলো গুছিয়ে টুছিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আমি ফিরে আসবো। আর সবচেয়ে দরকার আমার ঐ হেকিমী বইগুলো। ওগুলো আমি ওখান থেকে সরিয়ে দিতে চাই। আমার বইগুলোর মধ্যে একখানা বই-এ সব রোগের সার কথা লেখা আছে। এবং তা সারাবার সার দাওয়াই-এর হদিসও দেওয়া আছে, সে বই-এ। এই বইখানা আমি আপনাকে উপহার দিয়ে যেতে চাই। আপনার গ্রন্থাগারের মূল্যবান বইগুলোর মধ্যে সযত্নে রেখে দেবেন। এর থেকে আপনি অনেক দুরারোগ্য রোগ সারাবার দাওয়াই খুঁজে পাবেন।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো, সে বই কেমন?

রায়ান বললো, সে এক মহামূল্যবান গ্রন্থ। তাতে যা লেখা আছে তা ধন্বন্তরী সব দাওয়াই-এর কথা। আমার মুণ্ডুটা যখন কেটে ফেলবেন, তখন ঐ বইটার তিনের পাতা খুলে উপরের তিনটি লাইন পড়লে দেখবেন, আমার বিচ্ছিন্ন মুণ্ডুটা কথা বলছে।

এমন অদ্ভুত কথা শুনে বাদশাহ মজা পেলো। বললো, সত্যি, তোমার মাথাটা কেটে ফেললেও তুমি কথা বলতে পারবে?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা, সত্যি। আমি যে-সব অলৌকিক জ্ঞান সঞ্চয় করেছি এ তারই একটা।

এ কথা শুনে বাদশাহ হুকুম করলো, রায়ানকে সশস্ত্র প্রহরী ঘিরে তার বাসায় নিয়ে যাও।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো রায়ান। উজির আমির অমাত্য পবিবেষ্টিত হয়ে বাদশাহ বসেছিলো সিংহাসনে। সামনে এসে দাঁড়ালো রায়ান। তার এক হাতে সেই প্রাচীন পুঁথি, অন্য হাতে একটা ছোট্ট বাক্সে কিছু পাউডার। একখানা প্লেট আনতে বললো সে একজনকে। প্লেট এলো। বাক্সের খানিকটা পাউডার প্লেটে ঢেলে সে বাদশাহকে বললো, জাঁহাপনা,

আপনি যখন আমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলবেন, তখন তার রক্ত বন্ধ করার জন্যে এই প্লেটের পাউডারের ওপর মুণ্ডুটা রাখবেন। দেখবেন, রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এবার এই বইটা নিন হুজুর। কিন্তু আমার মুণ্ডুটা না কাটা পর্যন্ত বই-এর পাতা খুলবেন না। কাটা মুণ্ডুর রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে বই-এর পাতা খুলবেন।

কিন্তু বাদশাহ তখন উত্তেজনায় অধীর। ভালো করে শুনলোও না রায়ানের কথা। বইটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই তার পাতা ওলটাতে লাগলো। পাতায় পাতা সেঁটে আছে। বাদশাহ ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটের লালায় ভিজিয়ে নিয়ে পাতা ওলটাতে চেষ্টা করে। প্রথম পাতাটা ওলটালো। কিন্তু দ্বিতীয় পাতাও সেঁটে আছে। আবার আঙুলটা মুখের লালায় ভিজিয়ে নিয়ে পাতাটা ওল্টালো। কিন্তু কী ব্যাপার কোনো পাতাতেই তো কিছু লেখা নাই। একেবারে সাদা। বাদশাহ চেঁচিয়ে উঠলো, কই, কিছু তো লেখা নাই হে।

রায়ান বললো, আছে, আছে। পাতা ওলটান, লেখা চোখে পড়বে, জাঁহাপনা।

বাদশাহ দ্রুতগতিতে পাতা ওলটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু না, হাত পা যেন কেমন অবশ হতে থাকে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠতে লাগলো। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। তারপর ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে পড়ে গেলো সিংহাসনের নিচে। শুধু গোঁ গোঁ করে বলতে পারলো, বিষ, বিষ! তার পরই সব শেষ।

এ কাহিনী থেকে কী শিক্ষা পেলে, দৈত্য? যে অন্যায় করে না, আল্লাহ তাকে রক্ষা করে। তুমি অন্যায়ভাবে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ ওপরে আছেন। তিনি তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

শাহরাজাদ দেখলো রজনী অবসান হতে চলেছে। থামলো সে। দুনিয়াজাদ বললো, কী সুন্দর করে বলতে পারো তুমি, দিদি।

—তোমাদের কাল রাতে আরও ভালো, আরও মজার গল্প শোনাবো বোন। কিন্তু সবই নির্ভর করছে মেহেরবান শাহজাদার ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর।

পরদিন রাত্রে আবার কাহিনী শুরু হয় : তারপর সেই ধীবর দৈত্যকে বললো, এক সময় তোমার কব্জায় পড়েছিলাম আমি, এবার তুমি আমার কব্জায়। তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে। এখন তোমাকে আমি এক তামার জালার মধ্যে পুরেছি, এবার তোমাকে ঐ দরিয়ার জলে ডুবিয়ে রাখবো।

—আল্লাহর দোহাই, অমনটি করো না, ভাই, মরে যাবো। তুমি কত মহৎ, কত উদার। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যা করতে চেয়েছিলাম তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। আর কক্‌খোনো ওসব কাজ করবো না, কথা দিচ্ছি। তুমি জানো ভাই, আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, যে লোক তার দুষ্কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত, তাকে ক্ষমা করতে হয়। তা সে যত বড় অপরাধীই হোক না। উমান আর আতিকাহ্‌র কাহিনী—জানো তো?

ধীবর উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে, কী সেই কাহিনী? বলো, শুনি।

দৈত্য বলে, নিশ্চয়ই বলবো। কিন্তু ভাই, এই জালার মধ্যে বন্দী হয়ে থেকে সে কাহিনী বলতে আমার ভালো লাগবে না। জালার মুখটা একবার খুলে দাও, আমি বেরিয়ে আসি, তারপর কত গল্প শুনতে চাও? সব শোনাবো।

ধীবর কিন্তু ভোলবার পাত্র নয়।—না, না, গল্প শোনার দরকার নাই আমার। তোমাকে আমি জলের তলায় ফেলবো এখুনি। তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি আমায় আস্ত রাখবে নাকি?

দৈত্য এবার মরিয়া হয়ে চিৎকার করে ওঠে। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাকে আমি গল্প শোনাবো। ধনদৌলতে তোমার ঘর ভরে দেবো। আমাকে খালাস করে দাও। আল্লাহর নামে হলফ করছি। তোমাকে আমি মারবো না, বরং বাদশাহ বানিয়ে দেবো।

কী জানি কী মনে হলো ধীবরের, সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে ফেললো দৈত্যের কথা। জালার মুখটা খুলে দিলো। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লাগলো আকাশের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এক বিশালকায় বিকট দৈত্যের আকার ধারণ করলো সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী। প্রচণ্ড একটা লাথি মেরে পিতলের জালাটা ছুঁড়ে দিলো দরিয়ার মাঝখানে। এই না দেখে ভয়ে ধীবরের বুক শুকিয়ে কাঠ। না জানি দৈত্যটা কী করে! বললো, এটা কী করলে? এ তোমার অন্যায়। তুমি আল্লাহর নামে হলফ করেছো দানব। তুমি তোমার সেই দু'টো শর্তই মানবে, আমি আশা করি। সেই বাদশাহ য়ুনানের কাহিনী মনে করো। সে তার উপকারীকে হত্যা করতে চেয়েছিলো বলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলো না। তুমি যদি তোমার উপকারীর ক্ষতি করার চেষ্টা করো, তোমারও সেই দশা হবে।

এই কথা শুনে দৈত্য অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, ঠিক আছে। আমার সঙ্গে এসো। এই বলে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগলো। ধীবরের মনে শঙ্কা। না জানি ব্যাটা কোথায় নিয়ে যেতে চায়! আবার কী নতুন ফন্দী গজিয়েছে তার মাথায়। কিন্তু উপায় বা কী? তার পিছনে পিছনে চলতে থাকে জেলে। ক্রমে শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ের দিকে এগুতে থাকে সে। এক সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দাঁড়ালো তারা। ওপারে তাকাতেই চোখে পড়লো নিচে সুন্দর এক নীল নির্জন উপত্যকা। আর ঠিক তার মাঝখানে এক সরোবর। তার পাশে এসে দৈত্যটা থামলো। ধীবরকে হুকুম করলো, জাল ফেলো।

ধীবর দেখতে পেলো, সরোবরের স্বচ্ছ জলে কী সুন্দর সব লাল, নীল, সবুজ—নানা রঙের মাছ—খেলা করে বেড়াচ্ছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। জাল ফেললো সে। চারটে চার রঙের মাছ উঠলো। আনন্দে বুকটা নেচে উঠলো তার। দৈত্য বললো, এই মাছ চারটে নিয়ে এখানকার সুলতানের কাছে যাও। সে তোমাকে অনেক ইনাম দেবে। সেই টাকায় তুমি বড়লোক হয়ে যাবে।

এই দ্যাখো অনেক দিনের বন্দী দশায় সব আদব-কায়দা আমি একেবারে ভুলে গেছি। তুমি ভাই আমার গোস্তাকি মাফ করে দিও। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি রোজ একবার করে এই সরোবরে জাল ফেলবে। আর সেই মাছ বিক্রী করে তোমার সংসার চলে যাবে। কিন্তু দিনে একবারের বেশী জাল ফেলো না।

এই বলে দৈত্য এক লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে ধীরে ধীরে আকাশের নীলিমায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বাড়িতে ফিরে এসে একটা মাটির হাঁড়িতে করে মাছগুলো নিয়ে শহরের পথে পা বাড়ালো ধীবর। হাঁড়ির জলের মধ্যে খলবল করে নেচে বেড়াতে লাগলো মাছগুলো। এক সময় সুলতানের প্রাসাদে পৌঁছে গেলো সে। সুলতানের সামনে এসে কুর্নিশ করে মাছগুলো তার কাছে তুলে ধরলো। হরেক রকম রঙের মাছগুলো দেখে সুলতান তো মহাখুশি। এমন আজব মাছ সে জীবনে কখনো দেখেনি। রুমের বাদশাহ দিন তিনেক আগে একটা নিগ্রো পাচিকা উপহার পাঠিয়েছে। তার হাতের রান্না এখনও আস্বাদ করেনি সুলতান। উজিরকে বললো, আজ এই মাছ তাকে দাও। সে পাকিয়ে আনুক।

উজির তৎক্ষণাৎ মাছগুলো নিয়ে গিয়ে সেই নিগ্রো পাচিকার হাতে তুলে দিয়ে বললো, এখুনি আচ্ছা করে পাকাও। সুলতান খাবেন। খেয়ে যাতে তিনি বাহবা দেন তেমনি করে তৈরি করো। রান্নায় তোমার কতটা কেরামতি—আজ প্রথম দিনে দেখবো আমি। আজকের এই খানা যদি সুলতানের ভালো লাগে তা হলে তোমার পোয়া বারো।

উজির সুলতানের কাছে ফিরে এলো। সুলতান বললো, এই জেলেকে চারশো দিনার ইনাম দিয়ে দাও।

দিনারগুলো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে মহাখুশি হয়ে ঘরে ফিরে এলো ধীবর। বৌকে বললো, দ্যাখো, ছেলেমেয়েগুলোকে একটু ভালোমন্দ খাওয়াতে হবে। ওদের জন্যে জামাকাপড় কিনে দিতে হবে।

এদিকে সেই নিগ্রো পাচিকা মাছগুলো কুটে ধুয়ে উনুনে চাপিয়ে দিলো। এক পিঠ যখন ভাজা হয়ে এসেছে, তখন মাছগুলো উলটিয়ে দিতে গেছে এমন সময় এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেলো। রসুই ঘরের একটা দেওয়াল দু'টো ভাগ হয়ে খানিকটা ফাঁক হয়ে গেলো। আর সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকলো একটি পরমা সুন্দরী যুবতী। সুরমা টানা আয়ত চোখ, উন্নত উদ্ধত বুক। সুঠাম দেহবল্লরী। সমুদ্র নীল রঙের একখানা রেশমী রুমাল মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে চিবুকের নিচে বাঁধা। হাতের কব্জীতে সোনার ব্রেসলেট, আর আঙ্গুলে নানা রঙের হীরা-চুনী-পান্না বসানো গোটা কয়েক আংটী। তার রূপের জৌলুসে চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়। উনুনের কাছে এগিয়ে এলো সে। তার হাতে ছিলো বাঁশের একখানা লাঠি। ভেতরটা ফাঁপা। কড়াইয়ের ওপর লাঠিটা ধরে অন্যপ্রান্তে মুখ লাগিয়ে বললো, মাছ ভাই, মাছ ভাই শুনছো?

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে পাচিকা তো ভয়ে অজ্ঞান। মেয়েটি বার বার মাছগুলোকে ঐভাবে ডাকতে লাগলো। একটু পরেই মাছগুলো কড়াইয়ের মধ্যে থেকে মাথা তুললো। বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো শুনি।

মেয়েটি হঠাৎ কড়াইটা ধরে উনুনের মধ্যে উপুড় করে ঢেলে দিলো মাছগুলোকে। তারপর যে পথে এসেছিলো সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক হয়ে যাওয়া দেওয়ালটা আবার যেমন ছিলো তেমনি জোড়া লেগে গেলো। পাচিকার হুঁশ ফিরে এলো যখন, মাছগুলো উনুনের আগুনে পুড়ে ছাই। কপাল চাপড়ে তারস্বরে কাঁদতে লাগলো সে।—এ কী সর্বনাশ আমার হলো গো। আমার যে গর্দান যাবে।

তার কান্নার আওয়াজে উজির ছুটে এসে দেখে, সব মাটি হয়ে গেছে। বললো, ঐ পোড়া মাছগুলো নিয়ে চলো সুলতানের কাছে। দ্যাখো, তোমার কী দশা হয়!

একথা শুনে পাচিকা কান্নায় ভেঙে পড়লো। উজিরকে আদ্যোপান্ত যা ঘটেছে, খুলে বললো।

উজির শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসলো। যত্ত সব গাঁজাখুরি গল্প। আবার সে ধীবরকে বলে পাঠালো, আরও চারটে ঐ মাছ যেন সে দিয়ে যায়। উজিরের হুকুমে ঐ সরোবর থেকে আরও চারটে মাছ ধরে তাকে দিয়ে এলো। এবার উজির পাচিকাকে বললো, আমার সামনে খানা পাকাও, আমি নিজের চোখে দেখতে চাই, কী ঘটে! যথা হুকুম—পাচিকা মাছগুলো কুটে ধুয়ে আবার কড়াইতে করে ভাজতে থাকে। এক পিঠ যখন ভাজা হয়ে এসেছে ঠিক সেই সময় সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে গেলো। উজির থ'!

এমন সময় শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি বিদায় নিচ্ছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

পরদিন সপ্তম রাত্রি। আবার সে বলতে শুরু করে। তারপর সেই মেয়েটা যখন মাছের কড়াইটা উনুনের উপর উপুড় করে মাছগুলোকে আগুনে ফেলে দিলো, তখন অবশ্য উজির বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো। আর উপায়ন্তর না দেখে সুলতানের কাছে গিয়ে আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত খুলে বললো সে। সুলতান হেসে উড়িয়ে দিলো, যত্ত সব আজগুবি কিস্‌সা! কে আছো, এখনি সেই জেলেকে ডাকো।

ধীবরকে ডাকা হলো। তাকে হুকুম করলো সুলতান, আরও চারটে ঐ মাছ নিয়ে এসো। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই, এই সব ভুতুড়ে কাণ্ড!

ধীবর তো মহানন্দে আবার সেই সরোবরে গিয়ে চারটে মাছ ধরে নিয়ে এলো। এবং ইনাম হিসেবে চারশো দিনার খুঁটে বেঁধে বাড়ি ফিরে গেলো। সুলতানের হুকুমে তার চোখের সামনে সেই মাছ পাকানোর ব্যবস্থা করা হলো। নিজে রসুইখানায় গিয়ে বসলো। তার সামনে মাছগুলো কুটে ধুয়ে আবার কড়াইতে ভাজতে লাগলো পাচিকা। এক পিঠ ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে। ওলটাতে যাবে, এমন সময় আবার সেই কাণ্ড। এবার কিন্তু রূপবতী সেই যুবতী না, এবার দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ঢুকলো এক আবলুস কালো নিগ্রো। বিশাল একটা বুনো মোষের মতো চেহারা। তার হাতে সদ্য ভেঙে আনা একটা গছের ডাল। বিশ্রী একটা আওয়াজ তুলে সে ডাকতে লাগলো, মাছ ভাই, মাছ ভাই, শুনছো?

মাথা তুলে মাছগুলো বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনছি, বলো ভাই।

আবার সেই একই কাণ্ড। কড়াইটা উনুনের উপর উপুড় করে ধরে মাছগুলোকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলো। নিমেষে পুড়ে ছাই। নিগ্রোটাও দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সুলতান ভাবতে লাগলো, এ তো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। এর পিছনে অন্য কোনও গভীর রহস্য আছে। কী সেই রহস্য, জানতে হবে। কিন্তু কী করে জানা যায়? ডাকো সেই জেলেকে। কোথা থেকে আনে সে এ মাছ? সেখানে যেতে হবে। সেখান থেকেই পাওয়া যাবে এ রহস্যের হদিশ। ধীবরকে ডেকে পাঠানো হলো। সে এসে বললো, শহরের কাছেই যে পাহাড়টা—তার ওপরে একটা সায়র আছে, সেই সায়র থেকে এই মাছ সে ধরে আনে।

সুলতান তখন সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সেই পাহাড়ের পথে রওনা হয়ে গেলো। তার মনে এক দারুণ সংশয়। সৈন্য দল পাহাড় ডিঙিয়ে ওপরে গিয়ে পৌঁছলো। এক মনোরম ঘন সবুজ উপত্যকা। কোথাও কোনও জনপ্রাণী নাই। এমন সুন্দর জায়গা তারা আগে কখনও দেখেনি। সবাই দেখলো, সরোবরের স্বচ্ছ জলে খেলা করছে অসংখ্য রঙিন মাছ।

সুলতান তার লোকজনদের জিজ্ঞেস করলো, এর আগে তাদের কেউ এ জায়গায় এসেছে কিনা। তারা সবাই ঘাড় নেড়ে জানালো না। তখন আল্লাহর নামে হলফ করে সে বললো, যদি আল্লাহ বলে কোনও কেউ থাকেন, তবে তার দিব্বি করে বলছি, আসল ব্যাপার কী, না জেনে আমি এখান থেকে নড়ছি না।

তারপর তার লোকজনকে পাঠালো পাহাড়ের চারপাশ ঘুরে দেখে আসতে। সুলতান তার জ্ঞানবৃদ্ধ উজিরকে ডেকে বললো, শোনো উজির, আজ রাত্রে আমি একা এই পাহাড়ে, এই সরোবরে ঘুরে দেখতে চাই। আমার তাঁবুর চারপাশে কড়া পাহারা বসাবে। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে বলে দেবে, সুলতান কারো সঙ্গে দেখা করবেন না আজ রাত্রে। আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে, এই সরোবর আর তার আজব মাছের রহস্য। আমার এই মতলবের কথা যেন কোনক্রমেই ফাঁস না হয়, উজির।

উজির হলফ করে জানালো, কেউ জানতে পারবে না।

সুলতান ছদ্মবেশে একাকী বেরিয়ে পড়লো। সারা রাত ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে। এইভাবে রাত্রি যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে তখন সে দেখতে পেলো, ভীষণ কালো একটা কী বস্তু! বেশ খানিকটা দূরে। তার মন নেচে উঠলো। হয়তো এবার সে

জানতে পারবে এ রহস্যের হদিশ। কিন্তু হা হতোহস্মি! কাছে আসতেই দেখলো, একটা প্রাসাদ। আগাগোড়া কালো পাথরে তৈরি। প্রাসাদের সামনে এক বিশাল সিংহদরজা। তার একটা পাল্লা খোলা। আস্তে আস্তে কড়া নাড়লো সুলতান, এক দুই তিন বার। কিন্তু কোনও জবাব নাই। মনে হলো, জনমানব বর্জিত। এখানে কেউ বাস করে না। পায়ে পায়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো সে। একটু চড়া গলায় ডাকতে লাগলো, কে আছো, মালিক! আমি এক ক্লান্ত পথিক, বড় তেষ্টা পেয়েছে, আমাকে একটু পানি দাও। বার বার উচ্চারিত হতে থাকলো কথাগুলো। কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না। আরও ভিতরে ঢুকে পড়লো সুলতান। একেবারে প্রাসাদের মাঝখানে। কিন্তু কোথাও কেউ নাই। সুরম্য অট্টালিকা। সাজানো গোছানো। ঝকঝকে তকতকে। এক জলের ফোয়ারা দেখতে পেলো। তার চার পাশে চারটে সোনার সিংহ।

ফোয়ারার জলের ফিনকির সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে হীরা-পান্না-চুণী। আর সেগুলো জমে জমে চতুর্দিকে স্তূপাকার।

চারপাশের দেওয়ালে নানা জাতের রঙবেরঙের অসংখ্য পাখী। কিন্তু সবাই বন্দী। উড়ে পালাবার পথ নাই। ওপরটা সোনার জাল দিয়ে ঘেরা।

সুলতান বিস্ময় বিমূঢ়! কিন্তু চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন জন-মানবের সন্ধান পাওয়া গেলো না। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এক সময় বসে পড়লো এক জায়গায়।

হয়তো বা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে একটু তন্দ্রাভাব জড়িয়ে ধরেছিলো। এই সময় মৃদু কণ্ঠের এক করুণ-সঙ্গীত ভেসে এলো তার কানে।

হারিয়ে গেলো প্রেমের স্বপন,
কেন আমার ভাঙিয়ে দিলে ঘুম?
তুষের আগুন জ্বালিয়ে দিলে দিল্-এ,
এমন করে করলে কেন খুন?

মনে হলো বেশি দূরে না, কাছেই কেউ গাইছে। একটু এগোতেই সুলতানের চোখে পড়ে, একখানা বাদশাহী পর্দা ফেলা এক দরজা।

পর্দাখানা তুলতেই চোখে পড়লো, এক পালঙ্কে অর্ধশায়িত এক যুবক। কী তার রূপ! টানা টানা চোখ। উন্নত নাসিকা। আপেল সদৃশ চিবুক। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল।

তার চুলের অরণ্যের ছায়ায় রাত্রি নেমে আসে
আর ঐ উজ্জ্বল চোখের মণি
হার মানে আসমানের রুদ্ধবাক তারা
এমন রূপের ঐশ্বর্য দেখে কে না মুগ্ধ হবে, বলো।
আমি তো হবোই। হতবাক আমি।
এমন চাঁদের রূপ পেলো সে কোথায়?
কে দিয়েছে তাকে?

সুলতানের মনে আর আনন্দ ধরে না। ঘরের মধ্যে পা রেখে বললো, আমার কী সৌভাগ্য, তোমার দেখা পেলাম।

কিন্তু পালঙ্কে অর্ধশায়িত যুবকটি, যেমনটি শুয়েছিলো তেমনি শুয়ে রইলো। তার সর্বাঙ্গ এক মূল্যবান শাল-এ ঢাকা। শুধু বললো, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি উঠতে পারছি না। আমার দেহ অসাড়।

সুলতান দুঃখিত হলো। একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা এখানকার ঐ সরোবরে

নানা রঙের মাছের কাহিনী কি তুমি জানো? যদি জানো, আমাকে বলো। আর এই কান্নার গানই বা তুমি গাইছো কেন, আমাকে জানাবে? কী তোমার দুঃখ, কী তোমার ব্যথা?

এই কথা শুনে যুবকের চোখে অশ্রুধারা নেমে আসে। কান্না চেপে বললো, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ আমার এই দশা।

এই বলে শালটা দেহ থেকে সরিয়ে দিলো। সুলতান বিস্ময়ে বিমূঢ়! তার দেহের নিচের অংশ মারবেল পাথরের, আর কোমর থেকে ওপরের অংশ রক্তমাংসের।

যুবক বলতে থাকে, তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, সেই অদ্ভুত ধরনের রঙিন মাছের আর আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী আপনাকে বলি :

—আমার বাবা এক দেশের সুলতান ছিলেন, সে দেশ আপনি হয়তো চিনবেন না। খোদার দোয়ায় তিনি সত্তর বছর প্রজা পালন করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি সুলতান হলাম। আমার চাচার মেয়েকে শাদী করে বেগম করলাম। সে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। কোনও কাজে তাকে ছেড়ে কখনও যদি কোথাও যেতাম নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিতো সে। এমনি ভালোবাসা। এমনিভাবে পাঁচটা বছর কেটে গেছে। একদিন গোসলের জন্যে সে হামাম-এ ঢুকেছে। বাবুর্চিকে হুকুম করে গেছে, নানা-স্বাদের মুখরোচক খানা সাজাতে। আমি তখন আমার পালঙ্কে শুয়ে। আমার মাথা আর পায়ের কাছে দুই ক্রীতদাসী পাখায় হাওয়া করছে। হালকা ঘুমের আমেজ লেগেছে আমার চোখে। এমন সময় কানে এলো, ঐ দুই ক্রীতদাসী ফিসফিস করে বলাবলি করছে। আমাদের মালিকের কী দুর্ভাগ্য ভাই, ঐ রকম একটা খারাপ মেয়েমানুষ আজ তার বেগম। রোজ একটা করে নতুন মরদা না হলে যার ঘুম হয় না, সে কিনা আমাদের মালকিন, ছিঃ ছিঃ! আমাদের মালিক কিন্তু ভাই একেবারে মাটির মানুষ। অতোশত ঘোরপ্যাঁচ বুঝতে পারে না। কেউ যে তাকে ঠকাতে পারে সে কথা সে ভাবতেই পারে না।

—কী করে ভাববে বলো, অন্যজনে বলে, সেই শয়তানিটা রোজ রাতে মালিকের সরাবের সঙ্গে কী একটা মিশিয়ে দেয়। আর তাই খেয়ে মালিক বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। সেই মওকায় সে পরপুরুষকে নিয়ে মজা লোটে। সারা রাত ধরে ফুর্তি করে ভোরবেলায় হুজুরের ঘরে এসে নাকের কাছে কী একটা ধরে। আর তখুনি মালিকের ঘুম ভেঙে যায়, নেশা কেটে যায়।

ওদের কথা শুনে সারাটা দুনিয়া আঁধার হয়ে যায় আমার চোখের সামনে। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে।

একটু পরে হামাম থেকে ফিরে এসে আমাকে আদর করে জাগিয়ে দিলো বেগম। এও নিত্যকার ঘটনা। এর পর আমরা খানা খেতে বসলাম। নানা স্বাদের সুন্দর সুন্দর খাবার। দুষ্প্রাপ্য সরাব। অনেকক্ষণ ধরে বেশ তৃপ্তি করে খেলাম দু'জনে।

রোজ রাত্রে শোবার আগে একপাত্র সরাব পান করা আমার চিরকালের অভ্যেস। আর পাত্রটি নিজের হাতে তুলে দেয় আমার বেগম। সেদিনও সে যথারীতি তুলে দিলো আমার হাতে। একটু কায়দা করে, তার অলক্ষ্যে পিকদানীতে ঢেলে দিলাম সরাবটুকু। তারপর শয্যায় এলিয়ে পড়লাম ঘুমের ভাণ করে। আমার কপালে হাত বুলাতে লাগলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকতে লাগলাম আমি। শুনতে পেলাম ও বলছে, ঘুমোরে হারামজাদা, ঘুমো। আমি চললাম। তোর সুরৎ দেখলে সারা শরীর জ্বলে যায় আমার।

এবার সে সাজগোজ করতে লাগলো। দামি জমকালো শাড়ি পরলো। সুর্মা টানলো চোখে। খোঁপা বাঁধলো সুন্দর করে। খোঁপায় গুজলো একটা লাল গোলাপ। একেবারে মনমোহিনী রূপ। আতর ছিটালো গায়ে। সারা ঘর সুগন্ধি খুশবুতে ভরে গেলো। কোমরে বাঁধলো

আমাব তলোয়ারখানা। তারপর কালো একটা বোরখা দিয়ে ঢেকে নিলো সারা অঙ্গ। এবার সে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লো।

আমিও উঠে পড়লাম। তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে চললাম। প্রাসাদের চত্বর ছাড়িয়ে সিংহদরজা পেরিয়ে চলতে লাগলো সে শহর সীমান্তের দিকে। ওদিকটায় কোন সম্ভ্রান্ত লোক বাস করে না। নিম্নস্তরের চাকরবাকররা থাকে সব। মাটির দেওয়াল গাঁথা, খড়ের ছাউনি ঢাকা ছোট ছোট ঘর। আমার বেগম গিয়ে ঢুকলো ঐরকম একটা বাড়িতে।

ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে একটা ঘুলঘুলির ফুটোয় চোখ রেখে দেখতে থাকলাম তার কাণ্ডকারখানা। ঘরের ভেতর বসেছিলো মোষের মতো বিকটাকৃতি মিসমিসে কালো এক নিগ্রো। পুরু ঠোঁট দু'টো ঝুলে পড়েছে। দাঁতগুলো বরফের টুকরোর মতো। হাতে আধখানা আখ। তার চারপাশে ইত্যাকার ছড়ানো আখের ছোবড়া। সামনে মাটির হাড়িতে হাড়িয়া।

ঘরের ভেতর ঢুকেই আমার বেগম সেই নিগ্রোটার সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সালাম জানালো। নিগ্রোটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিশ্রী ভাষায় খেউড় করলো। এতো দেরি হ'লো কেন র‍্যা, মাগী? সব ব্যাটা মদ-ফদ টেনে যে যার মেয়েমানুষ লিয়ে লটকে পড়েছে। আর আমি শালা, এখানে বসে বসে ছোবড়া চুষছি।

আমার বেগম তখন ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে, তুমি তো জানো, মালিক; আমার চাচার ছেলের সাথে শাদী হয়ে গেছে আমার। সে এখন সুলতান। তাকে ছুপিয়ে তো আসতে হবে। আগে, আমার যখন শাদী হয়নি, তখন কী আমার দেরী হ'তো? এখন যদি সুলতান কোনও রকমে জানতে পারে, আমার গর্দান যাবে। লোকটাকে কুত্তার মতো ঘেন্না করি আমি। ওর কাছে গেলে, ওর মুখ দেখলে গা রি রি করে ওঠে আমার।

কিন্তু তবু সে সুলতান, আমার স্বামী। তার কথা না শুনলে আমাকে জ্যান্ত রাখবে না সে। শোনো, প্রাণনাথ, তোমাকে আমার মনের আসল কথা বলি, আমার যদি তেমন কোন ক্ষমতা থাকতো তাহলে ওর ওই প্রাসাদ-নগর ভেঙে চুরমার করে দিতাম। ভিটিতে ঘুঘু চরাতাম। আমি সহ্য করতে পারি না তার নবাবি চাল। ধন-দৌলত আর আভিজাত্য আমি পায়ে দলে তোমার কাছে চলে আসতে চাই, কিন্তু.....

—থাম্, নিগ্রোটা চিৎকার করে উঠলো, অনেক ঢং তোর দেখেছি। সত্যি করে বল, হারামজাদী, কোন নাগরের গলায় ঝুলছিলি এতক্ষণ? এই শেষবারের মতো তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, এরপর আর একদিনও যদি দেরি করে আসিস তবে তুলে আছাড় দেবো। আর আমি যদি সাচ্চা নিগ্রোর বাচ্চা হই তবে তোর শরীলের ওপর আমি শালা আর ঝাম্পেশ করবো না। তুই হচ্ছিস একটা বিশ্বাসঘাতিনী, বাজারের বারোভাতারী মেয়েমানুষ।

—শুনুন জাঁহাপনা, শাহজাদা বলতে থাকে, আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনুন। সেই নিগ্রো আর আমার বেগমের এই ধরনের কথাবার্তায় আমার রক্ত গরম হয়ে উঠলো। মনে হতে লাগলো, তামাম দুনিয়াটা মিথ্যা, একটা মস্ত বড় ধাপ্পা। মানুষ কিসের জন্যে বেঁচে থাকে? ধনদৌলত, বৈভব, স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, ভালোবাসা সব-সব তখন আমার কাছে মিথ্যে হ'য়ে যেতে লাগলো।

নিগ্রোর কথা শুনে আমার বেগম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, তুমি ছাড়া দুনিয়ায় কেউ আমার নাই। বিশ্বাস করো প্রাণনাথ, আমাকে দূরে ঠেলে দিও না, সোনামানিক। আমি চিরটা কাল তোমারই হয়ে থাকবো।

ওর কান্না দেখে বোধ হয় নিগ্রোটা নরম হলো। বললো, ঠিক আছে, নাও, এসো।

আমার বেগমের মুখে তখন হাসি ফুটেছে। ক্ষিপ্র বেগে শাড়ী জামা পেটিকোট,

কাঁচুলি সব খুলে ফেলে দিলো পাশে। কোমরের তলোয়ারখানা একপাশে একটা বাক্সের ওপর রেখে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে দাঁড়ালো সে নিগ্রোটার চোখের সামনে।

—প্রাণেশ্বর, আমাকে কিছু খেতে দেবে না?

—দ্যাখো, ওখানে ইঁদুরের ঝোল আর ঝারিতে খানিকটা হাড়িয়া আছে।

আমার বেগম তখন ঐ কুখাদ্য মাংস আর সেই হাড়িয়া বেশ তৃপ্তি করে খেলো। হাত মুখ ধুয়ে এসে বাঁশের খাটিয়ায়, নিগ্রোটার পাশে ওর শতছিন্ন তেল চিটচিটে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ঐ নোংরা ঘিনঘিনে বিছানাটার উপর, ওর ফুলের মতো পেলব দেহটা, নিগ্রোটার বুকের নিচে দলাই-মলাই হতে লাগলো। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ক্ষিপ্রবেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বাক্সটার ওপরে রাখা আমার তলোয়ারখানা খুলেই প্রচণ্ড এক কোপ বসিয়ে দিলাম, নিগ্রোটার গর্দানে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো। ভালুকের মতো এক বিকট চিৎকার করে বেগমের বুকের ওপর থেকে ছিটকে গড়িয়ে পড়ে গেলো নিচে। আর সেই মুহূর্তে বেগমকে কোন রকমে জামা কাপড় পরিয়ে টেনে বের করে নিয়ে এলাম আমার প্রাসাদে।

এমন সময় নিশাবসান হচ্ছে দেখে শাহরাজাদ তার কাহিনী থামালো।

সারাদিন দরবারের কাজকর্ম সেরে শারিয়ার যখন আবার অন্দর মহলে ফিরে এলো রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে, শুনুন জাঁহাপনা, তারপর কী করে ঐ শাহজাদা শাপগ্রস্ত হলো, সেই কাহিনী আজ বলবো।

শাহজাদা বলতে থাকে, আমি যখন নিগ্রোটার গর্দানে কোপ বসিয়ে দিয়েছি, তখন, আমার ইচ্ছে ছিলো, দু'জনকেই এক কোপে সাবাড় করে দেবো। কিন্তু তা হলো না। ঐ দৈত্যের মতো নিগ্রোটার গর্দানের অর্ধেক মাত্র কাটা গেলো সেই কোপে। নিগ্রোটা নিচে পড়ে গেলো। মনে হ'লো, ব্যাটা মারা গেলো। কিন্তু না, সে মরলো না। কিন্তু আমি তখন ভেবেছিলাম মরেই গেলো। যাইহোক, আমার বেগমকে প্রাসাদে নিয়ে এসে আমার ঘরেই আটকে রাখলাম সে রাতে। পরদিন দেখি, সে মাথার চুল ছেঁটে ফেলেছে। পরণে পরেছে কালো শোকের পোষাক। জিজ্ঞেস করতে বললো, কাল তার মা মারা গেছে, তাই। কিছুদিন আগে যুদ্ধে মারা গেছে তার বাবা আর এক ভাই। সে বললো, আমি এক বছর ধরে শোক পালন করবো। আমার জন্যে একটা শোক-মঞ্জিল বানিয়ে দাও। সেখানে থেকে আমি তাদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করবো।

তার কথা মতো প্রাসাদের বাইরে একটু নির্জন জায়গায় একখানা শোক-মঞ্জিল বানিয়ে দিলাম। সকাল সন্ধ্যায় সে যেতো সেখানে। করুণ সুরে কেঁদে কেঁদে শোক জানাতো। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিলো তার অন্য।

ওই মঞ্জিলের গম্বুজের মধ্যে এনে রেখেছিলো সে তার প্রেমিক নিগ্রোটাকে। তখনও তার ক্ষত সারেনি, কথা বলতে কষ্ট হয়। নড়াচড়াও খুব বেশী একটা করতে পারে না। বেগম প্রতিদিন তাকে সুন্দর সুন্দর খাবার দিয়ে আসতো। মুরগীরঝোল, দামি সরাব। ভালো ভালো ফলমূল সব, দিয়ে আসতো তাকে। আমার কেমন সন্দেহ হলো। একদিন ও মঞ্জিলের দিকে

বেরিয়ে যাবার পর পায়ে পায়ে ওর পিছনে পিছনে আমিও গেলাম। শুনতে পেলাম, ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে কাঁদছে বেগম। কিন্তু না, কাছে আসতেই আমার ভুল ভাঙলো, এতো করুণ সুরে কান্নার গান না। এতো গানের ছলে দয়িতের কাছে প্রেম নিবেদন।

যখন তুমি সমুখ দিয়ে যাও,
বিশ্ব আমার আঁধার হয়ে আসে।
ভাবি মনে, ভুলবো তোমায়,
সকল ছেড়ে যাবো বনবাসে।
যখন তুমি ফিরে আসো,
অঙ্গ আমার নেচে ওঠে যেন।
এমন কেন হয় গো, বলো,
বুকের মধ্যে অমন করে কেন?
যখন তোমার বাঁশির আওয়াজ শুনি,
তোমার সুরে শুনি আমার নাম,
পাগল করে, মাতাল করে হিয়া,
লুটিয়ে প'ড়ে জানাই আমার হাজারো এক সালাম।।

এই প্রেম সঙ্গীতে যখন সে বিভোর তখন তরবারি উন্মুক্ত করে আমি তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। গান থামতেই চিৎকার করে উঠি, ওরে শয়তানি এই তোর শোকগাথা। মহব্বতের গীত গাইতে গাইতে আত্মহারা হয়ে গেছো! এই বলে প্রচণ্ড শক্তিতে তলোয়ারের এক কোপ বসালাম। কিন্তু তড়াৎ করে এক লাফে কয়েক হাত দূরে সরে যেতে পারলো সে। এমন সময় এক কর্কশ কণ্ঠের অভিশাপ শুনতে পেলাম।—আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, আমার অলৌকিক ক্ষমতা বলে তোর দেহের নিম্নাঙ্গ পাথর হয়ে যাবে।

সেই থেকে আমি এই রকম হয়ে আছি। নিজের দেহটাকে এদিক ওদিক নড়াতে চড়াতে পারি না। আমার দুশ্চরিত্রা বেগমটা রোজ চাবুক হাতে আসে। আর সপাসপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে চলে যায়।

এই বলে সেই যুবক কান্নায় ফেটে পড়লো। কান্নার মধ্যেই গাইতে লাগলো :

খোদার কাছে নালিশ আমার,
বিচার কর, বিচার চাই।
বিচার আশায় বসে আছি
দিন-রজনী, চক্ষে আমার নিদ্রা নাই।।

সুলতান বললো, আমিও বড় দুঃখী, কিন্তু তোমার দুঃখে আরও দুঃখ পেলাম। সেই মেয়েটা কোথায় থাকে বলতে পারো?

—ওই যে গম্বুজওয়ালা ছোট্ট বাড়িটা—সেখানে সে ওই নিগ্রোটাকে নিয়ে পড়ে আছে। প্রত্যেক দিন একবার করে আসে। আর আমার পিঠে ঘা কতক চাবুক মেরে চলে যায়। আমি তো নড়তে চড়তে পারি না। তাই নীরবে সহ্য করে যেতে হয়। সে তার ভালোবাসাকে রোজ মুরগীর ঝোল, মদ আর ভালো ভালো খাবার খাইয়ে তাজা করছে।

—যদি মাথার ওপরে আল্লাহ থাকেন, তবে তার নামে হলফ করে বলছি, সুলতান উত্তেজিতভাবে বলতে থাকে, এমন শিক্ষা তাকে আমি দেবো, জীবনে ভুলতে পারবে না।

শাহজাদার সঙ্গে বাকী রাতটুকু কথাবার্তা বলে কাটিয়ে সুলতান ভোরবেলা সেই শোক-মঞ্জিলের দিকে পা বাড়ালো। খাপ থেকে তলোয়ারখানা খুলে গুটিগুটি ঘরের

মধ্যে ঢুকে পড়লো। একপাশে একটা টুলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে। সারা ঘরময় আতরের সুবাস। ওপাশে একটা পালঙ্কে ঘুমুচ্ছে সেই নিগ্রোটা। তিলমাত্র দেরি না করে প্রচণ্ড এক কোপে দু'খানা করে ফেললো তাকে। তারপর ওর দেহটা নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলো একটা কুয়োর মধ্যে। তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে আবার সে ফিরে এলো সেই মঞ্জিলের পিছনে। শাহজাদার বেগমটার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

এই ঘটনার ঘণ্টাখানেক বাদে শাহজাদার ঘরে ঢুকলো সেই শয়তানী বেগমটা। হাতে তার শঙ্কর মাছের চাবুক। নিষ্ঠুরভাবে মারতে লাগলো শাহজাদার পিঠে। আর্তনাদ করে ওঠে শাহজাদা। না, না, আর মেরো না আমাকে, তোমার পায়ে পড়ি। একটুখানি দয়া করো।

—দয়া? তোমাকে দয়া করবো? কেন? তুমি আমাকে দয়া করেছিলে! আমার ভালোবাসাকে তুমি জখম করেছো। তোমাকে আমি দয়া করবো?

শাহজাদার গায়ে চাদরখানা চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

খানিকটা দামি সরাব আর মুরগীর ঝোল নিয়ে মঞ্জিলের ঘরে এলো শয়তানী। নিগ্রোটাকে না দেখে সে কেঁদে উঠলো, কোথায় গেলে গো! একবার সাড়া দাও, মালিক। চেয়ে দ্যাখো, তোমার জন্যে আমি সরাব এনেছি, খাবার এনেছি, তুমি খাবে না? হায়, খোদা, সে কোথায় গেলো, তাকে ফিরিয়ে দাও।

এমন সময় দূরাগত এক বাণী শুনতে পেলো সে। তুমি আমার হুকুম তামিল করোনি কেন?

অদৃশ্য আল্লাহর বাণী বলে মনে করলো মেয়েটা। আপনার কী হুকুম তামিল করিনি, খোদা?

—তুমি প্রতিদিন তোমার স্বামীকে চাবুকের ঘা মারো। তার আর্তনাদে আমার বুক চিরে যায়। আমি যন্ত্রণায় ছটফট করি। আমার চোখে ঘুম আসে না। তোমাকে আমি বারণ করেছিলাম, এমনি ক'রো না, স্বামীকে আঘাত করা মহাপাপ। কিন্তু আমার কথা তুমি শোনো নি। অমন নিষ্ঠুর ভাবে তোমার স্বামীর ওপর অত্যাচার যদি না করতে, তাহলে, অনেক আগেই তোমার 'ভালোবাসা' সেরে উঠতো।

—আমার গুণাহ মাফ করুন, খোদা। এখন আমাকে হুকুম করুন, কী করতে হবে?

—তোমার স্বামীকে শাপমুক্ত করো।

—তাই করছি, খোদা।

আর ক্ষণমাত্র দেরি না করে শাহজাদার শোবার ঘরে এলো বেগম। একটা বাটিতে খানিকটা জল নিয়ে বিড় বিড় করে কী যেন সব মন্ত্র পড়লো। তারপর সেই জল হাতে নিয়ে শাহজাদার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে কী সব মন্ত্র আওড়াতে থাকলো। কী আশ্চর্য, একটু পরে শাহজাদা পালঙ্কের উপর দিব্যি সুস্থ মানুষের মতো উঠে বসলো। গায়ের চাদরটা সরিয়ে রাখলো। ওর দেহের নিচের অংশটা আর মারবেল পাথরের নয়, একেবারে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের দেহের আকার ধারণ করেছে। বিছানা থেকে নেমে মেঝেয় পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আনন্দে উল্লাসে সে আত্মহারা। খোদা, তোমার দয়ায় আজ আমি আবার আমার জীবন ফিরে পেলাম। তোমাকে আমার হাজার সালাম। তারপর তার বেগমের দিকে ঘৃণার চোখে তাকালো, ওরে হারামজাদী, যদি জানে বাঁচতে চাস তবে আমার সামনে থেকে দূর হ। নইলে তোকে খুন করে ফেলবো।

শয়তানীটা ফিরে এলো মঞ্জিলে।

—তোমার হুকুম মতো আমার স্বামীকে শাপমুক্ত করে দিয়েছি, খোদা। এবার হুকুম করো, আর কী করতে হবে আমাকে।

সেই দূরাগত বাণী আবার শোনা গেলো। এখনও তোমার অনেক কাজ বাকী। ঐ যে সায়রের মধ্যে রঙিন মাছগুলোকে বন্দী করে রেখেছো, ওরা রোজ রাতে জল থেকে মাথা তুলে আমার কাছে মুক্তির প্রার্থনা করে। ওরা মুক্ত না হ'লে আমিও শান্তি পাচ্ছি না।

শয়তানী বললো, এই কথা, এখুনি আমি ওদের শাপ মুক্ত করে দিচ্ছি।

দ্রুত পায়ে সে সায়রের দিকে হেঁটে চললো।

এমন সময় ভোর হয়ে এলো, শাহরাজাদ তার গল্প থামালো।

কাহিনী আবার শুরু হলো নবম রাত্রির দ্বিতীয় যামে। সায়রের পাড়ে এসে শয়তানী খানিকটা জল হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়ে ফেলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সারা সায়রটা উথাল পাথাল হতে লাগলো। তারপর দেখা গেলো, সব মাছগুলো মানুষ হয়ে গেছে। এগুলো সবই শাহজাদার সৈন্য সামন্ত, দাস-দাসী, লোকজন। এরাই ছিলো শহরের বাসিন্দা। তারপর মানুষগুলো নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেলো। হাট, বাজার কেনা বেচায় সরগরম হয়ে উঠলো। ঐ পাহাড়টা আবার এক সমতলভূমি শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেলো। সেখানে চাষবাস করে সোনার ফসল ফলাতে লাগলো মানুষ।

শয়তান মেয়ে এবার ফিরে এলো মঞ্জিলে। খোদা মেহেরবান, আপনার সব হুকুমই তো আমি তামিল করলাম। এবার বলুন, কী করবো?

হাঁটুগেড়ে গোড়ালীর ওপর বসে, দু'হাত জোড় করে মুখের সামনে তুলে ধরে চোখ দু'টো বুঁজে সে প্রার্থনা জানাচ্ছিলো।

—আর তোকে কিছু করতে হবে না রে শয়তানী। এই নে তোর পুরস্কার। তলোয়ারখানা সোজা বসিয়ে দিলো সুলতান, সেই শয়তানীর পিঠে। একেবারে এফোঁড় ওফোঁড়। পিঠের ভিতর দিয়ে বুকের ওপারে বেরিয়ে গেলো। নিজের স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস, আল্লাহর হুকুমে তোকে আজ খতম করলাম। এবার তার নাম জপ কর।

সুলতান এবার শাহজাদার ঘরে এলো। দেখলো, শাপমুক্ত হয়ে সে তার প্রতীক্ষায় বসে আছে। আদ্যোপান্ত সব কাহিনী—বললো তাকে। আনন্দে অধীর শাহজাদা। কোন কথা বলতে পারলো না। সুলতানকে জড়িয়ে ধরলো। সুলতান বললো, এবার আমার ছুটি, সুখে সচ্ছন্দে প্রজাপালন করো। আমি আমার দেশে ফিরে যাই।

শাহজাদা বললো, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। আপনার দেশে বেড়াতে যাবো।

শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এসে সুলতান সবিস্তারে সব কাহিনী বললো উজিরকে। উজির বিস্ময়ে হতবাক। সুলতান যে আবার ফিরে আসতে পারবেন সে আশা ছিলো না তার। আনন্দে সারা শহর মেতে উঠলো। প্রজারা আল্লাহর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো। সেই ধীবরকে ডেকে মূল্যবান ধনরত্ন এবং নানা উপঢৌকন দিলো সুলতান। এতোসবের একমাত্র সূত্র তো সেই ধীবর। ধীবরের সংসারের নানা খুঁটিনাটি খোঁজখবর জেনে নিলো সে। একটি ছেলে, দুটি মেয়ে আর বৌ। এই নিয়ে তার সংসার। সুলতান নিজে একটিকে শাদী করলো। আর একটি মেয়ের সঙ্গে শাদী দিলো শাহজাদার। এইভাবে সেই ধীবর দেশের মধ্যে সেরা ধনী হয়ে উঠলো। তার দুই মেয়ে বাদশাহর বেগম হয়ে সারাজীবন সুখে-সচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগলো।

শাহরাজাদ একটু থামলো, পরে বললো, কিন্তু মনে ভেবো না, এর চেয়ে সুন্দর কাহিনী আর নেই। এর পর এক কুলির কাহিনী তোমাদের শোনাবো। সে কাহিনী আরও চমৎকার। আরও মজার।

এক সময়ে বাগদাদ শহরে এক প্রিয় দর্শন যুবক বাস করতো। একা সে। বিয়ে থা করেনি। কুলি-গিরি করে খায়। একদিন তার খালি ঝুড়িটা সামনে রেখে রাস্তার একপাশে খদ্দেরের প্রতীক্ষা করছিলো। এমন সময় নজর পড়লো। ক্ষীণ-কটি উদ্ধত উন্নতবক্ষা, অপ্সরা সদৃশ, পরমা সুন্দরী এক যুবতী তারই দিকে এগিয়ে আসছে। দুধে-আলতা গায়ের রঙ। চাঁপার কলির মতো তার হাতের আঙ্গুলগুলো। কাছে এসে মুখের নাকাব ঈষৎ সরিয়ে সে বললো, এই, যাবে?

হরিণীর মতো টানা টানা চোখ। সুরমা পরে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। টিকালো নাক। গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল। এমন রূপসী নারী সচরাচর চোখে পড়ে না। ও যখন ডাকলো, এই যাবে? যেন মধু ঢেলে দিলো তার কানে। কি মিষ্টি গলার স্বর।

খালি ঝুড়িটা তুলে নিয়ে তার পিছে পিছে চলতে থাকে সে। এক সময় এক বাড়ির দরজার সামনে এসে কড়া নাড়লো মেয়েটি। একটি ট্যাশ মেয়েছেলে দরজা খুলে দিলো। তার হাতে কিছু দিনার দিতে একবোতল মদ এনে দেয় সে। সরাবের বোতল ঝুড়িতে তুলে দিয়ে আবার চলতে থাকে । তার পিছে পিছে চলে কুলি। এক ফলের দোকানের সামনে এসে থামে। কিছু ফল কেনে। নানা দেশের সেরা সব ফল। সিরিয়ার আপেল, ওসমানী বেদানা, উমানের আখরোট, আলেপ্পোর আলুবখরা, দামস্কাসের আঙুর, নীল-এর শশা,মিশরের পাতিলেবু, সুলতানী চাটনী, লাল রঙের জাম। ফলগুলো ঝুড়িতে তুলে নিলো।এবার হেনা, গোলাপ, চামেলী, যুঁই, আরও সব নানা জাতের সুন্দর সুন্দর সুগন্ধী ফুল কিনলো মেয়েটি। তারপর এল কষাই-এর দোকানে। পাঁচ সের মাংস নিলো। এর পর সে আলমন্ড কিনলো। তারপর এলো মিষ্টির দোকানে। পেস্তার বরফি, গাজরের হালওয়া, মাখন চীজ, দুধ, মধু, চিনি দিয়ে তৈরি হরেক রকম জিভে-জল-আসা ভালো ভালো মেঠাই কিনে ঝুড়িতে তুলে দিলো। তার সওদা করার বহর দেখে কুলি তো অবাক। ঝুড়িতে আর আঁটে না। কী পেল্লাই ভারি হয়ে গেলো ঝুড়িটা। একটু বিরক্ত হয়ে অথচ হাসতে হাসতে বললো, আগে যদি জানাতে মালকিন, তা হলে তোমার জন্য একটা খচ্চর ভাড়া করে দিতাম। এতো কি মানুষ বইতে পারে।

তার রসিকতায় হাসলো মেয়েটি। চোখে বান মারলো। মুখে কথা বললো না।

একটা আতরের দোকানে এসে গোলাপজল, আতর আর দশ বোতল নির্মল পানীয় জল নিলো। পিচকারীর যন্ত্রও কিনলো একটা। সব শেষে সে আলেকজান্দ্রিয়ার সুন্দর সুন্দর মোমবাতি কিনলো কিছু। সবগুলো ঝুড়িতে তুলে দিয়ে বললো, নাও, চলো, সব হয়ে গেছে।

সুবোধ বালকের মতো ঝুড়ি মাথায় তার পিছু পিছু চলতে থাকে সে। এক সময় দেখে অবাক হতে হয়, এক মনোরম প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো তারা। সামনে ফুলের বাগিচা। জলের ফোয়ারা। দরজায় টোকা দিতেই খুলে গেলো। কুলিটা দেখলো, দরজা খুলে দিয়েছে এক নবযৌবন-উদ্ভিন্না এক কিশোরী। যৌবনে হবে পরমা সুন্দরী রমণী। তার ছোট ছোট সুগঠিত স্তন, সরু কোমর আর কুসুম-পেলব তনুতে এখনই যাদু লেগেছে। টানা টানা চোখ, উন্নত নাসিকা, গালে গোলাপের আভা। চোখের তারায় হরিণীর চঞ্চলতা।

আজকের দিনটা তার ভালোই যাবে মনে হচ্ছে। কুলিটা ভাবলো, সকাল বেলায় এমন সুন্দরী নারীর দর্শন, এ পরম সৌভাগ্যের কথা।

ঘরের ভিতর ঢুকলো ওরা। বিশাল বিস্তৃত হল ঘর। দরজা জানলায় কারুকার্য করা

সিল্কের পর্দা। দামি আসবাবে সাজানো গোছানো। মেহগনি কাঠের টেবিল চেয়ার, সোফা কৌচ। পারস্য-গালিচায় মোড়া মেঝে। একটা পালঙ্কে মখমলের শয্যায় শুয়ে ছিলো একটি মেয়ে। তার

পায়ের গোড়ালির কাছে শাড়িটা একটু উপরে উঠে গেছে। ধবধবে ফর্সা পা দু'টো দেখে অবাক হয়ে যায় কুলিটা। এমন ফর্সা মানুষ হয়? ওপাশে কাত হয়ে শুয়েছিলো মেয়েটা। ওর চওড়া ভারি নিতম্ব ছোট্ট একটা পাহাড়ের ঢেউ খেলানো চূড়োর মতো। কোমরের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে আবার বুক-পাঁজরের কাছে উঠে গেছে। পিঠের নিচে কটিদেশে ও গ্রীবার অনাবৃত অংশটুকু দেখে কুলির সারা দেহে রোমাঞ্চ লাগে। অপলক চোখে দেখতে দেখতে ভুলে যায় তার মাথার ওপর অত বড় একটা ভারি বোঝা।

এমন সময় আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরলো মেয়েটি, প্রভাতের শুকতারার মতো প্রশান্ত মুখশ্রী। নিখুঁত সুন্দর। চোখ মেলে তাকালো। সমুদ্র-নীল গভীর আয়ত চোখ। আলস্য ঝেড়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বললো, তোমরা সব অমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওর মাথা থেকে ঝুড়িটা নামিয়ে নাও।

দু'জনে ধরাধরি করে ঝুড়িটা নামিয়ে নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে লাগলো শামানগুলো। কুলিটাকে দু'টো দিনার দিয়ে বললো ঠিক আছে?

কিন্তু কুলিটা কোন কথা বলতে পারলো না। হতবাক নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে লাগলো মেয়েগুলোকে। এত সুন্দর মেয়েছেলে ও জীবনে দেখেনি কখনও? এমন রূপ যৌবন অথচ কোন পুরুষ মানুষ নেই ওদের! এতো খানা-পিনার আয়োজন, এতো ফুলের সৌরভ, মনমাতানো সুগন্ধ সবই ওদের নিজেদের জন্যে? কোন পুরুষের ভাগ নেই এতে। অবাক হলো কুলিটা।

মেয়েগুলোর মধ্যে বড়জন জিজ্ঞেস করলো। কি হলো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমার কিরায়া পছন্দ হয়নি? এই নাও আরেক দিনার দিচ্ছি।

কুলিটা হাত সরিয়ে নিলো। না না, সে কি কথা। আমার মজুরী তো মাত্র এক দিনার। তোমরা দিয়েছ আমাকে দু' দিনার। সেদিক থেকে আমি খুব খুশি।

—তবে? মেয়েটি অবাক হয়। তবে দাঁড়িয়ে রইলে।

কুলি ছেলেটা একটু ইতস্তত করে বলে, তখন থেকে অন্য একটা কথা ভাবছি আমি। তোমরা তিনটি খুবসুরৎ লেড়কী। কোন কিছুই অভাব নাই তোমাদের। কিন্তু এমন একা একা থাকো কেন তোমরা? আমার তখন থেকে একটা কথাই মনে হচ্ছে-তোমাদের কোন পুরুষ মানুষ নাই কেন? যদি আচ্ছাসে ভোগ না করতেই পারলে তবে এই অঢেল রূপ যৌবনের কি দরকার, বলো? তোমরা তো তিনজনই উঠতি বয়সের যুবতী নারী। কামনা-বাসনা-লালসা সবই তোমাদের আছে? না নাই? অন্তত একটা পুরুষমানুষও তো তোমাদের দরকার! যদি না কোন পুরুষের সঙ্গ পায় যদি না তার পৌরুষের স্বাদ পায় তবে তো নারীর রূপ যৌবন সবই বিফলে যায়। এ সব আমার বানানো কথা না বিবিজান। কিতাবে লেখা আছে।

—কিন্তু আমরা যে কুমারী মেয়ে, গো। পরপুরুষের সঙ্গ আমাদের বিপদ ঘটাতে পারে। বড়বোন বলতে থাকে, তারা কাছে এসে আমাদের সর্বনাশ করে দিয়ে পালিয়ে যাবে। আর তার পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে আমাদের। এই ভয়েই আমরা একা একা দিন কাটাই।

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে কুলি ছেলেটি বলে ওঠে, আমি তোমাদের কথা

দিচ্ছি, আমাকে দিয়ে কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ পাবে না তোমরা। যেমনটি চাইবে তেমনটিই করবো।

নানা রকম ভালো ভালো শায়ের আওড়াতে থাকে ছেলেটা। কুলিগিরি করে বটে কিন্তু পড়াশুনা বেশ আছে। ওর কথা বার্তায় কবিতায় সবাই বেশ খুশি হলো।

মেজোটা বড়দিদির কানে কানে ফিসফিস করে বলে, ছোঁড়াটাকে নিয়ে একটু মজা মস্করা কর দিদি।

বড়টা গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলে, তুমি তো নিজের চোখেই দেখেছো আজকের বাজার হাট। অনেক খরচাপাতি হয়ে গেছে আমাদের। আজকের মাইফেলে আমাদের সঙ্গ দিতে চাইছো, খুব ভালো কথা। কিন্তু মালকড়ি আছে কিছু সঙ্গে? দিতে পারবে কিছু? আনন্দে ভাগ নেবে। খরচার ভাগ দেবে না?

কুলি ছেলেটা মুখ কাচুমাচু করে বলে দিন আনি দিন খাই। তোমাদের এই পেল্লায় খরচের কতটুকু দিতে পারি বলো। আর সে সামান্য পয়সা নিয়ে তোমাদেরই বা কি হবে?

মেজো বোনটা এগিয়ে এসে বলে, তা বললে কি করে চলবে, নাগর। সারা দিন সারা রাত ধরে মাইফেল চলবে আমাদের। সরাবের ফোয়ারা ছুটবে। খানা পিনা— কতো খরচ বলো। তার কিছু ভাগ না নিলে কি করে চলে বলো? মুফতে কি এসব চিজ মেলে?

—কিন্তু আমি কোথায় পয়সা পাবো অতো। এখন তোমরা যত দিনারের সওদা করে আনলে সারা মাসেও আমি তা রোজগার করতে পারি না।

এই বলে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে ছেলেটা বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই মেজোটা খপ করে চেপে ধরলো ওর একখানা হাত। আহা, গোসা হয়ে গেলো বুঝি নাগরের। খারাপটা কি বলেছি শুনি? পুরুষ মানুষ, মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করবে, পয়সা খরচা করতে পারবে না? তুমি না পুরুষ মানুষ। মেয়ে মানুষ খুশি করার পয়সা রোজগার করতে পার না কেন?

বড়বোন এবার মুখ খুললো, জানো তো পয়সা ছাড়া পিরীত জমে না। কথায় আছে, ফেল করি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?

মেজো আর বড় দু'জনেই খিল খিল করে হেসে ওঠে। ছোটটা কিন্তু রেগে ওঠে। কি, হচ্ছে দিদি, বেচারাকে নিয়ে অমন পুতুল নাচ করাচ্ছো কেন? ওকে ধরে রাখো আজকের মাইফেলে। দেখো, মজা হবে খুব। আমাদের তিনজনকেই আনন্দ দিতে পারবে ছেলেটা। দেখছো না ওর বুকের ছাতিখানা।

মেজোটা ভীষণ আমুদে। বলে, কিন্তু ওর ট্যাক তো গড়ের মাঠ। বিনি পয়সায়—

ছোট বলে, ঠিক আছে রাখো তোমার পয়সা। পয়সাটাই সব না? এক কাড়ি পয়সা খরচা করে কতো তো সওদা করে এনেছো। ওসব খেয়ে ভালোও লাগবে ঠিকই। সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতেও পারবে। কিন্তু তাই কি সব? পেটের খিদে পুরে গেলে, সুরার নেশা মিটে গেলেও আরও কিছু বাকি থেকে যায়। তা কি মেটাতে পারবে ওসব দিয়ে? আর পয়সাই যদি চাও না হয় আমি দেব ওর হয়ে।

মেজোটা বাঁকা চোখে তাকায়। মুখে দুষ্টু হাসি । বলে, মরেছিস।

এ কথা শুনে আনন্দে নেচে ওঠে ছেলেটার মন। ছোটকে লক্ষ্য করে বললো, তোমার অনুগ্রহের জন্য আমি চিরঋণী থাকবো।

—থাক ও কথা, মেয়েটি বললো, এসো এবার আমরা মন খুলে একটু কথাবার্তা বলি।

অন্য দুই বোনও ছেলেটিকে ভরসা দিয়ে বললো, আমরা এতক্ষণ তোমাকে নিয়ে

মজা করছিলাম। তোমার কোন অনাদর হবে না। আজ তুমি আমাদের মেহমান। যতো পার পান করো, খাও, নাচো, গাও।

এক এক করে সুরাপাত্র পূর্ণ করে নিলো সবাই। তিনটি রূপবতী নারী পরিবেষ্টিত হয়ে ছেলেটি ভাবতে লাগলো, একি অবিশ্বাস্য কাণ্ড। মৃদু মদের নেশা লেগেছে। ছোট বোনটি এক এক করে তিনবার সরাব ঢেলে দিলো তাকে। তারা নিজেরাও নিলো। ধীরে ধীরে নেশা জমছে।

ছেলেটা গান ধরলো ঃ

আজকে রাতে মদের নেশায় টলবো না,
আজকে শুধু গাইবো গান,
কাজের কথা বলবো না।
রূপের নেশায় মাতাল আমি,
মদের নেশায় নই।
একটুখানি আদর করো,
যেটুকু সময় রই।।

গান শেষে তিনজনের হাতে চুমু খেলো সে। তারপর বড়জনকে বললো, আমি তোমার দাসানুদাস, যেমন তুমি হুকুম করবে, তামিল করব আমি।

তোমার দুয়ারে ক্রীতদাস আমি
আদেশ করোগো, বিবিজান।
অসাধ্য কিছুই নাই
বলো যদি দিতে পারি প্রাণ।।

—খুব হয়েছে, বড়বোন বললো, এবার মদ খাও তো। এসো, কাছে বসো।

মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আবার গান ধরলো সে ঃ

সুরার নেশায় বিভোর হয়ে
ছিনু বাধা প্রিয়ার বাহু ডোরে।
কে ভাঙ্গালো ঘুম গো আমার,
সাক্ষী তারার ভোরে।।

ছোটবোন আরও এক পেয়ালা মদ এনে ধরলো তার ঠোঁটের কাছে।

এক চুমুকে উজাড় করে এবার উঠে নাচতে লাগলো ছেলেটি। তার সঙ্গে ওরা তিন বোনও নাচতে শুরু করলো। দু'জনকে দু' পাশে আর বড়জনকে সামনে নিয়ে নাচতে লাগলো ছেলেটা। হাসির হুল্লোড়ে মাতোয়ারা সবাই।। এক সময় অন্য দু'টোকে ছেড়ে বড়টিকে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলো ছেলেটা। মেজোটা একটা ফুলগাছের ডাল নিয়ে পেটাতে থাকে ছেলেটাকে। তখন বড়কে ছেড়ে মেজোর কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে থাকে।

এদিকে ছোটজন রাগে ফুসছে। কিল চড় লাথি চালাতে লাগলো ছেলেটার ওপর। কিন্তু তখন ওরা অন্য রাজ্যে। আলিঙ্গন আর অবলেহনের অতৃপ্ত আনন্দে আত্মহারা। নিরুপায় হয়ে শ্বেত পাথরের মেজেয় শুয়ে হাত-পা ছুড়তে থাকে ছোট।

ছেলেটা তখন মেজোকে ছেড়ে দিয়ে ছোটর দিকে এগিয়ে যায়। দু-হাতে ওর দেহটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে বাইরে বাগিচা প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ায়।

নানা জাতের মন মাতানো ফুলের সৌরভে বাগিচা ভরপুর। হরেক রকম রঙের বাহারী ফুলের সাজে সেজেছে সে। মাঝখানে একটা জলের ফোয়ারা। আর তার পাশে ঘিরে আছে এক প্রকান্ড চৌবাচ্চা। ছোটখাটো একটা পুকুর বলা যায়। মারবেল পাথরে বাঁধানো

তার পাড়। চৌবাচ্চার পাড়ে বসে নিরন্তর নির্ঝর ফোয়ারার দিকে চেয়ে থাকতে কতো না ভালো লাগে। চারপাশে ফোটা ফুলের সৌরভ, আর চৌবাচ্চার হালকা নীল স্বচ্ছ জলের তলায়, লাল নীল হলদে রঙের ছোট্ট ছোট্ট মাছগুলোর হুটোপুটি, মনে বসন্তের রঙ ধরিয়ে দেয়।

ছোটর রাগ আরও বেড়ে যায়। ছেলেটার মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে। এলো পাথাড়ী চড়চাপড় মারতে থাকে। কিন্তু ছেলেটা নিরস্ত করে না তাকে। তার ছোট ছোট নরম হাতের আঘাতে মাদকতা আছে। ভালো লাগে—খুব ভালো লাগে ছেলেটার। কাঁধের ওপর থেকে বুকের মধ্যে নামিয়ে নেয় ওর দেহটা। এবার হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে যায় মেয়েটা। দুহাতে ছেলেটার গলা জড়িয়ে ধরে আয়ত চোখ দু'টো মেলে অপলক ভাবে দেখতে থাকে ওর মুখ। ওর পৌরুষ- পুরু ঠোঁট। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে এইভাবে। অতর্কিতে মুখটা ওপরে তুলে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ছেলেটার নিচের ঠোঁটটা। আঃ বলে যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে ছেলেটা। ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ে।

ছোট এই প্রথম বুঝলো, রক্তের স্বাদ নোনতা। আরও নিবিড় করে চেপে ধরে ছেলেটাকে।

ছেলেটার বুকের মধ্যে তখন সমুদ্রের ঝড়। মেয়েটার শরীরের শক্ত বাঁধুনির আকর্ষণে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেই মারবেলের ওপর বসে পড়লো ছেলেটা। ছোটকে শুইয়ে দিলো নিচে। ওর উদ্ধত বুকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। মেয়েটির চোখ ছেলেটির চোখের দিকে। ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি ফুটে উঠলো। ছেলেটার হাত দু'টো টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলো। ছেলেটা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অস্ফুট স্বরে স্তনন করতে থাকে ছেলেটা। এই সময় জলের পাড়ে এসে দাঁড়ালো বড়বোন। মদির নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখ। ভিতরের অঙ্গবাস ছাড়া একে একে অন্য সব সাজ পোশাক খুলে ঝাঁপ দিলো জলে। সাঁতার কেটে খেলা করতে লাগলো। জল ছিটাতে লাগলো গায়ে। ডাকতে লাগলো, ওহে নাগর, নেমে এসো।

ছেলেটার কোন সাড়া নাই। অসাড়ের মতো পড়ে আছে চিৎপাট হয়ে। জলে জলে সারা জামাকাপড় ভিজে একাকার। সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ নাই।

ছোট উঠে এসে ছেলেটার জামা পাতলুম খুলে দিলো। একটা তোয়ালে এনে সযত্নে মুছিয়ে দিলো ওর সারা শরীর। কি শক্ত তার হাতের পেশী। কি বিশাল চওড়া বুকের ছাতি। এক সুঠাম সুন্দর যৌবন। শরীরের কোথাও এক ফোঁটা চর্বি নাই। শক্ত সমর্থ মাংসপেশী গড়া এক সিংহ সদৃশ পৌরুষ প্রত্যক্ষ করতে করতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সে।

বড় উঠে আসে জল ছেড়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটার ওপর। এবার আচ্ছন্নভাব কেটে যায় ছেলেটার। দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে।

কি যেন ঘটে গেলো মুহূর্তে। কি যাদু ছড়িয়ে দিলো বড়, যেন বেহেস্তের দরজা খুলে গেলো তার সামনে।

মেয়েটা শীৎকার দিয়ে বলে, কি অসভ্য তুমি?

এক হাতে তার ঘাড়টা চেপে ধরে অন্য হাতে থাবড়াতে লাগলো ছেলেটাকে। সে আঘাত বড় মধুর মনে হতে থাকে তার। রিরংসায় ক্রমশই হিংস্রতর হতে থাকে মেয়েটি।

এক সময় ক্লান্ত অবসন্ন অথচ প্রসন্ন হয়ে ছেলেটার দেহের উপরে ঢলে পড়ে মেয়েটা।

এর পর আর এক চক্কর সুরা পান করা হলো।

এবার মেজো বোনের পালা।

সেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ জল-কেলি করার পর সিক্ত দেহে উঠে এসে ছেলেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

তারপর চলতে থাকে সেই একই রঙ্গরীতি।

অবশেষে ক্লান্ত, অবসন্ন অথচ প্রসন্ন হয়ে সে-ও ঢলে পড়ে এক সময়।

এবার উঠে দাঁড়ালো ছোট। ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। সাঁতারের নানা কায়দা জানে সে। কখনও ডুব দিয়ে হারিয়ে যায়। আবার কখনও চিৎ হয়ে জলের উপর ভাসতে থাকে। মনে হয় ওর শরীরের বুঝি বা কোন ওজন নাই। হালকা একটা শোলার ভেলা। ফিকে নীল জলের ওপর ওর চাঁপার কলির মতো দেহটা আরও মনোহারিণী আরও রমণীয় মনে হয়। তার মরাল সদৃশ গ্রীবা, কুসুম পেলব বাহু, আপেলের মতো স্তন, ক্ষীণ কটি ভারি নিতম্ব দিনে দিনে তাকে এক পূর্ণ নারী করে তুলেছে।

মেয়েটা উঠে আসে। লজ্জাবনতা হয়ে ছেলেটার কাছে এসে দাঁড়ায়। শুয়ে শুয়ে সব দেখছিলো ছেলেটা। এবার দু-হাত বাড়িয়ে দেয়। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না মেয়েটা।

এবার পুতুল খেলায় মেতে উঠে ছোট। এক সময় প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়ে কেঁপে ওঠে ছেলেটা। আর তৎক্ষণাৎ মেয়েটির সে কি অস্ফুট আর্তনাদ আরও শক্ত করে জাপটে ধরলো ছেলেটাকে। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে অবসাদে অসাড় হয়ে ঢলে পড়ে ছোটর দেহ। সারা মুখে তখন ছড়িয়ে পড়েছে তার অনেক পাওয়ার পরিতৃপ্তি। এবার ছেলেটি নামলো জলে। ভালো করে ঘসে মেজে সাফ করলো নিজেকে।

তিন বোন তখন শান বাঁধানো জলের পাড়ে শুয়ে ছেলেটার জলকেলি প্রত্যক্ষ করছিলো। প্রত্যক্ষ করছিলো তার সারা শরীরের মজবুত মাংসপেশী। রিরংসায় কাতর হচ্ছিলো দেহমন।

ছেলেটা জল থেকে উঠে এসেই বসে পড়লো বড়বোনের পাশে। তার কাণ্ড দেখে তিনজনেই হেসে খুন।

—বিবিজান, এবার তোমায় ছাড়বো না।

মেয়েটি ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলে,তুমি ছাড়লেই আমি ছাড়বো নাকি।

ছেলেটি মুখটা নামিয়ে আনে মেয়েটার কানের কাছে। ফিসফিস করে বলে, কী? কেমন?

—খু-উ-ব ভালো। মনে হচ্ছে, যেন কোথায় কোন এক অজানা দেশে ভেসে চলেছি।

এবার ওরা আরও বেশী সময় ধরে গভীর আলিঙ্গনে আবিষ্ট হয়ে পড়ে রহলো।

এক সময় ঘুমে জড়িয়ে আসে ওদের চোখ।

এদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। বাহুপাশ মুক্ত করে উঠে পড়ে দু'জনে।

বড়বোন বলে, অনেক রঙ্গ দেখালে বটে। কোন মায়ের দুধ খেয়েছিলে গো? এত তাগৎ পেলে কোথায়। বাব্বাঃ, শরীরটা আমার তুলোধোনা করে দিয়েছো। সে যাক, সন্ধ্যে হয়ে এলো, এবার তুমি কেটে পড়ো নাগর।

—না না, ছেলেটি কান্নার স্বরে মিনতি জানায়, অমন করে এখনি আমাকে তাড়িয়ে দিও না। তাহলে আমি মড়ে যাব। সোনা, তোমাদের পায়ে ধরি, আজকের রাতটা এমনি সুখে কাটাতে দাও। কাল তো আমাকে যেতেই হবে।

ছোটজন বললো, থাক দিদি, আজকের রাতটা। কেমন মজার আমুদে লোক। সারাদিন ধরে কতো আনন্দ দিলো আমাদের। রাতটাও বেশ হৈহুল্লোড়ে কাটাতে পারবো। লোকটার সরম লজ্জা একটু কম, কিন্তু বেশ ভালো।

তার কথায় অন্য দুই বোন রাজি হলো। বড়জন বললো, বেশ ঠিক আছে, আজকের রাতটা আমাদের সঙ্গে কাটাবে তুমি। কিন্তু একটা শর্ত! আমরা যা বলবো তাই করতে হবে তোমাকে। কেন করতে হবে কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে না। কী, রাজি?

—রাজি।

তাহলে ওঠো, চলো দেখবে দরজার পাল্লায় কী লেখা আছে । ছেলেটাকে নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। ওকে দেখালো, সোনার অক্ষরে লেখা আছে ঃ

'তোমার ভালো লাগলো কি মন্দ লাগলো সেটা কোন কথাই নয়, যা করতে বলবো শুধু তাই করে যাবে। অন্যের ব্যাপারে আদৌ নাক গলাবে না।'

ছেলেটা বললো তোমাদের সাক্ষী রেখে আমি হলফনামা পড়লাম। এর অন্যথা করবো না।

এক সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামালো।

পর দিন দশম রাত্রি। শাহজাদা অন্দরে এলে আবার কাহিনী শুরু করলো শাহরাজাদ।

কুলিটা হলফ করার পর মেয়েরা খাবার টেবিলে খানা সাজালো। সারাদিন মদ খেয়ে হৈহুল্লোড় করে সবারই পেটে চনমনে ক্ষিদে। একজন জ্বেলে দিলো মোমবাতি-সুগন্ধী-চন্দন ধূপ। এবার সবাই খেতে বসলো। ছোটজন আর এক পাত্র মদ ঢেলে দিলো সবাইকে । তার পর নানারকম মুখরোচক খানা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো সকলে। সবচেয়ে উপভোগ্য হলো ছেলেটার অনর্গল কবিতা আবৃত্তি। চোখ বুজে মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করতে থাকে সে। ওরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে চৈতন্য ফেরে। কে যেন ডাকে ?

বড়বোন উঠে গিয়ে দরজা খোলে। একটু পরে ফিরে এসে বলে, আজ রাতে সত্যিই মজা হবে। তিনজন বিদেশী এসেছে। রাতটা এখানে থাকতে চায়। কারোরই দাড়ি গোঁফ নেই। আর তিনজনের বাঁ চোখটা কানা—ঠুলি পরা। অদ্ভুত কেমন যোগাযোগ। দেখলেই বোঝা যায় ওরা সবাই রম দেশের বাসিন্দা। ওদের যদি থাকতে দেওয়া যায় তা হলে ভারি মজা হতে পারে রাতে।

সবাই বললো, বেশ তো ওদের ভিতরে নিয়ে এসো। কিন্তু ওদের আগে দরজার হলফনামা পড়িয়ে দাও। ওই শর্তে যদি ওরা রাজি থাকে তবেই ওরা থাকতে পারে, নচেৎ নয়।

ছোট বোনটা ছুটে গেলো দরজার দিকে। একটু পরে ওই তিনজন বিদেশীকে ভিতরে নিয়ে এলো সে । সবাই মিলে তাদের অভ্যর্থনা করে বসালো। ওরা বসলো। কুলি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখলো তারা। ছেলেটা তখন মদের নেশায় মাতাল। ওকে দেখে ওরা ফিসফিস করে বলাবলি করতে থাকে। মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটাও আমাদের জাতভাই— আর এক কালান্দার ফকির।

ওদের কথা কিন্তু ছেলেটার কানে গেলো। আর হঠাৎ সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললো, ঠিক আছে ভাইসাব, আপনারা আরোও একটু ঘরোয়া হয়ে আলাপ সালাপ চালান। গোমড়া মুখ হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

ওর কথা বলার ধরণধারণ দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

মেয়েরা বললো, আমরা এই বিদেশী কালান্দার ফকিরদের নিয়ে একটু মজা করবো।

কালান্দারদের খেতে দিলো ওরা। গোগ্রাসে খেলোও তারা প্রচুর। যেমন খেলো খানা, তেমনি গিললো মদ। অবশেষে সবাই যখন মদের নেশায় চুর তখন মেয়েগুলো বায়না ধরলো, কালান্দারদের গান শুনবে তারা। ওরা বললো, নিশ্চয়ই শোনাবো। কিন্তু গানের সাথে বাজনা না হলে কি জমবে? বাজাবার কিছু আছে ঘরে?

বড় বোন জবাব দিলো, আছে— একটা বড় মসুল জয়ঢাক আছে। ইরাকের ফ্লুট আর পারস্যের সানাই আছে আমাদের ঘরে।

উল্লাসে ফেটে পড়লো ছেলেটা। হা, হা ইয়া আল্লাহ, কী মজা! গানের সঙ্গে এমন বাজনা— জমবে ভালো।

এমন সময় আর একবার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেলো।

সেই রাতে খলিফা হারুন-অল-রসিদ নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। প্রায় প্রতি রাতেই তিনি নিজের চোখে দেখতে বেরোন তার প্রজারা কীভাবে দিন কাটাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে থাকে উজির জাফর-অল-বারমাকি এবং তার তলোয়ার বাহক মাসরুর।

যখন তিনি নগরের পথ ধরে হেঁটে চলেছেন, তখন এই বাড়িটার ভেতর থেকে গান বাজনার আওয়াজ শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জাফরকে বললেন, আমি বাড়িটার অন্দরে ঢুকে দেখতে চাই কারা এই গান বাজনায় মত্ত।

জাফর খলিফাকে নিরস্ত করার জন্য বললো, ওরা এখন মদটদ খেয়ে চুর হয়ে হৈহুল্লোড় করছে। ওদের সামনে যাওয়া কি আপনার ঠিক হবে, হুজুর। হয়তো আপনার কোন চোট লেগে যেতে পারে।

—তা হোক, খলিফা বললেন, দেখতে হবে ব্যাপারটা। তুমি এমনভাবে ঢোকার ব্যবস্থা কর যাতে ওরা বুঝতে না পারে আমার পরিচয়।

—যা বলবেন হুজুর।

জাফর গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ালো। ছোট বোনটি খুলে দিলো দরজা। জাফর বললো, শোনো মা, আমরা তিবারিয়া দেশের সওদাগর। দশ দিন হলো বাগদাদ শহরে এসেছি। এখানকার সওদাগরদের মোড়লের বাড়িতে উঠেছি আমরা। সেখানেই রেখেছি আমাদের সামানপত্তর। আজ রাত্রে এক ব্যবসায়ী আমাদের খানাপিনার নিমন্ত্রণ করেছিলো। তার বাড়িটাও আমরা দেখেছি। কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে ঠাওর করতে পারছি না। পথ হারিয়ে ফেলেছি। গোলক ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে অনেক রাত হয়ে গেলো। এখন আমরা আর ফিরতে পারবো না। আজকের রাতটার মতো যদি তোমাদের এখানে একটু আশ্রয় দাও, খুব উপকার হয়। আল্লাহ তোমাদের দোয়া করবেন।

মেয়েটি দেখলো, সম্ভ্রান্ত বংশের লোক এঁরা। ভিতরে গিয়ে অন্য দুই বোনের সঙ্গে পরামর্শ করে ফিরে এসে বললো, আপনারা মেহেরবানী করে ভেতরে আসুন। আজ রাতে আমাদের মেহমান হয়ে থাকবেন আপনারা।

ভিতরে ঢুকতেই আর দুই বোন স্বাগত জানালো। আজ রাতে আপনারা স্বচ্ছন্দে এখানে থাকুন। শুধু একটি শর্ত। ঐ দরজার গায়ে যে হলফনামাটা লেখা আছে আপনারা সকলে তা মেনে চলবেন, এই অনুরোধ।

জাফর হলফনামা পড়ে দেখলো। বললো, আমরা রাজি।

ওরা তিনজনে গিয়ে বসলো ঐ কালান্দারদের পাশে। একটি মেয়ে সোনার পাত্রে সব চেয়ে দুষ্প্রাপ্য সরাব এনে ধরলো খলিফার সামনে। খলিফা বললেন, আমি হজযাত্রী ওসব আমি খাই না। তখন গোলাপ জলের সরবৎ এনে দেওয়া হলো তাকে। সাগ্রহে পান করলেন তিনি।

খলিফা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, তিনজন কালান্দারের বাঁ চোখ কানা—ঠুলি পরা।

ওদিকে নাচ গান বাজনা খানা পিনা জোরসে চলছে। এক সময় বড়জন বললো, আর কারো খানাপিনার কিছু দরকার আছে? সবাই জানালো, না যথেষ্ট হয়ে গেছে। তখন কালান্দারদের সে অনুরোধ করলো তারা হলের মাঝখানটা ছেড়ে যেন দরজা ঘেঁসে বসে।

হলটা ভালো করে সাফ করলেন এক বোন। অন্য দু'জন কুলি ছেলেটাকে ডেকে বললো, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি তো আর বাইরের লোক নও। এখন আমাদের ঘরেরই একজন।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ গায়ের চাদর আর জামা খুলে ফেলে কোমরের দড়িটা ভালো করে আঁটতে আঁটতে বললো, জো হুকুম, বিবিসাব।

আমার পিছনে এসো। এই বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো। একটু পরে শিকল বাঁধা দু'টো কালো কুচকুচে মাদি কুকুরকে নিয়ে আবার ঘরের মাঝখানে ফিরে এলো। একখানা শঙ্কর মাছের চাবুক হাতে তুলে দিয়ে ছেলেটাকে বললো, কষে লাগাও ঘা কতক, এই মাদিটাকে।

একটা কুকুরকে এগিয়ে দিলো সামনে। বড় বোনের হুকুম মতো চাবুক চালাতে লাগলো সে। কুকুরটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে। এক সময় ছেলেটার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করতে লাগলো। পিঠ চাপড়ে আদর করলো, চোখের জল মুছিয়ে দিলো, আর কপালে চুমু খেলো। একটু পরে অন্য কুকুরটাকে এগিয়ে দিলো ছেলেটার দিকে। বললো, চালাও চাবুক।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগলো।

এই দৃশ্য দেখে খলিফার হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠলো। জাফরকে বললো, মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করোতো কি ব্যাপার?

জাফর বললো, এ ব্যাপারে চুপ করে থাকাই ভালো।

মেজো বোন ছোটকে বললো, এসো, আমরা রোজ রাতের মতো প্রথা অনুসারে, এবার যা যা করতে হবে, করি।

এই বলে মারবেল পাথরের বাঁধানো বেদীর উপর উঠে দাঁড়ালো সে। ছোট বোনটি পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলো একটা বটুয়া থলে। অন্য দুই বোনের সামনে দাঁড়িয়ে থলে থেকে ছোট্ট একটা ফ্লুট বের করে বাজাতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে করুন সুর বাজালো। পরে যখন থামলো, মেজোবোন চিৎকার করে উঠলো, আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন বোন।

তারপর উন্মাদের মতো নিজের পোশাক-আসাক ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে লাগলো। এক সময় অচৈতন্য হয়ে মেজেয় লুটিয়ে পড়লো। খলিফা লক্ষ্য করলেন, মেয়েটির সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন তিনি। বড় বোন এসে তার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরলো। এবার সে নতুন জামা কাপড় পড়ে উঠে দাঁড়ালো। খলিফা ফিসফিস করে জাফরকে বললেন, ব্যাপারটা লক্ষ্য করলে? কিছু বুঝলে? মেয়েটির সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ দেখতে পেয়েছো? ঐ মাদী কুকুর দু'টোকে নির্মম ভাবে প্রহার করা, আর মেয়েটার পিঠের ঐ চাবুকের দাগ, আমাকে গোলক ধাঁধায় ফেলেছে। এ রহস্যের সন্ধান আমাকে করতেই হবে।

জাঁহাপনা, জাফর সবিনয়ে বললো, সেই শর্তের কথা স্মরণ করুন, হুজুর। কোন কিছু অহেতুক কৌতূহল এবং যে ব্যাপারের সঙ্গে আপনি জড়িত নন সে কথা জিজ্ঞেস করা শর্ত বিরুদ্ধ।

এমন সময় মেজো বোনটা আবার সেই ফ্লুট বাজাতে লাগলো। সেই করুণ সুর। আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। খলিফা দেখলেন, মেয়েটি তার পরিধেয় বস্ত্র কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে অজ্ঞান হয়ে গেলো। তার গায়ে সেই চাবুকের দাগ। চোখে মুখে জলের ঝাপটা মেরে আবার জ্ঞান ফেরানো হলো। এই ভাবে একই ঘটনার তিনবার পুনরাবৃত্তি হলো।

সেই তিন কালান্দার ফকির এবার ফিসফিস করে বলাবলি করতে লাগলো। এর চেয়ে অন্য কোথাও রাত কাটালেই ভালো ছিলো। এই বীভৎস দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

খলিফা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

কালান্দাররা বললো, আমরাও তাই জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।

—ওঃ, তবে এখানে আপনারা নবাগত?

—একেবারে। আপনাদের আসার একটু আগে এসেছি আমরা। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়,ঐ ছেলেটা বোধহয় সব জানে।

কুলি ছেলেটার কানে গেলো কথাগুলো। বললো, আজই আমি প্রথম ঢুকেছি এ বাড়িতে। এই সব হতচ্ছাড়া কান্ডকারখানার বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারছি না আমি। আজকের রাতটাই মাটি হয়ে গেলো। এর চেয়ে যদি রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে থাকতাম, তাও ভালো ছিলো।

তখন ওরা সবাই মিলে পরামর্শ করতে লাগলো। আমরা সাতজন আর ওরা তিনটি মেয়ে। আমাদের অতো ভয় পাবার কি আছে? চলো, আমরা এর চেয়ে কৈফিয়ৎ তলব করি, এসবের মানে কী? কেন এই নৃশংসতা? ওরা যদি সোজা কথায় জবাব না দেয় জোর করে জবাব আদায় করতে হবে।

সবাই এককথায় রাজি হলো। হলো না শুধু জাফর। বললো, আমরা যে শর্তাবদ্ধ সে কি মনে নেই? আজ রাতে আমরা ওদের মেহমান। আগে থেকে শর্ত করিয়ে নিয়েছে আমাদের। যে ব্যাপারে আমাদের কোন স্বার্থ নেই, সে ব্যাপারে নাক গলানো চলবে না। কোন কৈফিয়ৎ তলব করা চলবে না। এখন যদি আমরা এ শর্ত না রাখি, আতিথ্যের অপমান করা হয় না? ভোর হতে আর তো মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকী। তারপর আল্লাহর নাম করে যে যার পথে বেরিয়ে পড়বো।

খলিফার দিকে ঝুঁকে আবার বলতে লাগলো। আর তো মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকী। তারপর দরবারে ফিরে গিয়ে ওদের তলব করে নিয়ে যাবো। তখন তো আপনি সব ব্যাপারই জানতে পারবেন, হুজুর ।

—কিন্তু, খলিফা অধৈর্য হয়ে বললেন, অতোটা সময় আমি ধৈর্য ধরে থাকতে পারবো না।

এ ব্যাপারে সকলেই অধৈর্য হয়ে উঠলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কে জিজ্ঞেস করবে ওদের? শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো ছেলেটাই বলবে।

মেয়েদের একজন জিজ্ঞেস করলো। তোমরা ফিসফিস করে কী কথা বলাবলি করছো?

তখন বুকে সাহস করে কুলি ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মালকিন, আমরা জানতে চাই, কেন আপনি ওই কুকুর দু'টোকে অমন প্রহার করলেন? আর কেনই বা তাদের সোহাগ করে চুমু খেলেন? আর আপনার দেহেই বা ওরকম চাবুকের দাগ দেখলাম কেন? কী ব্যাপার, আমাদের খুলে বলুন।

বড়বোন জিজ্ঞেস করলো, একি তোমার একার প্রশ্ন না সবাই জানতে চেয়েছেন? ছেলেটা বললো, একমাত্র জাফর ছাড়া আর সকলেরই এই জিজ্ঞাসা।

বড় বোন বিস্মিত হয়ে বললো, আপনারা আতিথ্যের শর্তভঙ্গ করেছেন। আপনাদের শাস্তি পেতে হবে। আপনারা না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবেন না, কোন কৈফিয়ৎ চাইবেন না? কিন্তু এ কি ব্যবহার আপনাদের। আদর করে ঘরে ডেকে এনে জায়গা দিয়ে ভালো মন্দ খাইয়ে আমরা কি অন্যায় করেছি?

এই বলে চাবুকটা তুলে নিয়ে শপাং শপাং করে তিনবার আওয়াজ করলো মেজেয়। আর তখনি, কি আশ্চর্য, পর্দার ওপারে দরজার পাল্লা খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকলো, দৈত্যের মতো দেখতে, সাতজন নিগ্রো। সবারই হাতে ধারালো অস্ত্র। মালকিন হুকুম দিলো, এই অসভ্য লোকগুলোকে শিকল দিয়ে একটার সঙ্গে একটাকে বাঁধো।

তৎক্ষণাৎ ওরা সবাইকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে বললো, মালকিন হুকুম করুন, এখুনি এগুলোকে কোতল করি।

এই কথা বলে খাঁড়া তুলতেই, শোনা গেলো,থামো। ঘণ্টাখানেক বাদে আমি হুকুম দেবো। তার আগে জেনে নিতে চাই কে কি মেকদারের লোক।

কুলি ছেলেটা কেঁদে ফেললো, দোহাই মালকিন, আমার কোন দোষ নাই, আমাকে মেরো না। এই এক চোখওলা কালান্দার ফকিরগুলো যদি না ঢুকতো বাড়িতে, তাহলে এসব কিছুই হোতো না। যত নষ্টের গোড়া এই ফকিরগুলো।

বড় বোন অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, ছেলেটার কথা শুনে।

এমন সময় শাহরাজাদ দেখলো রাত শেষ হয়ে আসছে। গল্প শেষ করে চুপ করে বসে রইলো সে।

পরদিন একাদশ রাত্রি। কাহিনী শুরু হলো।

বড় বোনের অট্টহাসিতে সবাই আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। না জানি কি করে? সবাইকে লক্ষ্য করে সে বললো, আমি তোমাদের অসহায় নিরাশ্রয় ভেবে এখানে আশ্রয় দিয়েছি। তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের আত্ম-পরিচয় বলো, শুনবো। যদি বুঝি তোমরা সত্যিই অসহায় নও তা'হলে তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য।

এই সময় খলিফা জাফরকে বললো,শুনলে তো জাফর। আর বাঁচার কোন আশা নাই। চটপট আমাদের আসল পরিচয় জানিয়ে দাও। নাহলে বেঘোরে প্রাণ যাবে।

—তাইতো আমাদের প্রাপ্য, হুজুর।

—এটা কি রসিকতা করার সময়, জাফর?

বড় বোন সব আগে কালান্দার ফকির তিন জনকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা কি তিনজন ভাই?

—না না। তিনজন তিন দেশের লোক। আমরা গরীব দুঃখী মানুষ। দিন আনি, দিন খাই। আমাদের বিষয়-আশয়, সহায় সম্বল বলতে কিছুই নাই। ত্যাগই আমাদের ধর্ম।

—তোমাদের কি সবাই জন্ম থেকে এক চোখ কানা?

একজন কালান্দার জবাব দিলো, না। জন্মের সময় আমি কানা ছিলাম না। কিন্তু এক অদ্ভুতভাবে আমার চোখটা হারিয়েছি আমি।

বাকী দু'জন কালান্দারও এই একই কথা বললো। আরও বললো, তারা তিনজনে তিন দেশের বাসিন্দা। ঘটনাচক্রে একত্র হয়ে গেছে। ওদের জীবনের কাহিনী বড় বিচিত্র চমৎকার।

ঠিক আছে, বড় বোন গম্ভীরভাবে বললো, তাহলে এক এক করে তোমাদের জীবনের কাহিনী শোনাও। সব শুনে যদি ভালো লাগে তবে, এখান থেকে নিরাপদে চলে যেতে দেওয়া হবে।

কুলি ছেলেটা এগিয়ে এসে বললো, মালকিন, আমি গরীব সামান্য কুলি— সে তোমাদের জানা। তোমরা আমাকে কুলি হিসেবেই বাড়িতে নিয়ে এসেছো। আমার জীবনের অদ্ভুত ঘটনা কিছু নাই। অদ্ভুত যা কিছু আমার জীবনে আজ দিনের বেলায় তা ঘটেছে। আর সেসব

তো তোমাদের জানা। সে কাহিনী এখানে বলাও যাবে না। তাই, আমাকে রেহাই দাও।

ঠিক আছে, এখন তুমি যাও বিশ্রাম কর গে, সব শেষে তোমার কথা শুনবো।

ছেলেটি আপত্তি জানিয়ে বললো, না, না, ওদের কাহিনী না শুনে আমি নড়বো না।

প্রথম কালান্দার এগিয়ে এসে তার কাহিনী শুরু করলো। শুনুন মালকিন, কেন আমার দাড়ি গোঁফ কামানো। আর কেন একটা চোখ আমার কানা— সেই কাহিনী বলি ঃ

আমার বাবা ছিলেন এক দেশের বাদশাহ। আর আমার চাচাও আর-এক দেশের বাদশাহ । এমনি যোগাযোগ যে, আমার যেদিন জন্ম হয় আমার চাচারও একটি পুত্র সন্তান হয় সেইদিনই।

অনেক দিন কেটে গেছে। আমরা দু'ভাই তখন যুবক। আমাদের পরিবারের প্রথা ছিলো— কিছুদিন পর পর আমরা পিতৃব্যের কাছে গিয়ে বেশ কিছু দিন কাটিয়ে আসতাম । শেষবারের মতো যেবার আমার চাচার ওখানে যাই, তিনি আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করেছিলেন। নিত্য আমার জন্য সবচেয়ে ভালো ভেড়ার মাংস রান্না হতো। দুষ্প্রাপ্য সরাব জোগাড় করা হতো, আমরা দু'ভাই মদ্য পান করতে বসতাম। মদ পেটে পড়লে সে বেশ মাতোয়ারা হয়ে উঠতো। একদিন মদের নেশা যখন বেশ জমে উঠেছে, ভাইজান আমার দিলদরিয়া মেজাজে বললো, তুমি আমার শুধু ভাই নও, প্রাণের দোস্ত কি বলো? আমি তোমাকে একটা কথা বলবো কিন্তু তুমি না করতে পারবে না কিন্তু। বলো, না করবে না?

আমি তখন মদে বিভোর। বললাম, কথা দিচ্ছি না শুধু আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি, তুমি যা বলবে তাই করবো।

এই কথা শোনা মাত্র তড়িৎবেগে অন্য ঘরে চলে গেলো সে। একটু পরে এক লাস্যময়ী পরমাসুন্দরী— যুবতীকে নিয়ে আবার ফিরে এলো। তার পরনে মহা দামী জমকালো শাহী পোশাক। দেহে মনমাতানো আতরের খুশবু।

—ভাই জান, তুমি একে নিয়ে গোরস্তানে গিয়ে ঘুমটি ঘরে গিয়ে চুপটি করে বসো। কেউ যেন টের না পায়। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

আমি আর কি বলবো। আগেই আমার কাছে কথা আদায় করে নিয়েছে, ও যা বলবে শুনতে হবে। মেয়েটিকে নিয়ে নির্জন গোরস্তানের মধ্যে ঢুকলাম। তার মাঝখানে একটা ঘুমটি ঘর। সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওর জন্য। একটু বাদে সে এক ঝারি জল, খানিকটা প্লাস্টার আর একটা ছোট কুঠার নিয়ে হাজির হলো। ঘুমটির পাশেই একটা পেল্লাই পাথরের চাঁই। কুঠার দিয়ে সেই পাথরটা একটু করে কাটতে লাগলো। কাটতে কাটতে বেশ খানিকটা গর্ত বেরোলো যা—পরে সুড়ঙ্গ মতো হয়ে গেছে। আরোও একটু নিচে সরাতেই দেখা গেলো মনোরম এক প্রাসাদপুরি। সিঁড়ি বেয়ে নেমে মেয়েটি চোখের আড়ালে চলে গেলো। ভাই আমাকে বললো, আমি নিচে চলে যাচ্ছি, তুমি পাথরটা চাপা দিয়ে, তারপরে পাথরের টুকরোগুলো সাজিয়ে, প্লাস্টারগুলো দিয়ে লেপে পুছে এমন ভাবে বানাবে যেন, যেমনটি ছিলো তেমনটি দেখতে হয়।

আমি ওর কথা মতো সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে, যেমনটি ছিলো ঠিক তেমনি ভাবে তৈরি করে, প্রাসাদে ফিরে এলাম। ফিরে শুনলাম, চাচা কোথায় শিকারে বেরিয়েছেন। কখন ফিরবেন, কে জানে! একা একা আর ভালো লাগছিলো না। সারা রাত কেটে গেলো। চাচার ছেলে ফিরলো না দেখে আমি আবার গেলাম সুড়ঙ্গে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের কোন সন্ধান পেলাম না। বিষণ্ন মনে ফিরে এলাম। এইভাবে সাতটা দিন কেটে গেলো। সে ফিরলো না। আমার আর কিছুই ভালো লাগে না। নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলাম । আবার গেলাম সেই সুড়ঙ্গের

মধ্যে। অনেক খুঁজলাম। কিন্তু না, কোথাও কোন হদিশ করতে পারলাম না। শেষে ভারাক্রান্ত মনে নিজের দেশে রওনা হলাম।

আমার নিজের শহরে প্রবেশ পথে একদল সশস্ত্র লোক আমাকে ঘিরে ফেললো। আমাকে ওরা বন্দী করলো। আমি এদেশের শাহজাদা। আমাকে বন্দী করার দরুন অবাক হলাম। দেখলাম, যারা আমাকে বন্দী করেছে, তারা সকলেই আমার এবং বাবার অনুরক্ত বিশ্বাসী কর্মচারী।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেলো। তাহলে? তাহলে আমার বাবার কি হয়েছে? আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা বলো, আমার বাবার কী হয়েছে? সে কেমন আছে?

কিন্তু কেউ জবাব দিলো না। একটু পরে আমার ব্যক্তিগত এক নোকর আমাকে ফিস ফিস করে বললো, তোমার বাবা আর বেঁচে নেই। উজির সেনাপতির সঙ্গে যোগসাজস করে বিদ্রোহ করেছে। এখন এখানকার বাদশাহ তোমার বাবার উজির। আমরা তার আজ্ঞাবহ। তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে।

বাবার মৃত্যু সংবাদে আমি তখন ভেঙ্গে পড়েছি। ওরা আমাকে নিয়ে হাজির করলো উজিরের সামনে। আমার ওপর এই উজিরের ক্রোধ ছিলো বহুদিন ধ'রে।

অনেকদিন আগে, আমি তখন খুব ছোট, একদিন তীর ধনুক নিয়ে পাখি শিকার করছিলাম। একটা পাখি লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তীরটি পড়ল পাশের বাগানে। ঐ সময় উজির তখন ওই বাগানে পায়চারী করছিলো। তীরটা গিয়ে বিদ্ধ করলো উজিরের চোখে। বেচারীর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেলো। উজির ক্রুদ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু প্রকাশ করতে পারলো না। কারণ সে আমার বাবার কর্মচারী।

আজ আমি বন্দী। তার সামনে দাঁড়াতেই হুকুম দিলো, গর্দান নাও।

আমি শান্ত ভাবে প্রশ্ন করলাম কি আমার অপরাধ?

হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সে। চোখের ঠুলিটা দেখিয়ে বললো, এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে?

—কিন্তু সে তো একটা দুর্ঘটনা মাত্র। আমি তো ইচ্ছা করে করিনি!

উজির আমাকে তার কাছে যেতে বললো। আমি তার হাতের নাগালের মধ্যে যেতেই নখের খোঁচা মেরে আমার এই চোখটা ঘায়েল করে দিলো সে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে পড়ে গেলাম আমি। সেই থেকে চোখটা হারালাম। শুধু চোখটা নষ্ট করেই রেহাই দিলো না সে। আমাকে একটা বাক্সের মধ্যে পুরে জল্লাদকে হুকুম করলো, ওকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যা। সেখানে হত্যা করে ওর দেহটা শেয়াল শকুনিদের মুখে ফেলে দিয়ে আয়।

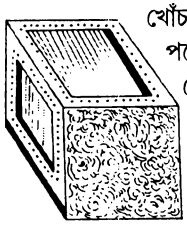

বধ্যভূমিতে এনে বাক্সর ভিতর থেকে আমাকে বের করলো লোকটা।

আমি তখন চোখের যন্ত্রণায় কাতর। এইরকম যন্ত্রণা একদিন উজিরও পেয়েছিলো, কিন্তু সেদিন আমার যন্ত্রণাও কিছু কম হয়নি। একটা মানুষের চোখ নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগে দগ্ধ হয়েছিলাম আমি। কিন্তু আজ সে আমার চোখ কানা করে দিয়েই ক্ষান্ত হলো না, আমাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে।

জল্লাদ আমার বাবার বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিলো। আমাকে বললো, আমি আপনাদের নিমক খেয়েছি সারা জীবন। আজ নিজের হাতে আপনাকে হত্যা করে নিমকহারামী করতে

পারবো না শাহজাদা। আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যান হুজুর। কিন্তু আবার যদি কখনও ফিরে আসেন, আমার গর্দান যাবে।

চোখটা হারালাম, কিন্তু জানে বাঁচলাম। অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আবার আমার চাচার কাছে ফিরে গেলাম। চাচাকে যখন আমার দুর্ভাগ্যের কথা বললাম, তিনি হাপুস নয়নে কাঁদলেন। বললেন তোমার দুঃখের কথা শুনে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, বাছা। এদিকে আমার দুঃখ আরোও কাহিল করেছে আমাকে। অনেকদিন ধরে আমার ছেলেটা নিখোঁজ। কেউই বলতে পারে না, কি হলো। তোমার বাবার মৃত্যুর জন্য তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নাই। কিন্তু একটা চোখ হারিয়েও যে তুমি জানটা বাঁচাতে পেরেছো, এজন্য আল্লাহকে সালাম জানাই।

চাচার কথা শুনে আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। তার ছেলের কীর্তি কাহিনী সব খুলে বললাম তাঁকে। সব শুনে তার মুখে হাসি ফুটলো।

গোরস্থানে গিয়ে, অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই সুড়ঙ্গের মুখটা নজরে পড়লো। পাথর সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কয়েক ধাপ নিচে নামতেই একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়ে ভয় করতে লাগলো। চাচা আমায় অভয় দিয়ে বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই বাছা। আল্লাকে স্মরণ কর, সব ভয় কেটে যাবে।

সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম। শেষে, একটা বিরাট হল ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। নানা ধরনের খাবার আর দামি দামি সরাবে ভর্তি সারা ঘরটা। একপাশে একটা পালঙ্ক। মনে হলো, মশারীর মধ্যে বিছানায় কারা যেন ঘুমিয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, চাচার ছেলে আর ঐ মেয়েটা উভয়ে জড়িয়ে ধরে ঘুমে আচ্ছন্ন। মশারীটা তুলে আঁতকে উঠলাম, একি? দু'টি দেহই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

চাচা আমার, ডুকরে কেঁদে উঠলেন, এই তোর উচিত ইনাম মিলেছে রে হারামী, তোর পাপের শাস্তি যে তোকে পেতেই হবে। শুধু জানে মরেই তোর শাস্তির শেষ হবে না। আল্লাহর দরবারে তোর বিচার হবে, সে বিচারে অনন্ত দোজকে যেতে হবে তোকে। আমি তোর বাবা হয়ে এই অভিশাপ দিচ্ছি।

এই বলে পায়ের পয়জার খুলে ওর মাথায় আঘাত করলো চাচা।

এমন সময় রজনী অতিক্রান্ত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামালো।

পরদিন দ্বাদশ রাত্রি সমাগত। আবার কাহিনী শুরু হলো।

খলিফা, জাফর এবং সেই মেয়েদের সামনে কালান্দার বলে চলে তার জীবনের বিচিত্র কাহিনী।

আমার চাচা যখন ভাইয়ের মাথায় জুতোর বাড়ি মারলো, দেখলাম তার মাথাটা ছাতু হয়ে গেলো। বিছানার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো খানিকটা কাঠকয়লার গুঁড়ো আর টুকরো। আমি কেঁদে উঠলাম, চাচার হাতটা চেপে ধরে বললাম, আপনি ক্ষান্ত হোন, এ দৃশ্য কি সহ্য করা যায় চাচা। ওদের দু'জনের শরীরই পুড়ে শুধু কাঠকয়লা হয়ে গেছে।

তখন চাচা বললেন, জানো, বাছা, কার পাপে এমন হয়েছে? ওর পাশে যে মেয়েটা দেখছো, ওটা ওর বোন, আমার মেয়ে। ওর এই ব্যভিচার কি আল্লাহ সহ্য করবেন? এতো পাপ দুনিয়া ধারণ করতে পারে না। ছোট বেলা থেকেই সে তার বোনের সঙ্গে এই অনাচার করে আসছে। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, শাসন করেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে আড়ালে তারা দু'জনে এক জায়গায় হতো। কিন্তু বাছা, আমার চোখকে ফাঁকি দিলেই কি তাঁর চোখ এড়ানো যায়? ওকে আমি কতভাবে শাসন করেছি, কত ভয় দেখিয়েছি

কিন্তু সব পানি হয়ে গেছে। দুনিয়াতে এরকম কদর্য কাজ এর আগে কখনও কেউ করেনি, ভবিষ্যতেও কেউ করবে না। আমি তাকে হাজার বার বলেছি, তুমি যদি এসব নোংরামী না ছাড়ো তাহলে পরকালে দোজকের আগুনে দগ্ধ হতে হবে তোমাকে।

কিন্তু এতেও তাকে নিরস্ত করা যায়নি। আল্লাহর ইচ্ছায় আজ সব নোংরামী, ব্যভিচার থেমে গেছে। আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলাম, যা করেছো করেছো, এখনও সময় আছে, বন্ধ করো। না হলে আমি নিজে হাতে তোমাকে খুন করবো। কিন্তু, শোভান আল্লাহ, আমার হাতে আর ওর খুন মাখতে হলো না। ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটারও মতিভ্রম ঘটেছিলো। সবই শয়তানের খেলা। তা না হলে এমনটা হবে কেন, বাছা। আমি যখন ভাইবোনকে আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা করলাম, তখন সে গোপনে গোপনে সুড়ঙ্গ কেটে মাটির তলায় এই ঘর তৈরি করেছে। তখন কি সে জানতো, আসলে এটা ঘর না—কবর। আমি যখন শিকার বা অন্য কাজে শহর ছেড়ে কোথাও যেতাম, তখনই তারা দু'জন এখানে এসে ব্যভিচার করতো। আগুনে পুড়ে মরেছে, আমি খুব খুশি। পরলোকে আরও বীভৎস শাস্তি অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে।

এই বলে চাচা আকুলভাবে কাঁদতে লাগলো। সে কান্না পুত্রশোকের, আমি শান্ত করতে চাইলাম না তাকে। কাঁদুক, আরও কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে বুকটা হালকা হোক।

চাচা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, বাছা আজ থেকে তুমি আমার ছেলে, তোমার বাবা নিহত হয়েছেন, আজ থেকে আমি তোমার বাবা। চলো, আমরা প্রাসাদে ফিরে যাই।

দরবারে ফিরে এসেই আর এক দুঃসংবাদ শোনা গেলো। যুদ্ধের দামামা বাজছে শহর প্রান্তে। বিদেশী শত্রু শহর আক্রমণ করেছে। সাজ সাজ রব পড়ে গেলো তখুনি। কিন্তু কোন লাভ হলো না। দুর্বার গতিতে শত্রু-সৈন্য শহরের পথে পথে ঢুকে পড়েছে। আমাদের সৈন্যরা প্রস্তুত ছিলো না। এই অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পলায়ন করতে লাগলো। চাচা তার এক সহচরকে প্রশ্ন করলেন, কিছু বুঝতে পারছো, কে আক্রমণ করেছে।

সে বললো, সেই উজির। যে তোমার ভাইকে হত্যা করে তাঁর দেশ-এর বাদশাহ বনেছে, সেই বদমাইসটা—

এ কথা শুনে আমি দিশাহারা হয়ে পড়লাম। কিছুই মাথায় এলো না, সেই মুহূর্তে কি করা উচিত। ভাবলাম, আমি যদি অস্ত্র ধারণ করি তবে সম্মুখ সমরে লড়াই করতে হবে। তার ফল অনিবার্যভাবে খারাপ। উজিরের সৈন্যসামন্ত সবই আমার বাবার পুরোনো লোক। আমাকে দেখা মাত্র ওরা চিনে ফেলবে। আর চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে হত্যা করবে। সুতরাং ওভাবে বাঁচা যাবে না। হঠাৎ আমার মাথায় একটু বুদ্ধি খেলে গেলো। আমার চাপদাড়িটা খুর দিয়ে কামিয়ে ফেললাম। তারপর এই ছেঁড়া কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে এক ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে গুটি গুটি করে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক দুর্গম পথ হেঁটে, অতি কষ্টে এই বাগদাদে এসে পৌঁছুলাম। শুনেছি এখানাকার বাদশাহ আল্লাহর পয়গম্বর খলিফা হারুন-অল-রসিদ পরম দয়ালু। তার কাছে গিয়ে অধমের আর্জি পেশ করবো, এই আমার ইচ্ছা। আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনে যদি তিনি কিছু দয়া করেন, সেই আশায় এতোটা পথ এসেছি। শহরে যখন ঢুকলাম, সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। পথঘাট কিছু জানি না। কোথায় যাবো, কি খাবো, কোথায় শোব কিছুই ঠিক ছিলো না। এক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এমন সময় এই কালান্দার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে আরও একজন কালান্দার এসে হাজির হলো। আমরা সবাই এখানে বিদেশী। কারুরই কোন আস্তানা নাই। রাতে তিনজনেরই আশ্রয় দরকার। তাই আপনার দরজায় কড়া নেড়েছিলাম আমরা। এই হলো আমার একটা চোখ নষ্ট হওয়া আর দাড়ি গোঁফ কামানোর ইতিবৃত্ত।

বড়বোন সব শুনে খুশি হলো। বললো, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এবার তুমি মুক্ত, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো।

প্রথম কালান্দার বললো, কিন্তু মালকিন, আমরা সঙ্গের দু'জনের কাহিনী না শোনা পর্যন্ত আমি এক পাও নড়ছি না এখান থেকে।

খলিফা জাফরকে ফিসফিস করে বললেন, এমন সাংঘাতিক ঘটনা একটা মানুষের জীবনে ঘটতে পারে, ভাবা যায় না।

প্রথম কালান্দার নিজের জায়গায় সরে যেতে দ্বিতীয় কালান্দার এগিয়ে এসে তার কাহিনী শুরু করলো ঃ

আমিও এক চোখ কানা হয়ে জন্মাইনি, মালকিন। আজ আমার এই ফকিরের বেশ, কিন্তু আদপে আমি ফকির ছিলাম না। আমিও এক বাদশাহর সন্তান। আমার বাবা শুধু ঐশ্বর্যবানই ছিলেন না, বিদ্যায় বুদ্ধিতে তার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি কমই জন্মায়। আমাকেও তিনি প্রচুর লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমাদের প্রাসাদে পৃথিবীর সেরা সব বই ছিলো। দিনরাত সেই বইপত্র নিয়েই আমার কাটতো। নিজের প্রশংসা নিজে করা ঠিক না, তবে লোকে বলতো আমি নাকি পণ্ডিত। অনেক নাকি আমার জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি। দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়লো আমার পাণ্ডিত্যের কথা। বাদশাহ, সুলতানরা আমাকে আদর করে ডেকে নিয়ে যেতো। সম্মান করতো। একবার সমরখন্দের এক বাদশাহর কাছ থেকে আমার আমন্ত্রণ এলো। বাবার অনুমতি নিয়ে রওনা হলাম। অনেক দিনের পথ। খাবার দাবার, পোশাক আশাক বিলাসব্যসন এবং লোক লস্করে ছয়খানা জাহাজ বোঝাই করা হলো। এক মাস ধরে জাহাজ চলছে। একদিন এক বন্দরে ভেড়ানো হলো। ঘোড়া আর উটগুলোকে নামানো হলো। তাদের পিঠে বোঝাই করা হলো নানা জাতের নানা ধরনের মনোহারী উপহার-সামগ্রী। বাদশাহকে ভেট দিতে হবে। বন্দর থেকে বাদশাহের দরবার ঘণ্টাখানেকের পথ। কিছু দূর এগোতেই প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেলো চারদিক। ঝড়ের ঘূর্ণিতে কে কোনদিকে কোথায় যে উড়ে গেলাম কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। অবশেষে বর্ষণ শুরু হলো।এবার ঝড় থেমেছে। অন্ধকার কেটেছে। দেখলাম, আমরা এক বিশাল মরুপ্রান্তরে জনা ষাটেক সশস্ত্র ডাকাতের একটা দল পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। বুঝলাম, প্রাণ-সংশয় উপস্থিত। বললাম, শাহেন শাহর জন্যে উপহার সামগ্রী নিয়ে চলেছি আমরা। সুতরাং আমাদের কোন ক্ষতি না করে পথ ছেড়ে দাও।

কিন্তু তারা সিংহের মতো গর্জে উঠলো, শাহ-ফাহ জানি না আমরা। আমরা আরব দস্যু। এই সব সামান আমরা লুঠ করে নেবো।

এমন সময় ডাকাতদের কে একজন আমাদের একজন ক্রীতদাসকে খুন করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয়ে চিৎকার দিয়ে যে যেদিকে পারলো চোঁ দৌড় দিতে লাগলো। আমিও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। চাচা আপন বাঁচা। কে কোথায় রইলো, কিছু দেখার ফুরসৎ নেই তখন।

দৌড়তে দৌড়তে এক পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। সেখানে এক গুহায় রাতটা কাটলো। পরদিন সকালে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। শেষে, এক সুন্দর শহরে এসে হাজির হলাম। যেদিকে তাকাই, চোখ জুড়িয়ে যায়। চারিদিকে প্রকৃতির বিচিত্র সমারোহ। এখানে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বলে কিছু নেই। সারাটা বছরই বসন্তকাল। শহরের পথ দিয় হেঁটে চলেছি। একসময় দেখলাম, এক দর্জি তার দোকানে বসে কাপড় রিপু করছে। আমাকে বোধহয় বিদেশী

দেখেই হাসলো। আমিও হেসে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে বসতে দিলো সে। তারপর জানতে চাইলো আমার কথা। সব শুনে তার চোখে মুখে ভয়ের ভাব ফুটে উঠলো। বললো তোমার বাবার সব চেয়ে বড় শত্রু এদেশের বাদশাহ। তোমাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনার উদ্দেশ্য হলো হত্যা করা। তোমার পরিচয় জানতে পারলে কেউ তোমাকে আশ্রয় দেবে না।

সে আমাকে খেতে দিলো। আমরা একত্রে বসে আহার করলাম। গভীর রাত পর্যন্ত অনেক কথা, অনেক গল্প হলো। তারপর আমার জন্যে একটা মাদুর আর চাদর নিয়ে এসে বললো, নাও এবার শুয়ে পড়ো।

দোকানের এক পাশে শুয়ে রাত কাটালাম। এইভাবে তিন দিন তিন রাত্রি সেই দর্জির দোকানে কাটলো। এক সময় দর্জি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, এমন কোন বিদ্যা কি তোমার জানা আছে—যা দিয়ে তোমার জীবিকা নির্বাহ হতে পারে?

—নিশ্চয়ই, আমি ববলাম, আমি আইনে পণ্ডিত। এছাড়া সাহিত্য দর্শন শাস্ত্রে আমার অনেক পড়াশুনা আছে। হিসাব শাস্ত্রও আমার নখদর্পণে।

—কিন্তু, সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, তোমার ঐ বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে এ শহরে কী ব্যবসা হতে পারে? এখানে কেউ ওসবের কদর করবে না। এখানকার লোকের একটাই লক্ষ্য, কি করে পয়সা বানানো যায়।

আমি বললাম, কিন্তু আমি তো এছাড়া অন্য কিছুই জানি না।

তখন দর্জি বললো, ঠিক আছে, বাছা, আল্লাহ আছেন, তিনিই ব্যবস্থা করবেন, কোন চিন্তা করো না।

একখানা কুঠার এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বনে গিয়ে কাঠ কেটে এনে শহরে বিক্রী করো। দেখবে খাওয়া পরার পয়সা রোজগার হয়ে যাবে।

অন্যান্য কাঠুরেদের সঙ্গে বনে গিয়ে প্রতিদিন এক-মোট কাঠ কেটে এনে বিক্রী করতে লাগলাম। এক মোটের দাম এক আধুলী। সামান্য কিছু খরচ করে খানা খেতাম, আর বাকীটা সযত্নে জমাতাম। এইভাবে পুরো একটা বছর কেটে গেলো। প্রতিদিন কাজ করি আর রাত্রে এসে দর্জির দোকানে ঘুমোই।

একদিন কাঠ কাটতে গিয়ে আমার সঙ্গীদের ছেড়ে আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। মোটা মোটা অসংখ্য গাছ। আমি একটা মরা গাছ বেছে নিয়ে কাটতে লাগলাম। গাছের গোড়ায় কোপ চালাতে চালাতে এক সময় আমার কুঠারের মুখে একটা তামার বালা উঠে এলো। একটু অবাক লাগলো। খানিকটা মাটি কেটে তুলতেই দেখি, একটা কাঠের পাটাতন। দু' হাত দিয়ে পাটাতনটা সরাতেই চোখে ধাঁধাঁ লাগলো। মাটির নিচে এক মনোরম প্রাসাদ। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম। একটা ঘরে পালঙ্কে শুয়ে আছে বেহেস্তের পরীর মতো পরম সুন্দরী একটি মেয়ে।

মেয়েটি আমাকে প্রশ্ন করে, তুমি মানুষ না দৈত্য?

আমি বললাম, আমি মানুষ।

মেয়েটি বললো। আজ কুড়িটা বছর কেটে গেছে, কোন মানুষের মুখ আমি দেখিনি, তুমি কী করে এখানে এলে?

—খোদাই আমাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছে সুন্দরী। এতো দিন ধরে যত দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, আজ তোমাকে দেখে তা সব লাঘব হয়ে গেলো।

আমার জীবনের দুঃখের কাহিনী তাকে বললাম। শুনে তার চোখে জল এলো। তার নিজের জীবনের করুণ কাহিনী শোনালো আমাকে ঃ

আমি ইফতিমাসের সুলতানের কন্যা। আমার চাচার ছেলের সঙ্গে আমার শাদী

হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু শাদীর দিনে বাজমুস দৈত্যের পুত্র জারজিস আমাকে উধাও করে নিয়ে এসে এই পাতালপুরীতে বন্দী করে রেখেছে। অন্য কোন দিকে কোন অভাব সে রাখেনি আমার। আমি যা খেতে চাই তাই এনে দেয়। দামি দামি সাজপোশাকে ভরে দিয়েছে আমার ঘর। দশ দিন পর এক দিনের জন্য আসে সে আমার কাছে। সারা দিন রাত আমার সঙ্গে থাকে। আমার সঙ্গে খানা খায়, আমার সঙ্গে সহবাস করে। তারপর সকালবেলা চলে যায়। আবার দশ দিন পরে আসে। অবশ্য যদি কোন কারণে এই দশদিনের মধ্যে আমার দরকার হয়, তবে তাকে স্মরণ করলে তখুনি সে এসে হাজির হবে। পাশে একটা ছোট ঘর আছে। সেই ঘরের দেওয়ালে দু'টো লাইন মন্ত্র লেখা আছে। সেই লেখাটার ওপর হাত রেখে তাকে ডাকলেই সে এসে পড়বে। চার দিন আগে সে এসেছিলো। আরও ছয় দিন বাকী তার আসার। সুতরাং নিশ্চিন্তে পাঁচটা দিন কাটাতে পারো তুমি আমার সঙ্গে। জারজিস আসার আগে তুমি চলে যেও, কেমন?

—ঠিক আছে, তাই হবে।

আমি রাজি হওয়াতে খুশিতে নেচে উঠলো মেয়েটি। আমাকে টানতে টানতে তার বিছানায় নিয়ে গিয়ে বসালো। আমার হাতের মধ্যে ওর হাত। ধমনীতে রক্ত প্রবাহ দ্রুততর হয়ে ওঠে। সে বললো, তোমাকে এই পাতালপুরীটা ঘুরিয়ে দেখাই।

একটার পর একটা সাজানো গোছানো ঘর দেখতে দেখতে এক সময় হামাম ঘরে এলাম আমরা। দামি আতরের গন্ধ মাতিয়ে তুললো আমাকে। প্রকাণ্ড বড় একটা বৃত্তাকার চৌবাচ্চা। তার ঠিক মাঝখানে একটা সুন্দর ফোয়ারা। দিবারাত্র জলের তুবড়ী ছুটিয়ে চলেছে। পোশাক-আশাক খুলে চৌবাচ্চার পাড়ে এসে বসলাম দু'জন। নিচে হালকা নীল জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করে কাটালাম। তারপর আমার সারা শরীরে খুব ভালো করে তেল মাখালো সে। আমিও তাকে মাখিয়ে দিলাম। মেয়েটির নরম হাতের স্পর্শে আমার দেহমন উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ওর মুখে তখন দুষ্টুমীর হাসি। কী অমন করছো কেন?

এই বলেই আচমকা একটা ঠেলা দিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিলো আমাকে। তারপর হো হো করে হেসে উঠলো। ফোয়ারার মতই সে হাসি অনর্গল, অবারিত। সেও ঝাঁপিয়ে পড়লো।

য়ে এসে চেপে ধরলো আমার পা। বুকের ওপর টেনে নিলাম নেকক্ষণ ধরে অনেক জলকেলী করে গোসল সারলাম আমরা। মাকে সাবান মাখালো সারা শরীরে। আমিও তাকে মাখালাম। ল থেকে উঠে আবার জামা কাপড় পরে তার শোবার ঘরে ফিরে এলাম আমরা। আমাকে আদর করে সে বললো, এবার সোনা ছেলের মতো ঘুমোও দেখি। এখন কিচ্ছু হবে না। ঘুমিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নাও। তারপর রাতের বেলায়... ঘুম থেকে উঠে আমরা খানা খাবো। মুরগীর মাংস আর শেরী। দেখবে, তারপর কত মজা হয়। এবার ঘুমাও।

আমার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে আদর করতে লাগলো সে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুমে কেটেছে। কার যেন হাতের স্পর্শে ঘুমটা ছেড়ে গেলো। চোখে তখনও তন্দ্রা। আমি বুঝতে পারছি একটা নরম হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার সারা শরীরের ওপর দিয়ে। বুঝতে পারলাম। মেয়েটি খেলা করছে আমার দেহটা নিয়ে। না জাগার ভান করে ওর আদর খেতে থাকলাম। একটু পরে সে টিপতে লাগলো আমার পা দু'টো, উরু, কোমর। আঃ কী ভালোই না লাগছে! সারা শরীর চনমন করে উঠলো। আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। কাছে টেনে নিলাম।

বিস্ময়ে চোখ দু'টো বড় বড় করে তাকালো আমার দিকে। ওরে দুষ্টু-এতক্ষণ তাহলে ঘাপটি মেরে ছিলে?

আমি আরও নিবিড় করে নিলাম ওকে।

ও বললো, ওঠো, এবার খানা-পিনা করবো আমরা।

খেতে খেতে অনেক সুখ দুঃখের কথা হলো। ও বললো, তুমি এলে, তাই আমার মুখে হাসি দেখছো। আজ বিশটা বছর আমি শুধু কেঁদে কাটিয়েছি। উপরে আল্লাহ আছেন, তিনি আমার কান্না শুনে তোমাকে পাঠিয়েছেন। না হলে কোনও মানুষের পক্ষে কি এখানে আসা সম্ভব?

গুনগুনিয়ে গান ধরলো সে ঃ

আগে যদি জানতেম সখা, আসবে আমার ঘরে,
ফুলের শয্যা বিছিয়ে দিতাম, তোমার পথের 'পরে।
দেখতে আমার সাজের বাহার, রূপের বাহার যতো
রাঙিয়ে দিতাম হৃদয় তোমার, লাল গুলাবের মতো॥

কি মিষ্টি গলা। মনটা ভরে গেলো গান শুনে। এতোদিনের ক্লান্তি আমি মুছে ফেলে নতুন করে জীবনের আনন্দ ভালোবাসার স্বাদ পেলাম। হাত ধরাধরি করে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। শেরী নিলাম দু'জনে। অনেকক্ষণ ধরে অনেক সরাব খেলাম। কাবাব, রোস্ট, চাঁপ, রোটি, শাহী- হালওয়া আরও কত সুন্দর সুন্দর খানা খেলাম, খুব তৃপ্তি করে। আজ বছর খানেক পোড়ারুটি আর ডাল খেয়ে মুখ আমার হেজে গিয়েছিলো।

খানা পিনা শেষ করে বিছানায় এসে শুলাম দু'জনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একের দেহ-মন-প্রাণ অন্যের মধ্যে হারিয়ে গেলো। বেহেস্ত কোথায় জানি না, সেখানে অপার সুখ আছে, সুধা আছে—শুনেছি। কিন্তু সে রাত্রে যে সুখ আমি পেয়েছি, যে সুধা আমি পান করেছি তার কোনও তুলনা নাই। আল্লাহ আমাকে বহুৎ কষ্ট সহ্য করিয়েছেন, সেই রাত্রির সুখের স্বাদ, সেই জন্যেই বুঝি এতো বেশী করে পেলাম।

খুশি খুশি মেজাজ নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম সকালে। ওকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার চোখে তখন ভালোবাসার রঙ ধরেছে। বললাম, তোমাকে এই পাষাণ পুরীতে রেখে যাবো না আমি। দৈত্যটা তোমার দেহ ছিঁড়ে খাবে, আমি ভাবতেই পারছি না।

—আহা, কী ভালোবাসার কথা গো, মেয়েটি কটাক্ষ হেনে বললো, ইচ্ছে করে, কলজেটা ছিঁড়ে দিই তোমাকে। কিন্তু সোনা, তুমি অমন অধৈর্য হয়ো না। সবুরে মেওয়া ফলে। দৈত্যটা তো দশদিন অন্তর একদিন আসে। তাতে আর কী যায় আসে। বাকী ন' দিন তো আমরা এক হয়ে থাকতে পারবো?

আমি তখন প্রেমে পাগল। ওর এই কথা আমার পছন্দ হলো না। বললাম, না, না, সে হয় না। আর একটা দিনও ব্যাটাকে ভোগ করতে দেবো না তোমাকে। তুমি শুধু আমার। আমি ওই শালার লেখাটা এখুনি মুছে ফেলবো। তাহলেই তো সে এসে পড়বে। আর আসলেই আমার হাতে তার মৃত্যু অবধারিত।

ছোটবেলা থেকেই আমার খুব ঝোঁক দৈত্যের সঙ্গে লড়বো। দৈত্যকে মারতে পারলে খুব পুণ্য হয় শুনেছি।

প্রেমের নেশায় হয়ো না অন্ধ,
ঝোঁকের মাথায় করো না কোন ভুল
হারিয়ে যাবে তুমি, ফুরিয়ে যাবে প্রেম
(তখন) কে রবে দুঃখী বলো, আমার সমতুল?

সুন্দর করে আবৃত্তি করলো সে। কিন্তু এ কবির সার কথায় কর্ণপাত করলাম না আমি। ছুটে গিয়ে আফ্রিদির সেই যাদু করা লেখাটার ওপর প্রচণ্ড ঘা মারলাম কুঠারখানা দিয়ে।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো প্রভাত সমাগত। গল্প থামালো।

ত্রয়োদশ রজনীতে আবার শুরু হলো কাহিনী। শুনুন, শাহজাদা, সেই দ্বিতীয় কালান্দার তার কাহিনী বলে চলেছে ঃ

আমি যখন সেই দেওয়ালের লিখনে কুঠারের আঘাত করলাম, চিৎকার করে কেঁদে উঠলো মেয়েটি। হায় আল্লাহ, এ কি করলে তুমি? এখুনি এসে হাজির হবে দৈত্য। তোমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে আছাড় দেবে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি পালাও। যে পথ দিয়ে এসেছিলে সেই পথ দিয়ে পালিয়ে যাও। আমার কথা শোন।

আমি সিঁড়ির দিকে ছুটলাম। পড়ি মরি করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। সরাব আর প্রেমের নেশা তখন ছুটে গেছে আমার। ভয়ে বুকটা শুকিয়ে গেলো। হঠাৎ মনে পড়লো, পায়ের জুতো আর কুঠারখানা ফেলে এসেছি। আবার তরতর করে নেমে ফিরে এলাম ওর ঘরে। এই ফিরে আসাই কাল হলো। মেদিনী কাঁপিয়ে এসে হাজির হলো সেই দৈত্য। কী ভীষণ দেখতে। এমন বীভৎস যে, চেয়ে দেখা যায় না। মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত কড়মড় করতে করতে বললো, এই অসভ্যতার মানে কী? আমি তো ভাবলাম তোমার কোন বিপদ আপদ ঘটেছে। ব্যাপার কী? হয়েছে কী?

মেয়েটি বললো, কিছুই ঘটেনি। আমি একটু নেশা করে টলে পড়ে গিয়েছিলাম দেওয়ালের গায়ে।

কিন্তু দৈত্যটা সে কথা বিশ্বাস করলো না। আমার জুতো আর কুঠার নজরে পড়লো তার। ওরে হারামজাদী, মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি। এগুলো কী? শিগ্গির বল, কার এগুলো?

মেয়েটি বললো, সত্যি, বিশ্বাস করো, তুমি দেখালে তাই দেখলাম। এর আগে আমার নজরে পড়েনি। আমার মনে হয় তুমিই কখনও নিয়ে এসেছিলে।

—থামো। বিকট চিৎকার করে উঠলো দৈত্যটা, ওসব বুজরুকী অন্য জায়গায় ঝেড়ো। এখন সত্যি কথা বল শয়তানী, না হলে দেখ তোর কী করি।

এই বলে মেয়েটাকে একেবারে ন্যাংটো করে মাটিতে শোয়ালো। হাত দু'টো আর পা দু'টো ক্রুশ-এ গেঁথে দিলো মাটির সঙ্গে। তারপর চালাতে লাগলো নৃশংস অত্যাচার। চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ। এবার সিঁড়ির দিকে চলে এলাম, পা টিপে টিপে। নিজের বোকামীর জন্যে ঠোঁট কামড়াতে লাগলাম। শুধু আমার দোষে, একটা ফুলের মতো মেয়ের জীবন শেষ করে দিলাম। অনুতাপে পুড়ে যেতে লাগলো বুকটা। মেয়েটা আজ কুড়িটা বছর বন্দী হয়েছিলো এখানে। কিন্তু তবু তো জানে বেঁচেছিলো। আর আজ! আজ তো সে মরে যাবে। শুধু আমার জন্যে—শুধু আমার জন্যে তাকে আজ মরতে হলো। হায় আল্লাহ, এ পাপ আমি কোথায় রাখবো?

যখন সেই দর্জির দোকানে এসে হাজির হলাম দর্জি তো আমাকে দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। বললো, কাল সারারাত আমি বসে বসে কাটিয়েছি। সবাই ঘরে ফিরলো।

কিন্তু তুমি ফিরে এলে না। আমার ভয় হলো, হয়তো কোন জানোয়ারের মুখে পড়েছো তুমি। তোমাকে খেয়ে ফেলেছে। যাক, খোদার দোয়ায় ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছো, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

তার পাশে বসে আগাগোড়া সব ঘটনা সবিস্তারে বলতে লাগলাম। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে দর্জি উঠে গেলো। একটু পরে ফিরে এসে বললো এক পার্শি সাহেব। তোমার জুতো জোড়া আর কুঠারখানা নিয়ে এসেছে। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

দর্জির কথা শুনে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। কী করি, কী বলি, কিছুই ভাবতে পারলাম না। মাথাটার মধ্যে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবো।

দর্জি বললো, যাও না, দেখা করে এসো। তোমার উপকার করতেই তো এসেছেন। অতো ঘাবড়াবার কি আছে? জুতো জোড়া আর কুঠারটা নিয়ে উনি ঘুরেছেন অনেক। শহরের কাঠকুড়ানোওয়ালারা যে অঞ্চলে বাস করে সেখানে গিয়েছিলেন প্রথমে। তাদের একজন তোমার জুতো জোড়া চিনতে পেরে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। যাও, দরজার সামনে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলো। শুক্রিয়া জানিয়ে এসো।

ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিলো আমার পা। কোনরকমে উঠে দরজার কাছে গিয়ে একটু ফাঁক করে দেখলাম, এক সুদর্শন পার্শি দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে জুতো অন্য হাতে কুঠার। চিনতে ভুল হলো না, আমারই। ভাবছি, দরজাটা খুলে ওর সামনে দাঁড়াবো কি দাঁড়াবো না। এমন সময় দরজার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে খপ করে আমার একখানা হাত চেপে ধরলো। দেখলাম, সে-হাতের থাবাটা কোনও মানুষের না। দৈত্যের। একটা বিকট আওয়াজ তুলে সে আমাকে হ্যাচকা টানে বের করে ফেললো। তারপর এক লাফে উঠে গেলো মহাশূন্যে। তার হাতের মুঠোয় আমি ঝুলতে ঝুলতে চললাম। কোথা দিয়ে কিভাবে আবার সেই পাতালপুরীর প্রাসাদে আমাকে এনে ফেললো, বলতে পারবে না। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আমি। যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখি, আমার সামনে সেই সুন্দরী—বিবস্ত্রা রক্তাপ্লুত দেহে গোঁঙাচ্ছে।

—এ্যাই হারামজাদী, ফিরে দেখ, দৈত্যটা গর্জে উঠলো, তোর পিরিতের নাগরকে ধরে এনেছি।

মেয়েটা বললো, আমার কোন পিরিতের মানুষ নাই। আমি কাউকে চিনি না। এই বলে মেয়েটা আমার দিকে তাকালো। তারপর আবার বললো, না, একে আমি কখনও দেখিনি, চিনি না।

—কী? গর্জে উঠলো দৈত্যটা, চেনো না? মিথ্যুক কাঁহিকা। যাকে নিয়ে ব্যভিচার করেছিস, তাকে চিনতে পারছিস নে। ঠিক আছে, এই নে তলোয়ার। কাট—কেটে ফেল ওর গর্দান। আমি দেখতে চাই নিজের চোখে।

মেয়েটা হাত পেতে নিলো তলোয়ারখানা। এগিয়ে এলো আমার সামনে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো আমার মুখ। চোখের ইশারায় মিনতি জানালাম, মেরো না আমাকে। আড়চোখে দেখে নিলো আমার ইশারা। তার পর চিৎকার করে উঠলো, তোমার জন্যেই আমাদের যত অশান্তি।

তারপর করুণ একটা গানের কলি গাইলো ঃ

দুঃখের দিনে কেন এলে?
সইবে কি গো, চোখের পানি।
ওই ইশারায় বলতে যা চাও,
অনেক আগেই হৃদয় দিয়ে জানি।

মাথা মোটা দৈত্যটা বুঝলো না, এই গানের মর্মার্থ। আমি বুঝলাম। মেয়েটা তলোয়ারখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। দৈত্যটা কুড়িয়ে নিয়ে আমার হাতে তুলে দিলো সেখানা। বললো, তোমার মেহবুবার গর্দানটা যদি কেটে ফেলতে পারো তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবো আমি। কোন ক্ষতি করবো না। জবান দিচ্ছি।

তলোয়ারখানা নিয়ে মেয়েটার সামনে এগিয়ে গেলাম। হাতটা ওপরে তুলতেই তার চোখের কাতর মিনতি আমাকে বিমূঢ় করে দিলো। তাই তো, এতো অত্যাচার সত্ত্বেও সে তো ভালোবাসার অপমান করেনি। তবে আমি নিজের স্বার্থের জন্যে এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছি কেন তার সঙ্গে? কান্নায় চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়লো। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম তলোয়ারখানা। তারপর দৈত্যকে কাতরভাবে বললাম, তুমি দৈত্য অধিপতি, তোমার হুঙ্কারে সারা দুনিয়া কেঁপে ওঠে। আমার আর্জি—তুমি আমাকে এই নৃশংস কাজ করতে হুকুম করো না। আমি পারবো না। তুমি তো দেখলে, সে আমাকে হত্যা করলো না। কারণ আমি তার কোন ক্ষতি করিনি কখনও। আমার সঙ্গে তার পরিচয় নাই। আমারও সেই কথা। সে যখন আমাকে হত্যা করতে পারলো না, আমিই বা তাকে হত্যা করবো কোন অপরাধে? আমি পারবো না। এর চেয়ে আমাকে জহর এনে দাও। আমি খেয়ে মরতে রাজি আছি, কিন্তু বিনা দোষে একজনকে কোতল করতে পারবো না।

—হুম, দৈত্যটা বিজ্ঞের মতো বললো, এবার বুঝলাম, কিরকম মহব্বতে হাবুডুবু খাচ্ছো তোমরা।

তারপর শুনুন, মালকিন, দ্বিতীয় কালান্দার বলতে থাকে, সেই পাষণ্ড দৈত্যটা বেহেস্তের পরীর মতো দেখতে ঐ মেয়েটার দু'খানা হাত আর দু'খানা পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। এই লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে তখন আমার দশা কী, ঠাওর করতে পারছেন? মনে হতে লাগলো, এ দৃশ্য দেখার চেয়ে আত্মহত্যা অনেক ভালো। তখনও মেয়েটার ধড়ে জান ধুক ধুক করছিলো। আমাকে চোখের ইশারা করলো সে। দৈত্যের নজর এড়ালো না তার এই ইশারা। গর্জে উঠলো, ওরে খানকীর মেয়ে এখনও পিরিত করতে সাধ হচ্ছে। দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি।

এই বলে গর্দানটা কেটে আলাদা করে ফেললো। আমার দিকে চেয়ে বললো, শোনো মানুষের বাচ্চা, আমাদের দৈত্যকুলে নিয়ম আছে ব্যভিচারিণীর একমাত্র সাজা—মৃত্যু। এই মাগীটাকে তার বিয়ের দিনে উধাও করে নিয়ে এসে, মানুষের অগম্য এই পাতালপুরীতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তখন বয়স তার বারো। আজ কুড়িটা বছর সে আমার সঙ্গে সহবাস করছে। অথচ আমার ওপর তার ভালোবাসা জন্মালো না। মহব্বত করলো সে তোমার সঙ্গে। একদিনেই তুমি তার দেহ-মন সব জয় করে নিলে? যাই হোক, সবই আমার ধারণা। নিজের চোখে আমি দেখিনি তোমাদের ব্যভিচার। সেই জন্যে তোমাকে জানে মারতে চাই না। কিন্তু আমার যাদু-মন্ত্রে তোমাকে আমি কোনও একটা জন্তু-জানোয়ার বানিয়ে রাখতে চাই। এখন তোমার কী ইচ্ছে, বলো? কী জন্তু হয়ে থাকতে চাও? শিগ্গির বলো। নষ্ট করার মতো সময় আমার নাই। জলদি করো।

আমি বললাম, কিন্তু আমি তো কিছুই ভাবতে পারছি না, কী হয়ে থাকলে আমার ভালো হবে।

—এখনও ভালো করে ভেবে বলো। গাধা, কুকুর, না খচ্চর, না কাক, না বাঁদর? কী হতে চাও, বলো?

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। তখন সে ভীষণ রেগে গেলো। বাঁ হাতের থাবায় কোমরটা চেপে ধরে শোঁ করে শূন্যে উঠে গেলো। উড়তে উড়তে এক পাহাড়ের

মাথায় গিয়ে নামলো। এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়লো। তারপর আমার গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে বললো, বাঁদর হয়ে যা। আর সঙ্গে সঙ্গে একশো বছরের বুড়ো লোম চর্ম এক বাঁদর বনে গেলাম আমি। ভয়ে, দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলাম। আর দৈত্যটা খিক্ খিক্ করে হেসে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। বাদশাহজাদা আমি। আমার কত বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান গরিমা। আজ আমি এক ঘৃণ্য বাঁদরে পরিণত হয়ে গেলাম। নিয়তির অভিশাপ!

পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নামলাম। কাছেই সমুদ্রতীর। সারাদিন সমুদ্রের কূলে কূলে ঘুরে বেড়াই। গাছের ফল আর নদীর জল খাই। রাত্রে গাছের ডালে ঘুমোই। এইভাবে দিন কাটে। একদিন দেখলাম, জাহাজ আসছে। জাহাজটা ক্রমশ কাছে এলো। আমি বিরাট এক লাফ দিয়ে উঠে এলাম জাহাজের ডেকে। ধর ধর, মার মার শোর পড়ে গেলো জাহাজময়। লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এলো সবাই। কেউ বলে তাড়িয়ে দাও। কেউ বলে, না মেরে ফেলো। একজন তেড়ে এলো একখানা তলোয়ার নিয়ে। আমি কায়দা করে এক থাবায় কেড়ে নিলাম। ওরা ভয় পেয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেলো। আমি তলোয়ারখানা পাশে রেখে কাঁদতে লাগলাম। নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে ওদের বোঝাতে চাইলাম, আমাকে মেরো না, তোমরা। আমি কোন ক্ষতি করবো না তোমাদের। ওরা বোধহয় আমার নীরব ভাষা বুঝলো। জাহাজের কাপ্তেন এগিয়ে এসে সবাইকে বললো, মনে হয়, বাঁদর আমাদের আশ্রয় চাইছে। যাই হোক, ওকে তোমরা মেরো না। দেখা যাক, কী করে।

আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো তার কেবিনে। অনেক ভালো কথা বললো। আমি সবই বুঝতে পারলাম। কিন্তু জবাব দিই কী করে? আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, তুমি যা করতে বলবে আমি ঠিক ঠিক তাই করবো।

কাপ্তেনের ব্যক্তিগত নোকরের কাজে রাখা হলো আমাকে। আমার কাজে কাপ্তেন সাহেব মহা খুশী। যা যা বলে, ঠিক ঠিক করি। কোন ভুলভ্রান্তি হয় না।

এইভাবে পঞ্চাশ দিন পরে এক বন্দরে নোঙর করা হলো জাহাজ। সে দেশের সুলতানের আমির আমলারা এসে সেলাম জানালো জাহাজের বণিকদের। সুলতানের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হলো নানা উপঢৌকন। তারা বললো, আমাদের সুলতানের উজির সম্প্রতি মারা গেছেন। তিনি নানা বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। তাঁর উজিরের সমকক্ষ পণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে সুলতান উজিরে বহাল করতে চান। কিন্তু তেমন কোন লোক আমরা জোগাড় করতে পারছি না। আপনাদের মধ্যে যদি তেমন কোনও যোগ্য ব্যক্তি থাকেন, সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। একটা জড়ানো পাট্টা খুলে দেখালো তারা। যে সব লোক উজিরের পদপ্রার্থী—তারা সকলে স্বহস্তে তাদের নাম স্বাক্ষর করে তার পাশে তাদের যোগ্যতার বিবরণ লিখে দিয়েছে।

ওদের হাত থেকে খপ করে কেড়ে নিলাম পাট্টাটা। শশব্যস্ত হয়ে পড়লো তারা। এই বুঝি কাগজটা ছিঁড়ে ফেলি আমি। কেউ আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করলো। আবার কেউ ভয় দেখালো, মেরে ফেলবে। আমি যখন ইশারায় তাদের বুঝালাম, আমিও লিখতে পড়তে জানি তখন ওরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কাপ্তেন সাহেব এগিয়ে এসে বললো, ঠিক আছে ওকে দোয়াত কলম দাও। লিখুক, দেখি!

কাপ্তেনের কথা মতো দোয়াত কলম এলো। আমি অতি সহজভাবেই গোটা গোটা অক্ষরে একটা শায়েরী লিখলাম। সবাই অবাক হয়ে আমার লেখা দেখছে। পরপর আরও তিনটে শায়েরী লিখে দিলাম। এবার কাগজখানা তুলে দিলাম ওদের হাতে। আমলারা কাগজখানা নিয়ে গিয়ে সুলতানের সামনে পেশ করলো। পাট্টায় আরও অনেকের লেখা ছিলো। সুলতান

আমার লেখায় মুগ্ধ হয়ে আমলাদের বললো, তোমরা দামি দামি পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে গিয়ে দাও এই মহা পণ্ডিতকে। আর আমার সবচেয়ে মূল্যবান খচ্চরকে বাদশাহী কেতায় জাঁকজমক করে সাজিয়ে নিয়ে যাও। খচ্চরের পিঠে তাকে বসিয়ে কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে সসম্মানে নিয়ে এসো। আমার দরবারে। আমি তাঁকে উজিরের পদে বহাল করবো।

সুলতানের কথা শুনে হাসি চাপতে পারলো না কেউ। কি করেই বা পারবে? একটা বাঁদরকে বাদশাহী কায়দায়...

সুলতান কিন্তু ক্রুদ্ধ হলো। হাসার কি কারণ ঘটতে পারে এ কথায়? আমি হুকুম দিচ্ছি, আর তোমরা শুনে হাসছো? এতো বড় স্পর্ধা!

গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, আপনার কথা শুনে হেসে উঠবো, এমন দুঃসাহস আমাদের কখনই হতে পারে না। কিন্তু সব কথা শুনলে আপনি নিজেও না হেসে পারবেন না। আপনি যাকে মহাপণ্ডিত বলছেন আসলে সে কোন মানুষ না, একটা বুড়ো বাঁদর। ঐ জাহাজের কাপ্তেনের কাছে আছে।

ওদের কথা শুনে সুলতান তো থ! এমন একটা অদ্ভুত জীব জীবনে দেখেনি সে। যত টাকা লাগে বাঁদরটা সে কিনে নেবে। সুলতান বললো, তোমরা মূল্যবান পোশাক-আশাক আর আমার সবচেয়ে দামী খচ্চরটাকে জঁকজমকভাবে সাজিয়ে নিয়ে যাও। জাহাজ থেকে তাকে বাদশাহী মর্যাদায় খচ্চরে চাপাবে। তারপর ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে মহা সমারোহে শহরের সদর রাস্তা পরিক্রমা করে নিয়ে আসবে আমার দরবারে।

সুলতানের হুকুমে কাপ্তেনের কাছে এসে প্রচুর ইনাম দিয়ে আমাকে কিনে নিলো তারা। তারপর সুলতানের নির্দেশ মতো মহাসমারোহে নিয়ে হাজির করলো দরবারে। আমি মাটিতে দু'হাত ছুঁইয়ে সেলাম জানালাম সুলতানকে। তারপর হাত জোড় করে দাঁড়ালাম তার সামনে। আমার নিখুঁত দরবারী আদব কায়দায় মুগ্ধ হয়ে গেলো সুলতান। মুগ্ধ হলো সবাই আমির অমাত্য, পারিষদ। আমার নির্দিষ্ট আসনে বসলাম আমি। সুলতানের ইশারায় দরবার ফাঁকা হয়ে গেলো। শুধু রইলাম আমি, সুলতান, একটা দশ বছরের প্রিয় চাকর, আর হারেমের প্রধান খোজা। আমি যা যা খেতে ভালোবাসি, জেনে নিয়ে, সেই সব খানার ফরমাশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে খানা সাজানো হলো ফরাসে। সুলতান আমাকে খানা খেতে অনুরোধ জানালো। নিখুঁত দরবারী আদব কায়দা দেখিয়ে আমি খানাপিনা সারলাম।

দোয়াত কলম কাগজ দেওয়া হলো আমার সামনে। কয়েকটা বিখ্যাত পারস্য শায়েরী লিখলাম আমি। সুলতানের সামনে তুলে ধরলাম কাগজ খানা। সুলতান তো অবাক! আমার হাতের লেখা মুক্তোর মতো। কবিতার লাইনগুলো পড়লো সে।—এ কি করে সম্ভব! একটা বাঁদর—সে কী করে লিখতে পড়তে পারে। খোদার মহিমা অপার। এ সবই তাঁর লীলাখেলা।

দাবার ছক আর ঘুটি আনা হলো। সুলতান জিজ্ঞেস করলো, জানা আছে কি?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, জানি। দাবার ছকটা বিছিয়ে ঘুটিগুলো সাজালাম। আমার সঙ্গে দাবায় মেতে উঠলো সুলতান। দু'দুবার মোক্ষম চালে মাৎ করে দিলাম সুলতানকে। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলো সে। দাবা খেলায় তার জুড়ি নাই দেশে। অথচ মাত্র গোটা কয়েক

চালেই বাজি মাৎ করে দিয়েছি আমি। সুলতান বলতে থাকে, তুমি যদি মানুষ হতে তবে দুনিয়ার সেরা পণ্ডিত বলে মেনে নিতো লোকে।

এই অদ্ভুত দৃশ্য তার প্রাণ-প্রতিমা কন্যাকে না জানিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলো না সুলতান। হারেমের প্রধান খোজাকে ডেকে বললো, শাহজাদীকে তলব দাও।

একটু পরে শাহজাদী এলো। ঘরে ঢুকেই দু'পা পিছিয়ে গিয়ে নাকাবে মুখ ঢেকে নিলো। বললো, আব্বাজান, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছো। শুনলাম, মজার একটা জানোয়ার এসেছে। সে নাকি লিখতে পারে। দাবা খেলায় তোমাকেও নাকি হারিয়ে দিয়েছে! কিন্তু এই বিদেশীর সামনে তুমি আমাকে ডেকে বে-আব্রু করালে কেন? আব্বাজান?

সুলতান অবাক হয়। বিদেশী—বে-আব্রু? তুমি কি বলছো মা? এখানে আমি আর এই খোজা ছাড়া আর কাকে দেখলে তুমি?

—তুমি যাকে বাঁদর মনে করছো আসলে সে শাহজাদা। শাহেনশাহ ইফিতামারাসের পুত্র। ফার দেশের বাদশাহ। আফ্রিদি জারজিসের যাদুতে সে বাঁদর হয়ে গেছে। এই শাহজাদা জ্ঞানে গরিমায় অনেক নাম যশের অধিকারী। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজ লোক চোখে হেয় এক বাঁদর ছাড়া কিছুই না।

সুলতান প্রশ্ন করে, তুমি যা বললে, সব সত্যি, মা?

শাহজাদী বললো, তুমি ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো না?

সুলতান আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। আমার চোখে তখন জলের ধারা। ঘাড় নেড়ে জানালাম। সবই সত্যি।

শাহজাদীর প্রতি এবার সুলতানের জিজ্ঞাসা।—তুমি এসব জানলে কেমন করে, মা?

—আমি যখন খুব ছোট, তখন এক বুড়ি পরিচারিকা ছিলো আমাদের প্রাসাদে। সে-ই আমাকে শিখিয়েছে এই যাদুবিদ্যা। অবশ্য তারপর আমি নিজে বহু চর্চা করেছি। অনেক পড়াশুনা করেছি। হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি অনেক। প্রায় একশো সত্তরটা মন্ত্র আমি শিখেছি। এবং তা কাজে লাগাতে পারি। আমি এমন বিদ্যা রপ্ত করেছি, আব্বাজান, যদি বলো, মুহূর্তে তোমার এই বিশাল প্রাসাদ এক ফুৎকারে শূন্যে উড়িয়ে দিতে পারি। চাইকি, গোটা শহরটাকে এক তুড়িতে মরুভূমি বানিয়ে ফেলতে পারি। শহরের ও প্রান্তে যে কাফ্ পর্বতমালা—তাকেও উর্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত করে দিতে পারি মাত্র এক আজ্‌লা পানি ছিটিয়ে। আর পাহাড়ের ওপারে যেখানে তোমার প্রজারা সুখে-স্বাচ্ছন্দে বসবাস করছে তাও হয়ে যেতে পারে বিশাল এক সায়র। তোমার প্রজারা সাঁতার কেটে খেলা করে বেড়াতে পারে নানা রঙের মাছ হয়ে।

—এমন অলৌকিক বিদ্যা তুমি জানো, আমি তো জানতাম না। যাই হোক, এই বেচারীকে যাদুমুক্ত করে ওকে মানুষ করে দাও, মা। কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে সে, বলো। কত জ্ঞানীগুণী মানুষ সে। তাকে আমি আমার প্রধান উজির করে রাখবো। তুমি যা জানো, সেই বিদ্যা দিয়ে, এই অভিশপ্ত জীবন থেকে অব্যাহতি দাও ওকে।

শাহজাদী বললো, আপনার আদেশ শিরোধার্য, আব্বাজান।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, প্রভাত সমাগত। সে চুপ করে গেলো।

চতুর্দশ রজনীর দ্বিতীয় যামে আবার কাহিনী শুরু করে শাহরাজাদ।

শুনুন, মহানুভব শাহজাদা, সেই দ্বিতীয় কালান্দার তার আত্মকাহিনী বলে চলেছে বড় বোনের সামনে।

একখানা ছুরি নিয়ে এলো শাহজাদী। প্রাসাদের সভাকক্ষের ঠিক মাঝখানে হিব্রুভাষায় কয়েকটা কথা লিখলো সেই ছুরির ফলা দিয়ে। এবং লেখাটাকে কেন্দ্র

করে বিরাট এক বৃত্ত এঁকে দিলো। এবার সে বৃত্তের মাঝখানে সেই খোদাই করা লেখাটার উপর দাঁড়ালো। তারপর বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব আওরাতে থাকলো। মুহূর্তের মধ্যে সারা প্রাসাদকক্ষ ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেলো। এমন অন্ধকার যে কোন কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ মনে হলো, সারা প্রাসাদটা দুলছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার কাটতে থাকে। প্রাসাদকক্ষে দেখা গেলো ভয়ঙ্কর দর্শন সেই আফ্রিদি জারজিসকে। গাঁইতির মতো তার হাত, মাস্তুলের মতো তার পা। চোখ দু'টো আগুনের গোলা সদৃশ। শাহজাদী ছাড়া আমরা সবাই ভয়ে শিউড়ে উঠলাম।

শাহজাদীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এসো, আফ্রিদি, তোমার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছি।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আফ্রিদি হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।—যে বিদ্যা শিখেছো তার মর্যাদা রাখতে পারলে না তুমি। কথা ছিলো, আমরা কারো কাজে বাধা হবো না। একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করবো না—এই ছিলো আমাদের হলফনামা। তুমি আজ সেই সত্যভঙ্গ করেছো। এর প্রতিফল তোমাকে পেতে হবে। এবং এক্ষুণি।

চোখের পলকে সেই আফ্রিদি দৈত্যটা এক হিংস্র সিংহের রূপ ধারণ করলো। শাহজাদীর দিকে থাবা বাড়িয়ে গর্জন করতে লাগলো। তার সেই ভয়ঙ্কর মুখের হা দেখে আমাদের আত্মারাম তখন খাঁচা-ছাড়া। মনে হলো এখুনি বুঝি শাহজাদীকে মুখের মধ্যে পুরে ফেলবে সিংহটা।

কিন্তু না। শাহজাদী ক্ষিপ্রহাতে মাথার একগাছি চুল ছিঁড়ে মন্ত্র পড়তেই মস্ত এক তলোয়ার হয়ে গেলো। সেই শাণিত তলোয়ারের আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো আমাদের। সিংহের ধড় আর কাল্লা দু'খানা হয়ে গেলো শাহজাদীর এক কোপে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সিংহের মুণ্ডটা এক প্রকাণ্ড কাঁকড়াবিছে হয়ে শাহজাদীর পায়ের দিকে ছুটে এলো কামড়াতে। চোখের পলকে এক বিষধর সাপের আকার ধারণ করলো শাহজাদী। তখন লড়াই শুরু হলো কাঁকড়াবিছে আর সাপে। সে কি প্রচণ্ড লড়াই। অনেকক্ষণ ধরে চললো। এক সময় দেখলাম, কাঁকড়াবিছেটা হয়ে গেলো একটা শকুনী। আর তক্ষুণি সাপটাও ঈগলপাখীর রূপ ধরলো। শকুনি আর ঈগলের যুদ্ধও চললো ঘণ্টাখানেক। এরপর শকুনি হলো এক বন-বিড়াল, ঈগল হয়ে গেলো নেকড়ে বাঘ। বিড়াল আর নেকড়ের লড়াই-এ বিড়ালটা কাবু হয়েছে প্রায়, এমন সময় দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড বড় ডালিম হয়ে লাফিয়ে গিয়ে বসলো দরবার প্রাঙ্গণের ফোয়ারাটার চারপাশের গোলাকৃতি চৌবাচ্চার ওপর। নেকড়েটাও ঝাঁপিয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। ডালিমটা এক লাফে উঠে গেলো শূন্যে। কিন্তু প্রাসাদ কক্ষের ছাদে বাড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লো একটা থামের গায়ে। আর প্রচণ্ড শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো নিচে মারবেলের মেজের ওপর। সারা ঘরময় ছড়িয়ে গেলো ডালিমের দানা। নেকড়েটা তখন একটা মোরগ হয়ে সেই দানাগুলো খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলতে লাগলো; এইভাবে একটা দানা বাদে সমস্তগুলোই খেয়ে নিলো। শেষ দানাটাও খাবে বলে ঠোঁটে করে তুলেছে এমন সময়, ভাগ্যের কি পরিহাস, ঠোঁট থেকে পিছলে পড়ে গেলো একখানা ফাটা মারবেলের ফাটলের মাঝখানে। ঠোঁটটা আর ঢোকাতে পারলো না মোরগ। তখন চিৎকার করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ঠোঁটটা নেড়ে চেড়ে কি যেন একটা বোঝাতে চাইলো। কিন্তু তার ইঙ্গিত অনুধাবন করতে পারলাম না আমরা। পরে বুঝেছিলাম, সে বোঝাতে চেয়েছিলো, তোমরা ঐ মারবেল-এর টুকরোটা তুলে দাও। আমি ঐ শেষ দানাটা খাবো। ওটা খেতে পারলেই আফ্রিদিকে পুরো হজম করে ফেলতে পারবো। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে। যা হবার তাই হবে। আমরা তার ভাষা বুঝলাম না। সে প্রচণ্ড শব্দে চিৎকার করতে লাগলো। তার চিৎকারে প্রাসাদটা দুলতে থাকে। বুঝিবা এখুনি হুড়মুড় করে ধসে পড়বে আমাদের মাথায়।

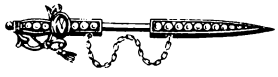

মোরগটা ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে চলেছে মারবেলটার ওপর। এক সময় দেখা গেলো, মারবেলের ভাঙা একটা টুকরো তুলে ফেলে দিয়ে সেই শেষ দানাটা ঠোঁটে করে তুলে নিলো সে। কিন্তু কি ব্যাপার, বুঝতে পারলো না। ডালিমের দানাটা ছিটকে গিয়ে পড়লো চৌবাচ্চার জলে। আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলো একটা মাছ। মোরগটা তার রূপ পালটে হলো পানকৌড়ি। চৌবাচ্চার জলে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে। প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেলো, পানকৌড়ি আর ওঠে না।

এক সময়ে প্রচণ্ড এক গোঁঙানীর শব্দে চমকে উঠলাম আমরা। দেখলাম, উথাল পাথাল করছে চৌবাচ্চার জল। এবার দেখলাম, আফ্রিদি তার আসল চেহারা নিয়ে উঠে আসছে জল থেকে। তার শরীরটা এক জ্বলন্ত অঙ্গার। গনগনে আগুনের এক বিরাট চাঁই। সে কি ভয়াবহ দৃশ্য! তার নাক চোখ মুখ দিয়ে উদ্গিরণ হচ্ছিলো চিমনীর ধোঁয়া। তার পিছনে পিছনে শাহজাদীও উঠে আসে। ঠিক আগের মতো এক রূপবতী যুবতী। কিন্তু তার দেহটাও লাল টকটকে। আগুনে দগ্ধ এক ধাতব মূর্তি।

ক্রমশ তারা দু'জনেই আমাদের দিকে এগুতে থাকে। ভয়ে শিউড়ে উঠলাম। ঐ আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপে ভস্ম হয়ে যাবো আমরা। কি করবো কিছু ভাবতে পারছি না। পালাবার পথ নাই। ঠিক করলাম চৌবাচ্চার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই আগুনের হল্কা থেকে নিজেকে বাঁচাই। কিন্তু দেখলাম, আফ্রিদিটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একমুহূর্ত। তারপর বিকট এক চিৎকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো—দরবার প্রাঙ্গণে—ঠিক আমাদের মাঝখানে। এক ঝলক আগুনের হল্কা এসে লাগলো আমার চোখে মুখে। এমন সময় শাহজাদীর জ্বলন্ত দেহটা এসে জাপ্‌টে ধরলো আফ্রিদিকে। দুই অগ্নিপিণ্ডের সে উদ্দাম লড়াই। আগুনের উত্তাপ দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। আফ্রিদির মুখ-নিঃসৃত একটা উল্কার মতো আগুনের ফলা এসে ঘায়েল করে দিলো আমার এই বাঁ চোখটা। আর একটা হল্কা এসে লাগলো সুলতানের থুতনীর কাছে। পুড়ে ঝলসে গেলো। নিচের ঠোঁটটা খসে ঝুলতে লাগলো। আর নিচের পাটির দাঁতগলো ঝুপ ঝুপ করে পড়ে গেলো মার্বেলের মেজের ওপর। আর একটা তির্যক আগুনের ফলা এসে বিঁধলো সেই হারেমের প্রধান খোজার বুকে। ব্যাচারী। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলো সে।

এই সময়কালের মধ্যে আফ্রিদি আর শাহজাদীর যুযুৎসুর লড়াই চলছিলো। আফ্রিদি চেয়েছিলো আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাইকে জীবন্ত দগ্ধ করে ফেলতে। কিন্তু শাহজাদীর প্যাঁচে পড়ে আর এগুতে পারলো না সে। তাই আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে হত্যা করতে চেয়েছিলো সবাইকে। আমরা দু'জনে অঙ্গহানির ওপর দিয়ে বেঁচে গেলাম। কিন্তু খোজাটা প্রাণ হারালো।

এমন সময় আর্তনাদ করে উঠলো আফ্রিদি। আল্লাহ, আমাকে তোমার কোলে টেনে নাও। তুমিই একমাত্র ভরসা। তুমি ছাড়া আমার অন্য কোন গতি নাই। জীবনে যতো পাপ করেছি—তার শাস্তি আমাকে পেতেই হবে। তোমার দেওয়া সব শাস্তি আমি মাথা পেতে নেবো, মালিক। তোমার পায়ের কাছে আমাকে একটু ঠাঁই দাও।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো আফ্রিদির আর্তনাদ। পাহাড়ের মতো তার ঐ বিশাল জ্বলন্ত বপুটা লুটিয়ে পড়ে গেলো মার্বেলের মেজের উপর। আগুনের তেজ কমে আসতে লাগলো। একটু পরে একেবারে নিভে ছাই-এর পাঁজা হয়ে পড়ে রইলো তার দেহটা।

শাহজাদী এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। বললো, শিগ্গির—শিগ্গির নিয়ে এসো এক গেলাস পানি।

জল এলো। সে বললো, আমার মুখের সামনে তুলে ধরো গেলাসটা। জলের

গেলাসটা সামনে ধরতে বিড়বিড় করে কি সব দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়ালো খানিকটা। তারপর বললো পানিটা ছিটিয়ে দাও ঐ বাঁদরটার ওপর।

আমার গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হলো সেই মন্ত্রপুত জল। সেই সঙ্গে শাহজাদী পরিষ্কার আরবীতে বললো, সর্বশক্তিমান—একমাত্র পরমসত্য আল্লাহর দোয়ায় তুমি তোমার আগের চেহারায় ফিরে এসো।

তখনি, আমি আমার আসল রূপ ফিরে পেলাম। মানুষের রূপ। শুধু ফিরে পেলাম না আমার বাঁ চোখটা—আগুনের হল্কায় কানা করে দিয়েছিলো—।

আমার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে দেখে শাহজাদী দুঃখ করলো খুব। কি করবে বলো। আগুন যাকে স্পর্শ করবে তাকেই দহন করবে। এই তার ধর্ম। বাবার ঝলসানো পোড়া মুখটা দেখেও তার অন্তর মথিত হতে লাগলো।

তারপর শাহজাদী বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো। বিষাদ বিবশ কণ্ঠে বলতে লাগলো, আব্বজান, আমারও যাবার সময় হয়ে এলো, আল্লাহর দরবারে ডাক পড়েছে আমার। বিধিলিপি এড়ানো যায় না। না হলে, দৈত্যটা যখন ডালিমদানা হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো আমি তার প্রতিটি দানাই পেটে পুরে নিয়ে ছিলাম—শুধু মাত্র একটি ছাড়া। ঐ দানাটা, আমার দুর্ভাগ্য, মার্বেলের ফাটলের মধ্যে আটকে গিয়েছিলো। ওটাকে যদি খেয়ে ফেলতে পারতাম—তবে, সেই মুহূর্তে আফ্রিদির মৃত্যু ঘটতো। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডন করবে, বলো! না হলে সব দানা খেয়ে শেষ করলাম আর ঐ একটা দানাই বা ফস্‌কে পড়ে যাবে কেন, মুখ থেকে। যাক, এ নিয়ে দুঃখ শোক ক'রো না, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হয়েছে, হবে।

একটু থেমে শাহজাদী আবার বলতে থাকে, আমার আর আফ্রিদির এই প্রচণ্ড লড়াইএ আগাগোড়াই আমি তাকে ঘায়েল করে গিয়েছি। আর প্রাণপণে আঘাত প্রতিরোধ করার চেষ্টামাত্র করে গেছে সে। পাল্টা আক্রমণ কোন সময়ই হানতে পারেনি। সে দিক থেকে এ লড়াই জয় আমার অবধারিত ছিলো। কিন্তু নিয়তি বড় নিষ্ঠুর—বড় নির্মম। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোনও লড়াই—এই সে যখন সুবিধে করতে পারলো না তখন সে নিজেই বেছে নিলো শেষ মারণাস্ত্র। অগ্নি কুণ্ডের দরজা খুলে ঝাঁপ দিলো সে। আমার হাতে মরতে তার পৌরুষ অহমিকায় বাধলো। কিন্তু আমার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। ওকে আত্মঘাতী হতে দেবো না আমি। নিজে হাতে খতম করবো, এই আমার জেদ। আর সে জন্যই কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমিও সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। টুঁটি চেপে তুলে নিয়ে এলাম ওপরে। নিজে হাতে খতম করবো তাকে—এই আমার তখন একমাত্র রোখ।

সবই নিয়তির পরিহাস, আব্বাজান। না হলে আফ্রিদি তো বিলকুল হেরে গিয়ে আত্মহত্যাই করতে গিয়েছিলো। আমি আবার কেন তার পিছে পিছে ধাওয়া করে সে আগুনে ঝাঁপ দিলাম। তার কোন দরকার ছিলো না। সে তো ঐ আগুনেই পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু এই রকমই ঘটতে হবে। এই আল্লাহর অভিপ্রায়। এ-ই বিধিলিপি! আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন। আমার ধ্যান জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করি না। তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই। মহম্মদ আল্লার পয়গম্বর।

এই বলে মেজের ওপর লুটিয়ে পড়ে গেলো—শাহজাদী। আফ্রিদির দেহাবশেষের পাশে তার নির্বাপিত দেহটাও পড়ে রইলো—একটা ছোট্ট ছাই-এর ডেলা হয়ে।

আমরা অনেক কাঁদলাম। এর চেয়ে আমার নিজের মৃত্যুই ভালো ছিলো। আমার মুক্তির জন্য তার আত্মাহুতি আমাকে দগ্ধ করতে লাগলো। কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে গেলো।

কন্যার শোকে উন্মাদের অবস্থা হলো সুলতানের। কপাল চাপড়াতে লাগলো

বারবার। নিজের হঠকারিতার জন্যে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো। কেন সে তার মেয়েকে বললো, বাঁদরকে মানুষ করে দিতে। কেনই বা সে তাকে দরবারে ডেকে পাঠালো। হায় আল্লাহ, এ দুর্মতি কেন হলো তার? অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলো সমস্ত অন্তরাত্মা। কন্যার ভস্মীভূত দেহটার পাশে গিয়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো সুলতান। কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো সে।

হারেমের বেগমরা এলো। ক্রীতদাসীরা এলো। বাদশাহী মর্যাদায় সাতদিন ধরে শোক পালন করা হলো শাহজাদীর উদ্দেশে।

শোক-সপ্তাহ শেষ হলে সুলতানের হুকুমে হাজার হাজার ক্রীতদাস আর হাজার হাজার বেগার মজদুর খাটিয়ে এক শাহজাদী স্মৃতি-মিনার গড়ে তোলা হলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। দিবা-রাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আলোর মালায় সাজানো হলো মিনারটা।

শোকে দুঃখে দিন দিন কৃশকায় হতে থাকে সুলতান। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিলো। কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে না। দরবারে বসে না নিয়ম মতো। সারা প্রাসাদ এক বিষাদের ছায়া। কারো মুখে হাসি নাই। সবাই যেন কেমন বিষণ্ণ—চুপচাপ। এইভাবে মাসাধিককাল কাটলো। একদিন সুলতান আমাকে ডেকে পাঠালো।

—শোনো, বাবা, তুমি এখানে আসার আগে আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো আমাদের। কিন্তু তুমি যে দিন এলে, সেই দিন থেকেই আমার সৌভাগ্যের চাকা উল্টোদিকে ঘুরছে। দুঃখ, শোক, দুর্বিপাকে জীবন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে আমার। আমার ইচ্ছে নয়, তুমি আর এখানে থাকো। তোমার মুখ আর আমি দেখতে চাই না। আমার কথায় মনে কোনও দুঃখ করো না, বাবা। তোমার কোনও দোষ নাই। দোষ তোমার ভাগ্যের। তোমার ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্য জড়াতে যাবে যে তারই ভাগ্য-বিড়ম্বনা ঘটবে—এই নিয়তি। তাই তোমাকে বলছি, বাবা, তুমি এদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। এদেশে তুমি থাকলে সারা দেশটাই উচ্ছন্নে যাবে আমার। তুমিই আমার প্রাণ প্রতিমা কন্যার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। তোমার জন্যেই আমার মুখটা পুড়ে কদাকার হয়ে গেছে। দাঁতগুলো হারিয়েছি। তুমি এদেশে না এলে আমার একান্ত বিশ্বাসী প্রধান খোজার প্রাণনাশ ঘটতো না। কিন্তু মনে করো না, বাবা, তোমাকে দোষারোপ করছি। তোমার কি দোষ? দোষ তোমার দুর্ভাগ্যের। তোমাকে সত্যিই আমি ভালোবাসি। আমার কন্যা তার নিজের জীবন দিয়ে তোমাকে শাপমুক্ত করে দিয়েছে। তুমি তোমার আসল রূপ ফিরে পেয়েছো। এবার তুমি এসো। আমার ভাগ্যে যা লেখা ছিলো তাই ঘটেছে। নিয়তি এড়ানো যায় না। ঢের সয়েছি শোকতাপ। এবার ফিরে যাও, শাহজাদা। আমাদের একটু শান্তিতে বাস করতে দাও, বাবা।

মালকিন্ বিশ্বাস করুন, তখন সেই মুহূর্তে, আমার নিজেকে মনে হলো দীন, হীন, অপয়া, অপদার্থ এক হতভাগা। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এলো আমার কণ্ঠ। চিৎকার করে বলতে চাইলাম, ধরণী দ্বিধা হও, আমি ঢুকি। কিন্তু পারলাম না। মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ছেড়ে। তারপর পথ আর পথ। শুধু পথ চলা। কোথায় চলেছি কিছুই জানি না—জানতে চাই না। শুধু উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে অবশেষে আজ সন্ধ্যায় এসে হাজির হলাম এই বাগদাদ শহরে।

বাগদাদ আমার ছোটবেলার স্বপ্ন-শহর ছিলো। এখানে কেউ দুঃখে দিন কাটায় না, শুনেছি। এখানকার সুলতান নাকি পরম ধার্মিক দয়াবান মহান। তাকে চোখে দেখার বাসনা আমার বহু কালের। এই হতভাগার জীবনের করুণ কাহিনী তাকে শোনাবার বড় সাধ আমার। কী পাপ করেছি আমি, যার জন্যে এতো দুঃখ এতো কষ্ট আমাকে পেতে হচ্ছে। মনে পড়ে, সেই

মরুভূমির ডাকাতদের হাতে পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে সেই দর্জির আশ্রয়ে এসে কাঠুরিয়ার জীবন। আজ মনে পড়ে, পাতালপুরীতে চিরবন্দিনী আমার সেই দুদিনের প্রিয়া। কেনই বা তার কাছে গেলাম, কেনই বা আফ্রিদির হাতে তাকে হত্যা করলাম! সেই অনুতাপে নিয়ত দগ্ধ হচ্ছি আমি। আর আমার দুর্ভাগ্য—না হলে আফ্রিদির যাদুতে কেনই বা হবো আমি বাঁদর! মনে পড়ে, শাহজাদা হয়েও নোকরের কাজ করেছি আমি, জাহাজের কাপ্তেনের। এমনকি শনির দশা আমার—যে, সুলতানের সুখের সংসার আমি বিষাদের সায়রে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছি। তার প্রাণাধিকা কন্যার মৃত্যুর কারণ হয়েছি। সুলতানের মুখটাও পুড়ে বিকৃত হয়ে গেছে আমারই জন্যে। তার বিশ্বস্ত নফর, ব্যাচারী খোজা, তার কি দোষ, সে কেন প্রাণটা হারালো? সেও তো আমার জন্যেই। আমিও অবশ্য হারিয়েছি আমার এই বাঁ চোখটা। তা আমার দুর্ভাগ্যের ফল তো আমি পেতেই পারি? কিন্তু ওরা? ওরা কেন এই ভয়াবহ বিষময় ফল ভোগ করলো আমার কারণে? আমার একটা চোখ গেছে, তবু তো আর একটা আছে। সব তো যায়নি। কিন্তু ওরা তো সব খুইয়েছে। আর আমিই সে জন্যে একমাত্র দায়ী। একমাত্র অপরাধী।

নানা পথ হেঁটে অবশেষে আজ সন্ধ্যায় এই বাগদাদ শহরে এসে পৌঁছলাম এক ফকিরের বেশে।

শাহজাদা নই—এক কালান্দার ফকির। একটা চোখ কানা। দাড়িগোঁফ কামিয়ে আমার নিজেকে বেমালুম পাল্টে ফেলেছি। কেউ আমাকে চিনবে না—আমি এক বাদশাহজাদা।

এক চৌরাস্তার মোড়ে এসে দেখি, আমারই মতো আর এক কালান্দার। তারও বাঁ চোখ কানা। দাড়িগোঁফ কামানো। সেও আশ্রয় আস্তানা খুঁজছে আমারই মতো। তার কাছে এলাম। একটু পরে আর এক কালান্দার এসে মিলিত হলো আমাদের সঙ্গে। অবাক কাণ্ড, তারও বাঁ চোখ কানা। সেও দাড়িগোঁফ হীন। এই তৃতীয় কালান্দার। তারও একই সমস্যা। রাতের মতো কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় কিনা সেই চিন্তা।

তারপর আমরা তিন কালান্দার মিলে আশ্রয় সন্ধান করতে করতে তোমাদের দরজাতেই করাঘাত করেছিলাম, মালকিন। সবই তার ইচ্ছে। আমরা নিমিত্ত মাত্র।

এই আমার জীবনের করুণ ইতিহাস।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলো এতক্ষণ। দ্বিতীয় কালান্দার তার কাহিনী শেষ করতেই বড়বোন বাহবা দিলো তাকে। বাঃ, বড় চমৎকার তোমার কাহিনী। আমি খুশি। এবার তোমার যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো। তোমার ছুটি।

দ্বিতীয় কালান্দার বললো, কিন্তু এই তৃতীয় কালান্দারের কাহিনী না শুনে যাবো না। এই আমি গ্যাট হয়ে বসলাম।

এবার তৃতীয় কালান্দার এগিয়ে এসে তার কাহিনী বলতে শুরু করে :

শুনুন মালকিন, মনে করবেন না, আমার কাহিনী ওদের দু'জনের চেয়ে আরও চমৎকার। তা নাও হতে পারে। তবে সত্যি ঘটনা—এটুকু বলতে পারি। কারণ এর সবই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

ওদের দু'জনের মতো আমারও বহু বিড়ম্বিত ভাগ্য। তবে ওদের দু'জনের মতো অতোটা না। আমার এই বাঁ চোখটা হারিয়েছি একমাত্র আমার নিজের দোষে। এর জন্য অন্য কাউকে দোষ দিতে পারি না।

আমি এক বাদশাহ। আমার বাবাও ছিলেন বাদশাহ। আমার বাবা কাসিব যখন মারা

গেলেন আমি তখন সিংহাসনে বসি। আমার ন্যায়বিচারে প্রজারা খুব খুশি ছিলো আমার ওপর।

ছোটবেলা থেকেই সমুদ্র যাত্রা আমার বড় প্রিয়। তার একটা কারণ বোধহয় আমার সল্‌তানিয়তের প্রধান শহরটা ছিলো সমুদ্রোপকূলবর্তী। বহুদূরব্যাপী সমুদ্রের মধ্যেকার দ্বীপগুলো ছিলো আমার দখলে। দশখানা রণতরী সাজিয়ে মাসাধিককাল ধরে যাত্রা করতাম আমি। আমার অধিকৃত দ্বীপগুলো পরিদর্শনে যেতাম।

এই রকম একবার যাত্রাপথে দারুণ ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো আমাকে—সারাদিন সারারাত্রিব্যাপী।

রাত্রি অবসান হলো। ঝড়ও থামলো। আবার হাসি ঝলমল দিন উপছে পড়লো। কিন্তু আমি দেখলাম, একটি ছোট্ট দ্বীপের চড়ায় এসে আটকে গেছে আমার জাহাজগুলো।

সমুদ্র তখন শান্ত অবোধ শিশুর মতোন। তার ঘন নীল জলে কাব্যের গন্ধ। কে বলবে গত রাত্রে সংহার মূর্তি ধারণ করেছিলো সে।

দিন দুই সেই দ্বীপে একটু জিরিয়ে নিলাম। তারপর পাল তুলে পাড়ি দিতে থাকলাম আবার। কুড়িদিন কেটে গেলো। তবু হারানো পথের নিশানা খুঁজে পেলাম না। তখন আমরা ভাসছি এক অজানা সমুদ্রে। দিশাহারা পাখীর মতো। নীড়ের সন্ধান চাই।

কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কত দূর? কোথায় এলাম আমরা?

উত্তর পেলাম, জানি না, বলতে পারবো না।

এ সমুদ্র পথ তার অচেনা। কখনও সে কোনও দিন আসেনি এই পথে।

উপায়ন্তর না দেখে একজন ডুবুরিকে নামিয়ে দিলাম জলে। কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরে এলো। বললো, সমুদ্রের ওধারে বড় বড় মাছ দেখলাম অনেক। আরও দূরে দেখতে পেলাম একটা পাহাড়। তার খানিকটা অংশ সাদা আর খানিকটা কালো।

ডুবুরীর কথায় ডুকরে কেঁদে উঠলো কাপ্তেন—আর রক্ষা নাই। মৃত্যু অবধারিত। ডুবুরি যা দেখে এসেছে ওটা একটা মরণ-ফাঁদ—চুম্বক পাহাড়। পাহাড়টার গায়ে গাঁথা আছে হাজার হাজার চুম্বক লোহার বর্শা। আমাদের জাহাজ যতই তার কাছে যেতে থাকবে সেই চুম্বকের প্রচণ্ড আকর্ষণ হিড় হিড় করে টেনে নেবে। আর পাহাড়ের ধাক্কায় চুরমার হয়ে যাবে জাহাজগুলো। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে আমাদের। এখন আল্লাহর নাম জপ করা ছাড়া আর কোন পথ নাই, জাঁহাপনা। আগামীকালই আমরা পাহাড়ের দুর্বার আকর্ষণে প্রাণ হারাবো। সবাইকেই মরতে হবে। কেউ বাঁচতে পারবে না। এ পর্যন্ত যত নাবিক পথ হারিয়ে এই পাহাড়ের আকর্ষণ-আওতায় গিয়ে পড়েছিলো তারা কেউই ফেরেনি। আমাদেরও আর ফেরা হবে না।

কাপ্তেনের দু'গাল বেয়ে বয়ে চলেছে জলের ধারা। অসহায় শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে। কাঁদতে কাঁদতেই আবার বলে, ঐ পাহাড়ের চূড়ায় একটা গম্বুজ আছে। দশটা পিতলের খুঁটির উপরে সেই গম্বুজ। আর গম্বুজের উপরে রয়েছে এক ঘোড়-সওয়ার। ব্রোঞ্জের তৈরি। এক হাতে ঢাল অন্য-হাতে তরোয়াল। দেহে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ—রণসাজে সজ্জিত এক যোদ্ধা। সীসার ফলকে উৎকীর্ণ করা এক দৈববাণী—আঁটা আছে তার বুকে। শুনুন শাহজাদা, লোকে বলে, ঐ পাহাড়ের চূড়ায় যতদিন ঐ ঘোড়সওয়ার ঐ ভাবে অবস্থান করবে ততদিন কোন জাহাজের নিস্তার নাই। তার আকর্ষণ-আওতার মধ্যে পড়লেই প্রচণ্ড বেগে টেনে নিয়ে খান খান করে দেবে। এইভাবে কত যে জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কত শত সহস্র নাবিক প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। ঐ ঘোড়সওয়ারকে ওখান থেকে ফেলে দিতে না পারলে এমনি ধ্বংসের তাণ্ডব চলতেই থাকবে।

মৃত্যুর আশঙ্কায় কাপ্তেনের দেহে কাঁপুনি ধরে যায়। আমরাও সকলে ভয়ে আঁতকে হিম হয়ে যাই। মোউৎ অনিবার্য। তার কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া ভিন্ন পথ নাই। হায় আল্লাহ্, কী এমন পাপ করেছিলাম, যার জন্যে বিদেশ-বিভুঁই-এ এইভাবে বেঘোরে জান কবুল করতে হচ্ছে।

পরদিন প্রত্যুষে কাপ্তেন জানালো, সেই কোষ্ঠী-কালো চুম্বক-পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি আমরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জাহাজগুলো ভেঙে গুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নাম নাও সবাই।

প্রচণ্ড শব্দে জাহাজগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। উত্তাল ঢেউ-এর প্রলয় নাচনের মধ্যে পড়ে কে যে কোথায় হারিয়ে গেলাম কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। কে মরলো, আর কে বেঁচে থেকেও মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে লাগলো তার কোনও হদিশই করতে পারলাম না।

সারাটা দিন অশান্ত ঢেউ-এর মুখে মুখে ওঠা-নামা করতে করতে নাম-না-জানা ঠিকানার উদ্দেশে ভেসে চলেছি—যারা বেঁচে আছি তখনও। সে কি দুর্যোগ, সে কি নিদারুণ ঝড়ঝঞ্ঝা! এলোপাথাড়ী হাওয়ার দাপটে উত্তালতরঙ্গমালা ভেঙেচুরে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস-এ পরিণত হতে লাগলো। আর কিছু মনে নাই। অজ্ঞান হয়ে গেছি।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে? আল্লাই বাঁচালেন সে যাত্রা। যখন জ্ঞান ফিরলো দেখি, সেই পাহাড়টার নিচে এক বালির চূড়ায় আটকে আছি আমি। জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড আঘাতে মরিনি, হাঙর কুমীরেও খায়নি, আশ্চর্য! সবই আল্লাহর দোয়ায়।

উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম, সামনেই একটা পথ, সোজা উঠে গেছে পাহাড়ের মাথায়। খোদা ভরসা করে উপরে উঠতে লাগলাম।

এই সময় রাত্রি ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন পঞ্চদশ রাত্রি। শাহরাজাদ গল্প শুরু করে ঃ

তৃতীয় কালান্দার তার জীবন কাহিনী বলে চলেছে। আর শুনছে সেই তিন বোন, কুলি ছেলেটা, তার সঙ্গী—আর দুই কালান্দার, খলিফা হারুন-অল-রসিদ, উজির জাফর, দেহরক্ষী আর সেই সাতজন সশস্ত্র নিগ্রো-প্রহরী।

আল্লাহর কি অপার মহিমা, আমি যখন সেই খাড়াই পথ বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে চলেছি তখন হঠাৎ হাওয়ার দিক পরিবর্তন হয়ে গেলো। এবং এই হাওয়ার আনুকূল্যে তরতর করে উঠে যেতে পারলাম ওপরে। বিপরীতমুখী হাওয়ার বেগ অগ্রাহ্য করে এ-পথ বেয়ে এক পাও এগুনো সম্ভব নয় কোন মানুষের।

যাই হোক, উপরওয়ালার কৃপায় উপরে উঠে এসে সেই গম্বুজের নিচে এসে দাঁড়ালাম। আনন্দে আমার শরীর তখন কাঁপছে।

সারা দিনের শ্রান্তিতে অবশ অবসন্ন হয়ে এলো শরীর। গম্বুজের নিচে—যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই—শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেলাম, এক দূরাগত কণ্ঠের বাণী—শোনো কাসিবের পুত্র, ঘুম থেকে জেগে উঠে তোমার পায়ের ঠিক তলায় গর্ত খুঁড়ে দেখো, একখানা তীর আর ধনুক পাবে। এই তীরধনুকটা দৈবশক্তিসম্পন্ন। তারপর ঐ ধনুকে তীরটা জুড়ে গম্বুজের মাথার ওপরে ঐ ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দাও। তাহলে ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ারটা সমুদ্রে পড়ে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দুনিয়ার মানুষ পরম উপকৃত হবে চিরকালের মতো। সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাত থেকেও খসে পড়ে যাবে ধনুকটা। যে গর্ত খুঁড়ে তুলেছিলে সেই গর্তেই ধনুকটা রেখে মাটি চাপা দিয়ে দিও। এর পর সামনে তাকালে দেখতে পাবে, সমুদ্রের জল ফুলে উঠছে। ফুলতে ফুলতে এক সময় দেখবে, তোমার পায়ের তলার পাহাড়ের চূড়া-সমান হয়ে গেছে। এই সময় দেখবে, একটা ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা বেয়ে আসছে একটা লোক।

তোমারই দিকে। কাছে এলে পরিষ্কার মনে হবে, সেই ঘোড়সওয়ার—অবিকল তার চেহারার সঙ্গে মিল আছে এই ডিঙ্গির লোকটার। আসলে কিন্তু তা ঠিক না। নৌকোটা আরও কাছে এলে দেখবে, মরার মাথার খুলিতে ভর্তি নৌকোর পাটাতন। ভয় পেয়ো না। তোমাকে নিরাপদে সাগর পার করে দেবার জন্যেই সে আসবে। সেই রূপই নির্দেশ দেওয়া আছে তাকে। কিন্তু সাবধান, তার নৌকোয় উঠে ভুলেও কখনও আল্লাহর নাম মুখে এনো না। নৌকোয় উঠলে সে একটানা দশ দিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তোমার দেশের চেনা শান্ত নিরাপদ সমুদ্র এলাকায় পৌঁছে যাবে। সেখানে দেখবে সওদাগরের এক নৌকো। তারা তোমাকে তুলে নিয়ে তোমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আবারও বলছি, ভুলেও কখনও তাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে না।

ঘুম ভেঙে গেলো। খোয়াব কেটে গেলো। উঠে দাঁড়ালাম। পায়ের তলার মাটি খুঁড়ে পেলাম সেই ধনুক আর তীর। ধনুকে তীর জুড়ে ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। প্রচণ্ড এক শব্দে নিচে সমুদ্রের জলে পড়ে গেলো মূর্তিটা। আর তৎক্ষণাৎ দেখলাম, সমুদ্র এক ভীষণ রূপ ধারণ করছে। টগবগ করে ফুটতে লাগলো অনন্ত জলরাশি। ফুসতে ফুসতে ফুলতে ফুলতে ক্রমশ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে গেলো। দেখলাম দূরে একখানা ছোট নৌকা বেয়ে নিয়ে আসছে একটি লোক। হুবহু যেমনটি দেখেছিলাম স্বপ্নে, সেই রকম সব ঘটে যেতে লাগলো। নৌকোটা কাছে আসতে লোকটাকে দেখলাম, ঠিক ঐ ঘোড়সওয়ারের মতো। কিন্তু স্বপ্নে জেনেছিলাম, দেখতে এক রকম হলেও ওরা এক না। আমার হাত থেকে ধনুকটা খসে পড়ে গেছে মাটিতে। ঐ গর্তটায় রেখে মাটি চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়লাম। নৌকোটা ততক্ষণে আরও কাছে—একেবারে আমার সামনে এসে থেমে গেছে। দেখলাম, লোকটার এক হাতে অনেকগুলো মড়ার মাথার খুলি। আর কি আশ্চর্য, যদিও নৌকো বাইছে, লোকটা কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ না। পিতলের তৈরি এক মানুষের মূর্তি। তার বুকে আঁটা এক সীসার ফলক। তাতে উৎকীর্ণ করে লেখা আছে এক দৈববাণী।

আমি কোন কথা না বলে নৌকোয় উঠে বসলাম। সেই পিতলের মানুষটা বেয়ে চললো নৌকোটা। এক-দুই-তিন এইভাবে দশটা দিন কেটে গেলো। অবশেষে দেখলাম, আমাদের দেশের চেনাজানা সমুদ্রে এসে পড়েছি। আনন্দে উল্লাসে আমি তখন আত্মহারা। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, আল্লাহ তোমার মহিমা অপার। তোমার দোয়াতেই আমি আমার জীবন ফিরে পেয়েছি, আজ আমার নিজের দেশের মুখ দেখতে পেয়েছি। তুমি সর্বশক্তিমান একমাত্র ঈশ্বর। তোমাকে ছাড়া অন্য কোন অলৌকিক শক্তিতে আমার আস্থা নাই। তুমিই একমাত্র পথ।

আমার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো। দেখলাম, সেই পিতলের মূর্তিটা বাঁ হাত দিয়ে তুলে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দিলো আমাকে। তারপর নৌকোটা নিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেলো কোথায়!

আমি খুব ভালো সাঁতারু। সমুদ্রের নীল জলে গা ভাসিয়ে দিলাম। এইভাবে সারাটা দিন কেটে গেলো। আমার হাত পা অবশ হয়ে আসতে লাগলো। ভয় হলো, এবার মৃত্যু অনিবার্য। আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় মসজিদ চূড়ার মতো উঁচু উত্তাল ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে চললো আমাকে। সমুদ্র-কূলের দিকে। তারপর এক সময় অনুভব করলাম, আমাকে তীরে ছুঁড়ে দিয়ে ঢেউটা আবার সমুদ্রে ফিরে গেছে। বুঝলাম এও তাঁরই এক মহিমা।

সমুদ্র সৈকতে উঠে এসে জামাকাপড় খুলে শুকাতে দিয়ে বালির ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে শুকনো জামাকাপড়গুলো পরে সামনে চেয়ে দেখি, এক সবুজ শস্যক্ষেত্র। আনন্দে নেচে উঠলো মন। এপাশ ওপাশ চক্কর দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে

লাগলাম। যেদিকে তাকাই শুধু জল আর জল আর জল। সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটা দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

একটা জায়গায় বসে পড়লাম। আমার অধম অদৃষ্টের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। নিজেকে এক হতভাগা বলে মনে হতে লাগলো। একটা ভুলের জন্যে এতো কষ্ট সহ্য করতে হলো আমাকে। ঠিক করলাম, এবার থেকে দেখে শুনে সাবধানে চলতে হবে। অদৃষ্ট যখন সাধ দিচ্ছে না তখন, যখন-তখন বিপদ-আপদ আসতে পারে।

এমন সময় নজরে এলো, একখানা জাহাজ এই দিকেই আসছে। না জানি, আবার কোন বিপদ হয়, এই ভেবে একটা গাছের উপর উঠে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিলাম পাতায় ঢেকে। জাহাজটা এসে নোঙর করলো। জনাদশেক নফর নামলো। সবাইর হাতে একখানা করে মাটিকাটা কোদাল। ওরা ঐ শস্যক্ষেত্রের এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কি যেন একটা খুঁজতে লাগলো। তারপর একটা জায়গায় মাটি কেটে গর্ত করতে থাকলো। আমি গাছের ডালে বসে দেখলাম, খানিকটা গর্ত করার পর একটা গুপ্ত দরজার সন্ধান পেলো তারা। দরজার পাল্লা খুলে ফেললো। এরপর আবার তারা ফিরে গেলো জাহাজে। নানারকম দামি দামি খাবারদাবার মাথায় নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলো! গুপ্তদরজা দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে সামানগুলো রেখে আবার ফিরে গেলো জাহাজে। আবার নিয়ে এলো সাজপোশাক ইত্যাদি। এইভাবে নানারকম জিনিসপত্তর নামিয়ে রেখে এলো মাটির নিচের সেই ঘরে। মোট কথা, একটা খানদানি পরিবারে যা যা দরকার তার সবকিছুই ছিলো তার মধ্যে। তারপর জাহাজ থেকে নেমে এলো জরাবার্ধক্যে জীর্ণ এক থুরথুরে বৃদ্ধ—একটা ফুটফুটে কিশোরের হাত ধরে। পিছনে পিছনে নফরগুলো। তাদের হতে মণিমুক্তা-খচিত সূক্ষ্মকারুকার্য করা বাদশাহী শাল। ওরা সবাই সেই গুপ্ত দরজা দিয়ে নিচে নেমে গেলো। কিছুক্ষণ বাদে সেই ছোট্ট কিশোর বালকটি ছাড়া আর সবাই উঠে এসে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো।

জাহাজটা যখন অনেক দূরে চলে গেছে, গাছ থেকে নামলাম আমি। ঐ জায়গাটায় গিয়ে মাটিগুলো সরিয়ে গুপ্ত দরজাটা খুলে ফেললাম। পাথরের তৈরি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম নিচে। এক সুরম্য অট্টালিকা। একটু এগোতেই চোখে পড়লো, দামি মখমলের পর্দা দেওয়া একটা দরজা। পর্দা সরিয়ে ভিতরে পা রাখতে সাহস হলো না। ঝকঝকে তকতকে আনকোরা বহু মূল্যবান পারস্য গালিচায় প্রকাণ্ড ঘরটার পুরো মেজেটা মোড়া। সুন্দর সুন্দর সোফা কোচ, টেবিল আলমারীতে চমৎকার সাজানো গোছানো ঘরটা। মাথার উপরে কারুকার্যখচিত ঝাড়বাতি। টেবিলের উপর সাজানো সুন্দর কাজ-করা এক ফলের ঝাঁপি আর মিঠাই মণ্ডার রেকাবী। তার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক ফুলদানী ওপাশে সোনার পালঙ্কে বসে সেই কিশোর বালক সোনার পাখায় হাওয়া খাচ্ছে। আমাকে দেখা মাত্র ভয়ে আঁৎকে উঠলো সে। আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম, কোন ভয় নেই, বন্ধু। আমিও মানুষ—এক বাদশাহর ছেলে। এবং নিজেও আমি বাদশাহ, আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। বরং তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করতে এসেছি। ওরা তোমাকে এই পাতালপুরীতে রুদ্ধ করে হাওয়া হয়ে গেলো। এখান থেকে কোন ভাবেই তুমি বেরিয়ে বাঁচতে পারবে না। তাই আমি তোমাকে বাঁচাতে এলাম।

আমার কথা শুনে কিশোর একটু হাসলো। কি সুন্দর তার ঠোঁটের হাসি। যেন মুক্তো ঝরে পড়লো। তার আয়ত চোখ, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট দেখে মনে হয়, এক খানদানী বংশের ছেলে সে। ইশারায় তার পাশে গিয়ে বসতে ডাকলো আমাকে।—শুনুন মালিক, ওরা আমাকে এখানে ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। আমার মৃত্যুও তাদের আদৌ কাম্য নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই ওরা আমাকে লোকচক্ষুর অগোচর এই পাতালপুরীতে লুকিয়ে রেখে গেলো।

তুমি হয়তো আমার বাবার নাম শুনে থাকবে। তামাম দুনিয়ার মধ্যে সব চেয়ে সেরা জহুরী আমার বাবা। তার মতো ধনী লোক বোধহয় খুব কমই আছে। দুনিয়ার এমন কোন সুলতান বাদশাহ নাই যার কাছে আমার বাবা হীরে-জহরৎ বিক্রী করেনি। তার খ্যাতি নাম জগৎজোড়া। বাবার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান আমি।

আমার জন্মের সময় এক সিদ্ধবাক গনৎকার বলেছিলো, এই শিশু তার পিতামাতার জীবদ্দশাতেই মারা যাবে। এর বয়স যখন পনেরো হবে সেই সময় বাদশাহ কাসিবের পুত্রের হাতে এর মৃত্যু ঘটবে।

গণৎকার আরও বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন। এক সময় বাদশাহ কাসিবের পুত্র সমুদ্র যাত্রায় জাহাজ ডুবি হয়ে এক কষ্টি-পাথর পাহাড়ে গিয়ে উঠবে। সেই পাহাড়ের চূড়ায় এক পিতলের ঘোড়সওয়ারকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে চিরকালের মতো হাজার হাজার নাবিকের প্রাণ বাঁচাবে।

আমার বাবা এই পনেরো বছর ধরে আমাকে খুব সাবধানে চোখে চোখে রেখে মানুষ করেছে। কয়েক দিন হলো খবর ছড়িয়ে পড়েছে কাসিবের পুত্র সেই পাহাড়ে উঠে পিতলের ঘোড়সওয়ারটাকে জলে ফেলে দিয়েছে। এই খবর শোনার পর থেকে আমার মা-বাবার চোখে ঘুম নাই। এই ক'টা দিনের মধ্যে আমার বাবার শরীর বার্ধক্যে একেবারে ভেঙে পড়েছে। দেখলে চেনা যায় না, এমন। আমার মা কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণী শোনার পর থেকেই বাবার চিন্তা, কি করে আমাকে কাসিবের পুত্রের হাত থেকে রক্ষা করবে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে এই নির্জন দ্বীপে মাটির তলায় এই প্রাসাদপুরী বানিয়ে রেখেছে সে। পনেরো বছর বয়সের সময় যাতে সে লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে এনে আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারে। কাসিবের পুত্র সেই পিতলের ঘোড়সওয়ারকে জলে ফেলে দিয়েছে। তাই আজ আমাকে সে এখানে লুকিয়ে রেখে গেলো। গণৎকারের ভবিষ্যৎ বাণীতে বলা হয়েছিলো, ঘোড়সওয়ারকে জলে ফেলে দেবার চল্লিশ দিনের মধ্যে এই ঘটনা ঘটবে। তাই বাবা আমাকে চল্লিশ দিনের জন্য এখানে লুকিয়ে রেখে গেলো। বাবার এবং আমার নিজেরও বিশ্বাস, এই দূরধিগম্য পাতালপুরীর সন্ধান কিছুতেই পাবে না সে।

রাগে কাঁপতে লাগলো আমার শরীর। কী মিথ্যেবাদী, ভণ্ড এই সব গণৎকারগুলো। নিরীহ মানুষের মনে এরা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। ওই ব্যাটাদেরই খুন করা দরকার। এমন সুন্দর ফুলের মতো এক কিশোর—নিষ্পাপ নির্মল—তাকে কিনা আমি হত্যা করবো। গাঁজাখুরি বানানো একটা গপ্পো শুনিয়ে ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে এদের মনে। এই বালকের জীবন রক্ষার জন্যে, যদি প্রয়োজন হয়, আমার জীবনও তুচ্ছ করে দিতে পারি। শয়তান গণৎকারটাকে—পেলে একবার শুনিয়ে দিতাম সে কথা। গলা চড়িয়ে বেশ জোরেই বললাম, শোনো বাছা, উপরে আল্লাহ আছেন। তোমার মতো একটা ফুলের কুঁড়িকে ছিঁড়ে ফেলবে কেউ, তা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সে যেই হোক, তোমাকে যে হত্যা করতে আসবে তাকে আমি হত্যা করবো আগে। আমাকে না মেরে তোমাকে ছুঁতে পারবে না কেউ। আমি তোমার পাহারায়, তোমার সঙ্গে বাস করবো এই চল্লিশ দিন। দেখি, কে তোমাকে মারে। তারপর চল্লিশ দিন কেটে গেলে, তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে আমার দেশে যাবো আমি। তুমি হবে আমার প্রাণের বন্ধু। তোমাকেই আমি বসিয়ে যাবো আমার সিংহাসনে।

জহুরীর ছেলে খুশী হলো খুব। বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানালো আমাকে। আমার উপর তার গভীর আস্থা লক্ষ্য করে আনন্দ হলো মনে।

অনেক গল্প কাহিনী শোনালাম তাকে। সেও শোনালো। খুশিতে ভরে গেলো আমাদের মন। নানারকম খানাপিনা করলাম। এতো খাবার দাবারে ঘর ভর্তি যে, শ'খানেক লোক সারা বছর ধরে খেয়েও তা ফুরাতে পারবে না।

আমার ব্যবহারে মুগ্ধ হলো কিশোর। তাকে যে আমি গভীর ভালোবাসার চোখে দেখছি সে কথা বুঝতে বেশী দেরি হলো না তার।

সারা রাত বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমুলো সে। আমিও। সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে দু'জনে নাস্তা করলাম। তারপর নানারকম মজার মজার কিস্‌সা শুনালাম তাকে। খেলাধুলা করলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সুগন্ধী আতর দেওয়া জলের চৌবাচ্চায় অবগাহন করে গোসল করলাম আমরা। দুপুরের খানাপিনা সেরে একটু বিশ্রাম করে আবার শুরু হলো আমাদের গল্প, খেলা। রাত্রিবেলায় পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিলাম তাকে। দু'জনে একসঙ্গে বসে মাংস রুটী, মাখন, ফল, দুধ, মধু, মিঠাইমণ্ডা দিয়ে রাতের আহার শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দিনের পর দিন এইভাবে খেলাধূলা, হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে কেটে যেতে লাগলো। তার মা-বাবার অদর্শন, তার মরণভীতি, সব ভুলিয়ে দিলাম আমার বন্ধু-সুলভ ব্যবহার দিয়ে, আমার আন্তরিকতা দিয়ে। এইভাবে কি করে যে চল্লিশটা দিন কেটে গেলো আমিও টের পাইনি, সেও বুঝতে পারেনি।

সেদিন সে ফিরে যাবে তার দেশে। তার বাবা আসবে তাকে নিয়ে যেতে। সকালে উঠেই এক হাঁড়ি গরম জল বসালাম। গরম জল-ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে খুব আচ্ছা করে ঘসে মেজে স্নান করালাম তাকে নিজের হাতে। খুব ভালো করে দামি সাজপোশাকে সাজালাম। আতরের খুশবু ছড়িয়ে দিলাম তার গায়ে।

পালঙ্কের ওপর শুয়ে শুয়ে সে ভাবছে, বাবা আসবে। সে চলে যাবে। আর আমি ভাবছি এ ক'দিনের দোস্ত, আবার কোথায় হারিয়ে যাবে। মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায়।

তন্ময় হয়ে কি ভাবছে দেখে আমি কথা বললাম, কিগো সাহেব, কি খাবে বলো?

ছেলেটা বললো, তরমুজ খাবো।

একটা বড়সড়ো পাকা তরমুজ নিয়ে এলাম। পালঙ্কের ওপাশের দেওয়ালে টাঙানো ছিলো একখানা ছুরি। তরমুজটা কাটবো বলে ছুরিটা নামিয়ে আনার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম পালঙ্কের ওপর। কাঁটায় ঝোলানো ছুরিটা খুলে হাতে নিয়েছি এমন সময় ঘটলো সেই কাণ্ডটা। ছেলেমানুষের খেয়াল, দুষ্টুমীতে ভরা মন। আমি যখন নাগালের খানিকটা ওপরে ঝুলানো সেই ছুরিটা হাতের মুঠোয় খুলে নেবার জন্য করসৎ করছি তখন তা দেখে হয়তো বা শিশু-সুলভ সারল্যে মজা অনুভব করেছিলো ছেলেটা। আমার উঁচু হয়ে যাওয়া পায়ের গোড়ালীতে সুড়সুড়ি দিলো। ঐ অবস্থায় আমার কি দশা হয় তাই দেখার মজায় পেয়ে বসেছিলো তাকে। অতর্কিতে তার কাতুকুতুর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না আমি। চমকে উঠে পাটা সরিয়ে নিতে গিয়েই শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম ছেলেটার ওপর। চিৎ হয়ে শুয়েছিলো সে। আমার হাতের শানিত ছোরা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেলো তার বুকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়ে গেলো আমারই হাতের উপর।

মালকিন, তখন আমার কি অবস্থা একবার কল্পনা করুন। আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছি। নিজের জামাকাপড় নিজেই ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে লাগলাম। কেঁদে গড়াগড়ি দিচ্ছি, হাত-পা ছুঁড়ছি, চোখের জলে বন্যা বয়ে চলেছে। হায় আল্লাহ একি হলো। একি করলাম আমি। কি এমন পাপ আমি করেছিলাম, যার জন্যে এই শোক অনুতাপে পুড়তে হলো আমাকে! না, একেই বলে নিয়তি! একটা দিন পরে হলেও গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণীই তো সত্যি হলো।

আল্লাহ তুমি আমাকে শাস্তি দাও। আমি মাথা পেতে নেবো। এ জীবন আমি আর রাখতে চাই না। আমাকে মৃত্যু দাও। আমি মরতে চাই।

ছেলেটার বাবা বৃদ্ধ জহুরী আসবে সন্ধ্যাবেলা। কি করে তার সামনে দাঁড়াবো আমি। কি ভাষায় সান্ত্বনা দেব তাকে। না-না, আমি পারবো না। পুত্রশোকের সেই নিদারুণ দৃশ্য আমি নিজের চোখে কিছুতেই দেখতে পারবো না। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। গুপ্ত দরজা বন্ধ করে মাটি চাপা দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিলাম।

মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, এখন কি করা যায়। কোন জায়গায় লুকিয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করতে হবে। তা না হলে, ঐ নফরগুলো আমাকে দেখতে পেলেই খুন করে ফেলবে।

সেই গাছটায় উঠে গেলাম। একটা ডালে পাতার আড়াল করে বসে রইলাম। খন্টাখানেক বাদে সেই জাহাজটা এসে ভিড়লো। নেমে এলো সেই দশজন নফর আর সেই বৃদ্ধ জহুরী। হন হন করে এগিয়ে এলো আমার গাছের নিচে। গুপ্ত দরজার জায়গাটায় চোখ পড়তে ভয়ে শিউরে উঠলো তারা। একি, গর্তের মাটি তো মনে হচ্ছে সদ্য সরানো হয়েছিলো। তবে? তবে কি বাছা আমার বেঁচে নাই।

জহুরী চিৎকার করে ওঠে, তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছো? চটপট মাটি সরাও। দরজা খুলে নিচে যাও। নিয়ে এসো আমার জানের কলিজাকে।

নফরগুলো অনায়াসেই সদ্য বুজানো মাটিগুলো সরিয়ে ফেলে নিচে নেমে গেলো। গাছের উপরে বসে সব দেখতে লাগলাম আমি। ছেলের নাম ধরে তারস্বরে ডাকতে লাগলো বৃদ্ধ। কিন্তু কে উত্তর দেবে! সে তো বেঁচে নাই। আমার হাতের ছুরি তার বুকে বিদ্ধ হয়ে গেছে। সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে সে। সে-ঘুম আর কোনদিন ভাঙ্গবে না তার।

নফররা এসে বৃদ্ধকে নিচে নিয়ে গেলো। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তার যে কি অবস্থা আমি গাছের ডালে বসেই তা অনুমান করতে পারলাম। একটু পরে নফরগুলো ধরাধরি করে বৃদ্ধর অচৈতন্য দেহটা উপরে নিয়ে এসে গাছের তলায় শুইয়ে দিলো। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে জ্ঞান ফিরে এলো তার। ছোট শিশুর মতো চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলো। সে দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো, এখনি বুঝি নিচে পড়ে যাবো। এর পর নফরগুলো নিচে নেমে গিয়ে ছুরিবিদ্ধ কিশোরকে উপরে নিয়ে এলো। পাশেই একটা জায়গায় কবর খোঁড়া হলো। কবরের তলায় তার মৃতদেহটা শুইয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিলো তারা। তারপর পাতালপুরীর সামানপত্তর সব জাহাজে তুলে নিয়ে চলে গেলো।

আমি গাছ থেকে নিচে নামলাম। সেই ছোট্ট দ্বীপটার চারদিকে চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারদিকে অনন্ত জলরাশি। যত দূর চোখ যায়, তীরের সন্ধান নাই। অথচ তীরের সন্ধান চাই। কেঁদে কেঁদে দিন কাটে। গাছের ফল খাই, গাছের তলায় শুই। দেশে ফেরার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি এমন সময় একদিন দেখলাম সমুদ্র শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। অবাক কাণ্ড! এমনও আবার হয় নাকি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখলাম, জল সরে গিয়ে বালির চড়া পড়ে গেছে। যত দূর চাই শুধু ধূ ধূ করা বালি। হাঁটতে হাঁটতে দিন শেষ হয়ে এলো। দেখলাম, শক্ত মাটির আসল তীরে পৌঁছে গেছি আমি। কৃতজ্ঞতায় মাথা নত এলো তাঁর উদ্দেশে।

মাঠের পথ বেয়ে হেঁটে চলেছি। এমন সময় দেখলাম, দূরে এক লাল আগুনের শিখা। মনে আশা হলো, কাছেই কোনও লোকালয় আছে। হয়তো বা কেউ ভেড়া পোড়াচ্ছে। কিন্তু কাছে আসতে ভুল ভাঙ্গলো। অবাক হয়ে দেখলাম, এক বিরাট প্রাসাদ। আর গোটা প্রাসাদটাই পিতলের তৈরি। সূর্যাস্তের লাল আভা এসে পড়েছে পিতলের উপর। তাই মনে হচ্ছে, গনগনে আগুনের এক কুণ্ড জ্বলছে।

প্রাসাদের সামনে দাঁড়াতেই দশজন যুবক এসে দাঁড়ালো প্রাসাদের সিংহ দরজায়। তারা সবাই সুঠাম দেহী সুন্দর সুপুরুষ। কিন্তু সবারই বাঁচোখ কানা—ঠুলি পরা। তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো এক অশীতিপর বৃদ্ধ। জরা বার্ধক্যে গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কিন্তু দেখলে বোঝা যায়, যৌবনে এক রূপবান পুরুষ ছিলো সে। আটজন সঙ্গী নিয়ে এগিয়ে এলো বৃদ্ধ। শুধু দু'জন দাঁড়িয়ে রইলো আগের জায়গায়। সবাই আমাকে স্বাগত জানালো। আমিও সালাম জানালাম। তারপর আমার ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের এক নিষ্ঠুর কাহিনী সব খুলে বললাম তাদের কাছে। সে কাহিনী আপনারা সবাই এতক্ষণ শুনলেন, তাই আর পুনরুক্তি করবো না এখানে। আমার দুঃখের কাহিনী শুনে তারাও খুব দুঃখিত হলো। সাদরে প্রাসাদের অন্দরে নিয়ে চললো। বিরাট প্রাসাদ। মহলের পর মহল পার হয়ে চলেছি। কিন্তু শেষ আর হয় না। প্রাসাদ কক্ষগুলো আগাগোড়া সাজানো গোছানো ঝকঝকে তকতকে। শেষে প্রকাণ্ড দরবার কক্ষে এসে আমরা থামলাম। এইটিই সব চেয়ে বড় কক্ষ। এবং প্রাসাদের ঠিক মাঝখানে। কি সুন্দর করে সাজানো। দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। দশখানা বিরাট বিরাট পারস্যের মূল্যবান গালিচায় মোড়া দরবার কক্ষের চারপাশ। আর মাঝখানে সুন্দর সব কাজ করা আর একখানা আরও দামি গালিচা পাতা। বৃদ্ধ গিয়ে বসলো সেই গালিচায়। আর যুবকরা গিয়ে বসলো চারপাশের সোফায়। বৃদ্ধ করজোড়ে আমাকে বললো, মালিক, মেহেরবানী করে বসুন।

আমাকে একটা সব চেয়ে উঁচু আসন দেখিয়ে বসতে অনুরোধ জানালো সে। বললে, চুপ করে বসুন ওখানে। কোন কথা বলবেন না, আমরা আপনার জন্যে প্রার্থনা জানাবো তাঁর কাছে।

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইলো বৃদ্ধ। তারপর উঠে দাঁড়ালো। এদিক ওদিক পায়চারী করলো একটু। তারপর মাংস আর মদ এলো আমাদের জন্যে। অন্য দশজন এবং আমি মোট এগারোজন একসঙ্গে বসে খানাপিনা সারলাম। বৃদ্ধ নিজে হাতে করে আমাদের এঁটোকাটা পরিষ্কার করলো। তারপর আবার তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো। কিন্তু কোন কথা বললো না।

বেশ রুক্ষ মেজাজেই যুবকদের একজন বললো, প্রার্থনা জানাবার জন্যে আমাদের দরকারী সামানপত্তর না এনেই বসে পড়লে কেন?

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিলো না। উঠে অন্য ঘরে চলে গেলো। এক এক করে দশবারে সুদৃশ্য সাটিনের ঢাকনায় ঢাকা দশটা পাত্র এবং দশটা চিরাগ বাতি নিয়ে এসে ঐ যুবকদের প্রত্যেকের পাশে রাখলো। কিন্তু আমার জন্যে কিছুই আনলো না সে। যে যার সবাই পাত্রগুলো হাতে তুলে নিয়ে মুখের ঢাকনা খুলে ফেলতেই দেখলাম, উনুনের ছাই, চিরাগের কালি আর কাজলে ভরা সেই পাত্রগুলো। ওরা সবাই ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো, আমাদের পাপের ফল।

ছাইগুলো নিজের নিজের মাথায় ছড়িয়ে দিলো, মুখে মাখলো চিরাগের কালি, আর ডান চোখে পরলো সেই কাজল।

ভোরবেলা আবার সবাই ধুয়ে মুছে সাফ করলো সেই ছাই, কালি আর কাজল। পাট করা পোশাক পরলো। একেবারে ফিটফাট সাহেব আগের মতো।

ওদের এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। ব্যাপার স্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। কৌতূহল হলো। কিন্তু কোন কথা বলার উপায় নাই। আগেই বারণ করে দিয়েছে বৃদ্ধ—কোন কথা বলবে না, চুপ করে বসে থাকবে শুধু। কিন্তু এইরকম কৌতূহল কি

চেপে রাখা যায়। পর পর তিন রাত্রি কেটে গেলো। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগলো। আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। ওদের কাছে জানতে চাইলাম, আচ্ছা মালিক, এ সব কী ব্যাপার? কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি জানি, এসব কথা জানতে চাওয়া বারণ আছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত সব কাণ্ড—না জেনেই বা থাকি কি করে? আমার ভাগ্যে যা আছে হবে। তবু আমি আজ শুনবো। বলুন, কেন আপনাদের সবারই বাঁ চোখটা কানা? আর প্রতি রাত্রে কেনই বা আপনারা মাথায় মাখেন ছাই, মুখে মাখেন কালি, আর চোখে পরেন কাজল?

—এ কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? তোমার যে সর্বনাশ হবে। কেন জানতে চাইছো এসব।

আমি তখন বেপরোয়া। বললাম, তা হোক, তবু বলুন, আমি শুনতে চাই।

—কিন্তু সে কথা শুনলে তোমারও বাঁ চোখটা যাবে।

—তা যাক্, তবু বলুন, আমি শুনবো। সারা জীবন ধরে একটা অদম্য কৌতূহল জীবিত রাখার চেয়ে আমার বাঁচোখটা কানা হওয়াও ভালো। কৌতূহল যদি কুরে কুরে খায় আমাকে, তবে কি হবে আমার চোখ দিয়ে। আপনারা বলুন। আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক—আমি শুনবোই।

তখন সেই যুবকদের একজন বললো, আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের দোষে বাঁচোখ হারিয়েছি। তুমিও হারাবে তোমার নিজের দোষে। এ জন্যে পরে আমাদের দায়ী করো না। তোমার বাঁচোখ কানা হবার পর কিন্তু এখানে তোমার ঠাঁই হবে না। কারণ, মাত্র দশজনেরই জায়গা আছে এখানে, এগারোজনের জায়গা হবে না।

এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ একটা জ্যান্ত ভেড়া নিয়ে ঢুকলো ঘরে। কোন কথা বললো না, একখানা ছুরি দিয়ে জবাই করে মারলো ভেড়াটাকে। ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে আবার চলে গেলো।

যুবকদের একজন বললো, এই ভেড়ার চামড়ার মধ্যে তোমাকে ভরে, সেলাই করে এই প্রাসাদের ওপরে চূড়ায় রেখে আসা হবে। রুখ পাখী জানো? একটা আস্ত হাতীকে ঠোঁটে তুলে উড়ে যেতে পারে। সেই রুখ পাখী এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে। তার ধারণা, তুমি বুঝি বা সত্যিই একটা ভেড়া। তোমাকে ফলার বানিয়ে খাবে, এই তার ইচ্ছা। উড়তে উড়তে সে গিয়ে বসবে একটা বিরাট উঁচু পাহাড়ের মাথায়। মানুষের সাধ্য নাই, সেখানে ওঠে। তোমাকে সেলাই করে ভরার আগে একটু ছুরি দেবো সঙ্গে। তুমি সেই ছুরি দিয়ে সেলাই কেটে বেরিয়ে আসবে। ভয় নাই, রুখ পাখী কখনও মানুষ খায় না। তোমাকে দেখা মাত্র সে উড়ে পালিয়ে যাবে। তারপর তুমি চলতে থাকবে। চলতে চলতে একসময় দেখতে পাবে এক বিশাল প্রাসাদপুরী। এই প্রাসাদের প্রায় দশ গুণ বড় আর এর চেয়ে হাজার গুণ সুন্দর সাজানো গোছানো। ঝলমলে। বলতে গেলে সারা প্রাসাদটাই সোনার পাতে মোড়া। দেয়ালে দেয়ালে হীরে চুনী পান্না বসানো। দেখে তোমার তাক লেগে যাবে। এমনটা হয়তো তুমি রূপকথার গল্পেই পড়েছো। কিন্তু নিজের চোখে দেখোনি কখনও। এখানেই তোমার বাঁচোখ কানা হবে। আমরা সবাই যেভাবে বাঁচোখ হারিয়েছি, তুমিও ঠিক সেই ভাবেই হারাবে। প্রতি দিন রাত্রে আমরা তার কাছে এইভাবে প্রার্থনা জানিয়ে একটু আত্মতুষ্টি লাভ করি মাত্র। এই হলো মোটামুটি ব্যাপার। বিস্তারিত বিবরণ শোনাবার দরকার কী? আপনা থেকেই তো সব জানতে পারবে।

দেখলাম, তারা আমাকে ভেড়ার চামড়ার মধ্যে ভরবার তোড়জোড় করছে। আমার হাতে একটা ছুরি দিয়ে বললো, এটা তোমার সঙ্গে রাখো। সেলাই কেটে বেরুবার সময় দরকার হবে।

ছুরিটা নিলাম। ওরা আমাকে ভেড়ার চামড়ার খোলের মধ্যে পুরে সেলাই করলো। তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে রেখে এলো প্রাসাদের চূড়ায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখলাম ঈগলের মতো প্রকাণ্ড বড় একটা পাখী উড়ে এসে ছোঁ মেরে আমাকে তুলে নিয়ে গেলো মহাশূন্যে। ভয়ে হাত-পা হিম হয়ে গেলো আমার। যদি তার ঠোঁট থেকে খসে পড়ে যাই? যদি আমার ভার সে বইতে না পারে? কিন্তু না, আমাকে নিয়ে গিয়ে নামলো মানুষের দুর্লঙ্ঘ্য

আকাশ ছোঁয়া এক পর্বত শিখরে। চটপট ছুরিটা দিয়ে সেলাই কেটে লাফিয়ে বেরিয়ে আসলাম। তারপর পাখীটাকে ভয় দেখাবার জন্যে বিকট এক আওয়াজ তুলে চিৎকার দিলাম। নিমেষে উড়ে পালিয়ে গেলো সে। এবার ভালো করে দেখলাম, কি বিশাল তার আকার, কি ভয়ঙ্কর তার রূপ। দশটা হাতী জোড়া দিলে যা হয়, সেইরকম তার বপু। আর কুড়িটা উটপাখী পিঠে পিঠে উঠে দাঁড়ালে যতটা উঁচু দেখাতে পারে, ততটা সে উঁচু।

আর তিল মাত্র না দাঁড়িয়ে চলতে লাগলাম। কৌতূহল এমনই বস্তু তার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত সে হনন করে চলে। আমার আর ধৈর্য সয় না। দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকি। সেই প্রাসাদের সন্ধান চাই। দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছলাম সেই প্রাসাদের সামনে। ঐ দশজন যুবক প্রাসাদের অনেক গুণকীর্তন শুনিয়েছিলো আমাকে। তা থেকে মোটামুটি একটা ছবি এঁকে নিয়েছিলাম মনে মনে। কিন্তু চোখের সামনে যা প্রত্যক্ষ করলাম তা কল্পনাতীত। এমন সুরম্য প্রাসাদ আমি জীবনে দেখিনি কখনও। সিংহ দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। নিরানব্বইটা বিরাট বিরাট চন্দন কাঠের দরজা পেরিয়ে প্রাসাদের মাঝখানের প্রশস্ত কক্ষে এসে দাঁড়ালাম। যে দিকে তাকাই—হীরা চুনি পান্নার মেলা। দেওয়ালের গায়ে বসানো এই সব অমূল্য রত্নগুলো ঝকমক করছে। মনে হলো, দুনিয়ার সব মণিমাণিক্যই বুঝি এখানে এনে রাখা হয়েছে।

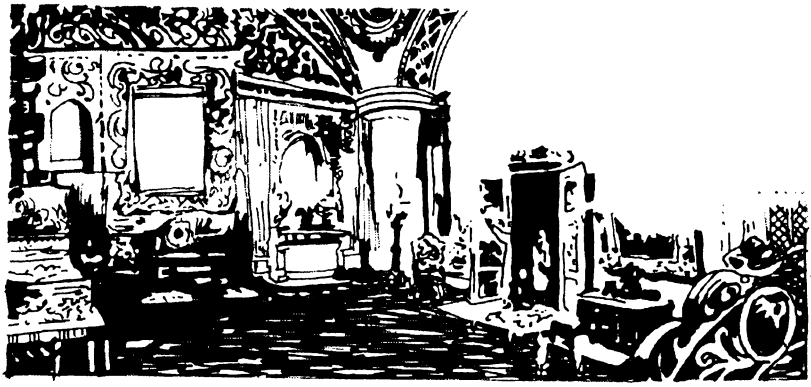

একটা ঘরে দেখলাম, বেহেস্তের পরীর মতো পরমাসুন্দরী চল্লিশটি যুবতী। আমার তেমন কোন ভাষা নাই—তাদের রূপের বর্ণনা দিতে পারি। এক কথায়, এমন নিখুঁত অনিন্দ্য সুন্দরী নারী সারা দুনিয়া ঢুঁড়েও একটা মিলবে না। আর কি আশ্চর্য, চল্লিশজনের প্রত্যেকেই একই রকম দেখতে। কারো সঙ্গে কারো এক ফোঁটা অমিল নাই। হুবহু সবাই এক ছাঁচে ঢালা পুতুলের মতো।

আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো তারা। মধুঝরা মিষ্টি গলায় স্বাগত জানালো। তুমি আমাদের আজ মেহমান। আমাদের কাছে মন প্রাণ খুলে দাও। আনন্দ করো। তুমি আমাদের ঘরের লোক আজ।

একটা উঁচু মঞ্চের উপরে নিয়ে গিয়ে বসালো আমাকে। আর ওরা বসলো নিচে—দামি কার্পেটের উপর। বললো, মালিক, আমরা তোমার দাসী। যা হুকুম করবে তাই করে ধন্য হবো আমরা। তুমি আমাদের প্রভু। মাথার মণি। তোমার আগমনে আমরা আনন্দে আত্মহারা। তুমি আমাদের ভাগ্যবিধাতা। তোমার সুখেই আমাদের সুখ। তোমার আনন্দেই আমাদের আনন্দ। তোমার ইচ্ছাতেই আমাদের ইচ্ছা। আমরা সবাই একান্তভাবে তোমারই।

একজন তোয়ালে আর গরম জল নিয়ে এলো। আর একজন আমার পা ধুইয়ে

দিলো। একজন খানিকটা সুগন্ধী আতর ঢেলে দিলো আমার গায়ে। আর একজন আমাকে পরিয়ে দিলো সিল্কের দামি পোশাক। সোনার তৈরি একটা বেল্ট দিয়ে এঁটে দিলো আমার পাতলুম। একজন এনে ধরলো এক পেয়ালা গুলাবী সরবৎ। কেউ আমার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো, কেউ মুচকি হেসে চোখের বান হানলো, কেউ ভ্রূ নাচিয়ে ইশারা করলো। কেউ বা শায়েরী আওড়াতে লাগলো। কেউ ধরলো গান। কেউ বা ঠেলাঠেলি করে সামনে এসে দাঁড়ালো। কারো মুখে 'বাঃ, কী সুন্দর'। কেউ বা বলে, 'কী মিষ্টি চেহারা রে'! তার জবাবে আর একজন বলে, 'চেটেপুটে খেয়ে নে'। সবাই মিলে হো হো করে হেসে ওঠে। একজন গেয়ে ওঠে, 'তুমি যে রূপের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে'—আর একজন হাত ধরে বলে, 'তুমি হবে মোর প্রিয়তম, আমি হবো তব দাসী।' একজন লাফিয়ে এসে পড়ে আমার কোলে। গলা জড়িয়ে ধরে বলে, না না না, তুমি আর কারো না। 'রূপটা তোমার খাসা। তুমি আমার—শুধু আমার ভালোবাসা।'

আমার চারপাশে মৌচাকের মতো ঘিরে বসলো মেয়েগুলো। কেউ আমাকে ঠেলা মেরে আদর করে। কেউ চিমটি কাটে। কেউ সুড়সুড়ি দেয়। চুল ধরে টানে কেউ। কেউ বা কোমর ধরে। সবাই মিলে আব্দার করে, তোমার জীবনের কাহিনী শোনাও, মালিক। আমরা এখানে বনবাসের মতো দিন কাটাই। কালেভদ্রে কোন পুরুষের সঙ্গ পাই। আজ তোমাকে পেয়েছি; অনেক দিন পরে। এবার আমরা খুশির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেবো। তুমি আমাদের ভালোবাসা দেবে, আদর করবে, সুখের সাগরে ডুবিয়ে দেবে।

আমি আমার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা সংক্ষেপে বললাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত।

সূর্য গেলো অস্তাচলে। আঁধার নেমে এলো। মেয়েরা অসংখ্য মোটা মোটা মোমবাতি এনে জ্বেলে দিলো। দিনের আলোর মতো ঝলমল করে উঠলো প্রাসাদ কক্ষ। চারপাশের দেয়ালের হীরা মণিমাণিক্যের ছটা এসে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

ফরাসের উপর নতুন চাদর পাতলো। তারপর এক এক করে খানা নিয়ে এসে সাজাতে লাগলো তারা। মুরগীর মাংস, দামী সরাব। ফল। মিষ্টি। তারপর আরম্ভ হলো নাচ গান বাজনা। একদল বাজাতে থাকলো। একদল ধরলো নাচের তালের গান। আর একদল নাচতে লাগলো মোহিনী রূপ ধরে। সে নাচে পুরুষের রক্ত নাচে। আগুন ধরে বুকে। আমি মদ আর মাংস খেতে খেতে দেখতে থাকলাম, তাদের এই অনিন্দ্যসুন্দর মনোরঞ্জন।

আমার খানাপিনা শেষ হলো। ওরাও গানবাজনা থামালো। একজন এগিয়ে এসে বললো, রাত হলো, এবার শোবে চলো, মালিক। আমাদের এই চল্লিশজনের মধ্যে যাকে খুশি তোমার বেছে নিয়ে যাও। আজকে রাতে সে হবে তোমার প্রিয়া—তোমার সাথী। সে তোমাকে সুখ দেবে, আনন্দ দেবে—ভালোবাসায় দেবে ভরিয়ে। তোমার যাকে পছন্দ বেছে নাও। আমাদের কারো মনে কোন হিংসা বা কোন ক্ষোভ থাকবে না। আমরা চল্লিশটি বোন পালা করে চল্লিশটি রাত কাটাবো তোমার সঙ্গে।

একথা শুনে আমার সব তালগোল পাকিয়ে গেলো। কাকে ছেড়ে কাকে নেবো? চোখ বুজে আন্দাজে খপ করে ধরলাম একজনকে। সবাই হো হো করে হেসে লুটিয়ে পড়লো। চোখ খুলে দেখি, আমার বাহুপাশে আবদ্ধ এক ষোড়শী। আমার হাত ধরে নিয়ে গেলো সে তার শয্যায়। সারা রাত ধরে সে আমাকে দুধের সায়রে ডুবিয়ে রাখলো। চল্লিশবার পান করালো তার অমৃত।

আমিও তাকে খাওয়ালাম আমার মধু—চল্লিশবার। সেও খেলো লেহন করে করে—প্রাণ ভরে।

এইভাবে চল্লিশটা সুখের রাত্রি কাটালাম আমি। চল্লিশটি বোন এক এক করে চল্লিশটি রাত্রে আমার প্রিয়া আমার সাকী হয়ে দুধের সায়রে ডুবিয়ে তাদের অমৃত পান করালো আমাকে। আমিও তাদের প্রাণ ভরে খাওয়ালাম আমার মধু। প্রতিটি রাত্রিবাসের পর আমার প্রিয়া আমার সাকী নিয়ে যেতো আমাকে হামামে। ঘসে মেজে সাফ করে স্নান করাতো আমাকে। নতুন পোশাক পরাতো। আতর মাখাতো গায়ে।

এমনিভাবে চল্লিশটা দিন-রাত্রি কেটে গেলো। মেয়েগুলো সবাই এলো আমার শয্যা পাশে। কেঁদে আকুল হলো। মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো। তাদের সেই আকুলিবিকুলি কান্নার মধ্যে একটা কথা শুনতে পেলাম।—তুমি ছিলে আমাদের চোখের মণি, আজ তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। এর আগে যারা এসেছিলো, তাদেরও একদিন বিদায় দিতে হয়েছে। তারা সকলেই আমাদের সুখ আনন্দ আর ভালোবাসা দিয়েছিলো। কিন্তু মালিক তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। সিংহের মতো তোমার ঐ পৌরুষ আর কোন পুরুষের দেহে দেখিনি আমরা। আমাদের জীবনে যত পুরুষ এসেছে—তুমিই সবার সেরা। তোমার দুরন্ত যৌবনের অসভ্য দুষ্টুমি পাগল করে দিয়েছে—মাতাল করে দিয়েছে আমাদের। আবার তোমার শান্ত সৌম্য ব্যবহারেও মুগ্ধ হয়ে গেছি আমরা। তবুও আজ তোমাকে ছেড়ে চল্লে যেতে হবে আমাদের। আমরা চল্লিশ বোন, জনমানব বর্জিত এই প্রাসাদপুরীতে সারাটা বছর নিঃসঙ্গ যৌবন যন্ত্রণায় দিন কাটাই। খোদা মেহেরবান, বৎসরান্তে মাত্র চল্লিশ দিনের জন্য তিনি একজন পুরুষ পাঠিয়ে দেন এখানে। সারা বছরে আমরা প্রত্যেকে একটিমাত্র রাতে পৌরুষের স্পর্শ পাই।

আমি জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আমাকে ছাড়বেই বা কেন তোমরা? কেন বিদায় দেবে আমাকে?

একজন জবাব দেয়।—আমরা একই বাবার চল্লিশ বোন। কিন্তু আমাদের সকলের মা আলাদা। আমাদের বাবা এখানকার শাহেনশাহ। সারা বছর ধরে আমরা এই প্রাসাদে বাস করি। তারপর বছরের চল্লিশ দিন বাকী থাকতে আল্লাহ একজন পুরুষ পাঠিয়ে দেন আমাদের যৌবন রক্ষার জন্য। এই চল্লিশ দিন পরে বছরের শেষে আমরা বাবা-মাকে দেখতে চলে যাই। আজ সেই দিন—বছরের প্রথম দিন। আজ আমাদের চলে যেতে হবে তোমাকে ছেড়ে। কিন্তু প্রিয়তম মন চায় না। তোমার গভীর প্রেমে মজে গেছি আমরা। ফি বছর একজন পুরুষ আসে। কিন্তু তোমার মতো এমন রূপ এমন উন্মত্ত যৌবন কারো দেখিনি। তাই তোমাকে ভালো লেগেছে খুব। তোমাকে ছেড়ে যেতে যে কি কষ্ট তা বোঝাবো কি করে? কিন্তু কী উপায় বলো, যেতেই যে হবে!

—কিন্তু সোনারা, আমি তো তোমাদের ছেড়ে এখান থেকে যাবো না কোথাও। বেশ তো, তোমরা যাও, তোমাদের মা বাবাকে দেখে এসো। আমি এখানে অপেক্ষা করবো।

মেয়েগুলো নেচে উঠলো।—সত্যি? সত্যি থাকবে তুমি? তা হলে এই নাও, চাবির গোছা। প্রত্যেকটি দরজার চাবি আছে এতে। তোমার নিজের ঘর মনে করে থাকবে এখানে। আজ থেকে এই প্রাসাদের মালিক তুমি। কিন্তু সাবধান, বাগিচার ওপাশে যে তামার দরজা আছে, ওটা কিন্তু ভুলেও খুলো না। তা হলেই সর্বনাশ হবে। যদি খোলো জীবনে আর তোমার সঙ্গে আমাদের মোলাকাৎ হবে না কখনও।

এক এক করে সবাই চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমার কাছে বিদায় নিলো। তাদের সেই করুণ বেদনার্ত চোখের চাহনি আজও আমি ভুলতে পারিনি, মালকিন।

তারা চলে গেলো। আমি একা পড়ে রইলাম সেই বিশাল শূন্য-প্রাসাদ কক্ষে। হাতে

আমার এক গোছা চাবি। ওরা দিয়ে গেছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। ক'দিন কি অপরূপ হাসি আনন্দ গানে উচ্ছ্বাস উচ্ছলতায় কেটে গেলো বেশ। কিন্তু আজ সেই প্রাসাদপুরী শূন্যতার হাহাকারে ভরা। এমন নীরব নিস্তব্ধতা মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয়। চারদিক ঘুরে দেখতে লাগলাম। যেদিকে তাকাই কি অপরূপ কারুকর্ম। নিপুণ শিল্পীর নিখুঁত শিল্প নিদর্শন ছড়িয়ে আছে এর সর্বাঙ্গে। মেয়েগুলোকে নিয়ে মশগুল ছিলাম এ ক'দিন, তাই এসব দেখার সময় হয়ে ওঠেনি। আজ চোখ সার্থক হলো। তাদের রূপের জৌলুষে চোখ আমার ধাঁধিয়ে ছিলো। তাই এই শিল্পরূপ আমার চোখে পড়েনি।

প্রথম চাবিটা দিয়ে প্রথম দরজাটা খুললাম। এক সুন্দর ফলের বাগান। এমন নানা জাতের ফলের গাছ একটা বাগানে আগে কখনও দেখিনি। আপেল, আঙ্গুর, কমলালেবু, শশা, কলা, পেয়ারা আরও কত নাম নানা জানা মিষ্টি মধুর ফল। প্রাণ ভরে পেটপুরে খেলাম। এর পর দ্বিতীয় দরজা খুললাম।

ফুলের সৌরভে ভরে গেলো দেহমন। এমন ফুলের মেলা কেউ কি দেখেছে কখনও? আমি তো দেখিনি। হয়তো বা নবাব বাদশাহদের বাগিচায় থাকতে পারে। যুঁই, বেল, মালতী, রজনীগন্ধা, গোলাপ, হাসনুহানা, টগর, মল্লিকা, সূর্যমুখী, ক্রিসেমথিমাম, পারিজাত আরও অসংখ্য। সব নাম ক'জনেই বা জানে। এমন এক স্বপ্নের দেশে, এমন এক কল্পনার কল্পলোকে এসে প্রাণ আমার নেচে ওঠে।

আর একটা চাবি দিয়ে তৃতীয় দরজা খুললাম। নানা জাতের নানা রঙের হাজার হাজার পাখীর কলকাকলীতে মুখরিত হচ্ছে সারা বাগিচা। মনে হলো, দুনিয়ার সব রকম পাখীই বোধহয় জোগাড় করে রাখা হয়েছে সেখানে। সারাদিন ধরে পাখীদের সঙ্গে খেলা করলাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি।

পরদিন চতুর্থ দরজা খুলতেই দেখি, বিশাল এক প্রাঙ্গণ। তারপর চার পাশে চল্লিশটা বড় বড় কক্ষ চন্দনকাঠের বিরাট বিরাট দরজা। দরজাগুলো সব খোলা। একটা ঘরে ঢুকেই আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। সারা ঘরের মেজেয় ঢালা আছে কয়েকশো মণ মুক্তা। এতো বড় বড় মুক্তো কখনও দেখিনি আমি। পায়রার ডিমের মতো প্রায়। মুক্তোর আলোর ছটায় সারা ঘরটায় পূর্ণচাঁদের হাট। পাশের ঘরে এলাম। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত হীরা আর রুবীতে ঠাসা। তৃতীয় ঘরে থরে থরে সাজানো ছিলো চুনী, পান্না, তার পাশের ঘর সোনার তাল-এ ভরা। পরের ঘরটায় সোনার মোহরের পাহাড়। এতো মোহর এলো কোথা থেকে। যতই দেখতে থাকি অবাক হই। তার পাশের ঘর রূপোর বাটে ভর্তি। পরের ঘরে শুধু রূপোর মুদ্রা।

পর পর ঘরগুলো সবই দেখলাম মহামূল্যবান ধনরত্ন মণিমাণিক্যে ঠাসা। দেখলাম আর অবাক বিস্ময়ে ভাবলাম, এতো সম্পদ আমার গোটা সলতানিয়ৎ-এ নাই।

আমার কোন কাজ নাই, প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটার পর একটা চাবি দিয়ে দরজা খুলতে থাকি। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দিন কাটে। কী অপার ঐশ্বর্য, কী বিচিত্র সংগ্রহ। তারিফ না করে পারা যায় না।

এইভাবে ঊনচল্লিশ দিন পার হয়ে গেলো। একটি ছাড়া সবগুলো দরজাই খুলে দেখেছি। এবার মাত্র একটি চাবিই বাকী আছে। কিন্তু মেয়েগুলো আমাকে দিব্বি দিয়ে বারণ করে গেছে এই চাবিটা দিয়ে যেন আমি না খুলি সেই তামার দরজা। কিন্তু মন আমার ভীষণ কৌতূহলী। অজানাকে জানার ইচ্ছে আমার জন্মাবধি। না দেখাকে দেখার আগ্রহ আমার শিরায় শিরায়। কিন্তু মেয়েগুলোর সেই করুণ মিনতি, সেই জলভরা চোখ আমার চোখের সামনে

ভেসে ওঠে। ওরা বলেছিলো, খুলো না, কোন কারণেই খুলো না সেই সর্বনাশা তামার দরজা। আর যদি না শোনো আমাদের কথা, যদি খোল, চিরদিনের মতো তোমার সঙ্গে আমাদের আর মোলাকাৎ হবে না। তোমাকে আমরা হারাতে চাই না, সোনা। তুমি শুধু এই কথাটা আমাদের রেখো। খুলো না—খুলো না, কিছুতেই যেও না ওই দরজার কাছে।

চাবিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি আর ভাবি। কী সুন্দর পরীর মতো মেয়েগুলো। কী রূপ আর কী উচ্ছল উদ্দাম যৌবন। তাদের মধুর ব্যবহার, তাদের নাচ, তাদের গান, তাদের আদরযত্ন, তাদের দেহ আমাকে চল্লিশটা দিন স্বর্গসুখ দিয়েছিলো। প্রতিটি দিনের স্মৃতি প্রখর স্পষ্ট হয়ে রয়েছে প্রদীপশিখার মতো আমার হৃদয়ে। ভুলবো না, কখনও ভুলবো না এই পরম পাওয়ার চল্লিশটা দিন-রজনী। আর ভুলতে পারবো না সেই মেয়েগুলোকে—যারা আমাকে ভরে দিয়েছিলো—হাসি আর গানে। যৌবনের পূর্ণ সুধাপাত্র আকণ্ঠ পান করিয়েছিলো যে সব যৌবন মদেমত্তা পরম রমণীয় নারী,—কেমন করে ভুলবো তাদের? কিন্তু কৌতূহল এমনই এক বস্তু তার নিবৃত্তি না হলে সব তুচ্ছ মনে হয়। জানি আমার সর্বনাশ হবে, জানি এই স্বর্গসুখ, এই নারী সংসর্গ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিতে হবে। তবু কৌতূহল দমন করা গেলো না। তামার দরজাটা খুলে ফেললাম। শয়তান যখন পিছনে লাগে তার আর নিস্তার নাই।

দরজাটা খুললাম বটে—কিন্তু কিছুই দেখলাম না। একেবারে শূন্য ঘর। শুধু কেমন একটা গন্ধ ভেসে আসতে লাগলো। গন্ধটা ক্রমশ উগ্রতর হতে লাগলো। আমার শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করতে থাকে। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠলো। তারপর আর মনে নাই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরে এলো। উঠে বসলাম। গন্ধটা বেশ হালকা হয়ে এসেছে। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটা দেখার জন্য পা বাড়ালাম। ওপাশে আর একটা দরজা। আর একটা ঘর। প্রকাণ্ড বড়। জাফরানে রং করা দেওয়াল। মোমবাতির মিষ্টি আলোয় এক মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। আতরের খুশবুতে ভরে গেছে সারা ঘর। ঘরের চারপাশে চারটে সোনার তৈরি চিরাগবাতি জ্বলছিলো। সেই পোড়া তেলের অপূর্ব এক মিষ্টি গন্ধও ছড়িয়ে পড়েছিলো ঘরময়। ঘরের এক পাশে একটা কালো ঘোড়া চোখে পড়লো। জবরদস্ত তাগড়াই। তার কপালে একটা সাদা তারার ছাপ। পিছনের দিকের বাঁ পা আর সামনের দিকের ডান পায়ে সাদা মোজা পরানো। তার পিঠের জীন সোনার তৈরি। নিপুণ স্বর্ণকারের সূক্ষ্ম কারুকর্ম করা। যবের আটা আর বার্লির জাবনা তার সামনে। আর একটা বারকোষে খানিকটা জল।

ঘোড়াটা দেখে আমার ভীষণ লোভ হয়। ছোট বেলা থেকেই দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার হিসাবে সারা দেশে নাম ছিলো আমার। বাঘা বাঘা জাঁদরেল ঘোড়সওয়ারকে পাল্লায় হারিয়ে দিয়েছি এক সময়। পিঠে চড়ে ঘরের বাইরে বাগানের মাঝখানে নিয়ে এলাম ঘোড়াটাকে। আর নড়তে চায় না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। একেবারে বেয়াড়া বেহুদা জানোয়ার। সপাং সপাং করে ঘা কতক লাগাতেই চিঁ-হি-হি করে লাফিয়ে উঠলো। আর কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে দু'খানা পেল্লাই পাখা ছড়িয়ে পড়লো, দু-পাশে এমনভাবে গোটানো ছিলো যে, চোখেই পড়েনি এতক্ষণ। এর পর অদ্ভুত ধরনের এক আওয়াজ তুলে শোঁ শোঁ করে আকাশের দিকে যেতে লাগলো। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘর-বাড়ি মানুষজন সব ছোট হতে হতে আরও ছোট হয়ে আসতে লাগলো আমার চোখে। অনেক উপরে উঠে গেছি

তখন। একেবারে মেঘের কাছাকাছি। এবার ঘোড়াটা বাজপাখীর মতো তীর বেগে ছুটে চললো শক্ত করে লাগামটা ধরে বসে রইলাম। ভয় আমি পাইনি। বরং এক অপূর্ব শিহরণ বোধ করছিলাম সারা দেহে।

আকাশ পথে দেশদেশান্তর পেরিয়ে উড়ে চললো সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া। তারপর এক সময় দেখলাম সেই তাম্র-প্রাসাদের ছাদে গিয়ে নামলো সে। এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারপর প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে গাঝাড়া দিয়ে আমাকে ফেলে দিলো নিচে—ছাদের উপর। আমি সামলে ওঠার আগেই ছুটে এসে তার একখানা পাখার ঝাপ্‌টা মারলো আমার এই বাঁ চোখে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে পড়ে গেলাম আমি। আর তক্ষুণি শোঁ শোঁ করে মহাশূন্যে উঠে গিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেলো সে।

এক হাতে বাঁ-চোখটা চেপে ধরে প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। সেই দশজন বাঁ-চোখ কানা যুবক বেরিয়ে এলো।

—অতো পইপই করে বারণ করেছিলাম সেদিন, কিন্তু আমাদের কথা গ্রাহ্য করলে না। এখন ঠেলা বুঝলে? তোমাকে আগেই বলেছিলাম দশজনের বেশী জায়গা নেই এখানে। আর দশজন আমরা হয়েই গেছি। তোমার জায়গা হবে না। এখন নিজের পথ নিজে দেখো। তবে তোমাকে একটা পথের নিশানা বলে দিতে পারি। সেই পথ ধরে যদি যাও তবে দিন কয়েক পরে বাগদাদ শহরে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। সেখানকার খলিফা হারুন-অল্-রসিদ পরম দয়ালু। তার কাছে গেলে তোমার আশ্রয় মিলতে পারে, তার দান ধ্যানের খ্যাতি জগৎ-জোড়া। তিনিই তোমার ভাগ্যবিধাতা।

দাড়ি গোঁফ কামিয়ে এক কালান্দার ফকিরের বেশে পথে নেমে পড়লাম। কেউ চিনবে না, কেউ জানবে না আমি বাদশাহ কাসিবের পুত্র। দিনের পর দিন হেঁটে হেঁটে আজ সন্ধ্যায় এই বাগদাদ শহরে পৌঁছেছি। কোথায় যাবো, কোথায় পাবো একটা আস্তানা—আজকের রাতের মতো, সেই ভাবনা ভাবতে ভাবতে একটা রাস্তার চৌমাথায় এসে দাঁড়ালাম। সেখানে দেখি আমারই মতো আরও দু'জন কালান্দার। তাদেরও দাড়ি গোঁফ কামানো। আমার মতো তাদের দু'জনেরও বাঁ চোখে ঠুলি পরা। কানা। ওরাও শহরে নবাগত। রাতের আশ্রয় খুঁজছে। তিনজনের একই সমস্যা। এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম আস্তানার সন্ধানে। রাতের মতো একটু আশ্রয় পেয়ে যাবো এই আশায় তোমাদের দরজায় কড়া নাড়লাম।

এই হলো আমার হতভাগ্য জীবনের করুণ কাহিনী। এই হলো আমার বাঁচোখ হারানো আর গোঁফদাড়ি কামানোর ইতিবৃত্ত।

সেই সুন্দরী তিন বোন তৃতীয় কালান্দারের কাহিনী শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হতবাক। বড়বোন বললো, খুব খুশি হয়েছি তোমার কাহিনী শুনে। যাও এক্কেবারে ছুটি।

—কিন্তু মালকিন, এখানে আর যাঁরা আছেন তাদের কাহিনী শুনবো না?

ছোটবোন তখন খলিফা জাফর আর মসরুর-এর দিকে চেয়ে বললো, এবার আপনাদের কাহিনী শোনান।

জাফর বললো, আমাদের যা কাহিনী তা তো দরজায় ঢোকার মুখেই তোমাকে বলেছি, মা। এর বেশী বলার মতো কোনও ঘটনা আমাদের জীবনে নাই।

বড়বোন বললো, ঠিক আছে, সবাইকে আমি মুক্তি দিলাম। যে যেখানে যেতে চাও যেতে পারো।

খলিফা ফিরে এসে ঘুমুতে গেলো। কিন্তু ঘুম আর আসে না। বাকী রাতটা পায়চারী

করে কাটায় ঘরময়। সকাল হতে দরবারে গিয়ে বসে। জাফরকে বলে, সেই তিনটি মেয়েকে আর তাদের ঐ মাদী কুকুর দু'টো আর ঐ তিন কালান্দারকে হাজির করো এখানে—এখুনি।

একটু বাদেই তাদের হাজির করা হলো দরবারে। আমির ওমরাহ পারিষদে গম্ গম্ করছে দরবার। তখন উজির জাফর বলতে লাগলো, কাল রাতে আমরা তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। তখন অবশ্য তোমরা জানতে না আমাদের পরিচয়। তবু বলবো, কোন খারাপ ব্যবহার করোনি আমাদের সঙ্গে। এখন শোনো, তোমরা পঞ্চম আব্বাস খলিফা হারুন-অল-রসিদের দরবারে এসেছো। যা বলবে সত্য বলবে, কোন মিথ্যা বলবে না। এখন বলো, কী তোমাদের কাহিনী, আর এই রহস্যজনক মাদী কুকুর দু'টারই বা ইতিবৃত্ত কী?

জাফরের এই কথা শুনে বড়বোন এগিয়ে এসে খলিফাকে কুর্নিশ জানালো। বললো, আপনি মহানুভব মেহেরবান শাহেনশাহ। আপনি আল্লাহর পয়গম্বর। আপনার কাছে কোন মিথ্যা বলবো না। কিন্তু আমার কাহিনী এতোই অদ্ভুত, শুনে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন হুজুর। এক বর্ণও মিথ্যা বানিয়ে বলবো না কিছু।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন রাত্রে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ। শুনুন শাহজাদা, সেই সুন্দরী তিন বোনের বড় জন তখন দরবার কক্ষে খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে তার জীবনের কাহিনী বলতে লাগলো ঃ

জাঁহাপনা, আমার নাম জুবেদাহ, আমার ছোট যে, অর্থাৎ মেজো, তার নাম আমিনাহ আর সবার ছোটর নাম ফহিমাহ। আমাদের তিন বোনের বাবা এক কিন্তু মা আলাদা। আমার বাবার তিন বিবি। প্রথম বিবি আমার মা। তার আরও দুই মেয়ে ছিলো আমার সহোদরা। তারা দু'জনই আমার চেয়ে বড়ো। কিন্তু আমার দুই বিমাতার এই দুই কন্যা—আমিনা আর ফহিমার চেয়ে আমি বয়সে কিছু বড়।

আমার বাবা মারা যাবার সময় পাঁচ হাজার দিনার রেখে গিয়েছিলো আমাদের জন্য। ফহিমা আর আমিনা চলে গেলো তাদের মায়ের কাছে। আমি আর আমার দুই বড়বোন একত্রে রয়ে গেলাম।

কিছুদিনের মধ্যে আমার বড় দুই বোন শাদী করলো। দিদিদের পয়সাকড়ি যা ছিলো তাই দিয়ে সওদাগরী ব্যবসা করবে। আমার দুই ভগ্নিপতি একদিন সমুদ্র-যাত্রা করলো। দিদিরাও তাদের সঙ্গে চলে গেলো।

চার বছর কেটে গেলো। একদিন দীন ভিখারীর বেশে ফিরে এলো তারা। তাদের শতছিন্ন নোংরা ময়লা জামাকাপড় দেখে প্রথমে আমি চিনতেই পারিনি। শীর্ণকায় দেহ। রুক্ষ এলোমেলো চুল। কালিবর্ণ গায়ের রং। গর্তের মধ্যে বসে গেছে চোখ। তুবড়ে গেছে গাল। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে গেছে। দুঃখে কষ্টে অনাহারে অনিদ্রায় হারিয়ে গেছে রূপের জৌলুষ। হাড় জিরজিরে কঙ্কাল-সার দু'টি রূপ যৌবন খোয়ানো মেয়েছেলেকে দেখে কি করে বিশ্বাস করি এরাই আমার সেই পরমা সুন্দরী রূপবতী দুই দিদি। পরিচয় দিতে তবে বুঝলাম।

রাতারাতি বড়লোক হবার বাসনায় সওদাগর হয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে সব খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়। সওদা সামান, পয়সাকড়ি সব ডাকাতরা লুঠ করে নিয়েছিলো। তারপর একদিন এক অচেনা শহরে তাদের দু-বোনকে অচেনা লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়ে যায় তারা। অনেক দুঃখে কষ্টে এতোদিনে দেশে ফিরে আসতে পেরেছে। দিনের পর দিন শুধু নদীর জল খেয়ে আর গাছতলায় শুয়ে কাটাতে হয়েছে। দু-বছরের মধ্যে গোসল করতে পারেনি তারা। পরনের একখানা মাত্র বস্ত্র সম্বল। তাও শতছিন্ন ময়লা।

তাদের দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে চোখে জল আসে আমার। সান্ত্বনা দিয়ে বলি, যা হয়েছে তা নিয়ে আর দুঃখ করো না দিদি। আল্লাহর বোধহয় এইরকমই ইচ্ছে ছিলো। তার বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না।

নতুন জামাকাপড় দিলাম। ভালো করে ঘসেমেজে সাফ করে গোসল করলো তারা। এক সঙ্গে বসে খানাপিনা করলাম। নতুন করে জীবন গড়ার অনেক কথাই হলো। বললাম, তোমরা আমার বড়বোন। বাবা মার অবর্তমানে বলতে গেলে তোমরাই আমার একমাত্র আপনজন, অভিভাবক। আল্লাহর দোয়ায় আমি যা পেয়েছিলাম, এই ক'বছরে তা বেড়ে অনেক হয়েছে। সেই লাভের টাকাটা নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য করে রুজি রোজগারের ধান্দা করো। দেখো সুখে স্বচ্ছন্দে দিব্যি চলে যাবে আমাদের।

আমার কাছেই তারা রইলো বছরখানেক। একদিন দুই বোন এসে আমাকে বললো, দেখ ছোট, বিয়েই মেয়েদের কাছে সব চেয়ে বড়। আমরা ভেবেছি আবার শাদী করবো।

শঙ্কিত হয়ে বললাম, দেখ দিদি একবার শাদী করেও তোমাদের শিক্ষা হয়নি। কী মধু পেয়েছ শাদী করে? আজকাল দুনিয়ায় সাচ্চা মানুষ ক'টা খুঁজে পাবে? ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।

কিন্তু ওরা আমার কথায় কান দিলো না। আমাকে গোপন করেই শাদীর পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেললো ভিতরে ভিতরে। অবশ্য সবই আমি জানতে পারলাম পরে। আমার মত না থাকলেও নিজেই সব ব্যবস্থা-পত্র করে শাদী দিয়ে দিলাম দু'জনের। আমার সাধ্যমত পয়সাকড়ি দান সামগ্রী সবই দিলাম। তাদের এই নতুন স্বামীরাও কিন্তু আবার সেই একই ভাবে বিদেশে রওনা হয়ে গেলো বাণিজ্য করতে। আমার দিদিদেরও নিয়ে গেলো সঙ্গে।

আবার সেই কাণ্ড। এবার আর বেশি দিন দেরি হলো না। কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে এলো তারা সব খুইয়ে, একেবারে কপর্দক শূন্য ভিখিরি হয়ে। তাদের স্বামীরা দু'জনেই ঠগ প্রবঞ্চক। এক অজানা বন্দরে ভুলিয়ে ভালিয়ে নামিয়ে দিয়ে জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। ওরা এসে বললো, দেখ ছোট আমাদের বকাবকি করিসনে। ভুল আমরা করেছি ঠিকই। কিন্তু হাজার হলেও তোর বড়বোন তো আমরা। তোর না হয় বুদ্ধিসুদ্ধি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তা বলে কি আমাদের ফেলে দিবি? এবারকার মতো ক্ষমাঘেন্না করে নে বোন। কথা দিচ্ছি এ পোড়ার মুখে আর কখনও বিয়ে শাদীর নাম উচ্চারণ করবো না।

আমি তাদের আদর আপ্যায়ন করে বসালাম। বললাম, তা ভুল মানুষেরই হয়। ভুলের জন্য অনুতাপ হলেই যথেষ্ট। কী আছে, আবার নতুন করে শুরু করো জীবন।

বছরখানেক কেটে গেছে। আমরা তিন বোন একসঙ্গে থাকি। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, বাণিজ্যে যাবো। সব ব্যবস্থা পাকা করে দুই দিদিকে বললাম, আমি বিদেশে বাণিজ্যে যাবো ঠিক করেছি। তোমরা যদি সঙ্গে যেতে চাও চলো। না হলে বাড়িতেই থাকো।

তারা বললো, তারাও যাবে আমার সঙ্গে। সুতরাং ওদের দু'জনকে সঙ্গে করে একদিন সমুদ্রযাত্রা করলাম। সব টাকাটা আমি সঙ্গে নিলাম না। অর্ধেকটা লুকিয়ে রেখে গেলাম বাড়িতে। বাকী অর্ধেক নিলাম সঙ্গে কি জানি, বিদেশে বিভুঁই। যদি খোয়া যায়। তবে খালি হাতে দেশে ফিরে পথে না বসি।

দিনের পর দিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছি। কিন্তু কূলের হদিশ পাওয়া গেলো না। চিন্তিত হলাম আমি। কাপ্তেন বললো, আমাদের বরাত খারাপ। পথ হারিয়ে ফেলেছি। এক অচেনা সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। জানি না কি হবে। এখানকার জল বড় বেয়াড়া। এমন এলোপাথাড়ি মারাত্মক ঢেউ আমাদের সমুদ্রে কখনও হয় না।

যাই হোক, জাহাজের গতি ঘুরিয়ে নিয়ে দিন দশেক বাদে একটা বন্দর পাওয়া

গেলো। কাপ্তেন বললো, এ বন্দর তার অচেনা। এর আগে কখনও সে আসেনি এখানে। এই সমুদ্রের নামও তার অজানা। তবে এটুকু বোঝা যায়, বিপদ অনেকটা কেটে গেছে। একেবারে অকূল পাথারে পড়ে প্রাণ হারাতে হবে না। এখন শহরটা ঘুরে দেখতে হবে। সওদাপত্র কিছু হয় কি না। আমি বললাম, জাহাজ নোঙর করো, দেখা যাক, কিছু বাণিজ্য করা যায় কিনা।

ঘণ্টাখানেক বাদে বন্দরে পৌঁছনো গেলো। কাপ্তেন জানালো, বন্দরের নাম ডিসেম্বার্ক। আল্লাহর নাম করে শহরে ঢুকে পড়ো। দেখ কি হয়।

শহরে গিয়ে ঢুকলাম আমরা। কিন্তু কি অবাক কাণ্ড, যেদিকে তাকাই সমস্ত ঘরবাড়িগুলো দেখলাম কালো পাথরের তৈরি। পথেঘাটে কোন জনপ্রাণী নাই। কিন্তু দোকান-পাট সব সাজানো গোছানো, ঝক্‌ঝকে তকতকে। দামি দামি সোনা রূপার তৈরি সামানপত্রে ঠাসা। কী ব্যাপার, কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না।

রাস্তার চৌমাথায় এসে আমরা চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। সবারই উদ্দেশ্য, দামি দামি সোনারূপার গহনা আর বাহারী সাজপোশাক সংগ্রহ করা।

আমি চললাম প্রাসাদের দিকে। কিছু দূর যেতেই চোখে পড়লো, বিশাল এক প্রাসাদ। তার সিংহ দরজাটা পুরো সোনার তৈরি। ভিতরে ঢুকে প্রাসাদের প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেটাও সোনার। মখমলের পর্দা ঝুলছে। পর্দা উঠিয়ে ভিতরে ঢুকতেই চোখ ছানাবড়া। বিরাট এক দরবার মহল। হীরা মণি মাণিক্যখচিত সিংহাসনে বাদশাহ বসে আছেন। তার দুই পাশে উজির আমীর ওমরাহ, গণ্যমান্য ব্যক্তি। কেউবা সোনা কেউ বা রূপার চেয়ারে আসীন। দরবার কক্ষের চারপাশে সশস্ত্র সিপাহী মোতায়েন। কিন্তু সবাই অনড় অচল নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কার অভিশাপে? কিছুই অনুমান করতে পারলাম না।

দরবার ছাড়িয়ে ভিতরে ঢুকলাম। হারেম। আরও সুন্দর আরও মনোহর। দরজা জানালা, খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল যাবতীয় আসবাবপত্র সব সোনার তৈরি। সূক্ষ্ম কারুকার্য করা সিল্ক আর মখমলের পর্দায় ঢাকা জানালা দরজাগুলো। হারেমের মাঝখানে এক দঙ্গল বেগম, পরিচারিকা, দাসী, খোজা। যে যেমনভাবে ছিলো, পাথর হয়ে গেছে। মূল্যবান হীরা মণিমুক্তার রত্নাভরণে সজ্জিতা এক যুবতীকে দেখে বুঝলাম, হারেমের সে প্রধান বেগম। নিশ্চল নিথর পাথরের মূর্তি হয়ে পালঙ্কে অর্ধশায়িতা।

আরও একটু এগিয়ে একটা রূপার দরজা খুলে আরও অবাক হই। একটা বিরাট চবুতরা। সাতটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। শ্বেত পাথরে তৈরি এই মঞ্চটা আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। কার্পেটখানা সোনার জড়ি দিয়ে তৈরি। একপাশে মখমলের গদি বিছানো এক বিরাট ফরাশ। অন্য দিকে একখানা বাদশাহী শয্যা। সারা মঞ্চটা আলো ঝলমল করছিলো, এতো আলোর উৎস কিন্তু একটা বিরাট হীরা। একটা ছোট্ট মেহগনি কাঠের টুলের ওপরে রাখা ছিলো রাজহাঁসের ডিমের মতো সেই হীরাটা, তার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা চবুতরায়।

সারা মঞ্চটা নিপুণভাবে সাজানো গোছানো। মনে হয়, কোন জীবন্ত মানুষের হাতের ছোঁয়া আছে সর্বত্র। তা না হলে এমন ঝকঝকে তকতকে থাকতো না সব। হয়তো আশেপাশে কোথাও আছে কেউ। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান করতে লাগলাম। কিন্তু না, অনেকগুলো মহল ঘুরলাম—কোথায়ও কোন জীবন্ত মানুষ দেখলাম না। যাদের দেখলাম সবই পাথরের।

এটুকু বেশ বোঝা যায়, ওরা সবাই একদিন রক্তমাংসের মানুষ ছিলো। হয়তো কোন কারণে কোন এক মুহূর্তে পাথর হয়ে গেছে। পাথর হওয়ার আগে যে যে ভঙ্গীতে ছিলো সে সেই ভঙ্গীতেই রয়ে গেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা জানার জন্যে তখন আমার মন আকুলি বিকুলি করছে। কিন্তু কোন জীবন্ত মানুষের সন্ধান পাওয়া না গেলে কে বলবে সে সব কথা। এবং আমার মনে হলো, কেউ না কেউ আছেই। আছে যে, তার কিছু প্রমাণও আমি পেয়েছি। সারা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। তখন আমার নেশায় পেয়ে বসেছে। সব ভুলে গেলাম। কে আমি—কোথা থেকে এসেছি। আমার জাহাজ, আমার বাণিজ্য, সব মন থেকে হারিয়ে গেছে তখন। এমহল থেকে ওমহলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যা নেমে এলো। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ফিরে এলাম আবার সেই ঘরে। যেখানে চবুতরার ওপরে সোনার কার্পেটের ওপর ফরাশ আর এক দিকে ছিলো বাদশাহী শয্যা। সেই সাতটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে শয্যায় শুয়ে পড়লাম। সারাদিন ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে পড়েছি। একখানা শাল টেনে নিলাম বুক অবধি। মাথার কাছে রাখা ছিলো একখানা পবিত্র কোরান। শোবার সময় রোজ রাতে কোরান পড়া আমার বহুকালের অভ্যাস। আল্লাহর বাণী পড়তে পড়তে মনটা বেশ প্রশান্ত হয়ে যায়। তখন ঘুমিয়ে পড়ি। সারারাত বেশ সুখ-নিদ্রা হয়। কোরানখানা তুলে নিলাম। সোনার পাত দিয়ে বাঁধানো, সোনার জলে লেখা একখানা খুব সুন্দর বই। আমাদের ধর্মগ্রন্থ। কয়েকটা উপদেশবাণী পড়লাম। তাঁর অপার মহিমার কথা পড়তে পড়তে দেহ মনের সব শ্রান্তি কেটে গেলো। এবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকলাম।

রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর তখনও আমি জেগে। এপাশ ওপাশ করছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। হঠাৎ একটা হাল্কা এক সুমধুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। বেশ কিছু দূরে কে যেন কোরাণের পয়ার সুর করে আবৃত্তি করছে। শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লাম। সেই আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। একটা ছোট্ট খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হলো আওয়াজটা এদিক থেকে ভেসে আসছে। ভিতরে ঢুকলাম। আমার হাতে ছিলো একটা চিরাগবাতি। তার আলোয় দেখলাম, ভিতরটা এক মসজিদ। একটা সবুজ রঙের স্তিমিত বাতি জ্বলছে। মেজের ওপর একখানা কম্বল বিছানো। তার উপর পূর্বদিকে মুখ করে হাঁটুগেড়ে নামাজের ভঙ্গীতে বসে এক প্রিয়দর্শন নওজয়ান পবিত্র কোরান পাঠ করছে। কী অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ, আর কী পরিষ্কার উচ্চারণ! মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে একাগ্র চিত্তে কোরান পাঠে মগ্ন হয়ে গেছে সে। কে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—কোন দিকে খেয়াল নাই তার।

আমার মনে তখন একটা কথাই হানা দিচ্ছে। এই প্রাসাদপুরীতে—অথবা আরো ভালো বিশেষণে ভূষিত করলে বলতে হয় পাষাণ পুরীতে সবাই যখন কোন কারণে পাষাণে পরিণত হয়ে গেছে তখন এই যুবক কী করে অব্যাহতি পেলো? সে যদি সেই মুহূর্তে প্রাসাদের বাইরেও কোথাও থেকে থাকতো তবু তো এ অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা নয়। কারণ, গোটা শহরটারই তো এই একই দশা।

আমি তার পাশে গিয়ে সালাম জানালাম। সেও আমাকে সালাম জানালো। আমি বললাম, তোমার অপূর্ব কোরান পাঠ আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছি। তুমি বন্ধ করো না, আল্লাহর পবিত্র বাণী শুনে আমিও ধন্য হই।

সে একটু হাসলো। বললো, আচ্ছা সুন্দরী, আগে বলো, এখানে এলে কি করে তুমি? তারপর তুমি যা শুনতে চাইবে শোনাবো আমি।

আমি আমার কাহিনী শোনালাম তাকে। এবার তাকে প্রশ্ন করলাম, এ শহরে প্রবেশ করেই তাজ্জব বনে গেছি। এখানকার জনমানব পশুপক্ষী সব পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে কী করে? আর একমাত্র তুমিই বা কী করে অব্যাহতি পেয়ে গেছো?

কোরানখানা বন্ধ করে একটা সাটিনের থলের মধ্যে ভরলো সে। আমাকে তার পাশে বসতে বললো। আমি বসলাম। তার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। রূপের মাধুর্যে ভরা অপূর্ব সুন্দর সেই মুখ। যেন এক পূর্ণ চাঁদের মায়া। তার সৌম্য প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কী সুঠাম সুন্দর তার দেহের গড়ন।

তখন তন্ময় হয়ে রূপের সমুদ্রে আমি স্নান করছি। সারা শরীরে শিহরণ লেগেছে আমার। বুকের মধ্যে বহ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে। কিন্তু কেন? আগে তো কখনও দেখিনি তাকে। এই তো প্রথম পরিচয়। তবে কেন এমনভাবে আমার সব ওলোটপালট হয়ে যেতে লাগলো। কী যাদু আছে তার ঐ রূপে? আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, শাহজাদা, মেহেরবাণী করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

সে বললো, নিশ্চয়ই। এবার বলছি, শোনো সুন্দরী!

এ শহরের সুলতান ছিলেন আমার বাবা। ধনে জনে পূর্ণ ছিলো তার সল-তানিয়া। কারো কোনও অভাব ছিলো না। প্রজারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো আমার বাবাকে। বাবারও খুব নাম যশ ছিলো প্রজাবৎসল হিসাবে। কিন্তু এমনি নিয়তি, আজ সারা দেশের মানুষজন, পশুপক্ষী সব পাষাণ হয়ে গেছে। ঐ যে দরবার মহল দেখছো, সিংহাসনে যিনি বসে আছেন পাথর হয়ে, তিনি আমার বাবা। আর হারেমে দেখেছো, প্রধান বেগম—যিনি পালঙ্কে অর্ধশায়িত—পাষাণ-প্রতিমা, তিনি আমার মা। এঁরা দু'জনেই যাদুবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নারদুন-এর উপাসক পরম নাস্তিক আমার মা-বাবা ইসলামে বিশ্বাস করতেন না। শয়তান নারদুন তাদের ঘাড়ে ভর করেছিলো।

বহুকাল পর্যন্ত বাবা-মার কোন সন্তানাদি ছিলো না। আমিই তাদের ঘরে একমাত্র পুত্র জন্ম নিলাম। স্বভাবতই বুঝতে পারছো আদর যত্নের সে কী ভীষণ ঘটা। আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। আমার খাওয়া দাওয়া, আমার খেলাধূলা, পড়াশুনা নিয়ে প্রতি মুহূর্তে সবাই তটস্থ। বাবা-মার শুধু চিন্তা—আমি কি করে মানুষের মতো মানুষ হবো। বড় হয়ে আমি তাঁর শাসনভার হাতে নিয়ে সুনামের সঙ্গে প্রজাপালন করবো—এই তাঁর একমাত্র বাসনা ছিলো। সেই সঙ্গে আর একটা ইচ্ছেও তার ছিলো, আমি যাতে সেই ভয়ঙ্কর শয়তান নারদুন-এর ভক্ত হই।

আমাদের এই প্রাসাদে এক বৃদ্ধা মহিলা ছিলো। গোপনে গোপনে সে আল্লাহর নামাজ করতো। আল্লাহর পয়গম্বর হজরত মহম্মদের নামগান করতো। কিন্তু বাবা-মার কাছে এমন ভাব দেখাতো যেন মনে হতো ইসলামের সব চেয়ে বড় শত্রু সে। বাবা তাকে খুব ভালো চোখে দেখতেন। আমার দেখ-ভালের ভার পড়লো তার উপর। বাবার ধারণা ছিলো, বৃদ্ধাও তাঁর ধর্মে বিশ্বাসী। ছেলেকে সে তার মনের মতো করে মানুষ করে তুলবে এই অগাধ বিশ্বাস বাবার ছিলো। আমার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব বৃদ্ধার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বাবা তাকে বলেছিলেন, তুমি বিদ্যায় বুদ্ধিতে এই প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা। তোমার হাতে আমার একমাত্র সন্তান, আমার বুকের কলিজাকে তুলে দিচ্ছি। তুমি ওকে আদর্শ মানুষ করে গড়বে। যাতে সে এক আদর্শ সুলতান হয়ে আমার মুখ উজ্জ্বল করে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। আর তাকে আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা সর্বশক্তিমান নারদুনের মন্ত্রে দীক্ষা দেবে। যাতে সে তার যোগ্য ভক্ত হতে পারে।

বৃদ্ধা বাবাকে আশ্বাস দেয়, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, জাঁহাপনা। আমি তাকে শিক্ষায় দীক্ষায় আদর্শ মানুষ করে তুলবো।

কিন্তু সে আমাকে ইসলামের ধর্মে দীক্ষা দিলো। সর্বশক্তিমান আল্লাহর অপার মহিমা, তার বাণী তার ফরমান শোনাতে লাগলো। পবিত্র কোরান পড়ে শোনাতো আমাকে। আল্লার পয়গম্বর মহম্মদের কাহিনী শোনাতো। আমি প্রাণ-মন দিয়ে শুনতাম। সে-সব ধর্মকথা। ধীরে ধীরে এক সাচ্চা মুসলমান হয়ে উঠতে লাগলাম আমি।

বৃদ্ধা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো, দেখো বাবা, তোমার আব্বাজান যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। তাহলে গর্দান যাবে আমার। আমি তোমাকে আদর্শ মানুষ করে গড়তে চাই। কিন্তু ইসলাম বিশ্বাসী না হলে আদর্শ মানুষ হতে পারে না কেউ। তোমার বাবার ধর্ম অসত্যের, অবিশ্বাসের, ধ্বংসের ধর্ম। নারদুন এক মহা শয়তান। ঝাড়ফুক মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে সে লোককে বশ করতে পারে। কিন্তু প্রেম ভালোবাসা দয়া দান উদারতা মহত্ব তার ধাতে নাই। সে শুধু জানে জ্বালাতে পোড়াতে, ধ্বংস করতে।

আমার শিক্ষা দীক্ষা প্রায় শেষ হয়ে আসছে এমন সময় একদিন সেই বিদুষী বৃদ্ধা দেহ রাখলো।

একদিন গভীর রাতে শহরের সবাই যখন নিদ্রামগ্ন আল্লাহ স্বপ্ন দেখালেন প্রত্যেক শহরবাসীকে।—তোমরা জাগো, ওঠো। আমিই একমাত্র আল্লাহ—আমার হুকুমেই তামাম দুনিয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই জগতে যা কিছু দেখছো সবই আমার সৃষ্টি। আবার আমাতেই লয় হবে তারা। আমি ছাড়া তোমাদের কোন গতি নাই। তোমরা এখন মোহাচ্ছন্ন হয়ে ঘোর পাপে লিপ্ত আছো। শয়তান নারদুন তোমাদের যাদু করে রেখেছে। তাকে তোমরা একমাত্র উপাস্য বলে মনে করছো। কিন্তু ভুল। সে তোমাদের মোক্ষদাতা নয়। পাপের পঙ্কিল থেকে সে কখনও উদ্ধার করতে পারবে না তোমাদের। কারণ, সে ক্ষমতা তার নাই। পাপই তার একমাত্র সহায়। ধ্বংসই তার একমাত্র সম্বল। কী করে সে নিয়ে যাবে তোমাদের পুণ্য লোকে। কী করে সে দেবে সৃষ্টির আনন্দ? ওঠো-জাগো। আর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না। আমার নামগান করো। মুক্তির আনন্দ পাবে।

পরদিন সকালে শহরবাসীরা সন্ত্রস্ত, ভীতচকিত হয়ে সুলতানের দরবারে এসে হাজির হলো। সব শুনে সুলতান অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। ঘাবড়াও মাৎ। ওই শয়তানটা আমাকেও ওই একই স্বপ্ন দেখিয়েছে। ভয় দেখিয়ে বলেছে, আমি যদি তার কথা না শুনি তবে নাকি সব ধ্বংস হয়ে যাবে। হা-হা-হা—। ধ্বংস হবে না ঘন্টা হবে। ঐ সব শয়তানের শয়তানিতে ডরো মাৎ। আমি সব শায়েস্তা করে দেবো নারদুনকে দিয়ে। ওসব দুশ্চিন্তা বিলকুল মুছে ফেলো মন থেকে। নিজের নিজের কাজকাম করো, খাওদাও, নাচো গাও। ওসব মনে রেখো না। নারদুন সর্বশক্তিমান—তিনিই রক্ষা করবেন।

প্রজারা অবনত মস্তকে ফিরে গেলো। একটা বছর কেটে গেছে প্রজারা ভুলে গেছে সে রাতের স্বপ্নের কথা। এমন সময় আর এক রাত্রে আকাশ থেকে দৈববাণী শোনা গেলো। তোমরা আমার ফরমান শুনছো না। এখনও সময় আছে। শয়তানের কব্জা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে আমার প্রতি আস্থা রাখো। না হলে সর্বনাশ হবে।

গগন বিদারী সেই আওয়াজে হৃদকম্প ধরে যায় শহরবাসীর। কিন্তু আবার সেই সুলতানের তড়ফানী। কোন ভয় নাই। অগ্নির উপাসনা করে যাও তিনিই একমাত্র মোক্ষদাতা।

পরের বৎসর আবার ঠিক সেই দিনে—গভীর রাতে আবার সেই গগন ভেদী আওয়াজ শোনা গেলো। এবারে আরও জোরালো আরও ভয়ঙ্কর হুকুমনামা শোনা গেলো।

এইভাবে পর পর তিন বৎসর ঠিক একই দিনে—একই সময়ে আল্লাহর ফরমান শোনা গেলো। কিন্তু সুলতান তার সেই এক গোঁ ধরে বসে রইলো।

এর পরিণাম হলো ভয়াবহ। একদিন সকালে সবাই যখন শতকর্মে রত তখন আকাশপথে এক উল্কার আবির্ভাব হলো। সারা শহরটা বিজলীর আলোয় চমকে উঠলো এক মুহূর্ত। ব্যাস, তারপরই সব শেষ। শহরের প্রতিটি মানুষ পরিণত হয়ে গেলো পাষাণে। গাধা, ঘোড়া,

উট, খচ্চর—সব প্রাণী পাথর হয়ে যে যেখানে যেমনটি ছিলো, দাঁড়িয়ে রইলো। শুধু আমি—একমাত্র প্রাণী ইসলামে বিশ্বাসী—বেঁচে গেলাম।

সেই থেকে আমি একা। আল্লার নামগান করে, কোরান পাঠ করে দিন কাটাই। সঙ্গী সাথী বলতে কেউ নাই আমার। আমি বড় একা। আজ বহুকাল বাদে তুমি এলে, তাই প্রাণ খুলে দু'টো কথা বলতে পারলাম। তোমাকে আজ কাছে পেয়ে কি যে ভালো লাগছে, সুন্দরী, কী বলবো?

তার কথা বলার ঢং-এ কী এক যাদু আছে—আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বললাম, আমাদের বাগদাদ শহরে চলো না, দেখবে তোমার আরও ভালো লাগবে। সেখানে কেউ কাউকে ঠকায় না। সবাই সবাইকে ভালোবাসে। আর সেখানকার সুলতান—খলিফা হারুন-অল-রশিদ আল্লার পীর। দয়ার সাগর। তার কাছে হাত পাতলে কেউ কখনও বিমুখ হয় না। দুনিয়াতে যদি বেহেস্ত কোথাও থেকে থাকে তবে সে বাগদাদে। চলো, ওখানে চলে যাই আমরা। সেখানে ইসলামের অনেক আদর্শ লোকের সঙ্গে তোমার মোলাকাৎ হবে। তাদের কাছ থেকে ইসলাম ধর্মের আরও গভীর তত্ত্বের সন্ধান পাবে। আর দ্বিধা করো না চলো কাল সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেখানে আমার প্রাসাদের মতো বাড়ি আছে। ধনদৌলত যা আছে, বেশ চলে যাবে আমাদের। বাগদাদ শহরে আমার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি নাম যশ আছে। লোকে খাতির করে আমাকে। তোমাকেও করবে। এতোকাল আমি শাদী নিকা করিনি। তার কারণ বোধহয় তুমি, তোমাকে পাবো বলেই অন্য কাউকে মনে ধরেনি। চলো, আমরা বাগদাদে গিয়ে ঘর বাঁধবো, স্বর্গ রচনা করবো। তুমি হবে আমার মালঞ্চের মালাকর। আমি হবো তব প্রিয়া। আল্লাহর বোধহয় এইরকমই ইচ্ছা। তা না হলে সমুদ্রে পথ হারিয়ে অচেনা-অজানা সমুদ্রে গিয়েই বা পড়বো কেন। আর কেনই বা ভেড়াবো আমার তরী—এই নাম না জানা বন্দরে! সবই নিয়তি। এ শহরে না এলে তোমার দেখা পেতাম?

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে। কাহিনী থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

পরদিন সপ্তদশ রজনী।

—শুনুন, জাঁহাপনা, শাহরাজাদ বলতে শুরু করে, জুবেদা তখন সেই শাহজাদার প্রেমে ডগমগ। সে রাত্রে সেই প্রিয়দর্শন যুবকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করার সাধ্য ছিলো না তার। তাদের সারাটা রাত কিভাবে কেটেছিলো সে বর্ণনা খলিফা-হারুন-অল-রসিদের কাছে দেয়নি জুবেদা। দেয়নি অথবা দিতে পারেনি, সে কথা জানি না। অল্প অল্প কথাবার্তা শেষে বাকী রাতটায় সে কি পেয়েছিলো অথবা পায়নি তা তার জবানীতে বলা হয়নি। আপনি অনুমান করে নিন, কী ঘটতে পারে!

সকালবেলায় দেখা গেলো, জুবেদা সেই যুবকের পায়ের কাছে শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

এবার জুবেদার জবানীতেই কাহিনী শুরু করি ঃ

সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গতেই উঠে পড়লাম। প্রাসাদের মূল্যবান, ধনরত্ন, যতটা পারলাম পোঁটলা বেঁধে নিলাম। শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে ফিরে এসে দেখি কাপ্তেন, আমার দিদিরা আর কুলিকামিন সবাই দারুণ উৎকণ্ঠায় বসে আছে। আমাকে দেখে হাসি ফুটলো তাদের মুখে। দিদিরা জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছিলো তোর। কাল ফিরলি না কেন? আর এ কে?

আমি বললাম, এ হচ্ছে এখানকার বাদশাহর ছেলে। আমাদের সঙ্গে বাগদাদে যাবে। আমার সঙ্গে থাকবে। ঘর বাঁধবো আমরা।

তারপর গতকালের আদ্যোপান্ত সব কাহিনী বললাম তাদের। কাপ্তেন এবং আমার জাহাজের কর্মচারীরা মহা খুশী হলো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম আমার দুই দিদির মুখের হাসি

মিলিয়ে গেলো। এতো ধন-দৌলত এবং তার সঙ্গে সুন্দর সুপুরুষ এক শাহজাদা জোগাড় করে এনেছি দেখে খুশি হতে পারলো না তারা।

জাহাজ ছেড়ে দিলো। শাহজাদা আমার কাছ ছাড়া হয় না। সারা দিন-রাত আমরা ভালোবাসার সায়রে গা ভাসিয়ে থাকি। আমার দিদিরা হিংসায় জ্বলতে লাগলো। দু' দুবার শাদী করে সংসারী হওয়ার সাধ করেছিলো তারা। কিন্তু বিধি বাম। কপালে নাইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কী।

এমন সুন্দর সুপুরুষ শাহজাদা তারাও আশা করেছিলো জীবনে। কিন্তু তার বদলে জুটেছিলো ঠগ প্রতারক জংলীজানোয়ার। দুই বোন মিলে ফন্দী আঁটতে লাগলো। খতম করতে হবে আমাদের দু'জনকে। তাহলে বুকের জ্বালাও জুড়াবে, আবার আমার ধনদৌলতও সব হাতানো যাবে। আমি কিন্তু তখন অন্য জগতে। ভালোবাসার এমন মধুর স্বাদ এর আগে তো কখনও পাইনি। তাই আমরা দু'জনে তখন একান্ত আপন হয়ে এই সব হিংসা দ্বেষের অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছি। নিকষিত হেম আমাদের প্রেম তখন সমাজ সংসার ছাড়িয়ে ইন্দ্রলোকের অমৃত আহরণে ব্যাকুল।

হাওয়া আমাদের অনুকূল। জাহাজ চলেছে। সমুদ্র শান্ত। চিন্তার কোন কারণ নাই। এমন চলতে থাকলে তাড়াতাড়িই পৌঁছে যাবো দেশে। দিনকয়েক পরে বসরাহ বন্দরে পৌঁছে গেলাম। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। জাহাজ নোঙর করা হলো। খানাপিনা সেরে সবাই আমরা শুয়ে পড়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা।

কিন্তু আমার দুই দিদি ঘুমোলো না। তারা পা টিপে টিপে আমাদের কামরায় এসে দাঁড়ালো। খুব সন্তর্পণে আমাদের ঘুমন্ত মানুষ দু'টোকে তুলে নিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলো। অন্ধকার রাত। সমুদ্রের জলে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। ছোটবেলায় সাঁতার শিখেছিলাম। সাঁতার কেটে কুলে এসে উঠলাম এক সময়। কিন্তু শাহজাদা—আমার ভালোবাসার কোন হদিশ করতে পারলাম না। সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তবু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম তাকে। কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না তার।

সিক্ত জামাকাপড়ে সমুদ্রসৈকতে বসে বসে বাকী রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ভোর হলে দেখলাম, ঢেউ-এর মুখে উথাল পাথাল হতে হতে জাহাজ ছেড়ে অনেক দূরে এসে গেছি আমি। এদিক ওদিক লক্ষ্য করতে করতে একটা পায়ে চলা পথ চোখে পড়লো। আশায় দুলে উঠলো মন। তাহলে জনবসতি লোকালয় আছে কাছে পিঠে। পথটা ধরে চলতে থাকি। হঠাৎ দেখলাম একটা ছোট্ট সাপকে তাড়া করে আসছে একটা প্রকাণ্ড বড় সাপ। এখনি হয়তো মেরে ফেলবে ওকে। আহা বেচারা। বড় মায়া হলো। ছোট সাপটা আমাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ছুটছে। আর বড় সাপটা ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না তাকে। কাছেই পড়েছিলো একটা পাথরের চাঁই। দু হাতে তুলে নিয়ে তাক করে ছুঁড়ে মারলাম। বড় সাপটার মাথা থেঁতলে গেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মরে গেলো। আর তক্ষুণি, আমাকে তাজ্জব করে দিয়ে, ছোট্ট সেই সাপটা পা মেলে শূন্যে উঠে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

রাত্রির সেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই আর অনিদ্রায় দেহ আর চলছিলো না। কাছেই একটা গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো দেখি আমার পায়ের কাছে বসে আছে এক হাবসী কিশোরী। কালো হলে কি হয়, দেখতে খুব সুন্দরী। মেয়েটা আমার পা টিপে দিচ্ছে দেখে অবাক লাগলো। পা দু'টো সরিয়ে নিয়ে বললাম, কে গা তুমি? আমার পায়ে হাত দিয়েছো কেন? কী হয়েছে তোমার? কী চাও?

মেয়েটি সলজ্জভঙ্গীতে বললো, আজ আপনি আমার জান বাঁচিয়েছেন। আমি এক জিনিয়াহ। ছোট্ট একটা সাপের রূপ ধরে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিলাম। আমার পিছনে তাড়া করে আসছিলো একটা বড় সাপ। সে আমার শত্রু, একটা জিনি। আমার উপর বলাৎকার করতে চেয়েছিলো। আমাকে ধরতে পারলে আমার সর্বনাশ করতো, তারপর মেরে ফেলতো সে। তুমি আমাকে রক্ষা করেছো। সেই কৃতজ্ঞতায় তোমার একটু উপকার করতে তখুনি আমি উড়ে গিয়ে তোমার জাহাজ থেকে তোমার দুই বোনকে উধাও করে নিয়ে এসেছি। ঐ দ্যাখো তাদের দু'জনকে যাদু করে কালো কুত্তি বানিয়ে রেখেছি আমি। তোমাকে ওরা মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। তাই আমি ওদের এই শাস্তি দিয়েছি। তুমি যদি না চাও তবে ওদের আবার যেমন ছিলো তেমনি মেয়েছেলে করে দেবো।

আমি বললাম, না, ওইরকমই থাক। কিন্তু আমার ভালোবাসা সেই বাদশাহজাদা কোথায় বলতে পারো?

মেয়েটি মুখ নিচু করলো। হতভাগ্য সে আর বেঁচে নাই। তার দিন ফুরিয়ে এসেছিলো। আল্লাহ তাকে কোলে টেনে নিয়েছেন। সাঁতার জানতো না সে। জলে পড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে তলিয়ে গেছে।

কান্নায় চোখ ফেটে জল এলো। বুকের মধ্যে হাহাকার করতে লাগলো। আমার বোন দু'টোকে, তখন মনে হচ্ছিলো ঠেঙিয়ে মেরে ফেলি। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। হাজার হলেও ওরা আমার মায়ের পেটের বোন।

হাবশী কিশোরী তখন আমার দুই বোন—সেই কালো কুত্তি দু'টোকে এক হাতে এবং অন্য হাতে আমাকে নিয়ে আকাশে উড়লো। উড়তে উড়তে এক সময় এসে নামলো আমার নিজের দেশ এই বাগদাদ শহরে—আমার বাড়ির দরজায়।

ঘরে ঢুকে দেখলাম আমার জাহাজের সব ধনদৌলত থরে থরে সাজানো আছে চারপাশে।

জিনিয়াহ জানালো, আমি যখন ঐ গাছতলায় ঘুমিয়ে ছিলাম, সেই সময়ে সে ওগুলো জাহাজ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে রেখে গেছে। জিনিয়াহ বললো, এবার আমার যাবার পালা। যাবার আগে আমি শাহেনশাহ সুলেমানের ফরমান জানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। এই দুই কুত্তিকে প্রতিদিন তিনশো ঘা করে চাবুক মারবে। যদি কোনওদিন মারতে ভুলে যাও তবে আমি ফিরে আসবো পরদিনই। এবং ওদের আবার ফিরিয়ে দেবো আগের দেহরূপ। আমি বললাম, তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

সেই থেকে প্রতি রাত্রে আমি তাদের নির্মমভাবে প্রহার করি।

এই আমার দুঃখের কাহিনী, জাঁহাপনা। এবার আমার বোন আমিনাহ তার বিচিত্র কাহিনী শোনাবে আপনাকে।

এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে জুবেদার কাহিনী শুনছিলেন খলিফা হারুন-অল-রসিদ। এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, তোমার জীবনের ঘটনা বড় বিচিত্র, বড় করুণ, বড় ভালো। খুব খুশি হলাম।

আমিনা বলতে শুরু করে।—জাঁহাপনা পরম পুণ্যাত্মা, আল্লাহ আপনার সহায়।

আমার দিদি আপনাকে বলেছে, বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা কে কোথায় গেলাম। আমি আর এখানে তার পুনরাবৃত্তি করবো না।

আমি আমার মার কাছে গিয়ে বাস করতে লাগলাম। কিছুদিন পরে এক থুরথুরো

বুড়ো সওদাগরের সঙ্গে আমার শাদী দিয়ে দিলো। লোকটার অনেক টাকা পয়সা ছিলো। কিন্তু শরীরে কোন সামর্থ্য ছিলো না। তবে লোভ ছিলো অনেক। বছর ঘুরলো না, দেহ রক্ষা করলো সে। তার বিশাল সম্পত্তির অনেকখানির মালিক হলাম আমি। নগদ পেলাম আশী হাজার সোনার মোহর। শাড়ী গহনা কেনার ধূম পড়ে গেলো আমার। হাজার মোহর দামের দশটা সেট দামি পোশাক বানালাম। হীরা চুনী পান্না বসানো জড়োয়া গহনা গড়ালাম। এবং আরও অনেক দামি দামি সামানপত্র কিনে সব পয়সা উড়িয়ে দিলাম দু'দিনে।

একদিন এক খুনখুনে বুড়ি এলো আমার কাছে। আগে কখনও দেখিনি তাকে। দেখতে কদাকার কুৎসিত। মুখটা একটা কুমড়োর মতো। চোখ দু'টো হোদল কুৎকুৎ। নাকটা থ্যাবড়া। একান ওকান পর্যন্ত বিস্তৃত মুখের হা। দাঁতগুলো মিশমিশে কালো ভাঙাভাঙা। নাকের উপরে একটা মস্ত আব। গলাটা মুরগীর গলার মতো সরু আর লম্বা।

আমাকে সালাম জানিয়ে বুড়িটা বললো, একটা অনাথ মেয়েকে লালন-পালন করেছি আমি। আজ রাতে তার শাদী দিচ্ছি। কিন্তু মা, বড় গরীব আমি। পয়সা কড়ি কিছু নাই। মাথার ওপর ভরসা করার মতো লোকজনও কেউ নাই আমার। তোমার গুণের কথা অনেক শুনেছি লোকের কাছে। পরের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে, আমি জানি। আমার আর কিছু বলার নাই মা। তোমার যা প্রাণ চায় আমাকে দিও। আমি খুশি হয়ে তাই মাথা পেতে নেবো। কিন্তু একটা কথা, মা, তোমাকে নিজে একবার যেতে হবে আমার গরীবখানায়। তোমার পায়ের ধুলো পেলে আমার মেয়ের কল্যাণ হবে। তবে এখন তোমাকে যেতে বলছি না। যখন রাতের বেলায় শাদী হবে। আমি তোমাকে নিতে আসবো—সন্ধ্যাবেলা। নিয়ে যাবো, আবার পৌঁছে দিয়ে যাবো তোমার দৌলতখানায়।

বুড়ির কথা মধুঢালা। কী করে বুঝবো ভিতরে তার এতো বিষ! ঘাড় নেড়ে বললাম, ঠিক আছে আমি তৈরি হয়ে থাকবো। সন্ধ্যাবেলায় এসো তুমি, যাবো।

বিকেলে হাতমুখ ধুয়ে সাজগোজ করলাম। আমার সবচেয়ে দামি সাজপোশাক পরলাম। জড়োয়ার গহনাগুলো পরে সুন্দর করে সাজালাম নিজেকে। গলায় পরলাম সাতনরী হার। হাতে বাজু, বাহুতে তাগা মাথায় টায়রা কোমরে বিছে নাকে নাকছাবি কানে মাকড়ী পায়ে মল পরে বেহেস্তের পরীর মতো। নাও, আর দেরি করো না, চলো। পাত্রের লোকজন এসে ভরে গেছে বাড়ি। সবাই তোমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে। তুমি না পৌঁছলে তো শাদীর কাজ শুরু হবে না।

একটা নোকরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ভিস্তিওলা রাস্তায় জল দিয়ে গেছে। মৃদুমন্দ সন্ধ্যাসমীরণ বইছে। কিছুক্ষণ চলার পর একটা বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছলাম আমরা। প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য সে বাড়ি। বৃদ্ধা কড়া নাড়লো। দরজা খুলে যেতেই ভিতরে ঢুকলাম আমরা। শাহী কায়দায় সাজানো হয়েছে গোটা বাড়িটা। বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে কড়িবর্গা থেকে। সবুজ রঙের বাতি জ্বলছে। চারদিকের দেওয়ালে সাজানো সব সমরাস্ত্র। ঢাল তলোয়ার বর্শা তীর ধনুক। মূল্যবান পর্দা ঝুলছে দরজায়। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকলাম বিশাল এক কক্ষে। সে ঘরের মনোহর রূপ আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। মন ভোলানো চোখ জুড়ানো অবাক হওয়ার মতো জিনিসপত্রে সুন্দর করে সাজানো সারা ঘরটা। পারস্য গালিচায় মোড়া মেজে। এক পাশে বহু কারুকার্য করা এক পলতে মখমলের গদীর বিছানায় শুয়ে ছিলো এক যুবতী। কী অপরূপ তার রূপ লাবণ্য। যেন মনে হয় আসমানের চাঁদ নেমে এসেছে। আমাকে দেখে উঠে বসলো সে।

—এসো ভাই, এসো। কী আমাদের সৌভাগ্য, তোমার পায়ের ধুলো পড়লো। কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো, ভেবে পাচ্ছি না।

নেমে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসালো।

—একটা কথা বলার জন্যে মন আমার ছটফট করছে বোন। আমার এক ভাই আছে। দেখতে সুপুরুষ। সুন্দর চেহারা। আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী সুন্দর সে। পয়সা কড়িও যথেষ্ট আছে। একটা শাদীর আসরে তোমাকে দেখেছে সে। তোমার রূপে পাগল হয়ে উঠেছে সেই থেকে। সেই কিছু পয়সা দিয়ে বুড়িকে পাঠিয়েছিলো তোমার কাছে। বুড়িটা অন্য একটা ফন্দী করে তোমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। অবশ্য, সেটা এমন আর কি দোষের? খারাপ কোন উদ্দেশ্য তো নাই এর পিছনে। সে তোমাকে সসম্মানে শাদী করে জীবন-সঙ্গিনী করতে চায়। এই তার অপরাধ। তা সে পাত্র হিসেবে আমার তো মনে হয় তোমার অযোগ্য হবে না। না হয়, একবার নিজের চোখে দেখেই পছন্দ অপছন্দ জানিয়ে দাও।

আমি বললাম, ঠিক আছে আমার অমত নাই।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো মেয়েটি। হাতে তুড়ি বাজাতেই সামনের একটা দরজা খুলে গেলো। এক সুদর্শন যুবক এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। তার বোন কাছে টেনে নিয়ে বসালো একপাশে।

আমি মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকি। এতো রূপ পুরুষ মানুষের হয় নাকি। যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলো মনে নিমেষে মুছে গেলো। একটু পরেই ঘরে ঢুকলো মৌলভী আর চারজন সাক্ষী। একটা কাগজে শাদীর কবুলনামা লেখা ছিলো। পড়ে শোনালো মৌলভী। আমার সম্মতি নিয়ে ঐ চারজন সাক্ষী সই করলো কবুল নামায়। এর পর সবাই চলে গেলো। শুধু রইলাম আমি আমার নতুন স্বামী আর তার বোন।

সামনের টেবিলে রাখা ছিলো একখানা পবিত্র কোরান। সেখানা তুলে আমার হাতে দিয়ে সে বললো, সুন্দরী এই পবিত্র কোরান ছুঁয়ে তুমি হলফ করো, আমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষে আসক্ত হবে না কখনও।

কোরানখানা হাতে নিলাম। অকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম। 'আজ থেকে তুমি আমার স্বামী, তোমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষে আসক্ত হবো না কখনও।'

আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো সে। তার উষ্ণ আলিঙ্গনে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিলাম তখুনি। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে লাগলো। এক অনাস্বাদিত পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমার সারা দেহ-মন।

বাবুর্চি খানা সাজালো। আমরা তিনজনে তৃপ্তি করে নানা ধরনের মুখোরোচক খানা খেলাম। দামি শ্যাম্পেন খেলাম একটু। গুলাবী নেশা ধরলো চোখে। রাত গভীর হতে থাকে। আমার স্বামীর বোন আমাকে আদর করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

সেই রাত আমার পরম পাওয়ার প্রথম রাত। যদিও আগে আমার আর একবার শাদী হয়েছিলো, তবুও সেদিনের রাতটাই আমার কাছে এক উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে। এর আগে যার সঙ্গে আমরা শাদী হয়েছিলো সে এক বিগত যৌবন বৃদ্ধমাত্র। আমার নারীত্বকে যেমন ভোগ করতে পারেনি তেমনি আমিও পাইনি কোন পৌরুষ প্রসাদ। সেদিন রাতে আমার কুমারীত্বের বিসর্জন হলো। আর সেই বিসর্জন উৎসবের হলাহল মন্থন করে প্রাণভরে পান করলাম পরিপূর্ণ এক সুধাপাত্র। মুখে মুখ,

বুকে বুক রেখে, হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে, কখনও স্বর্গে কখনও পাতালে আরোহণ করে এক ছন্দময় সৃষ্টির আনন্দে উদ্দাম হয়ে কাটালাম সারাটা রাত। আমার নারী-জন্ম সার্থক হলো।

একটা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেলো, বুঝতে পারলাম না। সুখের দিনগুলো সব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। একদিন স্বামীকে বললাম, বাজারে যেতে হবে। কিছু জামাকাপড় কেনা দরকার।

স্বামীর সম্মতি নিয়ে বুড়িকে সঙ্গে করে বাজার করতে বেরুলাম। একটা রেশমী কাপড়ের দোকানে এসে হরেক রকম বাহারী শাড়ি দেখে লোভ হলো। দোকানীকে বললাম, আপনার যা ভালো ভালো কাপড় আছে দেখান।

দোকানী অনেক দামি দামি শাড়ি বের হলো। ইচ্ছে করে, সবগুলোই নেই। খানকতক পছন্দ করলাম। দোকানি বেঁধে ছেঁদে দিলো সেগুলো। আমি পয়সা বের করে দিলাম বুড়ির হাতে। কিন্তু দোকানি দাম নিতে চায় না। বললো, আজ প্রথম আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন আমার দোকানে। আজ কোন দাম নেবো না। এগুলো আমার উপহার ধরে নিন।

আমি রেগে গেলাম।—সে হয় না, আপনি যদি দাম না নেন তবে ওগুলো রেখে চলে যাবো। দাম না দিয়ে নিতে পারবো না আমি।

বুড়ি বলে, নাও না মা। উনি যখন ভালোবেসে দিতে চাইছেন, নিলে ক্ষতি কী?

—ভালোবেসে? কিসের ভালোবাসা? না না, তুমি চলো এখান থেকে। দরকার নাই আমার শাড়ি।

দোকানি হাত জোড় করে পথ রুখে দাঁড়ালো। সে কি? রাগ করে চলে যাবেন? এই সামান্য কটা শাড়ি, কতই বা এর দাম। এগুলো আপনাকে উপহার দিচ্ছি। মেহেরবানী করে নিয়ে আমাকে খুশি করুন। তার বদলে আপনার একটুখানি সঙ্গ দু'টো মিষ্টি কথা আর একটা ছোট্ট চুম্বন আমি প্রত্যাশা করছি আপনার কাছে।

বুঝলাম, বদমাইশ বুড়িটার সঙ্গে দোকানির সাট আছে। শয়তানিটা ওর কাছ থেকে পয়সা খেয়ে আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। অতো সহজে নিস্তার পাওয়া যাবে না।

বুড়িটা বললো, জানো মা, দোকানি মেলাই পয়সার মানুষ। তা না হলে সামান্য একটা চুমুর বদলে এতোগুলো দামি শাড়ি কাপড় দিয়ে দিতে চায়? আর তাছাড়া বয়সেও নওজোয়ান। দেখতে খুবসুরৎ। একটা সামান্য চুমু বইতো নয়। রাজি হয়ে যাও মা, রাজি হয়ে যাও। সবে তো আজ প্রথম দিন। যদি বরাতে থাকে, দেখো, সোনাদানা-হীরে জহরতে ভরে দেবে তোমাকে।

—কিন্তু আমি যে আল্লাহর নামে হলফ করেছি আমার স্বামীর কাছে। অন্য কোন পুরুষে আসক্ত হবো না। আমার স্বামী জানতে পারলে আস্ত রাখবে না আমাকে।

—কি করে জানবে বাছা, জানবো তো আমরা এই তিনজন। আর কোন কাকপক্ষীও টের পাবে না। নাও, রাজি হয়ে যাও। আর দেরি করো না।

আমি দেখলাম নিরুপায়। বুড়ির কথাগুলো ক্রমশ অনুনয় বিনয়-এর ঢং ছাড়িয়ে অন্য সুরে বেজে উঠলো আমার কানে। এর পর 'না' করা মানে জবরদস্তি ইজ্জত খোয়ানো। অগত্যা রাজি হয়ে গেলাম। রাস্তার দিকে পিছন করে দাঁড়ালাম। যাতে আমার মুখ দেখতে না পায় কেউ। নাকাব দিয়ে মুখটা ঢেকে নিলাম। আমার বোরখার তলা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিলো লোকটা। আমার মুখের কাছে মাথাটা তুলে একটা গালে চুমু খেলো একবার। একটাই চুমু খাওয়ার কথা। তাই তার মাথাটা দু হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখন সে আমাকে জানোয়ারের থাবায় আঁকড়ে ধরেছে। গালটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে শক্ত করে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠি আমি। লোক জড়ো হয়ে যাবার ভয়ে কিংবা আমার প্রচণ্ড

ধাক্কা সামলাতে না পেরে ছিটকে বেরিয়ে গেলো সে বোরখা থেকে। আমিও অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লাম।

যখন জ্ঞান ফিরলো দেখি, দোকানের বাইরে রোয়াকে বুড়িটার কোলে শুয়ে আছি আমি। বাঁ-গালটা কেটে রক্ত ঝরছে। বুড়ির চোখে মুখে দারুণ ভয়ের ছাপ। দোকানি দোকান বন্ধ করে পালিয়েছে। বুড়িটা বললো দুঃখ করো না মা। নসীবে যা লেখা ছিলো তাই ঘটেছে। এখন ঘরে ফিরে চলো। কিন্তু খুব সাবধান! বিমার-এর ভান করে বিছানায় পড়ে থাকবে। কাউকে দেখতে দেবে না বাঁ-গালটা। আমি ভালো মলম এনে দেবো। দেখবে দু'দিনেই দাগ মিলিয়ে যাবে।

ক্ষিপ্র পায়ে হেঁটে চলে এলাম স্বামীর ঘরে। সটান গিয়ে শয্যা নিলাম। যে আসে বলি, তবিয়ৎ খারাপ। বুকের মধ্যে দুর দুর করতে লাগলো। সবাইকেই না হয় এড়ানো যাবে; কিন্তু স্বামী? তাকে এড়াবো কি করে। কি মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে পারবো এই কলঙ্ক?

একটু পরে আমার স্বামী এলো। আমাকে শয্যাশায়ী দেখে উদ্বিগ্ন হলো খুব।

—এই তো একটু আগেও বেশ বহাল তবিয়তে বাজারে বেরুলে। এর মধ্যে শরীর খারাপ হয়ে গেলো?

আমি বলি, কই না তো, শরীর আমার ভালোই আছে।

আমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনলো সে। হঠাৎ শিউড়ে উঠে প্রশ্ন করে, এ কী? তোমার গালটা কেটে ছড়ে গেলো কী করে? আহা, এতো নরম জায়গা—একেবারে সাংঘাতিক ঘায়েল হয়ে গেছে।

আমি কোনরকমে বলতে পারলাম, যখন তোমার কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম সেই সময় একটা উট পিঠে জ্বালানী কাঠ নিয়ে আসছিলো। কাঠের খোঁচাগুলো এপাশে ওপাশে বর্শার ফলার মতো বেরিয়ে ছিলো। আমি অতোটা লক্ষ্য করিনি। সেই কাঠের খোঁচায় গালটা কেটে গেছে।

—বাগদাদের রাস্তাগুলো এমন গলির মতো যে, দু'টো গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে না। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। কাল সকালেই আমি দরবারে নালিশ করবো। সব শালা উট-সোয়ারগুলোকে ধরে এনে কোতল করাবো।

রাগে ফুঁসতে লাগলো আমার স্বামী। আমি শঙ্কিত হলাম।—না না, অমন কাজটি করো না। মহা পাপ হবে। তা ছাড়া ওদের কি দোষ, বলো! দোষ তো আমারই পথঘাট দেখেশুনে না চলতে পারলে খেসারৎ দিতেই হবে। আমি ছিলাম একটা গাধার পিঠে। গাধাটা তিড়িং বিড়িং করে চলছিলো। আমি ঠিকভাবে চালাতে পারছিলাম না। তাই একটা গাড়ির ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম নিচে। একটা চেলা কাঠ পড়েছিলো মাটিতে। সেই কাঠের খোঁচায় গালটা আমার কেটে গেছে।

আমার স্বামী আরও রেগে গেলো।—যত্তোসব বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো শয়তানের বাচ্চাগুলো রাস্তায় রাস্তায় ডাংগুলি খেলবে। কাল সকালেই আমি যাবো উজির জাফর-অল-বারমাকীর কাছে। বাঁদরগুলোকে ধরে এনে কিরকম পিটানি দেওয়াই একবার দেখো।

—আমার জন্যে কি দুনিয়াশুদ্ধ লোককে মারধোর করাবে নাকি? যা ঘটেছে নেহাতই দুর্ঘটনা মাত্র। এর জন্যে কাউকে কি দায়ী করা চলে? না দায়ী করা উচিত? আমার নসীবে যা লেখা আছে তা তো আমাকে ভোগ করতেই হবে।

আমার এই অজুহাতে ভোবি কিন্তু ভুললো না। এবার সে উগ্র চণ্ডালের মূর্তি ধারণ

করলো।—চুপ কর্, হারামজাদী, বিশ্বাসঘাতিনী। মিথ্যে দিয়ে মিথ্যে ঢাকা যায় না। তুই না আমার কাছে কোরান ছুঁয়ে হলফ করেছিলি? দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।

এই বলে মেজের ওপর পদাঘাত করলো কয়েকবার। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলো দৈত্যের মতো দেখতে সাতটা হাবশী ক্রীতদাস। তারা এসেই এক ঝটকায় নিচে নামিয়ে নিলো আমাকে। তারপর আমার স্বামীর হুকুম মতো আমাকে ঘরের মাঝখানে কার্পেটের ওপর উপুড় করে শোয়ালো। একজন আমার মাথার উপর বসে দু হাতে দু কাঁধ চেপে ধরে থাকলো। আর একজন হাবশী বসলো আমার হাঁটুর উপর। সে ধরে রইলো আমার পা দু'টো। আর তৃতীয়জন উঠে দাঁড়ালো আমার পিঠে। হাতে তার শানিত তরবারী।

এবার শুনলাম আমার স্বামীর সিংহগর্জন।—কাট্, কেটে আলাদা করে দে, ধড় আর গর্দান। নেকড়েকে দিয়ে খাওয়াবো তোমার শরীরের মাংস। শয়তানী, বিশ্বাসঘাতিনী, এই তোমার যোগ্য পুরস্কার।

আগে যদি জানতাম আমি কলঙ্কিনী তুমি।
কে জানাতো এতো প্রেম তোমার অধর চুমি॥
ক্ষমা করো খোদাতালা দোষ নিও না প্রভু।
মহব্বতের এই অপমান সইবোনাকো কভু॥

—সাদ্, চিৎকার করে আমার স্বামী, কেটে দু'খানা করে ফেল, হারামজাদীকে।

মালিকের হুকুম তামিল করতে উদ্যত করেছে সে তরবারী। এমন সময় বোধ হয় ইশারায় নিরস্ত করলো তাকে। আমাকে লক্ষ্য করে বললো, মরার আগে তোর শেষ ইচ্ছা কী বল। আমার এখানে তোর সাজপোশাক সামান-পত্র সোনাদানা টাকা পয়সা যা কিছু আছে যাকে যা দিতে চাস দিয়ে যা। তোর মতো কলঙ্কিনীর একটা কুটোও আমার ঘরে রাখবো না আমি।

মুখটা একটু উঁচু করে তুলে বললাম, আমাকে তো তুমি মারবেই। তবু একটুখানি সবুর করো, আমার কয়েকটা কথা বলার আছে, বলে যাই ঃ

যদি জ্বালিয়ে ছিলে প্রেমের শিখা
(তবে) এমন কোরে নিভিয়ে দিলে কেনো?
যদি এমনি করেই ঝরিয়ে দেবে ফুল
(তবে) আদর করে ফুটিয়েছিলে কেনো?

চিৎকার করে উঠলো আমার স্বামী।—থামাও, থামাও তোমার ন্যাকামী। প্রেম—ভালোবাসা অতো বড় বড় কথা তোমার পাপ মুখে মানায় না, বুঝলে?

আমি আবার আবৃত্তি করলাম ঃ

ভালোবাসার প্রথম পাঠ
তোমার কাছেই পেলাম।
মরবো আমি দুঃখ নাই,
রইলো আমার সেলাম॥

—ঢং দেখাবার জায়গা পেলে না? আমার কাছে প্রেমের প্রথম পাঠ নিয়েছো? কেন, তোমার সে সব পীরিতের নাগররা কি করেছে এতোদিন?

তার একথা কানে শুনলাম না। প্রতিবাদও করলাম না। বিশ্বাস করবে না। কী লাভ? শুধু তাকে মনে করিয়ে দিলাম ঃ

সোহাগ করে বলেছিলে কপোলখানি চুমি।
বিশ্ব যদি নিঃস্ব হয়—রইবো আমি তুমি॥

—যা বলেছিলাম অন্তর থেকেই বলেছিলাম। ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম তোমাকে। কিন্তু তার মর্যাদা বুঝলে না। আমি তোমার রূপে, তোমার মন ভোলানো মুখের কথায় ভুলেছিলাম। আজ আমার ভুল ভেঙে গেলো। তুমিই আমার মোহ কাটিয়ে দিলে।

কবির ভাষাতেই বলি ঃ

ভালোবাসায় অন্ধ ছিলাম
তুমিই আমার দিয়েছো খুলে চোখ।
মৃত্যু হলো আমার প্রেমের,
কেমন করে সইবো বলো, শোক॥
কুসুম-পেলব দেহ তোমার
খাঁড়ার ঘায়ে দুভাগ করে দেবো।
মরবে তুমি—বাঁচবে তুমি;
সকল দুঃখ পাঁজর পেতে সবো॥

আমার চোখ জলে ভরে এলো। এতো অবিশ্বাস, এতো সন্দেহ! কিন্তু যে ঘটনা ঘটে গেছে তার জন্যে আমি কতটুকু দায়ী? সবই নিয়তি। আমি তো এ সর্বনাশ আমার চাইনি। ঐ শয়তানী বুড়িটাই তো আমাকে কলঙ্কের মুখে ঠেলে দিলো? তাই আমার অমন ভালোবাসার স্বামী আজ এতো নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে। সে কি সব ভুলে গেছে? কত প্রেম কত ভালোবাসা?

তোমার উদ্দাম প্রেম, উচ্ছল যৌবন,
আমার সুখের নীড়—স্বর্গ-উপবন,
ভুলে গেছো সব প্রিয়? কত ভালোবাসা
কি করে বোঝাই বলো! মুখে নাই ভাষা।

—থাক থাক, আর বুঝিয়ে কাজ নাই, অনেক বুঝেছি। এবার মৃত্যুর জন্যে মাথা পেতে দাও।

মৃত্যুকে সামনে দেখেও মৃত্যুভয় আমাকে বিচলিত করেনি। শুধু ভাবতে লাগলাম, লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিচ্ছে কেন সে? কী আমার অপরাধ খতিয়ে দেখলো না। এক কথায় কাজীর বিচারের মতো রায় হয়ে গেলো। মৃত্যুদণ্ড! একি তার ক্রোধ, না ছল! পুরুষের কাছে একটা মেয়ের যৌবন আর ক'দিন ভালো লাগে?

ভালোবাসার শাঁসটা খেয়ে
ছোবড়াখানা ফেলবে ছুঁড়ে,
কি আর এমন নতুন কথা!
সবাই জানে বিশ্ব জুড়ে।
তোমার প্রেমে গলদ ভরা
আগাগোড়া সবটা জাল।
রইলো আমার ভালোবাসা
তারার মতো জ্বলবে চিরকাল॥

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। হায় আল্লাহ এই কি আমার ভালোবাসার পরিণাম! আমার অনিচ্ছায় যে পাপ আমি করেছি, তার কি ক্ষমা নাই! আমি নিতান্তই বোকা-সোকা মেয়ে। অতোশতো বুঝিনি। হঠাৎ কোথা দিয়ে কি হয়ে গেলো, জানি না। আমার মতো বোকা মেয়েরা যেন প্রেমের ফাঁদে পা না দেয়। কাতর কণ্ঠে তাকে বললাম ঃ

এই অনুনয় ওগো প্রিয়, একটি কথা রাখো,
মারার পরে গোরস্তানে এই কথাটি লিখো ঃ

'ভালোবাসা তারই সাজে হিসাব যে-জন জানে।
বোকা মেয়ের বোকা প্রেম মৃত্যু ডেকে আনে॥'

আমার স্বামী শান্ত হলো না। তুমি বোকা মেয়ে? তোমার মতো নাগর নাচানো ঘড়েল মেয়ে ক'টা আছে। এ পাপের ফল তোমাকে পেতে হবে।

ওরে পাপীয়সী নারী, কেনো করেছিলি পাপ?
দোজকে যখন যাবি—হবে নাকি অনুতাপ!

এই বলে আবার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। সাদ, কাটো, কেটে ধড়-গর্দান আলাদা করে ফেলো। আমি আর ওর মুখদর্শন করতে চাই না।

হাবশীটা তরবারি উঁচিয়ে ধরেছে এমন সময় সেই বুড়িটা ঢুকলো ঘরে।—দোহাই বাবা, ওকে মেরো না। ওর কোন দোষ নাই। আমি তোমার মায়ের সমান। ছোট থেকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি তোমাকে। আমার একটা কথা রাখো বাবা। ওকে আর যে শাস্তিই দাও, জানে মেরো না। এমন গোস্তাকি সে করেনি, যাতে ওকে জান খোয়াতে হবে।

ছোটবেলায় আমার স্বামীর মা মারা যায়। তখন থেকে এই বুড়ি তাকে লালনপালন করেছে। সেই আব্দারে সে আমার প্রাণ-ভিক্ষা করছে।—কম বয়েসের নওজোয়ান লেড়কী। এ বয়সে একটু আধটু ভুলচুক হয়েই থাকে, বাছা। তা একটু ক্ষমা ঘেন্না করে দাও। এবারের মতো ওকে মাফ করে দাও, বাবা। আমি কথা দিচ্ছি, আর কখনও খারাপ কাজ করবে না সে। আমি চোখে চোখে রাখবো।

বুড়ির কথায় বোধ হয় কাজ হলো। গুম্ মেরে দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ। তারপর বললো, শুধু তোমার কথায় আজ ওকে জানে মারলাম না। কিন্তু এমন চিহ্ন এঁকে দেবো ওর শরীরে যা চিরকাল মনে করিয়ে দেবে এই বিশ্বাসঘাতকতা।

তার হুকুমে আমাকে বিবস্ত্র করা হলো। একখানা লিকলিকে বাঁশের কঞ্চি কেটে এনে সপাং সপাং করে নিজের হাতে মারতে থাকলো আমার পিঠে। কয়েক ঘা পরেই অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে গেলাম তার পায়ের উপর। আরও কত ঘা বসিয়েছিলো তা বলতে পারবো না।

সারা রাত কিভাবে কেটেছে জানি না। সকাল বেলায় যখন জ্ঞান হলো দেখলাম, আমার নিজের বাড়ির একটা ঘরে পড়ে আছি আমি। সারা দেহ চাবুকের কষাঘাতে জর্জরিত। বেশ কয়দিন আমি উঠে দাঁড়াতে পারিনি। সারা অঙ্গে ক্ষত। অনেক মলম, অনেক দাওয়াই লাগিয়ে বেশ কিছুদিন পরে খানিকটা সুস্থ হতে পারলাম। ঘাগুলো শুকিয়ে গেলো। কিন্তু দাগগুলো মিলালো না। কাল রাতে আমার সারা শরীরে এই দাগগুলোই দেখেছেন আপনারা।

মাস চারেক পরে ঘাগুলো সব শুকিয়ে গেলো। পুরো সুস্থ হয়ে উঠলাম। একদিন পায়ে পায়ে আমার স্বামীর বাড়ির পথে এগিয়ে চললাম। কিন্তু অবাক, কে বা কারা বাড়িটা গুড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে। অতো বড় একটা প্রাসাদের মতো বাড়ি একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে আছে। অথচ তার আশেপাশের বাড়ির এতোটুকু ক্ষতি হয়নি। পাশের অনেক লোককে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু কেউ আমার কথার জবাব দিলো না। কেউ বললো না, আমার স্বামী বেঁচে আছে কি নাই। কিংবা সে অন্য কোথাও চলে গেছে কিনা।

এরপর আমি আমার ছোট বোন ফহিমার কাছে চলে যাই। পরে ফহিমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসি আমার এই দিদি জুবেদার বাড়িতে। আমার দুঃখের কাহিনী শুনে মর্মাহত হলো দিদি। তবু আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, দুখ করিস নে বোন। দুনিয়ায় একটা মানুষও দেখাতে পারবি না, যে সব দিক থেকে সুখী। সুখ দুঃখ মিলে জীবন। আমাদের বাসনা সুখটাই বেশী পাই,

কিন্তু আল্লাহর বিধান তা নয়। দুঃখের ভাগটাই বেশী করে দেন তিনি। যাতে সুখের স্বাদটা আরও ভালো করে অনুভব করতে পারি।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিদি বলে, মনে কোন ক্ষোভ রাখিস নে। দুঃখ যখন এতো পেয়েছিস, এবার সবুর কর, সুখও পাবি। আমার কাছে থাক তোরা। এক সঙ্গে তিন বোন থাকবো। খাবোদাবো বেড়াবো, হাসবো, গাইবো, নাচবো। কিন্তু শাদী করবো না কেউ। কোন্ পুরুষ কি ধাঁচের কে জানে! কী দরকার ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে।

সেই থেকে আমরা আর বিয়ে শাদী করিনি। খাইদাই, মনের আনন্দে গান গাই। খাসা আছি। আমরা আমাদের কাজ কাম ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছি। আমি বাজার হাট করি—খানাপিনা বানাই। আর ছোট ঘরদোর গুছিয়ে রাখে। আর দিদি জুবেদা সে গৃহকর্ত্রী। তার কথাতেই সব চলে।

কোন পুরুষের সঙ্গ ছাড়াই দিব্যি দিন কাটছিলো আমাদের। অনেক কাল বাদে ঐ কুলীছেলেটা এসেছিলো বাজারের মোট নিয়ে। তাকে নিয়ে বেশ হৈহল্লা করে কেটে গেলো সারাটা দিন। তারপর আশ্রয়হীন এই তিন কালান্দার ফকির এলো আমাদের ঘরে। তার পরেই আপনাদের আগমন। এর পরের ঘটনা তো সবই আপনাদের জানা।

এই হলো আমারে দুর্ভাগ্যের কাহিনী।

আমিনার কাহিনী শুনে প্রীত হলেন খলিফা।

এই সময়ে দেখা গেলো রজনী অতিক্রান্ত প্রায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে রইলো।

অষ্টাদশ রজনীর মধ্যভাগে আবার গল্প বলতে আরম্ভ করে শাহরাজাদ।

জুবেদা আর আমিনার কাহিনী শোনার পর তাদের ছোট বোন ফহিমা, সেই দুই কালো কুক্কুরী আর তিন কালান্দারকে খলিফার সামনে হাজির করা হলো।

জুবেদা আর আমিনার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন খলিফা। অনুলেখকরা পাণ্ডুলিপি পেশ করলো খলিফার সামনে।

জুবেদাকে লক্ষ্য করে বাদশাহ বললেন, যে জিনিয়াহ তোমার এই দুই বোনকে কুকুর বানিয়ে রেখেছে তার কোন পাত্তা জানো।

জুবেদা বললো, আমি তার ঠিকানা বলতে পারবো না ঠিকই, কিন্তু দরকার হলেই সে এসে হাজির হবে আমাদের সামনে।

মাথার দু'গাছি চুল ছিঁড়ে হাতে নিয়ে খলিফাকে বললো, এই চুল দু'গাছি পুড়িয়ে দেওয়া মাত্র সে সামনে হাজির হবে জাঁহাপনা।

খলিফার হুকুমে চুলের গাছিখানা জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। আর সেই মুহূর্তে সারা দরবার মহল, সারা প্রাসাদ দুলতে লাগলো। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। হঠাৎ দেখা গেলো এক রূপ যৌবনবতী হাবশী কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে দরবারের এক প্রান্তে। জুবেদা তাকে কাছে ডাকলো। খলিফাকে বললো, এই সেই জিনিয়াহ হুজুর।

জিনিয়াহ এগিয়ে গিয়ে সালাম জানালো খলিফাকে।—আল্লাহর পয়গম্বর আপনি, আমার সালাম জানাই আপনাকে।

খলিফা আশীর্বাদ করলেন, তোমার কল্যাণ হোক।

জিনিয়াহ বললো, এই যুবতী এক সময়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো। তারই প্রতিদান স্বরূপ আমি তার কিছু উপকার করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। এই কুক্কুরী দু'টো তার দুই বোন। এরা তার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলো। তাই তাদের আমি কুক্কুরী বানিয়ে

রেখেছি। আপনি যদি চান, আমি ওদের শাপমুক্ত করে আবার আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে পারি।

খলিফা বললেন, আমার মনে হয় তাদের কৃতকর্মের যথেষ্ট ফলভোগ তারা করেছে। এবার এদের মুক্তি দাও। তারপর দেখছি আমিনার ব্যাপারটা। যদি তার কাহিনী সত্য হয় তবে যেমন করেই হোক, তার স্বামীকে খুঁজে বের করতে হবে আমার সারা সল্-তানিয়ৎ ঢুঁড়ে। আমার দেশে এতো অত্যাচার কিছুতেই সহ্য করবো না আমি।

জিনিয়াহ করজোড়ে বললো, আপনি যা চান এখুনি করে দিচ্ছি আমি। কুক্কুরী দু'টোকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে দিচ্ছি। তার আগে বাদশাহর কাছে ছোট্ট একটা কথা বলতে চাই।

খলিফা কৌতূহলী হলেন।—বলো।

আমিনার সেই অত্যাচারী স্বামীকে পলকের মধ্যেই হাজির করতে পারেন আপনি। সে আপনার খুব কাছেই থাকে।

—কে সে?

—সে আপনার পুত্র, অল-আমিন।

সমস্ত দরবার ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলো। কারো মুখে কোন কথা নাই। শুধু খলিফার একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেলো।

একটা পাত্রে খানিকটা জল মন্ত্রপুত করে কুক্কুরী দু'টোর গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় করে কি সব আওড়ালো জিনিয়াহ। তারপর দেখা গেলো, ধীরে ধীরে রূপলাবণ্যবতী যুবতীর আকার ধারণ করলো ঐ কুক্কুরী দু'টি।

এতক্ষণ দরবারের কেউ কোন শব্দ উচ্চারণ করেনি। খলিফাও না। বোধ হয় জিনিয়াহর কথায় মর্মাহত হয়ে ভাবছিলেন, কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? কোন মানুষের কথা হলে অবিশ্বাস করার কারণ অবশ্যই ছিলো। প্রমাণপত্রের প্রয়োজন হতো। কিন্তু এতো জিনিয়াহর কথা। ওরা তো সর্বজ্ঞ। ইচ্ছা করলেই সব কিছু জানতে পারে। পুত্রকে ডেকে পাঠালেন খলিফা। অল-আমিন এলে কৈফিয়ৎ তলব করলেন তিনি।

নিজের কোলে ঝোল টেনে মোটামুটি কাহিনী বিবৃত করলো সে। সে কাহিনী থেকে তাকে খুব একটা দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। যাই হোক, খলিফা তলব করলেন মৌলভীকে। তৎক্ষণাৎ হাজির হলো মৌলভী। শাদীর কবুলনামা লেখা হলো। অল-আমিনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার শাদী হলো আমিনার। জুবেদার সঙ্গে শাদী হলো প্রথম কালান্দার-এর। আর জুবেদার দুই সহোদর বোনের সঙ্গে শাদী দেওয়া হলো অন্য দুই কালান্দারের। আর খলিফা নিজে গ্রহণ করলেন ছোট বোন কুমারী ফহিমাহকে।

খলিফা হারুন-অল-রসিদ প্রত্যেক জুটির জন্যে একটা করে প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে উপঢৌকন দিলেন প্রচুর ধনদৌলত। সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করতে লাগলো তারা।

—কিন্তু, শাহরাজাদ বলে, এ কাহিনী আপনার কেমন লাগলো জানি না, জাঁহাপনা। তবে এর পরের যে কাহিনী শোনাতে চাই তা আরও চমৎকার আরও মজাদার। কিন্তু শাহেনশাহর কি আর শোনার ধৈর্য হবে?

শারিয়ার মুচকী হাসলো, মেয়েটা তো ভারি রসিক। এমন রসের গল্প ফাঁদবে; আবার ঠুকে কথা বলবে, 'শোনার ধৈর্য হবে' কিনা। শাহরাজাদের দিকে ফিরে বলে, বেশ তো হচ্ছে। বলো, শুনি।

একদিন রাতে খলিফা হারুন-অল-রসিদ উজির জাফর অল-বারমাকীকে বললেন,

আজ রাতে শহরের ভিতরটা একটু ভালো করে ঘুরে দেখতে চাই। আমার কাছে কিছু নালিশ এসেছে। নগরপাল এবং ওয়ালিরা নাকি তাদের কাজে গাফিলতি করছে। যদি প্রমাণ পাই, তবে ওদের বরখাস্ত করবো আমি।

জাফর সবিনয়ে বললো, হুজুরের যেমন মর্জি।

খলিফা, জাফর এবং খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর শহরের পথে বেরিয়ে পড়ে। এক সরুগলি দিয়ে যাবার সময় খলিফা দেখলেন, এক বৃদ্ধ ধীবর তার মাছধরা জাল মাথায় নিয়ে চলেছে। আর স্বগতোভাবে মনের দুঃখ প্রকাশ করছে।—এতো বড় শহরে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও দু'খানা রুটি দিতে পারি না বাছাদের। কি নসীব নিয়ে জন্মেছি, খোদা। এই কি তোমার বিচার।

বৃদ্ধের কথা শুনে খলিফা এগিয়ে গেলেন। মনে হলো লোকটা অনেক দুঃখ কষ্টে দিন কাটায়। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বাবা, তোমার কীসের কারবার?

—আমি মাছ ধরে খাই, মালিক। বুড়ো হয়ে গেছি। খাটার বল কমে গেছে। কিন্তু সংসারটা কম না, বেশ বড় সড়। সেই দুপুর থেকে এখন পর্যন্ত খেটে চলেছি। কিন্তু আল্লাহর কি বিচার, এখন পর্যন্ত বাল-বাচ্চাদের মুখে দু'খানা—পোড়া রুটি যোগাবার পয়সা রোজগার হলো না। রোজ এই একই হাল। চোখের সামনে ছেলেমেয়েদের কষ্ট আর সহ্য হয় না। খোদার কাছে আর্জি জানাই আর কেন, এবার কোলে টেনে নাও।

খলিফা বললেন, আমার একটা কথা শুনবে? নদীর ধারে চলো। টাইগ্রিস-এর পানিতে একবার মাত্র জাল ফেলবে তুমি। জালে যা উঠবে আমার। আর যদি কিছু নাও ওঠে তবু তোমাকে একশো দিনার দেবো। তোমাকে দিয়ে আজ আমার ভাগ্য পরীক্ষা করাতে চাই।

বৃদ্ধ উল্লসিত হলো, এ আর এমন কি কথা, চলুন মালিক।

টাইগ্রিসের তীরে এসে জাল ফেললো বৃদ্ধ। আস্তে আস্তে গুটিয়ে আনলো উপরে। মাছটাছ কিছু ওঠেনি। উঠে এসেছে একটা তালাবন্ধ বাক্স। পেল্লাই ভারি। খলিফার কাছ থেকে একশোটা দিনার নিয়ে খুশি হয়ে চলে গেলো বৃদ্ধ। জাফর আর মাসরুর ধরাধরি করে বাক্সটা নিয়ে এলো প্রাসাদে। একটা চিরাগবাতি এনে আলো দেখালেন খলিফা। মাসরুর ভেঙে ফেললো বাক্সের তালাটা। ডালাটা তুলতেই দেখলো, কতকগুলো তালের পাতা। পাতাগুলো সরাতেই চোখে পড়ে একখানা কার্পেট। তারপর একখানা সাদা বোরখা। তারপর এক বীভৎস দৃশ্য—একটা মেয়েকে টুকরো টুকরো করে কেটে দেহাংশগুলো সাজানো আছে। শিউড়ে উঠলেন খলিফা। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। দু-হাতে চোখ ঢাকলেন তিনি। চিৎকার করে জাফরকে বললেন, আমার সলতানিয়তে এই সব কাণ্ড ঘটছে, জাফর। তোমরা কেনো আছো আমার দরবারে। কি কর তোমরা, সব অপদার্থ? এইরকম নিষ্ঠুরভাবে মানুষ মানুষকে খুন করছে। আর তোমরা আমাকে বোঝাচ্ছো, এমন ন্যায় বিচারের দেশ আর হয় না। যত্তো সব ধোঁকাবাজী। শোনো, জাফর, তোমাকে তিন দিনের সময় দিচ্ছি আমি। তার মধ্যে যদি এই খুনীকে ধরে না আনতে পারো তা হলে তোমার প্রাণ যাবে। ঐ যে দেখছ দরবারের সিংদরজা—ওই দরজার পাল্লায় পেরেক দিয়ে গেঁথে মারা হবে তোমাকে। আর শুধু তোমাকে না, তোমার বংশের যত মেয়েপুরুষ আছে সবাইকে এনে কোতল করা হবে। তোমার বংশ আমি নির্বংশ করে দেবো। যাও, তিন দিনের সময় দিলাম। তার মধ্যে খুনীকে খুঁজে বার করো। এতো বড় একটা অপরাধ নিজের চোখে দেখে চুপচাপ সহ্য করতে পারি না আমি। এর বিহিত করতেই হবে আমাকে। তা না হলে আল্লাহর দরবারে শেষ বিচারের দিনে কী জবাবদিহি করবো আমি?

বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরে আসে জাফর। এতো বড় একটা শহর। কে কোথায় কাকে খুন করেছে কী করে তার হদিশ মিলবে। যে খুন করেছে সে কি সেধে এসে বলবে, আমি

খুন করেছি? আর যে খুন করে, সেকি কোন সাক্ষীসাবুদ রেখে করে? আর যদি কারো চোখেই পড়তো তা সে তো নিজে থেকেই দরবারে এজাহার দিয়ে যেতো। এখন শুধু-মুদু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কোন ফয়দা আছে? একি গরুছাগল হারিয়েছে—যে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় পাওয়া যাবেই। আর বিনা কারণে যাকে তাকে সন্দেহ করে ধরে আনাও তো ঠিক না। কারণ এ বিচারের একমাত্র সাজা প্রাণদণ্ড। তা সন্দেহ করে কোন লোককে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া তো উচিত হবে না। আবার খালি হাতে গেলেও নিস্তার নাই। খলিফার মুখ থেকে একবার যে কথা বেরিয়েছে তার নড়চড় হবার জো নাই। উভয় সংকটে পড়লো জাফর। একদিকে তার নিজের এবং পরিবারের প্রাণ সমস্যা—অন্য দিকে কোন নিরীহ লোকের জীবননাশের আশঙ্কা। অনেক ভেবে চিন্তে জাফর ঠিক করলো, যায় যাক প্রাণ, তবু সে মিথ্যাচার করতে পারবে না। যাকে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাড়ি-কাঠে ঢুকিয়ে দেবার পাপ সে কিছুতেই করবে না।

তিন দিন কেটে গেলো। জাফর চিন্তায় জর্জরিত। দেহটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে এলো দরবারে। মৃত্যু অবধারিত। সে জন্যেও সে ভীত নয়। তার শুধু চিন্তা তার পরিবারের চল্লিশজন নিরপরাধী ছেলেমেয়ে নারীপুরুষেরও প্রাণ যাবে আজ তারই কারণে। এই পাপই বা সে রাখবে কোথায়। চিন্তায় চিন্তায় জাফরের শরীর আধখানা হয়ে গেছে এই তিন দিনে।

চার দিনের দিন সকালবেলায় দরবারে এলো জাফর। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, খুনীর হদিশ পেয়েছো?

জাফর বলে, কেউ কি সেধে এসে আমাকে ধরা দিয়ে বলবে, সে খুন করেছে। আর সারা শহরে কোথায় খুঁজবো? না আমি হাত গুণতে জানি? না, লোকের মুখের চেহারা দেখে বোঝা সম্ভব?

জাফরের কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো খলিফা। তোমার কোন ওজর শুনতে চাই না। আমি তোমাকে শূলে দেবো।

জল্লাদকে ডেকে হুকুম দিলো, জাফরকে দরবারের সদর দরজার পাল্লায় শূলে গেঁথে হত্যা করবে। তার আগে সারা শহরে ঢ্যাড়া পিটিয়ে আমার এই ফরমান জারি করে দাও। যারা দেখতে চায় আসতে পারে।

খলিফার এই হুকুমনামায় শঙ্কিত হয়ে উঠলো শহরবাসী। তার মতো জ্ঞানীগুণী সজ্জন মানুষকে হত্যা করার কী কারণ ঘটতে পারে, কিছুই বুঝতে পারলা না কেউ। প্রতি ঘরে প্রতি জনে নানারকম জল্পনা করতে লাগলো। কেউ বললো, আহা বড় ভালো লোক ছিলো। কেউ বলে, অমন ইমানদার লোক আজকালকার দিনে হয় না। কেউ অনুমান করার চেষ্টা করে, নিশ্চয়ই এমন কোন মারাত্মক গোস্তাকি করেছে—যার জন্যে খলিফা ক্ষেপে আগুন হয়ে বারমাকী বংশ নির্বংশ করে দিচ্ছে।

সারা শহর ভেঙে পড়লো প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। এমন দৃশ্য দেখবে তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। কান্নার রোল উঠলো। এমন একটা সাচ্চা আদমী আজ শূলে যাবে! যেন তাদের কোন আপনজন হারাতে বসেছে তারা। জাফর, আর তার পরিবারের সবাইকে সকলেই ভালবাসতো। তাদের আচার ব্যবহার, দয়াদাক্ষিণ্য সকলের মন কেড়ে নিয়েছিলো।

শূলে বিদ্ধ করার সব আয়োজন শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা—খলিফার হুকুমের। হঠাৎ একটা সোরগোল পড়ে গেলো। এক যুবক ভীড় ঠেলে খলিফার একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। মাটিতে দু-হাত ছুঁইয়ে কুর্নিশ জানালো খলিফাকে। তারপর বললো, আপনি আল্লাহর পয়গম্বর দীনদুনিয়ার মালিক, আপনাকে আমার একটা কথা বলার আছে।

—কী কথা?

আপনি জাফর সাহেবকে বিনা দোষে হত্যা করবেন না। আমিই সেই আসামী। আমিই ঐ মেয়েটাকে খুন করে টাইগ্রিসের জলে ফেলে দিয়েছিলাম। ওঁকে রেহাই দিয়ে আমাকে হত্যা করুন, জাঁহাপনা। ওঁর কোন দোষ নাই।

যুবকের কথা শুনে জাফরের অন্তর ব্যথায় টনটন করে ওঠে। আহা, বেচারা। কিন্তু নিজের পক্ষে যে এটা কত বড় আনন্দের খবর তা সে ভুলেই গেলো। যুবকের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ শোনার জন্য প্রশ্ন করতে যাবে এমন সময় পিছন থেকে এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলো সামনে।

—ওর কথা বিশ্বাস করবেন না, হুজুর। ও সব বানিয়ে বলছে। আসলে খুন করেছি আমি। শাস্তি যা দেবার আমাকে দিন, হুজুর। যুবক তখন প্রতিবাদ করে বলে, উজির সাহেব, লোকটার বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে। আপনি ওর কথা শুনবেন না। যেমন আপনার ইচ্ছে সেইরকম শাস্তি আমাকে দিন; আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।

বৃদ্ধ তখন যুবকের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, বাবা, তোমার বয়স কম; আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আজ বাদে কাল মরে যাবো। কেন বাধা দিচ্ছো। আমার এই বরবাদ হয়ে যাওয়া জানটার বদলে তোমার, উজির-সাহেব আর তার পরিবারের সকলের জান যদি বাঁচে তাতে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী সুখী হবে না। তুমি বাধা দিও না, সরে যাও। জাঁহাপনা আমি আবার বলছি, আমিই সেই খুনী। আমাকে শাস্তি দিন।

খলিফা হারুন-অল-রসিদ মহা ফাঁপরে পড়লেন। এ আবার কি অদ্ভুত কথা। জাফরকে বললেন, ওদের দু'জনকেই শূলে চাপাও।

জাফর বললেন, কিন্তু একজনের অপরাধে দু'জনের প্রাণদণ্ড—এ যে ঘোরতর অবিচার হবে, জাঁহাপনা।

যুবক তখন চিৎকার করে বলতে থাকে, এই চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা যার হুকুমে কাজ করে সেই পরম পিতা আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি, খুন আমি করেছি। এবং তার প্রকৃত প্রমাণ আমি খাড়া করতে পারি।

এই বলে যুবক কী করে মেয়েটাকে খুন করেছিলো তার আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করলো। যুবকের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো খলিফার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী করে খুন করেছিলে তাতো শুনলাম। কিন্তু কেন খুন করেছিলে, সে কথা বলতো! আর খুন করে সব প্রমাণপত্র লোপাট করার জন্যে যদি লুকিয়ে ছুপিয়ে লাশটাকে নদীর পানিতেই ডুবিয়েই দিয়েছিলে, তবে আর নিজে থেকে এসে ধরাই বা দিলে কেন? কী ব্যাপার?

যুবক তখন বলতে থাকে। তবে শুনুন জাঁহাপনা, এই মেয়েটি আমার শাদী করা বিবি। এই বৃদ্ধ তার বাবা—আমার শ্বশুর। অনেক দিন আগে আমাদের শাদী হয়েছে। একসঙ্গে ঘর করেছি সুখে দুঃখে। আমার তিনটি সন্তানের মা সে। আদর্শ ঘরণী হিসাবে কোন খুঁত ছিলো না তার। আমি তার স্বামী—আমার ওপর তার গভীর ভালোবাসা ছিলো বরাবরই।

এই মাসের গোড়ার দিকে সে অসুখে পড়ে। আমার সাধ্যের অতীত নামকরা হেকিমকে দিয়ে দেখালাম। দাওয়াই পত্র খাওয়াতে লাগলাম। আমার দোকান-পাট মাথায় উঠলো। বিবির বিমার আর সারতে চায় না। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো সে। কয়েকদিন বাদে জ্বরের প্রকোপটা একটু কমলো বটে, কিন্তু একেবারে ছেড়ে গেলো না। মুখে রুচি নাই। কিছুই খেতে পারে না। ঘুসঘুসে জ্বর প্রায় সারাদিন লেগেই থাকে।

একদিন আমাকে বললো, কিচ্ছু খেতে রুচছে না মুখে। যদি পারো ভালো দেখে আপেল পাও তো নিয়ে এসো।

কিন্তু সারা বাজার ঢুঁড়েও কোন ভালো জাতের আপেল পেলাম না একটা। পাওয়া গেলো না, পাওয়া যাবে না একথা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না তার কাছে। তখন আমার একমাত্র চেষ্টা, কী করে তাকে ভালো করা যায়, কী করে তাকে খুশি রাখা যায়, কী করে তার মুখে একটু হাসি ফোটানো যায়।

রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, কাল সকালে আপেলের বাগানে যাবো। যদিও এটা আপেলের মরশুম না, তবু কোন কোন গাছে দু-চারটে আপেলও তো ধরতে পারে।

ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়লাম। অনেকগুলো বাগানে ঘুরলাম। কিন্তু না, কোন গাছেই আপেল নাই। শেষে এক বাগানের বৃদ্ধ মালিক আমাকে বললো, এ সময়ে আপেল পাওয়া খুবই মুসকিল বাছা। এ তল্লাটে কোথাও পাবে না। একমাত্র পাওয়া গেলেও যেতে পারে—যদি বসরাহর বড় বাজারে যাও। ওখানে কিছু ফল আসে। তবে শুনেছি, সে আপেল সাধারণ লোকের খাবার জন্যে বিক্রী হয় না। সবই চলে যায় খলিফার প্রাসাদে।

বাড়ি ফিরে এসে বিবিকে বললাম সব কথা। শুনে সে নির্বিকারভাবে বললো, পাওয়া যখন যাবে না,—তুমি আর কি করবে।

মনটা আমার খারাপ হয়ে গেলো। ঠিক করলাম, বসরাহর বাজারেই যাবো। পনেরো দিনের পথ। পথের শ্রান্তির কথা ভুলে গেলাম। আল্লাহর নাম নিয়ে বসরাহর পথে পা বাড়ালাম।

বরাতের জোরে তিনটি আপেল জোগাড় হলো। ইনাম মোট তিন দিনার। তা হোক। বিবির যদি মুখে রুচি ফিরে আসে তা হলেই আমার এতো পরিশ্রম, এতো দাম দিয়ে কেনা সার্থক হবে।

মনে বড়ো আশা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আপেল কটা দেখে নিশ্চয়ই সে খুশি হবে। কিন্তু না, আপেল তিনটে হাতে করে নিয়ে একপাশে রেখে দিলো সে। বোধ হয় শরীরটা আবার বেশি খারাপ হয়েছে। আমিও মুসড়ে পড়লাম। পরে শুনলাম, আমি যে দিন বসরাহর বাজারে আপেল সওদা করতে রওনা হয়ে গিয়েছিলাম সেই দিনই আবার কাঁপিয়ে জ্বর এসেছিলো তার। গতকাল থেকে একটু কম।

আমার আর দোকান-পাট খোলা হলো না। বিবির শয্যাপার্শ্বে বসে রইলাম এক হপ্তা। এই ক'দিনের দাওয়াইপত্র আর আমার অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায় একটু ভালোর দিকে মনে হলো। আল্লাকে স্মরণ করে দোকানে গিয়ে বসলাম পরদিন।

ঠিক দুপুর বলা যায় না তখনও—দেখলাম একটা নিগ্রো ছোঁড়া একটা আপেল এক হাত দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে অন্য হাতে লুফতে লুফতে এগিয়ে চলেছে।

—ও ভাই, শুনছো, নিগ্রো ছেলেটাকে ডাকলাম আমি। আচ্ছা বলতে পারো, এই অসময়ে এই আপেলটা কোথায় পেলে তুমি?

—আমার পিয়ারীর কাছ থেকে পেয়েছি, কেন?

—পিয়ারী, কে তোমার পিয়ারী? কোথায় থাকে সে?

নিগ্রো যুবকটা বেশ গর্বের সঙ্গেই জবাব দেয়, ঐ যে তাঁতীপাড়ায় ঢুকতে একটা ছোট্ট তালাও আছে না? সেই তালাও-এর পশ্চিম পাড়ের যে জাফরানী রঙের বাড়িটা—সেই বাড়ির একটা মালিকের বিবি আমার ভালোবাসা। লোকটা এমন হাঁদা কিস্‌সু বোঝে না। বিবি-অন্ত প্রাণ। ব্যাটা মেয়েমানুষের কথায় ওঠ্ বোস্ করে। ওর বিবিটার আজ মাস-খানেক বিমার। আহাম্মকটা পনেরো দিনের পথ হেঁটে বসরাহর বাজারে গিয়েছিলো আপেল আনতে। মনে আশা, যদি সে খুশি হয়। আমি আজ গিয়ে দেখি ওর বিছানার পাশে তিনটি আপেল। আমাকে এটা খেতে দিলো।

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগলো। আপনি বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, সেই মুহূর্তে মনে হলো সারা দুনিয়াটা মিথ্যে মস্ত বড় একটা ধাপ্পা। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। এই বিশ্বসংসার সব অন্ধকার হয়ে গেলো আমার চোখের সামনে। ক্রোধে উন্মত্ত এক সিংহের মতো ছুটে এলাম বাড়িতে—আমার বিবির ঘরে। হাতে আমার শাণিত ছোরা। কোন প্রশ্ন করলাম না, কোন কিছু জানতে চাইলাম না। শুধু একবার তাকিয়ে দেখলাম, আজ সাতদিন ধরে যেখানে তিনটি আপেল রাখা ছিলো সেখানে আজ দু'টি আছে—আর একটা নাই। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেলো জানি না, দেখলাম আমার ছুরিটা আমূল বসে গেছে আমার বিবির বুকে। এক অসহায় আর্তনাদ করে থেমে গেছে তার বুকের স্পন্দন—চিরদিনের মতো।

যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো, ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেলো। আমি খুন করে ফেলেছি। আমার ফাঁসী হবে। আতঙ্কে শিউড়ে উঠলাম। এখন কি করা যায়? হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এসে গেলো। ক্ষিপ্র হস্তে খাটের তলা থেকে একটা বাক্স টেনে বের করলাম। বিবির হাত, পা, ধড়, মুণ্ডু সব টুকরো করে কেটে বাক্সটায় ভরলাম। কার্পেট আর ওর বোরখাটায় রক্ত লেগে গিয়েছিলো। ও দু'টোও বাক্সে ভরে তালের পাতা দিয়ে ঢেকে বন্ধ করে দিলাম ডালাটা। একটা তালা এঁটে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এলাম টাইগ্রিসের জলে।

যুবক থামলো একটু। তারপর কাতর অনুনয় জানিয়ে বললো, আপনি ন্যায়বিচারক, আল্লার পয়গম্বর, আপনার কাছে আমার আর্জি, যতো তাড়াতাড়ি হয় আমার প্রাণদণ্ড মঞ্জুর করুন। তা না হলে আল্লাহর দরবারে আমাকে আরও কঠোর সাজা পেতে হবে।

আমি যখন টাইগ্রিসের জলের তলায় বাক্সটা ডুবিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম দেখি, আমার বড় ছেলেটা দরজার সামনে বসে আকুল নয়নে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে, কাঁদছিস কেন?

কাঁদতে কাঁদতে ও বলতে থাকে, মায়ের বিছানার পাশ থেকে একটা আপেল নিয়ে গিয়েছিলাম খেলা করতে। মা টের পায়নি। ঘুমিয়েছিলো। ভেবেছিলাম খেলাটেলা শেষ করে আবার ওখানে রেখে আসবো। কিন্তু পথ দিয়ে যাচ্ছিলো একটা তাগড়াই নিগ্রো। আমার গালে দু'টো থাপ্পড় দিয়ে আপেলটা কেড়ে নিয়ে দু-হাতে নাচাতে নাচাতে চলে গেলো। লোকটা কী জাঁদরেল। বাবাঃ দেখলে পিলে চমকে যায়।

ওর কথায় বুঝলাম, আপেলটার জন্যে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে সাহস করেনি। সদর দরজার ওপর বসে কাঁদছিলো। আহা বেচারী, ওর মা যে আর এ জগতে নাই, সে খবরও জানে না।

ছেলের কথায় বুঝলাম, যে ভুল আজ করলাম তার আর কোন চারা নাই। হারামজাদা নিগ্রোর বাচ্চা—একেবারে ডাঁহা মিথ্যা কথা বলে গেছে। বিবির কোনও দোষ ছিলো না। একটা নিষ্পাপ মেয়েকে খুন করার পাপ বোধ দংশন করতে লাগলো আমাকে। আমি আর আমার এই শ্বশুর সারা রাত ধরে কাঁদলাম।

আজ পাঁচদিন হলো আমি খুন করেছি আমার আদরের বিবিজানকে। পাঁচটা রাত ঘুমুতে পারিনি। মনের শোকতাপ প্রকাশ করতে পারিনি কারো কাছে। পারলেও বা কিছুটা

হালকা হতো বুকের জ্বালা। অপরাধী আমি, আমার শাস্তি একমাত্র মৃত্যু। আপনি আমার ভাগ্যবিধাতা, আল্লাহর পয়গম্বর। আপনার কাছে আমার একটাই আর্জি, আপনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি হয় শূলে দিন। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন আমাকে।

খলিফা বিস্ময়ে হতবাক। কয়েকটা মুহূর্তমাত্র। তারপর চিৎকার দিয়ে উঠলেন, আমি ওই বদমাইশ নিগ্রোটাকে শূলে দেবো। এতো বড় একটা সর্বনাশ সে করেছে?

এই সময় প্রভাত সমাগত দেখে গল্প থামিয়ে চুপ করলো শাহরাজাদ।

তারপর শুনুন শাহজাদা, শাহরাজাদ আবার উনিশতম রজনীর দ্বিতীয়যামে গল্প শুরু করলো, খলিফা দেখলেন, যুবকের কোন দোষ নাই। যত নষ্টের মূল ঐ নিগ্রোটা। বললেন, আমি ঐ নিগ্রোটাকে শূলে চড়াবো, ধরে নিয়ে এসো তাকে। তাকে যদি ধরে আনতে না পারো জাফর, তাহলে তোমাকেই শূলে চাপাবো আমি।

জাফর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গেলো।—কোথায় পাবো তাকে। কোথায় থাকে সেই নিগ্রো—কে তার হদিশ দেবে? এ যাত্রায় যদি বা বাঁচলাম, কিন্তু এর পরে বোধহয় বাঁচার আর কোন আশা নাই। এখন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাকে।

তিন দিন আর বাড়ি থেকে কোথাও বের হলো না। মনে মনে ভাবে এই তিন দিনে যদি খলিফার রাগ পড়ে যায়। যদি তিনি তাকে অব্যাহতি দেন। কিন্তু লোক মারফৎ খবর পাওয়া গেলো খলিফা প্রতীক্ষা করে বসে আছেন। জাফর নিগ্রোটাকে ধরে নিয়ে যাবে। আর তিনি তাকে শূলে চাপাবেন। আর যদি ধরে না নিয়ে যেতে পারে তবে তার মরার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন তিনি।

কাজীকে ডেকে পাঠালো জাফর। তার বিষয় সম্পত্তির উইল বানালো। বাচ্চাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরবারে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলো। একে একে সবাইকে আদর জানালো। সব শেষে সবচেয়ে ছোট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতে যাবে এমন সময় ওর কামিজের পকেটে কি একটা গোলাকৃতি বলের মতো বস্তু অনুভব করলো সে। অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে জাফর জিজ্ঞেস করলো, তোমার জেবে কী, বেটী?

—একটা আপেল আব্বাজান, আপেলটা বের করে দেখালো সে।—দিন চারেক আগে আমাদের নিগ্রো নফর রেহান আমাকে কোথা থেকে এনে দিয়েছে।

'নিগ্রো' এবং 'আপেল'এই শব্দ দু'টো শুনে কেমন যেনো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো জাফরের মুখ। এক মুহূর্ত। তারপর এক অদ্ভুত আনন্দে নেচে উঠলো তার সারা দেহ মন। তক্ষুণি ডেকে পাঠালো তাকে। রেহান এলে জিজ্ঞেস করলো, এই আপেলটা কোথায় পেয়েছিলি রে?

নিগ্রোটা বললো, আজ্ঞে মালিক, ক'দিন আগে পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখি, কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে। একজনের হাতে ছিলো এই আপেলটা। আমি ওকে দু'টো থাপ্পড় দিয়ে কেড়ে এনেছিলাম। আমাদের খুকুমণির জন্যে। ছেলেটা কেঁদে উঠে ফেরৎ চেয়েছিলো আমার কাছে। 'নিও না, ফেরৎ দিয়ে দাও ওটা। আমার মা আমাকে খুব বকবে। তার ভীষণ অসুখ। বাবা সেই বসরাহর বাজার থেকে তিনটি আপেল কিনে এনেছে মার জন্যে। মা একটাও খায়নি। আমি একটা চুরি করে এনেছি। ফেরৎ দিয়ে দাও আমাকে, তোমার দু'টো পায়ে পড়ি। না হলে মা আমাকে মারবে।' আমি কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে লুফতে লুফতে চলে এলাম। আমার তখন মনে ঘুরছে, খুকুমণি আপেলটা পেলে খুব খুশি হবে।

জাফর বড় সমস্যায় পড়লো। তার নিজের গৃহভৃত্য এর সঙ্গে জড়িত। ব্যাপারটা কেউ ভালো চোখে দেখবে না। কিন্তু হতভাগাটা একি কাণ্ড করে বসেছে। এই হ্যাপা এখন কী

করে সামাল দেবে সে? খলিফার যা রাগ, তাতে তো রেহাই দেবে বলে মনে হয় না। যাক, ভেবে আর কী হবে? রেহানকে বন্দী করে দরবারে নিয়ে এলো সে।

জাফর ভাবে, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে দু-দুবার কীভাবে সে রক্ষা পেলো। একেই বলে আল্লাহ যাকে বাঁচাবেন, মারবে কার সাধ্য?

প্রাসাদে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললো খলিফাকে। খলিফা শুনে তো অবাক।—এমন অদ্ভুত ব্যাপার তো জীবনে কখনও শুনিনি। সামান্য একটা তুচ্ছ ঘটনা একটা মানুষের জীবন নাশের কারণ; সে কথা কি ভাবতে পারে কেউ?

জাফর বলে, তাই হয় জাঁহাপনা। কোন একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাই অনেক বিরাট বড় একটা ঘটনার মূলসূত্র হতে পারে। সবই আল্লাহর খেলা। সবই নিয়তি। তা না হলে বেচারী যুবকটাই বা তার অতো পেয়ারের বিবিকে বিনা দোষে খুন করতে যাবে কেন? ওর হাতে ওর বিবির মৃত্যু নিয়তির লেখা ছিলো। ঐ আপেল আর নিগ্রোটার বোকামী সবই উপলক্ষ মাত্র। যাই হোক আপনাকে আমি এর চেয়েও অবাক করার মতো কাহিনী শোনাতে পারি জাঁহাপনা। উজির নূর-অল-দীন আর তার ভাই সামস্-অল-দীন-এর কাহিনী—আপনি শুনেছেন?

—না। কী সেই কাহিনী, শোনাও দেখি। জাফর বললো, বলবো নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা আর্জি—ঐ বেচারী নিগ্রোটাকে আপনি রেহাই দিন। ওটা একটা বোকা পাঁঠা। কিসে থেকে কি ঘটতে পারে সে চৈতন্য ওর নাই। ওর বোকামীর ফলে যা ঘটে গেছে তা আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু এও ঠিক, খুন করার জন্যে খুন করা, আর তার অজ্ঞাতসারে বোকামীর জন্যে কেউ খুন হয়ে যাওয়া এক নয়। ও জানেও না ওর একটা মিথ্যে কথা বলার জন্যে কী ঘটে গেছে। তাই আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি ওর দোষ মাফ করে দিন। আমি আপনাকে আরো অদ্ভুত, অবাক করার মতো কাহিনী শোনাচ্ছি।

খলিফা বললেন, ঠিক আছে আমি ওকে রেহাই দিয়ে দিলাম। সত্যিই তো, এই গুরুদণ্ড পাওয়ার মতো গোস্তাকি সে করেনি।

এক সময়ে মিশরে পরম দয়ালু ধর্ম পরায়ণ এক সুলতান প্রজাপালন করতেন। তার এক উজির ছিলো নানা বিদ্যায় বিশারদ। চাঁদের মতো সুন্দর দেখতে তার দুই যমজ পুত্র ছিলো। একটির নাম সামস্-অল-দীন, আর একটির নাম নূর-অল-দীন। বড়টি ছিলো যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি ছিলো তার আচার ব্যবহার। এক কথায় রূপ গুণে অসাধারণ। আর ছোটটি ছিলো আরও সুন্দর, আরো গুণবান। সারা দুনিয়ার সেরা ছেলে। মিশরে যে সব বিদেশীরা আসতো তারা অবাক হয়ে চেয়ে দেখতো তার রূপ।

উজিরের মৃত্যুর পর সুলতান সাদরে ডেকে নিলো দুই ভাইকে। তার দরবারে দু'জনকেই সমমর্যাদায় উজিরের আসন দিলো। নানা ধরনের মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে বললো, তোমরা আজ থেকে আমার দরবারে উজিরের কাজে বহাল হলে। বাবার স্মৃতির উদ্দেশে শোকপালন করে এক মাস বাদে তারা কাজে এলো দরবারে।

একদিন দুই ভাই দরবারে যাবার পথে এইরকম কথাবার্তা বলতে বলতে পথ চলছিলো :

বড়ভাই বলছিলো, এবার আমাদের বিয়ে শাদী করা দরকার। সুলতানের দরবারে পাকাপাকি চাকরী হয়ে গেলো। সুতরাং খাওয়া পরার ভাবনা তো আর থাকবে না।

তাছাড়া সময় মতো শাদী না করলে বালবাচ্চাদের মানুষ করে যাবো কী করে? তাদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ভালোভাবে বিয়ে শাদী দিতে হবে। আমার মনে হয়, এখনই শাদীর প্রশস্ত সময়। আর শাদী যখন করবো—দু'ভাই একসঙ্গে একই দিনে করবো। তুমি কী বলো?

ছোটভাই নূর-অল-দীন বললো, তুমি যেরকম বলবে, তাই হবে।

বড়ভাই সামস্-অল-দীন তখন বললো, ধরো শাদীর পর একই সঙ্গে আমাদের দু'জনের দু'টি বাচ্চা হলো। আচ্ছা ধরো, আমার মেয়ে আর তোমার ছেলে হলো। তা হলে তো আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের শাদী দিতে হয়।

ছোট বললো, উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বলো, তোমার মেয়ের জন্যে কী দেনমোহর দিতে হবে আমার ছেলেকে?

বড়ভাই বলে, আমি ভাবছি, তোমার ছেলের কাছ থেকে তিন হাজার সোনার দিনার নেবো। আর নেবো তিনটি খামার। আর জায়গীর নেবো তিনটি বড় গ্রাম। আমার মনে হয়, আমার মেয়ের জন্যে খুব বেশী কিছু একটা চাওয়া হবে না। অবশ্য তোমার ছেলে যদি না রাজী হয় তবে আর কথা বাড়িয়ে কাজ নাই। এখানেই প্রস্তাব খারিজ করে দেবো।

ছোট ভাই বললো, ভাই-এ ভাই সম্পর্ক হবে। ওরা ভাই-এ বোনে শাদী করবে। তা এর মধ্যে যৌতুক নিয়ে অতো দর কষাকষি কি আছে, দাদা? কেউ আমরা কম নই। দু'জনেই উজির। কার কী অভাব থাকবে। আমার তো মনে হয়, তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের শাদী হয়ে যাবে—এইটাই সব চেয়ে বড় কথা হওয়া উচিত। যৌতুকপত্র সেখানে নগণ্য। তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, টাকাপয়সাই যেনো সব। কি করে ধন সম্পত্তিকে রাতারাতি দু'গুণ চারগুণ করে বাড়াবে সেই সব সুদখোরদের মতো কথাবার্তা তোমার মুখে মানায় না, দাদা।

বড়ভাই বললো, তোমার কি ধারণা হচ্ছে, তোমার ছেলে আমার মেয়ের চেয়ে রূপেগুণে আরও বড়ো হবে? সে অহঙ্কার যদি করো তা হলে তোমার ছেলের সঙ্গে কিছুতেই আমি শাদী দেবো না আমার মেয়ের। তা যদি তাকে পাল্লায় ওজন করে সোনা ঢেলে দাও, তবু না। আমারটা মেয়ে বলে কি ফেল্না?

সামস্-অল-দীন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো শেষের কথাগুলো। নূর-অল-দীনও ভীষণ ক্ষেপে গেলো দাদার কথায়। বললো, আমার ছেলেও ফেল্না নয়। আমি এই বলে রাখলাম, তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের শাদী দেবো না, দেবো না। ব্যাস, এখানেই সব খতম হয়ে গেলো। এ নিয়ে আর কখনও কথা হবে না।

বড়ভাই বললো, কাল সকালে সুলতানের সঙ্গে বেরুবার পালা আমার। আমি তাকে বলবো তোমার এই অসভ্যতার কথা। তারপর দেখো কি হয়?

নূর-অল্-দীন রাগে গরগর করতে করতে চলে গেলো। আর কোনো কথা বললো না।

পরদিন সকালে সুলতানের সঙ্গে সামস্-অল-দীন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে নীল নদের ধারে এলো। একটা পান্সি নৌকো করে ওপারে জিজা যাওয়ার ইচ্ছা করলো। জিজায় অনেক পিরামিড আছে।

এদিকে সারারাত রাগে ক্ষোভে অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোর না হতে উঠে পড়ে নূর-অল-দীন। দাদার সঙ্গে তার সেই কথা কাটাকাটি ও তার কটূবাক্যে মনটা বিষিয়ে গেছে। সে ঠিক করলো দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

তার নফরকে ডেকে বললো, আমার সেই ছাই রঙের খচ্চরটা বের করে জীন লাগা।

এই খচ্চরটা দেখতে খুব বাহারী। শখের জানোয়ার। সোনার কাজ করা মখমলের

গদি পাতা দামী জীন লাগালো নফরটা। এমন কায়দায় সাজালো যেন মনে হয় শাদী করতে যাবে কোন বর। একটা দামী রেশমী গালিচা আর একখানা কম্বল সঙ্গে নিলো। খচ্চরের পিঠে চেপে নফরকে উদ্দেশ করে বললো নূর-অল-দীন, আমি চললাম রে, তোদের দেশে আর থাকবো না।

নফরটা জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন, হুজুর?

—আগে যাবো কালিব শহরে। সেখানে দু-তিন দিন থাকবো। তোদের এই পচা শহরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটু খোলামেলা আলো-হাওয়ায় মনটা সাফা করবো সেখানে। তারপর ভাববো, কোথায় যাবো। তোদের কিন্তু বারবার বারণ করে যাচ্ছি আমার কোন খোঁজখবর করার চেষ্টা করবি না। আমি একটু একা থাকতে চাই। এই হিংসা কুটিলতা স্বার্থপরতার নোংরামি থেকে পালিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চাই।

নূর-অল-দীন রওনা হয়ে গেলো। কাইরো ছাড়িয়ে বুলবেশা-এ যখন পৌঁছলো তখন ঠিক দুপুরবেলা। খচ্চরটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। তার নিজেরও বেশ খিদে পেয়েছে। একটা সরাইখানার সামনে নেমে খচ্চরটাকে ছেড়ে দিয়ে একটু কিছু খেয়ে নিলো সে। তারপর শহরের ভিতরে ঢুকে টুকিটাকি দরকারী দু-চারটে জিনিসপত্র কিনলো।

আবার যাত্রা শুরু হয়। দু'দিন বাদে জেরুজালেমে এসে পৌঁছলো নূর-অল-দীন। পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়েছে দেহ। এবার সে গালিচা আর কম্বলটা নামিয়ে খচ্চরটাকে চরতে পাঠিয়ে দিলো। কাছেই একটা কাফে খানা। হাত মুখ ধুয়ে খানাপিনা সেরে গালিচাটা বিছিয়ে শুয়ে পড়লো।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলো দাদাকে। দু'জনে ঝগড়া কথা কাটাকাটি করছে। ঘুম ভাঙতেই মনটা বিষিয়ে গেলো। সংসারের নীচতা-হীনতা থেকে সরে থাকবে বলে দেশ, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে এসেছে সে। কিন্তু এতো দূর এসেও তাকে সেই চিন্তাই হনন করছে এখনও।

পরদিন সকালে আবার রওনা হয়ে পড়ে নূর-অল-দীন। কোথায় যাবে তার কোন ঠিকানা নাই। যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে। সন্ধ্যে হয়ে এলো। এবার থামতে হয়। দেখলো আলেপ্পো শহরের কাছে এসে পড়েছে। একটা সরাইখানায় আশ্রয় নিলো। জায়গাটা বড় সুন্দর। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়ে নূর-অল-দীন। বেশ খুশি খুশি মেজাজে ভরে যায় মন। প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখতে দেখতে তিনটি দিন কেমন করে কেটে যায় খেয়াল করতে পারে না সে। মনের প্রসন্নতা এমনই বস্তু—তার প্রসাদে বিশ্বসংসার সব সুকুমার সুন্দর মনে হয়।

আলেপ্পোর মেঠাই-মিষ্টি খুব নাম করা। ছেলেবেলা থেকেই অনেক প্রশংসা শুনে এসেছে সে। মাঝে মাঝে খেয়েছেও। বিদেশীরা এখানে এলে হাঁড়ি ভরে নিয়ে যায় নিজের দেশে। এখানকার সবচেয়ে নামকরা পেস্তার বরফী কিনলো খানিকটা। আরও নানারকম মেঠাই মণ্ডা ভরে নিলো একটা পাতিল-এ।

আবার পথযাত্রা। নিরুদ্দেশের পথে। খুশিতে নেচে উঠেছে তার মন প্রাণ। আজ আর কোন মোহ মায়া নেই তার। সে এক যাযাবর। সমাজ সংসারের দ্বন্দ্ব কোলাহল, স্বার্থ সংঘাত তাকে বিচলিত করতে পারছে না। উন্মুক্ত আকাশের পাখীর মতো ডানা মেলে দিয়েছে সে। যেদিকে যায় যাক না।

এ আর এক আনন্দের জগৎ। এ রসের স্বাদ যে পায়নি তাকে কখনও বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। বন্ধনহীন হরিণের মতো ছুটে চলার যে কি আনন্দ তা সংসার সীমাবদ্ধ প্রাণী বুঝবে কি করে?

দিনের পর দিন একটানা চলতে চলতে একদিন এসে পৌঁছলো সে বসরাহ শহরে। নূর-অল-দীন কিন্তু জানে না বসরাহয় পৌঁছে গেছে সে। চলার পথে প্রতিদিন কত ছোট বড় গ্রাম শহর পেরিয়ে চলেছে—কে মনে রাখে সে সব নাম। আর কিই বা দরকার। সে তো

আর ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার মতলব করে পথে বেরোয়নি। সে এক পথভোলা পথিক। পথ চলাতেই তার আনন্দ। অন্য কোন উদ্দেশ্য তার নাই। যা দেখলো যা জানলো তা যে সবই মনে ধরে রাখতে হবে তার কি মানে আছে। যা মনের পাতায় দাগ কাটে তা মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলেও মোছা যায় না। আবার যাকে মনে ধরে রাখবো বলে অনেক চেষ্টা করা হয় তাও কখন হারিয়ে তলিয়ে যায় বুঝতে পারা যায় না।

একটা সরাইখানায় নামলো নূর-অল-দীন। খানসাহেবের কাছে জানতে পারলো , সামনেই যে শহর—ওটাই বসরাহ। নাম অনেক শুনেছে। এই প্রথম প্রত্যক্ষ করবে সে। বিরাট বন্দর। দেশবিদেশের সওদাগররা আসে এখানে বাণিজ্য করতে। বহু দূর দেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক আসে কেনাকাটার জন্যে।

খানাপিনা সেরে নূর-অল-দীন খানসাহেবকে বললো, আপনার একটা লোক দিন আমার সঙ্গে। খচ্চরটা ধরে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখবো শহরটা। ছেলেবেলা থেকে অনেক গল্প কাহিনীতে এই বসরাহর কথা পড়েছি। আজ যখন এসেই পড়েছি একবার ভালো করে দেখে যাই।

পাহাড়ী চড়াই উৎরাই পথ। কখনও বা খাড়া উপরের দিকে উঠে গেছে, আবার কখনও বা তরতর করে নিচে নেমে গেছে। খচ্চরের পিঠে চড়ে চলা নতুন লোকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু শহরের ভিতর ভাগ অতোটা উঁচুনিচু নয়। ছোকরাটা বললো, মালিক, এবার আপনি উঠে বসতে পারেন। কোন ভয় নাই। আমি লাগাম ধরে দেখে শুনে নিয়ে যাবো।

ছোকরার কথা মতো নূর-অল-দীন খচ্চরের পিঠে উঠে বসলো। ছেলেটা পাকা ওস্তাদ। এমনভাবে সামাল দিয়ে খচ্চরটাকে নিয়ে যেতে লাগলো—যাতে নূর-অল-দীনের কোন ঝাঁকানি না লাগে।

বসরাহর উজির সাহেব তখন তার প্রাসাদের গবাক্ষ পাশে বসে শহরের শোভা প্রত্যক্ষ করছিলো। হঠাৎ নজর পড়লো নূর-অল-দীনের ওপর। তার রূপ-জাঁকজমকে মুগ্ধ হলো সে। একটা নফরকে ডেকে বললো, যাতো, দেখে আয়, কে যায়, ঐ খচ্চরটার পিঠে? ডেকে নিয়ে আয় ওর সহিসটাকে।

যখন সে এলো বৃদ্ধ উজির জিজ্ঞেস করলো, তোমার মনিব কোন দেশের লোক, তার পরিচয় কিছু জানো?

—আজ্ঞে তাতো বলতে পারবো না। তবে মনে হয়, খুব খানদানী ঘরের আদমী। কোনও সওদাগরের লেড়কা হতে পারে।

—এখানে কোথায় উঠেছে সে?

সহিস ছোকরা বললো, আজ্ঞে আমাদের খান সাহেবের সরাইখানায়। কী সব দামী দামী সামানপত্তর। সুলতান বাদশাহর ঘরে অমনটা দেখা যায়।

উজির আর বিশেষ কোনও কথা বললো না ছেলেটার সঙ্গে। ওর খানসাহেবের সরাইখানার ঠিকানাটা নিয়ে দু'টো দিনার বকশিস দিয়ে বললো, ঠিক আছে, যাও।

বিকেলের দিকে সেই সরাইখানার সামনে এসে থামলো উজির। খানসাহেবকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার এখানে যে বিদেশী এক যুবক এসেছে তার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।

উজিরকে দেখে তো খানসাহেবের দফা রফা। না জানি কি বিপদ আপদ ঘটলো। শশব্যস্ত হয়ে করজোড়ে বললো, মেহেরবানী করে আমার গরীবখানায় হুজুরের পায়ের ধুলো দিতে আজ্ঞা হোক।

কিন্তু উজির ঘোড়া থেকে নামলো না।—তুমি তাকে একবার খবর পাঠাও।

নূর-অল-দীন ছুটে এলো। আপনি নিজে কষ্ট করে কেন এলেন, জনাব? আমাকে ডেকে পাঠালেই হাজির হতাম।

—তোমাকে তো হাজির করার জন্যে নিতে আসিনি, বাবা। আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি একটু।

উজিরকে সাদর অভ্যর্থনা করে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলো নূর-অল-দীন।

প্রাথমিক আলাপ পরিচয় হলো খানিকটা। তার পরেই উজির বললো, আমাদের দেশে এসে তুমি এই নগণ্য এক সরাইখানায় পড়ে থাকবে তাতো হয় না বাবা। চলো, আর এক মুহূর্তও তোমাকে এখানে থাকতে দিতে পারি না আমি। আমার বাড়ি চলো তুমি। তার পর অন্য কথা হবে।

নূর-অল-দীনের কোন ওজর আপত্তিই টিকলো না। দু'জনে ঘোড়ার পিঠে চেপে উজিরের বাড়ি এসে পৌঁছলো তারা। যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ণ করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো নূর-অল-দীনকে। বৃদ্ধ উজির এবার প্রশ্ন করে। এবার বলো বাবা, আমাদের এই বসরাহ-তে কেন এসেছো। কোনো কাজে কামে কী?

—জী না, স্রেফ বেড়াতে। আমি আজ অনেক দিন হলো আমার স্বদেশ, আমার জন্মভূমি কায়রো থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আমার বাবা মিশরের সুলতানের উজির ছিলেন। সম্প্রতি তিনি গত হয়েছেন। আমরা দুভাই-ই সুলতানের দরবারে উজিরের পদে বহাল হয়েছিলাম। কিন্তু সংসারের স্বার্থপরতা নীচতা দেখে আমি অস্থির অশান্ত হয়ে উঠলাম। মনে হলো এ আমার জায়গা নয়। এখান থেকে অনেক দূরে চেনা জানার বাইরে অন্য কোথাও অন্য কোনওখানে উধাও হয়ে যেতে হবে আমাকে। তাই একদিন সবার অগোচরে পথে বেরিয়ে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে, আমি ঠিক পথের সন্ধান করেছি। সারা দুনিয়ায় ঘুরে ঘুরে মানুষের মেলা দেখে বেড়াবো। আর দেখবো প্রাণ ভরে আল্লাহর অপার সুন্দর সৃষ্টি—প্রকৃতির বহু বিচিত্র রূপ। এর মধ্যেই আমার জীবনের আনন্দ, পূর্ণতা খুঁজে পাবো, এই আমার বিশ্বাস।

যুবকের এই উদাস বিবাগী হওয়ার সঙ্কল্প শুনে চমকে ওঠে উজির।—বাবা, তুমি যে পথ বেছে নিয়েছো, আপাতভাবে তোমার কাছে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ মনে হলেও আসলে কিন্তু চিরদিন তোমার ভালো লাগবে না। এখন প্রথম যৌবনের রঙ আছে তোমার চোখে। দেহে আছে সামর্থ্য। পথ চলার ক্লান্তি অগ্রাহ্য করার যথেষ্ট ক্ষমতা এখন তোমার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যেদিন নিজের দেহকে মনে হবে অসহ্য, অতিরিক্ত এক বোঝা। তখন চোখেও এই রং থাকবে না। শোনো বাছা, এই দুনিয়াটা বিরাট। একটা কেন দশটা জীবনের পরমায়ু পেলেও তুমি তাকে দেখে নিঃশেষ করতে পারবে না। আমি বুঝতে পারছি তুমি সুদূরের এবং সুন্দরের পিয়াসী। তুমি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে নিজেকে হারিয়ে দাও, তাও আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু বাবা, এই অরূপরতনের সন্ধানে কি তোমাকে তামাম দুনিয়া চুঁড়ে বেড়াতে হবে। একটা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু প্রমাণ সৌন্দর্য আছে, তাকি তোমার চোখে পড়েনি? সকালবেলায় দুয়ার খুলে ঘরের বাইরে এসে যে প্রথম শিশির কণাটা চোখে পড়ে তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেছো কখনও? প্রভাত কিরণের প্রতিসরণে সাতরঙা রঙে সে কি অপরূপ রূপবান হয়? তার তুল্য অপার সৌন্দর্যের সন্ধান তুমি কোথায় পাবে?

উজিরসাহেব শুধু বয়সে নয় জ্ঞানেও বৃদ্ধ। তার মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সচরাচর মেলে না, সুলতানের দরবারে তার নাম যশখ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচুর। নূর-অল-দীনকে ঘরমুখো

করার জন্যেই এতো যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরে উজির। মনে বাসনা, তার একমাত্র কন্যার সঙ্গে শাদী করিয়ে দিয়ে সুলতানকে ধরে তার দরবারে তাকে উজির করে কাছে রাখবে সে।

খানসাহেবের সরাইখানা থেকে নূর-অল-দীনের খচ্চর আর সামানপত্র নিয়ে আসার জন্য নফর পাঠিয়ে দিলো উজির। একখানা সুসজ্জিত কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করলো তার। উজিরের কাছে প্রতিদিন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আসে। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো তার। এইভাবে বেশ কয়দিন কাটে। একদিন নূর-অল-দীনের কাছে প্রস্তাব রাখলো, বাবা, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। ভাবছি আমি অবসর নেবো সুলতানের দরবার থেকে। তার আগে আমার একমাত্র কন্যার শাদী দিতে চাই। দেশবিদেশের বহু পাত্রের সন্ধানও এসেছে আমার কাছে। তাদের অনেকেই জ্ঞানে গুণে ধন-দৌলতে উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আমার কাউকেই তেমন মনে ধরেনি। নিজের মেয়ের রূপগুণের ব্যাখ্যান করতে চাই না। তা করাও ভালো দেখায় না। কিন্তু লোকে বলে, আমার মেয়ের মতো রূপ যৌবন নাকি সারা দেশে নাই। আমার যেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি আছে মেয়েকে শেখাবার চেষ্টা করেছি। তার অসাধারণ মেধা আমাকে অবাক করেছে। তোমাকে দেখে, বাবা, আমি মুগ্ধ হয়েছি। রূপ যৌবন তোমার অসাধারণ। কিন্তু তার চেয়েও বড় তোমার জ্ঞানগরিমা। আমি এই রকম পাত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। তোমার যদি অমত না হয় তবে আমার কন্যাকে গ্রহণ করো, বাবা। আমি খুব সুখী হবো। তুমি তোমার দেশে ফিরতে চাও না, যেও না। আমি সুলতানকে বলে তোমাকে তার দরবারের উজির-এ বহাল করে দেবো। তোমাকে পেলে আমার অভাব পূরণ হবে সুলতানের। আমি দরবার থেকে অবসর নেবো। এই বুড়ো বয়সে খাটতে আর ভালো লাগে না। শেষ ক'টা দিন আল্লাহর নামগান করে কাটাবো, এই ইচ্ছে।

সলজ্জভাবে মাথা নত করে বসে থাকে নূর-অল-দীন। কোন কথা বলে না। বলতে লজ্জা করে। একটু পরে মৃদু কণ্ঠে বলে, আপনি যা বলবেন, তাই হবে, জনাব।

উজিরের আনন্দ আর ধরে না। সাজো সাজো রব পড়ে গেলো বাহির অন্দর মহলে। আলোর মালায় সাজানো হলো সারা প্রাসাদ। প্রশস্ত প্রাসাদ কক্ষে অভ্যাগত আমিরদের বসার ব্যবস্থা করা হলো। সুগন্ধী আতরের খুশবুতে মদির হয়ে উঠলো সারা বাড়ি। খানাপিনার সেকি এলাহী আয়োজন।

একে এক অভ্যাগতরা আসতে লাগলো। উজিরের ব্যক্তিগত বন্ধুবান্ধব, সুলতানের পারিষদবৃন্দ, শহরের গণ্যমান্য সওদাগর প্রভৃতি আরো বহু মাননীয় ব্যক্তির সমাগমে সরগরম হয়ে উঠলো প্রাসাদকক্ষ। সবারই সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো নূর-অল-দীনের। সবাই এক বাক্যে তারিফ করতে লাগলো উজিরের পাত্র নির্বাচনের।

উপস্থিত অভ্যাগতরা খুব আমোদ আহ্লাদ করে খানাপিনা করলো। দামি দামি শরাব। শাম্মিকাবাব, শাহী কোপ্তা, মোঘলাই বিরিয়ানী, আলেপ্পোর মিঠাই, ইরানী হালওয়া, আপেল, আঙুর, বেদানা, পেস্তা বাদাম, আখরোট, আলুবখরা আরও হরেক রকম মুখরোচর খানাপিনা খুব তৃপ্তি করে খেলো সবাই। আতর গুলাবের খুশবুতে মেতে উঠলো সকলে। সব শেষে গুলাবজল ছিটানো প্রচলিত প্রথা। এর পর আর কেউ সেখানে থাকে না। যে যার মতো বিদায় নেয়।

সবাই চলে গেলে উজির নফরদের হুকুম করলো, নূর-অল-দীনকে হামামে নিয়ে যাও।

শাদীর সময় এও এক প্রচলিত নিয়ম। হবু জামাতাকে হামামে নিয়ে গিয়ে মূল্যবান আতর দেওয়া জলে গোসল করাতে হয়। কন্যার পিতা তার সবচেয়ে সেরা পোশাক নিয়ে দাঁড়াবে। সেই পোশাক পরে বাইরে আসবে বর। তার জন্যে অপেক্ষমান বহু রত্নখচিত সবচেয়ে দামী খচ্চরের পিঠে চেপে শহর পরিক্রমায় বেরুবে সে। এ সবই চিরাচরিত প্রথা।

রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে লোক জড়ো হতে লাগলো। উজিরের হবুজামাই

শাদীর সাজে শহর পথে ঘুরবে। পথঘাট আলোর মালায়, তোরণ দ্বারে সাজানো হয়েছে। নূর-অল-দীন-এর রূপ আর তার সাজের বাহার দেখে মনে হলো, আসমানের চাঁদ বুঝি মাটিতে নেমে এসেছে। শহর পরিক্রমা শেষ করে যখন ফিরে এলো নূর, উজির তখন অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নেবার জন্য সদর দরজায় অপেক্ষা করছিলো। খচ্চর থেকে নেমে উজিরের হাতে চুম্বন করলো সে। এবং তারপর.....

এই সময় শাহরাজাদ হঠাৎ চুপ করে গেলো। দেখা গেলো রজনী অতিক্রান্ত হতে চলেছে।

পরদিন রাত্রে।

তারপর শুনুন শাহজাদা, উজির বুকে জড়িয়ে ধরে নূরকে। বিংশ রজনীতে কাহিনী শুরু করলো শাহরাজাদ।

আল্লাহ তোমার কল্যাণ করবেন বাবা, উজির আদর জানিয়ে বললো, যাও ওপরে যাও। তোমার বিবি তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে।

নূর-অল-দীন উপরে উঠে এলো। সুসজ্জিত পালঙ্কে ফুলের সজ্জা। আজ তাদের পরিণীত জীবনের প্রথম রাত্রি। বহু মূল্যবান রত্নালঙ্কারে অপরূপ সেজেছে তার বিবি। তার দেহের অপরূপ রূপ লাবণ্যে তা আরও মনোহর আরও সুন্দর করে মানিয়েছে। দু'জনে দু'জনের হৃদয় বিনিময় করলো প্রথমে। অনেক কথা অনেক গল্প অনেক গান হলো অনেক রাত অবধি। তারপর রাত্রির দ্বিতীয় যামে দু'জনের দেহ মন প্রাণ দু'জনের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেলো।

পয়লা প্রহর মে সবকোই জাগে
দোসরা প্রহর মে ভোগী।
তিসরা প্রহর মে তস্কর জাগে
চৌঠা প্রহর মে যোগী।।

এর চেয়ে বেশী কিছু কাম্য ছিলো না নূর-অল-দীনের।

এদিকে বড়ভাই সামস্-অল-দীন সুলতানের সঙ্গে পিরামিড দেখে যখন ঘরে ফিরলো দেখে, ভাই নূর নাই। নফররা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। ওরা বললো, ছোট মালিক সুবা না হতেই হুকুম করলেন, খচ্চর-এর পিঠে জিন লাগাও। আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে দিলাম। তিনি কালিবের পথে চলে গেলেন। বললেন, বাইরের খোলা আলো হাওয়া পেলে তার বুকের জ্বালা যন্ত্রণার হয়তো উপশম হবে। এর বেশী আমরা আর কিছু জানি না, মালিক।

ভাইয়ের শোকে ভেঙে পড়লো সামস্-অল-দীন। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হতে লাগলো। রাগের মাথায় ঐ সব কটু কথা বলে সে মহা অন্যায় করেছে। ছোটবেলা থেকেই সে শান্ত মেজাজের ছেলে। ওই সব কথায় নিশ্চয়ই খুব আঘাত পেয়েছে সে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ হতে লাগলো তার। যেভাবেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে তাকে।

সুলতানের কাছে সব খুলে বললো সামস্-অল-দীন। তিনিও ব্যথিত হলেন খুব। নানা দেশের দরবারে দূত পাঠানো হলো। সন্ধান জানার জন্য। কিন্তু সব দেশ থেকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে দূত। না, কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেলো না।

কিন্তু দূতরা কেন বসরাহতে গেলো না, কেন তার খোঁজ করলো না সেখানে সে প্রশ্ন কারুর মনে জাগলো না। সামস্-অল-দীন বুক চাপড়াতে লাগলো। শুধু আমার নিজের দোষে ভাইকে হারালাম আমি। তাকে দেশান্তরী করলাম? তার মনে দুঃখ দিয়েছি—আঘাত করেছি। সে আঘাত ভাই আমার সহ্য করতে পারেনি।

পুত্র বিয়োগের শোকও একদিন থিতিয়ে আসে। সেইরূপ সামস্-অল-দীনও একদিন শোকতাপ অন্তরের এককোণে সরিয়ে রেখে আবার হেসে গেয়ে দিন কাটাতে লাগলো। কাইরোর এক সম্ভ্রান্ত সওদাগরের সুন্দরী কন্যাকে শাদী করে সংসারী হলো।

যোগাযোগই বলা যায়, তা না হলে একই দিনে—যেদিন ছোট ভাইয়ের শাদী সেদিনই তারও শাদী হয় কী করে! এবং শাদীর প্রথম রাতে দু'জনের বিবিই অন্তঃসত্ত্বা হলো। এও কি যোগাযোগ?

এদিকে শাদীর সব পর্ব শেষ হয়ে গেলে উজির একদিন সুলতান সমীপে হাজির হলেন জামাতা নূর-অল-দীনকে সঙ্গে নিয়ে। যুবকের রূপে মুগ্ধ হলো সুলতান। দু-হাত মাটিতে ছুঁইয়ে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো নূর। উদাত্ত কণ্ঠে সুন্দর করে আবৃত্তি করলো একটা শায়ের।

সবই ভালো লগে তার,
মনে হয় সবই অপরূপ।
হৃদয় মথিত করে,
জ্বলে উঠে কামনার ধূপ।
আমার এ তরুমূলে
সিঞ্চন করে সে বারী।
স্বর্গ সুখে তৃপ্ত হই,
আমি সেই নারী।।

সুলতান মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে নূর এর দিকে। কি সুন্দর রূপ! আর কী অপরূপ তার বাচনভঙ্গী। উজির এগিয়ে এসে বলে, আমার জামাতা। রূপে গুণে সেরা ছেলে।

সুলতান আরও খুশি হয়।—কিন্তু উজির, এ যুবক তোমার জামাতা না হলেও আমি তাকে সমানই আদর করতাম। ওকে আমার পাশে বসিয়ে দেওয়ানের কাজকর্ম বুঝিয়ে দাও। তুমি বয়সে ও জ্ঞানে অনেক বৃদ্ধ। তোমার যোগ্য সম্মান দিতে গেলে তোমার সহকারী হিসাবেই তাকে স্থান দেওয়া দরকার। তা না হলে ওকে আমি আজ থেকেই উজিরের পদে বহাল করতাম। তুমি যতদিন আছো, তুমিই উজির থাকবে। তোমার পর ওকে আমি উজির করবো।

একথা শুনে উজিরের মনে আহ্লাদ হলো।

সুলতান এই নবাগত যুবককে দেওয়ানের পদে বহাল করে নানারকম দামী দামী সাজপোশাক, এক হাজার সূক্ষ কারুকর্মের যোগ্য সূচ, দামী দামী সেরা খচ্চর এবং প্রচুর দাসদাসী ও নফর উপঢৌকন দিলো।

এর কিছুদিন পরে নূরের এক পুত্র সন্তান হয়। ঠিক সেইদিনই কায়রোতে তার দাদার এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। নূর তার ছেলের নাম রাখলো হাসান বদর-অল-দীন। তার রূপের বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য কারো নাই। বেহেস্তে হয় কিনা জানা নাই, ধরায় এরূপ কেউ প্রত্যক্ষ করেনি।

হাসলে পরে মুক্ত ঝরে
কান্নাতে তার পান্না।
এমন ছেলে কোথায় পেলে,
ও বিবিজান, বলো না।

নূর-অল-দীন নিয়মিত দরবারে যায়। তার কাজে মুগ্ধ হয় সুলতান। বসরাহ শহরের পরিচালন ভার দেওয়া হলো তাকে। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সব সমস্যার সমাধান করে দেয় নূর। এমন একজন দেওয়ান পেয়ে গর্ব হয় সুলতানের। নূরের মর্যাদা আরও বেড়ে যায় দরবারে। শুধু তার বেতনই বাড়ে না, সেই সঙ্গে তার

সৈন্যসামন্ত, লোকলস্কর, নফর চাকর, ক্রীতদাসের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়ে দেয় সুলতান। নূর আসার পর থেকে খাজনা আদায়ের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এর পর থেকে সবচেয়ে দুরূহ সমস্যাগুলো সমাধানের ভার পড়ে তার উপর। শহরবাসীরাও খুব খুশি। নূর আসার পর সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্যে রাস্তাঘাট সংস্কার করা হয়। জল সরবরাহ, নতুন নতুন বাসগৃহ নির্মাণ অনেক বেড়ে যায়। আরও বেশী লোকের রুজি রোজগারের জন্য ক্ষেত-খামার, জাহাজ নির্মাণ, বাঁধ, সড়ক তৈরি করে দেয় সে।

হাসান-বদর-অল-দীনের বয়স যখন চার বছর সেই সময় উজির দেহ-রক্ষা করে। যথাযোগ্য মর্যাদায় তার শোক পালন করে নূর। এবার সে দরবারে উজিরের আসন পায়।

হাসানের লেখাপড়া শিক্ষাদীক্ষার দিকে প্রখর দৃষ্টি দিতে থাকে নূর। মাদ্রাসার প্রধান মৌলভীকে শিক্ষক নিযুক্ত করে। বৃদ্ধ মৌলভী প্রতিদিন এসে হাসানকে পড়াতে লাগলো। দিনে দিনে বড় হতে থাকে হাসান। ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলায় সেরা ছাত্র হয়ে ওঠে সে। হাসানের বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ মৌলভী সাহেব। গর্বে বুক ফুলে ওঠে নূর-এর। মনে হয়, বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে সে।

হাসানের বয়স যখন পনেরো তখন মৌলভী সাহেব বললেন, সারা জীবন ধরে আমি যে বিদ্যা আহরণ করেছি তার সবই তোমার পুত্র শিখে নিয়েছে মাত্র এই বারো বছর বয়সে। আমার আর কিছু শেখাবার নাই, বাবা।

নূর খুশি হয়ে মূল্যবান সাজপোশাক, এক হাজার সোনার মোহর এবং সবেচেয়ে সেরা একটা খচ্চর উপহার দিলো মৌলভীকে। হাসানকে সঙ্গে নিয়ে সুলতানের দরবারে যাওয়ার পথে হাজার হাজার নারীপুরুষ হাসানের রূপের হাট অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলো আর বললো, বাপ্ কা বেটা। এই প্রথম সে ঘর ছেড়ে শহরের পথে বেরিয়েছে। এতোদিন ছেলেকে প্রাসাদের বাইরে কখনও যেতে দেয়নি নূর।

হাসানকে দেখে সুলতান বিস্মিত হয়। একদিন সে নূরকে দেখে বলেছিলো, এতো রূপ ধরায় হয় না। কিন্তু আজ তার ছেলের রূপ দেখে মুখে কোনও ভাষা জোগালো না। শুধু মুগ্ধ নয়নে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। একটুক্ষণ পরে শুধু বলতে পারলো, তোমার মতো নসীব আমার যদি হতো, উজির....প্রথম দর্শনেই তোমার ছেলের প্রেমে পড়ে গেলাম। আর তো ওকে না দেখে থাকতে পারবো না। রোজ তুমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। আমার হুকুম। বুঝলে উজির।

নূর আর কি বলবে।—জো হুকুম জাঁহাপনা।

প্রতিদিন হাসান বাবার সঙ্গে দরবারে যায়। সুলতান আদর করে সারাক্ষণ তার পাশে বসিয়ে রাখে। এইভাবে সুলতানের সঙ্গে তার গভীর সখ্যতা গড়ে ওঠে। শুধু সুলতানের নয়, সারা দরবারের আমির ওমরাহ—সবারই পরম প্রিয়পাত্র হয়ে পড়ে সে।

এইভাবে সুখের সমুদ্রে সাঁতার কেটে দিন গড়িয়ে চলছিলো। হঠাৎ একদিন নূর-অল-দীন অসুখে পড়লো। কঠিন অসুখ। অনেক বড় বড় হেকিম ডাকা হলো। অনেক দাওয়াই দিলো তারা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষে হেকিমরা জবাব দিয়ে গেলো। তাদের বিদ্যায় আর কিছু করার নাই। এবার আল্লাহ ভরসা।

পুত্র হাসানকে কাছে ডেকে নূর বললো, বাবা, আমার ডাক এসেছে। যেতে হবে। তোমরা অবশ্য প্রাণপণে চেষ্টা করলে—যদি আরও কিছু কাল ধরে রাখা যায়। কিন্তু তা হয় না। আমি যে ক'দিনের জন্য তাঁর কাছ থেকে ছুটি করে এসেছিলাম তোমাদের এই হাসি-খেলায়, তা আমার ফুরিয়ে এলো। এবার যেতে হবে। আমরা মায়াবদ্ধ প্রাণী। এ সংসারে এসে ভাবি এই

আমাদের চিরকালের আবাসস্থল। কিন্তু তা তো একদম ভুল, বাপজান। পথ চলতে চলতে সরাইখানায় যেমন দু'টো দিন কাটিয়ে যাই, এও তো তেমনি। আসল ঠিকানায় তো সবাইকে একদিন পৌঁছতে হবে। সেখানে পৌঁছে গেলে আর কোন দুঃখ তাপ কিছুই থাকে না। শোকতাপ দুঃখ-দুর্দশা যা পাওয়ার তা এ সংসারেই পাবে। তার কাছে পৌঁছতে পারলে খালি সুখ আর সুখ।

নূর-অল-দীন চুপ করলো। একটানা অনেক কথা বলে ফেলেছে। দূর্বল শরীরে হাঁপ ধরে যায়। একটু পরে আবার বললো, বাবা, আমার যা করার ছিলো সবই প্রায় নিখুঁতভাবে আমি সমাধা করেছি। শুধু একটি কাজ বাকি রয়ে গেলো। তোমাকে তার ভার দিয়ে যাচ্ছি, তুমি আমার হয়ে সেটুকু করে নিও। খুব ভালো করে মন দিয়ে শোনো। কাইরোতে আমার বড়ভাই সামস্-অল-দীন সেখানকার সুলতানের উজির। আমিও সেখানকার আর এক উজির ছিলাম। কিন্তু তুচ্ছ একটা কারণে দাদার সঙ্গে আমার একদিন কলহ বাধে। আমি রাগ করে দেশত্যাগ করে এই বসরাহতে চলে আসি।

নূর একটু দম নেবার জন্য থামলো। হাসানকে বললো, কাগজ কলম নিয়ে এসো।

হাসান একটা সোনার দোয়াত কলম আর তুলোট কাগজ নিয়ে এসে বসলো। নূর যা বলে গেলো হুবহু লিখে নিলো হাসান। বসরাহতে কবে সে এসেছিলো, কবে তার শাদী হয়েছিলো, সুলতানের দরবারে উজিরের পদ, হাসানের জন্ম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সন তারিখ সহ বিস্তারিত বিবরণ লিখে নিলো সে। তারপর নূর বলতে লাগলো তার বংশ পরিচয়। তার বাবার তরফ আর মায়ের তরফ। তাদের শাখা প্রশাখা—যে যেখানে থাকে সব ঠিকানাপত্র। তারপর বললো, ভালো করে কাগজখানা রেখে দিও। সময়ে কাজে দেবে। আমার মৃত্যুর পর তুমি তোমার স্বদেশ কাইরোতে যেও একবার। আমার বড়ভাই তোমার চাচা ওখানকার উজির। তার সঙ্গে দেখা করে বলবে, এ জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হলো না আমার। আমাকে যেন মাফ করে সে।

নূর-অল-দীনের গাল বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কাগজখানা পড়ে শোনায় হাসান। নূর ঘাড় নেড়ে জানালো ঠিক আছে। বাবার মোহর এঁকে দিলো কাগজটার ওপর। তারপর ভাঁজ করে একখানা মোমকরা কাপড়ে জড়িয়ে বাঁধলো। এইভাবে রাখলে নষ্ট হবে না সহজে। বাইরের স্যাঁতসেতে হাওয়া ঢুকতে পারবে না। এবার কাপড়ে জড়ানো কাগজখানা তার পাতলুনের কোমরবন্ধনীর মধ্যে ঢুকিয়ে সুচ সুতো দিয়ে সেলাই করে দিলো। আর হারাবার ভয় থাকলো না।

এরপর একটা দিন মাত্র বেঁচে ছিলো সে। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে সারা শহর ভেঙে পড়লো। হাজার হাজার নরনারী কালো পোশাক পরে শোকমিছিলে সামিল হলো। সুলতান শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। তার ডান হাতখানা আজ চলে গেলো।

যথাযোগ্য শাহী মর্যাদায় সমাহিত করা হলো তাকে। হাসান আজ পিতৃহারা। শোকের সায়রে ভাসতে থাকে। দু' নয়নে জলের ধারা। বাবার সেই কথাগুলো মনে করে নিজেকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারে। এ দুনিয়াটা পান্থশালা, দু'দিনের জন্যে আসা এখানে। সবাইকেই তো একদিন সব ফেলে চলে যেতে হবে।

দু'মাসব্যাপী মৌন হয়ে শোক পালন করলো হাসান। তারপরও সে বড় একটা কারো সঙ্গে কথা বলে না। বাবার শোকে সে মূহ্যমান। সুলতান তাকে খবর পাঠালো। তার দরবারে উজির করবে তাকে। কিন্তু হাসানের কোন হুঁশ নাই। ঘর ছেড়ে বেরোয় না সে। নাওয়া খাওয়া একরকম বন্ধ করে দিয়েছে। দিনে দিনে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেলো তার শরীর। সুলতান বারবার লোক পাঠায়। কিন্তু হাসান গেলো না। তার মনের মধ্যে শুধু একটা কথাই ঘোরাফেরা করে। তাকে যেতে হবে কাইরো। তার বাবার শেষ আদেশ।

সুলতান কুপিত হলো।—কী ওর এতো বড় স্পর্ধা! আমার হুকুম অমান্য করে সে। ধরে বেঁধে নিয়ে এসো তাকে। আমি তাকে শায়েস্তা করবো।

সুলতানের পরোয়ানা নিয়ে ছুটলো সিপাই বরকন্দাজ। শহরবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সর্বনাশ! না জানি, কী সাজা দেবে তাকে সুলতান। হাসানের এক বিশ্বস্ত নফর এসে খবর দিলো, শিগ্গির পালিয়ে যান হুজুর। সুলতান ক্ষেপে গেছে। আপনাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে। এখুনি পাইক বরকন্দাজ এসে পড়বে।

হাসানের চৈতন্য হয়। তাই তো, সুলতানের আদেশ অমান্য করেছে সে। তার পরিণাম তো মারাত্মক। হয়তো তার গর্দান যাবে। সুলতান ভেবেছে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য জ্ঞান করে তার ডাকে সে সাড়া দেয়নি। কিন্তু কী করে বোঝাবে সে, তার বাবার মৃত্যু কত বড় শেল হেনেছে তার বুকে।

হাসান বললো, আমাকে কিছু টাকাকড়ি দাও, জলদি করে।

নফর বললো, টাকাপয়সা বের করার সময় নাই। আপনি আর এক পলক দেরি করবেন না, হুজুর। বেরিয়ে যান এখান থেকে। না হলে জানে বাঁচবেন না। সুলতানের লোক এসে পড়বে এখুনি। আপনাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে। আপনার ঘর বাড়ি বিষয় আশয় সব বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছে সে। আপনি পালান।

হাসান কি করবে বুঝতে পারে না। এক মুহূর্ত। মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো। নিজের গায়ের দামী শালখানা ফেলে দিয়ে নফরের কাঁধের ময়লা চাদরখানা টেনে নিয়ে মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে সারা দেহটা ঢেকে নিলো। আপাতভাবে দেখে মনে হয়, কোন দীন ভিখারী। খিড়কীর দরজা দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো।

প্রথমে ঠিক করলো বাবার গোরস্তানে গিয়ে আজকে রাতের মতো আশ্রয় নেবে সেখানে। তারপর কাল সকালে ভাববে কী করে কাইরোর পথে রওনা হওয়া যায়।

বাবার কবরের পাশে বসে ভাবছে এমন সময় সেখানে এলো এক জু। বসরাহর নামকরা ধনী সওদাগর। এক অদ্ভুত হাসিতে নেচে উঠলো তার চোখ।—হুজুর এখানে? আহা কী দশা হয়েছে আপনার। একেবারে চেনা যায় না। তা সবই ভাগ্যের খেলা। আজ যে উজির কাল সে ফকির এই তো মালিকের খেলা।

হাসান সত্য গোপন করে বানিয়ে বললো, আজ দুপুরে আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি, বাবা বলছেন, আমার কবরের পাশে যাস। তোকে একটা কথা বলবো। তাই এসে বসে আছি এখানে।

জু বললো, আপনার বাবা বড় সজ্জন ছিলেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। অনেক দিন ধরে আপনাকে একটা ব্যবসার কথা বলবো বলবো করেও বলার সময়-সুযোগ পাইনি। আপনি তো জানেন, আপনার বাবার বড় জাহাজের কারবার আছে। আপনার বাবার কাছ থেকে একখানা জাহাজ কিনবো এইরকম একটা কথাবার্তা আমার হয়েছিলো এক সময়। কিন্তু তারপরই তিনি অসুখে পড়লেন। ব্যাপারটা ওখানেই থেমে গেলো। এখন আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমাকে বিক্রী করতে পারেন একখানা জাহাজ। আমি আপনাকে এক হাজার দিনার দাম দিচ্ছি।

সওদাগরের কথায় না করতে পারলো না হাসান।এক এক করে এক হাজার দিনার গুণে দিলো সওদাগর। তার সঙ্গে একটা সাদা কাগজ আর কলম তুলে দিলো হাসানের হাতে। বললো, নামকে ওয়াস্তে একটা রসিদ করে দিন হুজুর।

হাসান লিখে দিলে : "আমি মৃত উজির নূর-অল-দীনের একমাত্র পুত্র হাসান বদর-অল-দীন আপনার নিকট হইতে এক সহস্র দিনার গ্রহণ করিয়া আমার পিতার

(বর্তমানে আমার) একখানি সওদাগরী জাহাজ বিক্রয় করিলাম। বন্দরে প্রথম যে জাহাজ নোঙর করিবে সেই জাহাজই আপনি পাইবেন।"

নাম স্বাক্ষর করে জুয়ের হাতে তুলে দিলো হাসান। 'হুজুরের অশেষ কৃপা—হুজুর আমার মা-বাপ' এইরকম অনেক সৌজন্য দেখিয়ে বিদায় নিলো সে। বাবার সমাধির পাশে বিষন্ন মনে বসে রইলো সে। রাত্রি গভীর হতে হতে গভীরতর হয়। এক সময় ঘুমে ঢুলে পড়ে সে।

চাঁদ তখন মাথার ওপরে। হাসানের সারা দেহে চাঁদের আলোর লুটোপুটি। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে। দিনেরবেলার আতঙ্কভাব আর নাই। এক অপরূপ প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে।

এই গভীর রাতে গোরস্তানে আসে অশরীরী আত্মারা, জীন, পরীরা। এক খুবসুরৎ জিনিয়াহ তখন আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো। চাঁদের আলোয় হাসানের সুন্দর চেহারা দেখে সে নেমে আসে। এমন রূপবান যুবক সে তো কখনও দেখেনি। কে সে? এলো কোথা থেকে? আল্লাহ তাকে কি দিয়ে গড়েছেন? প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলে সে। জিনিয়াহ ভাবে, গায়ের রঙ তার কালো হলে কি হয়, মুখের চেহারা কি তার খারাপ? ছেলেটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এখন ওর ঘুম ভাঙাবো না, বরং আকাশের নীলিমায় একটা চক্কর দিয়ে আসা যাক।

আবার শোঁ শোঁ করে অনেক উপরে উঠে যায় জিনিয়াহ। একেবারে মেঘের মেলায়। ওখানে দেখা হয়ে গেলো এক চেনাজানা জিনের সঙ্গে। দু'জনেই দু'জনকে হাত নেড়ে স্বাগত জানায়। জিনিয়াহ, জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে আসছো ভাই?

জিনি বলে কাইরো। সোজা কাইরো থেকে আসছি।

—ওখানকার খবর কী? আমাদের জাতভাইবোনেরা কেমন আছে সব?

—ভালো। সবাই বেশ ভালো আছে, বোন। তোমার খবর কী?

—চলছে ভালোই। চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। নিচে একটা গোরস্তানে একটি চাঁদের মতো ফুটফুটে ছেলে ঘুমুচ্ছে। তুমি দেখলে তাজ্জব বনে যাবে। অমন রূপের বাহার আমি কখনো দেখিনি, ভাই।

জিনি বললো, চলো তো দেখি।

ওরা দু'জনে নেমে নিলো নিচে। গোরস্তানের ওপরে। সত্যিই অবাক করার মতো চেহারা বটে। জিনি বললো, লোকে বলে, তামাম দুনিয়ায় নাকি উজির নূর-অল-দীন-এর ছেলে হাসানের মতো রূপ আর কারো নাই। কিন্তু এ ছেলের রূপই বা কম কিসে? আমি কাইরোর উজির সামস্-অল-দীনের মেয়েকে দেখেছি। অমন হুরীর মতো রূপ কোন মেয়ের হয় না। একমাত্র সেই মেয়ের সঙ্গেই মানায় একে।

জিনিয়াহ বললো, আমি তাকে দেখিনি কখনও।

—তাহলে শোনো, জিনি বললো, সেই হতভাগ্য মেয়েটার কাহিনী শোনাই তোমাকে। সামস্-অল-দীনের মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে সুলতান একদিন প্রস্তাব করলো, দেখো উজির, তোমার মেয়ে রূপেগুণে সেরা হয়ে উঠেছে। আমি ইচ্ছা করি তুমি আমার সঙ্গে শাদী দাও তোমার মেয়ের।

সুলতানের কথায় আকাশ ভেঙে পড়লো মাথায়।—জাঁহাপনা, অধমের গোস্তাকি মাফ করবেন। আপনি তো জানেন, আপনাকে অনেক আগেই বলেছি, আমার ছোটভাই দেশত্যাগী হয়েছে। এবং কী কারণে হয়েছে তাও আপনাকে বলেছি। আমাদের কথা ছিলো, আমার মেয়ে আর তার ছেলে হলে দু'জনের শাদী দিয়ে দেবো। আল্লার দয়ায় তাইই হয়েছে। নূরের

ছেলে এখন বসরাহতে বড় হচ্ছে। আমার ভাই সম্প্রতি দেহ রেখেছে। এখন আমি ঠিক করেছি তাকে এনে আমার মেয়ের সঙ্গে শাদী দিয়ে দেবো। এ যদি না করি আমার ছোটভাই বেহেস্তে গিয়েও শান্তি পাবে না। আপনি, হুজুর খুঁজলে এই মিশরে আরো অনেক খুবসুরৎ লেড়কী পাবেন। এবং আপনি চাইলে যে কোন মেয়েই বর্তে যাবে। শুধু এইটুকু অনুগ্রহ আমাকে করুন, আমার সত্যরক্ষা করতে দিন আমাকে।

কিন্তু সুলতান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। কী এইভাবে অপমান? আমাকে প্রত্যাখ্যান? এতো বড় স্পর্ধা! দাড়াও মজা দেখাচ্ছি! আমি সুলতান হয়ে তোমার কাছে হাত পাতলাম। কোথায় তুমি ধন্য হবে তা না, আমাকে অবজ্ঞা করলে? আমাকে তুমি মেয়ে দেবে না, ঠিকই করে রেখেছো। খালি ফালতু বাহানা দেখাচ্ছো। দাঁড়াও মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি। আমার ঘোড়াশালে একটা কুঁজো বামন আছে। সহিসের জোগানদার। বাঁদরের বাচ্চার মতো ওর মুখ, পায়রার মতো ওর বুক। খুব মানাবে ভালো তোমার মেয়ের সঙ্গে। আজ রাতেই শাদীর সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। ঐ বাঁদর মুখো কুঁজোটার সঙ্গে তোমার মেয়ের শাদী হবে—আমার হুকুম। সারা দেশে ঢ্যাড়া পিটে দাও। ঢাক ঢোল, সানাই বাজিয়ে কুঁজো যাবে শাদী করতে। তাকে সাজানো হবে জাঁকজমক করে। যত টাকা লাগে দেবো আমি। কোনো চিন্তা নাই। আজকের দিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলো উজির। যতো ভালো পাত্রই তোমার হাতে থাক তাদের কারো সঙ্গে শাদী দিতে পারবে না। আমার পছন্দ করা পাত্রকেই তোমার জামাই করতে হবে। আজ রাতে তোমার মেয়েকে নিয়ে মধুযামিনী করবে ঐ কুঁজোটা। এই তোমার সাজা।

আমি যখন কায়রো ছেড়ে আসি সে সময়ে দেখলাম, দাসদাসী নফর চাকররা ঐ বাঁদর মুখো কুঁজোটাকে ঘিরে খুব হাসি মস্করা করছে। শাদীর দিনের লোকাচার, কাম কাজ শুরু হয়ে গেছে তখন। দল বেঁধে মেয়েরা সুর করে শাদীর গান করছে, দেখে এলাম। কুঁজোটাকে ধরে বেঁধে একটা চৌবাচ্চার খুশবু গোলা পানিতে ডোবাচ্ছে আর তুলছে। ঠাট্টা মজাক-এ মশগুল হয়ে গেছে দাসদাসীরা। এমন কাণ্ড তো তারা কখনও দেখেনি জীবনে। সত্যি বলতে কি বোন, লোকটাকে দেখলাম, অমন কদাকার কুৎসিৎ মানুষ আমি কখনো দেখিনি। জানোয়ারও ওর চেয়ে দেখতে ভালো হয়।

দাঁত মুখ সিঁটকে বিকট মুখভঙ্গী করে সেই কুঁজোটার কদাকার চেহারার একটা ছবি ফোটাবার চেষ্টা করে জিনি।

দুঃখ করে আবার বলতে থাকে, আহা, বেচারী! অমন খুবসুরৎ লেড়কী, তার কী নসীব! আমার মনে হয়, সামস্-অল-দীনের মেয়ে সিৎ-অল-হুসন তোমার এই মন ভোলানো ছেলেটার চাইতেও সুন্দর। শাদীর সাজে সাজানো হয়েছে তাকে অপরূপ করে। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তার গাল। সুরমা কাজল ধুয়ে গেছে। প্রাসাদের মাঝখানের বড় ঘরে বসানো হয়েছে তাকে। তার চারপাশে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে—গান বাজনা হৈ হল্লা হাসি মসকরায় মত্ত হয়ে গেছে। একটু পরেই ঐ বাঁদর মুখো কুঁজোটা বর সেজে আসছে। সবাই তার অপেক্ষায় আছে।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো রাত্রি প্রভাত হতে চলেছে। বলা থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

একুশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়। শাহরাজাদ বলে, তারপর শুনুন শাহজাদা, সেই জিনিয়াহ বললো, তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছো ভাই। এই ছেলের মতো রূপ সারা দুনিয়ায় কারো নাই। আমি ভাবতেই পারছি না, তোমার সেই সিৎ-অল-হুসন এর চেয়ে সুন্দর কি করে হতে পারে! অসম্ভব।

আফ্রিদি বললো, তুমি বিশ্বাস করো, বোন। আমি এতোটুকু বাড়িয়ে বলছি না। সত্যি, তার মতো রূপসী যুবতী হয় না। বিশ্বাস না হয়, চলো, নিজের চোখেই দেখবে। আর যেতেও হবে আমাকে। আমি বেরিয়েছি তার উপযুক্ত একটা পাত্রের সন্ধানে। তা তোমার ছেলেটার সঙ্গে মানাবে ভালো। একেবারে শাহী জুটি। ওই বাঁদর মুখো কুঁজোটা মেয়েটার পাপড়ীর মতো দেহটাকে ছিঁড়ে খাবে এ আমি বরদাস্ত করবো না কিছুতেই। যেমন করেই হোক শাদীর নামে এই বাঁদরামী বন্ধ করতেই হবে। চলো, আর দেরি না, এই ছেলেটাকে নিয়ে এখুনি আমরা উড়ে যাই কায়রো।

জিনিয়াহ বললো, হ্যাঁ তাই চলো, বাঁদরের বাচ্চাটা মেয়েটার শয্যাসঙ্গী হবে এ কিছুতেই হতে পারে না।

অকাতর ঘুমে আচ্ছন্ন হাসানের দেহটাকে সন্তর্পণে নিজের পিঠে তুলে নিলো আফ্রিদি। জিনিয়াহকে বললো, তুমি আমার পাশে পাশে থাকো।

প্রায় উল্কার গতিতে শোঁ শোঁ করে ছুটে চললো তারা। অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে নামলো কায়রো শহরের এক প্রান্তে। কাছেই উজিরের প্রাসাদ। আলোর মালায় সাজানো হয়েছে চমৎকার করে। সদরে বসানো হয়েছে নহবৎ। সানাই-এ বাজছে বেহাগ। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা মোমবাতি হাতে চলেছে দলে দলে। রাস্তার পাশে একটা পাথরে-তৈরি চবুতরার উপরে ওরা শুইয়ে দিলো হাসানকে। এবার তার ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ মেলে দেখে, অচেনা জায়গা। সে তো শুয়েছিলো তার বাবার গোরস্তানে বসরাহয়। কিন্তু এতো একটা অজানা অচেনা শহরের রাস্তার চবুতরা। অবাক হয়ে উঠে বসে সে। আরও অবাক হয় বিশালাকৃতির দাঁড়িগোঁফহীন একটা মানুষকে দেখে। ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে—মুখে তর্জনী চেপে কোন কথা না বলতে ইশারা করছে।

হাসান ভয়ে চুপ করে থাকে।

সেই বিরাট মানুষটা ওর হাতে ধরিয়ে দেয় একটা জ্বালানো মোমবাতি।—ধরো, এই বাতিটা নিয়ে ঐ নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে মিশে যাও। তুমি অবাক হয়ে ভাবছো, আমি কে? আমি হচ্ছি এক জীন। আল্লাহ আমার একমাত্র উপাস্য। তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমার ভালো করার জন্যেই তোমাকে এ শহরে নিয়ে এসেছি। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে বসরাহর এক গোরস্তানে। এখন তুমি বসে আছো কায়রো শহরে। আজ রাতে এখানকার উজির সামস্-অল-দীনের লেড়কীর শাদী হবে। একটা বাঁদর মুখো কুঁজোর সঙ্গে। ঐ যে প্রাসাদটা দেখছো, আলোয় ঝলমল করছে, কাতারে কাতারে লোকজন যাচ্ছে মোমবাতি হাতে ওখানেই আছে সেই উজিরের মেয়ে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে সে। যাও আর দেরি করো না। উঠে পড়ো। মোমবাতিটা হাতে ধরে মিশে যাও ভিড়ে। নহবৎখানা পেরিয়েই দেখবে বাঁদিকে হামাম ঘর। ওখানে ঐ বাঁদর মুখো কুঁজোটাকে গোসল করাচ্ছে দাসদাসীরা। কুঁজোটা যখন বরের ছাঁদে সেজেগুজে এসে খচ্চর-এর পিঠে চাপবে তখন তুমি তার পুরোভাগে থাকবে। যেন সবাই মনে করে তুমিই বরকর্তা। যে সব মেয়েছেলেরা গান বাজনার মুজরো করতে এসেছে—ওরা মাঝে মাঝেই নাচ গান থামিয়ে বরের সামনে ওড়না পেতে ধরবে প্যালা পাওয়ার জন্যে। তুমি তোমার জেবে হাত ঢোকাবে, আমার যাদুতে দেখবে, তোমার মুঠো ভরে উঠে আসবে সোনার মোহর। কোন অবাক না হয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করে সবটাই ছুঁড়ে দেবে ওদের দিকে। হয়তো বা দু-চারটে মাটিতেও পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তুমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনবে না। তোমার কোন ভাবনা নাই, যতোবার দরকার জেবে হাত ঢোকালেই পেয়ে যাবে মুঠিভরা মোহর। ফুরাবে না। এইভাবে হামাম থেকে প্রাসাদের মাঝখানের বড় ঘরের দরজা অবধি মুড়িমুড়কীর মতো মোহর বিলিয়ে যাবে, যাকে তাকে। ওই বড় ঘরে শাদীর আসর। ওখানে জড়ো হয়েছে শহরের উজির আমির ওমরাহ

সওদাগরদের বিবিরা। সবাই পরে এসেছে দামী দামী সাজপোশাক, রত্ন আভরণ। সেখানে একমাত্র বর ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তোমাকে কায়দা করে ঢুকে পড়তে হবে। এবং সেটা তোমার পক্ষে তখন আর খুব শক্ত কাজ হবে না। কারণ পয়সার প্যালা এমন একটা বস্তু যাতে সবাই থ হয়ে যাবে। তোমাকে ঘিরে ধরবে সকলে। মাথায় করে নাচতে চাইবে।

জিনি অদৃশ্য হয়ে গেলো। জ্বালানো মোমবাতিটা হাতে ধরে মিছিলে সামিল হয়ে যায় সে। বুঝতে অসুবিধা হলো না একটুও। নহবৎখানার বাঁ-পাশেই হামাম। তার চত্তরে অনেক দাসদাসী মুজরো করা মেয়ে মানুষ। ওরা পয়সা নিয়ে নাচগান করে বেড়ায়।

হামাম থেকে বেরিয়ে এলো সেই বাঁদরমুখো কুঁজো বর। মুক্তোর মালা গলায় পরেছে। সূক্ষ্মকারুকার্য করা বহু মূল্যবান বাদশাহী পোশাকে সাজানো হয়েছে তাকে। কয়েকজন মিলে চ্যাংদোলা করে তুলে খচ্চরটার পিঠে বসিয়ে দিলো কুঁজোটাকে। নাচনেওয়ালীরা খ্যামটা নাচ নাচতে লাগলো। কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে কাওয়ালী ধরলো কিছু মেয়ে। আর কতকগুলো বাজাতে লাগলো ঢোল নহবৎ। হাসির হুল্লোড় উঠলো প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। হাসান গিয়ে ধরলো খচ্চরের লাগাম। আগে আগে চলে সে। পিছে পিছে আসে খেমটাওয়ালীরা।

রূপবান হাসানকে দেখে সবাই মুগ্ধ হলো। মনে করলো, শাহ-পরিবারের কেউ। বরপক্ষের লোক। মেয়েগুলো মাঝে মাঝেই নাচগান থামিয়ে এগিয়ে এসে ওড়না পেতে ধরে। প্যালা চায়। বড় ঘরে বিয়ে শাদীর সময় এইরকম রেওয়াজই চালু। হাসান পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো ভরে তুলে আনে সোনার মোহর। ছুঁড়ে দেয় একটা মেয়ের আঁচলে। আর একট মেয়ে এগিয়ে আসে তখন। তাকেও দেয় এক মুঠো। তারপর আরও একজন। এমনিভাবে যে আসে, যে হাত পাতে তাকেই মুঠো ভরা মোহর দিতে লাগলো সে। সবাই অবাক। একেবারে আদৎ খানদানি ব্যাপার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবারই নজর গিয়ে পড়লো হাসানের উপর। কুঁজো বরের দিকে তখন আর কেউ তাকায় না।

এইভাবে প্রাসাদের প্রধান কক্ষের দরজায় এসে পৌঁছলো তারা। এবার বর একা যাবে সেই অন্দরমহলে। সেখানে গণ্যমান্য উজির আমিরের বিবিরা ঘিরে আছে সিৎ-অল-হুসনকে। কুঁজোটার একটা হাত ধরে প্রায় হিড় হিড় করে টেনে ভিতরে ঢুকে পড়ে হাসান। কেউ কিছু বলার বা বাধা দেবার চিন্তাই করলো না।

ভিতরে ঢুকেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় হাসানের। শহরের খানদানি পরিবারের লেড়কী বিবিরা এসে জড়ো হয়েছে সেই বিশাল কক্ষে। তাদের বাহারী সাজপোশাকের জেল্লায় সারা ঘরটা ঝকমক করছে।

একরাশ মেয়ে, তার মধ্যে ওরা দু'টি মাত্র পুরুষ। মেয়েরা সবাই নাকাব নামিয়ে মুখ ঢাকলো। প্রত্যেকে মোমবাতি হাতে, দু'টি সমান্তরাল রেখায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বরকে স্বাগত জানাবার জন্য। দুই সারির মাঝখান দিয়ে হাসান কুঁজোটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বসালো শেষ প্রান্তের মঞ্চের উপরে। নিজেও বসলো তার পাশে। এবারে মেয়েরা বিবিরা নাকাবের জাফরি দিয়ে ভালো করে দেখলো দু'জনকে। হাসানের রূপের চমক দেখে চোখের পলক পড়ে না কারো। দেখে আর ভাবে, এতো সুন্দর চেহারার পুরুষ মানুষ হয় নাকি। মেয়েদের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন ওঠে। সবারই ইচ্ছে হয় ছেলেটার কাছে যায়। পাশে গিয়ে বসে। একটু

আদর করে। তার হাত দু'টো টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে। কারও ইচ্ছে করে গলা জড়িয়ে ধরে প্রাণ ভরে চুমু খেতে। সবাই কেমন উষ্ণ রোমাঞ্চ অনুভব করে হাসানকে দেখে। কেউ ভাবে, যে যা বলে বলুক যে যা ভাবে ভাবুক ছুটে গিয়ে তার কোলের ওপর বসে পড়বে সে। কামনায় উদ্বেল হতে থাকে উপস্থিত মেয়ে বিবিদের দেহ মন। নিজেকে সামাল দিয়ে রাখা দায় হয়ে ওঠে। ষোল থেকে ষাট—সব মেয়ে বিবিদেরই তখন একই দশা। লাজলজ্জার বালাই আর রইলো না। এক এক করে সবাই নাকাব মাথার ওপরে তুলে দিয়ে হাসানকে দেখতে থাকলো। নাকাব খোলার উদ্দেশ্য অন্য। মেয়েরা বিবিরা তাদের নিজেদের চেহারা হাসানকে দেখাতেই মরিয়া হয়ে তুলে দিয়েছে মুখের ঢাকনা। যদি হাসান চেয়ে দেখে, যদি তার নজরে ধরে যায় তার রূপ যৌবন—ধন্য হতে পারবে সে। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা। এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় ওদের। হুড় পাড় করে গিয়ে ছেঁকে ধরে হাসানকে। সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে ওর চাঁদপনা মুখের দিকে। কেউ জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে। কেউ বা একটা চোখ ঈষৎ চোখ করে ইশারা করে। আবার কেউ নিজের ঠোঁটে নিজের দাঁত বসিয়ে রক্ত বের করে চোষে। আর এক রূপসী তেরছা চোখের বান মেরে বলে, তুমি কোন আশমানের চাঁদ, নাগর? কোথায় তোমার ঘর? কে বা তোমার মেহেবুবা?

হাসান বলে ঃ যে আশমানের সিতারো তোমরা, সেই আশমানেই আমার ঘর। আর মেহেবুবা? তাকেই তো ঢুঁড়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। তোমরা যদি কেউ রাজি হও? এ বান্দা রাজি আছে।

হাসির হুল্লোড় ওঠে। মেয়েটা গালে হাত রেখে বলে, ওমা, কী ফাজিল? শরমে মরমে মরে যাই...

খেমটাওয়ালীরা তখন মেয়ে বিবিদের কাছে হাসানের দু'হাত ভরে মোহর ছড়ানোর কথা বলতে থাকে। ওদের কথাবার্তা শুনে মেয়ে বিবিদের মনে হয়, এ তো তবে সাধারণ ঘরের ছেলে না। নবাব বাদশাহর খানদানি ঘরানা-না-হলে এমন দিলদরিয়া শেরিফ মেজাজ—হয় না কারো। সবাই তখন হা হুতাশ করতে লাগলো, হায় আল্লাহ, এমন একটা মানানসই বর হাতের কাছে থাকতে বাঁদর মুখো ঐ কুঁজোটার সঙ্গে শাদী হবে বেহেস্তের হুরী সিৎ-অল্-হুসন-র। আল্লাহ বোধ হয় দু'জনকে দু'জনের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু আমাদের বাদশাহ বাদ সেধেছেন। কি উপায়!

সবাই যখন হাসানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর কুঁজোর পিণ্ডি চটকাতে ব্যস্ত সেই সময় হঠাৎ সামনের একটা দরজা খুলে গেলো। পাশের ঘর থেকে এসে দাঁড়ালো মৌলভী আর সিৎ-অল-হুসন্। সঙ্গে একদঙ্গল পরিচারিকা, দাসী, খোজা। আর এলো বাজনাদাররা। কামনার হিল্লোল জাগানো, বুকে আগুন ধরানো বাজনা বাজাতে লাগলো তারা। হুসন্ এসে দাঁড়ালো সেই প্রশস্ত কক্ষের ঠিক মাঝখানে। চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো সব মেয়ে বিবিরা। মনে হতে লাগলো, মেঘশূন্য নীল আকাশে লক্ষ তারার মাঝখানে এক পূর্ণচন্দ্রের হাট। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো এক জ্যোতির জোয়ার। তার পাশে দাঁড়িয়ে শহরের সম্ভ্রান্ত খানদানি পরিবারের পরমাসুন্দরী সব মেয়ে বিবিরা ঝরে পড়া কুসুমের পাপড়ির মতো মূহ্যমান ম্লান দেখাতে লাগলো। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো তার দেহের খুশবু। মসলিনের ওড়নার নিচে যত্নে পাট করা রেশমের মতো তার ঘন চুলের অরণ্যে লুকিয়ে আছে এক মুকুলিত যৌনের যাদু। তাঁর নিচে চাঁপার পাপড়ির

মতো পেলব কোমল মরাল গ্রীবায় পরেছে তারার মতো ছোট ছোট হিরে জহরৎ-এর এক জড়োয়া মানতাশা। টকটকে লাল সালোয়ার কামিজ পরেছে পরনে। সোনার জড়িতে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা—নিপুণ শিল্পীর হাতে নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে নানা ধরনের পশু পাখীর বিচিত্র ভঙ্গী। দু'টো খুদে সাপ তার দুই বাহুকে আড়াই প্যাঁচ দিয়ে চেপে ধরে ফনা বাগিয়ে ধরেছে। সোনার সেই সাপ দু'টোর গায়ে চুনী পান্না বসানো। আর তাদের ফনার মাথায় জ্বলজ্বল করছে দু'টো চন্দ্রকান্তমণি। গলায় সাতনরী হার। পায়ে মল। বাঁহাতের অনামিকায় ইয়া বড় হীরা বসানো আংটি। কপালে টিকলি। মাথায় সোনার টায়রা—ছন্দোবদ্ধভাবে বসানো অসংখ্য হিরে-জহরৎ। আর তার মাঝখানে পাখীর ডিমের মতো একটা কোহিনূর। জানি না—কত লক্ষ লক্ষ দিনারের রত্নাভারণে সাজানো হয়েছে তাকে। তবু তার রূপের জেল্লার কাছে ঐ সব রত্ন আভরণ-এর চমকছটা তেমন কিছু না। কোন অলঙ্কার না পরলেও তার রূপের বাহার কি কিছু কম হতো? একদম না। সিৎ-অল-হুসন্‌র দেহে শোভা পেয়ে অলঙ্কার-আভরণ-ই আজ ধন্য হয়েছে।

হুসন্ এগিয়ে গেলো হাসানের দিকে। হাসান তখনও তেমনিভাবে বসে ছিলো মঞ্চের উপর। কুঁজোটা উঠে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে নানা অঙ্গভঙ্গী করে ধেই ধেই নেচে কুদে স্বাগত জানাতে লাগলো হুসন্‌কে। হুসন এক ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলো কুঁজোটাকে। হাসানের কাছে এসে দাঁড়ালো। এমন রূপের জৌলুস কোন পুরুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেনি হুস্‌ন। তার বাবার মুখে শুনেছিলো তার চাচার ছেলে হাসান নাকি দেখতে এমনি চাঁদের মতো সুন্দর। হুস্‌ন ভাবে এ সেই চাচার ছেলে হাসান না তো!

হুস্‌নকে মুগ্ধ নয়নে হাসানের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে উপস্থিত সব মেয়ে বিবিরা ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো। হুস্‌ন ততক্ষণে হাসানের গালদু'টো দু'হাতে চেপে ধরে আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে থাকে। ইয়া আল্লাহ, এই তো আমার স্বামী—আমার বুকের কলিজা—আমার মেহেবুব। তোমার পায়ে আমার হাজারো সালাম, তুমি আমাকে এর হাতে তুলে দাও। ঐ বাঁদরমুখো কুঁজোটার থাবা থেকে আমাকে মুক্ত করো খোদা।

হাসান তার জেবে হাত ঢোকালো। মুঠো মুঠো মোহর ছড়িয়ে দিলো মেজের উপর। নফর চাকর আর মুজরোওয়ালীরা হুড়োহুড়ি করে কুড়িয়ে নিলো—যে যতটা পেলো। সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, এই আমাদের পাত্র। [এখানে বলে রাখা দরকার নবাব বাদশাহদের শাদীর বাসরে, নফর-চাকরদের মধ্যে, পাত্র নিজে হাতে স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করে থাকে।]

কুঁজোটা রাগে গর গর করতে থাকে। বাঁদরগুলো রাগলে যেমন নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে, দাঁত মুখ খিচিয়ে, নিজের গালে নিজে থাপ্পড় মারতে থাকে, তেমনি সব হাস্যকর কাণ্ডকারখানা করতে লাগলো সে। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি হতে লাগলো। কেউ বা ওর কাছে এগিয়ে যায়। কুঁজোটা শূন্যে মুঠি ছোড়ে—ঘুসি মারার ভয় দেখায়, আরও মজা পায় মেয়েরা। নানাভাবে ক্ষেপিয়ে দিতে থাকে। একটি মেয়ে কাছে এসে বলে, আহা, তোরা হাসছিস কেন রে। দেখছিস না, আমাদের কুঁজো বোনাই বিবির শোকে কাঁদছে। তা বোনাই সাহেব কী আর করবে বলো। তোমার হবু বিবি তো আশমানের চাঁদ হাতে পেয়েছে। তোমাকে তার মনে ধরবে কেন?

আহা দুঃখু করো না বাঁদর বোনাই।
নাইবা হলো শাদী, নাইবা এলো পাশে,
নাইবা পেলে খাটে।
কিন্তু সে স্বপ্নে যাবে কোই!
ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে তাকে পাবেই।

হাসির ফোয়ারা ছোটে। একজন বলে, একটা ফিতে নিয়ে আয়তো রে, মেপে দেখি। আমাদের কুঁজো বাঁদরটা লম্বায় কয় ইঞ্চি। হুস্‌নর মেহেবুব-এর চাইতে কতটা বেঁটে।

আর একটি মেয়ে বলে, ফিতে টিতের কি দরকার। মেহবুব-এর হাঁটুর চাইতেও খাটো হবে কুঁজোটা।

—লোকে বলে না—বামন হয়ে চাঁদে হাত। তা—এ দেখছি, তারও বাড়া। বামনতো বটেই, তারপর আবার কুঁজো-বাঁদরমুখো। বাঁদরটার কলা ছেড়ে আপেল খাওয়ার শখ হয়েছে। মারো ঝাড়ু।

এবার পাত্রীর প্রদক্ষিণ পর্ব শুরু হলো। প্রতিবার নতুন সাজে সেজে এসে এক এক করে সাতবার সারা কক্ষটার চারপাশ—প্রদক্ষিণ করলো হুস্‌ন। প্রতিবার ঘুরে এসে দাঁড়ালো হাসানের মুখোমুখি। শাদীর প্রথা অনুসারে এইটাই প্রধান রীতি। এই সময় উপস্থিত মেয়েরা, ভালোবাসার মিলনের এবং খিস্তি খেউড়ের গান ধরে। যারা নাচে তাদেরও অঙ্গভঙ্গীতে কামকলার প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বাজনার তালে তালে রক্তে নাচন শুরু হয়। মেয়েরা জড়াজড়ি কামড়া কামড়ি শুরু করে। তখন সবাই এক অন্য নেশায় মেতে ওঠে। কেউ শুয়ে পড়ে আর একজনকে বুকের উপরে টেনে নেয়। ঠোঁট-এ ঠোঁট রাখে। আর চোখ রাখে হাসানের দিকে। দেখে মনে হয়, যেন এক জোড়া মেয়ে পুরুষ মেতে উঠেছে কাম কলায়।

এ সবই লোকাচার। শাদীর রাতের প্রচলিত রীতি। নানা ভাবে পাত্র-পাত্রীকে কাম ভাবে উত্তেজিত করাই এর আসল উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে পাত্রীর সাত পাক ঘোরা শেষ হয়। এক এক করে সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়। শুধু থাকে হাসান, বাঁদরমুখো কুঁজো বড়, হুস্‌ন আর তার দাসী পরিচারিকারা। তারা এবার পাত্রী নিয়ে যায় পাশের ঘরে। শাদীর সাজ পোশাক ছাড়ানো হবে তার।

বিশাল কক্ষের শাদী মঞ্চে তখনও দু'টি প্রাণী বসেছিলো। একজন হাসান, আর একজন সেই বাঁদরমুখো কুঁজো পাত্র। মঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়ালো কুঁজোটা। বললো, তুমি আজ আমাদের শাদীর বাসরে মেলাই আনন্দ দিয়েছো মালিক। সেজন্যে বহুত সুক্রিয়া। দু'হাতে অনেক মোহর ছড়িয়ে আমাকে অনেক ঋণী করেছো। তোমার এ ঋণ শোধ করতে পারবোনা আমি। যাই হোক, এবার তো আমাদের আসল কাজ-কাম আরম্ভ হবে। তা তোমাকে কি চ্যাংদোলা করে বাইরে বের করে দিয়ে আসতে হবে। যদি বলো, লোকজন ডাকি।

লোকটার কথায় হাসানের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। কি এর উত্তর দেবে ভেবে পায় না। আস্তে আস্তে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু বেরোন আর হয় না। সেই আফ্রিদি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে দরজা-ঘিরে। —কোথায় যাচ্ছো হাসান? দাঁড়াও, আমি যা বলি, শোনো। আমি ঐ কুঁজোটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও পাত্রীর পালঙ্কে। তাকে বলবে, তুমিই তার কানুন সম্মত শাদী-করা স্বামী। মজা করবার জন্যে কুঁজোকে বর সাজিয়ে পাঠিয়েছিলো সুলতান। এরপর দেখো, তোমার কথায় খুশি হবে সে। তারপর তাকে নিয়ে শাদীর রাতে যা করতে হয় করবে। সে সব আর আমি তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে চাই না।

হাসান ফিরে এলো শাদীর মঞ্চে। কুঁজোটা গিয়ে ঢুকেছে পাশের 'ছোট ঘরে।' পায়খানা প্রস্রাব সেরে হাত মুখ ধুয়ে পাত্রীর শয্যা সঙ্গী হওয়ার বাসনায় কল ঘরে ঢুকেছে সে। জিন এক ধেড়ে ইঁদুরের রূপ ধরে তার এপাশ-ওপাশ কখনও বা তার পায়ের তলা দিয়ে হুটোপাটি করতে থাকে। তখন সবে সে বসেছে দাস্ত করতে। ভয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে। ইঁদুরটা তখন জলের নর্দমার গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঝিক ঝিক আওয়াজ তুলতে থাকে। কুঁজোটা

হিস হিস করে তাড়াতে যায়। জোরে জোরে হাততালি বাজায়। হঠাৎ একটা বিরাট কালো বিড়াল মেঁউ মেঁউ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকে। চোখ দু'টো তারার মতো জ্বলজ্বল করছে। কুঁজোটা হ্যাট হ্যাট করে তাড়া করতে থাকে বিড়ালটাকে। এমন সময় একটা জাঁহাবাজ কুকুর হয়ে গেলো বিড়ালটা। ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে যায় ওকে। কুঁজোটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। এই, যা ভাগ, পালা, পালা এই রকম আওয়াজ করতে থাকে। একটু ক্ষণের মধ্যে কুকুরটা—গাধায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। গাধার কর্কশ ধ্বনি কানে তালা ধরিয়ে দেয়। নাক মুখ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে হাওয়া আর থুথু ছেটাতে থাকে কুঁজোটার মুখ বরাবর। ভয়ে থর থর কাঁপতে থাকে শরীর। হড় হড় করে পায়খানা করে ফেলে মেজের উপর। প্রাণভয়ে পালাবার জন্যে দরজার দিকে এগোবার চেষ্টা করে। কিন্তু গাধা তখন একটা বিরাট মোষের রূপ ধরে দরজা আড়াল করে দাঁড়ায়। এই সময়ে মানুষের গলায় বলতে থাকে মোষটা।—ওরে হতচ্ছাড়া নচ্ছার বাঁদর, চাঁদের মতো বিবি বাগাবার বাসনা হয়েছে তোর? তার আগে আমার—শিং-এর গুঁতো খেয়ে নে আগে একটা।

এই বলে তেড়ে যায় মোষটা। কুঁজোটা তখন শিউড়ে উঠে পিছে হঠতে গিয়ে হড়কে পড়ে মেজের উপর। সারা গায়ে একাকার হয়ে যায় তার পেট ছেড়ে দেওয়া বিষ্ঠায়।

মোষটা গর্জে ওঠে, ওরে মুখপোড়া বাঁদরের বাচ্চা দুনিয়াতে তোর যোগ্য পাত্রী খুঁজে পেলি না। যার তুই নফর হতে গেলে সাত জন্ম তপস্যা করতে হবে তোকে তাকে কি না তুই বিবি বানাতে চাস। বলো এমন আশা তোর হলো কি করে। —বল—না হলে এবার তোর বিষ্ঠা তোকেই খাওয়াবো।

কুঁজোটা তখন ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে, আমার কোন দোষ নাই, বাবা। আমাকে জোর করে ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। এ সব ঝামেলায় যেতে চাই নি আমি। কিন্তু কি করবো সুলতানের হুকুম। না মানলে গর্দান যাবে যে। আর তা ছাড়া আমি তো আদপেই জানতাম না—লেড়কীটার 'ভালোবাসা' আছে। দোহাই মহিষ সম্রাট; তোমার চারখানা পায়ে পড়ি, আমার গোস্তাকি মাফ করে দাও। আর কখনও এমন কাজটি করবো না।

মোষ তখন বলে, তা হলে আল্লাহর নামে হলফ করে বল—আমি যা বলবো তা শুনবি।

—তাঁর নামে হলফ করে বলছি যা বলবে, তাই করবো।

—তা হলে শোন, সকাল না হওয়া পর্যন্ত এইখানে ঠিক যেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছিস তেমনি দাঁড়িয়ে থাকবি। এক পা যদি নড়িস বা শাদীর বাসর ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারিস, তোকে আর আস্ত রাখবো না। একটা গাট্টায় মাথা গুড়িয়ে ছাতু করে দেবো। আর এই সব ব্যাপারে কারো সামনে যদি মুখ খুলিস, কাউকে যদি একটা কথাও বলিস তা হলে প্রাসাদের গম্বুজের উপর থেকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দেবো। তুমি ভেবো না আমি কিছু জানতে পারবো না। যত লুকিয়ে ছুপিয়ে বলো আমি সব টের পাবো। আর একটা কথা এর পরে কখনও যদি দেখি তুই এই প্রাসাদ মুখো হয়েছিস তা হলে রাস্তার পাশের ঐ বড় নর্দমায় ডুবিয়ে মেরে ফেলবো তোকে। যা বললাম সব ঠিক ঠিক মনে থাকবে?

কুঁজোটা সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নেড়ে বললো, যে আজ্ঞে, তা আর মনে থাকবে না!

মোষটা বললো, ওদিকে দেওয়ালের দিকে মুখ করে নর্দমার গর্তের মধ্যে একটা পা ঢুকিয়ে দাঁড়া—। ওই ভাবে বাকী রাত দাঁড়িয়ে থাকবি। সূর্য ওঠা পর্যন্ত। একটু নড়া চড়া করেছিস কি মরেছিস।

—না-না; তা করবো কেন? এই আমি গর্তের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দাঁড়ালাম।

তখন মোষটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। কুঁজোটা ঐ ভাবেই 'ছোট ঘরে' গর্তের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চলুন আমরা এবারে যাই হাসান বদর-অল দীনের কাছে।

এতক্ষণ হাসান একা একা বসে সিৎ-অল-হুস্‌নর দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলো। বুড়ি ধাই হুসনকে সঙ্গে করে দরজার কাছে ডাকলো, কই গো কুঁজো বড় এদিকে এসো। তোমার সোহাগের বিবিজানকে কোলে করে তুলে নিয়ে যাও পালঙ্কে। আল্লাহ তোমাদের সুখে রাখুন বাছা।

হুস্‌ন-এর বুক দুর দুর করে ওঠে। নিজে নিজেই বলতে থাকে, ওই খুদে বামন কুঁজো বাঁদরটাকে নিয়ে শোবার আগে যেন মৃত্যু হয় আল্লাহ!

কিন্তু দু-পা এগিয়ে আসতেই হাসানকে দেখতে পেয়ে আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়ে সে। —প্রিয়তম আমার সোনা, তুমি? তুমি একা বসে আছো আমার জন্যে? আমি ভেবেছিলাম ওই কুঁজোটার সঙ্গে হয়তো বা একটু ভাগ নেবে আমার দেহটার।

—ছিঃ অমন কথা ভাবলে কি করে বিবিজান?

আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা মজার। আর তা ছাড়া কুঁজো বামনটাকে আনার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিলো। শয়তানের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করা। জানোতো প্রবাদ আছে বামন আর কুঁজো থাকলে—শয়তান আসতে পারে না। তোমার বাবা দশ দিনার দিয়ে ভাড়া করে এনে ছিলো ওটাকে। সে এখন তার আস্তানায় আবার ফিরে গেছে।

হুস্‌ন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। হাসানের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করলো সে। হেসে গলা জড়িয়ে ধরে সোহাগ চাইলো। —সোনা আমাকে ধরো, আদর করো, আমাকে তোমার কোলে বসিয়ে নাও। আমার এই সতের বছরের যৌবন আজ তোমার হাতে তুলে দিলাম।

শুধুমাত্র একখানা শালে ঢাকা ছিলো তার দেহ। হাসানের ধমনীতে রক্তের প্রবাহ দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগলো। ক্ষিপ্র হাতে পাতলুনটা খুলে ছুঁড়ে দিলো ডিভান-এর উপর। টাকা পয়সার বটুয়াটা রাখলো চেয়ারে, আর সেটা চাপা দিয়ে দিলো সোনার কাজ করা মাথার টুপিটা দিয়ে। শোবার সময় পরার জন্যে একটা সাদা মাঠা কাপড়ের টুপি তুলে নিয়ে মাথায় পরলো। টুপিটা পরার কথা ছিলো কুঁজোটার। কিন্তু তার নসিবে নাই, কি হবে। খালি ইজেরটা সোনার রশি দিয়ে বেশ আঁটো করে কোমরে বাঁধা। হুস্‌ন হাঁটু গেড়ে ওর কোমরের সোনার রশিটা ধরে এমন জোরে এক হ্যাঁচকা টান মারলো যে পটাং করে ছিঁড়ে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেলো সে মখমলের শয্যার উপর। হো হো করে হেসে উঠলো হাসান। হাসির তুফান তুললো হুস্‌ন-ও। সেই তুফানের সমুদ্রে ওরা কে যে কোথায় তলিয়ে গেলো তার কোন হদিশ পাওয়া গেলো না।

যখন শান্ত অবসন্ন অথচ প্রসন্ন হয়ে ঢলে পড়লো দু'জনে তখন হাসান শুধু বলতে পারলো, বুঝলাম, আমিই তোমার জীবনে প্রথম পুরুষ।

সেই রাত্রেই হুসন অন্তঃসত্ত্বা হলো। তার পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, সে কাহিনী আপনাকে পরে বলবো, জাঁহাপনা। সেই রাতের সল্পকালের মধ্যে মোট পনেরো বার তারা মিলিত হলো। হাসান বললো, আজকে রাতের মতো এখানেই ইতি করা যাক। এবারে একটু ঘুমতে হয় কী বলো?

হুসন বলে ঘুমে আমারও চোখ জড়িয়ে আসছে।

একটু ক্ষণের মধ্যে অসাড় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে দু'জনেই।

'ছোট ঘর' থেকে বেরিয়ে এসে জিনি দেখে জিনিয়াহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের সুখ নিদ্রা। জিনি বললো, নাও আর দেরি করো না, ছেলেটাকে তুলে নাও। যেখান থেকে এনেছিলাম—সেই বসরাহর গোরস্থানে রেখে আসতে হবে।

জিনিয়াহ নিজের পিঠে তুলে নিলো ছেলেটাকে। গায়ে একটা জামা মাত্র সার। ইজের পাতলুন কিছুই পরনে নাই। শোঁ শোঁ করে আকাশ পথে উড়ে চললো। পাশে পাশে চলতে থাকে জিনি। এইভাবে চলা কালে জিনির মধ্যে বদ চিন্তা চাড়া দিয়ে ওঠে। জিনিয়াহর উপর বলাৎকার করতে উদ্যত হয়। অন্য সময় হলে জিনিয়াহ খুব একটা গররাজি হতো না। কিন্তু তখন তার পিঠে হাসান। এ অবস্থায় রতি বিহার করতে গেলে ছেলেটা পড়ে যেতে পারে। সেই আশঙ্কায় জিনিকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু আফ্রিদিদের সঙ্গম চিন্তা একবার চেগে উঠলে ক্ষান্ত করা অসম্ভব। বাধা পেলে তখন সে ভয়াল-ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সমস্ত কিছু-ভেঙেচুরে খানখান করে ফেলে। তেমনি কিছু একটা অঘটনই হয়তো ঘটতো কিন্তু উপরে আল্লাহ আছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়লো জিনির মাথায়। ব্যাস, সব শেষ। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা জিনির সেই প্রকাণ্ড বপুটা তীর বেগে নেমে গেলো মাটির দিকে। জিনিয়াহ শুনতে পেলো, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে এক আর্তনাদ উঠলো। মাটিতে পড়ে খান খান হয়ে গেলো জিনির দেহটা। পুড়ে ছাই হয়ে গেলো সব। জিনিয়াহ আস্তে আস্তে নেমে এলো জিনির জ্বলন্ত চিতার পাশে। সিরিয়ার দামাসকাস শহরের প্রবেশ মুখে নেমে পড়েছে সে। হাসানকে পিঠ থেকে নামিয়ে রাস্তার এক পাশে শুইয়ে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একেই বলে নিয়তি।

তখন বেশ বেলা হয়েছে, প্রবেশ দ্বার খুলে দিয়েছে দ্বারী। শহরের পথে লোকসমাগম হতে থাকে। আর সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো নবাবপুত্রের মতো দেখতে সুন্দর এক অর্ধউলঙ্গ যুবক ঘাসের উপর শায়িত। ঘুমে আচ্ছন্ন। গায়ে শুধু কামিজ আর মাথায় একটা রাতে পরার টুপি। পাতলুন ইজের—কিচ্ছু নেই পরনে। একজন পথচারী বললো, আহা, বেচারা বোধহয় বড়ই ক্লান্ত এবং বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। আর একজন বলে, কী সুন্দর চেহারা। অন্যজন প্রশ্ন তোলে, কিন্তু ছেলেটা উলঙ্গ হলো কি করে। কেউ কি পাতলুন ইজের খুলে নিয়েছে? আবার কেউ বা বাঁকা করে ফোড়ন কাটে দেখগে, বেহেড মাতাল হয়ে কোথায় কোন্ নর্দমায় পড়েছিলো।

যখন তারা এইরকম আজগুবি কল্পনায় মশগুল সেই সময় সকালবেলার একটা হাল্কা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গেলো তার কামিজ। সবাই দেখে অবাক হলো তার দেহের গোপন অঙ্গের অপূর্ব মনোহর সৌষ্ঠব। এই সময় হাসানের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দেখে অচেনা অজানা এক নতুন জায়গা। একটা শহরের প্রবেশমুখে রাস্তার একপাশে তৃণশয্যায় শুয়ে আছে সে। আর তাকে ঘিরে একপাল লোক জটলা করছে। চিৎকার করে উঠলো, আপনারা বলুন, আমি কোথায়? আর আপনারাই বা আমাকে এমন ভাবে ঘিরে ধরেছেন কেন? কী ব্যাপার?

একজন জবাব দিলো, তুমি এই অবস্থায় এখানে পড়ে আছো দেখেই আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি। তুমি কি জানো না জায়গাটা দামাসকাস শহরের ঢোকার প্রধান দরজা? কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে? আর কী করেই বা তোমার পরনের পাতলুন খোয়া গেছে?

হাসান প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, এ সব কী ব্যাপার কিছুই মাথায় ঢুকছে না। কাল রাতে ছিলাম আমি কাইরো। আর তোমরা বলছো, আমি এখন দামাসকাসে?

হাসানের কথা শুনে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলো কয়েকজন। একজন বললো, চরসের মাত্রা বোধ হয় একটু বেশি হয়ে গেছে সাহেবের?

দামাসদকাস থেকে কাইরোর দূরত্ব অনেক। এক রাতে কেন দশদিন দশরাত হাঁটলেও পৌঁছানো সম্ভব নয়। সুতরাং গাঁজাখুরি কথা শুনে এ-ধরনের মন্তব্য তো করবেই লোকে।

আর একজনের মনে হলো, লোকটা বোধ হয় বদ্ধ পাগল।

অন্য একজন বলে, আহা, এমন সুন্দর চাঁদের মতো ছেলে—মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একেই বলে নসীবের লেখা।

একজন বয়স্ক ভারিক্কিচালের লোক তার কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, আচ্ছা, বাপু খোলসা করে বলো দেখি, কি তুমি বলতে চাও?

হাসান বলে, গতকালে মাঝরাতে আমি কাইরোতে ঘুমিয়েছিলাম আর সন্ধ্যাবেলায় ছিলাম আমি আমার নিজের শহরে—বসরাহয়।

এবারে আর সেই বয়স্ক ভারিক্কিচালের লোকটিও হাসি চাপতে পারলো না। ওর কথা শুনে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি? ঐ লোকটি বলে নাঃ, কোন আশা নাই। একেবারেই গেছে।

একজন সম্ভ্রান্ত গোছের শিক্ষিত লোক এগিয়ে এসে বলে, তোমার মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করো। অমন বোকার মতো কথা বললে তো লোক হাসাহাসি করবেই।

—আমি বেশ সুস্থ। ভেবে চিন্তেই বলছি সব কথা। গতরাতে কাইরোতে আমার শাদী হয়েছে। চমৎকার কেটেছে রাতটা।

একজন ঠাট্টা করে ওঠে, সাহেব বোধ হয় স্বপ্নের ঘোরে শাদীর মজা লুটেছে রে! তা বাবা পাত্রীটা দেখতে কেইসা? হুরী পরী হবে নিশ্চয়ই।

হাসান বেশ রুষ্টই হয় তার কথা শুনে। বলে, ঠাট্টা করছো কেন? তা সে হুরীর কম কিসে? তার মতো রূপ যৌবন কোন মানুষের হয় না। আর স্বপ্ন বলে তামাশা করছো কেন? যা করেছি তা ঘুমুবার আগেই করেছি। একটা বাঁদরমুখো কুঁজো বামন-এর সাধ হয়েছিলো, শাদী করতে এসেছিলো তাকে। তার বাঞ্ছা আর পূরণ হয়নি। ভাগিয়ে দিয়েছি তাকে। আমার মাথায় এই যে রাতের টুপিটা দেখছো—এটা তার জন্যেই আনা হয়েছিলো।

এই বলে আশে পাশে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজতে থাকে হাসান। তারপর কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, হায় খোদা, আমার—টুপীটা গেলো কোথায়? আমার টাকা পয়সার বটুয়াটা? ইজের আর পাতলুনই বা কি হলো?

আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে তড়াৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে শহরের প্রবেশ দরজা পেরিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগলো। হাসানের তখন এক চিন্তা—তার টুপী তার বটুয়া আর পাতলুন। তার পিছন পিছন এক দঙ্গল ফচকে চেংড়া যে তাড়া করে চলেছে সে দিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। ছেলেগুলো মজা করে আওয়াজ তুলছে—পাগল পাগল...

হাসান দেখলো নিরুপায়। যতো সে এগোচ্ছে তত বেশী ফাজিল ফক্কড় ছোঁড়া এসে দল ভারী করে তুলছে। একটা রুটীর কারখানার দরজা খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে সে। এই দোকানের মালিকটা দারুণ বদমেজাজী লোক। তার ভয়ে ছোকরাগুলো কেটে পড়লো যে যার মতন।

এবার হাসানকে এখানে রেখে আসুন আমরা যাই সিৎ-অল-হুসনর কাছে।

সকালে ঘুম ভেঙে গেলো হুসনর। পাশে দেখে হাসান নাই। ভাবলো, হয়তো ছোটোঘরে ঢুকেছে। যখন হাসানের প্রতীক্ষায় সে বসে আছে, ঘরে ঢুকলো তখন তার বাবা সামস্-অল-দীন। জিজ্ঞেস করলো, কেমন কাটলো, বেটী?

তার মন বড় বিষণ্ন, মুখে হাসি নাই। সুলতানের কোপে পড়ে মেয়েটার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেলো। একটা কদাকার কুঁজোর সঙ্গে তার শাদী হলো। হয়তো মনের দুঃখে মেয়েটা তার আত্মঘাতী হবে। আবার প্রশ্ন করলো, তোর কোন অসুবিধে হয়নি তো মা?

বাবা ভেবেছিলো, মেয়েকে দেখবে বিষণ্ন কাতর। কিন্তু একি তার টসটসে চেহারা। আনন্দে ডগোমগো হয়ে উঠেছে ওর মুখ চোখ। রাগে গর্জে উঠে সে, বেশরম বেহায়া লেড়কী? বংশের খানদানী মর্যাদার কথাও কি সব ভুলে গেছিস তুই। একটা নীচ নফরকে নিয়ে আমোদ ফুর্তি করেছো সারারাত? তার চেয়ে গলায় দড়ি জুটলো না?

—আব্বাজান! হুসন বাবাকে জড়িয়ে বলে, তুমি ভুল করেছো। কাল রাতে আমার সঙ্গে যার শাদী হয়েছে তার পায়ের নখের যুগ্নিও না তোমার ঐ বাঁদরমুখো কুঁজো বামনটা। আমরা সবাই মিলে লোকটাকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছি সারাক্ষণ। ভারি মজা করেছি। তুমি মজাক করে কুঁজোটাকে নিয়ে এসে অবশ্য ভালোই করেছো, কিন্তু আমার অবস্থা বোঝ তখন? আমি তো কেঁদে সারা। তখন কী করে বুঝবো, ওটা আসলে আমার বর না—তোমরা তামাশা করার জন্যে পাঠিয়েছো? যাক গে? এখন অন্য কথা বলো।

হুসনর কথায় আরো রেগে উঠলো সামস্-অল-দীন।—কথাবার্তা যখন বলবে, একটু হিসেব করে সভ্য-ভব্য ভাবে ব'লো। এ সব কি অনা-সৃষ্টি কথা তোমার মুখে? তুমি কি বলতে চাও, ঐ কুঁজোটাকে নিয়ে রাত কাটাওনি?

হুসন আদুরে মেয়ের মতো ন্যাকা সুরে বলতে থাকে, আবার সেই হতচ্ছাড়া কুঁজোটার নাম মুখে আনছো আব্বাজান? বলছি, ওসব অলক্ষুণে কথা থাক এখন। তা হলে গোড়া থেকেই বলি, শোনো।

গতরাতের আগাগোড়া সব কাহিনী বিবৃত করলো হুসন। আঃ কী আমার বরাত আব্বাজান। আজ আমার মতো সুখী আর কোন মেয়ে নাই দুনিয়ায়। কী তার রূপ কী তার যৌবন। সারা দেশ ঢুড়লে তার জুড়ি পাবে না তুমি। যেমন রূপ তেমনি তার ব্যবহার। সারারাত ধরে কত ভাবে কত আদর সোহাগ করেছে—সে তোমাকে তো খুলে বলা যায় না, আব্বাজান!

--তোর কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেলো নাকি? কই, কোথায় সে ছেলেটা?

হুসন বলে, দেখো, হয়তো ছোটঘরে গেছে।

আর দেরি সহ্য হলো না। ক্ষিপ্র পায়ে উঠে গিয়ে ছোটঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো। একটা বেটে কুঁজোলোক গর্তের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

—কে তুমি? উজির গর্জে ওঠে।—তুমি সেই কুঁজোটা, না?

কিন্তু লোকটা এমনই ভীতসন্ত্রস্ত যে কোন জবাব দিতে পারলো না। কেবলই তার মনে হতে লাগলো, জিনিটাই বুঝি আবার ফিরে এসেছে।

এই সময় রাত্রি অবসান হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন বাইশতম রাত্রি। আবার সে গল্প শুরু করে।

তারপর শুনুন শাহজাদা, জাফর তার গল্প বলে যাচ্ছে আর খলিফা হারুন-অল-রসিদ তন্ময় হয়ে শুনছেন।

সেই ভীত সন্ত্রস্ত কুঁজোটা কোন উত্তর দিতে পারলো না। শুধু তার মনে হতে থাকে, জিনি এসে পড়েছে আবার।

উজির এবার আরও জোরে চিৎকার করে ওঠে, কে তুমি বলো শিগ্গির। জবাব দাও। না হলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেবো।

এই ওষুধে কাজ হলো।—দোহাই বাবা, জিনি সাহেব, তুমি অগতির গতি, জগতের পতি, অনাথের নাথ, পরম পিতা, তোমাকে গড় করি। আমার কোনো দোষ নিও না, আমি তোমার কোন কথার অবাধ্য হইনি।

—কী যাতা বক বক করছো। আমি কোন জিনি-ফিনি না, আমি মেয়ের বাবা-সুলতানের উজির।

তখন সেই কুঁজোটা তড়ফে উঠলো, ওঃ আপনি? আপনি বেরিয়ে যান এখান

থেকে। আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। আমার জীবনটাই বরবাদ করে দিয়েছেন আপনি। শিগ্গির এখান থেকে কেটে পড়ুন। না হলে, এক্ষুণি সেই আফ্রিদি এসে পড়লে ঠ্যালা বুঝবেন। আপনার মুখ দেখতে চাই না আমি, চলে যান। যত নষ্টের গোড়া আপনি। আমার এতো কষ্ট খালি আপনার জন্যে। আপনি আমাকে একটা নষ্ট মেয়েছেলের ঘাড়ে চাপাবার মতলবে ছিলেন। আপনার মেয়ে মহব্বত করে একটা মোষ—একটা গাধা—মানে মানে—একটা আফ্রিদি দৈত্যর সঙ্গে। আপনি নিজেও যতটা আপনার মেয়েও ঠিক ততটা খারাপ বদমাইশ।

—তুমি একটা বদ্ধ উন্মাদ, উজির বললো, এদিকে একবার বেরিয়ে এসো, তারপর তোমাকে মজা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কুঁজো তখন সেয়ানার মতো বলে, হুঁ বাবা, ওটি হচ্ছে না। আফ্রিদির হুকুম ছাড়া একপাও এখান থেকে নড়বো না, অতোটা পাগল এখনও হইনি আমি। যতক্ষণ না সূর্য উঠছে ততক্ষণ একপা নড়ছি না এখান থেকে। আপনি সরে যান। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন। আচ্ছা, বলুন তো, এতক্ষণে সূর্য উঠেছে কি ওঠেনি?

উজির বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন করে, আফ্রিদি কী কী করেছে, কী কী বলেছে তোমাকে?

কুঁজো তখন সমস্ত খুলে বললো তাকে।

উজির পায়খানার ওপাশের আর একটা দরজা খুলে দিয়ে বললো, রোদ উঠে গেছে, যা পালা এখান থেকে।

দরজার ওপারে পা দিয়েই চোঁ দৌড় দিয়ে নিমেষে হাওয়া হয়ে গেলো কুঁজোটা। দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলো প্রাসাদের দরবার মহলে—একেবারে সুলতানের সামনে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সব বৃত্তান্ত। কালকের রাতের সব কাহিনী।

এদিকে সামস্-অল-দীন সিৎ-অল-হুসনর কাছে এসে দিশাহারা ভাবে বললো, বেটা মনে হচ্ছে আমার মাথাটা বোধ হয় খারাপই হয়ে গেছে।

—কেন আব্বাজান?

—এ যে সব ভুতুড়ে আজগুবী কাণ্ডকারখানা আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। একটু খোলসা করে বলতো, মা।

হুসন বাবার হাত ধরে কাছে বসায়। বলে, এতো জলের মতো পরিষ্কার, আব্বাজান! সেই প্রিয় দর্শন যুবক গত রাতে উপস্থিত সবারই খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলো। তার সঙ্গেই আমি মধুযামিনী যাপন করেছি। তোমাকে বলতে লজ্জা করছে, আব্বজান, আমার বিশ্বাস, তার সঙ্গে গতরাতে সহবাসের ফলে আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি। এই দেখো তার প্রমাণ—তার মাথার বাদশাহী টুপী, তার টাকাপয়সার বটুয়া, আর ঐ দেখো তার পাতলুন আর ইজের।

চেয়ারের উপরে রাখা টুপীটা হাতে তুলে নিলো সামস্-অল-দীন। এ টুপী তো বসরাহর উজির আমিররা পরে। দেখেই চিনতে পারলো। সোনার পাতে মোড়া। নানা লতাপাতার নক্সা করা চার পাশে। হুসন বসলো, বাবা দেখো, ওর পাতলুনের কোমর বন্ধনীতে কি একটা শক্ত জিনিস।

পাতলুনটা বাবার হাতে এগিয়ে দিলো হুসন।

ক্ষিপ্রহাতে উজির সেলাইটা ছাড়িয়ে ফেললো কোমরবন্ধনীর। একখানা কাপড় জড়ানো তুলোট কাগজ। কাগজখানার ভাঁজ খুলতে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে সে। হুসন, মা পেয়েছি! এই তো আমার জানের ভাই নূর-এর সই কার দস্তাবেজ। টাকা পয়সার বটুয়াটা খুলে দেখলো, এক হাজার সোনার মোহর—সেই সওদাগরের দেওয়া। সেই সঙ্গে একখানা কাগজে

কয়েকটা ছত্র লেখা। বসরাহর সেই সওদাগর একহাজার মুদ্রার বিনিময়ে নূর-অল-দীনের পুত্র হাসান বদর-অল-দীন-এর কাছ থেকে একটা জাহাজ ক্রয় করেছে। এবং নগদে সেই মুদ্রা হাসানের হাতে তুলে দিয়েছে। তারই বয়ান লিখে সওদাগর সই করে দিয়েছে ঐ কাগজে। সামস্-অল-দীন পড়ে উল্লাসে ফেটে পড়লো।—আমার ভাই নূর-অল-দীন। তার ছেলে হাসান বদর-অল-দীন। তারপরে বুক চাপড়াতে লাগলো উজির।—হায়রে আমার আদরের অভিমানী ভাই। রাগ করে চলে গেলে জন্মের মতো। আর দেখা হলো না, আর দেখা হবে না। জানো মা—এই নূর-অল-দীন তোমার আপন চাচা, আমার সহোদর ভাই। হাসান বদর-অল-দীন তার ছেলে। তোমার চাচার ছেলে—তোমার ভাই। এর সঙ্গেই তোমার শাদী হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু একটা তুচ্ছ কারণে আমাদের ঝগড়া বাঁধে। আর তার জন্যে ভাই আমার চিরকালের মতো দেশান্তরী হয়ে গেলো। সে যাই হোক, আজ আঠারো বছর বাদে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। হাসানকেই আমি চেয়েছিলাম জামাই করতে। তা এই নাও, তোমার একহাজার দেনমোহর। শাদীর যৌতুক রেখে গেছে সে।

তুলোট কাগজখানা ভালো করে আর একবার পড়লো উজির। নূর-অল-দীনের জীবনের মোটামুটি রোজনামচা। তার শাদী এবং হাসানের জন্ম তারিখ দেখে অবাক হয় সে। সে কি, এ যে তারও শাদীর তারিখ। হাসানের জন্মতারিখে তার মেয়ে হুসনও তো জন্মেছে। আশ্চর্য খোদার লীলা! উজির আর অপেক্ষা করে না। তড়িঘড়ি সুলতানের কাছে গিয়ে কাগজখানা হাতে তুলে দেয় তার। আদ্যোপান্ত সব কাহিনী খুলে বলে তাকে। সব শুনে হতবাক হয়ে পড়ে সুলতান। এমন আশ্চর্য যোগাযোগ—যেন আল্লাহরই অভিপ্রায় বলে প্রতিভাত হয় তার কাছে। নকল নবীশদের ডেকে বলে, কাহিনীর সব বিবরণ হুবহু লিখো রাখো।

উজির আবার ফিরে আসে মেয়ে হুসনর কাছে। কিন্তু তখনও হাসান ফিরে আসে না। এদিকে বেলা বাড়তে থাকে। উজির উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তবে কি চলে গেছে?

হুসন বলে, কিন্তু বাইরে সে যাবে কি করে আব্বাজান। ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখতে না পেয়ে প্রথমে ভেবেছিলাম সে বাইরে কোথাও গেছে। কিন্তু দরজাগুলো সব যেমন বন্ধ করা হয়েছিলে'—তেমনি বন্ধই ছিলো। আমি নিজে হাতে দরজাগুলো খুলেছি। তার খানিকবাদে তুমি এলে আমার কাছে।

উজির ভাবলো, এও আল্লাহরই এক লীলা। এর অর্থ উদ্ধার করা মানুষের কর্ম নয়।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখলো রাতের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

তেইশতম রজনী। আবার কাহিনী শুরু হলো। শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা, আপনার তো খেয়াল আছে নিশ্চয়ই, জাফর গল্প শোনাচ্ছে আর খলিফা মাঝে মাঝে তারিফ করে উঠছে।

উজির বুঝতে পারলো তার ভাইয়ের ছেলে—তার জামাতা উধাও হয়ে গেছে। কবে ফিরবে কে জানে। কিন্তু দুনিয়ার সব কিছু এতো দ্রুত বদলায় যে আজকের মানুষকে দু'বছর বাদে চেনা দায় হতে পারে। তাছাড়া কত রকমের ঠগ জোচ্চোর আছে—তাদের কত রকম ফন্দী, কে ধরতে পারে। একটিমাত্র রাত—তাও সারাক্ষণ নয়—তার মধ্যে কতটুকু সময়ই বা হুসন তাকে কাছে পেয়েছে? তাকে যদি সে পরে ঠিকঠাক চিনতে না পারে, দোষ দেওয়া যায় না। তাই শাদীর বাসর সজ্জা ভেঙে ফেলার আগে তার একটা নিখুঁত চিত্র ফুটিয়ে তুলে বিস্তারিত বিবরণ লিখে রাখার সিদ্ধান্ত করলো। দোয়াত কলম নিয়ে একখানা তুলোট কাগজে ঘরের খুঁটিনাটি সব জিনিসপত্রের হুবহু বর্ণনা লিখে নিতে লাগলো। কোনখানে মঞ্চ—কী ভাবে কী কী

জিনিস দিয়ে তাকে সাজানো হয়েছিলো, ঘরের কোথায় কোথায় ছিলো ঝাড়বাতি, কোথায় মোমবাতি, কোথায় ছিলো ফুলদানি, কোথায় ছিলো টেবিল, কোথায় কখানা চেয়ার ইত্যাদি সব বিবরণ লিখে গেলো উজির। লেখা শেষে কাগজখানা ভাঁজ করে পাতলুন, টুপী, ইজের বটুয়া সব চাদরের সঙ্গে সিন্দুকে ভরে রাখলো। মেয়েকে বললো দরকার হলে কাগজখানা পড়ে দেখো, মা। কাজে লাগতে পারে।

সিৎ-অল যা ভেবেছিলো তাই। শাদীর প্রথম রাতেই সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলো। ন'মাস পরে চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিলো সে। ছেলের বাবার মতো সেও অনিন্দ্যসুন্দর। ধাত্রী এসে বাচ্চাকে গোছল করিয়ে, কাজল পরিয়ে নাড়ী কেটে ধাইমার কোলে তুলে দিলো। নাম রাখা হলো আজীব—অর্থাৎ আজব, মানে চমৎকার। যখন আজীবের বয়স সাত, কাইরোর এক নাম করা মাদ্রাসায় ভর্তি করা হলো তাকে। প্রতিদিন সে সেজেগুজে দাদামশায়ের এক পুরোনো বিশ্বস্ত নফরের সঙ্গে মাদ্রাসায় যায়। দুপুর বেলায় খানা খেতে আসে। আবার ফিরে যায়। আসে সেই বিকেলে। কিন্তু পাঁচটা বছর পরে মাদ্রাসার পাঠে ইতি করে ঘরে ফিরে আসতে হয় তাকে।

আজীব ভীষণ দুরন্ত ছিলো। তার সহপাঠীদের মানুষ বলেই গণ্য করতো না। সব সময় তার অহঙ্কার ভাব। সে উজিরের নাতি। কথায় কথায় সহপাঠীদের শুনিয়ে দিতে সে কথা। যাই হোক, এই ভাবে পাঁচ বছর কেটে গেলো। একদিন ছেলেরা দল বেঁধে মৌলভীর কাছে নালিশ করলো। মৌলভী সাহেব বড় সদাশয় ব্যক্তি। তিনিও পছন্দ করতেন না আজীবের ডেপোমী। ছেলেদের শান্ত করে বললেন, তোমরা এখন চুপচাপ থাকো। কাল আমি এর বিধি ব্যবস্থা করবো। যাতে আর কখনও সে তোমাদের পিছনে না লাগে। কাল যখন তোমরা সবাই খেলার সময় এক জায়গায় জড়ো হবে, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আজ একটা ভারি মজার খেলা দেখাবো আমি। কিন্তু তার আগে তোমরা সবাই চেঁচিয়ে তোমাদের মা বাবার নাম বলবে—যাতে প্রত্যেকে শুনতে পায়। যদি কেউ তার মা বাবার নাম না বলতে পারে, তবে সে জারজ। তার সঙ্গে আমরা আর কখনও খেলবো না।'

পরদিন সকালে যথারীতি আজীব মাদ্রাসায় গিয়ে পৌঁছলো। খেলার সময় ছেলেরা তাকে ছেঁকে ধরে বললো—আজ আমরা একটা মজার খেলা খেলবো। কিন্তু তার আগে ভাই সবাইকে তার মা বাবার নাম বলতে হবে। যে বলতে পারবে না তাকে আমরা খেলায় নেবো না। কী, সবাই রাজি।

রাজি-রাজি-রাজি বলে সবাই সমস্বরে আওয়াজ তুললো।

—আচ্ছা তা হলে আরম্ভ করা যাক।

একটি ছেলে সামনে এগিয়ে এসে বললো, আমার নাম নবী, মার নাম নবীহাহ্ আর আমার বাবার নাম ঈজ্-অল-দীন। আর একজন এসে বললো, আমার নাম নাবীজ, আমার মায়ের নাম জামিলাহ, বাবার নাম মুসতাফা। এইভাবে একে একে প্রায় সকলেই সবার মা-বাবার নাম বলতে লাগলো। যখন আজীবের পালা এলো, গর্বভরে সামনে এসে বলতে লাগলো, আমার নাম আজীব, আমার মার নাম সিৎ-অল-হুসন আর আমার বাবা মিশরের উজির সামস্-অল-দীন।

তৎক্ষণাৎ সব ছেলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠে।—দুয়ো দুয়ো, কিচ্ছু জানো না। তিনি তোমার বাবা কি করে হবেন?

আজীব ক্রুদ্ধ হয়।—তোমাদের ডাণ্ডা মেরে মাথা গুড়িয়ে দেবো। উজিরই আমার বাবা।

ছেলেরা সবাই প্রতিবাদ করতে থাকে।—না না না। কিচ্ছু জানো না তুমি। উজির তোমার বাবা নন। তিনি তো তোমার মায়ের বাবা তোমার দাদু। দুয়ো, বাবার নাম বলতে পারে না। তোমার সঙ্গে আর কেউ খেলবো না।

ছেলেরা কেউ বা মাথায় টোকা মেরে পালায়, কেউবা জামা ধরে টানে আবার কেউ চিমটি কেটে চম্পট দেয়। আজীব একা অতোগুলো ছেলের টিটকিরিতে নাস্তানাবুদ হয়ে ওঠে। এক পাশে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে থাকে, ব্যাপারটা কী?

মৌলভী সাহেব কাছে এসে সস্নেহে বলেন, ওরা ঠিক কথাই বলেছে, বাবা। উজির সাহেব তোমার বাবা নন। উনি তোমার দাদু হন। তুমিও জানো না—আমরাও জানি না তোমার বাবা কে? সুলতান তোমার মার সঙ্গে এক কুঁজো বামনের শাদী দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কখনও তোমার মার সঙ্গে সহবাস করেনি। সে অবশ্য গল্প বলে বেড়ায় শাদীর রাতে বাসরঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও নাকি জীন এসে তোমার মার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে গেছে। আচ্ছা তুমিই বলো, বাবা এসব গাজাখুরি গল্প না? সুতরাং তোমার সহপাঠীরা যা সব বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে তা মোটেই অন্যায্য নয়। ওরা তোমাকে জারজ বলেছে, আমি শুনেছি। যার বাবার ঠিক নাই তাকেই তো আমরা জারজ বলি। সে দিক থেকে তারা তো কিছু অন্যায় বলেনি? রাস্তার একটা নামগোত্রহীন ক্রীতদাসকে আমরা অতো অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা করি কেন? কারণ ওর মা-বাবার ঠিক নাই। তাই বলছি, বাবা দেমাকটা একটু কমাও, একটু নরম হয়ে মিলেমিশে চলো দেখবে সবাই তোমাকে ভালোবাসবে, মাথায় করে রাখবে।

আজীব কিন্তু মৌলভীর উপদেশে কর্ণপাত করলো না। মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো, তার মা—সিৎ-অল-হুসন-এর সামনে।—মা, কে আমার বাবা। কী তার নাম? বলো।

ছেলের এই মূর্তি কখনও দেখেনি সে। চোখের জলে বুক ভেসে গেলো তার। বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, কে আবার, উজির তোমার বাবা।

—না না, মিথ্যে কথা। উজির সামস্-অল-দীন আমার বাবা না। সে তোমার বাবা। আমার বাবা কে বলো?

সিৎ-অল চুপ করে থাকে। উত্তর দিতে পারে না। আজীব কিন্তু নাছোড়বান্দা। চিৎকার করে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলে, বলবে কিনা বলো? যদি না বলো, এক্ষুণি আমি তরোয়াল দিয়ে গলা কেটে ফেলবো আমার।

সিৎ-অল আঁতকে ওঠে।—না না, বাবা, না। অমন কথা মুখে এনো না। বলছি, তোমার বাবার কথা। বলছি, শোনো।

শাদীর প্রথম রাতে এসেছিলো সে।
তার লকলক করা রূপের আগুনে
পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেলাম আমি—নিমেষে।
আমার সকল সত্ত্বা; আমার সকল সঞ্চয়,
দেহ মন প্রাণ
নির্ভয়ে উজাড় করে দিয়েছি তার হাতে,
নিয়ে সে উধাও হলো জানি না কোথায়।
অনেক শীতের রাত,
ফাল্গুনের মাস
একে একে পার হয়ে যায়,

আজও বসে আছি প্রতীক্ষায় তার—দিবস শর্বরী,
আমি এক নিন্দিত শবরী।

মা যত কাঁদে ছেলে আরও বেশী কাঁদে। হুসনর প্রাণ হুহু করে যায়। আজ বারোটা বছর তুষের আগুন জ্বলছে তার বুকে। মুখ ফুটে বলতে পারে না কাউকে। আজ পেটের সন্তান আজীবকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তার দুঃখের কাহিনীর কিছুটা বলতে পেরে, ভার কিছুটা লাঘব হয়।

উজির-এর কাছে খবর পৌঁছয়, আজীব অশান্ত হয়ে উঠেছে। সে তার জন্ম পরিচয় জানতে চায়। তাড়াতাড়ি ছুটে আসে হুসনর মহলে। দেখে মা বেটা দু'জনে আকুল নয়নে কেঁদে চলেছে।

—কী হয়েছে মা, তোমরা কাঁদছো কেন?

হুসন বললো, আজ মাদ্রাসা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা আমার বাবা কে?' আমি কী উত্তর দেবো, আব্বাজান? মাদ্রাসার ছেলেরা তাকে অনেক মন্দ কথা বলেছে। তাই বোধহয় ওর মনে আঘাত লেগে থাকবে।

নাতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে উজির বলতে থাকে, সেই সব অতীত কাহিনী। তার ছোট ভাই নূর-অল-দীন কী কারণে দেশত্যাগী হয় এবং বসরাহয় গিয়ে কবে সে সেখানকার উজিরের কন্যাকে শাদী করে। তারপর হাসানের জন্ম, নূর-এর লোকান্তর এবং শাদীর রাতে হাসানের অলৌকিক আবির্ভাব এবং শাদীর রাত শেষে তার রহস্যজনক অন্তর্ধান—সব সবিস্তারে বর্ণনা করলো সে। অবাক বিস্ময়ে শুনতে থাকে আজীব।

—আমার বাবা কবে ফিরে আসবে, দাদু?

উজির এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। কান্নায় ভেঙে পড়ে—তা তো বলতে পারবো না ভাই। চলো আমরা বসরাহ-য় যাই। তাকে খুঁজে নিয়ে আসি।

উজির সুলতান সমীপে হাজির হয়ে নিবেদন করলো সব বৃত্তান্ত।

—হুজুর, এ ধরনের গুঞ্জন বে-ইজ্জতের ব্যাপার। এভাবে তো আর চলতে দেওয়া যেতে পারে না। একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

সুলতান বললো, এক কাজ করো, উজির। কিছুদিনের জন্য ছুটি দিচ্ছি তোমাকে। যাও, একবার খোঁজ করে দেখে এসো তাকে। আমার মনে হয়, বসরাহতেই বা তার কাছাকাছি কোথাও আছে সে। আমি তার নামে হুলিয়া করে দিচ্ছি। আমার হুলিয়া সঙ্গে থাকলে যে কোন দেশের সুলতান তোমাকে তার সন্ধান দেবার সাধ্যমতো ব্যবস্থা করবে। এবং যেখানে খুশি তুমি যেতেও পারবে।

সুলতানের বদান্যতায় মহা খুশি হলো উজির। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ করে দরবার থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। হুসন ও আজীবকে সঙ্গে নিয়ে সেই দিনই বসরাহর পথে বেরিয়ে পড়লো। অনেকদিন পরে তারা এসে পৌঁছলো দামাসকাস শহরে। কাইরো থেকে দামাসকাস যতোটা পথ দামাসকাস থেকে বসরাহও ততোটা। এখনও অর্ধেক বাকী। পথের ক্লান্তি কাটাবার জন্য সেখানে দু'টো দিন বিশ্রামের সিদ্ধান্ত করে উজির। শহরের প্রবেশ তোরণের সামনে তাঁবু গাড়লো সে।

উজিরের সঙ্গে যতো নফর চাকর এসেছিলো সবাই দামাসকাস দেখার জন্য ব্যাকুল হলো। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে শহর পরিক্রমা শুরু করলো উজির। সেখানাকর নানারকম মনোহারী জিনিসপত্র সওদা করলো ওরা। নিজেদের দেশের কিছু কিছু বাহারী

জিনিস বিক্রিও করলো কেউ কেউ। শহরের বনেদী হামাম-এ গোছল করলো। ওখানকার বহুপ্রাচীন মসজিদ উম্যাদ-এ নামাজ পড়লো। লোকে বলে দামাস্কাসের এই মসজিদ দুনিয়ার সেরা। এতো প্রাচীন, এতো বিশাল মসজিদ নাকি আর কোথাও নাই।

সবাই যখন এই সব করছে, আজীব তখন শহরের পথে পথে নানা রঙের মজার মজার জিনিসের সন্ধান করে চলেছে। উজিরের পুরাতন ভৃত্য খোজা সাইদ রয়েছে তার পাশে পাশে। তার হাতে একখানা লম্বা লাঠি।

দামাস্কাসের দামাল ছেলেরা আজীবের পিছনে পিছনে ধাওয়া করে। এমন খুবসুরৎ লেড়কা জীবনে দেখেনি তারা। কিন্তু আজীবের বা সাইদের এসব ভালো লাগে না। একটু স্বচ্ছন্দে পথ চলার যো নাই। সাইদ লাঠি উঁচিয়ে ভয় দেখায়—'হট যাও, হট যাও হিঁয়াসে!' কিন্তু ভিড় আরো বাড়তেই থাকে। শুধু ছেলেরাই না, শহরের হাজার হাজার মেয়েপুরুষ দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। আজীবের অসাধারণ রূপের কথা চাউর হয়ে গেছে সারা শহরে। কেউ বলে, এমন রূপের বাহার কোন মানুষের হয় না। নিশ্চয়ই কোন বেহেস্তের দূত মাটিতে নেমে এসেছে। আবার কেউ বলে আসমানের শুকতারার মতো আলো ঠিকরে পড়ছে তার শরীর থেকে।

ভিড় ক্রমশই বাড়তে থাকে। জনতার চাপে আজীবের দেহে আঘাত লাগতে পারে আশঙ্কায় সাইদ চিৎকার করে ওঠে।—কী; হচ্ছে কি? তোমরা কি ছেলেটাকে পিষে মেরে ফেলবে নাকি? এতো দেখবার কি আছে? আসমানের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে বুঝি। যত্তোসব...

কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করে না। সাইদ তখন লাঠি নিয়ে তাড়া করে। কিন্তু এভাবে আর কাঁহাতক পারা যায়। দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে ওরা এক সময় এক খাবার-এর দোকানের সামনে এসে পড়ে। সাইদ ভাবে, জনতার হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়া ছাড়া বোধহয় আর গতি নাই।

এই খাবারের দোকানের সঙ্গে আপনাদের একবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। হাসান বদর-অল-দীন একদিন চেংড়া ছোঁড়াদের তাড়া খেয়ে এই দোকানেই আশ্রয় নিয়েছিলো। তারপর থেকে সে আর এ দোকান থেকে চলে যায়নি। দোকানের মালিক তাকে আদর করে আশ্রয় দিয়েছিলো। পরে তাকে নিজের ছেলের মর্যাদায় দোকানের কাজে বসিয়ে তার হাতেই চাবি তুলে দেয়। আজ বারো বৎসর এই দোকানেই আটকে পড়ে আছে হাসান। মালিক আজ তিন বছর হলো দেহ রক্ষা করেছে। এখন সেই পুরোপুরি মালিক। সে-দিন নানারকম খাবারের মধ্যে একটা খুব মুখোরোচক খাবার বানিয়েছিলো সে। বেদানার হালওয়া। সারা দামাসকাস শহরের আর কোন দোকানে এ খাবার পাওয়া যায় না। দামাসকাস শহরেই বা বলি কেন, তামাম দুনিয়ার কেউ এ খাবার বানাতে পারবে না। শুধু একজন ছাড়া। সে তার মা। ছোটবেলায় প্রায়ই সে এই হালওয়া তৈরি করে খাওয়াতো তাদের। মা-র কাছ থেকেই তার শেখা।

আজীবকে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসানের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে তার নিখুঁত চেহারা—রূপ। এ ছেলে তো কোনো সাধারণ ঘরের না।—খোকা ভেতরে এসো, না! এসো, ভেতরে এসে বসো। তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে! তোমার চাঁদের মতো সুরৎ দেখে আমার কেমন যেনো সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেনো তোমাকে দেখেছি, বাবা। কিছুতেই মনে করতে পারছি নে। অথচ মনে হয়, খুবই চেনা, খুবই আপনার। ভেতরে এসে বসো, বাবা। তোমাকে একটু মিষ্টি-মুখ করাতে চাই। আমি নিজে হাতে বানিয়েছি।

হাসানের কথা শুনে আজীবের ভালো লাগে। সাইদের দিকে চেয়ে বলে, দেখো, বাবা-সাইদ, মনে হয়, লোকটা বড় দুঃখী। বোধহয় আমার মতো একটা ছেলে ছিলো তার। হয়তো বা সে বেঁচে নেই। অথবা থাকলেও তার কাছে নেই। চলো লোকটা যখন অতো করে

ডাকছে ভেতরে গিয়ে বসি। সে যেমন তার ছেলের জন্যে পাগল আমিও তো তেমনি আমার বাবাকে খুঁজতেই পথে বেরিয়েছি। তার কথা শুনলে আল্লাহ খুশি হবেন। তিনি হয়তো আমার বাবাকে ফিরিয়ে দেবেন।

কিন্তু সাইদ সঙ্গে সঙ্গে 'না না' করে ওঠে। ওরে সব্বোনাশ উজিরের ছেলে হয়ে তুমি এই বাজারের দোকানের খাবার খাবে, তা কক্‌খনো হয় না। উজির জানতে পারলে আমার গলা কেটে ফেলবে। তোমার কিচ্ছু ভয় নাই। তোমাকে এই লোকগুলো যারা ঘিরে ধরেছে তাদের আমি এক্ষুণি লাঠি-পেটা করে ভাগিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তাই বলে তুমি দোকানের ভিতরে গিয়ে বসবে—তা হতে পারে না। তোমার কত মান ইজ্জত। উজিরের ছেলে তুমি। একটু তুচ্ছ মেঠাইওলার দোকানে বসে যা তা খাবে, তা হয় না।

সাইদের কথা সবই শুনতে পায় হাসান। চোখে ভরে আসে জল। কাকুতি মিনতি করে বলে, মেহেরবানী করে একটিবার আমার দোকানে তোমার পায়ের তুলে দাও, মালিক—। আমি মনে একটু শান্তি পাবো। আমাকে এইটুকু অনুগ্রহ করো, বাবা। আল্লাহ তোমাকে সুখে রাখবেন। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

সাইদ বলে, সে হয় না দোকানি। আমার মালিক তোমার দোকানে বসে বারোজনে যা খায় সে জিনিস খেতে পারে না। কত বড় ঘরের ছেলে সে। তার বনেদীয়ানা নষ্ট হয়ে যাবে, না!

হাসান এবার সাইদের মন ভিজাতে বলে, তোমার বাইরেটা ঝুনো নারকেলের মতো অতো শক্ত হলে কি হবে, আমি বুঝেছি, ভেতরটা ধবধবে সাদা মিষ্টি শাসে ভরা।

হাসানের কথা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ঝুনো নারকেল সাইদ।—আচ্ছা! তাই নাকি? বাঃ, বেশ মজার কথা বলতে জানো তো!

হাসান আবৃত্তি করে ঃ একান্ত সে অনুরক্ত, সুলতানের বিশ্বস্ত নফর।
জুড়ি তার পাবে নাকো, করে এসো দুনিয়া সফর॥
আপন মাথার মণি—অন্তরের ধন।
তার হাতে তুলে দেয়, নিশ্চিন্ত নির্ভর অনুক্ষণ॥

যাদু মন্ত্রের মতো কাজ হলো এই কবিতার কটা ছত্রে। প্রশংসায় কে না খুশি হয়! আজীবের হাত ধরে দোকানে ঢুকে পড়ে সাইদ।

হাসান যেনো আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। বাদশাহ সুলেমানের সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্ন হাতের মুঠোয় পেলেও এতো আনন্দ হতো না তার। অপলক নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে আজীবকে। দেখে দেখে যেনো আর আশ্ মেটে না।

দু'খানা তামার রেকাবী করে বেশ খানিকটা বেদানার হালওয়া এনে রাখলো আজীবের সামনে।—আজ আমার বড় আনন্দের দিন, তোমাকে মিষ্টিমুখ করাতে পারছি। আজকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে, বাবা। যতো দিন বাঁচবো।

আজীব আর সাইদ প্রাণভরে তৃপ্তি করে খেলো। বেদানার দানাগুলোর সঙ্গে চিনি, দুধ, বাদাম, পেস্তা, মনাক্কা এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে তৈরি এই বেদানার হালওয়া। এমন সুন্দর মিষ্টি গন্ধ—সারা দোকান ঘরটা ভরপুর হয়ে গেছে। সবটুকু চেটেপুটে খেলো দু'জনে। আজীব মহা খুশি। বাঃ বেড়ে মজার জিনিস। আমাদের হালুইকররা তো বানাতে পারে না, বাবা-সাইদ?

সাইদ বলে, আমি বুড়ো হয়ে মরতে চলেছি। অনেক সুলতান বাদশাহর নেমন্তন্ন খেতেও গেছি তোমার দাদুর সঙ্গে। কিন্তু কই, কোথাও তো এমন খাবারের নামও শুনিনি কখনও!

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আজীব বললো, বড় চমৎকার তোমার হালওয়া দোকানি। তা তুমি নিজে একটু খাও। সারা দিন রাত শুধু খেটেই চলেছো, একটু বসো আমাদের পাশে, গল্প করি।

হাসান পিস্তার বরফী বানাচ্ছিলো। হাতটা ধুয়ে এসে আজীবের পাশে বসলো।—ঠিক আছে আজ আর কোন কাজ নয়, বলো, আজ তোমার কথাই শুনবো শুধু।

আজীব বললো, জানো আমিও বড় দুঃখী। আমার বাবা কোথায় চলে গেছে সেই কবে, আর ফেরেনি। আমি আমার মা আর দাদু দেশে দেশে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাকে। হয়তো এমনি করে খুঁজতে খুঁজতে সারা দুনিয়াটাই ঘুরে বেড়াতে হবে। জানি না, খোদার কি ইচ্ছা। তুমিও একটু আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙ্গো না, দোকানি। আমার বাবাকে যেনো আমরা তাড়াতাড়ি খুঁজে পাই।

আজীবের চোখে জল এলো। হাসানও রুদ্ধ করতে পারে না তার অশ্রু। এই দশা দেখে সাইদের বুকটা টনটন করে ওঠে। ভাবে, শুধু মেঠাই মণ্ডাতে পেট ভরলেও প্রাণ ভরে না।

যাই হোক, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়, এবার তারা উঠে পড়ে তাবুর পথে রওনা হয়ে পড়ে।

আজীব চলে যেতেই হাসানের প্রাণ হাহাকার করে ওঠে। সব যেন কেমন ফাঁকা শূন্য হয়ে যায়। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সে। চটপট দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে রাস্তায় নেমে পড়ে। দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দামাসকাসের প্রধান তোরণ দ্বারের কাছে চলে আসে। সামনে অদূরে দেখতে পেলো ওরা দু'জনে চলেছে। চলার গতি মন্থর করে ওদের পিছনে পিছনে অনুসরণ করতে থাকে। হাসানের কিন্তু কখনও মনে হয়নি, আজীব তার নিজের ঔরসের সন্তান।

সাইদের সন্দেহ হয়, কে যেন তাদের পিছন পিছন ধাওয়া করে আসছে। হঠাৎ পিছন ফিরে দু'পা পিছিয়ে এসে হাসানকে প্রশ্ন করে, আমাদের পিছনে পিছনে আসছো কেন, তুমি? কী মতলব তোমার?

হাসান বলে, শহরের বাইরের একটু কাজে যাচ্ছি। তা তোমরাও এই পথে যাচ্ছো দেখে একটু পা চলিয়ে কাছে এলাম। একই যখন পথ, একটু গল্পসল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

সাইদ কিন্তু ক্ষেপে গেলো তার কথায়—তুমি কি ভেবেছো একটু হালওয়া খাইয়ে আমাদের মাথা কিনে নিয়েছো? মনে হচ্ছে, এখনি বমি করে দিই।

কিন্তু আজীব দেখলো, সাইদের এই কথায় হাসানের মুখা কালো হয়ে গেলো। বললো, তা আসুক না, কি হয়েছে? খোদার তৈরি পথে সব সাচ্চা মুসলমানেরই সমান অধিকার। ওর পথে ও চলবে, আমাদের কি ক্ষতি? তবে যদি সে আমাদের তাঁবুর দিকেও যেতে থাকে তা হলে মজা টের পাইয়ে দেবো বাছাধনকে।

প্রধান তোরণ দ্বার পার হয়ে ওরা হাসাবার দিকে পা বাড়ালো। হাসাবার সমতলে তাঁবু গেড়েছে ওরা। হাসানও বাঁদিকে বেঁকে ওদের পিছু নিলো। এবার আজীব রেগে আগুন। তা হলে তো সাইদ ঠিকই বলেছে। লোকটার মতলব খারাপ। একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে মারলো হাসানকে। অব্যর্থ লক্ষ্য। পাথরটা গিয়ে আঘাত করলা হাসানের কপালে। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত চেপে বসে পড়লো পথের উপর। রক্তে ভেসে যেতে লাগলো ওর সারা মুখ। আজীবের হাত ধরে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে তাঁবুতে এসে পৌঁছলো সাইদ।

নিজের হঠকারিতার জন্যে নিজেকেই দোষারোপ করতে লাগলো হাসান। কেন-বা সে তার দোকান বন্ধ করে তাদের পিছু ধাওয়া করতে গেলো। ওরা তো তাকে বারণ করেছিলো। সে তো তা শুনলো না, মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাদের পিছু নিলো কেন? ফিরে এসে আবার দোকান খুলে বেচাকেনা করতে লাগলো হাসান। আজ তার মা-র একটা কথা বার বার মনের মধ্যে নাড়া দিতে লাগলো। নিয়তি কখনো এড়ানো যায় না।

দু'দিন দামাসকাসে কাটাবার পর তৃতীয় দিনের শেষে তাঁবু গুটিয়ে আবার বসরাহর পথে যাত্রা করলো সামস-অল-দীন। চলার পথে হীম, হামাহ, আলেপ্পো, দিয়ার, বাকর,

মরিদীন, মসুল প্রভৃতি নানা ছোট বড় গ্রাম-শহর পেরিয়ে চললো। অবশেষে একদিন বসরাহয় এসে পৌঁছলো তারা।

সব আগে গিয়ে উঠলো সুলতানের দরবারে। যথাযোগ্য শাহী কায়দায় কুর্নিশ জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলো সুলতানের কাছে।

—আপনার পূর্বতন উজির নূর-অল-দীনের বড়ভাই আমি। মিশরের উজির পদে বহাল আছি।

সুলতানও খুব খাতির যত্ন করে বসালো তাকে। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলো। বললো, নূর-অল-দীন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু আমি তার কথা আজও ভুলতে পারি না। সে আমার বড় প্রিয় ছিলো। তার কাজে কামে, আচারে ব্যবহারে আমি কেন, আমার সল্‌তানিয়তের প্রতিটি মানুষ মুগ্ধ ছিলো। তার মতো মানুষ লাখে একটা মেলে। আর তার হীরের টুকরো ছেলে—হাসান, সে আমার চোখের মণি ছিলো। তাকেও হারিয়েছি আমি আজ তেরো বছর। কোথায় যে চলে গেলো—কেউ বলতে পারে না। তার মা—নূর-অল-দীনের বিধবা বিবি এখনও এই বসরাহতেই পড়ে রয়েছে। ছেলের প্রতীক্ষায়। যদি কখনও সে ফিরে আসে—সেই আশায়। নূর-অল-এর শ্বশুরও বিচক্ষণ উজির ছিলো আমার দরবারে। অনেক আগেই সে দেহ রক্ষা করেছে।

হাসানের মা-র কথা শুনে তাকে দেখার জন্য ব্যগ্র হলো সামস্-অল-দীন। লোকজন সঙ্গে দিয়ে সামস্-অল-দীনকে হাসানের মা-র কাছে পৌঁছে দিলো সুলতান।

প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে নূর-এর প্রাসাদোপম বিরাট ইমারৎ। নানা বিচিত্র রঙের মারবেল পাথরে তৈরি। সদর দরজায় ঢুকতেই সোনার ফলকে উৎকীর্ণ করা নূর-অল-দীনের নামের ফলক চোখে পড়লো। সামস্-অল-দীন নামটার উপর হাত বুলিয়ে কি যেন অনুভব করলো। চোখ জলে ভরে এলো।

রুদ্ধকণ্ঠে অনর্গল আওড়াতে থাকলো ঃ

সকালবেলায় সূর্যকে প্রতিদিন জিজ্ঞেস করেছি
তোমার কথা। সন্ধ্যাবেলার শুকতারাকেও।
হায়রে আমার নসীব। কেউ তো জবাব দেয়নি!
কিন্তু ওরা তো সবাই জানতো তোমার ঠিকানা—
তুমি এখানেই আছো।
কত হাজারো স্বপ্ন দেখেছি, কতো সব!
কিন্তু ভাই আমার—
তোমাকে তো কখনও পেলাম না আমার খোয়াবে?
একবার ফিরে এসো, দেখে যাও,
এখনো আমার মন তেমনি সবুজ আছে—
তেমনি কোমল। সেই যখন দুভাই একসাথে
ঘুরে বেড়াতাম নীলের তীরে—ঠিক তেমনি।
আবার যদি ফিরে আসো একবার!
আবার যদি তেমনি করে হাসো!
সেই আকাশ ফাটানো দিলখোলা হাসি—
জলপ্রপাতের মতো উচ্ছল—নির্ঝর।
লোকে বলে, কত নাম যশ, কত বড় দিল্ আমার।

কিন্তু ওরা তো জানলো না, শুধু তোমার জন্যে
খাটো হয়ে মাথা হেঁট করতেও দ্বিধা ছিলো না আমার।

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করলো সামস্-অল-দীন। হাসানের মা-র রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করতে খুলে গেলো। হাসান উধাও হওয়ার দীন থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে শোকানলে জ্বলছে সে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা তাজিয়া সাজিয়ে রেখেছে। তার ধারণা, হাসান—তার আদরের দুলাল আর বেঁচে নাই। তাই তার স্মৃতি হিসাবে এই তাজিয়াটা তৈরি করিয়েছে। সারা দিন রাত তাজিয়াটার সামনে বসে ছেলের কথা ভাবে সে।

তাজিয়া, তুমি কি বলতে পারো সে আর এ জগতে নাই!
সে কি তোমার কোলেই মাথা রেখেছে?
আর কি তাকে দেখতে পাবো না কোনদিন?
দুনিয়াটা আমার কাছে আজ শুকনো এক সাহারা,
খালি ধূ ধূ করা ধুলো আর বালি।
ঐ দূর আশমানের তারাদের ভীড়ে,
এক নওজোয়ান শাদীর পাত্রের সাজে,
সে তো তোমার কোলেই শুয়ে আছে...

হাসানের মা-র এই শোকগাথা শুনে দরজার সামনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সামস-অল-দীন। একটু পরে হাসানের মা উঠে এসে স্বাগত জানায়। ভিতরে এসে বসে সামস্-অল-দীন। প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে পরে আগাগোড়া সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বললো তাকে। কীভাবে তার কন্যার শাদীর রাতে সে বাসর ঘরে ঢোকে, কীভাবে তার সঙ্গে শাদী হয়। এবং কীভাবে তার সঙ্গে রাত্রিবাস করে সকাল হওয়ার আগেই রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান হয়—সব কাহিনী। তারপর আজীবকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে, এই নাও তোমার নাতি—আমার নাতি। এই-ই এখন আমাদের একমাত্র শুকতারা। একে বুকে জড়িয়ে মনের শোকতাপ কিছুটা হাল্কা করো।

সামস-অল-দীনের কথায় বুঝলো তার ছেলে হাসান তাহলে বেঁচেই আছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সে। তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে।

ওরা যারা বলেছিলো ম'রে গেছে সে;
বিশ্বাস করি না—করি না সে কথা।
বহুকাল পরে আজ আমি ক্ষুধার্ত জননী,
খানা দাও খাবো, প্রাণ খুলে গাবো
আজ উৎসবের গান। নানা সাজে সাজাও আমাকে।

আজীব এগিয়ে এসে দাদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। সামস-অল-দীন বলে, এখন তো কান্নার সময় নয়, মা। অনেক কাজ বাকী আমাদের। নাও, তৈরি হয়ে নাও, আর দেরি না, এখুনি আমরা রওনা হয়ে যাবো মিশরের পথে। হাসানকে খুঁজে বের করতেই হবে।

হাসানের মা চটপট তৈরি হয়ে নিলো। সামান-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেলো। পথের খানাপিনা যোগাড় যন্তর করলো। জনকয়েক নফরদাসী নিয়ে সামস্-অল-দীনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো পথে।

বসরাহ ত্যাগ করার আগে সুলতানের কাছে বিদায় নিতে গেলো তারা। নানারকম সুন্দর সুন্দর বাহারী জিনিস উপহার দিলো সুলতান। মিশনের সুলতানের জন্যেও দিলো আরও অনেক মূল্যবান উপঢৌকন। এর পর আজীব, হুসন, হাসানের মা আর নফরচাকরদের সঙ্গে নিয়ে বসরাহ ছেড়ে ফিরে চললো সামস্-অল-দীন।

কয়েকদিন পরে আবার তারা এসে পৌঁছলো দামাসকাসে। দু'একদিন একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে আবার তারা তাঁবু গাড়লো ঐ একই জায়গায়। সামস্-অল-দীন বললো, এখানে কয়েকটা দিন থাকবো আমরা। সুলতানের জন্যে কিছু কেনাকাটা করবো এখানকার বাজারে।

পরদিন উজির গেলো বাজারে—সওদাগরী দোকানে। আজীব তখন আব্দার ধরলো, বাবা সাইদ চলো আমরা শহরে এদিক ওদিক একটু ঘুরে আসি। মজার মজার কত কি দেখা যাবে। তা ছাড়া ওই হালুইকর লোকটা কেমন আছে তাও একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। আহা, লোকটাকে সেদিন অমন করে ঘায়েল না করলেই হতো। কি সুন্দর মেঠাই খেতে দিয়েছিলো আমাদের।

সাইদ বললো, যা বলবে, মালিক।

আজীব আর সাইদ দামাসকাসের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে। কত সুন্দর সুন্দর সাজানো গোছানো দোকানপাট কত মজার মজার উট, গাধা, আর ঘোড়ার মিছিল। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। সূর্য পাটে বসেছে। দেখলো দলে দলে মুসলমানরা চলেছে বানু য়ুমায়াদ মসজিদে সন্ধ্যাকালীন নামাজ পড়তে। আজীবের চিনতে অসুবিধা হলো না, সেই হালুইকরের দোকানের সামনে এসে পড়েছে তারা। দোকানের বাইরে থেকেই দেখতে পেলো, আজও সে সেই বেদানার হালওয়া বানিয়েছে। খুশবুতে ভরে গেছে চারপাশ। দোকানের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখলো দোকানি আছে কিনা। তার মাথার ঘাটা শুকিয়েছে কিনা, তাও একবার দেখতে চায় সে। দেখলো, ঘা শুকিয়েছে কিন্তু দাগটা মিলায়নি।

—কেমন আছো গো, হালুইকর। সারাটা পথ তোমার কথাই ভাবতে ভাবতে আসছি। আমাকে চিনতে পারছো তো! আহা, সেদিন জব্বর লেগেছিলো তোমার।

হঠাৎ আজীবকে সামনে দেখে হাসান কেমন স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। জল ভর্তি গামলাটা হাত থেকে পড়ে যায়। বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে। মাথাটা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকে। জীভটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না। মুহূর্তমাত্র। তার পরে নিজেকে সংযত করে বলে, ভিতরে এসো, মালিক। যদি মেহেরবানী করে আজকেও একটু মিষ্টি-মুখ করো খুব খুশি হবো। আল্লাহ জানেন কেন, সেদিন তোমাকে দেখা অবধি দিন রজনী তোমার কথা মন থেকে সরাতে পারি না। কী যাদু আছে তোমার ঐ চোখে। ঘুমের ঘোরেও তোমার ঐ চোখ দু'টো ভেসে ওঠে আমার সামনে। তোমাদের পিছু ধাওয়া করা আমার খুব বোকামী হয়ে গিয়েছিলো। সে জন্যে পরে আমাকে অনেক অনুতাপও করতে হয়েছে।

আজীব বলে, তুমি তো ভারি সাংঘাতিক লোক! আদর করে ডেকে মেঠাইমণ্ডা খাইয়ে আবার আমাদের জানে ভয় ধরানোর জন্যে পিছু ধাওয়া করেছিলে! কিন্তু কেন? আজ আর তোমার দোকানে ঢুকবো না। আগে হলফ করো আমাদের পিছু নেবে না, তবে তোমার হালওয়া খেতে পারি। না হলে আর কক্‌খনো আসবো না তোমার দোকানে। আমরা এবার এক হপ্তা থাকবো দামাসকাসে। আমার দাদু সুলতানকে ভেট দেবার জন্যে হরেক রকম বাহারী সওদা করবে।

—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বাছা। আর কখনও তোমাদের পিছু নেবো না। এসো ভিতরে এসো।

আজীব আর সাইদ খুব মৌজ করে খেতে থাকলো সুন্দর মিষ্টি আর মধুর সেই বেদানার হালওয়া। আজীব বললো, ও হালুইকর, কই তুমিও এসো, তুমিও খাও আমাদের সঙ্গে। আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙ্গো, যাতে আমার বাবাকে খুঁজে পাই।

হাসান ওদের সামনে এসে বসলো। অপলক ভাবে আজীবকে দেখতে থাকে। কোন কথা বলতে পারে না। তার একভাবে চেয়ে থাকার ভঙ্গীটা ভালো লাগে না আজীবের। একটু বিরক্ত হয়েই বলে, হাঁ করে কি অমন দেখছো, বলো তো। আমার মুখে কি বেদানার

হালওয়া মাখানো আছে—চেটে চেটে খাচ্ছো? দোহাই বাপু, তোমার চোখ দু'টো সরাও। গিলে খাবে নাকি আমার মুখটা।

হাসান হাসে। রাগ করে না ওর কথায়, কবিতা করে বলে ঃ

তোমার ইশারায় সূর্য যদি নিভে যায়—যেতে পারে,
রূপোলী তারারাও খ'সে যেতে পারে হয়তো বা,
চাঁদকেও ছিঁড়ে নিলে নিতে পারো—হতে পারো আরও শক্তিধর।
তবু বলি শোনো বন্ধু,
আন্দাজ পাবে না আমার অপার আনন্দ উৎসর।

এছাড়াও হাসান আরও সুন্দর সুন্দর ছড়া, শায়ের শোনাতে লাগলো আজীব আর সাইদকে। কথা আর কবিতায় ভুলিয়ে রাখলো তাদের খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পরেও প্রায় এক ঘন্টা। তারা বুঝতেই পারে না, কিভাবে এতোটা সময় কেটে যায়। মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে দু'জনে। একটা বাটিতে ঈষৎ গরম জল এনে নিজে হাতে আজীবের হাত ধুইয়ে দেয়। তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেয় হাত আর মুখ। কুলুঙ্গী থেকে গুলাবজলের পিচকারীটা নামিয়ে এনে পিচকারী করে দেয় তার গায়ে। তারপর দু' গ্লাস সরবত এনে সামনে রাখে।—নাও, খাও।

সুন্দর সুমিষ্ট গুলাবের সরবৎ। খেয়ে মন ভরে যায় দু'জনের। খাওয়াদাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে তারা, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তাঁবুতে ফিরে দেখে মা দাদী সবাই চিন্তিত হয়ে পথের দিকে তাকিয়ে আছে। বিদেশ বিভুঁই জায়গা—কি জানি কি হয়। আজীব ছুটে গিয়ে প্রথমে মাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। তারপর দাদীকে। দাদী তো কেঁদে আকুল। বলে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি, ভাই?

—বাজারে দাদী।

—তবে তো খিদে পেয়েছে খুব। আয়, খেতে দিই।

উঠে গিয়ে একটা সুদৃশ্য চীনামাটির পিরিচে করে খানিকটা বেদানার হালওয়া এনে রাখে আজীবের সামনে। বসরাহতে প্রায়ই করে খাওয়াতো সবাইকে। খেয়ে সবাই তারিফ করতো তাকে। এমন সুন্দর মেঠাই শহরের কোন দোকানে কিনতে পাওয়া যেতো না। বানাতে পারতো না কেউ। হাসানের মার এটা নিজস্ব আবিষ্কার বলা যায়। সাইদকেও বলে, তুমিও তোমার মনিবের সঙ্গে বসে যাও, খেয়ে দেখো, আমার তৈরি বেদানার হালওয়া কেমন লাগে। তোমাদের মিশরে কেন, দুনিয়ার কোথাও কেউ বানাতে পারবে না এ জিনিস।

হতভাগ্য খোজা সাইদ হাসতে চেষ্টা করে। —জী আজ্ঞে এখন দেবেন না। হুজুরের সঙ্গে বসে খাবো, তাকি হয়?

আজীব খানিকটা হালওয়া মুখে পুরে এগাল ওগাল করতে থাকে। কিন্তু বিচ্ছিরি স্বাদ। চিনি কম, খুশবু নাই। কেমন এক অদ্ভুতভাবে মুখব্যাদান করে আজীব বলে, এ কেমন হালওয়া, দাদী, একদম ভালো হয়নি।

—কী বলছিস, দাদু। আমি বানাতে জানি না? এক সময়ে এই বেদানার হালওয়া খেয়ে তোর বাবা কি তারিফ করতো। কেমন করে কি কি মসলাপাতি দিয়ে আমি বানাই—সব শিখে নিয়েছিলো আমার কাছে। পরে আমাকে করেও খাওয়াতো মাঝে মাঝে। তা আমার চেয়ে খারাপ হতো না। তাই বলে আমার হালওয়ার নিন্দে তো শুনিনি তার কাছে। তুই তার ব্যাটা হয়ে আমার নিন্দে করছিস আজ?

আল্লা সাক্ষী, দাদীমা, আমি কোন বানিয়ে বলছি না। সত্যিই তোমার মেঠাই-এ মিষ্টি কম হয়েছে। আর সেই খুশবু কোথায়—নাকে লাগলেই জিভে জল আসে? তাহলে তোমাকে সত্যি কথাটা বলেই ফেলি, দাদী। কিন্তু খবরদার মা আর দাদু যেনো জানতে না পারে। তাহলে একেবারে কোতল করে ফেলবে। আমি আর বাবা-সাইদ এইমাত্র বাজারের একটা হালুইকরের দোকানে খেয়ে এসেছি এই বেদানার হালওয়া। এই-সা চমৎকার খেতে, কী বলবো তোমাকে। গন্ধ পেলে মরা মানুষ উঠে বসে খাবে। এখনো মুখে লেগে আছে তার স্বাদ। তাই তোমারটা আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে, ওর কাছে একেবারে পানসে। তুমি বোধ হয়, ঠিক ঠিক মশলা-পাতি যা লাগে, দিতে পারোনি।

তখন দাদীমা রেগে আগুন হয়ে সাইদকে বললো...

এই সময় প্রায় সকাল হয়ে যাচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুনিয়াজাদ বললো, তোমার বলার কি মিষ্টি কায়দা, দিদি! আর কী করেই বা বলো এমন সুন্দর কিস্‌সা।

শাহরাজাদ বলে, এখনো তো গল্পটা শেষ হয়নি। কাল রাতে বাকীটা যখন শুনবে, আরও ভালো লাগবে। নাও, এখন ঘুমিয়ে পড়ো।

শারিয়ার ভাবে, মেয়েটার গল্পগুলো সব শুনতে হবে। তারপর ওকে মারবো।

তারপর দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে ওরা। দরবারের সময় হলে উঠে শাহজাদার সাজে—সজ্জিত হয়ে দরবারে যায়। এক এক করে হকুমতের সব কাজ সমাধা করে দিনের শেষে আবার অন্দর মহলে ফিরে আসে শারিয়ার। রক্তে ধরেছে গল্প শোনার নেশা। শাহরাজাদও প্রতীক্ষায় ছিলো তারই।

চব্বিশতম রজনী। ওদের দৈনন্দিন কাম কলা শেষ হবার পর নিচের কার্পেট থেকে উঠে আসে দুনিয়াজাদ। বলে, এবার তোমার কাহিনী শোনাও, দিদি।

শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ শুনুন, জাঁহাপনা, তখন আজীবের দাদীমা আগুন হয়ে সাইদকে বললো, হতভাগা কোথাকার এই ভাবে ছেলেটার সর্বনাশ করেছো? এতো বড় স্পর্ধা তোমার কি করে হলো, একটা তুচ্ছ হালুইকরের দোকানে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়েছিলে তাকে। মান ইজ্জত কিছুই গ্রাহ্য করোনি। এতো বড়ো শয়তান তুমি।

সাইদ বেমালুম অস্বীকার করে। —না দাদীমা, ওর কথা ধরবেন না। হালুইকরের দোকানে যাইনি। আমরা দোকানটার পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছি শুধু।

কিন্তু হাঁদা গঙ্গারাম আজীব এর গূঢ়ার্থ বুঝলো না। চিৎকার করে তাঁবু মাথায় করলো। —হেই আল্লাহ, কি বলে শোনো, আমরা বলে যাইনি দোকানে। আমরা দোকানে বসলাম। দোকানী কত আদর করে বেদানার হালওয়া খেতে দিলো। আমি খেলাম, তুমিও খেলে। আবার বলে দোকানে যাই-ই নি। একেবারে সব ভুলে মেরে দিয়েছো? তোমার মাথাটা একেবারেই গেছে বাবা-সাইদ। হেকিম দেখাও। দাদীমা ওর কথা শুনো না, আমরা সত্যিই গিয়েছিলাম। আর পেট পুরে খেয়েছিও দু'জনে। আঃ, কী সুন্দর হালওয়া দাদী, কী তার বাস, আর কী তার স্বাদ। গন্ধেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়।

হাসানের মা এবারে উজিরের কাছে ছুটে যায়। নালিশ জানায়, ঐ কালো কুৎসিৎ খোজাটা কি সাংঘাতিক কাণ্ড করেছে, আপনি একবার শুনুন।

হাসানের মার কাছ থেকে সব শোনার পর উত্তেজিত হয়ে সাইদকে ডেকে পাঠায় উজির।

—যা শুনেছি, সব ঠিক? আজীবকে নিয়ে তুই হালুইকরের দোকানে গিয়েছিলো।

—জী হুজুর, না।

ভয়ে কুঁকড়ে গেলো সাইদ। কিন্তু আজীব বলে ডাঁহা মিথ্যে কথা, দাদু। ও আর আমি দু'জনেই খেয়ে এসেছি হালুইকরের দোকানে। পেট পুরে বেদানার হালওয়া খাওয়ার পর আবার এক গেলাস করে গুলাবের সরবৎও খেতে দিয়েছিলো আমাদের। ভারি সুন্দর। দিল্ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সাইদ কিন্তু তখনও বলে, না তারা সেখানে যায়নি, বা খায়নি।

উজির বলে, ঠিক আছে, এক্ষুণি প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। এখানে বোস। আমার ভাইয়ের বিবি যা বানিয়েছে পেট ভরে আজ খেতে হবে তোকে। একটুও নষ্ট করতে পারবি নে। তাতেই বোঝা যাবে, খেয়েছো কি খাওনি।

সাইদ প্রাণপণে পেটে পুরে নেবার চেষ্টা করলো। যতটা সম্ভব। কিন্তু প্রথম গ্রাসটাই গিলতে পারলো সে। বমি করে ফেললো। পেটে আর জায়গা থাকলে তো ঢুকবে। মিথ্যে করে আবার একটা গপ্পো বানিয়ে বলে, গতকাল নফরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোগ্রাসে অনেক কিছু খেয়ে ফেলেছিলো সে। তাই আজ সারাটা দিন পেটের গোলমাল চলছিলো। বদহজম।

কিন্তু উজির বুঝতে পারলো, আগাগোড়া পুরোটাই মিথ্যে বলে যাচ্ছে। অন্য একটা নফরকে ইশারা করতেই দামাদ্দম পেটাতে শুরু করলো সাইদকে। পিটুনির ঠেলায় কবুল করলো, হ্যাঁ, সে আর আজীব হালুইকরের দোকানে খেয়ে এসেছে। এবং তার কথা থেকে এও বেশ বোঝা গেলো, সেই বেদানার হালওয়া সত্যিই অপূর্ব। তার কাছে দাদীমার হালওয়া এককথায় 'অখাদ্য'।

উজির হো হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু হাসানের মা আরও আহত, আরও গম্ভীর হয়ে গেলো। তার অহঙ্কারে আঘাত লেগেছে। —মিথ্যেবাদী। বিশ্বাস করি না, আমার চেয়ে ভালো বেদানার হালওয়া কেউ বানাতে পারে। আমার হাতের জিনিস খেয়ে দুনিয়াশুদ্ধ লোক বাহবা দিয়েছে এতোকাল। আর ওরা বলছে আজ, আমার হালওয়া মুখে তোলা যায় না। যা, নিয়ে যা একটা বাটি, নিয়ে আয় দেখি, তোর কেমন সে হালওয়া। আমার স্বামীর বড়ভাই খেয়ে বিচার করবেন, কারটা ভালো।

সুতরাং সাইদ একটা চিনেমাটির বাসন আর আধলা দিনার নিয়ে রওনা হয় হালওয়া আনতে। দোকানে এসে হালুইকরকে বললো, দেখো ভাই, আমাদের বাড়ির একজন খানদানি আদমি তোমার ঐ বেদানার হালওয়া খাবে। আমাকে এই বাটিটায় আধ দিনারের মতো দাও। বাড়িতেও আজ এই হালওয়া বানানো হয়েছে। দু'টো একসঙ্গে খেয়ে যাচাই করা হবে, কোনটা বেশী ভালো। সেই জন্যে বলছি, ভালো জিনিস দিও। আমি আর খেয়ে দেখতে চাই না, কারণ তোমাকে আমার বিশ্বাস আছে।

—ঘাবড়াও মাৎ। এমন জিনিস দেবো, খেয়ে তাক লেগে যাবে। এ জিনিস এক আমার মা ছাড়া সারা দুনিয়ায় কেউ বানাতে জানে না। আজ সে এখন অনেক দূর দেশে থাকে।

বাটিটা ভর্তি করে হালওয়া দিয়ে তার উপরে ছিটিয়ে দিলো একটু গুলাবজল। সাইদ নিয়ে এসে দিলো দাদীমার হাতে।

বাটিটা হাতে নিয়েই চেখে দেখার জন্য একটুখানি তুলে মুখে দিলো সে। আর তৎক্ষণাৎ আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেলো হাসানের মা।

হালওয়ার এক টুকরো জিভে ঠেকাতেই বুঝতে পারলো, এ আর কারো নয়, তার পুত্র হাসানের নিজের হাতের জিনিস। উজির এবং আর যে যেখানে ছিলো, ছুটে এলো। জলের ঝাপটা দেওয়া হলো চোখেমুখে। একটু পরে জ্ঞান ফিরলো। বললো, এ হালওয়া আমার ছেলে হাসানের তৈরি। দুনিয়াতে সে ছাড়া এর কৌশল আর কারো জানা নাই। আমি নিজে হাতে তাকে শিখিয়েছি। আর আমি কারো কাছ থেকে শিখিনি। নানা রকম খাবার তৈরি করা

আমার শখ ছিলো। নানা রকম মাল-মশলা দিয়ে বানাতে বানাতে একদিন হঠাৎ তৈরি হয়ে গিয়েছিলো এই বেদানার হালওয়া। আমি শুধু তাকেই শিখিয়েছিলাম, আর কাউকে নয়।

উজিরের তখন অবস্থা কাহিল। হারানো মণি খুঁজে পাওয়ার অদ্ভুত এক আনন্দে কাঁপিয়ে জ্বর এসে গেলো তার। —শেষে আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন।

কিন্তু তখন কী করা যায় কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারে না উজির। একটু ভেবে সাইদকে বললো, জনা-বিশেক নফর সঙ্গে নিয়ে এক্ষুণি যাও সেই দোকানে। যেমন করে পারো বেঁধে ছেঁদে তুলে নিয়ে আসবে তাকে। কিন্তু দেখো, তার যেনো কোন চোট না লাগে।

উজির নিজে একটা ঘোড়ায় চাপলো। মিশরের সুলতানের দেওয়া পরোয়ানাখানা সঙ্গে নিয়ে দামাসকাসের কাইরেনি হুকুমদারের দপ্তরে গিয়ে পৌঁছালো। হুকুমদার আদর অভ্যর্থনা করে বসালো তাকে। জিজ্ঞেস করলো কাকে আপনি কয়েদ করতে চান?

—এই বাজারের এক হালুইকরকে।

—এ আর এমন বেশী কি কথা, আমি এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

জনা কয়েক সিপাই বরকন্দাজ পাঠিয়ে দিলো তখনি। তাদের বলে দিলো, উজির সাহেবের লোকজন সেখানে গেছে, তোমরা গিয়ে দেখো, যদি দরকার হয় সাহায্য করবে তাদের।

সামস্-অল-দীন তখন হুকুমদারের দপ্তর থেকে সোজা তাঁবুতে ফিরে এলো।

একদল লোক লাঠি-সোটা কোদাল গাইতি নিয়ে হাজির হলো হালুইকরের দোকানের সামনে। নিমেষে ভেঙে চুরমার করে দিলো সব। মেঠাই মণ্ডা যা তৈরি হয়েছিলো সব ছুঁড়ে ফেলে দিলো তারা। তারপর হাসানকে দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে আসতে থাকলো। নফরের পিঠে চেপে আসতে আসতে ভাবে হাসান, খানিকটা বেদানার হালওয়া যে এমন বেদনাদায়ক হতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

হাসানকে যখন উজিরের সামনে নামানো হলো, তখন সে কান্নায় ফেটে পড়লো। —কী আমার গুনাহ, হুজুর?

—তুমি তৈরি করেছিলে সেই বেদানার হালওয়া?

—জী হুজুর। কেন, বে-আইনী কোনো কাজ করেছি আমি?

—বে-আইনী? তাতে আর কী শাস্তি তোমার হতে পারে। তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।

একজন নফরকে একটা বড় কাঠের বাক্স কিনে আনতে বললো উজির। হাসানকে সেই কাঠের বাক্সে ভরে উটের পিঠে চাপিয়ে কাইরো নিয়ে যেতে হবে।

উজির ভাবে, এখন ওর মা, হুসনকে কিচ্ছু বলা হবে না। মিশরে পৌঁছনোর পর জানাবে সব।

তাঁবু গোটানো হলো। উজির তার দলবল নিয়ে কাইরোর পথে রওনা হয়ে পড়লো। দিনের পর দিন তারা চলতে থাকে। আহারের সময় হলে হাসানকে নামানো হয় কিছুক্ষণের জন্য। খানাপিনা শেষ হলে আবার বাক্সে পুরে চাপানো হয় উটের পিঠে। এইভাবে আরও কয়েকদিন কাটে। হাসানকে মাঝে মাঝে নামিয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে উজির। —তুমি নিজে হাতেই কি বানিয়েছিলে সেই বেদানার হালওয়া?

হাসান জবাব দেয়, জী হুজুর।

উজির তখন হুকুম দেয়, লোকটাকে বাক্সে পুরে আবার উটের পিঠে চাপাও।

অবশেষে তারা কাইরোর সীমানায় এসে পৌঁছয়। শহরের এই শেষ প্রান্তে

জায়দানিয়াহ ময়দানে সেনা বাহিনীর ছাউনি। উজিরের নির্দেশে ময়দানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো তার দলবল। হাসানকে নামিয়ে আনতে বললো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নামিয়ে উজিরের সামনে দাঁড় করানো হলো। পিছমোড়া করে বাঁধা হাসান। বুঝতে পারে না সে, কী তার অপরাধ। আর কী সাজাই বা তাকে পেতে হবে। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে উজিরের সামনে। উজিরের নির্দেশে একজন ছুতোর মিস্ত্রি এলো। উজির বললেন, এই লোকটার মাপে একটা কাঠের ক্রুশ বানাও। জলদি। তারপর সেই ক্রুশে তার হাত পা কোমর গলা রশি দিয়ে বেঁধে একটা মোষের গাড়ির পিছনে বেঁধে দাও।

হাসান কেঁদে ওঠে, একি করছেন হুজুর।

উজির হুঙ্কার ছাড়ে, আমি তোমাকে ক্রুশে গেঁথে মারবো। এখন তোমাকে গাড়ির পিছনে বেঁধে ছেচড়াতে ছেচড়াতে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। শহরবাসীরা আগে দেখুক তোমাকে। তারপর ক্রুশে গাঁথা হবে তোমাকে।

—কিন্তু আমার কি অপরাধ?

—অপরাধ? তুমি সেই বেদানার হালওয়াতে ঠিকমতো মরিচের গুঁড়ো মেশাওনি। এই তোমার অপরাধ।

এই কথা শুনে নিজের গাল নিজে থাবড়াতে থাকে হাসান। —হায় আল্লাহ, এই একটা তুচ্ছ ব্যাপারে একেবারে ফাঁসীর হুকুম। এই জন্যে আপনি আমাকে এতোদিন ধরে হাত পা বেঁধে বাক্সে পুরে রেখেছেন? সারা দিনে দানা পানি বলতে গেলে নামে মাত্র একবার দিয়েছেন? এতো অত্যাচার করেছেন, এতো কষ্ট দিয়েছেন তাতেও আপনার সাধ মিটলো-না। তাতেও আমার অপরাধের সাজা হলো না? এরপর আমাকে ক্রুশে গেঁথে মারলে তবে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে?

—ঠিক, ঠিক, ধরেছো। তবেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। ঠিক মতো কেন দাওনি তুমি মরিচের গুঁড়ো? কেন দাওনি? সেজন্যে এই-ই তোমার যোগ্য সাজা!

হাসান মাটির উপর বসে পড়ে। দু' চোখে জলের ধারা। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে ভেবে আকুল হয়।

একটু পরে উজির প্রশ্ন করে, কী, ভাবছ কী?

—নাঃ, কিছু না। শুধু ভাবছি, আপনার মতো মাথা মোটা লোকগুলো দেশের শির-মণি হয়ে আছে বলেই দুনিয়ার আজ এই দশা। আপনার মতো গর্দভের হাতে যদি দেশের শাসনভার না থাকতো তাহলে আমার মতো নির্দোষ নিরীহ লোকের এইরকম তুচ্ছ কারণে এইভাবে জান খোয়াতে হতো না। হুঁ! অপরাধ কী? না, ঠিক মতো মরিচের গুঁড়ো মেশানো হয়নি—বেদানায় হালওয়ায়। এই না হলে কাজীর বিচার।

উজির তখন গম্ভীর চালে মাথা দুলিয়ে বলে, আমাকে তো দেখতে হবে, আবার যাতে তোমার কাজে তুমি ফাঁকি না দাও!

—কিন্তু, হাসান বলে, লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখলে তবে তো বোঝা যাবে—পরে সে তার কাজে ফাঁকি দেবে কি দেবে না?

উজির বলে, সে হয় না। তোমার তো আর একদিনের দোষ না। রোজই তুমি এই বেদানার হালওয়া বানিয়েছো আর রোজই লোককে ফাঁকি দিয়েছো। ঠিক মতো মরিচের গুঁড়ো মেশাওনি। প্রত্যেক দিনের অপরাধ তিল তিল করে জমে এখন পাহাড় হয়ে গেছে। তা একদিনের ফাঁকির জন্যে যদি এক ঘা বেতের সাজা হয় তবে তুমিই ভেবে দেখো, এক সঙ্গে জমা হলে

এতো কালের অপরাধের সাজার পরিমাণ কী দাঁড়ায়। মৃত্যুদণ্ড তো কমই হলো, আমার হিসাবে আরো বেশী সাজা পাওয়া উচিৎ তোমার।

হাসান ভাবে, প্রতিবাদ করে, কথা কাটাকাটি করে কোন লাভ নাই। শুধু বলে, উন্মাদের সঙ্গে তর্ক করা যায় না।

হাসান আর উজিরের মধ্যে যখন এইসব তর্ক বিতর্ক চলছিলো, ছুতোর তখন তার কাজ করে চলেছে। আর মাঝে মাঝে হাসানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আহা, বেচারা, আর একটু বাদেই ক্রুশটা তৈরি হয়ে যাবে। তখন কি আর ও অমনিভাবে উজিরের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করতে পারবে?

সন্ধ্যা নেমে এলো। হাসানকে আবার সেই কাঠের বাক্সে ভরা হলো। উজির গর্জে ওঠে, কাল তোমাকে ক্রুশে গাঁথা হবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো উজির। অন্য দিনের মতো আজ আর তড়ফানি নাই হাসানের। বাক্সের মধ্যে ভরার পরই নেতিয়ে পড়লো। তার পর যখন দেখলো সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, লোকজনদের বললো, এবারে চলো আমার ইমারতে।

ঘরে ফিরে আসার পর এই প্রথম সিৎ-অল-হুসন আর হাসানের মা-র কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললো উজির।

প্রথমে সে গেলো কন্যা হুসন-র ঘরে। মেয়েকে আদর করে বললে, বেটা, এতো দিন তোর দুঃখ কাটলো। এবারে তোর মুখে হাসি দেখবো। ওঠ মা, উঠে বোস, ভালো করে সাজগোজ কর। আমি তোদের বলিনি। হাসানকে আমি খুঁজে পেয়েছি। তাকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে। নে, ওঠ। আনন্দ কর। শাদীর রাতে যেভাবে বাসর সাজানো হয়েছিলো, মনে আছে?

আছে আব্বাজান।

—ঠিক ঠিক সেই ভাবে সাজাতে হবে আবার আজ। হুবহু সেই ভাবে যেখানে যেমনটি ছিলো। যদি অসুবিধে হয়, সিন্দুক খুলে কাগজখানা বের কর। সব নিখুঁত করে লেখা আছে।

আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো হুসন-র মনে। নফরদাসী লোকজন ডাকা হলো তখুনি। হুসন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করে তাদের দিয়ে বাসরঘর সাজাতে লাগলো। ঠিক যেমনটি সাজানো হয়েছিলো শাদীর রাতে। যদি কোন ভুলচুক হয়ে যায় সেজন্যে সিন্দুক থেকে বাবার লিখে রাখা সেই কাগজখানা বের করলো। চেয়ার টেবিল খাট পালঙ্ক যেখানে যা ছিলো ঠিক তেমনি করে সব সাজানো হলো। শাদীর রাতে যারা উপস্থিত ছিলো তারা যদি দেখে, তো তাজ্জব বনে যাবে।

সব সাজনো গোছানো হয়ে গেলে উজির সিন্দুক খুলে বের করলো হাসানের সেই পাতলুন, ইজের, টুপী আর মোহরের বটুয়া। চেয়ারের উপর রাখলো টুপী। আর টুপীর নিচে রাখলো সেই বটুয়া—যার মধ্যে আছে এক হাজার সোনার মোহর আর সেই ইহুদী সওদাগরের লেখা একখানা চিরকুট। খাটের বাজুতে রাখলো পাতলুন ঠিক শাদীর রাতে যেমনটি রেখে ছিলো হাসান। আর এলোমেলো বিছানার উপর ফেলে রাখলো তার দড়ি ছেঁড়া ইজেরখানা। সব শেষে উজির নিজে হাতে পাতলুনের কোমর বন্ধনীর ভিতরে ঢুকিয়ে দিলো সেই নূর-অল-দীনের সই করা ঠিকুজী পত্রখানা। সূচসুতো দিয়ে সেলাই করে দিলো—ঠিক যেমনটি ছিলো তেমনিভাবে। তারপর হুসনকে বললো, মা, ঠিক শাদীর রাতে হাসানের সঙ্গে পালঙ্কশয্যায় শোবার আগে যে অবস্থায় ছিলে তেমনি বিবস্ত্রা হয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ো তুমি। হাসানকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে এলে সেদিন যেভাবে তাকে আদর অভ্যর্থনা করে কাছে নিয়েছিলে ঠিক তেমনিভাবে গ্রহণ করো।

হুসন-র ঘর ছেড়ে হাসানের কাছে চলে গেলো উজির। সেই কাঠের বাক্সর ভিতরে

হাসান তখন ঘুমে অচৈতন্য। উজিরের ইশারায় নফররা টেনে বের করলো তাকে। কিন্তু ঘুমে গলে গেছে সে। পরনের কামিজ পাতলুন সব খুলে ফেলে উলঙ্গ করা হলা। শুধু একটা দামী রেশমীর কোর্তা আর মাথায় একটা সাদা পাড়ের টুপী পরিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে রেখে এলো হুসন-র ঘরের মেজেয়—গালিচার উপর।

এক সময় হাসানের ঘুম ভাঙ্গে। চোখ মেলে অবাক হয়। সে কি স্বপ্ন দেখছে নাকি। আবার চোখ বন্ধ করে। না, স্বপ্ন তো নয়। এই তো সেই ঘর। সেই পালঙ্ক। সেই হুসন শুয়ে আছে। ঠিক যেমনটি সেই শাদীর রাতে দেখেছিলো। সব-সব হুবহু একই রকম। কিন্তু তা কি করে হয়! সে তো কতকাল আগের কথা! নাঃ, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে। পায়ের আঙুল দিয়ে টিপে গালিচার মসৃণতা অনুভব করে। না না, তা কি করে হয়? এই বাসর-শয্যা এই ঝাড়বাতি, এই ফুলদানি, এই আতরের খুশবু এ যেমন সত্যি তেমনি সে যে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় একটা কাঠের বাক্সে বন্দী হয়েছিলো তাও তো আরো সত্যি। কিন্তু দু'টোর মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক। কী করে সম্ভব হতে পারে?

একবার মনে হয়, সে বুঝি পাগল হয়ে গেছে। তা বিচিত্র নয়। উজির তাকে যে অত্যাচার করেছে এবং যে সাজা দেবার ফরমান দিয়েছে, তাতে যে কোন সুস্থ লোকই পাগল হয়ে যেতে পারে?

হঠাৎ চোখ পড়লো, চেয়ারের উপরে রাখা তার বাহারী সেই বসরাহর টুপী। সোনার পাতে মোড়া। নানা কারুকার্য করা। টুপীটা তুলে দেখলো, হ্যাঁ ঠিক তেমনি রাখা আছে সেই মোহরের থলিটা। খুলে দেখলো, সব ঠিক আছে। সেই ইহুদী সওদাগরের চিরকুটটা দেখে মনে পড়লো, একখানা জাহাজ কেনার পাল্টা রসিদ করে দিয়েছিলো সে। ওপাশে খাটের বাজুতে রাখা পাতলুনটা তুলে নিলো। হ্যাঁ, এও তারই। কোমর বন্ধনীতে হাত দিয়ে বুঝতে পারলো, সেই তুলোট কাগজে লেখা, তার বাবার সই করা, সেই কুলজীপত্রখানা—ঠিক যেমন ছিলো তেমনি আছে। যতই দেখতে থাকে ততই কেমন গোলমাল হয়ে যায়। হিসাব মেলাতে পারে না কিছুতেই।

একপা একপা করে পালঙ্কের পাশে এগিয়ে আসে হাসান। পাশবালিশ আঁকড়ে শুয়ে হুসন। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে অনেক পাওয়ার প্রশান্তি। দু-চারটে খুচরো চুল এসে পড়েছে গালে। অধরে মৃদু মিষ্টি হাসির রেখা। বন্ধ চোখের কোণে কাজল আর সুরমার মাখামাখি। রাত্রির অত্যাচারে মুখের প্রসাধন মুছে গেছে। ভয়ে ভয়ে বিছানায় বসে ওর কপোলের চুলগুলো সরিয়ে দিলো হাসান। আড়মোড়া ভেঙে চোখ মেলে তাকালো হুসন।—বাব্বাঃ সেই কখন গোসল খানায় ঢুকেছো, আর এই এখন বেরুলে! ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি, সোনা?

দু'হাত বাড়িয়ে হাসানকে বুকে টেনে নিতে চায় হুসন।—আরো কাছে এসো না? অমন হা করে কী দেখছো আমাকে। এতো করে দেখলে তবু আশ মিটলো না? সকাল হয়ে গেছে। এখন আর হবে না।

হুসনর কথা শুনে বোকার মতো হাসে হাসান। হি হি হি। হো হো হো। ভারি মজার খোয়াব তো? আবার ভাবে, নাঃ, নিশ্চয়ই সে হাসিস গাঁজা কিছু একটা খেয়েছে। না হলে এমন অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা কখনো হতে পারে। হুসনকে ছেড়ে দিয়ে তড়াক করে উঠে পড়ে সে।

ছানাবড়ার মতো চোখ করে, হাত দু'টো কানের দু'পাশে তুলে ধরে, একপা একপা করে পিছু হটতে থাকে। যেন কোন সাপটাপ তাড়া করেছে। হঠাৎ দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ে যায় গালিচার উপর। হুসন আর হাসি চাপতে পারে না। বিছানায় উঠে বসে বলে, আহা, লাগলো নাকি! তা তুমি অমন করছো কেন সোনা। কোনো নেশাভাঙ করেছো নাকি?

—নেশা ভাঙ? কি নেশা ভাঙ? হাসিস? গাঁজা? আফিং?

—তা আমি কেমন করে বলবো। ভালো মানুষ, ফূর্তি করলে কত, কাজকাম সেরে ছোটাঘর-এ গেলে। তারপর তো আমি কিছু জানি না। তুমি ওখানে নেশা করেছো বা ঘুমিয়ে পড়ে খোয়াব দেখেছো আমি জানবো কি করে? তবে তোমার দেরি হয়েছে বেশ। তা ঘণ্টাখানেক হবে।

—ঘণ্টা খা-নেক। তা হলে তো মনে হয় আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি সব যাতা স্বপ্ন দেখেছি। দেখছি, দেখছি, দামাসকাসে আমি একটা হালুইকরের দোকান করেছি। নিজে হাতে মেঠাই মণ্ডা বানিয়ে বিক্রী করি।

হুসন হেসে লুটিয়ে পড়ে।—ওমা তুমি হালুইকর-এর কাজ জানো নাকি?

—ছোট বেলায় আমার মার কাছ থেকে বেদানার হালওয়া তৈরি করা শিখেছিলাম। খেতে খুব মজাদার। তোমাকে করে একদিন খাওয়াবো। তা শোনো, সেই দোকানে একদিন একটা বাচ্চা ছেলে এলো। কি সুন্দর দেখতে, তোমায় কি বলবো, যেন বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছে। তাকে আদর করে ডেকে আমার নিজের হাতের তৈরি সেই বেদানার হালওয়া খাওয়ালাম। আর সেই আমার কাল হলো।

হুসন চোখ বড় বড় করে শুনছে। বলে, ক্বী হলো?

হাসান বলে সন্ধ্যাবেলা ছেলেটাকে আর তার নফরটাকে হালওয়া খাইয়ে ছেড়ে দিলাম। তার খানিক পরে একদল লোক এসে আমার সেই দোকানটা ভেঙে চুরে তছনছ করে দিলো। রাস্তায় ছুঁড়ে দিলো মিঠাই-মণ্ডাগুলো। আমাকে পিছমোড়া করে দড়ি দিয়ে বাঁধলো।

হুসন অবাক হয়।—কেন, কেন বাঁধলো?

—কি করে বলবো, বলো। যারা বাঁধলো তারাও বলতে পারলো না। উজিরের হুকুম, তাই। যাই হোক উজিরের সামনে হাজির করা হলো আমাকে। আমাকে দেখেই উজির হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, হুম্, তুমি বানিয়েছো বেদানার হালওয়া?

হুসন বলে, তা বানিয়েছো তো হয়েছে কি? কেন, খেয়ে কি সেই ছেলেটার অসুখটসুখ করেছিলো নাকি?

—আরে না না, সে সব কিচ্ছু না। যাই হোক শোনো, উজির তার লোকজনদের হুকুম করলো, আমাকে একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরে উটের পিঠে চাপিয়ে কাইরো নিয়ে যেতে হবে।

হুসনর মুখ শুকিয়ে যায়। কাঠের বা-ক্-সে পুরে? তোমাকে? দেখি দেখি, তোমার হাত-পা ছড়ে গেছে কিনা!

হাসান হেসে বলে, দূর বোকা মেয়ে, স্বপ্নে হাত-পা ছড়ে যাবে কি করে? এতো আর সত্যি সত্যি না। তারপর শোনো, আমাকে তো কাঠের বাক্সে ভরে উটের পিঠে চাপিয়ে কাইরো আনা হলো।

হুসন জিজ্ঞেস করে, খেতে টেতে দেয়নি.

—খেতে? সারা দিনে মাত্র একবার।

—আহারে, সেই জন্যে শরীরটা শুকিয়ে গেছে, সোনা।

—তোমার মাথাটাথা খারাপ হলো নাকি? বলছি না—স্বপ্নে দেখেছি সব।

—না গো, না, সত্যিই কেমন রোগা হয়ে গেছো তুমি।

—তোমার যেমন কথা। এই একঘণ্টা আগে শরীরটা তাগড়াই ছিলো, আর এর মধ্যেই রোগা হয়ে গেলাম? তোমাদের—মেয়েদের কাছে শরীর স্বাস্থ্যের কথা একবার উঠলে হয়—। যাকগে ওসব, এবার উজির সাহেবের হুকুম হলো, একটা ক্রুশ-এ গেঁথে আমাকে হত্যা করা হবে। ছুতোর ডেকে আমার মাপ নিয়ে কাঠের ক্রুশ বানানো হতে লাগলো।

হুসন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনছিলো হাসানের কথা। এবার কঁকিয়ে ওঠে, কিন্তু কি তোমার গোস্তাকি?

—বেদানার হালওয়াতে মরিচের গুঁড়ো একটু কম হয়ে গিয়েছিলো, এই আমার অপরাধ!

—এ্যাঁ?

হুসন হাসবে কি কাঁদবে, ঠাওর করতে পারে না। হাসলেই সব মাটি হয়ে যাবে। তাই সে কেঁদেই ফেললো। হায় আল্লাহ, এমন স্বপ্ন মানুষে দেখে! তুমি 'ছোটাঘরে' গেলে। দেরি হচ্ছিলো। আমি ঘুমিয়ে গেছি। তুমিও যে গোসলখানায় ঘুমিয়ে পড়েছো, বুঝবো কি করে?

হাসান বললো, কিন্তু সোনা, আমার যেন মনে হলো, বারো তেরোটা বছর পার হয়ে গেছে আমার জীবনে।

—স্বপ্নে ঐ রকমই হয়। ও নিয়ে আর মন খারাপ করো না। নাও। এসো একটু জড়িয়ে ধরে শুই। শরীরটা গরম হলে দুঃস্বপ্নের ঘোরটা কেটে যাবে।

হুসন দু' হাতে হাসানকে টেনে নিলো বুকের মধ্যে। চুলের মধ্যে হাত বুলাতে লাগলো। এক সময় আঁৎকে উঠে বললো, একি তোমার কপালে এতো বড় একটা কাটা দাগ কিসের?

হাসান কপালে হাত বুলালো—তা হলে তো ব্যাপারটা স্বপ্ন না, হুসন। ঐ ছেলেটাকে ধাওয়া করে যাওয়ার সময় রেগেমেগে সে একটা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলো। কপালটা কেটে দরদর করে রক্ত ঝরছিলো। ঘাটা শুকোতেও সময় লেগেছিলা বেশ কয়দিন? কিন্তু সে যাক, সব যে আমার কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তবে কি...

আর ভাবতে পারে না হাসান। হুসনর বুকে মুখ গুঁজে চুপ করে শুয়ে থাকে।

হুসন আদর করে বলে, ছাড়ো, ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামানোর দরকার নাই। যাই হয়ে থাক, তুমি তো এখন আমার কাছেই ফিরে এসেছো?

কেমন একটা তন্দ্রার ভাব হাসানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিড়বিড় করে আপন মনেই বলতে থাকে। স্বপ্ন—সবটাই কি স্বপ্ন?

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গে হাসানের। তখনও সে হুসনর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলো। চোখ মেলতেই দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই উজির—যে তাকে ক্রুশে গেঁথে মারার হুকুম দিয়েছিলো। এই লোকটার হুকুমেই তার দোকানটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো তার লোকজন। হাসান ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো উজিরের দিকে। কোন কথা বলতে পারলো না।

সামস্-অল-দীনই কথা বললো।—শোনো, বাবা, তুমি আমার ছোট ভাই নূর-অল-দীনের ছেলে। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। ক্রুশে গেঁথে হত্যা করার হুমকী দিয়েছি। বেদানার হালওয়ায় মবিচের গুঁড়ো কম দিয়েছিলে এই অজুহাতে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো বলে ভয় দেখিয়েছিলাম। কিন্তু আসল কারণ তা নয়। আমার প্রাণপ্রতিমা কন্যা হুসনকে শাদী করে তার গর্ভে সন্তান দিয়ে সেই রাতেই তুমি উধাও হয়ে গিয়েছিলে।

আর আমার মেয়ে বারোটা বছর কেঁদে কেঁদে সারা হলো। সেই রাগে তোমাকে ঐ সাজা দিয়েছি। আমার খুব কষ্ট হয়েছে বাবা। যাক, মনে আর কোন ক্ষোভ রেখো না। এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলো না। শাদীর রাতে বা তার আগে তোমাকে কখনও দেখিনি। তুমিই যে আমার মেয়ের প্রকৃত স্বামী, তোমার ঔরসেই আমার নাতি আজীবের জন্ম হয়েছে তা নিশ্চিত হবার জন্যেই এই চাতুরি আমাকে করতে হয়েছে। গতকাল রাতে আমি পাশের ঘরে ছিলাম। তোমাদের কথাবার্তা সব শুনে আমি একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছি। আর কোন সংশয় সন্দেহ নাই। তুমিই আমার জামাতা-আজীবের বাবা। এতো সব কাহিনী কেচ্ছার কিছুই হতো না। নূর-এর সঙ্গে আমার সেই সামান্য ভুল বুঝাবুঝির জন্যেই যতো সব অনাসৃষ্টি কাণ্ডকারখানা ঘটে গেলো।

উজির আবার সেই সব পুরোনো কাহিনী শোনালো হাসানকে। কি নিয়ে নূর-এর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়—যে কারণে মনের দুঃখে দেশত্যাগী হয়ে বসরাহয় চলে যায় সে। সব শেষে উজির বলে, বাবা, তোমার মাকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি বসরাহ থেকে। এখুনি তাকে দেখতে পাবে। তোমার ছেলে আজীব-তাকেও আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে বৃদ্ধ উজির ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। একটুক্ষণ পরেই আজীব ছুটতে ছুটতে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে। হুসন বলে, এই তোর আব্বাজান।

আজীব দেখলো সেই দামাসকাসের হালুইকর। অপলকভাবে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত। তারপর আকুল আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো হাসানের বুকে।

তারপর এলো হাসানের মা। আনন্দে আত্মহারা। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। তার এতোকালের ব্যথা বেদনা কান্না শোক আজ এই আনন্দ কান্নার তলায় চাপা পড়ে মরে গেলো। সব দুঃখ আজ নিমেষে উধাও হলো। এখন থেকে তার আহ্লাদের দিন শুরু হলো।

ক্ষত শুকিয়ে গেলো। যন্ত্রণার উপশম হলো। কিন্তু দাগটা স্মৃতি হয়ে থাকবে চিরকাল।

শাহরাজাদ চুপ করলো। একটুক্ষণ। তারপর বলে, উজির জাফর বারমাকীর গল্প এখানেই শেষ। খলিফা হারুন-অল-রসিদ রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলো এতক্ষণ। মুগ্ধ হয়ে বললো অপূর্ব তোমার কাহিনী, জাফর। এতো ভালো কিসসা শুনিনি কোথাও। নকলনবীশদের ডেকে বললো জাফরের কাহিনীটা লিখে রাখো। ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েরা পড়ে অনেক আনন্দ পাবে। আর জাফর, তোমার ওপর খুশি হয়ে তোমার পিয়ারের নফর রাইহানকে রেহাই করে দিলাম আমি। আচ্ছা সেই হতভাগ্য খুনী স্বামীটাকে একবার ডাকো। বেচারা অমন ভালো বিবিটাকে ভুল করে হত্যা করে কি অনুতাপেই না দিন কাটাচ্ছে। একটা ভালো ডাগর দেখে মেয়েকে রক্ষিতা করে দাও ওর। যা মাসোহারা লাগে আমি দেবো।

শাহরাজাদ বললো, এ কাহিনী আপনার কেমন লাগলো জানি না, শাহজাদা। হয়তো আমার বলার দোষেই খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু জাঁহাপনা যদি শুনতে ইচ্ছা করেন তবে আরও একটা মজার গল্প শোনাতে পারি। হুজুরের হয়তো ভালোই লাগবে।

শারিয়ার প্রশ্ন করে, কী গল্প?

শাহরাজাদ বলে, সে এক অদ্ভুত গল্প।

শারিয়ার অধৈর্য হয়, আঃ, গল্পের নামটা কী?

শাহরাজাদ বলে, গল্পের নামটা বেশ বড়সড়—বাগদাদের এক কুঁজো দর্জি, ইহুদী, খ্রীস্টান, আর নাপিত-এর কাহিনী।

শারিয়ার বলে, ঠিক আছে, বলো দেখি, শুনি।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে, শুনুন জাঁহাপনা ঃ

এক সময়ে চীন দেশের এক শহরে এক দর্জি বাস করতো। দিল দরিয়া মেজাজের লোক। কারো সাতে পাঁচে নাই। খায় দায় গান গায় আর দোকানে কাজ করে চলে। খাওয়া পরার জন্যে যতটুকু দরকার রোজগার করে তারপর বাকী সময়টুকু হৈহল্লা আনন্দ করে কাটায়। বিকেল হলেই আর কোন কাজ নয়, বিবিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হয়। নদীর ধারে ময়দানে ঘুরে বেড়ায়। আবার সন্ধ্যার মুখে দু-চারটে কেনাকাটা করে বাড়ি ফেরে।

সেদিনও তেমনই বেড়াতে বেরিয়েছিলো তারা দু'জনে। অনেক হৈহল্লা করে অনেক জায়গা ঘুরেটুরে বাড়ি ফেরার পথে এক কুঁজোর সঙ্গে দেখা হলো। কুঁজোটা দেখতে কেমন অদ্ভুত হাস্যকর। লোকটা ওদের দেখে হঠাৎ হো হো করে হাসতে লাগলো। দর্জি বেশ মজা পেলো ওর হাসি আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দেখে। কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, কী ব্যাপার হাসছো কেন?

—এমনি, হাসি পেলো তাই হাসছি।

এই বলে আবার হাসতে লাগলো। দর্জি জিজ্ঞেস করলো, আমাদের সঙ্গে যাবে আমাদের বাড়িতে। আজ রাতে আমাদের ওখানেই খাবে থাকবে, বেশ মজা হবে।

কুঁজো বললো, যাবো।

ওরা কুঁজোটাকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে এলো। ওকে দোকানে বসিয়ে রাতের দরকার মতো কয়েকটা জিনিস সওদা করে আনলো। ভাজা মাছ, রুটি, লেবু আর লম্বা একফালি ক্ষিরা।

রাতে বেশ মৌজ করে খানাপিনা করতে লাগলো তিনজনে। এক সময় দর্জির বিবি মজা করার জন্যে বড় দেখে একখানা মাছের টুকরো নিয়ে কুঁজোর মুখে পুরে দেয়। বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষ। অত বড় মাছের টুকরোটা ওর মুখে আর ধরে না। কিন্তু উগরে ফেলারও জো নাই। দর্জির-বিবি হাত দিয়ে চেপে ধরে থাকে ওর মুখ। আল্লাহর দোহাই, খেয়ে নাও, তা না হলে ভীষণ রাগ করবো।

অনেক কষ্টে এগাল-ওগাল করে মাছের টুকরোটি গলাধঃকরণ করতে পারলো। কিন্তু বিপত্তি এড়ানো গেলো না। গলায় গেঁথে গেলো একটা হাড়। আর সঙ্গে সঙ্গে কুপোকাৎ—মরে গেলো লোকটা।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো রাত্রি শেষ হতে আর বেশি দেরি নাই। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

পরদিন পঁচিশতম রজনী।

দুনিয়াজাদ আব্দার ধরলো, তোমাদের কাজ কাম সব তো মিটলো। এবার তাহলে সেই গল্পটা শুরু করে, দিদি!

শাহরাজাদ বললো, এখুনি করছি, বোন। কিন্তু তার আগে বাদশাহজাদার অনুমতি চাই তো!

শারিয়ার বললো, ঠিক আছে, বলো, শুনি।

শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

তারপর শুনুন শাহজাদা, সেই দর্জি আর তার বিবি দেখলো, তাদের চোখের

সামনে অসহায়ের মতো লোকটা মরে যাচ্ছে। দেখলো, কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। নিয়তির লেখা। তা না হলে লোকটাকে কেনই বা তারা ঘরে নিয়ে আসবে। আর কেনই বা তার বিবির অমন প্রাণঘাতী বিদঘুটে রসিকতার নেশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। ওর মোৎ বোধ হয় এইভাবেই লেখা ছিলো।

—এখন কি করা যায়?

দর্জি জিজ্ঞেস করে তার বিবিকে। বিবি বললো, কাঁধে তোলো লোকটাকে। আমি শাল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। আচ্ছা দাঁড়াও শালে জড়িয়ে কাঁধে নিচ্ছি আমি। যা করার আমিই করছি, তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু আমার পিছনে পিছনে এসো।

দর্জির বিবি কুঁজোটাকে কাঁধে করে রাস্তায় নামলো। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তর তর করে হেটে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে কোন লোকজন আসছে দেখলেই—আরও গলা চড়িয়ে দেয়।—ওগো আমার কি হবে গো। আমার ছেলেটা আর বাঁচবে না। আমার ঘরে বসন্তের দয়া হলো কেনো গো। ওগো তোমরা কে কোথায় আছো দেখে যাও আমার জানের কলিজার দশা। বসন্তে সারা গা ছেয়ে গেছে বাছার আমার।

দর্জি-বিবির কান্নাকাটিতে পথচারীরা বেশ ভালো করেই বুঝলো। বৌটার ছেলের বসন্ত রোগ হয়েছে। আশায় আশায় হেকিমের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। যদি বাঁচে। শোনামাত্র সবাই আর কোন কথাবার্তা জিজ্ঞেস না করে রাস্তার ওপাশে চলে যেতে লাগলো।

এইভাবে সারাটা পথ লোক সরাতে সরাতে শেষে এক ইহুদী হেকিমের বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়লো। একটা অল্প বয়সের কালো নিগ্রো ক্রীতদাসী এসে দরজা খুলে দিলো।

দর্জি-বিবি জিজ্ঞেস করে, হেকিমসাহেব বাড়ি আছেন। মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলে, আছেন।

এই নাও সিকি একটা। তোমার মনিবকে গিয়ে দাও। আর বলো, শিগ্গির করে আসতে। আমার বাছাটার খুব অসুখ। যেন দেরি না করে, বুঝলে?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে উপরে চলে যায়। দর্জির বৌটা উঁকি দিয়ে দেখলো নিগ্রো মেয়েটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। দর্জিকে ফিস ফিস করে বললো, আর এক লহমা দেরি না, চলো কেটে পড়ি এখান থেকে।

কুঁজোটাকে সিঁড়ির একটা ধাপের উপর বসিয়ে দিয়ে একরকম প্রায় জোর করেই দর্জির হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামালো রাস্তায়। তারপর লম্বালম্বা পা ফেলে জোর কদমে হেঁটে চললো। রীতিমতো দৌড়নোই বলা যায়।

ইহুদী হেকিমের হাতে সিকিটা দিয়ে নফরাণীটা বললো, নিচে একটা রুগী এসেছে। খুব খারাপ অবস্থা। এখুনি একবার চলুন।

চকচকে সিকিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বলে, বাঃ, ভালো খদ্দের তো। একেবারে আগাম পয়সা দিয়েছে! চল্ দেখি। পড়ি মরি ভাবে তড়বড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে ইহুদী হাতে চিরাগ নেবার আর তর সয় না। অন্ধকারে সিঁড়ির ধাপগুলো দেখা যায় না। আন্দাজে পা চালাতে থাকে। সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে এসে কিসে যেনো ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। হেকিমের পড়ে যাওয়ার শব্দে বাতি নিয়ে নেমে আসে মেয়েটা। দেখে একটা কুঁজো লোক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে সিঁড়ির নিচে। ইহুদী ভাবলো, সেই তার মৃত্যুর কারণ। তার ধাক্কাতেই লোকটা মরে গেলো। মনে খুব দুঃখ হলো তার। হায় প্রভু, একি হলো, একি পাপের ভাগী করলে আমাকে?

ইহুদী ভেবে পেলো না কি করা যায়। মৃতদেহটা বাড়ির প্রাঙ্গণে বের করে তার বৌকে খবর পাঠালো। ইহুদী বৌ এসে বললো, এক্ষুণি সরাতে হবে ওটাকে। এভাবে এখানে রাখা যাবে না কিছুতেই। যা হোক একটা ব্যবস্থা করো।

ইহুদী বলে, এই রাতবিরেতে কী ব্যবস্থা করি বলো তো?

ইহুদী বৌ বলে, চলো, ধরাধরি করে ছাদের উপরে নিয়ে যাই। ওখান থেকে পাশের মুসলমান বাড়ির ছাতে ছুঁড়ে দেবো। ও বাড়ির মালিক সুলতানের বড়ো বাবুর্চি। অনেক ইঁদুর কুকুর বেড়াল আছে ওবাড়িতে। রাতের অন্ধকারে এসে খেয়ে ফেলবে।

অতঃপর ইহুদী আর তার বৌ ধরাধরি করে কুঁজোর মরদেহটা ছাতে উঠিয়ে এনে পাশের বাড়ির ছাদে ছুঁড়ে দিলো। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য পাশের বাড়ির ছাদের ওপর ফেলতে পারলো না। নিচে পড়ে গেলো বাবুর্চির রান্নার ঘরের পাশে।

কিছু পরে সুলতান প্রাসাদের কাজ শেষে বাড়ি ফিরে বাতি জ্বালতেই চমকে ওঠে লোকটা। একি! এ যে একটা মানুষ মরে পড়ে আছে? লোকটা বোধহয় চুরি করে খেতে এসেছিলো। কিন্তু খোদার মার দুনিয়ার বার। একেবারেই শেষ খাওয়া খাইয়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এই রাতে এই মড়াকে নিয়ে কি করা যায়?

কুঁজোর লাশটা কাঁধে তুলে বাজারের দিকে যেতে থাকে। খুঁজে পেতে একটা জুৎসই জায়গায় এক দোকানের দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে চলে আসে।

রাত্রি তখন অনেক। এক খ্রীষ্টান মাতাল পথ দিয়ে চলেছে। আর নেশা জড়ানো কণ্ঠে বলে চলেছে, ঠিক আছে যিশু আসছেন, যিশু এক্ষুণি এসে পড়বেন, তারপর বাছাধনরা কোথায় পালাবে। আমার মাথায় মদ ঢেলে দেওয়া? এতো বড়ো আস্পর্দা। দাঁড়াও যিশু এসে পড়লেন বলে।

একবার এপাশ, একবার ওপাশ সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলতে চলতে বাজারের পাশে হামামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটা। হাসি মজাক করে ওর সঙ্গের লোকরা মদ ঢেলে দিয়েছে মাথায়। বেচারী গোসল করবে এই মাঝ রাতে।

ঐ দোকানটার পাশে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলো। কিন্তু মদের নেশায় এমনই বুঁদ হয়ে হয়ে টলছে যে কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। মরা লাশটা যে তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে দেখলো না। কিন্তু টলতে টলতে এক-পা পিছু হটতেই বুঝতে পারলো, কে যেনো তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। খ্রীষ্টানের আর বুঝতে বাকী রইলো না, সে এখন ছেনতাই-এর কবলে। এসব ব্যাপার খুব চট্ করে বুঝে ফেলে। চোখের পলকে নিজের শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিয়েই ধাঁ করে এক ঘুষি বসিয়ে দিলো লোকটার মুখে। আর এক ঘুষিতেই পপাত ধরণীতলে।—তবে রে ব্যাটা, একেবারে খুন করে ফেলবো। ওঠ্, উঠে দাঁড়া বলছি। হুঁ হুঁ বাবা, কোথায় তুমি খাপ খুলতে এয়েছিলে? একেবারে বাঘের মুখে পড়ে গেছো।

তার চিৎকারে, তরফানীতে বাজারের ঘুমন্ত পাহারাওলা লাফিয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই কোন চোর ছ্যাঁচোড়। লাঠি হাতে দৌড়ে আসে। কিন্তু যখন দেখলো একটা খ্রীষ্টান একজন মুসলমানকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, সে তখন বললে, ঠিক আছে ছেড়ে দিন সাহেব। এই, ওঠ!

কিন্তু লোকটা আর্ ওঠে না। তখন ঝুঁকে পড়ে দেখলো, লোকটা মরে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে সারা বাজারের লোকজন জাগিয়ে তুললো।—কে আছো, বেরিয়ে এসো, দেখো, এক খ্রীষ্টানের বাচ্চা একজন মুসলমানকে মেরে ফেলেছে।

পাহারাওলা দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধলো খ্রীষ্টানটাকে। কোতোয়াল সাহেবের বাড়ির দিকে যেতে থাকলো। হায় যিশু তুমি নেমে এসো, রক্ষা করো। আমি তো লোকটাকে মেরে ফেলতে চাইনি। আর এক ঘুষিতেই মরে যাবে—তাই বা ভাববো কি করে? তুমি এসো যিশু, তুমি না বাঁচালে এ মাতালকে কেউ উদ্ধার করবে না।

কোতোয়াল সাহেব ঘুমুচ্ছেন। তাকে বিরক্ত করা যাবে না। সুতরাং বাকী রাতটা

তালাবন্ধ ঘরে কাটাতে হলো খ্রীষ্টানকে। সকালবেলায় বিচারে বসলো কোতোয়াল। সব শুনেটুনে রায় দিলো—খ্রীষ্টানের ফাঁসী।

শহরের পথে পথে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে প্রথমে। তারপর হাজারো লোকের সামনে বাজারের মধ্যে তাকে ফাঁসীতে ঝুলাতে হবে।

সারা শহর ঘুরিয়ে এনে যখন তার গলায় ফাঁসীর দড়ি পরাতে যাবে এমন সময় সুলতানের সেই বড় বাবুর্চি এসে বলে, তোমরা দাঁড়াও একটু। কেন, এই নিরীহ নিরপরাধ লোকটাকে ফাঁসীতে ঝুলাতে চাইছো। ওতো মারেনি ঐ কুঁজোটাকে। মেরেছি আমি।

কোটাল বললো, তার প্রমাণ?

প্রমাণ দিচ্ছি। গতকাল আমি সুলতানের খানা পাকিয়ে যখন বাড়ি ফিরি তখন অনেকখানি রাত। বাতি জ্বালাতেই দেখি একটা লোক আমার রসুইখানার কাছে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। খানা চুরি করতে এসেছিলো। আমি একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে এক ঘা বসাতেই বেচারা মরে গেলো। তখন আমি কাঁধে করে এনে বাজারের পাশে ঐ দোকানটার পাশে মরাটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে যাই। আমার দোষে একজন মুসলমানের প্রাণ গেছে। আবার আমার কারণেই একজন খ্রীষ্টানের প্রাণ যেতে বসেছে। এতো পাপ আমার সইবে না। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। তার চেয়ে আপনি আমাকে ফাঁসী দিন। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

বাবুর্চির কথা শোনার পর খ্রীষ্টানকে ছেড়ে দিলো কোটাল। জল্লাদকে বললো, ওকে ছেড়ে দাও, ওর কোনও দোষ নাই। বাবুর্চি যখন নিজের মুখে তার দোষ স্বীকার করছে তার উপরে তো আর অন্য কোনও প্রমাণের দরকার নাই। নাও, আর দেরি করো না, ফাঁসীর দড়ি বাবুর্চির গলায় পরিয়ে দাও।

জল্লাদ এবার বাবুর্চির গলায় দড়ি পরাতে যায়। এমন সময় সেই ইহুদী ডাক্তার ছুটে আসে। একটুখানি সবুর করো, বাবা। ওকে ছেড়ে দাও ওর কোন দোষ নাই। আমিই ঐ কুঁজোটাকে হত্যা করেছি।

ইহুদীর বক্তব্যে পরিষ্কার বোঝা গেলো বাবুর্চির কোনো দোষ নাই। হত্যাকারী আসলে ইহুদীই।

এবার ইহুদীর গলায় ফাঁসীর দড়ি পরানো হলো। এমন সময় ভীড়ের মধ্যে থেকে একটা চিৎকার শোনা গেলো। এই রোকো, রোকো, থামাও। এই হেকিমের কোন দোষ নাই। সে ঐ কুঁজোটাকে হত্যা করেনি, গতকাল বিকেলে আমি আর আমার বিবি বেড়িয়ে ফিরছিলাম। এই কুঁজোটাকে দেখলাম একটা রাস্তার মোড়ে বিনা কারণে খুব হাসছে। আমার খুব মজা লাগলো, ওকে আমাদের বাড়ি নিয়ে এলাম। লোকটা খুব মজার ছিলো। কথায় কথায় খুব হাসাতে পারতো। সুতরাং অতি অল্প সময়েই আমার এবং আমার বিবির প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলো। আমরা এক সঙ্গে খেতে বসেছি। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে ও ভীষণ লাজুক। কিছুই যেন খেতে চায় না। কিন্তু আমার বিবিও নাছোড়বান্দা। খাওয়াবেই। এক টুকরো মাছ জোর-জার করে ওর মুখে পুরে দিয়েছিলো সে। মাছের টুকরোটা গলায় আটকে গিয়ে বেচারা সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। আমাদের চোখের সামনে। নিরুপায় হয়ে আমার স্ত্রী ওকে চাদর চাপা দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে গেলো এই হেকিমের বাড়ি। সঙ্গে আমিও ছিলাম। কড়া নাড়তেই একটা নিগ্রো নফরাণী দরজা খুলে দেয়। তার হাতে একটা সিকি দিনার দিয়ে বলি হেকিম সাহেবকে জলদি ডেকে আনো। রুগীর অবস্থা খুব খারাপ। নফরাণীটা ওপরে গেলো হেকিম সাহেবকে ডাকতে। ইতিমধ্যে আমার বিবি সিঁড়ির একটা ধাপের ওপর কুঁজোটাকে বসিয়ে দিয়ে আমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। তারপর বোধহয় হেকিম সাহেব অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ধাক্কা খায়। তার ধারণা হয়, তার ধাক্কাতেই লোকটার জীবনান্ত হয়েছে। তাই না হেকিম সাহেব?

ইহুদী তখন মাথা নেড়ে বলে, একদম ঠিক।

দর্জি বলে, তাহলে, দারোগা সাহেব, ওকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে ফাঁসী দিন।

দারোগা সাহেব হুকুম দিলো, ইহুদীকে ছেড়ে দাও। আর এই দর্জিকে ফাঁসীতে ঝুলাও। আমি এবার আসল লোককে পেয়ে গেছি। আর আমার হুকুমের রদবদল হবে না।

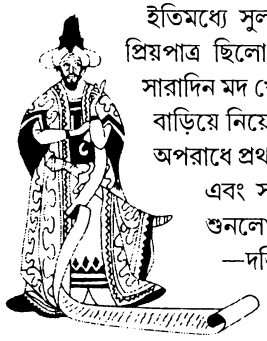

ইতিমধ্যে সুলতানের কানে গেলো এই খবর। এই কুঁজোটা সুলতানের খুব প্রিয়পাত্র ছিলো। তার আগেরদিন সকালে সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন মদ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় মাতলামী করে বেড়ায়। শেষে এক দর্জি তাকে বাড়িয়ে নিয়ে যায়। তারপর কিভাবে তার মৃত্যু ঘটে এবং দারোগা সাহেব সেই অপরাধে প্রথমে এক খ্রীষ্টান, পরে সুলতানের বাবুর্চি, তারপর এক ইহুদী হেকিম এবং সব শেষে ঐ দর্জিকে ফাঁসীর হুকুম দেয় তার বিস্তারিত বিবরণ শুনলো সুলতান।

—দর্জিটাকে কি ফাঁসী দেওয়া হয়ে গেছে।

—আজ্ঞে না, তাকে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড় করানো হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়সওয়ার পাঠানো হলো সুলতানের আদেশে। ফাঁসী রদ করার ফরমান দিয়ে ঘোড়সওয়ার ছুটলো কোটালের কাছে।

কোটাল এসে কুর্নিশ জানিয়ে সবিস্তারে জানালো সব বৃত্তান্ত। সুলতান অবাক হলেন। এমন ঘটনা জীবনে সে শুনেনি কখনও। নকলনবীশদের নির্দেশ দিলো, ঘটনাটা ভালো করে লিখে রাখো। এমন ঘটনা কি তোমরা কখনও কেউ শুনেছো?

সেই খ্রীষ্টান লোকটি এগিয়ে এসে বললো, হুজুর আমি আপনাকে আরও অবাক করার মতো গল্প শোনাতে পারি। যদি হুকুম করেন।

সুলতান বললো, নিশ্চয়ই। বলো, শুনবো।

তখন সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে খ্রীষ্টানটি তার গল্প আরম্ভ করলো।

আপনি দীন-দুনিয়ার মালিক। আপনাকে আমার হাজারো সালাম।

আমি এক বিদেশী। দেশ আমার কাইরো। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষে একদিন আপনার দেশে এসে ব্যবসা শুরু করলাম। আমার বাবাও আমার সঙ্গে এসেছিলেন। তিনিও আমার এই ব্যবসাই করতেন। দালালীর ব্যবসা আমাদের বংশগত।

আমার বাবার মৃত্যুর পর আমিই পুরো মালিক হলাম আমার ব্যবসার। আর এই দালালীর কাজে আমার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি আর ছিলো না এ তল্লাটে।

একদিন আমি আমার গদিতে বসে আছি দেখি একটি যুবক গাধার পিঠে চড়ে আমার দিকেই আসছে। দেখে মনে হলো, বেশ সুদর্শন সুপুরুষ। এবং খানদানী বংশের ছেলে। সামনে এসে সালাম জানালো আমাকে। আমি আলেকুম সালাম জানালাম। ছেলেটি একখানা রুমালে কিছু ক্ষীরার বীজ-এর নমুনা খুলে দেখালো আমাকে। জিজ্ঞেস করলো, কী রকম দাম যাচ্ছে এখন।

আমি বললাম একশো দিরহাম।

সে বললো, দাড়ি বাটখারা সঙ্গে নিয়ে আপনি আসুন খান-অল-জয়ালী বিজয় দরওয়াজার কাছে। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো সেখানে।

রুমালে বাঁধা ক্ষীরার বীজগুলো রেখে সে চলে গেলো। তখুনি আমার মহাজনের ঘরে গিয়ে নমুনা বীজগুলো দেখিয়ে কেনার দাম জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললো, তুমি কি দাম বলেছো।

—একশো দিরহাম।

—আমরা তোমাকে দশ দিরহাম লাভ দেবো। মোট একশো দশ পাবে তুমি।

আমি মহা আনন্দে দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হলাম। ওজন করে মোট পঞ্চাশ মণ হলো। যুবকটি বললো, মণ প্রতি দশ দিরহাম দালালী পাবেন আপনি। মালগুলো নিয়ে যান। মোট পয়সা কড়ি মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে রাখুন। আমি পরে গিয়ে নিয়ে আসবো। মোট দাম হচ্ছে পাঁচ হাজার। তার থেকে আপনার দালালী পাঁচশো কেটে রেখে আমার সাড়ে চার হাজার একটু সাবধানে রেখে দেবেন। আমার এদিকের কাজ কাম সেরে সুরে আপনার কাছে গিয়ে একদিন নিয়ে আসবো।

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম ঠিক আছে।

সেই দিন আমি হাজার দিরহাম রোজগার করেছিলাম। পাঁচশো মহাজনের কাছ থেকে, আর পাঁচশো ছেলেটার কাছ থেকে। মানে শতকরা কুড়ি।

মাসখানেক বাদে ছেলেটি আমার কাছে এলো। আমি বললাম তোমার টাকাটা আমি একটা থলে করে বেঁধে রেখেছি। নিয়ে যাও।

ছেলেটি বললো, আরও কিছুদিন আপনার কাছেই রেখে দিন। আমার একটু রাখার অসুবিধে আছে।

মাসখানেক বাদে আবার একদিন সে এলো। তখনও তাকে বললাম, তোমার টাকাটা নিয়ে যাও।

সে বললো, আরও কিছুদিন আপনার কাছেই রাখুন। পরে সুবিধে মতো নিয়ে যাবো।

আমি বললাম, অনেক বেলা হয়ে গেছে। দুপুরের খানাটা আজ আমার বাড়িতেই সেরে যাও।

কিন্তু সে বললো, আমার হাতে এখন অনেক কাজ। মরবার ফুরসৎ নাই। পরে একদিন এসে খেয়ে যাবো।

এর মাসখানেক বাদে সে গাধার পিঠে চেপে আমার গদীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে বললো, এখন আর নামবো না। সন্ধ্যেবেলা ফেরার পথে টাকাটা নিয়ে যাবো আজ।

আমি ওর টাকার থলেটা এনে সারা সন্ধ্যা বসে রইলাম। অনেকটা রাত হয়ে গেলো। কিন্তু সে আর সেদিন ফিরলো না। এর মাসখানেক বাদে আবার একদিন এলো। আমি বললাম, তুমি কেমনধারা লোক বাপু! একটা অচেনা অজানা দালালকে এতো বিশ্বাস করলে কি দেখে? এতোকাল দালালী করে খাচ্ছি কিন্তু তোমার মতো এতো অদ্ভুত লোক তো জীবনে দেখিনি। কিন্তু সেদিনও সে টাকাটা না নিয়েই চলে গেলো।

সব শেষে আবার একদিন সে এসে হাজির হলো। সেদিন বেশ জাঁকজমক করে সেজেগুজে এসেছে। দামী রেশমের কোর্তা, পাতলুন পরনে। মাথায় সোনার জরির

টুপী। চোখের কোণে কাজল টেনেছে। অপূর্ব সুন্দর লাগছিলো দেখতে। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাতে একটা চুমু খেয়ে আদর করে নামালাম। আজ মনে হয় তোমার সময় হবে বাছা। টাকাটা নিয়ে আমাকে একটু নিশ্চিন্ত করো। তোমার টাকাটার জন্যে রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারি না। কি জানি, পরের টাকা যদি কোনভাবে খোয়া যায়।

—আর একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। প্রায় মেরে এনেছি। আর ক'টা দিনের মধ্যেই এখানকার কাজকারবার আমার শেষ হয়ে যাবে। তখন যাবার সময় আপনাকে ভারমুক্ত করে টাকাটা নিয়ে যাবো।

এই বলে সেদিনও সে চলে গেলো।

আমি ভাবলাম, আবার হয়তো সে অনেক দিন বাদে এই একই কথা বলে টাকাটা না নিয়েই চলে যাবে। আমি ওর টাকাটা সুদে খাটাতে লাগলাম। শতকরা কুড়ি টাকা সুদ প্রতি মাসে। এইটেই আমাদের দেশে প্রচলিত। ছেলেটা যদি বছরখানেক বাদে টাকাটা ফেরৎ নেয়, তবে তার মধ্যে অনেক টাকা বানিয়ে নিতে পারবো আমি।

বছরখানেক বাদেই সে আবার একদিন এলো। বেশ সেজেগুজে। আমি তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে নামালাম। এবং বললাম, আজ আর তোমাকে না খাইয়ে ছাড়বো না।

সে খুব হাসলো, পরে রাজি হলো একটা শর্তে।—খেতে পারি। কিন্তু আজ যা খরচ হবে, সব আমার। আমার টাকা থেকে খরচ করতে হবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে।

তাকে বাড়িতে আদর যত্ন করে বসিয়ে বাজারে গেলাম আমি। ভালো দামী সরাব আর মাংস নিয়ে এলাম খানিকটা। সেই সঙ্গে কিছু ফল আর মিষ্টি। খানাপিনার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই হলো। টেবিলে খানা সাজিয়ে তাকে ডাকলাম। বেশ আগ্রহ নিয়ে খেলোও সব। কিন্তু দেখে অবাক লাগলো, সমস্ত খাবারই সে বাঁ হাত দিয়ে খেলো। আমি ভাবলাম, হয়তো দুর্ঘটনায় ডান হাতটা জখম হয়ে থাকবে।

খাওয়া শেষ হলে লক্ষ্য করাম, বাঁ হাতখানা ধুলো সে ডান হাতখানার সাহায্য ছাড়াই। আমার কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, আচ্ছা মালিক, আপনার ডান হাতখানার কী হয়েছে। কোন দুর্ঘটনায়...

গায়ের আলোয়ানখানা সরিয়ে আমাকে দেখালো। তার ডান হাতখানা কব্জী থেকে কাটা। ছেলেটি বললো, আজ যে আমি আপনার বাড়িতে এসে বাঁ হাত দিয়ে খেলাম এতে আপনি অপমানিত হবেন না; আশা করি। তার কারণ, ডান হাত দিয়ে খাওয়ার কোন উপায় আমার নাই। আর এই হাতটা কাটার পিছনে এক অদ্ভুত কাহিনী আছে।

তখন ছেলেটি তার কাহিনী বলতে লাগলো।

বাগদাদ শহরে আমার জন্ম। আমার বাবা ছিলেন ওখানকার এক লক্ষপতি সওদাগর। যখন আমার উঠতি বয়স, সেই সময় থেকেই বাবার ব্যবসা বাণিজ্য বেশ মোটামুটি বুঝতে শিখলাম। সারা বছরই আমাদের বাড়িতে তীর্থযাত্রী, মুসাফীর এবং বিদেশী সওদাগরদের আগমনে ভরে থাকতো। বাবা মারা যাবার পর আমি তার ব্যবসা বাণিজ্য সম্পত্তির ষোল আনা মালিক হলাম। যার কাছে যা পাওনা ছিলো আদায়পত্র করে সব টাকায় কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করলাম। বাগদাদ আর মসুল ছিলো কাপড়ের জন্যে বিখ্যাত। নানারকম পোশাক আশাক কিনে

উটের পিঠে চাপিয়ে একদিন কাইরো যাত্রা করলাম। খোদার মেহেরবানীতে কয়েকদিন বাদে নিরাপদেই এসে পৌঁছলাম কাইরোয়।

শহরের কাছে এক সরাইখানায় উঠলাম। কাপড়ের গাঁটগুলো রাখার জন্যে একটা ঘর ভাড়া করা হলো। সামানপত্র নামানোর পর নফরটাকে পয়সা দিয়ে বললাম, একটু কিছু খাবার নিয়ে আসতে। খানাপিনা সেরে একটু জিরিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে শহরের পথে বেরুলাম। বেন-অল-কাসরেন ফূর্তি করার জায়গা। সন্ধ্যাবেলায় নাচ গানে জমে ওঠে বেশ। মেয়েমানুষ আর মদের আখড়া। নতুন জায়গার নতুন স্বাদ। সন্ধ্যাটা কাটলো বেশ। পথের ক্লান্তি কেটে গিয়ে চাঙ্গা হলো শরীর। সরাইখানায় ফিরে এসে সুখ-নিদ্রা হলো সেদিন।

সকালে উঠে নফরকে বললাম, চল বাজারে বেরুতে হবে। সবরকম কাপড় চোপড় কিছু কিছু করে নিয়ে একটা গাট্‌রী বাঁধ। দেখি, কী বাণিজ্য করা যায়।

শহরের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র কাইজারিয়াৎ জিরজিস। এইখানেই সব বড় বড় দোকানপাট। দেশবিদেশের সওদাগররা আসে বাণিজ্য করতে। একটা দালালকে ধরে বললাম, আমি বাগদাদ আর মসুলের বাহারী সাজপোশাক এনেছি। কী দাম পাওয়া যাবে, একটু দেখবে?

দালালটা বললে, ঠিক আছে, চলুন আমার সঙ্গে। ভালো মহাজন ঠিক করে দিচ্ছি। মাল পছন্দসই আর দামে বনলে সওদা হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার নসীব খারাপ, অনেকগুলো বড় বড় মহাজনের গদি ঘুরেও একখানা জামা কাপড় বিক্রী করতে পারলাম না। তারা যে দামে কিনতে চায় সে দামে আমারই কেনা নাই। তার উপর রাহা খরচ, দালালী এবং আমার মুনাফা আছে।

দালালটা বললো, মুনাফা বের করার একটাই উপায় আছে। এখানে এসে সব সওদাগররাই যা করে আপনাকেও তাই করতে হবে। আপনি এক কাজ করুন, মালগুলো ধারে বেচে দিন। ধারে দিলে একটু বেশী দামে নেবার অনেক দোকান পাবেন। তাতে আপনার মোটামুটি ভালোই মুনাফা থাকবে। মাল দেওয়ার সময় ওরা আপনাকে হুণ্ডি করে দেবে। এক মাস পরে প্রতি সোমবার আর বৃহস্পতিবার ওরা কিস্তি দেয়। সপ্তাহে এই দু'দিন এসে কিস্তি আদায় করবেন, আর বাকী কটা দিন—আনন্দ ফূর্তি করে কাটাবেন। এখানকার শহর আর নীল নদের শোভা আপনার ভালোই লাগবে।

আমি বললাম, বাঃ, খাসা হবে।

দালালকে সঙ্গে করে আমার সরাইখানায় এলাম। আমার ভাড়া করা গুদামে যতো মাল ছিলো সব তাকে দেখালাম। সেইদিনই সব মাল বিক্রী হয়ে গেলো। বেচে নগদ কিছু পেলাম না বটে, কিন্তু তার বদলে হুণ্ডির কাগজ করে দিলো দোকানীরা।

খুব খুশি মনে সরাইখানায় ফিরে এলাম। এখন একটা মাস শুধু খাওয়া দাওয়া, স্ফূর্তি করা, আর ঘুমানো ছাড়া আর কোন কাজ নাই। প্রতিদিন সকালে উঠে মাখন, রুটি আণ্ডা, আপেল, বেদানা, আঙুর, মিষ্টি দিয়ে নাস্তা করে নীলের ধারে বেড়াতে যাই। আবার দুপুরে এসে মাংস পরোটা সব্জী দিয়ে খানা সারি। তারপর বিকাল থেকে শুরু হয় সরাব। সন্ধ্যাবেলায় বেন-অল কাসবেন পাড়ায় মৌজ করে মেয়েমানুষের নাচগানে মেজাজটা শেরিফ হয়ে ওঠে। অনেক রাতে আবার সরাইখানায় ফিরে আসি।

এইভাবে এক মাস কাটলো। এবার শুরু হলো আমার কিস্তি আদায়। প্রতি সোম আর বৃহস্পতিবার। বাজারে গিয়ে আমি এক এক দিন এক একটা দোকানে বসি। আমার দালালটা খুব চৌকস। দোকানে দোকানে ঘুরে সে আমার কিস্তির পাওনা টাকা পয়সা আদায়

করে এনে দেয়। একদিন কাইজারিয়ৎ জিরজিস-এর একটা বড় রেশম কাপড়ের দোকানে বসেছি। দোকানের মালিক, আমারই সমবয়েসী হবে, আমার সঙ্গে ইয়ার দোস্তের মতো হাল্কা মজাক করতো। আমার চেহারা নাকি মেয়েদের খুব পছন্দসই। তারা একবার পেলে আর আমাকে ছাড়বে না—এইরকম আদি রসাত্মক চুলবুলানী ধরিয়ে দিতো আমার দেহ মনে।

একটা বোরখা ঢাকা মেয়ে এসে বসলো আমার পাশের একটা টুলে। কিছু কাপড় চোপড় কিনবে। তার পাতলা নাকাবের ভিতর দিয়ে মুখের আদলটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। টানা টানা চোখ, টিকলো নাক আর চাঁপার মতো গায়ের রং। দামী আতরের খুশবু ছড়িয়ে পড়ছিলো তার গা থেকে।

স্বভাবতই আমি তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। সেও যে আমার প্রতি উদাসীন ছিলো না, একটু পরেই তা বুঝলাম। মুখের নাকাবটা সরিয়ে চোখের বান ছুঁড়লো আমার উপর। দেখলাম, তার গভীর কালো আয়ত চোখ। দোকানের মালিক বদর-অল-দীন বুস্বানীকে বললো, কয়েকটা ভালো শাড়ি দেখান তো।

খুব মিষ্টি গলার স্বর। যেন মধু ঝরে পড়ে। আমার হৃদয়ে অনুরণন তোলে তার সেই মৃদু কণ্ঠের কয়টি কথা—কয়েকটা ভালো শাড়ি দেখান তো।

অনেকগুলো বাহারী শাড়ি দেখানো হলো। কিন্তু একটাও পছন্দ হলো না তার। বললো, সোনার জড়ির কাজ করা কোন ভালো মসলিন আছে?

বদর-অল-দীন দোকানের অপর প্রান্ত থেকে একটা লম্বা কাঠের বাক্স নিয়ে এলো। অনেক দামী দামী মসলিন বের করে দেখালো। এর মধ্যে একখানা কাপড় সে পছন্দ করলো। জিজ্ঞেস করলো, কত দাম?

দাম শুনে মেয়েটি বলে, অতো টাকা তো সঙ্গে আনিনি। ঠিক আছে, কাপড়খানা দিন, বাড়ি গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দোকানের মালিক বললো, আমাকে মাফ করবেন মালকিন, এ কাপড় আমি ধারে বেচতে পারবো না। এই দেখুন আমার মহাজন বসে আছেন। তাকে আজ টাকা দিতে হবে।

দোকানীর কথা শুনে মেয়েটা তো রেগে আগুন।—আমি আপনার দোকানের পুরোনো খদ্দের। কত টাকার জিনিস কিনি। আর আজ আপনি আমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করছেন? এই যে এতো দিন ধরে হাজার হাজার টাকার কাপড় চোপড় কিনেছি; আমার কি কোন বাকী বকেয়া আছে আপনার কাছে। ধারে নিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে কি টাকা পাঠিয়ে দিই নি?

—নিশ্চয়ই দিয়েছেন। আপনার মতো ভালো খদ্দের আমার অহঙ্কার। কিন্তু আজ আপনাকে ধারে দিতে পারছি না, আমাকে ক্ষমা করুন। আজ আমার এই পাওনাদারদের দেনা মেটাতে হবে। আপনি নগদ দিয়ে নিন।

এই কথা শুনে সে দোকানীর মুখের উপর ছুঁড়ে দিলো কাপড়খানা। —আপনারা—এই বাজারের সব দোকানীরা এইরকম। ভালোমন্দ খদ্দের যাচাই করার ক্ষমতা আপনাদের কারুরই নাই।

রাগের মাথায় শরীরটাকে একটু বেশী মাত্রায় ঝাঁকানী দিয়ে উঠে গট গট করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

আমার খুব ভালো লাগলো না। মেয়েটার জন্যে মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি করতে লাগলো। আহা, বেচারী খুব অপমানিত হয়েছে। দোকানী যখন আপত্তি করলো, তখন

আমি লক্ষ্য করছিলাম সারা মুখটা লাল হয়ে উঠেছিলো তার। আমি আর থাকতে পারলাম না। দোকান থেকে বেরিয়ে হন হন করে হেঁটে গিয়ে ধরলাম তাকে।—শুনছেন মালকিন, রাগ করে চলে যাবেন না। আসুন, একবার দোকানে ফিরে আসুন, কথা আছে।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো। মিষ্টি করে হাসলো। ভুরু নাচিয়ে বললো, দোকানীর ব্যবহারে খুব আঘাত পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, শুধু আপনার খাতিরে আমি যেতে পারি।

মেয়েটি ফিরে এসে বসলো আবার সেই টুলে। বদর-অল-দীনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ঐ কাপড়খানার দাম কত?

দোকানী বললো, এগারোশো দিরহাম।

—ঠিক আছে, কাপড়খানা ওকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে ঐ টাকার একখানা রসিদ করে দিচ্ছি।

তারপর মেয়েটিকে বললাম, আপনি নিয়ে যান। আপনার যখন খুশি হবে, আমাকে দিয়ে দেবেন দামটা। প্রতি সোম আর বৃহস্পতিবার আমি এই মহল্লায় আসি। এই কাপড় পট্টির কোন এক দোকানে বসি। আপনার ইচ্ছা হলে দেখা করবেন। আর যদি এই শাড়িখানা আমার সামান্য উপহার হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে বিশেষ ধন্য হবো আমি।

আমার কথা শুনে মেয়েটা গলে গেলো। আপনার মতো মহানুভব মানুষ আমি দেখিনি। আল্লাহর দয়ায় আপনার অনেক আছে। এ হয়তো আপনার কাছে কিছুই না। কিন্তু আমি আজ কৃতার্থ হয়ে গেলাম। আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার গরীবখানায় পায়ের ধুলো দেন, খুব খুশি হবো।

—তা হলে কাপড়টা নিন, সুন্দরী। আর আপনি যখন আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণই করছেন, আপনার সঙ্গে তখন তো আমার আর পর্দার সম্পর্ক রইলো না। আপনার অমন সুন্দর মুখখানা নাকাবে ঢেকে রাখবেন? খুলুন না। দেখে নয়ন সার্থক করি।

মেয়েটি নাকাব তুলে দিলো। এবার ভালো করে দেখলাম তার চোখ ঝলসানো রূপ। চোখ আর ফেরানো যায় না। আমাকে ঐভাবে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে শরমে মুখটা নামিয়ে নিলো একটু। কিন্তু বুঝলাম আড়চোখে আমাকেও দেখছে সে। ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি। আমার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকে। কপালে স্বেদবিন্দু জমে ওঠে।

কাপড়খানা হাতে নিয়ে উঠে পড়লো সে।—তাহলে মালিক, আজ চলি। আপনি আসছেন তো আমাদের বাড়ি? না, চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের আড়াল হয়ে যাবো? আমার ঠিকানা এখানেই পাবেন।

আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না। সে সুযোগও দিলো না মেয়েটি। দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

সারাটা বিকাল বসে রইলাম ঐ দোকানে। চুপচাপ। শুধু মেয়েটির কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গী, বাঁ চোখের চাহনী, ভুরু নাচানো—সব, সব ছবির মতো ভেসে উঠতে লাগলো আমার চোখের সামনে। বদর-অল-দীন মাঝে মাঝে ঠাট্টা মজাক করে আমাকে সহজ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই মৃত্যু হয়ে গেছে, আমার।

সেদিন আর কাসরেন পাড়ায় গেলাম না। সরাব ভালো লাগলো না। সকাল সকাল সরাইখানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। নফরটা এসে বলে, মালিক, খানাপিনা করবেন না।

আমি বলি, নারে, তুই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

সে বললো, কেন, মালিক, তবিয়ৎ খারাপ হয়েছে নাকি?

বিদেশ বিভূঁই জায়গা। আমার পুরাতন ভৃত্য চিন্তিত হয়ে পড়লো। কিন্তু ওকে আমি তখন কি করে বোঝাই, আমার কী হয়েছে? মনের মধ্যে কিসের তুফান উঠেছে? তার প্রথম চোখের বাণ আমাকে বিদ্ধ করেছে। সেইখানেই আমার মৃত্যু হয়ে গেছে।

সারা রাত ঘুম এলো না। ঘরের এ প্রান্ত ও প্রান্ত পায়চারি করে কাটালাম। সকাল না হতেই গোসল করলাম। জমকালো দামী পোশাক পরলাম। একটু সরাব আর নাস্তা খেয়ে বাজারের দিকে পা বাড়ালাম। বদর-অল-দীন তখন সবে দোকান খুলে বসেছে। আমাকে দেখেই হৈহৈ করে উঠলো, আরে ব্যাস, সুবা না হতেই সূর্য উঠেছে আজ।

বদর-এর পাশে বসে আছি। অনর্গল রঙ্গ রসিকতা করে চলেছে সে। তার সব কথা কানেও ঢুকছে না আমার। 'হু' 'না' করে তার দু-একটা কথার জবাব দিই। আবার কখনও একেবারেই দিই না। আমার তখন এক চিন্তা। এক ধ্যান-জ্ঞান। সেই মদালসা মোহিনী।

একটু পরেই মেয়েটি এলো। আমার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, ভালো আছেন?

—হ্যাঁ। আপনি?

ঘাড় নেড়ে জানালো, সেও ভালো আছে। তারপর ছোটখাটো আরও কিছু কথা হলো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, আজ আর সে একবারও দোকানীর দিকে ফিরে চাইলো না, বা তার সঙ্গে কোনও বাক্যালাপ করলো না।

তারপর এক সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এবার চলি। আপনার কোন একজন লোক দিতে পারেন আমার সঙ্গে? টাকাটা দিয়ে দিতাম তার হাতে।

—থাক না, এতো তাড়া কিসের?

—আপনি বহুৎ দিল-দরিয়া মানুষ। তাই এমন কথা বলতে পারলেন?

—টাকাটা দিয়ে দিতে পারলেই তো যোগাযোগের সুতোটাও ছিঁড়ে দিতে পারবেন। থাক না। ওই তুচ্ছ টাকাটার অছিলা করেও যদি আপনার দরবারে হাজিরা দিতে পারি, ধন্য হয়ে যাবো।

মেয়েটি ঠোঁট দিয়ে দাঁত কামড়ে ধরলো। বটুয়া খুলে গুণে গুণে এগারোশো দিরহাম আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললো আমার মহল আপনার জন্যে সব সময়ই খোলা রইলো। যখন খুশি, যাবেন। কোন অছিলা অজুহাতের দরকার হবে না। বুঝলেন সাহেব? এবার আমি চলি।

দিরহামগুলো আমার হাতে দেবার সময় ওর চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলো আমার হাতের তালুর ওপর দু-এক মুহূর্ত নিশ্চল নিথর হয়ে থেমেছিলো বোধহয়। আমার ধমনীতে রক্তপ্রবাহের গতিবেগ উদ্দাম হতে থাকলো। সাধারণ সৌজন্য-সূচক দু-একটা কথা বলে রাস্তায় নেমে পড়লো সে। ও বুঝতে পেরেছে পাখী জালে পড়েছে। তাই সে আর তিলমাত্র অপেক্ষা করলো না।

আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। দোকান থেকে বেরিয়ে একটু পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখা গেলো অদূরে হেঁটে চলেছে সে। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখেই চলতে লাগলাম। হঠাৎ এক সময় লোকজনের ভীড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলো সে। এদিক ওদিক উঁকি বুকি মেরে তাকে খুঁজছি, এমন সময় বোরখা পরা অচেনা একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে।

—মালিক, মেহেরবানী করে আমার মালকিনের বাড়িতে একবার যাবেন? আপনার সঙ্গে তার দু'একটা কথা আছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম। অচেনা অজানা জায়গা। মেয়েটিকে চিনি না। কে তার মালকিন, তাও জানি না। হঠাৎ তার কথায় যাবোই বা কেন? বললাম, আমি তো তোমাকে চিনি না মেয়ে। আর তোমার মালকিনই বা কে? আমার সঙ্গে তার কি দরকার? আমি যেতে পারবো না।

—সে কি সাহেব, এর মধ্যে সব ভুলে গেলেন? একটু আগেও তার সঙ্গে দোকানে বসে কত গল্প করলেন? আমি তো তার সঙ্গেই ছিলাম। আমার মনিব উনি।

এবার বুঝলাম। বললাম, চলো।

একটু এগোতেই দেখলাম, একটা দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি। আমাকে দেখে ইশারায় দেওয়ালের ওপাশে অপেক্ষাকৃত একটু নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়াতে বলে নিজেও এগিয়ে গেলো সেখানে।

মেয়েটি মুখের নাকাব সরিয়ে সোজা আমার দিকে তাকালো। তার চোখে মিনতির ভাষা। বললো, তোমাকে দেখা অবধি আমার বুকের মধ্যে কেমন এক কাঁপুনি ধরেছে। সেই কাল থেকে। সারা রাত ঘুমুতে পারিনি। খানাপিনা ভালো লাগছে না। এরকম কেন হলো আমার? কী করেছো তুমি, সোনা? তুমি কি যাদু জানো?

—আমার তো সেই কথা। আমিও তো তোমাকে দেখা মাত্র ভালোবেসে ফেলেছি। কাল সারারাত শুধু ঘর-বার পায়চারী করে কাটিয়েছি। এক মুহূর্ত ঘুমুতে পারিনি? তুমি কি যাদু জানো?

হাসলো সে। তার কথার প্রতিধ্বনি শুনলো আমার মুখে। সেই জন্যেই বুঝি হাসলো। বললো, এখন বলো মালিক, তুমি আমার বাড়ি যাবে, না আমি তোমার বাড়ি যাবো। তুমি যা বলবে, তাই হবে।

আমি বললাম, আমি এখানে বিদেশী। এখানে আমার কোন বাড়ি নাই। একটা সরাইখানায় উঠেছি। সেখানে তো আর তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায় না। হরেক রকম লোকের আনাগোনা সেখানে। সেখানে প্রাণ খুলে মনের কথা বলা যায়? তার চেয়ে তোমার যদি অসুবিধে না থাকে, আমি যেতে পারি তোমার বাড়ি।

—কিচ্ছু অসুবিধে নেই, সোনা। কিন্তু আজ না। কাল দুপুরের নামাজের পরে একটা খচ্চরে চড়ে আসবে আমার বাড়ি। হাব্বানিয়াহর মোড়ে এসে জিজ্ঞেস করবে সিনডিক রবাক-এর বাড়ি কোনটা। আবু সামাহ বললেই বেশী লোকে চিনবে। ওটাই আমার গরীবখানা। যাবে কিন্তু। তোমার জন্যে না খেয়ে বসে থাকবো আমি। যদি না যাও, কিচ্ছু খাবো না, এই বলে রাখলাম।

ওর ছেলে মানুষী কথাগুলো শুনতে ভারি ভালো লাগলো। ওর ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কথা বলা, ওর আদর আব্দার আমাকে এক অন্য জগতে নিয়ে চলে গেলো। বললাম, যাবো—নিশ্চয়ই যাবো। না গেলে আমি যে মরে যাবো, সুন্দরী।

খুশিতে প্রায় নাচতে নাচতেই ফিরে আসি সরাইখানায়। কিন্তু কেন জানি না, সে রাতেও ঘুম এলো না। সারা রাত তার কথা ভেবে, তার ছবি এঁকে এঁকে কেটে গেলো। সকালে গোসলখানায় ঢুকে আচ্ছা করে সাফা করলাম সারা শরীর। দামী সিল্কের পোশাক পরলাম। একপাত্র সরাব নিয়ে নানারকম খাবার দিয়ে নাস্তা সারলাম। সারা গায়ে দামী আতর ছড়ালাম।

দুপুর হতে না হতেই রুমালের খুঁটে পঞ্চাশটা সোনার মোহর বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই বাব জাবিলার মোড়। সেখানে গিয়ে একটা সুন্দর দেখে খচ্চর ভাড়া করলাম। ছোকরাটাকে বললাম, হাব্বানিয়াহ-র মোড়ে চল্।

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম। ছোকরাটাকে বললাম, দেখে আয় তো, আবু-সামার বাড়ি কোন্‌টা।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলো সে। বললো, চলুন, ঐ যে বাড়িটা দেখছেন লাল রঙের—ওই বাড়িটা।

বাড়ির সামনে এসে সোনার একটা সিকি মোহর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছোকরাটাকে বললাম, কাল সকালে এসে আমাকে আবার নিয়ে যাবি।

মোহরটা কপালে ঠেকিয়ে ছোকরাটা বলে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, কত্তা। আমি ঠিক সময়ে এসে হাজির হবো।

কড়া নাড়তেই দু'টি অল্প বয়েসী খুবসুরৎ লেড়কী দরজা খুলে দাঁড়ালো। অপূর্ব সুন্দরী। ডানাকাটা পরীর মতো।

—ভিতরে আসুন মালিক, আমাদের মালকিন আপনার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন। সারা রাত পায়চারী করে কাটিয়েছেন। আপনার সুরৎ চিন্তায় তার খানাপিনা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। আপনিই তাকে খুশি করতে পারবেন।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখি, বিশাল আঙ্গিনা। আর তার চার পাশে সাতখানা ঘর। সাতটা দরজা। আর চোদ্দটা জানালা। নানারঙের ফুলের গাছে আঙ্গিনাটা ভরা। মাঝখানে একটা নিরবধিনির্ঝর ফোয়ারা। তাকে ঘিরে একটা শান বাঁধানো বিরাট চৌবাচ্চা।

গোটা বাড়িটাই শ্বেতপাথরের তৈরি। দেওয়ালে টাঙানো নামী শিল্পীর দামী দামী ছবি। পারস্য গালিচায় মোড়া মেঝে। মেহগনি কাঠের আসবাব পত্রে সুন্দর করে সাজানো গোছানো। সোফা কোচ টেবিল চেয়ার ইত্যাদি। আমি গিয়ে বসলাম একটা সোফায়।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছাব্বিশতম রজনী।

শাহরাজাদ বলতে থাকে। তারপর, শাহজাদা শুনুন ঃ

সেই কাইরোর খ্রীষ্টান দালাল তার কাহিনী বলে চলেছে, আর চীনের সুলতান সাগ্রহে তা শুনছে।

আমি দেখলাম, সেই সুন্দরী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। নানারকম মণিমুক্তার অলঙ্কারে

সেজেছে সে। পরনে ঢাকাই মসলীন। সাত প্যাঁচে জড়িয়েছে। তবু মনে হয়, একেবারে নগ্ন। তার গ্রীবা, স্তন, কটি, নিতম্ব, জঙ্ঘা, উরু সব পরিষ্কার স্বচ্ছ। প্রসাধন পরিচ্ছন্ন মুখাবয়ব, কাজল আর সুর্মা টানা চোখে তাকে আজ এক অপরূপ লাস্যময়ী রমণী করে তুলেছে। আমার কাছে এসে গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। আমার মুখটা চেপে ধরলো ওর কবোষ্ণ বুকে। তারপর মুখটা নামিয়ে আমার ঠোঁটে রাখলো ওর ঠোঁট। বললো, আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে আজকের এই দিনটা।

আমি বললাম, আমারও। জীবনে আজ এই প্রথম তোমার ভালোবাসা পেলাম। ভালোবাসা যে কি বিষম বস্তু আগে বুঝিনি। নারীকে চেয়েছি দেহের প্রয়োজন। দাম দিয়ে কিনেছি। মজা লুটেছি। তারপর ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু আজ দু'দিন থেকে আমার সব কেমন ওলোটপালোট হয়ে গেছে। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার চোখে ঘুম নাই, আহারে রুচি নাই।

সে বললো, আমারও সেই দশা। আমিও তো এর আগে কারো ভালোবাসা পাইনি।

আমার শাদী হয়েছিলো সুলতানের প্রিয়পাত্র এক আমীর-এর সঙ্গে। পয়সাকড়ি প্রতিপত্তির কিছুই অভাব ছিলো না সেই বৃদ্ধের অভাব, ছিলো শুধু একটা জিনিসের। যা না থাকলে মেয়েদের কাছে সে একটা হতভাগা মাত্র। আমি ভালোবাসার স্বাদ বুঝিনি। আজ আমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে তুমি। আমিও উজাড় করে দেবো সব।

টেবিলে নতুন কাপড় বিছিয়ে খানা সাজানো হলো। মোরগ মসাল্লাম, তন্দুরী রুটি, সব্জী আর হালওয়া আমরা দু'জনে বসে খুব তৃপ্তি করে খেলাম, আমার 'ভালোবাসা' আদর করে দু-এক টুকরো মাংস আমার মুখে পুরে দিলো। আমিও দিলাম তাকে।

একটা তামার গামলায় হাত মুখ ধুলাম আমরা। পরিচারিকা এসে গোলাপজল পিচকারী করে দিলো আমাদের মুখে। তুরস্কের তোয়ালে দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিলো আমার ভালোবাসা।

এর পর আমরা নিভৃতে জানালার পাশে বসে সামনের ফুলবাগিচার মনোহর শোভা দেখতে দেখতে অনেক হৃদয়ের কথা বিনিময় করলাম। যে কথা কাউকে বলিনি, যে কথা কাউকে বলা যায় না সেই সব অতি গোপন কথা বললাম, শুনলাম।

তারপর আমরা আরো কাছাকাছি হয়ে দেহে দেহ মেলালাম। নতুন খেলায় মেতে উঠলাম দু'জনে। ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। সন্ধ্যাও এক সময় গভীর রাত্রি হয়ে যায়। আমরা দু'জনা দু'জনের মধ্যে হারিয়ে গেছি। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মোমের বাতি গলতে গলতে এক সময় ফুরিয়ে যায়। আবার নতুন বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। আবার জ্বলে জ্বলে শেষ হয়। আবার জ্বলে ওঠে বাতি। দু'জনে দু'জনের বাহু পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকি। যতক্ষণ না ভোর হয়। জীবনে এমন মধুযামিনী এর আগে কখনও আসেনি আমার।

সকালে উঠে সরাইখানায় ফিরে আসি। আসার আগে সেই রুমালে বাঁধা পঞ্চাশটা সোনার মোহর তার বালিশের নিচে চাপা দিয়ে রেখে এলাম।

বিদায় নিয়ে আসার সময় তার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের সেই কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারি না।—আবার কবে দেখা হবে, আমার জান।

—আজ রাতেই আবার আসবো।

সরাইখানায় নেমে খচ্চরটার সহিস ছোকরাকে বলে দিয়েছিলাম সন্ধ্যাবেলায় সে যেন এসে আবার আমাকে নিয়ে যায়।

সরাইখানায় এসে গোসল করে নাস্তা খেলাম। তারপর ভাবলাম তাগাদায় বেরুতে হবে। কিছু টাকা চাই। আজ রাতে যাবো আবার আমার প্রিয়ার কাছে। সুতরাং নাস্তা সেরে বাজারের পথে বেরুলাম। আদায়পত্র করে সরাইখানায় ফিরে এসে দেখি আমার টেবিলে বিরাট জামবাটীতে ভর্তি ভেড়ার মাংসের কোর্মা এবং অনেকখানি ভালো ভালো মিঠাই-মণ্ডা রাখা আছে. বাজারে বেরুবার আগে বলে গিয়েছিলাম বাজারের সবচেয়ে সেরা দোকান থেকে সে যেনো এই খাবারগুলো নিয়ে এসে রাখে। আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো আমার প্রেয়সীর বাড়ি। রুমালের খুঁটে আবার পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা বেঁধে খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে সেই ছোকরার খচ্চরের পিঠে চেপে আবার গিয়ে নামলাম তার বাড়ির গেটে।

সে দিন দেখলাম আগাগোড়া বাড়িটা ঝাড়পোছ করা হয়েছে। আরও সুন্দর করে সাজানো-গোছানো হয়েছে ঘরদোর। আমাকে আরও ভালো ভাবে আদর অভ্যর্থনা করার সব ব্যবস্থাই ভারি চমৎকার মনে হলো আমার।

আমাকে দেখা মাত্র ছুটে এসে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সে আদর করতে থাকলো,

সোনা, সারাটা দিন কী ভাবে যে কাটিয়েছি, কী বলবো। তোমাকে না দেখতে পেলে আমি আর এক মুহূর্ত বাঁচবো না।

টেবিলে খানা পিনা সাজানো হলো। আমার প্রিয়া আমার সাকী আমায় সরাবের পাত্র মুখে তুলে ধরলো। আমি একটা চুমুক দিলাম। এক টুকরো মাংস তুলে নিয়ে আমার মুখে পুরে দিলো। আমি গিলে ফেললাম।

সুরার নেশায় যত না নেশা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি নেশা ধরায় প্রিয়ার বাহুডোর। মনে হয় 'এ জগতে তুমি ছাড়া আর কিছু নাই কেহ নাই গো'।

সারাটা রাত দু'জনে দু'জনের বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে রইলাম। সকাল হতেই উঠে পড়ি। আমার খচ্চর আসবে। সরাইখানায় যেতে হবে। তারপর আবার তাগাদায় বেরুতে হবে। আবার চাই টাকা। পঞ্চাশটি সোনার মোহর। সন্ধ্যাবেলা রুমালের খুঁটে বাঁধা মোহরগুলো বালিশের তলায় রেখে ফিরে এলাম সরাইখানায়।

সারারাতের অনিদ্রা অত্যাচারের ফলে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। সে দিন আর সকালে তাগাদায় বেরুতে পারলাম না। সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমুলাম। বিকালের দিকে স্নান টান সেরে তৈরি হলাম। নফরটাকে পাঠালাম দোকানে। মুরগীর বিরিয়ানী, চাঁপ, হালওয়া, আপেল, আঙ্গুর বেদানা নিয়ে এলো সে। সন্ধ্যার আগে খচ্চর নিয়ে এলো ছেলেটা। খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে

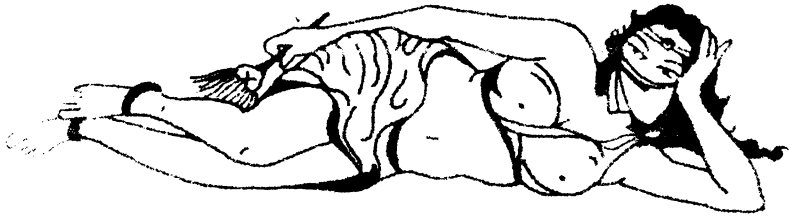

পৌঁছলাম প্রেয়সীর বাড়ি। সাদর অভ্যর্থনা করে পালঙ্কে বসালো সে। দু'জনে মিলে খানা পিনা সারলাম। তারপর সারা সন্ধ্যা অনেক আদর-সোহাগ-এর পর্ব চললো। রাত বাড়ে। দেহের উত্তেজনাও বাড়তে থাকে। একে অনের মধ্যে হারিয়ে গেলাম। মোমবাতি গলে গলে ফুরিয়ে যায় এক সময়। আবার নতুন মোম জ্বলে ওঠে। তাও এক সময় শেষ হয়। আবার। আবার। এইভাবে রাত্রি অবসান হয়। অনিদ্রা-অবসন্ন দেহটা টেনে নিয়ে ফিরে আসি সরাইখানায়। রুমালের খুঁটে বাঁধা পঞ্চাশটা সোনার মোহর রেখে আসি ওর বালিশের তলায়।

এই ভাবে রাতের পর রাত তার বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে দিন কাটতে থাকে। অবশেষে একদিন সকালে উঠে বুঝতে পারলাম, আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমার সম্বল বলতে আর কানা-কড়িও নাই।

কি করবো, কোথায় যাবো, কোথায় টাকা পাবো--সেই চিন্তা আমাকে পাগল করে তুললো। বাজারে গিয়ে লাভ নাই। সেখানে আমার কোনও কিছু পাওনা নাই। একটু এগুতেই দেখলাম, কতকগুলো ছেলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে কি যেন দেখছে। কাছে গিয়ে দেখি, একটা তাগড়াই ঘোড়ার পিঠে এক সিপাই। লড়াই এর সাজে সজ্জিত। এমন দৃশ্য শহরের সাধারণ মানুষ সচরাচর দেখতে পায় না। তাই এতো ভীড়। আমিও ওদের সামিল হয়ে পড়লাম। ভীড়ের চাপে পড়ে সিপাই-এর গায়ে গিয়ে লেপটে পড়ি। সেপাই-এর জেবে আমার হাত ঠেকলো। শক্ত মতো বটুয়া আছে বুঝতে পারলাম। জানি না কি হতে কি হয়ে গেলো, টুক করে তুলে নিলাম সেটা। হয়তো আমার হাতে পয়সা কড়ি ছিলো না বলেই লোভটা সামলাতে পারলাম না। কিন্তু বিপদ

এড়াতে পারলাম না। পর মুহূর্তেই সিপাইটা চিৎকার করে উঠলো, আমার টাকা? আমার বটুয়া?

আশে পাশের যারা ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিলো, সকলের মুখের ওপর একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলো সে। আমি ভীড় ঠেলে বেরোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা আর হলো না। সিপাই-এর দস্তানা পরা হাতের প্রচণ্ড এক ঘুসিতে পড়ে গেলাম। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছি আমি। বুঝতে পারলাম, সিপাইকে ছেঁকে ধরেছে সবাই। —কেন মারলে ওকে। একটা অসহায় ছেলের গায়ে হাত তুললে কেন?

সিপাই বললো, লোকটা চোর। আমার জেব থেকে টাকার থলে তুলে নিয়েছে।

একজন রুখে এলো, মিছে কথা। খানদানী চেহারার ছেলে, দেখছোনা! ও তোমার জেবে হাত ঢোকাবে? তোমার ভুল হয়েছে।

সিপাই তখনও বলছে, না, আমি ভুল করিনি। ও-ই নিয়েছে আমার বটুয়া।

কিছুলোক আমার পক্ষে সিপাইকে ডাঁটছে। আবার কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে চলে যাচ্ছে। এমন সুন্দর একটা ছেলে—চুরি করেছে!

কেউ আবার মন্তব্য করে, কি যে দিন কাল হলো, মানুষের মুখ দেখ চেনার উপায় নাই—কে কেমন?

জনতার আক্রোশ ক্রমশই বাড়তে থাকে। সিপাই প্রায় কোণ ঠাসা হয়ে পড়ে। এমন সময়, আমার নসীব খারাপ, সেই পথ দিয়ে দারোগা সাহেব যাচ্ছিলো। এমন একটা জমায়েৎ দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, এতো জটলা কিসের?

জনতার একজন এগিয়ে এসে নালিশ জানালো, এই সিপাইটা এই ছেলেটাকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে।

সিপাইটা বললো, আমীর সাহেব, লোকটা চোর। আমার জেব থেকে টাকার বটুয়া তুলে নিয়েছে।

দারোগার প্রশ্ন, তুমি কি হাতে নাতে ধরেছো?

—জী না।

—আর কেউ দেখেছে তোমার জেবে হাত ঢোকাতে? জনতা নিরুত্তর। সিপাইটা বললো, না।

—তবে? কী করে বুঝলে, ও তোমার জেব মেরেছে?

—আমার জেবে একটা নীল রঙের বটুয়া ছিলো। আর তার মধ্যে কুড়িটা সোনার মোহর ছিলো, হুজুর।

দারোগা বললো, ওকে তাল্লাসী করে দেখো।

আমার পকেট থেকে সেই নীল রঙের বটুয়া পাওয়া গেলো। দারোগা সাহেব নিজে বটুয়া খুলে দেখলো। হ্যাঁ কুড়িটাই মোহর আছে।

দারোগা সাহেব ক্রুদ্ধ। আমাকে জেরা করতে লাগলো, সত্যি করে বলো, চুরি করেছো?

আমি আর কি বলবো। মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন আমি যাই বলি না কেন, কোন সুফল হতে পারে না। আমার অস্বীকারে দারোগার ক্রোধ বাড়বে বই কমবে না। তাই কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু তাতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো সে। —এখনোও বলো, তুমি চুরি করেছো কি না।

আমি বললাম, জী হুজুর।

দারোগা তখন তার লোকজনকে বললো, ওর হাত দু'খানা কেটে ফেলো।

চুরি করার একমাত্র সাজা হাত কেটে ফেলা। আমার ডান হাতটা কাটা হয়েছে।

এবার বাঁ হাতটাও কাটা হবে। এমন সময় সেই সিপাইটা দারোগার কাছে আমার বাঁ হাতটা না কাটার জন্যে আর্জি পেশ করলো। সিপাই-এর দৌলতেই এ হাতটা রক্ষা পেয়ে গেছে।

দারোগারা চলে যাবার পর উপস্থিত জনতার কয়েক জন আমাকে, দয়াপরবশ হয়ে, হেকিমি দাওয়াখানায় নিয়ে গেলো। ওষুধপত্র লাগিয়ে বেঁধে দিলো হেকিম। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে শরীরের। বেশ দুর্বল হয়ে পড়লাম। কে একজন এক পাত্র সরাব এনে দিলো আমাকে। এক চুমুকে টেনে নিলাম। একটু পরে চাঙ্গা হলো শরীরটা। ডান হাতের ওপর রুমালটা জড়িয়ে নিয়ে দাওয়াখানা থেকে পথে নামলাম।

আমার 'ভালোবাসার' কাছে যাবো। কিন্তু এই হাত নিয়ে তার কাছে দাঁড়াবো কি করে? কী বলবো তাকে? ভেবে কিছু কূল কিনারা করতে পারলাম না। এক পা এক পা করে কখন যে তার বাড়ির সামনে এসে পড়েছি, বুঝতে পারিনি।

আমাকে দেখে ছুটে এলো সে। সন্ধ্যা বেলায় আসার কথা, অথচ সকালেই এসে গেছি। অপ্রত্যাশিত পাওয়ার আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো আমার প্রেয়সী। আমি বিষণ্ন বিবশ হয়ে ঘরে গিয়ে পালঙ্কে শুয়ে পড়লাম। সে আমার পাশে এসে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলো—কি হয়েছে, সোনা, তোমাকে এমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে কেন? অন্যদিন কেমন সেজেগুজে আসো। কিন্তু আজ তোমার জামাকাপড়ও কেমন কুচকে গেছে, মাথার চুলগুলো এলো মেলো—কী হয়েছে বলতো?

আমি বললাম, শরীরটা ভালো নেই, বড্ড মাথা ধরেছে।

—টিপে দেবো?

আরো কাছে এগিয়ে আসে সে। আমার মাথাটা তুলে নেয় ওর কোলে।

আমি বলি, না, থাক। তেমন কিছু না। ও এমনি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েমানুষের চোখে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ও বললো, না সোনা, তুমি লুকিয়ে রাখছো। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। তোমাকে এমন মন-মরা হয়ে থাকতে কখনও দেখিনি। আমার কাছে খুলে বলো, সোনা। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

—কিছু ঘটেনি। আমার শরীরটা ভালো নাই। তুমি এখন যাও, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

আমার বলার ঝাঁজে আহত হলো সে। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো। —বুঝেছি, আমাকে আর ভালো লাগছে না তোমার। এই ক' দিনেই আমি ফুরিয়ে গেছি তোমার কাছে।

আমি মহা ফাঁপরে পড়লাম। কি বলে, কি করে ওর কান্না থামাই। কি করে বোঝাই, ওসব কিছু না, ভালোবাসাতে কোন চিড় খায়নি।

—তোমার ওসব কথা মনে এলো কি করে? তোমাকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে ভালোবাসিনি সোনা।

—না না না। ও কথা বলে আমাকে বোঝাতে পারবেনা। তোমার চোখ দেখে আমি বুঝেছি। আমার ওপর আর কোনো আসক্তি নাই তোমার। তোমাকে খুশি করার মতো আর কিছুই নাই আমার।

আমার কোন কথাতেই কান দিলো না সে। সারাটা দুপুর, সারাটা বিকাল কেঁদে ভাসালো। সন্ধ্যার আগে অন্য দিনের মতো খাবার সাজানো হলো। আমার কাছে এসে ডাকলো, ওঠো, খাবে এসো।

আমি বললাম, আমার খিদে নেই। তুমি খেয়ে নাও। আমি পরে খাবো'খন।

এই কথায় ভীষণ রেগে গেলো সে। —খাবে তো শিগ্গির উঠে এসো। না হলে সব উল্টে দেবো, বলছি।

অগত্যা বাধ্য হয়ে খাবার টেবিলে যেতে হলো। বাঁ হাত দিয়ে খাবার তুলে মুখে দিতেই অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করে, সেকি? তোমরা ডান হাতে কি হয়েছে? দেখি?

আমার রুমালে বাঁধা হাতটা তুলে ধরলো সে। আমি বললাম, একটা ফোঁড়া উঠেছে, তাই বেঁধে রেখেছি।

সে বলে, ঠিক আছে, আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি। খাওয়ার পর ছুরি দিয়ে মুখটা ছাড়িয়ে দেবো, দেখবে পুঁজ রক্ত বেরিয়ে গেলে, আরাম পাবে।

আমি বলি, সবে উঠেছে, এখনও পাকেনি। আমার চোখে জল এসে গেলো। যার কাছে হৃদয়ের কোন কথা গোপন রাখিনি, আজ তার কাছে অনর্গল মিথ্যে বলে যাচ্ছি আমি। আমার চোখে জল দেখে সে মনে করলো ফোঁড়ার ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছি। বললো, একটু সরাব খেয়ে নাও, ব্যথাটা কমে যাবে।

একপাত্র সরাব তুলে ধরলো আমার মুখে। এক চুমুকে খেয়ে নিলাম। আরও এক পাত্র ভরে দিলো—পরে আরও এক পাত্র। নেশা বেশ ধরে গেলো। ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে এলো চোখ। আমাকে ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো। মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমে গলে গেলাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই ডান হাতটা তুলে দেখলাম। আমরা ঘুমের সুযোগে সে হাতটা খুলে দেখে আবার বেঁধে রেখেছে। হেকিমের হাতের বাঁধা থেকে সে বাঁধা অন্য রকম। লজ্জায় দুঃখে ওর মুখের দিকে আর তাকাতে পারি না। ও কিন্তু কিছু বললো না, কিছু প্রশ্ন করলো না। শুধু এক পেয়ালা সরাব আমার মুখের সামনে তুলে ধরলো। কোন কথা না বলে এক চুমুকে খেয়ে নিলাম সবটুকু। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এবারে চলি, অনেক বেলা হয়ে গেলো।

সে এবার পথ রোধ করে দাঁড়ালো, না, যাওয়া হবে না। কোথায় যাবে তুমি?

—যেদিকে দু-চোখ যায়। আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তোমাকে আর জড়াতে চাই না। ভাগ্যের অন্বেষণে বেরুবো। দেখি, কি হয়।

সে বললো, এখন তোমার হাতের এই অবস্থা। ভালো করে সেবা শুশ্রূষা দরকার। অন্য কোথাও গেলে তা হবে না। এখানেই থাকতে হবে তোমাকে।

আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ওর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ছোট ছেলের মতো কেঁদে উঠলাম,—আমি চোর। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি।

ও আমার মুখে হাত চাপা দিলো, চুপ, কেউ শুনে ফেলবে। আমি কাল রাতেই তোমার হাত খুলে দেখেছি। চুরি করার একমাত্র সাজা হাত কেটে দেওয়া। কিন্তু আমি ভেবে পেলাম না, সোনা, তুমি কেন চুরি করতে গেলে?

—আমার আর কিছুই নাই। সব শেষ করে দিয়েছি।

মেয়েটি কোন কথা বলতে পারলো না। সব দোষটাই তার। প্রতি সন্ধ্যায় সে এসেছে। সারারাত স্ফূর্তি করেছে। মদ মাংসে অনেক পয়সা গেছে। তাছাড়া রোজ পঞ্চাশটা করে মোহর দিয়ে গেছে তাকে। এইভাবে ব্যবসার সব টাকা পয়সা খুইয়ে সে পথের ভিখিরী।

—তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। এখানেই থাকো। আমার জন্য তোমার আজ এই অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য ভুলে তুলে আমাকে নিয়ে মত্ত হয়ে গিয়েছিলে। বোকার মতো দু'হাতে পয়সা উড়িয়েছো, আমিও তোমাকে পেয়ে আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। তোমার কিসে ভালো হবে, তা আমার দেখা উচিত ছিলো। তা না, আমি তোমাকে সব কাজ কাম ভুলিয়ে আমার কাছে ধরে রেখেছিলাম। আজ তুমি সর্বস্বান্ত, শুধু আমার জন্যে। আর আমার

জন্যেই তোমার হাতটা গেছে। এই দুঃখ আমি কোথায় রাখবো, সোনা। কি দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করবো।

আমি ওকে বুকে টেনে নিই। তোমার কি দোষ? আমি তো আর ছেলেমানুষ নই। আমার নির্বুদ্ধিতার ফল আমাকে ভোগ করতে হবে।

—না না না। সে হতে পারে না। তুমি আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না। দুনিয়াতে এমন কোন শক্তি নেই, তোমার থেকে আমাকে আলাদা করে রাখবে। আমি আজই এখুনি সব ব্যবস্থা পাকা করে দিচ্ছি। তোমাকে আমি শাদী করবো। আমার যা আছে সব তোমাকে দেবো, তুমি আবার ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। আমরা সুখে দুঃখে ঘর সংসার করবো।

আমি হতবাক হয়ে রইলাম। সত্যিকারের ভালোবাসা না থাকলে এ কথা কেউ বলতে পারে না। অথচ ওকে আমি গোড়া থেকেই ভুল বুঝেছিলাম। টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিলাম।

মৌলভী আর সাক্ষী ডাকা হলো। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় আমরা শাদী করলাম। ও তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি আমার নামে দান-পত্র করে দিলো। —তোমার মানেই আমার। এই বিশাল সম্পত্তির বোঝা আমি আর বইতে পারছি না। আজ থেকে তুমি আমার আইনসম্মত স্বামী। তোমার হাতেই সব তুলে দিলাম। আর আমার শাদীর দেন মোহর? সে তো তুমি সোনা, অনেক দিন ধরে জমা করে দিয়েছো আমার কাছে।

রাতের খানা পিনা শেষ করে আমাকে নিয়ে গেলো সে তার সিন্দুকের কাছে। এক এক করে সব দেখালো, তার টাকাপয়সা। হীরা জহরৎ, অলঙ্কার। আমার দেওয়া মোহরগুলো দেখলাম, তেমনি রুমালের খুঁটেই বাঁধা আছে। সে বললো, আজ থেকে এইসব তোমার। এই নাও চাবি।

আবার আমি নতুন জীবন পেলাম। হাসি গানে ভরে—উঠলো আমাদের জীবন। নতুন করে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করলাম। কিন্তু আমার বিবির মুখে অনেক হাসি হল্লার মধ্যেও, এক করুণ বেদনার ছাপ অনুভব করতাম আমি। অনেকরাতে ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকতো, আমার জন্যে—শুধুই আমারই জন্যে ডান হাতটা গেলো। আমার মতো হতভাগীর মরণ হয় না—কেন...

আমি তাকে জাগিয়ে তুলি, সোনা, কি সব ভুল বকছো। আমার একটা হাত গেছে, তার জন্যে তুমি দিন রাত অতো কষ্ট পাও কেন? আর একটা হাত তো আমার আছে? আর সব চেয়ে বড়ো—তুমি তো আছো। আমার যদি এ হাতটাও কাটা যেতো, তোমাকে যখন সারা জীবনের মতো পেয়েছি, আমার কোন দুঃখ থাকতো না। আমি হয়তো প্রাণেই বাঁচতাম না, যদি তুমি আমাকে না এমনিভাবে কাছে টেনে নিতে। কোন মন খারাপ করো না, সোনা। যা গেছে তা গেছে। যা আছে, যা পেয়েছি তাই নিয়ে হেসে খেলে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবো আমরা।

কিন্তু সারাটা জীবন আর একসঙ্গে কাটাতে পারলাম না। কি কালব্যাধিতে ধরলো তাকে—কত বড় হেকিম দেখলাম, কত দামী দামী দাওয়াই পত্র খাওয়ালাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো সে। যতই তাকে হৈ চৈ করে মাতিয়ে রাখতে চেষ্টা করি, ততই যেন সে আরও মুষড়ে পড়ে। বুঝতে পারলাম, আমার হাতটা কাটা যাওয়ায় যে-আঘাত পেয়েছে সে, তা আর সামলাতে পারছে না।

ঘুসঘুসে জ্বর হতে লাগলো। সারাদিন রাত ছাড়ে না। খুক খুক করে কাশে। বুকে ব্যথা। একদিন কাশতে কাশতে রক্ত উঠলো মুখ দিয়ে। হেকিম বললো, ক্ষয় রোগ। সারা বুকটা ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। বাঁচানো শক্ত।

বাঁচানো গেলোও না। এর মাসখানেক বাদে একদিন সকালে আমাকে শোকের সায়রে ভাসিয়ে দিয়ে বেহেস্তে চলে গেলো সে।

তার মৃত্যুর পর তার সমস্ত ধন সম্পত্তি আমার হাতে এলো। এতো অর্থ নিয়ে আমি কী করবো? টাকা পয়সা বা হীরে জহরৎ ছাড়াও আর যে সব জিনিসপত্র ছিলো সেগুলো এক এক করে বিক্রী করে দিলাম। পঞ্চাশ মণ ক্ষীরার বীজ ছিলো ঘরে। আপনাকে দিয়ে বিক্রী করালাম। দিনের পর দিন কথা দিয়েও আপনার কাছে টাকাটা নিয়ে যেতে পারলাম না। তার কারণ আমি তখন অন্যান্য জিনিসপত্র, জমিজমা, বিষয়আশয় সব বেচে দেবার ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এতোদিনে সব কাজ শেষ হয়ে গেলো। আজ আমার সময় হয়েছে তাই আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু আমার একটা নিবেদন আছে। আমার এখন অনেক টাকা। এতো টাকা নিয়ে আমি কি করবো, ভেবে পাচ্ছি না। আপনার কাছে যে টাকাটা গচ্ছিত আছে সেটা আমি আর ফেরৎ নিতে চাই না, ওটা আপনাকে দিলাম। আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করে ধনবান হোন, এই আমি চাই।

যুবক বললো, এই হলো আমার জীবনের কাহিনী। এই জন্যে আজ আমি আপনার বাড়িতে বাঁ হাত দিয়ে খানা খেলাম।

তারপর, জাঁহাপনা আমি সেই যুবককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম, তোমার এই অনুগ্রহ আমার চিরকাল মনে থাকবে।

সে বললো, ওসব কিছু মনে রাখার দরকার নাই। আজ আমি এতো বিত্তবান, আপনার ঐ সাড়ে চার হাজার দিরহাম আমার কাছে কিছুই না। আপনি যদি আমার সঙ্গে ব্যবসায় আসেন, খুব খুশি হবো। আমি এখন বাগদাদে কারবার শুরু করেছি। আপনি তো শুনলেন বাগদাদ আমার জন্মভূমি। কাইরো এবং আলেকজান্দ্রা থেকে মাল নিয়ে গিয়ে বাগদাদে বিক্রী করছি। দারুণ মুনাফা। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, তাহলে কারবারটা আরও বড় করে বাড়াবো।

আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম। কাইরো আর আলেকজান্দ্রা থেকে মালপত্র নিয়ে গিয়ে বাগদাদে বিক্রী করে মোটা লাভ করতে লাগলাম। সে আমাকে লাভের আধাআধি বখরা দেয়। এইভাবে আমাদের কাজ-কারবার বেশ ভালোই চলছে। এখন আবার এসেছি মালপত্র কিনতে। কাল রাতে একটু মৌজ করে আস্তানায় ফিরছিলাম। পথের মধ্যে কুঁজোর মরা লাশটা নিয়ে ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি, হুজুর।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, রাত শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

সাতাশতম রজনী।

শাহরাজাদ শুরু করে। শুনুন জাহাপনা ঃ সেই খ্রীষ্টান দালাল তার কাহিনী শেষ করে বললো, আমার বিশ্বাস, হুজুর, কুঁজোর এই মৃত্যুর জন্যে কোন ব্যক্তি বিশেষের হাত নাই। নিয়তি লেখা ছিলো, তাই সে মারা গেছে।

সুলতান মাথা নেড়ে বলে, না না, ওসব ছেঁদো কথায় আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমি তোমাদের সবাইকে এক এক করে ফাঁসী দেবো। আমার দরবারের এমন মজার বয়স্যকে তোমরা হত্যা করেছো, তোমাদের কাউকে ছাড়বো না।

তখন সুলতানের বাবুর্চি এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, হুজুরের আজ্ঞা হলে আমার কাহিনী দরবারে পেশ করতে পারি।

সুলতান বললো, বেশ, বলো।

বাবুর্চি বললো, আমার কাহিনী ঐ খ্রীষ্টান দালালের কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি

চমৎকার। শুনে যদি জাঁহাপনার ভালো লাগে, এবং বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তবে সকলের দোষ মাফ করে দেবার প্রার্থনা জানাচ্ছি।

সুলতান বললো, আচ্ছা—কি রকম মজার কাহিনী—তা আগে শোনাও দেখি।

বাবুর্চি তার কাহিনী শুরু করলো। শুনুন জাঁহাপনা ঃ

গত রাতে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে শাদীর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, অনেক গুণী-জ্ঞানী লোকের সমাগমে আসর জমজমাট। কোরান পাঠ শেষ হলে খানার টেবিল সাজানো হলো। নানারকম মাংসের হরেক রকম মুখোরোচক খানা, সব্জীর বিরিয়ানী হালওয়া ফল ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে সুস্বাদু একটা খানা ছিলো রসুনের বিরিয়ানী। যাকে আমরা বলি 'জিরবাজা'। রসুনের সঙ্গে নানারকম মশলাপাতি ও শাকসব্জী দিয়ে চালের তৈরী এই বিরিয়ানী বিয়ে শাদী উৎসবের এক বাহারী খানা। আমরা—অভ্যাগত নিমন্ত্রিতরা সবাই খুব তৃপ্তি করে খেতে লাগলাম। শুধু একজন বললো, আমাকে মাফ করবেন, আমি ঐ রসুনের 'জিরবাজা' খাবো না।

আমরা বার বার অনুরোধ করলাম, একটু খেয়ে দেখুন, অপূর্ব হয়েছে।

—আমি জানি, খেতে খুব ভালো হয়। কিন্তু আমি খাবো না, তার কারণ আছে। এই 'জিরবাজা' খাওয়ার জন্যে আমাকে একবার অনেক আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছে। না, আপনারা খান, আমি খাবো না!

আমরা আর তাকে খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলাম না। শুধু জানতে চাইলাম, কী হয়েছিলো, কী কারণে তাকে আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছিলো।

যুবকটি বললো, আমি হলফ করেছি, 'জিরবাজা' কখনও খাবো না আমি। আর যদি কখনো খাই, তার আগে এবং পরে চল্লিশবার সোডা, চল্লিশবার পটাশ এবং চল্লিশবার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

গৃহস্বামী হেসে বললো, এ আর এমন কি কথা, এই কে আছিস, সাহেবের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা কর।

সঙ্গে সঙ্গে নফর চাকররা জল, সোডা, সাবান ইত্যাদি নিয়ে এলো।

আমরা অবাক হলাম। প্রথমতঃ খুব ধীর মন্থর গতিতে খাচ্ছিলো সে, এতৎসত্ত্বেও, অন্যান্য সবই খেলো, কিন্তু ঐ রসুনের 'জিরবাজা'য় হাত দিলো না। অথচ আমরা বুঝলাম, খাওয়ার লোভটা ষোল আনা আছে।

আমরা অবাক হলাম। প্রথমতঃ খুব ধীর মন্থর গতিতে খাচ্ছিলো সে, আর দ্বিতীয়তঃ তার বুড়ো আঙুলটা কাটা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হায় আল্লাহ, আপনার বুড়ো আঙুলটা কাটা কেন? না জন্মের থেকেই ঐ রকম? না কোন দুর্ঘটনা ঘটেছিলো?

যুবকটি বললে, তা এক রকম দুর্ঘটনাই বলতে পারেন? তবে কোন রকম যন্ত্রে কেটে যায়নি।

বাঁহাতটা তুলে দেখালো। দেখলাম, সে হাতের বুড়ো আঙুলটাও একই ভাবে কাটা। এরপর পা দু'খানা দেখালো সে। কি আশ্চর্য, পায়ের বুড়ো আঙুল দু'টোও কাটা। এইসব দেখে তখন খানাপিনা আমাদের মাথায় উঠেছে। হাঁ করে চেয়ে আছি ওর দিকে? একজন জিজ্ঞাসা করলো, কী ব্যাপার? কী করে আপনার হাত পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো কাটা গেছে? আর কেনই বা খানা খেতে বসার আগে এতোবার করে হাত ধুলেন। জানতে ইচ্ছে করছে। যদি আপত্তি না থাকে, বলুন।

আমার বাবা খলিফা হারুন-অল রসিদের সময় বাগদাদের এক নামজাদা সওদাগর ছিলো। সুরারসিক হিসাবে বাবার খুব নাম ডাক। দুনিয়ার যেখানে যতো সেরা সরাব তৈরি হতো, বাবা আনাতেন, এবং ইয়ার দোস্ত নিয়ে মৌজ করতেন। গান-বাজনার শখ ছিলো খুব। দেশ বিদেশের নামকরা বাঈজীরা আসতো মুজরো করতে। বাবা এসব ব্যাপারে

দরাজদিলের মানুষ ছিলো। কিন্তু তার ফলে যা হয়, তার মৃত্যুর পর দেখলাম, পর্বত-প্রমাণ ঋণের বোঝা এসে চেপেছে আমার ঘাড়ে। বাবার শেষকৃত্য সমাধা হতে না হতেই দরজায় এসে দাঁড়ালো পাওনাদাররা। আমি তাদের প্রত্যেককে বললাম, পিতৃঋণ রাখবো না। যেমন করে হোক পরিশোধ করবোই। তবে ভাই, সময় দিতে হবে। তোমরা প্রতি সপ্তাহে আসবে। ব্যবসায় যা লাভ হবে, নিয়ে যেও।

কেনা বেচার ব্যবসা শুরু করলাম। প্রতি সপ্তাহে যা লাভ হয়, খরচ খরচা বাদ দিয়ে দেনা শোধ করি। এইভাবে একদিন সব দেনা শোধ করে দিলাম। এর পর থেকে যা লাভ হতে লাগলো তা দিয়ে মূলধন বাড়িয়ে কারবারটা আরও বড় করে ফেললাম।

একদিন আমার দোকানে বসে আছি, দেখলাম জমকালো সাজে সেজে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে একটা খচ্চরের পিঠে চেপে এসে দাঁড়ালো আমার দোকানের পাশে।

তার সামনে পিছনে দু'জন খোজা পাহারাদার। বাজারে ঢোকার জন্যে সে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো। একজন খোজাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে ঢুকতে যাবে এমন সময় খোজাটা বললো, মালকিন, বাজারের এই পথটা দিয়ে ঢুকবেন না। জায়গাটা ভালো না। কিন্তু তার কথা কানে তুললো না সে। হন হন করে ভিতরে ঢুকে গেলো। একটার পর একটা দোকান ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলো। কিন্তু কারো দোকানই আমার দোকানের মতো তেমন সাজানো গোছানো নয়। শেষে আমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। বললো, দামী দামী শাড়ি কি আছে, দেখান তো।

কি মিষ্টি কণ্ঠ। কি অপূর্ব চেহারা। চোখ ফেরানো যায় না। আমি শশব্যস্ত হয়ে দোকানের সেরা সেরা কাপড় দেখাতে থাকি। কিন্তু একটাও পছন্দ হলো না তার। বললো, আর কিছু নাই।

আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি পাশের দোকানগুলো খুলবে। ওদের যা আছে তাও এনে দেখাবো। যদি পছন্দ হয়, নেবেন।

অন্য দোকান না খোলা পর্যন্ত আমার দোকানেই বসে রইলো সে। স্বভাবতই দু'চারটে কথাবার্তাও হলো। মেয়েটি বেশ রসালো কথাবার্তা বলতে পারে।—তা মেয়েদের পোশাকের দোকান করেছেন, আর মেয়েরা কি পছন্দ করে কি চায় তা জানেন না?

আমি বিনীতভাবে বলি, জী আমার বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা কম, পুঁজিপাটা তেমন নাই—তাছাড়া মেয়েদের সঙ্গে তো মেলামেশা করিনি কখনও, কি করে জানবো তারা কি চায়।

চোখের বাণ ছুঁড়লো সে।—কেন, বিয়ে শাদী করেননি?

—জী না, তেমন সময় সুযোগ এখনও হয়ে ওঠেনি।

এই সময় পাশের দোকানগুলো খুলে গেলো। অনেক দামী দামী বাহারী শাড়ি এনে দেখালাম তাকে। তার থেকে বেছে বেছে খান কয়েক শাড়ি পছন্দ করলো সে। প্রায় পাঁচ হাজার দিরহাম দাম হবে। সে বললো, এগুলো বেঁধে দিন।

কাপড়গুলো বেঁধে তার খোজা নফরের হাতে দিতেই দোকান থেকে বেরিয়ে খচ্চরের পিঠে চেপে চলে গেলো সে। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। টাকার কথা বলতে পারলাম না। সেও দিলো না, বা বললো না, কবে দিয়ে যাবে। অথচ অন্য দোকানের মাল। তাদের বলে এলাম, এক সপ্তাহ বাদে টাকা দেবো।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলো। কিন্তু না এলো মেয়েটি, না পাঠালো দাম। অথচ

চেহারা-চরিত্র, বেশভূষা, আদব কায়দা দেখে মনে হয়েছিলো বড়ঘরের দুলালী। কিন্তু আমার টাকাটার কি হবে? ঠিকানাপত্রও কিছু জানি না যে গিয়ে তাগাদা করবো। পাশের দোকানদাররা টাকার তাগাদা করলো। আমি আর এক সপ্তাহের সময় নিলাম।

আমার জোর বরাত, পরের সপ্তাহের শেষ দিনে সে আবার এলো আমার দোকানে। আমার হাতে একটা সোনার অলঙ্কার তুলে দিয়ে বললো, স্যাকরার কাছে এটা বেচে আপনার দামটা নিয়ে নিন। আর আমাকে আরও কয়েকটা কাপড় দেখান।

সোনার জিনিসটা বেচে আমার কাপড়ের দাম হয়ে গেলো। টাকাটা দিয়ে পাশের দোকান থেকে আরও দামী দামী কতকগুলো কাপড় এনে দেখালাম তাকে। কতগুলো শাড়ি পছন্দ করলো। দশ হাজার দিরহাম দাম হলো। কিন্তু সেদিনও সে দাম দিয়ে গেলো না। বা কবে দিয়ে যাবে তাও বলে গেলো না। আমিও বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। দাম চাইতে পারলাম না। এতো ভারি মুসকিল হলো। গতবারে ছিলো পাঁচ হাজার এবারে বাকী বেড়ে হলো দশ হাজার। আর যদি না আসে? যদি না দিয়ে যায় দাম? তাহলে? তাহলে তো দেনার দায়ে আমার দোকান-পাট লাটে উঠবে!

রাতে শুয়ে ঘুম আসে না। যদি মেয়েটা আর না আসে? গল্প কাহিনী শুনেছি, ঠগদের কত বিচিত্রভাবে প্রতারণা করার কায়দা। মেয়েটা তার সুন্দর রূপ যৌবন আর বাদশাহী চালবোল দিয়ে আমার হাতে হারিকেন ধরিয়ে গেলো না তো?

এক এক করে চার সপ্তাহ কেটে গেলো। টাকার তাগাদায় অস্থির করে তুলেছে আমাকে। আর পারা যায় না। রূপের মোহে ভুলে একি করলাম আমি। এখন আমার দোকানের মাল জলের দামে বেচে দেনাশোধ করতে হবে। এবং সেই ভাবেই নিজেকে তৈরি করছি, এমন সময় মেয়েটি একদিন এলো। আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। একটা থলে আমার সামনে এনে রাখলো। বললো, দাড়ি-পাল্লা নিয়ে এসে ওজন করে দেখুন, কত আছে।

হিসেব-পত্র করে দেখলাম, যা দাম তারচেয়ে বেশ বেশী আছে। আমাকে বললো, ওটা আপনার কাছে রাখুন। খুশিতে ভরে গেলো মন। আহা, এই মেয়েটাকে আমি ঠগ জোচ্চোর ভেবেছিলাম! এমন সুন্দর রূপ যৌবন—এমন নবাবী চালচলন আর কখনও দেখিনি কোন মেয়ের। বুকের মধ্যে কি যেন অভাব বোধ করতে লাগলাম। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, বিয়ে শাদী করবেন না?

আমি বলি, তেমন ভাগ্য কি আর করে এসেছি।

—কেন, আপনার এমন সুন্দর চেহারা—মেয়েরা দেখে তো পাগল হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনি ছাড়া কোন মেয়েই তো এমন আপন করে কথাবার্তা বলে নি কখনও!

মেয়েটি মুখ টিপে হাসলো। আমার বুকে আগুন ধরে গেলো। ওর রূপের এক দারুণ আকর্ষণ আমাকে টানতে লাগলো। নিজেকে আর বুঝি ধরে রাখতে পারি না।

দোকান ছেড়ে উঠে বাইরে এলাম। মেয়েটি বসে রইলো। ওর খোজা নফরটাকে আড়ালে ডেকে এনে এক-মুঠো দিনার গুঁজে দিলাম ওর হাতে। বললাম, তোমার মালকিনকে আমার খুব ভালো লেগেছে। ভালোবেসে ফেলেছি। এখন তোমাকে আমার হয়ে তার কাছে মহব্বৎ জানাতে হবে।

সে খুব হাসলো। বললো, আমাদের মালকিন আপনার প্রেমে মশগুল হয়ে পড়েছে। আপনাকে দেখার জন্যে, আপনার সঙ্গে দু'টো কথা বলার জন্যেই শুধু সে আসে আপনার কাছে। এতো যে শাড়ি কাপড় কেনা, সে সবই অছিলা। যা শাড়ি গহনা আছে তার,

রোজ একখানা করে পরলে, সারা জাবনে একবারের বেশী দু'বার পরতে হবে না কোন শাড়ি। শুধু আপনাকে দেখতেই সে আসে এখানে।

আমি যখন খোজাটার সঙ্গে কথা বলছিলাম, মেয়েটি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে গেলো একবার। একটু পরে যখন আবার দোকানে এলাম মেয়েটি হেসে জিজ্ঞেস করলো, কী শলাপরামর্শ হলো?

—শলাপরামর্শ কিছু না। আপনার নফরটাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, কোথায় থাকেন আপনারা?

—তার জন্যে অতোগুলো পয়সা দিতে হলো?

খোজাটাকে যে বকশিস দিয়েছি, তাও ওর চোখ এড়ায়নি। আমি বললাম, ও কিছু না। ওকে একটু খুশি রাখার জন্যে দিলাম। আপনি আমার এতো বড় খদ্দের। সে যাতে অন্য দোকানের পয়সা খেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে না যায়।

মেয়েটি এবার ভুরু কুঁচকে হাসলো।—কেন, আমি চলে গেলে আপনার খুব ক্ষতি হবে নাকি?

—ক্ষতি না হোক, লাভতো কিছু হবে না। লাভ করার জন্যেই তো দোকান সাজিয়ে বসা।

মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়ালো।—অনেক দেরি হয়ে গেছে, আজ চলি। পরে আর একদিন আসবো।

আমি বললাম, একটা কথা বলবো বলবো করেও বলার সাহস হয়নি। আপনার খোজাকে বলেছি। আমার হয়ে সে আপনাকে বলবে। আপনি যেন তার কোন অপরাধ নেবেন না।

—ঠিক আছে। কিন্তু এমন কি কথা যা সামনাসামনি বলতে পারলেন না?

মেয়েটি আর জবাবের জন্যে দাঁড়ালো না।খচ্চরের পিঠে চেপে চলে গেলো।

রোজই ভাবি, সে অথবা তার নফর আসবে। কিন্তু কেউ এলো না। কি জানি কি হলো অহরহ তার কথাই ভাবি। রাতে শুয়ে ঘুম হয় না। কিছু খেতে ভালো লাগে না। কাজ কামে মন বসতে চায় না।

আরও কয়েক দিন পরে খোজাটা এসে খবর দিলো, তার মালকিন অসুস্থ। আমি জানতে চাইলাম, কিন্তু তোমার এই মালকিনটি কে?

—খলিফা হারুন-অল-রসিদের পেয়ারের বেগম জুবেদার পালিত কন্যা সে। বেগমসাহেবা তাকে দত্তক নিয়ে মানুষ করেছে। বড়, আদরের দুলালী। তার কোন আদর আব্দারই এড়াতে পারে না। কিছুদিন আগে সে তার মাকে বলেছিলো, 'মা, এইভাবে একা-একা ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে আর ভালো লাগছে না, তুমি যদি মত করো তবে খোজাদের নিয়ে একটু বাইরে বেরিয়ে আসতে পারি।' বেগমসাহেবা মেয়ের কথা ঠেলতে পারেনি। প্রথম দিন বাজারে এসে আপনার কাছ থেকে পোশাক আশাক কেনাকাটা করে নিয়ে গেলো। মা মেয়ের পছন্দসই সওদা দেখে খুব খুশি হলো। তারপর থেকে বাইরে বেরুনোর আর কোন বাধা রইলো না। কয়েকদিন আগে শাহজাদী বেগমসাহেবাকে তার মনের ইচ্ছার কথা বলেছে। আপনাকে দেখে তার খুব পছন্দ হয়েছে জেনে বেগমসাহেবা বলেছে, আমি নিজে ছেলেকে দেখবো আগে—আমার যদি পছন্দ হয় তবেই শাদী দিয়ে দেবো। এখন সাহেব, আপনি বলুন, বেগমসাহেবার সঙ্গে দেখা করতে চান কিনা?

আমি বললাম, আমি তো পা বাড়িয়েই আছি। এখন বলো, কিভাবে, কবে, কোথায় তার সঙ্গে দেখা হতে পারে?

খোজা বললো, আজ সন্ধ্যায় আপনি টাইগ্রীসের ধারে বেগম জুবেদা সাহেবার যে

বড় মসজিদ—ওখানে নামাজ পড়তে যাবেন। নামাজ শেষ করে ওখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। তারপর যা করার আমি করবো।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম, ঠিক আছে।

খোজা বিদায় জানিয়ে চলে গেলো।

সন্ধ্যাবেলায় টাইগ্রীসের উপকূলের সেই মসজিদে গেলাম নামাজ পড়তে। নামাজ শেষ করে রাতের মতো ওখানেই শুয়ে পড়লাম। ভোর হতে দেখি একটা ছোট্ট পানসি নৌকা এসে ভিড়লো মসজিদের ঘাটে। বাক্স আর খোজা ক্রীতদাসে ভর্তি।নৌকা থেকে কয়েকটা বাক্স নামানো হলো ঘাটে। ক্রীতদাসেরা সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলো মসজিদের এক পাশে। একটু পরে দেখলাম, আমার পরিচিত সেই খোজা এবং তার পাশে আমার মানসী সেই শাহজাদী। আমার পাশে বসলো। তার ফন্দী মতলব সব বুঝিয়ে বললো আমাকে। তারপর আদর করলো অনেক। অনেকক্ষণ ধরে। পরে বললো, এবার তোমাকে বাক্সে পুরে তালা বন্ধ করে নিয়ে যাবো।

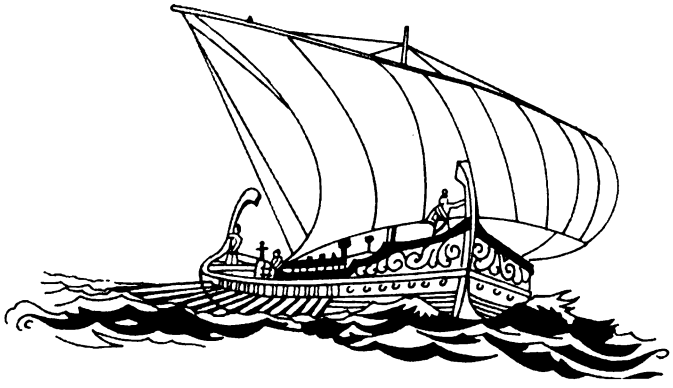

আমি বাক্সের ভিতরে গিয়ে বসলাম। আমাকে তালা বন্ধ করে নৌকায় নিয়ে গিয়ে তুললো খোজা। আবার যখন বাক্স খুলে বার করা হলো, দেখলাম, আমি এসে পড়েছি প্রাসাদের হারেমে। দামী পোশাক আশাক এনে দিলো সেই খোজা। নতুন সাজে সাজলাম। একটা সোফায় বসানো হলো আমাকে। এমন সময় ঘন্টা বেজে উঠলো। দেখলাম, হারেমের কুড়িজন ক্রীতদাসী দু'টি সারিতে ভাগ হয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে পড়লো। সবারই বয়স কুড়ির কাছাকাছি। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। ক্ষীণ কটি উন্নত বক্ষা।

দুই সারি ক্রীতদাসীদের মাঝখান দিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এলো বেগম জুবেদা। চোখ ঝলসানো সাজপোশাক-এ সজ্জিতা। রত্নালঙ্কারের ভারে নুয়ে পড়েছে তার দেহ।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার কাছে এসে ইশারায় বসতে বললো আমাকে। তারপর আমার নাম, ধাম, বংশগোত্র, পেশা সব এক এক করে জেনে নিলো। আমার জবাবে খুশি হলো সে। বললো, তাহলে আর সময় নষ্ট করে লাভ নাই। দশ দিনের মধ্যে শাদীর সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলবো।

তারপর আমার দিকে চেয়ে জুবেদা বললো, শোনো, সাহেব, মেয়ে আবার বড় আদরের দুলালী। তোমার সঙ্গে তার শাদী দেবো। কিন্তু একটা কথা, তাকে কোন কষ্ট দিও না। সে আমি সহ্য করতে পারবো না। দশ দিন পরে তোমাদের শাদী হবে। এই দশ দিন তুমি এই প্রাসাদেই থাকবে।

দশ দিন ধরে প্রাসাদের এক মনোরম কক্ষে আরামেই কাটালাম। এর মধ্যে আমার

মানসীর সঙ্গে দেখা হলো না একবারও। কিন্তু পরিচারিকারা আমার দেখাশুনা করতো। তাদের মারফতে সব খবরাখবর পেতে থাকলাম।

জুবেদা খলিফার সম্মতি পেলো। তিনি যৌতুক হিসাবে দশ হাজার সোনার মোহর পাঠালেন আমাকে। জুবেদা দিলো পঞ্চাশ হাজার দিনার। কাজী এবং সাক্ষী এলো। শাদীর কবুলনামা লেখা হলো। সারা প্রাসাদ আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। শাহজাদীর সঙ্গে শাদী হয়ে গেলো আমার।

উজির আমির ওমরাহরা সবাই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলো সেদিন। প্রকাণ্ড সামিয়ানায় খানাপিনার সে কি বিরাট আয়োজন। এরে আগে কখনও চোখে দেখিনি। কত সব সুন্দর সুন্দর খাবার, বিরিয়ানী, মাংস, চাঁপ, হালওয়া, ফল, মিষ্টি, সরবৎ—এলাহী ব্যাপার। আমিও ওদের পাশে বসে খেলাম। নানারকম খানার মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয় জিরবাজা দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। খেলাম খুব তৃপ্তি করে। বোধ হয় লোভে লোভে বেশ কিছুটা বেশীই খেয়ে ফেলেছিলাম। খানাপিনা শেষ করে রুমালেই হাতটা পুছে ফেললাম। এতো খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো যে, উঠে গিয়ে হাত মুখ ধোয়ার কষ্টটা আর স্বীকার করতে মন চাইলো না তখন।

রাত্রি গভীর হতে থাকে। উৎসবের আসর তখন জমজমাট। হাজার খানেক মোমবাতি জ্বালানো হলো। আমাকে ঘিরে শুরু হলো নাচ গান। সাতবার সাতরকম জমকালো সাজে সেজে এসে পাত্রী প্রদক্ষিণ করলো শাদীর বাসর। উপস্থিত অভ্যাগতরা সোনার মোহর দিতে লাগলো থালায়। সারা বাসরকক্ষ তখন পরিপূর্ণ। শাদীর অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হলো এক সময়। গুলাব জলের পিচকারী করা হলো সবাইকে। এবার এক এক করে বিদায় নেবার পালা। আসর ফাঁকা হয়ে আসে। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের কামরায়। মনোহর করে বাসর শয্যা রচনা করা হয়েছে। এইখানে আমাদের মধু যামিনী হবে। পরিচারিকারা পাত্রীকে নিয়ে এলো। শাদীর প্রথামত বিবস্ত্রা করা হলো তাকে। তারপর আমার পাশে পালঙ্কে শুইয়ে রেখে চলে গেলো তারা।

দেখলাম, সবাই চলে গেছে—শুধু আমি আর সে শুয়ে আছি পাশাপাশি। গভীর আলিঙ্গনে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো।—তুমি রসুন খেয়েছো। ওঃ কি বিশ্রী গন্ধ! বাবা, মরে গেলাম।

আর্তনাদ করে উঠলো সে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের কামরা থেকে ছুটে এলো দাসীরা।—কি হলো, শাহজাদী?

শাহজাদী তখন হাত পা ছুঁড়ছে, এই অসভ্য জংলী জানোয়ারটা রসুন খেয়েছে। কি বিশ্রী গন্ধ, আমার বমি আসছে। আমি কি আগে জানতাম, লোকটা এমন একটা বনমানুষ! তোরা আমাকে এই গাধার বাচ্চার হাত থেকে বাঁচা। ওর কাছে থাকলে আমি নির্ঘাত মরে যাবো। হায় আল্লা আমার একি হলো, এমন শয়তান বদমাইস একটা জানোয়ারকে শাদী করলাম আমি।

শাহজাদী ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমি কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, আমাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলো, চুপ করো, তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। কেন তুমি রসুন খেয়েছো? কেন ভালো করে হাত সাফা করোনি? তুমি কি ভেবেছো, এর পরেও তোমার কোলে শোব আমি?

রাগে গর গর করতে করতে ঘরের এক পাশ থেকে একখানা বেতের চাবুক এনে সপাং সপাং করে এলোপাথাড়ী পেটাতে লাগলো আমাকে। যন্ত্রণায় ছটফট করে পালাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। চাবুকের একটা বাড়ি এসে লাগলো আমার দুই জঙ্ঘার মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গালিচার উপর লুটিয়ে পড়ে গেলাম।

অনেকবাদে জ্ঞান হলো আমার। চোখ খুলে দেখলাম, শাহজাদী তখন চাবুক হাতে পালঙ্কে বসে রয়েছে। একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তি। চারপাশে ক্রীতদাসীরা ঘিরে আছে আমাকে। শাহজাদী হুকুম করলো, ওকে নিয়ে যাও। কোটালের হাতে তুলে দিয়ে বলো, লোকটা রসুন খেয়ে

হাত সাফা করেনি। আমার নাকে গন্ধ লেগেছে। কোটাল যেন ওর হাতখানা—যে হাত দিয়ে ও 'জিরবাজা' খেয়েছিলো—কেটে ফেলে।

শাহজাদীর রায় শুনে তখন আমার বুকে কাঁপুনি ধরে গেলো। শাহজাদীর সহচরীরা আমার ওপর দয়াপরবশ হয়েই বোধহয়, অনুরোধ জানাতে লাগলো, এবারের মতো ওঁকে মাফ করে দিন। এবার তো প্রথমবার। পরে আবার যদি কখনও এমন হয়, তখন যা খুশি সাজা দেবেন।

আমার তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। এতো লঘু দোষে এমন গুরু দণ্ড? 'জিরবাজা' খেয়ে হাত না ধোয়ার জন্যে এই সাজা?

শাহজাদী বললো, ঠিক আছে, তোমরা যখন বলছো এবারের মতো ওর হাতখানা না হয় কাটবো না। কিন্তু তা বলে বেকসুর ছেড়ে দিতে পারবো না। এমন একটা চিহ্ন করে দেবো যার ভয়ে, বাছাধন আর জীবনে 'জিরবাজা' খেতে চাইবে না।

এই বলে সহচরী দাসীদের সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে। শাদীর প্রথম রাতে, বাসর শয্যায় আমি পড়ে রইলাম একা।

দশদিন পরে ফিরে এলো আমার কাছে। সঙ্গে সহচরী ও দাসীবৃন্দ। তর্জনী নাচিয়ে নাচিয়ে বলতে লাগলো, কি, কেমন? আর 'জিরবাজা' খাবে কখনও? দাঁড়াও, আজ তোমাকে এমন শিক্ষা দেবো যাতে আর রসুনে কখনও হাত না ঠেকাও।

তারপর ইশারা করতেই ক্রীতদাসীরা আমাকে জাপটে ধরে জোর করে গালিচার উপর শুইয়ে ফেললো। শাহজাদী হুকুম করলো, রসি দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেলো ওর।

আমার হাত পা বাঁধা হলো। একজন একখানা চকচকে ধারালো ছুরি দিয়ে আমার হাতের আর পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো কেটে ফেললো। তাই আপনারা আজ আমাকে এইরকম দেখছেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। সে আমার ক্ষতস্থানে রক্ত বন্ধ করার ঔষুধপত্র লাগিয়ে বেঁধে দিয়েছিলো। যখন জ্ঞান ফিরে এলো আমি চিৎকার করে উঠলাম, আল্লাহ সাক্ষী আর কখনও 'জিরবাজা' খাবো না। আর যদি কখনও খাই, খাওয়ার আগে এবং পরে চল্লিশবার সোডা, চল্লিশবার পটাশ আর চল্লিশবার সাবান দিয়ে হাত সাফ করবো।

সুতরাং বন্ধুগণ, আপনারা আমার অপরাধ নেবেন না। আপনারা যখন আমাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন, আমি তখন খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ আমি তার কাছে হলফ করেছি। যদিও আজ সে বেঁচে নাই, তবু আল্লাহর নামে কসম খেয়েছি—আমি ও জিনিস আর মুখে তুলবো না। এই 'জিরবাজার' জন্যে আমার বুড়ো আঙ্গুলগুলো হারিয়েছি একদিন।

বাবুর্চি বলতে থাকে, শুনুন জাঁহাপনা, এরপর সেই বাগদাদের তরুণ সওদাগরকে প্রশ্ন করলাম, এর পর আপনার বিবির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কিরকম রইলো?

যুবকটি বললে, আমি যখন আল্লাহর নামে দিব্যি করলাম, আর কখনও 'জিরবাজা' খাবো না, তখন সে বেশ নরম হলো। আমাকে ক্ষমার চোখে মেনে নিলো। এর পর আমরা একসঙ্গে সহবাস করেছি অনেক দিন-রজনী।

এইভাবে প্রাসাদ পরিবেশে কাটলো বহুদিন। শাহজাদী—আমার বিবি বললো, এখানে তো অনেকদিন কাটালে। ঘরজামাই হয়ে থাকবে নাকি চিরকাল? তার চেয়ে বাইরে কোথাও একটা ইমারৎ কিনে নাও। আমি টাকা দিচ্ছি।

পঞ্চাশ হাজার সোনার মোহর দিয়ে একটা বিরাট বাড়ি কিনলাম। শাহজাদীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামানপত্র এবং তার যাবতীয় বিষয়সম্পদ নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে। সুচারু সুন্দর করে সাজালাম সারা বাড়িটা। কিন্তু এত সুখ আমার কপালে সইলো না। বছর না ঘুরতেই সে মারা গেলো। শোকে দুঃখে ভেঙে পড়লাম। উদাসী মন বিবাগী হলো। বাড়ি ঘরদোর, বিষয় সম্পত্তি সব বেচে দিয়ে একদিন পথে বেরিয়ে পড়লাম। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। কোথাও মন টিকে না। অবশেষে সুদূর পরবাসে আপনাদের এই দেশে এসে বাসা বেঁধেছি। আল্লাহ জানেন, এখানেই বা কতদিন থাকবো।

জাঁহাপনা, বাবুর্চি বললো, এই হলো সেই বাগদাদের তরুণ সওদাগরের কাহিনী। এর পর সেই নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবাই যে যার ঘরের দিকে চললাম। আমি ফিরে গেলাম আমার বাড়ি। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর পার হয়ে গেছে। তারপর এই কুঁজোটার মরা লাশ নিয়ে যা যা কাণ্ড ঘটে গেছে সে তো আপনার সবই জানা।

চীনের বাদশাহ গম্ভীর মুখে বললো, হুম্, তোমার গল্প কিন্তু এমন কিছু আহা মরি নয় হে, বাপু। এর চেয়ে এই কুঁজোর মরার ব্যাপারটা আরও অনেক বেশী অদ্ভুত। তোমাদের দু'জনের কারো কাহিনীই আমাকে অবাক করতে পারেনি। কিন্তু কুঁজোর মরার ঘটনা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেছি! সুতরাং তোমাদের কারো নিষ্কৃতি নাই। সবাইকে ফাঁসীতে ঝুলাবো।

এই সময়ে সেই ইহুদী হেকিম এগিয়ে এলো। বাদশাহকে কুর্নিশ করে বললো, শাহেনশাহ, আমার কাহিনীটা মেহেরবানী করে শুনুন। আমার বিশ্বাস, ওদের চেয়ে হাজার গুণ ভালো লাগবে আপনার। এমন কি, কুঁজোর মরার ঘটনার চাইতেও বেশী অবাক হবেন আপনি।

বাদশাহ বললো, ঠিক আছে, যদিও আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি, তবু শোনাও দেখি।

ইহুদী হেকিম তার কাহিনী শুরু করলো ঃ

আমার তরুণ বয়সে এই অদ্ভুত কাহিনীটা শুনেছিলাম। তখন আমি দামাসকাসে থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে গবেষণা করি। তার আগে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমি পাশ করেছি।

একদিন ওখানকার সুবাদার সাহেবের পেয়াদা এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো। একটা বিশাল প্রাসাদ। তার মাঝখানের প্রশস্ত কক্ষে দামী পালঙ্কে শুয়েছিলো এক যুবক। অসুস্থ। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

কোনো কথা বললো না সে। শুধু চোখের ইশারায় কি যেন বলতে চাইলো। আমি বললাম, হাত দেখি—

বাঁ হাতটা বের করে আমার সামনে তুলে ধরলো। আমি একটু অবাক হলাম, কিছুটা বা অপমানিতও। এমন সুন্দর শিক্ষিত এক তরুণ, সাধারণ সভ্য আদব-কায়দাও জানে না? যাই হোক মনে মনে বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলাম না। বাঁ হাতের নাড়ি দেখে ঔষুধ লিখে দিলাম। পরদিন আবার আমাকে যেতে হলো। তারপর দিনও। এই ভাবে দশ দিন ধরে তার চিকিৎসা করে মোটামুটি সারিয়ে তুললাম। সুবাদার সাহেব আমার ওপর খুশি হয়ে অনেক ইনাম দিলেন। এবং দামাসকাসের সদর হাসপাতালের বড় হেকিমের পদে সসম্মানে বহাল করলেন আমাকে। আমি তাদের গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত হলাম। তাই রোজই তাকে দেখতে যাই। কিন্তু আমার মনে একটা খট্‌কা রয়ে গেলো, কেন সে রোজই বাঁহাত বাড়িয়ে দেয়। দশ দিন পরে ওকে দরজা জানলা বন্ধ করে গরম জলে গা পুছিয়ে দিতে লাগলাম। কিন্তু এই কাজটা করা বেশ শক্ত। ঐ সময় কোন রকমে বাইরের হাওয়া গায়ে লাগলে বা গা মোছাবার সময় জলকণা গায়ে লেগে থাকলে উপকারের বদলে উল্টে অপকারের সম্ভাবনা বেশী। সুবাদার সাহেব বললো,

আমি যেন নিজে সব ব্যাপারটা তদারক করি। সুতরাং নফরচাকররা তাকে যখন হামামে নিয়ে গেলো, আমাকেও সঙ্গে যেতে হলো। প্রথমে তার সমস্ত জামা কাপড় খুলে ফেলা হলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ওর ডানহাতটা নেই—কাটা। তার সর্বাঙ্গে চাবুকের দাগ। যুবক বললো, আপনি অবাক হচ্ছেন? তা হবারই কথা। কিন্তু এমনটা আমার জন্ম থেকে ছিলো না। কি করে হলো সে কাহিনী পরে বলছি। হামাম থেকে বেরিয়ে আমরা গিয়ে বসলাম নিচের বড় ঘরটায়। ওখানে সাজানো হয়েছিলো আমাদের সন্ধ্যাবেলার খানাপিনা।

যুবক বললো, চলুন আমরা ওপরের ঘরে গিয়ে বসি। আরও নিরিবিলি। কী, আপত্তি নাই তো?

আমি বললাম, না না, আপত্তি কিসের?

তখন সে বাবুর্চিকে বললো, একটা ভেড়ার কাবাব করে, ওপরে পাঠিয়ে দাও। আমরা আজ রাতের খানা ওপরেই খাবো।

একটু পরে খানসামা এসে খাবার সাজিয়ে দিলো। আমরা খেতে খেতে নানারকম টুকিটাকি খুচরো আলাপ সারলাম। তারপর আমি বললাম, এবার আপনার কাহিনী শোনান।

তখন যুবক তার কাহিনী শুরু করলো ঃ

আমার জন্ম মসুল শহরে। খানদানী পরিবার হিসাবে আমাদের খুব নাম-ডাক ছিলো সেখানে। আমার ঠাকুরদার দশ ছেলে। তার মধ্যে আমার বাবাই সব চেয়ে বড়। তার জীবদ্দশাতেই দশ ছেলের বিয়ে-শাদী দিয়ে গিয়েছিলো সে। কিন্তু একমাত্র আমার বাবা ছাড়া, অন্য কাকাদের কোন সন্তানাদি ছিলো না। সেই কারণে, আমার কাকারা আমাকে দারুণ ভালোবাসতো। কোন সময়ই চোখের আড়াল করতে চাইতো না।

এক জুম্মাবারে আমি গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে মসুলের বড় মসজিদে নামাজ পড়তে। নামাজ পর্ব শেষ হলে সবাই চলে গেলো, কিন্তু আমার বাবা আর কাকারা রয়ে গেলো সেখানে। একটা বিরাট কম্বল পেতে বসে ওরা সবাই নানা কথাবার্তা বলতে লাগলো। কাকারা বললো, আমরা ঠিক করেছি বাণিজ্য করতে বেরুবো। অনেক জায়গার কথা উঠলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, মিশরে যাবো। মিশরের প্রধান শহর কাইরো নীল নদের তীরে। নীলের অনেক মনোরম দৃশ্যশোভার গুণকীর্তন করলো ওরা। যারা বহুদেশ ঘুরেছে। তাদের মতে নাকি মিশরের মতো সুন্দর দেশ সারা দুনিয়ায় নাই। মিশরের জল হাওয়া খুব ভালো। ওখানকার প্রকৃতির শোভা নীলনদের ধারে ফুলের সমারোহ মানুষকে সকল শোকসন্তাপ ভুলিয়ে অন্য জগতে নিয়ে যেতে পারে।

বাড়িতে ফিরে ভাবতে লাগলাম, এমন সুন্দর দেশ যদি না-ই দেখলাম, এ জীবন বৃথা। কাকারা যাবে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে যাবো না—আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল্যে। দিন কয়েকের মধ্যেই কাকাদের যাবার আয়োজন শেষ হয়ে এলো। আমি বাবার কাছে গিয়ে বায়না ধরলাম। কাকাদের সঙ্গে কাইরো যাবো। বাবা প্রথমে রাজি হলো না, অত দূর-দেশ, কী জানি কী হয়। কিন্তু আমার চোখে জল দেখে আর না করতে পারলো না। বললো, যাও, কিন্তু অত দূরে না গিয়ে দামাসকাস অবধি গিয়ে বেড়িয়ে এসো।

কাকারা বললো, তাই হবে। শেষে একদিন মসুল ছেড়ে দামাসকাসের পথে রওনা হলাম আমরা। প্রথমে এলাম আলেপ্পো শহরে। সেখানে দু-এক দিন কাটাবার পর এসে পৌঁছলাম এই দামাসকাস শহরে। দামাসকাস আমাকে মুগ্ধ করলো। সারা শহরটা গাছপালা বাগ-বাগিচায় ভরা। আর কাছেই স্রোতস্বিনী নদী। আমি একটা সরাইখানায় উঠলাম। শহর থেকে একটু দূরে। আর কাকারা শহরের ভিতরে ঢুকে গেলো। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বাণিজ্য। আর আমার ইচ্ছা প্রাণ ভরে দেখবো শুধু প্রকৃতির শোভা।

কাকারা বাণিজ্য সারলো। মসুল থেকে যা যা এনেছিলো তার কিছুটা বিক্রী করলো দামাসকাসে। আর দামাসকাসের কিছু বাহারী জিনিস কিনে নিলো কাইরোর বাজারে বেচার জন্যে। আমি ওদের বললাম, জানি না কাইরো হয়তো আরও সুন্দর, আরও ভালো, কিন্তু কাকা, দামাসকাসের শোভা আমার বড় ভালো লেগেছে। এখানকার তরুলতা, এই নদী, এই আকাশ বাতাস ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। তোমরা যাও। আমার যদি ভালো না লাগে পরে যাবো তোমাদের কাছে।

কাকারা, বললো, তাহলে তোর সওদাপত্র যা আছে তার দাম নিয়ে নে। আমার যতগুলো সওদা ছিলো প্রতিটির জন্যে পাঁচ দিরহাম লাভ সুদ্ধ সব টাকা দিয়ে গেলো তারা।

নদীর ধারে মাসে দু'দিনারে একটা সুন্দর বাড়ি ভাড়া করলাম আমি। আগাগোড়া বাড়িটা শ্বেতপাথরে তৈরি। সামনে ফুলের বাগিচা। জলের ফোয়ারা। এক কথায় অপূর্ব। মাত্র দু-দিনারে এমন বাড়ি ভাবা যায় না। খুশিতে মন ভরে গেলো। মনের আনন্দে মদ মাংস খাই, আর প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে গান গাই।

একদিন বাইরের রোয়াকে একটা আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত হয়ে সরাবে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছি, আর নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা চেয়ে চেয়ে দেখছি। এমন সময় এক সুন্দরী যুবতী সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালাম তাকে। ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। বোরখাটা খুলে এক পাশে রাখলো। তার রূপের জেল্লায় চোখ আমার ঝলসে গেলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠলো সে।

—সাহেবের বিবি কোথায়? তাকে দেখছি না তো?

—এখনও বিয়ে শাদী করিনি।

—ওমা সে কি? এই জোয়ান বয়স। মেয়েমানুষ ছাড়া রাত কাটাও কি করে গো?

—তা আর কি করবো? শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনি।

মেয়েটি চোখের বান ছুঁড়ে বলে, আহা, তোমার মতো নাগর পেলে সব মেয়েই বর্তে যাবে।

আমি বসেছিলাম খাটে। চেয়ার ছেড়ে আমার পাশে এসে বসলো সে। একেবারে গা ঘেঁসে। কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। একেবারে অচেনা অজানা এক সুন্দরী যুবতী। একটু সরে বসার চেষ্টা করি। কিন্তু মেয়েটি আমার হাত চেপে ধরে। আহা ঢং দেখে বাঁচি না, পেটে খিদে মুখে লাজ!

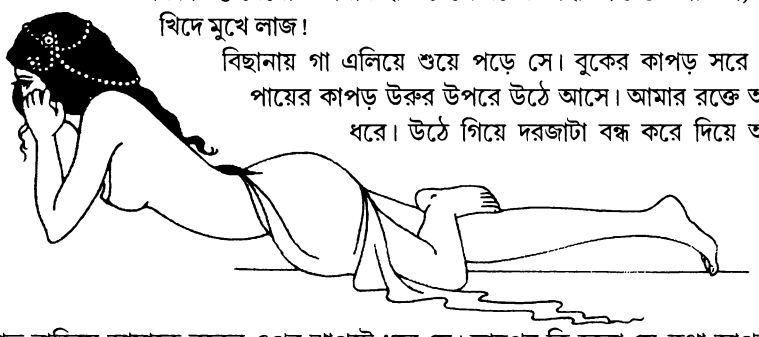

বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে সে। বুকের কাপড় সরে যায়। পায়ের কাপড় উরুর উপরে উঠে আসে। আমার রক্তে আগুন ধরে। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকের ওপর ঝাপটে ধরে সে। তারপর কি হলো সে-কথা আপনাকে বলতে পারবো না।

আমি বললাম, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, তার পর কী হলো, বলো।

যুবক বলতে থাকে, আমি তার রূপের সমুদ্রে ডুবে গেলাম। অনেকক্ষণ পরে বিছানা

ছেড়ে উঠলাম আমরা। হামামে ঢুকে ভালো করে স্নান করলাম দু'জনে। তারপর টেবিলে কাপড় পেতে খানা সাজালাম। মাংসের কাবাব, কোপ্তা, মোরগ মসাল্লাম, তন্দুরী, মিষ্টি, ফল আর দামী সরাব।

অনেকক্ষণ ধরে পুরো এক বোতল সরাব দু'জনে মিলে খেলাম। নেশা বেশ জমে উঠলো। খানাপিনা শেষ করে খাটে এসে শুয়ে পড়লাম আমরা। সে রাতের স্মৃতি আমি ভুলবো না কোনও দিন। সেই আমার জীবনের প্রথম সহবাস-রাত্রি। বেহেস্তে কি সুখ আছে জানি না, কিন্তু সে-রাতে যে সুখের স্বাদ পেয়েছিলাম তা আর কোনও দিন পেলাম না।

সকালে ও যখন বিদায় নেবে, দশটা সোনার মোহর দিতে গেলাম তাকে। দু'হাত পিছিয়ে গিয়ে সে বললো, টাকা? টাকা নিয়ে আমি কি করবো? ও সব তুচ্ছ জিনিসে আমার প্রয়োজন নাই। আমি চাই—তোমাকে।

—আমি তো তোমারই গোলাম হয়ে গেছি, বিবিজান।

—আহা, গোলাম হতে যাবে কেন, তুমি আমার দিল্‌কা কলিজা।

তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গভীর আশ্লেষে চুম্বন করলো আমাকে। বললো, আজ চলি, সাহেব। তিনদিন বাদে আবার আসবো। সে দিনের যা খরচ—সব কিন্তু আমার। কী, রাজি?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, ঠিক আছে, তাই হবে।

—তা হলে, সোনা, এই টাকাটা রাখো। গতকাল যেমন খানাপিনার ব্যবস্থা করেছিলে, তেমনি ব্যবস্থা করে রেখো। আমি চারদিনের দিন বিকেলে আসবো।

দশটা সোনার মোহর বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। আমি অবাক হলাম। মোহরগুলো নিলাম হাত পেতে।

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আমার নিচের ঠোঁটে একটা ঠোনা মেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলাম তার চলে যাওয়া। বুকের মধ্যে কেমন হু হু করে উঠলো। মনে হতে লাগলো, ও বুঝি আমার কলিজাটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলো।

ঠিক চারদিনের দিন বিকেল বেলায় আবার এলো সে। ঘরে ঢুকেই বোরখাটা খুলে ছুঁড়ে দিলো। সেদিন আরও জমকালো সাজে সেজে এসেছে। সোনার জরিতে কাজ করা স্বচ্ছ মসলিন পরেছে। শরীরের প্রতিটি ভাঁজ প্রতিটি খাঁজ একেবারে স্পষ্ট পরিষ্কার চোখে পড়ছে। তার ঐ মোহিনী রূপের আগুনে আমার পৌরুষ—আমার যৌবন ঝলসে গেলো। নিজেক আর ধরে রাখতে পারলাম না। দু'হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে ধরলাম ওকে। একটা চুমু খেয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিলাম।

টেবিলে খানাপিনা সব সাজিয়েই রেখেছিলাম। গতদিন যা যা খেয়েছিলাম সেদিনও ঠিক তাই-ই ছিলো। দু'জনে মিলে মৌজ করলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপর নেশা যখন বেশ জমে উঠেছে—খানাপিনা সেরে শুয়ে পড়লাম। আর একটা সুখ-সম্ভোগের রাত্রি কেটে গেলো আমার। আমার জীবনের দ্বিতীয় সহবাসরজনী। পরদিন সকালে, আবার চলে গেলো সে। সেদিনও বলে গেলো, চারদিনের দিন আবার সে আসবে।

এবং এলো তাই। খানাপিনা সাজিয়ে বসে আছি। সূর্য ডোবার একটু আগে এসে হাজির হলো সে। আরও জমকালো সাজ। আবার মৌজ করে খানাপিনা সারলাম। সারারাত বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকলাম। মোমবাতি জ্বলে জ্বলে গলে গলে এক সময় ফুরিয়ে গেলো। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে যাবার আগে আমাকে একটা প্রশ্ন করলো সে—আচ্ছা প্রিয়তম, সত্যি করে বলো তো, আমাকে তোমার কেমন লাগলো—এই তিন দিনে?

আমি অবাক হই? দুম্ করে এ ধরনের এক প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিলাম না।—কেন, একথা জিজ্ঞেস করছো কেন, বিবি জান? তোমাকে পেয়ে আমি বেহেস্তের চাঁদ হাতে পেয়েছি। আমার জীবন সুধা পাত্রে ভরিয়ে দিয়েছো তুমি। তোমাকে ছাড়া আমি আর বাঁচতে পারবো না, সোনা।

সে বললো, আমি কি সত্যিই দেখতে খুব সুন্দর। তুমি কি আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে 'ভালোবাসা' করছো?

—তোমার চেয়ে সুন্দরী কে আছে জানি না, কিন্তু আমার চোখে তোমার চেয়ে রূপবতী নারী আমি আর কখনও দেখিনি।

—দেখোনি তো? ঠিক আছে, পরের দিন দেখাবো। আর একটা মেয়েকে নিয়ে আসবো সেদিন। সে, দেখবে, আমার চেয়ে আরও সুন্দরী। দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না।

আমি বললাম, হতে পারে। কিন্তু তাতে আমার কী? আমি কেন তার রূপে পাগল হতে যাবো?

—দেখা যাবে।

এই বলে সে কুড়িটা মোহর আমার হাতে গুঁজে দিলো।—এটা রাখো। চারদিনের দিন বিকেলে আসবো আমরা। ঐ মেয়েটাকে সঙ্গে করে আনবো। সরাব আর খানা একটু বেশি করে ব্যবস্থা রেখো। তিনজনে মৌজ করে খাবো। খুব হাসি মজাক, হৈ হল্লা করে সারারাত কাটাবো আমরা।

আমি বললাম, ঠিক আছে, তুমি যা বলবে তাই হবে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, দেখো, নতুন মানুষের খাতির যত্নে যেন ত্রুটি না হয়।

আমি বললাম, আগে আসুক, তারপর দেখে নিও, কী রকম অভ্যর্থনা করি।

ঠিক চারদিনের মাথায় যথাসময়ে এলো ওরা। সঙ্গের মেয়েটির বয়স আরো কম। মনে হয় ষোলর বেশি হবে না। এতো রূপ যে কোন মেয়ের হতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মনে হলো বেহেস্তের ডানাকাটা হুরী।

তিনজনে মিলে হৈ-হল্লা করলাম খুব। প্রাণভরে সুরা পান করলাম। নেশায় মাতোয়ারা হলাম। তারপর খানাপিনা করে রাতের মতো শোবার তোড়জোড় করতে থাকলাম। শুতে যাবার আগে এক চক্কর সরাব নিলাম আমরা। আমি নিজে ঢেলে দিলাম ওদের দু'জনকে। নতুন মেয়েটির হাতে মদের গেলাম তুলে দেবার আগে আমার ঠোঁটে ছুঁইয়ে দিলাম। আমার প্রেয়সীর তা সহ্য হলো না। বুঝলাম, ভীষ চটে গেছে। কিন্তু মুখে প্রকাশ করলো না। বরং শুধু বললো, কি গো সাহেব, তোমার জন্যে নতুন চিড়িয়া ধরে আনলাম। তা তার সঙ্গে একটু কথাটথা বলো। একটু আদর সোহাগ করো। কেন, তোমার মন ওঠেনি নাকি? এমন রূপসী! তোমার ভালো লাগলো না?

আমি বলি, ভালো লাগবে না কেন? খুবই ভালো লেগেছে। তা এত ভালো জিনিস কি সবারই পেটে সহ্য হয়?

—হবে হবে। একটু চেখেই দেখো না?

আমি ভীষণ বোকা। তার এই কথায় একেবারে গলে গেলাম।—তুমি যদি বলো, চেখে দেখতে পারি।

—বাঃ, এই তো পুরুষের মতো কথা। নাও, আজ রাতে এ তোমার শয্যাসঙ্গিনী হবে। ওকে নিয়ে শুলে, খুব খুশি হবো আমি।

নির্বোধের মতো আমি বললাম, তোমার কথা তো ঠেলতে পারবো না। তুমি যা বলবে, তাই হবে।

সে রাতে আমাদের দু'জনের শোবার ব্যবস্থা হলো খাটে। আর আমার প্রেয়সী বিছানা করে নিলো নিচে।

আমার রক্তে তখন কামনার অধীর উত্তেজনা। নতুন নারী সম্ভোগের বাসনায় তাল মান জ্ঞান খুইয়ে বসেছি। নিচে শুলো সে। আর খাটের ওপরে নতুন মেয়েটির দেহটাকে নিয়ে আমি মেতে উঠলাম পুতুল খেলায়। এইভাবে কতক্ষণ কেটেছিলো জানি না। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো দেখি, আমার বাঁহাতের বাহুটা রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম, খোয়াব। চোখদু'টো ভালো করে রগড়ে আবার তাকালাম। না, স্বপ্ন নয়, সত্যি রক্ত। শুধু আমার হাতে নয় বালিশের তোয়ালেও লালে লাল। পাশে ঘুমন্ত মেয়েটাকে জাগাবার জন্যে ওর কপালে হাত রেখে নাড়া দিই। আর কি বলবো, সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথাটা গড়িয়ে মেজের ওপর পড়ে গেলো। আমার যে তখন কি অবস্থা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। এমন বীভৎস ব্যাপার চোখে দেখা তো দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারিনি কখনও। ভরে সারা শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে—এখন কি করি! নিচে তাকিয়ে দেখি, সে মেয়েটি নাই। উঠে হামাম দেখলাম। না, সে নাই। চোখ পড়লো, বাইরে যাবার দরজার হুড়কো খোলা। বাইরে থেকে দরজাটা ভেজানো। বাইরে এলাম। না, কোথাও নাই। সদর দরজাটা দেখলাম, হাট করে খোলা। বুঝতে বাকী রইলো না, কার কাণ্ড। কিন্তু এখন আমি কি করি? লোক জানাজানি হয়ে গেলে কোটাল এসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে আমাকে। মেয়েটার ঠিকানা জানি না, কি জবাবদিহি করবো কোটালের কাছে। ভাবতে ভাবতে একটা উপায় পেলাম। ঘরের মাঝখানকার মেজের কয়েকখানা পাথর তুলে ফেললাম। মাটি খুঁড়ে একটা লম্বা গর্ত করে তার মধ্যে মেয়েটার লাশ আমার পরনের কাপড়চোপড়, বিছানার চাদর আর তোয়ালে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলাম। শ্বেতপাথরের টালিগুলো যেমনভাবে লাগানো ছিলো হুবহু সেইভাবেই লাগিয়ে দিলাম।

অন্য জামা কাপড় পরে বাইরে এলাম। বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করে বললাম, আমি কিছুদিনের জন্যে বিদেশে যাচ্ছি। কাজ হয়ে গেলেই ফিরে আসবো। এই নিন আগাম এক বছরের ভাড়া। অন্য কোন ভাড়াটেকে যাতে ভাড়া না দিয়ে দেন সেই জন্যে বারোমাসের পুরো ভাড়া চব্বিশ দিনার দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।

বাড়িওলা খুশি হয়ে বললো, আপনার যখন খুশি ফিরবেন। বাড়ি আপনারই রইলো।

সেই দিনই আমি কাইরো রওনা হয়ে যাই। ওখানে আমার কাকারা আছে। তাদের সঙ্গে দেখা করে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নেবো।

কয়েক দিনের মধ্যে কাইরো পৌঁছে গেলাম। কাকারা আমাকে দেখে মহাখুশি হলো। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। টাকা কড়ি যা ছিলো দামাসকাসে ফুরিয়ে গেছে। এখন এখানে এসে কাকাদের সঙ্গে দেখা না হলে মহা বিপদে পড়তাম। কাকারা আমার খাওয়া দাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিলো। খাই দাই আর ঘুরে ঘুরে মিশরের শোভা সৌন্দর্য দেখে বেড়াই।

কিছুদিন বাদে কাকারা বললো, আমাদের কাজ-কাম সব শেষ। এবার দেশে ফিরে যাবার পালা।

আমি বললাম, কিন্তু আমার আরো কিছুদিন থাকার ইচ্ছে এখানে। অনেক কিছু দেখার বাকী। ওরা বললো, তা থাক, না—বার বার তো আসা হবে না। ভালো করে দেখে যা।

কাকারা আমাকে বেশ কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দেশে চলে গেলো। আমি ছোটখাটো কেনা বেচার সওদা করি, আর খাই দাই ঘুরে বেড়াই। এইভাবে তিনটি বছর কেটে গেলো। প্রতি বছরই দামাসকাসের বাড়িওলাকে ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। অবশেষে ঠিক করলাম দেশে ফিরে যাবো। তখন কাকাদের সঙ্গে যাইনি, তার কারণ, কাকাদের সঙ্গে দামাসকাসে থামতে হতো। এবং আমার বাসায় গিয়ে উঠতো তারা। কিন্তু এখন, এই তিন বছর পরে আমার ধারণা হলো, লোক সব ভুলে গেছে। তাই দামাসকাসে এসে বাড়িওলার সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে বাড়ির চাবিটা দিয়ে তিনি বললেন, এই নাও তোমার চাবি। যেখান যা রেখে গিয়েছিলে, দেখো, সব ঠিকঠাক আছে কি না।

শোবার ঘর খুলে ঢুকলাম। দেখলাম, সবই যথাযথ ঠিকই আছে। শুধু ধুলো বালি জমে গেছে সারা ঘরময়, বিছানাটা ঝেড়ে বিছাবার জন্য তোষকটা তুলতেই অবাক হলাম। একটা জড়োয়া হাঁসুলী হার। বেশ ভারি। বুঝতে দেরি হলো না, সেই রাতে মেয়েটি শুতে যাবার আগে হারটা খুলে তোষকের তলায় রেখে দিয়েছিলো। সন্ধ্যাবেলায় তার গলায় এই হারটাই দেখেছিলাম, মনে পড়লো।

হাতে টাকা পয়সা কম ছিলো, এতখানি সোনা হাতে পেয়ে খুশিই হলাম। কিন্তু তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম, এ সবই শয়তানের খেলা।

পথশ্রমে তখন আমি বড় ক্লান্ত। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে শরীরটা ঝরঝরে হলো। জড়োয়া হারটা জেবে পুরে বাজারের দিকে চললাম। ভাবলাম, আজই ওটাকে বেচে দেবো। এ জিনিস কাছে রাখার বিপদ আছে। বাজারে গিয়ে একটা দালালের গদিতে ঢুকলাম। সোনা রূপার দালালী করাই তার পেশা। হারটা তার হাতে দিয়ে বললাম, এটা বিক্রী করবো।

সে আমাকে সাদরে বসালো। বললো, মেহেরবানী করে একটু বসুন সাহেব। আমি মহাজনের ঘরটা ঘুরে আসি। হারটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো সে। আমি বসে রইলাম।

ঘণ্টাখানেক বাদে সে ফিরে এলো। বললো, আমি ভেবেছিলাম খাঁটি সোনা, আর আসল মুক্তোর তৈরি। কিন্তু জহুরী সাহেব বললো, ঝুটো মুক্তা, আর নকল সোনা। ফ্রাঙ্কফুটের তৈরি নকলি মাল। আসল হলে এক হাজার দিনার দাম হতো। কিন্তু এ জিনিসের দাম এক হাজার দিরহামের বেশী হবে না।

আমি বললাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি একটা মেয়েকে ভোলাবার জন্যে এই ঝুটো হারটা কিনে দিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েটা মারা যাবার আগে আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে যায় ওটা। যাই হোক, যা দাম পাওয়া যায় তাতেই বিক্রী করে দিন। আর যত তাড়াতাড়ি পারেন টাকাটা এনে দিন আমাকে। অনেক কাজের তাড়া আছে। এখুনি যেতে হবে।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

আঠাশতম রজনী।

সে বলতে থাকে ঃ

সেই ইহুদী হেকিম তার কাহিনী বলে চলেছে ঃ

যখন সেই যুবক দালালটাকে বললো, যা দাম পাওয়া যায় নিয়ে এসে দিন তাড়াতাড়ি, দালালের সন্দেহ হলো। নির্ঘাৎ চোরাই মাল। তা না হলে, এক কথায় ঝুটো বলে মেনে নিলো কি করে। হয় সে কোথাও কুড়িয়ে পেয়েছে, নয় সে চুরি করে এনেছে।

যুবকটি বলতে থাকে ঃ

দালালটা বললো, আপনি আর একটু বসুন, সাহেব। আমি এখুনি বিক্রী করে দাম নিয়ে আসছি।

আমি বসে রইলাম টাকার জন্যে। কিন্তু টাকা পেলাম না, পেলাম হাত কড়া। কয়েকজন সিপাই এসে ঘিরে ফেললো আমাকে। হাতে কড়া পরিয়ে ধরে নিয়ে গেলো কোটালের কাছে।

আমাকে দোকানে বসিয়ে লোকটা সোজা গিয়েছিলো ওদের বড় দালালের কাছে।

তাকে বলতেই সে খবর দেয় কোতোয়ালীতে।

কোটাল আমাকে প্রশ্ন করলো, এ হার কার?

—জী আমি একটি মেয়েকে উপহার দিয়েছিলাম। সে মারা যাবার পর আমার বিবির হাতে আসে হারটা।

—কম দামে কিনে ছিলে? কোথা থেকে কিনে ছিলে? বললাম, ঠিক মনে নাই। তবে হাজার দুই দিরহাম হবে। কিনেছিলাম কাইরোর এক মনোহারী দোকান থেকে।

কোটাল সাহেব হো হো করে হেসে উঠলো। —বাঃ চমৎকার বানিয়ে বলতে পারো তো, যাদু। হারটার আসল দাম কতো তা এখুনি টের পাবে।

এই বলে সপাং সপাং করে চাবুকের ঘা বসাতে লাগলো আমার সর্বাঙ্গে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম। কোটাল থামলো না। —আগে বল্ কোথায় পেয়েছিস? কোথা থেকে চুরি করেছিস।

—আজ্ঞে চুরি করিনি।

আবার সপাং করে চাবুকের ঘা পড়ে আমার পিঠে। —চুরি করোনি, সোনার চাঁদ। তবে কি করে এলো তোমার হাতে? এতো দামী জিনিস পেলে কোথায়? উজির আমির ছাড়া এ গহনা কার ঘরে থাকে?

বুঝলাম দালালটা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। উপায়ন্তর না দেখে, আর একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে বললাম তাকে।

—হারটা আমি চুরি করেছি।

—কোথা থেকে?

—বড় দালালের গদি থেকে।

অনেক ভেবে এই মিথ্যে কথাটা বললাম। না হলে দারোগার মার থেকে রেহাই পাবো না। সত্যি কথা বলার বিপদ ছিলো। কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠে পড়বে। চুরি ছেড়ে খুনের দায়ে পড়বো। এখানে হয়তো একটা অঙ্গ যাবে। কিন্তু খুনের আসামীর সাজা প্রাণদণ্ড।

কোটাল সাহেব সিপাইদের বললো, ওর ডান হাতখানা কেটে ফেলো।

কোটালের হুকুমে আমার ডান হাতখানা কাটা হলো। তারে আগেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। কে যেন আমার মুখে কি একটা দাওয়াই ঢেলে দিলো। তারপর জ্ঞান ফিরে আসে।

আস্তে আস্তে উঠে বাসায় ফিরে এলাম। সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলো এই মুখরোচক খবর। বাসায় ঢোকার মুখেই দেখি বাড়িওলা দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, সারা শহরে টি টি পড়ে গেছে। তুমি বাপু, অন্য বাড়ি দেখো, এখানে আর রাখতে পারবো না তোমাকে। আগাম যা দিয়ে রেখেছো কাল হিসেব করে ফেরৎ দিয়ে দেবো।

কাতর অনুনয় করে বললাম, কালই কোথায় যাবো। আমাকে দু'একটা দিন সময় দিন, বাসা খুঁজে নিশ্চয়ই চলে যাবো।

বাড়িওলা চলে গেলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ব্যথায় টনটন করছে হাতটা। চোখে জল এসে গেলো, হায় আল্লাহ একি হলো আমার। এই কাটা হাত নিয়ে কি করে দেশে যাবো

আমি। মসুলের কোন লোক কি বিশ্বাস করবে আমার কোন বানানো কথা। সব দেশের লোকই জানে, চুরি করলে হাত কাটা যায়। এই একমাত্র সাজা।

ভেবে কোন কূল-কিনারা করতে পারলাম না। বাসা খুঁজতেও বেরুলুম না। পথে বেরুলেই লোকে ছিঃ ছিঃ করে থু থু ফেলবে। আর এই অবস্থায় কে আমাকে বাসা ভাড়া দেবে? সুতরাং সে-চেষ্টা না করে না খেয়ে, না নেয়ে, খোদা ভরসা করে ঘরেই পড়ে রইলাম। এইভাবে তিনটে দিন কেটে গেলো। ভাবলাম, আজ হোক কাল হোক, বাড়িওলা আবার আসবে। আমার আগাম টাকা ফেরৎ দিয়ে, ঘরের সামান-পত্র রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে আমাকে বের করে দেবে। দেয় দিক। কি আর করবো। আর ভাবতে পারি না। যা হয় হবে। তখনকার কথা তখন ভাববো। কিন্তু মন মানে না। যত রাজ্যের ভাবনা এসে আচ্ছন্ন করে ফেলে আমাকে।

হঠাৎ কিসের শব্দে তন্দ্রা কেটে যায়। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে জাঁদরেল ফৌজি আবসার। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে বললো, সুবাদার সাহেবের হুকুমে তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।

ফৌজরা এসে আমাকে বেঁধে ফেললো। সুবাদারের দরবারে দাঁড় করানো হলো আমাকে। দেখলাম সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। তার মধ্যে আমার বাড়িওলা আর সেই দুই দালালকেও দেখলাম। সুবাদার সাহেব বললেন, কোটোয়ালের কাছ থেকে শুনলাম, এই হাঁসুলী হারটা তুমি নাকি এই দালালটার দোকান থেকে চুরি করেছো। কিন্তু হারটার মালিক তো এই দালাল নয়। এটা আমার মেজো মেয়ের হার। আজ তিন বছর আগে একদিন বড়মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে যায়, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। এখন তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, সত্যি কথা কি, বলতো? আমি তোমাকে কোন সাজা দেবো না। আজ তিনটি বছর ধরে দামাসকাসের প্রতিটি কোণে কোণে আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু তার কোন হদিস করতে পারিনি। আজ এই হারটা আমার হাতে এসেছে। এখন বুঝতে পারছি, সে আর জান-এ বেঁচে নাই।

সুবাদার সাহেবের কথা শুনে আমার পায়ের তলার মাটি সরে যেতে লাগলো। এবার আর বাঁচার কোন আশা নাই। মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু দুনিয়াতে অবাক করার মতো ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটে। সুবাদারসাহেব ফৌজদারকে বললেন, শিকল খুলে দাও।

আমাকে বন্ধন মুক্ত করা হলো। সুবাদার সাহেব তার আরও কাছে ডাকলেন আমাকে। তারপর বড় দালালের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই লোকটা মিথ্যেবাদী শয়তান। মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে তোমার হাতটা কাটিয়েছে। ওকে আমি জেলে ভরবো। এই বেচারার কাটা হাতের উপযুক্ত খেসারৎ দাও। এবং এক্ষুণি আমার সামনে। না হলে তোমাকে আমি শূলে দেবো। বুঝেছো শয়তান। দালালী করা তোমার জন্মের মতো ঘুঁচিয়ে দেবো।

সুবাদার সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একেবারে মুখোমুখি। দরবার ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হুকুম দিলেন। এমনকি সুবাদারের ব্যক্তিগত রক্ষীও রইলো না সেখানে। আমাকে আদর করে পাশে বসালেন তিনি। বললেন, আচ্ছা বাবা এবার বলোতো সত্যি কথাটা কি? আমি জানি তোমার দ্বারা কোন খারাপ কাজ সম্ভব নয়। তোমার চোখ, তোমার চেহারা সে কথা আমাকে বলে দিয়েছে। তোমার একটুও ভয় নেই। আমি বাঁচালে তোমার কোন ক্ষতিই কেউ করতে পারবে না এখানে। সুতরাং নির্ভয়ে বলো। তা সে যত অপ্রিয়ই হোক, আমি শুনতে চাই। আর তোমার সাজার ভয়? সে তো তোমাকে আগেই বলেছি, কোন ভয় নাই। কোন সাজা তোমাকে দেবো না।

আমি কেঁদে ফেললাম, আপনি আমাকে যে সাজাই দিন, কোন কথা না ছুপিয়ে আগাগোড়া সব খুলে বলবো আপনাকে।

তারপর প্রথম মেয়েটির কথা বললাম। সে আমার সঙ্গে যা যা করেছিলো সব বললাম। তার পরে কবে দ্বিতীয় মেয়েটাকে আনলো এবং তার সঙ্গে আমাকে এক খাটে শুতে দিয়ে সে নিচে শুয়ে পড়লো এবং গভীর রাতে খুন করে পালিয়ে গেলো—সবিস্তারে সব বললাম।

আমার কথা শুনতে শুনতে সুবাদার সাহেব মাথাটা নিচু করে রুমালে মুখ ঢাকলেন। ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন অনেকক্ষণ ধরে। আমি আর কী সান্ত্বনা দেবো তাঁকে। চুপ করে বসে রইলাম। রুমালে চোখ মুছে বললেন, সেই প্রথম মেয়েটি আমার বড় কন্যা। ছোটবেলা থেকেই সে খারাপ হয়ে যায়। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। না বলে বাড়ির বাইরে রাত কাটাতো। আমি তাকে নানাভাবে শাসন করেছি, ভয় দেখিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই তাকে ভালো করা গেলো না। শেষে আমার ছোটভাই-এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কাইরোয়। আমার ভাইপোর সঙ্গে শাদী দিয়ে দিলাম। আশা, যদি সে ভালো হয়। কিন্তু নসীব খারাপ, বছর না ঘুরতেই ওর স্বামী মারা গেলো। তখন আর কোন উপায় না দেখে আবার তাকে এখানে—আমার কাছে নিয়ে এলাম।

এখানে আসার পর দেখলাম, আরও খারাপ হয়ে গেছে সে। মিশরে থাকাকালে ওখানকার মেয়েদের সঙ্গে মিশে, তাদের সব খারাপ দোষগুলোই সে বেশ রপ্ত করে ফেলেছিলো। তুমি তো মিশরে ছিলে, নিশ্চয়ই জানো, মিশরের মেয়েদের মতো বদ-চরিত্রের মেয়েমানুষ সারা দুনিয়ার কোথাও নাই। কামনার বিকৃতি তাদের রক্তের কণায় কণায়। নানা ছল চাতুরি দিয়ে ছেলেদের সর্বস্বান্ত করে পথে বসাতে তারা ওস্তাদ। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পারে না এমন কোনও কাজ নাই। দরকার হলে নিজের ছেলেকে খুন করতে পারে। কোনও যুবককে চোখে ধরলে তার আর নিস্তার নাই। সে যতো চরিত্রবান ছেলেই হোক, ছলাকলা দেখিয়ে, যেন-তেন-প্রকারেন, তাকে জাহান্নমে টেনে নামাবেই। মিশরের মেয়েদের সব গুণই সে আয়ত্ত করে ফেলেছিলো।

এখন বুঝতে পারছি মিশর থেকে আসার পর সে তোমাকেই তাক করেছিলো। পর পর চারবার তোমার ঘরে গিয়েছিলো সে। তা যাক, তাতে আমার আর দুঃখ ছিলো না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আর ভালো করা যাবে না নিশ্চিত হয়ে ওকে আমি খরচের খাতায় লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু চিন্তা হলো যখন দেখলাম, আমরা মেজো মেয়েটাকেও সে খারাপের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কড়া শাসনে চোখে চোখে রাখতাম মেজোটাকে। যাতে সে তার দিদির সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করে। কিন্তু আমি নানা কাজের লোক, অন্দরমহলে বসে থাকলে তো আমার চলে না। হরদম সুবা-র কাজে এখানে ওখানে চলে যেতে হয় আমাকে। সেই ফাঁকে বড় মেয়েটা মেজোটাকে নিয়ে এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়ে। তুমি তো বাবা জানো, মেজোর কি কচি বয়স ছিলো। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা স্বভাবতই একটু বেশী কৌতূহলী হয়। নতুন কোন কিছু জানার দিকে, নতুন কোন কিছুর স্বাদ পাওয়ার জন্যে ভীষণ লোভ হয়। দেহে প্রথম যৌবনের জোয়ার আসে। সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। সেই জন্যেই খুব কড়া নজর রাখতে হয় এই সময়। নজর আমার কড়াই ছিলো। কিন্তু বড় মেয়ের কারসাজীর কাছে আমার হার হয়ে গেলো। এই বয়সে কামনার আগুন একবার জ্বালিয়ে দিতে পারলেই হলো। তারপর আর তাকে নিরস্ত করা শক্ত। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে মেজোটাকে নিয়ে সে মাঝে মঝে বাড়ির বাইরে গিয়ে রাত কাটাতো।

একদিন সকালে মহাল থেকে ফিরে এসে শুনলাম মেজো মেয়েটা বাড়ি নাই। বড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললো, কাল বিকেলে ওকে

নিয়ে আমি বাজারে গিয়েছিলাম, দু-একটা মনোহারী জিনিস কিনতে। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে কোথায় সে হারিয়ে গেলো আর খুঁজে পেলাম না আব্বাজান।

প্রথমে ভেবেছিলাম, বড়টা ওকে কোন ছেলের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছে। হয়তো আজই ফিরে আসবে। কিন্তু আমার ধারণা যে ভুল তা আজ তোমার এবং বড়মেয়ের কথা থেকে জানতে পারলাম। সেদিন বিকেলে সে তাকে সঙ্গে করে তোমার বাসায় গিয়ে উঠেছিলো। বরাবরই লক্ষ্য করেছি, মেজোর অসাধারণ রূপ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। সে নিজেও কিছু কম সুন্দরী না, কিন্তু মেজোর মতো অতোটা না। ওর সামনে যদি মেজো মেয়ের রূপের প্রশংসা করতো কেউ, তার ওপর ক্ষেপে লাল হয়ে উঠতো। অথচ মেজোকে ছেড়েও থাকতো না সে। সারা দিন রাত তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া গল্পগুজব করতো। মনে হতো, ওরা যেন বোন নয়—দুই সখী।

তোমার বাসাতে অযাচিত ভাবে তাকে নিয়ে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য ছিলো। হত্যা করা। মেজোর রূপ সে সহ্য করতে না পেরে আগে থেকেই মতলব এঁটে রেখেছিলো—কিভাবে কোথায় তাকে খুন করবে। আজ যখন মেজো মেয়ের হাঁসুলী হারটা তাকে দেখালাম, তখন সে সব কথা কবুল করেছে আমার কাছে। তোমার মুখ থেকে শুনে বুঝলাম, সে যা বলেছে সবই ঠিক।

তাকে আর ফিরে পাবো না, বাবা। সারা জীবন শোকের আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হবো আমি। আর বাবা, তোমার কি দুর্ভাগ্য দেখো, বিনা দোষে তোমার হাতখানা কাটা গেলো। তাও তো আর ফেরৎ হবে না। এই-ই হয়। নিয়তির লেখা কেউ খণ্ডন করতে পারে না। তাই বলছি, মনে কোন ক্ষোভ রেখো না, বাবা। আবার নতুন করে জীবন শুরু করো।

আমি বললাম, কিন্তু এই কাটা হাত নিয়ে আমি দেশে ফিরবো কী করে? লোকে তো বিশ্বাস করবে না আমার কথা। আমি দেশে যেতে পারবো না।

আমিও তোমাকে এখানেই ধরে রাখতে চাই, বাবা। আমার তিন মেয়ে। কোন ছেলে নাই। তুমি আমার ছোট মেয়েকে শাদী করে আমার কাছেই থাকো। আমার ছেলের অভাব পূরণ করো। রূপে সে মেজো মেয়ের চেয়েও সুন্দরী। আর গুণে সে সকলের সেরা। অমন মেয়ে লাখে একটা মেলে।

আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। বললাম, আপনি যা বলবেন তাই করবো। শুধু একটা কথা, খবর পেলাম, মসুলে আমার বাবা গত হয়েছেন। আমরা পাওনা বিষয় সম্পত্তিগুলো সব বেচে দিতে চাই।

তিনি বললেন, আজই আমি আমার লোকজন সঙ্গে দিয়ে একজন বড় আবসার পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখানে। তোমার যা ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝে সে নিয়ে আসবে। তোমাকে কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না।

এর পর সুবাদার সাহেবের ছোট মেয়েকে শাদী করে বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছি। আমার বিবি বড় ভালো মেয়ে। জান দিয়ে ভালোবাসে আমাকে। আর সুবাদার সাহেব—আমার শ্বশুর যে কি চোখে দেখে আমাকে সে তো আপনি এই ক'দিনে ভালো করেই জেনেছেন।

ইহুদী হেকিম বলতে থাকে, যুবকের কাহিনী আমি অবাক বিস্ময়ে শুনছিলাম এতক্ষণ। এবার বললাম, যেভাবে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছো তা সত্যিই রোমাঞ্চকর। তবে সবই সম্ভব হয়েছে সুবাদার সাহেবের মতো এমন ভালো মানুষের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ঘটেছিলো বলে।

জামাতার অসুখ সেরে গেলে সুবাদার সাহেব খুশী হয়ে আমাকে প্রচুর অর্থ এবং নানা শৌখিন জিনিসপত্র উপহার দিলেন।

হাতে অনেক টাকা পয়সা এসে গেলো। দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। দুনিয়ার নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে জাঁহাপনা, আপনার সলতানিয়তে এসে বড় ভালো লেগেছে। তাই এখানে একখানা বাসা ভাড়া করে বসবাস করছি। হঠাৎ কাল রাতে এই কাণ্ড। কে বা কারা এই কুঁজোটার লাশ আমার বাসায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলো। তার পরের ঘটনা তো আপনার সবই জানা, হুজুর।

চীনের সুলতান তখন মাথা দুলিয়ে বললো, হুঁ, তোমার গল্পটা মন্দ নয়। কিন্তু কুঁজোর মরার ঘটনার চেয়ে অবাক করার মতো কিছু না। নাঃ, তোমাদের কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। ফাঁসী তোমাদের দেবোই।

এই সময় সেই দর্জি এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানালো। দুনিয়ার মালিক জাঁহাপনা, আমি আপনাকে আমার কাহিনী শোনাতে চাই। আপনি মেহেরবানী করে একটু ধৈর্য করে শুনবেন এই আমার আর্জি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমার আগের তিনজন কেন, সারা জিন্দেগীভর যতো কাহিনী কিস্‌সা এতাবৎকাল আপনি শুনেছেন, সে-সবের চেয়ে সেরা, মজাদার এবং সবচেয়ে অবাক করার মতো আমার এই কাহিনী।

সুলতান মাথা দুলিয়ে বললেন, ঠিক আছে, এতো করে যখন বলছো, শুনবো তোমার কাহিনী। যদি সত্যিই ভালো লাগে, যদি সত্যিই অবাক হই, তবে তোমাদের চারজনকেই বেকসুর খালাস করে দেবো। আর যদি তা না হয়, তবে কারো রক্ষা নাই। মনে রেখো, ফাঁসীতে ঝুলাবো।

দর্জি তার কাহিনী শুরু করে ঃ

আপনি মেহেরবান, সারা দুনিয়ার বাদশাহ, আমার কাহিনী পেশ করছি, অনুগ্রহ করে ধৈর্য ধরে শুনে আমাকে কৃতার্থ করুন ঃ

এই হতভাগ্য কুঁজোর মৃত্যুর আগে আমি এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে শহরের অনেক গণ্যমান্য এবং আমার মতো অতি সাধারণ মানুষের সমাগম হয়েছিলো। যেমন—দর্জি, নাপিত, ধোপা, ছুতোর, মুচি, মুর্দাফরাস এবং আরও অনেক জাতের লোক।

একটা বিরাট বাড়ির প্রকাণ্ড মহলে আয়োজন করা হয়েছিলো এই উৎসবের। সকাল হতে না হতেই আমন্ত্রিতরা এসে জড়ো হতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো সমস্ত কক্ষ। কিন্তু উৎসবের আসল হোতা গৃহস্বামী তখনও অনুপস্থিত। আমরা সবাই তার প্রতীক্ষায় বসে আছি। এমন সময় এক প্রিয়দর্শন তরুণকে সঙ্গে করে গৃহস্বামী প্রবেশ করলো। তরুণের সাজ ফিটফাট কেতাদুরস্ত। দেখে মনে হয় বাগদাদবাসী। অন্তত তার সাজপোশাকের ধরন আর বাহার দেখে তাই মনে হয়।

আসরে ঢুকেই বাগদাদী কায়দায় সালাম জানালো সবাইকে। আমরাও জানালাম আলেকুম সালাম। দেখতে সে সুঠাম সুন্দর সুপুরুষ, কিন্তু আহা, একটা পা খোঁড়া।

সবাইকে সালাম জানিয়ে খুশি খুশি ভাব নিয়ে এসে বসলো আমাদের পাশে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কি জানি কি হলো, সারা মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এলো তার। এবং ঘর

থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে আমরা তাকে আটকালাম। কী ব্যাপার, কিছুই তখন বুঝতে পারছি না। গৃহস্বামী বললেন, কিন্তু কী আমার ত্রুটি হলো, এভাবে চলে যাবে কেন, বাবা, খুলে বলো, না হলে বুঝবো কী করে?

আজ আপনার নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এমন একজন এখানে উপস্থিত আছে যাকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। আল্লাহর নামে দিব্যি করেছি, জীবনে তার আর মুখদর্শন করবো না, এক সঙ্গে বসবো না বা এক সঙ্গে খানাপিনা করবো না। সেই জন্যে আমি নীরবে আসর ত্যাগ করে চলে যেতে চাই। আপনার অভ্যাগত আমন্ত্রিতরা কেউ আহত অপমানিত হোক, তা আমি চাই না। এই কারণে তার নামও আপনাদের বলতে চাই না।

গৃহস্বামী বললো, কিন্তু তুমি আমাদের আজ এক মুসাফীর মেহমান, যে কারণেই হোক, তোমাকে আমরা এইভাবে চলে যেতে দিতে পারি না। যতো অপ্রিয় হোক, সব কথা খুলে বলো। আমরা শুনবো। কে সেই লোক, তাকে দেখাও; কেনই বা তোমার এতো গুস্‌সা?

তখন সেই তরুণ এক নাপিতকে দেখিয়ে বললো, এই লোকটার জন্যে আমি ল্যাংড়া হয়েছি। এর জন্যে আমি দেশত্যাগী হয়ে এই সুদূর চীন দেশে চলে এসেছি। একটা উদ্দেশ্য তার আর মুখ-দর্শন করবো না জীবনে। সে আমার জীবনের এক ধূমকেতু—অভিশাপ। আল্লার নামে দিব্যি করেছি, তার সঙ্গে একসাথে বসবো না, একসাথে খানা-পিনা করবো না। কিন্তু এমনই আমার মন্দভাগ্য এই দূর প্রবাসে এসেও তাকে এড়াতে পারলাম না। আমার আগেই সে এখানে এসে হাজির।

এই কথা শুনে সেই নাপিতের মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেলো। মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে রইলো। কোনও প্রতিবাদ করতে পারলো না।

আমরা সবাই সেই তরুণকে চেপে ধরলাম। শোনাতে হবে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। আমরা শুনতে চাই।

তখন সেই খোঁড়া তরুণ তার কাহিনী শুরু করলো ঃ

আপনারা শুনে হয়তো খুশি হবেন, আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার বাবা বাগদাদের সেরা এক সওদাগর ছিলেন। অর্থের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও আচার বিনয় বিদ্যা সব গুণেরই অধিকারী ছিলেন তিনি। এবং আমিও তার কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলাম। আমার শিক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়ার পরই তিনি দেহ রাখলেন। এবং আমি একাই তার বিশাল বিষয় সম্পত্তির মালিক হলাম।

তখন থেকে খানাপিনা শখ-শৌখিনতা আমার বেড়ে গেলো। দামী দামী সাজপোশাকে সেজে থাকতাম। ভালো ভালো খানা খেতাম। মোট কথা বিলাসিতার ত্রুটি ছিলো না কিছুই। কিন্তু একটা ব্যাপার ছাড়া। কোন মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াতাম না আমি। কেন জানি না, মেয়েছেলে দেখলেই আমার গা রি রি করে উঠতো।

একদিন পথ দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম, এক দঙ্গল মেয়ে আসছে। ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের এক অন্ধ গলিতে ঢুকে পড়ি। একটা বাড়ির রোয়াকে বসে তাদের পার হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বসে আছি, হঠাৎ আমার সামনের বাড়ির দোতলার একটা জানলা খুলে গেলো। একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে দেখলাম। জানলার কার্নিশের ওপরে রাখা ফুলগাছের টবে জল দিতে লাগলো সে। অসাধারণ তার রূপ আর যৌবন। অমন রূপ আমি আগে কখনও দেখিনি। নারী সম্পর্কে এত বিরূপতা নিমেষে উধাও হয়ে গেলো। প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেললাম তাকে। মেয়েটি যতক্ষণ জানলার পাশে ছিলো অপলক ভাবে শুধু দেখতে থাকলাম তাকে। মেয়েটি কিন্তু আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফুলের গাছে জল দিতে থাকলো। একটু পরে জল দেওয়া শেষ হলে আবার জানলাটা বন্ধ করে দিলো। আমি কিন্তু বসেই রইলাম। আবার যদি খোলে। তাহলে আবার দেখতে পাবো তাকে। কিন্তু না, সন্ধ্যা অবধি বসে রইলাম। আর খুললো না। বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এলাম। বুকের মধ্যে কেমন হুহু করে যেতে লাগলো। যতই মনকে শান্ত নিরস্ত করতে চেষ্টা করি ততই আরো বেশী করে তার কথা মনে পড়ে। তার রূপ, তার যৌবন আমাকে আকর্ষণ করতে থাকে।

দিন যায় রাত্রি আসে। না পাওয়ার বেদনা বাড়তেই থাকে। শেষে এমন হলো, যদি না তাকে পাই, আমার জিন্দগীই বরবাদ হয়ে যাবে। খেতে পারি না, ঘুমুতে পারি না। এ কি যন্ত্রণা! শুধু ভাবি তার কথা অহরহ। সব কাজকর্ম ডকে উঠলো। তা উঠুক। কোন দিকে তখন আমার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমি আবার যাই ঐ বাড়ির সামনে। রোয়াকে গিয়ে বসে থাকি। কিন্তু জানলা আর খোলে না সে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই। শুধু একবার জানলাটা সে খুলুক। দেখে নয়ন সার্থক করে চলে যাই। কিন্তু না, জানলা আর খোলে না। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, দেখলাম খচ্চরের পিঠে চেপে সুলতানের কাজী নফরচাকর পরিহত হয়ে এসে ঐ বাড়ির দরজায় নামলো। দরজাটা খুলে গেলো। সবাই ঢুকে গেলো ভিতরে। তারপর আবার বন্ধ হয়ে গেলো দরজা। বুঝলাম বাড়িটা কাজী সাহেবের।

আর অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। ঘরে ফিরে এসে শয্যা নিলাম। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিলাম। মানসীর চিন্তায় শুকিয়ে যেতে লাগলো শরীর। আমার নফরচাকর দাসদাসী চিন্তিত হয়ে পড়লো। আমার কোন কঠিন অসুখ করেছে ভেবে বড় হেকিমকে ডেকে আনবে কিনা জানতে চাইলো। আমি তাদের বারণ করলাম, আমার কোন অসুখ করেনি। এ অসুখ কোন হেকিম কবিরাজ সারাতে পারবে না।

একদিন আমি বিছানায় শুয়ে আছি, এক বৃদ্ধা মহিলা এলো আমার ঘরে। চোখের জল মুছতে মুছতে বললো, বাবা, তোমার শরীর যে দিনদিন হাড়্ডিসার হয়ে যাচ্ছে। পুরুষ মানুষ, এভাবে নেতিয়ে পড়ে থাকলে তো মরে যাবে। ওঠ। খাও দাও, মৌজ করো। দেখো, মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে।

প্রতিদিনই আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শী অনেকেই আমাকে দেখতে আসে। অনেকেই অনেক জ্ঞান দিয়ে যায়। সব শুনি। কিন্তু কিছুই কানে ঢোকে না। ভাবলাম এও সেই রকমই সমবেদনা জানাতে এসেছে। কিন্তু না, বৃদ্ধা এসেছিলো অন্য উদ্দেশ্যে। ঘর থেকে অন্য সবাই বিদায় নিলে সে আরও একটু এগিয়ে এলো আমার কাছে। গলাটা খাটো করে বললো, তোমার অসুখটা কি জানি বাবা। তা সব খুলে বলো দিকিনি, আমি কি করতে পারি, দেখবো।

আমি তাকে সব কথাই বললাম। বৃদ্ধা বললো, কিন্তু মুসকিল হচ্ছে, মেয়েটার বাবা হচ্ছে বাগদাদের কাজী। ভীষণ রাশভারী লোক। যাই হোক, মেয়ে আর বাবা এক বাড়িতে থাকলেও আলাদা মঞ্জিলে, আলাদা মহলে বাস করে। কাজী থাকে নিচতলায়, আর মেয়ে থাকে ওপরে। যদিও মেয়ের মহলে কোন নফরচাকর বা কেউই যেতে পারে না, একাই থাকে, তবু বাড়ির পাহারা চৌকির এমন কড়া বন্দোবস্ত একটা মাছি ঢুকতে পারবে না। যাই হোক, বাবা, তুমি কিছু ভেবো না। উপায় আমি একটা বের করবোই। ওঠ, নাওয়া খাওয়া করো। তুমি না পুরুষ মানুষ।

বৃদ্ধার কথায় বুকে বল পাই, আশা হয়, হয়তো সে কোন ব্যবস্থা করে দেবে। খুশি মনে উঠে পড়ি। খাওয়াদাওয়া কাজ কামে মন দিই। বাড়ির সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

পরদিন বৃদ্ধা আবার আসে। আমি ভাবি কোন সুখবর আছে। কিন্তু তার মুখ দেখে সে আশা নিভে যায়, বৃদ্ধা বলে, বাবা, আমি পারলাম না। মেয়েটি আমাকে অনেক গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলো। তার কাছে প্রস্তাব রাখতেই সাপের মতো ফুঁসে উঠলো সে। বললো, এক্ষুণি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। তোমার মতো শয়তান মেয়েছেলের সঙ্গে আমি আর একটাও কথা বলতে চাই না। তুমি আমাকে খারাপ পথে নামাতে চাও। তোমাকে এমন শাস্তি দেবো জীবনে ভুলতে পারবে না।

আমি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াই নি। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু আমিও দমবার পাত্রী নই। যেমন করে হোক রাজি তাকে করাবোই, বাবা।

বৃদ্ধার এই নিরাশ কথা শুনে আমি আবার শয্যা নিলাম। নাওয়াখাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো।

দিনকয়েক বাদে আবার এলো সেই বৃদ্ধা। এবারে সে খুশিতে ডগমগ। বললো, কই গো বাছা, আগে মেঠাই মণ্ডা নিয়ে এসো। তারপর সুখবর দেবো।

আমি বললাম, তা দাদী কত মেঠাই খেতে পারো? যত পারো খাওয়াবো। শুধু খাবে কেন, যা খুশি চাও দেবো।

বৃদ্ধা বলে, গতকাল আবার গিয়েছিলাম বাবা। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তার কাছে গিয়ে বললাম, বাছা, তোমার জন্যে আমার জানের কলিজা, আমার চোখের মণিকে হারাবো। সে আর বাঁচবে না।

আমার কথায় মেয়েটি আঁৎকে উঠলো, কেন কি হয়েছে দাদী। আমার জন্যে বাঁচবে না কেন? আমি তার কি ক্ষতি করেছি?

—তুমি তো সজ্ঞানে কিছু কর নি, বাছা। তোমার এই আগুনের মতো রূপ যৌবন দেখে পাগল হয়ে গেছে ছেলে। নাওয়াখাওয়া বন্ধ করেছে। হাড় জিরজিরে হয়ে গেছে শরীর। তা আর বেশী দিন বাঁচবে না। হেকিম কবরেজ এ রোগ সারাতে পারবে না—একমাত্র তুমিই পারো তার মুখে হাসি ফোটাতে।

বুঝলাম কাজ হলো। মেয়েটির চোখে মুখে আশঙ্কা ভয়ের ছাপ ফুঠে উঠলো। কিন্তু ছেলেটি কে? তাকে কি আমি চিনি? দেখেছি কখনও?

সে আমার নিজের ছেলে না হলেও তার বাড়া। তার কষ্ট দেখে আমার পাঁজর ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে সে তোমাকে দেখে গেছে। তুমি জানলা খুলে ফুলের গাছে জল দিচ্ছিলে, তখন সে তোমাদের সামনের বাড়ির রোয়াকে বসে তোমাকে দেখেছিলো। আর সেই থেকেই তোমার প্রেমে পাগল। ক'দিন আগে তোমার কাছে এই জন্যেই এসেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথা ভালো করে না শুনেই তাড়িয়ে দিলে। সেই কথা শোনার পর থেকে বাছা আমার আরও কাহিল হয়ে পড়েছে। এখন এমন অবস্থা, বাঁচানো দায়। যদি বাঁচে তোমার দয়াতে বাঁচতে পারে। আর না হলে আল্লাহ ভরসা।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেলো মেয়েটির। বললো, আমার—আ-মা-র জন্যে সে আজ মৃত্যু শয্যায়?

—তা ছাড়া আর কী বলবো? এখন যদি তোমার দয়া হয়—সে বাঁচতে পারে। ভেবে দেখো, যা বলতে চাও বলো। আমি গিয়ে তাকে বলবো।

—তুমি আর দেরি করো না দাদী। শিগ্গির গিয়ে তাকে খবর জানাও, আমি তার ব্যথায় সমব্যথী। কাল জুম্মাবার। নামাজের পরে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকবো আমি। সে যেন

ঐ সময় অবশ্যই আসে। আমার বাড়ির আমার ঘরের দরজা খোলা থাকবে। ঘণ্টাখানেক তার সঙ্গে কাটাতে পারবো। কিন্তু তাকে বলে দিও, তার বেশী দেরি যেনো সে না করে। তা হলে আব্বাজান নামাজ সেরে এসে পড়বে।

বৃদ্ধার কথা শুনে লাফিয়ে উঠি আমি। সব শোক দুঃখ উবে যায় মুহূর্তে। আনন্দের চোটে মোহরে-ভর্তি আমার বটুয়া সুদ্ধ ধরে দিই তার হাতে। এমন সুখবর যে এনেছে তাকে আমার না দেওয়ার কী আছে?

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন উল্লসিত হলো আমার মুখে হাসি দেখে। খানাপিনা হৈ হল্লায় সারা বাড়ি আবার সরগরম হয়ে উঠলো।

সারাটা রাত অধীর আগ্রহে কাটালাম। কখন সকালে হবে। কখন নামাজের সময় আসবে—শুধু সেই চিন্তা। সকালবেলায়ই সেজেগুজে বসে রইলাম। বৃদ্ধা আবার এলো।—রাতে ঘুম হয়েছিলো, বাবা? শরীর ভালো আছে?

আমি বললাম ঘুম আর কী করে আসে। তবে শরীর মন বেশ ভালো আছে।

বৃদ্ধা বললো, এক কাজ করো, হামামে গিয়ে আচ্ছা করে গোসল করো। সাবান দিয়ে হাতমুখ সাফা করে নাও। দেখো, সুরৎ আরও চেকনাই হবে। এখনও অনেক সময় আছে।

আমি ভাবলাম, তাই তো! এতদিন নাওয়া খাওয়া করিনি। চেহারাটা কালি পড়ে আছে। এইভাবে কি অভিসারে যায় কেউ? নফরকে ডেকে বললাম, একটা নাপিত ডেকে নিয়ে আয়, ভালো করে কামিয়ে তারপর হামামে ঢুকবো। দেখিস যাকে তাকে ধরে আনিস নি। এমন নাপিত আনবি যে ভালো করে চুল ছাটতে জানে। দেখে যেনো কেউ হাসি মজাক না করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমার নফর একটা নাপিত ডেকে আনলো। আপনারা, এখন ঐ যে লোকটা দেখছেন, এ সেই নাপিত—আমার জীবনের অভিশাপ।

ঘরে ঢুকেই সে আমাকে সালাম জানালো। আমিও জানালাম। তবে সে বললো, আল্লাহ আপনার সকল দুঃখ শোক কাটিয়ে দেবেন। আপনি আবার খুশিতে মেতে উঠবেন। আল্লাহ আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

আমি বললাম, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

নাপিতটা বলতে লাগলো, মালিক, আপনার জন্যে মস্ত একটা সুখবর এনেছি, দারুণ সুখবর। আর শুধু সুখবরই বা বলি কেন আপনার শরীর স্বাস্থ্য মন মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠবে এমন দাওয়াই। আপনি তো জানেন মালিক, আল্লাহর পয়গম্বর ইবন-আব্বাস বলে গেছেন, প্রতি জুম্মাবার নামাজের আগে যে ব্যক্তি ক্ষৌরকর্ম করে সারাটা সপ্তাহ তার খুব ভালোভাবে কাটে। সত্তরটা নানা ধরনের বিপদ-আপদ কাটাতে তার বেগ পেতে হয় না। তবে এও তিনি বলে গেছেন, জুম্মাবারে যে ব্যক্তির রক্তপাত হয়, নানারকম দুর্ঘটনা দুর্বিপাকে পড়ে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে।

আমি বিরক্ত হই। সক্কালবেলা জ্ঞান দিতে লাগলো লোকটা। এখন কী এসব ভালো লাগে আমার। বললাম, ওহে নাপিত কুলপতি এবার তোমার বচন থামাও। আমার মাথাটা এগিয়ে দিচ্ছি। একটু অনুগ্রহ করে ভালো ভাবে চুলটা ছেঁটে দাও। আমার তাড়া আছে, একটু জলদি করো।

নাপিতটা উঠে দাঁড়ালো। একটা কাপড়ে বাঁধা যন্ত্রপাতির বাণ্ডিল খুলে ধরলো। ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, শান, জলের খুরি, বুরুশ, সাবান ইত্যাদি। আমি ভাবলাম ও বুঝি ক্ষুর কাঁচি বের করছে। কিন্তু না ক্ষুরের বদলে বের করলো একখানা জ্যোতিষ দর্পণ। অদ্ভুত ধরনের দেখতে

সাতমুখওলা একখানা আর্শি। ঘর ছেড়ে প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ালো। মাথার উপরে জ্যোতিষ দর্পণখানা তুলে সূর্যরশ্মির প্রতিফলন করে করে কি সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করলো। তারপর এসে বললো শুনুন, আজ হিজরী সন সাতশো তেষট্টি সালের দশই শকর শুক্রবার। আজকের দিনে যে যে কামনা-বাসনা করে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবে, সব মনোস্কামনা পূর্ণ করবেন তিনি। জ্যোতিষ শাস্ত্র আমার নখদর্পণে। মঙ্গল আর বৃহস্পতি একঘরে এসেছেন আজ। এখন সাতটা ছয় মিনিট। এই সময় ক্ষৌরকর্ম-এর পক্ষে উত্তম। শুধু বিধি সম্মতই না, এই সময়ে যে ব্যক্তি ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করে তার বহুদিন-আকাঙ্ক্ষিত অভীষ্ট অচিরে সিদ্ধ হয়। জ্যোতিষ গণনায় আমি দেখতে পাচ্ছি, আজ আপনি কোন প্রিয়া-সন্নিধানে যাবার উদ্যোগ করছেন। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য, এই অভিসার আপনার পক্ষে ভালোও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। সেই রূপসীর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার পর কী কী ঘটনা ঘটবে আমি তা জানি, কিন্তু সে-সব কথা বলা আমার গুরুর বারণ আছে। তাতে আমার বিদ্যার অহঙ্কার প্রকাশ পাবে। সুতরাং ও ব্যাপারে এখন কিছু বলবো না।

আমি অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠি, দোহাই তোমার, একটুখানি চুপ কর। আমি তোমার বকবকানি শুনতে ডাকিনি। এখন দয়া করে চুলটা ছাঁটবে? আর একটাও বাণী ছাড়বে না। নাও, এসো।

নাপিতটা আহত হলো। আমার মাথার পাশে এগিয়ে এসে বললো, আপনার যেমন অভিরুচি তাই হবে মালিক। তবে একথা জেনে রাখুন, হুজুর, যদিও চুলদাড়ি কাটাই আমার পেশা এবং জাতেও আমি নাপিত, তবু জানবেন শুধু একটা নাপিতই আমি নই। জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার অগাধ পড়াশুনা আছে। এমন কোষ্ঠী বিচার করে দেবো, এমন নিখুঁতভাবে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে দেবো তাজ্জব হয়ে যাবেন আপনি। কতদূর দেশ থেকে আমার কাছে লোক আসে। আমাকে হাত দেখায়। কোষ্ঠী-বিচার করায়। আর শুধু জ্যোতিষ কেন, আমার মতো কবরেজ ক'টা আছে এই বাগদাদ শহরে। কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি আমি সারিয়ে দিই ধন্বন্তরী গাছগাছড়ার জড়িবড়ি দিয়ে। আর কাটা-ছেঁড়াতেই বা আমার জুড়ি কোথায়, কে আছে? এছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল সাহিত্য কি না জানি আমি। সব বিদ্যা আহরণ করা হয়ে গেছে আমার। সেরা সেরা কাব্য গাঁথা আমর সব কণ্ঠস্থ। আমি আপনাকে কতকগুলো ভবিষ্যৎবাণী করে দেবো তার সবগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে। আমার গণনাও কখনও ভুল হয়নি। কখনও ভুল হয় না। আপনি আপনার একখানা ঠিকুজি কুষ্ঠী বানিয়ে নিন। তাতে আমি লিখে দেবো আপনার ভাগ্যলিপি। আপনি মিলিয়ে নেবেন অক্ষরে অক্ষরে। আমি আপনার ভালোর জন্যই বলছি, মালিক। আপনি ভাববেন না আমার অন্য কোন মতলব আছে। আমি আপনার কাছে কোন টাকা পয়সা চাই না শুধু চাই আপনি ঠিক পথে চালিত হোন। আপনার কল্যাণ হোক। আপনার বিপদ আপদ যাতে কেটে যায় সে জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে আপনাকে সৎ পরামর্শ দিতে চাই। যদি ইচ্ছা করেন সারা বছর ধরে আপনার কাছে প্রতিদিন এসে আপনার প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্মর বিধান দিয়ে যেতে পারি। থাক, আর বেশী বাক্য ব্যয় করবো না। এবার আপনার ক্ষৌর কর্ম সম্পাদন করে দিচ্ছি। আপনি যদি চান প্রত্যহ এসে আপনার ক্ষৌরকর্মও

আমি করে দিয়ে যাবো। ভাববেন না কোন পারিশ্রমিক-এর লোভে একথা বলছি। একটা কানাকড়িও নেবো না এজন্যে।

এবার আমি আর ধৈর্য রাখতে পারি না।—তুমি কি আমাকে পাগল করে দেবে? মনে হচ্ছে তোমার ক্ষুরটা দিয়ে তোমার গলাটা আমি কেটে নামিয়ে দিই। হায় আল্লাহ, একি ফেরে পড়লাম আমি।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখলো, প্রভাত সমাসন্ন।

গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

ঊনত্রিশতম রজনী।

শাহরাজাদ কাহিনী শুরু করে ঃ

তারপর শুনুন জাঁহাপনা, সেই তরুণ খোঁড়া যখন নাপিতের বক্তৃতায় অধৈর্য হয়ে তাকে বললো, ক্ষুরটা দিয়ে তোমার গলাটা নামিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। নাপিত তখন বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললো, আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন, মালিক। কিন্তু একটা জায়গায় আপনি মস্ত ভুল করছেন। আপনার ধারণা আমি অহেতুক বেশী কথা বলি, কিন্তু মোটেও তা ঠিক না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথা আমার মুখ থেকে বেরুবে না। এজন্যে অনেকেই আমাকে মৌনমানুষ বলে বিদ্রূপ করেন। আমার আরও ছটি ভাই আছে। একবার যদি তাদের পাল্লায় পড়েন আপনি, প্রাণ আপনার অতিষ্ঠ করে তুলবে। তাদের সবারই গুণের কথা আমি এক এক করে বলছি। বড়জনের নাম অল-বাকবুক—মানে ভরা কলসী থেকে জল ঢালার সময় যে শব্দ হয়। দ্বিতীয় জনের নাম অল-হাদ্‌দার অর্থাৎ উটের আওয়াজ। আর তৃতীয় জনের নাম বক্‌বক্—কথাটার অর্থ—মোরগের ডাক। চতুর্থ জন অল-কুজ-যুসবান—মানে কলসী ঠোকার শব্দ। পঞ্চম জনের নাম অল-আসার—তার মানে উট পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। আর ষষ্ঠ জনের নাম সাক-কাসিক—তার অর্থ হলো, গুগুলি ফাটানোর শব্দ। আর সপ্তম ব্যক্তির নাম সামিত—তার মানে হলো, মৌনব্রতী—এই অধম।

নাপিতের এই নতুন বক্তৃতা শুনতে শুনতে সারা শরীর গুলিয়ে গেলো আমার। আমি চিৎকার করে উঠলাম, এই, কে আছিস, এই নাপিতটাকে একটা সিকি দিনার দিয়ে এখান থেকে বিদেয় কর। আমি আর এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারছি না। আমার চুল ছাঁটার সাধ মিটে গেছে।

আমার কথা শুনে নাপিত বললো, মালিক, আপনার হয়তো ধারণা হচ্ছে আমি খুব অবান্তর কথাবার্তা বলে চলেছি। কিন্তু আদৌ তা ঠিক না। আমি নিজে তো বলিই না, অন্যে কেউ বললে তা সহ্যও করতে পারি না। আপনি গোড়াতেই মস্ত ভুল করেছেন। আপনার এখানে এসেছি আমি এক গভীর উদ্দেশ্যে নিয়ে। মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্যে। কোন অর্থের লোভে আসিনি। আমার দ্বারা আপনার যদি কোন উপকার হয়, নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। তাই বলে তার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করবো—সে আমি ভাবতেও পারি না। ছিঃ ছিঃ! আমি যখন আপনার কোন কাজেই আসিনি, তখন পারিশ্রমিক নেবো কিসের জন্যে? আপনি ভাবতে পারলেন কি করে সে কথা? এহেন অবস্থায় আপনার কাছ থেকে একটা কানাকড়িও যদি গ্রহণ করি মহাপাতকের কাজ হবে আমার পক্ষে। আল্লাহর দরবারে গিয়ে কী জবাবদিহি করবো আমি? না না, আপনি আমাকে কোনও পয়সাকড়ি নিতে হুকুম করবেন না। আমি ভেবে দুঃখ পাচ্ছি, আপনি আমার কদর বুঝতে পারলেন না। কিন্তু আপনি আমার মূল্য বুঝতে পারলেন না বলে আমিও যে আপনার মূল্যায়ন করতে পারবো না তা তো ঠিক না। আমি জানি, আপনি আপনার পিতার উপযুক্ত পুত্র। আপনার পিতার মতো উদার মহৎ ব্যক্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। তার মহত্বের কথা

যখন ভাবি, চোখে জল আটকে রাখতে পারি না। আহা, তিনি আমাকে কতো না স্নেহ করতেন! তিনি ছিলেন সত্যিকারের গুণী ব্যক্তি। গুণের কদর বুঝতেন। তার মতো বোদ্ধা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমার প্রকৃত মূল্য। একদিন তার কাছে এসে দেখি, দেশ-বিদেশের বহু আদর্শ ব্যক্তি তাকে ঘিরে আছেন। কিন্তু আমাকে দেখামাত্র সবাইকে ছেড়ে দিয়ে পাশে ডেকে বসালেন। বললেন, 'আমার বাঁ হাতে একটা ফোড়া উঠেছে। তা থেকে আজ আমার কিছু রক্তপাত ঘটেছে। দেখো তো হে, জ্যোতিষ, কোন অমঙ্গল হবে কিনা! তার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্যোতিষ দর্পণ বের করলাম। সূর্যের উচ্চতা মেপে দেখলাম। এবং গণনা করে জানতে পারলাম সে দিনে সেই সময়ে রক্তপাতে দারুণ অমঙ্গলের আশঙ্কা। মারাত্মক কোন বিপদের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক, আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি আপনার গ্রহ-শান্তি করে দেবো। আজ বেলা বারোটা বত্রিশ মিনিট একুশ সেকেণ্ড গতে আপনার ফোড়া কাটার প্রশস্ত সময়। ওই সময়ে কেটে পুঁজরক্ত সব বের করে দাওয়াই লাগিয়ে দেবো। আপনি নিরাময় হয়ে উঠবেন। তারপর উপযুক্ত সময় সমাগত হলে আল্লাহর নাম করে ফোড়াটায় ছুরি বসালাম। আমার অব্যর্থ অস্ত্রোপচারে ফোড়া সেরে গেলো। আপনার পিতা মহাখুশি হয়ে আমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন।

নাপিতটা যখন তার নিজের গুণ-কীর্তনে খৈ ফোটাচ্ছে আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না।—আমার বাবা আজ স্বর্গে গেছেন, তার মতো নিরাহঙ্কার নিরীহ বোকা-সোকা মানুষকে তুমি যে কি ভাবে জগ দিয়েছো তা বুঝতেই পারছি।

নাপিত বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে একটু করুণার হাসি হাসলো।—গেছে, এক্কেবারে গেছে। এই কাম-জ্বরে আপনার মাথার ইসকুরুপগুলো সব ঢিলে হয়ে গেছে, মালিক। আপনার কথাবার্তা কেমন সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। তা আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেবো। খোদার আশীর্বাদে সব বিদ্যা আমার নখদর্পণে। এখন শুধু একটা কথা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। স্বয়ং আল্লাহর বাণী। পবিত্র ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে ঃ 'অন্যের দোষ ক্ষমা করে, যে নিজের ক্রোধ সংযত রাখে, আল্লাহ তার সহায় থাকেন।' আল্লাহর এই বাণী প্রত্যেক নামাজের পর একশো আটবার জপ করবেন। দেখবেন, আপনার দিব্যজ্ঞান লাভ হবে। আপনি আমাকে যে সব কটূবাক্য বলেছেন সে জন্য আমার কাছে কোন ক্ষমা চাওয়ার দরকার নাই। কারণ, আমি নিজগুণে ওগুলো তখনই ভুলে গেছি। এ কান দিয়ে শুনে ওকান দিয়ে বের করে দিয়েছি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে একটু অসুবিধে হচ্ছে, মালিক। আজ আপনি এতো অধৈর্য উতলা হয়ে পড়েছেন কেন? এতো আপনার স্বভাবজাত নয়! আপনি জেনে রাখুন, আপনার প্রাজ্ঞ পিতা আমার উপদেশ ছাড়া কোন নতুন কাজে হাত দিতেন না। 'যে ব্যক্তি গুণীজনের উপদেশ গ্রহণ করে, তার কখনও কোনও বিপদ হয় না।'—খোদার এই বাণী সব সময় জপ-মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করবেন। দুনিয়াতে উপদেশ দেওয়ার লোকের অভাব নাই। কিন্তু উপদেশ দেবার যোগ্যতা ক'জনের আছে? আমি তো সারা দেশ ঢুঁড়ে একমাত্র আমাকে ছাড়া আর কোন যোগ্য ব্যক্তি পাইনি। এর অবশ্য কারণ আছে—আমার মতো সবজান্তা পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ মানুষ তো আর ঝুড়ি ঝুড়ি মেলে না। লাখে একটা—তাও দেখা যায় না। যাই হোক, আর কথা বাড়াবো না, বুঝতে পারছি, আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। এখুনি আপনি চিৎকার করে উঠবেন। কিন্তু আমাকে দেখুন, আমার কোন বিকার নাই। আমার ধৈর্য অসীম। আল্লাহ এই জিনিসটা আমাকে দরাজ হাতে ঢেলে দিয়েছেন। আমার কী দরকার ছিলো বলুন, আপনাকে এতো ভালো মূল্যবান উপদেশ দেবার? শুধু একটাই কারণ। সে হচ্ছে আপনার পিতা। তিনি আজ নাই। কিন্তু তাঁর কথা স্মরণ করে, আপনার প্রতি উপদেশবাণী দেওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব বলে মনে করি।

—উফ্, আল্লাহ, আমি অসহায়ের মতো কেঁদে ফেলি, একি অসহ্য অত্যাচার। আমি তোমাকে চুল ছাঁটতে ডেকে এনে মহা অপরাধ করেছি, এবার ক্ষমা দাও নাপিত প্রবর। তোমার অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমি ভক্ষণ করেছি। সোনারচাঁদ, এবার তুমি কেটে পড়ো বাবা। আর সোজা আঙ্গুলে যদি ঘি না ওঠে, তবে এই যে গামছা দেখছো, এটো তোমার গলায় দিয়ে...

রাগে দাঁত কড় মড় করে আমি লাফিয়ে উঠি। ইচ্ছে করে লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিই কিন্তু আমার মাথায় তখন সাবান জলের ফেনা।

কিন্তু সে ব্যাটা আমার এই রাগ উত্তেজনা, গ্রাহ্যই করলো না। তখনও একটানা বলে চলেছে, আমার মনে হচ্ছে, আপনি কিছু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সেই কারণে আমার প্রতি ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশ করছেন। কিন্তু আমার মতো প্রবীণ প্রাজ্ঞব্যক্তির এ সব তুচ্ছ ব্যাপার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওসবে আমার কিছু এসে যায় না। আর তা ছাড়া মনে করার কী আছে? প্রেম-জ্বরে আপনার মাথা তো একটু গড়বড় হয়ে গেছে। ঐ ধরনের ভুলবকা স্বাভাবিক। যাই হোক আপনার এখন কাঁচা বয়স। ঠিক মতো চিকিৎসা করলে নির্ঘাৎ সেরে যাবে। এবং আমিই সারিয়ে দেবো। ছোটবেলায় আপনার সেই মাদ্রাসা যাওয়ার কথা মনে পড়ে, মালিক? আমি আপনাকে কাঁধে করে মাদ্রাসায় দিয়ে-নিয়ে আসতাম। আর আপনি আমার কাঁধ থেকে নেমে ছুটোছুটি করার জন্যে আমাকে এস্তার কিল চড় লাথি মারতেন। রাগে দাঁত কড়মড় করতেন। মনে আছে? আপনার আজকের চেহারা দেখে আমার সেইসব কথা মনে পড়ছে।

আমি এবার কাতর অনুনয় করে বললাম, তুমি আমার নাপিত সোনা ভাই, এবার আমাকে ক্ষান্তি দাও। আজ আমার একটা জরুরী কাজ আছে। এখুনি যেতে হবে। তোমার দু'খানা হাতে ধরে বলছি, আজকের দিনের মতো তুমি আমাকে রেহাই দাও। আর যদি আমার কথা না শোনো, তাহলে...

এই বলে আমার গায়ের দামী শালখানা দু'ফালা করে ছিঁড়ে ফেললাম। রাগে চোখ দু'টো আমার ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিলো, লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর নাকটা কামড়ে দিই। সত্যি সত্যিই ও আমাকে পাগল করে দেবে।

লোকটা এবার একটু থমকে গেলো। এক মুহূর্ত। তারপর ক্ষুরটা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে, বাঁ হাতে আমার মাথাটা চেপে ধরে ক্ষুর চালাতে লাগলো। মাত্র কয়েকগাছি চুল কামানো হয়েছে। ক্ষুরটা তুলে ধরে বলতে লাগলো, 'শয়তান ভর না করলে অধৈর্য আসে না।'

কিন্তু এসব দর্শনের কথা আপনাকে শুনিয়ে কী লাভ? আমার ওপর আপনার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তাই আমি যা বলবো, আমি যা করবো সবই আপনার কাছে বিষবৎ মনে হবে। হতে বাধ্য। কারণ এও গভীর দর্শনেরই কথা।

আমি বলি, মাথাটা কামাবে তো কামাও। না হলে ছাড়ো। তোমার বকবকানীতে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেলো। এরকম যদি আর কিছুক্ষণ চালাও, আমি অক্কা পাবো। আর আমার যদি মৃত্যু ঘটে, তার জন্যে একমাত্র তুমিই দায়ী হবে, এই বলে রাখলাম।

নাপিত বললো, এবার বুঝলাম আপনার খুবই তাড়া আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—ভীষণ ভীষণ ভীষণ তাড়া আছে। তোমাকে তো সেই তখন থেকে হাজার বার বলছি—তাড়া আছে। তাড়াতাড়ি কামিয়ে দাও।

নাপিত বলতে থাকে, কিন্তু কে আপনাকে বলেছে, আপনার তাড়া আছে? তাড়াতাড়ি করার পরামর্শ কে দিয়েছে আপনাকে? সে কথা তো আমি বলবো! আমি বলে দেবো, তাড়াতাড়ি যেতে হবে কি হবে না? অহেতুক তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করা উচিৎ না, তাতে ক্ষতিই বেশী হয়। করলে পরিণামে অনুতাপ করতে হয়। আমাদের পীর মহম্মদ বলেছেন, 'তামাম

দুনিয়াতে যা কিছু সুন্দর দেখবে, তার সবই সমাধা হয়েছে খুব ধীর-মন্থর গতিতে' কিন্তু আপনি বলছেন, আপনার খুব তাড়া আছে। কি এমন আপনার কাজ—যার জন্যে তাড়াহুড়া করতে চাইছেন? আমি শুনলে আপনাকে সৎ উপদেশ দিতে পারবো। বলতে পারবো প্রকৃতপক্ষে তাড়াহুড়া করে সে-কাজ আপনার করার প্রয়োজন আছে কি নাই। আপনার মাথা কামানো বন্ধ রেখে আপনাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করছি বলে গোঁসা করবেন না, মালিক। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, আর কয়েকঘণ্টা বাদে আপনার ভালো সময় আসছে।

এই বলে সে তার হাতের ক্ষুরটা নিচে নামিয়ে রাখলো। এবং সেই জ্যোতিষ-দর্পণখানা তুলে নিলো। আবার উঠানে গিয়ে সূর্যের দিকে মেলে ধরলো। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে কি ছাইপাশ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকলো। আমার আর সহ্য হয় না। এ কি আপদ জুটেছে আমার ঘাড়ে! ওই বস্তুটার মধ্যে একটা চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো তো তাকিয়েই রইলো। কিন্তু আর একটা চোখ তার আমার দিকেই ছিলো। সূর্যের উচ্চতা মেপেটেপে আমার কাছে ফিরে এসে বললো, নাঃ, এখন তো আপনার কোন তাড়াহুড়ার কাম নাই। দুপুর বেলা নামাজের সময় আপনার কামের পক্ষে প্রশস্ত সময়। তার আগে তাড়াহুড়া করে কোন লাভ নাই, কত্তা। মাথাটা ঠাণ্ডা করে বসুন। এখনও পাক্কা তিন ঘণ্টা দেরি আছে। আমার গণনা অভ্রান্ত।

আমি বললাম, দোহাই তোমার, আর বক বক করো না। আমার গা গুলিয়ে যাচ্ছে। হয়তো এখুনি বমি করে দেবো।

নাপিত এবার তার ক্ষুর তুলে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো। খুব আস্তে আস্তে অল্প একটু মাথা কামালো। বুঝলাম, ইচ্ছে করেই সে মন্থরগতিতে ক্ষুর চালাচ্ছে। একটুক্ষণ পরে আবার তার পাঁচালী শুরু হলো, আপনার অধৈর্য দেখে সত্যিই আমি দুঃখিত, সাহেব। আপনি যদি আমাকে সব খুলে বলতেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম। আমার কাছে কোন কিছু গোপন রাখা আপনার উচিৎ নয়, মালিক। আপনি তো জানেন, আপনার বাবা আমার পরামর্শের কতো মূল্য দিতেন?

লোকটার হাত থেকে নিস্তার পাবার আশা না দেখে বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হলো, আজ নামাজের সময় আমাকে পৌঁছতে হবে আমার মানসীর বাড়ি। নামাজ শেষ হওয়ার আগেই তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে কেটে আসতে হবে। না হলে। ওর বাবা বাড়ি এসে আমাকে দেখলে আর রক্ষা থাকবে না। তাই তোমার কাছে আমার মিনতি, একটু তাড়াতাড়ি কামিয়ে দাও। আর কথার ফুলঝুরিটা একটু থামাও। অহেতুক কৌতূহল একটু চেপে রাখো। আরও যদি জানতে চাও তো বলি, আমার এক বন্ধু আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। তার বাড়ি গিয়ে খানাপিনা সারতে হবে। তারপর সেখানে যাবো। সে-জন্যেও খানিক আগে বেরুতে হবে আমাকে।

—নি-ম-ন্ত্র-ণ! নাপিত যেন কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ করলো। —ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, মালিক। আমি তো এক্কেবারে ভুলে বসে আছি। আজ রাত্রে আমার বাসায় ক'জন বন্ধুকে খেতে বলেছি। কিন্তু এতোটা বেলা হলো, একেবারে ভুলে গেছি, বাজারহাট কিচ্ছু করা হয়নি। কি বে-ইজ্জতের ব্যাপার হবে বলুন তো?

আমি বললাম, কিচ্ছু ভাবনার নাই। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আজ তো আমার নিমন্ত্রণ—আমি বাড়িতে খাবো না। কিন্তু রোজ যেমন খানাপিনা হয় আজও তেমনি সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। মাংস মদ প্রচুর আছে। তোমার যা দরকার এখান থেকে নিয়ে যেও। কিন্তু একটা কথা, আর একটুও দেরি করো না, নাপিত ভায়া। আমাকে তাড়াতাড়ি কামিয়ে ছেড়ে দাও।

—খোদা আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন, আপনি শতায়ু হবেন, মালিক। তা কি কি খানাপিনা তৈরি হচ্ছে, সাহেব? একটু চাখাবেন?

—পাঁচ রকমের খানা পাকানো হয়েছে। ডিমের আপেল, পায়রার দোপিয়াজী—তার মধ্যে দেওয়া হয়েছে আঙ্গুরের পাতা আর লেবুর রস; মাংসের চাঁপ, সরু দাউদখানি চালের বিরিয়ানী—তার মধ্যে সরু সরু করে কাটা বিলাতী বেগুন, আর মাংসের বটি, ছোট ছোট পেঁয়াজের ঝোল। এছাড়া আছে দশটা তন্দুরী মুরগী—আর একটা ভেড়ার মাংসের কোর্মা। আর আছে দুই থালা ভর্তি হালুয়া, লাড্ডু, পেড়া। আরও আছে। মাখন, মধু, পনির। আপেল, আঙ্গুর, কলা, শশা, তরমুজ, ক্ষীরা।

টসটস করে জল গড়িয়ে পড়লো নাপিতের জিভ দিয়ে।—একটু চাখাবেন, মালিক?

বাবুর্চিকে ডেকে বললাম, আজকের খানা যা তৈরি আছে, নিয়ে এসো এখানে।

একটু একটু করে সব খাবারগুলো চেখে দেখলো নাপিত।—বাঃ, চমৎকার, এমন খানা অনেককাল খাইনি। তা সরাব কি রেখেছেন, মালিক?

—ছ'টা বড় বড় ঝুড়ি ভর্তি আছে নানাজাতের সরাব। আমি এখনও খেয়ে দেখিনি, তেমন। ওগুলোও তুমি সব নিয়ে যাও। আমি আবার পরে আনিয়ে নেবো।

নাপিত এবার গদ গদ হয়ে উঠলো, আপনার মতো এতো মহৎ এমন দিলদরিয়া মানুষ এক আপনার বাবাকে ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। তা সাহেব, কিছু গোলাপজল, আতর, ধূপ, খানিকটা ফুল পেলে আরও ভালো ভাবে মেহেমানদের আপ্যায়ন করতে পারতাম।

আমি বললাম, ঠিক আছে, তাও দেবো, সব বাড়িতেই আছে। কিন্তু এখন আগে এসো তো, আমাকে কামিয়ে দাও। চাকরকে ডেকে বললাম, যে বাক্সটায় আতর, ধূপটুপ আছে ওটা এনে দে নাপিতকে।

চাকর নিয়ে এলো। নাপিত আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, ওরে বাস্, কি বাহারী বাক্স। তা নফরভায়া, বাক্সের ডালাটা একটু খোল তো, দেখি কি কি আছে?

আমার চাকরটা বাক্সের ডালা তুলে ধরলো। হাতের জ্যোতিষদর্পণ খানা পাশে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে একটা একটা করে বাক্সের যাবতীয় জিনিসপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলো। আর আমি তখন আধকামানো মাথা নিয়ে অসহায় আহম্মকের মতো বসে রইলাম। উপায় নাই—পড়েছি ধূর্ত নাপিতের হাতে...আমি তখন নিজের বোকামীর জন্যে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছি। আর নাপিত ব্যাটা কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একটা করে জিনিস তুলছে আর নাকের কাছে ধরে আঘ্রাণ নিচ্ছে। এমন জোরে নিশ্বাস টেনে গন্ধ শুঁকতে লাগলো, মনে হলো, নাক দিয়েই খেয়ে ফেলবে সব। আমার মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। এমন মানসিক অত্যাচারের চেয়ে কেউ যদি দু'ঘা ডাণ্ডার বাড়ি দিতো আমার মাথায়, তাও বুঝি এতোটা মারাত্মক হতো না।

অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে ক্ষুর হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো নাপিত প্রবর। এক যোজন লম্বা প্রশস্তি গাইলো আমার। তারপর মাথা কামাতে আরম্ভ করলো। একটুক্ষণ পরেই আবার তার কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠলো, খোদা হাফেজ, আজকের এই বদান্যতার জন্যে খালি আপনাকে সুক্রিয়া জানালে তো আমার কর্তব্য শেষ হয় না, মালিক। আসল ধন্যবাদ পাওয়া উচিত আপনার পিতার। তারই দৌলতে আজ আপনার এই বিপুল বৈভব। তাই তো আপনি দরাজ হাতে দান করতে পারলেন। তা হলে, আপনিই ভেবে দেখুন কত্তা, প্রকৃতপক্ষে ধন্যবাদটা কার পাওনা? সে যাই হোক, আজকের দিনে আপনি যে অনুগ্রহ করলেন তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো। আমার নিমন্ত্রিত মেহেমানরা আজ চোব্য চোষ্য করে খেয়ে তৃপ্তি পাবে। তারা সবাই আমার মতো গরীব-সরীব মানুষ। এতো ভালো ভালো খানা-পিনা তাদের না খাওয়ালেও কেউ অখুশি হতো না। তা বলে মনে করবেন না, আমি তাদের খাটো করে দেখছি। তাদের প্রত্যেককে

আমি দারুণ ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। গরীব হলে কি হবে, মানুষ হিসাবে কেউ তারা ছোট না। তাদের নাম ধাম বললে হয়তো আপনি চিনতেও পারবেন। একজনের নাম জানতুত—ঝাড়ুদার মেথর। আরেকজন সিলাত—বাজারে মুরগীর মাংস বেচে। অন্য একজন সালিয়াহ গম-আটার দোকানদার। আরও একজন—তার নাম আকরাশাহ—সব্জী বিক্রি করে। হামিদ—ভিস্তিওলা আর গোয়ালা আবুমাকারিস।

স্বভাবতই সবাই আমার মতো মেকদারের মানুষ। এরা এতো ভালো খানা কল্পনা করবে কি করে মালিক? তবে লোক হিসাবে সবাই খাসা। আর আপনি জানেন, বাজে লোকের সঙ্গে আমি আলাপ রাখি না। এরা সবাই আমারই মতো—বড় সজ্জন। খুব কম কথা বলে। অহেতুক কোন কৌতূহল নাই। পর নিন্দা পরচর্চার ধার ধারে না। তবে হ্যাঁ, সন্ধ্যা হলে মৌজ করে সরাব খেতে ভালোবাসে সবাই। মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গায়, নাচে। ওদের নাচ গানের খ্যাতি সারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়েছে। যদি কিছু মনে না করেন তবে ওদের দু-একটা নামকরা গান আপনাকে গেয়ে শোনাতে পারি। আর নাচও আমি মন্দ জানি না। গানের সঙ্গে নাচটাও তা হলে দেখুন একবার।

ঝাড়ুদার জানতুত যে গানটা গায় আর তার সঙ্গে যে নাচটা নাচে সেটা আগে দেখাই ঃ

ও আমার দরদিয়া বন্ধুরে
তোমার ঠ্যাং কেন খোঁড়া?
তোমার তরে বসে আছি
এসো বসো, মদ খাও থোড়া।

কোমরটা হেলিয়ে দুলিয়ে এক অদ্ভুত বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে নাচের নামে কায়দা কসরৎ করতে লাগলো নাপিত। রাগও হয় হাসিও পায়। কিন্তু এখন তো ওকে চটালে চলবে না। যে কোন ভাবে আধ কামানো মাথাটা আমার শেষ করাতেই হবে।

কিন্তু সে তখন জানতুত ছেড়ে হামিদ-কে ধরেছে। হামিদের নাম করে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলো। গায়ে বিচুটি ঘসে দিলে যে ভাবে দাপাতে থাকে মানুষ, সেইভাবে দাপাতে লাগলো সে। আর মাঝে মাঝে আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তারিফ চাইতে লাগলো।—হামিদের নাচের এই আড়-খেমটা তাল আমি হুবহু রপ্ত করে ফেলেছি কত্তা। দেখুন, এক্কেবারে নিখাদ নিখুঁত।

আমি বললাম, হ্যাঁ খুঁত ধরতে পারবে তেমন সমঝদার আদমী সারা বাগদাদে খুঁজ পাওয়া যাবে না। খুব ভালো—চমৎকার। কিন্তু আরো ভালো আরও চমৎকার হবে, এবার যদি দয়া করে তুমি থামো।

নাচ না থামিয়ে নাপিত বলে, হামিদের গানটা শুনুন সাহেব। বড় মজাদার ঃ

আমার বিবি—কালো কুচ্ছিত কুত্তা,
খানা চাইলে মারে আমায় গোত্তা।
তবু তারে আদর করি, পায়ে ধরি,
বিবি বলে, পান খাবো, আনো আগে দোক্তা।

আমার কোন প্রতিবাদই কানে তুললো না সে। একের পর এক নাচ আর গানের তাণ্ডব চলতে লাগলো।

অনেক বাদে নাচ গান থামিয়ে সে এক প্রস্তাব পেশ করলো, আজ রাতে আপনি আমার বাসায় আসুন কত্তা। নাচ গান দেখবেন, খানা করবেন। দেখবেন, আপনার এতো দিনের জ্বরের দুর্বলতা কেটে যাবে। আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। মেজাজ শেরিফ হয়ে যাবে।

আমি বললাম, তোমার আমন্ত্রণের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আজ তো হবে না, নাপিতভায়া। আজ আমার অনেক কাজ। এর পরে একদিন তোমার বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবো।

নাপিত বললো, কাজ কাম সেরে না হয় একটু রাত করেই যাবেন। আমার বন্ধুদের নাচ গান দেখে আপনি ভীষণ আমোদ পাবেন। অতোগুলো গুণী লোক আজ এক জায়গায় হবে—

আমার তখন রাগে সারা শরীর জ্বলছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না ওর এই সব নচ্ছার-পনা। বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ অতোগুলো গুণী জ্ঞানী লোকের সমাগম হবে। সেখানে না গেলে তো জিন্দগীই বরবাদ হয়ে যাবে। ওসব ন্যাকাপনা রাখো তো। এবার তোমার কাম সারো, তারপর কেটে পড়ো। আর একটাও কথা তোমার শুনতে চাই না আমি।

নাপিত একটু দমে যায়। ভয়ে ভয়ে বলে, কিন্তু আপনি নারাজ হচ্ছেন কেন সাহেব? শুধু একটুক্ষণের জন্যে আমার বাসায় আপনার পায়ের ধুলো দিতে অনুরোধ করছি। এইটুক অনুরোধ রাখতে পারেন না, মালিক! আপনি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কখনও মেশেননি তাই বুঝতে পারছেন না কী মজাদার মানুষ তারা। একবার যদি আলাপ করেন তো জীবনে আর ছাড়তে চাইবেন না। বার বার যেতে হবে তাদের কাছে।

আমি বলি, ঠিক আছে, একদিন তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করবো আমার বাড়ি। সেদিন খুব মৌজ করে খানাপিনা হবে। সে-দিনই আলাপ সালাপ করবো। আজ নয়, আজ আমার সময় হবে না।

নাপিত মাথা নেড়ে আমার কথার তারিফ করলো।—ভালো, খুব ভালো হবে মালিক। সেই ভালো হবে। তাহলে আপনি বসুন একটু। আমি আপনার দেওয়া এই খানপিনাগুলো বাড়িতে রেখে এক্ষুণি আসছি। আর আসার পথে আমার বন্ধুদের সুখবরটা দিয়ে আসি। আপনার বাড়িতে আপনি তাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন। এতো বড় সুখবরটা তাদের না শুনিয়ে আর থাকতে পারছি না। আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। আমি যাবো আর আসবো।

আমি চিৎকার করে উঠি, আগে আমাকে কামিয়ে দাও। তারপর যেখানে খুশি যাও। কিন্তু আমাকে না কামিয়ে এক পা নড়তে পারবে না। আমাকে কামিয়ে দ্বিয়ে খানাপিনা নিয়ে বাড়ি যাও। তোমার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মৌজ-কর। আর আমি আমার কাজে যাই।

—কিন্তু মালিক আপনি একা একা যাবেন, সে তো হতে পারে না। আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, আমি যেখানে যাবো সেখানে আমাকে একাই যেতে হবে। অভিসারে কেউ সঙ্গী নিয়ে যায় না। আমার মানসীর কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো কি করে?

নাপিত বললো, কিন্তু আমার ভয় হয়, আপনার বিপদ আপদ হতে পারে। নতুন জায়গা, কিছু বলা তো যায় না। আমাকে সঙ্গে নিলে আপনার কোনও চিন্তার কিছু থাকবে না।

—না সে হয় না।

নাপিত বলে, আপনি বুঝতে পারছেন না, কত্তা। এই বাগদাদ শহরে এমন সব ফাঁদ আছে তার মধ্যে একবার ঢুকলে আর বেরুতে পারবেন না। নির্ঘাৎ মৃত্যু। আর বড় বড় ফাঁদগুলো মেয়েদের দিয়েই পেতে রাখে ওরা। আমাদের সুলতানের আবসাররা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়। কারুর কোন খেয়াল নাই, কোথায় কি ঘটছে। সব অপদার্থ নপুংশক।

আমি এবারে ক্ষেপে গেলাম।—ওসব বুজরুকি থামাও। আমার মাথাটা কামাবে কিনা বলো? না হলে ক্ষুর দিয়ে তোমার নাকটা কেটে দেবো এবং এক্ষুণি।

এই বলে হাতটা বাড়িয়ে ক্ষুরটা নিতে যাই। এই প্রথম দেখলাম সে চুপ করলো,

কাছে এগিয়ে এসে মাথায় ক্ষুর চালাতে লাগলো। মাথাটা যখন কামানো শেষ হলো, দেখলাম নামাজের সময় পার হয়ে গেছে। সুতরাং আমার মনের অবস্থা তখন বুঝতেই পারছেন। কিন্তু কী আর করা যাবে। চলে যাওয়া সময় তো আর ফেরানো যায় না।

আমি বললাম, খুব করেছো। এখন খাবারদাবার নিয়ে রওনা হও। আমার সব মাটি হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি ওগুলো রেখে ফিরে এসো। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবো।

নাপিত বললো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মালিক, আমাকে বিদায় করার জন্যেই একথা বলছেন আপনি। আমি বেরিয়ে গেলেই আপনি টুক করে কেটে পড়বেন। কিন্তু তা করবেন না, সাহেব। আমি যতক্ষণ না ফিরি আপনি বাড়ি থেকে বেরুবেন না। তাতে অনেক বিপদ আপদ ঘটতে পারে। একা যদি চলে যান, আর যদি কোন বিপদ ঘটে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবেন না।

—ঠিক আছে, যাবো না, শুধু একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

আমি তার কাঁধে মাথায় তুলে দিলাম খাবারদাবার। কিন্তু বেচারী তার ভারে নুয়ে পড়লো। শেষে দু'জন কুলি ডেকে তাদের মাথায় চাপিয়ে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো নাপিত।

নাপিত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হামামে ঢুকে গোসল সেরে সেজেগুজে একাই বেরিয়ে পড়লাম আমি। একটু এগোতেই নামাজের আজান ভেসে এলো কানে। আমি রুদ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগলাম। একটানা দ্রুত দৌড়ে এসে পৌঁছলাম সেই কাজীর বাড়ির দরজায়। দরজা খোলাই ছিলো। আমি একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিলাম ভেতরটা। তার পর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সেই বৃদ্ধা ভিতরে অপেক্ষা করছিলো। আমাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে গেলো।

কিন্তু কিসের যেন সোরগোল কানে এলো। আমি যখন দৌড়তে দৌড়তে আসি সেই সময় রাস্তার আশে পাশের অনেক লোক হাঁ করে আমাকে লক্ষ্য করছিলো। তাদের অনেকেরই ধারণা হতে পারে আমি কোন ছিনতাই চোর। মনে হলো কয়েকজন আমার পিছু ধাওয়া করে আসছিলো। এখন কাজী সাহেবের বাড়িতে ঢুকে পড়ায় তারা বোধ হয় নিশ্চিত হয়ে গেছে—আমি চোর ছাড়া আর কেউ নই।

ক্রমশই গোলমাল বাড়তে থাকলো। বেশ বুঝতে পারলাম, কাজীসাহেবের বাড়ির অন্ধ গলিটার মুখে অনেক লোকের জটলা হচ্ছে। কেউ বলছে, চোরটা কাজীসাহেবের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছে। কেউ বলছে, না, পালিয়েছে। এমন সময় কাজীসাহেব স্বয়ং এসে হাজির হলেন। এই সময়ে এতো লোকের ভীড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? কী হয়েছে।

আমি আর আমার মানসী জানলার ফুটোয় চোখ রেখে দেখলাম কাজীসাহেব খচ্চরের পিঠ থেকে নামলেন। তার সঙ্গে জনাদশেক নিগ্রো প্রহরী। আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেই ব্যাটা নাপিত।

কাজী সাহেবের কথার কেউ জবাব দেয় না। ক্রমশ ভীড় বাড়তে থাকে। আমি দেখলাম, কাজী সাহেব এসে বাড়ি ঢুকলেন। আর আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কাজী সাহেবের মেয়ে বললেন, তোমার কোন ভয় নাই, আব্বাজান আমার ঘরে কদাচিৎ আসেন। আর যদি আসেনও, তোমাকে লুকিয়ে রাখার এখানে অনেক জায়গা আছে।

নাপিতটা যখন বুঝতে পারলো কাজীর বাড়ির অন্দরে আমি ঢুকে পড়েছি সে তখন চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। নিজের জামা কাপড় ছিঁড়েখুঁড়ে চিৎকার করতে লাগলো।

—ওগো, কে আছো, তোমরা, আমার মালিককে বাঁচাও। কাজীসাহেব তাকে মেরে ফেললো।

ক্রমশই রাস্তার লোক আরও বেশী ভিড় জমাতে থাকে। একজন প্রশ্ন করে, কী, কী হয়েছে?

নাপিত তখন হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে।—আমার মালিক কাজীর বাড়ি ঢুকেছে। কাজী তাকে বেদম মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছে। আমার মনে হচ্ছে এতক্ষণে সে আর বেঁচে নাই। তোমরা সবাই এসো ভাই, আমার মালিককে উদ্ধার করে দাও।

—কিন্তু তোমার মালিককে কাজী সাহেব মারবেন কেন? কী করেছেন তিনি?

কিন্তু সে কথার জবাব দিলো না নাপিত। ইনিয়ে বিনিয়ে সেই একই কথা, তোমরা সবাই মিলে চলো, কাজীর কাছে যাই। জবাব দিতে হবে তাকে,কেন সে মেরে ফেলেছে আমার মালিককে?

তখন জনতা বিক্ষুব্ধ। তাই তো, একটা মানুষকে মারতে মারতে মেরেই ফেলেছে একেবারে। কী অন্যায় কথা। কাজী হয়েছে বলে কি হাতে মাথা কাটবে নাকি? এসো, সবাই মিলে কাজীর কাছে যাই। এর জবাব চাই আমরা।

হুড়পাড় করে জনতা কাজীর দরজার সামনে এসে চিৎকার করতে লাগলো।—কই, কে আছো দরজা খোল। দরজা খোল, খোল বলছি, না হলে তুড়ে দেবো।

দমাদম ইঁট পাটকেল লাঠি ডাণ্ডা পড়তে লাগলো দরজার ওপর। কাজী সাহেব হতবাক। একি অদ্ভুত সব কাণ্ড। নামাজের আগেও তিনি দেখে গেছেন, সব ঠিক ছিলো। হঠাৎ এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসব কি ব্যাপার? দরজার দিকে এগিয়ে যান তিনি। নিগ্রো পাহারাদাররা বাধা দেয়, সাহেব দরজা খুলবেন না। ওরা হয়তো আপনার ওপরেই চড়াও হবে।

—আমার ওপর চড়াও হবে? কেন, আমার অপরাধ?

—সে বিচার তো জনতার মানুষ করে না। আগে তারা হাতের সুখ মেটায়। আফশোষ করতে হয় পরে করে।

কাজী সাহেব বললেন, সে যাই হোক, দরজা খুলে দাও। ওরা কি বলতে চায়, আমি শুনবো।

একটা নিগ্রো নফর দরজা খুলে দেয়। কাজী সাহেব দেখলেন সারা গলিটা লোকে লোকারণ্য। এমন হৈ হল্লা—কে যে কি বলতে চায় কিছুই বোঝা যায় না। কাজী সাহেব বললেন, তোমরা শান্ত হও। একজন এসে বলো, কী তোমাদের বক্তব্য?

নাপিত এগিয়ে গেলো। বললো, আপনি আমার মালিককে মেরে ফেলেছেন কেন তার জবাব চাই।

—কে তোমার মালিক। আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? আর কেনই বা তাকে আমি মেরে ফেলবো। কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

—তা বুঝতে পারবেন কেন? নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন, এদিকে যে সব ফাঁক হয়ে গেলো সে দিকে তো আর হুস ছিলো না কাজী সাহেবের।

এক নিচুতলার মানুষের মুখে এ ধরনের অশালীন উক্তি শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন কাজী সাহেব।

—ওসব বুজরুকী রাখো। সভ্য ভব্য ভাবে কথা বলো। ভুলে যেও না কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো।

নাপিত তখন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বললো, না না, তা আর ভুলবো কি করে? আমরা যে মহামান্য কাজীসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সে কথা কি ভুলতে পারি?

কাজী সাহেব দেখলেন, জনতা ফুঁসছে। তিনি একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করে অপেক্ষাকৃত নিম্ন গলায় প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মালিকটি কে? আমার বাড়িতে তার কী প্রয়োজন?

নাপিত এবার বিদ্রূপের ঢং-এ জবাব দেয়, আহা ন্যাকা, দেশসুদ্ধ লোক জানে, আপনার মেয়ের সঙ্গে সে মহব্বৎ করছে, আর আপনি জানেন না? আপনার বাড়িতে সে ফি দিন আসে। আপনার মেয়ের সঙ্গে রাত কাটায়। তারপর আপনাকে কলা দেখিয়ে আপনারই নাকের ডগা দিয়ে পার হয়ে যায়। আপনি বলতে চান, এ সবের আপনি কিছুই জানতেন না? আর যদি জানতেনই, তবে গোড়া থেকে তা বন্ধ করেন নি কেন? কেন আগে নিজের মেয়েকে শাসন করেন নি? পরের ছেলের গায়ে হাত তোলা খুবই সোজা, না? কাজী হয়েছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? আমাদের মালিককে মারার মজা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে আসুন, চলুন আপনাকে যেতে হবে খলিফার কাছে। আপনার বিচার তিনিই করবেন।

কাজী সাহেব লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারেন না। ছি ছি মান-ইজ্জত সব গেলো। মেয়ের চরিত্র নিয়ে কি জঘন্য সব কথা শুনতে হলো তাকে। কিন্তু সব মিথ্যা—মিথ্যা। তার মেয়েকে সে খুব ভালো করেই জানে,এরকম সে কিছুতেই হতে পারে না। আর তাছাড়া তার বাড়িতে ঢোকার একটাই দরজা। সে দরজায় কড়া পাহারা থাকে।

নাপিতকে বললেন, খলিফার কাছে যাওয়ার আগে একবার আমার বাড়িটা ভালো করে খুঁজে পেতে দেখে নাও তোমরা। কোথাও তোমাদের মালিকের লাশটাস পাও কিনা।

এবার আমি প্রমাদ গুণলাম। এখুনি উঠে আসবে তারা। তারপর আমার যে কি দশা হবে—আর ভাবতে পারলাম না। কাজীসাহেবের মেয়ে আমাকে অভয় দিতে লাগলো। কিচ্ছু ভয় নাই। তোমাকে আমি ঐ বাক্সটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখছি। ওর মধ্যে চুপটি করে বসে থাকো। ওরা এলেও খুঁজে পাবে না তোমাকে।

উপায়ন্তর না দেখে ঘরের এক পাশে রাখা সেই কাঠের বাক্সটার মধ্যেই ঢুকে বসে পড়লাম। ডালাটা সে বন্ধ করে দিলো।

হুড়মুড় করে জনতার পঙ্গপাল ঢুকে পড়লো বাড়ির অন্দরে। এঘর ওঘর আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলো সকলে। বুঝতে পারলাম, উপরে আমাদের ঘরেও ঢুকেছে কিছু লোক। নাপিতের গলা শোনা গেলো। কাজীসাহেবের মেয়েকে প্রশ্ন করছে, এঘরে আর কে আছে?

—আর আবার কে থাকবে? আমি একাই থাকি, একাই আছি।

—কেন তোমার পেয়ারের নাগর? সে আসেনি?

—না। কেউ আসেনি আমার ঘরে।

মেয়েটির কথা শুনে অন্য সবাই বেরিয়ে গেলো। কিন্তু ধূর্ত নাপিত ঘরের এদিক ওদিক উঁকিঝুকি দিয়ে খুঁজতে থাকলো। এক সময় আমার বাক্সের পাশে দাঁড়ালো। আমার তখন ধড়ে আর প্রাণ নাই। ডালাটা একটু তুলে ধরলো সে। আমার চোখে চোখ পড়তেই আবার বন্ধ করে দিলো। বুঝতে পারলাম, বাক্সটা কাঁধে তুলে নিলো সে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে একেবারে বড় রাস্তায় এসে ধপাস করে ফেলে দিলো। আমার তখন প্রাণ যায় যায়। বাক্সের ডালাটা মাথায় ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েই টপকে বেরিয়ে পড়ি। আর এই বাক্সটা থেকে বেরুতে গিয়ে উল্টে পড়ে যাই, রাস্তায়। সেই সময় আমার এই পায়ে ভীষণ চোট লাগে। তার ফলেই আজ আমি ল্যাংড়া।

সে-যাই হোক, রাস্তায় পড়ে গিয়েই উঠে দাঁড়িয়েই জেবে যা ছিলো মুঠো করে বের করে রাস্তায় ছুঁড়ে দিলাম। কিছু লোক হুমড়ি খেয়ে পড়লো সেই পয়সাকড়ির লোভে। আর কিছু মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো তখন। আমি পড়ে যাওয়ায় অনেকেই করুণা পরবশ হয়ে আমাকে ধরে তুলতে এগিয়ে এসেছিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে চোঁ দৌড় দিতেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারা।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

ত্রিশতম রজনী।

শাহরাজাদ আবার তার কাহিনী শুরু করে ঃ

তারপর শাহজাদা শুনুন, সেই দর্জি তার গল্প বলে চলেছে।

তখন সেই তরুণ ল্যাংড়া আমাদের উৎসবের আসরে তার জীবনের সবচেয়ে করুণ কাহিনী বলছে, আর আমরা উপস্থিত অভ্যাগতরা রুদ্ধশ্বাসে শুনছি ঃ

আমি বাক্স থেকে বেরুতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেলাম। সেই পড়াতেই এমন চোট লাগলো—যার ফলে আজ আমার এই দশা। পা-টাই জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে গেলো।

যাই হোক, জনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যেই আমি আমার জেবের টাকা পয়সা রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাতে থাকলাম। পিছনে শুনতে পেলাম সেই নাপিতের কণ্ঠস্বর। শুনুন ভাই সাব, আর কোন ভয় নাই, আমার মালিককে পেয়ে গেছি। যাক, আল্লার মর্জিতে তিনি বেঁচে গেছেন।

—কিন্তু বাক্সের মধ্যে ঢুকেছিলো কেন সে?

জনতার প্রশ্ন। নাপিত বললো, আমরা চেঁচামেচি চিৎকার করাতে কাজীর লোকজন আর তাকে সাবাড় করতে পারেনি। এই বাক্সটার মধ্যে পুরে রেখেছিলো। আমরা না ঢুকলে, বাক্সটা না আনতে পারলে, পরে নির্ঘাৎ কোতল করতো তাকে। যাক বাবা, জানে বেঁচে গেছে। আমি ভাবছি, আমার এই উপস্থিত বুদ্ধি না থাকলে আজ কি সর্বনাশই না হতো।

আমি তখন একটানা দৌড়ে চলেছি। প্রাণ ভয়ে। কিন্তু নাপিত আমার পিছু ছাড়ে না। সে-ও দৌড়াতে দৌড়াতে আসতে থাকে। তারঃস্বরে চিৎকার শুনতে পাই।—ও সাহেব, শুনুন, থামুন। আজ আমি না থাকলে ওরা আপনাকে আস্ত কবর দিয়ে দিতো। আপনাকে তখনই উপদেশ দিয়েছিলাম, আমাকে না নিয়ে কোথাও বেরুবেন না, তা আমার কথা শুনলেন না বলেই আপনার এই দশা হলো। তাও আপনার ভাগ্য ভালো সময় মতো আমি এসে পড়েছিলাম। তাই প্রাণটা বাঁচাতে পেরেছি। না হলে আজ আপনার বাঁচার কোন পথ ছিলো না। সেই জন্যেই বলি আমার কথা মেনে চলবেন আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনার বাবা কখনও আমার উপদেশ ছাড়া কোন কাজে পা বাড়াতেন না। কিন্তু আপনি এইভাবে দৌড়াচ্ছেন কেন? এখন আর কেউ কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। আপনি দাঁড়ান, আমার কথা শুনুন।

আমি একটুক্ষণের জন্য দাঁড়ালাম। নাপিত আরো নিকটতর হলে বললাম, আল্লাহর দোহাই, তুমি আমাকে রেহাই দাও। তোমার জন্যেই আমার পাটা গেছে। এবার কি আমাকে জানেও মারতে চাও।

আবার দৌড়াতে লাগলাম। এগলি ওগলি দিয়ে এঁকে বেঁকে শেষে বাজারের কাছে একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম। এই দোকানের মালিক আমার

বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু লোক। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন। যখন বাবা বেঁচেছিলো। আমাকে খুব স্নেহ করেন।

সারা শরীর ঘামে নেয়ে গেছে। শুধু হাঁপাচ্ছি আমি। দোকানের মালিক আমার এই অবস্থা দেখে অবাক হলেন। উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে, বাপজান, এমন করে হাঁপাচ্ছো কেন?

আমি বললাম, বলবো, সব বলবো আপনাকে। আগে আমাকে দোকানের ভিতরে একটুক্ষণ লুকিয়ে রাখুন। না হলে ও ব্যাটা এখুনি এসে ধরে ফেলবে আমাকে।

দোকানী বললো, কী বলছো সব? কে তোমাকে ধরে ফেলবে? কী করেছো তার? এসো, ভেতরে এসো।

আমি তখন আগাগোড়া সব ঘটনা খুলে বললাম তাকে। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, তোমার কোন ভয় নাই, আমার দোকানের ভেতর ঢুকতে পারবে না সে। আর তোমার পা যতদিন না ঠিক হচ্ছে তুমি এখানেই থেকো। আমি দাওয়াইপত্র ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সব। তোমার বাবা আমার প্রাণের বন্ধু ছিলেন। তোমার কোনও অনাদর অযত্ন হবে না, বাবা।

আমি ওখানেই রয়ে গেলাম কয়েক দিন। পা-টা ফুলে ঢোল হয়ে গেলো। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলাম। হেকিম এলো। দাওয়াই দিলো। ফোলা ব্যথাও কমলো একদিন। কিন্তু পা-টা একেবারে ঠিক হলো না। এখনও মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলাফেরা করি।

এই ঘটনার পর এই নাপিত সম্পর্কে দারুণ এক আতঙ্ক আর ঘৃণা হলো মনে। লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। শয়তানের অসাধ্য কিছুই নাই। তাই ঠিক করলাম, দেশান্তরী হবো। যে-দেশে এই দুষ্ট নাপিত বাস করছে সে-দেশের ধারে কাছেও থাকবো না। ব্যবসা বাণিজ্য ছোট করে বেচে দিলাম অনেকখানি। বাকী যা রইলো, আমার এক বন্ধুকে দেখাশোনার ভার দিয়ে একদিন বিদেশ যাত্রা করলাম। ঠিক করলাম, এই বাগদাদ ছাড়িয়ে এমন এক দূর দেশে চলে যাবো, যেখানে অন্তত এই নাপিতের মুখদর্শন করতে হবে না। আল্লাহর কাছে ওর সর্বনাশ প্রার্থনা করেছি। নাপিত আমার যে সর্বনাশ করেছে তার প্রতিফল যেনো সে পায়। সবংশে নির্বংশ হয় যেনো।

কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস, দুর্গম গিরি, কান্তার মরু আর দুস্তর পারাবার পেরিয়ে চলে এলাম আপনাদের মুলুকে—এই চীন দেশে, ভাবলাম চিরদিনের মতো অব্যাহতি পেলাম সেই অপয়া ধূর্ত শয়তান নাপিতের হাত থেকে; কিন্তু হায় আল্লাহ, এখানে এসেও তার মুখই আমাকে দেখতে হলো আজ! আর এক মুহূর্ত আমি অপেক্ষা করবো না এখানে, আপনাদের এই দেশে। একদিন যেমন আমার নিজের দেশ পরিত্যাগ করে আপনাদের দেশের পথে পা বাড়িয়েছিলাম তেমনি আজ আবার আপনাদের দেশ ত্যাগ করে অন্য কোনও অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো।

এই কথা বলে আর ক্ষণ-মাত্র অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে।

আমরা সবাই তখন সেই নাপিতের দিকে ফিরে চাইলাম। মুখ নামিয়ে চুপ করে বসেছিলো সে। আমাদের একজন প্রশ্ন করলো, ছেলেটি যা বলে গেলো তা কি সত্যি? আর যদি সত্যি হয় তাহলে জিজ্ঞেস করি, এমন সর্বনাশ তার কেন করেছিলে, বাপু? এইভাবে তার জিন্দেগীটা বরবাদ করে দিয়ে তোমার লাভ কি হয়েছে?

নাপিত এবার সোচ্চার হয়ে উঠলো।—আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি তার ভালো বই মন্দ ভাবিনি কখনও। আমার কথা যদি সে শুনতো, তার এই দশা হতো না কখনও। আর এ-ও ঠিক, একটা পা-এর ওপর দিয়ে রক্ষা পেয়ে গেছে। আমি সেদিন না থাকলে, আমার উপস্থিত বুদ্ধি খরচ না করলে জানে মারা যেতো সে। এ জন্যে তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। তা না, সে

আমাকে শাপ-শাপান্ত করে গেলো। আল্লাহ ওপরে আছেন, তার চোখ ফাঁকী দেওয়া যায় না। তিনি সবই দেখেছেন।

আপনারা এখানে সবাই গুণীজন উপস্থিত আছেন। আপনারাই বলুন, আমি কি বাজে বকবক করি? না, এতক্ষণ বসে আছি, শুনেছেন তেমন কোনও কথা? আমি আজে বাজে অবান্তর কথাও বলি না, অবিবেচকের কাজও করি না কিছু। হ্যাঁ, তা যদি বলেন, সে ব্যাপারে ওস্তাদ আমার ছয় ভাই। আমি আমার নিজের কথা প্রথমে বলছি, তারপরে বলবো আমরা ছয় ভাই-এর কাহিনী। আপনারাই বিচার করে দেখবেন, আমি কতো জ্ঞানী, উদার বিচক্ষণ এবং সাবধানী। সবচেয়ে বড় কথা, আমি যে কতো মিতবাক, সেটা আপনারা এক্ষুণি প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

দর্জি বলতে থাকে, আমরা সবাই সাগ্রহে চুপ করে বসে রইলাম, আর নাপিত তার কাহিনী শুরু করলো।

আপনারা তো শুনেছেন, আমি বাগদাদের অধিবাসী। আমি যখন বাগদাদ পরিত্যাগ করে আসি তখন বাগদাদের সুলতান ছিলেন অল-মুসতানসির বিল্লাহ। খুব ধার্মিক বাদশাহ।

তার সলতানিয়তে কখনও কোন অনাচার অবিচার ছিলো না। সবাই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতো। সুলতান সবাইকে, বিশেষ করে গরীব-দুঃখীদের বড় ভালোবাসতেন। জ্ঞানী গুণীর সমাদর করতেন খুব।

একদিন খলিফা খবর পেলেন, শহরের কাছেই দশজন সমাজ-বিরোধী খুনী ছেনতাই-এর আস্তানা আছে। মাঝে মাঝেই তারা হানা দিয়ে গৃহস্থ মানুষের ধনসম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। সুলতান তার ছোটা সুবাদারকে বললেন, আমার দেশে এই সব রাহাজানী এ আমি বরদাস্ত করবো না। যেমন করেই হোক তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসো।

একদিন বিকালবেলা টাইগ্রীসের উপকূলে বেড়াতে বেরিয়েছি। দেখি, একটা ছোট নৌকায় দশজন লোক চেপেছে। নৌকাটা ছাড়বে বলে নোঙর তুলছে। আমি ভাবলাম, এরা সবাই সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরিয়েছে। আমিও সঙ্গী হই তাদের। আপনারা জানেন, আমি খুব অল্প কথার মানুষ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও মুখে আসে না। সেই কারণে, তাদের কাছে কোনও অনুমতিও চাইলাম না। অহেতুক কথা বাড়বে। সোজা গিয়ে উঠে বসলাম নৌকায়। নোঙর ততক্ষণ তোলা হয়ে গেছে। এমন সময় একদল সিপাই এসে ঘিরে ফেললো নদীর পাড়। সঙ্গে স্বয়ং দারোগা সাহেব। তার হুকুমে আমাদের সবাই-এর হাতে হাত কড়া, পায়ে বেড়ি পরানো হলো। গলায় শিকল বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেলো সোজা সুলতানের দরবারে। সারাটা পথ কেউ কারো সঙ্গে একটি কথাও বললো না। আর আমার কথা তো স্বতন্ত্র। আমি তো প্রয়োজনেই কারো সঙ্গে কথা বলি না। তা আবার ওদের সঙ্গে কি খোশ গল্প করবো?

আমাদের দেখা মাত্র খলিফা জল্লাদকে হুকুম করলেন, এক্ষুণি এই খুনী বদমাইশ দশজনের গর্দান নাও। সুলতানের সামনে আমাদের সবাইকে হাঁটুগেড়ে বসতে বললো জল্লাদ। আমরা সুবোধ বালকের মতো হাঁটু গেড়ে বসে গলা বাড়িয়ে দিলাম। জল্লাদ তখন তার ফিনফিনে পাতলা তরবারী দিয়ে এক কোপে এক একজনের মুণ্ডু কেটে নামিয়ে দিলো। এইভাবে দশজনের মাথা মাটিতে পড়ে গেলো। বাকী রইলাম আমি। আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন, সুতরাং সুলতান আর কি করে মারবেন। তা না হলে সারির সব শেষেই বা আমাকে দাঁড় করাবে কেন? যাই হোক, দশজনের ধড় মুণ্ডু আলাদা করার পর জল্লাদ তরবারী রেখে দিলো। আমি অবাক। অবাক সকলেই। সুলতান অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, ওকে বাদ দিলে কেন?

—জী হুজুর, আপনার যেমন হুকুম তাই করেছি।

—আমি তো তোমাকে সবারই গর্দান নিতে বললাম। তা ওকে বাদ দিলে কেন?

—নফরের গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, আপনি দশজনের জান নিতে বলেছেন, আমি তামিল করেছি। আপনি গুণে দেখুন, হুজুর, দশটা কাল্লা আছে কিনা।

সুলতান এবং সবাই গুণে দেখলেন, হ্যাঁ জল্লাদ ঠিকই বলেছে। হুকুম হয়েছিলো দশজনের প্রাণদণ্ড। দশজনকেই কোতল করেছে সে।

সুলতান বিস্ময় প্রকাশ করলেন।—তবে? তবে এ লোকটা কে? কোথা থেকে এলো সে। এই, এদিকে সামনে এসে দাঁড়াও। কে তুমি? এই খুনী ডাকাতদের দলে এলে কি করে?

আমার স্বভাব কম কথা বলা। তাই এতক্ষণ চুপ করেছিলাম। এবার সুলতান যখন জিজ্ঞেস করলেন, বাধ্য হয়ে তখন আমাকে মুখ খুলতেই হলো। বললাম, ধর্মাবতার, আমি খুব কম কথা বলি বলে লোকে আমাকে সীমিত বলে ডাকে। আপনি যখন আপনার জল্লাদকে হুকুম করলেন 'এই দশজনের গর্দান নাও' আমি তখন জানতাম আপনি ভুল করেছেন। কিন্তু যেহেতু আমি মৌনব্রতী মানুষ, সেই জন্যে আপনি ভুল করছেন জেনেও আমি কোন বাক্য উচ্চারণ করতে পারিনি। কারণ বিনা প্রয়োজনে অহেতুক কথা বলা আমার স্বভাব নয়। আর শুধু কম-কথা বলাই না, আমার আরও বড় গুণ অযথা অন্যের ব্যাপারে কখনও নাক গলাই না। আমার প্রগাঢ় জ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসায় সবাই পঞ্চ-মুখ। আমার জাত ব্যবসা ক্ষৌরকর্ম করা। আমরা সাত ভাই। এবার এখানে এদের সঙ্গে কি করে এলাম, সে-কথা বলি। আজ বিকালে নদীর ধারে বেড়াবো বলে টাইগ্রীসের উপকূলে গিয়েছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম এই দশজন একটা ছোট নৌকায় চেপেছে। নৌকাটা ছাড়বো ছাড়বো করছে এমন সময় আমি ঠিক করলাম ওদের সঙ্গে নৌকা বিহারে যাবো। আমি নৌকাতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার লোকজন আমাদের গ্রেপ্তার করে ফেলে। আমি তখন বুঝলাম লোকগুলো ডাকাত। কিন্তু যেহেতু আমি মৌনব্রতী মানুষ সেই কারণে আপনার লোকজনদের বা আপনাকে আমি কোন কথা বলিনি। আমি যে নিরপরাধ, নির্দোষ—তা প্রমাণ করার কোনও চেষ্টা করিনি। সারাটা পথ কারো সঙ্গে কোনও কথাবার্তা বলিনি। সেই কারণে আমার সঙ্গে যে আর কারা গ্রেপ্তার হয়েছিলো, কী তাদের পরিচয় কিছুই জানি না।

এইভাবে আমি আপনার দরবারে এসে পড়েছি। আপনার জল্লাদকে যখন হুকুম করলেন গর্দান নিতে, তখনও আমি আমার অসীম ধৈর্য এবং সাহসের পরিচয় দিয়ে চুপ করেছিলাম। আমার মতো সৎসাহসী এবং ধৈর্যবান ব্যক্তি আপনি খুব বেশী পাবেন না, হুজুর। এবং আমি জানতাম আমার সততা, আমার সহনশীলতা, আমার অসম-সাহসিকতা এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি আমাকে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত করে দেবে।

সুলতান আমার কথায় প্রসন্ন হলেন। এবং দরবার কক্ষে সর্বসমক্ষে আমার ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।—তোমার মতো মিতবাক, বিদ্বান, বিচক্ষণ পরোপকারী, নির্ভীক সাহসী ব্যক্তি বিরল।

অথচ একটু আগে, নাপিত বলতে থাকে, আপনারা শুনলেন সেই ল্যাংড়া যুবক আমার নামে কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে গেলো। আমি নাকি বাজে বকবক করি। আমি নাকি তার পা-খানা ল্যাংড়া করার একমাত্র গোঁসাই।

সুলতান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, প্রাজ্ঞ সেখ নাপিত প্রবর, তুমি তো বললে, তোমার আরও ছয় ভাই বর্তমান। তা তারা সবাই কেমন? তোমারই মতো স্বল্পভাষী, বিচক্ষণ জ্ঞানীগুণী তারা?

—না, না, হুজুর, আমি বললাম, একদম না। তারা সবাই আমার থেকে এক্কেবারে আলাদা। আশমান জমিন ফারাক। তাদের সঙ্গে তুলনা করে আপনি আমাকে খাটো করলেন,

জাঁহাপনা। তাদের অবিবেচকের মতো আনতাবড়ী কথা বলা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, কাপুরুষতা, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা সর্বজন বিদিত। তাদের মতো চরিত্রহীন হীনমন্য, পরছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর জঘন্য মানুষ খুব বেশী পাওয়া যায় না। দেখতে বেঁটে বামন। আমার চেহারা দেখছেন হুজুর, কেমন লম্বা চওড়া জাঁদরেল, কিন্তু ওরা একজন খোঁড়া, একজন কানা, একজনের মুখ পোড়া, আর একজন একেবারেই অন্ধ, আমার পঞ্চ ভ্রাতার নাকটা নাই আর ষষ্ঠজন কানে শুনতে পায় না।

আপনি ভাববেন না, জাঁহাপনা, এতোটুকু বাড়িয়ে বলছি আমি। এক এক করে তাদের গুণের কথা সব বলছি আপনাকে, শুনলেই বুঝবেন ওদের সঙ্গে আমার কতো ফারাক।

নাপিতের প্রথম ভাই বাকবুকের কাহিনী ঃ

আপনি তো শুনেছেন, জাঁহাপনা, আমার বড় ভাই বাকবুক ল্যাংড়া। তাকে সবাই বাকবুক বলে ডাকে, তার কারণ—সব সময় মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বের করে—ঠিক যেনো মনে হয়, ভরা কুঁজো থেকে জল ঢালা হচ্ছে।

এক সময়ে বাগদাদ শহরে দর্জির কাজ করতো। একটা ছোট্ট দোকানে সেলাই-এর কাজ করতো সে। দোকান ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলো এক বিরাট সওদাগরের কাছে। সেই বাড়িরই উপরতলায় থাকতো তার বাড়িওলা। আর নিচে ছিলো একটা কলুর ঘানি। আর তার বলদ রাখার একটা ছাপরা।

একদিন আমার ভাই বসে কাজ করছিলো তার দোকানে। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়লো, ওপর তলার কড়িডোরে দাঁড়িয়ে একটি বিবি একমনে রাস্তার লোকজন দেখছে। পরে জেনে ছিলো বাড়িওলার বিবি সে। তার হরিণ চপল চোখ আর পিনোদ্ধত বক্ষ দেখে ওর মনের মধ্যে ভালোবাসা আঁকুপাঁকু করতে থাকে। একেবারে প্রথম দর্শনেই প্রেম। সারাদিন আর সূচে সুতো ভরলো না। এক ফোঁড় সেলাই করতে পারলো না সারাদিন। মুখ তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে রইলো। আবার যদি সে কড়িডোরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু না, সেদিন আর এলো না তার মানসী। পরদিন খুব সকালে এসে দোকান খুললো। সূচ সুতো নিয়ে বসলো। কিন্তু চোখ তার চাতালে। কখন করিডোরে এসে দাঁড়াবে সে, নয়ন স্বার্থক হবে। এই আশায় ঘন ঘন তাকাতে লাগলো। ফলে সারাদিনে যতবার কাপড়ে না সূচ ফুঁড়লো তার চেয়ে বেশীবার বিঁধলো তার আঙ্গুলে। কিন্তু সেদিনও সারা দিনে তার দেখা মিললো না। এইভাবে আরও কয়েকটি দিন কেটে গেলো, কিন্তু তার আর দেখা পাওয়া গেলো না। সে আর কড়িডোরে এসে দাঁড়ালো না। এদিকে কাজকামও কিছুই এগোলো না। রোজগার পাতির নামে লবডঙ্কা। ফলে যা হবার তাই হলো। বাজারহাট হয় না। হাড়ি না চড়ার হাল।

বাড়িওলার বিবিটা ইচ্ছে করেই এই নাচানোর খেলায় মেতেছিলো আমার ভাই-এর সঙ্গে। সে চেয়েছিলো, দুই দিক থেকে সে তাকে দেওলিয়া করে দেবে। প্রথমত তার রুজিরোজগার বন্ধ করা, দ্বিতীয়ত তার বুকে ভালোবাসার আগুন ধরিয়ে দেওয়া। এক ধরনের মেয়ে আছে—যারা পুরুষদের নাচিয়ে তাদের কাজকাম নষ্ট করে আনন্দ পায়। সে ছিলো সেই জাতের ছোঁড়া-নাচানো ছেনাল।

একদিন বাকবুক তার দোকানে বসে আছে খদ্দেরের আশায় এমন সময় মেয়েটি

এসে দাঁড়ালো করিডোরের সামনে। অদ্ভুতভাবে এক চোখ ছোট করে হাসলো। এই না দেখে আমার নির্বোধ ভাই-এর বুকে আগুন ধরে গেলো। সে ভাবলো, মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু সে তো জানতো না, এই ধরনের মেয়েদের এটা একটি ফাঁদ ফেলার কায়দা। এর আগেও সে এইভাবে একটু হেসে, একটু চোখ মেরে বহু ছেলের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

পরদিন সকালে বাড়িওলা নেমে এলো। হাতে তার এক থান রেশমী কাপড়। বললো, আমার কয়েকটা কোর্তা করে দিতে হবে।

দর্জি তো হাতে স্বর্গ পেলো। বললো, নিশ্চয়ই করে দেবো। মাপটা দিয়ে যান।

সারাদিন ধরে কুড়িটা কোর্তা বানালো সে। সন্ধ্যেবেলা বাড়িওলা এলো। কোর্তাগুলো দেখে খুব খুশি। বললো, বাঃ খুব সুন্দর হয়েছে। তা কতো দিতে হবে?

এমন সময় করিডোরে এসে দাঁড়ালো সেই মেয়েটি। চোখের ইশারা করে, আর হাত নেড়ে জানালো, মজুরী নিও না।

তখন বাকবুক গদগদ হয়ে বললো, না না, সে কি! আপনার নিজের ব্যবহারের জন্যে ক'টা কোর্তা বানিয়ে দিলাম, তার জন্যে মজুরী নিতে পারি? না না, সে হয় না।

সেদিন আমার ভাই-এর হাতে একটা কানাকড়িও নাই। বাড়িতে সবাই উপোষ করে আছে। দুপুরে তার নিজেরও খাওয়া হয়নি। অথচ নিজের কাজের ন্যায্য মজুরীটা হাত পেতে নিতে পারলো না—এমনই রামছাগল। সে ভাবলো, তার স্বামীর পোশাক সে বিনি পয়সায় বানিয়ে দিয়েছে বলে মেয়েটি তার ওপর আরও প্রসন্ন হবে। কিন্তু বোকাটা জানে না, এটা তাদের স্বামী-স্ত্রীর যুক্তি করা চাল।

পরদিন সকালে আবার এলো বাড়িওলা। বগলে এক বোঝা কাপড়। বললো, কোর্তাগুলো ভারি সুন্দর বানিয়েছো, ভায়া। কিন্তু ওর সঙ্গে মানান-সই পাতলুন না হলে তো পরে সুখ নাই। তাই পাতলুনের কাপড় কিনে এনেছি। যে ক'টা হয়, বানিয়ে দাও।

বাকবুক বললো, বিলক্ষণ, খুব ভালো মানাবে কোর্তার সঙ্গে। আজই করে দিচ্ছি।

সারা দিন না খেয়ে না দেয়ে, খুব যত্ন নিয়ে কুড়িটা পাতলুন বানালো সে। বাড়িওলার অপেক্ষায় না থেকে নিজেই নিয়ে গেলো সে ওপর তলায়। বাড়িওলা দেখে খুব প্রশংসা করলো, তোমার হাত বড় চমৎকার। এমন সূক্ষ্মকাজ সবাই করতে পারে না। তা তোমার মজুরী কতো? কী দিতে হবে বলো?

এমন সময় দরজার পাশে দু'টো চোখ উঁকি দিলো। বাড়িওলার বিবি এসে দাঁড়িয়েছে। ভাই-এর আমার অবস্থা তখন কাহিল। সারাদিন যার চিন্তায় সে বিভোর, একবার চোখে দেখার জন্যে হা পিত্যেশ করে চেয়ে থাকে ওপরে, সে এখন তার এতো কাছে, একেবারে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি চোখের ইশারা করে, ঘাড়নেড়ে বোঝালো, নিও না, কোন পয়সাকড়ি নিও না। হাতে একটা দিরহাম নাই। সেই জন্যে সারা দিন নাস্তা পানিও করতে পারেনি সে। পয়সার বড় প্রয়োজন। কিন্তু মেয়েটার ইশারায় সব গোলমাল হয়ে যায়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, না না, এর জন্যে আপনাকে কিছু দিতে হবে না। গায়ে গতরে খেটে আপনার একটু উপকারে আসতে পেরেছি। তাতেই আমি ধন্য।

বাড়িওলা টাকা বের করে ওর হাতে দিতে যাচ্ছিলো। বাকবুকের আপত্তি দেখে টাকাগুলো আবার জেবে ভরে ফেললো। সবটাই পূর্ব-পরিকল্পিত সাজানো ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রী

দু'জনে মিলে সাট করে তাকে নাস্তানাবুদ করছে। আমার গর্দভ ভাই কিন্তু সে-সব বুঝতে পারে না।

বাড়িওলা বললো, তুমি আমাদের জন্য এতো করছো, আমার বিবি বলছেন, এর একটা প্রতিদান দেওয়া দরকার। টাকা পয়সা যখন হাত পেতে নেবেই না, অন্য কীভাবে তা পুষিয়ে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে উনি একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তাঁর হয়ে আমি তোমাকে বলছি। আমাদের বাড়িতে একটা এদেশীয় ঝি আছে। বয়স অল্প, দেখতে ভারি সুন্দর। একেবারে ডাগর। তোমার সঙ্গে খুব ভালো মানাবে। আমার বিবি চান, তুমি মেয়েটাকে শাদী করো। তাহলে তো তুমি আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে থাকবে।

বাকবুক ভাবলো, এ-সব তার বিবির চাতুরির খেলা। ওই মেয়েটার সঙ্গে তার শাদী হলে বাড়ির অন্দরে ঢোকার অবাধ গতি হয়ে যাবে তার। তার পর তার সঙ্গে আচ্ছা-সে মহব্বৎ করতে আর বাধা কোথায়? বাড়িওলার বিবির এই কৌশল দেখে বাকবুক অবাক হয়। মেয়েছেলের কি বুদ্ধি! স্বামীকে কলা দেখিয়ে তার সঙ্গে প্রেম করবে, তার জন্যে কি চমৎকার মতলব সে এঁটেছে। বাকবুক বললো, আপনারা দু'জনেই যখন চান, আমার কোনও অমত নাই।

পর দিন বিনা আড়ম্বরে শাদী হয়ে গেলো। নিচের ঘানি ঘরে ওদের বাসর শয্যা পাতা হয়েছিলো। কারণ দোকান ঘরটা ছোট। ঘানির ঘরটা অনেক বড়। সার রাত যাতে তারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারে সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। মনে অনেক আশা নিয়ে বাসর ঘরে গেলো আমার ভাই। কিন্তু সদ্য শাদী করা বিবি তার বিমুখ। বললো, আজ কিছু হবে না, আজ আমার শরীর খারাপ হয়েছে। মেয়েদের শরীর খারাপ হলে শোয়া দূরে থাক, পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় বসতেও হয় না। তাই আজ রাতে একাই তুমি থাকো এখানে। আমি ওপরে শোবো।

এই বলে পাত্রী উপরে পার হয়ে গেলো। আর আমার ভাই মনের দুঃখে একলা শুয়ে রইলো সেই ঘানি ঘরে, ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেলো চেঁচামেচি চিৎকারে। ঘানি ঘরের মালিক রেগে আগুন। আমার হুকুম ছাড়া আমার কারখানায় ঢুকেছো। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।

এই বলে সে আমার ভাই-এর ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলো ঘানির জোয়ালে, আজ ব্যাটা তোকে দিয়েই টানাবো। নে ধর, খুব জোরে জোরে ভালো করে টানবি, না হলে পিটিয়ে লাট করে দেবো।

সপাং করে চাবুকের ঘা পড়লো পিঠে।—কথা কানে যাচ্ছে না। আমার খদ্দেররা এসে পড়বে এখুনি। তাদের তেল দিতে হবে। আর নবাব পুত্তুর চলেছেন গজেন্দ্র গমনে। এইভাবে ঘানি টানলে সারা দিনে কতটুকু তেল বেরুবে? আমার একটা খদ্দেরও যদি ফিরে যায়, তোর পিঠের ছাল চামড়া আমি তুলে দেবো। এখনো বলছি, বাপের সুপুত্তুরের মতো পা চালিয়ে টানো, তা না হলে দেখছো এই চাবুক—তোমার পিঠে ভাঙ্গবো।

এই বলে আবার সপাং সপাং করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলো তার পিঠে—পাছায়। মারের চোটে বাঁই বাঁই করে টেনে ঘোরাতে লাগলো ঘানি। সারাটা দিন একটানা। তারপর বিকালে যখন ছাড়া পেলো, শরীরের আর কিছু নাই। মরার মতো অসাড় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলা দোকানে। সারা গা হাত পা ব্যথায় টনটন করছে। চাবুকের ঘায়ে কেটে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে পিঠে-পাছায়।

বাড়িওলা এসে অনেক দুঃখ জানালো, আহা-হা একি হয়েছে তোমার দশা! আমি ভাই বাড়ি ছিলাম না, তাই এই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। যাক যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা

নাই। মনে কোন দুঃখ করো না ভাই। এটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই না। আমি থাকলে এমনটা ঘটতে পারতো না।

বাড়িওলা মনে মনে হাসলো। ব্যাটার প্রেম করার সাধ মেটাচ্ছি।

বাড়িওলা দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেলে চাকরানীটা এলো। বললো, মালকিন শুনে তোমার দুঃখে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। এতো বড়ো মারাত্মক ভুল কি করে হলো এই নিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করেছে।

চাকরানীটা চলে গেলে এলো সেই শাদীর সাক্ষী। গতকাল সে শাদীর কবুল নামায় একমাত্র সাক্ষী সেজেছিলো। বাকবুককে বললো, তা ভাই সাব, শাদীর প্রথম রাতটা কাটলো কেমন? দেখে মনে হচ্ছে, পাত্রী তোমাকে সুখের সায়রে ডুবিয়ে রেখেছিলো। তা হবে না কেন বলো? অমন কচি বয়স। আর কি মজবুত শরীরের বাঁধুনী। একেবারে ভরা যৌবন। অমন ডবকা মেয়েকে নিয়ে রাত কাটালে শরীর তো এমন নেতিয়ে পড়বেই। তা ভালো তা ভালো, দেখে খুব খুশি হলাম। তোমার মধু-যামিনী বড় মধুর কেটেছে।

বাকবুক আর কি বলবে। চুপ করে সব শুনলো। আর মনে মনে জ্বলতে লাগলো—মধুযামিনী!

সাক্ষী বললো, মেয়েটা সত্যিই খুব ভালো। দেখো, শুধু গত রাতই না, জীবনের প্রতিটি রাত্রিই সে তোমাকে মধু ঢেলে দেবে। তার ভালোবাসায় ভরে যাবে তোমার জীবন।

বাকবুক তখন রাগে ফুঁসছে। মনে হতে লাগলো, এই ধাপ্পাবাজ লোকটাকে একটা লাথি মেরে দোকান থেকে নিচে ফেলে দেয়। কিন্তু পারে না। শুধু চিৎকার দিয়ে ওঠে, থামো, তোমার ওই সব মন ভোলানো কথায় আমার জ্বালা জুড়াবে না। ফুলশয্যা, মধুযামিনী? শালা, সারাদিন ধরে আমাকে কলুর ঘানি টেনে মরতে হয়েছে—আর উনি এসে আমাকে রঙের রসের বাক্যি শোনাচ্ছেন। দূর হও তুমি, আমার দোকান থেকে। তোমাদের জন্যেই আমার আজ এতো কষ্ট। তোমরা সব শালা, শয়তান, বদমাইশ!

লোকটা এবারে থতমত খেয়ে যায়। একটু পরে বলে, তা সবই নসীবের খেলা। তোমার ভাগ্য মন্দ। তা না হলে প্রথম শাদীর রাত এই ভাবে কাটে কখনও? আমার মনে হচ্ছে, মেয়েটার রাশিচক্র তোমার সঙ্গে এক্কেবারে উল্টো। মোটেও খাপ খাবে না। তুমি এক কাজ করো, ওকে তালাক দিয়ে দাও।

—বলা তো খুব সোজা। কিন্তু বলি, তালাক দিতে গেলে যে আক্কেল সেলামী লাগবে সেটা দেবে কে? তুমি দেবে? দূর হও তুমি আমার সামনে থেকে। তোমাদের শয়তানীর জন্যেই আজ আমার এই দশা।

লোকটা চলে যাওয়ার একটু পরে আবার এলো সেই চাকরানীটা। ফিসফিস করে বললো, আমার মালকিন তোমার প্রেমে পাগল, সে বলছে তোমাকে কাছে না পেলে সে গলায় দড়ি দেবে। আমার ডর লাগছে, তুমি যদি রাজি না হও, সে তো তবে আত্মঘাতী হবে। আজ রাতে আমাদের মালিক বাড়ি ফিরবে না। কি যেনো কাজে বাইরে গেছে। তুমি যদি মেহেরবানী করে একটিবারের জন্যে তার ঘরে যাও, তোমাকে পেলে তার সব জ্বালা যন্ত্রণা মিটে যাবে। একটিবার সে তোমাকে কাছে পেতে চায়, আদর করতে চায়। আজ রাতটা তোমাকে খাটে নিয়ে খুব মৌজ করে আনন্দ

করতে চায়। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তুমি একবার করিডোরের দিকে চেয়ে দেখো। সে দাঁড়িয়ে আছে, কখন তুমি একবার চোখ তুলে তাকাবে, সে তোমাকে প্রাণ ভরে একবার দেখবে—শুধু এই আশায়।

বাকবুক বিগলিত হয়ে গেলো। উপরে তাকাতেই দেখতে পেলো, তার প্রিয়া তার মানসী সাশ্রু নয়নে দাঁড়িয়ে আছে তারই দিকে চেয়ে। চোখে চোখ পড়তেই সে দু' হাত এক করে কাতর কাকুতি জানাতে লাগলো। আকারে প্রকারে জানালো, আজ রাতে মালিক বাড়ি থাকবে না, তুমি আমার ঘরে এসো। সারা রাত আমরা এক সঙ্গে কাটাবো। আরও বোঝালো, আমার এই দেহ, আমার এই দিল্, সে শুধু তোমারই জন্যে। তোমাকে কাছে নিতে পারি না বলে এ যৌবন আমার বিফলে চলে যাচ্ছে।

এর পরে আর কোন ক্ষোভ থাকে না। মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মনে হয়, সব ক্লান্তি সব ব্যথা-কষ্ট নিমেষে জল হয়ে গেলো। ঘাড় নেড়ে জানায়, যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। আজকেই হবে আমার সত্যিকারের বাসর-রাত—মধুযামিনী...

মনে স্ফূর্তি নিয়ে আবার কাজে মন দিলো। মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনতে লাগলো। আজ রাতে সে যাবে অভিসারে। তার প্রিয়া প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে তার পথ চেয়ে। তারা আজ একসঙ্গে খানা পিনা করবে। তারপর তার এতোকালের সাধ আজ সে প্রাণ ভরে মেটাবে। তাকে নিয়ে সারা রাত ধরে কতো গল্প করবে, কতো আদর করবে। গোপন মিলনের বাসনায় দেহ-মনে এক অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগে।

কিন্তু ওদিকে ওপরতলায় বাড়িওলা আর তার বিবি তখন নতুন ফন্দী আঁটছে। লোকটার আহম্মকী ভেবে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে দু'জনে। স্বামীটা বললো, দেখো বিবি, আজ রাতে লোকটা যখন তোমার ঘরে আসবে তখন কি করবো বলো তো? আমার মনে হয়, তার আগে কোতোয়ালিতে একটা খবর দিয়ে রাখা ভালো।

বিবি বললে, সে জন্যে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, যা করার আমিই করবো। ভালোবাসার সখ ওর চিরজন্মের মতো ঘুঁচিয়ে দেবো।

তাদের এই বদ মতলবের কোন কিছুই জানতে পারলো না সে। রাত যখন একটু গভীর হয়ে এলো, চাকরানীটা এসে তাকে উপরে নিয়ে গেলো। বাড়িওলার বিবি ওকে সাদরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো।—তোমার পথ চেয়েই বসে আছি, সোনা। তোমাকে দেখার জন্যে বুকের মধ্যে আঁকুপাঁকু করছে। শুধু ভাবছি, কখন রাত হবে, কখন আমার স্বামী হতচ্ছাড়াটা বিদেয় হবে। তোমাকে কাছে পাবো। আমার দেহের জ্বালা জুড়াবো।

আর থাকতে পারে না বাকবুক। মেয়েটার ভালোবাসার কথায় তার শরীর গরম হয়ে ওঠে। চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে যায় তার দিকে। ছলনাময়ী নারী তখন তাকে নিরস্ত করে।—না, না, এখন না। আগে একটু বসো। খানাপিনা করি। তারপর সারা রাত ধরে তুমি আর আমি—শুধু ভালোবাসা করবো।

মেয়েটির কথায় শক-খাওয়া খরগোসের মতো আবার ফিরে এসে বসে পড়ে চেয়ারে। মনে মনে লজ্জা পায়। তাই তো, রাতভর যাকে নিয়ে শুয়ে কাটাব, এখনই তাকে দলামলাই করার জন্যে অধৈর্য হচ্ছে কেন সে?

এমন সময় দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো তার স্বামী—বাড়িওলা। তার সঙ্গে দু'জন নিগ্রো। দমা দম কয়েকটা ঘুসি মেরে নিচে ফেলে দিলো আমার ভাইকে। তারপর আষ্টেপিষ্টে বাঁধলো, রশি দিয়ে। চাবুকের ঘায়ে কেটে সারা শরীরে রক্ত ঝরতে লাগলো। কিন্তু এখানেই শেষ না, মার খেতে খেতে সে যখন অচৈতন্য, ওকে কাঁধে করে নিয়ে গেলো ওরা কোতোয়ালিতে। কোটালের কাছে।

দুশো ঘা বেত লাগানো হলো তার পিঠে। তারপর একটা উটের পিছনে বেঁধে সারা শহর টেনে ঘোরাবার হুকুম দিলো কোটাল। উটের পিছনে বাঁধতে যাওয়ার সময় বিকট চিৎকার করে পা ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিলো উটটা। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাই আমার ছিটকে পড়ে সাত হাত দূরে।

সেই সময়ই তার পায়ের একটা হাড় ভেঙে যায়। সেই থেকে সে ল্যাংড়া—লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামান্য চলা-ফেরা করতে পারে। কোটাল তাকে কিছুকালের জন্য শহর থেকে বহিষ্কারও করে দিয়েছিলো। এখন সে আবার ফিরে এসেছে। আমার কাছেই আছে। বিশেষ চলাফেরা করতে পারে না। কাজ কামই বা করবে কি করে। আমার ঘাড়েই খায়।

খলিফা অল-মুসতানসির বিল্লাহ আমার ভাই-এর এই কাহিনী শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। বাহবা দিয়ে বললেন, বাঃ সেরা তোমার কাহিনী। আর চমৎকার তোমার গল্প বলার কায়দা।

আমি বললাম, জাঁহাপনা, এতো শুধু আমার এক ভাই-এর বোকামীর কাহিনী শোনালাম। আমার আর সব ভাইদের কীর্তি কাহিনী যদি শোনেন আরও মজা লাগবে আপনার। এবং তখন বুঝতে পারবেন, আমার ভাইদের থেকে কতো ভিন্ন আমার স্বভাব প্রকৃতি কতো আমার বিচক্ষণতা এবং কতো আমি মিতভাষী?

খলিফা বললেন, সে আমি এখনই বেশ বুঝতে পারছি। যাই হোক, এক এক করে তোমার সব ভাইদের কাহিনীগুলো বলো। শুনতে ভারি আমোদ লাগছে।

এবার আমার দ্বিতীয় ভাই অল-হাদ্দারের কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

নাপিত বলতে থাকে ঃ

তাকে সবাই অল-হাদ্দার নামে ডাকতো। তার কারণ উটের মতো গলাটাকে একবার সামনে বাড়িয়ে দিতো এবং পরক্ষণেই আবার পিছনে টেনে নিতো। আর মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ তুলতো, মনে হতো উটের ডাক। তার মুখটা ছিলো পোড়া কয়লার মতো। দেখতে বড় বিশ্রী। অহেতুক মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে যে কতরকম কাণ্ডকারখানা করেছে তার সীমা সংখ্যা নাই। তার একটা ঘটনার কথা শোনাই আপনাকে।

একদিন সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় এক বৃদ্ধা এসে তার কাছে একটা প্রস্তাব করলো, শোনো বাছা তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। তুমি সেটা শুনতেও পারো, আবার নাও শুনতে পারো। সবই তোমার খুশি।

হাদ্দার বললো, বেশ তো, বলো না শুনছি।

বৃদ্ধা বললো, বলবো, আমার প্রস্তাব শোনার পর তোমার যদি মনে হয়—তুমি তাতে রাজি হতে পারো, অথবা গররাজীও হতে পারো। কিংবা চিন্তা করে দেখতে পারো রাজি হতে পারো কি পারো না।

হাদ্দার বললো, ঠিক আছে। বলো, শোনার পর বলবো, রাজি হবো কি হবো না।

বৃদ্ধা বললো, একটি শর্ত আছে, বাবা। আমার প্রস্তাব শুনে, অযথা ফালতু কোন প্রশ্ন করবে না। আনতাবড়ী কোন কথাবার্তা বলবে না।

হাদ্দার বললো, ঠিক আছে, তাই হবে। এবার বলো।

বৃদ্ধা বললো, তোমাকে আমি এক সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যার মনোহর দৃশ্য দেখলে তুমি আর ফিরে আসতে চাইবে না। কুলকুল করে নদী বয়ে চলেছে। চারদিকে ফলেফুলে ভরা নানা জাতের লতা গুল্ম বৃক্ষ। ঝর্না দিয়ে ঝরে পড়ছে সরাব। আর চারদিকে বেহেস্তের পরীর মতো খুবসুরৎ সব মেয়ে—গান গাইছে নাচছে আর আনন্দে এ-দিক ও দিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তুমি যাওয়ামাত্র তোমাকে ঘিরে ধরবে তারা। তোমাকে আদর করবে। চুমু খাবে। তারপর সারারাত তোমাকে নিয়ে শুয়ে থাকবে। তোমাকে আমি সেই স্বপ্নের দেশে, সেই প্রমিলা সঙ্গমে নিয়ে যাবো—কিন্তু একটা শর্ত তোমাকে মানতে হবে।

আমার ভাই হাদ্দার অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু দুনিয়াতে এতো মানুষ থাকতে আমাকেই বা সেখানে নিয়ে যেতে চাও কেন? আমার মধ্যে কী গুণ দেখলে?

—আমি তো তোমাকে আগে বলেছি, বাছা, অহেতুক ফালতু প্রশ্ন করবে না বা অযথা কৌতূহল জানাবে না। আমি যা বলি, শোনো, কোনও প্রশ্ন করো না।

আর একটি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বৃদ্ধা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো এক প্রকাণ্ড প্রাসাদে। প্রাসাদটা বাইরে থেকে দেখতে যতো না সুন্দর ভিতরটা তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রাসাদের দোতলায় উঠে এলো তারা। সেখানে দেখলো, চারটি পরমাসুন্দরী মেয়ে মেজের গালিচায় বসে সুর করে গান করছে। কি অপূর্ব তাদের কণ্ঠ। কি মিষ্টি।

মেয়েদের মধ্যে যে সবচেয়ে সেরা সুন্দরী সে উঠে এসে স্বাগত জানালো তাকে। এক পেয়ালা সরাব এনে ধরলো তার ঠোঁটে। আমার ভাই খেলো। আরও এক পেয়ালা ভরে এনে দিলো সে। সে পাত্রও টেনে নিলো হাদ্দার। এবার মেয়েটি সরে এসে তার গলাটা এক হাতে চেপে ধরে আর এক হাতে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিলো তার গালে।

আমার ভাই খুব রেগে ওঠে। উঠে চলে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু বৃদ্ধা চোখের ইশারা করে বলে, না যেও না, বসো।

হাদ্দার ভাবলো, সে বৃদ্ধার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই আবার বসে পড়ে। মেয়েটি তাকে থাবড়াতে লাগলো, চিমটি কাটতে লাগলো, শেষে এলোপাথাড়ী কিল আর লাথি মারতে থাকলো। বাকী তিনটি মেয়েও কিন্তু চুপ করে বসে রইলো না। একজন মাথার চুল ধরে টানতে লাগলো, আর একজন কান দু'টো মলতে থাকলো আর অন্যজন তার ধারালো নখ বসিয়ে দিলো তার গালে।

এই সব অসহ্য কাণ্ডকারখানা যখন চলছে, বৃদ্ধা কিন্তু তখন বলছে ধৈর্য ধরে চুপচাপ বসে থাকো বাছা। কোনও কথা বলো না, কোনও প্রতিবাদ করো না।

আমার ভাই হাদ্দার অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিলো। একটা কথাও বললো না। এতো চড়চাপড় লাথি খেয়েও কোনও রা-টি করলো না। অবশেষে প্রথম মেয়েটি হাদ্দারকে তুলে দাঁড় করিয়ে তার জামা পাতলুন সব খুলে নিলো। একেবারে ন্যাংটো করে ফেললো তাকে। তারপর একটা সোনার পিচকারী এনে তার সারা গায়ে গোলাপ জল পিচকারী করে দিলো। এবং বললো, আমি কোনও দাঁড়ি গোফওয়ালা মানুষকে সহ্য করতে পারি না। তারা যখন চুমু খায় তখন আমার নরম গালে বিশ্রী খোঁচা লাগে। তুমি যদি আমার সঙ্গে ভালোবাসা করতে চাও তবে আগে তোমার ঐ বিশ্রী দাড়ি গোঁফগুলো কামিয়ে এসো।

সেই বৃদ্ধা তখন হাদ্দারকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ক্ষুর দিয়ে তার দাড়ি গোঁফ আর ভুরুটুরু সব কামিয়ে দিলো। তারপর লাল আর সাদা রঙের ডোরা কেটে দিলো তার সারা মুখে। পাশের ঘর থেকে এ ঘরে এসে মেয়েদের সামনে এসে দাঁড়াতেই মেয়েগুলো ওর ওই

চেহারা দেখে প্রথমে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর হো হো করে হেসে মেজেতে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।

প্রথম মেয়েটি উঠে এসে বললো, মালিক তোমার অপরূপ রূপে আমি মুগ্ধ। এবার একটু নাচো।

হাদ্দার বুঝলো তামাশা করছে। ক্ষুব্ধ হয়ে সে ফিরে দাঁড়ালো। কিন্তু মেয়েটি সামনে এসে ওর দুটি হাত ধরে কাছে টেনে বললো, রাগ করলে? কিন্তু সত্যি বলছি, তোমার এই মন ভোলানো রূপে আমি পাগল হয়ে উঠেছি। এবার একটু নাচো। তারপর আমরা ভালোবাসা করবো।

অতঃপর এক টুকরো রেশমী কাপড় কোমরে জড়িয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাচলো সে। উদ্দাম নৃত্য। তার আসুরিক কায়দায় হাত-পা চালনার ফলে ঘরের ফুলদানী মদের ঝারি, গেলাস অনেক কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগলো। মেয়েরা হেসে লুটোপুটি হলো।

নাচ তখনও চলছে, প্রথম মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। এবং এক এক করে সব জামা কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। আর এমন অঙ্গভঙ্গী করতে থাকলো, যা দেখে আমার ভাই-এর অবস্থা তখন তুঙ্গে। সারা শরীর শির শির করতে থাকে। মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। চোখ দু'টো ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে যায়। এসব কি দেখছে সে? এসব কি করছে মেয়েটা। উফ! সে আর চাইতে পারছে না। হাদ্দার নাচ থামিয়ে দিলো।

বৃদ্ধা বললো, মেয়েটা ছুটবে, তোমাকে কিছুতেই ধরা দিতে চাইবে না। কিন্তু তোমার কাজ হবে, যেন তেন-প্রকারেন তাকে ধরে ফেলা। এটাই এখানকার রীতি। মেয়েটা এঘর থেকে ওঘরে, ওঘর থেকে সে-ঘরে তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে। তোমার একমাত্র লক্ষ্য—তাকে ধরা। ধরতে পারলেই সে তোমার অঙ্কশায়িনী হবে।

মেয়েটি দৌড় শুরু করে, আর হাদ্দার তাকে ধরার জন্যে তার পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে। মেয়েটি বাঁই বাঁই করে ছুটে দু-দুবার ঘুরে এলো সারা মহল, কিন্তু হাদ্দার তাকে ধরতে পারলো না।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

একত্রিশতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়। শাহরাজাদ বলে, তারপর শুনুন শাহজাদা, চীন-সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে সেই দর্জি তার কাহিনী বলে চলেছে ঃ

নাপিত তার দ্বিতীয় ভাই অল-হাদ্দারের নির্বুদ্ধিতার সেই কাহিনী শোনাচ্ছে বাগদাদের সুলতান সমীপে ঃ

হাদ্দার তখন উন্মত্ত হয়ে ধাওয়া করে চলেছে সেই মেয়েটির পিছনে পিছনে। মেয়েটি হাসছে, আর কায়দা করে তাকে পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছে।

বাকী তিনটি মেয়ে মজা পেয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। ধরি ধরি করেও যখন ধরতে পারছে না, হাততালি দিয়ে উঠছে।

মেয়েটি এবার সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উপরে উঠে পালায়। ছেলেটি যায় পিছনে পিছনে। এঘর ওঘর তাড়া করে ছুটতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারে না। একবার

মেয়েটি পাশের একটা ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে হোচট খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়। হাদ্দার ভাবে, এইবার আর সে পালাতে পারবে না। ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ঘরের ভিতরটা মিশমিশে কালো—অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। হাদ্দার অন্ধের মতো হাতড়ায়। কোথায় গেলো মেয়েটা? এপাশ ওপাশ হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। কিন্তু চোখে কিছু দেখা না গেলে খুঁজে পাবে কি করে? অন্ধকারের মধ্যে তাই আন্দাজে চলতে চলতে এক সময় বিপত্তি ঘটে। বুঝতে পারেনি কার্নিশে পা পড়তেই উল্টে গিয়ে পড়লো নিচে রাস্তায়। একটা মুচির দোকানের সামনে। দোকানের মালিক বেরিয়ে এসে দেখে, একটা কিম্ভুত কিমাকার লোক—সম্পূর্ণ উদোম, দাড়ি গোঁফ ভুরু কামানো সারা মুখে লাল সাদা রঙের ডোরা কাটা, যেন একটা জোকার—উপর থেকে পড়ে গেছে। দোকানী ভাবলো, লোকটা চোর বদমাইশ। সবাই মিলে বেদম পেটালো। অতোটা উপর থেকে পড়ে গেছে, তার উপর চামড়ার চাবুকের পিটানি সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়লো হাদ্দার। তখন সেই মুচি তাকে একটা গাধার পিঠে চাপিয়ে কোতোয়ালিতে নিয়ে এলো। কোটালের প্রশ্নের জবাবে মুচি বললো, লোকটা বোধ হয় আমাদের উজির সাহেবের বাড়ি ঢুকেছিলো চুরি করতে। কিন্তু অন্ধকারে ঠাওর করতে না পেরে খোলা বারান্দার কার্নিশে পা দিতেই আমার দোকানের সামনে পড়ে যায়।

কোটাল তাকে দুশো ঘা বেত-এর সাজা দিয়ে শহর থেকে বের করে দেয়। আমি খবর পেয়ে গোপনে আমার ভাইকে ঘরে নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখেছি। তার নির্বুদ্ধিতার দোষে সে আজ পঙ্গু। আমি আমার সহজাত উদারতায় তাকে আশ্রয় দিয়েছি। এখন সে আমার ঘাড়েই খায়।

কিন্তু জাঁহাপনা, আমার তৃতীয় ভাই-এর কাহিনীটা একটু অন্যরকম, বলছি শুনুন।

তৃতীয় ভাই বাকবক-এর কাহিনী।

বাগদাদের ভিখিরিদের সে পাণ্ডা। একেবারে পুরোপুরি অন্ধ। একদিন ভিক্ষেয় বেরিয়ে চলতে চলতে এক বিরাট বড়লোকের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো।—কই গো, কে আছো?

আমার এই অন্ধ ভাই বাকবক-এর ভিক্ষে করার কায়দা একটু অন্যরকম। প্রথমে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে শুধু ওই একটি কথা-ই উচ্চারণ করবে, 'কই গো, কে আছো'। দরজা খোলার আগে সবাই একবার জিজ্ঞেস করে, 'কে'? কিন্তু আমার ভাই আর 'রা'টি কাড়বে না। ভিজে বিড়ালের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেননা, বেশিরভাগ লোকই, যদি বুঝতে পারে ভিখিরি, দরজা না খুলে বলে দেয়, 'এখানে কিছু হবে না, বাছা, অন্য জায়গায় দেখো।' ও সেই জন্যেই দরজা খোলার আগে কোনও কথা বলে না। এর ফল কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বেশ ভালো হয়। অন্ধ লোককে সামনে দেখলে স্বভাবতই আমরা একটু বেশী মাত্রায় করুণা পরবশ হয়ে পড়ি।

সে-দিনও সে সেই বড়লোকের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে যথারীতি একটা হাঁক দিলো, কই গো, কে আছো?

একটু পরে উপরতলা থেকে আওয়াজ এলো, কে?

আমার ভাই কিন্তু দারুণ সেয়ানা। কোন জবাব দিলো না। আবার প্রশ্ন এলো, কে? কে ওখানে? কথা বলছো না কেন?

কিন্তু তখনও ভ্রাতা আমার নিরুত্তর। একটু পরে সশব্দে দরজাটা খুলে গেলো।—কে?

এবার বাকবক করুণ কাকুতি কণ্ঠে বলে, আমি অন্ধ নাচার, বাবা। আপনাদের দয়াতে বেঁচে আছি। এক মুঠো ভিক্ষে চাই।

লোকটি কাছে এগিয়ে এসে বললো, দেখি তোমার একখানা হাত!

আমার ভাই বাড়িয়ে দিলো তার ডান হাতখানা। লোকটা বললো, আমার সঙ্গে এসো।

এই বলে সে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে অনেক সিঁড়ি ভেঙে তিনতলার ছাদের ওপরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো তাকে। আমার অন্ধ ভাইটি ভাবলো, লোকটা বোধ হয় খুব ধর্মপ্রাণ। ভালোমন্দ অনেক কিছু খাওয়াবে তাকে।

কিন্তু ওর খোয়াব কেটে গেলো। লোকটা বললো, তোমাকে যখন বারবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কে? কে?' তুমি সাড়া দিলে না কেন? কেন আমাকে তিনতলা থেকে নিচে নামালে? কেন আমাকে দিয়ে দরজা খোলালে? কেন? আমি কি তোমার নফর। তোমাকে এই তিনতলা থেকে নিচে ফেলে দেবো আমি—শয়তান কাঁহাকা। যাও ভাগো, আর কোনও দিন এরকম বেয়াদপি করবে না।

বাকবক মুখ কাঁচুমাচু করলো। কোন জবাব দিলো না। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলো। কিন্তু নসীবে যা লেখা আছে তাকে সে এড়াবে কি করে। দোতলা থেকে একতলা নামতে গিয়ে লাঠি হড়কে পড়ে গেলো সে। তারপর গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে এসে পড়লো। সারা শরীর ব্যথায় টনটন করতে লাগলো। মনের দুঃখে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। এমন সময় তার আর দু'জন সঙ্গী এসে জুটলো। তারাও অন্ধ। ভিক্ষে করে খায়। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে যাচ্ছে শুনে, কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি গো, ওস্তাদ কি হলো? অমন কাতরাচ্ছো কেন?

বাকবক তার দুঃখের কাহিনী বললো। তারা শুনে সমবেদনা জানায়। বলে, আজ তোমার নসীব খারাপ, আজ আর ভিক্ষে করে কাজ নাই, বাসায় ফিরে যাও।

বাকবক বলে, আমিও তাই ভাবছি, বাসাতেই ফিরে যাবো। ঘরে যা জমানো টাকা আছে তার থেকে কিছু বের করে দু'খানা রুটি কিনে খাবো। কিন্তু আমার সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। তোমরা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো। না হলে যেতে পারবো না। ওরা বললো, ঠিক আছে চলো, তোমার রুটি তরকারী কিনে এনে দেবো।

ওরা যখন এই সব কথা আলোচনা করছে সেই সময় একটা চোর ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। অন্ধদের কথা শুনে তাদের পিছু পিছু চলতে লাগলো সে। তিন অন্ধ এসে বাকবকের ঘরের দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো। পা টিপে টিপে চোরটাও ঢুকে পড়লো। বাকবক বললো, দরজাটা বন্ধ করে দাও। তারপর ভালো করে হাতড়ে দেখো, আমাদের পিছনে অন্য কোন লোক ঢুকে পড়েছে কিনা। উপর থেকে একটা সিকে ঝুলছিলো, ওটা ধরে চোরটা উপরে উঠে গিয়ে টঙ্গে বসে থাকলো। অন্ধ যখন হাতের লাঠি দিয়ে ঘরের চারপাশ হাতড়ে দেখে নিশ্চিন্ত হলো, না, কোনও বাইরের লোক ঢোকেনি, বাকবক তখন তার লুকিয়ে রাখা জমানো টাকার থলেটা বের করলো। তিনজনে মিলে গুনলো। দশ হাজার দিরহাম। এগুলো সে সারাজীবন ধরে ভিক্ষে করে জমিয়েছিলো। বাকবক তার থেকে কয়েকটা দিরহাম নিয়ে একজনকে বললো, আমাদের জন্যে তিনখানা রুটি আর একটু শব্জী নিয়ে এসো। সবাই বসে খাই। তারপর আমি শুয়ে পড়বো। মনে হচ্ছে হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে। ব্যথায় টনটন করছে সারা শরীর।

অন্ধটা রুটি আর শব্জী নিয়ে এলে তিনজনে মিলে খেতে বসলো। এমন সময় চোরটা খুব সন্তর্পণে নিচে নেমে এসে, ওদের পাশে বসে রুটির কোনা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো।

আমার ভাই-এর কান খুব ভালো। বুঝতে পারলো, আরও একজনের চোয়ালের শব্দ হচ্ছে। চিৎকার করে উঠলো, চোর চোর, পাকড়াও।

এই বলে সে হাত দু'খানা এদিক ওদিক ঘোরাতে লাগলো। চোর দেখলো বেগতিক—উঠে পড়ে পালাতে যাবে, বাকবকের হাতে ধরা পড়লো তার পা দু'খানা। গড়মড় করে চেপে

ধরতেই ধড়াস করে পড়ে গেলো লোকটা। তখন ওরা তিনজনে মিলে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করতে লাগলো। চোর তখন প্রাণ ভয়ে পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু না, ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছে তারা।

বাকবক চিৎকার করতে লাগলো,—চোর চোর চোর। কে আছো, মুসলমান ভাইসব, ছুটে এসো, চোর চোর—

বাকবকের সঙ্গে ওর দুই সঙ্গীও সমানে 'চোর চোর' বলে আওয়াজ তুলতে থাকে। পাড়পড়শীরা ছুটে এলো।

—কী ব্যাপার, কি হয়েছে?

চোরটা তখন তার চোখ দু'টো বন্ধ করে অন্ধের ভান করে বলে, দেখো তো ভাই সব, আমরা চারজন একসাথে ভিক্ষে করি। এতোকাল ধরে আমার ভাগে দশ হাজার দিরহাম জমেছে। সেই টাকাটা আজ নিতে এসেছিলাম। তা টাকা তো দেবেই না, আবার উল্টে চোর চোর বলে চেঁচাচ্ছে। তোমরা আমাদের থানাতেই নিয়ে চলো।, ভাই সব। কোটালসাহেব এর ন্যায্য বিচার করবেন। আমার ভাগের ন্যায্য পয়সা আমি পাবো না?

চোরের কথা শুনে আমার ভাই-এর আক্কেল গুড়ুম। বলে কি ব্যাটা! পাড়াপরশীরা বললো, তাই ভালো, চলো তোমরা কোতোয়ালিতে চলো। যা করার কোটাল সাহেবই ব্যবস্থা করবেন।

চারজনকেই কোতোয়ালিতে নিয়ে এলো তারা। দশ হাজার দিরহামের থলেটা নিয়ে এসে দিলো কোটাল সাহেবের হাতে।

প্রথমে চোরটাই জবান-বন্দী দিতে উঠলো। চোখ দু'টো তার তখনও বন্ধ। বললো, হুজুর টাকাটা আমার ভাগের ন্যায্য পাওনা। কিন্তু ওরা আমাকে দেবে না। আমাকে চোর সাব্যস্ত করে আপনার হাতে তুলে দেবে এই ছিলো তাদের ফন্দী। আপনি ধর্মাবতার, ন্যায্য বিচার করুন।

বাকবক উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সব মিথ্যে কথা, হুজুর। ও লোকটা চোর। আমরা তিনজন যখন ঘরে ঢুকি, আমাদের পিছু নিয়ে সেও ঢুকে পড়েছিলো। কোটাল মহা ফাঁপড়ে পড়লো। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, এমন সময় চোরটা প্রস্তাব করলো, হুজুর আমি বলি কি, আমাদের সবাইকে পিটুনি লাগান। তা হলে, মারের চোটে বাছাধনরা কবুল করতে পথ পাবে না।

কোটাল ভাবলো, হুঁ, লোকটা তো ঠিকই বলেছে। পিটানিই এখানে একমাত্র ওষুধ। একজন সিপাইকে বললো, লাগাও চাবুক।

চোরটা সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো, আমাকে দিয়েই শুরু করুন, হুজুর।

চাবুকের কয়েক ঘা পিঠে পড়তেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো চোরটা। চোখ দু'টো খুলে কোটালের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকাতে লাগলো।

কোটালের চোখও ছানা বড়া—সে কি! তুমি না অন্ধ?

—আজ্ঞে, কেউ আমরা অন্ধ নই। ওটা আমাদের ভিক্ষের সাজানো মূলধন। অন্ধ সাজলে লোকের মনে দয়া মায়া একটু বেশি হয়। এমনি ভিখিরিদের চেয়ে আমরা অনেক বেশি রোজগার করি।

—তাজ্জব ব্যাপার, কোটাল বললো, বাকী তিনজন? ওরাও কি তোমারই মতো?

—জী হুজুর। কেউই অন্ধ না। বিশ্বাস না হয় চাবুক চালান। দেখবেন, চোখ খুলতে পথ পাবে না, বাছাধনরা। অন্ধ সেজে শুধু পয়সাই বেশি রোজগার হয় না, আরও কিছু ফাও মেলে।

কোটাল প্রশ্ন করে, কী রকম?

—অন্ধ সেজে বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে গেলেও কারো কোনও আপত্তি থাকে না। বাড়ির কর্তারা ভাবে, আহা, বেচারী অন্ধ। চোখে দেখতে পায় না। তা যাক না অন্দরে। ওর জন্যে তো মেয়েদের আব্রু নষ্ট হবে না।

কিন্তু মেয়ে-মহলে ঢোকার পর যখন আমরা চোখ খুলে দিই, মেয়েরা খুব অবাক হয়। হাতে স্বর্গ পায়। কারণ, সারাজীবন ধরে কোনও পরপুরুষের মুখ দেখার, সঙ্গ পাওয়ার সৌভাগ্য হয় না তাদের। আমাদের দিয়ে প্রাণের সাধ মিটিয়ে নেয় তারা। এই সব ক্ষেত্রে ভিক্ষের মাত্রাটা অনেক বাড়িয়ে দেয় মেয়েরা।

কোটালের হুকুমে বাকবক আর তার দুই সঙ্গীর পিঠে চাবুক পড়তে থাকে। কিন্তু চোখ আর খোলে না তারা। কোটাল ভাবে, ব্যাটারা একেবারে রাম ঘুঘু। মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তিনজন। একেবারে বেহুঁশ। কিন্তু তবুও চোখ খোলে না। কোটালের হুকুমে ওদের তিনজনকে শহরের বাইরে ফেলে দিয়ে আসে সেপাইরা। বাকবকের টাকার থলে থেকে আড়াই হাজার দিরহাম চোরটাকে দিয়ে কোটাল বলে, যা ভাগ। এগুলো ওদের তিনজনের জন্যে রইলো।

চোর তো মহাখুশি হয়ে চলে যায়। কোটাল কিন্তু বাকী টাকাটা নিজের জেবে পুরে ফেলে।

আমি যখন খবর পেলাম, আমার প্রাণের ভাই বাকবককে মেরে অজ্ঞান করে শহরের বাইরে ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে, আমি আর থাকতে পারিনি। সবারই অলক্ষ্যে তাকে ঘরে এনে সেবা-যত্ন করে সারিয়ে তুলি। এখন সে অনেকটা সুস্থ। কিন্তু তাকে আর ভিক্ষে করতে পাঠাই না। আমার রোজগারেই সে খায়। এখন জাঁহাপনা, আপনিই ভেবে দেখুন, আমি কতো উদার, কতো মহৎ।

খলিফা অল-মুসতানির বললেন, একশোবার। তোমার মতো উদার, পরোপকারী, মিতবাক, দূরদর্শী ব্যক্তি আমি খুব কম দেখেছি। আমি তোমাকে খুশি হয়ে একশো দিনার পুরস্কার দিচ্ছি। ওটা নিয়ে তুমি বাড়ি যাও।

আমি বললাম, কিন্তু হুজুর আপনি আমার বাকী তিন ভাই-এর কথা শুনবেন না? খুব সংক্ষেপেই বলছি। কারণ, আপনি তো জানেন, জাঁহাপনা, বেশী বকবক করা আমার ধাতে সয় না।

খলিফা বললেন, ঠিক আছে, শোনাও।

নাপিতের চতুর্থ ভাই অল-কুজের কাহিনী।

নাপিত বলতে শুরু করে : আমার এই ভাইয়ের নাম যুশবান-অল-কুজ। তার অর্থ হলো—কাঁসার কুঁজো ঠোকার আওয়াজ। এক সময়ে বাগদাদের খুব নাম করা কষাই ছিলো সে।

বেছে বেছে সেরা ভেড়া কিনে আনতো। তার চেকনাইওলা গোস-এর প্রশংসা করতো সবাই। শহরের যত বড় বড় খদ্দের সব ভীড় করতো তার দোকানে। তার মতো ভালো মাংস আর কেউ দিতে পারতো না। ফলে, অল্পকালের মধ্যেই সে অনেক পয়সা বানিয়ে ফেলে। কিন্তু পয়সা সকলের ভাগ্যে চিরদিন সহ্য হয় না।

একদিন এক সাদা দাড়িগোঁফওলা বৃদ্ধ তার দোকান থেকে খানিকটা মাংস কিনলো। সদ্য তৈরি ঝকঝকে রূপোর দিনারে দাম মিটিয়ে চলে গেলো। আমার ভাই অল-কুজ পয়সাগুলো নেড়ে চেড়ে উল্টেপাল্টে দেখলো—সবগুলোই রূপোর এবং আনকোরা নতুন ঝকঝকে। অল-কুজ পয়সাগুলো আলাদা একটা বাক্সে ফেলে রাখলো। এমন সুন্দর পয়সা খরচ করতে মায়া হয়। বৃদ্ধ রোজই দোকানে আসে। রোজ মাংস কেনে, আর রোজই একই ধরনের ঝকঝকে আনকোরা রূপোর দিনার দিয়ে যায়। অল-কুজ যথারীতি সে-গুলো সেই বাক্সে ফেলে রাখে। ভাবে, পরে বেশ

কিছু টাকা জমে গেলে ভালো দাম দিয়ে একজোড়া লড়াই-এর ভেড়া কিনবে সে। (এক সময় বাগদাদের ভেড়ার লড়াই-এর খুব নামডাক ছিলো। বহু দূর থেকে লোকে দেখতে আসতো)।

অবশেষে একদিন টাকাটা গুণবে বলে বাক্সটা খুলে দেখলো টাকা পয়সা কিচ্ছু নাই। আছে শুধু কতকগুলো গোলগোল সাদা কাগজের টুকরো। অল-কুজের মাথায় বাজে ভেঙে পড়ে। একি সর্বনাশ করে গেছে লোকটা। যাদুমন্ত্র করে টাকার বদলে কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেছে তাকে। নিজের গাল নিজেই থাবড়াতে লাগলো। মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো। চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুনে অনেক লোকজন জড়ো হতে লাগলো। তাদের সবাইকে বললো, বৃদ্ধটা কি সর্বনাশ তার করে গেছে। কিন্তু তার এই আজগুবি গল্প বিশ্বাস করতে চাইলো না কেউ। এমন সময় ভীড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালো সেই বৃদ্ধ। আর তখনই অল-কুজ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগলো, এই সেই শয়তান, জোচ্চোর—আমাকে ঠকিয়ে সাদা কাগজ দিয়ে ভালো ভালো মাংস নিয়ে গেছে।

বৃদ্ধের দাড়ি গোঁফ খামচাতে থাকে অল-কুজ। বৃদ্ধ কিন্তু শান্ত ভাবে চুপচাপ সহ্য করতে লাগলো তার এই মারধোর। কোন বাধা দিলো না। শুধু আস্তে খুব আস্তে আস্তে বললো, ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে।

অল-কুজ বলে, ছাড়বো? চলো তোমাকে কোতোয়ালিতে নিয়ে গিয়ে কোটালের হাতে তুলে দেবো। লোক ঠকানোর মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ তখনও বলে, আমাকে ছেড়ে দাও, তাতে তোমার ভালো হবে। না হলে তোমার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। আমি তোমাকে নগদ পয়সা দিয়েছি—মাংস নিয়েছি। এর মধ্যে ঠকাবার কি প্রশ্ন থাকতে পারে?

—নগদ পয়সা দিয়েছো? এগুলো পয়সা? ঠগ, জোচ্চোর কোথাকার।

বৃদ্ধ তেমনিভাবেই বলে, ওসব ঝুট কথা বলে লোক হাসাচ্ছো কেন? আমি কাগজের টুকরোগুলো দিয়েছি আর তুমি তার বদলে আমাকে ভালো ভালো মাংস দিয়েছো? এ কথা বিশ্বাস করবে কেউ? জিজ্ঞেস করো, এখানে যারা হাজির আছেন?

কিন্তু কেউ বিশ্বাসসূচক সম্মতি জানালো না। বরং বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো, তা কি করে সম্ভব? তুমি কি পয়সাকড়ি বাজিয়ে নাওনি?

অল-কুজ বললো, আপনারা বুঝছেন না, ও ব্যাটা যাদুকর। ঠগ, প্রতারক।

বৃদ্ধ বললো, প্রতারক আমি, না তুমি? ভেড়ার মাংস বলে দিনের পর দিন মানুষের মাংস বিক্রী করছো—তুমি লোক ঠকাচ্ছো, না আমি ঠকাচ্ছি?

উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেলো সে কথা শুনে। একটুক্ষণের মধ্যেই গুঞ্জন উঠলো।—সেকি? মানুষের মাংস খাইয়েছে আমাদের?

বৃদ্ধ বলল, হ্যাঁ। মানুষের মাংস বিক্রী করেছে সে। আর ভেড়ার চেকনাই মাংস বলে বেশীদাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন আপনারা।

—মিথ্যে কথা, অল-কুজ চিৎকার করে ওঠে, আমার মাংস সাচ্চা ভেড়ার মাংস। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে ভেজাল মাংস বিক্রী করি আমি, সারাজীবন গোলাম হয়ে থাকবো তার। আমার সর্বস্ব দিয়ে দেবো তাকে।

বৃদ্ধ হাসলো, অত বাহাদুরী করো না, এখুনি আমি তোমার গুমোর ফাঁক করে দেবো।

এই বলে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে অল-কুজের ভিতরের কামরায় ঢুকে পড়লো। এখানে সে ভেড়া জবাই করে ছালচামড়া ছাড়িয়ে মাংসের বড় বড় খণ্ড তৈরি করে। বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগলো, এই দেখুন ভাই সব, যে মাংসের খণ্ডগুলো টাঙানো

আছে তার মধ্যে এইগুলো ভেড়ার আর এইগুলো মানুষের। কিন্তু ঐ নিচের দিকে তাকিয়ে দেখুন ঘরের ঐ কোণে তিনটি মানুষের মাথা।

সবাই দেখে শিউড়ে উঠলো। একজন তো অজ্ঞান হয়ে পড়েই গেলো মাটিতে। জনতার রুদ্র-রোষে তখন আমার ভাই-এর যে কি দশা—আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, জাঁহাপনা। কিল চড় লাথি যে যে-ভাবে পারলো মারতে থাকলো। আমার নিরপরাধ ভাই কিছুতেই বোঝাতে পারলো না, এ সব তোমরা বিশ্বাস করো না। লোকটা যাদুকর। তোমাদের সবাইকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। মেরেই তারা ক্ষান্ত হলো না। হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলো কোতোয়ালিতে। কোটাল শুনে তিনশো বেতের ঘা সাজা দিলো তাকে। বেচারী অল-কুজ! মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। কোটাল তার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলো তাকে। উন্মত্ত জনতা যখন তার ওপর চড়াও হয়ে কিল চড় ঘুসি চালিয়েছিলো সেই সময় তার বাঁ চোখে একটা প্রচণ্ড ঘুসি এসে লাগে। ফলে চোখটা কানা হয়ে যায়।

মনের দুঃখে অল-কুজ অন্য এক অচেনা দেশের অচেনা শহরে চলে গেলো। একটা রাস্তার মোড়ে বসে জুতো সারানোর কাজ করতে থাকে। সারাদিন খেটে কোন রকমে পেটের খাবার জোগাড় হয়।

একদিন ওই রাস্তার মোড়ে বসে জুতো সেলাই করছে, এমন সময় 'হট যাও হট যাও' রব উঠলো। অল-কুজ তাকিয়ে দেখে, একদল পল্টন ঘোড়া ছুটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। লোক মুখে শুনলো, সুলতান শিকারে যাচ্ছে, তাই তার পল্টনরা ভিড় হটাচ্ছে। একটু বাদেই দেখা গেলো, বিরাট একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে সুলতান আসছেন। তার সামনে পিছনে সশস্ত্র পল্টনবাহিনী। মোড়ের মাথায় এসে বাঁ চোখে ঠুলী পরা অল-কুজের ওপর চোখ পড়তেই চিৎকার করে ওঠে সুলতান।—হায় আল্লাহ একি দেখলাম আমি। কানা লোক দেখলে যে অযাত্রা হয়। সুলতানের আর শিকারে যাওয়া হলো না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে প্রাসাদের দিকে ফিরে চললেন। বলে গেলেন, এই অপয়া অযাত্রা লোকটাকে শায়েস্তা করো।

সুলতানের হুকুম শোনামাত্র তার দেহরক্ষীরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ী ডাণ্ডা মারতে লাগলো। বেচারী অল-কুজ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান

ফিরলে কোনরকমে বুকে হেঁটে হেঁটে আস্তানায় ফিরে আসে। হাড়গোড় সব ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। সে শুধু ভাবতে লাগলো, কী তার অপরাধ? কেন তাকে ওরা অমনভাবে মারলো? একজনকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাই বলতে পারো, কেন আমাকে ওরা এইভাবে মারলো?

লোকটি রাজদরবারে চাকরী করে। বললো, সে কি। তুমি জানো না? আমাদের সুলতান কোনও কানা লোককে সহ্য করতে পারেন না। বিশেষ করে সে আবার যদি বাঁ চোখ কানা হয়। সুলতানের বিশ্বাস, বাঁ চোখ-কানা লোক দেখলে সব শুভ কাজ পণ্ড হয়ে যায়। সেই

জন্যে তার হুকুমই আছে বাঁচোখ কানা লোক নজরে পড়া মাত্র হত্যা করবে। তা তোমার তো অনেক বরাত জোর, তা না হলে জানে বাঁচলে কি করে তুমি?

লোকটির একথা শুনে অল-কুজ শঙ্কিত হয়। হয়তো পল্টনগুলো ভেবেছিলো, সে মরে গেছে, তাই তারা ফেলে দিয়ে চলে গেছে। অল-কুজ ঠিক করলো, আর এক মুহূর্ত এ শহরে থাকবে না, যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে। জুতো সেলাই-এর যন্ত্রপাতিগুলো বেঁধেছেঁদে নিয়ে সেইদিনই রাতের অন্ধকরে গা ঢাকা দিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। চলতে চলতে এমন এক শহরে এসে পৌঁছলো যেখানে কোন সুলতান বাস করে না।

বেশ কয়েকটা দিন ভালোয় ভালোয় কাটলো। মনে হলো জায়গাটা মন্দ না। একদিন বিকালবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলো সে। পাহাড়ের পাদদেশে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি নির্জন। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজে চমকে উঠলো অল-কুজ। মনে হলো তীর বেগে ছুটে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার। ভয় হলো তার, হয়তো বা পল্টনবাহিনী। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলো সে। কিন্তু নিজেকে লুকোবার মতো একটা জুতসই জায়গা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হঠাৎ চোখে পড়ে অদূরেই একটা পোড়ো বাড়ি। দরজা জানলা সব হাট করে খোলা। সোজা গিয়ে বাড়িটার অন্দরে ঢুকে পড়লো। বারান্দায় একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে থাকে, ঘোড়সওয়ারগুলোর গতিবিধি। হঠাৎ দুটি লোক পিছন দিকে চেপে ধরলো তাকে।—এইবার বাছাধন, যাবে কোথায়? তিন তিনটে দিন আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছো? শালা, কিছুতেই ধরতে পারি না। একেবারে পাঁকাল মাছের মতো হাতের নাগাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছো। এবার? এবার কি হবে। দমাদ্দম ঘাকতক কিল চড় বসিয়ে দিলো তারা। বললো, চল ব্যাটা, চল কোতোয়ালিতে। কেমন প্যাদানী দেবে কোটাল সাহেব, দেখবি চল?

হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চললো তারা। আমার ভাই-এর কোন প্রতিবাদই কর্ণপাত করলো না। কোতোয়ালিতে নিয়ে গিয়ে সোজা একেবারে কোটালের হাতে। অল-কুজ তার দুর্ভাগ্যের কথা, তার দেশান্তরী হওয়ার কথা সবিস্তারে বললো কোটালের কাছে। কিন্তু সে কথায় কোনও কাজ হলো না। হুকুম হলো, ন্যাংটো করে চাবুক লাগাও।

জামা-কাপড় খুলতেই কোটাল দেখলো লোকটার সারা শরীরে চাবুকের আর ডাণ্ডার কালো কালো দাগ। হো হো করে হাসলো সে।— পুরোনো পাপী। এর আগেও অনেকবার কোতোয়ালের জল খেয়েছো, দেখছি। তা এই নিয়ে ক'বার হলো?

অল-কুজ বলতে চায়, না হুজুর, চুরি আমি জীবনে কখনও করিনি। কিন্তু মার খেয়েছি প্রচুর, কবুল করছি। কিন্তু কিভাবে কেন খেয়েছি সে-কাহিনী তো আপনাকে বললাম। আপনি বোধহয় খেয়াল করে শোনেননি।

—চোপরাও বদমাইশ চোর। মার খেয়ে খেয়ে সারা গায়ে চাবুক ডাণ্ডার কালসিরা পড়ে গেছে, আর বলে কিনা চুরি করেনি। কোতোয়ালের লোক-এর সঙ্গে তোমার শত্রুতা আছে তো? তাই জন্যে তারা তোমাকে শুধু শুধু ধরে ঠেঙিয়েছে! লাগাও চাবুক।

কোটালের হুকুমমাত্র সপাং সপাং করে চাবুকের ঘা পড়তে থাকে। অল-কুজ আর সহ্য করতে পারে না। কিন্তু এক এক করে গুণে গুণে একশো বেতের ঘা তাকে সহ্য করতেই হয়। এর পর উটের পিছনে বেঁধে সারা শহরের পথে পথে ঘোরানো হলো তাকে। কোটাল বললো, এবারের মতো অল্পে ছেড়ে দিলাম। পরে যদি শুনি আবার চুরি করতে ঢুকেছিস কারো বাড়ি, তা হলে আর জান থাকবে না তোর।

আমার ভাই-এর হেন দুরবস্থার কাহিনী শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সবার অলক্ষ্যে বাগদাদ শহরে আমার বাসায় নিয়ে এলাম তাকে। সেই থেকে সে আমার

কাছেই থাকে, খায়। মার খেয়ে খেয়ে তার শরীরের হাড়গোড় কিছু আস্ত নাই। কাজ কাম করার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে আমি ছোট ভাই হয়ে তাকে তো আর ফেলে দিতে পারি না। অন্য লোকে হলে হয়তো পারতো। কিন্তু আমার মতো উদার এবং মহৎ মানুষের পক্ষে তা পারা তো সম্ভব নয় জাঁহাপনা।

খলিফা অল মুসতানসির বিল্লাহ বললেন, তা তো ঠিকই। তা এবার কি তুমি তোমার পঞ্চম ভাই-এর কথা শোনাবে? না, আরও একশো দিনার বকশিস নিয়ে বাড়ি রওনা হবে?

—না হুজুর, আমার পঞ্চম ভাই অল-আসার-এর অসাধারণ কাহিনী আপনাকে শোনাতে না পারলে সোয়াস্তি পাবো না।

নাপিতের পঞ্চম ভাই অল-আসারের কাহিনী।

নাপিত বলতে থাকে, আমার এই ভাই-এর দেহের তুলনায় পেটটা বেশ মোটা। মনে হয়, একটা ছোটখাটো জয়ঢাক। নড়াচড়া করতে পারে না বললেই চলে। সারা দিন সারা রাত শুয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। যাকে বলে পিপু-ফিশু গোছের। আমাদের বাবা যখন মারা যান, প্রত্যেক ভাই-এর জন্যে একশো দিরহাম নগদ রেখে যান। অল-আসারের মাথায় হাজারো রকম ব্যবসার ফিকির ঘুরতে থাকে। কোনটা ছেড়ে কোনটা করবে ভেবে পায় না। অবশেষে ঠিক করলো কাচের বাসনপত্র কেনাবেচার কারবার করবে। এতে পরিশ্রম কম। মহাজনের ঘর থেকে কিনে নিয়ে এসে রাস্তার উপর বসে পড়লেই হলো। পথ চলতি লোকের নজরে পড়বে। যার দরকার ঠিকই কিনবে।

সুতরাং একশো দিরহাম পুঁজি সম্বল করে অল-আসার কাচের বাসন-এর সওদাগর বনে গেলো। রোজ বিকালে মস্ত একটা ঝুড়িতে সাজিয়ে রাস্তার মোড়ে বসে পড়ে। সুর করে হাঁকে—লে লে বাবু ছে আনা, যা লিবে তাই ছে আনা। চমকদার ছে আনা... ইত্যাদি ইত্যাদি নানারকম ছড়া বিচিত্র সুরে আওড়াতে থাকে।

কিন্তু ক্রেতার চেয়ে শ্রোতার ভিড়ই বেশী হয়। একদিন জুম্মাবার দুপুরবেলায় শুয়ে শুয়ে আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখছিলো সে ঃ

আমি আমার পুরো পুঁজিটা কাচের বাসনের কারবারে লাগিয়েছি। নিশ্চয়ই মালগুলো দু'শো দিরহামে বিক্রী হবে। সেই দু'শো দিরহাম দিয়ে আবার বাসনপত্র কিনে আনবো। সেগুলো বেচে চারশো পাবো। সেই চারশো দিয়ে বাসন এনে আরও চারশো লাভ করবো। এইভাবে প্রতি দফায় দ্বিগুণ হতে থাকবে আমার মূলধন। শেষে যখন বেশ মোটামুটি লাভ হবে তখন একটা দোকান ভাড়া নিয়ে আতরের ব্যবসা শুরু করবো। শুনেছি আতরের ব্যবসায় অনেক লাভ। একশো দিনারের আতর নাকি পাঁচশো দিনারে বিক্রী হয়। এইভাবে লাভের অঙ্ক যখন বেশ মোটা হয়ে দাঁড়াবে তখন তা দিয়ে বিশাল একখানা ইমারৎ কিনবো আমি। অনেক দাসদাসী হাতী ঘোড়া কিনবো। দামী দামী গালিচা পর্দায় ঘর দোর সাজাবো। মেহগনি কাঠের বাহারী আসবাবে ঘর ভরে দেবো। ভালো ভালো খানাপিনার ব্যবস্থা হবে। নাচ গানের আসর বসাবো। শহরের নামী বাঈজীরা আসবে মুজরো করতে। নামকরা উজির আমীরদের কন্যার সঙ্গে আমার শাদীর কথাবার্তা চলতে থাকবে। কিন্তু প্রধান উজিরের নিচের কোন অমাত্যের মেয়েকে আমি শাদী করবো না। তাও সে-মেয়ে রূপে গুণে দুনিয়ার সেরা হওয়া চাই। এছাড়া আমার ইজ্জত খাটো হয়ে যাবে। আমার যদি পাত্রী পছন্দ হয় তবে দেন মোহর হিসাবে নগদ এক হাজার মোহর দেবো তাকে। কিন্তু আমার প্রস্তাবে যদি সেই উজির গররাজি হয় তা হলে জোরজবরদস্তি করে তার নাকের ডগা দিয়ে মেয়েকে তুলে নিয়ে আসবো আমার প্রাসাদে। দশটা বাছাই-করা

খোজা কিনবো। এমন জাঁকজমক সাজে সেজে-গুজে থাকবো শাহ-সুলতানরা ভিরমি খেয়ে যাবে। আমার ঘোড়ার জীন-লাগাম একটা দেখার মতো জিনিস হবে। শহরের সেরা জহুরীকে ডেকে নানারকম হীরা চুনী পান্না মুক্তো বসিয়ে সাজাবো। বাদাবী মরুভূমির বিখ্যাত একটা ঘোড়া কিনে আনবো অনেক দাম দিয়ে। তারপর অসংখ্য ক্রীতদাস সমভিব্যাহারে শহর পরিক্রমায় বেরুবো। রাস্তার দু' ধারে লোক দাঁড়িয়ে পড়বে। আমাকে দেখবে বলে। রাস্তার দু' পাশের বাড়ির জানলা খুলে যাবে। মুখের নাকাব সরিয়ে মেয়েরা দেখবে আমাকে। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি গিয়ে পৌঁছবো প্রধান উজিরের প্রাসাদে। উজির শশব্যস্ত হয়ে উঠে এসে অভ্যর্থনা জানাবে। নিজের আসনে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসাবে। আর নিজে দাঁড়িয়ে থাকবে কোরবাণীর খাসীর মতো। কারণ আমি তার কন্যার পানি প্রার্থী। আমার দুই নফরের প্রত্যেকের হাতে থাকবে হাজার মোহরের রেকাবী। একটা রেকাবী আমার শাদীর দেন মোহর। আর একটা রেকাবী শ্বশুরকে আমার সদিচ্ছা-উপহার। উজির দেখে আমার দিল দরিয়া মেজাজের তারিফ করবে। টাকাটা যে আমার কাছে কোনও ব্যাপারই না, এমনি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভরে রেকাবী দু'খানা এগিয়ে দেবো উজিরের দিকে। খুশিতে গদ গদ হয়ে হাত পেতে গ্রহণ করে ধন্য হয়ে যাবে সে। এর পর বেশ ভারিক্কি চালে বেরিয়ে আসবো আমি। উজির আমায় জোড় হাতে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবে। আমার প্রাসাদে ফেরার প ব পাত্রীর সখীরা আসবে তার শুভেচ্ছা বাণী বহন করে। আমি তাদের প্রত্যেককে নতুন পোশাক এবং মোহর বকশিস দেবো। এতে আমার মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু উজির যদি কোন উপহার সামগ্রী পাঠায়, আমার পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তাকে বোঝাতে হবে, পরের দ্রব্যে আমার কোনও লোভ নাই। আমিই ঠিক করবো আমার শাদীর তারিখ। এবং শাদীর সব খরচ আমার। তাদের কোন খরচ-পত্র করতে দেবো না। এবং আমি সেটা সগর্বে তাদের জানিয়ে দেবো। শাদীর আসরে নামকরা মুজরো দলের নাচ গান হবে। এবং সে সব খরচও আমার। সারা বাড়িটা দামী পারস্য গালিচায় মুড়ে দেবো। আর ফুলে ফুলে ভরে দেবো সব মহল। দামী আতরের খুশবুতে মেতে উঠবে গোটা প্রাসাদ। আমার সাজপোশাক হবে সবচেয়ে সেরা—খানদানী। শাহনশাহ সিংহাসনে বসার সময় যে সাজে সেজে যান, ঠিক সেইরকম। শাদীর আসরটা সাজানো হবে ছবির মতো করে। আমার হবু বিবি যখন তার হীরা জহরতের অলঙ্কার পরে এসে দাঁড়াবে আমার সামনে, মনে হবে, বেহেস্তের কোনও এক হুরী নেমে এসেছে বুঝি। তার রূপের জেল্লায় জেল্লায় আলোময় হবে যাবে সারা মহল। মনে হবে, রমজানের পূর্ণচাঁদের মেলা। আমি কিন্তু ধীর স্থির হয়ে বসে থাকবো। না তাকাবো পাত্রীর দিকে, না তাকাবো এদিক ওদিক। যাতে সবাই ভাবে, আমি একজন দারুণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। আমার বিবি আমার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকাবে। তার মনমোহিনী রূপ আর দেহের সুবাস আমাকে বিচলিত করবে কিন্তু আমার মুখে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাবে না। এমন ভাব দেখাবো, যেন এমন কিছুই না, এমন রূপ যৌবন আমি আকছার দেখেছি। আমার পাত্রী আমার চার পাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তারপর এক সময় সে বলবে, মালিক আমি এসেছি, আমি তোমার বিবি, আমাকে গ্রহণ করো। আমি তোমার দাসী হয়ে থাকবো। কিন্তু আমার কোনও ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাবে না দেখে সে ভীত, বিচলিত হবে। ভাববে তাকে বুঝি আমার মনে ধরেনি। কাতর অনুনয় করে

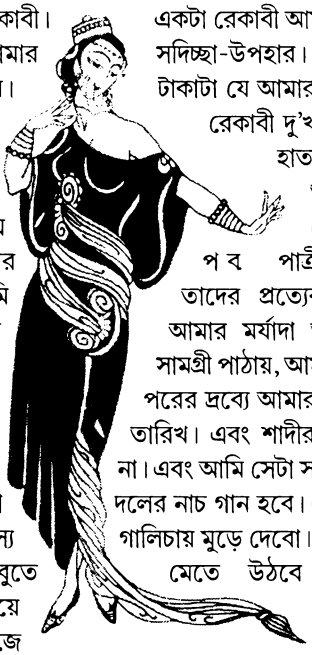

বলবে, আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো, আমাকে বসতে বলবে না? ঘরের অন্য সব মেয়েরা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু একটি কথাও বলবো না আমি। সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেলে মাত্র এক পলকের জন্যে তার দিকে চেয়ে থাকবো। কিন্তু ঐ একবারই। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে গুরুগম্ভীর হয়ে বসে থাকবো। ক্রীতদাসীরা পাত্রীকে নিয়ে যাবে। পোশাক পালটাবার জন্যে। সেই ফাঁকে আমিও আরো জমকালো আরো দামী শাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে ফিরে আসবো। আমার পাত্রীও নব সাজে সেজে এসে দাঁড়াবে। আরো দামী, আরো বাহারী সাজ। আগের রত্নালঙ্কার খুলে রেখে নতুন অলঙ্কার পরে আসবে। পুরো জড়োয়া গহনা। অসংখ্য তারার মতো রত্নরাজি ঝকমক করতে থাকবে। আরো দামী খুশবুতে ভরে যাবে সারা বাসরকক্ষ। পাত্রীর সখীরা আমাকে বার বার অনুরোধ জানাবে—একবার যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার রূপ যৌবন তার সাজসজ্জা, অলঙ্কার আভরণ। কিন্তু আমি নির্বিকার—উপরের দিকে চোখ রেখে কড়িকাঠ গুণতে থাকবো। যতক্ষণ ধরে শাদীর বাসরের এই সব আচার অনুষ্ঠান চলতে থাকবে, আমি একটিও কথা বলবো না, একটিবারও চেয়ে দেখবো না তাকে।

এই সময় রাত্রি হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

বত্রিশতম রজনী।

শাহরাজাদ বলে, শুনুন জাঁহাপনা, নাপিত তার পঞ্চম ভাই-এর কাহিনী বলে চলেছে ঃ

অল-আসার দিবাস্বপ্ন দেখছে ঃ

...এইভাবে বাসরঘরের সব আচার অনুষ্ঠান শেষ হলে আমি আমার এক নফরকে ইশারা করবো। একটা সোনার রেকাবী করে পাঁচশো সোনার মোহর নিয়ে এসে ধরবে আমার সামনে। মুঠো মুঠো নিয়ে সারা ঘরময় ছুঁড়ে দেবো আমি। উপস্থিত যে সব গাইয়ে নাচিয়েরা ছিলো এবং যতো নফর ভৃত্য—সব হুমড়ি খেয়ে পড়বে। যে যা পারবে কুড়িয়ে নেবে। পাশের ঘরেই আমাদের ফুলশয্যা রচিত থাকবে। মেয়ের সহচরীরা তাকে এবার নিয়ে যাবে সে ঘরে। আমি যাবো বেশ কিছুক্ষণ পরে। পালঙ্কে মখমলের গদিতে দামী রেশমী চাদর পাতা। বাঘ-সিংহ, নর্তক নর্তকী—নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূচী কর্ম করা এই চাদরখানা কিনে আনা হবে পারস্যের এক বড় সওদাগরের দোকান থেকে। আতর আর আগরবাতির গন্ধে সারা ঘর ভরপুর। আমার প্রবেশে পাত্রীর সহচরীরা দু' সারিতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে কুর্নিশ জানাবে। আমি গিয়ে বসবো সোফায়। আর পাত্রী বসে থাকবে পালঙ্কে। কিন্তু একবারও দৃষ্টি বিনিময় হবে না আমাদের। আমার সঙ্গে যাতে মেয়েরা ফাজিল রসিকতা না করতে পারে সে জন্য দারুণ গাম্ভীর্য নিয়ে বসে থাকবো আমি। এক গ্লাস গুলাবী সবরৎ এনে ধরবে আমার সামনে। হাতে নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট চুমুক দিয়ে খেতে থাকবো। আমার বিবি অধৈর্য হয়ে উঠবে। সে চাইবে, আমি তার পাশে গিয়ে বসি। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে আমার যে কোন মোহ নাই সেটা বোঝাবার জন্যে আমি নিরাসক্ত ভাব দেখিয়ে সোফাতেই বসে থাকবো। আমার বিবি যদি গোড়াতেই বুঝতে পারে আমি তার রূপে পাগল, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। সারাটা জীবন সে আমাকে তার পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখবে। সেই জন্যে কষ্ট হলেও শাদীর রাতে আমাকে মুখখানা এঁটে বসে থাকতেই হবে। কিছুতেই বুঝতে দেবো না, তাকে দেখে আমার সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। এর পর পাত্রীর মা—আমার শাশুড়ী এসে আমার কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলবে, 'বাবা আমার মেয়েকে কি তোমার পছন্দ হয়নি? একটা কথাও বলছো না, একটু হাসিও দেখছি না মুখে? কিন্তু বিশ্বাস করো, বাবা, অমন ভালো মেয়ে হয় না। যেমন রূপ তেমনি তার গুণ। রূপ চোখেই দেখতে পাচ্ছো কিন্তু গুণের কথা তো ক্রমশঃ জানতে পারবে? আজ শাদীর রাত, তোমরা একটু হাসি হল্লা

করো, তবে তো ভালো লাগবে; আমার আহ্লাদ হবে?' আমার শাশুড়ীর এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আমাকে টলাতে পারবে না। একটি কথাও উচ্চারণ করবো না। আমার শাশুড়ী মাতা এবারে শঙ্কিত হয়ে পড়বে। তাহলে হয়তো সত্যি সত্যিই মেয়ে পছন্দ হয়নি জামাই-এর। সে এবার আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলবে, 'তা হলে কি বাবা, সে তোমার উপযুক্ত হবে না, মনে করছো? কিন্তু আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি বাবা, আমার মেয়ে অপাপবিদ্ধ শিশু। ও এখনও কোন পুরুষের ছায়া মাড়ায়নি। তাকে তোমার ভালো লাগবেই। যাও বাবা, পালঙ্কে যাও তার কাছে, তোমাকে সব দিক দিয়ে খুশি করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে সে। রাতটা তার সঙ্গে কাটাও, তাহলেই বুঝতে পারবে তার আচার ব্যবহার আদব কায়দা। আমি নিজে হাতে করে তাকে শিখিয়েছি সব। যে-সব গুণ থাকলে একটা নারী তার পুরুষের চোখে আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে তার সবটাই সে খুব ভালো করে জানে। যাও, ওঠো, তোমার প্রতীক্ষাতেই বসে আছে সে। যেভাবে তাকে চাইবে সেইভাবেই পাবে—আমি সেইরকম করেই তাকে গড়েছি।' আমার শাশুড়ী উঠে গিয়ে এক গেলাস সরাব ঢেলে তার মেয়ের হাতে দেবে। গেলাসটা হাতে নিয়ে আমার হাতে তুলে দেবে সে। লক্ষ্য করবো, সরাবের গেলাসটা আমার হাতে দেবার সময় হাতটা তার ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকবে। তার দিকে না তাকিয়েই হাতটা বাড়িয়ে গেলাসটা নেবো। আর তার হাতের আঙ্গুলের সঙ্গে আমার হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরে এক অভূতপূর্ব শিহরণ খেলে যাবে। কিন্তু মুখে তার কোন ভাব প্রকাশ করবো না। আমার সামনে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকবে সে। তার রূপ যৌবনের গমক আর সাজপোশাকের বাহার দেখে মনে হবে, কোন এক শাহজাদী দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। তার গাল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়বে। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলবে, 'মালিক, মেহেরবানী করে আমার গোস্তাকি মাফ করুন। আমার প্রতি একটু সদয় হোন। আমি আপনার দাসানুদাসী।' সে আমার আরও কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসবে। আমার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দেবে। আমি কিন্তু তখন ভীষণ ক্রুদ্ধ হবো। হাতখানা ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াবো। এই সব ন্যাকামী একদম বরদাস্ত করবো না। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেবো তার গালে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার ছল করবো। আমার সামনে বসে পড়ে পা-দু'টো জড়িয়ে ধরতে যাবে। জোর-সে এক লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে দেবো তাকে...

স্বপ্নের ঘোরে এমন জোরেই অল-আসার লাথি ছুঁড়লো যে, পায়ের কাছে কাচের বাসনের ঝুড়িটাতে লেগে একেবারে উল্টে গেলো। আর সব বাসনপত্র মাটিতে পড়ে খান খান হয়ে ভেঙে সারা মেজেয় ছড়িয়ে পড়লো।

আমি যদি সেদিন সেখানে উপস্থিত থাকতাম, হুজুর, ওকে ধরে আমি পেটাতাম। অতগুলো টাকার জিনিস, সারা পুঁজিটা এক নিমেষে সব নষ্ট করে ফেললো। এত বড় আহম্মক কে আছে, এইরকম আকাশ কুসুম কল্পনা করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে?

অল-আসার নিজের গালে নিজে থাপ্পড় দিতে থাকলো। জামা কাপড় ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে লাগলো। হায় হায়, তার সারা পুঁজিটা খতম হয়ে গেলো। এখন সে কি করবে, উপোষ করে মরতে হবে তাকে। পাড়াপড়শীরা ছুটে এলো। কেউ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। আবার কেউ বা তার অলীক কল্পনার কাহিনী শুনে হেসে লুটিয়ে পড়লো।

মনের দুঃখে ভাই আমার কাঁদছে—তার এত সাধের ব্যবসা এক পলকে নষ্ট হয়ে গেলো। এমন সময় সামনের পথ দিয়ে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা দাসদাসী সমভিব্যাহারে খচ্চরের পিঠে চেপে মসজিদে যাচ্ছিলো। তার সাজ পোশাক তার চেহারা দেখে মনে হয়, খুব বড়লোক খানদানী ঘরের মেয়ে সে। একটা নফরকে বললো, দেখে আয়তো, ওই লোকটা অমন করে কাঁদছে কেন?

একটু পরে নফরটা ফিরে তার মালকিনকে বললো, আকাশকুসুম কল্পনা করতে

করতে বিভোর হয়ে পড়েছিলো। এবং সেই সময় পায়ের এক লাথি মেরে তার সমস্ত পুঁজিতে কেনা কাচের বাসনপত্র ভেঙে ফেলেছে সে। অল-আসারের অলীক কল্পনার পুরো কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ দিলো নফর। তখন সেই মহিলা বললো, তোমার সঙ্গে যা টাকা পয়সা আছে ওকে দিয়ে এসো। এবং বলে এসো, আবার যেন সে নতুন করে ব্যবসা আরম্ভ করে।

নফরের সঙ্গে পাঁচশো সোনার মোহর ছিলো। মালকিনের হুকুমে সবটাই অল-আসারকে দিয়ে এলো সে। অল-আসার তো আশমানের চাঁদ হাতে পায়। 'ওরে বাবা, এতো টাকা! এ যে রাতারাতি বড়লোক।

প্রথমে একটা সুন্দর দেখে বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেলো অল-আসার। এবার জাঁকিয়ে ব্যবসা করতে হবে। নানারকম ব্যবসার ফিকির খুঁজতে লাগলো। এতো টাকা হাতে পেয়েছে। এবার সে বড় রকমের একটা লাগসই ব্যবসায় নেমে পড়বে। একদিন ঘরে শুয়ে শুয়ে এই সব ভাবছে, এমন সময় সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখে এক অচেনা বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধাটি বললো, বাবা, আজ জুম্মাবার, দুপুরের নামাজের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু আমি এখনও বাড়ি পৌঁছতে পারলাম না। নামাজটা তোমার এখানে সেরে নিতে পারি?

অল-আসার বললো, নিশ্চয়ই। আপনি ভিতরে আসুন। হাত মুখ ধুয়ে নিন।

অল-আসার তাকে কলঘরে নিয়ে গিয়ে বললো, আপনি এখানে হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন।

একটু বাদে আমার ঘরে এসে একটা মাদুর বিছিয়ে তার নামাজ শেষ করলো। আমার ভাই ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধার প্রতি প্রসন্ন হয়ে দু'টো মোহর তার হাত দিয়ে বললো, এটা রাখুন।

কিন্তু বৃদ্ধা হাত পেতে নিলো না। বললো, না বাবা, পয়সায় আমার প্রয়োজন নাই। তোমার কাছেই রাখো ওটা তোমার অনেক কাজে দেবে। তোমার উদারতার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ তোমার ভালো করবেন। আর তোমার যদি একান্তই প্রয়োজন না থাকে এই পয়সার, তা হলে যার কাছে থেকে হাত পেতে নিয়েছিলে তাকেই তা ফেরৎ দিয়ে দিতে পারো।

বৃদ্ধার কথায় অবাক হয় অল-আসার।—সে কি! আমার সব কথা এই বৃদ্ধা কি করে জানলো? বললো, যে মহিলাটি দয়া করে আমাকে এতোগুলো মোহর দিয়ে গেলেন তার সঙ্গে আমার এক পলকেরও পরিচয় হয়নি। আপনি কি জানেন তাকে? একটি বার তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন?

বৃদ্ধা বললো, সেই সুন্দরী মেয়েটি তোমাকে ঐ টাকাগুলো দিয়েছিলো কেন জানো? দিয়েছিলো তোমার বয়স দেখে। আহা মেয়েটা, ধন দৌলতের কোন অভাব রাখেননি আল্লাহ, কিন্তু একটা জায়গায় মেরে দিয়েছেন। মেয়েটির স্বামী পুরোপুরি ধ্বজভঙ্গ। একটা ভরা যুবতী মেয়ে—তার কী দুর্ভাগ্য বলো? ধনদৌলত দিয়ে সে কি করবে। তার যৌবনটাই তো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। যাক্ আর দেরি করো না বাছা। তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবো বলেই এসেছি। ঘরে তালা দিয়ে, চলো বেরিয়ে পড়ি। সোনার মোহরগুলো ঘরে রেখে যেও না। কোমরে বেঁধে নাও। কি জানি চোর-ডাকাতের কথা তো কিছু বলা যায় না।

খুশিতে মন নেচে উঠলো। সেই দিন থেকে তাকে দেখার তার সঙ্গে একটু আলাপ করার সাধ ছিলো। কিন্তু নাম ঠিকানা কিছুই জানতাম না, কি করে কোথায় গিয়ে তার দেখা পাবো? আল্লাই তার সন্ধান করে দিয়েছেন। তা না হলে এই বৃদ্ধাই বা তার কাছে আসবে কেন?

পথে যেতে যেতে বৃদ্ধা বললো, অনেককাল থেকে আমি তার চাকরী করছি। আমাকে দিয়ে অনেক নিষিদ্ধ গোপন কাজ সিদ্ধি করে নিয়েছে। তোমাকে শুধু একটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, তার কাছে গিয়ে কথা বলবে খুব কম। যেটুকু বলবে, খুব হিসেব করে ধীরে সুস্থে বলবে।

কথার চেয়ে কাজই সে বেশী ভালোবাসে। তুমি যদি তাকে খুশী করতে পারো, বাবা, তা হলে তো তোমার পোয়া বারো। তার মতো রূপসী মেয়েকে হাতের মুঠোয় তো পাবেই, সেই সঙ্গে তার বিষয় আশয়, ধনদৌলত সবই তোমার কব্জায় এসে যাবে।

আমার ভাই তো আনন্দে দিশাহারা। এবার আর কে পায় তাকে। তোফা কাটানো যাবে সারাটা জিন্দগী। একটা বাড়ির দরজায় এসে অদ্ভুত কায়দায় কড়া নাড়লো বৃদ্ধা। একটা গ্রীক পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিয়ে একটু মুচকী হাসলো। ভিতরে ঢুকে এগোতেই একটা রেশমী পর্দা ঝোলানো দরজা—ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালো। মেঝেয় দামী গালিচা পাতা। চারপাফশ সোফা সেঠি সাজানো। এক ধারে মখমলের গদি বিছানো পালঙ্ক। একটু পর আর একটা দরজার পর্দা ঠেলে একটি মেয়ে ঢুকলো। তার রূপ যৌবনের বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্য নয়, জাঁহাপনা। এক কথায় বেহেস্তের হুরী। রূপের ছটায় সারা ঘর আলো হয়ে যায়। বিমুখ হয়ে চেয়ে থাকে আমার ভাই। মেয়েটির কোন লজ্জাশরম বলে কিছু নাই। কোন কথাবার্তা বলার আগেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমার ভাই-এর গা ঘেঁসে বসে গলাটা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো সে। অল-আসারের সারা দেহে অপূর্ব এক শিহরণ ধরিয়ে দেয়। এবার মেয়েটি পালঙ্কে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আমার ভাই তখন উন্মত্ত হাতীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটির ওপর।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মেয়েটি আবার দরজা খুলে দেয়। আমার ভাইকে বলে, তুমি একটু বসো, আমি এখুনি আসছি। আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবে না।

মেয়েটি চলে যেতেই যমদূতের মতো এক নিগ্রো এসে ঢুকলো। এক হাতে তার শাণিত ছোরা, আর এক হাতে চাবুক।

—এই শুয়ার কা বাচ্চা, এখানে কেন এসেছিস? কে তোকে নিয়ে এসেছে, বল?

অল-আসার কি বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু বলা আর হলো না। নিগ্রোর আধমনি একটা ঘুষি এসে লাগলো ওর চোয়ালে। আর সঙ্গে সঙ্গে উল্টে পড়ে গেলো গালিচার ওপর। এলোপাথাড়ী চাবুক মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেললো তাকে। তারপর ছোরার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। আমার ভাই তো তখন অচৈতন্য। অসাড় মরার মতো পড়ে রইলো। নিগ্রোটা বোধ হয় ভাবলো, খতম হয়ে গেছে। ওর কোমর থেকে মোহরের থলেটা ছিঁড়ে নিয়ে ঘর থেকে উধাও হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো এক নিগ্রো যুবতী। এক থালা নুন হাতে নিয়ে। অল-আসার-এর ক্ষতগুলোর গর্তে নুন পুরে দিতে থাকলো সে। এমন সময় সেই বুড়িটা নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো, ওরে বাবারে। আমার সোনার বাছার এ হাল কে করলো রে! অতগুলো সোনার মোহর ছিলো। সবগুলো কে নিয়ে গেলো রে। ওরে বাবারে, আমার কী হলো রে!

শয়তান বুড়িটা তখন আমার ভাই-এর পা দু'টো ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে উঠানে নামিয়ে আনলো। উঠানের ওপাশে এক কোণের দিকে একটা খুপরী ছিলো। অল-আসার-এর লাসটা সেই খুপরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে রেখে এলো। প্রতিদিন এ বাড়িতে যারা ঢোকে, তারা আর জান নিয়ে বেরুতে পারে না। নিগ্রোটার হাতে প্রাণ হারাতেই হয়। নিগ্রো মেয়েটা

ক্ষতর গর্তে নুন ভরে দেয়, আর বুড়িটা টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে লাসটা রেখে আসে এই খুপরীর মধ্যে। নুনের জন্যে লাসগুলো পচে দুর্গন্ধ ছড়ায় না।

দু'দিন বাদে অল-আসারের যখন জ্ঞান ফিরে এলো দেখে সে লাসের গাদার ওপর শুয়ে আছে। প্রতিদিন যত লোককে মারা হয় তাদের সবাইকে ছোট্ট এই খুপরিতেই ভরে রাখতে গেলে একটার উপরে আর একটা লাস গাদা করে রাখতেই হবে। তার আশে পাশে আরও অনেকগুলো গাদা লক্ষ্য করলাম। আল্লাহর কি অপার দয়া, আমার ভাই কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলো। তার একটা কারণ বোধহয়, হিড় হিড় করে টেনে এনে লাসের গাদার ওপরে তুলে ফেলার সময় ওর ক্ষত থেকে নুনগুলো সব ঝরে গিয়েছিলো। এবং তার ফলেই শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে যেতে পারেনি। জমাট বেঁধে বন্ধ হয়ে গেছে।

রাত্রি তখন অনেক। ওপরের শার্সি দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। অল-আসার ওঠার চেষ্টা করে কিন্তু সারা শরীর টনটন করছে। খুব কষ্ট হয়। শরীর কাঁপতে থাকে। তবু মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে। লাসের গাদার ওপরে দাঁড়াতেই শার্সির পাল্লাটা নাগালে পায়। খুব সন্তর্পণে খুলে ফেলে, সেই ফাঁক দিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে দিয়ে বাইরে নেমে পড়ে।

আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা বাড়ি যায় অল-আসার। একেবারে নিজের বাড়ি। আমি তাকে মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে খুব তাড়াতাড়িই সারিয়ে তুললাম। আমার দাওয়াই এমনই—যে রোগ দু-মাসে সারার কথা দু'দিনে সেরে যাবেই।

যাই হোক মনে তার দারুণ প্রতিহিংসা। বদলা সে নেবেই। সেই বুড়ি, সেই নিগ্রো, সেই নিগ্রি (নিগ্রোর স্ত্রী) সেই বারবণিতা—কাউকে বাদ দেবে না সে। বিলকুল সাফ করে ফেলবে।

এক কেতা-দুরস্ত পারসী সাহেবের মতো করে দাড়ি গোঁফ ছাঁটলো। আজানুলম্বিত এক শেরোয়ানী মাথায় জুলফি-টুপী পরলো। বুকে গুঁজলো একটা লাল গোলাপ। সারা গায়ে ছিটালো পারসী খুশবু।

সেই বাড়িটার অদূরে দাঁড়িয়ে দরজাটার দিকে লক্ষ্য করতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে বুড়িটা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে পথ চলতে থাকে। অল-আসার-এর কাছে আসতেই একেবারে পারসী কেতায় আদাব জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মাজী, এদিকে কোন স্যাকরার দোকান আছে বলতে পারেন?

বলার ঢং, উচ্চারণ সবই পারসীয়। বুড়িটার চোখ চিক চিক করে ওঠে। লোকটা এদেশী নয়। বিদেশী মক্কেলদের ট্যাঁকে মোটা মাল-কড়ি থাকে। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো, ওর ট্যাঁকে গোঁজা একটা মোটাসোটা থলে। বললে, কেন বাবা, স্যাকরার দোকানে কী দরকার?

অল-আসার বলে, না মানে, একটা মাল বিক্রী করে ন'শো সোনার দিনার পেয়েছি। তা ওজন করে দেখবো আমাদের পারসী টাকায় কতো টাকা হবে।

বুড়ি এবার চোখ দু'টো বড় বড় করে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বলে। সে আর এমন অসুবিধা কী? আমার সঙ্গে এসো, ভালো দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। এক পয়সার হেরফের হবে না।

বুড়ির পিছনে পিছনে চলে অল-আসার। শেরওয়ানীর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে অনুভব করে দেখে ছোরাটা। দরজার সামনে এসেই সেই অদ্ভুত কায়দায় কড়া নাড়ে বুড়ি। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দাঁড়ায় সেই গ্রীক পরিচারিকা। সেই চেনা মুচকী হাসি। একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বসায় সেই গালিচা পাতা সোফা-সেঠি সাজানো ঘরে। একটু পরেই আসে সেই মেয়েটি। হাসে। দরজা বন্ধ করে গা ঘেসে বসে পড়ে। আচমকা চুমু খায়। তারপর ধরতে গেলেই পালিয়ে গিয়ে পাশের পালঙ্কে শুয়ে পড়ে। অল-আসার উত্তেজিত হয়। ঝাঁপিয়ে পড়ে। সব—সব একই ঘটনার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। ঘণ্টাখানেক বাদে মেয়েটি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

সেই একই ঢং-এ বলে, 'তুমি একটু বসো, আমি আসছি। আমি না আসা পর্যন্ত যেও না কিন্তু।' মেয়েটি বেরিয়ে যাবার আগেই খুলে রাখা শেরওয়ানীটা গায়ে চাপিয়ে নেয় অল-আসার। আর একবার অনুভব করে দেখে—ছুরিটা ঠিক আছে কিনা। মেয়েটা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৈত্যের মতো হুঙ্কার ছেড়ে ঘরে ঢোকে সেই নিগ্রোটা। এক হাতে শাণিত ছোরা, অন্য হাতে চাবুক। মুখে সেই একই প্রশ্ন, এই শুয়ার কা বাচ্চা, কেন এখানে ঢুকেছিস? কে তোকে এনেছে বল?

অল-আসার বলে, সেকি, ঐ তো তোমার পিছনে যে সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছে, ওকেই জিজ্ঞেস করো না; ও-ই আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলো তোমার ঝিটার হাতে। নিগ্রোটা চিৎকার করে পিছন ফিরে তাকায়। আমার পিছ—

কথা আর শেষ করতে পারে না। পিছনে কে—দেখার জন্যে ঘাড় ঘোরাতেই ক্ষিপ্রবেগে ছুরিটা বের করে প্রচণ্ড জোরে এক কোপ বসিয়ে দেয় অল-আসার। নিগ্রোর মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। ঘাড়টা দু'খানা হয়ে মাথাটা ঝুলে পড়ে। এমন সময় এক থালা নুন নিয়ে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায় নিগ্রি মেয়েটা। তার গলাতে আর এক কোপ। ধর মুণ্ডু আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ে যায়। এর পর ছুটে আসে গ্রীক মেয়েটি। তাকেও সাবাড় করে ফেলে এক কোপে। সব শেষে বুড়িটা ছুটে আসে খদ্দেরের লাসটা সরিয়ে ফেলার জন্যে। তার চুলের মুঠি ধরে এক ধাক্কায় ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিচে, ওরে শয়তানী, বুড়ি খানকী, তোমার দালালী খাওয়ার শখ আমি জন্মের মতো মিটিয়ে দিচ্ছি।

সোজা ওর বুকের মধ্যে গেঁথে দিলো ছুরিখানা। টুকরো টুকরো করে কাটলো তার হাত পা মুণ্ডু। তারপর রক্তমাখা ছুরি হাতে খুঁজতে লাগলো সেই মেয়েটাকে। দু'দিনই যার দেহটা তাকে অনেক সুখ দিয়েছিলো।—সেই মেয়েটার তাজা খুন এখন চেখে দেখবে সে। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেলো। কয়েক ঘর ছাড়িয়ে একটা ঘরের চৌকির তলায় লুকিয়ে কাঁপছিলো। অল-আসার টেনে বের করলো তাকে। মেয়েটা ঢং জানে। পা-দু'টো জড়িয়ে ধরে সে-কি কান্না।—তুমি আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করো, সাহেব। এখানে এতকাল এরা আমাকে বন্দী করে রেখেছে। আমি যা নই সেই কাজ আমাকে দিয়ে করিয়েছে। আমি অবলা মেয়েছেলে। কি করবো বলো, পালাতে পারিনি। চব্বিশ ঘণ্টা দরজায় পাহারা। আসলে আমি কিন্তু অনেক খানদানী ঘরের মেয়ে। আজ বিপাকে পড়ে এই জাহান্নমে এসে পড়েছি।

আমার ভাই অল-আসার তখন মেয়েটিকে তুলে বসালো। হাজার হলেও সে তার শয্যাসঙ্গিনী। দু'দণ্ডের শান্তিও তো দিয়েছিলো। ওর কান্নায়, মনটা কিছু নরম হয়ে আসে। বলে, কী করে এখানে এলে? কে নিয়ে এলো?

—কে আবার! ঐ শয়তান দালাল বুড়িটা। যে তোমাকে ভুলিয়ে এনেছিলো। যে ফিদিন কত মক্কেলকে ভুলিয়ে এনে তাকে জানে প্রাণে মারে। আমি এক খানদানী বংশের মেয়ে। আমাদের বাড়িতে ঝি-এর নকরী নিয়ে কাজে ঢুকেছিলো ঐ বুড়িটা। কথাবার্তা কি মিষ্টি। একদিন আমার এক আত্মীয়ের শাদীর নিমন্ত্রণ ছিলো। মা বাবা বললেন, 'বুড়িমাকে নিয়ে যাও। সকাল সকাল ফিরে আসবে।' আমি আর বুড়ি রাস্তায় বেরুলাম। কিন্তু আমি তো আর পথঘাট চিনি না। কি করেই বা চিনবো? পথেঘাটে একদমই বেরুই না। বুড়ি বলেছিলো, সারা বাগদাদ তার নখদর্পণে। ঠিকানা জানা থাকলে সব জায়গায় সে যেতে পারে। তাই ভরসা করে মা-বাবা তাকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়েছিলো। তাছাড়া বুড়ি মানুষ, কথায়

বার্তায় তো চৌকস, দু'দিনেই বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিলো তাদের। বুড়ি কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিয়ে গেলো না। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে তুললো এই ডেরায়। এই গোলক ধাঁধায় একবার যে ঢুকেছে তার আর বেরুবার পথ নাই। আমিও বেরুতে পারলাম না। নিগ্রোটা আমার উপর বলাৎকার করে আমার সতীত্ব শেষ করে দিলো। তারপর খাঁড়া উঁচিয়ে ভয় দেখাতে লাগলো—সে যা বলবে অক্ষরে অক্ষরে না মানলে আমার গর্দান নেবে। জানের ভয়ে আমাকে গণিকা হতে হলো। এছাড়া আমার বাঁচার কোন উপায় ছিলো না।

আমার ভাই অল-আসার জিজ্ঞেস করলো,—এতদিন ধরে তো বহু লোকের সর্বনাশ করেছে ব্যাটা। অনেক পয়সা লুঠ করেছে। তা সে-সব পয়সাকড়ি, সোনাদানা সব কোথায়?

মেয়েটি গলা খাটো করে বললো, সব-সব আছে সাহেব। ওই পাশের ঘরে, সিন্দুক ভর্তি। সোনার মোহর ঠাসা। দেখবেন, চলুন।

—চলো, যাই দেখি—

মেয়েটির পিছনে পিছনে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে। সিন্দুকটা খুলতেই চোখ ঝলসে যায়।

মেয়েটি বললো, চলুন, এগুলো নিয়ে আমরা এখান থেকে পালাই। এতো টাকা। সারা জীবন খুব আরামে কাটাবো আমরা দু'জন।

অল-আসার-এর চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। এত টাকা! এত টাকা নিয়ে সে—মানে তারা কি করবে? ভাবতে পারে না। মেয়েটি বলে, দাঁড়াও আমি কতকগুলো বস্তা নিয়ে আসি।

বারোখানা বস্তায় ভর্তি করা হলো সোনার মোহরগুলো। এক একটা বস্তা কি পেল্লাই ভারি। নড়ানো যায় না। মেয়েটি বলে, কী করে নেবে। বারোটা কুলীর কম হবে না।

অল-আসার বলে, তুমি দাঁড়াও, আমি কুলী ডেকে আনছি।

রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে কুলীর সন্ধানে। কিন্তু বারোটা কুলী এক সঙ্গে জোগাড় করতে একটু বেশীই দেরি হয়ে গিয়েছিলো। কুলীগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে, বামাল সুদ্ধ পাখী পালিয়েছে। কিন্তু পালালো কি করে? খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেলো—পিছন দিকে একটা খিড়কীর দরজা আছে।

মেয়েটা যদিও সোনাদানা সবই নিয়ে পালিয়েছে, অল-আসার দেখলো, ঘরে তবুও অনেক দামী দামী সাজ-পোশাক, আসবাব এবং আরো অনেক সামানপত্র রয়ে গেছে। তার দামও অনেক। একটা জীবনের পক্ষে সে সম্পদ যথেষ্ট। এগুলো বেচে যা পাওয়া যাবে তা দিয়ে ব্যবসা করলে দিব্যি ভালোভাবে চলে যাবে তার। কিন্তু এসব জিনিস সে নিয়ে যাবে কি করে। ঠিক করলো, আজ থাক, কাল সঙ্গে গাড়ি এনে বোঝাই করে নিয়ে যাবে। সেদিনের মতো সদর দরজায় তালা দিয়ে চলে গেলো অল-আসার।

পরদিন সকালে গাড়িঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হলো আবার। কিন্তু সামানপত্র আর ওঠানো হলো না। তার আগেই প্রায় জনা বিশেক সিপাই ঘিরে ফেললো সারা বাড়িটা। অল-আসার গ্রেপ্তার হলো। কোটাল বলতে থাকে, আমি সব শুনেছি। কীভাবে কতগুলো মানুষকে তুমি খুন করেছো। এবং সেখান থেকে টাকাকড়ি সব লোপাট করেছো।

অল-আসার চিৎকার করে ওঠে, কোটাল সাহেব? এ আপনি কী বলছেন? এক মিনিট ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো আগে শুনুন, তারপর আপনার যা অভিরুচি করবেন।

কোটাল বললো, বেশ বলো।

তখন অল-আসার গোড়া থেকে সব কাহিনী বিস্তারিতভাবে খুলে বললো। একটুও বাদ দিলো না—বা গোপন করলো না। তারপর কোটালকে একটা প্রস্তাব দিলো সে।—এখন শুনুন কোটাল সাহেব, আসল মাল কড়ি তো মেয়েটা নিয়ে পালিয়েছে—তবু এখনও যা

জিনিসপত্র আছে তার দামও নেহাৎ কম না। আমি বলি কি, এসবই তো এখন বেওয়ারিশ মাল। সরকার জানতে পারলে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাবে। তা সরকারের হাতে তুলে দিয়ে কী লাভ? আসুন আমরা দু'জনে ভাগাভাগি করে নিই। এতে মুফতে আমিও কিছু পেয়ে যাবো, আপনি পাবেন।

অল-আসার-এর প্রস্তাব শুনে কোতোয়াল রেগে কাঁই!—কী এতবড় কথা? অন্যের সম্পত্তি আমি হাতিয়ে নেবো? আমি ঘুষ খাবো? সরকার আমাকে বেতন দেয় না? এই কে আছিস্, লোকটাকে রাতের অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে এই সলতানিয়তের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসবি। এ রাজ্যে তোমার মতো অসৎ লোকের জায়গা হবে না। নির্বাসনই তোমার যোগ্য সাজা।

কোটাল আমার ভাইকে সেইদিনই রাতের অন্ধকারে অন্য দেশে পাচার করে দিয়ে আসে। তার কারণ, সে কোনও ভাগ দিতে চায় না, সে কোনও সাক্ষী রাখতে চায় না। আমি খবর পেয়ে আমার ভাইকে গোপনে ফিরিয়ে আনি আমার কাছে। কোতোয়াল টের পেতে পারে এই আশঙ্কায় তাকে ঘর ছেড়ে বেরুতে দিই না। আমার আশ্রয়েই রেখেছি তাকে। আমার রোজগারেই সে খেয়ে পরে বেঁচে আছে।

এই হলো অল-আসারের কাহিনী।

খলিফা কোনও মন্তব্য করলেন না। কোনও বাহবা দিলেন না। নাপিত বললো, আর একটিমাত্র ভাই-এর কাহিনী শুধু বাকী আছে। খুব সংক্ষেপে একটানা বলে শেষ করে দিচ্ছি, জাঁহাপনা।

নাপিতের ষষ্ঠ ভাই শাক্কাশিক-এর কাহিনী।

তাকে সবাই শাক্কাশিক বলে ডাকতো। তার কারণ ওর গলার স্বরটা ছিলো ভাঙ্গা কাঁসীর মতো। তার মতো গরীব দুঃখী এ সংসারে আর কেউ ছিলো না। নিজের রোজগারের অন্ন সে কোনও দিনই খায়নি। অন্যের দুয়ারে চেয়ে চিন্তে খেয়েই তার দিন কাটতো। বাবা মারা যাওয়ার সময় আমাদের প্রত্যেক ভাইকে একশো দিরহাম করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সে-টাকাও সে কোনও কাজে লাগাতে পারেনি। এক ছেনতাই দলের পাল্লায় পড়ে এক দিনেই তা নষ্ট হয়ে যায়।

শাক্কাশিক ছিলো একটা হাঁদা বোকা মানুষ। তার এই বোকামীতে মজা পেতো অনেকেই। বিশেষ করে বিত্তবানরা। আর তার এই নির্বুদ্ধিতায় মজা পেতো বলেই অনেক বড় লোকের বাড়িতে সে পাত পেড়ে খেতে পেতো।

এক দিন শাক্কাশিক দু'মুঠো খাবার-এর প্রত্যাশায় দরজায় দরজায় ঘুরতে ঘুরতে দিনান্তে এক বিরাট বড়লোকের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো। প্রাসাদের মতো বাড়ি। অনেক লোকজন দাসদাসী পরিপূর্ণ। সদর দরজার প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গা, এতো পেল্লাই এই বাড়িটা কার?

প্রহরী জবাব দেয়, সে কি সেখ, জানো না! এতো সেই বারমাকী সাহেবদের বাড়ি। এককালে কত নাম ধাম ছিলো। খলিফার দরবারে এরা বংশানুক্রমে উজিরের পদে বহাল থাকতো। এখন যিনি মালিক, বৃদ্ধ হয়েছেন। দরবারের কাজে ইস্তফা দিয়ে বিশ্রাম করছেন। ছেলেপুলে কেউ নেই। একা। তা তোমার কি চাই?

শাক্কাশিক বলে, সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। যদি কিছু খানাপিনা পাওয়া যায়...

প্রহরী বলে, যাও না, ভিতরে যাও। মালিক আমাদের খুব ধর্মাত্মা। কারো দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারেন না।

প্রহরীর কথায় আশা হয়। এক পা এক পা করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সামনের

বিশাল প্রাঙ্গণে ফুলের বাগিচা। মাঝখানে একটা জলের ফোয়ারা। নানা জাতের পাখীর কলরবে মুখর হয়ে আছে সারা কুঞ্জবন।

শ্বেত পাথরের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসে শাক্কাশিক। প্রশস্ত বারান্দা পেরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে এক বিরাট কক্ষে। দামী গালিচায় মোড়া ঘরের মেজে। বাদশাহী আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো—ঝকঝকে তকতকে। একটা আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ। শাক্কাশিককে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই তোমার?

শাক্কাশিক বলে, আজ সারাদিন কিচ্ছু খাওয়া হয়নি। যদি মেহেরবানী করে কিছু খেতে দেন—

বৃদ্ধ আহত হলেন, সে কি? আমার তো ধারণা ছিলো, এই বাগদাদ শহরে কেউই অভুক্ত থাকে না। ভালো হোক, মন্দ হোক, সাধ্য মতো খানপিনা সকলেই পায়। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—আমার ধারণা তো ভুল। এসো, এখানে বসো, আহা রে, সারাটা দিন অভুক্ত রয়েছো, আর আমি ভুরি ভোজ করে দিব্যি শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছি।

বৃদ্ধ তার একজন নফরকে ডেকে হাত মুখ ধোয়ার জল দিতে বললেন, সঙ্গে সঙ্গে সাবান, জল এলো। বৃদ্ধ বললো, নাও, আর দেরি করো না, মুখ হাত ধুয়ে নাও, আমরা দু'জনে এক সঙ্গেই খাবো। আজ তুমি আমার মেহেমান।

এরপর নফর চাকররা নানারকম উপাদেয় খানা এনে সাজালো টেবিলে। বৃদ্ধ বললেন, নাও এসো, খানাপিনা তৈরি। এবার বসা যাক।

বৃদ্ধ কিন্তু কিছুই খেলেন না। শুধু খাবার-এর থালাগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাত মুখে ঠেকালেন। খাওয়ার অভিনয় করে পরমানন্দে চিবুতে থাকলেন, আর মাঝে মাঝে, 'বাঃ কি চমৎকার' বলে তারিফ করতে থাকেন। শাক্কাশিক বুঝতে পারে না, কী ব্যাপার? দারুণ খিদে পেয়েছিলো, গ্রোগ্রাসে খেতে থাকলো সে। বৃদ্ধ বললেন, এই শাহী কোপ্তাটা খেয়ে দেখো, ভারি স্বাদের হয়েছে। আমি একটা নিগ্রো মেয়ে রাঁধুনী রেখেছি—পাঁচশো মোহর দিয়ে। বড় ভালো রাঁধে মেয়েটি।

শাক্কাশিক খেয়ে তারিফ করলো, চমৎকার। এতো ভালো রান্না সে কোথাও খায়নি।

—আহা-হা, ওই মোরগ মোসাল্লামটা খাচ্ছো না কেন, ও জিনিস কোন সুলতান বাদশাহর বাড়িতে পাবে না।

আমার ভাই এক এক করে সবই উদরস্থ করতে থাকে। বৃদ্ধ এবার আপেল-ডিমের থালাটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, সবগুলো খেতে পারবে। মাত্র চুয়াল্লিশটা আছে। তোমার মতো বয়সে আমি একশো চুয়াল্লিশটা খেতাম।

শাক্কাশিক বলে, দেখি, চেষ্টা করে দেখি।

একটা একটা করে মুখে পুরে নেয়। এইভাবে থালাটা শূন্য করে ফেলে। বৃদ্ধ খুব খুশি হয়, তুমি তো বেশ খাইয়ে লোক আছো হে। তোমার মতো লোককে খাইয়ে সুখ আছে। আজ থেকে তুমি আমার এখানেই থাকবে—খাবে। আমি যতদিন বাঁচি। সেই থেকে আমার ভাই সেখানেই থেকে গেলো। বৃদ্ধ আরও বিশ বছর জীবিত ছিলেন। এই বিশটা বছর তাঁকে আর অন্য কোথাও যেতে হয়নি।

কিন্তু বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে, যেহেতু তার অন্য কোন ওয়ারিশ ছিলো না, কোতোয়াল তার সব-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে শাক্কাশিককে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিলো।

মনের দুঃখে ভাই আমার মক্কার পথে যাত্রা করে। মনের বাসনা, জীবনের বাকী দিনগুলো আল্লাহর নাম গান করে সেখানেই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক।

তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে মরুপ্রান্তর পার হওয়ার সময় দুর্ধর্ষ আরব্য-দস্যুদের কবলে পড়ে সর্বস্বান্ত হলো সবাই। পয়সাকড়ি যার কাছে যা ছিলো তা নিয়ে ক্রীতদাস করে নিয়ে গেলো। দলের সর্দার তার নিজের বাড়ির নফর করে রাখলো শাক্কাশিককে। মাঝে মাঝেই তার উপর অত্যাচার চালাতো সে। বলতো, ওহে নবাব পুত্তুর হাত চালিয়ে কাজ কাম করো, মনে হচ্ছে, কোন দেশের আমীর ওমরাহ ছিলে তুমি। মাল-কড়ি অনেক আছে বুঝি দেশে। তা নিয়ে এসো না, তোমাকে ছুটি করে দেবো।

শাক্কাশিক বলে, এক কানা কড়িরও মুখ দেখিনি কখনও। সারাজীবন পরের অন্নে প্রতিপালিত হয়েছি। কোথায় পাবো টাকা পয়সা?

দস্যু সর্দার বিশ্বাস করে না, থু করে থুথু ফেলে বলে, মিথ্যুক, তাহলে থাক, এখানেই পচে মর।

সর্দারের বৌটা ছিলো খুব সুন্দরী। বয়সে কাঁচা-ডাগর। যেমন তার রূপ তেমনি তার উদ্দাম যৌবন। সর্দার বেরিয়ে গেলেই বৌটা আমার ভাই-এর কাছে ঘেঁসে আসতো। গায়ের কাপড় ফেলে দিয়ে বলতো, আহা চোখটা তুলে দেখো না। আমার এই রূপ এই ভরা যৌবন ওই বুড়ো সর্দারটা এর কি মর্ম বুঝবে, বলো। তুমি জোয়ান মর্দ—তোমার হাতের পরশ পেলে আমার গায়ে ফুল ফুটবে গো। আহা, লজ্জা কি, এসো না!

শাক্কাশিকের হাত ধরে টানতে থাকে মেয়েটা। কিন্তু ভাই আমার ওসব ব্যাপারে একেবারেই হাঁদা। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, নানা, আমার ওসব ভালো লাগে না।

মেয়েটা ঠোঁট ওলটায়, তোমার মতো একটা জোয়ান পুরুষ, ইচ্ছে করে না, কি গো! তুমি কি হিজরে নাকি?

এইভাবে আরো কিছুদিন কাটে। সর্দার বেরিয়ে গেলেই মেয়েটা ওর কাছে আসে। জামা কাপড় খুলে ফেলে শাক্কাশিককে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভাই আমার অন্য ধাতুতে গড়া। কিছুতেই উত্তেজিত করতে পারে না তাকে। একদিন বৌটা এসে বললো, তুমি যদি আমার কথা শোনো, তাহলে তোমাকে পালাবার ব্যবস্থা করে দেবো আমি। দেখো, ভেবে দেখো আমার কথা।

শাক্কাশিকের মনে তখন একটা কথাই ঘোরাফেরা করে। মুক্তি পেতে হবে। যেভাবেই হোক, এই কয়েদখানা থেকে পালাতেই হবে তাকে। বৌটার কথায় ভরসা হয়। ওকে খুশি করতে পারলে পালাবার পথ করে দিতে পারে বোধহয়। অনেক ভেবেচিন্তে একদিন রাজি হয়ে গেলো শাক্কাশিক। মেয়েটা তো হাতে স্বর্গ পায়। শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কে শুয়ে পড়ে। মেয়েটি তাকে খুব আদর করতে থাকে—চুমু খায়। একটা পুরুষকে জাগ্রত করার সব কৌশলই জানা আছে তার। শাক্কাশিক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। দেহের রক্তে নাচন শুরু হয়। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। এখনি ঝড় উঠবে। এমন সময় যমদূতের মতো দরজার সামনে এসে খাড়া হয় সেই দস্যু সর্দার। এ সময়ে তার আসার কথা নয়। কিন্তু শাক্কাশিকের নিয়তির লেখা বুঝি এইরকমই ছিলো। ডাকাতটা হুঙ্কার ছাড়ে, তোর ঘাড়ে কটা মাথা, রে? আমার বৌ-এর সঙ্গে—বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। এসো বাছাধন তোমাকে একটু শিক্ষা দিই।

এই বলে কোমরের শাণিত ছোরা বের করে প্রথমে শাক্কাশিকের ঠোঁট দু'টো কেটে নিলো।—আহা-হা ওই ঠোঁটে চুমু খেয়েছিলে, বাছাধন?

যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে শাক্কাশিক। কিন্তু ডাকাতটা তখন পিশাচের হাসিতে ফেটে পড়ছে।—আহা, এতেই এত কাতর হলে চলবে কেন, এবার যে তোমার আসল অঙ্গটা কেটে নেবো। সারাজনম আর যাতে অসভ্যতা করতে না পারো তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

তারপর কি বলবো, জাঁহাপনা, সেই শয়তান ডাকাতটা আমার ভাই-এর পুরুষাঙ্গটাও কেটে ফেললো। শাক্কাশিক তখন অচৈতন্য। ডাকাতটা ভাবলো মরে গেছে। একটা উটের পিঠে চাপিয়ে উটটাকে পাহাড়ের পথে পাঠিয়ে দিলো। পাহাড়ে ওঠার পথে উটের পিঠ থেকে হড়কে পড়ে যাবে সে।

মক্কা যাত্রীরা এই পাহাড়ের পথ ধরেই যায়। তাদের কেউ কেউ চিনতে পেরেছিলো আমার ভাইকে। তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে আমি ছুটে যাই। নিজের কাছে নিয়ে আসি। আমার দাওয়াই-এর গুণে ওর ক্ষত সারতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু একেবারে অক্ষম হয়ে পড়ে আছে। আমার কাছেই থাকে। আমার ঘাড়েই খায়।

নাপিত বললো, এক এক করে আমার ছটি অপদার্থ অপরিণামদর্শী, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ভাইদের কাহিনী আপনাকে শোনালাম জাঁহাপনা। এবার আপনিই বিচার করে দেখুন, আমি কত বিচক্ষণ, কত জ্ঞানী, মহৎ পরোপকারী উদার আর স্বল্পভাষী।

খলিফা-অল-মুসতানসির বিল্লাহ ঘাড় নেড়ে বললেন, তোমার মতো সর্বগুণসম্পন্ন মানুষ দুনিয়াতে বিরল। তাই আমি আর তোমাকে এই ছোট্ট বাগদাদ শহরের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাই না। তোমার মতো বিচক্ষণ, উদার, পরোপকারী মানুষ দুনিয়ার বহু দেশেই নাই। আমার নির্দেশ, আজই—এক্ষুণি তুমি বাগদাদ ছেড়ে দুনিয়া সফরে বেরিয়ে পড়ো।

দুনিয়ার মানুষ তোমার সাহচর্য পেলে অনেকভাবে উপকৃত হবে।

এই বলে তিনি আমাকে সেইদিনই বাগদাদ থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। আমি তাই নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে শেষে আপনাদের এই চীন দেশে এসে হাজির হয়েছি। আসার আগে হলফ করে এসেছি, যতদিন না খলিফা মুসতানসির বিল্লাহ মারা যাবেন ততদিন আর বাগদাদের মাটিতে পা রাখবো না। তিনি খলিফা হতে পারেন, কিন্তু গুণীর কদর বোঝেন না। আর এই ল্যাংড়া যুবকের উষ্মার কথাও সব শুনেছেন আপনারা। এবার বিচার করুন, আমি কি সত্যিই বেশী কথা বলি? আমার তো বিশ্বাস, আমার মতো মিতভাষী মানুষ আর দ্বিতীয় নাই। আর দূরদর্শিতার কথাই ধরুন—আমি তো সেই যুবককে পই পই করে বারণ করেছিলাম, এখন আপনি কোন নতুন কাজে যাবেন না। সময়টা খারাপ চলছে। কিন্তু আমাকে অগ্রাহ্য করে সে গেলো। পরিণামে কি বিপত্তি বলুন? সময় মতো আমি সেখানে না গেলে মেয়েটির বাবা কাজী সাহেবের হাতে তার প্রাণটাই খোয়া যেত। আমার জন্যে সে যে একটামাত্র পা-এর ওপর দিয়েই বেঁচে গেলো, সে জন্যে ধন্যবাদ তো দিলো না? আজকালকার দুনিয়াটাই এইরকম। যার আপনি উপকার করবেন, সেই আপনাকে বাঁশ দেবে।

নাপিতের এই সুদীর্ঘ কাহিনীর কচকচানী শেষ হলে আমরা উপস্থিত অভ্যাগতরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উফ্! লোকটা কি বকবকই না করতে পারে। আর বলে কিনা—অল-সামিত—একেবারে স্বল্পবাক! কি হামবড়াই ভাব। সে নাকি সেই সওদাগর ছেলেটিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। লোকটা ডাহা মিথ্যুক, শয়তান, বদমাইশ। তার হঠকারিতার জন্যেই ছেলেটির পা-টা খোঁড়া হয়ে গেছে। সে যদি চুল কামানোর সময় ঐ রকম বক বক করে ফালতু সময় নষ্ট না করতো তাহলে, যথা সময়েই সে মেয়েটির কাছ থেকে ফিরে আসতে পারতো। তার

দোষেই সে ঠিক সময়ে যেতে পারেনি। দেরি করে পৌঁছলেও সে কিছুতেই কাজীর হাতে ধরা পড়তো না। কিন্তু অনর্থক হৈচৈ বাঁধিয়ে খুঁচিয়ে সবাইকে জানানোর জন্যেই যত বিপত্তি ঘটলো। আমাদের মনে হতে লাগলো, দর্জি বলতে থাকে, নাপিতটা শয়তানী করেই ঐ কাণ্ডটা করেছিলো।

সবাই রাগে ফুঁসতে লাগলো। নাপিতটাকে শায়েস্তা করা দরকার। তার জন্যেই আমরা আজ এক মুসাফীর মেহমানকে হারালাম। ঠিক করা হলো, ওর সঙ্গে আমরাও কেউ খানাপিনা করবো না। ওকে পাশের একটা ঘরে চ্যাংদোলা করে তুলে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা মেরে দেওয়া হলো। ঘরটায় অসংখ্য ধাড়ী ইঁদুরের আড্ডা। এঘরে আমরা যখন খানা খাচ্ছি তখন তার কান্না আর চিৎকার কানে আসতে লাগলো, ওরে, বাবারে, আমাকে খেয়ে ফেললো রে। আমরা সে দিকে কর্ণপাত করলাম না। খুব মৌজ করে সরাব খেলাম। আকণ্ঠ খানা খেলাম। তারপর বিকেলবেলা বিবির জন্যে খানিকটা খাবার বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

বিবি আমার রেগে আগুন।—সারদিন তুমি আমাকে একা বাড়িতে ফেলে মজা করতে বেরিয়েছো। আমি এই দৈত্য পুরীতে একা একা কাটাই কি করে? তোমার কি কোনও আক্কেল বুদ্ধি নাই? আজই—এক্ষুণি যদি আমাকে নিয়ে বেড়াতে না যাও তা হলে, এই আমি চললাম কাজীর কাছে। তোমাকে তালাক দেবো।

আমি খুব শান্ত মেজাজের লোক, কোন সময়ই চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি সইতে পারি না। অশান্তি আমার ভালো লাগে না। তাই বললাম, নাও চলো, কাজীর কাছে আর গিয়ে কাজ নেই, এখন চলো একটু বেড়িয়েই আসি।

সুতরাং আমরা সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত নানা জায়গায় ঘুরলাম—দেখলাম। তারপর যখন বাড়ি ফিরছি এমন সময় দেখা হয়ে গেলো এই কুঁজোটার সঙ্গে। খুব টেনেছিলো সে। একেবারে বেহেড মাতাল অবস্থা। মনের আনন্দে আবোল তাবোল বকছে কখনও বা বেসুরোভাবে দু-একটা পরিচিত গানের কলি গাইছে। আবার কখনও বা বিনা কারণেই হো হো করে হাসছে। পথ চলতি মানুষের কোর্তার কোনা টেনে দিয়ে পালাচ্ছে। আবার কখনও বা ধেই ধেই করে নাচছে। আমার বিবি এবং আমি দু'জনে মিলে ঠিক করলাম, লোকটাকে বাড়ি নিয়ে গেলে বেশ মজা হবে। মদের নেশায় বিভোর সে। সুতরাং লজ্জা-শরমের বালাই নাই—প্রাণ খুলে নাচ গান হল্লা করে মাতিয়ে রাখবে।

কুঁজোকে বলতেই এক কথায় রাজি হয়ে গেলো। সেদিন ঘরে কিছু খাবার দাবার ছিলো না। আসার পথে দোকান থেকে প্রয়োজন মতো কিনে নিলাম। আমার বিবি পর পুরুষের সামনে বের হন না। কিন্তু কুঁজোকে তিনি কোনও মানুষ জ্ঞান করলেন না। একটা পুতুল বলে মনে হয়েছিলো তার। সুতরাং সকলে মিলে এক সঙ্গে খেতে বসলাম। কুঁজোটা তার কলা-কৌশল দেখাতেই মত্ত। মদের নেশায় খানার দিকে তার তখন নজর নাই। আমার বিবি এক টুকরো মাছ তার মুখে পুরে দিলো—জোর করেই। কুঁজোটা কিছুতেই মুখে নেবে না, আমার বিবিও ছাড়বে না। এই জোর করে খাওয়ানোর মধ্যেও বেশ একটা মজা পাচ্ছিলো সে। কিন্তু বিপদ হলো ওখানেই। একটা মাছের টুকরো জোর করে গিলতে গিয়ে আটকে গেলো গলায়। আর সেটা উগরে নিচে না নিতে পারায় সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়ে গেলো।

আমরা তো ভয়ে অস্থির। আমার বিবি তখন তাকে কোলে নিয়ে চললো হেকিমের কাছে। আমিও গেলাম সঙ্গে। হেকিমের বাড়ির সিঁড়ির ধাপে তাকে বসিয়ে রেখে চলে আসি আমি।

এর পরের কাহিনী তো আপনি হেকিম, বাবুর্চি ও খ্রীষ্টান দালালের জবানীতেই

শুনেছেন। এখন বলুন, জাঁহাপনা, যে কাহিনী আপনাকে শোনালাম—সেই ল্যাংড়া তরুণ সওদাগর, সেহ নাপিত আর তার ছয় ভাই-এর কাহিনী কি আপনার এই কুঁজোর আশ্চর্যজনক মৃত্যুর কাহিনীর চেয়ে আরো অদ্ভুত না?

চীনের সুলতান তারিফ করে ঘাড় দোলালেন, নিশ্চয়ই। তোমার কাহিনী আরও তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছে আমাকে? কিন্তু সেই নাপিতটা কোথায়? তাকে আমি দেখতে চাই। তার মতো অদ্ভুত মানুষ তো আমি দেখিনি কখনও! তাকে যদি আনতে না পারো তোমাদের চারজনের কাউকেই ছাড়বো না।

দর্জি বললো, এ আর এমন বেশি কথা কি জাঁহাপনা। আপনার লোকজন আমার সঙ্গে দিন, আমি এক্ষুণি আপনার সামনে তাকে হাজির করে দিচ্ছি।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। যা লোকজন দরকার নিয়ে যাও। ধরে হোক, বেঁধে হোক, যেভাবে পারো তাকে নিয়ে এসো। নাপিতকে নিয়ে আসার পর কুঁজোকে কবর দিতে হবে। তার সমাধির উপর আমি একটা স্মৃতিসৌধ বানাবো। সে আমার বড় প্রিয় বয়স্য ছিলো।

সুলতানের লোক-লস্কর নিয়ে দর্জি গেলো নাপিতের সন্ধানে। ঘণ্টাখানেক বাদে নাপিতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো তারা। সুলতান দেখলো, নাপিতের বয়স প্রায় নব্বই হবে। দাড়ি গোঁফ সবই দুধের মতো সাদা। কান দু'টো ফুটো করা। নাকটা ভীষণ চোখা। চোখ দু'টো হাতীর মতো একেবারে খুদে। সুলতান তাকে দেখে হেসে খুন।

—ওহে নাপিত, তোমার কাহিনী শুনে আমি ভারি মজা পেয়েছি। তাই তোমাকে সামনাসামনি দেখার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার লোকজন হয়তো তোমাকে ধরে বেঁধে এনে অনেক কষ্ট দিয়েছে। যাই হোক কিছু মনে করো না। শুনেছি তুমি খুব স্বল্পভাষী লোক। তা তোমার মজার মজার কাহিনীর দু'একটা আমাকেও শোনাও।

নাপিত বললো, তা হুজুর মিথ্যে কিছু শোনেননি। গল্প আপনি যতো শুনতে চান শোনাবো। সাত দিন সাত রাত অনর্গল বলে যেতে পারি। তাতে আমার কোন ক্লান্তি নাই। কিন্তু তার আগে হুজুর, আমাকে বলুন, এই খ্রীষ্টান, এই মুসলমান, এই ইহুদী আর কুঁজোর লাস—এরা সব এখানে কেন? কী ব্যাপার? আপনি শুনেছেন, আমি একেবারে স্বল্পভাষী। এবং কোন কিছু জানার জন্যে অহেতুক কৌতূহল আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না। তবুও আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, এরা সব এখানে কেন?

সুলতান বললেন, এসব ব্যাপারে তোমার এতো আগ্রহ কেন, নাপিত? এদের কাহিনী শুনে তুমি কী করবে?

নাপিত বললো, আমার দূরদৃষ্টি দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা ভুলের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। সেইজন্যেই, আমি মিত-বাক হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। এবং আপাতদৃষ্টিতে আপনার মনে হতে পারে—আমি অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করছি, কিন্তু এই কৌতূহল অহেতুক নয়, তাও আপনাকে আমি প্রমাণ করে দেবো।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, শোনো।

কুঁজোর মৃত্যু থেকে শুরু করে খ্রীষ্টান দালালের ফাঁসীর হুকুম পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী নাপিতকে শোনানো হলো।

নাপিত সব শুনেটুনে বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়তে লাগলো।—তোমাদের কেউ কুঁজোর মুখের কাপড়টা সরিয়ে দাও, দেখি—

একজন কাপড়টা সরিয়ে নিলো। নাপিত কুঁজোটার মৃতদেহর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নিবিষ্ট মনে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকলো। অনেকক্ষণ ধরে। তার চোখ মুখ গলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর এক সময় তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে হো হো করে হাসতে লাগলো। মুখের ভাবখানা—সব সমস্যার জলের মতো সমাধান করে ফেলেছে সে।—হুম্, মারা সে সত্যিই গেছে। দুনিয়াতে এমন কোনও হেকিম বদ্যি নাই, যে ওকে আবার বাঁচাতে পারে। কিন্তু আমি পারি। আমি ওকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারি।

সুলতান সহ দরবারের সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। এমন অদ্ভুত কথা কি কেউ শুনেছে কখনও। মরা মানুষ আবার বেঁচে উঠবে?

সুলতান বললো, দর্জি তোমার সম্বন্ধে অনেক মজার কথাই আমাকে শুনিয়েছে, কিন্তু এমন আজগুবি ব্যাপার তুমি ঘটাতে পারো, তেমন তো কোনও আভাষ পাইনি।

নাপিত বললো, আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? না হওয়ারই কথা। যাই হোক, এক্ষুণি আপনার সামনেই দেখিয়ে দিচ্ছি। কী করে আবার কুঁজোটা বেঁচে ওঠে, একবার দেখুন।

কোমরে গোঁজা সন্নাটা হাতে নিয়ে কুঁজোর কাছে এগিয়ে গেলো। এক হাত দিয়ে মুখটা হাঁ করিয়ে অন্য হাত দিয়ে সন্নাটা ঢুকিয়ে দিলো মুখের ভিতর। কয়েক মুহূর্ত। সন্নাটা বের করলো। তার মুখে মাছের একটা টুকরো।

সঙ্গে সঙ্গেই, কি আশ্চর্য কুঁজোটা চোখ মেলে তাকালো। তাজ্জব ব্যাপার। এ-ও সম্ভব। মরা মানুষ বেঁচে উঠলো?

সুলতান হতবাক। হতবাক সকলেই। অবাক বিস্ময়ে সবাই চেয়ে দেখে কুঁজোটাকে—চেয়ে থাকে নাপিতের মুখের দিকে।

নাপিত তখন নির্বিকার। এমন ভাব—যেন বিশেষ কিছুই হয়নি। এ আর এমন কি—আরও অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতে পারে সে।

সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। খোদার পয়গম্বর ছাড়া এমন অলৌকিক ঘটনা কে ঘটাতে পারে? মুহূর্তের মধ্যে নাপিত সম্পর্কে সকলের ধারণা আমূল পাল্টে গেলো। কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী না হলে এরকম ঘটনা কি করে সম্ভব? নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে স্বয়ং এখানে পাঠিয়েছেন।

সুলতান বললেন, জীন্দগীতে অনেক আশ্চর্য ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তুমি আজ যা দেখালে নাপিত, তার জবাব নাই। এরকম তাজ্জব ঘটনা একমাত্র আল্লাহর পয়গম্বর ছাড়া আর কেউ ঘটাতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, তিনিই তোমাকে পাঠিয়েছেন। আমার দরবারের প্রিয়তম বয়স্য এই কুঁজো। এর বিয়োগে আমার দরবারে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিলো। তুমিই আবার আলো জ্বালিয়ে দিলে। আমার মুখে হাসি ফোটালে। সবই তাঁর অপার লীলা। তিনিই তোমাকে পাঠিয়েছেন। না হলে, দর্জির সঙ্গেই বা তোমার দেখা হবে কেন? আর সেই বা বলবে কেন তোমার অলৌকিক গুণের কাহিনী? দর্জির মুখে শোনার পর থেকে আমার কিন্তু বার বারই মনে হচ্ছিলো, তোমার ভেতরে এমন একটা কিছু গুণ আছে যা অন্যের চোখে ধরা পড়ছে না। তুমি এলে তাই প্রিয় বয়স্যর প্রাণ রক্ষা পেলো। সে নিশ্চিত মারা গেছে—আমরা তার শেষকৃত্য করবো বলে তৈরি হচ্ছিলাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দেহ সমাহিত করা হতো। শুধু তোমার কল্যাণে আমরা আবার তাকে ফিরে পেলাম। এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি ঘটতে পারে?

সুলতান তার মহাফেজখানার প্রধানকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে লিখে সযত্নে রেখে দাও। ভাবীকালের মানুষ পড়ে এর থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

এর পর দর্জি, ইহুদী হেকিম, বাবুর্চি এবং খ্রীষ্টান দালালকে মূল্যবান সাজপোশাক ও স্বর্ণমুদ্রায় পুরস্কৃত করে বিদায় দিলেন সুলতান। কুঁজোকেও নানা পোশাক পরিচ্ছদে ভূষিত করে আবার দরবারে বসালেন। আর নাপিতকে দিলেন হীরা জহরৎ বসানো সোনার জ্যোতিষ দর্পণ, সোনার কাঁচি, সোনার ক্ষুর। তাছাড়া নানারকম দামী দামী সাজপোশাক দিয়ে বললেন, আজ থেকে তুমি আমার সভার আর এক বয়স্য হলে। তোমাকে আমি আমার ব্যক্তিগত ক্ষৌরকার নিযুক্ত করলাম।

শাহরাজাদ একটুক্ষণের জন্য থামলো। এখানেই এ কাহিনীর শেষ। কিন্তু শাহজাদা, এর চেয়েও চমৎকার কাহিনী আছে। আপনি শুনে আরও তাজ্জব বনে যেতে পারেন।

বাদশাহ শারিয়ার বললো, কী সেই কাহিনী?

মধুমিতা এবং আলী নূরের কাহিনী এবার শোনাবো আপনাকে। এ কাহিনী আরও মজাদার আরও চমৎকার।

এক সময়ে বসরাহর সিংহাসনে সুলতান মহম্মদ ইবন সুলেমান অল-জিনি অধিরূঢ় ছিলেন। দীন দুঃখীদের প্রতি দরদ ছিলো তার অপরিসীম। তার মতো ধর্মপ্রাণ সুলতান সে সময়ে খুব কমই ছিলো।

সুলতানের দুই উজির। একজনের নাম সাবীর পুত্র মইন আর একজন কা-কনের পুত্র অল-ফাদল। তিনি ছিলেন খুব দয়ালু, সৎ এবং জ্ঞানী। যে কেউ যে কোনও সমস্যা নিয়ে হাজির হলে তিনি তা ধৈর্য সহকারে শুনতেন এবং তার যথাযোগ্য সমাধান করে দিতেন। কিন্তু অন্য উজির মইন ছিলেন ঠিক তার উল্টো। কোনও লোককেই সহ্য করতে পারতেন না। বিনা কারণে চটে যেতেন। এবং লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড বিধান করতেন।

প্রজারা মইনের প্রতি যেরূপ অপ্রসন্ন ছিলো, সেই রকমই ভালোবাসা ভক্তি ছিলো অল-ফাদলের প্রতি।

একদিন মহম্মদ ইবন সুলেমান শুনলো, বসরাহর বাজারে ভালো ভালো ক্রীতদাসী এসেছে। অল-ফাদলকে ডেকে সুলতান বললেন, তুমি নিজে যাও, দেখে শুনে একটা খুবসুরৎ ক্রীতদাসী কিনে নিয়ে এসো। দেখতে শুনতে এমন হওয়া চাই, যেন সবাই তারিফ করে। সবার সেরা হওয়া চাই। শুধু দেখতে সুন্দর হলেই চলবে না, স্বভাব চরিত্র খুব ভালো হওয়া দরকার।

এমন একটা কাজের ভার তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেওয়া হচ্ছে দেখে মইন ক্ষুব্ধ হয়। একটু রাগত স্বরেই বললেন, কিন্তু জাঁহাপনা, আপনার যেমন পছন্দ সেরকম একটা ক্রীতদাসী কিনতে গেলে দশ হাজার মোহরের কমে পাওয়া যাবে না।

সুলতান মইনের এই গায়ে পড়ে কথা বলায় বিরক্ত হন। খাজাঞ্চীকে ডেকে বললেন, কোষাগার থেকে দশ হাজার মোহর অল-ফাদলকে দাও।

খাজাঞ্চী মোহর নিয়ে এসে দিলো। সুলতান বললেন যাও অল-ফাদল, বাজারে যাও। যা বললাম ঠিক সেইরকম হওয়া চাই।

সুলতানের হুকুম শিরোধার্য করে অল-ফাদল বাজারে চলে গেলেন। সব দালালদের ডেকে জানালেন তাঁর চাহিদা। দালালরা শুনে বললো, কিন্তু হুজুর সেরকম ক্রীতদাসী তো এ বাজারে নাই। এখন যা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা সেরা দাম হতে পারে বড়জোড় হাজারখানেক দিনার।

অল-ফাদল বললেন, ঠিক আছে, খুঁজে পেতে দেখো, যা ভালো পাও নিয়ে এসো।

সারাদিন খুঁজেও তেমন কোন মেয়ে পাওয়া গেলো না, যা হাজার দিনার দিয়ে কেনা যায়। দালালরা বললো, হুজুর এই মাসের শেষে একটা চালান আসবে। সেই চালানে কিছু

ভালো মেয়ে পাবেন। তার মধ্যে থেকে বাছাই করে নিলে হয়তো সুলতানের পছন্দ হতে পারে।

অল-ফাদল ফিরে গেলেন। সুলতানের কাছে আরও কিছু সময় প্রার্থনা করে বললেন, আপনি আর কয়েকটা দিন সময় দিন আমাকে। এই মাসের শেষে ভালো ভালো মেয়েছেলে আসার কথা আছে।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে অপেক্ষা করবো। কিন্তু তোমাকে যা বলেছি—দুনিয়ার সেরা মেয়ে হওয়া চাই।

কিছুদিন পরে এক দালাল এসে বললো, হুজুর, আপনি যা চাইছেন, সেইরকম একটা মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অল-ফাদল বললেন, যত তাড়াতাড়ি পারো আমার প্রাসাদে নিয়ে এসো তাকে। আমি আগে দেখবো, তারপরে সুলতানকে দেখাবো।

ঘণ্টাখানেক বাদে একটি মেয়েকে সঙ্গে করে সেই দালাল হাজির হলো অল-ফাদলের প্রাসাদে। মেয়েটি বেশ লম্বা এবং তন্বী। সরু কোমর সুগঠিত স্তন, কাজল কালো টানাটানা চোখ। আপেলের মতো সিঁদুরে, মসৃণ চিবুক। মুখে তার হাসি লেগেই আছে। আর হাসলে পরে গালে এক অদ্ভুত সুন্দর টোল খায়। গায়ের রং দুধে আলতায়। মেয়েটা কারণে অকারণে খিলখিল করে হাসতে থাকে। দাঁতগুলো ওর ধবধবে সাদা মুক্তোর মতো। আঙ্গুরের মতো টসটসে ঠোঁট। গুণ গুণ স্বরে গানের কলি ভাঁজছিলো সে। আহা, কি মিষ্টি তার কণ্ঠ।

অল-ফাদল ভাবেন, এমন রূপের হাট, সুলতান দেখলে নির্ঘাৎ পছন্দ করবেন। একেবারে ভরা যৌবন—ডাঁসা পেয়ারা।

অল-ফাদল জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

—আনিস-অল-জালিস।

নামের মানে—মধুমিতা। দেখে এবং তার কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হলেন উজির। দালালকে জিজ্ঞেস করলেন, কী দাম?

দালাল বললো, ওর মালিক বলেছে দশ হাজার দিনার। আমার মনে হয় দামটা এমন কিছু বেশী বলেনি সে।

উজির বললেন, ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো। ওর মালিককে ডেকে নিয়ে এসো। টাকাটা আমি ওর হাতে দেবো।

দালাল নিয়ে এলো মেয়েটার মালিককে। উজির দেখলেন, লোকটি বয়সে বৃদ্ধ। কিন্তু বড় সৌখিন। জাতে পারসিক অল-ফাদল জিজ্ঞেস করলেন, কতো দাম নেবে মেয়েটার?

লোকটি বললে, সুলতান যদি ইচ্ছা করেন, বিনামূল্যেই দিতে পারি। তবে দাম যদি জিজ্ঞেস করেন, দশ হাজার মোহরই নেবো। তাকে আমি নবাব বাদশাহদের যোগ্য মানুষ করেছি। আরবী এবং পারসী সাহিত্যে তার ভালো দখল আছে। অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, আইন, সমাজবিদ্যায় তার তুল্য পারদর্শী খুব কমই পাবেন হুজুর। আমি তার লেখাপড়া বিষয়ে কোনও কার্পণ্য করেনি। তার চরিত্রে কোন খুঁত খুঁজে পাবেন না। আচার ব্যবহারে সে সকলের মনে জয় করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমি রাখি। সবচেয়ে বড়, তার রসবোধ। এমন সূক্ষ্ম রস-জ্ঞান অনেকেরই হিংসার বস্তু। এবং এই কারণেই তার নাম মধুমিতা।

উজির বললেন, তোমার কোন কথাই অবিশ্বাস করছি না। এই নাও, দশ হাজার মোহরই দিলাম, গুণে দেখো।

পারসিক লোকটি টাকাগুলো গুণতে গুণতে বললো, আপনাকে একটা কথা বলি, মেহেরবানী করে আজই ওকে সুলতানের সামনে দাঁড় করাবেন না। পথশ্রমে ও ভীষণ

ক্লান্ত। ওর রূপের জেল্লা কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে। দশটা দিন ওকে আপনার কাছে রাখুন। একটু বিশ্রাম করুক। স্নানটান সেরে নতুন সাজপোশাক পরুক। তারপর দেখবেন আজ যা দেখছেন তার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী হয়ে উঠবে সে। তখন সুলতান তাকে দেখলে আপনার ওপর আরো খুশি হবেন।

বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রহণযোগ্য মনে হলো উজিরের। নিজের প্রাসাদের একটা সুসজ্জিত কক্ষে তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

উজির অল-ফাদলের একটি পুত্র ছিলো। তার মতো রূপবান যুবক সচরাচর চোখে পড়ে না। ধবধবে ফর্সা গায়ের রং। সুঠাম দেহের গড়ন। টানাটানা চোখ উন্নত নাসিকা প্রশস্ত ললাট। ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল।

ছেলেটির নাম আলী নূর। মধুমিতা সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। কত টাকায় কেনা হয়েছে এবং কার জন্যে কেনা হয়েছে তার কোনও খবরই সে রাখে না।

উজির মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, আজ থেকে দশ দিন তুমি এইখানেই থাকবে। পথের ক্লান্তি কাটিয়ে নাও। তারপর তোমাকে সুলতানের সামনে নিয়ে যাবো। কিন্তু একটা কথা, তোমাকে সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি। আমার একটি ছেলে আছে—পাজি বদমাইশ। কিন্তু দেখতে সুন্দর সুপুরুষ। তুমি কিন্তু নিজেকে খুব শক্ত করে রাখবে। তার মোহে নিজেকে বিলিয়ে দিও না। তাহলে সুলতানের কাছে আমি বে-ইজ্জত হবো। সে এমনি যাদু জানে, মেয়েরা তাকে দেখলেই মজে যায়। আমার পুত্র এ মহল্লার একটি মেয়েকেও আস্ত রাখেনি। মেয়েগুলো আপনা থেকেই পতঙ্গের মতো উড়ে পড়ে তার রূপের আগুনে। আমার শ্রীমান তাদের প্রত্যেককে দগ্ধ করে মারে। এই তার কাজ। তুমি খুব সাবধানে থাকবে। ঘরের দরজা খুলে একা বাইরে যাবে না। খোজাকে বলে রেখেছি, তোমার পাশেই থাকবে সে। তোমার যা প্রয়োজন, তাকে বলো, সেই সব করে দেবে। তোমার গলার আওয়াজ যেন ঘরের বাইরে না যায়। একবার যদি সে জানতে পারে তুমি আছো এখানে, তাহলে আর রক্ষে নাই। সে তোমার সামনে এসে দাঁড়ালে তাকে আর কোনও চেষ্টা চরিত্র করতে হবে না, তুমি নিজেই তোমার নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।

মধুমিতা বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে বললো, আপনি যা বললেন তাই হবে।

কিন্তু বিধির লিখন কে করে খণ্ডন! পরদিন মধুমিতা গোসলের জন্যে বামন-খোজার সঙ্গে হামামে গেলো। আতর মেশানো জলের ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে স্নান করলো। সারা গায়ে সাবান মাখিয়ে দিলো খোজা। এমন বিলাসবহুল গোছলের কথা শোনেওনি কখনও। আজ প্রথম প্রত্যক্ষ করলো। নতুন সাজ-পোশাক পরে হাতে মেহেদী, নখে পালিশ পায়ে আলতা, কপালে টিপ, চোখে সুর্মা কাজল লাগিয়ে হামাম থেকে বেরিয়ে এলো সে। উজির সামনে থাকলে চিনতেই পারতেন না তার এমন রূপের বাহার খুলেছে তখন। খোজারা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো উজিরের বিবির কাছে। এই তিনি প্রথম দেখলেন মেয়েটিকে। উজিরের বিবি মধুমিতাকে দেখামাত্র এগিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন। পালঙ্কে নিয়ে গিয়ে বসালেন, তোমার রূপের আলোয় দেখো কেমন ঘর ভরে গেছে। এত রূপ তুমি কোথায় পেলে মধুমিতা? এমন যার নিজের রূপ, কি দরকার তার এত সাজে?

মধুমিতা বিগলিত হয়। রূপের প্রশংসা করলে কে না মুগ্ধ হয়? বলে, আপনি মা। মা-এর চোখে মেয়ে চিরদিনই সুন্দর। আল্লাহ আপনাকে সুখে রাখুন, মা।

আলী নূর-এর মা মধুমিতার জন্যে শরবৎ আর মিষ্টি আনতে বললেন। শরবৎ মিষ্টি এলো। মধুমিতা খুব তৃপ্তি করে খেলো। আলী নূরের মা বললেন, মা, তুমি একটু বিশ্রাম করো, আমি হামামে যাচ্ছি গোছল সেরে আসি।

দুটি বামন খোজাকে পাহারায় বসিয়ে তিনি তার পরিচারিকাদের সঙ্গে নিয়ে হামামে চলে গেলেন। খোজা দু'টোকে বলে গেলেন, ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।

নূরের মা চলে গেলে মধুমিতা সাজ-পোশাক ছেড়ে বিবস্ত্রা হয়ে পালঙ্কে শুয়ে পড়লো। একটুক্ষণ পরে নূর এসে ঢুকলো প্রাসাদে। বাইরে থেকে ফিরে প্রথমে সে মা এর সঙ্গে দেখা করে। এটা তার চিরকালের অভ্যাস। মা-এর ঘরের দরজার সামনে আসতেই দেখে দুটি বামন-খোজা পাহারা দিচ্ছে। নূর জিজ্ঞেস করে, কিরে তোরা আজ এখানে?

—জী হুজুর মা-জী হামামে গেছেন, তাই—

—মা-জী হামামে গেছেন, তা তোরা এখানে বসে কি করছিস।

—আমাদের ছোটা মালকিনকে পাহারা দিচ্ছি, হুজুর।

—ছোটা মালকিন? সে আবার কে?

—জী, মধুমিতা, নতুন এয়েছেন। কেন, হুজুর, আপনি জানেন না? উজির সাহেব—আপনার বাবা দশ হাজার মোহর দিয়ে কিনে এনেছেন আমাদের সুলতানের জন্য।

নূর ঘরের ভিতরে ঢুকতে যায়। খোজা দু'টো বাধা দেয়। বলে, আপনি ঢুকবেন না হুজুর। আমাদের গর্দান যাবে। মালকিন আমাদের বারণ করে গেছে, ঘরে যেন কাউকে ঢুকতে না দিই। যাবেন না হুজুর। যাবেন না—

কিন্তু নূর কি ওদের কথায় কর্ণপাত করার পাত্র? দরজা ঠেলে সে ঢুকবেই। আর তাকে বাধা দেয় কার সাধ্য? বাইরে কার সঙ্গে খোজা দু'টো কথা বলছে—মধুমিতা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। এ নিশ্চয়ই আলী নূর। উজির তাকে এই আলী নূর সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে গেছেন। ভীষণ বাজে ছেলে সে। তার সঙ্গে সে যেন কোনমতেই কথা না বলে। তার সামনে না যায়। সারা বাগদাদের একটা মেয়েও তার সতীত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি তার হাত থেকে। কী এমন চেহারা যা দেখে মেয়েরা পাগল হয়ে স্বেচ্ছায় নিজের দেহ বিলিয়ে দেয়? মধুমিতার দেখতে ইচ্ছে হয়। তবে এও ঠিক উজির সাহেব তাকে যা নির্দেশ দিয়ে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে সে। আর তাছাড়া, এ পর্যন্ত কত সুপুরুষ ছেলেকেই তো দেখেছে। তারা সবাই তার রূপের আগুনে পুড়ে মরতে চেয়েছে। তারাও তো অনেকেই সুপুরুষ ছিলো। কিন্তু মধুমিতাকে কেউ টলাতে পারেনি। আর আলী নূর এমন কি কন্দর্পকান্তি যে তাকে দেখে সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না। মধুমিতা ভাবে, আচ্ছা দেখাই যাক না! সে যদি নিজে ঠিক থাকে তবে একটা আলী নূর কেন, হাজারটা এলেও তার কিছু করতে পারবে না। পালঙ্ক থেকে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একটা পাল্লা একটু ফাঁক করে দেখে। মধুমিতার সারা শরীরে কেমন যেন শিহরণ খেলে যায়। একি! এমন রূপ কোনও পুরুষ মানুষের হয়? নূর এর চোখে চোখ পড়তেই তার সব তালগোল পাকিয়ে যায়। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে। দেহ অবশ হয়ে আসে। কাম-বাণে জর্জরিত হয় সারা শরীর। মধুমিতা বুঝি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। দরজাটা বন্ধ করে পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু হাত ওঠে না।

নূরও অপলক চোখে দেখতে থাকে মধুমিতাকে। এমন নিখুঁত সুন্দরী সে তো সারা বসরাহতে একটাও দেখেনি। কত হাজার রূপসী নিজে থেকে এসে তার সামনে বিবস্ত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের যৌবন বিলিয়ে দিয়েছে তার পায়ে। তাদের মধ্যে, কাউকেই তো মনে করতে পারছে না, এর পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে। এযে শালা একেবারে ডানা কাটা হুরী। দরজা

ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে আলী নূর। ভীত শশকের মতো মধুমিতা ছিটকে সরে যায় ঘরের এক কোণে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে থাকে। না না, সে কিছুতেই দেখবে না তাকে। উজিরের কাছে সে কথা দিয়েছে, নূর-এর সঙ্গে কথা বলবে না। তার হাতে ধরা দেবে না।

নূর এগিয়ে আসে।—কি গো সুন্দরী, মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আহা, অমন চাঁদের মতো সুরৎ—একটু দেখাও। প্রাণভরে দেখে জীবন সার্থক করি।

মধুমিতা তখন কি করবে বুঝতে পারে না। হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে নূরকে দেখে। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। লোকটা কি জাদু জানে নাকি? তা না হলে সে কেন বলতে পারছে না, তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। কেন বলতে পারছে না, তোমার বাবাকে আমি কথা দিয়েছি, তোমার সঙ্গে কথা বলবো না, তোমার মুখ দেখবো না। মধুমিতা চেষ্টা করে কিন্তু মুখে কথা সরে না। আস্তে আস্তে পালঙ্কে গিয়ে বসে। নূর সামনে এসে দাঁড়ায়। থুতনিটা তুলে ধরে বলে, আমি দেখতে এতই খারাপ, মুখটা নিচু করে আছো কেন? দু'টো কথা বলতেও আপত্তি? তাহলে আর কি উপায়। চলেই যাই।

নূর বেরিয়ে যাওয়ার ছল করে ফিরে তাকায়। মধুমিতা এবার খপ করে ওর হাত ধরে ফেলে। নূর ওর চোখের দিকে তাকায়। মধুমিতার চোখে করুণ মিনতি। মুখে কোনও কথা বলে না। চোখের ইশারায় বলে, পাশে বসো।

নূর হাসে। গা ঘেঁসে বসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ঠোটে ঠোঁট চেপে ধরে। মধুমিতা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না, ছাড়িয়ে নিতে চায়ও না। সারা শরীরে এক অভূতপূর্ব পুলক জাগে। সেও দু'হাত দিয়ে নূরকে আরও শক্ত করে চেপে ধরে বুকে। ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। নূর এবার ওকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। মধুমিতা বলে, দাঁড়াও। আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।

আলী নূর উঠে এসে খোজা দু'টোর মুখের সামনে দড়াম করে বন্ধ করে দেয় দরজাটা। খোজা দু'টো হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, মালিক আপনি বেরিয়ে আসুন,আপনার বাবা জানতে পারলে আমাদের গর্দান যাবে। মালিক, বেরিয়ে আসুন।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নূর আর মধুমিতা তখন অমৃত সায়রে সাঁতার কাটছে। খোজা দু'টো কাঁদতে কাঁদতে বেগম সাহেবের হামামের দিকে ছুটে যায়। নূরের মা তখন হামাম-এ ঢুকেছেন। দাসী পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে তিনি স্নান পর্ব সারছেন। খোজা দু'টো হামামের দরজায় করাঘাত করতে থাকে। 'মা-জী শিগ্গির বেরিয়ে আসুন, সর্বনাশ হয়ে গেছে।' কিন্তু বেগম সাহেবা তখন বেরুবেন কি করে। তার গায়ে সাবান ঘসছে দাসীরা। এখনও স্নানের অনেক বাকী। একজন পরিচারিকা এসে দরজাটা একটু ফাঁক করে জিজ্ঞেস করে, এই মুখপোড়ারা, অতো চেল্লাছিস কেন? জানিস না, বেগম সাহেবা এখন বে আব্রু, গোছল করছেন?

একটা খোজা বলে, কিন্তু মেরে জান, এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে।

মেয়েটি এবারে মারমুখো হয়ে বেরিয়ে আসে, কে তোর 'মেরে জান' রে হতচ্ছাড়া?

—আহা অতো চটছো কেন সুন্দরী? না হয় মুখেই একটা কথা বললাম, তা বলে কি আর সত্যি সত্যিই তুমি আমার বিবিজান হতে পারো নাকি। আল্লাহ সাধ দিয়েছেন ষোলআনা—সাধ্য দেয় নি এক কণা।

—আহা দুঃখু করিস নি, অমন করে দুঃখু করিস নি রে। আমি আল্লাহকে বলে দেবো, সে যেন পরের জন্মে তোকে একটা রাম পাঁঠা বানিয়ে পাঠায়। তা হলে তোর কি মজা হবে বল? সারা দিন রাত শুধু পাঠি পাল দিয়ে দিয়ে বেড়াতে পারবি। সাত জন্মের সাধ এক জন্মেই মেটাতে পারবি।

খোজাটা চটে যায়, এই—ভালো হবে না বলছি। গালাগাল করছো কেন?

—গালাগাল? ওমা, গালাগাল আবার কখন করলুম রে, বাঁদর?

—গালাগাল করলে না? এই তো এক্ষুণি রামপাঁঠা বললে!

—ওঃ এই কথা। রামপাঁঠা কি একটা গালাগাল হলো? আর এই বাঁদর বললাম, বাঁদরটা গালাগাল হলো না? ওটা বুঝি আদর হলো, নারে হাঁদা।

খোজাটা এবারে কেঁদে ফেলে। দাঁড়াও বেগম সাহেবাকে বলে কেমন পিটানী খাওয়াই তোমাকে। আমাকে রামপাঁঠা বলেছো, আমাকে বাঁদর বলেছো।

মেয়েটা এবার খিল খিল করে হাসে। —আর কিছু বলিনি তোকে? ওরে মাথা মোটা তোকে যে আমি মুখপোড়া, হতচ্ছাড়া, হাঁদা বললাম সেগুলো তাকে বলবি নি?

খোজাটা মাথা চুলকায়, একটু ফিক করে হেসে বলে, কি যে বলো, মেরে কলিজা, ওগুলো তো তুমি আমাকে আদর করে বলো।

মেয়েটা এবার মারতে হাত ওঠায়। মেরেই ফেলবো, তোকে আদর করতে যাবো কেন র‍্যাঁ—ছুঁছো? তার আগে জহর মুখে পুরতে পারবো না। তা যাক, কেন ডাকছিলি, বল।

খোজাটা দাঁতে জিভ কাটে। হেই বাবা, সব ভুলে মেরে দিয়েছি। ওদিকে তো কম্মো ফতে হয়ে গেলো।

মেয়েটা বুঝতে পারে না খোজাটার এই হেঁয়ালী। ভুরু কুঁচকে বলে, কিসের কম্মো ফতে হলো রে, কি বলছিস?

—মধুমিতা...

—মধুমিতা? মধুমিতা কী?

মধুমিতার কম্মো ফতে করে দিয়েছে এতক্ষণ—

নিজের গাল নিজেই থাবড়াতে লাগলো খোজাটা। যে কথা বলার জন্যে সে ছুটে এসেছিলো, মেয়েটার সঙ্গে আশনাই করতে গিয়ে, সেই আসল কথাই সে ভুলে গেছে।

মেয়েটা এবারে অবাক হয়। সে কি রে? কে—?

খোজাটা বলে, ছোটা মালিক।

মেয়েটার মুখটা হা হয়ে যায়, আলী নূ-র্-র্...

এক মুহূর্ত। তার পরই চিৎকার করে ভিতরে ছুটে যায়, বেগম সাহেবা—তাড়াহুড়া করে কোন রকমে সাজপোশাক করে ছুটে এলো বেগমসাহেবা। মধুমিতা তখন অসাড় অবসন্ন দেহে এলিয়ে পড়ে আছে পালঙ্ক শয্যায়। বেগম সাহেবা জিজ্ঞেস করলেন, নূর? সে কোথায়।

—চলে গেছে।

—তাকে তুমি ঘরে ঢুকতে দিলে কেন, মা? তোমাকে না তোতা পাখীর মতো পড়িয়ে গেলাম, যেই আসুক ঘরে ঢুকতে দেবে না?

—আমি দিই নি, মা। সে জোর করে ঢুকেছে।

—তারপর কী হলো?

মধুমিতা চুপ করে থাকে। বেগম সাহেবা গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করেন। বলো, সে কি সর্বনাশ করে গেছে।

মধুমিতা বলে, সবই করে গেছে—আমার সবই নিয়ে গেছে সে।

তুমি কেন রাজি হলে, মা। এখন যদি উজির শোনেন, কী হবে?

—আমি কি করবো বলুন, আমি তাকে বারণ করেছিলাম কিন্তু আমাকে সে অন্যভাবে বোঝালো।

—কী ভাবে?

মধুমিতা বলে, আমি তাকে বললাম, তোমার বাবা আমাকে সুলতানের জন্যে দশ হাজার মোহর দিয়ে কিনে এনেছেন।

সে বললো, আগে সেই রকমই ঠিক ছিলো। কিন্তু সুলতান নাকি আমাকে গ্রহণ করবেন না। তাই উজির সাহেব ঠিক করেছেন আপনার ছেলেকে উপহার দেবেন আমাকে।

—আর তুমি সেই কথা বিশ্বাস করলে?

মধুমিতা কেঁদে ফেলে, আপনি বিশ্বাস করুন, মা। সে এমনভাবে বললো যাতে বিশ্বাস না করে পারলাম না। তাছাড়া আমি তো বাঁদী। হুকুম তামিল করাই আমার কাজ।

বেগম সাহেবা তখন রাগে ক্ষোভে দুঃখে নিজের গাল নিজে থাবড়াতে লাগলো।—এখন আমি কি করি। উজিরকে আমি কী বলবো? তাঁর মতো শান্তশিষ্ট মানুষ হয় না। কিন্তু অন্যায় তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। তাছাড়া সুলতানের এই অসম্মান তিনি তো কিছুতেই সহ্য করবেন না। ছেলেকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবেন।

এমন সময় উজির ফাদল ঘরে ঢুকলেন। —কী ব্যাপার তোমরা এমন কান্নাকাটি করছো কেন? কী হয়েছে?

বেগম সাহেব কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আগে তুমি খোদার নামে হলফ করে কথা দাও আমি যা বলবো তার বাইরে কিছু করবে না। তা হলে কোনও কথা গোপন করবো না। সব খুলে বলবো। আর আমাকে কথা দিয়ে যদি তা না মানো তাহলে আমার মরা মুখ দেখবে।

উজির ফাদল খোদার নামে দিব্যি করে বললো, তুমি যা বলবে তার বাইরে আমি কিচ্ছু করবো না, বেগম। তুমি নির্ভয়ে বলো।

তখন বেগম সাহেবা আগাগোড়া সব ঘটনা খুলে বললেন তাকে। তার বদমাইশ ছেলে কিভাবে মধুমিতার ঘরে ঢুকে তাকে ধাপ্পা দিয়ে তার সর্বনাশ করে পালিয়েছে শুনে উজির মাথা চাপড়াতে লাগলেন। —হায় হায় একি হলো আমার। এখন আমি কি মুখ নিয়ে সুলতানের কাছে দাঁড়াবো? রাগে দুঃখে নিজের জামার কাপড় ছিঁড়ে ফেড়ে কুটি কুটি করতে লাগলেন।

বেগম সাহেবা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। —নিজেকে শক্ত সংযত করো। এই বিপদের সময় ভেঙে পড়লে তো চলবে না। আমি তোমাকে দশহাজার মোহর দিয়ে দেবো। নগদ যা আছে নাও, এবং বাদবাকী আমার গহনাপত্র বিক্রী করে দশ হাজার মোহর পূরণ করে সুলতানকে ফেরৎ দিয়ে দাও।

উজির বললেন, একি কথা বলছো নূর-এর মা। তুমি কি শুধু টাকার কথাই ভাবছো? টাকাটা আমার কাছে কিছুই না। আমি ভাবছি আমার ইজ্জতের কথা। সুলতানের কাছে কি বে-ইজ্জত হবো, একবার ভাবো। হয়তো সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে আমার গর্দানও নিতে পারেন।

বেগম বললেন, কিন্তু সুলতানরা মধুমিতার কথা এখনও জানেন না। তাকে তো চোখে দেখেন নি তিনি। সুতরাং মধুমিতাকে যে তার হাতে তুলে দিতে হবে তার কি কোন মানে আছে। আমি তোমাকে দশ হাজার মোহর দিচ্ছি। তুমি বরং অন্য একটা মেয়ে কিনে দাও তাকে।

এতে তোমার জান প্রাণ ইজ্জত সবই ঠিক থাকবে। মধুমিতা যেমন এখানে আছে তেমনি থাক। ছেলেটাও বাউণ্ডুলে হয়ে যাচ্ছে। মধুমিতার রূপে তোমার ছেলে পাগল হয়ে গেছে। এবং ছেলেদের বশ করার মতো রূপ তার আছে।

উজির বাধা দিয়ে বললেন, কিন্তু নূরের মা, এটা তুমি বুঝছো না কেন চারদিকে শত্রুর অভাব নাই। সুলতানের আর এক উজির মইন আমার খুঁত ধরার জন্যে ওৎ পেতে আছে। পাপ কখনো চাপা থাকে না। একদিন যখন তার কানে যাবে এই সব কথা সুলতানকে জানাতে কসুর করবে না। আমার কিভাবে সর্বনাশ হয় সেই পথই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এই সময় রাত্রি অবসান হয়ে আসে। শাহরাজাদ তার গল্প থামায়।

পরদিন তেত্রিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার শুরু করে শাহরাজাদ।

তারপর শুনুন জাঁহাপনা, উজির ফাদল তার বেগমকে বললেন, তুমি বুঝতে পারছো না নূর-এর মা, উজির মইন জানতে পারা মাত্র সুলতানকে ভাঙ্গানী দিতে আরম্ভ করবে। 'জাঁহাপনা আপনি যাকে আপনার একান্ত অনুগত এবং বিশ্বস্ত উজির বলে মনে করেন, সে কি চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে একবার শুনুন। আপনি যে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তাকে দিয়েছিলেন, সেই টাকায় সে দুনিয়ার সেরা একটি বাঁদী কিনেছিলো। কিন্তু তার পুত্র-এর খুব পছন্দ হওয়ায় তার ভোগের জন্য উজির ফাদল নিজের প্রাসাদেই তাকে রেখে দেয়। এবং বলে, সুলতানের তো হাজারটা বাঁদী রক্ষিতা আছে, তাদের দলে পড়ে মেয়েটার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। আর বুড়ো সুলতান এই ষোড়শী যুবতীকে খুশিই বা রাখবে কি করে। এই বলে মেয়েটিকে ছেলে নূর-এর হাতে তুলে দিয়ে নিজের জেব থেকে টাকা দিয়ে আর একটা বাঁদী আপনার জন্যে যোগাড় করে এনে দিয়েছে। কিন্তু সে-মেয়ের নখের যোগ্য এ বাঁদী। এই হলো আপনার একান্ত বশংবদ প্রিয়পাত্র উজির অল-ফাদলের কীর্তি-কাহিনী। মইন তোমার ছেলের গুণের কথাও বলতে ছাড়বে না। সে যে সারা বাগদাদের তামাম কুমারী মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করেছে এ কথা সে ফলাও করে বলবে। এবং মধুমিতা যে এখনও আমার প্রাসাদে নূর-এর অঙ্কশায়িনী রক্ষিতা হয়ে দিন কাটাচ্ছে তাও সে জানিয়ে দেবে। তখন? তখন কী হবে? সুলতান আমাকে গভীর বিশ্বাস করেন। তিনি হয়তো ভাববেন, মইন হিংসার জ্বালায় এসব মিথ্যে বানিয়ে বলছে। কিন্তু মইন-এর শয়তানী তো আমি জানি বেগম, সে তখন সুলতানকে বলবে, 'ঠিক আছে আপনার যদি বিশ্বাস না হয় আমাকে হুকুম দিন তাকে ফাদল-এর প্রাসাদ থেকে এক্ষুণি তুলে এনে হাতেনাতে ভজিয়ে দিচ্ছি।' সুলতান তখন কি বলবেন? তিনি অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলবেন, 'ঠিক আছে যাও, নিয়ে এসো দেখি।' মইন তখন লোক লস্কর নিয়ে এসে আমার বাড়ি তল্লাশী করে মধুমিতাকে তুলে নিয়ে যাবে সুলতানের কাছে। তখন তোমার এই মধুমিতা কি সুলতানের জেরার সামনে সত্যি কথা না বলে পার পাবে। আর মধুমিতার মুখ থেকে যখন শুনবেন তিনি, আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। এই দাঁওটাই মইন খুঁজবে। সে তখন সুলতানকে বিষিয়ে দেবে, 'জাঁহাপনা আপনি যাকে একবিন্দু অবিশ্বাস করেন না, সে আপনার সঙ্গে কি সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে দেখুন। এবং আমি যে কতো অনুগত এবং হিতৈষী নোকর তাও আপনি প্রমাণ পেলেন।' এরপর আমার ওপর সুলতানের আর কোন আস্থা থাকতে পারে না। এতকাল ধরে যে মান ইজ্জত আমার তৈরি হয়েছিলো তাসের ঘরের মতো এক ফুৎকারে তা ধসে পড়ে যাবে। এবং সুলতান আমার প্রাণদণ্ডের বিধানও দিতে পারেন।

বেগম-সাহেবা তাকে বললেন, কবে কি ঘটবে না ঘটবে আগে থেকেই তুমি অতোশতো ভাবছো কেন? আমি তুমি নূর আর মধুমিতা এই ক'জন ছাড়া ঘটনাটা কেউ জানে না।

জানবেও না। সুতরাং তোমার মইনই বা জানবে কি করে? আর সুলতানের কানেই বা বিষ সে ঢালবে কি করে? তুমি কিছু ভেবো না, কেউ জানবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো, তিনিই সব বিপদ কাটিয়ে দেবেন।

বেগমের কথায় উজির ফাদল কিছুটা শান্ত হন। কিন্তু পুত্র নূরের প্রতি ক্রোধ তার কমে না একবিন্দু।

আলী নূর অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। সে যখন মধুমিতাকে নিয়ে সুখের সায়রে ভাসছে সেই সময়ে, খোজা দু'টো চিৎকার করতে করতে হামামের দিকে ছুটে যায়। হামাম থেকে তার মা ফিরে আসার আগেই মধুমিতার মধু নিগড়ে খেয়ে ক্ষিপ্রবেগে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যায় সে। বুঝতে পারে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে। অনেক রাতে ফিরে সে নফর চাকরদের কাছেই সব শুনে নিলো। গা ঢাকা দিয়ে পা টিপে টিপে মেয়ে মহলে তার মা এর ঘরে গিয়ে ঢোকে। হাজার হলেও মায়ের মন, কোথায় গেলো, ফিরবে কি ফিরবে না এই চিন্তায় ঘর বার করছিলো। ছেলেকে কাছে পেয়ে ধড়ে প্রাণ এলো। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো। —এতরাত অবধি কোথা ছিলি, বাবা?

নূর বলে আব্বাজান খুব চটে আছেন, তাই না মা?

যে গুণধর ছেলে তুমি। বাপের মুখে চুনকালি দেবে। আর বাপ তোমাকে চুমু খাবে। যাও একবার তার সামনে, কোতল করে ফেলবে।

নূর বললো, আমি এখান থেকে একেবারে চলে যাবো।

—সে কি, বাবা। না না, অমন কথাটি মুখে এনো না। তোমার কিছু ভয় নাই। হারেম ছেড়ে বাইরে যাবার দরকার নাই। তোর বাবার যতদিন না রাগ পড়ছে আমার ঘরে আমার কাছেই থাক। তিনি তো খবর না দিয়ে এ মহলে কখনও আসেন না।

সেই রাত থেকে নূর তার-মা-এর মহলেই রাত্রিবাস করতে লাগলো। মধুমিতা থাকে পাশের কামরায়। সারাটা রাত তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাটায়।

একদিন বেগম সাহেবা উজির ফাদলকে বললেন, আর কত দিন ক্রোধ নিয়ে থাকবে। ছেলে তো শুনবে কোনদিন দেশত্যাগী হয়েছে। তখন? তখন খুব সুখ হবে তোমার? আমি বেঁচে বর্তে থাকি তা কি তুমি চাও না।

উজির বাধা দিয়ে বলেন, আহা কী হলো? কী সব অলুক্ষণে কথাবার্তা বলো? তা কী করতে হবে বলো?

—ছেলে তোমার ভয়ে ভয়ে সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। অনেক রাতে এসে আমার ঘরে ঢোকে। ছেলে বড় হয়েছে। এখন কি আর সেই ছোটবেলার শাসন চলে? আজ রাতে তুমি আমার ঘরে থাকবে। ছেলে এলে তাকে ভালোভাবে বোঝাবে। এবার তাকে বদখেয়াল ছাড়তে হবে। বিয়ে শাদী করে সংসারী হতে হবে। মধুমিতা মেয়েটা বড় ভালো। অমন সুন্দরী মেয়ে তো তুমি সারা দুনিয়া ঢুঁড়েও যোগাড় করতে পারবে না। আর তোমার ছেলে তাকে ভালোওবাসে প্রাণ দিয়ে। ওর সঙ্গে শাদী দিলে ছেলে তোমার ঘরে থাকবে। তা হোক না পয়সা দিয়ে কেনা বাঁদী। অনেক খানদানী ঘরের ছুঁচোর কেত্তন তো আমার জানতে বাকী নাই। বাইরে সতীপনা দেখায়। ভিতরে ভিতরে চাকর-নফর দিয়ে কাম সারে।

উজির বিরক্ত হয়। আঃ নূরের মা, তোমার মুখে কিছু আটকায় না!

বেগমের পরামর্শ মতো রাত্রিবেলা উজির তার ঘরে যায়। অনেক রাতে আলী-নূর ঢুকতেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। —বদমাইশ বেত্তমিজ আজ তোকে খুনই করে ফেলবো। বাঁদর ছেলে, আমার মান-ইজ্জৎ সব ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছো তুমি!

বেগম সাহেবা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে চেপে ধরেন উজিরের হাত। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। ছেলেটাকে খুন করবে?

—হ্যাঁ আমি ওকে খুনই করবো। ও যদি নিজেকে না শুধরায়, না ভালো হয়, অমন ছেলে থেকে আমার দরকার নাই।

বেগম বলেন, তুমি শান্ত হও। আমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভালো পথে নিয়ে আসবো। ছেলেমানুষ ভুল না হয় করেইছে। তাকে তো বোঝাতে হবে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। তা না করে যদি আগেই এমন সাজা দাও কী ফয়দা হবে। ছেলেটা মরে গেলে আর ফেরৎ পাবে?

নূর বাবার পায়ের উপর পড়ে ছিলো। এবার মুখ তুলে ভয়ে ভয়ে বললো, আব্বাজান, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি আর কোনোও খারাপ কাজ করবো না। আপনার অবাধ্য হবো না।

উজির-এর মন নরম হয়। ছেলেকে টেনে তুলে পাশে বসান। —বাবা, এখন তুমি বড়ো হয়েছো, ভালো-মন্দ বুঝতে শেখো। লোকে তোমার নামে বদনাম দিলে বাবা হয়ে আমি সহ্য করি কি করে? এবার বিয়ে শাদী করে সংসারী হও। তুমি যে মধুমিতাকে ভালোবাসো তাতো কখনও বলোনি। মেয়েটি বড়ো ভালো। তার মতো রূপ ও গুণের মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি। তুমি যদি আমাকে কথা দাও তাকে নিয়ে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করবে তাহলে মধুমিতার সঙ্গে তোমার শাদী দিয়ে দেবো। কিন্তু একটা কথা, শাদীর পরে অন্য কোনও বদখেয়াল আমি বরদাস্ত করবো না। তাকে ঘরে ফেলে রেখে অন্য কোনও মেয়েকে নিয়ে বেলেল্লাপনা করতে পারবে না। তাকেই তোমার সারা জীবনের একমাত্র সঙ্গী করে রাখতে হবে। তাকে ঘরে রেখে আর কোনও মেয়েকে শাদী করে আনতে পারবে না।

আলী নূর বললো, না, আব্বাজান, তা হবে না। মধুমিতাকে ছাড়া অন্য কোনও মেয়েকে আমি ভালোবাসতে পারবো না। আমি ভালো হতে চাই। আপনি শাদীর ব্যবস্থা করুন।

সারা প্রাসাদে আনন্দের হিল্লোল উঠলো। আলী-নূর-এর সঙ্গে মধুমিতার শাদী হবে। উজির অল-ফাদল দশ হাজার মোহর দিয়ে অন্য একটা বাঁদী কিনে এনে সুলতানকে দিলেন। মহাজাঁকজমক করে নূর ও মধুমিতার শাদী হয়ে গেলো। এ খবর কিন্তু চাপা থাকলো না। দুষ্ট মইন সব খবরই জানতো। কিন্তু সুলতানের সামনে মুখ খুলতে সাহস করলো না। মইন ভাবলো, অল ফাদল সুলতানের সুনজরে আছে, এ সময় তার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে গেলে কোন কাজ হবে না। বরং সুলতান তার উপর ক্ষিপ্ত হতে পারেন। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। সুতরাং সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই শ্রেয়।

সেই সুযোগ একদিন এসে গেলো। অল-ফাদল অসুখে পড়লেন। এবং সে অসুখ থেকে আর সেরে উঠতে পারলেন না তিনি। মাত্র দু'দিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করলেন। মৃত্যুর আগে পুত্র নূর-কে ডেকে বললেন, বাবা আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। আমি চললাম। তোমার বয়স অল্প তাই ভয় হয়, দেখে শুনে ঠিক পথে চলতে পারবে কিনা। আল্লাহর উপর ভরসা রেখো। সৎভাবে জীবন যাপন করো। তারপর নসীবে যা আছে তাই হবে। সবাইকে একদিন যেতেই হবে। চিরকাল এখানে কেউ থাকার জন্যে আসে না। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, এবার আমার যাবার পালা। তাই মনে কোনও শোক ক'রো না। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, মধুমিতা বড় ভালো মেয়ে। সে শুধু রূপসীই না, তার মতো বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ মেয়ে আমি দেখিনি। সংকট কালে তার পরামর্শ নিও। সে তোমাকে সঠিক পথের সন্ধান করে দেবে। আল্লাহ একমাত্র সহায়। তিনি ছাড়া অন্য কোনও পথ নাই। তাঁর প্রতি তোমার যেন ভক্তি থাকে, এই আমার একমাত্র ইচ্ছা।

বসরাহ শহরে শোকের ছায়া নেমে এলো। উজির অল ফাদল দেহরক্ষা করেছেন। সারা শহর ভেঙে পড়লো উজিরের প্রাসাদের সামনে। আবাল বৃদ্ধ নারী চোখের জল ফেলতে লাগলো, তার মতো এমন একজন দীন দুঃখীর বন্ধুকে হারিয়ে আজ তারা শোকাহত।

যথাযোগ্য আড়ম্বরে পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করলো নূর। আমির ওমরাহ এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শোক মিছিলে সামিল হলেন। নূর কোনও কার্পণ্য করলো না। প্রচুর অর্থব্যয়ে উপযুক্ত মর্যাদায় সমাহিত করা হলো তার পিতার মর-দেহ। সবাই বাহবা দিলো। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান।

বাবার অবর্তমানে নূর শোকে ভেঙে পড়লো। আর সেই আগের মতো হৈ হল্লা করে বেড়ায় না। নিজের প্রাসাদেই মন মরা হয়ে পড়ে থাকে। ভালো করে খায় না, কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চায় না।

একদিন নূর তার ঘরে বসে বাবার স্মৃতিচারণ করছে এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। তারই সমবয়েসী একটি যুবক এসে ঘরে ঢুকলো। তার বাবার বন্ধুর ছেলে। নূর-এর সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা আছে। ছেলেটি বললো, দোস্ত, এতো ভেঙে পড়ছো কেন? মা-বাবা কারো চিরকাল বেঁচে থাকে না। কেউই এ সংসারে চিরদিনের জন্যে থাকতে আসেনি। সবাইকে একদিন ঐ পথে যেতে হবে। এর জন্যে শোক করো না বন্ধু। এই-ই দুনিয়ার নিয়ম। একে সহজভাবে মেনে নিয়ে নিজের দায়দায়িত্ব পালন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আল্লাহর পয়গম্বর এই রকম নির্দেশই আমাদের দিয়ে গেছেন। এবার সব ঝেড়ে ফেলে, আবার হাসো গাও।

নূর কিন্তু বিষণ্ণতা কাটাতে পারে না। বন্ধুর কথার জবাবে কি বলবে তাও ঠিক করতে পারে না।

বন্ধু বলে, এক কাজ করো, একদিন সব ইয়ার-দোস্তদের নিমন্ত্রণ করো। খুব হৈ হল্লা করে খানাপিনা করো। দেখবে সব শোক তাপ কেটে যাবে, আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

আলী নূর ভাবলো, কথাটা মন্দ বলেনি সে। এই গুমোট ভাবটা কাটাবার জন্যে একটু হৈ হল্লা করা দরকার। নূর এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা জনা দশেক। একেবারে জীগরী দোস্ত যাকে বলে। এমন একদিন ছিলো, সারা দিনরাত তাদের সঙ্গে কাটিয়েছে সে। কথায় বলে না, এক গেলাসের ইয়ার। সেই রকম দশ জন বন্ধুকে খানাপিনার নিমন্ত্রণ করে একটু আনন্দ স্ফূর্তি করে মনের ভার লাঘব করবে ঠিক করলো।

বন্ধু বললো তা হলে আর দেরি কেন, আজ সন্ধ্যা বেলাতেই বসা যাক একসঙ্গে?

আলী বলে, সেই ভালো। তাই ডাকো।

সেদিন বিকেল থেকে বৈঠকখানার বড় কামরাটা ভালো করে সাজানো হলো। খাবার টেবিলে পাতা হলো পাট ভাঙা ধবধবে সাদা কাপড়। টেবিলের মাঝে মাঝে বাহারী ফুলদানী বসানো হলো। আতর আর গুলাব জল পিচকারী করে খুশবু ছড়ানো হলো সারা ঘরে। সুগন্ধী আগর আর বেলোয়াড়ী ঝাড়ে বাতি জ্বালানো হলো। যেন কোন উৎসব আসর।

এক এক করে বন্ধুরা এলো সবাই। দশজনই কেতা দুরস্ত সাজে সেজে গুজে এসে বসলো টেবিলে। দামী সরাবের পাত্র পূর্ণ করে দিতে লাগলো বাবুর্চি, সাজিয়ে দিলো, কোপ্তা, কাবাব, চাঁপ, তন্দুরী, মোরগ মসল্লাম এবং আরও অনেক বাদশাহী খানা। খুব মৌজ করে সরাব পান করলো সকলে। খুশির মেজাজে ঝলমল করে উঠলো সারা প্রাসাদ। অনেক দিন বাদে নূর যেন আবার নূতন জীবন—আগের সেই মধুর জীবনের স্বাদ ফিরে পেলো। অনেক রাত অবধি চললো এই খানাপিনার উৎসব। যাবার সময় বন্ধুদের প্রত্যেককে দামী পোশাক উপহার দিলো আলী-নূর।

আবার হাসি গানে ভরে উঠলো আলী নূরের জীবন। প্রায় প্রতি দিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির বৈঠকখানায় আসর বসে। কোনদিন আমীর ওমরাহদের নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করে। আবার কোনদিন এসে জমায়েত হয় বসরাহর বিখ্যাত সওদাগররা। সবাইকে সাদর অভ্যর্থনায় স্বাগত জানায় নূর। খানাপিনার আসর সরগরম হয়ে ওঠে। যারাই তার প্রাসাদে আসতে লাগলো, প্রত্যেককে দামী দামী উপহার সামগ্রী বিতরণ করতে থাকলো সে। মধুমিতার কিন্তু গোড়া থেকেই খুব অমত ছিলো। সে বলতো, তোমার বাবা বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এসব করতেন, তাঁর সাজতো। কিন্তু তুমি তার ছেলে, উজির আমীর কিছুই হতে পারোনি, কিন্তু এইভাবে তার জমানো টাকা পয়সাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছো, সেটা কি ঠিক হচ্ছে?

নূর আহত হয়। বলে দেখো, আমি উজিরের ছেলে, দীন ভিখিরির মতো আচার ব্যবহার তো আমার পোষায় না। এসব না করলে মান ইজ্জত থাকে কি করে?

মধুমিতা বলে, তোমার যতদিন পয়সা আছে কিছুর অভাব হবে না। কিন্তু বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও একদিন শেষ হয়। তারপর কী করবে? তার চেয়ে বলি কি—এসব বন্ধ রেখে একটা কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করো। এখনও যা আছে তা দিয়ে মোটামুটি একটা ভালো ব্যবসাই দাঁড় করাতে পারবে। ব্যবসাতে লাভ হলে সেই টাকা দিয়ে তাদের আদর আপ্যায়ন করো না? তাতে তুমি বিপদে পড়বে না, কিন্তু এখন যা করছো, এতো আত্মহত্যার সামিল।

কিন্তু মধুমিতার এসব পরামর্শ তার ভালো লাগলো না। বললো তুমি বুঝতে পারছো না, মিতা, এইসব নামজাদা বড়লোকদের সঙ্গে দহরম-মহরম থাকলে তবেই ভালো মুনাফার ব্যবসা করতে পারবো। তা না হলে, ছোটোখাটো দোকানপাট করে কি এমন ফয়দা উঠানো যাবে? আর তাছাড়া ইয়ার বন্ধুদের হাতে রাখলে বিপদে আপদে তারা তো পাশে এসে দাঁড়াবে।

মধুমিতা ভাবে, নূর এক রঙিন স্বপ্নে বিভোর। এখন কোনও কথাই তার ভালো লাগবে না। খোয়াব যখন কেটে যাবে, তখন সে বুঝতে পারবে, দুনিয়া কি আজব জায়গা।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আসর বসে, আলী-নূর-এর প্রসাদে। ইয়ার বন্ধুরা এসে হৈহল্লা করে খানাপিনা করে। ভালো ভালো উপহার সামগ্রী নিয়ে চলে যায়। এইভাবে একদিন জমানো টাকা সব শেষ হয়ে আসে। বাবুর্চি এসে বলে, মালিক, আজকের খানাপিনার ব্যবস্থা কি করে হবে? টাকা পয়সা যা ছিলো সবই ফুরিয়ে গেছে।

আলী নূর চিন্তান্বিত হয়। সন্ধ্যাবেলা বন্ধুরা এসে জড়ো হতে থাকে। কিন্তু খানাপিনা গান বাজনার কোন ব্যবস্থা না দেখে তারা অবাক হয়। নূর এগিয়ে আসে।—তোমরা আজ ভাবছো, কেন কোনও আয়োজন করা হয়নি। তবে শোনো, বন্ধুরা, আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে তার যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিলো সবই আমি খরচ করে ফেলেছি। আজ আমি নিঃস্ব। হাতে একটা পয়সা নাই যে তোমাদের কোন আদর আপ্যায়ন করি। এখন ভাবছি, সবই তো শেষ হয়ে গেলো, এর পর কি করে চালাবো। তোমরা দশজন আমার জীগরী দোস্ত—প্রাণের বন্ধু। তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও—কি করা যায়।

একজন বন্ধু বললো, কাল থেকে ভাই, আমার বিবির খুব জ্বর। আমাকে এখুনি যেতে হবে। শুধু তোমাকে এই কথাটা জানাবার জন্যেই এসেছিলাম।

আর একজন বলে, আজ রাতে আমার বড়ভাই-এর ছেলের ছুন্নৎ। আমাকে সেখানে হাজির থাকতেই হবে। আর ভাই দেরি করতে পারছি না। আজকের মতো চলি। পরে আবার দেখা হবে, কেমন?

এইভাবে এক এক করে সব বন্ধুই তাদের 'ভীষণ জরুরী' কাজের অছিলায় কেটে পড়লো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নূর দেখলো তার বৈঠকখানা ফাঁকা—একা বসে আছে সে।

একটু পরে মধুমিতা এসে নূর-এর ঘাড়ে হাত রাখলো। গভীর চিন্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলো সে। মধুমিতার স্পর্শে সম্বিত ফিরে পায়।

—কী ভাবছো?

নূর বলে, আর কি ভাববো, মিতা, আমার কিছু নাই শুনে সবাই চলে গেলো।

—এমনটা যে ঘটবে, সেতো তোমাকে অনেক আগেই আমি বলেছিলাম। যতক্ষণ তোমার ট্যাক ভারি থাকবে ততক্ষণ তারা তোমাকে ঘিরে থাকবে। আর যখন বুঝতে পারবে, তুমি ফতুর হয়ে গেছো, তোমার একমাত্র বিশ্বস্ত কুকুর ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তখন তোমার চোখে সোনালী রঙ। আমার কথা তোমার ভালো লাগেনি। কিন্তু সোনা, এখন বুঝতে পারছো, এই বাঁদীর কথা বাসী হলে মিঠা লাগে।

আলী-নূর বলে, তুমি তো জানো মিতা, আমি আমার সর্বস্ব খরচ করে দিয়েছি আমার বন্ধুদের মনোরঞ্জনের জন্যে। তারা আমার কাছে যে যা চেয়েছে কখনও বিমুখ করিনি। দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছি বাবার যত সব মূল্যবান সংগ্রহ। আজ এই বিপদের দিনে তাদের কাছে গিয়ে যদি দাঁড়াই তারা কি আমাকে সাহায্য করবে না?

—না করবে না, মধুমিতা জোর দিয়ে বলে, কেউ করবে না। যারা এতোদিন ধরে মুঠো ভরে নিয়ে গেলো আজ তাদের কাছ থেকে কানাকড়ি সাহায্য তুমি পাবে না। এই ভবিষ্যৎবাণী তোমাকে আমি অনেক আগেই করেছিলাম।

নূর মাথা নেড়ে বলে, না না, মিতা তুমি সবাইকে একই ছাঁচে ঢেলে দেখো না। আমার বন্ধুরা তেমন হবে না। আমি তো তাদের ছোটবেলা থেকে জানি। আমার দোস্তরা আমার জন্যে জান কবুল করতেও কসুর করবে না।

—তোমার বন্ধুদের তুমি ছোটবেলা থেকে জানো, আর আমি তাদের চোখেও দেখিনি কখনও। কোনও আলাপ পরিচয় নাই। তবুও আমি তোমাকে যা বলে দিলাম, অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিও।

পরদিন সকালে আলী-নূর বন্ধুদের কাছে গেলো। উদ্দেশ্য, কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। না হলে এমন অবস্থা—হাঁড়ি চড়বে না। প্রথমে এক বন্ধুর দরজায় কড়া নাড়তেই একটি নিগ্রো দাসী এসে খুলে দিলো, কাকে চান?

—তোমার মনিবকে বলো গিয়ে আলী-নূর এসেছে।

মেয়েটি ভিতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললো, মালিক বললেন, তিনি বাড়ি নাই।

সরল অবোধ মেয়েটির কথা শুনে হাসি পায়। আহা, বেচারী। ওকে যা বলতে বলে দিয়েছে—তাই সে আওড়ে দিলো। নূর কিন্তু ওর বন্ধুর এমত ব্যবহারে আহত হয়। বাড়িতে থেকেও সে এইভাবে ছলনা করলো তার সঙ্গে। এই তার এতকালের প্রাণের বন্ধু, কি আর করবে, হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলো আর এক বন্ধুর বাড়ি। নূরের আশা, তার এ বন্ধু নিশ্চয়ই ঐ অকৃতজ্ঞ বেজন্মাটার মতো হবে না। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। এক এক করে দশটি বন্ধুর দরজা থেকেই শূন্য হাতে ফিরে আসে সে।

মধুমিতা বলে, তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম মালিক, কেউ হাত ওলটাবে না। ওরা হচ্ছে সু-সময়ের বন্ধু, অসময়ে কেউ কারো নয়। যাকগে, এখন তো বাঁচার পথ দেখতে হবে। প্রাসাদে যা কিছু আসবাবপত্র আছে সব বেচে দাও। কি হবে এই সব দামী দামী আসবাব দিয়ে?

আলী নূর তাই করলো। কিন্তু বসে খেলে আর কতদিন চলে? কোনও দোকানপাট বা ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই করতে পারলো না। ফলে, সে টাকাও একদিন ফুরিয়ে গেলো। আলী-নূর তার অদৃষ্টের কথা ভেবে চোখের জল আর রাখতে পারে না। মধুমিতা এসে ওকে জড়িয়ে ধরে।—তুমি কাঁদছো সোনা? কেঁদো না, তোমার চোখের জল আমি সইতে পারবো না। আমার কথা শোনো, তুমি তো জানো সারা আরব দুনিয়ার মধ্যে আমি সবচেয়ে সেরা সুন্দরী। সুলতানের ভোগের জন্য তোমার বাবা আমাকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনে এনেছিলেন। আমাকে তুমি বাজারে নিয়ে চলো, বেচে দাও। আমার বিশ্বাস, এখনও তুমি সেই দামই পাবে। সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজের পায়ে দাঁড়াও। সোনা, যেখানেই থাকি, আর যত দূরেই থাকি, তোমার আমার ভালোবাসায় চিড় খাবে না কোনোদিন। যদি আল্লাহর ইচ্ছা থাকে, আবার তবে আমরা দু'জনে দু'জনকে ফিরে পাবো।

আলী-নূর বলে, না-না-না, সে কিছুতেই হয় না, হতে পারে না। আমি তোমাকে এক পলক না দেখলে বাঁচতে পারবো না।

মধুমিতা সান্ত্বনা দেয়, কষ্ট হবে জানি, কিন্তু পারতেই হবে তোমাকে। এছাড়া আমরা দু'জনেই তো মরবো।

উজির অল-ফাদলের পুত্র আলী-নূর তখন জীবনধারণের উপায়ন্তর না দেখে মধুমিতাকে বাজারে নিয়ে গেলো। বসরাহর ওই ক্রীতদাসী বাজার তামাম আরবের মধ্যে সেরা। দেশ বিদেশ থেকে অনেক সুন্দরী রূপসী মেয়ের আমদানী হয় এখানে। বহু দূর দূরান্তর থেকে বাদশাহ, উজির আমীররা আসে মেয়ে কিনতে। একদিন মধুমিতাকেও আনা হয়েছিলো এই বসরাহর বাজারে। দশ হাজার মোহরে বিক্রি করে দিয়েছিলো তার মনিব। সুলতানের সেবাদাসী করার জন্যে উজির অল-ফাদল কিনেছিলেন এক দালালের কাছ থেকে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, আজ আবার সে এসেছে এই বসরাহর বাজারে। বিক্রি হতে। আজকের বিক্রেতা তারই শাদী করা স্বামী আলী-নূর। আর দালাল সেই একই।

আলি-নূরকে দেখে এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানালো লোকটা।—তা হুজুর, আপনি? কিরকম লেড়কী চাই বলুন, হুজুর।

আলী-নূর বলে, কিনতে চাই না, বিক্রি করতে এসেছি।

দালালটা অবাক হয়। আলী-নূর তাকে কাছেই একটা কাফেখানায় নিয়ে যায়। একটা কামরায় বোরখা ঢেকে বসেছিলো মধুমিতা। নূর বলে, নাকাবটা সরিয়ে সুরৎটা একটু দেখাও। দালাল এসেছে।

নাকাব সরাতেই চমকে ওঠে দালাল। একি! এ যে সেই মধুমিতা? আপনার বাবার কাছে দশ হাজার মোহরে বিক্রি করেছিলাম একদিন। কিন্তু এ বাঁদীকে আপনি পেলেন কী করে মালিক। এ তো সুলতানের খাস বাঁদী।

আলী-নূর মুখে তর্জনী চেপে চুপ করতে বলে দালালকে। কাফে-র বাইরে এনে বলে, ও যে মধুমিতা, ওকে যে সুলতানের বাঁদী করার জন্যে কেনা হয়েছিলো, এসব কথা তুমি ফাঁস করবে না, এই আমার অনুরোধ। আসল ব্যাপার কী, সব তোমাকে খুলে বলছি আমি। কিন্তু চারদিকে আমার শত্রুর অভাব নাই। খুব গোপনে কাজ সমাধা করে দিতে হবে। আজ আমি বড় অভাবে তাকে বিক্রি করতে এনেছি। সে আমার প্রাণের বিবিজান। তার অদর্শনে আমি বাঁচবো না। কিন্তু তার কষ্টও আমি সহ্য করতে পারবো না। সে অন্য ঘরে যাক। সুখে সম্পদে থাক। সে কথা ভেবেও আমি খানিকটা সান্ত্বনা পাবো।

দালাল দুঃখ করে, সবই নসীবের খেলা, হুজুর। আল্লাহ যখন যাকে যেভাবে রাখেন, সেইভাবেই থাকতে হবে। একদিন আপনার বাবার দয়ায় কতো মানুষের প্রাণ বেঁচেছে। আপনি তার ছেলে—দু'বেলা দু'মুঠো খাবার-এর জন্যে আজ আপনাকে কি করতে হচ্ছে। যাক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সবচেয়ে বেশী দামে যাতে বিক্রী হয় তার আমি কোসিস করবো।

বাজারের ঠিক মাঝখানে একটা শান বাঁধানো চবুতরা আছে। দালালরা এই চবুতরার উপরে দাঁড়িয়ে তাদের পণ্যের গুণ কীর্তন করতে থাকে। তখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেশ বিদেশের সওদাগররা—যারা নীলাম ডাকতে এসেছে, সবাই সেখানে জড়ো হয়। এক এক করে মেয়েদের নাকাব খুলে দেখানোর পালা চলে। তারপর ডাক শুরু হয়। একজনের দামের চেয়ে অন্যজন বেশী দাম হাঁকে। তার চেয়ে আরও কিছু বেশী দিতে চায় কেউ। তাকেও হটিয়ে দিয়ে আর কেউ হয়তো আরও বেশী দাম বলে। এইভাবে চলতে থাকে নীলামের ডাকাডাকি। সব শেষে যার দাম বেশী হয়, তাকেই দেওয়া হয় সেই মেয়ে।

মধুমিতাকেও এনে দাঁড় করানো হলো সেই চবুতরার উপরে। তার পাশে দাঁড়িয়ে দালালটা তার গুণগান করতে থাকে।—এমন মেয়ে তামাম দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে বেহেস্তের হুরী। আসমানের চাঁদ। আপনারা হয়তো এখানে আরও অনেক মেয়ে দেখেছেন, কিন্তু মুড়ি মিছরি এক করে গুলিয়ে ফেলবেন না। আমি যে মেয়েকে এখানে খাড়া করেছি, তার যেমন রূপ তেমনি তার গুণ। রূপে গুণে এমন লেড়কী আর একটাও নাই এই বসরাহর বাজারে। সারা বছরে তো অনেক মেয়েই আসে এ বাজারে—আপনারা দেখেছেন, কিন্তু আজ যাকে দেখলেন, তেমন মেয়ে কি আপনাদের চোখে পড়েছে কখনও? যাক, আমি আমার মালের গুণকীর্তন করতে চাই না। আপনারা সমঝদার আদমী—জহুরী, নিজেরাই চিনতে পারবেন। এখন আসুন মালিক, আপনারা নীলামের ডাক দিন।

এক সওদাগর এগিয়ে এসে ডাকলো, চার হাজার মোহর। আর একজনের ডাক শোনা গেলো, সাড়ে চার হাজার। দালালটা হো হো করে হেসে উঠলো, আসলী হীরা, সাড়ে চার হাজার—মাত্র সাড়ে চার হাজার? তা আপনারা খদ্দের, এক পয়সাও বলতে পারেন। কিন্তু এ দামে তো হীরে পাওয়া যায় না সাহেব, হীরে ধোয়া পানি মিলতে পারে।

ঠিক এই সময়ে সুলতানের উজির মইন যাচ্ছিলো বাজারের পথ দিয়ে। দূর থেকে মধুমিতা আর আলী-নূরকে লক্ষ্য করে কাছে এগিয়ে এলো। স্বগতভাবে গজগজ করতে থাকলো, বদমাইশটা সব উড়িয়ে দিয়ে এখন এসেছে শেষ সম্বলটা নীলামে তুলতে। এই মওকা। যেভাবেই হোক, মেয়েটাকে নিতেই হবে। তবেই সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হবে, প্রতিশোধ নেওয়া হবে—সেই অপমানের।

দালালের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো মইনকে।—ফরমাশ করুন হুজুর।

মইন-এর মুখে ক্রুর হাসি। বললো, এই বাঁদীটাকে আমি কিনতে চাই। কী দাম উঠেছে?

দালাল জানালো, এই সবে ডাক শুরু হয়েছে হুজুর। একজন চার হাজার আর একজন সাড়ে চার হাজার মোহর বলেছে। এই সময়ে আপনি এলেন।

মইন বলে, ঠিক আছে, আমি ঐ সাড়ে চার হাজারই দেবো। আর কারো কিছু বলার আছে।

মধুমিতা আজকের নীলামের সেরা বাঁদী। অনেক পয়সাওয়ালা সওদাগররা জড়ো হয়েছে, নীলাম ডাকবে বলে। কিন্তু সুলতানের এই বদমেজাজী শয়তান উজিরটাকে সবাই ভয় করে। তার ইচ্ছেয় বাদ সাধলে, ভিটেমাটি চাঁটী করে ছেড়ে দেবে সে। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আর কেউ মুখ খুলতে সাহস করে না। দালাল বুঝতে পারলো, এত বড় সওদাটা আজ এখানেই

ভেস্তে গেলো। শয়তান মইন যখন একবার হাত বাড়িয়েছে সে থাবা থেকে মধুমিতার আর রেহাই নাই। দালালকে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মইন ধমকে ওঠে।—কী হলো? ক্যাবলার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শুনতে পেয়েছো, বাঁদীটা আমি কিনলাম। চার হাজার দাম, আর তোমার দালালী পাঁচশো, এই মোট সাড়ে চার হাজার দিনার পাবে। দাও মেয়েটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

নূর দাঁড়িয়েছিলো দালালের পাশে। দালাল ফিসফিস করে বলে, মালিক, বরাত খারাপ। নেকড়েটা থাবা বাড়িয়েছে। বোধহয় জলের দরেই ছেড়ে দিতে হবে মধুমিতাকে। শয়তানটা আপনাকে ভালো করেই চিনতে পেরেছে। লোকটা আপনার বাবার সঙ্গে শত্রুতা করেছে সারাজীবন। আপনার বাবার গুণের কদর করতো সুলতান, প্রজা, পারিষদ সবাই। এই অপদার্থ উজিরটা তা কোনোদিনই সহ্য করতে পারেনি। হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরেছে। কোন কাজই সে জানতো না। জানতো শুধু কি করে নিরীহ মানুষ-এর উপর অত্যাচার চালাতে হয়। প্রজারা আল্লাহর কাছে অহরহ তার মৃত্যু কামনা করে। আজ শকুনটার চোখ পড়েছে মধুমিতার ওপর। আপনার বাবার ওপর আক্রোশ করেও তার একগাছি চুলও ছিঁড়তে পারেনি সে। কিন্তু আজ মওকা পেয়েছে। এতকালের বদলা সে আজ নেবে। শয়তানটা বুঝেছে মধুমিতা আপনারই। কিন্তু মালিক, হুসিয়ার করে দিচ্ছি, যেভাবেই হোক, এই নীলামের ডাক খারিজ করে মধুমিতাকে নিয়ে আপনি ঘরে চলে যান। মইন যদি নিয়ে যায় তাকে, সাড়ে চার হাজার কেন সাড়ে চার দিরহাম আপনি আদায় করতে পারবেন না তার কাছ থেকে। আজ তো সে আপনাকে একটা হুণ্ডি ধরিয়ে দিয়ে মধুমিতাকে নিয়ে চলে যাবে। তারপর বলবে, অমুক দিন এসো, টাকা দিয়ে দেবো। আপনি সেদিন গেলে 'আর একদিন এসো' বলে একটা লম্বা তারিখ দিয়ে বিদেয় করে দেবে। সেদিন যখন যাবেন আপনার হাত থেকে হুণ্ডির কাগজটা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে আপনাকে ভাগিয়ে দেবে। বেশী কিছু বলতে গেলে ডাণ্ডার বাড়ি খেয়ে ফিরে আসতে হবে। এ-সব আমি বানিয়ে বলছি না, হুজুর। এরকম ভুক্তভোগী লোক বসরাহতে অনেক আছে। তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে আরও ভালো জানতে পারবেন। এখন মালিক, কিভাবে ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায় তাই ভাবুন।

নূর বললো, আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। কী করা যায়, বলো তো?

দালাল বললো, উজিরটা যখন জেদ ধরেছে, মধুমিতাকে সে নিয়ে যাবেই। আর আমিও গরীব সরীব মানুষ, উজির আমীরের হুকুম অমান্য করবো কি করে। তা হলে তো গর্দান নেবে। আপনি উজিরের ছেলে, মালিক। আমি মধুমিতাকে সঙ্গে করে যখন মইন-এর দিকে এগোতে থাকবো আপনি তখন ছুটতে ছুটতে এসে তার হাতটা খপ করে চেপে ধরে চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন—এই নচ্ছার হারামজাদী, কোথায় যাস? তুই কি ভেবেছিলি, তোকে আমি সত্যি সত্যিই বেচে দিতে বাজারে এনেছিলাম। আর যাতে আমার সঙ্গে কখনও মুখে মুখে তর্ক না করিস, সেজন্যে তোকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যে ভয় দেখাতে এসেছিলাম। চল, বাড়ি চল শিগ্গির। সোজা হয়ে মুখ বুঁজে থাকবি। না হলে সত্যি সত্যি একদিন কিন্তু এই হাটে বেচে দিয়ে যাবো। চল, এখন বাড়ি চল। দরকার মনে করলে, এক আধটা চড়চাপড়ও দিতে পারেন তাকে। এতে হয়তো পাজী উজিরটা বিশ্বাস করবে, না, আপনি ওকে ভয় দেখাবার জন্যেই বাজারে এনেছিলেন। সত্যি সত্যি বেচার কোনও অভিপ্রায় ছিলো না।

নূর বললো, মতলবটা মন্দ ভাঁজোনি। দেখা যাক, কি হয়।

দালালটা যখন মধুমিতাকে নিয়ে মইন-এর দিকে এগোতে লাগলো, নূর ছুটতে ছুটতে এসে মধুমিতার গালে এক থাপ্পর বসিয়ে দিয়ে হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বলে, এই বজ্জাৎ মাগী, যাচ্ছিস কোথায়? ভাতারের বাড়ি? একেবারে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো। আর যদি কখনও বেয়াদপি করবি তো সত্যি সত্যি একদিন বেচে দিয়ে যাবো। এবারের মতো মাফ করে দিলাম। চল্, বাড়ি চল। তোকে বেচে দেবো, এমন দীন ভিখারী আমি এখনও হইনি।

মইন হুঙ্কার ছাড়ে, কে রে আমরা খাজাঞ্চা? লম্বা লম্বা চাল বোল ঝাড়ছে? ঘরে তো হাঁড়িতে ছুঁচোয় ডন-বৈঠক মারছে, তার অতো আমীরি বুক্‌নি কিসের? আমার কি জানতে কিছু বাকী আছে, ভাবছো? তোমার ঘরে যে একটা কানাকড়ির মালও নাই তা আমার জানা আছে। এখন বাপের সুপুত্তুর হয়ে কেটে পড়ো। ওকে আমি নীলামে ডেকে নিয়েছি। ও আমার।

এই বলে মইন এগিয়ে এসে মধুমিতার হাত ধরতে যায়। আলী-নূর এতক্ষণ লোকটার কথাগুলো হজম করার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু মধুমিতার দিকে হাত বাড়াতেই মাথাটা কেমন বিগড়ে গেলো। মুহূর্তে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে মইনের উদ্যত হাতটা চেপে ধরে। একটু বাদে ছেড়ে দিয়ে বলে, যান, বাড়ি যান, এদিকে হাত বাড়াবেন না।

তখন মইন রাগে থরথর করে কাঁপছে।—কী? এতো বড় আস্পর্দা। আমাকে ধাক্কা দেওয়া? বাজারে আপনারা সবাই উপস্থিত আছেন, ভাই সব। আপনারা সাক্ষী। কীভাবে সে আমাকে অপদস্থ অপমান করলো, আপনারা স্বচক্ষে দেখলেন। এখন আমি যদি একটা ঘুষিতে ওর মুখটা তুবড়ে দিই, আপনারা কী বলবেন?

বাজারের উপস্থিত জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। তারা বললো, আপনি হুজুর স্বয়ং উজির। আর উনিও কিছু কম না, উজির ফাদল-এর ছেলে। আপনাদের এই বাঘ সিংহের লড়াই-এর মধ্যে আমাদের সাক্ষী মানবেন না। আমরা ইতরজন, ওসব বড় ব্যাপারে মাথা গলাতে চাই না। আপনাদের যা অভিরুচি করুন। ওসব সাতে পাঁচে আমরা নাই।

আলী-নূর মনে ভরসা পায়। প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে জীনসুদ্ধ মইনকে নিচে ফেলে দেয়। তার পর হাঁটুগেড়ে বসে এলোপাথাড়ি ঘুষি চালাতে থাকে ওর মুখে। তাগড়াই জোয়ান ছেলে নূর। মইন-এর বয়স হয়েছে—বুড়ো। সে কেন পারবে নূর-এর সঙ্গে। প্রচণ্ড ঘুষির ঘায়ে মইনের যে কটা দাঁত পড়তে বাকী ছিলো তাও খসে পড়ে গেলো। চোয়াল ফেটে, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। মইন প্রথমে ভেবেছিলো, একাই সে লড়তে পারবে নূর-এর সঙ্গে। কিন্তু নূর-এর এক-একটা আধমণি ঘুষির ঘা খেয়ে সে-ভ্রম নিমেষেই ভেঙে গেলো। তখন সে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে।—কে আছো, বাঁচাও, আমাকে মেরে ফেলে দিলো।

নূর-এর তখন শরীরে অসুরের শক্তি ভর করেছে। দু'হাতে ঘুষি চালাতে থাকে সমানে। বুকে, পিঠে, পেটে তলপেটে—এবং সবশেষে অণ্ডকোষে। আর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যায় মইন। এতক্ষণ উজিরের প্রহরীরা দাঁড়িয়ে দেখছিলো, এবার তারা এগিয়ে যায় আলী-নূর-এর দিকে। কিন্তু বাজারের প্রতিটি লোক বাধা দেয়, ওসব উজির আমীর-এর লড়াই তোমরা কেন মাথা ঘামাচ্ছো, বাছা। কার সঙ্গে লড়াইটা হচ্ছে জানো? তোমাদের আগের উজির অল-ফাদলের ছেলে আলী নূর। সুতরাং বুঝতেই পারছো, ওদের বিবাদ একদিন মিটে যাবে, আবার গলায় গলায় ভাব হবে। কিন্তু তুমি আমি যেমন ছিলাম তেমনই চাকর নফর হয়েই থাকবো। উজিরের ছেলের গায়ে হাত তোলার জন্যে সুলতানের সাজা ছাড়া ইনাম মিলবে না। এই বুঝে সুঝে আলী নূর-এর গায়ে হাত উঠাবে।

প্রহরীরা জানতো না নূর-এর পরিচয়। যখন শুনলো, অল-ফাদলের ছেলে, দু'পা

এগিয়েছিলো, এবার তিন-পা পিছিয়ে গেলো। আলী-নূর যখন দেখলো, লোকটা আর নড়ে না, তখন সে ঘুষি মারা বন্ধ করে শান্ত হয়। মধুমিতাকে নিয়ে ভীড় ঠেলে হন হন করে বেরিয়ে যায় বাড়ির পথে।

একটু পর মইন-এর জ্ঞান ফিরে আসে। পথের ধুলো আর দেহের রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। সাজপোশাক ছিঁড়েখুড়ে একশা। প্রাসাদে ফিরে এসে সুলতান মহম্মদ ইবন সুলেমান-এর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলো শয়তান উজিরটা।—শাহেন শাহ, আপনার সলতানিয়তে আজ আমাকে এইভাবে মার খেতে হলো? আমি আপনার উজির। আমার গায়ে হাত তোলা মানে সরকারকেই বেইজ্জত করা। আপনি ধর্মাবতার, আমি বিচার চাই।

সুলতান হতবাক। তার হুকুমতে বাস করে এমন দুঃসাহস কার হতে পারে? তার উজিরের গায়ে হাত তোলার স্পর্ধা কে রাখে? সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, কী হয়েছে উজির? খুলে বলো তো। এখুনি আমি এর সমুচিত ব্যবস্থা করছি।

মইন তখন ইনিয়ে বিনিয়ে এক চমৎকার মিথ্যে গল্প খাড়া করলো সুলতানের সামনে।—হুজুর আমি বাজারের পথ দিয় যাচ্ছিলাম। দেখলাম, বাঁদীর নীলামের ডাক চলছে। একটা বাঁদী আমার নজরে ধরলো। খুব রূপসী সুন্দরী। আমি ঠিক করলাম, ঐ বাঁদীটা দিয়ে সুলতান সাহেবকে আমি নজরানা দেবো। আপনার হয়তো স্মরণ আছে, জাঁহাপনা, উজির অল-ফাদলকে আপনি দশ হাজার মোহর দিয়েছিলেন একটা সেরা সুন্দরী বাঁদী কেনার জন্য। এই মেয়েটা সেই সুন্দরী বাঁদী। সারা আরবে এরকম আর একটা মেয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আপনার বিশ্বস্ত উজির অল-ফাদল মেয়েটাকে কেনার পর আর আপনার হাতে তুলে দেয়নি। তার নিজের পুত্র আলী নূরের ভোগের জন্য তার প্রাসাদেই রেখে দিয়েছিলো। আপনাকে যে বাঁদীটা এনে দিয়েছিলো, সে-টা তার পরে কেনা। অল-ফাদল তার নিজের টাকা দিয়ে সেই মেয়েটি কিনে এনে দিয়েছিলো আপনাকে। আজ আলী নূর অভাবের দায়ে মেয়েটাকে বাজারে নিয়ে গিয়েছিলো নীলামে বেচে দিতে। দেখলাম, সাড়ে চার হাজার টাকা দাম উঠেছে। জাঁহাপনার জন্যে আমি ঐ টাকা দিয়ে কিনে নিলাম। কিন্তু আলী নূর আমার কাছে কিছুতেই বেচবে না। আমার মা-বাপ তুলে গালিগালাজ করতে লাগলো। তার বক্তব্য, সে যে কোনও ইহুদী বা খ্রীষ্টান-এর কাছে কম টাকাতেও বেচে দেবে, তবু সুলতানের ভোগ্য পণ্য হতে দেবে না তাকে। তা সুলতান যদি তাকে পাল্লায় ওজন করেও সোনার মোহর দিতে চায়, তবু তাকে দেবে না। আমি তখন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সুলতান ন্যায্য দামে কিনতে চান, তাতে তোমার এত আপত্তি কেন? তার উত্তরে হুজুর, আলী নূর অশ্রাব্য ভাষায় আপনাকে গালিগালাজ করতে লাগলো। আপনি নাকি একটা বুড়ো হাবড়া শয়তান। আপনার হাতে পড়লে মেয়েটার জীবনই বরবাদ হয়ে যাবে। দোষের মধ্যে আমি এর প্রতিবাদ করেছিলাম, সুলতানের নামে এরকম গালিগালাজ করা তার উচিৎ না। সুলতানের কানে গেলে তিনি ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তখন আলী-নূর ক্ষেপে গিয়ে আমাকে খচ্চরের পিঠ থেকে টেনে নামিয়ে ঘুষি লাথি মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেললো। আমি বুড়ো হয়েছি। অসহায়ের মতো তার হাতে একতরফা মার খেয়ে ফিরে এলাম। আমার লোকজন কিছু করতে সাহস করেনি, কারণ আলী-নূর আপনার প্রিয়পাত্র প্রাক্তন উজিরের পুত্র। জাঁহাপনা, আপনি স্বচক্ষেই দেখছেন, আমার শরীরের এই রক্তারক্তি কাণ্ড। এখন আপনার কাছে আমার নালিশ এর সুবিচার করুন।

সুলতান ক্ষণকাল চিন্তা করলেন। তারপর উজিরকে বললেন, জনা চল্লিশেক ফৌজ নিয়ে হানা দাও অল ফাদলের বাড়ি। যেভাবেই হোক নূর আর সেই মেয়েটাকে আমার সামনে হাজির করো। আর নূর-এর বাড়িঘর দোর বিষয় সম্পত্তি যা আছে—সব বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করে দাও।

মইন এইরকম আদেশই চেয়েছিলো। সুলতানকে কুর্নিশ করে বললো, জাঁহাপনার যেরূপ অভিরুচি। আমি এক্ষুণি তাকে গ্রেপ্তার করে আনছি। আর তার বাড়িঘর সব বাজেয়াপ্ত করে দিচ্ছি।

দরবারের এক তরুণ পারিষদ সুলতানের এই হুকুম শোনামাত্র দরবার থেকে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লো। এই ছেলেটি নূর-এর বাবা অল-ফাদলের বড় প্রিয়পাত্র ছিলো। তারই অনুগ্রহে এখানে এক উচ্চপদে বহাল হতে পেরেছে সে। আলী নূর-এর সঙ্গেও তার দারুণ ঘনিষ্ঠতা। রাস্তায় নেমে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো সে। একটানা দৌড়ে এসে নূর-এর প্রাসাদে কড়া নাড়লো। নূর তখন মধুমিতার সঙ্গে আলোচনা করছিলো। মধুমিতা বলছিলো, তুমি আজ যা করেছো, ভেবো না, ওখানেই ব্যাপারটা মিটে গেছে। উজির মইন শুনেছি ভীষণ খারাপ লোক। এই মারের প্রতিশোধ সে নেবেই। এবং সে ক্ষমতাবান লোক। সত্যি মিথ্যে বলে সুলতানকে ভাঙ্গানী দিয়ে তার কাছ থেকে আমাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এনে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর তোমরা নসীবে কি আছে সে আমি ভাবতে পারছি না, সোনা।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ দ্রুততর হয়। মধুমিতা বলে, ঐ শমন এসেছে।

নূর বলে দাঁড়াও, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি, তুমি যেও না।

মধুমিতা বলে, না, তোমাকে যেতে দেবো না। তুমি খিড়কীর দরজা দিয়ে পালিয়ে যাও। নিয়ে যেতে চায়, আমাকে নিয়ে যাবে। তুমি পালাও।

নূর বলে, সে হয় না, মিতা, আমি তোমাকে ফেলে পালাতে পারবো না কিছুতেই।

মধুমিতা বলে, ঠিক আছে, আমাকে খুলতে দাও দরজা। তুমি পাশের ঘরে থাকো। আমার কথাবার্তার ধরন বুঝে যা ভালো বোঝ করো।

মধুমিতা দরজা খুলে দেখে, নূর-এর সমবয়সী একটি সুদর্শন ছেলে। —নূর কোথায়? আপনারা এখুনি পালিয়ে যান। শয়তান উজির মইন আসছে গ্রেপ্তার করতে।

নূর এসে দাঁড়ালো। ছেলেটি বললো, আর দেরী করো না নূর। যেখানে পারো এখুনি পালাও। সুলতানের হুকুমে চল্লিশজন ফৌজ নিয়ে মইন আসছে। এই নাও আমার কাছে চল্লিশটা দিনার আছে। এতে কতটা কি হবে জানি না। কিন্তু আর এক মুহূর্ত এখানে তোমাদের থাকা চলবে না। ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে। তোমরা বেরিয়ে পড়ো।

মধুমিতা আর নূর সঙ্গে সঙ্গে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে শহরের অলিগলি দিয়ে হন হন করে হেঁটে চলে। বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না। লোকের চোখে পড়ে যাবে। এক সময় তারা বসরাহর বন্দরে এসে হাজির হলো। সেই সময় একটা জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছিলো বাগদাদে। খালাসীরা হাঁকছে, কে যাবে বাগদাদে, চলে এসো, এখুনি জাহাজ ছাড়বে। নূর আর মধুমিতা গিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজটা ছেড়ে দিলো।

এদিকে মইন ফৌজ নিয়ে অল-ফাদলের প্রাসাদে এসে দেখে, পাখী পালিয়েছে। রাগে জ্বলে উঠলো সে। হুকুম করলা, শহরের প্রান্তে প্রান্তে তল্লাসী চালাও। যেভাবেই হোক পাকড়াও করতেই হবে। উজিরের হুকুমে বসরাহর জনপথে ধূলি উড়তে লাগলো। সারা শহর তোলপাড় করে ফেললো ফৌজরা। যাকে সামনে পেলো, জেরা করলো। যাকে সন্দেহ হলো, গ্রেপ্তার করলো। কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেলো না তাদের। ওরা তখন বাগদাদের জাহাজের পাটাতনে বসে ভীরু কপোত-কপোতীর মতো বসরাহর বিলীয়মান বন্দরের দিকে তাকিয়েছিলো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন চৌত্রিশতম রজনীর মধ্যরাতে আবার কাহিনী শুরু করলো সে।

জাহাজের পাটাতনে বসে দুই কপোত-কপোতী তখন দূরে বিলীয়মান বন্দর বসরাহর দিকে তাকিয়েছিলো।

সারা শহর তোলপাড় করেও আলী নূর আর মধুমিতাকে না পেয়ে মইন ব্যর্থ মনোরথে সুলতানের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লো।—জাঁহাপনা, আমি যাওয়ার আগেই সে খবর পেয়ে গিয়েছিলো। কোথায় পালালো কিছুই বুঝতে পারছি না। সারা বসরাহ তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু না, কোথাও পেলাম না। কেউ বলতে পারলো না, কোন্ পথে তারা গেছে।

সুলতান গর্জে উঠলেন, অপদার্থ কোথাকার। এখুনি শহরের সব প্রবেশ মুখে ফৌজ মোতায়েন করো। প্রত্যেকটি মানুষকে ধরে ধরে তল্লাসী করো। পালাবে কোথায়? আমার সারা সলতানিয়তে হুলিয়া জারি করে দাও। যে ধরে দিতে পারবে তাকে মূল্যবান পোশাক আর নগদ এক হাজার সোনার মোহর ইনাম দেওয়া হবে। টাকার লোভে দেখবে ধরিয়ে দেবেই।

কিন্তু কে কাকে ধরিয়ে দেবে? যখন হুলিয়া জারি করে ফিরে এলো মইন, আলী নূর আর মধুমিতা তখন বাগদাদের বন্দরে পৌঁছে গেছে। কাপ্তেনকে অনেক সুক্রিয়া জানিয়ে ভাড়া বাবদ পাঁচটা মোহর গুঁজে দিলো তার হাতে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। বাগদাদে নেমে যে দিকে তাকায় চোখ জুড়িয়ে যায়। চারদিকে শুধু সবুজের সমারোহ। গাছে গাছে ফুল আর পাখীর মেলা। হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে একটা বিরাট বাগানের সামনে এসে দাঁড়ালো তারা। চারপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড এক মনোরম বাগিচা। হাজারো রকম ফুলের গাছে চেনা-অচেনা হাজারো রকম ফুলের বাহার! এমন মন ভোলানো দৃশ্য জীবনে দেখেনি নূর। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে দু'জনে। আহ্ কি অপূর্ব। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না, ভেতরটা কত সুন্দর। চারপাশে দেয়াল দিয়ে সারা বাগিচাটা ঘেরা। আর দেওয়ালের মাঝে মাঝে টাঙানো ঝাড়বাতি। মৃদু মিষ্টি সবুজ আলে জ্বলছে। বাগিচার মাঝখানে একটা মস্ত বড় জলের ফোয়ারা। তার চারপাশ দিয়ে অনেকগুলো শান বাঁধানো চবুতরা।

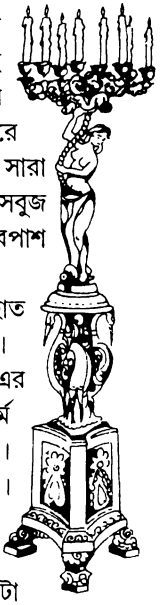

নূর আর মধুমিতা ঠিক করলো রাতটা এখানেই কাটাবে। ঝরনার জলে হাত মুখ ধুয়ে একটা চবুতরার ওপর দু'জনে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ওরা জানতো না বাগিচাটা কার। বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রসিদ-এর অবসর বিনোদনের জায়গা এই বিনোদন-বাগিচা। খলিফা যখন শতকর্মে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, কিছুদিনের জন্য তখন তিনি এসে কাটান এখানে। বাগানের এক পাশে একটি ছোট্ট হাবেলী। একেবারে নির্জন নিরিবিলি। এখানে দরবারের কোলাহল নাই, আছে শুধু ফুলের গন্ধ, ঝরনার কুলুকুলু, পাখীর কাকলী আর প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য। হাবেলীর প্রধান কক্ষে মোট পয়তাল্লিশটি জানালা। আলো হাওয়ার প্রাচুর্যে ভরা। কক্ষের মাঝখানে একটা সোনার চিরাগদানী। হাজার মোমবাতি জ্বালানো যায়। প্রতিটি মোম সবুজ কাচের আচ্ছাদনে ঢাকা। বছরের বেশী দিনই এঘর অন্ধকারে ডুবে থাকে। আলোর বাহার-এ স্বপ্নপুরী হয়ে ওঠে মাত্র কয়েকটা দিন—যখন খলিফা আসেন। ঘরদোর সাফ করা হয়। আলোর মালায় সাজানো হয় সারা বাগিচা। হাবেলী কক্ষ মনোরম হয়ে ওঠে। একটা শান্ত, মিষ্টি মধুর পরিবেশ গড়ে ওঠে সর্বত্র। খলিফা এসে বসেন পালঙ্কে। আর নিচে গোল হয়ে বসে সব গাইয়ে

বাজিয়েরা, তানপুরাতে সুর বাজে। আর দেশ বিদেশের গুণী গাইয়েরা রাগ-রাগিণীর ইন্দ্রজাল রচনা করে। দুনিয়ার সেরা ওস্তাদ ইশাকও আসেন এই আসরে।

বাগানের মালীর নাম ইবরাহিম। সারাটা জীবন এই বাগানের দেখাশুনা করেই বুড়ো হয়ে গেছে সে। এইখানেই তার ঘর, এইখানেই তার সংসার। এই বাগিচার প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে তার মমতা। প্রতিটি ফুলের গাছে জড়ানো রয়েছে তার আদর মাখা হাতের স্পর্শ। এ বাগিচার প্রতিটি লতাতরুগুল্ম যেন তার এক-একটি সন্তান। বুকের কলিজা। বাইরের কাউকে ঢুকতে দেয় না সে। বাগিচার ফল ফুল ছিঁড়ে কেউ ছত্রখান করবে, তা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না। এই আশঙ্কায় বাইরের কারুরই প্রবেশ অধিকার নাই। ফটকের বাইরে বড় বড় হরফে সে-কথা লিখেও দিয়েছে সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ দু'টো এখানে এলো কেন? আর বলা নাই কওয়া নাই ঢুকেই সটান নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে শুরু করলো। তাজ্জব ব্যাপার? ওরা কি জানে না, খলিফা তাকে কতখানি ক্ষমতা দিয়েছেন? তার অনুমতি ছাড়া যদি কেউ ঢোকে তাকে যে কোনও সাজা সে দিতে পারে? এ বাগিচায় শুধু খলিফার আত্মীয়স্বজন এবং অভ্যাগত অতিথি ছাড়া আর কারো প্রবেশ অধিকার নাই। আর ঐ যে চবুতরার ওপরে শুয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে—ওখানে আসলে তো বাইরের কোন লোকের বসারই হুকুম নাই। ইবরাহিম রেগে আগুন হয়ে ওঠে। এত বড় আসপর্দা, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি বাছাধনদের। একটা পেঁপের ডাল কেটে চোঙ্গা বানালো।—'ওদের কানের কাছে ডালের নলটা ধরে ঘ্যাক করে এই-সা একটা আওয়াজ দেব—বাছাধনরা ভয়ে শিটকে যাবে।' কিন্তু কাছে যেতে ইবরাহিম কেমন মিইয়ে যায়। আহা, বোধ হয় অনেক পথ হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারিরা। আর তা ছাড়া মাথামুণ্ডু তো সব ঢাকা। না দেখে, না জেনেশুনে এরকম ব্যবহার কি করা ঠিক হবে? কে জানে, হয়তো ভিন্‌দেশের কোনও মুসাফিরও হতে পারে। হতে পারে কোনও আমীর ওমরাহ। নলটা ওদের কানের কাছে ধরেও সরিয়ে নেয়। আগে ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার। ইবরাহিম চাদরটা সরিয়ে দেয়। হায় আল্লাহ, এ কি! এতো কোনও সুলতান বাদশাহর ছেলে মেয়ে! এমন রূপ তো সাধারণ মানুষের হয় না! ঘুমে বিভোর হয়ে আছে যেন বাগিচার দুটি ফুল! ইবরাহিম ভাবে, এখন সে কি করবে? এমন সুন্দর চাঁদের মতো দুই নওজোয়ানকে সে চাবকাতে চেয়েছিলো? ইবরাহিম যেন নিজের পিঠেই চাবুকের ঘা খায়।

চাদরটা দিয়ে আবার ওদের মুখ ঢেকে দেয় ইবরাহিম। আলী-নূরের পায়ের কাছে বসে পায়ের ওপর হাত বুলাতে থাকে। আলী-নূর-এর ঘুম ভেঙে যায়। পায়ের কাছে এক বৃদ্ধ। সে তার পায়ে হাত বুলাচ্ছে। লজ্জা পেয়ে পা সরিয়ে উঠে বসে। ওর হাত দু'টো টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বলে, একি করছেন? আপনি বয়সে আমার বাবার চেয়েও বড়। এতে যে আমার পাপ হবে?

ইবরাহিম জিজ্ঞেস করে, কখন তোমরা এলে বাছা, কোথায় তোমাদের ঘর?

আলী নূর বলে, আমরা বিদেশী পথিক। চলতে চলতে রাত হয়ে গেলো। তাই এই বাগিচায় ঢুকেছি, রাত কাটাবো বলে। সকাল হলেই চলে যাবো।

ইবরাহিম বলে, তোমরা মুসাফির, আমার মেহমান। আমি আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে পড়েছি, তিনি বহু জায়গায় নির্দেশ দিয়েছেন, 'যারা পথশ্রমে ক্লান্ত, যারা পরদেশী তাদের মেহেমান জ্ঞান করে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করবে।' আল্লাহর এই বাণী আমি অবহেলা অবজ্ঞা করবো কি করে, বাবা? তাহলে যে আমার দোজকেও জায়গা হবে না। ওঠ, চলো, আজ তোমরা আমার মেহমান। বাগিচাটা ঘুরিয়ে দেখাই তোমাদের।

আলী নূর বলে, কিন্তু এমন সুন্দর বাগিচাটা কার?

—ধরো, আমারই। আমরা তিন পুরুষ ধরে এই বাগিচা দেখাশুনা করে আসছি। আমার হুকুমেই এখানকার সব কিছু চলে। কেন, তোমাদের কি সন্দেহ হচ্ছে?

নূর বলে, না না, আমি সেকথা বলিনি।

বসরাহতে অনেক সুন্দর সুন্দর বাগিচা দেখেছে আলী নূর। কিন্তু এমন সুন্দর নয়নাভিরাম বাগান সে কল্পনাও করতে পারেনি কোনও দিন। সদর ফটকটা কি বিশাল। দু-পাশে নানা কারুকার্য করা দু'খানা থাম্বা। তার মাথায় আঙুরের লতার ঘেরা-টোপ। থোকায় থোকায় ঝুলছে টুকটুকে লাল, মিশমিশে কালো জাতের আঙ্গুর। যে দিকে তাকাও, গাছ আর গাছ। দুনিয়ার সবরকম গাছ-এর এক মেলা। আর ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে ডালপালা। কোনটায় বা পাকা, কোনটায় বা ডাঁসা, আবার কোন গাছে সবে ধরেছে গুটি। ডালে ডালে পাখীদের বাসা। দিন শেষে কুলায় ফিরে এখন তারা প্রিয় পরিজনদের সঙ্গে কলমুখর। কেউ বা শিস্ দিচ্ছে, কেউ বা কুহু কুহু তানে গান ধরেছে। নানা জাতের পাখীর নানা বিচিত্র আওয়াজে মুখরিত সারা বাগিচা।

বাগিচার মাঝে মাঝে ফুলের কেয়াড়ী। অনেকটা জায়গা ঘিরে সারি বদ্ধভাবে লাগানো হয়েছে এক একটা জাতের ফুল-গাছ। কোন সারিতে গুলাব, কোনটাতে বেলী, আবার কোন সারিতে চাঁপা। যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, হাস্নু হানা, সূর্যমুখী, ডালিয়া, ক্রিসেমথিমাম—কত দেশী বিদেশী ফুলের কি বিচিত্র সংগ্রহ। চোখ ফেরানো যায় না।

ইবরাহিম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে থাকে। কোন্ গাছটার কি নাম, কোন্ ফুলের গাছ কোন দেশ থেকে আনা হয়েছে—সব বুঝিয়ে বলতে থাকে তাদের। বাগিচা দেখা শেষ করে এবার তারা এসে দাঁড়ায় বাগানের ভিতরে সেই ছোট্ট হাবেলীর সামনে। শিল্পীর আঁকা একটা ছবির মতো। ইবরাহিম ওদের ভেতরে নিয়ে যায়। একটা প্রশস্ত কামরা শ'খানেক লোক বসতে পারে এমনটা জলসাঘর। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে অনেকগুলো হাজারবাতির ঝাড়। আর মাঝখানে একটা সোনার চিরাগ দানী। পারস্য গালিচায় সারা ঘরের মেজে মোড়া। সাটিনের আস্তর দেওয়া অসংখ্য তাকিয়া। আর মাঝে মাঝে বসানো আগরদানী। ধূপের সুমিষ্ট গন্ধে ঘরটা ভরপুর। ঘরটার চারপাশে নীল পর্দা ঢাকা অসংখ্য জানালা। একটা জানালার পর্দা তুলে আলী নূর বাইরে তাকায়। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া—প্রায়পূর্ণ চাঁদ তখন মাথার ওপরে। সারা বাগিচা নরম আলোর বন্যায় ডুবে গেছে। গাছের পাতার ওপর চাঁদের আলোর প্রতিসারণ প্রতি পলে এক অদ্ভুত অভূতপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করে চলেছে। আলী নূর আর মধুমিতা প্রাণ ভরে দেখতে থাকে। দুনিয়াতে এত রূপ আছে, এত গন্ধ আছে আগে কখনও বুঝতে পারেনি আলী নূর। আবেশে মধুমিতাকে আরও কাছে টেনে নেয়। বলে, আচ্ছা মিতা বসরাহতে থাকতে প্রকৃতির এই মনোহারী রূপ তো কখনও ধরা পড়েনি চোখে!

মধুমিতা নূরের বুকে মুখ রেখে বলে, কি করে ধরা পড়বে বলো? তখন তো তুমি ফালতু আড়ম্বরের নেশায় মেতেছিলে। এসব জিনিস দেখতে গেলে, মনটাকেও তো সেইভাবে তৈরি করতে হয়। প্রকৃতির রূপ উপভোগ করতে হলে তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তুমি তখন মিথ্যার জগতে বিচরণ করছো। কি করে এসব তোমার চোখে পড়বে। আজ তুমি অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের আগুনে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ সোনা হয়েছো। তোমার মনে এখন আর সেই অহঙ্কার, ফালতু আড়ম্বর নাই। তাই প্রকৃতির দিকে চোখ ফেরাতে পেরেছো। তাই তার অনিন্দ্য অপার রূপ তোমার চোখে ধরা পড়েছে।

আলী নূর আরও নিবিড় করে চেপে ধরে মধুমিতাকে।—তোমার কতো জ্ঞান মধুমিতা! এসব তুমি শিখলে কোথায়?

মধুমিতা বলে, এ-তো কেউ কাউকে শেখাতে পারে না, সোনা। এ উপলব্ধি করার জিনিস। আর এই উপলব্ধি আসে—অনেক পড়াশুনো করলে।

নূর বলে, জীবনটাই তো হৈ হল্লা করে নষ্ট করে দিয়েছি। পড়াশুনার দিকে নজর দিইনি। ভেবেছিলাম, ঐভাবেই দিন কেটে যাবে। কথায় আছে না। 'মাছ মারবো খাবো ভাত, লেখাপড়া কী উৎপাৎ।' আমার ছিলো সেই দশা। বড়লোকের ছেলে—কাজ কাম বা লেখাপড়া না করলেও তো বড়লোকী চালেই চলতে পারবো। সুতরাং মনে ধারণা ছিলো, লেখাপড়া এক উৎপাত বিশেষ। আজ সে-জন্যে সত্যিই দুঃখ হয়, মিতা। যদি একটু পড়াশুনা করতাম, বাবা মারা যাওয়ার পর সুলতানের দরবারে একটা ভালো চাকরী পেতাম আমি। চাই কি—কালে উজিরও হতে পারতাম।

মধুমিতা বলে, তা না পারার তো কারণ ছিলো না। উজিরের ছেলে তুমি। তুমিও উজির হবে, এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্যে তো শুধু মেয়ে-বাজী করে বেড়ালে হয় না। সেই সঙ্গে একটু আধটু বিদ্যে-চর্চাও করার দরকার ছিলো। একবার ভেবে দেখো তো, তোমার বাবা কত জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন। আর তার এই গুণের জন্যেই তো সুলতান তার কদর করতেন। দেশের লোক শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যদি নির্গুণ হতেন, তাহলে কি সুলতান তাকে অতো ভালোবাসতেন। আদৌ না। বিত্তবানকে লোকে মানে এই কারণে যে, প্রয়োজনে সে তাকে অনুগ্রহ করতে পারে। কিন্তু বিদ্বানকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে—কোনও কিছু টাকাকড়ি পাওয়ার লোভে নয়।

—কই গো বাছারা, খানা খাবে এসো।

ইবরাহিম টেবিলে কাপড় বিছিয়ে খানা সাজিয়েছে। মধুমিতা আর আলী গিয়ে খেতে বসে। খানাপিনার তেমন কোনও আড়ম্বর ছিলো না। রুটি, কিছু মাংস আর সব্জী। আর নানা জাতের ফল ছিলো অনেক। খিদে যথেষ্টই পেয়েছিলো। বেশ তৃপ্তি করেই খেলো দু'জনে। হাত মুখ ধুয়ে আবার এসে বসে তারা জানলার পাশে। আলী নূর প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ। নিজেকে হারিয়ে দিতে চায়। ভুলে যেতে চায় দুনিয়ার কলকোলাহল। হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি। কাম ক্রোধ লোভ মোহ সব মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পেরেছে সে। আজ সে এক নতুন জাতের মানুষ। অতীতকে সে পিছনে ফেলে এসেছে। তাকে সে মন থেকেও মুছে ফেলতে চায়।

ইবরাহিম দুটি গেলাসে গুলাবী শরবৎ এনে রাখে। প্রতিদিন রাতে খাওয়ার পর মিষ্টি সরাব খাওয়ার অভ্যাস চিরকালের। নূর গ্লাসে চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখে। ইবরাহিম জিজ্ঞেস করে, শরবৎ ভালো হয়নি, মালিক?

—না না, খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু রাতে শোবার আগে শরবৎ খাওয়ার তো কোনও অভ্যাস নাই, তাই ঠিক ভালো লাগছে না।

ইবরাহিম বলে, আমি বুঝতে পারিনি মালিক। এখানে সব ব্যবস্থাই আছে। অনেক দামী দামী সরাব তোমাদের খাওয়াতে পারি—যা কিনা শুধু নবাব বাদশাহদের খানার আসরেই পাওয়া যায়।

ইবরাহিম চলে গেলো। একটু পরে দু'টো গেলাস ভর্তি মদ এনে রাখলো ওদের পাশে। বললে, একশো বছরের পুরোনো, আসলী আলেপ্পোর আঙুর থেকে বানানো।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে আলী নূর মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, একেবারে খাটি আলেপ্পোর সরাব। লোকটা তো বেশ সমজদার! নূর বললো, আপনার খানা বেশ সাধারণ, কিন্তু পিনা তো বহুৎ মজাদার!

ইবরাহিম বললে, কিন্তু মালিক, আমি ওসব আর ছুঁই না। তেরো বছর হলো হজ

করে এসেছি। তারপর থেকে সরাব আমার কাছে হারাম। আমি খাই না, কিন্তু তা বলে কারো ভালো লাগলে খাবে—তাতেও আমার কোনও আপত্তি নাই। আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।

চোঁ চোঁ করে সরাব-এর গেলাস দু'টো সাবাড় করে দিলো দু'জনে। কিন্তু নেশা থোড়াই হলো। মধুমিতা বলে, আর খেতে হবে না, এবার শুতে চলো।

নূর-এর এতোকালের অভ্যাস। হঠাৎ কি এক কথায় হুট করে ছাড়া যায়। কিন্তু ছাড়তে তাকে হবেই। পয়সার সংস্থান নাই। কোথায় মিলবে আশ্রয়, কিভাবে জোগাড় হবে, রুটি, সেই চিন্তাই এখন প্রধান। মদ সেখানে বিলাসিতা।

নূর ভাবে, কাল যা হবে, হবে। আজকের এই সুন্দর রাতটা মদের নেশায় মধুর করতে পারলে হতো। ইবরাহিমকে বলে, আপনার এত দামী সরাব আর নষ্ট করতে চাই না। আপনি আমাদের জন্যে আর একটু কষ্ট করবেন?

—কষ্ট আর কী? হুকুম করো, মালিক, কি করতে হবে।

নূর বলে, শুনেছি, বাগদাদে যে-সব দোকানে গুলাব জল বিক্রী হয়, মদও পাওয়া যায় সেখানে। গুলাব জলের বোতলের পিছনে লুকিয়ে রাখে মদের বোতল। একটু বেশী দাম দিলেই বের করে দেয়। তা আপনার যদি কোনও লোকজন থাকে, তাকে পাঠিয়ে একটা বোতল আনিয়ে দিতে পারেন? এই নিন, বোতলের দাম দু' দিনার, আর এই বাড়তি দু' দিরহাম।

ইবরাহিম হো হো করে হেসে ওঠে।—না, মালিক, তার দরকার হবে না। পয়সা তোমার রাখো। সরাব আমি তোমাদের প্রাণ ভরেই খাওয়াচ্ছি। যত পারো খাবে। তার জন্যে, অন্তত আজ রাতে, তোমাদের কানাকড়িও খরচ করতে হবে না। আজ তোমরা আমার মেহমান। আমার সঙ্গে এসো তোমরা।

নূর আর মধুমিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো পাশের একটা ছোট্ট ঘরে। সেখানে আলমারীতে থরে থরে সাজানো সব নানা দেশের নানা জাতের মদ। ইবরাহিম বললো, এই নাও চাবি। যে-টা ইচ্ছা খুলে যত ইচ্ছা খাও। কেউ কিছু বলবে না। খলিফা হারুন-অল-রসিদ-এর জন্যে রাখা আছে এ সব। তাঁর অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করার জন্যে তাঁর হুকুমে জোগাড় করে রাখা হয়েছে।

নূর তাজ্জব হয়ে যায়। এতরকম মদ সে জীবনে কখনও দেখেনি। কোনটা সোনার, কোনটা রূপোর ঝারিতে ভরা। আর কত বিচিত্র রকমের কারুকার্য করা সব বোতল! আলী নূর দিশাহারা হয়ে পড়ে। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে?

একটা দুষ্প্রাপ্য মদের বোতল নামিয়ে নিয়ে আসে আলী নূর। কাজ করা সোনার পেয়ালা এনে দেয় ইবরাহিম। খুব মৌজ করে পান করতে থাকে নূর আর মধুমিতা। আস্তে আস্তে নেশা জমতে থাকে। মধুমিতার লাস্যময় ভঙ্গী বড় অপূর্ব। বিশেষ করে মদ পেটে পড়ার পর। তার হরিণীর মতো চঞ্চল আয়ত চোখ দু'টো যখন মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু হয়ে আসে তখন যে-কোন সংযমী পুরুষের রক্তেও নাচন ধরে।

ইবরাহিম বেশ খানিকটা দূরে দরজার পাশে বসেছিলো। অচেনা পরপুরুষের উপস্থিতি স্বভাবতই মেয়েদের সঙ্কুচিত করে ফেলে। যদিও নেশা বেশ জমে উঠেছে, মধুমিতা তবু তেমন সহজ হতে পারে না। আলী নূরের কাছ থেকে একটু সরে সরে থাকতে চায়। কিন্তু নূর তখন নেশায় মত্ত। মধুমিতাকে কাছে টানতে চায়। বাধা দেয় মধুমিতা, আঃ, দেখছো না, ইবরাহিম রয়েছে।

ইবরাহিম অন্যত্র সরে যেতে পারতো। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াই তার উচিৎ ছিলো। কিন্তু কেন জানি না, চেষ্টা করেও বেরিয়ে যেতে পারে না সে। মেয়েটা এমনিতেই দেখতে ভারি খুবসুরৎ। তার উপর মদের নেশায় মাতোয়ালা হয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে সে। তার বিলোল কটাক্ষ, তার জিব দিয়ে ঠোঁট চাটা, তার উঠতে গিয়ে টলে যাওয়া—বৃদ্ধ ইবরাহিমের যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারও একদিন ঐ বয়স ছিলো। তার বিবির কাজলটানা চোখের বাণে সে-ও একদিন কামনার আগুনে জ্বলে উঠতো। নূর-এর মতো সে-ও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে কতোদিন বিবির কাছে ধাক্কা খেয়েছে, 'আঃ ছাড়ো, এখুনি আম্মা এসে পড়বে।'

ভাবতে ভালো লাগে। ফেলে আসা যৌবনের মদির দিনের কথা সব বৃদ্ধেরই ভাবতে ভালো লাগে। মধুমিতাকে অপলক চোখে দেখতে থাকে ইবরাহিম। দেহ থেকে যৌবন বিদায় নিলে তাকে আর ফেরানো যায় না। আর এই না ফেরাতে পারার এক যন্ত্রণা আছে। সেই অক্ষম যন্ত্রণার মধ্যে জন্ম নেয় হিংসার। ইবরাহিম বুঝতেই পারে না, কখন থেকে সে নূর-কে হিংসা করতে শুরু করেছে।

ইবরাহিম বলে, আমাকে লজ্জা করার কি আছে? তোমরা আরও সহজ হও, বাছা। আমার কাছে কোন শরম করো না। তোমাদের আদর ভালোবাসা দেখে বড়ো ভালো লাগছে। বুড়ো হয়েছি আজ। কিন্তু একদিন আমিও তোমাদের মতো নওজোয়ান ছিলাম। আমার নাদান বিবিকে নিয়ে কতো না আনন্দ ফুর্তি করেছি। আজ আবার সেই সব পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছে। বড় ভালো লাগছে। তোমরা অত দূরে দূরে থেকো না, কাছাকাছি হয়ে আদর সোহাগ করো। দেখে চোখ সার্থক করি। রোজ রোজ তো এমন মধুর-মিলন দেখার সৌভাগ্য হবে না।

আলী নূর-এর কথা জড়িয়ে আসে।—আরে বয়স ফয়স-এর কথা গুলি মারো। চুল পাকলেই কি মানুষ বুড়ো হয়? মনে যদি রং থাকে তবে চুলে বা বয়সে কি করবে? আর কেন দোস্ত, দূরে দূরে বসে আছো। এসো, কাছে এসে বসো। আমাদের রসের ভাগীদার হও। এসো।

নূর এমন ভঙ্গী করে দু'হাত বাড়ালো যে, ইবরাহিম আর কাছে না এসে পারে না। নূর আর মধুমিতার অদূরে এসে বসলো। মধুমিতা গালিচার ওপর চিৎপাট হয়ে শুয়েছিলো। এবার উঠে বসে ইবরাহিমের দিকে চোখ মেলে তাকালো। নূর একটা পেয়ালায় মদ ঢেলে তুলে ধরে ইবরাহিমের দিকে। এক যাত্রায় পৃথক ফল আর কেন হবে? নাও দোস্ত, একটু খাও, মৌজ করো। তবে তো মজাটা জমবে!

ইবরাহিম বলে, না না, ওসব আমি তেরো বছর হলো ছেড়ে দিয়েছি। দু'বার মক্কা গিয়ে হজ করে এসেছি। ওসব আমার চলে না। তোমরা খাও, মৌজ করো, তাই দেখেই আমার আনন্দ।

নূর মদের পেয়ালা হাতে টলতে টলতে এগিয়ে আসে। আরে আজ রাতে একটু খেলে কোন দোষ হবে না। আর তা ছাড়া তুমি তো সাধ করে নিজে খাচ্ছো না, আমরা তোমার মেহমান। মেহমানকে খুশি করার জন্যে নিয়ম ভঙ্গ করলে কোনও দোষ হয় না।

নূর এতই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, পেয়ালাটা আর ধরে রাখতে পারলো না। গালিচার ওপর পড়ে গেলো।

—কুছ পরোয়া নাই, আবার দিচ্ছি ভরে।

কিন্তু পর পর তিনবারই কাপ ভর্তি মদের পেয়ালা পড়ে যায় তার হাত থেকে। নিজেও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। গড়িয়ে শুয়ে পড়ে গালিচায়। এবার মধুমিতা এগিয়ে এসে, নূর-এর হাত থেকে পেয়ালাটা কেড়ে নিয়ে এক পেয়ালা মদ ভরে তুলে ধরলো ইবরাহিমের মুখের সামনে।—তুমিই দেখো, বন্ধু, এক সঙ্গে নেশা করতে করতে এইভাবে বেহেড হয়ে গেলে ভালো লাগে কারো। রোজ রোজ এই একই ব্যাপার! আমার আর সহ্য হয় না। সাহেব

তো চোঁ চোঁ করে এক বোতল সাবাড় করে দিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। এখন আমি—আমি কি একা একা বসে নেশা করবো? সে কি ভালো লাগে কারো? মদের নেশায় এখন গাইতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তুমিই বলো ইবরাহিম, আমি কি কড়িকাঠকে গান শোনাবো? ওর এই অবস্থায় আমার কি আর নাচতে ইচ্ছে করবে? অথচ নেশা করে যদি একটু নাচ গানই না করলাম তা হলে অত কষ্ট করে ওসব শিখে কি ফয়দা?

তখন ইবরাহিমের সামনে সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেলো। একমাত্র মধুমিতার লাস্যময় আব্দারটাই বড় হয়ে উঠলো। হাত বাড়িয়ে মদের পেয়ালাটা নিয়ে বললো, শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়েই আমি আজ খাবো, দাও।

—আঃ, বাঁচালে আমায়, কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো, ইবরাহিম।

একটার পর একটা পেয়ালা পূর্ণ করে দিলো মধুমিতা। আর ইবরাহিম চোঁ চোঁ করে টেনে নিলো। এক সময় সে বলে, আর না, থাক। অনেক খেয়েছি, আর বেশী খেলে আমার নেশা হয়ে যাবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। মধুমিতার আব্দার এড়াতে পারে না সে।—এই আর এক পেয়ালা। আর দেবো না।

ইবরাহিম হাত বাড়িয়ে নেয়। এই সময় আচমকা লাফিয়ে উঠে বসে নূর হো হো করে হাসতে থাকে।

এমন সময় রাত্রি ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পঁয়ত্রিশতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়।

তারপর শুনুন জাঁহাপনা, ইবরাহিম যখন মধুমিতার আব্দারে আরও এক পেয়ালা মদ হাতে নিলো, নেশার ভান করে পড়েছিলো, নূর তড়াক করে উঠে বসে বললো, কি গো সাধু মহাপুরুষ, আমি তখন অমন করে সাধলাম, খেলে না। বললে, হজ করে এসেছো। তেরো বছর ছেড়ে দিয়েছো। আর এখন দেখি চোঁ চোঁ করে টানছো। কী ব্যাপার? না, মেয়েছেলের নাকি সুরের আব্দারে গলে গেলে!

ইবরাহিম লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে আসে।—না, মানে তুমি বেহেড হয়ে ঢলে পড়লে—মেয়েটা একা একা মদ খাবে—তাই একটু... কিন্তু তোমার বিবি যে আমাকে একেবারে আস্ত একটা মাতাল করে ছাড়বে তা তো বুঝতে পারিনি।

আলী নূর আর মধুমিতা হেসে গড়িয়ে পড়ে। ইবরাহিম হাসতে পারে না। বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মধুমিতা বলে, থাক, ঢের হয়েছে, ওকে আর লজ্জা দিওনা।

মধুমিতা দু'টি পেয়ালায় মদ ঢালে। একটা নূরকে দেয়, আর একটা সে নিজে নেয়। বলে, ইবরাহিমকে আর দেবো না, ও ব্যাচারির খুব নেশা করিয়ে দিয়েছি আমি।

এরপর আর ওরা ইবরাহিমের দিকে ফিরেও তাকায় না। হাসি গল্পে মশগুল হয়ে একের পর এক পেয়ালা শেষ করতে থাকে। আর ইবরাহিম সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাদের মৌতাত। এক সময়ে আর থাকতে পারে না, বারে, শুধু তোমরাই খেয়ে যাবে, আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো? আমাকে দেবে না?

এবার হাসির হুল্লোড় ওঠে। সে হাসিতে ইবরাহিমও সামিল হয়। মধুমিতা মদ ঢেলে এগিয়ে দেয় ইবরাহিমের দিকে।

মধুমিতা বললো, দোস্ত ঘরের মাঝখানের চিরাগ দানীর একটা বাতি জ্বালিয়ে দেবে?

ইবরাহিম তখন নেশায় বুঁদ। বলে, মাত্র একটা? হুকুম করো তো সব আলো জ্বেলে দিতে পারি।

মধুমিতা বলে, না একটা জ্বাললেই যথেষ্ট।

ইবরাহিম একটা একটা করে শ'খানেক বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে এলো। আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো সারা কক্ষ।

এক এক করে সব জানলাগুলোই খুলে দিলো আলী নূর। আর প্রতিটি জানলার সামনে জ্বালিয়ে দিলো এক একটা মোমবাতি। সারা বাগানে ছড়িয়ে পড়লো সেই আলোর রোশনাই। ইবরাহিম ততক্ষণে নেশায় বুঁদ হয়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছে। আলো জ্বালার পর জানলা খোলায় যে কি বিপর্যয় ঘটে গেলো তা আর তখন কেউই জানতে পারলো না।

খলিফা হারুন-অল-রসিদের প্রাসাদ থেকে তার এই বিনোদন-বাগিচা স্পষ্ট দেখা যায়। অনেক রাতে খলিফা প্রাসাদের গবাক্ষ থেকে দেখলেন, তার বাগিচার হাবেলী আলোয় আলোময়। সেই রাতেই, তখনই, উজির জাফর অল-বারমাকীকে ডেকে পাঠালেন। এই রাত দুপুরে খলিফার তলব! নিশ্চয়ই অভাবনীয় কিছু ঘটেছে। ভয়ে ভয়ে কোরবানীর খাসীর মতো এসে দাঁড়ালো। খলিফা বললেন, ওহে উজির, তোমরা কি সবাই মিলে বাগদাদ শহরটাকে উচ্ছন্নে দিতে বসেছো? নাকে তেল দিয়ে দিব্যি তো ঘুমচ্ছো। এদিকে যে কি সব কাণ্ড-কারখানা চলছে, তার খবর রাখো? আমার বিনোদন বিহার আলোয় ঝলমল করছে। নাচ-গান মদের ফোয়ারা ছুটছে। কী ব্যাপার, আমি কি মরে গেছি?

জাফর বিনীতভাবে বলে, জাঁহাপনা, আপনাকে এই সব আজগুবি খবর কে এনে দিয়েছে। এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কি ঘটা সম্ভব?

—কে বলবে? আমি নিজে চোখে দেখেছি। বিশ্বাস না হয়, ওপরে যাও, দেখে এসো, এখনও আলো জ্বলছে। দরজা জানলা সব হাট করে খোলা রয়েছে।

জাফর দেখে ফিরে এসে বললো, এ হুজুর ঐ বুড়ো ইবরাহিমের বদমাইশি। লোকটা পয়সার লোভে ভাড়া খাটাচ্ছে। গত সপ্তাহে বুড়োটা আমার কাছে এসেছিলো। তার ছোট ছেলেটার সুন্নৎ। কিছু টাকা দরকার। তা আমি ভাগিয়ে দিয়েছি। হুট করে চাইলেই তো আর টাকা পাওয়া যায় না।

খলিফা বললো, খুব অন্যায় করেছো, জাফর। লোকটা আমার বহুকালের পুরনো চাকর। কিন্তু বড্ডো গরীব। তার দরকারে কিছু টাকা তো দেওয়াই কর্তব্য। তা আমাকে না জানিয়ে তাকে শুধু হাতে ভাগিয়ে দিলে কেন?

জাফর মাথা হেঁট করে। —আমার দোষ স্বীকার করছি, হুজুর। আমি আপনাকে জানাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু নানা কাজের ঝামেলায় একেবারে ভুলে গেছি।

খলিফা বললেন, ঠিক আছে, এ যাত্রা আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। কিন্তু ইবরাহিমের এই কাজের সময় তাকে কিছু টাকা পয়সা দেওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য। আর শুধু দু'টো পয়সা ছুঁড়ে দিলেই কি সব হয়? সে আমার এতকালের পুরনো লোক। তার সুখে দুঃখে আমারও তো সামিল হওয়া দরকার। আমি ঠিক করেছি তার কাছে একবার যাবো। তার এই উৎসবের দিনে আমাকে পেলে খুব খুশি হবে সে। তাছাড়া কতো রকম লোকের আনাগোনা হয়েছে সেখানে। হয়তো দু-একজন গুণী লোকের সঙ্গেও মোলাকাৎ হয়ে যেতে পারে।

জাফর বললো, আপনি কাল সন্ধ্যাবেলা যেতে চান, হুজুর? কিন্তু ততক্ষণে তার অতিথি অভ্যাগতরা কি আর কেউ থাকবে? আজ রাতে যদি কাজ-কাম হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তো কাল দিনমানেই তারা যে যার ঘরে ফিরে যাবে।

খলিফা বললেন, তাহলে আর দেরি নয়, চলো, এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক।

খলিফা, জাফর আর খলিফার দেহরক্ষী মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে তিন ছদ্মবেশী সওদাগরের বেশ ধরে পথে বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে বাগিচার সদর ফটকের সামনে এসে দেখে দরজা খোলা। অন্য সময়, রাতে কেন, দিনের বেলাতেও খোলা থাকে না এ দরজা। আজ নিশ্চয়ই ইবরাহিমের ছেলের সুন্নৎ উৎসব। বাইরের নিমন্ত্রিতরা আসবে যাবে। সেই কারণে এই সদর ফটক খুলে রেখেছে সে।

বাগিচার ভিতরে ঢুকে খলিফা বললেন, এ অবস্থায় ওদের উৎসবের আসরে যাওয়া ঠিক হবে না। তার আগে লুকিয়ে দেখতে হবে ওরা কি করছে।

একটা বাতাবী লেবুর গাছ দেখিয়ে তিনি বলেন, এই গাছটার ওপরে উঠে উঁকি মেরে দেখতে হবে।

মাসরুরের কাঁধে চেপে খলিফা আর জাফর গাছের উপরে উঠে গেলেন। ডালের ওপরে বসে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন। একটা জানলার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলেন, ঘরের মধ্যে তিনটি প্রাণী। তার একজন ইবরাহিম। আর দু'জন খুবসুরৎ যুবক-যুবতী। আহা, কি তাদের রূপ। এমন অপরূপ সুন্দর ছেলে মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু একি! ওরা সবাই সরাবের নেশায় বুঁদ। সবারই হাতে মদের পেয়ালা। ইবরাহিম তো মাথা গোঁজ করে বসে আছে। মেয়েটি গুণগুণ করে গান ধরেছে। আর ছেলেটি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তারিফ জানাচ্ছে। খলিফা বললেন, আমি ভেবে পাচ্ছি না, জাফর, এরা কারা। মনে হচ্ছে বিদেশী মুসাফির। কিন্তু এখানে এলো কি করে?

জাফর কোনও জবাব দিতে পারে না। খলিফা বললেন, এই অবস্থায় ওদের সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই না, জাফর?

জাফর বলে, কিন্তু না গেলে, এই গাছের ডালে বসে কি করে হদিস পাবেন, হুজুর?

এমন সময় ওঁরা দেখলেন, ইবরাহিম বলছে, এমন নেশা করে একটু গান বাজনা না হলে কি জমে? মালকিন, তুমি কি বাজাতে জানো?

মধুমিতা বললো, জানি, কিন্তু বাজাবার কি আছে এখানে?

ইবরাহিম বলে, আছে আছে, খুব ভালো যন্ত্র আছে। দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো ইবরাহিম। একটু বাদে একটু ফ্লুট নিয়ে এলো হাতে করে। খলিফা জাফর-এর দিকে তাকান। —কী এতবড় স্পর্ধা? ওস্তাদ ইশাক যে ফ্লুট বাজান সেই ফ্লুট নিয়ে এসেছে বুড়োটা! আমি এসব কিছুতেই বরদাস্ত করবো না, জাফর। এ-ও আমি বলে রাখছি, বাজনা যদি বেসুরো হয়, তোমাদের সবাইকে কোতল করবো আমি।

জাফর বললো, আর যদি সুর তাল ঠিক থাকে? তবে কি করবেন, জাঁহাপনা?

—তবে? তবে ওদের সবাইকে ছেড়ে দেবো। শুধু তোমাকে শূলে চড়াবো।

—হায় আল্লাহ, মেয়েটা যেন বেসুরোই বাজায়।

খলিফা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেন? এরকম প্রার্থনা করছো কেন?

জাফর বলে, মরতে হয় সবাই মিলে এক সঙ্গে মরাই ভালো।

খলিফা তারিফ করলেন।

মধুমিতা ফুটে অপূর্ব সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করতে থাকে। খলিফা মুগ্ধ হন। বাঃ, রীতিমতো গুণী মেয়ে, হে। এমন মন-মাতানো মধুর সুর বহুকাল শুনিনি।

জাফর বলে, তা হলে আশা হচ্ছে, জাঁহাপনার ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে।

খলিফা এবং জাফর দু'জনেই গাছ-এর উপর থেকে নামলেন। খলিফা বললেন, না, জাফর, আর তো ধৈর্য রাখতে পারছি না। এবার তো দেখতে হয়, ওরা কারা। এমন গুণীজনের সমাগম হয়েছে আমার হাবেলীতে। একটু আলাপ-সালাপ করা দরকার।

জাফর বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, আপনার কি এ সময় ওদের সামনে যাওয়া ঠিক হবে? মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে ইবরাহিম। আপনাকে দেখা মাত্র ওর নেশা-ফেসা কেটে পানী হয়ে যাবে। হয়তো বা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে মরেই যাবে লোকটা। আর ঐ দুই যুবক-যুবতী ওরা তো বুঝতেই পারবে না, এই এতো রাতে কেনই বা আপনি ওখানে গেলেন, আর কেনই বা ইবরাহিম ওভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো?

খলিফা বললেন, তা যা বলেছো। ঠিক আছে, তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি ওদিকটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

জাফর আর মাসরুর দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। খলিফা এগিয়ে গেলেন।

বাগানের ওপ্রান্তে একটা বিরাট পুকুর। নালা কেটে টাইগ্রীস থেকে জল এনে ভরাট করা হয় এই পুকুর। ফলে ছোট বড় নানা জাতের মাছে ভর্তি থাকে সারা বছর। আর এই মাছের ওপর জেলেদের ভীষণ লোভ। দাও পেলেই বাগানে ঢুকে জাল ফেলে মাছ চুরি করে পালায়। সেই কারণে বাগানের সবগুলো দরজাই বন্ধ করে রাখে ইবরাহিম। কিন্তু আজ তার ছেলের সুন্নৎ, তাই সদর ফটকটা হাট করে খোলা। আর এই মওকায় করিম জেলে ঢুকে পড়ে বাগানে। চুরি করে মাছ ধরায় সারা বাগদাদে তার জুড়ি নাই। আরও মজার ব্যাপার, যার পুকুরের মাছ চুরি করে, তার কাছেই সে বিক্রি করে যায়। খলিফা দূর থেকে লক্ষ্য করেছিলেন, সদর দরজা দিয়ে ঢুকে জাল কাঁধে করে কে যেন পুকুরের দিকে চলে গেলো। তখন তিনি জাফর আর মাসরুরকে সেখানে দাঁড় করিয়ে পুকুরের দিকে চলে এলেন। খলিফা দেখলেন, সেই করিম জেলে। জালটা দু'হাতে দোলাতে দোলাতে ছত্রাকারে ছড়িয়ে দিলো জলে। স্বগতভাবে বলে, আজ শালা, আচ্ছা মওকা মিলেছে। বুড়োটা সরাব গিলে বেহদ্দ মাতাল হয়ে পড়ে আছে। পুকুরের সব মাছ আজ সাবাড় করে দেবো।

নিস্তব্ধ রাত্রি। বিড় বিড় করে বললেও পরিষ্কার শুনতে পান খলিফা। পা টিপে টিপে আরও কাছে এগিয়ে আসেন তিনি। একেবারে করিমের পিছনে। ফিস ফিস করে ওর কানের কাছে মুখ রেখে বলেন, অতো মাছ কি করবি, করিম?

আঁৎকে ওঠে লোকটা। ফিরে তাকায়। ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে, জাঁহাপনা, আপ-নি—

—চুপ! একদম চেঁচাবিনা।

—হুজুর, আমাকে এবারের মতো মাফ করে দেন, আমি আপনার পা ছুঁয়ে কসম খাচ্ছি, আর কক্‌খনো চুরি করতে আসবো না। কি করবো হুজুর, পেট চলে না, ঘরে অনেক লোক—

—ঠিক আছে বাঁদর, এখন জালটা তোল, দেখি কি মাছ পড়েছে।

জালটা গুটিয়ে তুললো করিম। অনেকগুলো বেশ ভালো ভালো মাছ ধরা পড়েছে। খলিফা বললো, চমৎকার! খাসা হবে। নে, এবার তোর জামা পাতলুন খুলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়া।

করিম বেচারী মুখ কাচুমাচু করে। জী হুজুর—

—'জী হুজুর' কি করে? তোকে না বললাম, ন্যাংটো হয়ে দাঁড়া? তা কথা শুনতে পাচ্ছিস না?

করিম এবার চটপট গায়ের চোগা চাপকান খুলতে থাকে। বাগদাদের সব লোকের কাছে করিমের এই পোশাকটা বহু পরিচিত। কবে যে সে প্রথম পরেছিলো, কেউ বলতে পারে না। ইঞ্চি খানেক পুরু তেল চিটচিটে ময়লা জমেছে। ছিঁড়ে ঝুল্লি হয়ে গেছে। জামাটা খুলতেই গোটা কুড়ি বড় বড় ছারপোকার হুটোপুটি শুরু হয়ে গেলো।

খলিফার চোখ তো ছানাবড়া। সে কিরে করিম। এই সব সঙ্গী-সাথী নিয়ে দিব্যি তো আরামে থাকিস! কামড়ায় না?

—তা হুজুর পরথম পরথম কামড়াতো। এখন আমার সাথে ভাব হয়ে গেছে। আর কামড়ায় না। তা ছাড়া ও আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কামড়ালেও টের পাই না, হুজুর।

করিম ভেবে পায় না, জাঁহাপনা কেন তাকে উলঙ্গ করলেন। হয়তো চুরি করার সাজা হিসাবে গায়ে এমন কোনও দাগ কেটে দেবেন যা তার চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু না, করিম দেখলো, খলিফা স্বয়ং নিজেও সব সাজ-পোশাক খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেন,—

—এবার করিম, তুই আমার পোশাকগুলো পর। আর আমি তোরগুলো পরছি।

করিম হাঁদার মতো হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখে। খলিফা হারুন-অল-রসিদ—দণ্ড মুণ্ডের বিধাতা,—দীন হতে দীন জেলে করিমের শতচ্ছিন্ন ময়লা নোংরা সেই পোশাক দেহে ধারণ করলেন। খলিফার নির্দেশে করিমও তার সাজ পোশাক পরে নিলো। খলিফা বললেন, বাঃ বেড়ে হয়েছে তো দেখতে। একেবারে সুলতান খলিফা হারুন-অল-রসিদ—উফ! ওরে করিম, একি হলো রে, ব্যাটারা যে কুট কুট করে কামড়াচ্ছে, আর তির তির করে ছুটে বেড়াচ্ছে—!

জেলে বলে, ও কিছু না, জনাব। এখুনি সয়ে যাবে। নতুন মানুষ পেয়েছে, একটু তাজা রক্ত চুষে সেলাম জানাচ্ছে আপনাকে। পেট পুরে গেলে আর কামড়াবেনা।

খলিফা বলে, বলিস, কিরে? পেট পুরে গেলে—? আমি খলিফা হারুন-অল-রসিদ আর আমারই রক্ত চুষে খাচ্ছে? এত বড় স্পর্ধা?

হুজুর ক্ষান্ত হোন। এখন আপনি ওদের প্রজা। ওরা এখন শাহেন শাহ। ওটা ওদের জন্মগত অধিকার।

খলিফা খুশি হয়ে বলে, বাঃ তুই তো ব্যাটা রসিক আছিস। নে এই আংটিটা দিলাম তোকে। ঐ মাছগুলো রেখে তুই এখন পালা।

মাছগুলো করিমের একটা থলেয় ভরে নিয়ে জাফরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। জাফর খলিফাকে করিম বলে ভুল করলো, হ্যাঁরে করিম এই রাতে বাগানে ঢুকেছিস কী মতলবে? জানে বাঁচতে চাস তো শিগ্গির পালা। খলিফা এসেছেন এখানে।

জাফর-এর কথা শুনে খলিফা হো হো করে হেসে উঠলেন। জাফর তো অবাক! —জাঁহাপনা, আপনি?

খলিফা বললেন, তাহলে ছদ্মবেশটা বেশ লাগসই হয়েছে, বলো? ইবরাহিম চিনতে পারবে না তাহলে?

জাফর বলে, আমিই চিনতে পারিনি, তা ইবরাহিম চিনবে কি করে, হুজুর?

—ঠিক আছে। তোমরা এখানেই থাকো। আমি আসছি।

খলিফা সোজা ঢুকে পড়লেন হাবেলীর ঘরে। বাইরের মানুষের পায়ের শব্দে ইবরাহিম সজাগ হয়ে ওঠে, কে রে?

খলিফা সামনে এসে ইবরাহিমকে আদাব জানায়।

—ওঃ তুমি? এতো রাতে এ বাগানে ঢুকেছিস কেন রে চোর বদমাইস, নচ্ছার? খলিফা মুখ কাচু মাচু করে মাছের থলেটা সামনে রাখে, আপনার জন্যে ক'টা মাছ এনেছি, জনাব?

ইবরাহিম হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, মাছ? আমারই পুকুরের মাছ চুরি করে আমারই কাছে এনেছো বিক্রি করতে?

আজ্ঞে, বিক্রি করতে আনি নি, যদি মেহেরবানী করে গ্রহণ করেন—

মধুমিতা এগিয়ে আসে, দেখি দেখি, কি মাছ?

সদ্য ধরা জ্যান্ত মাছগুলো বের করে দেখান খলিফা। খলখল করে লাফাতে থাকে। নূর বলে, বাঃ জমবে ভালো। ভাজা মাছ মদের সঙ্গে তোফা চাট।

ইবরাহিম খলিফাকে ধমকে ওঠে, তা হাঁদারাম, মাছগুলো ভেজে আনতে পারোনি? ওনারা কি তোমার এই কাঁচা মাছগুলো কামড়ে কামড়ে খাবেন?

খলিফা শশব্যস্ত ভাবে বলে, আমি এক্ষুণি ভেজে এনে দিচ্ছি, জনাব।

ইবরাহিম বলে, যা, ওপাশে রসুই ঘরে তেল মশলা সব আছে। বেশ কড়া করে ভেজে আনবি।

খলিফা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শুনতে পেলেন, ওরা তিনজনে চেঁচিয়ে বলছে, খুব জলদি, আচ্ছা-সে কড়া করে ভেজে নিয়ে আয়।

জাফরের কাছে ফিরে এসে খলিফা হাসতে হাসতে বললেন, জাফর, বিলকুল চিনতে পারেনি ইবরাহিম। আমাকে দেখে রেখে আগুন। চোর বদমাইশ নচ্ছার বলে আদর অভ্যর্থনা করলো। তারপর নবাবী চালে হুকুম করলো, 'জলদী, মাছগুলো আচ্ছা-সে কড়া করে ভেজে নিয়ে আয়।' কিন্তু জাফর, ছেলেটা আর মেয়েটাকে দেখে বনেদী খানদানী ঘরের নওজোয়ান মনে হলো। শুধু ভাবছি, ইবরাহিমের সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক?

জাফর বললো, মাছগুলো আমার হাতে দিন জাঁহাপনা, আমি ভেজে এনে দিচ্ছি।

না না, সব মাটি হয়ে যাবে। ইবরাহিম যদি রসুই ঘরে এসে দেখতে চায়—আমি কি দিয়ে কি করে মাছগুলো ভাজছি তা হলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। তুমি এখানেই থাকো। আমি রসুইখানা থেকে ভেজে নিয়ে উপরে যাচ্ছি।

রসুইখানায় ঢুকে মাছগুলো কাটলেন, ধুলেন, নুন, হলুদ, মশলা, দিয়ে মাখলেন তিনি। উনুনে কাঠ দিলেন, কড়াই-এ তেল ঢেলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। টগবগ করে যখন ফুটে উঠলো তেল, মাছগুলো কড়াই-এ ছেড়ে দিলেন। এক্কেবারে পাকা বাবুর্চির মতো নিখুঁতভাবে করে যেতে থাকলেন সব। এক পিঠ ভাজা ভাজা হয়ে এলে উল্টে দিলেন। এইভাবে মাছের টুকরোগুলো লালচে হয়ে এলে উনুন থেকে নামালেন। বাগান থেকে দু'টো পাতিলেবু আর একখানা কলা পাতা এনে ভাজা মাছগুলো ওপরে নিয়ে এলেন তিনি।

আলী নূর, মধুমিতা আর ইবরাহিম তিনজনে মিলে মাছগুলো সব সাবাড় করে দিলো। নূর বললো, বাঃ, বেড়ে ভেজেছো তো হে? তোফা হয়েছে। এই নাও, তোমার বকশিস।

তিনটি দিনার বের করে খলিফার হাতে দিলো সে। দু'হাত একত্র করে ইনাম নিলেন খলিফা। কপালে ছুঁইয়ে মুদ্রা তিনটি চেপে কপালের সঙ্গে সেঁটে দিলেন। অর্থাৎ 'তোমাদের ইনাম মাথায় করে নিলাম', খলিফা গদগদ হয়ে হাত জোড় করে বললেন, একটা কথা বলবো, হুজুর।

আলী নূর অবাক হয়। লোকটার কি তিন দিনারে মন ওঠেনি? কিন্তু সনজার তাকে মাত্র চল্লিশটা দিনার দিয়েছিলো আসার সময়। তাছাড়া তার নিজের কাছে একটা পয়সাও ছিলো না। তা থেকে জাহাজের কাপ্তেনকে পাঁচটা দিনার দিতে হয়েছে ভাড়া বাবদ। তিন দিনার

ওকে দিয়েছে। এখন আর সাকুল্যে বত্রিশটা রইলো তার কাছে। বিদেশ বিভুঁই-এ সামান্য এই বত্রিশ দিনারে কদিন চলবে? আলী নূর বলে, কি বলবে বলো।

খলিফা বলেন, জী হুজুর, যদি মালকিন একটা গান শোনান—ওঁর বাজনা শুনে বড়্ড ভালো লেগেছে।

মধুমিতা বললো, কি গান শুনতে চাও, বলো, কি ধরনের গান তুমি ভালোবাসো?

—বেগম সাহেবা কি সব রকম গানই জানেন?

—সবই তো শিখেছিলাম এক কালে, খেয়াল, ঠুংরী, কালোয়াতী, কাওয়ালী—কি শুনবে বলো?

খলিফা অবাক হয়। মেয়েটা বলে কি? খেয়াল ঠুংরী! —তা যদি একখানা দরবারী কানাড়া শোনান তো খুব ভালো হয়। অনেক দিন শুনিনি।

মধুমিতা বলে, তুমি তো মাছ ধরে খাও। দরবারী বুঝতে পারবে?

খলিফা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলেন, আমাদের জাত ব্যবসা মাছ ধরা ঠিকই কিন্তু আমার বাবা ছিলেন সাধক লোক। গানের সাধনায় তিনি অনাহারে জীবন পাত করেছেন। মাছ ধরা ফেলে রেখে তানপুরা নিয়েই মেতে থাকতেন। আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, বাবার কোন গুণই পাইনি। তবে শুনতে ভালোবাসি, ভালোলাগে।

এতকাল পরে একজন সমজদার পেয়ে মধুমিতা খুশি হয়। দরদ দিয়ে দরবারী কানাড়া গাইতে শুরু করে। সত্যিকারের গুণী মেয়ে। সেই নিশুতিরাতে কানাড়ার নিখুঁত তাল মান লয় এর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন খলিফা। ওস্তাদ ইশাকের পরে এত ভালো গান বহুদিন শোনেন নি তিনি। গভীর আবেশে মাথাটা ঝুঁকে আসে।

ইবরাহিম ঠেলা মারে, এই চোট্ঠা, ঘুমিয়ে পড়লি না কিরে।

খলিফা হকচকিয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, না জনাব, শুনছিলাম।

—কচু শুনছিলে। এসব গানের তুই কি বুঝবি রে?

মধুমিতার গান শেষ হয়ে আসে। খলিফা দু'হাতে তালি বাজিয়ে বাহবা জানায়। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। আল্লাহ আপনাকে সুখে রাখবেন। এমন গান আপনি কোথায় পেলেন, মালকিন। শুনলে দিল্-এ আর কোনই দুঃখ দর্দ থাকে না।

নূর বলে, বুঝলাম আমার বিবির গান তোমার খুব পছন্দ হয়েছে। তা এক কাজ করো, ওসব কালোয়াতী গান ফান তো আমি বুঝি না। আমি ওর কদরও করতে পারি না। তুমি ওকে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে যাও। প্রাণ ভরে গান শুনবে? কি বলো? না না, আর কোনও ওজর আপত্তি শুনবো না, জেলে, আমি তোমাকে বরাবরের জন্যে ওকে তোমায় দান করে দিলাম।

শেরওয়ানীটা কাঁধে ফেলে গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়ায় আলী নূর। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। মধুমিতার কাতর কণ্ঠ শুনে থামে। মুখ ফেরায়। মধুমিতা বলে, প্রাণনাথ, তুমি আমাকে এইভাবে একা ফেলে চলে যাচ্ছো, একটুও তোমার মায়া হচ্ছে না। আর চিরকালের মতোই যখন যাচ্ছো দু'টো মিষ্টি কথাও কি বলে যাবে না, একটুখানি সবুর করো, প্রাণেশ্বর, একটি কথা শুনে যাও।

খলিফা কিছুই আন্দাজ করতে পারেন না। ছেলেটি দুম করে মেয়েটাকে ছেড়ে পালাতেই বা চাইছে কেন? তবে কি সে ওর শাদী করা বেগম নয়। কাউকে কি ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে? নূরকে লক্ষ্য করে বললেন, শুনুন মালিক, আমি আপনার বাবার চেয়েও হয়তো বড় হবো। আমার কাছে গোপন করবেন না, খুলে বলুন, কি আপনাদের দুঃখ, কি আপনাদের অভাব অভিযোগ। আমি গরীব জেলে। দিন আনি দিন খাই। তবু যদি বুঝি, আমার সাধ্যমতো

উপকার করতে কোসিস করবো। আপনি কি ভয় করছেন, এখানে কোতোয়ালের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে আপনাকে এই লেড়কীর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে? ওসব আপনি বিলকুল ভাববেন না। কোতোয়াল তো কোন ছার, তার বাবার বাবার সঙ্গে আমার দহরম মহরম আছে। আমার এক ইশারাতে ছেড়ে দিতে পথ পাবে না বাছাধনরা। তা সত্যিই কি ভাগিয়ে এনেছেন, হুজুর?

নূর বলে, না না, ওসব নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নাই। আমি কোনও বে-আইনি কাজ-ফাজ করিনি। সমস্যা তা নয়। এককথায় তো তোমাকে সব বোঝানো যাবে না, জেলের পো। অনেকটা সময় লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, শোনো, গোড়া থেকেই বলি, আমাদের দুঃখের কাহিনী—। তা একরকম ভালোই হবে। বলতে বলতে রাতটাও কাবার করে দিতে পারবো।

নূর যখন তাদের কাহিনী বলা শেষ করলো, রাত্রি তখন আর বেশি বাকী নাই। খলিফা বললেন, সবই তো শুনলাম। এখন কি করতে চান বলুন মালিক।

নূর বলে আল্লাহর পথ অবারিত, খোলা আছে। যে দিকে দু' চোখ যায়, চলে যাবো।

খলিফা বলেন, শুনুন, জনাব, আমি যদিও এক দীন হীন সামান্য জেলে। তবু ছোটবেলায় বসরাহর সুলতানের সঙ্গে একই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিলো। সে সুবাদে তার কাছে আমি একখানা খৎ লিখে দিচ্ছি। আমার মনে হয়, আমার চিঠি দেখলে আপনাদের সমস্যার সমাধান করে দেবেন তিনি।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে এলো। গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ চুপ করে বসে রইলো।

ছত্রিশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

করিমের ছদ্মবেশী খলিফা বললেন, ছোটবেলায় বসরাহর মাদ্রাসায় আমি ওখানকার সুলতান মহম্মদ ইবন সুলেমান অল-জিনির সহপাঠী ছিলাম। পড়াশুনায় আমার খুব মেধা ছিলো। সে তুলনায় সুলেমান বেশ কাঁচা। কোরাণের পাঠ সে কিছুতেই মনে রাখতে পারতো না। মৌলভী ছিলেন ভীষণ কড়া। তার ভয়ে সবাই যুযু হয়ে থাকতো। আমি তাকে মুখে মুখে মুখস্থ করিয়ে দিতাম। ফলে আমাদের দোস্তী বেশ জমে উঠেছিলো। সুলতানের সন্তান সে, তাই কালে সুলতানই হলো। আর আমি, সামান্য জেলের ছেলে, আমার জাত-ব্যবসাতেই জীবনপাত করতে থাকলাম। তবু সেই ছোটবেলার বন্ধুত্বে কিন্তু এতটুকু ঘুন ধরেনি। এখনও দেখা হলে, সব ভুলে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সে যে অত বড় সলতানিয়তের একজন সুলতান, ভুলে যায় সে কথা। কোনও অহঙ্কার, দম্ভ আমি দেখিনি। আমি হয়তো খুবই কম জবাব দিই, কিন্তু সে নিয়মিত আমাকে চিঠি লেখে, খবর নেয়।

নূর বলে, যাই হোক, আল্লাহর নাম নিয়ে লিখে দাও একটা চিঠি। হয়তো কাজে দিতে পারে।

ইবরাহিম কাগজ দোয়াত কলম এনে দিলো। গালিচায় হাঁটু গেড়ে বসে একখানা চিঠি লিখলেন খলিফা।

॥ এলাহি ভরসা ॥

আমি—আব্বাস বংশের অন্যতম পুত্র মাহদি তস্য পুত্র হারুন-অল-রসিদ। আমার অন্যতম সলতানিয়তে নিযুক্ত সুলতান মহম্মদ-ইবন সুলেমান জীনির প্রতি এই হুকুমনামা পাঠাইতেছি ঃ

এই পত্রবাহক আলী নূর, তোমার প্রাক্তন পরলোকগত উজির অল-ফাদলের পুত্র।

এই পত্র পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি সিংহাসন থেকে নেমে এসে আলী নূরকে

সিংহাসনে অধিরূঢ় করিবে। এতকাল যে অধিকার তোমাকে দিয়াছিলাম অদ্য হইতে তাহা খারিজ করিলাম। এবং আলী নূরকে প্রদান করিলাম।

পত্র পাঠ আমার হুকুম তামিল করিবে। আল্লাহ তোমার সহায় থাকুন।

এর পরে খলিফা হারুন-অল-রসিদ সহি ও টিপ সহি দিয়ে কাগজখানা ভাঁজ করে আঁঠা লাগিয়ে বন্ধ করে দিলেন। নূরের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি আর দেরি করবেন না, জনাব। সকাল হয়ে এসেছে, এখুনি বেরিয়ে পড়ুন। বন্দরে জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

নূর ভাবলো ক্ষণকাল। লোকটা গুলতাপ্পি দিচ্ছে না তো? শেষে সুলতানের হাতে ধরা পড়ে বে-ঘোরে প্রাণটা যাবে? ঠিক আছে, আল্লাহ নাম নিয়ে বেরিয়ে তো পড়া যাক। তারপর পথের মাঝে দেখে নেওয়া যাবে, কি লেখা আছে খতে। নূর বললো, তা হলে ওই কথাই রইলো, মধুমিতা এখানেই রইলো। আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম। যাই বসরাহতে। যা ঘটে এসে বলবো।

আলী নূর বেরিয়ে যেতেই ইবরাহিম গর্জে ওঠে, শয়তান ঠগবাজ, দু' পয়সার মাছ খাইয়ে তিন তিনটি মোহর নিলি জগ দিয়ে। তাতেও তোর আশ মিটলো না? আবার যাদু করে ছেলেটাকে ভাগিয়ে দিয়ে মেয়েছেলেটাকেও ভোগ করতে চাস? সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না। সমান সমান ভাগ দিতে হবে আমাকে। না হলে ছাড়বো না। তিন মোহরের আদ্দেক আর মেয়েটার আদ্দেক আমার চাই। মেয়েটাকে আগে আমি ভোগ করবো, তারপর তোকে দেবো। তা না করে তোমার হাতে ছেড়ে দেবো, আর তুমি শালা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে? ওটি হচ্ছে না।

ইবরাহিমের এই নোংরা কথা শুনে আপাদমস্তক জ্বলে যায় খলিফার। উঠে গিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে তুড়ি বাজাতেই তীরবেগে ছুটে আসে মাসরুর। ঝাঁপিয়ে পড়ে ইবরাহিমের উপর। জাফর-এর সঙ্গেই ছিলো খলিফার সাজ-পোশাক। ক্ষিপ্র হাতে জেলের পোশাকটা খুলে ফেলে দিয়ে নিজের আসল বেশে রুদ্র মূর্তিতে দাঁড়ালেন ইবরাহিমের সামনে।

ইবরাহিমের প্রথম মনে হয়েছিলো খোয়াব। কিন্তু মুহূর্তে তার ভুল ভাঙ্গলো। দারুণ দুঃখ লজ্জা ভয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো, নিজেই নিজের হাত কামড়াতে থাকলো।

খলিফা খুব শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, এসব কী? আর কখনও এরকম বে-শরম বাত মুখে এনো না। বুড়ো হয়ে মরতে বসলে এখনও মেয়ে মানুষের লোভ গেলো না? যাও, এবারের মতো মাফ করে দিলাম।

তারপর মধুমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, তা হলে সুন্দরী, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, আমি কে? আর এখানে কেন? চলো, আমার প্রাসাদে যাই।

মধুমিতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে তার থাকার জন্যে একটা বিলাসবহুল শয্যাকক্ষের বন্দোবস্ত করলেন খলিফা। খোজা, দাসী, পরিচারিকারা ব্যস্ত হয়ে উঠলো মধুমিতার পরিচর্যায়। খলিফা নিজে এসে দেখলেন তার ঘর, পালঙ্ক, শয্যা প্রভৃতি। বললেন, আলী নূর শিগ্গিরই ফিরে আসবে। সে যে কদিন না আসে, তুমি আমার অঙ্কশায়িনী হয়ে থাকবে, কেমন রাজী?

মধুমিতা স্মিত হাসে। বড় মিষ্টি করে হাসতে জানে মেয়েটা। বলে, আলী নূর্ তো জাঁহাপনার হাতেই সমর্পণ করে গেছে আমাকে। এখন তার যা মর্জি হবে।

খলিফা বলেন, কিন্তু আলী নূর তো এক জেলের হাতে দিয়ে গিয়েছিলো। সে যদি এসে দেখে, হাতবদল হয়েছে, আমাকে কোতল করবে না তো?

মধুমিতা রসিকা মেয়ে। কোন জবাব দেয় না। একথার জবাব হয় না। শুধু হাসে। অনর্গল হাসতে থাকে। আর তার এই হাসির ঝরনায় মুক্তো কুড়াতে থাকেন খলিফা হারুন-অল-রসিদ।

এদিকে আলী নূর বসরাহয় পৌঁছে ছুটে যায় সুলতানের প্রাসাদে। কিন্তু প্রহরী

ঢুকতে দেবে না। আলী নূর চিৎকার করতে থাকে। সুলতান মহম্মদ সুলেমান শুনতে পায়। একজনকে বলে, কে চেঁচাচ্ছে, দেখো তো। লোকটাকে নিয়ে এসো।

আলী নূর দরবারে এসেই সোজা সুলতানের সামনে গিয়ে চিঠিখানা বাড়িয়ে দেয়। সুলতান বিরক্ত হয়। লোকটাতো ভীষণ বেয়াদপ। সুলতানকে কুর্নিশ না করেই সে দরবারে ঢুকে পড়লো। অবাক হয়েছিলো সবাই। এমন ঘটনা তো দেখা যায় না। কিন্তু চিঠি খানা পড়া মাত্র সুলতানের মুখের চেহারা পালটে গেলো। বারবার তিনবার চিঠিখানা মাথায় ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানালো।

—খলিফার আদেশ আমার শিরোধার্য। আল্লাহর পয়গম্বর খলিফার হুকুম আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। কই কে আছো, এখুনি চারজন কাজীকেই ডাকো। আর ডাকো আমার সব আমীর ওমরাহদের। তাদের সামনে আমি এই সিংহাসন ছেড়ে দেবো খলিফার মনোনীত এই যুবককে।

তখুনি সবাই এসে হাজির হলো। সুলতান তার পদত্যাগ পত্র সই করতে যাবে এমন সময় উজির মইন এসে বাধ দিলো, এ আপনি কি করছেন হুজুর! ক্ষান্ত হোন।

সুলতান তাকে খলিফার হুকুমনামা খৎখানা দেখালো। চিঠিখানা পড়ে খলিফার টিপসই আর সই-এর অংশটুকু ছিঁড়ে ফেলে বললো, জাল। স্রেফ জাল, হুজুর। লোকটা একটা মস্তবড় জালিয়াৎ। খলিফার সই জাল করেছে। তা না হলে, আপনি ভাবুন, খলিফা কখনও একখানা সাদা কাগজে এইভাবে চিঠি লিখতে পারেন। তার সব চিঠিতেই তো প্রাসাদের ছবি আঁকা থাকে। আর তা ছাড়া চিঠি বয়ে নিয়ে আসবে তার দরবারের দূত। সঙ্গে থাকবে পাইক বরকন্দাজ, সিপাই, সান্ত্রী। এ চিঠি বিলকুল জাল, হুজুর। আপনি ওকে কয়েদ করুন। খলিফার কাছে খবর পাঠান। তারপরেই দেখবেন, আসল কথা জানা যাবে।

সুলতান মাথা নাড়ে, ঠিক। ঠিক বলেছো মইন। তোমার দেখছি একটু একটু বুদ্ধি হয়েছে। লোকটা একেবারে ফেরেববাজ! ওকে কয়েদখানায় আটকে রাখো। আমি খলিফার দরবারে লোক পাঠাচ্ছি।

মইন চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে মুখে পুরে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দিলো।

সুলতান বললো, আহা, তুমি অতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন মইন?

—হবোনা। লোকটা ঠগ, জোচ্চোর, পাজি, বদমাইশ? খলিফা তো দূরে থাক, ও কখনো তার উজির জাফর-এর কাছে পৌঁছতে পেরেছে? ও একটা শয়তান। ওকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। আপনি হুকুম করুন, হুজুর, আমি ওর দাওয়াই-এর ব্যবস্থা করছি। আর নাহলে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি এমন শিক্ষা দেবো, যা সে জীবনে ভুলতে পারবে না। আচ্ছা এক কাজ করুন, হুজুর। লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে দরবারের কোন পারিষদকে পাঠিয়ে দেন বাগদাদে। তাহলেই আসল ঘটনা টের পাওয়া যাবে। তারপর বাছাধনকে আমি চিঠি জাল করা বের করে দেবো।

মইন-এর যুক্তিতর্কে সুলতানের ক্রমশ স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, লোকটা সত্যিই জালিয়াৎ। হুকুম দেয়, ওকে আচ্ছা করে বেত লাগাও। যতক্ষণ না কবুল করে, চালাও বেত।

আলী নূরকে পিছমোড়া করে বেঁধে, মাটিতে ফেলে বেতের ঘা মারা হতে লাগলো। বেচারী নূর কিছুক্ষণের মধ্যেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সুলতান হুকুম দিলো, এবার কয়েদখানায় পুরে রাখো। পরে আবার দেখা যাবে।

মইন এসে কয়েদখানার সর্দারকে বলে গেলো। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় বেত চালাবে, যতদিন না পর্যন্ত স্বীকার করে—

সৌভাগ্যক্রমে কয়েদখানার সর্দার ছিলো উজির-অল-ফাদলের বিশেষ প্রিয়পাত্র। নূরকে ফিসফিস করে বললো, মালিক, আপনার বাবার নোকর ছিলাম আমি। তার নুন

খেয়েছি। আমি আপনাকে যতটা পারি বাঁচাবো। আপনি শুধু মরার মতো পড়ে থাকবেন—যাতে উজিরটা সন্দেহ করতে না পারে। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, সকাল বিকাল আপনার ওপর অত্যাচার চালাতে হবে। আপনাকে দিয়ে স্বীকার করাতেই হবে, আপনি একটা জালিয়াৎ। কিন্তু হুজুর, আমি তো জানি, আপনার দ্বারা অমন নোংরা কাজ করা সম্ভব নয়। আপনি একেবারে ওদিকে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। মইন এলে কোন সাড়া দেবেন না।

চল্লিশ দিন কেটে গেলো। সর্দার প্রতিদিন সকাল-বিকাল উজিরের কাছে খবর পাঠায়। বেত মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলেছে তাকে। কিন্তু কিছুই সে কবুল করেনি।

একচল্লিশ দিনের দিন বাগদাদ থেকে নানা ধরনের মূল্যবান উপহার সামগ্রী এলো বসরাহর সুলতানের কাছে। সুলতান কিছু অনুমান করতে পারলো না, কি ব্যাপার! যারা বয়ে নিয়ে এসেছিলো বাগদাদ থেকে, তারাও কিছু বলতে পারলো না। খলিফার হুকুমে উজির তাদের পাঠিয়েছেন এখানে। ব্যস। এর বেশী কিছু জানে না তারা। সুলতান চিন্তিত হলো। এতকালের মধ্যে বাগদাদ থেকে তো কোন উপহার সামগ্রী আসেনি। বরং বাগদাদেই ফিবছর ভেট পাঠাতে হয় তাকে। তবে? কিছুই ভেবে পায় না সে। আমীর ওমরাহদের কাছে পরামর্শ চাইলো—এই উপহারের কি অর্থ?

পারিষদরা বললো, খলিফা এ উপহার পাঠিয়েছে ঐ যুবক নতুন সুলতানের জন্যে। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এই শুভেচ্ছা উপহার পাঠানো হয়েছে।

মইন বললো, এখনও আপনি ওকে কেন জ্যান্ত রেখেছেন হুজুর? আপনি কি জানেন না, শত্রুর শেষ রাখতে নাই।

—তুমি ঠিক বলেছো, মইন। শত্রুর শেষ রাখতে নাই। এখুনি ওর গর্দান নাও।

মইন তখন সারা শহরে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিলো; সুলতানের হুকুমে উজির অল-ফাদলের পুত্র জালিয়াৎ আলী নূর-এর গর্দান নেওয়া হবে। যারা এই দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চায়, সকাল দশটার সময় দরবার প্রাঙ্গণে হাজির হতে পারে।

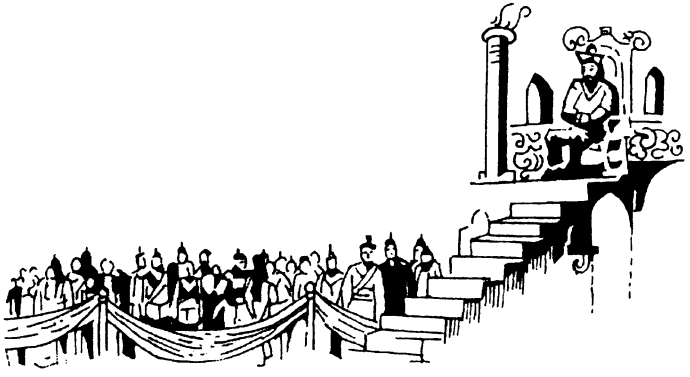

সকাল থেকে দলে দলে লোক এসে ভীড় জমাতে লাগলো দরবার প্রাঙ্গণে। হায় হায় করতে লাগলো সকলে। মইন এলো কয়েদখানার সামনে। সঙ্গে দশ জন প্রহরী। সর্দারকে বললো, আলী-নূরকে দাও। আজ ওর গর্দান নেওয়া হবে।

সর্দার বললো, আজ চল্লিশ দিন ধরে বেতের ঘায়ে সে তো এমনিতেই আধমরা হয়ে পড়েছে। আজ আবার তার গর্দান নেবার হুকুম হলো কেন?

মইন বললো, তা আমি কি করে বলবো? সুলতানের হুকুম, তামিল করতে হবে।

কয়েদখানার দরজা খুলে দেয় সর্দার। মইন চিৎকার করে ওঠে, এই জালিয়াতের বাচ্চা জালিয়াৎ, এদিকে বেরিয়ে আয়। আজ তোর মউৎ হাজির।

আলী নূর বেরিয়ে আসে। চলো, কোথায় যেতে হবে। তবে এও জেনে রাখো মইন, আল্লাহ উপরে আছে, তোমার শয়তানী তিনি সবই দেখছেন। আমার হাত থেকে রক্ষা পেলেও তার হাত থেকে রেহাই পাবে না তুমি।

—থামো, রাখো তোমার বুকনী। এবার চলো হাড়িকাঠ তৈরি।

মইনের হুকুমে প্রহরীরা তাকে একটা খচ্চরের পিঠে বাঁধলো। কিন্তু এগোতে সাহস করলো না। উত্তাল জনস্রোত তখন ধেয়ে আসছে কয়েদখানার দিকে। সবারই কণ্ঠে একই ধ্বনি, আমাদের নতুন সুলতান আলী নূরের মুক্তি চাই—মুক্তি চাই। আলী নূর জিন্দাবাদ। উজির মইন মুর্দাবাদ। আমাদের সুলতান—আলী নূর আলী নূর। আলী নূর হুকুম করো, মইনের মাথা গুড়িয়ে দিই—গুঁড়িয়ে দিই। এই রকম নানা ধ্বনি দিতে দিতে জনতা এগিয়ে আসতে থাকে।

আলী নূর চিৎকার করে বলে, ভাইসব ধৈর্য ধর, শান্ত হও। পাপীর শাস্তি আল্লাহ দেবেন।

একদল যুবক চিৎকার করে ওঠে, মইনের মুণ্ডু চাই। ব্যাটাকে কেটে টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

আলী নূর শান্ত করার চেষ্টা করে, না না, অমন কাজ করো না তোমরা।

মইন হুঙ্কার ছাড়ে, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বর্শা উঁচিয়ে ধরো। এগিয়ে চলো।

জনতার মধ্যে খচ্চরটাকে এগিয়ে নিয়ে যায় প্রহরীরা। আলী নূর সবাইকে স্বাগত জানাতে থাকে। এই ভাবে প্রাসাদ প্রঙ্গণে এনে হাজির করা হয় আলী-নূরকে। হাড়িকাঠ তৈরি। জল্লাদও প্রস্তুত। হাতে হার শাণিত তরোয়াল।

এবার শয়তান মইন চিৎকার করে ওঠে, তোমরা সবাই দেখো, এবার জালিয়াৎ নূরকে কোতল করা হচ্ছে। জল্লাদকে উদ্দেশ্য করে বলে, আর দেরি করছো কেন? সুলতানের হুকুম তামিল করো।

জল্লাদ এগিয়ে আসে। নূরের কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, আমি আপনাদের আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। যা হুকুম হবে আমাকে তাই করতে হবে। আপনার বাবা আমাকে স্নেহ করতেন। আহা, তার মতো মানুষ হয় না। আপনি শেষবারের মতো সুলতানের কাছে আর্জি পেশ করুন না, মালিক। দেখুন হয়তো তিনি মকুব করে দিতে পারেন।

আলী নূর চিৎকার করে বলতে থাকে, তোমরা কে আছো কোথায়, শোনো, আমি কোন দোষ করিনি, তবু আমার প্রাণদণ্ডের বিধান হয়েছে। এত বড় অবিচার আল্লাহ সহ্য করবেন না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন।

প্রাসাদের ওপর থেকে মইন মুখ বাড়িয়ে বলে, জল্লাদ, এখনও তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো?

এই সময় কে একজন এক এক গেলাস জল এনে দিলো নূরের হাতে। জলের গেলাসটা মুখে তুলেছে, এমন সময় মইন নেমে এসে এক ঝটকায় জল-সুদ্ধ গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। এবার জল্লাদকে ধমক দিয়ে বলে, কি হচ্ছে কি এসব, শুধু সময় নষ্ট করছো কেন?

জল্লাদ এবার নূর-এর চোখ বেঁধে দিলো। জনতা সমস্বরে গর্জে উঠলো। উজির মইন মুর্দাবাদ।

হঠাৎ অশ্বখুরের শব্দে নিস্তব্ধ হয়ে গেলো সব কলকোলাহল। শুধু শোনা যেতে লাগলো, খট্-খট্-খট্-খট্ আওয়াজ। বুঝতে বাকী রইলো না, এক বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী প্রাসাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ধুলি-বালিতে অন্ধকার হয়ে এলো চারদিক। সুলতান

গবাক্ষপথে মুখ বাড়ালেন। দেখতে পেলেন, বিশাল এক ফৌজি বাহিনী টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ধেয়ে আসছে। পুরভাগে খলিফার উজির জাফর অল বারমাকী। সুলতান বললেন, মইন, নিচে যাও দেখে এসো কে আসছেন? মনে হচ্ছে, খলিফার সৈন্যবাহিনী নিয়ে উজির জাফর নিজে এসেছেন।

মইন বললো, আপনি কি করছেন হুজুর। জল্লাদকে হুকুম দিন, সে যেন আর এক পলকও দেরি না করে। নূরের কাল্লা নামিয়ে দিন।

সুলতান বলে, থামো তুমি। তোমার বুদ্ধিতে অনেক লাভ হয়েছে। এবার যা বলছি শোনো। উজির জাফরকে অভ্যর্থনা করে নামাও, আমি যাচ্ছি।

মইন নিচে নেমে গেলো। সুলতানও নামলো একটু পরে।

উজির জাফর তার আগমনের উদ্দেশ্য সবিস্তারে বর্ণনা করলো সুলতানের কাছে :

আলী নূরকে খৎ লিখে খলিফাই পাঠিয়েছিলেন। তার পর তিনি যথারীতি নানা কাজের মধ্যে সে কথা আর মনে রাখেন নি। রাখার কোনও দরকারও বোধ করেন নি। খলিফার হুকুম কেউ অমান্য করতে পারে, সে তো কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আলী নূর এখানকার সুলতান হয়ে দিব্যি সুখে প্রজাপালন করছে। আলী নূর তার বাঁদী মধুমিতাকে খলিফার হেফাজতে রেখে এসেছে। কথা ছিলো, বসরাহর সিংহাসনে বসে সে তাকে নিয়ে গিয়ে হারেমের প্রধান বেগম করে রাখবে। খলিফাকে বলে এসেছিলো, সে যতদিন না ফেরে ততদিন মধুমিতাকে তিনিই যেন ভোগ দখলে রাখেন। মধুমিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মাত্র একটি দিন কাটিয়েছেন খলিফা। তারপর তিনি অন্য দিকে মন ফিরিয়ে নিয়েছেন। এক মাস কাল কেটে গেছে। মধুমিতার কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। খলিফার স্বভাবই ঐরকম। এই মুহূর্তে তিনি যা করলেন, পরের মুহূর্তে আর তা স্মরণ করেন না। আবার নতুন কোনও সমস্যা নতুন কোনও কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। এই ভাবে আলী নূর এবং মধুমিতা দু'জনেই তাঁর মনের পর্দা থেকে সরে গিয়েছিলো। একদিন খলিফা প্রাসাদের ভিতরে ঢুকছেন, এক করুণ কান্না ভেসে এলো কোন এক কামরা থেকে। ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।—কে কাঁদে?

একজন পার্শ্বচর বলে, হুজুর, মধুমিতা।

—মধুমিতা? খলিফা অবাক হন, সে কে? সে কেন আমার প্রাসাদে?

পার্শ্বচর বলে, আজ্ঞে আপনি মধুমিতাকে ভুলে গেছেন?

—ভুলে যাবো? আমি কি চিনতাম যে ভুলে যাবো? ও নামের কোন মেয়েকে তো আমি মনে করতে পারছিনে।

—আজ্ঞে সেই যে—আলী নূর? তার বাঁদী।

—তা আলী নূরের বাঁদী আমার প্রাসাদে কেন? আর আলী নূরই বা কে?

তখন তাঁকে সেদিন রাত্রের সব কাহিনী আবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়। তখন তিনি লাফিয়ে ওঠেন। ওঃ হো হো, বিলকুল ভুলে গেছি। মেয়েটা আজ একমাস ধরে একা একা আছে। একবারও দেখাশুনা করিনি। অথচ আলী নূর বিশ্বাস করে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলো। তোমরাও এমন হতভাগা একবার মনে করিয়ে দিতে পারোনি?

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন খলিফা। খলিফাকে দেখে মধুমিতার কান্নার রোল আরও উচ্চগ্রামে ওঠে। পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মিনতি জানায়, একটি বার আলী নূরের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন, জাঁহাপনা। আমি আর তাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না। এতদিন হয়ে

গেলো, সে ফিরে এলোনা। একটা খবর পাঠালো না। এ তো হতে পারে না। নিশ্চয়ই তার কোন বিপদ আপদ ঘটেছে। তার জীবনে আসার পর থেকে একটি দিনও সে আমাকে ছেড়ে থাকেনি। আমাকে না দেখলে যে মানুষটা এক মুহূর্ত থাকতে পারে না, আজ এক মাস হয়ে গেলো, সে কেমন করে আছে, আপনি আমাকে একটি মাত্র দিন সম্ভোগ করেছিলেন, তারপর আর কোন খোঁজ করেন নি আমার।

খলিফা বললেন, আমি নানা কাজের মানুষ, ভুলে যেতে পারি। কিন্তু তুমি? তুমি তো আমাকে তলব করতে পারতে সুন্দরী।

—বাঁদীর কি সে অধিকার থাকে? আমি তো আর হারেমের বেগম নই?

খলিফা বললেন, অধিকার কি কেউ হাতে তুলে দেয়? ওটা আদায় করে নিতে হয়। যাক ওসব কথা, এখন হুকুম করো সুন্দরী, বান্দা হাজির।

চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে সে-এক অপূর্ব মোহিনী রূপে তাকালো মধুমিতা।

—একটা মাস আমার চোখে ঘুম নাই। আলী নূর-এর একটা খোঁজ পাওয়ার জন্যে মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে, জাঁহাপনা। আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি, একটিবার তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিন।

সেইক্ষণেই জাফরকে তলব করলেন খলিফা। জাফর এসে দাঁড়ালে বললেন, দেখো, প্রায় একমাস আগে আমার খৎ নিয়ে বসরাহয় গেছে আলী নূর। তারপর থেকে তার আর কোনও খবর নাই। আমার মনে হচ্ছে, ওখানকার সুলতান বিদ্রোহী হয়েছে। আলী নূরকে সে হত্যা করেছে। আমার হুকুম সে অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু এও বলে রাখছি, জাফর, আলী নূরের যদি কেউ ক্ষতি করে তাকে রেহাই দেবো না। তা সে যেই-ই হোক। আমার প্রাণের বন্ধু হলেও নিস্তার পাবে না আমার হাতে। আমার ইচ্ছা, তুমি আর এক মুহূর্ত এখানে বিলম্ব না করে, লোক-লস্কর যা প্রয়োজন নিয়ে, বসরাহর পথে রওনা হয়ে যাও। আমি জানতে চাই মহম্মদ সুলেমান কী ধরনের আচরণ করেছে আলী নূরের সঙ্গে।

উজির জাফর বললো, খলিফার নির্দেশে আমি এসেছি আপনার কাছে। এখন বলুন, আলী নূর কোথায়? এবং কীভাবে তাকে রাখা হয়েছে। আর এই বিশাল জন-সমুদ্র দেখছি, এরাই বা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কেন? খলিফার হুকুম আছে, আলী নূরের ওপর যদি কেউ অত্যাচার করে থাকে তাকে আমি হত্যা করবো।

আলী নূরকে বধ্যভূমি থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে হুকুম করলো সুলতান। জাফর কিন্তু আলী নূরের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো না। সুলতান আর তার উজির মইনকে গ্রেপ্তার করলো। এবং ঘোষণা করে দিলো, এখন থেকে আলী নূর হবে বসরাহর সুলতান।

মহাসমারোহে আলী নূরকে বসরাহর সিংহাসনে বসালো জাফর। তিনদিন ব্যাপী চললো উৎসব আনন্দ। চতুর্থদিন সকালে আলী নূর জাফরকে বললো, ধর্মাবতারকে দেখার জন্যে মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জাফর বললো, ঠিক আছে, নামাজের পরই আমরা বাগদাদে রওনা হবো। মহম্মদ সুলেমান আর মইনকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবো বন্দী করে। খলিফা নিজেই ওদের বিচার করে যা সাজা দেবার দেবেন।

আলী নূরকে সঙ্গে নিয়ে বাগদাদে পৌঁছে, সর্বাগ্রে খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো জাফর। খলিফা তাঁর তলোয়ারখানা আলী নূরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, নাও ধরো, তুমি নিজে হাতে কেটে নামিয়ে দাও ওই শয়তান মইনের মাথাটা।

আলী নূর হাত পেতে নিলো তলোয়ারখানা। মইনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। মইন তখন দু'হাত জোড় করে কাতরভাবে বলতে থাকে, আলী নূর, তুমি তো জানো, আমি জন্মগত

ভাবেই দুষ্ট চরিত্রের লোক। সারা বসরাহতে আমার কোন সুনাম ছিলো না। প্রতিটি মানুষ আমাকে খারাপ বলেছে। প্রতিনিয়ত আমার মৃত্যু কামনা করেছে। আমি জানি, তারা কিছু অন্যায় বলেনি। সত্যিই আমি খারাপ। আর সেই জন্যেই তোমার ওপর অত অত্যাচার নির্যাতন করেছি। তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রও করেছিলাম। সবই আমার মন্দ চরিত্রের ফল। কিন্তু আলী নূর, তুমি? তুমি তো সর্বজন পূজ্যপাদ উজির অল ফাদলের সুযোগ্য পুত্র। খানদানী বংশের রক্ত আছে তোমার শিরায়। জ্ঞানত তোমার দ্বারা কারো ক্ষতি কখনও হয়নি। এবং আমার বিশ্বাস, হতে পারে না। তোমার মতো উদার এবং মহৎপ্রাণ কি আমার তুল্য অধম আচরণ করতে পারে? আমি খারাপ, দুষ্ট, শয়তান—আমি তোমাকে বিনা দোষে হত্যা করতে পারি। কিন্তু তুমি তো সৎবংশের ছেলে। তুমি কি আমাকে দোষী জেনেও হত্যা করতে পারো?

এই কথা শুনে আলী নূর খলিফার পায়ের কাছে তলোয়ার নামিয়ে রেখে বললো, আপনি মার্জনা করুন, জাঁহাপনা। মইন আমাকে কথার প্যাঁচে ঘায়েল করে ফেলেছে। আমি পারবো না।

খলিফা চিৎকার করে উঠলেন, মাসরুর?

বান্দা হাজির, জাঁহাপনা।

—ওই শয়তানটার মাথা ধড় থেকে নামিয়ে দিবি—এক কোপে।

খলিফা এবার আলী নূরকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার বলো, তুমি কি চাও?

আলী নূর কুর্নিশ জানিয়ে বললো, জাঁহাপনা, সলতানিয়তে আমার লোভ নাই। আমি সুলতান হতে চাই না। বসরাহর সুলতান হয়ে আমি কি করবো? তার চেয়ে আপনি অনুমতি করুন, যতদিন বাঁচি, আপনার কাছে কাছেই যেন থাকতে পারি।

খলিফা বললেন, তাই হবে। তুমি খুশি হলেই আমি খুশি।

আলী নূর আর মধুমিতার জন্যে একখানা সুরম্য প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন খলিফা। নানা প্রকার দামী দামী আসবাব পত্রে সাজিয়ে দিলেন প্রাসাদকক্ষ। প্রতি মাসে নিয়মিত এক হাজার দিনার মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিলেন। আলী নূরকে করে নিলেন তার দরবারের অন্যতম পারিষদ। আর মহম্মদ সুলেমানকে ক্ষমা করে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন বসরাহর সিংহাসনে। বলে দিলেন, ভবিষ্যতে যেন আর সে ঐ রকম বদমাইশ উজির নিযুক্ত করে প্রজাদের সর্বনাশ না ঘটায়।

এরপর তারা সবাই যে যার মতো সুখেসচ্ছন্দে দিনকাটাতে লাগলো।

শাহরাজাদ বলে, এ কাহিনীর এখানেই শেষ। কিন্তু জাঁহাপনা মনে করবেন না এর চেয়ে মজাদার গল্প আমার জানা নাই। এবার আপনাকে ঘানিম ইবন আয়ুব আর তার বোন ফিৎনার কাহিনী শোনাবো।

বাদশাহ শারিয়ার বললো, বেশ বলো, শুনি।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে :

এক সময় এক নামজাদা সওদাগর ছিলো—তার নাম আয়ুব। আয়ুবের দুটি সন্তান। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম ঘানিম আর মেয়ের নাম ফিৎনা। দু'জনেই দেখতে শুনতে বড় চমৎকার। যেমন তাদের ধবধবে ফর্সা গায়ের রং তেমনি তাদের চাঁদপনা গড়ন। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আয়ুব মারা যাবার সময় তার বিশাল বিষয় সম্পত্তি.....

এমন সময় রাত্রি ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাইত্রিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে বলতে শুরু করে :

ছেলে মেয়েদের জন্যে বিশাল বিষয় সম্পত্তি রেখে আয়ুব একদিন মারা গেলো। দুই ভাই বোন দেখলো, একশো গাঁট সিল্কের কারুকার্য করা মূল্যবান কাপড় আর একশো বয়াম গুলাবের নির্যাস। এগুলো সবই বাগদাদে পাঠাবার জন্যে বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গিয়েছিলো। সেখানকার বাজারে বিক্রি করা হবে—এই ছিলো উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়ুব তার এই অর্ধসমাপ্ত কাজটুকু আর শেষ করে যেতে পারলো না।

তরুণ ঘানিম ঠিক করলো, বাগদাদে যাবে। বাবার ব্যবসাই মন দিয়ে করবে। বাগদাদে বাবার বহুকালের ব্যবসা। ওখানে বাবার বহু চেনাজানা আছে। নিজের পরিচয় দিয়ে সামনে দাঁড়ালে সকলেই সাধ্য মতো সাহায্য করবে—এই ভরসায় মা ও বোনকে রেখে একদিন বাগদাদের পথে রওনা হয়ে গেলো সে।

বাগদাদে এসে সব আগে সে একখানা বাড়ি ভাড়া নিলো। শোবার ঘরখানা বেশ ঝকঝকে তকতকে। দামী আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো। সঙ্গে লাগোয়া গুদোমঘরটা বেশ বড়সড়। উটের পিঠ থেকে নামিয়ে ঘরে ভরলো মালগুলো। তারপর তালাচাবি বন্ধ করে শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লো ঘানিম। শহরের যে যে অঞ্চলে বড় বড় দোকানপাট আছে, ঘুরে ঘুরে দেখলো। সবারই সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ পরিচয় করলো। তার বাবার পরিচয় দিতে অনেকেই বেশ খাতির যত্ন করলো। সবারই কাছে তার বাসার ঠিকানাপত্র রেখে এলো। উদ্দেশ্য, যার প্রয়োজন বাসাতে এসেও মালপত্র দেখেশুনে সওদা করে নিয়ে যেতে পারে।

পরদিন সকালে খানদশেক শৌখিন কাজ করা সিল্কের থান নিয়ে সে বাজারে এলো। বাহারী কাজ দেখে প্রথম দোকানদারই পছন্দ করে কিনে নিলো। ঘানিম দেখলো প্রতি থানে দু' দিনার লাভ পেয়েছে সে। পরদিনও আবার কয়েকটা থান নিয়ে বাজারে গেলো। সেগুলোও চটপট বিক্রি হয়ে যায়।

এইভাবে একটা বছর কেটে গেলো। ঘানিমের কাপড়ও যেমন বাজারের সেরা, তেমনি তার গুলাবের নির্যাসও ষোলআনা খাঁটি। কোন মালই পড়ে থাকলো না। এক এক করে সব বিক্রি হতে লাগলো। এবং ভালো লাভ দিয়েই বিক্রি হলো।

একদিন বিকেলে বাজারে গিয়ে ঘানিম দেখলো, সব দোকানপাট বন্ধ। এমন কি বাজারে ঢোকার সদর ফটকটাও তালা দেওয়া। কি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারে না সে। আজ তো কোন পরবের দিন না। তবে? তবে কেন সব বন্ধ! একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করতে বললো, বাজারের খুব নামজাদা এক দোকানের মালিক মারা গেছেন আজ। তাকে নিয়ে সবাই মিলে মিছিল করে গেছে গোরস্থানে। ঘানিম ভাবলো, তারও যাওয়া উচিত। কারণ ব্যবসাদারদের এই সব সৌজন্য খুব দরকার।

গোরস্থানের পথে দ্রুত হেঁটে চললো সে। কিছু দূর যেতেই দেখলো, বড় মসজিদের সামনে নামানো হয়েছে মৃতদেহটা। একটু পরে প্রার্থনা শেষ হলে আবার উঠানো হলো শব। ঘানিমকে পেয়ে দোকানদাররা খুব খুশি হলো। বিদেশী হয়েও সে তাদের কাজের সময় এসেছে।

কবর দেওয়া শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেলো। ঘানিমের ভয় করতে লাগলো। বাসাতে তার দ্বিতীয় কোন লোক নাই। অথচ চোর ডাকাতের উপদ্রব যথেষ্টই আছে। যদি তার ঘরের তালা ভেঙে চুরি করে নিয়ে যায় সব মালপত্র। ঘানিম দ্রুত পা চালিয়ে বাসার দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু কিছু দূরে গিয়ে আর এগোতে সাহস

পায় না। সামনে একটা বাদাবন পেরুতে হবে। শেয়াল, পেঁচা, হোদল প্রভৃতি নানারকম জন্তুজানোয়ারের ডাক শুনতে পেলো। ঘানিম দাঁড়িয়ে পড়ে। অচেনা অজানা জায়গা। রাতের বেলায় এদিকে সে কখনও আসেনি। না জানি কোন বাঘ ভাল্লুকের আস্তানায় গিয়ে পড়বে সে। দারুণ ভয় করতে লাগলো তার। এখন সে কি করবে? কী করে পৌঁছবে তার বাসায়? আর তাছাড়া যাবেই বা কোথায়? কালো লম্বা মতো কি একটা বস্তু যেনো তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ঘানিম ভয়ে একপা একপা করে পিছু হটতে থাকে। তারপর পিছন ফিরে চোঁ দৌড়। দৌড়ে যে কোথায় যাবে তার হদিস জানা নাই। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই দৌড়তে দৌড়তে এক সময় একটা ছোট্ট গোরস্থানে এসে ঢুকে পড়ে। একটু আগে সে তার মালপত্রের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলো। এখন কিন্তু সে-সব চিন্তাভাবনা উবে গেছে। আপন প্রাণ বাঁচানোর সমস্যাই এখন সবচেয়ে বড় তার কাছে।

কোন এক বড়লোক পরিবারের ব্যক্তিগত সমাধিক্ষেত্র। গুটি কয়েক মাত্র কবর। মাঝখানে বেশ বড় রকমের একটা গম্বুজ। পাশেই একটা নারকেল গাছ। আর এ পাশে শান বাঁধানো একটা চবুতরা। ঘানিম রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেবে বলে চবুতরার উপরে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। উঠে গিয়ে ফটকের দরজাটা বন্ধ করে এসে আবার শুয়ে পড়ে। তবু ঘুম আসে না। একটু পরে দেখতে পেলো, একটা লণ্ঠনের আলো শহরের প্রধান ফটক ছাড়িয়ে ক্রমশ ঘানিমের দিকেই আসছে। ভয়ে শিউরে উঠে সে। কি করবে কোথায় লুকোবে ভেবে পেলো না। এখন যদি দরজা খুলে বাইরে পালাতে যায়, নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যাবে ওদের হাতে। উপায়ন্তর না দেখে নারকেল গাছ বেয়ে উপরে একেবারে মাথায় উঠে গেলো সে। আলো আরো নিকটবর্তী হলে গাছের মাথায় বসে ঘানিম দেখলো, তিনটি নিগ্রো। একেবারে দৈত্যের মতো দেখতে। একটা বিরাট বড় বাক্স দু'জনে মাথায় করে বয়ে আনছে। আর একজনের হাতে একটা লণ্ঠন আর একখানা কোদাল। ফটকের সামনে এসে লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরে একটা নিগ্রো আশ্চর্য হয়ে বললো, কী ব্যাপার, সবাব। সন্ধ্যাবেলা আমরা দেখে গেলাম দরজা খোলা। আর এর মধ্যে ভিতর থেকে বন্ধ করলো কে?

সবাব জবাব দিলো, তাই তো, আমার মনে হচ্ছে, কাফুর ভিতরে লোক আছে।

তৃতীয় নিগ্রোটার নাম বুখাইৎ। বললো, তোমাদের যেমন বুদ্ধি! মালিক দরজা খুলে রেখে দেবে তোমাদের? আর তোমরা এসে দিব্যি মরাটা তুলে ফলার করো আর কি?

অপর দু'জন বলে, দ্যুৎ, আবোলতাবোল বকছিস খালি। মালিকের খেয়েদেয়ে কাজ নাই সে এই গোরস্থানের দরজা বন্ধ করতে আসবে।

বুখাইৎ বলে, বিশ্বাস না হয় ভিতরে ঢুকে দেখো, নিশ্চয়ই কেউ পাহারায় আছে। আর এও ঠিক আমাদের হাতের আলো দেখার পর সে নারকেল গাছের মাথায় উঠে লুকিয়ে পড়েছে।

ঘানিম ভাবলো আর কোন বাঁচার উপায় নাই। এখুনি ওরা ভিতরে ঢুকবে। নারকেল গাছে উঠে তাকে হিড় হিড় করে টেনে নামাবে। তারপর? তারপর আর ভাবতে পারে না সে। ঐ তিনটি সুদানী নিগ্রোর হাতে তার জানটা আজ যাবে। একমাত্র আল্লাই ভরসা। তিনি ছাড়া আর কেউই বাঁচাতে পারবে না।

দুই নিগ্রো সবাবকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, সবাব তুই দেওয়ালটা টপকে ওপারে গিয়ে দরজা খুলে দে। তোকে সবচেয়ে চর্বিওলা মাংসগুলো দেবো।

সবাব বললো, আমাকে কি তোমরা এতোই হাঁদা পেয়েছো? তার চেয়ে এসো একসাথে মিলে বাক্সটাকে দেওয়ালের মাথায় তুলে ওপারে ফেলে দিই।

কিন্তু অন্যজন রাজি হলো না।—না না সে হয় না। বাক্সটাই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

সবাব মাথা নাড়ে, তা ভাঙ্গতেও পারে বটে। আবার ওদিকটাও ভাবো। আমরা

হয়তো ভেতরে ঢুকে দেখলাম আর এক মস্তান তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে আমাদের জন্যেই বসে আছে। তখন তাদেরও ভাগ দিতে হবে।

—তুই একটা আস্ত গাধা। যত সব বিদঘুটে কল্পনা—

ওরা দু'জনে দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে ফটক খুলে দিলো। সবাব আলো দেখালো আর ওরা দু'জনে বাক্সটাকে টেনে ভিতরে ঢুকিয়ে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

একজন হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, কি শালা লম্বা পথ, ফুরাতে আর চায় না।

বোঝা গেলো অনেকটা পথ বাক্সটা বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। তারপর কসরৎ করে দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকেছে। তাই তাদের হাঁপ ধরে গেছে। একজন বললে, দাঁড়াও আগে একটু জিরিয়ে নিই। তারপর গর্ত খোঁড়া যাবে 'খন। এখন সবে মাঝ রাত্তির। সকাল হতে ঢের বাকী।

আর একজন বললো, তা এই মাঝ রাতে শুয়ে শুয়ে তো আর জিরোনো ঠিক হবে না। শালা ঘুমিয়ে পড়লেই চিত্তির। এক্কেবারে সকাল হয়ে যাবে।

আর একজন বললে তার চেয়ে গল্প বলো, নিজের নিজের খোজা হবার কাহিনী এসো বলি আমরা তিনজন। তাতে আয়েসও হবে, গল্পও শোনা যাবে—অথচ ঘুমও আসবে না।

বাকী দু'জনে সায় দিয়ে বললো, খুব ভালো বলেছো। আজ আমরা নিজের নিজের কাহিনী বলবো। কি করে আমরা খোজা হলাম সেই কাহিনী।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি প্রায় শেষ। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

আটত্রিশতম রজনী।

শাহরাজাদ আবার কাহিনী শুরু করে।

সেই তিনজন সুদানী নিগ্রো তাদের খোজা হওয়ার কাহিনী বলবে বলে ঠিক করলো। প্রথমে শুরু করে সবাব।

আমার তখন বয়স মাত্র পাঁচ। সেই সময় বাগদাদের বাজারে এনে বিক্রি করে দিয়ে যায় আমার মা-বাবা। সুলতানের প্রাসাদের দ্বাররক্ষী আমাকে কিনে নিয়েছিলো। তার নিজের একটি তিন বছরের মেয়ে ছিলো। আমি যেমন ঘরদোরের কাজ করতাম, তেমনি তার খেলার সাথীও ছিলাম আমিই। আমি তাকে গান শোনাতাম, নাচ করাতাম, মজার মজার গল্প করতাম। মোট কথা সে ছিলো আমার নিত্য সহচরী।

এইভাবে আমার বয়স যখন বারো, তখন ওর দশ। একদিন আমি একটা বাগানে নির্জন নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলতি দিয়ে পাখী তাক করছিলাম। এমন সময় মেয়েটি এসে পিছন থেকে আমার চোখ চেপে ধরলো। আমি তখুনি বুঝেছি। কিন্তু না বোঝার ভান করে ওর হাতটা চেপে ধরে বললাম, কে?

কিন্তু মেয়েটা জবাব দেয় না। আমার পিঠের সঙ্গে ওর বুকটা আরও সেঁটে আরও শক্ত করে চেপে ধরে আমার চোখ দু'টো। আমি ওর সারা হাত দু'টো বাহু পর্যন্ত হাত বুলাতে থাকি। কি নরম আর মসৃন সুডৌল ওর বাহু। আমার পিঠে ওর বুকের ছোট ছোট স্তন দুটি পিষ্ট হতে থাকলো। কেমন যেন শিহরণ খেলে গেলো আমার শরীরে। বোধহয় মেয়েটারও ঐ একই দশা হয়ে থাকবে। সেও আমাকে ছাড়ে না। আমিও তাকে ছাড়তে চাই না।

এইভাবে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেছে। এবার আমি ওর বাহু ছাড়িয়ে গলায় হাত বুলাতে থাকি। তারপর হাতখানা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে।

এমন সময় মেয়েটা খিল খিল করে হেসে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে দৌড় মারে। কিন্তু বেশী দূর যায় না। একটা বিরাট মোটা গাছের গুড়ি পড়েছিলো, তার ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ে সে। আমিও ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। তারপর শুরু হয় ধস্তাধস্তি। কামড়া কামড়ি, খামচাখামচি। ও আমার ডান হাত-এর বাহুতে এমন জোরে দাঁত বসিয়ে দিলো যে রক্ত বেরিয়ে গেলো। আমি ছেড়ে কথা কইবার ছেলে নই। দিলাম ওর ঠোঁটটা কামড়ে। ও আমাকে এলোপাথাড়ী কিল চড় ঘুষি মারতে লাগলো। আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। ওর ছোট্ট নরম হাতের মার আমার বেশ আরামই লাগছিলো। এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটলো। আমি আলতো করে ওর কোমরটা আমার দেহের কাছে টেনে নিতেই আবার ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আরও ক্ষিপ্রতায় ওর বুকে হাত ঢুকিয়ে চেপে ধরলাম সেমিজটা। আর সঙ্গে সঙ্গে দু'ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেলো। সেই প্রথম দেখলাম ওর দেহে সবে যৌবনের জোয়ার আসতে শুরু করেছে। লজ্জায় ও দু' হাত দিয়ে বুকটা ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো। আমি তখন হাসছি। ওর চোখে দেখলাম এক আদিম হিংস্রতা। এক মুহূর্ত। তারপরে ও ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। ওর এই আচমকা আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিলাম না। টাল সামলাতে না পেরে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর আমার ইজেরটা ধরে এমন জোরে একটা হ্যাঁচকা টান মারলো যে, পড়াৎ করে ছিঁড়ে ওর হাতের মধ্যে চলে গেলো একটা টুকরো। আর সেই মুহূর্তে নিশ্চল নিথর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। অপলক চোখে দেখতে থাকলো আমার ছেঁড়া ইজেরটার দিকে। আমিও নির্বাক নিশ্চল। তারপর আকাশে ঝড় উঠলো। কালো মেঘে ঢেকে গেলো সারা দুনিয়া। ভয় হলো এখনই প্রবল বর্ষণ শুরু হবে। হলোও তাই। সেই প্রথম বর্ষণেই সব ভেসে গেলো।

বাড়ি ফিরে গেলো সে ভয়ে ভয়ে। জামা ছেঁড়া, রক্তের দাগ। ওর মার সন্দেহ হলো। ভালো করে পরীক্ষা করে বুঝলো মেয়ে সর্বনাশ করে এসেছে। মায়ের কাছে কিছুই গোপন করতে পারলো না সে। ওর মা আমাকে কিছু বললো না। কারণ বকাবকি করতে গেলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে। তা ছাড়া মেয়েটার বাবা ছিলো ভীষণ কড়া লোক। হয়তো আমার সঙ্গে তার মেয়েকেও কেটে ফেলবে। ওর মা শাদীর পাত্র খুঁজতে লাগলো। একটা নাপিতের ছেলের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই কথাবার্তা হয়েছিলো। এবার পাকাপাকি শাদীর তারিখ ঠিক হয়ে গেলো।

মেয়ে বায়না ধরলো, আমি সঙ্গে না গেলে সে শাদী করবে না। তখন ঠিক করা হলো আমাকে খোজা করে মেয়ের সঙ্গে পাঠানো হবে। একদিন নাপিত ডেকে আমাকে খোজা করা হলো। এর মাসখানেকের মধ্যেই শাদী হয়ে গেলো তার। ওর দেখাশুনা করার জন্যে আমিও গেলাম ওর শ্বশুর বাড়ি। সেইখানেই আমার জীবনের বেশী সময় কেটে গেছে। তারপর একে একে মেয়েটির মা বাবা এবং স্বামী মারা গেলো। আমি চাকরী পেলাম সুলতানের প্রাসাদে। সেই থেকে ওখানেই আছি। এই হলো আমার খোজা হওয়ার কাহিনী। এবার কাফুর, তুমি শোনাও তোমার কিস্‌সা।

কাফুর বলতে থাকে :

আমার বয়স তখন সবে আট। ঐ বয়সেই আমি মহা ধড়িবাজ হয়ে উঠেছিলাম। আমার মতো অসৎ এবং মিথ্যেবাদী সে তল্লাটে ছিলো না কেউ। এমন কায়দা করে সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতাম, শুনে লোকের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেতো। তবে একটা গুণ ছিলো আমার। আমি যখন তখন মিথ্যা কথা বলতাম না। বছরে মাত্র একটাই মিথ্যে বলতাম। এবং সেইটে বড় জব্বর। তার জন্যে আমার কতো মালিকের কতো যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই।

এইভাবে একবার এক মালিকের সঙ্গে মিথ্যে রসিকতা করতে গিয়ে আমি আমার পুরুষ অঙ্গ হারিয়ে খোজা হয়েছিলাম। সেই কাহিনীই এখানে সংক্ষেপে শোনাচ্ছি তোমাদের।

তখন আমি এক সওদাগরের হেপাজতে। ক্রীতদাস কেনাবেচাই তার ব্যবসা। আমার আগের মালিক তার কাছে বিক্রি করে গেছে। এবার সে আমাকে নীলামে তুললো। দাম উঠলো ছয়শো দিরহাম। আমার নতুন মালিক সওদাগরের হাতে গুণে গুণে ছয়শো কুড়ি দিরহাম দিলো। কুড়ি দিরহাম দালালী। সওদাগর আগেই বলে দিয়েছিলেন, কাজে কর্মে আমি দারুণ চৌকস। শুধু একটাই দোষ আমার, বছরে মাত্র একবার মিথ্যে কথা বলা। এই দোষের কথা জেনেশুনেই আমার মালিক আমাকে কিনে নিয়ে এলো। নতুন জামাকাপড় দিলো। ভালো দেখে শোবার আস্তাবল দিলো। মোট কথা খাওয়া পরার ব্যবস্থা বেশ ভালোই করেছিলো। মালিক আমাকে ভালোভাবে কাজ করার জন্যে অনেক বোঝালো। মিথ্যে কথা বলা মহাপাপ, দোজকে যেতে হয়। সুতরাং কোন কারণেই যেন আমি মিথ্যে কথা না বলি। কিন্তু ওদের ভালো কথা কি আর আমার ভালো লাগে। মুখে বললাম, না না, আর কখনো মিথ্যে বলবো না, কিন্তু মনে মনে শয়তানী প্যাঁচ খুঁজতে থাকলাম। এই ভাবে ছ' মাস কেটে গেলো। মালিক ভাবলো তার উপদেশে কাজ হয়েছে। আমি সুবোধ বালক হয়ে গেছি।

একদিন সকালে মালিক বললো, কাফুর, চল আজ এক জায়গায় যাবো। অনেক লোক আসবে। খানাপিনা, নাচ, গান খুব হবে সেখানে।

মালিক আমাকে শহরের বাইরে, অনেক দূরে এক বাগানবাড়িতে নিয়ে গেলো। এক এক করে মালিকের বন্ধুবান্ধব আসতে শুরু করলো। মালিক আমাকে বললো, কাফুর, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে রে। এখন কী করা যায়?

আমি বললাম, কী করতে হবে বলুন?

—তুই আমার খচ্চরটা নিয়ে বাড়ি চলে যা। আলমারীর মাথায় দশ জোড়া তাস কিনে রেখেছি। ওগুলো জলদি নিয়ে আয়। তা না হলে, আসর জমবে না।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমি ছুটে যাবো আর ছুটিয়ে আসবো।

খচ্চরটা ছুটিয়েই বাড়ি চলে এলাম। হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। মালকিন, তার দুই মেয়ে, দুই ছেলে সবাই ছুটে এলো।

—কী ব্যাপার কাঁদছিস কেন?

আমি কোন জবাব দিই না। আরও জোরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকি।

ওরে বাবারে, কি হবে রে, কি করে আমি সে কথা বলবো রে।

এবার আমার মালকিন, চিৎকার করে উঠলো—কাফুর! কি হয়েছে বল।

—মালিক মারা গেছে।

—মালিক মারা গেছে—!

—হ্যাঁ মালকিন, মালিক মারা গেছে।

ছেলে মেয়ে বউ সবাই এক সঙ্গে কঁকিয়ে উঠলো, কি হয়েছিলো? কি করে মারা গেলো?

আমি তখন বানিয়ে বললাম।—বাগান বাড়ির পাঁচিলের ওপর উঠে একটা সরবতী লেবুর ডাল থেকে লেবু পাড়তে উঠেছিলো মালিক। হঠাৎ বেসামাল হয়ে নিচে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ। এখন কি হবে, মালকিন?

কান্নার রোল উঠলো সারা বড়িতে। পরনের জামাকাপড় ছিড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগলো সবাই। ঘরের দামী দামী বাসনপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভাঙ্গতে লাগলো। চেয়ার, টেবিল, আলমারী সব বাইরে বের করে পিটিয়ে পিটিয়ে ভাঙ্গা হলো। খাট পালঙ্ক লেপ তোষকে

আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। দেওয়ালে আলকাতরা লেপে দেওয়া হলো। মোট কথা, বাড়ির মালিক মারা গেলে যা যা করে শোকপ্রকাশ করতে হয় তার কিছুই বাদ রাখা হলো না।

এর পর চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বোরখা খুলে, মাথার চুল এলোমেলো করে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় ছুটতে থাকলো। দু' পাশের বাড়ির লোকজন বেরিয়ে এসে সমবেদনা সান্ত্বনা জানাতে লাগলো।—কি করবে বাছা, সবই আল্লাহর খেলা। তাঁর বিধান মেনে নিতেই হবে।

মালকিন বললো, ওরে কাফুর আমাকে সেই বাগানবাড়িতে নিয়ে চলরে বাবা। গোর দেবার আগে তাকে একবার শেষ দেখা দেখে আসি।

পাড়া পড়শীরা বললো, অপঘাতে মারা গেছে। কোতোয়ালীতে খবর পাঠানো দরকার। কোতোয়াল সাহেব না যাওয়া পর্যন্ত কবর দেওয়া যাবে না।

মালকিনকে সঙ্গে নিয়ে তারা কোতোয়ালের উদ্দেশে রওনা হলো। আর সেই ফাঁকে আমি গেলাম বাগান বাড়িতে।

শাহরাজাদ দেখলো রজনী অতিক্রান্ত। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

ঊনচল্লিশতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

খোজা কাফুর তার কাহিনী বলছে ঃ

মালকিন যখন কোতোয়ালের উদ্দেশে রওনা হলো আমি তখন চলে গেলাম বাগানে। সারা গায়ে কাদামাটি মেখে কিম্ভূতকিমাকারের মতো সাজলাম। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে হাজির হলাম মালিক-এর সামনে।

—ও মাগো, ও বাবাগো, আমার কি হলো গো? আমার মালকিন, আমার ছোট্ট দুই মালকিন, আমার ছোট দুই মালিক—ও বাবা গো, কি করে বলবো এসব কথা—

আমার মালিক কিছুই বুঝতে পারে না। ছোঁড়াটা কি বলে?—কীরে কি হয়েছে কাঁদছিস কেন?

—সব শেষ হয়ে গেছে মালিক, সব খতম—

—কী সব শেষ হয়ে গেছে রে? কী সব যাতা বলছিস? তোর কি মাথাটাথা সব খারাপ হয়ে গেলো নাকি?

—হয়নি। কিন্তু এবার হয়ে যাবে। ওরে বাবা, একসাথে অতোগুলো মানুষ—? না না, আমি বলতে পারবো না, আমি বলতে পারবো না—

আমি মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম।

মালিকের এবার ভয় হলো।—কাফুর! কি হয়েছে বাবা, তাড়াতাড়ি বল।

মালিক, আমি এখান থেকে বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের বাড়ির সামনে হাজার হাজার লোক। এমন সব চেঁচামেচি—কিছুতেই বুঝতে পারছি না। কাউকে জিজ্ঞেস করলেও কেউ কিছু জবাব দেয় না।

মালিক অধৈর্য হয়ে ওঠেন, কাফুর? মোদ্দা কথাটা কি—তাই আগে বল, বাঁদর। তারপর শুনবো তোর ভ্যানতারা।

মালিক, লোকজন দেখে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি তখন। লক্ষ্যই করিনি যে আমাদের গোটা বাড়িটাই ধসে পড়ে গেছে।

—বলিস কিরে? কারো লাগে টাগে নি তো?

—না তেমন কিছু না, তবে মরে গেছে।

—মরে গেছে? কে মরে গেছে? তোর মালকিন?

—জী হাঁ।

—তো ছোট দুই মালকিন? তারা?

—জী, তারাও মারা গেছেন।

এবার বিকট এক চিৎকার দিয়ে ওঠে মালিক।—তোর ছোট দুই মালিক? তারা বেঁচে আছে তো?

—জী না। তারাও চাপা পড়ে মারা গেছে। বাড়ির একটা জনপ্রাণী বাঁচেনি। গরু, ছাগল, মুরগী সব—সব দেওয়াল চাপা পড়ে শেষ হয়ে গেছে।

মালিক এবার দু'হাতে মুখ ঢেকে ধপাস করে মাটির উপর বসে পড়লো। ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। দাড়ি উপড়াতে থাকলো। জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো।

—হায় আল্লাহ আমি কি পাপ করেছিলাম, এইভাবে আমাকে সাজা দিলে? আমার বিবি আমার আদরের মেয়ে আমার জানের কলিজা ছেলে—সব তুমি কেড়ে নিলে? এই কি তোমার বিচার মালিক?

উপস্থিত বন্ধুবান্ধব অভ্যাগতরা মালিককে সান্ত্বনা দিতে থাকে, কি করবে বলো, কপালের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। ওঠ, চলো, ঘরে যাই। তাদের ইন্তাকালের কাজ কাম সমাধা করতে হবে তো। বিপদের দিনে ভেঙে পড়লে তো চলবে না, ভাই। নিজেকে শক্ত করো। খোদা যা করে, তাকে মেনে নিতেই হবে।

মালিককে টেনে তোলে তারা। মদ খাওয়া মাতালের মতো টলতে থাকে সে। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে বাড়ির দিকে নিয়ে আসতে থাকে। এমন সময় অদূরে শোনা গেলো কান্নার রোল। মনে হলো বিরাট একটা শোক মিছিল এগিয়ে আসছে বাগানবাড়ির দিকে। মিছিল আরো কাছে এলে দেখা গেলো তার পুরোভাগে রোরুদ্যমানা মালকিন। বোরখা নাই। এলোমেলো অবিন্যস্ত চুল। ঠিক একটা পাগলীর মতোন।

মালিক অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকে। মালকিনের পিছনে তার দুই মেয়ে আর দুই ছেলে। সবাই হাহুতাশ করে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সবারই সাজপোশাক ছিন্ন ভিন্ন। চুল উস্কোখুস্‌কো। মালকিন এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।—ওগো, তুমি বেঁচে আছো?

ছেলেমেয়েরা বাবাকে জড়িয়ে ধরলো, আব্বাজান, তোমার লাগেনি তো?

মালিক কিছুই বুঝতে পারে না। বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।—কেন, লাগবে কেন? কি হয়েছে আমার?

মালকিন বলে, সে কি? তুমি নাকি পাঁচিলের উপর থেকে পড়ে মরে গেছো?

—মরে গেছি? আমি? আমি তো শুনলাম বাড়ি ধসে পড়ে তোমরা সবাই মারা পড়েছো?

—বাড়ি ধসে পড়ে? আমরা সবাই মারা গেছি? কে? কে? তোমাকে এসব ডাহা মিথ্যে খবর দিয়েছে, বলো তো?

—কেন? তোমার গুণধর চাকর কাফুর। সেই তো কাঁদতে কাঁদতে এসে বললো, তোমরা কেউই বেঁচে নাই।

মালকিন এবার বুঝতে পারলো, সব আমার শয়তানী।—ব্যাটা, শয়তান, ছুঁচো এত বড় বদমাইশ! এইরকম ডাহা মিথ্যে কথা কেমন নিখুঁত করে সাজিয়ে বলেছে। অবিশ্বাস করার উপায় ছিলো না।

মালিক এসে আমাকে এক ঘুষি মেরে নিচে ফেলে দিলো। পাশে একটা শাবল পড়েছিলো, সেটা তুলে নিয়ে তেড়ে এলো আমার দিকে, হারামী বাচ্চাটাকে আজ মেরেই ফেলবো।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি আমাকে মারছেন কেন?

—মারবো না তো কি সোহাগ করবো, বাঁদর কোথাকার।

কিন্তু সওদাগরের কাছ থেকে যখন আমাকে কিনে আনেন তখন একটা শর্তের কাগজে আপনি সই করে এসেছেন, মালিক। সওদাগর আপনাকে সব খুলেই বলেছিলো। কাজে কামে আমার কোন গাফিলতি নাই। দোষের মধ্যে একটাই বছরে একটা শুধু মিথ্যে বলা। আপনি সব শুনেও আমাকে কিনে নিলেন। সওদাগরের সঙ্গে আপনার চুক্তি হয়েছে। কাজ কাম ঠিক মতো না করলে আপনি আমাকে সাজা দিতে পারেন। কিন্তু মিথ্যে কথা বললে বছরে প্রথমবার আমাকে কোনও সাজা দিতে পারবেন না। প্রত্যেক বছরে একবার মাত্র আমি মিথ্যা কথা বলবো এবং তার জন্যে আপনার যা-ই ক্ষয়ক্ষতি হোক, আপনাকে মেনে নিতে হবে। এই ছিলো আপনার শর্ত।

কাফুর-এর কথা শুনে মালিক শাবলটা নামিয়ে রাখে।—তা বলে এই রকম মিথ্যে রসিকতা? এতে তো মানুষের জীবন সংশয় ঘটতে পারে।

ঘটতে পারে ঘটবে। আপনাকে তো কিছু গোপন করা হয়নি। আর তাছাড়া আমার মিথ্যে কথাটা তো এখনও পুরো বলা হয়নি মালিক। সবে অর্ধেক হয়েছে। আরও অর্ধেক এখনও বাকী।

মালকিন চোখ বড় বড় করে বলে, ওরে বাঁদর, এই তোর আধখানা রসিকতা। তা হলে পুরোটা কি, সোনার চাঁদ? দাঁড়াও তোমার বাকী রসিকতাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

কোতোয়াল পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। তার হুকুমে সিপাই আমাকে সপাং সপাং করে বেতের চাবুক চালাতে থাকলো। এর পর আমার আর জ্ঞান নাই। যখন জ্ঞান ফিরলো দেখি আমার পুরুষাঙ্গটা কাটা। ওষুধ লাগিয়ে তুলো কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

মালকিন বললো, বাকী অর্ধেক রসিকতাটা এ-ই—বুঝলে বাঁদর। আমার শখের ঘরদোর, খাট, পালঙ্ক, আসবাবপত্র সব তুমি নষ্ট করে দিয়েছো। সেই কারণে আমিও তোমার জীবনের আসল জিনিসটাই ছেঁটে বাদ করে দিয়েছি।

এর পর মালিক আমাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বিক্রি করে দিলো। সাধারণ নফর চাকরদের চেয়ে খোজাদের বাজার দর অনেক বেশী। এইভাবে দু' বছর চার বছর বাদ বাদ আমি নানা মালিকের হাত বদল হতে হতে একদিন খলিফার হারেমে এসে পড়লাম। তারপর থেকে এখানেই রয়ে গেছি।

কাফুর বললো, এই হলো আমার খোজা হওয়ার ইতি বৃত্তান্ত।

অন্য দু'জনে কাফুরের পিঠে গাঁট্টা বসিয়ে দিয়ে বললো,—শালা মাইরি, এক্কেবারে হাড়ে হারামজাদা। এমন রসিকতা—জান কয়লা করে ছেড়ে দেবে!

এবার বুখাইতের পালা।

বুখাইত বললো, শোনো ভাই, আমার দুঃখের কাহিনী বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। কিন্তু রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে কাজ হাসিল করে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। তাই আজ আর তোমাদের সে কাহিনী শোনাবার সময় নাই। ভালোয় ভালোয় কাজ কাম শেষ করে নাও। তারপর ফিরে গিয়ে বলবো। সংক্ষেপে শুনে রাখো, আমি আমার মালকিনের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছিলাম আর ব্যভিচার করেছিলাম তার ছেলের সঙ্গে। সেই অপরাধের সাজা আমি পেয়েছি।

যাক, ওসব কথা পরে শুনো, এখন এসো গর্ত খুঁড়ি।

কোদাল দিয়ে মাটি কেটে বাক্সটার মাপে একটা বেশ বড় সড় গর্ত খুঁড়লো ওরা। তারপর দু'জনে ধরে বাক্সটা নিচে নামিয়ে দিলো। আর একজন উঁচু করে আলো ধরে রাখলো। এর পর তিনজনে মিলে মাটি চাপা দিয়ে, গোরস্থান থেকে বেরিয়ে হন হন করে হেঁটে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ঘানিম নারকেল গাছ থেকে নেমে এলো। হাত দিয়ে মাটি সরিয়ে সরিয়ে বাক্সটাকে টেনে উপরে তুললো। একটা পাথরের চাঁই দিয়ে বাড়ি মেরে মেরে তালাটা ভেঙে ফেললো। ডালাটা তুলতেই মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেলো। ফুটফুটে ফর্সা ডানাকাটা পরীর মতো সুন্দরী এক যুবতী। ঘুমিয়ে আছে। তার পরণে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা দামী সিল্কের সাজপোশাক। গলায় সাতনরী জড়োয়া হার। নাকে হীরের নাকছাবি। মাথায় টায়রা। বাহুতে তাগা। বাজুতে বাজবন্ধ। কোমরে বিছা। পায়ে মল। আগাগোড়া শরীরটা সোনা হীরা জহরতে মোড়া। ঘানিম ভাবে এতো কোনও সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়। নিশ্চয়ই কোনও সুলতান বাদশাহর শাহজাদী! বুকে হাত রেখে অনুভব করলো, মরা নয় জীবন্ত। ঘুমিয়ে আছে। মানে নাকে ওষুধ ধরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। একটা বিশ্রী ওষুধের আরক এসে ঘানিমের নাকে লাগে, মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। ঘুম ঘুম আমেজ আসে। কিন্তু নাকে কাঠি দিয়ে জোরে জোরে হেঁচে নিজেকে ঠিক করে নেয়। মেয়েটার গায়ে নাড়া দেয়। কিন্তু অঘোর ঘুমে সে কাতর। ঘানিম ভাবে, কি করে ওর ঘুম ভাঙ্গানো যায়—নাকের ফুটোর ভিতরে সুড়সুড়ি দিতে থাকে। মাথাটা এদিক ওদিক নাড়িয়ে নাকটা সরিয়ে নিতে চায়। তারপর জোরে জোরে হাঁচতে থাকে। ঘানিম দেখলো, একটা বড় ডেলা নাক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। অজ্ঞান করার ওষুধ। এইবার ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো মেয়েটি। ওষুধের বড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ঘানিম। ওরে বাস, একটা হাতীর নাকে গুঁজেও দিলেও তা বিশঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবে।

চোখ মেলে তাকালো বটে, কিন্তু তখনও তন্ময়ভাব কাটলো না, স্বগতভাবে বিড়বিড় করে কি সব বলতে থাকে। সব কথা বোঝা যায় না। দু-একটার অর্থ উদ্ধার করতে পারে ঘানিম। ওঃ কি গরম, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া করো, আমাকে একটু পানি দাও। কোথায় রে, কোথায় গেলি সব? কাছে আয় ও সীতারা, ও বাজিয়া, কাছে আয়, হাওয়া কর। কইরে, তোরা সব গেলি কোথায়? কথা বলিস না কেন?

কিন্তু কেউ জবাব দিলো না। জবাব দেবার মতো একমাত্র ঘানিম ছাড়া তো সেই গোরস্থানে দ্বিতীয় কোন মানুষ নাই। এবার বড় বড় চোখ মেলে তাকালো সে। এপাশ ওপাশ উপরে নিচে সব ভালো করে দেখে চিৎকার করে উঠলো।—এখানে, এই গোরস্থানে আমাকে কে নিয়ে এলো? আমার প্রাসাদের হারেম? আমার খাট পালঙ্ক, দাসী, খোজা তারা সব কোথায় গেলো? হায় আল্লাহ কে আমার এই সর্বনাশ করলো?

এতক্ষণ ঘানিম চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো ওকে। বললো, সুন্দরী, আমার নাম ঘানিম ইবন আয়ুব। তোমার কোনও ভয় নাই। যদিও তুমি তোমার প্রাসাদের অন্দরমহল থেকে এই গোরস্থানে এসে পড়েছো, তবু ভরসা রাখো, তোমার কোন ক্ষতি আর কেউ করতে পারবে না। আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমার ভালো-বই মন্দ করবো না। আল্লাহর অপার মহিমা, তা না হলে আজ রাতে আমিই বা এখানে আসবো কেন? তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। তোমাকে বাঁচাতে—উদ্ধার করতে। আমি আল্লাহর বান্দা। তোমারও গোলাম। তুমি যা হুকুম করবে আমি তাই তালিম করবো।

মেয়েটি দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে লাগলো। ভাবলো, বুঝি বা খোয়াব। কিন্তু না, সে তো জেগেই আছে।

—আমি কি করে এখানে এলাম, বলো তো।

তখন ঘানিম আদ্যোপান্ত সব খুলে বললো। মেয়েটি বললো, ঠিক আছে, আমি যেমন বাক্সের মধ্যে ছিলাম সেইভাবেই আমাকে শুইয়ে রেখে ডালা বন্ধ করে দাও। একটা খচ্চর ভাড়া করে নিয়ে এসে তোমার ঘরে নিয়ে চলো। আমি তোমাকে আমার সব কাহিনী খুলে বলবো সেখানে।

তখন সবে সূর্য উঠছে। ঘানিম মেয়েটিকে বাক্সে ভরে গোরস্থান থেকে বেরিয়ে পড়ে। একটু পরে একটা খচ্চর ভাড়া করে নিয়ে আসে। চালকটার সঙ্গে ধরাধরি করে বাক্সটা চাপিয়ে দেয় খচ্চরের পিঠে।

সারাটা পথ ঘানিম ভাবতে ভাবতে আসে, নিশ্চয়ই কোনও সুলতান বাদশাহর পরিবারের মেয়ে সে। তার গায়ে খুব কম করে হলেও দশ হাজার দিনারের গহনা আছে। নানারকম কল্পনার জাল বুনতে বুনতে এক সময় তার বাসার দরজায় এসে হাজির হয়।

এইসময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে যায়।

চল্লিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়।

তারপর শুনুন জাঁহাপনা, খচ্চরের পিঠ থেকে বাক্সটা নামিয়ে ঘানিম ঘরে নিয়ে যায়। ডালা তুলে মেয়েটিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। ঘরের চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে সে। মেজেটা দামী গালিচায় মোড়া। দরজা জানলায় সিল্কের কাজ করা পর্দা। পালঙ্কে মখমলের শয্যা। কুর্নিশ কেদারায় ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। পালঙ্কের একপাশে বসে বলে, শোনো ঘানিম, আমার বড় খিদে পেয়েছে। একটু কিছু খেতে দাও।

ঘানিম বাজারে গিয়ে দুম্বার চাঁপ, শাহী হালওয়া, পেস্তার বরফী, বাগদাদী লাড্ডু কিছু আঙ্গুর আপেল কলা, আর এক ঝারি মদ নিয়ে এলো। আর নিয়ে এলো কিছু সুগন্ধী ফুল। খানাপিনার এই আয়োজন দেখে মেয়েটির চোখ খুশিতে নেচে ওঠে। রেকাবী করে সাজিয়ে দিলো ঘানিম, নাও, খাও।

—বারে, আমি একা খাবো নাকি? তুমিও বসো।

ঘানিম বলে, বেশ বসছি।

অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে ঘানিম বসলো ওর পাশে। মেয়েটির কিন্তু মোটেই পছন্দ হলো না। একেবারে ঘানিমের গা ঘেঁসে এসে বসলো সে। —অত দূরে দূরে বসছো কেন? খিদে পেয়েছে বলে তোমাকে সুদ্ধ খেয়ে ফেলবো নাকি?

ঘানিম মাথা নিচু করে হাসে। জবাব দিতে পারে না—না, মানে—মানে—

—আর মানে মানে করতে হবে না। নাও, খাও। একটা মাংসের টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে ঘানিমের মুখে পুরে দেয়।

মেয়েটির চাঁপার কলির মতো আঙ্গুলগুলোর ছোঁয়া ওর ঠোঁটে লাগে। পলকে সারা শরীরে কি যেন এক শিহরণ খেলে যায়। নিজের মা বোন ছাড়া এই প্রথম সে এক অচেনা অন্য মেয়ের এত কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে।

মেয়েটি এবার ওর মুখটা তুলে ধরে। আহা লজ্জা কেন তোমার!

ঘানিম কোনও কথা বলে না। ওর চোখ দু'টো হাসে।

—বারে, আমি তো আজ তোমার ঘরে মেহেমান। আমাকে আদর যত্ন করো।

—কেন, কোন দোষ ত্রুটী হয়েছে নাকি, কোন—

—আলবৎ হয়েছে, খানাপিনা এনে সামনে ধরলেই সব হয়ে গেলো? খাইয়ে দেবে না—?

ঘানিম তাড়াতাড়ি রেকাবী থেকে এক টুকরো মাংস তুলে ওর মুখে পুরে দিতে যায়। কিন্তু অনভ্যাসের ফলেই হোক, বা হাতটা কেঁপে ওঠার জন্যেই হোক, মেয়েটির কামিজের ওপর পড়ে যায়।

—দিলে তো? দিলে তো মাটি করে! এখন আমি কি করি? তোমার ঘরে আছে নাকি বাড়তি কামিজ?

—আমার ঘরে? আমার ঘরে মেয়েদের কামিজ আসবে কি করে?

—আচ্ছা, কি করে আসে তাও বুঝি জানো না?

—না তো—

শাদী করলেই আসে। খালি কামিজ কুর্তাই আসে না, ঝোলের সঙ্গে মাংসও এসে পড়ে।

ঘানিম-এর সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে।—না, এখনও আমি শাদী করিনি। তুমি আমার জীবনে প্রথম নারী। এর আগে পরনারীর সামনে দাঁড়াইনি কখনও।

আহা-হা-হা, চুক চুক। তা হলে তো দারুণ গোস্তাকি করে ফেলেছি। তোমাকে আমি ছুঁয়ে দিয়েছি। না বাবা, তা হলে সরেই বসি।

মেয়েটি সরে যাবার ভান করে। ঘানিম এবার ওর একখানা হাত চেপে ধরে বলে, আমি কি তাই বলেছি নাকি?

মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসে।—তবে কি বলেছো, চাঁদ?

সে-কথার জবাব না দিয়ে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে এনে কামিজটায় ঘসে ঘসে ঝোলের দাগ তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তেল-হলুদের দাগ শুধু জলে ওঠে না।

মেয়েটি বলে, ছাড়ো তো। থাক দাগ। একটু আধটু দাগফাগ থাকা ভালো, বুঝলে। তোমার মতো অত সফেদ হলে আরও বিপদ।

এর পর ওরা দু'জনে খানাপিনা সারে। মৌজ করে মদ খায়। মদের নেশায় মদির হয়ে আসে মেয়েটির চোখ। ঘানিমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। ছেলেটির সারা শরীরে এক অপূর্ব পুলক জাগে। এ অনুভূতি তার জীবনে এই প্রথম। অপলক চোখে মেয়েটিকে দেখে। কি তার রূপ! কি তার যৌবন!

মেয়েটি হাসে। অপূর্ব সে হাসি। বলে, কী? কি দেখছো?

—তোমাকে। কি সুন্দর তুমি। আকাশের চাঁদ তোমার মতো এত সুন্দর না।

—ও বাবা, এ যে কবিতা গো।

—তোমাকে দেখলে, কবিতা আপনা থেকেই আসে।

—তা শোনাও না একটা।

—পরে শোনাবো। এখন বাঁশী বাজাবো, শুনবে।

—শোনাও।

নেশায় মেয়েটির চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসে। আর নিবিড় করে ঘানিমের কোলের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দেয়।

—একটু ছাড়ো। বাঁশীটা বের করে নিয়ে আসি। আমার বাক্সে আছে।

—না থাক, এখন ছাড়বো না তোমাকে। বাঁশী পরে শুনবো। তুমি আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। বড়্ডো ঘুম পাচ্ছে।

ঘানিম ওর কপালে হাত রাখে। চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বিলি কাটতে থাকে। আর একভাবে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে তার নিটোল নিখুঁত রূপলাবণ্য। কি সুন্দর টানাটানা হরিণ কালো চোখ। আপেলের মতো টুকটুকে গাল, পাকা আঙুরের মতো ঠোঁট। ওর সারা মুখে হাত বুলিয়ে অনুভব করতে থাকে কোমল মসৃণতা। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠে বসে।—এই বুঝি তোমার মাথায় হাত বুলানো হচ্ছে—সাহেব?

ঘানিম লজ্জা পায়। নিজের অজান্তে কখন হাতটা নেমে এসেছিলো ওর গালে ঠোঁটে। মেয়েটি বলে, আর একটু সরাব দাও, সব নেশা কেটে গেছে।

ঘানিম আবার দু' পেয়ালা সরাব ঢালে। এক পেয়ালা তুলে দেয় মেয়েটির হাতে। নিজে নেয় এক পেয়ালা। এইভাবে সারাটা দিন মদ খেয়ে গান গেয়ে, খুশির বন্যায় দু'জনে গা ভাসিয়ে দেয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। আবার বিকেলও ফুরিয়ে রাত্রি নেমে আসে। মোমের আলোয় এক অপূর্ব মাদকতা আছে। ঘানিম আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। আরও কাছে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে চুমু খেতে চায়। কিন্তু মেয়েটি খিল খিল করে হেসে দু-হাত পিছিয়ে সরে যায়।—এখনি নয়গো বন্ধু, এখনি নয়। আরও কিছু ধৈর্য ধরো। রজনী গভীর হোক। আজ সারা রাত তোমাকে আমি অমৃতসায়রে ভাসিয়ে রাখবো। এখনি নয়, আমাকে আরও একটু নেশা করতে দাও। তুমিও আরও উদ্দাম হও। তোমার চোখে এখনও দেখতে পাচ্ছি না সিংহের বিক্রম। নাও, আরও একটু সরাব খাও।

নিজের পেয়ালাটা ঘানিমের মুখে তুলে ধরে। এক চুমুকে সবটুকু টেনে নিয়ে বলে, কেন, আমাকে কি পুরুষ বলে মনে হচ্ছে না।

—সারাদিন হয়নি। এখন একটু হচ্ছে। অতো শান্তশিষ্ট হয়ে লজ্জায় লাল হয়ে বসে থাকলে কি কোনও মেয়ের ভালো লাগে। পুরুষ পুরুষের মতো হবে। তোমার দাঁতের দংশনে আমার ঠোঁটে রক্ত ঝরবে, তোমার হাতের থাবায় আমার যৌবন জর্জরিত হবে, তবে না তুমি সার্থক পুরুষ! তুমি আমাকে জাগাবে, না, মেয়ে হয়ে আমি তোমাকে সারাদিন ধরে জাগালাম।

ঘানিম বলে, জীবনে এই প্রথম তুমি আমার যৌবনে রং ধরালে। প্রথম প্রথম একটু শরম হবে না?

—ও, তাই বুঝি! পরে তা হলে একেবারে বে-শরম বেহায়া হয়ে যাবে?

—কি যে বলো!

—বুঝেছি বুঝেছি। দেখতে মনে হচ্ছে, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানো না। আসলে তুমি একটা জাগুয়ার।

ধীরে ধীরে রাত্রি গভীরতর হয়। দু'জনেই তখন মদের নেশায় বিভোর। ঘানিমকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি। ঘানিমও তার ডাকে সাড়া দেয়। দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে শুয়ে থাকে। অনেকক্ষণ। মেয়েটি এবার হিংস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু ঘানিম শঙ্কিত হয়। না না, এই ভালো। এর বেশী আর কিছু চাই না আমি। আজকের রাতটা তোমাকে বুকে নিয়েই কাটাতে চাই।

—কিন্তু, সোনার চাঁদ, এত অল্পে তো আমি তুষ্ট হবো না।

—আজ আমাকে ক্ষমা করো। আজ আর এর বেশী না।

মেয়েটি আদর করে ঘানিমকে ঠোনা মারে, বোরখা পরে থেকো।

ঘানিম ওর বুকের মধ্যে মুখ লুকায়।—দিন কি শেষ হয়ে যাচ্ছে নাকি? তুমি তো আমারই আছো। আমারই থাকবে।

—কি করে বুঝলে?

—কেন, তুমি চলে যাবে?

—ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হবে। ওরা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

ঘানিম উঠে বসে।—দুনিয়াতে এমন কোনও শক্তি নাই আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে।

—আহা, কি আমার বীর পুরুষ গো! একটা মেয়ের সামনে মুখ তুলে তাকাতে পারে না, তা আবার বড়াই।—চলো, অনেক রাত হলো। এবার খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া যাক। শুয়ে শুয়ে আজ আমার সব কাহিনী বলবো। তখন জানবে আমার পরিচয়।

খানাপিনা সেরে দু'জনে দু'জনকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে। ঘানিম বলে, কই, বলবে বলেছিলে? বলো তোমার কাহিনী?

মেয়েটি বলতে থাকে ঃ খলিফা হারুন-অল-রসিদের আমি খুব পেয়ারের বাঁদী। তিনি আমাকে সোহাগ করে কুৎ-অল-কুলুব বলে ডাকেন। খুব ছোট থেকে খলিফার প্রাসাদে আমি মানুষ হয়েছি। খলিফার যত বাঁদী রক্ষিতা আছে আমি তাদের সকলের সেরা। আমাকে খুশি রাখার জন্যে খলিফার চেষ্টার অন্ত নাই। আমার জন্যে গোটা একটা মহল তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। সুন্দর সুন্দর বারোটা দাসী আমার পরিচর্যায় দিন রাত ব্যস্ত থাকে। হীরে জহরৎ আর দামী দামী সাজপোশাকে সাজিয়ে তিনি আমাকে পটের বিবি বানিয়ে রেখেছিলেন। প্রায় প্রতি রাতেই তিনি আমার ঘরে আসতেন। তাঁর খাস বেগম জুবেদার এটা সহ্য হতো না। হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতো। অনেক দিন থেকে আমাকে দুনিয়া থেকে সরাবার তাকে খুঁজছিলো সে। কাল রাতে সেই মউকা মিলে গেছে। খলিফা আজ দু'দিন হলো বাইরে গেছেন। একটা সুবায় তার প্রজারা নাকি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

আমার বারোজন দাসীর মধ্যে দু-একজন জুবেদার প্রিয় পাত্রী ছিলো। মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে তাদের হাত করেছিলো। কাল রাতে শোবার আগে অভ্যাস মতো এক গেলাস সরবৎ খেয়েছিলাম। একটু পরেই আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগলো। দাসীটাকে বলেছিলাম, এমন কেন হলো?

সে আমাকে বোঝালো, ও কিছু নয়, ঘুমিয়ে পড়ো মালকিন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার মনে কেমন সন্দেহ ঘনিয়ে এলো। নিজেকে শক্ত করে বসে রইলাম। কিন্তু ওষুধের ক্রিয়া এড়াবো কি করে? মাথাটা ঢলে পড়তে থাকে। জোর করে নিজেকে সোজা রাখার চেষ্টা করি। একটু পরে ঐ দাসীটা এসে আমার মুখটা তুলে ধরে বললো, কই চলুন মালকিন, শোবেন চলুন।

আমি আর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পালঙ্কে শুয়ে পড়লাম। কেমন একটা বিশ্রী গন্ধে সারা শরীর গুলিয়ে যেতে লাগলো। তখনও আমার চৈতন্য লুপ্ত হয়নি। সবই শুনতে পাচ্ছি। সবই বুঝতে পারছি। অথচ হাত-পা নাড়তে পারছি না। কোনও কথা বলতে পারছি না। মনে হতে লাগলো, আমি মরে যাচ্ছি।

শুনতে পেলাম, জুবেদা আমার ঘরে এসে ঐ দাসীটাকে বলছে, সবাব, কাফুর আর বুখাইৎকে বলে রেখেছি। ওদের কাঠের বাক্সটা নিয়ে এখানে আসতে বলো।

বুঝতে পারলাম, একটু পরে ঐ তিন খোজা আমাকে ধরাধরি করে একটা বাক্সের মধ্যে শুইয়ে দিলো। জুবেদা বললো, যা নিয়ে যা। আমাদের গোরস্থানে কবর দিয়ে রাত থাকতে থাকতে ফিরে আসবি।

আমি সবই শুনতে পেলাম, সবই বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে কথা বলতে পারলাম না। পারিনি, একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। জুবেদা যদি বুঝতে পারতো ওষুধে কাজ হয়নি, হয়তো আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতো।

এর পরের ঘটনা তো তোমার সবই জানা। আল্লাহ তোমাকে পাঠিয়েছিলেন। তা না হলে, তুমি এক বিদেশী, নিশি রাতে মানুষের অগম্য ওই গোরস্থানেই বা যাবে কেন? আর আমাকেই বা উদ্ধার করবে কেন?

এখন আমি ভাবছি, খলিফা লড়াই থেকে ফিরে এসে যখন দেখবেন আমি নাই, তখন কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড হবে!

কুৎ-অল-কুলুবের কাহিনী শুনে ঘানিম ঘামতে থাকে। সর্বনাশ! এ কাকে নিয়ে এসে সে ঘরে তুলেছে? ধর্মাবতার খলিফার রক্ষিতা! তাকে ছোঁয়াও তো মহাপাপ! ঘরের এক প্রান্তে গিয়ে একটা টুলের উপর বসে থাকে। কুৎ-অল-কুলুব বুঝতে পারে না। ডাকে, তুমি দূরে সরে গেলে কেন, সোনা?

—না না, সে হয় না। তুমি খলিফার বাঁদী। তোমার দিকে হাত বাড়ালে সে হাত আমার পঙ্গু হয়ে যাবে। খলিফা সাক্ষাৎ আল্লাহর পয়গম্বর।

কুৎ-অল-কুলুব উঠে এসে ঘানিমের হাত ধরে। দূর বোকা ছেলে, ভয় পাচ্ছো কেন? আমি তো আছি। চলো, শোবে চলো।

ঘানিম কিন্তু সত্যিই শঙ্কিত হয়েছে। বাদশাহর রোষানলে দগ্ধ হতে পারে সে। সামান্য এক সওদাগর হয়ে সে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছে। কুৎ-অল-কুলুবের ডাকে আর সাড়া দিতে পারে না ঘানিম। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নেশা কেটে যায়। খলিফার প্রিয় পাত্রীকে সে তার অঙ্কশায়িনী করতে চেয়েছিলো।

—না, না, তুমি পালঙ্কে শুয়ে পড়ো। আমি নিচে শোবো।

—তাই হয় নাকি। চলো, এক সাথে শোবো।

কিন্তু ঘানিম রাজী হতে পারে না। সারারাত একরকম বসেই কেটে যায়।

ভোর না হতেই ঘানিম বাজারে বেরিয়ে গেলো। কুৎ-অল-কুলুব তখনও নিদ্রামগ্ন। বাজার গিয়ে নানারকম দামী দামী খাবারদাবার কিনলো। সুলতান বাদশাহরা যে সব দুষ্প্রাপ্য সরাব খায় তারই একটা কিনলো কুৎ-অল-কুলুবের জন্য। তার ঘরে আজ মহামান্য অতিথি—তার মনোরঞ্জনের জন্য দামী আতর, বাহারী ফুল, সুগন্ধী আগরবাতি প্রভৃতি নানা শৌখিন জিনিসপত্র কিনে যখন বাসায় ফিরলো, বেশ বেলা হয়ে গেছে। কুৎ-অল ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে। ঘানিমকে দেখে ছুটে এলো, কখন তুমি কোথায় গেলে, আমি ভেবে আকুল, এতে দেরি হলো কেন?

—এই একটু বাজারে গিয়েছিলাম।

কুলির মাথা থেকে সামানপত্র নামাতে নামাতে বলে, আমার ঘরে সুলতানের খাস বাঁদী—এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়? আদর যত্নের ত্রুটি হলে যে গর্দান যাবে।

কুৎ-অল রাগ করে।—তুমি আমাকে এত পর পর ভাবো?

ঘানিম টেবিলে নাস্তা সাজাতে থাকে। কুৎ-অল সামনে এসে রুখে দাঁড়ায়।—ওসব রাখো বলছি, আগে আমার কাছে এসো। না হলে সব ছুঁড়ে ফেলে দেব বলছি। আমি কি তোমার এখানে খানাপিনা করতে এসেছি? যে কটা দিন থাকবো, আমি আর তুমি এক হয়ে থাকবো। কোথাও যেতে পারবে না।

ঘানিমকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিতে চায়। কিন্তু ঘানিম উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি তোমার আজ্ঞাবহ দাসানুদাস। তুমি খলিফার 'ভালোবাসা'। ওসব ভাবাও আমার পাপ।

—কি বললে? দাসানুদাস? আজ্ঞাবহ। তা হলে আমি আদেশই করছি—আমার বুকে এসো।

ঘানিম মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।—দেখো, ঘানিম, আমি খলিফার খাস বাঁদী—আমার হুকুম, কাছে এসো। তা না হলে তোমার গর্দান যাবে।

—গর্দান তো বাড়িয়েই আছি। ইচ্ছে হয় নিতে পারো। কিন্তু ওকথা বলো না। আমি পারবো না।

কুৎ-অল উঠে এসে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, ঘানিমের ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে দেয়। রক্ত ঝরে পড়ে।—ওগো সাধু মহাপুরুষ, এবার তোমার খোলসটা ছাড়ো। আমি যে আর সইতে পারছি না। সিংহের মতো একবার ঝাঁপিয়ে পড়ো, সোনা।

ঘানিম বলে, প্রভুভক্ত কুকুর কখনও সিংহ হতে পারে না, কুৎ-অল। আমাকে ক্ষমা করো।

আমার কথা না শুনলে তো তোমার ক্ষমা নাই, ঘানিম। আমাকে চটিও না, বলছি। তোমার ভালো হবে না।

ঘরের এক প্রান্তে গিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে ঘানিম। কুৎ-অল এগিয়ে আসে। মাথায় হাত বুলায়।—রাগ করলে? ঠিক আছে, চলো, নাস্তা সেরে নিই।

ঘানিমের হাত ধরে দু'জনে টেবিলে এসে বসে। আর একটাও কথা হয় না। নীরবে আহার পর্ব শেষ হয়। ঘানিম কেমন মনমরা হয়ে যায়। বাঁশীতে করুণ সুর বাজাতে থাকে। কুৎ-অল অবাক হয়। এমন বেহাগের সুর অনেককাল সে শোনেনি। শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে আসে। আস্তে আস্তে উঠে এসে ঘানিমের কাঁধে হাত রাখে।—কোথায় শিখেছো?

—আমার বাবা খুব গুণী লোক ছিলেন। দামাসকাস শহরে গাইয়ে বাজিয়ে মহলে তাঁর বেশ নাম ছিলো। সেই সুবাদে অনেক নামজাদা ওস্তাদের আনাগোনা ছিলো আমাদের বাসায়। যা কিছু শিখেছি, তাদের কল্যাণেই।

গান বাজনার মধ্য দিয়ে সারা দিন কেটে যায়। রাতের আহার শেষ করে ঘানিম নিজের জন্য নিচে আলাদা বিছানা করে নেয়। এবার কুৎ-অল চিৎকার করে ওঠে, তোমার এই ফালতু গোঁড়ামী রাখো তো। যতক্ষণ তোমার ঘরে আছি, আমি তোমার। তুমিও আমার। এর মধ্যে খলিফার কথা মনে রেখো না। এসো, আমার কাছে এসো। এক সাথে শোবো আমরা। আজকের রাত হবে, আমাদের মধুযামিনী।

ঘানিম রাজী হয় না।—না, তা হতে পারে না, কুৎ-অল।

কুৎ-অল মিনতি করে, তোমার দু'টো পায়ে পড়ি, ঘানিম আমার কথা শোনো। তোমাকে না পেলে আমি এক ফোঁটা ঘুমুতে পারবো না।

ঘানিম রাজী হয় না, সে হয় না, কুৎ-অল।

কুৎ-অল কেঁদে ফেলে, অমন করে 'না' করো না, সোনা। আমার দেহ-মন তোমাকে চাইছে। এসো, কাছে এসো। শুধু একটা চুমু। আর কিছু চাই না।

কুৎ-অল অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

এইভাবে একটা মাস কেটে যায়। খায় দায় আর বিরহ বেদনার গান গায়। কুৎ-অল-এর আসল পরিচয় জানার পর থেকে ঘানিম নিজেকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখে।

এদিকে খলিফার খাস বেগম জুবেদা খবর পায়, লড়াই শেষ করে খলিফা বাগদাদে ফিরে আসছেন। প্রাসাদের সবচেয়ে পুরনো এক বুড়ি দাসী ছিলো জুবেদার প্রিয় পাত্রী। কুমন্ত্রণা দিতে তার জুড়ি নাই। জুবেদা তাকে জিজ্ঞেস করে, খলিফা তো ফিরে আসছেন। এখন কি হবে?

—কিচ্ছু ভেবো না মা, আমি তোমাকে ফিকির বাৎলে দিচ্ছি। ছুতোরকে দিয়ে একটা কাঠের পুতুল বানিয়ে নাও। আমাদের প্রাসাদে একজন ভালো কারিগর আছে। খুব সুন্দর সুন্দর পুতুল বানাতে পারে। তাকে ডেকে তুমি বলে দাও, সে ঠিক কুৎ-অলের মতো দেখতে একটা

পুতুল বানিয়ে দেবে। প্রাসাদের চত্বরে একটা কবর খুঁড়ে পুতুলটাকে গোর দিয়ে রাখো। হ্যাঁ, একটা কথা, কুৎ-অল যে সব দামী দামী হীরে জহরৎ পরে থাকতো সেইভাবে সাজাতে হবে তাকে। খলিফার যদি সন্দেহ হয়, যদি বলেন, কবর খোলো, আমি তাকে দেখবো। সেই জন্যে পুতুলটাকে দামী দামী রত্নালঙ্কারে সাজাতে হবে। খলিফা যদি কবর খুলে দেখেনও, ঐ সব মূল্যবান অলঙ্কারাদি দেখে তার আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

জুবেদা বলে, আর যদি খলিফা বলেন, আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখবো, তখন?

—তখন তুমি বলবে, কুৎ-অল-এর মৃতদেহ বিবস্ত্র করে কবর দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রে আছে, নিজের বিবি হলেও ন্যাংটো করা মেয়েছেলের মৃতদেহ কোনও পুরুষ স্পর্শ করতে পারে না।

—সাব্বাস্! তোমার কি বুদ্ধি!

জুবেদা সেই বুড়ি দাসীকে দামী দামী সাজপোশাক এবং স্বর্ণমুদ্রায় পুরস্কৃত করলো। বুড়ির কথা মতো কাঠের তৈরি নকল কুৎ-অল-কুলুবকে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হলো।

এর দু'দিন পরে খলিফা ফিরে এলেন। প্রাসাদে ঢুকতে গিয়েই দেখলেন, প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে এক বিরাট সমাধি। প্রাসাদের কর্মচারী নফর চাকর খোজা দাসদাসী সকলের পরনেই কালো পোশাক। অন্দর মহলে গেলেন। খাস বেগম জুবেদাও শোকের পোশাকে সজ্জিতা। সারা প্রাসাদে থমথমে ভাব। কারো মুখে কথা নাই। কুৎ-অল-কুলুবের মহলে গেলেন। দাসী পরিচারিকারা অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলো। কুৎ-অল নাই। সারা মহল ধূপ আর আতরের গন্ধে ভরপুর। চারপাশে সারিবদ্ধভাবে সাজানো মোমের বাতি গলছে। জুবেদা কাঁদতে কাঁদতে বলে, কুৎ-অল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

খলিফাকে সঙ্গে করে সমাধির পাশে নিয়ে গেলো জুবেদা।—আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কবর খুঁড়িয়ে বাদশাহী মর্যাদায় তাকে গোর দিয়েছি।

খলিফা কোনও কথা বলতে পারলেন না। কুৎ-অল-এর এই আকস্মিক মৃত্যু তাকে মুহ্যমান করে ফেলেছে। পথশ্রমে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। তার উপর এই গভীর শোকসংবাদ। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শয্যা নিলেন।

সারা দিন সারা রাত মড়ার মতো পড়ে রইলেন। কারো সঙ্গে দেখা করলেন না। খানাপিনা কিছুই খেলেন না। শুধু ভাবতে লাগলেন, অমন সুন্দর সুস্থ কুৎ-অল হঠাৎ মারা গেলো কি করে। যতই ভাবেন, সন্দেহ ঘনীভূত হয়। সকালে উঠে জাফরকে ডেকে বললেন, কবর খোলার ব্যবস্থা করো, আমি একবার কুৎ-অলকে শেষবারের মতো দেখতে চাই।

জুবেদার বুক কেঁপে উঠলো। বুড়ি দাসী তাকে অভয় দেয়, কিচ্ছু ভেবো না, মা। নিজেকে শক্ত করো। খলিফার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। যা বলেছি, মনে থাকে যেন।

খলিফার নির্দেশে কবর উন্মুক্ত করা হলো। মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি দেখলেন, প্রায় স্বচ্ছ দামী কফিনে মোড়া কুৎ-অল-কুলুবের মৃতদেহ। দেখলেন তার সারা অঙ্গে সেই সব হীরে জহরতের অলঙ্কার। পলকে সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গেলো। বললেন, ঠিক আছে, কবর ঠিক করে রাখো।

জাফরকে নির্দেশ দিলেন, সাত দিন সাত রাতব্যাপী কবরের সামনে কোরান পাঠ হবে। ব্যবস্থা করো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

একচল্লিশতম রজনী।

আবার কাহিনী শুরু হয়। শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

খলিফার ইচ্ছানুসারে কুৎ-অল-কুলুবের নকল সমাধির পাশে সাত দিন সাত রাতব্যাপী কোরান পাঠ হতে থাকলো। সব কাজকাম মুলতুবি রেখে খলিফা দরবার কক্ষের একখানা সাধারণ চৌকির ওপর মাদুর বিছিয়ে শুয়ে রইলেন। জাফরকে বলে রাখলেন, কেউ যেনো তাকে বিরক্ত না করে।

খলিফার মাথা ও পায়ের কাছে বসে দুই পরিচারিকা পরিচর্যা করতে থাকে। পানাহার পরিত্যাগ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকেন খলিফা। কোরানের পবিত্র বাণী শুনতে শুনতে পার্থিব সুখ দুঃখের অনেক উপরে অন্য এক জগতে বিচরণ করতে থাকেন।

হঠাৎ তার কানে আসে, দুই পরিচারিকার একজন বলছে,

ছিঃ ছিঃ কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড ভাই শুভিয়া।

শুভিয়া অবাক হয়, কেন, কেলেঙ্কারী কিসের ভাই নুজা?

—আমাদের খলিফা একটা মিথ্যে কবরের সামনে কোরান পাঠের আসর বসিয়েছেন। আসলে ওটা কুৎ-অল-এর কবর না ছাই।

—তবে? কুৎ-অল গেলো কোথায়?

—তাকে তো বেগম সাহেবা জুবেদা ঔষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে মারার ফন্দী করেছিলেন। সবাব, কাফুর আর বুখাইৎ এই তিনটি খোজা জুবেদা বেগমের খুব পেয়ারের। কুৎ-অলকে অজ্ঞান করে, একটা কাঠের বাক্সে পুরে ঐ তিন খোজাকে দিয়ে সুলতানের খাস কবরখানায় পুঁতে রেখে এসেছিলো। শুভিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তাহলে প্রাসাদের চত্বরে এই কবরখানা কার?

—নকল কুৎ-অল-এর। একটা কাঠের পুতুলকে সাজিয়ে-গুজিয়ে শুইয়ে রেখেছে জুবেদা বেগম।

—তা হলে কুৎ-অলকে জ্যান্ত কবর দিয়ে মেরে ফেলেছে?

—আল্লাহ যাকে রাখেন, তাকে কেউ মারতে পারে? শুনেছি, কুৎ-অল বেঁচেই আছে।

—কোথায়?

—এই বাগদাদ শহরেই এক নওজোয়ান সওদাগরের ঘরে। তার নাম নাকি ঘানিম ইবন আয়ুব।

—তোমাকে এসব কথা কে বললো ভাই, নুজা?

ওই যে বুড়ি দাসীটা। জুবেদা বেগমের পেয়ারের দাসী গো। ওই বুড়িটাই বলছিলো আমাকে। তা ভাই অনেক দিব্যি করিয়ে নিয়েছে। তুমি যেন আমার বলো না কাউকে। বড় ঘরের বড় বড় ব্যাপার। ওসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কি দরকার?

খলিফা লাফিয়ে উঠে বসলেন। দরবার কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, জাফর?

কোরবানীর খাসির মতো জাফর এসে দাঁড়ালো।—ফৌজদারকো বোলাও। এক্ষুণি যত লোক-লস্কর দরকার নিয়ে বেরিয়ে পড়। কে এক ঘানিম ইবন আয়ুব আছে এই শহরে, তাকে ধরে নিয়ে এসো। যেমন করে পারো।

সঙ্গে সঙ্গে জাফর সব কোতোয়ালদের ডেকে পাঠালো। বললো, তোমাদের নিজের নিজের এলাকায় সন্ধান করে দেখো, ঘানিম ইবন আয়ুব নামে এক ছোকরা সওদাগর এই শহরেই কোথাও বাসা ভাড়া করে আছে। গোপনে তার বাসার ঠিকানা সংগ্রহ করে এক্ষুণি আমাকে জানাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘানিমের ঠিকানা সংগ্রহ হলো। আর তিল মাত্র দেরি না করে জাফর-অল-বারমাকী চল্লিশজনের এক ফৌজী বাহিনী নিয়ে ঘানিমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।

তখন টেবিলে নাস্তা সাজিয়ে ঘানিম আর কুৎ-অল সবে আহারে বসেছে। হঠাৎ চারদিক জনরবে মুখর হয়ে উঠলো। কুৎ-অল কান খাড়া করে শুনলো অশ্বক্ষুরধ্বনি। খট খট খটাখট!—ঘানিম! সর্বনাশ হয়েছে। খলিফার সৈন্য বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। তুমি পালাও। পালাও।

—কিন্তু তুমি?

—আমার জন্যে কোনও চিন্তা করো না, ঘানিম। যেমন করো পারো, পালাও। তোমাকে ধরতে পারলে আর আস্ত রাখবে না।

ঘানিম কি করবে কিছুই ভাবতে পারে না। বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—কিন্তু পালাবো কি করে? ফৌজ তো বাড়ি ঘেরাও করে ফেলছে।

ক্ষিপ্র হাতে কুৎ-অল টেবিল-মোছা ন্যাকড়াটা ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ঘানিমের মাথায় ফেটি বেঁধে দেয়। রসুইখানা থেকে এঁটোকাটার বালতী আর নর্দমা পরিষ্কার করার একটা ঝাড়ু নিয়ে আসে। বলে, শিগ্গির জামা পাতলুন খুলে ফেলো। শুধু ইজেরটা থাক। এই নাও এঁটোকাটার বালতি—মাথায় তোল। আর হাতে ধরো এই ঝাড়ুখানা। যাও গম্ভীর-সে বেরিয়ে হন হন করে কেটে উধাও হয়ে পালাও। ওরা কেউ সন্দেহ করবে না। ভাববে, মেথর। নোংরা পরিষ্কার করতে এসেছিলো। আমার কথা বিলকুল তুমি ভেবো না। আমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না ওরা। খলিফার সামনে হাজির হতে পারলে আমার কোনও ভয় নাই। তাকে বশ করার যাদু আমার জানা আছে।

জাফর ঘরে ঢুকে দেখে, কুৎ-অল পালঙ্কে বসে আছে একা। তার সারা দেহ হীরে জহরতের অলঙ্কারে মোড়া। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো জাফর।

কুৎ-অল বলে, নিয়তিই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এখন আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চান, আমি প্রস্তুত।

জাফর বলে, আমার ওপরে হুকুম হয়েছে, ঘানিব-ইবন আয়ুব নামের এক ছোকরা সওদাগরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে হবে। আপনি কি বলতে পারেন, মালকিন, সে কোথায়?

কুৎ-অল বলে, সে তো দিন কয়েক আগে তার দেশের বাড়ি দামাসকাসে চলে গেছে! এর বেশী কিছু আর আমি বলতে পারবো না।

জাফর বিনীতভাবে বলে, আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে চলেন—

নিশ্চয়ই যাবো। যাওয়ার জন্যেই তো আমি তৈরি হয়ে বসে আছি। চলুন।

প্রাসাদে ফিরে এসে জাফর জানায়, ঘানিম কয়েকদিন আগে বাগদাদ ছেড়ে দামাসকাসে ফিরে গেছে। সেখানেই তার দেশ। নিজের বলতে তার মা আর এক বোন আছে।

খলিফা গম্ভীর হলেন। হুম, পালিয়েছে। তা পালিয়ে কোথায় সে যাবে। ধরা তাকে দিতেই হবে।

কুৎ-অল-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘানিমের বয়স কত?

কুৎ-অল বলে, তা মনে হয় চব্বিশ পঁচিশ হবে।

—তা হলে তো ভালোই জমেছিলো, কি বলো?

কুৎ-অল বলে, সে কোনও খারাপ কাজ করেনি।

—চোপ রহ, বেশরম—একটা জোয়ান ছেলের সাথে এক সঙ্গে এতদিন কাটালে, আর কিছু খারাপ কাজ করোনি? এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে—আগুনে ঘি পড়লে জ্বলবে না? মাসরুর! অন্ধকার ঘরে কয়েদ করে রাখো।

—জো হুকুম, জাঁহাপনা।

খলিফা এবার ঘানিমের অনুসন্ধানে মেতে উঠলেন। এক দল অশ্বারোহী ফৌজ পাঠিয়ে দিলেন দামাসকাস শহরে। নিজে হাতে একখানা খৎ লিখে দিলেন।

দামাসকাসের ভারপ্রাপ্ত সুলতান ইবন সুলেমান অল-জেনির প্রতি আব্বাসের পঞ্চম বংশধর খলিফা হারুন-অল-রসিদ-এর হুকুমনামা।

॥ এলাহী ভরসা ॥

আশা করি তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল। মেহেরবান আল্লাহর দোয়ায় সুখে থাকো।

অতঃপর লিখি ঃ

প্রিয় বৎস, তোমার শহরে ঘানিম ইবন আয়ুব নামে এক তরুণ সওদাগর বাস করে। সম্প্রতি সে বাগদাদে এসেছিলো। আমার এক বাঁদীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হওয়া সম্ভব তাই ঘটেছে। কয়েকদিন আগে সে এখান থেকে পালিয়ে আবার দামাসকাসে ফিরে গেছে। আমার বিশ্বাস এখন সে তার মা ও বোনের কাছেই আছে। আমার এই পত্র পাওয়ামাত্র তাকে গ্রেপ্তার করে পাঁচশো ঘা বেত লাগাবে। উটের পিঠে চাপিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করাবে। এবং ঘোষণা করে দেবে, খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অপরাধে এই সাজা তাকে দেওয়া হচ্ছে। এর পর বদমাইশটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপর আমি ওর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করবো।

ওর বাড়ি-ঘরদোর ভেঙে চুরে ধূলিসাৎ করে দেবে। ওর মা আর বোনকে উলঙ্গ করে, চৌমাথার মোড়ে তিন দিন তিন রাত্রি দাঁড় করিয়ে রাখবে। তারপর তোমার শহর থেকে বহিষ্কার করে দেবে।

আমার এই হুকুম যথাযথ পালন করবে। খোদা হাফেজ।

তীর বেগে ছুটে চললো অশ্ববাহিনী। বিশ দিনের পথ মাত্র আট দিনে পৌঁছে গেলো। সুলতান মহম্মদ খলিফার চিঠিখানা হাতে নিয়ে সাতবার কপালে ছুঁইয়ে শ্রদ্ধা জানায়। তারপর খুলে পড়ে।

ক্ষণমাত্র দেরি না করে লোক লস্কর সঙ্গে নিয়ে ঘানিমের বাড়ি চড়াও হলো সুলতান। দরজায় কড়া নাড়তেই ফিৎনা দরজা খুলে দেয়। তখন তার মা প্রার্থনায় বসেছিলো। ঘানিম আজ এক বছরের ওপর বাড়ি থেকে চলে গেছে। কিছুদিন আগে বাগদাদ থেকে এক দল সওদাগর ফিরে এসে খবর দিয়েছে ঘানিম নাকি মারা গেছে। সেই থেকে ঘানিমের মা শোকে দুঃখে মুহ্যমান। উঠনের ঠিক মাঝখানে পুত্রের স্মৃতির উদ্দেশে একটা তাজিয়া বানিয়েছে। সারা দিন রাত সেই তাজিয়ার সামনে বসে ছেলের শোকে সে আকুল হয়ে কাঁদে, আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙে।

—ঘানিম কোথায়?

ফিৎনা বলে, সে আজ এক সালের উপর হলো বাগদাদে গেছে। তারপর আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। লোকে বলছে, মারা গেছে।

পুত্রহারা মা-এর অন্তর-ব্যথা অনুভব করে সুলতান। কিন্তু কোনও উপায় নাই। খলিফার হুকুম। অক্ষরে অক্ষরে তামিল করাই তার একমাত্র কর্তব্য। তার ইশারায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘানিমের বাড়ি-ঘর ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিলো। মা আর বোনকে উলঙ্গ করে সদর রাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো। তিন দিন তিন রাত্রি। তারপর শহর থেকে তাড়িয়ে বের করে দিলো।

এবার ঘানিমের কাহিনী শুনুন জাঁহাপনা। বাগদাদ শহর ছেড়ে বন জঙ্গল ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে ঘানিম। খাওয়া নাই নাওয়া নাই অবিশ্রান্ত একটানা পথ চলে চলে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। উসকুখুস্‌কু চুল, খালি পা, পরণে শুধু একটা ইজের মাত্র। পথে যারা দেখলো, ভাবলো পাগল। এইভাবে এক গ্রামের মসজিদে ঢুকে লুটিয়ে পড়লো। নামাজ পড়তে এসে মৃত-প্রায় যুবককে দেখে গ্রামবাসীদের দয়া হয়। কেউ বললো, ছেলেটার বোধহয় অসুখ করেছে। কেউ বলে, না না, না-খেতে পেয়ে ঐ অবস্থা হয়েছে। একজন দু'খানা রুটি আর মধু এনে খাওয়ালো। শরীর ঠকঠক করে কাঁপছিলো। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। একজন একটা ছেঁড়া জামা এনে পরালো। একটু সুস্থ বোধ করলে গ্রামবাসীরা জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গো বাছা, কোথা থেকে আসছো?

ঘানিম কোনও জবাব দিলো না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো। সবাই ভাবলো, জ্বরে বেহুঁশ হয়ে গেছে। তখনকার মতো আর কোন প্রশ্ন না করে যে যার কাজে চলে গেলো।

এইভাবে ঐ মসজিদের বারান্দায় একটা মাস কেটে গেলো। গ্রামবাসীরা অনুগ্রহ করে কিছু খাবার দিয়ে যায়। তাই খেয়ে মসজিদের খোলা বারান্দায় পড়ে থাকে। দিনে মাছি আর রাতে মশার কামড়। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো। এদিকে জ্বরও ছাড়ে না। অবশেষে গ্রামের মাতব্বররা ঠিক করলো, এইভাবে এখানে পড়ে থাকলে ছেলেটা মারা যাবে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসা দরকার।

একদল উট যাচ্ছিলো বাগদাদ শহরে। গ্রামবাসীদের অনুরোধে উটের মালিক রাজী হলো। বললো, ঠিক আছে, আমরা ওকে বাগদাদের সদর হাসপাতালের ফটকে নামিয়ে দেব।

গ্রামবাসীরা ঘানিমকে উটের পিঠে ভালো করে বেঁধে দিলো। কিছু দূরে আসার পর উটের পিঠে বাঁধা ঘানিমকে দেখে বোরখা ঢাকা দু'টি পথচারী মেয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আচ্ছা মা, দেখো তো, উটের পিঠে ঐ ছেলেটা—যদিও খুব গরীব সরীব, কিন্তু আমার ভাইজান ঘানিমের মতো দেখতে না?

মা বললো, কি জানি বাপু, কেঁদে কেঁদে চোখ আমার অন্ধ হয়ে গেছে। অত দূরে কি আর নজর যায়! তোর ওসব মনের ভুল ফিৎনা। ঘানিম কি আমার বেঁচে আছে?

দামাসকাসের সুলতান ওদের দু'জনকে শহর থেকে বহিষ্কার করে দিলে ওরা বাগদাদের পথ ধরে চলতে থাকে। মনে ক্ষীণ আশা, চলতে চলতে একদিন তারা বাগদাদে পৌঁছবে। ঘানিমকে খুঁজে পাবে আবার।

সারা রাত পথ চলার পর ভোরবেলা উটের দল শহরে পৌঁছয়। মালিক দেখলো, এখনও হাসপাতালের দরজা খোলেনি। ঘানিমকে দরজার পাশে বসিয়ে দিয়ে চলে গেলো। ঘানিমের তখনও চৈতন্য নাই। কোথায় সে ছিলো, এখনই বা কোথায় এসেছে কিছুই বুঝতে পারে না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে মরার মতো পড়ে থাকে।

রাত্রির আঁধার কেটে গেলো। সবে রাস্তাঘাটে লোকজন বেরুতে শুরু করেছে। পথচারীদের মধ্যে কেউ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকটার চেহারার সঙ্গে ঘানিমের কেমন মিল খুঁজে পায়? আবার ভাবে, দূর তা কি করে হবে? ঘানিম এখানে আসবে কি করে? একটু পরে বাজারের এক নামজাদা দোকানের মালিক ওকে দেখতে পায়। তার কিন্তু কোনও সংশয় হয় না। কতদিন তার দোকানে গেছে সে। কত আলাপ পরিচয়। কত সওদা করেছে। সে ভাবে, হায় আল্লাহ, ওকে যদি হাসপাতালে ভর্তিও করা হয় রোগের হাত থেকে বাঁচলেও খলিফার রোষ থেকে রেহাই পাবে না। মৃত্যু তার অনিবার্য। ওকে বাঁচাতে হবে। যেভাবেই হোক বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। জেনে শুনে ওকে এইভাবে ফেলে রেখে গেলে আল্লাহর দরবারে সে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে পারবে না। তার নিজের কাঁধে ঘানিমের দেহভার নিয়ে কোনরকমে আস্তে আস্তে

বাড়িতে নিয়ে এলো দোকানী। বিবিকে ডেকে বললে, আজ থেকে এই মেহেমান আমাদের বাড়িতে থাকবে। খুব অসুস্থ। একে সুস্থ সবল করে তোলার দায়িত্ব তোমার।

দোকানী মালিক গরম জল করে ঘানিমের সারা শরীর মুছিয়ে দিলো। নতুন জামা কাপড় এনে পরালো। এক গেলাস দুধ এনে খাওয়ালো। এবার ঘানিম একটু সুস্থ বোধ করে। মনে হয় জ্বরের তোড়টা খানিক কমেছে। ধীরে ধীরে তার সব মনে পড়তে থাকে। বাগদাদ শহর। তার ব্যবসা। তার মা বোন ফিৎনা। তার কুৎ-অল-কুলুব—তার ভালোবাসা।

এই সময়ে রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

বিয়াল্লিশতম রজনীর দ্বিতীয় যামে আবার গল্প শুরু হয়।

এক গেলাস গরম দুধ খাওয়ার পর ঘানিম কিছুটা সুস্থ বোধ করে। একে একে আবার সব মনে পড়তে থাকে। তার মা বোন। তার ভালোবাসা—কুৎ-অল-কুলুব।

এদিকে কুৎ-অল-কুলুবকে অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রেখেছেন খলিফা। দ্বারে প্রহরারত সেই বৃদ্ধা বুড়ি দাসী। প্রায় একটা মাস কেটে গেছে। খলিফা নানা কাজের ঝামেলায় এসব ঘটনা একেবারেই ভুলে গেছেন। একদিন প্রাসাদে ঢুকছেন, এমন সময় করুণ কান্না ভেসে এলো তার কানে। খলিফার তখন স্মরণ হয়, প্রায় এক মাস আগে কুৎ-অলকে তিনি অন্ধকার ঘরে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন। একেবারে ভুলে গেছেন। কেউ মনেও করিয়ে দেয়নি। ধীর পায়ে দরজার পাশে দাঁড়ান। কুৎ-অল-কাঁদছে, ঘানিম, তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে কেন ঘানিম। না হয় আমি সুলতানের কবরখানায় মাটি চাপা পড়েই মরে থাকতাম। এ জীবনে আজ বেঁচে থেকেই বা কি ফয়দা পেলাম। তুমি আমার সঙ্গে সহবাস করোনি সে কথা তো খলিফা বিশ্বাস করলেন না। তবে কেন তুমি নিজেকে অত সংযত করে রাখলে? আলাদা শয্যায় রাত কাটালে। জানি না তুমি বেঁচে আছো কিনা, বেঁচে থাকলেও তোমার রেহাই নাই। খলিফার চর সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। যেখানেই থাকো একদিন না একদিন তোমাকে ধরে শূলে চড়াবেনই। তুমি তার মেয়েছেলের ইজ্জৎ রাখার জন্যে নিজেকে বঞ্চিত করে কি যে দারুণ সংযম দেখালে! আমি মেয়েমানুষ, আর কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক আমি বুঝি ঐভাবে অতগুলো নিঃসঙ্গ রাত্রি তোমার কি দুঃসহ যন্ত্রণায় কেটেছে। কিন্তু কি তার ইনাম পেলে ঘানিম? প্রাণদণ্ডের হুলিয়া! আর তোমার মা বোনের বে-ইজ্জৎ? এই তোমার পুরস্কার? তুমি দুঃখ করো না ঘানিম, তোমার সঙ্গে আর আমার কোনওদিন দেখা হবে না। তবে দেখা হবে আর একবার আল্লাহর দরবারে। শেষ বিচারের দিন। সেদিন তুমি এর যোগ্য পুরস্কার পাবে।

এই প্রথম খলিফা উপলব্ধি করলেন, ঘানিম নির্দোষ। নিজের ঘরে ফিরে এলেন। হুকুম করলেন, কুৎ-অলকে নিয়ে এসো।

রোরুদ্যমানা কুৎ-অল এসে দাঁড়ালে খলিফা অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, আমাকে মার্জনা করো সুন্দরী, অনেক মিথ্যা সন্দেহ করে তোমাকে বহুৎ কষ্ট দিয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, আল্লাহর দরবারে একটা বড় গুনাহ করে ফেলেছি। কুৎ-অল, তুমি তখন কেঁদে কেঁদে কি সব বলছিলে? যে আমার মেয়েছেলের ইজ্জত রক্ষা করেছে আমি তার ঘরের মা-বোনের ইজ্জৎ নষ্ট করেছি? কে সে?

—ধর্মাবতার সে সে-ই ঘানিম। এক মাসের ওপর আমার সঙ্গে সে এক ঘরে রাত কাটিয়েছে। শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষ। আমার মতো রূপসী মেয়ের পাশে পাশে থেকে নিজেকে ঠিক রাখা কতটা শক্ত আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন হুজুর। কিন্তু একদিনের তরেও তার পদস্খলন হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি আমিই তাকে প্রলুব্ধ করেছি নানাভাবে। কিন্তু

যখনই সে শুনেছে আমি আপনার ভোগ্যা, তারপর থেকে অসাধারণ সংযমে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে সে। আপনার প্রতি এই অসীম শ্রদ্ধার সে উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছে। তার মা বোনের ইজ্জৎ আপনি ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছেন। তাদের মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু আপনি রাখেননি।

খলিফা কোনও জবাব দিতে পারেন না। মাথা নিচু করে দু'হাতে মুখ ঢাকেন।—সত্যি, কুৎ-অল বড় মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। সব ক্ষতি অর্থ দিয়ে পূরণ করা যায়। কিন্তু ইজ্জৎ একবার খোয়া গেলে তার ক্ষতিপূরণ আর কিছুতেই হয় না। তবু বলো, কুৎ-অল, যতটুকু পারি আমি করবো। তোমরা যা চাও তাই আমি দেব।

আমার নিজের জন্যে কিছুই চাইবার নাই, জাঁহাপনা। শুধু আর্জি, ঘানিম নির্দোষ। ওকে কোনও সাজা দেবেন না।

—কিন্তু সাজা দেব কাকে? সারা দামাসকাসে সারা বাগদাদ-এ তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। আমি দেখছি, তাকে যদি খুঁজে পাই, যদিও তুমি আমার বড় আদরের বাঁদী, তার হাতেই তোমাকে তুলে দেব।

—জাঁহাপনা, যদি অনুমতি করেন আমি তাকে একবার খুঁজে দেখতে পারি।

—আমার কোনও অমত নাই কুৎ-অল। আজ থেকে ঘানিম তোমার। তাকে যদি খুঁজে পাওয়া যায় আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের শাদী দিয়ে দেব।

খুশিতে কুৎ-অল-এর মন নেচে ওঠে। সঙ্গে হাজার খানেক দিনার নিয়ে ঘানিমের সন্ধানে বাগদাদের পথে বেরিয়ে পড়ে। প্রথম দিন সারা শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত জনে জনে জিজ্ঞেস করেও কোন সন্ধান পেলো না। পরের দিন সে বাজারের বড় বড় দোকানে ঢুকে খোঁজ করলো। এই সব দোকানে সে তার সওদা বিক্রি করতো। কিন্তু তারাও কেউ কিছু বলতে পারলো না। পরদিন সে গেলো জহুরীদের দোকানে। জনে জনে জিজ্ঞেস করতে করতে এক বৃদ্ধ জহুরী বললো, মা, কয়েকদিন আগে এক বিদেশীকে আমি অসুস্থ অবস্থায় সদর হাসপাতালের ফটক থেকে তুলে নিয়ে এসেছি। এখন সে আমার বাড়িতে আছে। তবে খুব দুর্বল। খুলে কিছুই বলতে চায় না, তবে মনে হয় কোনও ভালোবাসার ব্যাপারে ঘা খেয়েছে। পয়সাকড়ি সব খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তবে দেখে মনে হয় খানদানী ঘরেরই ছেলে।

কুৎ-অল অধৈর্য হয়ে ওঠে। বলে, দেখুন, আপনার তো এখন কাজের সময়। দোকানপাট ফেলে যেতে পারবেন না। তা যদি আমার সঙ্গে কাউকে দেন—আপনার বাড়িটা সে চিনিয়ে দিত—

শেখসাহেব একটি ছোট্ট বাচ্চাকে সঙ্গে দিলো। ছেলেটি তার বাড়ি চেনে। কুৎ-অলকে সে পৌঁছে দিলো তার বাড়ি। দরজায় কড়া নাড়তেই শেখসাহেবের বিবি দরজা খুলে দেয়। কুৎ-অল-কুলুবকে দেখে চিনতে পারে। মাটি ছুঁয়ে সালাম জানায়। কুৎ-অল তাকে দু'হাত বাড়িয়ে তুলে ধরে।—মা, শুনলাম আপনার ঘরে এক অসুস্থ বিদেশীকে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি তাকে একবার দেখতে চাই।

—কিন্তু তাকে দেখেই বা কি করবে মা। জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। সাধ্য মতো চিকিৎসাপত্র করাচ্ছি। কিন্তু জ্বর ছাড়ে না। চেহারা একেবারে কঙ্কালসাড় হয়ে গেছে।

—তা হোক। তবু আমাকে একবার নিয়ে চলুন, আমি দেখবো।

শেখ-এর বিবি কুৎ-অলকে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। একটা পালঙ্কে শুয়েছিলো ঘানিম। জ্বরে বেহুঁশ। প্রথম দর্শনে কুৎ-অল-এর সন্দেহ হয়। না না, এ কেমন করে হবে ঘানিম। ঘানিমের কি সুন্দর স্বাস্থ্য রূপ জৌলুস দেখেছে সে। তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? যাই হোক, শেখের বিবিকে বলে, ওর যেন কোন অযত্ন না হয় মা। এই নিন রাখুন এই টাকাটা। শহরের

সবচেয়ে বড় হেকিমকে ডেকে দেখান। যত দামী ওষুধ দরকার হয় দিন। বাজারের সেরা ফল দুধ ওকে খেতে দেবেন। আরও টাকা আমি দিয়ে যাবো।

কুৎ-অলের সঙ্গে ছিলো হাজার খানেক দিনার। সবটাই সে শেখ-স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে সেদিনের মতো প্রাসাদে ফিরে যায়। সারা রাত ঘানিমের মুখটা কল্পনা করে, আর কল্পনা করে সেই রুগ্ন হাড় জিরজিরে যুবকের মুখ। দু'জনের মুখ এক করে মেলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোথায় যেন খেই হারিয়ে যায়। এক করতে পারে না। এই একটা মাসের মধ্যে মানুষের চেহারা এত পাল্টে যেতে পারে?

পরদিন সকালে সে বাজারে যায়। সেই বৃদ্ধ জহুরীর সঙ্গে দেখা করে। উদ্দেশ্য ছেলেটি সম্পর্কে আরও যদি কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

শেখ বললো, মাজননী, গতকাল তুমি চলে যাওয়ার পর দু'টি গরীব ভিখিরি মেয়েছেলে এসেছিলো আমার দোকানে। দেখেই মনে হলো বিদেশী। নতুন এসেছে শহরে। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, শুধু ভিক্ষে করার জন্যে এই বিদেশে এসেছো? তা মা, জবাবে যা বললো, শুনে মনে হলো, তুমিও যাকে খুঁজছো তারাও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা?

—ঐ যে বললে না? ঘানিম-ইবন-আয়ুব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তারা কেন খুঁজে বেড়াচ্ছে? কোথায় তারা? কোথা থেকে এসেছে?

শেখ বলে, কেন খুঁজছে তা তো বলতে পারবো না, মা। তবে কোথায় আস্তানা গেড়েছে বলতে পারি। একটু এগুলেই তো ধরমশালা দেখতে পাবে, তারই দাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা এসেছে দামাসকাস থেকে?

—দামাসকাস থেকে। তবে তো ওরা ঘানিমের মা আর বোন ফিৎনা।

শেখ বললো, তা হতে পারে। তুমি যদি চাও, ডেকে দিতে পারি।

—একবার ডেকে পাঠালে ভালোই হয়।

শেখ ডাকলো, এই ফুলফুল! ফুলফুল!

সেই ছোট্ট বাচ্চাটা এসে দাঁড়ালো, দেখতো ঐ মুসাফিরখানার দাওয়ায় দু'টি মেয়ে বসে আছে—ডেকে নিয়ে আয়।

বাচ্চাটা ছুটতে ছুটতে চলে গেলো। একটু পরে বোরখা ঢাকা দু'টি মেয়ে এসে দাঁড়ালো কুৎ-অল-এর সামনে।

তাদের পরিচয়পত্র জেনে বুঝলো, তার অনুমান ঠিকই। তারা দু'জনে ঘানিমের মা আর বোনই বটে।

জহুরীর হাতে দিনারের একটা থলে তুলে দিয়ে কুৎ-অল-কুলুব বললো, আমার অনুরোধ, এদের দু'জনকে আপনার বাড়ি নিয়ে এসে আদর যত্নে রাখুন। এই নিন এতে হাজার খানেক দিনার আছে। আরও যা লাগে সব খরচা আমি দেব। কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখবেন, যেন কোনও অযত্ন না হয়।

জহুরী বিগলিত হয়ে বলে, এ-তো আমার কাছে হুকুম। কিচ্ছু চিন্তা করো না, মা। ওরা আদরে থাকবে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন তেতাল্লিশতম রজনী।

আবার গল্প শুরু করে শাহরাজাদ।

কুৎ-অল জহুরীর হাতে ধরে বললো, এই টাকা পয়সা রইলো। আপনি মেহেরবানী করে ওদের খাওয়া পরার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন।

পরদিন স্বচক্ষে দেখবার জন্য কুৎ-অল-কুলুব সোজা জহুরীর বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। শেখের বিবি তো তাকে মহা খাতির যত্ন করে অভ্যর্থনা করলো। তারপর ঘানিমের মা আর বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। ছিন্ন ময়লা বেশবাস পরিত্যাগ করে আজ তারা নতুন পোশাক পরেছে। গোসল করে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে। কুৎ-অল লক্ষ্য করলে, ফিৎনা দেখতে বেশ সুন্দরী। দীর্ঘ দিনের পথশ্রম, অনাহার অনিদ্রার ফলে ওর আসল চেহারা অনুমান করতে পারেনি। এই কটা দিনেই কেমন সুন্দর চেকনাই লাবণ্য ফুটে উঠেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তাদের সঙ্গে নানা কথা হলো। শেখ-গৃহিণী অবাক হয়। খলিফার পিয়ারী। অথচ এতটুকু অহংকার নাই। যাবার আগে কুৎ-অল জিজ্ঞেস করে, রুগী কেমন আছে?

—ঐ সেই একই রকম।

—কী খেতে দিচ্ছেন?

—হেকিম তো শক্ত কিছু খেতে দিচ্ছেন না। দুধ, মুরগীর ঝোল, আঙুরের, বেদানার রস—এই সব।

—আর ওষুধপত্র?

—সে তো লম্বা ফিরিস্তি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে হচ্ছে। হেকিম বলেছে দিন কয়েকের মধ্যে বাছা আমার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

—তা চলুন, একবার দেখে যাই।

কুৎ-অল ঘানিমের মা বোনকে সঙ্গে নিয়ে রুগীর ঘরে ঢোকে। ঘানিম চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। ঘরের এক পাশে বসে ওরা আবার নানা কথায় মশগুল হয়ে ওঠে। এক সময় ঘানিমের মা জিজ্ঞেস করে। কিছু মনে করো না মা, আমি তোমার মায়ের মতো, কালকেও তোমাকে দেখলাম; আজকেও এখানে দেখছি, কে মা তুমি? আমাদের জন্যে এত করছো?

কুৎ-অল হাসে। শুধু বলে, আমার নাম কুৎ-অল-কুলুব।

এই একটিমাত্র নামেমাচ্চারণে যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হয়। পলকে উঠে বসে ঘানিম। তাকিয়ে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে তার ভালোবাসা।—আকুলভাবে দু'হাত বাড়িয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, কুৎ-অল-কুলুব—?

ঘানিমের গলার আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে কুৎ-অল। এ কণ্ঠ তার খুব চেনা।—ঘানিম, ঘানিম তুমি, সোনা?

—হ্যাঁ আমি ঘানিম।

কুৎ-অল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। অচৈতন্য হয়ে যায় ঘানিমের মা আর বোনও। একটু পরে কুৎ-অল নিজেকে সংযত করে বলে, অবশেষে আল্লাহর দোয়ায় তোমাকে ফিরে পেলাম। আর এই দেখো, তোমার পাশে তোমার মা বোনও এসে গেছেন।

তারপর কুৎ-অল সব বৃত্তান্ত খুলে বললো। বললো, খলিফা আমার কথা বিশ্বাস করেছেন। তোমার তিনি সন্ধান করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমার সঙ্গে আমার শাদী দিয়ে দেবেন।

এ কথা ঘানিম বিশ্বাস করতে পারে না। এত দিন সে দুঃখশোকে তাপে মৃত-কল্প হয়েছিলো, এবারে আনন্দ সংবাদে আত্মহারা হয়ে বুঝি প্রাণ সংশয় ঘটবে। একি কথা শোনালো কুৎ-অল। খলিফা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কুৎ-অল-এর সঙ্গে তার শাদী হবে? কুৎ-অলের হাতে একটা চুমু দেয় ঘানিম।

কুৎ-অল বলে, তোমরা একটুক্ষণ অপেক্ষা করো। আমি আসছি।

কুৎ-অল আর দাঁড়ায় না। সোজা চলে আসে প্রাসাদে। তার নিজের জমানো টাকা থেকে একটা থলে ভর্তি করে নিয়ে এসে শেখ-এর হাতে দেয়। বলে, মেহেরবানী করে ঘানিমের মা বোনের জন্যে চার পরস্ত জমকালো দামী পোশাক কিনে নিয়ে আসুন। যত দাম লাগে লাগুক। তার জন্যে ভাববেন না। সেই সঙ্গে নেবেন খানকুড়ি রেশমী রুমাল।

এর পর শেখের বাড়ি ফিরে এসে ঘানিমের মা আর বোনকে ভালো করে গোসল সেরে নিতে বলে। শেখের বিবির হাতে একটা মুঠো মোহর গুঁজে দেয়।—চাকরকে বাজারে পাঠান। ভালো দেখে মুরগী, মাংসের চাপ, শব্জী, আঙুর, আপেল, বেদানা আর খানিকটা দামী সরাব নিয়ে আসতে বলুন। আজ আমি নিজে হাতে খানা পাকাবো। আপনাদের সবাইকে খাওয়াবো।

চাকরটা বাজার করে নিয়ে এলো। নানারকম সুন্দর সুন্দর খানা বানালো কুৎ-অল। সবাইকে নিজে হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালো। সারাটা দিন খুব হৈ হল্লা করে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা প্রাসাদে ফিরে এলো। পরদিন সকালে উঠে আবার সে শেখের বাড়ি এসে হাজির। সারা দিন ধরে খানাপিনা করে আবার ফিরে যায় প্রাসাদে। এইভাবে পর পর চারটে দিন খুব আমোদ করে কাটে। ভালো ভালো খানাপিনা করে ঘানিমের মা আর বোন-এর যেমন চেকনাই খোলে, তেমনি ঘানিমও বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। পরদিন কুৎ-অল নিজে হাতে সাজিয়ে দেয় ফিৎনা আর তার মাকে। নতুন সাজপোশাক কিনে এনেছিলো শেখ। সেই দামী দামী পোশাক পরালো দু'জনকে। ঘানিম তার মা আর সুন্দরী বোন ফিৎনাকে সঙ্গে নিয়ে কুৎ-অল খলিফার প্রাসাদে এসে হাজির হয়।

খলিফা তখন তার খাসমহলে বিশ্রাম করছিলেন। ঘানিম, তার মা আর বোন ফিৎনাকে একটা ঘরে বসিয়ে রেখে কুৎ-অল এলো খলিফার কাছে।

—জাঁহাপনা, আমি ঘানিমের সন্ধান পেয়েছি। তার মা আর বোন ফিৎনাও এসেছে বাগদাদে। ওদের সবাইকে নিয়ে এসেছি।

খলিফা খুশি হন।—ঠিক আছে, ওদের নিয়ে এসো আমার কাছে।

ঘানিম, তার মা আর বোন এসে কুর্নিশ জানিয়ে দাঁড়ালো। খলিফা বললেন, তুমি ঘানিম?

—গোলাম হাজির জাঁহাপনা।

খলিফা বললেন, গোলাম কেন, তুমি আমার ভাই। কাছে এসো। ভুল করে আমি তোমাদের অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়েছি। তোমার মা বোনের ইজ্জৎ ধ্বংস করেছি। জানি না এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি দিয়ে হবে?

ঘানিম বললো, ও কথা বলবেন না, হুজুর। আমি আপনার বান্দা। বান্দা কখনও মালিকের ন্যায় অন্যায় বিচার করতে পারে না।

খলিফা অবাক হন। বাঃ চমৎকার কথা বলে তো ছেলেটি! আদর করে পাশে বসান। বলেন, আমি ঠিক করেছি ঘানিম, আমার পিয়ারের বাঁদী কুৎ-অল-এর সঙ্গে তোমার শাদী দেব।

—হুজুরের হুকুম তামিল করার জন্য বান্দা সর্বদাই প্রস্তুত, জাঁহাপনা।

খলিফা বলেন, আরও একটা প্রস্তাব আছে ঘানিম। একদিন তোমার মার আর এই বোন ফিৎনাকে আমি বে-ইজ্জৎ করেছিলাম। টাকাপয়সার বিনিময়ে সবই পাওয়া যায়। কিন্তু ইজ্জৎ একবার খোয়া গেলে আর ফেরৎ পাওয়া যায় না। সে দিক থেকে আমি অসহায়। কোনও ধন-দৌলত দিয়েই তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবো না। সেই কারণে ভেবেছি, তোমার বোন ফিৎনাকে শাদী করে আমি তাকে বেগমের মর্যাদা দেব। হয়ত বা এতে কিছু সান্ত্বনা পাবো। এখন তুমি পাত্রী পক্ষ, তোমার কি অভিপ্রায়, বলো।

হঠাৎ এইরকম একটা অভাবনীয় প্রস্তাবে ঘানিম হতভম্ব হয়ে যায়। এক মুহূর্ত মুখে

কথা সরে না। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আপনার মতো মহাপ্রাণ মহাপুরুষই একথা উচ্চারণ করতে পারেন। না হলে, যে কারণেই হোক, হাজার হাজার মানুষের কাছে যাকে একদিন বেইজ্জৎ করা হয়েছে, তাকে আজ আপনার হারেমের বেগম করতে চান? এত বড় সম্মান, এত বড় মর্যাদা পাওয়ার কি সে যোগ্যা?

খলিফা বলেন, আমার দোষে সে যে বস্তু একদিন হারিয়েছে তা তো আর তাকে ফেরৎ দিতে পারবো না ঘানিম। তাই আজ তাকে আমি বেগমের মর্যাদা দিয়ে সামান্য একটু ক্ষতিপূরণের সান্ত্বনা পেতে চাই।

ঘানিম বলে, ফিৎনা আপনার বাঁদী হয়ে থাকবে, জাঁহাপনা।

খলিফার হুকুমে তখুনি কাজীকে ডেকে এনে দু'খানা শাদীর কবুলনামা তৈরি করা হলো। একখানা ঘানিম আর কুৎ-অল-কুলুব-এর আর একখানা খলিফা আর ফিৎনার জন্যে। দেন-মোহর হিসাবে খলিফা ফিৎনাকে দিলেন এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। আর ঘানিম কুৎ-এর কানে কানে বললো, আমার দেন-মোহর বাকী রইলো। আজ রাতে দেব, কেমন?

কুৎ-অল-এর সারা মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে, অসভ্য কোথাকার।

সেই রাতে মহা ধূমধাম করে দুই জোড়ের শাদী হয়ে গেলো। সারা বাগদাদ শহর আলোর মালায় সাজানো হলো। নাচ গান, হৈ হল্লা, খানাপিনায় মেতে উঠলো শহরবাসীরা। সেই রাতে প্রাসাদের দুই মহলে দুই বাসর শয্যায় খলিফা-ফিৎনা আর ঘানিম-কুৎ-অল মধুযামিনী যাপন করলো।

ঘানিম-কুৎ-অলের জন্যে খলিফা একখানা সুরম্য ইমারৎ বানিয়ে দিলেন। ঘানিম দরবারের এক উচ্চ পদে বহাল হলো। মা এবং বিবি কুৎ-অলকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করতে থাকলো।

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা, ঘানিম আর কুৎ-অল-কুলুব-এর কাহিনী শুনলেন। যদি ইচ্ছা করেন, এবার আপনাকে শোনাতে পারি উমর অল-নুমান আর পুত্র দু-অল-মাকান-এর এক বিচিত্র কাহিনী।

বাদশাহ শারিয়ার বলে, বলো, আমি শুনবো।

শাহরাজাদ উমর অল-নুমান আর তার পুত্র দু-অল-মাকান-এর কাহিনী শুরু করে ঃ

খলিফাদের রাজত্ব শেষে বাগদাদে শহরে এক সময়ে উমর অল-নুমান নামে এক বাদশাহ সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলো। যুদ্ধবিদ্যায় তার সমকক্ষ সে সময়ে আর দ্বিতীয় ছিলো না। তার বিক্রমের সামনে কোনও সুলতান বাদশাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না। এমন কি সম্রাট সীজারকেও তার বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিলো। সুদূর প্রাচ্যের সমস্ত ভূখণ্ড তার পদানত ছিলো। দুনিয়ার প্রায় সব রাজা বাদশাহর কাছ থেকে নানারকম উপহার উপঢৌকন আসতো। কারণ তারা সদাসর্বদা তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো।

উমর অল-নুমানের একমাত্র পুত্র সারকান মাত্র বিশ বছর বয়সে তার বিস্ময়কর শৌর্যবীর্য দেখিয়ে দুনিয়ার সব সুলতান বাদশাহদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো। উমর তাকে প্রাণাধিক ভালোবাসতো। তার মৃত্যুর পর পুত্র সারকানই সিংহাসনে বসবে এই ছিলো তার একান্ত বাসনা।

উমর-এর চারটি বেগম। তার মধ্যে তিন বেগমের কোন সন্তানাদি হয়নি।

সারকানই একমাত্র সন্তান। এই চার বেগম ছাড়াও উমরের তিনশো ষাটটি রক্ষিতা ছিলো। নানা দেশের, নানা জাতের নানা ধর্মের মেয়ে তারা। সবাই পরমা সুন্দরী যুবতী। উমর প্রত্যেক রক্ষিতার জন্যে খোজা দাসী পরিবৃত আলাদা আলাদা সুসজ্জিত কক্ষের ব্যবস্থা করেছিলো। প্রাসাদের হারেমে তিনশো ষাটটি কক্ষে এই রক্ষিতাদের বসবাসের ব্যবস্থা হয়েছিলো। প্রতি দিন উমর এক একজন রক্ষিতার ঘরে রাত কাটাতো। তার হারেম বিভক্ত ছিলো বারোটি মহলে। প্রতি মহলে তিরিশটি রক্ষিতার ঘর। প্রতিটি রক্ষিতার ঘরে একটি মাত্র রাত্র অতিবাহিত করতেই এক মাস কাল সময় কেটে যেতো। এইভাবে সে পুরো এক বছরে সমগ্র হারেমের প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে একবার মাত্র সহবাস করতো। কোন রক্ষিতাই এক বছরের আগে দ্বিতীয়বার উমরের দর্শন পেতো না। তার এই ন্যায় বিচারে সব রক্ষিতাই খুব খুশি। দেশের আপামর জনসাধারণ শাহেনশাহর এই অলৌকিক বীর্যবত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো।

একদিন উমরের কাছে খবর এলো, তার অন্যতম রক্ষিতা সফিয়া অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। বাদশাহ তো আনন্দে আত্মহারা। বহুকাল বাদে তার আবার সন্তান হবে। উমর-এর দৃঢ় প্রত্যয়, পুত্র সন্তানই প্রসব করবে তার রক্ষিতা।

যথা সময়ে সফিয়া একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলো। উমর অধীর আগ্রহে দরবার কক্ষে পায়চারি করছিলো। খোজা দূত এসে খবর দিলো, একটি কন্যা সন্তান হয়েছে। বাদশাহ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। কিন্তু উমরের পুত্র সারকান শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। যাক একটা মস্ত ফাঁড়া কাটলো। সে-ই একচ্ছত্র অধিপতি হতে পারবে। আর কাউকে ভাগ দিতে হবে না।

এই সময় শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো। বাদশাহ শারিয়ার দেখলো, রজনী অতিক্রান্ত হতে চলেছে।

পরদিন পঁয়তাল্লিশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার শাহরাজাদ গল্প শুরু করে ঃ

সারকান ভাবলো, যাক বাঁচা গেলো, সেই একচ্ছত্র অধিপতি হতে পারবে। আর কাউকে ভাগ দিতে হবে না। সারকান মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো, যদি পুত্র সন্তানও হয় তবু সে-ই অদ্বিতীয় শাহেনশাহ হবে। নব-জাতককে যেন তেন প্রকারেণ ধরাধাম থেকে সে সরিয়ে দেবেই।

কিছুক্ষণ বাদে আবার সেই খোজা দূত এসে সংবাদ দিলো, শাহেনশাহ, মালকিন আরও একটি সন্তান প্রসব করেছেন। এবারেরটি ছেলে।

উমর অল-নুমান আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। খোজাকে সঙ্গে নিয়ে তখুনি সেই রক্ষিতার কক্ষে ছুটে এলো।

গ্রীক সম্রাট উমরকে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলো এই বাঁদীটি। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী সুঠামদেহী এই গ্রীক রমণী সফিয়া নাচে গানে শিক্ষায় দীক্ষায় বিশেষ পটিয়সী। আচার ব্যবহারে কথাবার্তায় একেবারে চৌকস। বছরে একটি মাত্র রাত্রি উমর তার সঙ্গে সহবাস করতো। সেই একটি রাতই সে এমন মধুময় করে তুলতো, যার পুরস্কার স্বরূপ আজ লাভ করেছে জোড়া সন্তান। উমর দেখলো, ছেলেটি দেখতে অবিকল তারই মতো হয়েছে। কিন্তু গায়ের রং রূপ হয়েছে তার মা-এর মতো।

প্রাসাদে আনন্দের হাট বসলো। খানাপিনা নাচ গান হৈ হল্লায় মেতে উঠলো সবাই। উমর নামকরণ করলো। মেয়ের নাম রাখা হলো, নুজাত-অল-জামান আর ছেলের নাম রাখলো দু-অল-মাকান। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। গুলাবজল, আতর, আগরবাতি, মৃগনাভী কস্তুরীর সুবাসে ভরে উঠলো প্রাসাদ। জনে জনে মিষ্টি বিতরণ করা হলো। দীন দুঃখীদের পেট ভরে খাওয়ানো হলো। প্রত্যেককে উপহার দেওয়া হলো নতুন নতুন সাজ-পোশাক।

সমস্ত শহরটা আলোর মালায় সাজানো হলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্থাপন করা হলো তোরণ-দ্বার।

এর পর থেকে প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় উমর খোজা দূতের মাধ্যমে সফিয়া আর তার সন্তানদের সংবাদে পেতে থাকে। উমর নিজে পছন্দ করে হিরে-জহরতের অলঙ্কার বানাতে দিতো। এবং প্রায়ই নিজে গিয়ে দিয়ে আসতো সফিয়ার হাতে। এইভাবে চারটি বছর কেটে গেলো। এবারে সে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলো। তার পরম বিশ্বাসভাজন এক প্রাজ্ঞ শিক্ষককে নিযুক্ত করলো উমর।

সারকান কিন্তু এ সবের কিছুই জানতো না। বাবার এক রক্ষিতা গর্ভবতী শুনে সে প্রাসাদে অবস্থান করছিলো। তার মৎলব ছিলো খারাপ। যদি শোনে পুত্র হয়েছে, যে কোন উপায়ে তার প্রাণ সংহার করবে—এই ছিলো তার পণ। কিন্তু খোজা দূতের মুখে যখন শুনলো, সফিয়া কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে, তার তিলমাত্র অপেক্ষা না করে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে পরদেশ আক্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলো। দ্বিতীয়বার খোজা এসে যখন খবর দিলো, শুধু কন্যা নয়, সফিয়া আর একটি পুত্র সন্তানেরও জননী হয়েছে, তখন সারকানের অশ্বক্ষুরধ্বনি বাগদাদ ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূর দেশের মানুষের বুকে আতঙ্ক জাগিয়েছিলো। তারপর পুরো চারটি বছর ধরে সে বহু দেশ জয় করেছে। বহু সম্রাট তার পদানত হয়েছে। বশ্যতা স্বীকার করেছে। কিন্তু এদিকে যে তার আর এক অংশীদার গোকুলে বাড়ছে সে-কথা আর কানে পৌঁছলো না।

একদিন উমর অল-নুমান সিংহাসনে বসে আছে, এমন সময় একদল আমীর ওমরাহ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রবেশ করে যথাবিহিত কুর্নিশ জানালো।

শাহেনশাহ, আমরা আসছি রোমের সম্রাট আফ্রিদুন-এর দূত হয়ে। যদি আপনি বিরূপ হন, আমরা বিদায় নিয়ে চলে যাবো। আর যদি আপনার আজ্ঞা হয়, আমরা আসন গ্রহণ করতে পারি। আমাদের সম্রাট রোম, গ্রীস ও ইয়োনিয়ার অধিপতি। কনসতানতিনোপোল শহরে তার প্রাসাদ। সেখানেই তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। আমরা তার আজ্ঞা-বহ দাস মাত্র। তিনি আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন। সিসারিয়ার দুর্ধর্ষ সম্রাট হারদুব-এর প্রচণ্ড আক্রমণে হাজার হাজার নিরীহ প্রজাবৃন্দ প্রাণ হারাচ্ছে।

উমর জানতে চাইলো, কেন, কি কারণে? ঝুট মুট সে আক্রমণই বা করবে কেন?

—কারণ যা তা হলো এই ঃ

কিছুদিন আগে আমাদের এক আরব সেনাপতি মরুপ্রান্তর অতিক্রম করার সময় এক জায়গায় এক রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পায়। সম্রাট আলেকজান্দার সারা পৃথিবী জয় করে সমস্ত ধনরত্ন এনে লুকিয়ে রেখেছিলো এই জায়গায়। সেই বিপুল বৈভব-এর পরিমাণ করা সম্ভব নয়। হীরা, জহরৎ, মণিমুক্তার পাহাড়। এর মধ্যে তিনটি গ্রহরত্ন ছিলো, যার অলৌকিক গুণে দুরারোগ্য ব্যাধি সারে। বিশেষ করে শিশুদের অসুখে ধন্বন্তরী। আমাদের সেই আরব সেনাপতি এইসব পাথরের গুণাগুণ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলো। সুলতানকে ভেট দেবার জন্যে দু'টো জাহাজ বোঝাই করে সে এই সব ধনরত্ন কনসতানতিনোপোলে নিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু এমনই বরাত, জাহাজ ছাড়ার কিছু পরেই গ্রীক সৈন্যের দামামা শোনা যায়। খবর আসে সিসারিয়ার সম্রাট হারদুব সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের সেনাপতি হারদুবের প্রচণ্ড আক্রমণ

প্রতিরোধ করতে পারে না। যাবতীয় ধনরত্ন লুঠপাট করে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ঐ তিনখানা অলৌকিক পাথরও তার হস্তগত হয়ে পড়ে। আমাদের সম্রাট আফ্রিদুন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠালো। কিন্তু তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিলো হারদুব। আরও এক জাহাজ সৈন্য পাঠানো হলো। তারাও ফিরে এলো না। পরে আরও এক জাহাজ সৈন্য তার দাপটের সামনে দাঁড়াতে না পেরে প্রাণ ভয়ে পশ্চাদাপসরণ করে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

আমাদের সুলতান দারুণ ক্রুদ্ধ। কিন্তু নিরুপায়। হারদুবের মতো প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটকে দমন করার মতো শক্তি তার নাই। এখন আপনার কাছে এসেছি। আমাদের প্রার্থনা—এই নিদারুণ সঙ্কটের দিনে আপনি আমাদের সম্রাটকে সাহায্য করুন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার প্রবল পরাক্রম সে সহ্য করতে পারবে না। পরাজয় তাকে স্বীকার করতেই হবে। এই আমাদের সম্রাটের বাসনা। তিনি আপনাকে নানা উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। আপনার আদেশ পেলেই আমরা জাহাজ খালাস করার নির্দেশ দিতে পারি।

এই সময় শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

ছেচল্লিশতম রজনী।

আবার সে গল্প শুরু করে।

কনসতানতিনোপোলের সম্রাট আফ্রিদুনের প্রতিনিধিরা বললো, সম্রাট যে সব উপহার পাঠিয়েছেন তার মধ্যে আছে পঞ্চাশটি পরমা সুন্দরী গ্রীসের কুমারী কন্যা। আর পঞ্চাশটি গ্রীসের সুঠাম দেহী নওজোয়ান। সবাই রত্নালঙ্কারে এবং বাহারী সাজপোশাকে সুসজ্জিত। মণিমুক্তা ছাড়া তাদের স্বর্ণালঙ্কারের ওজনই হবে প্রায় এক হাজার কিলো। মেয়েরাও তদনুরূপ রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে এসেছে। এই দুই প্রধান উপহার ছাড়াও আরও সহস্রবিধ সামগ্রী সঙ্গে পাঠিয়েছে। মূল্যায়ন করলে সে সবের দামও কিছু কম নয়।

উমর খুশি হলো। বললো, আমি আপনাদের সম্রাটের উপহার গ্রহণ করলাম।

তারপর উজিরকে নির্দেশ দিলো, এদের যথাযোগ্য আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো। তারপর আমার কাছে একবার এসো, তোমার সঙ্গে কিছু গোপন পরামর্শ আছে।

অভ্যাগত অতিথিদের সৎকারের ব্যবস্থা করে বৃদ্ধ উজির দানদান উমরের নিভৃত কক্ষে ফিরে এলে বাদশাহ বললো, কনসতানতিনোপোলের সম্রাট আফ্রিদুন আমার সাহায্য চায়। এখন বলো, কি করা উচিত?

বৃদ্ধ উজির ধীর শান্তভাবে বলতে থাকে, কনসতানতিনোপোলের সম্রাট বিধর্মী কাফের খ্রীষ্টান। তার প্রজারাও সবাই কাফের। অবশ্য তার শত্রুপক্ষ তারই স্বজাতি। সেও কাফের, বিধর্মী খ্রীষ্টান। সুতরাং সেদিক থেকে আমাদের আপত্তির কিছু নাই। এর ফলে ইসলাম ধর্মের প্রতি কোনও আঘাত আসবে না। আমার পরামর্শ, আপনি আপনার যোগ্য পুত্র সারকানকে পাঠান। সে যুদ্ধবিদ্যায় পরম বিক্রমশালী। তার হাতে সিসারিয়া সম্রাটের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর তাছাড়া আপনার মতো বিশ্ববিজেতা শাহেনশাহকে যদি, সামান্য এক সিসারিয়া সম্রাটকে পরাজিত করতে, বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে হয়, মোটেও তা গৌরবের হবে না। লোকে বলবে, মশা মারতে কামান দাগা। তবে সাহায্য আপনার পাঠানো দরকার। কারণ, তার প্রেরিত উপঢৌকন আপনি গ্রহণ করেছেন। তার প্রতিনিধিদের শর্তই ছিলো, সব শুনে আপনি যদি সম্মত হন তবেই তারা জাহাজ খালাস করে উপঢৌকন নিয়ে আসবে। নচেৎ ফিরে যাবে।

উমর অল-নুমান, ঘাড় নাড়লো, ঠিক-ঠিক বলেছো উজির। একবার যখন তার

উপহার গ্রহণ করেছি, সাহায্য তাকে করবোই। তোমার মতো প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ উজির আমার অহঙ্কার। আজ থেকে তোমাকে আমি আমার সৈন্যবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করলাম। আমার পুত্র সারকান তোমার নির্দেশে যুদ্ধ পরিচালনা করবে।

সারকানের কাছে দূত পাঠানো হলো। কয়েক দিনের মধ্যে পুত্র ফিরে এলে উমর জানালো, উজিরকে প্রধানহিসাবে সঙ্গে নিয়ে তুমি সিসারিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও। আমার বাছাই করা দশ হাজার ফৌজ আর তাদের খানাপিনা, প্রয়োজনীয় লটবহর নিয়ে যত শীঘ্র পারো বেরিয়ে পড়ো।

সারকান পিতার আদেশ শিরোধার্য করে বললো, আমাকে মাত্র তিন দিনের সময় দিন, শাহেনশাহ। আমি তার মধ্যে আমার সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে নিচ্ছি।

তিনদিন পরে উমর অল-নুদান দশ হাজার কুর্নিশ গ্রহণ করে সৈন্যবাহিনী সহ পুত্র সারকান এবং বৃদ্ধ উজির দানদানকে বিদায় জানালো।

সারকান বাছাই করা সমর সম্ভার নিয়ে রওনা হলো। বিশ দিনের পথ। সম্রাট আফ্রিদুন তার জন্যে এক বিরাট ছাউনি তৈরি করে রেখেছে। প্রথমে যেখানে গিয়ে ডেরা গাড়তে হবে। বিদায়কালে সুলতান উমর অল-নুদান সাতটা বাক্স ভর্তি মোহর সঙ্গে দিয়েছে। উজির দানদানকে বলে দিয়েছে, এগুলো সে যেন তার নিজের হেপাজতে রাখে।

একুশ দিনের মাথায় সারকান তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হলো এক সুরম্য উপত্যকায়। এখানেই তার জন্যে ছাউনি প্রস্তুত করে রেখেছে সম্রাট আফ্রিদুন। সারকান তার অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলো, এই ছাউনিতে তিনদিন বিশ্রাম নিতে হবে।

এই ছাউনির অদূরেই সম্রাট হারদুবের অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা। সারকান ঠিক করলো, গোপনে গোপনে সব পথঘাট আগে দেখে নিতে হবে। কোনদিক দিয়ে কিভাবে আক্রমণ চালাতে হবে তার জন্যেই এই গোপন অনুসন্ধান দরকার। নিজের দেহরক্ষীদের বিদায় দিয়ে একাই সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। যত দূর যায় শুধু গভীর জঙ্গল। কোন জনবসতির চিহ্ন নাই। এইভাবে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়। সারকান-এর ক্লান্তি আসে। একটা বিশাল বৃক্ষের নিচে ঘোড়াটাকে দাঁড় করায়। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘোড়র পিঠে চেপে থেকেই একটুক্ষণের জন্য সে ঘুমিয়ে নেয়। তারপর আবার এগোতে থাকে। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে কান পেতে শোনে, অদূরে নারী কণ্ঠের কলহাস্য। এত রাতে এই গভীর জঙ্গলে নারী কণ্ঠ আসে কোথা থেকে। সারকান ভাবে, নিশ্চয়ই অদূরে কোথাও লোকালয় আছে। কিন্তু না, আশে পাশে কোথাও কোন ঘর বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেলো না। এবার কিন্তু সেই হাসির শব্দ আরও উচ্চতর হতে থাকে। হোহো—হাহা—হিহি এই ধরনের অট্টহাসিতে মুখর হয়ে ওঠে।

সারকান-এর ভয় হয়। নিশ্চয়ই কোন ভৌতিক ব্যাপার। এখন একমাত্র আল্লাহই ভরসা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এসে সেই হাসির শব্দ অনুসরণ করে সারকান হাঁটতে থাকে। চলতে চলতে অবশেষে হাজির হয় এক নদীর ধারে। কুলকুল করে বয়ে চলেছে স্রোতধ্বনি। তার তীরে গাছের ডালে পাখীরা কুলায় ফিরে মিষ্টি মধুর আওয়াজ তুলে গান ধরেছে। যেদিকে তাকায়, দেখে নানা বিচিত্র রঙের ফুলের মেলা।

সারকান দেখলো নদীর ওপারে চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় আবছা আবছা দেখা গেলো বিরাট উঁচু মিনারওয়ালা এক প্রাসাদ। একেবারে নদীর তীরে। নদীর শান্ত জলে তার ছায়া পড়েছে। মনে হলো ঐ প্রাসাদে মানুষের বসতি আছে। এবং ঐ অট্টহাসির আওয়াজ ওখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে।

ক্রমশ চাঁদের আলো আরও উজ্জ্বল হয়। এবার পরিষ্কার দেখা যায়, প্রাসাদের সামনে একখণ্ড সবুজ প্রাঙ্গণ। তার মাঝখানে একটি অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণীকে ঘিরে বৃত্তাকারে

কলহাস্যরত দশটি যুবতী। এই রূপসীর অট্টহাসিই সে দূর থেকে শুনতে পেয়েছিলো। এবারে তার কথাও শোনা গেলো। পরিষ্কার আরবীতে বলছে ঃ তোদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তোরা সব অপদার্থ। অমন ন্যাকাপনা করলে কুস্তি লড়া যায় না বুঝলি! কুস্তির জন্যে দেহে তাগদ দরকার। নে আয়, আমাকে হারানো চাই।

একটা একটা করে মেয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু এক একটা প্যাঁচেই এক একজনকে কাত করে ফেলে দেয়। মেয়েগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। শুধু ইজের আর কাঁচুলী পরা সেই তরুণী কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়। দু'হাতে নিজের জঙ্ঘা থাবড়াতে থাবড়াতে আবার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, এই ওঠ—ওঠ শিগ্গির। আয় লড়বি আয়। কিন্তু কেউ আর সাহস করে না। তখন মেয়েটি ক্ষেপে যায়, কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি। ওঠ বলছি, নইলে কিন্তু বেল্টের বাড়ি দিয়ে পাছা ফাটিয়ে দেব।

ভয়ে ভয়ে একটি মেয়ে উঠে আসে। কিন্তু পলকেই তাকে তুলে আছাড় দেয় সে। এইভাবে এক এক সব কটা মেয়েকেই অতি সহজেই কাবু করে ফেলে। এই সময় একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এক বয়স্কা রমণী।—মেয়েগুলোকে নিয়ে কি সব ছিনিমিনি খেলছো। ওরা কি কুস্তি জানে যে ওদের সঙ্গে কুস্তি লড়ছো? এই সব আনাড়ী মেয়েগুলোর ওপর তোমার কায়দা কসরৎ দেখিয়ে কি এমন মজা পাচ্ছো? তার চেয়ে যে কুস্তি জানে তার সঙ্গে লড়ে দেখাও তোমার হিম্মৎ, তবে বুঝি? সত্যিই তুমি যদি কুস্তিই লড়তে চাও এসো, আমার সঙ্গে লড়বে। আমি বুড়ো হয়েছি। তবু তোমাকে একটু শিক্ষা দিতে পারবো।

তরুণীটি মনে মনে বিরক্ত হয়। কিন্তু মুখে প্রকাশ করে না। বলে, বুড়িমা তামাশা করছো, না সত্যি সত্যিই লড়তে চাও আমার সঙ্গে?

—কেন, তামাশা করবো কেন? এসো, সত্যিই একবার দেখে নিই, কতখানি প্যাচ পয়জার তুমি শিখেছো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতচল্লিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু করে ঃ

তখন সেই তরুণী হুঙ্কার ছাড়ে, তবে এসো, কেমন করে তোমার ঘাড় মটকাই একবার দেখে যাও।

এই বলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বয়স্কার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তখন বয়স্কা রমণীটি বলে, দাঁড়াও, কুস্তি লড়তে গেলে তো আর এই জবুথুবু সাজপোশাকে লড়া যাবে না। পোশাক আশাক আগে খুলে ফেলি। তারপর দেখবো, তোমার কত হিম্মৎ।

এই বলে সেই বিশাল বপু কুৎসিৎ রমণী তার সব সাজপোশাক খুলে ছুঁড়ে ফেলে। এমন কি ইজেরটা পর্যন্ত। তরুণীকে উদ্দেশ করে বলে, তুমিই বা কাঁচুলী ইজের পরে রইলে কেন? ওটা ধরে টান দিলে তো এখুনি কুপোকাৎ হয়ে যাবে।

এক মুহূর্ত কি চিন্তা করলো মেয়েটি। তারপর সেও খুলে ফেললো তার কাঁচুলী আর ইজের। সেই চন্দ্রালোকে সারকান পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করতে পারলো, শ্বেত পাথরে খোদাই করা এক অপ্সরী মূর্তি। আর তার সামনে বীভৎস-দর্শনা কালো কুৎসিত ভাল্লুকীর মতো এক মধ্যবয়স্কা রমণী।

দুই কুস্তিগীর তাক করে গুটি গুটি মুখোমুখি এগোতে থাকে। দু'জনেই নিজের

নিজের জঙ্ঘা থাবড়াতে শুরু করে। সারকান আর হাসি রুখতে পারে না। মনে হয় সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে।

প্রথম প্যাঁচ থেকে পিছলে বেরিয়ে আসে তরুণী। বয়স্কার ঘাড়টা বাঁ হাতে চেপে ধরে ডান হাতটা চালিয়ে দেয় তার দুই জঙ্ঘার মাঝখান দিয়ে। তারপর একটা ঝাঁকি দিয়ে ঐ বিশাল বপুটা মাথার উপরে তুলে ছুঁড়ে দেয় সাত হাত দূরে। বয়স্কাটি কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে তেড়ে আসে তরুণীর দিকে। আবার তাকে অতি সহজেই তুলে আর এক আছাড় দেয়। এবার আর সে উঠে দাঁড়াতে পারে না। তরুণী এগিয়ে আসে। তার পোশাক-আশাক এগিয়ে দিয়ে বলে, বুড়ি মা, আমার কিন্তু কোনও দোষ নাই। আমি চাইনি। কিন্তু তুমি আমাকে চটিয়ে দিলে, তাই তোমার সঙ্গে লড়তে নেমেছিলাম। যাই হোক, যীশুর দয়ায় তোমার তেমন কোন চোট-ফোট লাগেনি তো! নাও ওঠ।

বয়স্কা কোন কথা বললো না। সাজপোশাক নিয়ে বাগান ছেড়ে ওপাশে চলে গেলো।

সারকান দেখলো তরুণীটি একা পায়চারী করছে। তার দশটি বাঁদী সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে ঘাসের উপর পড়ে আছে। সারকান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে এক লাফে নদী পেরিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে যায়। মেয়েটি তখন আনমনে অস্তমিত চাঁদের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলো। সারকান পিছনে এসে দাঁড়ায়। আচমকা চিৎকার করে ওঠে, আল্লাহ সর্ব-শক্তিমান।

তরুণীটি হতচকিত হয়ে ছিটকে সরে যায় খানিকটা। তারপর সারকানের দিকে নজর পড়তেই নদীর দিকে দৌড়ে পালায়। নদীটা চওড়ায় মাত্র ছ'সাত হাত। এক লাফে ওপারে গিয়ে দাঁড়ায়। সুললিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে তুমি, আমাদের এই নিরালা নির্জন প্রাঙ্গণে এসে তলোয়ার হাতে দাঁড়ালে? এমন ভাব করে এসেছো, যেন কোনও বীরপুরুষ, সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করতে এসেছো। তুমি আসছো কোথা থেকে, আর যাবেই বা কোথায়? সাফ সাফ সত্যি কথা বলো। না হলে ভেবো না এখান থেকে পালিয়ে রেহাই পাবে। আমার এক ডাকে চার হাজার খ্রীষ্টান সৈন্যসামন্ত বেরিয়ে আসবে। আমার নির্দেশেই তারা চলে। এখনও সত্যি করে বলো, তুমি কি চাও? যদি এই অরণ্যে পথ হারিয়ে এখানে এসে থাকো, আমি তোমাকে আবার পথের নিশানা বাৎলে দেব।

—আমি এক বিদেশী মুসলমান মুসাফির, সারকান বলে, না, আমি পথ হারিয়ে আসেনি এখানে। আজ রাতের সঙ্গী হিসাবে গোটা কয়েক তাগড়াই মেয়েছেলে খুঁজতেই বেরিয়েছি। তোমার এই দশটা বাঁদী আমাদের সে-ক্ষুধা মেটাতে পারবে, আশা করি। যদি তোমার অমত না থাকে তবে আমার সঙ্গীসাথীদের আস্তানায় এদের নিয়ে যেতে পারি।

—তুমি একটা মিথ্যেবাদী ভণ্ড সৈনিক। তোমার এসব কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার ধারণা, তোমার অন্য কোনও বদ মৎলব আছে।

ওগো সুন্দরী, যে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারে সেই প্রকৃত সুখ পায়। আর কোনও সুখই সুখ নয়—যার সঙ্গে আল্লাহর নামগান জড়িত থাকে না।

তরুণী তখন বলে, তোমার এসব ভণ্ডামী। আসল কথা চেপে যাচ্ছো। আমি কিন্তু আমার সৈন্যবাহিনী তলব করতে বাধ্য হবো। এখনও সত্যি কথা বলো। তুমি যদি প্রকৃত মুসাফির হও, আমার দ্বারা তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। বিশেষ করে তুমি যখন দেখতে শুনতে সুন্দর সুপুরষ। তোমাদের রাত্রি সহবাসের জন্যে এই বাঁদীগুলোকে যদি প্রয়োজন হয় স্বচ্ছন্দে দিতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ো। তোমার অস্ত্রশস্ত্র রেখে দাও। আমি যেমন খালি হাতে তেমনি খালি হাতে এগিয়ে এসো আমার কাছে। আমার সঙ্গে এক হাত

লড়তে হবে। আমাকে যদি তোমার পিঠে তুলে নিতে পারো, এই সব বাঁদী তোমার হবে। আমাকেও যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যদি না পারো? লড়াইয়ে যদি আমার হাতে হেরে যাও? তাহলে তোমাকে আমার গোলাম হয়ে থাকতে হবে।

সারকান ভাবে, মেয়েটা পাগল? সে জানে না কার সামনে দাঁড়িয়ে এই সব হাম বড়াই বাত ছাড়ছে। বললো, আমি রাজী। কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেবো না। শুধু হাতে তোমার সঙ্গে আজ কুস্তি লড়বো, এসো। যেভাবে চাও সেইভাবেই লড়বো। চলে এসো। আমি যদি হেরে যাই, তবে মুক্তি পণ হিসাবে যত টাকা চাও আমি দেব। আর তুমি যদি হারো তুমি হবে আমার সুলতানের উপহারের পাত্রী। আল্লাহর পয়গম্বরের নামে হলফ করে বলছি—আমার কথার নড়চড় হবে না।

মেয়েটি বললো, আবার পয়গম্বর কেন, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যাঁর দৌলতে বেঁচে আছো তাঁর নামে কসম খেয়ে বলো, কথার কোনও এদিক ওদিক করবে না।

সারকান সেইভাবেই হলফ করলো।

তরুণীটি তখন এক লাফে আবার নদীটা পেরিয়ে আসে। উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে। বলে, এখনও বলছি, ভালো মানুষের ছেলে, মানে মানে কেটে পড়ো। সকাল হতে আর বেশি দেরি নাই। এখনই আমার বাঁদীরা সব জেগে উঠবে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে যে রোগা পটকা সে-ই তোমাকে তুলে আছাড় দেবে।

এই বলে সে সারকানকে পাশ কাটিয়ে বাগিচার অপর প্রান্তে চলে যায়। সারকান দেখে, মেয়েটি কুস্তির কথাটা বেমালুম চেপে যেতে চাইছে। একটু আগেই সে যে তাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেছিলো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও-সব তার বাহানা।

সারকান অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, এই না, পাঁয়তারা করলে তুমি আমার সঙ্গে কুস্তি লড়বে? কই, কি হলো? এখন সুড় সুড় করে কেটে পড়ছো কেন?

মেয়েটি মুচকি হেসে বলে, তুমি কি চাও, আমার হাতে মান ইজ্জত খোয়াবে? ঠিক আছে, আমার কোনও আপত্তি নাই।

সারকান বলে তোমার দরবারে যখন এসেই পড়েছি, তোমাকে একটু সেবা যত্ন না করে যাবো না। আমি তো তোমার দাসানুদাস।

—তা কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলোনি। আচ্ছা, ঘোড়া থেকে নামো। তুমি আমার মেহেমান।

সারকান পুলকিত হয়। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। মেয়েটি তার ঘোড়াটাকে একটা বাঁদীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, ভালো করে দানাপানি খাওয়াবার ব্যবস্থা কর।

সারকান বলে, সুন্দরী, তোমার রূপে যেমন মোহিত হয়েছি, তেমনি তোমার আদর আপ্যায়নও আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে—এই বনবাদাড়ে পড়ে থেকে জীবনটাকে নষ্ট করছো কেন? চলো, আমাদের বাগদাদ শহরে নিয়ে যাবো তোমাকে। দেখবে কত মজা পাবে। কত সুন্দর শহর, চোখ জুড়িয়ে যাবে। আর দেখতে পাবে দুনিয়ার সেরা সব বীরপুরুষ। আর দেখবে, আমার কি খাতির। চলো সুন্দরী, একবার সেই মনভোলানো দেশ বাগদাদেই চলো আমার সঙ্গে।

—হা ঈশ্বর, আমি ভেবেছিলাম, তুমি একজন জ্ঞানীগুণী মানুষ। এখন বুঝলাম তোমার মাথার ইস্কুরুপ কিছু নড়বড়ে আছে।

—কেন, কেন?

—তা না হলে অসভ্য বর্বরদের আস্তাবল বাগদাদে নিয়ে যেতে চাও আমাকে। ওখানে শুনেছি বাদশাহ উমর অল-নুমানের হারেমে তিনশো ষাটটি রক্ষিতা আছে। লোকটা নাকি প্রত্যেক রাতে একটা রক্ষিতাকে নিয়ে শোয়। আর সারা রাত ধরে মেয়েটার মাংস ছিঁড়ে

ছিঁড়ে খায়। জানোয়ার কোথাকার। তুমি আমাকে সেই লোকটার থাবার মধ্যে ছুঁড়ে দিতে চাইছো? সারা বছরের মধ্যে একটা রাত সে আমার ঘরে আসবে। পশুর মতো অত্যাচার করে চলে যাবে। তারপর আবার একটা বছর ধরে তার পথ চেয়ে ভিখিরির মতো বসে থাকবো। ঈশ্বর রক্ষা করুন, মরে গেলেও ঐ শয়তানের খপ্পরে পড়তে রাজী নই। আর কখনো ওসব কথা বলে আমাকে লোভ দেখাবার চেষ্টা করো না। এমন কি তুমি যদি স্বয়ং সারকানও হও,তবু তোমার সঙ্গে যাবো না।

—সারকান কে, তুমি জানো?

—জানবো না কেন? বাগদাদের বাদশাহ উমর অল-নুমানের পুত্র। জাঁদরেল যোদ্ধা। তার দাপটে সবাই নাকি থর থর কম্পমান। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে সে এসেছে। ছাউনি ফেলেছে আমাদের দেশের সীমান্তে। সম্রাট আফ্রিদুনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করবে আমাদের সম্রাট হারদুবের বিরুদ্ধে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, একাই আমি চলে যাই ওর ছাউনিতে। শয়তানের বাচ্চার মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে আসি। সে আমাদের পরম শত্রু। যাক, ওসব কথা, এখন এসো, আমার সঙ্গে এসো।

এই সময়ে রাত্রি অবসান হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটচল্লিশতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়।

সারকান বুঝতে পারলো মেয়েটি তার এবং তার সৈন্যদলের ওপর কি রকমটা চটা। ভাগ্যে সে নিজের পরিচয় দিয়ে ফেলেনি। তা হলে তো এতক্ষণে তাকে সাবাড় করে দিতো। তরুণীর পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চলে সারকান।

একটা বিরাট ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটি বলে, চলো, ভেতরে চলো।

একটা সুসজ্জিত সুরম্য কক্ষে তারা প্রবেশ করে। মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো ঝকঝকে তকতকে। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে অনেকগুলো ঝাড়বাতি। সারা ঘরময় মোমের মিষ্টি মধুর নরম আলো আতর আর আগরবাতির সুবাসে মন মেতে ওঠে। সারকান ভাবে সে এক স্বপ্ন পুরীতে এসে পড়েছে। ঘরের এক পাশে একটি বিশাল শয্যা।

মেয়েটি বলে, এখানে শুয়ে বিশ্রাম করো।

সারকান বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। দাসী বাঁদীরা এসে তার চারপাশে বসে পড়ে। মেয়েটি অন্য ঘরে চলে যায়।

অনেকক্ষণ একা একা শুয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েটি আর ফিরে আসে না। সারকান বাঁদীদের জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মালকিন কোথায় গেলো, আর আসবে না?

—না। তিনি ঘুমুতে গেলেন—

সারকান উঠে বসে। ভাবে, কি করা যায়। মেয়েটি তাকে একা ফেলে চলে গেলো?

দাসী বাঁদীরা নানারকম খানাপিনা নিয়ে এলো। সারা রাত কিছু খাওয়া হয়নি। সারকান অনুভব করে, দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে তার।

বাঁদীরা সোনার থালায় খানা সাজিয়ে দিয়ে বলে, মেহেরবানী করে একটু কিছু খেয়ে নিন।

সারকান আর অপেক্ষা না করে গোগ্রাসে খেতে থাকে। অপূর্ব স্বাদ। এমন খানা সে বহুকাল খায়নি। বাঁদীরা গোলাপ জল দিয়ে তার হাত মুখ ধুইয়ে দেয়। কেউ তোয়ালে এনে মুছিয়ে দেয় মুখ।

সারকান এবার আবার সৈন্যদের কথা ভেবে চিন্তিত হয়। সেই পাহাড়ী উপত্যকায়

ছাউনিতে তাদের ফেলে রেখে চলে এসেছে। নতুন জায়গা। বিদেশ বিভুঁই। যদি কোন অতর্কিত আক্রমণ হয়? তার বাবার সতর্কবাণী মনে পড়ে। নিজের সৈন্যসামন্ত ছেড়ে কোথাও যাবে না। তাদের সুখেই তোমার সুখ। তাদের দুঃখেই তোমার দুঃখ—এই তোমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হবে। অথচ বাবার সে-নির্দেশ উপেক্ষা করে আজ সে বিলাসব্যসনের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে! ক্রমশই সে অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। আরও খারাপ লাগে মেয়েটার এই রহস্যজনক অনুপস্থিতি। না বলে কয়ে তাকে একা ফেলে রেখে মেয়েটা এইভাবে হাওয়া হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি। তাছাড়া মেয়েটার কোনও পরিচয়ই সে জানে না। আর এই সুরম্য-প্রাসাদই বা কোন সুলতান বাদশাহর তাও তার কাছে অজ্ঞাত। এ অবস্থায়, এখানে এইভাবে থাকা কি তার পক্ষে নিরাপদ? এই সব ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলা চোখ খুলতে দেখতে পায়, ঘরের ঠিক মাঝখানে গোটা কুড়ি দাসী বাঁদী পরিবেষ্টিত হয়ে সেই সুন্দরী। চোখ ধাঁধানো জমকালো সজে সজ্জিতা। তার সেই মনোমোহিনী রূপ দেখে সারকানের সব কিছু ওলোট পালোট হয়ে যায়। ভুলে যায়, কোথায় তার সৈন্যসামন্ত কোথায় তার ছাউনি, কেনই বা এই দূর দেশে সে এসেছে। ভুলে যায় তার বাবার উপদেশ।

মেয়েটি অপরূপ লাস্যময়ী ভঙ্গীতে তার পাশে এগিয়ে আসে।

—তুমিই সারকান? উমর অল-নুমানের পুত্র? তবে আমার কাছে চেপে গেছো কেন? কেন নিজের পরিচয় দাওনি? তুমি না প্রবল পরাক্রান্ত বাদশার ছেলে? তোমার পক্ষে এই ধরনের কাপুরুষের মতো আচরণ কি শোভা পায়?

সারকান বুঝতে পারে, আর লুকিয়ে লাভ নাই। মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে ঢাকা যায় না। তাতে পরিণামে আরও খারাপ হবে।

—তুমি ঠিকই ধরেছো সুন্দরী। আমি সারকান। উমর অল-নুমান আমার বাবা। আমার আর কিছু বলার নাই। এখন তোমার যা অভিরুচি করতে পারো। যদি কিছু সাজা দিতে চাও, মাথা পেতে নেবো।

মেয়েটি এক মুহূর্ত কোনও কথা বলতে পারে না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে সারকানের চোখে চোখ রেখে বলে, তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নাই সারকান, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করবো না। তুমি আমার মহামান্য মেহেমান। ঐ নুন আর রুটি সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তোমার কোনও ক্ষতি তো করবোই না, বরং অন্য কেউ যদি তোমার অনিষ্ট করতে আসে, আমাকে না মেরে তা করতে পারবে না। তোমাকে রক্ষা করার সব দায়দায়িত্ব আমার।

মেয়েটি এসে সারকানের পাশে বসে। একটা গ্রীক বাঁদীকে উদ্দেশ করে কি যেন বলে। সারকান গ্রীক ভাষা জানে না। একটু পরে বাঁদীটা একটা বারকোষে সাজিয়ে নিয়ে আসে নানা ধরনের খানাপিনা। সারকানের সামনে রাখে। মেয়েটি বলে, নাও, নাস্তা করো।

কিন্তু সারকান ইতস্তত করে। কি জানি যদি কিছু বিষটিস খাইয়ে মারে। মেয়েটি বুঝতে পারে। হাসে। বলে, ভয় নাই, জহর খাওয়াবো না। মারলে তোমাকে অনেক আগেই খতম করতে পারতাম। আমার ডেরায় যখন এসে পড়েছো, তুমি যত বড় বীরপুরুষই হও, নিজেকে রক্ষা করতে পারতে না। কিন্তু তা আমি করিনি, করবো না। কারণ তুমি আমার মেহেমান। একবার যখন সে-সম্মান তোমাকে দিয়েছি, নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, এখানে তুমি নিরাপদ।

এই বলে প্রত্যেক রেকাবী থেকে একটু একটু খাবার তুলে নিয়ে মেয়েটি মুখে পুরে।—এবার তো বিশ্বাস হচ্ছে, কোনও বিষ মিশিয়ে দিইনি?

সারকান লজ্জিত হয়। সত্যিই তো সে ঐরকম সন্দেহই করেছিলো? এর পর আর

কোনও দ্বিধা থাকে না। দু'জনে একসঙ্গে বসে আহারপর্ব শেষ করে। নাস্তা শেষে সোনার পেয়ালায় সরাব ঢালে সাকী। বলে, এবার মৌজ করো।

মেয়েটি প্রথমে মদের পেয়ালায় চুমুক দেয়। সারকান লজ্জিত হয়। পেয়ালাটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে টেনে নেয়। সুন্দরী বলে, জীবনটাকে জটিল করে না দেখে সহজ সরল করে দেখতে পারলে অনেক যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, জানো, মুসলমান। বিশ্বাস করে ঠকা ভালো, কিন্তু অবিশ্বাসের আগুনে দগ্ধ হতে নাই।

এই সময়ে ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ঊনপঞ্চাশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার সে শুরু করে ঃ সারকান আর সেই মৃগনয়না সুন্দরী মৌজ করতে করতে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। একের পর এক পেয়ালা শূন্য হতে থাকে। নেশা বেশ জমে উঠেছে। একটি বাঁদী উঠে পাশের ঘরে চলে যায়। একটু পরে চারটি মেয়েকে সঙ্গে করে ফিরে আসে। একজনের হাতে দামাসকাসের বাঁশী, একজনের হাতে পারসীয় বীণ আর একজনের হাতে তাতারের চিখারা এবং অন্য মেয়েটির হাতে ছিলো মিশরের গীটার। মৃগনয়না সুন্দরী বাঁশীটা নিজের হাতে নিয়ে মিষ্টি সুরে বাজাতে থাকে। তার সঙ্গে তাল রেখে অন্য মেয়েরা বাজিয়ে চলে বীণ, গীটার আর চিখারা। অপূর্ব এক সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়। সারকান সব ভুলে যায়। ভেসে চলে অজানা অচেনা এক দেশে, যেখানে, আশা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ, মোহ, হিংসা দ্বেষ, হানাহানি কাটাকাটি কিচ্ছু নাই। শুধু আছে অমৃত, আর আছে ভালোবাসা।

এক সময়ে বাঁশী থেমে যায়। সুরের রেশ কিছু লেগেই থাকে। সারকান চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। এমন সুরের মুর্চ্ছনা সে শোনেনি কখনও। মনটা কেমন উদাস বাউল হয়ে যায়।

এর পর একটি মেয়ে গ্রীক-সঙ্গীত গায়। গানের ভাষা সারকান বুঝতে পারে না। কিন্তু সুরের ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে মানুষের মুখের ভাষা আলাদা হলেও সুরের ভাষা সর্বত্রই এক।

এর পর মৃগনয়না গান ধরে। তার সুললিত কণ্ঠ সারকানের মনে বসন্ত জাগায়। পৃথিবীতে, এত সুন্দর সুন্দর ফুল আছে, গন্ধ আছে, রং আছে, রূপ আছে, পাখীর কাকলী আর ঝরনার কলতান আছে, এমন প্রাণ মাতানো গান আছে, এত সুর আছে তার এর আগে কখনও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সারকান চোখ মেলে দেখেনি, প্রাণ ভরে আঘ্রাণ করেনি, কান পেতে শোনেনি।

ষোড়শী গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিছু বুঝলে?

সারকান বলে, গানের ভাষা জানি না, সুরের ভাষা বুঝেছি। আমার সমস্ত সত্ত্বা তোমার গানের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সুন্দরী। এমন গান আগে কখনও শুনিনি।

মেয়েটি বললো, এবার আরবী ভাষায় গাইছি, শোনো।

সরাবের নেশা জমে উঠেছিলো বেশ। গান শুনতে শুনতে এক সময় গভীর আবেশে ঘুমিয়ে পড়ে সারকান।

সারা দিন রাতে আর তার ঘুম ভাঙ্গে না। পরদিন সকালে জেগে দেখে চারপাশে দাসী বাঁদীরা বসে আছে কিন্তু সেই হরিণী সেখানে নাই। মতিয়া বললো, আপনার ঘুমে যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে সেই জন্যে সারারাত আমরা বসে পাহারা দিয়েছি।

সারকান জিজ্ঞেস করে তোমাদের মালকিন কোথায়?

—তার শোবার ঘরে। তিনি বলেছেন, আপনার ঘুম ভাঙ্গলে তার ঘরে যেন আপনাকে নিয়ে যাই। যাবেন?

—চলো যাই।

মতিয়া সারকানকে সঙ্গে নিয়ে মালকিনের ঘরে আসে। সোনার পালঙ্কে মখমলের শয্যায় শুয়ে ছিলো সে। সারকান যেতেই এগিয়ে এসে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসায়। মতিয়া এনে দেয় কস্তুরী সরবৎ। মৃগনয়না গান ধরে। সারকান সবরৎ-এ চুমুক দেয়। তার পাগল করা গানের সুরে মনে রং ধরে। গানের পর বাজনা, বাজনার পর আবার গান, তারপর আবার বাজনা—নিরবচ্ছিন্ন সুরের লহরী চলতে থাকে।

এক সময়ে গান বাজনা শেষ হয়। ষোড়শী সুন্দরী কাছে সরে আসে।—কাল রাতটা কেমন কাটলো?

সারকান বলে, খানাপিনা তো খুব ভালোই হয়েছিলো। তারপরে তোমাদের অমন সুন্দর গানবাজনা। একেবারে বেহেস্তের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। এক ঘুমে কোথা দিয়ে কি করে রাতটা কেটে গেছে, বুঝতে পারিনি।

সেদিনও খানাপিনা গান বাজনার এলাহী ব্যবস্থা হলো। সারকান সব ভুলে মেতে রইলো সেখানে। এর পর আরও একটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারে না সে। মধুর মুহূর্তগুলো বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

মৃগনয়না বলে, সারকান, তুমি তো যুদ্ধবাজ। তা নিশ্চয়ই দাবা খেলতে জানো?

সারকান বলে, খুব জানি।

দাবার ছক বিছানো হয়। কিন্তু সারকানের আনাড়ী চাল দেখে মেয়েটি হেসে ফেলে। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি লড়াই করো। যেখানে বড়ে চালতে হবে সেখানে চালাচ্ছো ঘোড়া। যেখানে দরকার মন্ত্রী সেখানে পাঠাচ্ছো সেনাপতি? এতে তো এক লহমাতেই মাৎ হয়ে যাবে, সাহেব?

সারকান লজ্জিত হয়। ভুল স্বীকার করে। অনেকদিন অভ্যাস নাই। তা ছাড়া এই প্রথমবার—আচ্ছা, এসো, এবারে তোমাকে হারাবো।

কিন্তু একবার দুবার না, পর পর পাঁচবার সারকানকে হারালো সে।

সারকান হাসে।—তোমার কাছে হেরে যে কি সুখ তুমি কি করে বুঝবে পিয়ারী।

—আহা, না পারলেই ওই বাহানা। এখন খাবে এসো।

টেবিলে খাবার সাজানো হয়েছে। সারকান আর সুন্দরী খেতে বসে। মেয়েরা কেউ বাঁশী, কেউ বীণ, কেউ গীটার আবার কেউবা চিখারা বাজিয়ে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে।

খানাপিনা শেষ করে মৃগনয়নাও গান ধরে। সরাবের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সারকান তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে।

একটু বা তন্দ্রা এসেছিলো। এমন সময় একদল লোকের হুড়পাড় শব্দে সারকানের চৈতন্য ফিরে আসে। উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক বর্ম-শিরস্ত্রাণ পরা জাঁদরেল সেনাপতি। তার হুঙ্কারে সারাঘর কেঁপে ওঠে, সারকান! সারকানকে আমরা হাতের মুঠোয় পেয়েছি। হা-হা-হা—

সারকান ভাবলো, শমন সম্মুখে, পালাবার পথ নাই। তবে কি মেয়েটা তার সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করলো? এই যে এত আদর যত্ন খাতির—সবই তার ছলনা? মেয়েটির দিকে তাকালে দেখলো, ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলো, কি চাও? কেন এসেছো এখানে? কে তুমি?

সারকান বুঝতে পারে। না, কোনও ষড়যন্ত্র নয়। টুক করে উঠে গিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে।

খ্রীষ্টান সেনাপতি জবাব দেয়, মহামান্যা রাজকুমারী, ইরবিজা, আপনি কি এই যুবকের পরিচয় জানেন? ও হচ্ছে সারকান, বাগদাদের বাদশাহ উমর অল-নুমানের পুত্র। দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ। ছদ্মবেশে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে সে আমাদের এই দুর্গে প্রবেশ করেছে। উদ্দেশ্য গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা।

—কার কথা তুমি বলছো?

—আমি এই যুবকের কথাই বলছি, মহামান্য রাজকুমারী। ওর নাম সারকান।

—মিথ্যা কথা। ও একজন বিদেশী মুসাফির। আর তাছাড়া ছদ্মবেশে সে এখানে ঢোকেনি। আমি তাকে ডেকে নিয়েছি। সে আমার মাননীয় মেহেমান। কে তোমাকে বলেছে এসব বাজে কথা।

সেনাপতি সবিনয়ে বলতে থাকে, আপনি আমার ওপর রুষ্ট হবেন না, রাজকুমারী। আমি আপনার বাবার আজ্ঞাবহ দাস। তারই আদেশে সারকানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে এসেছি।

রাজকুমারী ইরবিজা প্রশ্ন করে, তাঁকে এই মিথ্যে খবরটা কে দিলো?

—আমাদের বাঁদী সর্দারণী।

—ওঃ, সেই ধুমসো বুড়ি বাঁদরীটা! বুঝেছি, কাল ওকে তুলে আছাড় মেরেছিলাম বলে আমার নামে লাগিয়েছে।

সেনাপতি বলে, না সে ভুল কথা বলেনি। ও যে সারকান তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। আপনি ওকে আমার হাতে তুলে দিন, এই আমার প্রার্থনা। আপনার বাবা হারদুবের হাতে তুলে দেব তাকে, এই আমার একমাত্র কর্তব্য। সারকানকে খতম করা মানেই আফ্রিদুনকে খতম করা। সম্রাট আফ্রিদুনের ক্ষমতা নাই, সম্রাট হারদুবের একগাছি চুল ছিঁড়তে পারে। তাই সে উমর অল-নুমানের কাছে হাঁটু গাড়তে বাধ্য হয়েছে। এখন সারকানই তার একমাত্র জোর। আমরা যদি সারকানকে শেষ করতে পারি, এ যুদ্ধে জয় আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না। তাই আপনার কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ, আপনি সরে দাঁড়ান। সারকানকে গ্রেপ্তার করতে দিন।

সিসারিয়া সম্রাট হারদুবের কন্যা ইরবিজার চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়।—কি তোমার নাম আর পরিচয়?

—আমি আপনার আজ্ঞাবহ দাস, আমার নাম মাসুরা, আমার বাবার নাম মাউসুরা, তার বাবার নাম কাসিরদা। আমি আপনার বাবার পদাতিক সেনাবাহিনীর প্রধান।

ইরবিজা চিৎকার করে ওঠে, শোনো অবাধ্য মাসুরা, কে তোমাকে এখানে আসতে দিলো। আমার নিভৃত মহলে ঢোকার অধিকার কে দিলো তোমাকে? কেন ঢুকেছো? কার হুকুমে ঢুকেছো, জানতে চাই।

—আজ্ঞে, আমাকে তো কেউ প্রতিরোধ করেনি। কেউ বাধা দেয়নি।

—বাধা দেয়নি বলেই তুমি আমার অন্দর মহলে ঢুকে পড়বে? এতবড় স্পর্ধা তোমার কি করে হলো? তুমি জান, এর পরিণাম কী?

মাসুরা বলে, জানি হয়তো আমার প্রাণদণ্ড হবে। তবু আমি সম্রাটের আজ্ঞাবহ দাস। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার এখন একমাত্র লক্ষ্য। আপনি এই যুবককে আমার হাতে তুলে দিন, রাজকুমারী।

রাজকুমারী ইরবিজা টেবিলে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বলে, ওই মিথ্যেবাদী শয়তানের জাসু হাড়ে হারামজাদী ধুমসো বুড়ি মাগীটার কথা তোমরা বিশ্বাস করলে? ওতো বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলতে ওস্তাদ। একথা একশোবার সত্যি আমাদের এই দুর্গপ্রাকারে একজন অচেনা মানুষকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। সে বিদেশী মুসাফির। সে আমার মেহেমান। তার সঙ্গে সারকানের কি সম্পর্ক? আর যদি সারকানও হয় তবু সে এখন আমার মাননীয় অতিথি। অতিথির অবমাননা কিছুতেই আমি সহ্য করবো না। দুনিয়াতে এমন কোনও শক্তি নাই তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমার কথা যদি তোমরা না শোনো, তবে আগে আমাকে মেরে ওকে ছুঁতে পারবে, এই বলে দিলাম। এটা জেনে রেখো, ইরবিজা কখনও মেহেমানের অসম্মান বরদাস্ত করে না। যার সঙ্গে বসে নুন রুটি খেয়েছি, তার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি না। ব্যস্, এর বেশী আর আমার কিছু বলার নাই মাসুরা, এবার তুমি আমার বাবার কাছে গিয়ে যা খুশি নালিশ করতে পারো। তার জবাব আমি তাকেই দেব। দয়া করে এই কথাটা তাকে বলো, ঐ বুড়ি বাঁদী সর্দারণীটা ডাঁহা মিথ্যে কথা বলেছে।

মাসুরা হাত জোড় করে প্রার্থনা জানায়, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, রাজকুমারী। আমি খালি হাতে ফিরে যেতে পারবো না। আপনার বাবা সম্রাট হারদুবের হুকুম, সারকানকে নিয়ে যেতেই হবে।

—মাসুরা, তুমি তোমার অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। তুমি আমার মাইনে করা চাকর। তোমাকে রাখা হয়েছে লড়াই করার জন্যে। যখন লড়াই করতে হুকুম করা হবে, তখন জান কবুল করেও তোমাকে তা করতে হবে। কিন্তু এটা লড়াই-এর ক্ষেত্র নয়। এ-সব তর্কসাপেক্ষ ব্যাপারের মধ্যে তোমার নাক না গলানোই ভালো। আর আমার কথা যদি তোমার অমান্য করতেই সাধ হয়, তার ফলও হাতে হাতেই পাবে। আমার এই মহামান্য অতিথিকে যদি তোমার সারকান বলেই সন্দেহ হয়, এবং আমার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তাকে যদি বন্দী করতেই চাও, সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই করবে। এর পরিণতির জন্যে আমাকে দোষারোপ করবে না। আমি তার হাতে এই ঢাল তলোয়ার তুলে দিচ্ছি, তোমারা একে একে এসো, লড়াই করো, হিম্মৎ দেখাও, তারপর ক্ষমতা থাকে তাকে জ্যান্ত অথবা মৃত অবস্থায় সম্রাটের কাছে নিয়ে যাও—আমার কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু একটা কথা সাবধান করে দিচ্ছি। একসঙ্গে একজনের বেশী আসবে না। সেটা কোনও বীরের কাজ নয়। বীরত্ব যদি দেখাতেই চাও, যদি প্রমাণ করতে চাও তুমি আমার বাবা সম্রাট হারদুবের যোগ্য প্রধান সেনাপতি তবে দলবল না নিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে এসো। দেখবো কার কতটা হিম্মৎ।

মাসুরা বিনীতভাবে বলে, একদিকে আপনার বাবা ক্রুদ্ধ হয়েছেন অন্যদিকে আপনিও ক্রোধান্বিত। এখন আমি উভয় সংকটে পড়েছি কাকে তুষ্ট করি। যাই হোক, আপনার প্রস্তাবই শিরোধার্য করে নিলাম। এক এক করেই হবে আমাদের অসির লড়াই। আমি সেনাদলের প্রধান। আমিই প্রথম লড়বো।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখলো রাত্রি অবসান হতে চলেছে। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

পঞ্চাশতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হলো ঃ

মাসুরা বললো, আপনি উপযুক্ত কথাই বলেছেন, রাজকুমারী। বীর বীরের সঙ্গে সম্মুখ সমরে লড়বো। আমি সেনা দলের প্রধান, আমিই প্রথমে লড়তে চাই।

ইরবিজা সতর্ক করে দেয়, কিন্তু তোমার পিছনে যারা আছে তাদের সবাইকে জানিয়ে দাও আমার শর্তের কথা। মনে রেখো, তোমাদের কেউ যদি এই শর্ত ভঙ্গ করে আমি আমার মেহেমানকে রক্ষা করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবো।

মাসুরা বলে, আপনার শর্তে আমরা রাজি, রাজকুমারী।

ইরবিজা একটু হাসলো, বললো, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত ছিলো, মাসুরা। এক নিরস্ত্র যুবককে বন্দী করতে একশোজন-এর এক বাহিনী আনতে হয়েছে? ছি ছি, কি লজ্জা।

ইরবিজা থামের পাশে গিয়ে সারকানকে তার প্রস্তাব জানালো। সারকান বললো, কিন্তু সুন্দরী, একজনের সঙ্গে লড়াই করা আমাদের রীতি বিরুদ্ধ। এক সাথে অন্তত জনাদশেক লড়িয়ে না পেলে হাতের সুখ হয় না। যাইহোক, তুমি যখন প্রস্তাব দিয়েছো, তাই হবে।

এই বলে সে ঢাল তলোয়ার হাতে হারদুবের প্রধান সেনাপতির দিকে রুখে আসে। সারকানের প্রথম ঘা সে সামলে নিয়ে বসে পড়ে। মাথার উপর দিয়ে তলোয়ারখানা বোঁ করে ঘুরে আসে। এবার সারকান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্রগতিতে আবার এক কোপ মারে। এবারে আর মাসুরা এড়াতে পারে না। ধড় আর মুণ্ডু আলাদা হয়ে যায়। প্রচণ্ড এক আর্তনাদ করে মাসুরার ধড়টা মেজের উপরে লুটিয়ে পড়ে।

ইরবিজা সারকানের এই বিক্রম দেখে মুগ্ধ হয়। লোক মুখে তার শৌর্য বীরত্বের অনেক গল্প গাথাই সে শুনেছিলো, মনে মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো তাকে। কিন্তু আজ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে সে-শ্রদ্ধা সহস্রগুণ বেড়ে গেলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো, কি তার স্পর্ধা, এই মানুষটাকে কাল সে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেছিলো? এবার ইরবিজা চিৎকার করে ওঠে, কই আর কে আছো, এগিয়ে এসো।

মাসুরার এক ভাই আসে। দৈত্যের মতো চেহারা। দাঁত কড়মড় করতে থাকে। একমুহূর্ত। সাঁই করে চালিয়ে দেয় তলোয়ার। কিন্তু সারকানের এক ঘায়ে তার হাতের বাঁট হাতেই ধরা রইলো দ্বিখণ্ডিত তলোয়ার-এর টুকরো নিচে পড়ে গেলো। সারকান এক কোপেই শেষ করে দিতে পারতো। কিন্তু নিরস্ত্রকে আঘাত করা তার ধর্ম নয়। বললো, ওকে একখানা তলোয়ার দাও।

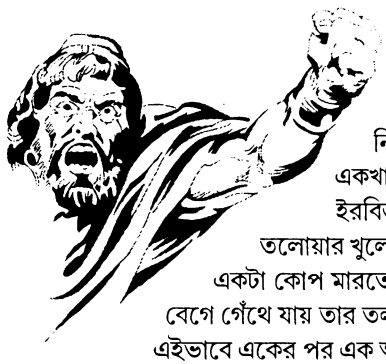

ইরবিজা অবাক হয়। দেওয়ালে টাঙানো একখানা তলোয়ার খুলে এনে মাসুরার ভাই-এর হাতে দেয়। কিন্তু তাক বুঝে একটা কোপ মারতে যায় কিন্তু তার আগে সারকানের তলোয়ার প্রচণ্ড বেগে গেঁথে যায় তার তলপেটে।

এইভাবে একের পর এক আসে। আর সারকানের এক এক কোপে খতম হতে থাকে। এইভাবে জনা পঞ্চাশ শেষ হয়ে গেলো। এবার আর কেউ শর্তের কথা মানলো না। সারকানকে খতম করতে এক সঙ্গে বাকী সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সারকানের বিক্রমের কাছে ইহা তুচ্ছ। সব কচুকাটা করে শেষ করে দিলো।

রাজকুমারী ইরবিজা উল্লাসে ফেটে পড়ে, দেখ, দেখ, আর কেউ বাকী রইলো কিনা।

বাঁদীরা বললো, না, মালকিন আর কেউ নাই। সব শেষে গুণে দেখা গেলো মোট আশীটা লাশ। বাকী জনা কুড়ি আহত হয়ে চৌ-দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেছে।

সারকান তলোয়ারের রক্ত পুঁছে নামিয়ে রাখলো। ইরবিজা এসে গভীর আলিঙ্গনে বেঁধে সারকানের অধরে ছোট্ট একটি চুম্বন এঁকে দেয়। তারপর ওর হাত ধরে ঘরের

মাঝখানে এনে দাঁড় করায়। নিজের গায়ের শালখানা খুলে বাঁদীর হাতে দেয়। সারকান দেখে অবাক হয়, ইরবিজা রণ-সাজে সজ্জিতা। কোমরে ঝোলানো তরবারীখানা দেখিয়ে বলে, একেবারে খাঁটি ভারতীয় ইস্পাতে তৈরি। তুমি যখন লড়াই করছো, আমি পাশের ঘরে গিয়ে নিজেকে তৈরি করে এলাম। যদি তোমার কোন সাহায্য দরকার হয়। তা তুমি তো একাই একশো। তোমার আবার সাহায্য দরকার হবে কিসে!

এরপর দুর্গ প্রাকারের দ্বার-রক্ষীদের ডেকে ইরবিজা কৈফিয়ৎ তলব করে, আমার হুকুম ছাড়া অন্য লোককে ঢুকতে দিয়েছিলে কেন?

দ্বার-রক্ষীরা জবাব দেয়, সম্রাটের প্রধান সেনাপতিকে বাধা দেবার সাহস পাবো কি করে? সম্রাট যেখানে নিজে তাদের পাঠিয়েছেন, আমরা কি করতে পারি? আপনি আমাদের মালকিন ঠিক; কিন্তু আপনার ওপরে তো তিনি।

ইরবিজা দ্বার-রক্ষীদের এই উদ্ধত জবাবে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, কার ওপরে কে, আমি দেখাচ্ছি।

সারকানকে বললো, এই অবাধ্য প্রহরীদের কোনও প্রয়োজন নাই। ওদের তুমি খতম করো।

সারকানের তলোয়ারের কোপে তারা ধরাশায়ী হয়।

ইরবিজা বলে, এবার তোমাকে আমার নিজের কথা শোনাবো। আমার নাম ইরবিজা সে তো তুমি শুনেছো। আমার বাবা সিসারিয়া সম্রাট হারদুব। আর ঐ যে ধুমসো বুড়িটা—ও হচ্ছে আমার বাবার পুরোনো বাঁদী। একসময় বাবার খুব অসুখ হয়েছিলো, সেই সময় ওর সেবাযত্নে বাবা সুস্থ হয়ে ওঠেন। সেই থেকে সে বাবার নেক-নজরে আসে। এই দুর্গের দেখাশুনার কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হয় তার উপর। কিন্তু আমার সঙ্গে তার কোন দিনও বনিবনাও ছিলো না। আজকের এই ঘটনা সে বাবার কাছে চতুর্গুণ করে লাগাবে, আমি জানি। বাবার মনটা বিষিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। হয়তো বলবে, আমি খ্রীষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেছি। এখন আমার একমাত্র রক্ষা আমি যদি দেশের বাড়িতে চলে যাই। এ ব্যাপারে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

সারকান ভাবে, এই মেয়েটির দৌলতেই আজ সে এতটা বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। তার নিজের বিপদ জেনেও তাকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এখন তার কর্তব্য তাকে রক্ষা করা। সারকান বলে, আমার ধড়ে যতক্ষণ প্রাণ আছে, তোমার কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, ইরবিজা। কিন্তু তুমি কি তোমার বাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চাও?

ইরবিজা বলে, এখন তা ছাড়া আর কোনও পথ নাই, সারকান। কারণ এর পরিণাম যা ঘটতে পারে, আমি অনুমান করতে পারি। আমার বাবাকে আমি জানি, তার ক্রোধ বড় মারাত্মক। সেখানে সন্তান-স্নেহ তুচ্ছ। তোমাকে আমার একটা কথা বলার আছে, আশা করি আমার অবস্থা বিবেচনা করে কথাটা তুমি শুনবে।

সারকান বলে, কি কথা বলো, তোমার কথা না শোনার মতো স্পর্ধা আমার নাই, ইরবিজা।

—তুমি আমার কথা শোনো, তোমার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাগদাদে ফিরে যাও।

—কিন্তু ইরবিজা, আমার বাবা উমর-অল-নুমান আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কনসতানতিনোপল-এর সম্রাট আফ্রিদুন আমার বাবার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তোমার বাবা সম্রাট হারদুব তাঁর জাহাজ আক্রমণ করে সব লুঠপাঠ করে নিয়ে যান। সেই জাহাজে অনেক ধনরত্ন বোঝাই ছিলো। এবং তার মধ্যে ছিলো অলৌকিক দৈব-শক্তি সম্পন্ন তিনখানা পাথর।

ইরবিজা বাধা দিয়ে বলে, তাহলে আসল ব্যাপারটা খুলে বলি শোনো। তোমরা তো একতরফাই শুনেছো। এবার আমার কথা শুনলে, সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রতি বছর বড়দিনের সময় আমাদের—খ্রীষ্টানদের বিরাট উৎসব হয়। আমরা এই দুর্গে ফি বছর বছরের শেষ সাতটা দিন খুব জাঁকজমক করে আনন্দ উৎসব পালন করে থাকি। নানা দেশের সম্রাটদের নিমন্ত্রণ করা হয়। সপরিবারে তাঁরা আসেন। খুব হৈ-হল্লা, আমোদ প্রমোদ করে তাঁরা আবার দেশে ফিরে যান। একবার এই উৎসবে সম্রাট আফ্রিদুন তার কন্যা সফিয়াকে উপহার স্বরূপ আমার বাবার হাতে সমর্পণ করে যান। তুমি নিশ্চয়ই জানো, সেই সফিয়া এখন তোমার বাবার অন্যতম রক্ষিতা হয়ে বাগদাদের প্রাসাদে রয়েছে। এবং সম্প্রতি সে একটি সন্তানের জননী হয়েছে।

আমার বাবার সঙ্গে তখন তোমার বাবার খুব সদ্ভাব ছিলো। তিনি সফিয়াসহ আর পাঁচটি সুন্দরী গ্রীক কুমারীকে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন তোমার বাবার কাছে। সেই থেকে সে তোমার বাবার প্রাসাদেই আছে।

কিন্তু এদিকে বিপত্তি ঘটে। সম্রাট আফ্রিদুন ভাবলেন, আমার বাবা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে তার কন্যাকে অন্যত্র চালান করে দিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই দারুণ অপমান করে বাবাকে পত্র দিলেন তিনি। চিঠিখানার বয়ান মোটামুটি এই রকম ঃ

বছর দুই আগে তোমার হাতে আমার কন্যা সফিয়াকে সমর্পণ করে এসেছিলাম। আমার আশা ছিলো, যথাযোগ্য রাজসিক মর্যাদায় সে তোমার কাছে থাকবে। কিন্তু সম্প্রতি খবর পেলাম, তুমি আমার উপহারের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করেছো। এখন সে তোমার কাছে নাই। এক ম্লেচ্ছ যবন সুলতানের হারেমে সে এখন নগণ্য বাঁদী। আমি মনে করি, এ তোমার ঔদ্ধত্য। এবং আমাকে অপমান করার কৌশল মাত্র। আমার পত্র পাওয়া মাত্র আমার কন্যা সফিয়াকে সসম্মানে আমার রাজধানীতে ফেরৎ দিয়ে যাবে। নচেৎ সমুচিত শাস্তি পেতে হবে। আমার এই পত্রের জবাব যদি না দাও, তার পরিণাম আরও খারাপ হবে।

চিঠি পড়ার পর বাবা চিন্তিত হলেন। অহেতুক যুদ্ধ-বিগ্রহ তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু তাই বলে, হত-বীর্য, কাপুরুষ তিনি নন। বাবা দেখলেন, এ ক্ষেত্রে আফ্রিদুনের সঙ্গে কলহ এড়ানো কঠিন। কারণ সফিয়াকে এখন ফেরৎ আনা সম্ভব নয়। সে সম্প্রতি উমর-অল-নুমানের সন্তানের জননী হয়েছে।

আমার বাবা বুঝলেন, ঝামেলা এড়ানো শক্ত। তবু শেষ চেষ্টা করলেন। আফ্রিদুনকে বুঝিয়ে সুজিয়ে চিঠি দিলেন। লিখলেন ঃ সফিয়াকে তিনি ইচ্ছে করে সেখানে পাঠাননি। বাগদাদ-সুলতানকে উপহার পাঠানো হয়েছিলো, পাঁচটি সুন্দরী কুমারী কন্যা। তাদের মধ্যে সফিয়া ভুল করে চলে গেছে। এটা কোনও ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। তবুও তাকে ফেরৎ হয়তো আনা যেতো, কিন্তু এখন সে উমর-অল-নুমানের সন্তানের জননী হয়েছে, আর তা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আফ্রিদুন যেন ব্যাপারটাকে অহেতুক জটিল না করে সহজ স্বাভাবিকভাবে মেনে নেন।

কিন্তু এর ফলে আফ্রিদুন শান্ত তো হলেনই না, বরং আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, কী, এত বড় স্পর্ধা, আমার মেয়ে মুসলমানের হারেমে তিনশো ষাটজনের একজন হয়ে পাশবিক অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। আমার বাবার উপর প্রতিশোধ নেবার পাঁয়তারা ভাঁজতে লাগলেন। কিন্তু নামে সম্রাট হলে হবে কি, তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। না আছে ধনদৌলতের জোর, না আছে সেনা বল। অথচ ফুঁকো-আভিজাত্য আর দম্ভ আছে ষোল আনা। যাদের ভেতরটা ফাঁপা, অথচ বড়ফট্টাই বেশী তারা কিন্তু শয়তানের জাসু হয়। যত সব বদবুদ্ধির প্যাঁচ মাথায় ঘুরতে থাকে। আফ্রিদুন ফন্দী করলেন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। তাই তিনি নানারকম উপহার উপঢৌকনের ঘুষ পাঠালেন আপনার বাবার কাছে। আর সেই সঙ্গে বলে পাঠালেন এক আষাঢ়ে গল্প, তার তিনখানা ধনদৌলতে ঠাসা জাহাজ নাকি আমার বাবা লুঠপাঠ করে

নিয়ে গেছেন। এবং তার হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত মেরে শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু আফ্রিদুনের রাজত্বের হাল যাদের জানা আছে তারা একথা কি করে বিশ্বাস করবে। তার এমন কোনও ধনদৌলত নাই যা একটা জাহাজও বোঝাই হতে পারে। আর হাজার হাজার সৈন্য? সে তো তার স্বপ্ন লোকের কল্পনা। তার গোটা রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা সাকুল্যে হাজারখানেক হবে কিনা সন্দেহ। তার মধ্যে হাজার সৈন্য যদি মারাই গিয়ে থাকে তবে নিজের সুরক্ষা ঠিক রাখবে কি করে?

তোমার বাবা অত ঘোর প্যাঁচের মানুষ নন। তিনি আফ্রিদুনের এই চাল বুঝতে পারেননি। ভেবেছেন, বিপদের সময় সাহায্য চাইলে এগিয়ে যাওয়াই বীরের ধর্ম। কিন্তু বীরত্ব আর রাজনীতি তো এক বস্তু নয়, সারকান। তোমার বাবা বিশ্ববিজেতা যোদ্ধা। রাজ্য জয় করতে গেলে বীরত্ব বিক্রমই প্রধান, কিন্তু রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে রাজনীতিজ্ঞ হতে হবে।

আফ্রিদুন তোমার দশ হাজার সৈন্য এনে ফেলেছে তার কব্জায়। এমন ফাঁদে তোমাকে তিনি ফেলবেন, তুমি আর বেরুতে পারবে না। জানো তো বুদ্ধির বলের কাছে দেহের বল তুচ্ছ। আবার সে বুদ্ধি যদি শয়তানের বুদ্ধি হয়। কি ভাবে কেমন করে তোমার সব সৈন্য তিনি রাতারাতি খতম করে দেবেন, তুমি টেরও পাবে না।

তুমি বলছিলে না? তিনটি দৈব শক্তিসম্পন্ন গ্রহরত্ন ছিলো সেই জাহাজে? আসলে ঐ গ্রহরত্ন তিনটি তার কন্যা সফিয়ার কাছেই ছিলো। গ্রীসে যাওয়ার পর সেগুলো সে আমার বাবার হাতে তুলে দেয়। সত্যিই, অবাক হতে হয়, পাথর তিনটির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ধারণ করলে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হতে পারে। বাবার অলক্ষ্যে আমি ঐ পাথরগুলো চুরি করে নিয়েছি। সময় মতো তোমাকে দেখাবো একদিন। সে যাকগে, তুমি আর এক মুহূর্ত দেরি করো না। ছাউনিতে ফিরে যাও। সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে পড়ো।

সারকান বলে, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে, ইরবিজা। আমি আর কাল-বিলম্ব করতে চাই না। তোমার এই মূল্যবান উপদেশ না পেলে কী সর্বনাশই যে ঘটতো, ভাবতে শিউড়ে উঠছি। কিন্তু সুন্দরী, তোমাকে এখানে ফেলে রেখে কিছুতেই যাবো না আমি। আজ যা ঘটে গেছে তার পরিণতি বড়ই মারাত্মক। তোমাকে এখানে রেখে গেলে আর আস্ত রাখবে না তোমার বাবা। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। আজই আমরা বাগদাদে রওনা হয়ে যাই।

ইরবিজা এক মুহূর্ত কি ভাবলো।—ঠিক আছে, তুমি তোমার ছাউনি গোটাতে থাকো। লোকলস্কর রওনা করে দাও। আমি তিনদিনের মধ্যেই তোমার কাছে যাচ্ছি। তারপর দু'জনে বাগদাদে রওনা হবো।

ইরবিজা সারকানের বুকে মাথা রেখে কাঁদলো। সারকানের চোখেও জল আসে। বাঁদী ঘোড়া এনে দেয় সারকানকে। বিদায় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছু দূরে যেতেই সারকান দেখে, তিনজন ঘোড়সওয়ার তার দিকে ছুটে আসছে। শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কায় সে তলোয়ার খুলে বাগিয়ে ধরে। কিন্তু না, কাছে আসতে দেখা গেলো, তার উজির দানদান আর দুই বিশ্বস্ত আমীর। যথারীতি আদব কায়দা দেখিয়ে তারা কাছে এসে দাঁড়ালো। উজির দানদান বললে, কী ব্যাপার আজ তিনদিন ধরে তোমার কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা তো দুশ্চিন্তায় ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি। না জানি কী বিপদ হলো। সৈন্যদের মধ্যেও দারুণ আতঙ্ক। তারা বুঝতে পারছে না, তোমার কী হলো।

সারকান তখন আফ্রিদুনের ষড়যন্ত্রের কাহিনী বললো। আফ্রিদুন ফাঁদ পেতেছে। উদ্দেশ্য, তার সৈন্যবাহিনী সাবাড় করা। এই সময়ে ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে আসা ঠিক হয়নি। সারকান বলে, আর দেরি নয়, এখুনি আমাদের ছাউনিতে পৌঁছতে হবে।

তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা ছাউনিতে এসে পৌঁছয়। না, সব ঠিকই আছে। কোনও বিপদ আপদ ঘটেনি। সারকানের হুকুমে তখুনি তাঁবু উঠানো হলো। উজির দানদানকে বললে, আপনি এদের নিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে পড়ুন। আমি এখানে আরও তিন দিন থাকবো। আমার সঙ্গে থাকবে শুধু একশোজন সেনাপতি। বাকী সব আপনি নিয়ে যান।

সৈন্যসামন্তরা খানাপিনা শেষ করে নিলো। ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্চরদের দানাপানি খাওয়ানো হলো। তারপর মাত্র একশোজন সেনাপতি রেখে সমস্ত সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে দানদান রওনা হলো।

সারকান দাঁড়িয়ে দূরে পাহাড় শীর্ষে প্রত্যক্ষ করে শ'খানেক ঘোড়সওয়ার তার দিকেই ধাবমান। শত্রুশঙ্কায় সেও তার সেনাপতিদের সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো। কাছে আসতে দেখা গেলো, সারকানের আশঙ্কা অমূলক নয়, সত্যিই একশো যোদ্ধার এক অশ্বারোহী বাহিনী। দূর থেকে হুঙ্কার ছাড়লো তারা, শোনো মুসলমানের ছেলেরা, শান্ত সুবোধ বালকের মতো তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ো। না হলে, মেরী আর জোনের নাম বলছি, একেবারে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।

সারকান অবাক বিস্ময়ে শোনে। ক্রোধে চোখ লাল হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে। চোয়াল কঠিন হতে থাকে।—ওরে খ্রীষ্টানের বাচ্চা, কুকুর, তোদের এত বড় দুঃসাহস, আমারই এলাকায় এসে আমাকেই ধমকাচ্ছিস। ঘাড়ে কটা করে মাথা আছে রে? দাঁড়া এখুনি মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি। এখনও ভালোয় ভালোয় বলছি ভালোয় ভালোয় মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে যা। তা না হলে জন্মের সাধ মিটিয়ে দেব এখুনি।

তারপর সারকান তার সেনাপতিদের উদ্দেশ করে বলে, আল্লাহর নাম করে ঝাঁপিয়ে পড়ো। শয়তানগুলোকে সমুচিৎ শিক্ষা দিয়ে দাও।

নিমেষে দুই দলে প্রচণ্ড লড়াই বেঁধে গেলো। ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়ার, অসির সঙ্গে অসির, মানুষের সঙ্গে মানুষের আঘাত প্রত্যাঘাতে কেঁপে উঠলো সারা পাহাড় উপত্যকা। ধূলী বালীতে অন্ধকার হয়ে এলো চতুর্দিক। এইভাবে সন্ধ্যা নেমে আসে। অন্ধকার ছেয়ে যায়। হঠাৎ দেখা গেলো, হানাদাররা অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সারকান শুনে খুশি হলো, তার দলের কেউই হতাহত হয়নি।

সারকান তার সেনাপতিদের উদ্দেশ করে বলে, বন্ধুগণ, আজ আমরা অতর্কিত আক্রান্ত হয়েছিলাম, যাক আল্লাহর দোয়ায় কারুরই তেমন কোন আঘাত লাগেনি। কিন্তু যারা এসেছিলো রাতের অন্ধকারে ফিরে গেলেও কাল সকালে যে আবার হানা দেবে না তার কোনও ভরসা নাই। সুতরাং সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। তাঁবুর বাইরে পালা করে পাহারায় থাকো। বাকী সবাই রাতের মতো ঘুমিয়ে শরীরকে চাঙ্গা করে নাও। কাল সকালে আরও বীরবিক্রমে লড়াই করতে হবে। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা খুবই ভালো; কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশি ভালো, শত্রুর শক্তি খাটো করে না দেখা। আমরা একশোজন, তারাও মাত্র একশোজনই ছিলো, তা সত্ত্বেও আমরা তাদের ঘায়েল করতে পারলাম না। সুতরাং মনে হচ্ছে, তারাও কিছু কম বাহাদুর নয়। যাই হোক, খানাপিনা সেরে রাতের মতো ঘুমিয়ে নাও।

এদিকে খ্রীষ্টান যোদ্ধারা তাদের সেনাপতিকে ঘিরে বলে, আজ তো আমরা কিছু করতে পারলাম না। মনে হচ্ছে অত সহজে ওদের কাবু করা যাবে না।

সেনাপতি বলে, ঠিক আছে, ঘাবড়াচ্ছো কেন? কাল সকালে আবার নতুন কায়দায় আক্রমণ চালাতে হবে। এখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নাই। ঘুমিয়ে পড়ো।

পরদিন সকালে সারকান সেনাপতিদের সঙ্গে নিয়ে সামনের পাহাড়ের পথে এগোতে থাকে।—মনে হচ্ছে, বাছাধনরা কাহিল হয়ে পড়েছে। তা না হলে এতটা বেলা হয়ে গেলো কারো পাত্তা নাই কেন?

একজন বলে, জানের মায়া তো সকলেরই আছে, হুজুর। জেনে শুনে কে আর মাথা এগিয়ে দিতে আসে। জানে তো আজ গেলে কচু কাটা হতে হবে। কাল ওরা হঠাৎ এসে হানা মেরেছিলো, আজ তো আর তা হচ্ছে না। আমরা রীতিমতো তৈরি। আসুক না, মাথা রেখে যেতে হবে।

—দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমরা বড়্ডো বেশী উৎফুল্ল হয়ে উঠেছো। কে জানে, হয়তো ওদের অন্য কোনও প্যাঁচ আছে। তোমরা এক কাজ করো, এক এক করে এগিয়ে যাও। পাহাড়টার ওপারেই মনে হচ্ছে ওরা ডেরা গেড়েছে। একা পেয়ে হয়তো তেড়ে আসতে পারে। তখন তো আমরা পিছনেই আছি। এইভাবে ওদের ফাঁদে এনে ফেলতে হবে।

সারকানের নির্দেশ মতো একজন ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের পথে উঠে যায়। চিৎকার করতে থাকে, কই হে কে আছো, নেকড়ের বাচ্চারা, বেরিয়ে এসো। তোমাদের যম হাজির।

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো, একটা দড়ির ফাঁস এসে এঁটে গেলো তার গলায়। সারকান সেনাপতি দেখলো, অদূরে ঘোড়ার পিঠে এক বর্ম শিরস্ত্রাণ পরিহিত এক সুদর্শন যোদ্ধা। ফাঁসের দড়িটা তার হাতের মুঠোয় ধরা। এক ঝটকায় নিয়ে ফেলে দিয়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে গুহার দিকে নিয়ে চললো।

এদিকে সারকান চিন্তিত হলো। আর একজনকে হুকুম করলো, যাও—দেখ, ওর কি হলো। তারও আসতে দেরি দেখে আরও একজন এগিয়ে যায়। এইভাবে সারাদিনে কুড়িজন সারকান সেনাপতি পাহাড়ের ওপারে গিয়ে আর ফিরে এলো না। সারকান অবাক হয়। কী ব্যাপার। তার সব দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। একটার পর একটা গেলো—আর ফিরলো না। দিন শেষ হয়ে এলো। এখনই রাত্রির কালো ছায়া নামবে। এ অবস্থায় আর এগোনো ঠিক হবে না মনে করে তাঁবুতে ফিরে আসে। ক্রোধে সারা শরীর জ্বলতে থাকে। মনে মনে ঠিক করে, কাল সকালে সে এর উপযুক্ত জবাব দেবে। আর অন্য কাউকে নয় নিজেই যাবে পাহাড়ের ওপারে। দেখবে কত বড় লড়িয়েরা সেখানে আছে। সেনাপতিদের উদ্দেশ করে বলে, তোমরা আজকের মতো বিশ্রাম করো। ঘাবড়াবার কিচ্ছু নাই, কাল আমি নিজে লড়বো ওদের সবার সঙ্গে, দেখি কত বড় বীরপুরুষ তারা। কৈফিয়ৎ চাইবো, কেন তারা আমাদের এলাকার মধ্যে ঢুকেছে। যদি ভালোয় ভালোয় মিটিয়ে নিতে চায় ভালো, না হলে, লড়াই করার শখ ঘুচিয়ে দেব জন্মের মতো।

পরদিন সকালে সারকান একাই উঠে যায় পাহাড়ের পথে। ওপারে এক উপত্যকায় গিয়ে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে শত্রু শিবিরের সন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ বুঝতে পারলো প্রায় পঞ্চাশজনের এক পদাতিক বাহিনী তাকে ঘিরে ফেলেছে। প্রত্যেকেই বর্ম-শিরস্ত্রাণ পরিহিত। উদ্যত তরবারী হাতে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়লো। দলের সামনে তাদের প্রধান। উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে। ঘোড়ার লাগাম টেনে সেও দাঁড়ালো। হুঙ্কার দিয়ে পরিষ্কার আরবী ভাষায় বললো, যুদ্ধবাজ সারকান, এবার তোমার মৌৎ হাজির। লড়াই-এর জন্যে প্রস্তুত হও। আমরা দু'জনেই দুই বাহিনীর প্রধান। সম্মুখ সমরে আমাদের মধ্যে যে জিতবে, সব সৈন্যসামন্ত তার বশ্যতা স্বীকার করবে। নাও, আর দেরি কেন, এসো।

সারকানের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। সিংহের মতো গর্জে ওঠে। তলোয়ারে

তলোয়ারে লড়াই শুরু হয়। ইস্পাতে ইস্পাতে ঘর্ষণে ক্ষণে ক্ষণেই আগুনের ফুলকী ঠিকরে বেরুতে থাকে। যাকে বলে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। কেউই কাউকে কাবু করতে পারে না। এইভাবে দিনের আলো ফুরিয়ে আসে। সে দিনের মতো রণে ভঙ্গ দিয়ে যে যার ডেরায় ফিরে যায়।

সারকান অবাক হয়ে ভাবতে থাকে। তার সমকক্ষ বীরপুরুষ তামাম দুনিয়ায় তো কেউ নাই। তবে কেন সে তাকে কাবু করতে পারলো না? তার যে-সব মোক্ষম মার ডাকসাইটে জাদরেল যুদ্ধবাজরাও এড়াতে পারে না, মনে হলো, অতি সহজে সেগুলো পাশ কাটিয়ে গেলো সে।

পরদিনও সারাদিন ধরে চললো তাদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। কিন্তু না, সারকান পরাস্ত করতে পারে না। আক্রোশে, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তাঁবুতে ফিরে যায়। পরদিন আবার তারা রণক্ষেত্রে হাজির হয়। এইদিন খ্রীষ্টান সেনাপতি এক সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ে যায়। সারকান তলোয়ার বাগিয়ে ধরে। কোপ মারতে যাবে, এমন সময় হাত তুলে সে থামতে বলে, থামো, তুমি না বিশ্ববিজেতা উমর অল-নুমানের পুত্র সারকান। তোমার মতো বিক্রম বীর নাকি সারা আরব দুনিয়ায় নাই। এই তোমার বীরত্ব! একটা অসহায় নিরস্ত্র নারীর ওপর তলোয়ার চালাতে লজ্জা করে না তোমার।

সারকান হতভম্ব হয়ে পড়ে।

—ইরবিজা—তুমি? আমি তো চিনতেই পারিনি, সোনা?

—হ্যাঁ, আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। যার সঙ্গে আমি যাবো, চিরকাল যার কাছে থাকবো, তাকে একটু বাজিয়ে দেখে নেবো না? কতটা তার হিম্মৎ। এই যে আমার সৈন্যসামন্ত দেখছো, এরা সবাই নারী। এরাই তোমার বিশজন সেনাপতিকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে আমার হাত তুলে দিয়েছে। ভয় নাই। তাদের কোনও ক্ষতি করিনি। বেশ আদর যত্নেই আমার শিবিরে তারা রয়েছে।

সারকান ঘোড়া থেকে নেমে ইরবিজাকে জড়িয়ে ধরে। চুমু খায়।—এইভাবে আমার সঙ্গে লড়াই করলে? যদি আমার একটা মারও ঠেকাতে তোমার পলকমাত্র দেরি হতো, আমি ভাবতে পারছি না সোনা, কি অঘটনই না ঘটে যেতো। আল্লাহ মেহেরবান, তিনিই রক্ষা করেছেন।

ইরবিজা একজনকে নির্দেশ করলো, সারকানের বন্দীদের এখানে নিয়ে এসো। দেখবে, কোনও অসম্মান যেন না হয়।

এর পর তারা দু'জনে দুশো সৈন্যসামন্তের বাহিনী নিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে যায়।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন একান্নতম রজনী।

শাহরাজাদ আবার গল্প শুরু করে।

সারকান ইরবিজার সহচরীদের বলে, তোমরা রণসাজ খুলে ফেলো। নিজের নিজের পোশাকে সেজে নাও।

সারকান তার কয়েকজন সেনাপতিকে বললো, তোমরা তীরগতিতে বাগদাদের পথে পাড়ি দাও। সুলতান উমর অল-নুমানকে সংবাদ দাও আমরা আসছি।

সে রাতটা তারা ওখানেই তাঁবুতে কাটালো। পরদিন সকালে উঠে গোসল এবং খানাপিনা সেরে রওনা হলো।

বিশ দিনের পথ অতিক্রম করে অবশেষে তারা বাগদাদে এসে পৌঁছয়। উজির

দানদান তাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করার জন্যে শহরের প্রবেশ মুখে এক হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী দাঁড় করিয়েছিলো। সারা শহর আর তোরণদ্বার আলোর মালায় সাজানো হয়েছিলো।

দরবারে ঢুকেই যথাবিহিত কুর্নিশ জানায় সারকান। উমর অল-নুমান পুত্রকে পেয়ে খুশি হয়। ইরবিজার সঙ্গে সারকানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জানায় তার বাবাকে। ইরবিজা সম্রাট হারদুবের কন্যা। তাকে বলতে গেলে, শয়তান আফ্রিদুনের ফাঁদ থেকে বাঁচিয়েছে। তার নানা গুণের কথা বলতে বলতে সারকান-এর বুক গর্বে ফুলে ওঠে। ইরবিজার মতো সর্বগুণসম্পন্না মেয়ে তামাম দুনিয়াতে কোথাও নাই। সারকানকে সে যেমন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, তেমনি তার অসাধারণ রণকৌশল দেখেও সে বিস্মিত হয়েছে। দুনিয়াতে এমন কোন যোদ্ধা নাই যে তার অব্যর্থ অসির আঘাত প্রতিহত করতে পারে, কিন্তু ইরবিজা এমনই দক্ষ যে, সে সব মারের প্যাঁচ অতি সহজেই সে পাশ কাটিয়ে দিয়েছে।

উমর অল-নুমান-এর মনে পাশবিক প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। অনেক দিন সে নতুন মেয়ের স্বাদ পায়নি। সারকানের মুখে ইরবিজার অসাধারণ রূপ আর যৌবনের কথা শুনে ধৈর্য আর বাঁধ মানে না।

—তাকে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো, আলাপ করতে চাই।

সারকান বাবার অভিপ্রায় আঁচ করতে পারে না। বললো, এখুনি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, জাঁহাপনা।

একটু পরে ইরবিজা এসে আভূমি আনত হয়ে উমরকে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। সুলতানের ইশারায় দরবার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো সবাই। শুধু রইলো ইরবিজা, খোজা আর উমর অল-নুমান?

উমর প্রশ্ন করে, তোমার নাম কী?

—ইরবিজা।

পরিষ্কার আরবী ভাষায় জবাব দিলো।

—তোমার বাবা?

—সিসারিয়া সম্রাট হারদুব।

—তা হলে তুমি তো খ্রীষ্টান!

—জী হুজুর।

এখানে এসেছো কি অভিপ্রায়ে, সুন্দরী।

এই 'সুন্দরী' সম্বোধনে ইরবিজা বিস্মিত হয়।—আপনি আমাকে ইরবিজা বলেই ডাকবেন, জাঁহাপনা।

—কেন সুন্দরীকে সুন্দরী বলা কি অন্যায়?

—আপনি মহানুভব শাহেনশাহ, আপনার ন্যায় অন্যায়ের বিচার কি আমি করতে পারি? তবে আমি আপনার মেয়ের তুল্য। তাই বলছিলাম—

উমর অল-নুমান-এর অট্টহাসিতে শূন্য দরবার মহল চকিত হয়ে ওঠে।—একই নারী কারো মা, কারো কন্যা, আবার কারো বা ভগ্নী হতে পারে। তা আমার তোমার সম্পর্কটা না হয় পরেই ঠিক করা যাবে। থাক ওসব কথা, শুনলাম আমার ছেলে সারকানকে তুমি খুব সাহায্য করেছো। তোমার বুদ্ধির জোরেই সে আফ্রিদুনের ফাঁদ থেকে কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। এবং এ-ও শুনলাম রণ-বিদ্যায় তুমি নাকি পারদর্শী? তা শিখলে কার কাছে?

—আমার বাবা—তিনিই আমাকে হাতে ধরে ধরে সব শিখিয়েছেন। বাবার আমি একমাত্র সন্তান। ছেলে নাই বলে তিনি আমাকে ছেলের মতো করেই মানুষ করেছেন।

উমর অল-নুমান ইরবিজাকে ডেকে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আফ্রিদুনের সেই অলৌকিক পাথর তিনখানা নাকি তোমার কাছেই আছে?

—হ্যাঁ হুজুর, আমি সঙ্গে করেই এনেছি।

—একবার দেখাবে?

—নিশ্চয়ই। ওগুলো তো আপনাকে উপহার দেব বলেই নিয়ে এসেছি। আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।

খোজাটাকে বললো, মতিয়াকে বলো, সে যেন আমার হাত বাক্সটা নিয়ে আসে।

মতিয়া একটা ছোট্ট রূপোর বাক্স নিয়ে এসে ইরবিজার হাতে দেয়। বাক্সটা খুলে তার মধ্য থেকে আরও ছোট একটা সোনার বাক্স বের করলো ইরবিজা। এই বাক্সে রাখা ছিলো সেই দৈব-শক্তিসম্পন্ন পাথর তিনখানা। বাক্সটা সুদ্ধ সে উমর অল-নুমানের দিকে এগিয়ে দেয়।—জাঁহাপনা, এই আমার সেলামী—

উমর-এর চোখ নেচে ওঠে। এই মাণিক্যের কথা সে বহুকাল ধরে শুনে আসছে। আজ তার হাতের মুঠোয় এসে গেলো। বাক্সটা সুদ্ধ ইরবিজার হাতখানা সে চেপে ধরে। ইরবিজা অস্বস্তি বোধ করে। বাক্সটা হাতে তুলে দিয়ে প্রায় জোর করেই হাতটা ছিনিয়ে নেয়। উমরের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, তলোয়ার-ধরা হলে কি হয়, হাতটা তোমার ফুলের কলির মতো নরম।

ইরবিজার এ-সব কথা ভালো লাগে না। উঠে পড়ে বলে, এবার যদি অনুমতি করেন জাঁহাপনা, আমি তবে আসি?

উমর বলে, তোমার এবং তোমার সহচরী দাসীদের জন্যে আমি প্রাসাদের একটা মহল সাজাতে বলে দিয়েছি। আজ থেকে ওখানেই তুমি থাকবে।

ইরবিজা কুর্নিশ করে বলে, যো হুকুম, জাঁহাপনা।

খোজা এবং মতিয়াকে সঙ্গে করে সে দরবার ত্যাগ করে নিজের মহলে চলে যায়।

উমর অল-নুমান সারকানকে ডেকে পাঠায়। সারকান এসে কুর্নিশ জানায়। একখানা পাথর এগিয়ে দিয়ে উমর বলে, এটা তোমার কাছে রাখো।

সারকান বলে, আর দু'খানা কি হলো জাঁহাপনা?

উমর বলে, একখানা দেব তোমার বোন নুজাৎকে। আর একখানা রইলো তোমার ছোট ভাই দু-অল-মাকান-এর জন্যে।

—দু-অল-মাকান?

—হ্যাঁ, তোমার ছোট ভাই, নুজাতের সহোদর। তুমি জানো না?

সারকান বলে, জী না। আমি তো শুনেছিলাম, আমার একটা শুধু বোন হয়েছে।

উমর বললো, তুমি নুজাতের কথা শুনেই বাইরে চলে গেছো। কিন্তু তার পরেই সফিয়া আর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। মাকান আর নুজাৎ যমজ ভাই বোন।

সারকানের মুখ কালো হয়ে যায়। এত বড় দুঃসংবাদ শুনবে, আশা করেনি। সারকানকে বিষণ্ণ দেখে উমর বলে, কিন্তু এতে তোমার মন খারাপ করার কি আছে, সারকান! আমি অনেক আগেই ফরমান জারি করে দিয়েছি, তুমিই হবে আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। সুতরাং তোমার তো মন খারাপ করার কোনও কারণ নাই।

সারকান নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আল্লাহ ওদের সুখে রাখুন।

আবার কুর্নিশ জানিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে সে ইরবিজার কাছে যায়। সারকানকে চিন্তিত দেখে ইরবিজা জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন, সারকান? কোনও খারাপ খবর আছে নাকি?

সারকান বলে, খারাপ কিনা জানিনা, তবে সুখবর নয়। এতদিন জানতাম আমার একটি ছোট বোন আছে। নুজাৎ। কনসতান্তিনোপোল-এর সম্রাট কন্যা সফিয়া তার মা। কিন্তু আজ শুনলাম সফিয়া একটি পুত্র সন্তানেরও জন্ম দিয়েছে। সে এখন এই প্রাসাদেই সফিয়ার কাছে মানুষ হচ্ছে। কিন্তু এ-ই আমার মন খারাপের একমাত্র কারণ নয়, ইরবিজা। আসল কারণ—তোমাকে বোধহয় হারাবো আমি!

—কী? কি বলছো তুমি সারকান? সব ছেড়েছুড়ে শুধু তোমার জন্যেই এখানে এসেছি। সেই তোমাকেই যদি ছাড়তে হয়, তবে আর এখানে থাকবো কিসের জন্যে? কেন, কি হয়েছে?

সারকান ধীরে ধীরে বলে, তোমাকে দেখে বাবার লোভ হয়েছে।

ইরবিজা চমকে ওঠে। তাহলে তার আশঙ্কা মিথ্যা নয়। উমরের চোখে ইরবিজা দেখেছিলো লালসারই আগুন।—কিন্তু সারকান, এও শুনে রাখো, আমি সম্রাট হারদুবের কন্যা। যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ আছে সজ্ঞানে আমার দেহ স্পর্শ করতে পারবে না সে। আমার যুযুৎসুর প্যাঁচ তুমি দেখেছো, আমার তলোয়ারের মার তোমার অজানা নাই। প্রয়োজন হলে, সে তোমার বাবাই হোক আর যেই হোক, তার সদ্ব্যবহার করতে কসুর করবো না। ও নিয়ে তুমি কোনও দুর্ভাবনা করো না সারকান। নিজেকে রক্ষা করার মতো ক্ষমতা আমার আছে। আমি তোমার বাবার তিনশ একষট্টিতম রক্ষিতা হয়ে আমার জীবন বরবাদ করে দেব না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো। তাকে খুশি করার তো মেয়ের অভাব নাই। তবু আমার দিকে তার এই লোভ কেন?

—নেশা। নতুন নারী-সম্ভোগের নেশা তার রক্তের কণায় কণায়, যাই হোক, তুমি একটু সাবধানে থেকো।

এর পর ইরবিজা আর সারকান খানাপিনা করলো। সারকান বললো, আমি দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে আবার দেখা করবো।

সারকান প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই উমর আসে সফিয়ার কামরায়। সফিয়া তার দুই সন্তান নুজাৎ আর দু-অল-মাকানকে নিয়ে প্রাসাদের এই কক্ষে বাস করে। সুলতানকে এই অসময়ে তার কামরায় আসতে দেখে সফিয়া অবাক হয় যেমন, খুশি হয় তার চেয়েও বেশী।

জাঁহাপনা এ-সময়ে বাঁদীকে মনে পড়লো।

উমর বলে, তুমি যে কনসতান্তিনোপল-এর সম্রাট আফ্রিদুনের কন্যা, সে কথা আমাকে আগে বলো নি কেন সফিয়া?

—কেন, তাতে কী?

—তুমি সম্রাটের কন্যা। তোমার যোগ্য সম্মান আমি তোমাকে দিতে পারিনি।

রক্ষিতা করে রেখে তোমার উপর অবিচার করেছি। বেগমের মর্যাদা তোমার প্রাপ্য ছিলো। কিন্তু তোমার পরিচয় আমি জানতে পারিনি, তাই বাঁদী করে রেখেছি।

—আপনি মহানুভব শাহেনশাহ। আমার তো কোনও অসম্মান অমর্যাদাই আপনি করেন নি। বেগম যে ইজ্জৎ পায় আপনি কি তার চেয়ে কিছু কম ইজ্জৎ করেছেন আমাকে? এই ফুলের মতো দু'টো সন্তান আমাকে উপহার দিয়েছেন। একটা মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে? আপনি মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না, জাঁহাপনা। দুনিয়াতে আমার মতো সুখী, আমার মতো ভাগ্যবতী ক'জন আছে?

সফিয়ার কথায় উমর খুশি হয়। নুজাৎ আর দু-অল-মাকানকে কাছে টেনে আদর করে। সফিয়ার হাতে পাথর দু'খানা তুলে দিয়ে বলে, চিনতে পারছো?

পাথর দু'খানা হাতে নিয়ে সফিয়া বলে, হ্যাঁ, কিন্তু আর আধখানা কোথায়, জাঁহাপনা?

—সারকানকে দিয়েছি। এ দু'খানা নুজাৎ আর মাকান-এর গলায় পরিয়ে দাও।

সফিয়া খুশি হয়ে বলে, খুব ভালোই করেছেন। ও পাথর কাছে থাকলে কোন অসুখ বিসুখ হয় না। এই পাথর তিনখানা আমার বাবা আমাকে যৌতুক দিয়েছিলেন। আমি সম্রাট হারদুবের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। জানি না আপনার হাতে কি করে এলো?

—তোমার কি ধারণা, সম্রাট হারদুব আমাকে উপহার পাঠিয়েছেন?

—অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু শুনেছি, আমার বাবার সঙ্গে সম্রাট হারদুবের এখন শত্রুভাব চলছে। আর জাঁহাপনা নাকি আমার বাবাকে সাহায্য করতে সারকানের সঙ্গে দশ হাজার সৈন্যসামন্ত পাঠিয়েছিলেন। বুঝতে পারছি না, এই অবস্থায়, হারদুবের হাত থেকে পাথর তিনখানা আপনার হাতে এলো কি করে? তবে কি সম্রাট হারদুব পরাজিত।

উমর জবাব দেয়, না, যুদ্ধ তার সঙ্গে হয় নি।

সফিয়া অবাক হয়, তবে?

—সম্রাট হারদুবের কন্যা ইরবিজা এখন আমার হারেমে। এ পাথর তার কাছেই ছিলো। আমাকে সে উপহার দিয়েছে।

—ইরবিজা? সম্রাট হারদুবের একমাত্র সন্তান? সে আপনার হারেমের বাঁদী হয়েছে?

—একটু বাড়িয়ে বললে সফিয়া। সে আমার হারেমে অবস্থান করছে বটে, কিন্তু বাঁদী বা রক্ষিতা কিছুই সে এখনও হয়নি। হয়নি তবে হবে।

—জাঁহাপনা কি তাকে বেগম করে রাখবেন?

—তোমার আপত্তি আছে?

—না, আপত্তি কেন থাকবে! সে সম্রাট হারদুবের মেয়ে, বেগমের ইজ্জৎই তার পাওনা।

—আর তোমার?

সফিয়া বলে, আমাকে আপনি বাঁদী করেই রাখুন আর রক্ষিতা করেই রাখুন, আমি যে ইজ্জৎ পেয়েছি তাতে আর আমার কোন ক্ষোভ নাই।

উমর বলে, ইরবিজাকে এখনও কোনও প্রস্তাব আমি দিইনি। হয়তো সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করতে পারে।

সফিয়া বিস্ফারিত চোখে তাকায়।—শাহেনশাহ উমর অল-নুমানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার দুঃসাহস তার হবে কি করে?

উমর বলে, তার মতো তেজস্বী মেয়ের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু সফিয়া, তাকে দেখা ইস্তক আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। অমন রূপ হয়তো তোমাদের অনেকেরই

আছে, কিন্তু ঐরকম উদ্দাম যৌবন আমি কোনও মেয়ের মধ্যে দেখিনি। যেভাবেই হোক তার দেহ আমার চাই-ই। সে যাক, আজ আমি তোমার কাছে এসেছি অন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে।

—হুকুম করুন জাঁহাপনা।

—হুকুম নয় নয় সফিয়া, আদর আর ভালোবাসার উপহার স্বরূপ তোমার জন্যে নতুন এক প্রাসাদের ব্যবস্থা করেছি। এই রক্ষিতামহলে আর তুমি থাকবে না। তুমি আমার নুজাৎ আর মাকান-এর মা। এখন থেকে তুমি আমার বেগম—তোমার যোগ্য মর্যাদায় তুমি থাকবে তোমার নিজের প্রাসাদে। দেওয়ানকে আমি বলে দিয়েছি, তোমার ঘরদোর মন মতো করে সাজিয়ে দেবে। দাসী বাঁদী খোজা যা দরকার সব চাওয়া মাত্র পাবে। তোমার জন্যে দশ হাজার দিনার মাসোহারা মঞ্জুর করেছি।

আনন্দে সফিয়ার চোখ নেচে ওঠে। গর্বে ভরে ওঠে বুক। মুখে বলে, আপনার ভালোবাসা যখন পেয়েছি, প্রাসাদের বিলাস বৈভবে আর কি প্রয়োজন ছিলো জাঁহাপনা! কিন্তু আপনি দিচ্ছেন, আপনার ভালোবাসার দান আমি মাথা পেতে নেব।

সফিয়াকে প্রাসাদ থেকে অন্য প্রাসাদে সরাবার একটাই উদ্দেশ্য, ইরবিজার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক গড়ে উঠছে তা যাতে সফিয়া জানতে না পারে। প্রতিদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই উমর এসে উপস্থিত হয় ইরবিজার ঘরে। নানা কথায় তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। বেগম করে রাখবে। সাতমহলা প্রাসাদ বানিয়ে দেবে। হীরে জহরতে ভরে দেবে তাকে। কিন্তু ইরবিজার মন গলাতে পারে না।

—আমি আপনার বেগম হতে আসিনি, জাঁহাপনা। আপনার পুত্র সারকানের সঙ্গী হয়ে থাকতে এসেছি। এতে যদি আপনার অমত থাকে, আমি ফিরে যাবো আমার বাবার কাছে।

উমর বিমর্ষ হয়ে ফিরে যায়। কামনার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। শেষে একদিন উজির দানদানকে বলে ইরবিজার এই প্রত্যাখ্যান আমি তো আর সইতে পারছি না উজির। কিভাবে তাকে পাওয়া যায় তার একটা মতলব বাৎলে দাও।

উজির বলে, সম্রাট হারদুবের রক্ত আছে ওর শরীরে। সহজে সে বশ্যতা স্বীকার করবে, মনে হয় না।

উমর বলে, তবে? তবে কি উপায়?

দানদান ভারিক্কি চালে মাথা দোলায়, অধৈর্য হবেন না জাঁহাপনা। উপায় আমি বাৎলে দিচ্ছি। আজ সন্ধ্যায় যখন তার ঘরে যাবেন সঙ্গে নিয়ে যাবেন খানিকটা ঘুমের ওষুধ। কায়দা করে সরাবের সঙ্গে খাইয়ে দেবেন। তারপর একটু পরে সে যখন ঘুমে ঢলে পড়বে, আপনি ওর ইজ্জৎ নষ্ট করে দেবেন। তারপর পরদিন সকালে সে বুঝতে পারবে, তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে আপনার ওপর সে রুষ্ট হবে। কিন্তু দেখবেন, আস্তে আস্তে জড়তা কেটে যাবে। পরে সে নিজে থেকেই আপনাকে ডেকে পাঠাবে। কিন্তু একটা কথা, কাল থেকে আর তার ধারে কাছে ঘেঁষবেন না। অপেক্ষা করতে থাকবেন—সে-ই আপনাকে ডাকবে।

—সাব-বা-স্, উমর আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, তোমার ফন্দী বেশ চমৎকার, উজির। আমার মনে হচ্ছে, এই চালেই বাজীমাৎ করে দেব।

সন্ধ্যেবেলা উমর এলো ইরবিজার ঘরে। ইরবিজা নিরাসক্তভাবে সুলতানকে স্বাগত জানায়। বলে, বসুন জাঁহাপনা।

উমর বলে, আমি কাল বাইরে যাবো ইরবিজা, তাই আজ তোমার ঘরে একটু বেশিক্ষণ কাটিয়ে যাবার সাধ।

—তা বেশ তো, থাকুন না, যতক্ষণ ইচ্ছে।

—শুধু শুধু আর কতক্ষণ কাটানো যায় বলো, একটু যদি খানাপিনার ব্যবস্থা কর, ভালো হয়।

—এ আর এমন বেশী কি কথা হুজুর। কি খাবেন বলুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

উমর বলে, তোমার যা খুশি, ভালো একটু সরাব দাও, তা হলেই হবে।

সোনার পেয়ালায় দামী সরাব ঢেলে দেয় ইরবিজা। কিন্তু উমর পেয়ালা হাতে নেয় না।—না, না, সে হয় না। আমি একা একা খাবো না। তুমি না খেলে মৌজ হবে কি করে?

ইরবিজা মৃদু আপত্তি জানায়, সরাব খাওয়া আমার তেমন অভ্যেস নেই।

—সে কি? সম্রাট হারদুবের কন্যা, তায় আবার খ্রীষ্টান, সরাব তোমার ভালো লাগে না?

—জী না, উৎসব অনুষ্ঠানে ছাড়া বড় একটা খাই না।

উমর বলে, তা মনে কর না কেন, আজ একটা বিশেষ উৎসবের দিন। কাল আমি বাইরে চলে যাবো। আজ আমাকে না হয় বিদায় সম্বর্ধনাই জানালে।

ইরবিজা আর আপত্তি করে না।—বেশ, আপনি যখন বলছেন, আপনার সম্মানেই খাবো।

আরও একটা পেয়ালায় সরাব ঢেলে নেয় ইরবিজা। নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে টুকটুক করে তিন পেয়ালা সরাব শেষ হয়ে যায়। ইরবিজা বলে, আজ এই পর্যন্তই থাক জাঁহাপনা, আবার যখন ফিরে আসবেন, আবার একদিন আপনার সঙ্গে খাবো।

উমর বলে, কিন্তু মদের আমেজ তো এখনও লাগেনি ইরবিজা।

ইরবিজা বলে, দামী মদ, নেশা ধরতে একটু সময় লাগবে জাঁহাপনা, তা ছাড়া যত মদই খাই না কেন, বেহেড মাতাল আমি কোনও দিনই হই না। এই তো ভালো হাল্কাগুলাবী নেশা—এতেই তো বেশি আনন্দ পাওয়া যায়।

ইরবিজা ভাবে, সুলতানের মাথায় শয়তানী বুদ্ধি খেলা করছে। সরাবের নেশায় তাকে বেহুঁশ করে দিতে চায়। কিন্তু ইরবিজা হাঁদা-বোকা নয়। সবই বুঝতে পারে। এসব পুরোনো কায়দায় তাকে ঘায়েল করা যাবে না।

উমর আবদার ধরে, বেশ আর খাবে না। শুধু আমার অনুরোধে শেষবারের মতো আর এক পেয়ালা। তার অর্ধেকটা আমি খাবো। আর এ পেয়ালাটা আমি তুলে দেব তোমার মুখে। কেমন, রাজি?

অগত্যা ইরবিজা সম্মত হয়। সুলতানের সাধ, তাকে নিজে হাতে মদ ঢেলে মুখে তুলে দেবে।—ইরবিজা মনে মনে ভাবে, তুমি আমাকে যতই তোয়াজ কর, উমর, আমি তোমার খপ্পরে ধরা দিচ্ছি না। নিজে হাতে মদ ঢেলে, মুখে ধরে খাওয়াবো ভাবছো, আমি বুঝি তোমার সোহাগে গলে জল হয়ে যাবো। অত সহজে জল গলবে না, সুলতান। বৃথাই সময় নষ্ট করছো। আর মদ! কত মদ তুমি খাওয়াতে চাও? সারারাত ধরে খেলেও আমার পা টলবে না।

ঠিক আছে জাঁহাপনা, এই-ই শেষবার। আপনি নিজে হাতে ঢেলে দেবেন, শুধু সেই আনন্দেই না করতে পারলাম না।

সোনার ঝারি থেকে সোনার পেয়ালা পূর্ণ করে সরাব ঢাললো স্বয়ং সুলতান উমর অল-নুমান। নিজে আগে চুমুক দিয়ে খায় খানিকটা। শেরওয়ানীর পকেট থেকে ঘুমের বড়িটা বের করে ইরবিজার অলক্ষ্যে টুক করে পেয়ালার মধ্যে ফেলে দেয়। তারপর পেয়ালাটা ইরবিজার ঠোঁটে ধরে বলে,

—নাও, চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলো।

ইরবিজা কোন আপত্তি করে না। উৎফুল্লও হয় না। নির্বিকার ভাবে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দেয়।

সুলতান-এর চোখে শয়তানীর হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে, বাঃ এই তো কেমন লক্ষী মেয়ে! নাও, চলো, এবার খানা সেরে নিই।

দু'জনে খাবার-এর টেবিলে গিয়ে বসে। নানা রকম শাহী খানায় সারা টেবিল জোড়া। মতিয়া এগিয়ে এসে রেকাবী পেতে দেয়। সুলতান হাতের ইশারায় তাকে বাইরে চলে যেতে বলে।, আজ আমি নিজে হাতে ইরবিজাকে পরিবেশন করবো। আর ইরবিজা খানা সাজিয়ে দেবে আমার রেকাবী ভরে। তোমরা সব বাইরে চলে যাও। কেউ থাকবে না ঘরে।

ইরবিজা দেখলো, সুলতান-এর কথা জড়িয়ে আসছে। মদের নেশা বেশ ধরেছে।—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, জাঁহাপনা, সবাইকে আমি বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। ঘরে আছি এখন শুধু আমি আর আপনি। আমি আপনাকে খাওয়াবো, আর আপনি আমাকে খাওয়াবেন। এর মধ্যে ওরা থাকবে কেন?

—তুমি ঠিক বলেছো, ইরবিজা। তোমার আমার মধ্যে ওরা থাকবে কেন?

ইরবিজা ভাবলো, মদের নেশায় তাকে বেহুঁস করতে এসে বাছাধন যে নিজেই নেশায় বুঁদ হয়ে পড়লো? কিন্তু নেশা হলে কি হবে, এখনও জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। ঘর থেকে সবাইকে বিদেয় করে দিতে চায়। অর্থাৎ একাঘরে উদোম নেশায় আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় ঢলে পড়বো, এই তার বাসনা। ইরবিজার হাসি পায়। মাগীবাজ সুলতানের আশা কত? এক টুকরো মোরগমসাল্লাম ছিঁড়ে নিয়ে সুলতানের মুখে পুরে দেয় ইরবিজা।

—বাঃ বেড়ে, মজাদার পাকিয়েছে তো? তুমি খাও? এই নাও, খাও।

সুলতান নিজে হাতে একটু মাংস পুরে দেয় ইরবিজার মুখে। কিন্তু মাংসটা আর মুখে রাখতে পারে না। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে ওঠে। সুলতান দেখলো, বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ইরবিজার মাথাটা সামনে ঝুলে পড়ে। এবার হয়তো কুর্শি থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। পাঁজাকোলা করে ইরবিজার দেহটা তুলে এনে শয্যায় শুইয়ে দেয় উমর।

খানিক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে ঝড়ের বেগে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যায় সুলতান। মতিয়া ঘরে ঢুকে দেখে, ইরবিজা বিবস্ত্রা। মড়ার মতো অসাড় নিস্পন্দ তার দেহটা এলোমেলো শয্যায় নেতিয়ে পড়ে আছে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাছে আসে। বুকে হাত রেখে অনুভব করে—না, বুকের স্পন্দন ঠিকই আছে। তার কোনও হুঁস নাই। মুখ দিয়ে গ্যাজলা উঠছে। কি বিশ্রী ওষুধ খাইয়ে সর্বনাশ করে গেছে। গায়ের জামাকাপড় সংযত করে একখানা শাল চাপা দিয়ে দেয় মতিয়া।

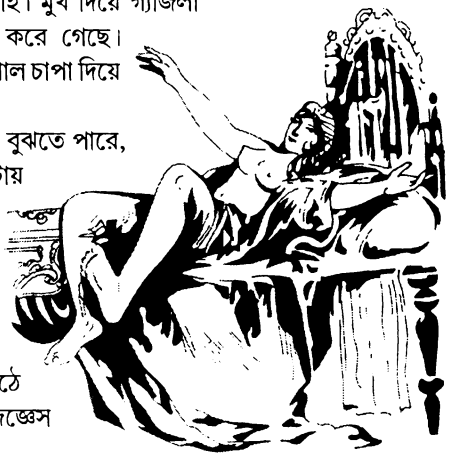

সকালবেলা ঘুম ভেঙে গেলে ইরবিজা বুঝতে পারে, কাল রাতে কি যেন ঘটে গেছে। তলপেটটায় বেশ ব্যথা হয়েছে। মতিয়া কাছে আসে। ওর চোখে জল।

—কি রে, মতিয়া, কাঁদছিস কেন?

মতিয়া কথা বলে না। ইরবিজাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ইরবিজা বুঝতে পারে না। অবাক হয়। উঠে বসে ওকে আরও কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বলতো?

মতিয়া কথা বলতে পারে না। ইরবিজার ছিন্নভিন্ন সেমিজটা আঙুল দিয়ে দেখায়—রক্তের দাগ।

চমকে ওঠে ইরবিজা। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বলতে পারে, শয়তান—

তারপরই হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মতিয়া বলে, গতকাল রাতে আপনাকে সরাবের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে এই সর্বনাশ করে গেছে সুলতান।

ইরবিজা ক্রোধে ফেটে পড়ে। পালঙ্কের বাজুতে মুষ্ঠ্যাঘাত করে বলে, এর বদলা চাই।

কিন্তু কি করে বদলা আপনি নেবেন, মালকিন! সে সুলতান। আর আপনি তারই হারেমে আশ্রিতা।

—আশ্রিতা, কিন্তু আমি তার বাঁদী রক্ষিতা নই। সে ভেবেছে, অত সহজেই পার পেয়ে যাবে? আমার বাবা সম্রাট হারদুব। ওর সলতানিয়তে ঘুঘু চরিয়ে ছেড়ে দেবে সে।

মতিয়া শান্ত করার চেষ্টা করে।—আপনি চুপ করুন, রাজকুমারী। চারদিকে সুলতানের চর আছে। আমাদের কথা শুনতে পেলে বিপদ বাড়বে। তার চেয়ে আমি বলি কি, ঠাণ্ডা মাথায় মতলব আঁটুন। সুলতানকে কি করে এর সমুচিত শিক্ষা দেওয়া যায় তার উপায় ভাবুন।

ইরবিজা মাথা নাড়ে, তুই ঠিকই বলেছিস মতিয়া। মাথা গরম করলে সব ভেস্তে যাবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। আচ্ছা এক কাজ কর, দরবারে খবর পাঠিয়ে দে আমার শরীর খুব খারাপ। এখন আমি কিছুদিন সুলতানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবো না।

ইরবিজা একা একা নিজের ঘরে দিন কাটায়। একমাত্র মতিয়া তার সঙ্গী। আর কারো সঙ্গে দেখা করে না। মাস দুই পরে ইরবিজা বুঝতে পারে, সে সন্তান-সম্ভবা। কান্নায় ভেঙে পড়ে। মতিয়াকে বলে, এখন কি হবে মতিয়া? সারকান শহরে নাই। এখন কি করি আমি।

মতিয়া পরামর্শ দেয়, যেভাবেই হোক, এখান থেকে পালাতে হবে, রাজকুমারী।

—কোথায় যাবো?

—আমরা আবার সিসারিয়াতেই ফিরে যাবো।

কিন্তু বাবা যদি আমার প্রতি বিরূপ থাকেন? তা হলে কি হবে?

মতিয়া বলে, তা থাকতে পারেন না তিনি। আপনি তার একমাত্র সন্তান। মেয়ে বলতেও আপনি, ছেলে বলতেও আপনি। আপনাকে না দেখে তিনি কি সুখে দিন কাটাচ্ছেন, আপনার ধারণা? আর তা ছাড়া সুলতান উমর আপনার উপর বলাৎকার করেছে শুনলে তিনি বাবা হয়ে কখনও চুপ করে থাকতে পারেন? তার ক্রোধে মেদিনী কাঁপে—আপনি কি জানেন না? এই শয়তানীর সমুচিৎ সাজা তিনি উমরকে দিতে কসুর করবেন না।

—তুই ঠিকই বলেছিস, মতিয়া। বাবার রাগ বড় চণ্ডাল? তার প্রতিজ্ঞা বড় মারাত্মক। তিনি যদি একবার পণ করেন, উমর-এর সর্বনাশ করবেন, তা তিনি করবেনই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে—এই প্রাসাদপুরী থেকে পালাবো কি করে! কোনও পুরুষ মানুষের সাহায্য ছাড়া এতটা পথ যাবোই বা কি করে। লোকে সন্দেহ করবে না?

মতিয়া বলে, আপনি একটু ধৈর্য ধরুন রাজকুমারী, আমি ব্যবস্থা করছি। প্রাসাদের দ্বাররক্ষীদের একজন নিগ্রো। পয়সার উপর লোকটার খুব লোভ। ওকে যদি টোপ ফেলা যায় ও গিলবে। আর ও ব্যাটা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, তাহলে পথে ঘাটে কেউ ধারে কাছে ঘেঁসতে পারবে না।

ইরবিজা বলে ঠিক বলেছিস। নিগ্রো সঙ্গে থাকলে সাধারণ লোক সাত হাত দূরে দিয়ে চলবে। তুই ওকে ভজাবার চেষ্টা কর। বলবি নোকরীর জন্য কিচ্ছু ভেবো না। সারাজীবন সুলতানের প্রাসাদের দ্বাররক্ষী থেকে যা রোজগার করবে তার দশগুণ টাকা তোমাকে একসঙ্গে দিয়ে দেব। শুধু তুমি সিসারিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তারপর তোমার পয়সা কড়ি নিয়ে দেশে গিয়ে বাস করবে। সুলতান উমর তোমার একগাছি চুলও ছিঁড়তে পারবে না।

পরদিন মতিয়া এসে বলে, নিগ্রোটা রাজি হয়েছে, রাজকুমারী। আগামী জুম্মাবার নামাজ শেষ করে সুলতান শিকারে যাবে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা দু'জনে খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবো। নিগ্রোটা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে তিনটে খচ্চর নিয়ে। শুধু বলে দিয়েছে, তুমি খুব সাধারণ সাজ পোশাকে সাজবে লোকে দেখে যাতে মনে করে, একটা সাধারণ দাসী বাঁদী।

শুক্রবার দিন সন্ধ্যাবেলা খিড়কীর দরজার পাশে তিনটি খচ্চর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিগ্রোটা। ভাবে; ভালো একটা মওকা পাওয়া গেছে। সম্রাট হারদুবের মেয়ে, খুবসুরৎ লেড়কী। হীরে জহরৎও অনেক পাওয়া যাবে। ভালো করে দেহের ক্ষিদেটাও মিটিয়ে নিতে পারবো।

কিছুদিন ধরেই ইরবিজার শরীরটা একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। কিছুই খেতে পারে না। যা খায় বমি হয়ে যায়। সারা শরীর গুলিয়ে যেতে থাকে। মতিয়া বলে, ওতে ভয়ের কিছু নাই। এ সময় ও রকম হয়। আবার কয়েকদিন বাদেই দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে।

—কিন্তু মতিয়া, শরীরে আমি কোনও জোর পাচ্ছি না রে। মনে হচ্ছে ছ'মাসের রুগী।

—এ কোনও অসুখ নয়, রাজকুমারী। পেটে বাচ্ছা এলে প্রথম প্রথম সব মেয়েরই এরকম হয়। নিন তৈরি হয়ে নিন, নিগ্রোটা বোধহয় এসে দাঁড়িয়ে আছে।

মতিয়া ওকে সাধারণ সাজ পোশাক পরায়। একটা মাঝারি গোছের অতি সাধারণ বাক্সে ভরে সব হীরে জহরতের গয়নাগাটি। সবারই অলক্ষে আস্তে আস্তে খিড়কীর দরজার কাছে চলে আসে। তিনটে খচ্চর নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো নিগ্রোটা। বলে, বহুৎ দেরি করলেন, লিন, চটপট উঠে পড়ুন।

কৃষ্ণপক্ষের মাঝামাঝি। আকাশে তখনও চাঁদ ওঠেনি। অন্ধকার পথ। গা ছমছম করে নিগ্রোটা বলে, কোন ভয় নাই, লাগামটা শক্ত করে চুপচাপ বসে থাকুন। কোনও শালা কাছে ঘেঁসতে সাহস পাবে না। আর যদি কেউ হামলা করতে আসে, আমার এক এক কোপে সাবাড় করে দেব সব। মাঝরাত বরাবর আসমানে চাঁদ উঠবে। তখন আর পথ চলতে কষ্ট হবে না।

নিঝুম নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। খচ্চর তিনটের পায়ের শব্দ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই কানে আসে না। মাঝে মাঝে হয়তো বা কোনও রাত জাগা পাখির আওয়াজ, কিংবা শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে। অনেক মাঠ ঘাট জঙ্গল পেরিয়ে চলতে থাকে ওরা। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় আকাশে ভাঙ্গা চাঁদ দেখা গেলো। ইরবিজা বললো, মতিয়া, শরীরটা বড়ই খারাপ করছে রে, রাতের মতো কোথাও বিশ্রাম করলে হয় না?

নিগ্রোটা বললো, এই বাঁকটা পেরোলেই একটা বাগান পাওয়া যাবে। ওখানে গাছের তলায় রাতটা কাটিয়ে লিন। তারপর আবার ভোরবেলা রওনা হওয়া যাবে।

মতিয়া বললো, তাই করো।

একটু পরেই নিগ্রোটা বললো, এইখানে নেমে পড়ুন আপনারা।

ইরবিজা আর মতিয়া নেমে পড়ে। একটা গাছের তলায় চাদর বিছিয়ে মতিয়া বলে, এখানে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নিন, রাজকুমারী। আমি জেগে আছি।

ইরবিজার শরীর এলিয়ে পড়েছিলো। আর দ্বিরুক্তি না করে শুয়ে পড়লো। মতিয়াও পাশে বসে ঝিমাতে লাগলো। হঠাৎ একটা বিদঘুটে আওয়াজে দু'জনেরই তন্দ্রা ছুটে যায়। ধড়মড় করে উঠে বসে ইরবিজা। দেখে মতিয়া ভয়ে কাঁপছে।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই নিগ্রোটা। দৈত্যের মতো চেহারা। একেবারে উলঙ্গ। মুখে তার শয়তানের হাসি। হাতে শাণিত তলোয়ার।

একা একা শুয়ে শুয়ে রাত কাটবে। তাতো হবে না রাজকুমারী! আজ আমি

তোমার লাগব হবো। কেন, আমাকে দেখে কি পছন্দ লয়! নাকি সতীপনা করছো? তা বাবা সুলতান উমর তো তোমার সতীপনা খতম করে দিয়েছে।

—চোপ রহ, বেয়াদপ!

ইরবিজা গর্জে ওঠে। নিগ্রোটা কিন্তু চুপ করে না। ভয়ও পায় না। বলে আ-হা, অত চটছো কেন, মালকিন। চটে কোনও লাভ নাই। এখানে তোমার কোনও বাপ বাঁচাতে আসবে না। যা বলছি ভালো মেয়ের মতো শোনো। তা না হলে এই যে দেখছো—

ইরবিজা রাগে থর থর করে বলে, শুয়ার কা বাচ্চা! ও দিয়ে আমাকে কব্জায় আনতে পারবি না।

ইরবিজা হাঁপাতে থাকে। একে অসুস্থ শরীর। তায় এই উত্তেজনা। মনে হয় এখুনি বুঝি টলে পড়ে যাবে সে। মতিয়া ওকে জাপটে ধরে। আপনি উত্তেজিত হবেন না, রাজকুমারী। শান্ত হোন। লোকটা যে এমন শয়তান তাতো ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি।

নিগ্রোটা আবার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কই কি হলো? সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না দেখছি।

ইরবিজা উঠে দাঁড়ায়। সারা শরীর কাঁপতে থাকে। একটা পাথরের চাই পড়েছিলো পাশেই। তুলে নিয়ে ছুড়ে মারতে চেষ্টা করে।—শয়তান, ভেবেছিস, তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে সর্বনাশ করবি। তা কিছুতেই হবে না।

যে হাতে একদিন গন্ধমাদন পর্বত উপড়ে ফেলার ক্ষমতা ছিলো, সেই হাতে আজ সে সামান্য পাথরের ঢেলা ছুঁড়তে পারলো না। ব্যর্থতার আক্রোশে দিশেহারা হয়ে ঘুষি বাগিয়ে সে নিগ্রোটার দিকে ছুটে যায়।—মেরেই ফেলবো, হারামজাদাকে।

কিন্তু মারা আর হলো না। নিগ্রোর তলোয়ারের ফলা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেলো তার বুকে। সেই নিশুতি নিস্তব্ধ নির্জন রাতে ইরবিজার রক্তাক্ত দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো।

এইভাবে কুঁড়িতেই বিনষ্ট হয়ে গেলো তার অমূল্য জীবন।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন বাহান্নতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়।

শাহরাজাদ বলে, নিগ্রোটার হাতে সম্রাট হারদুবের কন্যা ইরবিজা নৃশংস ভাবে নিহত হলো। এইভাবে অকালে বিনষ্ট হয়ে গেলো, ফুলের মতো সুন্দর একটা জীবন।

ইরবিজার যা কিছু ধনরত্ন ছিলো, সব নিয়ে নিগ্রোটা পাহাড়ের পথে উধাও হয়ে গেলো। মতিয়া বসে বসে কাঁদতে থাকে। এমন সময় দেখা গেলো, সারা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে এক অশ্বারোহী বাহিনী ছুটে আসছে। আর একটু কাছে আসতেই মতিয়া সৈন্যবাহিনীর সাজ পোশাক দেখে বুঝতে পারলো, সিসারিয়া সম্রাট হারদুবের বাহিনী। মনে কিছুটা ভরসা পায়। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ইশারা করতে থাকে। হারদুব এসে থেমে পড়ে। ইরবিজার রক্তাপ্লুত দেহ দেখে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে আসে।—কে? কে করলো আমার এই সর্বনাশ?

বাগদাদের সুলতান উমর-ইল-নুমানের ক্রীতদাস এক নিগ্রোর হাতে কি ভাবে ইরবিজা নিহত হয়েছে এবং সুলতান উমর তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে কি জঘন্য উপায়ে তার উপর বলাৎকার করেছে, সব সবিস্তারে বললো মতিয়া।

সম্রাট হারদুব রাগে গর্জে ওঠে, হুম্ এতো বড় স্পর্ধা, তোমার উমর! আমার মেয়েকে বাঁদী রক্ষিতা পেয়েছো? এর প্রতিদান তোমাকে পাই পাই করে করে মিটিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে আমার আদরের দুলালীর শেষকৃত্য সমাধা করতে হবে।

সারকানের হাতে হারদুবের একশত সৈন্যসামন্ত নিহত হওয়ার 'পর বাঁদী সর্দারনী সে বুড়িটার মুখ থেকে যখন হারদুব শুনলো, বাগদাদের সুলতান-এর পুত্র সারকান ইরবিজাকে তুক তাক করে ভুলিয়ে তার দেশে নিয়ে গিয়ে উমরের বাঁদী করে রেখেছে, হারদুব তখন এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য এক বিশাল অশ্ব বাহিনী নিয়ে বাগদাদের দিকে ধাবমান হচ্ছিলো। পথি মধ্যে এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়লো সিসারিয়ার সম্রাট হারদুব তার সেনাপতিদের নির্দেশ দিলো, আগে রাজকুমারীর মৃতদেহ যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাহিত করতে হবে। তারপর শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করা যাবে।

সুতরাং সম্রাট হারদুব আপাততঃ আক্রমণ স্থগিত রেখে কন্যার মৃতদেহ নিয়ে দুর্গে ফিরে এলো। বাঁদী সর্দারনী বুড়ি কেঁদে আকুল।—হায় হায়, আমার সোনার বাছার এই হাল কে করলো?

সম্রাট হারদুব বলে, কে আবার, সেই সাচ্চা মুসলমানের বাচ্চা—উমর। শয়তানটা আমার মেয়ের উপর বলাৎকার করেছে। আর তারই ক্রীতদাস দিয়ে হত্যা করিয়েছে। এও তোমাকে বলে রাখছি, সর্দারনী, এর প্রতিশোধ আমি নিজে হাতে নেবো। দেখবো, সুলতান উমর কত বড় শাহেনশাহ। বাঁদী সর্দারনী বলে,—সম্রাট আপনি অধৈর্য হবেন না। উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে গেলে কার্য সিদ্ধি হবে না। প্রতিশোধ নিতে হয় ঠাণ্ডা মাথায়। মুসলমানরা বলে, শত্রু যখন সব ভুলে নিজেকে অসতর্ক অরক্ষিত করে রাখবে সেই সুযোগে তাকে আক্রমণ করে কাজ হাসিল করো। দরকার হলে এই সুযোগের জন্য চল্লিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। শয়তানটাকে কি করে সমুচিত শিক্ষা দিতে হয় আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব। সারা পৃথিবীর লোক অবাক হয়ে তারিফ করবে, হ্যাঁ এর নাম বদলা। আমি ওকে সবংশে নিধন করবো। শুধু আমি যা বলি, ভালো করে শুনুন এবং আমাকে সাহায্য করুন। প্রথমে আপনার সারা সাম্রাজ্য খুঁজে গোটা পাঁচেক সুন্দরী কিশোরী সংগ্রহ করুন। তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্যে সবচেয়ে সেরা জনা কয়েক মুসলমান শিক্ষক দরকার। আপনার সাম্রাজ্যে তার অভাব নাই। এই শিক্ষকগুলোর কাজ হবে এই মেয়েগুলোকে তালিম দিয়ে পাক্কা মুসলমানী আদব কায়দায় গড়ে তোলা। আরব ইতিহাস তাদের নখদর্পনে থাকবে। খলিফাদের চৌদ্দ পুরুষের ঠিকুজি কুষ্ঠি মুখস্থ থাকবে। কথাবার্তা চালচলন আদবকায়দা নাচ-গান খানা-পিনা রীতি-নীতি আচার আচরণ সব এমন ভাবে তাদের রপ্ত করাতে হবে যাতে কেউ না সন্দেহ করতে পারে—তারা খানদানী মুসলমান ঘরের মেয়ে নয়। এই সব শিক্ষা-দীক্ষা দিতে যদি দশ বছরও সময় লাগে, লাগবে। তবু চুল-চেরা নিঁখুত নিখাদ হওয়া চাই। কারণ এই মেয়েগুলোই আমার প্রতিশোধ নেবার একমাত্র হাতিয়ার। আপনি বোধ হয় জানেন সম্রাট, ওই অসভ্য জংলী সুলতানটা দাসী বাঁদীদের সঙ্গে ব্যভিচার করে। শুনেছি, তার হারেমে নাকি বেগম ছাড়াও তিনশো ষাটটি রক্ষিতা আছে। সারা বছর ধরে প্রতি রাতে এই জানোয়ারটা এক একটি রক্ষিতার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এখন আবার সোনায় সোহাগা হয়েছে আমাদের রাজকুমারী ইরবিজা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো একশোটা কুমারী। এখন তারাও ভোগের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানোয়ারটার ভোগলালসার চরম নিবৃত্তি কেমন করে মেটাতে হয় আপনি দেখবেন।

সম্রাট হারদুব-এর মনটা কিছু হাল্কা হয়। বাঁদী সর্দারনীকে সাবাস জানিয়ে বলে আজই তোমাকে পাঁচটা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী কিশোরী পাঠিয়ে দিচ্ছি। এমন মেয়ে পাঠাবো, কালে যাতে তারা রগরগে যুবতী হতে পারে।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো সে।

তিপ্পান্নতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার গল্প শুরু হয়।

শাহরাজাদ বলে, তারপর শুনন জাঁহাপনা, সম্রাট হারদুব পাঁচটি সুন্দরী মেয়ে আর তাদের মুসলমানী কেতায় মানুষ করার জন্যে পাঁচজন চৌকস মৌলভী পাঠিয়ে দিলো। বাদী সর্দারনীর তত্ত্বাবধানে থেকে মেয়েগুলোর শিক্ষাদীক্ষার কাজ শুরু হলো।

এদিকে সুলতান উমর-অল-নুমান শিকার শেষে প্রাসাদে ফিরে শুনলো, ইরবিজা নাই। এতো কড়া পাহারা ফাঁকি দিয়ে সে কিভাবে পালাতে পারলো ভাবা যায় না। সুলতান উমর-এর হুঙ্কারে প্রাসাদ কেঁপে ওঠে, আমার প্রাসাদ থেকে সে পালিয়ে গেলো, আর তোমরা তা দেখতে পেলে না? আমি বাইরে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র কি তোমরা সব নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়! জবাব দাও। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কারো রেহাই নাই। এক এক করে সবগুলোকে আমি কোতল করবো। কোনদিন হয়তো এসে দেখবো, আমার সিংহাসনটাই চুরি গেছে। আশ্চর্য।

দ্বার রক্ষীরা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। এই বুঝি গর্দান নেবার হুকুম হয়। একজন সাহস করে এগিয়ে আসে, জাঁহাপনা, ইয়ে মানে—আমাদের গিয়ে—ইয়ে মানে—মানে।

—ওরে হতভাগা যা বলবি চটপট বল, 'ইয়ে মানে—ইয়ে মানে' করছিস কেন?

—না মানে হুজুর মানে—আমাদের মানে।

—থাম বেল্লিক, আর মানে মানে করে কাজ নাই। সোজা আরবী ভাষায় বল দিকিনি, কি বলতে চাস?

—মানে হুজুর নিগ্রো—

—কি বললি, আমি নিগ্রো?

—না মানে হুজুর ঐ নিগ্রোটা।

—কোন্ নিগ্রোটা?

—ওই যে হুজুর, দ্বাররক্ষী নিগ্রোটা—ওরই সঙ্গে সাট করে পালিয়েছেন উনি। মানে—গিয়ে সরষের মধ্যেই ভূত।

উমর-অল-নুমান বুঝলো, দ্বাররক্ষী নিগ্রোটার সঙ্গে যোগসাজস করে ইরবিজা পালিয়েছে।

সারকান শহরে ছিলো না। সে-ও ফিরে এসে শুনলো, ইরবিজা নিরুদ্দেশ হয়েছে। সুলতান তার উপর বলাৎকার করেছে। বাবার এই ব্যবহারে সারকান ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। মেয়েদের নিয়ে তার এই ছিনিমিনি খেলা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ইরবিজার জন্যে মনটা হু হু করতে থাকে। বেচারী মনের দুঃখে প্রাসাদ ছেড়ে কোথায় গেলো? তারই কথায় সে বাগদাদে এসেছিলো। উচিত ছিলো তাকে রক্ষা করা। কিন্তু পারেনি। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়। ক্রমশই বাবার ওপর মনটা বিষিয়ে ওঠে। সারকান ঠিক করে, এখানে আর সে থাকবে না। এই প্রাসাদপুরী তার কাছে পাপপুরী বলে মনে হয়।

সুলতান উমর লক্ষ্য করে, সারকান আর সে-সারকান নাই। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, কারো সঙ্গে ভালো করে কথাবার্তা বলে না। সব সময় কেমন মনমরা হয়ে থাকে। একদিন সারকানকে কাছে ডেকে উমর জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বেটা, তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখছি কেন?

সারকান বলে, আব্বাজান, আমি আর এই প্রাসাদে থাকতে চাই না। আপনি আমাকে অন্য কোথাও পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

—কোথায় যেতে চাও?

—আপনার সলতানিয়তের যে-কোন একটা সুবায় আমাকে পাঠিয়ে দিন। আমি সেখানেই গিয়ে থাকবো।

সুলতান উমর বললেন, আমার সুবার মধ্যে সবচেয়ে সেরা দামাসকাস। নানাদিক থেকে দামাসকাসের গুরুত্ব অনেক বেশি। তোমার যদি পছন্দ হয়, ওখানকার সুবাদার হয়ে তুমি যেতে পারো।

সারকানের তখন এমন মানসিক অবস্থা, বাগদাদ ছেড়ে পালাতে পারলে বেঁচে যায়। বললো, আমি রাজি, জাঁহাপনা। আপনি ব্যবস্থা করে দিন, আমি আর বিলম্ব করতে চাই না।

সুলতান উজির দানদানকে নির্দেশ দিলো, সারকান দামাসকাসের সুবাদার হয়ে যাবে। তুমি তার যাত্রার আয়োজন কর।

সারকান দামাসকাসে পৌঁছলে বিপুল সম্বর্ধনা করে স্বাগত জানালো প্রজারা। শহরের বড় বড় রাস্তার মোড়ে তোরণদ্বার তৈরি করা হয়েছিলো। আলোর মালায় সাজানো হয়েছিলো সারা শহর। আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছিলো দামাসকাস।

সারকান বিদায় নেবার পর উমর-অল-নুমান তার কন্যা নুজাৎ আর পুত্র দু-অল-মাকানের খোঁজ খবর নিয়ে জানলো, তারা পড়াশুনা করে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। বৃদ্ধ মৌলভী সাহেব বললেন, জাঁহাপনা, আমার যা কিছু শেখাবার ছিলো, সবই তাদের শিখিয়ে দিয়েছি। ধর্ম সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানে তারা দু'জনেই যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেছে। আমার বিবেচনায় পুঁথিগত বিদ্যার পাঠ তাদের শেষ হয়েছে।

সুলতান-উমর শুনে খুশি হয়ে মৌলভীকে মূল্যবান বস্ত্রাদি এবং প্রচুর অর্থ পুরস্কৃত করে বিদায় দিলো।

এই সময় নুজাৎ আর দু-অল-মাকান-এর বয়স চৌদ্দ বছর। তাদের বিদ্যাবুদ্ধির কথা বাগদাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লো। বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে লাগলো। গর্বে সুলতানের বুক ফুলে উঠলো।

একদিন কিশোর দু-অল-মাকান প্রত্যক্ষ করলো, একদল হজ যাত্রী বাগদাদ শহরের ভিতর দিয়ে মিছিল করে চলেছে। পার্শ্বচরকে জিজ্ঞেস করতে সে জানলো, ওরা সব ইরাক থেকে আসছে। যাবে মক্কায়। প্রতি বছর মক্কায় যে হজ মেলা হয় সেই মেলায় গিয়ে আল্লাহর নাম গান করবে। তারপর ওরা যাবে মদিনায়—যেখানে পয়গম্বর মহম্মদের সমাধি ক্ষেত্র।

দু-অল-মাকানের নিষ্পাপ কিশোর চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সে বলে, আমিও যাবো।

পার্শ্বচর বোঝায়, আপনি তো এখনও নাবালক, হুজুর। সাধারণত, মানুষ সব ভোগ-লালসা বিসর্জন দিতে যায় সেখানে। কিন্তু আপনার তো এখনও জীবনের শুরুই হয়নি। এখনই সেখানে যাবেন কেন?

দু-অল-মাকান কিন্তু সে কথায় ভুলতে চায় না।—না, আমি যাবো। পার্শ্বচর বলে, আপনি সুলতানকে জানান, তিনি যদি মত দেন, গিয়ে দেখে আসবেন।

কিন্তু সুলতান উমরও সেই কথাই বলে, দূর বোকা ছেলে, ওখানে তুই যাবি কেন? সংসারের সবকিছু দেখা শোনা শেষ হলে, সব কামনা বাসনার পূর্ণ হলে তবে মানুষ যায় মক্কায়। সেখানে গেলে সংসার-এর মায়া বন্ধন আর মানুষকে আকর্ষণ করে না।

দু-অল-মাকান তবু বায়না ধরে, না আমি যাবো।

সুলতান দেখলো, ছেলেকে কিছুতেই ভোলানো যায় না। বললো, সেখানে তো তুমি একা একা যেতে পারবে না, বাবা। সামনের বছর আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

মাকান আব্দার ধরে, না, আব্বাজান, তুমি এই বারেই চলো।

উমর-অল-নুমান ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে, এখন আমার হাতে অনেক জরুরী কাজ বাবা। এ বছর যাওয়া হবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সামনের বার নিয়ে যাবো।

—আল্লাহর উদ্দেশে যাওয়ার চেয়ে আবার অন্য কোনও জরুরী কাজ থাকতে পারে নাকি, আব্বাজান?

উমর-অল কি করে বোঝায়, পুঁথিতে যে-সব কথা লেখা থাকে তা-ই সব নয়। কিন্তু ছেলের কথার জুৎসই জবাবও দিতে পারে না। শুধু বলে, এখন তুমি মার কাছে যাও বাবা, আমি তোমাকে পরে নিয়ে যাবো।

কিশোর মাকান কিন্তু শান্ত হয় না। তার মাথায় তখন এক চিন্তা। মক্কা যেতে হবে। আল্লাহর পয়গম্বর মহম্মদের পবিত্র পদধূলি মিশে আছে মক্কার পথে ঘাটে। সেই মাটি মাথায় ধরণ করে সার্থক হবে সে। সারা রাত বিনিদ্র রজনী কাটে। যেভাবেই হোক—মক্কায় সে যাবেই। সকালে বোন নুজাৎকে বলে, আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে দিদি, আমি মক্কায় যাবো। কিন্তু কি করে যাবো রে!

নুজাৎ বলে, আমারও খুব যেতে ইচ্ছে ভাই। কিন্তু বাবা-মা কেউই রাজি হবে না।

মাকান বলে, চল, পালিয়ে যাই।

—পালিয়ে যাবো? কেমন করে?

মাকান বুদ্ধি বাৎলায়, তুই কিছু ভাবিস নি, দিদি। আমি তোকে নিয়ে যাবো। তুই বরং এক কাজ কর। মার বাক্স থেকে কিছু টাকা পয়সা আর কিছু সাজ-পোশাক হাতিয়ে নে। দেখিস কেউ যেন না টের পায়। দু'টো উট ভাড়া করে আমরা হজ-যাত্রীদের মিছিলে সামিল হয়ে যাবো। তাহলেই দেখবি একদিন মক্কায় পৌঁছে গেছি।

নুজাৎ বলে, কিন্তু আমি মেয়েছেলে, সবে আমার যৌবন আসছে। এই সময় পথে ঘাটে অনেক বিপদ-আপদ ঘটতে পারে।

মাকান বলে, তোর মাথায় কিছু বুদ্ধি নাই। তুই আমার সাজ-পোশাক পরে ছেলে সেজে নে। তাহলেই ল্যাঠা চুকে গেলো।

নুজাৎ বলে, ঠিক বলেছিস, ভাই। তোর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

রাত্রে মাকান এসে নুজাৎকে জানায়, কালকের ভোরে আমরা চুপি চুপি বেরিয়ে যাবো শহরে। ওখানে দু'টো উট ভাড়া করে রাখবে আমার নফর। আমি সব ব্যবস্থা করেছি। ইরাক থেকে যে-সব হজ যাত্রীর দল কাল বাগদাদে আসবে তাদের সঙ্গে মিশে যাবো আমরা। কেমন, ঠিক আছে?

নুজাৎ বলে, বিলকুল ঠিক আছে।

এইভাবে দুই কিশোর-কিশোরী একদিন মক্কায় এসে পৌঁছয়। পবিত্র আরাফৎ গিরিশৃঙ্গ এবং মদিনার পবিত্র সমাধি ক্ষেত্র দর্শন করে ওদের মন আনন্দে ভরে যায়।

এবার ঘরে ফেরার পালা। তীর্থযাত্রীরা অনেকেই ফেরার পথে খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, যীশুর জন্মস্থান জেরুজালেম শহরটা দেখে যায়। মাকান বললো, দিদি চল, আমরাও জেরুজালেম দেখে তারপরে দেশে ফিরবো।

কিন্তু তীর্থযাত্রীদের অনেকেই বারণ করেছিলো।

—এই বয়সে এতো ধকল কি তোমাদের সহ্য হবে? পথ বড়ো খারাপ।

মাকান বলে, খারাপ তো কি হয়েছে? কত বুড়ো হাবড়া যাচ্ছে, আর আমরা যেতে পারবো না?

কিন্তু পথ চলতে চলতে মনে হতে লাগলো, না এলেই ভালো হতো। দুর্গমগিরি কান্তার মরু পেরিয়ে চলতে চলতে দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। জন্মাবধি কোন কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস নাই। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। ওরা কেন সইতে পারবে এই দুঃসহ খরতাপের জ্বালা? নুজাতের জ্বর পথের মধ্যেই সেরে গেলো। কিন্তু দু-অল-মাকান দিন দিন কাহিল হয়ে পড়তে থাকে। এইভাবে একদিন ওরা জেরুজালেমে এসে পৌঁছয়। মাকান তখন জ্বরে অচৈতন্য। প্রলাপ বকে চলেছে।

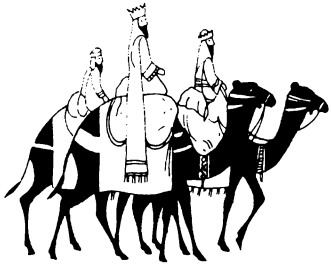

শহরের উপান্তে একটা সরাইখানায় আশ্রয় নেয় তারা। নুজাৎ-এর মনে ভয় ধরে। এই বিদেশ বিভুঁই-এ অসুস্থ ভাইকে নিয়ে সে কিভাবে দেশে ফিরবে?

দিন যায় রাত্রি আসে। কিন্তু মাকান-এর জ্বর বাড়তেই থাকে। হাতে যা পয়সা কড়ি ছিলো ফুরিয়ে এলো। কিন্তু মাকান-এর জ্বর কমে না। নুজাৎ চিন্তায় পড়লো। সাজ্‌পোশাক যা ছিলো এক এক করে বিক্রি করতে লাগলো। কিন্তু তাতে আর কতদিন চলতে পারে? একদিন নুজাৎ দেখলো, বিক্রি করার মতো আর কোন সাজ-পোশাকও অবশিষ্ট নাই। নুজাতের কান্না পায়। হায় আল্লাহ, এ কি বিপদে ফেললে? এখন কি করি? কি করে আমার ভাই-এর মুখে ওষুধ পথ্য দিই? আর কি করেই বা দেশে ফিরবো?

আল্লাহ বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন। মাকানের জ্ঞান হলো।—দিদি কাঁদিস নি। আমার জ্বর সেরে যাবে। আমরা শিগ্গিরই দেশে ফিরে যাবো। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে রে। কিছু খাবার দে।

সুলতানের ছেলে আজন্ম ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে লালিত হয়েছে। সে কি করে বুঝবে, খেতে চাইলেই সবাই খেতে পায় না। খাবার কিনতে পয়সার প্রয়োজন হয়। নুজাৎ বলে, কিন্তু ভাই, আমার কাছে তো পয়সাকড়ি কিচ্ছু নাই। কি করে তোকে খেতে দেব? লোকের কাছে ভিক্ষে মাঙবো, তাও পারছি না। যাই হোক, আজকের রাতটা একটু কষ্ট করে থাক। কাল আমি কোনও আমির সওদাগর—কারো বাড়ি গিয়ে ঝি-এর কাজ করেও কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আসবো। সারাটা দিন তোকে ছেড়ে থাকতে আমার মন চাইছে না। কিন্তু কি করবো, ভাই, আল্লাহর বোধহয় এ রকমই ইচ্ছে। জানি না, তিনি কবে আমাদের আবার বাগদাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

পরদিন সকালে নুজাৎ ভাই-এর কপালে চুমু দিয়ে পথে নেমে আসে। কিন্তু কোথায় যাবে, কার বাড়িতে কাজ পাবে কিছুই বুঝতে পারে না। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে।

দু-অল-মাকান সারাদিন অপেক্ষা করে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে গেলো, কিন্তু নুজাৎ ফিরে আসে না। ক্ষিদের জ্বালায় পেটের নাড়ি জ্বলতে থাকে। সারাটা রাত ক্ষিদের দুশ্চিন্তায় বিনিদ্রভাবে কাটে। কিন্তু নুজাৎ ফিরে এলো না। তার পর দিনও সেই ভাবে কেটে যায়। তারও পরের দিন অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু নুজাতের কোনও সন্ধান পাওয়া গেলো না। আজ পুরো দু'টো দিন-রাত্রি মাকান কিছু খায়নি। খিদের জ্বালায় চোখে অন্ধকার দেখছে। কোন রকমে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে দরজার চৌকাঠ অবধি আসে। সরাইখানার একটা চাকরকে বলে, আমাকে একটু বাজারে নিয়ে যাবে, ভাই। আমি আজ দু'দিন খাইনি। খিদের জ্বালা আর সইতে পারছি না।

চাকরটা বলে, কিন্তু সেখানে কে তোমাকে খেতে দেবে?

—যদি কারো দয়া হয়। না হলে এখানে থেকেই বা কি করবো।

চাকরটা ওকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে বাজারের এক পাশে একটা পোড়ো বাড়ির বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে চলে আসে। মুখে আওয়াজ তুলে কারো কাছে ভিক্ষে চাইবে, মাকানের তখন সে অবস্থাও নাই। পথচারীদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। মুখে কিছু বলতে পারে না। শুধু হাতের ইশারা করে জানায়, সে বড় ক্ষুধার্ত, একটু কিছু খেতে চায়।

মাকানেরই সমবয়সী কয়েকটি ছেলে ওর আবেদনে সাড়া দেয়। বাজারের দোকানীদের কাছ থেকে চাঁদা করে পয়সা তুলে মাটির থালা করে কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসে। মাকানকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও পেটভরে খেতে পারে না সে। একটুখানি মুখে দিতেই বমি হয়ে যায়। আবার নেতিয়ে পড়ে। খাবার কেনার পর চাঁদার পয়সা তিরিশ দিরহাম বেঁচে ছিলো। অনেকেই বললো, একটা উট ভাড়া করে দামাসকাসের হাসপাতালে পৌঁছে দাও তোমরা। না হলে বাচ্চাটা মরে যাবে। সুলতান উমর-অল-নুমানের সরকারী হাসপাতালে ভালো চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। গরীব দুঃখীদের কোনও পয়সা লাগে না।

সবাই জল্পনা কল্পনা করলো অনেক। কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এলো না। দামাসকাস অনেক দূরের পথ। নিজের কাজকাম বন্ধ করে কে আর পরের উপকার করতে ছুটবে? শেষ পর্যন্ত এক এক করে সবাই কেটে পড়লো। শাহেনশাহ উমর অল-নুমানের পুত্র শাহজাদা দু-অল-মাকান সেই পোড়ো বাড়ির খোলা বারান্দার এক কোণে মরার মতো পড়ে থেকে রাত্রি কাটালো। মাটির বাসনে একটু রুটি আর এক ভাড় জল রেখে গেলো ওরা। কিন্তু মাকানের কোনও চৈতন্য নাই। কি করে সে খাবে?

পরদিন সকালে একটা লোক দোকানে দোকানে চাঁদা তুলতে লাগলো। সবাইকে বললো, একটা বাচ্চা, এখানে পড়ে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে—আপনারা যে যা পারেন সাহায্য করুন। আমি ওকে দামাসকাসের সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাবো।

দোকানীরা তো দিলোই। পথচলতি মানুষও দয়া পরবশ হয়ে যার যা সাধ্য সাহায্য করলো। লোকটার উদ্দেশ্য সাধু ছিলো না। একটা উট ভাড়া করে মাকানকে নিয়ে রওনা হলো। বাজার ছাড়িয়ে শহরের শেষ প্রান্তে এসে চাঁদার পয়সাগুলো বের করে গুণে দেখলো। প্রায় দশ দিনারের মতো হবে। শয়তান লোকটা মাকানকে একটা সরকারী হামাম-এর পাশে নামিয়ে দিয়ে স্বগতভাবে বলতে থাকে, এই মরাটাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আমার কি ফায়দা হবে। তার চেয়ে থাক, এখানেই মর। আল্লাহ, আমার কোনও দোষ নিও না। ছেলেটার যদি বাঁচার কোনও আশা থাকতো, তবে তোমার নামে কসম খেয়ে বলছি, ওকে আমি দামাসকাসের হাসপাতালে পৌঁছে দিতাম।

এই বলে বদমাইশটা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

একটু পরে হামামের পাশে একটা লোক এসে দাঁড়ালো। বৃদ্ধ—দাড়ি গোঁফ সাদা হয়ে গেছে। এই হামামে সে চাকরী করে। যারা গোসল করতে আসে তাদের গরম জল জোগানই তার কাজ। একটা বিরাট চুল্লী আছে হামামের একপাশে। আর আছে একটা চেলাকাঠের গুদাম। সারাদিন ধরে সে শুধু গরম জল করে যায়। পথচারীরা আসে গোসল করতে। যার দরকার তাকে গরম জল দেয়। এর জন্যে সে সরকারের কাছে বেতন পায়। অবশ্য সে বেতন অতি সামান্য। স্বামী-স্ত্রীর কোন রকমে চলে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ বড় সৎ। কোনো পথচারী স্নান সেরে খুশি হয়ে দু'পয়সা বকশিস করতে এলে নেয় না। বলে, আল্লাহর দোয়ায় আমার কোনও অভাব নাই, জনাব। আমি নিতে পারবো না।

বৃদ্ধ ভাবে, এই সকালবেলা দরজার সামনে একটা মড়া ফেলে গেলো কে?

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তার ভুল ভাঙ্গে। না, ছেলেটা তো মরেনি। হাত পা নাড়ছে যেন মনে হচ্ছে। কাছে গিয়ে নাড়ি ধরে দেখে বৃদ্ধ বুঝতে পারে, এখনও ছেলেটা বেঁচে আছে।

কিন্তু এ অবস্থায় থাকলে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না হয় তো বা। বৃদ্ধ ভাবে, ছেলেটা বোধ হয় খারাপ দলে পড়ে বেশি মাত্রায় হাসিস খেয়েছে। কিন্তু ভালো করে দেখে বুঝতে পারলো, না, নেশা করে বেহেড হয়নি। অসুখে অসুখে দুর্বল হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে না খেতে পেয়েই তার এই মরণাপন্ন দশা। কিন্তু অবাক লাগে তার, এমন ফুলের মতো টুকটুকে সুন্দর ছেলে তো কোনও সাধারণ ঘরের নয়। নিশ্চয়ই কোনও খানদানী পরিবারের ধনীর দুলাল। কিন্তু এ অবস্থায় কে তাকে এখানে ফেলে গেলো? যাই হোক, আগে ওকে সুস্থ করে তোলা দরকার। তারপর জানা যাবে, কেমন করে কোথা থেকে এলো!

মাকানকে বৃদ্ধ কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ি আসে। বিবিকে বলে, দেখো, ছেলেটা বোধহয় না খেতে পেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। আগে একে খাইয়ে ধুইয়ে সুস্থ করে তোলো। মনে হচ্ছে খানদানী ঘরের ছেলে।

বিবি আঁৎকে ওঠে, আহা-হা, এমন সোনার চাঁদ বাছা। একে পেলে কোথায়?

হামামের পাশে চেলা কাঠের গুদামের পাশে কে বা কারা ওকে ফেলে গিয়েছিলো। আমি ভেবেছিলাম মড়া। পরে দেখলাম, না, বেঁচে আছে। কিন্তু ভালো করে আদর যত্ন না করলে বাঁচানো যাবে না। তুমি ওকে দেখো, আমি কাজে চললাম।

বৃদ্ধের বিবি গরমজল করে মাকানের গা হাত পা মুছিয়ে দেয়। এক গেলাস গরম দুধ এনে মুখে ধরে। দুধটুকু খেয়ে মাকান একটু সুস্থ বোধ করে। পরনের নোংরা সাজ-পোশাক খুলে ফেলে বৃদ্ধের বৌ ওকে ধোয়া জামাকাপড় পরায়। গোলাপ জলের পিচকারী করে মুখটা ধুয়ে দেয়। যুঁই-এর আতর এনে ছিটিয়ে দেয় পোশাকে। মাকান ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। প্রফুল্ল হয়ে ওঠে মন।

এই সময় রজনী অবসান হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চুয়ান্নতম রজনীর দ্বিতীয় যামে আবার কাহিনী শুরু হয়।

বৃদ্ধের বিবির সেবা যত্নে মাকান বিছানায় উঠে বসে। হামাম থেকে ফিরে এসে বৃদ্ধ খুশি হয়ে বলে, বাঃ এই তো দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠেছো। আল্লা মেহেরবান, আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকে আর বাঁচানো যাবে না।

আরও তিন দিন পরে মাকান মোটামুটি ভালো হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করে এখন কেমন মনে করছো, বাবা?

—একটু একটু গায়ে জোর পাচ্ছি।

বৃদ্ধ দু'হাত তুলে আল্লাহর উদ্দেশে প্রণাম জানায়।—সবই তাঁরই দয়ায়।

বাজারে গিয়ে গোটা দশেক মুরগীর ছানা নিয়ে আসে। বিবিকে বলে, রোজ সকাল বিকাল একটা করে মুরগীর ঝোল করে দেবে। বাছার আমার শরীরে কিছু নাই।

বৃদ্ধের বৌ নিজে হাতে মুরগী মেরে দু-বেলা ঝোল রেঁধে খাওয়াতে থাকে। এই ভাবে আরও কয়েকদিন পরে বৃদ্ধ মাকানকে জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন লাগছে, বাবা?

মাকান বলে, বেশ ভালো। আমি তো প্রায় আগের মতোই সুস্থ হয়ে উঠেছি। এখন আর আমার জন্যে আলাদা খানাপিনার কি দরকার। আপনারা যা খান, এবার থেকে তা-ই খাবো।

—কেন বাবা, একথা বলছো? আমরা গরীব বলে? কথাটা ঠিকই। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মাত্র পাঁচ দিরহাম রোজগার করি। চার দিরহাম খরচ করে রোজ একটা করে দিরহাম সঞ্চয় করেছি। সেই থেকে তোমার সেবা যত্ন চলছে। ভেবো না লোকের কাছে

ধারকর্জ করছি। তোমার জন্য খরচ করতে পেরে আমার সারা জীবনের সঞ্চয় করা আজ সার্থক হয়েছে, বাবা।

বৃদ্ধ তার বিবিকে বলে, এবার ছেলেটাকে ভালো করে গোসল করানো দরকার। আমি একটা গাধা ভাড়া করে নিয়ে আসছি। ওকে আজ সরকারী হামামে নিয়ে যাবো।

প্রায় মাসখানেক মাকানের স্নান হয়নি। গায়ে এক পরদা ময়লা জমে গিয়েছিলো। সাবান-ছোবড়া দিয়ে খুব ভালো করে ঘসে মেজে বৃদ্ধ মাকানের সর্বাঙ্গ পরিষ্কার করলো। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ। বৃদ্ধ দেখে অবাক হয়। ভাবে, এমন হাত-পায়ের গড়ন, চাঁদপনা মুখের আদল, এই চাঁপার মতো রঙ এ পেলো কোথায়? স্নান শেষ হলে নতুন দামী পোশাক পরালো তাকে। দেখে মনে হতে লাগলো যেন কোন্ সুলতান বাদশাহর ছেলে।

মাকানকে বাড়িতে নিয়ে এসে প্রথমে গোলাপের সরবৎ খাওয়ালো। তারপর মুরগীর ঝোল দিয়ে রুটি, শাহী হালওয়া, আঙুর বেদানা প্রভৃতি নানা পুষ্টিকর খানা সাজিয়ে দিলো। মাকান লজ্জিত হয়ে বলে, আপনাদের কাছে আমার ঋণের আর অন্ত রইলো না।

বৃদ্ধ বলে, ওসব কথা বলে আমাকে আঘাত দিও না, বাবা। তুমি বিদেশী মুসাফির। তায় অসুস্থ। আল্লাহর নির্দেশ মুসাফিরকে সাধ্যাতীত আদর যত্ন করবে। কিন্তু আমি আর কি করতে পারছি তোমার জন্যে। একটা কথা বাবা কয়েকদিন ধরেই ভাবছি, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ভরসা হচ্ছে না।

—কী কথা?

—তোমার আদবকায়দা চেহারা চরিত্র দেখে মনে হয়, তুমি কোনো বড় ঘরের ছেলে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তোমার পরিচয় জানতে ইচ্ছে করে।

মাকান বলে, সবই আপনাকে বলবো। তার আগে আপনি বলুন, কোথায় এবং কবে আমাকে পেয়েছেন?

বৃদ্ধ বলে, একটা হামামের কাঠগুদামের পাশে তোমাকে কে বা কারা ফেলে রেখে গিয়েছিলো। আমি সেই হামামে চাকরী করি। প্রথমে ভেবেছিলাম, তুমি বেঁচে নাই। পরে বুঝতে পারলাম, প্রাণটা তখনও ধিক ধিক করছে। তাই কাঁধে তুলে বাড়ি নিয়ে এলাম। তারপর আমার বিবির চেষ্টায় তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছো। সবই আল্লাহর দোয়ায়।

মাকান বলে, আল্লাহ আপনাদের ভালো করবেন। আচ্ছা, এই জাগায়টার নাম কী?

—জেরুজালেম।

মাকান গম্ভীর হয়ে যায়। এই শহরেরই একটা সরাইখানায় তাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে রেখে তার দিদি একদিন কাজের সন্ধানে বেরিয়েছিলো, আর ফিরে আসেনি। ভাবতে ভাবতে মাকানের চোখে জল আসে। সুলতান উমর অল-নুমান যে তার জন্মদাতা শুধু এইটুকু গোপন করে আর সব কাহিনীই সে বৃদ্ধর কাছে বলে।

বৃদ্ধ সান্ত্বনা দেয়। দুঃখ করো না বাবা। নসীবের লিখন। কেউ তা খণ্ডাতে পারে না।

মাকান জিজ্ঞেস করে, এখান থেকে দামাসকাস কতদূর।

—পুরো ছ'দিনের পথ। কিন্তু কেন, বাবা?

মাকান বলে, ঠিক করেছি এখান থেকে দামাসকাসেই যাবো।

না, বাবা, না। তোমার এই শরীরে একা সেখানে যাওয়া হবে না। যদি যেতেই চাও, আমি সঙ্গে যাবো। হয়তো আমার বিবিও যেতে চাইবে। যাওয়ার পথটা বড় খারাপ কিন্তু শহরটা বড় সুন্দর। একপাশে কুলকুল করে নদী বয়ে চলেছে। আর সারা শহরটা ফল ফুলের গাছে ভরা—যেন একটা সুন্দর বাগিচা।

এমন সময় বৃদ্ধের বিবি ঘরে এলো।—ওগো চাচার মেয়ে, শুনেছো, ছেলে আমার দামাসকাস যেতে চায়। তা ওকে তো আর একা ছাড়তে পারি না। আমি সঙ্গে যাবো। তুমিও যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে?

শেখ-গৃহিণী বলে, ওমা, আমি যাবো না? না গেলে ছেলের দেখ-ভাল কে করবে? শুনেছি, ওখানকার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো ভীষণ বজ্জাত। ওদের সঙ্গদোষে পড়লে বাছার আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ বলে, নাও, তাহলে আর দেরি করে লাভ কী? জামাকাপড় বিছানাপত্র সব গোছগাছ করে নাও। আর চাল ডাল আটা ময়দা যা নেবার সব বাঁধা-ছাঁদা করে ফেলো। আজকালই রওনা হয়ে যাবো। ছ'দিনের পথ।

বৃদ্ধের বিবি ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী রেখে বাকী সব সামানপত্র পঞ্চাশ দিরহামে বিক্রী করে দিলো। তার কিছু টাকায় বৃদ্ধ একটা গাধা কিনে আনলো। তারপর দিনক্ষণ দেখে আল্লাহর নাম নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো ওরা তিনজন।

রাত্রি শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামায়। চুপ করে বসে থাকে।

পঞ্চান্নতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়।

দু-অল-মাকানকে গাধার পিঠে চাপিয়ে বৃদ্ধ আর তার বিবি পিছনে পিছনে হেঁটে চলে। চলতে চলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কোথাও থেমে একটু জিরিয়ে নেয়। এইভাবে কয়েকদিন

চলার পর এক সন্ধ্যায় দামাসকাসে পৌঁছে গেলো তারা। একটা সরাইখানায় দু'জনকে বসিয়ে বৃদ্ধ বাজারে যায়, কিছু খানাপিনার সন্ধানে।

সেদিন রাতেই বৃদ্ধের বিবির কাঁপিয়ে জ্বর আসে। প্রথমে মনে হয়েছিলো পথশ্রমের ক্লান্তি আর গায়ের ব্যথার জ্বর। কিন্তু পরে বোঝা গেলো, না, এ কালব্যাধি। পাঁচদিনের দিন

ওদের দু'জনকে কান্নার সায়রে ভাসিয়ে সে আল্লাহর দরবারে চলে গেলো। মাকান শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এই সেবিকার সেবা-যত্নেই সে তার প্রাণ ফিরে পেলো, কিন্তু তার প্রাণটা আর কেউ-ই ধরে রাখতে পারলো না। কিশোর মাকান বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেয়, মৃতের জন্য শোক করলে মৃত ফিরে আসে না। তার জন্যে চোখের জল ফেলে তার আত্মার অমঙ্গল কামনা করো না, বাবা। আমাদের সবাইকে একদিন সেখানেই যেতে হবে। কেউ দু'দিন আগে, আর কেউ দু'দিন পরে—এই যা তফাৎ।

তোমার এত জ্ঞান, বাবা। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন। আমরা একদিন সকল শোকতাপ ভুলে তার পায়ের তলায় আশ্রয় নেব। তুমি যা বললে তাই তো একমাত্র সত্য। আমাদের সবাইকে একদিন সেখানেই যেতে হবে। বাঃ, কি সুন্দর কথা। তোমার কথায় মনের দুঃখ অনেকটা হাল্কা হয়ে গেলো, বাবা। আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আর শোক করবো না। চলো, শহরটা একটু ঘুরে দেখি। এই কটা দিন কি উদ্বেগেই কেটেছে! একভাবে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছো। চলো, তোমাকে একটু বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

বৃদ্ধের হাত ধরে শহরের পথে পথে ঘুরতে থাকে মাকান। এই কোতোয়ালীর সামনে এসে দেখে অনেক লোক জমায়েত হয়ে কি যেন দেখছে। কাছে আসতে চোখে পড়ে অনেকগুলো উট, গাধা, ঘোড়া খচ্চর-এর পিঠে বোঝাই করা বাক্স প্যাটরা, গালিচা এবং আর নানা রকম সওদাগরী সামান পত্র। এক জনকে জিজ্ঞেস করলো, এত জিনিসপত্র সব কার? কোথায় যাবে?

লোকটা জবাব দেয়, এখানকার কোতোয়াল বাগদাদে বাদশাহ উমর-অল-নুমানের কাছে বাৎসরিক ভেট পাঠাচ্ছেন।

মাকানের চোখে জল আসে। কান্না চাপতে পারে না। বৃদ্ধ সান্ত্বনা দেয়, নিজেকে শান্ত করো বাবা। সদ্য তুমি অত বড় কঠিন অসুখ থেকে উঠেছো। আবার শরীর খারাপ হতে পারে। আমি বুঝতে পারছি দেশের নাম শুনে তোমার মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। শান্ত হও, ধৈর্য ধর। আল্লাহ একদিন তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবেনই।

মাকান কাঁদতে কাঁদতে বলে, না, আমি এদের সঙ্গেই বাগদাদে যাবো। দেশের জন্যে আমার ভীষণ মন খারাপ করছে। আর এক মুহূর্তও এখানে ভালো লাগছে না। আপনি আমাকে বিদায় দিন, বাবা। আমি এদের পিছনে পিছনে একদিন বাগদাদে পৌঁছে যাবো।

বৃদ্ধ বললো, তা হয় না, বাবা। তোমাকে আমি একা ছাড়তে পারি না। ঠিক আছে, আমার আর পিছনের কি টান, আমিও তোমার সঙ্গেই যাবো।

মাকান আনন্দে নেচে ওঠে। —খুব ভালো হবে। আপনি সঙ্গে থাকলে আমার আর কি চিন্তা।

মাকানকে গাধার পিঠে চাপিয়ে বৃদ্ধ পিছনে পিছনে হেঁটে চলে। মাকান আপত্তি করেছিলো, আমি তো এখন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। বরং আপনি, বুড়োমানুষ, গাধার পিঠে আপনি চাপুন, আমি হেঁটে যাবো।

কিন্তু তার সে আপত্তি টিকে নি। বৃদ্ধ বলেছিলো, পাগল ছেলের কথা শোনো। আমি বুড়ো হলে কি হবে, এখনও সাত জোয়ানের ঘাড় মটকাতে পারি। তুমি এখন চাপো। তারপর তোমার যখন ভালো লাগবে না, নেমে খানিকটা হেঁটে পায়ের জড় ভেঙে নিও। তখন না হয় আমি খানিকক্ষণ চাপবো।

মাকান বলেছিলো, আপনি যা আমার জন্যে করছেন, কোন ভাই-এর জন্যে ভাই তা করে না।

এবার আমরা দু-অল-মাকানের দিদির কথা বলবো।

সুন্দরী কিশোরী নুজাৎ অসুস্থ ভাই মাকানকে সরাইখানায় রেখে কাজের সন্ধানে

রাস্তায় বেরিয়ে আসে। কিন্তু কে তাকে কাজ দেবে, কোথায় যেতে হবে, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। এমন সময় সে এক বাদাবী সর্দারের নজরে পরে। তার সঙ্গে ছিলো আরও পাঁচজন সাগরেদ।

তাদের একজনকে ফিসফিস করে সর্দারটা বলে, মনে হচ্ছে, নয়া চিড়িয়া।

সাগরেদটা বলে, হাঁ উস্তাদ, উমর বহুৎ কম, আর দেখতে ভী খুবসুরৎ মালুম হচ্ছে। এই তো দেখুন না, এই দিকেই আসছে। মনে হচ্ছে, কী যেন খুঁজছে। জিজ্ঞেস করুন না, উস্তাদ।

বাদাবীরা কুখ্যাত ডাকাত। মরুভূমির বাদাবী অঞ্চলে এদের বাস। চুরি-ডাকাতি রাহাজানি ছিনতাই এদের একমাত্র পেশা।

নুজাৎ কাছে আসতে সর্দার জিজ্ঞেস করে হ্যাঁ, ভালো মানুষের মেয়ে, তুমি কি কারো বাড়িতে বাঁধা না, যখন যেখানে পাও, ফুরনের কাজ করো?

অজানা অচেনা এক মেয়ের সঙ্গে এ ধরনের গায়ে পড়ে কথা বলতে আসায় নুজাৎ বিরক্ত হয়। পাশ কাটাবার জন্যে বলে, আমি বড় শোকে তাপে কাহিল হয়ে আছি, আপনারা আমাকে বিরক্ত করবেন না।

সর্দারটা গলায় মধু ঢেলে বলে, কিছু মনে ক'রো না, মা জননী। তোমার মতো আমার ছ'টা মেয়ে ছিলো। আল্লাহ পাঁচটাই কেড়ে নিয়েছেন। এখন মাত্র একটি। একেবারেই নাবালিকা, বাড়িতে একা একা থাকে। দেখাশোনার কোনও লোক নাই। তাই একটি ভালো বংশের আয়া খুঁজতে বেরিয়েছি। তা বাছা, তোমাকে দেখে মনে হলো, তুমি খানদানী ঘরের মেয়ে। হয়তো অভাবের তাগিদে পথে বেরুতে হয়েছে। তা মা, যদি কাজ কামের সন্ধানেই বেরিয়ে থাকো, আমি বলি কি, আমার মেয়েটাকে দেখা শোনার ভার নিয়ে আমাকে একটু নিশ্চিন্ত কর। পারিশ্রমিক যা চাও, দেব। যদি তুমি অন্য কোনও ঘরে কাজে না লেগে থাকো, আমার বাসায় চলো। মা-হারা মেয়েটা আমার বাঁচবে।

নুজাৎ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে, শেখসাহেব, আমি এখানে বিদেশী। আর তাছাড়া, ঘরে আমার একটি অসুস্থ ভাই আছে। আপনার কাজ আমি নিতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যার আগে আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। ভাইকে ছেড়ে রাতে কোথাও থাকতে পারবো না আমি।

সর্দার বলে, তাই হবে মা, সন্ধ্যার আগেই আমি ঘরে ফিরি। তখন তুমি চলে যেও। আর যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তোমার ভাইকেও আমার বাড়িতে এনে রাখতে পারি।

নুজাৎ ভাবে, দুনিয়াতে এত সহৃদয় মানুষও আছে? এই বিপদের মুহূর্তে স্বয়ং আল্লাহই বুঝি ছদ্মবেশে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। নুজাৎ বলে, চলুন।

এইভাবে শিশু-প্রাণ নুজাৎ এক বাদামী দস্যুর কবলিত হয়। এমন নিখুঁত অভিনয় করে সে তাকে ধাপ্পা দিলো বুঝতেও পারে না। তার ঘর, তার নাবালিকা মাতৃহারা কন্যা—সবই তার ধাপ্পা। নুজাৎকে উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে। পিছনে পিছনে আসে তার সাগরেদরা। এবার নুজাৎ বুঝতে পারে, লোকটা একটা ঠগ। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। যদি কেউ সাহায্য করতে ছুটে আসে। কিন্তু বাদাবী সর্দারের উট তখন শহর ছাড়িয়ে নির্জন প্রান্তরে ছুটে চলেছে। সর্দার হুঙ্কার ছাড়ে, এই হারামজাদী চুপ কর—চুপ কর বলছি।

কিন্তু শাহজাদী নুজাৎ চুপ না করে আরও জোরে চিৎকার করতে থাকে, কে আছো, বাঁচাও, বাঁচাও। ডাকাত আমাকে ছেনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে—

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সর্দার। তোর ডাকে কেউ সাড়া দেবে না রে, শয়তানী। চুপ কর। ভালো চাসতো চুপ কর।

নুজাৎ ফুঁসে ওঠে। শয়তান আমি না তুমি? ভালো মানুষ পেয়ে আমাকে ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছো। আল্লাহ তোমাকে দোজকে পুড়িয়ে মারবেন।

—হা—হা—হা। আমাকে না হয় দোজকের আগুনে পুড়িয়ে মারবে, কিন্তু তোকে রক্ষা করুক দেখি, তোর আল্লাহর কত ক্ষমতা। নে চুপ করবি তো কর। তা না হলে এই দেখছিস ছুরি, একবার চেঁচালে টেনে জিভটা কেটে নেব।

নুজাৎ ভয় পায়। কি চকচকে ধারালো ছুরি। লোকটার অসাধ্য কিছুই নাই। সত্যিই যদি তার জিভটা কেটে নেয়? আর তাছাড়া এই নিরালা নির্জন মাঠের মধ্যে কেই বা তাকে উদ্ধার করতে আসবে। চিৎকার করে লাভ হবে না ভেবে নুজাৎ চুপ করে যায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

একটু পরে লোকটা বলে, আমি যখন রেগে যাবো, তখন আমার কোনও কথায় 'না' করো না। তা হলে রাগের মাথায় হয়তো তোমাকেই খুন করে ফেলবো। কিন্তু তাই বলে ভেবো না, মানুষটা আমি খুব খারাপ। তোমাকে ধোঁকা দিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ঠিক। কিন্তু কি করবো, এই আমাদের ব্যবসা। এইভাবেই নানা ছলে বলে কৌশলে মেয়েদের জোগাড় করে আনতে হয়। ভেবো না তোমাকে ভোগ করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। ভোগ আমি করবো না, তবে করবে একজন। এবং সে-জন বড় খানদানী আদমী। তোমাকে বহুৎ আদর যত্নে রাখবে। অনেক দাসী বাঁদী থাকবে তোমার। তার ঘরের বিবির মতোই তোমাকে হীরে জহরতে মুড়ে রাখবে। তবে বিবির ইজ্জত দেবে না। তার পেয়ারের রক্ষিতা হয়ে থাকবে। আর আমি? আমি কিছু নগদ বিদায় নিয়ে চলে যাবো আবার কোনও নতুন মেয়ের সন্ধানে। দামাসকাসের বাঁদী হাটে তোমাকে নিলামে তুলবো। দেশ-বিদেশের সুলতান বাদশাহ আমির ওমরাহ সওদাগরের দালাল আসে সেখানে। তারা তোমার দর হাঁকবে। যার দর চড়া হবে তার কাছেই তোমকে বেচে দেব, এই আমাদের কারবার। সুতরাং ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নাই। তোমাকে জলেও ফেলে দেব না শূলেও চাপাবো না। এমনকি তোমার গায়ে কেউ হাতও ছোঁয়াবে না। সব শুনলে তো? এবার ভালো মানুষের মেয়ের মতো কান্না থামিয়ে চুপ কর। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সুলতান উমর অল নুমানের দালালের কাছেই তোমাকে বেচে দেব। তুমি হবে বাগদাদের সুলতানের রক্ষিতা। এমন সৌভাগ্য ক'টা মেয়ের হয়, বলো? শুধু তোমার রূপ আছে বলেই বলছি, সুলতানের অপছন্দ হবে না। আর যদি আমার কথা না শুনে নাকে কাঁদতেই থাক তবে একটা হাড়ে বজ্জাৎ সওদাগরের হাতে তুলে দেব। সে আবার কোথায় চালান করে দেবে তোমাকে, আমি বলতে পারবো না।

নুজাৎ ভাবলো, লোকটা মহা শয়তান। রাগলে একেবারে চণ্ডাল হয়ে যায়। তখন ও সবকিছু করতে পারে। সুতরাং চুপ করে নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলো।

সর্দার বলে, খিদে পায়নি? এই নাও রুটি শব্জী খাও।

লোকটা দু'খানা যবের রুটি আর একটু শব্জী এগিয়ে দেয় নুজাতের দিকে। গতকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছিলো। হাত বাড়িয়ে রুটি দু'খানা গোগ্রাসে খেতে থাকলো।

সর্দার হাসে। খিদের বড় জ্বালা। বলে, আর একখানা নেবে?

নুজাৎ মাথা নাড়ে। না আর সে নেবে না। ভাই মাকানের মুখখানা ভেসে ওঠে। খিদের জ্বালায় হয়তো আর সে বেঁচে থাকবে না। দু'চোখ নেমে আসে জলের ধারা।

এক সময়ে সর্দার বলে, আমরা দামাসকাসে এসে গেছি।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখে রাত্রি শেষ হতে চলেছে। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন ছাপ্পান্নতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়।

দামাসকাসে পৌঁছে সর্দার নুজাৎকে নিয়ে গিয়ে তুললো এক সরকারী সরাইখানায়। মহামান্য সুলতান উমর-অল-নুমান বিদেশী মুসাফিরদের আশ্রমের জন্য বাব-অল মালিকে বানিয়ে দিয়েছে এই সরাইখানা। নুজাৎ আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। সর্দার ধমকায়। ফের যদি কাঁদিস, মেরে মুখের আদল পালটে দেব। চুপ কর মাগী, চুপ কর। না হলে কিন্তু একটা বদমাইশ ইহুদীর কাছে বেচে দেব, বলছি।

নুজাৎকে সরাইখানার একটা খুপরীতে পুরে শিকল তুলে দিলো লোকটা। বাঁদীহাটে গিয়ে হাঁকতে থাকলো, কই গো কে আছো, এদিকে এসো। জেরুজালেম থেকে একটা ডাগর ছুঁড়ি নিয়ে এসেছি। কে নেবে এসো।

দালাল, সওদাগররা এগিয়ে আসে, কী রকম মাল?

সর্দার বলে, দেখতে খুব-সুরৎ। কিন্তু একটা ঝামেলা আছে। জেরুজালেমে সে তার রুগী ভাইকে ছেড়ে এসেছে। যার কিনতে ইচ্ছে, আগে থেকে শর্ত দিচ্ছি, তার ভাই-এর দায়-দায়িত্বও নিতে হবে তাকে। যদি তোমরা কেউ এই শর্তে রাজি থাকো, আমি খুব সস্তায় ছেড়ে দেব।

একজন সওদাগর জিজ্ঞেস করে, উমর কত?

—একেবারে আনকোরা কুমারী। বিয়ের যুগ্যি, ডাগর। বিদ্যায় বুদ্ধিতে একেবারে চৌকস। দেখতে শুনতে যেমন খুবসুরৎ তেমনি তার খানদানী আদব-কায়দা। ভাইটার অসুখের চিন্তায় কেঁদে কেঁদে শরীরটা এখন কাহিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু বড়ঘরের আদর যত্ন পেলে আবার চেহারা খোলতাই হয়ে উঠবে।

সওদাগর বলে, চলো, দেখাও দেখি। যদি পছন্দ না হয় নেব না কিন্তু। আর যদি তোমার কথামতো সব ঠিক ঠিক মিলে যায়, তবে ন্যায্য দাম পাবে। সুলতান উমর-অল-নুমানের জন্যে কিনবো। তার ছেলে শাহজাদা সারকান এখন এখানকার সুবাদার। আগে তাকে দেখাবো। তার পছন্দ হলে তার কাছ থেকে একটা চিঠি করে নিয়ে বাগদাদে যাবো সুলতানের কাছে। সুন্দরী কুমারী মেয়ের উপর সুলতানের ভারি লোভ। তার যদি মনে ধরে তা হলে ভালো ইনাম পাবে।

বাদাবী সর্দার বলে, ঠিক আছে, আপনার শর্তে আমি রাজি। চলুন, সরাইখানায় দেখবেন চলুন।

নুজাতের দরজার সামনে এসে শিকল খুলে সর্দার ডাকে, নুজায়া, ও নুজায়া?

নুজাতের নামটা বিকৃত করে উচ্চারণ করে সে। নুজাৎ কাঁদতে থাকে। কোনও জবাব দেয় না। সওদাগরকে বলে, বেটি রা কাড়ছে না। যান ভিতরে গিয়ে দেখুন। একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে কথা বের করুন।

সওদাগর ভিতরে ঢুকে নুজাৎকে বলে, আল্লাহ তোমার ভালো করবেন, বাছা।

কোকিল-কণ্ঠী নুজাৎ ধীরে ধীরে বলে, আল্লাহ আমাদের মতো হতভাগীদের দিকে মুখ ফিরে চায় না। আপনারাই তার কৃপা পেতে থাকুন।

নুজাতের জবাব শুনে সওদাগর মুগ্ধ হয়। বাঃ কি সুন্দর কথা। আর কি পরিশুদ্ধ মার্জিত উচ্চারণ!

নাকাবের জাফরী দিয়ে নুজাৎ দেখে বৃদ্ধ সওদাগরকে। মনে হয়, অমায়িক সদাশয়

মানুষ। তাকে, ডাকাতটার হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে। তার বদলে যদি এই সওদাগরের বাঁদী হয়ে থাকতে হয় সে-ও অনেক ভালো। আমার রূপ যৌবন, আমার শিক্ষাদীক্ষা এঁর নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

সওদাগর জানতে চাইলো, তুমি কে? কি তোমার পরিচয়, মেয়ে?

নুজাৎ মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয়, আপনি জানতে চাইছেন, আমি কে? এইটুকু জেনে রাখুন, আমি আপনার শত্রু নই, কোনও ক্ষতি করবো না। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। আমার কপালে যা লিখে দিয়েছেন, হাজার চেষ্টা করলেও তা এড়াতে পারবো না। আমাকে তা মেনে নিতেই হবে। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, আপনি আমার ভাগ্য নিয়ন্তা। কিন্তু আমি মনে করি, আপনি উপলক্ষ্য মাত্র।

নুজাতের এই দার্শনিক তত্ত্বকথায় সওদাগর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়। ভাবে তার চেহারা এখনও দেখিনি, কিন্তু মুখের কথা শুনেই আমি অনুমান করতে পারছি, বড়ঘরের মেয়ে সে। বাদশাহ উমর-অল-নুমান-এর সামনে হাজির করলে লুফে নেবেন তিনি। মোটা বকশিস মিলবে। বাদাবী সর্দারকে জিজ্ঞেস করলো, সর্দর সাহেব তোমার মেয়েটা বড় ভালো, কি সুন্দর তার কথাবার্তা, আর নম্র-ভদ্র ব্যবহার। তা কি দাম নেবে ভাই?

কী বললে? নম্র-ভদ্র? ওর মতো দজ্জাল মেয়েছেলে তুমি আর দু'টি পাবে না, সওদাগর। ওর হাড়ে হাড়ে শয়তানী বুদ্ধি। ওকে কিনলে তোমার হাড়মাস জ্বালিয়ে শেষ করবে। বলছো কিনা নম্র-ভদ্র। যাও, আগে বাড়ো, তোমার সঙ্গে আমি সওদাই করবো না।

সওদাগর বুঝলো সর্দারটা ক্ষেপে বোম্ হয়ে আছে। মেয়েটির প্রশংসা সে আদৌ বরদাস্ত করবে না। বললো, ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিলাম, মেয়েটা ভীষণ বজ্জাৎ; মুখরা। আমি ওই বজ্জাত মুখরা মেয়েটাকেই কিনতে চাই। এখন বলো, কি দাম নেবে?

বাদাবী সর্দার নিজে কোনও দাম বলে না। উল্টে জিজ্ঞেস করে, তুমিই বলো, কি দাম দেবে?

সওদাগর বলে, তোমার ছেলের তুমি নামকরণ করবে না করবে পাড়াপড়শী? তোমার মালের তুমি দাম বলবে। আমার পোষায় নেব, না পোষায় কেটে পড়ব। তোমার বিবেচনা যা হয় বলো, তারপর আমি যা পারবো বলবো।

কিন্তু বাদাবী-দস্যু দাম বলতে পারে না। আসলে দাম সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই নাই। বলবে কি করে? এ যাবৎকাল যত ছেলে মেয়ে সে চুরি করে এনে বেচেছে তাদের কেউই এমনটি ছিলো না। দেখতে মোটামুটি সুন্দর হলে নেহাৎ খারাপ দাম পাওয়া যায় না। কিন্তু এ মেয়ের মতো এমন বিদ্যাধরী তো একটাও সে কখনও চোখে দেখেনি। বাঁদী রক্ষিতার রূপ যৌবন দরকার এটা সে ভালো করেই জানে, কিন্তু লেখাপড়া কি কামে লাগে! আর তার কদরই বুঝবে কোন আমির সুলতান? সুতরাং ওগুলো তার গুণ না হয়ে, দোষ বলেও তো গণ্য হতে পারে!

সর্দারকে নিরুত্তর দেখে সওদাগর বলে, দু'শো দিনার দিতে পারি, দেবে?

সর্দার এবার অদ্ভুত হাসে, থাক থাক আর কইয়ো না, আমার উটটা শুনলে হাসবো।

সওদাগর বিরক্ত হয়, হাসির কথা তো কিছু বলিনি সর্দার। তোমার কাছে দাম জিজ্ঞেস করলাম, বললে না। উল্টে আমার কাছে দাম জানতে চাইলে। তা আমার যা মনে হয়েছে, বললাম। এবার তোমার কথা বলো?

বাদাবী সর্দার বলে, না বাপু বিক্রি করে আমার কাজ নাই। তার চেয়ে দেশে নিয়ে গিয়ে ভুট্টার ক্ষেতে কাজে লাগাবো। আমার উট চরাবে। তাও অনেক সুরাহা হবে।

সওদাগর দেখলো, লোকটা গোঁয়ার। কোন যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। বললো, আহা—অমন গোঁসা করছো কেন শেখ? হাটে যখন এনেছো, বেচবে বলেই এনেছো।

তা দরদাম না হলে কি কেনাবেচা হয়। তোমার মেয়ের গুণের কথা না হয় জেনেছি, কিন্তু মুখের সুরৎ তো এখনও দেখিনি। রূপ না হলে গুণ ধুয়ে জল খাবে নাকি লোকে?

সর্দার ক্ষেপে ওঠে, তা তোমাকে তার চেহারাটা দেখতে কে বারণ করছে। যাওনা, বোরখাটা খুলে দেখে এসো না। চাই কি সাধ হলে সাজ-পোশাক খুলে ন্যাংটো করেও উল্টেপাল্টে দেখতে পারো। আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।

—শোভন আল্লাহ, একি কথার ছিরি। মেয়ে মানুষের কেনা বেচার কারবার করি ঠিক। কিন্তু তাই বলে, মান ইজ্জতও কি খুইয়ে বসবো নাকি!

সর্দার বলে, কেন দোষ কী? ময়রা কি সন্দেশ খায় না?

—তোবা তোবা, তোমার মুখের কোনও রাখ-ঢাক নাই, শেখ। একেবারে গোল্লায় গেছো। নাও চলো, আমি শুধু তার মুখের আদলটা দেখবো। বোরখাটা খুলবার দরকার নাই। মুখের নাকাবটা একবার সরালেই যথেষ্ট।

রাত্রির অন্ধকার কেটে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতান্নতম রজনী।

শাহরাজাদ আবার কাহিনী শুরু করে।

সওদাগর আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে নুজাতের কাছে যায়। নুজাৎ মাথা নত করে স্বাগত জানায়। পাশের একটা কুর্শি দেখিয়ে বসতে অনুরোধ জানায়।

সওদাগর জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি, বাছা?

নুজাৎ এক মুহূর্ত জবাব দেয় না। তারপর সলজ্জ কণ্ঠে বলে, আপনি কি আমার এখনকার নাম জানতে চাইছেন? না, আমার মা-বাবার দেওয়া নাম শুনবেন? তাঁরা আমাকে 'নয়নতারা' বলে ডাকতেন। কিন্তু এখন আমি নিজেকে 'চোখের বালী' বলেই মনে করি।

নুজাতের কথায় সওদাগরের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মেয়েটির মনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে। নুজাৎও অশ্রু সংবরণ করতে পারে না। বলে, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলাম। আজ সায়রে পেতেছি শয্যা।

বাদাবী সর্দার তেড়ে আসে, বলি, এতক্ষণ ধরে গুজগুজ ফুসফুস কি হচ্ছে? চাবুকের ঘায়ে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দেব।

নুজাৎ কাতরভাবে সওদাগরের দিকে তাকায়। —আপনি আমাকে এই পাপ থেকে উদ্ধার করুন, জনাব। আমি আর এই অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না। আমার কথা যদি না শোনেন আজ রাতেই জীবনটা শেষ করে দেব।

সওদাগর বাদাবী সর্দারের দিকে ফিরে বলে, শেখসাহেব, তোমার ভয়ে মেয়েটা শিটকে যাচ্ছে। একটু ক্ষান্ত হও। বলো কি দাম চাও, দেব।

ডাকাতটা চিৎকার করে ওঠে, তোমাকে তো বলেছি, আমি দাম বলবো না। তোমার যা মনে হয় বলো। আমার ইচ্ছে হলে দেব, না হলে দেব না।

সওদাগর এক লাফে দর হাঁকে, পঞ্চাশ হাজার দিনার।

কিন্তু শয়তান ডাকাতটা তাতেও রাজি হয় না। বলে, তামাশা করছো আমার সঙ্গে।

—সত্তর হাজার দিনার।

সর্দার বলে, ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করতে আমার খরচা হয়েছে নব্বই হাজার।

সওদাগর সর্দারের কথায় রেগে ফেটে পড়ে, ঝুটা বাৎ। তোমার চৌদ্দগুষ্টি মিলে একশো দিনার খেতে পারবে না, তা বলছো, ওর পিছনে খরচ হয়েছে নব্বই হাজার দিনার। যাই হোক, এক লাখ দেব, এই আমার শেষ কথা। রাজি থাকো দিয়ে দাও। না হলে আমি সরকারের দপ্তরে তোমার নামে মেয়ে চুরির নালিশ এবং তুমি তার উপর কি অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছো, তারও সাক্ষী দেব। কোতোয়ালকে যদি তুমি টাকা দিয়ে হাত করার চেষ্টা করো, তবু রেহাই পাবে না। আমি শাহজাদা সারকানের কাছে যাবো। দেখি তোমাকে কে রক্ষা করে।

ডাকাত সর্দার দেখলো, বেকায়দা—সওদাগরের কথায় রাজি হয়ে গেলো। বললো, ঠিক আছে টাকাটা দিয়ে দাও। আমাকে আবার জেরুজালেমে ফিরে যেতে হবে। না জানি ওর ভাইটার কি হলো।

পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে বাদাবী সর্দার উর্ধ্বশ্বাসে উট ছুটিয়ে দেয়। জেরুজালেমে যাবে সে। যার বোনকে বিক্রি করে এক লাখ দিনার পাওয়া গেলো তার ভাইকে পেলে না জানি কত পাওয়া যাবে। যে ভাবেই হোক, তাকে চুরি করতে হবে।

কিন্তু জেরুজালেমে পৌঁছে সে সরাইখানায় গিয়ে শুনলো, ছেলেটা ওখান থেকে চলে গেছে। সারা শহর চষে বেড়ালো, কিন্তু হদিস করতে পারলো না।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন আটান্নতম রজনীর দ্বিতীয় জামে আবার গল্প শুরু হয়।

সওদাগর নুজাৎকে তার নিজের বাসায় নিয়ে যায়। বাজার থেকে বাদশাহী সাজপোশাক কিনে নিয়ে আসে। নুজাৎকে পরতে দিয়ে বলে, পরে দেখো দেখি, কেমন মানায়।

নুজাৎ বেশ পরিবর্তন করে আসে। দেখে সওদাগরের চোখ ঝলসে যায়। বললে, বাঃ, চমৎকার। এবার চলো বাজারে স্যাকরার দোকানে নিয়ে যাবো।

বাজারের সবচেয়ে সেরা জহুরীর দোকানে নিয়ে গিয়ে নুজাতের পছন্দসই গহনাপত্র কিনতে থাকে। কানের জন্য কিনলো এক জোড়া মুক্তা বসানো দুল। এক একখানা মুক্তোরই দাম হাজার দিনার। গলার জন্যে নিলো একটা সাতনরী হার আর মানতাসা। হারটা গলায় পরতে সারা বুক পর্যন্ত ঝলমল করে ওঠে। এইভাবে হাতের বাজুবন্ধ, কোমরের গোট, পায়ের মল, মাথার টিকলী টায়রা—সব আভরণ পরে সে যখন দাঁড়ালো, সওদাগরের মনে হতে লাগলো, যেন কোন এক শাহজাদী।

নুজাৎকে রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে আবার নিয়ে এলো সওদাগর। বললো, তোমাকে একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, বাছা, শাহজাদা সারকানকে কিন্তু বলো না, কত দাম দিয়ে তোমাকে কিনেছি। সে যাতে ওকালতী করে তার বাবা উমর-অল-নুমানের নামে একটা চিঠি লিখে দেয় তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। চিঠি আর তোমাকে নিয়ে বাগদাদে যাবো। ছেলের সুপারিশ থাকলে শাহেনশাহ না করতে পারবেন না। আর একবার যদি তিনি হ্যাঁ করেন, আমি মোটা টাকা মুনাফা পাবো।

নুজাৎ মুখ নিচু করে। দু'গাল বেয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়ে। সওদাগর অবাক হয়। —বাগদাদের নাম শুনে অমন মন খারাপ হয়ে গেলো কেন, বাছা? তোমার কি কোন চেনা জানা আত্মীয় স্বজন কেউ ছিলো সেখানে? ওখানকার কোনও সওদাগরকে কি তুমি চেনো? বলো মা, আমার কাছে লজ্জা করো না, খুলে বলো। বাগদাদের সব বড় বড় সওদাগরই আমার খুব চেনা।

নুজাৎ ঘাড় নেড়ে বলে, না, একমাত্র সুলতান উমর-অল-নুমান ছাড়া আমি সেখানকার আর কাউকে চিনি না।

সওদাগর শঙ্কিত হয়।—তবে কি এর আগে কোনও সওদাগর তোমাকে সুলতানের কাছে পেশ করেছিলো?

—জী না। আমি সুলতানের কন্যার সঙ্গে এক সাথে মানুষ হয়েছি তার প্রাসাদে। এই সূত্রে তিনি আমাকে বড় স্নেহ করতেন। এবং যখনই যা চেয়েছি, নির্দ্বিধায় দিয়েছেন। যদি আপনি মনে করেন, তাঁর কোনও অনুগ্রহ আপনার দরকার একটা কাগজ কলম দিন, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। চিঠিটা তার হাতে দিলে, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। শুধু আমার চিঠিটা তাঁর হাতে দিয়ে বলবেন, তার একান্ত অনুগত নুজাৎ দিয়ে পাঠিয়েছে আপনাকে। আর বলবেন, ভাগ্যের ফেরে সে আজ পথহারা পাখির মতো এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বহু জনের মনোরঞ্জন করতে করতে অবশেষে এখন সে দামাসকাসে তারই পুত্র শাহজাদ সারকানের আশ্রয়ে আছে। এই বলে তাকে আমার সালাম জানাবেন।

নুজাতের কথা শুনে সওদাগরের শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মা, প্রাসাদে থাকা কালে তুমি কোরান এর পাঠ শেখোনি।

—আলবাৎ শিখেছি, জনাব। শুধু কোরানই নয়, অঙ্ক, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিদ্যা আহরণ করেছি। নানা বিষয়ে আমি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছি। বিদগ্ধ ব্যক্তিরা তা পাঠ করে ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। আমার লেখা কাব্য গাথা আজ বাগদাদের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

সওদাগর অবাক বিস্ময়ে নুজাতের কথা শুনছিলেন। উঠে গিয়ে কাগজ কলম আর দোয়াত এনে রাখলো তার সামনে।

নুজাৎ একখানা চিঠি লিখে ভাঁজ করে সওদাগরের হাতে দেয়। চিঠিখানা কপালে ঠেকিয়ে সওদাগর তার কামিজের জেবে রেখে বলে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই, তোমাকে যেন তিনি আরও গুণবতী করে রাখেন।

এই সময়ে রজনী অতিক্রান্ত হলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ঊনষাটতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়।

তারপর শুনুন, জাঁহাপনা, নুজাতের পরিচয় জানার পর কিভাবে যে তাকে আদর করবে সওদাগর ভেবে পায় না।

—মা, চলো তোমাকে হামামে নিয়ে যাই। খুব ভালো করে ঘসে মেজে গোসল করে নাও। সারকানের দরবারে যেতে হবে। এমন সাজগোজ করে যাবে, যাতে এক নজরেই শাহজাদা বলে ওঠেন, বাঃ খাসা।

সওদাগরের কথায় নুজাৎ লজ্জা পায়। মুখ নামিয়ে মৃদু হাসে। খুশির ছোঁয়া লাগে ওর গালে। রক্তরাঙ্গা হয়ে ওঠে মুখ। ঘাড় নেড়ে বলে, চলুন।

আতর, সাবান, তোয়ালে, ছোবড়া, সাজপোশাক সঙ্গে নিয়ে সওদাগর নুজাৎকে নিয়ে এলো শহরের সবচেয়ে সেরা অভিজাত এক হামামে। একটা শরীর সাফা করার মেয়ে ভাড়া করলো।

—দেখো, মেয়ে, মালকিনকে, আচ্ছা করে ঘসে মেজে সাফা করে দেবে। আজ তাকে বাদশাহজাদা সারকানের দরবারে নিয়ে যাবো।

মেয়েটা বলে, আপনি কিছু ভাববেন না জনাব। এক চিলতে ময়লা রাখবো না গায়ে। সাবান ছোবড়ায় ডলে ছাল চামড়া ছাড়া আর সবই তুলে দেব।

নুজাৎ হেসে ওঠে। সওদাগর বলে, না, শুনেছি মেয়েটা সাফাই করার ভালো কায়দা জানে।

স্নান শেষ হলে একটা বিরাট তার্কিস তোয়ালে জড়িয়ে পাশের কামরায় এসে একটা

সোফায় বসে। সামনে টেবিলে রাখা ছিলো, গোলাপের সরবৎ, আঙুর, আপেল, আনার আপেল। অনেক দিন পরে স্নান করে তার শরীরটা বেশ ঝরঝরে তাজা হয়ে ওঠে। সরবৎটা খেয়ে শরীরটা জুড়িয়ে যায়। মেয়েটা বলে, ফলগুলোও খেয়ে নাও, মালকিন, যা ডলাই মলাই হয়েছে খিদে পাওয়ার কথা। সত্যিই মেয়েটা গোসল করানোর কায়দা জানে ভালো। এমন ভাবে তেল মালিশ করেছে, এতদিনের পথের ক্লান্তি ব্যথা বেদনা সব নিমেষেই দূর হয়ে গেলো। নুজাৎ বললো, আমি এত ফল খেতে পারবো না। তুমিও নাও।

দু'জনেও খেয়ে শেষ করতে পারলো না। হামামের বুড়ি দ্বাররক্ষীটাকে অনেকগুলো দিয়ে দিলো। এরপর শুরু হলো প্রসাধনের পালা।

সওদাগর এসে গহনার বাক্স দিয়ে গেলো। একটুবাদে সাজ-পোশাক করে গহনাপত্র পরে যখন সে বেরিয়ে এলো সওদাগর দেখে একেবারে থ। জীবনে বহু মেয়ের বেচা কেনা সে করেছে, কিন্তু এমন রূপের জেল্লা কোনও মেয়ের সে দেখেনি। একটা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে শাহজাদা সারকানের দরবারের পথে রওনা হলো। এমন রূপবতী রমণী দেখার সৌভাগ্য রোজ রোজ আসে না।

দরবারে এসে আভূমি আনত হয়ে সওদাগর সারকানকে কুর্নিশ জানায়।

—আজ হুজুরের দরবারে এক অপূর্ব সুন্দরীকে হাজির করছি। জাঁহাপনা স্বচক্ষে দেখে বিচার করুন। রূপে গুণে এমন অতুলনীয়া মেয়ে এর আগে কখনও দামাসকাসে আসেনি, জাঁহাপনা। দুনিয়ার সেরা সুন্দরীদের মধ্যে সবার সেরা।

—ঠিক আছে আনো, দেখতে দাও।

সওদাগর নুজাতের হাত ধরে সারকানের সামনে নিয়ে আসে। মুখের নাকাব সরিয়ে দেয়। সারকান এর আগে তার বোনকে চোখে দেখেনি। সুতরাং চিনতে পারার প্রশ্ন ওঠে না। নুজাৎকে দেখে শরীরে শিহরণ জাগে। এতরূপ এমন ঢলঢলে যৌবন এর আগে কখনও সে দেখেনি।

সওদাগর গুণকীর্তন করতে থাকে, শুধু রূপটাই সব নয় জাঁহাপনা। গুণেরও অন্ত নাই। এমন কোনও বিদ্যা নাই যা তার অজানা। ইচ্ছে হয়, হুজুর পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, অঙ্ক, ইতিহাস জ্যোতির্বিদ্যা—নানা বিষয়ে জ্ঞান তার অসাধারণ।

সারকান মনস্থির করতে এক মুহূর্তও সময় নিলো না। সওদাগরকে বললো, আমার খাজাঞ্চীকে বলো, সে তোমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেবে।

সওদাগর বুকে সাহস করে বলে, হুজুর আমি একে বাদশাহ উমর-অল-নুমানের জন্য এনেছিলাম। তা হুজুরের যদি নিজেরই পছন্দ হয়ে থাকে, আমি আরও খুশি হবো। আমি ভেবেছিলাম, হুজুরকে দেখিয়ে একটা চিঠি করে নেব। আপনার চিঠি পেলে বাদশাহ 'না' করতে পারবেন না। তা এখন বুঝেছি তার আর দরকার হবে না। শুধু শাহজাদার কাছে আমার আর্জি ঃ মেয়ে কেনাবেচাই আমার ব্যবসা। এর জন্য সুলতানকে যে কর দিতে হয় সেই কর থেকে আমাকে রেহাই করে দিন।

সারকান বলে, ঠিক আছে, তাই হবে। এখন বলো, কি ইনাম দিতে হবে? কি দামে তুমি একে কিনেছো?

সওদাগর বলে, হুজুর একলক্ষ দিনারে কিনেছি, আর একলক্ষ দিনারের অলঙ্কার আর সাজ-পোশাকে সাজিয়ে এনেছি।

সারকান খাজাঞ্চীকে বললো, সওদাগরকে টাকাটা দিয়ে দাও। আর ওর দালালী

বাবদ আরও বিশ হাজার, এবং বকশিস হিসাবে দামী দামী সাজ-পোশাক দিয়ে বিদায় করো। আর আমার খাজনা দপ্তরে বলে দাও, আজ থেকে সওদাগর যা বাণিজ্য করবে তার সব কর মুকুব করে দিলাম।

এই সময় রজনী শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ষাটতম রজনী।

শাহরাজাদ আবার কাহিনী শুরু করে।

সারকানের নির্দেশে শহরের চারজন কাজী এসে হাজির হয়। সারকান বলে, আমি বাঁদীকে কিনেছি। তার সব দায় দেনা থেকে আমি রেহাই দিলাম। এখন আমার ইচ্ছা, ওকে শাদী করে বেগম করবো। তোমরা তার সাক্ষী হবে। কাগজপত্র সব তৈরি করো।

কাজীরা তড়ি ঘড়ি শাদীর হলফনামা তৈরি করে দিলে। সারকান উপস্থিত সকলকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা এবং মূল্যবান সাজ-পোশাক উপহার দিয়ে বিদায় করলো। শুধু রইলো চার কাজী আর সেই সওদাগর। সারকান বলছে, এই বাঁদী শুধু রূপে নয়, নানা বিদ্যায় বিদুষী। এবং অসাধারণ গুণবতী। তোমাদের সামনে সে তার গুণের পরীক্ষা দেবে। বিচার করে বলবে, সওদাগরের গুণকীর্তন কতখানি সত্যি।

একটা বিরাট কক্ষের মাঝখানে পর্দার আড়ালে নুজাৎকে বসানো হয়েছে। পর্দার এপাশে বসেছে শহরের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা। একটু পরে পর্দাটা একটু নিচে করে দেওয়া হলো। মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। নুজাতের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে সকলে। কেউ বলে, বেহেস্তের ডানাকাটা হুরী। কেউ বলে, হুরীরাও কি এতো সুন্দর হয়! কেউ বা তামাশা করে টিপ্পনি কাটে, ঝাড়বাতিগুলোর আর কি দরকার, এমনিতেই ঘর আলো হয়ে গেছে।

তামাশা নয়, সত্যিই নুজতের রূপের জেল্লায় মেয়েদের চোখ ঝলসে যায়। নুজাৎ উঠে এসে সবাইকে মৃদু সম্ভাষণে স্বাগত জানায়। তার মধুর বাচনভঙ্গীতে মুগ্ধ হয় সকলে। মেয়েরা আদর করে বলে, তোমার রূপের আলোয় সুলতানের ঘর আলো হয়ে উঠবে।

পর্দার এপাশ থেকে সারকান বলে, সুন্দরী, তোমার জ্ঞান গরিমার কথা অনেক শুনেছি। এবার আমাদের কিছু নীতি কথা শোনাও।

নুজাৎ বলে, আপনার আদেশ শিরোধার্য, জাঁহাপনা। আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। আমি প্রথমে বলছি, প্রাথমিক আচরণ বিধির কথা। একটি পরিপূর্ণ জীবনের অর্থ—ক্রম বিকশিত উৎসাহ-উদ্দীপনার ফলশ্রুতি। আর জীবনের প্রধান উৎসাহ আসে কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থেকে। বাসনার অতৃপ্ত আগুনে না পুড়তে থাকলে উৎসাহ উদ্দীপনা আসতে পারে না। রাজনীতি, বাণিজ্য, সংসার ধর্ম এবং শিল্পকলা এই চারপ্রকার বিষয়ে মানুষ তার কুশলতা দেখাতে উৎসাহিত হয়ে থাকে।

রাজনীতি—অর্থৎ যে নীতি দ্বারা দেশের শাসনব্যবস্থা মজবুত হয়। জনগণ সুখে সমৃদ্ধিতে বসবাস করতে পারে। দেশের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় থাকে। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা এবং স্থিতি বজায় থাকে। সাধারণ মানুষ সরকারের প্রতি আস্থাবান থাকে।

পারস্যের তৃতীয় শাহ মহামান্য আরদাশির বলেছেন, 'সরকার' 'আস্থা' এরা যমজ বোন। আস্থা হচ্ছে সম্পদ আর সরকার হচ্ছে রক্ষক।

আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, দুনিয়াতে দু'টিমাত্র বস্তু সবচেয়ে ক্ষমতাবান। ন্যায় আর অন্যায়। যখন সবাই ন্যায় ধর্ম মেনে চলে, তখন তামাম দুনিয়া সুন্দর হয়ে ওঠে। আর সবাই যখন অন্যায়ের পথ বেছে নেয়, তখন দুনিয়া কলুষিত হয়ে পড়ে।

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে—প্রত্যেক সুলতানের উচিত আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। তিনি অসি এবং মসির মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে নির্দেশ করেছেন। (মানুষের বাহুবলকে তিনি 'অসি' এবং বুদ্ধিবলকে 'মসি'—অর্থাৎ কলম আখ্যা দিয়েছেন।) তা না হলে, অসির যত বিক্রমই থাক মসির কাছে সে পরাজিত হতে বাধ্য। শুধু অসি বলে সিংহাসন রক্ষা করা অসম্ভব। বুদ্ধির কৌশলে সে সিংহাসনের পতন ঘটা বিচিত্র নয়।

বাদশাহ আরদাশির তার বিশাল সলতানিয়ৎকে চার ভাগে বিভক্ত করে শাসনকার্য চালাতেন। প্রতিটি সুবার নিদর্শন হিসাবে এক একটি মোহরাঙ্কিত আংটি ধারণ করতেন। এর ফলে চারটি সুবার শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতো। একটি সুবার বিক্ষোভ অন্য সুবায় সংক্রামিত হতে পারতো না। তাঁর এই শাসননীতি ইসলামের শাসন কাল পর্যন্ত সব সুলতানরা মেনে চলেছিলো।

পারস্যাধিপতি মহামান্য শাহেনশাহ কাসরা, তার অন্যতম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পুত্রকে একবার লিখেছিলেন...

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন একষট্টিতম রাতে আবার সে বলতে শুরু করে।

পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'বাবা, একটা কথা মনে রেখো, অহেতুক কারো প্রতি করুণা প্রদর্শন করো না। এতে সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে।' আবার এও তিনি লিখেছিলেন, 'কিন্তু যেখানে মার্জনা প্রয়োজন সেখানে রূঢ় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এতে তারা বিদ্রোহী হবে।'

এক আরবীয় দার্শনিক খলিফা আবুজাফর আবদাল্লাহ অল-মনসুর-এর দরবারে একবার বলেছিলেন, 'আপনি যখন অনশন করবেন তখন আপনার কুকুরকেও নিশ্চয় না খাইয়ে আপনার অনুগত করে রাখতে চাইবেন। কিন্তু সাবধান, পথ চলতি মানুষ যেন না তাকে রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে যায়।' অল-মনসুর দার্শনিকের এ কথায় জীবনে বহুবার বহুভাবে উপকৃত হয়েছিলেন।

খলিফা আবদ্-অল মানিক ইবন্ অল মারবান মিশরে তার সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ, ভ্রাতা আবদ্ অল আজিজকে একবার লিখেছিলেন, তোমার পরামর্শদাতারা তোমাকে কোনও শিক্ষাই দিতে পারেনি। শিক্ষা লাভ করেছো তোমার শত্রুর কাছ থেকে। কি করে নিজের সৈনাবাহিনী আরও শক্তিশালী রাখতে হয় তারা তোমাকে সেই জ্ঞান দিয়েছে।

জ্ঞানবৃদ্ধ খলিফা উমর ইবন খাতাব তাঁর দরবারে যাদের উচ্চপদে বহাল করতেন তাদের প্রত্যেককে হলফনামা দিতে হতো—ভারাক্রান্ত পশুর পিঠে চাপবে না, শত্রুর সামান অপহরণ করবে না, কখনও সাহেবীয়ানা পোশাক পরবে না এবং নামাজ পাঠের সময় বিলম্ব করবে না। তিনি বলতেন জ্ঞানই প্রকৃত ঐশ্বর্য। বিচক্ষণতাই একমাত্র মন্ত্র এবং বিদ্যার্জনের গৌরব।

উমর আরও বলেছেন, তিন প্রকারের রমণী আছে। যে মুসলমান রমণী কেবলমাত্র পতিঅন্ত প্রাণ সে আদর্শ। যে মুসলমান রমণী কেবলমাত্র সন্তানের জন্য স্বামী সঙ্গ চায় সেও ভালো। কিন্তু যে নারী পরপুরুষের সঙ্গে মাতামাতি করে সে অত্যন্ত খারাপ। তার সাহচর্য পরিহার করে চলবে।

উমর বলেছেন, তিন রকমের পুরুষও আছে সংসারে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার বিবেচনা করে কাজে হাত দেয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমে নিজে বিচার বিবেচনা করে, এবং পরে অন্যের কাছে পরামর্শ নিয়ে কাজে হাত দেয়। আর নির্বোধরা না করে চিন্তা, না নেয় উপদেশ।

দার্শনিক আলী-ইবন্ তালিব বলেছেন, নারীর ছলাকলা সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। ভুলেও কখনও তাদের পরামর্শ নিও না। কিন্তু সাবধান, তাদের কখনও অখুশি রেখো না, এর পরিণাম আরও খারাপ হয়। তারা জাহান্নমের পথে পা বাড়াতে পারে।

নুজাতের এবম্বিধ-জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা শুনে কাজীরা মুগ্ধ হয়ে বলে, ইয়া আল্লাহ, এমন উপদেশের বাণী আমরাও তো জানি না।

নুজাৎ বলে, মানবতার তিনটি দিক নিয়ে অন্য আর একদিন আলোচনা করবো। আজ আচরণবিধি ও বিচক্ষণতার দ্বিতীয় পর্যায় ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছি ঃ দ্বিতীয় পর্যায়—অর্থাৎ পরিপূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতার স্তরে কোনও সাধারণ মানুষ চেষ্টা করে পৌঁছতে পারে না। এখানে পৌঁছতে গেলে জন্মগত গুণের অধিকারী হওয়া দরকার। এখানে আমি শুধু দু-একটা উদাহরণ খাড়া করবো।

এই সময় রজনীর অবসানে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন বাষট্টিতম রজনীতে আবার বলতে শুরু করে।

নুজাৎ বলে, একদিন খলিফা মুয়াবিয়াহ শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে দেখলেন ল্যাংড়া রসিক আবু বাহর ইবন কাইস জনে জনে ভিক্ষা মাঙছে। খলিফা সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বাণীটানী ছাড়ো তো হে।

ল্যাংড়া বললো, ধর্মাবতার, প্রতিদিন আপনি মাথা কামাবেন, গোঁফ ছাঁটবেন, নখ বাড়ছে কিনা লক্ষ্য রাখবেন, আপনার দাঁত মুখ সাফা রাখবেন। কিন্তু সাবধান, ভুলেও কখনই জুম্মাবারে এসব করবেন না। এই-ই 'পবিত্র' বিধান।

খলিফা বললেন, আচ্ছা আমাকে না হয় বাণী দিলে, এবার জিজ্ঞেস করি, তোমার নিজের সম্পর্কে কি কি বিধান মেনে চলো তুমি?

—আমি হুজুর, এক পা সামনে ফেলার আগে দু পা-ই ভালো করে দেখে নিই।

খলিফা প্রশ্ন করলো, তুমি তোমার জ্যেষ্ঠদের প্রতি কিরূপ আচার-আচরণ করে থাকো?

—আমি বাড়াবাড়ি না করে তাদের যথাযোগ্য সম্মান দেখাই এবং তারাও তাদের আশীর্বাদ জানাবে, এই প্রত্যাশা করি।

খলিফা, এবার রসের প্রশ্ন করেন, তুমি তোমার বিবির সঙ্গে কি রূপ আচরণ কর, ল্যাংড়াসাহেব?

আবু বাহর লজ্জিতভাবে মুখ নিচু করে। জাঁহাপনা, আমাকে মাফ করবেন, সে কথা আমি বলতে পারবো না।

—আরে বলই না, লজ্জার কি আছে?

ল্যাংড়া দেখলো নিরুপায়। স্বয়ং খলিফার শুনতে সাধ হয়েছে। বলতেই হবে।—শুনুন, জাঁহাপনা, আমার বিবি খুব দুবলা আর কুঁজো। চিৎ হয়ে শুতে পারে না।

সুলতান গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে, তা হলে তো বিপদ।

—কেন, বিপদ কেন, হুজুর?

—চিৎ হয়ে শুতে না পারলে শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ-এ টিকটিকির খেলা দেখে কি করে?

ল্যাংড়া জবাব দিতে দেরি করে না।—জী হুজুর, বিবি আমার উপুর হয়ে শুয়ে নেংটি ইঁদুরের লুটোপুটি দেখতেই ভালোবাসে।

খলিফা ল্যাংড়ার বাক-চাতুর্যে মুগ্ধ হন। তারিফ জানিয়ে বলেন, সাবাস! তোমার কথায় খুব খুশি হয়েছি। বলো, কি চাও? আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চাই।

ল্যাংড়া বলে, সত্যপথে থেকে প্রজাপালন করুন—এই আমার একমাত্র কামনা। আর কিছু চাই না।

এই বলে ল্যাংড়া আবু বাহর আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করে খলিফার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

খলিফা আনন্দিত হয়ে বললেন, সমগ্র ইরাকে যদি আর একজনও জ্ঞানী ব্যক্তি না থাকে তাতেও আমার দুঃখ নাই। আবু বাহর একাই একশো।

রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন তেষট্টিতম রাতে আবার কাহিনী শুরু হয়।

নুজাৎ বলে, খলিফা উমর ইবন অল-খাতাবের শাসনকালে কোষাগারের খাজাঞ্চী ছিলেন বৃদ্ধ মুয়াইকিব। তার মতো ধর্মপ্রাণ সৎব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়। একদিন খলিফা উমরের ছোট ছেলেটি আয়ার হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে বৃদ্ধ মুয়াইকিবের কাছে এসেছিলো। বৃদ্ধ খাজাঞ্চী তাকে আদর করে একটা আনকোরা চকচকে রূপোর দিরহাম হাতে দেয়। এর কয়েকদিন বাদে খলিফা খাজাঞ্চীকে ডেকে বললেন, তোমার নামে এসব কি শুনছি খাজাঞ্চী?

—কী শুনেছেন, জাঁহাপনা?

—কোষাগার থেকে তুমি অর্থ অপহরণ করেছো!

—ইয়া আল্লাহ, একি শোনালেন, হুজুর। সারা জীবনে আমি কারো একটা দিরহাম নিইনি।

—কিন্তু তা হলে আমার বাচ্চাটাকে একটা দিরহাম দিলে কোথা থেকে?

বৃদ্ধ আশ্বস্ত হন।—ও, এই কথা, একখানা খাতা এনে সুলতানের সামনে মেলে ধরে, এই দেখুন জাঁহাপনা, শাহজাদার নামে এক দিরহাম খরচ লিখে রেখেছি।

খলিফা তবু সন্তুষ্ট হতে পারেন না।—কিন্তু কার পয়সা তাকে দিয়েছ? সমগ্র মুসলমান জাতের কাছে ঋণী করে রাখলে তাকে?

মুরাইকিব অবাক বিস্ময়ে খলিফার দিকে চেয়ে থাকে। সারা জীবনে সে নিজেকেই একমাত্র সৎ বলে মনে করে এসেছে। আজ মনে হলো, সুলতান উমরের কাছে তার সততা নিতান্তই নগণ্য।

একদিন অন্ধকার রাতে আসলাম আবু জাইদকে সঙ্গে নিয়ে খলিফা উমর শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে অদূরে একটা আলোর শিখা দেখতে পেয়ে কাছে গেলেন। দেখলেন, এক রমণী রাস্তার একপাশে কাঠ জ্বালিয়ে একটা হাঁড়িতে জল গরম করছে। ছোট ছোট দু'টি রুগ্ন শিশু তার পাশে বসে আছে। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ গা মেয়ে, এই অন্ধকার রাতে রাস্তার উপর বসে কি করছো?

—একটু পানি গরম করছি, বাবা। আমার বাচ্চা দু'টোর খাবার-দাবার কিছুই জোগাড় হয়নি। তাই একটু পানি গরম করে খাওয়াবো। আমার দুঃখের কথা আর কাকে বলবো, খোদাতালা দেখছেন। আমার দুধের বাছারা এক মুঠো দানা পায় না। খলিফাকে একদিন এর জন্যে আল্লার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

খলিফা বলেন, ওগো ভালোমানুষের মেয়ে, তোমার কি ধারণা, তোমাদের এই দুঃখ কষ্ট জেনেও খলিফা চুপ করে বসে আছেন? এত বড় শহরে কে কোথায় না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, না বললে, তিনি জানবেন কি করে?

মেয়েটি এবার ঝাঁঝালো সুরে চটে ওঠে, প্রজাদের সুখ দুঃখের খবরই যদি তিনি না রাখতে পারেন তবে খলিফা হওয়ার অত সাধ কেন?

খলিফা তার কোন জবাব দিতে পারেন না। আসলাম আবু জাইদকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসেন। ভাঁড়ার থেকে চটপট এক বস্তা আটা আর এক ঝারি চর্বি নিয়ে আসেন। আবু জাইদকে বলেন, ধরো তো জাইদ, আটার বস্তাটা আমার পিঠে তুলে দাও।

আবু জাইদ অবাক হয়।—সে কি জাঁহাপনা, আপনি পিঠে বয়ে নিয়ে যাবেন? কোনও চাকরকে ডাকছি, সে দিয়ে আসবে মেয়েটার কাছে।

—তা হয় না জাইদ।

—তা হলে, আমাকে দিন, আমি পিঠে বয়ে দিয়ে আসছি, জাঁহাপনা!

খলিফা বলেন, তা হতে পারে না জাইদ। আল্লাহর দরবারে শেষ বিচারের দিন, আমার পাপের বোঝা কি তুমি পিঠে বইবে?

খলিফা নিজেই বয়ে নিয়ে গেলেন সেই আটার বস্তা আর চর্বির ঝারি। সেই গরীব মেয়েটির পাশে নামিয়ে নিজেই খানিকটা আটা মেখে পরটা বানাতে লাগলেন। অনেক কসরৎ করে সেই নিভু নিভু আগুনের আঁচে পরটাগুলো ভাজা করে বাচ্চা দু'টো আর তার মাকে পেটপুরে খাওয়ালেন। ওদের খাওয়া শেষ হলে একখানা ঠাণ্ডা চিমসে পরটা নিয়ে খলিফা নিজেও খেলেন। অনেকক্ষণ আগের ভাজা, তখন আর গরম ছিলো না।

বাকী আটা চর্বি সব মেয়েটিকে দিয়ে খলিফা প্রাসাদের পথে রওনা হলেন। আসতে আসতে আবু জাইদকে বললেন, মেয়েটির কথায় আজ আমার চোখের পর্দা সরে গেছে, সব অন্ধকার কেটে গেছে। ও নিজেই একটা জ্বলন্ত আগুনের শিখা।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন চৌষট্টিতম রাতে আবার শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

নুজাৎ নীতি কথা শোনাচ্ছে ঃ

একদিন খলিফা উমর মাঠের পথ ধরে হেঁটে চলেছেন। দেখলেন, এক রাখাল কতকগুলো ছাগল চরাচ্ছে। খলিফা ছেলেটির কাছে গিয়ে বললেন, আমায় একটা ছাগল বিক্রি করবে?

রাখাল ছেলেটি অবাক হয়। বলে, ছাগলগুলোতো আমার নয়, জনাব। আপনি যদি কিনতে চান, আমার মালিকের সঙ্গে কথা বলুন। আমি তার কেনা গোলাম।

খলিফা মুগ্ধ হলেন। দুনিয়াতে অসৎ লোকের ভিড়ে এমন একটা সৎ ছেলের সন্ধান পেলে আনন্দ হওয়ারই কথা। খলিফা বললেন, তোমার মালিকের কাছে চলো। আমি তোমাকেই কিনতে চাই।

—কেন জনাব?

খলিফা বললেন, পথে বেরুলেই রোজ রোজ সৎ মানুষের দেখা মেলে না। আজ তোমাকে দেখে আমি ধন্য হয়েছি। তোমার মালিকের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাই। আর কোনও ধরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে তোমাকে দাসত্ব করতে হবে না। তোমার যেখানে খুশি যেতে পারবে। যা প্রাণ চায়, করতে পারবে।

একদিন হাফসা নামে খলিফার এক নিকট আত্মীয় এসে বলে, ধর্মাবতার, শুনলাম, আপনি অনেক ধনদৌলত নিয়ে দেশে ফিরছেন। তা আমি তো আপনার এক শরিক। আমার ভাগের অংশটুকু আমি নিতে এসেছি।

উমর বলে, আল্লাহ আমাকে শুধুমাত্র রক্ষক করে পাঠিয়েছেন। ধন দৌলত যা কিছু আমার বলে মনে করছ, সবই আমার মুসলমান প্রজাদের সম্পত্তি। তার একটি কানাকড়িও

আমার নয়। তাছাড়া প্রজা হিসাবেও তোমাকে কিছু দিতে পারি না। তার কারণ তোমার বাবা আমার সহোদর ভাই। লোকে বলবে, স্বজন পোষণ করছি।

নুজাৎ শুনতে পায় পর্দার ওপার থেকে—বহুৎ খুব বহুৎ খুব আওয়াজ উঠছে। হাততালিতে সারা ঘর ফেটে পড়েছে। নুজাৎ একটুক্ষণ থেমে থাকে। করতালি থামলে আবার শুরু করে ঃ

এবার আমি তৃতীয় পর্যায়ের কথা বলবো। পুণ্যবানরা এই স্তরে পৌঁছতে পারে।

হাসান অল বসরি বলেছেন, মানুষ তার অন্তিম সময়ে এই তিনটি কথা স্মরণ করে দুঃখ পায়। এক—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা। দুই—অপূর্ণ বাসনা। তিন—অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

একদিন সুফিয়াকে একদল লোক জিজ্ঞেস করেছিলো, ধনীরা কি পুণ্যবান হতে পারে?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, পারে। যখন তারা তাদের ধনদৌলত খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়, তখন পারে। আর পারে, যখন সে শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করতে পারে। 'আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই দান গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন, এই কথা যে অন্তর থেকে বলে দান করতে পারে—সে পুণ্যাত্মা'।

আবদাল্লাহ ইবন সাদ্দাদ মৃত্যুকালে তার পুত্র মহম্মদকে ডেকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ ধর্মে মতি রেখো, সৎ পথে চলো এবং আল্লাহর প্রতি ভক্তি যেন তোমার অটুট থাকে। আর একটা কথা খুব ভালো করে মনে রেখো, বাবা, সম্পদে সুখ হতে পারে, কিন্তু আনন্দ পাবে না। ভোগে কোনও আনন্দ নাই, ত্যাগেই 'পরম পাওয়া' পেতে পারো।

ধর্মাত্মা আবদ অল আজিজ যখন উমায়াদের অষ্টম খলিফা হয়ে সিংহাসনে বসেন, তখন তিনি একদিন শহরের বিত্তবানদের ডেকে বললেন, তোমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়সম্পত্তি রেখে বাকী সব সরকারের তহবিলে জমা করে দাও।

খলিফার এই কথা শুনে তারা ক্ষুব্ধ হলো। খলিফার পিসি ফতিমার কাছে গিয়ে নালিশ জানালো। ফতিমাকে খলিফা বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। একদিন রাতে ফতিমা খলিফার শয়নকক্ষে এসে গালিচার একপাশে চুপ করে বসে রইলো।

খলিফা জিজ্ঞেস করেন, কি খবর পিসিমা, কি বলবে, বলো।

ফতিমা বলে, তুমি হচ্ছ ধর্মাবতার খলিফা। তোমার সামনে এসে আগে আমার কথা বলা সাজে না। যা প্রশ্ন করবে, আমি তার জবাব দেব, এইটাই রীতি। আর তোমার অজানা তো কিছুই থাকতে পারে না। কেন এসেছি, তাও তুমি জান।

খলিফা বললেন, আল্লাহ তার পয়গম্বরকে পাঠান, মানুষের মাঝে খুসবু ছড়াতে। এবং মানব ধর্মের উন্মেষ ঘটাতে। নদী যেমন তৃষ্ণার্তকে জল দান করতে করতে বয়ে যায় পয়গম্বর-এর পুণ্য-জীবনও ঠিক তেমনি। তিনি নিজে কিছুই গ্রহণ করেন না। দান করতে করতে চলে যান। তাকে অবলম্বন করে কত লোকে বৈতরণী পার হয়। আর আমার একমাত্র কাজ—এই স্রোতস্বিনী যাতে শুকিয়ে মরুভূমি না হয়ে যায়—তাই দেখা।

এই সময়ে ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন পয়ষট্টিতম রাতে আবার গল্প শুরু হয়।

শাহরাজাদ বলতে থাকে, তারপর শুনুন জাঁহাপনা, পর্দার ওপার থেকে নুজাৎ নীতি কথা বলে চলেছে। আর পর্দার এপাশে সারকান চার কাজী ও সওদাগরকে সঙ্গে নিয়ে গভীর আগ্রহে শুনছেন ঃ

ফতিমা বলে, তোমার সব কথাই আমি বুঝতে পেরেছি বেটা। যে কথা জানতে এসেছিলাম তার জবাব আমি পেয়ে গেছি। আর কিছু বলার নাই।

ফতিমা ফিরে গিয়ে বিত্তবানদের বললো, তোমাদের জন্মজন্মান্তরের ভাগ্য যে, খলিফা উমর ইবন আবিদ-অল-আজিজের মতো সুলতান পেয়েছ। সে যা বলে, মাথা পেতে নাও।

স্পষ্টবাদী উমর মৃত্যুকালে তার সন্তানদের উপদেশ দিয়ে গেছেন ঃ দারিদ্র্য অভিপ্রেত নয়, কিন্তু দারিদ্র্যের স্পর্শ শোঁকার প্রয়োজন অপরিহার্য। আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে গেলে দারিদ্র্যের স্পর্শ অনুভব করতে হবে।

তাঁর শয্যাপার্শ্বে মসলামাহ ইবন আবদ অল মালিক উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, লোকে বলছে আপনি আপনার সন্তানদের সম্পত্তির এক কপর্দকও দিয়ে গেলেন না। অথচ ইচ্ছা করলেই বিত্তবান করে রেখে যেতে পারতেন।

খলিফা অবাক এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তুমি কি বলতে চাও মসলামাহ, সারা জীবন ধরে ন্যায় পথে চলে, শেষে মৃত্যুকালে এই জঘন্য মিথ্যাচার করে যাবো! তাহলে সারা জীবন ধরে যেটুকু পুণ্য সঞ্চয় করেছি—এক ফুৎকারে উবে গিয়ে আমার জন্যে দোজকের দরজা খুলে যাবে যে? ছোটবেলায়, মনে আছে, আমার এক পূর্বসুরীর শব যাত্রায় সামিল হয়েছিলাম। তিনি তার জীবদ্দশায়, অন্যায় অনাচার, অবিচারের চূড়ান্ত করেছিলেন। ফলে তার মৃত্যুতে লোকে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলো। আল্লাহর কাছে নালিশ জানিয়েছিলো, তার যেন দোজক বাস হয়। সেইদিন থেকে আমি হলফ করেছিলাম, তার মতো অসৎ ব্যবহার আমি যেন মানুষের সঙ্গে না করি। আমি যদি খলিফা হই, আমার প্রজারা যেন বলতে না পারে, আমি কোনও অন্যায় অবিচার করেছি।

এই মসলামাহ অল মালিক একবার বলেছিলেন, একদিন এক ইচ্ছামৃত বৃদ্ধের শবদেহ সমাধিস্থ করে রাত্রে শুয়েছি—স্বপ্নে দেখলাম, সেই বৃদ্ধ আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন।—শোনো, মসলামাহ, জীবনে এমন কিছু কাজ করে যাবে যার জন্যে পুরস্কার আশা করতে পারো।

তিনি একটা কিস্‌সাও বলেছিলেন ঃ উমর ইবন আবদ্ অল-আজিজের শাসনকালে এক যুবক তার এক রাখাল বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো। একপাল ছাগল ভেড়ার মাঝখানে ইয়া তাগড়াই এক জোড়া কুকুর দেখে অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দোস্ত, তোমার এই ছাগল ভেড়ার মধ্যে ঐরকম জাঁদরেল কুকুর দু'টো রেখেছো কেন?

রাখাল বন্ধু জবাব দেয়, উহুঁ, ওদু'টো আসলে কুকুর না।

—তবে?

—পোষ মানানো নেকড়ে।

—কী করে পোষ মানালে? ওরা ছাগল ভেড়া খেয়ে ফেলে না?

—মারের ভয় দেখিয়ে। ওরা জানে থাবা বাড়ালে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব আমি। আসল কথা কি জান দোস্ত, কাল্লা শক্ত থাকলে ধড়েও তাগদ থাকে।

একদিন খলিফা উমর ইবন আবিদ-অল-আজিজ মাটির তৈরি একটা সিংহাসনে বসে প্রজাদের উদ্দেশে বাণী দিলেন, আবদ্ অল মালিক মারা গেলেন, তারা বাবাও গত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কি দুর্ভাগ্য, তাঁরা কোনও সুনাম রেখে যেতে পারেননি। আমিও তো ঐভাবেই একদিন মরে হারিয়ে যাবো। তাই আজ বিনোদনের সব উপকরণ এখন থেকে আমি পরিহার করে চলবো।

—কিন্তু তাই বলে, মসলামাহ বললেন, মাটির আসনে বসা আপনার শোভা পায় না। একখানা কুশন পেতেও বসুন, জাঁহাপনা।

খলিফা চটে উঠলেন, 'শেষ বিচারের দিন' ঐ কুশন যখন শিকল বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে আমার গলায়, তোমার খুব আনন্দ হবে, না?

এমন সময় রজনী প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন ছেষট্টিতম রজনীতে আবার যথাসময়ে কাহিনী শুরু হয়।

নুজাৎ বলছে আর চার কাজী ও সওদাগর সহ সুলতান সারকান শুনছে ঃ খলিফা আবিদ-অল-আজিজ একদিন বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে চিরজীবী করে পাঠাননি। যে কোন ধর্মাত্মার কাছে মৃত্যুই তাঁর সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

একদিন খলিফা হিসারাম এক তাঁবুতে তার পাত্রমিত্র পারিষদ পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় খলিদ ইবন সফবান এসে বললেন, ধর্মাবতার আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আজ আপনাকে নীতিগর্ভ কাহিনী শুনিয়ে যাবো।

এক সুলতান একদিন তার পারিষদদের বলেছিলেন, আমার মতো মহান উদার দয়ালু এবং বিত্তশালী বাদশাহ কি তোমরা কখনও দেখেছো?

তখন এক প্রবীণ বিজ্ঞ ধর্মানুরাগী পারিষদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জাঁহাপনা, আপনি খুব কঠিন প্রশ্ন করেছেন। যাই হোক, জবাব দেবার আগে সবিনয়ে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই—আপনি কি মনে করেন আপনার এই অতুল বৈভব চিরস্থায়ী হবে?

সুলতান জবাব দিলেন, ধনদৌলত কখনও চিরস্থায়ী হয় না।

পারিষদ বললেন, তাহলে আপনি অত গর্ব করে এরকম প্রশ্ন করছেন কেন?

খলিফা বললেন, তা হলে আমার কি করা উচিত, বলো।

—নিজেকে নির্মল পবিত্র রাখুন। পাপ-চিন্তা করবেন না। অহঙ্কার পরিত্যাগ করুন। অনাড়ম্বর জীবনযাপন করুন। আল্লাহর পায়ে নিজেকে সঁপে দিন।

সেই দিন থেকে খলিফা মাথার মুকুট খুলে নামিয়ে রাখলেন। বাদশাহী সাজপোশাক ফেলে দিয়ে দীন দরিত্র যে পোশাক পরে সেই মোটা জামা কাপড় পরলেন। একটি মাত্র কম্বল সম্বল করে মক্কার পথে যাত্রা করলেন।

এই সময় পর্দার ওপার থেকে চার কাজী আর সওদাগর তারিফ জানিয়ে বললেন, আহা-হা, কি কথাই শুনলাম। অমৃত সমান। শুনে জীবন সার্থক হয়ে গেলো।

নুজাৎ বলে, এই পর্যায়ে আরও অনেক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু আজ এই আসরে সব শোনানো সম্ভব নয়। যদি সুযোগ হয়, আর একদিন শোনাবো।

এই বলে নুজাৎ চুপ করলো।

এই সময়ে প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজাদ, গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন সাতষট্টিতম রজনী।

শাহরাজাদ গল্প শুরু করে ঃ

শুনুন জাঁহাপনা, চার কাজী নুজাতের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। এ রমণী যুগের আলো। দেশের গৌরব। আমাদের সুলতান পরম ভাগ্যবান। তার মতো রূপে গুণে অনন্যা আর একটিও আমাদের চোখ পড়েনি।

এই বলে তারা সকলে সারকানকে কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিলো।

সারকান তার দাসদাসীদের ডেকে হুকুম দিলো, জলদি শাদীর আসর সাজাও। শাহী খানা পাকাও। আজ রাতে আমি শাদী করবো।

মুহূর্তের মধ্যে সারা প্রাসাদে সাজো সাজো রব পড়ে গেলো। সন্ধ্যা না হতেই আলার মালায় সাজানো হলো প্রাসাদ। দামাসকাসের বাহারী ফুল এলো, আতর গোলাপজল, সুগন্ধী আগরবাতি এলো, এলো দামী দামী সরাব, মাংস, মিঠাই মণ্ডা। উৎসবে মেতে উঠলো সবাই। আমীর ওমরাহদের বিবিরা—যারা এসেছিলো, সবাইকে শাদী দেখার নিমন্ত্রণ জানালো সারকান। উপস্থিত অভ্যাগতদের এলাহী খানাপিনার ব্যবস্থা করা হলো। শহরের সম্ভ্রান্ত সওদাগর আমির ওমরাহরা এসে সারকানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলো।

হামাম থেকে গোসল সেরে শাদীর আসরে এসে বসলো শাহজাদা সারকান। মেয়েরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালো। কুমারী মেয়েরা নুজাৎকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে নিয়ে এসে বাসর কক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়ে সারকানের সামনে দাঁড় করাতে লাগলো। প্রতিবার নতুন নতুন সাজে সজ্জিত করে পরপর সাতবার নুজাৎকে এইভাবে বাসর কক্ষ প্রদক্ষিণ করানো হলো। শাদীর এই চিরাচরিত প্রথা। সপ্তপদী শেষ হলে নুজাৎকে আবার তারা পাশের ঘরে নিয়ে যায়। এবার রীতি অনুযায়ী তাকে বিবস্ত্রা করা হয়। একজন বৃদ্ধ পরিচারিকা পাত্রীর সর্বাঙ্গ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। পাত্রীর দেহ পাত্রের সঙ্গে সহবাসের উপযুক্ত হয়েছে কিনা—পরীক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্য তাই। বৃদ্ধা দেখলো পাত্রী একেবারে তৈরি। শুভেচ্ছা জানিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

সারকান এবার নুজাতের পাশে বসে। ভাবতেও পারে না, পাত্রী তার নিজেরই বোন। শাদীর প্রথম রাতেই নুজাৎ অন্তঃসত্ত্বা হলো। মিলনের আনন্দে নুজাৎ সারকানের হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সারকান তার একান্ত সচিবকে ডেকে বললো, বাগদাদে খলিফা উমর অল নুমানকে চিঠি পাঠাতে হবে।

সচিব কাগজ কলম নিয়ে এলো। সারকান চিঠির বয়ান বলে যায় ঃ আমি এক পরমা সুন্দরী গুণবতী বাঁদীকে কিনে মুক্ত করে দিয়েছি। এবং পরে তাকে শাদী করে আমার বেগম করে নিয়েছি। প্রথম রাতেই আপনার পুত্রবধূ গর্ভবতী হয়েছে। আপনার আশীর্বাদ নেবার জন্য অতি শীঘ্র তাকে বাগদাদে পাঠাবো। সে তার ননদ নুজাৎ এবং দেবর দু-অল-মাকানকেও দেখে আসবে।

একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর হাতে চিঠিখানা পাঠানো হলো। আটদিন পরে সে জবাব নিয়ে ফিরে আসে।

এই সময়ে রজনী অতিক্রান্ত হচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন আটষট্টিতম রাত্রে আবার সে গল্প শুরু করে।

সুলতান উমর অল নুমান-এর চিঠির বক্তব্য মোটামুটি এইরকম ঃ

প্রাণাধিক পুত্র সারকানের প্রতি শোক দুঃখ জর্জরিত হতভাগ্য পিতা উমর-অল-নুমানের পত্র।

শোন বাবা, তুমি এখান থেকে যাওয়ার পরে নানাভাবে আমার ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়েছে। আমি আজ শোকে তাপে জর্জরিত। আমার প্রিয় পুত্র দু-অল-মাকান এবং নয়নের মণি নুজাৎ আর প্রাসাদ নাই। কাজের তাগিদে বাগদাদ ছেড়ে যেতে হয়েছিলো আমাকে। মাসাধিককাল পরে ফিরে এসে শুনলাম, তোমার ভাই মাকান আর বোন নুজাৎ তীর্থযাত্রীদের দলে ভিড়ে

মক্কায় চলে গেছে। মাকান আমার কাছে বায়না ধরেছিলো, সে মক্কা যাবে। কিন্তু তার এই নাবালক বয়স—এই বয়সে কি কেউ তীর্থধর্ম করতে যায়? আমি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। এও বলেছিলাম, সামনের বারে আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। কিন্তু সে-কথা তার মনঃপুত হয়নি। আমাকে লুকিয়ে তার দিদির সঙ্গে সে পালিয়ে চলে গেছে। সেই থেকে অনেক সন্ধান করেছি, মক্কায় লোক পাঠিয়েছি, কিন্তু কোন হদিস করতে পারিনি। শোকে দুঃখে আমি বড় কাতর হয়ে পড়েছি। বিশেষ আর কি লিখি। আগামীতে তোমার কুশল জানাবে।

এর কিছুদিন পরে নুজাৎকে আসন্ন প্রসবা রেখেও সারকান বাগদাদে যেতে বাধ্য হয়। তার কারণ বাবার অসুস্থতা। বাবাকে দেখে সে যখন ফিরে আসে, নুজাৎ তার সাতদিন আগে একটি ফুটফুটে সুন্দর কন্যার জন্ম দিয়েছে।

নুজাৎ বললো, আজ সাতদিনের দিন মেয়ের নামকরণ করতে হয়।

সারকান মেয়েকে কোলে তুলে আদর করতে থাকে। মেয়ের গলার হারে একটা লকেটে তার চোখ আটকে যায়। একি। এতো সেই পাথর! সারকান চিৎকার করে ওঠে, তুমি এ পাথর পেলে কোথায়? এতো সেই তিন দৈব-পাথরের একখানা। হতভাগী ইরবিজা বাবাকে দিয়েছিলো? শিগগির বল্ বাঁদী, কোথায় পেলি তুই এ পাথর?

সারকানের মুখে এই 'বাঁদী' ডাক শুনে নুজাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।—মুখ সামলে কথা বলো। আমি তোমার শাদী করা বেগম। বাঁদী বলতে লজ্জা করলো না? তুমি আমাকে সওদাগরের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে কিনেছিলে বলেই ভেবেছো আমি নাম গোত্রহীন একটা বেজন্মা মেয়েমানুষ। তবে শোনো, তুমি যেমন শাহজাদা, আমিও তেমনি শাহজাদী। এতদিন গোপন করে রেখেছিলাম, কিন্তু আজ আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। আমার বাবা বাগদাদের উমর অল-নুমান। আমার আসল নাম নুজাৎ-অল-জামান।

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে নুজাৎ হাঁপাতে থাকে।

এই সময়ে রাতের অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামায়।

পরদিন ঊনসত্তরতম রাতে আবার সে শুরু করে।

নুজাতের কথা শুনে সারকান নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একি নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। তার নিজের বোন তার অঙ্কশায়িনী বেগম। ছি ছি ছি! লজ্জায় মাথা কাটা গেলো? হায় আল্লাহ, একি শাস্তি আমাকে দিলে! জীবনে এমন কি পাপ আমি করেছি!

অনুতাপ অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলো তার হৃদয়। সারকানের এখনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, এই সেই নুজাৎ—উমর-অল-নুমানের কন্যা। সারকান ঠিক ঠিক শুনেছে তো?

নুজাৎও কাঁদতে থাকে, হায় আল্লাহ, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি দিয়ে হবে?

সারকান বলে, না জেনে যা করেছি তার জন্যে আমরা কেন দায়ী হবো। যাই হোক, এখন যখন জানতে পারলাম, তোমার আমার এ সম্পর্ক আর থাকা উচিৎ না। আজই আমি আমার দরবারের এক পদস্থ সচিবের সঙ্গে তোমার শাদীর ব্যবস্থা করছি। আমি বললে সে 'না' করতে পারবে না। আমাদের মেয়েও তার কাছেই মানুষ হবে।

নুজাৎও সারকানের প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। বলে, সেই ভালো, যত তাড়াতাড়ি হয় ব্যবস্থা কর।

সেইদিনই অনাড়ম্বরভাবে নুজাতের শাদী হয়ে গেলো এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে। বাচ্চাটার দেখাশুনা করার জন্য সারকান আয়া চাকরের ব্যবস্থা করে দিলো।

এর কয়েকদিন পরে বাগদাদ থেকে দূত এলো উমর-অল-নুমানের বার্তা নিয়ে। সুলতান উমর লিখেছে, এখনও নুজাৎ-মাকানের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সন্তান শোকে

সে মুহ্যমান। কনসতানতিনোপল থেকে এক বুড়ি এসেছে। সঙ্গে এনেছে পাঁচটি পরমাসুন্দরী যুবতী। বুড়ি বলেছে, শুধু রূপ নয় গুণেও নাকি তাদের জুড়ি মেলা ভার। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিদূষী। মেয়ে পাঁচটি উমরের কাছে সে বিক্রি করতে এসেছে। কিন্তু দাম হিসাবে নগদ অর্থ সে চায় না। এখানকার বাহারী জিনিসপত্রে দাম মিটিয়ে দিলেই সে খুশি হবে। বাগদাদের নামজাদা জিনিসপত্র সব জোগাড় করা হয়েছে। এখন সারকান যেন দামাসকাসের নামজাদা সামানপত্র পাঠিয়ে দেয় এখানে। সেই সঙ্গে তার সদ্য-বিবাহিত বিবিকেও পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছে সে। উমর শুনেছিলো, সারকানের স্ত্রী বিদূষী। বুড়ির ঐ মেয়ে পাঁচটিকে যাচাই করে নিতে গেলে পুত্রবধূকে নিতান্তই দরকার। তাই সারকান যেন আর বিলম্ব না করে জিনিসপত্রের সঙ্গে তাকেও সত্বর পাঠিয়ে দেয়।

উমর-অল-নুমানের চিঠিখানা পড়ে সারকান চিন্তিত হয়। কি করা উচিৎ কিছুই ঠিক করতে পারে না। নুজাৎকে ডেকে পাঠায়। সে লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।

নুজাৎ এসে সব শুনে বলে, আমি আর কি বলবো, তুমিই এ ব্যাপারে ভালো বুঝবে। তবে আমার মনে হয়, আমাকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো। গোড়া থেকে সব বৃত্তান্ত বাবাকে খুলে বলা দরকার। তুমি একটা চিঠিতে লিখে দাও, কিভাবে আমি বাদাবী সর্দারের হাতে গিয়ে পড়ি। তারপর সওদাগরের হাত ঘুরে তোমার হাতেই বা কি করে এলাম, সব লিখে দাও। তুমি আমাকে না জেনে শাদী করেছিলে, তাও লিখবে। শুধু লিখবে না, তুমি আমার সঙ্গে সহবাস করেছো। আমার পরিচয় জানার পর তুমি তোমার দরবারের এক পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আমার আবার শাদী করিয়ে দিয়েছ।

নুজাতের পরামর্শ সারকানের খুব পছন্দ হয়। দামাসকাসের বাজার থেকে দামী দামী বাহারী বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ করে উটের পিঠে বোঝাই করা হলো। নুজাতের সঙ্গে বাগদাদে পাঠাবে। প্রতি বছরই বাগদাদে ভেট পাঠানো হয়। এবারে তার বহরটা কিছু বেশি। তার কারণ, স্বয়ং সুলতান নিজে থেকে খৎ পাঠিয়েছে। বাছাই করা দামী দামী জিনিসপত্র পাঠাতে হবে। পাঁচটি গ্রীক সুন্দরীর মূল্য হিসাবে এই সব বিলাস সামগ্রী বুড়িকে দিতে হবে। একটা উটের পিঠে দোলা বাঁধা হলো। এই দোলায় চেপে যাবে নুজাৎ। আর বাকী উটগুলোর পিঠে বাঁধা-ছাঁদা হতে লাগলো জিনিসপত্র। এই সব বাদশাহী ভেটের সামানপত্র দেখার জন্য শহরের কৌতূহলী মানুষ ভিড় করে এলো।

এই সময় দু-অল-মাকান আর তার সঙ্গী সেই বৃদ্ধ শহরের নানা পথ ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে দাঁড়ায়। একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে মাকান জানতে পারে, এই সব লাট-বহর যাবে বাগদাদে। সুলতান উমর-অল-নুমানের ভেট। মাকান-এর চোখ জলে ভরে আসে। বৃদ্ধকে বলে, সে-ও যাবে এদের সঙ্গে। কতদিন হলো বাগদাদ ছেড়ে এসেছে সে। এদের পিছনে পিছনে গেলে একদিন সে বাগদাদে পৌঁছে যাবে। এ সুযোগ সে হারাতে চায় না। বৃদ্ধ বলে, মাকানকে সে একা ছেড়ে দিতে পারে না। সে যদি একান্তই যেতে চায়, বৃদ্ধ তার সঙ্গে যাবে।

গাধাটার পিঠে মাকানকে চাপিয়ে সে বলে, চলতে চলতে তোমার যখন কোমর ধরে যাবে, তখন না হয়, নেমে একটু হেঁটে যেও। হাত পায়ের আড় ভাঙ্গবে। আমি সেই সময় গাধার পিঠে চাপবো।

তিন দিন চলার পর যাত্রীদল এক শহরের মুখে এসে থামে। এইখানে বিশ্রাম নেওয়া হবে। তিন দিন। পথের শ্রান্তি কাটিয়ে আবার তারা রওনা হবে। মাকানও গাধার পিঠ থেকে নামে। বৃদ্ধ গাধাকে দানাপানি খাওয়ায়। নিজেরাও খানাপিনা সারে। একটা সরাইখানায় শোবার জায়গা করে নেয়। চাঁদনী রাত। দক্ষিণা হাওয়া বইছে। দু-অল-মাকানের মন উদাস বাউল হয়ে ওঠে। গুণ গুণ করে গান ধরে। মাকানের গলা বড় মিষ্টি।

ওপাশে নুজাৎরা তাঁবু গেড়েছে। তার সদ্য-বিবাহিত স্বামী পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। অন্য তাঁবুগুলোতে সরকারী কর্মচারী, চাকর নফর দাস দাসীরাও ঘুমিয়ে পড়েছে। পথশ্রমে ক্লান্ত উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চরগুলোও জিরিয়ে নিচ্ছে। শুধু জেগে আছে প্রহরীরা। আর জেগে আছে নুজাৎ। তার চোখে ঘুম আসে না। কতকাল পরে দেশে ফিরছে—অথচ একা। প্রাসাদ থেকে তারা দুই ভাইবোন একসঙ্গে পথে বেরিয়েছিলো। তারপর পথের মধ্যেই ভাইকে সে হারালো। এখন বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কি করে? কি জবাব-দিহি করবে তার কাছে? কি সান্ত্বনা তাকে দেবে? এই নিদারুণ পুত্রশোক কি করে সহ্য করবেন তিনি। নুজাতের দু' গাল বেয়ে অশ্রুধারা নামে। হঠাৎ মিষ্টি একটা গানের কলি ভেসে আসে তার কানে। নির্জন নিশুতি রাত। মৃদু কণ্ঠের গাওয়া গানও পরিষ্কার শোনা যায় ঃ

কেমনে বলিবো তারে এ নিদারুণ কথা।
কেমনে জুড়াবো বলো, হৃদয়ের ব্যথা॥

নুজাৎ পিছন হাতড়াতে থাকে। এই গান, এই সুর, এই গলা—এ সবই তো তার চেনা চেনা। মাকানের গলাও ঠিক এমনি মিষ্টি মধুর ছিলো। তার এই গানের সুর—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ে—এই সুরে এই গান সে প্রায়ই গাইতো। দ্বাররক্ষী খোজাকে ডেকে বলে, দেখ তো, কে গান গায়?

খোজা ভাবে, গানের চিৎকারে মালকিন ঘুমোতে পারছে না। একটা বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে যায়। এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। কিন্তু সরাইখানার সামনে সেই বৃদ্ধ ছাড়া আর কাউকেই চোখে পড়ে না। বৃদ্ধের কাছে এসে খোজা কড়া মেজাজে জিজ্ঞেস করে—একটু আগে এখানে গান গাইছিলো কে?

সুলতানের শমন। বৃদ্ধ শঙ্কিত হয়।—কই না, কেউ তো গায়নি বাবা।

খোজা চটে ওঠে, গায়নি মানে? আলবৎ গেয়েছে। আমি নিজে কানে শুনেছি। গায়নি বললেই হলো? আর যদি কেউ না থাকে, তুমিই গেয়েছো।

বৃদ্ধ হাত জোড় করে।—বিশ্বাস করো বাবা, খোজা, আমি বুড়ো হাবড়া মানুষ। আল্লাহর নাম জপতপ করি। কিন্তু গলায় বোমা মারলেও সা বেরুবে না।

খোজা সন্দিগ্ধ চোখে বৃদ্ধের আপাদমস্তক দেখতে থাকে। হুম্, লোকটা নেহাত মিথ্যে বলেনি। চেহারাচরিত্র দেখে অবশ্য মনে হয় না গান-ফান জানে।

—যাই হোক শোনো, শেখ, আমাদের মালকিন-এর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। যেই গা'ক, গান বন্ধ করো। তা না হলে খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে খোজাটা আবার তাঁবুতে ফিরে যায়।

বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাকানের কাছে গিয়ে বলে, সব্বোনাশ হয়ে গেছে, বাবা।

মাকান ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে।—কি সর্বনাশ হলো, বাপ জান? চোর ডাকাত নাকি?

—আরে না। সুলতানের তাঁবু থেকে পেয়াদা এসেছিলো।

—কেন?

—তোমার গান শুনে আমিরের বিবি চটে গেছে। তার ঘুম নষ্ট হচ্ছে। তাই

তোমাকে পাকড়াও করতে এসেছিলো। তা আমি ভাগিয়ে দিয়েছি। বলেছি, এখানে কে গান গাইবে? শোনো, বাবা, তুমি আর গান টান করো না। না হলে আবার ব্যাটা তেড়ে আসবে।

—আসুক। দেখি কে কি করতে পারে! আমি আমার গান গাইবো। গান গাই না গাই আমার খুশি। আমিরের বিবির ভয়ে আমি গান বন্ধ করবো? কেন?

বৃদ্ধ বলে, বিদেশ বিভুঁই জায়গা। এই সময়ে একটা কিছু বিপদ আপদ ঘটলে কে রক্ষা করবে?

—কেন মাথা কেটে নেবে নাকি? আমার যত খুশি গাইবো। কারো মানা শুনবো না।

বৃদ্ধ কাঁদো কাঁদো হয়ে দরজার সামনে গিয়ে বসে পড়ে।

মাকান আবার গান ধরে ঃ

কেমনে বলিবো তারে এ নিদারুণ কথা।
কেমনে জুড়াবো বলো, হৃদয়ের ব্যথা॥

খোজা গিয়ে বলেছিলো, মালকিন, আশে পাশে কাউকেই দেখলাম না। মনে হচ্ছে পথচলতি কোন মানুষ গাইতে গাইতে চলে গেছে।

নুজাৎ ভেবেছিলো, হতেও পারে। তারই হয়তো মনের ভুল। মাকানের কথাই সে অহরহ চিন্তা করছে। তাই হয়তো অন্য কোনও লোকের গান শুনে মাকানের গলা বলে ভুল হয়েছে। কিন্তু একটু পরে যখন আবার শুনতে পেলো সেই একই গান, নুজাৎ খোজাকে ডেকে বললো, তুমি বোধ হয় ভালো করে তলাশ করে দেখনি। ওই শোনো, আবার গাইছে সেই গান—আর দেরি করো না। যাও দেখে এসো, কে গায়। নিয়ে এসো তাকে।

বৃদ্ধ দেখলো, খোজাটা আবার হন হন করে ছুটে আসছে। মাকান তখন আবার গান থামিয়ে দিয়েছে। খোজাটা কাছে এসে বাজখাই গলায় হুঙ্কার দেয়, এই না বললে, এখানে কেউ গাইছে না। এই তো একটু আগে আবার শুনলাম সেই গান।

—তুমি ভুল শুনেছো, পেয়াদা সাহেব। এই নিশুতি রাতে এখানে কে গান গাইবে!

খোজা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ভুল শুনেছি। ন্যাকামী পেয়েছো? চলো, তোমাকেই ধরে নিয়ে যাবো।

—রক্ষা কর বাবা খোজা সাহেব, আমি কেন আমার চৌদ্দ পুরুষ কেউ গান জানে না।

—তাহলে যে গাইছে তাকে দেখিয়ে দাও।

—কে গাইছে, কাকে দেখিয়ে দেব? আমার মনে হচ্ছে কি জান? মরুভূমির মায়া।

—মরুভূমির মায়া।

বৃদ্ধ বলে, হ্যাঁ মরুভূমির মায়া। রাত্রিবেলায় মরুভূমিতে কত বিচিত্র কাণ্ডকারখানা ঘটে তা শোনোনি? কখনও মনে হয়, বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। আবার কখনও শুনবে কেউ গান গাইছে। আবার অনেকে বলে এইরকম চাঁদনী রাতে নাকি মরুভূমির মাটিতে নেমে আসে হুরী পরীর দল।

খোজাটা অবাক হয়ে শোনে।—তাহলে তুমি বলছো, এ-ও সেইরকম কিছু?

—আমার তো তাই মনে হয়।

খোজা ফিরে গিয়ে নুজাৎকে বলে, ও কিছু না, মালকিন, রেতের বেলা মরুভূমিতে এরকম অনেক কিছুই শোনা যায়। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

কিন্তু নুজাতের ঘুম আর আসে না। বার বারা মাকানের মুখ ভেসে ওঠে।

একটুখানি তন্দ্রা লেগে এসেছিলো। আবার সেই সুর কানে বাজতেই উঠে বসে নুজাৎ। খোজাটাকে ডেকে বলে, তুমি আবার যাও। আমার বিশ্বাস, এ কোনও মায়া নয়। নিশ্চয়ই কোন মানুষই গাইছে। যেমন করে পারো তাকে নিয়ে এসো আমার কাছে। এমনিতে না আসলে—এই নিয়ে যাও এক হাজার মোহর। টাকার লোভ দেখালে সে নিশ্চয়ই আসবে।

খোজার ভুল ভাঙ্গে। সে ভেবেছিলো মালকিনের ঘুম নষ্ট হচ্ছে বলে তাকে ধরে বেঁধে আনতে বলেছিলো। কিন্তু তা তো না। কিছুই বুঝতে পারে না সে। ভাবে—বড়লোকের খেয়াল।

খোজা এবার আর বেতের লাঠিটা সঙ্গে নেয় না। বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, ওগো, বুড়ো বাপজান, তোমার দু'টো পায়ে পড়ি, আমাকে বলে দাও, কে গান গাইছে। না হলে আমার নোকরী থাকবে না। মালকিন একবার শুধু তার সঙ্গে দু'টো কথা বলতে চায়, একটু চোখের দেখা দেখতে চায়। তার জন্যে যদি সে পয়সাকড়ি চায়, তাও দিতে পারি। কথা দিচ্ছি, কোন ভয় নাই। তার কোন ক্ষতি তিনি করবেন না।

বৃদ্ধ কিছুই বুঝতে পারে না। এ আবার কি নতুন চাল! এমন সময় মাকান উঠে আসে দরজার সামনে।

—কী? ব্যাপার কী?

খোজা মাকানের সুপুরুষ বলিষ্ঠ চেহারা দেখে সেলাম ঠুকে বলে, এখানে কে গান গাইছিলো, জনাব?

—কেন, আমি।

খোজা যেন হাতে স্বর্গ পায়।—মেহেরবানী করে আপনি যদি একবার তাঁবুতে আসেন—কোনও ভয় নাই আপনার। আমার মালকিন শুধু একটিবার আপনারসঙ্গে কথা বলতে চান।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন সত্তরতম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে।

মাকান চটে ওঠে, কে তোমার মালকিন? আমার সঙ্গে তার কি দরকার? আমি কি তার কেনা বান্দা, সে ডাকলেই যেতে হবে!

খোজা বলে, আপনি গোঁসা করবেন না, হুজুর। আপনি কেন তার গোলাম হতে যাবেন। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, যে গান গাইছে তাকে যেভাবে পারি তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্যে টাকাপয়সা দিতেও তিনি রাজি।

মাকানের অবাক লাগে। এমন আজগুবি কথাও তো সে শোনেনি কখনও। তার গান শুনে পর্দানসীন আমিরের বিবি তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। আবার বলে কিনা টাকাপয়সা চাইলেও দিয়ে নিয়ে আসবে। মনে মনে অপমানিত বোধ করলেও মুখে প্রকাশ করে না। একটা অদম্য কৌতূহল মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে। দেখাই যাক না, কি ব্যাপার। বলে, চলে যাবো।

বৃদ্ধ শিউড়ে ওঠে।—সে কি বাবা! ওর কথা তুমি বিশ্বাস করলে? তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে আটকে ফেলবে?

মাকান একটা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, কেন, আটকাবে কেন, আমি কি কারো পাকা ধানে মই দিয়েছি নাকি?

খোজাটা দু' হাত জোড় করে বলে, না, হুজুর, কোনও ভয় করবেন না। আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনার কোনও ক্ষতি হবে না।

মাকান বলে, হয় হোক, আমি পরোয়া করি না। চলো, যাবো তোমার মালকিনের কাছে।

খোজা তাঁবুর ভিতরে ঢুকে নুজাৎকে জানায়, সে এসেছে।

নুজাৎ বলে, তাকে আবার সেই গানটা গাইতে বলো। আর তার নাম ধাম জিজ্ঞেস কর।

খোজা বাইরে এসে বলে, জনাব, আমার মালকিন আপনার গান শুনতে চাইছেন। আর জানতে চাইছেন, আপনার নাম কি, দেশ কোথায়?

মাকান বলে, গান শোনাচ্ছি। কিন্তু নাম ধাম বলতে চাই না। ভাগ্যের ফেরে আজ আমি পথে পথে ঘুরি। নাম ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি।

এই বলে মাকান আবার সেই গান ধরে ঃ

কেমনে বলিবো তারে এ নিদারুণ কথা।
কেমনে জুড়াবো বলো, হৃদয়ের ব্যথা॥

গান শুনে নুজাৎ উন্মাদের মতো ছুটে বেরিয়ে আসে। এতো মাকান—তার প্রাণের ভাই ছাড়া আর কেউ নয়। মাকানকে দেখে চিৎকার করে ওঠে নুজাৎ, মাকান—মাকান।

আর কিছু বলতে পারে না। অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামায়।

পরদিন একাত্তরতম রাতে আবার শুরু করে ঃ

ছুটে তাঁবুর বাইরে এসে ভাইকে দেখে নুজাৎ, মাকান, মাকান বলে, চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

দু-অল-মাকান দেখে আমির-বিবি আর কেউ না—তার দিদি নুজাৎ। ছুটে গিয়ে নুজাৎকে টেনে তোলে। আনন্দে উত্তেজনায় মাকানও আত্মহারা হয়ে পড়ে। দুই ভাইবোন-এর এই কান্নাকাটি দেখে খোজা ব্যাচারী ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। নুজাৎ মাকানের সারা শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে।

সে রাতে তারা দু'জনে কেউই ঘুমুলো না। মাকান বলে, দিদি, তোমার কাহিনী শোনাও। সেই যে আমাকে জেরুজালেমের সরাইখানায় রেখে তুমি কাজের ধান্দায় বেরুলে, তারপর থেকে তো আমি কিছু জানি না।

নুজাৎ বলে, আমিও তো তোমার কোন কিছু জানি না, ভাই। আগে আমার কাহিনী শোনো। তারপর তোমার কাহিনী শুনবো।

নুজাৎ আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত খুলে বলে। মাকানও বললো। তার কাহিনী। বললো, ঐ মেহেরবান বৃদ্ধের দয়াতেই সে তার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

মাঝ রাতে নুজাতের স্বামীর ঘুম ভেঙে যায়। এই গভীর রাতে তার তাঁবুর মধ্যে এক অচেনা যুবককে নুজাতের পাশে দেখে অবাক হয়।

নুজাৎ হাসতে হাসতে বলে, কী? ভাবছো এই রাতে আমি আবার কার সঙ্গে বসে কথা বলছি? এ তো তোমার বড় কুটুম, গো। আমার সহোদর ভাই দু-অল-মাকান। সুলতান উমর-অল-নুমানের ছোট ছেলে।

এই প্রথম নুজাৎ তার স্বামীর কাছে আসল পরিচয় প্রকাশ করলো। স্বামী ব্যাচারী সুলতানের কর্মচারী। নুজাতের কথায় আকাশের চাঁদ হাতে পায়। আরব অধিপতি শাহেনশাহ উমর অল-নুমানের সে জামাতা। গর্বে বুক ভরে ওঠে। শ্বশুর নিশ্চয়ই কোন সুবাদার করে দেবে তাকে। চাকর নফরদের ডেকে হুকুম করলো, আর একটা তাঁবু খাটাও। আমার বড় কুটুমের আদর যত্নের যেন ত্রুটি না হয়।

নুজাৎ বলে, তার আর কি দরকার। আমরা কাল সকালেই তাঁবু উঠিয়ে বাগদাদে রওনা হয়ে যাবো। আজকের রাতটুকু ভাই আমার তাঁবুতেই থাক। এতকাল বাদে আমরা আবার মিলেছি, আজ সারা রাত দু'টো সুখ-দুঃখের কথা বলে কাটাবো।

নুজাতের স্বামী বলে, সেই ভালো, তোমরা ভাই বোন প্রাণের কথা বলো। আমি অন্য তাঁবুতে যাচ্ছি। আর মিঠাই মণ্ডা, ফলমূল, খানাপিনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাইকে আদর যত্ন করে খাওয়াও।

নুজাৎ তার স্বামীকে বললো, সকাল হলেই সেই বৃদ্ধকে এখানে নিয়ে আসবে। তার দয়াতেই ভাই আমার জানে বেঁচে আছে। তার জন্যে একটা ভালো দেখে ঘোড়া এনে দামী জীন লাগাম দিয়ে সাজাও। বাকী পথ সে আর হেঁটে যাবে না।

নুজাতের স্বামীর হুকুমে তখনই খোজা আরও কয়েকজন নফর চাকর সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধের খোঁজে চলে গেলো। বৃদ্ধ তখন ভয়ে জড়সড় হয়ে গাধাটাকে নিয়ে একটা গাছের তলায় বসে থর থর করে কাঁপছে। খোজাকে দলবল নিয়ে আসতে দেখে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দাখিল। ভাবলো, এবার আর রক্ষা নাই। নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়াবে।

এমন সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

বাহাত্তরতম রজনী।

আবার গল্প শুরু হয়।

খোজাটা দলবল নিয়ে বৃদ্ধের সামনে এগিয়ে এসে কপট হুঙ্কার দেয়, ওহে মিথ্যের জাসু, তুমি না বলেছিলে, কে গাইছে জানো না? সে তো বললো, সে তোমার সঙ্গের লোক। চলো, তোমাকে আর ছাড়া হবে না। মালকিনের হুকুম, তোমাকে বাগদাদে নিয়ে গিয়ে সমুচিত সাজা দেওয়া হবে। তোমার সঙ্গীর সঙ্গে তোমাকেও শূলে চাপানো হবে। বুঝেছো? এবার ওঠ, চলো আমাদের সঙ্গে।

বৃদ্ধ ভাবলো, নিয়তি এড়ানো যায় না। এইভাবে মৃত্যু লেখা ছিলো নসীবে। মরতেই হবে। কাঁদতে কাঁদতে খোজার সঙ্গে চললো।

নুজাতের স্বামী খোজাদের বললো, এই বৃদ্ধকে ঘোড়ায় চাপিয়ে বাগদাদে নিয়ে চলো। দেখবে তার যেন কোন অসুবিধে না হয়। সব সময় তোমরা তাকে ঘিরে থাকবে।

খোজা সেলাম ঠুকে বললে, যো হুকুম, জনাব।

চাকর নফররা বৃদ্ধকে ঘিরে নিয়ে চলে। বৃদ্ধ ভাবে, বাগদাদে পৌঁছতে যে ক'টা দিন বাকী, তার পরেই তার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। খোজাকে উদ্দেশ করে বলে, শুনছো কাপ্তেন সাহেব, যে ছেলেটা গান গেয়েছিলো সে কিন্তু আমার কোন আত্মীয়স্বজন কিছু না। জেরুজালেমে আমি একটা পানি গরম করার চাকরী করতাম। একদিন দেখি আমার কাঠগুদামের পাশে ছেলেটিকে আধমরা অবস্থায় কে বা কারা ফেলে গেছে। আমি তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর যত্ন করে বাঁচিয়েছি। তারপর থেকে এই দেড়খানা বছর সে আমার কাছেই আছে। আমি যা খাই সে-ও তাই খায়। আমি যখন যেভাবে থাকি সে-ও সেইভাবে থাকে। এর বেশি তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই। তা তোমরা যদি তার সঙ্গে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চাও, কর। কি আর বলবো, বলো।

খোজা মজা করে বলে, ওসব কোনও অজুহাত শুনতে চাই না বুড়ো বাবা। তোমরা দু'জনেই আমার মালকিনের ঘুম নষ্ট করেছ। সাজা দু'জনকে সমান পেতে হবে।

চলার পথে যখনই খানাপিনার জন্যে থামে খোজা ভালো ভালো খানাপিনা এনে দেয় বৃদ্ধকে। বলে, যে ক'টা দিন বাঁচো, প্রাণ ভরে ভালো মন্দ খেয়ে নাও। যা খেতে ইচ্ছে, বলো। এনে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ বলে, সামনে খাঁড়া ঝুলিয়ে মিঠাই মণ্ডা দিচ্ছ? এসব কি আর গলা দিয়ে নামবে?

খোজা বলে কী আর হবে, অত ভেবে লাভ কি বলো? যতক্ষণ বেঁচে আছ, পিও, জীও।

কিন্তু এসব কোনও কথাই বৃদ্ধর ভালো লাগে না। নানারকম মনগড়া দুর্ভাবনায় মুষড়ে পড়ে সে।

এইভাবে বৃদ্ধের সঙ্গে মজা করতে করতে খোজারা পথে হাঁটার ক্লান্তি ভুলে যায়। চলতে চলতে একদিন তারা বাগদাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছয়। সেখান থেকে বাগদাদ মাত্র আর একদিনের পথ। নুজাৎ-মাকান চঞ্চল হয়ে ওঠে। কতদিন পরে তারা আবার দেশের মাটিতে পা দেবে। মা বাবাকে দেখতে পাবে। আবার হাসি আনন্দে ভরে উঠবে প্রাসাদ।

কিন্তু এমন সময় কালো আঁধার হয়ে এলো সামনের পথ। অশ্বখুরের শব্দে চকিত হয়ে উঠলো সকলে। নুজাতের স্বামী হুকুম জারি করলো, যে যেখানে আছো, দাঁড়িয়ে পড়। আর এক পাও এগোবে না।

কয়েক মুহূর্ত কাটার পর দেখা গেলো, এই বিশাল অশ্ববাহিনী তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে সুলতানের পতাকা। ক্রমশ আরও নিকটবর্তী হলো তারা। কাড়া নাকাড়ার শব্দে মুখরিত হতে থাকলো আকাশ বাতাস।

সেনাবাহিনীর পাঁচজন প্রধান এগিয়ে এসে বজ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে তোমরা? কোথা থেকে আসছো? কোথায় যাবে?

নুজাতের স্বামী এগিয়ে এসে বলে, আমি দামাসকাসের দরবারের সচিব। শাহজাদা সারকানের দূত হয়ে যাচ্ছি তার বাবার কাছে—বাগদাদে। আমার সঙ্গে আছে সুলতানের বাৎসরিক ভেট।

সেনাপতিরা দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। নুজাতের স্বামী বুঝতে পারে কোনও গভীর দুঃসংবাদ আছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সেনাপতিদের প্রধান এগিয়ে এসে বলে, সুলতান উমর-অল-নুমান আর এ জগতে নাই। বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটেছে। আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন। উজির দানদান আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান। তিনি সঙ্গে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন, চলুন। তিনি আপনাকে বিস্তারিত সব বলবেন।

উজির দানদান গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বললো, সুলতান বিষক্রিয়ায় মারা গেছেন। কিভাবে বিষক্রিয়া হলো, সেসব কাহিনী আপনাকে পরে বলবো। এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য বাগদাদের সুলতান নির্বাচন করা। আমি বাগদাদের চারজন কাজীর সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তাঁদের মতে শাহজাদা সারকানকেই সিংহাসনে বসানো উচিৎ। তাই আমি দলবল নিয়ে চলেছি দামাসকাসে। তাঁকে নিয়ে এসে সুলতান উমর-অল-নুমানের উত্তরাধিকারী হিসাবে বাগদাদের সিংহাসনে বসানই এখন আমার একমাত্র কাজ। অবশ্য বাগদাদের বেশিরভাগ মানুষেরই ইচ্ছা—দু-অল-মাকানকে সিংহাসনে বসানো হোক। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে—আজ প্রায় দেড় বৎসর কাল দু-অল-মাকান তার ভগ্নি নুজাতের সঙ্গে মক্কায় চলে গেছে। সেই থেকে অনেক অনুসন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু কোনই হদিশ করা যায়নি।

উজির দানদানের উক্তি শুনে, সুলতানের শোকসংবাদ শোনা সত্ত্বেও নুজাতের স্বামীর প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। দেশের মানুষ যখন চায়, দু-অল-মাকানের সুলতান হতে কে আর আটকায়। আর মাকান যদি সুলতান হয় তারও বরাত খুলে যাবে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন তিয়াত্তরতম রাতে যথা সময়ে আবার গল্প শুরু হয়।

নুজাতের স্বামী দানদানকে বলে, শ্বশুর মশায়ের মৃত্যু-সংবাদ বুকে শেলের মতো হেনেছে। কিন্তু এই নিদারুণ শোকের মধ্যেও একটি সুখবর আপনাকে শোনাচ্ছি। নুজাৎ-অল-জামান এবং দু-অল-মাকানের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারা দু'জনেই আমার দলবলের সঙ্গে বাগদাদে চলেছে। নুজাৎ আজ আমার বেগম।

দানদান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। বিশ্বাস করতে পারে না, মাকান, নুজাৎ ফিরে চলেছে বাগদাদে। নুজাতের স্বামী আদ্যোপান্ত সব কাহিনী দানদানকে বললো। কিভাবে তারা দু'জনে মক্কা মদিনা দেখে জেরুজালেমে আসে। মাকানের অসুস্থতা। অর্থাভাব। নুজাতের অর্থ ধান্দায় বেরুনো। বাদাবী ডাকাতের খপ্পরে পড়া। তারপর সওদাগরের হাত ঘুরে সারকানের হাতে আসা। তারপর শাদী। সব খুলে বললো সে। এদিকে মাকান কিভাবে এক বৃদ্ধের দয়ায় জীবনরক্ষা করতে পেরেছে সে কাহিনীও সবিস্তারে তাকে জানালো।

দানদান রুদ্ধশ্বাসে শুনলো সব। আনন্দে চিৎকার করে ডাকলো সেনাপতিদের।

—আল্লাহর দোয়ায় আমরা আবার সুলতানের হারানো ছেলেমেয়েদের ফিরে পেয়েছি। আপনারা আসুন। সবাই মিলে ঠিক করুন, সুলতান কে হবে।

সেই মাঠের মধ্যেই তাঁবু ফেলা হলো। দানদান সভা ডাকলো। সেনাবাহিনীর সেনাপতিরা ছাড়াও দরবারের বিশিষ্ট আমির ওমরাহরা তার সঙ্গে এসেছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো, সারকানকে সুলতান পদে অভিষিক্ত করে বাগদাদে নিয়ে আসবে কিন্তু পালের হাওয়া ঘুরে গেছে। দু-অল-মাকান ফিরে এসেছে। এ অবস্থায় নতুন করে চিন্তা করা দরকার। নতুন করে আলোচনায় বসা দরকার। কাকে তারা সুলতান করতে চায়, আজকের সভায় তা ঠিক করতে হবে।

অনেক আলাপ আলোচনার পর আমির ওমরাহ সেনাপতি কাজী একমত হলো, সুলতানের ছোট ছেলে দু-অল-মাকানকেই তারা বাগদাদের সিংহাসনে বসাবে। ঠিক হলো, সুলতান বিহীন সলতানিয়ৎ চলতে পারে না। আর বিলম্ব না করে এই মাঠের মধ্যেই দু-অল-মাকানের অভিষেক হবে।

নুজাতের স্বামী ফিরে আসে তার স্ত্রী আর শ্যালক দু-অল-মাকানের কাছে। বাবার মৃত্যু সংবাদে নুজাৎ, মাকান হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে। সেই—দেশে তারা ফিরছে, অথচ বাবাকে দেখতে পাবে না। এ ব্যথা তারা কোথায় রাখবে?

নুজাতের স্বামী মাকানকে বললো, উজির আমির ওমরাহ কাজী সেনাপতি—সবাই মিলে একমত হয়েছে, তোমাকেই তারা বাগদাদের সিংহাসনে বসাবে। এ বিষয়ে তোমার কি অভিমত?

দু-অল-মাকান বলে, কিন্তু বড় ভাই থাকতে সেটা কি সঙ্গত হবে? তার মনে দুঃখ দিয়ে কিছু করতে চাই না।

ভগ্নিপতি পরামর্শ দেয়, এক কাজ কর। এখন যথারীতি অভিষেক হয়ে যাক। তুমিই সুলতান হও। তারপর সারকানকে ডেকে সলতানিয়ৎকে দু'টো ভাগে ভাগ করে একটা অংশ তুমি শাসন কর, আর একটা অংশ সারকানকে ছেড়ে দাও। এতে, আমার মনে হয় ভায়ে ভায়ে সম্প্রীতি বজায় থাকবে।

দু-অল-মাকান বলে, ঠিক আছে, তাই হবে।

এরপর দু-অল-মাকানকে বাদশাহী সাজে সাজানো হলো। উজির দানদান এই অভিষেকের পোশাক-আশাক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো। মাকানকে সুলতান বেশে সাজিয়ে অভিষেক-তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। সারা তাঁবুটা ফুলের মালায় সাজানো হয়েছিলো। সেনাবাহিনী জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে চলেছে। একে একে আমির ওমরাহরা এসে তাঁবুর

ভিতরে দরবার মহলে গিয়ে আসন গ্রহণ করলো। সব শেষে দু-অল-মাকানকে এনে বসানো হলো সিংহাসনে। উপস্থিত পারিষদরা উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানাতে থাকলো। দু-অল-মাকানের হাতে সোনার তলোয়ার—অভিষেকের সময় এই তলোয়ার বংশগত ভাবে উত্তরাধিকারীরা পেয়ে আসছে। আজ যেমন পেলো দু-অল-মাকান। তলোয়ারখানা মাথায় ঠেকিয়ে হলফনামা পড়তে হয়। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন—এই তার একমাত্র ন্যায় ধর্ম।

এরপর একে একে আমির ওমরাহরা সামনে এসে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে হলফ করলো, আজ থেকে আপনি আমাদের মহামান্য সুলতান। আপনার আদেশ শিরোধার্য করে নেবো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

[ঘন ঘন রাত্রি অবসানে গল্পের গতি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় এখন থেকে প্রতিটি রজনীর অবসান পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ না করে মাঝে মাঝে উল্লেখ করা হবে।]

অভিষেক শেষে নুজাতের স্বামী এক ভোজসভার আয়োজন করলো। দামাসকাস থেকে যে সব খানাপিনা সঙ্গে এসেছিলো সেনাদের মধ্যে সব বিতরণ করে দেওয়া হলো।

সুলতান দু-অল-মাকান আমির ওমরাহদের সঙ্গে বসে খানাপিনা সারলো। উজির দানদানকে নুজাৎ জিজ্ঞেস করে, কিভাবে আব্বাজানের মৃত্যু হলো, তার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে ইচ্ছে করে।

উজির দানদান বলে, নিশ্চয়ই বলবো, মা। এই ভোজ সভাতেই সে কাহিনী শোনাবো সকলকে।

দানদান বলতে শুরু করে ঃ

তোমরা চলে যাওয়ার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। মক্কা-মদিনা চষে বেড়ালাম। কিন্তু কেউই বলতে পারলো না, তোমরা কোন পথে গেছো। যাই হোক, তোমাদের শোকে তাপে সুলতান মুহ্যমান হয়ে প্রাসাদে থাকেন। কারো সঙ্গে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। নেহাৎ জরুরী কাজ না থাকলে দরবারেও নিয়মিত বসেন না। সুলতানের মনোবেদনা বুঝতে পেরে আমরাও তাকে ছোটখাটো কাজে বিব্রত করতাম না। এই সময় একদিন এক বৃদ্ধা রমণী এলো। সঙ্গে তার পাঁচটি অপরূপ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী তরুণী। সুলতানের দর্শনপ্রার্থী হয়ে আমাকে বললো, কনস্তানতিনোপল থেকে সে এসেছে। সুলতানের জন্যে এই পাঁচটি খুবসুরৎ মেয়ে নিয়ে এসেছে। শুধু রূপেই তারা দুনিয়ার সেরা নয়। তাদের তুল্য সর্বগুণান্বিতা মেয়ে তামামদুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

সুলতানকে জানালাম। তিনি বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠালেন। মেয়ে পাঁচটিকে দেখলেন। সত্যি কথা বলতে কি, গুণ কতটা আছে তখনও আমরা জানি না, অমন রূপসী রমণী আমি কখনও দেখিনি। স্বয়ং সুলতানও তারিফ করলেন। হ্যাঁ, সুন্দরী বটে।

বৃদ্ধা বললেন, জাঁহাপনা, আপনি ওদের যাচাই করে দেখুন। দুনিয়াতে এমন কোনও বিদ্যা, এমন কোনও শাস্ত্র নাই—যা তাদের অজানা। আচার আচরণ আদব কায়দায় দস্তুর মতো শাহী।

সুলতান সহাস্যে মেয়েদের দিকে তাকালেন, কি গো মেয়েরা, তোমাদের কর্ত্রী যা বলছে সব ঠিক-?

মেয়েগুলো অভিবাদন জানিয়ে ঘাড় নাড়ে—সব ঠিক।

এখন সুলতান বললেন, ঠিক আছে, কি বিদ্যা শিখেছো, তার কিছু নমুনা দেখাও।

একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বাদশাহী ঢং-এ কুর্নিশ জানিয়ে বলতে শুরু করে।

শুনুন, জাঁহাপনা মানুষ বেঁচে থাকে কেন? সে নিজের ওপর প্রভুত্ব দেখিয়ে যেতে চায়। এই বাসনা তার অন্তরে অঙ্কুরিত থাকে বলেই সে আল্লাহর দোয়ায় বেঁচে থাকতে চায়। বড় হতে চায়। নাম যশের অধিকারী হতে চায়।

আল্লাহ মানুষকে জীবন দান করে সংসারে পাঠান কেন? কারণ সে তার নিজেকে—সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও সুন্দর করে গড়ে তুলবে—এই তার ইচ্ছা।

সুলতানই প্রথম পুরুষ। তার পুণ্যতেই প্রজারা পুণ্যবান হয়। তাঁর সুখেই সুখী হয়। তাঁর দুঃখেই তারা দুঃখ পায়। সংস্কৃতিবান জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিনয়ী, মিতভাষী এবং ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকেন। প্রকৃত বন্ধুকে চিনে নিতে পারেন। শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। বন্ধুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেন না। কারণ তিনি জানেন, দুনিয়াতে সব কিছুই সুলভ। একমাত্র প্রকৃত বন্ধুত্ব পাওয়াই কঠিন। বন্ধুর সঙ্গে বিবাহিত বিবির তুলনা চলে না। কারণ প্রয়োজন বোধে এক বিবি তালাক দিয়ে অন্য বিবি ঘরে আনা যায়। কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলে নতুন বন্ধু খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। বন্ধুত্বে একবার চিড় খেলে তার আর জোড়া দেওয়া যায় না।

পীর পয়গম্বরদের একটা বাণী শোনাচ্ছি ঃ এক কাজী ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর চোখে সবাই সমান ছিলো। নিরপেক্ষ বিচার করে উচিত রায় দিতেন। তিনি সব সময়ই চেষ্টা করতেন দুইপক্ষের সমঝোতা করিয়ে দিতে। এতে শান্তি অব্যাহত থাকে। যেখানে তা সম্ভব হতো না, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তার সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে দেখতেন, নানা সাক্ষী প্রমাণে নিঃসন্দেহ হতেন, তারপর রায় দিতেন। কিন্তু মনের কোণে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সন্দেহ থাকলে রায়দান স্থগিত রেখে পুনরায় তা খতিয়ে দেখতেন। ন্যায় বিচার মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। অত্যাচার করে ভয় দেখিয়ে বা ক্ষুধার্ত রেখে কাউকে দিয়ে কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়া কোনও বিচারকের কর্তব্য নয়। এর দ্বারা সুবিচার সম্ভব হয় না। অনেক সময়ই মানুষ অত্যাচারের ভয়ে বা ক্ষুধার তাড়নায় মিথ্যাকেই সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

সম্রাট আলেকজান্দার দেশ বিজয়ের সময় তিনজনকে সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। একজন বিচক্ষণ বিচারক, একজন ভালো পাচক আর একজন শিক্ষক। তিনি বলতেন, অপরাধী সেনার বিচারের দায়িত্ব তিনি নিজে নিতে চান না। কারণ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দিতে পারি। এর পরিণাম ভয়াবহ। সেই কারণে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করার জন্য বিচক্ষণ বিচারক অপরিহার্য। আর ভালো পাচকের দরকার এই জন্য—সে আমার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক নজর রাখবে। আমার খাওয়াদাওয়ার দায়িত্ব আমার উপর থাকলে বেশিরভাগ দিন অনাহারেই কেটে যেত। শিক্ষকও নিতান্তই প্রয়োজনীয়। পুত্র কন্যার লেখাপড়া একটা প্রধান ব্যাপার। তার জন্যে চাই যোগ্য শিক্ষক। ভালো শিক্ষক ছাড়া ছেলেমেয়েকে উপযুক্ত করে মানুষ করা কঠিন। শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতের বুনিয়াদ মজবুৎ করতে হলে চাই ভালো শিক্ষক।

এই বলে মেয়েটি নাকাবে মুখ ঢেকে কুর্নিশ জানিয়ে পিছনে সরে যায়। এর পর আর একটি মেয়ে এগিয়ে এসে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে বলতে থাকে ঃ

শুনুন জাঁহাপনা, লুকমান নামে এক দার্শনিক বলেছেন, বিশ্ব সংসারে তিনটি প্রধান সত্য পরীক্ষা করার তিনটি চমৎকার কষ্ঠিপাথর আছে। (১) কোন মানুষ কতটা সৎ এবং মহৎ তার একমাত্র প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে তার ক্রোধের সময়। ক্রোধ মানুষের প্রকৃত চেহারা খুলে ধরে। (২) মুখে যে বাঘ মারে তাকে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নাই। প্রকৃত বীরের

পরিচয় শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই মিলতে পারে। (৩) কে তোমার প্রকৃত বন্ধু কি করে তা বুঝবে? অত্যন্ত বিপদের দিনে যে পাশে এসে দাঁড়ায়—সেই একমাত্র বন্ধু।

স্তাবকদের স্তুতি ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও উদ্ধত অত্যাচারী শাসক তার সমুচিত শিক্ষা পায়। এবং অত্যাচারিত একদিন তার সুবিচার পাবেই। যে যেমন কর্ম করে তাকে সেইরূপ ফল দান করাই সুশাসনের কর্তব্য। কে কি কাজে ফেঁসে গেলো তাই দিয়ে তার বিচার করা উচিৎ নয়। তার প্রকৃত মতলবটা জানার চেষ্টা করা বিধেয়। মানুষের দেহে হৃদয় নামক বস্তুটাই সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। একটা মানুষ খারাপ—তার কারণ তার হৃদয়টা খারাপ। এবং এই কারণেই সে মনুষ্য পদবাচ্য হতে পারে না।

ইজরায়েলে এক পরিবারে দুই ভাই ছিলো। এক ভাই অন্য ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলো, আচ্ছা দাদা, এ যাবৎ যত কাজ তুমি করেছো বা দেখেছো তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ কি মনে হয়েছে?

দাদা জবাব দেয়, একদিন মুরগীর ঘরের কাছ দিয়ে যেতে একটা জাপটে ধরি। দেখলাম, তার মাথাটা বোঁ করে এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে এসে আমার দিকে তাকালো। তারপর আবার সে উল্টো পাকে পাক ঘুরিয়ে মাথাটা সোজা করলো। আমি অবাক হলাম। একটা মুরগী অনায়াসে যা পারলো আমি মানুষ হয়ে শত চেষ্টা করেও তা করতে পারবো না। এবার বলো তোমার কাছে সব চেয়ে কঠিন কাজ কী মনে হয়েছে।

ছোট ভাই বললো, আমি একদিন ভাবলাম আল্লাহর কাছে কিছু চাইবো। নামাজের সময় আল্লাহকে ডাকলাম কিন্তু কিছুতেই আর কিছু চাইতে পারলাম না।

এই বলে দ্বিতীয় মেয়েটি বিদায় নিলে আর একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো।

আজ আমি সংক্ষেপে দু'টি মাত্র নীতিকথার উল্লেখ করে বিদায় নেবো।—মানুষের আত্মা যদি পরিশুদ্ধ থাকে, তবে সে বেহেস্তের দরজায় পৌঁছতে পারে।

সুফিয়া বলেছেন ঃ মানুষের মুখ তার অন্তরের আয়না।

এর পর চতুর্থ কন্যা আসে।

—শেখ ইব্রাহিম একটি গল্প বলেছিলেন, একদিন এক ভিখারী তার ভিক্ষে করে পাওয়া একটি তামার পয়সা রাস্তায় হারিয়ে ফেলে। আমি তাকে একটা রূপোর টাকা দিতে গেলাম। কিন্তু সে নিলো না। বললো, তামার পয়সা হারিয়েছি, রূপোর টাকা নিয়ে কি করবো আমি? পয়সাটা আমি নির্বিবাদে খরচা করে দিতে পারি। কিন্তু টাকা হাতে এসে গেলে প্রাণে ধরে ভাঙ্গাতে পারবো না।

মনসুর ইবন উমর এই কাহিনীটা বলেছিলেন ঃ

আমি একবার মক্কায় হজ করতে যাচ্ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি। কুফা শহরের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। এমন সময় কিছুটা দূরে একটি লোকের উচ্চকিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে বলছে, হে খোদা, আমি তোমার গোলাম। তোমার বাণী অগ্রাহ্য করবো—ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু কর্মদোষে আজ আমি পাপী। কিন্তু মনে প্রাণে এই পাপ আমি চাইনি। তোমার নির্দেশ আমি মাথা পেতে নেবো। তুমি আমাকে পাপমুক্ত করো।

এই প্রার্থনা জানাবার একটু পরে একটা প্রচণ্ড শব্দ করে কি যেন একটা নিচে পড়ে গেলো। অন্ধকার রাত। কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। আমি অনেক ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু কেউ সাড়া দিলো না। আমি আমার ডেরায় চলে গেলাম। পরদিন সকালে দেখি একটা শবদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোরস্তানে। মিছিলে এক শোকাহত অশীতিপরা বৃদ্ধাকে দেখে জিজ্ঞেস

করলাম, কে মারা গেছে? বৃদ্ধ বললো, গতকাল আমার ছেলে নামাজের পর উপস্থিত সবাইকে আল্লাহর বাণী পড়ে শুনিয়েছিলো। তার এক জায়গায় ছিলো, "শোনো, তোমরা যারা আমার কথা বিশ্বাস কর, মান, তাদের প্রতি আমার নির্দেশ নিজের নিজের হৃদয় উন্মুক্ত কর।"

পবিত্র গ্রন্থের এই বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে একজন পথচারী নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে কলিজাটা টেনে বের করে ফেললো।

এর পর শেষ মেয়েটি এসে দাঁড়ালো।

—এক দার্শনিক বলেছেন, যে মানুষ তার প্রতিবেশীর সুখ দুঃখের খবর রাখে না সে আল্লাহর করুণাও প্রত্যাশা করতে পারে না। একজন প্রতিবেশীর কাছে যত ঋণ জমা হয় নিজের ভাই-এর কাছেও তা হয় না।

একদিন ইবন আদহাম মক্কা থেকে ফেরার পথে তার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কিরকম জীবনযাপন করতে ভালোবাসেন?

বন্ধুর জবাব, আমি স্বল্পাহারী মানুষ, যেদিন জোটে খাই। যেদিন না জোটে প্রত্যাশা করে বসে থাকি। যদি জোটে খাবো, না হলে খাবো না।

ইবন আদম ঠোঁটকাটা মানুষ। বলেছিলাম, বাখ-এর কুকুরগুলোও কিন্তু তাই করে। আমার কথা বলো, আল্লাহ যেদিন জুটিয়ে দেন আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। তাঁর গুণগানে পঞ্চমুখ হই। আর যেদিন তিনি বঞ্চিত করেন, সেদিন শুধু তাকে ধন্যবাদ জানাই।

এরপর সে বিদায় নিয়ে সরে যায়। এবার এগিয়ে আসে তাদের কর্ত্রী—সেই বৃদ্ধা। সুলতানকে অভিবাদন জানিয়ে বলে, ইমাম অল সফি বলেছেন ঃ একটা রাত্রিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে অধ্যয়ন দ্বিতীয় ভাগে নিদ্রা এবং তৃতীয় ভাগে প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জীবনের সায়াহ্নে সারারাতই তিনি জেগে কাটাতেন।

ইমাম আর এক সময় বলেছেন, আমি বিগত দশ বছর নামমাত্র যবের রুটি খেয়ে জীবনধারণ করে আছি। অতিরিক্ত আহারে দেহ ভারাক্রান্ত হয়। বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে আসে। ঘুমে এবং অবসাদে শরীর নেতিয়ে পড়ে। সব উৎসাহ উদ্দীপনা নিভে যায়।

ইবন ফুয়াদ বলেছিলেন, একদিন আমি নামাজের জন্য রুজু করবো বলে নদীর ধারে ছুটে চলেছি। এক সাদা দাড়িগোঁফ ওয়ালা বৃদ্ধ পিছন থেকে বলে উঠলেন, নিষ্ঠা নিয়ে রুজু কর বাপু, অত তাড়াহুড়া করছো কেন? নিষ্ঠাবান না হলে নামাজ পড়ে কোন ফল পাবে না।

দেখলাম বৃদ্ধ এসে জলে নামলেন। পরিপাটি করে হাত মুখ প্রক্ষালন করলেন। তারপর উঠে মসজিদের দিকে রওনা হলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে চলতে থাকলাম। এক সময় তিনি পিছনে ফিরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবে?

আমি বলি, মেহেরবানী করে আমাকে যদি বাৎলে দেন, কিভাবে চললে, আল্লাহকে জানতে পারবো।

তিনি বললেন, আগে নিজেকে জানার চেষ্টা কর। যখন নিজেকে জানা সম্পূর্ণ হবে তখন আপনা থেকেই তাকে জানতে পারবে।

খলিফা আবু জাফর অল মনসুর ঘোষণা করলেন, আবু হানিফাকে তিনি বাৎসরিক দশ হাজার দিরহাম দক্ষিণা দিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করলেন। পরদিন সকালে সুলতানের দরবার থেকে অর্থসচিবকে পাঠানো হলো, আবু হানিফার গৃহে। অনাড়ম্বর সাদা মাঠা সাজপোশাকে সজ্জিতা হানিফা বেরিয়ে এলেন। অর্থসচিব সবিনয়ে দশ হাজার দিরহামের তোড়াটা তার সামনে রেখে সুলতানের ফরমান জানালো, তিনি এই দশ হাজার

দিরহাম আপনাকে এক বৎসরের বেতন হিসাবে অগ্রিম পাঠিয়েছেন। এবং বলে দিয়েছেন, এ অর্থ কোনও অসদুপায়ে অর্জিত নয়। হানিফা সাহেব যেন গ্রহণ করেন।

আবু হানিফা অর্থসচিবকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার সুলতানকে গিয়ে বলো, টাকাটা হয়তো সৎ উপায়ে অর্জিত—কিন্তু তোমার সুলতান নিজেই তো অসৎ, উদ্ধত, অত্যাচারী। এরকম লোকের দাসত্ব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর বৃদ্ধা বললো, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। এখনকার মতো বিদায় নিতে চাই। সুলতান যদি ইচ্ছা করেন, পরে আবার শোনাবো।

এই সময় একটুক্ষণের জন্য দানদান থামে। দু-অল-মাকান আর নুজাৎ অধীর আগ্রহেই শুনছিলো। মাকান জিজ্ঞেস করে, তারপর?

উজির আবার বলতে থাকে ঃ বৃদ্ধা আর তার পঞ্চকন্যার গুণে মুগ্ধ হয়ে সুলতান উমর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এমন সারগর্ভ নীতি কথা তিনি বহুকাল শোনেননি। উজিরকে বললেন, প্রাসাদে যে মহলে ইরবিজা থাকতো সেখানে এদের থাকার ব্যবস্থা করো। দেখবে, যেন আদর যত্নে কোনও ত্রুটি না হয়।

সুলতান প্রতিদিন নিজে এসে বৃদ্ধা আর পঞ্চকন্যার খোঁজখবর নিতে থাকলেন। আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন। আমরা অবশ্য তাদের কোনও অভাবই রাখিনি। আতিথেয়তার সব রকম বন্দোবস্তই নিখুঁতভাবে করা হয়েছিলো। বৃদ্ধা সারাদিন কোনও রকম আহার করতো না। শুধু রাত্রিবেলায় সামান্য একটু রুটি আর সরবৎ খেয়ে কাটিয়ে দিত। সারাদিন তার উপাসনার মধ্য দিয়ে কাটত। বৃদ্ধার এই কৃচ্ছ্রসাধন দেখে সুলতান আরও মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর প্রাসাদ পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠছে—এই ভেবে তিনি পুলকিত হতে থাকেন। এইভাবে দশটা দিন কেটে গেলো। সুলতান আমাকে বললেন, এবার আসল কথাবার্তা হওয়া দরকার। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস কর, কি দাম সে নেবে।

বৃদ্ধা বললো, সোনাদানা যাই দিতে চান, কিছু নেবে না। তা সে যদি এক দিকে মেয়ে আর দিকে হীরে জহরৎ দিয়েও ওজন করে দিতে চান—আমি নেবো না।

—আমি শুধু একটা শর্তেই আপনার কাছে বিক্রি করতে পারি।

—কী শর্ত?

বৃদ্ধা বললো, দীর্ঘ এক মাসকাল ধরে আপনি উপবাস করবেন। এই উপবাসকালে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা ছাড়া মনে কোনও কামনা বাসনার প্রশ্রয় দেবেন না। এর ফলে আপনার দেহ মন কলুষমুক্ত পবিত্র হয়ে উঠবে। তারপর আপনি মেয়েদের গ্রহণ করবেন। তার আগে নয়। আমার এই শর্ত যদি পূরণ করতে পারেন, নগদ মূল্য হিসাবে কিছুই নেবো না। সে ক্ষেত্রে আপনার দেশের যা নাম করা জিনিস তার কিছু আমাকে উপহার দিতে পারেন।

বৃদ্ধার এই অভূতপূর্ব প্রস্তাব শুনে সুলতানের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। তখুনি সম্মতি দেন, আমি রাজি।

বৃদ্ধা বললো, আমিও প্রার্থনাদি করে আপনার উপবাসের সুফল পেতে সাহায্য করবো। এখন তামার ঝারি করে এক ঝারি পানি আনতে বলুন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা তামার ঝারি পূর্ণ করে জল নিয়ে আসা হলো। ঝারিটা হাতে নিয়ে বৃদ্ধা বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়লো। তারপর এক টুকরো পাতলা কাপড় দিয়ে মুখটা বেঁধে দিয়ে বললো, উপবাসের দশদিন পরে এই পাত্রের জল পান করবেন। এতে আপনার শরীরের দুর্বলতা কেটে যাবে। ক্ষয় পূরণ হবে। আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। ঠিক এগারো দিনের দিন আবার ফিরে আসবো।

এই বলে বৃদ্ধা কুর্নিশ করে বিদায় নিলো। জলের ঝারিটা সুলতান নিজে হাতে সিন্দুকে বন্ধ করে চাবিটা তার শেরওয়ানীর জেবে রেখে দিলেন।

সেই দিন থেকেই উপবাস শুরু হলো। তখন তার একটাই লক্ষ্য, বৃদ্ধার কথামতো দেহ-মন পবিত্র করতে হবে। তা হলেই সে ঐ পরমা সুন্দরী কুমারী তনয়াদের অঙ্কশায়িনী করার অধিকার পাবে।

এগারো দিনের দিন সকালবেলা পিপাসার্ত সুলতান এক নিঃশ্বাসে ঝারির জলটুকু সব পান করলেন। দশ দিনের অনাহারে দেহ নেতিয়ে পড়েছিলো। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো। জলটুকু পেটে পড়ায় ক্ষুধার তীব্রতা স্বভাবতই একটু কমে আসে। অবসাদও খানিকটা কেটে যায়। সুলতান ভাবলেন বৃদ্ধার কথা তো অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো। এই মন্ত্রপুত জলে নিশ্চয়ই সে এমন কোন দৈবশক্তি রেখে গেছে যার দৌলতে তিনি মুহূর্তেই অবসাদ কাটাতে পারলেন।

জল পান করা শেষ হওয়ার একটুক্ষণ পরে কড়ানাড়ার শব্দ শুনে সুলতান দরজা খুলে দেন। ঘরে ঢুকলো বৃদ্ধা। হাতে তার কলার পাতায় মোড়া একটা মোড়ক। বললো, আপনার উপবাসের একুশ দিনের দিন এই মোড়ক খুলবেন। এতে খানিকটা আচার আছে। সেই দিন আপনি খাবেন।

সুলতান বৃদ্ধাকে সাদরে বসালেন। সশ্রদ্ধভাবে কলাপাতার মোড়কটা নিয়ে সিন্দুকে চাবি দিয়ে রাখলেন।

একুশ দিনের দিন সুলতান আচারটুকু বের করে খেলেন। একটু পরে সেই বৃদ্ধা এসে কড়া নাড়লো। সুলতান রুদ্ধদ্বার খুলে স্বাগত জানালেন। বৃদ্ধা বললো, আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কি শর্তে আপনার হাতে তাদের কন্যাদের তুলে দেব—জানিয়েছি। এবং আপনি যে আমার শর্ত পূরণ করতে উপবাস করে চলেছেন, তাও বলেছি। শুনে তারা খুশি হয়েছেন। সুলতান যখন তাদের পাওয়ার জন্য দুরূহ কর্তব্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন এতে স্পষ্টতই প্রমাণ হয়, তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোন ফাঁকি নাই। তাদের ধারণা, মেয়েরা আপনার কাছে সুখে থাকবে। শুধু একটি কথা বলেছেন, চিরদিনের মতো ছেড়ে দেবার আগে একটিবার তারা তাদের চোখের দেখা দেখতে চান। আজ আপনার উপবাসের একুশদিন চলছে। আমি আজ ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ফিরে আসবো তিরিশ দিনের দিন। সেই দিন আপনার উপবাসের শেষ দিন। এই দশটা দিন তারা তাদের মা-বাবার কাছে থাকবে। ভালোমন্দ খানাপিনা করবে। তারপর আমি আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

এ কথায় সুলতান সায় দিতে পারে না—সে কি করে হয়? যাদের পাবো বলে এত কৃচ্ছ্রসাধন করছি, তারাই আমার কব্জার বাইরে চলে যাবে!

বৃদ্ধা হাসেন, এতদিন আমাকে দেখছেন, এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আপনি তো জোর করে তাদের ধরে নিয়ে আসেননি। আমি নিজেই সেধে এসে প্রস্তাব দিয়েছি। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার আপত্তি হচ্ছে কেন? এটা তো বোঝেন, মা-বাপের সন্তান, চিরকালের মতো নাগালের বাইরে চলে যাবে। শেষবারের মতো একবার চোখের দেখার সাধ হয় না?

সুলতান ঘাড় নাড়লেন, তা ঠিক। বাবা-মাকে ছেড়ে সন্তান চলে গেলে কি যে ব্যথা বুকে বাজে তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ঠিক আছে, ওদের নিয়ে যাও। তবে দেরি করো না। তিরিশ দিনের দিনই যেন তারা প্রাসাদে ফিরে আসে।

বৃদ্ধা বলে, আপনি নিশ্চিত থাকুন, জাঁহাপনা, আমার

কথার কখনও নড়চড় হয় না। আর আপনার মনে যদি কোনও দ্বিধা থাকে তা হলে এক কাজ করুন, আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কোনও মহিলাকেই আমাদের সঙ্গে দিন। তার তত্ত্বাবধানেই এ-কদিন থাকবে মেয়েরা। ওদের মা-বাবা যদি দেরি করতে চায়, বুঝিয়ে বলতে পারবে, —সুলতানের হুকুম, নির্দিষ্ট দিনেই ফিরতে হবে।

সুলতান বললেন, ঠিক বলেছো, বুড়িমা। আমার নিজের লোক একজন সঙ্গে থাকা দরকার। সে বুঝিয়ে বলতে পারবে। দেরি করলে সুলতান গোঁসা করবেন। আমার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী বাঁদী সফিয়া তোমাদের সঙ্গে যাবে। আমার দু'টি সন্তানের সে জননী। তার বাবা কনসতান্তিনোপল-এর সম্রাট আফ্রিদুন। আচারে ব্যবহারে খুব ভদ্র, শিক্ষিত। তোমার ভাইদের সঙ্গে সে কথা বলতে পারবে। বোঝাতে পারবে। কিন্তু তা তো হলো, তিরিশদিনের দিন আমি কি আহার করবো, তার ব্যবস্থা করে যাবে না?

বৃদ্ধা বলে, আমার সবদিকে নজর আছে। কিছু বলতে হবে না। যাবার আগে আপনার জন্যে এক গেলাস সরবৎ দিয়ে যাবো। সযত্নে রেখে দেবেন। তিরিশ দিনের দিন সকালে উঠে হামামে যাবেন। খুব ভালো করে গোসল করবেন। দেখবেন শরীরটা কেমন হাল্কা হয়ে গেছে। দেহের এবং মনের সব ক্লেশ কেটে গেছে। আল্লাহর নামাজ শেষ করে সরবৎটা খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবেন। ঘুম থেকে উঠে দেখবেন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ তাজা মানুষ হয়ে গেছেন।

এই বলে সুলতানকে এক গেলাস সরবৎ দিয়ে, পাঁচটি মেয়ে আর সফিয়াকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে। তিরিশদিনের দিন খুব ভোরবেলা তোমাদের বাবা সুলতান উমর-অল-নুমান হামামে গেলেন। গোসল সেরে এসে নামাজ পড়লেন। তারপর সিন্দুক খুলে ঢাকনা ঢাকা সরবতের গ্লাস বের করে দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন, সরবৎ খেয়ে আমি বিশ্রাম করবো। তোমরা কেউ আমাকে ডাকবে না।

সারাটা দিন কেটে গেলো। আমরা সবাই সুলতানের কামরার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কখন তার ঘুম ভাঙ্গবে। কখন তিনি কাকে তলব করবেন। কিন্তু না, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি গভীর হতে থাকে। কিন্তু সুলতানের ঘুম আর ভাঙ্গে না। তখন কি জানি, সে ঘুম আর ভাঙ্গবার নয়। পরদিন দুপুরে অনেক ডাকাডাকির পর যখন কোনও সাড়া পাওয়া গেলো না, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখি সুলতানের মৃতদেহ পড়ে আছে শয্যায়।

দু'হাতে মুখ ঢেকে দানদান কাঁদতে থাকে। দু-অল-মাকান আর নুজাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাঁদতে থাকে দরবারের সকলে। নুজাতের স্বামী মাকানের হাত ধরে টেনে তোলে, ওঠ, কেঁদে আর কি করবে, বল। নিয়তির লিখন এড়াতে পারে না কেউ। বাবা কারো চিরকাল বেঁচে থাকে না। এখন শোকতাপ ভুলে নিজেকে শক্ত কর।

চোখের জল মুছে দানদান বলতে থাকে, সরবতের গেলাসটা পরীক্ষা করে দেখলাম। তার তলায় কাগজের একটা টুকরো পাওয়া গেলো। তাতে লেখা ছিলো ঃ শয়তানের জন্য শোক করো না। এ চিঠি তোমরা যারা পড়বে—জেনে রেখো, ব্যাভিচারের পরিণামে এই শাস্তিই পেতে হয়। একবার ভেবে দেখো, কত সম্রাটের আদরের দুলালীদের সর্বনাশ সে করেছে। তার নৃশংস অত্যাচারে কত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। এই শয়তানটা তার ছেলে সারকানকে পাঠিয়েছিল সিসারিয়ায়। ছলনায় সে ভুলিয়ে এনেছিলো সম্রাট হারদুবের প্রাণপ্রতিমা কন্যা ইরবিজাকে। তার সঙ্গে জানোয়ারের মতো আচরণ করেছিলো এই বদমাইশ সুলতান। তারপর এক নিগ্রোর হাতে তুলে দিয়েছিলো। নৃশংসভাবে তাকে সে হত্যা করে তার ধনরত্ন ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। সেই অত্যাচারী উদ্ধত সুলতান উমর অল-নুমানকে আজ আমি খতম করলাম। এজন্য ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করবেন। এবার আমার পরিচয় শোনো, আমি সেই হারদুবের দুর্গ কর্ত্রী—বাঁদী সরদারণী। সফিয়াকে আমি তার বাবা আফ্রিদুনের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তবে

এইখানেই শেষ নয়, এরপর আমরা সৈন্যবাহিনী সাজিয়ে নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করতে আসছি। এই পাপপুরী প্রাসাদ আমরা ধুলোয় মিশিয়ে দেব। সুলতানের বংশ নির্বংশ করে দেব। দুনিয়াতে মুসলমান সাম্রাজ্য বলে আর কিছু থাকবে না। বাগদাদের আকাশে উড়তে থাকবে খ্রীষ্ট ধর্মের বিজয় নিশান।

এক মাস ধরে শোকপালন করা হলো। দেশের লোক বলতে লাগলো, এবার বাগদাদের সিংহাসনে যোগ্য উত্তরাধিকারী বসানো হোক। তখন আমি কাজীদের ডেকে পরামর্শ করলাম। তাদের অভিমত দামাসকাস থেকে সারকানকে এনে সুলতান করা যেতে পারে। জনগণের দাবী—দু-অল-মাকানকে সিংহাসনে বসাতে হবে। কিন্তু দু-অল-মাকানকে আমরা কোথায় পাবো। দেশে দেশে তাদের সন্ধান করা হয়েছে—কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তাই কাজীদের উপদেশ মতো দামাসকাসেই যাচ্ছিলাম। শাহজাদা সারকানকে সুলতান পদে অভিষেক করে বাগদাদে নিয়ে আসবো—এই ছিলো উদ্দেশ্য। আল্লাহর অপার মহিমা—শাহজাদা দু-অল-মাকান আর শাহজাদী নুজাৎ দু'জনকে এক সঙ্গেই ফিরে পেলাম।

দু-অল-মাকান উজির দানদানকে বললো, আপনি বয়সে এবং জ্ঞানে বৃদ্ধ, আমার বাবার পুরনো উজির। এখন থেকে আপনি আমারও উজির হলেন। এখন আমার প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ আমার বাবা কি ধনদৌলত রেখে গেছেন তার একটা মোটামুটি হিসাব করা।

উজির দানদান একখানা লম্বা ফর্দ খুলে ধরলো, সুলতানের মৃত্যুর পর আমি তার বিষয় সম্পত্তির একটা খতিয়ান তৈরি করেছি।

মাকান বললো, আপনি এক কাজ করুন, দামাসকাস থেকে যে সব ধনরত্ন বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার সবটাই আপনি সেনাবাহিনীর লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিন।

নুজাতের স্বামী বাক্সের তালা খুলে টাকাপয়সা সোনাদানা হীরে জহরৎ সব বের করলো। উজির দানদান সেনাবাহিনীর প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুসারে ভাগ বাটোয়ারা করে দিলো সব ধনরত্ন।

সৈন্য সামন্তরা ধন্য ধন্য করতে লাগলো। নতুন সুলতানের শতায়ু কামনা করতে থাকলো।

এরপর তাঁবু ওঠানো হলো। আর কোনও বিরতি নয়, সোজা বাগদাদ। শহরের প্রবেশ মুখে হাজার হাজার নরনারীর ভীড়। তাদের নতুন সুলতানকে বরণ করতে এসেছে তারা। সারা শহর আজ নতুন সাজে সেজেছে। আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে সর্বত্র।

প্রাসাদে ফিরে এসে দু-অল-মাকান-এর প্রথম কাজ হলো, বড়ভাই সারকানকে চিঠি লেখা। সে লিখলো, দাদা যত সত্তর তোমার সাধ্যমতো সৈন্যবল নিয়ে বাগদাদে চলে এসো। সিসারিয়া সম্রাট হুমকি দিয়েছে, বাগদাদ আক্রমণ করবে।

চিঠিখানা ভাঁজ করে উজির দানদানের হাতে দিয়ে দু-অল-মাকান বললো, আপনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। এই চিঠি আমি অন্য কারো হাতে পাঠাতে চাই না। আপনি যান। সমস্ত ঘটনা খুলে তাকে বলুন। সে যদি চায়, আমি বাগদাদের সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে দামাসকাসের সুবাদার হয়ে থাকবো। কিন্তু আজ এই বিপদের দিনে, আমরা ভাই-ভাই বিরোধ করবো না। আগে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। পরে নিজের স্বার্থ চিন্তা করবো।

উজির খুশি হয়ে বললো, তুমি অতি বিচক্ষণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো, বাবা। বিপদের দিনে যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারে সে-ই বিচক্ষণ ব্যক্তি।

দানদান বিদায় নিলো। এবার দু-অল-মাকান জেরুজালেমের সেই বৃদ্ধ বন্ধুকে ডেকে পাঠালো। তার বসবাসের জন্যে একটা প্রাসাদ বন্দোবস্ত করে দিলো সে। দাসদাসী চাকরনফর পরিবৃত্ত হয়ে বৃদ্ধ সুখে দিন কাটাতে থাকলো।

কয়েক দিন বাদে দানদান ফিরে এসে জানালো, সারকান অখুশি হয়নি। সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হয়েছে। এখন আমরা আমাদের বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাবো। পথের মধ্যে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সিসারিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করতে হবে। সারকানের পরিকল্পনা এই রকম।

সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দু-অল-মাকান একদিনের পথ অতিক্রম করে তাঁবু গাড়লো। ওদিক থেকে সারকানও তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হলো। এই প্রথম দুই ভাই-এর মিলন ঘটলো। দু'জনে দু'জনের বুকে মাথা রেখে বাবার শোকে চোখের জল ফেলতে থাকলো।

বড়ভাইকে সসম্মানে বাগদাদে নিয়ে আসে দু-অল-মাকান। শহরের আশে পাশে ছাউনি ফেলা হলো। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তখন দু-ভাই একাত্মা হয়ে পড়েছে।

দিন কয়েকের মধ্যেই দুই ভাই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিসারিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আরবের অন্যান্য মুসলমান সুলতানরাও তাদের সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে বাগদাদ সুলতানকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

এক মাস চলার পর তারা শত্রু সীমান্তে পৌঁছয়। ভীত সন্ত্রস্ত কনসতান্তিনোপলবাসীরা সম্রাট আফ্রিদুনকে জানায়—বাগদাদ সৈন্য শিয়রে। আফ্রিদুন হারদুবের বাঁদী সর্দারণীকে খবর পাঠায়। সে আবার সিসারিয়ায় সম্রাট হারদুবকে জানায়।

হারদুব আর আফ্রিদুনের যুক্ত সৈন্যবাহিনী সীমান্ত ঘিরে রুখে দাঁড়ায়। একদিকে খ্রীষ্টান সৈন্য আর এক দিকে মুসলমান বাহিনী। বাঁদী সরদারণী হারদুবকে অভয় দেয়, আপনি কিছু ভাববেন না, সম্রাট, আমি ওদের সমুচিত শিক্ষা দেব। এটা জানবেন স্বয়ং যীশু আমাদের সহায় আছেন, শয়তানরা আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

বাঁদী সরদারণীর বুদ্ধিতে যুদ্ধের ফাঁদ তৈরি করা হতে থাকে।

—পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নৌকা বোঝাই করে পাহাড়ের নিচে পাঠিয়ে দিন। আর বাকী সৈন্যরা থাকবে এপারে। মুসলমানরা ছাউনি ফেলেছে পাহাড়ের পাদদেশে। সুতরাং তারা সামনেও এগোতে পারবে না পিছনেও পালতে পারবে না।

আফ্রিদুন বললো, চমৎকার ফন্দী। বাছাধনরা কচু কাটা হবে।

সম্রাট আফ্রিদুন এবং সম্রাট হারদুব তাদের সেনাপতিদের ডেকে বললেন, কাল খুব ভোরে তোমরা দু'টো ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'দিক থেকে সাঁড়াশী অভিযান চালাবে। নৌকা করে পাহাড়ের নিচে পাঠিয়ে দাও পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। আর বাকী সৈন্য থাকবে পাহাড়ের ওপরে। পাহাড়ের নিচেই ওরা ছাউনি ফেলেছে। ব্যাটারা এতে চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবে। এ যুদ্ধে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। বুকে সাহস সঞ্চয় করে যীশুর নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে—এই আমাদের একমাত্র পণ।

বাঁদী সরদারণী বললো, আমাদের এখন প্রধান লক্ষ্য হবে সারকান। সে এক মূর্তিমান শয়তান। তার বিক্রম অসাধারণ। একাই সে হাজার মানুষের সঙ্গে লড়তে পারে। এটা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব না। শয়তান তাকে ভর করে আছে। কিন্তু তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। ঈশ্বরের হাতে শয়তান-এর মৃত্যু ঘটে। আমরা ধর্মযোদ্ধা। ঈশ্বরের নির্দেশে খ্রীষ্টান ধর্ম বিশ্বাসীদের রক্ষার জন্যে ধর্মযুদ্ধে নামছি। ঈশ্বর আমাদের সহায় আছেন, শয়তানের পতন অনিবার্য।

সুতরাং যেন-তেন-প্রকারেণ সারকানকে হত্যা করতে হবে। মুসলমানদের একমাত্র বলভরসা এই সারকান। সারকান নিহত—শোনামাত্র সমস্ত সৈন্যবাহিনী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকবে। কিন্তু আমাদের হাত থেকে একজন মুসলমানও রেহাই পাবে না। সবগুলোকে কেটে কচু-কাটা করবো।

বাঁদী সর্দারণীর এই রক্ত গরম-করা বক্তৃতায় সেনাপতিরা উৎসাহিত হয়। প্রতিজ্ঞা করে, যেভাবেই হোক, মুসলমানদের পরাজিত করবোই।

খ্রীষ্টানদের প্রধান সেনাপতি লুকা। তার মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সেই সময়ে সারা ইউরোপে আর দু'টি ছিলো না। দেখতে ছিলো ভাল্লুকের মতো। গায়ের রং পোড়া কয়লার মতো কালো। তলোয়ার হাতে সে যখন দাঁড়াত দেখে মনে হতো—সাক্ষাৎ যমদূত। এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে সে পরাজয় স্বীকার করেনি। তার নাম শুনলে সেনাপতিদের বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। সে লোহার বর্ম শিরস্ত্রাণ পরে যখন ঘোড়ায় চাপলো, আফ্রিদুন তাকে আশীর্বাদ করে বললো, জয় তোমার সুনিশ্চিত। সারকানকে হত্যা করাই তোমার একমাত্র লক্ষ্য। যেভাবেই পারো, তাকে খতম করতেই হবে।

লুকা সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো। সোজা সারকানের ছাউনির সামনে। ঘোষক হাঁকতে থাকে, কই কোথায় আছ সারকান, মরার যদি সাধ থাকে বেরিয়ে এসো। তোমার যম সেনাপতি লুকা তোমার সামনে দাঁড়িয়েছে। যদি সাহস থাকে, তলোয়ার ধরো।

সারকান ধীর পায়ে এগিয়ে আসে। হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার। বিকট একটা চিৎকার তুলে লুকা ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারকান শরীরটাকে একটু কাত করে পাশ কাটিয়ে দেয়। তারপর শুরু হয় তলোয়ারের লড়াই। প্রথম প্রথম নির্বিকারচিত্তে লুকার মারগুলো ঠেকিয়ে যেতে থাকে সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারকান বুঝতে পারে, যতগুলো প্যাঁচ জানা ছিলো সবই লুকা দেখিয়ে শেষ করে ফেলেছে। অথচ সারকানকে কাবু করতে পারছে না। তখন সে আবার সেই প্যাঁচগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালাতে থাকে। সারকান এবার নিশ্চিত হয়। বুঝতে পারে লুকার বিদ্যার দৌড়। এবার সারকান তার নিজের কৌশল প্রয়োগ করলো। এবং তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা লুকার ছিলো না। তলোয়ারের এক কোপেই ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ে গেলো। এই দৃশ্য দেখে লুকার সঙ্গী সাথীরা প্রাণ ভয়ে চিৎকার করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলো।

আফ্রিদুন এবং হারদুব মাথায় হাত দিয়ে বসে। ভাবতে পারে না লুকা নাই। সমগ্র খ্রীষ্টান রাজ্যে লুকা একটি জীবন্ত প্রবাদ। কথায় কথায় লোকে লুকার শৌর্য বীর্যের উপমা দেয়। মা বাবা সদ্যজাত শিশুর নামকরণ করে লুকা। বড় হয়ে ছেলে লুকার মতো বীর হবে, এই আশা। সেই লুকা সারকানের হাতে নিহত হলো? একথা আফ্রিদুন-হারদুব বিশ্বাস করলেও দেশের লোক বিশ্বাস করবে না। আফ্রিদুন বলে, আমার সাম্রাজ্যের আসল থামটাই ভেঙে পড়ে গেলো।

বাঁদী সর্দারনী অভয় দিয়ে বলে, বিপদের সময় অধীর হলে তো চলবে না, সম্রাট। বুঝতে পারছি শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে লড়াই করে আমরা জিততে পারবো না। কারণ লুকা যখন পারেনি তখন সমগ্র খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের কোন সেনাপতির পক্ষেই তাকে নিহত করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।

নিরাসক্ত ভাবে হারদুব বলে, কী করতে চাও? বাহুবলেই যদি হারাতে না পারো, হারাবে কিসে?

—হারাবো বুদ্ধি বলে। বুদ্ধির কাছে বাহুবল তুচ্ছ। আমি এমন ফাঁদ তৈরি করবো, সেখান থেকে সারকান বেরুতে পারবে না।

সম্রাট হারদুব প্রশ্ন করে, সেই ফাঁদটা কি, শুনি?

বাঁদী সর্দারনী বলে, আপনার সৈন্যদের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক সৈন্য বাছাই করে আমার সঙ্গে দিন। তারা সবাই ভালো আরবী বলতে পারবে, এবং আরবীয় আদব কায়দায় দস্তুরমতো শিক্ষিত হওয়া চাই।

হারদুব বললো, এ আর এমন শক্ত কি? আমার সেনাবাহিনীতে খাস আরবের লোকও অনেক আছে। তাদের মধ্য থেকে তোমার পছন্দমতো যে ক'জন দরকার বাছাই করে নাও। কিন্তু তাদের দিয়ে কি করাবে?

—সোজা পথে যখন কাজ হবে না, বাঁকা পথ ধরতেই হবে। আপনার ঐ পঞ্চাশজন সৈন্য এবং আমি আরব সওদাগরের ছদ্মবেশ ধরে তাদের সামনে হাজির হবো। এবং কান্নাকাটি করে বলবো, আমরা বহুকাল ধরে কনসতান্তিনোপল-এ ব্যবসা বাণিজ্য করি। আরব থেকে সওদা এনে খ্রীষ্টানদের কাছে বিক্রি করি। এখন খ্রীষ্টান আর মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বাধায় তারা আমাদের মারধোর করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। টাকা পয়সা সামান পত্র যা ছিলো সব কেড়ে কুড়ে নিয়েছে। এখন আমাদের দেশে ফিরে যাবার সঙ্গতিটুকু সঙ্গে নাই। তাই আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি। দেখবেন, সম্রাট, এই চালে আমি বাজি মাৎ করে দেব। মুসলমানরা ভীষণ স্বজাতি-প্রিয়। এইভাবে তাদের করুণার পাত্র হয়ে সারকানের দলে ঢুকে পড়া আমার পক্ষে খুব একটা শক্ত কাজ হবে না। তারপর কি করে সিসারিয়ার মরণ ফাঁদে এনে ফেলতে হয় একবার দেখবেন।

বাঁদী সর্দারণীর ফন্দীটা ভালোই। কিন্তু কতটা কাজে ফলবে, কে জানে। আফ্রিদুন এবং হারদুব সম্মতি জানালো।—ঠিক আছে, দেখ চেষ্টা করে।

সারকান আর মাকান দুই ভায়ে নিজের তাঁবুতে বসে কনসতান্তিনোপল আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করছে। এমন সময় দ্বাররক্ষী এসে খবর দিলো, একদল আরব সওদাগর আপনাদের দর্শনপ্রার্থী।

দু-ভাই বেরিয়ে এসে দেখে, প্রায় জনা পঞ্চাশেক আরব সওদাগর এবং তাদের সঙ্গে এক নিষ্ঠাবতী ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধা এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পোশাক আশাক ছিন্নভিন্ন, দেহ রক্তাক্ত, চোখে মুখে সন্ত্রাসের ভাব। সারকান প্রশ্ন করে, কে তোমরা?

পাক্কা মুসলমানী কেতায় কুর্নিশ জানিয়ে তারা আরও একটু এগিয়ে আসে। বুড়িটা হাতের মালা ঘুরাতে ঘুরাতে বলে, আমরা ইস্পাহানের বাসিন্দা। আজ বিশ বছর ধরে কনসতান্তিনোপল-এ বাণিজ্য করে আসছি। আরব থেকে সামান পত্র এনে খ্রীষ্টানদের কাছে বিক্রি করাই একমাত্র কাজ। এতকাল কোনও অসুবিধে হয়নি। দিব্যি আরামে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ওদের দেশের পয়সা নিয়ে গিয়ে আমাদের বাল-বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছিলাম। কিন্তু এখন তারা অন্যরূপ ধরেছে। তারা খ্রীষ্টান, আমরা মুসলমান। ওদের যত আক্রোশ আমাদের উপর। কারণ আমরা মুসলমান। মুসলমানরাই তাদের দেশ আক্রমণ করেছে। এই অজুহাতে আমাদের ধরে নানাভাবে অত্যাচার চালিয়েছে। এবং শেষে মেরে ধরে আমাদের টাকা পয়সা, সামান পত্র সব কেড়ে নিয়ে কনসতান্তিনোপল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের এমন কোন রেস্ত নাই যা নিয়ে দেশে ফিরতে পারি।

সারকান এবং মাকান ওদের কাহিনী শুনে ব্যথিত হয়। বলে, তোমরা আমার ছাউনিতে বিশ্রাম কর। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

সারকানের নির্দেশে বিরাট তাঁবু খাটানো হলো। সওদাগরের ছদ্মবেশে সিসারিয়ার পঞ্চাশজন সৈন্যের একটা বাহিনী মুসলমান ছাউনির ভিতরে আস্তানা গাড়লো। তাদের খানাপিনা আদর যত্নের কোনও ত্রুটি রাখলো না সারকান। মাঝে মাঝেই খোঁজ খবর নিতে থাকলো।

সারকানের কর্মচারীরা বললো, সওদাগররা সবাই খানাপিনা করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কিন্তু বুড়িমা খানাপিনা কিছুই করেনি। দিন-রাত সে শুধু নামাজ আর কোরান পড়ছে।

এ-কথা শুনে সারকান নিজে দেখাশুনা করতে গেলো। সওদাগররা বললো বুড়িমা আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙছেন, যাতে এ যুদ্ধে আমাদের জয় হয়। বুড়ি মা আমাদের ধর্মাত্মা সিদ্ধবাক। তাঁর উপর আল্লাহর 'ভর' হয়। সেই সময় তাকে যা প্রশ্ন করবেন সব জবাব দেবেন তিনি। সে-সবই আল্লাহর বাণী। তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় মাত্র।

শ্রদ্ধা ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসে সারকান মাকানের। জিজ্ঞেস করে কবে মার উপর 'ভর' হবে।

সওদাগররা বলে, সে কিছুই বলা যায় না। হয়তো এখুনি হতে পারে। আবার দু'দিন নাও হতে পারে। তবে যতক্ষণ 'ভর' না হবে তার এই মৌনভাব কাটবে না। কারো দিকে তাকাবেন না, কারো সঙ্গে কথা বলবেন না।

সারকান জিজ্ঞেস করে কিন্তু তিনি মৌনব্রতী হয়ে এই উপাসনায় বসলেন কেন?

—বাঃ, সে কি বলেন, জাঁহাপনা। এতবড় ধর্মযুদ্ধ। এর জয়-পরাজয়ে মুসলমান ধর্ম, জাতির বাঁচামরা নির্ভর করছে। এ সময়ে উপাসনায় না বসলে বসবেন কবে? নিজের ছেলে মেয়ের সৌভাগ্য ফিরবে কি করে, বা কিভাবে কোথায় বাণিজ্য করলে নিজের ধনদৌলত আরও ফুলে ফেঁপে উঠবে এই জন্যে তিনি উপাসনায় বসবেন? কক্‌খনো না। নিজের স্বার্থ চিন্তা তিনি কোনওদিনও করেন না। কি করে পরের উপকার হবে, দেশের দশের উপকার হবে সে-ই তার একমাত্র চিন্তা।

সারকান মাকান দু'ভাই অবাক হয়ে শোনে। মনে হয়, এই সংকটকালে আল্লাহই তাদের পাঠিয়েছেন।

পরদিন ভোরবেলা 'ভর' উঠলো। সারকান মাকান আভূমি আনত হয়ে সালাম করে জানতে চাইলো, এই ধর্মযুদ্ধে আমাদের জয় হবে, মা?

—অবশ্যই হবে বাবা। তবে শত্রুর গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধান না পেলে তাদের ঘায়েল করা যায় না। আমার সঙ্গে যারা এসেছে তারা সেই সব ঘাঁটির সন্ধান জানে। তাদের কথামতো তোমরা অগ্রসর হও। শত্রুকে নিধন করতে পারবে।

সারকান এবং মাকান সওদাগরদের দিকে তাকায়। ওদের একজন বলে, মা ঠিকই বলেছেন। আমরা আজ বিশ বৎসর যাবৎ কনসতান্তিনোপল আর সিসারিয়ার প্রতিটি প্রান্তে ঘুরেছি। সারা খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের পথ-ঘাট, আমাদের নখদর্পণে। কোথায় তাদের গুপ্ত ঘাঁটি। কোন পথে যাওয়া নিরাপদ হবে সব আমরা বলে দেব।

সারকান হাতে স্বর্গ পায়। এ যুদ্ধে তাদের জয় আর কেউ আটকাতে পারবে না। তামাম খ্রীষ্টান জাতটাকে সাবাড় করে দেবে।

ঠিক হলো, সৈন্যদের পঞ্চাশটাভাগে বিভক্ত করা হবে। এবং এই পঞ্চাশজন সওদাগর-এর এক-একজন এক একটি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে ঢুকে পড়বে। গুপ্ত পথের নিশানা দেখিয়ে দেবে সওদাগররা। এইভাবে খ্রীষ্টানদের পঞ্চাশটা গুপ্তঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব হবে।

সারকান মাকানকে বললো, তুমি ছাউনিতেই থাক। উজিরও তোমার সঙ্গে থাকবেন। আমি যাবো স্বয়ং বুড়িমার সঙ্গে। তিনি আমাকে

সিসারিয়ার দুর্গে নিয়ে যাবেন। এখন শত্রুসৈন্য দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে চলে এসেছে। এই সময় হারদুবের এই সুরক্ষিত দুর্গ প্রায় শূন্য। গুপ্ত পথ ধরে আমরা এগিয়ে যাবো। একবার দুর্গটা অধিকার করতে পারলে আর কোনও অসুবিধেই হবে না। এরপর আমরা সহজেই কনসতান্তিনোপল দখল করে নিতে পারবো।

দাদাকে আলিঙ্গন করে বিদায় জানালো দু-অল-মাকান। বললে, ফিরে এসো, তোমাকে আমি নিজে হাতে সুলতানের মুকুট পরিয়ে দেব।

কিন্তু মুকুট আর তার পরা হলো না। শয়তানী বাদী সর্দারণীর ফাঁদে পা দিয়ে প্রাণটা হারাতে হলো। সারকান তার সৈন্যবাহিনী সঙ্গে করে বুড়ির সঙ্গে সিসারিয়া দুর্গের ভিতরে ঢুকেছিলো। বুড়ি তাকে ধাপ্পা দিয়েছিলো, দুর্গ এখন শূন্য এই অবস্থায় অধিকার করে নাও। সারকান দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে সত্যিই দেখলো, কোন জনপ্রাণী নাই। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে দেখছিলো, এমন সময় এক আততায়ী পিছন দিক থেকে সারকানের পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না সে। সারকান মাটিতে পড়ে গিয়ে তলোয়ার খুলে দাঁড়ায়। তখন তার সামনে প্রায় শ'খানেক খ্রীষ্টান সৈন্য। তলোয়ার উদ্যত করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সারকানের এক এক কোপে একাধিক শত্রু সৈন্য ধরাশায়ী হতে থাকে। এইভাবে সেই আহত অবস্থাতেও প্রবল বিক্রমে সবকটা সৈন্য নিধন করে খিড়কীর পথ দিয়ে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ছাউনিতে ফিরে আসে। সারা দেহ রক্তাক্ত। তখনো ছুরিটা পিঠেই গাথা ছিলো। মাকান ছুটে এসে ছুরিটা টেনে বার করে। ধরাধরি করে দাদাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। এইবার সারকানের দেহ নেতিয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও রক্ত বন্ধ করা সম্ভব হয় না। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা সারকান দেহত্যাগ করে।

রাত্রি যত গভীর হয় সব দিক থেকেই দুঃসংবাদ আসতে থাকে। শয়তানরা তাদের পুরো সেনাবাহিনীটাই ফাঁদে ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

উজির দানদান বললো, আর এখানে থাকা ঠিক নয়। এরপর শত্রুরা ছাউনি আক্রমণ করবে।

মাকানও ভাবলো, এবার ছাউনি গুটিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হওয়াই শ্রেয়।

যে যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনাই ষোল আনা—সেই যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে মাকানকে দেশে ফিরতে হলো। বাদশাহী মর্যাদায় সারকানের মৃতদেহ সমাহিত করে তার উপর এক শোক মঞ্জিল বানালো মাকান। তার গায়ে লেখা হলো সারকানের অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী।

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা সুলতান উমর অল-নুমান, তার পুত্র সারকান, মাকান এবং কন্যা নুজাতের কাহিনী শুনলেন। এবার আপনাকে শোনাবো আজিজ এবং শাহজাদা তাজ অল মুলুকের কাহিনী।

পারস্যের ইসপাহান পর্বতমালার পিছনে সবুজ শহর। এখানকার সুলতান সুলেমান শাহ। সারাটা জীবন সে ধর্মকর্ম নিয়েই কাটাতো। তার মতো সৎ প্রজাবৎসল উদার সুলতান বড় একটা দেখা যায় না। সারা সলতানিয়তের কোণে কোণে সে ঘুরে বেড়াতো। উদ্দেশ্য—তার প্রজারা কে কিভাবে দিন গুজরান করছে তাই দেখা। তার নিরপেক্ষ উদারনীতির জয়গান করতো সকলে। ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ করতো না। তার চোখে সবাই সমান। সবাই প্রজা। এইভাবে প্রজাদের ভক্তি ভালোবাসা কুড়িয়ে তার জীবনের বেশীরভাগ সময়ই কেটে গেলো। শুধু একটা সাধই তার অপূর্ণ রয়ে গেলো। বেগম আর পুত্র কন্যা। যতই জীবনের সায়াহ্নকাল এগিয়ে আসে সুলতান সুলেমান ক্রমশই নিজেকে বড় একা—অসহায় মনে করতে থাকে। একদিন উজিরকে

ডেকে বললো, দেখ, আমার স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়ছে। উৎসাহ উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে আসছে। শরীরে কোনও বল পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, দিন শেষ হয়ে এলো। এখন এই বয়সে বুঝতে পারছি, কোন মানুষের একা থাকা উচিত নয়। সঙ্গীবিহীন জীবন মরুভূমির মতো। বিশেষ করে সুলতানের পক্ষে তো নয়ই। কারণ সিংহাসনের উত্তরাধিকার একটা বিরাট সমস্যা। তাছাড়া আমাদের পয়গম্বরও বলেছেন শাদী কর এবং সংখ্যা বাড়াও। এখন আমাকে সৎ পরামর্শ দাও, উজির—কি করা বিধেয়।

উজির চিন্তিতভাবে বলে, আপনি বড় কঠিন প্রশ্ন করেছেন হুজুর। এককথায় এর জবাব হয় না। আমি আমার সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। জানি না আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো কি না। এটাও অবশ্য অত্যন্ত দুঃখের হবে, যদি আপনি কোন অজ্ঞাতকুলশীল বাঁদীকে শাদী করেন। বাঁদীকে শাদী করায় আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু কথা হচ্ছে, তার বংশ পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। হয়তো এমনও হতে পারে, যে বাঁদীকে আপনি শাদী করলেন তার বাবা একটা শয়তান বজ্জাৎ বা চোর ডাকাত ছিলো। বাবার রক্ত মেয়ের ধমণীতে প্রবাহিত হয়। আবার সেই রক্ত নাতির দেহে সঞ্চারিত হবে এ আর বিচিত্র কি? আপনার পুত্র যদি বড় হয়ে আপনার সৎ গুণের অধিকারী না হয়ে তার দাদুর স্বৈরাচারের দোষে দুষ্ট হয়, তাহলে? এই কারণে হুজুরের প্রতি বান্দার আর্জি তিনি যেন আমাকে কোন বাঁদী কিনে আনতে না হুকুম করেন। তা সে মেয়ে যদি দুনিয়ার সেরা সুন্দরী হয় তাতেও আমার সায় নাই। সন্তান উৎপাদনই যদি আপনার একমাত্র কাম্য হয়, আমি পরামর্শ দেব, কোনো সুলতান বাদশাহর মেয়েকে বেগম করে আনুন। আপনি চাইলে শাহবংশের সেরা সুন্দরীর অভাব হবে না।

সুলতান বললো, তা যদি পাওয়া যায়, তাই নিয়ে এসো। শাদী করবো শুধুমাত্র সন্তানের জন্য।

—পাত্রী আমার দেখাই আছে, জাঁহাপনা।

—তাই নাকি! কে, কার মেয়ে?

আমার বিবি বলেছে, সফেদ শহরের সুলতান জহর শাহর এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। তার রূপের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে শুনেছি, ইদানীংকালে অমন রূপসী, নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে সারা আরবে নাই।

আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়ে সুলতান, ইয়া আল্লাহ!

উজির বলে, আপনি আর বিলম্ব করবেন না হুজুর। দরবারের এক বিচক্ষণ আমিরকে পাঠিয়ে দিন। সুলতান জহর শাহকে সে শুধু এই সংবাদটা দেবে যে সবুজ শহরের সুলতান তার কন্যার পাণিপ্রার্থী। তারপর দেখবেন সুলতান জহর শাহ আপনার কাছে ছুটে আসবে। তার নাতি সবুজ শহরের সিংহাসনে বসবে—এ লোভ কি সে সম্বরণ করতে পারবে!

সুলতান বললো, কাকে পাঠানো যায় বলতো উজির। এমন লোককে পাঠাতে হব যে বেশ কায়দা করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারবে। অথচ আমার মান ইজ্জতটাও খোয়া যাবে না।

উজির ভেবে পায় না কাকে পাঠানো যায়। সুলতান বললো থাক, অত ভেবে কাজ নাই। এসব কাজ অন্য লোক দিয়ে হয় না। তুমি নিজেই যাও। তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করে ফিরে এসো। তুমি না ফেরা পর্যন্ত খুব চিন্তায় থাকবো।

খুব তাড়াহুড়া করে দরবারের জরুরী কাজকর্ম সমাধা করে উজির সফেদ শহরের সুলতান সকাশে যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগলো। উট আর খচ্চরের পিঠে বোঝাই করা হলো নানা উপঢৌকন—হীরে, জহরৎ,

স্বর্ণালঙ্কার, রেশমের গালিচা, সূক্ষ্ম কারুকার্য করা শাল, সুগন্ধী আতর, গোলাপের নির্যাস এবং আরও ছোট ছোট বহু মূল্যবান বিলাসসামগ্রী। তার সঙ্গে নিলো দশটি তাগড়াই আরবের ঘোড়া, একশোটি খোজা, একশোটি নিগ্রো ক্রীতদাস এবং একশোটি দাসী বাঁদী। লাটবহর বোঝাই করে উজির রওনা হওয়ার আগে সুলতানের কাছে বিদায় নিতে এলো। সুলতান বললো, খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে। এবং খালি হাতে আসবে না। পাত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

উজির বললো আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা, আমি যাবো আর আসবো। ওখানে দেরি করার কিছু নাই। পাত্রীকে নিয়েই চলে আসবো।

উজির তার দলবল নিয়ে রওনা হয়ে পড়ে। দুর্গম গিরি পর্বত ডিঙিয়ে, দুস্তর মরুপ্রান্তর পেরিয়ে এবং বিস্তর খাল বিল নদী অতিক্রম করে একদিন সফেদ শহরের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছয়। দ্রুতগামী এক অশ্বারোহীকে দূত করে সুলতান জহর শাহর দরবারে পাঠিয়ে দেয় উজির।

বিকালে সুলতান জহর শাহ মুক্ত বায়ু সেবন করতে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দূরাগত এক অশ্বারোহীকে দেখতে পেয়ে উজিরকে জিজ্ঞেস করে, কে আসছে দেখতো উজির।

ইতিমধ্যে অশ্বারোহী আরও নিকটতর হলে বোঝা গেলো, কোনও বিদেশী দূত। একটু পরে সামনে এসে অভিবাদন জানিয়ে সে বললো, আমি সুলতান সুলেমান শাহর দূত। আপনার শহরের প্রান্ত সীমায় নদীর ওপারে আমাদের উজির তাঁবু গেড়েছেন।

সুলতান জহর আনন্দিত হয়ে বললো। তুমি এখন বিশ্রাম করো, খানাপিনা সারো। তারপর সব শুনবো।

একজন আমিরকে বললো, একে খুব খাতির করে খাওয়াও। দেখো, যেন বদনাম না হয়।

নদীর ওপারে তাঁবু গেড়ে উজির প্রত্যাশা করে বসে থাকে। তার দূত কখন ফিরে আসবে, কি সংবাদ বহন করে আনবে সে চিন্তায় অধীর হয়ে পথের দিকে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে রাত বাড়ে, দূত ফিরে আসে না। উজিরের চিন্তা ক্রমশ দুশ্চিন্তায় রূপান্তরিত হতে থাকে। এমন সময় দেখা গেলো, সুলতান জহর শাহর উজির আমির ওমরাহদের নিয়ে তার সামনে এসে হাজির হলো।

যথাযোগ্য বাদশাহী কেতায় পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় পর্ব শেষ হলো। সুলতান শাহর উজির করজোড়ে আমন্ত্রণ জানালো, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের শহরে পায়ের ধুলো দেন, ধন্য হবো।

সুলতান সুলেমানের উজির বলে, চলুন, সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো বলেই তো এসেছি।

বিরাট একটা দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো তারা। দুই পাশে সারিবদ্ধভাবে আমির ওমরাহরা উপবিষ্ট। ও প্রান্তের ঠিক মাঝখানে এক শ্বেতপাথরের সিংহাসনে সুলতান জহর শাহ। পিছনে সুলতানের দেহরক্ষী এবং প্রধান সেনাপতি। সারা দরবার কক্ষ পারস্য-গালিচায় মোড়া। মাথার উপরে ঝুলন্ত ঝাড়বাতি।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরবর্তী রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়।

সুলতান সুলেমানের উজিরকে সাদর অভ্যর্থনা করে বসানো হলো। সুলতান জহর শাহ উজিরের সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করলো। নানারকম বাদশাহী খানাপিনায় আপ্যায়িত করা হলো তাকে।

এর পর দরবার থেকে সবাই একে একে বিদায় নিয়ে চলে যায়। শুধু সুলতান, তার উজির এবং সুলতান সুলেমানের উজির বসে রইলো।

সুলেমানের উজির উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আপনি মহানুভব সুলতান।

আপনার দরবারে আমার সুলতানের তরফ থেকে একটি আর্জি পেশ করছি। আমাদের সুলতান আপনার কন্যার পাণি প্রার্থী। আমি তাঁর কাছ থেকে যে সব উপহার উপঢৌকন নিয়ে এসেছি, আপনি গ্রহণ করে ধন্য করুন।

সুলতান জহর শাহ উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানালো। দরবারের সকলে অবাক! একি কাণ্ড, সুলতান স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানালেন সামান্য এক উজিরকে। সুলতান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললো, আপনি প্রবীণ প্রাজ্ঞ উজির। আপনার প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলাম। আমার কন্যা আপনার সুলতানের কেনা বাঁদী হয়ে থাকবে। আমি নিজেও তাঁর একান্ত অনুগত প্রজাতুল্য। আমার কন্যার পাণি প্রার্থনা করে যে প্রস্তাব তিনি পাঠিয়েছেন সে জন্য আমি তার কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম।

সুলতান কাজীদের ডেকে পাঠায়। কাজীরা এসে তার কন্যার সঙ্গে সুলতান সুলেমানের শাদীনামা তৈরি করে দিলো। সুলতান জহর কাগজখানা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে সম্মান জানালো।

সুলতান উপস্থিত সকলকে মূল্যবান পোশাক এবং প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিয়ে খুশি করলো। কন্যার সহচরী হয়ে যাবে যারা, সেই সব দাসী-বাঁদী বাছাই করা হলো। দশটা খচ্চরের পিঠে উপহার সামগ্রী বোঝাই করে, পরদিন প্রত্যুষে সুলতান জহর শাদীর সাজে সাজিয়ে কন্যাকে নিয়ে রওনা হয়ে, তিন দিনের পথ অতিক্রম করার পর উজির এবং কন্যাকে বিদায় জানিয়ে আবার নিজের শহরে ফিরে এলো।

আরও তিনদিন চলার পর সবুজ শহরের এলাকায় পৌঁছে উজির এক অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে সুলতান সুলেমানকে খবর পাঠালো ঃ সংবাদ শুভ। পাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

সুলতান সুলেমান উত্তেজনায়, আনন্দে অধীর হয়ে নিজের গায়ের মহামূল্যবান শালখানাই দূতের হাতে তুলে দেয়।

সারা শহরে আনন্দের হিল্লোল জাগে। তাদের সুলতান শাদী করছেন। এবার সিংহাসনের নতুন উত্তরাধিকারীর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলো। শহরবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেরা এসে মনোহারী সাজে প্রাসাদ সাজাতে থাকে। আলোয় আলোয় ভরে ওঠে শহরের পথঘাট।

সেদিন রাতে সুলতান মধুযামিনী যাপন করে। প্রথম রাতেই বেগম অন্তঃসত্তা হয়। সুলতান নতুন জীবন ফিরে পায়! তার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আসবে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

দশ মাস পরে বেগম এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলো। চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। আদর করে সুলতান তার নাম রাখে তাজ অল মুলুক।

ছেলের যখন সাত বছর বয়স সেই সময় থেকে তার লেখাপড়া শিক্ষা-দীক্ষার জন্য শহরের প্রাচীন জ্ঞানীগুণী শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তাজ অল মুলুক লেখাপড়ায় বেশ মেধাবী। অল্পকালের মধ্যেই সে নানা বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে দেহচর্চা। ঘোড়ায় চড়া এবং অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করে ফেলে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতাও বাড়তে থাকে। আঠারো বছর বয়সে তাজ অল মুলুক সর্বশাস্ত্র বিশারদ এক পরিপূর্ণ যুবক হিসাবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠে। সে যখন ঘোড়ায় চেপে শিকারে বেরুতো রাস্তার দু-ধারে আবালবৃদ্ধবনিতা জড়ো হয়ে তার রূপের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো। শিকার তার বড় প্রিয় ছিলো। সঙ্গী সাথী নিয়ে মাঝে মাঝেই জঙ্গলে চলে যেত।

একদিন নদীর ধারে তাজ অল মুলুক পাখি শিকারে বেরিয়েছে। এমন সময় দেখলো একদল সওদাগর তাদের উট খচ্চরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে নদীর ওপারে তাঁবু গেড়েছে। সওদাগররা নদীর জলে নেমে রুজু করছে। শাহজাদা তাজ অল মুলুক একজন নফরকে পাঠিয়ে ওদের খবরাখবর জেনে আসতে বলে।

চাকরটা এসে জিজ্ঞাসা করায় ওদের একজন বলে, আমরা বিদেশী বণিক। চলতে চলতে পরিশ্রান্ত হয়ে এই নদীর ধারে তাঁবু গেড়েছি। এখানে দু'একদিন বিশ্রাম করে আবার রওনা হবো। এখানকার শস্যশ্যামল প্রান্তর আমাদের বড় ভালো লেগেছে।

চাকরটা প্রশ্ন করে, তোমরা যে এই অজানা অচেনা দেশে তাঁবু ফেলেছো, ভয় করে না? যদি চোর ডাকাত-এর উপদ্রব হয়?

ওরা বলে, আমরা জানি সুলতান সুলেমান শাহর দেশে চুরি রাহাজানি হয় না। এখানকার মানুষ সুলতানের মতোই সৎ এবং ধার্মিক। সুলতান সুলেমান শাহর সত্যনিষ্ঠার খ্যাতি সর্বত্র। আর তা ছাড়া, আমরা শাহজাদা তাজ অল মুলুকের কাছে ভেট নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ভয় কী?

চাকরটা ফিরে এসে তাজ অল মুলুককে এ কথা জানাতেই সে ওদের কাছে এগিয়ে যায়। তার কাছেই ওরা যাচ্ছে। সঙ্গে উপহার সামগ্রী। তাজ অল মুলুক কিছুই বুঝতে পারে না।

শাহজাদাকে আসতে দেখে সওদাগররা এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে যায়। নানারকম বাহারী জিনিসের সে কি বিচিত্র মেলা। তাজ অল মুলুক যা দেখে তাই পছন্দ করে বসে। এক এক করে অনেকগুলো সৌখিন জিনিস তার পছন্দ হয়। সওদাগররা সেগুলো একত্র করে বাঁধাছাঁদা করে শাহজাদার হাতে তুলে দেয়। তাজ অল মুলুক জিজ্ঞেস করে, কত দাম?

সওদাগররা নাক কান মলে জিভ কেটে বলে, ও কথা বলবেন না, হুজুর। আমরা আপনার গোলামের গোলাম। এই সামান্য ক'টা জিনিস পছন্দ করে নিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন। আমরা কি দাম নিতে পারি?

চাকরের হাতে জিনিসগুলো নিজের তাঁবুতে পাঠিয়ে দিয়ে সওদাগরদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপতে যাবে, এমন সময় এক বিষাদ বিষণ্ণ যুবকের দিকে তাজ অল মুলুকের নজর পড়ে। ছেলেটি দেখতে বড় সুন্দর। কিন্তু কিসের যেন ব্যথা, কিসের যেন দুঃখ তাকে মুহ্যমান করে রেখেছে। তাজ অল মুলুক-এর আর চলে যাওয়া হয় না । ছেলেটির কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, তোমার চোখে জল কেন ভাই, কি নাম তোমার?

ছেলেটি শান্ত গলায় জবাব দেয়, আমার নাম আজিজ।

আর কিছু বলতে পারে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

তাজ অল মুলুক সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কেঁদ না, বন্ধু চুপ কর। দুঃখ সকলের জীবনেই আসে। তাই বলে তার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া ঠিক না। বলো, তোমার কি দুঃখ। আমি যদি কাটাতে পারি, কথা দিচ্ছি, প্রাণ দিয়েও তা করবো।

ছেলেটি শান্তভাবে বলে, সে কথা শুনে আপনার কি ফয়দা হবে? থাক।

তাজ রাগ করে, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমাকে? কিন্তু সত্যি বলছি, তোমাকে দেখামাত্র আমার অন্তর কেঁদে উঠেছে। বলো বন্ধু, অসঙ্কোচে বলো, তোমার কাহিনী। তোমার দুঃখের কিছু ভাগ নিতে চাই।

ছেলেটি বলে, ঠিক আছে বলবো, চলুন আপনার তাঁবুতে গিয়েই বলবো। এখানে অনেক লোকের ভিড়।

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তাজ তার তাঁবুতে ফিরে আসে। দু'জনে মিলে খানাপিনা করে। তারপর ছেলেটি বলতে থাকে ঃ আমি আমার বাবার একমাত্র সন্তান। ধনী সওদাগর হিসাবে বাবার বেশ নামডাক ছিলো। আমার কাকা মারা যাওয়ার সময় তাঁর একমাত্র মা-হারা মেয়েকে আমার বাবার হাতে তুলে দিয়ে যান। আমরা দুই ভাইবোন এক সঙ্গেই মানুষ হতে থাকি। ওঃ বলতে ভুলে গেছি, আমার নাম আজিজ আর আমার কাকার মেয়ের নাম আজিজা। আজিজার শাদির বয়স হলো। বাবা বললেন, ভাই মারা যাওয়ার সময় হাতে ধরে বলে গিয়েছিলো, আজিজের সঙ্গে আজিজার যেন শাদী দিই।

আজিজের মা বলে, তা তো বেশ ভালোই হবে। মানাবেও ভালো। তা ছাড়া ছোট থেকে ওরা এক সঙ্গে হেসে খেলে মানুষ হয়েছে, এখন মেয়েটা পরের ঘরে পাঠাবে নাকি?

একদিন রাতে খানা খেতে বসে বাবা বললেন, তোমাকে শাদী করতে হবে।

আমি তো আশমান থেকে পড়ি। হঠাৎ বলা নাই কওয়া নাই শাদী করতে হবে? আর তা ছাড়া পাত্রীই বা কোথায়? কাকে শাদী করবো! ঘরেই যে পাত্রী বাড়ছে সে কথা কিন্তু একবারও আমার মনে হয়নি। কিন্তু তা বলে আজিজা আর আমার মধ্যে ভালোবাসা যে কিছু কম ছিলো তা নয়। দু'জন দু'জনকে ছেড়ে একটা দিন কাটাতে পারতাম না। কোনও একটা ভালো জিনিস দেখলে সব আগে আজিজার কথাই আমার মনে পড়তো। তেমনি আজিজাও আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। কোথাও কোনও ভালো খাবারদাবার পেলে আমার জন্যে তুলে রাখতো। বলতো, খাও, তুমি খেলেই আমার খাওয়া হবে।

এহেন যে সম্পর্ক—তা যে একদিন স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে যাবে তা কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি। বাবা একটু কর্কশভাবেই আবার বললেন, আগামী জুম্মাবার সন্ধ্যায় তোমাদের শাদীর দিন ঠিক করা হয়েছে। তোমার বন্ধুবান্ধবদের—যাদের ডাকতে চাও নিমন্ত্রণ করে এসো।

বাবার ওপরে কথা বলার সাহস আমার ছিলো না। মাথা গুঁজে খেয়ে দেয়ে উঠে পড়লাম।

শুক্রবার দিন নামাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবো হঠাৎ মনে পড়লো, এক বন্ধুকে এখনও বলা হয়নি। ওর বাড়ির দিকে হেঁটে চললাম। দুপুরের ঝাঁঝাঁ করা রোদ। একেবারে লু বইছে। চোখমুখ ঝলসে যাবার দাখিল। আমি আর চলতে পারি না। সামনেই একটা বাগিচা। ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একটা গাছের ছায়ায় শান বাঁধানো চবুতরায় বসে একটু জিরিয়ে নেবো। তারপর রোদের ঝাঁঝটা একটু কমলে আবার বেরিয়ে পড়বো—এইরকম ইচ্ছা।

ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। একটা রুমাল বিছিয়ে চবুতরার উপরে শুয়ে পড়ি।

একটু বোধ হয় তন্দ্রা লেগেছিলো। হঠাৎ খট করে একটা শব্দ হতেই কেটে গেলো। চেয়ে দেখি একখানা লাল রঙের রুমালে কি যেন একটা বস্তু পড়ে আছে আমার কাছেই। তুলে নিয়ে খুলে দেখি, রুমালে বাঁধা এক টুকরো পাথর। এদিক ওদিক চাইলাম। দেখি, সামনের বাড়ির দোতলার একটি জানালা খোলা। তার পাশে বসে এক পরমা সুন্দরী কন্যা। বুঝলাম রুমালখানা সে-ই ছুঁড়েছে।

সেই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে কি যে ঘটে গেলো বোঝাতে পারবো না। মনে হলো, যাকে প্রণয় বলে, প্রেম বলে—তার প্রথম আস্বাদ পেলাম। নারী আমার শৈশবকালের সঙ্গী। কিন্তু এই উন্মাদনা সে আমার অন্তরে জাগাতে পারেনি।

রুমালখানার এক কোণে কয়েকটা কথা লেখা ছিলো ঃ পথিক, তুমি কি পথ হারাতে চাও না? যে পথে চলেছো তার বাইরে তো আরও অনেক অচেনা অজানা দুর্গম পথ আছে। সেই পথে পাড়ি দেবার মজা কি পেয়েছো কখনও?

সেই মুহূর্তে ভালোবেসে ফেললাম সেই অজানা অচেনা সুন্দরীকে। আমার চিত্ত বিহ্বল হলো। ভুলে গেলাম সেই দিন সন্ধ্যায় আমার শাদী।

মেয়েটি আমাকে অনেক রকম ইশারা করে কি সব বোঝাতে চাইলো। প্রথমে তর্জনী ঠোঁটে রাখলো। পরে দু'হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরলো। কিন্তু আমি তার একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। একটু পরে জানালা বন্ধ করে দিলো।

আমি তবু ঠায় বসে থাকি। আশা, আবার যদি খোলে, আবার যদি কিছু বলে! আবার

যদি তার দেখা পাই। সেই আশায় একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম সেই রুদ্ধ কপাট জানালার দিকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যাও কখন রাত্রির রূপ ধারণ করে। কিন্তু বসে থাকি সেই চবুতরায়। আশা, যদি আবার সে জানালা খোলে!

কিন্তু না, জানালা আর খুললো না, ব্যর্থ মনে ঘরে ফিরে চলি! বাবা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, এই তোমার আক্কেল। আজ তোমার শাদী, আর তুমি কিনা দুপুর রাতে বাড়ি ফিরলে। এমন যার দায়িত্ব বোধ তার হাতে মেয়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। এ শাদী হবে না। আমি বাতিল করে দিলাম।

মা কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু তিনি বাবাকে ভালো করেই জানতেন। বাবার রাগ বড় চণ্ডাল। একবার 'না' বললে 'হ্যাঁ' করানো শক্ত!

আজিজা এলো। আমার হাত দু'টো ধরে পাশে বসালে, কি হয়েছে বলতো ভাই। আমার কাছে লুকিয়ো না, খুলে বলো।

জীবনে কখনও কোনও কথা আজিজার কাছে আমি গোপন করিনি। আজও পারলাম না। সব বললাম।

—প্রথম দর্শনেই ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানি না আজিজা, কিন্তু আজ ঐ মেয়েটিকে দেখার পর থেকে সারা দেহমনে আমার ঝড় উঠেছে। কিছুতেই মন শান্ত করতে পারছি না। কিছুতেই তার মুখচ্ছবি মুছে ফেলতে পারছি না। তুমি বলতে পারো আজিজা, এমন কেন হলো! এর কি নাম?

আজিজা বলে, এরই নাম ভালোবাসা। তুমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছো।

আমি বাধা দিয়ে বলি, না না, আজিজা, সে কি করে হয়? আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।

—না আজিজ। তোমার আমার সম্পর্ক যে ভালোবাসার, এ ভালোবাসা সে ভালোবাসা নয়। একে বলে প্রেম।

আমি চমকে উঠি। প্রেম!

আজিজা আমাকে সোহাগ জানিয়ে বলে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না আজিজ, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। তুমি জীবনে সুখী হবে। তোমার মুখে হাসি দেখবো, এর চেয়ে বড় কিছু নেই আমার কাছে। তোমার জন্যে আমার বুকের কলিজাও ছিঁড়ে দিতে পারি। শুধু আমার একমাত্র কামনা তোমাকে খুশি করা। এখন বলো তো মেয়েটা তোমাকে কিছু বলেছে কিনা।

আমি বললাম, অত দূর থেকে কথা বলবে কি করে! এই রুমালখানা সে ছুঁড়ে দিয়েছে। আর হাতের ইশারা করে কি সব বোঝাতে চেয়েছে—আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

—কী ইশারা করেছে।

—প্রথমে হাতের একটা আঙুল ঠোঁটে রাখলো। পরে হাত দু'টো বুকে চেপে ধরলো।

আজিজা বলে, বুঝেছি, ও তোমাকে চুম্বন জানিয়েছে। আর তার হৃদয় তোমাকে সমর্পণ করতে চেয়েছে। তুমি নিশ্চিত থাক, আজিজ আমি তোমাদের দু'জনের মিলন ঘটিয়ে দেব। এখন দিন দুই তুমি বিশ্রাম করো। তারপর আবার তোমাকে আমি পাঠাবো সেখানে।

আজিজার কোলে মাথা রেখে আমি তার অনেক আদর সোহাগ খেলাম। নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে সে আমাকে আশ্বস্ত করতে থাকলো। দু'দিন পরে বিকেলে সে নিজে হাতে আমাকে সাজালো। দামী পোশাক পরলো। আতর ছড়ালো শরীরে।

বললো, যাও। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবে। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো।

বাগিচায় ঢুকে সেই চবুতরায় বসে অধীর আগ্রহে বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে থাকি। এক এক মুহূর্ত মনে হয় এক এক যুগ। একটু পরে জানালা খুলে যায়। সেই মৃগনয়না ষোড়শী। এক হাতে আয়না আর অন্য হাতে একখানা রুমাল। রুমালখানা তিনবার ভাঁজ করলো

আবার খুললো। রুমাল সুদ্ধ হাতখানা একবার উপরে একবার নিচে উঠাতে নামাতে থাকে। আয়না দিয়ে তিনবার আমার মুখে আলো ফেলে। এর পর গায়ের জামাটার আস্তিন গুটাতে গুটাতে ধবধবে ফর্সা বাহুমূল পর্যন্ত উন্মুক্ত করে দেখায়। সব শেষে ডান হাতের পাঁচটা আঙুল প্রসারিত করে বুকের ওপর চেপে ধরে। এর পর জানালা বন্ধ করে দেয়।

আমি কিছুই বুঝতে পারি না। ছুটে বাড়ি আসি। আজিজাকে সব ইশারাগুলো দেখাই।

আজিজা বললো, এর অর্থ হলো, পাঁচদিন পরে সে তোমাকে তার হৃদয়ের কথা বলবে। ওদের বাড়ির কাছাকাছি একটা কাপড় রং করার দোকান আছে, সেখানে তুমি অপেক্ষা করবে।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠি, তুমি ঠিকই বলেছ আজিজা। ওদের বাড়ির কাছেই একটা জহুরীর দোকান আছে। জামাকাপড় রং করে। কিন্তু আজিজা, পাঁচটা দিন তাকে না দেখে আমি বাঁচবো কি করে?

আজিজা বলে, ভালোবাসা বড় বিষম বস্তু। কোনও কোনও সময় বছরের পর বছর তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়। তবে দেখা মেলে। তোমাকে মাত্র পাঁচটা দিন অপেক্ষা করতে হবে, পারবে না? মনটা একটু শক্ত কর, সোনা, অত অধৈর্য হলে কি চলে? ওঠ, একটু কিছু মুখে দাও। শরীরে বল পাবে।

কিন্তু আমার মুখে কিছু রুচে না। কিছুই খেতে পারি না। সারা রাত এক ফোঁটা ঘুমাতে পারি না। এই প্রথম অনুভব করতে থাকলাম ভালোবাসার কি বিষম জ্বালা।

এই পাঁচটা দিনের অসহনীয় প্রতিটি মুহূর্ত আমার পাশে পাশে থেকে আজিজা আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে। সে ঋণ আমি কোনওদিন ভুলবো না।

পাঁচদিন পরে সে আমাকে গরম জল করে দিলো, আমি হামামে গিয়ে ভালো করে গোসল করলাম। নিজে হাতে আমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলো সে।

—যাও আর দেরি করো না। সে হয়তো এসে ফিরে যেতে পারে। তার চাঁদ মুখ দেখে নয়ন সার্থক করে এসো। রাতে ঘুমিয়ে তাকে স্বপ্ন দেখতে পারবে।

আমি হন হন করে হেঁটে চললাম। কিন্তু গিয়ে দেখি দোকানটা বন্ধ। খেয়াল হলো, আজ শনিবার—বন্ধের দিন। যাই হোক, বন্ধ দরজার সামনে রোয়াকের উপর বসে রইলাম। সন্ধ্যাবেলার নামাজের সময় হয়ে গেলো। কিন্তু তার দেখা নাই। একটু পরেই রাতের অন্ধকার নেমে আসবে। ভাবলাম, আর বিলম্ব করা সমীচীন হবে না। উঠে দাঁড়িয়ে মদ্যপ মাতালের মতো প্রায় টলতে টলতে ঘরে ফিরে আসি। আজিজাকে কোনরকমে বলতে পারি, আসেনি। দেখা হয়নি।

তারপর আমার আর চৈতন্য ছিলো না। পরদিন সকালে চোখ মেলে দেখলাম, আজিজার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সারা রাত তুমি ঘুমাওনি?

—কি করে আর ঘুমাই বলো! তুমি যা ভুল বকেছো, আমার তো ভয়ই লেগে গিয়েছিলো।

আমি বললাম, কিন্তু সে এলো না কেন আজিজা?

—এও ভালোবাসার একরকম পরীক্ষা। সত্যিই তুমি তাকে ভালোবাস কিনা।

এবং তার জন্যে কতটা ধৈর্য তোমার আছে সে পরীক্ষাও সে করে নিলো। যাই হোক, আজ বিকেলে আবার তুমি বাগিচায় গিয়ে বসো। দেখবে, নতুন কোনও ইশারা জানাবে।

বিকেলে যথারীতি আজিজা আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রওনা করে দিলো। বাগিচার চবুতরায় এসে বসে রইলাম। একটু পরে জানালা খুলে গেলো। এবার দেখলাম তার এক হাতে একটা বটুয়া এবং একখানা আয়না অন্য হাতে একটা লণ্ঠন এবং একটা ফুলদানী।

প্রথমে আয়নাখানা বটুয়ায় ভরলো। বটুয়ার দড়িটা এঁটে বন্ধ করে পিছনের দিকে ছুঁড়ে দিলো। তারপর মাথার চুলগুলো খুলে আলুথালু করে মুখটা ঢেকে ফেললো। এরপর সে ফুলগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো লণ্ঠনটা। এর একটুক্ষণ পরেই জানালা বন্ধ করে দিলো।

আমি কিছুই বুঝলাম না। হাহাকার করা রিক্ত হৃদয় তুষানলে জ্বলতে থাকলো। বাড়ি ফিরে এসে আজিজাকে বললাম।

আজিজা ব্যাখ্যা করে জানালো, আয়নাটা বটুয়ার মধ্যে ভরে পিছনে ফেলে দেওয়ার অর্থ—দিন শেষ হলে যখন রাত্রি নেমে আসবে। কালো চুলগুলো এলোমেলো করে ফর্সা মুখটা ঢাকার অর্থও ঐ একই। সূর্যের আলো যখন অন্ধকারে ঢেকে যাবে। ফুল—অর্থাৎ ফুলবাগানে মানে ঐ বাগিচায় যাবে তুমি। আর লণ্ঠন দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে, একটা আলো দেখতে পাবে। সেই আলো অনুসরণ করে গেলেই তুমি তোমার ভালোবাসার দেখা পাবে।

এবার আর আজিজার কথা আমার বিশ্বাস হয় না।—তোমার কথা মতো যাচ্ছি, কিন্তু দেখা তো হচ্ছে না।

আজিজা বললো, ধৈর্য ধরো, আবার যাও। দেখবে এবার তুমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে না।

সত্যিই সেদিন তার দেখা পাওয়া গেলো। সন্ধ্যার অন্ধকার সবে ঘনিয়ে এসেছে। বাহারী সাজে সেজেগুজে বাগিচার সামনে আসতেই দেখি সদর ফটকটা খোলা। ভিতরে ঢুকলাম। অদূরে একটা ঝাঁপড়া গাছের নিচে একটা চিরাগ জ্বলছিলো। আলোটা লক্ষ্য করে চলতে থাকি। আলোটাও চলতে থাকে। এইভাবে এক সময় এসে ঢুকলাম এক বিশাল জলসাঘরে।

দরজা জানালায় দামী রেশমী পর্দা। মেজেয় পারস্য গালিচা। উপর থেকে ঝুলছে বিরাট বিরাট ঝাড়বাতি। টেবিলে নানারকমের বাদশাহী খানাপিনা। একপাশে ফরাশের ওপর রাখা নানা দেশের নানা জাতের বাদ্য যন্ত্র। কিন্তু ঘরে কেউ নাই। একেবারে জনমানবশূন্য। ফাঁকা। শুধু আমি একা বসে রইলাম। ভাবছি, এই বুঝি সে আসবে, এই বুঝি তার পায়ের শব্দ শুনলাম। কিন্তু না। পুরো তিনঘণ্টা কেটে গেলো। খিদেয় পেট জ্বলছে। সামনে লোভনীয় খানাপিনা। আমার প্রিয় আঙুর। কিন্তু খাই কি করে। যার আমন্ত্রণে এসেছি, তারই দেখা নাই। কিন্তু কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়। পেটে ক্ষিদে আর সামনে খাবার রেখে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। খান কয়েক পিস্তার বরফী তুলে নিয়ে খেতে থাকলাম। ওফ, কি অপূর্ব স্বাদ! এমন জিনিস তো আগে কখনও খাইনি। কতগুলো খেয়ে ফেলেছিলাম বলতে পারবো না। এক সময় দেখলাম রেকাবীখানা খালি হয়ে গেছে। কিন্তু খিদে একটুও কমলো না। এর পর রসালো 'বাক্‌কালাবাহ' গুলো একে একে সব গলাধঃকরণ করে নিলাম। তখন আমাকে খাওয়ার নেশায় পেয়ে গেছে। সফেদ হালওয়ার রেকাবীও শূন্য হয়ে গেলো। এর পর আমি মোরগ-মোসল্লাম-এর দিকে নজর দিলাম। এক এক করে চারটেই সাবাড় করে ফেললাম। সবগুলো খাবারই অপূর্ব স্বাদের। যেখানে যা ছিলো সব চেটেপুটে খেয়ে পেটটা বেশ ভরে গেলো। ঝারি থেকে পেয়ালা পেয়ালা সরাব ঢেলে নিয়ে এক এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিতে থাকলাম। ধীরে ধীরে মাথাটা ভারি হয়ে আসতে থাকে। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে। জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করি। কিন্তু ঘুম আমাকে রেহাই দিলো না। কার্পেটের উপর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এর পর আর বলতে পারবো না, সারা রাতে কিছু ঘটেছে কি না। যখন ঘুম ভাঙ্গলো, দেখলাম জানালা দিয়ে সোনালী রোদ এসে পড়েছে আমার মুখে। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমি রিক্ত মেজের উপরে শুয়ে আছি। সারা মেজেয় নুন ছড়ানো। কাঁটার মতো বিঁধছে। কে যেন পেটের উপর রেখে গেছে এক রাশ কয়লায় গুঁড়ো। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এদিক ওদিক ভালো করে দেখলাম। নাঃ, কেউ কোথাও নাই। সারা শরীর রী রী করতে লাগলো। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজের হাত কামড়াতে লাগলাম। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি ফিরে এসে আজিজার কাছে আছাড় খেয়ে পড়ি।

আমার ঐ কিম্ভুত কিমাকার চেহারা দেখে ভীতচকিত আজিজা আমাকে টেনে তোলে, কী সোনা, একি দশা হয়েছে তোমার! কেউ কী মারধোর করেছে?

—না।

—তবে?

—জানি না। আমি ঘুমিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি কে বা কারা আমার সর্বাঙ্গে কয়লার গুঁড়ো ঢেলে দিয়ে গেছে।

আজিজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটা বলতে পারলো না?

—মেয়েটার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

—সে কি, তোমার ঘুম ভাঙ্গার আগেই কেটে পড়েছে?

আমি অধৈর্য হয়ে উঠি।—আসলে তো কেটে পড়বে। আদপেই সে আসেনি।

আজিজা আরও অবাক হয়। মেয়েটা এলো না। অথচ তুমি তার ঘরে গেলে কি করে?

আমি সব বললাম। আজিজা হতভম্ব হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে আজিজ। মেয়েটার হাতে তোমার অনেক দুঃখ আছে। নুনের অর্থ হলো—তোমার দেহের যৌবন অপুষ্ট। যে কারণে নারী সম্ভোগের কামনার চেয়ে আহার এবং নিদ্রাই তোমার কাছে প্রধান মনে হয়। আর কয়লার গুঁড়োর মানে হচ্ছে—তার চোখে তুমি অতি ঘৃণ্য। মেয়েটার ধারণা, তুমি সেখানে শুধু খাওয়া আর ঘুমানোর জন্যেই যাও। তার দেহ যৌবন বা ভালোবাসা তোমার কাছে তেমন কোনও লোভনীয় ব্যাপার নয়। সেই কারণে আমার মনে হয়, তোমার সেখানে আর না যাওয়াই উচিৎ।

আজিজার কথা শুনে আমি বুক চাপড়াতে লাগলাম। —ইয়া আল্লাহ, সব দোষ তো আমার। বুকে যদি ভালোবাসার আগুন জ্বলতে থাকে তবে কি আর নাওয়া খাওয়ার কথা মনে আসে। প্রেম এমনই বস্তু যা চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। কিন্তু আমি তো সেই তুচ্ছ রসনা তৃপ্ত করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এইভাবে প্রেমের অপমান করলে কোন প্রেমিকাই সহ্য করে না। সেদিক থেকে ওর তো কোনও দোষ দিতে পারি না। এখন আমার কী হবে আজিজা, সে যদি আমাকে প্রত্যাখান করে আমি বাঁচবো না। একটা কিছু উপায় বাৎলে দাও, সোনা।

আমার দুঃখ দেখে আজিজাও ব্যথিত হয়। এ জীবনে আমাকে ছাড়া আর কিছুই সে জানে না। আমিই তার ধ্যান জ্ঞান। আমার সুখেই তার সুখ। আমার দুঃখে সে কাতর হয়। আমাকে কী ভাবে হাসি খুশি রাখবে তার চিন্তাতেই সে পাগল। তা না হলে কোনও মেয়ে তার ভালোবাসার ধন অন্য মেয়ের হাতে তুলে দিতে পারে? আমি বুঝতে পারি, আজিজার অন্তরে তুষের আগুন জ্বলছে। কিন্তু কী অসাধারণ চাপা মেয়ে, মুখে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নাই।

—শোনো, আজিজ, আমার তরফে যতটা করা দরকার আমি করবো। কিন্তু তাতেই কী তুমি সুখী হবে? তাকে পাবে? তুমি তো জান সোনা, তোমার বাবা আমার চাচা আমার শাদীর জন্যে চেষ্টা করছেন। শুনেছি পাত্রও নাকি ঠিক করে ফেলেছেন। তাই এখন আমাকে

তারা ঘরের বাইরে বেরুতে দেবে না। তাছাড়া তোমাদের দু'জনের ভালোবাসার মধ্যে, আমি একটা ফালতু মেয়ে, আমার যাওয়াও ঠিক হবে না। আজ রাতে তুমি আবার যাও। কিন্তু সাবধান, ঘুমিয়ে পড়বে না। যদি খানাপিনার লোভ সামলাতে পারো তা হলে চোখের ঘুম ঠেকাতে পারবে। পেট ভরা থাকলে চোখে ঘুম আসেই। তাই বলছি, জিভ দিয়ে জল গড়ালেও খানাপিনা একদম ছোঁবে না। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে যাও, আমার মনে হয়, আজ রাতে সে দেখা দেবে।

সারাটা দিন ছটফট করে কাটালাম। সূর্য যখন পাটে বসলো আমি ততক্ষণে সেজেগুজে তৈরি। আমার পোশাকে আতর ছড়িয়ে দিতে দিতে আজিজা বললো, আমার কথা মনে আছে তো?

—কি কথা?

—বাঃ রে, তোমাকে বলেছিলাম না, যখন তোমার 'ভালোবাসা' তোমায় সোহাগ করবে, তখন একটা প্রেমের গান শোনাবে তাকে—

আমার মনে পড়ে। আজিজা আমাকে একটা ভালোবাসার গান শিখিয়ে দিয়েছিলো।

ওগো আমার ভালোবাসা,
ওগো আমার প্রাণ,
আমার যাহা—সকল তোমায়
করেছি তো, দান।
(আর) দেবার মতো নেইকো কিছু—
রেখে গেলাম ঋণ,
তোমার আমার মিলন হবে
শেষ বিচারের দিন॥

আজিজা বলতো, গানের গলা নাকি আমার চমৎকার।

দেখলাম, ওর দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

—আজিজা তুমি কাঁদছো।

—না না, কই না তো।

ওড়নার আঁচল দিয়ে চোখ দু'টো মুছে ফেলে বলে, ও কিছু না। চোখে একটা কুটো পড়েছে।

আমার তখন ভালোবাসার ভীমরতি ধরেছে। আজিজার অন্তরের ব্যথা তলিয়ে দেখার ফুরসৎ নাই।

আজিজা আমাকে বিদায় দিতে দিতে বলে, দেখে শুনে যেও। আর যা যা বলে দিয়েছি মনে থাকে যেন।

সেদিনও গিয়ে দেখি, সাজানো গোছানো আগের দিনের মতোই করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনও জন প্রাণী নাই। শূন্য ঘরে একা বসে রইলাম। প্রত্যাশা আজ সে আসবে। দেখা হবে। আমায় ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ এলো না। অনেক রাত অবধি একা একা বসে রইলাম। খুব খিদে পেয়ে গেলো। আর থাকতে পারলাম না। ভাবলাম খেয়ে নিই। ঘুম যদি আসে জোর করে জেগে থাকবো। এক এক করে সব খানা পিনা চেটে পুটে খেলাম। আজ আমি খুব হুঁশিয়ার আছি ঘুম এড়াতেই হবে। চোখ দু'টো বুজে আসতে চায়। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে, পায়চারী করে জেগে থাকার চেষ্টা করতে থাকলাম। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। কখন যে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, বুঝতেই পারিনি। ঘুম ভাঙতে দেখি সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু একি! আমি তো জলসাঘরে ছিলাম, এই ঘোড়ার আস্তাবলে এলাম কি করে? সারা শরীর কাদা-চোনায় মাখামাখি হয়ে গেছে। আমার পেটের ওপর কতকগুলো মাংসের হাড় আর একটা

গোলাকৃতি বল। কিছু তরকারীর খোসা, কিছু শুকনো শুটি, দু'টো দিরহাম আর একখানা ছুরি। ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়ালাম। শুধু ছুরিখানা হাতে নিয়ে বাড়ির পথে ছুটে চললাম।

আমার সেই উদ্ভ্রান্ত চেহারা দেখে আজিজা বুঝলো, আজও কোনও অঘটন ঘটে গেছে।

—তোমাকে পই পই করে বারণ করলাম, তবু ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। কোন জবাব দিতে পারি না। আজিজা আমাকে অনেক করেই বলেছিলো, খানাপিনার লোভ করলে ঘুম এড়াতে পারবে না। আমার নিজের সর্বনাশ আমি নিজেই করছি। তার জন্যে কাকে দোষ দেব। আজিজা আমাকে ভালো পরামর্শই দিয়েছিলো। কিন্তু আমি তা মানিনি। তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবার তা-ই হয়েছে।

আজিজা আমার কাছে এসে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, তুমি ভীষণ বোকা। এখনও বুঝতে পারছো না মেয়েটা কি বোঝাতে চায়?

আজিজার প্রশ্নের জবাবে গতরাতের সবই খুলে বলতে হলো।

আজিজা শুনে কপাল চাপড়াতে থাকলো—তোমাকে তো আমি তোতাপাখির মতো পড়িয়ে দিলাম, সোনা, যত লোভই হোক, খানা খাবে না, মদ ছোঁবে না। তা আমার বারণ শুনলে না কেন?

আমি চিৎকার দিয়ে উঠি।—যা হবার তো হয়ে গেছে। এবার বলো, কি করবো? তাকে না পেলে আমি মরে যাবো।

আজিজা বলে, ঐ গোল বলটার মানে হচ্ছে—তোমার ভেতরটা ফাঁপা বেলুনের মতো, অন্তঃসারশূন্য। শুধু হাওয়া ভরা। না আছে কোনও কামনা, না আছে কোন বাসনা। ঐ শব্জীর খোসাগুলো তোমার অপদার্থতার প্রতীক। আর ঐ শুকনো শুটিগুলো দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে—তোমার প্রাণের সব রং রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভালোবাসার নাম গন্ধ নাই। আর ঐ মাংসের হাড়গুলো দেখে আমি ভয় পেয়েছি—বলতে আমার গা শিউড়ে উঠছে।

আমি অধৈর্য হয়ে চিৎকার করি, কিন্তু ঐ ছুরিটা। তার কথাতো বললে না? তাছাড়া ঐ দু'টো দিরহামই বা কী?

আজিজা এক মুহূর্ত চুপ করে কি যেন ভাবে। তারপর বলে, শোনো, সোনা, ছুরিটার ইঙ্গিত বড় মারাত্মক। ঐ দু'টো রূপোর দিরহাম তার দু'টো চোখের প্রতীক। ওটা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে, চোখের কসম খেয়ে সে বলছে ফের যদি তুমি ওখানে গিয়ে খানাপিনা করে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো তোমার গলা সে কেটে দেবে।

আজিজার কথা শুনে অঝোরে কাঁদতে থাকি।—আমার কোনও পথ নাই। কিন্তু তাকে না পেলে আমি বাঁচবো কি করে?

আজিজা বললো, যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নাই। এবার নিজেকে একটু শক্ত কর। যা বলি মন দিয়ে শোনো। আজ সারাটা দুপুর তুমি ঘুমাও। তারপর বিকালে উঠে গোসল করে খানাপিনা করে নেবে পেট ভরে। আমি নিজে হাতে খানা পাকাচ্ছি। তুমি যা যা খেতে ভালোবাসো সেই সব খানা তৈরি করবো। খেতে রুচি হবে। পেটভরে খেয়ে গেলে খিদেও পাবে না। আর পেটে খাবার না পড়লে ঘুম আসবে না। তাছাড়া দুপুরে যা ঘুমাবে তারপর বড় একটা ঘুম পাবেও না।

আজিজার কথায় অনেকটা ভরসা হলো। বললাম, আমার মাথার কসম খেয়ে বলছি, এবার আর কোনও নড়চড় হবে না। যা যা বলবে, দেখে নিও, অক্ষরে অক্ষরে মানবো।

সারাটা দুপুর খুব ঘুমালাম। আমার শিয়রে বসে আজিজা হাওয়া করতে থাকলো। মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আমি আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠে শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হতে থাকে। হামামে গিয়ে গোসল করে নিই। আজিজা নতুন সাজ-পোশাক এনে দেয়। এই পোশাক পরে আজিজার সঙ্গে আমার শাদী হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে বিয়ে ভেঙে গেছে।

আমি বললাম, এ পোশাক কেন আনলে আজিজা? এতো আমার শাদীর পোশাক?

—কিন্তু শাদী তো আর হ'লো না!

—হ'লো না মানে—আর কি হবে না?

আজিজা মাথা নত করে মৃদু কণ্ঠে বলে, হবে না কেন? কিন্তু তখন কি আর এই পোশাকের দরকার হবে? শাহজাদীর সঙ্গে শাদী হবে, সাজপোশাকও বাদশাহী বাহারী হতে হবে।

আমি বলি, কেন তোমার সঙ্গে হবে না?

—আমার শাদী অন্য পাত্রের সঙ্গে ঠিক করছেন চাচা। তোমার সঙ্গেই তো একবার ঠিক হয়েছিলো। কিন্তু তুমি তো করছো না। চাচা আর কি করবেন। বাধ্য হয়েই অন্য পাত্রের সন্ধান করেছেন।

আমি আর কোনও জবাব দিতে পারি না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। আজিজা আমাকে আদর করে বলে, তাতে কি হয়েছে আজিজ। শাদী যার সঙ্গেই হোক, আমি তোমারই ছিলাম, তোমারই আছি, তোমারই থাকবো। আর তুমিও যাকেই চাও আমার তাতে কিছু যায় আসে না। এ জীবনে তোমাকে না পেলেও শেষ বিচারের দিন মিলন আমাদের হবেই।

টস টস করে দু-ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। আজিজা বলতে থাকে, আজ তোমার পরম লগ্নের দিন। চোখের জল ফেলে তোমার অভিসারের পথ পিছল করে দেব না। যাও, আজ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। প্রিয়ার আদর সোহাগে ভরে যাবে তোমার দেহ-মন। এতদিনের সাধ তোমার পূর্ণ হবে আজ। কিন্তু আজিজ সেই ভালোবাসার গানটা তাকে শোনাতে ভুলো না। তোমার মতো গানের গলা ক'জনের হয়। দেখবে, গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে আরও কত আদর সোহাগ করবে তোমায়। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙছি, সোনা তোমরা যেন ক্রৌঞ্চ মিথুন হয়ে সারাজীবন এক হয়ে থাকতে পার।

আজিজার মতো প্রেমিকা এ সংসারে হয় না। নিজের ভালোবাসার পাত্রকে সাজিয়ে গুছিয়ে অন্য মেয়ের বাসরশয্যায় পাঠাতে পারে ক'টা মেয়ে? আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বললাম, মনে আছে আজিজা। আজ যদি তার দেখা পাই, যদি মিলন হয়, তবে শোনাবো তোমার সেই গান।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। বাগিচার সদর ফটকের সামনে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো সেই আলো। নিশানা ধরে এগিয়ে যেতেই পৌঁছে গেলো সেই সাজানো গোছানো জলসা ঘরে। সেই একই দৃশ্য। খানাপিনা সব যথাযথ রাখা আছে। নাই শুধু কোন জনপ্রাণী। আজ আমি আটঘাট বেঁধে এসেছি। কিছুতেই খাবার-দাবার স্পর্শ করবো না। আর ঘুম আজ আমার ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারবে না।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি গভীর হতে থাকে। আমি ঠায় চুপচাপ বসে কড়ি কাঠ গুনছি। পাশের টেবিলে খানাপিনা সাজানো আছে। ভুলেও ওদিকে নজর দিচ্ছি না। যদিও আজ আমি খেয়েই এসেছি, পেট বেশ ভর্তিই আছে। তবু বলা যায় না, বাদশাহী খানাপিনা, লোভ যদি না সামলাতে পারি। ধীরে ধীরে চারদিক নিঝুম নিশুতি নিস্তব্ধ হয়ে আসে। আমি গুন গুন করে গান গাই। মাঝে মাঝে রাত জাগা পাখির কর্কশ আওয়াজে চমকে উঠি। বাগিচার কোথাও হয়তো কোনও জানোয়ার-এর পায়ের শব্দ কান পেতে শুনি।

এইভাবে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরও কেটে যায়। এবার ধীরে ধীরে হতাশা গ্রাস করতে

থাকে। না, সে বুঝি আর আসবে না। আমার এত তোড় জোড় এত আশা আকাঙ্ক্ষা সব বুঝি ভেস্তে গেলো। প্রিয়া আমার প্রতি বিরূপ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এই সময়ে কিছু নারী কণ্ঠের কলহাস্যে চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখি দশটি সুদর্শনা সখী পরিবৃতা হয়ে সে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হলো, দশটি উজ্জ্বল তারার মাঝখানে সে এক আসমানের চাঁদ। গাঢ় নীল রঙের রেশমী শাড়ি পরেছে। সারা অঙ্গ তার জহরতের গহনায় মোড়া। আরো কাছে এসে সে মুচকি হেসে বললো, বাঃ, চমৎকার। কিন্তু আজ তোমার ঘুম গেলো কোথায়, সাহেব। দিব্যি তো জেগে আছো দেখছি।

তোমার আগমনের খবর পেয়ে সে পালিয়েছে, সুন্দরী।

সখীদের ইশারা করতেই তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। সে আমার পাশে এসে বসলো। দু'হাতে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। গভীর আশ্লেষে চুম্বন করলাম তাকে। সেও প্রতিদান দিলো। তারপর কার্পেটের উপর শুয়ে পড়লাম দু'জনে। সারাটা রাত ধরে সে আমাকে আদর সোহাগ করতে থাকলো। আমার এত দিনের কামনা বাসনা আজ চরিতার্থ হলো। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে সুখ নিদ্রায় ডুবে গেলাম।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখি, অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমি বললাম, আজ চলি।

সে বললো, দাঁড়াও দু'টো কথা বলি। সারা রাত তো মত্ত হয়েই কেটেছে। আলাপ পরিচয় কিছুই হয়নি। তা সাহেবের নাম কি?

—আমার নাম আজিজ। তোমার?

—আমার নাম দুনিয়া। আমার বাবা কর্পূর আর প্রবাল দ্বীপের সুলতান। আজ তোমাকে একটা জিনিস উপহার দেব। ভালো করে রেখো। আমাদের প্রথম মিলনের স্মৃতি চিহ্ন। আমি যখন তোমার কাছে থাকবো না, এই রুমালখানা আমার কথা মনে করিয়ে দেবে তোমায়। সূক্ষ্ম কাজ করা আছে এক কোণায়। আমার নিজের হাতের কাজ।

এই বলে সে একখানা রেশমী রুমাল আমার হাতে তুলে দিলো।

আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখি আজিজা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। আমাকে দেখে সে হাসলো।

—একি তোমার চেহারা হয়েছে, আজিজা।

—ও কিছু নয়, আজিজ। আমি বেশ আছি। তোমার খবর কি বলো?

গত রাতের সব ঘটনাই যথাযথ খুলে বললাম তাকে। রুমালখানা ওর হাতে দিয়ে বললাম, প্রথম মিলনের প্রীতি উপহার।

আজিজা উৎফুল্ল হলো না। কোন উপদেশ দিলো না। শুধু বলতে পারলো, তুমি সুখী হয়েছ আজিজ? তোমার মুখে হাসি দেখে যেতে পারলেই আমার অনেক পাওয়া হবে।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করি, কোথায় যাবে, আজিজা?

—না মানে, চিরকালই তোমাদের এখানে থাকবো নাকি? বিয়ে শাদী করবো না? শ্বশুরঘর যাবো না?

—ওঃ, এই কথা।

—আমি হতাশ বলি, আমাকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে না, আজিজা?

—আমি যেখানে যাবো সেখানে কষ্ট বলে কিছু নাই।

আজিজার এই হেঁয়ালী ভরা কথার কোন অর্থ করতে পারলাম না। চেষ্টা করলাম না। কারণ তখন আমি সুখ, স্বপ্নে বিভোর।

আজিজা বললো, আমার সেই গানটা ওকে গেয়ে শুনিয়েছিলে?

—ও—ই—যাঃ! একদম ভুলে গেছি।

—ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক, আজিজ। যাক, আজ যদি মনে থাকে, গেয়ে শুনিও। ভালোবাসার মন্ত্র দিয়ে গড়া ঐ গানখানা। শুনলে, সে গুণী মেয়ে, নিশ্চয়ই তারিফ করবে।

বুঝলাম আমার এই ভুলে যাওয়ায় আজিজা আহত হয়েছে। স্বাভাবিক ভালোবাসার পাত্র যদি কোনও অনুরোধ রাখতে ভুলে যায় তা অমার্জনীয় অপরাধ। আজিজার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তা তো ভালোবাসা ছাড়া আর কোনও নামেই ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি ওর হাত দুটো ধরে কাছে টেনে নিলাম। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করে চুমু খেয়ে বললাম, আমাকে মাফ করো সোনা, আজই তাকে শোনাবো তোমার গান।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় বাগিচায় ঢুকতেই দেখি দুনিয়া নিজে দাঁড়িয়ে আছে। আমার হাত ধরে জলসাঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। সেদিন রাতে আমরা একসঙ্গে বসে খানাপিনা করলাম। আদর সোহাগে আমার হৃদয় মন সে ভরিয়ে দিতে থাকলো। আমার জীবনে তখন যৌবনের ঢল নেমেছে। সেই অবিশ্রান্ত বর্ষণে সব ভেসে একাকার হয়ে গেলো। সে রাতে আর আমরা ঘুমালাম না। একে অন্যের দেহ আশ্রয় করে সারাটা রাত মধুর করে কাটিয়ে দিলাম।

ভোরবেলা বিদায়ের পালা। হঠাৎ আমার মনে পড়লো আজিজার সেই ছলছল চোখ। আমার গানটা তাকে শুনিও। আমি বললাম, বিদায় নেবার আগে তোমাকে একটা গান শোনাবো। এই আমার স্মৃতি উপহার। যদি কোনওদিন তোমার কাছে নাই থাকতে পারি, তবে কখনও বৃষ্টিঝরা দিনে বাতায়ন পাশে বসে আমার কথা ভেবো—আর আমার এই গানখানি গুণগুণ করে গেও, প্রিয়তমা।

ওগো আমার ভালোবাসা,
ওগো আমার প্রাণ,
আমার যাহা—সকল তোমায়
করেছি যে দান।
(আর) দেবার মতো নেইতো কিছু—
রেখে গেলাম ঋণ
তোমার আমার মিলন হবে
'শেষ বিচারের দিন॥'

গান শেষ হতে না হতেই দুনিয়া চিৎকার করে ওঠে, থামো। এ গান তুমি কোথায় পেলে? কে শিখিয়েছে তোমাকে?

আমি হতবাক। নিছকই একটা প্রেম-সঙ্গীত। তা শুনে দুনিয়া কেন এত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বললাম, গানটা আমার চাচার মেয়ে আজিজা আমাকে শিখিয়েছে।

—সে তোমাকে ভালোবাসে?

আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু সে আরও জোরে চিৎকার করে ওঠে, বলো, চুপ করে থেক না।

আমি ঘাড় নাড়লাম।—হ্যাঁ সে আমাকে প্রাণাধিক ভালোবাসে।

—তবে আমার সঙ্গে ঢং করতে এসেছো কেন? একটা মেয়ের জীবন বরবাদ করে দিয়ে আর একটা মেয়েকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এসেছো?

—আমি ছিনিমিনি খেলতে আসিনি সোনা, আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি।

—ছাই করেছো। সে-ও তোমাকে প্রাণ দিয়েই ভালোবাসে। তার জীবনটা নিয়েই বা এই রকম জুয়া খেললে কেন? বেচারী বোধ হয় আর এতক্ষণে বেঁচে নাই।

আমি শিউড়ে উঠি, বেঁচে নাই? কে বলেছে তোমাকে?

—কে আবার বলবে। আমি লিখে দিতে পারি সে আর জীবিত নাই। তুমি কি কিছুই বোঝ না, হাঁদা? গানটার মধ্যেই তো তা পরিষ্কার বলা আছে। যাও, বাড়ি যাও। দেখগে, সে আর এতক্ষণে এ জগতে নাই। ছিঃ ছিঃ আজিজ, একটা মেয়ের নিষ্পাপ ভালোবাসা পায়ে দলে কি করে পারলে তুমি আমার কাছে আসতে?

আমি মাথা নিচু করে বসে থাকি। তুমি প্রেমের অযোগ্য পাত্র। তোমার সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নাই। তুমি নিজে হাতে তোমার প্রেমাস্পদকে খুন করেছো। প্রেমের যে মর্যাদা দিতে পারে না, তার কাছ থেকেই আমিই বা কি পাবো। তুমি যাও, বিদায় হও। তার কবরে একটা ফুলের তোড়া দিয়েও অন্তত তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর গে।

আমি ধীর বিষণ্ণ পায়ে বাড়ি ফিরি। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই চমকে উঠি। একটু করুণ কান্নার রোল উঠেছে। অনেক লোকজন জড় হয়েছে।

দুনিয়া ঠিকই বলেছিলো। আজিজা আর ইহজগতে নাই। আজ ভোরেই সে মারা গেছে। জহর খেয়েছিলো।

আমার সারা শরীর অবশ অসাড় হয়ে আসে। কান্নায় মুখ ঢেকে বসে পড়ি। একি করলাম আমি। সব-সব আমার দোষ!

সারাটা বছর ধরে শুধু কাঁদলাম। সেই প্রথম অনুভব করলাম, আমিও আজিজাকে ভালোবাসতাম। সে-ভালোবাসার আগুনের শিখা কোনদিনই লেলিহান ছিলো না। মৃদু মিষ্টি মোমের আলোর মতো সে প্রেম ছিলো স্নিগ্ধ-সুরভিত। সে যতদিন ছিলো—তার অভাব অনুভব করতে পারিনি। আজ তার অভাবে বিশ্ব সংসার আমার কাছে বিষবৎ মনে হতে থাকে—জীবনের আর কোনও দাম নাই—বাঁচার আরও কোনও মানে নাই।

তবু বাঁচতে হয়। তাই আবার রোজগারের ধান্দায় বেরিয়ে পড়ি। দেশে দেশে ঘুরি। মন ভোলানো হরেক রকম বাহারী জিনিস ফিরি করে ফিরি। কিন্তু আমরা মন কিছুতে ভোলে না। অহরহ সেই এক চিন্তা—আজিজা। আমার নয়নের মণি—আমার কলিজা।

আজিজের কাহিনী শুনে তাজ অল মুলুক মুগ্ধ হয়ে বলে, দোস্ত আজিজ, দুনিয়াকে দেখার বড় বাসনা হচ্ছে। মেয়েটির রূপ যেমন বুদ্ধিও তেমনি অসাধারণ।

আজিজ বললো, তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

তাজ তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো। আমি ভাবছি, যাবো সেই কর্পূর প্রবাল দ্বীপ। দেখবো সেই সুন্দরীর রূপ। আঁজলা ভরে পান করবো তার সুধা।

আজিজ বলে, খুব ভালো কথা। কিন্তু সে মেয়ে কি সহজে বশে আসবে?

—দেখা যাক। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা—তোমাকে আমি ছাড়বো না। আমার জিগরী দোস্ত। তোমার সঙ্গী সাথী সওদাগরদের বলে দাও, এখানেই তুমি আমার আশ্রয়ে থাকবে। ওরা যেন চলে যায়।

প্রাসাদে ফিরে এসে শাহজাদা তাজ অল মুলুক প্রথমে বন্ধু আজিজের বসবাসের জন্য একটি মনোরম প্রাসাদতুল্য ইমারতের বন্দোবস্ত করে দিলো। দরবারে তাকে একটা উঁচু পদে বহাল করে মোটা বেতনের ব্যবস্থা করলো। চাকর-নফর দাস-দাসী যা প্রয়োজন সব দেওয়া হলো তাকে।

এরপর তাজ এসে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে দেয়। সারা প্রাসাদে হৈচৈ পড়ে যায়। শাহজাদার গোঁসা হয়েছে। কেন, কেউ বলতে পারে না। তবে এটা ঠিক, রাগ করে দরজা বন্ধ করেছেন তিনি। এক সময়ে সুলতান সুলেমানের কানে গেলো, শাহজাদা নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছেন।

সুলেমান উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, কেন? কি চায় সে?

তাজ-এর ছোটবেলা থেকেই এই এক কায়দা। কোনও কিছু চাইতে হলে সোজাসুজি সে চাইবে না।

উজির বলে, সে জানিনা জাঁহাপনা, আপনি তো জানেন সে কারো সঙ্গে কোনও পরামর্শ করে না।

সুলতান বললো, ঠিক আছে, আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলবো।

সুলতান বুঝতে পারে পুত্র এক অদর্শনা নারী প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাকে আর কিছুতেই নিরস্ত করা যাবে না। তবু উজিরকে দিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখেন। উজির বলে, আমি শাহজাদাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি। সাত সমুদ্র তের নদী পারের দেশ কর্পূর—প্রবালদ্বীপ।

সুলতান প্রশ্ন করে, সে মেয়ের সন্ধান তাকে দিলো কে?

—এক বিদেশী সওদাগর। বয়সে সে নবীন, শাহজাদারই উমর হবে। সে তার মনে রং ধরিয়েছে। দুনিয়ার মতো সুন্দরী কন্যা নাকি দুনিয়ায় নাই। তার চোখ, তার নাক, মুখ-এর গড়ন নিখুঁত। দুধে-আলতা গায়ের রং।

সুলতান সুলেমান শাহ চিন্তিত হয়। —এমনি দূর দেশ থেকে পাত্রী না আনলে ছেলের পছন্দ হবে না? আমাদের আশেপাশের সুলতান বাদশাহের ঘরে কি পরমা সুন্দরী মেয়ে জন্মায় না?

—খুব জন্মায়, জাঁহাপনা। আপনি হুকুম করুন, এখুনি গণ্ডাখানেক এনে হাজির করছি। বাজিয়ে দেখে নেবেন। যদি কেউ খুঁত ধরতে পারে, নাকে খত দিয়ে চলে যাবো। কিন্তু ছেলের যদি দিল্ বাঁধা পড়ে থাকে অন্যখানে, তা সে যাকেই এনে দিন, মনে ধরবে না।

সুলতান তাজকে ডেকে বললো, মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ বাবা। মেয়ের কোনও অভাব নাই। যদি বলো, আমি পাঁচশো সুন্দরী বাঁদী এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। তার মধ্যে দুনিয়ার সেরা সুন্দরী মেয়ে অনেক পাবে। তাও যদি পছন্দ না হয় আশেপাশের সুলতানদের ঘরে অনেক সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাবে। তাদের কাউকে পছন্দ কর।

কিন্তু তাজের সেই এক গোঁ। দুনিয়া ছাড়া দ্বিতীয় মেয়ে সে দেখবে না।

সুলতান ভাবে, বেশি পিড়াপিড়ি করলে ছেলে বিগড়ে যেতে পারে। উজিরকে বললো, আর ঘাঁটিয়ে লাভ নাই। তুমি কর্পূর-প্রবাল দ্বীপে যাত্রা কর।

ছেলেকে বললো, তোমার আব্দার আমি কখনও অপূর্ণ রাখিনি, বাবা। তাই আজ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্পূর প্রবাল দ্বীপের সুলতানের কাছে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি। সে যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তা আমি সহ্য করবো না। তার সলতানিয়ৎ গুঁড়ো করে দেব।

তাজ-এর বন্ধু আজিজকে ডেকে সুলতান জিজ্ঞেস করলো, কর্পূর-প্রবাল দ্বীপে যাওয়ার পথ ঘাট তোমার জানা আছে?

আজিজ জানায়, সে সেখান থেকেই আসছে। পথ ঘাট সব তার নখ-দর্পণে।

সুলতান সুলেমান বললো, তাহলে তোমাকে বাবা, উজিরের সঙ্গে যেতে হবে।

আজিজ মাথা হেঁট করে সম্মতি জানায়, যো হুকুম, জাঁহাপনা।

সুলতান উজিরকে বলে, আর দেরি করে লাভ নাই, উজির। চটপট রওনা হয়ে পড়। কর্পূর-প্রবাল দ্বীপে পৌঁছাতেই অনেক দিন কেটে যাবে।

দু এক দিনের মধ্যে নানা সুন্দর সুন্দর মূল্যবান উপহার উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে উজির রওনা হয়ে যায়। সঙ্গে চললো আজিজ। অনেক খাল বিল নদ-নদী মরুপ্রান্তর পার হয়ে অবশেষে একদিন কর্পূর-প্রবাল দ্বীপের সীমানায় এসে তাঁবু গাড়লো। অশ্বারোহী দূত গেলো সুলতানের দরবারে। সুলতান সাদরে অভ্যর্থনা করে উজিরকে নিয়ে এলো প্রাসাদে।

উজির সুলতান সুলেমান শাহর উপহার সামগ্রী তুলে দেয় সুলতানের হাত।—সুলতানের তরফ থেকে আমি আপনাকে সুক্রিয়া জানাচ্ছি, জাঁহাপনা। আপনি গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

প্রচলিত রীতি অনুসারে শাহী মেহমানদের বিশ্রামের আয়োজন করা হলো। একটি বিলাস বহুল সুরম্য প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা হলো। খানা পিনা আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখলো না সুলতান। এইভাবে পাঁচ দিন বিশ্রাম নেবার পর আলাপ আলোচনা শুরু হয়। এই এখানকার নিয়ম।

ছয় দিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে উজির হামামে গিয়ে ভালো করে গোসল সারলো। তারপর বাদশাহী উজিরের সাজ পোশাক পরে দরবারে এসে নিজের পরিচয় পত্র পেশ করে সুলতানের দর্শনপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো। ক্ষণকাল মধ্যে সুলতানের উজির নিজে এসে অভ্যর্থনা করে দরবার কক্ষে নিয়ে গেলো।

উজির যথারীতি কুর্নিশ জানিয়ে সুলতান সমীপে তার সুলতান সুলেমান শাহর প্রস্তাব পেশ করলো।

সুলতান ক্ষণকাল মৌন থেকে চিন্তা করলো। চোখে মুখে অজানা আতঙ্কের রেখা ফুটে উঠলো। কি জবাব দেওয়া যায় কিছুই ভাবতে পারে না। সুলতান সুলেমান সবুজ শহরের মহাপ্রতাপান্বিত বাদশাহ। তাকে অখুশি করার মতো কোনও কথা বলতে গেলে ভাবতে হবে বৈকি! সে তার মেয়েকে খুব ভালো করেই জানে। এর আগেও কয়েকবার তার শাদীর উদ্যোগ করা হয়েছিলো। কিন্তু মেয়ের সেই এক গোঁ, শাদী সে করবে না।

ভেবে কোনও কুল-কিনারা করতে পারে না। অবশেষে প্রধান খোজাকে ডেকে বললো, শাহজাদী দুনিয়াকে নিয়ে এসো।

খোজা কুর্নিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়। সুলতান বলে আমার কন্যা দুনিয়া বড় এক রোখা। তার জেদ কিছুতেই সে শাদী করবে না। আশে পাশের সুলতান বাদশাহের শাহজাদারা তার জন্যে পাগল। কিন্তু কিছুতেই তাকে রাজি করানো যাচ্ছে না। সে আসুক, আপনার সামনেই আমি মহামান্য সুলতানের প্রস্তাব জানাবো। দেখুন, কি জবাব দেয়।

খোজা সেই গেলো তো গেলই। আর ফেরে না। খোজাকে খোঁজার জন্য আর একজন খোজা পাঠানো হলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে সে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো, জাঁহাপনা, আমাকে তাড়া করেছেন।

সুলতান বুঝতে পারে না, তাড়া করেছে? কে তাড়া করেছে?

—জী হুজুর, শাহজাদী।

—দুনিয়া?

—জী হুজুর।

—কেন?

খোজা বলে, আমি তাকে গিয়ে বললাম, সুলতান আপনাকে ডেকেছেন। তা তিনি আসছিলেন। সাজ গোজ সব হয়েই গিয়েছিলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, কেন ডেকেছে জানিস?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনার শাদীর লেগে সবুজ শহরের সুলতান উজির এসেছেন।

এই কথা শুনা মাত্র, কি বলবো, জাঁহাপনা, কোমর থেকে ইয়া বড় ছুরি বের করে আমাকে তেড়ে এলেন তিনি, বাঁদর আগে বলিসনি কেন? আমি তোর নাক কান সব কেটে নামিয়ে দেব। এই না শুনে, আমি চোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়েছি। শাহজাদী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকলেন, আব্বাজানকে গিয়ে বল, ফের যদি আমার শাদীর কথা তোলেন তিনি, আমি আত্মঘাতী

হবো। আমার হুবু স্বামী আমার মুখের সুরৎ দেখতে পাবে না। আর তাতেও যদি বাধা দেন, পাহারা বসিয়ে রাখেন আমার চারপাশ, আমি বাসর ঘরে স্বামীকে খুন করবো। তারপর নিজের কলিজায় ছুরি বসাবো। বোরখা খুলে আমার চেহারা দেখার সুযোগ দেব না তাকে।

এই সময়ে রজনী অবসান হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

একশো একত্রিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার কাহিনী শুরু হয়।

শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

শুনুন জাঁহাপনা দরবারের সবাই খোজার সেই বর্ণনা শুনলো।

দুনিয়াজাদের পিতা সুলতান উজিরের উদ্দেশে বললো, আপনি নিজের কানেই সব শুনলেন। এবার বলুন আমার কি কর্তব্য?

উজির এর কি পরামর্শ দেবে? সুলতান বললো, আপনি মহানুভব সুলতান সুলেমান শাহকে আমার অন্তরের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিবেদন করুন, আমার কন্যার বড় এক রোখা স্বভাব। শাদীর কথা শুনলেই তার মাথায় খুন চেপে যায়। আমিও জোর জবরদস্তি করি না। আমার এক মাত্র সন্তান এই দুনিয়া। যে কোন কারণেই হোক, তাকে যদি হারাই, সে শোকতাপ আমি সহ্য করতে পারবো না। আল্লাহ আপনাদের যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন করুন, এই প্রার্থনা করি।

আর দেরি না করে আজিজকে নিয়ে উজির সবুজ শহরের পথে যাত্রা করলো।

সুলতান শুনে ক্রোধে কাঁপতে থাকে। এত বড় স্পর্ধা। আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। দরবারের সব আমির ওমরাহদের জরুরী তলব পাঠানো হলো।

সুলতান হুকুম জারি করলো কর্পূর-প্রবাল দ্বীপ আক্রমণ করতে হবে। আর তিল মাত্র দেরি না করে সেনাবাহিনী প্রস্তুত কর।

উজির উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সুলতানের দরবারে—আমার একটা আর্জি আছে জাঁহাপনা, কর্পূর-প্রবাল দ্বীপের সুলতানের কোন দোষই নাই। তিনি আমাদের আদর যত্নের কোন ত্রুটি রাখেননি। সুলতানের প্রস্তাবে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। কিন্তু বাধ সেধেছে তাঁর অবাধ্য কন্যা শাহজাদী দুনিয়া। সুলতানকে হুমকি দিয়েছে, ফের যদি তার শাদীর ব্যবস্থা করা হয়, তবে সেই বরকেই সে খুন করবে, পরে নিজেও আত্মঘাতী হবে। তার বাবাও আপনার মতোই ক্রুদ্ধ হয়েছেন মেয়ের উপরে।

সুলতান সুলেমানের রাগ কিছুটা প্রশমিত হয়। হুঁ, উজির যথার্থই বলেছে। দুনিয়ার পিতার সলতানিয়ৎ আক্রমণ করা সঙ্গত হবে না। কারণ সুলতানের কোনও দোষ নাই। আর দুনিয়ার প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্য যদি আক্রমণ চালানো হয়, ফল শুভ হবে না। দুনিয়া আত্মঘাতী হলে তাজ বিরূপ হবে।

সুলতান পুত্র তাজ অল মুলুককে ডেকে সব বললো। তাজ বললো, আমি কিন্তু আশা ছাড়তে পারছি না জাঁহাপনা। আপনি আমার ওপর সব ব্যাপারটা ছেড়ে দিন। আমি তাকে রাজি করাবোই।

সুলতান আঁতকে ওঠে, সে কি। তুমি যাবে নাকি সেখানে? শুনেছি সে পুরুষ বিদ্বেষী। তোমাকে দেখামাত্র হত্যা করবে।

তাজ বলে, যায় যদি প্রাণ যাবে তারই হাতে। সে মৃত্যুই আমার বেহেস্ত সমান। কিন্তু আমি বলছি, সেসব কিছুই হবে না।

সুলতান আতঙ্কিত হয়। তুমি আমার সবে ধন নীলমনি। তোমাকে হারালে আমি বাঁচবো কি করে? আর এই বিশাল সলতানিয়াতেরই বা কি হবে?

তাজ পিতাকে আশ্বস্ত করে বলে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, জাঁহাপনা, নিজেকে রক্ষা করার মতো অস্ত্র বিদ্যা আমার রপ্ত করা আছে। আর তাছাড়া আমি তার কাছে শাহজাদার পরিচয় নিয়ে যাবো না।

সুলতান অবাক হয়ে বলে, তবে কি ভাবে যাবে?

—আমি এক সওদাগরের ছদ্মবেশ নেবো।

সুলতান বললো, যাই কর বাপু, উজির আর আজিজকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। বিদেশ বিভুঁই—একা একা তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার মন চায় না।

তাজের ইচ্ছায় আর সুলতানের হুকুমে প্রায় লক্ষাধিক দিনারের দামী দামী মনোহারী বিলাস সামগ্রী সাজ পোশাক আর রেশমী কাপড় কেনা হলো। সুলতান খাজাঞ্চীখানা থেকে নগদ একলক্ষ সোনার মোহর অনেক হীরে জহরৎ সঙ্গে দিলো। দিনক্ষণ দেখে উট, খচ্চরের পিঠে সওদা পত্র বোঝাই করে মার কাছে বিদায় নিতে যায়। মা আশীর্বাদ করে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলো। প্রাসাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা চোখের জলে ফেলতে থাকে। তাজ সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিলো।

উজির, আজিজ এবং তাজ অল মুলুক প্রায় একমাস চলার পর একদিন কর্পূর-প্রবাল দ্বীপে এসে পৌঁছয়। আজিজের কথা মতো একটা সরাইখানায় ওরা আশ্রয় নেয়। তাজ-এর হৃদয় আনন্দে দুলে ওঠে। এই সেই কর্পূর-প্রবাল দ্বীপ—তার মানস প্রিয়া-বাসভূমি। সেই রাতটা সরাইখানায় কাটাবার পর পরদিন একটা বিরাট বাড়ি ভাড়া করা হলো। তার পর কাপড় পট্টির দোকানে দোকানে ঘুরে দোকানীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে থাকলো।

উজির বললো, দেখ বাপু, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

দুজনে সমস্বরে প্রশ্ন করে কী?

—দোকানে দোকানে ঘরে সওদা না বেচে বরং এক কাজ কর। শহরের মাঝখানে এক চৌরাস্তার মোড়ে এক বিরাট দোকানের সামনে বসবে। খদ্দের যারা আসবে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। আর আজিজ থাকবে পিছনে। সে শুধু তোমার হুকুম মতো কাপড় চোপড় বের করে দেবে। আমার মনে হয়, তোমাদের দুজনের যা সুন্দর চেহারা, দু-একদিনের মধ্যে দোকানের পশার জমবে। শাহজাদা তাজ আর আজিজ দুজনেই তারিফ করে বলে, চমৎকার হবে।

তাজ আর আজিজ শহরের কাপড় পট্টির দোকানগুলো যখন ঘুরে দেখছিলো, সবাই ওদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। এমন সুন্দর চেহারার যুবক তারা কমই দেখেছে। একজন দোকানদার স্বাগত জানিয়ে বলে, দয়া করে একটু পায়ের ধুলো দিন।

উজির বলে, আমরা আপনার খদ্দের হতে আসিনি শেখ!

—তাতে কি হয়েছে। আসুন ভিতরে আসুন। আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে বিদেশী মুসাফির।

উজির ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিকই ধরেছেন। ছেলে দুটোর লেখাপড়া শেষ হয়েছে এখন ওদের একটা ব্যবসা বাণিজ্যে স্থিতি করে দেব বলে দেশ ভ্রমণে বেড়িয়েছি। অনেক দেশের অনেক শহর ঘুরেছি। শেষে আপনাদের শহরে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। ভাবছি যদি একটা মনমতো দোকান ঘর পাই, ভাড়া নিয়ে একটা কাপড়ের দোকান করে দেব। তা শেখ সাহেব, তেমন কোন দোকান ঘর এখানে মিলতে পারে? দিতে পারেন কোনও সন্ধান?

দোকানী বললো, সানন্দে। আপনারা বিদেশী। একটু সাহায্য না করলে যে মহাপাতক হবো। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, ঐ চৌমাথার মোড়ে একটা প্রকাণ্ড দোকান বিক্রি আছে। দোকানের মালিক বৃদ্ধ হয়েছেন। সন্তান বলতে একটি মাত্র কন্যা। তার শাদী হয়ে গেছে। জামাই খানদানী ঘরের ছেলে। দোকানে বসা তার ইজ্জতে বাধে। তাই বৃদ্ধ ঠিক করেছেন দোকান পাট বিক্রি করে দিয়ে মক্কা চলে যাবেন।

চৌমাথার দোকান ঘরটা বেশ বড়সড়। এক রকম সাজানো-গোছানই আছে। তার সামান পত্র এনে তুললে একেবারে জমজমাট হয়ে উঠবে। সেই দিনই দরদাম ঠিক হয়ে গেলো। বৃদ্ধ আর দেরি করতে চায় না। উজিরের হাতে চাবি তুলে দিয়ে বললো, আজ থেকে এ দোকান আপনার। আপনার ছেলেরা, আল্লাহর দোয়ায়, দোকানের চেহারা চরিত্র পালটে দিতে পারবেন।

পরদিন থেকে দোকান সাজাবার পালা শুরু হলো। বাহারী বাহারী নানা রঙের সাজ পোশাক সামনে এনে ঝুলিয়ে দিলো। কয়েক দিনের মধ্যে নতুন নতুন খদ্দেরে জমজমাট হয়ে উঠলো।

অল্প দিনের মধ্যেই দোকানের খ্যাতি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। খানদানী ঘরের নারী পুরুষরা এসে ভিড় জমাতে থাকে। দামী দামী বাহারী সাজ পোশাক কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু যার জন্য দোকান খুলে বসা,—সেই দুনিয়া এক দিনও এলো না।

তাজ অল-মুলুক দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ে। তবে কি এত উদ্যোগ আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? রাতে শুয়ে ঘুমাতে পারে না। খানা পিনা কিছুই ভালো লাগে না।

এমনি ভাবে দিন যায়। দোকানে বসে আজিজের কাছে মনের দুঃখ জানায় তাজ। মাঝে মাঝে খদ্দের আসে। আবার চুপ করে যায়।

একদিন দোকানে বসে, তখন খদ্দের ছিলো না, দুই বন্ধু প্রাণের কথা বলে চলেছে। এমন সময় এক বৃদ্ধা মহিলা এসে ঢুকলেন। সাদর অভ্যর্থনা করে বসালো তাজ। বলুন, সাহেবা, আপনার জন্য কি করতে পারি?

বৃদ্ধা প্রশ্ন করে, আচ্ছা বেটা, তোমরা এদেশের মানুষ?

—জী না। আমরা বিদেশী। এর আগে কখনও এ দেশে আসিনি। এই প্রথম এসে, কিছুদিন হলো দোকান খুলেছি। ব্যবসা করাই বড় কথা নয়, আপনাদের দেশে এসে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করাই আসল উদ্দেশ্য।

বৃদ্ধা বলে, শুনে খুব খুশি হলাম বেটা। তা কি ধরনের সাজ পোশাক এনেছো। সবই তো তোমাদের নিজের মুলুক থেকে আনা? আমাকে দু' চারটে বাহারী কাপড়-এর থান দেখাও তো।

—জী হাঁ। সবই বাহারী। এ দোকানে সাধারণ মানুষের জন্যে কোন সাজপোশাক আমরা রাখিনি। সবই বাদশাহ, সুলতান, আমির ওমরাহদের বিবি কন্যাদের জন্যে।

বৃদ্ধা বেশ একটু অহঙ্কার নিয়েই বলে, আমিও কিনতে এসেছি শাহজাদী দুনিয়ার জন্যে। তার কয়েকটা সেমিজ কামিজ বানাতে হবে।

তাজ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। বৃদ্ধা যেন কার নাম করলো? —কি বললেন? শাহজাদী দুনিয়া?

—হ্যাঁ গো বাছা, সুলতান শাহরিমানের কন্যা দুনিয়া।

তাজ আজিজকে বলে, সব চেয়ে সেরা কাপড়ের থানগুলো বের করে দাও।

সবুজ শহরের তাঁতীদের খ্যাতি অনেক কালের। তাদের হাতে বোনা রেশমী কাপড় দেশ বিদেশে চালান যায়। সূক্ষ্ম কারুকর্ম অসাধারণ। চোখে না দেখলে বলে বোঝান অসম্ভব।

তাজ অব মুলুক একটার পর একটা থান খুলে মেলে ধরে। বৃদ্ধার চোখ আনন্দে নেচে ওঠে। এমন বাহারী কাপড় অন্য কোন দোকানে সে দেখেনি।

বৃদ্ধা বলে, দেখে তো সবই নিতে ইচ্ছে করছে। সব গুলোই চমৎকার।

তাজ বলে, তা নিন না। যেটা যেটা পছন্দ, বলুন আমি বেঁধে দিচ্ছি।

—তাতো বুঝলাম বাছা, কোনটার কি দাম বলো, শুনি।

তাজ বলে, দামের জন্যে কেন চিন্তা করছেন। শাহজাদীর পছন্দ হয় কিনা দেখুন। তিনি যদি মেহেরবানী করে গ্রহণ করেন, আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

বৃদ্ধা বলে, পছন্দ না হওয়ার কিছু নাই বেটা। এমন রংদার বাহারী কাপড় সারা শহর খুঁজলে একটা মিলবে না। তাছাড়া আমি পছন্দ করে নিয়ে গেলে দুনিয়া না বলতে পারবে না। ওকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি।

তাজ বলে, দাম কিছু দিতে হবে না দাদীমা, আপনি আমার দোকানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন তাতেই সব পাওনা শোধ হয়ে গেছে।

—ওমা সে কি কথা গো। আমি বুড়ি থুড়ি মানুষ। কচি ডাগর ডাঁসা রূপসী সুন্দরী হলেও না হয় কথা ছিলো। এক কথায় এত দামের সওদা দিয়ে দেবে আমায়?

তাজ হাসে, আপনার কি ধারণা ডাগর ডাঁসা রূপসী মেয়ে দেখলেই আমরা ভুলে যাই।

—তা তোমাদের এই কাঁচা বয়েস এখন, ডবকা মেয়েদের দিকেই তো নজর থাকা স্বাভাবিক।

—না দাদীমা, অমন ছোট নজর আমার নয়। পথ চলতি অল্প বয়েসী মেয়েছেলে দেখলেই জান খলখল করে উঠবে সে বান্দা আমি নই। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।

খুশিতে ডগমগ করে ওঠে বৃদ্ধা। —বেটা তোমার কি নাম?

—আমার নাম তাজ-অল-মুলুক।

বৃদ্ধা অবাক হয়। —এ রকম নাম তো সুলতান বাদশাহর ঘরে ছাড়া হয় না।

কি বলবে তাজ ভেবে পায় না। আজিজ এগিয়ে এসে বলে, মানে—বাপ-মায়ের খুব আদরের দুলাল তো, শখ করে ঐ ধরনের শাহজাদাদের নাম রেখেছিলো। কানা ছেলের নাম কি পদ্মলোচন হয় না? সেই রকম আর কি—

আহা অমন কথা বলো না, বাছা। ষাট ষাট কানা হতে যাবে কেন। সুলতান বাদশাহ ঘরে না জন্মালে কি হবে, সুরৎখানা কিন্তু শাহী। এমন বনেদী চেহারা কিন্তু হাল ফিল উঠতি বড়লোকদের ঘরে জন্মায় না, বাবা। রক্তে বংশের ধারা থাকা চাই।

বৃদ্ধার পছন্দ করা কাপড়গুলো আজিজ বাণ্ডিল বেঁধ খচ্চরের পিঠে তুলে দিলো। বৃদ্ধা অনেক ধন্যবাদ জানাতে জানাতে চলে গেলো। বলে, আবার আসবে।

বৃদ্ধার হাতে বাণ্ডিল দেখে দুনিয়া ছুটে আসে। —দেখি দেখি, দাদীমা, কি আনলে?

দাদীমা বলে, সে ভারি রংদার কাপড় এনেছি। তোমার কতকগুলো সেমিজ কামিজ বানাতে হবে।

কাপড়গুলো দেখে দুনিয়া আনন্দে লাফিয়ে ওঠে বৃদ্ধাকে জাপটে ধরে বলে, কোথায় পেলে দাদীমা? এ তো আমাদের দেশের কাপড় না!

—তুমি ঠিকই ধরেছো, বাছা। এ কাপড় বিদেশী সওদাগরের ছেলেরা নিয়ে এসেছে। বাজারের ভিতরে কি প্রকাণ্ড দোকান সাজিয়ে বসেছে। দেখলে তাক লেগে যায়।

দুনিয়া বলে, কত দাম বলেছে?

—দামের কথা জিজ্ঞেস করতেই বাছা আমায় তেড়ে এলো। বলে কি—শাহজাদী পরবেন, তার আবার দাম নেব কি? তিনি যদি মেহেরবানী করে পরেন, তাই আমার অনেক পাওয়া হবে। শাহজাদী আমার দোকানের খদ্দের শুনলে, আমির ওমরাহদের বাড়ির বিবি-মেয়েরা ভিড় করে আসবে।

দুনিয়া রাগ করে। সে হয় না। দাদীমা! তুমি তাকে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে বলো, আমি বলে দেব, আব্বাজান তাকে ইনাম দিয়ে দেবে।

তা বাছা, মন্দ বলো নি, হিসেব করে দাম দিতে গেলে বেচারীকে ছোট করা হয়।

সুলতান যদি ইনাম দেন নেবে না কেন? দেখে মনে হলো খানদানী ঘরের ছেলে। যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি তার আদব কায়দা—

দুনিয়া থামিয়ে দিয়ে বলে, থাক থাক, আর অতো ব্যাখান করে কাজ নাই। মুখে যে প্রশংসা ধরে না। কী ব্যাপার লোকটা গুণ করেছে নাকি তোমাকে?

তোমার মুখে কোন রাখ-ঢাক নাই বাছা। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, বুড়ি হয়ে মরতে বসেছি, অমন চাঁদপনা নওজোওয়ান ছেলে আমাকে গুণ করতে যাবে কেন? তার রূপের জেল্লা দেখলে তোমাদের মতো কচি ডাঁসা মেয়েরাই তাকে ভোলাত চাইবে।

—দাদীমা? তোমার কি মাথা টাথা বিগড়ে গেছে? কি সব আবোল-তাবোল বকছো?

—মাথা আমার ঠিকই আছে, বাছা তাকে একবার দেখলে তোমার মাথাই ঠিক থাকবে না।

দুনিয়া ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ঠিক আছে, তুমি এখন যাও, লোকটাকে খবর দিয়ে এসো। সে যেন আব্বাজানের সঙ্গে দেখা করে ইনাম নিয়ে যায়।

—সে আর বলতে, বাছা। আমি এখুনি যাচ্ছি তাকে খবর দিতে।

তাজ দেখলো, বৃদ্ধা আবার এসেছে। আজিজকে বললো, ভালো দেখে শরবৎ আর মিঠাই-এর ব্যবস্থা কর। বুড়িটাকে জপাতে হবে।

বৃদ্ধাকে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালো তাজ অল মুলুক। শরবৎ আর মিঠাই খেতে দিলো। বৃদ্ধা বলে, একটা সুখবর আছে, বেটা। শাহজাদী বলে পাঠিয়েছে, তুমি সুলতানের সঙ্গে দেখা করবে। সুলতান তোমাকে ইনাম দেবেন।

তাজ ভাবে, বড়শির চারে মাছ লেগেছে। বৃদ্ধাকে বললো, আমি আপনার শাহজাদীকে একখানা খৎ লিখে দিচ্ছি। দয়া করে ওকে পৌঁছে দেবেন?

—কেন দেব না বাছা।

আজিজ কাগজ দোয়াত কলম এনে দেয়। তাজ লিখলো ঃ

আপনাকে চোখে দেখিনি। কিন্তু আপনার সুবাস আমি আঘ্রাণ করেছি। আপনার রূপের ছটায় আমার চোখ ঝলসায়নি, তবে দিল-এ বিজলি হেনেছে। আপনি আমার কল্পলোকের মানসী। আপনাকে আমি কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার হাজার বছরের পরিচয়। আপনাকে দেখেছি আমি প্রস্ফুটিত পদ্মের কোরকে। লাল গুলাবের পাপড়িতে। দূর আশমানের সিতারায়। অশান্ত সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে। আর দেখেছি বসন্ত মর্মরে হিল্লোলিত দ্রাক্ষাকুঞ্জের লতায় পাতায়। রক্তবর্ণ সূর্যাস্তের বিলুপ্ত শোভায়—

আজ এই পর্যন্ত

আপনার বান্দা তাজ-অল-মুলুক।

ভাঁজ করে আঠা দিতে মুখ এঁটে বৃদ্ধার হাতে তুলে দিলো তাজ। সেই সঙ্গে এক হাজার দিনারের একটা থলে।

বৃদ্ধা বিস্ফারিত চোখে মোহরগুলো দেখে বলে, এ গুলো কি হবে বাবা?

—এ আপনার সেলামী।

বৃদ্ধা ফিরে আসতেই দুনিয়া জিজ্ঞেস করে, তোমার সওদাগর ছেলে কি বললো, গো দাদীমা?

চিঠিখানা বাড়িয়ে দিয়ে বৃদ্ধা বলে, মুখে কিছু বলেনি। লিখে দিয়েছে। জানিনা কি লিখেছে, পড়ে দেখো।

ক্ষিপ্রহাতে ছোঁ মেরে চিঠিখানা তুলে নিয়ে দুনিয়া পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে চোয়ালের হাড় ফুলে ওঠে, ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। ঠোঁটে দাঁতের কামড় বসিয়ে ফুঁসে ওঠে, এত বড় স্পর্ধা!

বৃদ্ধা ভয় পায়। —কেন কি হয়েছে, বাছা।

—কি হয়েছে? কি হয়নি তাই বলো।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করে, কেন খুব চড়া দাম হেঁকে বসেছে বুঝি?

দুনিয়া চিৎকার করে ওঠে, দামের জন্যে দুনিয়া থোড়াই পরোয়া করে। খায় তো কাপড় বেচে—তা বামন হয়ে চাঁদে হাত? তোমার গুণধর সওদাগর নন্দন আমাকে প্রেম পত্র লিখেছেন।

—এ্যাঁ! বলো কি? এত বড় আস্পরদা। এতো ভালো কথা নয় মা। তুমি খুব কড়া করে জবাব লিখে দাও। আমি গিয়ে তুড়ে দিয়ে আসবো।

দুনিয়া বলে, চিঠির জবাব দিলে আরো লাই পেয়ে যাবে না?

—না না, চিঠিই লিখে ওকে বুঝিয়ে দাও, এ বড় শক্ত ঘাঁটি। অত সহজে ডাল গলবে না।

দুনিয়া লিখতে বসে ঃ

আহাম্মকরা নিজেকে পির পয়গম্বর ভাবে। মূর্খের অশেষ দোষ। তারা নিজের দাম কষতে জানে না। বাঁদরের হাতে কলাই শোভা পায়। গলায় মুক্তোর মালা পরালেও বাঁদর বাঁদরামীই করে।

অসভ্য জানোয়ার লোককে কি করে শায়েস্তা করতে হয়, আমার খুব ভালো করে তালিম নেওয়া আছে। শুধু একটা কথা বলে রাখি, আশমানের সিতারা আসমানেই থাকে—থাকবে। মুদিখানায় নেমে আসবে না। আগুনে হাত দিলে হাতখানা যাবে। ক্রুশে বিদ্ধ করে যাদের মারা হয় তারা সবাই যীশুর মতো নিষ্পাপ নয় এই কথাটা মনে রাখলে খুশি হবো।

চিঠিখানা নিয়ে বৃদ্ধা ছুটতে ছুটতে তাজ-এর দোকানে আসে। বলে, শাহজাদী জবাব দিয়েছেন।

তাজের হৃদয় দুলে ওঠে। কিন্তু পড়তে পড়তে মুখের চেহারা পাল্টে যায়। বিষাদে ভরে ওঠে মন।

—আমাকে ধাঁতানী দিয়েছে। ক্রুশে গেঁথে মারবে বলে শাসিয়েছে। তা মারুক। মরতে আমি ভয় পাই না। এই দুর্বিষহ জীবন রাখার চেয়ে মরা অনেক ভালো। তাতে চিরকালের মতো শান্তি আসবে। এ চিঠিরও জবাব দেব আমি। তাতে যা নসীবে আছে—হবে।

বৃদ্ধা বলে, তুমি ঘাবড়াবে না, বাছা। আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমার যাতে না কোন ক্ষতি হয়, আমি দেখবো। লেখো, জবাব লিখে দাও।

আজিজকে ডেকে তাজ বলে, দাদীমাকে এক হাজার দিনারের একটা তোড়া দিয়ে দাও। আর আমাকে এনে দাও দোয়াত কলম। আমি জবাব লিখবো।

"তুমি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়েছো, সুন্দরী। কিন্তু ও ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপে না। তুমি ভোগ বিলাসিনী নারী। তোমার বেঁচে থাকা আর সুখ সম্ভোগ করাই বড় কথা। কিন্তু আমি উদ্দাম, উচ্ছল। আমি নির্ভয়। প্রেমিক। মৃত্যুকেও পরোয়া করি না। তুমি যদি আমাকে ক্রুশে গেঁথেই মারো, তাতেও আমার চিত্ত বিচলিত হবে না। আমি যীশুর খ্যাতি চাই না। আমি হাসি মুখে মরবো। ভাববো, প্রেম অনেকের জীবনে নতুন বসন্ত আনে, আমার কাছে সে না হয় মৃত্যুর রূপ ধরেই এলো।"

চিঠিখানা ভাঁজ করে বৃদ্ধার হাতে দিতে দিতে তাজ বলে, আমার জন্যে আপনি কেন এত কষ্ট করছেন? জানি আমার মৃত্যু অনিবার্য। তবু এর শেষ না দেখে আমি ছাড়বো না। মৃতু যদি আসে আসুক।

বৃদ্ধা সান্ত্বনা দিয়ে বলে, ওসব আজগুবি চিন্তা ছাড়ো তো। আমি আছি তোমার কোনও ভাবনা নাই, বেটা তোমার মতো ছেলে তার কি অপছন্দ হবে? চোখে দেখেনি তাই অমন তড়বড় করছে। একবার দেখলে ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে। আমি আজ চলি। শিগ্গিরই আবার আসবো। এবার আশা করছি শুভ সংবাদই নিয়ে আসতে পারবো।

দুনিয়ার ঘরে ঢোকার আগে বৃদ্ধা তার মাথার চুলের ভাঁজের নিচে চিঠিখানা লুকিয়ে রাখলো। দুনিয়া বলে, কি গো দাদীমা, তোমার চাঁদপনা সওদাগর দুলালের খবর কি?

—কি জানি বাছা, আমার কি দরকার, তোমার চিঠি আমি তার হাতে ফেলে দিয়ে এসেছি। তারপর কিছু জানিনা। তোমাদের ব্যাপার তোমরা বোঝ গিয়ে।

দুনিয়া হাসতে থাকে। বাছাধনকে যা দাওয়াই দিয়েছি। তারপর আর রা কাড়তে হবে না।

বৃদ্ধা বলে, মাথায় বড় খুস্কি হয়েছে, বাছা। তোমার বাঁদীদের কাউকে ডাকো তো, মাথাটা একটু আঁচড়ে দিক।

বাঁদীর কি দরকার কি দাদীমা, আমিই দিচ্ছি, তুমি আমার চুল বেঁধে দিও।

দুনিয়া চিরুনী নিয়ে বৃদ্ধার চুল আঁচড়াতে বসে মাথায় চিরুনী দিতেই চিঠিখানা নিচে পড়ে যায়।

দুনিয়া চিঠিখানা তুলে নিতেই বৃদ্ধা হাঁ হাঁ করে ওঠে, ওটা আমাকে দিয়ে দাও বাছা। আমি যখন ছেলেটার দোকানে ঢুকেছিলাম তখন বোধহয় ওপর থেকে ওদের চিঠি আমার মাথায় ওপর এসে পড়ে থাকবে। পরের চিঠি খোলার দরকার নাই। দাও, ওদের জিনিস ওদের দিয়ে আসি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, দুনিয়া ততক্ষণে চিঠিখানা খুলে পড়তে শুরু করেছে।

—কি তোমার চালবাজী দাদীমা। তুমি ভারি দুষ্টু। এই শয়তান সওদাগরটি কে? কোন দেশের বাসিন্দা? আমাকে কি রকম বিদ্রুপ করেছে দেখো। বলে কিনা—আমি ভোগ বিলাসিনী নারী। এত বড় সাহস তার। আমার দেশে এসে আমাকেই অপমান। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম দাদীমা, জবাব দেওয়া ঠিক হবে না। লোকটা লাই পেয়ে যাবে। তা দেখলে তো।

বৃদ্ধা কপট ক্রোধে ফেটে পড়ে। —এত বড় শয়তান বেল্লিক তা কি করে জানবো, বেটী। আমি ভেবেছিলাম তোমার জবাব পেয়ে তার আক্কেল হবে। যাই হোক, এবার তুমি ওর পিণ্ডি চটকিয়ে একটা কড়া করে জবাব লেখো। আমি এখুনি নিয়ে যাবো। এরপর যদি তোমার কাছে ক্ষমা না চায়, দেখাবো মজা।

"শরতের ঝিকিমিকি রোদে দূর নীল গগনে এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা ওড়ে। তাদের সফেদ ডানা সূর্যের অলোয় রূপালী হয়। তারাও পাখি। আবার একটা ভাগাড়ে বুনো শেয়ালের পচা মৃতদেহ ঠুকরে ঠুকরে খায় যে শকুনগুলো—তারাও পাখি। সুতরাং মানুষের চামড়া গায়ে থাকলেই কি সব মানুষই সমান।"

চিঠিখানা বৃদ্ধার হাতে দিয়ে দুনিয়া বলে, যদি পেটে কিছু থাকে বুঝতে পারবে চিঠির মর্মকথা।

তাজ অল মুলুক চিঠির নির্মম নিষ্ঠুর ভাষায় ব্যথিত হয়। বুঝতে পারে, আর কোন আশা নাই। আজিজের দিকে চেয়ে বলে, এখন বলো, কি করা যায়। আমি আর জবাব দেবার উৎসাহ পাচ্ছি না। সব আশা ভরসার ইতি হয়ে গেছে।

আজিজ বলে, ঠিক আছে, আপনার হয়ে আমি জবাব লিখছি।

তাজ বলে, যা ভালো বোঝ কর।

"এখন আমার আল্লাহই একমাত্র ভরসা। তোমাকে যে ভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, সেই উদগ্র বাসনা নিয়ে যদি আল্লাহকে ডাকতাম, তিনি আমাকে কোলে তুলে নিতেন। কিন্তু

তুমি সামান্যা অবোধ নারী। তোমার কাছ থেকে আল্লাহ মহিমা কি করে আশা করতে পারি। একদিন, মা-বাবা আত্মীয় পরিজন, প্রিয় বাসভূমি ছেড়ে তোমার সন্ধানে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিলে। এর পর আমি যেখানে যাবো, সেখানে তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেবেন না। সেখানে সবাইকেই একদিন যেতে হয়, কাউকেই তিনি বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দেন না। তার কোলে অনেক জায়গা। দিলটা দরাজ।"

তাজ অল মুলুক পড়ে বাহবা দিলো, চমৎকার লিখেছো, দোস্ত!

দুনিয়া চিঠিখানা পড়ে বৃদ্ধার ওপর ক্রোধে ফেটে পড়ে। যত সব ফাজিল ফক্কর ডেঁপো ছোড়ার ন্যাকামী। তোমার জন্যেই, দাদীমা আমার জানটা কয়লা হয়ে গেলো। যত নষ্টের গোড়া তুমি। আমার সামনে থেকে দূর হও। আর তোমার মুখ দেখতে চাই নে আমি। তোমার যা বদ মতলব আমি বুঝতে পেরেছি, তাতে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো উচিত তোমার লাশ।

শাহজাদী ক্ষিপ্ত হলে তার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তখন সে করতে পারে না এমন কোন কাজ নাই। রাগের মাথায় মানুষও খুন করতে পারে। বৃদ্ধা দৌড়ে পালায়। ছুটতে ছুটতে চলে আসে তাজ অল মুলুকের দোকানে। তাজ তাকে আদর করে বসায়। জিজ্ঞেস করে, কি দাদীমা, কি হলো, অমন হাপাচ্ছেন কেন?

—তাড়া করেছে বাবা, তাড়া করেছে।

—কে?

—কে আবার, ঐ দুনিয়া। বেটি একেবারে রণমূর্তি ধরেছে। ক্ষেপলে আর মানুষ থাকে না। তোমার চিঠিখানা দেওয়া মাত্র তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। বলে কিনা—আমাকে কুকর দিয়ে খাওয়াবো।

তাজ প্রশ্ন করে, আসল ব্যাপারটা কি বলতো, দাদীমা? নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনও কারণ আছে। এরকম পুরুষ বিদ্বেষী নারীর কথা তো শুনিনি কোথাও। এ এক ধরনের মানসিক রোগ।

—রোগ না আতঙ্ক।

—তা আতঙ্কই এলো কি করে। কোন পুরুষের কাছে চোট ফোট খেয়েছে এর আগে?

—না বাবা, সে সব কিছু না। স্বপ্ন!

—স্বপ্ন?

বৃদ্ধা বলে, হ্যাঁ একদিন রাতে স্বপ্ন দেখার পর থেকেই ও ওই রকম হয়ে গেছে। কোনও পুরুষের নাম গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না।

তাজ কৌতূহলী হয়ে ওঠে, স্বপ্নটা কী? জানো? শুনেছো তার কাছে?

—আলবাৎ শুনেছি। তা হলে শোনো বলছি ঃ

একদিন রাতে দুনিয়া স্বপ্ন দেখছে, এক শিকারী একটা বাগানে ঢুকে গাছের তলায় পাখি ধরা জাল বিছিয়ে তার ওপর কিছু যবের দানা ছড়িয়ে রেখে গাছের আড়ালে ওৎ পেত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে এক ঝাঁক পাখি উড়তে উড়তে এসে বসলো বাগানের গাছের ডালে। তার মধ্যে দু'টি পায়রা নেমে আসে নিচে—জালের ওপর ছড়ানো যবের দানা খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে।

পুরুষ পাখিগুলোর ঢং রং কেমন যেন বাচালের মতো। তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এক সময়ে জালের ফাঁসে পুরুষ পাখিটার একটা পা আটকে যায়। অনেক টানা হ্যাচড়া করেও আর ছাড়াতে পারে না। এ দিকে মেয়ে পাখিটা ছটফট করতে থাকে। কি

করে তার সাথীকে ছাড়াবে? উন্মাদের মতো মাথা কুটতে থাকে। পুরুষ পাখিটার পাখার ঝাপটানির আওয়াজে গাছের অন্য পাখিরা চকিত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে শিকারীর ফাঁদে পুরুষ পায়রার পা আটকে গেছে। আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে তারা ঝাঁক বেঁধে আবার উড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু মেয়ে পাখিটা তার সঙ্গীকে ছেড়ে গেলো না। ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে জালের দড়ি কেটে ফেললো। ছাড়া পেয়ে শোঁ করে উড়ে গিয়ে বসলো গাছের ডালে। এ দিকে মেয়ে পাখিটার পায়ে ততক্ষণে ফাঁস আটকে গেছে। ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণে ডানা ঝাপটে পা ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু আরও কষে এঁটে যায়। পুরুষ পাখিটা কিন্তু আর নেমে এসে তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করে না। এ দিকে শিকারী দেখলো, একটা পালিয়েছে, এটাও যদি পালিয়ে যায়। ছুটে এসে পাখিটাকে ধরে খাঁচায় পুরে ফেললো। পুরুষ পাখিটা ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে।

শাহজাদী দুনিয়ার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঐ রাতেই আমাকে ডেকে সে স্বপ্নের কাহিনী শোনালো। বললো, কি সাংঘাতিক এই পুরুষ জাতটা। পশু পাখিদের মধ্যেই যদি এই রকম হয়, না জানি পুরুষ মানুষগুলো বা কেমন। তারা আরও খারাপ আরও স্বার্থপর হবে নিশ্চয়ই।

সেই থেকে মেয়ের এক আতঙ্ক ঢুকেছে মনে। পুরুষ মানুষের ছায়া মাড়াতে চায় না। শাদীর কথা শুনলে ক্ষেপে ওঠে। সে বলে, জ্ঞান থাকতে কোন পুরুষের খপ্পরে পড়তে চাই না আমি।

—কিন্তু দাদীমা, তাজ অল মুলুক বলে, সব পুরুষই এক রকম—খারাপ স্বার্থপর? আর সব মেয়েই কি ভালো—একেবারে পরের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে। তাকে একবার বলো, না—দুনিয়াতে কটা পুরুষ মানুষ দেখেছো, ভালো পুরুষেরও অভাব নেই।

কিন্তু বাবা, দাদীমা বলে, সে বুঝতে চাইবে না, তাকে বোঝাবো কি করে? সে তার গরবেই বাঁচে না।

তাজ বলে, যে ভাবেই হোক, একটি বার তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন দাদীমা। আমার বিশ্বাস, আমি তার এই খারাপ ধারণা পালটে দিতে পারবো। আপনার বুদ্ধির চাতুর্য আছে, আপনিই পারবেন।

—শোন সোনা মনি, প্রাসাদের সামনে একটা বাগান আছে,সেই বাগানের এক পাশে একটা জলসাঘর আছে। দুনিয়া ফি মাসে একবার করে সেখানে যায়। প্রাসাদ থেকে ঐ জলসাঘরে যাবার একটা গুপ্ত দরজা আছে। আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে তার যাওয়ার সময় হবে। তখন আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো সেখানে। তার সামনে হাজির করে দেব। তার পরের ব্যাপার তোমার। যদি তাকে ভোলাতে পারো সে তোমার হাতযশ। তবে আমার কি মনে হয় জানো, বাবা তোমাকে একবার সামনা সামনি দেখলে তার সব ধারণাই পালটে যাবে।

তাজ-এর কিছুটা ভরসা হয়। বৃদ্ধাকে বলে, দাদীমা চলো, তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো।

দোকান-পাট বন্ধ করে তাজ বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে তাজ আর আজিজ বাসায় আসে। উজির দানদান সব শুনে বলে ঠিক আছে, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। চলো, আগে সেই বাগানে একবার যাই। আগে নিজের চোখে দেখা যাক তারপর কি করা যায় ভাবা যাবে।

বৃদ্ধাকে বাসায় রেখে ওরা তিনজন সুলতানের প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে গিয়ে হাজির হয়। বাগানের মালি পলিত-কেশ এক বৃদ্ধ। উজির তার হাতে একশো দিনারের একটা তোড়া গুঁজে দিয়ে বলে, আমরা বিদেশী মুসাফির। তোমার এই বাগানে পুকুরের ধারে বসে একটু বিশ্রাম করতে চাই, অনেক দূর দেশ থেকে আসছি, খানা পিনা হয়নি এখনও, ভাবছি এই পুকুরের ধারে বসে সেরে নেবো।

বৃদ্ধ মালী তো গদ গদ। অতগুলো মোহর এসে গেছে হাতে। বললে, এ আর বেশি

কথা কি জনাব। যতক্ষণ ইচ্ছে, বিশ্রাম করুন। খানা পিনা সারুন। যদি দরকার হয় বলুন দোকান থেকে খানা পিনা যা দরকার আমি এনে দিচ্ছি।

—না, চাচা, তার দরকার হবে না। খানা আমরা সঙ্গেই এনেছি। শুধু একটু আরাম করে তার পরে খাবো। তা চাচা যে বাগানের ও পাশে একটা বাড়ি দেখছি, ওটা কার?

মালী বলে, জানেন না বুঝি, কত্তা, ও হলো আমাদের শাহজাদী দুনিয়ার বিলাসমহল। ওখানে উনি মাসে একবার মাত্র আসেন। খেয়াল খুশি মতো দু চার দিন থাকেন।

উজির অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, শাহজাদীর বিলাস মহল বলছ, অথচ দেখছি আগাছা জঙ্গলে ভরে আছে সামনেটা। মনে হচ্ছে, কতকাল কলি ফিরানো হয়নি। চুন বালি খসে খসে পড়ছে, ব্যাপারটা কী?

মালী বললো, আমরা হুকুমের নফর, সাহেব। তিনি না বললে আমরা কি করতে পারি। অনেকবার বলেছি বিলাসমহলে মিস্ত্রি লাগানো দরকার। কিন্তু শাহজাদী সে কথায় কান দেন না। শুনেছি তিনি নাকি এখন অসুখে ভুগছেন। তাই মন মেজাজ ভালো নাই।

উজির বলে, তাই বলে শাহজাদীর বিলাস ভবন এইভাবে নষ্ট হবে? চাচা, তুমি আর দেরি করো না মিস্ত্রিটিস্ত্রি যা দরকার এখুনি নিয়ে এসে কাজে লাগাও। এই নাও, একশো দিনার রাখো, দরকার হলে আরও দেব।

মালি অবাক হয়। এ কোন দেশের সওদাগর বাদশাহ। কথায় কথায় খোলামকুচির মতো মোহর বের করে দিচ্ছে। মোহরের তোড়াটা নিয়ে সে সাতবার সেলাম ঠুকে বলে, আমি এক্ষুণি শহরের সেরা মিস্ত্রি এনে কাজে লাগাচ্ছি, হুজুর।

উজির বলে, দেওয়াল যারা রং করবে তারা যেন ভালো আঁকিয়ে লোক হয় চাচা।

—কেমন আঁকিয়ে চান হুজুর, ঘরের দেওয়ালে এমন ছবি এঁকে দেবে, দেখে ভিরমি খেয়ে যাবেন।

উজির মজা পায়, কেন? ভিরমি খাবো কেন?

মালি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বোঝাতে থাকে, মন সব বেহেস্তের পরীর মতো ডবকা ছুঁড়িদের ঠ্যাকারের ছবি এঁকে দেবে, দেখে জিভে জল এসে যাবে, কত্তা।

—আহা-হা-হা, ওরকম আঁকিয়ে আমার দরকার নাই, চাচা। ওসব বদখদ ছবি আঁকলে চলবে না। আমি চাই এমন আঁকিয়ে—যে আঁকতে পারবে, গাছপালা নদনদী সমুদ্র আকাশ লতাপাতা ফুল—

—হ, হ, বুঝেছি জনাব, পিরকিতির দিশ্য।

—ঠিক—ঠিক বুঝেছ, চাচা।

আপনি কিছু ভাববেন না। এমন ফুল বাগিচা এঁকে দেব, ঘরে ঢুকলে ফুলের বাসে দিল মাতোয়ারা হয়ে যাবে, হুজুর।

—সাবাস্। তোমাকে দিয়েই হবে, চাচা। তা তোমার সেই বিশ্বকর্মাদের একবার ডাকো। তাদের বলে যাই, কোথায় কি করতে হবে। কি ছবি আঁকতে হবে।

মালি বলে, আপনারা একটু জিরিয়ে নিতে থাকুন, হুজুর। এই আমি—ছুটে যাবো আর দৌঁড়ে আসবো।

কোথায় কোথায় মেরামত করতে হবে, কোথায় কি রং করতে হবে—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিস্ত্রিদের বুঝিয়ে দিলো উজির। বললো, রং টং সব হয়ে যাবার পর ঘরের দুই দেওয়ালে বিরাট ছবি আঁকতে হবে। দুটো ছবিই প্রায় একই রকম হবে। একটু শুধু তফাৎ হবে ঃ একটা বিরাট বাগান। বড় বড় সব গাছ। এক জায়গায় এক শিকারী পাখি ধরা জাল পেতে গাছের গুঁড়ির আড়ালে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। জালের ফাঁসে একটা মেয়ে পায়রার পা আটকে

গেছে। সে শুধু ডানা ঝাপটাচ্ছে। আর পুরুষ পাখিটা তার চারপাশে বাঁই বাঁই করে পাক খাচ্ছে।

এই হবে এক দেওয়ালের ছবি। আর অন্য দেওয়ালের ছবিতে থাকবে ঃ পুরুষ পাখিটা ঠোঁট দিয়ে জালের দড়ি কেটে দিয়েছে। মেয়ে পাখিটা উড়ে পালাচ্ছে। আর পুরুষ পাখিটার পায়ে জালের ফাঁস আটকে গেছে। ছাড়াবার জন্যে সে আকুলি বিকুলি করছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে, কিন্তু ছাড়াতে পারছে না। গাছের আড়াল থেকে শিকারী বেরিয়ে এসে পুরুষ পাখিটাকে ধরতে যাচ্ছে।

মিস্ত্রি বললো, বহুত আচ্ছা সাহেব, খুব বঢ়িয়া করে এঁকে দেব। আপনি কাল এসে দেখবেন। দেখে আপনার কলিজা ফেটে যাবে।

উজির চমকে ওঠে, কলিজা ফেটে গেলে তো আর জানে বাঁচবো না, মিস্ত্রি। আর একটু নিরেস করে এঁকো, বাবা।

বাসায় ফিরে দাদীমাকে সব বলা হলো। দাদীমা উজিরের বুদ্ধির তারিফ করে বলে, ভারি চমৎকার ফন্দী আঁটা হয়েছে। এবারে এই এক চালেই শাহজাদী দুনিয়া মাৎ হয়ে যাবে।

কিন্তু তাজ-এর প্রত্যয় হয় না। দেওয়ালে আঁকা দুখানা ছবি দেখেই তার সব ধ্যান-ধারণা পলকে পালটে যাবে? যাইহোক, প্রত্যাশায় দিন গুণতে থাকলো। সাতদিন পরে শাহজাদী বাগিচা-বিহারে বেরুবে। সেই কটা দিন প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে। আর এই ফিকিরও যদি কাজে না আসে, তা হলে কি উপায় হবে? তাজ রাখবে কি করে এ জীবন?

সাতদিন পরের ঘটনা।

দুনিয়া ছটফট করতে থাকে। সারা প্রাসাদ খুঁজে দেখতে বলে, দেখো, দাদীমা কোথায়। দাসী বাঁদীরা এসে বলে, প্রাসাদে নাই, অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে।

শাহজাদী রেগে ওঠে, তাকে খুঁজে পেতে ডেকে আনতে বলেছি। কোথায় আছে না আছে—সে ফিরিস্তি আমাকে শোনাচ্ছিস কেন?

খুঁজতে খুঁজতে বাজারে এসে তাজ-এর দোকানে বৃদ্ধাকে পাওয়া গেলো। দুনিয়া তলব করেছে শুনে বৃদ্ধার হাসি আর ধরে না। ওই—ডাক পড়েছে। এবার বাগিচা বিহারে বেরুবে শাহজাদী। তা আমাকে সঙ্গে না নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না। আমাকে না বলে কোনও একটা কাজ করবে না। আবার রেগে গেলে আমাকেই মারতে তাড়া করবে। একেবারে জ্ঞানগম্যি থাকে না—পাগল।

তাজ বলে, আপনাকে খুব ভালোবাসে কিনা—তাই।

—ভালোবাসে না ছাই। ভালোই যদি বাসবে বাছা, তবে এতদিন ধরে তোতাপাখির মতো পড়াচ্ছি, তা আমার কথা আমলই দিচ্ছে না। আবার কি বলে শাসায়—ফের যদি তোমার নাম উচ্চারণ করি, গলা আমার কেটে দেবে।

তাজ বললো, ও নিয়ে আপনি মন খারাপ করবেন না, দাদীমা। মা মরা মেয়ে, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। তাই রাগ, অভিমান, ভালোবাসা, আক্রোশ সবই আপনাকে ঘিরে।

—তা যা বলেছ, বাবা। আমি ছাড়া আর একদণ্ড চলে না। অথচ একটু এদিক হলে খাঁড়া নিয়ে তাড়া করবে। আমি যাচ্ছি। যা বলে গেলাম, মনে থাকে যেন। আজ বিকেলে সূর্য ডোবালো আগে বাগানে গিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। তারপর আমি যেমন ইশারা করবো, তেমনি তেমনি করবে। খুব বাহারী রংদার সাজে সেজে যাবে। চেহারাখানা তো শাহজাদার মতো আছেই, তারপর সেজে গুজে গেলে আর দেখতে হবে না।

তাজ-অল-মুলুক বাদশাহী সাজ পোশাকে সেজে যখন বাগানের ফটকে পৌঁছলো তখন বিকেলের পড়ন্ত রোদের তেজ ঝিমিয়ে এসেছে। মৃদু-মন্দ দখিনা বাতাসে বসন্তের আমেজ।

বৃদ্ধ মালি এসে দরজা খুলে সেলাম করে দাঁড়ালো, আসুন জনাব ভিতরে আসুন। এ আপনার নিজের বাগিচা বলে মনে করবেন। যখন ইচ্ছে হয় এসে যতক্ষণ থাকতে চান থাকবেন।

কিন্তু বৃদ্ধা জানে না, গুপ্ত দরজা দিয়ে ততক্ষণে শাহজাদী দুনিয়া বাগানের ভিতরে এসে গেছে। দাদীমা বলে গিয়েছিলো, বাগানের একধারে একটা কেয়াগাছের ঝোপ আছে। সেই ঝোপের আড়ালে তাকে সে দাঁড়াতে বলেছে।

তাজ মালিকে বলে, আমি একটু এদিকটায় আছি। তুমি তোমার নিজের কাজে যাও চাচা। দরকার হলে ডাকবো।

মালি বলে, হুকুম করলেই বান্দা হাজির হবে হুজুর।

মালি তার নিজের কাজে চলে গেলো। তাজ অপেক্ষা করতে থাকে। একটুক্ষণের মধ্যে দাসীবাঁদী পরিবৃতা হয়ে শাহজাদী দুনিয়া ফুল বাগিচার মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সেই বৃদ্ধা দাদীমা।

—বেটি, বৃদ্ধা বলে, তোমাকে দু-একটা কথা বলতে চাই—

দুনিয়া বলে, বলো না, কি বলবে?

—আগে তোমার দাসীবাঁদীদের বিদায় কর। তারপর বলবো।

দুনিয়ার ইশরায় সবাই চলে যায়। বৃদ্ধা দুনিয়াকে নিয়ে কেয়াঝোপের দিকে এগোতে থাকে। তাজ এবার দুনিয়াকে পরিষ্কার দেখতে পায়। এমন রূপের জৌলুস এমন নিখুঁত চেহারা আগে সে কখনও দেখেনি। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। বৃদ্ধা আর দুনিয়া কিন্তু দাঁড়ায় না। ধীর পায়ে চলতে চলতে বিলাস মহলের দরজার দিকে চলে যায়।

দুনিয়া খুশিতে উপছে পড়ে, বাঃ, বাহারী রং করেছে তো মালিটা। আমাকে অবশ্য আগে কয়েকবার বলেছিলো, কিন্তু আমি তেমন গা করিনি। কি হবে এসবে? আমি তো কোনও নাগর নিয়ে রসকলি করতে আসবো না এখানে!

বৃদ্ধা বলে, তাই বলে ইমারৎটা ভূতুড়ে বাড়ি হয়ে থাকবে? সুলতান বাদশাহ বলে কথা—অমন চুনবালি খসা ইটের দাঁত-বের করা ছিরি দেখলে লোকে বলে কি!

দুজনে জলসাঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ায়। অনেকদিন বাদে এখানে এলো দুনিয়া। সেই স্বপ্ন দেখার পর থেকে সে বড় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। নিজের মহল ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা যায়-ই না। আগে বাজার করার ভীষণ শখ ছিলো। কারণে অকারণে দাদীমাকে নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতো। সাজ পোশাক, শৌখিন জিনিসপত্র সবই সে নিজে দেখেশুনে পছন্দ করতো। কিন্তু ইদানিং হাটবাজারের নাম শুনতে পারে না। ওরেব্বাস, ওখানে তো শুধু পুরুষ মানুষ কিলবিল করে। কোনও পুরুষের ছায়া মাড়াবো না আমি।

এই জলসাঘরেও সেই কারণে সে আসে না। এখানে তো আর মেয়েতে মেয়েতে মাইফেল জমে না। পুরুষ আর নারীর কামনা বাসনা মেটাবার জায়গা এই জলসাঘর। কিন্তু দুনিয়ার জীবন থেকে সে পাট বিদায় নিয়েছে।

দু-পাশের দেয়ালে চোখ পড়তেই দুনিয়া আঁৎকে ওঠে, দাদীমা—

বৃদ্ধা অলক্ষ্যে হাসে।—কি হলো, বেটা। ভয় পেলে কিসে?

—একি দেখছি, দাদীমা? এ ছবি এখানে এলো কোথা থেকে, এ তো আমার সেই স্বপ্নের দৃশ্য। হুবহু। কিন্তু এখানে দেখছি পুরুষ পাখিটার পা ফাঁসে আটকে গেছে আর মেয়ে-পাখিটাই উড়ে পালাচ্ছে। আমার স্বপ্নে তো তা ছিলো না—

—তুমি ভুল করেছিলে, মা। স্বপ্নে যা দেখেছিলে, ঘুম ভাঙ্গার পর তা গুলিয়ে গিয়েছিলো। মেয়েকে পুরুষ আর পুরুষকে মেয়ে ভেবে নিয়েছিলে। ওরকম ভুল হামেশাই হয়। সবারই হয়।

দুনিয়া গুম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। স্মৃতি হাতড়াবার চেষ্টা করে। চোখ বন্ধ করে সেই স্বপ্নের দৃশ্যটি আর একবার দেখতে চায়। কিন্তু কেমন যেন

সব ঝাপসা মনে হয়। সবটা ভালো করে মনে করতেও পারে না। ভাবে, দাদীমা বোধহয় ঠিক কথাই বলছে। স্বপ্নের সবকিছু হুবহু মনে রাখা যায় না। হঠাৎ সে বৃদ্ধাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, দাদীমা, তুমি কি সুন্দর—তুমি ঠিক বলেছ, আমি স্বপ্নে যা দেখেছিলাম ঘুম ভাঙ্গার পরে মনে তার উল্টো ছাপই পড়েছিলো। আসলে পুরুষ পাখিটাই ফাঁদে আটকে পড়েছিলো; আর মেয়ে পাখিটা পালিয়েছিলো।

একটুক্ষণ থেমে আবার বলতে থাকে, এখন আমার কি উপায় হবে দাদীমা? আমি তো কত সুলতান বাদশাহের ছেলেকে ভাগিয়ে দিয়েছি। কোন মুখে আবার আব্বাজানকে বলবো, একটা নওজোয়ান পুরুষ না হলে আমার আর চলছে না।

বৃদ্ধা বলে, আহা অত অধৈর্য হলে চলে? আপসে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কিন্তু দাদীমা, এখন ছেলেরাই বা রাজি হবে কেন? আর আমাকে বিশ্বাসই বা করবে কি করে? সবাইকে ঢাক পিটিয়ে বলা হয়েছে, কোনও ছেলের সঙ্গে আমার শাদী দিলে, আগে পাত্রের গলা কাটবো, তারপর নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দেব। এখন যদি চাউর করেও দেওয়া হয়, শাহজাদী আবার শাদী করতে রাজি হয়েছে, জানের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসবে না। ভাববে এ আবার নতুন কোনও ফন্দী।

বৃদ্ধা দুনিয়ার মাথায় হাত রাখে, তুমি কিছু ভেবো না বাছা, সব ঠিক হয়ে যাবে। চলো, বাগিচায় চলো, ফুলের বাহার দেখলে মনটা খানিক হালকা হবে।

কেয়া ঝোপের আড়াল থেকে তাজ বৃদ্ধার চোখের দিকে তাকায়। বৃদ্ধা ইশারা করে, তাদের সামনে দিয়ে সে যেন নির্বিকার চিত্তে হেঁটে বাগিচার বাইরে বেরিয়ে চলে যায়।

তাজ অল-মুলুক স্বচ্ছন্দ ভাবে সোজা সদর ফটকের দিকে এগিয়ে চলে। এদিকে সে শাহজাদী তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দেখছে, সেদিকে সে লক্ষ্যই করে না। এমনভাব—বাগিচায় অন্য কেউ আছে তা যেন সে দেখেইনি।

দুনিয়া হাঁ করে চেয়ে থাকে। তাজ-এর প্রিয়দর্শন চেহারা তাকে মুগ্ধ করে। —দাদীমা, দেখছো?

—হুঁ। ভারি অন্যায়। মালিটার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। শাহজাদী বিহারে এসেছে, আর সে ব্যাটা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। তুমি ওকে শূলে চাপাও, শাহজাদী। তবে ব্যাটার চৈতন্য হবে।

দুনিয়া বলে, আহা-হা আমি মালির কথা বলিনি, দাদীমা? বলি, দেখছো, কি সুন্দর নওজোয়ান।

বৃদ্ধা কপট ক্রোধে ফেটে পড়ে, সেই জন্যেই তো বলছি, মালিটাকে শূলে চাপাও। বাগানের দরজা হাট করে খুলে রাখে। আর সেইজন্যেই যখন তখন উটকো লোক ঢুকে পড়ছে।

দুনিয়া বলে, আহা, আস্তে বলো, সাহেব শুনতে পেলে কি ভাববে বলতো?

—ভাববে আবার কী? এতে ভাবাভাবি কি আছে। তুমি সবুর কর বাছা, আমি বাছাধনকে একটু আক্কেল দিয়ে আসি। যখন তখন শাহজাদীর বাগানে ঢোকার মজা আমি বুঝিয়ে দিয়ে আসছি।

দুনিয়া বাধা দিয়ে বলে, না, দাদীমা অমন করো না, দেখছো না কি খুবসুরৎ—মনে হয় কোনও শাহজাদা।

—শাহজাদা না হাতী। আজকালকার ফচকে ছোঁড়াগুলো বাপের ঘাড় ভেঙে কেতাদুরস্ত সাজ-পোশাক পরে নবাবী চালে রাস্তায় নামে—মেয়ে শিকার করতে।

দুনিয়ার সে কথা বিশ্বাস হয় না।—এ তুমি বাড়াবাড়ি করছো দাদীমা। আমি কি ওর সাজ-পোশাক দেখে ভুলে গেলাম—ভেবেছো। পয়সা খরচ করলে বাদশাহী সাজ-পোশাক না হয় জোগাড় করা যায় কিন্তু রূপ যৌবন? তাও কি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়? দেখছো, না, সুন্দর রূপবান পুরুষ। সারা শহর খুঁজলেও আর একটা যোগাড় করতে পারবে?

—বুঝেছি বাছা, বুঝেছি! পিরিতে মজিলে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম—

—এ তোমার ভারি অন্যায় দাদীমা। হাড়ি মুচির সঙ্গে তুলনা করলে তার?

বৃদ্ধা বিচিত্র মুখের ভঙ্গী করে বলে, আহা-হা, চুক চুক। আমি কি জানি, বাছা, পয়লা নজরেই প্রেমে পড়ে গেছ তার? তা বলো কি করতে হবে।

দুনিয়া বলে, ছুটে যাও। ফটক দিয়ে রাস্তায় নেমে গেলে আর ধরতে পারবে না। যেভাবেই হোক, ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। এমনিতে রাজি না হলে বলবে, অনেক টাকা দেব। যত চায়। ওকে না পেলে আমি আত্মহত্যা করবো।

—না না, বাছা, অমন কাজটি করো না। আমি এখুনি যাচ্ছি। যেভাবে পারি তাকে রাজি করাবোই। আত্মহত্যা করলে যে প্রাণে বাঁচবে না মা! তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে তোমার মহলে যাও। আমি দেখছি ছেলেটা কতদূর গেলো।

বৃদ্ধা আর দাঁড়ায় না। হন হন করে ফটকের বাইরে বেরিয়ে এলো। তাজ তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। বৃদ্ধা বললো, কেল্লা ফতে—তোমার সুরৎ দেখে শাহজাদী কাত। কাল তোমার বাসায় যাবো। কখন যাবো বলতে পারছি না। তবে তুমি তৈরি হয়ে থাকবে। আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

বৃদ্ধা আর অপেক্ষা করলো না। হন হন করে আবার প্রাসাদের দিকে চলে গেলো।

শাহজাদী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। বৃদ্ধা ঘরে ঢুকে বলে, দেখা পেয়েছি। কিন্তু রাজি হলো না, বাছা।

—রাজি হলো না? আমার কথা বলেছিলে?

—খুব বলেছি। সে বলে কি—আমার অনেক কাজ। মেয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা করার ফুরসৎ নাই।

শাহজাদী একেবারে নিভে যায়, তবে? তবে কি হবে দাদীমা। আমি তো আর এ জীবন রাখবো না। আমাকে খানিক জহর এনে দাও।

বৃদ্ধা বলে, ঘাবড়াও মাৎ বেটি, আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। আজকালকার ছোকরাগুলোর আর কিছু থাক না থাক, ডাঁট আর ফাটটা ষোলআনা আছে। তা আমার কাছে অত ডাঁট দেখিয়ে পার পাবে না বাছাধন। যে রোগের যা ওষুধ তা আমার ভালো করেই জানা আছে।

দুনিয়া ভেবে পায় না, বৃদ্ধা কি ভাবে তাকে রাজি করাতে পারবে। বলে, সে যদি না আসে তাকে তুমি কি পাকড়াও করে আনবে!

—দরকার হলে তাই করবো। তুমি কিছু চিন্তা করো না। ওসবের দরকার হবে না। যখন শুনবে তুমি সুলতান সারিমানের মেয়ে—কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে যাবে না? আমি তার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে এসেছি। কল সকালে যাবো। আজকের রাতটা কোনও রকমে কাটাও বাছা, কাল তোমার প্রেম-নাগরকে এনে মালা করে গলায় ঝুলিয়ে দেব। আর তা যদি না পারি তবে তাকে কড়ি কাঠে ঝুলাবো—এও বলে রাখলাম।

—না, দাদীমা, আর যাই কর, তাকে প্রাণে মেরো না। সে যদি না আসতে চায় নাই আসুক। আমার বুকের জ্বালায় আমি জ্বলে পুড়ে খাক হবো। কিন্তু ওর যেন কোনও অনিষ্ট না হয়।

—হেই শোনো মেয়ের কথা। আমি কি তাকে সত্যি সত্যিই কড়িকাঠে ঝুলাবো নাকি? কামড়াবো না, তা বলে কি ফোঁস করতেও মানা—!

পরদিন সকালে তাজ-এর বাসায় গিয়ে হাজির হলো বৃদ্ধা। হাতে তার শালোয়ার কামিজ আর বোরখার একটা মোড়ক। তাজকে বলে, নাও চটপট এগুলো পরে ফেলো। জেনানা সাজিয়ে নিয়ে যাবো তোমাকে। তা না হলে প্রাসাদে ঢোকা যাবে না। বেটা খোজা কাফুর পাহারায় বসে আছে। ওকে এড়ানো বড় শক্ত।

তাজ-অল-মুলুক মেয়ে সাজলো। বৃদ্ধা দেখে অবাক হয়। তাজের যা রূপ—চাঁদপানা সুরৎ, মেয়ের সাজেও সুন্দর দেখায়। বৃদ্ধা বলে, মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মালে ছোড়াগুলো তোমাকে আর আস্ত রাখতো না। নাও, এই চটিটা পর। পথে যখন চলবে, দেখে যেন কেউ সন্দেহ না করে। মেয়েছেলের মতো কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটবে। ঠিক এই রকম—

বৃদ্ধা বিচিত্র ভঙ্গী করে কয়েক পা হেঁটে দেখিয়ে দিলো। তাজ আর হাসি চাপতে পারে না, ঠিক আছে দাদীমা, একেবারে নিখুঁত করে হাঁটবো, দেখে নিও।

প্রাসাদের অন্দর মহলে ঢোকার মুখেই বসেছিলো খোজার সর্দার। এই—রোখো।

বৃদ্ধা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কেন, 'রোখো' কেন?

খোজা বললো, আমি পরীক্ষা করে দেখবো, তারপর ঢুকবে। সুলতানের কড়া হুকুম আছে নতুন লোক হলে—সে যেই হোক, তল্লাসি না করে ভিতরে ঢুকতে দেবে না।

—তা কি তল্লাসি করবে শুনি, খানদানি ঘরের জেনানা। গায়ে হাত দেবে নাকি।

—দরকার হলে, তাও দিতে পারি।

—ওরে আমার কে রে, গায়ে হাত দেবে। হাত ভেঙ্গে দেব না।

—সে যাই বলো, দাদীমা না দেখে ছাড়তে পারবো না।

—তাই বলে আমিরের ঘরের লেড়কী। তোমার সামনে বেহায়ার মতো বোরখা খুলে দাঁড়াবে? মান ইজ্জৎ বলে কি আর কিছু নাই।

খোজা বলে, বোরখা না খুললে হাত চালাবো। আমাকে তো বুঝতে হবে, আসলি মেয়েছেলে কিনা।

—আসলি না তো কি নকলি নাকি খোজা সর্দার। আচ্ছা তুমি কী? সারাটা জীবন আমার এই প্রাসাদে কেটে গেলো। মাথার চুল সব সফেদ হয়ে গেছে। এই বয়সে তোমার কাছে মিথ্যে বলে দোজকে যাবো?

খোজা জিজ্ঞেস করে, যাবে কোথা?

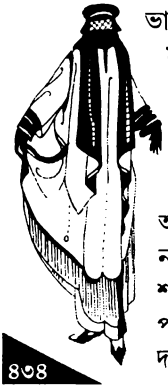

বৃদ্ধা কপালে হাত রাখে, ইয়া আল্লাহ, তাও জানো না। এক আমিরের বিবি খুব ভালো সূঁচের কাজ জানে শুনে সুলতান তাকে বলেছিলো, তার বিবি যেন মাঝে মাঝে এসে শাহজাদী দুনিয়াকে শিখিয়ে যায়। তাই তো আমি তাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম। নাও, পথ ছাড়। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। শাহজাদী বোধহয় এতক্ষণে ক্ষেপে বোম হয়ে আছে। তুমি কিছু মনে করো না মা, সর্দার আমার সঙ্গে একটু মসকরা করছে। এসো, আমার সঙ্গে এসো।

খোজা পথ ছেড়ে দেয়। বৃদ্ধা তাজকে নিয়ে হলঘরের ভিতরে ঢুকে যায়। অদ্ভুত কায়দায় তাজ পাছা দোলাতে থাকে। সদরের যত খোজা সবাই লোলুপ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এমহল ওমহল পার হতে হতে এক সময় শাহজাদীর মহলের সামনে এসে হাজির হয়। বৃদ্ধা বলে, এই যে লাল রেশমী পর্দা দেওয়া দরজা দেখছো, এই রকম ছ'খানা দরজা পার হওয়ার পর যে দরজাটা পাবে, খেয়াল রেখো, সেই দরজাই দুনিয়ার। আমি এখানে দাঁড়ালাম।

তুমি দরজাগুলো গুণতে গুণতে চলে যাও। দুনিয়ার ঘরে ঢুকে দেখবে সে এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। তার পরের ব্যাপার যা করার তুমি করবে—আমি আর বলে দেব না।

তাজ গুণে গুণে ছ'খানা দরজা ছেড়ে দিয়ে পরে দরজার পর্দা তুলে দেখলো, পালঙ্কে মখমলের শয্যায় শাহজাদী ঘুমে বিভোর। কামিজের বোতাম খোলা, পায়ের ওপরে উঠে এসেছে শালোয়ার। এলোমেলো চুলের খুচরো দু'এক গাছি এসে পড়েছে চিবুকের পাশে। তাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। জাগাবে কি জাগাবে না—ঠিক করতে পারে না। একবার হাত দিয়ে মুখের চুলগুলো সরিয়ে দিতে যায় আবার কি ভেবে হাতখানা সরিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে ওর পাশে এসে বসে। চাঁদের শোভা দেখতে থাকে। অপলক নয়নে। আপনা থেকেই মুখটা আনত হয়ে আসে। কি সুন্দর পাকা আঙুরের মতো ঠোঁট। তাজ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে। আপনা থেকে হাত দু'খানা উঠে আসে ওর দেহে।

শাহজাদীর ঘুম ছুটে যায়। কিছুই বুঝতে পারে না—স্বপ্ন না সত্যি। ঝটকা মেরে উঠ পড়তে চায়। কিন্তু তাজের বজ্রমুঠিতে বাঁধা আছে তার দেহ। দুনিয়া চিৎকার করতে চায়। কিন্তু ওর ঠোঁট চাপা আছে আর এক ঠোঁটে। তার পৌরুষের কাছে হার মানতে হয় তাকে। হার মানতে হয় সব নারীকেই।

দুনিয়া এতক্ষণে বুঝতে পারে। ওর চোখ হেসে কথা বলে, তুমি—তুমি এসেছো। আমি তো সারাটা রাত তোমার কথাই ভেবেছি প্রিয়। তোমার স্বপ্নেই এতক্ষণ আচ্ছন্ন ছিলাম। তুমি কখন এলে?

তাজও চোখেই কথা বলে, তুমি শুধু সারাটা রাত আমার কথা ভেবেছো? স্বপ্ন দেখেছ? আর আমি সারাটা বছর তোমার কথা ভেবে ভেবে সারা হয়েছি, প্রিয়া। তোমাকে পাবো বলে পাহাড় নদী প্রান্তর ডিঙিয়ে এসেছি এখানে।

দুনিয়া দু'হাত বাড়িয়ে তাজকে জড়িয়ে ধরে। তারপর ওরা কামনার বন্যায় কোথায় যে ভেসে যায় তার বিশদ বিবরণ এখানে আর নাই বা দিলাম।

পুরো একটা মাস দুনিয়ার ঘরে তাজ রয়ে গেলো। সারাদিন ধরে খায় দায়, নাচ-গান হৈ-হল্লা করে কাটায়। তাজ-এর হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। দুনিয়াও নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেয়। তাজ-আর দুনিয়া-দুই-এ মিলে এক সুখের নীড় রচনা করতে থাকলো।

এদিকে উজির আর আজিজ সারাটা রাত উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে। কিন্তু তাজ আর ফেরে না। একদিন দুদিন করে এক সপ্তাহ কেটে যায়। কিন্তু তাজ-এর কোন সন্ধান নাই। সেই বৃদ্ধাও আর আসে না। উজির ভাবলো, নিশ্চয়ই সে ধরা পড়েছে। এবং সুলতান তাকে কোতল করে ফেলেছে। ভাবতেও গা শিউড়ে ওঠে।

আজিজ বললো, একমাস বাদে আবার বিলাস মহলের ফটক খুলবে। শাহজাদী বিহারে আসবে। ততদিন পর্যন্ত কি অপেক্ষা করবেন?

অগত্যা তাই করতে হবে। না হলে এই অবস্থায় কি সংবাদ নিয়ে যাবো সবুজ শহরে কি বলবো সুলতান সুলেমানকে?

একটি মাস পুরো হয়ে গেলো একদিন। কিন্তু বিলাস ভবন-এর দরজা খুললো না। এবার উজির শঙ্কিত হলো। আর তো এখানে অপেক্ষা করা চলে না। আজিজকে বললো, চলো আজিজ, দেশে ফিরতে হবে। আর অপেক্ষা করে লাভ নাই। সুলতানের কাছে সব খুলে বলা ছাড়া গতি নাই।

আর দেরি না করে পরদিনই তারা যাত্রা করলো। কয়েক দিন পরে সবুজ শহরে পৌঁছে কাঁদতে কাঁদতে জানালো, তাজ অল মুলুক কর্পূর প্রবাল সুলতানের প্রাসাদে বন্দী হয়ে আছে। আজ প্রায় দু মাস তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সুলতান আর্তনাদ করে ওঠে। মনে হয় তার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে।

কিন্তু বসে বসে কাঁদলে তো ছেলেকে ফেরৎ পাওয়া যাবে না। একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কর্পূর দ্বীপের সুলতান ভেবেছে কি? আমার হুঙ্কারে ইস্পাহান পাহাড় কেঁপে ওঠে। আর ওই সামান্য কর্পূর-সুলতান? ওকে আমি রেণু রেণু করে গুঁড়িয়ে দেব।

উজির বললো, এখনি ব্যবস্থা কর। সেনাপতিদের খবর পাঠাও। কর্পূর দ্বীপ আক্রমণ করতে হবে। সারা শহরে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। ঢাল তরোয়াল, বর্শা, সড়কী নিয়ে বেরিয়ে এলো হাজার হাজার সৈন্য। আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে চললো।

এদিকে দুনিয়া আর তাজ সুখের সায়রে ভাসছে। একদিন তাজ দুনিয়াকে আদর করতে করতে বললে, সোনা, তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ, আমিও দিয়েছি সাধ্যমতো। কিন্তু একটা জায়গায় একটু খুঁত রয়ে গেছে। সেই জন্যেই স্বস্তি পাচ্ছি না।

—কি সোনা? তুমি যা চাও যেভাবে আমাকে পেতে চাও আমি কি সেভাবে দিতে পারছি না।

তাজ ওকে বুকে টেনে নেয়। না, সোনা, ওসব কিছু না। ওদিক থেকে আমার কোন কিছুর অভাব নাই। তুমি আমাকে দু'হাত ভরে উজাড় করে দিয়েছো। আমিই তোমার কাছে খানিকটা চেপে গেছি।

দুনিয়া অবাক হয়, সে কী?

আমি আমার আসল পরিচয় তোমাকে দিইনি।

—মানে?

আমি শাহেনশাহ সুলেমান শাহর পুত্র তাজ-অল মুলুক। সবুজ শহর এবং ইস্পাহান পর্বতমালার অধিপতি আমার বাবা। তোমার কাছে সওদাগরের ছদ্মবেশে এসেছি। অনেকদিন ধরেই তোমাকে বলবো বলবো ভাবি, কিন্তু বলা আর হয় না।

দুনিয়ার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। তুমি সুলতান সুলেমানের ছেলে। তোমার উজিরই না আমার বাবার কাছে এসেছিলো শাদীর—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাজ বলে, শাদীর প্রস্তাব নিয়ে উজিরই এসেছিলো তোমার বাবার কাছে। তোমার বাবা দারুন খাতির যত্ন করেছিলেন, কিন্তু তুমিই বেঁকে দাঁড়িয়েছিলে। মনে আছে খোজাকে খাঁড়া নিয়ে তাড়া করেছিলে!

—হুঁ। খুব মনে আছে। তখন আমার মাথায় শয়তান ভর করেছিলো। পুরুষ মানুষের নাম শুনলে খুন চেপে যেত।

তাজ বললো, আজ ক'মাস হয়ে গেলো, উজির কোন খবর না পেয়ে কি যে ভাবছে, কি যে করছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমিও এমন নেশায় মত্ত হয়েছিলাম ওদের কথা মনেই ছিলো না। কিন্তু এত দিনে কি আর তারা এখানে আছে?

—নেই। আমি দাদীমার কাছে খবর পেয়েছি। দাদীমা গিয়েছিলো। তোমাদের দোকানও আর খোলা হয় না। বাড়িও তালা বন্ধ। বাড়িওলার কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, আজ মাস-দুই তারা দেশে গেছে। বাড়ি ছাড়েনি। এক বছরের অগ্রিম ভাড়া জমা দিয়ে গেছে।

তাজ বলে, সর্বনাশ হয়েছে।

—কেন?

—যুদ্ধ অনিবার্য। উজির নিশ্চয়ই ভেবেছে তোমার বাবা আমাকে বন্দী করেছে অথবা মেরে ফেলেছে। সে দেশে গিয়ে বাবাকে বলা মানেই যুদ্ধ। আমাদের হাজার হাজার সৈন্য সামন্তের কাছে তোমার বাবা কি দাঁড়াতে পারবেন? একেবারে ছাতু ছাতু হয়ে যাবে সারা শহর।

দুনিয়া আঁৎকে ওঠে, তা হলে কি হবে?

তাজ বলে, আর দেরী নয়, সোনা, চলো আমরা সবুজ-শহরের পথে রওনা হই। আমাকে চোখে না দেখা পর্যন্ত বাবাকে কেউ থামাতে পারবে না। রাগলে সে আর মানুষ থাকে না।

এই সব কথা বলতে বলতে রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। দুনিয়া বলে, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। কালই আমরা রওনা হয়ে যাবো।

দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। এই ভাবে অনেক বেলা পর্যন্ত তারা সুখনিদ্রায় বিভোর হয়ে থাকে।

সেই দিন সকালে সুলতান সারিমানের দরবারে এক জহুরী এসে কুর্নিশ জানালো। জহুরীর হাতে একটা গহনার বাক্স। সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে বলে, পারস্য থেকে এক সওদাগর নিয়ে এসেছে, জাঁহাপনার যদি প্রয়োজনে লাগে এই ভেবে নিয়ে এসেছি।

সুলতান সারিমান দেখলো, মূল্যবান জড়োয়া গহনা। নানা রকম হীরা চুনী মুক্তো পান্না বসানো বাহারী কাজ করা। লক্ষাধিক মোহর দাম হতে পারে। সুলতান ভাবে, দুনিয়ার যদি পছন্দ হয় রেখে দেবে। খোজা সর্দারকে ডেকে বলে কাফুর, অন্দরমহলে শাহজাদীকে গহনাগুলো দেখিয়ে আয়, তার যা পছন্দ—সে যেন রেখে দেয়।

গহনার বাক্সটা হাতে নিয়ে কাফুর শাহজাদীর মহলে চলে আসে। বৃদ্ধা দাদীমা দুনিয়ার সামনে একটা গালিচা পেতে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল। কাফুর তাকে ডিঙিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে কাফুরের চোখের সামনে সারা ঘরটা যেন দুলতে থাকে। মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। চোখ দুটো হাত দিয়ে ডলে আবার দেখে, নাঃ, সে তো স্বপ্ন দেখছে না। সত্যি সত্যিই শাহজাদী উলঙ্গ হয়ে একটি ছোকরাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমে অচেতন।

এতক্ষণে কাফুরের সামনে সব খোলসা হয়ে যায়। এই জন্যেই শাহজাদী শাদীর নাম শুনলে ক্ষেপে যেত। এই জন্যেই তাকে সে একদিন ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিলো। হুঁম্, এতদিনে বোঝা গেলো, রহস্যটা কোথায়। কাফুরের মনে প্রতিশোধ প্রবৃত্তি মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে। আমাকে ছুরি নিয়ে তেড়ে এসেছিলে? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।

বাক্সটা হাতে নিয়ে, ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে কাফুর। সুলতান জিজ্ঞেস করে, কি খবর কাফুর?

—এই নিন জাঁহাপনা, আপনার বাক্স।

—কী ব্যাপার, একটাও পছন্দ হলো না শাহজাদীর?

—আমকে মাফ করবেন জাঁহাপনা, এত লোকের সামনে ঘরের কথা বলতে পারবো না।

সুলতানের ইশারায় দরবার ফাঁকা হয়ে গেলো। কাফুর গলা খাটো করে বললো, শাহজাদীর ঘরে ঢুকে দেখি একটা খুবসুরৎ নওজোয়ানকে নিয়ে শুয়ে আছে। এর বেশি আর জিজ্ঞেস করবেন না, হুজুর।

সুলতান হুঙ্কার ছাড়ে, কী? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে আমার অন্দরমহলে ঢোকে। তোরাই বা সব কি করিস। বাইরের পুরুষ মানুষ অন্দরে ঢুকলো কি করে? তুই ঠিক দেখেছিস তো কাফুর?

—হুজুর, প্রথমে আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। ভাবলাম বুঝি খোয়াব দেখছি। তারপর আবার ভালো করে দেখলাম, শাহজাদীর শরীরে কোনও বস্ত্রর নাই, জাঁহাপনা?

—থাম্, সুলতান আর সহ্য করতে পারে না, একটা নিগ্রোকে ডাক। ওদের দু'জনকেই ধরে বেঁধে যেমন করে পারে আমার সামনে হাজির করুক। আমি নিজে চোখে দেখতে চাই বেতমিজ বদমাইশটাকে।

তাজ আর দুনিয়াকে এনে দাঁড় করানো হলো সুলতানের সামনে। সুলতান চিৎকার করে উঠলো, তা হলে কাফুরের কথা মিথ্যে নয়। তরে রে শয়তান—

এই বলে সুলতান নিজে হাতেই একখানা বর্শা ছুঁড়ে মারে। কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে

দুনিয়া তাজকে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, মারতে যদি হয় দু'জনকে এক সঙ্গেই মারুন জাঁহাপনা। দোষ তো ওর কিছু নাই। আমি একে আমার ঘরে না আনলে আসতে পারে কখনও?

সুলতান কৈফিয়ৎ তলব করে, কে তুমি, কি তোমার পরিচয়?

তাজ বিনীতভাবে বলে, আমার নাম তাজ অল-মুলুক। আমার বাবার নাম সুলতান সুলেমান শাহ—সবুজ শহর আর ইস্পাহান পর্বতমালার অধিপতি। আপনার যদি ইচ্ছা হয় আমাকে হত্যা করতে পারেন। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। কিন্তু আপনার পরিণাম কি হবে একবার চিন্তা করে দেখুন। আমার বাবার বিক্রম আপনার অজানা নাই। এই কর্পূর দ্বীপ কর্পূরের মতোই উড়িয়ে দেবেন তিনি। সুতরাং আমাকে খতম করার আগে আপনার নিজের বাঁচার পথটা ঠিক করে রাখুন।

তাজের কথায় দিশাহারা হয়ে পড়ে সুলতান। কি করা উচিৎ কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। উজিরকে জিজ্ঞেস করে, কি করা যায় বলতো। ছেলেটা যা বলছে তা যদি ঠিক হয় তাহলে তো সমূহ বিপদ।

উজির বলে, লোকটা একেবারে ফেরেববাজ। ওর কথা বিলকুল বিশ্বাস করবেন না, হুজুর। ধাপ্পাবাজির আর জায়গা পায়নি। সুলতান সুলেমানের পুত্র। তার ছেলে এই রকম বেলেল্লাপনা করতে আসবে? আপনি ওর ওসব ভাঁওতায় ভুলবেন না, জাঁহাপনা, কোতল করে ফেলুন। শত্রুকে বেশিক্ষণ জিইয়ে রাখতে নাই।

—তুমি ঠিক বলেছ উজির, সুলতান সুলেমানের পুত্র এই রকম বেলেল্লা হতে পারে না। এই কুকুরের বাচ্চাটার মৃত্যুই একমাত্র সাজা।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার কাহিনী শুরু হয়।

সুলতান যখন বললো, এই কুকুরের বাচ্চাটার মৃত্যুই একমাত্র সাজা, ঠিক সেই সময় প্রহরী এসে খবর দিলো, সবুজ শহরের সুলতানের প্রতিনিধি এসেছেন সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে।

সুলতান উজিরকে বললো, ওদের সসম্মানে নিয়ে এসো।

উজির এবং আজিজ এসে কুর্নিশ জানিয় দাঁড়াতেই তাজ অল মুলুককে দেখে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, শাহজাদা—

তাজ-অল-মুলুক বলে, কে বললে আমি শাহজাদা। আমি তো একটা ধাপ্পাবাজ মিথ্যেবাদী, শয়তান।

সুলতান স্বয়ং সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে।—আমি উজিরের কথায় তোমার উপর অবিচার করেছি বাবা। অনেক কটু কথা বলেছি। তুমি কিছু মনে করো না। আমি ঐ উজিরটাকে শূলে চাপাবো। মাথা মোটা একটা হাঁদা কোথাকার। সারিমান ভাবে ভাগ্যে জল্লাদকে সে হুকুম দিতে দেরি করেছিলো। আর এক দণ্ড পরে যদি এঁরা আসতেন তা হলে তাজ-এর কাটা মুণ্ডু এতক্ষণে মাটিতে পড়ে থাকতো। উফ্ ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে সারিমানের। উজির জানায়, সুলতান সুলেমানের সেনাবাহিনী জোর কদমে এগিয়ে আসছে কর্পূর দ্বীপের দিকে। ওদের খবর পাঠাতে হবে। নইলে শহরের ভিতর ঢুকে সব ধুলোয় মিশিয়ে দেবে—এই রকম হুকুমই তাদের দেওয়া আছে। সুতরাং আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। সেনাপতিদের সঙ্গে দেখা করে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নিতে হবে।

ভয়ে সুলতান সারিমানের হাত পা কাঁপতে থাকে। উজির বলে, আপনি আশ্বস্ত হোন জাঁহাপনা, আমি সব ব্যবস্থা করছি। আর আপনি আপনার বৃদ্ধ উজিরকে এর জন্যে কোন শাস্তি দেবেন না এই আমার আর্জি। কারণ সে নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করতে চায়নি।

যা কিছু করেছে সুলতানের মঙ্গল চিন্তা করেই করেছে। হয়তো তার বিচারে ভুল হতে পারে। এর জন্য প্রাণদণ্ড হয় না।

সুলতান সারিমান তাজ-অল-মুলুকের দিকে তাকায়, তোমার কি মত বাবা?

আমিও সেই কথাই বলি, জাঁহাপনা, ওকে আপনি এযাত্রা রেহাই দিন। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়।

সুলতান সারিমান বলে, ঐ ব্যাটা খোজা কাফুর, সব নষ্টের গোড়া সে। ওকে আমি ক্রুশে গেঁথে মারবো।

তাজ বলে, সে আপনার ইচ্ছা। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে লোকটার জন্যেই যে আমার গর্দান যেতে বসেছিলো, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

উজির এবং আজিজ দু'জনেই এগিয়ে এসে বলে, শুভকাজ সামনে। এখন আর নরহত্যা না হয় নাই করা হলো। এ যাত্রা ওকে ক্ষমাঘেন্না করে না হয় ছেড়েই দিলেন।

সুলতান সারিমান বললো, এ ব্যাপারে আপনারা যা বলবেন আমি তাই করবো। খোজাকে শূলে চাপাতে বলেন শূলে চাপাবো। ছেড়ে দিতে বলেন ছেড়ে দেব।

তাজ বলে, ঠিক আছে, এবারের মতা ওর বেয়াদপি মাফ করেই দিন।

সুলতান সারিমান বলে, আর বাবা, আমার গুনাহ্‌র কে বিচার করবে?

তাজ বলে, ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না জাঁহাপনা। এখন থেকে আপনি আমার দ্বিতীয় পিতা। পিতাপুত্রের সম্পর্ক তো বিচার-বিবেচনার সম্পদ নয়, জাঁহাপনা।

সারিমান তাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে। উজির আর আজিজ সেনাপতিদের সঙ্গে দেখা করতে চলে যায়। আমির ওমরাহ এবং দরবারের সচিবরা তাজকে নিয়ে যায় হামামে। এদিকে কাজীদের খবর পাঠানো হয়। সারাপ্রাসাদে হৈচৈ পড়ে যায়। শাহজাদী দুনিয়ার শাদী।

সুলতান সারিমান এবার কন্যা দুনিয়ার ঘরে আসে। মেয়ে হয়তো মনে আঘাত পেয়েছে। দরবারে ডেকে উজিরের সামনে তাদের এইভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। অভিমানী মেয়ের মনে চোট লাগা স্বাভাবিক।

ঘরে ঢুকতেই চমকে ওঠে। শাহজাদী দুনিয়া একখানা ছুরি হাতে বাগিয়ে ধরেছে। আর এক

মুহূর্ত দেরি হলে নিজের বুকে বসিয়ে দিত। সুলতান ক্ষিপ্রহাতে ছুরিখানা ছিনিয়ে নিয়ে বলে, এ কি করছিলে, মা।

দুনিয়া কেঁদে ওঠে, এ জীবন আমি আর রাখবো না বাবা।

সুলতান সারিমান আকুল হয়ে বলে, ও কথা মুখে আনতে নাই মা। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। তুমি না থাকলে আমি বাঁচবো কি নিয়ে?

দুনিয়া বলে, তাজ ছাড়া আমার জীবনের কোনও মূল্য নাই। সে আমার জীবনের একমাত্র ভরসা ছিলো। তুমি তাকে হত্যা করেছ। আমি কি নিয়ে থাকবো?

—না মা, না। সে এখনও বেঁচে আছে। আমি ভুল করে তাকে সাজা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। সবুজ শহর থেকে সুলতান সুলেমানের উজির এসেছেন। তার কাছেই জানলাম, তাজ কোনও ধাপ্পা দেয়নি। ওঠ মা, ওঠ। আমি তোমাদের মিলন ঘটিয়ে দিচ্ছি।

তাজ-অল-মুলুক হামাম থেকে ফিরে আসে। সুলতান নিজে হাতে ধরে তাজকে নিয়ে এলো দুনিয়ার ঘরে।—এই দেখো, মা। তাজ বেঁচে আছে।

দুনিয়া ছুটে এসে তাজ-এর হাত ধরে, আনন্দে তার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। সুলতান ঘরে ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

তাজ দুনিয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।—ওরা আমাকে মারতে চেয়েছিলো, সোনা। কিন্তু আমাদের ভালোবাসা আমাকে রক্ষা করেছে। চলো, আর দেরি করবো না। বাবা বড় দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। আজই আমরা সবুজ শহরের পথে রওনা হবো।

সেই দিনই তাজ, দুনিয়া, উজির, আজিজ এবং সুলতান সারিমান সবুজ শহরের পথে যাত্রা করে। কিছুদিন বাদে যখন তারা এসে পৌঁছয় সারা সবুজ শহর তখন আনন্দের বন্যায় ভেসে চলেছে। দূত এসে আগেই সুলতান সুলেমানকে খবর দিয়েছিলো, শাহজাদা তাজ-অল-মুলুক পাত্রী শাহজাদী দুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসছেন।

শহরের প্রবেশ মুখে বিরাট তোরণদ্বার তৈরি করা হয়েছিলো। হাজার হাজার নরনারী এসে সমবেত হয়েছে। তাদের ভাবী সুলতান আর তার ভাবী বেগমকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে সবুজ শহর আজ ভেঙে পড়েছে। কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে চলেছে সেনাবাহিনী। রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে হাজার হাজার সেনা।

ফুলের মালায় সাজানো হয়েছে প্রাসাদ। সুলতানের হুকুমে জনে জনে দান করা হচ্ছে নতুন পোশাক, খানাপিনা, ফল ফুল, আতর, গোলাপজল।

তাজ প্রাসাদে ঢুকেই প্রথমে সুলতান সুলেমানকে জড়িয়ে ধরে।—আব্বাজান, আমার জন্যে বড় দুশ্চিন্তায় দিন কেটেছে আপনার। অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আমাকে ক্ষমা করুন।

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে সুলতান বলে, আল্লাহ যখন যাকে যে ভাবে রাখেন তাই থাকতে হয় বাবা। ও নিয়ে আমার কোনও দুঃখ নাই। আজ যে আবার তোমাকে ফিরে পেয়েছি এজন্যেই তাকে আমার হাজার হাজার সালাম জানাই।

দুই সুলতান এবং তাজ একসঙ্গে বসে খানাপিনা করলো। কাজীরা এসে শাদীনামা তৈরি করে দি.. নানারকম সাজপোশাক এবং নগদ অর্থ উপহার নিয়ে বিদায় নিলো। সেনাবাহিনীর মধ্যে দুহাতে ধনদৌলত বিতরণ করা হতে থাকলো। নাচ গান বাজনা হৈ-হল্লায় মেতে উঠলো শহরবাসী। চল্লিশ দিনব্যাপী চলতে থাকলো এই আনন্দ উৎসব। দুনিয়া আর তাজ ভালোবাসার সায়রে গা ভাসিয়ে দিয়ে স্বর্গ-সুধা পান করতে লাগলো।

তাজ কিন্তু আজিজকে ভোলেনি। দামী দামী সাজপোশাক, মূল্যবান গালিচা পর্দা, খাটপালঙ্ক নানা রকম শৌখিন বিলাস সামগ্রী এবং প্রচুর ধনরত্ন সহ দাসদাসী নফরবাঁদী উট খচ্চর গাধা ঘোড়া সঙ্গে দিয়ে আজিজকে তার মার কাছে পাঠিয়ে দিলো। আজ কতকাল তার মা ছেলেকে চোখে দেখেনি। হয়তো সে ব্যাচারী কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে।

সুলতান সুলেমানের মৃত্যুর পর তাজ-অল-মুলুক সুলতান হলো। আজিজকে করলো তার উজির। আর সেই বাগানের বৃদ্ধ মালির কথাও ভোলেনি তাজ। সবুজ শহরে এক বিরাট রেশমী কাপড়ের দোকান করে দিলো তাকে।

দু-অল-মাকানের পুত্র কান-মাকানা এবং নুজাতের কন্যা নসিবা ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে হেসেখেলে মানুষ হতে থাকে। তাদের স্বর্গীয় রূপের তুলনা মেলা ভার। নসিবার প্রকৃতি ধীরস্থির শান্ত শতদলের মতো। কিন্তু কান-মা-কানার স্বভাব চরিত্র ভিন্ন ধাঁচের। ঘোড়ায় চড়ে শিকার, ছুটোছুটি লাফাঝাঁপিতে সে ওস্তাদ। কখনও বা সে তীরধনুক নিয়ে চলে যায় গভীর জঙ্গলে। আবার কখনও সে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে—লড়াই করে সেনাপতির সঙ্গে। কুস্তি লড়ে নিগ্রোকে নিয়ে। এত সত্ত্বেও কিন্তু তার অন্তরে ভরা ছিলো কুসুমের কোমলতা। ফুলের শোভায় সে মাতাল হতো। কান পেতে শুনতো সে মধুপ গুঞ্জন। নসিবা কাছে এলে কান মা-কানার মনে হয়, ও যেন একটি গোলাপের কুঁড়ি। যখন দল মেলে ফুটবে, ওর খুসবুতে মদির হবে বাগিচা।

নসিবার বাবা নুজাতের স্বামী দু-অল-মাকানের কল্যাণে এখন প্রবল প্রতাপান্বিত। তার কথাতেই সবাই ওঠ-বোস করে। সেনাবাহিনীর একটা বিরাট অংশ এখন তার তাঁবে। অবশ্য এখনও সেনাবাহিনীর অনেকেই বৃদ্ধ উজির দানদানের অনুগত। তবু নসিবার বাবার দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে দানদান এখন বাগদাদ ছেড়ে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। পাশের একটা শহরে গিয়ে সে এখন সুদিনের অপেক্ষায় বসে আছে। কবে পিতৃহারা নাবালক পুত্র কান মা-কানা সাবালক হবে, কবে তাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নুজাতের স্বামীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবে—সেই দিনের প্রতীক্ষায় সে চুপ করে আছে।

নুজাতের স্বামীর ভয়ে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। তার কথার উপরে কারো কথা বলার জো নাই। সে এখন দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। কান মা-কানা আর তার মাকে গৃহে নজরবন্দী করে রাখলো। উদ্দেশ্য—তার কন্যা নসিবার সঙ্গে যাতে কান মা-কানা মেলামেশা না করতে পারে। মনের দুঃখে মা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নিজের প্রাসাদ বন্দী দশায় দিন কাটাতে থাকে। আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করি, এই অন্যায়ের সুবিচার কর খোদা। তুমি ছাড়া আমাদের আর কোনও পথ নাই।

বাবার কড়া প্রহরা সত্ত্বেও কান মা-কানা কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে মাঝে মাঝেই নসিবার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু এ ভাবেও বেশি দিন চললো না। নসিবার বাবা মেয়েকে এমনভাবে চোখে চোখে রাখতে লাগলো যে কান মা-কানা আর কিছুতেই তার দেখা পায় না। কি করবে কিছুই ভেবে না পেয়ে সে নসিবাকে চিঠি লিখলো ঃ

"প্রিয়তমা নসিবা, তোমার অদর্শন আমি আর সইতে পারছি না। আমার আহার নিদ্রা ঘুচে গেছে। জানি না আবার কবে দেখা হবে। তোমাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। চলো, আমরা এই নরক থেকে পালিয়ে চলে যাই।"

চিঠিখানা এঁটে একটা খোজার হাতে দিয়ে বললো, খুব সাবধান, নসিবার হাতে দিবি। কেউ যেন টের না পায়।

খোজা বলে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, হুজুর। কাক-পক্ষী জানতে পারবে না।

কিন্তু খোজাটা চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে সোজা তুলে দেয় নসিবার বাবার হাতে। চিঠি পড়ে নসিবার বাবা ক্রোধে ফেটে পড়ে। এতবড় স্পর্ধা। উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে কান মা-কানাকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে নেয় সে। রাগে মাথা গরম করলে লাভ হবে না। কাউকে কিছু না বলে চিঠিখানা নিয়ে সে নুজাতের কাছে যায়।—দেখ, তোমার গুণধর ভাইপোর কাণ্ড দেখ।

নুজাৎ চিঠিখানা পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কি বলবে, কি বলা উচিৎ কিছুই ভাবতে পারে না। স্বামী বলে, দেখ, নুজাৎ, মেয়ে বড় হচ্ছে। কান মা-কানার দেহে এখন যৌবন আসছে। এ-সময় নসিবার সঙ্গে তার আর মোলাকাৎ উচিৎ না। ঘি আগুন এক সঙ্গে থাকলে তার পরিণাম তো তোমার অজানা নয়, নুজাৎ। সুতরাং আজ থেকে নসিবাকে তুমি হারেমের মধ্যে চোখে চোখে রাখবে। সে যেন কোন মতলবেই বাইরে না বেরুতে পারে—লক্ষ্য রাখবে। এরপর অবাধ মেলা-মেশার ফল যে ভালো হবে না এতো বুঝতে পারছো। আমি ব্যবস্থা করছি যাতে কান মা-কানা আর নুজাতের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ না রাখতে পারে।

এই বলে নুজাতের স্বামী চলে গেলো। নুজাৎ বসে বসে চোখের জল ফেলতে থাকে। ভাইপো কান মা-কানাকে ডেকে বলে, নসিবার বাবা তোমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছে। তোমার চিঠিখানা তার হাতে পড়েছে। এ অবস্থায়, আমার আশঙ্কা, সে তোমার অনিষ্ট করতে পারে, বাবা। আমি জানি, তুমি নসিবাকে ভালোবাসো। নসিবা আমার মেয়ে, তাকেও আমি বাজিয়ে দেখেছি, তুমি ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় চিন্তা নাই। তোমার জন্যে সে তার জীবন যৌবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। যদিও তুমিই সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী—আমাদের ভাবী সুলতান, তবু তুমি এখনও সাবালক হওনি, তোমার পিসেই এখন অছি। তার হুকুমেই হুকুমৎ চলছে। এখন যদি রাগের মাথায় সে একটা কিছু করেই বসে—পরে হাজার মাথা কুটলেও তার আর সুরাহা হবে না। তাই বলছি বাবা, একটু সাবধানে থাকবে। ধৈর্য ধরে আর ক'টা বছর কাটাও। তারপর নিজের সলতানিয়ৎ ফিরে পাবে। তুমিই হবে তখন আমাদের ভাগ্যবিধাতা। তখন তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

কান মা-কানা বলে, কিন্তু পিসি, এখন কি তার সঙ্গে একেবারেই দেখা হবে না?

—আমি বুঝতে পারি বাবা, ভালোবাসার অদর্শন সহ্য করা শক্ত।

কান মা-কানা নুজাতের এই কথায় তেমন কিছু ভরসা পায় না। বলে, এভাবে আমি এখানে থাকতে পারবো না পিসি। এই প্রাসাদ আমার কাছে কয়েদখানা মনে হচ্ছে। আমি অন্য কোথাও অন্য কোনও দেশে চলে যাবো, যেখানে সিংহাসনের মোহ নাই। আমি সিংহাসন চাই না, সলতানিয়ৎ চাই না, ধনদৌলত, নফর চাকর দাসদাসী আমার প্রয়োজন নাই। আমি চাই নসিবার ভালোবাসা। আপনি আমার সঙ্গে নসিবাকে দিন। আমি কথা দিচ্ছি, আমরা দু'জনে দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবো। আর কোনদিন ফিরে আসবো না। পিসে সুলতান হয়ে বসুক সিংহাসনে। আমার কোনও আপত্তি নাই।

নুজাৎ বলে, তোমার আপত্তি না থাকলেও তোমার প্রজাদের ষোলআনা আপত্তি আছে। বাগদাদের পবিত্র সিংহাসন তার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছাড়া কেউই জবর দখল করে নিতে পারে না। প্রজাদের বিশ্বাস, এই ধর্ম-সিংহাসন জোর করে অধিকার করলে সে সবংশে নির্বংশ হবে। আর তুমি ঐ গৃহত্যাগের কথা ছাড়ো, বাবা। ওতে কোনও সুরাহা হবে না। নসিবাকে তোমার সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না। ওকে পেতে গেলে তোমাকে কষ্ট করে এখানেই থাকতে হবে।

কান মা-কানা ব্যর্থ মনে ফিরে আসে। নুজাতের কোনও উপদেশই তাকে শান্ত করতে পারে না। সেই দিনই রাতের অন্ধকারে এক কালান্দার ফকিরের ছদ্মবেশে পথে বেরিয়ে পড়ে।

পুত্রের নিরুদ্দেশে কান মা-কানার মা কেঁদে কেঁদে সারা হয়। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ছেলের প্রতিক্ষায় ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। কোথায় গেলো তার নয়নের মণি, কবে সে ফিরে আসবে। এই ভেবে ভেবে অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে। কাঁদে প্রাসাদের দাসদাসী নফর ভৃত্য। কাঁদে দরবারের উজির আমির ওমরাহ। কাঁদে সারা দেশবাসী। বাদশাহ উমর অল

নুমানের বংশে বাতি দিতে এই একমাত্র সলতে—সেও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো। এখন এই ধর্ম সিংহাসনে, কার দুঃসাহস, কে বসতে পারবে!

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কান মা-কানা চলতে থাকে। কোথায় সে যাবে কিছুই জানে না। শুধু সারা দিন একটানা হেঁটে চলে। রাতের অন্ধকার নেমে এলে কখনও গাছতলায় কখন বা কারো বাড়ির দাওয়ায় ঘুমিয়ে রাত কাটায়। সকালে উঠে আবার চলতে থাকে। এইভাবে চারদিন পরে সন্ধ্যাবেলা সে এক নদীর ধারে সুন্দর শস্য শ্যামল প্রান্তরে এসে হাজির হয়। যেদিকে তাকায় সবুজের সমারোহ। ফলে ফুলে ভরা। গাছে গাছে দোয়েল ফিঙের নাচানাচি। নদীর জলে নেমে রুজু করে নামাজ পড়ে কান মা-কানা। সঙ্গের এক টুকরো বাসি রুটি খেয়ে গাছতলায় শুয়ে পড়ে।

অনেক রাতে এক সুমধুর সঙ্গীতের সুরে কান মা-কানার ঘুম ভেঙ্গে যায়। অবাক হয়ে ভাবে, এই নির্জন প্রান্তরে এমন মিষ্টি গান কে গায়! উঠে দাঁড়িয়ে গানের আওয়াজ অনুধাবন করে এগিয়ে চলে। কিন্তু কোথাও কোনও জনমানবের দেখা পায় না। আরও খানিকটা এগোতে গানের কথাগুলো আরও স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে কানে বাজে। গায়ক কে—জানবার জন্যে তখন সে বনবাদাড় ভেঙ্গে এগিয়ে চলে। সামনে একটা পাহাড়। মনে হয়, পাহাড়ের ওপর বসে কেউ গাইছে এই গান। পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে আসে কান মা-কানা। গলা ছেড়ে ডাকতে থাকে, কই, কে আছো, কে গাইছো গান, সাড়া দাও।

উত্তর আসে, কে ডাকছো আমায়? কে তুমি? মানুষ না জিনি? তুমি যদি জিনি হও এগিয়ে এসো। আর যদি মানুষ হয়ও, আর এক পা এগিয়ো না। ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। রাতের অন্ধকারে কোথায় পা দিতে কোথায় পা দিয়ে হড়কে নিচে পড়ে যাবে। সকাল হোক তারপর দেখা হবে।

কান মা-কানা কিছুই বুঝতে পারে না। এই বিপদসঙ্কুল গিরি পর্বতের মাথায় বসে সে কেন এই সঙ্গীত গেয়ে চলেছে। নিশ্চয়ই তারও মনের দুঃখ ব্যথা কান মা-কানার মতোই অসীম। আর এক পাও না এগিয়ে সেখানেই বসে সে বাকী রাতটা কাটিয়ে দেয়।

এক সময় রাতের অন্ধকার কাটে। চারদিক ফর্সা হয়ে আসে। কান মা-কানা দেখলো, একটি লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। পরনে তার মরুভূমির বাদাবীদের মতো সাজপোশাক। কোমরে তলোয়ার, বাহুতে ঢাল। কাছে আসতে দু'জনে দু'জনকে স্বাগত জানায়। লোকটি প্রশ্ন করে, কে তুমি? কোথা থেকে আসছো? কী জাত? তোমার বাবা-মাই বা কে? এই বয়সে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে না নিয়ে এই ভয়ঙ্কর দুর্গম পাহাড়ে উঠেছ কোন সাহসে?

কান মা-কানা বলে, আমার নানা শাহেন শাহ উমর অল নুমান। বাগদাদের সুলতান ছিলেন তিনি। গত হয়েছেন। আমার বাবা সুলতান দু-অল-মাকান। তিনিও গত হয়েছেন। আমার নাম কান মা কানা। আমার পিসির মেয়ে নসিবার প্রেমের বিরহে আমি আজ বিবাগী হয়ে দেশে দেশে ঘুরছি।

বাদাবীর চোখে সন্দেহ।—তুমি যদি শাহজাদাই হবে তবে কেন তোমার এই ফকিরের বেশ? সঙ্গে কোন দেহরক্ষী না নিয়ে এই বিদেশ বিভুঁই-এ এসেছো, কোন সাহসে?

কান মা-কানা বলে, আমি কাউকে কিছু না বলে প্রাসাদ থেকে পালিয়েছি। সঙ্গে কাকে নেব? তা হলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে না? তুমি যদি চাও আমি যখন সুলতান হয়ে সিংহাসনে বসবো, তোমাকে আমার প্রধান দেহরক্ষী করতে পারি।

বাদাবী হো হো করে হেসে ওঠে।—তুমি এমনভাবে কথা বলছো, যেন মনে হচ্ছে দিগ্বিজয় করে ফিরছো কোনও বীরপুরুষ।

তোমার তলোয়ারের এক ঘায়ে বিশটা মাথা লুটিয়ে পড়ে—এমনি তোমার হাবভাব। কিন্তু ছোকরা, তুমি আমার বাহুবলের তো হদিশ জানো না। আমি যদি মনে করি, তোমাকে আমার গোলাম বানিয়ে রাখতে পারি। আর তোমার মা-বাবা যদি সত্যিই কোন শাহী পরিবারের কেউ হয়—অনেক ইনাম দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে।

বাদাবীর কথায় কান মা কানা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।—তার দরকার হবে না। আমার দাম আমি নিজেই শোধ করে দিতে পারি। তোমার মিষ্টি মধুর গান শুনে মনে হয়েছিলো, তোমার অন্তরটাও ঐরকম সুন্দর। কিন্তু এখন দেখছি লোকটা তুমি আদৌ সুবিধের না।

কান মা-কানার একটু শিশুসুলভ সারল্যে বাদাবী মজা পায়। বিশ্ব সংসারে কতরকম শয়তান শঠ, খল, ঠগ, প্রবঞ্চক আছে তার বিন্দু বিসর্গও খোঁজ রাখে না এই অপাপবিদ্ধ শিশু। সেই জন্যেই সেই গভীর রাতে চোর ডাকাতের আস্তানা এই দুর্গম পাহাড়ে নির্ভয়ে উঠে আসতে পেরেছে। বাদাবী ডাকাত কান মা কানাকে টুক করে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে থাকে। কান মা কানা হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে থাকে।—ছাড়ো ছাড়ো বলছি, বদমাইশ। আমাকে কেন কাঁধে তুললে? আমি তোমার কি করেছি?

বাদাবী বলে, আমি তোমাকে ঐ নদীর জলে ফেলে দেব। ঐ নদী গিয়ে মিশেছে টাইগ্রীস নদীতে। তুমি ভাসতে ভাসতে টাইগ্রীসে চলে যাবে। টাইগ্রীস তোমাকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে ইশা নদে। আর ইশা বয়ে নিয়ে যাবে ইউফ্রেট নদীতে। এইভাবে একদিন তুমি তোমার দেশে পৌঁছে যাবে।

এই বলে, বাদাবী কান মা কানাকে মাথার উপর তুলে ধরে। যেন মনে হয়, এই মুহূর্তে সে নদীর অতল জলে ছুঁড়ে দেবে তাকে। কান মা কানা চিৎকার করে ওঠে, বাঁচাও—বাঁচাও, তোমার পায়ে পড়ি। প্রাণে মেরো না।

বাদাবী হাসতে হাসতে ওকে নদীর ধারে মাটিতে নামিয়ে দেয়। আজ থেকে আমি তোমার বান্দা, শাহজাদা। তোমার ভালোবাসা নসিবার নামে কসম খেয়ে বলছি, তোমার জন্যে আমি জান কবুল করবো।

কান মা কানা অবাক হয় বাদাবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। লোকটার আচার আচরণ কথাবার্তা কেমন যেন সব উল্টোপাল্টা। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না সে। শুধু বলে, তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে?

দু'জনে নদীর পাড়ে বসে পড়ে। বাদাবী তার ঝোলা থেকে যবের রুটি আর নুন বের করে কান মা কানাকে খেতে দেয়। নিজেও একটু খায়। এইভাবে তাদের বন্ধুত্বের গোড়াপত্তন হয়। কান মা কানা বলে, নাঃ, যতটা খারাপ মনে হয়েছিলো, মানুষটা তুমি ততোটা খারাপ নও। আচ্ছা এবার বলো, তুমি কে?

—আমার নাম সাব্বা ইবন রামাহ ইবন হুমাম। শাম মরুভূমিতে আমার ঘর। জাতে তাইস। আমার জীবনের কাহিনী শুনবে? সংক্ষেপে বলছি, শোনো ঃ

আমি যখন খুব ছোট সেই সময় আমার বাবা মারা যায়। আমার চাচা তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে মানুষ করতে থাকে। চাচার এক মেয়ে ছিলো—নাজমা। আমরা দু'জনে দু'জনকে খুব ভালোবাসতাম। যখন তার শাদীর বয়স হলো আমি তাকে শাদী করতে চাইলাম। কিন্তু আমার চাচা রাজি হলো না। রাজি না হওয়ার একমাত্র কারণ আমি গরীব। শাদী করে বিবিকে খাওয়াতে পারবো না এই-ই একমাত্র কারণ। আমাদের দলের প্রধান সর্দার চাচাকে বললো, শাদীর পরে খাওয়া পরার ব্যবস্থা দল থেকেই করে দেওয়া হবে। কিন্তু তাতেও চাচা রাজি হলো না। তখন সে নতুন বায়না ধরলো। শাদীর আগে তাকে পঞ্চাশটা ঘোড়া, পঞ্চাশটা উট, দশটা দাসদাসী, পঞ্চাশ বস্তা যব আর পঞ্চাশ বস্তা ভুট্টা যৌতুক দিতে হবে।

কিন্তু এত সব আমি কি করে দেব। তাই ঢাল তরোয়াল নিয়ে মরুভূমির পথে পথে তীর্থ-যাত্রীর-দলের উপর হানা দিতে লাগলাম। ছিনতাই, রাহাজানিই এখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। যেন তেন প্রকারে চাচার দাবী মেটাতেই হবে। না হলে নাজমাকে আমি পাবো না। নাজমা আমার কলিজা। তাকে না পেলে বাঁচারও কোন অর্থ নাই আমার কাছে। সারা দিন রাহাজানি ছিনতাই করি আর রাতের বেলায় নাজমার বিরহে কাতর হয়ে মনের দুঃখে গান গাই। এই আমার জীবন।

কান মা কানা বলে, তোমার দুঃখ আর আমার দুঃখ একই। প্রেমই আমাদের পথে বের করে দিয়েছে।

এমন সময় ওরা দেখতে পায়, একজন ঘোড়সওয়ার এই দিকেই এগিয়ে আসছে। সাব্বা মুঠি করে তরোয়াল বাগিয়ে ধরে। কিন্তু না, লোকটা এক আহত আরব মুসলমান যোদ্ধা। দেহের সারা পোশাক রক্তে লাল হয়ে গেছে। কোনরকমে ঘোড়ার লাগামটা ধরে সে ধুঁকছে। কাছে আসতেই গোঙানির আওয়াজ শোনা গেলো, একটু পানি—পানি দাও।

কান মা কানা এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামায়। ঘাসের উপর শুইয়ে দিয়ে মুখে একটু জল দেয়। কিন্তু ভালো করে খেতে পারে না। গাল বেয়ে পড়ে যায়। কান মা কানা জিজ্ঞেস করে, কে তুমি? কি করে এমন হলো?

লোকটা তার কামিজ খুলে দেখায়। পিঠের মাঝখানে একটা গর্ত হয়ে গেছে। হুড় হুড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। কান মা কানা শিউড়ে ওঠে। এ অবস্থায় কোনও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে?—কে তোমার এমন দশা করেছে বন্ধু?

এই ঘোড়াটাই আমার কাল হলো। এরকম ঘোড়া সারা আরবে আর দু'টি নাই। যে দেখে তারই লোভ হয়। এক সময়ে সে কনস্তান্তিনোপল-এর সম্রাট আফ্রিদুনের আস্তাবলে ছিলো। আমি ওকে চুরি করে নিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে সারা আরবে ঘোড়াটার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের সর্দার বললো, এরকম জানোয়ার আগলে রাখাও শক্ত। সকলেরই নজর পড়েছে। অন্য দলের ডাকাতরা সুযোগ পেলেই ছিনতাই করে নিয়ে যাবে। সুতরাং ঝামেলা এড়াবার জন্যেই সর্দার আমাকে বললো, আরব সীমানায় রক্ষী বাহিনীর কাছে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে এসো।

তার কথা মতো আমি সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, তুমি যা গুণগান করছো, তার সত্যাসত্যের প্রমাণ কী? এত দাম দিয়ে কিনবো, পরে যদি দেখি একটা গাধার বাচ্চা?

সেনাপতির কথায় আমার রাগ হলো।—বেশ পরীক্ষা দিচ্ছি। আপনার আস্তাবলে সবচেয়ে তাড়তাগড়াই সেরা যে সব ঘোড়া আছে তাদের নিয়ে আসুন। আমি ছুটবো, আমাকে যদি তাদের কেউ ছুঁতে পারে, জান কবুল করে যাবো।

সেই আমার কাল হলো। আমাকে কেউ তারা ধরতে পারলো না। হাওয়ার আগে আগে উড়ে চলে আমার ঘোড়া। সৈন্যরা ক্রোধে ফেটে পড়লো। তাদের সেনাবাহিনীতে যা নাই তা এক ডাকাতের হাতে আছে। তীর বর্শা সড়কী ছুড়তে লাগলো। তারই কয়েকটা আমার পিঠে গেঁথে গিয়েছিলো। এ সত্ত্বেও হয়তো জানে বাঁচতাম। কিন্তু ঘোড়ার গতি আমি আর রুখতে পারলাম না। একটানা তিন দিন তিন রাত্রি সে উল্কার মতো ছুটে চললো। জানি না এত শক্তি সে কোথায় পেলো। একমাত্র দৈব ক্ষমতা ছাড়া সম্ভব না।

বৃদ্ধ নেতিয়ে পড়ে।—আমার সময় শেষ হয়েছে বন্ধু। ইচ্ছা ছিলো, মরার আগে আমার দলের সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা হবে। কিন্তু তা আর হলো না। যাই হোক, আমার দেহটা তোমরা কবর দিয়ে দিও। আর এই ঘোড়াটা আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম। এর নাম অল-কাতুল-অল মাজনুন।

এই বলে লোকটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। কান মা কানা এবং তার সঙ্গী সাব্বা তার মর দেহটা সমাধিস্থ করে আল্লাহর কাছে তার আত্মার শান্তি কামনা করলো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পর দিন রজনীতে শাহরাজাদ আবার কাহিনী শুরু করে।

কবর দেওয়া শেষ হলে কান মা কানাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সাব্বা একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরের মতো পিছনে পিছনে চলতে লাগলো। চলতে চলতে এক সময়ে এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামে। বনের হরিণ শিকার করে পুড়িয়ে পেটের খিদে মেটায়। হঠাৎ কান মা কানা দেখলো অদূরে এক গাছতলায় কতকগুলো বান্দা বসে জটলা করছে। আর তাদের সামনে একপাল উট, ভেড়া, ছাগল আর ঘোড়া চরছে। সাব্বাকে বললো, তুমি দাঁড়াও, আমি জানোয়ার আর বান্দাগুলোকে ধরে নিয়ে আসি। ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটে গিয়ে লোকগুলোর মাঝে ঝাপিয়ে পড়ে কান মা কানা। বান্দাগুলো ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, কে আছো কোথাও বাঁচাও—বাঁচাও। ডাকাত পড়েছে—

তাদের চিৎকারে পাহাড়ের ওপরের ছাউনি থেকে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে এলো তিনজন সৈন্য। কান মা কানাকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে ওঠে, এই সেই কাতুল—ব্যাটা চুরি করে পালিয়েছে। এত খুঁজেছি, কোথাও পাইনি। আজ বাছাধন যাবে কোথায়। এবার তোমার ঘোড়া চুরি করার সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি।

কান মা কানা ফিস ফিস করে কাতুলের কানে কি একটা কথা বলতেই চিহিঁ হিঁ করে সামনের দুপা ঊর্ধ্বে তুলে লোকগুলোর দিকে ছুটে যায়। কান মা কানার তলোয়ারের এক কোপে একজনের ধড় মুণ্ডু আলাদা হয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে। বাকী থাকে দুজন। আর দুই ঘায়ে তারাও ধরাশায়ী হয়। এবার সে বান্দাগুলোর দিকে তেড়ে যায়। কিন্তু তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে করুণা ভিক্ষা করতে থাকে। কান মা কানা তখন বলে ওঠ—উঠে দাঁড়া সব। জানোয়ারগুলো খেদিয়ে নিয়ে চলো আমার সঙ্গে।

সাব্বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান মা কানার লড়াই দেখছিলো। কাছে আসতে বলে, সাবাস! এই না হলে বাদশাহর ছেলে।

কিছু দূর এগোতেই দেখলো, সামনের আকাশ বাতাস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বুঝতে পারলো কোনও ফৌজি বাহিনী এক্ষুণি এসে পড়বে। কান মা কানা সাব্বাকে বললো, দোস্ত, তুমি জানোয়ারগুলো আগলে রাখো। আমি দেখে আসি কী ব্যাপার?

সাব্বা বলে, কিন্তু ফৌজী বাহিনীর সামনে যাওয়া কি ঠিক হবে বন্ধু? ওরা দলে অনেক ভারি। আর তারা সবাই লড়াকু যোদ্ধা।

কান মা কানা বলে, হতে পারে তারা একশো। কিন্তু আমি সুলতান উমর অল নুমানের নাতি—আমি একাই একশো। হয় নেবো শত প্রাণ, নয় দেব এক প্রাণ—অত ডরালে চলে?

একটু এগিয়ে আসতে কান মা কানা দেখতে পায়, শ'খানেকের অশ্ব সেনার এক বাহিনী আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে আসছে। তাদের সাজপোশাক দেখে চিনতে অসুবিধে হয় না—খ্রীষ্টান আফ্রিদুনের সেনাবাহিনী। কান মা কানার সামনে এসে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ালো তারা। ওদের প্রধান এগিয়ে এসে বলে, কি গো সুন্দরী, ঘোড়ায় চড়ার শখ হয়েছে, বুঝি! তা যাবে কোথায়, খুকি!

কান মা কানা রাগে গরগর করতে থাকে। এখনও তার দাড়িগোঁফ ওঠেনি বলে

ব্যাটারা তাকে মেয়েছেলে বলে তামাশা করছে। দাঁড়াও তামাশা করা ওদের জন্মের মতো ঘুচিয়ে দিচ্ছি। সেনাপতি মজা করে বলে, তা সুন্দরী তোমার গাল দুটো তো বেশ টুকটুকে লাল। ফুলের পাঁপড়ির মতো তুলতুলে নরম মনে হচ্ছে! আহা কি সুন্দর কাজল কালো হরিণীর মতো চোখ। আর সুন্দরী, তোমার ঐ পাকা আঙুরের মতো ঠোঁট দুটো দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারছিনে। ইচ্ছে করছে, চুষে রক্ত ঝরিয়ে দিই। আচ্ছা সুন্দরী, অমন রণ সাজে সেজেছো কেন? এ সাজ তোমার মানায় না। তার চেয়ে এসো, আমার ঘরে তোমাকে রানী বানিয়ে রাখবো।

কান মা কানা চিৎকার করে ওঠে, ওরে শূয়ারের বাচ্চা—শূয়ার, কি বলছিস তার মানে বুঝিস। তোদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তোদের যম। এবার প্রাণ ভরে তোদের ঈশ্বরকে ডেকে নে। জীবনে আর সুযোগ হবে না। আমার মুখে দাড়ি গোঁফ ওঠেনি বলে কি ভাবছিস কব্জীর জোর কিছু কমতি আছে। যখন এক এক কোপে এক একজনের মাথা লুটিয়ে পড়বে, তখন বুঝবি মেয়েছেলে—না মেয়েছেলের বাবা।

সেনাপতি বুঝলো, এ একেবারে বিছুটি। অত সহজে তাকে বশে আনা যাবে না। হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে খোকা? ঠিক ঠিক জবাব দেবে। না হলে একেবারে শেষ করে দেব।

সে তার দলের একজনকে লক্ষ্য করে হুকুম করলো, ইসকো বাঁধো।

কিন্তু তার সামনে পর্যন্ত এগোতেই পারলো না সে। কান মা কানার এক কোপে দুখণ্ড হয়ে গেলো তার দেহ। আর একজন তেড়ে আসে তার দিকে। তাকেও এক কোপে ধরাশায়ী করে দেয়। তারপর আরও একজন—আরও একজন। এইভাবে পর পর পাঁচজন যখন তার শাণিত তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ হারালো, সেনাপতির মনে শঙ্কা জাগে। ইশারায় বাকীদের এগোতে বারণ করে নিজেই কান মা কানার সামনে এসে দাঁড়ালো।

—তোমার অসাধারণ বীরত্ব দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি। আমি কারদাস। সমগ্র রোমে আমার বীরগাথা মানুষের মুখে মুখে। এই বয়সে তোমার এই বীরত্ব দেখে আমি খুশি হয়ে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি যেতে পারো।

কান মা কানা চটে আগুন, ক্ষমা? আমি তোমার ক্ষমাপ্রার্থী? এত বড় স্পর্ধা তোমার। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষমার কোন স্থান নাই। তুমি কারদাস হও আর হরিদাসই হও আমার জানবার কোন প্রয়োজন নাই। তলোয়ারেই পরিচয় পাওয়া যাবে। আর আমার বংশ পরিচয় যদি শুনতে চাও তবে শোনো, আমার নানা সুলতান উমর অল নুমান, আমার বাবা সুলতান দু-অল-মাকান আর আমার নাম কান মা কানা। কারদাস বলে, আমি তোমার বাবার সঙ্গে অনেকবার সামনা সামনি লড়াই করেছি। তার মতো বীরের পুত্র তুমি—যোগ্য বাপের যোগ্য সন্তান। যাই হোক, তুমি তোমার বিষয় সম্পত্তি নিয়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যাও। আমার লোক কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।

কিন্তু লড়াই থেকে কাউকে ক্ষমা করে বা কারো ক্ষমা নিয়ে ফিরে যাওয়া তো আমাদের রীতি নয়। সুতরাং শত্রু যখন সামনে তাকে নিধন না করে, জিইয়ে রেখে তো আমি চলে যেতে পারি না। এবং তোমাকেও যেতে দিতে পারি না। খ্রীষ্টান বীর কারদাস মউৎ-এর জন্য প্রস্তুত হও।

কাতুল-এর কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বলতেই টগবগিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেনাপতির ওপর। দুই বীরের সে কি প্রচণ্ড লড়াই। ভেড়া অথবা ষাড়ের লড়াই যারা দেখেছে তারা খানিকটা তার আঁচ করতে পারবে। পর পর কয়েকটা মারাত্মক প্যাঁচের মার কান মা কানা আশ্চর্য দক্ষতায় এড়িয়ে গেলো। কিন্তু তার পরেই একটা মোক্ষম কোপ বসিয়ে দিলো কারদাস। কান মা কানা এ প্যাঁচটা ধরতে পারেনি। কিন্তু সাবাস কাতুল। সে বুঝতে পেরেছিলো

তার মালিক মাৎ হয়ে পড়ছে। সেই মুহূর্তে সে আশ্চর্য কায়দায় অত বড় বিশাল বপুটা টুক করে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে যায়। কারদাসের তলোয়ার হাওয়া কেটে শাঁই করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলেই কান মা কানার কাহিনী এখানেই শেষ করতে হতো।

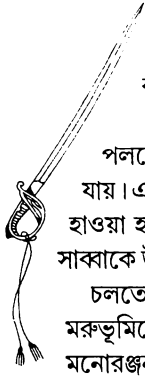

কাতুলের রণ-কৌশলে কারদাসের মোক্ষম মার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পলকের মধ্যে কান মা কানার এক প্রচণ্ড কোপে কারদাস দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এই না দেখে কারদাসবাহিনীর বাকী সৈন্যরা সব ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে নিমেষে হাওয়া হয়ে গেলো। মৃত সেনাপতির কামিজে তলোয়ারখানির রক্ত পুছে কোষে ভরে সাব্বাকে উদ্দেশ্য করে বললো, চলো, আজ রাতটা একটু ভালো করে মৌজ করতে হবে।

চলতে চলতে পথের মাঝে একটা নিগ্রো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। মেয়েটি মরুভূমিতে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি ঘুরে ঘুরে নানা বিচিত্র গল্প বলে মানুষের মনোরঞ্জন করে বেড়ায়। কান মা কানা বলে, চলো, আজ রাতটা আমাদের সঙ্গেই খাবেদাবে। আর মজার মজার গল্প বলবে।

পাহাড়ের নিচে একটা গাছের তলায় তাঁবু খাটিয়ে খানাপিনা সেরে নিলো তিনজন। তারপর কান মা কানা নিগ্রো মেয়েটাকে বললো, এবার তোমার কিস্‌সা বলো, শুনি।

নিগ্রো মেয়েটা বলতে থাকে ঃ

আজ এক চরস খোরের কাহিনী শোনাবো। লোকটার নেশা ছিলো কুমারী মেয়ের দেহ উপভোগ করা। অনেক পয়সা খরচ করে নিত্যি নতুন কুমারী মেয়ে জোগাড় করে আনতো সে। এইভাবে নারী দেহ ভোগ করতে করতে একদিন তার পয়সাও ফুরিয়ে যায় বিতৃষ্ণা আসে। কোনও ভালো জিনিসও বেশী খাওয়া ভালো না। তাতে পয়সারও অপচয় ঘটে। লালসাও বিকৃত হয়ে পড়ে।

যাই হোক, তখন তার অতি দীন দশা। জামা কাপড় কেনার পয়সা নাই—পরণে শতছিন্ন ময়লা পোশাক। খালি পা। ভিক্ষে করে খায়। একদিন বাজারের পথে পথে ঘুরে ভিক্ষে করছিলো, এমন সময় পায়ে একটা পেরেক ঢুকে যায়। অনেক রক্তপাত হতে থাকে। কিছুতেই বন্ধ করা সম্ভব হলো না। এক টুকরো কাপড় ছিঁড়ে বাঁধলো। কিন্তু রক্ত আর বন্ধ হয় না।

শহরে গরীবদের জন্য নিখরচায় স্নানের হামাম ঘর আছে। সেখানে গিয়ে বসার ঘরে ঢুকে বসে পড়লো। একটু বিশ্রাম কারর পর একটা কলের কাছে গিয়ে পাটা ধুয়ে সাফ করছে এমন সময় নজবে পড়লো, একটা লোক তার পাশে, যে লোকটা বসেছিলো, সে যেন কি একটা জিনিস চিবুচ্ছে। কেমন যেন কৌতূহল হলো। লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, কি চিবুচ্ছো গো?

লোকটি ফিসফিস করে বলে, হাসিস। যদি খাও তোমাকেও একটু দিতে পারি—খাবে?

সে বললো, দাও খাবো।

লোকটি তার চোয়াল থেকে এক টুকরো বের করে ওর হাতে দিয়ে বললো, খাও, দিল্‌-এর সব দুখ্‌ দরদ্‌ বেমালুম সাফ হয়ে যাবে।

আমাদের গল্পের নায়ক হাসিসের টুকরোটা নিয়ে মুখে পুরে চিবুতে থাকলো। কোনও দিন খাওয়ার অভ্যেস নাই, তাই সে একটু পরেই বিনা কারণে খিক্‌ খিক্‌ করে হাসতে লাগলো। উপস্থিত সবাই এ দৃশ্য দেখে অবাক। লোকটা পাগল নাকি। একটু পরেই শ্বেতপাথরের মেজেয় শুয়ে পড়ে প্রলাপ বকতে শুরু করলো। সেই প্রলাপোক্তি থেকে এই কাহিনীটুকু দাঁড় করানো হয়েছে।

একটা হামামে তাকে ন্যাংটো করে ফেলা হয়েছে। দুটো নিগ্রো তার হাত পা শক্ত করে চেপে ধরে আছে। আর একজন মাঝারদার বোঁধলের খোসা দিয়ে আগাপাছতলা ঘসে মেজে শরীরের ময়লা সাফ করছে। তাদের খেয়ালখুশি মতো তা যে দিকে ইচ্ছে ঘোরাচ্ছে ফিরাচ্ছে। তার কোনও ওজর আপত্তিই তারা শুনছে না। এমনভাবে তারা দলাই মলাই করছে—যেন হাড় মাংস আলাদা হয়ে যাবে। আড়াইমনি এক মক্কেল তার ভুঁড়িটার ওপর চেপে বসে জঙ্ঘার পাশের দাবনা দুখানা খাবলে খাচ্ছে।

এইভাবে স্নান সমাপন হলে বড় বড় তিনখানা তুর্কি তোয়ালে দিয়ে সারা শরীর ঢেকে ওরা বললো, সময় হয়ে গেছে, হুজুর। তাড়াতাড়ি করুন। এবার আপনার পাত্রীর ঘরে যেতে হবে।

—পাত্রী? পাত্রী কি বলছো? আমি তো শাদীই করিনি!

—হুজুরকে বোধ হয় কেউ হাসিস খাইয়ে দিয়েছে। তা না হলে এমন ভুল বকবেন কি করে? চলুন, আর দেরি করবেন না। আপনার পাত্রী অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন।

একটা কালো বোরখা পরিয়ে লোকটিকে নিগ্রো দুটো রাস্তায় বের করে নিয়ে আসে। একটু পরে তারা তাকে একটা বিরাট শয়নকক্ষে এনে বসায়। দামী দামী খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল আলমারীতে ঘরটা বেশ সাজানো গোছানো। একদিকে টেবিলের উপর একটা প্রকাণ্ড ফুলের ঝাঁপি। সারা ঘর ধূপ, গোলাপজল আর আতরের খুশবুতে ভরপুর। এ পাশের টেবিলে থরে থরে সাজানো নানা জাতের ফল, হালওয়া, পেস্তা, বাদাম, আখরোট মিঠাই মণ্ডা সরবৎ। নিগ্রো দুটো কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিলো।

একটু পরে ঢুকলো একটি খানসামা। ঘরে ঢুকে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, হুকুম করুন জাঁহাপনা, বান্দা হাজির।

লোকটা ফিকফিক করে হাসে।—লোকগুলো সবাই হাসিস খেয়ে চুর হয়ে আছে নাকি? আমাকে বলে কিনা জাঁহাপনা। আরে—আমার চৌদ্দপুরুষের কেউ কখনও সুলতান বাদশাহর সুরৎ দেখেনি। এদিকে এসো বাবা, একটা তরমুজ কাটো, দেখি। আধখানা আমাকে দাও, আর বাকী আধখানা তুমি খাও, বুঝলে? তরমুজের মতো ফল হয় না। আপেল বলো আর আঙুরই বলো—তরমুজই ফলের বাদশাহ।

খানাসামাটা একটু পরে টইটম্বুর পাকা তরমুজ এনে সামনে ধরে।

—চমৎকার। কাটো। বেশ ফালা ফালা করে কাটো।

খানসামা তার কথা মতো সরু সরু ফালি করে কেটে রেকাবীতে সাজিয়ে দিলো।

লোকটার জিভে জল আসে।—বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু এমন রসের জিনিস শুধু মুখে তো ভালো লাগবে না। তুমি এক কাজ কর। একেবারে আনকোরা—বুঝলে? মনে থাকে যেন—একেবারে আনকোরা—একটা ডবকা মেয়েছেলে নিয়ে এসো দিকিনি। তা না হলে এমন রসের জিনিস জমবে না।

খানসামা আজ্ঞাবহ দাস। হুকুম পাওয়া মাত্র সে একটা নবযৌবন উদ্ভিন্না কিশোরীকে নিয়ে এসে দাঁড় করালো। মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর দোলাতে থাকে। লোকটা উত্তেজিত হয়ে মেয়েটিকে জাপটে ধরে কোলের ওপরে বসায়।

এই সময় পিঠে ঠাণ্ডা লাগছে বুঝতে পেরে সে শ্বেতপাথরের মেঝের উপর উঠে বসে। তার চারপাশ ঘিরে শ'খানেক লোক। সবাই তার এই মজার প্রলাপ বাণী শুনতে

শুনতে স্নানের কথা ভুলে গেছে। লোকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজলো। তারপর সামনের লোকগুলোর উদ্দেশে বললো, মেয়েটাকে তোমরা কোথায় সরিয়ে নিলে?

এবার হাসির রোল ওঠে। সেই বিশল কক্ষের প্রায় শ'খানেক লোক এক সঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠে। লোকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। ব্যাপার কী? ওরা হাসে কেন? সবাই কি হাসিস খেয়েছে নাকি?

ঘরের লোকগুলো, হাসতে হাসতে বলে, ওহে চরসখোর এখনও তোমার শখ মিটলো না, খুব তো উজির বাদশাহ মারলে—ডবকা ছুড়ির সঙ্গে ফূর্তি লুটলে। এবার তোমার বচন একটু থামাও।

নিগ্রো মেয়েটার গল্প শুনতে শুনতে কান মা কানা হেসে গড়াগড়ি যায়। —তুমি বেড়ে মজাদার কিসসা বলতে পারো গো।

বুড়ি বলে, বাবা, এই আমার কাজ। দোরে দোরে ভিক্ষা করে খাই না। প্রাণখুলে কিসসা বলি, যদি কারো ভালো লাগে, ভালোবেসে কেউ যদি কিছু দেয়, হাত পেতে নিই।

কান মা কানা বলে, তোমাকে আমি খুশি করে দেব, বুড়ি মা। তুমি আর একটা মজাদার গল্প শোনাও।

নিগ্রো বুড়ি আর একটা কাহিনী শোনাবার তোড়াজোড় করছে এমন সময় তাঁবুর সামনে এক ঘোড়সওয়ার এসে দাঁড়ালো। কান মা কানা তলোয়ার খুলে বেরিয়ে আসে।

—কে? কি চাই।

—আমি বাগদাদ থেকে আসছি। উজির দানদানের দূত। আমার মতো আরও একশো ঘোড়সওয়ারকে তিনি আরবের নানা দেশে পাঠিয়েছেন। প্রতি গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে শহরে শহরে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কান মা কানা প্রশ্ন করে, কেন, কি কারণে?

উজির দানদান তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করে আমাদের ভাবী সুলতান শাহাজাদা কান মা কানার পিসেকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। এখন বাগদাদের সিংহাসন তিনি আগলে বসে আছেন। শাহজাদা কান মা কানা দেশত্যাগী হয়েছেন। জানি না তিনি কি ভাবে কোথায় খেয়ে না খেয়ে দিন গুজরান করছেন। উজির দানদান আমাদের পাঠিয়েছেন, যেভাবেই হোক, তাকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে। তার প্রাপ্য সিংহাসন তার হাতে তুলে দিয়ে দানদান অবসর নিতে চান।

এখন আমরা জনেজনে জিজ্ঞেস করে ফিরছি, কেউ যদি তাঁকে দেখে থাকেন, তাঁর সন্ধান জেনে থাকেন মেহেরবানী করে জানাবেন এই আমার প্রার্থনা। আমরা আবার তাকে ফিরে পেতে চাই।

ঘোড়সওয়ার দূতের কথা শুনে কান মা কানা পুলকিত হয়। সাব্বাকে গিয়ে গলাখাটো করে কানে কানে বলে, সব ফসলই সময় হলে পাকে। চলো দোস্ত, এবার যাবার সময় বিহঙ্গের। বাগদাদে যেতে হবে।

ঘোড়সওয়ার কিন্তু শাহজাদার মৃদুকণ্ঠের কথাও সব শুনতে পায়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এই যুবকই তাদের ভাবী সুলতান কান মা কানা। সঙ্গে সঙ্গে সে আভূতি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায়। সেই নিগ্রো বুড়ি আর সাব্বাও তার দেখাদেখি কুর্নিশ জানালো। কান মা কানা সাব্বাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমার জিগরী দোস্ত। এখন কেন কুর্নিশ জানাচ্ছো। যখন সিংহাসনে বসবো, তখন সে-সব হবে।

নিগ্রো বুড়িটাকে বললো, বুড়ি মা, তুমিও বাগদাদে চলো। আমাকে নিত্যি নতুন মজাদার কাহিনী শুনাবে।

বুড়ি বলে, যাবো, হুজুর, নিশ্চয়ই যাবো।

দূতকে নানা ইনাম নিয়ে বাগদাদে রওনা করে দিলো। —উজির সাহেবকে জানাও আমি বহাল তবিয়তে আছি। আজই আমরা রওনা হচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যাবো।

এরপর কাতুল-এর পিঠে চাপলো কান মা কানা। বুড়িকে চাপানো হলোা একটা খচ্চরের পিঠে। উটের পিঠে বোঝাই করা হলো সামান পত্র। সাব্বা জানোয়ারগুলোকে গুছিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকলো।

সারা বাগদাদ শহর আলোর মালায় সাজানো হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তোরণ তৈরি করা হয়েছে। শহরবাসী আনন্দে আত্মহারা। তাদের ভাবী সুলতান আসছে শহরে। উজির দানদানের নির্দেশে সারা প্রাসাদ অপরূপ সাজে সাজানো হয়েছে। নাচ-গান হৈ-হল্লা খানা-পিনার লহর ছুটেছে।

কাতুলে চেপে কান মা কানাকে আসতে দেখে শহর প্রান্তের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার নগরবাসী হর্ষধ্বনি করে ওঠে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ উজির দানদানও ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে যায়। কান মা কানাকে জড়িয়ে ধরে বুকে। দানদান অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে, তোমার প্রতীক্ষাতেই বসে আছি, ভাই। তোমার সিংহাসন তুমি বুঝে নাও।

প্রাসাদে এসে কান মা কানা সব আগে ছুটে যায় মায়ের ঘরে। কেঁদে কেঁদে মায়ের চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আদর করে। দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। মুখে কোনও কথা সরে না।

—মা—মাগো, কথা বলছো না কেন?

কান মা কানা আকুল হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে। মা উত্তর দেয়, কথা বলার ভাষা আজ হারিয়ে ফেলেছি বাবা। কতদিন দেখিনি তোকে। আজ একটু দু'চোখ ভরে শুধু দেখতে দে। তা বাবা, এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন রে। খাওদা দাওয়ার খুব কষ্ট গেছে।

কান মা কানা বলে, কই, রোগা তো হইনি মা। দিব্বি, দেখছো না, কেমন তাগড়াই চেহারাখানা হয়েছে। তুমি মা তো—তাই তোমার নজরে পড়ছে না।

মা হাসে। আনন্দ বেদনা মিশ্রিত সে হাসি। বড় মধুর। কান মা কানা জিজ্ঞেস করে, নসিবার খবর কি মা? সে কেমন আছে?

তুমি চলে যাওয়ার পর কারো মনেই আনন্দ নাই বাবা। নসিবা আর তা মা ঘরে থেকে আর বের হয় না। চলো, আমার সঙ্গে, ওদের কাছে নিয়ে যাই।

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নুজাতের ঘরে আসে। বিষণ্ণ বিষাদগ্রস্ত মা মেয়ে কান মা কানাকে দেখে আনন্দে দুলে ওঠে। কিন্তু ভয়, না জানি কান মা কানা কিভাবে তাদের গ্রহণ করবে।

—পিসি কেমন আছ?

নুজাৎ বলে তোমার পিসার ইন্তেকাল হওয়ার পর থেকে আমার আর ভালোমন্দ বলে কোনও বোধ নাই, বেটা। আর নসিবা—সে তো তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে কারো সঙ্গে হেসে কথা বলেনি। সময়মতো নাওয়া খাওয়া করে না। দেখো না, সুরৎখানার কি হাল হয়েছে।

নসিবা মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে চেয়ে থাকে। এতকালের চাপা অভিমান আজ যেন উথলে উঠতে চায়। যাবার আগে কান মা কানা তাকে একটা খবর পর্যন্ত দিয়ে যায়নি। এতকাল দূরে দূরে রইলো, একটিবার খোঁজও করেনি, সে বাঁচালো কি মরলো। দুচোখ জলে ভরে আসে তার। কিন্তু মা-মনির নজরে পড়ার লজ্জায় জানলার গরাদ ধরে বাইরে বাগিচার দিকে চেয়ে থাকে।

সে-রাতেই তাদের শাদী এবং মধুযামিনী হলো। কান মা কানা নসিবাকে বুকে টেনে নেয়, আমি যখন ছিলাম না, আমার কথা মনে পড়তো তোমার?

নসিবা ঠোঁট ওলটায়, আমার দায় পড়েছিলো—তোমার কথা ভাবতে যাবো কেন?

কান মা কানা বুঝতে পারে, দারুণ অভিমানের কথা। বলে, আমার কিন্তু সব সময় তোমার কথা মনে পড়তো।

—ছাই মনে পড়তো। পুরুষ মানুষের মন বলে কোনও পদার্থ আছে নাকি? হৈ-হল্লা করে নেচে বেড়িয়েছো। নতুন নতুন মেয়ে মানুষ নিয়ে ফূর্তি করেছো, আমার কথা তোমার মনে পড়বে কোন্ দুঃখে।

—ইয়া আল্লাহ! আমার সম্বন্ধে এই তোমার ধারণা? তুমি সাব্বাকে জিজ্ঞেস করো, সেই তোমাকে সব বলবে। যতদিন বিদেশে ছিলাম সেই আমার একমাত্র সঙ্গী ছিলো।

—সাব্বা কে?

—ডাকাত! বাদাবী ডাকাত।

—ডাকাত? নসিবা আঁৎকে উঠে। ভয়ে জড়িয়ে ধরে কান মা কানাকে।

—তুমি ডাকাতের দলে ছিলে?

—দলে নয়, শুধু একজন ডাকাতের সঙ্গে। তার মতো ডাকাত হয় না নসিবা। ভালোবাসার জন্যে সে ডাকাত হয়েছে।

—ভালোবাসার জন্যে আবার কেউ ডাকাত হয় নাকি?

নসিবা অবিশ্বাস করে। কান মা কানা বলে, হয় হয়। সে কথা তোমাকে আর একদিন বলবো। আজ আমাদের প্রথম মিলন রাত্রি। আজ ওসব কথা থাক, নসিবা। অনেক রাত হলো, এবার এসো—

এই মধুযামিনী থেকেই তাদের মধুর জীবনের সুখপাত্র। তারপর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নসিবা কান মা কানা সুখের সায়রে গা ভাসিয়ে কাটিয়ে দিলো।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। শাহরাজাদ বললো, নসিবা কান মা কানার কাহিনী শুনলেন, জাঁহাপনা। এবার আপনাকে পশু-পাখির মজাদার কাহিনী শোনাবো। আজ আর সময় নাই। রাত্রি শেষ হয়ে এলো। এবার গল্প থামাচ্ছি।

একশো ছেচল্লিশতম রজনীর মধ্য যামে সুন্দর সুন্দর পশু-পাখিদের গল্প বলতে শুরু করে শাহরাজাদ। প্রথমে শুনুন রাজহাঁস ময়ূর আর ময়ূরীর উপাখ্যান ঃ

সে অনেককাল আগের কথা। এক সমুদ্রের তীরে বাস করতো এক ময়ূর দম্পতি। মনের আনন্দে দুজনে পুচ্ছ নাচিয়ে ঘুরে বেড়াতো বনে বনে। ঝরনার সৌন্দর্য দেখে আর পাখির কাকলি শুনে দিন কাটাতো। দিনের বেলায় বেরুতো আহারের অন্বেষণে। আর রাত্রিবেলা এক গাছের কোটরে এসে বিশ্রাম করতো। এইভাবে দিন কাটছিলো। একদিন ময়ূর ময়ূরীকে বললো, চলো, একটু দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসি। একই জায়গায় রোজই ঘোরাফেরা—বড় একঘেঁয়ে লাগছে। নতুন জায়গার গাছপালা ফুল পখি—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য ভালোই লাগবে।

ময়ূরী বলে, খুব ভালো হবে। চলো যাই।

সেই দিনই তারা উড়তে উড়তে চলে গেলো একটা সুন্দর দ্বীপে। যে দিকে তাকায় চোখ জুড়িয়ে যায়। গাছে গাছে বাহারী ফুল, থোকা থোকা নানা সুমিষ্ট ফল। আর নিরন্তর

নির্ঝর ঝরনার সে কি মনোহারী শোভা? একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় বসে নাম-না-জানা নানা জাতের মিষ্টি মিষ্টি ফল আর ঝরনার নির্মল জল খেয়ে খেয়ে খুশিতে নাচতে লাগলো তারা।

সারাদিন বেশ আনন্দ করে কাটিয়ে পড়ন্ত বিকেলে যখন তারা স্বগৃহে ফেরার উদ্যোগ করছে, এমন সময় সেখানে এক রাজহাঁস এসে হাজির হলো। চোখে মুখে আতঙ্ক। ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এসে বললো, বাঁচাও বাঁচাও আমাকে।

ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। ময়ূর এগিয়ে এসে বললো, কোনও ভয় নাই। আমরা তো আছি। কী ব্যাপার, কেউ তাড়া করেছে বুঝি। যাই ঘটুক তোমার কোন চিন্তা নাই, বোন। এখন তুমি আমাদের মেহেমান—ঘরের লোক। তোমাকে রক্ষা করার সব দায়-দায়িত্ব আমাদের।

রাজহাঁস কাঁপতে কাঁপতে বলে, আদমকিন!

ময়ূর বলে, ভয় নাই, আল্লাহ রক্ষা করবেন। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এই দ্বীপে আদমকিন এলো কি করে? চারদিকে জল, আদমকিন তো আর উড়তে পারে না। সাঁতার দিতেও জানে না। তুমি এখানে কতদিন আছো?

রাজহাঁস বললো, খুব ছোটবেলা থেকে আমি এই দ্বীপে বাস করছি। এতদিনের মধ্যে ভয়ের কোনও ব্যাপার হয়নি। দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলাম। গত রাতে আমি আমার ডেরায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছি—একটা স্বপ্ন দেখলাম। একটা আদমকিন এসে আমাকে বলছে, ওহে রাজহংস, তোমার শরীরটা বেশ নাদুস-নুদুস। আমার জিভে জল আসছে। আর খিদেও পেয়েছে বেজায়।

দেখলাম তার চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে। লম্বা লম্বা দাঁতগুলো দেখে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেলো। আদমকিনরা ভয়ঙ্কর বদমাইস। ওদের গায়ে ভীষণ জোর আর মগজে শয়তানী বুদ্ধি। বুনো হাতীর সঙ্গেও তারা পাঞ্জা লড়ে।

আমি ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চোঁ দৌড় দিলাম। আদমকিন আমার পিছনে পিছনে তাড়া করতে লাগলো। আমিও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি। ছুটতে ছুটতে অবশেষে এক পাহাড়ের গুহায় এসে লুকিয়ে পড়লাম। তখন আমার হাত পা অসাড় অবশ হয়ে গেছে। ভয়ে বুক ধড়াস ধড়াস করছে। সারাদিন না খেয়ে সেই গুহার মধ্যে পড়ে রইলাম। বাইরে বেরিয়ে যে খাবার-দাবারের সন্ধান করবো—সে সাহস নাই। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু গুহার ভিতরে জল কোথায় পাবো? হঠাৎ নজরে পড়লো, গুহার আর এক কোণে শুয়ে আছে এক পশুরাজ সিংহ। আমাকে সে অনেক আগেই দেখেছিলো—আমি তাকে এই প্রথম দেখলাম। শুয়ে শুয়ে আমাকে দেখে মৃদু মৃদু হাসছে। আমার বুকে ভরসা হয়। সে আমাকে মিষ্টি করে ডাকলো, কি বাছা, অমন ভয়ে জড়সড় হয়ে আছো কেন? এদিকে এসো, কি হয়েছে, বলো দেখি শুনি।

তার কথায় আমি খানিকটা আশ্বস্ত হই। গুটি গুটি তার দিকে এগিয়ে যাই। পশুরাজ জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি? কোন্ জাতের জানোয়ার তুমি?

আমি বলি, আমার নাম রাজহংস, জাতে আমি পাখি।

সিংহ মশায় বললো, দেখছি তুমি ভয়ে সিটকে গেলে। কী ব্যাপার?

আমি তাকে আমার স্বপ্নের কাহিনী বললাম।

সিংহ শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো আশ্চর্য ব্যাপার

তো? দিন কয়েক আগে আমিও ঠিক এই রকম একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমার বাবাকে বলতেই তিনি হুশিয়ার করে দিয়ে বললেন, খুব সাবধান, এই আদমকিনগুলো ভীষণ শয়তান হয়। ওদের বদমাইশী বুদ্ধির কোনও তুলনা নাই। কিভাবে কখন যে পিছন দিক থেকে এসে ঘায়েল করবে কেউ জানে না।

সিংহের কথা শুনে আবার আমি ভয়ে শিউড়ে উঠলাম। তাহলে উপায়? এই রকম একটা মারাত্মক জানোয়ার নিয়ে এই বনে বাস করবো কি করে? পশুরাজকে তোয়াজ করতে লাগলাম, তুমি এ বনের রাজা। এখানে এসে একটা সামান্য আদমকিন দাপট দেখাবে—তা কি সহ্য করবে তুমি? এ কথা শুনলে লোকে যে ছি-ছি করবে। তোমার যা অসীম বিক্রম—তুমি যদি একটা হুঙ্কার ছাড়ো—আদমকিন তো কোন্ ছার ওর বাবা সুদ্ধ কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে যাবে। ঐ শয়তান জানোয়ারটাকে যদি শায়েস্তা করতে পারো তা হলে আমাদের মতো চুনোপুটিরা দু'হাত তুলে তোমার জয়গান করবে। তুমি পশুরাজ—বনের অধিপতি, তোমার সাম্রাজ্যে এত বড় অনাচার তো চলতে দিতে পারো না। আমরা তোমার একান্ত অনুগত প্রজা। আমার ধন প্রাণ রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। তুমি এর একটা বিহিত কর সিংহরাজ। না হলে আমি তো যাবোই আমার মতো হাজার হাজার জন্তু জানোয়ার ওর শিকার হবে।

সিংহ গর্জে ওঠে, তুমি ঠিক বলেছ, রাজহংস। আমার বনে অন্য কেউ এসে মস্তানি করে যাবে এ তো সহ্য করা যায় না। চলো, এখনি ব্যাটার সাধ মিটিয়ে দিয়ে আসি।

এই বলে পশুরাজ সদর্পে গুহা থেকে বেরিয়ে বন বাদাড় ভেঙে চলতে থাকে। আমিও তার পিছনে পিছনে চলি। তার হুঙ্কার আর লেজের ঝাপটে সারা জঙ্গল কাঁপতে থাকে। তার পিছনে চলা আমার পক্ষে বেশ কষ্ট হয়ে উঠেছিলো। না জানি কখন ওর ওই লেজের চাবুকের বাড়ি এসে লাগে আমার গায়ে। তা হলে আর দেখতে হবে না। এক বাড়িতেই ছাতু ছাতু হয়ে যাবো।

যাই হোক, অনেকটা জঙ্গল পেরুবার পর এক সময় নজরে এলো, সামনেটা ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেছে। ক্রমশই ধুলোর ঝড়টা আরও কাছে আসতে থাকলো। এবার মোটামুটি বোঝা গেলো, একটা গাধা ছুটে আসছে। মাঝে মাঝে সে উল্টে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আবার উঠে ছুটছে। আমাদের সামনে আসতে সিংহরাজ ধমক দিয়ে ওঠে, এ্যাই—ও রকম বাঁদরের মতো লম্ফ ঝম্ফ করছো কেন? কে তুমি? কোন্ জাতের জানোয়ার?

গাধাটা কাঁপতে কাঁপতে বললো, হুজুর মহানুভব আমার নাম গাধা। আমরা জাতেও গাধা জানোয়ার। আদমকিনের ভয়ে আমি প্রাণরক্ষা করার জন্যে পালাচ্ছি।

সিংহ হো হো করে হেসে ওঠে, তোমার মতো দশাসই চেহারার জানোয়ার—সামান্য একটা আদমকিনের ভয়ে তুমি পালাচ্ছো? লজ্জা করে না।

গাধাটা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, আপনি জানেন না পশুরাজ, আদমকিন কি মারাত্মক জানোয়ার। তার অসাধ্য কিছুই নাই। এমন ছলচাতুরী করে সে আপনাকে ফাঁদে ফেলবে, বাঁচবার আর কোন পথ থাকবে না। সে যে আমাকে মেরে ফেলবে—এবং সেই ভয়ে আমি পালাচ্ছি তা ঠিক না। কিন্তু সে আমাকে বিস্তর নাস্তানাবুদ করতে পারে। করেছেও। সে আমার কাছে এসে বললো, আমি তোর পিঠে চাপবো। আমি দেখলাম 'না' বললে ঝামেলা করবে। বললাম, তা চাপতে চাও চাপো। সে এমন একটা বদখদ জিন লাগাম এনে জুড়লো যে, পিঠের ছাল চামড়া আমার উঠে গেছে, এই দেখুন।

আমরা দেখলাম, সত্যিই পিঠের কয়েকটা জায়গা ঘষা লেগে ছড়ে গেছে। রক্ত ঝরে না পড়লেও বেশ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। গাধাটা মুখখানা হাঁ করে দেখিয়ে বললো,

এমন একটা লাগাম লাগিয়েছিলো, এই দেখুন ধর্মাবতার, জং-ধরা লোহার আংটায় আমার জিভটা কেটে কি হয়েছে?

সত্যিই—জিভটা দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। গাধা বলতে থাকে, এমন চাবুক কষতে লাগলো যে, আমার দফা রফা। মারের চোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম। কিন্তু কাঁহাতক আর একটানা অত জোরে ছোটা যায়। যেই একটু ঢিলে দিয়েছি—আবার সপাসপ চাবুক পড়তে থাকে পিঠে। আর সে কি খিস্তি করে গালাগাল। আমার চৌদ্দ পুরুষের গুষ্টির তুষ্টি করে ছেড়েছে। আপনাকে আমি কসম খেয়ে বলছি, হুজুর আমি সাচ্চা গাধার বাচ্চা। আমার চৌদ্দ পুরুষের কেউ খারাপ ছিলো না। অথচ সে আমাকে কি গালাগালটাই দিলো, আমি নাকি খানকির ছেলে, আমার বাবা নাকি ছিলো জুয়াচোর, মেয়ে মানুষের দালাল। আরও অসভ্য সব কথা—যা মুখে আনা যায় না। রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগলো। তাকে তাকেই ছিলাম। একটা টিলার ওপরে উঠেছি—তাকিয়ে দেখলাম, নিচে একটা খাদ। এমন জোরে লাফিয়ে উঠে গা-ঝাড়া দিলাম, বাছাধন একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়লো খাদের নিচে। আর সেই মওকায় দে ছুট—দে ছুট। ছুটতে ছুটতে হাফ ধরে গেলো। পা জড়িয়ে আসতে লাগলো। বুড়ো হয়েছি, আগের মতো গায়ে কি অত জোর আছে। তাই মাঝে মাঝে উল্টে পড়ে গেলাম।

সিংহ মজা পায়, তা পালাবার কি আছে?

—আপনি জানেন না, হুজুর, শয়তানটা আমাকে ভিস্তিওয়ালার কাছে বিক্রি করে দেবে বলে ধমকাচ্ছিল। তা যদি সত্যি সত্যিই ভিস্তিওয়ালার কাছে বেচে দেয়, একেবারে মরে যাবো। এই বুড়ে হাড়ে ঐ রকম জলের জালা বইতে পারা কি সহজ? নির্ঘাৎ মরে যাবো। তখন আমার লাশটা ওরা জঙ্গলে ছুঁড়ে দেবে। আর শেয়াল শকুনে ফলার করে খাবে। এখন বলুন, ধর্মাবতার, আপনি এই বনের রাজা থাকতে আমাকে আদমকিনের হাতে এই রকম সাজা পেতে হবে? তার মতো সাংঘাতিক শয়তান জানোয়ার সারা দুনিয়ায় আর দু'টি নাই। আপনি এক একটা বিহিত করুন, এই আমার প্রার্থনা।

আমি বললাম, গাধার কথা শুনে আপনি আরও ভালো করে বুঝতে পারলেন, হুজুর, জানোয়ারটা কত বড় পাজি। গাধাকে সে জানে মারতে পারবে না—তবু কি নাজেহালটা না করেছে। আর আমাকে তো সে গিলেই খেয়ে ফেলতে পারে।

গাধাটা চলে যাবার উদ্যোগ করতেই সিংহ বললো, এত তাড়া কিসের? কোথায় যাবে? না—ভয়ে পালাচ্ছো? দাঁড়াও সবুর কর। আমার সঙ্গে একবার চলো, জায়গাটা দেখিয়ে দেবে, কোন্ দিকে গেলে আদমকিনের দেখা পাবো।

—ওরে বাবা, দোহাই হুজুর, ঐ কথাটি বলবেন না। আমি ওই মহাশয়তানটার ধারে কাছে যেতে চাই না আর। ওর ফন্দী ফিকির বড় খারাপ। আমার এখন একমাত্র কাজ, ওর থেকে মাইলদশেক দূরে চলে যাওয়া। ও যে দিকে যাবে আমি ঠিক তার উল্টো দিকে যাবো। এমন একটা গুপ্ত ঘাঁটি খুঁজে বের করতে হবে, যাতে বদমাইশটা আমার আর হদিশ করতে না পারে।

এই সময়ে দেখা গেলো ধুলো উড়িয়ে আর একটা জানোয়ার আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। তার খটাখট খুরের শদে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে চারপাশ। জানোয়ারটা কাছে এসে পশুরাজকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে অভিবাদন জানায়। সিংহরাজ জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি?

—হুজুর আমি অশ্ব। অশ্ব জানোয়ার বলেই আমি পরিচিত। আদমকিনের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি পালাচ্ছি।

সিংহ বলে, এমন কথা তোমার মুখে সাজে না। তোমার যা শক্তি এবং বিক্রম তাতে ঐ রকম একটা জানোয়ারকে গ্রাহ্য করা কি তোমার উচিত। ভেবে দেখো, ব্যাপারটা কি লজ্জার। তোমার একটা লাথির ঝাপটায় সে অক্কা পেতে পারে। আর তাকেই তোমার এতো ভয়। আমার দিকে তাকাও, আমি তো তোমার মতো চেহারায় অতো জাঁদরেল নই। তবু এই রাজহংসকে কথা দিয়েছি, শয়তানটাকে আজ আমি শেষ করবোই। ফলার করে ওর মাংস খাবো। ওর হাড় দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো। বেচারা রাজহংস ওর ভয়ে কাল সারাটা রাত ঠকঠক করে কেঁপেছে। এখনও ওর আশঙ্কা, আদমকিন যদি মারা না পড়ে, তবে এ বনে সে বাস করবে কোন্ ভরসায়? ওকে আতঙ্ক থেকে মুক্ত করাই এখন আমার একমাত্র কর্তব্য। আমি বনের রাজা, আমি যদি প্রজাদের রক্ষা না করতে পারি তারা এ বনে থাকবে কেন?

ঘোড়াটা করুণভাবে চাইলো, মহারাজ আপনার কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা, অমন কাজটি করতে যাবেন না। ওই হাড়ে-হারামজাদা শঠশয়তানটার মারপ্যাঁচ আপনি জানেন না। ও আপনাকে নাকানি চোবানি খাইয়ে নাজেহাল করে ছাড়বে। বছর দুই আগে নানা রকম ছলছুতো করে এই আদমকিনটা আমার কাছে এসেছিলো। তারপর কখন যে টুক করে আমার গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিয়েছিলো, বুঝতেই পারিনি। যখন জানতে পারলাম দেখি ফাঁসের দড়িটা মাথার উপরে গাছের ডালে বেঁধে সে ফিক ফিক করে হাসছে। তখন আমার কি দশা একবার ভাবুন। না-পারি চলতে, না-পারি বসতে। একভাবে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখে দিলো শয়তানটা। তারপর আমার পিঠে জিন লাগাম চাপিয়ে উঠে বসে শঙ্করমাছের চাবুক দিয়ে সে বেধড়ক পেটাতে থাকে। সারা শরীর কেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। কিন্তু মার আর কিছুতেই থামে না। রাতের বেলা ফাঁস পরিয়ে গাছের ডালে বেঁধে রাখে। আর, দিনের বেলায় সারা বন বাদাড়ে নিয়ে বেড়ায়। বয়স হয়েছে, অত দৌড়-ঝাঁপ এই বয়সে সইবে কেন? কিছুদিনের মধ্যেই অসুখে পড়লাম। সে আমাকে এক কলুর কাছে বিক্রি করে দিলো। কলু আমাকে দিয়ে ঘানি টানায়। জোয়াল কাঁধে নেওয়া আমাদের চৌদ্দপুরুষের কারো অভ্যাস নাই। দিন কয়েকের মধ্যে ঘাড়ে ঘা হয়ে গেলো। তখন সে আমাকে কষাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেয়। লোকটা আমাকে মেরে আমার চামড়া বিক্রি করবে—এই তার মৎলব। আমি দেখলাম, বাঁচবার আর পথ নাই। তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। এস্পার ওস্পার যা হয় হোক, একদিন তাক বুঝে কষাইটাকে বিরাশি সিক্কার একখানা লাথি ঝেড়ে দিলাম। ব্যাটা তো কুপোকাৎ। আর সেই ফাঁকে আমিও হাওয়া। এই হলো আমার অভিজ্ঞতা। সুতরাং ঐ হতচ্ছাড়া বদমাইশটার কাছ থেকে সব সময় শতহাত দূরে থাকবেন, হুজুর।

ঘোড়ার উপদেশে বিরক্ত হয় সিংহ। বলে কোন্ রোগের কি ওষুধ, আমার বেশ ভালোভাবেই জানা আছে। সুতরাং ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। কি করে তোমাদের আদমকিনকে খতম করতে হয় একবার দেখে নিও। এখন বলতো, শেষ তার সঙ্গে তোমার কখন দেখা হয়েছে?

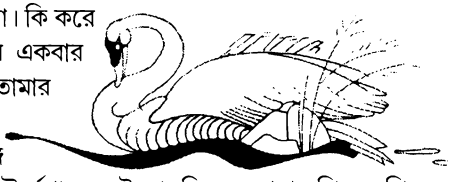

ঘোড়া বলে, আজ দুপুরে তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে। দেখা মাত্র আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছি। সে আমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে আসছে।

ঘোড়ার কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেলো ধুলো উড়িয়ে একটা উট ছুটে আসছে। চোখে মুখে তার দারুণ আতঙ্ক। পাগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে। উটের এই অবস্থা দেখে সিংহ ভাবে, ও নিশ্চয়ই সে শয়তান আদমকিনের বদমাইসির শিকার। সিংহ জিজ্ঞেস করে, তুমি এত কাঁপছো, কেন? কি হয়েছে?

উটটা বলে, আমার নাকটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, হুজুর। আদমকিন ফুটো করে দড়ি বেঁধে দিয়েছে। সে আমাকে যেখানে খুশি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আমার পিঠের দিকে তাকান, ব্যাটা আমার ওপর পাথরের চাঁই চাপিয়ে দিয়েছিলো। কেটেছড়ে একসা হয়ে গেছে। আর দেখুন আমার পাগুলোর কি দুর্দশা। পাহাড় পর্বতের দুর্গম পথে পথে আমাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে খোঁড়া করে ফেলেছে। আর এই শেষ না। সে আমাকে একটা কষাই-এর কাছে বেঁচে মোটা টাকা মুনাফা লুটেছে। লোকটাকে গুঁতিয়ে মেরে আমি জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সিংহ গর্জে ওঠে।—কোথায় আদমকিন, কোথায় আদমকিন, তাকে আমি জ্যান্ত গিলে ফেলবো।

এই বলে সে কেশর ফুলিয়ে হুঙ্কার দিতে থাকে। উটকে জিজ্ঞেস করে, তার সঙ্গে সব শেষ তোমার কোথায় দেখা হয়েছে।

উট বলে, সে একটু আগেই আমার পিছু ধাওয়া করেছে। মনে হয় এক্ষুণি এখানে এসে পড়বে। আপনি আমাকে অনুমতি করুন, হুজুর, আমি চলে যাই। ওই শয়তানটার খপ্পরে পড়লে এবার আর বাঁচবো না। এদেশ ছেড়ে আমি অন্য কোন দেশে পালিয়ে যেতে চাই।

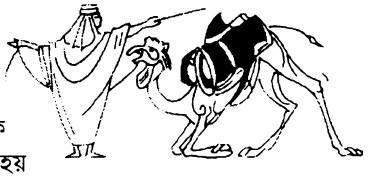

সিংহ বলে, একটুখানি দাঁড়াও উট, আমি তোমাকে আমার ভেল্কী দেখাচ্ছি। কি করে ব্যাটাকে জব্দ করতে হয় একবর নিজে চোখে দেখে যাও। ওকে আমি তুলে আছাড় দেব। ওর রক্ত চুষে খাবো। ওর হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলবো, ব্যাটা ভেবেছে কি?

সিংহের এই তর্জন গর্জন দেখে উট বেচারী তো ভয়ে কাঁপতে থাকে।

—দোহাই হুজুর আমাকে ছেড়ে দিন।

আভূমি আনত হয়ে উট সিংহকে কুর্নিশ জানিয়ে দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

উট চলে যেতেই এক থুরথুরে বুড়ো এসে হাজির হয়। তার মাথায় একটা বাক্স। হাতুড়ি, বাটালী, তুরপুণ প্রভৃতি নানা রকম ছুতোরের যন্ত্রপাতি। লোকটার কাঁধে খানকয়েক কাঠের বর্গা।

বুড়ো ছুতোর বলে, আপনি বনের অধিপতি, মহানুভব সম্রাট, আপনার গুণের সীমা নাই। আপনার মতো পুণ্যবান; মহৎ দানশীল পশুপতি তামাম দুনিয়ার কোথাও নাই। আমি দীনহীন এক ছুতোর। দিন আনি দিন খাই। আমাকে ঐ শয়তানটার হাত থেকে রক্ষা করুন, হুজুর।

সিংহ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, কে তোমার অনিষ্ট করেছে? কে তোমাকে উত্যক্ত করেছে, বলো। আমি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেব। কি তোমার নাম আর পরিচয়?

বুড়ো বলে, আমার নাম সূত্রধর। আমরা জাতেও সূত্রধর। বনে বনে কাঠ কাটি। তা দিয়ে ঘরবাড়ি নানারকম আসবাবপত্র বানাই। এই আমার পেশা। আমি এই বনে এসে এক আদমকিনের খপ্পরে পড়েছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সে আমাকে দিয়ে কাঠ কাটায়। তার বদলে না দেয় খানা, না দেয় ইনাম। দিনে দিনে অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। আজ আমি বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছি। ঠিক করে ফেলেছি, যে-বনে আদমকিন থাকবে সে বনের ধারে কাছে আমি থাকবো না।

সিংহ শুনে দাঁত কড়মড় করতে থাকে। ওকে আমি ছিঁড়ে খাবো। কোথায় সে?

—অপেক্ষা করুন, হুজুর, এক্ষুণি সে এখানে এসে পড়বে। সে আমার পিছনে পিছনেই আসছে। আমাকে না হলে তার তো চলবে না। আমি ছাড়া কে ওর ঘরটা বানিয়ে দেবে? সুতরাং যে ভাবেই হোক, আমাকে আটকে রাখার চেষ্টা সে করবেই।

সিংহ জিজ্ঞেস করে, তা এখন মশায়ের যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

ছুতোর বলে, আমি আপনার বাবার উজির চিতার কাছে যাবো। তিনি আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, তাঁর জন্যে একটা দারুণ মজবুত কামরা বানিয়ে দিতে হবে। আদমকিনের অত্যাচারে নাকি তিনি রাতে ভালো করে ঘুমুতে পারছেন না। সেই জন্যেই আমি এই বর্গার কাঠগুলো আর যন্ত্রপাতি নিয়ে ওখানে যাচ্ছি।

সিংহের মনে হিংসা হয়। বলে, আমার বাবার উজির চিতা আমাদের নোকর। রাজার ঘর বানাবার আগে তার ঘর বানাবে—এ হতে পারে না। তুমি তোমার কাঠ যন্ত্রপাতি সব নামাও। আগে সুন্দর করে আমার জন্যে একখানা ঘর বানাও, তারপর ওসব পরে হবে।

—কিন্তু হুজুর, আপনি চিতাবাঘের দাপট তো জানেন, সে আমাকে আস্ত রাখবে না। আজ বরং আমি তার ঘরটা বানিয়ে দিয়ে আসি। তারপর কাল আপনাকে ঘর কেন, প্রাসাদ বানিয়ে দেব।

এই বলে বুড়ো সামনে পা বাড়াতেই সিংহটা তার সামনের একটা পা তুলে বৃদ্ধের বুকের কাছে থাবা মেলে ধরে। থাবা মারার জন্যে থাবা সে তুলে ধরেনি। একটু ভয় দেখাবার জন্যেই এই 'হালুম' করা। কিন্তু বুড়ো ভয়ে পিছনে হটতে হটতে চিৎপাট হয়ে পড়ে গেলো। কাঠের বর্গা আর যন্ত্রপাতিগুলো ইত্যাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। দু-হাত জোড় করে

কাকুতি মিনতি করতে থাকে বুড়ো, দোহাই বাবা, সিংহরাজ, থাবা চালাবেন না।—একেবারে মরে যাবো। দিচ্ছি—আপনার ঘরটাই আগে বানিয়ে দিচ্ছি। তারপর চিতার কাছে যা হবার তা হবে।

—কি আবার হবে? কিচ্ছু হবে না। বলবে আমার হুকুমে তুমি আমার কামরা বানিয়ে দিয়েছ। তারপরও যদি সে তোমাকে কিছু মন্দ বলে আমাকে বলবে, ওর পিণ্ডি আমি চটকে শেষ করে দেব।

বুড়োটা উঠে এসে সিংহের মাপ নিলো। কতটা লম্বা চওড়া উঁচু—সব যথাযথ মেপে নিয়ে কাঠগুলো দিয়ে একটা কামরা বানালো। ঢোকার মুখটা ছাড়া বাকী সব দিকই বেশ ভালো করে এঁটে দিয়ে বললো, নিন, হুজুর একবার ঢুকে দেখুন তো ঠিক হলো কিনা।

সিংহ বললো, জী হুজুর। কাঠগুলো তো আপনার মাপে ছিলো না। চিতার কামরা বানাবো বলে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনি শুনলেন না। যাই হোক, এখনকার মতো চালিয়ে নিন। দু-একদিন বাদে আপনার পছন্দসই একটা বিরাট মহল বানিয়ে দেব। নিন, এখন ঢুকে দেখুন, কেমন লাগে।

মাথা পিঠ নিচু করে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সিংহ সেই খাঁচার ভিতরে ঢুকলো। আর তৎক্ষণাৎ বুড়ো দরজাটা বন্ধ করে সারা খাঁচাটার চতুর্দিকে বড় বড় পেরেক ঠুকে দিলো। সিংহ আর নড়তে পারে না। চারপাশে পেরেকের আল্ গায়ে ফুটতে থাকে। সিংহ রাগে গর্জে ওঠে, এসবের মানে কি?

বুড়ো বলে, কি করবো হুজুর, মালিকের হুকুম, তামিল না করলে আমাকে যে আস্ত রাখতো না।

—কে তোমার মালিক?

—আদমকিন।

এমন সময় সিংহ দেখতে পেলো বুড়োর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেই ছোট্ট জানোয়ারটা—আদমকিন। দেখতে ভীষণ কুৎসিৎ, বেঢপ মোটা হোদল কুৎকুৎ চোখ, থ্যাবড়া নাক, সারা গায়ে লোমে ভরা। কামড়ে কামড়ে একটা আপেল খাচ্ছে। আর সিংহের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। —কী, খুব গায়ে জোর—না? তা খাটাও দেখি কত

আছে জোর? ঘটে নাই এক ফোঁটা বুদ্ধি—একেবারে হামবড়াই ফাট। এবার বাছাধন, আল্লাহর নাম কর। মৌৎ তোমার সামনে হাজির।

বুড়োকে কি যেন ফিসফিস করে বলতেই কতকগুলো, খড়বিচালি কুড়িয়ে এনে খাচাটার ওপরে ছড়িয়ে দিলো। চকমকিটা বের করতেই সিংহ চিৎকার করে ওঠে, আমাকে পুড়িয়ে মারবে নাকি?

আদমকিন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বলে, না না, তোমাকে ধূপ ধুনো দিয়ে পুজো করবো।

—দোহাই তোমার, সিংহ কাকুতি মিনতি জানাতে থাকে, আমাকে পুড়িয়ে মেরো না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, বুড়ো ততক্ষণে নুড়ো জ্বেলে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো খড়বিচালি। আর তখন সিংহর কি অবস্থা—সে দৃশ্য আমি বর্ণনা করতে পারবো না।

যাই হোক, আদমকিন তখন সিংহকে পোড়ানোর আনন্দে মশগুল। আমার দিকে কোন নজর ছিলো না। তাই টুক টুক করে ওখান থেকে কেটে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছি তোমাদের কাছে। তোমরা আমাকে বাঁচাও। নইলে আমাকে একবার সামনে পেলে আর আস্ত রাখবে না।

ময়ূর বললো, কিচ্ছু ভয় নাই। কপালে যা লেখা আছে তা কেউই খণ্ডন করতে পারে না, বোন। ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করে কোন লাভ নাই। দেখাই যাক না, কি হয়।

এমন সময় সামনের ঝোপে খসখস শব্দে চকিত হয়ে ওঠে রাজহাঁস। বলে, ওই—ওই তো আসছে। শুনতে পাচ্ছো না তার পায়ের শব্দ। ঝোপ জঙ্গল ভেঙে সে এই দিকেই এগিয়ে আসছে।

রাজহাঁস আর অপেক্ষা করে না। ছুটে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে থাকে। ময়ূর চিৎকার করে ডাকে, আরে শোনো, বহিন শোনো। ও কিছু নয়। একটা কাঠবিড়ালী ছুটে বেড়াচ্ছে।

রাজহাঁসের ধড়ে প্রাণ আসে। গুটিগুটি করে আবার ওদের কাছে ফিরে এলো।

এরপর ঐ দ্বীপে একটা জাহাজ এসে ভিড়লো। নাবিকরা শিকারে বেরিয়ে পড়লো। ময়ূর-ময়ূরী টুক করে গাছের ডালে গিয়ে বসলো। কিন্তু রাজহাঁস পাখি হলেও তেমন উড়তে পারে না। ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। নাবিকরা অতি সহজেই রাজহাঁসটাকে ধরে গলা কেটে ফেলে।

ময়ূর-ময়ূরী গভীর দুঃখ পায়। কিন্তু কি করা—ভাগ্যের লেখা কে খণ্ডাতে পারে। এইভাবে নির্জন দ্বীপে মানুষের হাতে তার প্রাণ যাবে লেখা ছিলো—সেই নিয়তি সে এড়াবে কি করে?

কি আর করা যাবে। ময়ূর ময়ূরী নিরানন্দ মনে দেশে ফিরে গেলো।

একটুক্ষণের জন্য শাহরাজাদ থামে।

সুলতান শারিয়ার বলে জানোয়ারটার বুদ্ধি তো বড় জব্বর। এরকম আর কোনও মজার কিস্‌সা কি তোমার জানা আছে, শাহরাজাদ?

শাহরাজাদ বলে, এ আর এমন কি কাহিনী। এর চেয়ে আরও মজাদার কাহিনী আপনাকে শোনাতে পারি শাহজাদা।

—তা হলে আর দেরি কেন, শুরু করো।

শাহরাজাদ বলে, পশুপাখির গল্প বলার আগে আপনাকে ছোট্ট একটা অন্য কাহিনী শোনাই, জাঁহাপনা।

বাদশাহ শারিয়ার বলে, কি কাহিনী, শাহরাজাদ?

—এক মেষপালক রাখাল আর একটি মেয়ের কথা শুনুন।

আমাদের দেশের উত্তরে যে গিরিপর্বতমালা আছে তারই এক প্রান্তে এক মেষপালক বাস করতো। তার মতো ধার্মিক, সৎ এবং পরোপকারী মানুষ আর দু'টি হয় না। তার গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে শুধু মানুষই না, বনের হিংস্র পশুরাও তাকে খুব খাতির করতো। তার পাল থেকে একটা ভেড়াও কোন দিন খোয়া যেত না।

আল্লাহ একদিন ভাবলেন, লোকটার গুণগানে দেশের মানুষ তথা পশুপাখি সবাই পঞ্চমুখ। কি ব্যাপার। এমন সৎ ধর্মপ্রাণ মানুষ এখনকার দিনে হয় নাকি। আচ্ছা একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক। সুতরাং তিনি বেহেস্তের এক হুরীকে পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে।

মেষপালক তখন অসুস্থ হয়ে নিজের গুহায় শুয়ে শুয়ে আল্লাহর গুণগান করছিলো। এমন সময় সে দেখলো, একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাজল-কালো চোখ, টুকটুকে গুলাবের মতো লাল দু'টি গাল। মুখে তার মিষ্টি মধুর হাসি—যেন মুক্তো ঝরে পড়ছে। গুহার ভিতর হঠাৎ আতরের খুশবুতে ভরে গেলো। মেয়েটির দেহের সুবাস। মেষপালকের মন চনমন করে ওঠে।

—হ্যাঁ গো, মেয়ে, এখানে তুমি কি করছো? কি তোমার নাম আর পরিচয়? আমি তো তোমাকে ডাকিনি, বা ডাকার কোন প্রয়োজনও বোধ করিনি—তবে কেন এসেছো এখানে?

মেয়েটি তার পাশে এসে বসলো। বললো, আমার দিকে ভালো করে তাকাও। আমি সবে ষোলয় পা দিয়েছি। আমার দেহে যৌবনের জোয়ার আসতে শুরু করেছে। এবং এখনও আমি অপাপবিদ্ধকুমারী। আমি এসেছি তোমার কাছে আমার নিজের সুখের জন্য। তুমি আমাকে গ্রহণ করে আমাকে তৃপ্ত করো এই আমার একমাত্র কামনা। শুনেছি—তুমি খুব দয়ালু। কারো অভীপ্সাই অপূর্ণ রাখো না। তাই বড় আশা নিয়ে এসেছি, আমাকেও তুমি অখুশি করে ফেরাবে না।

মেষপালক বিছানায় উঠে বসে। রাগে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে।—বেরিয়ে যাও, এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাও; শয়তানী। দূর হও, আমার সামনে থেকে। তোমার মতো নষ্টচরিত্র মেয়েমানুষের মুখ দেখাও মহাপাপ। আর কক্‌খনো এপথ মাড়াবে না। যে ক'টা দিন বাঁচি একমাত্র তাঁর নামগান ছাড়া আমার আর অন্য কোনও কামনা বাসনা নাই।

মেয়েটি কিন্তু নড়ে না। বিলোল কটাক্ষ হেনে লাস্যময় ভঙ্গী করে আধো ভাষায় আশনাই করে বলে, কেন আমাকে তুমি নেবে না? আমি কি দেখতে এতই খারাপ? তুমি বুড়ো হয়েছ তাতে কি! আমি তোমার শরীরে এমন যাদু ঢুকিয়ে দেব, দেখবে কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। এই যে আমার কাজল কালো হরিণীর মতো চোখ, আপেলের মতো গাল, আর পাকা আঙুরের মতো এই দু'টো ঠোঁট দেখে তোমার চিত্তে কি কোনও বিকারই ঘটছে না? দেখ, কি সুন্দর আমার বুক, কি সরু আমার কটি আর এই ভারি নিতম্ব দেখে তোমার মনে কি কোনও চাঞ্চল্যই জাগছে না?

আমাকে কাছে টেনে নাও। আদর করে দেখ, তোমার হারানো যৌবন আবার ফিরে পাবে।

মেষপালক গর্জে ওঠে, ওরে শয়তানী, নরকের কীট এখান থেকে দূর হ। এ সব কথা শোনাও আমার পাপ। আর যদি না যাস, ঐ দেখ আমার লাঠি—তোর পিঠে ভাঙবো। বেলেল্লাপনার আর জায়গা খুঁজে পেলে না। আমাকে এসেছে ভোলাতে?

মেয়েটি কিন্তু তার এই রাগের কথায় কোনও কর্ণপাত করলো না। দুম করে গিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে একটা চুম্বন করে বললো, আমি একটা ডাগর ডাসা ফল, টকটক মিষ্টি

মিষ্টি। চেখে দেখে যাও—দেখবে কি মজা। আমার কুমারীত্ব তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। যুঁই ফুলের মতো এর খুশবু তোমার হৃদয় ভরিয়ে দেবে।

মেষপালক ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে বলে, ইয়া আল্লাহ, আমার সারা দেহ মন অপবিত্র হয়ে গেলো। দূর দূর—বিদেয় হ।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু চলে গেলো না। ধীরে ধীরে সে তার সব সাজপোশাক খুলতে থাকলো। মেষপালক আর সহ্য করতে পারে না। মেয়েটার ঐ ফুটন্ত যৌবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে।—না না—না। এ কিছুতেই হতে পারে না।

দু' হাতে মুখ ঢাকে সে। তার নিজের উপরে দখল বুঝি সে হারিয়ে ফেলবে। আর সে কিছুতেই চোখ মেলে দেখবে না পদ্মকলির মতো তার দেহ বল্লরী—আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। ওরে শয়তানী মায়াবিনী দূর হ। যুগে যুগে কালে কালে তোদের জন্যেই দুনিয়ায় এত অশান্তি। সৃষ্টির আদিকাল থেকে ভালো মানুষগুলোকে তোরাই টেনে নিয়ে গিয়েছিস জাহান্নমে। তোদের মোহে পড়ে পীর পয়গম্বর পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহর করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এই বলে মেষপালক তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইলো।

মেয়েটি বললো, প্রাচীনকালোর মানুষের কথা বললে, তবে জেনে রাখ, পৃথিবীর সবচেয়ে গুণীজ্ঞানী মানুষদের কিন্তু আমকে না হলে চলে না। আমিই তাদের জীবনের প্রেরণার উৎস। আমার এই রূপ-যৌবন তাদের বিভ্রান্ত তো করেই নি, বরং নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

মেষপালক দু হাতে কান ঢেকে চিৎকার করে ওঠে—ওরে শয়তানী বেবুশ্যে এখনও বলছি ভাগ্। তোর ছলনায় আমি ভুলছি না। তোর লোকভোলানো মিষ্টি মিষ্টি কথায় আমাকে কাবু করতে পারবি না।

তখন সেই লাস্যময়ী রমণীর কণ্ঠ শোনা গেলো, ওগো ধর্মাত্মা, তুমি তোমার পথেই অবিচল থেকে আল্লাহর নামগান করো। আমি চললাম।

এই বলে সেই হুরী অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এই বলে শাহরাজাদ চুপ করলো। বাদশাহ শারিয়ার বলে শাহরাজাদ, তোমার কিস্সা শুনে এই সিংহাসনের মায়া মোহ ছেড়ে দিয়ে আমারও ইচ্ছে করছে কোনও এক পাহাড়ের কন্দরে গিয়ে মেষ চরাই আর তাদের দুধ খেয়ে গুহার মধ্যে শুয়ে শুয়ে আল্লাহর নামগান করে জীবনটা কাটিয়ে দিই। কিন্তু তার আগে আরও কিছু জ্ঞানের কথা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।

পরদিন একশো ছেচল্লিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়।

—এবার এক কচ্ছপ আর এক বকের কাহিনী শোনাবো ঃ

একদিন এক বক সমুদ্রের তীরে বসে বসে জলের শোভা দেখছিলো। এমন সময় দেখতে পেলো, একটা মৃতদেহ ভেসে আসছে। লাশটা ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেলো পাড়ের একটা বাঁকে। দেখলো, লোকটার মুণ্ডটা কাটা। পরনে ফৌজী পোশাক। বুঝতে কষ্ট হয় না, লড়াই হেরে গিয়ে তার এই দশা হয়েছে। যাই হোক, আনন্দে তার মন নেচে উঠলো। এমন শাঁসালো খানা সে অনেকদিন খায়নি। এমন সময় দেখলো, একটা কচ্ছপ সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে। বকটা মাথা তুলে তাকে স্বাগত জানায়। কচ্ছপটা বলে, কি গো, বক তীরে বসে বসে কী দেখছো?

বক বলে, মনে মনে তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার পথ চেয়েই বসেছিলাম, কখন তুমি আসবে। আজকাল এদিকটায় বড় নেকড়ের উৎপাত শুরু হয়েছে। সুখে শান্তিতে আর বসবাস করা যাবে না। আমি তো ভাবছি এদেশ ছেড়ে পালাবো। কচ্ছপ বলে, যদি যেতেই চাও বন্ধু আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। আমিও আর থাকতে চাই না পোড়া এই দেশে। এখানে আমাদের কেউ কদর বুঝলো না। কথায় আছে না, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।

আমাদের হয়েছে সেই দশা। এখানে আমাদের কেউ কদর বুঝবে না। বিদেশে যেখানেই যাবো, দেখবে সবাই কত খাতির যত্ন করবে। একদিন তোমার সঙ্গে আমার পথের দেখা-আলাপের মতো ছিলো। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে।

বক খুব খুশি হয়। বলে, তোমার মতো এত সুন্দর ব্যবহার আমি আর কারো দেখিনি। তুমি যে আমাকে বন্ধুত্ব দিতে চাইছো এ আনন্দ রাখবার আমার জায়গা নাই। মন প্রাণ দিয়ে তা আমি গ্রহণ করলাম। তোমার এই দিল-খোলা মেজাজ আমাকে মুগ্ধ করেছে বন্ধু। জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন অপরিহার্য। বন্ধুহীন জীবন মৃত্যুরই সামিল। বন্ধুর কথা, বন্ধুর হাসি, গান জীবন মধুর করে তোলে। যে তার নিজের মনের মতো বন্ধু খুঁজে নিতে পারে সেই বুদ্ধিমান। আমাদের সমাজে সে-রকম একজনকেও এ যাবৎ আমি খুঁজে পাইনি। সব বকরাই ভীষণ স্বার্থপর আর হিংসুটে। তারা এমনই হাঁদা বোকা যে, কোন একটা ভালো কথার ধারে কাছে দিয়েও ঘেঁষে না। শুধু তাদের একমাত্র লক্ষ্য, কি করে ভালো ভালো মাছ ধরবে, আর বাচ্চা পয়দা করবে। তারা সবাই বড়্ডো বেশী আত্মকেন্দ্রিক। আল্লাহর নাম তারা ভুলেও কখনও মুখে নেয় না। শুধু ঠোঁট দু'টো চোখা করে ওৎ পেতে বসে থাকাই তাদের একমাত্র কাজ। আল্লাহ যে তাদের দু'খানা পাখাও দিয়েছে সে-কথা তাদের মনে থাকে না। দূর দিগন্তে নীল আকাশের নিঃসীম শূন্যে পাখা মেলে উড়ে বেড়াবার যে কি নির্মল আনন্দ তা তারা কোনও দিনই জানতে পারলো না। জানতে চাইলোও না।

কচ্ছপ এতক্ষণ নীরব শ্রোতা ছিলো এবার সে আর চুপ করে থাকতে পারলো না, তুমি এত সুন্দর সুন্দর কথা কি করে বলো, ভায়া। এসো, আমরা একটু আলিঙ্গন করি। বক নিচে নেমে আসে। ওরা দু'জনে গভীর আশ্লেষে কোলাকুলি করে। বলে, তোমার স্বজাতিদের মধ্যে তোমাকে শোভা পায় না। তাদের না আছে তোমার মতো জ্ঞানগরিমা—না জানে তারা তোমার মতো এইরকম বাদশাহী আদব-কায়দা। কি দরকার তোমার জাতিভাইদের মধ্যে গিয়ে নিজেকে কূপ-মণ্ডুক করে রাখার। তার চেয়ে চলো, কোথাও গিয়ে আমরা একটা ঘর বেঁধে বসবাস করিগে। সুন্দর একটা নদীর ধারে একটা গাছের কোটরে আমরা বাস করবো। খাবো দাবো আর মনের আনন্দে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াবো, কেমন?

বক বলে, খুব ভালো হবে, খুব চমৎকার হবে, বোন। কিন্তু আমার বৌ আর ছেলেমেয়েদের কি হবে?

কচ্ছপ বলে, সে-জন্যে তুমি কিচ্ছু ভেবো না ভায়া। আল্লাহর দোয়ায় সব দেখবে চলে আসবে। সবাই মিলে আমরা সুখের নীড় বানিয়ে তুলবো।

এই কথা শুনে বক বলে, আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ—তোমার মতো এমন একজন বন্ধু মিলিয়ে দিলেন তিনি।

এই সময়ে শাহরাজাদ থামলো। রাত্রি প্রায় শেষ হতে চলেছে। বাদশাহ শারিয়ার বলে, শাহরাজাদ তোমার সব গল্পগুলোই বড় মধুর। এসব কথা শুনতে থাকলে—হিংসা দ্বেষ মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো জেগে উঠতে থাকে। সেই জন্যে বলছি, তুমি কোনও ধূর্ত নেকড়ে বা কোনও হিংস্র জন্তু জানোয়ারের কাহিনী শোনাও।

—তাহলে, ওধরনের মজার মজার অনেক গল্প আমার জানা আছে।

শাহরাজাদ বললো, কিন্তু আজ তো রাত কাবার হয়ে গেছে। কাল রাতে শোনাবো জাঁহাপনা।

পরদিন একশো উনপঞ্চাশতম রজনী।

সে এক নেকড়ে আর খেঁক শিয়ালের কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

এক খেঁক শিয়াল তার মালিক নেকড়ের প্রতি নিয়ত দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রাগে ফুঁসতে থাকে। গাছের কোটরে বসে বসে ভাবে, কি করে এই শয়তান নেকড়েটর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে নেকড়েটাকে খুঁজতে থাকে। অবশেষে তাকে দেখতে পেয়ে মনের রাগ চেপে মুখে কপট হাসি টেনে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বিনয়ে বিগলিত হয়ে দাঁড়ায়। নেকড়েটা অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, এই শয়তান কুকুরের বাচ্চা কুকুর, কিরে, ব্যাপার কী?

খেঁকশিয়ালটা ততোধিক বিনীত হয়ে বলে, মালিক, আমার মাথায় একটা জব্বর বুদ্ধি এসেছে। আপনি যদি ধৈর্য ধরে শোনেন—

নেকড়ে ধমক দিয়ে বলে, বাজে লম্বা ভনিতা ছেড়ে আসল কথাটা কি তাই বল্। তা না হলে মেরে হাড় ভেঙে দেব।

খেঁকশিয়াল বলে, আমি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি হুজুর, আদমকিনটা আমাদের সঙ্গে শয়তানী আরম্ভ করেছে। সারা জঙ্গলটায় সে এক বিরাট ফাঁদ পেতেছে। তার অত্যাচারে সবাই ভয়ে তটস্থ। সে যেন একটা জ্বলন্ত বিভীষিকা। আমরা যদি সবাই মিলে এক জোট হয়ে তাকে না শায়েস্তা করতে পারি তা হলে সমূহ বিপদ।

খেঁকশিয়ালের এই অযাচিত উপদেশে নেকড়ে তেলবেগুনে জ্বলে ওঠে।—ওরে গিধড়, তুই তোর নিজের চরকায় তেল দে। ওসব আজগুবি উদ্ভট কল্পনা করে মগজটাকে নষ্ট করিস নে। ফের যদি শুনি এই মোড়লি কথাবার্তা—মেরে হাড়মাস আলাদা করে দেব।

এই শুনে খেঁকশিয়াল উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি টেনে হাত জোড় করে বলে, আমি যদি কিছু অন্যায় বলে থাকি, আমাকে মাফ করবেন মালিক। আমি নেহাতই বোকা-সোকা প্রাণী। কি বলতে কি বেফাঁস বলে ফেলেছি—আপনি মহানুভব প্রভু, নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন।

খেঁকশিয়ালের এই তোষামদে নেকড়ে কিছুটা নরম হয়।—ঠিক আছে, আজকের মতো ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু মনে থাকে যেন, ভবিষ্যতে আর কখনও, যা বুঝিস না সে-সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবি না। যে কথা তোর মুখে সাজে সেইটুকুই শুধু বলবি। কোনও ফালতু কথা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

—যা বলেছেন হুজুর। পীর-পয়গম্বররা বলে গেছেন, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না? আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে গায়ে পড়ে কোনও উত্তর দেবে না। সব সময় নিজের চরকায় তেল দিয়ে যাবে। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক নাক গলাবে না।

খেঁকশিয়াল মনে মনে ভাবতে থাকে, ঠিক আছে রে, নেকড়ের বাচ্চা, দিন আমার আসবে, তখন তোমায় আমি দেখে নেবো। আমারও নাম খেঁকশিয়াল—। এখন আমার হাতে ক্ষমতা নাই, গায়ে জোর নাই বলে তোমার সব অপমান, সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছি, কিন্তু মনে রেখ, নেকড়ে, চাকা একদিন ঘুরবেই।

—হুজুর, আপনি তো জানেন, খেঁকশিয়াল করজোড়ে নিবেদন করে, ন্যায় বিচারই পুণ্য। আর ক্ষমা উদারতা। আমার দোষ পর্বত প্রমাণ, আমি জানি। সেই সঙ্গে আমার অনুশোচনাও অসীম। আপনার চমৎকার লাথিটা আমাকে আহত করেছে ঠিকই, কিন্তু তাতে আমার মনের অন্ধকার কেটে গেছে, আমি প্রভাত সূর্যের নতুন আলো প্রত্যক্ষ করছি।

নেকড়ে প্রীত হয়ে বলে, তোমার চৈতন্য হয়েছে দেখে খুশি হলাম। তোমাকে লাথি মেরে আমিও স্বস্তি পাইনি। যাই হোক, এর পর থেকে সমঝে চলবে, যাতে আমাকে ঐরকম রুষ্ট আচরণ আর না করতে হয়।

খেঁকশিয়াল দুই পা মাথায় ঠেকিয়ে প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ আপনাকে আরও ক্ষমতাবান করুন, এই প্রার্থনা করি। আপনার জয়জয়কারে আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছে—হবে।

নেকড়ে বলে, এখন এসো। আজ থেকে তুমি আমার বিশ্বস্ত অনুচর হলে। যদি কোনও দেবার মতো খবর পাও, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।

খেঁকশিয়াল বলে, যথা আজ্ঞা হুজুর।

এই বলে সে বনের মধ্যে চলে যায়। চলতে চলতে এক সময় সে এক দ্রাক্ষাকুঞ্জে এসে পড়ে। খেঁকশিয়াল জানতো এইখানে একটা মস্ত খাদ আছে। এই কারণে এ পথটা সে এড়িয়ে চলে। মহাপুরুষেরা বলেছেন, দেখে শুনে পথ চলো। না হলে পতন অনিবার্য। খেঁকশিয়াল ভাবে, আদমকিনের নানারকম ছদ্মবেশ এবং তার ছলচাতুরী আমার জানা হয়ে গেছে। যদি দেখি, এই দ্রাক্ষাবনে খেঁকশিয়ালের কোনও নকল মূর্তি রাখা আছে তা হলে আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়াবো না। বুঝবো, এ আর কেউ নয়, সেই আদমকিনের নতুন কোনও ফাঁদ।

পা টিপে টিপে সে এগুতে থাকে। পিছনের দিকটা ভালো করে দেখে নেয়। এখানে ওখানে মাটি শুঁকে শুঁকে কি যেন অনুভব করার চেষ্টা করে। একটু কোনও আওয়াজ পেলেই কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। এইভবে সে ঐ বিপদসঙ্কুল পথটুকু অতিক্রম করে চলে আসে। একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। মনে হয় সামনে একটা গর্ত। কে বা কারা কিছু ডালপালা আর মাটি দিয়ে গর্তের মুখটা বন্ধ করে গেছে। এক অজানা আনন্দে নেচে ওঠে তার হৃদয়।

একটু পুরে নেকড়ের সঙ্গে দেখা করে সে বলে, একটা সুখবর আছে, জনাব। মনে হচ্ছে, সৌভাগ্যের দরজা এবার খুলে গেলো।

নেকড়ে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলে, কাব্যি রাখ, সাফ কথা কি—সোজা বাৎ বল দেখি বাপু।

খেঁকশিয়াল বলে দ্রাক্ষাবনে আজ আনন্দের লহর ছুটেছে। বনের মালিক দেহ রেখেছে। পাশেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

—বেশ করেছ। তা এখানে হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? গতরখানা নড়াও না! যাও, সেখানে গিয়ে পাহারা দাও। আমি যাচ্ছি।

খেঁকশিয়াল আগে আগে চলতে থাকে। নেকড়ে তার পিছনে পিছনে যায়।

খেঁকশিয়াল বলে, এই সেই জায়গা হুজুর।

থোকা থোকা পাকা আঙুর দেখে নেকড়ে আর লোভ সামলাতে পারে না। প্রচণ্ড একটা লাফ দিয়ে আঙুরগুলো পাড়তে চায়। কিন্তু নিজের দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে আছাড় খেয়ে নিচে পড়ে যায়। আর পড়বি তো পড় একেবারে সেই ডালপালা চাপা দেওয়া গর্তটার মুখেই গিয়ে সে পড়ে। আসলে ঐ গর্তটা একটা ফাঁদ। নেকড়ের দেহের ভারে গর্তটার মুখ খুলে আলগা হয়ে পড়ে। আর পুরো দেহটা ঢুকে যায় গর্তের নিচে।

খেঁকশিয়াল আনন্দে লাফাতে থাকে। নেকড়ে তখন ওপরে ওঠার জন্যে নানারকম কায়দা কসরৎ করে চলেছে। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে সে।

খেঁকশিয়ালটাও ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। নেকড়ে মাথা তুলে বলে, বন্ধু এখন কি কান্নার সময়! একটা উপায় বের করো—যাতে আমি উপরে উঠতে পারি। জানি, এক সময়ে আমি তোমার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছি। কিন্তু সে-সব কথা এখন তো মনে করলে চলে না ভাই। তুমি আমার বউ বাল-বাচ্চাদের একটা খবর দাও। তারা এসে দেখুক, আমি কি বিপদে পড়েছি।

এরপর দ্বিতীয় খণ্ডে

সময় এক আবর্ত রজনী

কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

মৌসুমী প্রকাশনী ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

সহস্র এক আরব রজনী

অসংক্ষেপিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

দ্বিতীয় খণ্ড

ভাষান্তর : ক্ষিতীশ সরকার

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সত্য চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ
১লা অক্টোবর, ১৯৮২

পরিমার্জিত শোভন সংস্করণ
জুন, ২০১১

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯
কম্পোজ
বর্ণায়ন
৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
মুদ্রক
পপুলার এন্টারপ্রাইজ
৩৫এ/৩ বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কল[illegible] ৬৭

দাম : ২০০ টাকা

খেঁকশিয়ালটা খেঁকিয়ে ওঠে, ওরে হতচ্ছাড়া পাজি বদমাইশ, তুই কি ভাবছিস, তোর দুঃখে আমি কাতর হয়ে কাঁদছি। আমি কাঁদছি তার কারণ, তোর মতো একটা শয়তানের হাত থকে আরও আগে কেন রক্ষা পাইনি। কাঁদছি এই কারণে যে, তোর এই আজকের দশা এক বছর আগে কেন হয়নি। তাহলে হাড়ে আমার বাতাস লাগতো। এবার তুই মর, তোর কবরে আমি থুথু ফেলবো, মর—মর। আমরা দল বেঁধে মহচ্ছব করবো—তুই এক্ষুণি মর রে হতভাগা।

নেকড়ে কাতরভাবে মিনতি করে, এখন কি এসব কথা বলার সময় বন্ধু! তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, অগতির গতি। এ বিপদে তুমি না উদ্ধার করলে কেউ আমাকে বাঁচাবে না ভাই। এই তো কিছুক্ষণ আগেও তুমি আমাকে কত ভালো ভালো জ্ঞানের কথা শোনালে। কত প্রতিজ্ঞা করলে। সে-সব কি এর মধ্যে ভুলে গেলে ভাই? এ কথা ঠিক, তোমার সঙ্গে আগে আমি একটু আধটু খারাপ ব্যবহার করেছি। কিন্তু সে-কথা কি এখন মনে রাখলে চলে?

—ওরে বোকা পাঁঠা, নেকড়ে তুই এখন বলছিস একটু আধটু খারাপ ব্যবহার করেছিস? ওরে শয়তান, তোর সেই কলজে-ফাটা লাথির ব্যথা তো এখনও আমার যায়নি। এর মধ্যেই তা ভুলে গেছিস। তোর প্রতিটি দিনের অত্যাচারের কোনও কথা আমি ভুলিনি। সেই কারণেই তোর এই মরণ দশায় সবচেয়ে আমি বেশি খুশি হয়েছি।

নেকড়ে করুণ ভাবে মিনতি জানায়, তুমি কত মহৎ, কত উদার। আজ এই বিপদের সময় তোমার মনে যত দুঃখই দিয়ে থাকি, তুমি আমাকে উদ্ধার করবেই। আমি জানি, যা বলছ সবই তোমার মুখের কথা—মজা করছ। আসলে তোমার অন্তরটা খুব নরম। ও সব কথা থাক ভাই। এখন তুমি একটা রশি এনে গাছের ডালে বেঁধে আমার কাছে নামিয়ে দাও। আমি উঠে আসি। তারপর দেখে নিও, সারা জীবন ধরে তোমাকে মাথায় করে রাখবো।

—ধীরে, বন্ধু ধীরে। তোমার ভালো ভালো মধু মাখা কথাগুলো এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে, সখা? গর্তটা থেকে তোমার আত্মাটাই শুধু উঠে আসতে পারবে। কিন্তু দেহটা নৈব নৈব চ। এর জন্যে তুমিই একমাত্র দায়ী। এত দিন তুমি কাউকেই মানুষ জ্ঞান করনি। ধরাকে সরা মনে করেছ। তার প্রতিফল পেতে হবে না! ওহে মাথা মোটা নির্বোধ—উদ্ধত জানোয়ার, সেই বাজপাখির কাহিনী কি তুমি শোনোনি?

নেকড়ে বলে, বাজপাখির আবার কি কাহিনী?

খেঁকশিয়াল বলে, তবে, শোনো ঃ আমি একদিন এই দ্রাক্ষাবনে আঙুর পেড়ে পেড়ে খাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, একটা বিরাট বাজ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো একটা ছোট্ট তিতির পাখির উপর। যাই হোক, আল্লাহর দোয়াতে তিতির সে যাত্রা টুক করে নিজের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রাণ রক্ষা

করতে পেরেছিলো। বাজ কিন্তু আশা ছাড়ে না। গর্তের মুখে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। কখন সে বেরুবে সেই প্রত্যাশায়। মনে মনে বলে, আমার ছোবল থেকে তুমি রেহাই পাবে? তা কি কখনও হয়। সেই ধরা তুমি দেবেই, মাঝখান থেকে খানিক হয়রানি করবে আমাকে—এই আর কি!

তারপর একটু চড়া সুরেই তিতিরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকে, ওহে ছোট্ট

সোনা, অত ভয় পাওয়ার কি আছে? বেরিয়ে এসো। আমি জানি তোমার খুব খিদে পেয়েছে। তাই তোমাকে ধরে কিছু দানা খাওয়াতে চেয়েছিলাম। আর তুমি অমনি ভয় পেয়ে গর্তে ঢুকে গেলে? বোকা মেয়ে কোথাকার—বেরিয়ে এসো। খিদে পায়নি বুঝি? বেরিয়ে এসো, দেখ, কি সুন্দর সব দানা এনেছি, পেট পুরে খাও। তুমি তো জানো না, তোমাকে আমি কত ভালোবেসে ফেলিছি। বেরিয়ে এসো, সোনা লক্ষ্মী মেয়ে।

রাজ্যের মধুঢালা কথায় বিশ্বাস করে বোকা-সরল তিতির গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। আর তৎক্ষণাৎ হিংস্র বাজ টুক করে তার থাবার মধ্যে পুরে নেয় তাকে।

তিতিরের প্রাণ যায় যায়। রাগে সে ফেটে পড়ে, ওরে শয়তান বদমাইশ বিশ্বাসঘাতক, এই তোর মনে ছিলো। আমাকে খেয়ে ভাবছিস হজম করবি। আল্লাহর দোয়ায় তোর পেটে ঢুকে আমি জহর হবো। তোরও জান শেষ করবো।

বাজ কিন্তু তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করলো না। মুখে পুরে গিলে ফেললো। কিন্তু কি আশ্চর্য, আল্লাহর কি অপার মহিমা, তিতিরের আকুল প্রার্থনা তিনি বুঝি শুনেছিলেন, পাখিটাকে গিলতে না গিলতেই বাজপাখিটা চিৎপাৎ হয়ে পড়ে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

শুনলে তো হে নেকড়ে? তোমারও আজ সেই দশা। অধর্ম অবিচার অত্যাচার চিরকাল চলে ন। একদিন তার প্রতিফল পেতেই হয়। তুমি আমার ওপর এতকাল যে দুর্ব্যবহার করে এসেছ বিনা দোষে আমাকে লাথি-ঝাঁটা মেরেছ, আজ সেই বিচারের দিন। আল্লাহ তার যোগ্য শাস্তিরই ব্যবস্থা করেছেন।

নেকড়ে আকুলভাবে কাঁদতে থাকে, দয়া করো বন্ধু, দয়া করো। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। দেখো, আমি এ ঋণ তোমার শোধ করে দেব। আমিই তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু হবো। আমার মতো সুপরামর্শদাতা তুমি আর পাবে না জীবনে।

চতুর খেঁকশিয়াল কিন্তু নেকড়ের মিষ্টি কথায় ভোলে না।—তুমি দেখছি কোনও নীতি কথাই জানো না?

—কী নীতি কথা?

খেঁকশিয়াল বলে, মহাজনরা বলে গেছেন, তোমার মতো হত কুৎসিৎ চেহারার লোক-এর চোখের শয়তানী দেখেই মনের আসল চেহারা পড়ে নিতে হবে। এতক্ষণ তুমি যে-সব সুন্দর কথা বলে গেলে তা পরম উপাদেয়। কিন্তু বন্ধু, তোমার মুখের সারল্য কোথায়। তোমার চোখ দু'টো অমন শয়তানীতে ভরা কেন বলতে পারো? তুমি আমাকে সুপরামর্শ দান করবে বলে আশ্বাস দিয়েছ। খুব ভালো কথা। কিন্তু একটা কথা বলি নেকড়ে মশাই, তোমার ঘটে যদি অতখানিই বুদ্ধি থাকবে তবে কি আজ এই গর্তে পড়ে প্রাণ হারাতে বসো। নিজেকে খুব ধূর্ত চালাক ভাবো—তাই না? তোমার মতো হাঁদা আমি আর দু'টি দেখিনি। তাহলে আমার কথায়, আগে পিছে বিবেচনা না করেই, দ্রাক্ষাবনে হুড়পাড় করে এলে কেন? আর এলেই যদি অমন নির্বোধের মতো লম্ফঝম্ফ বা করতে গেলে কেন? সামনে যে একটা অজানা আশঙ্কা থাকতে পারে, আগে তা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলে না কেন? ঘটে নাই এক ছটাক—অন্যকে দেবে উপদেশ! তোমার দশা দেখে সেই ডাক্তারের কাহিনী মনে পড়ছে।

—আবার কাহিনী?

খেঁকশিয়াল বলতে থাকে ঃ এক ভদ্রলোকের ডান হাতে একটা আব হয়েছিলো। দিন দিন আবটা এমনি বড় হতে থাকলো যে ব্যথায় সে আর কাজ কাম করতে পারে না। শহরের নামজাদা ডাক্তারকে সে ডেকে পাঠায়। ডাক্তার এলো। তার এক চোখে পটি বাঁধা। রুগী প্রশ্ন করে, ডাক্তারবাবু, আপনার চোখে কি হয়েছে?

ডাক্তার জবাব দেয়, চোখে একটা আব উঠেছে, বাপু। চোখটা প্রায় বন্ধই হয়ে যাচ্ছে।

রুগী অবাক হয়, সে কি আপনি না ডাক্তার। আপনার নিজের চোখে আব হয়েছে—তাই আপনি সারাতে পারছেন না? তাহলে আমার আব সারাবেন কি করে? থাক, আর দরকার নাই। এবার আপনি আসুন।

সুতরাং নেকড়ে মশাই বুঝতে পারলেন, অন্যের রোগ সারাবার আগে নিজের রোগটা সারাবার যোগ্যতা আছে কি না সে একবার যাচাই করে দেখা ভালো না, কী? আজ যে বিপদে তুমি পড়েছ তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে তোমার মূল্যবান মগজের খানিকটা অন্তত খরচ করো। নিজে বাঁচলে তো বাপের নাম। তারপর আমাকে উপদেশ দেবার স্পর্ধা করো। আর তো যদি না পারো, যেখানে এখন পড়েছ—সেখানেই থাকো—যতদিন বাঁচো। কেমন?

নেকড়ে হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে।—বন্ধু তোমার লেজটা নিচে নামিয়ে দাও, আমি ওটা ধরে উপরে উঠে আসি। আগে যে সব দুর্ব্যবহার তোমার সঙ্গে আমি করেছি তার জন্যে আমি অনুতপ্ত ভাই। তুমি আমাকে একটিবার ক্ষমা করো। আমি কথা দিচ্ছি আমার থাবার নখগুলো ঘসে সমান করে দেব। আর এই লম্বা লম্বা দাঁতগুলো—সব আমি সাঁড়াশী দিয়ে টেনে তুলে ফেলে দেব। নখ আর দাঁত যদি না থাকে তা হলে ঝগড়া বিবাদই বা করবো কি দিয়ে। মাছ মাংস ছোঁব না, বলতে গেলে নদীর জল খেয়েই প্রাণ ধারণ করবো। দেখবে তখন আমি কি সাত্ত্বিক লোক হয়ে গেছি। সব সময় আল্লাহর নামগান করেই কাটাবো।

কিন্তু এতেও ডাল গলে না। খেঁকশিয়াল মিষ্টি কথায় ভুলবার পাত্র নয়।—একটা দুষ্ট, খল, শঠ, শয়তান তার স্বভাবচরিত্র রাতারাতি পালটাতে পারে এরকম কোন নজির ইতিহাসে নাই। তুমি কি নব-ইতিহাস রচনা করতে চাও, নেকড়ে সন্তান? তুমি আমাকে অতোই বোকা পাঁঠা পেয়েছ, তুমি বললে আর অমনি আমার লেজটা নামিয়ে দেব তোমার থাবায়। আমি এখন দেখতে চাই, কি করে তুমি তিলে তিলে মর। পীর পয়গম্বররা কি বলে গেছেন জানতো? 'দুষ্কৃত নিধনেই পৃথিবী পাপমুক্ত হতে পারে।'

নেকড়ে তখন তার সামনের পা দু'খানা একত্র করে করজোড়ের ভঙ্গীতে বলে, প্রাণের বন্ধু খেঁক, তুমি কত বড় খানদানী ঘরের সন্তান। তোমাদের বংশের খ্যাতি জগৎজোড়া। তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আচার বিনয় বিদ্যার কোনও তুলনা নাই। তোমাদের বিচার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। তোমাদের সততা উদারতা মহত্ব-এর কাহিনী দিগদিগন্তে ছড়িয়ে আছে। সর্বোপরি পরোপকারই তোমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। একথা তো সবাই জানে বন্ধু।

নেকড়ের এই তোষামোদের ঢং দেখে খেঁকশিয়াল হেসে আর বাঁচে না। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায় আর কি? বলে, তোমার দেখি এখনও শৈশবদশা কাটেনি। তুমি মূর্খ জানতাম, কিন্তু এতটা মূর্খ ভাবতে পারিনি। শোনো, তোমাকে একটু জ্ঞান দিই ঃ 'সব রোগই হয়তো সারতে পারে, কিন্তু মৃতকে জীবন দান করা যায় না। হীরা ছাড়া সব বস্তুতে ভেজাল মেশানো সম্ভব। আমরা সবই এড়াতে পারি, একমাত্র নিয়তি ছাড়া।'

এই মাত্র তুমি বললে, আমি যদি তোমাকে উদ্ধার করি, সারা জীবন তুমি আমার অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে থাকবে। সেই খল সাপের কাহিনী শুনেছ? তবে শোনো ঃ একটা সাপ একদিন কোনও ক্রমে সাপুড়ের ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। অনেক দিন তাকে না খেতে দিয়ে ঝুড়িতে ভরে রাখার ফলে তার দেহে কোন শক্তি

ছিলো না। তাই শত চেষ্টা করেও সে পালাতে পারছে না দেখে এক পথচারীর প্রাণে মায়া হলো। সাপটাকে কাঁধে করে সে বাড়ি নিয়ে গেলো। নিয়মিত দুধকলা খাইয়ে বেশ তাগড়াই করে তুললো তাকে। সাপ যেদিন বুঝতে পারলো এবার সে একাই যত্রতত্র চলাফেরা করতে পারবে, প্রথম রাতেই সে তার জীবনদাতার মাথায় ছোবল বসিয়ে দিলো। এবং বলাবাহুল্য, সেই ছোবলের বিষে তার প্রাণান্ত ঘটেছিলো।

সুতরাং নেকড়ে ভায়া, আর নয়, এবার চলি, টা টা।

খেঁকশিয়ালটা বাইরে বেরিয়ে এসে একটা উঁচু টিলার উপরে দাঁড়িয়ে হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া করে চিৎকার করতে থাকলো। তার চিৎকারে আঙুর ক্ষেতের মালিক ছুটে আসে। খেঁকশিয়াল ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে নেকড়ের গর্তটার দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে।

মালিক ভিতরে ঢুকে গর্তের নিচে নেকড়েকে দেখে ইয়া বড় বড় পাথরের চাঁই এনে ওর মাথার উপর ফেলতে লাগলো। খেঁকশিয়াল শুনতে পায়—মৃত্যুর আগে যেমন আকাশ-ফাটা চিৎকার দেয় তেমনি এক শেষ চিৎকার দিয়ে নেকড়েটা নীরব হয়ে গেলো।

এই সময় শাহরাজাদ গল্প শেষ করে একটুক্ষণের জন্য থামলো। দুনিয়াজাদ এক গেলাস পিস্তার সরবৎ এনে হাতে দেয়। সরবৎটুকু খেয়ে শাহরাজাদ বলে, এবার বলুন, জাঁহাপনা, কেমন শুনলেন?

বাদশাহ শারিয়ার উৎফুল্ল হয়ে বলে, চমৎকার। নিশ্চয়ই নেকড়েটাকে হত্যা করা হয়েছিলো। এরকম শয়তানের মৃত্যুই একমাত্র সাজা। আমি খুব খুশি হয়েছি। এর পর, অন্ধ বিশ্বাসের পরিণাম যে শুভ হয় না—সেই নিয়ে একটা কাহিনী শোনাও।

শাহরাজাদ বলে, যো হুকুম, জাঁহাপনা? এবার আপনাকে ইঁদুর আর নেউলের গল্প শোনাচ্ছি ঃ

একটি স্ত্রীলোক ক্ষীরার বিচির ডাল বিক্রি করতো। একদিন এক খদ্দের এসে ফরমাস দিয়ে গেলো, ডাক্তার তাকে ক্ষীরার বিচির ডাল খেতে বলেছে। শুনলাম, মেয়ে, তোমার কাছে নাকি ভালো জাতের ডাল পাওয়া যায়। তা আমাকে সের পাঁচেক বানিয়ে দাও।

মেয়েটি বলে, কাল এসো পাবে।

সেদিন সে খুব যত্ন করে ডালগুলো বানিয়ে একটা ডালায় করে তক্তপোশের নিচে রেখে দিলো।

ঐ পাড়ারই অন্যবাড়ির একটা নেউল এক ফাঁকে তার ঘরে ঢুকে খানিকটা ডাল খেয়ে পালিয়ে গেলো। সকালবেলায় মেয়েটি যখন ডালা বের করে দেখে ডালের দানা অনেক কম। মেয়েটি গজ গজ করতে থাকে, ইঁদুরগুলোর মুখে আগুন—মুখে আগুন। সব খেয়ে কেটে শেষ করে দিলো। বেড়ালটা যদ্দিন বেঁচে ছিলো একটু শান্তিতে ছিলাম। যেই সে মরে গেলো, অমনি তোদের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়েছে। দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি। এখন আমি খদ্দেরকে কি বলি?

ঘরের পিছনে আড়ি পেতে নেউল সব শুনলো মেয়েটির কথা। তাহলে মেয়েছেলেটা ইঁদুরগুলোকেই সন্দেহ করেছে—

এইভাবে প্রায় রোজই মেয়েটি ডাল তৈরি করে রেখে দেয়। আর রোজই নেউলটা এসে খানিকটা সাবাড় করে দিয়ে যায়।

মেয়েটি তো রেগে কাই। ঝাঁঝালো কণ্ঠে গালাগালি দিতে থাকে—ওরে ইঁদুরের বাচ্চা ইঁদুর, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন, তাই আমি দেখবো। সারা রাত আজ আমি জেগে বসে থাকবো, দেখি বাধন কখন তুমি আসো।

নেউল দেখলো এই মউকা। সে ইঁদুরের কাছে গিয়ে বললো, ইঁদুর ভায়া ইঁদুর ভায়া, কেমন আছো?

ইঁদুর বলে এই চলে যাচ্ছে আর কি?

—তোমাকে একটা সুখবর দিতে এলাম, ভাই। আজ রাতে তোমাদের মালকিন ক্ষীরার বিচির ডাল তৈরি করেছে। বড় মজাদার খানা। তা তোমায় কানে কানে বলি, তক্তপোশের তলায় একটা ডালায় করে রেখে দিয়েছে। ইচ্ছে করে তো খেয়ে আসতে পারো। আমি এইমাত্র খেয়ে এলাম, বড়িয়া চিজ।

ইঁদুর বলে, তুমি আমার সত্যিকারের দোস্ত। তা না হলে এমন সুখবর কেউ দেয়? আমি এখুনি যাচ্ছি। খেয়ে আসি চারটে।

ইঁদুর মনের আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। কোনও দিকে দৃকপাত না করে সে তক্তপোষের তলায় ঢুকে কুট কুট করে ডালের দানা খেতে থাকে। এদিকে নেউলটা ঘরের দাওয়া দিয়ে মালকিনের সামনে দিয়ে চলে যায়। মালকিন ভাবে নেউলটা ঘর থেকে বেরুলো না তো। একটা লাঠি হাতে ঘরে ঢুকে দেখে মহা আনন্দে ইঁদুর তার এত পরিশ্রমের ডালগুলো খেয়ে শেষ করছে। লাঠির একঘায়ে ইঁদুর ধরাশায়ী হয়। ওদিকে নেউল হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে।

বাদশাহ শারিয়ার বলে তোমার ছোট্ট ছোট্ট গল্পগুলো বেশ সারগর্ভ। অনেক কিছু শেখা যায়। এরপর বিশ্বস্ত বন্ধুর কাহিনী শোনাও।

শাহরাজাদ বলে, শুনুন জাঁহাপনা একটি কাক আর কাঠবেড়ালীর কাহিনী শোনাচ্ছি। একটি কাকের সঙ্গে এক কাঠবিড়ালীর খুব বন্ধুত্ব ছিলো। একদিন তারা দুই বন্ধু মিলে গাছের গুঁড়ির উপরে বসে জমিয়ে গল্প করছিলো। এমন সময় গাছের ওধারে কখন একটা বাঘ এসে দাঁড়িয়েছে কেউ টেরই পায়নি। বাঘটা যখন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে তখন কাঠবিড়ালীর পিলে চমকে যায়।

বাঘের গর্জন শুনে কাক তার বন্ধুর পাশ থেকে উড়ে গিয়ে উপরের একটা ডালে গিয়ে বসে। কিন্তু কাঠবিড়ালী ভেবে পায় না কোথায় সে লুকাবে। কাককে জিজ্ঞেস করে, কি করি বন্ধু বলতো?

কাক বলে, তাই তো? মুশকিল হলো, তোমাকে কি করে বাঁচানো যায়, বুঝতে পারছি না। বাঘ ব্যাটা ধারে কাছেই এসে পড়েছে। এখুনি হয়তো হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এমন সময় কাক দেখতে পেলো, অদূরে মাঠের মধ্যে একপাল ভেড়া চরছে। তাদের পালে কয়েকটা সিংহের মতো তাগড়াই কুকুর ছিলো। কুকুরগুলোকে রাখা হয় বাঘের হাত থেকে ভেড়াগুলোকে রক্ষা করার জন্য।

কাক উড়তে উড়তে গিয়ে কুকুরগুলোর চোখে ঠোঁকা মেরে উড়ে উড়ে পালাতে লাগলো। রাগে হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে কুকুরগুলো। পায় তো কাকটাকে চিবিয়ে খায় আর কি! কিন্তু কাকের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে কেন। সে ঠোকা মেরেই আবার শূন্যে পালিয়ে যায়। কাকের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে কুকুরগুলো দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে উড়ন্ত কাকের নিশানা লক্ষ্য করেই ছুটতে থাকে। কাকেরও সেই উদ্দেশ্যই ছিলো।

এইভাবে সে তাদের বাগের মধ্যে নিয়ে আসে। একটা গাছের ডালে বসে কাকটা কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বল করে হাসতে থাকে। তখন কুকুরগুলোর সে কি বিকট চিৎকার। পারে তো তারা পুরো গাছ সুদ্ধ কাকটাকে গিলে ফেলবে।

কুকুরের এই চিৎকারে বাঘ ব্যাটা হাওয়া হয়ে যায়। কাক তখন উড়ে অন্যত্র চলে গেলে কুকুরগুলোও হতাশ হয়ে ফিরে যায়।

তখন কাক এসে কাঠবিড়ালীকে বলে, কী। এখন ভয় কেটেছে তো?

কাঠবিড়ালী বলে সত্যিই তুমি বন্ধুর মতো কাজ করেছ ভাই।

এরপর শাহরাজাদ বলে, এবার আপনাকে আলী-ইবন বকর ও সুন্দরী সামস অল-নাহারের কাহিনী শোনাবো ঃ

খলিফা হারুন-অল-রসিদের সময়ে বাগদাদ শহরে আবু অল হাসান নামে এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বাস করতো। তার দোকানে সুলতান বাদশাহদের উপযোগী বাহারী বাহারী মহামূল্যবান সাজপোশাক পাওয়া যেত। আমির বাদশাহরাই তার খদ্দের। অতো দামের সাজ-পোশাক সাধারণ মানুষ ব্যবহার করবে কি করে?

হারেমের খোজারা তার দোকান ছাড়া অন্য কোথাও যেত না। আর শুধু সাজপোশাকই তো নয়, লক্ষ লক্ষ দিনারের হিরে জহরতের জড়োয়া গহনারও সেই একমাত্র বিক্রেতা। অন্য সব দোকান ছেড়ে খোজারা তার দোকানেই ভিড় করতো তার অন্য কারণও ছিলো। প্রথমত দোকানে এলেই খুব খাতির যত্ন পেত। শরবৎ মিঠাই পান তো মিলতোই তাছাড়া পেত মোটা দালালী। যত সওদা প্রাসাদে যেত তার দামের ওপর হিসেব করে দালালী পেত তারা। এছাড়া তার নম্র ব্যবহারেও সবাই প্রীত ছিলো। স্বয়ং সুলতান হারুন-অল-রসিদও তার দোকানে পায়ের ধুলো দিতেন। আবুল হাসানের অমায়িক ব্যবহার এবং তার প্রিয়দর্শন চেহারা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। খলিফা কোন উৎসবে অনুষ্ঠানে আবুল হাসানকে বাদ দিতেন না। প্রাসাদে তার অবাধ গতিবিধি ছিলো। যখন খুশি সে খলিফার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারতো। খলিফা নিজেই সে অধিকার তাকে দিয়েছিলো।

তরুণ আবুল হাসানের দোকানে বাগদাদের সম্ভ্রান্ত তরুণ-তরুণীদেরও খুব ভিড় জমতো। যত আমির ওমরাহ—তাদের বাড়ির ছেলে-মেয়ে-বিবিরা কেনাকাটা করতে আসতো। পারস্যের এক সুলতানের পুত্র ছিলো তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার নাম আলী ইবন বকর। সেও তার দোকানে প্রায়ই আসতো।

একদিন এই শাহজাদা তার দোকানে বসে আবুল হাসানের সঙ্গে গল্পগুজব করছে এমন সময় জনা দশেক সুবেশা সুন্দরী মেয়ে এসে দোকানের সামনে দাঁড়ালো। তাদের সঙ্গে আর একজন মেয়ে। সে ছিলো একটা দামী খচ্চরের পিঠে। তার বাহারী সাজ-পোশাকে চোখ ঝলসে যায়। পাতলা ফিনফিনে নাকাবের ভিতর দিয়ে তার মুখের চেহারা বেশ পরিষ্কার চোখে পড়ে। এমন পরমাসুন্দরী মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। টানাটানা চোখ, উন্নত নাক, আবির রাঙা গাল, পাকা আঙুরের মতো ঠোঁট—বেহেস্তের হুরীর কথা মনে করিয়ে দেয়। খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে সে দোকানে ঢোকে। আবুল হাসান দু'হাত জোড় করে সাদর অভ্যর্থনা জানায়, আমার কি সৌভাগ্য আপনার পায়ের ধুলো পড়লো—

একটা মখমলের গদি দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করে। আবুল হাসান গাদা গাদা সাজ-পোশাক বের করে দেখায়। কোনটা বা সে হাতে ধরে

দেখে, কোনটা বা সে হাতেই ধরে না। কয়েকটা সোনার জরি দেওয়া কাপড় ও কিছু মূল্যবান জড়োয়া গহনা পছন্দ করে। পছন্দ করতে করতে কখন সে মুখের নাকাব সরিয়ে ফেলেছে নিজেই বুঝতে পারেনি। সওদাগর আবুল তার অনেকদিনের চেনা লোক—তার সামনে অতটা লজ্জা শরমের কিছু নাই। কিন্তু দোকানে তো বাইরের মানুষও বসেছিলো।

তার রূপের জেল্লা আলী-ইবন বকর-এর বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। এমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে সে জীবনে কখনও দেখেনি। আলী ইবন আর স্থির থাকতে পারে না। মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে, বুকের ভেতর মোচড় দিতে থাকে। ভাবে, এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারলে ভালো হয়। এত রূপ আর সহ্য করা যায় না। আলী ইবনের এই অস্থিরতা মেয়েটির চোখ এড়ায় না। ইতিমধ্যেই আড় চোখে কয়েকবার সে তাকে দেখে নিয়েছে। ঠোঁটের কোণে একটু মুচকি হেসে বলে, আমার জন্যে আপনার দোকানের খদ্দের চলে যাবে সে তো হয় না। বরং আমিই চলে যাচ্ছি। আমার অনুরোধ উনি থাকুন।

আলী ইবন বকর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, খোদা কসম বলছি, সুন্দরী, আমি যে আপনার ভয়ে দোকান ছেড়ে চলে যেতে চাইছিলাম তা কিন্তু ঠিক না। আপনাকে দেখা অবধি আমি এক অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছি—জানি না, বলতে পারবো না, কিসের সে যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যেই আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম।

অদ্ভুত সুন্দর করে কথা বলে আলী ইবন। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে মেয়েটি। মনের সঙ্গোপনে কিসের যেন অনুরণন হতে থাকে। খাটো গলায় সওদাগরকে প্রশ্ন করে, কে এই মেহেমান?

আবুল হাসান বলে, ওর নাম আলী ইবন বকর। প্রাচীন পারস্য শাহদের বংশধর, যেমন দেখতে সুঠাম সুপুরুষ—ভেতরটাও তেমনি খাসা। মেয়েটি বলে, ভারি খুবসুরৎ দেখতে তো!

—হবে না? কত বড় খানদানী শাহ বংশের ছেলে। শরীরের শিরায় বইছে সাচ্চা নীল রক্ত।

মেয়েটি বলে, আমি যদি আমার একটি খোজাকে পাঠাই, আপনারা কি একবার তার সঙ্গে যেতে পারবেন? অবশ্য আপত্তি থাকলে—আমি শুধু আপনার দোস্তকে একবার দেখাতে চাই, বাগদাদ সুলতানের প্রাসাদে রূপে গুণে যে-সব রত্ন মেয়েছেলে আছে তা পারস্য-সুলতানের হারেমের চেয়ে কিছু খাটো নয়।

আবু হাসান বুদ্ধিমান ছেলে। তার কথার নিগূঢ় অর্থ বুঝতে কিছু অসুবিধে হলো না। মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে বললো, আপনার আদেশ শিরোধার্য করলাম। যথাসময়ে বান্দারা হাজির হবে।

মেয়েটি আর তিলমাত্র অপেক্ষা করলো না। নাকাবে মুখ ঢেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

আবুল হাসান এবার আলী ইবনের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললো, কি দোস্ত, অমন মন-মরা হয়ে বসে রয়েছ কেন?

—চোখের সামনে দিয়ে আসমানের চাঁদ চলে গেলো, আমি কি খুশিতে ডগমগ হবো।

আবুল হাসান বলে, চলে আর একেবারে গেলো কোথায়। সবে তো তোমার গগনে উদয় হবে বলে উঁকি ঝুকি দিচ্ছে।

—ঠাট্টা রাখো। আমার দিল পুড়ে যাচ্ছে। কেন যে মরতে তোমার দোকানে আজ এসেছিলাম।

আবুল ওর চিবুকটা নেড়ে দিয়ে চোখের মণি নাচিয়ে বলে, আহা, সোনার চাঁদ, না এলে এমন চাঁদমুখের দেখা পেতে?

—কিন্তু 'ওতো জ্বালিয়ে আগুন পালিয়ে গেলো, এ জ্বালা তো সয়না প্রাণে।'

—ধৈর্য্য ধরো বন্ধু, ধৈর্য্য ধরো। আপসে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আলী ইবন রাগত ভাবে বলে, সব সময় রসিকতা ভালো লাগে না হাসান। বলো, মহিলাটি কে?

—উনি খলিফা হারুন-অল রসিদের প্রিয় প্রিয়তমা। খাস বেগমের চাইতেও কদরের বাঁদী—সামস অল-নাহার। খলিফা এর জন্যে আলাদা প্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছেন। এর দাস-দাসী নফর-চাকর সব আলাদা। খলিফা একমাত্র তাকেই ভীষণ বিশ্বাস করে। যে কারণে তার প্রহরায় কোনও খোজাকে রাখা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি হারেমের কড়া পাহারার মধ্যেও বেগমরা পরপুরুষের প্রেমে আসক্ত হয়। অন্যের ঔরসের সন্তান গর্ভে ধারণ করে। সেদিক থেকে সামস-অল-নাহার ভালো। এ পর্যন্ত তার নামে, যদিও তার মতো রূপসী সারা বাগদাদে দুটি নাই, তেমন কোনও কেচ্ছা রটেনি।

এইসব কথাবার্তা চলছে এমন সময় একটি ছোট্ট চাকর এসে আবুল হাসানের কানের কাছে ফিস ফিস করে বললো, আপনাদের দুজনকে, মালকিন যেতে বলেছেন।

আবুল দোকান বন্ধ করে বন্ধু আলীকে সঙ্গে নিয়ে সামস-অল-নাহার-এর প্রাসাদের দিকে রওনা হলো। আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে থাকলো সেই ছোট্ট চাকরটা।

আলী ভেবেছিলো সে কিছু সুন্দর সুন্দর কবিতা শুনিয়ে সামস-অল-নাহারকে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু সে সুযোগ সে পেলো না। বসতে না বসতেই খানসামারা নানা রকম খানাপিনা এনে টেবিলে সাজিয়ে দিলো। খাবারের সুগন্ধে সারা ঘর আমোদিত হয়ে ওঠে। দুজনে তৃপ্তি করে খানাপিনা করলো। সামস-অল-নাহার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব তদারক করতে থাকলো। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে নিজে হাতে সে গোলাপ জল ঢেলে দিল ওদের দুজনের হাতে। দামী আদর ছড়িয়ে দিল ওদের সাজ পোশাকে।

এরপর সামস-অল-নাহার একটা দরজা খুলে ওদের ভিতরের আর একটা মহলে নিয়ে গেলো। বিরাট সেই কক্ষটার চারপাশে চব্বিশটি স্ফটিকের স্তম্ভ। তারা মাথায় ধরে আছে একটা বিশাল গম্বুজ। সেই গম্বুজের চারপাশ সোনার তৈরি পাখি দিয়ে সাজানো। আর গম্বুজের ভিতরটা সূক্ষ্ম শিল্পীর হাতে আঁকা নানাপ্রকার লতাপাতার নক্সা। দেখলে চোখ ফেরানো দায়। সারা মেজোটা পারস্য গালিচায় মোড়া।

এই সুদৃশ্য মহলে দাঁড়িয়ে বাইরে যেদিকে তাকাও ফুলের সমারোহ। চারপাশে ফুলের বাগিচা। শুধু ফুল আর ফুল। চেনা অচেনা হরেক রকম দেশ বিদেশের বাহারী ফুলে ফুলে ভরা।

আবুল আর আলী যখন এইসব অপরূপ সৌন্দর্য্যের সমুদ্রে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে সেই সময় দশটি সুদর্শনা সুবেশা মেয়ে এসে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে বসে পড়লো সেখানে। তাদের সবারই টানাটানা চোখ, টুকটুকে রাঙা গাল আর সুগঠিত বুক।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

একশো তিপ্পান্নতম রজনীর মধ্যভাগে আবার কাহিনী শুরু হয়।

সে বলে, তারপর শুনুন, জাঁহাপনা, সেই দশটি মেয়ের প্রত্যেকের হাতে একটি করে তারের বাদ্যযন্ত্র। মেয়েরা বাজাতে শুরু করে আর নাহার গান ধরে। সে কি করুণ সুর। আলীর মনে হতে লাগলো সে যেন কাঁদছে। অথচ সত্যিই সে কাঁদছে না। তার গানের করুণ সুর কান্না অশ্রু হয়ে গলে গলে পড়ছে। আলী বলে, আবুল, এ গান আমি আর সইতে পারছি না, দোস্ত। এমন ব্যথাও কি মানুষ মানুষকে দিতে পারে। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বিষাদের বিষে জহর

হয়ে গেছে। গানেব সুর আমার কানে কানে বলে যাচ্ছে, আলী কাঁদো, প্রাণ ভরে কাঁদো, এমন নিখাদ কাঁদার সুযোগ জীবনে ক'জন পায়?

আবু সান্ত্বনা দিতে থাকে, অত উতলা হয়ো না, বন্ধু। গান মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে ঘা দিতে পারে। তেমন শক্তি আর কোন অস্ত্রেরই নাই। মানুষের ভিতরটা আয়নার মতো দেখে নিতে গেলে তাকে গান শোনাতে হয়। গানের সুরে মনের রুদ্ধ দরজা খুলে দেয়। তখন তাকে দেখো। দেখে চিনে নাও।

সামস-অল-নাহার গান থামালে মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরে। আজকের আসরের প্রধান অতিথি আলী ইবন বকর। তাই সবারই লক্ষ্য তার দিকে। তাকে ঘিরেই মেয়েরা নেচে নেচে গান করতে থাকে।

প্রায় গোটা দশ-বারো নিগ্রো ক্রীতদাসী কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসে একটা রূপোর সিংহাসন। তার উপরে উপবিষ্টা বোরখা ঢাকা এক সুন্দরী। নিগ্রো মেয়েগুলোর বুক অনাবৃত। পরণে সংক্ষিপ্ত সাজ। সোনার সুতোয় বোনা জালি পায়জামা পরণের একমাত্র বাস। সিংহাসনটা ঘরের ঠিক মাঝখানে নামিয়ে দিয়ে তারা সকলে বাগিচায় গিয়ে দাঁড়ায়।

কাচের মতো প্রায়-স্বচ্ছ নাকাবের মধ্য দিয়ে সামস-অল-নাহারের রূপের জৌলুস পুরোপুরিই নজরে পড়ে। নাহার স্মিত হেসে আলীকে স্বাগত জানায়। আলীও মাথা আনত করে জবাব দেয়।

গানের সুরে মন ভরে ওঠে প্রাসাদের প্রতিটি প্রান্ত। নেচে ওঠে ফুলের বনের নাম-না-জানা পাখি। নেচে ওঠে আলী ইবন বকর-এর হৃদয়। একটা পর একটা গান চলতেই থাকে। অনেক অনেকক্ষণ ধরে চলে। তারপর একসময় গান থেমে যায়। কিন্তু সুর তখনও অনুরণন তুলে হৃদয়ে হৃদয়ে ফেরে। আলী মুগ্ধ হয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। অন্তরের অন্তস্থলে অনুভব করতে থাকে গানের মাধুরী।

আবুল হাসান ঠেলা মারে, এই—কি হলো?

—না কিছু হয়নি তো এমনিই।

—কী ভালো লাগছে না?

আলী কি করে আবুলকে বোঝায়, এমন ভালো লাগা বহুকাল তার লাগেনি। —আমার সমস্ত মন প্রাণ ভরে গেছে আবুল।

—হুম তবে যে বলেছিলে তখন, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে। জীবনটা তোমার বরবাদ হয়ে গেলো।

—না ভাই সত্যি বুঝতে পারি ওই নাকাবের আড়ালে এক ভেল্কী আছে? সত্যি যাদু জানে ও। আমার সমস্ত মন প্রাণ প্রথম দর্শনেই নিমেষে কেড়ে নিয়েছে সে। জানি না এরপর কি আছে আমার নসিবে।

আবার গান শুরু হলো। এবারের গায়িকা আবার সেই নাহার। সেই করুণ সুরের মূর্চ্ছনা। এত বিরহ ব্যথার গান সে কেন গায়? কেমন করে গায়।

সামস-অল-নাহারের দু'গাল বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। সে দৃশ্য দেখে আলী আর স্থির থাকতে পারে না। সে-ও কেঁদে আকুল হয়।

সামস-অল-নাহার উঠে দাঁড়ায়। ধীরপায়ে এগিয়ে যেতে থাকে সে দরজার দিকে। এবার সে বিদায় নেবে। আলী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। সে-ও উঠে দাঁড়ায়। ছুটে যায় দরজার দিকে। পর্দার ওপারে গিয়ে নাহারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নাহার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। আলীর বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

আলী তাকে আদর করে। কিন্তু নাহারের দেহ অবশ অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যায়। মেয়েরা ধরাধরি করে তাকে তুলে এনে একটা সোফায় শুইয়ে দেয়। একজন ঝারি করে গোলাপ জল এনে চোখে মুখে ঝাপটা মারতে থাকে। একটু পরে সামস-অল-নাহার চোখ মেলে তাকায়। একজন একটা উগ্র আতরের নির্যাস এনে ওর নাকের কাছে ধরে। ঝাঁঝালো গন্ধে তন্দ্রাভাব কেটে যায় তার।

সামস-অল-নাহার চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকায়। কি যেন খুঁজতে থাকে। এক পাশে আলীকে দেখে স্মিত হাসে। সে হাসি বড় করুণ, বড় মধুর। আলী আরও কাছে সরে আসে। নাহার জিজ্ঞেস করে, আবুল হাসান কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?

আবুল হাসান তখন ঘরের বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মনে এক অজানা আশঙ্কা। একটু আগে যা ঘটে গেছে এতক্ষণে সারা প্রাসাদের প্রতি মানুষ তা নিশ্চয়ই জেনেছে। আলী এসে বললো, তোমাকে খুঁজছে।

আবুল হাসান গিয়ে নাহারের পাশে দাঁড়ায়। নাহার বলে, তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নাই। আর শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে খাটোও করবো না তোমাকে। তবে একটি কথা জেনে রাখো, আজ তোমার জন্যেই আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। আমি আজ নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছি। যাইহোক, আমি অকৃতজ্ঞ নই, আবুল হাসান। তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

আবুল হাসান নিজেকে ধন্য মনে করে। নাহারকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, আপনি যে আমাকে মনে রাখবেন তা শুনেই আমি ধন্য হলাম।

সামস-অল-নাহার আলীর দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসে, তোমার ভালোবাসা নিখাদ, আমি আমার অন্তর দিয়ে বুঝেছি, আলী। যদিও আমার মতো নয়। আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের সব চেয়ে উঁচু আসনে বসিয়েছি। মেয়েরা এখানে মাত্র একজনকেই বসাতে পারে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তুমি সেই জায়গায় স্থান পেয়েছো। অথচ আমার একটু করুণামিশ্রিত ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে কত তরুণই না পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে মরেছে। তাদের জন্য আমি দুঃখ পেয়েছি কিন্তু ভালোবাসা ঢেলে দিতে পারিনি। আজ তোমার কাছে আমার এই আত্মসমর্পণে আমি নিজেও কম অবাক হইনি, আলী।

প্রিয়তমা, তোমার প্রেম আমার কাছে কোনও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়—আমার আত্মারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মৃত্যুও তাকে আলাদা করতে পারবে না। কিন্তু কি আমাদের বিরহ বিধুর জীবন। একথা ভাবতে পারি না, পার্থিব জীবনে আমাদের কখনও মিলন হতে পারে না।

দুজনে আকুল নয়নে কাঁদতে থাকে। আবুল হাসান বলে, একমাত্র খোদাই ভরসা, আমি বুঝতে পারছি না, তোমরা কি করে বাঁচবে। এখন যদি তোমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে জীবন কাটাতে হয়, জানি না কি অঘটন ঘটবে। সে যাই ঘটুক পরের ব্যাপার পরে দেখা যাবে। এখন, এই মুহূর্তে যখন এক সঙ্গে রয়েছ, একটু প্রাণ খুলে হাসো। গাও। মৌজ করো।

আবুল হাসানের এই কথায় নাহার চোখের জল মুছে ফেলে। চাকরদের একজনকে ইশারা করতেই সে ভিতরে চলে যায়। একটু পরেই একদল খানসামা নিয়ে আসে খানাপিনা। বড় বড় রূপোর রেকাবী সাজানো হয় টেবিলে। নানা রকমের বাদশাহী খানা। মাংসের চপ, সাম্মিকাবাব, মোরগ মোসাল্লাম, শাহী কোর্মা কোপ্তা, কালিয়া, বিরিয়ানী, হালওয়া, তন্দুরী রুটি প্রভৃতি। টেবিলের মাঝখানে বসানো হয় একখানা বিরাট সোনার থালা। আপেল, আঙ্গুর, আনার, কলা, কালোজাম, গুলাব জাম ইত্যাদি নানা জাতের ফল। পারস্যের কাজকরা ঝারিতে দুষ্প্রাপ্য সরাব, গোলাপজল।

সামস-অল-নাহার আলীকে বলে, তুমি বসো ঠিক মাঝখানে। আমি বসবো তোমার

মুখোমুখি। আবুলকে পাশে বসায় নাহার। নিজে হাতে পরিবেশন করতে থাকে। একটা একটা করে তুলে দেয় আলী আর হাসানের রেকাবীতে।

কুমারী নিগ্রো বাঁদীরা মদের পেয়ালা পূর্ণ করে দিতে থাকে। নাহার এগিয়ে দেয় আলী আর হাসানের দিকে। ধীরে ধীরে মৌজ করে খানাপিনা চলতে থাকে।

মেয়েরা গোলাপজলের ঝারি হাতে দাঁড়িয়েছিলো। খানাপিনা শেষ হলে আলী আর হাসানের হাতে জল ঢেলে দেয়। কেউ বা দাঁড়িয়েছিলো তোয়ালে হাতে।

এরপর সামস-অল-নাহার একমাত্র গাইয়ে মেয়েদের ছাড়া আর সবাইকে বিদায় করে দেয়। নাহার গান ধরে। এক এক করে মদের পেয়ালা পূর্ণ হয়। আলী হাসান আর নাহার ছোট ছোট চুমুকে শেষ করতে থাকে।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন একশো চুয়ান্নতম রজনীর দ্বিতীয় যামে আবার গল্প শুরু হলো।

সে বলতে থাকে ঃ

সামস-অল-নাহার গাইতে থাকে, আর মেয়েরা তার তালে তালে বাজায়। আলী আর হাসান সুধা পাত্র মুখে তোলে। সুরের মূর্চ্ছনায় আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে মদের নেশা বেশ জমে ওঠে। জমে ওঠে গানের আসর। নাহার এবার বাঁশী তুলে নেয় হাতে। বাঁশীর করুণ সুরে সে এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করতে থাকে।

আলীর মনে হয়, সে কোনও এক বেহেস্তের বাসিন্দা। যেখানে বিত্ত বৈভবের কোনও চিন্তা ভাবনা নাই। শুধু আছে গান আর গান। হাসানেরও তাই মনে হতে থাকে। ভুলে যায়, সে এক নামজাদা সওদাগর। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার। তার দোকানে কত আমির উজিরের মেয়ে বিবিরা আসে। কত কেনা-বেচা। গানের অপরূপ মাদকতায় সমাজ সংসার, জীবনের এই কলরব—সব হারিয়ে তলিয়ে একাকার হয়ে যায়।

আলী কখনও বা হাসে কখনও কাঁদে। আবুল হাসানকে জড়িয়ে ধরে বলে, এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এসেছো, দোস্ত। জীবনে এত গান আছে, এত সুর আছে এবং তার মধ্যে নিজেকে এমন করে নিঃশেষ করা যায়, তাতো জানতাম না। এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে বন্ধু। আমার বড় ভয় করছে, আজকের এই মধুর রাত্রি কাল হয়তো ফুরিয়ে যাবে।

হাসান বলে, কাল কি হবে সে কথা আজ নাই ভাবলে দোস্ত। আজকের এই মুহূর্তে যা পে কাল যদি তার কণা মাত্র অবশিষ্ট না-ই থাকে, তাতেই বা কী ক্ষতি? কিন্তু আজকে রাতের এই মধুর স্মৃতি সারা জীবন তো অক্ষয় হয়ে থাকবে। ওসব ভবিষ্যত ভাবনা ছাড়। এসো, পান করো, গাও, হাসো।

আবুল দু'খানা বাঁশী তুলে নিয়ে একখানা আলীর হাতে দেয়। বলে, এসো আমরাও নাহারের সঙ্গে সুর মিলাই।

কতক্ষণ এইভাবে সুরের কল্পলোকে ওরা বিচরণ করেছিলো মনে নাই। হঠাৎ চৈতন্য হলো। খবর এলো, প্রাসাদ ফটকে এসে দাঁড়িয়েছে মাসরুর। তার সঙ্গে আছে আফিফ এবং অন্য অনেকগুলো খোজা। সামস-অল-নাহার এগিয়ে এসে বললো, মালিক বাঁশী থামাও। শিয়রে শমন হাজির। মাসরুর এসেছে। সে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

নাহারের এই কথা কানে আসা মাত্র আলী আর আবুল দিশাহারা হয়ে পড়ে। বাজিয়ে মেয়েগুলো আতঙ্কে শিউড়ে ওঠে। কিন্তু সামস-অল-নাহার ধীর শান্ত। তার মুখে স্মিত হাসি তখনও লেগে রয়েছে। —ভয়ের কিছু নাই। তোমরা শান্ত হয়ে বসো।

নাহার তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে বলে, মাসরুর আর আফিফকে একটু অপেক্ষা করতে বলো। আমি যাচ্ছি।

মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার সিংহাসনট তোমরা ধরাধরি করে বাগানের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রেখে দাও।

তারপর আলী আর আবুলকে উদ্দেল্য করে সে বলে, তোমরা এই ঘরেই থাকবে। আমি বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে যাবো। না, কোনও ভয় করবে না। যা করার আমিই করবো।

চারিদিকের দরজা জানলা বন্ধ করে দেওয়া হলো। নাহার তার দাসী বাঁদীদের সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে থাকে আলী আর আবুল। তাদের মনে শঙ্কা, না জানি কি বা হয়। আলী বলে, দোস্ত আজ প্রাণটা বেঘোরে মারা গেলো। কেন যে তোমার কথায় নাচলাম।

আবুল সান্ত্বনা দেয়, নিজেকে শক্ত রাখো, আলী। আল্লাহ সব বিপদ কাটিয়ে দেবেন।

কিন্তু আল্লাহ কি বলেছিলেন অন্যের মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করো?

হাসান বললো ধৈর্য ধরো বন্ধু। প্রেমের পথ বড় বন্ধুর।

এদিকে ঘরের দরজায় কুলুপ এঁটে সামস-অল-নাহার বাগানে গিয়ে সিংহাসনে বসে। পরনে তার স্বল্পবাস। একটি বাঁদীকে বলে তেল নিয়ে এসে আমার দাবনায় মালিশ করতে থাক।

হামামে যাবার আগে এ তার নিত্য প্রসাধন।

একটি নিগ্রো বাঁদী মাসরুর আর আফিফকে সঙ্গে নিয়ে বাগিচায় আসে। রণ সাজে সজ্জিত মাসরুর। হাতে তার তালা খোলা বাঁকা তরোয়াল। সামস-অল-নাহারকে ঐ রকম প্রায় বিবস্ত্রা অবস্থায় দেখে ওরা দুজনে সেলাম জানিয়ে মাথা নত করে দাঁড়ায়।

নাহার স্বাগত জানায়, আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন, মাসরুর। কি শুভ-সংবাদ নিয়ে এসেছো, বলো।

মাসরুর আর সামনে তাকাতে পারে না। মালকিনকে এইভাবে দেখবে সে আশা করেনি। মাথা নত করেই বলে, মালকিন, খলিফা আপনাকে স্মরণ করেছেন। অনেক দিন আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ হয়নি, তিনি বললেন, 'মাসরুর মন আমার বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যা একবার তোর মালকিনের খবর নিয়ে আয়। তার তবিয়ৎ যদি ভালো থাকে আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। তা সে যদি নিজে আসতে চায় সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। আর যদি আমাকে যেতে হুকুম করে, আমিই যাবো।'

খলিফার নাম কানে আসতেই সামস-অল-নাহার উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে আভূমি আনত হয়ে তার উদ্দেশ্যে কুর্নিশ জানায়। এই-ই প্রচলিত বাদশাহী রীতি।

—তুমি তাঁকে গিয়ে বলো, তিনি যদি বাঁদীর প্রাসাদে পায়ের ধুলো দিতে চান আমি ধন্য হবো।

মাসরুর সেলাম জানিয়ে বিদায় নিলো। জলসাঘরের তালা খুলে ছুটে গিয়ে আলীকে বুকে ধরলো নাহার। আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আলী, আমি কি করে বাঁচবো? কেন তুমি আমার কাছে এলে? কেন তুমি হাসানের দোকানে বসেছিলে? কেন—কেন? আমার দেহমন তোমার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে। অথচ ভাগ্যের এমনি পরিহাস তোমাকে আমি ধরে রাখতে পারবো না।

আলী নাহারকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। —অমন করে কেঁদো না, নাহার। তোমার আমার প্রেম যুগ যুগান্তের। তুমি আমারই থাকবে আমিও তোমার হয়েই থাকবো। নাইবা হলো এ জীবনে আমাদের মিলন। দৈহিক মিলনটাই সব চেয়ে বড় কথা?

নাহার বলে, না না না, দেহের মিলনের কথা আমি বলিনি, সোনা। কিন্তু তোমাকে তো আর চোখের দেখাও দেখতে পাবো না। আমি অন্তঃপুরে বন্দী হয়ে থাকি। বাইরে বেরুবার স্বাধীনতা কতটুকু আমার? কিন্তু তোমরা পুরুষ মানুষ—বাইরে পাঁচটা জায়গায় ঘুরতে পারো। নানা রকম হৈ-হল্লার মধ্যে কাটাতে পারো। কত নতুন মেয়ে আসবে দোকানে। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে। তাদের রূপে ভুলে যাবে। আমি তখন তোমার মন থেকে মুছে যাবো। না না, এ আমি ভাবতেও পারছি না আলী। অন্য কোনও মেয়ে তোমার দিকে মুচকি হাসবে। চোখের বান ছুঁড়বে। আর তোমরা পুরুষ—মেয়েদের মুখে হাসি দেখলে কি আর কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে! সব ভুলে তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

আলী নাহারের মুখ চেপে ধরে, ভুল—সব তোমার ভুল ধারণা নাহার। সব পুরুষই এক ছাঁচে ঢালা নয়। সবাইকে একই ভাবে মাপতে যেও না। তোমার কি ধারণা, এই এতটা উমর হলো, কোনও মেয়ে এর আগে আমার দিকে তাকায় নি, হেসে কথা বলেনি? আমি কি তাদের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছি? এই তোমাকে ছুঁয়ে দিব্যি করে বলছি, আমার এই ভরা যৌবনে তুমিই একমাত্র নারী—যে আমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছ। আর আমিও উজাড় করে দিয়েছি আমার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা।

সামস-অল-নাহার বলে, তুমি তো জানো, সোনা, আমি কত অসহায় এক অবলা। আমার নিখাদ ভালোবাসা তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না। কারণ, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে খলিফার অঙ্কশায়িনী হবো আমি। কিন্তু সে যে কি বিষম ব্যথা বুকে বাজবে, তোমাকে কি করে বোঝাবো? আমি তার কেনা বাঁদী। আর সে দেশের শাহেনশাহ। তার পালঙ্কে আমাকে যে শুতেই হবে। তার পেয়ালায় সরাব ঢেলে মুখে তুলে ধরতেই হবে—এই দুর্ভাগ্য নিয়েই তো আমার জন্ম। মনে মনে ঘৃণা করলেও তাকে আদর করতে হবে। মিষ্টি কথায় ভোলাতে হবে। নাচ গানে তুষ্ট করতে হবে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাসী আমি। এ ছাড়া তো আমার আর অন্য কোনও পথ নাই সোনা।

তুমি হয়তো ভাবছো, এই বিলাস ব্যসনের মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে আছে। এই বিত্ত বৈভব আমাকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করে আছে। কিন্তু ভুল, বিলকুল ভুল। আমি চাই না এই অতুল ঐশ্বর্য, চাই না এই দাস-দাসী পরিবৃত প্রাসাদতুল্য ইমারৎ। দরকার নাই আমার দামী দামী আবরণ আভরণে কি প্রয়োজন আমার সরাবের নেশায় মাতাল হয়ে থাকা।

আমি এক নারী। মেয়েরা মনে প্রাণে যা কামনা করে তার কতটুকু পেয়েছি আমি?

কেঁদে আলীর বুকে ভাসিয়ে দেয় নাহার। আলী মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে, চোখের জল মুছিয়ে দেয়। বলে, কেঁদ না, সোনা, আমি জানি ব্যথা কোথায়। কিন্তু কি করবে বলো, ভাগ্য কেউ এড়াতে পারে না। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।

এক অনুচর ছুটে এসে খবর দিল, খলিফা আসছেন।

সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সামস-অল-নাহার আর একবার জড়িয়ে ধরে আলীকে। মেয়েদের লক্ষ্য করে বলে, প্রাসাদের ওদিককার ফটকটা খুলে দাও। খলিফাকে অভ্যর্থনা করে বসাও। আমি যাচ্ছি।

টাইগ্রীসের তীরে নাহারেরই নয়নাভিরাম প্রাসাদের আর এক মহল ওদিকটায়। সামনে নদীর মনোহর শোভা। খলিফা হারুন-অল-রসিদ এলে এই মহলেই ওঠেন।

নাহার চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ায়। বেশবাস সংবৃত করে নেয়। আলীকে শেষ বিদায় জানিয়ে বলে, এবার তোমরা এসো। এখন আমাকে তাঁর মনোরঞ্জন করতে যেতে হবে।

নাহারের অনুচর আলী আর আবুলকে সঙ্গে করে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অবশেষে এমন একটা ঘরে নিয়ে এসে দাঁড় করালো যেখান থেকে প্রাসাদের টাইগ্রীস মহলটা পুরো নজরে আসে। অথচ তাদের কেউ দেখতে পাবে না। মেয়েটি বলে, আপনার এখানে আরাম করে বসুন। ইচ্ছে হলে এই পালঙ্কে শুয়ে ঘুমাতে পারেন। খিদে পেলে খানা খেতে পারেন—টেবিলে সাজানো আছে। পান করার বাসনা হলে পান করতে পারেন। ঝারিতে সরাব আছে। আর তাছাড়া তো আমি হাজির আছি সামনে। যা দরকার বলবেন, এনে দেব। কিন্তু একটা কথা, জোরে কথাবার্তা বলবেন না। ওদিক থেকে এদিকে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু কথাবার্তা শোনা যেতে পারে।

ঘরটা বড় অন্ধকার। কিন্তু একটু পরেই চোখে সয়ে গেলো। আলী আর হাসান এতক্ষণ জলসাঘরের চোখ ধাঁধাঁনো আলো থেকে উঠে এসেছে। তাই প্রথম প্রথম বেশ আঁধার আঁধার লাগলেও পরে আর অতটা মনো হলো না। মেয়েটি খাটো গলায় বলে, হয়তা একটু অসুবিধে হবে আপনাদের। কিন্তু এ ঘরে আলো জ্বালানো যাবে না। ওমহল থেকে নজরে পড়লে বিপদ ঘটতে পারে।

আলী ফিসফিস করে বলে, আলোর কোনও দরকার নাই। ওদিকে যা আলোর রোশনাই—তাতেই এ ঘর বেশ স্বচ্ছ পরিষ্কার।

জানলার জাফরীতে চোখ রেখে আলী আর হাসান খলিফার প্রমোদ বিহার দেখতে থাকে। প্রায় শ'খানেক অল্পবয়েসী খোজা—প্রত্যেকের হাতে একটা করে চিরাগ। সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে। খোজাগুলো একটা বিরাট এক বৃত্ত রচনা করে ধীরে ধীরে টাইগ্রিসের ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের মাঝখানে আরও শ'খানেক বয়স্ক খোজা—হাতে তলোয়ার আর ঢাল। আর এই খোজাদের মাঝে কুড়িটি সুবেশা সুদর্শনা বাঁদী এ ওর হাত ধরে খলিফাকে কেন্দ্র করে একটি পদ্ম রচনা করেছে। ধীর মন্থর গতিতে এগোতে থাকে তারা।

সামস-অল-নাহার জমকালো সাজে সেজে ফটকেরী সামনে এসে দাঁড়ায়। তার পিছনে পিছনে এক দঙ্গল মেয়ে—সবারই হাতে নানারকম বাদ্যযন্ত্র।

বাজনার অপূর্ব সুরে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। খলিফা ফটকের কাছে এগিয়ে আসতেই নাহার আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায়। খলিফা তার বাহু ধরে টেনে তোলে, তোমার স্থান ওখানে নয় সুন্দরী, তুমি আমার বুকে এসো।

সামস-অল-নাহার কটাষ হানে। পথে ঘাটে এ রসিকতা আমার ভালো লাগে না, জাঁহাপনা। রাস্তার লোকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর আপনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

খলিফা হাসেন, কই জড়িয়ে ধরিনি তো! তবে ধরতে চেয়েছিলাম। তা তুমি তো দিলে না।

—আগে ভিতরে চলুন। তারপর যতখুশি ধরবেন।

খলিফা উপরে উঠে আসেন। বিশাল খোলা ছাদ। চারপাশ ঘেরা। নানা ফুলের গাছের সমারোহ। আর সামনে স্বচ্ছ সলিলা টাইগ্রিস। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ। এক কথায় অপূর্ব মনোহর পরিবেশ।

মাঝখানে একটা রূপোর সিংহাসন—খলিফা আসন গ্রহণ করলেন। পায়ের নিচে সূক্ষ্ম কাজ করা পারস্য-গালিচা পাতা। সামস-অল-নাহার খলিফার পায়ের কাছে বসলো।

খলিফা বলেন, অনেকদিন তোমার কাছে আসিনি। নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে বড় ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু আর আর কিছুই ভালো লাগলো না। তাই তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম।

নাহার মাথা নিচু করে বলে, খোদা মেহেরবান, তাই আজ আপনাকে পেলাম।

—আপনার বিরহে আমি সর্বক্ষণই কাতর, জাঁহাপনা, কিন্তু চাইলেই আপনাকে কি সব সময় ধরে রাখতে পারি? না ধরে রাখা উচিৎ?

—কেন—উচিৎ নয়, সুন্দরী!

—আমি তো আপনার একা না, আপনার আছে লক্ষ লক্ষ প্রজা—দরবার। কত দায়-দায়িত্ব আপনার। তার মধ্যেও মাঝে সাঝে এই বাঁদীকে যে আপনার মনে পড়ে—এতেই আমি ধন্য। আমার মতো সৌভাগ্য কটা মেয়ের হয়?

খলিফা প্রশ্ন করে, কিসে তুমি সৌভাগ্যবতী? আমি তোমাকে কি দিয়েছি—কি দিতে পেরেছি, নাহার? টাকা পয়সা ধন-দৌলত এইই কি সব—একটা নারীর জীবনে। আমি কি বুঝতে পারি না, কি নিঃসঙ্গ জীবন তুমি কাটাও।

সামস-অল-নাহার বাধা দিয়ে বলে, কোনও দুঃখ নাই আমার, জাঁহাপনা। আমি বেশ সুখী।

মেয়েরা সেতারে সুর তোলে।

পূরবীর সুর। এই আসন্ন সন্ধ্যায় ঝির ঝির করে বসন্তের দখিনা বাতাস কানে কানে কি যেন গোপন কথা বলে যায়। খলিফা তন্ময় হয়ে শোনে।

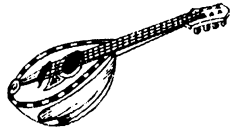

—বড় ভালো বাজায় তোমার মেয়েরা। কোন্ ঘরানা?

নাহার বলে, সব আমার নিজে হাতে তালিম দেওয়া।

খলিফা মুগ্ধ হয়ে বলেন, বড় গুণী মেয়ে তুমি নাহার। তোমার গুণের কদর করতে পারলাম না আমি। আমার মতো সুলতান বাদশাহরা পয়সা দিয়ে গুণী মানী লোকের মাথা হয়তো কেনে কিন্তু তাদের মগজের মর্যাদা দিতে পারে কতটুকু?

সামস-অল-নাহার তার অনুচরকে ইশারা করেত সে মেয়েগুলোকে কি যেন বলে আসে। একটু পরে তারা গান ধরে। ভালোবাসার গান। প্রেমিক গেছে পরবাসে। প্রেমিকা সে বিরহ জ্বালা সহ্য করতে পারছে না। কবে তাদের আবার মিলন হবে। কবে আবার তার মুখে হাসি ফুটবে—এই যন্ত্রণাই ফুটে উঠতে থাকলো সেই গানে।

আলী আর আবুলকে মেয়েটি বলে, আমাদের মালকিনের এখন বিরহে ব্যাকুল প্রাণ। সে এ গান গাইতে বললো কেন জানেন?

আলী জিজ্ঞেস করে, কেন—কেন?

—আপনাকে শোনাবার জন্যে, সাহেব। আপনি তার মন প্রাণ কেড়ে নিয়ে বিবাগী হয়েছেন। সে এখন দিন কাটায় কি করে?

আলী বুঝতে পারে, মেয়েটি মজাক করছে। কিন্তু সত্যিই নাহারের হৃদয় তোলপাড় হয়ে গেছে। একটা দিনের পরিচয় আপাতভাবে এমন কিছুই ব্যাপার নয়। কিন্তু তার মধ্যে হাজার বছরের বন্ধনের আকর্ষণ অনুভব করতে পেরেছে সে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন একশো পঞ্চান্নতম রজনী।

আবার সে বলতে থাকে ঃ

গান শুনতে শুনতে এক সময় নাহার তার পাশে একটি মেয়ের কোলে ঢলে পড়ে। আবু উৎকণ্ঠিত হয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার কী হলো?

মেয়েটি মুচকি হাসে, ও কিছু নয়, মূর্চ্ছা গেছে, এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

আলী আর ভাবতে পারে না। আবুলকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রেখে বলে, কি হবে দোস্ত?

আবুল হাসান শান্ত করার চেষ্টা করে, তোমার বিরহে সে এখন কাতর। তার উপর এই বিরহ-সঙ্গীত ওকে বিচলিত করে ফেলেছে। কিছু চিন্তার নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আলী আর ভাবতে পারে না। আবুলকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রেখে বলে, কি হবে দোস্ত?

আবুল হাসান শান্ত করার চেষ্টা করে, তোমার বিরহে সে এখন কাতর। তার উপর এই বিরহ-সঙ্গীত ওকে বিচলিত করে ফেলেছে। কিছু চিন্তার নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু এমন সময় কি যেন এক গুঞ্জন শোনা গেলো। মেয়েটি বলে দাঁড়ান আমি দেখে আসি।

একটু বাদে ছুটে এসে ঘরে ঢুকে বলে, শিগগির বেরিয়ে আসুন, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

আবুল আতঙ্কিত হয়ে বলে, এদিকে যে আরও বিপদ। আলী মূর্চ্ছা গেছে। একটু পানি ছিটিয়ে দাও ওর চোখে মুখে। মেয়েটি জলের ঝারিটা নিয়ে গিয়ে চোখে মুখে ঝাপটা দিতে থাকে। একটু পরে চোখ মেলে তাকায় আলী। মেয়েটি বলে, নিন ধরুন।

আবুল আর মেয়েটির কাঁধে ভর দিয়ে আলী ইবন বকর কোনও রকমে হাঁটতে পারলো। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে তারা এসে দাঁড়ালো প্রাসাদের অন্য প্রান্তের নদী উপকূলে। অন্ধকার রাত। দূরের মানুষ চোখে পড়ে না। শুধু অনেক দূরে সামস-অল-নাহারের দোতলার বিলাস উদ্যানের মৃদু আলোর আভা নজরে আসে।

ওরা তিন জনে নদীর ধারের একটা শান বাঁধানো চবুতরায় বসে পড়ে। অদূরে একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকা যাচ্ছিল। মেয়েটি হাতে তুড়ি বাজিয়ে ডাকে। নৌকাটা কাছে আসে। ওরা মুখে কোনও কথা না বলে নৌকায় গিয়ে উঠে পড়ে। একটি মাঝ বয়েসী জেলে ডিঙিটা একাই চালিয়ে চলেছিলো। বলে, সাহেবরা সুলতানের লোক, যেখানে যেতে চায় নিয়ে যাবে।

আবুল হাসান বলে, আপনাকে প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মেয়েটি বললো, না না। তার দরকার হবে না। আমি দিব্যি যেতে পারবো। আপনারা এখন ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ুন তো।

মেয়েটি আর দাঁড়ালো না, সেই আধো আলো, আধো আঁধার পথ দিয়ে আবার খিড়কির দরজার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া মাথায় লাগতে আলী বেশ সুস্থ হয়ে ওঠে। একটু পরে নৌকাটা নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছয়। আবুল হাসানের কাঁধে ভর দিয়ে সে নেমে পড়ে। কিন্তু একটা শেওলা ধরা পাথরের ওপরে পা রাখতেই হড়কে পড়ে যায়। আলী বলে, দোস্ত, ধর ওঠাও, কাদায় পা পুতে গেছে।

টাইগ্রীসের এ পারটা চোর-ডাকাতের বড় উপদ্রব। একটু রাত হলেই এদিক ওদিক ওৎ পেতে বসে থাকে তারা। শাঁসালো মক্কেল দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বস্ব লুঠ-পাঠ করে নিয়ে পালায়।

আলীর হাত ধরে টেনে তোলে আবুল হাসান। বলে, বেশি দূর হাঁটাহাঁটি করে দরকার নাই। কখন কোন্ চোর ছেনতাই-এর খপ্পরে পড়ে যাবো। তার চেয়ে চলো, কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে—সেখানে রাতটা কাটিয়ে দিই।

আলী আর কি বলবে। এছাড়া এখন উপায় বা কি। রাতও বেশ হয়ে গেছে। এখন ফেরা ফেরিও পাওয়া যাবে না। গেলেও যাওয়া ঠিক হবে না। পথ-ঘাট ভালো না। নদীর বুকেও অনেক রাহাজানি ডাকাতি খুন খারাপি হামেশাই হয়, শোনা যায়।

কিছুদূর যেতেই আবুল হাসানের বন্ধুর বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছনো গেলো। কড়া

নাড়তেই দরজা খুলে দেয় তার বন্ধু। বিস্ময়ে আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়ে সে। কী ব্যাপার, এতকাল বাদে এই গভীর রাতে তোমার দেখা পাওয়া গেলো দোস্ত। এসো, ভিতরে এসো।

আবুল এক কল্পিত কাহিনী খাড়া করে কারণ দেখালো—কেন তাদের এত রাত হলো ফিরতে। আদ আপ্যায়ন মাত্রাতিরিক্ত। প্রায় অস্বস্তিকর বলা যায়। সেই মাঝ রাতে সারা বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেলো। খানাপিনার সে কি মহা ঘটা। কিন্তু কি করে বলবে, সারাদিনে অনেক ভালো ভালো খানাপিনা তারা করেছে। এখন এই মাঝ রাতে এসব না হলেই বরং ভালো লাগতো। খাবো না—খিদে নাই—অথবা শরীর ভালো লাগছে না—এসব ওজর অতিথির চলে না। কোনও আপত্তিই তারা কানে তুললো না। দম-ভর খাওয়ালো।

খানাপিনা সেরে দুই দোস্ত পাশাপাশি শুয়ে ছটফট করতে থাকে। কারো চোখেই ঘুম নাই। আলী ইবন বকর ভাবে, এই সে জীবনে প্রথম না বলে বাড়ির বাইরে রাত কাটাচ্ছে। তার মা নিশ্চয়ই এতক্ষণ ঘর-বার করে বেড়াচ্ছেন। আর বাবা রাশভারি মানুষ। মুখ দেখে বুকের ব্যথা বোঝে, কার সাধ্য! শ্যাওলায় হড়কে গিয়ে পা-টা বেশ চোট লেগেছে, মনে হয়। গা-হাত-পা বেশ টনটন করছে।

আলী ভাবে, সামস-অল-নাহার এখন কেমন আছে কে জানে? তাকে মূর্ছিত হয়ে ঢলে পড়তে দেখে এসেছে সে। হয়তো এতক্ষণে খলিফা সব জানতে পেরেছেন। ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে তার চোখ। জানিনা কি শাস্তি তিনি বিধান দেবেন। হয়তো এতক্ষণে মাসরুরের খাঁড়ার এক কোপে নাহারের মাথাটা লুটিয়ে পড়েছে। না না না, এসব কি আজগুবি উদ্ভট কল্পনা করছে সে। খলিফা তাকে সত্যিই খুব ভালোবাসে। যে যে-ভাবেই তার কান ভারি করুক হাতেনাতে প্রমাণ না পেলে নাহারকে তিনি সাজা দেবেন না। আর তাছাড়া সামস-অল-নাহার, নানারকম ছলাকলা জানে, বাক চাতুর্যে খলিফাকে কাৎ করে দিতে তার বেশি সময় লাগবে না।

পরদিন সকালে আবুল আর আলী বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরে ফিরে আসে। আলীর ব্যথা তখন বেশ বেড়েছে খুব কষ্ট করে হেঁটে কোনক্রমে আবুলের বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারে। শহরে ঢুকতে বলে, দোস্ত এখানে তুমি বিশ্রাম করো। বিছানাপত্র খানাপিনা সবই আছে। আগে একটু সুস্থ হয়ে নাও। তারপর তোমার বাড়ি পৌঁছে দেব।

আলীর শরীর প্রায় নেতিয়ে পড়েছিলো। বিছানায় শোয়ামাত্র অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়লো। যেন মনে হয়, দিনের পর দিন হেঁটে হেঁটে পথ-শ্রান্ত হয়ে এই প্রথম বিশ্রাম করছে সে।

একটানা একটা প্রহর ঘুমানোর পর আলী উঠে হাত মুখ ধুয়ে রুজু করে। তারপর নামাজ সেরে বেরুবার তোড়জোড় করতে থাকে। কিন্তু আবুল বাধা দেয়, শোনো বন্ধু, তোমার যা তবিয়ৎ, আজ সারা দিন সারা রাত বিশ্রাম দরকার। এ অবস্থায় রাস্তায় বেরুলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে। বরং আমি তোমার মনোরঞ্জনের কিছু ব্যবস্থা করছি।

আলী বলে, কী ব্যবস্থা করবে শুনি?

—কিছু গান বাজনার ব্যবস্থা করছি। সন্ধ্যাবেলায় নামকরা মুজরোদলকে ডেকে আনবো। ওরা তোমাকে পছন্দসই গান-বাজনা শুনিয়ে যাবে!

কিন্তু সে রাতটা আগের রাতের চেয়ে আরও খারাপ কাটলো। গানবাজনা কিছুই সে সহ্য করতে পারলো না।

আবুল বললো, কিন্তু মেয়েগুলো তো খারাপ গায়না দোস্ত।

—আরে, ওরা কেন খারাপ গাইবে—বাজাবে। আসলে আমার মেজাজটা ঠিক নাই—যতই ভালো হোক, কিছুই ভালো লাগতে পারে না।

পরদিন আলীর শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়ে। আর এ অবস্থায় এখানে রাখা

ঠিক হবে না। ভাবলো, ওর মা-এর আদর যত্ন পেলে সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু পায়ে হেঁটে সে যেতে পারবে না। একটা খচ্চর ভাড়া করে পাঠিয়ে দিতে হবে। আলীকে বললো, তুমি একটু অপেক্ষ করো। আমি দোকানটা খুলে দিয়ে একটা খচ্চর নিয়ে আসছি।

দোকান খুলে বসতেই একজন খদ্দের ঢুকলো। তার একটু পরেই এল সামস-অল-নাহার-এর সেই অনুচর।

এই সময় রাত্রি অবসান হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরের দিন একশো ছাপ্পান্ন রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

মেয়েটি তাকে আদাব জানায়। আবুল-এর হৃৎকম্প হতে থাকে। নিশ্চয়ই কোনও দুঃসংবাদ আছে। অবশ্য মেয়েটির মুখ দেখে তাই মনে হয়।

আবুল জিজ্ঞেস করে, কী গো, কী খবর? তোমার মালকিন কেমন আছেন?

মেয়েটি কিন্তু সে কথার জবাব দেয় না। উল্টো প্রশ্ন করে, আলী সাহেব কেমন আছেন?

আবুল বললো, শরীরটা তার এমনিতেই ভালো ছিল না সেদিন। তারপর আজ দুটো রাত ঘুম হয়নি। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

মেয়েটির মুখ কালো হয়ে গেলো, আমার মালকিনের অবস্থা আরও খারাপ। নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছে। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়েছে।

আবুল বলে, আমরা তো দেখে এলাম, গান শুনতে শুনতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। তারপর কী হলো?

মেয়েটি বলতে থাকে ঃ আপনাদের দুজনকে নৌকায় তুলে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি প্রাসাদে ফিরে এলাম। তখনও দেখি সামস-অল-নাহার অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। তার মুখ চোখে পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে। খলিফা হারুন-অল-রসিদ তার পাশে বসে রয়েছেন। আমরা তো ভয়ে জড়সড়। কি করা উচিৎ কি বলা উচিৎ কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এইভাবে অনেক রাত অবধি তার অচৈতন্য ভাব ছিলো। মাঝ রাতে একবার চোখ মেলে তাকালো। খলিফা খুব সোহাগ করে ডাকলেন, নাহার, মানিক সোনা কী হয়েছে তোমার? কিন্তু কোন কথা বলতে পারলো না সে। আবার চোখ বন্ধ করলো। শুয়ে শুয়েই খলিফার পায়ের উপরে ডান হাতখানা রাখলো। খলিফা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কষ্ট বলো, নাহার। আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি সোনা। তুমি না বললে তো আমি বুঝতে পারবো না—কষ্টটা তোমার কোথায়?

কিন্তু সামস-অল-নাহার কিছুই বলতে পারে না। সুলতান মাথায় হাত বুলাতে থাকে। নাহার আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কষ্ট বলো, নাহার। আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি সোনা। তুমি না বললে তো আমি বুঝতে পারবো না—কষ্টটা তোমার কোথায়?

কিন্তু সামস-অল-নাহার কিছুই বলতে পারে না। সুলতান মাথায় হাত বুলাতে থাকে। নাহার আবার চোখ মেলে তাকায় সুলতান আবার জিজ্ঞেস করে, বলো, তোমার কি কষ্ট। আমার কাছেও বলতে তোমার সঙ্কোচ। তাহলে কি আর তুমি আমাকে ভালোবাস না?

নাহার এবার ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে, বিশেষ কিছুই না, জাঁহাপনা, আজ এমন একটা নতুন ফল খেয়েছিলাম যা একদম হজম হয়নি। এই বদহজমের জন্যেই শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। আপনি কিছু ভাববেন না। একটু ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে।

সুলতান বলে, তার সঙ্গে কি কি খেয়েছিলে বলো দেখি।

নাহার বলে, দুটো পাতিলেবু, ছটা কাঁচা আপেল, এক বাটি দই, খানিকটা ভাজা বাদাম, আর এক মুঠো কাঁচা কড়াইশুটি।

—দূর, বোকা মেয়ে এ সব খেয়ে কারো বদহজম হয়? এ সবই তো খিদে বাড়ায়। তবে আমার মনে হয় খাওয়ার সময়েই ভেবেছিলে, বোধ হয় হজম হবে না। যা-ই খাও তৃপ্তি করে না খেলে হজম হওয়া শক্ত। সে যদি হজমিগুলিও হয়—দেখবে বদহজম হয়ে গেছে। যাই হোক, তোমার জীবনটা তো শুধু তোমার একার নয় নাহার। তোমার কিছু হলে আমি যে সুস্থির থাকতে পারবো না। আমার কথা ভেবেও তোমার শরীরটা দিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। যাই হোক, এখন আর কোনও কথা নয়, একটু ঘুমাও। আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। ভালো লাগবে।

ভোর না হওয়া পর্যন্ত, বিশ্বাস করুন, সুলতান সেই একভাবে মালকিনের বিছানায় বসে রইলেন! চোখে তার একবার তন্দ্রাভাব এলো না। কি তাজ্জব ব্যাপার! সকাল হতেই তিনি প্রাসাদ এবং শহরের সব নামজাদা হেকিমকে এক সঙ্গে ডেকে পাঠালেন।

হেকিমরা এসে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনেক রকম দাওয়াই ব্যবস্থা করে গেলো। কিন্তু আসলে কোনও রোগ হলে তো দাওয়াই-এ সারবে। এ রোগ-এর গোড়া তো অন্য জায়গায়।

সুলতান এবং হেকিমরা বিদায় নেওয়ার পর সামস-অল-নাহার চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো। আমি তাকে এক গেলাস সরবৎ এনে দিলাম। সরবৎটুকু খেয়ে নাহার আমাকে বললো, আমি ওকে না দেখলে বাঁচবো না, তুই একবার আলীর খবর নিয়ে আয়।

আবুল বলে, যা বললাম এর বেশী খবর এখন আর দিতে পারছি না, মেয়ে। এখন তুমি যাও। কাল আবার এসো। তখন জানাবো কেমন থাকে।

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর আবুল দোকান বন্ধ করে দ্রুত পায়ে বাড়ি চলে আসে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন একশো সাতান্নতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

আলীর চারপাশে তখন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন এবং হেকিম গিজ গির করছে। আবুল জিজ্ঞেস করলো, এখন কেমন আছো আলী?

আলী বলে, খুব একটা ভালো না। ওদিকের কিছু খবর পেয়েছ?

আবুল চোখের ইশারায় বললো, আছে।

আলী ঘর থেকে সবাইকে বাইরে যেতে বলে।

আবুল নাহার-এর দূতের কথা শোনায়। তার পর বলে, তোমার এত দুঃখের কারণ একমাত্র আমি। কেন যে মরতে তোমাকে নিয়ে গেলাম—। তুমি সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমি আর কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। আল্লাহর দোয়া মাঙছি, তিনি যেন তোমায় তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলেন।

পরদিন সকালে আবার সেই মেয়েটি এল আবুল-এর দোকান।—আমার মালকিন আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শাহজাদা আলীর শরীর কেমন আছে আজ?

আবুল বললো, ও কথা আর জিজ্ঞেস করো না, মেয়ে। আজকের খবর আরও খারাপ। সারারাত সে ঘুমায় না। খা না। শুধু হা হুতাশ করছে সামস-অল-নাহার-এর সঙ্গে আর বুঝি তার দেখা হবে না।

মেয়েটি বলে, আমার মালকিনের অবস্থাও ভালো না। একখানা চিঠি দিয়েছে

সে। আপনি শাহজাদা আলীকে চিঠিখানা দিয়ে দেবেন মেহেরবানী করে। মালকিন জবাব নিয়ে যেতে বলে দিয়েছে।

আবুল দোকান বন্ধ করে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আলীর বাড়িতে আসে। দরজায় অপেক্ষা করতে বলে, আবুল ঢুকে যায়। আলীর ঘরে এসে ইশারায় জানায়, যারা ঘরের ভিতরে আছে তাদের বাইরে যেতে বলো।

আলী উপস্থিত সকলকে বলে আমার পেটে বিষম ব্যথা হচ্ছে, তোমরা একটু বাইরে যাও। আমি ঘুমাবার চেষ্টা করি।

ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে আবুল চিঠিখানা আলীর হাতে দেয়। নাহারের প্রেম-পত্রে পড়ে আলী আরও বেশি অসুস্থ বোধ করতে থাকে। আবুলকে বলে, আমি নিজে হাতে এর জবাব লিখতে পারবো না বন্ধু শরীর বড় দুর্বল, তুমি দেখো, আমি বলে যাই।

আলীর জবানীতে আবুল হাসান চিঠিখানা লিখে পড়ে শোনায়। আলী বলে, ঠিক আছে, কলম দাও, আমি সই করে দিই।

আলীকে সেলাম জানিয়ে জবাব দিয়ে মেয়েটি চলে যায়।

আবুল হাসান দোকানে এসে বসে ভাবতে থাকে, ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে। মেয়েটি এখন রোজই চিঠি নিয়ে যাওয়া আসা করবে। প্রাসাদের খোজাদের চোখে ধুলো দিয়ে কতদিন এভাবে চলতে পারবে। শেষে খলিফার কানে যাবেই। তারপর—ওরে সর্বনাশ—তারপরের দৃশ্য সে কল্পনাও করতে পারছে না। সুলতান সবাইকে কোতল করবে। কিন্তু আবুল ছা-পোষা মানুষ, সে মারা গেলে তার সংসারের কী দশা হবে। না না না। এ কিছুতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না। আলীকে সাফ সে বলে দেবে, এসব ফালতু ঝামেলায় সে আর নাই।

পরদিন সকালে আলীর বাড়িতে যায় হাসান।—তোমার মতো প্রেমকাতর মানুষ তো আমি আর দুটি দেখিনি, ভাই। নিজের শরীরটা ক্ষয় করছো আর এদিকে নিজের মরণ ফাঁদ নিজেই পাতছে? ছাড়ো—ছাড়ো ভায়া, জীবনে বেঁচে থাকলে অনেক পরমাসুন্দরীর সাক্ষাৎ পাবে। এই অলীক মায়ার পিছনে ছুটে কোনও লাভ আছে? তুমি কি ভাবছো, সামস-অল্-নাহার তোমার অঙ্কশায়িনী হবে, আর সুলতান তা চেয়ে চেয়ে দেখবে! খলিফা যেদিন জানতে পারবেন সে-দিন নাহারও বাঁচবে না। আর আমার অবস্থা বুঝতেই পারছো—ভিটে মাটি চাটি করে দেবে। তাই এখনও বলছি, বন্ধু কথা শোনো, নিজেকে সংযত করো। দেখো, সময়ে সব সয়ে যাবে।

আলী ইবন বকর্ বললো, বহুৎ সুক্রিয়া দোস্ত, কিন্তু সামস-অল-নাহার বিহীন এ জীবনে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। তার জন্যেই সঁপেছি—এজীবন। যায় যাবে, থাকে থাকবে।

বাহবা বাহবা দিয়ে উঠলা আলীর অন্য বন্ধুরা। কেউ বললো, তোমার এই প্রেমগাথা অমর হয়ে থাকবে দোস্ত। আবার আর একজন বলে, প্রেম করতে বসে অত ভয় করেল চলে আবুল বলে, তাহলে কিন্তু আমাকে অন্য চিন্তা করতে হবে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সুলতান একদিন জানবেই। তখন আমাদের কারুরই রক্ষা থাকবে না। আমি ভাই এ-সবের মধ্যে থাকতে পারবো না।

আবুল হাসান বিদায় নিলো। শুধু সে-দিনের জন্যে নয় চিরকালের মতো। পরদিন আলীর বন্ধু অন্যতম আমিন এসে জানালো, আবুল ভীষণ ভীতু। খলিফা ওকে কোতল করবে ভয়ে ও আজ সকালেই সপরিবারে বসরাহ পালিয়েছে। সেখানে দোকান পাট খুলে ব্যবসা বাণিজ্য করবে। পরে এসে এখানকার দোকান বিক্রি করে দিয়ে যাবে।

আলী শুনে আহত হয়।—আমাকে এই অবস্থায় ফেলে আবুল চলে যেতে পারলো। সে যে আমার প্রাণের দোস্ত, আমিন।

আমিন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ওরকম ওপর ওপর প্রাণের বন্ধু সবাই হতে পারে, দোস্ত। বন্ধুর পরীক্ষা বিপদে, দুঃসময়ে দুঃখের দিনে। সুসময়ে সুখের খবর সবাই নিতে আসে। কিন্তু প্রকৃত বন্ধুই শুধু দুঃখের দিনে পাশে থাকে। সে তোমার প্রাণের বন্ধু—অথচ আজ এই চরম সময়ে সে কেটে পড়লো। তা পড়ুক, তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি আছি তোমার পাশে। যা করতে হয় আমাকে বলো, আমি করে দেব। নিজের বলতে আমার কেউ নাই। সংসারে আমি একা। এক বুড়ি নিগ্রো ঝি আছে সেই রেঁধে বেড়ে দেয়। সুতরাং সুলতানের রোষে যদি আমার এ তুচ্ছ প্রাণ যায় তাতেও আমি বিচলিত নই। তবুও বন্ধুর জন্যে যদি কিছু করতে পারি সে-ই আমার বড় সান্ত্বনা।

আলী বলে, কিন্তু তুমি কি করে আমার উপকারে আসতে পারবে বন্ধু! আবুল ছিল খলিফার পিয়ারের লোক। প্রাসাদের যত্রতত্র ওর ছিল অবাধ গতিবিধি। হুই করে নাহারের প্রাসাদে ঢুকে গেলেও কোনও নফর চাকর সন্দেহ করতো না কিন্তু তোমাকে তারা ঢুকতে দেবে কেন?

আমিন বলে, ও বাবা, তাও জান না বুঝি, আমি, আবুলের মতো না হলেও, ছোট খাটো জহরৎ-এর ব্যবসা করি। আমার কাছ থেকেও হারেমের বেগমরা অনেক কিছুই কেনে। অনেক সময় খোজাদের দিয়ে ডেকে পাঠায়। আবার আমার হাতে নতুন কোনও জহরৎ এসে গেলে নিজেও গিয়ে দেখিয়ে আসি। সুতরাং প্রাসাদে যে আমারও গতিবিধি একেবারে নাই তা নয়।

আলী আশ্বস্ত হয়। তা হলে হয়তো কোনও অসুবিধে হবে না।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে আমিন উঠে যায়। একটু পরে ফিরে এসে বলে, সামস-অল-নাহারের কাছ থেকে একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আলী অধৈর্য হয়ে ওঠে, নিয়ে এসো তাকে এক্ষুণি।

মেয়েটি এসে সেলাম জানিয়ে দাঁড়ায়।

আলী জিজ্ঞেস করে, তোমার মালকিন কেমন আছে?

—আপনার বিরহে সে প্রায় পাগল। একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। কিন্তু তা কি করে হতে পারে?

আমিন বলে, যদি কিছু মনে না করো, আলী একটা কথা বলি। আমার বাড়ির সামনেই আর একখানা আমার খালি বাড়ি আছে। সেখানে কেউ থাকে না। তালা বন্ধ করে রেখেছি। যদি চাও সেখানে তোমাদের নিভৃত মিলন করিয়ে দিতে পারি।

দুর্বল অসুস্থ আলী যেন মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। —তোমাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো, ভাই—

আমিন বলে, কৃতজ্ঞতার কি আছে। আমি যদি তোমাদের কোনও উপকারে আসতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করবো।

মেয়েটি বললো, আমি আমার মালকিনকে গিয়ে বলি। সে যা বলে কাল এসে আপনাদের জানাবো।

পরদিন সকালে আবার সে এলো। আমিনকে বললো, মালকিনকে সব বললাম। সে আমাকে বললো, আপনাকে তার প্রাসাদে নিয়ে যেতে।

মেয়েটির এই কথায় আমিনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আসে। একটা অজানা ভয় যেন তাকে গ্রাস করে ফেলবে। ঠোঁট দিয়ে জিভ চেটে বলতে থাকে, আমি—মানে আমার কি সেখানে যাওয়া ঠিক হবে? যদি খোজারা সন্দেহ করে? তার চেয়ে তাকেই আমার বাড়িতে আসতে বলো। মন খুলে কথাবার্তা বলা যাবে।

মেয়েটি বুঝলো, আমিন যাবে না। বললো, ঠিক আছে তাই গিয়ে বলি—

সামস-অল-নাহার এতই দুর্বল যে উঠে বসতে পারে না। কিন্তু মেয়েটি যখন গিয়ে বললো, তারা কেউ আসবে না, আপনাকেই যেতে বলেছে, তখন ঐ অবস্থাতেই সে উঠে দাঁড়ালো। কোনও রকমে সাজ পোশাক পরে একটা সাধারণ বোরখায় শরীর ঢেকে সবারই অলক্ষ্যে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লো। মেয়েটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে এল আমিনের বাড়ি।

আমিন বাড়িতেই অপেক্ষা করছিল। মেয়েটি নাহারকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আমিনের সঙ্গে কথা বলতে থাকে।—এ বাড়িতে আর কে কে থাকে?

—আমি আর এক বুড়ি নিগ্রো ঝি। কিন্তু এ বাড়িতে আর কে কে থাকে? আ একটা বাড়ি আছে আমার। সে বাড়িতে কেউ বাস করে না। সেখানেই আমি দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি।

মেয়েটি বলে, কিন্তু এ নিগ্রো বুড়িটাও যেন সে বাড়িতে না ঢোকে।

আমিন বলে, তুমি নিশ্চিত থাকো, কেউ টের পাবে না। চল ঐ বাড়িতেই যাই। এবার সামস-অল-নাহার মুখের নাকাব সরিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, এই সেই সাহেব? এর কথাই তুই আমাকে বলেছিলি?

আমিন দেখলো, তার রূপের আলোয় ঘরটা ভরে গেলো। আলীর পছন্দ আছে বটে। এ রূপের জন্যে কে না পাগল হতে পারে?

নাহার এবার আমিনের দিকে তাকায়, আপনার নাম-ই আমিন?

—জী হাঁ।

—আপনি বিবাহিত?

—জী না। তাছাড়া মা বাবা কেউই আমার নাই। ছোটবেলা থেকেই আমি অনাথ।

একটা সুসজ্জিত কক্ষ খুলে দিয়ে আমিন বললো, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, আমি আলীকে নিয়ে এখুনি আসছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আলীকে নিয়ে ফিরে এলো।

অনেক কয়দিন বাদে দুজনেই দুজনকে দেখে আনন্দে আত্মহারা। আলীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো নাহার।

অনেক রাত অবধি খানাপিনা হৈ-হল্লা আনন্দের মধ্যে কাটলো। এক সময় আমিন আর নাহারের অনুচর মেয়েটি বিদায় নিয়ে চলে গেলো। ওরা দরজা বন্ধ করে দিলো।

পরদিন সকলে সারা পাড়ার লোক জমে গেছে বাড়িটার সামনে। দরজার কপাট ভাঙ্গা। কাল রাতে ডাকাতি হয়ে গেছে আমিনের এই খালি কুঠিতে। পাড়ার প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন এগিয়ে এসে বললো, গকাল মাঝ রাতে অনেকগুলো ডাকাত এসে দরজা ভেঙ্গে বাড়ির সামান-পত্র আর আমিন সাহেবের দুজন মেহেমানকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাদের হাতে ইয়া বড় বড় ছোরা বল্লম দেখে আমি ভয়ে চিৎকার করতে পারিনি।

প্রতিবেশীরা অনেকেই উপদেশ দিল, কোতোয়ালকে গিয়ে নাশি করো। ডাকাতকে তারা পাকড়াবার ব্যবস্থা করবে। কি করবে কি করা উচিৎ কিছুই ভাবতে পারে না আমিন। এমন সময় একজন অচেনা লোক তার সামনে এসে বললো, শোনও, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললো, ডাকাতদের আস্তানা আমি জানি, যাবে আমার সঙ্গে,... এসো।

আমিন যেন হাতে স্বর্গ পায়, বলে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো চলুন।

হাঁটতে হাঁটতে তারা টাইগ্রীসের ধারে এসে পড়ে। লোকটি বলে, ওপারে যেতে হবে। একটা নৌকায় চেপে ওপারে গিয়ে নামে। তারপর অলিগলি এঁকে বেঁকে এমন এক

গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে আমিনকে নিয়ে গিয়ে হাজির করে, যেখান থেকে ছেড়ে দিলেও সে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

একটা পোড়ো বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। লোকটা ট্যাঁক থেকে চাবি করে করে তালা খোলে। আমিনকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢোকে। আমিন দেখলো, দশজন সণ্ডা-গুণ্ডা মার্কা লোক বসে বসে খানা পিনা করছে। আমিনকে বসতে বলে লোকটিও মুখ হাত ধুয়ে এসে ওদের সঙ্গে বসে পড়ে। বলে, খাবে নাকি? এসো।

আমিনের বেশ খিদে পেয়েছিলো। কিন্তু বসতে ভরসা হলো না। কি জানি, বিষ টিস যদি খাইয়ে দেয়। বলে, না খিদে নাই।

লোকটা হাসে, বিশ্বাস করতে পারছো না—তাই না? আরে, আমরা ডাকাত হলেও লোক ভালো। স্বাচ্ছন্দে বসে খেতে পারো।

আমিনের হৃদকম্প শুরু হয়। লোকগুলো ডাকাত! এদিক ওদিক চেয়ে দেখে, নানা রকম মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র রাখা আছে এক পাশে।

লোকটা বলে, কাল রাতে তোমার বাড়িতে আমরাই ডাকাতি করে এসেছি।

আমিন শিউরে ওঠে, তাহলে আমার মেহেমানদের কি—

—না মেরে ফেলিনি। তারা নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। রাজপ্রাসাদেও তেমন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত নাই—তেমনি ভাবেই তাদের রাখা হয়েছে। দেখতে চাও? একটু সবুর করো খানা শেষ হলে তাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে একটা সত্যি কথা বলবে? ওরা কারা? কি ওদের পরিচয়? কিন্তু সাবধান, যা বলবে, সত্যি বলবে। মিথ্যে কোনও কথা বললে আমরা ধরে ফেলবো? এবং তার পরিণাম বড় খারাপ হবে।

আমিন আর কোনও কথা গোপন করলো না। সামস-অল-নাহার এবং আলীর সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললো।

আর একবার ঝালাই করে নেয় লোকটা, তোমার সব কথা বিশ্বাস করতে পারি?

—একশোবার। এর এক বর্ণও বানিয়ে বলিনি।

এমন সময় পাশের একটা দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকলো সুলতানের কোতোয়াল। পরণের বেশবাসেই চেনা গেলো।

—তোমার সব কথা আমি পাশের ঘর থেকে শুনেছি। সব সত্যি বলেছো?

আমিনের তখন কাপড়-চোপড়ে অবস্থা। কাঁপতে কাঁপতে বলে, জী হুজুর, সব সত্যি।

কোতোয়াল বলে, ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।

লোকটিকে ইশারা করতেই দরজা খুলে আমিনকে নিয়ে বেরিয়ে আসে সে।

—এখন বুঝতে পারলে আমরা ডাকাত কিনা?

আমিন বলে বুঝেছি, আপনারা সবাই সুলতানের লোক।

লোকটি বলে, একথা তোমরা ভুলে গেলে কি করে? হয়তো বা কখনও আল্লাহর চোখেও ধুলো দিতে পারো, কিন্তু খলিফা হারুন-অল রসিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা চলে না।

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। সামস-অল-নাহারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো তার প্রাসাদে। আর বেচারী আলী-ইবন-বকর-এর গর্দান গেলো সুলতানের হুকুমে।

এইখানেই এ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটতে পারতো। কিন্তু আরও একটু বাকি ছিলো।

সামস-অল-নাহার কে আদর-সোহাগ করে খলিফা বললেন, আমি তোমার সব গোস্তাকি মাফ করে দিলাম, নাহার। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। তাই বলে তার কি সংশোধন নাই? আমার ভালোবাসা তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি, সোনা। তাই অন্য দিকে হাত বাড়িয়েছিলে?

কিন্তু বিশ্বাস করো, জীবনে আমি কখনও মিথ্যা বলি না, তোমার আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়া।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সামস-অল-নাহারের দেহটা খলিফার কোলে ঢলে পড়ে।

জহরে নীল হয়ে যেতে থাকে ওর স্বর চাঁপার মতো দেহখানা।

একশো সত্তরতম রজনীর দ্বিতীয় যামে ছোটবোন দুনিয়াজাদ গালিচা থেকে উঠে এসে শাহরাজাদের পাশে বসে বললো, এবার তোমার গল্প শুরু করো দিদি।

শাহরাজাল বললো, শাহেনশাহ যদি শুনতে চান নিশ্চয়ই শোনাবো বোন।

শাহরিয়ার বলে, আমি শোনার জন্যে হাঁ করে আছি শাহরাজাদ। তুমি এবার শুরু করো।

শাহরাজাদ বলে, তা হলে শুনুন, জাঁহাপনা, এবার শাহজাদা কামার অল-জামান আর শাহজাদী বদর-এর প্রণয় কাহিনী বলছি ঃ

বহুকাল আগে খালিদাসে শাহরিমান নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ ছিলেন। ধন-দৌলত, লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্তে তার তুল্য সুলতান সে সময়ে সমগ্র আরবে আর কেউ ছিলো না। একদিকে কঠোর হাতে শত্রু দমন এবং অন্যদিকে দক্ষতার সঙ্গে প্রজাপালন তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো। বিলাস ব্যসনেও ছিলো তাঁর প্রগাঢ় আসক্তি। চারটি বেগম এবং সত্তরটি রক্ষিতা ছিলো তাঁর হারেমে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাদশাহর মনে সুখ ছিলো না। দেখতে দেখতে বয়স গড়িয়ে বিকেল হতে চলো, কিন্তু বাদশাহর কোনও সন্তানাদি হলো না। তার এই বিশাল সলতানিয়তের কে হবে উত্তরাধিকারী, সেই চিন্তাতেই নিয়ত মূহ্যমান হয়ে থাকেন তিনি।

চিন্তায় চিন্তায় দিন দিন কৃশকায় হতে থাকেন সুলতান। একদিন প্রধান উজিরকে মনের দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহ আমাকে সবই দিয়েছেন। কোনও দিকেই কোনও অভাব রাখেননি। কিন্তু একটি পুত্র সন্তান থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করলেন তিনি?

উজির চট করে এ কথার কোনও জবাব দিতে পারে না। এ দুঃখ তো শুধু তাঁর একার নয়। সমগ্র খালিদানবাসী সদা সর্বদা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায়, সুলতান যাতে পুত্র লাভ করেন।

গভীরভাবে চিন্তা করে অনেকক্ষণ পরে উজির বললো, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এ সমস্যার সমাধান কেউ করে দিতে পারে না, জাঁহাপনা। আপনি তাঁকেই স্মরণ করুন। নিশ্চয়ই

তিনি আপনার আবেদনে সাড়া দেবেন। আজ রাতে যখন আপনি হারেমে যাবেন তার আগে শুদ্ধাচারভাবে হাতমুখ ধুয়ে রুজু করে নামাজ সেরে নেবেন। নামাজান্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাবেন, আজ রাতের সহবাসে যেন একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।

—চমৎকার কথা বলেছ উজির, আনন্দে প্রায় চিৎকার করে ওঠে শাহরিমান, আমারও মনে হয় এতে আল্লাহ ফেরাতে পারবেন না আমাকে।

সুলতান খুশি হয়ে উজিরকে মূল্যবান সাজ-পোশাক উপহার দিলেন। সন্ধ্যাকালে একটি মনমতো রক্ষিতা পছন্দ করলেন। আজ রাতে তার ঘরেই তিনি কাটাবেন। উজিরের পরামর্শ মতো বেশবাস পরিবর্তন করে শুদ্ধ চিত্তে নামাজ সারলেন। নামাজান্তে কায়মনে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, আল্লাহ, তুমিই একমাত্র ভরসা, তুমি না দিলে আমি এই অতুল বৈভবের মালিক হয়েও দীনভিখারী হয়েই থাকবো।

সেই রাতে সুলতান যে রক্ষিতার ঘরে গিয়েছিনেল দশমাস পরে তারই গর্ভে এক সুদর্শন পুত্রের জন্ম হয়। শাহরিমান আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। এতকালের সাধ তাঁর পূর্ণ হলো। সারা সলতানিয়তে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। প্রজারা নবজাতকের শতায়ু কামনা করে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলো। সুলতান আদর করে নাম রাখলেন কামার অল-জামান—অর্থাৎ এ যুগের চাঁদ।

তা চাঁদই বটে। এমন রূপ চোখে পড়ে না। তারায় ভরা চৈত্র মাসের রাতে ছাতের ওপর মাদুর পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে দূর নীলনভে যে রূপের হাট প্রত্যক্ষ করা যায় একমাত্র তার সঙ্গেই বুঝি তুলনা চলে কামার অল-জামানের রূপ। অথবা কোনও এক বসন্ত বিকালের বিদায়ী সূর্যের বিদায় চুম্বনে আরক্তিম ফোটা ফুলের সমারোহ তার তুল্য রূপ ধরা পড়ে।

শাহরিমান পুত্রকে কোনও সময় চোখের আড়াল করেন না। তার লেখাপড়া শেখানোর ভার দেওয়া হয় শহরের সবচেয়ে নামজাদা মৌলভীর ওপর। দিনে দিনে বড় হতে থাকে কামার অল-জামান।

যখন তার পনেরো বছর বয়স, জামানের দেহে যৌবনের জোয়ার আসতে থাকে। শাহরিমান পুত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবেন, আল্লাহ তাকে যখন দিলেন, দুহাত ভরেই দিলেন। এমন রূপ তিনি কখনও চোখে দেখেননি।

সুলতান মনে মনে স্থির করলেন, এবার পুত্রের শাদী দিয়ে দিতে হবে। তার নিজের বয়স হয়েছে। মানুষের শরীর বলা যায় না, হুট করে মরে গেলে মনের সাধ মনেই রয়ে যাবে। উজিরকে ডেকে বললেন, শোনো, উজির, ছেলে তো বড় হলো, আমার শরীর স্বাস্থ্যও দেখছো, খুব ভাল নাই। তা জামানের যদি শাদী দিয়ে দিই খুব কি খারাপ দেখাবে। ওর শাদীটা না দেখে যদি মরি আমার এত কালের সাধ অপূর্ণ থেকে যাবে।

উজির বললো, জাঁহাপনা পুত্র আপনার জ্ঞানে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। এখনই শাদীর প্রশস্ত সময়। আমার মনে হয় আর দেরি না করে শুভ কাজ সম্পন্ন করে দিন। আপনার প্রজারাও এই শুভ দিনটির জন্যে অধীর আগ্রহে দিন গুণছে। তাছাড়া স্বামী স্ত্রীর সহবাসে দেহ ক্লেদ মুক্ত হয়। সুতরাং আপনি যা ভেবেছেন তা চমৎকার।

সুলতানের মনে যেটুকু দ্বিধা ছিলো তাও সাফ হয়ে গেলো। কামার অল-জামানকে খবর পাঠালেন। একটু পরেই জামান এসে বাবাকে কুর্নিশ জানিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়ায়।

—আব্বাজান, আমাকে ডেকেছেন?

এই সময়ে রাত্রি অবসান হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুনিয়াজাদ বলে, কি সুন্দর করে তুমি বলতে পারে দিদি—!

শাহরাজাদ বলে, এবার একটু ঘুমিয়ে নে।

বাদশাহ শারিয়ার শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। —সত্যি শাহরাজাদ, কিসসাগুলো শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে রাত কাবার হয়ে যায় বুঝতেই পারি না। তুমি আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছ।

শাহরাজাদ বলে, সেই জন্যেই তো আমি সকাল হতে না হতেই গল্প থামিয়ে দিই, জাঁহাপনা। সারারাত্রি জাগরণের পরে আপনার যাতে ঠিক মতো ঘুম হয় সেটাও তো আমাকে দেখতে হবে।

শারিয়ার আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে, কেন? দেখতে হবে কেন? আমার তবিয়ৎ খারাপ হলে তোমার কী?

বা রে, আপনিই তো আমার সব। স্বামী ছাড়া মেয়েদের আর কি থাকে?

শারিয়ার শাহরাজাদের ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। দুনিয়াজাদ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে নিজের ঠোঁট। রক্ত বেরিয়ে যায়। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে, সুলতান শারিয়ারের বুকের নিচে কি করে তার দিদি হারিয়ে যেতে থাকে। শাহরাজাদ একটা মৃদু চাপড় দিয়ে দুনিয়াজাদকে বলে, দূর মুখপুড়ি, পাশ ফিরে শো।

পরদিন একশো একাত্তরতম রজনী ঃ

সারাদিন দরবারের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যা হতে না হতেই সুলতান শারিয়ার শাহরাজাদার কক্ষে চলে আসে। দুনিয়াজাদ নিচে গালিচায় গিয়ে শোয়। শাহরাজাদ সরে এসে শারিয়ারের গা ঘেঁষে বসে। শারিয়ার ওকে বুকে টেনে নিয়ে আলতো করে একটু চুমু খায়। তারপর চলতে থাকে পূর্বরাগের পালা। রাত বাড়ে। রিরংসাও বাড়তে থাকে দুজনের। উত্তেজনায় অস্ফুট স্তনন করতে থাকে শাহরাজাদ।

দুনিয়াজাদ এবার আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। বুকে তাকিয়া চেপে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ বাদে শাহরাজাদ ডাকে, দুনিয়া, ওপরে আয়।

দুনিয়া উঠে এসে শাহরাজাদের পাশে বসে। আবার গল্প শুরু হয়।

তারপর শুনুন, জাঁহাপনা, শাহজাদা কামার অল-জামান বাবাকে কুর্নিশ জানিয়ে বলে, আমাকে ডেকেছেন, আব্বাজান?

—হ্যাঁ বাবা, বসো।

জামান সুলতানের পাশে গিয়ে বসে। শাহরিমান বলে, আমার বয়স হয়েছে, বেঁচে থাকতে থাকতে তোমার শাদীটা দেখে যেতে চাই, বাবা।

কামার অল-জামানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, কিন্তু আব্বাজান, এখনই আমি বিয়ে করতে চাই না। জীবনে নারীর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি তার কোনও অভাব বুঝতে পারিনি, আব্বাজান। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনও ধ্যান ধারণা গড়ে ওঠেনি। ওদের সম্পর্কে আমার কোন মোহ বা আকর্ষণ কিছুই নাই। এ অবস্থায় হঠাৎ একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক, আমার মনে হয়, সুখের হবে না। আদত কথা, শাদী নিয়ে আমি এখনও কিছু ভাবিইনি। আমার মন ঠিক তৈরি হয়ে ওঠেনি। আপনি অপেক্ষা করুন, আব্বজান। আমি শাদী করবো না—এমন কথা বলছি না। কিন্তু শাদী করার আগে আমাকে প্রস্তুত হতে দিন, এই আমার আর্জি।

শাহরিমান পুত্রের কথায় বিচলিত হলেন। —কিন্তু বাবা, শিক্ষাদীক্ষার পাঠ তোমার হয়ে শেষ হয়ে গেছে। এবার সংসার ধর্ম পালন করার সময় এসেছে। এখন তুমি বলছো, মেয়েদের সম্পর্কে তোমার কোনও ধ্যান ধারণাই গড়ে ওঠেনি। আমার মনে হচ্ছে, তুমি কিছু

গোপন করছো। কিন্তু গোপন করার কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না, বাবা। তুমি এখন বড় হয়েছো। অনেক পড়াশুনা করেছো। সব কিছু ভালোমন্দ বোঝার বিদ্যাবুদ্ধি তুমি অর্জন করেছো। তুমি বিনা দ্বিধায় বলো, আমি তোমার কথাই শুনতে চাই।

কামার অল-জামান মাথা নিচু করে বসে থাকে। বাবার কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। সত্যিই সে আসল কথাটা শত চেষ্টা করেও বাবাকে বলতে পারেনি। কিন্তু বৃদ্ধ শাহরিমানের চোখ এড়ায়নি। জামান যে কি একটা গোপন করতে চাইছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

একটুক্ষণ পরে জামান বললো, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আব্বাজান, আমি একটা কথা বলতে গিয়ে বলতে পারিনি। আপনি আমাকে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বহু কিতাবে পড়েছি, মেয়েদের নানারকম ছলাকলা বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। তাদের রূপ যৌবন দিয়ে কিভাবে পুরুষের সর্বনাশ করে সেই সব বিচিত্র বিবরণ জানলে কোনও মেয়েকে কেউ ভালো চোখে দেখতে পারে না, আব্বাজান। যে মেয়ে খারাপ হতে চায় তাকে আপনি জিঞ্জিরে বেঁধে কয়েদ করে রাখলেও সে পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে পারে। একথা আমি বানিয়ে বলছি না, আব্বাজান, আমাদের পীর পয়গম্বররা এই বাণী রেখে গেছেন। আর আমার একমাত্র আর্জি, জাঁহাপনা আপনি আমাকে আর শাদীর কথা বলবেন না। এ সত্ত্বেও আমার কথা যদি না শোনেন, যদি জোর করে কোনও মেয়েকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন, ফল ভালো হবে না। হয়তো আপনার মনের একটা সাধ পূরণ করতে গিয়ে আমাকেই আপনি চিরকালের মতো হারাবেন।

বাদশাহ শাহরিমান শিউড়ে ওঠেন। —না না না, সে হতে পারে না। অমন অলুক্ষণে কথা মুকে আনতে নাই, বাবা। আমি তো তোমাকে জোর জবরদস্তি করছি না। তোমার বয়স হয়েছে। আর আমিও বুড়ো হয়েছি। এ অবস্থায় বিয়ে শাদী করে ধন দৌলত বুঝে নিয়ে প্রজাপালন করাই তোমার ধর্ম। আর আমার কথাটা একবার ভাবো, কবে মরে যাবো, মরার আগে কে না নাতির মুখ দেখে তে চায়? যাই হোক, তুমি আদৌ ভেবো না তোমাকে ধরে বেঁধে শাদী দিয়ে আমার মনোবাসনা চরিতার্থ করবো। যাকে শাদী করবে সে হবে তোমার খাস বেগম। সারাজীবনের সঙ্গী। তার সঙ্গে তোমার যদি বনিবনাও না হয় সে শাদী তো জহর সামিল। আমি কিছুতেই তা হতে দেব না। কিন্তু বাবা, তবুও একটা কথা থেকেই যায়। আমি জানি তুমি বহু জ্ঞান আহরণ করেছ। বহু দর্শন তোমার নখদর্পণে। তবু বলবো, আরও কিছু অনুসন্ধান করে দেখো, মেয়েদের সম্বন্ধে ভালো কথাও নিশ্চয়ই অনেক মনীষীই বলেছেন। তোমার বয়স অল্প। পুঁথিগত বিদ্যাই এখন একমাত্র মূলধন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক সময় হব তোমার অধিত বিদ্যার দৃঢ় প্রত্যয়কে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেয়। সে সব নজির তো কিতাবে লেখা থাকে না। নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। যাই হোক, এখন আর তোমাকে উত্যক্ত করতে চাই না। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক। পরে যদি কখনও তোমার চিন্তা-ভাবনার কোনও রদবদল হয়, আমাকে অসঙ্কোচে জানাবে।

এরপর আরও একটা বছর কেটে যায়। শাহরিমান আর কোনও প্রশ্ন তোলেন না। ছেলের প্রতি তার দারুণ দুর্বলতা। কোনও কথায় সে আহত হয় সুলতান তা আদৌ চান না।

শাহরিমানের শরীর দিন দিন জরাগ্রস্ত হয়ে থাকে। মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে, বুঝতে কষ্ট হয় না। একদিকে অপত্য পুত্র স্নেহ অন্যদিকে জীবনের শেষ সাধ। নির্জন প্রাসাদ কক্ষে একা একা বসে ভাবেন। ছেলে বড় হয়েছে, তার অমতে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। অথচ এদিকে দিনও শেষ হয়ে আসছে। নাতির মুখ আর বুঝি দেখে যাওয়া হলো না। শাহরিমান

নিশ্চিত জানেন, প্রথম যৌবনের স্বপ্নরঙিন কল্পনার দিনগুলো সব পুরুষের জীবনেই একবার আসে। ধরাবাঁধা জীবনের শাশ্বত আবর্তকে সে তখন কিছুকালের জন্য স্বীকার করতে চায় না। সকলে যা করে সকলে যা বলে তা সে করতে চায় না—বলতে চায় না। সে চায় নতুন কিছু একটা করতে—যাতে সে হতে পারবে অনন্য। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির প্রসারতা বাড়ে, অভিজ্ঞতার আয়তন ব্যপ্ত হয়।

শাহরিমান ভাবেন। জামানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে হয়—তার ধ্যানধারণার কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

কামার অল-জামান আবার এসে সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। মুখের দিকে তাকালে কেউ ভাবতেই পারবে না এ ছেলে বাবার কথার অবাধ্য হতে পারে। তার কথাবার্তায় হাব-ভাবে চাল-চলনে এত শালীনতা, এত ভব্যতা বিশ্বাসই করা যায় না যে বাবার একটি অপূর্ণ সাধ, সে মেটাবে না। শাহরিমান জিজ্ঞেস করেন, এখনও কি তোমার সেই একমত, জামান?

কামার অল-জামান বাবার বিষণ্ণ করুণ মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। তার একটি অপূর্ণ সাধ পূরণ করতে পারছে না সে। সেই অপরাধ তাকে এই একটা বছর ধরে দংশন করে আসছে। কিন্তু, তন্নতন্ন করে খুঁজেও, কোনও একটা কিতাবে মেয়েদের সম্পর্কে একটা ভালো কথাও তার নজরে পড়েনি। বরঞ্চ যতই বইয়ের পাত উল্টিয়েছে মেয়েদের সম্পর্কে আরও মারাত্মক খারাপ খারাপ উক্তি সে পড়েছে। তাদের মতো ভ্রষ্টা, নষ্ট চরিত্রা, নির্বোধ, বিশ্বাসঘাতিকা, ছলনাময়ী প্রাণী বিশ্ব সংসারে আর কিছু নাই। কামার অল-জামান-এর ধারণা দিন দিন বদ্ধমূল হতে থাকে। কোন নারীর সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধার আগে তার যেন মৃত্যু হয়, এই তার আল্লাহর কাছে একমাত্র প্রার্থনা।

—আব্বাজান, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, আপনার সাধ আমি কিছুতেই পূরণ করতে পারবো না। এই একটা বছরে আমি আরও নানা কিতাব পড়েছি। যতই পড়ছি, বিশ্বাস করুন, মেয়েদের সম্পর্কে ধারণা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়াতে যত খারাপ কাজ আছে তার কোনওটাই তাদের অসাধ্য নয়।

সুলতান শাহরিমান বুঝলেন, পুত্র এখন ঘোরে রয়েছে। তাকে বোঝানো বিষম দায়। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন জোর করে বোঝাতে গেলে হিতে-বিপরীত হতে পারে।

মনের দুঃখ কিছুটা হাল্কা করার জন্য উজিরকে ডেকে বললেন, দেখো উজির, আমি ভেবে দেখেছি, মানুষের চাওয়ার লেষ নাই। আমি যখন নিঃসন্তান ছিলাম তখন আল্লাহর কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা ছিলো, আল্লাহ আমাকে একটি পুত্র সন্তান দাও। আর কিছু বাসনা নাই আমার। তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করলেন। একটা চাঁদের মতো ছেলে দিলেন। আজ কিন্তু আমি তাতেই সন্তুষ্ট নই—আজ আমার সাধ একটি নাতির। কিন্তু জামান ঘোরতর নারী বিদ্বেষী। এক বছর আগে যা ছিল এখন তার থেকেও আরও এক কাঠি বেশি। ভারি ভারি কিতাব পড়ে ওর দিন দিন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের নামই সে কানে শুনতে চায় না। এখন কি করা যায় বলতো?

অনেকক্ষণ একথার কোনও জবাব দিতে পারে না উজির। তন্ময় হয়ে ভাবতে থাকে। তাইতো বড় কঠিন সমস্যা।

—জাঁহাপনা, উজির বলে, আপনি মেহেরবানী করে আরও একটা বছর ধৈর্য ধরে থাকুন। তারপর একদিন আচমকা তাকে দরবারে ডেকে পাঠাবেন। সেখানে উপস্থিত আমির ওমরাহ-গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে আপনি ঘোষণা করে দেবেন, কামার অল-জামানের শাদীর দিন পাকা করে ফেলেছেন।

—কিন্তু উজির, ছেলে যেমন এক রোখা, এতে কি ফল ভালো হবে?

—হবে জাঁহাপনা, হবে। আমি জানি জামানের মতো বিনয়ী ভদ্র নম্র এবং পিতৃভক্ত পুত্র খুব বড় একটা হয় না। আপনি পাঁচজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে খেলো হয়ে যাবেন, আপনার কথার কোনও দাম থাকবে না তেমন বেয়াদপি সে কখনও করতে পারবে না। আমি তার স্বভাব চরিত্র খুব ভালো করে জানি, হুজুর। অমন চরিত্রবান ছেলে আমার জিন্দগীতে দেখিনি।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

একশো বাহাত্তরতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

উজিরের পরামর্শে সুলতান শাহরিমান উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।—তুমি ঠিক বলেছ, উজির। সে আমাকে ভক্তি করে, ভালোবাসে। আমার ইজ্জৎ নষ্ট হতে পারে এমন কাজ সে কখনও করতে পারে না—একথা আমি জানি। যদি প্রকাশ্য দরবারে দশজন সম্ভ্রান্ত মানুষের সামনে আমি বড় মুখ করে ঘোষণা করি, শাহজাদা জামানের শাদীর ব্যবস্থা পাকা করেছি তাহলে তার অনিচ্ছা থাকলেও, আমার মুখরক্ষা করার জন্যও সে 'না' করতে পারবে না। তুমি ঠিকই বলেছো, উজির। তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। তোমার মতো বিদ্বান বিচক্ষণ উজির পেয়ে আমি গর্বিত। এই নাও তোমার পুরস্কার।

শাহরিমান তাঁর কণ্ঠ থেকে মহামূল্যবান মণিমুক্তা খচিত রত্নহার খুলে উজিরের হাতে তুলে দিলেন। উজির দ্বিধা ভরে হাত পেতে নিতে নিতে অবাক হয়ে বললো, এ যে অমূল্য রত্নহার, জাঁহাপনা।

—তোমার এ পরামর্শ মূল্য দিয়ে যাচাই করা যায় না, উজির। আমি খুশি হয়ে দিলাম। তুমিও মনে কোনও সংশয় রেখো না।

এরপর আরও একটা বছর কেটে গেলো। একদিন পূর্ণ দরবার কক্ষে কামার অল-জামানকে ডেকে পাঠালেন শাহরিমান। পিতৃভক্ত পুত্র যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো। জামানের রূপের আলোয় যেন দরবার কক্ষ আরও বেশি আলোকিত হয়ে উঠলো। আমির ওমরাহ অভ্যাগতদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠলো—আহা, আল্লাহ কি ভাবেই গড়েছেন? আসমানের চাঁদও হার মেনে যায়।

—শোনো বাবা, সুলতান শাহরিমান ধীরে ধীরে বলেন, আমি তোমার শাদীর ব্যবস্থা করছি। আমি বুড়ো হয়েছি। কবে আছি কবে নাই, তাই যাবার আগে তোমাকে শাদী দিয়ে যেতে চাই। আজ এখানে শহরের সম্ভ্রান্ত আমির ওমরাহরা আছেন। তাদের সামনে ঘোষণা করছি, যত সত্বর সম্ভব আমি তোমার শাদী দেব।

কামার অল-জামান এতক্ষণ বিনয়াবনত সুবোধ বালকের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো। সুলতানের কথায় সে লাঠি খাওয়া ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফণা তুলে ধরলো। চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠলো। রোষ কষায়িত বিস্ফারিত চোখে সে সুলতানের দিকে উদ্ধতভাবে চেয়ে রইলো। মুখে কোনও ভাষা নাই। চোখে তার অগ্নিঝরা প্রতিবাদ।

উপস্থিত আমির ওমরাহ অভ্যাগতরা মাথা নিচু করে বসে রইলো। সুলতান গর্জে উঠলেন।—আমার অবাধ্য! এতবড় স্পর্ধা! এই—কে আছিস, ওকে বাঁধ। বেঁধে নিয়ে গিয়ে পাশের পোড়ো বাড়িটার চিলেকোঠার ঘরে বন্ধ করে রেখে দে।

সুলতানের হুকুম। সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদাকে বেঁধে প্রহরীরা নিয়ে গেলো পোড়ো বাড়ির চিলে কোঠায়। অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে তারা দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। যদি শাহজাদা কিছু বলেন এই প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে রইলো তারা। কিন্তু না, কামার অল-জামান কোন সাড়াশব্দ

করলো না। অন্ধকার ঘরের এক কোণে বসে ভাবতে লাগলো; এ-ই বরং ভালো হয়েছে। বাবার কথায় যদি সুবোধ বালকের মতো সে সায় দিত সে-ই হতো তার অপমৃত্যু। আজ এই জীর্ণবাড়ির অন্ধকার চিলেকোঠায় আমাকে বন্দী করে সুলতান আর একবার প্রমাণ করলেন, দুনিয়াতে যত অঘটন ঘটেছে তার মূলে সেই নারী।

শোক-কাতর অবসন্ন মনে সুলতান শাহরিমান প্রাসাদে নিজের শয়নকক্ষে ফিরে গেলেন। প্রাণাধিক একমাত্র পুত্র আজ তারই হুকুমে কারারুদ্ধ। অথচ এই পুত্র লাভের আকুতি তাকে একদিন পাগল করে তুলেছিলো। দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। অপত্য স্নেহ একসময় পুত্রের সব গুনাহ মাফ করে দিলো। সুলতান ভাবলেন, তার কি দোষ? সে তো তাকে একাধিকবার তার মনের কথা খুলে বলেছে। এ অবস্থায়, ছেলে বড় হয়েছে, জোর করে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে যাওয়াই অন্যায়। এ জন্যে তার তো কোনও অপরাধ নাই। যত নষ্টের গোড়া ঐ উজির। তার ঐ বাজে পরামর্শ নিতে গিয়েই যত অনর্থ ঘটলো। যতই ভাবেন তিনি, সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়তে থাকে উজিরের উপর। উজিরকে ডেকে পাঠালেন শাহরিমান।

—তুমিই এর জন্যে একমাত্র দায়ী, উজির। তোমার ঐ বদ পরামর্শ নিয়েই আমার মান-ইজ্জৎ সব গেলো। একমাত্র পুত্রকে আমি কয়েদ করলাম—সবই তোমার অপরিণামদর্শিতায়। যাক এখন উপায় বাতলাও, কিভাবে এর সমাধান হতে পারে। তুমি তো জানো উজির, আমার বুকের কলিজা একমাত্র পুত্র সে। তাকে এইভাবে কষ্ট দিয়ে আমি কি করে বাঁচবো?

উজির করজোড়ে বলে, হুজুর। অধমের কথা শুনুন, ধৈর্য ধরে পনেরোটা দিন আপনি চুপচাপ থাকুন।

—কী বললে? পনেরো দিন? পনেরো দিন ধরে সে ঐ নোংরা অন্ধকার ঘরে পচবে?

—না হুজুর, পচবে কেন, তার সব ব্যবস্থাই আমি করে দিয়েছি।

একথা শুনে শাহরিমান-এর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।—কী ব্যবস্থা করে দিয়েছ। কার হুকুমে? তোমার আমি গর্দান নেবো।

—হুজুরের ইচ্ছা। যেদিন হুজুরের দরবারে চাকরী নিয়েছি সেইদিন জান কবুল করেছি। জাঁহাপনার যদি তাই অভিপ্রায় হয় নিতে পারেন আমার গর্দান। কিন্তু সুলতানের কোনও ইজ্জৎহানি হয় তেমন কোনও কাজ আমি করিনি। করতে পারি না। শাহজাদা আপনার যেমন পরম পেয়ারের আমাদেরও কি কম আদরের? আপনার সলতানিয়তের প্রতিটি মানুষ তাকে বড় ভালোবাসে। সে-ই আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। এই কারণে, যদি কোনও প্রহরী শাহজাদার কষ্টে কাতর হয়ে তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একটু ব্যবস্থা করে থাকে তবে কি সুলতান তাদের সে গুণাহ উপেক্ষার চোখে এড়িয়ে যেতে পারেন না?

—উজির, সত্যিই তোমার বুদ্ধির তুলনা নাই। কিন্তু সাবধান এসব কথা আমি জানি তা যেন তোমার প্রহরীরাও জানতে না পারে।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা, শাহজাদা জানেন না, আমার হুকুমে প্রহরীরা তার থাকা খাওয়ার অমন সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তার ধারণা প্রহরীরা ভালোবেসে সবারই অলক্ষ্যে এসব করছে। তারা তাকে এ-ও শুনিয়ে দিয়েছে, সুলতান জানতে পারলে তাদের হয়তো গর্দান যাবে। তা যাক। কিন্তু তাই বলে তাদের শাহজাদাকে এইভাবে তারা কষ্টে রাখতে পারবে না।

সুলতান শাহরিমান শুনে খুশি হয়। বলেন, কিন্তু পনেরো দিন তার অদর্শন আমি কেমন করে সইবো? তাকে পাশে না পেলে যে আমি ঘুমাতে পারি না, উজির।

উজির বলে, এছাড়া কোনও উপায় নাই, জাঁহাপনা। এই পনেরোটা দিন আপনাকে

কষ্ট করে থাকতেই হবে। তারপর দেখবেন, শাহজাদা আপনার কত বাধ্য হয়ে গেছে। শাদীতে আর সে অমত করবে না।

সুলতান সবই বুঝলেন জামান-এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ত্রুটি হবে না তা সত্ত্বেও সে রাতে তিনি ভালো করে ঘুমাতে পারলেন না। পালঙ্কে শুয়ে শুধু বার বার জামানের শূন্য শয্যার দিকেই নজর চলে যায়। বুকের মধ্যে কেমন হু হু করতে থাকে। রাত্রির প্রহর বাড়ে। সুলতান ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি পায়চারি করতে থাকেন। ঘুম আর আসে না।

ওদিকে কামার অল-জামান রাতের খানাপিনা শেষ করে। বইপত্র নিয়ে বসে। অনেক রাত অবধি একমনে পড়াশুনা করে শুতে যাবার আগে রোজ-এর অভ্যাসমতো হাত মুখ ধুয়ে রুজু করে কোরানের কয়েক পাতা সুর করে পড়ে। পাঠ শেষ হলে গায়ের একটি মাত্র কামিজ ছাড়া পরনের সব সাজপোশাক খুলে ফেে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। আর শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তারপর যেসব ঘটনা ঘটলো সেগুো স্বপ্ন না সত্যি তা কে বলতে পারে?

এইসময় রজনী শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

[এর আগের তিনটি রজনী মাত্র কয়েকটি ছত্রে শেষ করেছেন ডঃ মারড্রুস। এখানে সেই কয়েক ছত্রের জন্য আলাদাভাবে সেই রজনী-ত্রয়ের উল্লেখ করলাম না। এতে গল্পের গতি ব্যাহত হতো মাত্র। এরপরে এই ধরনের বর্জন উল্লেখ করে জানানো হবে না—অনুবাদক]

এরপর একশো ছিয়াত্তরতম রজনী ঃ

দ্বিতীয় প্রহরে আবার কাহিনীর সূত্রপআত হয়। শাহরাজাদ বলতে থাকে।

যে পোড়ো বাড়িটার চিলেকোঠায় কামার অল-জামান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলো সেই ধ্বংসস্তূপ সদৃশ জরাজীর্ণ পোড়ো প্রাসাদটা এক সময়ে খুব রমরমা চেহারার ছিলো। সে অতি প্রাচীনকালের কথা। রোম তখন দুনিয়ার সেরা শহর। তখন সব রাস্তাই রোমে গিয়ে মিশেছিলো। সব মানুষই রোম-যাত্রী। এই ভাঙা প্রাসাদ সেই আমলের। তখনকার সুলতান বাদশাহের সুখের আধার ছিলো এই প্রাসাদ। কালের হাতছানিতে আজ শুধু দাঁত বের করা ইঁটের পাজা ছাড়া আর কোন বাহারই অবশিষ্ট নাই।

এই ভাঙা প্রাসাদের পিছনে একটা বিশাল কূপ আছে। সেই কূপে বাস করে এক যুবতী জিনি। ইবলিসের বংশধর মাইমুনাহ। মাইমুনাহর বাবা সাবটেরা নিয়ানের বাদশাহ জিন দিমিরিয়াৎ। তার অমিত শৌর্যবীর্যের অলৌকিক কাহিনী বিশ্ববিশ্রুত।

মাঝরাতে মাইমুনাহ কূপ থেকে বেরিয়ে আকাশে ওড়ে। এই তার প্রতিদিনের অভ্যাস। উড়তে উড়তে সে প্রথমে মহাশূন্যে উঠে যায়। তারপর ঠিক করে কোনদিকে কোথায় যাবে।

সেদিন রাতেও সে যথা নিয়মে কূপ থেকে বেরিয়ে উপরে উঠছে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখলো, চিলেকোঠার ঘরে আলো জ্বলছে। জন্মাবধি এতকালের মধ্যে এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য সে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এইরকম জনমানব পরিত্যক্ত একটা পোড়ো বাড়িতে কেউ কখনও পদার্পণ করে না। আজ হঠাৎ এখানে মানুষ কি করে এলো? জিনি ভাবলো, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় রহস্য আছে। ব্যাপারটা কি দেখতে হবে। চিলেকোঠার ঘরের জানালা দিয়ে সে ভিতরে ঢুকে পড়লো।

চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর কামার অল-জামানের অর্ধ উলঙ্গ দেহটার দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে জিনি। এত রূপ কোনও পুরুষ মানুষের হয়। তার দেহমনে এক অজানা আনন্দের শিহরণ

লাগে। পা টিপে টিপে সে জামানের পালঙ্কের পাশে যায়। অপলক চোখে তাকে প্রাণ ভরে দেখতে থাকে। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে যায়। কিন্তু জিনির আর দেখে দেখে আশ মেটে না। আশ মেটে না। আল্লাহর এই অতুলনীয় সৃষ্টির কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধার মাথা নত হয়ে আসে। দুচোখ জলে ভরে যায়। ভাবে, এমন খোদার আশীর্বাদকে এইভাবে নির্বাসন দিয়েছে কোন পাষাণ হৃদয় বাবা-মা। কি তার এমন অপরাধ—যার জন্য তাকে বন্দী করে রেখেছে এই রুদ্ধ কয়েদখানায়? তারা কি জানে না এটা শয়তান আফ্রিদি দানবের আস্তানা? একবার তাদের কারো নজরে পড়লে ছেলেটাকে কি তারা আস্ত রাখবে? যাইহোক, অন্য কোন জিন যাতে এর কোন অনিষ্ট না করতে পারে তা আমাকে দেখতেই হবে।

জামানের কপালে মুখটা নামিয়ে আলতোভাবে একটু চুমু দিলো জিনি। তারপর জানালা দিয়ে বেরিয়ে আকাশের ওপরে উঠে গেলো। যেখানে সাদা মেঘের পেঁজারা হালকা হাওয়ার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে সেখানে উঠে গিয়ে ডানা মেলে ভেসে বেড়াতে থাকে সে।

একটুক্ষণ পরে পাখার ঝটপটানি আর বিকট কর্কশ আওয়াজে সে সজাগ হয়ে এদিক ওদিক চায়। একটা বিশাল দৈত্য তার দিকেই উড়ে আসছে। আরও একটু কাছে আসতেই চিনতে পারে—আফ্রিদি দানাশ। একটা শয়তান দৈত্য। ব্যাটা সর্বশক্তিমান শাহেনশাহ সুলেমানের বশ্যতা স্বীকার করে না। পয়লা নম্বরের নাস্তিক। এর বাবা সামহারিস সবচেয়ে দ্রুতগামী জিন বলে পরিচিত।

মাইমুনাহর আশঙ্কা জাগে, যদি ঐ পোড়ো প্রাসাদের চিলেকোঠার দিকে ওর নজর পড়ে? সুতরাং আর অপেক্ষা না করে শোঁ করে অনেকটা নিচে নেমে এসে একেবারে দানাশের মুখোমুখি থামে। ইচ্ছে ছিলো পাখার এক বাড়ি মেয়ে একেবারে ধরাশায়ী করে দেবে তাকে। কিন্তু দানাশ বোধহয় বুঝতে পেরেছিলো। মাথার উপরে মাইমুনাহকে শোঁ শোঁ করে নামতে দেখে চিৎকার করে ওঠে সে।

—শোনো, শাহজাদী মাইমুনাহ, আমি দানাশ। শাহেনশাহ সুলেমান আমার রক্ষা কর্তা, দোহাই তোমরা আমাকে মেরো না। সুলেমান তোমার ভালো করবেন।

মাইমুনাহ মনে মনে হাসে—ভূতের মুখে রাম নাম। এখন ব্যাটা বেকায়দায় পড়েছে অমনি সুলেমান ওর রক্ষা কর্তা হয়ে গেলো। অন্য সময় সে সুলেমানকে মানতেই চায় না। এত বড় আহাম্মক। দানাশ বলে, তুমি আমাকে মেরো না মাইমুনাহ। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার কোনও অনিষ্ট করবো না।

—ঠিক বলেছো, আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি, একটা শর্তে। সত্যি করে বলো, তুমি কোথা থেকে আসছো? আর এত দেরিই বা কেন? এখন তোমার মনের মধ্যে কি শয়তানীই বা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ঠিক ঠিক সাচ্চা বাৎ বলবে। আমার সঙ্গে বেগড়বাই করলে তোমাকে আমি জ্যঅন্ত রাখবো না। পাখা ছিঁড়ে খুঁড়ে দেব। আঁচড়ে গায়ের ছাল চামড়া খুলে নেবো। আর এমন গোত্তা মারবো—পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। তোমার কোনও বাবা রক্ষা করতে আসবে না এখানে।

দানাশ জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, কি যে বলো সুন্দরী, তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলতে পারি। আর বলবো বা কেন? যাক ওসব কথা, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে বেশ ভালোই হলো। আজ যে কি মজার কাণ্ড কারখানা হয়েছে, বলছি শোনো। কিন্তু তার আগে আমাকে কথা দাও, আমার কিস্‌সা শোনার পর তুমি যদি খুশি হও—আমাকে যেখানে খুশি চলে যেতে দেবে?

মাইমুনাহ অধৈর্য হয়ে বলে, আমি সুলেমানের নামে হলফ করে বলছি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানে খুশি তুমি যেও, আমি কোনও বাধা দেব না, নাও এবার তোমার কাহিনী শুরু করো।

আমি সুদূর চীনের পশ্চিম অঞ্চল থেকে উড়ে আসছি। তুমি হয়তো শুনে থাকবে, প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ঘায়ুরের সাম্রাজ্য সেটা। তার দাপটে কত বড় বড় সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। তার সেনাবাহিনীর মেয়েরা সবাই পরমা সুন্দরী—হুরীর মতো। স্নানের পরে তাদের দেহ থেকে ফুলের খুশবু ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরে। সেই সম্রাট ঘায়ুরের একটি মাত্র কন্যা বদর। তার রূপের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। তবু যদি শুনতে চাও, আমার সাধ্যমতো বর্ণনা দিতে চেষ্টা করবো।

তার আজানুলম্বিত কালো চুলের সঙ্গে বুঝিবা একমাত্র নিরন্তর নির্ঝন ঝরনারই তুলনা চলে। তার মুখের সৌন্দর্যের বর্ণনা আর কি করে দিই! শুধু বলতে পারি আশমানের চাঁদ যদি তার মুখের মতো সুন্দর হতে পারতো—ধন্য হতো সে। হরিণীর মতো তার কাজল কালো চোখের তারায় আমি ঘন নীল অতল সমুদ্রের গভীরতা প্রত্যক্ষ করেছি। তার পাকা আঙুরের মতো দুটি ঠোঁট, মরালের মতো গ্রীবা, সুডৌল স্তন, ক্ষীণ কটি, ভারি নিতম্ব, নিরাসক্ত পুরুষের বুকেও ঝড় তুলতে পারে।

সম্রাট ঘায়ুর তার মেয়েকে প্রাণাধিক ভালোবাসে। তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য ঘায়ুরের চেষ্টার অন্ত নাই। কিছুদিন আগে মেয়ের জন্য সে সাতখানা সাতমহলা আজব প্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছে। একখানা প্রাসাদ আগাগোড়া স্ফটিকের তৈরি। দ্বিতীয়খানা দুধের মতো চকমিলানো অ্যালাব্যাসটারের তৈরি। তৃতীয় প্রাসাদ পুরোটাই চীনে মাটিতে গড়া। চতুর্থখানা বাহারী রঙের মার্বেল পার্থ দিয়ে তৈরি করেছে সে। পঞ্চমখানা রূপো, ষষ্ঠখানা সোনা আর সপ্তম প্রাসাদখানা তৈরি করা হয়েছে হীরে দিয়ে। প্রত্যেকটি প্রাসাদ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কি তাদের গড়ন আর কি তাদের কারুকর্ম। দুনিয়ার সেরা কারিগর দিয়ে বানিয়ে দিয়েছে সম্রাট ঘায়ুর। শুধু মেয়ের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সম্রাটের ইচ্ছা প্রত্যেকটি প্রাসাদে বদর একটি করে বছর কাটাবে। প্রত্যেক বছরে নতুন নতুন প্রাসাদে বাস করলে তারা মনে একঘেয়েমির ছাপ পড়বে না। সদা সর্বদা হাসি খুশি উৎফুল্ল হয়ে থাকবে সে।

প্রাসাদের ঐ মনোরম পরিবেশে আমি তাকে দেখেছি। তুমি কি বিশ্বাস করবে তাকে দেখার পর থেকেই আমার মাথাটা কেমন বিগড়ে গেছে।

দেশ বিদেশের রাজা বাদশাহরা এসেছিলো তার পাণি প্রার্থনা করতে। সম্রাট ঘায়ুর চেয়েছিলেন্দা মেয়ে তার পছন্দ মতো পাত্র বেছে নিক। কিন্তু বদর কারো দিকে ফিরেও তাকায় নি। তার এক কথা ঃ আমি নিজেই আমার রানী। ভারতের সূক্ষ্ম মসলিনের স্পর্শেই যে কাতর হয়ে পড়ে সেই কুসুমাদপি কোমল এই তনু কি করে একটা পুরুষের দৌরাত্ম্য সহ্য করবে, বাবা? না, তুমি ওদের বিদেয় করে দাও। আমি কোনও পুরুষের প্রভুত্ব সহ্য করতে পারবো না।

সম্রাট ঘায়ুর মেয়েকে অখুশি করার কথা ভাবতেই পারে না। সে যা পছন্দ করে না তা কিছুতেই তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় না সে।

একবার এক পরাক্রমশালী সম্রাট লক্ষ লক্ষ মোহরের উপহার উপঢৌকন পাঠিয়ে সম্রাট ঘায়ুরের কাছে প্রস্তাব পেশ করলে, সে তার কন্যার পাণিপ্রার্থী।

সম্রাট ঘায়ুর মেয়েকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো। এই সম্রাটের রানী হলে তার মর্যাদার হানি হবে না। কারণ ঘামুরের মতো তারও জগৎজোড়া নাম।

কিন্তু এত বোঝানোর ফল হলো উল্টো। বদর রাগে ফুসতে ফুসতে বললো, বাবা তুমি যেভাবে আমাকে নির্যাতন করছো তাতে আর আমি এ জীবন রাখতে চাই না। এক্ষুণি তরবারির এক কোপে নিজেকে আমি শেষ করে দেব।

বাবা শিউড়ে উঠলো। সে কি মা! ও কথা কি মুখে আনতে আছে? থাক, ওসব কথা

আর মুখে আনবো না আমি। তোমার যখন একান্তই ইচ্ছা নয়, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করবো না, মা। কিন্তু দোহাই বেটা, রাগের মাথায় যা তা কিছু করে বসো না।

আফ্রিদি দানাশ বললো, শুনলে তো মাইমুনাহ। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি—সেই মেয়েকে। চলো, তুমিও দেখে আসবে সেই ডানাকাটা হুরীকে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

মাইমুনাহ এতক্ষণ চুপচাপ দানাশের কাহিনী শুনছিল। দানাশ থামলে সে হো হো করে হাসতে হাসতে বললো, একটা মেয়ের রূপেই তুমি মজে গেছ! কি করে ভাবলে তার মতো সুন্দর আর হয় না? তুমি দেখোনি বলে? আমি যে শাহজাদাকে ভালোবেসেছি তাকে যদি দেখতে তাহলে আর তোমার এই উচ্ছ্বাসের ফুলঝুরি মুখ দিয়ে বেরুতো না।

দানাশ বললো, তা হতে পারে। কিন্তু তোমার ভালোবাসাকে তো আমি দেখিনি। যাই হোক, তোমার যদি আপত্তি না থাকে চলো তাকে একবার দেখে নয়ন সার্থক করে আসি। তবে নিজে চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই যে, আমার রাজকুমারীর চেয়েও সুন্দর কেউ হতে পারে।

মাইমুনাহ রেগে ওঠে, চুপ করো। যাকে চোখে দেখিনি সে বড় সুন্দরী। অমন চোখ ঝলসানো রূপ আমি ঢের দেখেছি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমার ভালোবাসার নখের যুগ্যি হবে না তোমার সেই রাজকুমারী। তার রূপ দেখেই যদি তোমার মাথা বিগড়ে গিয়ে থাকে তবে আর আমার ভালোবাসাকে দেখে কাজ নাই। একবার তাকে চোখে দেখলেই তুমি ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে—আর চৈতন্য ফিরবে না। কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবে, থাক, তাকে আর চোখে দেখে তোমার কাজ নাই।

দানাশ বলে, কিন্তু কে সে? কোথায় থাকে?

মাইমুনাহ বলে, সে এই বাদশাহর ছেলে। আমি যে কূপে বাস করি তার পাশে যে ভাঙা প্রাসাদ—তারই চিলেকোঠার ঘরে সে এখন বন্দী হয়ে আছে। সাবধান, কক্ষণো তুমি একা যাবে না সেখানে। যদি দেখতে চাও আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। তোমার মতো শয়তানকে আমি এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না। সুন্দর ছেলে দেখলেই তার সর্বনাশ করতে তোমরা ওস্তাদ।

—আহা, অত চটছো কেন সুন্দরী। একবার যখন বলেছো সে তোমার ভালোবাসা, আমি তার অনিষ্ট করতে পারি? আমি কসম খেয়ে বলছি, একা সেখানে কখনো যাবো না। তবে তাকে একবার দেখতে চাই—কেমন সে সুন্দর। তা তোমার সঙ্গেই যাবো। দূর থেকে এক পলক দেখবো মাত্র।

মাইমুনাহ বলে, নিয়ে যেতে পারি একটা শর্তে। তাকে দেখে যদি তোমার মনে হয় সত্যি সে তোমার রাজকুমারীর চেয়ে সুন্দর তা হলে আমাকে পেট পুরে ভালো মন্দ খাওয়াতে হবে। আর তোমার রাজকুমারী যদি আমার শাহজাদার চেয়ে বেশি সুন্দরী হয়, আমি তোমাকে খাওয়াবো—যা চাইবে।

দানাশ আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, চমৎকার! ঠিক আছে, তাই হবে। তাহলে চলো, আগে আমার রাজকুমারী বদরকে দেখিয়ে নিয়ে আসি—

মাইমুনাহ বাধা দিয়ে বলে, আমার শাহজাদা তো ঐ নিচে ভাঙা প্রাসাদের চিলেকোঠার ঘরেই শুয়ে আছে। এখান থেকে সোজা নেমে গেলেই তাকে দেখতে পাবে। এক পলকের ব্যাপার। আগে চলো তাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। তারপর যাওয়া যাবে তোমার রাজকুমারীর দেশে। সেখানে যেতে তো রাত কাবার হয়ে যাবে।

ওরা দুজনে কামার অল-জামানের ঘরে ঢুকে পড়লো।

মাইমুনাহ ফিস ফিস করে দানাশের কানে কানে বলে, খুব সাবধান, কোনও শব্দ করবে না। তোমার যা বাজখাঁই স্বভাব, এখুনি হয়তো খ্যাঁ খ্যাঁ করে উঠবে। তা হলে ওর ঘুম ভেঙে যাবে।

দানাশ একভাবে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। এমন নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব সে কোন মানুষের কখনও দেখেনি।

মাইমুনাহ বিরক্ত হয়ে বলে, অমন হাঁ করে দেখছ কী?

দানাশের তন্ময়তা কাটে, সত্যি, এমন অপরূপ সুন্দর ছেলে আমি আর কোথাও দেখিনি, মাইমুনাহ। দেখে নয়ন সার্থক হয়ে গেলো। নাঃ, আমি হেরে গেলাম তোমার কাছে। এ রূপের কোনও জুড়ি নাই। বেহেস্তেও আছে কি না সন্দেহ। আমার রাজকুমারী দুনিয়ার সেরা সুন্দরী বলে তোমার কাছে বড়াই করেছিলাম। কিন্তু সে দম্ভ আমার ভেঙে দিলে। কিন্তু এত প্রশংসা করেও একটা কথা ভয়ে ভয়ে বলবো। যাই বলো এত রূপ কোনও পুরুষ মানুষের মানায় না। আল্লাহ বোধ হয় মেয়ে গড়তে গড়তে হঠাৎ ভুল করে ছেলে বানিয়ে দিয়েছেন। দেখছ না, ওর সারা দেহটায় কেমন মেয়েলী ছাপ—একেবারে বদর-এর মতন।

দানাশের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো, মাইমুনাহ দানাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড জোরে পাখার বাড়ি মারলো। দানাশের একটা শিং ভেঙে পড়ে গেলো। মাইমুনাহ রাগে থর থর কাঁপতে থাকে, শয়তান বদমাইশ, বেল্লিক, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তুই তো তুই, তোর বাপ-ঠাকুরদা—চৌদ্দপুরুষের কেউ কখনও দেখেছে এমন রূপবান পুরুষ? ভাগ হতচ্ছাড়া, প্রাণে যদি বাঁচতে চাস, এক্ষুণি বেরিয়ে যা এখান থেকে। না হলে তোকে আমি তুলে আছাড় মারবো।

দানাশ ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে। গুটি গুটি জানলার দিকে এগিয়ে যায়। মাইমুনাহ হুকুমের স্বরে বলে, এক্ষুণি সোজা চলে যা তোর রাজকুমার বদর-এর কাছে। আজ রাতেই তাকে এখানে নিয়ে আসা চাই। আমি শাহজাদার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো সে কেমন সুন্দরী? আর তার মেয়েলী শরীরের সঙ্গে শাহজাদার শরীরেরই বা কতটুকু মিল আছে আমার দেখা দরকার। আমার হুকুম তামিল না করিস, এইরাতেই যদি বদরকে এখানে না আনিস তোর কপালে অনেক দুঃখ। তোকে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে শেয়াল শকুন দিয়ে খাওয়াবো মনে থাকে যেন।

দানাশ কোনও কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক

পরে সে ফিরে আসে। পিঠের ওপর ঘুমন্ত রাজকুমারী বদর। ফিনফিনে পাতলা একটিমাত্র শেমিজ ছাড়া তার পরণে অন্য কোনও পোশাক নাই। প্রায় কাঁচের মতো স্বচ্ছ শেমিজটার নিচে ধবধবে ফর্সা দেহখানা আয়নার মতো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই দানাশকে লক্ষ্য করে মাইমুনাহ কটাক্ষ করে বলে, কি রে হতচ্ছাড়া এত দেরি কেন? এই খালিদান থেকে চীনে যেতে আসতে কতটুকু সময় লাগে? না, রাজকুমারীর ন্যাংটো শরীর দেখে আর

ঠিক থাকতে পারিস নি? পথের মাঝে কোথাও ঝোপ জঙ্গলে নামিয়েছিলি বুঝি? যাগ গে, এখন শাহজাদার যেন ঘুম না ভাঙে।

দানাশ অতি সন্তর্পণে বদরকে শাহজাদার পাশে শুইয়ে দিয়ে আলতোভাবে শেমিজটা গা থেকে খুলে নিলো। মাইমুনাহ অপলকভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলো। নাঃ, কোথাও কোনও খুঁত ধরা গেলো না। বরং দানাশ যা রূপের বর্ণনা দিয়েছিলো আসলে সে তার চেয়ে ঢের—ঢের বেশি সুন্দরী। শাহজাদার সঙ্গে রাজকুমারীর অঙ্গ সৌষ্ঠবের তফাৎ কিছুই নাই। মনে হয়, ওরা যেন একই ছাঁচে গড়া—যমজ। দুজনেরই মুখের সুরৎ একই রকম অনন্যসাধারণ—অপূর্ব সুন্দর।

মাইমুনাহ বললো, হুঁ, স্বীকার করতেই হয় তোমার রাজকুমারী কিছু কম সুন্দরী না। দুজনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর এ নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে। আমি বলবো, আমার শাহজাদা বেশি সুন্দর। আর তুমি বলতে পারো তোমার রাজকুমারীই বেশি সুন্দরী। এ তর্কের মীমাংসা হতে পারে না। কিন্তু তুমি যে একটা ডাঁহা মিথ্যে কথা বলেছ তা তো প্রমাণ হয়ে গেলো। আমার শাহজাদার শরীরে যে আদৌ মেয়েলী ছাপ নাই। তা তো এখন দেখতে পাচ্ছ? আর তা ছাড়া মেয়েদের সারা শরীর জুড়ে থাকে কামের ছাপ। ওই দেখো, ওর বুক, ওর কোমর, পাছা, যেখানে দেখবে, শরী চনমন করে উঠবে। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে 'বাঃ'। কিন্তু সত্যিই 'বাঃ' বলার নিখুঁত কিনা সেটা কেউ খুটিয়ে দেখতে পারে? নিরুত্তাপ নিষ্কাম চিত্তে যদি বিচার করো আমার শাহজাদাই প্রথম পুরস্কার পাবে কি বলো?

—দেখ মাইমুনাহ, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না। তুমি যদি খুশি হও, আমি মনের কথা চেপে তোমাকে খুশি কারর জন্যে না হয় মিথ্যেটাই মেনে নিলাম।

—কী, এত বড় কথা, আমি মিথ্যে বলছি।

—আহা-হা অত চটছ কেন? আমি তো মেনে নিচ্ছি, তোমার শাহজাদাই বেশি সুন্দর। সে-ই প্রথম, আমার রাজকুমারী দ্বিতীয়। তুমি খুশি তো?

মাইমুনাহ আরও চটে ওঠে। অমন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার কি দরকার? যদি সাহস থাকে তবে বেলা, আমার কথা তুই মানতে রাজি নোস। তুই না পুরুষ মানুষ—একটা নপুংসক কোথাকার।

—এ তোমার ভারি অন্যায়। অমন করে গালাগাল দিচ্ছো কেন? আমি তো তোমার কথা মেনেই নিয়েছি।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

একশো বিরাশিতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়ঃ

মাইমুনাহ রেগে কাঁই। —তুমি কি আর সত্যি সত্যি মেনে নিয়েছ? মুখে মানছো আমার প্যাঁদানীর ভয়ে। কিন্তু তাতেও তোমার নিস্তার নাই। তোমার মতো মিচকে শয়তানকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমার জানা আছে।

এই বলে মাইমুনাহ একখানা পাখার ঝাপট মারে দানেশের চোখে। বেচারী, বড়াৎ জোর, তড়াক করে দু' পা পিছিয়ে যেতে পেরেছিলো তাই রক্ষে। না হলে চোখটাই যেত। কিন্তু ততক্ষণে মাইমুনাহ ক্ষেপে উঠেছে। তাক করছে, দানেশের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দানেশ ওর মতলব বুঝে নিমেষের মধ্যে একটা মাছি হয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে বিছানায়—ওদের দুজনের মাঝখানে। অন্য সময় মাইমুনাহ ছেড়ে কথা কইতো না। যেন তেন প্রকারে ওর পিণ্ডি চটকে দিত। কিন্তু এখন, এই অবস্থায় বিছানার ওপর ধস্তাধস্তি করা সম্ভব না। তাতে ওদের দুজনের ঘুম ভেঙে যাবে। তাই সে নিজেকে সামলে নিলো।

—ঠিক আছে, কিছু বলবো না। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসো।

দানাশ বলে, তুমি আমাকে মারবে।

মাইমুনাহ বলে, খোদা কসম, কিছু বলবো না, বেরিয়ে এসো।

এবার দানাশ উড়ে এসে আবার নিজের আসল রূপ ধরলো।

—শোনো দানাশ, মাইমুনাহ বলে, এভাবে এই বিতর্কের নিষ্পত্তি হবে না। তার চেয়ে এমন কাউকে সালিশ মানা যাক—যে ব্যাপারটার ফয়সালা করে দিতে পারবে।

দানাশ বললো, সেই ভালো। তোমার যাকে ইচ্ছে ডাকো।

মাইমুনাহ মেঝের উপর তিনবার টোকা দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটা দুভাগ হয়ে নিচে থেকে উঠে এলো বিশাল বিকট কদাকার কুৎসিত এক দৈত্য। মাথায় তার ইয়া বড় বড় ছ'খানা শিং। এক এক খানার মাপ কাঁটার মতো। তে-ভাগা। পিঠের উপর দুম্বার মতো একটা কুঁজ। আর একটা পা খোঁড়া। নাক বলে কোন বস্তু নাই। গোলাকার চোখ দুটো নাকের জায়গাটা দখল করে আছে। তার একখানা বাহু লম্বায় পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ হাত। আর একখানা মাত্র বিঘৎখানেক লম্বা। এক একখানা হাতের থাবা দেখতে ঠিক জলের ডেকচির মতো। ওর নাম কশকশ ইবন ফকরাশ ইবন আত্রাশ—আবু হানফাশের বংশধর।

ঘরের ভিতরে উঠে দাঁড়াতেই আবার মেঝেটা জোড়া লেগে গেলো। কশকশ আভূমি আনত হয়ে মাইমুনাহকে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, বান্দা হাজির মালকিন।

মাইমুনাহ হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে বললো, জিতা রহো, বেটা। আমার সঙ্গে হাড়েহারামজাদা এই দানাশের ঝগড়া বেঁধেছে। তোমাকে আমরা সালিশ মানছি। তুমি ফয়সালা করে দাও। ঐ যে দেখছ শাহজাদা আর রাজকুমারী শুয়ে ঘুমাচ্ছে, তোমাকে বলে দিতে হবে কে বেশি খুবসুরৎ। খুব ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখো। তোমার বিচারে যাকে বেশি সুন্দর মনে হবে আমরা তাকেই সেরা বলে মেনে নেবো। রায় দেবার আগে খুব ভালো করে ভেবে দেখবে—যেন কোনও অবিচার না হয়।

কশকশ এতক্ষণ পালঙ্কের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়েছিলো। এবার ফিরে দেখেই আনন্দে উত্তেজনায় ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো। ওরেব্বাস, একি দেখছি। আশমানের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে। কিন্তু মালকিন, বড় মুশকিলে ফেললেন, দুজনেই তো দেখি একইতরা খুবসুরৎ। ফারাক তো কিছু বুধি না।

মাইমুনাহ বলে, তা বললে তো হবে না কশকশ, এর মধ্যে একজনকে বাছাই করে বলতেই হবে।

কশকশ বলে, ঠিক আছে ঘাবড়াবেন না, উপায় একটা বাৎলে দিচ্ছি।

—কী সে উপায়?

কশকশ বললো, প্রথমে আমি এই রাজকুমারীর রূপের গুণগান করে একটা কবিতা শোনাতে চাই।

মাইমুনাহ বাধা দিতে বলে, অত সময় নাই। ওসব কাব্যিটাব্যি রাখো। এখন সোজাসুজি যা বলতে চাও বলো।

কশকশ বললো, তা হলে এক কাজ করুন। আমরা তিনজনই অদৃল্য হয়ে হাওয়ায় মিশে থাকি। তারপর সকাল হতে দিন। ওরা ঘুম থেকে জেগে উঠুক। দুজনে দুজনকে দেখুক। তখনই বোঝা যাবে কার রূপে কে বেশি মুগ্ধ হয়। যদি ছেলেটা মেয়েটার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে তা হলে বুঝতে হবে মেয়েটাই বেশি সুন্দরী। আর যদি ছেলেটার জন্য মেয়েটার ছটফটানি ধরে তা হলে বুঝবেন ছেলেটার রূপে এমন কোন যাদু আছে যার টানে মেয়েটা আর ঠিক থাকতে

পারছে না। সব সমস্যা লহমায় জল হয়ে যাবে মালকিন। খালি অদৃশ্য হয়ে ঘাপটি মেরে দেখতে থাকুন।

এই সময় রাত কাবার হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামায়।

পরদিন একশো তিরাশিতম রজনী ঃ

রজনীর মধ্যভাগে আবার কাহিনী শুরু হয়। মাইমুনাহ লাফিয়ে ওঠে, ওঃ, কি চমৎকার বুদ্ধি তোমার কশকশ। দানাশও হেঁড়ে গলায় বাহবা দিতে থাকে, বেড়ে-মজার। এই বলে আবার সে মাছি হয়ে উড়ে গিয়ে বসলো কামার অল-জামানের ঘাড়ে। কুটুস করে দিলো একটা কামড়। কামড়ের যন্ত্রণায় সে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে ছটফট করে ওঠে। ঘাড়ের কাছে, যেখানটা জ্বালা করছিলো, হাত বুলিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে কি দানাশ সেখানে বসে থাকার পাত্র। শাহজাদা উঠে পড়বে আশঙ্কায় মাইমুনাহ আর কশকশও অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় মিশে গিয়েছিলো।

এরপরের ঘটনাগুলো বড় মজার ঃ

কামার অল-জামানের চোখে তখন ঢুলু ঢুলু ঘুম। হাতখানা ঘাড়ের কাছে কিছুক্ষণ বুলিয়ে আলতোভাবে নামিয়ে বিছানার ওপর রাখতে যায়। কিন্তু পাশে শূন্য শয্যা ছিলো না। রাজকুমারী বদরের কুসুমাদপি কোমল বিবস্ত্রা দেহখানি এলিয়ে পড়েছিলো সেখানে। হাতখানা নামিয়ে রাখতে গিয়ে রাখলো সে বদরের কবোষ্ণ ঊরুর খাঁজে।

এবার তার ঘুম ছুটে গেলো। একবার চোখ মেলে বদরকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো। হয়তো বা সে ভুল দেখলো, কিংবা খোয়াব-এর খোয়াড়ি কাটছে না! চোখ বন্ধ করেই হাতটা আস্তে আস্তে চালিয়ে অনুভব করতে থাকলো—সত্যিই কোনও রক্তমাংসের কোনও মেয়ে তার পাশে শুয়ে আছে, কিনা। নাঃ, ভুল সে করেনি। খোয়াবও দেখছে না। এই তো মাখনের মতো মোলায়েম কি নরম তার ঊরুর মাংস। প্রাণ ভরে জোরে শ্বাস টানলো সে। আঃ, কী সুন্দর খুশবু? মেয়েটার গা থেকে সেই সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিলো ঘরময়। অজানা অপরূপা। তার নিরাবরণ নগ্ন নিরুপম রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে এক অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত পুলকে জামানের দেহমন শিহরিত হয়ে উঠতে থাকে।

একটি মেয়ে তার পাশে তায় আবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এ দৃশ্য দেখাও পাপ। কিন্তু কৌতূহল এমনই বস্তু তাকে জোর করে বেশিক্ষণ চেপে রাখা যায় না। তেরছা চোখে চুরিয়ে চুরিয়ে তার সারা শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলো। যতই দেখে ততই মুগ্ধ হয়। দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন সুনিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া। কোনও খুঁত নাই। সুঠাম সুন্দর এক শিল্প মূর্তি। কামার অল-জামান ভেবে পায় না তার এই রূপ কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হীরা চুনি পান্না? না, তারা সবাই এর জেল্লার কাছে ম্রিয়মান হয়ে যাবে। তবে কি পারস্যের লালগুলাব—যার সুবাসে দিল মদির হয়ে ওঠে। কিন্তু না, তাও গ্রাহ্য হয় না। এ নারীর রূপেরর আকর্ষণে আশমানের তারা ধরায় ধরা দিতে পারে। পর্বত নতজানু হয়ে বলতে পারে, ওগো, সুন্দরী আমার মাথা নত করে দাও তোমার ঐ পদ্মরাঙা পায়ে। আবার সমুদ্রও হয়তো আছড়ে পড়ে মিনতি জানাবে, 'গণ্ডুষ ভরিয়া পান কর দেবী, আমি তব অন্তরে লুকায়ে রহিত চিরকাল।'

উত্তেজনায় সারা শরীর ঘেমে ওঠে জামানের। গা থেকে মাথা অবধি বদরের আগাগোড়া দেহখানার উপরে হাত বুলাতে থাকে সে। কি যে ভালো লাগে তার—কি করে বোঝাবে সে কথা। এ আনন্দ শুধু অনুভবের—প্রকাশের নয়। কামার অল-জামানের জীবনে এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তাদের সমাজে নারী অসূর্যস্পশ্যা। পরপুরুষ পরনারীর মুখই দেখতে পায় না।

তায় আবার নিরাবরণ সারা দেহ। জামানের দেহে সবে যৌবনের জোয়ার আসতে শুরু করেছে কিছুদিন থেকে। এতদিন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে চলছিলো, আজ, এই মুহূর্তে, বুঝি সকল বাধা ছাপিয়ে সে উপছে পড়তে চায়। নিজেকে নির্মম নিষ্ঠুর পীড়নে পীড়িত করতে থাকলে হয়তো বা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তখন হয়তো আর সংযত-সংহত থাকার সব বাঁধই উৎখাত হয়ে যাবে।

তাই আর দেরি নয়। এবার সময় সমাগত। দেহ যা চায় মনও যখন তাই চায় তাতে আর বাধা দিতে নাই। জামান হাত বুলাতে থাকে ওর গালে ঠোঁটে, ওর গ্রীবা ঘাড়ে বুকে স্তনে।

অসহ্য এক যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে জামান। বদরের বুকের সঙ্গে মুখ ঘষকে থাকে। চাঁপাকলির মতো স্তনাধার ঠোঁটের ঘর্ষণেই পলকে রক্তাভ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ জামানের খেয়াল হয়, ওর গায়ের শেমিজ গেলো কোথায়। এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে। না, কোথাও নাই। আর মেয়েটাই বা কি রকম! এমন ওলোট পালোট করাতেও তার ঘুম ভাঙছে না। জামান কি করে জানবে দানাশ তাকে যাদু করে রেখেছে। এখন তার শরীর নিয়ে দলাই মলাই করলেও এ ঘুম তার ভাঙবে না।

কামার অল-জামান বৃথাই চেষ্টা করে তার ঘুম ভাঙানোর। যতই তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে ততই সে কামনায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বদরের অধরে অধর রাখে। দীর্ঘ চুম্বনে চুষতে থাকে। কিন্তু তবু তার সাড়া নাই। পরপর তিনবার চুম্বনে চুম্বনে ঠোঁটে রক্ত ঝরিয়ে দেয়। কিন্তু না, সে জাগে না। এবার জামান ওকে নাড়া দিয়ে ডাকে, সোনা—সোনা, চেয়ে দেখো, তোমার সামনে কে। ওঠ, সাড়া দাও। তুমি আমার দিল, কলিজা সব কেড়ে নিয়েছো, সুন্দরী। একবার চোখ মেলে তাকাও, দেখো, আমি শাহজাদা কামার অল-জামান—তোমার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এসেছি।

কিন্তু কে সাড়া দেবে। দানাশের মায়াবলে সে তখন অসাড় অচৈতন্য। জামান বলে, আমার গোস্তাকি মাফ করো সুন্দরী। আমি আর নিজেকে রাখতে পারছি না। আমি চেয়েছিলাম, আমার ডাকে তুমি সাড়া দেবে। জেগে উঠবে। আমি বড় তৃষ্ণার্ত, আমার স্বইচ্ছায় সুধা পান করাবে। কিন্তু তুমি ঘুমে বিভোর। আমি তোমার ঘুম ভাঙাতে পারলাম না। এদিকে যৌবন জ্বরে জর্জর্ আমি। কামবানে বিদ্ধ এক তৃষ্ণার্ত কপোত। আর তুমি সেই মদালসা নারী ঘুমে অচৈতন্য। ক্ষমা করো সোনা, সাধ্য নাই ধৈর্য ধরি, তাই চুরি করে নিতে হলো তোমার সদ্যফোঁটা যৌবনের প্রথম কদম ফুল।

মাইমুনাহ, দানাশ আর কশকশ অলক্ষ্যে সবই প্রত্যক্ষ করছিলো।

এইসময় রাত্রি শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে। শারিয়ার বলে, যাঃ বাব্বা, ভালো জায়গায় রাতটা কাবার হয়ে গেলো...

পরদিন সন্ধ্যা হতে না হতে বাদশাহ শারিয়ার এসে হাজির হয়। শাহরাজাদ বুঝতে পারে সুলতান কোন্ আফিঙের নেশায় ছটফট করছে। শারিয়ার কিছু বলার আগেই সে বলে, জাঁহাপনা আমার শরীরটা এখন ভালো লাগছে না। যদি মঞ্জুর করেন তবে প্রথম রাতটা একটু ঘুমিয়ে শরীরটা একটু চাঙ্গা করে নিই। তারপর আবার শুরু করবো কাহিনী।

শারিয়ার বলে, গল্প তো রোজই শুনছি শাহরাজাদ, শরীরটাই তো আগে। এসো এখন শুয়ে পড়ি। তারপর মেজাজ ভালো লাগলে, সে পরে দেখা যাবে।

শাহরাজাদের শরীর ভালোই ছিলো। শারিয়ারকে একটু বাজিয়ে দেখে নিলো মাত্র। সেই রাতেই দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে শুরু করে ঃ

বদর চিৎ হয়ে এলিয়ে শুয়েছিলো। কামকাতর জামান দু'হাত দিয়ে ওর দেহখানা বুকে নিয়ে জাপটে ধরতে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই সে থমকে গেলো। এতক্ষণের সব ধাঁধাঁ নিমেষে জলের মতো সহজ সরল পরিষ্কার হয়ে গেলো। বুঝতে আর তার বাকি রইলো না—এসব তার বাবার কারসাজি। তা না হলে এই কয়েদখানায় এতগুলো পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে এই বন্ধ ঘরের মধ্যে এ-মেয়ে এখানে এলো কি করে? বাবা চান, জামান শাদী করে সংসারী হোক। কিন্তু জামান নারী বিদ্বেষী। তার মনের এই বিদ্বেষ ভাব কাটাবার জন্যে তিনি এই ফন্দী এঁটেছেন। কোনও জানলার ফুটোয় চোখ রেখে নিশ্চয়ই সব লক্ষ্য করছেন। কাল সকালে টিটকিরি দিয়ে বলবেন, জামান, মুখে তো অনেক বড় বড় বাত আওড়াও। 'নারী নরকের দ্বার। স্ত্রীলোকের চরিত্র স্বয়ং খোদাতালাও জানেন না। দুনিয়ার তাবৎ অনিষ্টের মূল এই মেয়ে জাত।' কিন্তু বাপজান, কাল রাতে সেই দোজকের কীট নিয়ে কি খেলায় মেতেছিলে? তখন সে কথার কী জবাব দেব আমি? বড়মুখ করে আদর্শের কথাবার্তা বলা তো আমার খতম হয়ে যাবে। জীবনে আর তাঁর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না কোনও দিন। না না, এ হতে পারে না। আব্বাজানের এই ফাঁদে আমি কিছুতেই পা দেব না। তিনি আমাকে মিথ্যেবাদী ভণ্ড ভাববেন, এ হতে পারে না।

সাপের উদ্যত ছোবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ যেভাবে ছিটকে সরে যায় কামার অল-জামানের অবস্থাও ঠিক সেই রকম হলো। এক লাফে সে পালঙ্ক থেকে নেমে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। আজকের রাতটা সে কোন রকমে সংযম রক্ষা করে চলবে। জামান ভাবে, কাল বাবার কাছে সোজাসুজি প্রস্তাব পেশ করবো, এই মেয়ের সঙ্গে যদি তিনি শাদী দিতে চান আমার কোনও আপত্তি নাই। ছেলের সুমতি হয়েছে দেখে বাবা নিশ্চয়ই খুশি হয়ে শাদী দিয়ে দেবেন। তারপর তো সে আমারই হবে। তখন তাকে নিয়ে আমি যা-ই করি না কেন তিনি আড়ি পাততে আসবেন না। বরং আহ্লাদে আটখানা হবেন।

এতক্ষণ মাইমুনাহর মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিলো। তার শাহজাদা এত কামকাতর। একটা মেয়ে—চেনা নাই জানা নাই, যেহেতু সে তার পালঙ্কে শুয়ে আছে অমনি সে তার রূপে ঢলে পড়লো? ছি, ছি, লজ্জায় মাথা কাটা গেলো? বাদশাহর ছেলের রুচি প্রবৃত্তি বলে কি কিছু নাই। একটা মেয়ের ন্যাংটো শরীর দেখেই জিভে জল এসে গেলো?

যাই হোক, শেষ মুহূর্তে মাইমুনাহর ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে শাহজাদা। এবার সে সম্বিত ফিরে পেয়েছে। বাদশাহ শাহরিমানের একমাত্র পুত্র সে। এই বিশাল সলতানিয়তের সে-ই হবে সুলতান। যে-সে কথা নাকি?

আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে থাকে মাইমুনাহ। কামার অল-জামান ধীর পায়ে পালঙ্কের পাশে দাঁড়ায়। আলতোভাবে একটু ছোট্ট চুম্বন এঁকে দেয় বদরের গালে। নিজের হাত থেকে মহামূল্যবান একটা হীরের আংটি খুলে পরিয়ে দেয় বদরের আঙুলে। সেইক্ষণে মনে মনে সে তাকে বেগম বলে গ্রহণ করে নেয়। আজ থেকে সে তার স্ত্রী। সহধর্মিনী। এই আংটি তার সাক্ষী।

এরপর জামান বদর-এর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে গলে গেলো। এইবার মাইমুনাহ ধরলো মাছির রূপ। শোঁ করে উড়ে গিয়ে বদরের উরুতে বসিয়ে দিলো এক কামড়। ঘুমের ঘোরেই কঁকিয়ে ওঠে সে। কিন্তু মাইমুনাহ ছাড়বার পাত্রী নয়। রাজকুমারীর ওপর রাগে তার সারা শরীর রি রি করে জ্বলছে। পায়ের তালুতে, নাভিকুণ্ডলীতে বাহুমূলে কামড়িয়ে কামড়িয়ে শেষ করতে লাগলো। রাজকুমারী যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে চোখ মেলে

তাকালো। কিন্তু একি? নিজের চোখকে নিজেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। দু'হাত দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে নেয়। সে কি স্বপ্ন দেখছে? কিন্তু না, স্বপ্ন তো নয়। তন্ময় হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সে জামানের অর্ধনগ্ন দেহ। বাঃ কি সুন্দর! এত রূপ কখনও পুরুষের হয়? কিন্তু এখানে সে এল কি করে? খোজাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে এই অন্দরমহলে তো পুরুষের প্রবেশ সম্ভব না। তবে কি তার বাবারই এই কারসাজি? বিয়ে করবে না বলে সে পণ করে বসে আছে। সে জন্যেই কি তার বাবা এই রূপবানকে পাঠিয়েছে? তা এমন সুন্দর সুপুরুষ দুনিয়াতে আছে জানলে কি সে 'না' করতো। এমন ছেলে পেলে কি কোনও মেয়ে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে।

বদর আরও কাছে সরে আসে জামানের। যতই দেখতে থাকে ততই সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মুখখানা নামিয়ে এনে জামানকে একটু চুমু খায়। মনে মনে ঠিক করে, কাল সকালেই সে বাবাকে বলবে, না, তার আর কোনও অমত নাই। এই ছেলেকেই সে বিয়ে করবে। বাবাও খুশি হবে, তারও জীবন আনন্দে ভরে উঠবে। বদর ভাবে, এমন পাত্র থাকবে বাবা কেন ঐ সব হত কুৎসিত বুড়ো-হাবড়া রাজা বাদশাহদের নিয়ে আসতো। বাবা যদি অনেক আগে একে নিয়ে আসতো তাহলে তো কোনও আপত্তিই করতো না সে। যাইহোক, আর দেরি নয়, কালই সে বিয়েতে মত দেবে।

জামানের একখানা হাত তুলে নিয়ে বুক চেপে ধরে। ফিস ফিস করে ডাকে, এই—শুনছো, চেখ মেলে দেখো, আমি বদর। তোমার রূপে আমি পাগল হয়ে গেছি। ওঠ, সোনা, আমাকে আদর করো। তোমার বুকে আমি মাথা রেখে আমার দেহমন সঁপে দিয়ে জীবন সার্থক করি। ওঠ, আর ঘুমিও না।

কিন্তু জামানের ঘুম ভাঙবে কি করে? মাইমুনাহ তো তাকে যাদু করে রেখেছে। বদর সে কথা জানে না। এবার বেশ জোরে জোরেই নাড়া দিতে থাকে। ভাবে ঘুম তার ভেঙে গেছে। কিন্তু চোখ মেলে তাকাচ্ছে না, ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। পায়ের তলায়, বগলে সুড়সুড়ি দিতে দিতে ডাকে, অমি যে আর সইতে পারছি না সোনা, এভাবে আর কত কষ্ট দেবে? ওঠ, আমার ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, বুকের মধ্যে উথাল পাথাল করছে, আমাকে আদর করো, চুমু খাও। চোখ খোলো, আমার এই ভরা যৌবনের রূপে দেশ-বিদেশের কত রাজা-বাদশাহরা পাগল। আমি তাদের দিকে ফিরেও তাকাইনি। শুধু তোমার জন্যেই অতি সযত্নে সঙ্গোপনে লালন করেছি আমার এই কুমারী দেহখানা। তিল তিল করে আজ সে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে। আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। তোমার জন্যই আমি এতকাল প্রতীক্ষা করেছিলাম। আজ তুমি এসেছো, তোমার হাতেই এই দেহমন সঁপে দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই। আমার মল্লিকা বনে যখন প্রথম কলি ধরতে শুরু করেছে তখন থেকেই কত ভ্রমরের আনাগোনা, কিন্তু এ ফুলের মধু শুধুমাত্র তোমার জন্যে সযত্নে রক্ষা করে এসেছি। তুমি গ্রহণ করে তৃপ্ত হলে আমিও তৃপ্তি পাবো। আর দেরি করো না, সোনা, এই মধুযামিনী শেষ হতে চলেছে। ওঠ, আজকে রাতে আমাদের মধুর মিলন স্মৃতির পটে শুকতারা মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে চিরকাল।

কিন্তু কে সাড়া দেবে? জামান তখন ঘুম অসাড়। এদিকে বদরের দেহে উত্তেজনা ক্রমশই বাড়ে। বাঁ নাকের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয়। বুকের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে। সারা শরীরে সে এক তুফানের তোলপাড়। শান্ত স্নিগ্ধ চোখের তারারা কামবানে হয়ে ওঠে চঞ্চল। আর সারা মুখে কে যেন মাখিয়ে দিয়েছে আবীর। কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না বদর। জামানের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে। দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে অধরে দংশন করে। ঠোঁটে রক্ত ঝরে। কিন্তু জামান ঘুমে অচেতন। কোন

সাড়া নাই। ওর সারা শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হাত বুলিয়ে স্পর্শ সুখ অনুভব করতে থাকে বদর। এই অনুভবের কি যে আনন্দ, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ধন-দৌলত দিয়ে অনেক সুখ-সম্পদ কেনা যায় কিন্তু এই মুহূর্তের এই অনুভব কোনও মূল্যের বিনিময়েই আহরণ করা যায় না।

হঠাৎ নতুন এক আবিষ্কারের আনন্দে বদরের বুকে তোলপাড় শুরু হয়। জামানের দেহের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। ঘুমে অসাড় দেহ, কিন্তু কি আশ্চর্য, বদরের যাদু স্পর্শে জাগ্রত হয়ে ওঠে। বদর ভাবে এবার নিশ্চয়ই সে জেগে উঠবে, চোখ খুলবে। কিন্তু না, জামানের শরীর সাড়া দিলেও ঘুম তার ভাঙে না। বদর ক্ষুব্ধ হয়, নিজের উপরই রাগ হয়। তারই দোষ! এ ব্যাপারে একেবারেই সে আনাড়ী। তাই সে জামানকে জাগাতে পারছে না। অথচ নিজেকেই সে আর ঠিক রাখতে পারছে না। জামানকে জড়িয়ে ধরে সে শুয়ে পড়ে। গালে ঠোঁটে ঘাড়ে বুকে চুমুতে চুমুতে ভরে দিতে থাকে। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে যায় কিছুই বুঝতে পারে না বদর। কে যেন জোর করে তুলে জামানের দেহের ওপর তাকে বসিয়ে দেয়। দু'হাত দিয়ে জামানের দেহটা জাপটে ধরে। তারপর সে কি ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব। বদরের সারা শরীর ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো উথাল পাথাল হতে থাকে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে বদর, বাঁচাও বাঁচাও, আমি শেষ হয়ে গেলাম—

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন একশো পঁচাশিতম রজনীতে সে শুরু করে ঃ

তিন আফ্রিদি রুদ্ধশ্বাসে রাজকুমারী বদরের কাম-কলা প্রত্যক্ষ করছিলো। মাইমুনাহ খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো, দানাশের মুখ চুন। বললো, আমি হেরে গেছি, মাইমুনাহ, তোমারই জিৎ হলো। মেয়েদের ধৈর্য বলে কোন পদার্থ নাই, ছোঃ।

মাইমুনাহ হেসে গড়িয়ে পড়ে। —আহা রাজকুমারীর কি দোষ! আমার শাহজাদার মতো অমন সুন্দর সুরৎ দেখলে কোন্ মেয়ে চরিত্র ঠিক রাখতে পারে, শুনি?

কশকশকে অনেক সুক্রিয়া জানালো মাইমুনাহ, তোমার পরামর্শেই এত বড় তর্কের ফয়সালা হয়ে গেলো। যাক, এবারে তোমরা দুজনে রাজকুমারীকে তার প্রাসাদে আবার শুইয়ে দিয়ে এসো।

দানাশ আর কশকশ পালঙ্কের দিকে এগিয়ে যায়। রাজকুমারী বদর তখন কাম-ক্লেদ মুক্ত জামানের বুকের ওপর দেহখানা এলিয়ে দিয়ে অঘোর ঘুমে অচেতন। দানাশ বদরে কাঁধে তুলে নেয়। জানলা দিয়ে বেরিয়ে নিঃসীম নীল আকাশ পথ ধরে বায়ুবেগে উড়ে চলে তারা চীনের দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যে সম্রাট ঘায়ুরে প্রাসাদে যথাস্থানে বদরকে শুইয়ে দিয়ে নিজের নিজের ডেরার পথে পাড়ি দেয় তারা।

মাইমুনাহও শাহজাদার গালে একটা চুমু এঁকে দিয়ে নিজের কূপে গিয়ে ঢোকে।

ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় কামার অল-জামানের। গত রাতের সব কথাই তার স্মরণে আছে। কিন্তু মেয়েটি কোথায় গেলো। ঘরের এদিক ওদিক সে খুঁতে থাকে। কিন্তু না, কোথাও নাই। এ-ও কি তার বাবার একটা কৌশল? যাইহোক, আজই আব্বাজানকে শাদীর কথা বলবে সে।

দরজা খুলে দেখে প্রহরীরা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। জামান রাগে ফেটে পড়ে, এই ব্যাটা বাঁদরগুলো, তোদের কি নাক ডাকাবার জন্যে রাখা হয়েছে? পাজী বদমাইশ কোথাকার।

শাহজাদার হুঙ্কারে ধড়মড় করে উঠে বসে সকলে। কেউ জলের গামলা কেউ তোয়ালে নিয়ে এসে দাঁড়ায়। হাত-মুখ ধুয়ে রুজু করে নামাজ সেরে নেয়। তারপর কোরান খুলে পাঠ করতে থাকে।

কোরানের কয়েকটা স্তবক পাঠ করে সে উঠে পড়ে। খানসামা এসে নাস্তা সাজিয়ে দেয়। জামান নির্বিকারভাবে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটা কোথায় গেছে, সাব্বাব।

—মেয়েটা? কোন মেয়েটা হুজুর?

সাব্বাব কিছুই আঁচ করতে পারে না। জামান ক্ষেপে যায়, ন্যাকা চৈতন, যেন কিছুই জানে না। যা জিজ্ঞেস করছি সাফ সাফ জবাব দাও।

শাহজাদার কণ্ঠ গর্জে ওঠে। সাব্বাব ভয়ে জড়সড় হয়ে কোরবানীর খাসীর মতো একপাশে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

—সেই মেয়েটা কোথায়? গতকাল রাতে আমার পালঙ্কে কে তাকে পাঠিয়েছিলো?

সাব্বাব কাঁপতে কাঁপতে বলে, খোদা কসম, আমি কোনও লেড়কীকে এ তল্লাটে দেখিনি, হুজুর। আর তাছাড়া আমি তো দরজার সামনে আড়াআড়ি হয়ে শুয়েছিলাম। আমাকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকবে কার সাধ্যি!

জামান এবার ক্ষেপে বোম হয়ে যায়। —দেখো সাব্বাব, তুমি ভুলে যেও না আমি শাহজাদা কামার অল-জামান, তোমার রসিকতার পাত্র নই। হতে পারো তুমি আমার বাবার বিশ্বস্ত নোকর। কিন্তু তাই বলে আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করবে সে আমি বরদাস্ত করবো না। এখন বলছি ভালোয় ভালোয় বলো সে কোথায়। না হলে কিন্তু আমার মাথায় খুন চেপে যাবে। তখন তোমার কোনও বাবা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমি বুঝেছি তারা তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু তাতে তুমি নিস্তার পাবে না সাব্বাব। সত্যি কথা তোমাকে বলতেই হবে।

লোকটা এবার দু'হাত উপরে তুলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, খোদা, তুমি সাক্ষী, আমি কি শাহজাদার সঙ্গে মস্করা করছি? আপনি বিশ্বাস করুন হুজুর, আপনি কি যে বলছেন আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না।

—ওরে ভণ্ড, শয়তান, এ দিকে আয়।

সাব্বাব ভয়ে ভয়ে শাহজাদার কাছে এগিয়ে যায়। প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে মেঝের ওপর ফেলে দেয়, এখনও বল, নইলে তোকে আস্ত রাখবো না।

সাব্বাব বলে, আমি কিছু জানি না হুজুর, কি করে বলবো? জামান ক্যাঁক করে একটা লাথি বসিয়ে দেয় ওর পেটে। বেচারা। এমনভাবে কঁকিয়ে ওঠে মনে হলো বোধ হয় পিলে টিলে ফেটে গেলো। জামান বলে চলে, তোকে কুয়োর জলে ডোবাবো। এই শীতের ঠাণ্ডা জলে কেমন আরাম বুঝবি।

কোমরে একগাছি রশি বেঁধে কুয়োর নিচে নামিয়ে চুবিয়ে দেয় ওকে। বেচারা সাব্বাব জলের মধ্যে খাবি খেতে থাকে। —দোহাই হুজুর, বাঁচান, মরে যাবো।

কিন্তু জামান-এর অবস্থা তখন ক্ষেপা কুকুরের মতো। বারবার ওকে জলের মধ্যে চুবাতে থাকে। —সে কোথায়। না হলে তোকে আমি আর তুলবো না।

সাব্বাব ভাবলো শাহজাদা তাকে মেরেই ফেলবে। মরিয়া হয়ে চিৎকার করতে লাগলো, আপনি আগে আগে আমাকে ওপরে তুলুন, হুজুর, তারপর আমি সব বলছি।

—হুম্, সোজা পথে এসো।

এবার জামান ওকে ওপরে তুলে আনলো। বুড়ো সাব্বাব তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে। সারা শরীরের এখানে ওখানে ছড়ে গেছে। কুয়োর পাটে বাড়ি খেয়ে দুটো দাঁত ভেঙে গেছে। নাকটা কেটে গিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। কামার অল-জামান কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। রাগটা কিছুটা প্রশমিত হয়ে আসে।

—যাও, জামাকাপড় ছেড়ে ওষুধপত্র লাগিয়ে এসো।

শাহজাদার সামনে থেকে সে প্রায় ছুটে পালায়। আর কোথাও না গিয়ে সোজা সুলতানের সামনে হাজির হয়। সেই সময় সুলতান শাহরিমান উজিরকে বলছিলেন, কাল সারাটা রাত বড় খারাপ কেটেছে উজির। এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি। খালি এদিক থেকে ওদিক পায়চারী করে বেড়িয়েছি। বারবার একটা কথাই মনের মধ্যে নাড়া দিয়েছে, আমার কলিজা-জামান, না জানি কত কষ্টে, ঐ পোড়ো প্রাসাদের নোংরা ঘরে রাত কাটাচ্ছে। কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিনি।

উজির বলে, আপনাকে তো আমি বলে গিয়েছিলাম, জাঁহাপনা, কোনও দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার প্রাসাদে যে সুখে তিনি থাকেন তার চেয়ে কম আরামে তাঁকে রাখা হয়নি।

এই সময় সাব্বাব এসে সুলতানের পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে। —জাঁহাপনা সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সুলতান এবং উজির দুজনেই চমকে ওঠেন। কেন, কী হয়েছে, সাব্বাব?

—জী হুজুর, শাহজাদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কি করে বুঝলে।

—জাঁহাপনা, সাব্বাব কাঁদতে কাঁদতে বলে, সকালে ঘুম থেকে উঠেই শাহজাদা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কাল রাতে আমার পালঙ্কে যে মেয়েটা শুয়েছিলো সে কোথায় গেলো?' আমি যতই বলি এখানে কোন মেয়ে আসেনি—আসতে পারে না, ততই তিনি আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আমি জেনেও তার কাছে ছুপিয়ে রাখছি মনে করে আমাকে মেরে পাট পাট করে দিয়েছেন তিনি। কোমরে দড়ি বেঁধে কুয়োর পানিতে নাকানি চোবানি খাইয়েছেন। এই দেখুন হুজুর আমার দু'খানা দাঁত ভেঙে গেছে। নাকটা কেটে চৌচির হয়ে গেছে।

সুলতান ভাবেন, তার আশঙ্কাই ঠিক হয়েছে। না জানি বাছা আমার কত কষ্ট পেয়েছে। উজিরের দিকে তাকিয়ে গর্জে ওঠেন তিনি, তোমার মৌৎ এগিয়ে আসছে, উজির। তুমি একটা বদমাইশ শয়তান, কুকুর। তোমার দাওয়াই-এর ব্যবস্থা আমি করছি। তোমার বদ পরামর্শেই আমি তাকে আজ কয়েদ করেছি। নাও এখন মেহেরবানী করে গতরখানা নড়াও। দেখো গিয়ে, বাছার আমার কি দশা হলো। চটপট খবর দেবে। আমি—বেশিক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারবো না।

উজির আর কোনও কথাটি না বলে হন হন করে পোড়ো-প্রাসাদের চিলেকোঠার ঘরের দিকে ছোটে। পিছনে পিছনে অনুসরণ করে সাব্বাব। কোনও দিকে না তাকিয়ে উজির সোজা গিয়ে ঢোকে জামানের কামরায়। জামান তখন তন্ময় হয়ে কোরান পাঠ করছিলো। চোখ মুখ শান্ত, প্রসন্ন।

এইসময় রাত্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

.

জামানের পাশে গিয়ে উজির বলে, হতচ্ছাড়া সাব্বাবের কথা শুনে আমাদের প্রাণ তো খাঁচা ছাড়া। শয়তানের জাসু মিথ্যেবাদী কোথাকার! কি সব যা তা কথা বানিয়ে বলে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলো। যাক, বাবা তোমাকে দেখে স্বস্তি পেলাম।

জামান মৃদু মৃদু হাসে। কেন, কি বলেছে সে?

—সে তোমাকে বলতে পারবো না বেটা। বড় খারাপ কথা।

—তা শুনি না, কি এমন খারাপ, কি এমন মিথ্যে কথা সে বলেছে?

—ব্যাটা বলে কি—তোমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি নাকি বলেছো, তোমার ঘরে কে এক মেয়ে এসেছিলো। সকালে তাকে দেখতে না পেয়ে সাব্বাবকে মারধোর করেছো—যত্ত সব আজগুবি কথা?

—আজগুবি হতে যাবে কেন? এ সবই তোমাদের ষড়যন্ত্র। আমি তোমাকে এখনও সাবধান করে দিচ্ছি উজির, আমার সঙ্গে এইসব চালাকি বন্ধ করো। না হলে খুব খারাপ হবে। মেয়েটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো এখনও সাফসাফ বাতাও না হলে তোমার কপালে অনেক দুখ আছে। আমি বুঝতে পেরেছি, আব্বাজানের সঙ্গে তোমরা সাট করে এইসব তামাশা করে যাচ্ছো। কিন্তু আমি আর এক দণ্ডও এসব বরদাস্ত করবো না। সাব্বাব-এর কপালে যা জুটেছে তোমার বরাতে তার চেয়েও খারাপ জুটবে।

উজির হতভম্ব হয়ে যায়। —খোদা হাফেজ, বেটা তুমি এসব কথা বলছ কেন? কি হয়েছে তোমার? আমার মনে হচ্ছে রাতে তোমার ভালো ঘুম হয়নি—তাই এই সব আজগুবি স্বপ্ন দেখেছো। চারদিকে কড়া পাহারা, কে আসতে পারে তোমার ঘরে—আর যদি এলোই তো সে গেলো কোথায়? ওসব নিয়ে মাথা খারাপ করো না বাবা, ঘুমের ঘোরে ওরকম খোয়াব দেখা যায়। মাথা ঠাণ্ডা করো, এসব কথা বললে লোকে যে পাগল বলবে?

জামান গর্জে ওঠে, পাগল বলবে, কেন পাগলামীর কি করেছি আমি। পাগল যদি হই, তোমাদের মতো বেল্লিক শয়তানদের কারসাজিতেই হবো। কেন, আমি কি তাকে আমার এই চোখ দিয়ে দেখিনি? এই হাত দিয়ে তার শরীর স্পর্শ করিনি? তার দেহের খুশবু আমি নাকে শুঁকিনি? কি—কি বলতে চাও তোমরা? আমি কি বুঝি না, এ সবই তোমাদের ইতরামী।

উজির হাসতে থাকে। কি যেন বলতে যায় কিন্তু তার আগেই জামানের প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে লাগে তার মুখে। বেচারী উজির টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে গিয়ে পড়ে মেঝের উপর।

—বদমাইশ, নচ্ছার, এখনও যদি জানে বাঁচতে চাস, বল সে কোথায়? উজিরের সাদা দাড়ির গোছা একহাতে ধরে অন্য হাতে বেদম পেটাতে থাকে জামান। বৃদ্ধ উজির নিজেকে ছাড়াবার বৃথাই চেষ্টা করে। —আমার সঙ্গে শয়তানী করে পার পাবে না। এখনও বলছি কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছো, বলো? না হলে, ইহজন্মের সাধ তোমার ঘুচিয়ে দেব আজ।

এক নাগাড়ে বেদম প্রহার করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে জামান। বৃদ্ধকে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। যত্ত সব শয়তানের পাল্লায় পড়েছি। এরা আমাকে পাগল, না করে ছাড়বে না—?

উজির ভাবলো, শাহজাদার হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর। মাথাটা ওর একদম খারাপ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কিছু বোঝাতে যাওয়া বোকামি। তাতে আরও সে ক্ষেপে যাবে। শেষে হয়তো বদ্ধ উন্মাদ হয়েও যেতে পারে।

—বাবা, তা হলে তোমাকে সত্যি কথাই বলি, উজির এক ফন্দী এঁটে বলতে থাকে, আমি তোমার বাবার মাইনে করা নোকর। তার নুন খাই, তাই তার অনুগত হয়ে কাজ করা আমার কর্তব্য। তুমি যে আমার ওপর এত ক্ষিপ্ত হয়েছো তার অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে, আমি মানি। কিন্তু বাবা, আমি তো আজ্ঞাবহ দাস মাত্র, তোমার বাবা যা হুকুম করেছেন তার বাইরে আমি কি করতে পারি। যে-মেয়েটিকে কাল রাতে তুমি তোমার ঘরে দেখেছিলে, তোমার বাবার কথামতো, আমিই তাকে তোমার ঘরে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি গোপন রাখতে বলেছিলেন। তারও অবশ্য কারণ আছে। তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন, মেয়েটি তোমাকে কতখানি মুগ্ধ করতে পেরেছে। তোমাকে কষ্ট দেওয়া বা ধোঁকাবাজি করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি যদি জানতে পারেন, মেয়েটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে, তা হলে খুশি হয়ে শাদী দিয়ে

দেবেন। তুমি শাদী করে সংসারী হও, এই তো তার একান্ত ইচ্ছা। আর সেইটে জানবার জন্যই তিনি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার আর বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না বাবা, মেয়েটি তোমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি তাকে আপন করে নিতে চাও। বেশ তো কোনও অসুবিধা নাই, এতো মহা আনন্দের কথা। সুলতানও এই-ই চান, আজই এক্ষুণি আমি তাঁর কাছে সব বিবরণ জানাচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ঐ মেয়ের সঙ্গেই তিনি তোমার শাদী দিয়ে দেবেন।

এই ওষুধে কাজ হলো। জামান রাগত ভাবেই উজিরকে তাড়া মারে, জলদি যাও আব্বাজানের কাছে। এক্ষুণি তাঁর কাছ থেকে কথা নিয়ে এসো। আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

উজির আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে সটান সুলতানের প্রাসাদে চলে আসে। আসার আগে সাব্বাবকে ইশারা করে নজরে নজরে রাখতে, যেন ছুটে কোথাও বেরিয়ে না যায়।

মাথার টুপি ছিটকে কোথায় পড়ে গেছে, এলোমেলো, দাড়ির কিছু ছিঁড়ে-উপড়ে গেছে, সাজপোশাক দুমড়ে-কুঁচকে একশা। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে উজির গিয়ে হাজির হয় সুলতানের সামনে। সুলতান অবাক হয়ে উজিরের আপাদমস্তক দেখতে থাকেন।—কী ব্যাপার? কী হয়েছে, উজির? তোমার এ দশা কে করলো? মাথার টুপি কোথায়? মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে!

—আমার আর এমন কি হয়েছে জাঁহাপনা? এর চেয়ে হাজার গুণ মারাত্মক ব্যাপার হয়েছে আপনার পুত্র জামানের।

—কি রকম?

—একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে সে।

—উন্মাদ। বলো কি উজির? এই একটা রাতের মধ্যে এমন মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেছে। হায় হায়, একি হলো আমার। কেন, আমি তোমার মতো একটা উল্লুকের কথায় নেচে উঠলাম। কি করে বুঝলে, সে পাগল হয়ে গেছে?

—তার আবোল-তাবোল কথাবার্তায় হুজুর। তার ধারণা গতকাল রাতে আমি আর আপনি যুক্তি করে তার ঘরে একটা মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। মেয়েটি নাকি সারারাত তার শয্যাতেই ছিলো। তাকে তার বেশ মনেও ধরেছে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে তাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে প্রথমে সাব্বাব-এর ওপর হম্বিতম্বি করে। কিন্তু সে বেচারী কি বলবে, শেষে তাকে বেদম প্রহার করে কুয়োর জলে চুবিয়ে দেয়। তারপর আমি গেলাম। আমাকে দেখেই সে রেগে কাঁই। তার ধারণা, নাটের গুরু আমি। আমার পরামর্শেই মেয়েটিকে সকাল হবার আগেই ঘর থেকে সরিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই, আমার বরাতেও কিছু সিন্নি জুটে গেলো।

সুলতান রাগে ফেটে পড়েন, এ আর তোমার কি হয়েছে, উজির, আমি তোমাকে ক্রুশে গেঁথে মিনারের মাথায় ঝুলিয়ে রাখবো। আমার একমাত্র সন্তান, জানের কলিজা, তার যদি কোনও অনিষ্ট হয় তার জন্য তুমিই একমাত্র দায়ী। আমি রেহাই দেব না। এখন চলো, আমি নিজে তাকে একবার দেখি।

হন হন করে পোড়ো প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন সুলতান। পায়ে পায়ে উজির। কামার অল-জামানের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অত্যন্ত শান্ত বিনয়ী সুবোধ ছেলের মতো সে এগিয়ে এসে বাবার হাতে চুম্বন করে অবনত মস্তকে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সুলতান সস্নেহে জামানকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে, চোখে, গালে চুমু খেলেন।

তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বেটা, চলো, পালঙ্কে বসা যাক।

সুলতান নিজে বসলেন, জামান বাবার কাছে একাসনে বসতে ইতস্ততঃ করছিলো, হাতে ধরে পুত্রকেও পাশে বসালেন। দাঁত কড়মড় করে উজিরের দিকে অগ্নিবান হেনে বললেন, উজির, তুমি যে কত বড় একটা মিথ্যেবাদী তা নিজের চোখেই একবার দেখো, আমার হীরের টুকরো ছেলে, কত নম্র, কত ভদ্র, বিনয়ী, আর তুমি বলে কিনা—সে যাক তোমার ব্যবস্থা আমি পরে করছি।

জামানের দিকে ফিরে মুখে মধু ঢেলে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, বেটা, আজ যেন কি বার?

জামান বললো, আজ শনিবার আব্বাজান?

—কাল কি বার বাবা?

—কেন, কাল রবিবার?

জামান অবাক হয়। হঠাৎ আব্বাজান আজ এই ধরনের প্রশ্ন করছেন কেন? মনে পড়ে খুব ছোটবেলায় যখন সে সবে প্রথম ভাগ পড়ছে, রাতে শুয়ে শুয়ে বাবা তাকে এই ধরনের নানা প্রশ্ন করে বুদ্ধির পরীক্ষা করতেন। কিন্তু আজ কেন এই সব প্রশ্ন? হঠাৎ সে বুঝতে পারে। উজিরটা তাঁকে বুঝিয়েছে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জামানের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। বলে, পরশু সোমবার, তরশু মঙ্গল, তারপর দিন বুধ, তারপর দিন বৃহস্পতিবার। আর তারপর দিন শুক্র, আমাদের নামাজের দিন পবিত্র জুম্মাবার।

সুলতানের মুখে গর্বের হাসি; উজিরের দিকে কটাক্ষ হেনে বলেন, শুনলে উজির, এর পরেও তোমার কোনও সংশয় আছে?

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

একশো অষ্টাশিতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

সুলতান আবার জামানকে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা বেটা, আরবী হিসাবে এটা কোন মাস?

—জেলকদ, পরের মাস জেলহিজ্জা, পরে মহরম, শসার, পরে রবিয়ল আউয়ল, রবিয়স্বাসি, তারপর জামাদ আউয়ল, জামাদ শ্বাসি, রজব, শ্বাবন, রমজান, শ্বওয়াল।

সুলতান আনন্দের চোটে উজিরের গালে ছোট্ট একটা ঠোনা মারেন, দুনিয়াতে যদি বদ্ধ পাগল কেউ থাকে—সে তুমি নিজে। বাহাত্তর পেরিয়ে গেছে, এবার তোমার ভীমরতি ধরেছে। শাহ-দরবার তোমার জায়গা নয় উজির। এবার মক্কা-মদিনায় গিয়ে আল্লাহর নাম গান করো।

এরপর সুলতান কামার অল-জামানের দিকে চেয়ে বলেন, বেটা তোমার নামে এই বেহেড উজিরটা কি সব যা-তা বলেছে, জানো? তুমি নাকি ঐ বাঁদরমুখো কালো কুৎসিত হতচ্ছাড়া সাব্বাব আর এই বাহাত্তুরে বুড়ো উজিরটাকে বলেছো, গতকাল রাতে তোমার ঘরে নাকি একটা খুবসুরৎ লেড়কী ঢুকেছিলো। এবং তাকে নিয়েই তুমি সারারাত কাটিয়েছো। সকালবেলায় তাকে দেখতে না পেয়ে তুমি নাকি সাব্বাব-এর ওপর চোটপাট করেছো, মারধোর করেছো, কুয়োর জলে চুবিয়েছো। শুধু সাব্বাব নয় উজিরকেও নাকি তুমি এই কারণে পিটিয়েছো। এমন সব ডাহা মিথ্যেবাদী ওরা—আমি ওদের এমন সাজা দেব, বুঝতে পারবে হাড়ে হাড়ে।

কামার অল-জামানের মন বিষিয়ে ওঠে। —আব্বাজান এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক লেবু কচলাকচলি হয়ে গেছে। এই ধরনের তামাশা আর আমার ভালো লাগছে না। এত দিন আপনি আমাকে শাদীর জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু তখন মেয়েদের সম্পর্কে আমার খুব খারাপ ধারণা ছিলো, সেজন্য আজ আমি লজ্জিত। দোহাই আব্বাজান, আপনি আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন, আর কষ্ট দেবেন না। আমি আর আপনার অবাধ্য হবো না। গতকাল রাতে যে মেয়েটিকে আপনি আমার বিছানায় পাঠিয়েছিলেন তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

আপনি আমাকে ঐ মেয়ের সঙ্গে শাদীর ব্যবস্থা করুন, আমি আজই তাকে শাদী করতে চাই। তাকে দেখা অবধি আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। এক মুহূর্ত তার অদর্শন আর সইতে পারছি না। সে আমার সারা দিল জুড়ে বসেছে। তাকে ছাড়া আমি আর একটা দিনও বাঁচতে পারবো না। মেয়েদের সম্বন্ধে যে সব উক্তি আমি করেছি, সেজন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন আব্বাজান। আর দেরি করবেন না, আজই শাদীর ব্যবস্থা করুন।

ছেলের এসিব কথা শুনে সুলতান চিৎকার করে ওঠেন, ইয়া আল্লাহ, একি করলে তুমি! আমার একটামাত্র ছেলে, সবেধন নীলমনি, তার একি দশা করলে? আমি বাঁচবো কি নিয়ে?

ছেলেকে উদ্দেশ্য করে সুলতান বলতে থাকেন, খোদা তোমার মঙ্গল করবেন বাবা। তিনি তোমার উন্মাদ দশা নিশ্চয়ই কাটিয়ে দেবেন। জীবনে সজ্ঞানে আমি কোনও অন্যায় করিনি। তবে কোন পাপে আমি এত বড় শাস্তি ভোগ করবো? নিশ্চয়ই তোমার ঘাড়ে কোন শয়তান ভর করেছে। তিনি রক্ষা করবেন তা থেকে। কাল রাতে কি তোমার খানাটা খুব বেশি হয়ে গিয়েছিলো। গুরুপাক জিনিস পেটে পড়েছিলো বোধ হয়। তাই হজম হয়নি। রাতে বদহজম হলে এই রকম বিদঘুটে খোয়াব দেখে অনেকে। যাই হোক আমার ধারণা তোমার এই মাথার গোলমালটা নেহাতই সাময়িক। মন থেকে রাতের ঐ স্বপ্নের ব্যাপারটা একেবারে মুছে ফেলো। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি কথা দিচ্ছি, আর তোমার ওপর কোনও জোর জুলুম করবো না। তোমার ইচ্ছে হয় বিয়ে শাদী করবে, না ইচ্ছে হয় করবে না। দরকার নাই আমার নাতির মুখ দেখে। ছেলেকে খুইয়ে আমি নাতি পেতে চাই না। ভবিষ্যতে আমি আর নিজে থেকে কখনও শাদীর কথা বলবো না, বাবা। শুধু তুমি নিজেকে একটু শান্ত করো।

কামার অল-জামান প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আপনাকে আমি দুনিয়ার সব থেকে বেশি ভালোবাসি, ভক্তি করি। আপনিও আমাকে এই কথা বলছেন, আব্বাজান। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তবুও আপনি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে আর একবার বলুন, গতকাল রাতে আমার শয্যায় যে মেয়েটি গিয়েছিলো, সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন না। তারপর আমি প্রমাণ দেব, কালরাতে আমার ঘরে কোনও মেয়ে এসেছিলো কি না।

সুলতান বললে, আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, বাবা এ রকম কোনও কাজ আমি করিনি।

জামান তখন বললো, গতকাল শেষরাত্রে যখন আমার ঘুম ভেঙে যায় সেই সময় আমি আধা ঘুমন্ত অবস্থায় বেশ বুঝতে পারছিলাম একটি মেয়ে আমার শরীরের ওপরে উথাল পাথাল করছে। তখন আমার এমন অবস্থা নয় যে ঘুম থেকে উঠে পড়ি। যাই হোক সকাল বেলায় যখন ঘুম ভাঙলো দেখি আমার তলপেটের নিচে বেশ খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আপনার বিশ্বাস না হয় হামামে চলুন দেখবেন, আমি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেছি। এখনও সেখানে সেই রক্ত দেখতে পাবেন। তা ছাড়াও, এই দেখুন আমার হাতের এই আংটিটা। এটা নিশ্চয়ই আমার হাতে আগে কখনও দেখেন নি। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, আংটিটা কোনও মেয়ের হাতের। আর আমার এই আঙুলে যে হীরের আংটিটা ছিলো সেটা নাই।

সুলতান বললেন, তোমার কথা আমি মানছি, কিন্তু এই প্রমাণই তো যথেষ্ট নয়। এতেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

একশো নব্বইতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, দাঁড়াও হামামে গিয়ে আমি নিজের চোখে দেখে আসি।

সুলতান হামামে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন। যে জলের গামলায় জামান হাত মুখ ধুয়েছে তার মধ্যে ডেলা ডেলা রক্তের ছিট। সারা জলটা রক্তে লাল হয়ে আছে।

—হুম, গম্ভীর ভাবে সুলতান অস্ফুট স্বগতোক্তি করেন, মনে হচ্ছে, লড়াকু মেয়েটা বেশ তাগড়াই। এখন বুঝতে পারছি, ওই উল্লুক উজিরটারই এই কাণ্ড।

ছেলের কাছে ফিরে এসে বলেন, হুঁ, খুব চিন্তার ব্যাপার!

আর একটিও কথা বললেন না সুলতান। ঠায় বসে বসে ভাবতে লাগলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটে। তারপর উজিরের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়েন তিনি। —এ সব তোমার শয়তানী—উজির। তুমিই কাল রাতে কোনও মেয়েকে পাঠিয়েছিলে এ ঘরে।

উজির সুলতানের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে, আপনি বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, আমি এক বিন্দু-বিসর্গ জানিনা। আল্লার নামে কসম খাচ্ছি, পবিত্র কোরাণ ছুঁয়ে হলফ করতে পারি, এ সবের কিছুই আমি জানি না।

সাব্বাবও সেই রকম একইভাবে কসম খেয়ে বললো, সে-ও কিছুই জানে না।

সুলতান এবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন।—তা হলে একমাত্র স্বয়ং খোদাতালা ছাড়া এ রহস্যের জাল কেউ ভেদ করতে পারবে না।

জামান এবার সত্যিই প্রায় উন্মাদের মতো বললো, কিন্তু আব্বাজান, সে মেয়েকে না পেলে এ জীবন আমি রাখবো না। যেমন করেই হোক তাকে খুঁজে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। আমি তাকে না দেখে আর এক মুহূর্ত বাঁচবো না।

সুলতান অসহায় ভাবে বলে, কিন্তু বেটা তা কি করে সম্ভব। এত বড় বিশ্বসংসারে সেই অজানা অচেনা মেয়ের সন্ধান কি করে পাবো আমি। তুমি তার নাম জানো না, তার বংশ পরিচয় দিতে পারছো না, আন্দাজে কোথায় খুঁজে বেড়াবো তাকে? এখন একমাত্র আল্লাহ, তিনি সর্বজ্ঞ, একমাত্র ভরসা। তিনি যদি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করেন তবেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। এখন তার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে হা হুতাশ করা ছাড়া আর আমাদের অন্য কোনও পথ নাই, বাবা। তোমার মনের ব্যথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু, এই বিশাল সলতানিয়তের অধিপতি হয়েও আমি আজ নিরুপায়। কি করে তার হদিশ করবো?

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান প্রাসাদে ফিরে আসেন। সারা প্রাসাদে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। সুলতান এবং জামান কারো সঙ্গে দেখা করেন না। দরবারে সব কাজ কাম মুলতুবী রাখা হয়। পুত্রের ব্যথায় ব্যথিত সুলতান, কোনও কাজে মন দিতে পারেন না। কোথায় গেলে ছেলের মানসী প্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যাবে কিছুই বুঝতে পারেন না।

প্রাসাদে নিজের কক্ষে পুত্র জামানকে নিয়ে তিনি বিষণ্ণমনে দিন কাটাতে থাকেন। তার একমাত্র ভাবনা কি করে পুত্র জামানের মুখে হাসি ফোটানো যায়। কিন্তু না, দিন যায় সন্ধ্যা হয়, আবার ফিরে আসে সকাল, জামান বিরহে কাতর হয়ে পড়ে থাকে। শেষে প্রাসাদের পরিবেশও বিষময় মনে হয় তাদের।

দরিয়ার মাঝখানে সুলতানের এক বিলাস ভবন ছিলো। তীর থেকে সেতু বাঁধা ছিলো সেই প্রাসাদ পর্যন্ত। সুলতান ঠিক করলেন, পুত্রকে নিয়ে সেই নিরালা নির্জন প্রাসাদে গিয়ে দিন কাটাবেন। প্রাসাদের এই কোলাহল আর তার ভালো লাগছিলো না।

কিন্তু সেই অনিন্দ্য সুন্দর প্রমোদ প্রাসাদে গিয়েও জামান এতটুকু সান্ত্বনা পায় না। দিনে দিনে সে আরও বেশি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এ দিকে দানাশ এবং কশকশ রাজকুমারী বদরকে তার শয্যায় শুইয়ে রেখে আসার ঘণ্টাদুই বাদে সকাল হয়। বদরের ঘুম ভাঙে। চোখ মেলে তাকায়। দারুণ খুশি খুশি ভাব। মুখে মৃদু হাসি। গত রাতের সুখ-সম্ভোগ তাকে মোহিত করে রেখেছে। বিছানার পাশে চোখ ফেরালো, ভুরু দুটো কুঁচকে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে—কোথায় গেলো সে। তখনও ভালো করে ঘুমের ঘোর কাটেনি তার। আবার চোখ বন্ধ করে। দু' হাত দিয়ে কি যেন হাতড়াতে থাকে। কিন্তু না, সে তো শয্যায় নেই। তবে, এই ভোরে গেলো কোথায়? এ ঘর থেকে বেরুবার তো কোনও উপায় নাই। অজানা আশঙ্কায় তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। দিশাহারা হয়ে চিৎকার করে ওঠে। প্রধান বাঁদী ছুটে আসে। না জানি রাজকুমারীর কি বা হয়েছে। —কী হলো, মালকিন, অমন করে চেঁচালেন কেন? স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছেন?

এই সময় রাত্রি অবসান হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন একশো একানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে শুরু করে ঃ

বদর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ন্যাকামি করছো? তুমি জানো না কেন আমি চিৎকার করছি। সাফ সাফ বলো, কাল রাতে আমার পাশে যে ছেলেটা শুয়েছিলো সে কোথায়? ওফ্, কী তার রূপ, কী তার পৌরুষ—আমাকে সে একটা রাতে যা দিয়েছে সারা জিন্দগীভর কেউ তার দিতে পারবে না। যাক ওসব কথা শুনে তোমার কাজ নাই। এখন বলো তাকে আবার কোথায় নিয়ে গেছো।

বদরের কথা শুনে বুড়ি বাঁদীর চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়, কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, ইয়া আল্লা, একি কথা বলছেন, রাজকুমারী? এমন অসৎ অলুক্ষণে কথা মুখে আনা পাপ। এতকাল আমি আপনার বাঁদীগিরি করছি, কোনও দিন তো এ মতিভ্রম আপনার হয়নি রাজকুমারী? না না, আপনি আমার সঙ্গে মস্করা করছেন, তাই না?

বদর বিছানার ওপরে ভর দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রেখে আধশোয়া অবস্থায় বুড়ি বাঁদীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে বলে, দেখো বুড়ি, তোমর কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে। আমাকে তুমি চেনো না? আমার রাগ কখনও দেখোনি? এখনও লক্ষ্মী মেয়ের মতো সত্যি কথা বলো। কাল রাতে সে আমাকে বেহেস্তের সুখ দিয়েছে। আমি আমার এতকালের যত্ন-লালিত এই দেহ-রূপ-যৌবন সব তার হাতে তুলে দিয়েছি। সে এখন আমার ভালোবাসা। তাকে ছাড়া মুহূর্ত আমি থাকতে পারবো না। বলো সে কোথায়?

বুড়ি-বাঁদী চোখে সর্ষে ফুল দেখতে থাকে। মনে হয় সারা প্রাসাদটা জ্বলছে। বুঝিবা এখুনি হুড়মুড় করে সব ধসে পড়বে। নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। এ সব কী কথা শুনলো সে। আবার নিজের কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো, ওগো, আমার কী হলো গো, এমন সব্বোনাশ কে করলো গো। হায় আল্লাহ, একি করলে তুমি!

তার চেঁচামেচি চিৎকারে হারেমের অন্যান্য দাসী বাঁদীরা সব ছুটে আসে। রাজকুমারীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে শুনে তারাও হা-হুতাশ করে চোখের জল ফেলতে থাকে।

রাজকুমারী এবার বাঘিনীর মূর্তি ধারণ করে। —দাঁড়াও তোমাদের সাট করে শয়তানী আমি ভেঙে দিচ্ছি। সবগুলো এক গোয়ালের গরু। হাড়ে হাড়ে বজ্জাৎ। কিন্তু এখনও শোনো বলছি, আমার মেহেবুবকে এখুনি নিয়ে এসো। না হলে তোমাদের সবাইকে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

দাসী বাঁদীরা শিউড়ে ওঠে, কিন্তু রাজকুমারী, এ-কথা সম্রাটের কানে গেলে কি কাণ্ড হবে বলুন, দেখি। আমাদের যেমন গর্দান যাবে, সেই সঙ্গে আপনাকেও কোতল করে ফেলবে। এ-সব কথা এমন করে চাউর করা কি ভালো হচ্ছে মালকিন?

—ওসব ছেঁদো কথা আমি শুনতে চাই না, রাজকুমারী বদর কঠিন কণ্ঠে বলতে থাকে, আমার চোখের মণি, দিল্-কা-পিয়ারাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো বলো। কাল রাতে তার সঙ্গে আমি যে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছি তার প্রমাণ আমার শরীরে এখনও জ্বলজ্বল করছে।

বুড়ি বাঁদী হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো, হায় আল্লাহ একি হলো, আমার সোনার বাছার মাথা খারাপ হয়ে গেলো? এযে একেবারে বদ্ধ পাগলের প্রলাপ বকছে সে। এখন আমি কি করি। তখনই বলেছিলাম, মেয়েছেলে সোমত্থ হলে শাদী দিয়ে দিতে হয়। তা না হলেই যত বিপত্তি। এখন এই ঠ্যালা কে সামলাবে? সম্রাটের কাছে কে জানাবে এই দুঃসংবাদ। যে বলতে যাবে, তারই তো গর্দান যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

বদর এবার ক্ষেপা কুকুরের মতো তেড়ে যায়, তবে রে শয়তানী? আমার সঙ্গে মস্করা করা হচ্ছে। অমি তোর ইয়ার্কির পাত্রী?

ছুটে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ঢাল-তলোয়ারের একখানা পেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে। দাসী-বাঁদীরা আঁতকে ওঠে। আর একটু হলেই দু-এক জনের জান খতম হয়ে যেত। ভাগ্যে তারা ছিটকে সরে যেতে পেরেছিলো তাই রক্ষে।

রাজকুমারী বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে—এই সংবাদ সারা প্রাসাদে মৃত্যু সংবাদের মতোই মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো। সম্রাট ঘায়ুরেরও কানে পৌঁছতে বেশি দেরি হলো না। তিনি তৎক্ষণাৎ হারেমের তাবৎ দাসী বাঁদী খোজদের তলব করলেন। বুড়ি বাঁদী সাশ্রু নয়নে আদ্যোপান্ত সবিস্তারে সব বর্ণনা দিল। ঘায়ুর শুনে স্তম্ভিত হলেন। এক রাতের মধ্যে এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড কি করে ঘটতে পারে, তিনি কিছুই ভাবতে পারেন না। শুধু চিন্তিতভাবে একটি কথাই বলতে পারলেন, ভয়ঙ্কর কথা!

বুড়ি-বাঁদী বললো, সে যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। তলোয়ার ছুড়ে আমাদের খতম করতে চেয়েছিলো, বরাতজোরে বেঁচে গেছি।

ঘায়ুর এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না, চিৎকার করে প্রাসাদ ফাটিয়ে দিতে চান। —তুমি যে সব কথা বলছো, তা কি সত্যি?

—এক বর্ণও মিথ্যা নয় হুজুর।

—বড় সাংঘাতিক কথা, কিন্তু কি করে হলো? আর বদর যা বলছে তার সবটাই কি পাগলামী?

সম্রাট মহানুভব, প্রথমে আমার তাই মনে হয়েছিলো। কিন্তু পরে যা দেখেছি তাতে আমার মনেও খানিকটা দ্বিধা এসেছে।

সম্রাট উত্তেজিত অধৈর্য হয়ে কৈফিয়ত তলব করেন, কি দেখেছো, বলো।

হুজুর, আজ সকালে যখন রাজকুমারী ঘুম থেকে জেগেছেন, তার পরেই তার চিৎকারে আমি ঘরে ছুটে যাই। তখন তিনি মাত্র একটি শেমিজ পরেছিলেন। রোজ রাতে শোবার সময় এই পোশাকেই তিনি শুয়ে থাকেন। দেহের নিচের অংশ একেবারে নগ্ন থাকে। আমি দেখেছি, তার জঙ্ঘার দু'পাশে শুকনো রক্তের ছোপ—উরু পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য আমার কাছে নতুন। আপনি সম্রাট, আমার কাছে মেয়েদের এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার খুলে বলা সম্ভব না। তবে জেনে রাখুন এ ধরনের রক্তপাত, স্বাভাবিকভাবে হয় না। কোনও পুরুষ-সঙ্গ ছাড়া হতে পারে না। কিন্তু তাও একেবারে অসম্ভব। প্রাসাদের যা কড়া পাহারা—তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোন কাক-পক্ষীরও হারেমে ঢোকা সম্ভব নয়।

সম্রাট ঘায়ুর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন, তাজ্জব ব্যাপার! সম্রাট আর তিলমাত্র দেরি না করে কন্যা বদরের মহলে ছুটে এলেন। কন্যাকে সস্নেহ চুম্বন দিয়ে বললেন, মা

জননী, এইসব দাসী-বাঁদীরা তোমার নামে কী সব বলছে! আমি ওদের সব শূলে চাপাবো।

—কেন বাবা, কি বলেছে তারা?

—ওরা বলেছে, কাল রাতে নাকি তোমার ঘরে কোন্ এক অচেনা অজানা যুবক ঢুকেছিলো। তুমি নাকি তাকে গ্রহণ করেছো, এক বিছানায় রাত্রিবাস করেছো। তোমার নামে এ-সব অপবাদ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না মা। আমি ওদের শূলে দেব। শুধু একবার বলো, সব মিথ্যে।

—মিথ্যে? মিথ্যে কেন হতে যাবে বাবা। এর চেয়ে বড় সত্যি আজ আর আমার জীবনে কিছু নাই, বাবা! আমি এতকাল পুরুষ বিদ্বেষী ছিলাম। তার কারণ, যে সব পাত্র আপনি হাজির করেছিলেন তাদের কাউকেই আমার যোগ্য বলে মনে হয়নি। কিন্তু কাল রাতে যে অপূর্ব সুন্দর ছেলেটিকে আমার ঘরে পাঠিয়েছিলেন, তার জুড়ি বিশ্ব সংসারে নাই। সেদিক থেকে আপনার পছন্দের তারিফ করছি বাবা। আমি কাল রাতেই তাকে আমার দেহ-মন সব সঁপে দিয়েছি। এখন আমার আর কোনও অমত নাই। তার সঙ্গে আমার শাদীর ব্যবস্থা করুন। আমি শাদী করবো। বাবা, তাকে যদি আমার ঘরে পাঠালেন তবে ভোর না হতেই আবার তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কেন? সে যে আমার, সে যে আমার নয়নমণি—তাকে আমি সব দিয়েছি। সেও আমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। এই দেখুন, তার প্রমাণ। সে আমাকে তার হাতের আংটি পরিয়ে দিয়েছে।

সম্রাট ঘায়ুর মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, মা, তুমি সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেছো। ওরা ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু কি করবো, ঈশ্বর যা চান তাই হবে। যাক, তুমি আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি তোমার ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।

বাবার কথা শুনে বদর ক্রোধে ফেটে পড়ে। নিজের সাজপোশাক ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করতে থাকে। ঘায়ুর ভাবলেন, পাগল হলে কোনই কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হয়তো সে তার প্রাণটাই শেষ করে দিতে পারে। দাসী বাঁদীদের হুকুম করলেন, রাজকুমারীকে ধরো। জোর করে ওকে শুইয়ে দাও। যেন সে না ওঠে। লক্ষ্য রাখবে। আর যদি দেখো, তাকে সামলানো যাচ্ছে না, সোনর শিকর দিয়ে তাকে জানলার গরাদের সঙ্গে বেঁধে রাখবে। কোনও ক্রমেই যেন সে ছুটে না যায়।

ঘায়ুর দরবারে ফিরে গেলেন। তার একমাত্র সন্তান, নয়নের আলো—সে আজ পাগল হয়ে গেলো! কি হবে এই সাম্রাজ্যে? কিসের প্রয়োজন এত বিত্ত বৈভবের? কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। হায় ঈশ্বর একি ভয়ঙ্কর শাস্তি দিলে তুমি, কি আমার অপরাধ?

দরবারে গণমান্য অমাত্য পারিষদদের ডেকে পাঠালেন। তাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদের দিনে কেউ যদি আলোর রেখা দেখাতে পারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের গণমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, হেকিম বদ্যি, গণৎকার সব হাজির হলেন। সম্রাট তাদের কাছে সব খুলে বললেন।

—এখন সে বদ্ধ উন্মাদ। তবে আমার বিশ্বাস এ রোগ সারানো সম্ভব। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার এই ব্যধি সারাতে পারো আমি তার হাতেই তুলে দেব আমার প্রতিমা বদরকে। তার সঙ্গে ছেড়ে দেব আমার এই সিংহাসন—বিশাল সাম্রাজ্য। কিন্তু একটা শর্ত—যদি কেউ সারাতে পারবে বলে এগিয়ে আসে, অথচ সারাতে না পারে, তবে তার গর্দান যাবে।

সম্রাটের এই ঘোষণা নানা দেশের নগরে প্রান্তরে জারি করে দেওয়া হলো। বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক গুণীজ্ঞানী বদ্যি, হেকিম, জ্যোতিষী গণৎকার আসতে লাগলো। সবাই রাজকুমারীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললো, নাঃ, এ বড় দুরারোগ্য কঠিন রোগ।

সারবে কি সারবে না বলা শক্ত। এ অবস্থায় হাড়ি কাঠে মাথা গলিয়ে দিতে বিশেষ কেউই ভরসা পেলো না। যারা ধনদৌলত সাম্রাজ্য আর রাজকুমারীর লোভ সামলাতে না পেরে পতঙ্গের মতো উড়ে এলো তাদের ভাগ্যে যা জুটতে পারে তাই জুটলো।

রাজকুমারী বদরের এক পাতানো ভাই ছিলো। বুড়ি বাঁদীর একমাত্র পুত্র, ছোট থেকে একসঙ্গেই তারা হেসে-খেলে মানুষ হয়েছে। ছেলেটি খুব ধর্মবিশ্বাসী। ছোট থেকেই সে তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে সাধনা করত। মজার যাদুবিদ্যা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিত। হিন্দু এবং মিশরীরয় তন্ত্রমন্ত্র সম্বন্ধে পড়াশুনাও করেছে সে প্রচুর। এই তার নেশা। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। নতুন কোনও যাদু নতুন কোনও মন্ত্র যদি কোথাও শেখা যায়। সারা দুনিয়ার নানা দেশ ঘুরে ঘুরে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। কত রাজা বাদশাহের দরবারে সে সম্মোহন বিদ্যা দেখিয়ে উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নাই।

ছেলেটির নাম মারজাবন। অনেক দিন বাদে, অনেক দেশ ঘুরে সে দেশে ফিরছে। শহরে ঢোকার মুখেই দেখে, প্রবেশ দ্বারের সামনেই গোটা চল্লিশেক নরমুণ্ডু ঝোলানো রয়েছে। কি ব্যাপার, কিছুই ঠাওর করতে পারে না। এক সঙ্গে এতগুলো মানুষ বলি হয়েছে। পথচারীদের জিজ্ঞেস করতে একজন বললো, রাজকুমারী পাগল হয়ে গেছেন। সম্রাট ঘোষণা করেছেন যে সারাতে পারবে তাকে রাজকন্যা ও রাজত্ব দুই-ই হাতে তুলে দেবেন তিনি। আর যে না পারবে তার গর্দান যাবে। তাই—লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু। বেচারীদের জন্মের সাধ মিটে গেছে। রাজকুমারীকে কেউ সারাতে পারেনি।

এইসময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

একশো চুরানব্বইতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু করে সে ঃ

মারজাবন তার বুড়ি বাঁদীকে জিজ্ঞেস করে, আম্মা, বদর কেমন আছে?

—আর বলিস নি, বাবা, মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে। দেশে বিদেশের কত ডাক্তারবদ্যি আসছে, কিন্তু কেউ সারাতে পারছে না। সম্রাট ঢ্যাঁড়া পিটে দিয়েছেন, যে তাঁর মেয়েকে সারিয়ে তুলতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ের শাদী দিয়ে দেবেন। সেই সঙ্গে দেবেন তার গোটা সাম্রাজ্য। কিন্তু যারা লোভে পড়ে এলো কেউই তারা প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারলো না।

মারজাবন বুঝলো, পথচারী লোকটা যা বলেছিলো, কথাটা তাহলে ঠিকই। মারজাবনের মনটা ভীষণ খারা হয়ে গেলো। ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে হেসে খেলে তারা ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছে। অনেকক্ষণ চিন্তার করার পর সে মাকে বললো, মা, একবার তুমি তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। আমার বিশ্বাস, আমি তাকে সারিয়ে তুলতে পারবো।

মা শঙ্কিত হয়, সে বড় কঠিন ব্যামো, বাবা। দেশে বিদেশের কত নামজাদা হেকিম বদ্যি এলো, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলো না। ওসবের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নাই।

মারজাবন কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললো, তুমি একবার তার সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়ে দাওই না। তারপর আমি বুঝবো।

পুত্রের বায়না ঠেলতে পারে না বুড়ি বাঁদী।—ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো। মেয়েদের সাজপোশাক পরে আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে হারেমে ঢুকবে।

মায়ের কথামতো নারীর ছদ্মবেশ ধরে যথাসময়ে মায়ের কাছে আসে মারজাবন। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমারী বদরের হারেমে ঢুকতে যায়। প্রথমে খোজারা বাধা দিলো, নতুন কোনও লোকের ঢোকার হুকুম নাই।

বুড়ি বাঁদী বলে, আহা, নতুন লোক আবার কোথায় দেখলে? এ তো আমার লেড়কী। রাজকুমারী বদরের সঙ্গে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছে। ওরা দুজনে বড় পিয়ারের সখী।

খোজা ভাবে, রাজকুমারীর সখী—সে তো সোজা কথা নয়। বাধা দিলে রাজকুমারী হয়তো তার গর্দান নিয়ে নেবে। তাই আর কথাটি না বলে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

হারেমে ঢুকে বদরে দেখে সে বোরখা খুলে ফেলে দিলো। বোরখার মধ্যে সে একখানা জ্যোতিষ দর্পণ লুকিয়ে এনেছিলো। আর এনেছিলো খানকয়েক যাদুমন্ত্রের বই এবং একটি মোমবাতি।

মারজাবনকে দেখে ছুটে আসে বদর। ওর ঘাড়ে মাথা রেখে বলে, কোথায় ছিলে ভাই? এরা সবাই আমাকে পাগল বানিয়ে রেখেছে। ওর যাই ভাবুক, তুমি তো আমাকে ভালো করে জানো ভাই। ওদের মতো তুমিও যেন আমাকে ভুল বুঝো না।

মারজাবন বলে, সেইজন্যেই তো নিজের চোখে দেখতে এসেছি বোন। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আল্লা ভরসা করো, সব ঠিক হয়ে যাবে। যাক, সে কথা, আমি তোমার একখানা ঠিকুজী বানাতে চাই।

বদর বলে, তোমার যা ইচ্ছা বানাও। আমার কোনও অমত নাই। যে ভাবে চাও আমাকে পরীক্ষা করে দেখো, তাহলেই বুঝবে, সত্যি আমি পাগল, কি সুস্থ মানুষ।

মারজাবন বলে, যারা সুস্থ, জ্ঞানী তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। তাই আগে তোমার কাহিনী শোনাও আগাগোড়া। একটুও বাদসাদ দেবে না।

বদর সব বৃত্তান্ত হুবহু খুলে বললো তাকে। কোনও কিছু গোপন করলো না।

—এখন সারা দিনরাত শুধু আমার কেঁদে কেঁদে কাটে। কোথায় আমার ভালোবাসা, কোথায় গেলে তাকে পাবো জানি না। ভাই মারজাবন, তুমি আমার শুধু পাতানো ভাই না, তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে আজ কাছে পেয়েছি, যে কথা কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারি না, তবু তোমাকে বলা যায়। আমি ধনদৌলত সাম্রাজ্য কিচ্ছু চাই না, ভাই। শুধু তাকে চাই। তার জন্যে আমাকে যদি ভিক্ষা করেও জীবনধারণ করতে হয় আমি রাজি আছি। দুনিয়াতে চাইবার মতো আর কোনও বস্তুই আমার নাই—শুধু তাকে ছাড়া। সে আমার কলিজা, সে আমার সর্বস্ব।

মারজাবন মাথা নত করে বসে থাকে।—তোমার দুঃখ আমি বুঝি বোন। বিরহের যে কি ব্যথা তা ওরা বুঝবে কি করে। ওরা জীবনটাকে হীরে জহরৎ আর ধনদৌলত দিয়ে মাপতে শিখেছে। যাই হোক, তোর সব কাহিনীই শুনলাম। সবই আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার। কিন্তু আমি কসুর করবো না। আমার বিশ্বাস আমি তোমাকে সুখী করতে পারবো। কিন্তু বোন, যথেষ্ট ধৈর্য ধরতে হবে। আমি দেশে দেশে ঘুরি, বহু রাজাবাদশাহর দরবারে আমার অবাধ গতি। আর তোমার 'ভালোবাসা' সে কোনও সে যে ঘরের ছেলে নয়। তার যা রূপের বর্ণনা দিলে তেমন রূপবান পুরুষ তো আকছাড় পথে-ঘাটে মেলে না। তাছাড়া, এই যে মহামূল্যবান হীরের আংটি—এ-ও যার তার হাতে থাকা সম্ভব না। এর বেশি আর কিছু তোমাকে এখন বলতে পারছি না, বোন। আজই আমি আবার পথে বেরিয়ে পড়বো। পথে প্রবাসে ঘোরাই আমার কাজ। কিন্তু এবার যাবো শুধু তোমার জন্যে। দেখি চেষ্টা করি, যদি আমার বোনের মুখে আবার হাসি ফোটাতে পারি। মনে একটু বসন্তের রঙ ধরাতে পারি।

সেইদিনই সে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে। সারাটা মাস ধরে সে এ শহর থেকে ও শহরে ঘুরে বেড়ায়। যেখানেই যায় বদরের পাগল হওয়ার কাহিনী শোনে।

চলতে চলতে অবশেষে একদিন সে সমুদ্রের ধারের বন্দর শহরে

এসে হাজির হয়। শহরটার নাম তারাব। সেখানে কিন্তু কেউ বদরের কাহিনী শোনেনি। কিন্তু তার বদলে সেখানকার শাহজাদা কামার অল-জামানের অদ্ভুত দুরারোগ্য ব্যাধির কথা লোকের মুখে মুখে। কামার অল-জামান সেই দেশের সুলতানের একমাত্র সন্তান। নানা লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে কামার অল-জামানের আজব কাহিনী সব জেনে নিলো। সব শুনে তার মনে হয়, কোথায় যেন বদরের কাহিনীর সঙ্গে এর একটা যোগসূত্র আছে। একজনকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাইসাব, কোথায় গেলে সেই শাহজাদার দেখা পাওয়া যাবে?

লোকটি বলে, সুলতান শাহরিমানের সলতানিয়ত কি আর এতটুকু! সাত-সমুদ্র তের নদী পারেও তার শেষ নাই। সুলতান শাহরিমানের দরবার হলো খালিদানে। হাঁটাপথে ছ'মাস লাগে। আর সাগর পাড়ি দিয়ে গেলে লাগবে পুরো এক মাস।

মারজাবন একখানা নৌকা ভাড়া করে যাত্রা করলো। পালের হাওয়া অনুকূলেই ছিলো। তর তর করে বয়ে চলে নৌকা। এইভাবে প্রায় একটা মাস কেটে গেছে, খালিদান শহর আর বেশি দূরের পথ নয়। মারজাবনের প্রাণ আশায় দুলে ওঠে।

হঠাৎ ঈশান কোণে মেঘ দেখা গেলো। এখনি ঝড় উঠবে। মারজাবনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। এখন কি হবে উপায়? এই অকূল দরিয়ায় বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হলো। মাঝি হাল ঠিক রাখতে পারলো না। পালের কাছি ছিঁড়ে গেলো। প্রচণ্ড শব্দে নৌকাটা গিয়ে ধাক্কা খেলো এক পাহাড়ের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

মারজাবন ভালো সাঁতারু। তা হলেও তাণ্ডবের সঙ্গে লড়াই করা—সে কি চাট্টিখানি কথা। যাই হোক, কোনও রকমে একটা ভাসমান বয়া ধরে সে প্রাণ রক্ষা করতে পারলো। ঢেউ-এর সঙ্গে উথাল পাতাল হতে হতে এক সময় সে সুলতান শাহরিমানের প্রমোদ প্রাসাদের ধারে এসে ভিড়লো।

বরাতের জোরে সে-যাত্রা সেখানে এসেছিলো। ঐ সময় সুলতানের উজির দরবারের দরকারি কাজকর্মে সেখানে এসেছিলো। তারই নজরে পড়ে মারজাবন। প্রাসাদের একটা জানলা দিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে তার তাণ্ডবলীলা দেখছিলো। হঠাৎ দেখতে পেলো, একটা বয়া এগিয়ে আসছে প্রাসাদের দিকে। সেই বয়াটা আঁকড়ে ধরে আছে একটি যুবক। তৎক্ষণাৎ নফর চাকরদের বললো, যা, দেখতো, একটা লোক বোধহয় বয়া ধরে ভাসতে ভাসতে এসে ভিড়েছে ঘাটের সিঁড়িতে। নিয়ে আয় তাকে।

চাকরবাকররা ছুটে গেলো। একটু পরে প্রায় অচৈতন্য মারজাবনকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো তারা উজিরের সামনে। জামাকাপড় বদলে দেওয়া হলো। একজন এক গেলাস সরবৎ এনে ধরলো তার সামনে। সরবৎটুকু খাওয়ার পরে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলো সে।

ছেলেটিকে দেখে উজিরের বেশ ভালো লাগে। চোখে মুখে বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ। সুন্দর চেহারা, সুঠাম দেহ। দেখে মনে হয় বহুদূর দেশের মুসাফির।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

একশো ছিয়ানব্বইতম রজনী ঃ

উজির মারজাবনকে উদ্দেশ করে বলে, এই ঘোর বিপদের দিনে আল্লাহ তোমাকে বোধহয় আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

মারজাবন একথার অর্থ বুঝতে পারে না, কেন জনাব, একথা বলছেন কেন? আমি নৌকা করে চলছিলাম—উদ্দেশ্য ছিল খালিদানের শাহজাদা কামার অল-জামানের সঙ্গে

মোলাকাৎ করবো। কিন্তু আল্লাহর বুঝি তা ইচ্ছা নয়, তাই ঝড়তুফানের মধ্যে পড়ে নৌকাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। আমি কোনরকমে এই বয়াটা ধরে আত্মরক্ষা করেছি। তাও আপনারা না থাকলে হয়তো দরিয়ার জলে জান হারাতে হতো।

উজির অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।—শাহজাদা কামার অল-জামানের সঙ্গে তোমার কি দরকার?

—না মানে, শুনেছি তিনি খুব অসুস্থ। মানে।—মাথার নাকি—

উজির বলে ঠিকই শুনেছো, শাহজাদা কামার অল-জামান বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। তাকে সারাবার অনেক চেষ্টাই করা হয়েছে—হচ্ছে, কিন্তু কোনও হেকিম বদ্যিই কিছু করতে পারছে না। তা—তোমার কি করা হয়?

—যে আজ্ঞে আমিও, রোগবালাই-ই সারাই। তবে কোনও দাওয়াই পত্র দিয়ে নয়।

—তবে?

তাবিজ কবজ ঝাড়ফুক মন্তর—এই হচ্ছে আমার তরিকা।

উজিরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—আমার মনে হচ্ছে তুমিই পারবে। কারণ এত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও আল্লাহ তোমাকে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে দিয়েছেন। এ হচ্ছে সুলতান শাহরিমানের বিলাস ভবন। তারই পুত্র কামার অল-জামানকে এখন এই প্রাসাদেই এনে রাখা হয়েছে। তুমি যদি চাও তার সঙ্গে দেখা করতে পারো।

মারজাবন বলে, নিশ্চমই দেখা করবো, জনাব। কিন্তু তার আগে আগাগোড়া বৃত্তান্ত সব একবার শোনা দরকার।

উজির বললো, একবার কেন, একশোবার শোনাবো। আমরা চাই, আমাদের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী শাহজাদা জামান সুস্থ হয়ে উঠুক। তার জন্যে যে মূল্য প্রয়োজন আমরা দিতে প্রস্তুত।

এরপরে আগাগোড়া সব কাহিনী তাকে শোনালো উজির। মারজাবনের আর বুঝতে বাকি থাকে না শাহজাদা জামানের সে-রাতের নায়িকা বদর ছাড়া আর কেউ-ই নয়। একটা নতুন আবিষ্কারের আনন্দে তার মনে নেচে ওঠে। কিন্তু তখুনি নিজেকে সামলে নেয়। উজিরকে সে বুঝতে দিতে চায় না তার মনের ভাব। বললো, ঠিক আছে, আগে তার সঙ্গে আমার করিয়ে দিন। নিজের চোখে একবার দেখি রুগীকে। তারপর বলবো, পারবো কি পারবো না। তবে খোদা আমার একমাত্র ভরসা, কোনও দাওয়াই পত্রে আমি বিশ্বাস করি না, আশা হয় পারবো।

আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে উজির মারজাবনকে শাহজাদা জামানের কক্ষে নিয়ে যায়। প্রথম দর্শনেই সে চমকে ওঠে। এত রূপ কোনও পুরুষের হয়? যেন মনে হয় রাজকুমারী বদরের জুটির জন্যেই সে জন্মেছে। আর বদরের মুখেও তার মেহেবুবের চেহারার যে বর্ণনা সে শুনে এসেছে তার সঙ্গে এই সুরৎ হুবহু মিলে যাচ্ছে।

কামার অল-জামান কৃশ অবসন্ন দেহে বিছানায় শুয়েছিলো। চোখের ইশারায় মারজাবনকে বসতে বললো সে। শাহরিমান ভাবছেন, ছেলে হয়তো কিছু ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলতে চায় ছেলেটির সঙ্গে। তাই তিনি উজিরকে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যান।

মারজাবন ফিসফিস করে বলে ঃ আর কোনও ভয় নাই। আল্লাহ আমাকে দূর করে পাঠিয়েছেন এখানে। আপনার 'ভালোবাসার' খবর বয়ে নিয়ে এসেছি আমি।

জামান সন্দেহাকুল চোখে তাকায়। লোকটা এদেরই চর নয় তো। হয় তো বা কোনও নতুন ফন্দী।—ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে মারজাবনের মুখের দিকে।

—কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? হবে হব। সব বলছি সব প্রমাণ আছে আমার কাছে। স্বয়ং রাজকুমারী বদর আমাকে বলেছেন আপনাদের সেই রাতের সোহাগ মিলনরে কাহিনী।

এরপরে মারজাবন যে সব খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে থাকলো তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ রইলো না—ছেলেটা আর যাই হোক তার বাবা বা উজিরের কোনও গুপ্তচর নয়।

মারজাবন বললো, রাজকুমারীর নাম বদর। সম্রাট ঘায়ুরের একমাত্র সন্তান। সে আমার পাতানো বোন। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে আমরা মানুষ হয়েছি।

কামার অল-জামান-এর চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। যেন একটা আশার আলো দেখতে পায়।—তা হলে আর দেরি নয় দোস্ত, চল আজই আমরা রওনা হয়ে যাই, সম্রাট ঘায়ুরের দেশে।

মারজাবন বলে, সে দেশ তো অনেক দূরের পথ। তোমার এই শরীরে এখনই রওনা হওয়া ঠিক হবে না। সে ধকল তুমি সহ্য করতে পারবে না। আগে শরীরটাকে সারিয়ে নাও, তারপর যাওয়া যাবে। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে তবে রাজকুমারী বদর সুস্থ হয়ে উঠবেন।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

একশো নিরানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে শুরু করে ঃ

কৌতূহল চাপতে না পেরে সুলতান শাহরিমান আবার ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে যান। আনন্দে নেচে ওঠে তার বুক। এতদিন পরে ছেলের মুখে তিনি হাসি দেখলেন। এই মুহূর্তেই তার মুখের বিষণ্ণতা মুছে গেছে। তিনি শুনলেন, জামান বলছে, তুমি বসো, দোস্ত, আমি হামাম থেকে হাতমুখ ধুয়ে, সাজপোশাক পালটে একটু পরিপাটি হয়ে আসি।

সুলতান ছুটে এসে মারজাবনকে জড়িয়ে ধরেন। আনন্দে তিনি আজ আত্মহারা। কি যাদু দিয়ে, কেমন করে ছেলেকে সে প্রাণবন্ত করে তুললো সে সব আর জানতে চাইলেন না তিনি। জামান যে আবার সুস্থ হয়েছে—এই-ই তার কাছে যথেষ্ট।

সবচেয়ে মূল্যবান রত্নাভরণে মারজাবনকে ভূষিত করলেন তিনি। উপহার দিলেন দামী দামী সাজপোশাক। সারা শহরের মানুষ নাচ গান হৈ হল্লায় মেতে উঠলো। আলোয় মালায় সাজানো হলে প্রাসাদ। দু'হাতে বিতরণ করা হতে থাকলো টাকা পয়সা, পোশাক-আশাক খানা-পিনা। বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হলো। আবার দরবারকক্ষ গমগম করে উঠলো।

কয়েকদিন বাদে, শাহজাদা জামান তখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে, মারজাবন বললো, এবার যাত্রার আয়োজন করো দোস্ত। আমার বোনের অবস্থা যে কি, তা তো বুঝতে পারছো।

কামার অল-জামান বিমর্ষভাবে বলে, কিন্তু, আব্বাজান আমাকে যেতে দেবেন না, মারজাবন। তিনি আমাকে কাছ ছাড়া করে একটা দিনও থাকতে পারেন না। আমি আবার অসুখে পড়বো, মনে হচ্ছে। তার অদর্শন আমি সইবো কি করে।

মারজাবন তাকে সান্ত্বনা দেয় কিছু ভাবনার নাই, দোস্ত, সব ঠিক হয়ে যাবে। উপায় আমি বাৎলে দিচ্ছি। তবে একটুখানি মিথ্যের আশ্রয় নিতে হবে। তা—শুভ কাজে একটু আধটু মিথ্যে বললে এমন কিছু গোস্তাকি হয় না। তুমি শুধু সুলতানকে বলবে, মারজাবন তোমাকে নিয়ে দিন কয়েকের জন্য শিকারে যেতে চাইছে। দেখবে কোনও অমত করবেন না। আমার ওপর এখন তিনি দারুণ খুশি। তাছাড়া অনেকদিন একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে অসুস্থ হয়ে আটকে ছিলো। খোলামেলা মুক্ত আলো হাওয়া তোমার এখন যথেষ্ট প্রয়োজন।

মারজাবনের বুদ্ধির তারিফ করে জামান। সুলতানের কাছে গিয়ে বলতে তিনি না করতে পারলেন না। বললেন, কিন্তু বাবা, একটা রাতের বেশি তুমি বাইরে কাটাবে না। তা হলে আমি মরে যাবো। তুমি তো জানো, একটা রাত তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না।

দু'জনের জন্য দুটো সেরা তাগড়াই ঘোড়া সাজানো হলো। সঙ্গে আরও ছ'জন

ঘোড়সওয়ার, লোক লস্কর, উট, খানা পিনা, সাজ পোশাক তাঁবু প্রভৃতির লাট বহর নিয়ে রওনা হলো তারা। শহরের সীমান্ত মুখ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন সুলতান। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিদায় জানালেন।

মারজাবন বললো, দেখো বন্ধু আজ সারাটা দিন আমরা বনে জঙ্গলে শিকার সন্ধান করে বেড়াবো। কেন জানো? সঙ্গের লোকজনের মনে কোনও সন্দেহ যাতে না হয়, সেইজন্য একটা দিন আমরা যথার্থ শিকারীই না হয় হলাম। তারপরের ফন্দী আমি ভেবেই রেখেছি।

সারাদিন ধরে খুব হৈ হল্লা দৌড় ঝাঁপ করে শিকার সমাধা করা হলো। সন্ধ্যাবেলা একটা বাগানের মধ্য তাঁবু ফেলে খানাপিনা শেষ করে শুয়ে পড়লো সকলে।

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। সঙ্গের লোকজন সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। সবাই তখন বেঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। মারজাবন জামানকে জাগালো। ফিসফিস করে ওর কানে কানে বললো, এই রাতে এখুনি আমাদের পালাতে হবে। সবাই ঘুমে অচেতন কেউ টের পাবে না। নাও, ওঠ, দু'জনে দু'টো ঘোড়ায় চেপে কেটে পড়ি।

তখুনি, আর কাল বিলম্ব না করে, জামান আর মারজাবন অতি সন্তর্পণে সেখান থেকে সরে পড়লো। কিছুদূর ধীরে ধীরে চলার পর জোর কদমে ঘোড়া চালিয়ে ভোর না হতেই বহু যোজন পথ পার হয়ে গেলো তারা। আসার সময় তারা সঙ্গে এনেছিলো একটা তোরঙ্গ। তার মধ্যে ছিলো কিছু সাজপোশাক, এক বাক্স সোনার মোহর আর খানিকটা খানাপিনা। এছাড়া এনেছিলো একটা বাড়তি ঘোড়া।

সকাল হয়ে গেলো। একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে থামলো ওরা। মারজাবন বললো, দোস্ত, তোমার জামা আর পাতলুন খুলে আমার হাতে দাও। আর তোরঙ্গ থেকে একটা সাধারণ সাজ পোশাক বের করে পরো।

জামান বুঝতে পারে না কিছুই শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

—কী ব্যাপার? কেন?

—যা বলছি করো, কোনও প্রশ্ন করো না।

জামান আর কথা না বাড়িয়ে সাজপোশাক বদলে জামা পাতলুন তুলে দেয় মারজাবনের হাতে। মারজাবন বলে, এবার তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি।

এই বলে সে জামানের জামা পাতলুন কাঁধে ফেলে সেই ফালতু ঘোড়াটাকে নিয়ে পাশের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

একটু পরে সে ফিরে এলো। জামান অবাক হয়ে দেখলো, তার সাধের সৌখিন জামা পাতলুন রক্তে রাঙা। মারজাবন বলে ঘোড়াটাকে জবাই করে খুনে মাখিয়ে নিলাম তোমার সাজপোশাক। এবার দেখো, এ গুলোকে এই চৌমাথার এক পাশে ফেলে রেখে আমরা উধাও হয়ে যাবো।

জামান হাসে। সব তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হলো এতক্ষণে। কি অসাধারণ বুদ্ধি মারজাবনের।

মারজাবন বলে, এসো এবার নাস্তা সেরে নিই। আবার কখন কোথায় থামবো, তার তো ঠিক নাই।

দু'জনে বসে পেট ভরে খানাপিনা করলো। মারজাবন বললো, আর দেরি নয়। এবার ঘোড়ার পিঠে ওঠো। টগবগিয়ে ছুটাবো। দুপুর হওয়ার আগেই আমাদের অনেক দূর চলে যেতে হবে। এতক্ষণে তোমার শিকারের সঙ্গী নফর চাকররা ঘুম থেকে উঠে আমাদের নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছে। এরপর তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও যখন কোনও হদিশ করতে পারবে না,

সুলতানের কাছে গিয়ে জানাতেই হবে। সে ধরো, আজ দুপুর নাগাদ সুলতান খবর পাবেন। তারপর কি হবে বুঝতেই পারছো, তার হুকুমে একদল সৈন্যসামন্ত ছুটাছুটি শুরু করে দেবে। এক সময় তাদের কেউ চৌরাস্তার মোড়েও আসবে। দেখবে, তোমার সাজপোশাক রক্তে রাঙা—পড়ে আছে পথের ধারে। জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকবে তারা। দেখবে, তোমার ঘোড়াটা মরে পড়ে আছে। ভাববে কোনও ভয়ঙ্কর জানোয়ারের মুখে পড়ে ঘোড়াটা ঘায়েল হয়েছে। তোমাকে সে খাবার করে নিয়ে চলে গেছে। এই সাংঘাতিক বিবরণ যখন সুলতান শুনবেন, সুলতানের সে যে কি নিদারুণ অবস্থা হবে আমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু কি করা যাবে, এছাড়া সহজ উপায়ে তোমাকে তার কাছ থেকে নিয়ে আসা যেত না। তবে এও ভাবো। বিষম শোকতাপে দগ্ধ হতে হতে একদিন যখন তোমাকে আবার ফিরে পাবেন তখন তিনি কত আনন্দ পাবেন? সে আনন্দের কোনও তুলনা নাই। জান তো, সব ভালো, যার শেষ ভালো।

জামান বলে, তোমার মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা। তোমার উপস্থিত বুদ্ধি, বিচক্ষণতার কোনও তুলনা নাই। ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাকে ছোট করবো না। কিন্তু চলার পথে তো আমাদের অনেক খরচ হবে। সে পয়সাকড়ি তো আমার সঙ্গে নাই। তবে আমার হাতে মহামূল্যবান কয়েকটা আংটি আছে। বিক্রি করলে লাখখানেক মোহর দাম হতে পারে। এগুলো কোথাও বেচে রাহাখরচ চালাবার ব্যবস্থা করো।

মারজাবন বলে, ও নিয়ে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, চাঁদ। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করেই এসেছি। আমার ওপর খুশি হয়ে তোমার বাবা আমাকে বহু ধনরত্ন এবং নগদ এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়েছেন। সেগুলে সব এই তোরঙ্গের মধ্যে একটা বাক্সে নিয়ে এসেছি আমি। সম্রাট ঘায়ুরের সাম্রাজ্যে পৌঁছতে আমাদের এত পয়সার দরকারই হবে না; জামান। আর তাছাড়া তোমার হাতের ঐ অমূল্য রত্নগুলো বেচতে গেলেই ধরা পড়ে যেতে হবে। জহুরীর হাতে পড়লেই তার সন্দেহ হবে। এসব বস্তু তো ইতর সাধারণের কাছে থাকতে পারে না। এদিকে তোমার বাবা সুলতান শাহরিমানও নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবেন না। তার নিজের দেশ ছাড়াও আশেপাশের আর পাঁচটা দেশেও হুলিয়া জারি করে দেবেন। একটা সামান্য জহুরী মোটা পুরস্কারের লোভে তোমাকে ধরিয়ে দেবে না, সে কি হতে পারে। সুতরাং ওগুলো বরং খুলে জেবের ভেতরে রেখে দাও।

একনাগাড়ে মাসখানেক চলার পর একদিন সকালে তারা সম্রাট ঘায়ুরের রাজধানীর উপান্তে এসে পৌঁছল। কামার অল-জামানের আর ধৈর্য মানে না, তখনি সে সম্রাট ঘায়রের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু মারজাবন বলে, ধৈর্যং কুরু, বন্ধু, এখানে তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

শহরের প্রান্তমুখে একটা বনেদী সরাইখানা। মারজাবন বলে, এখানে উঠবো আমরা। দিন তিনেক বিশ্রাম করবো আগে। বাব্বা, একটানা একমাস ঘোড়ার পিঠে—গায়ের হাড়মাংস আর নাই। বেদনায় টনটন করছে; টানটান হয়ে আগে শুয়ে কাটাবো তিনটে দিন। তারপর অন্যকথা।

সরাইখানার একটা ঘরে পাশাপাশি দুটো পালঙ্কে দুই বন্ধু তিন দিন তিন রাত্রি শুয়ে শুয়ে কাটালো। পথের ক্লান্তি কেটে গিয়ে ফোটাফুলের স্নিগ্ধতা ফুটে ওঠে জামানের মুখে। দেহমন বেশ ঝরঝরে মনে হয়। মারজাবন বলে, নাও, এবার হামামে চলো, তোমাকে আমি নিজে হাতে ঘষে মেজে সাফ করে গোসল করাবো।

স্নানাদি শেষ করে এক জ্যোতিষের বেশ ধারণ করল জামান। মারজাবন তাকে সুন্দর করে সাজালো। জামানের যা রূপ তাতে ওকে যে সাজেই সাজানো যাক, অপরূপ লাগবে।

সম্রাট ঘায়ুরের প্রাসাদের পথে পা বাড়াতেই শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা এসে ভিড় জমাতে থাকলো। এমন রূপের হাট তারা আগে কখনও দেখেনি। পথচারীদের কেউ কেউ জানতে চাইলো, কী অভিপ্রায়ে যাওয়া হচ্ছে রাজদরবারে।

জামান গর্বভরে ঘোষণা করে, আমি ত্রিভুবন জয়ী জ্যোতিষ। আমার অসাধ্য কিছুই নাই। রাজকুমারী বদর-এর দুরারোগ্য ব্যাধির কথা শুনে বহু দূর দেশ থেকে আসছি। তার সব রোগ আমি সারিয়ে দেব।

জনতার মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। লোকটা বলে কি? সে কি জানে না, আজ পর্যন্ত যত গুণীজ্ঞানী হেকিম বদ্যি এসেছে, তাদের কি দশা হয়েছে।

কে একজন বলে, তা মরার জন্য যদি পাখা গজায়, কে আর আটকাতে পারে বলো। ঐ যে ওখানে যাদের কাটা মুণ্ডু ঝুলছে ওখানে গুণতিতে আর একটা মুণ্ডু বাড়বে—এই আর কি—

মেয়েরা চুকচুক করে, আহা রে, চাঁদের মতো সুরৎ, মনে হয় বড়ঘরের ছেলে। এমন রূপ এমন যৌবন—সব শেষ হয়ে যাবে।

অনেকে বারণ করে, দেখো বাপু, অমন কাজটি করতে যেও না। যা কেউ পারলো না, তা যে তুমিও পারবে না তা জানি। পাতালপুরীর রাজপুত্তুরের মতো তোমান মন ভোলানো রূপ আছে তাও মানছি—কিন্তু ওতে তো ভবি ভুলবে না। আমাদের সম্রাটের প্রতিজ্ঞা বড় সাংঘাতিক। মুখ দিয়ে একবার যা বের করবে তার আর নড়চড় হবে না। রাজকুমারীর রোগ যদি সারাতে না পারো বাছা, তা সে তোমার যত রূপ-গুণই থাক, গর্দান তোমাকে দিতেই হবে। তাই বলছি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও! কি দরকার অত লোভে। জানেই যদি না বাঁচলে কি হবে রাজত্ব আর রাজকন্যা দিয়ে?

কামার অল-জামান সে-সব কথায় কর্ণপাত করে না।—মুড়িমিছরি এক করে দেখো না তোমরা, এই আমার অনুরোধ। আমার পীরের কাছ থেকে যে বিদ্যা আমি আহরণ করেছি, তাতে মরা মানুষকে আবার বাঁচিয়ে দিতে পারি—পাগল তো কোন্ ছার।

এই কথা শুনে চমকে ওঠে সকলে। মরা মানুষকে জীয়ন্ত করতে পারে।

মুহূর্তে লোকের মুখে মুখে সারা শহর ছড়িয়ে পড়ে এই অদ্ভুত জ্যোতিষীর কথা। শহর ভেঙে পড়ে তাকে দেখতে।

মারজাবন বলে, প্রাসাদের ফটকে গিয়েই আমি কিন্তু কেটে পড়বো। তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে সম্রাট ঘায়ুর অন্যরকম ভাবতে পারেন। আমি প্রাসাদের অন্দরেই থাকবো। লক্ষ্য করবো তোমার কীর্তিকলাপ। কিন্তু সাবধান, যা শিখিয়ে দিয়েছি, সেইভাবে ঠিক ঠিক করে যাবে।

হু হু করে জনস্রোত বাড়তে থাকে। সবাই দেখতে ব্যাকুল জামানকে। নতুন চিড়িয়া ফাঁদে ধরা দিতে এসেছে। প্রধান ফটকের প্রহরী পথ রুখে দাঁড়ায়।

—আপ কৌন হ্যায়? কাকে চান?

জামান বলে, আমি এক বিদেশী জ্যোতিষী। এসেছি রাজকুমারীর ব্যাধি সারাতে। তুমি মহামান্য সম্রাটকে খবর দাও। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

প্রহরীরা অবাক হয়। সব জেনে শুনে এমন সোনার চাঁদ ছেলেটি হাড়ি কাঠে মাথা দিতে চায়। প্রধান প্রহরী এগিয়ে এসে বলে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান মালিক, এখানে একবার যে ঢুকেছে, প্রাণ নিয়ে আর ফিরে যেতে পারেনি।

জামান বিরক্ত হয়। —আমি কারো উপদেশ শুনতে আসিনি। রাজকুমারীর দুরারোগ্য রোগ সারাতে এসেছি। তুমি সম্রাটকে সংবাদ দাও। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

বাইরে কোলাহল শুনে সম্রাট উজিরকে পাঠালেন। —যাও দেখতো বাইরে কোনও বিদেশী মুসাফীর এসেছে মনে হচ্ছে, নিয়ে এসো তাকে।

দরবারে প্রবেশ করে আভূমি আনত হয়ে সম্রাট ঘায়ুরকে কুর্নিশ জানায় জামান।

কামার অল-জামানের মুখের দিকে তাকিয়েই সম্রাট চোখ বন্ধ করে ফেলেন। একি

অপরূপ সুন্দর চেহারা। এমন রূপবান মানুষ তো কোথাও দেখেন নি। কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়েযায়।

—শোনো বাবা, সম্রাট ঘায়ুর বলেন, চাঁদের মতো তোমার এই রূপ, আর এমন কচি বয়স। পাত্র হিসাবে তুমি আমার পরমাসুন্দরী কন্যা বদরের আদর্শ জুটি হতে পারো সন্দেহ নাই। কিন্তু জানো তো আমার শর্ত, তাকে যদি সারাতে না পারো—আমি তোমাকে কোনও ভাবেই রেহাই দিতে পারবো না। তাই এখনও বলছি, নিজের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে ফিরে যাও। অবশ্য তুমি এসেছো, আমার মেয়ের রোগ সারাতে। তোমাকে নিরস্ত করলে আমার লাভ কি! বরং একটা আশা নিয়ে কিছু সময় কাটাতে পারবো— যদি আমার নয়নমণিকে তুমি সারিয়ে তুলতে পারো। কিন্তু তা যে অসম্ভব। কত দেশের কত ডাকসাইটে ডাক্তার, কবরেজ, হেকিম উনানী এলো, তাদের কেউই প্রাণে বেঁচে ফিরে যেতে পারে নি। তা তোমার যদি শখ হয়, চেষ্টা করে দেখতে পারো। তবে আমার ঐ এক শর্ত বাবা, না পারলে তোমার মুণ্ডু কেটে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

—আমি রাজি আছি মহামান্য সম্রাট। আপনার সব শর্ত জেনেই আমি এসেছি।

সম্রাট ঘায়ুর প্রধান খোজাকে বললেন, একে অন্দর মহলে নিয়ে যা। রাজকুমারীর ব্যামো সারাতে এসেছে। যা বলবে শুনবি।

জামানকে সঙ্গে নিয়ে খোজা রাজকুমারী বদরের হারেমে যেতে যেতে বলে, তা সাহেবের, জামাই সাজার শখ হয়েছে বুঝি। এমন আহম্মক আর কতজন আছে কে জানে?

—আমি আহাম্মক নই। জেনে শনে কেউ জান খোয়াতে আসে না—আসা উচিত না। অন্ততঃ আমি আসিনি। তোমাদের রাজকুমারীকে আমি সারিয়ে তুলবোই। আর এ-ও আমার ক্ষমতা আছে তাকে চোখে না দেখেই আমি তার সব রোগ সারিয়ে দেব। দেখবে?

খোজাটা এবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। —সে কি? রুগীকে না দেখেই রোগ সারবেন! তা যদি পারেন, আমরা আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো, মালিক। আমাদের সম্রাট আপনাকে মাথায় করে রাখবেন। রাজকুমারী আপনার হবে।

—দেখ পারি কি না, জামান দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলে, আমাকে শুধু একবার রাজকুমারী বদর-এর দরজার সামনে নিয়ে চলো। আমি ভিতরে ঢুকবে না। পর্দার এপারে থেকেই তার সব রোগ সারিয়ে দেব।

জামান আর খোজা রাজকুমারীর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, একখানা কুর্শি নিয়ে এসো। এখানে আমি বসবো।

সঙ্গে সঙ্গে একখানা আরামকেদারা এনে দেওয়া হলো। জামান জেব থেকে কাগজ কলম বের করে একখানা চিঠি লিখলো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো চারতম রজনী ঃ

আবার সে শুরু করে ঃ

চিঠির বয়ান এই রকম ঃ

খালিদানের বাদশাহ শাহরিমানের পুত্র কামার অল-জামান-এর এই পত্র মহামান্য সম্রাট ঘায়ুরের কন্যা রাজকুমারী বদর-এর উদ্দেশ্যে লিখিত হচ্ছে ঃ

তুমি তো জানো না প্রিয়া, কী ব্যথা মরমে নিয়া আমি দিন কাটাইতেছি। প্রতিনিয়ত তুষানলে দগ্ধ হইতেছি। তোমার অদর্শন আমাকে উন্মাদ করিয়াছে। আমার কলমে এমন কোন ভাষা নাই যাহা দ্বারা আমার অন্তরের বেদনা প্রকাশ করিতে পারি। সেই আশ্চর্য মিলন রাত্রির পর হইতে তোমার বিরহে আমি কাতর—লোকে বলে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে।

কিন্তু কি করিয়া তাহাদের বুঝাই, জীবনে ইহার চাইতে বড় সত্য আর কিছুই নাই। সেই রাত্রে তোমার হাতে আমি একটি হীরার আংটি পরাইয়া দিয়াছিলাম। এবং তুমিও আমার হাতে পরাইয়া দিয়াছিল এই পান্নার আংটিটা। দেখো, চিনিতে পারো কি না। আমার হৃদয় অশান্ত সমুদ্রের মতো অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কবে দেখা পাইবো। কবে হইবে আমাদের মধুর মিলন।

ইতি—

কামার অল-জামান

পুনঃ—শহরের প্রবেশদ্বারের পাশে বড় সরাইখানায় আমি উঠিয়াছি। আংটিটা পুরে খোজার হাতে দিয়ে বললো, তোমার রাজকুমারীকে দিয়ে এসো।

বাইরে পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে জামান শুনতে পেলো, খোজাটা বলছে, মালকিন, পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে আছেন এক জ্যোতিষী। তিনি বলেছেন, আপনাকে সামনে না দেখেই তিনি আপনার ব্যামো সারিয়ে পারবেন। এই নিন, উনি আপনাকে খুলে দেখতে বলেছেন।

বদর-এর আর তর সয় না। ক্ষিপ্রহাতে চিঠিখানা খুলে ফেলে। আংটিটা দেখেই সে চমকে ওঠে। এই তো সেই আংটি। —তার ভালোবাসার হাতে সে পরিয়েছিলো। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। তবে কি আল্লাহ এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন। চিঠিখানা পড়তে থাকে। হঠাৎ সে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। এবার বুঝি সে সব সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাবে। পর্দা ঠেলে সে বাইরে আসে। সামনেই দাঁড়িয়েছিলো জামান। এক মুহূর্তে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে—তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে। দু'হাতে জড়িয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। এতকাল কোথায় ছিলে, সোনা। এত কষ্ট কি করে দিতে পারলে।

জামানের চোখ দুটিও জলে ভরে আসে। বদরের মাথায় কপালে হাত বুলাতে থাকে। —আমিও তো সেই একই কথা বলতে পারি সোনা। তুমিই সেই রাতে কোথায় উধাও হয়ে গেলে?

গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দু'জনে দু'জনকে চুম্বন করতে থাকে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। যেন সব বাধাবন্ধনহীন এক জোড়া কপোত-কপোতী।

খোজা ছুটে গিয়ে সম্রাটকে খবর দেয়, রাজকুমারী সাফ্—

সম্রাট ঘায়ুর অজানা আশঙ্কায় সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।

—কী, কী হয়েছে? রাজকুমারী সাফ কি রে?

—আজ্ঞে রাজকুমারীর মাথাটা সাফ হয়ে গেছে। আর কোনও অসুখ নাই। সব সেরে গেছ।

ঘায়ুর বিশ্বাস করতে পারে না। —কী সব যা তাল বলছিস?

—না—আজ্ঞে, নিজে চোখে দেখে এলাম। রাজকুমারী জ্যোতিষী সাহেবকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছেন।

—বলিস কি রে?

—হ্যাঁ, হুজুর, সত্যি সত্যিই। বিশ্বাস না হয় চলুন, নিজের চোখেই দেখবেন।

সম্রাট আর তিলমাত্র ধৈর্য ধরতে পারেন না। মাথার মুকুট পরতে ভুলে গেলেন। পায়ের জুতা ওখানেই পড়ে রইলো। খালি পায়ে খালি মাথায় ছুটলেন হারেমে। দেখলেন, সত্যিই বদর, আগের মতো হাসি খুশি সুস্থ হয়ে গেছে। মেয়ের কপালে চুম্বন করে বললেন, যাক, এতদিনে আমার দুঃখের দিন শেষ হলো।

কামার অল-জামানকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি অসাধ্য সাধন করেছ বাবা। আমার সব দিয়েও তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো না। এখন বলো কে তুমি?

জামান বলে, খালিদানের বাদশাহ শাহরিমান আমার বাবা। আমার নাম কামার অল-জামান।

এরপর আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী শোনালো তাঁকে।

সম্রাট বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শুনলেন সেই অদ্ভুত কাহিনী। শুধু মুখে বলতে পারলেন, তাজ্জব ব্যাপার! এ কাহিনী সোনার অক্ষরে লিখে রাখা দরকার।

দরবারের সেরা কলমচীকে ডেকে বললেন, শাহজাদার এই কাহিনী যত্ন করে লিখে রেখে দাও। আগামী দিনের মানুষ এ কাহিনী পাঠ করে অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

শহরের প্রধান কাজীকে ডাকা হলো। খাঁটি মুসলমান প্রথায় শাদীনামা তৈরি হয়ে গেলো। আনন্দ উৎসবমুখর হয়ে উঠলো সারা প্রাসাদ, সারা শহর। আলোর মালায় সাজানো হলো প্রাসাদ, ইমারৎ। খানাপিনা, নাচ গান হৈ-হল্লায় মাতোয়ারা হয়ে উঠলো সকলে। লহরের এবং দরবারে সম্ভ্রান্ত আমির ওমরাহ সওদাগর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এসে নব দম্পতির সুখ সুনিবিড় দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলো।

দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার অবসান হলো, আবার ফিরে এলো সেই মধুযামিনী। বদর আর কামার অল-জামান সুখের সায়রে গা ভাসিয়ে দিলো। এতদিন পরে তারা প্রাণ ভরে হাসলো, গাইলো, খানা পিনা করলো, আর গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমালো।

ভোরের দিকে জামান স্বপ্ন দেখলো, তা বাবা সুলতান শাহরিমান সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কেঁদে কেঁদে তার দু'চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। বলছেন, জামান, বেটা, তোমার শোকে আমি আজ মৃত্যুপথ যাত্রী। একটি বার এসো বাবা, যাবার আগে একবার প্রাণ ভরে দেখে যাই। তুমি ছাড়া জীবন আমার মরুভূমি হয়ে গেছে। কি হবে আমার এই অতুল ঐশ্বর্য, এই বিশাল সলতানিয়ত দিয়ে? একটি বার এসো বাবা।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। বাবার বিষাদ বিষণ্ণ করুন মুখখানাই বারবার চোখের সামনে ভাসতে থাকলো। এক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে জামান। তার আর্তনাদে বদর জেগে ওঠে।

—কী হলো, সোনা? শরীর খারাপ করছে? মাথা ধরেছে? টিপে দেব। ভিনিগার লাগিয়ে বেঁধে দেব? এক্ষুণি কমে যাবে।

জামান কঁকিয়ে ওঠে, না।

—তবে? তবে কি তোমার পেটে দরদ হচ্ছে? মৌরির তেল মালিশ করে দেব পেটে?

জামান ছটফট করে ওঠে, না না ওসব কিছু না।

—তবে কি তোমার বদহজম হয়েছে। একটু জোয়ানের আরক খাবে? কিংবা এক গেলাস গোলাপ জলের শরবৎ?

জামান বলে, না, সোনা সে জন্যেও না।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিমে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো ছয়তম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

কামার অল-জামান বলে, কালই আমরা দেশে রওনা হয়ে যাবো। খুব একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম। বাবা শোকে তাপে একেবারে শুকিয়ে গেছেন। আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বললেন, জামান, একটিবার আমার কাছে এসো। তোমাকে না দেখে আমি মরতেও পারছি না। তার চোখে দেখলাম জল। আমি আর কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না, সোনা। কালই আমাদের রওনা হতে হবে। তোমার কি মত?

—আমার আবার কি মত? তোমার মতই আমার মত। তোমার পথই আমার পথ। তুমি যা বলবে তাই হবে। চলো, দেশেই যাই। তোমাকে না দেখে বাবার অবস্থা যে কি—তা তো আমিও বুঝতে পারছি। কাল সকালে আমি বাবাকে বলবো, তিনি সানন্দে সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

খুব ভোরো বদর প্রধান খোজাকে পাঠালো সম্রাটের কাছে। ঘায়ুর তাকে দেখেই শঙ্কিত হলেন, আবার এই সক্কালবেলায় কী দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এলি বাঁদর।

—আজ্ঞে রাজকুমারী আপনার সঙ্গে দুটো কথা কইতে চান। খুব দরকারী।

—দাঁড়া, আমি আমার মুকুট আর জুতো পরে নিই।

বদরের হারেমে এসে ঘায়ুর বললেন, কাল রাতে কি এক গাদা লঙ্কার ঝাল খেয়েছিলি, মা? এই সাত সকালে তোমাদের ঘুম ভাঙলো কি করে? কী ব্যাপার? কেন ডেকেছো?

—না বাবা, ওসব কিছু না, বদর বলে, আজ আমরা দেশে রওনা হয়ে যাবো। তাই তোমার অনুমতি চাই।

—এ তো বড় সুখের কথা, মা। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর ঘরে যাবে, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে? তবে একটা কথা মা, তুমিও তো আমার একমাত্র সন্তান, জীবনে কোনও একটা দিন চোখের আড়াল করিনি। আমার কষ্টটাও নিশ্চয়ই বুঝবে। তাই বলছি, একটা বছর পরে একবার আমার কাছে ফিরে এসো।

বদর বাবার হাতে চুমু খেয়ে বলে, এ তুমি কি বলছো, বাবা, তোমাকে না দেখে কি আমিই থাকতে পারবো? যত তাড়াতাড়ি হয় আমি তোমাকে দেখতে আসবো।

সকাল থেকে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। রাজকুমারী বদর যাবে শ্বশুরবাড়ি। গাধা খচ্চর উটের পিঠে বোঝাই হতে থাকলো সাজ-সামগ্রী। সম্রাট ঘায়ুর নানা মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য উপহার উপঢৌকনে ভরে দিলেন। সেই সঙ্গে দিলেন অমূল্য ধন-দৌলত হীরা-জহরৎ। জিনিস পত্র বাঁধা ছাঁদা করতেই দুপুর গড়িয়ে গেলো। সম্রাট সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলেন কন্যা জামাতাকে। কামার অল-জামান আর বদর-এর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু শহর ছাড়িয়ে প্রান্তরের পথে যেতে না যেতেই চোখের জল শুকিয়ে গেলো। আনন্দে উদ্দাম হয়ে উঠলো দু'জনে। তারপর চলা আর চলা।

এইভাবে তিরিশটা দিন পথ চলার পর একটা ঘন সবুজ শস্যক্ষেত্রের পাশে এসে ওরা আস্তানা গাড়লো। এইখানে কয়েকটা দিন বিশ্রাম করবে তারা। কাছেই নদী আছে, সুতরাং জলের কষ্ট হবে না। খুঁজে পেতে খেজুর গাছের ছায়ায় তাঁবু গাড়া হলো। বদরের শরীরে এত ধকল হইবে কি করে। ফুলের ঘায়ে যে মেয়ে মূর্চ্ছা যায়, সে কি না একটানা এতটা পথ উটের পিঠে এসেছে। যদিও হাওদায় মখমলের গদি ছিলো। তবুও উটের দুলকি চালের দুলনিতে সারা শরীর ব্যথায় টন টন করছে। সামান্য একটু কিছু মুখে দিয়ে তাঁবুর ভিতরে সে টান ট্রান হয়ে শুয়ে পড়লো। শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে গলে গেলো বদর। কামার অল-জামান সঙ্গের অনুচরদের বললো, তোমাদের তাঁবুগুলো একটু দূরে খাটাও। রাজকুমারী বড় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছেন। তোমাদের হট্টগোলে তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

তাঁবুর ভিতরে ঢুকে জামান দেখে, একটা কাঁচুলী আর পাতলা ফিনফিনে একটা মসুল-এর তৈরি রেশমী-সেমিজ পরে বদর ঘুমে অচেতন। মাঝে মাঝে একটা হালকা হাওয়া এসে সেমিজটা ওপরের দিকে উড়িয়ে দিয়ে পালাচ্ছে। জামানের চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। একটি মাসের অতৃপ্ত কামনা দেহ কুরে কুরে খেতে থাকে। পাশে বসে বদরের সারা দেহে হাত বুলাতে থাকে জামান। দেহমন উত্তপ হতে থাকে। হঠাৎ কোমরে শক্ত মতো কি একটা হাতে ঠেকে। একটা অচেনা পাথর। নিশ্চয়ই মহামূল্যবান। তা না হলে বদর কেন শরীরে ধারণ করবে। হয়তো এর

কোনও দৈব ক্ষমতা আছে। তার পাতানো ভাই মারজাবন দিয়ে থাকবে হয়তো বা। হয়তো এর গুণে অনেক বিপদ আপদ কেটে যায়—

আলগোছে পাথরটাকো খুলে নিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে এলো জামান। পরীক্ষা করে দেখবে, চিনতে পারে কি না। পাথরটার চারটে মুখ। কি সব আঁকিবুকি কাটা আছে চারপাশে। কিছুই বোধগম্য হয় না। তবে দেখে বোঝা যায়, পাথরটা কোনও মন্ত্রপুত।

পাথরটা হাতে নিয়ে একমনে নিরীক্ষণ করছিলো সে। এমন সময় একটা পাখি শোঁ করে নেমে এসে, ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো সাততম রজনীতে আবার শুরু করে ঃ

পাখিটা উড়তে উড়তে গিয়ে বসে অনেক দূরের এক বিশাল ঝাঁকড়া গাছের ডালে। দূরে হলেও জামান দেখতে পায়, শয়তান পাখিটা তারই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড় দোলাচ্ছে।

কিছুক্ষণের জন্য সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। এমন যে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তার মাথাতেই আসেনি। কিন্তু এখন উপায় কি হবে। রাজকুমারী জেগে যখন দেখতে তার পাথরটা নাই তখন সে তাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে। পাথরটা নিশ্চয়ই তার প্রাণাধিক প্রিয়।

একটা পাথরের ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে যায় গাছটার দিকে। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু তার আগেই পাখিটা উড়ে পালায়। পালিয়ে কিন্তু বেশি দূর যায় না। আর একটু দূরের একটা গাছের ডালে গিয়ে বসে। আর একটা ঢিল নিয়ে জামান ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। কিন্তু পাখিটা মহা ধড়িবাজ। ঢিল মারার মুহূর্তেই সে শোঁ করে উড়ে যায়। গিয়ে বসে আর একটা গাছের ডালে। জামানের মাথায় খুন চেপে যায়। যে ভাবেই হোক, পাখিটাকে মেরে ফিরে পেতেই হবে পাথরটা। পাখিটাও বড় সেয়ানা। বারবারই এমন একটা দূরত্ব রেখে কোনও একটা গাছের ডালে বসছে, যেখান থেকে পাথরটা স্পষ্ট দেখা যায়—এবং জামানের মনে আশা জাগে, হয়তো সে এবার তাকে ধরাশায়ী করতে পারবে। কিন্তু না, তাড়া করতে করতে অনেক বাগ বাগিচা পার হয়ে যায়। মারতে আর পারে না কিছুতেই

গাছপালা ছাড়িয়ে পাখিটা গিয়ে বসে কাছেরই একটা পাহাড়ের চূড়ায়। জামান মরিয়া হয়ে উঠেছে। কোনও দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে যায়। পাথর ছুঁড়ে মারে পাখিটাকে। পাখিটাও টুক করে উড়ে গিয়ে বসে আর একটা চূড়ায়। এইভাবে পাহাড়ের কন্দরে উপত্যকায় পাখিটার পিছনে পিছনে ছুটে হয়রান হয়ে পড়ে।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলো। সূর্য গেলো পাটে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে গেছে সে। এখন কি করে বদরের সামনে দাঁড়াবে। কী জবাবদিহি সে করবে? হয়তো এমনও হতে পারে, তার এই অমূল্য রত্নটার শোকে সে অসুস্থও হয়ে পড়তে পারে।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে থাকে। কামার অল-জামান ভাবে, এই অবস্থায় এই দুর্গম গিরি পর্বত অতিক্রম করে তাঁবুতে ফেরা সঙ্গত হবে না। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের ভয়ও তাকে শঙ্কিত করে তোলে।

সামনের একটা গাছের ডালে বসে পাখিটা পাখা ঝাপটায়। সেই অন্ধকারেও জামান দেখতে পায় পাখির ঠোঁটে পাথরটা ধক ধক করে জ্বলছে। দারুণ আক্রোশে ফেটে পড়ে সে। পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে। পাখিটা বিশ্রী বিদঘুটে একটা আওয়াজ তুলে উড়ে গিয়ে আর একটা গাছের ডালে বসে। জামান তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম গিরি পথ ভেঙে পাখিটাকে তাড়া করতে থাকে। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। এক সময় ক্লান্ত অবসন্ন

দেহটাকে আর টানতে পারে না। একটা পাথরের টিলার উপর বসে পড়ে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখে সেই টিলাটার উপরই শুয়ে তার অঘোর ঘুমে রাত কেটে গেছে। পাখিটার ডানা ঝাপটানিতে আবার সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মরিয়া হয়ে জামান ওর পিছু পিছু ধাওয়া করে। পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে থাকে। কিন্তু পাখিটা তার নাগালের বাইরে অথচ আশেপাশেই এগাছ ওগাছ লাফিয়ে উড়ে বসে।

জামানের তখন রোখ চেপে বসেছে। যে ভাবেই হোক পাখিটাকে ঘায়েল করে পাথরটা পেতে হবে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। পাখিটা একটু একটু করে উড়তে উড়তে আরও অনেকটা পথ তাকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়।

সারাটা দিন পাখিটার পিছনে ধাওয়া করতে করতে আবার সন্ধ্যা নেমে আসতে থাকে। জামান ক্লান্ত দেহে বসে পড়ে। দুটো দিন দানা পানি পেটে পড়েনি। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। এবার সে এদিক ওদিক এগোতেই দেখতে থাকে, কোথাও খাবার কিছু সংগ্রহ করা যায় কিনা। একটু এগোতেই কয়েকটা আপেল আর চেরী গাছ দেখতে পেলো। সামনে একটা ঝরনা। গোটাকয়েক আপেল আর চেরী ফল পেড়ে গোগ্রাসে খেলো। তারপর আঁজলা করে ঝরনার জল খেয়ে পাশেই একটা জায়গায় শুয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

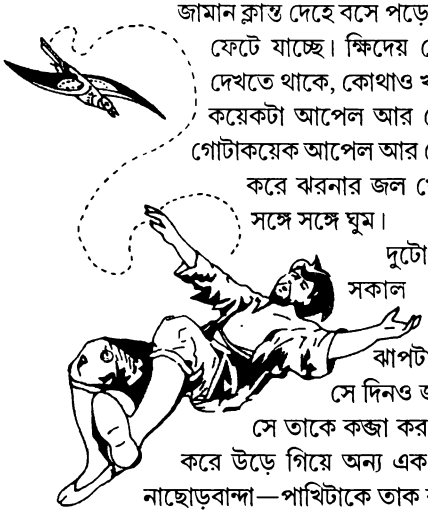

দুটো দিন দুটো রাত পার হয়ে গেছে। তিন দিনের দিন সকাল বেলায় চোখ খুলেই আবার সেই দৃশ্য। সামনের একটা চেরী গাছের ডালে পাখিটা বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আবার শুরু হলো পাখি সংহারের প্রচেষ্টা। সে দিনও জামান-এর সব চেষ্টা বিফল হলো। কোনও ক্রমেই সে তাকে কব্জা করতে পারে না। অথচ তারই নাকের ডগা দিয়ে শোঁ করে উড়ে গিয়ে অন্য এক গাছের ডালে অথবা গিরিচূড়ায় বসে। জামানও নাছোড়বান্দা—পাখিটাকে তাক করে করে অজস্র অগুন্তি ঢিল ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু পাখিটা এমনই ওস্তাদ তার সব নিশানাকেই অবলীলাক্রমে পাশ কাটিয়ে দিতে পারে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে থাকে। গিরি পর্বতমালা পেরিয়ে এবার সে সমতলভূমিতে এসে পড়ে। চাষীরা যব ভুট্টার ক্ষেতে কাজ করে চলেছে। পাখিটা উড়তে গিয়ে বসে কোনও খেজুর গাছের মাথায়। জামান মাটির ঢিল তুলে তাক করে মারে। কিন্তু পাখিটা টুক করে উড়ে গিয়ে আরও একটু দূরে আর একটা গাছের ডালে বসে।

জামানের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। ঐটুকু পাখির এই রকম বেয়াদপি সুলতান শাহরিমানের পুত্র হয়ে কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারে না। মনে হয়, একবার যদি তাকে হাতের মুঠোয় পায়, তাহলে ওর এই ফাজিল চালাকি হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে। কিন্তু হাতের মুঠোয় সে আর এলো না। বরং শাহজাদা জামানকে নাকে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এসে ফেলল, এক সমুদ্রের ধারে। একটা আখরোটের গাছের ডালে বসে অদ্ভুত উল্লাসের আওয়াজ করতে লাগলো সে। জামানের সারা শরীর খর রৌদ্রতাপে ঝলসে গেছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে। দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁফ ধরে গেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। চোখে সর্ষে ফুল দেখতে। তবু ক্ষোভ আক্রোশে জ্বলতেই থাকে। প্রায় অবসন্ন দেহে একটা মাটির ডেলা তুলে নিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারে। পাখিটা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আকাশে ওড়ে। জামানের

মাথার ওপরে চক্রাকারে কয়েকটা পাক দেয়। জামান আর একটা ঢিল হাতে তুলে নেয়। কিন্তু ততক্ষণে পাখিটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

জামানের সব আশা ভরসার ইতি হয়ে গেলো। এবার সে মাটির ওপরে থপ করে বসে পড়ে। চোখে ফেলে জল আসে। এত প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে গেলো। এখন সে কি করবে? কিছুই ভাবতে পারে না।

অবসাদে দেহ এলিয়ে পড়ে জামানের। সেখানেই ঘাসের উপর গা ঢেলে দিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

ঘণ্টা দুই বাদে ঘুম থেকে জেগে উঠে জামান ভাবতে এখন সে কোথায় যাবে। অচেনা অজানা বিদেশ বিভুঁই। পথ ঘাট কিছুই জানা নাই। একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে সামনে এগোলেই কিছুদূরে একটা শহর। জামান সেই দিকে চলতে থাকে। মনে মনে ভাবে, তাঁবু থেকে কত দূর সে চলে এসেছে কে জানে। না জানি তার অদর্শনে বদর-এর কি দশা হয়েছে এ ক'দিনে।

শহরের প্রবেশ দ্বারে এসে হাজির হয় জামান। সড়ক ধরে সোজা ঢুকে পড়ে শহরের অভ্যন্তরে। কেউই তাকে বাধা দেয় না। কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না। চারিদিকের ঘরবাড়ি দেখে মনে হয়, শহরটা মুসলমান জনবসতি বহুল। আরও খানিকটা এগাতে একটা বিরাট বাগিচার ফটকের সামনে এসে হাজির হয়। বাগানের মালী সাচ্চা মুসলমান। জামানকে সালাম আলেকুম বলে স্বাগত জানায়। জামানও যথারীতি আলেকুম সালাম জানায়। জামান জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা জনাব, আমি যখন পথ ধরে আসছিলাম, রাস্তায় যাদের দেখলাম, কেউই আমার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা বললো না কেন? সবারই চোখে মুখে, লক্ষ্য করলাম অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা কৌতূহল। কী ব্যাপার?

বৃদ্ধ মালী জবাব দেয়, খোদা মেহেরবান, তাই আপনি রেহাই পেয়ে গেছেন, সাহেব। যাদের দেখলেন, ওরা সবাই শত্রু পক্ষের লোক। কিছুদিন হলো শহরটা আক্রমণ করে অধিকার করে নিয়েছে ওরা। ও-ই শয়তান কাফেরগুলো দরিয়ার ওপার থেকে এসে আচমকা আক্রমণ করে এখানকার শান্ত নিরীহ মুসলমানদের খুন জখম করে শহরটা তছনছ করে ফেলেছে। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। শয়তান তাদের একমাত্র একমাত্র উপাস্য। তারা অসভ্য অশিক্ষিত জংলী ভূত। ওদের প্রিয়খাদ্য পূতিগন্ধময় পচা মাংস আর চর্বি। ওরা কখনও গোসল করে না বা রুজু করে না। শুনেছি, জন্মের সময় বাচ্চার মাথায় এক কলসী জল দেয় তারা। ব্যস্, সারা জিন্দগীভর আর তারা পানি স্পর্শ করে না। তাই এ শহরে ঢুকেই প্রথমে তারা সব হামাম, পানির ফোয়ারা, ঝরনাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, মালিক, রাস্তার ধারে দোকানপাটে পসরা সাজিয়ে বসে যারা সবাই মেয়েমানুষ। ওরা সবাই বেবুস্যা। দোকানে ঢুকলে আপনাকে গেলাসে ঢেলে দেবে হাল্কা হলদে রঙের এক ধরনের চিরতা ভিজানো পানি। দেখবেন, ফেনায় ভরে গেছে গেলাসের মাথা। ওরা পানির বদলে ওই জিনিসই খায়। ওকে ওরা বলে 'পিনেকা পানি'। আমার মনে কি হয় জানেন সাহেব, ও জিনিসটা গরুছাগলের মুত ছাড়া আর কিছু না। কিংবা তার চাইতেও খারাপ কিছু হতে পারে। ওদের মেয়েরা গোসল করে না বটে কিন্তু এক ধরনের লেবুর রস দিয়ে হাত মুখ সাফা রাখে। ফালা ফালা করে লেবু কেটে তার টুকরোগুলো ঘাড়ে মুখে গলায় ঘসে ফসে সব ময়লা সাফ করে। ডিমের খোলা গুঁড়িয়ে ময়দার মতো করে মুখে মাখে ওরা। ওরা একেবারে বেআব্রু। বোরখা পরে না। এ শহরে আমিই বোধহয় একমাত্র জীবিত মুসলমান। ওরা আমাকে মারেনি।

এইসব ভয়ঙ্কর তাজ্জব কথাবার্তা শুনতে শুনতে জামানের মাথা ঘুরতে থাকে।

মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নিজেকে আর সে ধরে রাখতে পারে না। কোনও রকমে ঘাসের উপর বসে পড়তে পারে।

মালী বুঝতে পারে, ছেলেটি অনাহারে অনিদ্রায় কাহিল হয়ে পড়েছে। জামানকে সঙ্গে করে সে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। ছোট্ট সুন্দর বাড়িখানা বাগানেরই লাগোয়া। কিছু খানা, খানিকটা শরবৎ তাকে খেতে দেয়। ক্ষুধার্ত জামান তৃপ্তি করে খায়। বৃদ্ধ মালি প্রশ্ন করে, কে বাবা, আপনি? কেন এসেছেন এই সর্বনাশা দেশে?

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দু'শো আটতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

বৃদ্ধ মালীর সহায়তায় জামান-এর মন ভরে যায়। এমন অচেনা অজানা দেশে এসে এমন একটি দরদী মানুষের সন্ধান পাওয়া ভাগ্যের কথা। জামান তার দুঃখের কাহিনী খুলে বললো তাকে। বলতে বলতে চোখের জলে বুক ভেসে যায়। বৃদ্ধ বুঝতে পারে জামানের মর্মবেদনা। নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে সে।

—কী করবেন বাবা, সবই খোদাতালার ইচ্ছা। তিনি যা করান তাই আমরা করি, তিনি যা বলান তাই আমরা বলি। ও নিয়ে দুঃখ করে লাভ নাই। নিয়তির লেখা খণ্ডাতে পারে না কেউ। প্রাণ ভরে শুধু তাঁকে ডাকুন, তিনিই সব সমস্যার সুরাহা করে দেবেন। তবে আমার কি মনে হয় বাবা, জানেন? রাজকুমারী এখন আর ওখানে নাই। একদিন দেখার পরই তারা খালিদানে রওনা হয়ে গেছে। ভেবেছে, আপনার সন্ধান করতে হলে, সুলতান শাহরিমানকে খবর দেওয়া দেওয়া দরকার। তাহলে তিনি চারদিকে লোকলস্কর পাঠিয়ে তল্লাস করতে পারবেন। আমার এই ছোট্ট গরীবখানায় আপনি কয়েকটা দিন বিশ্রাম করুন। তারপর আমি আপনার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেব। এখানকার বন্দরে মাঝে মাঝে খালিদানের সওদাগরি জাহাজ এসে ভেড়ে। কাজকাম শেষ করে আবার তারা ফিরে যায়। ওই রকম যে কোনও একটা জাহাজে চেপে দিব্যি আপনি দেশে চলে যেতে পারবেন। আমি রোজই একবার বন্দরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবো। খালিদানের জাহাজ এলেই আপনি চলে যাবেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কখনও বা দেখা যায় হামেশাই জাহাজ আসছে যাচ্ছে। আবার কখনও বা বছর ঘুরে যায় তবুও একখানার পাত্তা মেলে না।

বৃদ্ধ মালী তার কথা রাখে। প্রতিদিন সে বন্দরে খোঁজখবর নিতে যায়। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে থাকে, জামান জামাই-আদরে তার বাড়িতে দিন কাটাতে থাকে।

আসুন এবার আমরা রাজকুমারী বদর-এর দিকে চোখ ফেরাই।

তাঁবুর ভিতরে বদরের ঘুম ভেঙে যায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে কামার অল-জামানকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু এদিক ওদিক কোথাও না দেখতে পেয়ে উঠে বসে। হঠাৎ সে বুঝতে পারে তার কোমরের পাথরটা নাই। বদর ভাবে হয়তো তার স্বামী দেখার জন্যে খুলে নিয়ে গেছে। এখুনি এসে পড়বে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেও যখন সে ফিরে আসে না বদর চিন্তিত হয়ে ওঠে। উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। আরও

অনেক সময় কেটে যায়, কিন্তু জামান ফিরে আসে না। ক্রমে সন্ধ্যা নেমে আসে, অজানা আশঙ্কায় বদর-এর বুক কেঁপে ওঠে। ঐ মন্ত্রপূত পাথরটার উপরেই তার রাগ হতে থাকে। রাগ হয় তার পাতানো ভাই মারজাবনের ওপর। কেন সে ঐ হতচ্ছাড়া পাথরটা তাকে পরতে দিয়েছিলো? হয়তো ওরা হাতে ধরাতেই জামানের কোনও বিপদ আপদ ঘটেছে।

সারাটা রাত বিনিদ্র ভাবে কাটে। তারপর দিনও সে দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটায়। কিন্তু জামান ফিরে আসে না। ভয়ে কাউকে কিছু বলতে সাহস করে না। সঙ্গের চাকর নফররা যদি শোনে, শাহজাদা নাই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তবে তাদের মনে বদ মতলব মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে পারে। এই চরম সংকটের সময়ে নিজেকে খুব শক্ত সহজ করে রাখার চেষ্টা করে, বদর তার বাঁদীকে বলে, খু হুঁশিয়ার, শাহজাদা তাঁবুতে নাই, একথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ টের না পায়।

আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সে তার আশু কর্তব্য ঠিক করে ফেলে। নিজের সাজপোশাক ছেড়ে ফেলে বদর পরে নেয় জামানের সাজপোশাক। মাথায় পরে একটা বাহারী রেশমী টুপী। কোমরে বেঁধে নেয় একখানা ইয়াবড় তলোয়ার। আর বাঁদীটাকে পরিয়ে দেয় তার নিজের পোশাক। এমনভাবে সাজিয়ে তোলে, দেখলে কে বলবে সে-ই বদর নয়।

দু'জনে তাঁবু ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। আগে আগে বদর আর পিছন পিছন বাঁদী। সকলে দেখলে, শাহজাদা জামান তার বেগম বদরকে নিয়ে বেরিয়েছেন। আভূমি আনত হয়ে সকলে কুর্নিশ জানিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। বদর বলে, এবার আমরা রওনা হবো, আজই, এখুনি। সবাই তৈরি হয়ে নাও।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাঁধাছাঁদা শেষ করে আবার, তারা যাত্রা শুরু করে। সমুদ্রতীরে এসে একখানা জাহাজ ভাড়া করা হলো। সাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হবে এবার।

একটানা প্রায় দশ দিন চলার পর এবনি দ্বীপের বন্দরে এসে জাহাজ নোঙর করা হলো। শহরের প্রধান প্রবেশদ্বারের মুখে তাবু গাড়ার হুকুম দিলো বদর। সেখানকার লোকের কাছ থেকে জেনে নিলো, সেই দ্বীপটার নাম—এবনি দ্বীপ।

—এখানকার অধিপতির কি নাম?

লোকটি জানালো, আমাদের সম্রাট আরমাসুস। তার একটিমাত্র পরমাসুন্দরী কন্যা—তাঁর নাম হায়ৎ-অল-নাফুস।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামায়।

পরদিন দুশো নয়তম রজনী ঃ

গল্প শুরু হয় ঃ

বদর সেখানকার সম্রাটের কাছে একখানা চিঠি পাঠায়। নিজেকে পরিচয় দেয়—সে খালিদানের সুলতান শাহরিমানের পুত্র কামার অল-জামান।

সম্রাট আরমানুসের সঙ্গে সুলতান শাহরিমানের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। তাঁর পুত্র এসেছে তাঁর রাজধানীতে, সুতরাং যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাকে আদর অভ্যর্থনা করে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হলো। শহরের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন সম্রাট। জামানের সম্মানে বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করা হলো। সারা শহর সুন্দর করে সাজানো হলো। তিন দিন ধরে নানা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাকে বিস্তর আদর অভ্যর্থনা জানানো হলো।

চতুর্থ দিন সকালে উঠে বদর একাই হামামে চলে গেলো। সঙ্গে কোনও গোসল করাবার লোক নিলো না। নিজেকে ভাল করে ঘষেমেজে নতুন সাজপোশাক পরে তৈরি হয়ে নিয়ে সম্রাট আরমানুসের পাশে এসে বসলো। সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, এখন তোমার কি অভিপ্রায়, বলো। এখান থেকে কোথায় যাবে?

বদর বলে, তেমন কোনও হিসেব করে বেরুই নি। দেখি, যে দিকে যেতে ইচ্ছে হয়, যাবো। সম্রাট আরমানুস বলেন, তোমার বাবার সঙ্গে আমার বহুকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। তোমার কথাও তার মুখে অনেক শুনেছি। রূপে গুণে তুমি সেরা, শুনেছিলাম। এখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছি, বাবা। আমার ইচ্ছা, আমার একমাত্র কন্যা হায়াৎ-অল- নাফুসকে তুমি শাদী করো। তার মতো সুলক্ষণা সুন্দরী মেয়ে বড় একটা হয় না। আমি বাবা, মেয়ের গুণের কথা বড়াই করে বলতে নাই, কিন্তু সত্যিই বলছি বাবা, তার মতো গুণবতী কন্যা—সে একমাত্র তোমারই যোগ্য। নানা দেশের নানা শাহজাদা রাজকুমাররা তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল। কিন্তু কাউকেই আমার মনে ধরেনি। তোমাকে দেখার পর, তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার পর আমি মনে মনে ভেবেছি, তোমার জন্যেই সে বুঝি জন্মেছে। এই সবে সে পনেরোয় পা দিয়েছে। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আর ভোগবিলাস ভালো লাগে না, তুমি যদি রাজি হও বাবা, তবে তোমার হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে তোমাকে আমার সিংহাসনে বসিয়ে আমি বাণপ্রস্থ নিতে চা।

রাজকুমারী বদর সম্রাটের কথায় বিচলিত বোধ করে। অনেকক্ষণ মুখে কোনও কথা সরে না। হাত পা হিম হয়ে আসতে থাকে। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করতে থাকে। তখনকার সেই শীত শীত হিমেল হাওয়ার দিনেও সে ঘেমে নেয়ে ওঠে। হাড়ে কাঁপুনি ধরে। মনে মনে ভাবে, এখন যদি তাকে বলি, আমি রাজকুমারী বদরকে শাদী করেছি, আমার পক্ষে তাঁর এ প্রস্তাব আর গ্রহণ করা সম্ভব না, তখন তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে নির্দেশ আছে—একজন পুরুষ এক সঙ্গে চারটি বিবি রাখতে পারে। বদর যদি তার প্রথমা হয়, হায়াৎ না হয় হবে দ্বিতীয়া বেগম। তাতে কি অসুবিধা? আর যদি আসল কথা তাকে খুলে বলা যায়, আমি ছদ্মবেশী কামার অল-জামান। আসলে আমিই রাজকুমারী বদর। তখন এই বৃদ্ধ বয়সেও সম্রাটের কামনা বাসনা চেগে উঠবে। তিনি বলবেন, তাহলে আর তোমাকে ছাড়ছি না, সুন্দরী। তুমি হবে আমার পিয়ারের বেগম। আমি হবো তব মালঞ্চের মালাকর। কামের ব্যাপারে বুড়োদের ঘাড়ে ভীমরতি চেপে বসে। আর আমি যদি কামার অল-জামানের ছদ্মবেশেই তার কন্যার পাণিগ্রহণে অক্ষমতা জানিয়ে তাকে প্রত্যাখান করে চলে যাই তবে, এই মুহূর্তেই যত সব স্নেহ ভালোবাসা পলকে প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়বে। হয়তো বা এমনও হতে পারে, তাঁর রাজধানী ত্যাগ করার সঙ্গেই সঙ্গেই তিনি আমাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করবেন। সুতরাং নানা পন্থা, এই অবস্থায় তার প্রসতআবে আপাতত রাজি হওয়া ছাড়া উপায় নাই। এরপর নিয়তি আমাকে নিয়ে যে-খেলা খেলবে তাই খেলতে হবে। কে বলতে পারে! কার ভাগ্যে কি লেখা আছে। সেই বিধি লিপি কেউ কি খণ্ডাতে পারে! সুতরাং ও নিয়ে আর দুর্ভাবনা করে কোনও লাভ নাই। যা হবার তাই ঘটবে। এতে মানুষের কোনও হাত নেই।

বদর মাথা তুলে সম্রাট আরমানুসের দিকে তাকালো। মুখে সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসির আভাস। সম্রাট বুঝলেন, শাহজাদা স্বভাবসুলভ ভব্যতায় এই কথার সোজাসুজি জবাব দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে। বিনয় বিনম্র কণ্ঠে সে বলতে পারে, এসব ব্যাপারে আমার আর নিজের কি মতামত থাকতে পারে। তাছাড়া, আপনি আমার বাবার পরম বন্ধু। আপনার ইচ্ছা আমার পিতার আদেশতুল্য। আমি তা অপূর্ণ রাখতে পারি না।

বদরের কথায় আনন্দে নেচে ওঠেন আরমানুসু, এই তো সুলতান শাহরিমানের পুত্রের মতো কথা। তাঁর শিক্ষাদীক্ষার কায়দাই আলাদা। তোমাকে যেভাবে তিনি গড়ে তুলেছেন তার নজির মেলা ভার। আজকালকার দিনে তোমার মতো আচার ব্যবহার আদব কায়দা আমি খুব কম ছেলের মধ্যেই দেখছি, বাবা।

সম্রাট আর ধৈর্য ধরতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ দরবার-এ সভা ডাকা হলো। শহরের গণ্যমান্যরা এসে জড়ো হলো। মন্ত্রী, পারিষদ এবং সেনাপতিদের সামনে তিনি ঘোষণা করলেন, খালিদানের বাদশাহ শাহরিমানের একমাত্র পুত্র কামার অল-জামানের সঙ্গে আমার একমাত্র কন্যা হায়াৎ অল নাফুসের বিবাহ আজ সন্ধ্যায় সম্পন্ন হবে। এই দরবারের উপস্থিত নাফুসের বিবাহ আজ সন্ধ্যায় সম্পন্ন হবে। এই দরবারের উপস্থিত থেকে পাত্রপাত্রীর শুভকামনা করতে আহ্বান জানাচ্ছি।

দরবারকক্ষ করতালি-মুখরিত হয়ে উঠলো, সম্রাট আরমানুসের দ্বিতীয় ঘোষণা ঃ আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এখন অবসর গ্রহণ করে ঈশ্বরের উপাসনা করে দিন কাটাতে চাই। তাই মনস্থ করেছি, এখন থেকে এই সিংহাসনের অধিকারী হবে আমার জামাতা কামার অল-জামান। আপনারা আমার প্রতি এতকাল যে আনুগত্য দেখিয়েছেন, আমি আশা করবো, আমাদের এই নতুন সম্রাট-এর প্রতি সেরূপ আনুগত্য এবং মর্যাদা প্রদর্শন করবেন।

এবার ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হলো দরবার মহল। সবারই চোখে বিস্ময়—মুহূর্তে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো অভ্যাগতরা। করতালী ধ্বনিতে ফেটে পড়লো দরবার কক্ষ। জনে জনে এসে শাহজাদাকে আতর গোলাপ জল আর ফুল মালা দিয়ে বরণ করতে লাগলো।

রাজধানীতে সেদিন সে কি সমারোহ। খানাপিনা, নাচ গান হৈ হল্লায় সবাই মাতোয়ারা হয়ে উঠলো। ধনী দরিদ্র সবার কাছেই সেদিন রাজপ্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিলো। যে যা পারলো—খেলো। সবাই মুগ্ধ। দু'হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকে সকলে—তারা যেন সুখে থাকে, শতায়ু হয়। শহরের সেরা কাজীকে ডেকে শাদীনামা লেখানো হলো। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় যথারীতি আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দু'জনের শাদী হয়ে গেলো। কামার অল-জামানের ছদ্মবেশে বদর হলো হায়াৎ অল নাফুসের নকল স্বামী।

বিবাহ পর্বের শেষে বৃদ্ধ মহারানী উলু-উলু-উলু ধ্বনি করতে করতে নিজে হাতে ধরে কন্যা হায়াৎ অল নাফুসকে বদরের শয্যাকক্ষে পৌঁছে দিয়ে এলেন। এ দেশের এ-ই প্রচলিত রীতি। বদর এগিয়ে এসে পাত্রীকে সাদরে বরণ করে নিলো। তার কুসুমের মতো পেলব একখানা হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো পুষ্পপালঙ্কে—নিজেও বসলো তার পাশে। মুখের নাকাব উঠিয়ে শুভদৃষ্টি বিনিময় করে নিলো। এ-ও প্রচলিত রীতি।

মেয়েটির মুখ আনত, চোখ নিমীলিত। বদর দেখলো, মেয়েটির মুখে এক অজানা আশঙ্কা। চোখে মুখে কোনও হাসি আনন্দের ছাপ নাই, —যেন পাণ্ডু বিবর্ণ। বদর মৃদু কণ্ঠে সোহাগ মাখিয়ে বলে, কই, মুখ তোলো, চেয়ে দেখো—আমি তোমার মতো এত রূপসী না হতে পারি তবে হত-কুৎসিত নই।

এবার হায়াৎ চোখ মেলে তাকায়। বদরের রূপের তুলনায় তার নিজের রূপ নগণ্য মনে হয়। এমন বেহেস্তের রূপে সে রূপবান, অথচ কত বিনয়—বলে কিনা, তার মতো রূপ নাকি তার নাই? খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে সে। আনন্দে নেচে ওঠে হৃদয়। মনে মনে তার শঙ্কা ছিলো, না জানি তার স্বামী দেখতে কেমন হবে। হয়তো কোনও বুড়ো হাবড়ার হাতেই তুলে দেবেন তার বাবা। কিন্তু না, সে আশঙ্কা তার কেটে গেছে। এরকম সুন্দর স্বামী সে পাঁবে তাও অবশ্য আশা করতে পারেনি।

এমন সময় রাত্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন দুশো দশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার সে শুরু করে ঃ

বদর তার সারা দেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকে। তার টানা টানা কাজল কালো আয়ত চোখ, টিকলো নাক, আপেলের মতো গাল, পাকা আঙুরের মতো ঠোঁট, সুগঠিত স্তন, ভারী নিতম্ব বড় সুন্দর। এককথায় হায়াৎ-অল নাফুসকে তার পরমাসুন্দরী বলে মনে ধরে। ক্ষণিকের জন্য মনের নিভৃত কোণে এক টুকরো হিংসার কালো মেঘ উঁকি মেরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বদর তার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আদর করে। এতক্ষণ ভীত চকিত হরিণীর মতো গুটিয়ে রেখেছিলো। না জানি তাকে তার স্বামীর পছন্দ হয়েছে কিনা। এবার সে কিছুটা সাহস পায়। বদর আরও কাছে সরে এসে হায়াৎকে চুমু খায়। হায়াতের সারা দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক অভূতপূর্ব উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে দেহমন। চুম্বনের স্বাদ যে-এমন সে এই প্রথম বুঝলো। খুব ভালো লাগলো। সে ভালোলাগা কোনও ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। একতরফা বদরের চুম্বন সে প্রাণভরে আস্বাদ করলো। কিন্তু প্রতিদানে সে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলো না একটা। ইচ্ছে হয়েছিলো, কিন্তু দুস্তর লজ্জা এসে তাকে নিরস্ত করে দিলো।

আলতো করে দু'হাত ধরে হায়াৎকে সে বিছানায় শুইয়ে দিলো। কপালে ঠোঁটে, গালে, গ্রীবায় স্তনে চুমুতে চুমুতে ভরে দিলো বদর। সারা গায়ে হাত বুলিয়ে আদর-সোহাগ করতে থাকলো। এক সময়ে সে দেখলো, হায়াৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখে তার পরম প্রশান্তি। বদরও এক পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ঘুম ভাঙতেই হামামে ঢুকে নিজেকে তৈরি করে নিলো বদর। আজ থেকে তার দরবারে বসতে হবে। তার হাতেই শাসন দণ্ড তুলে দিয়েছেন সম্রাট আরমানুস। যথাসময়ে সে সুলতানি গাম্ভীর্য নিয়ে দরবারে আসে। মন্ত্রী ছুটে এসে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসায়। দরবারে উপস্থিত আমীর অমাত্য সেনাপতিরা আভূমি আনত হয়ে তাকে অভিবাদন জানায়। বদর সকলকে নিজের নিজের আসন গ্রহণ করতে বলে। তারপর শুরু হয় দরবারের কাজকর্ম।

দরবারের মন্ত্রী আমীর অমাত্যরা দেখে মুগ্ধ হয়, শাহজাদা কি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সব কাজ কত স্বল্প সময়ে চটপট সমাধা করে দিলো। বদর বললো, আদালতের বিচার পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। অপরাধীকে শুধুমাত্র শাস্তি দিলেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কেন মানুষ অপরাধ করে, কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করতে হবে। অপরাধীকে শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু সেই শাস্তির বিধান দেওয়ার সময় বিচারকের হৃদয় ব্যথায় মথিত হবে—এই-ই হওয়া উচিৎ। বিচারে সন্দেহের অবকাশ থাকলে কারো প্রাণদণ্ড হবে না। মনে রাখতে হবে, দেশের প্রতিটি মানুষ তার প্রজা। প্রজা যদি অবিনয়ী, উদ্ধত, স্বৈরাচারী হয়ে পড়ে তার জন্য মূলত প্রশাসনই দায়ী।

এদিকে আরমানুস তার মহারানীকে সঙ্গে নিয়ে কন্যা হায়াৎ অল-নাফুসের মহলে এসে উপস্থিত হন। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে আদর করে মা জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে বর পছন্দ হয়েছে তো?

হায়াৎ সলজ্জভাবে সাড়া দেয়, খু-ব পছন্দ হয়েছে মা। আমাকে কত আদর করেছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

মা জিজ্ঞেস করেন, শুধু এই! আর কিছু করেনি?

—আর আবার কী করবে? বললাম তো খুব আদর করেছে।

—দূর বোকা মেয়ে, সে কথা জিজ্ঞেস করিনি।

—তবে?

ঘুমুবার আগে সে তোকে গ্রহণ করেনি?

হায়াৎ বুঝতে পারে না মা তাকে কী বোঝাতে চাইছেন। —গ্রহণ মানে কী মা?

মা বুঝলেন মেয়ে একেবারে অর্বাচীন। সোজাসুজি কিভাবে তাকে সে-কথা জিজ্ঞেস করবেন বুঝতে পারেন না। শোবার আগে সাজপোশাক খুলেছিলি?

মেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে বলে, না। কিন্তু মা, কেন একথা জিজ্ঞেস করছো?

মহারানী গম্ভীরভাবে বলে, ও কিছু না। ঠিক আছে, তুমি বিশ্রাম করো। আমরা আবার পরে আসবো।

মা-বাবা দু'জনে চোখে চোখে কি যেন কথা বলে? হায়াৎ বুঝতে পারে না। চিন্তিত মুখে তারা দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দরবারের কাজকর্ম সেরে বদর হায়াতের কাছে আসে। হায়াৎ-এর মনে তখন মা-এর ঐসব হেঁয়ালিভরা প্রশ্নগুলো তোলপাড় করছিলো। বদর কাছে এসে হায়াতের ঘাড়ে হাত রাখে, কী ভাবছো, হায়াৎ?

—না—না, কিছু না তো—

হায়াতের অন্যমনস্কতা কেটে যায়। বদর জিজ্ঞেস করে, বাবা মা দেখা করতে এসেছিলেন?

হায়াৎ ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ।

—কী জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা?

হায়াৎ বললো, রাতে শোবার আগে তুমি আমার সাজপোশাক খুলে দিয়েছিলে কিনা? কিন্তু ওকথা তারা কেন জানতে চাইলো, বলতো?

বদর মুচকি হাসে, ওই রকমই রীতি। শাদীর পরে বাসর ঘরে পাত্র নিজে হাতে খুলে দেয় পাত্রীর সাজপোশাক। তারপর তারা একসঙ্গে শোয়। কিন্তু কাল রাতে তুমি বড় ক্লান্ত ছিলে। শোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লে। তাই আর তোমাকে বিরক্ত করিনি। তা এসো, আজ তোমাকে সেইভাবে শুইয়ে দিই।

বদর এক এক করে হায়াতের সব সাজপোশাক খুলে দু'হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলো। খুব আলতো ভাবে সে তার গালে একটা ছোট্ট চুমু এঁকে দেয়। জিজ্ঞেস করে পুরুষ মানুষকে খুব ভালো লাগে তোমার?

হায়াৎ জবাব দেয়, জীবনে হারেমের খোজা ছাড়া অন্য কারো মুখ দেখিনি আমি। কিন্তু তাদের দেখে কি পুরুষ বলা যায়? মনে হয় তারা পুরোপুরি মানুষই না। একটা পুরুষ বা নারীর যা যা দরকার তার কোনওটাই তাদের নাই। আচ্ছা বলতো, সাবই ওদের আধা মানুষ বলে কেন? কী তাদের নাই?

বদর হাসে, কেন, জানো না? তোমার যা নাই—তাদেরও তা নাই।

—সে আবার কী?

—বোকা মেয়ে, সে তুমি পরে ধীরে ধীরে বুঝবে।

হায়াৎকে জড়িয়ে ধরে চুমায় চুমায় ভরে দেয়। হায়াৎ সারা দেহে কি এক রোমাঞ্চ অনুভব করে। উত্তেজনায় কেঁপে উঠতে থাকে। বদর তার গায়ে মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দেয়। একসময় তারা দু'জনেই কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো এগারতম রাত্রে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

সকালে উঠে নিজেকে তৈরি করে বদর দরবারে চলে যায়। সম্রাট আরমানুস মহারানীকে সঙ্গে নিয়ে হায়াতের মহলে আসেন। আজ রাত কেমন কাটলো মা?

হায়াৎ বলে, খুব ভালো, বাবা, খুব সুন্দর।

আরমানুস বলে, এখনও তুমি শুয়ে আছো—দেখছি, মা। সারা রাতে কি অনেক ধকল হইতে হয়েছে?

—না বাবা, মোটেও না। বড় আরামে ঘুমিয়েছি। সে আমাকে খুব আদর সোহাগ করেছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। কাল সে নিজে হাতে আমার সব সাজপোশাক খুলে দিয়েছিলো। সারা শরীর চুমায় চুমায় ভরে দিয়েছিলো। কি যে ভালো লেগেছিলো, তোমায় কি করে বোঝাবো বাবা। মনে হচ্ছিল, আমি স্বর্গে চলে যাচ্ছি।

মহারানী জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তোমার রাতের সেই তোয়ালেটা কোথায়, দেখি। খুব কি রক্ত ঝরেছিলো?

হায়াৎ অবাক হয়ে বলে, তোয়ালে তো নিইনি, মা। আর রক্ত ঝরবে কেন?

মেয়ের এই কথা শুনে মা-বাবা দু'জনেই কপাল চাপড়াতে লাগলেন, হায় আমার কপাল, তোমার স্বামী এভাবে তোমাকে বঞ্চিত করছে কেন, মা?

সম্রাট আরমানুসের মুখের পেশী কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে ওঠে। মহারানীকে উদ্দেশ করে বলে,ন এতো খুব খারাপ কথা মহারানী। সে যদি তার কর্তব্য না করে, আমাকে তো অন্যরকম ভাবতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কই যদি তৈরি না হয়, এ বিয়ে দিয়ে কি ফয়দা হলো? কাল সকাল যদি শুনি, হায়াৎ তখনও কুমারীই রয়ে গেছে তাহলে আমি কিন্তু আর চুপ করে থাকবো না, মহারানী। কামার অল-জামানের হাত থেকে কেড়ে নেবো আমার সিংহাসন। আমার মেয়েকে সে বঞ্চিত করবে আর আমি তাকে মাথায় করে নাচবো, তা হতে পারে না।

মহারানী বলেন, অত উত্তেজিত হও না। ঠাণ্ডা মাথায় ভালো করে আগে ভেবে দেখো সব। তার হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে তার পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছ?

—কী আবার হাতি ঘোড়া হবে। হায়াতের আবার আমি বিয়ে দেব। একটা মাত্র মেয়ে আমার। একটা অপদার্থ রাঙামূলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সারাটা জীবন তো সে বরবাদ করে দিতে পারে না।

—কিন্তু মহারানী বলেন, এতে জামানের বাবা সুলতান শাহরিমান যদি ক্রুদ্ধ হন?

সম্রাট আরমানুস উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, ওসবে আমি ভয় করি না। যা হবার তা হবে।

দরবারের কাজ শেষ করে রাত্রে আবার হায়াতের কাছে আসে বদর। গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ রেখে হায়াৎকে সে আদর সোহাগ করতে থাকে। হায়াতের চোখে জল দেখে সে অবাক হয়, কী ব্যাপার, কাঁদছো কেন হায়াৎ? আসতে আমার দেরি হয়েছে বলে?

হায়াৎ ঘাড় নাড়ে, না। আজ সকালে মা বাবা এসেছিলেন। বাবা খুব রেগে গেছেন। তিনি বললেন, তোমার হাত থেকে সিংহাসন তিনি কেড়ে নেবেন।

বদর হাসে, কী আমার গোস্তাকি?

হায়াৎ বলে, বিয়ের পর দুটো রাত কেটে গেলো, এখনও তুমি আমাকে কুমারী করেই রেখেছ, তাই তাঁরা ভীষণ রেগে গেছেন। বাবা বলে গেছেন, আজ রাতে যদি তুমি আমার দেহ গ্রহণ না কর, শুধু সিংহাসনই তিনি কেড়ে নেবেন না, আরও মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। শাহজাদা। বাবার রাগ তো আমি জানি, রেগে গেলে তাঁর আর কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তোমার যদি কোনও অনিষ্ট হয়—

—আমার অনিষ্ট হলে তোমার খুব কষ্ট হবে?

—বারে, কি যে বলো?

বদর মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে, তুমি আমাকে ভালোবাসো, না?

হায়াৎ বদরের বুকে মুখ লুকায়, তুমি যে খু-ব ভালো, তোমাকে পেলে কেউ ভালো না বেসে থাকতে পারে? সারাদিন আমি তোমার বিপদের আশঙ্কায় কেঁদেছি। যাইহোক, আমার একটা কথা শোনো, সোনা। বাবা-মা যা চান তুমি সেই ভাবেই চলো। আমার কুমারীত্ব খোয়া গেলে যদি তাদের মুখে হাসি ফোটে, তাই না হয় করলে! কাল সকালে মা এসে আগে আমার তোয়ালে দেখতে চাইবেন। রক্তের দাগ যদি না দেখতে পান তা হলে আর রক্ষা থাকবে না তোমার। সেই ভেবেই আমার বুক কাঁপছে। আমি আর ভাবতে পারছি না, প্রিয়তম। এই দেহ মন প্রাণ—আমার বলতে যা সবই তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তুমি যা ভালো বোঝ, তাই কর। আমার নিজের মত বলতে আলাদা কিছু নাই। তোমার মতই আমার মত, তোমার পথই আমার পথ।

বদর মনে মনে বলে, এই মওকা, এখন হায়াৎকে যা বোঝানো যাবে তাই বুঝবে, যা বলা যাবে তাই সে করবে। মহব্বতের মায়া জালে সে এখন আবদ্ধ। হায়াৎকে আরও নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বদর বলে, শোনো, নয়ন তারা, তুমি যেমন আমাকে ভালোবাস, আমি তার কিছু অধিক তোমাকে ভালোবেসেছি। এ ভালোবাসার মধ্যে কোনও গলদ নাই, এ-কথা তো মান?

হায়াৎ বলে, একশোবার। ফুলের নির্যাসের মত নিখাঁদ আমাদের মহব্বৎ।

বদর বলে, আমি একটা কথা বলবো হায়াৎ?

হরিণীর মতো কাজল কালো ডাগর চোখ মেলে তাকায় হায়াৎ—কী? কী এমন কথা?

—ধর যদি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কামনা বাসনার কোনও গন্ধ না-ই থাকে?

—খু-ব ভালো হয়। আমি বুঝতে পারি না, মা-বাবা কি সব বলছেন। তোমার আমার সম্পর্ক তো সুন্দর, ভালোবাসায় কোনও খাদ নাই।

বদর বলে তোমার সঙ্গে যদি আমার ভাই-বোনের সম্পর্ক হয়—তুমি কি দুঃখ পাবে?

—মোটেই না। খুব ভালো হবে। এক সাথে হেসে খেলে আমাদের দিন কাটবে। তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বলবে। আমি খুলে দেব আমার মনের দরজা। আমার নিঃসঙ্গ জীবন ফিরে পাবে এক অন্তরঙ্গ দোসর।

বদর এবার আরও এক ধাপ এগোয়, আচ্ছা, হায়াৎ সুন্দরী, ধর, আমি যদি তোমার ভাই না হয়ে বোন হই? তখন তুমি আমাকে কিভাবে নেবে? তখনও কি তুমি আমাকে এমনিভাবেই ভালোবাসতে পারবে?

হায়াৎ উচ্ছল আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, আরও মজা হবে, আরও বেশি করে তোমাকে ভালোবাসবো তাহলে। তুমি হবে আমার সব সময়ের সখী। কেউ আমাদের ভালোবাসায় চিড় খাওয়াতে পারবে না। কোনওদিন আমরা ছাড়াছাড়ি হবো না।

বদর ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলে, হায়াৎ, তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাবো। কিন্তু তার আগে তোমাকে কসম খেয়ে বলতে হবে, কাউকে সে-কথা বলবে না।

হায়াৎ অবাক হয়, ওমা, এতে সন্দেহ অবিশ্বাসের কি আছে। আমি তো আগেই বলেছি, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তুমি যা বলবে তাই আমি করবো। তুমি যা বারণ করবে তা আমি বলবো কেন? তবু যখন বলছো, কসম খেয়েই বলছি, কাউকে বলবো না—হলো তো।

বদর আর একটা দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এক এক করে নিজের দেহ থেকে সব সাজ-পোশাক খুলতে থাকে। হায়াৎ বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে।

নিজের সুডৌল স্তন দুটি দু'হাতের থাবায় পুরে বদর হাসতে হাসতে বলে, কী, কী দেখছো? ভাবছো, আমি কি মহা ধড়িবাজ শয়তানী? না?

হায়াৎ বলে, ধ্যুৎ, কি যে যা তা বলো। কিন্তু কেন তুমি এখানে পুরুষের বেশে এসেছিলে দিদি? কিসের জন্য এই রকম মারাত্মক ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে তোমায়?

বদর বললো, বলবো, সবই বলবো তোমাকে বোন, একবার যখন আমরা ভালোবেসেছি, অন্তরের কোনও গোপন কথাই আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব না। তবে সে দুঃখের কাহিনী শুনলে তুমিও কাঁদবে। তা কাঁদো, আমি আর কোন কথা লুকাবো না। আজ সারা রাত ধরে আমার কাহিনী শোনো তুমি।

পালঙ্কে উঠে এসে হায়াতের পাশে বসে কামার অল-জামানের সঙ্গে তার প্রথম রাত্রির মিলন থেকে শুরু করে তাঁবু থেকে রহস্যজনক অন্তর্ধান পর্যন্ত আদ্যোপান্ত সব কাহিনীই সবিস্তারে বলে গেলো।

কিশোরী হায়াৎ মুগ্ধ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বদরের বুকে মাথা রাখে। বদর ওর কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, বোন। আবার কবে কামার অল-জামানকে ফিরে পাবো, কে জানে। তবে এ বিশ্বাস আছে, আমাদের অন্তরের বন্ধন কেউ ছিঁড়তে পারবে না। একদিন না একদিন তার সঙ্গে আমাদের মিলন হবেই। তাঁর কাছে সদাসর্বদা প্রার্থনা জানাচ্ছি। সে যেন সত্বর ফিরে আসে। আমার মনের কি বাসনা জান বোন? জামান-এর হবে তুমি দ্বিতীয়া বেগম। আমরা দুই বোন এক সাথে সারাটা জীবন কাটাবো, এই আমার একান্ত ইচ্ছা।

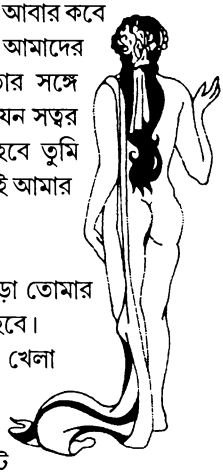

হায়াৎ বলে, কিন্তু তিনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন।

—সে ভার আমার। আমার কথা সে ফেলতে পারবে না। তাছাড়া তোমার মতো রূপসী মেয়েই বা কটা মেলে। তোমাকে পেলে সে খুব খুশিই হবে।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ে হায়াৎ। বদরের নগ্ন দেহখানা নিয়ে খেলা শুরু করে। এবার আর কোনও জড়তা নাই, নিজেই বদরকে চুমু খায়। হাতের মুঠিতে তার সুগঠিত স্তন দুটি পিষ্ট হতে থাকে। হায়াৎ বলে, আচ্ছা দিদি তোমার দুটো তো বেশ বড় বড়। আমার দুটো এত ছোট ছোট কেন?

বদরের চোখে দুষ্টু হাসি, সবুর কর, সময়ে ওরাও এই রকম ডাঁসা হয়ে উঠবে।

বদরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সে তার নিজের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে থাকে। হায়াৎ বলে, জান দিদি, আমি আমার দাসী বাঁদীদের কাছে অনেকবার জানতে চেয়েছি, শরীরের কোন অঙ্গটা কী জন্যে তৈরি, তা সে বেটিরা আমার কথার সোজাসুজি কোনও জবাব দেয়নি। সব সময়ই আকারে ইঙ্গিতে কি সব বোঝাতে চেয়েছে। সেগুলো আমার মাথায় ঢোকেনি। তুমি আমাকে সব বুঝিয়ে দাও তো, কোন্ অঙ্গটা কি দরকারে লাগে? একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিলো। আমি হামামে গোসল করছি, গায়ে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে আমার এক বাঁদী। তাকে আমি চেপে ধরলাম, আজ তোমাকে বলতেই হবে, আমার শরীরের এই সব অঙ্গগুলো, কী দরকারে লাগে। তা সে বেচারী ভয়ে লজ্জায় কোনও জবাব দিতে পারে না। রাগি না রাগি না, কিন্তু রাগলে আমি আর মানুষ থাকি না। বাঁদরী আমার কথার জবাব দিচ্ছে না দেখে আমার জেদ চেপে গেলো। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করতে লাগলাম, বল্ শিগ্গির, বলতেই হবে তোকে। চুপ করে থাকলে আমি ছাড়বো না।

আমার চিৎকারে সারা মহলে তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো। মা ছুটে এলেন, কী? কী হয়েছে? অমন চেঁচাচ্ছো কেন?

আমি তো চুপ। বাঁদীর মুখেও কথা নাই। মা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন। বাঁদীকে প্রশ্ন করতে সে বললো, রাজকুমারী জানতে চাইছেন, শরীরের এই সব অঙ্গ দিয়ে কি হয়?

মা-র মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। আর একটিও কথা বললেন না। ঠাস করে আমার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন, বাঁদর মেয়ে কোথাকার। ফের যদি শুনি তুমি এই সব নিয়ে দাসী বাঁদীদের সঙ্গে আলোচনা করেছ, কেটে ফেলবো।

তারপর থেকে আমি আর কখনও কাউকে জিজ্ঞেস করতে সাহস করিনি।

বদর বললো, ঠিক আছে, তোমাকে আমি সব শিখিয়ে দিচ্ছি, কোন্‌টা কি কাজে দরকার হয়।

বাকী রাতটুকু বদর তাকে কামসূত্রের প্রতিটি স্তর বিষদভাবে বুঝিয়ে দিতে থাকে। এক সময়ে ভোর হয়ে আসে। হায়াৎ উৎকণ্ঠিতভাবে বলে, কিন্তু দিদি সকাল হলে মা বাবা আসবেন। মা আমার তোয়ালে দেখতে চাইবেন। কি হবে?

বদর বললো, কিচ্ছু ভেবো না, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মহলের এক পাশে পাখীর খাঁচা ছিলো। বদর উঠে গিয়ে একটা পাখী বের করে নিয়ে এসে হামামে গেলো। একটুক্ষণ পরে খানিকটা খুন এনে বললো, এসো, তোমার দুই জংঘায় খানিকটা লাগিয়ে দিই। আর একটা তোয়ালে দাও। মাখিয়ে রাখি। কাল সকালে যখন মা দেখতে চাইবেন এই রক্তমাখা তোয়ালেটা তাকে বের করে দেখিয়ে দিও। তোমাকে যদি পরীক্ষা করতে চান, দেখতে পাবেন তোমার জংঘায় শুকনো রক্তের ছোপ। বাস, কেল্লা ফতে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বেন তিনি। খুব বেশি আনন্দ বা দুঃখ হলে মানুষ তার বিচক্ষণতা হারিয়ে ফেলে। এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। তোমার জংঘায় রক্তের দাগ দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠবেন। আর তোমাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন না।

হায়াৎ বলে, কিন্তু এ সবের কি দরকার? পাখীর রক্ত না লাগিয়ে আমার শরীরের রক্ত তো তুমিই বের করে দিতে পার, দিদি।

—পারি, কিন্তু দেব না। ওটা কামার অল-জামানের সম্পত্তি। ওখানে আমি হাত লাগাবো না।

পরদিন সকালে বদর যথারীতি কামার অল-জামানের ছদ্মবেশে আবার দরবারে চলে যায়। সম্রাট আরমানুস আর মহারানী এসে হাজির হন হায়াতের মহলে। রাগে ক্ষোভে সাপের মত ফুঁসতে থাকেন সম্রাট। আজ একটা হেস্তনেস্ত তিনি করবেনই। এভাবে মেয়ের জীবনটা তিনি নষ্ট হতে দেবেন না। কিন্তু পলকেই সব রাগ জল হয়ে গেলো তাঁর। হায়াৎ রক্তমাখা তোয়ালেখানা বের করে মা-কে দেখালো। মা দেখলেন, মেয়ের জংঘায় উরুতে শুকনো রক্তের দাগ।

—ওগো শুনছো, মহারানী আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। জামাই আজ মেয়েকে গ্রহণ করেছে।

সারা প্রাসাদে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগলো। শুভ সংবাদ মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো শহরময়। নাচ-গান হৈ-হল্লায় মেতে উঠলো সকলে। সম্রাট ঘোষণা করলেন, আজ ছুটির দিন, দরবার দপ্তর সব বন্ধ থাকবে। আজ শুধু খানাপিনা আর আমোদ-আহ্লাদ করে কাটাবে সকলে।

রাজকুমারীর রক্তমাখা তোয়ালে নিয়ে জাঁকজমক করে শোভাযাত্রা বেরুলো। শহরের নানা পথ-পরিক্রমা করে বিকেল নাগাদ আবার প্রাসাদে

এলো। উটের বাচ্চা কাটা হলো, অসংখ্য ভেড়া পোড়ানো হলো। ইতর জনের আজ অবাধ নিমন্ত্রণ। গরীব দুঃখীরা পেটপুরে খেয়ে দুহাত তুলে প্রার্থনা জানিয়ে গেলো, রাজকুমারী যেন চাঁদের মতো সুন্দর পুত্র লাভ করে।

প্রতিদিন যথার্সময়ে দরবারে গিয়ে বসে বদর। দারুণ বিচক্ষণতার সঙ্গে শাসন কাজ চালাতে থাকে। তার ন্যায়বিচারে প্রজারা খুব খুশি। প্রজাদের শুভেচ্ছা আর ভালোবাসায় তার মন ভরে ওঠে। কিন্তু এত উল্লাস আনন্দের মধ্যেও একটি চিন্তাই তাকে কুরে কুরে খেতে থাকে। কামার অলজামান কবে আসবে? তার নয়নের মণি, তার বুকের কলিজা কোথায় চলে গেলো। সকলের অলক্ষ্যে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

খালিদানে ফিরতে হলে জাহাজ পথে যেতে হবে। আর সব জাহাজই এই এবনী দ্বীপে নোঙর করে। বদর বন্দর সর্দারকে জানিয়ে রেখেছে, যদি কোনও জাহাজ খালিদানের দিকে যেতে থাকে; খুব ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে সে যেন তাকে জানায়।

এদিকে শাহজাদা কামার অল-জামান সেই বৃদ্ধ মালীর ছোট্ট বাড়িতে বসে বসে দিন গোনে। কবে খালিদানের জাহাজ আসবে। কবে সে দেশে পৌঁছবে, তার প্রাণপ্রতিমা বদরকে বুকে পাবে।

আর খালিদানে—শোকার্ত সুলতান শাহরিমান তখন মৃত্যু পথযাত্রী। এবার তিনি সব আশা পরিত্যাগ করেছেন। তার পুত্র কামার-অল-জামান আর বেঁচে নাই। সমস্ত আরব দুনিয়ার প্রতিটি সলতানিয়তে—প্রতিটি শহরে বন্দরে, গঞ্জে গ্রামে তিনি লোক পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেউই কোনও খবর আনতে পারেনি। তাই অবশেষে সুলতান শাহরিমানের হুকুমে সারা দেশব্যাপী শোকদিবস পালন করা হলো। পুত্রের স্মৃতির উদ্দেশে তৈরি করা হলো একটা সুউচ্চ মিনার। এই মিনারের একটি স্বল্পপরিসর কামরায় কাটতে লাগলো তাঁর বিষাদ বিষণ্ণ জীবনের শেষের দিনগুলো।

বৃদ্ধ মালীর অন্তরঙ্গ সাহচর্য সত্ত্বেও কামার অল-জামান বিষাদে দিন কাটায়। মালী রোজই সমুদ্র তীরে যায়। যদি কোনও খালিদানের জাহাজ এসে ভিড়ে। কিন্তু শহরটা পশ্চিমীর আক্রমণে বিধ্বংস্ত হওয়ার পর থেকে ভয়ে আর এপথ মাড়ায় না কেউ। তবু মালী আশা ছাড়ে না। নিশ্চয়ই কোনও না কোনও জাহাজ একদিন আসবেই।

একদিন বিকালে, মালী তখন সমুদ্র তীরে গেছে, কামার অল-জামান জানলার ধারে বসে বাগানের দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট মনে তার অতীতের সুখস্মৃতি রোমন্থন করছিলো। এমন সময় পাখীর ঝটপটানীতে সে সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলো, দুটো পাখীতে প্রচণ্ড লড়াই বেঁধেছে। একটি আর একটিকে পাখার বাড়ি মেরে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে গায়ের পালক ছিঁড়ে খুঁড়ে দিচ্ছে। এই ভাবে কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর একটি পাখী ঝুপ করে নিচে পড়ে গেলো। জামান ছুটে গিয়ে পাখীটাকে হাতে তুলে নেয়। কিন্তু না, সব শেষ হয়ে গেছে। ওপরে তাকিয়ে দেখলো, অন্য পাখীটা উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। পাখীটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে আবার সে এসে জানলার ধারে বসে। একটু পরে দেখলো, আরও দুটো পাখী উড়ে এসে মৃত পাখীটার পাশে বসলো। ওদের ভাষা বুঝতে পারে না জামান, তবে এটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলো, শোকে তারা মুহ্যমান। অনেকক্ষণ ধরে তারা পাখীটার পাশে চুপচাপ বসে রইলো। তারপর ঠোঁট দিয়ে মাটি ঠুকরে ঠুকরে একটা গর্ত খুঁড়লো। মরা পাখীটাকে টেনে এনে গর্তের মধ্যে রেখে মাটি চাপা দিয়ে আবার তারা উড়ে চলে গেলো।

কিছুক্ষণ কেটে গেছে। আবার একটা বিকট চেঁচামেচির শব্দে জামানের তন্ময়তা কেটে যায়। সেই পাখী দুটো ঐ খুনী পাখীটাকে তাড়া করতে করতে বাগানের ভিতরে নিয়ে এসেছে। পাখীটা পালাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু ওদের দু'জনের সাঁড়াশী আক্রমণে তা সম্ভব হচ্ছে না। একটি সামনে থেকে অন্যটি পিছন থেকে পাখার ঝাপটা মারতে মারতে এক সময় মাটিতে

ফেলে দিলো তাকে। তারপর খুনী পাখীটার মৃতদেহটা টানতে টানতে নিয়ে এলো তারা সেই নিহত পাখীটার কবরের পাশে। দুটিতে মিলে ধারালো ঠোঁট দিয়ে চিলে ফেললো তার পেট। বেরিয়ে পড়লো নাড়িভুড়ি। তারপর ওরা উড়ে চলে গেলো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহজাদা গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো ষোলতম রজনী ঃ

আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য সে প্রত্যক্ষ করছিলো। এবার সে উঠে দাঁড়ালো। আবার বাগানের ভিতরে এসে দাঁড়ালো। ঐ খুনী পাখীটার কাছে। পেটের নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছে। কি বীভৎস দৃশ্য। চোখে দেখা যায় না। হঠাৎ কামার-অল-জামানের বুক দুলে ওঠে। পাখীটার পেটের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে লাল রঙের কি যেন একটা বস্তু ঝকমক করছে। আরও একটু কাছে আসতেই পরিষ্কার দেখতে পায়, বদরের সেই গ্রহরত্ন পাথরখানা। কামার-অল-জামানের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে ওঠে। কোনও রকমে বসে পড়ে সে পাথরখানা তুলে নিয়ে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে। ভাবখানা, আবার যদি কেউ ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। কোন রকমে টলতে টলতে দেহখানা টেনে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সহজ স্বাভাবিক করতে পারে কামার অল-জামান। নতুন একটা কার বেঁধে নিজের গলায় পরে নেয় পাথরখানা। আল্লাহ আমার দুঃখ ব্যথা বুঝেছেন। তাই তিনিই আমাকে ফেরৎ দিয়ে দিলেন। আর আমার কোনও দ্বিধা নাই। এবার আমি বদরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো। বদর—আমার চোখের মণি—আমার কলিজা।

কামার-অল জামানের চোখ বেয়ে নামে জলের ধারা। পাথরখানায় বার বার চুমু খায় সে। ভাবে, না, এভাবে গলায় ঝুলিয়ে রাখা ঠিক হবে না। তাতে লোকের নজর লাগবে। গলা থেকে খুলে একখানা রেশমী রুমালে ভালো করে জড়িয়ে বাঁ হাতের বাহুতে তাগার মতো করে বাঁধে।

বৃদ্ধ মালী বলেছিলো, জ্বালানীর কাঠ নাই। বাগানের মধ্যে একটা মরা গাছ আছে। ওটা কাটা দরকার। তার গায়ে এখন তেমন শক্তি নাই, কুড়ুল চালাতে পারে। অথচ শহরের সব মানুষ কোথায় ছন্নছাড়া হয়ে পালিয়েছে। একটা জনমজুরও পাওয়া যায় না।

জামান বলেছিলো, তার জন্যে আপনি কেন চিন্তা করছেন, চাচা। আমি তো আছি, হতে পারি সুলতানের ছেলে, তা বলে কি শরীরে তাগদ নাই? নিজেদের কাজ নিজেরা করবো তাতে লজ্জা কিসের। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, বিকেলে আমি কেটে দেবো আপনার গাছ।

জামান একখানা কুঠার হাতে নিয়ে আবার বাগানের ভিতরে আসে। মরা গাছটার গোড়ায় কুঠারের কয়েক ঘা মারতেই ঝন ঝন করে একটা আওয়াজ বাজে। ঠিক যেন—কোনও লোহার পাতের উপর আঘাত করলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি। মাটি আর পাথরের টুকরো সরাতেই চোখে ফেললো সে। একটা সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির নিচে। শাহজাদা জামান-এর আর তর সয় না। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায় সে। দশটা ধাপ নামার পর সে দেখতে পায়, একটা বিরাট পাতালপুরীর গুহা। গুহার সামনে খোদাই করে লেখা আছে আদ এবং থামুদের নাম আর সাল তারিখ। জামান ঝুঁকে পড়ে দেখলো, গোটা কুড়ি ইয়া বড় বড় তামার জ্বালা। ভিতরে ঢুকে একটা জ্বালার ঢাকনা তুলে দেখতে পেলো, সোনার মোহরে ঠাসা। আর একটার ঢাকনা খুললো। সেটাতে সোনার তাল। এইভাবে সব কটা জালারই সে মুখ খুলে দেখলো, দশটায় মোহর আর দশটায় সোনার তাল-এ ভর্তি।

শাহজাদা অবাক হয়ে ভাবে। এত বিশাল ধন-দৌলত মাটির তলায় গচ্ছিত রেখে এখানকার সুলতানরা দেহ রেখেছে। এখন এ শহর বিদেশী ম্লেচ্ছদের কবলে। তারা সন্ধান

পেলে এখুনি ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে। জামান উপরে উঠে এসে গর্তটার মুখ ব্রোঞ্জের পাতখানা দিয়ে ঢেকে মাটি চাপা দিয়ে বাগানের এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে ফুলের গাছে জল দিতে থাকে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মালী ফিরে আসে। আজ তার মুখ হাসিতে ভরা। —সুখবর আছে বাপজান, খুব শিগ্গিরই আপনি দেশে ফিরে যেতে পারবেন। আমি একটা জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে কথা বলে এলাম। তিনি আপনাকে এবনী দ্বীপ অবধি নিয়ে যেতে পারেন। সেখান থেকে হামেশাই খালিদানের জাহাজ ছাড়ে। এবনী পৌঁছতে তিন দিন লাগবে। তারপর ওখান থেকে খালিদানের জাহাজে চেপে বসবেন। বাস, একেবারে দেশে পৌঁছে যাবেন।

জামান আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, চমৎকার। এদিকেও একটা সুখবর আছে, চাচা। অবশ্য আপনি এখন এই দুনিয়ার ভোগ লালসার অনেক উর্ধ্বে চলে গেছেন। এ সংবাদ আপনাকে হয়তো পুলকিত করবে না। আসুন আমার সঙ্গে।

জামান বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে সেই মরা গাছতলায় এসে দাঁড়ায়। মাটি সরিয়ে ব্রোঞ্জের পাতখানা সরিয়ে গর্তের নিচে নেমে গেলো দু'জনে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো ঊনিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

কুড়িটা জালা ভর্তি সোনার মোহর আর সোনার তাল দেখে বৃদ্ধের চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। —কী সর্বনাশ! এত ধনদৌলত দিয়ে মানুষ কি করে বাবা?

জামান বলে, কেন, ভোগ করে। এগুলো সব আপনার। যে কটা দিন বাঁচেন দু'হাতে দেদার খরচাপাতি করে ওড়ান।

—না বাবা, এসবে আমার কোনও লোভ নাই। এ জঞ্জাল অশান্তিই বাড়ায়। আজ বাদে কাল মরে যাবো। এখন আর ভোগবাসনার দরকার নাই আমার। আপনার এখনও কচি বয়স। অনন্ত ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে সামনে। আপনি ওগুলো নিয়ে যাবেন, বাবা। আমার অভাব আছে সত্যি, কিন্তু দৌলতের দেমাক আমার সহ্য হয় না। আপনি বরং যাবার আগে গোটা কয়েক পয়সা দিয়ে যাবেন। একখানা কফিন কিনে রাখবো। আমার মরার পরে যাতে ওরা ওই কাপড়ে জড়িয়ে কবর দেয়। সেই আমার যথেষ্ট পাওয়া হবে।

জামান বলে, কিন্তু অর্ধেকটাও যদি আপনি না নেন, আমিও কিছু নেব না। বৃদ্ধ বলে, যা ভালো বোঝেন করুন।

কামার অল-জামান সারা রাত ধরে গোটা কুড়ি কাঠের বাক্স বানায়। হাতে বাঁধা বদরের গ্রহরত্নটার দিকে তাকায়। নাঃ, এই অমূল্য রত্ন এমন ভাবে হাতে বেঁধে রাখা ঠিক না। একটা বাক্সের নিচে পাথরটা সযত্নে রেখে তার উপর সোনার মোহর ঢেলে দেয়। প্রায় ভর্তি হয়ে এলে উপরে কতক গুলো জলপাই দিয়ে ডালা এঁটে দেয়। লোকে ভাববে ফলের বাক্স। এই ভাবে সব বাক্স গুলো সোনার তাল আর মোহরে ভর্তি করে ডালা এঁটে দেয়। প্রথম বাক্সটার ওপরে এক টুকরো চামড়া এঁটে দিয়ে চিহ্ন রাখে—এইটায় আছে সেই গ্রহরত্ন পাথর খানা। তারপর প্রতিটি বাক্সের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখে দেয় জামানের নাম-ধাম। বৃদ্ধ মালীকে বলে, চাচা, খুব ভোরে আপনি জাহাজের খালাসীদের কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে আসবেন। তারা না এলে এই ভারি ভারি বাক্স নিয়ে যাবে কে?

বৃদ্ধ বলে, আপনি কিছু ভাববেন না, মালিক। আমি ভোরেই তাদের ডেকে আনবো।

জামান তখন যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। বৃদ্ধ মালীর জ্বর এসেছে তা সে বুঝতেই পারলো না। মালীও কিছু বললো না। সারারাতে জ্বর আরও বাড়তে থাকে। মালী কিন্তু জামানকে কিছু বলে না। আহা বেচারী, কতকাল দেশ ছাড়া, এতদিন বাদে একটা আশার আলো দেখা গেছে, এই শুভ সময়ে নিজের অসুখের কথা বলে তার মন খারাপ করে দিতে চায় না সে। জীবনে তার কবে অসুখ করেছিলো মনে পড়ে না। আজ সে বুঝতে পারে, যাবার ডাক পড়েছে।

খুব ভোরে উঠে বৃদ্ধ চলে যায় বন্দরে। কুড়িজন খালাসীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। জামান ওদের বাক্সগুলো দেখিয়ে বলে, ভালো জাতের দামী জলপাই আছে বাক্সগুলোয়। দেখ, ভাই, একটু যত্ন করে নিয়ে গিয়ে জাহাজে নামাবে। আছড়ে দিয়ে ফেলো না, তা হলে সব যাবে। তোমাদের যা ন্যায্য ইনাম তার চেয়ে অনেক বেশিই দেব আমি।

খালাসীদের সর্দার সেলাম ঠুকে বললো, ঠিক আছে, হুজুর। আপনি বেশি দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি জাহাজে চলে আসুন। মনে হচ্ছে, কাল সকাল নাগাদ হাওয়ার নিশানা আমাদের পথের দিকে ঘুরে যাবে। হাওয়া পেলে আমরা আর অপেক্ষা করবো না। সঙ্গে সঙ্গে পাল তুলে দেব, হুজুর। তাই বলছি, আপনি তাড়াতাড়ি জাহাজে চলে আসুন।

জামান বললো আমার জন্য তোমাদের জাহাজ ছাড়তে এক পলকও দেরি হবে না সর্দার। আমি একটু বাদেই আসছি, তোমরা যাও।

খালাসীরা বাক্সগুলো মাথায় নিয়ে চলে গেলো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো বাইশতম রজনী ঃ

আবার কাহিনী বলতে থাকে সে।

বৃদ্ধ মালীর ঘরে ঢুকে দেখে জ্বরে ঠক ঠক করে কাঁপছে সে। চোখ মুখ কেমন পান্ডুর হয়ে গেছে। জামান কাছে এসে মাথায় হাত রাখে, সেকি, আপনার এত জ্বর—কখন এলো।

—ও কিছু না বাবা, আপনি তৈরি হয়ে জাহাজে চলে যান।

—আপনি এই জ্বর গায়ে খালাসী ডাকতে গিয়েছিলেন অতটা পথ হেঁটে?

—তাতে কি হয়েছে বাবা। এতদিন বাদে একটা জাহাজ পাওয়া গেলো, কত আনন্দের কথা। তার জন্য আমার কী কষ্ট। আপনি রওনা হয়ে যান বাবা। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আর তা ছাড়া আজ বাদে কাল তো তাঁর কাছে যেতেই হবে। এ ডাক যত তাড়াতাড়ি আসে ততই ভালো।

জামান বলে, আপনি ও সব কথা ভাববেন না। আমি কিছু টোটকা জানি। গাছগাছড়ার রস করে আপনাকে খাইয়ে দিচ্ছি। আজ রাতেই আপনার জ্বর ছেড়ে যাবে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হলো না। রাত যত বাড়ে জ্বরও তত বাড়তে থাকে। সারারাত ধরে জামান বৃদ্ধের পাশে বসে শুশ্রুষা করে। কিন্তু নিয়তির লেখা কেউ এড়াতে পারে না। ভোর হতে না হতেই বৃদ্ধ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো জামান। এতদিন তার স্নেহছায়ায় সে কাটিয়েছে। আজ দেশে ফিরে যাওয়ার সময় সে-ই আগে চলে গেলো।

নিজে হাতে কবর খুঁড়ে জামান তাকে যথাবিহিত রীতি অনুসারে সমাহিত করলো। বেলা তখন অনেক। সূর্য মাথার উপরে এসে পড়েছে। এতক্ষণ জামানের অন্য কোনও দিকে খেয়াল ছিলো না। আজ সকালে যে তার জাহাজ ছাড়ার কথা, তাও তার মনে ছিলো না। এবার

খেয়াল হলো সময় উৎরে গেছে। হাওয়ার নিশানা ফিরেছে। হয়তো বা জাহাজটা ছেড়েই চলে গেছে।

হন হন করে সে হেঁটে চলে সমুদ্রের ধারে। কিন্তু হায়, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সমুদ্র-সৈকতে সে যখন পৌঁছল জাহাজ তখন মাঝ দরিয়ায় পাল তুলে দিয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে।

একরাশ হতাশা আর দুঃখ চেপে বসলো তার বুকে। ক্লান্ত-অবসন্ন দেহখানা টেনে নিয়ে ফিরে এলো সে বাগানে। এখন এই বাগিচা এই ছোট্ট বাড়িখানা সবই তার দখলে। ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে জামান, এমনই তার দুর্ভাগ্য, বদরকে সে আর ফিরে পাবে না। বদরের পাথরখানা পেয়েও সে আবার হারালো।

কামার অল-জামান বুঝতে পারে, এই অজানা অচেনা বিদেশে বেঘোরে তাকে প্রাণ হারাতে হবে। অথবা কতকাল এই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে কে জানে। জামান মনে মনে ভাবে, ঐ পাথরটা হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগ্যও তার পিছনে লেগেছে। যখন ওটা ফিরে পাওয়া গেলো, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। কিন্তু আবার সে হাতের নাগালের বাইরে চলে গেলো। না জানি এখন তার ভাগ্যে কি বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। এখন মেহেরবান আল্লাহর দোয়া ছাড়া কোনও ভরসা নাই।

বাজারে গিয়ে কুড়িটা বাক্স কিনে আনলো জামান। জালার অর্ধেকটা সোনা সে বৃদ্ধমালীর জন্য সেই গুহার মধ্যেই রেখে দিয়েছিলো। প্রতিটি বাক্সের অর্ধেকটা মোহর আর সোনার তাল-এ ভর্তি করে, বাকী অর্ধেক জলপাই সাজিয়ে ডালা এঁটে দিলো।

মনে মনে আশা করতে থাকলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুখ তুলে চাইবেন। দু-এক দিনের মধ্যেই একটা জাহাজ তিনি পাঠাবেন।

এরপর আবার সে আগের মতো বাগানের টুকিটাকী কাজকর্ম ফুলের গাছে জল দেওয়ার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিলো। বাকী সময় বদর-এর বিরহে গান গেয়ে গেয়ে কাটায়।

পালের হাওয়া অনুকূলে ছিলো। জাহাজখানা তর তর করে বয়ে এবনী দ্বীপের বন্দরে এসে ভিড়ে নোঙর ফেলা হলো।

বন্দর-সর্দার বদরকে খবর পৌঁছে দিলো, একটা জাহাজ এসে ভিড়েছে। জাহাজে কুড়িটা বাক্স আছে—প্রতিটি বাক্সে কামার অল-জামানের নাম লেখা।

আনন্দে বদর-এর বুক দুরু দুরু করে। এতদিন পরে তার প্রিয়তম স্বামী ফিরে এসেছে! দরবারের পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে সে জাহাজে এলো। কাপ্তেনকে একান্তে ডেকে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কামার অল-জামান কোথায়?

কাপ্তেন বললো, তিনি জাহাজে নেই। তাঁর আসার কথা ছিলো, কিন্তু কেন জানি না, আসেন নি। আমরা তার জন্য—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। জাহাজ ছাড়ার কথা ছিলো খুব সকালে, শুধু তাঁর জন্যেই আমরা অনেক দেরিতে ছেড়েছি।

বদর জিজ্ঞেস করে কী ধরনের সওদা আছে জাহাজে?

কাপ্তেন বলে, নানা দেশের সুন্দর সুন্দর সুতী আর রেশমী কাপড়, কাজ করা মখমল, চমৎকার সব দেখতে সেকেলে এবং আধুনিক ঢংএর ছবি আঁকা কাপড়। চীনা এবং ভারতীয় দাওয়াই পত্র, হীরা, মুক্তা, নানা জাতের সুগন্ধী আতর, নানা রকম ফুলের নির্যাস, কর্পূর আর আছে কয়েক বাক্স উৎকৃষ্ট জাতের জলপাই,—ভারি সুন্দর খেতে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো পঁচিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে।

বদর কাপ্তেনের ফর্দ শুনতে শুনতে বাধা দিয়ে বলে, আমি ঐ জলপাই-ই কিনতে চাই কিছুটা। কতটা আছে।

কাপ্তেন বলে, কুড়িটা বাক্স।

—সবগুলো বাক্সতেই কি একই ধরনের জলপাই আছে।

—তা বলতে পারবো না। তবে মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন বাক্সে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জালপাই-ই থাকতে পারে।

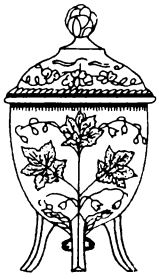

বদরের জিভে জল এসে যায়। বলে, আমি একটা বাক্স কিনতে চাই। হুজুর। যে মালিক সে জাহাজ ধরতে পারেনি। অবশ্য জাঁহাপনা যদি ইচ্ছে করেন তবে যা খুশি নিয়ে যেতে পারেন।

খালাসীদের সে হুকুম করলো, এই—জলপাই-এর বাক্সগুলো সব এদিকে নিয়ে আয়।

তৎক্ষণাৎ বাক্সগুলো সামনে এনে রাখা হলো। কাপ্তেন একটা বাক্সের ডালা খুলে জলপাই-এর চেহারা দেখালো।

বদর আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, আমি সবগুলো বাক্সই কিনবো। বাজারে কি দাম হতে পারে?

—আপনার দেশে জলপাই-এর খুব চাহিদা, জাঁহাপনা। আমার মনে হয় এক একটা বাক্স একশো দিরহাম হবে।

বদর তার এক কর্মচারীকে বললো, প্রত্যেকটা বাক্সের জন্য এক হাজার দিরহাম করে ইনাম দিয়ে দাও কাপ্তেনকে।

বদরের পিছনে পিছনে খালাসীরা বাক্সগুলো মাথায় নিয়ে জাহাজ থেকে নামে। বদর কাপ্তেনকে উদ্দেশ্য করে বলে, ফলের মালিকএর সঙ্গে দেখা হলে দামটা তাকে দিয়ে দিও।

প্রায় ছুটতে ছুটতে বদর হায়াতের কাছে আসে। বাক্সগুলো সব নিয়ে আসা হলো হারেমে।

দুখানা রেকাবী এনে দিলো বাঁদীরা। একটা বাক্সের ডালা খোলা হলো। টসটসে পাকা জলপাই। পাকা সোনার মত রং। দাসীরা খোস ছিলে ছিলে রেকাবী সাজিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু কি অবাক কান্ড, জলপাই গুলোর গায়ে সোনার গুঁড়ো মাখামাখি হয়ে আছে। মুখে দিতে গিয়েও নামিয়ে রাখে বদর। বলে, অন্য দুখানা রেকাবী নিয়ে এসো। আর একটা বাক্স খোলো।

সে বাক্সটাও খুলে দেখা গেলো সেই একই অবস্থা। তখন বদর হুকুম দেয়, সব বাক্স খুলে সব জলপাই ঢেলে দেখ।

এক এক করে সবগুলো উপুড় করে ঢালা হতে থাকে। সোনার তাল আর সোনার মোহর গুলো দেখে তো সবারই চোখ ছানাবড়া! একি তাজ্জব কান্ড। সব শেষের বাক্সটা যখন উপুড় করা হলো, বদর চিৎকার করে ওঠে, একি ব্যাপার! আমার এই দৈব পাথরখানা এর মধ্যে এলো কি করে?

হলুদবর্ণ জলপাইগুলোর মধ্যে লাল রঙের গ্রহরত্নখানা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই পাথরখানাই একটা কারে বাধা ছিলো তার কোমরে। বদর নির্ভুলভাবে চিনতে পারে। আর সে ভাবতে পারে না। মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে। হায়াতের কাঁধে মাথা রেখে বদর চোখ বন্ধ করে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা তুলে দাসী বাঁদীদের চলে যেতে ইশারা করে। দৈব পাথরখানা তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে হায়াৎকে বলে, জান হায়াৎ, এটা কী?

হায়াৎ কিছুই বুঝতে পারে না। বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বদর বলে, মন্ত্রপুতঃ দৈব পাথর। এই পাথরখানা যেদিন খোয়া যায় সেই দিনই আমার স্বামীকেও হারিয়েছি আমি। আজ আবার ফিরে পেলাম। তুমি দেখে নিও, সে-ও এবার ফিরে আসবে আমার কাছে। আবার আমাদের জীবনে বসন্তের ফুল ফুটবে, হায়াৎ।

জাহাজের কাপ্তেনকে ডেকে পাঠালো বদর। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এসে কুর্নিশ জানালো, বদর জিজ্ঞেস করে, এই ফলের মালিককে তুমি চেন? সে কোথায় থাকে? কী করে। সে কি এখানকার আদি বাসিন্দা?

কাপ্তেন বলে, তা তো বলতে পারবো না, হুজুর। তবে এটুকু জানি তিনি ওখানকার একটা বাগানের বৃদ্ধমালীর সঙ্গে থাকেন। আমার জাহাজে তাঁর আসার কথা ছিলো। কিন্তু সময়মতো তিনি এসে পৌঁছতে পারেন নি। আমি জাহাজ ছেড়ে চলে এসেছি।

বদর বললো, বেশির ভাগ জলপাইই বেশ টসটসে পাকা। খেয়ে দেখেছি, ভারি মিষ্টি। কিন্তু মুসকিল হয়েছে, আমার বাবুর্চিটা কদিন হলো বেপাত্তা হয়ে গেছে। লোকটা কাজ জানে ভালো, কিন্তু বড্ড কামাই করে। এখন এমন সুন্দর জলপাইগুলো ভালো করে বানানোর মতো লোক নাই। বদমাইশটা ফিরে আসুক, তারপর তাকে এমন শায়েস্তা করবো, বাছাধন জীবনে বদমাইশটা ফিরে আসুক, তারপর তাকে এমন শায়েস্তা করবো, বাছাধন জীবনে ভুলতে পারবে না। কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন লোক অভাবে এই সুন্দর জলপাইগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে যে। তুমি এক কাজ কর, আজই জাহাজ ছেড়ে চলে যাও। যে-ভাবে পার ফলওয়ালাকে এখানে ধরে নিয়ে এসো। যদি আমাকে খুশি করতে পার, অনেক ইনাম পাবে, আর যদি না পার তবে আর কোনও দিন আমার বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে পারবে না; এই বলে দিলাম। আর যদি আমার কথা গ্রাহ্য না করে জাহাজ ভেড়াও, তোমার গর্দান যাবে। শুধু তোমার না তোমার জাহাজের সঙ্গী-সাথী সক্কলের।

দুশো আটাশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

বদরের এই হুকুম কাপ্তেনকে শিরোধার্য করে নিতে হলো। এ ছাড়া উপায় নাই। সম্রাটের আদেশ অমান্য করলে নির্ঘাৎ প্রাণদণ্ড।

আল্লাহর দোয়ায় হাওয়া অনুকূলে ছিলো। জাহাজে পাল তুলে কাপ্তেন আবার সেই ম্লেচ্ছাক্রান্ত শহরটার দিকে যাত্রা করলো। কয়েকদিন পরেই জাহাজ গিয়ে ভিড়লো। কাপ্তেনের আর তর সয় না। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চলে গেলো সেই বাগিচায়। বৃদ্ধমালীর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে থাকে। চিন্তায় ভাবনায় কামার অল-জামানের চোখের কোণে কালী পড়েছে। নাওয়া খাওয়া প্রায় করে না বললেই চলে। দেহ কৃশ হয়েছে। সারা মুখে বিষাদের ছায়া। ঘরের একপাশে চুপচাপ বসে নিজের নসীবের কথা ভাবছিলো সে। কড়া নাড়ার শব্দে, বসে থেকেই সে হাঁক দেয়, কে?

কাপ্তেনের মনে আশা হয়। বোধ হয় এখনও সে আছে এখানে। ক্ষীণ স্বরে জবাব দেয়, আমি এক দীন ভিখারী, জনাব।

গলার স্বর কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকে! কথার টানে মনে হয়, এ যেন তার নিজের দেশের কেউ? জামান উঠে এসে দরজা খোলে। অবাক হয়ে তাকায়।

কাপ্তেন বলে, আমার জাহাজে আপনার যাওয়ার কথা ছিলো সেদিন। আমরা অপেক্ষাও করেছিলাম অনেক বেলা অবধি। কিন্তু আপনি আর এলেন না দেখে আমরা জাহাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, জনাব। আমার কোন অপরাধ নেবেন না।

জামান খুব খুশি হয়, না না, তোমাদের কি দোষ। আমিই সময় মতো পৌঁছতে পারলাম না।

কাপ্তেন বলে, আপনি যেতে পারলেন না, তাই আবার নিতে এসেছি আজ।

জামান বলে, খুব আনন্দ পেলাম। ঠিক আছে চলো। হ্যাঁ, আরও কুড়িটা বাক্স জলপাই আছে আমার ঘরে। ও গুলোও নিয়ে যাবো।

কাপ্তেনের ইশারায় খালাসীরা বাক্সগুলো মাথায় তুলে নিলো।

জাহাজে বসে কাপ্তেন বললো, এবনি দ্বীপের সম্রাটের রসুইখানার বাবুর্চি ভেগে

গেছে। আপনার জলপাইগুলো বানাবার লোক মিলছে না সেখানে। অথচ সম্রাটের ভারি পছন্দ হয়েছে ফলগুলো। ভালো দাম দিয়ে কিনেছে সে সবগুলো। এই নিন, প্রতিটা বাক্সের জন্য এক হাজার দিরহাম দাম দিয়েছে সে। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে। ওখানকার রসুইখানার প্রধান বাবুর্চির কাজ পেয়ে যাবেন আপনি।

এমন একটা সুখবর দিয়ে কাপ্তেন গর্বের সঙ্গে জামানের মুখের দিকে তাকায়। ভাবে, নিশ্চয়ই সে খুসিতে গদগদ হয়ে উঠবে। কিন্তু জামানের কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য না দেখে সে যেন চুপসে যায়। জামান কোনও জবাব দিলো না।

একটু পরে জাহাজ ছাড়া হলো। কাপ্তেন আবার তার কাছে এসে বলে, প্রাসাদের রসুইখানার মালিক হবেন আপনি, আপনার তো পোয়া বারো। এতক্ষণ জামান কোনও কথা বলেনি, এবার সে আর থাকতে পারলো না। —আমি নেবো না ও চাকরী। আর এ সব কথা বলতে তোমার একটুও বাধছে না কাপ্তেন? এখন দরিয়ায় তোমার জাহাজ, আল্লাহর নাম কর।

কাপ্তেন বলে, অনেক আগেই আমি তার দোয়া মেঙেছি, সাহেব। তিনি যেন আমাদের যাত্রা পথ শুভ করেন। আপনার যেন প্রাসাদের রসুইখানার চাকরীটা হয়ে যায়।

জামান কোনও জবাব দেয় না। নির্বিকার ভাবে দূরে সমুদ্রের নীল জলরাশির দিকে চেয়ে থাকে। কাপ্তেন আরও কাছে এসে বলে, মনে হচ্ছে, আপনি এই চাকরীটা নিতে খুব ইচ্ছুক না। তবে কি সম্রাটের ধারণা ভুল! আপনি কি রসুইখানার কাজ কাম জানেন না?

জামান বলে, আমি এখন আল্লার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। তোমাদের কোনও কথা আমি শুনবো না। এর বেশি কিছু বলবোও না।

কাপ্তেন বলে, সে আপনার যা অভিরুচি। আমার কর্তব্য সম্রাটের সামনে হাজির করা—তা করতে পারলেই রেহাই পেয়ে যাবো আমি।

এবনি বন্দরের এলাকার মধ্যে জাহাজ ঢুকছে। কাপ্তেন বলো, নিন সাহেব, নিজেকে ঠিক ঠাক করে নিন, এবার আপনাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবো। এখুনি জাহাজ বন্দরে ভিড়বে।

জাহাজ ভিড়ার সঙ্গে সঙ্গে জামানকে সঙ্গে নিয়ে সে প্রাসাদে এসে সম্রাট সমীপে হাজির হলো। বদরের মাথায় একটা বদ বুদ্ধি চেগে উঠেছিলো। কাপ্তেনের সঙ্গে কামার অল-জামানকে দেখামাত্র বদর-এর চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না—এই তার প্রাণেশ্বর। জামানের পরণে ছিলো বৃদ্ধমালীর দেওয়া সাধারণ সাজ-পোশাক। তার এই দীন ভিখারীর দশা দেখে বদরের বুক ব্যথায় টন টন করে ওঠে। জামান কিন্তু বদরকে একদম চিনতে পারে না। এই তার প্রাণ প্রতিমা—এরই জন্যে সে দিন রজনী চোখের জল ফেলছে।

নিমেষে নিজেকে সহজ করে নিতে পারে বদর। কাপ্তেনকে বলে, ওকে ফলের দাম বুঝিয়ে দিয়েছ?

—জী হুজুর। জাহাজে আরও কুড়িটা জলপাইএর বাক্স আনা হয়েছে।

বদর বলে, ঠিক আছে, ওগুলো প্রাসাদে নিয়ে এসো। একহাজার সোনার দিনার দাম পাবে।

কাপ্তেন কুর্নিশ করে চলে যায়।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো তিরিশতম রজনী ঃ

আবার সে শুরু করে।

জামান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলো। বদর তার একজন কর্মচারীকে বললো, একে হামামে নিয়ে যাও। ভালো করে গোসল করাও। কাল সকালে আমার সামনে হাজির করবে।

বদর হায়াতের কাছে গিয়ে বলে, এই—সে এসেছে। আমি কিন্তু তার কাছে পরিচয় দিচ্ছি না কিছুতেই।

হায়াৎ খুশিতে উপছে পড়ে। বদরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। সে রাত্রে তারা দুজন আর জড়াজড়ি করে শোয় না। সহজভাবে পাশাপাশি শুয়ে সুখস্বপ্ন দেখে দেখে রাত কাটায়।

পরদিন সকালে দামী সাজপোশাক পরে কামার অল-জামান দরবারে এসে হাজির হয়। চোখে মুখে ফোটা ফুলের প্রসন্নতা।

বদর উজিরকে বলে, এই যুবকের জন্য একখানা বড় ইমারৎ, একশোটা নফর চাকর এবং উজিরের যোগ্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিন। আজ থেকে সে হবে আমার দরবারের আর একজন উজির। তার জন্যে দামী দামী ঘোড়া, খচ্চর, উট প্রভৃতি যা যা দরকার সব ব্যবস্থা করে দিন।

এই কথা বলে সেদিনের মতো দরবার ছেড়ে চলে গেলো বদর। পরদিন যথা সময়ে আবার সে কামার অল-জামানের ছদ্মবেশে দরবারে আসে। জামানকে কাছে ডাকে। সিংহাসনের পাশে যেখানে রাজকুমারদের বসার আসন সেখানে তাকে বসায়। জামান অবাক হয়ে ভাবে, হঠাৎ তাকে সম্রাট এত সম্মান দেখাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনও মতলব আছে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না—কী সে মৎলব? কাপ্তেনের কথাবার্তা শুনে তো এরকম কিছু মনে হয়নি! মনে হচ্ছে, এর পিছনে গূঢ় কোনও রহস্য আছে। খোদা ভরসা, কারণটা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। ভাবতে ভাবতে কারণও একটা খুঁজে পায়। সম্রাট বয়সে নেহাৎই কচি। একেবারে তরুণ বলা যায়। এই বয়সে সুঠাম সুন্দর যুবকদের সাহচর্য খুব ভালো লাগে। তাই কি সে আমাকে তার পাশে পাশে রাখতে চায়? ওর কি ধারণা হয়েছে কচি বয়সের লালটুস ছেলে দেখলেই আমার জিভে জল ঝরবে? আর এই জন্যেই কি সে আমাকে হুট করে এমন উঁচু আসনে বসালো? তা যদি ভেবে থাকে সে, খুব ভুল। ওসব বিকৃতির মধ্যে আমি নাই। আমাকে কলের পুতুল বানিয়ে যা খুশি করাবে সে-টি হচ্ছে না। ওর মতলবটা কি, আগে আমাকে জানতে হবে। তারপর যদি বুঝি ব্যাপারটা গোলমেলে, আমি কিন্তু ঐসব ধন-দৌলত ইনাম সম্মানের পরোয়া করি না। লাথি মেরে সব ফেলে রেখে আবার আমার সেই বাগানে ফিরে যাবো।

জামান বদরকে উদ্দেশ করে বলে, জাঁহাপনা, অনেক দামী দামী জিনিসপত্রে আমার বাড়ি ভরে দিয়েছেন। ধন-দৌলত এবং প্রয়োজনের সামগ্রী এত দিয়েছেন, অত আমার কোনও কাজে আসবে না। আর তাছাড়া আপনার দরবারে আমাকে যে আসনে বসিয়েছেন তাতে আমি অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করছি। কারণ এ আসনে কেবলমাত্র আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন প্রাজ্ঞ, প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই বসতে পারেন। বয়সে আমি নিতান্তই যুবক। সাদা দাড়ি গোঁফওয়ালা জ্ঞানী-গুণী উজিরের যোগ্যতা আমি পাবো কোথায়? এসব জেনে শুনেই আপনি আমাকে এই আসনে বসিয়েছেন। এর পিছনে যদি অন্য কোনও উদ্দেশ্য আপনার না থাকে তাহলে তো ব্যাপারটা আরও তলিয়ে ভেবে দেখতে হয়।

বদর মৃদু মুচকী হাসে। বিলোল কটাক্ষ হেনে জামানের দিকে তাকায়। বলে, শোনো, প্রিয়দর্শন উজির, তুমি যা বললে তা খুব সত্যি, এর পিছনে কারণ একটা অবশ্যই আছে। তোমার রূপের আগুনের ঝলকানীতে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়েছে? তোমার লাল টুকটুকে গাল দুটো দেখে, বলতে লজ্জা নাই, আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছি।

জামান বলে, আল্লা আপনাকে শতায়ু করুন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আপনি এই সিংহাসনে আসীন থাকুন। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিন সম্রাট, আমার একটি বিবি আছে। তাঁকে আমি প্রাণাধিক ভালোবাসি। আজ আমি ভাগ্য বিড়ম্বিত। তার সঙ্গে আমার আপত-বিচ্ছেদ ঘটেছে। কিন্তু প্রতিটি দিন রজনীর প্রতিটি মুহূর্ত তার বিরহেই আমি আকুল। অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণছি। আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হবে—তাকে আমার বুকে পাবো। আপনার এই হতভাগ্য দাসানুদাসকে অব্যাহতি দিন। আমি আবার সাগর পেরিয়ে সেই শহরেই চলে যেতে চাই। আপনি আমার ভোগ বিলাসের জন্য যে-সব বিধিব্যবস্থা করেছিলেন, তার জন্যে আমি ধন্য। যাবার আগে আপনার যাবতীয় দান সামগ্রী আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাবো, সম্রাট।

বদর জামানের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। অধীর হয়ো না, উজির, শান্ত হয়ে বসো। যাবার কথা মুখে আনতে নাই। বরং এখানেই থাক। তুমি তো বুঝতে পারছো, তোমার ঐ সুন্দর চোখের তারায় যে নিরুত্তাপ আগুন তার দহনে দগ্ধ হচ্ছে একটি অশান্ত হৃদয়। তাই বলছি, তার পাশে বসেই না হয় কিছু সময় তোমার কাটলো। তোমার এই বাহুলতা যদি তাকে দু-দণ্ডের শান্তি দিতে পারে, দেবে না তুমি?

বদরের এবম্বিধ প্রেমালাপ শুনে জামানের গা রি রি করে ওঠে। মহানুভব সম্রাট, আমি আপনার দাস, আপনার মুখে এসব কথা শোনাও আমার পাপ। আপনি আমাকে মাফ করবেন, আমার দ্বারা এসব কাজ হবে না।

জামানের কথা শুনে বদর হাসে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এতে ঘাবড়াবার কি আছে। তোমার মতো এমন খুব সুরৎ নওজোয়ান ভয় পাচ্ছে কেন? আচ্ছা শোনো, তুমি কি এখনও নাবালক? যদি নাবালকই হও, তোমার নিজের কোনও দায়-দায়িত্ব থাকছে না। আর যদি শক্ত সমর্থ সাবালক হও (আমার ধারণা তুমি তাই) তাহলে পিছপা হচ্ছ কেন? তোমার ইচ্ছে মতো তুমি যা খুশি করতে পার। একটা কথা তো মান, কপালে যা লেখা থাকে না তার কিছুই ঘটতে পারে না জীবনে। পিছাতে হলে বরং আমারই পিছনো উচিৎ। কারণ আমি তোমার থেকে অনেক ছোট।

কামার অল-জামানের মুখ কালো হয়ে ওঠে। মিনতি করে বলে, আপনি মহামান্য সম্রাট। আপনার হারেমে অনেক সুন্দরী মেয়েছেলে আছে। কুমারী দাসী বাঁদীর অভাব নাই। তাদের সকলকে ছেড়ে আমার দিকেই আপনার নজর পড়লো কেন? আপনি তো জানেন, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য যেকোন মেয়েকে যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে গ্রহণ করা আইন সম্মত। তাকে নিয়ে আপনি নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারেন। অজানা কৌতূহল মেটাতে পারেন। তাতে কোনও দোষ হয় না।

বদর মুচকী হেসে চোখ মারলো। —তুমি যা ভাবছো, তার কোনওটাই ঠিক নয় গো প্রিয়দর্শন, কোনওটা ঠিক নয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রুচির। রুচির সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি-ও পালটায়। যখন মানুষের অনুভূতি সূক্ষ্মতর হয় তখন রসবোধেরও অনেক তারতম্য ঘটে। সে ক্ষেত্রে কি উপায়?

কামার অল-জামান ভাবলো, সম্রাটের মতি গতি খারাপ। এখন তাকে কিছু বোঝাতে যাওয়া নিরর্থক। অবশ্য তার কথায় সে যে কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি—তাও বলা ঠিক না। নতুন কোনও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করুক—কে না চায়!

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো চৌত্রিশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার সে শুরু করে ঃ

সুতরাং জামান বলে, মহামতি সম্রাট, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি হতে পারি

একটা শর্তে। আপনি আমাকে কথা দিন, আমাকে নিয়ে আপনি যে খেলাই খেলতে চান আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু শুধু একটি বারের জন্য। দ্বিতীবার আমি আপনার প্রবৃত্তি মেটাতে পারবো না।

বদর স্মিত হেসে বলে, কথা দিলাম।

জামান বলে, আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের আলোর পথ দেখান।

হারেমের নিরালা নিভৃত কক্ষ। জামানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে বদর। এক ঝটকায় মখমলের শয্যায় ফেলে দেয় জামানকে। বদরের এই অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে যায় জামান। নিজেকে রক্ষা করার জন্য বাধা দিতে গিয়ে কি মনে হতেই হাত সরিয়ে নেয়, নাঃ, ঠিক আছে, কথা যখন দিয়েছি, বাধা দেব না। খোদা ভরসা, যা হয় হবে। তাঁর ইচ্ছাতেই এ-সব হচ্ছে। তিনিই করাচ্ছেন।

গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বদর জামানকে চুমায় চুমায় ভরে দিতে থাকে। এতক্ষণে জামানের সন্দেহ হয়, সম্রাট-এর শরীরে খুঁৎ আছে। যতই সে তাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে ততই তার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হতে থাকে। নাঃ, এতো কোনও পুরুষের দেহ নয়। বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জামান। তখন বদর উত্তেজনায় উন্মত্ত। —সোনা, আমাকে তুমি এখনও চিনতে পারছো না? আমি যে তোমার বদর। আমাদের সেই শাদীর রাত তারও আগে আর একটি রাতের স্মৃতি কি তোমার মন থেকে মুছে গেছে?

বদর এবার তার ছদ্মবেশের সকল সাজ খুলে ফেলতে থাকে।

কামার অল-জামান দেখলো, ছদ্মবেশের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো সম্রাট ঘায়ুরের কন্যা বদর। তার নয়নের মণি, বুকের কলিজা।

বহুদিন বাদে আবার তাদের এই মিলনে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে থাকলো। বদর তার কাহিনী বললো জামানকে। জামান শোনালো, তার দুঃখের কিস্‌সা।

জামান বললো, কিন্তু আজ যা করলে তার কিন্তু জবাব নাই বদর।

দেহমন একাকার করে আনন্দে বিভোর হয়ে সারাটা রাত সুখ শয্যায় কাটিয়ে দিলো ওরা।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে বদর এলো আরমানুসের কাছে। অকপটে সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বললো তাকে। আর এও বললো, আপনার কন্যা হায়াৎ এখনও কুমারী। কামার অল-জামানকে আপনি জামাই করতে চেয়েছিলেন। সেই জামান আপনার প্রাসাদেই অপেক্ষা করছে। আপনি ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে হায়াতের শাদীর ব্যবস্থা করতে পারেন।

—কিন্তু মা, তুমি, আরামানুস, আকুলভাবে প্রশ্ন করে, তোমার কোনও অমত নাই?

—আমার মত আছে বলেই বলছি। হায়াৎকে আমি ছোট বোনের মতো, বন্ধুর মতো ভালোবেসে ফেলেছি। ওকে ছাড়া আমি আর বাঁচতে পারবো না। জামানের সঙ্গে তার শাদী হলে আমরা দুই বোন সব সময় এক সঙ্গেই থাকতে পারবো। এতে আমার চেয়ে আর কেউই বেশি খুশি হবে না।

এই সময় কামার অল-জামানকে নিয়ে হায়াৎ এলো সেখানে। আরমানুস বললেন, বাবা, জামান, তুমি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করে আমার এই সাম্রাজ্যের অধিকারী হও। সে তোমার দ্বিতীয় বেগম হয়েই সুখে থাক।

জামান বললো, আপনার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখবো না, সম্রাট। তাছাড়া আমার বদরও যখন চায়, আমার কোনও অমত থাকতে পারে না।

এই বলে সে বদরের দিকে তাকায়। বদর বলে, আমি এতকাল এখানে পড়ে আছি শুধু এই জন্যই। তুমি আসবে, তোমার সঙ্গে হায়াতের শাদী হবে। সে হবে তোমার খাস বেগম। আমি দ্বিতীয়া—তার সেবা দাসী।

আরমানুসের দিকে ফিরে কামার অল-জামান বলে, আপনি তো নিজের কানেই শুনলেন, বদর বলছে, আপনার মেয়েই হবে প্রধান বেগম, সে হবে তার বাঁদী।

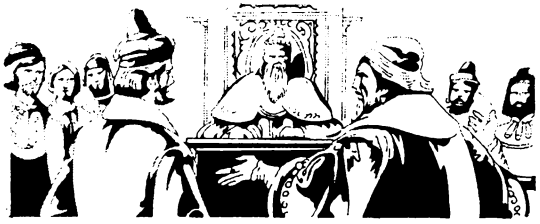

বৃদ্ধ সম্রাট আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অনেকদিন পরে আবার একবার তিনি সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। উজির আমীর ওমরাহদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, কামার অল-জামান আর বদরের বিচিত্র কাহিনী।

দরবারে উপস্থিত সকলে সেই পরমাশ্চর্য কাহিনী শুনে তাজ্জব হয়ে গেলো। সম্রাট ঘোষণা করলেন, আমার একমাত্র কন্যা হায়াৎ অল-নাফুস-এর পাণি গ্রহণ করবে শাহজাদা কামার অল-জামান। এবং আজ থেকে জামান এই এবনী দ্বীপের অধিপতি হচ্ছে।

সম্রাট আরমানুসের ঘোষণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো। এবং সমস্বরে শপথ উচ্চারণ করলো, আজ থেকে কামার অল-জামান আমাদের সম্রাট—আমরা তাঁর একান্ত অনুগত ভৃত্য। তাঁর আজ্ঞাবহ দাস।

সম্রাট আরমানুস সন্তুষ্ট হয়ে সবাইকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। তার নির্দেশে শহরের প্রধান কাজী এসে শাদীনামা তৈরি করলেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করলেন সেই শাদীনামায়। এ সবই কামার অল-জামান এবং হায়াৎ অল-নাফুসের সম্মতিক্রমে তাদের সমক্ষেই সমাধা করা হলো।

সম্রাট আরমানুসের আদেশে দরবার দপ্তর সব বন্ধ রাখা হলো। আজ কোনও কাজ নয়। শুধু আমোদ-আহ্লাদের দিন। খানা-পিনা নাচ-গান বাজনায় মুখর হয়ে উঠলো সারা এবনী দ্বীপ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের আজ অবাধ নিমন্ত্রণ। হাজার হাজার জন্তু-জানোয়ার জবাই করা হলো। দেশের যত মানুষ আছে, সকলকে আজ পেটপুরে খাওয়াতে হবে। এই-ই সম্রাটের হুকুম। গরীবজনে অর্থ পোশাক বিতরণ করা হতে লাগলো। সেনাবাহিনীর মধ্যেও নানা উপহার উপঢৌকন এবং নগদ অর্থ বন্টন করা হলো।

আপামর জনসাধারণ ধন্য ধন্য করতে লাগলো। নতুন সম্রাটের শতায়ু কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকলো।

কামার অল-জামান দুই বেগম নিয়ে সুখে-সচ্ছন্দে ঘর করতে লাগলো। তার ন্যায় বিচার এবং অনুশাসনে প্রজারা মহা খুশি হলো।

কামার অল-জামান তার বাবা শাহরিমানের কাছে দূত পাঠিয়ে জানালো, এবনি দ্বীপের সুলতান হয়ে সে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। খুব শিগ্গিরই সে তাকে দেখতে যাবে। তার আগে সে একবার যুদ্ধ যাত্রা করবে। এখানকার সমুদ্রতীরের এক শহর পশ্চিমী বর্বর ম্লেচ্ছরা আক্রমণ করে তছনছ করে দিয়েছে। তাদের সে শায়েস্তা করতে যাবে।

বছর খানেক বাদে বদর এবং হায়াৎ একটি করে পুত্র লাভ করলো। দুটি শিশুই দেখতে হলো চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর। একই সঙ্গে হেসে খেলে তারা মানুষ হতে থাকলো। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাদের আর কেউ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি।

এই হলো কামার অল-জামান আর বদরের কাহিনী।

শাহরাজাদ স্মিত হেসে চুপ করলো।

কাহিনী শুনতে শুনতে দুনিয়াজাদের ধবধবে সাদা চাঁদের মতো মুখে আবীরের ছোঁয়া লেগেছে। চোখে মুখে খুশির বন্যা।

শাহরাজাদ একটানা বলতে বলতে কিছুটা বা ক্লান্ত। এক গেলাস শরবৎ খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিলো। দুনিয়াজাদ লজ্জা জড়ানো কণ্ঠে বলে, দিদি, কি গল্পই তুমি শোনালে। সারা শরীর-এ আমার তুফান লেগে গিয়েছিলো। এ সব গল্প শুনলে কি নিজেকে ঠিক রাখা যায়, বলো? দিদি, এবার তুমি আলা অল-দিন এর কাহিনীটা শোনাও!

শাহরাজাদ বললো, কিন্তু আলা অল-দিন তো একটা ছেলে!

শাহরাজাদের কাহিনী তন্ময় হয়ে শুনেছে সুলতান শাহরিয়ার। শুনতে শুনতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে—কামার অল-জামানের সুখ-দুঃখের সায়রে। শাহরিয়ার বললো, সত্যিই শাহরাজাদ, তোমার কিস্‌সা বলার কায়দা বড় অসাধারণ। বড় ভালো লেগেছে। আর একটা এই রকম গল্প শোনাও।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ বলে আজ আর সময় নাই, জাঁহাপনা, এবার বিশ্রাম করুন, কাল রাতে আবার নতুন কিস্‌সা শুরু করবো।

দুশো সাঁইত্রিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে শুরু করে ঃ

কোনও এক সময়ে কুফা শহরে এক সওদাগর বাস করতো। তার নাম বাহার। যথাকালে শাদী করার এক সাল বাদে তার একটি পুত্র সন্তান হয়। আদর করে ছেলের সে নাম রাখলো, খুশ বাহার।

ছেলের জন্মের সাতদিন পরে বাহার বাঁদী বাজারে গেলো। উদ্দেশ্য—একটি কাজ-কাম করার জন্য বাঁদী কেনা। বিবির সদ্য বাচ্চা হয়েছে, তার সেবা যত্ন তথা ঘরের কাজ-কাম করানোর জন্য একটা লোক না হলে চলছে না। বাজারে ঢুকে সে পছন্দসই মেয়েছেলে খুঁজতে থাকে। নানা জাতের নানা বয়সের হরেক কিসিমের ছেলে-মেয়ে আনা হয় বিক্রী করতে। বাহার ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে একটা আধাবয়েসী মোটামুটি সুশ্রী মেয়েকে দেখে তার পছন্দ হয়। মেয়েটির পিঠে বাঁধা ছিলো একটা ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা মেয়ে। ওয়াদা হলো—যে তাকে কিনতে চাইবে ঐ বাচ্চা সুদ্ধই কিনতে হবে। দালালকে দাম জিজ্ঞেস করে বাহার। দালাল বলে, দরাদরি নাই, বাচ্চা আর মেয়েটার জন্য পঞ্চাশ দিনার লাগবে।

বাহার বলে, ঠিক আছে, চুক্তিনামা তৈরি কর।

চুক্তিতে সই করে পঞ্চাশ দিনার দিয়ে মেয়ে আর মেয়ের মাকে ঘরে নিয়ে আসে সওদাগর।

বিবি দেখে খুশি হলো, কিন্তু কুণ্ঠিতভাবে বললো, কী দরকার ছিলো অতগুলো পয়সা খরচ করার। আমি তো আর রুগী হয়ে পড়িনি। আস্তে আস্তে আমিই সব কাজ চালিয়ে নিতে পারতাম। শুধু শুধু ফালতু একটা খরচের ফেরে পড়ার কী দরকার ছিলো।

সওদাগর বলে, আসল কথা কি জান, বিবিজান, ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে বড় মায়া হলো। দেখ না, কী সুন্দর সুরৎ। ওর ওই টলটলে মুখ, ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। বড় হলে কী অপূর্ব সুন্দরী হবে ভাবো। আমার খুশ বাহারের সঙ্গে মানাবে কেমন বলো? ওরা দুটিতে একসঙ্গে হেসে খেলে মানুষ হবে। তারপর সময়কালে ওদের শাদী দিয়ে দেব। ভালো হবে না?

—সে তো খুবই ভালো হবে। কিন্তু ভালো করে মানুষ করতে পারলে তবে তো!

বাহার বলে, সে আমার কোনও কষ্ট হবে না। ওজন্যে তুমি ভেবো না বিবিজান। বড় হলে মেয়েটা তামাম আরব পারস্য তুরস্কের মধ্যে সেরা হবে, তুমি দেখে নিও।

সওদাগর বিবি জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গা বাছা, তোমার নাম কী?

মেয়েটি নম্র কণ্ঠে জবাব দেয়, আমার নাম হাফিজা।

—বাঃ, বেশ নাম তো। তা তোমার মেয়েটার কী নাম?

মেয়েটি জবাব দেয়, নসীবা।

—চমৎকার। তোমার নাম হাফিজা আর তোমার মেয়ের নাম নসীবা। তোমরা আমার ঘরে এলে—আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার ঘরে মঙ্গলবাতি জ্বলতে থাকবে। আমাদের নসীব ফিরে যাবে—এই কামনা করি।

তারপর স্বামীর দিকে ফিরে বললো, কিন্তু ঘরে নতুন কোনও দাসী বাঁদী কিনে আনলে নামকরণ করতে হয়। আর সে নামকরণ ঘরের মালিকই করে। তাই ওদের পুরনো নামে তো চলবে না, নতুন নামকরণ কর তুমি।

সওদাগর বলে, না, তুমি ঘরের মালকিন, তুমিই নামকরণ কর।

—আমাকে যদি বলো আমি বাচ্চাটার নাম রাখবো, খুশ নাহার।

সওদাগর বলে, বাঃ চমৎকার, খুশ বাহার আর খুশ নাহার বেড়ে মিলিয়েছ তো।

খুশ বাহার আর খুশ নাহার একসঙ্গে মানুষ হতে থাকে। দিনে দিনে তারা বড় হয়। ঠিক যেন দুটি ফুটন্ত গুলাব। নাওয়া খাওয়া বেড়ান, খেলা-ধুলা সব সময়েই তারা এক আত্মা। লোকে দেখে বাহবা দেয়, কি সুন্দর দুই ভাই-বোন। খুশ বাহারও জানে খুশ নাহার তার বোন। ওদের মা বাবা কখনও দুটিকে আলাদা চোখে দেখে না।

খুশ বাহারের বয়স যখন পাঁচ, তার বাবা খুব ঘটা করে তার ছুন্নৎ করে দিলো। এই উৎসবে আত্মীয় বন্ধু পাড়াপড়শীদের পেট পুরে ফলার খাওয়ালো সে। সবাই সবুজ পতাকা হাতে কুফা শহরের পথে পথে পরিক্রমা করতে করতে সওদাগর সন্তানের শতায়ু কামনা করলো। একটা সুসজ্জিত খচ্চরের পিঠে বাদশাহী সাজে সাজানো হয়েছিলো। আর একটা খচ্চরে চেপে খুশ নাহার যাচ্ছিল তার পাশে পাশে। হাতে তার পাখা। খুশ বাহারকে সে হাওয়া করতে করতে চলছিলো। মেয়েদের উলুধ্বনি আর ছেলেদের আনন্দ উল্লাসে সেদিন সারা শহর উচ্চকিত হয়ে উঠেছিলো। রাস্তার দুধারে শতশত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো এই ছুন্নৎ মিছিল দেখার জন্য। সেদিন গর্বে বুক ফুলে উঠেছিলো সওদাগরের।

পথ পরিক্রমা শেষ করে আবার মিছিল ফিরে আসে সওদাগরের বাড়ির ফটকে। এবার যে যার মতো ঘরে ফিরে যায়। যাবার আগে সবাই কামনা করে সওদাগর সন্তানের সুখের জীবন।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো আটত্রিশতম রাত্রে আবার শুরু করে ঃ

খুশ বাহারের বয়স যখন বার, তার বাবা একদিন বললো, বেটা, এবার তুমি বড় হয়েছ, এখন থেকে তুমি আর খুশ নাহারকে বোনের মতো দেখবে না। সে তোমার সহোদরা বোন নয়। আমাদের বাঁদী হাফিজার মেয়ে সে। কিন্তু বাঁদীর মেয়ে বলে তাকে তোমার চেয়ে কম আদরে মানুষ করা হয়নি। তার এখন দেহে যৌবন আসছে। আমরা ঠিক করেছি, তোমার বয়স কালে তার সঙ্গে তোমার শাদী দেব। তাই এখন থেকে তার সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা বন্ধ রাখতে হবে। খুশ নাহার বোরখা পরে পর্দানসিন হয়ে থাকবে।

সে রাতেই খুশ বাহার খুশ নাহারের সঙ্গে সহবাস করলো। এইভাবে আরও পাঁচটা বছর কেটে যায়। দিনে দিনে খুশ নাহারের দেহে যৌবনের ঢল নামে। সে-সময়ে কুফা

শহরে তার মতো সুন্দরী মেয়ে আর একটাও ছিলো না। শুধু রূপসীই না, তার মতো নম্র বিনয়ী শিক্ষিতা মেয়ে খুব কমই দেখা যেত। অবসর সময়ে সে কোরান, সাহিত্য এবং নানা প্রকার বিজ্ঞান দর্শন পড়ে দিন কাটাতো। এছাড়া তার ছিলো গানের সাধনা। খুশ নাহারের মধুর সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হোত সকলে।

খুশ বাহার আর খুশ নাহার প্রতিদিন বাগিচায় বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিত। সেই নিরালা কুঞ্জবনে প্রাণ খুলে তারা মনের কথা বলতো। কখনও বা পুকুরের সান বাঁধানো সিড়ির ধাপে বসে তারা জল নিয়ে খেলা করতো। খিদে পেলে, সঙ্গে আনা তরমুজ, ভুট্টার খই, বাদাম পেস্তা খেত। বাগিচার গুলাব যুঁইএর গন্ধে দুটি তরুণ হৃদয় মাতোয়ারা হয়ে উঠতো। বসন্তের ছোঁয়া লাগতো প্রাণে। অনর্গল আবৃত্তি করে কবির ভাষায় নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করতো তারা। কখনও খুশ বাহার আব্দার ধরতো, এবার তোমার বেহালা শুনবো, সোনা।

এইভাবে তাদের প্রথম যৌবন-বসন্তের সুমধুর দিনগুলো প্রকৃতির শোভা দেখে আর গান গেয়ে গেয়ে কেটে যেতে থাকে।

কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন সুখ বেশি দিন কারো সয় না। আল্লাহ কারো ভাগ্যে বুঝি চিরকালের জন্য সুখ-ভোগ লিখে দেন না। তাই খুশ বাহার আর খুশ নাহারের সুখের দিনও একদিন শেষ হয়ে যায়।

কুফার সুবাদার খুশ নাহারের রূপ আর গুণের কথা শুনে মনে মনে ঠিক করলো, এই পরমাসুন্দরী গুণবতী মেয়েটাকে যদি সে ভাগিয়ে এনে খলিফা আবদ-অল মালিক ইবন মারবানকে ভেট দিতে পারে তাহলে তার আখেরে অনেক উন্নতি হবে। একদিন সে এক বুড়িকে পাঠালো খুশ নাহারের কাছে। এই শয়তানী বুড়িটা মেয়ে পটানোর কাজে ওস্তাদ। সুবাদার বললো, দেখ বুড়ি, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—বলুন, হুজুর, কী-এমন কঠিন কাজ। জিন্দগীভর অনেক কঠিন কাজইতো দেখলাম। সবই আমার কাছে অতি সাধারণ মনে হয়েছে।

সুবাদার বলে, কিন্তু এবারের কাজটা অত সহজ নাও হতে পারে। সওদাগর বাহার-কে জান?

খুব জানি, হুজুর।

—তার বাঁদী হাফিজার একটা পরমা সুন্দরী লেড়কী আছে—খুশ নাহার।

বুড়ি ঘাড় নাড়ে, তাও জানি হুজুর। কী আমার জানা নাই, তামাম কুফা শহরটা আমার নখ দর্পণে। কার ঘরে কি জিনিস আছে তা কি আমার জানতে বাকী আছে। খুশ নাহার যে খালি দেখতেই সুন্দরী তাই না, তার মতো নাচ গান লেখা পড়া জানা মেয়ে সারা তল্লাটে কোথাও খুঁজে পাবেন না, হুজুর।

সুবাদার বলে, বাঃ, তুমি তো সবই জান দেখছি। ঠিক আছে এখন তোমার কাজ হলো, যেন তেন প্রকারে ঐ মেয়েটাকে আমার কাছে হাজির করতে হবে। আমি খলিফাকে ভেট দেব।

বুড়ি বলে, আর বলতে হবে না, হুজুর। আমি সব বুঝতে পেরেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাজ আমি হাসিল করে দেবই।

পরদিন সকালে শয়তানীটা কিম্ভূতকিমাকার বেশে সাজলো। গায়ে চাপালো একটা মোট পশমের আলখাল্লা। গলায় পরলো একটা অজানুলম্বিত হাড়ের মালা। হাতে নিলো ইয়া বড় একখানা চিমটি। তারপর রওনা হলো সওদাগর বাহারের বাড়ির পথে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে পাড়া কাঁপিয়ে আওয়াজ তুললো, খোদা হাফেজ। আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ ছাড়া কোনও গতি নাই।' এই রকম নানা ধ্বনি তুলতে তুলতে সে এগোতে থাকে। রাস্তার দু-পাশে লোকজন জড়ো হতে লাগলো। সবারই কৌতূহল, হয়তো কোন

পীর পয়গম্বর এসেছে, বাড়ির দরজা খুলে সবাই বেরিয়ে এলো। এইভাবে সে সওদাগরের বাড়ির দরজার সামনে এসে থামে। মুখে তখনও বলে চলেছে, খোদা হাফেজ, খোদা মেহেরবান।

সওদাগরের ছেলে খুশ বাহার বেরিয়ে এসে দেখলো, এক ধর্মাত্মা বৃদ্ধা তার দরজায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—আপনি কী চান বুড়ি মা?

বৃদ্ধা বলে, বাবা, নামাজের সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি তোমার বাড়িতে আমার সকালবেলার নামাজটা সেরে নিতে চাই।

—এতো খুবই আনন্দের কথা বুড়িমা? আসুন ভিতরে আসুন। হাত-মুখ ধুয়ে রুজু করে নিন। আমি আপনার নামাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বুড়িটাকে সঙ্গে করে খুশ বাহার বাড়ির অন্দরে নিয়ে আসে। খুশ নাহারের ঘরে এনে বসায়। বুড়ি খুশ নাহারকে দেখে হাসে—আশীর্বাদের ঢংএ হাত তুলে বলে, খোদা তোমার ভালো করবেন, বেটি।

খুশ নাহার বুড়িকে দেখে শ্রদ্ধাবনতা হয়ে বলে, আপনি একটু জিরিয়ে নিন বুড়ি মা। আমি আপনার শোবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—না মা, থাক। এখন নামাজের সময়, আগে নামাজ সারতে দাও আমাকে।

আর কথাটি না বলে—শয়তানীটা মক্কার দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে বসে ঢিব ঢিব করে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলো।

নামাজের ভন্ডামী শেষ হলো। বুড়ি যাবার নাম করে না। খুশ বাহার এবং খুশ নাহার ধর্মাত্মা বৃদ্ধার অবস্থানে খুশিই হয়। খুশ নাহার বলে, বুড়ি মা, আপনি আজকের দিনটা এখানেই বিশ্রাম করুন।

বুড়িটা বলে, মা, বিশ্রাম কাকে বলে আমি জানি না। সংসারের দুঃখ তাপে যারা কাতর তারাই বিশ্রাম চায়। কিন্তু আমি তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছি। ক্লান্তি আমাকে ছুঁতে পারে না। একবার যে আল্লাহর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে সে বেহেস্তের আনন্দ পায়।

বৃদ্ধার মুখে ধর্মকথা শুনে নাহার মুগ্ধ হয়।—আমাদের ইচ্ছা আজ রাতে আপনি আমাদের সঙ্গে একটু কিছু খানা পিনা করুন।

—কিন্তু মা, তা তো হবে না। আমি তো এখন রোজা করছি। রোজা করলে আত্মার শুদ্ধি হয়। তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে খানা পিনা কর, আমি দেখেই আনন্দ পাবো।

খুশ নাহার তার স্বামী খুশ বাহারের কাছে গিয়ে বললো, দেখ, মনে হচ্ছে, আমাদের ঘরে আল্লার পয়গম্বর এসেছেন। তুমি তাঁকে আদর যত্ন করে এখানেই রেখে দাও। আমাদের মঙ্গল হবে।

খুশ বাহার বললো, সে কথা আমি আগেই ভেবেছি নাহার। তার জন্যে—ঐ পাশের ঘরটায় সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি। তার থাকা খাওয়া, নামাজের যাতে কোনও রকম অসুবিধে না হয় তার সব ব্যবস্থাই আমি করেছি। সে-ঘরে কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারবে না—সে দিকে আমি নজর রাখবো।

সারারাত ধরে বুড়িটা নামাজের ভন্ডামী করে আর তারস্বরে কোরান পড়ে কাটালো। খুব সকালে হাতমুখ ধুয়ে খুশ বাহারকে সে বললো, এবার তা হলে চলি, বাবা। আল্লাহ তোমাদের ভালো করবেন।

খুশ নাহার বললো, কিন্তু বুড়ি মা, আপনি এই ভাবে আমাদের ফেলে চলে যাবেন? আমরা চেয়েছিলাম, আমাদের এই গরীব খানাতেই বরাবরের জন্য থাকুন। আপনাকে পেয়ে

আমরা বড় খুশি হয়েছি। সেই জন্যে আমাদের সব চাইতে ভালো ঘরখানা আপনার থাকার উপযোগী করে সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়েছি। আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করুন বুড়ি মা। আপনি এখানেই থাকুন।

—আল্লাহর দোয়া সব সময়েই তোমরা পাবে বাছা। আদৎ মুসলমানের প্রকৃত গুণের অধিকারী হয়েছ তোমরা। দয়া ধর্মই তোমাদের অন্তর জুড়ে আছে, আমি তা বুঝতে পেরেছি। সেই জন্যেই আমি তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। এর পরে যখন আসবো, তোমাদের আশ্রয়েই উঠবো। কিন্তু এখন আমাকে যেতে হবে। কুফার ধর্মস্থান গুলো ঘুরে ঘুরে দেখবো। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো বাছা। আমি সদাই তোমাদের ভালোর জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবো। সব দরগা মসজিদগুলো দেখা শেষ হলে আবার আমি তোমাদের আশ্রয়েই ফিরে আসবো। কিন্তু এখন আমাকে যেতে দাও, বাছা।

হায় রে বোকা মেয়ে খুশ নাহার, তুমি চিনতে পারলে না এই শয়তানীকে। বুঝতে পারলে না তার বদমাইশী? সে যে তোমার সর্বনাশ করার ফিকিরে ঘুরছে। তোমাদের সুখের সংসার সে ছারখার করতে এসেছে। কিন্তু তুমি সরল মেয়ে, কি করে বুঝবে এই কুটিলতা! আর তাছাড়া তোমার নসীবের লেখাই বা তুমি এড়াবে কি করে? কোনও মানুষই তার অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না।

শয়তান বুড়িটা সোজা সুবাদারের কাছে আসে। বুড়িকে দেখে সুবাদারের চোখ নেচে ওঠে, কি গো, খবর কী? ভালো তো?

বুড়ি বলে, খবর খারাপ হবে কেন হুজুর?

—তা কি রকম দেখলে, মাল কেমন?

—আহা, কি করে তার অমন রূপের বর্ণনা দিই। এমন রূপসী মেয়ে এর আগে কখনও দেখিনি, হুজুর। যেন একেবারে বেহেস্তের ডানা কাটা হুরী।

সুবাদার আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, ইয়া আল্লাহ। তারপর বলো, বলো বুড়ি। আর কি দেখলে?

—তার সুরেলা কণ্ঠের কথা যদি একবার শুনতেন, হুজুর, একেবারে মধু-ঢালা। কথা তো নয়, যেন ঝরনার কলকল আওয়াজ। আর কী তার হরিণীর মতো কাজল কালো আনত চোখ!

সুবাদার বলে, বহুৎ আচ্ছা, তোমাকে তো বলেছি বুড়ি, খলিফাকে ভেট দেব, যেমন করেই পার তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আনতেই হবে।

বুড়ি বলে, কাজ আমি হাসিল করে দেব, হুজুর। কিন্তু মাসখানেক সময় লাগবে। হুট করে বললেই তো আর তাকে ঘরের বাইরে আনতে পারি না। তার জন্যে নিত্যি আমাকে সেখানে যাতায়াত করতে হবে। আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা করতে হবে। আমাকে তারা যথেষ্টই শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়েছে। তবুও সেটা আরও দড় করতে হবে। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে হবে যাতে খুশ নাহার আমার সঙ্গে বাইরে বেরুতে কোনও রকম ইতস্ততঃ না করে।

সুবাদার বললো, তা ঠিক। তাড়াহুড়া করতে গেলে গোটা ব্যাপারটাই হয়তো কেঁচে যেতে পারে। এই নাও, হাজার খানেক দিনার রাখো। কাজ হয়ে গেলে আরও দেবো।

দিনারগুলো কোমরে বেঁধে বুড়িটা বলে, যাই, আর দেরি করবো না।

প্রতিদিন সে খুশ বাহারের বাড়ি যায়। নামাজের ভড়ং করে। কোরান পাঠের ঢং করে। বড় বড় বুলি আওড়ায়। বাণী দেয়। এই ভাবে গোটা একটা মাস কেটে যায়। বুড়িটা একদিন নাহারকে বললো, কুফার সুবাদারকে জান, মা? আল্লাহর পয়গম্বর—অমন পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ জন্মায় না। তাঁর কাছে দুদণ্ড বসলে জীবন জুড়িয়ে যায়। আল্লাহর গুণগানে তিনি সদাই ব্যাকুল।

তাঁকে দেখার জন্য কত দূর দেশ থেকে মানুষজন আসছে। তুমি যদি চাও মা, আমি তোমাকে তাঁর দর্শন করিয়ে আসতে পারি। একবার তাঁর দোয়া পেলে, জীবনে অনেক শান্তি পাবে।

খুশ নাহার বলে, কিন্তু আমার স্বামী এখন ঘরে নাই। তাকে না বলে যাই কি করে। সে ফিরে আসুক, তার কাছ থেকে মত নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যাবো, বুড়ি মা।

শয়তান বুড়ি বলে, তোমার শাশুড়িকে বলে চলো, তাহলেই হবে। তাছাড়া, এই তো যাবো আর আসবো। আমরা তো সেখানে বসবো না। শুধু একবার দর্শন করেই চলে আসবো। তোমার স্বামী ফেরার আগেই আমরা আবার ফিরে আসবো।

খুশ নাহার শাশুড়ির কাছে গিয়ে বলে, মা, এখানকার সুবাদার নাকি আল্লাহর পয়গম্বর। তাকে দেখার জন্যে সারা দেশের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। বুড়ি মা আমাকে দর্শন করাতে নিয়ে যেতে চান। আপনি যদি মত করেন তবে যেতে পারি।

—কিন্তু বাছা, খুশ বাহার বাড়িতে নাই। সে যদি ফিরে এসে দেখে তুমি ঘরে নাই, বড় আঘাত পাবে। তার চেয়ে বরং অপেক্ষা কর—সে আসুক তার মত নিয়েই যাওয়া ভালো।

শয়তান বুড়িটা এগিয়ে এসে বলে, তুমি মা নিশ্চিন্ত থাক, ওর স্বামী ফেরার অনেক আগেই তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

খুশ বাহারের মা আর আপত্তি করতে পারে না—ঠিক আছে যাও। বেশি দেরি করো না। সকাল-সকাল ফিরে এসো।

খুশ নাহারকে সঙ্গে নিয়ে বুড়িটা সুবাদারের প্রাসাদ সন্নিহিত নিরালা বাগিচার একপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বুড়িটা বলে, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি।

হন হন করে সে প্রাসাদের অন্দরে ঢুকে সুবাদারকে খবর দেয়, মাল হাজির, হুজুর।

সুবাদার বাইরে এসে নাহারকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। মনে মনে সে তার একটা ছবি এঁকেছিলো। কিন্তু সে কল্পচিত্রের সঙ্গে এ মেয়ের রূপের জৌলুসের অনেক ফারাক। এ যেন কল্পলোকের হুরী।

এই সময় রাত্রির অবসান হয়। শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

দুশো একচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে শুরু করে।

খুশ নাহার বদখদ চেহারার এই লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি নাকাবে মুখ ঢেকে জড়সড় হয়ে পড়ে। সেই বুড়িটা কিন্তু আর ফিরে আসে না। ধীরে ধীরে তার সামনে সব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। শয়তান বুড়িটা তাকে ধোঁকা দিয়ে তুলিয়ে এনেছে এই বাঘের খাঁচায়। এখান থেকে তো পালাবার আর পথ নাই। কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তার।

সুবাদার-এর চোখ খুশিতে নেচে ওঠে। নাহারকে বলে, ভিতরে এসো।

কলের পুতুলের মতো নাহার প্রাসাদের অন্দরে যায়। সুবাদার কাগজ কলম নিয়ে খলিফা আবদ-অল মালিক ইবন মারবানকে একখানা চিঠি লেখে। প্রহরীদের প্রধান সর্দারকে ডেকে বলে, এই লেড়কীকে দামাসকাসে খলিফার কাছে নিয়ে যেতে হবে। এই নাও খৎ, তাক দিয়ে বলবে, আমি পাঠিয়েছি।

—জো হুকুম হুজুর।

সর্দার সেলাম ঠুকে নাহারকে নিয়ে চলে যায়। জোর জবরদস্তি করে ঘোড়ার পিঠে চাপায়। সামনে পিছে আরও ছ'জন জাঁদরেল ঘোড়সওয়ার চলে পাহারায়।

সারাটা পথ নীরবে চোখের জল ফেলতে থাকে নাহার। দামাসকাসে পৌঁছে প্রহরী সর্দার চিঠিখানা আর নাহারকে জমা করে দেয় খলিফার একান্ত সচিবের হাতে। সচিবের কাছ থেকে রসিদ নিয়ে আবার সে ফিরে যায় কুফায়।

পরদিন সকালে খলিফা হারেমে আসে। বেগম আর বোনকে বলে, কুফার সুবাদার একটি খুবসুরৎ বাঁদী পাঠিয়েছে। সে এক সওদাগরের কাছ থেকে কিনেছে আমার জন্য। দূর দেশের কোন এক সুলতানের নাকি মেয়ে।

বেগম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, খোদা আপনাকে আনন্দে রাখুন। কী নাম তার? দেখতে কেমন? কালো না ফর্সা?

খলিফা বললো, আমি এখনও তাকে চোখে দেখিনি।

খলিফার বোনের নাম দাহিয়া। বললো, কোথায় তাকে রাখা হয়েছে, দাদা? চলো তো গিয়ে দেখি, কেমন সে সুন্দরী।

প্রাসাদেরই একটা কামরায় নাহারকে তোলা হয়েছে। দাহিয়া দেখলো, মেয়েটি বয়সে কচি, সত্যিই অপরূপ সুন্দরী। পথের ধকলে সে বড় কাহিল হয়ে পড়েছে। দারুণ গ্রীষ্মের খরতাপে চোখ মুখ ঝলসে তামাটে হয়ে গেছে। পালঙ্কের এক পাশে বসে অঝোর নয়নে কাঁদছিলো। দাহিয়া অবাক হয়। কাছে এগিয়ে আসে। নাহারের মাথায় হাত রেখে বলে, কাঁদছো কেন বোন? কেউ তোমাকে তকলিফ দিয়েছে?

নাহার কথা বলে না, শুধু ঘাড় নেড়ে জানায়—না।

তবে কান্নার কী আছে। জান তুমি এখন কোথায় এসেছ?

নাহার এবারও ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ সে জানে।

দাহিয়া আরও অবাক হয়, তুমি এখন খলিফার পিয়ারের বাঁদী হতে চলেছ। যে-কোনও মেয়ের কাছে এটা কত সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর তুমি কাঁদছো? কেন, কীসের দুঃখ তোমার? এখানে তুমি যে রকম সুখ বিলাসের মধ্যে থাকবে তা পেলে যে কোনও মেয়েই বর্তে যায়। আমি বুঝতে পারছিনা বোন, কেন তুমি কাঁদছো? এই ভাগ্য হলে অন্য যে কোনও সুন্দরী মেয়েরই মুখে হাসির খৈ ফুটতো।

এবার খুশ নাহার তার আয়ত চোখ মেলে তাকায়। —মালকিন, এ শহরটার নাম কী?

দাহিয়া বলে, দামাসকাস। কেন, সওদাগর তোমাকে বলেনি, কোথায় কার বাঁদী করে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? খলিফা আবদ-অল মলিক-ইবন মারবানের ভোগবিলাসের জন্য তোমাকে কেনা হয়েছে—সে কথা তো তোমাকে তার জানানো উচিত ছিলো! এখন তুমি আমার বড় ভাই খলিফার সম্পত্তি। উচিৎ দাম দিয়ে তোমাকে কেনা হয়েছে। সুতরাং চোখের জল মোছ বোন। কী করে খলিফার মুখে হাসি ফোটাতে পারবে—সেই হবে তোমার একমাত্র কাজ। তোমার নাম কী—?

—বাড়িতে আমাকে সবাই খুশ নাহার বলে ডাকে।

এই সময়ে খলিফা ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে নাহার নাকাবে মুখ ঢাকে। হাসি মুখে সে নাকাবের পাশে এগিয়ে এসে বললো, আহা, লজ্জা কেন, নাকাব তোলো, তোমার সুরৎ দেখবো বলেই তো এলাম।

কিন্তু নাকাব সরানো দূরে থাক। বোরখাখানা আরো টেনেটুনে নিজেকে আরও গুটিয়ে লি নাহার।

খলিফা রুষ্ট হলো না, বরং উচ্চৈস্বরে হো হো করে হেসে উঠলো। বোনের দিকে তাকিয়ে বললো, লেড়কীকে তোমার হেপাজতে রেখে যাচ্ছি বোন। দিন কয়েকের মধ্যে ঠিক মতো তালিম দিয়ে একে তৈরি করে দেবে। এই রকম জবুথবু হয়ে থাকলে তো চলবে না।

খলিফা আর একবার বোরখায় জড়ানো পাকানো নাহারের দেহটা লক্ষ্য করে। কিন্তু শুধুমাত্র তার শশাঙ্ক শুভ্র হাতের দু-খানা কব্জী ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না। দেখতে না

পাওয়ার অদম্য কৌতূহল বুকের মধ্যে দাপাদাপি করতে থাকে। মনের যন্ত্রণা মনেই চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় খলিফা।

দাহিয়া নাহারকে সঙ্গে করে হামামে নিয়ে যায়। ভালো করে ঘষে মেজে তাকে গোসল করাতে বলে।

স্নান সমাপন করে যখন সে দামী সাজ পোশাকে সেজে গুজে বাইরে আসে দাহিয়ার দেখে তাক লেগে যায়। আহা মরি মরি—একি রূপ! যেন আশমানের বিজলী বাঁধা পড়ে গেছে ধরায়।

নাহারের গলায়, কানে, মাথায় মুক্তা হীরা চুনী পান্নার জড়োয়া গহনা ঝলমল করতে থাকে। পাতলা ফিনফিনে হালকা পোশাকের তলায় চাঁপার কলির মতো তার নিরুত্তাপ শরীরের স্বর্ণাভা যে কোনও পুরুষের বুকে তুফান তুলতে পারে। দাহিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে নাহারকে দেখতে থাকে।

এমন সুন্দর সাজ পোশাকে সেজে দামী দামী অলঙ্কার পরেও কিন্তু নাহারের মুখে হাসি ফোটে না। বরং কান্না আরো বেড়ে যায়। চোখের জলে বুক ভাসতে থাকে। দাহিয়ার মনে সন্দেহ জাগে। এই কান্নার কোনও হদিশ করতে পারে না সে।

ঘরের নিরালা কোণে বসে নাহার তার অদৃষ্টের কথা ভাবে। নিজের নীড়ে এতকাল সুখের সায়রে ডুবে ছিলো সে। কিন্তু বিধাতা বুঝি তার এত সুখ সহ্য করতে পারলেন না। নাহার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। না জানি তার নসীবে কি লেখা আছে। খুশ বাহারের জন্য তার মনটা পুড়ে যেতে থাকে। দিন রাত শুধু তার সোহাগ ভরা চাঁদের মতো মুখখানাই ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। খানা পিনা বন্ধ করে নিঃসঙ্গ ঘরে সে দিন কাটায়। চিন্তা জীয়ন্ত মানুষকে দহন করে। খুশ নাহার শয্যা আশ্রয় করে, দিনে দিনে তার শরীর অবসন্ন হতে থাকে। প্রথমে ঘুস ঘুসে কিন্তু কয়েকদিন পর হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এলো তার। সারা দামাসকাসের নামজাদা হেকিমকে ডাকা হলো। পুরোদমে চিকিৎসা পত্র চলতে থাকলো। কিন্তু জ্বর আর ছাড়ে না।

এদিকে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে খুশ বাহার এ ঘর ও ঘর খুঁজতে থাকে—নাহার গেলো কোথায়। নাহার—নাহার বলে দু তিন বার ডাকে। কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। খুশ বাহার ভাবে নাহার বোধ হয় তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মেতেছে। আবার ডাকে, নাহার সোনা, কোথায় লুকিয়ে আছ, বেরিয়ে এসো, মানিক।

কিন্তু সাত রাজার ধন মানিক তখন ঘরে থাকলে তো সাড়া দেবে! খুশ বাহারের আর ধৈর্য মানে না। মা-এর কাছে ছুটে যায়, মা-মাগো নাহার কোথায়?

মা এতক্ষণ একলা ঘরে বসে প্রাণপণে কান্না চাপার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, এখন খোদাই একমাত্র ভরসা বাছা, তাকে বোধ হয় আর ফিরে পাবো না। রোজকার মতো সেই বুড়িটা আজও এসেছিলো। নাহারকে সঙ্গে নিয়ে সে সুবাদারের কাছে গেছে। যাবে আর ফিরে আসবে এই ওয়াদা করে সে নাহারকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেলো সে ফিরলো না। সেই থেকে আমি তোর অপেক্ষায় বসে আছি, বাবা। যা একবার গিয়ে খোঁজ কর। বুড়িটা কোথায় নিয়ে গেলো তাকে কিছুই বুঝতে পারছিনা।

খুশ বাহার আর তিলমাত্র অপেক্ষা করে না। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে পৌছায় সুবাদারের প্রাসাদে। কোনও রকম আদব কায়দা না দেখিয়ে সে সোজা সুবাদার-এর সামনে এসে বলে, আমার নাহার কোথায়? কোথায় সেই বুড়ি?

—নাহার? বুড়ি? তারা কে? এখানে আসবে কেন?

খুস বাহার আরও গলা চড়িয়ে বলে, নাহার আমার বিবি। আর বুড়িটাকে ভেবেছিলাম

আমরা সাধুসন্ত মানুষ। পরণে মোটা পশমের আলখাল্লা আছে। গলায় একটা হাড়ের মালা, আর হাতে একখানা মস্ত বড় চিমটি আছে তার। আপনার কাছে আসবে বলে সে আমার বিবিকে নিয়ে বেরিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, ঐ পীরের ছদ্মবেশে বুড়িটা মহা শয়তান।

সুবাদার যেন আকাশ থেকে পড়ে, তাই নাকি! আহা-হা রে, ঐ সব শয়তান বদমাইশদের বাড়ির অন্দরে ঢুকতে দিতে আছে কখনও?

—আপনি দেখলে আপনার মনেও ভক্তি আসবে। এমনি তার সাজের ভড়ং। প্রহরে প্রহরে নামাজ পড়ে। কোরান-এর পাতা থেকে মুখ তোলেনা। যেন সাক্ষাৎ আল্লাহর পয়গম্বর।

সুবাদার বলে, তোমার বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু লোক। আমার পক্ষে যতখানি করা সম্ভব আমি নিশ্চয়ই করবো। তুমি এক কাজ কর বাবা, আমার কোতোয়ালের সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বলো তাকে। সে নিশ্চয়ই খুঁজে বের করে দেবে তোমার বিবিকে। আর ঐ বুড়িটাকে পেলে আমার কাছে নিয়ে আসতে বলবে। কি করে ধোলাই দিতে হয় আমি বুঝিয়ে দেব তাকে হাড়ে হাড়ে।

খুশ বাহার কোতোয়ালের কাছে যায়। তখন সে ইয়ার বক্সী নিয়ে পায়ের উপর পা তুলে মৌজ করে চরস টানছিলো। হঠাৎ এই অসময়ে আচমকা ঘরের ভিতরে খুশ বাহারকে ঢুকতে দেখে ভ্রু দুটো কপালে তুলে কোতোয়াল প্রশ্ন করে, কী চাই?

খুশ বাহার বলে, আজ সকালে আমার বাড়ি থেকে আমার বিবিকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে একটা বুড়ি।

বুড়িটার চেহারা এবং বেশভূষায় যথাসাধ্য বর্ণনা দিতে চেষ্টা করলো সে।

কোতোয়াল ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলে, তাতো বুঝলাম। তারা গেছে কোন পথে?

—বুড়িটা বলে গেছে, সে সুবাদারের প্রাসাদেই তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু সুবাদার সাহেব বললেন, ধাপ্পাবাজরা কখনও সত্যি কথা বলে না।

কোতোয়াল বললো, তা হলে, এই এতবড় শহরটায় কোথায় খুঁজবো তাঁদের? আমাকে যদি নিশানা বলে দিতে পার, আমি সেই মতো লোক পাঠাতে পারি।

—নিশানা কি করে বলবো আমি। আমি তো জানিনা কোন পথে তাকে নিয়ে গেছে সে।

—তবে? আমিই বা জানবো কি করে? আমি তো আর হাত গুণতে জানিনা। যাদুবিদ্যাও আমার জানা নাই। যাও, এখন আর বিরক্ত করো না।

খুশ বাহার সুবাদারের কাছে এসে নালিশ জানায়, কোতোয়াল আমার কথা গ্রাহ্য করলো না, হুজুর। আমি বললাম, আপনি নিজে পাঠিয়েছেন আমাকে। তাতেও তার কোনও ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা গেলো না। আমার কথা শুনে সে কি কথা বলে জানেন? আমি তো আর যাদু জানিনা যে মন্ত্রবলে তোমার বিবিকে উদ্ধার করে দেবো।

সুবাদার নকল গাম্ভীর্য মুখে টেনে বলে, হুম! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। এই—কে আছিস, কোতোয়ালকে ডেকে নিয়ে আয়—এক্ষুণি।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে কোতোয়াল এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়।

সুবাদার গলাটা বেশ চড়িয়ে বলতে থাকে, শোনো কোতোয়াল, দেশের লোকের ধন সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। চুরি, ছিনতাই, রাহাজানী ধাপ্পাবাজি বন্ধ করার দায় তোমার। আমার দোস্ত সওদাগর বাহারের ছেলে। আজ সকালে একটা শয়তান বুড়ি এর বিবিকে ভুলিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে। যেমন করেই হোক, তাদের খুঁজে বার করতেই হবে। আমার শহরে এই সব শয়তানী আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। তুমি আর দেরি করো না। দিকে দিকে

ঘোড়সওয়ার পাঠাও। প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গা তাল্লাসী করে দেখ। আমার শহরের সব ঘোঁচ ঘাঁচ তো তোমার অজানা নাই—ধূর্ত শয়তানরা সেই সব গর্তের কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকে। যদি সে এই শহরের মধ্যেই গা ঢাকা দিয়ে থাকে তবে তোমার পক্ষে টেনে বের করা আদৌ অসম্ভব হবে না। কিন্তু সে-যদি শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চালান হয়ে যায় তা হলে তোমার করার কিছুই থাকবে না। যাই হোক, আর দেরি না করে চারদিকে লোক পাঠাও।

কোতোয়াল এতক্ষণ ঠিক বুঝতে পারছিলো না, সুবাদার সাহাব এ সব কি বলছেন! সে লেড়কী তো দামাসকাসের পথে চালান হয়ে গেছে। সুবাদার খুশ বাহারের অলক্ষ্যে কোতোয়ালকে ইশারা করে জানালো, ওসব কথায় কান দিও না। বলতে হয় বললাম। এবার কোতোয়াল ধাতস্থ হয়। সুবাদারের চালটা ধরতে পারে।

—ঠিক আছে, হুজুর, আপনি কিছু ভাববেন না হুজুর। শহরের যে গর্তেই তারা থাকুক টেনে বের করবোই। কিন্তু শহর ছেড়ে অন্য কোথাও সরিয়ে দিলে আমার কোনও হাত থাকবে না।

সুবাদার সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি বাড়ি যাও, বাবা। যা করার আমরা করছি। নসীব যদি সাধ দেয় তবে তোমার বিবিকে ঠিকই ফিরে পাবে। তা না হলে খোদার নাম জপ কর।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো বিয়াল্লিশতম রাত্রে আবার সে শুরু করে ঃ

খুশ বাহার বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে শান্ত রাখতে পারে না। সারা রাত ধরে কুফার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। যদি কোথাও নাহারের সন্ধান মেলে।

পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে এসে শয্যা নেয়। দারুণ কাঁপিয়ে জ্বর আসে। এক দিন দুই দিন—এই ভাবে অনেক কয়দিন কেটে যায়। জ্বর ক্রমশই বাড়তে থাকে। অনেক হেকিম বদ্যিকে ডাকা হলো। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলো না। সবাই বলে, এ রোগের একটাই দাওয়াই। বিবি ফিরে এলেই রোগ সেরে যাবে।

এই সময় কুফায় এক পারসী-সাহেব এলেন। তিনি রসায়ন এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। সওদাগর তার নামযশ শুনে ডেকে এনে ছেলেকে দেখালো। বললো, এই আমার এক মাত্র পুত্র, একে যদি আপনি সুস্থ করে তুলতে পারেন হেকিম সাহেব, আপনাকে আমি দু-হাত ভরে ইনাম দেব—যা চাইবেন তাই দেব। শুধু আমার বুকের কলিজা, আমার চোখের মনিকে সারিয়ে তুলুন।

পারসী সাহেব কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। গম্ভীর ভাবে খুশ বাহারের নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরে স্মিত হেসে সওদাগরকে বললেন, অসুখ ওর দেহে নয়, অসুখ ওর দিল-এ। এবং কোনও আপনজনের বিরহেই তা ঘটেছে। ঠিক আছে, আমি মন্ত্রবলে জেনে নিচ্ছি, এখন সে কোথায় অবস্থান করছে।

এই বলে সেই পারসী-সাহেব মেঝের উপরে বসে সামনে কিছুটা বালি ছড়িয়ে দিলেন। বালির মাঝখানে সাজিয়ে দিলেন পাঁচখানা সাদা পাথরের নুড়ি, আর তিন খানা কালো পাথরের নুড়ি, দুখানা কাঠি আর একটা বাঘের মাথা। বেশ অনেকক্ষণ ধরে এইগুলো সাজাতে সাজাতে তিনি পারসী ভাষায় কি সব মন্ত্র তন্ত্র আওড়াতে থাকলেন। আরপর বললেন, আপনারা যারা এখানে হাজির আছেন, সবাই মন দিয়ে শুনুন, যার বিরহে এই ছেলে কাতর, তাকে পাওয়া যাবে বসরাহয়—...না না, হলো না, হলো না। এই তিনটি নদীই আমার সব গোলমাল করে দিচ্ছে। হ্যাঁ হয়েছে—তাকে পাওয়া যাবে দামাসকাসের—সুলতানের প্রাসাদে। এবং তারও এই একই অবস্থা। সে-ও অসুখে শয্যাগত হয়ে আজ অনেকদিন।

সওদাগর আকুলভাবে জিজ্ঞেস করে, তাহলে কি উপায় হবে সাহেব? আপনি

ছাড়া তো এর কোনও সুরাহার পথ জানা নাই আমার। মেহেরবানী করে আপনি না বাঁচালে ওরা কেউ বাঁচবে না, আমিও মরে যাবো। আপনি যা চান, আমি দেব সাহেব। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচান, আমাকে আর আমার ছেলের বিবিকে বাঁচান।

পারসী সাহেব বলে, ধৈর্য ধরুন, শান্ত হোন। অধীর হলে চলবে না। তাড়াহুড়ার কাজ নয় এটা। তবে আমি কথা দিচ্ছি, ওদের দু'জনের মিলন ঘটিয়ে দেব। এখন আপনি আমাকে মাত্র চার হাজার দিনার দিন। তারপরে কাজ সমাধা হয়ে গেলে আপনার যা প্রাণ চায় দেবেন।

সওদাগর তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা এনে পরসী সাহেবের হাতে দিলো।

পারসী সাহেব বললেন, বাস বাস, এই যথেষ্ট। এখন আমি দামাসকাসের পথে রওনা হয়ে যাচ্ছি। আপনার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। আল্লাহার কৃপায় আপনার ছেলের বিবিকে সঙ্গে নিয়েই ফিরবো।

তারপর তিনি খুশ বাহার-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি গো বাছা, তোমার নাম কী?

—খুশ বাহার।

—ঠিক আছে, এবার উঠে পড় বাবা, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। তোমার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমরা ফিরে আসবো।

পারসী সাহেবের ভরসায় দেহ মনের অবসাদ অনেকখানি কেটে যায় তার। সাহস করে উঠে বসে। বাড়ির সবাই বলে, আর ভাবনা কি, উনি যখন কথা দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই তাকে ফিরে পাবে। খানাপিনা কর। হাসো, কথা বলো, দেখো, দেহ মনে জোর পাবে।

পারসী সাহেব বললেন, আমি এক সপ্তাহ বাদে আসবো। এর মধ্যে খেয়ে দেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নাও। তারপর দু'জনে দামাসকাসের পথে বেরিয়ে পড়বো।

এই বলে তিনি সেদিনের মতো চলে গেলেন। এদিকে সওদাগর তার ছেলের যাত্রার তোড়জোড় করতে থাকলো।

সওদাগর তার ছেলের হাতে পাঁচহাজার দিনার দিলো। একটা ভালো দেখে উট কিনে আনলো। নানারকম সওদাগরী জিনিসপত্র চাপালো তার পিঠে। তার মধ্যে সব চেয়ে নামকরা কুফার রেশমী কাপড় দিলো অনেকগুলো।

সপ্তাহখানেক পরে খুশ বাহারের শরীর যখন মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলো তখন তারা দিনক্ষণ—দেখে একদিন রওনা হয়ে গেলো।

শাহরাজাদ বলতে থাকে, আপনার হয়তো খেয়াল আছে জাঁহাপনা, এই সময়ে কুশ বাহার সতেরয় পা দিয়েছে তখন তার দেহে সবে যৌবনের জোয়ার আসতে শুরু করেছে।

খুশ বাহারের আদব কায়দা আচার বাহারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন পারসী সাহেব। সারাটা পথ তার যাতে কোন তকলিফ না হয় সেই দিকেই পারসী সাহেবের চোখ। নিজের সুবিধা অসুবিধা গ্রাহ্যও করলেন না।

এইভাবে তারা একদিন নিরাপদেই দামাসকাসে এসে পৌঁছায়। প্রথমে একটা দোকান ঘর ভাড়া নিলেন পারসী সাহেব। দামাসকাসের বড়বাজারের দোকনটিকে তিনি মনোহর করে সাজালেন। নানা রকম বাহারী প্রসাধন সামগ্রী এবং সুন্দর সুন্দর ঘর সাজানো জিনিসে দোকান ঝলমল করতে লাগলো। একদিকে নানা রকম হেকিমি ওষুধপত্রও রাখলেন।

যথাযোগ্য সাজগোজ করে মাথায় একটা সাত প্যাঁচের পাগড়ী পরলেন। এবং খুশ বাহারকে পরালেন নীল রঙের রেশমী কামিজ তার উপর চাপালেন কাজকরা কাশ্মীরি কুর্তা।

হাতের বন্ধে বেঁধে দিলেন একখানা গুলাব রঙের সোনার জরির কাজ করা রেশমী রুমাল। হাতে তুলে দিলেন একটা ওষুধের বাক্স। ঠিক যেন হেকিমের সাগরেদ। পারসী-সাহেব বললেন, এখন থেকে বেটা, তুমি আমাকে বাবা বলবে আর আমি তোমার পরিচয় দেব ছেলে বলে।

দোকান খুলতেই নানা রকমের মেয়ে পুরুষ এসে ভিড় জমাতে লাগলো। কেউ বা দাওয়াই-এর জন্য আসতে লাগলো। আবার কেউ কেউ খুশ বাহারের রূপে মুগ্ধ হয়ে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে থাকলো। কয়েক দিনের মধ্যেই সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো তাদের নাম।

রুগীরা আসে। পারসী সাহেব রুগীর চোখের দিকে তাকান। তারপর একটা কাঁচের বাটি সামনে ধরে বলেন, থুথু ফেলুন। রুগী থুথু ফেলে। বাটিটাকে তুলে ধরে কি যেন পরীক্ষা করেন তিনি। তারপর রোগ বাৎলে দেন। রুগী অবাক হয়। কী আশ্চর্য ক্ষমতা! নাড়ী না ধরে, বুক পিঠ না দেখে শুধু থুথু পরীক্ষা করে রোগ দাওয়াই বাৎলে দিতে পারেন? এমন অদ্ভুত হেকিম তারা জীবনে দেখেনি কখনও। এমন ধন্বন্তরী মানুষ-এর কথা শোনেও নি তারা।

কয়েকদিনের মধ্যে পারসী সাহেবের নাম যশের খ্যাতি খলিফার কানে পৌঁছয়। একদিন সকালবেলা পারসী সাহেব দোকানে বসে আছেন, এমন সময় এক খানদানী বৃদ্ধা মহিলা সুসজ্জিত এক খচ্চরের পিঠে চেপে এসে সামনে দাঁড়ালো। বৃদ্ধা নামতে চায়। পারসী সাহেবকে সে ইশারায় ডাকে। তাকে ধরে নামাতে বলে। পারসী সাহেব তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বৃদ্ধাকে নামিয়ে দোকানের ভিতরে নিয়ে এসে বসতে অনুরোধ করেন। খুশ বাহার একখানা আসন এগিয়ে দেয়। বৃদ্ধা বসে। বোরখার ভেতর থেকে একটা বোতল বের করে। জলে ভরা। পারসী সাহেবের হাতে তুলে দিতে দিতে বলে, প্রস্রাব আছে। আচ্ছা সাহেব, আপনিই তো ইরাক থেকে এসে এখানে নতুন দাওয়াইখানা খুলেছেন?

—জী হ্যাঁ, আমিই আপনার সেই নফর।

—ও কথা বলতে নাই সাহেব, কেউ কারো নোকর নয় এ দুনিয়ায়। আমরা সবাই একজনেরই দাসানুদাস। তিনি পরম পিতা খোদাতালা। থাক ওসব কথা, আমি যে জন্যে এসেছি, বলি। এই বোতলে যে প্রস্রাব দেখছেন তা আমাদের খলিফার সদ্য কেনা বাঁদীর। অনেকদিন, এখানে আসার পর দিন থেকে তার জ্বর—কিছুতেই ছাড়ে না। আমাদের প্রাসাদের ডাক্তাররা দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন আপনিই শেষ ভরসা। আপনার নাম যশ শুনে খলিফার বোন আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে। এখন দেখুন আপনি যদি সারাতে পারেন—

—তার নামটা না জানলে তো হবে না। আমি তো শুধু দাওয়াই দিয়েই রোগ সারাই না। ঝাড়ফুকও করি—প্রয়োজন হলে।

বৃদ্ধা বলে, তার নাম খুশ নাহার।

পারসী সাহেব একখণ্ড কাগজে এক নাগাড়ে অনেকগুলো সংখ্যা লিখে ফেলেন। কতকগুলো লিখলেন লাল কালিতে, কতকগুলো সবুজ কালিতে তারপর তিনি লালকালির সংখ্যাগুলোর সঙ্গে সবুজ কালীর সংখ্যাগুলো যোগ করলেন। সেই যোগফলের সঙ্গে আরও কিছু যোগ-বিয়োগ গুণ ভাগ করে কি সব হিসেব করলেন।

—শুনুন মালকিন, রোগ আমি ধরে ফেলেছি। বুকের ধড়ফড়ানিই তার একমাত্র রোগ।

বৃদ্ধা আঁৎকে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বটে। বুকের মধ্যেই তার যত রোগ। হরদম ধড়ফড় করে ব্যাথা করে।

পারসী সাহেব বলে, সুতরাং দাওয়াই ঠিক করার আগে রুগী সম্পর্কে আরও কিছু বিশদভাবে জানা দরকার। কোন্ দেশের মেয়ে সে? কোথা থেকে এসেছে? এটা জানা বিশেষ দরকার। কারণ সেখানকার জল হাওয়া আর এখানকার জল হাওয়ার সঙ্গে কতটা কি ফারাক

আছে, বুঝতে হবে। তাছাড়া তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধরণ-ধারণ বোঝার জন্য তার সঠিক বয়সটাও জানা দরকার। আর কতদিন হলো সে এ শহরে এসেছে?

বৃদ্ধা বলে, তার মুখ থেকে যা শুনেছি, তাতে মনে হয়, সে কুফাতেই জন্মেছে, সেখানেই মানুষ হয়েছে। তার বয়স এখন, আমি যতদূর জানি, বছর ষোল হবে। সেই যেবার কুফা শহরে আগুন লেগেছিলো সেই সালে তার জন্ম। সে আজ মাত্র কয়েক সপ্তাহ হলো দামাসকাসে এসেছে।

পারসী সাহেব খুশ বাহারের দিকে তাকায়। খুশবাহারের অবস্থা তখন কাহিল। বুক ধড়ফড় করতে শুরু করেছে। কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

—বেটা, সাত নম্বর দাওয়াই বানাও। ইবন সিনার সূত্র ধরে বানাতে হবে। খুব সাবধান, কোনও উল্টো পাল্টা যেন না হয়।

বৃদ্ধা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলে, যার জন্যে দাওয়াই নিচ্ছি সেও তোমার মতোই খুব সুরৎ। আচ্ছা হেকিম সাহেব, এটা আপনার লেড়কা?

—জী হাঁ, আমার বেটা, আপনার নফর।

বৃদ্ধা বিগলিত হয়ে গেলো। বললো, আপনার ধন্বন্তরী দাওয়াই-এর খ্যাতি আজ সারা দামাসকাসে ছড়িয়ে পড়েছে। আর আপনার ছেলের রূপ গুণের কথাও চাপা থাকবে না। কালে আপনার ছেলেও নামজাদা হেকিম হবে।

ওরা দু'জনে যখন কথা বলতে ব্যস্ত সেই সময় খুশ বাহার দাওয়াই বানিয়ে কয়েকটা পুরিয়া তৈরি করলো। পুরিয়াগুলো একটা ছোট্ট বাক্সে ভরে বাক্সটার গায়ে কুফার স্থানীয় ভাষায় দুর্বোধ্য হরফে খুশ বাহারের নাম ঠিকানা লিখে বৃদ্ধার হাতে তুলে দিলো।

বটুয়া খুলে দশটা সোনার মোহর বের করে বৃদ্ধা পারসী সাহেবের হাতে দেয়। খোদা হাফেজ, এবার তা হলে আসি?

বৃদ্ধা আর তিলমাত্র দাঁড়ায় না। খচ্চরের পিঠে চেপে প্রাসাদের পথে রওনা হয়ে যায়।

খুশ নাহারের ঘরে ঢুকে দেখে অঝোর নয়নে কাঁদছে সে। কাছে এসে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয় বৃদ্ধা। বলে, ছিঃ কাঁদে না। এই দেখ, আমি তোমার জন্যে কি দাওয়াই এনেছি। একবারে ধন্বন্তরী। নির্ঘাৎ সব অসুখ সেরে যাবে তোমার। যেমন হেকিম সাহেব, তেমনি তার খুব সুরৎ লেড়কা— দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এই নাও তোমার দাওয়াই-এর বাক্স।

খুশ নাহার এই বৃদ্ধাকে চটাতে চায় না। যাই হোক, সারা প্রাসাদের মধ্যে এই একটি মাত্র মানুষই তার সঙ্গে দরদ দিয়ে কথা বলে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত পেতে বাক্সটা নেয়। হঠাৎ বাক্সটার গায়ে লেখাটার ওপরে নজর পড়তেই পলকে মুখের চেহারা পালটে যায় তার। নাহার পরিষ্কার পড়তে পারে, "আমি খুশ বাহার। কুফার সওদাগরের পুত্র।" নাহারের মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। বুক ঢিব ঢিব করে ওঠে। সব যেন কেমন তাল গোল পাকিয়ে যেতে থাকে। নিমেষেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কয়েক মুহূর্ত ঝিম মেরে পড়ে থাকার পর আবার সে চৈতন্য ফিরে পায়। ধীরে ধীরে মাথাটা তুলে একটু হেসে প্রশ্ন করে, সেই ছেলেটি সত্যিই কেমন দেখতে? খুব সুন্দর?

—খু—ব। তার রূপের বর্ণনা আমি দিতে পারবো না। তবে তার মতো সুন্দর নওজোয়ান আমি খুব কম দেখেছি। কী তার চোখ, কী তার নাক, ইয়া আল্লাহ। তার মুখের বাঁদিকে একটা কালো তিল—ভারি সুন্দর লাগে দেখতে। আর যখন সে হাসে বড় সুন্দর টোল খায় তার ডান গালে।

তার এই সব বর্ণনা শুনে নাহারের আর বুঝতে বাকী থাকে না, ছেলেটি তার প্রাণ-প্রতিম ছাড়া আর কেউই নয়। বাক্সটা খুলে একটা পুরিয়া বের করে মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। পুরিয়ার কাগজখানার দিকে চোখ পড়তেই দেখে, একখানা চিঠি।

খুশ নাহার আনন্দে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে, বুড়িমা, এ দাওয়া কোথায় পেলেন। আমার এতদিনের অসুখ এক পুরিয়াতেই সেরে গেলো। ওঃ, কী যে ভালো লাগছে, কী করে বোঝাবো। আজ একমাস আমি কিছু খাইনি, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে— যাহোক কিছু খানা এনে দিন। আজ আমি পেট ভরে খাবো, আর প্রাণ-ভরে ঘুমাবো।

বারকোষে সাজিয়ে খাবার নিয়ে আসে বৃদ্ধা। মাংসের চাপ, তন্দুরী রুটি, ফল এবং সরবৎ। তারপর খলিফার কাছে গিয়ে জানায়, খুশ নাহার-এর অসুখ বিলকুল সেরে গেছে। দামাসকাসে এক পারসী সাহেব এসে দাওয়াখানা খুলেছেন। তাঁর এক পুরিয়াতেই খুশ নাহার ভালো হয়ে গেছে।

খলিফা বললো, বাঃ দারুণ গুণী মানুষ তো! ঠিক আছে, এই এক হাজার দিনার নিয়ে যাও। তাকে দিয়ে এসো।

পারসী সাহেবের কাছে যাওয়ার আগে বৃদ্ধা খুশ নাহারের সঙ্গে দেখা করতে এলো। খুশ নাহার বললো, দাঁড়ান বুড়িমা, আমিও তাকে একটা উপহার পাঠাবো।

একটা ছোট বাক্সের মুখে মোহর করে বৃদ্ধার হাতে দিয়ে বলে, এই বাক্সটা তাঁর হাতে দেবেন।

বৃদ্ধা দোকানে গিয়ে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আর সেই বাক্সটা খুশ বাহারের হাতে তুলে দেয়।

খুশ বাহার বাক্সটা খুলে দেখে, একখানা চিঠি। কী করে কুফার সুবাদার খুশ নাহারকে ধোঁকা দিয়ে ভুলিয়ে এনে দামাসকাসে খলিফার ভোগের জন্য পাঠিয়েছে, তারই মর্মন্তুদ কাহিনী লিখে পাঠিয়েছে সে। চিঠিখানা পড়ে খুশ বাহার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

বৃদ্ধা অবাক হয়। —আপনার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো কেন, সাহেব?

পারসী সাহেব বলে, এছাড়া আর কী হতে পারে, মা? আপনি যাকে খলিফার বাঁদী ভাবছেন, আমার দাওয়াই খেয়ে যার অসুখ সেরে গেলো, আসলে সে এই ছেলের বড় পিয়ারের বিবি। কুফার শয়তান সুবাদার কারসাজী করে এক বুড়িকে দিয়ে তাকে ভাগিয়ে এনে এই দামাসকাসে চালান করে দিয়েছে—খলিফার ভোগের জন্য। মেয়েটির বিরহে এই ছেলেটির মৃতকল্প দশা দেখে আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এখানে। আপনি জানেন, ও আমার ছেলে। কিন্তু না, ওর সঙ্গে আমার কোনও রক্তের সম্পর্ক নাই। এই খুশ বাহার কুফার এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বাহার সাহেবের পুত্র। দামাসকাসে আমরা কোনও ব্যবসাবাণিজ্য করতে বা রোজগারের ধান্দায় আসিনি, মা। আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য—ওর চোখের মণি বিবি খুশ নাহারকে উদ্ধার করা।

পারসী সাহেব একটু থেমে আবার বলেন, সবই তো শুনলনে, এখন আপনি আমাদের সাহায্য না করলে তাকে তো ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে না, মা। এই নিরপরাধ ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে এই উপকারটুকু আপনাকে করতেই হবে। খলিফা আমাকে সহস্র মুদ্রা ইনাম পাঠিয়েছেন, আমি মাথায় ঠেকিয়ে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। এ টাকায় আমাদের কোনও দরকার নাই। এটা আপনিই রাখুন। আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হলে আমরা আপনাকেও খুশি করে যাবো, মা।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো পঁয়তাল্লিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়ঃ

বৃদ্ধা বলে; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সাহেব, আমার তরফ থেকে যতটা করা সম্ভব আমি করবো। এরপর তাকে উদ্ধার করতে পারা-না-পারা আপনাদের নসীব আর আমার হাত-যশ।

এই বলে সে আর সেখানে দেরি না করে তাড়াতাড়ি প্রাসাদে ফিরে আসে। খুশ নাহার হাসি খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। তার আর মনে কোনও সংশয় নাই, এবার সে তার প্রিয়তমের কাছে ফিরে যাবে। বৃদ্ধা নাহারের কাছে এসে মাথায় হাত রাখে, মা, এই বুড়িটাকে বিশ্বাস করতে পারনি এতদিন, তাই না? তা না হলে আমার কাছে মনের গোপন কথা খুলে বলো নি কেন? আমাকে কি দেখে মনে হয়েছিলো, আমি তোমার কোনও অনিষ্ট করতে পারি? কেন যে তুমি দিন রাত ঐভাবে কান্নাকাটি করতে এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু তখন যদি বলতে, তাহলে অনেক আগেই তোমার দুঃখ ঘুচিয়ে দিতাম।

খুশ নাহার বৃদ্ধার মুখের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। বৃদ্ধা বলে, মা, তুমি আমার ওপর ভরসা রাখ, আমি তোমাকে ঠকাবো না। এক মা মেয়ের ভালোর জন্য যা করতে পারে, আমিও তোমার জন্য তাই করবো। আমি আল্লাহর নামে কসম খাচ্ছি, যেভাবেই হোক, তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার মিলন আমি ঘটিয়ে দেবই। তার জন্যে যদি আমার জান কবুল করতে হয় সে-ভি আচ্ছা। মন থেকে সব চিন্তাভাবনা মুছে ফেলো, মা। এই বুড়ি তোমার কি করে, একবার শুধু দেখ।

খুশ নাহার আনন্দে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধাকে। দু-চোখ জলে ভরে ওঠে। তার ঊষর মরুময় জীবনে এই বৃদ্ধা এক সুবজ বৃক্ষের আচ্ছাদন।

বৃদ্ধা আবার পারসী সাহেবের দোকানে আসে। কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলি হাতে দিয়ে খুশ বাহারের কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলে। পুঁটলিটা নিয়ে বুড়িকে সঙ্গে করে খুশ বাহার পিছন দিকে পর্দার আড়ালে চলে যায়। খুশ বাহার পুঁটলিটা খুলে ফেলে। মেয়েছেলের বাহারী সাজ পোশাক, জড়োয়া গহনা, প্রসাধন ইত্যাদি নানারকম টুকিটাকি জিনিসপত্র। বৃদ্ধা নিজে হাতে তাকে মেয়েছেলের সাজে সাজায়। নিখাদ নিখুঁত ভাবে। পর্দার আড়াল থেকে যখন সে বেরিয়ে আসে পারসী সাহেব হাঁ করে চেয়ে থাকে। ভাবতে কষ্ট হয়, এই সেই খুশ বাহার। দিব্যি এক পরমা সুন্দরী রমনী। কাজলটানা চোখ, আঁকা ভুরু। ঠোঁটে গালে লাল গুলাবী আভা। গলায় সাতনরী হার, হাতে বাজুবন্ধ, মাথায় টায়রা কপালে টিকলি, কানে দুল, নাকে নাকছাবি কোমরে বিছা, পায়ে মল-একেবারে মোহিনী রূপা। মসুলের বিখ্যাত রেশমী বোরখায় দেহখানা ঢেকে নিয়ে খুশ বাহার বৃদ্ধাকে অনুসরণ করে পথ চলতে থাকে। যেতে যেতে কয়েকটি অল্পবয়েসী যুবতীকে দেখিয়ে বৃদ্ধা বলে, জোয়ান মেয়েরা কেমন করে পাছা দুলিয়ে চলছে একবার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ। ঠিক ওমনি ঢং-এ পা ফেলো। দেখবে, পাছাটা সুন্দর দুলতে থাকবে।

খুশ বাহার অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েদের হাঁটার কায়দা রপ্ত করে ফেলে। বৃদ্ধা বাহবা দেয়, বাঃ, এই তো শিখে ফেলেছ। চমৎকার। এবার কী করে পুরুষের দিকে তাকাতে হবে আর আধো আধো নাকি সুরে কথা বলতে হবে—শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। কখনও কোনও পুরুষের দিকে সোজাসুজি তাকাতে নাই। সব সময়ই একটু তেরছা চোখে তাকাবে। তাতে আরও সুন্দর দেখায়। লাস্যময়ী মনে হয়।

হারেমের সামনে এসে দাঁড়াতেই খোজা-সর্দার পথ রুখে দাঁড়ায়। বাইরের অচেনা কোন মেয়েছেলেকে সে ঢুকতে দেবে না। বলে, হুকুম নাই। যদি একে অন্দরে নিয়ে যেতে হয় খলিফার চিঠি চাই। না হলে ফিরে যেতে হবে। অথবা একে বাইরে রেখে তুমি একা ভিতরে যেতে পার।

বৃদ্ধা বলে, একি কথা বলছো গো, ভালো মানুষের পো। এতকাল আমি সুলতানের নোকরী করছি। আমাকে তোমার বিশ্বাস নাই?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, বুড়ি মা। সুলতানের কড়া হুকুম ঃ —বাইরের কোনও মেয়েকে ঢুকতে দেব না।

—কিন্তু তুমি কি জান, এ মেয়েটি কে? সুলতানের বোন দাহিয়ার জন্য সদ্য কেনা হয়েছে এই বাঁদীকে। এখন তুমি যদি একে আটকাও তাহলে কি কাণ্ড হবে একবার ভেবে দেখ। রেগে-মেগে তিনি হয়তো তোমাকে শূলেই চাপাবেন। অথবা গলা ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবেন। এখন ভেবে চিন্তে বলো, কী করবে।

বৃদ্ধার কথায় খোজা-সর্দার থতমত খেয়ে যায়। মুখে কথা সরে না। এই ফাঁকে বৃদ্ধা কুশ বাহারের হাত ধরে বলে, এসো বাছা, ভিতরে এসো। বুড়ো খোজা সর্দারের বাহাত্তুরে রোগ হয়েছে। ওর কথায় কিছু মনে করো না, মা।

খোজা-সর্দারকে আর কোনও বাধা দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে খুশ বাহারকে প্রায় টানতে টানতেই অন্দরে নিয়ে যায় সে। হারেমের নিরাপদ মহলে এসে বৃদ্ধ বলে, বাবা, এই হারেমে তোমার জন্য আলাদা একখানা কামরা আমি ঠিক করে রেখেছি। তোমাকে নিশানা বাৎলে দিচ্ছি, তুমি সোজা চলে যাও সেই ঘরে। আমি তোমার সঙ্গে যাবো না।

এই বলে বৃদ্ধা বোঝাতে থাকে, ঐ যে দরজাটা দেখছ, ঐ দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাও। দেখবে একটা লম্বা দোড়তি বারান্দা। সেই বারান্দার শেষে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে যাবে। তারপর দেখবে পথটা ডানদিকে ঘুরে গেছে। তুমিও ঘুরে যেতে থাকবে। আবার ডানদিকে ঘুরতে হবে। এবার দেখবে পাশাপাশি অনেকগুলো দরজা। গুণে গুণে প্রথম পাঁচখানা ছেড়ে দিয়ে ছয়ের দরজাটা খুলবে। ঐখানেই তোমার ঘর। কী? মনে থাকবে তো? তুমি যাও, ঘরে বিশ্রাম করগে। আমি খুশ নাহারকে যথা সময়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব'খন। তারপর সুযোগ মতো খোজা আর প্রহরীদের অলক্ষ্যে তোমাদের দুজনকে প্রাসাদ থেকে পাচার করে দেব এক সময়। তাহলে ঠিক আছে, এবার তুমি যাও, কেমন?

খুশ বাহার ঘাড় নেড়ে বলে, আচ্ছা।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই সে দেখে বিরাট লম্বা একটা বারান্দা। বারান্দাটার শেষ প্রান্তে এসে সব গুলিয়ে যায়। বাঁদিকেও একটা পথ ডান দিকেও একটা পথ। কোন দিকে বাঁক নিতে হবে। কিছুতেই আর মনে পড়ে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবে। তারপর ডানদিকের পথ ধরে চলতে থাকে এবার পথটা বাঁদিকে ঘুরে গেছে। খুশ বাহার মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই পথে চলে। যেতে যেতে দেখতে পায় পাশাপাশি অনেকগুলো দরজা, মুখে তার হাসি ফুটে ওঠে। যাক, বাবা, এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ পাওয়া গেলো। গুণে গুণে প্রথম পাঁচটা দরজা ছেড়ে দিয়ে ছয়-এর দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লো সে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন দুশো ছেচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে।

সে দেখলো, বিরাট বিশাল একটা মহল-সদৃশ ঘর। মাথার ওপরে একটা ঘেরা-টোপ গম্বুজ। তার চারপাশে সূক্ষ্ম কাজ করা। নানা বর্ণের। নানা ঢং-এর দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে সোনার অক্ষরে বিখ্যাত সব সায়ের লেখা। চারপাশের দেওয়াল লালগুলাবী রেশম কাপড়ে মোড়া। জানলাগুলোয় জাফরীকাটা চিকনের পরদা। আর মেঝে জুড়ে অসংখ্য হিন্দুস্তানের কাশ্মীরি গালিচা। মেহগনি কাঠের টুলগুলোর ওপরে গামলা ভরা নানা জাতের মিষ্টি মিষ্টি ফল, হালওয়া, বরফী ইত্যাদি। সারা ঘরময় দামী আতরের খুশবু। ঘরের যেদিকেই চোখ ফেরায় সে, সেরা শিল্পীর হাতের ছাপ নজরে পড়ে।

খুশ বাহার বুঝতে পারে সে ভুল ঘরে ঢুকে পড়েছে। এতবড় প্রকাণ্ড ঘর কেউ

নিভৃত শয়ন কক্ষ মনে করতে পারে না। ঘরে বসার মতো একটিই মাত্র আসন—মখমলের চাদরে ঢাকা একখানা সিংহাসন।

এ অবস্থায়, এত বড় প্রাসাদের হাজার হাজার ঘর দরজার মধ্যে কোথায় সে হাতড়ে বেড়াবে তার ঘর। বাইরের বারান্দায় ঘোরা-ফেরা করায় বিপদও থাকতে পারে। তাই সে আর অনর্থক সে-চেষ্টা না করে সিংহাসনের ওপরেই বসে পড়লো। ভাবলো, নসীবে যা আছে, হবে।

কিছুক্ষণ পরে খুশ বাহার কান খাড়া করে শোনে—কার যেন পায়ের চটির শব্দ ক্রমশ এই দিকেই এগিয়ে আসছে। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করতে থাকে। পলকের মধ্যেই এক বৃদ্ধা মহিলা এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। এই মহিলা—দাহিয়া, সুলতানের বোন।

দাহিয়া দেখতে পায়, একটি মেয়ে বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে সিংহাসনে বসে আছে। অবাক হয়ে সে কাছে এসে দাঁড়ালো। নরম গলায় খুশ বাহারকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাগো মেয়ে, কে তুমি? আর এই হারেমের মধ্যে বোরখা ঢাকা দিয়েই বা বসে আছ কেন? এখানে আর পরপুরুষ আসতে পারবে না কেন?

খুশ বাহার হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে কাঁপতে থাকে। মুখে কথা সরে না।

দাহিয়া বেশ নরম গলাতেই আবার জিজ্ঞেস করে, কি গো বাছা, কথা বলছো না কেন? শরম কিসের? নকাব তোলো, বোরখা খুলে ফেলো! আহা, কী সুন্দর কাজল কালো ডাগর তোমার চোখ। অমন করে ঢেকে রাখতে আছে?

তবু খুশ বাহার কথা বলে না।

দাহিয়া কিন্তু রাগ করে না। বরং আরও মোলায়েম কণ্ঠে বলে, তুমি সুলতানের বাঁদী? কোনও কারণে কী তিনি তোমার ওপর চটে গিয়ে বরখাস্ত করে দিয়েছেন তোমাকে? তা যদি হয়ে থাকে, তুমি কিছু চিন্তা করো না, খলিফাকে বলে আবার তোমাকে বহাল করে দেব আমি। আমি কে জান? আমার নাম দাহিয়া—খলিফার সহোদরা বোন। আমার কোনও কথাই তিনি ঠেলতে পারেন না। সুতরাং কী হয়েছে, খুলে বলো দেখি, বাপু।

তথাপি খুশ বাহার নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দাহিয়া ভাবে, এমন কোনও কথা সে বলতে চায়, যা অন্য কোনও দাসী চাকরানীর সামনে বলা যায় না। সঙ্গের দাসীটাকে চোখের ইশারা করতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। দাহিয়া আশা করতে থাকে, এবার নিশ্চয়ই সে মুখ খুলবে। কিন্তু খুশ বাহার রা কাড়ে না। দাহিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে খুশ বাহারের। এক রকম প্রায় জোর করেই টেনে বোরখা খুলে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। খুশ বাহার প্রাণপণে শক্ত করে চেপে ধরে থাকে—বোরখা সে খুলতে দেবে না। দাহিয়ার সঙ্গে এক রকম ধস্তাধস্তি করতে হয় তাকে।

দাহিয়ার ভুরু কুঁচকে ওঠে, জাপটা জাপটি করার সময় সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, তার বুকটা একেবারে ছেলেদের মতো সমান। এই বয়সের মেয়েদের বুক ডাঁসা ডালিমের মতো হয়। কিন্তু ডালিম দূরে থাক ডুমুরেরও চিহ্ন নাই।

দাহিয়া গম্ভীর হয়ে বলে, বোরখা খুলে ফেলো। তা না হলে খুব খারাপ হবে।

খুশ বাহার ভাবে, আর উপায় নাই। এবার সে চুপ করে থাকলে দাহিয়া তাকে ছেড়ে দেবে না। হয়ত খোজাকে ডেকে জোর করে খোলাবে। তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। খুশ বাহার আর কালক্ষেপ না করে হাঁটু গেড়ে বসে দাহিয়ার পা দুটো জড়িয়ে ধরে, আপনি আমাকে বাঁচান।

—আহা-হা, ওঠ। আমি তো তোমাকে আগেই ভরসা দিয়েছি, বাছা, তোমার কোনও ভয় নাই। যাক, সব সত্যি কথা খুলে বলো দেখি, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? এবং কেন?

খুশ বাহার কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, মালকিন, আমি মেয়ে নই—আমার নাম খুশ বাহার। মেয়েছেলের ছদ্মবেশ না ধরলে হারেমে ঢুকতে পারবো না, তাই আমার এই সাজ।

—কিন্তু পর পুরুষ হয়ে হারেমে ঢোকার কি সাজা জান?

—জানি, প্রাণদণ্ড। কিন্তু এছাড়া আমার কোনও উপায় ছিলো না। তাই নিজের জান কবুল করতে হতে পারে জেনেও আমি এখানে এসেছি।

—কিন্তু কেন?

—আমার বিবি আমার চোখের মণি, বুকের কলিজা এই হারেমে বন্দী হয়ে আছে। তাকে উদ্ধার করতে না পারলে সেও বাঁচবে না, আমিও মরে যাবো।

দাহিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকায়, তার মানে?

খুশ বাহার কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, আমার বিবির নাম খুশ নাহার। আমার বাবা বাঁদীবাজার থেকে নাহার আর তার মাকে কিনে এনেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা—আমার সবে জন্ম হয়েছে, তখন নাহারও তার মা-এর কোলের সন্তান। ছোট থেকে আমরা এক সঙ্গে হেসে খেলে মানুষ হয়েছি। বাবা মা-র বাসনা ছিলো, বড় হলে আমাদের শাদী দিয়ে দেবেন। যখন আমার 'বার বছর বয়স তখন আমাদের শাদী হয়।

নাহারের মতো সুন্দরী রূপসী সারা কুফাতে আর দুটি নাই। বোধহয় এই জন্যেই সুলতানের সুবাদারের 'সুনজর' পড়েছিলো তার উপর। ছলে কৌশলে সে তাকে চুরি করে দামাসকাসে চালান করে দেয়। এখন সে খলিফার এই হারামে বন্দী হয়ে আছে। সুবাদার ভেট হিসাবে নাহারকে পাঠিয়েছে খলিফার কাছে। লোকটা এমনই মিথ্যেবাদী, খলিফাকে মিথ্যে করে জানিয়েছে, নাহারকে সে এক সওদাগরের কাছ থেকে নায্য দামে কিনেছে। নাহার নাকি কোনও শাহ বাদশাহর ঘরের মেয়ে। সব ঝুট্!

—হাতে তুড়ি বাজাতেই সেই দাসীটা দাহিয়ার পাশে এসে দাড়ায়। —জলদি, ছুটে যা, খুশ নাহারের কামরায়। গিয়ে বলো, আমি ডাকছি, সে যেন এক্ষুণি এসে দেখা করে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো সাতচল্লিশতম রজনী ঃ

দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে বলতে শুরু করে।

দাহিয়া রোরুদ্যমান খুশ বাহারের মাথায় হাত রেখে বলে, চোখের পানি মুছে ফেল, বেটা। আমি যতক্ষণ জিন্দা আছি, তোমার কোনও ডর নাই। সব আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার বিবিকে তুমি ফিরে পাবে। আমার ভাই খলিফা, তিনি ধর্মপ্রাণ সুলতান। এতবড় অধর্ম তিনি সইবেন না। অন্যের বিবি বোন তিনি কেড়ে এনে ভোগ করেন না। এত বড় অপবাদ তাকে কেউ কোনও দিন দিতে পারেন নি। আজ যদি কুফার সুবাদারের শয়তানীর জন্য তার নাম যশে এতটুকু আঘাত লাগে, আমি বলে দিচ্ছি বাছা, সে-সব তিনি বরদাস্ত করবেন না।

এদিকে যখন এই সব কাণ্ড চলছে বৃদ্ধা তখন খুশ নাহারকে বলছে আমার সঙ্গে চলো, বেটা। তোমার চোখের মণিকে আমি হারেমের অন্দরে এনে একটা ঘরে লুকিয়ে রেখেছি। দেখবে চলো।

খুশ নাহারের আর তর সয় না। আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু খুশ বাহারের জন্য যথানির্দিষ্ট কামরায় গিয়ে যখন দেখে, সে-ঘরে সে নাই ভয়ে শিউরে ওঠে।

বৃদ্ধা বলে, সর্বনাশ—নিশ্চয়ই সে নিশানা ভুলে গেছে। হয়তো সারা হারেমে চরকীর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে! এখন কী হবে? এত বড় মহল—কী করে তাকে খুঁজে বের করা যাবে? তুমি বাছা ঘরে ফিরে যাও। আমি দেখছি, কোথায় গেলো সে।

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে খুশ নাহার আবার ঘরে ফিরে আসে। একটুক্ষণ পরে দাহিয়ার দাসী এসে বলে, শাহজাদী দাহিয়া আপনাকে তলব করেছেন।

এবার সে আরও ভয় পায়। নির্ঘাৎ খুশ বাহার দাহিয়ার হাতে ধরা পড়েছে। আর রক্ষা নাই, তার গর্দান যাবে। যাই হোক, দাহিয়া ডেকেছেন, দেরি করা চলে না। খুশ নাহার অসংবৃত বেশবাস নিয়েই, খালি পায়ে, উদ্ভ্রান্তের মতো মেয়েটির পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চললো। সেই প্রকাণ্ড ঘরটায় ঢুকতেই হাসতে হাসতে ছুটে এসে দাহিয়া খুশ নাহারকে জড়িয়ে ধরে। প্রায় হিড় হিড় করে টানতে টানতে সিংহাসনের পাশে নিয়ে গিয়ে বলে, কী? চিনতে পারছ?

খুশ নাহার সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়ে। দাহিয়া বলে, এইতো যুগলে মিলন ঘটিয়ে দিলাম, এবার মিঠাই খাওয়াও।

খুশ বাহারের মুখে হাসি ফোটে। দাহিয়া বলে, আমরা আর কেন পথের কাঁটা হয়ে থাকি। তোমরা এবার বিশ্রম্ভালাপ কর। আমি এখন চলি!

দাসীকে সঙ্গে নিয়ে দাহিয়া বিদায় নিলো। সঙ্গে সঙ্গে খুশ নাহার খুশ বাহারের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকলো। কাঁদলো খুশ বাহারও। অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে বুকের বোঝা হালকা করলো দু'জনে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে দাহিয়া ফিরে এসে দেখে দু'জনে দু'জনের কাঁধে মাথা রেখে গভীর আবেশে নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। দু'জনের গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দাশ্রুধারা। দাহিয়া বললো, নাও, এবার একটু চাঙ্গা হয়ে নাও। তোমাদের জন্যে দামী সরাব এনেছি। খাও মৌজ কর। তোমাদের পুনর্মিলন সুখের হোক—আনন্দের হোক।

খুদে দাসীটা মদের পেয়ালা ভর্তি করে দু'জনের হাতে তুলে দেয়।

দাহিয়া বলে, আজ শুধু খানা-পিনা আর গান বাজনা চলবে, কি বলো? তোমরা নিশ্চয়ই ভালোবাসার গান গাইতে জান?

দু'জনেই ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ জানে। পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ওরা গুনগুন করে গান ধরে।

গানের মুর্ছনায় সকলেই বিভোর। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নাই। আরও কতক্ষণ কাটতো তার ঠিক নাই—হঠাৎ দরজার পর্দা সরে গেলো, ঘরে ঢুকলো খলিফা। গান থেমে গেলো মুহূর্তে তিনজনেই তড়াৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে আভূমি আনত হয়ে খলিফাকে কুর্নিশ জানাতে থাকলো।

সুলতান স্মিত মুখে সিংহাসনে বসে বললেন, বেশতো চলছিলো গান, থামালে কেন, সুন্দরীরা?

তারপর দাসীটিকে ইশারা করে বললেন, আমাকেও এক পেয়ালা দে। মদের আসরে মদ না খেয়ে মজা দেখতে নাই।

দাসী পেয়ালা পূর্ণ করে সুলতানের সামনে বাড়িয়ে দিলো। সুলতান সরাবের পেয়ালা ঠোঁটে স্পর্শ করে বললো, এতদিন বাদে আমার খুশ নাহার সেরে উঠেছে—সেই আনন্দে আজ আমি মৌজ করবো।

সুলতান ছোট ছোট চুমুকে কাপটা শূন্য করে দিলো। দাসী আবার পূর্ণ করে দেয়। এবার সুলতানের নজর পড়ে বোরখা-ঢাকা সুন্দরীর দিকে। নাকাবের ফিনফিনে পর্দার নিচে তার কুসুম পেলব গাল, কাজল কালো ডাগর চোখ, আঙুরের মতো অধর পরিষ্কার দেখা যায়। দাহিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটি তো ভারী খুবসুরৎ! কে?

দাহিয়া বলে, খুশ নাহারের প্রাণের বন্ধু। ওরা কেউ কাউকে না দেখে দু-দণ্ড থাকতে পারে না। একজনের বিরহে দু'জনেরই নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

সুলতান খুশ বাহার-এর মুখ থেকে নাকাব সরিয়ে দেয়। অদ্যাবধি তার দাড়ি গোঁফ

ওঠেনি। মুখে মেয়েলী ভাবটা ষোল আনাই বজায় আছে। তার ওপরে প্রসাধনের প্রলেপ পড়েছে। সন্দেহের কোনোও অবকাশ নাই। আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে খুশ বাহারের বাঁ গালে একটা তিল আছে। সারা মুখের গোলাপী আভার মধ্যে ঐ এক বিন্দু কালো তিল কী অপূর্ব সুন্দর-ই যে মনে হয় চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না। সুলতান এক ভাবে খুশ বাহারের মুখের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে। নির্মেঘ নীল আকাশের গায়ে শুকতারার মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে ঐ বিন্দুসম কৃষ্ণকালো তিলটি।

ইয়া আল্লাহ, সুলতান উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আজ থেকে এই নতুন বাঁদীকে আমার রক্ষিতা করলাম। খুশ নাহারের পাশে, ভালো করে সাজিয়ে একটা ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দাও। এখন থেকে সে পাবে শাদী করা বেগমের মর্যাদা।

দাহিয়া বলে, বাঃ, চমৎকার। এর যা রূপের জৌলুস তাতে এই মর্যাদা দিয়ে তুমি সুবিচারই করেছ, ভাই জান।... এই ব্যাপারে তোমাকে একটা ছোট্ট কিসসা শোনাই,—গল্পটা পড়েছিলাম এক নামজাদা লেখকের কিতাবে।

গল্পটা কী, শুনি।

দাহিয়া বলতে শুরু করে ঃ

শুনুন ধর্মাবতার, কুফা শহরে এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বাস করতো—। তার একটি মাত্র পুত্র সন্তান—নাম খুশ বাহার। ছোট বেলা থেকে সে তাদের বাড়ীর বাঁদীর এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে খেলা-ধূলা করে মানুষ হতে থাকলো। এইভাবে একদিন তারা কৈশোর—কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিলো। এতদিনে খুশ বাহারের সাথীর দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে। তার রূপের জেল্লায় কুফার সুবাদার লুব্ধ হয়ে এক বজ্জাৎ বুড়িকে তার পিছনে লাগালো। ধূর্ত শয়তান বুড়িটা ছল চাতুরী করে মেয়েটিকে সুবাদারের প্রাসাদে নিয়ে আসতে পারলো। তারপর সেই বদমাইশ সুবাদার তার নিজের কাজ হাসিল করার জন্য তাকে সুলতানের কাছে ভেট পাঠিয়ে দিলো।

সাথীকে হারাবার পর থেকে খুশ বাহার-এর নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো, সাথীকে খুঁজে পাওয়ার জন্য।

অবশেষে একদিন সে দামাসকাসে এসে সন্ধান পেলো তার প্রিয়তমা সুলতানের হারেমে বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছে। নান ফিকির করে সে একদিন হারেমের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তার ভালোবাসার সঙ্গে মিলনও হলো। দু'জনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে ওরা যখন আনন্দে আত্মহারা সেই সময় সুলতান খবর পেয়ে উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে ছুটে এসে এক কোপে দু'জনেরই মাথা নামিয়ে দিলো। কোনও কথাই সে শুনতে চাইলো না, শুনলো না।

লেখক গল্পটা এখানেই শেষ করেছেন। কোনও মন্তব্য করেন নি। তাই ভাইজান, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, ঐ অবস্থায় তুমি থাকলে, তোমার বিচারে তুমি কী করতে?

সুলতান আবদ্ অল মালিক ইবন মারবান বললো, এ ব্যাপারে আমার কোন দ্বিধা নাই, সেই সুলতান ভীষণ অন্যায় কাজ করেছে। যে কোনও লোকেরই গর্দান নেবার আগে কতবার চিন্তা করা উচিৎ। কারণ প্রয়োজন হলে সহস্রবার চেষ্টা করেও আবার আমরা তার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারি না। সুতরাং প্রাণ নেবার সময় অত তাড়াহুড়া করা তার সঙ্গত হয়নি। যদি ওদের বলার সুযোগ দিতেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তলোয়ারের বদলে ওদের গলায় পুষ্পহার পরিয়ে দিতেন তিনি। প্রথমতঃ তারা আশৈশব গভীর প্রেমে আবদ্ধ। দ্বিতীয়ত তারা তখন তার প্রাসাদে মেহেমান। তৃতীয়তঃ সুলতান সব সময়ই স্থিতধী, বিচক্ষণ, ন্যায় বিচারক হবেন। এই সব কথা বিবেচনা করে আমি ঐ সুলতানকে অযোগ্য অপদার্থ ছাড়া কিছুই বলতে পারি না।

শাহজাদী দাহিয়া সুলতানের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। ধর্মাবতার, তুমি না

জেনে, তোমার নিজের মামলার রায় তুমি আজ নিজেই দিয়ে দিলে! আমাদের পুণ্যাত্মা পিতার তুমি যোগ্য সন্তান—তোমার মুখেই এই সব কথা সাজে।

সুলতান অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কী? কী ব্যাপার? কিছুই তো বুঝতে পারছি না বোন! ওঠ, কী হয়েছে, নির্ভয়ে বলো, তুমি তো জান, কোনও অন্যায় অবিচার আমি সইতে পারি না।

খুশ বাহারকে দেখিয়ে দাহিয়া বলতে থাকে, বোরখা ঢাকা এই মেয়েটি আসলে ছদ্মবেশী খুশ বাহার। প্রিয়তমার বিরহে উদ্ভ্রান্ত হয়ে নিজের জীবন তুচ্ছ করে দুর্ভেদ্য পাহারা পেরিয়ে সে এই হারেমের অন্দরে ঢুকে পড়েছে। জানে, ধরা পড়লে নির্ঘাৎ মৃত্যু, তবু, ভালোবাসার টান এমনই বস্তু, কিছুই সে পরোয়া করেনি। কুফার শয়তান সুবাদার ইউসুফ অল থাফাকী খুস নাহারেকে চুরি করে তোমার কাছে ভেট পাঠিয়েছে। তার দুরাশা, তুমি তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আরও উঁচু পদে বহাল করবে। লোকটা ডাঁহা মিথ্যেবাদী। সে তোমাকে লিখেছিলো, খুশ নাহারকে সে দশ হাজার দিনারে এক সওদাগরের কাছ থেকে কিনেছে। আমি চাই তুমি তাকে সমুচিৎ সাজা দিতে কসুর করবে না। আর এই বাছাদের ক্ষমা করে দেবে। এদের তো কোনও গুনাহ নাই, একটাই এদের অপরাধ, দু'জনে দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসে এরা। যাই হোক, এখন এরা তোমার মেহেমান। তোমার আশ্রয়ে এসেছে।

খলিফা বললো, আমার জবান একটাই। তার কোনও নড়চড় হয় না। খুশ নাহার, যা শুনলাম সব সত্যি? এই খুশ বাহার তোমার ভালোবাসা?

খুশ নাহার মাথা হেঁট করে ঘাড় নেড়ে বলে, এর চেয়ে বড় সত্যি আমার কাছে আর কিছুই নাই, জাঁহাপনা।

খলিফা চিৎকার করে উঠলেন সাবাস্! তোমাদের পুনর্মিলনে আমিই সবচেয়ে খুশি হলাম। যাও তোমরা মুক্ত।

তারপর খুশ বাহারের দিকে তাকিয়ে খলিফা বললো, আমি শুধু জানতে চাই, বাছা, কি করে তুমি হারেমের পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে দুর্ভেদ্য হারেমের অন্দরে ঢুকতে পেরেছ। আর কি করে বা জানলে, তোমার বিবি বন্দী হয়ে আছে এই হারেমে?

খুশবাহার করজোড়ে বললো, আমি অকপটে সব কথাই আপনাকে খুলে বলছি, আমার গোস্তাকি মাফ করবেন, হুজুর।

এই বলে সে আদ্যোপান্ত সব কথাই সবিস্তারে সুলতানকে খুলে বললো। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলো সুলতান। পারসী সাহেবের কাছে লোক পাঠালো। বললো, খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে বাদশাহী কেতায় তাকে এখানে নিয়ে এসো।

খুশ নাহার আর খুশ বাহারকে সাতটা দিন মহা আদর যত্নে প্রাসাদে রেখে নানা মূল্যবান উপহার উপঢৌকন সঙ্গে দিয়ে কুফায় স্বদেশে পাঠিয়ে দিলো সুলতান। কুফার সুবাদারকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় খুশ বাহারের বাবা সওদাগর বাহারকে বহাল করলো।

শাহরাজাদ চুপ করলো। সুলতান শাহরিয়ার মুগ্ধ হয়ে বলে, কী সুন্দর তোমার কিস্সা, শাহরাজাদ। কিন্তু একটা জিনিস একটু খটকা লাগলো। ভালোবাসার সোহাগ অনুরাগের বিশদ বিবরণগুলো তুমি পাশ কাটিয়ে গিয়েছ। এবং তা ইচ্ছে করেই।

শাহরাজাদ স্মিত হাসে, পরের যে কাহিনীটা বলবো তার মধ্যে এসব মালমসলা পুরোদস্তুর পাবেন, জাঁহাপনা। যদি ধৈর্য ধরে শোনেন তবে এরপর আলা-অল-দিন আবু সামাতের কাহিনী শোনাবো। কিন্তু তাতে আপনার চোখ থেকে ঘুম বিদায় নেবে।

—তা হোক, তুমি বলো। অনিদ্রা রোগে ভুগে মরবো সে-ভি আচ্ছা, এমন মজাদার কিস্সা আমি না শুনে ছাড়বো না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ বলে, আজ আর নতুন কাহিনী শুরু করার সময় নাই। এখন ঘুমান। কাল রাতে শুরু করা যাবে।

দুশো পঞ্চাশতম রজনী ঃ

নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে সে।

কোনও এক সময়ে কায়রো শহরে এক সদাশয় সম্ভ্রান্ত সওদাগর বাস করতো। শহরের সমস্ত সওদাগররা তাকে খুব মান্য করে চলতো। তার সরলতা সততা বিনম্র ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করেছিলো।

এক জুম্মাবারে নামাজ-এর আগে সে হামামে গিয়ে গোসলাদি সেরে নাপিতের কাছে গিয়ে ক্ষৌরকর্ম সেরে নিলো। মাথা ন্যাড়া করে, গোঁফ চেঁছে ফেলে সে শাস্ত্রাচার পালন করতো সদা সর্বদা। নাপিতের কাছ থেকে আরশী নিয়ে মাথামুণ্ডু সব ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলো, যথারীতি কামানো হয়েছে কিনা। প্রায় সাদা লম্বা দাড়ির দিকে নজর পড়তে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ মনে ভাবতে থাকে; বয়স বিকেল হতে চলেছে। এখনও, খুঁজলে কাঁচা দাড়িও পাওয়া যাবে অনেক। কিন্তু আরও কিছুকাল পরে, চেষ্টা করেও হয়তো আর কাঁচা দাড়ি খুঁজে বের করা যাবে না। পলিত কেশ বার্দ্ধক্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর বার্ধক্যই মৃত্যুকে কাছে টেনে আনতে থাকে। সে ভাবে, হায় বেচারী সামস্-অল-দিন, দিন ফুরিয়ে এলো, সন্ধ্যা হতে চললো। এখন কবরে শয্যা নিতে হবে। অথচ জীবনে কী তুমি পেলে? সারা জীবন ধরে যদি একটা ছেলে-মেয়েরই মুখ না দেখলে তবে কার জন্যে এই বিত্ত-বৈভব রেখে যাচ্ছো? কে খাবে! মোমের শিখার মতো জ্বলতে জ্বলতে একদিন তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে। বাস্ সেখানেই তোমার জমানার ইতি হয়ে গেলো। আর কেউ মনে রাখবে না তোমাকে। কেউ বইবে না তোমার বংশের ধ্বজা।

বেদনা বিধুর চিত্তে সে-দিনের মতো সে মস্‌জিদে নামাজ সারে। তারপর বাড়ি ফিরে আসে। বিবি বসেছিলো তার প্রতীক্ষায়। যথারীতি সে খানা-পিনা বানিয়েছে। এক সঙ্গে বসে দু'জনে খাবে। স্বামীর পায়ের শব্দ পেয়ে সে ছুটে যায়। হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, আজ এত দেরি হলো কেন, গো?

সওদাগর বিবির উচ্ছলতায় সাড়া দিতে পারে না। গম্ভীর মুখে বলে, কী হবে অত তাড়াহুড়া করে। আমার জীবনে আনন্দ বলতে আর কী আছে? যে-কটা দিন বাঁচি, কোনওরকমে দিনগত পাপক্ষয় করে কাটানো ছাড়া আর কি বা গতি আছে।

সওদাগর বিবি স্বামীর এই উদাস-বিবাগী কথায় কেমন যেন ঘাবড়ে যায়। বলে, তোমার কী হয়েছে গো, হঠাৎ এইরকম কথাবার্তা বলছো কেন?

—কেন বলছি? জান না? তুমিই তো আমার সব দুঃখের একমাত্র কারণ। প্রতিদিন আমি বাজারে যাই, দেখি আমারই সমব্যবসায়ীরা তাদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আসে দোকানে। কত আনন্দ স্ফুর্তি করে। আমার বুকের মধ্যে হু হু করে যায়। মনে হয়, আমার এই নিঃসন্তান জীবন উষর এক মরুভূমি। এই ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো।

সওদাগর বিবি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, ওসব নিয়ে মন খারাপ করতে নাই। আল্লাহ যাকে যে ভাবে রাখেন তাতেই সুখী থাকতে হয়। এসো, টেবিলে খানা সাজিয়েছি। হাত মুখ ধুয়ে খাবে চলো।

সওদাগর প্রায় চিৎকার করে ওঠে, আল্লাহর দোহাই, আমাকে বিরক্ত করো না। আমার কোনও ক্ষিদে তেষ্টা নাই। আর তাছাড়া তোমার মতো আঁটকুড়ির হাতে আমি খেতেও চাই না। আজ আমি নিঃসন্তান—সে শুধু তোমার কারণে। শাদীর পর চল্লিশটা বসন্ত বয়ে

গেলো। একটা ছেলে বা মেয়ে বিয়াতে পারলে না তুমি। আর একটা বিবি আনবো ঘরে, তাতেও তুমি সব সময় বাদ সেধেছ। আমি নরম প্রকৃতির মানুষ। তোমার বারণ আমি ঠেলতে পারিনি। তুমি বরাবরই আমাকে ধোঁকা দিয়ে এসেছ, 'আর কিছু দিন সবুর কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন।' কিন্তু তুমি জন্মাবধি বন্ধ্যা। আল্লাহ কি করে মুখ তুলে চাইবেন! সব জেনে শুনেও তুমি আমাকে অন্য মেয়ে ঘরে আনতে দিলে না। তোমার কি উচিৎ ছিলো না—আমার মুখে হাসি ফোটানো? তুমি কি নিজে থেকেই বলতে পারতে না—'না আর কোনও আশা নাই, এবার তুমি আর একবার শাদী কর।' আজ থেকে কসম খাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আর শোব না। সহবাস করবো না। তার চেয়ে বরং লিঙ্গটা কেটে ফেলব। তোমাকে ছুঁতে আমার ঘেন্না হয়। তুমি আর আমার সামনে এসো না। তোমার মতো বাঁজা-মেয়ের মুখ দেখলেও পাপ হয়।

সওদাগরের এই অপমানকর কথায় তার বিবি রণমূর্তি ধারণ করলো, মুখ সামলে কথা বলো, বলে দিচ্ছি। নিজের মুরোদে কুলায় না, সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে লজ্জা করে না তোমার। তুমি একটা ধ্বজভঙ্গ ক্লীব। আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছ। একটা দিনের জন্য মিলনের আনন্দ দিতে পারনি। আজ তুমি আমাকে বাঁজা আঁটকুড়ি বলে গালাগাল দিচ্ছ। কিন্তু কেন আমি বাঁজা, কেন আমি আজ নিঃসন্তান, সে কথা ভেবে দেখেছ কখনও। সে সবই তোমার হীন বীর্যতার কারণে। আমার কোনও দোষ নাই। তোমার যদি ক্ষমতা থাকতো, সন্তান আমি পেটে ধরতাম। মুখে লম্বা লম্বা বাত ছাড়ার আগে নিজের চিকিৎসা কর। শুক্রসঞ্জীবনী দাওয়াই এনে খাও। হয়তো অসুখ সেরেও যেতে পারে। যদি সারে, যদি বীর্যে জীয়ন্ত বীজ বেরোয়, তাহলে দেখে নিও, আমি মা হতে পারি কি না।

বিবির বচনে সওদাগর চুপসে গেলো। আমতা আমতা বললো, হ্যাঁ, তা কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলিনি বোধ হয়। হয়তো আমারই দোষ। মনে হয় আমার বীর্যের তেজ মরে গেছে। তুমি কি জান বিবিজান, তেমন কোনও দাওয়াই কোথাও পাওয়া যায় কিনা, যা খেলে শরীর চনমন করে ওঠে, এবং বীর্য দৃঢ় হয়?

বিবি পরামর্শ দেয়, তুমি হেকিমের কাছে যাও। সে-ই তোমাকে বাৎলে দিতে পারবে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো একান্নতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

—খোদা হাফেজ, সওদাগর বলে, কাল সকালেই আমি দাওয়াখানায় যাবো। দেখি কোনও দাওয়াই পাই কিনা।

পরদিন সকালে দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে সওদাগর এক দাওয়াখানায় এসে দাঁড়ালো। তার হাতে একটা চিনে মাটির বাটি—ওষুধ নেবে বলে নিয়ে এসেছে। দোকানের মালিক সালাম আলেকুম জানিয়ে বললো, আজ সকালে আপনিই আমার প্রথম খদ্দের হতে এলেন, কী আমার সৌভাগ্য! তা সওদাগর সাহেব, কী দাওয়াই দেব?

সওদাগর তার চিনে মাটির বাটিটা পাশে রেখে বললো, আমি এমন একটা দাওয়াই চাই—যা খেলে শরীরে তাগদ আসে, বাচ্চা পয়দা করার ক্ষমতা জন্মায়।

দোকানী সওদাগরের মুখে এ ধরনের কথা শুনবে কল্পনা করতে পারেনি। তাঁর মতো ধর্মানুরাগী ভাব-গম্ভীর ব্যক্তির মুখে একি কথা। না, এই সকালে তিনি রসিকতা করতে এসেছেন? ঠিক আঁচ করতে পারে না সে। যাইহোক, একটা লাগসই জবাব দিতে হবে। দোকানী বলে, ইস্, আপনি যদি কালকেও আসতেন, সওদাগর সাহেব। কাল পর্যন্ত অনেকখানি ছিলো,

অনেকগুলো খদ্দের এসে সবটুকু নিয়ে গেছে। দাওয়াইটার চাহিদা খুব বেশি। আপনি বরং এক কাজ করুন, পাশের দাওয়াখানায় দেখুন, হয়তো পেয়ে যাবেন।

সওদাগর আর একটা দাওয়াখানায় গেলো। কিন্তু সে-ও ঠিক একই কথা বলে অন্য দোকানে খোঁজ করতে বললো। এই ভাবে এক এক করে বাজারের সব কয়টা দাওয়াখানাতেই সে খোঁজ করলো। কিন্তু সবাই মুচকী হেসে একই কথা বলে বিদায় করলো তাকে।

খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ব্যর্থ মনে সে তার নিজের দোকানে এসে বসে। কিছুক্ষণ পরে সামসাম নামে এক দালাল এলো তার কাছে। লোকটা মদ গাঁজা ভাঙ্গ আফিং চরস খেয়ে সব সময় চুর হয়ে থাকে। এবং লোচ্চামীতে গুরুদেব। কিন্তু সামস অল-দিনকে সে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। তার সঙ্গে কখনও, ভাঁড়ামী বা বেলেল্লাপনা কিছু করতো না। তার সদাশয় বিনম্র ব্যবহার-এ সে মুগ্ধ না হয়ে পারতো না। কিন্তু আজকের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে সওদাগরের মেজাজ ঠিক নাই। কেমন যেন তিরিক্ষিভাব, কোনও কথারই ভালো করে জবাব দিচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোনও অঘটন ঘটেছে। সামসাম জিজ্ঞেস করে, আজ অমন মন মরা হয়ে বসে আছেন কেন সওদাগর সাহেব?

সওদাগর বলে, আমার পাশে এসে বস সামসাম, শোনো আমার দুঃখের কাহিনী। আমি শাদী করেছি আজ চল্লিশ বছর। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, একটা সন্তানের মুখ দেখলাম না আজ পর্যন্ত। আমার বিবি বলে, সব দোষ নাকি আমার। আমার বীর্যের দোষ আছে। সন্তান পয়দা করার ক্ষমতা নাই। আজ সারাটা সকাল সমস্ত দাওয়াখানায় খুঁজেছি, কিন্তু কোনওখানেই সেই দাওয়াই পেলাম না। সবাই বলে কাল ছিলো, আজ ফুরিয়ে গেছে। তাই খুব বিষাদ মনে বসে আছি। কিছুই ভালো লাগছে না।

সওদাগরের কথা শুনে সামসাম অবাক হলো না, মজাও পেলো না। গম্ভীরভাবে বললো, কিছু চিন্তা করবেন না, দাওয়াই আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আপনি আমাকে একটি দিনার দিন। আমি মালমসলা কিনে এনে নিজে হাতে বানিয়ে দিচ্ছি।

—ইয়া আল্লা, সওদাগর প্রায় চিৎকার করে ওঠে, তাও কি সম্ভব? আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি, তুমি যদি সত্যিই আমাকে সন্তানের বাবা করে তুলতে পার তাহলে তোমার ভাগ্য আমি ফিরিয়ে দেব, শেখ। ঠিক আছে একটা কেন, এই নাও দুটো দিনার দিলাম। মশলাপাতি নিয়ে এসো। বানাও দেখি কেমন সে ধন্বন্তরী দাওয়াই!

চিনে মাটির বাটিটা আর দুটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সামসাম বেরিয়ে গেলো। লোফার সামসাম নিজেকে ভাবে সে একটা দিগগজ হেকিম। যা যা মসলাপত্র মনে করলো, কিনে নিয়ে ফিরে এলো সে সওদাগরের দোকান। তারপর চললো তার দাওয়াই বানানোর পর্ব ঃ

একটার সঙ্গে আর একটা মশাল সে মিশিয়ে ফেলে পিষে গুঁড়ো করলো। সব শেষে খানিকটা মধু দিয়ে মেড়ে এক রকমের থক-থকে খানিকটা গোলা বানালো। দাওয়াই-এর বাটিটা সওদাগরের হাতে তুলে দিয়ে বললো, এই নিন একেবারে মোক্ষম জিনিস। খেলেই আবার নতুন যৌবন ফিরে পাবেন। রাতে শুতে যাবার ঠিক দুঘণ্টা আগে একমাত্রা খাবেন। কিন্তু তার আগে তিনদিন আপনাকে রোজ একটা করে পায়রার দোপিয়াঁজী খেতে হবে। বেশ ঝাল মসলা দিয়ে বানাতে বলবেন। আর খাবেন পাকা পোনার কালিয়া, ভেড়ার অণ্ডকোষ ভাজা। এর পর যদি আপনার শের-এর মতো তাগদ না আসে, যদি বাচ্চা পয়দা করার ক্ষমতা না জন্মায়, আপনি আমার এই দাড়ি উপড়ে ফেলবেন—আমার মুখে থুথু দেবেন।

এই বলে সামসাম বিদায় নিলো। সওদাগর ভাবলো, লোকটা মদ ভাং খেয়ে আর মেয়ে-মানুষ নিয়েই সারাটা জীবন কাটাচ্ছে। এ ব্যাপারে তার ওপর ভরসা রাখা যায়।

নিশ্চয়ই সে আনতাবড়ি কিছু একটা বানিয়ে দেয় নি। হয়তো কাজ হলেও হতে পারে। আর দেরি না করে সে তক্ষুণি বাড়ি চলে এলো। বিবিকে সব কথা বললো। আগের রাগ সব জল হয়ে গেছে। আবার তারা এক সঙ্গে বসে খানাপিনা করলো। এক শয্যায় রাত কাটালো।

সামস অল-দিন যথাযথভাবে সামসামের নির্দেশ মেনে চলতে থাকলো। পায়রার দোপিয়াঁজী, পাকা পোনার কালিয়া, ভেড়ার অণ্ডকোষ ভাজা—প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এই কয়টি খানাই প্রধান হয়ে উঠলো। তিনদিন পরে সে শোবার দুঘণ্টা আগে একমাত্রা দাওয়াই খেলো। বেশ সুস্বাদু। কিছুক্ষণের মধ্যে শরীর গরম হয়ে উঠলো। যেন সে আবার তার হারানো যৌবন ফিরে পেয়েছে। ধাঁ করে বয়সটা তার চল্লিশ বছর কমে গেছে। সেদিন তার বিবি প্রথম বুঝতে পারলো যৌবনের স্বাদ। লোকটা যেন একটা বীর পুরুষ—শেরের মতো, তার শরীরটা থাবার মধ্যে পুরে নিলো। সেই রাতে সওদাগর বিবি সত্যিই সন্তান সম্ভবা হলো। কিন্তু নিঃসংশয় হলো মাস তিনেক বাদে—সে যখন দেখলো, পরপর তিনটি মাস তার মাসিক ধর্ম আর হলো না।

যথা সময়ে সওদাগর বিবি একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করলো। ছেলেটি এমন হৃষ্টপুষ্ট চেহারার হলো, ধাই তো দেখে অবাক। বললো, সারা জীবন এই করে আসছি, কিন্তু এমন তাগড়াই বাচ্চা কারো হতে দেখিনি। দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না—সদ্য হয়েছে। মনে হয়, বছরখানেক বয়স হবে।

বৃদ্ধা ধাই আল্লাহর নামগান করতে করতে বাচ্চাকে ধোয়ালো মোছালো। তারপর মায়ের কোলে দিয়ে বললো, ছেলেকে মাই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

তিনদিন তিন রাত পরে পাড়াপড়শীর সকলকে মিঠাই বিতরণ করা হলো। বৃদ্ধা ধাই ইনাম নিয়ে চলে গেলো। সাতদিনের দিন ঘরে নুন ছড়ানো হয়। সওদাগর ঘরে এসে বিবিকে বললো, কই গো ছেলের মা, দেখাও, আল্লাহর আশীর্বাদটা একবার নয়ন ভরে দেখি।

সওদাগর বিবি ছেলেকে তুলে ধরে। মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে সওদাগর। —ইয়া আল্লাহ, কী সুন্দর! যেন আসমানের চাঁদ নেমে এসেছে আমার ঘরে। আর দেখ, বিবিজান, কত বড়টা হয়েছে! আচ্ছা, ছেলের কী নাম রাখবে?

—যদি মেয়ে হতো, সওদাগর বিবি বলে, তাহলে আমি একটা নাম দিতাম। ছেলের নাম তুমিই দাও।

বাচ্চাটার বাঁ উরুতে একটা ছোট্ট তিল দেখে সওদাগর আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।—আমরা একে আলা অলদিন আবু সামাত বলে ডাকবো, কেমন?

সেই থেকে ছেলের নাম আলা-অলদিন আবু সামাতই হয়ে গেলো। কিন্তু নামটা বেশ বড়সড় বলে সকলে ওকে আবু সামাত বলেই ডাকে। চার বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেকে দুটো ধাই আর তার মা বুকের দুধ খাওয়ালো। ঐ বয়সে সে তাগড়াই সিংহ শাবকের মতো লাফাতে থাকে। পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। ভালোবাসে। কারণে অকারণে সওদাগরের বাড়ি এসে তারা ভিড় জমায়। ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করতে চায়। কিন্তু ঐ শিশু সামাতের ওসব বিলকুল পছন্দ নয়। কারো কোলেই সে থাকতে চায় না। কারো আদর চুম্বনই সে বরদাস্ত করতে পারে না। সওদাগর আর তার বিবিও পাড়া-পড়শীদের এই আদর-সোহাগ ভালো চোখে দেখে না। সওদাগর বলে, সামাতকে সামলে রাখবে। অন্য লোকের নজর লাগাতে পারে।

সেইদিন থেকে আবু সামাতকে আর সকলের সামনে বের করা হলো না। অন্দরের এক নিভৃত কক্ষে রাখা হলো তাকে। আদর যত্নের কোনও ত্রুটি রাখলো না সওদাগর। একটা ছেলের জন্য পাঁচটা বাঁদী চাকরের ব্যবস্থা করা হলো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করে। নামজাদা মৌলভীর হাতে তার শিক্ষা দীক্ষার ভার দেওয়া হয়। যথা সময়ে

সে কোরান এবং নানা বিদ্যায় বিশারদ হয়ে ওঠে। শুধু লেখাপড়া নয় খেলাধূলাতে সে বেশ চৌকস হতে লাগলো। কিন্তু সবই তার একা একা—সবই লোক চক্ষুর আড়ালে—সেই নিভৃত কক্ষে।

এই ভাবে চৌদ্দটা বছর কেটে গেছে। আবু সামাতের গোঁফের রেখা ফুটছে। একদিন চাকর খানা সাজিয়ে দিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগে ঘরের দরজায় শিকল তুলতে সে ভুলে গিয়েছিলো। দরজা খোলা পেয়ে সামাত এক পা এক পা করে ঘরের বাইরে আসে। এই নিভৃত বন্দী জীবন তার আর ভালো লাগে না। সে চায় মুক্ত আলো হাওয়া—মানুষের সাহচর্য।

এঘর ওঘর করতে করতে এক সময় সে চলে আসে তার মা-এর ঘরে। সেখানে তখন তার মা পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে খোশ গল্পে মশগুল। মেয়েগুলোও তন্ময় হয়ে গল্প শুনছিলো। হয়তো কারো বেশ-বাস অসংবৃত হয়েও থাকতে পারে। হঠাৎ এক উঠতি বয়সের ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখে সকলে সম্বিত ফিরে পায়। ক্ষিপ্র হাতে যে যার মতো বোরখা টেনে নিয়ে দেহ মাথা মুণ্ড ঢেকে ফেলে।

—ইয়া আল্লাহ, কী বে-শরম বে-ইজ্জতের কথা। বলা নাই কওয়া নাই, হুট করে মেয়েদের ঘরে ঢুকে পড়লো!

আবু সামাতের মা বলে, এ আমার ছেলে, আমার চোখের মণি। একে লজ্জা করার কী আছে? এতদিন সে দাসদাসীদের পরিচর্যায় মানুষ হয়েছে। বাইরের কোনও ছেলে মেয়ের সঙ্গে মিশতে দিইনি।

এই কথা শুনে মেয়েরা নাকাব সরিয়ে দেয়, তাই বলুন। তা এতদিন তো আপনার ছেলেকে দেখিনি কখনও। আপনার মুখে তার কথা শুনিওনি কোনওদিন।

সওদাগর বিবি উঠে গিয়ে ছেলেকে আদর করে চুমু খায়। বলে, বেটা, এখন তোমার ঘরে যাও।

বান্ধবীরা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছে দেখে ছেলেকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিলো।—ওর বাবা, ওকে বাইরে বেরুতে দেয় না। বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যেতে পারে, এই তার ভয়। তাই সে একা একাই মানুষ হচ্ছে। ঘরের মধ্যেই তার নাওয়া খাওয়া খেলাধূলা লেখাপড়ার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। যতদিন না সে বড় হয়—দাড়ি গোঁফ গজায়, ততদিন সে এইভাবেই মানুষ হবে—এই আমাদের ইচ্ছা। ছেলের যা রূপ তাতে ভাই সত্যিই ডর লাগে, হয়তো কোন খারাপ মেয়ের পাল্লায় পড়ে নিজেকে নষ্ট করে ফেলবে। আজই এই প্রথম দেখলাম সে আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলো। হয়তো ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিতে ভুলে গেছে চাকরগুলো।

সওদাগর বিবির বান্ধবীরা বিদায় নেবার সময় ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললো, খুব সুন্দর ছেলে হয়েছে আপনার। চাঁদের মতো দেখতে। আহা—চোখ জুড়িয়ে যায়। আল্লাহ তাকে শতায়ু করে বাঁচিয়ে রাখুন।

কিছুক্ষণ পরে আবু সামাত আবার মা-এর কাছে ফিরে আসে। বাইরের আঙ্গিনায় সে দেখতে পায়, একটা খচ্চরের পিঠে জীন লাগাম পরাচ্ছে চাকরেরা।

—আচ্ছা মা, আবু সামাত প্রশ্ন করে, এই জানোয়ারটাকে ঐভাবে সাজাচ্ছে কেন ওরা?

—তোমার বাবাকে বাজার থেকে আনতে যাবে। তার ফেরার সময় হয়ে এসেছে কিনা, তাই।

আমার বাবা কী করেন মা, কীসের ব্যবসা তার?

মা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে, তোমার বাবা মস্তবড় সওদাগর—

সারা কাইরো শহরে তার খুব নাম ডাক। আরবের সুলতান এবং নানা দেশের রাজা বাদশাহদের সঙ্গে তার কারবার। একটা মোটামুটি ধারণা কর ঃ কোনও ছোটখাটো খদ্দের তার কাছে সোজাসুজি সওদা করতে পারে না। কমপক্ষে এক হাজার দিনারের লেন দেন না হলে দালাল ধরে যেতে হয় তার কাছে। তা যদি নশো নিরানব্বই দিনারও হয়—তবু। তোমার বাবা সওদাগর সমিতির প্রধান। তার কথা ছাড়া কাইরোর কোনও সওদাগরই শহরের বাইরে বাণিজ্য করতে যেতে পারে না। আল্লাহর দোয়ায়, তোমার বাবা শহরের সেরা ধনী। সবাই খুব মান্য গণ্য করে।

—খোদা মেহেরবান, তিনি আমাকে সম্ভ্রান্ত সওদাগরের ঘরে জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু মা, আমি ঐ ঘরে বন্দী হয়ে আর কতকাল কাটাবো। আমার জীবন হাঁফিয়ে উঠেছে। কাল থেকে আমি বাবার সঙ্গে দোকানে গিয়ে বসবো।

—ঠিক আছে বাবা, অধৈর্য হয়ো না, তোমার বাবা ফিরলে আজ সন্ধ্যাবেলা তার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলবো আমি।

সন্ধ্যাবেলা খেতে বসে সওদাগর বিবি কথাটা পেশ করলো, দ্যাখ, ছেলেটা বড় হচ্ছে, এভাবে তাকে আর ঘরে আটকে রাখা ঠিক না। তুমি বরং সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যাও তাকে। নিজের ব্যবসা বাণিজ্য নিজে দেখে শুনে বুঝে নিতে হবে তো।

—কিন্তু আবু সামাতের মা, সওদাগর বলে, তুমি তো জান, চারপাশের মানুষের কি শকুনের দৃষ্টি। ছেলেটা যদি কারো কুনজরে পড়ে!

সওদাগর বিবি বলে, কিন্তু তাই বলে ছেলেটাকে এইভাবে বন্দী করে রাখাও কি ঠিক?

—তুমি কি কিছুই খোঁজ রাখ না, বিবি? ওপাড়ার একটি ছেলে একটা ডাইনীর বিষ নজরে পড়ে সেদিন মারা গেছে। যতগুলো বাল বাচ্চা মারা যায় তার প্রায় সবই এই একই কারণে।

সওদাগর বিবি বাধা দিয়ে বলে, তাই বলে ছেলেকে তুমি বাইরে বেরুতে দেবে না। সবাই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। শিকল দিয়ে বেঁধে খাঁচায় পুরে রাখলেই কি নিয়তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়? নসীবের লেখা পালটানো যায় না। যা হবার তা হবেই। ও নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি করে কোনও ফায়দা নাই। এইভাবে তাকে যদি সবারই কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখ তাহলে আখেরে তার কী ভালোটা হবে, শুনি? তুমি বুড়ো হয়েছ। মরতে একদিন হবেই। তোমার মরার পর এই বিশাল ব্যবসা বাণিজ্যের একমাত্র মালিক হবে সে। কিন্তু সারা কাইরো শহরে তোমার চেনাজানা বন্ধু-বান্ধব সম-ব্যবসায়ী কেউই তোমার ছেলের সুরৎ দেখেনি। হঠাৎ দুম করে সে যদি তোমার অবর্তমানে দোকানে গিয়ে বসতে চায় কেউ তাকে স্বীকার করবে? তোমার দোকানের কর্মচারীরাও যদি বলে বসে, কে সে, তাকে তারা জানে না, তখন? আর তাছাড়া এত বড় ব্যবসা—কী তার হালচাল, কী তার তারিকা কিছুই তার জানা থাকবে না। কেমন করে সে চালাবে তখন? তুমি বলবে, আমি তো আছি। আমিই সবাইকে বলবো, 'এই হচ্ছে সওদাগর সামাস অল-দিনের একমাত্র সন্তান—তার ব্যবসার একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমার কথা শুনবে কেন তারা? আমি বানিয়েও বলতে পারি। তারা হয়তো অবিশ্বাস করতে পারে—আবু সামাত তোমার ঔরসের সন্তান নয়। তখন? তখন কী হবে? সরকারের ফৌজদার এসে তোমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আটক করে নিয়ে যাবে। তোমার ছেলে আর আমি তখন কি আঁটি চুসবো? আমি যদি শহরের পাঁচজন সম্ভ্রান্ত লোককে সাক্ষী মানতে যাই— বেঁহুজ্জৎ হয়ে যাবো। তারা বেমালুম বলে দেবে, 'কই সওদাগর সাহেবের কোনও সন্তানাদি ছিলো বলে তো আমরা শুনিনি কখনও!' সে-অবস্থায় তাদেরও দোষ দেওয়া যাবে না। সত্যিই তো তারা কখনও শোনেনি তোমার ছেলের কথা। বা চোখেও দেখেনি কখনও?

বিবির কথায় সওদাগরের চৈতন্য উদয় হয়। হুঁ, ঠিক সাচ্চা বাত বলেছো বিবি। অতটা তো সে তলিয়ে দেখেনি। হাজার হলেও মেয়েমানুষের সম্পত্তি জ্ঞান টনটনে হয়।

—খোদা হাফেজ, তুমি ঠিক বলেছ, বিবিজান। আমি কাল থেকে আবু সামাতকে সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যাবো। চেনা জানা সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেব। নাঃ, তুমি যথার্থ কথা বলেছ। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার! আর আমার শরীর স্বাস্থ্যের কথাও কিছু বলা যায় না। তাছাড়া এখন থেকে কেনা বেচার তরিকাগুলো না শেখালে পরে ব্যবসাই বা চালাবে কি করে?

তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে সামস অল-দিন বললো, বেটা, কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে দোকানে বেরুবে। কথাটা শুনে হয়তো পুলকে প্রাণ নেচে উঠছে তোমার কিন্তু বাবা, খুব সাবধান, দুনিয়ায় দুষ্ট লোকের অভাব নাই। মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। সেই ধূর্ত শয়তানদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাই সব চেয়ে কঠিন কাজ। এতদিন ধরে তুমি তোমার গুরুর কাছে যে বিদ্যা শিখেছ, তা এবার কাজে লাগাতে হবে। মানুষের সঙ্গে সব সময়ই সদ্ব্যবহার করবে। আর নজর রাখবে কে তোমার অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট। তাকে সযত্নে পরিহার করে চলবে।

এমন সময় প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো চুয়ান্নতম রাতে আবার সে বলতে শুরু করে।

পরদিন সকালে সামস অল-দিন ছেলেকে নিয়ে হামামে গোসল করতে যায়। খুব ভালো করে স্নানাদি শেষে সম্ভ্রান্ত সওদাগরের সাজ-পোশাকে সাজগোজ করে দু'জনে। নাস্তা পানি সেরে খচ্চরের পিঠে চাপে সামস অল-দিন, আর ছেলেকে পিছনে বসায়। রাস্তার লোক সামাতকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন সুন্দর চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না! যেন একেবারে পূর্ণ চাঁদের হাট। কে বটে ছেলেটা-এর আগে তো কখনও দেখিনি। মোট কথা যেই দেখে, প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

দোকানের কাছে আসতে সেই মদ ভাঙ্গ আফিঙ চরস খোর বেহেড মাতাল সামসামের সঙ্গে দেখা হয়। লোকটা তখন তুরীয় মার্গে বিচরণ করছিলো। সওদাগরের সঙ্গে আবু সামাতকে নামতে দেখে চোখ দুটো কপালের ওপর টেনে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে ঠোঁট বাঁকিয়ে এক বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বলে, কে বাবা, আসমানের চাঁদ—মাটিতে নেমে এলে?

সারা রাত ধরে গাঁজা চরস-এ দম দিতে দিতে সব কিছু তার তালগোল পাকিয়ে গেছে। এখন আর লঘু গুরু কোনও জ্ঞান নাই। যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছে। সব ভুলে মেরে দিয়েছে, সে-ই একদিন মহা তোড়জোড় করে সওদাগরকে এক মোক্ষম দাওয়াই বানিয়ে দিয়েছিলো। এবং সেই দাওয়াই-এর কল্যাণেই আজ সে চাঁদের মত ফুটফুটে ছেলেকে পেয়েছে। বৃদ্ধ সওদাগরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সে তামাশা করতে থাকে, দেখ, দেখ সবাই, অমাবস্যায় চাঁদের উদয় হয়েছে। বুড়োর চুল দাড়ি সব সফেদ হলে কি হবে, শরীরে এখনও মজবুত জোয়ানের মত তাগদ আছে তা নাহলে, হুঁ হুঁ বাবা, এই বুড়ো হাড়ে ভেল্কী খেলাতে পারে?

গাঁজা চরসের পাজী নেশা। একটা কথা মুখে এলে, বারবার সেই কথাটা নিয়েই সে নাড়াচাড়া করতে থাকে। সামসামের অবস্থা তখন তাই। যাকে সামনে পায় তাকেই ডেকে ডেকে বলে, দেখ, দেখ তোমরা, অমাবস্যায় পূর্ণচাঁদের উদয় হয়েছে। বুড়ো হাড়ে বসন্ত জেগেছে।

নিজের কাঁচা রসিকতায় নিজেই সে হাসতে থাকে। কিন্তু কথাটা মাতালের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে পারলো না সকলে। চারদিকে চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো নিমেষে।

প্রধান-সওদাগররা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আলোচনায় বসে। ব্যাপারটা বিষদভাবে খতিয়ে দেখতে চায় তারা। সত্যিই তো এতদিন তারা বৃদ্ধ সওদাগর সামস অল দিনের কোনও সন্তানাদির সংবাদ জানে না। আজ হঠাৎ একটা ছেলেকে সঙ্গে এনে নিজের ছেলে বলেই বা পরিচয় দিচ্ছে কেন? তারা সামসামকে ডেকে পাঠালো।

সমবেত সওদাগরের সামনে সামসাম ঠাট্টা বিদ্রূপ ভরা কণ্ঠে বলতে থাকে ঃ আমি আমাদের মাননীয় সভাপতি সাহেবকে ছোট করে দেখতে চাই না। তাঁর মান-ইজ্জত খোয়া যাক, মরে গেলেও তেমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। কিন্তু আপনারাই বিচার করুন সাহেব, হঠাৎ একটা চোদ্দ বছরের ছেলেকে তিনি পেলেন কোথায়? আমার মনে হয়, এইরকম একটা অসৎ লোক এই সভার সভাপতি হয়ে থাকার অযোগ্য। তাকে বরখাস্ত করে অন্য কাউকে এই ভার দেওয়া হোক, এই আমার আর্জি।

সামসামের অকাট্য-যুক্তি কেউ খন্ডন করতে পারলো না। সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিলো, না, এরকম অসৎ-লোককে এইরম দায়িত্বশীল পদে রাখা উচিৎ নয়।

দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বান্ধব এবং সমব্যবসায়ীরা প্রতিদিন এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে যায় সামস অল-দিনকে। কিন্তু আজ এতটা বেলা হলো কেউ এদিক মাড়াল না। সামস অল-দিন ভেবে পায় না, হঠাৎ আজ কেন এমন হলো। একজনের পর একজন চেনা লোক দোকানের সামনে দিয়ে সটকে পড়ে। কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে না, কথা বলে না। দালাল সামসামও দোকানের দিকে পিছন ফিরে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সামস অল দিন আর চুপ করে থাকতে পারে না। বেশ একটু চড়া গলাতেই হাঁক দিলো। ও ভাই সামসাম, এদিকে শোনো না?

সামসাম এই ডাকার অপেক্ষাতেই ধীর কদমে চলছিলো। এবার সে মুখ ফিরিয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কী ব্যাপার, সামসাম, তোমরা সব পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছো কেন? রোজ সকালে সকলে এসে আমাকে ফতিয়াহ শুনিয়ে যায়। আজ কেউ এলো না কেন?

সামসাম খুক খুক করে কাশে, হুম, আমি তো কিছুই জানি না সাহেব। কিন্তু সারা বাজারে একটা চাপা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কান পেতে শোনা যায় না—এমন নচ্চার সব কথা। আজ সকালে বাজারে এক সভা ডাকা হয়েছিলো, আপনি জানেন না, কী সব জঘন্য নোংরা কথাবার্তা আপনার নামে উঠেছিলো। আমি তো তাজ্জব বনে গেছি, আপনার মতো সদাশয় ধর্মপ্রাণ মানুষকে ওরা বাতিল করে দিয়ে নতুন সভাপতি ঠিক করে ফেলেছে!

সামস-অল দিনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু মুখের কথায় কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে বলে, আচ্ছা সামসাম, কারণ-টা কী বলতে পার। কী আমার গোস্তাকি।

সামসাম কোমরটা ঈষৎ হেলিয়ে সওদাগরের কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বলে, আমার কাছে তো আপনার কোনও লুকোচাপা কিছু নাই, সাহেব, আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো এই চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটাকে আপনি এই দোকানে এনেছেন কী কম্মে? ওকে দিয়ে মাছি তাড়াবেন, তা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। মনে রাখবেন সাহেব, ওদের এই নোংরা কথার আমি ভীষণভাবে প্রতিবাদ করেছি। মনে করুন ঐ এক ঘর ব্যবসাদারের সভায় একমাত্র আমিই ছিলাম আপনার পক্ষে। আর সবাই আপনার কুৎসায় মেতে উঠেছিলো। আমি ছাড়িনি, বলেছি—ওদের জোর গলায় বলেছি সাহেব, যদি সওদাগর সামস অল-দিন এই বুড়ো বয়সে কোন অল্প বয়সের কচি ছোকরায় আসক্ত হয়ে থাকে—সে খবর সবার আগে আমিই জানবো তো? কারণ কায়রো শহরে যে-সব বুড়ো কর্তার এই রোগ আছে তার দাওয়াই-পত্র তো আমিই দিয়ে থাকি। আমি ছাড়া অল্পবয়সের সুন্দর চেহারার লেড়কা জোগাড় করে দেবে কে? আপনি কিচ্ছু ভাববেন না সাহেব, আমি তাদের আচ্ছা করে ঠুকছি। বলেছি, ছেলেটি নিশ্চয়ই তাঁর বিবির কোনও নিকট আত্মীয় হবে। অথবা বাগদাদ কিংবা তাঁতার শহরের কোনও বন্ধু বান্ধবের ছেলেও হতে পারে। তবে আপনার রুচির প্রশংসা না করে উপায় নাই, কর্তা। দারুণ ছেলে জোগাড় করেছেন আপনি। লাখে একটা মেলে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো পঞ্চান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে।

—চুপ কর বেয়াদপ, সওদাগর গর্জে ওঠে, ওহে চরসখোর তুমি কি ভুলে গেছ সব কথা। তুমি না একদিন আমাকে ছেলে পয়দা করার দাওয়াই বানিয়ে দিয়েছিলে।

সামসাম বলে, কিন্তু এই চোদ্দবছরের লেড়কা এতদিন ধরে কি মায়ের গর্ভেই ছিলো, সাহেব? আগে তো কখনও দেখিনি একে?

—শোনো সামসাম, তোমার দাওয়াই খাওয়ার পর আমার বিবি এই ছেলের জন্ম দেয়। তারপর এই চৌদ্দটা বছর ধরে তাকে ঘরের মধ্যে আমি কয়েদ করে মানুষ করেছি। আমার শুধু ভয় হতো, না জানি কোন দুষ্ট মানুষের কুনজর পড়ে তার ওপর। সেইজন্যে তাকে বাইরে বের করিনি। আজ এতদিন বাদে তাকে দোকানে নিয়ে এসেছি—এই প্রথম। ব্যবসা-বাণিজ্য তাকে শেখাতে হবে তো। আমার এতবড় ব্যবসার এ-ই তো একমাত্র মালিক। তোমাকে এতদিন বলার তেমন সুযোগ হয়নি। যাক, এই নাও তোমার ইনাম। রাখ, এই এক হাজার দিনার।

সামসামের সব মনে পড়ে। আর কোনও সংশয় নাই, এ ছেলে এই বৃদ্ধ সওদাগরেরই। তাড়াতাড়ি সে ছুটে গিয়ে বাজারের সব দোকানে আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত খুলে বলে। দোকনীরা বুঝতে পারে, অনুতপ্ত হয়। সওদাগর সামস-অল দিনের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, তাদের ভুলের জন্য তারা লজ্জিত। সওদাগর-সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করে। বলে, তা এমন সুন্দর ছেলের বাবা হলেন আপনি, আমাদের মিষ্টিমুখ করাবেন না?

—নিশ্চয়ই করাবো। একশোবার করাবো। শুদু আসিদার মধুই না, পেটপুরে ফলার খাওয়াবো সকলকে। কাল সকালে আপনারা সবাই আসুন আমার বাগান বাড়িতে। সেখানেই খানাপিনার ব্যবস্থা করছি আমি।

সামস-অল দিন আর দেরি না করে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। পরদিন সকালে অভ্যাগত অতিথিরা আসবে তার বাগান বাড়িতে। তারই তোড়জোড় করতে থাকে। চর্বিওলা তাগড়াই ভেড়া কেনা হয়। জাইনি গলির মিঠাইওলাকে মুখরোচক মিঠাই মণ্ডার বায়না দেওয়া হয়। ঝুড়ি ঝুড়ি শব্জী, ফল আসে। সারা বাড়িতে উৎসবের ধুম পড়ে যায়।

পরদিন সকালে সওদাগর পুত্র আবু সামাতকে সঙ্গে নিয়ে বাগানবাড়িতে চলে যায়। সেখানে দাস দাসী চাকর নফররা আগে থেকেই হাজির ছিলো। বাবুর্চি খানা পাকাতে ব্যস্ত। খানসামারা খাবার জায়গা ঠিক করছে। এলাহী ব্যাপার।

যথাসময়ে অভ্যাগতরা আসতে থাকে। সওদাগর বয়স্কদের আপ্যায়ন করে বসায়। আর ছোট ছোট ছেলেদের তদারকির ভার পড়ে আবু সামাতের উপর।

সবাই বেশ আনন্দ করে খানা পিনা করলো। গান বাজনায় জমে উঠলো আসর। আতর আর ধূপের গন্ধে ভরপুর হয়ে গেলো চারদিক! খানা শেষ হয়ে গেলো, চাকররা শরবতের গেলাস বাড়িয়ে দিলো নিমন্ত্রিতদের সামনে।

এইসব অভ্যাগতদের মধ্যে সামস-অল দিনের এক বিত্তশালী খদ্দেরও এসেছিলো। তার নাম মাহমুদ।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো ছাপান্নতম রাতে আবার সে কাহিনী শুরু করে ঃ

মাহমুদ কিশোর আবু সামাতকে দেখে মুগ্ধ হয়। আবু সামাত তখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো ছুটাছুটী খেলায় মেতে উঠেছে। আজ চৌদ্দটা বছর সে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়েছিলো।

মাহমুদ তাকে ইশারায় কাছে আসতে বলে। সামাত খেলা বন্ধ করে সামনে এসে দাঁড়ায়। মাহমুদ বলে, ইস, কী-সব মজাদার কিসসা আমরা বলছিলাম, তুমি শুনতে পেলে না?

আবু সামাত সপ্রশ্ন নয়নে তাকায়, কিসের কিসসা?

—আঃ সে বড় চমৎকার। দামাসকাস, আলেপ্পা, বাগদাদের সব কাহিনী। তোমার বাবা তো বহুৎ বড় সওদাগর। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক দেশ ঘুরেছ? দু একটা কিসসা আমাদের শোনাও না।

—আমি? আপনারা বোধ হয় জানেন না, জন্মের পর থেকে আমার মা বা আমাকে ঘরের বাইরে বেরুতে দেননি। কোনও মানুষের সঙ্গে মিশতে দেন নি। এই সবে দু'দিন হলো আমি বাইরে বেরুবার অনুমতি পেয়েছি। তাও শুধু মা-এর জন্যে সম্ভব হয়েছে। বাবা আসলে কিছুতে দোকানে নিয়ে যেতে রাজী ছিলেন না। শুধু মা-এর চাপে পড়ে বাধ্য হয়েছেন।

—বেচারী! এই দুনিয়ার এত রূপ রস গন্ধ, সব থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে রেখেছিলো তোমার বাবা? ঘর চেড়ে বাইরে না বেরুলে কি করে বুঝবে বেড়াবার কি আনন্দ!

আবু সামাত বলে, হয়তো আপনার কথা ঠিক, তবু ঘরেরও তো একটা আলাদ আকর্ষণ আছে।

—তুমি কুয়োর ব্যাঙ-এর মতো কথা বলছো। তারা ভাবে ঐ কুয়োর সীমানা ছাড়া আর বুঝি কিছুই নাই। আর তাছাড়া তোমার বোধহয় ভয়, বাইরের নানা দেশের নানারকম জল-হাওয়ায় তোমার এই মেয়েলী ধাঁচের মাখনের মতো শরীর হয়তো গলে যাবে। শুধু মেয়েরাই ঘর ছাড়া পাখীর মতো নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা ভাবতে পারে না।

আবু সামাতের পৌরুষে আঘাত লাগে। তৎক্ষণাৎ সে বাড়ি চলে আসে। মা-এর কাছে ছুটে যায়। ছেলের সেই উদ্ভ্রান্ত চেহারা দেখে মা উৎকণ্ঠিত হয়। বলে, কী হয়েছে বাবা? কেউ তোমাকে কিছু বলেছে নাকি?

আবু সামাত তখন ঐ সব ঠাট্টা-তামাসার কথা বলে। —মা, এ-রকম খাঁচায় পোরা বন্দীজীবন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তোমরা আমাকে দুনিয়ার সব কিছু সুন্দর রূপ-রস-গন্ধ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। আমি আর তোমার আঁচলের তলায় থাকবো না। তোমরা যদি বাধা দাও, নিজের বুকে নিজেই আমি ছুরি বসিয়ে দেব।

মা কাঁদতে কাঁদতে বলে, অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আনতে নাই, বাবা। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলবো সব। তিনি তোমা-অন্ত-প্রাণ—হয়তো চোখের আড়াল করতে রাজি হবেন না। তবু আমি কথা দিচ্ছি, বাবা, তোমার বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করবো। আমার নিজের পয়সা দিয়ে তোমার সওদাগরি সামানপত্র কিনে দেব। তুমি বড় হয়েছো, এখন তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখলে চলবে কেন? যেখানে প্রাণ চায়, যাবে।

আবু সামাত বলে, ঠিক আছে, বাবা ফিরে আসুন, দেখি কি বলেন।

মা বললো, তিনি যা-ই বলুন আমি তোমার যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

তারপর বাড়ির চাকরদের ডেকে বললা, গুদোম ঘরটা খোলো। যে-সব কাপড়-পত্র আছে বের কর।

চাকররা ঘর থেকে অনেকগুলো কাপড়ের গাঁট আঙ্গিনায় বের করলো।

এদিকে অভ্যাগত অতিথিরা বিদায় নিলে বৃদ্ধ সামস অল-দিন বাড়ি ফেরার আগে ছেলে আবু সামাতের খোঁজ করলো। কিনতু যখন শুনলে, অনেক আগেই সে বাড়ি চলে গেছে,

চিন্তিত হয়ে পড়লো। একা একা পথ চলা অভ্যাস নাই, না জানি রাস্তা ভুল করে অন্য কোনও দিকে হারিয়ে গেলো কিনা। আর তিল মাত্র না দাঁড়িয়ে একটা খচ্চরে চেপে পিঠে চাবুক কষলো। খচ্চরটা রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে পৌঁছয়। সামস অল-দিন সদর দরজার কাছে একটা চাকরকে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, হ্যারে, আবু সামাত ফিরেছে?

—জী হাঁ। ভিতরে গিয়ে দেখুন না, গুদোম থেকে কাপড়ের গাঁট বের করাচ্ছে। ছোট সাহেব নাকি বাণিজ্যে যাবেন।

সামস অল-দিন হনহন করে বাড়ির অন্দরে ঢোকে। তবে তো চাকরটা ঠিকই বলেছে। আঙিনার চারপাশে অনেকগুলো কাপড়ের গাঁট দাঁড় করানো হয়েছে।

—কই গো, ছেলের মা, কোথায় গেলে?

আবু সামাতের মা বেরিয়ে আসে।

—কী, ডাকছো কেন?

—বলি এ সব কী?

এই সময়ে রাত্রি অবসান হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো সাতান্নতম রাত্রে আবার সে কাহিনী শুরু করে ঃ

সওদাগর বিবি বলে, তোমার ছেলে লায়েক হয়েছে। এখন সে আর ঘরে কয়েদ হয়ে থাকতে চায় না। সে বাণিজ্যে যাবে। তাই আমি সামান-পত্র বের করতে বলেছি।

—কোথায় যেতে চায়?

—আলেপ্পা, দামাসকাস, বাগদাদের পথে যাবে সে।

সওদাগর মাথা নেড়ে বলে, না না, এ হতে পারে না, বিবি। আমি তাকে যেতে দেব না। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো, এই বয়সে বিদেশ বিভূঁই-এ যাওয়া তার উচিত হবে না।

আবু সামাতকে ডেকে সে বোঝাতে চেষ্টা করলো, বাছা, তোমার মনে হয়তো বিদেশ বেড়াবার বাসনা হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে বারণ করছি সামাত, এসব খেয়াল তুমি ছাড়। আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, যে মানুষ তার জন্মভূমিতে বাস করে সুখের সন্ধান করে সে-ই প্রকৃত সুখ পায়। স্বদেশ ছেড়ে এক পা-ও বাইরে যাওয়া উচিৎ নয়। আশা করি এর পরে তুমি মত পাল্টাবে।

আবু সামাত বলে, আপনি হয়তো আমাকে অবাধ্য সন্তান ভাববেন, কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নাই। একবার আমি যখন ভেবেছি বিদেশে যাবো, যাবোই। তাতে যদি আমাকে কপর্দক শূন্য অবস্থায় এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরুতে হয়, সেও ভালো।

ছেলের এক গুঁয়েমী দেখে সওদাগর চিন্তিত হয়। ভাবে, আর বাধা দিয়ে লাভ নাই। ফল ভালো হবে না।

—ঠিক আছে, যাবে যাও। আমি তোমাকে পঞ্চাশটা কাপড়ের গাঁট সঙ্গে দিচ্ছি। পঞ্চাশটা উঠের পিঠে চাপিয়ে তুমি রওনা হয়ে যাও। কোন্ শহরে কি ধরনের কাপড় বিকোবে, আমি তোমাকে বলে দেব। যে সওদা আলেপ্পার বাজারে বেচা সহজ হবে, দামাসকাসের বাজারে তার কোনও চাহিদাই নাই। আবার দামাসকাসে মানুষ যা লুফে নেবে বাগদাদে তার কদর, হবে না। আমার এই কথাগুলো মনে রেখে বাণিজ্য করলে তোমার বেশ লাভ হবে। যাও বাবা দেখে শুনে পথ চলবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। চলার পথে সব দিকে সতর্ক চোখ রাখবে। মরুভূমির মারাত্মক কুকুরগুলো প্রাণ-সংশয় করে তোলে। আর সাবধান থাকবে, বাদাবী ডাকাতদের হাতে পড়ে যেন ধন-প্রাণ সব খোয়া না যায়। ওরা বড় সাংঘাতিক। দয়ামায়া বলে কিছু জানে না। দরকার হলে নির্মমভাবে খুন জখম করে লুঠপাট রাহাজানি করে।

আবু সামাত বলে, ঠিক আছে আব্বাজান, আপনার উপদেশ আমি মনে রাখবো। তবে শয়তানের শাস্তি আল্লাহই দেন। আমার কাজ আমি করে যাব; ফল যা দেবার তিনিই দেবেন।

ছেলের এই দার্শনিক কথাবার্তায় সওদাগর মুগ্ধ হয়।

সওদাগর বিবি কিন্তু তার হাজার দফা নামাজ শেষ করার আগে ছেলেকে রওনা হতে দেয় না। গরীব মানুষদের দান-ধ্যান করে। একশো ভেড়া পোড়ান হয়। হাজীদের ডেকে খাওয়ায়। তারা আবু সামাতের বিদেশযাত্রা নির্ভয় নিরাপদ হোক—এই কামনা করে। মা ছেলেকে সঙ্গে করে পীর আবদ অল-কাদির-এর দরগায় নিয়ে যায়। তার দোয়া মেঙে আনে।

মা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ছেলেকে বিদায় দিলো। উট চালকদের সর্দার—কামালকে বললো, আমার বুকের কলিজাকে, তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি ওকে চোখে চোখে রেখ। আল্লাহ ভরসা, পথে যেন তোমাদের কোনও বিপদ-আপদ না ঘটে।

তারপর ছেলেকে উদ্দেশ করে বললো, বাবা, কামালের কথা শুনো। বাবার মতো মান্যি করো তাকে।

ছেলের হাতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিয়ে মা বলে, এই দিনারগুলো যত্ন করে রেখ, সময় অসময়ে খরচ করো। যদি দেখ, বাজার মন্দা, বিক্রিবাটা সুবিধের হচ্ছে না, তখনই এই টাকায় হাত দেবে। তাই বলে, ঠিক মতো দাম না পেলে সওদা বিক্রি করবে না।

আবু সামাত মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাইরো শহরের সীমানা পার হয়ে যায়।

এদিকে মাহমুদ খবর পেয়েছিলো, আবু সামাত বিদেশ সফরে বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে নিজেকে তৈরি করে নিয়ে আবু সামাতকে অনুসরণ করে। কাইরো থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে তার দেখা পায়। মাহমুদ সঙ্গে নিয়েছে খচ্চর, উট আর ঘোড়ার এক বাহিনী। চলতে চলতে নিজের মনেই স্বগতোক্তি করে, ওহে মাহমুদ, এই মরুপ্রান্তরে কেউ তোমাকে বাধা দিতে আসবে না। কেউ আড়ি পেতে দেখবে না তোমার গতিবিধি। তুমি এখন স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গের মতো যেদিকে প্রাণ চায় উড়ে চলবে। সঙ্গে তোমার এক শান্ত সুবোধ বালক। তাকে নিয়ে যত খুশি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাক, কে কি বলতে পারবে।

এক জায়গায় এসে আবু সামাত প্রথম তাঁবু গাড়লো। মাহমুদও তার পাশেই তাঁবু ফেললো। আবু সামাতের বাবুর্চিকে ডেকে বললো, দেখ, তোমাদের আর উনুন জ্বালাবার দরকার নাই। আমার লোক যা পাকাবে তাই আমরা সবাই মিলে খাবো, কেমন? তোমাদের সাহেবকে একবার আমার তাঁবুতে আসতে বলো না?

আবু সামাত এলো। কিন্তু একা নয়। সঙ্গে এলো সেই কামাল—উট চালকদের সর্দার। মাহমুদ অস্বস্তি বোধ করলো। প্রাণ-খুলে আবু সামাতের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলো না। পরদিনও ঠিক একই ঘটনা ঘটলো। এইভাবে প্রতিদিন তাঁবু ফেলে তারা। প্রতিদিনই মাহমুদ আবু সামাতকে তার নিজের তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানায়। আবু সামাত আসেও। কিন্তু কোনও সময়ই একা নয়। সব সময় ছায়ার মতো আসে কামাল। মাহমুদ মুখে কিছু বলতে পারে না। বুকের ব্যথা বুকেই চেপে মামুলী কথাবার্তায় সময় কাটায়।

এই ভাবে একদিন তারা দামাসকাসে এসে পৌঁছয়। কাইরো, আলেপ্পা, দামাসকাস এবং বাগদাদে মাহমুদের বাড়ি আছে। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের এই সব বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এসে দেদার আনন্দ স্ফূর্তি করে সে।

দামাসকাস শহরের উপান্তে আবু সামাত তাঁবু গাড়ে। মাহমুদ ওঠে তার নিজের

বাড়িতে। চাকর দিয়ে খবর পাঠায়, আবু সামাত যেন একা আসে তার বাড়িতে। এক সঙ্গে খানা-পিনা করবে।

সামাত বলে, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আমাদের বুড়ো সর্দার কামালকে জিজ্ঞেস করে আসি একবার।

একটু পরে আবু সামাত তাঁবু থেকে ফিরে এসে মাহমুদের লোককে বলে, না, আমার যাওয়া হবে না। তুমি মাহমুদ সাহেবকে বলো, কামাল আমাকে একা ছাড়বে না।

দামাসকাসে বেশিদিন না কাটিয়ে আবু সামাত আবার পথে বেরিয়ে পড়ে। আলেপ্পার পথে বেরিয়ে পড়ে। আলেপ্পাতে এসেও মাহমুদ একই নিমন্ত্রণ জানায় আবু সামাতকে। কিন্তু বুড়ো সর্দার কামাল বলে, না বেটা, আমি তোমার মা-র কাছে জবান দিয়েছি—একা কোথাও ছাড়বো না।

আবু সামাতেরও ব্যাপারটা ভালো লাগে না। বারবার লোকটা তাকেই বা কেন ডেকে পাঠায়। মাহমুদের লোককে বলে, না, আমি যেতে পারবো না। তুমি মাহমুদ সাহেবকে গিয়ে বলো, কামাল আমাকে একা যেতে দেবে না।

বারবার প্রত্যাখ্যানে মাহমুদেরও রোখ চেপে যায়। আলেপ্পা ত্যাগ করার পর প্রথম যেখানে তাঁবু ফেলা হয়, মাহমুদ নিজে আবু সামাতের তাঁবুতে এসে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলো। হয়তো কোনও দ্বিধা ছিলো, কিন্তু মাহমুদ নিজে আসায় মুখ ফুটে 'না' সে বলতে পারলো না। মাহমুদ বললো, বহুৎ কিসিমের মজাদার খানা পাকানো হচ্ছে। আজ তোমাকে যেতেই হবে। আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

আবু সামাত হাসলো, বেশ তো, যাবো।

সাজ-গোজ সেরে মাহমুদের তাঁবুতে যাবার উদ্যোগ করছে সামাত; এমন সময় কামাল বললো, তুমি বড় অবিবেচক, বেটা। আমি তোমাকে বারবার বারণ করছি কেন, তা একবার ভেবে দেখলে না? ঐ মাহমুদ লোকটার কি মৎলব তা কি জান? ওকে কাইরোর সবাই হাড়ে হাড়ে চেনে। লোকে ওকে 'দুমুখো' বলে ডাকে।

—কিন্তু, আবু সামাত বলে, আমি জবান দিয়েছি, তার নিমন্ত্রণ মেনে নিয়েছি, এখন না যাওয়াটা কথার খেলাপ হবে না? লোকে ওকে যে নামেই ডাকুক আমাকে তো সে গিলে ফেলবে না। তবে অত ডর কিসের।

কামাল বলে, কে বলে গিলে ফেলতে পারবে না? এর আগে আরও অনেককে সে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে, তা জান?

আবু সামাত হো হো করে হেসে ওঠে। তার হাসির তোড়ে কামালের কথা তলিয়ে যায়। হয়তো সে আরও কিছু বলতে চেয়েছিলো, আরও বিশদ ভাবে বোঝাতে চেয়েছিলো কিন্তু আবু সামাত সেদিকে কর্ণপাত করলো না। এক রকম প্রায় ছুটেই মাহমুদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলো।

খানসামারা যে তাঁবুতে খানা-পিনা সাজিয়ে অপেক্ষা করছিলো সামাতকে সঙ্গে নিয়ে মাহমুদ সেই তাঁবুর ভিতরে এসে দাঁড়ায়। ধবধবে সাদা কাপড় বিছানো হয়েছে। তার উপর সদ্য পাকানো নানা রকম খানা সাজানো। একপাশে সরাবের পাত্র-সম্ভার।

খুব পরিতৃপ্তি করে দু'জনে পেটপুরে পানাহার সারলো। মদের গোলাবী নেশায় তখন দু'জনেই মাতোয়ারা। হঠাৎ মাহমুদ আবু সামাতের গোলাপী গাল দুটো দু'হাতে ধরে মুখটা বাড়িয়ে ঠোঁটে চুমু খেতে যায়। কিন্তু সামাতের নেশা হলেও জ্ঞান বেশ টনটনে ছিলো। তাছাড়া কামাল ওর মনে যে সন্দেহের চারা পুঁতে দিয়েছিলো তাতে সে সব সময়ই বেশ সতর্ক ছিলো। এক ঝটকায় মাহমুদের হাত দু'খানা ছুঁড়ে দিতে দিতে বলে, এসব কী?

মাহমুদ তখন মত্ত। এক হাতে আবু সামাতের ঘাড় বেষ্টন করে আর এক হাত দিয়ে তার দেহটাকে কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করে। আবু সামাত প্রায় চেঁচিয়েই বলতে থাকে, কী ব্যাপার? কী চান আপনি?

আবু সামাত এক রকম প্রায় জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। কামাল দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে বসেছিলো।

—আল্লাহর কসম খেয়ে বলো বেটা, কি হয়েছে?

—না, কিছুই হয়নি তো! কিন্তু আর দেরি নয়, এখুনি তাঁবু গোটাও। আমরা বাগদাদে রওনা হবো। ঐ লোকটার সঙ্গে আর যেতে চাই না। লোকটার মতিগতি আমার ভালো লাগলো না।

কামাল বলে, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম বেটা। কিন্তু তুমি যে বলছো কিছুই হয়নি। যাই হোক, ওকে এখানে রেখে একা একা পথ চলা আমাদের ঠিক হবে না, ছোট সাহেব। এই মরুভূমির পথটা বড় খারাপ। বাদাবী ডাকাতের ভীষণ হামলা। ঐ খুনী ডাকাতগুলো কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে কে জানে।

কিন্তু আবু সামাত সে-কথায় দমলো না। সেই রাতেই তারা বাগদাদের পথে রওনা হয়ে গেলো। সারা রাত সারা দিন পথ চলার পর তারা বাগদাদের প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে এসে যখন পৌঁছল তখন সূর্য পাটে বসেছে। সামাত বললো, আর নয়, আজকের রাতটা এখানেই কোথাও তাঁবু গেড়ে কাটানো যাক। কাল সকালে আবার যাত্রা করা যাবে।

কামাল বললো, কিন্তু জায়গাটা সুবিধের নয়। আমি বলি কি, তাঁবু না ফেলে একটু কষ্ট করে আজ রাতেই বাগদাদে পৌঁছে যাই। তারপর একটানা বিশ্রাম নিলেই হবে। এই জায়গাটায় কুকুরের ভীষণ হামলা হয়। আর ঐ মানুষ-খেকো কুকুরগুলোর মুখে পড়লে কারো নিস্তার নাই। নির্ঘাৎ মৃত্যু। তাই বলছি, একটু হাঁকিয়ে চললে শহরের সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই আমরা বাগদাদে পৌঁছে যেতে পারবো।

এই পরামর্শ আবু সামাতের ভালো লাগলো না। —খোদা মেহেরবান, এই গভীর রাতে আমি কিন্তু বাগদাদ শহরে ঢুকবো না, চাচা। বরং কাল সকালে বাগদাদের সূর্য ওঠা প্রাণ-ভরে দেখতে চাই। আজকের রাতটা আমরা এখানেই কাটাবো। অত তাড়াহুড়ো করার কি আছে, আমরা তো আর বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যেই আসিনি। এসেছি দেশ দেখতে। আনন্দ পেতে। জীবনে যে সৌন্দর্য দেখিনি তাই দেখবো বলে পথ বেরিয়েছি।

কামাল আর কিছু জোর করে না। হাজার হলেও সে তার মনিব।

সে রাতে আবু সামাত হাল্কা একটু খানাপিনা সেরে তাঁবুর বাইরে মুক্ত বাতাসে এসে পায়চারি করতে থাকে। চাকর নফররা তখন যে যার মতো শুয়ে পড়েছে।

আবু সামাত পায়ে পায়ে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে যায়। মরুভূমির মাঝে একখণ্ড শস্য সবুজ প্রান্তর। একটা ঝাকড়া গাছের তলায় গিয়ে বসলো। চাঁদিনী রাত। ঝিরঝির করে দখিনা হাওয়া বইছে। প্রাণে বসন্তের ছোঁয়া লাগে। হৃদয় কাব্যময় হয়ে ওঠে ঃ

ইরাকের রাণী ওগো,
বাহারী বাগদাদ,
এসেছি দুয়ারে তোমার
পেতে শুধু—
রূপে-রসে-গন্ধে ভরা যৌবনের স্বাদ

হঠাৎ একপাল ঘোড়ার চিঁহিহি রবে সামাতের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধেয়ে আসছে বাদাবী ডাকাতের একটা দল। সামাত

দেখলো পলকের মধ্যে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার তাঁবুগুলোর উপর। এলোপাথাড়ী চালাতে লাগলো তরোয়াল। প্রাণ ভয়ে পালাবার চেষ্টা করলো চাকর নফররা। কিন্তু হায়, কেউই রক্ষা পেলো না। খুনী বাদাবী ডাকাতের হাতে প্রাণ হারালো সবাই। তাঁবুগুলো ভেঙ্গেচুরে ছত্রখান হয়ে পড়লো। ডাকাতগুলো যখন বুঝতে পারলো আর একজনও জীবন্ত নাই। খচ্চর, ঘোড়া উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেলো তারা।

এতক্ষণ আবু সামাত গাছের তলায় বসে বসে অসহায়ভাবে নিরীক্ষণ করছিলো এই মর্মন্তুদ দৃশ্য। এবার সে তাঁবুর কাছে এগিয়ে এলো। না, একজনও বেঁচে নাই। তার বৃদ্ধ সহচর কামালও মরে পড়ে আছে। আবু সামাত আর চোখমেলে চেয়ে দেখতে পারে না এই নারকীয় দৃশ্য। কান্নায় চোখ ফেটে জল আসে।

যাই হোক, আর এখানে অপেক্ষা করা সমীচীন নয়, হয়তো আবার কোনও ডাকাতের দল হানা দিতে পারে। সামাত ভাবলো, এই রাতেই সে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে যাবে। পরনের দামী সাজপোসাক সে খুলে ফেললো। শুধু রইলো একটা কামিজ আর ইজের। দীনহীন দারিদ্র্যের ছাপ ফোটানো দরকার। নইলে হয়তো পথের মধ্যে আবার কারো নজরে পড়ে যেতে পারে। জামাটাকে মাঝে মাঝে ছিঁড়ে ধুলো বালি মাখিয়ে নোংরা করলো। মাথার চুল এলোমেলো উস্কোখুস্কো করে দিলো। একেবারে ভিখিরির সাজ।

সারা রাত ধরে পথ চলার পর ভোরবেলা সে বাগদাদে এসে পৌঁছয়। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ এলিয়ে পড়তে চায়। শহরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকতেই একটা ছোট বাগিচা। তার মধ্যে একটা জলের ফোয়ারা। আবু সামাত ফোয়ারর জলে হাত মুখ ধুয়ে পাশের একটা শান বাঁধানো চবুতরার ওপর শুয়ে পড়ে। এবং নিমেষের মধ্যে সে ঘুমে গলে যায়।

মাহমুদও সেই রাতেই তাদের পিছু ধাওয়া করেছিলো। অন্য একটা পথ ধরে সে বাগদাদে আসতে থাকে। এই পথটায় যেতে পারলে আরও কম সময়ে বাগদাদে পৌঁছন যায়। কিন্তু বিদেশীদের এ পথ অজানা। মাহমুদ সব পথই জানে। সে আবু সামাতকে ধরবে বলে এই পথে জোরকদমে চলে এসেছে। বাদাবী ডাকাতরা এই পথটা এড়িয়ে চলে। কারণ মালকড়িওলা বিদেশীরা এপথে চলে না। তাই মাহমুদ নির্বাধায় বাগদাদে এসে পৌঁছল। আবু সামাতের একটু পরেই। শহরে ঢুকে সব লোকই এই ছোট্ট বাগিচার ফোয়ারার জলে হাতমুখ ধুয়ে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নেয়। মাহমুদও বাগিচায় ঢুকে পড়ে। হঠাৎ তার নজরে এলো, কে যেন শুয়ে আছে ওপাশের চবুতরায়। কাছে যেতেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে সে, আরে, এযে দেখি সেই যাদুমনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাহমুদ ভাবে, ছেলেটার এই হাল হলো কি করে। নিশ্চয়ই রাহাজানি হয়েছে। হয়তো সর্বস্ব খুইয়ে ফেলেছে। তা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। এবার নিশ্চয়ই সে একা। সেই গাব্দামুখো সর্দারটা আর আড়াল করে দাঁড়াবে না। তাছাড়া এই বিদেশ বিভূঁই-এ দাঁড়াবার মতো আশ্রয় তো চাই। মাহমুদের এখানে বাড়ি আছে। সামাত তা জানে। সে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে নিশ্চয়ই সে আপত্তি করবে না। কারণ অন্য কোনও উপায় তো নাই।

মাহমুদ এই সব যখন ভাবছে, আবু সামাত চোখ মেলে তাকালো। কি একটা স্বপ্ন দেখে ঘুমটা তার কেটে গেলো। মাহমুদ আরও কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার? কী হয়েছে? এখানে এই অবস্থায় শুয়ে আছে কেন?

সামাত তখন গত রাতের সব ঘটনা বললো তাকে। মাহমুদ বললো, যাক, যা নসীবে ছিলো তাই ঘটেছে। ও নিয়ে হাহুতাশ করে লাভ নাই। তোমার সামান-পত্র যা গেছে, তার জন্য ভেবো না। আমি তোমাকে তার অনেক বেশি দামের সওদা দেবো। চলো, আমার বাড়িতে চলো।

সামাত কিন্তু কিন্তু করছিলো, কিন্তু মাহমুদ আর কোনও সুযোগ দিলো না।

সামাতকে তার পিছনে বসিয়ে বললো, শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকবে, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবো।

বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই আবু সামাতকে সে হামামে নিয়ে যায়। আচ্ছা করে নিজে হাতে তার সর্বাঙ্গ ডলাইমলাই করে সাফ করে। গামলা গামলা জল ঢেলে গোসল করায়। দামী সাজপোশাক-এ সুন্দর করে সাজায়। তারপর সঙ্গে করে বসার ঘরে নিয়ে যায়। নানারকম মুখোরোচক খাবার আর দামী সরাবে খানাপিনা জমে ওঠে। ঢুলুঢুলু নেশায় দু'জনেরই চোখ ছোট হয়ে আসতে থাকে। মাহমুদ হেড়ে গলায় গান ধরে। খিস্তিখেউড়ের গান। আবু সামাত সহ্য করতে পারে না। লোকটা কী ভীষণ নোংরা। সারা দেহ মন রি রি করে ওঠে। না, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। পালাতে হবে। সামাত উঠে দাঁড়ায়। মাহমুদ হাঁ হাঁ করে ওঠে। ধরতে যায়। কিন্তু ততক্ষণে সামাত ছুটে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে হন হন করে হাঁটতে শুরু করেছে।

সারাদিন ধরে শহরের পথে পথে ঘুরে ঘুরে সামাত ভীষণ ক্লান্ত। এবার সে একটু বিশ্রাম চায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, রাতের মতো একটা আস্তানা জোগাড় করতে হবে। উপায়ন্তর না দেখে সামনের একটা মসজীদের আঙ্গিনায় ঢুকলো সামাত। পায়ের চটি খুলে মসজীদের ভিতরে গেলো। একটু পরে দুটি লোক লণ্ঠন হাতে ঢুকলো। তাদের পথ করে দেবার জন্য সে একটু সরে বসতে যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ লোকটি সামাতের কাছেই এগিয়ে এসে সালাম জানায়, খোদা হাফেজ; সালাম আলেকুম। সামাতও আলেকুম সালাম জানায়। দু'জনেই সামাতের পাশে বসে পড়ে। বৃদ্ধটি জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বেটা, তুমি কি মুসাফীর?

—জী-হাঁ। আমি কাইরো থেকে আসছি। আমার বাবা সওদাগর সামস্ অল দিন কাইরোর বণিক সমাজের সভাপতি।

বৃদ্ধ তার সঙ্গীটির দিকে মুখ ফিরিয়ে খাটো গলায় বলে, খোদা বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন। এত তাড়াতাড়ি এরকম এক বিদেশীকে পাওয়া যাবে আশা করিনি।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো একষট্টিতম রাতে আবার সে শুরু করে ঃ

আবু সামাতের আরও কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বৃদ্ধ।—মনে হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের জন্যেই তোমাকে এই শহরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমার কাছ থেকে একটু অনুগ্রহ চাই, বাবা। একটা কাজ তোমাকে করে দিতে হবে। অবশ্য বিনি পয়সায় নয়। তার জন্যে পাঁচ হাজার নগদ, এক হাজার মোহরের সওদাপত্র আর এক হাজারী একটা ঘোড়া তোমাকে আমরা ইনাম দেবো।

আবু সামাত অবাক হয়। এই বিদেশে আজ সে কপর্দক শূন্য। পয়সার তার প্রচুর প্রয়োজন। কিন্তু তার মতো একটি আনাড়ী অনভিজ্ঞ ছেলেকে দিয়ে কি এমন কাজ করিয়ে নিতে পারবে তারা, যার বিনিময়ে এত ইনাম পাওয়া যাবে? সামাত বলে, কিন্তু আপনি ভুল করেছেন। আমার কোন কাজের অভিজ্ঞতা নাই। আমি আপনার কোনও উপকারে আসতে পারবো না। টাকাপয়সার খুব দরকার আছে, কিন্তু আমাকে দিয়ে কাজ না হলে শুধু শুধু দেবেন কেন?

বৃদ্ধ বলে, ও নিয়ে তোমাকে কোনও মাথা ঘামাতে হবে না, বাবা। আমি দেখেই বুঝেছি, তোমাকে দিয়েই আমাদের কাজ উদ্ধার হবে। তা হলে শোনো বাবা, বলি ঃ

তুমি তো জান, মুসলমান ধর্মের বিধান—বিবিকে একবার তালাক দিলে তিন মাস বাদে আবার তাকে ঘরে নেওয়া যায়। দ্বিতীয়বার তালাক দিলেও বিধিসম্মত সময়ের ব্যবধানে আবার সে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু তিন-তালাক হয়ে গেলে আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। তবে শাস্ত্রে তারও ব্যবস্থা দেওয়া আছে। সে ক্ষেত্রে যদি বয়ান-তালাক দেওয়া বিবিকে আবার

ফিরে পেতে ইচ্ছা হয়, তবে সেই বিবির অন্য কারো সঙ্গে শাদী হওয়া দরকার। শাদীর পরে অন্তত একটি রাত্রি তার সঙ্গে সহবাস করতে হবে। তার পর সে যদি তাকে তিন-তালাক দিয়ে দেয়, তখন সে আবার তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে নিকা করতে পারে।

এখন, এই ক'দিন আগে আমার মেয়ের সঙ্গে এই ছেলের খুব ঝগড়া-ঝাঁটি হয়। এই ছেলেটির সঙ্গে তার শাদী দিয়েছিলাম। রাগের মাথায় বাবাজীবন আমার মেয়েটিকে এক সঙ্গেই তিন-তালাক দিয়ে দেয়। মুসলমান ধর্মে জবানই সার। মুখ দিয়ে একবার বের করলেই হলো, আমি তোমার সঙ্গে আর ঘর করবো না। আজ থেকে তুমি আমার আর কেউ না। এই দিলাম এক তালাক—দুই তালাক—তিন তালাক। বাস্ সব খতম। এর পর তো আমার মেয়ে বোরখার সারা শরীর ঢেকে ফেললো। কারণ তখন তার স্বামী তার কাছে পরপুরুষ। সেইদিনই সে তার দেনমোহর নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে। এদিকে বাবাজীবনের মাথা যখন ঠাণ্ডা হলো, তখন সে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলো। আর তো কোনও উপায় নাই। এখন সে দিন রাত হাহুতাশ করছে। কীভাবে তাকে আবার নতুন করে নিকা করা যায় তার ফিকির খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমিও বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা রাগের মাথায় ঘটেছে। আদতে ওদের দু'জনের ভালোবাসা ঠিকই ছিলো। না হলে বয়ান-তালাক দেওয়া মেয়েকে কেউ আবার ফিরে পেতে চায়?

এখন বাবা, তুমিই ভরসা, জানি পথে যখন বেরিয়েছ, পয়সার তোমার দরকার আছে। তুমি বিদেশী, পথ চলতে চলতে একটা রাতের জন্য যদি একটি খুবসুরৎ লেড়কী আর তার সঙ্গে কিছু স্বর্ণমুদ্রা মিলে যায় নেবে না কেন? তোমাকে তো কোন বন্ধনে আটকাতে চাই না। পথ চলতে ঘাসের ফুলের মতো পথেই ফেলে চলে যাবে তুমি। শুধু বাড়তি লাভ টাকা পয়সাগুলো নিয়ে যাবে।

দারিদ্র্য এমনই বস্তু, তার চাপে পড়ে অনেক শুভবুদ্ধির বলি দিতে হয়। বাধ্য হয়ে সামাত তাদের এই অ-মানুষিক প্রস্তাবে রাজি হলো।

—তা হলে আমি পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, এক হাজার দিনারের সামানপত্র এবং এক হাজার দিনার দামের মতো একটা তেজী ঘোড়া পাবো তো?

—আলবৎ পাবে।

এর জন্যে আমাকে এক রাতের জন্য আপনার কন্যাকে শাদী করতে হবে। এবং সারা রাত তার সঙ্গে সহবাস করতে হবে। এই তো?

—ঠিক এই। এর বেশী আর কিচ্ছু করতে হবে না, বেটা। পরদিন সকালে উঠে যে দিকে তোমার খুশি চলে যাবে। বাস্। আর পিছনে তাকাবার কোনও দরকার নাই। কোনও দায় দায়িত্ব, কোনও ঝঞ্ঝাট তোমাকে পোয়াতে হবে না।

সামাত বলে বেশ আমি রাজি। আপনারা সব ব্যবস্থাপত্র করুন।

এবার বৃদ্ধের পাশে বসে-থাকা ছেলেটি মুখ খুললো; আপনি আমাদের কত বড় মুসকিল আসান করলেন কি আর বলবো। এ ঋণ শুধু কিছু পয়সা দিয়ে শোধ করা যায় না। আমি আমার বিবিকে প্রাণাধিক ভালোবাসতাম। কিন্তু রাগের মাথায়, হঠাৎ কি হয়ে গেলো, একেবারে তিনতালাক দিয়ে দিলাম তাকে। মুখ থেকে জবান বেরিয়ে গেছে। সাচ্চা মুসলমানের বাচ্চা। কথা তো আর উলটানো যায় না।

ছেলেটি একটুক্ষণের জন্য দম নিয়ে আবার বলতে থাকে, আমি সবই বুঝতে পারছি, আপনি বিদেশী পথিক। আজ এখানে কাল সেখানে করে চলতে থাকবেন। কিন্তু তবুও আমার মন থেকে ভয় যেতে চায় না। ধরুণ সবই কথাবার্তা পাকা হলো, কিন্তু মানুষের মন, কিছুই তো বলা যায় না, শাদীর পর সকালে হয়তো আপনার মতিগতি পালটে গেলো। সদ্য শাদী করা বিবির রূপে গুণে আপনি মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। মায়ামোহ কখন কাকে কিভাবে জড়িয়ে ফেলে কেউই

বলতে পারে না। তাই বলছিলাম, শাদীর আগে একটা চুক্তিনামা করে নিলে আপনার কি আপত্তি আছে?

সামাত বুঝতে পারে না, কেমন চুক্তি?

—ধরুন আপনি যদি শাদীর পর আর তাকে না ছাড়েন। ফিরিয়ে না দেন। সেই জন্যে আপনাকে একটা খেসারত দিতে হবে। শর্তভঙ্গের সাজা বলতে পারেন। দশ হাজার দিনারের খেসারতনামা সই করে দেবেন। শর্ত না মানলে, বিবিকে না ছাড়লে আমি ঐ টাকা আপনার কাছে দাবী করে আদায় করবো।

সামাত হো হো করে হেসে ওঠে, ও, এই কথা! আমি একশোবার রাজি। শর্ত ভাঙলে তো সাজা—তা ওপথে যাবে না এ মক্কেল।

তখনি তিনজনে কাজীর বাড়ি গেলো। শাদী-নামার সঙ্গে খেসারৎ নামার চুক্তিপত্রও তৈরি করা হলো। সই-সাবুদও হয়ে গেলে বৃদ্ধ তার নতুন জামাতা সামাতকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে মেয়েকে বললো, বেটি তোমার জন্যে এক নওজোয়ান ছেলেকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছি। আমার বিশ্বাস, সে তোমাকে সুখী করতে পারবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আজকের শুভরাত্রি তোমাদের সুখের হোক। তবে শুধু আজকের রাতের জন্যেই তার সহবাস তুমি পাবে। কাল সকালেই সে আবার চলে যাবে।

এর পর মেয়ের মা এবং বাবা দু'জনে এসে সামাতকে প্রচুর আদর আপ্যায়ন করলো। বৃদ্ধ বললো, তুমি একটু অপেক্ষা কর বাবা, মেয়ে এখুনি আসবে তোমার ঘরে।

এই বলে তারা অন্দরে চলে গেলো। সামাত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

এদিকে মেয়েটির আসল স্বামী দারুণ হিংসায় জ্বলছে। তার বিবিকে অন্য লোকে ভোগ করবে। কিছুতেই প্রবোধ মানে না মন। সে একটা ডাইনী বুড়িকে বকশিসের লোভ দেখিয়ে নিযুক্ত করে। তাকে খুব আদর সোহাগ জানিয়ে মাথায় তুলে বলে, বুড়িমা, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমার ঘরের বিবিকে অন্য লোক নিয়ে শোবে এ কেমনতর কথা, বুড়িমা। তুমি এর একটা মতলব বের কর। যেমন করেই হোক, ওদের দু'জনের লদকালদকী বন্ধ করতেই হবে।

বুড়িটা বলে, তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছি।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

দুশো বাষট্টিতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

সারা শরীর বোরখায় ঢেকে সে বৃদ্ধের বাড়ি আসে। এদিকে ওদিক উকিঝুঁকি মেরে টুক করে আবু সামাতের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সামাত তখন শয্যায় অর্ধশায়িত হয়ে তার সদ্য-শাদী করা বিবির প্রতীক্ষা করছিলো। বুড়িটা জিজ্ঞেস করে, যে মেয়েটাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে সে কোন্ ঘরে আছে বলতে পার, বাবা? আমি রোজ তার শরীরে দাওয়াই মালিশ করতে আসি। যদিও জানি, দাওয়াই দিয়ে কুষ্ঠব্যাধি সারানো যায় না, তবু কি করবো, তার মা-বাবাকে বোঝানো দায়।

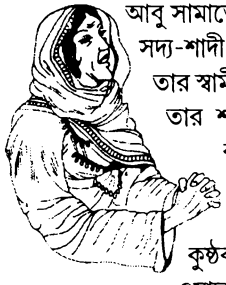

আল্লাহ রক্ষা করুন, সামাত আঁৎকে ওঠে, বলো কী? মেয়েটার কুষ্ঠব্যাধি আছে নাকি? আজ রাতে যে তার সঙ্গে আমার সহবাস করার ওয়াদা আছে! সর্বনাশ, জেনেশুনে তো এ-কাজ আমি করতে পারবো না।

বুড়িটা না বোঝার ভান করে, কেন? সহবাস করতে হবে কেনো?

সামাত বলে, তার আগের স্বামীর সঙ্গে সেইরকমই চুক্তি হয়েছে আমার। সে আবার

তার তিন তালাক দেওয়া বিবিকে ঘরে নিতে চায়। তাই এক রাতের জন্য তাকে আমি শাদী করেছি, শাস্ত্রমতে একটা রাত তার সঙ্গে সহবাস করতে হবে। তারপর কাল সাকালে তাকে আমি বয়ান তালাক দিয়ে চলে যাবো।

—সে কি বাবা, অমন কাজটি করো না। কুষ্ঠ দুরারোগ্য ছোঁয়াচে ব্যারাম। একবার ধরলে আর সারে না। আর যাই কর তাকে স্পর্শ করো না। তোমার এই সুন্দর নতুন জোয়ান বয়স। এইভাবে নষ্ট করো না।

বুড়িটা আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এবার সে মেয়েটার ঘরে ঢোকে। বলে, সাবধান, মা, তোমার বাবা ঘাটের মড়া কুড়িকুষ্ঠে ভরা একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে। ভুলেও তার সঙ্গে কিছু করো না। শরীরে বিষ পুরে দিয়ে চলে যাবে।

আবু সামাত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো, কিন্তু মেয়েটি ঘরে আসে না। চাকর-বাকররা এসে খানা পিনা সাজিয়ে দিয়ে গেলো। একা একাই সে রাতের খানাপিনা সেরে নেয়। ঘুমাতে যাবার আগে নিত্যকার অভ্যাসমতো সে সুর করে কোরান পাঠ করতে থাকে।

মেয়েটি পাশের ঘর থেকে তার সুরেলা কণ্ঠ শুনে মুগ্ধ হয়। এমন মধুর গলার স্বর তো কোনও অসুস্থ মানুষের হতে পারে না! খোদা ভরসা, যা ঘটে ঘটুক, আমি তাকে স্বচক্ষে পরীক্ষা করে দেখবো। মনে হচ্ছে, শয়তান বুড়িটা বানিয়ে মিথ্যে কথা বলে গেছে।

ঘরের এক পাশে গান বাজনার যন্ত্রপাতি ছিলো, একটা হিন্দুস্তানী তানপুরা তুলে নিয়ে সে গান ধরে। অপূর্ব কণ্ঠ। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবে সামাত, এতো কোনও কুষ্ঠরোগীর গলা দিয়ে বেরুতে পারে না। বুড়িটা কি তাকে ধোঁকা দিয়ে গেলো?

আবু সামাত, মেয়েটির গান শেষ হলে, একটি আড়-খেমটা গাইতে শুরু করে। চোখে দেখতে না পেলেও, পরিস্কার সে বুঝতে পারলো, পর্দার ওপারে ওঘরে সে ঘুঙুর বাজিয়ে গানের তালে তালে নেচে চলেছে। এবার সে নিঃসন্দেহ হয়, যে-কুষ্ঠ রুগী সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না, সে আবার নাচতে পারে নাকি? ডাঁহা মিথ্যে কথা বলে গেছে শয়তান বুড়িটা।

গান থামলে, মেয়েটি নাচ থামিয়ে পর্দা ঠেলে সামাতের ঘরে ঢোকে। সামাত চমকে ওঠে। এক ঝলক বিজলী যেন হঠাৎ থেমে গেছে তার সামনে। তার কুসুম পেলব দেহলতা সামাতের চিত্তে চঞ্চলতা জাগায়। এত রূপ, এত লাবণ্য, এমন লাস্য সে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলো। যেন এতক্ষণ ঘরখানা অন্ধকার কালো মেঘে আচ্ছন্ন ছিলো, হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ বেরিয়ে আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে।

—কী গো, অমন হাঁ করে কী দেখছো, ঘরে চলো, শোবে না।

ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু নাচিয়ে এমন ঢং-এ মেয়েটি তাকে ডাকে, সামাতের সারা শরীরে আগুন ধরে যায়। বলে, কোথায় যেতে হবে, চলো।

মেয়েটি এমন ভাবে পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে চলতে থাকে, দেখলে ধ্বজভঙ্গও যৌবন ফিরে পাবে। সামাতের মনে কোনও সংশয় ছিলো না, তবু সহবাসের আগে তার দেহটা একবার পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে হলো। কিন্তু মুখে বলে কি করে সে কথা। মেয়েটি কিন্তু আঁচ করতে পারে, ও, বুঝেছি, সেই ডাইনী বুড়িটা তোমার ঘরেও ঢুকেছিলো। আচ্ছা তোমার সন্দেহ নিরসন করে দিচ্ছি।

এক এক করে সে তার বেশবাস খুলে ফেললো। —এই দ্যাখো, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব ভালো করে দ্যাখো, সারা গায়ে গোটা কয়েক তিল ছাড়া কোথাও একটা ফুস্কুড়ী বা কাটা ছেঁড়ার কোনও দাগ ফাগ আছে কিনা।

সামাত দেখলো তার সর্বাঙ্গ মাখনের মত নরম। কোথাও কোনও অসামঞ্জস্য নাই। সুন্দর নিটোল মসৃন একটি কচি শালের গুঁড়ি।

সামাতের সুপ্ত পৌরুষ জেগে ওঠে। কিন্তু আনাড়ী তরুণ বুঝতে পারে না, কিসে কি হয়। সারা শরীরে অসহ্য এক যন্ত্রণা অনুভব করে। ভাবে মেয়েটি তো সেয়ানা, ও নিশ্চয়ই বাৎলে দেবে, শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। কিন্তু কাছে এগোতেই মেয়েটি ছিটকে সরে যায়। চোখে মুখে তার আতঙ্ক।

—তোমার শরীরে যদি সত্যিই কুষ্ঠের বিষ থাকে। তাহলে আমি যে সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকবো। আমাকে ধরার আগে তুমি বাপু কাপড়-চোপড় খুলে শরীরটা দেখাও। জানি আমি কুষ্ঠরুগীর চেহারা এমন চেকনাই লালটুস হয় না, তবু বলা তো যায় না।

আবু সামাত হাসে, সে তো খুব ভালো কথা, যাকে দেহ দেবে, তার দেহটা একবার চোখে দেখবে না—সে কি হয়?

একেবারে নগ্ন হয়ে দাঁড়ালো তার সামনে। মেয়েটির চোখে অপার বিস্ময়। নিরন্তর নির্ঝর জল-প্রপাতের মধ্যে যেন একখণ্ড প্রস্তর শিলা। ছুটে গিয়ে স্বামীকে বাহুপাশে বেঁধে ফেলে সে। প্রায় এক রকম বুকে জড়িয়েই এনে ফেলে পালঙ্কে। তারপর প্রতি পলকে প্রলয় কাণ্ড ঘটতে থাকে। মেয়েটি বাঘিনীর মতো গোঁঙায়, তুমি না পুরুষ! কই, চালাও তোমার সিংহের থাবা। চিরে শেষ করে দাও আমাকে। প্রমাণ কর, তুমিও তোমার বাবার মতো আর এক সিংহ শিশুর জন্মদাতা।

একটি সুখের রাত্রির অবসান হয়। মেয়েটির বাহুপাশে আবদ্ধ সামাত-এর ঘুম ভাঙ্গে। রাত্রে সে জেনে নিয়েছে, মেয়েটির নাম জুবেদা। সামাত বলে, জুবেদা, আমার দুঃখ তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আমি শর্তে আবদ্ধ। এখুনি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। অথচ, মাত্র একটি রাতের কয়েক প্রহরের মধ্যে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, তুমি ছাড়া আমি বাঁচবো না।

জুবেদা আকুলভাবে তার হাত চেপে ধরে, সে কি কথা? কেন চলে যাবে? তা হয় না।

—তুমি কি জান না, কি শর্তে আমি সই করেছি। তোমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু একটি রাতের জন্য। তোমার আগের স্বামী তোমাকে ফিরে পেতে চায়। আর সেই পথটা পরিষ্কার করার জন্যে আমার সঙ্গে তোমার শাদী দেওয়া হয়েছে। এবার আমি তোমাকে তিন-তালাক দিয়ে গেলে সে আবার তোমাকে নিকা করে ঘরে নিতে পারবে। আমি যাতে বিশ্বাসঘাতকতা না করতে পারি সে জন্য তোমার আসল স্বামী আমাকে দিয়ে চুক্তি করিয়ে নিয়েছে। চুক্তি না মানলে আমার কাছ থেকে দশ হাজার দিনার খেসারত আদায় করবে। দশ হাজার দিনার তো অনেক দূরের কথা, দশটা দিরহামও আমার জেবে নাই। সে ক্ষেত্রে, আমি যদি তোমাকে তালাক না দিই তোমার স্বামী আমার নামে মামলা দায়ের করবে। মামলায় আমি নির্ঘাৎ হারবো। তার পরিণাম কি জান? দশ হাজার দিনার আক্কেল সেলামী দিতে হবে। আর তা দিতে না পারলে, দিতে যে পারবো না তা তো জান, হাতে কাতকড়া পড়বে। ফাটক খাটতে হবে।

জুবেদা কি যেন একটুক্ষণ ভাবলো। তারপর সামাতের হাতে চুমু খেয়ে বললো, সামাত আমার সোনা, কালকে রাতের সুখ স্মৃতি সারা জীবনে আমি ভুলবো না। তোমার মতো পৌরুষ কটা পুরুষের থাকে? আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না। সারা জীবন ধরে তুমি আমার আকাশে ধ্রুব তারার মতো জ্বলবে। আমি কথা দিচ্ছি, একটা উপায় আমি বের করবোই। মুসকিলের আসান হবেই। তোমাকে ছাড়া এ যৌবন অন্য কারো হাতে তুলে দেবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়, সোনা।

সামাত ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে, কিন্তু কীভাবে তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে? আমি যে সই করে দিয়েছি।

জুবেদা বলে, ঘাবড়াও মাৎ, আমি তোমাকে ফিকির বাতলে দিচ্ছি। একটু বাদে আমার বাবা তোমাকে কাজীর কাছে নিয়ে যাবে। শাদী নামা বাতিল করে বয়ান তালাকের কাগজপত্রে সই সাবুদ করার জন্য তোমাকে যেতে হবে সেখানে। তুমি গিয়ে কাজীর কানে কানে বলবে, 'আমি আমার বিবিকে তালাক দিতে চাই না।' সে কথা শুনে সে অবাক হয়ে বলবে, 'কী বললে? পাঁচ হাজার সোনার মোহর এক হাজার দিনারের জিনিসপত্র এক হাজার দিনার দামের তেজী ঘোড়া—সব ছেড়ে দেবে সামান্য একটা মেয়েছেলের জন্য?' তখন তুমি বলবে, 'তার একগাছি চুলের দাম দশ হাজার দিনার!' কাজী তখন গম্ভীর হয়ে বলবে, বেশ, যা ভালো বোঝ, কর। আমার আপত্তির কি থাকতে পারে। কানুন তোমার পক্ষে আছে। শাদী করা বিবি আইনত তোমার সম্পত্তি। না ছাড়লে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ফাঁসবে তুমি অন্য রাস্তায়। শর্ত করেছ, চুক্তি না মানলে দশ হাজার দিনার খেসারত দিতে হবে। তা দেবে, পয়সা যদি তোমাকে কামড়ায় দশ হাজার দিনার ছুঁড়ে দেবে তার আগের স্বামীর নাকের ডগায়। পয়সা দিয়ে দিলে তোমাকে আর সাজা দেবে কার সাধ্য। তবে হ্যাঁ, গুণে গুণে দশটি হাজার দিনার দিতে হবে। নইলে ফাটক—একেবারে সোজা শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে।

জুবেদা বলতে থাকে, শোনো, কাজী লোক ভালো। শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গরিমায় চমৎকার—শুধু একটাই তার দোষ—সুন্দর সুন্দর অল্প বয়েসী ছোকরা দেখলে আর ঠিক থাকতে পারে না।

—যাঃ বাবা, কাজীও দুমুখো নাকি?

সামাত আঁৎকে ওঠে। তাই দেখে জুবেদার কি হাসি। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

—তুমি ঠিক ধরেছ তো। কেন আগের কোনও অভিজ্ঞতা আছে নাকি?

আবু সামাত বলে, খুব আছে। এর আগে এক দুমুখোর পাল্লায় পড়েছিলাম আমি। কোনও রকমে পালিয়ে বেঁচেছি। কিন্তু এখন ভাবছি এক দুমুখোর খপ্পর থেকে ছিটকে এসে আর এক দুমুখোর খপ্পরে পড়তে চলেছি। না না, সে আমি পারবো না, তুমি বরং অন্য ফিকির বাতলাও। আমি বুড়ো কাজিটার নোংরামী সহ্য করতে পারবো না।

জুবেদা বললো, আগেই অধৈর্য হয়ো না। দাঁড়াও, দেখ কি হয়? কাজী যখন তোমাকে বলবে, 'তাহলে খেসারতের দশ হাজার দিনার দিয়ে দাও,' তখন তুমি শুধু মুচকী হাসবে। ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াবে। আব্দার করে বলবে, 'এখন আমি দিতে পারবো না, আমাকে কিছু সময় দিন।' দেখবে কাজ হবে। কাজী তোমাকে সময় দেবে। তারপর আল্লাহ একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন।

আবু সামাত বলে, এটা মন্দ বলো নি।

এই সময় চাকর এসে বললো, মালকিন, বাইরে আপনার বাবা অপেক্ষা করছেন, এই সাহেবকে নিয়ে তিনি কোথায় বেরুবেন।

আবু সামাত চটপট নিজেকে তৈরি করে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

জুবেদার কথাই ঠিক। কাজী আবু সামাতের ব্যবহারে বিগলিত হয়ে দশ দিনের সময় দিয়ে বললো, এই দশ দিনের মধ্যে যদি টাকা জোগাড় করতে না পার, চিন্তা করো না, আমি দিয়ে দেব সে-টাকা।

আবু সামাত কৃতজ্ঞ চিত্তে কাজীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিবির কাছে ফিরে এলো।

জুবেদা শুনে আনন্দে নেচে ওঠে। সামাতের হাতে একশোটা দিনার দিয়ে বলে, আজ রাতে জোর খানা-পিনার ব্যবস্থা কর। সারা রাত ধরে মৌজ করবো দু'জনে।

আবু সামাত নিজে কেনাকাটা করে নিয়ে আসে। সরাবের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে নাচ-গান হাসি-মস্করার মধ্যে কাটাতে থাকে।

রাত তখন গভীর। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে সামাত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতে যায়।

খালিফা হারুন অল-রসিদ সেই রাতে পারসীক দরবেশের ছদ্মবেশে বাগদাদের পথ পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো উজির জাফর, দেহরক্ষী মাসরুর আর সভাকবি আবু নসাব। খলিফা জাফরকে বললেন, বুকের ভিতরটা কেমন ভার ভার মনে হচ্ছে, চলতো, জাফর, খোলা হাওয়ায় একটু ঘুরে আসি।

জাফর বললো, জো হুকুম জাঁহাপনা—

চারজনে চলতে চলতে এক সময় জুবেদা আর সামাতের গান-বাজনা শুনে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ে। —বাঃ তোফা মাইফেল চলছে তো!

দরবেশদের একজন জুবেদার দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খুলে আবু সামাত দেখলো, চারজন ফকির। সাদরে তাদের অভ্যর্থনা করে অন্দরে এলো সে। পাশের ঘরটায় বসালো। সামাত খানাপিনা এনে সাজিয়ে দিলো তাদের সামনে। তারা কিন্তু সবিনয়ে প্রত্যাখান করে বললো, খোদা মেহেরবান, আমরা একাহারী, খানাপিনার কোনও প্রয়োজন নাই। যদি গান শোনাও খুশি হবো। বাইরে থেকে তোমাদের গানের কলি কানে ভেসে আসছিলো। বড় সুন্দর সুরেলা গলা তোমাদের। মনে হয়, যেন কোনও নামজাদা গাইয়েরা গাইছিলো!

সামাত বলে, না, আমরা কেউই পেশাদার গাইয়ে নই। মনের আনন্দে গাই, এই আর কি! আমার বিবি সত্যিই ভালো গায়।

এরপর কথায় কথায় আলাপ পরিচয় জমে ওঠে। সামাত যে এদেশের বাসিন্দা নয় তা ওরা আগেই বুঝেছিলো। কি করে সে বাগদাদে এলো, তারপর কি বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা—সব আগাগোড়া খুলে বললো সামাত। সে-সব বিবরণের পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই।

দরবেশের প্রধান—অর্থাৎ খলিফা—আবু সামাতের কথা-বার্তায় আদব কায়দায় মুগ্ধ হয়ে পড়েন।

শোনো বাবা, দশ হাজার দিনারের ভাবনায় মন খারাপ করো না। ব্যবস্থা একটা হবেই। আমি বাগদাদ শহরের সমস্ত দরবেশদের প্রধান। মোট আমরা চল্লিশজন। তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে তোমার দেনা আমরা শোধ করে দেব। যাক, ওসব টাকা পয়সার তুচ্ছ কথা, এখন তোমার বিবিকে একবার অনুরোধ জানাও, আমরা তার দু-একটা গান শুনতে এসেছি। তিনি যদি খুশি মনে শোনান, আমরা ধন্য হবো। কারো কাছে সঙ্গীত সুসম খাদ্য সমান, কেউবা সঙ্গীতকে দাওয়াই মনে করে, আবার কেউ ভাবে সঙ্গীত সময় কাটানোর উৎকৃষ্ট উপায়। যে যে-চোখে দেখে, যে যেভাবে ভাবে। কিন্তু আমাদের কাছে সঙ্গীতই সব। তা দিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, ওষুধেরও কাজ দেয়, আর সময় কাটানো—তা তো হবেই।

জুবেদা দরবেশদের গান শুনিয়ে মাত করে দিতে পারলো। বাকী রাতটা কোন দিক দিয়ে কিভাবে কখন পালিয়ে গেলো, কেউ টেরই পেলো না। যখন তন্ময়তা কাটলো, তখন ভোর হতে চলেছে। সদলবলে প্রস্থান করার আগে খলিফা একশো স্বর্ণমুদ্রার একটি তোড়া তাকিয়ার নিচে রেখে গেলেন।

দুপুরবেলা সামাত বাজারে যাবার জন্য তৈরি হয়। খলিফা যে মোহরের তোড়াটা ফেলে গিয়েছিলেন তাই দিয়ে কিছু কেনাকাটা করবে—এই রকম ইচ্ছে। দরজা খুলতেই সে অবাক হয়। পঞ্চাশটা খচ্চর-এর পিঠে দামী দামী সামান পত্র। আর একটা খচ্চরে চেপে এসেছে আবু সিনিয়ার এক সুদর্শন বান্দা। ছেলেটি লাফিয়ে নেমে এসে সামাতের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বলে, আমি কাইরো থেকে আসছি। আপনার বাবা আমাদের পাঠিয়েছেন। আপনার বিবির জন্য পঞ্চাশ হাজার দিনারের দান সামগ্রী পাঠিয়েছেন।

সামাত চিঠিখানা খুলে পড়তে থাকে।

'প্রাণ প্রতিম পুত্র আলা অল-দিন আবু সামাতের প্রতি তার পিতা সামস অলদিনের আশীর্বাদ পত্র ঃ

বাবা, তোমার বিপদের কথা শুনলাম। ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে আজ তুমি কিভাবে দিন কাটাচ্ছো জানি না। তোমার কষ্টের কথা ভেবে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

যাই হোক, এই সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার দিনার মূল্যের দান সামগ্রী পাঠালাম। তোমার মা তার পুত্রবধূর জন্য নিজে হাতে তৈরি করা মূল্যবান পোশাক-আশাক এবং স্বর্ণালঙ্করাদি পাঠালেন। আশা করি এসব তার অপছন্দ হবে না।

আমরা শুনে আহত হলাম, তুমি নাকি অর্থাভাবে কোনও তালাক দেওয়া মেয়েকে শাদী করে আবার তার স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছ। এ কাজ সম্ভ্রান্ত লোকে করে না। যাইহোক, শাদীর পর সে তোমার আইন সম্মত বিবি। তুমি না ছাড়লে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে এই অ-মানুষিক কাজ তোমার শোভা পায় না। তোমার যদি পছন্দ হয়, সে বিবিকে তুমি কিছুতেই তালাক দিও না। আমি সালিমের সঙ্গে যা পাঠালাম তার মূল্য পঞ্চাশ হাজারের অনেক বেশী। প্রয়োজন বোধ করলে, এর থেকে খেসারতের টাকা পরিশোধ করে দিয়ে শাদী বিবিকে সসম্মানে ঘরে আনবে।

আমি এবং তোমার মা কুশলে আছি। সত্বর ঘরে ফিরে আসবে। আল্লাহ তোমার সহায় থাকুন। ইতি—

তোমার আব্বাজান

আবু সামাতের আনন্দ আর ধরে না। ছুটে গিয়ে জুবেদাকে সব বলে, চিঠিখানা দেখায়, আর কী ভাবনা, এবার আমি তোমার আগের স্বামীর নাকের ডগায় ছুঁড়ে মারবো দশ হাজার দিনার। টাকার জন্যে তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে! ভারি তো দশ হাজার দিনার—তার আবার কথা। তোমার একগাছি চুলের দাম তার চেয়ে ঢের বেশি।

স্বামীর মুখে তোয়াজ প্রশংসা শুনলে কোন্ মেয়ে না খুশিতে ডগমগ হয়। জুবেদা গলে গেলো। স্বামীকে সোহাগ করে বলে, ওগো আমার গুল বাগিচার মালি, তোমায় আমি ছাড়বো না—ছাড়বো না। এমন করে ঢালতে পার পানি—আমার চৈত্র মাসের ঝরা পাতার মরা ডালে আবার নতুন করে গজায় কুঁড়ি।

এমন সময় জুবেদার বাবা এবং তার আগের স্বামী ঘরে ঢুকলো। বাবা বলে, বেটা সামাত, আমি তোমার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি।

—বলুন।

—তুমি বাবা, আমার এই আগের জামাই-এর ওপর একটু করুণা কর। গরীব বেচারী, রাগের মাথায় বিবিকে বয়ান তালাক দিয়ে ফেলেছিলো। তা সে আর সত্যি সত্যি তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চায়নি। জুবেদাকে তুমি ছেড়ে দাও বাবা, এই আমার ভিক্ষে। আল্লাহর কৃপায় তোমার অনেক আছে। আজ তোমার বাবা যা পাঠিয়েছে তা দিয়ে তুমি অনায়াসে বাঁদী বাজারের সেরা মেয়েকে কিনে আনতে পার। তা যদি পছন্দ না হয়,হাঁ করলেই আমির ওমরাহর সুন্দরী মেয়েকে বিবি করতে পারবে। কিন্তু আমার এই গরীব ছেলেটা জুবেদাকে ফিরে না পেলে আত্মঘাতী হবে। তুমি ওকে ফিরিয়ে দাও। সারা জীন্দগী সে তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে।

আবু সামাত বাধা দিয়ে বলে, আহা-হা ওকি কথা। কে কার গোলাম হয়ে থাকবে। ও কথা রাখুন, আল্লাহ আমাকে অনেক মূল্যবান সওদাপত্র পাঠিয়েছেন। এখন আমার আর কোনও অভাব নাই। তাই জুবেদার স্বামীকে খেসারতের পরিমাণটা আরও অনেক বাড়িয়ে দিতে চাই। ঐ পঞ্চাশটা খচ্চর সুদ্ধ সামান পত্র সব আমি তাকে দিচ্ছি—সেই সঙ্গে ঐ বান্দা

সলিমকেও দেব। আর যদি জুবেদা বলে, সে তার আগের স্বামীর সঙ্গেই ঘর করবে, আমার কোনও অমত নাই। এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। জুবেদাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন সে কি বলে—সে কি চায়।

জুবেদার বাবা এবার মেয়ের মত চায়, মা, তুমি বলো, কার সঙ্গে ঘর করতে চাও। তোমার জন্য তোমার আগের স্বামী খানা-পিনা বন্ধ করে পাগলের মতো হয়ে গেছে। আমি বলি কি মা, অমন রাগের মাথায় বেফাঁস কথা সবার মুখেই বেরোয়। তাই নিয়ে জিদ করে বসে থাকলে সংসার চলে না।

জুবেদা বলে, জিদের কথা নয় বাবা, লোকটা একেবারে অপদার্থ। একটা দিন সে তোমার মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি। মেয়ে হয়ে এর বেশি আর কি বলবো তোমাকে। আর এই যে আমার নতুন স্বামী—কি তার যৌবন-পৌরুষ। আমার গুল বাগিচায় সে বাহার এনে দিয়েছে। জীবনে এত সুখ এত আনন্দ আছে—আগে বুঝিনি। আমার ঐ আগের স্বামী চলতে চলতে মাঝপথেই পা পিছলে পড়ে যেত—আর সে উঠতে পারতো না। না বাবা, আমার এই নতুন জীবনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি ওকে অন্য পথ দেখতে বলো।

জুবেদার এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীটা গোঁ গোঁ করতে করতে ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেলো। আর উঠলো না।

আবু সামাত তার সুন্দর সহচরী জুবেদা বিবির সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করতে লাগলো। প্রতিটি রাত্রি তারা খানা পিনায়, নাচে গানে মধুর করে তোলে। জীবনের সুধাপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠে।

শাদীর পর নটা দিন কেটে গেছে। দশ দিনের দিন আবু সামাত তার বিবি জুবেদাকে বললো, দেখছো, কান্ডখানা। সেই দরবেশ প্রধান কি রকম ধাপ্পাটা দিয়ে গেলো। তার আশায় চুপ করে বসে থাকলে তো আমাকে ফাটকের খানা খেতে হতো। আবার যদি বাছাধনের দেখা পাই, আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব।

সন্ধ্যাবেলা যথারীতি গান বাজনার আসর, বসলো। একটুক্ষণ, পরে কড়া নাড়ার শব্দে সামাত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। সেই দরবেশগুলো আবার এসেছে। আবু সামাত-এর মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে।—আসুন আসুন, মিথ্যের বাদশাহরা, ভিতরে আসুন। আহা, অমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভিতরে আসুন? আল্লাহর কৃপায় আপনাদের খয়রাতি ছাড়াই আমার বিপদের সুরাহা হয়ে গেছে। যদিও আপনারা ডাঁহা মিথ্যুক এবং শঠ, তবু তো আমার মেহেমান, তাই বিনীত অনুরোধ ভিতরে আসুন।

দরবেশরা নীরবে ঘরের ভিতর ঢুকে একপাশে বসে। আবু সামাত পর্দার ওপারে ওঘরে জুবেদাকে বলে, বিবিজান, সেই মেহেমানরা এসেছেন তোমার গান শুনতে। খুব ভালো করে গান শোনাও।

জুবেদা খুব রগরগে নাচএর সঙ্গে ততোধিক রগরগে গান গাইলো।

নাচগান থামলে প্রধান দরবেশ কি একটা কারণে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতেই সভাকবি আবু নসাব সামাতকে বলে, আচ্ছা সাহেব, কি করে তুমি ভাবলে, কাইরো থেকে তোমার বাবা পঞ্চাশটা খচ্চর আর ঐ সব দান-সামগ্রী তোমাকে পাঠিয়েছে? এখান থেকে কাইরো কত দিনের পথ? কম করে হলেও পঁয়তাল্লিশ দিনের আগে পৌঁছান যায় না। কি? তাইতো?

আবু সামাত ঘাড় নেড়ে বলে, জী-হাঁ বিলকুল ঠিক।

কবি বলে, কাইরো থেকে বাগদাদ আসতেও নিশ্চয়ই ঐ রকম সময়ই দরকার?

—সে তো একশো বার।

—তবে? তবে এটা কি করে সম্ভব, বলো? মাত্র দিন দশেক আগে তুমি ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুইয়েছ। এই সংবাদ এত অল্প সময়ের মধ্যে তার কাছে পৌঁছল কি করে? খবর যেতে লাগবে দেড় মাস এবং সেখান থেকে কোনও কিছু আসতেও লাগবে দেড় মাস। তাই না?

—ইয়া আল্লাহ, আবু সামাত চিৎকার করে ওঠে, তাইতো। একথা তো আমার মাথায় ঢোকেনি—ঐ সব সামান পত্র আর বাবার চিঠিখানা দেখে আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আর খতিয়ে দেখিনি, এত অল্প সময়ের মধ্যে কাইরো থেকে কি করে বাবা এসব পাঠাতে পারেন! আমার মনে হচ্ছে,আপনি সব জানেন। কে পাঠিয়েছে ঐ সব সামান পত্র, বলুন তো?

কবি বললো, আবু সামাত, তোমার রূপের মতো গুণটা যদি থাকতো তা হলে তোমার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যেত না। তুমি খলিফার উজির হয়ে তার পাশে বসতে। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে ইনি খলিফা হারুন অল রসিদের উজির জাফর অল বারমাকী, তার দেহ রক্ষী মাসরুর, আর এই অধম তাঁর সভাকবি আবু নসাব। স্বয়ং খলিফা একটু আগে বাইরে গেলেন।

আবু সামাত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

—আচ্ছা কবি সাহেব, বলতে পারেন, আমার মধ্যে এমন কি বস্তু তিনি দেখেছিলেন যার জন্য তাঁর এই বদান্যতা?

কথাগুলো বলতে বলতে সামাতের গলা কেঁপে যায়। সারা শরীর ঘেমে ওঠে।

আবু নসাব স্মিত হেসে বলে, তোমার সুন্দর চেহারা আর আদব কায়দায় মুগ্ধ হয়েছিলেন খলিফা।

এই সময়ে খলিফা আবার ঘরে ঢুকলেন। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে আবু সামাত বলে, ধর্মাবতার, আপনার অপার মহিমা। আমি দীনহীন অসহায় অবোধ, না জেনে অনেক কটূকথা বলেছি—আমার গোস্তাকি মাফ করুন, জাঁহাপনা। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে যে-সব বকশিস পাঠিয়েছেন তার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ঐরকম বিপদের মুহূর্তে আপনি আমাকে সাহায্য করে বাঁচিয়েছেন। এ ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না।

খলিফা মৃদু হাসলেন। আবু সামাতের চিবুক ধরে আদর করে বললেন, কাল তুমি আমার প্রাসাদে আসবে।

এই বলে জাফর অল বারমাকী, মাসরুর আর আবু নসাবকে সঙ্গে নিয়ে খলিফা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আবু নসাব সামাতের কানে কানে বলে গেলো, ইয়াদ থাকে যেন, কাল অবশ্যই খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

পরদিন সকালে আবু সামাত খলিফা সন্দর্শনে যাবার উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকে। খলিফা সেদিন সালিমের হাতে এক প্রস্থ মূল্যবান সাজপোশাক পাঠিয়েছিলেন আবু সামাতের জন্য। খুব পরিপাটি করে, সেই সাজপোশাক তাকে পরিয়ে দিলো জুবেদা। খলিফার পাঠানো দানসামগ্রীর মধ্য থেকে সবচেয়ে সুন্দর কাজ করা একটা উপহার সে বেছে বের করলো। ছোট একটা বাক্সে ভরে সলিমের হাতে দিয়ে বললো, চলো এবার রওনা হওয়া যাক।

খলিফা তখন দরবারে সিংহাসনে বসেছিলেন। আবু সামাত যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে খলিফার পায়ের কাছে বাক্সটা রেখে বললো, এই সামান্য ভেট গ্রহণ করে আপনার এই অধম নফরকে ধন্য করুন, জাঁহাপনা।

তরুণের এই বিনয়াবনত বাক্য-ব্যবহারে খলিফা প্রসন্ন হয়ে বললেন, তোমার দেওয়া শুধু বাক্সটা পেলে তো আমার চলবে না, আবু সামাত। তোমাকেও আমি চাই। তুমি আমার প্রাসাদে এসো, তোমাকে একটা ভালো পদে বহাল করবো আমি। এবং আজ থেকেই।

খলিফা তখন দরবারে ঘোষণা করলেন, আজ থেকে এই তরুণ আবু সামাতকে আমি সওদাগর সভার সভাপতি পদে বহাল করলাম। বাগদাদের পথে ঘাটে গঞ্জে বাজারে এই বার্তা সকলকে জানিয়ে যাও।

সুলতানের হুকুম মাফিক সারা শহরে তক্ষুণি ঢ্যাড়া পিটে সেই ঘোষণা জানিয়ে দেওয়া হলো। সেই দিন থেকে খলিফা একদিনও আবু সামাতকে কাছ ছাড়া করতেন না। সুতরাং আবু সামাত-এর মনের বাসনা মনেই শুকিয়ে যেতে থাকলো। সে ভেবেছিলো, বাজারে একটা দোকান নেবে। সওদাগরি সামানপত্র সাজিয়ে বসবে। কিন্তু তা আর হলো না। খলিফা তাকে বণিক সভার সভাপতির পদে বহাল করলেন। কয়েক দিন পরে প্রাসাদের প্রধান সরাবজী মারা গেলো। সুলতান এবার যথাযোগ্য মর্যাদায় আবু সামাতকে সেই পদে বরণ করে নেন। পরদিন দরবার কক্ষে প্রবেশ করে এক সরকারী কর্মচারী জানালো, প্রাসাদের প্রধান সচিব আজ মারা গেছে। সুলতান সামাতকে বললেন, আজ থেকে তোমাকে আমার প্রাসাদ-এর পূর্ণ দায়িত্ব দিলাম। তুমি যা মাসোহারা পাচ্ছিলে, এখন থেকে তা দুগুণ হবে।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো সাতষট্টিতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়ঃ

আবু সামাত সারাদিন প্রাসাদের কাজকর্ম দেখাশুনা করে। এবং রাত্রিবেলায় বিবির কাছে চলে যায়। দু'জনে মিলে মৌজ করে খানাপিনা করে। দরবারের গল্প শোনায়।

খলিফা একদিন বললেন, আজ নাচগানের মাইফেল বসানো হোক।

জলসাঘরে ঝাড়বাতি জ্বালানো হলো। ফুল আতর ধূপের গন্ধে মদির হলো সারা ঘর। পর্দার ওপারে খলিফার এক সুন্দরী বাঁদী রক্ষিতা এসে গান ধরলো। গানের মুর্ছনায় সকলেই তখন তন্ময়। খলিফা এক সময় সামাতের কানে কানে বললেন, তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে বন্ধু, আমার বাঁদীর রূপে তুমি মজেছ!

—জাঁহাপনা মজলে বান্দাও মজবে, এই তো নিয়ম।

—উহুঁ, সে কথা বলে পাশ কাটালে হবে না। আমি আমার পিতৃপুরুষের নামে হলফ করে বলছি, আজ থেকে এই বাঁদী তোমার।

খোজাকে ডেকে বললো, 'দিল কা পেয়ারা'র যা কিছু ধনদৌলত আছে— সব এই সাহেবের বাড়ি পৌঁছে দাও। আর তাকেও তার চল্লিশজন দাসী বাঁদীর সঙ্গে ওখানে রেখে এসো।

কিন্তু আবু সামাত করুণভাবে মিনতি জানায়, অমন কাজটি করবেন না, জাঁহাপনা, একেবারে মরে যাবো। আমি তাকে স্পর্শও করতে পারবো না। সুলতানের ভোগের পাত্রী আমি ভোগ করবো, সে কথা মনে আনাও মহাপাপ।

হারুন অল রসিদ থামলেন, আমি বুঝেছি তোমার ভয় কোথায়। তারই নাকের ডগা দিয়ে আর একটা মেয়েকে ঘরে তুললে সে সহ্য করতে পারবে না। হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে, তাই না?

—না হুজুর সে-ভয় আমার নাই।

আবু সামাত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। খলিফা জাফরকে বললেন, জাফর বাঁদীবাজার থেকে হাজার দশেক দিনার দিয়ে একটা বহুৎ খুব সুরৎ বাঁদী কিনে নিয়ে এসো। আমি সামাতের বাড়িতে পাঠাবো। তার কাজে খুশি হয়ে আমি তাকে ইনাম দিতে চাই।

জাফর আবু সামাতকে সঙ্গে নিয়ে বাঁদীবাজারে যায়। বলে, দেখেশুনে পছন্দ কর। দামের জন্য ভাববে না।

কোতোয়াল আমির খালিদও সে-দিন বাঁদীবাজারে এসেছে। উদ্দেশ্য তার একমাত্র পুত্রের জন্য একটা বাঁদী কেনা। ছেলেটি সবে চৌদ্দয় পা দিয়েছে। দেখতে বড় কুৎসিৎ কদাকার। বাঁদরের মতো মুখাবয়ব, খুদে খুদে গোলাকৃতি দুটি চোখে জুলজুল করে মেয়েছেলের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায়। ঘৃণায় সব মেয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুতরাং বাঁদীবাজার থেকে মেয়ে কেনা ছাড়া আর কি উপায়? এই বামন সদৃশ বাঁদরমুখো ছেলেটার নাম বড়ফট্টাই।

গত রাত্রে তার মা লক্ষ্য করেছে, ছেলের দেহে পুরুষত্ব এসেছে। তার বিছানার চাদরে দাগ দেখে সে বুঝেছে, ছেলের স্বপ্নদোষ হচ্ছে। তাই সে স্বামীকে বলেছে, ছেলে লায়েক হয়ে গেছে, আর দেরি নয়, এই বেলা তাকে একটা মেয়ে এনে দাও। বিবির পরামর্শে, তাই, আমিরসাহেব ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে এসেছে।

দালালরা ফর্সা, কালো, শ্যামলা নানা রঙের নানাজাতের বাঁদী এনে দেখাতে থাকে। ছেলেকে নিয়ে আমির, আর আবু সামাতকে নিয়ে জাফর সেই-সব আনকোরা মেয়েমানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। কিন্তু কোনটিই কারো পছন্দ হয় না। এমন সময় দালাল সর্দার একটি মেয়েকে এনে হাজির করলো। মেয়েটির রূপের তুলনা হয় না। যেন রমজানের চাঁদ। মেয়েটিকে দেখামাত্র বড়ফট্টাই কামাতুর চোখে জুলজুল করে তাকায়। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে। অর্থাৎ তার খুব পছন্দ। বাবাকে বলে, এই হচ্ছে আসলি মাল, এইটাই আমি নেব, বাবা।

এদিকে জাফর আবু সামাতকে বলে, দেখ, চলবে?

সামাত বলে, তোফা, খুব চলবে।

—আচ্ছা বাঁদীমেয়ে, জাফর জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

মেয়েটি জবাব দেয়, আমার নাম যুঁই, মালিক।

জাফর দালালকে যুঁই-এর দাম জিজ্ঞেস করলো, কত নেবে?

দালাল বলে, পাঁচ হাজার দিনার, হুজুর।

তৎক্ষণাৎ বড়ফট্টাই দুম করে বলে, আমি ছয় হাজার দেব। আবু সামাত সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমি আট দেব।

বড়ফট্টাই চিৎকার করে ওঠে, আমি আট হাজার এক দেব।

সামাত বলে, নয় হাজার এক।

জাফর বললো, পুরো দশ হাজারই রইলো।

দালাল হাঁকতে লাগলো, দশ হাজার দিনার—বাঁদী যুঁই দশ হাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে—আর কেউ আছেন? তাড়াতাড়ি বলুন। মাত্র দশ হাজার, দশ হাজার—দশ হাজার। ডাক শেষ।

দশ হাজারে আবু সামাত যুঁই-কে কিনে নিলো। দালাল তাকে সামাতের হাতে তুলে দেয়। বড়ফট্টাই মাটিতে পড়ে দাপাতে লাগলো। আমির তার ছেলের এই বেয়াদপি সহ্য করতে পারে না। ছেলেটা একেবারে অকালকুষ্মাণ্ড হয়েছে। শুধু বিবির বায়না ঠেলতে না পেরে সে সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে এসেছে। না হলে এমন ছেলেকে সে ঘরের বাইরে নিয়ে আসতো না। ছিঃ ছিঃ কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড!

জাফরকে অনেক সুক্রিয়া জানিয়ে আবু সামাত যুঁইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি চলে আসে। জুবেদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। জুবেদা স্বামীর পছন্দ করা বাঁদীকে অনাদর করতে পারে না। কাছে ডেকে বসায়। নাম ধাম জিজ্ঞেস করে।

জুবেদার ব্যবহারে সামাত মুগ্ধ হয়। বাঁদীকে সে তার দ্বিতীয় বিবির আসন দেবে। জুবেদা যুঁইকে সাজিয়ে গুজিয়ে সে রাতে সামাতের ঘরে পাঠায়। সামাতের সহবাসে সেই রাতেই যুঁই অন্তঃসত্ত্বা হলো।

বড়ফাট্টাই-এর বাবা ছেলেকে আর কিছুতেই বাগে আনতে পারে না। অবশেষে তাকে মিথ্যে স্তোক দিয়ে বাড়ি নিয়ে আসতে পারলো। ছেলে ঘরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়ে।—ঐ বাঁদী না পেলে আমি আত্মঘাতী হবো।

মা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো, ওগো আমার কী হবে গো, আমার ছেলে আর বাঁচবে না, গো।

এমন গলা ফাটিয়ে এমন কাণ্ড শুরু করলো, পাড়াপড়শীরা ছুটে এলো। অনেকেই ছেলের দুঃখে হাহুতাশ করলো, আহা দুধের বাছা, তার মুখের খাবার কেউ ঐভাবে কেড়ে নেয়?

যারা সমবেদনা জানাতে এসেছিলো তাদের মধ্যে সিঁদেল চোর আহমদের বুড়ি মা মহা শয়তান। বললো, কিচ্ছু ভাবনা কর না বাছা, তোমার ছেলের মনোবাঞ্ছা আমি পুরণ করে দেব। আমার ছেলে আহমদ-এক্কেবারে পাকা চোর। তার অসাধ্যি কিচ্ছু নাই। মালিকের নাকের ডগা দিয়ে তার বাড়ির দরজা জানলা খুলে নিয়ে আসে সে। তাকে ধরবে, তেমন মরদ আরবে নাই। সে এমন যাদু জানে, ঘরের মালিক জেগে আছে, তার চোখের সামনে সিঁদ কেটে সে তার ঘরে ঢুকে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে আসে—কিচ্ছু করতে পারে না।

বড়ফট্টাই-এর মা বুড়িকে আদর করে বসায়। বলে, যেমন করেই হোক, তোমার ছেলেকে দিয়ে বাঁদী যুঁইকে চুরি করিয়ে এনে দিতেই হবে। না হলে আমার ছেলে বাঁচবে না।

বুড়ি বলে, কিন্তু কি করে সে কাজ সে করবে বাছা। তাকে তো তোমার স্বামী হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে কয়েদ করে রেখে দিয়েছে।

বড়ফট্টাই-এর মা জিজ্ঞেস করে, কেন?

—অতি তুচ্ছ কারণে মা, অতি তুচ্ছ কারণে। বাছা আমার সামান্য কটা দিনার জাল করেছিলো—এই তার অপরাধ।

আমির বিবি বলে, ঠিক আছে, ছেলের বাবা ঘরে আসুক, আজই আমি এর বিধি-ব্যবস্থা করছি।

সন্ধ্যা বেলায় কোতোয়াল ফিরে এলে, খানাপিনা শেষ হলে তার ঘরে এলো আমির বিবি। পরণে বাহারী সাজপোশাক, প্রসাধন-প্রলেপে মুখখানা ডাগর মেয়ের মতো ঢলঢলে হয়েছে। চোখে সুর্মা কাজল পরেছে কচি মেয়েদের মতো করে। গায়ে ছিটিয়েছে দামী আতর। ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। এই মোহিনী বেশে সামনে এসে দাঁড়াতেই খালিদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। বিবিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে পালঙ্কের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ছলনাময়ী নারী নিজেকে শক্ত করে রাখে, না, আগে বলো, আমি যা বলবো, শুনবে।

খালিদের রক্তে তখন নাচন শুরু হয়েছে বলে, আল্লাহ কসম, যা চাইবে তাই দেব, যা বলবে তাই করবো, এবার চলো।

আমির-বিবি স্বামীকে সোহাগ করতে করতে বলে, আহমদের মা মৃত্যু শয্যায়। ছেলের শোকে সে অন্ধ হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক, তাকে খালাস করে দিতে হবে।

ততক্ষণে খালিদের দেহের ক্লেদ নির্গত হয়ে গেছে। আলস্য-অবসাদ জড়িত কণ্ঠে কোনরকমে সে বলতে পারলো; জবান যখন দিয়েছি নিশ্চয়ই তাকে খালাস করে দেব।

পরদিন সকালে আমির কয়েদখানায় এসে আহমদকে জিজ্ঞেস করে কী? আর করবে কখনও জালিয়াতী?

—জী না, আর কক্‌খনো করবো না, খোদা কসম। আমার অনেক আক্কেল সেলামী হয়েছে। এবারে একটু মানুষের মতো বাঁচতে চাই। আমি তামাম দুনিয়াকে চিৎকার করে জানাতে চাই, অপরাধ করে সুখ শান্তি কিছুই পাওয়া যায় না।

কোতোয়াল তাকে সঙ্গে করে খলিফার সামনে নিয়ে যায়। সুলতান তো দেখে অবাক, এত নির্যাতনের পরেও লোকটা বেঁচে আছে? আমি তো ভেবেছি, প্যাঁদানীর চোটে কবে অক্কা পেয়ে গেছে।

আহমদ বেড়িসুদ্ধ হাতখানা মাথার উপরে তুলে বলে, খোদা মেহেরবান, আপনি ধর্মাবতার, কিন্তু শয়তানের কলিজা বড় কঠিন বস্তু।

খলিফা হো হো করে হেসে উঠলেন, বাঃ, তোফা কথা বলেছ তো, হে।

খালিদকে উদ্দেশ করে বললেন, ওকে কামারের কাছে নিয়ে যাও। কড়া বেড়ি সব খুলে দাও। লোকটাকে কাজে লাগাতে হবে। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলবো। চোর ডাকাতদের এ যতটা জানে আর তো তেমন কারো পক্ষে জানা সম্ভব না। তাদের গতিবিধি ঘোঁৎঘাঁৎ আড্ডা—সবই এর নখ-দর্পণে। আজ থেকে একে আমি প্রধান কোতোয়ালের পদে বহাল করলাম।

আহমদ আভূমি আনত হয়ে খলিফাকে কুর্নিশ জানায়।

আজ তার আনন্দের সীমা নাই। শুধু কয়েদখানা থেকে ছাড়া পাওয়া নয়, একেবারে প্রধান কোতোয়ালের চাকরী মিলে গেলো। একেই বলে বরাত।

ইহুদী ইব্রাহিমের মদের দোকানে গিয়ে ঢকঢক করে কয়েক পাত্র গলায় ঢেলে দিলো। আঃ, কী মজাদার সরাব। কতকাল সে মদ খেতে পায়নি। আজ আর কোনও কথা নয়, প্রাণ ভরে খাবে। যত পারে।

নেশায় টং হয়ে বাড়ি ফেরে। মা কেঁদে আকুল। এত মদ খেয়েছিস কেন, বাবা?

—খাবো না? কতদিন ফাটকে আটকে ছিলাম, এক ফোঁটা জিভেয় ঠেকাতে পারিনি।

বুড়ি বলে, কিন্তু আমার যে একটা কাজ করে দিতে হবে, বাবা।

—বলো মা, কি করতে হবে। তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।

তখন বুড়ি আবু সামাত, বাঁদী যুঁই আর বড়ফট্টাই-এর সব বৃত্তান্ত খুলে বলে তাকে।

—এখন বড়ফট্টাই নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছে। যুঁইকে তার চাই-ই। তোর অসাধ্য কোনও কাজ নাই। তুই চেষ্টা করলে যুঁইকে তার কাছে এনে দিতে পারিস, বাবা।

আহমদ বলে, এ আর এমন শক্ত কী? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

সে-দিন মাসের পয়লা। যথারীতি ফি মাসে এই তারিখে খলিফা তার প্রধান বেগমের ঘরে যান। তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন, খানাপিনা সারেন তারপর রাত্রিবাস করেন।

সন্ধ্যা হতেই খলিফা বেগমের মহলে আসেন। বেগমের শোবার ঘরের এ পাশে একটি ছোট বসবার ঘর। সেই ঘরের একটি মেজ-এর উপর খলিফা খুলে রাখলেন তার গলার রত্নহার, তার বাদশাহী মোহর এবং হীরা বসানো একটা সোনার রোশনাই বাতি। এই হীরাটার দ্যুতি অন্ধকার-এ জ্বল জ্বল করে। ঘরের অন্ধকার কেটে যায়।

এ-সব আহমদের জানা। প্রাসাদের নফরচাকর সব ঘুমিয়ে পড়লে দড়ির মই বাধিয়ে তরতর করে প্রাচীরের উপরে উঠে যায় সে। তারপর টুক করে নিচে লাফিয়ে পড়ে। বেগমের বসার ঘর থেকে খলিফার খুলে রাখা জিনিসগুলো বগলদাবা করে আবার সে যেভাবে এসেছিলো সেইভাবে সন্তর্পণে সটকে পড়ে।

আবু সামাতের বাড়ির দিকে ছুটে চলে আহমদ। নিঃশব্দে ফটকের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ঘরের পিছনের দিকের দেওয়ালের একখানা শ্বেতপাথরের থান তুলে ফেলে। শাবল দিয়ে খানিকটা গর্ত করে তার মধ্যে খলিফার ঐ রত্নহার আর মোহরখানা ভরে আবার যথারীতি পাথরের থানখানা এঁটে লাগিয়ে দিয়ে চুপিসারে কেটে পড়ে। তারপর ইবরাহিমের দোকানে এসে সারারাত ধরে তাড়ি খেতে থাকে।

সকালবেলা বেগমের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খলিফা হতবাক্ হয়ে যায়। তার ব্যবহারের জিনিসে কেউ হাত দিতে পারে—ভাবতে কষ্ট হয়। এত বড় দুঃসাহস কার হতে পারে!

সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রাসাদ তোলপাড় হতে লাগলো। কী সর্বনাশ, প্রাসাদের হারেমে চোর ঢুকেছিলো! খোজাদের তলব করা হলো। সবাই পাংশু বিবর্ণ মুখে বললো, কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। খলিফা সিংহনাদ করে উঠলেন, আজ কারো নিস্তার নাই। সবাইকে আমি শেষ করে ফেলবো।

হন হন করে তিনি দরবারে এসে সিংহাসনে বসলেন। সারা মুখে চাপা ক্রোধ, চক্ষু রক্তবর্ণ। চারপাশে উজির আমির অমাত্যরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। কারো মুখে কোনও ভাষা নাই। খলিফাও নির্বাক। সমগ্র দরবারে তখন কবরের নীরবতা।

হঠাৎ খলিফা হুঙ্কার ছাড়লেন, জাফর, রক্ত যে টগবগ করে ফুটছে।

জাফর শান্তভাবে বলে, আল্লাহ শয়তানকে শায়েস্তা করবেন।

এই সময়ে কোতোয়াল খালিদ আহমদকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো। খলিফা বললেন, এই যে আমির খালিদ, এদিকে এসো, আমার সামনে দাঁড়াও।

কোরবানীর খাসীর মতো খালিদ এগিয়ে যায়।

—তোমার শহর এলাকার হালচাল কী রকম চলছে?

—খুব ভালো জাঁহাপনা, চুরি ছিনতাই একদম নাই। আমি সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছি।

—হুঁ, তাই নাকি। কিন্তু আমি তো গরম হয়ে গেছি, কোতোয়াল। আমাকে ঠাণ্ডা করবে কি দিয়ে?

—জাঁহাপনা—

—তুমি একটা মিথ্যেবাদী, উজবুক।

—জী হুজুর। কোথাও তো কিছু ঘটেনি।

—চোপরও।

উজির জাফর ফিসফিস করে খালিদের কানের কাছে বললো, কাল রাতে বেগমের ঘর থেকে স্বয়ং ধর্মাবতারের জিনিসপত্র চুরি গেছে—সে খবর রাখ?

সুলতান বললেন, শোনো খালিদ, যে জিনিসগুলো খোয়া গেছে তা আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং মূল্যবান। সারা সাম্রাজ্যের বিনিময়েও তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। সুতরাং, যেভাবেই হোক, সেগুলো আমার ফেরৎ চাই-ই চাই। তা যদি না পার, তোমার গর্দান যাবে। আজকের দিন সময় দিলাম, তার মধ্যে তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে সেই চোরকে। নইলে কাল সকালে, এই প্রাসাদের ফটকের সামনে তোমার কাটা-মুণ্ডু ঝুলবে, বুঝলে?

বড়ফট্টাই-এর বাবা আমির খালিদের অবস্থা তখন কাহিল। এত বড় শহরে কোথায় সে-চোর গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে, কি করে সে জানবে? নাঃ, আর কোনও বাঁচার পথ নাই। প্রাণটা গেলো। হঠাৎ তার মাথায় ধাঁ করে একটা বুদ্ধি এলো, হুজুর, আপনি তো কাল থেকে এই আহমদকে প্রধান কোতোয়ালে বহাল করেছেন। এখন তো সব দায়দায়িত্ব তার—আমি তার আজ্ঞাবহ মাত্র। যদি চুরির মাল না পাওয়া যায় তবে সাজা পেতে হলে তারই পাওয়া উচিত।

এবার আহমদ সামনে এগিয়ে আসে।—ধর্মাবতার, চোরকে খুঁজে বের করা শক্ত হবে না। হুজুরের কাছে প্রার্থনা, আপনি আমাকে শহরের যে কোন বাড়ি, ঘর দোকানপাঠ তল্লাসী করার ফরমান দিন। আমার অবাধ গতি থাকবে সর্বত্র। তা সে উজির জাফর অল বারমাকীর

প্রাসাদই হোক, বা কাজী বা জাঁহাপনার একান্ত প্রিয়পাত্র আবু সামাতের বাড়িই হোক। আমার যেখানে প্রয়োজন আমি যাবো, যাকে খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করবো, যে কোন জায়গা খানাতল্লাসী চালাবো।

খলিফা বললেন, অতি উত্তম কথা। আমি এক্ষুণি এইমর্মে ফরমান দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে আহমদ, গর্দান চাই-ই। তা সে তোমারই হোক, বা সেই চোরেরই হোক। তাকে ধরতে পারলে তোমারটা বাঁচবে তারটা যাবে। না পারলে তোমার—

আহমদ বিচলিত হলো না।—তাই হবে জাঁহাপনা। আমি অপনার বিচার মাথা পেতে নিলাম। এই আমি আমার বাপ ঠাকুরদা—চৌদ্দ পুরুষের নামে কসম খেয়ে বলছি—চোর আমি ধরবোই। তা সে যদি আমার নিজের ঔরসের ছেলেও চুরি করে থাকে—রেহাই পাবে না সে। আপনার দরবারে হাজির করবো তাকে।

আহমদ সুলতানের ফরমান এবং কাজীর দুজন আর কোতোয়ালের দুজন সিপাইকে সঙ্গে নিলো। প্রথমে সে গেলো উজির জাফরের প্রাসাদে। সারা প্রাসাদ খানাতল্লাসী করলো। কিন্তু না, কিছুই পেলো না। তারপর গেলো কোতোয়াল আর কাজীর বাড়ি। সেখানেও কিছু মিললো না। সব শেষে এলো সে আবু সামাতের বাড়ি। তখনও এত সব কাণ্ড কারখানার কিছুই খবর রাখে না আবু সামাত।

আবু সামাত বাইরের ঘরে বসেছিলো। আহমদের এক হাতে সুলতানের ফরমান অন্য হাতে একখানা মস্ত শাবল। আবু সামাতকে সে তার আসার কারণ বুঝিয়ে বললো।

—আপনি সুলতানের প্রিয়পাত্র, আপনাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার কারণ থাকতে পারে না। তবু কর্তব্য বড় কঠিন বস্তু, তল্লাসী আমাকে করতেই হবে। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।

সামাত হাসি মুখে বলে, না না, সে কি কথা? আপনি কর্তব্যের দাস। আমি মনে করবো কি? যেমন ভাবে খুশি সারা বাড়ি তল্লাসী করে দেখুন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

আহমদ বিড় বিড় করে বলে, শুধু নিয়ম রক্ষার জন্যে—তাছাড়া কোনও দরকার ছিলো না।

তারপর ঘরের বাইরে আঙিণায় এসে দাঁড়ায়। হাতের শাবলটা দিয়ে এখানে ওখানে ঠুকতে থাকে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চালাবার পর এক জায়গায় এসে আহমদ দাঁড়িয়ে পড়ে।

উঁহু, এই আওয়াজটা তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

আর একবার সে ঐ জায়গাটা শাবল দিয়ে ঠুকে। আওয়াজাটা সত্যিই যেন কেমন কেমন। সামাত বলে, খুলে ফেলুন তো পাথরখানা।

আহমদ বলে, নিশ্চয়ই ভেতরটা ফাঁপা—

সাবলের ডগা দিয়ে চাঁ দিতেই পাথরখানা খুলে যায়। ভেতরটায় একটা ছোট্ট গর্ত। গর্তের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে আহমদ টেনে বার করে খলিফার ব্যবহারের সেই জিনিসগুলো।

সামাতের মুখ সাদা হয়ে যায়। মাথা ঘুরতে থাকে। কোনও রকমে সে মাটির ওপরে বসে পড়ে।

একটা কাগজে উদ্ধার করা জিনিসগুলোর বিবরণ লিখে তখুনি সে কাজী এবং কোতোয়ালের কাছে পাঠায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই খলিফা কাজীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পড়েন। সিপাইরা চ্যাংদোলা করে সামাতকে কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে হাজির করে।

খলিফা সাক্ষ্য প্রমাণে নিঃসন্দেহ হয়ে অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন। শেষকালে সামাত—তার একান্ত প্রিয় পাত্র সামাতের এই কাণ্ড! কিছুতেই তিনি হিসাব মেলাতে পারেন না। এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে বসে ভাবতে থাকেন। তারপর এক সময় রায় দেন, একে নিয়ে যাও, ফাঁসীতে ঝোলাও।

হাবিলদার সারা শহরে ঢ্যাড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেয়, আজ সন্ধ্যায় সামাতের ফাঁসী হবে।' তারপর সামাতের সব বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার দুই বিবিকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসে। সোনাদানা টাকাকড়ি যা পাওয়া গেলো—খাজাঞ্চীখানায় জমা করে দেয়। বাঁদী যুঁই আর বিবি জুবেদাকে নীলামের ডাকে তোলে। বাঁদী যুঁইকে বড়ফট্টাই-এর বাবা খালিদ কিনে নিয়ে চলে যায়। আর জুবেদাকে হাবিলদার নিয়ে যায় তার নিজের বাড়িতে।

এখানে বলে রাখা দরকার, এই সদাশয় হাবিলদারটি সামাতকে খুবই স্নেহ করতো। সামাতও তাকে বাবার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতো। হাবিলদার সামাত-এর চরিত্র খুব ভালো ভাবেই জানে। তার পক্ষে এই জঘন্য কাজ কিছুতেই করা সম্ভব না। নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য কোনও মতলব আছে। হাবিলদার বুঝতে পারে না—কি সে মতলব। যাই হোক, সুলতানের হুকুম সামাতকে ফাঁসী দিতে হবে। উপায় নাই। কিন্তু হাবিলদারের মন কিছুতেই সায় দেয় না। একটা নিরপরাধ ফুলের মতো নিষ্পাপ পবিত্র ছেলে প্রাণ হারাবে!

আর দেরি করা চলে না। আজ সন্ধ্যাতেই আবু সামাতের ফাঁসী দিতে হবে। হাজার হাজার লোক জড়ো হচ্ছে প্রাসাদের সামনে।

হাবিলদার কয়েদখানার সচিবের কাছে গিয়ে বললো, জনা চল্লিশেক ফাঁসীর কয়েদী আছে আপনার ফাটকে। আমি ওদের সবাইকে পরীক্ষা করে দেখবো।

ফাঁসীর আসামীদের এক এক করে দেখতে দেখতে একজনকে দেখে মনে হলো, এই লোকটার সঙ্গে সামাতের চেহারার অনেকটা মিল আছে। লোকটাকে সে বাইরে বের করে আনলো। যথা সময়ে সেই নকল সামাতের গলায় ফাঁসীর দড়ি পরানো হলো। লোকে হায় হায় করতে থাকলো। সেই উদ্বেলিত জনতার সমক্ষে সে-দিন সন্ধ্যায় নকল সামাতের ফাঁসী হয়ে গেলো।

এর পর প্রায় মাঝ রাতে আসল সামাতকে ফাটক থেকে বের করে হাবিলদার তার বাড়িতে নিয়ে গেলো। সামাতকে সে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বাবা, সত্যি কথা বলতো কেন এই কাজ করলে?

হাবিলদারের এই কথা শুনে সামাত আবার মুর্ছিত হয়ে পড়ে। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে। শেষে আপনিও আমাকে এই মিথ্যা সন্দেহে জড়াতে চাইছেন, বাবা। আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানি না। এ সবই এক জঘন্য চক্রান্ত।

হাবিলদার বলে, আমি জানি বেটা, তোমার মতো সাচ্চা মুসলমানের পক্ষে এধরনের অসৎ কাজ করা কিছুতেই সম্ভব না। যাই হোক, তুমি ভেব না, দোষী একদিন ধরা পড়বেই। এই মুহূর্তে তা প্রমাণ করা শক্ত। তোমার নিজের নিরাপত্তার জন্যে এখন আপাততঃ কিছুদিন এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে তোমাকে। কারণ চারিদিকে শত্রুর চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার সন্ধান পেলে তোমার গর্দান যাবে,আমার গর্দান যাবে। আর দেরি নয়, আজই তোমাকে পালাতে হবে। লবন সমুদ্রের ওপারে আলেকজান্দ্রিয়া—সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকো। তারপর সময় হলে আমি তোমাকে নিয়ে আসবো। এখন তোমার বিবি জুবেদা আমার বাড়িতেই থাক। তার আদর যত্নের কোনও ত্রুটি হবে না।

আবু সামাত বলে, কিন্তু আমি তো পথঘাট কিছুই চিনি না।

—তার জন্যে কোনও ভাবনা করো না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো। তোমাকে রেখে আমি ফিরে আসবো। আলেকজান্দ্রিয়ার শোভা বড় মনোহর। যে দিকে তাকাও, শুধু সবুজের মেলা। দেখে দু' চোখ জুড়িয়ে যায়।

তড়িঘড়ি তারা বেরিয়ে পড়লো। যাবার আগে জুবেদার সঙ্গে একবার দেখাও করে

আসতে পারলো না সামাত। চুপিসারে নিঃশব্দ পায়ে পথ হেঁটে তারা বাগদাদের শহর সীমানা পার হয়ে যায়। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সামাত। পায়ে হেঁটে আর কত দূর যাওয়া সম্ভব! ঊষর মরুভূমির উত্তপ্ত বালি। ঝাঁ ঝাঁ করা রোদ। ক্রমশই গতি মন্থর হয়ে আসে।

এই সময়ে, হাবিলদার লক্ষ্য করলো, দুজন রক্তচোষা ইহুদী সুদখোর ঘোড়ায় চেপে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। লোক দুটো কাছে আসতে হাবিলদার হুকুম করলো, নামো, তোমাদের তল্লাসী করবো।

ঘোড়া থেকে নামতেই তরোয়ালের দুই কোপে দু'জনের মাথা মাটিতে নামিয়ে দিলো সে। সামাত বললো, লোক দুটোকে মারলেন কেন, বাবা। ওরা তো কোনও দোষ করেনি।

হাবিলদার বলে, লোকগুলো সুদখোর শয়তান। ওদের ছেড়ে দিলে বাগদাদে পৌঁছে টাকার লোভে আমাদের কথা খলিফাকে জানিয়ে দিত।

হাবিলদার তখন ইহুদী দুটোর টাকাকড়ি বের করে নিয়ে সামাতকে বললো, নাও, ঘোড়ায় চাপো। এতটা পথ হেঁটে হেঁটে যাওয়া তো সম্ভব না।

জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে বন্দরে এসে পৌঁছয় তারা। একটা সরাইখানায় ঘোড়া দুটো রেখে তারা একটা নৌকার সন্ধানে বের হয়। বেশীক্ষণ খুঁজতে হলো না, একটু এগোতেই নজরে পড়লো, একখানা নৌকা ছাড়বো ছাড়বো করছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, নৌকাটা আলেকজান্দ্রিয়াতেই যাবে। আবু সামাতের হাতে সোনা দানা ইহুদী দুটোর দেহ তল্লাসী করে যা পাওয়া গিয়েছিলো, তুলে দিয়ে হাবিলদার বলে, আলেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে তুমি আমার খবরের প্রত্যাশায় বসে থাকবে। সময়ের চাকা একদিন ঘুরবেই, তখন আমি নিজে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

নৌকা ছাড়ার সময় হয়ে আসে। হালিদারের দু চোখ জলে ভরে ওঠে। হাত নেড়ে সে বিদায় জানায়।

বাগদাদে ফিরে এসে সে যা শুনেছিলো তা এইরকম ঃ

নকল সামাতকে ফাঁসী দেওয়ার পরদিন সকালে খলিফা অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। কাল সাররাত তিনি ঘুমাতে পারেননি। এখনও তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না, সামাত-এর দ্বারা এই কাজ হতে পারে। ছেলেটি বড় ভালো ছিলো, তার স্বভাবচরিত্র আদব কায়দা পলকেই সবারই মন কেড়ে নেয়। জাফরকে তলব করতেই সে এসে হাজির হলো।

—উজির, কালকের ব্যাপারে আমি বড় ভেঙ্গে পড়েছি। দুনিয়ায় কাউকেই কি বিশ্বাস করতে পারা যাবে না। ছেলেটাকে বাইরে থেকে কত ভালো মনে হয়েছিলো, কিন্তু ভেতরটা যে ঐরকম কদাকার তা কি করে বুঝবো!

জাফর বলে, ধর্মাবতার, রহস্যের কিনারা না পাওয়া পর্যন্ত সবই দুর্বোধ্য মনে হয়। কিছুতেই ভাবা যায় না কি করে অসম্ভব সম্ভব হলো। কিন্তু আসল কারণ যেদিন জানা যায় সেদিন সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যাই হোক, আবু সামাত মিশরের এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বংশের ছেলে। তার চেহারা চরিত্র আদব কায়দার মধ্যে একটা খানদানী ছাপ আছে। এখনও আমার ধারণা, এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাপার নিহিত আছে।

খলিফা, চুপচাপ বসে বসে ভাবতে থাকেন। সত্যিই কি তিনি কোনও নিরপরাধীকে ফাঁসী দিলেন? সে তো মহা অধর্ম, মহাপাপ!

—জাফর, আবু সামাতের লাশটা একবার দেখবো, চলো। দু'জনে ছদ্মবেশ ধারণ করে বধ্যভূমিতে এসে দাঁড়ালেন। তখনও কফিনে ঢাকা সামাতের লাশটা ফাঁসী কাঠেই ঝুলছিলো। জাফর ঢাকাটা সরিয়ে দিতেই নকল সামাতের লাশটা দেখে চমকে ওঠেন খলিফা।

—এই সেই সামাত? কিন্তু সে তো আরও লম্বা চওড়া ছিলো।

জাফর বলে, মরার পরে মানুষ সিটকে যেতে পারে। তাতে লম্বা মানুষকেও খাটো মনে হওয়া সম্ভব।

খলিফা বলেন, কিন্তু জাফর, তার গালে দুখানা তিল ছিলো, এর গালে কোন তিলের বালাই নাই।

—জাঁহাপনা, এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে মুখের যে বিকৃতি ঘটে তাতে অনেক কিছুই পালটে যেতে পারে। সুতরাং ও-সব দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না।

খলিফা বললেন, তা ঠিক। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখ, এই ছেলেটার পায়ের পাতায় উল্কি কাটা আছে। আর ঐ উল্কিতে দুই শেখের নাম লেখা—এতো সিয়া সম্প্রদায়ের চিহ্ন। কিন্তু আমি ভালো করে জানি, আবু সামাত সুন্নি ছিলো।

জাফর বলে, একমাত্র আল্লাহই এ রহস্যের কিনারা করতে পারেন।

দু'জনে প্রাসাদে ফিরে আসেন। খলিফা হুকুম দিলেন, আবু সামাতের লাশটা কবর দিয়ে দাও।

এর পর থেকে আবু সামাতের সমস্ত স্মৃতি খলিফা হারুন অল রসিদের মন থেকে মুছে যেতে থাকে।

এবার আমরা আবু সামাতের দ্বিতীয় বিবি বাঁদী যুঁই-এর দিকে চোখ ফেরাচ্ছি ঃ

আবু সামাতের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পর হাবিলদার তার দুই বিবিকে নীলামে তুলেছিলো। প্রথম বিবি জুবেদাকে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। আর দ্বিতীয় বিবি বাঁদী যুঁইকে কিনে নেয় বড়ফট্টাই-এর বাবা কোতোয়াল খালিদ।

যুঁইকে বাড়ি নিয়ে এসে খালিদ ছেলে বড়ফট্টাই-এর ঘরে ঠেলে দেয়। বড়ফট্টাই-এর কামাতুর চোখ দুটো নেচে ওঠে। ছুটে এসে সে যুঁইকে জাপটে ধরতে যায়। কিন্তু যুঁই-এর গা রিরি করে ওঠে। এক ঝটকায় সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বড়ফট্টাই এর দুম্বার মতো দেহটা। কপট ক্রোধে সে কোমর থেকে ছুরি বের করে ভয় দেখায়, ফের যদি আমার গায়ে হাত দিতে আসবে তো জবাই করে ফেলবো।

বড়ফট্টাই-এর মা ছুটে আসে, তোমার তো বড় সাহস বাঁদী! আমার ছেলেকে শাসাচ্ছো! দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। বেয়াদপ বজ্জাৎ মেয়ে কোথাকার।

যুঁই রাগে গর্জে ওঠে, মুখ সামলে কথা বলো, এমন বেআইনি কথা কে শুনেছে—এক স্বামীর ঘর করতে করতে আর একজনের সঙ্গে কোন্ মেয়ে সহবাস করে? তোমরা কি জাননা, আমি আবু সামাতের বিবি? তোমার ছেলের বামন হয়ে চাঁদ ধরার শখ কেন? সিংহীর গুহায় কুকুর ঢুকলে তার কী দশা হয়, জান না?

বড়ফট্টাই-এর মা আস্ফালন করতে থাকে, বড় বাড় বেড়েছে, না? কেমন করে তোমাকে শায়েস্তা করতে হয়, দেখ। খাটিয়ে তোমার গতর শেষ করে দেব।

যুঁই বলে,ঐ বাঁদরটাকে দেহ দান করার আগে আমি নিজেকে খতম করে দেব। আমার এই দেহ যৌবন ভালোবাসা সবই আমার স্বামীর জন্য। তা সে জিন্দাই থাক আর মারাই যাক।

বড়ফট্টাই-এর মা যুঁই-এর সাজপোষাক এবং অলঙ্কারাদি জোর করে খুলে নিয়ে অতি সাধারণ ঝি চাকরাণীর পোশাক পরতে দেয়। বলে, রসুইখানায় যাও,ওখানেই তোমাকে থাকতে হবে। উনুন ধরাবে খানা বানাবে—এই তোমার কাজ।

যুঁই বলে, তোমার ঐ বাঁদর-মুখো কুঁজো বামন ছেলের সুরৎ দেখার চেয়ে এসব খাটুনি খাটাও ঢের ভালো।

এর পরে রান্না ঘরেই তার জায়গা হলো। বাড়ির অন্যান্য ঝি চাকররা এই ব্যাপারটা

ভালো নজরে দেখতে পারলো না। যুঁই-এর মতো সুন্দরী বাঁদী রান্না ঘরের কালি ধোঁয়ার মধ্যে দিন কাটাবে! সবাই তাকে ভালোবেসে কাছে টেনে নিলো। বলতে গেলে কোনও কাজই তাকে করতে দিত না। বললে, আহা, ঐ সোনার মতো হাতে কি কয়লার ছাই শোভা পায়। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না মালকিন, আমরা সবাই মিলে হাতে হাতে তোমার কাজগুলো ভাগাভাগি করে সেরে দেব। তুমি চুপটি করে বসে থাকো।

আপনারা শুনে খুশি হবেন, বড়ফট্টাই সেই-যে বিছানা নিলো আর উঠলো না।

আর হয়তো আপনাদের স্মরণে আছে, বাঁদী যুঁই-এর গর্ভে সামাতের সন্তান ছিলো। কয়েক মাস পরে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করলো সে। ছেলের বাবা সামাত আজ নাই, থাকলে সে-ই তার নামকরণ করতো। চোখের জল ফেলে যুঁই-ই ছেলের নাম রাখলো আসলান।

ঝি চাকরাণীদের চত্বরে আসলান শুধু মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হতে থাকে। বড়ফট্টাই-এর মা বা বাবা কেউই তার খোঁজখবর নেয় না। বাচ্চাটা কি খায় অথবা অনাহারে কাটায়, সে দিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নাই।

ছেলেটি কিন্তু শুধুমাত্র মাতৃস্তন্য পান করেই সিংহ শাবকের মতো তাগড়াই, তড়বড়ে হয়ে উঠতে থাকে। চেহারাখানা অবিকল সামাতের মতো, ধবধবে ফর্সা, ফুটফুটে সুন্দর। সবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে একটু একটু হাঁটতে শিখেছে।

একদিন বাঁদী যুঁই কি একটা দরকারে রসুইখানার ওপরতলায় গিয়েছিলো, এমন সময় আসলান পা পা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে খালিদের বসার ঘরে চলে যায়। খালিদ তখন তসবী জপ করছিলো, বাচ্চাটার দিকে নজর পড়তেই খালিদের দু চোখ জলে ভরে আসে। সামাতের শান্ত সৌম্য চেহারাখানা ভেসে ওঠে। একেবারে খুদে সামাত। সেই চোখ মুখ নাক কান—সব-সব একেবারে সামাতের মতো।

—এসো বেটা, এসো।

আসলানকে সে দু হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নেয়। কোলের ওপরে বসিয়ে আদর করতে থাকে।—খোকন সোনা, চাঁদের কনা—

একটুক্ষণ পরে যুঁই নেমে এসে দেখে, আসলান নাই। প্রাণ উড়ে যায়। ডাইনী বড়ফট্টাই-এর মা-এর নজরে পড়লে তো আর রক্ষা নাই। নির্ঘাৎ সে বাছাকে বিষ খাইয়ে দেবে। এঘর-ওঘর ছুটাছুটি করে খুজতে থাকে সে। খালিদের বসার ঘরে গিয়ে ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়। খালিদের কোলে বসে সে খুব ভাব জমিয়েছে। যুঁইকে দেখে খালিদ জিজ্ঞেস করে, তোমার ছেলে?

—জী হাঁ।

—এর বাবা কে, চাকরবাকরদের কেউ?

যুঁই আহত হয়। বলে, আপনি তো জানেন, আবু সামাত আমাকে শাদী করেছিলো; তার সঙ্গে আমি কিছুকাল ঘর করেছিলাম। আপনি যখন আমাকে এখানে নিয়ে আসেন, আমি তখন কয়েক মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম—

খালিদ মাথা নাড়ে, ঠিক বটে, ঠিক। দেখতেও বেটা, একেবারে আবু সামাতের মতো হয়েছে।

যুঁই বলে, আজ থেকে আসলান আপনারই ছেলে। আপনি একে মানুষের মতো মানুষ করে তুলুন, এই আমার একমাত্র সাধ।

খালিদ-এর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠিক বলছো, মা, আমাকে দিয়ে দিলে? আমি ওকে লেখাপড়া শেখাবো, মস্ত বড় নামজাদা আমির বানাবো। আমি একে দত্তক নিলাম। শুধু তোমার কাছে আমার অনুরোধ, কারো কাছে এর আসল পরিচয় ফাঁস করে দিও না। লোকে জানবে, আসলান আমারই ঔরসের সন্তান।

যুঁই বলে, তাই হবে। ওর ভালোর জন্য আমি আপনার সব কথাতেই রাজি।

খালিদ যুঁই-এর ছেলেকে নিজের শাদী করা বিবির গর্ভজাত সন্তানের মতো করে লালন-পালন করতে থাকে। খুব যত্ন করে তার লেখা-পড়া শেখানোর ব্যবস্থা হয়। নানা ভাষা বিশারদ এক মহাপণ্ডিত মৌলভীকে মাইনে করে রাখা হলো। নামজাদা হস্তলিপি বিশারদ হিসাবেও তার দেশ জোড়া নাম ছিলো। যথা সময়ে, কোরান, কাব্য, অঙ্ক বিজ্ঞান দর্শনে এবং হস্তলিপিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে আসলান। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা, অস্ত্রবিদ্যা ঘোড়ায় চড়াতেও বেশ পটু হয়ে ওঠে। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার হিসাবে আসলানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খলিফা তাকে আমিরের উপাধিতে ভূষিত করেন।

একদিন নিয়তির বিধানে, ইহুদী ইব্রাহিমের সুঁড়িখানার সামনে আহমদ-এর সঙ্গে দেখা হয় আসলানের। আহমদের পীড়া-পীড়িতে আসলান দোকানে গিয়ে বসে। খুব মৌজ করে মদ্যপান চলতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আহমদ নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আসলান বলে, অনেক হয়েছে, আজ আর খেয়ে কাজ নাই। চলুন বাড়ি ফেরা যাক।

দু'জনে দোকানের বাইরে আসে। অন্ধকার রাত। আহমদ কামিজের জেব থেকে ছোট একটা সোনার চিরাগ বের করে। ঢাকনাটা খুলতেই হীরের আলোয় পথের অন্ধকার কেটে যায়। আসলানের অবাক লাগে। এমন আজব চিরাগ-বাতি সে কখনও দেখেনি। —দেখি দেখি, কেমন জিনিস! বাঃ চমৎকার তো। তেল না মোম না, অথচ জ্বলে? আমাকে দেবেন?

আহমদ বলে, তাই কি দেওয়া যায়। এতো আর সাধারণ চিজ নয়। এর পিছনে কত কাণ্ড-কারখানা ঘটে গেছে। একটা নিরীহ নিরপরাধ মানুষের জান খতম হয়ে গেছে এর জন্যে।

—কী রকম?

আসলান কিছুই বুঝতে পারে না? আহমদ তখন আবু সামাতের ফাঁসীর কাহিনী আদ্যোপান্ত খুলে বলে তাকে। আসলান বিষাদ বিষণ্ন মুখে বাড়ি ফিরে আসে। ভাবে, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য মানুষ এত নীচ হয়! মা-এর কাছে সব খুলে বলে আসলান।

ছেলের কথা শুনে যুঁই অস্ফুট আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো ঊনসত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

যখন জ্ঞান ফিরে আসে, যুঁই ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, বাবা, এতদিনে আল্লাহ বুঝি মুখ তুলে চাইছেন। পাপ কখনও চাপা থাকে না। যা সত্যি তা একদিন না একদিন ফুটে ওঠেই। এত দিনের চাপা রহস্যের কিনারা পাওয়া গেছে। আমি আর কোনও কথা গোপন রাখবো না। বাবা, আমির খালিদ তোমার জন্মদাতা পিতা নন। তিনি তোমাকে আমার কাছ থেকে দত্তক নিয়ে প্রতিপালন করেছেন মাত্র। তোমার বাবা আমার স্বামী আবু সামাত। সুলতানের প্রাসাদের চুরির মিথ্যা দায়ে তার ফাঁসী হয়। আর দেরি নয়, এক্ষুনি তুমি তোমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু বৃদ্ধ হাবিলদারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলো তাকে। এবং খোদার নামে কসম খেয়ে তার সামনে হলফ করে এসো, যেভাবেই হোক, তুমি তোমার বাবার হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেবে।

আসলানের মুখে সব শুনে বৃদ্ধ হাবিলদার উল্লাসে ফেটে পড়ে।—খোদা হাফেজ, তিনিই সব রহস্যের পর্দা ছিঁড়ে আলোর সন্ধান করে দিয়েছেন। তাঁর ওপরই ভরসা রাখ, তিনিই শয়তানের সমুচিত শাস্তি বিধান করবেন।

বৃদ্ধের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো। সেইদিন পোলো খেলার আসরে এই নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হলো। খলিফা তার দলবল নিয়ে পোলো খেলায় মেতেছেন।

সুলতানের দল এবং প্রধান কোতোয়ালের দলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। আসলান খেলছে সুলতানের দলে।

খেলা বেশ জমে উঠেছে। বিপক্ষজনের একজন খেলোয়াড় সপাটে বল ঘুরিয়ে মারলো হারুন-অল-রসিদের দিকে। আর একটু হলেই খলিফার একটা চোখ কানা হয়ে যেত। কিন্তু আসলান অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় বলটা রুখে দিতে পারলো। খলিফা বাহবা দিয়ে ওঠেন, সাবাস্! এরপর আসলান এমন জোরে একটা বল মারলো, সেই খেলোয়াড়টার পিঠের শিরদাঁড়ায় লেগে হাড়টা ভেঙ্গে গেলো।

খলিফা চিৎকার করে ওঠেন, বাঃ চমৎকার মার মেরেছ ত, খালিদের ছেলে!

এইখানেই সেদিনের খেলার ইতি হয়। সবাই খলিফার সামনে এগিয়ে এলো। খলিফা তখন আসলানের খেলার তারিফ করছেন।

—আমি খুব খুশি হয়েছি, তোমার খেলায়। কি ইনাম চাও, বলো।

আসলান বলে, আমার বাবার হত্যাকারীর শাস্তি চাই, জাঁহাপনা!

—তোমার বাবা? তোমার বাবাতো সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমির খালিদ।

—না হুজুর, উনি আমার বাবা নন। আমাকে দত্তক নিয়ে প্রতিপালন করেছেন। আমার বাবা আবু সামাত—যাকে আপনি মিথ্যা চুরির দায়ে ফাঁসী দিয়েছেন?

—সে কি! কী করে বুঝলে, সে চুরি করেনি?

—এখুনি আমি আসল চোর কে—প্রমাণ করে দিচ্ছি। ঐ যে আহমদ—ওর দেহ আপনি খানা-তল্লাসী করান। ওর কাছে আছে আপনার সেই আজব চিরাগ বাতি।

আসলানের এই কথায় খলিফা অবাক বিস্ময়ে আহমদের দিকে তাকান। আহমদ তখন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো। খলিফা গর্জে ওঠেন, লোকটাকে তল্লাসী কর।

সঙ্গে সঙ্গে আহমদকে তল্লাসী করে তার কামিজের জেব থেকে খলিফার সেই সোনার চিরাগ বাতি পাওয়া গেলো।

খলিফা হুঙ্কার ছাড়েন, এটা কোথায় পেলে?

—কিনেছি হুজুর।

—কিনেছো! এ জিনিস হাটে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়? মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি। এই—কে আছিস, চাবুক লাগা।

চাবুকের ঘায়ে জর্জরিত হয়ে যায় আহমদের সর্বাঙ্গ। দরদর করে রক্ত ঝরে পড়তে থাকে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে আহমদ। কিন্তু আসল কথা কবুল না করা পর্যন্ত চলতেই থাকে চাবুক।

অবশেষে সে স্বীকার করলো। হ্যাঁ, সে-ই বেগমের বসার ঘর থেকে খলিফার ব্যবহারের জিনিসগুলো চুরি করে সামাতের বাড়ির দেওয়ালে রত্নহার আর মোহরখানা পুরে রেখেছিলো। আজব চিরাগ বাতির লোভ সে সামলাতে পারেনি। ওটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলো। তারই হঠকারিতায় সামাতের ফাঁসী হয়ে গেছে।

খলিফা আসলানের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার তুমি তোমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিজের হাতেই নাও, আসলান। তুমি নিজে হাতে লোকটাকে ফাঁসী দাও।

আসলান এবং হাবিলদার মিলে আহমদকে উপস্থিত সকলের সামনে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দিলো।

খলিফা আসলানকে সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন, বলো, আর কী করলে তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে?

আসলান বলে, জাঁহাপনা, আপনি আমার বাবাকে ফিরিয়ে এনে দিন, শুধু এইটুকু হলেই আমি খুশি হবো।

—কিন্তু, খলিফা হারুন অল-রসিদ অসহায়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে বলেন, তাকে আমি কি করে ফেরৎ দেব, বাবা? তুমি তো শুনেছো, ভুল বিচার করে আমি তার ফাঁসী দিয়েছি!

আসলান বলে, যদি অভয় দেন তবে একটা কথা বলি।

—তুমি নির্ভয়ে বলো, বাবা।

—আমার বাবা আবু সামাত এখনও বেঁচে আছেন।

—আবু সামাত বেঁচে আছে? তা কি করে সম্ভব? আমি যে তাকে ফাঁসী দিয়েছি, আসলান। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেছে। সামাতের ফাঁসীর পরদিন আমি আর জাফর তার লাশ পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। লাশটা দেখে কিন্তু সেদিন আমি নিঃসন্দেহ হতে পারিনি—সামাতের দেহের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য সেই লাশে আমি খুঁজে পাই না। যাই হোক, এ বিষয়ে যদি কেউ কোন হদিশ দিতে পারে, আমার পিতৃ-পুরুষের নামে হলফ করে বলছি, তার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করবো।

খলিফার কথা শুনে বৃদ্ধ হাবিলদার এগিয়ে এসে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বলে, ধর্মাবতার আপনি আমাকে অভয় দিন, আমি সব বলবো।

খলিফা বললেন, তোমার কোন ভয় নাই, বলো।

—হুজুর, আবু সামাত জীবিত আছে। আপনার হুকুম সেদিন আমি তামিল করিনি, আমার গোস্তাকি মাফ করুন, জাঁহাপনা!

—তবে কাকে ফাঁসী দিয়েছিলে?

অন্য একজন ফাঁসীর আসামীকেই ফাঁসী দিয়েছিলাম, হুজুর।

—আর আবু সামাত?

—তাকে আমি রাতের অন্ধকারে বাগদাদ পার করে আলেকজান্দ্রিয়ার নৌকায় তুলে দিয়ে এসেছি। এখনও সে সেখানেই আছে। সেখানে সে একটা জাহাজী যন্ত্রপাতির দোকান করেছে।

হারুন অল-রসিদ আনন্দে, উল্লাসে ফেটে পড়লেন, খোদা মেহেরবান। এক্ষুণি আলেকজান্দ্রিয়াতে চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি পার তাকে এখানে নিয়ে এসো।

জাফরকে উদ্দেশ করে খলিফা আবার বললেন, হাবিলদারকে দশ হাজার মোহর সঙ্গে দিয়ে এখুনি আলেকজান্দ্রিয়া পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

আল্লাহর ইচ্ছায় আবার আমরা আবু সামাতের কাহিনী শুনবো।

নৌকায় চেপে আবু সামাত যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছয়, সেখানকার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তার দুচোখ জুড়িয়ে যায়। শহরের ভিতরে ঢুকে সে খবর পায়, সম্প্রতি এক দোকানের মালিক মারা গেছে। দেখাশুনার লোকের অভাবে দোকানটা বিক্রি হবে। দরদাম করে আবু সামাত দোকানটা কিনে নেয়। জাহাজী যন্ত্রপাতির দোকান। ভালো লাভের ব্যবসা। নানা রকম হাল, দঁড়ি, কাছি, বস্তা, বাক্স, প্যাটরা—প্রভৃতিতে দোকানটি ভরা। বিদেশের বাজারে এখানকার এইসব সওদার ভীষণ চাহিদা। দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের ব্যবসায় সে বেশ মোটা অঙ্ক লাভ করেছে। পুঁজি বেড়ে আজ দশগুণ হয়ে গেছে।

আবু সামাতের নিঃসঙ্গ জীবন আর ভালো লাগে না। সে ঠিক করে ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে সে এখান থেকে চলে যাবে। আস্তে আস্তে গুদামজাত জিনিসপত্র বেচে দিতে থাকে। খদ্দের পেলে সে গোটা দোকানই বেচে দেবে।

এইভাবে দোকানটা ক্রমে ক্রমে খালি হয়ে আসে। একদিন সে সামানপত্র ঝাড়াই

বাছাই করতে করতে তাকের এক পাশে একটা হারের সঙ্গে একটা রঙিন পাথরের তক্তি দেখতে পায়। পাথরটা নিশ্চয়ই কোনও দৈব গ্রহরত্ন হবে। এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে থাকে। কিন্তু কিছুই অনুমান করতে পারে না।

এমন সময় দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো জাহাজের এক কাপ্তেন। পাথরের তক্তিটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে। আবু সামাত জিজ্ঞেস করে, কি দেখছো, সাহেব?

কাপ্তেন বলে, ঐ পাথরটা বিক্রি করবে?

—কেন—করবো না! দোকানের যা দেখছো, সব বিক্রি করে দেব—মায় দোকানটা পর্যন্ত। তা কত দাম দেবে?

কাপ্তেন বলে, আশী হাজার দিনার নাও।

ইয়া আল্লাহ, আবু সামাত অবাক হয়ে ভাবে, এত দাম দিতে চায় কেন সে? নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি দাম হবে। হেসে বলে, ভালো রসিকতা করতে জান তো, সাহেব। আমি তোমাকে এক লক্ষ দিনার দিচ্ছি, এনে দাও তো এই রকম একখানা পাথর!

ঠিক আছে, কাপ্তেন বলে, আরও দশ হাজার বেশি দেব।

সামাত রাজি হয়ে যায়। কাপ্তেন বলে, কিন্তু অত টাকা তো আমার সঙ্গে নাই। তোমাকে কষ্ট করে আমার জাহাজে যেতে হবে একবার। পাথরটা সঙ্গে নাও, এক হাতে দাম দেব এক হাতে পাথরটা নেব।

আবু সামাত বলে, খুব ভালো কথা, চলো, তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

সামাতকে সঙ্গে নিয়ে কাপ্তেন জাহাজে এসে বলে, তুমি এখানে বসো, আমি আমার কামরা থেকে মোহরগুলো নিয়ে আসি।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে, সেই যে কাপ্তেন ভিতরে চলে গেলো আর ফিরে এলো না। হঠাৎ আবু সামাত কূলের দিকে তাকিয়ে দেখে, জাহাজটা তীর ছেড়ে মাঝ দরিয়ার দিকে চলেছে। আবু সামাতের আর বুঝতে বাকী রইলো না, সে ঠগের পাল্লায় পড়েছে। এখন আর নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ নাই। কাপ্তেনের কব্জায় সে এখন বন্দী। যেদিকে তাকায়, জল আর জল। কোনও দিকে কোনও জাহাজ বা নৌকার চিহ্ন নাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপ্তেনের আবির্ভাব হলো, কী আবু সামাত, কেমন মালুম হচ্ছে? তুমিই তো সেই আবু সামাত—তোমার বাবা কায়রোর নামজাদা সওদাগর। এক সময়ে তুমি বাগদাদের খলিফার খুব প্রিয়পাত্র কর্মচারী ছিলে না? তোমাকে এখন জেনেভায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর দেখো, তোমার নসীবে কী লেখা আছে।

আবু সামাত মুখ বুজে বসে থাকে। কাপ্তেন অদ্ভুত এক হাসি হেসে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জাহাজটা জেনেভা বন্দরে এসে নোঙর করে। দু'জন প্রহরী সঙ্গে নিয়ে এক বৃদ্ধা এসে উঠলো জাহাজে। বৃদ্ধার ইশারায় আবু সামাত তাকে অনুসরণ করে এক মঠ সন্নিহিত গীর্জায় এসে পৌঁছয়। এবার বৃদ্ধা মুখ খোলে, এখন থেকে তুমি এই গীর্জায় আর মঠে নফরের কাজ করবে। কি কি কাজ তোমাকে করতে হবে, ভালো করে মন দিয়ে শোনো ঃ খুব সকলে ঘুম থেকে উঠবে। কুঠার নিয়ে জঙ্গলে যাবে—কাঠ কেটে আনবে। কাঠ কেটে ফিরে এসে এই গীর্জা আর মঠের চত্বর বারান্দা খুব ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে সাফ করবে। সতরঞ্চ, মাদুরগুলো সব ঝাড়বে। দুটো বাড়িই ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করবে। গম পিষে ময়দা করে রুটি বানাবে। চাকীতে ডাল ভেঙ্গে রাঁধবে। এইভাবে তিনশো সত্তরজন পাদরীর খাবার তৈরি করবে। প্রত্যেক পাদরীর ঘরে ঘরে সেই খাবার যথাসময়ে পৌঁছে দিতে হবে। প্রতিদিন। এর কোনওরকম ব্যতিক্রম হলে তার পরিণাম খুব খারাপ হবে। তাদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলেই সেই তিনশো সত্তরখানা থালা

ঝকঝকে করে মেঝে ধুয়ে রান্না ঘরে সাজিয়ে রাখবে। এর পর তোমার কাজ, বাগানে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া। চারটে ফোয়ারার চৌবাচ্চার জল পালটানো। তারপর দেওয়ালের ধারে ধারে যে-সব জলের পিঁপেগুলো বসানো আছে, ওগুলো ভরতে হবে। এসব তোমাকে দুপুরের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তারপর বিকেলের কাজ শোনো ঃ বিকালে তুমি গীর্জার বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে। পথচারীদের প্রার্থনা শুনতে আসার জন্যে জোর জবরদস্তি করবে। তাতেও যদি তারা আসতে নারাজ হয়, তবে এখানে একটা পেল্লায় ভারি গদা আছে। সেই গদা দিয়ে তাদের পেটাবে। কারণ, আমরা চাই না, এই খ্রীস্টান শহরে কোনও বিধর্মী বাস করুক। এ শহরে যারা থাকবে, পাদরীদের আশীর্বাদ নিয়েই তাদের থাকতে হবে। সব শুনলে, আর এক মুহূর্ত দেরি না করে কাজে লেগে যাও। যা বললাম, ঠিক ঠিক মনে থাকে যেন।

আড়চোখে পিটপিট করে তাকাতে তাকাতে বৃদ্ধা চলে গেলো। আবু সামাত ভাবতে থাকে, হায় আল্লাহ, এ কি বেঘোরে পড়লাম। কি করে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।

গীর্জার ভিতরে ঢুকে একটা কাঠের তক্তপোষের উপর বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে। সে। ঘন্টাখানেক বাদে এক নারী কণ্ঠের আওয়াজে চমকে ওঠে। থামের আড়াল থেকে এক মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত ভেসে আসছে। এমন সুরেলা কণ্ঠ সে শোনেনি কখনও। নিমেষের মধ্যে তার হৃদয়ের সকল সন্তাপ মুছে যায়।

আবু সামাত উঠে দাঁড়ালো। মেয়েটিকে দেখতে হবে। একটু এগোতেই সে দেখতে পেলো, বোরখা ঢাকা একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় সে বললো, আবু সামাত; আমি তোমার দেখা পেলাম। এবার তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

আবু সামাত অবাক বিস্ময়ে বলে, আল্লাহ, তুমিই একমাত্র সত্য, তুমি ছাড়া আর কিছু জানি না। একি! আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি? আমি কি আমার আলেকজান্দ্রিয়ার সেই দোকানে শুয়ে ঘুমাচ্ছি?

মেয়েটি বলে, না না, তা কেন হবে? তুমি তো জেগেই আমার সঙ্গে কথা বলছো। আর এ শহরটার নাম জেনেভা। জাহাজের কাপ্তেনকে দিয়ে কৌশল করে আমিই এখানে আনিয়েছি তোমাকে। আমার বাবা এখানকার সম্রাট। আমার নাম রাজকুমারী হুসন মরিয়াম। ছোটবেলায় আমি যাদু বিদ্যা শিখেছিলাম। মন্ত্রবলে আমি তোমার অপূর্ব রূপ আর যৌবন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেই থেকে তোমায় ভালোবেসেছি। আমার সাধ ছিলো তোমাকে স্বচক্ষে দেখবো। এই দ্যাখো, আমার গলায় সেই দৈব পাথরখানা। আমার হুকুমেই ঐ জাহাজের কাপ্তেন তোমার দোকানে এই হারটা লুকিয়ে রেখে এসেছিলো। কি যে এর দৈব ক্ষমতা, হাতে হাতে তা বুঝেছ! যাই হোক, এতকালের সাধনার পর তোমাকে যখন কাছে পেলাম, এবার তুমি আমাকে বিয়ে কর। তারপর আমি তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করবো—যা চাও।

—রাজকুমারী, তুমি কি আমাকে কথা দিতে পার—আমি আবার আলেকজান্দ্রিয়া ফিরে যাবার অনুমতি পাবো?

—কেন পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে।

তক্ষুণি পাদরীকে ডাকা হলো। আবু সামাত আর মরিয়ামের বিয়ে দিয়ে দিলো সে।

মরিয়াম বললো, বিয়ে তো হয়ে গেলো, এবার তুমি কি আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে যেতে চাও?

—খোদা হাফেজ, হ্যাঁ, এখনই আমি চলে যেতে চাই।

তখন মরিয়াম তার গলার সেই দৈব পাথরখানা সূর্যের দিকে তুলে ধরে। হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ায়, 'সুলেমানের নাম স্মরণ করে

বলছি, শোনো রক্তমুখী মণি, আমি তোমাকে হুকুম করছি, এই মুহূর্তে আমার জন্যে একখানা উড়ন্ত শয্যা নিয়ে হাজির হও।'

মুখের কথা শেষ হতে না হতে তাদের সামনে একখানা উড়ন্ত-শয্যা নেমে এলো। মোটা গদি আঁটা চারদিক ঘেরা। দু'জনে উঠে বসলো। এবার মরিয়াম পাথরখানাকে ঘুরিয়ে আবার ঘষতে ঘষতে আওড়াতে থাকলো, রক্তমুখী মণি, এবার তুমি আমাদের নিয়ে সোজা আলেকজান্দ্রিয়া উড়ে চলো।

তৎক্ষণাৎ উড়ন্ত-শয্যা তরতর করে শূন্যে উঠে যেতে থাকলো। উঠতে উঠতে মেঘের ওপরে গিয়ে তীর বেগে চললো। কয়েকটি মুহূর্তমাত্র, তারপর আবার সে শোঁ শোঁ করে নিচে নেমে এলো। আবু সামাত তাজ্জব হয়ে দেখে, আলেকজান্দ্রিয়াতে পৌঁছে গেছে তারা।

শয্যা ছেড়ে মাটিতে পা রাখলো দু'জনে। আবু সামাত দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাগদাদের সেই বৃদ্ধ হাবিলদার। সামাত কি স্বপ্ন দেখছে। বিস্ময়ে রুদ্ধবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক মুহূর্ত। তারপর হাবিলদারকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। হাবিলদার সামাতকে সান্ত্বনা দেয়, দুঃখের দিন শেষ হয়েছে বাবা। আসল চোর ধরা পড়েছে।

সামাতকে সব খুলে বললো সে।

—খলিফা তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাগদাদে নিয়ে যেতে বলেছে।

আবু সামাত বলে, আগে আমাকে কাইরো যেতে দিন, কতকাল মা বাবাকে দেখিনি। তাদের সঙ্গে নিয়ে খলিফার সঙ্গে দেখা করবো আমি।

হাবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে ওরা তিনজন উড়ন্ত শয্যায় উঠে বসে। চোখের পলকে উড়ে চলে যায় কাইরোয়—সওদাগর সামস্ অল-দিনের বাড়ির দরজায়। কড়া নাড়তেই সওদাগর বিবি দরজা খুলে দাঁড়ায়, কে?

আবু সামাত আকুল হয়ে ছুটে যায়, আমি, মা, আমি তোমার ছেলে আবু সামাত।

বৃদ্ধ মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। সামস্ অল-দিনও ছুটে বেরিয়ে আসে। এতকাল পরে ছেলেকে পেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে সে।

কাইরোতে তারা তিনদিন বিশ্রাম নিলো। তারপর সামাত মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচজনে উঠে বসলো উড়ন্ত শয্যায়। এবার সোজা চলে এলো বাগদাদে। সামাতকে পেয়ে খলিফা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। যেন মনে হলো, বহুকাল বিদেশে কাটানোর পর নিজেরই সন্তান ঘরে ফিরেছে। তিনি সামস্ অল দিন, আবু সামাত ও আসলানকে হুকুমতের উচ্চ পদে বহাল করলেন।

আবু সামাত ভেবে দেখলো, তার এই ভাগ্য বিবর্তনের একমাত্র নায়ক মাহমুদ। অনেক অনুসন্ধানের পর তার খোঁজ পাওয়া গেলো। প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলো সামাত। এবং প্রধান কোতোয়ালের পদে বহাল করলো তাকে।

এর পর আবু সামাত তার পুত্র আসলান, তিন বিবি জুবেদা, যুঁই ও মরিয়ামকে নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়েছিলো।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ চুপ করে বসে রইলো। এতক্ষণ সুলতান শাহরিয়ার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলো। এবার সে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, সত্যিই শাহরাজাদ তোমার এই আবু সামাতের কিস্সার তুলনা হয় না। দু মুখো মাহমুদ আর সামসামকে ভোলা যায় না।

শাহরাজাদ স্মিত হাসে। দুনিয়াজাদ বলে, দিদি, এবার কোন কাহিনী শোনাবে?

—শুনুন মহানুভব জাঁহাপনা, এবার আপনাকে সভাকবি আবু নসাব-এর দু-একটা মজার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবো। বড় উপাদেয়, মনোহারী।

দুনিয়াজাদ আব্দার ধরে, তা হলে শুরু কর, দিদি।

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা শুনতে চেয়েছেন, শোনাতে আমি বাধ্য, বোন। কিন্তু আজ তো আর হবে না, রাত শেষ হয়ে আসছে। এখন ঘুমাও, কাল রাতে শুরু করা যাবে।

দুশো সত্তরতম রজনীতে নতুন কাহিনী ঃ

শুরু করার আগে শাহরাজাদ সুলতান শারিয়ারের সঙ্গে সুরতরঙ্গ শেষ করে নেয়। দুনিয়াজাদ এতক্ষণ নিচে গালিচার উপরে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাপ মেরে শুয়েছিলো। এবার সে পালঙ্কে দিদির পাশে এসে বসলো। শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ একদিকে আবু নসাব খলিফা হারুন অল বসিদের সভাকবি হিসাবে খ্যাতিমান ছিলো; আর এক দিকে আবার তার মতো কুখ্যাত অসচ্চরিত্রের মানুষ দুটি ছিলো না।

দুনিয়াজাদ দিদিকে জড়িয়ে ধরে, কেন দিদি, কী সে করেছিলো?

সুলতান শারিয়ারও বলে, কিস্‌সা শুরু করার আগেই দারুণ জমিয়ে দিলে, দেখছি। আবু নসাবের দু-একটা কীর্তির কিস্‌সা তা হলে শুনতেই হয়। মনে হচ্ছে, খুব মজাদার হবে। কিন্তু আজ রাতে আমার মনটা বড় উদাস হয়ে আছে, শাহরাজাদ। আজ কিছু জ্ঞানের কথা, কিছু উপদেশর বাণী শুনতে পেলে দিল্‌টা হালকা কবতে পারতাম।

শাহরাজাদ বলে, আমিও হঠাৎ, আজ সারাটা দিন, এই ধরনের কথাই ভাবছিলাম জাঁহাপনা।

শাহরিয়ার বলে, তা হলে আর কাল বিলম্ব করে লাভ কী? শুরু কর।

শাহরাজাদ এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। তারপরে সে বলতে থাকে ঃ

এক সময়ে বাগদাদ শহরে এক ধনী সওদাগর ছিলো—বিষয় আশয় ধনদৌলত—কোনও কিছুরই অভাব ছিলো না তার। কিন্তু এত সত্ত্বেও তার মনে কোনও সুখ ছিলো না। তার সেই বিশাল বিত্ত বৈভব কে ভোগ করবে? তার কোন সন্তানাদি ছিলো না। ভেবে ভেবে অকালে তার মাথার চুল সাদা হয়ে গেলো। দেহে জরা-বার্ধক্য দেখা দিলো। পুত্রার্থে অনেক ভার্যা সে কিনেছিলো কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

কারণে অকারণে সে অনেক দানধ্যান করতো। অনেক পীর পয়গম্বরের আস্তানায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতো। উপবাস থেকে দেহমন শুদ্ধ রাখতো। প্রহরে প্রহরে নামাজ পড়তো। এবং সর্বকনিষ্ঠা সুন্দরী বিবির সঙ্গে সহবাস করতো।

অবশেষে আল্লাহ মুখে তুলে চাইলেন। ছোট বিবি গর্ভবতী হলো। ন'মাস পরে সে একটি চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর ছেলে প্রসব করলো। খোদাতালার এই অপার করুণায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে ভিক্ষুক, অনাথ, বিধবাদের সাতদিন ধরে পেট পুরে খাওয়ালো।

ছেলের নাম রাখা হলো আবু অল-হুসন। ধাই ও বহু সুন্দরী বাঁদীদের পরিচর্যায় শিশু বড় হতে থাকে। সময়কালে তার লেখা পড়ার ব্যবস্থা করলো সওদাগর। কোরান, কাব্য, অঙ্ক, হস্তলিপিতে সে পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকে। খেলাধূলা এবং অস্ত্রবিদ্যাতেও বেশ পটু হতে লাগলো—সব চেয়ে তার ঝোঁক ছিলো ধনুর্বিদ্যায়। অব্যর্থ লক্ষ্য তার। নিশানার এক চুল এদিক ওদিক যায় না তার তীর।

শুধু লেখাপড়া বা খেলাধুলাতেই সে অন্য ছেলেদের চেয়ে সেরা হয়ে উঠেছিলো তাই না, তার মতো চোখ ঝলসানো যাদুকরের মতো রূপই বা আর কার ছিলো? একবার দেখলে সহসা চোখ ফেরানো যায় না।

আবু হুসন তার বাবার চোখের মণি, আঁধার ঘরের আলো। ছেলের দিকে বুক ভরা আনন্দ নিয়ে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ। আর ভাবে, তার তো যাবার সময় হয়ে এসেছে—এবার সব

ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। ছেলেকে কাছে ডেকে সে বলে, বাবা শোনো, তাঁর ডাক পড়েছে, আমাকে যেতে হবে। কোনও কাজই আমি অসমাপ্ত রেখে যাচ্ছি না। তোমার জন্য প্রচুর ধন-দৌলত রইলো—সাত পুরুষ বসে খেলেও ফুরাবে না। যা রেখে গেলাম, ভালো করে ভোগ করবে। কিন্তু অমিতব্যয়ী হয়ো না। তাই বলে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে সম্পত্তি সঞ্চয় করো না। যতটুকু প্রয়োজন, ব্যয় করতে দ্বিধা করো না। সব সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। মনে রাখবে, তার করুণাতেই বেঁচে আছো।

সওদাগর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। যথাবিহিত মর্যাদা সহকারে তার শেষ কৃত্য সমাধা করলো আবু অল-হুসন।

শোকের দিনগুলো শেষ হয়ে গেলো। বন্ধু-বান্ধবরা হুসনকে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসল করিয়ে নতুন সাজপোশাকে সাজালো।

"সব শিশুই একদিন বৃদ্ধ হয়। তার মৃত্যুই তার অস্তিত্বের ইতি নয়। সব শিশুর অন্তরেই পিতা ঘুমিয়ে থাকে। মুছে ফেলো অশ্রু। তোমার এই অফুরন্ত যৌবন আর অতুল বৈভব-এর সদ্ব্যবহার কর।"

বন্ধুদের সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে শোকের পালা শেষ হয়। দিন যায়। সঙ্গী সাথীর সাহযর্যে দেহ-প্রাণ-মন চপল চঞ্চল হয়ে ওঠে। সুতরাং আবু অল-হুসন একটু একটু করে বাবার উপদেশ বাণী ভুলে যেতে থাকে। বিলাসিতার বাহুল্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। 'ম' কারান্ত সবগুলো উপসর্গই প্রধান হয়ে ওঠে তার জীবনে। বাড়িতে নাচগানের আসর বসে নিত্য। নামকরা বাইজীরা আসে। দামী দামী মদ মাংসে মহোৎসব চলে। এইভাবে বসে বসে উড়ালে সুলতানের ভাণ্ডার শূন্য হতে কতদিন লাগে! হঠাৎ একদিন সে দেখলো, তার বিপুল বিত্ত বৈভবের আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই। থাকার মধ্যে আছে শুধু একটি কেনা বাঁদী।

এই হচ্ছে নসীবের নিয়তি। একটিমাত্র সুন্দরী বাঁদী ছাড়া সব তিনি কেড়ে নিলেন। এই বাঁদী তখনকার দিনের সেরা সুন্দরীদের সেরা ছিলো। তার অসাধারণ রূপগুণের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো তামাম দুনিয়ায়। নাম হাফিজা। তন্বী শ্যামা শিখর দশনা। হরিণীর মতো কাজল কালো টানা টানা চোখ, টিকালো নাক, গুলাবের পাঁপড়ীর মতো গাল আর পাকা আঙুরের মতো অধর পুরুষের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এখন আবু অল-হুসনের এই সুন্দরী হাফিজাই একমাত্র এবং শেষ সম্পত্তি। আর সবই সে খুইয়ে ফেলেছে। চিন্তায় ভাবনায় তার মুখে খানা রোচে না, চোখে ঘুম আসে না।

হাফিজা দেখলো, এইভাবে অনাহারে অনিদ্রায় কাটাতে থাকলে হুসন বাঁচবে না। যেভাবেই হোক, তার মনের কষ্ট লাঘব করতে হবে। মুখে হাসি ফোটাতে হবে।

ঘরে যে-টুকু গহনা-পত্র অবশিষ্ট ছিলো, তাই পরে নিলো হাফিজা। দামী সাজ-পোশাকে সেজেগুজে হুসন-র কাছে এসে বললো, আমাকে দিয়ে তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। আমার কথা শোনো, খলিফা হারুন অল-রসিদের কাছে নিয়ে চলো আমাকে। বলবে, মাত্র দশ হাজার দিনার-এর বিনিময়ে তুমি আমাকে বেচে দিতে চাও। যদি তিনি বলেন, দাম বড় বেশি হচ্ছে, তুমি বলবে 'ধর্মাবতার, এ বাঁদীর বাজার দাম আরও অনেক বেশি, বাঁদী বাজারে নীলামে তুললে কোন্ দেশের কোন্ বাদশা সওদাগরের ঘরে চলে যাবে সে—কিছুই জানতে পারবো না। কিন্তু আপনার কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হবো, সে কোনও দুঃখ কষ্ট পাবে না। আর তাছাড়া, রূপের

জেল্লায় সবাই হয়তো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিন্তু তার গুণের কদর আপনি ছাড়া আর কেউ-ই করতে পারবে না। যদি প্রমাণ চান, এখুনি কেমন সে গুণবতী পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন।' তবে একটা কথা, খলিফা যদি দর কষাকষি করে, তুমি কিছুতেই রাজি হবে না।

আবু অল হুসন ভাবতে পারে না। হাফিজার মতো সর্ব গুণান্বিতা সেরা সুন্দরীকে হাত ছাড়া করার কথা কি করে সে ভাববে? সে তো শুধু পয়সা দিয়ে কেনা বাঁদীই নয়, সে যে তার দিল কা কলিজা! কিন্তু পেয়ারের চেয়ে প্রয়োজন অনেক বড়। তাই হাফিজার এই প্রস্তাব একেবারে নস্যাৎ করে দিতে পারে না। বলে, ঠিক আছে চলো।

যথারীতি কুর্নিশ জানিয়ে হুসন খলিফার কাছে হাফিজার শেখানো বুলিগুলো আওড়ে যায়। খলিফা জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী, সুন্দরী?

—হাফিজা।

খলিফা বললেন, হাফিজা, তোমার তো অনেক গুণকীর্তন শুনলাম। তা কী কী বিষয়ে তোমার পাণ্ডিত্য—একটু-আধটু নমুনা দেবে?

—কেন নয়, জাঁহাপনা? একশোবার দেব। বলুন, আপনি কী জানতে চান? আমি কাব্য, ব্যাকরণ, সমাজবিজ্ঞান, সামরিক বিজ্ঞান, সঙ্গীত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, অঙ্ক, আইন এবং কলাবিদ্যা আহরণ করেছি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের শাশ্বত সত্য আমি উপলব্ধি করেছি। তার প্রতিটি স্তবক, প্রতিটি ছত্র আমার মুখস্থ। আমি জানি কোরানের কোন্ অংশটুকু মক্কায় লেখা আর কোন্টুক মদিনায় বলেছিলেন। আমি মুসলমান ধর্মের সব ফরমানই জানি।

আমি কালোয়াতী গাইতে পারি। নাচতেও জানি। বীণা সেতার স্বরোজ পাখোয়াজ বাজাতে পারি।

হারুন অল রসিদ মেয়েটির অসাধারণ বাকপটুতায় মুগ্ধ হয়ে আবু অল হুসনকে বললেন, আমি আমার দেশের সমস্ত গুণীজ্ঞানীদের ডেকে পাঠাচ্ছি। তারাই পরীক্ষা করে দেখবে তোমার এই বাঁদীর বিদ্যাবুদ্ধি। তাদের বিচারে এ যদি উৎরে যায়, তাহলে মাত্র দশ হাজারই নয় অনেক অনেক বেশি ইনাম তুমি পাবে। আর যদি সে না পারে, তবে তোমার জিনিস তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, আমার কোনও কাজে লাগবে না।

খলিফা তখনকার সবচেয়ে সেরা পণ্ডিত ইবরাহিম ইবন শিয়ারকে ডেকে পাঠালেন। বলতে গেলে, তিনি বিদ্যার সাগর। এছাড়া দেশের সেরা কবিদেরও ডাকা হলো। ডাকা হলো ব্যাকরণবিদ, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, আইনবিদ এবং আরও বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের।

প্রাসাদের বিরাট সভাকক্ষে সকলে এসে সমবেত হলো। কেউই জানে না, কী কারণে খলিফা তাদের তলব করেছেন। সভাকক্ষের ঠিক মাঝখানে খলিফার স্বর্ণাসন। তার চারপাশ ঘিরে বৃত্তাকারে বসলো সকলে। হাফিজা নগণ্য এক নারী—বোরখা ঢাকা দিয়ে সভাকক্ষের এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলো।

হঠাৎ কলগুঞ্জন থেমে গিয়ে নিরালা নির্জন অন্ধকারের নিঃশব্দ নিস্তব্ধতা নেমে এলো সেই বিশাল সভাকক্ষে। হাফিজা এগিয়ে এসে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিস জানালো, খলিফাকে।

—ধর্মাবতার বাঁদী হাজির, হুকুম করুন, আমি তামিল করার জন্য প্রস্তুত। এখানে উপস্থিত সকলেই প্রাজ্ঞব্যক্তি, আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনও বিষয়ে যে কোনও প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন, আমি সাধ্য মতো জবাব দেবার কোসিস করবো।

হারুন অল রসিদ চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, এখানে আপনারা সবাই গুণীজন হাজির আছেন। যার যা ইচ্ছা, এই মেয়েকে প্রশ্ন করতে পারেন। আজ তার বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা হবে।

সকলে মাটিতে মাথা নুইয়ে সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো।

হাফিজা উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত পণ্ডিতদের সামনে বলতে থাকে, আপনাদের মধ্যে কোরান বিশেষজ্ঞ কি কেউ আছেন? মেহেরবানী করে সাড়া দিন।

সকলের চোখ একজনের দিকে ঘুর গেলো। এক হেকিম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি—আমি সেই লোক।

হাফিজা স্মিত হেসে বললো, তাহলে আপনিই আমাকে প্রথমে প্রশ্ন করুন, মালিক।

সুতরাং কোরান বিশারদ সেই হেকিম তখন প্রশ্ন করেন, শোনো মেয়ে, তুমি তো কোরানের সব পাঠই শেষ করেছ। আচ্ছা বলো দেখি, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত? কতগুলি শব্দ কতগুলি অক্ষর এবং কতগুলি আদেশ আছে কোরানে? আচ্ছা আগে বলো, কে তোমার মালিক কে তোমার পয়গম্বর, কে তোমার ইমাম? বলো, কোন্‌টা তোমার নির্দিষ্ট দিক। এবং তোমার জীবনের নীতি কী? কী তোমার নির্দেশিত পথ? এবং কারা তোমার ভ্রাতা?

সে বললো, আল্লাহ আমার মালিক। মহম্মদ আমার পয়গম্বর। কোরানই আমার কানুন। সুতরাং তিনিই আমার ইমাম। মক্কাতে অবস্থিত আবরাহামের নির্মিত আল্লাহর কাবাহ্ আমার দিক। আমার পয়গম্বরের নির্দেশই আমার জীবনের নীতি। সুন্নী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যই আমার পথনির্দেশ। আর আমার ধর্মে বিশ্বাসী যারা সকলেই আমার ভাই।

হাফিজার জবাবে খলিফা মুগ্ধ হলেন। এবার সেই হেকিম আবার প্রশ্ন রাখলেন, আচ্ছা বলো, কী করে বুঝতে পার আল্লাহ আছেন?

—যুক্তি দিয়েই বুঝতে পারি।

—কী সেই যুক্তি?

—যুক্তি দুই প্রকারের। প্রথম যুক্তি পাই অন্তর থেকে। দ্বিতীয় যুক্তি অর্জন করতে হয়। প্রথম যুক্তি যা অন্তর থেকে পাই তা আল্লাহ নিজেই তার অনুগতদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেন। আর অর্জিত যুক্তি শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা লাভ করতে হয়।

—চমৎকার। কিন্তু এবার বলো, এই যুক্তির অবস্থান কোথায়?

—হৃদয়ে। অবশ্য উৎসাহ আসে মস্তিষ্ক থেকে।

—আমাদের ধর্মের অবশ্য করণীয় কর্তব্য কি কি?

—অবশ্য করণীয় কর্তব্য পাঁচটি। ধর্ম বিশ্বাস—আল্লা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নাই, এবং মহম্মদ আল্লাহর পয়গম্বর। প্রার্থনা। দান। রোজা—রমজান মাসব্যাপী উপবাস। যখন সম্ভব মক্কায় তীর্থ যাত্রা।

—ধর্মের প্রতি প্রশংসণীয় আচরণ কি কি?

—ছয় প্রকার। প্রার্থনা-নামাজ। দান। উপবাস। তীর্থযাত্রা। রিপু দমন, নিষিদ্ধ দ্রব্যবর্জন এবং ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা।

—নামাজের উদ্দেশ্য কি?

—আল্লাহর পায়ে আমার ধর্মের অর্ঘ নিবেদন করা, তার মহিমার গুণকীর্তন করা। এবং আমার আত্মার শান্তি বিধান করা।

—বাঃ বা, চমৎকার—চমৎকার। নামাজের জন্য অপরিহার্য প্রস্তুতির প্রয়োজন নাই?

—নিশ্চয়ই আছে। রুজু দ্বারা সমস্ত দেহ পবিত্র করা দরকার। পরিষ্কার শুদ্ধ বস্তু পরিধান বিধেয়। নামাজের জন্য পরিষ্কার স্থান নির্বাচন করা দরকার। পবিত্র এবং একাগ্র হওয়ার জন্য নাভি থেকে উরুপ্রদেশ পর্যন্ত সুরক্ষা করা প্রয়োজন। পবিত্র কাবার দিকে—অর্থাৎ মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে।

—নামাজের আবশ্যকতা কী?

—ধর্ম বিশ্বাসের ভিত সুরক্ষিত করে।

—নামাজে কি লাভ হয়?

—নিখাদ নামাজে পার্থিব কোন লাভ নাই। মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে এক অপার্থিব যোগসূত্র রচনা করে। এর দ্বারা দশটি অলৌকিক ফললাভ হয় ঃ হৃদয় উদ্ভাসিত করে। মুখমণ্ডলে প্রশান্তি আনে। সহানুভূতি জাগ্রত করে। শয়তানকে তাড়িত করে। হৃদয় দয়ার্দ্র হয়। অশুভ অন্তর্হিত হয়। অসুস্থতা প্রতিরোধ করে। শত্রু থেকে রক্ষা করে। টলায় মান চেতনাকে দুর্গ-সুরক্ষিত করে। এবং আত্মা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়।

—নামাজের চাবি-কাঠি কী?

—যথাযথ রুজুই নামাজের প্রকৃষ্ট উপায়। এবং রুজু করার আগে মন করুণাঘন ও সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলা দরকার।

—রুজুর বর্ণিত ব্যবহার কিরূপ?

—গোঁড়া ইমাম মহম্মদ ইবন ইদ্রিস অল সফির নির্দেশ ছয় প্রকারের ঃ সৃষ্টিকর্তার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য একনিষ্ঠ ইচ্ছা দরকার—এতে আত্মা পবিত্র হয়। প্রথমে মুখমণ্ডল প্রক্ষালন, হাত থেকে কনুই অবধি ধোয়া, মাথার একাংশ ঘর্ষণ করা, পায়ের নখ থেকে গোড়ালী পর্যন্ত ধোয়া, এবং সব কাজই গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে করা।

যখন রুজু শেষ হয়ে যাবে তখন এই সূত্রটি আওড়াতে হবে ঃ আল্লাহ, আমাকে শুদ্ধ, অনুতপ্ত এবং বিশ্বস্ত বলে গ্রহণ কর। আমি জানি আর কেউ নাই, তুমিই একমাত্র আল্লাহ। তুমি আমার আশ্রয়, আমার গুনাহর জন্য তোমার কাছে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। আমেন। এই সূত্রটি আমাদের পয়গম্বর আওড়াতে সুপারিশ করেছেন। বলেছেন, এই প্রার্থনা যে করে তার জন্য আমি বেহেস্তের আটটি দরজা উন্মুক্ত করে রাখি। তার খুশি মতো যে কোনও ফটক দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারে।

—যথার্থ প্রশংসা পাওয়ার মতো জবাবই বটে। কিন্তু এ কথা কি বলতে পার, যখন একজন মানুষ রুজু করে তখন শয়তান অথবা জীনরা কি করে?

—মানুষ যখন রুজু করতে থাকে তখন জীনরা ডান পাশে এসে দাঁড়ায়। আর শয়তানরা দাঁড়ায় বাঁ পাশে। কিন্তু যখনই আল্লাহর নামে নামাজ প্রস্তুতি উচ্চারিত হতে থাকে শয়তান সটকে পড়ে, কিন্তু জীন আরও কাছে সরে আসে। চারদিকে থেকে চারটি আলোর মণ্ডপ মাথার উপরে তুল ধরে। আল্লাহর জয়গান করে এবং মানুষের পাপের ক্ষমার জন্য মধ্যস্থতা করে। যদি সে আল্লাহ নাম উচ্চারণ করতে ভুলে যায় অথবা রুজু করার সময় বাদ পড়ে যায়। শয়তান ফিরে এসে তার উপর চড়াও হয় প্রাণপণে আত্মাকে নিপীড়িত করতে থাকে। সন্দেহর ইঙ্গিত করে। চেতনা প্রশমিত করার আগ্রহ দেখায়।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

দুশো তিয়াত্তরতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

হাফিজা বলতে থাকে, রুজুর সময় প্রত্যেকের উচিত সারা দেহ পানিতে প্রক্ষালন করা। দৃশ্য অথবা অদৃশ্য সমস্ত চুল জলে ভেজানো দরকার। এবং তার যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও। সারা শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালোভাবে ঘষামাজা করা দরকার। এই সব শেষ না হওয়া পর্যন্ত পা ধোয়া উচিত নয়।

—খুব চমৎকার জবাব। আচ্ছা বলতে পার, তায়ামাম প্রথায় কীভাবে রুজু করা হয়?

—তায়ামাম শুদ্ধি বাণী দিয়ে করা হয়। সাতটি উপলক্ষ্যে পয়গম্বর এই বাণী দিয়ে রুজুর বিধান দিয়েছেন। সাতটি উপলক্ষ্য এইরূপ ঃ পানির অভাব, পানি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, পানীয় পানির প্রয়োজনে, পানি বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, পানি ব্যবহারে মারাত্মক ব্যাধির আশঙ্কায়, হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার পরে এবং এমন ক্ষত যা স্পর্শ করা নিষেধ। আরও চারটি প্রয়োজনীয় শর্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে। একান্ত বিশ্বস্ত হওয়া দরকার। বালি অথবা ধুলো হাতে নিয়ে গায়ে মুখে না মেখে মাথায় অনুরূপ নকল ভঙ্গী করতে হবে। দুটি রীতি সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এইভাবে রুজু করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করবে এবং শরীরের বাঁ পাশের আগে ডান পাশের রুজু শেষ করতে হবে।

—অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আচ্ছা এবারে রোজা সম্বন্ধে বলো।

—রমজান মাসে সূর্যাস্তের আগে আহার, পান, ও মৈথুন থেকে বিরত থাকতে হয়। নতুন চাঁদ যতদিন না দেখা যাবে ততদিন ধরে এই উপবাস পালন করা বিধেয়। আরও ভালো হয় যদি এই রোজার সময় কোরান ছাড়া অন্য কিছু পাঠ এবং অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা যায়।

—আপাত দৃষ্টিতে কতকগুলো ব্যাপারে মনে হতে পারে রোজা কলুষিত হয়, কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে না তা হয় না—সেগুলো কী?

—চুলে মাখার সুগন্ধী তেল, মলম, কাজল সুর্মা ব্যবহার; রাস্তার নোংরা ধুলোবালি লাগা, থুথু গিয়ে ফেলা, দিনে অথবা রাত্রে বীর্যপাত; অমুসলমান নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, রক্তপাত, সহবাস—এর কোনটার দ্বারাই রোজা দূষিত হয় না।

—আত্মিক পলায়ন কাকে বলে?

—শুধুমাত্র উদবাসন, নারী সংসর্গ পরিহার এবং মৌন থাকার জন্য দীর্ঘকাল মসজিদে অবস্থানকে সুন্নীরা আত্মিক পলায়ন বলে। কিন্তু এটা ধর্মসম্মত নয়।

—আচ্ছা এবার তীর্থযাত্রা বিষয়ে বলো।

—প্রত্যেক মুসলমানের জীবদ্দশায় অন্তত একবার মক্কায় তীর্থ করতে যাওয়া কর্তব্য। এ ব্যাপারে কতকগুলো শর্ত মেনে চলা কর্তব্য ঃ দরবেশের পোশাক ধারণ করা, নারীদের সঙ্গে কোন ব্যবসায়িক বিষয় পরিহার করা, মস্তক মুণ্ডন করা, নখ কাটা, মস্তক এবং মুখমণ্ডল আবৃত রাখা। সুন্নীরা অবশ্য আরও কতকগুলো বিধি পালন করে।

—এবার পবিত্র যুদ্ধ সম্পর্কে বলো।

—বিধর্মী দ্বারা ইসলাম বিপন্ন হলে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য—আক্রমণাত্মক নয়। তখন সাচ্চা মুসলমান অস্ত্রসজ্জিত হয়ে নির্ভয়ে সামনে কদম বাড়াবে—কখনও পলায়ন করবে না।

প্রশ্নকর্তা মনে মনে স্বীকার করলেন, হাফিজার অজানা কিছুই নাই। তবু তাকে বেকায়দায় কী করে ফেলা যায় তার কায়দা ভাঁজতে লাগলেন।

—আচ্ছা বলো, রুজু করার ভাষাগত অর্থ কী?

—অন্তরের এবং বাইরের সব মলিনতা প্রক্ষালন করা।

—রোজা শব্দের অর্থ?

—বিরত থাকা।

—দানের অর্থ?

—নিজেকে সমৃদ্ধ করা।

—তীর্থযাত্রী দলে সামিল হওয়া মানে?

—চরম লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়া।

—যুদ্ধ কাকে বলে?

—নিজেকে রক্ষার জন্য প্রতিরোধ করা।

এবার প্রশ্নকর্তা, প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন, ধর্মাবতার এই বাঁদীর অগাধ পাণ্ডিত্য আমাকে হতবাক করে দিচ্ছে।

হাফিজা মৃদু হাসলো, এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

—বলতে পারেন, ইসলামের বনিয়াদ কী?

কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, চারটি বনিয়াদের ওপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। ধর্ম বিশ্বাস—যা জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দ্বারা প্রতিভাত হয়। সাধুতা। কর্তব্য বোধ, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা। এবং সমস্ত অঙ্গীকার পালন।

হাফিজা বলে, আর একটা প্রশ্ন করতে অনুমতি দিন। যদি আপনি এ প্রশ্নের জবাব না দিতে পারেন, তবে, আপনার ঐ শিরোপা খুলে আমাকে দিয়ে দিতে হবে।

—আমি রাজি। কী তোমার প্রশ্ন, বলো?

হাফিজার প্রশ্ন, ইসলামের কয়টি শাখা?

অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন সেই কোরান বিশারদ। কিন্তু জবাব দিতে পারলেন না। সুতরাং খলিফা বললেন, হাফিজা তুমি যদি পার, তুমিই আমাদের শুনিয়ে দাও। শিরোপা তোমার পাওনা হলো।

হাফিজা মাথা নত করে খলিফাকে শ্রদ্ধা জানায়।

—ইসলামের কুড়িটি শাখা ঃ শাস্ত্রের কঠোর শিক্ষা, পয়গম্বরের মুখ নিসৃত বাণী নির্দেশ এবং রীতিনীতি পদ্ধতির স্বীকৃতি, অন্যায় অবিচার এড়ানো, মঞ্জুরীকৃত খাদ্য গ্রহণ, কখনও না নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ, শয়তানের শাস্তি বিধান, দুষ্কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ, ধর্মজ্ঞান আহরণ, শত্রুর সঙ্গে সহৃদয়তা, বিনয় নম্রতা, আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ, নতুন প্রথা প্রবর্তন ও পরিবর্তন থেকে বিরত থাকা, বাধা বিপত্তিতে সাহস প্রদর্শন এবং পরীক্ষার সময় শক্তি সঞ্চয়, ক্ষমতাবানকে ক্ষমা প্রদর্শন, বিপদে ধৈর্য ধারণ, আল্লাকে উপলব্ধি করা, পয়গম্বরকে জানা, দুষ্টের পরামর্শ প্রতিরাধ করা, ষড়রিপু দমন, পবিত্র আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ।

খলিফা কোরান বিশারদকে বললেন, আপনি পরাজিত, আপনার শিরোপা হাফিজাকে দিয়ে দিন।

তৎক্ষণাৎ তিনি তার শিরোপা হাফিজার সামনে রেখে অবনত মস্তকে সভাকক্ষ ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন।

এর পর আর এক বিশারদ উঠে দাঁড়ালেন।

—আমি তোমাকে সামান্য একটা প্রশ্ন করবো। আচ্ছা বলো তো, আহার্য গ্রহণের সময় কী কী নিয়ম অনুসরণ করা বিধেয়?

—খেতে বসার আগে হাতমুখ প্রক্ষালন করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানানো অবশ্য কর্তব্য। খানার সময় বাঁদিকে কুঁজো হয়ে বসতে হয়। এবং শুধুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট, তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে খাদ্যবস্তু তুলে মুখে পুরতে হয়। খুব ছোট ছোট গ্রাস মুখে নেওয়া উচিৎ। প্রতিটি গ্রাস ভালোভাবে চর্বন করা প্রয়োজন। খাওয়ার সময় অন্য কারো দিকে দৃকপাত করতে নাই বা কে কি ভাবছে এই ভেবে সঙ্কুচিত হতে নাই। এর ফলে ক্ষুধা নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে।

—আচ্ছা বলো, খানিকটা কী, অর্ধেকটা কী এবং তুচ্ছাতি তুচ্ছই বা কাকে বলে?

—ধর্মাত্মাই 'খানিকটা', ভণ্ড 'অর্ধেকটা' আর বিধর্মীই 'তুচ্ছাতিতুচ্ছ'।

—চমৎকার। আচ্ছা বলতে পার বিশ্বাসের সন্ধান কোথায় পাওয় যায়?

বিশ্বাস চার জায়গায় থাকে ঃ হৃদয়ে, মস্তকে, জিহ্বায় এবং ধর্মানুসারীদের মধ্যে।

—হৃদয় কয় প্রকারের?

—অনেক। তার মধ্যে সাচ্চা মুসলমানের হৃদয় পুতপবিত্র হয়, কিন্তু বিধর্মীর অন্তর ঠিক তার বিপরীত...

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো ছিয়াত্তরতম রাত্রিতে আবার সে শুরু করল ঃ

—কারো কারো অন্তর বিষয় আশয়ে মজে থাকে। আবার বা কারো হৃদয় অপার্থিব আনন্দে মশগুল। কেউবা কামনায় দগ্ধ হয়, ঘৃণা ও লোলুপতা কারো অন্তরে বাসা বাঁধে। কেউ বা অলস হৃদয়, কারো হৃদয় ভালোবাসার আগুনে জ্বলে পুড়ে যায়, কারো অন্তর অহঙ্কারে ভরা, আমাদের পয়গম্বরের উন্মুক্ত হৃদয় আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত। এই হৃদয়ই কাম্য।

হাফিজার জবাব শুনে প্রশ্নকর্তা বিস্ময়ে হতবাক!

—তোমার তুল্য জ্ঞান আমি প্রত্যক্ষ করিনি।

হাফিজা হাসে, আমার কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। খলিফার দিকে চেয়ে বলে, ধর্মাবতার, আমি এঁকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। যদি তিনি জবাব দিতে না পারেন ওঁর শিরোপা আমাকে খুলে দিতে হবে।

খলিফা হাসলেন, ঠিক আছে, তাই হবে।

—বলতে পারেন, সবচেয়ে আগে কোন্ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। হয়তো অনেক জরুরী কাজ সামনে আছে—তার থেকে আরও জরুরী কাজ সামনে আছে। তার থেকে আরও জরুরী কাজ কি মনে হতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাব জোগালো না তার মুখে। হাফিজা শিরোপা পেয়ে গেলো। তারপর নিজেই সে উত্তর দিলো ঃ

ধর্মীয় সব কর্তব্য পালন করার আগে রুজু কর্তব্য সমাধা করতে হবে। ধর্মীয় কর্তব্য সমাধা করতে গেলে প্রথমে দেহ মনের শুদ্ধি প্রয়োজন।

এবার আর এক মহা দিগ্‌গজ উঠে দাঁড়ালেন।

—তুমি তো কোরান সম্বন্ধে সবই জান। আমাদের কিছু নমুনা শোনাও, দেখি!

—কোরানে একশো চোদ্দটি অধ্যায় আছে। তার মধ্যে সত্তরটি মক্কায়এবং বাকী চুয়াল্লিশটি মদিনায় রচিত হয়েছিলো। এগুলো আবার ছয়শো একুশটা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এদের নাম দশক। ছয় হাজার দুশো ছত্রিশটি স্তবক আছে এতে। সব শুদ্ধ সংখ্যা ঊনআশী হাজার চারশো উনচল্লিশ। তিনলক্ষ তেইশ হাজার ছয়শো সত্তরটি অক্ষরমালায় এই শব্দ সমষ্টি গঠিত।

পঁচিশজন পয়গম্বরের নাম ঃ আদম, নোয়াহ, ইসমাইল, আইজাক, জ্যাকব, জোসেফ, ইলিসা, জোনাহ্, লভ, সালিহ্, হুদ, সুয়াইব, ডেভিড, সোলোমান, ধুল-কাফ্ল, ইদ্রিস, ইলিয়াস, ইয়াহিয়া, জ্যাকারিয়াস্, জোব, মোসেস, আরুন, জেসাস এবং মহম্মদ।

—ঠিক বলেছ। এবারে বলো, আমাদের পয়গম্বর কিভাবে বিধর্মীর বিচার করেছেন।

—তিনি বলেছেন, ইহুদীরা বলে খ্রীস্টানরা ভুল, আর খ্রীস্টানরা বলে ইহুদীরা ঠিক নয়। বলতে গেলে ওরা দুজনই ঠিক কথা বলে।

এই সময়ে রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকে। শাহরাজাদ চুপ করে বসে রইলো।

দুশো আটাত্তর রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

প্রশ্নকর্তা এবারে উল্লসিত কণ্ঠে বলেন, ধর্মাবতার এই অসামান্য মহিলার পাণ্ডিত্যের তুলনা নাই।

হাফিজা বললো, আমি এবারে একটা প্রশ্ন করবো। বলুন তো কোরানের কোন স্তবকে কাফ অক্ষরটি তেইশবার আছে! মিম ষোলবার এর আর একটা অক্ষর চল্লিশবার আছে?

এ প্রশ্নের তিনি উত্তর দিতে পারলেন না। হাফিজা তখন তাঁর শিরোপা দাবি করে বললো, আমি বলে দিচ্ছি।

খলিফা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, সারা দেশের মধ্যে হাফিজা শ্রেষ্ঠ গুণী। তার সমকক্ষ আর কেউ নাই।

হাফিজাকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ইনাম দিলেন খলিফা। দশটি থলেয় ভরে এই মোহরগুলো আবু অল হুসনর হাতে তুলে দেওয়া হলো।

খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, হাফিজা তুমি কি আমার হারেমে যেতে চাও? সেখানে তোমাকে বাদশাহী মর্যাদায় রাখতে পারি আমি। অথবা তুমি এই যুবকের সঙ্গেও যেতে পার।

হাফিজা আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায়। খোদা মেহেরবান, তিনি আপনার মঙ্গল করুন, আপনার বাঁদী এই যুবকের সঙ্গে যেখানে থেকে এসেছিলো সেখানেই ফিরে যেতে চায়।

এ কথায় খলিফা অসন্তুষ্ট হলেন না। বরং খুশি হয়ে বললেন, আমি তোমাকে আরও পাঁচশো দিনার উপহার দিচ্ছি। তোমাদের ভালোবাসার কাছে আমার প্রাসাদেরএই ভোগবিলাস যে তুচ্ছ, তা জেনে আমি মুগ্ধ হলাম, হাফিজা। আমি তোমার ভালোবাসা আবু অল হুসনকে আজ থেকে আমার দরবারের এক উচ্চ পদে বহাল করলাম।

এর পর ওরা দু'জনে সভাগৃহ ছেড়ে চলে গেলো। হাফিজা নিলো সেই শিরোপাগুলো আর আবু অল হুসন নিয়ে চললো সেই মোহরের থলেগুলো।

সভাকক্ষের সমবেত সকলে বিপুল হর্ষধ্বনি দিয়ে ওঠে, আব্বাসের বংশধরের এই মহানুভবতায় তুলনা সারা বিশ্বে কোথাও খুঁজে পাবে না কেউ।

শাহরাজাদ বললো, তারপর খলিফার হুকুমে হাফিজার এই গুণকীর্তন লিপিবদ্ধ করে রাখা হলো।

শাহরাজাদ থামলো। শারিয়ার বাহবা দিয়ে বলে, তোফা? কিন্তু এবার তো তোমাকে আবু নসাবের কাহিনী শোনাতে হবে শাহরাজাদ?

—বেশ তো শোনাচ্ছি।

এতক্ষণ দুনিয়াজাদ আধা-ঘুমে ঢুলছিলো। এই সব তত্ত্ব-কথা তার ভালো লাগবে কি করে? আবু নসাবের নাম কানে ঢুকতেই সে সোজা হয়ে বসলো।

একদিন রাতে খলিফা হারুন অল রসিদের চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসে না। অবশেষে তিনি একাই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে তিনি তার বাগানে এসে উপস্থিত হন। দেখতে পেলেন, বাগান-সন্নিহিত তার হাবেলীতে আলো জ্বলছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যান তিনি। দরজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। বাইরে খোঁজাটা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। অতি সন্তর্পণে খোজটাকে ডিঙিয়ে খলিফা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

এক পাশে একটি পর্দাঘেরা পালঙ্ক। পালঙ্কের দুই দিকে দুটি ঝুলন্ত ঝাড়বাতি। মাথার দিকে ছোট্ট একটা মেজ। তারপর একটা সোনার তৈরি সরাবের ঝারি। ঝারির মুখ একটি সোনার পেয়ালায় ঢাকা।

হারুন অল রসিদ অবাক হয়ে দেখতে থাকেন। তার হাবেলীর ঘরে এই সব কাণ্ডকারখানা চলছে—তিনি ভাবতেও পারেন না। পালঙ্কের পর্দা তুলতে খলিফা আরও অবাক হলেন। এ কি? অসামান্য রূপলাবণ্যবতী এক ডানাকাটা পরী—অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

হারুন অল রসিদ সরাব ঢাললেন। আস্তে আস্তে পেয়ালাটা শেষও করলেন। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকলেন, কী করে কোথা থেকে এলো এই সুন্দরী? মেয়েটির কপালে হাত রাখেন খলিফা। চোখ মেলে তাকালো সে। এক মুহূর্ত। খলিফাকে চিনতে পেরেই ধড়মড় করে উঠে বসে সে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁপতে লাগলো। খলিফা হাসলেন, ভয় কী? ঠিক হয়ে বস।

মেয়েটি তবু নিজেকে সহজ করতে পারে না। কোন রকমে বেশবাস সংবৃত করে সরে গিয়ে এক কোণায় বসে।

খলিফা বললেন, পাশে তানপুরা দেখছি, তুমি গাইতে জান?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ, জানে।

খলিফা বললেন, যদিও জানি না, তুমি কে, কেনই বা এখানে এসেছ, তবু, থাক সে-সব পরিচয়, আজ সারা রাত তোমার গান শুনে কাটাবো, শোনাবে?

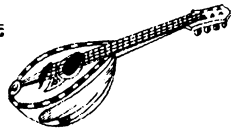

মেয়েটি তানপুরা হাতে তুলে নেয়। তারে টঙ্কার দিয়ে সুর তোলে। কণ্ঠ গুনগুনিয়ে ওঠে। অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ। খলিফা তন্ময় হয়ে শোনেন। এক এক করে একুশটা রাগরাগিণী গাইলো সে।

এক অনাবিল আনন্দে খলিফার মনপ্রাণ ভরে গেছে। এবার বুকে সাহস নিয়ে মেয়েটি বলে, ধর্মাবতার আজ আমি ভাগ্যদোষে এই নির্জনপুরীতে নির্বাসিত হয়ে আছি।

খলিফা অবাক হয়ে বলেন, কেন? কী ব্যাপার?

—আপনার পুত্র, অল আমিন কয়েকদিন আগে আমাকে বাঁদীবাজার থেকে দশ হাজার দিনার দিয়ে কিনে এনেছেন। আমাকে শোনানো হয়েছিলো, ধর্মাবতারকে ভেট দেবার জন্যই নাকি তিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আমার নসীব মন্দ, খাস বেগম জুবেদা এই ব্যাপারটা সুনজরে দেখলেন না। তিনি একটা নিগ্রো খোজাকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে এই নির্জনপুরীতে পাঠিয়ে দিলেন। খোজাকে তিনি হুকুম করেছেন, এখানে যেন আমাকে বন্দী করে রাখা হয়।

মেয়েটির কথা শুনে খলিফা ক্রোধান্বিত হন।—এ ভারি অন্যায়। যাই হোক, তুমি দুঃখ করো না সুন্দরী, আমি তোমার জন্য আলাদা একটা প্রাসাদের বন্দোবস্ত করে দেব। সেখানে তুমি দাসী-বাঁদী নিয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে। আমি তোমার মোটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

গানের আওয়াজে 'খোজাটার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিলো। কোরবানীর খাসীর মতো সে দাঁড়িয়েছিলো দরজার পাশে। খলিফা বললেন, যা, খুব চটপট কবি সাহেব আবু নসাবকে তল্লাস করে ডেকে নিয়ে আয়।

আপনারা শুনে রাখুন, খলিফার মাথায় যখনই কোন দুষ্টু বুদ্ধি আসে, তিনি আবু নসাবের খোঁজ করেন।

খোজা আবু নসাবের বাড়ি ছুটে যায়। কিন্তু ঐ গভীর রাতে—তখনও সে বাড়ি ফেরেনি। বাগদাদের সমস্ত গাঁজা-ভাঙ্গের আড্ডায় হানা দিতে দিতে সবুজ দরজার কাছে এক তাড়িখানায় তাকে পেলো সে।

খোজা বলে, জাঁহাপনা আপনাকে তলব করেছেন। এখুনি যেতে হবে। চলুন।

মদে চুর আবু নসাব কোনরকমে বলতে পারে, সে কি করে হবে বাবা, একটা ছেলের কাছে আমার এই দেহটা যে বন্ধন দিয়ে দিয়েছি, খোজা সাহেব। ও না ছাড়লে যাই কী করে?

খোজা ঠিক বুঝতে পারে না। সোনা-দানা সওদাপত্র বাঁধা দেওয়া যায়। কিন্তু নিজের দেহটাও বন্ধক দেওয়া চলে নাকি?

—ব্যাপারটা তো বুঝতে পারলাম না, কবি সাহেব?

কবি হো হো করে হাসতে লাগলো, পারলে না, একটুও বুঝতে পারলে না, খোজা বাবা? ছেলেটা খুবই কচি, এখনও গোঁফ দাড়ি গজায়নি, লম্বা ছিপছিপে। একেবারে লালটুস। আমি তাকে বলেছিলাম এক হাজার দিরহাম দেব। কিন্তু আগে খেয়াল হয়নি—আমার কাছে টাকা পয়সা কিছু ছিলো না। তাই, টাকা না পেলে সে তো আমাকে ছাড়বে না?

—ইয়া আল্লাহ, খোজা অসহায়ের মতো আর্তনাদ করে ওঠে, কোথায় সে ছেলে?

এই সময়ে ছেলেটি এসে দরজায় সামনে দাঁড়ালো। আবু নসাব উল্লাসে ফেটে পড়ে, ঐ তো এসেছে, সোনারচাঁদ।

সোনার চাঁদই বটে। অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা। আর অপূর্ব সাজে সেজেছে সে। ছেলেটির মুখে মিষ্টি হাসি। কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো সে।

খোজা হাভেলীতে ফিরে এসে খলিফাকে জানালো; আবু নসাব, একটা তাড়িখানায় নেশা করে চুর হয়ে পড়ে আছে। সেখান থেকে আসার তার উপায় নাই। একটি বাচ্চা ছেলেকে টাকা দেবে বলেছিলো, কিন্তু দিতে পারে নি। তাই সে নিজেকেই বাঁধা দিয়েছে তার কাছে।

খলিফা মজাও পেলেন, ক্রুদ্ধও হলেন। খোজার হাতে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আয়। যা, ছুটে যাবি, আর দৌড়ে আসবি।

খোজা দ্রুত পায়ে তাড়িখানায় গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

আবু নসাবকে দেখে খলিফা হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, তোমার লজ্জা করে না, বেহেড মাতাল হয়ে তাড়িখানায় পড়ে থাকতে?

আবু নসাব কিন্তু খলিফার এই ক্রোধে বিচলিত হয় না। দাঁত বের করে হাসে।—বাঃ, মেয়েটা তো বেড়ে জোগাড় করেছেন, জাঁহাপনা।

আবু নসাব মেয়েটির গা ঘেঁষে বসে পড়ে। মেয়েটি খলিফাকে এক পেয়ালা মদ ঢেলে দিলো। খলিফা গম্ভীর মুখে নসাবকে বলে, নাও, চুমুক দাও।

আবু নসাব দ্বিধা না করে মদের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে সাবাড় করে দেয়। মদের ক্রিয়া করবেই, আবু নসাব টাল সামলাতে না পেরে টলতে টলতে পড়ে যায়। খলিফা তলোয়ার বের করে বাগিয়ে ধরেন—ভাবখানা, এক কোপে নসাবের মুণ্ডুটা নামিয়ে দেবেন। আবু নসাব ভয়ে ছিটকে সরে যায়। কিন্তু খলিফাও ঘাবড়াবার পাত্র নন, নসাবকে তাড়া করতে করতে ঘরময় এদিক ওদিক ছুটাছুটি করেন। কিন্তু নসাব, মাতাল হলে কি হলো, তালে ঠিক ছিলো, খলিফার তলোয়ার বাঁচিয়ে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত লুকোচুরি খেলতে থাকে। শেষে খলিফা ক্লান্ত হয়ে বলে, ঢের হয়েছে, এবার এসো, আর এক পাত্র চড়িয়ে নাও, নেশা তো সব পানি হয়ে গেছে।

আবু নসাব খলিফাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। সে টুক করে মেয়েটির পিছনে এসে লুকিয়ে পড়ে। খলিফা তলোয়ারখানা রেখে মুচকি হেসে বলেন, এবার থেকে তোমাকে আমি একটা নতুন চাকরীতে বহাল করবো, নসাব। তুমি হবে বাগদাদের মেয়েমানুষের দালালদের সর্দার।

আবু নসাব ঠোঁট কাটা। ভয় ডর কিচ্ছু নাই। বলে, জাঁহাপনা দালালীটা আজ থেকেই পাবো তো?

—কেন?

—বাঃ, এমন খুব সুরৎ মেয়েমানুষ নিয়ে রাত কাটাবেন। দালালী দেবেন না?

খলিফা রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকেন। খোজাকে হুকুম করেন, এই—মাসরুরকে ডেকে নিয়ে আয়। আজ আমি এর গর্দান নেব।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

দু'শো নব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

মাসরুর এসে কুর্নিশ জানালো। খলিফা বললেন, এই বেয়াদপকে উলঙ্গ কর। গাধার জীনের রেকাবীর সঙ্গে রসি দিয়ে বেঁধে ওকে শহর ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। তারপর সকালবেলা শহরের সিংহ দরজায় সকলের সামনে এর গর্দান নেবে।

মাসরুর সারা রাত ধরে সুলতানের হুকুম তামিল করে নসাবকে শহরের সদর ফটকে নিয়ে আসে। শহরবাসীরা দলে দলে এসে জড়ো হতে থাকে। আহা বেচারা! লোকটা বড় রসিক ছিলো। সুলতানের কোপে পড়ে আজ প্রাণ হারাতে হবে।

উজির জাফর অল বারমাকী প্রাসাদে যাওয়ার পথে জনতার ভিড় দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার? কী হয়েছে, এত জমায়েত কেন?

কে যেন বললো, সভাকবি আবু নসাবের গর্দান নেওয়া হবে।

জাফর ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখে, সত্যিই তাই। জাফর জিজ্ঞেস করে আবু নসাব, কী ব্যাপার? কী করেছ? এ দশা কেন?

আবু নসাব বলে, আল্লাহ সাক্ষী, কোনও দোষ করিনি আমি। এমন কি কবিতা শুনিয়ে খলিফাকে এইসা মাতিয়ে দিয়েছি যে খুশি হয়ে তিনি আমাকে তার গায়ের বাদশাহী সাজপোশাক ইনাম দিয়েছেন।

খলিফা কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। নসাবের কথা শুনে হো হো করে হাসতে লাগলেন। নসাবকে তিনি শুধু ক্ষমাই করলেন না, সত্যিই নিজের অঙ্গের পোশাক খুলে পুরস্কার দিলেন।

শাহরাজাদ গল্প থামাতে দুনিয়াজাদ হেসে গড়িয়ে পড়লো।—কী মজার গল্প, দিদি। আর একটা আবু নসাবের গল্প বলো না।

সুলতান শারিয়ার বাধা দিয়ে বলে ওঠে, না না, ঐ সব ফচ্‌কে গল্প আর না। এবার তুমি রোমাঞ্চকর কিছু একটা শোনাও।

শাহরাজাদ বললো, ঠিক আছে এবার সিন্দবাদ-এর সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শোনাচ্ছি।

খলিফা হারুন অল রসিদের সময়ে বাগদাতে সিন্দবাদ নামে দরিদ্র কুলি বাস করতো। অন্যের মোট বয়ে কোনক্রমে তার দিন যেতো।

একদিন সে দারুণ গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ হয়ে পেল্লাই ভারি মোট মাথায় করে নিয়ে চলছিলো। ঘামে সারা শরীর নেয়ে যাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে এক বিরাট সওদাগরের বাড়ির ফটকের সামনে এসে থামলো। পা আর চলতে চায় না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কাছেই একটা রোয়াকের ওপর মোটটা নামিয়ে সে বসে পড়লো।

মনে হয় একটু আগেই ফটকের সামনেটায় কেউ গোলাপ জল ঢেলে দিয়ে গেছে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় গোলাপ জলের মনমাতানো সুবাস বড় মধুর লাগে। সিন্দবাদের সকল ক্লান্তি কেটে যায়। প্রাণ ভরে সে গোলাপের গন্ধ আঘ্রাণ করতে থাকে।

কান পাতলে শোনা যায়, সওদাগরের বাড়ির অন্দর থেকে অপূর্ব মিষ্টি গানের কলি ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে তানপুরার সুমধুর তান। সিন্দবাদ ফটকের ফাঁকে মাথাটা ঝুকিয়ে দৃষ্টিপাত করে। একটা বাগিচা। ঝকঝকে তকতকে। কত বিচিত্র নানা বর্ণের বাহারী সব ফুল। দুচোখ জুড়িয়ে যায়। এমন সাজানো গোছানো বাগান সে বড় একটা দেখেনি। সাধারণ লোকের কথা দূর থাক, অনেক সুলতান বাদশাহের বাগিচাও এমন সুন্দর হয় না।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো, গুলাবের সুবাস কোথা থেকে আসছে। মৃদুমন্দ সমীরণে চারদিক সুগন্ধে মদির হয়ে গেছে। সিন্দবাদ এই প্রথম অনুভব করতে পারে, জীবনে কত গান আছে, কত ফুল আছে, কত রূপ আছে কত গন্ধ আছে। কিন্তু সে-সব তার জন্য নয়। এই গান এই ফুল, এই গন্ধ তাদের মতো দরিদ্রের জন্য নয়। ধনীর দুলাল হয়ে জন্মালে তবেই এই সব ভোগ করার অধিকার থাকে। সিন্দবাদ ভাবতে থাকে, প্রতিদিন প্রতি নিয়ত আমি ধনীর মোট বয়ে বেড়াই। কত সোনা দানা হীরে জহরৎ বয়ে নিয়ে যাই বিত্তবানের বাড়ি কিন্তু, হায় আমার নসীব, কয়েকটা দিরহাম ছাড়া, সে-সব আমি চোখেও দেখতে পাই না। সেইসব ধনরত্ন বিলাসের সামগ্রী যারা ভোগ করে তারা তো ভিন্ন গোত্রের মানুষ। বিলাস ব্যসন তাদের জন্মগত অধিকার। আমি মোট বয়ে চলি।

এই তো, আজও, যে মোটের অত্যধিক ভারে আমি ঘর্মাক্ত ক্লান্ত এবং নুব্জ্য হয়ে এখানে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম, জানি, এর মধ্যে যে আনন্দ বিলাসের উপকরণ আছে, তাতে বহুজন বিত্তের বিবিধ বিনোদন হতে পারবে।

মনের দুঃখে গান ধরে। সে-গানে হৃদয়ের সকল ব্যথা বঞ্চনা গলে গলে ঝরতে থাকে। অনেকক্ষণ জিরিয়ে শরীর এবং মন বেশ জুড়িয়ে গেছে। মোটটা মাথায় তুলে আবার সে যাত্রা করতে উদ্যত হয়েছে—এমন সময় ফটকটা খুলে গেলো। একটি ছোট্ট বান্দা বেরিয়ে এলো। মুখে বেশ মিষ্টি হাসি। কোন রকম ভূমিকা না করে সিন্দবাদের একটা হাত ধরে সে টানে, আমার মালিক তোমাকে ডাকছে, চলো।

সিন্দবাদ অবাক হয়, ভয়ও পায়। না যাওয়ার ছুতো খুঁজতে থাকে। যাহোক একটা কিছু বলে ছেলেটাকে বোঝাতে হবে তো। কিন্তু ভেবে পায় না, কি বলবে। ছেলেটা আবার হাত ধরে টানে, চলো না, আমার মালিক তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

ছেলেটি একেবারে নাছোড় বান্দা। সিন্দবাদ বলে, কিন্তু আমার এই মোট? এটা কোথায় রেখে যাবো?

ছেলেটি বলে, সে তুমি কিছু ভেবো না। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ফটকে পাহারা আছে না? পাহারাওলার কাছে রেখে, চলো। ভয় নাই, কেউ কিচ্ছু নেবে না।

পাহারাওলার কাছে মোটটা গচ্ছিত রেখে সিন্দবাদ খুদে বান্দাটার পিছনে পিছনে চলে।

সুরম্য ইমারৎ। ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো। ছেলেটি তাকে এক বিশাল কক্ষে নিয়ে গেলো। খানদানী ঘরের অতিথি অভ্যাগত সমবেত হয়েছে। ঘরময় হরেক রকম নাম-না-জানা ফুলের সেকি সমারোহ—প্রাণমন ভরে যায়। আর আতর গোলাপজলের মিষ্টি গন্ধে মাতাল করে হৃদয়। বিরাট লম্বা মেজ-এ চিকনের কাজ করা দুগ্ধ ফেননিভ চাদর বিছানো। তার ওপর থরে থরে সাজানো খানাপিনা—পেস্তার বরফী, গাজরের শাহী হালওয়া, দুষ্প্রাপ্য ফল, ইত্যাদি। অসংখ্য রূপোর রেকাবীতে ভরা ঝলসানো দুম্বার মাংস, মুরগীর দোপিঁয়াজী, বটি কাবাব, টিকিয়া ইত্যাদি। আর একধারে সরাবদানীতে ভরা দামী আঙ্গুরের মদ। একদল বান্দারা সেজেগুজে অপেক্ষমান। আর এক দিকে সুন্দরী বাঁদীরা নানারকম বাদ্য-যন্ত্র হাতে নিয়ে বসে আছে।

সিন্দবাদ মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এযে একেবারে বেহেস্ত। এখানে যারা সমবেত তারা নাকি এই দুনিয়ার কোন নরনারী, না—বেহেস্তের জীন পরী? উপস্থিত সকলে তাকে স্বাগত জানায়। সিন্দবাদ এক পাশে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ একজন তাকে কাছে ডাকে। আদর করে পাশে বসায়।

বান্দাদের একজনকে খানা দিতে বলে। সিন্দবাদের সামনে রেকাবী ভর্তি খাবার

সাজিয়ে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বলে, হাত-মুখ ধুয়ে আগে খানা সেরে নাও, তারপর তোমার সঙ্গে কথা হবে।

সিন্দবাদ সুবোধ বালকের মতো খানাপিনা সারে। বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হয়ে বলে, একটু আয়েস করে বস। আচ্ছা বেটা, তোমার নাম কী? কী কর তুমি?

—আমার নাম সিন্দবাদ কুলি। আমি ভারি ভারি মোট বয়ে রুটির পয়সা রোজগার করি।

বৃদ্ধ হাসলেন। শিশুর মতো সরল হাসি। বললেন, আরে, কী আশ্চর্য, তোমার নাম আর আমার নাম যে এক। তুমি সিন্দবাদ কুলি, আর আমার নাম সিন্দবাদ নাবিক...আমি তোমাকে ডেকেছি তোমার সুন্দর মিষ্টি গান শুনে। আমার ইচ্ছা, এখানে তুমি আমাদের দু-একখানা গান শোনাও।

সিন্দবাদ কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। —আল্লাহর দোহাই, আমার ঐ দুঃখের গান শুনে আমাকে দোষারোপ করবেন না।

সিন্দবাদ নাবিক বললো, কেন, দোষারোপ করবো কেন? আর তোমারও কুণ্ঠিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। গলা ছেড়ে প্রাণ খুলে গাইবে। তাতে কার কী মনে করার থাকতে পারে। এখানে তোমার লজ্জা সঙ্কোচ করার কিচ্ছু দরকার নাই। তুমি আমার ছোট ভাই-এর মতো। ঐ যে গানগুলো গাইছিলে না? সেইগুলোই আবার শোনাও।

সিন্দবাদ আবার গাইলো গানগুলো। সিন্দবাদ নাবিক তো মহাখুশি।

আমার ভাগ্যও বড় বিচিত্র। তোমাকে বলবো সেই কাহিনী। তাহলে বুঝতে পারবে, কী নিদারুণ উত্থান পতন আর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজ আমি এই অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছি। কী অমানুষিক কঠোর পরিশ্রম ধৈর্য তিতিক্ষার ফলশ্রুতি এই বিত্ত তা আমার কাহিনী না শুনলে উপলব্ধি করতে পারবে না। কত বিপর্যয় কত দুর্ভাগ্য আর কত দুঃসাহসিকতা জড়িয়ে আছে এই সাফল্যের পিছনে তা কল্পনা করতে পারবে না। আমি পরপর-সাতবার অসাধারণ সমুদ্রযাত্রা করেছি—তার যে-কোন একটা কাহিনী শুনলে মানুষ হতবাক হয়ে যাবে। তোমাকে আমি সবগুলোই শোনাব।

বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক বলতে শুরু করে ঃ

এখানে, আমার মহামান্য মেহেমানরা,—যাঁরা উপস্থিত আছেন, এবং আমার এই নতুন মিতা—সবাই শুনুন। আমার বাবা ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর। গরীবদের প্রতি তার দরদ ছিলো অসীম। দু হাতে তাদের জন্য খরচ করতেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি যথেষ্টই পেলাম। টাকা-পয়সা, জমি-জমা—প্রচুর রেখে গিয়েছিলেন তিনি। আমি তখন নাবালক। সুতরাং অছি হিসাবে আমার এক আত্মীয় আমার বিষয় আশয় দেখাশুনা করতো।

যখন আমি সাবালক হলাম, আমার বিষয় সম্পত্তি আমি নিজের হাতে ফিরে পেলাম। হঠাৎ কাঁচা বয়সে প্রচুর পয়সা হাতে পেয়ে আমার ভোগ বিলাসের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। ইয়ার বন্ধুদের সংখ্যাও দিনদিনই বাড়তে লাগলো। প্রতিদিন দামী দামী মদ আর মাংসের মহোৎসব চলতে থাকলো। মূল্যবান সাজপোশাক পরে ফূর্তি মেরে আর কাব্য করে দিন কাটাই। এইভাবে অনেক দিনই চললো। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলাম, বিষয়সম্পত্তি বলতে আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট নাই আমার। যা আছে, বলতে গেলে, নগণ্য। আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। জীবনে বাকী দিনগুলো কি নিদারুণ কষ্টেই আমার কাটবে। পয়গম্বর সুলেমান ইবন দাউদ-এর এটা বাণী মনে পড়লো। —আমার বাবা প্রায়ই এই কথাগুলো আওড়াতেন ঃ 'জন্মের মুহূর্তর চেয়ে মৃত্যুর মুহূর্ত অনেক ভালো। জীয়ন্ত কুকুর মৃত সিংহের চেয়ে সেরা। দারিদ্র্যের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।'

সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে আমার যা কিছু কিঞ্চিৎ বিষয়সম্পত্তি তখনও অবশিষ্ট ছিলো কোনদিকে দৃকপাত না করে প্রায় জলের দরেই বেচে দিলাম। সর্বসাকুল্যে মাত্র তিন হাজার দিরহাম পেলাম।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো বিরানব্বই রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক তার কাহিনী বলছে ঃ

এই মাত্র তিন হাজার দিরহাম সম্বল করে আমি বিদেশ যাত্রা করবো মনস্থ করলাম।

বাজারে গিয়ে নানা ধরনের বাহারী জিনিসপত্র সওদা করে একাট গাঁটরী বাঁধলাম। নিজেই মাথায় করে বন্দরে নিয়ে গেলাম। ঐ সময়ই একখানা জাহাজ ছাড়ছিলো—আর কোনও কিছু না ভেবে জাহাজে চেপে বসালম। দেখলাম, আরও অনেক সওদাগর চলেছে সেই জাহাজে। আমাদের জাহাজ বাগদাদের বন্দর ছেড়ে বসরাহর দিকে এগিয়ে চললো।

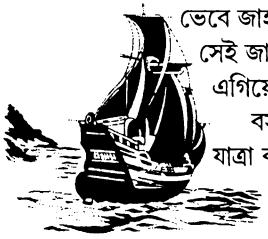

বসরাহ ছেড়ে আবার জাহাজ চলতে থাকে। দিনের পর দিন সমুদ্র যাত্রা করে চলেছি আমরা। এক এক করে অনেক দ্বীপ আসে। তাদের পিছনে ফেলে আমরা আবার এগিয়ে চলি। ক্লান্তিহীন বিরামহীন আমাদের এই সমুদ্র যাত্রা। কবে শেষ হবে কে জানে। প্রতি বন্দরেই জাহাজের ভিড়ে আমরা সওদা ফিরি করে ফিরি। কিছু কিছু বিক্রিও হয়।

কয়েক সপ্তাহ ধরে একটানা সমুদ্র যাত্রার পর একদিন এক দ্বীপের নিশানা দেখতে পেলাম। গাছপালায় ভর্তি, শস্য শ্যামল প্রান্তর—শুধু সবুজের মেলা। কি মনোহর দৃশ্যাবলী—বেহেস্তের উদ্যানের শোভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাপ্তেন এই দ্বীপে জাহাজ নোঙর করলো। যাত্রীরা সকলে নেমে পড়লো।

আমরা সব সওদাগরই এক সঙ্গে নামলাম। খানা পাকাবার সাজসরঞ্জাম এবং ডাল আটা ঘি সঙ্গে নিলাম। একটা গাছের তলায় উনুন জ্বালানো হলো। কেউ তরকারি কাটে, কেউ বাটনা বাটে, কেউ বা কাপড় পরিষ্কার করতে লেগে গেলো। কেউ বা এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। কেউ বা গাছতলায় পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। আমার কিন্তু নাওয়া খাওয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি শুধু প্রকৃতির মনোহর শোভা দেখে আকুল। চোখ আর ফেরাতে পারি না। কি অপূর্ব বনরাজিলীলা।

সবাই আমরা যখন শত কর্মে রত, এমন সময় হঠাৎ সারা দ্বীপটা ভীষণ আন্দোলিত হয়ে কেঁপে উঠলো। কে কোথায় যে কীভাবে ছিটকে পড়লো বুঝতে পারালাম না। শুধু শুনতে পেলাম, কাপ্তেনের চিৎকার—যে যেখানে আছ, জাহাজে ফিরে এসো। এটা কোনও দ্বীপ নয়। বিরাট একটা তিমি মাছের পিঠ। বহু যুগ ধরে সে এই সমুদ্রের মাঝখানে ঘুমাচ্ছে। তাই কালক্রমে তার পিঠে পলি জমেছে। আর এই পলি মাটিতে গজিয়েছে লতাগুল্ম বৃক্ষ। তোমরা আগুন জ্বালিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছ। আগুনের উত্তাপে যন্ত্রণা পেয়েছে, তাই মোচড় দিয়ে উঠেছে সে। এবার সে চলতে শুরু করেছে। তোমরা আর দেরি করো না—শিগ্গির জাহাজে পালিয়ে এসো। এখুনি হয়তো ডুব দিয়ে সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে।

কাপ্তেনের চিৎকারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হাঁড়িকুড়ি বাসন, খানাপিনা জামা-কাপড় সব ফেলে রেখে জাহাজের দিকে ছুটে এলো সবাই। কাপ্তেন ততক্ষণে নোঙর তোলার হুকুম দিয়ে দিয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হলো। ঐ সময়ের মধ্যে যারা

পারলো, হুড়পাড় করে জাহাজের পাটাতনে উঠে পড়লো, আর যারা দেরি করলো, তারা আর সে সুযোগ পেলো না। তিমিটা ততক্ষণে আড়মোড়া ভেঙ্গে তিনেক প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে গেলো।

যে সব হতভাগ্যরা সময়মতো জাহাজে উঠতে পারলো না আমি তাদের একজন। কিন্তু আল্লা আমাকে সমুদ্রের গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন। ভাসমান এক খণ্ড ফাঁপা কাঠের গুঁড়ি সামনে দেখে আঁকড়ে ধরলাম। এই কাঠের পাটে কিছুক্ষণ আগে আমার সহযাত্রীরা তাদের কাপড়-চোপড় আছাড় দিয়ে কাচছিলো। বহু কায়ক্লেশে, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর, গুঁড়িটার উপরে উঠে বসতে পারলাম। ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে সেইভাবে গুঁড়ির মাঝখানে নিজের দেহটাকে ঠিক করে বসিয়ে দুই পা জলে ডুবিয়ে দাঁড় কাটতে থাকলাম। এইভাবে কিছুদূর হয়তো অতিক্রম করা গেলো কিন্তু হঠাৎ একটা উত্তাল ঢেউ এসে আবার আমাকে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো কিছুই হদিস পেলাম না।

এদিকে, তখন বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জাহাজে পাল তোলা হচ্ছে। আমি চিৎকার করতে থাকলাম। কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর অতদূর অবধি পৌঁছলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পালে হাওয়া লাগলো। নিমেষে আমার নজর থেকে জাহাজখানা অদৃশ্য হয়ে গেলো। এদিকে রাত্রির কালো ছায়া নেমে আসে। ঐ নিঃসীম নির্জন নীল সমুদ্রের অন্ধকার কারাগারে আমি তখন এক প্রাণদণ্ডের আসামী। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। তিনিই একমাত্র ভরসা ভেবে সেই কাঠের পাটাতনে পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে বসে রাত্রি আর মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকলাম। কিন্তু না, মরিনি। অন্ধকার কেটে গেলো, সকাল হলো, সূর্যোদয়ের পূর্বাভাষে সমুদ্র সন্নিহিত নীলাকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করলো। আমি তাঁর উদ্দেশে প্রণতি জানালাম।

আবার শুরু হলো আমার পদ-সঞ্চালন। পায়ের দাঁড়ে জল কেটে পাড়ি জমাবার সে-এক দুরন্ত ছেলেমানুষী প্রয়াস। ঘটি ঘটি জল তুলে সমুদ্র শোষণ করা—আর কি! যাইহোক, আমার আকুল আকুতি বুঝি তিনি বুঝেছিলেন। তাই, বেলা বাড়তেই বায়ুবেগও বাড়তে থাকলো। হাওয়ার ঠেলায় আর ঢেউ-এর ধাক্কায় তরতর করে তীরের দিকে ভেসে চললাম আমি।

অবশেষে তীর পাওয়া গেলো। কিন্তু না, তীর না, সে এক সমুদ্রদ্বীপের দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত-পাদদেশ। পাহাড় পর্বত সঙ্কুল এই দ্বীপটির কাছে এসে আমি হতাশ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলাম। সমুদ্রের তলদেশ থেকে খাড়াই উঠে গেছে একটি পাহাড়। সারা পাহাড়ময় লতাগুল্ম বৃক্ষ। সবুজের সমারোহ। কিন্তু উপরে উঠবার উপায় নাই। এমন একটা স্থানও দেখতে পেলাম না যেখানে পা রেখে কিছু একটা আঁকড়ে ধরে ওপরে ওঠা যায়। এদিক ওদিক দেখছি। কিন্তু কোনও কায়দা করতে পারছি না। হঠাৎ নজরে পড়লো, একটা পাহাড়ী বটের ডাল থেকে ঝুরি ঝুলে পড়েছে সমুদ্রের জলে। পা দিয়ে দাঁড় কাটতে কাটতে গুঁড়িটাকে নিয়ে গেলাম সেখানে। লতানে ঝুরিটা আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে এলাম গাছের ডালে।

এইভাবে অনেক কষ্টে এক সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলাম আমি। এবার মনে কিছুটা বল ফিরে পেলাম। নিজের সারা শরীরটার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করার ফুরসৎ হলো। পা দুটো সামুদ্রিক মাছের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। দুর্গম পাহাড়ের ঘষায় বুকে পিঠের ছাল-চামড়া ছড়ে গেছে। এসব নজর করার আগে অবধি কোন জ্বালা যন্ত্রণা ব্যথা আমি অনুভব করতে পারছিলাম না। এবার কাতর হয়ে পড়লাম। সারা শরীর টনটন করতে লাগলো। একটা জায়গায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর আমার আর কিছু স্মরণ নাই। কতক্ষণ ঐভাবে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলাম জানি না, যখন চোখ খুললাম, দেখি আবার সকাল হয়েছে। সূর্যের ঝলমলে রোদ এসে পড়েছে আমার মুখে। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু

পারলাম না। পা দুটো ব্যথায় অসাড় হয়ে গেছে। আবার মাটিতে পড়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে বুকে হেঁটে, হামাগুড়ি দিতে দিতে সামনের সমতল ভূমির দিকে এগোতে লাগলাম। এইভাবে এক সময় সেই ঝর্ণা আকুল শ্যামল সমতটে নেমে আসতে পারলাম। চারদিক ফুলে ফলে ভরা।

এখানে আমি গাছের ফল আর ঝর্ণার জল খেয়ে অনেকদিন কাটালাম। ধীরে ধীরে দেহের ক্ষত শুকিয়ে এলো, বল ফিরে আসতে লাগলো। কিন্তু মাটিতে পা ফেলে তখনও হাঁটতে পারি না। দুখানা কাঠের ডাণ্ডায় ভর দিয়ে কোনও রকমে চলাফেরা করি।

একদিন এইভাবে সমুদ্র সৈকতে—এসে বসেছিলাম। হঠাৎ কী যেন একটা অদ্ভুত বস্তু দেখলাম। ঠিক বর্ণনা করতে পারবো না, মনে হলো, কোনও জংলী জানোয়ার অথবা সামুদ্রিক দানব। অদম্য কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলাম। ভয়েও বুক দুরু দুরু করছে। কি জানি, যদি কোনও বিপদ হয়। যাইহোক, কাছে যেতেই বুঝতে পারলাম। না, তেমন কোনও হিংস্র কোনও কিছু নয়। আমাদের দেশের শান্ত নিরীহ মাদী ঘোড়া জাতীয় একটি প্রাণী। সমুদ্রের ধারে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধা। লোভ হলো, জানোয়ারটার পিঠে চেপে বেড়ানো যেতে পারে। একেবারে ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ একটি মানুষের চিৎকারে আমি হতচকিত হয়ে পড়ি। একটি লোক ছুটতে ছুটতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। রাগে সে ফুঁসছে। হুঙ্কার ছেড়ে বললো, কে তুমি? কোত্থেকে এসেছ, এ জায়গায় আসার সাহসই বা তোমার হলো কী করে?

আমি ভীত চকিত হয়ে বললাম, মালিক, আমার অপরাধ নেবেন না, আমি বিদেশী। জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলাম। কিন্তু পথের মধ্যে বিপর্যয় ঘটে। আমার সঙ্গে আরও অনেকে সমুদ্রের জলে ভেসে যাই। তারা কে কোথায় গেছে, বেঁচে আছে কি নাই জানি না। আমি, আল্লাহর মেহেরবানীতে, একটা কাঠের গুঁড়ি ধরে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছি। নিজের ইচ্ছায় নয়, ঢেউ-এর তালে তালে আমি ভেসে এসেছি এই দ্বীপে।

লোকটি আমার একখানা হাত ধরে বললো, এসো, আমার সঙ্গে এসো।

আমি তার পিছনে পিছনে চলতে থাকি। সে আমাকে পাহাড়ের নিচে একটা গুহায় নিয়ে আসে। ভিতরে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে গেলো। বিরাট প্রশস্ত একটি ঘর। আমাকে আদর করে বসালো। খানাপিনা দিলো খেতে। খেলাম। কতকাল এই সব খানা খাইনি। বড় ভালো লাগলো। প্রাণ ভরে চেটেপুটে খেলাম সব। খুশিতে ভরে উঠলো মন। লোকটি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমার নামধাম পরিচয়। আমি সব বললাম তাকে। কেন আমার এই সমুদ্রযাত্রা সে কাহিনীও শোনালাম।

লোকটি মুগ্ধ বিস্ময়ে সব শুনলো। এবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মালিক, আপনিই বা এই নির্জন দ্বীপে কেন? কি করেই বা এই পর্বতগুহায় বাসা বাঁধলেন। আর আপনার ঐ মাদী ঘোড়াটা—ওকেই বা পেলেন কোথায়? সমুদ্রের ধারে ওকে বেঁধেই বা রেখেছেন কেন? কী ব্যাপার কিছুই অনুমান করতে পারছি না।

এমন সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দু'শো তিরানব্বইতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

লোকটি বলে। এই দ্বীপে আমার মতো আরও অনেকেই আছে। আমি একা নই। সুলতান মিরজানের আজ্ঞাবহ দাস আমরা। দ্বীপের চার পাশে পাহারারত আছি। প্রতি মাসে প্রথম চাঁদ দেখা দিলে আমরা সবাই সমুদ্রের ধারে একটা করে মাদী ঘোড়া বেঁধে রেখে গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকি। মাদী ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেয়ে সমুদ্র থেকে সিন্ধুঘোটক উঠে এসে উপগত হয়।

তারপর তাকে সঙ্গে করে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো সেয়ানা। কিছুতেই তার সঙ্গে যেতে চায় না। চিঁহিহি করে ওঠে। সেই শব্দে আমরা বুঝতে পারি, কাজ খতম হয়ে গেছে। তখন ছুটে গিয়ে সিন্ধুঘোটকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে মাদী ঘোড়াটাকে নিয়ে আসি। এরপর কিছুদিন বাদে সে বাচ্চা প্রসব করে। এই বাচ্চা কালে তাগড়াই জাঁদরেল ঘোড়া হয়। বিদেশের বাজারে সেইসব ঘোড়ার চড়া দাম পাওয়া যায়। আমাদের সুলতানের এই করেই এত ধনদৌলত।

আজ সিন্ধুঘোটকের ওঠার দিন। তুমি অপেক্ষা কর, কাজ শেষ হয়ে গেলে, তোমাকে নিয়ে আমদের সুলতানের কাছে যাবো। আমাদের দেশটাও ঘুরিয়ে দেখাবো। আল্লাহর দয়াতেই আমার সঙ্গে তোমার আজ দেখা হয়ে গেলো। তা না হলে হাজার চেষ্টা করেও এই দ্বীপের গণ্ডী ছেড়ে তোমার নিজের দেশে ফিরে যেতে পারতে না।

কৃতজ্ঞতায় ভরে গেলো আমার মন। আমরা বসে কথা বলছি, এমন সময় হঠাৎ সিন্ধুঘোটক জল থেকে উঠে এসে মাদী ঘোড়ার ওপর চড়াও হওয়ার আওয়াজ শোনা গেলো। আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মাদী ঘোড়াটার পাল-খাওয়া দেখতে লাগলাম। কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে, সিন্ধুঘোটকটা ঘোড়াটাকে তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। কিন্তু সে যেতে নারাজ।

এই সময় আমার বন্ধুটি তারস্বরে চিৎকার করতে থাকলো, হেই, কে আছ, ছুটে এসো। হেই, কে আছ, ছুটে এসো।

পলকের মধ্যে লাঠি-সোটা বর্শা তীর ধনুক নিয়ে তার অনেক সঙ্গী সাথী জড়ো হয়ে গেলো। তাদের আক্রমণে সিন্ধুঘোটকটা শঙ্কিত হয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গেলো।

এবার সকলে হৈ-হৈ করতে করতে মাদী ঘোড়াটাকে সঙ্গে করে গুহার সামনে হাজির হয়। আমার বন্ধুটি আমার সঙ্গে তার সঙ্গী সাথীদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয়। আমাকে পেয়ে তারা তো মহাখুশি। নানা রকম ফলমূল খানাপিনা দিয়ে তারা আমাকে আদর-আপ্যায়ন করলো। একটা ভালো দেখে ঘোড়া এনে দিলো আমাকে। বললো, ওঠ দোস্ত, ঘোড়ায় চাপো, তোমাকে আমাদের সুলতানের কাছে নিয়ে যাবো। তুমি আমাদের মেহেমান।

ঘোড়ায় চেপে ওদের সঙ্গে সুলতানের প্রাসাদে গেলাম। সুলতান মিরজান আমাকে দারুণ আদর অভ্যর্থনা করে তাঁর পাশে বসালেন। আমার সমুদ্রযাত্রার কারণ এবং ভাগ্য বিড়ম্বনার সবিস্তার বিবরণ আগাগোড়া খুলে বললাম, তাকে। তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনলেন সব। বললেন, বেটা, উপরে আল্লাহ আছেন, নিয়তির লিখন কেউ এড়াতে পারে না। তোমার নসীবে যা লেখা আছে তা ঘটবেই। তিনি তোমার ইন্তেকালও তোমার কপালে লিখে রেখেছেন, তার আগে তোমার মৃত্যু কিছুতেই হতে পারে না। তোমার যা দুর্ভোগ, দুঃখ, কষ্ট, সুখ, আনন্দ সবই লিপিবদ্ধ করা আছে— তার কোনওটাই এড়াতে পারবে না। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তিনিই সব বিপদ উদ্ধার করে দেবেন।

সুলতান শুধু আমাকে উপদেশই দিলেন না, তার উজির আমিরদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাকে বন্দরের প্রধান পরিদর্শকের পদে বহাল করলেন।

আমার এই চাকরীর কাজ তেমন কিছু কঠিন নয়। ক্বচিৎ কখনও জাহাজ আসে বা ছাড়ে। সুতরাং কাজের তেমন চাপও ছিলো না। সাধারণত সুলতানের দরবারেই আমার বেশিরভাগ সময় কাটে। মাঝে মধ্যে বন্দরে গিয়ে এক পাক ঘুরে আসি।

প্রায় সব সময় সুলতানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকার ফলে তিনি প্রায় প্রতি বিষয়েই

আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আমার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায়, তিনি কেন, দরবারের সকলেই খুব প্রশংসা করতেন। প্রজারাও উপকৃত হতে লাগলো। দুহাত তুলে তারা সুলতানের গুণগান করতে থাকলো। ফলে এমন অবস্থা দাঁড়ালো, আমার কথা ছাড়া সুলতান আর কোনও কাজই করেন না।

আমার কিন্তু কিছুতেই মন বসে না। সুলতানের এত আদর যত্ন ভালোবাসা—তবু মন ভরে না। শুধু এক চিন্তা—কবে দেশে ফিরে যাবো।

হা পিত্যেশ করে বন্দরে বসে থাকি। দূরে-বহুদূরে সমুদ্রের শূন্যতায় শুধু খুঁজে মরি জাহাজের মাস্তুল। যদি কোন নাবিক, এই পথে পাড়ি দেয় তাকে শুধাবো, তুমি কি জান বন্ধু, কোন পথে যেতে হয় বাগদাদ—আমার জন্মভূমি?

প্রতীক্ষায় বসে থাকতে থাকতে একদিন হয়তো একখানা জাহাজ এসে ভিড়ে। আমি ছুটে যাই। কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করি, সাহেব, আপনি বলতে পারেন, বাগদাদ এখান থেকে কতদিনের পথ। কোন্ দিকে যেতে হবে?

কাপ্তেন অজ্ঞতার কথা শোনায়। শুনেছি বটে বাগদাদ বলে একটা শহর আছে। জাহাজও ভিড়তে পারে তার বন্দরে। কিন্তু আমি কখনও যাইনি, বলতেও পারবো না, কোন্ পথে যাওয়া যায়—কতদিন লাগে।

আমি হতাশা নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসি। জাহাজের নাবিকই যদি বলতে না পারে তবে কে আমাকে সন্ধান দেবে?

সুতরাং আরও অনেককাল আমাকে সেই সুলতান মিরজানের দ্বীপেই কাটাতে হয়। এই প্রবাস কালে কতকগুলো অদ্ভুত বিস্ময়কর বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিলো। তার দু-একটা এখানে আমি শোনাবো ঃ

একদিন সুলতান মিরজান, আমি তখন তার দরবারে বসেছিলাম, কয়েকজন হিন্দুস্তানীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথায় আপনাদের দেশ?

—সেখানকার অধিবাসীরা কোন্ ধর্মের লোক?

—হিন্দু। আমরা, হিন্দুরা, বহু বর্ণে বিভক্ত। তার মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ। ক্ষত্রিয়েরা উচ্চ বংশ কুলোদ্ভব, সাহসী, বীর, যোদ্ধা। কখনও অন্যায় করে না—অন্যায় প্রশ্রয় দেয় না। শত্রুর দমন এবং শিষ্টের পালনই তাদের ধর্ম। আর যাঁরা ব্রাহ্মণ তারা পুত পবিত্র। পূজা উপাসনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, রচনা তাদের জীবনের ব্রত। কখনও তারা মদ্যপান করে না। আচার বিনয় বিদ্যা তাদের সহজাত ধর্ম। কাব্য সাহিত্য দর্শন শিল্প, সঙ্গীত চর্চা করে তারা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে। এই ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া আরও বাহাত্তর রকমের নিম্নবর্ণের মানুষ সেখানে বাস করে। এদের জীবন যাত্রার প্রণালী অবশ্য একেবারে ভিন্ন ধরনের।

ওদের এইসব অদ্ভুত কথা শুনে আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। একই দেশে একই ধর্মে এত ভাগ? আমি কখনও হিন্দুস্তানে যাইনি। কিন্তু তার পাশের দেশ আমাদের সুলতানের সলতানিয়ৎ কাবুলে একবার গিয়েছিলাম।

একদিন আমি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি, একখানা বিরাট জাহাজ আসছে বন্দরের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজখানা এসে নোঙর করলো। মালপত্র কি কি আছে দেখার জন্য আমি জাহাজে উঠে গেলাম। কাপ্তেন আমাকে এক এক করে সমস্ত সওদাপত্র বের করে দেখালো। আমি সব পরীক্ষা করে দেখতে থাকলাম। কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কিছু নাই?

কাপ্তেন বলে, আছে। কিন্তু সে-সব সামান পত্রের মালিক জাহাজে নাই। তাই, পরের জিনিস, ওগুলো বিক্রি করতে পারবো না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, তারা কোথায় গেছে?

কাপ্তেন বললো, পথের মধ্যে তারা জলে ডুবে গেছে। আল্লাহ জানেন, তাদের কে বেঁচে আছে অথবা কেউই বেঁচে নাই। যাইহোক, আমাদের দেশে বাগদাদে ফিরে গিয়ে তাদের ওয়ারিশের কাছে ফেরৎ দিয়ে দেব।

আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকে। প্রশ্ন করি, তাদের কী কী নাম?

কাপ্তেন বলে, একজনের নাম সিন্দবাদ—

কাপ্তেন আর কি বললো আমি আর শুনতে পেলাম না। মাথাটা কেমন বোঁ করে ঘুরে গেলো। কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভালো করে কাপ্তেনের দিকে লক্ষ্য করলাম। হ্যাঁ, আমাদের জাহাজের সেই কাপ্তেনই বটে। আমি প্রায় চিৎকার করেই বললাম, আমি—আমিই সেই সিন্দবাদ। তিমি মাছের পিঠের উপর নেমেছিলাম আমরা। তারপর সে আড়মোড়া ভেঙ্গে গা ঝাড়া দিতেই কে কোথায় ছিটকে পড়েছিলাম। প্রায় সবাই জাহাজে উঠতে পেরেছিলো। কিন্তু আমি পারিনি। তিমিটা জলের তলায় তলিয়ে গেলো। আমি একটা কাঠের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে কোনওক্রমে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছি।

তারপর কিভাবে কত কষ্ট করে এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছি—সবই সবিস্তারে বললাম তাকে।

—এখন আমি এখানকার সুলতান মিরজানের খুব পেয়ারের লোক। আমাকে তিনি জাহাজ পরিদর্শকের কাজে বহাল করেছেন।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দু'শো চুরানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আমার কথা শুনে কাপ্তেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই। তিনিই একমাত্র সত্যি। কিন্তু সাহেব, তোমার মতো এতবড় মিথ্যেবাদী তো আমি জীবনে দেখিনি। নিজের চোখে আমি দেখেছি, যারা জাহাজে সময়মতো উঠে আসতে পারেনি। তারা সবাই সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেছে। আর তুমি কিনা বোঝাতে চাইছ, তুমি বেঁচে গেছ! গাজাখুরি গল্প মারবার আর জায়গা পেলে না?

আমি মুহূর্তের জন্য মুষড়ে পড়লাম। —কিন্তু—কিন্তু আমি যে সেই সিন্দবাদ তার প্রমাণ দিতে পারি আপনাকে।

—কী প্রমাণ দেবে?

আমি বললাম, জাহাজে আমার যারা সহযাত্রী ছিলো তারা তো আছেন। তাদের সবাইকে এখানে ডাকুন। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, আমি কে।

কাপ্তেন সওদাগরদের সকলকে বাইরে আসতে বলতেই তার সহযাত্রীরা বাইরে এসে আমাকে দেখা মাত্র জড়িয়ে ধরে হৈ-হৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুললো। তাদের চোখে মুখে আনন্দ আর ধরে না।

কাপ্তেনকে আর কিছু বোঝাতে হলো না। সে নিজেই বুঝলো আমিই সেই সিন্দবাদ।

আমার সহযাত্রীরা বলে, আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি কোথায় তলিয়ে গেছ। সামুদ্রিক জন্তু-জানোয়ারের ফলার হয়েছ। তা কি করে বাঁচলে ভাই?

আমি তখন আবার আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বললাম তাদের। তারা আসমানের দিকে দু-হাত তুলে খোদাতালার উদ্দেশে প্রণাম জানালো। এর থেকেই বোঝা যায়, দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনও কিছু নাই। তা না হলে যে অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনালে, তাকি কখনও সম্ভব হয়? এতো তোমার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে!

কাপ্তেন আমার যাবতীয় সওদাপত্র আমাকে বের করে দিলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, যা যা ছিলো সবই যথাযথ ঠিক আছে।

বাজারে নিয়ে গিয়ে বেশিরভাগ সওদাই বেশ চড়া দামেই বেচলাম। সবচেয়ে বাহারী কয়েকটা জিনিস উপহার দিলাম সুলতান মিরজানকে।

আমাদের জাহাজ বন্দরে নোঙর করেছে শুনে সুলতান মিরজান আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন।—যাক এতদিনে আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন।

নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর উপহার উপঢৌকনে আমাকে ভরে দিলেন তিনি। এত জিনিস নিয়ে আমি কী করবো। আমার সহযাত্রীদের কাছে ভালো দামে বেচে দিলাম খানিকটা।

সুলতান মিরজান যে আমাকে কতখানি ভালোবেসে ফেলেছিলেন তা বুঝলাম যেদিন আমি তার কাছে বিদায় নিতে গেলাম।

আমাদের জাহাজ ছাড়বে। এবং এই জাহাজেই আমি স্বদেশে ফিরে যাবো। সবই সুলতান জানতেন, তবু বিদায় বেলায় তাঁর চোখ ছলছল করে উঠেছিলো, কথা বলতে গলা ভারি হয়ে এসেছিলো।

আমিও বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। —যাচ্ছি। অনেক সুখ স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, জাঁহাপনা। জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না। কিন্তু আমার স্মৃতির আকাশে চিরকাল ধ্রুব তারার মতো জ্বলবেন আপনি।

সুলতান মিরজান আমার মাথায় হাত রাখলেন, বেটা, মায়া মহব্বৎ বহুৎ খারাপ চিজ! দিল-কলিজা ঝাঁঝরা করে দেয়।

তারপর নিজের দেহ থেকে খুলে খুলে মহামূল্যবান সব সাজ-পোশাক, রত্নহার আমার হাতে তুলে দিলেন।

—এই সব যখন দেখবে, আমাকে মনে পড়বে তোমার।

সে-গুলো আমি প্রাণে ধরে বিক্রি করে দিতে পারিনি। ঐ যে দেখ, এই ঘরেই সেগুলো সব সাজানো আছে। এখনও ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে যাই, ঐ সাজ-পোশাক, ঐ রত্নহার পরে তিনি যেন সেই সিংহাসনেই বসে আছেন। কিন্তু শুধু স্মৃতিটুকুই পড়ে আছে, ভার মুক্ত সে তো আজ নাই।

যথা সময়ে হাওয়া সাধ দিলো। পাল তুলে হাল খুলে আমরা জাহাজ ছেড়ে দিলাম।

একটানা অনেক দিন অনেক রাত্রি অতিবাহিত করার পর একদিন আমরা বসরাহয় এসে পৌঁছলাম। এবার মন নেচে উঠলো, বাগদাদ আর বেশি দূর নয়। বাঁধাছাদার তোড়জোড় পড়ে গেল। দু-এক দিনের মধ্যেই আমাদের জাহাজ বাগদাদের বন্দরে এসে ভিড়লো।

অনেক টাকা পয়সা মূল্যবান উপহার উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে আমি বাড়ি এলাম। আত্মীয় পরিজনরা, অনেকদিন পরে আমাকে পেয়ে, খুশিতে ডগমগ হলো। দেখলাম, তারাও সবাই বহাল তবিয়তে রয়েছে।

এরপর খুশিতে ভরে উঠলো আমার সংসার। দাসদাসী-বাঁদী সওদা-সামান-পত্র কিনে এনে বাড়ি ভরে ফেললাম। আবার সেই, আমার বাবার আমলে যেমনটি ছিলো, আগের মতো ধনদৌলত-এ সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো আমার ঘর।

আবার সব হারানো বন্ধুদের ফিরে পেলাম। আমার দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তারাও একদিন বিদায় নিয়েছিলো। মধুর সন্ধান পেয়ে আবার তারা গুন গুন করে জড়ো হতে থাকলো। খানাপিনা হাসি গানে মেতে উঠলাম আমি।

এই হলো আমার প্রথম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী। এরপরে দ্বিতীয় অভিযানের বিচিত্র

কাহিনী শোনাবো তোমাদের। তার আগে এসো, আমরা খানাপিনা সেরে নিই। সিন্দবাদ কুলিকেও বললো, তুমিও আমাদের সঙ্গে খাবে কিন্তু।

খানাপিনা শেষ হলে সিন্দবাদ নাবিক একশোটা স্বর্ণমুদ্রা সিন্দবাদ কুলির হাতে দিয়ে বললো, এটা রাখো। কাল সকালে আবার আসবে, আমার কাহিনী শোনাবো, কেমন?

সিন্দবাদ কুলি কুণ্ঠিতভাবে বলে, তা আসবো। কিন্তু এই মোহরগুলো কি জন্যে?

—তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমি দিচ্ছি, নাও।

—আপনার ইনাম আমি মাথা পেতে নিলাম। ঠিক আছে, কাল সকালে আবার আসবো।

সেদিনের রাত্রিটা সুখ-স্বপ্নে কাটলো তার।

রাত্রির অন্ধকার কাটছে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দু'শো পচাঁনব্বইতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

সকালে উঠে সিন্দবাদ কুলি সিন্দবাদ নাবিকের প্রাসাদে চলে আসে। তাকে দেখে বৃদ্ধ তো মহাখুশি।—এসো, এসো, মিতা। তোমার জন্যেই বসে আছি। আরে, অত লজ্জা সঙ্কোচের কি আছে, এসো; আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসো দিকিনি। মনে কর না কেন, এ তোমার নিজের ঘর।

সিন্দবাদ কুলি বৃদ্ধের হাত জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে।

বৃদ্ধ বলে, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

কিছুক্ষণের মধ্যে অন্যান্য অভ্যাগতরাও এসে পড়লো। মেজ-এ থরে থরে সাজানো ছিলো সকালবেলার নাস্তা। বাঁদীরা গানবাজনা শুরু করে। সুমধুর সঙ্গীতের সুরে অবগাহন করতে করতে নাস্তাপর্ব সমাধা হয়।

তারপর এক সময় গানবাজনা থেমে যায়। কারো মুখে কোন শব্দ নাই। সকলেই প্রতীক্ষা করছে, এবার বৃদ্ধ সিন্দবাদ তার কাহিনী শুরু করবে।

অসাধারণ আনন্দ উল্লাসে দিন কাটছিলো। একঘেয়ে আনন্দও আমার বেশিদিন ভালো লাগে না। ইচ্ছে হলো, আবার অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। বাজারে গেলাম। অনেক অর্থব্যয় করে বহু মূল্যবান জিনিসপত্র সওদা করে গাঁটরি বাঁধলাম। আমি জানতাম কোন্ কোন্ জিনিস বিদেশের বাজারে চাহিদা বেশি। সেই সব জিনিসপত্রেই বোঝাই করলাম আমার বাক্স প্যাটরা প্রভৃতি।

সন্ধান পেলাম, সুন্দর একখানা আনকোরা জাহাজ বিক্রী আছে। শুধু দেখতেই বাহারী নয়, তার সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি আমার খুব পছন্দ হলো। জাহাজের নওজোয়ান কাপ্তেনটিও দারুণ চৌকস। এই বয়সে সে তামাম দুনিয়ার সব দেশে জাহাজ ভিড়িয়েছে। দাম কিছু বেশিই নিলো, তা নিক, জাহাজখানা আমার বেশ মনের মতো হলো।

আমার চেনাজানা পেয়ারের সওদাগর বন্ধুদের খবর দিলাম। তারা যদি বাণিজ্যে যেতে ইচ্ছা করে আমার জাহাজে যেতে পারে। পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের প্রায় সকলেই তল্পিতল্পা নিয়ে জাহাজে উঠে বসলো।

দিনক্ষণ দেখে একদিন জাহাজ ছেড়ে দিলাম। ভেসে চললাম অজানার সন্ধানে। এদেশ থেকে ওদেশ, দ্বীপ থেকে দীপান্তরে সওদার সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। কত নতুন নতুন শহর বন্দর দেখতে থাকি। সেই সব দেশের হাটে বাজারে গঞ্জে বিক্রি করি বাগদাদের বাহারী জিনিসপত্র। বিদেশীরা হুমড়ী খেয়ে পড়ে। এমন জিনিস তারা কখনও চোখে দেখেনি। বেশ চড়া দামে বিক্রী হতে থাকে মাল।

এইভাবে একদিন সমুদ্র মধ্যে এক সুন্দর দ্বীপে এসে নোঙর করলাম। যেদিকে তাকাই সবুজের সমারোহ। বিশাল বিশাল গাছপালা। আমরা সবাই নামলাম। খানাপিনা পাকাবার ব্যবস্থা করা হলো।

আমি চারদিক ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির শোভা দেখতে থাকি। এক জায়গায় এসে গাছের পাকা ফল পাড়লাম। পাশেই কুলকুল রবে ঝর্ণা বয়ে চলেছে। গাছের সুমিষ্ট ফল ঝরণার জল খেয়ে প্রাণ ভরে গেলো। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছিলো। আবেশে দু চোখ জুড়িয়ে আসে।

কতক্ষণ ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম জানি না, কিন্তু দ্রুতপায়ে জাহাজের দিকে এসে দেখি জাহাজখানা নাই। মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। ওরা আমাকে ফেলে রেখেই জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। এই নিরালা নির্জন প্রান্তরে আমি একা-কপর্দক শূন্য। আমার যা কিছু সবই ছিলো ঐ জাহাজে।

কিছুই বুঝতে পারলাম না, কেন ওরা আমাকে এই নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে চলে গেলো? কী তাদের মৎলব?

যতই ভাবি, কোনও কূলকিনারা পাই না। বুক ফেটে কান্না এলো, হায় খোদা, একি কঠিন পরীক্ষায় ফেললে? এই কি আমার নিয়তি? প্রথম যাত্রায় তোমার দয়ায় কোনওরকমে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এবার? এবার কি করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো? বার বার কি বিপদে বাঁচা যায়?

আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে তাকি। কখনও বা নিজের কপালটা মাটিতে ঠুকি, এ কি করলে আল্লাহ। এমন শাস্তি কেন আমায় দিলে? কী পাপ আমি করেছি? হায়, আমার আবার কেন এই সমুদ্রযাত্রার দুর্মতি হলো। বেশ তো মহা সুখে ছিলাম বাগদাদে। কেন আমাকে সুখে থাকতে ভূতে কিলালো? খাওয়াপরা, ধনদৌলত কোনও কিছুরই তো অভাব ছিলো না আমার। তবে কেন সেধে এই বাঁশ ঘাড়ে নিতে গেলাম! প্রথমবারের সমুদ্রযাত্রায় যা পেয়েছিলাম—সাতপুরুষ দিবি আরামে বসে খেতে পারতাম। কেন আবার আমার লোভ হলো—কেন—কেন?

মাথা ঠুকতে ঠুকতে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়লাম।

অবশেষে আমি বুঝলাম, এইভাবে নিজেকে ধ্বংস করে কোন ফয়দা নাই। হাহুতাশ করে মাথা ঠুকলে এ বিপদের সুরাহা হবে না। সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় উপায় খুঁজতে হবে। তারপর উপরে আল্লাহ আছেন, তিনি যদি দয়া করেন, উদ্ধার পেয়ে যাবো। আর না হলে মরতে হবে। উপায় কী?

উঠে দাঁড়িয়ে এদিক দিক চেয়ে দেখলাম খানিকক্ষণ। তারপর একটা বিরাট গাছের ডালে উঠে বসলাম। কি জানি, কোথায় ওৎ পেতে আছে কোন্ জন্তুজানোয়ার। গাছের অত্যুচ্চ শিখরে উঠে এদিক ওদিক যে দিকে তাকাই কোনও জনবসতি দেখি না। চারদিকে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত গহন গভীর বন-জঙ্গল, ধূধূ করা মাঠ, প্রান্তর, সমুদ্র, পাহাড় আর পাখী। দেখতে দেখতে হঠাৎ একদিকে বহু দূরে কি যেন উজ্জ্বল সাদা ধরনের একটা বস্তু নজরে পড়লো। কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম না।

গাছ থেকে নেমে পড়লাম। কিন্তু একা একা এগিয়ে যেতে গা ছমছম করতে লাগলো। যাই হোক, এদিক ওদিক খুব ভালোভাবে দেখে শুনে অতি সন্তর্পণে সেই অদ্ভুত সাদা বস্তুটার উদ্দেশে এগোতে থাকলাম। পায়ে পায়ে এক সময় পৌঁছেও গেলাম তার কাছে। বিশাল বিরাট পেল্লাই একটা গম্বুজ। সাদা পাথরের তৈরি। চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। কিন্তু না, কোথাও একটা দরজা নাই। অথবা ভেতরে ঢোকার কোনও সিঁড়ি বা পথ—কিছুই দেখতে পেলাম না। অনেক রকম কায়দা কসরৎ করে গম্বুজটার মাথার ওপরে ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু

বৃথাই আমার কোসিস। এমন তেলতেলে মসৃণ তার গা—যে কোনও রকমেই আঁকড়ে ধরে ওপরে ওঠা সম্ভব না। পা-এর সামনে পা রেখে সার গম্বুজটা প্রদক্ষিণ করে মেপে দেখলাম—একশো পঞ্চাশ পদক্ষেপ।

গম্বুজের ভিতরে ঢোকার বা ওপরে ওঠার ফিকির খুঁজতে খুঁজতে কখন যে সূর্য পাটে বসেছে বুঝতে পারিনি। ধীরে ধীরে যখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো তখন আমার চৈতন্য হলো। তাই তো—এখন কি করি।

প্রথমে মনে হয়েছিলো, একখণ্ড বিশাল কালো মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাই বা হবে কি করে? এই দারুণ গ্রীষ্মে এমন বর্ষার মেঘ আসবে কোথা থেকে? পরে বুঝতে পারলাম, মেঘ নয়, একটি বিশাল পাখী ডানা মেলে নিচের দিকে নেমে আসছে।

অনেক গল্প কাহিনীতে পড়েছিলাম, একরকমের পাখী আছে তারা দেখতে ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো। এদের নাম রকপাখী। এবার আমি আন্দাজ করতে পারলাম, যাকে আমি এতক্ষণ একটা গম্বুজ বলে মনে করেছিলাম আসলে তা ঐ রক পাখীরই ডিম।

একটু দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পাখীটা নেমে এসে তার বিশাল বিস্তৃত ডানা দুখানা মেলে সেই গম্বুজটার ওপরে বসলো।

মাথায় একটা মৎলব এলো। মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে অতি সন্তর্পণে ডিমটার পাশে চলে এলাম। পাখীটা তখন পাখা দুখানা দিয়ে ডিমটাকে আচ্ছাদিত করে তা দিচ্ছে। ডিমের দুপাশে তার দুখানা পা ঝুলে পড়েছে। মাথার পাগড়ীটা খুলে আলগোছে পাখীর একটা পায়ে ফাঁস পরিয়ে দিলাম। ভাবলাম, যখন সে আবার আকাশে উড়বে, ফাঁসটা পায়ে আটকে যাবে, আর পাগড়ীর অপরপ্রান্ত আঁকড়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে আমিও তার সঙ্গে উড়ে চলবো। শুনেছি, এই রক পাখিরা নাকি আস্ত একটা হাতীকেও ঠোঁটে ধরে তুলে নিয়ে যায়।

এই সময়ে রাত ফুরিয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো ছিয়ানব্বইতম রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে শুরু করে ঃ

সারাটা রাত ডিমটার পাশে আমি উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম। আমার হাতের কব্জীতে বাঁধা পাগড়ীর অন্য এক প্রান্ত। চোখে তন্দ্রা নাই। কখন রক আকাশে উড়বে তারই অধীর প্রতীক্ষায় রাতের প্রহর গুণতে থাকি। মনে মনে আশার জাল বুনি, হয়তো রক আমাকে এই নির্জন কারাদ্বীপ থেকে উদ্ধার করে কোনও এক জনবসতি এলাকায় নিয়ে যাবে। তারপর ঘরে ফেরার পথ আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পাবো।

এই সব আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতে এক সময় ভোর হয়ে আসে। ডানা ঝাপটে রক আকাশে উড়লো। আমি প্রাণপণে পাগড়ীর প্রান্ত আঁকড়ে ধরে থাকি। পাখীটা শোঁ শোঁ করে খাড়াই উপরে উঠে যায়—একেবারে মহাশূন্যে, প্রায় বেহেস্তের কাছাকাছি। মনে হতে থাকে, এর ওপরে বুঝি আর যাওয়ার কোনও পথ নাই। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, পাখীটা তীরবেগে নিচের দিকে নামতে শুরু

করেছে। সারা দেহের রক্ত শির শির করে মাথার দিকে ধাবিত হতে লাগলো। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরই অনুভব করলাম আমার শরীরের ওজন একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, এক পর্বতমালার ওপরে এসে সে বসেছে।

ক্ষিপ্র হাতে কব্জীর বাঁধন খুলে পাগড়ীটা ফেলে দিই। কি জানি, আবার যদি এখুনি সে আকাশে উঠে যায়।

আমার অনুমানই ঠিক। আর এক পলক দেরি করলেই আবার সে আমাকে নিয়ে আকাশে উড়ে যেত। ভাগ্যিস পাগড়ীর ফাঁসটা আমি পাখীটার পা থেকে খুলে ফেলতে পেরেছিলাম।

কিন্তু না পারলেই বোধহয় ভালো হতো। পাখীটা উড়তে উড়তে সমুদ্রের ওপারে কোন অজানা দেশে অদৃশ্য হয়ে গেলো। দেখে শিউরে উঠলাম, পর্বতচূড়া থেকে ডানা ঝাপটে ওঠার সময় সে বিশাল কে পাহাড়ী ময়াল সাপ ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে গেলো। মনে হয় পাহাড়ের মাথায় ঐ সাপটাকে দেখেই সে নেমে এসেছিলো।

আমার প্রাণ ভয়ে উড়ে গেলো। ঐ ভয়ালভয়ঙ্কর সাপটা এই পর্বত কন্দরেই কোথাও নিশ্চয়ই ছিলো। আর একটা যখন দেখলাম, তখন বিশ্বাস কি, আরও হাজারটা থাকতে পারে।

এদিক ওদিক ভালো করে তাকালাম। না, কোথাও কোনও গাছপালা, ঝর্ণা, নদী কিছুই নাই। সেই দ্বীপটা তবু অনেক ভালো ছিলো—জনমানব না তাক, ফলমূল জল প্রচুর ছিলো। না কেয়ে অন্তত মারা যেতাম না। কিন্তু এ যে একেবারে নির্জলা নিষ্ফলা বন্ধুর মরুপর্বত। এখানে শুধু বিষধর সাপের আড্ডা। একবার তাদের নিশ্বাসের আওতায় পড়লে আর রক্ষা নাই। প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে নিয়ে মুখের গহ্বরে পুরে ফেলবে। যত বড় বীরপুরুষই হোক, পালাতে পারবে না।

মৃত্যু অনিবার্য ভেবেই সেই পর্বত শীর্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে ভাবছি। খিদে পেলে কি খাবো। তৃষ্ণার জল দেবে কে? উফ্ ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। এ একেবারে কড়াই থেকে চুল্লিতে এসে পড়েছি।

ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকি। একটু নামলেই একটা উপত্যকা। পর্বতসঙ্কুল হলেও মোটামুটি সমতল। নামতে নামতে, কি আশ্চর্য, যেদিকে তাকাই শুধু দেখি হীরের স্তূপ। চোখ ঝলসে যায়। দূর থেকে এতক্ষণ যেগুলোকে পাথরের টুকরো বলে ভ্রম হচ্ছিল আসলে তা সবই ছোট বড় হীরে। কোথাও কোথাও এই হীরের স্তূপ প্রায় মানুষ সমান উঁচু হয়ে উঠেছে।

আমি অবাক হয়ে সেই হীরের স্তূপ দেখছি এমন সময় নজরে পড়লো কিছুটা দূরে অসংখ্য সাপ কিলবিল করছে। ভয়ে শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে।

দেখলাম সাপগুলো ধীরে ধীরে তাদের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এই সাপগুলো রকপাখীর ভয়ে দিনেরবেলায় আদৌ বাইরে বেরোয় না। রাতেরবেলা, যখন রক-এর উপদ্রব থাকে না, ওরা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আহারের সন্ধান করে। এক-একটা সাপ এত বড় যে একটা হাতী পর্যন্ত অনায়াসে গিলে ফেলতে পারে।

প্রতি পদক্ষেপের আগে খুব ভালোভাবে জায়গাটা দেখে নিই। কি জানি, হয়তো সাপের গর্তেই পা রাখবো। মনে মন নিজের নসীবের কথা ভাবি। সুখে থাকতে ভূতে কিলালো। তা না হলে অমন বেহেস্তের বাগদাদ ছেড়ে এই দোজকের দক্ষিণ দুয়ারে আসবো কেন?

সারাটা দিন আমি একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে কাটালাম। কিন্তু একটিমাত্র গুহা ছাড়া কোনও কিছুই চোখে পড়লো না। প্রাণে আমার সাপের ভয়। ক্ষিদেতেষ্টা মাথায় উঠেছে। সারাটা দিনের মধ্যে সেসব কথা মনেও এলো না।

ক্রমে সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে আসতে থাকে। আমি আর বাইরে থাকা নিরাপদ মনে না করে সেই ছোট গুহাটার ভিতরে কোনওরকমে শরীরটাকে গলিয়ে দিলাম। একটা পাথরের চাঁই দিয়ে চাপা দিয়ে দিলাম গুহাটার মুখ। ভাবলাম, কোনওরকমে রাতটুকু তো কাবার করা যাক। তারপর কাল সকালে যা ভাগ্যে থাকে হবে।

গুহার ভিতরে একটা কোণ বেছে নিয়ে শুতে যাবো হঠাৎ সামনের পাথরের চাঁইটা কেমন নড়েচড়ে উঠলো। সর্বনাশ! দিনেরবেলায় যাকে একখণ্ড কালো পাথরের চাঁই ভেবেছিলাম আসলে সেটা একটা সাপ—কুণ্ডলি পাকিয়ে ডিমে তা দিচ্ছে। আমার অবস্থা তখন যে কি; বুঝতেই পারছেন। সারা শরীর অবশ হয়ে গেলো। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। তারপর আর কিছু মনে নাই।

সকালবেলায় জ্ঞান ফিরে পেলাম। অতি সন্তর্পণে গুহার মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দেহটাকে টেনে বাইরে বের করে আসতে পারলাম। গতকাল সারা দিনরাত্রি উপবাসে কেটেছে। তার উপর স্নায়ুর ওপর ঐ ভয়ঙ্কর চাপ—আমার শরীরের সব শক্তি যেন কে কেড়ে নিয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নাই। তবু কোনওরকমে দেহটাকে তুলে ধরলাম। ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না। মাতালের মতো টলতে থাকি। হঠাৎ থপ করে কি একটা শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি আমার সামনে এসে পড়েছে প্রকাণ্ড মাংসের একটা খণ্ড। অবাক হলাম। কাছে গিয়ে দেখি একটা ভেড়ার চার ভাগের এক ভাগ ছালচামড়া ছাড়ানো মাংসপিণ্ড।

মনে হলো, গল্প শুনেছিলাম, জহুরীরা এই হীরক পাহাড় থেকে হীরে সংগ্রহ করার জন্য ভেড়ার মাংসপিণ্ড ছুঁড়ে দেয়। কাঁচা মাংসের গায়ে হীরের কিছু টুকরো গেঁথে যায়। তারপর রক অথবা বাজপাখীরা এসে মাংসের খণ্ডটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের বাসায় গিয়ে বসে। সেই সময় পাখীগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে তারা হীরের টুকরোগুলো বেছে নিয়ে যায়।

মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। বড় বড় অনেকগুলো হীরে কুড়িয়ে আনলাম কুর্তা কামিজ ইজার পাতলুন সব খুলে হীরের টুকরোগুলো বোঝাই করে কোমরে ঝুলিয়ে নিলাম। তারপর পাগড়ীটা খুলে মাংসর পিণ্ডটাকে ফাঁস দিয়ে এমনভাবে বাঁধলাম, যাতে মাংসর বেশির ভাগ অংশই অনাবৃত থাকে। তারপর পাগড়ীর অপর প্রান্ত আমার হাতে বেঁধে একটা পাথরের চাঁই-এর আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। একটুক্ষণ পরে শোঁ শোঁ করে নেমে এলো একটা রকপাখী। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেলো মাংস পিণ্ডটা। আর সেই সঙ্গে আমাকেও। ঝুলতে ঝুলতে আমিও রকপাখীর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখীটা তার আস্তানায় নামলো। আমি কব্জীর বাঁধন খুলে একটু দূরে সরে পড়লাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বৃদ্ধ জহুরী এগিয়ে এলো সেখানে। আমাকে দেখে সে অবাক হয়েছে। মানুষের মুখ দেখে আমার তো আর আনন্দ ধরে না। আমি খুশিতে লাফাতে লাফাতে তার দিকে এগিয়ে যাই। সে কিন্তু খুশি হতে পারলো না। রুক্ষ স্বরে কৈফিয়ৎ চাইল, কে তুমি? এখানে কী করতে এসেছ, চোর কোথাকার। আমার হীরে চুরি করার মৎলব করেছ? কিন্তু জেনে রাখ, সেটি হবে না। এ আমাদের বংশজাত অধিকার। আমাদের রুটিতে হাত দিতে এলে কিছুতেই ববদাস্ত করবো না।

আমি হাসতে হাসতেই বলি, আপনি অত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন কেন, শেখসাহেব। আমি আপনার বাড়া ভাতে ছাই দিতে আসিনি। আপনার ধারণা বিলকুল ভুল। আমি চোরও না, ডাকাতও না—নেহাতই একজন সাদাসিধে সৎ সওদাগর। ভাগ্যের ফেরে আজ আমার এই দশা।

কামিজের জেব থেকে কয়েকখানা হীরে বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, এই নিন। হবে তো?

বৃদ্ধের চোখ ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে ওঠে, ইয়া আল্লাহ, এত বড় বড় হীরে তো জীন্দগীভর কখনও দেখিনি। আমাদের মাংসের পিণ্ডে তো ছোট ছোট হীরের কুচি আটকে আসে। এ হীরে তুমি কোথায় পেলে, বেটা?

—কোথায় পেলাম, পরে বলছি। আগে বলুন, আপনি খুশি হয়েছেন কিনা। না, আরও কয়েকটা দেব।

জহুরী বলে না, না, বাবা, আর কী করবো। এর একখানার দামেই সাতপুরুষ বসে বসে খাওয়া যায়। আমার তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তা ছাড়া বংশে বাতি দেবার কেউ নাই। এই পয়সাই কে খাবে। ওসব তোমার নিজের কাছে রাখ।

আমি বললাম, আমাকে একটা থলেটলে দিতে পারেন?

তখনও আমি উলঙ্গ। আমার পাতলুনের দোনলায় ভরা হীরের টুকরো। বৃদ্ধ বললো, আলাবৎ, এই নাও থলে। কটা নেবে?

সমস্ত হীরেগুলো একটা বড় থলেতে বোঝাই করে আবার আমি কামিজ পাতলুন পরে সভ্য হলাম।

জহুরী জিজ্ঞেস করলো, ঐ দুর্গম হীরক পাহাড়ে কী করে তুমি গিয়েছিলে বেটা। ওখানে আজ অবধি কোনও মানুষ গিয়ে ফিরে আসতে পারেনি।

আমি আমার সমুদ্রযাত্রা থেকে শুরু করে আগাগোড়া সব কাহিনী তাকে খুলে বললাম।

বৃদ্ধ আমাকে বাহবা দিয়ে বললো, তোমার সাহস বটে। যাই হোক, আল্লাহর দোয়ায় প্রাণে বেঁচে গেছ।

আমি তখন দারুণ ক্ষুধার্ত। বললাম, কাল সারাদিন রাতে পেটে দানাপানি পড়েনি। কিছু খেতে দিতে পারেন।

বৃদ্ধ বললো, ও, তাই তো, আমি একেবারে খেয়াল করিনি, বাবা। চলো, আমাদের তাঁবুতে চলো। কাছেই।

ওদের তাঁবুতে এসে পেট ভরে খানাপিনা খেলাম। এতক্ষণে দেহে বল ফিরে এলো। সারাটা দিন ওদের তাঁবুতে ঘুমালাম। সন্ধ্যায় খেয়েদেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠলাম দেহ, মন বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে। ওরা আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে এলো। সেখান থেকে জাহাজে উঠে চলে এলাম কর্পূর দ্বীপে। এই দ্বীপে একটা প্রকাণ্ড বড় বৃক্ষ আছে। তার ডালপালার মধ্যে শখানেক মানুষ নির্বিবাদে লুকিয়ে থাকতে পারে। এই বৃক্ষের দুধের মতো সাদা রস থেকে তৈরি হয় কর্পূর।

এই দ্বীপটায় আমি অবশ্য কতকগুলো মারাত্মক রকমের হিংস্র জানোয়ার দেখে এসেছি। এই জানোয়ারটার নাম কারকাডন—অনেকটা আমাদের দেশের গণ্ডারের মতো দেখতে। এর নাকের ডগায় আছে প্রায় ছয় হাত লম্বা একটা শিং। এদের গায়ে ভীষণ জোর। বড় বড় হাতীর সঙ্গে যুঝতে পারে এরা। শিং দিয়ে গুতিয়ে গুতিয়ে হাতীকে মেরে না ফেলা পর্যন্ত এরা ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু হাতীটা মরে পড়ে গেলে এরা আর তার ধারে কাছে যায় না। রক পাখিরা তাকে তাকে থাকে। হাতীর বিশাল বপুটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই উড়ে এসে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে মহাশূন্যে উড়ে যায়।

এই দ্বীপে এসে আমি আমার একখানা হীরে বিক্রি করে সোনা কিনলাম। এখান থেকে দেশে ফেরার জন্য জাহাজ ভাড়া করতে হবে। জাহাজ-এর ভাড়া মেটাবার জন্য সোনা দরকার।

এ বন্দর থেকে সে বন্দর, আবার সেখান থেকে অন্য এক বন্দর—এইভাবে একদিন আমি বসরায় এসে পৌঁছলাম। আমার মন খুশিতে নেচে উঠলো। দেশ আর বেশি দূর নয়। দু-এক দিনের মধ্যেই আমি আমার জন্মভূমি চিরসুন্দর সুখের নীড় বাগদাদে ফিরে এলাম।

আমাকে পেয়ে আপনজনরা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। আমিও বহুদিন বাদে তাদের সঙ্গ ফিরে পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলাম। সোনাদানা হীরে—যা এনেছিলাম সবারই হাতে কিছু কিছু দিলাম। অনেকদিন পর আবার হাসি গানে ভরে উঠলো আমার ঘর।

এর পর থেকে নানা ভোগবিলাসের মধ্যেই দিন কাটতে লাগলো। দামী দামী মদ আর মাংস সপরিবারে নিত্য খাই। বাহারী সাজপোশাক পরি। গান বাজনা হৈহল্লার মধ্যে আমার মহা আনন্দে দিন কাটতে থাকে। প্রতিদিন আমার ইয়ার বন্ধুরা আমার কাছে গল্প শুনতে আসে। বহু বিচিত্র আমার জীবনের অভিজ্ঞতা। দিনের পর দিন বলেও শেষ করা যায় না।

এই হলো আমার দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার কাহিনী। কিন্তু আগামীকাল, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তোমাদের আমি তৃতীয় সমুদ্রযাত্রার বিচিত্র কাহিনী শোনাবো। যে দুটো কাহিনী তোমরা শুনলে সে কাহিনী তার চেয়ে আরও অনেক বেশি রোমাঞ্চকর।

রাত্রি অবসান হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দু'শো আটানব্বইতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

সিন্দবাদ নাবিক গল্প থামিয়ে চুপ করে। টেবিলে খানাপিনা সাজানো ছিলো। বান্দারা উপস্থিত অভ্যাগতদের সকলকে খানাপিনা দিলো। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বৃদ্ধ সিন্দবাদ কুলি সিন্দবাদকে একশোটা সোনার মোহর দিয়ে বলে, এটা রাখো। আমি খুশি হয়ে দিলাম।

কুলি সিন্দবাদ কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করে তার দান। মহা আনন্দে বাসায় ফিরে আসে। পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে রুজু নামাজাদি সেরে আবার সে বৃদ্ধ সিন্দবাদের প্রাসাদের দিকে রওনা হয়।

সিন্দবাদ নাবিক তারই প্রতীক্ষায় বসেছিলো। আদর করে কাছে বসায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক এক করে আবার সব অতিথি অভ্যাগতরা এসে হাজির হয়। যথারীতি টেবিলে সাজানো ছিলো সকালবেলার নাস্তা। খানাপিনা শেষ হলে সিন্দবাদ কাহিনী শুরু করে ঃ

বন্ধুগণ, আল্লা যে সর্বশক্তিমান সে তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু তার অসাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি বিচক্ষণতাও মানুষের চাইতে অনেক অনেক বেশী। তা না হলে যে বিপদে পড়ে একদিন আমার প্রাণসংশয় ঘটেছিলো, এইরকম বিত্ত বৈভবের মধ্যে মহা আনন্দে দিন কাটাতে কাটাতে, আবার সেই প্রাণঘাতী বিপদের মধ্যে পা বাড়াবো কেন? যথা সময়ে তিনি আমার মন থেকে সেই সব আতঙ্ক ভয় মুছে নিয়েছিলেন। তাই আবার আমার সমুদ্রযাত্রার বাসনা হলো। বাগদাদে বসে বসে একঘেয়ে আনন্দের জীবন আর আমার ভালো লাগলো না। কোনও বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ের মতো ঘরে বসে বসে বিলাস ব্যসনের মধ্যে দিন কাটাবো আমার রক্তের ধারা সেরকম নয়। তাই আবার একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

এবার আমি আর ভারি ভারি মোটা সওদা সঙ্গে নিলাম না। বিদেশের বাজারে আরবের মূল্যবান আতর নির্যাসের কদর খুব বেশি। এছাড়া বাগদাদের সূক্ষ্ম শিল্পকর্মও অন্য দেশে চড়া দামে বিক্রি হয়। পয়সার তো আমার অভাব নাই তখন, অনেক অর্থ ব্যয়ে এই সব বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহ করে বসরাহয় এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে দুনিয়ার প্রায় সব জায়গারই জাহাজ ছাড়ে। বসরাহয় গিয়ে একদল সাচ্চা মুসলমান, সদাশয় সওদাগরের সঙ্গে আমার

দোস্তি হয়ে গেলো। তারাও বাণিজ্যে যাবে। ভালো সঙ্গীদল পেয়ে আমিও ভিড়ে গেলাম তাদের দলে।

দিনক্ষণ দেখে, আল্লাহর নাম নিয়ে একদিন জাহাজে চেপে বসলাম আমরা।

পালে হাওয়া লাগলো। জাহাজ চলতে থাকলো।

এক এক করে অনেক বন্দর আসে। শহরে শহরে আমরা সওদা ফিরি করি। আমি যে-ধরনের মূল্যবান বিলাস সামগ্রী সঙ্গে নিয়েছি সে-ধরণেও সওদা বড় একটা কেউই সঙ্গে নিতে পারে না। তাই যেখানেই দেখাই সবাই লুফে নিতে থাকে। প্রতিটি সওদায় মোটা লাভ হতে থাকে আমার। খুশিতে মন নেচে ওঠে।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন আমরা মুসলমান সুলতানদের সলতানিয়াৎ এলাকা ছাড়িয়ে মাঝ-সমুদ্র ধরে পাড়ি জমিয়েছি। হঠাৎ কাপ্তেন চিৎকার করে ওঠে। সর্বনাশ!

আমরা ছুটে গেলাম তার কাছে।—কী? কী হয়েছে?

সে কোনও কথার জবাব দেয় না। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে, আর কপাল চাপড়ায়।

আমরা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে, বলবে তো?

কাপ্তেন তখন পাগলের মতো প্রায়। মাথার চুল, আর জামাকাপড় ছিঁড়ছে। চোখে মুখে তার সে-এক অবর্ণনীয় নিদারুণ আতঙ্ক। কোনওরকমে সে বলতে পারে, পালের হাওয়া ঘুরে গেছে। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখন যে পথে জাহাজ চলেছে, সে পথে চলতে থাকলে আমরা বাঁদর দ্বীপে পৌঁছব। সেখানে একবার গেলে আর কেউ ফিরে আসতে পারে না।

আমরা চিৎকার করে উঠি, যেভাবেই হোক, জাহাজের গতি ফেরাও।

কাপ্তেন বললো, অসম্ভব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ বাঁদর দ্বীপে পৌঁছে যাবে। এখন চেষ্টা করে কোনও লাভ নাই। জোর করে ঘোরাতে গেলে জাহাজ ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাবে।

আমরা উদ্ভ্রান্তের মতো জাহাজের ডেকে ছুটাছুটি করতে লাগলাম। সামনে মৃত্যু অবধারিত জেনে কে আর চুপচাপ বসে থাকতে পারে?

কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজ বাঁদর দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়লো। জাহাজটা ঘিরে ধরলো বাঁদরের পঙ্গপাল। সংখ্যায় কত—তার হিসাব বলতে পারবো না। দশ বিশ—এমন কি পঞ্চাশ হাজারও হতে পারে। এক বিশাল সেনাবাহিনী বলা যায়।

আমরা জাহাজের মধ্যে ভয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। নিচে নামবো—সাধ্য কী? কিন্তু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সহজাত অসভ্যতায় 'স্বাগত' জানাতে থাকে। মুখের ভাষা দুর্বোধ্য, কিন্তু ভাবখানা এই—নিচে নেমে এসো বাছাধনরা, আমরা তোমাদের বুক চিরে রক্ত পান করবো।

ওদের আক্রমণ করার দুঃসাহস আমাদের নাই। অথবা ওদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তিও আমরা ধরি না। এই অবস্থায় আশু কর্তব্য কী, কিছুই ঠিক করতে পারছি না। এমন সময় হুড়পাড় করে তারা আমাদের জাহাজের ডেকে উঠে এলো। আমরা জড়সড় অচল হয়ে বসে রইলাম। ওরা আমাদের সওদাপত্র তছনছ করতে লাগলো। ওদের বীভৎস চেহারা দেখে আর বিকট চিৎকার শুনে হৃৎপিণ্ড শুকিয়ে যায়। বিচিত্র ধরনের অঙ্গভঙ্গী আর অদ্ভুত ধরনের মুখ ব্যাদন করে তারা যে কত কি বলতে লাগালো তার একবর্ণও বুঝলাম না। আমাদের সামনেই তারা মাস্তুলের মাথায় উঠে পালের কাছি খুলে দিলো। তারপর হাল আর দখল অধিকার করে জাহাজটাকে সমুদ্রসৈকতে নিয়ে গিয়ে ভেড়ালো।

এক এক করে আমাদের সবাইকে টানতে টানতে তীরে নামালো ওরা। আমরা তখন কোরবানীর খাসী। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও রুখে দাঁড়াবার দুঃসাহস নাই।

আমাদের সকলকে নামিয়ে দিলো, কিন্তু ওরা কেউই জাহাজ থেকে নামলো না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের যথাসর্বস্ব সওদাপত্র ঠাসা জাহাজখানা নিয়ে ওরা মাঝদরিয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আমার মতো অনেকেই বুক ভাঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু কান্নাকাটি করেই বা লাভ কী? বিদেশে বিপর্যয় ঘটতেই পারে। তার জন্য আগে থেকে যেমন সতর্ক হওয়াও সম্ভব না, তেমনি বিপদ এসে গেলে ভেঙ্গে পড়াও সঙ্গত না। অবস্থা ও সময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলাই বিচক্ষণতা।

যাই হোক, আমাদের সর্বস্ব চলে গেছে। এখন বাঁচার পথ বের করতে হবে। আমরা সকলে সেই সমুদ্রসৈকতে বালির উপরে বসে এক সভা করলাম। ঠিক হলো আগে আমরা দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকে কিছু খানাপিনার সন্ধান করবো। প্রথমে ফলমূল এবং জলের সন্ধান করে তারপর অন্য ফিকির খুঁজতে হবে।

সমুদ্রতীর থেকে খানিকটা ভিতরে ঢুকতেই নানারকম পাকা মিষ্টি ফল আর ঝর্ণার জলের খোঁজ পাওয়া গেলো। ধরে প্রাণ এলো। যাই হোক, অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে না।

এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে পাকা মিষ্টি ফলের সন্ধান করতে করতে আমরা আরও অনেকটা ভিতরে ঢুকে পড়েছি। হঠাৎ নজরে পড়লো, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, অদূরে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা। আপাতভাবে মনে হয় জনমানব শূন্য।

খানাপিনা শেষ করে আমরা ঐ ইমারতের দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড উঁচু, প্রস্থে দৈর্ঘে সমান—চতুষ্কোণাকৃতি পেল্লাই এক প্রাসাদ। চারদিক পাথরের প্রাচীরে ঘেরা। দু-দুটো সিংহ দরজা পেরিয়ে তবে প্রাসাদের চত্বরে প্রবেশ করা যায়।

শুধু সিংহ দ্বারই হাট হয়ে পড়ে আছে। সিংহ সদৃশ প্রহরী আজ আর নাই সেখানে। আমরা ভিতরে ঢুকে গেলাম। বিরাট প্রশস্ত প্রাঙ্গণসদৃশ এক কক্ষ। সারা ঘরময় থরে থরে সাজানো রানাবান্নার সাজ-সরঞ্জাম। বড় বড় কড়াই ডেকচি হাতা বেড়ি প্রভৃতি। ঘরের মেজেয় স্তূপীকৃত হাড়। কতকগুলো একেবারে শুকনো সাদা। আবার কতকগুলো এখনও মাংসের ঝোলঝাল লেগে রয়েছে। একটা পচাদুর্গন্ধ নাকে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। পলকের মধ্যেই আমরা সংজ্ঞা হারিয়ে মেজেয় লুটিয়ে পড়লাম।

সূর্য সবে পাটে বসেছে; এমন সময় বাজ পড়ার মতো হুঙ্কারে আমাদের নিদ্রাভাব কেটে গেলো। ধড়মড় করে উঠে বসতেই দেখলাম বিশাল দৈত্যের মতো একটা কালো কুৎসিত কদাকার একটা মানুষ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে। লম্বায় সে তাল গাছের সমান, হতকুৎসিৎ বাঁদরের চেয়েও দেখতে বীভৎস। তার চোখ দুটো গোলাকৃতি আগুনের ভাঁটা। গাঁইতির কাটার মতো তার দাঁত আর মুখের গহ্বর ঠিক একটা ইঁদারার মতো। নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে বুক অবধি। কুলোর মতে কান দুখানা কাঁধ ঢেকে ফেলেছে। হাতের নখগুলো ইয়া বড় বড়, আর থাবা—ঠিক সিংহের মতো।

দেখা মাত্র আমরা ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম। পরে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। দেওয়ালের পাশে একটা বেঞ্চির উপরে সে বসলো। এক এক করে আমাদের সকলের ওপর চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলো। তারপর উঠে এসে সিংহের মতো থাবা দিয়ে আমার ঘাড়টা চেপে ধরলো। তারপর ছোট্ট একটা ইঁদুর ছানার মতো আমার দেহটাকে শূন্যে তুলে এদিক ওদিক ঘোরাতে থাকলো। তারপর কি খেয়াল হলো, আমাকে মেজের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আর একজনের ঘাড়ে থাবা বসালো। হয়তো আমার কৃশকায় দেহটা তার পছন্দসই হলো না। কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাকে ধরলো তাকেও দু-একবার দুলিয়ে ছুড়ে দিলো। এইভাবে এক এক করে সে সকলের দেহের ওজন পরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। সব শেষে সে এলো কাপ্তেনের কাছে।

কাপ্তেনের শরীরটা বেশ মোটাসোটা তাগড়াই। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তাকে দেখে দৈত্যটার মুখে হাসি আর ধরে না। অর্থাৎ খুব পছন্দ হয়েছে তার।

এক হাত দিয়ে ওর কোমরটা আর এক হাত দিয়ে ঘাড়টা ধরে একটা মোচড় দিয়ে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেললো সে। তারপর একটা বিরাট কড়াই-এর মধ্যে ফেলে উনুনে আগুন জ্বেলে দিলো। কিছুক্ষণ পরে কাপ্তেনের দেহের আধ সেদ্ধ মাংসপিণ্ডটা তুলে গোগ্রাসে খেতে থাকলো সে। খুব তৃপ্তি করে খেয়ে মোটা মোটা হাড়গুলো মেজের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়া মাত্র সে বেঞ্চিটার ওপরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে মোষের মতো নাক ডাকাতে লাগলো। এইভাবে পরদিন সকাল অবধি সে ঘুমিয়ে কাটালো। ঘুম ভাঙ্গামাত্র কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যে পথে নেমে এসেছিলো সেই সিঁড়ি দিয়েই আবার ওপরে উঠে চলে গেলো। আমাদের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। বেঁচে আছি কি নাই, সে বোধশক্তিও নাই কারো।

যখন বুঝলাম সে সত্যিই চলে গেছে, আমরা হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললাম।—এর চেয়ে গহিন সমুদ্রে ডুবে মরাও ঢের ভালো ছিলো, আল্লাহ। অথবা বাঁদরগুলো যদি আমাদের কলিজা ছিঁড়ে রক্ত পান করতো সেও বরং সহ্য হতো, কিন্তু কড়াই-এর ফুটন্ত তেলে ফেলে ভাজা হওয়া—উফ্ঃ!

কিন্তু ভেবে আর লাভ কী? নসীবে যা লেখা আছে তা হবেই। আল্লাহই একমাত্র ভরসা। তিনি না বাঁচালে কেউ বাঁচাতে পারবে না এখন।

প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। সারাদিন দ্বীপের এদিক ওদিক ঘুরলাম। লুকিয়ে থাকার মতো কোনও একটা গুহা বা ডেরা যদি কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু আতি পাতি করে খুঁজেও কোথাও কিছু পাওয়া গেলো না। সারা দ্বীপটায় আর কোনও বাড়িঘর নাই। না আছে কোনও পাহাড় পর্বত, না আছে কোনও গভীর জঙ্গল। সর্বত্রই ফাঁকা ফাঁকা গাছপালা বা উন্মুক্ত প্রান্তর।

সন্ধ্যা নেমে এলো। আমরা নিরুপায় হয়ে আবার সেই রাক্ষস পুরীতেই ফিরে এলাম। এছাড়া উপায়ই বা কী? রাক্ষসটার একটা গুণ—সে আমাদের একজনকে ছাড়া দুজনকে এক সঙ্গে খাবে না। কিন্তু এই অরক্ষিত গাছতলায় রাত কাটানর কী ভরসা। হয়তো এক রাতেই সদলে সকলে প্রাণ খোয়াবো আমরা। তার চাইতে যার নসীবে যা আছে, তাই হবে। রাক্ষস পুরীতেই যাওয়া যাক। যার বরাত খারাপ আজ রাতে তার প্রাণ যাবে—

আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৈত্যটা হুংকার ছাড়তে ছাড়তে নেমে এলো। আবার সে গত রাতের মতো এক এক করে সকলের দেহ পরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। কোনটা ওজনে বেশি ভারি। শেষ পর্যন্ত একজনকে বেছে নিয়ে একই কায়দায় আধাসিদ্ধ করে খেয়ে আবার বেঞ্চে শুয়ে পড়ে মোষের মতো নাক ডাকাতে লাগলো। যথারীতি পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার সে উপরে উঠে গেলো!

আমরা ঠিক করলাম, না, এই নারকীয় বীভৎস ব্যাপার আর সহ্য করা যায় না। এর চেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা ঢের ভালো। মরীয়া হয়ে উঠেছি সকলে, আজ যা হয় একটা এসপার-ওসপার করতেই যে হবে। আমাদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, শুনুন ভাইসব, নিজেরা নিহত হওয়া অথবা আত্মহত্যা করার চেয়ে এই শয়তানটাকে হত্যা করার ফিকির খোঁজা কি ভালো না? মরতে তো হবেই, তা বলে এইভাবে মরা? আসুন আমরা আমাদের শত্রুকে নিধন করি। তার জন্যে যদি মৃত্যু আসে আসুক—সে অনেক গৌরবের হবে। কিন্তু এতো কাপুরুষের মতো নিজের গলাটা হাড়িকাঠে বাড়িয়ে দেওয়া—

এরপর আমি উঠে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। —শুনুন শেখ সাহেবরা, দৈত্যটাকে যদি মারতে পারি তো খুব ভালো, কিন্তু না যদি পারি সে ক্ষেত্রেও তো একটা উপায় ভাবতে হবে। আমি বলি কি—আমরা একটা কাঠের ভেলা বানাই। আমি দেখেছি সমুদ্রের ধারে

অনেক কাঠের গুড়ি পালা দেওয়া আছে। ভেলাটায় চড়ে আমরা ভাসতে ভাসতে চলি। তারপর আল্লাহ যদি মুখ তুলে চান, নিশ্চয়ই কোনও জাহাজের নাবিক আমাদের তুলে নেবে। নতুবা হয়তো কোনও নতুন দ্বীপে গিয়ে ভিড়বো। আর যদি পথের মধ্যে ডুবেই মরি, সে-ও তো এর চেয়ে অনেক ভালো হবে। এই অবধারিত অপ-মৃত্যুর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করার চেয়ে অনেক ভালো হবে। অনেক গৌরবের হবে।

সকলে আমার কথায় সায় দিলো। —বহুৎ আচ্ছা, চমৎকার!

রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশোতম রজনী ঃ

বৃদ্ধ সিন্দবাদ তার কাহিনী বলছে ঃ

আমরা সকলে সমুদ্র-সৈকতে গিয়ে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে একটা ভেলা বানালাম। নানারকম কাঁচা পাকা ফলমূলে বোঝাই করলাম। বেশ কিছুদিনের খাবার সঙ্গে থাকা দরকার। না জানি কতদিনে নতুন দ্বীপের বা কোনও জাহাজের সন্ধান পাওয়া যাবে। এরপর আমরা আবার দৈত্যপুরীতে ফিরে আসি। যথা সময়ে রাক্ষসটা হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে নামে। তারপর এক এক করে বাছাই করে একজনকে কড়াই-এ চাপায়। আমাদের এই বীভৎসতা অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিলো। তবু চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম।

একটু পরে রাক্ষসটার খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমরা দুখানা ইয়া মোটা মোটা লোহার সিক এনে উনুনের মধ্যে রাখলাম। গনগনে আগুনে টকটকে লাল হয়ে উঠলো সিক দুটো। তারপর দু'জনে দুখানা তুলে এনে এক সঙ্গে ঢুকিয়ে দিলাম দৈত্যটার দুই চোখে। যন্ত্রণায় আকাশ-ফাটা আর্তনাদ করে ওঠে সে। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের কাজ হাঁসিল হয়ে গেছে। বিকটভাবে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে আমাদের দিকে তেড়ে আসে। কিন্তু এলে কি হবে, চোখ তো গেছে, আন্দাজে কি করে ধরবে আমাদের? আমরা ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করতে করতে পাশ কাটিয়ে যেতে থাকি। নিরুপায় হয়ে দৈত্যটা তখন গোঁঙাতে গোঁঙাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

এবার আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে সমুদ্রের ধারে এসে ভেলায় উঠে পড়লাম।

ভাবলাম পথের কাঁটা দূর হয়েছে। কিন্তু না, ভেলাটা তখনও তীর ছেড়ে খুব বেশিদূর যায়নি, দেখলাম, একটা কালো কদাকার মেয়েছেলে দৈত্যটার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে তীরের দিকে আসছে। মেয়েটা একখণ্ড পাথরের চাঁই এনে দিলো ওর হাতে। আর প্রচণ্ড বেগে সে ছুঁড়ে মারলো আমাদের ভেলা বরাবর। চোখে দেখতে না পেলে কি হবে, নিশানা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। আর একটু হলেই ভেলার মাঝখানে পড়তো চাঁইটা। নেহাৎ বরাতের জোর, এক দিকের কানায় লেগে কাত হয়ে গেলো খানিকটা। আমাদের দুটি লোক প্রাণ হারালো। তবুও, অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেলো। এর পরেও অবশ্য আরও কয়েকটা পাথরের চাঁই সে ছুঁড়েছিলো, কিন্তু ততক্ষণে আমাদের ভেলা তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

আল্লাহর দোয়ায় হাওয়া অনুকূল হলো। একটানা দুদিন-দুরাত্রি চলার পর আমরা একটা নতুন দ্বীপে এসে ভিড়লাম। নতুন জায়গা, কিছুই জানি না, সুতরাং খানাপিনা সেরে আমরা একটা বড় গাছের ডালে উঠে সে-রাতটা কাটালাম।

সকাল বেলা, অন্ধকার কেটে যেতেই, নজরে পড়লো, বিরাট বিরাট সাপ সেই

গাছের অন্য ডালে লেজ-জড়িয়ে ঝুলছে। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেলো। তাদের চোখগুলো যেন জ্বলন্ত ভাঁটা। লেলিহান জিহ্বা বের করে আমাদের দিকে জ্বল জ্বল করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ একজনের আর্ত চিৎকারে তাকিয়ে দেখি, আমাদের একজনকে প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলছে একটা সাপ। তারপর বিকট বিশাল হা করে তার গোটা দেহটা নিমেষের মধ্যে গিলে ফেললো সে।

হায় আল্লাহ, একি হলো, দৈত্যের খপ্পর থেকে যদি বা রেহাই পাওয়া গেলো কিন্তু এখন ভয়াল সাপের হাত থেকে বাঁচবো কি করে? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে। জ্ঞান চৈতন্য প্রায় নাই বললেই চলে। কোনও রকমে গাছের ডাল থেকে নামতে পারলাম আমরা। একটা ঝর্ণার ধারে এসে মুখ হাত ধুয়ে কিছু ফলমূল খেয়ে নিলাম। তারপর শুরু হলো আমাদের অন্বেষণ যাত্রা। কোথায় একটা নির্ভরযোগ্য আস্তানা পাওয়া যাবে তারই অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অবশেষে অনেক দূরে একটা গাছ নির্বাচন করা হলো। তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেতে দেখলাম। না, কোথাও কোনও সাপখোপ কিছু নাই। তাছাড়া গাছটা অনেক উঁচু। সে-রাতটা আমরা সেই গাছের ডালেই অনেকটা নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবো। মনে আশা হলো এতদিন পরে বোধহয় এই প্রথম আমাদের নির্ভয় রাত্রিবাস হবে। কিন্তু হায় কপাল, রাত, যত গভীর হতে থাকে চারদিকে ভয়াল সাপের নিশ্বাসের শব্দ শুনে কেঁপে উঠি। দিনের বেলায় তারা গাছে থাকে না। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়।

আমার নিচের ডালের সঙ্গী চিৎকার করে উঠে। বুঝলাম, যদিও অন্ধকারে চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, সাপের মুখে চলে গেছে সে।

তখন, সেই অন্ধকারে, গাছ থেকে নেমে পালাই তার সাধ্য কি? মরি বাঁচি এই গাছের ডাল আঁকড়েই রাতটা কাটাতে হবে। প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহর নাম জপ করতে থাকলাম।

সকাল হলো। দেখলাম সাপটা খেয়ে-দেয়ে কেটে পড়েছে। আমি গাছ থেকে নেমে পড়ি। তখন আমার মাথায় শুধু একমাত্র চিন্তা এই সাপপুরী থেকে পালাতে হবে। আবার সমুদ্রেই পাড়ি জমাবো। তাতে যদি ডুবেও মরি, কোন দুঃখ নাই।

সমুদ্রের দিকে চললাম। কিছুদূর যেতেই আমার বিবেক বাধা দিতে লাগলো। সামান্য সাপ-খোপের ভয়ে যদি পালাতে হয় তবে, দেশের সুখ-বিলাস ছেড়ে পরবাসের দুর্ভোগ পোয়াতে বেরুবার কি দরকার ছিলো? ভাবলাম, না, পলায়ন নয়, সাপের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। সেই উপায় খুঁজে বের করতেই হবে।

সুতরাং আবার আমি ফিরে এলাম। কতকগুলো টুকরো টুকরো কাঠ যোগাড় করলাম। দুপায়ে বাঁধলাম দুখানা। কোমর থেকে গলা অবধি বুক পিঠ ঢোকে বাঁধলাম কয়েকখানা কাঠে। দু'হাতে বাঁধলাম দুখানা। এইভাবে অনেকগুলো কাঠের টুকরো দিয়ে সারা শরীরটা মুড়ে ফেললাম। এবার যদি সাপ আমাকে আক্রমণও করে, গিলে ফেলতে পারবে না।

আমার এই কায়দায় সে রাতটা আমি সাপের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিলাম নিজেকে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ময়াল সাপ এসে আমাকে গ্রাস করার চেষ্টা করলো। কিন্তু দুস্তর কাঠের বাধা—সে কিছুতেই মুখে পুরতে পারলো না। কিছুতেই কায়দা করতে না পেরে শেষে সাপটা আমাকে জড়িয়ে ফেললো। কিন্তু তাতেও আমার কিছু অসুবিধে হলো না। তার প্যাচের বাঁধন কাঠের গায়েই আটকে থাকলো। আমার দেহে কোনও আঘাত করতে পারলো না।

এইভাবে সাপটা সারাটা রাত আমার সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে ভোরবেলা কেটে পড়লো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো একতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

যখন আমি নিশ্চিতভাবে বুঝলাম, সাপটা চলে গেছে, কাঠের টুকরোগুলো এক এক করে খুলে ফেললাম সব। সারাটা রাত এই কাঠের বন্ধনে কাটিয়ে শরীরটা অবশ অসাড় হয়ে গেছে। ঝর্ণার পাশে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে কিছু ফলাহার করে উন্মুক্ত সূর্যালোকে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

এইভাবে অনেকক্ষণ আয়েস করার পর, ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চলতে থাকি। হঠাৎ একটা মাস্তুল চোখে পড়লো। ছুটে আরো কাছে যেতেই পরিষ্কার দেখতে পেলাম, একখানা জাহাজ চলে যাচ্ছে। আমি দু হাত নেড়ে তারস্বরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু মনে হলো, কেউ শুনতে পেলনা। তখন আমার মাথার পাগড়ী খুলে জোরে জোরে দোলাতে থাকলাম। এবার কাজ হলো। বুঝলাম, ওরা আমার পাগড়ী নাড়া দেখতে পেয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপ্তেন জাহাজের গতি ঘুরিয়ে দ্বীপে এসে ভিড়লো। আমাকে ওরা তুলে নিলো জাহাজে।

ওরা আমাকে নতুন সাজ পোশাক দিলো, খানাপিনা দিলো। আমি আবার নতুন জীবন ফিরে পেলাম। জাহাজের কাপ্তেন, খালাসীদের বললাম আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী। তারা শুনতে শুনতে আমার দুঃসাহসিকতার তারিফ করলো। বললো, আল্লাহ তোমার সহায় আছেন, তাই এই বিপদেও প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছ।

এর পর আমরা বেশ সুখেই দিন কাটাতে থাকলাম। জাহাজ চলতে চলতে একদিন সালাহিতা দ্বীপে এসে নোঙর করলো। সওদাগররা নেমে শহরের দিকে চললো—কেনাবেচা করতে।

জাহাজের কাপ্তেন আমকে ডেকে বললো, দেখো, তুমি তো ভাগ্যের বিপর্যয়ে আজ নিঃসম্বল। গরীব। এক কাজ কর, আমার এই জাহাজে বাগদাদের এক সওদাগরের কিছু সওদাপত্র আছে। পথের মাঝখানে তাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তুমি সেই জিনিসপত্রগুলো এখানকার শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করো। যা লাভ হবে, সবই তোমার। আমাকে শুধু আসল দামটা ফেরৎ দিও। দেশে ফিরে তার আপনজনদের হাতে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেব।

আমি কাপ্তেনের এই বদান্যতায় খুশি হয়ে বললাম, আপনি আমার জন্যে এতটা করছেন, এ ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না।

কাপ্তেন বলে, তার দরকার নাই। যাও, আমি খালাসীদের বলে দিচ্ছি। তোমাকে গাঁটরিগুলো বের করে দেবে।

কাপ্তেনের হুকুমে খালসীরা গাঁটরীগুলো বাইরে আনলো। আমি দেখে অবাক হলাম—গাঁটরীগুলোর ওপরে আমার নাম 'সিন্দবাদ নাবিক' লেখা রয়েছে।

আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলাম। এসব তো আমারই জিনিস। গতবারের সমুদ্রযাত্রার সময় এক দ্বীপে নেমে যথা সময়ে জাহাজে ফিরতে পারিনি আমি। জাহাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো।

কাপ্তেন সব শুনে আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করলো, তাই তো, তুমিই তো সেই সওদাগর বটে। তা হলে তো ভালোই হলো। তোমার জিনিস তুমি ফিরে পেলে। আর আমিও একটা দায় থেকে রেহাই পেলাম। যাও, এবার শহরে গিয়ে বেসাতি করে এসো।

সেই সব জিনিসপত্র বেশ চড়া দামে বিক্রি করে অনেক নাফা করলাম আমি।

এর পর আমরা দেশে ফিরে আসি। এই হচ্ছে আমার তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা। এর পর তোমাদের শোনাবো আমার চতুর্থ যাত্রার কাহিনী।

বৃদ্ধ সিন্দবাদ একশোটা সোনার মোহর কুলি সিন্দবাদের হাতে গুঁজে দিয়ে বললো, কাল সকালে ঠিক সময়ে আসবে কিন্তু।

পরদিন যথা সময়ে কুলি সিন্দবাদ এবং অন্যান্য শ্রোতারা এসে হাজির হয়। নাস্তাপানি শেষ করার পর বৃদ্ধ তার কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

যদিও দারুণ ভোগ বিলাসের মধ্যে আমার দিন কাটছিলো কিন্তু রক্তে আছে আমার ঘর-ছাড়ার নেশা। তাই বাগদাদের বৈচিত্র্যহীন বিলাসের জীবন-যাত্রা আমার ধাতে সইলো না। কিছুদিন যেতে না যেতেই বিদেশ যাত্রার ভূত আমার ঘাড়ে চেপে বসলো।

এবারও আমি অনেক বাছাই করা দামী দামী বাহারী সামগ্রী সওদা করলাম। যে-সব জিনিস সাধারণত বিদেশের বাজারে মেলে না, সেই জাতের জিনিসপত্র।

দিনক্ষণ দেখে একদিন বসরাহর বন্দর থেকে এক বিরাট জাহাজে চেপে বসলাম আমরা কয়েকজন সওদাগর।

দিনের পর দিন জাহাজ চলেছে। একদিন কাপ্তেন এসে বললো, এখুনি ঝড় উঠবে। আর এক পাও এগানো যাবে না। জাহাজ এই মাঝসমুদ্রেই নোঙর করতে হবে।

ঝড়ের কথা শুনে বুক শুকিয়ে গেলো। না জানি এবার কি বিপদ ঘটে। যদি উত্তাল ঢেউর দাপট সহ্য করতে না পেরে জাহাজটা উল্টে যায়—

মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড ঢেউ-এর ধাক্কায় আমাদের জাহাজটা খানখান হয়ে গেলো। সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে কে কোথায় তলিয়ে গেলো তার কোনও হদিশ করতে পারলাম না।

আল্লাহর অপার মেহেরবানী, আমি একখানা কাঠের পাটাতন আঁকড়ে ধরতে পেরেছিলাম। সেই পাটাতনখানা আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে এক সমুদ্র-সৈকতে এসে উঠলাম।

তখন আমার প্রায় মৃত-কল্প দশা। হিমের মতো ঠাণ্ডা জলে সারা শরীর সিঁটকে গেছে। সারা রাত সৈকতের বালির উপরে অসাড় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলাম। সকালবেলায় উঠে দেখি আমার পাশে আরও কয়েকজন সহযাত্রী শুয়ে আছে। আল্লাহর কৃপায় তারাও প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেছে।

সমুদ্রতীর ছেড়ে আমরা গ্রামের পথে পা বাড়ালাম। কিছু দূর যেতেই একটা বাগানের মধ্যে একখানা সাদা রঙের বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িটার কাছে আসতেই একদল উলঙ্গ কালো মানুষ বেরিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরলো। তাদের মুখে কোনও কথা নাই। শুধু ইশারায় পথ দেখিয়ে বাড়িটার ভিতরে নিয়ে এলো। প্রকাণ্ড প্রশস্ত একখানা ঘর। তার মাঝখানে সিংহাসনে আসীন এক সম্রাট।

সম্রাট আমাদের বসতে হুকুম করলেন। একটু পরে বড় বড় বারকোষে বোঝাই করে খানা এলো। খানা বলতে এক ধরনের অদ্ভুত মাংস। এ ধরনের মাংস আমি জীবনে কখনও দেখিনি। চেহারা দেখেই আমার ক্ষিদে তেষ্টা উবে গেলো। কিন্তু আমার সঙ্গীরা ক্ষিদের জ্বালায় সেই মাংসই গোগ্রাসে খেতে লাগলো। জাহাজ ডোবার পর থেকে খাওয়া দাওয়া হয়নি, ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে জ্বলছিলো, তাই আর কোনও দিকে দৃকপাত না করে গোটা বারকোষটাই সাবাড় করে দিলো তারা। আমি বসে বসে দেখলাম। আমার গা গুলিয়ে যাচ্ছিল ওদের ওই রাক্ষসের মতো গেলা দেখে।

খেয়েদেয়ে ওরা ঢেকুর তুলতে লাগলো। ভুরি ভোজের খানা। আমি কিন্তু নিরম্ব উপবাসীই রয়ে গেলাম। মরে গেলেও ঐ আজব খানা আমার মুখে উঠবে না।

খানাপিনা ব্যাপারে আমার এই খুঁতখুঁতে বাই সে-যাত্রায় আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো। কেমন করে, সেই কথাই বলছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বেশ বুঝতে পারলাম, এই উলঙ্গ হাবসী লোকগুলো নরখাদক। আর ঐ সম্রাট—সেও। তবে ওদের হাতে কোনও মানুষ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে

ওরা খায় না। প্রথমে তাকে কিছুদিন খাইয়ে-দাইয়ে বেশ মোটাসোটা নাদুস নুদুস করে তোলে। দেহে চর্বি না গজালে নাকি মাংসের স্বাদ হয় না। তাই তারা খুব ভালো করে পেটপুরে খেতে দেয়। আদর যত্ন করে। খাটুনি-মেহনত একেবারেই করায় না। মোট কথা বড় তোয়াজে রাখে।

যে-সব মানুষ ধরা পড়ে তাদের মধ্যে মোটা-সোটা তাগড়াইগুলো থাকে সম্রাটের জন্য। বাকীগুলো খায় উলঙ্গ হাবসীরা। হাবসীরা মানুষের কাঁচা মাংস খেতেই ভালোবাসে। কিন্তু হাবসী-সম্রাটের বিলাসিতা অনেক। সে কখনও না পুড়িয়ে খাবে না। তার খানা পাকাবার কায়দাই আলাদা। বিরাট মানুষ সমান চুল্লীতে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। দাউ দাউ করা আগুনে কাঠগুলো পুড়ে যখন গনগনে আগুনের অঙ্গার হতে থাকে, সেই সময়, জ্যান্ত একটা মানুষের সর্বাঙ্গে তেল-মসলা-ঝালের গোলা মালিশ করা হয়। মানুষটা যখন লঙ্কার ঝালে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে থাকে তখন হাবসীরা বুঝতে পারে, মসলায় সে জারিত হয়ে গেছে। এর পর তারা তাকে চুল্লীর নিচে নামিয়ে দেয়। আধপোড়া মতো যখন হয়ে আসে তখন তারা সিকে গেঁথে আংরা মানুষটাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসে। এর পর টুকরো টুকরো করে কেটে সম্রাটের সামনে ভোগ নিবেদন করে। আমি ওদের মুখেই শুনেছি, এই নরমাংসের কাবাব-এর স্বাদই নাকি আলাদা। একবার যে খেয়েছে তার মুখে মোরগ-মসাল্লামও নাকি পানসে লাগবে।

এই সব জানার পর থেকে আমি ক্ষিদে ভুলে গেলাম। শুধু পানি খেয়ে প্রাণ ধারণ করতে লাগলাম। উলঙ্গ হাবসীরা আমাদের সকলকে রাখালের হেপাজতে দিয়ে বললো, খুব সাবধানে চোখে চোখে রাখবি। একটাও যেন খোয়া না যায়। আর খুব ভালো করে চরাবি। দু-চার দিনের মধ্যেই যেন মোটাসোটা নাদুস-নুদুস হয়ে ওঠে সবাই। সম্রাটের ভোগে লাগবে। মনে থাকে যেন।

রাখাল আমাদের বনে জঙ্গলে মাঠে নিয়ে যায়। গাছের ফল পেড়ে এনে দেয়। ফসলের শুটি, রসালো আখ খাইয়ে পেট ডাঁই করে দেয় আমার সঙ্গীদের। আমি কিন্তু কিছু স্পর্শ করি না। ফলে, দিনে দিনে কৃশ হতে কৃশতর হতে থাকি। শেষে এমন হলো; গায়ে বল পাই না, শরীরের হাড়গোড় সব বেরিয়ে গেলো। রাখালটা ভাবে, এই লোকটা একটা আপদ। এক ফোঁটা মাংস লাগছে না গায়ে উল্টে শুকিয়ে চেলা কাঠ হয়ে যাচ্ছে। সম্রাট কেন, তার সাগরেদরাও খেতে চাইবে না বেটাকে।

রাখালটা আর আমার দিকে তেমন নজর রাখে না। সে শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে আমার বন্ধুদের ওপর। ওরা নির্বিবাদে খেয়েদেয়ে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে দিনকে দিন ঢাউস হতে থাকলো। হাবসীরা আর রাখালও ওদের তদারকেই ব্যস্ত হয়ে থাকে। আমি যেন ওদের কাছে এক অবাঞ্ছিত অতিথি। নেহাত ফেলে দেওয়া যায় না তাই রেখেছে—ভাবখানা এই।

তাদের এই ভাবেরই সুযোগ নিলাম আমি। একদিন রাখাল আমাদের চরাতে নিয়ে বেরিয়েছে। আমি কিছু দূর গিয়েই ধপাস করে পড়ে গেলাম। রাখাল জিজ্ঞেস করলো, কী? কী হলো?

আমি বললাম, না, কিচ্ছু না, মাথাটা কেমন ঘুরে গেলো?

—ব্যামো? আরে ছো! শকুনে খাবে।

অর্থাৎ অসুস্থ মানুষের মাংস অভক্ষ্য। ওগুলো শেয়াল শকুনকে খেতে দেয় তারা। আমাকে পথের ওপর ফেলে রেখে আমাদের বন্ধুদের তাড়িয়ে নিয়ে রাখলটা এগিয়ে যেতে যেতে বলে, মাথাটা ঠিক হয়ে গেলে পিছনে পিছনে আয়। না হলে, ফেরার সময় নিয়ে যাবো, এখানেই শুয়ে থাক।

এই—মউকা! রাখালটা চোখের আড়াল হতেই আমি বাঁকা পথ ধরলাম। ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে সবার অলক্ষে সমুদ্রের দিকে এগোতে থাকি।

কিন্তু কোথায় সমুদ্রতীর? সারা দিন সারা রাত চলার পরও কোনও সমুদ্রের কিনারা পাওয়া গেলো না। পরদিনও এইভাবে দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলতে থাকি। শেষে আটদিনের দিন এক নতুন দেশে এসে হাজির হই। সেখানকার অধিবাসীরা দেখলাম, আমাদের মতোই সভ্য জগতের মানুষ। তাদের গায়ের রঙ শুভ্র; কাপড়চোপড় পরে।

একদল মানুষের সঙ্গে দেখা হলো। ওরা তখন লঙ্কার ক্ষেত থেকে লঙ্কা তুলে বস্তাবন্দী করছিলো। আমাকে পরদেশী দেখে তারা কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। ওদের মুখের ভাষা আমারই মাতৃভাষা। কতকাল পরে অন্যের মুখে নিজের দেশের ভাষা শুনে কি যে ভালো লাগলো—

ওরা জিজ্ঞেস করে, কে বাছা তুমি? এমন কেন তোমার দশা?

আমি জবাব দিই, আমি বিদেশী মুসাফীর। সমুদ্রে জাহাজ ডুবি হয়ে এই হাল হয়েছে। নরখাদকদের হাতে পড়েছিলাম। কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গীরা এখনও তাদের খপ্পরেই পড়ে রয়েছে।

আমার কাহিনী শুনে ওরা বিস্ময়াহত হয়। বলে, আহা, তোমার বুঝি অনেক কাল নাওয়া খাওয়া হয়নি?

আমি বলি, খাইনি, তাই বেঁচে গেছি। খাওয়া দাওয়ার লোভ সামলাতে না পারলে আর বাঁচতে হতো না।

ওরা আমাকে ওদের ঘরে নিয়ে গেলো। ভালো করে গোসল করলাম। এই প্রথম পেট পুরে খানা খেলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ওরা আমাকে একখানা জাহাজে করে দরিয়ার ওপরে একটা দ্বীপের শহরে নিয়ে গেলো। সেখানে থাকে ওদের সুলতান। শহরটা ভারি সুন্দর। অনেক দোকানপাট, অনেক লোকের বাস। সুলতানের দরবারে যাওয়ার পথে শহরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে দেখালো ওরা। আমাদের বাগদাদের মতোই নানারকম বাহারী জিনিসপত্র পাওয়া যায় সেখানকার বাজারে। পথঘাটগুলোও বেশ চওড়া। তাগড়াই ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্চর সবই দেখতে পেলাম। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক লাগলো, জীন লাগাম ছাড়াই ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছে সেখানকার সওয়ারীরা।

সুলতানের দরবারে আমাকে হাজির করা হলো। যথা বিহিত কুর্নিশ জানিয়ে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার দেশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছ, জাঁহাপনা। কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, জীন লাগাম না লাগিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কেন এখানকার মানুষ? জীন লাগাম শুধু আরামদায়কই না, দেখতেও বড় বাহারী।

সুলতান অবাক হয়।—জীন লাগাম? সে কেমনতর বস্তু? আমার বাপ চৌদ্দপুরুষ তো তেমন কোনও জিনিসের নামও শোনেনি!

আমি বললাম, আপনি যদি হুকুম করেন, আমি আপনাকে বানিয়ে দেখাতে পারি। তারপর বুঝতে পারবেন, কত সুন্দর, সুখের, শখের আর দরকারী এই জীন লাগাম।

সুলতান বললো, বেশ তো করে দেখাও। যদি খুশি করতে পারো—তোমাকেও খুশি করে দেব আমি।

আমি বললাম, আমাকে একজন চৌকস ছুতোর দিতে হবে।

সুলতানের নির্দেশে শহরের সেরা সূত্রধর এলো আমার কাছে। আমি তাকে নক্সা এঁকে বোঝালাম, কী বস্তু আমি বানাতে চাই। লোকটা কাঠের কাজে ওস্তাদ। যেমনটি আমি চাই—নিখুঁতভাবে সেই রকম একখানা কাঠের জীন বানিয়ে দিলো। এবার আমি ধুনুরীকে দিয়ে জীনের মাপের একখানা বাহারী গদী তৈরি করালাম। সোনার জরিতে কাজ করা নানা

বর্মের এই গদী কাঠের জীনের ওপর বসিয়ে এঁটে দিলাম। এর পর এক দক্ষ কামারের সহায়তায় বানালাম একজোড়া লাগাম আর রেকাবী।

সব যখন আমার পছন্দ মতো যথাযথভাবে তৈরি হয়ে গেলো, সুলতানের ঘোড়াশাল থেকে বাছাই করে একটা তাগড়াই ঘোড়া নিয়ে এলাম আমি। সেই নতুন জীন লাগাম তার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে এলাম সুলতানের সামনে। সুলতান ক'দিন ধরে রোজই আমার কাজের খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। নতুন এই বস্তুটি দেখার আগ্রহে সে অধীর হয়েছিলো।

ঘোড়ার যে এমন মনোহর সাজ হতে পারে সুলতান ভাবতে পারেনি। খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো সে। আর তর সইলো না, তখুনি সে লাফিয়ে উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে।

—বাঃ, বহুৎ বড়িয়া চিজ তো? হুঁ—খুব আরাম—

সুলতান খুব খুশি হয়ে আমাকে প্রচুর পরিমাণে ইনাম দিলো। উজির আমাকে বললো, বাঃ চমৎকার জিনিস তো। আমাকেও একটা বানিয়ে দাও।

তাকেও তৈরি করে দিলাম একটা। সে-ও আমাকে অনেক পয়সাকড়ি উপহার দিলো। এরপর দরবারের আমির ওমরাহ, সেনাপতি একে একে সবাই ফরমাশ করতে থাকলো—সবাইকেই বানিয়ে দিলাম লাগাম জীন। বিনিময়ে পেলাম প্রচুর অর্থ। এইভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে, সেই শহরের আমি এক সেরা ধনী এবং মান্যগণ্য মানুষ হয়ে উঠলাম।

সুলতান আমাকে বহুৎ খাতির যত্ন করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমি তার পহেলা পেয়ারের মানুষ হয়ে গেলাম।

একদিন, দরবারে আমি তার পাশে বসে আছি, সুলতান আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললো, সিন্দবাদ। তুমি কি জান, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি! তুমি তো আমার প্রাসাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছ। তোমাকে ছাড়া আমার এক দণ্ড চলে না, তোমার পরামর্শ ছাড়া কোনও একটা কাজ করতে পারি না। সুতরাং আমার এই মায়াবন্ধন ছিঁড়ে ফেলে যে দেশে পালাবে সে আমি হতে দেব না। এই কারণে আমি তোমাকে কঠিন বাঁধনে বাঁধতে চাই।

আমি বললাম, আদেশ করুন, জাঁহাপনা। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। আজ আমার যে এই ধনদৌলত ইজ্জত—সবই তো আপনার মেহেরবানীতে। সুতরাং আপনি যা হুকুম করবেন আমি মাথা পেতে নেব।

—তাহলে, সুলতান বলে, তুমি আমার কথা মতো আমার প্রাসাদের একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে শাদী করে এখানে পাকাপাকি ভাবে সংসার পাতো! মেয়েটি রূপে গুণে অসাধারণ। সারা দেশে তার জুড়ি খুঁজে পাবে না। আমার বিশ্বাস, সে তোমাকে সুখ শান্তি দুইই দিতে পারবে। আমি ভেবেছি, সে-ই পারবে তোমাকে এখানে ধরে রাখতে।

আমি লজ্জাবনত হয়ে বসে থাকি। ভেবে পাই না, কি এর জবাব দেব—কিভাবেই বা দেব।

সুলতান, আমাকে নীরব থাকতে দেখে, প্রশ্ন করলো, কী, চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও?

আমি কোনও রকমে কুণ্ঠিত ভাবে বলতে পারি, আমি আর কী বলবো জাঁহাপনা, সবই আপনার হাতে। আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমি আপনার দাসানুদাস।

সুলতানের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কাজীকে খবর দেওয়া হলো। তক্ষুণি সাক্ষীসাবুদ নিয়ে হাজির হলো কাজীসাহেব। এক ঘণ্টার মধ্যে শাদীনামা তৈরি হয়ে গেলো। শাহবংশের এক পরমা সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে শাদী হয়ে গেলো আমার।

আমার সদ্য শাদী করা বিবি শুধু সুন্দরী আর শিক্ষিতাই নয়—সে তার মৃত পিতার অতুল

ঐশ্বর্যের একমাত্র ওয়ারিশ। প্রাসাদোপম ইমারৎ, বিশাল ভূসম্পত্তি, বহু মূল্যবান ধনরত্ন এবং প্রচুর নগদ অর্থের সে মালিক। এছাড়া সুলতানও উপহার উপঢৌকন দিলো অঢেল। আমাকে দিলো সে একখানা প্রাসাদ এবং আরও দিলেন বিশ্বস্ত লোকজন, দাসদাসী নফর বান্দা। এদের কেউই বাজার থেকে সদ্য কেনা নয়। বহুকাল সুলতান-প্রাসাদে একান্ত বশংবদ হয়ে কাজ করে এসেছে।

শাদীর পরে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। এত আনন্দ, এত প্রাণঢালা ভালাবাসার স্বাদ এর আগে কখনও পাইনি। আমার যৌবনের বসন্তের রং ধরলো। নানা বাহারে, নানা ছন্দে বিকশিত হয়ে উঠলাম আমি।

এইভাবে অনেক দিন কেটে গেলো। যদিও সুলতানের কাছে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ, তবু অন্তরে, অতি সঙ্গোপনে, লালন করে চলেছি, একদিন না একদিন আমার বিবিকে সঙ্গে করে আমি আবার বাসভূমি বাগদাদে ফিরে আসবো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। মানুষ নিয়তিকে এড়াতে পারে না। এবং তার ভবিতব্য কি তাও সে জানতে পারে না। নিয়তির হাতে সে খেলার পুতুল মাত্র।

একদিন আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর বিবি মারা গেলো। তার তারস্বরে কান্না শুনে আমি ছুটে গেলাম। নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কোনও সান্ত্বনাই তার মড়াকান্না থামাতে পারলো না। আমি যতই তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করি, ততই সে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

আমি বোঝাতে চাই, দেখ, বিবি কারো চিরকাল বেঁচে থাকে না। তাই নিয়ে এত কান্নাকাটি করে কি করবে? এই তো তোমার জোয়ান বয়স, আবার শাদী করবে, আবার তোমার সংসার ভরে উঠবে। কেন এত দুঃখ করছ। আমি তোমাকে সুন্দরী মেয়ে দেখে শাদী দিয়ে দেব।

আমার বন্ধু আরও উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলো, এসব তুমি কী বলছো, দোস্ত। আর একঘণ্টা বাদে যাকে সহমরণে মরতে হবে তার আবার নতুন করে শাদী করার কথা ওঠে কি করে?

আমি কিছুই বুঝতে পারি না তার কথা।—তার মানে? একঘণ্টা বাদে মরতে হবে কেন?

আমাকে অবাক হতে দেখে বন্ধুবর বললো, সেকি! তুমি জান না আমাদের দেশের আইনকানুন। এদেশে স্বামী বা বিবি যে-ই আগে মরুক, তার সহমরণেই মরতে হবে অন্যজন্যকে। তা সে যদি স্বয়ং সুলতানও হন, কোনও রেহাই নাই।

আমি আঁৎকে উঠি। সর্বনাশ! এমন জানলে, কে শাদী করতো। এখন আমার বিবি যদি মারা যায় তবে আমাকে মরতে হবে? একি কথা? কিন্তু আমি তো পরদেশী। এ দেশের আইনকানুন আমার ঘাড়ে চাপবে কেন? বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা বলতে পার, দোস্ত তোমাদের দেশের এই বদখদ আইন আমার বেলাতেও খাটবে কিনা?

—আলবৎ খাটবে। এদেশে যে বাস করবে তা সে এদেশীই হোক, আর বিদেশীই হোক সকলের বেলাতেই সমানভাবে খাটবে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কান্নার আসল কারণটা কী? বিবি মারা যাওয়ার জন্য তার বিশেষ শোকতাপ নাই, নিজেকে মরতে হবে সেই আতঙ্কেই সে সারা।

যাই হোক বিপদের দিনে বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ানো দরকার। তার এই অন্তিমযাত্রায় দু ফোঁটা চোখের জল ফেলাও তো আমার কর্তব্য।

পাড়াপড়শীরা অনেকেই এলো। যথা নিয়মে মৃতদেহকে বয়ে নিয়ে চললো কিছু লোক। তার পিছনে আমার বন্ধু কাঁদতে কাঁদতে চলে। আমরা চলি তার পিছনে। আমাদের চোখেও জল। সমবেদনার অশ্রু।

শহর ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে পাহাড়ের পাদদেশে ওদের সমাধিক্ষেত্র। সমাধিক্ষেত্র

বলা বোধ হয় ঠিক হলো না। একটা প্রকাণ্ড বড় ইঁদারা। তারা নিচে নামিয়ে দেওয়া হয় শবদেহটা। তারপর যাকে সহ-মরণে পাঠানো হবে তার পিঠে সাতখানা রুটী, এক কলসী জল আর হাতে দড়ি বেঁধে সেই ইঁদারার নিচে নামানো হয়। তলায় মাটি স্পর্শ করার পর উপর থেকে বলা হয়, এবার হাতের বাঁধন খুলে দড়ি ছেড়ে দাও। দড়ির বাঁধন সে খুলে দেয়। তখন দড়িটা তুলে, ইঁদারার মুখে একটা পাথর চাপা দিয়ে তারা ঘরে ফিরে যায়। ব্যাচারী সাতটা রুটি খেয়ে যতদিন বাঁচতে পারে ততদিন বেঁচে থাকে। তারপর অনাহারে, আতঙ্কে একদিন সে মরে যায়।

আমার বন্ধুর এই ভয়াবহ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দেখে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। মনে হলো, এখনি বুঝি আমি মুর্ছা যাবো। কিন্তু না, নিজেকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে ছুটে গেলাম সুলতানের কাছে। কোনওরকম ভূমিকা না করে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, আমার বিবি যদি আগে মারা যায়, আমাকে কী তার সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে?

সুলতান বললো, নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন, তোমার বিবি কি—

আমি বাধা দিয়ে বলি, না সে সব কিছু ঘটেনি। তবে ঘটতে তো পারে। সে ক্ষেত্রে আমাকে কেন মরতে হবে? আমি তো পরদেশী। আর তা ছাড়া ছেলে মেয়ে বিবি সবই তো আছে। আপনার দেশের আইনকানুন আমাকে মানতে হবে কেন?

—আলবৎ মানতে হবে। এদেশে বাস করলে, এদেশের মেয়েকে শাদী করলে এদেশের কানুন মানতেই হবে। সে তুমি যে-দেশের মানুষই হও।

আমার অবস্থা তখন উন্মাদের মতো। প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি ফিরে এলাম। আসার পথে কেবল আতঙ্ক হচ্ছিল, যদি বাড়ি পৌঁছে দেখি, বিবি মরে গেছে! তখন? তখন কী হবে? শহরের প্রতিটি মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমার শোকে সান্ত্বনা দিতে আসবে তারা। আমার বিরাট প্রাসাদ-এ তিল ধরনের ঠাঁই থাকবে না। লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। এর পর শবযাত্রায় সঙ্গী হতে আসবেন, সুলতান, উজির আমির সেনাপতি—সবাই। এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো যাবে না। বে-ঘোরে প্রাণ হারাতে হবে।

কিন্তু না, ওসব কিছুই হয়নি। বিবি আমার বহাল তবিয়তেই আছেন। ধড়ে প্রাণ এলো।

কথায় আছে—খোদার মা'র দুনিয়ার বা'র। নসীব খারাপ, কিছু দিন যেতে না যেতে আমার বিবিজান অসুখে পড়লো। শরীর থাকলেই অসুখ-বিসুখ হয়। তাই নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কী আছে? এই বলে মনকে প্রবোধ দিই। কিন্তু ঘর পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডর হয়। আমার দশাও তাই। শুধুই মনে শঙ্কা জাগে, যদি অসুখ না সারে। যদি আর শয্যা ছেড়ে না ওঠে সে?

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। সত্যি সে আর সে-শয্যা ছেড়ে উঠলো না। খোদা তাকে কোলে তুলে নিলেন। আমার অবস্থা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছো তোমরা। কোরবানীর খাসীর মতো গলা বাড়িয়ে দিতে হবে ভেবে আমি শিউরে উঠলাম। পালাবো সে পথ নাই। আমার অগণিত শুভানুধ্যায়ীরা পিলপিল করে ধেয়ে এসে আমার প্রাসাদ ভরে ফেললো। সুলতানের প্রাসাদে খবর গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার দলবল নিয়ে সান্ত্বনা জানাতে এলো আমাকে।

সুলতান সাশ্রু নয়নে বললো, বিধাতার বিধান মেনে নিতেই হবে, বাবা। এই সংসারের মায়া মহব্বৎ, সব কাটিয়ে তোমাকে আজ তার দোসর হতে হবে। আমাদের শাস্ত্রের এই বিধান। এবং এর চেয়ে বেশি পুণ্য আর কিছুতে হয়না। হাসি মুখে তোমার বিবির অনুগামী হও, বেটা। মন পার্থিব কামনা বাসনা মুক্ত কর। দেখবে, তখন এই পার্থিব জগতে থাকতে আর মন চাইবে না।

সুলতানের এই বাক্‌তালা আমার তখন অসহ্য মনে হচ্ছিল। এই লোকটার জন্যেই আজ আমার এই দশা। দেশে বিবি বাচ্চা থাকতে এখানে একটা মেয়েকে গছিয়ে দিলো সে। আর এত বড় হাড়ে-হারামজাদা, সব কথা খোলসা করে বলেনি আমায়! এইরকম বর্বর আইনকানুন আছে এদেশে সে-কথা আগে জানলে কে সেধে হাড়ি-কাঁঠে মাথা গলাতো?

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতাম। বিবি-বাচ্চা নিয়ে সুখে সংসার করতাম। শুধু এই সুলতান বেটাই আমাকে আটকে রেখে দিলো। বলে কিনা, 'তোমায় আমি ছাড়বো না। তোমাকে আমি পেয়ার করি। আমাকে ছেড়ে চলে গেলে প্রাণে বাঁচবো না—তুমি এখানে শাদী করে সংসার পাতো।' তখন কি বুঝেছিলাম, লোকটা আমাকে এখানকার মাটিতে জ্যান্ত কবর দেওয়ার ফন্দী আটছে!

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।—আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন। আমি দেশে ফিরে যাবো। সেখানে আমার বিবি বালবাচ্চা আছে। আমি পরদেশী। এভাবে আমাকে মেরে ফেলা আপনাদের অন্যায়।

কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাত করলো না কেউ। আমার বিবিকে শাদীর সাজে সাজানো হলো। দামী দামী রত্নালঙ্কারে মুড়ে দেওয়া হলো তার সারা শরীর। তারপর একখানা সাদা কাপড়ের আচ্ছাদনে ঢেকে শব-দেহটা কাঁধে তুলে নিলো কয়েকজন।

শব-মিছিলের পুরো ভাগে আমার মৃত বিবি, তার পিছনে আমি, আমার পিছনে সুলতান, তারপর উজির আমির এবং অগণিত শুভানুধ্যায়ীরা। ধীর পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে চলি সমাধি ক্ষেত্রের দিকে। সমুদ্র সন্নিহিত পর্বত পাদদেশে।

সেই ইঁদারার কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা। শবদেহ নিচে নামানো হলো। আচার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমার বিবির মৃত দেহটা ইঁদারার নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো। এবার আমার পালা। একটা কলসীতে জল ভরে সঙ্গে সাতখানা রুটি আমার পিঠে বেঁধে দিলো ওরা। আমি এবার ডুকরে কেঁদে উঠলাম।—দোহাই আপনাদের, আমাকে ছেড়ে দিন।

কিন্তু কেউ শুনলো না সে কথা। আমার হাতে পরিয়ে দিলো দড়ির ফাঁস। তারপর কয়েকজনে মিলে জোর-জবরদস্তি করে নামিয়ে দিলো ইঁদারার নিচে।

উপর থেকে চিৎকার শোনা গেলো, ফাঁসটা খুলে দড়িটা ছেড়ে দাও—

কিন্তু আমি ওদের কথা শুনলাম না। ঠিক করলাম দড়ি আমি ছাড়বো না। বারবার ওরা আমাকে হুকুম করতে থাকলো, দেরি করো না, দড়িটা ছেড়ে দাও। আমরা ফিরে যেতে পারছি না।

তবু আমি ওদের কথা শুনলাম না। শেষে দড়ির আশা ছেড়ে, ইঁদারার মুখে পাথর চাপা দিয়ে ওরা চলে গেলো।

আমি সেই প্রায়ান্ধকার ইঁদারার তলদেশে, বসে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকলাম। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে শেষে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সারাটা দিন সারাটা রাত অসাড় ঘুমে কেটে গেলো। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলো। প্রচণ্ড ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। একখানা রুটি আর একটু জল খেলাম।

চারদিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম, অসংখ্য নরকঙ্কাল। কতকগুলো মৃতদেহে পচন ধরেছে। আর কতকগুলো এখনও আনকোরা। পচা দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু উপায়ই বা কী?

ভেবে ভেবে আতঙ্কিত হতে থাকলাম, এই রুটি ক'খানা ফুরিয়ে গেলে, একদিন অনাহারে শুকিয়ে মরে যেতে হবে এখানে। এই-ই আমার নিয়তি।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো চারতম রজনী সমাগত ঃ

শাহরাজাদ আবার বলতে শুরু করে ঃ

আমি আমার নসীবের কথা ভাবছি। কেন এই পরবাসে শাদী করার শখ হয়েছিলো আমার? দেশের ছেলে দেশে ফিরে গিয়ে বিবি বালবাচ্চাদের নিয়ে সুখে সংসার করতে পারতাম। কিন্তু কেন আমার এই দুর্মতি হলো? এখন এইভাবে অপমৃত্যু বরণ করতে হলো? এর চেয়ে

সেই হীরক পাহাড়ে সাপের গহ্বরে প্রাণ হারালে ক্ষতি কি ছিলো? কিংবা সেই নরখাদকরা যদি আমাকে কাবাব করেই খেত—তাতেই বা কি হতো। সেও মৃত্যু, এও মৃত্যু। সবচেয়ে ভালো হতো, যখন জাহাজখানা খানখান হয়ে গেলো, সেই সময় সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাওয়া। সে মৃত্যু অনেক গৌরবের হতো।

আমি নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে থাকি। ইঁদারার দেওয়ালে কপাল ঠুকি। অসহায়ের মতো আর্তনাদ করি। কিন্তু কে শুনবে আমার সেই আকুল আবেদন।

এইভাবে সাতটা দিন কেটে গেলো। রুটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ক্ষিধেয় পেট জ্বলতে থাকে। তবুও এখনও ঐ একখণ্ড রুটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারছি আরও দু-একটা দিন হয়তো বাঁচতে পারবো। মউৎ শিয়রে এলে বাঁচার সাধ বড় বেশি করে জাগে।

ক্ষিদের বড় জ্বালা। খাবো না খাবো না করেও রুটির শেষ খণ্ডটুকু খেয়ে ফেললাম। এরপর আরও দুটি দিন কেটে গেলো। আর বুঝি বাঁচা গেলো না, জঠরের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। চোখ বন্ধ করে আল্লাহর নাম জপ করতে থাকি।

হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে উদ্ভাসিত হয়ে গেলো আমার আশপাশ। উপরে তাকিয়ে দেখলাম, পাথরখানা সরে গেছে। একটি নতুন শব-দেহ নিচে নেমে আসছে। মৃতদেহটি একজন বৃদ্ধের। এর পরেই দড়ি বেয়ে নেমে এলো তার বিবি। পিঠে বাঁধা সাতখানা রুটি আর এক কলসী জল।

আমি উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম কঙ্কালের একখানা পা। সেই হাড়ের ডান্ডা বসিয়ে দিলেম বুড়িটার মাথায়। একটা বাড়ি মারতেই সে লুটিয়ে পড়ে গেলো, আর একটা বাড়ি দিতেই সব শেষ।

এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড করতে হলো ঐ মাত্র সাতখানা রুটির জন্য। যেন তেন প্রকারে আমাকে প্রাণ ধারণ করতে হবে—তখন আমার একমাত্র চিন্তা। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম সে জ্ঞান বুদ্ধি তখন আমার লুপ্ত হয়ে গেছে।

সেই ক'খানা রুটি আর এক কলসী জলে আরও কয়েকদিন চললো। এর পর আবার একদিন কূপের মুখ উন্মুক্ত হলো। নেমে এলো একটি বিবির মৃতদেহ আর তার জীয়ন্ত স্বামী। মানুষের কাছে তার নিজের জীবন সবচেয়ে প্রিয়। তাই তাকেও হত্যা করে সেই সাতখানা রুটি আর জল সংগ্রহ করলাম।

এইভাবে অনেক দিন বেঁচে থাকলাম আমি। এক একটা করে মৃত দেহ আসে; আর তার সঙ্গীকে হত্যা করি আমি।

একদিন আমি আমার জায়গায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দে ধড়মড় করে উঠে হাড়ের ডাণ্ডাটা হাতে বাগিয়ে ধরলাম। শব্দটা অনুসরণ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাকি। বেশ বুঝতে পারি, বড়সড় গোছের কোনও একটা প্রাণী ছুটে চলে গেলো। আমিও তার ছায়া অনুধাবন করে ছুটে চলি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই নজরে আসে না। তবু চলতে থাকি। ব্যাপারটা কী—দেখতে হবে। এইভাবে অনেকক্ষণ চলার পর হঠাৎ একটি আলোর রশ্মি এসে পড়লো আমার মুখে। সেই আলোর নিশানা ধরে আমি এগিয়ে চলি। ক্রমশ সামনেটা পরিষ্কার হয়ে আসে। আরও এগিয়ে যাই। আলোর বন্যায় চোখ আমার ঝলসে গেলো। তখনও আমি কিন্তু ভাবতে পারছি না, এই আমার মুক্তির পথ। বরং মনে হলো, এ বুঝি আর একটা মৃত্যু কূপ। কিন্তু

একটু পরেই আমার ভ্রম কাটলো। সেই দিবালোকে পরিষ্কার দেখলাম, একটি মাংসভুক জানোয়ার দৌড়ে পালিয়ে গেলো। আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম।

হিংস্র জানোয়াররা মড়ার লোভে পাহাড়ের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে এই মৃত্যুকূপের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। রাতের বেলায়, তারা চুপিসারে এসে লাশ টেনে নিয়ে চলে যায়।

জানায়ারটাকে অনুসরণ করে আমি এগিয়ে যাই। এবার আমি উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়াই। সামনে সমুদ্র। পিছনে খাড়াই পাহাড়। প্রাণ ভরে মুক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস নিই। দু-হাত তুলে তাঁকে প্রণতি জানাই।

ঋজু পাহাড়টা ওপারের শহরটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে যাওয়ার বা ওদিক থেকে এদিকে আসার কোনও উপায়ই নাই। একমাত্র সমুদ্র পাড়ি দেওয়া ছাড়া পালাবার কোনও পথ দেখতে পেলাম না।

খিদের জ্বালায় আবার আমি ফিরে গেলাম সেই মৃত্যু-কূপএ। সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। আবার আসে নতুন শব। আবার সেই নরহত্যা—সেই রুটি জল সংগ্রহ। এইভাবে বেশ কিছুকাল কাটালো।

সমুদ্রের ধারে এসে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকি। যদি কোনও জাহাজের মাস্তুল দেখতে পাই। হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। মৃত্যুকূপ-এ এসে হীরে জহরৎ অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করতে থাকি। কতকাল ধরে কত হাজার হাজার মানুষের সমাধি হচ্ছে এখানে। তার অর্ধেক নারী। তারা সবাই রত্নাভরণে সজ্জিতা হয়ে আসে। সেই সব অলঙ্কার ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে।

এক এক করে কুড়িয়ে এক জায়গায় পালা দিই। বিরাট স্তূপের মতো হয়ে ওঠে। শবাচ্ছাদনের মোট কাপড়ে বোঝাই করে পুটলী বাঁধতে থাকি। তারপর পুটলীগুলো কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাই সমুদ্রের পাড়ে।

দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পর একখানা জাহাজ দেখতে পাই। মাথার পাগড়ী খুলে এদিক ওদিক দোলাতে থাকি। কাপ্তেনের যাতে এদিকে নজর পড়ে সে জন্য এধার ওধার ছুটাছুটি করি। নসীব সাধ দিলো। কাপ্তেন সদয় হয়ে একখানা ছোট ডিঙি পাঠিয়ে দিলো আমার কাছে। পুটলীগুলো সঙ্গে নিয়ে নৌকায় চেপে বসলাম আমি। একটুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে উঠে এলাম।

কাপ্তেন জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি? এই হিংস্র জন্তুজানোয়ারের রাজ্যে এলেই বা কী করে। ঐ পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে এদিকে তো কোনও মানুষ আসতে পারেনি কখনও। আমি এই সমুদ্রে সারাটা জিন্দগী ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনও মানুষের ছায়া তো আমার চোখে পড়েনি! তুমি কী করে এলে ওখানে?

আমি বললাম, তা হলে শুনুন আমার কাহিনী ঃ আজ আমি এক মুসাফীর। কিন্তু একদিন আমি ভাগ্য অন্বেষণে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিলাম। সমুদ্রের মধ্যে ঘূর্ণী ঝড়ের মুখে আমাদের জাহাজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আমি জাহাজের একখানা পাটাতনের কাঠ ধরে কোনও রকমে এইকূলে এসে উঠি।

আমি কিন্তু প্রথমটুকু ঠিকই বললাম, কিন্তু শেষের সব ঘটনাই বেমালুম চেপে গেলাম। বললাম, আমার সামানপত্র সবই খোয়া গেছে। শুধু কোনরকমে আঁকড়ে ধরে ছিলাম আমার এই মূল্যবান হীরে জহরৎগুলো।

একখানা খুব দামী জড়োয়ার গহনা বের করে কাপ্তেনের হাতে দিয়ে বললাম, এটা আপনি রাখুন, যে উপকার আমার করলেন, সে ঋণ এই সামান্য হীরে জহরতে শোধ করা যায় না।

কাপ্তেন কিন্তু গ্রহণ করলেন না।—সে হয় না। তোমার কাছ থেকে একটা কানাকড়ি আমি নিতে পারবো না, বাবা। তুমি বিপদে পড়েছ, আমি নাবিক, তোমাকে উদ্ধার করে যথা স্থানে পৌঁছে দেওয়াই আমার কর্তব্য। এজন্য একটুও কুণ্ঠিত হয়ো না তুমি। এই দুস্তর সমুদ্র পথে চলতে চলতে কত মানুষকে আমি উদ্ধার করি। তাদের খানাপিনা সাজ-পোশাক এমন

কি ঘরে ফেরার মতো সামান্য কিছু রাহা খরচও সাধ্য মতো দিই। কিন্তু ঐ আমার এক কথা, কারো কাছ থেকে একটা কপর্দকও আমি নিই না। তাই তোমার কাছ থেকেও কিছু নিতে পারবো না। ওটা তুমি রেখে দাও। শোন বাবা, এই দুনিয়াটা পান্থশালা, এখানে খোদাতালার নির্দেশে দুদিনের জন্য এসেছি আমরা। কাজ ফুরালেই চলে যাব। চলার পথে দুদিনের চেনাজানা, দেখাশোনা—সেই স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকে, যদি কখনও কারও এতটুকু উপকারে আসতে পারি।

কাপ্তেনের দীর্ঘ জীবন কামনা করে অনেক সুক্রিয়া জানালাম আমি। জাহাজ আবার চলতে থাকলো। অনেক শহর বন্দর দ্বীপ পার হয়ে চলতে থাকলাম।

জাহাজের খোলা পাটাতনে বসে সমুদ্রের ঘন নীল জলরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে স্মৃতি রোমন্থন করি। মাঝে মাঝে শিউরে উঠি। আবার কখনও সন্দেহাকুল হয়ে ভাবি, যা মনে করতে পারি, সবই কি সত্যি সত্যি ঘটেছিলো? কোনও মানুষের জীবনে কী এই সব ঘটনা ঘটতে পারে? আমার মৃত বিবির সঙ্গে সেই মৃত্যু-কূপের দিনগুলো? উফ্, ভাবা যায় না। এসব কথা বললে, কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে, হাসিসের মাত্রাটা বুঝি বেশি হয়ে গেছে!

আল্লাহ দোয়ায় একদিন বসরাহর বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়লো। খুশিতে নেচে উঠলো মন। এতদিনে ভরসা হলো, দেশে ফিরতে পারবো। বসরাহয় কয়েকটা দিন অবস্থান করার পর আমরা বাগদাদে এসে পৌঁছলাম।

আমাকে দেখে আপনজনদের আনন্দ আর ধরে না। তারা আশঙ্কা করেছিলো, আমার সলিল সমাধি ঘটেছে। আমার যে কী আনন্দ সে তোমাদের বোঝাতে পারবো না।

সাতদিন ধরে দীনভিখারী অনাথ আতুরদের ভুরি ভোজন করালাম। ফকির দরবেশদের দানধ্যান করলাম অনেক।

কিন্তু এও তেমন কিছু নয়, বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক বলতে থাকে, আগামীকাল তোমাদের যে কাহিনী শোনাবো তার কোনও তুলনা হয় না। সবই আল্লাহর ইচ্ছা—

সেদিনও সে কুলি সিন্দবাদকে একশোটা সোনার মোহর দিয়ে বলে, কাল সকালে ঠিক সময়ে চলে আসবে, কেমন? আচ্ছা, এবার সবাই এসো খানাপিনা সেরে নেওয়া যাক।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে সে দিনের মতো সকলে যে যার ঘরে চলে গেলো।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো ছয়তম রজনী ঃ

কুলি সিন্দবাদ বাড়ি ফিরে আসে। সারা রাত তার চোখে ঘুম আসে না। বৃদ্ধ সিন্দবাদের সেই বিচিত্র কাহিনীর সব জীয়ন্ত ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। পরদিন সকালে সে যখন আবার বৃদ্ধের বাড়িতে চলে আসে তখনও সে ভাবছে—কী করে সেই মৃত্যুকূপের মধ্যে এই মানুষটা একদিন অতগুলো বীভৎস দিন কাটাতে পেরেছিলো। আর কী করেই বা সে মৃত্যু গহ্বর থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছিলো।

নাস্তাপানি সেরে আবার বৃদ্ধ সিন্দবাদ তার জীবন কাহিনী বলতে শুরু করলো ঃ

আমার চতুর্থ অভিযানের পর বেশ কিছুকাল আমি ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে ফুর্তি করে দিন কাটাতে থাকলাম। কালক্রমে সবই ফিকে হয়ে আসে। সেই নিদারুণ দুঃখকষ্ট আর

অনুভব করতে পারি না। শুধু মনে থাকে বিশাল ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির ছবিগুলো। অন্তর থেকে তাগিদ আসে—বাণিজ্যে যাও, সিন্দবাদ বেরিয়ে পড়, ঘরের কোণে বন্দী হয়ে থাকা তোমার ধর্ম নয়। তোমার রক্তে নাচছে ঘরছাড়ার দুরন্ত বাসনা।

বাগদাদের বাজার থেকে দামী দামী দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করলাম। একখানা আনকোরা নতুন জাহাজ কিনে বোঝাই করলাম সব। অভিজ্ঞ একজন কাপ্তেনকে মোটা মাইনেয় বহাল করলাম। এবার আমি সঙ্গে নিলাম চাকর নফর বান্দা। এরা আমাকে দেখাশুনা করবে, জাহাজের কাজ কাম করবে। যারা জাহাজে ওঠার আগে ভাড়া চুকিয়ে দেয় সেইরকম কিছু বাছাই করা সওদাগর নিলাম।

দিনক্ষণ দেখে, আল্লাহ নাম করে বসরাহর বন্দর থেকে যাত্রা করলাম আমরা। চলার পথে অনেক শহর বন্দর আসে। আমরা যথারীতি সওদা ফিরি করি। আমাদের দেশের জিনিস তাদের কাছে বিক্রি করি। তাদের দেশের দুষ্প্রাপ্য জিনিস কিনে নিই। অন্য দেশে চড়া দামে বিক্রি হবে—এই আশায়।

চলতে চলতে একদিন এক দ্বীপের নিশানা দেখতে পেলাম। মনে হলো, জন-বসতি নাই। শুধু বন জঙ্গল আর ধূধূ করা প্রান্তর। আরো কাছে আসতে মাস্তুলের উপরে উঠে দেখলাম দুই গোলাকৃতি গম্বুজের মতো সাদা দুটি অদ্ভুত বস্তু। বুঝতে কষ্ট হলো না—এ হচ্ছে রক পাখীর ডিম। এমন বিচিত্র বস্তু দেখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? সঙ্গী সাথীরা বললো, আমরা গল্প শুনেছি, আপনার মুখে, এবার যখন সুযোগ এসে গেলো; জাহাজটা একবার ভেড়ান, দেখে আসি।

দ্বীপের কিনারে ভিড়িয়ে জাহাজটা নোঙর করা হলো। আমি ছাড়া সকলেই মহাউল্লাসে নেমে গেলো। আমি বললাম, আমার তো দেখা জিনিস। আমি আর যাবো না, জাহাজেই থাকছি। আপনারা দেখে আসুন। আর তা ছাড়া জাহাজখানা একেবারে অরক্ষিত রেখে সবাই মিলে দল বেঁধে নেমে যাওয়াও ঠিক না।

একটু বাদে সঙ্গীরা ফিরে এসে যা বর্ণনা দিলো, শুনে ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে লাগলো। ডিম দুটো ওরা সবাই মিলে ঠেলে এক চুল নড়াতে পারেনি। শেষে বিরাট দুখানা পাথরের চাঁই ছুঁড়ে মেরেছিলো। পাথরের আঘাতে ডিম দুটো ভেঙ্গে একপ্রকার গোলা-পদার্থ নির্গত হতে থাকে। শেষে বেরিয়ে আসে রক পাখীর দুটো কচি বাচ্চা।

আমি বললাম, কী সর্বনাশ করেছেন, আপনারা। এখুনি ওদের মা-বাবা আমাদের খতম করে ফেলবে। রক পাখীরা সাধারণত মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। কিন্তু একবার যদি তারা বুঝতে পারে, তাদের অনিষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছে কেউ—তার আর রক্ষা নাই। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। এখনি নোঙর ওঠাও। জাহাজ ছাড়ো।

তাড়াহুড়ো করে নোঙর তুলে আমরা জাহাজ মাঝদরিয়ায় নিয়ে এলাম। মনে হলো এ যাত্রা বুঝি বিপদ কেটে গেলো; কিন্তু না। সবে তখন আমরা খানা-পিনা পাকাতে আরম্ভ করেছি এমন সময় দূর আকাশে দুখণ্ড কালো মেঘ দেখলাম। ভয় হলো; হয়তো তুফান উঠবে। কিন্তু না, সে আমাদের ভুল। মেঘ নয়, দুটি রক পাখী শোঁ শোঁ করে নিচের দিকে নেমে আসছে। তাদের পায়ে ধরা দুখানা বিশালাকৃতির পাথরের চাঁই। তার যে কোনও একখানা আমাদের জাহাজের চাইতেও বড়।

আমাদের তো হাত পা ঠাণ্ডা হওয়ার জোগাড়। একটা পাখি একখানা পাথর তাক করে ছেড়ে দিলো। আমাদের কাপ্তেন ছিলো চৌকস। ক্ষিপ্র হাতে সে হাল ঘুরিয়ে নিমেষে জাহাজখানা বেশ খানিকটা সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলো। যে জায়গায় জাহাজখানা ছিলো সেখানে থাকলে পুরো পাথরের চাঁইটা এসে পড়তো জাহাজের ঠিক মাঝখানে। যাই হোক, প্রথম ফাঁড়াটা

কাটলো। পাথরটা পড়লো একটু দূরে জলের উপর। বিরাট একটা পুকুরের মতো গর্ত হয়ে গেলো সমুদ্রের জল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য মাত্র। তারপর চারাপাশ থেকে উত্তাল জলরাশি এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই গর্তের ওপর। প্রচণ্ড ঢেউ-এর সৃষ্টি হলো। আমাদের জাহাজ দুলতে থাকলো।

আমরা তখন আতঙ্কিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। আর একটি রক এর পায়ে আর এক খণ্ড পাথর আছে। সে তাক করছে—জাহাজের ওপরে ফেলবে। আমাদের কাপ্তেনের শ্যেন চক্ষু তার পায়ের দিকে নিবদ্ধ। পা দুটো আলগা করতেই তীর বেগে নেমে আসতে থাকে পাথরখানা। কাপ্তেন হালে মোচড় দিতে থাকে। জাহাজখানা প্রায় ঘুরিয়ে ফেলেছিলো সে। কিন্তু একটুর জন্য সর্বনাশ ঘটে গেলো। জাহাজের এক দিকের গলুই-এর উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে জলে পড়ে গেলো পাথরখানা। আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানার সামনের খানিকটা অংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। বাকী আমরা যারা পাথর চাপা পড়লাম না, তাদেরও বাঁচার কোনও নিশ্চয়তা রইলো না। কারণ মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজখানার সলিলসমাধি ঘটে গেলো। কে কোথায় গেলো বলতে পারবো না, আমি একখণ্ড ভাঙ্গা জাহাজের কাঠ ধরে ভাসতে লাগলাম। অনেক কসরৎ করে কাঠের তক্তাটার উপরে উঠে বসে দুই পা দিয়ে দাঁড় কাটতে কাটতে চলতে থাকলাম।

এইভাবে চলতে চলতে এক সময় এক দ্বীপের কিনারে এসে ভিড়লাম। শরীরে শক্তি বলে আমার কিছু নাই। কোনওরকমে কূলে নেমে বালির বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। এইভাবে ঘণ্টাখানেক মড়ার মতো অসাড় হয়ে পড়ে থাকার পর উঠে দাঁড়িয়ে দ্বীপটার ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

একটু এগোতেই মনোরম এক উদ্যানে এসে পড়ি। গাছে গাছে সোনার বর্ণের পাকা ফল, নানারকম রঙের বাহারী সব ফুল, সুন্দর সুন্দর পাখি, রূপোর মতো ঝকঝকে ঝর্ণার আর মখমলের মতো ঘাসের গালিচা। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেলো। গাছের ফল আর ঝর্ণার জল খেয়ে তৃপ্ত হলাম।

এমন সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো সাততম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে না আসা পর্যন্ত আমি সেই বাগিচার তৃণশয্যায় শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করলাম। এতক্ষণ বেশ ভালোই কাটছিলো। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সেই অচেনা অজানা দ্বীপে নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো। ভয়ে গা ছমছম করতে লাগলো। যদিও আমার চারপাশে নানা সৌন্দর্যের সমারোহ, তবু আমি ক্রমশ ভীত শঙ্কিত হতে থাকলাম। সুতরাং ঘুম এলো না চোখে। সারাটা রাত একরকম জেগে জেগেই কেটে গেলো। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রাভাব হয়েছিলো। তার মধ্যে দেখলাম বিশ্রী সব দুঃস্বপ্ন।

সকাল হতে অনেকটা সুস্থির হতে পারি। ঠিক করলাম, আজ আমি দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে দেখবো।

কিছু দূর যেতেই একটা ছোট্ট জলপ্রপাত চোখে পড়লো। তার এক পাশে একটা সাঁকো। সেই সাঁকোর এক প্রান্তে প্রায় উলঙ্গ একটি বৃদ্ধ মানুষ বসে ছিলো। গাছের পাতার আচ্ছাদনে কোনরকমে সে লজ্জা নিবারণ করেছে। আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো। ভাবলাম, আমারই মতো কোনও হতভাগ্য, হয়তো জাহাজ ডুবি হয়ে সর্বস্ব খুইয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, শেখ সাহেব, আপনার এই দশা কেন? কী হয়েছিলো?

কিন্তু সে কোনও জবাব দিলো না। হাতের আর চোখের ইশারা করে কি যেন বোঝাতে চাইলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি ওর মনের কথা বুঝতে পারলাম। ও বোঝাতে চাইছে, আমার চলার শক্তি নাই। তুমি আমাকে কাঁধে করে ঐ বাগানে ঝর্ণার ধারে নিয়ে যেতে পার? আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে।

আমি বোঝালাম, এ আর বেশি কথা কী। এসো, তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

বুড়ো অক্ষম মানুষের উপকার করলে পরকালের কাজ হয়। বৃদ্ধকে আমি কাঁধের ওপর বসিয়ে নিলাম। দু হাত দিয়ে সে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বসে রইলো। সেই বাগিচার ঝর্ণার পাশে এসে ওকে নামাতে চেষ্টা করি, কিন্তু লোকটা আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে থাকলো। হাত দিয়ে আমার গলাটা এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরলো; মনে হলো, এখুনি আমি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে যাবো। প্রাণপণে তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু না, তার হাতের লোহার মতো পেশী একচুল সরানো গেলো না। তবে কি, লোকটা আমাকে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলে দেবে? মৃত্যুর আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলাম। তারপর আর মনে নাই। কখন আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেছি, বলতে পারবো না। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখি, লোকটা তখনও আমার ঘাড়ের উপর বসে আছে। শুধু তফাৎ এই, আমাকে অচৈতন্য দেখে হাতটা একটু আলগা করেছিলো সে। কিন্তু যেই আমার সাড়া পেলো আবার সে বজ্রবেড়িতে চেপে ধরলো আমার গলা। আমি ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করেছি মাত্র, এমন সময় সে প্রচণ্ড এক লাথি মারলো আমার পেটে। আমি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠি। সে আমাকে উঠে দাঁড়াতে ইশারা করলো। ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আবার সে লাফিয়ে উঠলো আমার ঘাড়ে। পা দুখানা ঝুলিয়ে দিলো আমার বুকের ওপর। হাত দিয়ে এঁটে ধরলো আমার গলা। তারপর ইশারা করলো—ফলের গাছের তলায় নিয়ে যেতে। আমি নিরুপায়। সে বৃদ্ধ হলে হবে কি, তার গায়ে অসুরের বল। তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার নাই।

আমার কাঁধে চেপে সে গাছের নিচে এসে ফল ছিঁড়ে খেলো। আমাকে ইশারা করে ঝর্ণার কাছে নিয়ে গেলো। ঝর্ণার জল খেয়ে আবার সে আমাকে অন্য দিকে নিয়ে চললো। এইভাবে সারাদিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে নাস্তানাবুদ করতে থাকলো। আমি তার হাতের খেলার পুতুল হয়ে, তার ইচ্ছা পূরণ করতে লাগলাম। রাত্রিবেলায় সে আমাকে চেপে ধরে শুয়ে রইলো। কিছুতেই নিষ্কৃতি পেলাম না।

এইভাবে দিনের পর দিন সেই জানোয়ারটা আমার ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে থাকে। আমি ভেবে পাই না, কি ভাবে এই বাঁদরটার হাত থেকে রক্ষা পাবো।

একদিন ওকে কাঁধে নিয়ে চলতে চলতে এক দ্রাক্ষা কুঞ্জে ঢুকে পড়লাম। থোকা থোকা পাকা আঙুরের অরণ্য। আমার মাথায় একটা ফন্দী এলো। পাশেই দেখলাম, একটা লাউ গাছ। একটা পাকা লাউ-এর বশ ছিঁড়ে এনে তার ভেতর থেকে কুরে কুরে বিচি আর শাঁসগুলো বের করে ফেলে দিলাম। তারপর আঙুর ছিঁড়ে এনে ভরলাম সেই লাউ-এর খোলে। মুখটা ভালো করে বন্ধ করে একটা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখলাম। কয়েক দিন পরে আঙুরগুলো পচে পচে গাজলা কাটতে থাকে। আমি লাউ-এর খোলটা তুলে এনে খুলে দেখলাম, বেশ টলটলে মদ তৈরি হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে কয়েক চুমুক খেয়ে নিলাম। খুব বেশী খেলাম না। একটু পরেই মদের ক্রিয়া শুরু হলো। ধীরে ধীরে শরীরটা আমার হাল্কা তুলোর মতো মনে হতে লাগলো। ঘাড়ের ওপর অত বড় যে বোঝা—তখন আর তেমন ভার বলেই মনে হলো না। স্ফূর্তিতে নেচে উঠলো আমার মন। আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলাম।

আমার এই অস্বাভাবিক অবস্থা এবং অসাধারণ বল দেখে সে ঘাবড়ে গেলো। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। তারপর আমাকে একটা গোত্তা মেরে ইশারা করলো—ঐ লাউ-এর খোলের জিনিসটা খাবে সে। তার ধারণা হয়েছিলো, ঐ পদার্থটা খেয়েই আমার শরীরের তাগদ অনেক বেড়ে গেছে। এইভাবে আমি শক্তিধর হতে থাকলে সে হয়তো আমাকে আর কাবু করে রাখতে পারবে না। তাই, সে-ও আরও শক্তি সঞ্চয় করতে চায়।

আমি হাসলাম। লাউ-এর মদটা ওর হাতে দিলাম। প্রথমে অল্প একটু চেখে দেখলো। বেশ মিষ্টি মিষ্টি টকটক ঝাঁঝালো বস্তু। ঢকঢক করে সবটা সে উজাড় করে গলায় ঢেলে দিলো। অতখানি কড়া মদ পেটে পড়ার পর দারুণ ক্রিয়া শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নেশায় বুঁদ হয়ে গেলো। হাত পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে পড়লো। এই সুযোগে প্রচণ্ড এক ঝাঁকানী দিয়ে আমি তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। আমার মাথায় তখন প্রতিশোধের খুন চেপে উঠেছে। একখানা পাথরের চাঁই তুলে এনে ওর মাথায় ছুঁড়ে মারলাম। লোকটা গোঁঙাতে লাগলো। এবার আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে পাথরখানা দিয়ে বাড়ি মারতে তার মাথার খুপরীটা খুলে ফেললাম।

এইভাবে সেদিন সেই শয়তানের হাত থেকে রেহাই পেলাম।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো আটতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বুড়োটাকে হত্যা করার পর আমার দেহের বল আর মনের স্ফূর্তি দশ গুণ বেড়ে গেলো। আমি মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে সমুদ্র সৈকতের দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন সবে মাত্র একখানা জাহাজ কিনারায় ভিড়ে নোঙর করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের কাপ্তেন এবং অন্যান্য যাত্রীরা নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এই দ্বীপে নামলেন কেন? এখানে তো কোনও জন-বসতি নাই!

কাপ্তেন বললো, জানি। কিন্তু এখানে একটা ঝর্ণা আছে। তার জল বড় মিষ্টি। আমরা জল আর ফল সংগ্রহ করতে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি? তুমি এখানে কি করে এলে?

আমি আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী সবটুকুই সংক্ষেপে বললাম।

কাপ্তেন চোখ কপালে তুলে বললো, সর্বনাশ! তুমি ঐ শয়তান বুড়োটার খপ্পরে পড়েছিলে? যে-সব নাবিক একবার তার পাল্লায় পড়েছে—জান নিয়ে আর ফিরতে পারেনি। শয়তানটার দাবনাতে এত জোর—দুই পায়ের চাপেই মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। তোমার এই জোয়ান বয়স, আর তাগড়াই স্বাস্থ্য—তাই তুমি সামলাতে পেরেছ। তা না হলে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া শক্ত ছিলো। ঐ বুড়ো শয়তানটা 'সমুদ্রের আতঙ্ক' নামে কুখ্যাত ছিলো। যাক, তাকে মেরে ফেলে তুমি অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচালে।

কাপ্তেন আমাকে তার জাহাজে নিয়ে গেলো। আমার পরনের পোশাক আশাক প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। সে আমাকে নতুন সাজপোশাক দিলো পরতে।

জাহাজ ছেড়ে দিলো। অনেক দিন চলার পর এক সুন্দর বন্দরে ভিড়লো আমাদের জাহাজ। স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, জায়গাটার নাম বাঁদর-শহর। তার কারণ, হাজার হাজার অদ্ভুত জাতের বাঁদর বাস করে এই শহর বন্দরের গাছে গাছে।

একজন সওদাগরকে সঙ্গে নিয়ে আমি তীরে নামলাম। ইচ্ছা ছিলো, শহরের কোথাও যদি একটা কাজ-কাম জোগাড় করতে পারি। বন্দর পিছনে রেখে আমরা শহরের পথে এগিয়ে যেতে থাকি। আমার সঙ্গী সওদাগরটি বড় সদাশয় মানুষ। আমাকে একটা কাপড়ের থলে দিয়ে বললো, পাথরের নুড়িতে ভরে নাও থলেটা। শহরের সদর ফটকে চলো, সেখানে দেখবে, তোমার মত আরও অনেকে থলে ভর্তি পাথরের নুড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। এক এঁক করে আরও অনেকে এসে দাঁড়াবে সেখানে। সবারই হাতে থলে ভর্তি পাথরের নুড়ি। তারপর ওরা যেখানে যাবে, ওদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যাবে। ওরা যা করবে তুমিও তাই করবে। দেখবে তোমার অনেক লাভ হবে।

সওদাগরের কথা মতো থলেটা বোঝাই করলাম পাথরের নুড়িতে। কাঁধে করে নিয়ে চললাম শহরের সদর ফটকের সামনে। সওদাগরের কথাই ঠিক, কিছু লোক দাঁড়িয়েছিলো সেখানে। সকলেরই কাঁধে আমার মতো একটা করে নুড়ি বোঝাই থলে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও অনেকে এসে জড়ো হলো। তাদের কাঁধে একটা থলে। আমরা সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকলাম। এক জায়গায় এসে দেখি, অসংখ্য লম্বা লম্বা গাছ। এগুলোকে এরা নারকেল গাছ বলে। গাছের মাথায় বেশ বড় বড় কাঁদি কাঁদি এক জাতের ফল। এর ওপরের খোসটা বেজায় শক্ত। কিন্তু ভিতরে মিষ্টি জল আর ধবধবে সাদা সন্দেশের মতো শাঁস। এদেশের লোকের খুব প্রিয় খাদ্য। একে এরা নারকেল বলে। এই নারকেল গাছের মাথায় বাঁদরের বাসা।

আমরা সবাই মিলে পাথরের নুড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাঁদর খেপাতে লাগলাম। বাঁদরগুলো পাথরের আঘাত পেয়ে রাগে ফুঁসতে থাকে। নারকেল ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাদের মারে। কিন্তু আমরা তাদের তাক বুঝে পাশ কাটাই। নারকেলগুলো এক এক করে থলেয় ভরে নিই। এইভাবে থলেটা বোঝাই হয়ে গেলে সে দিনের মতো ফিরে আসি। শহরের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করি। বেশ ভালো দামেই বিক্রি হয়। এ এমন সওদা—সবটাই লাভের।

এইভাবে প্রতিদিন সকালে আমরা দল বেঁধে বাঁদর খেপাতে যাই। ফিরে আসি নারকেল বোঝাই বস্তা নিয়ে। বাজারে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করি।

কয়েক দিনে বেশ কিছু জমে গেলো। এবার আমরা মুক্তো-সমুদ্রে যাত্রা করবো। হিসেব করে দেখলাম, আমার জাহাজের ভাড়া জোগাড় হয়ে গেছে। এর পরে যেসব নারকেল সংগ্রহ করে আনলাম সেগুলো আর এই শহরে বিক্রি না করে জাহাজে এনে তুললাম। আমাদের যাত্রা পথে যে সব বন্দর পড়বে সেখানে আরও ভালো দামে এগুলো বিক্রি হবে।

হলোও তাই। এইভাবে হাতে কিছু পয়সা জমিয়ে ফেললাম। এর পর আমরা মুক্তো সমুদ্রে এসে মুক্তো সন্ধান করতে থাকি। কোনও কোনও ঝিনুকের খোলে মুক্তো পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মুক্তো মেলে না। আমার নসীব সাধ দিলো। যতগুলো ঝিনুক খুলি তার বেশিরভাগেই মুক্তো পাই।

হাতে অনেক টাকা এসে গেলো। বাড়ির জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। আমি আর সেখানে অপেক্ষা করলাম না। একখানা নৌকা ভাড়া করে বসারহয় এসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে বাগদাদ নিজের দেশে এসে নামলাম।

এর পর আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে থাকলাম।

এই হলো আমার পঞ্চম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী।

বৃদ্ধ সিন্দবাদ ক্ষণকালের জন্য থামলো। তারপর কুলি সিন্দবাদের হাতে একশোটা মোহর গুঁজে দিয়ে সবাইকে বললো, এসো, এবার আমরা খানা পিনা সেরে নিই। কাল আবার তোমাদের শোনাবো আমার আর এক অভিযানের কাহিনী।

পরদিন সকালে আবার সবাই এসে হাজির হলো। নাস্তাপানি শেষ হলে বৃদ্ধ সিন্দবাদ বলতে শুরু করে ঃ

একদিন আমার বৈঠকখানায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে খোশগল্পে মসগুল হয়ে আছি এমন সময় দেখলাম, আমার বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে কয়েকজন পরদেশী সওদাগর। সাদর অভ্যর্থনা করে তাদের ডেকে বসালাম আমার ঘরে। কথাবার্তায় বুঝলাম, বিদেশে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছে তারা। আমার রক্ত চনমন করে ওঠে। বললাম, আমিও যাবো, আমাকে নেবেন আপনাদের জাহাজে?

ওরা বললো, এতো ভারি আনন্দের কথা। আসুন আমাদের জাহাজে। এখানে আমরা আরও দুদিন থাকবো।

আমি আর দেরি না করে বাজারে গিয়ে নানারকম সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র সওদা করে আনলাম। বাঁধাছাঁদা শেষ করে জাহাজে চেপে বসলাম। জাহাজ চললো বসরাহর দিকে।

বসরাহয় এসে আমরা আরও একটা বড় জাহাজে গিয়ে উঠি। দিনক্ষণ দেখে জাহাজ ছাড়া হলো। আমরা নিরুদ্দেশের সায়রে গা ভাসালাম।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো নয়তম রাতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আমরা এ বন্দর থেকে সে বন্দরে নোঙর করি। নতুন নতুন দেশ দেখি সওদাপত্র ফিরি করি।

এইভাবে কত অজানা দেশ দেখা হয়। একদিন রাতে আমরা তখন শুয়ে পড়েছি, হঠাৎ কাপ্তেনের চিৎকার শুনে ধড়মড় করে উঠে পড়লাম সবাই।

কাপ্তেন বললো, তোমরা সবাই শোনো, আমরা এক অজানা সমুদ্রে এসে পড়েছি। এ পথ আমার অচেনা। কি হবে কিছুই বলতে পারছি না। এখন আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তিনি যদি বাঁচান, তবেই বাঁচবো।

কাপ্তেন আর দাঁড়ালো না। সোজা মাস্তুলের উপরে উঠে গেলো। পালের কাছি খুলে দেওয়া হলো। একটুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ঝড় উঠলো। সেই তুফানের দাপটে জাহাজখানা উথাল পাতাল করতে করতে সামনের এক পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেলো। অগাধ জলে কে কোথায় তলিয়ে গেলো, কিছুই হদিশ করতে পারলাম না। আমি সেই পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো পাথর আঁকড়ে ধরে কোনওরকমের আত্মরক্ষা করতে পারলাম।

পাহাড়টাই খাড়াই উঠে গেছে। ওপরে ওঠার আশা দুরাশা। তবে লক্ষ্য করলাম, পাহাড়টা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে একটা দ্বীপ। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে অতি কষ্টে এগিয়ে চললাম সেই দ্বীপের দিকে।

দ্বীপের সৈকতে অসংখ্য জাহাজের ভাঙ্গা টুকরো আর নানারকম সওদাগরী সামনপত্রে ভর্তি। কত জাহাজ যে পথ হারিয়ে এই পাহাড়ের ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নাই। সেই সব জাহাজের ধ্বংসাবশেষ আর তার মালপত্র ঢেউ-এ ঢেউ-এ এসে জড়ো হয় এই বেলাভূমিতে।

ভাঙ্গা গলুই, কাঠের পাটাতন, মাস্তুল, পালের কাছি কাপড়ের গাঁট, বাক্স প্যাটরা তোরঙ্গ-এর স্তূপ ডিঙিয়ে দ্বীপের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একটু এগোতেই চোখে পড়লো, একটি ছোট্ট কলস্বনা নদী। ঐ পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। দ্বীপের এদিক ওদিক এঁকেবেকে আবার ঐ পাহাড়ের পাদদেশের এক গুহার মধ্যে হারিয়ে গেছে।

কিন্তু এর আসল চেহারা অন্য। এই ছোট্ট নদীটার দুই তীর নানা বর্ণের উপলখণ্ডে সমাকীর্ণ। লক্ষ কোটি ছোট ছোট পাথরের নুড়ি। সবই মূল্যবান পাথর। বেশীর ভাগই চুনী। মাঝে মাঝে সূর্যের রশ্মি ঠিকরে চোখে হানছে হীরের দ্যুতি। এর মধ্যে সোনা আর রূপোর টুকরোর কি ছড়াছড়ি। তাছাড়া আরও কত অমূল্য গ্রহরত্ন যে এর মধ্যে মিশে রয়েছে তার হদিশ একমাত্র পাকা জহুরীই করতে পারবে। আমার সাধ্য নাই। সারা নদীর উপকূলে এই যে বহু বিচিত্র রঙের মেলা—এর উপর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে স্বপ্ন লোকের হুরী পরীর দেশের সে-এক রঙিন ছবি মনে করিয়ে দেয়। চীন আর ভারতের কুমারিকা অঞ্চলে যে উৎকৃষ্ট মানের ঘৃতকুমারী পাওয়া যায় সেই জাতের ঘৃতকুমারী গাছ গজে উঠেছে এই ঝর্ণানদীর জলে।

পাহাড় থেকে আরও একটা ঝর্ণা নেমে এসেছে। না, জলের নয়। গলিত আলকাতরার মতো এক প্রকার তরল পদার্থ পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে অবিরামভাবে বয়ে চলেছে

সমুদ্রের দিকে। সমুদ্র থেকে লোভী মাছেরা উঠে এসে এই তরল পদার্থ খেয়ে পেট ডাই করে। তারপর এক সময় সব উগলিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই বমি জলের ওপরে রঙিন শক্ত মোমের মতো ভাসতে থাকে। এবং সেই ভাসমান মোমের সুগন্ধে সারা সৈকত মদির হয়ে ওঠে।

এই যে অমূল্য সম্পদসম্ভার, সবই মূল্যহীন হয়ে পড়ে আছে এখানে। সম্পদ তখনই মূল্যবান হয় যখন তা মানুষের অধিকারে আসে। কিন্তু এই জনমানব বর্জিত দ্বীপে বাইরের কোনও মানুষ সশরীরে এসে পৌঁছতে পারে না। যারা পথ ভুলে এসে পড়ে, পাহাড়ের দুর্বার আকর্ষণে জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে, তাদের সলিল সমাধি ঘটে। তাই, আজ পর্যন্ত এই অতুল ঐশ্বর্য মানুষের অদেখাই রয়ে গেছে।

সারা দ্বীপে এত ঐশ্বর্যের সমারোহ, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনও আহার্য নাই। তন্নতন্ন করে খুঁজেও খাবার মতো কোনও বস্তুর সন্ধান পেলাম না। খিদের জ্বালায় আমি হন্যে হয়ে ঘুরি। কিন্তু না, কোথাও কিছু নাই। ভাবলাম, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

এইভাবে আরও কয়েকটা দিন কাটে। আম আর চলতে ফিরতে পারি না। বালির ওপরে অসাড় হয়ে পড়ে থাকি। বুঝতে পারি ধীরে ধীরে আমার সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। অনাহার অনশনের যে কি জ্বালা—সে কথা আর বোঝাবো কি করে। তখন আর উপায় নাই, শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর মুহূর্তের অপেক্ষায় আছি। হাত দিয়ে বালি সরিয়ে সরিয়ে নিজের কবর নিজেই খুঁড়তে থাকি।

মোটামুটি গর্তটা খোঁড়া হয়ে গেলো তার নিচে দেহটাকে সঁপে দিই। মনে আশা, আমার মৃত্যুর পর সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া বালি উড়িয়ে এসে ঢেকে দেবে আমার দেহখানা।

নিজের উপর রাগ হয়। এর আগে পাঁচ পাঁচ বার কত বিপদ বিপর্যয়ে দিন কেটেছে তাতেও আমার শিক্ষা হলো না। আবার পথে বেরুলাম। আমার মতো মানুষের এই সাজাই সমুচিত। কি দরকার ছিলো এই সেধে বাঁশ ঘাড়ে নেবার। বাগদাদে যে সম্পত্তি আমি রেখে এসেছি তিন পুরুষ ধরে মোচ্ছব করে খেলেও ফুরাবে না। তবে? তবে কেন এই দুর্মতি হলো আমার?

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, আচ্ছা, এই যে ছোট্ট নদী—এর উৎপত্তি স্থান ঐ পাহাড়—সে জায়গা আমি দেখে এসেছি। কিন্তু এর শেষ কোথায়, তাতো দেখতে পেলাম না? শুধু এইটুকু দেখতে পাচ্ছি। নদীটা এঁকে বেঁকে আবার ঐ পাহাড়েরই গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু গুহার ভিতর দিয়ে কোথায় কত দূর সে চলে গেছে, কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে মিশেছে তা তো জানা হলো না?

আমি ভাবলাম, নদীটা নিশ্চয়ই এই পাহাড়ের তলাতেই শেষ হয়ে যায়নি। হয়তো অন্য কোথাও অন্য কোনও দেশে চলে গেছে। ঠিক করলাম, শেষ দেখতে হবে। মৃত্যু তো শিয়রে এসেই গেছে, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। যদি বেরুবার কোনও পথ পাই, ভালো, আর যদি ঐ নদীর জলেই সমাধি ঘটে ঘটুক। এমনিও মরতে হবে—না হয় জলেই ভেসে যাবো।

ভাঙ্গা জাহাজের পাটাতনের কাঠ জুড়ে জুড়ে একখানা ভেলা বানালাম। কয়েকটা বস্তা, সমুদ্রের ধারে এই সব জিনিসের ছড়াছড়ি, সংগ্রহ করে নদীর ধার থেকে হীরে চুনি পান্না মুক্তোয় বোঝাই করে নিলাম। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে বস্তাগুলো ভেলায় চাপিয়ে নিজেও চেপে বসলাম। খরস্রোতা আমার ভেলা নিয়ে ঢুকে গেলো গুহার গহ্বরে। নিরন্ধ্র নিঃসীম অন্ধকার! তবে বেশ বুঝতে পারলাম, আমার ভেলাখানা তরতর করে এগিয়ে চলেছে। শুধু ভাবছি, এইবার হয়তো তমসার শেষ হবে। এই পাহাড়ে সুড়ঙ্গ নদী আলোয় এসে পড়বে। কিন্তু না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে থাকলো, অন্ধকার আর নদী কেউই শেষ হয় না। ভেলার ওপরে শুয়ে উপবাসী আমি এক মৃতকল্প মানুষ। কোনই চৈতন্য নাই। কি ভাবে কোথা দিয়ে কোথায় চলেছি কিছুই বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ আমার তন্দ্রাভাব কেটে গেলো। চেয়ে দেখি আমি এক সবুজ ঘাসের শয্যায় শুয়ে আছি। আমার ভেলাটা বাঁধা আছে অদূরে নদীর কিনারে। আর আমার চারপাশে এসে জড়ো হয়েছে শতাধিক উৎসুক মুখ। সাজপোশাক চেহারা চরিত্র দেখে বুঝলাম, এরা হিন্দুস্তানের বাসিন্দা।

ওর আমাকে কি যেন জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু ভাষার দুস্তর বাধা, ওদের কথা একবর্ণ বুঝলাম না আমি। বললাম, কে তোমরা? এই দেশেরই বা কী নাম?

ওরাও বুঝলো না আমার ভাষা। কিন্তু আমিও চেষ্টা করতে থাকলাম—কী করে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়, কী করে ওদের বক্তব্য বুঝতে পারা যায়—তারই কসরৎ চলতে থাকলো।

আমি পেট দেখিয়ে মুখে হাত রেখে বোঝালাম, অন্য কথা পরে হবে, আগে আমাকে কিছু খেতে দাও। আমি কতকাল কিছু খাইনি।

দেখলাম, ওদের মুখ ব্যথায় টনটন করে উঠলো। কয়েকজন ছুটে গেলো খাবার আনতে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অনেক খাবার দাবার এসে গেলো। আমি খুব তৃপ্তি করে খেলাম।

এমন সময় দেখলাম, আমার এক জাতভাই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরাই ডেকে নিয়ে এসেছে তাকে। আমাকে সে পরিষ্কার আরবী ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কী? দেশ কোথায় তোমার? কেনই বা এসেছ এখানে?

আমি আমার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করলাম। আমার নাম ধাম সব বললাম তাকে। সে আমার কথাগুলো হিন্দুস্তানী ভাষায় তর্জমা করে বুঝিয়ে দিলো ওদের। দোভাষীর মুখে এই সব তাজ্জব কাহিনী শুনে তো তাদের চোখ কপালে ওঠার দাখিল।

—এমন দুঃসাহসিক কাণ্ড কি কেউ করতে পারে?

—আমি বললাম, এই আমার ধাত, একবার নয়, এর আগে আরও পাঁচ পাঁচবার ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে প্রাণ সংশয় ঘটেছিলো। প্রতিবারই আল্লাহর অপার করুণায় উদ্ধার পেয়ে গেছি। এবারও বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় বেঁচেই গেলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ জায়গাটার নাম কী?

দোভাষী বললো, সারন দ্বীপ। এখানকার সম্রাটের কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো, চলো। তোমাকে দেখলে তিনি খুব খুশি হবেন।

আমি বললাম বেশ, চলো।

ওরা আমাকে শোভাযাত্রা করে সম্রাটের কাছে নিয়ে এলো। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে কাছে বসালেন। আমি আমার এই দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযানের সমস্ত কাহিনী তাঁকে খুলে বললাম।

সারন দ্বীপ সম্রাট বললেন, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করেছেন। না হলে, এইরকম বিপদে পড়ে কেউ বাঁচতে পারে না।

আমার বস্তা খুলে কিছু রত্নপাথর ভেট দিলাম তাকে।

এই সব দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পাথর দেখে সম্রাট তো মহাখুশি। সাগ্রহে নিলেন আমার উপহার। তিনিও আমাকে দিলেন অনেক মূল্যবান উপহার উপঢৌকন।

তার কাছ থেকেই জানলাম, এই বিশাল সারন দ্বীপ চব্বিশটি প্রদেশে বিভক্ত। এই উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শিখর। লোকে বলে, আমাদের আদি পিতা আদম এই পর্বতশৃঙ্গে কিছুকাল বসবাস করেছিলো। এই পর্বতমালায় নানা মূল্যবান গ্রহরত্ন পাওয়া যায়। সম্রাট তার কয়েকটা আমাকে উপহার দিলেন। যদিও আকারে সেগুলো বেশ বড়ই। তবুও আমার গুলোর মতো অত সুন্দর না। এই দ্বীপের আর একটা বস্তু লক্ষ্য করার মতো—চারদিকে অসংখ্য নারকেল গাছ।

একদিন সম্রাট আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, সিন্দবাদ, তোমার স্বদেশ

বাগদাদের শাসন ব্যবস্থাদি কেমন? এবং সুলতান হারুন অল রসিদ-ই বা কতটা জনপ্রিয় শাসক?

আমি বললাম, আমাদের সুলতানের মতো ধর্মাত্মা আমি দেখিনি। তাঁর হুকুমতে অন্যায় অবিচার বলে কিছু নাই। লোকে সুলতানকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। সুলতানও প্রজাদের কল্যাণের জন্য দিবস-রজনী চিন্তা করেন।

সারন দ্বীপ সম্রাট মুগ্ধ হয়ে বললেন, সত্যিই আদর্শ বাদশাহ। আমার প্রীতির নিদর্শন হিসাবে তাকে কিছু উপহার পাঠাতে চাই। তুমি তাঁর কাছে পৌঁছে দেবে, আমার হয়ে?

—বাঃ, কেন দেব না? আর তাছাড়া আপনি যে আমার সঙ্গে কত সুন্দর ব্যবহার করছেন তাও তাকে বলবো বৈকি! আমার তো মনে হয়, এর ফলে, দুই দেশের মধ্যে সখ্যভাব গড়ে উঠবে।

সম্রাট রাজন্যদের নির্দেশ দিলেন, সুলতান হারুন অল রসিদের উপহার সামগ্রী সাজাতে।

একটা বড় ঘট নানাজাতের মূল্যবান রত্নপাতরে ভর্তি করা হলো। একটা প্রকাণ্ড গালিচা দিলেন তিনি। সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি। আগাগোড়া গালিচাটার গায়ে মোহরের মতো গোল গোল চক্র। শ দুই কর্পূরের ডেলা। আট হাত লম্বা আর সেই পরিমাণ চওড়া হাতীর দাঁত। এবং এর সঙ্গে দিলেন সারন দ্বীপের এক উর্বশী কন্যা।

এই সঙ্গে তিনি একখানা পত্র দিলেন খলিফা হারুন অল রসিদকে।

"মহামান্য খলিফা; আমার এই দীন উপহারটুকু আপনি গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন। আপনার কীর্তিকাহিনী শুনে আমি মুগ্ধ। আমি আপনার মতো আদর্শ সম্রাট হয়ে রাজ্য শাসন করতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আপনার বন্ধুত্ব পেলে আমি ধন্য হবো।"

সম্রাট আমাকে বললেন, সিন্দবাদ, তুমি আমার আদরের অতিথি। যদি এ দেশ তোমার ভালো লাগে, এখানেই থাকো। আমি খলিফার কাছে অন্য দূত পাঠাচ্ছি। সে তোমার আপনজনদেরও খবর দিয়ে আসতে পারবে—তুমি ভালো আছ।

আমি বললাম, আপনার সহৃদয়তা আমি কোনওদিনই ভুলতে পারবো না, সম্রাট। না, আমি দেশেই ফিরে যেতে চাই। আপনার দেশ আমার খুবই ভালো লেগেছে। কিন্তু নিজের আত্মীয়স্বজনদের দেখার জন্য মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দু-এক দিনের মধ্যেই একখানা নৌকা বসরাহর দিকে ছাড়বে। আমি ঠিক করেছি, এই নৌকাতেই রওনা হয়ে যাবে।

সম্রাট বললেন, বেশ, তাই যাও। কিন্তু তোমার জন্য আমার দরজা সব সময়ই খোলা রইলো, সিন্দবাদ। যখন তোমার ইচ্ছে হবে, চলে আসবে।

কাপ্তেনকে ডেকে তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে সম্রাট বললেন, এ হচ্ছে সিন্দবাদ, দুর্বার দুরন্ত। কতবার যে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসেছে তার ইয়ত্তা নাই। তুমি যাওয়ার পথে এর মুখে শুনবে সেই সব বিচিত্র কাহিনী। শোনো, কাপ্তেন, সিন্দবাদ আমার বিশেষ অতিথি। তাকে খুব যত্ন করে পৌঁছে দেবে তার দেশে। তোমার যা ভাড়া, আমি দেব।

সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি নিরাপদে বসরাহয় এসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে আমার স্বদেশ-বাগদাদ।

জাহাজ থেকে নেমে প্রথমে আমি গেলাম সুলতান হারুন অল রসিদের প্রাসাদে। যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে সম্রাটের চিঠিখানা আর তার উপহার সামগ্রী দিলাম তাঁকে। আমার সমুদ্র যাত্রার কাহিনীও বললাম।

খলিফা মনোযোগ সহকারে চিঠিখানা পড়লেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন সব উপহারের জিনিসপত্র। বললেন, বাঃ, বেশ সুন্দর তো!

আমি সম্রাটের গুণগান করে বললাম, সত্যিই, তাঁর মতো ধর্মপ্রাণ প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আমি দেখিনি, জাঁহাপনা। তাঁর দেশে অধর্ম, অন্যায়, অবিচার বলে কিছু নাই। সম্রাট নিজেই তাঁর দেশের প্রধান বিচারক। প্রতিটি প্রজার কল্যাণের জন্য সর্বদা তিনি চিন্তিত।

খলিফা বললেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে, সিন্দবাদ। তুমি যে তাঁর শুভেচ্ছা বয়ে নিয়ে এসেছ আমার কাছে, এজন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

খলিফা আমাকে মূল্যবান সাজপোশাক উপহার দিলেন।

এই হচ্ছে আমার ষষ্ঠ অভিযানের কাহিনী। এর পর কাল তোমাদের শোনাবো আমার শেষ সমুদ্রযাত্রার আর এক অভিজ্ঞতা।

বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক, এরপর, সকলের সঙ্গে বসে খানাপিনা করলো। কুলি সিন্দবাদকে একশোটা সোনার মোহর উপহার দিয়ে বললো, কাল সকালে আবার আসবে। আমার কাহিনী শোনাবো।

পরদিন সকালে কুলি সিন্দবাদ রুজু নামাজ সেরে যথা সময়ে বৃদ্ধ সিন্দবাদের বাড়ি এসে হাজির হয়।

এক এক করে অন্য সব অভ্যাগতরা এসে পড়লে বৃদ্ধ সবাইকে নিয়ে খানাপিনা করে। অনেক রসালাপ হয়। তারপর কাহিনী বলতে শুরু করে সিন্দবাদ নাবিক ঃ

আমার ছয় ছয় বার অভিযানের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর সমুদ্র অভিযানের সঙ্কল্প একেবারে মন থেকে মুছে ফেলে দিলাম। একবার দুবার নয়, এই ন্যাড়া পর পর অনেকবার বেলতলায় গেছে, আর নয়। যে-সব কথা স্মরণ করলে শিউরে উঠতে হয়। সুতরাং এই বয়সে আর সেই সব বিপদের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না। তাছাড়া বয়সও বেড়েছে, এখন আর এত ধকল শরীরে সইবে না। আর কেনই বা যাবো? আমার তো অর্থের প্রয়োজন নাই। আমি এখন, আল্লাহর কৃপায়, বাগদাদের সেরা ধনী। সাতপুরুষ বসে খেলেও ফুরাবে না। শুধু কি অর্থ, সারা শহরে আজ আমার কত নাম যশ খ্যাতি। স্বয়ং খলিফা আমাকে সাদরে ডেকে পাঠান। আমার অভিযানের কাহিনী শুনে তিনি চমৎকৃত হন।

কিন্তু মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছাই বড় কথা নয়। একদিন খলিফা হারুণ অল রসিদের দরবারে বসে আমার দুঃসাহসিক অভিযানের বিচিত্র কাহিনী শোনালাম তাকে। তারপর খলিফা আমাকে একটি প্রস্তাব দিলেন।

—সিন্দবাদ, আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছি, সারণ দ্বীপ সম্রাটের কাছে আমার শুভেচ্ছা আর উপহার পাঠাবো। কিন্তু জুতসই কোনও দূত পাচ্ছি না। তুমিই একমাত্র যোগ্য লোক, আমার ইচ্ছে, তুমি আমার দূত হয়ে তাঁর কাছে যাও। তোমাকে আবার পেয়ে তিনি খুব খুশিও হবেন, আমারও কাজ হবে।

বুঝলাম, খলিফার ইচ্ছাই আদেশ। আমি বিনয়াবনত হয়ে বললাম, আপনার হুকুম শিরোধার্য, জাঁহাপনা। কবে যেতে হবে, বলুন।

দু-এক দিনের মধ্যেই তিনি সব গোছগাছ করে দিলেন। তোমরা বিশ্বাস কর, ঘর ছেড়ে বেরুবার এক বিন্দু ইচ্ছে ছিলো না আমার, শুধু খলিফাকে তুষ্ট করার জন্যই পথে বেরুতে হলো।

তিনি আমাকে দশ হাজার দিনার রাহা খরচ দিলেন। সারন দ্বীপ সম্রাটকে এক

শুভেচ্ছাপত্র লিখলেন। সেই চিঠির সঙ্গে তাঁর স্বনির্বাচিত উপহার উপঢৌকনাদি বেঁধে ছেঁদে দিলেন আমার হাতে। তার মধ্যে ছিলো ঃ একটি চমৎকার রক্তাভ মখমল শয্যা। কি যে দাম হতে পারে, আমি কল্পনা করতে পারলাম না। অর্থ আমার প্রচুর আছে, কিন্তু অমন বিলাসশয্যা আমি জীবনে চোখে দেখিনি। এই ধরনের আরও দুখানা দুরঙের শয্যা তিনি সঙ্গে দিলেন। কুফার তৈরি একশো প্রস্ত বাহারী সাজ-পোশাক। আলেকজান্দ্রিয়ার তৈরি লোভণীয় রেশমী কাপড়। বাগদাদের বিখ্যাত কারু শিল্পীদের তৈরি কিছু সূক্ষ্ম সূচীকর্ম করা সাজপোশাক। কারুকার্যকরা সোনার তৈরি অতি প্রাচীন এবং দুষ্প্রাপ্য ফুলদানী। সেই ফুলদানীর গায়ে বিখ্যাত শিল্পীর হাতে খোদাই করা ছিলো একটি ছবি—এক শিকারী এক সিংহকে তীরবিদ্ধ করতে উদ্যত। এ ছাড়া একজোড়া সেরা আরবী ঘোড়া এবং হাজারো রকমের অন্যান্য জিনিসপত্র।

রাত্রি শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো বারোতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

খলিফার এই সব লটবহর নিয়ে একদিন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, রওনা হয়ে পড়লাম।

একটানা দুই মাস সমুদ্র যাত্রার পর একদিন নিরাপদে এসে পৌঁছলাম সারণদ্বীপে। সম্রাটের হাতে তুলে দিলাম খলিফার সেই চিঠি আর উপহার। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে আবার কাছে পেয়ে সম্রাট দারুণ খুশি হলেন। খলিফার দূত হয়ে এসেছি আমি। সুতরাং রাজসিক আদর অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি রাখলেন না তিনি। আমাকে তিনি যথেষ্ট ভালোবাসেন, সুতরাং আদর যত্নের কোনও অভাব হওয়ার কথা ছিলো না, কিন্তু এই অভ্যর্থনা, এই সম্মান খলিফা হারুন অল রসিদের জন্য। আমাকে সম্মান দেখানো মানেই সুলতানকে সম্মান জানানো।

সম্রাট বললেন, সিন্দবাদ এতদিন বাদে তোমাকে আবার কাছে পেয়েছি, এবার বেশ কিছুদিন থেকে যাও।

আমি বললাম, কিন্তু সম্রাট আমি তো এবার সুলতানের আজ্ঞাবহ দাস হয়ে এসেছি। এখানে, আমার ইচ্ছামতো, থেকে যাবো—সে তো হয় না। তাঁকে যথাসময়ে আমার কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে। আপনি মাফ করবেন, এবার আমাকে ছেড়ে দিন, পরে যদি কখনও আসতে পারি, আপনার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখবো না।

কয়েক দিন পরে সম্রাটের কাছে বিদায় নিয়ে আমার জাহাজে চেপে বসলাম। আর কোনও দিকে নয়, সোজা যাবো বসরাহ। সেখান থেকে বাগদাদ।

পালের হাওয়াও আমাদের অনুকূলে হলো। খুব সুন্দর আরামের সমুদ্রযাত্রা করছি আমরা। সমুদ্রের জলে ভেসে এত নির্বিঘ্ন নির্ঝঞ্ঝাট যাত্রা আমার নসীবে আগে কখনও জোটেনি।

এইভাবে সপ্তাহখানেক চলার পরে আমরা সিন দ্বীপে এসে নোঙর করলাম। এখানে সওদাগররা কেনা বেচা করার জন্য নামে। দ্বীপটা মোটামুটি জন-বসতি-বহুল। লোকের আর্থিক অবস্থাও মন্দ না। তাই, চলার পথে সওদাগরদের চোখ এড়ায় না এই বন্দরটা।

সিন ছাড়িয়ে সবে সমুদ্রের মাঝ বরাবর এসে পথের নিশানা ঠিক করা হচ্ছে, এমন সময় কাপ্তেন এসে আতঙ্কিত ভাবে বললো, ঠিক বুঝতে পারছি না, কোথায় এসে পড়লাম। যাইহোক, আমি মাস্তুলের উপরে যাচ্ছি, দেখি, নিশানা বুঝতে পারি কি না।

কাপ্তেন ক্ষিপ্র হাতে গায়ের কুর্তা খুলে ফেলে দিয়ে মাস্তুলের মাথায় উঠে যায়। আমরা অজ্ঞ অসহায় কতকগুলো সওদাগর। আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইলাম। ভয়ে বুক ঢিব ঢিব করছে। কাপ্তেন কি বার্তা শোনাবে, কে জানে!

জানা গেলো, বার্তা শুভ নয়। আমরা এসে পড়েছি এক মরণ ফাঁদ দ্বীপের মুখোমুখি। এখানে এলে কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারে না। অন্তত নাবিকরা তাই বলে।

এতকাল ধরে যারা পথ ভুলে, অথবা নসীবের দোষে এই সমুদ্রে এসে পড়েছে তাদের সকলেরই ইন্তেকাল হয়ে গেছে এখানে।

কাপ্তেন নেমে এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আর কেন, এবার তাঁর নাম জপ কর। আর কোনও আশা নাই। একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝড় তেড়ে আসছে এই দিকে। আমাদের মতো শখানেক জাহাজ তার একটা পাকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। খুব কাছেই একটা দ্বীপ আছে—চেষ্টা করলে এই তুফানের তাণ্ডব এড়িয়ে আমরা সেই দ্বীপে গিয়ে নোঙর করতে পারি। কিন্তু তাতেও কোনও ফয়দা হবে না। সিংহের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে হায়নার মুখে পড়া হবে।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কেন—কেন?

কাপ্তেন বললো, ঐ দ্বীপের কিনারে বাস করে অসংখ্য ময়াল সাপ। তারা আকারে এক-একটা ছোটোখাটো পাহাড়ের মতো। আমাদের এই জাহাজখানা আস্ত একেবারে পেটে পুরে ফেলতে তাদের একটুও মেহনত করতে হবে না।

আমরা আঁৎকে উঠলাম, ওরে—বাবা! দরকার নাই—

তার চেয়ে ঝড় তুফানে মরবো, সে-ও ভালো।

কাপ্তেন তার তোরঙ্গ থেকে একটা ছোট্ট বাক্স বের করলো। বাক্সের তালা খুলে তার মধ্যে থেকে একখণ্ড ন্যাকড়া আর কিছু সাদা গুঁড়ো মতো একটা বস্তু বের করলো। খানিকটা জল দিয়ে ঐ অত্যাশ্চর্য গুঁড়ো বস্তুটি ভিজিয়ে আটা মাখার মতো ডেলা করে নাকের ফুটোয় পুরে দিলো। এরপর সে একখানা ছোট্ট কিতাব বের করে বললো—আমার যাদুমন্ত্রের বই!

আমরা বললাম, এ দিয়ে কি হবে?

—তোমরা জান না, ঐ যে ঝড় আসছে দেখছো, ও হচ্ছে পয়গম্বর সুলেমানের সৈন্যবাহিনী। আর ঐ যে দ্বীপ দেখছো, ঐ দ্বীপে আছে সুলেমানের সমাধি। আজ পর্যন্ত কেউ ঐ সমাধিক্ষেত্র দেখতে পায়নি। এখানে এলেই, প্রথমে তেড়ে আসতে থাকে ঐ তুফান। তাকে পাশ কাটিয়ে যদি দ্বীপের তীরে পৌঁছেও যাও, তবু রক্ষা নাই। ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ আর বিকটাকৃতির দানব আস্ত গিলে ফেলবে।

এরপর কাপ্তেন আর একটি কথা বললো না। নিবিষ্ট মনে বই-এর কয়েকটা পাতা উল্টে উল্টে বিড় বিড় করে কি সব পড়তে থাকলো।

—নাঃ, হলো না।

—কী হলো না?

আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করি, কি হলো না কাপ্তেন?

—সে বললো, না, এ দুর্যোগ কাটবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বরং আরও বাড়বে। সুতরাং আমার ওপর ভরসা না রেখে নিজের নিজের পথ দ্যাখো, ৩।২সব। আল্লাহ মেহেরবান—

তখনও ঝড় এসে পৌঁছয়নি, কিন্তু বৃষ্টির বন্যায় জাহাজের পাটতন ভেসে যেতে থাকে। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করি—কাপড়ের গাঁটগুলো বাঁচানো যায় কিনা। কাপ্তেন বললে, ওসব থাক, আপনি বাঁচলে বাপের নাম, আগে নিজের বাঁচার পথ দেখ। জানে বাঁচতে পারলে অনেক কাপড়ের গাঁট চোখে দেখতে পাবে। এখুনি ঘূর্ণী ঝড় এসে আছড়ে পড়বে। যদি পারো সাবধান হও। আমি চললাম, বিদায় বন্ধু, বিদায়। বেঁচে যদি থাকি, আবার হয়তো কোনদিন দেখা হতে পারবে—

কাপ্তেনের করুণ চোখের সেই ভয়ার্ত দৃষ্টি আমি আজও ভুলতে পারিনি। জানিনা সেই দিনই তার সলিল সমাধি হয়েছে কিনা। জানিনা, বেঁচে থাকলেও, জীবনে আর কোনও দিন তার সঙ্গে দেখা হবে কিনা।

একটু বাদেই প্রচণ্ড একটা ঝড়ের ধাক্কা এসে লাগলো আমাদের জাহাজে। প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে পারলেও পরের দাপট আর সহ্য করতে পারলাম না। এলো পাথাড়ী ঝড়ের তাণ্ডব চলতে থাকলো। বিশাল বিশাল ঢেউ এসে আমাদের গোটা জাহাজটা গ্রাস করে ফেলে। কখনও বা মনে হয়, জলের একটা পাহাড় এসে পড়লো। আবার দেখি, না, জলটা সরে গেলো। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ কাটলো না। একটা ঘূর্ণী এসে আমাদের জাহাজখানাকে প্রায় একশো হাত ওপরে তুলে আছাড় মারলো। তারপর কে কোথায় আমরা ছিটকে পড়লাম, তলিয়ে গেলাম, হারিয়ে গেলাম তার কোনই হদিশ করতে পারলাম না। তখন সবাই নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। কে কোথায় বাঁচলো কি মরলো, সে-কথা মনে আসবে কি করে?

আমি জাহাজের একখানা ভাঙ্গা পাটাতন আঁকড়ে ধরতে পারলাম। এই তক্তাখানায় ভর করে ভেসে চললাম। কোথায় এবং কতদূরে জানি না, এক সময় দেখলাম, একটা দ্বীপের কিনারে এসে ভিড়েছি। দ্বীপটা শান্ত শ্যামল, ফলে ফুলে ভরা। ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনী নদী দ্বীপের মাঝ দিয়ে বহমান।

আগের অভিযানের সেই রত্নগর্ভা খরস্রোতার কথা মনে পড়ে গেলো। সেবার সেই নদীর দৌলতেই আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছিলো। ঠিক করলাম, এই নদীর জলেই ভেলা ভাসিয়ে চলবো—যা থাকে কপালে। যদি বাঁচি ভালো, না বাঁচলেও দুঃখ থাকবে না। এছাড়া উপায়ই বা কি!

গাছের সুমিষ্ট ফল আর নদীর জল খেয়ে নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নিলাম। কাঠের পাটাতনখানা টেনে এনে ফেললাম নদীর জলে। তার উপর চেপে বসে ভেসে চলতে থাকলাম স্রোতের টানে। ভেলা ছাড়ার আগে যতটা পারলাম ফলমূল বোঝাই করে নিলাম। আর নিলাম কতকগুলো সুগন্ধী গাছের ডাল। নাম জানি না, কিন্তু সেই কাঠের সুবাস আঘ্রাণ করে বেশ বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই কোনও দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান বস্তু।

গাছের ডাল গুলো ভেলার ওপরে না চাপিয়ে শক্ত লতা দিয়ে ভেলার পাশে বেঁধে দিলাম। এর ফলে ভেলার ওপরে ভার পড়লো না, অথচ ভেলাটাও আকারে অনেক বড় হয়ে গেলো।

ভেলার ওপরে চেপে একটা গাছের ডাল দিয়ে ঠেলা দিতেই নদীর মাঝখানে চলে যায়। তারপর প্রবল স্রোতের টানে দুর্বার গতিতে ছুটে চলে। আমি আর তাল সামলাতে পারি না। ভেলার ওপরে পাক খেয়ে পড়ে গেলাম। আমার দেহের ওপরে গাদা হয়ে গড়িয়ে পড়লো ফলের ডাঁই। আমি চাপা পড়ে গেলাম।

যখন আমার জ্ঞান ফিরলো, দেখি, ভেলাটা তখনও তীর বেগে ছুটে চলেছে। প্রাণপণে উঠে বসবার চেষ্টা করি। কিন্তু কে যেন আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছে, কিছুতেই উঠতে পারলাম না। ভয়ে আঁৎকে উঠলাম, এই দুর্বার গতি রোধ করার সাধ্য তো কারো হবে না। তাহলে, তাহলে কি এই আমার অনন্ত যাত্রা? চোখ বন্ধ করে আল্লাহর নাম জপ করতে থাকলাম।

হঠাৎ কানে এলো, কিছু লোকের চিৎকার। তাকিয়ে দেখলাম, একদল ধীবর জাল ফেলেছিলো, সেই জালে আটকে গেছে আমার ভেলা। লোকগুলো ছুটে এসে আমাকে তীরে তুললো। তখন আমার অর্দ্ধমৃত অবস্থা। জালের জট থেকে ভেলাটাকেও ছাড়িয়ে ওপরে তোলা হলো।

শীতে আমি তখন ঠকঠক করে কাঁপছি। ওরা আমাকে গরম কাপড় চোপড় দিয়ে ঢেকে দিলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো তেরতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

একজন বৃদ্ধ আমার সারা শরীরে তেল মালিশ করে আমাকে খানিকটা চাঙ্গা করে তোলে। এবার আমি উঠে বসতে পারি। কিন্তু তখনও কথা বলতে পারছি না। আমাকে ওরা ধরাধরি করে একটা হামামে নিয়ে গেলো। গরম জলে গোসল করার পর মোটামুটি একুট সুস্থ হলাম।

বৃদ্ধ তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলো আমাকে। পাড়া-পড়শীরা ভিড় করে এলো। চমৎকার সব খানাপিনা এনে দিলো। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলো সে। চোখে আমার তন্দ্রা আসছিলো। শোয়া মাত্রা ঘুমে ডুবে গেলাম।

এইভাবে তিন দিন তিন রাত্রি দারুণ তোয়াজের মধ্যে কাটালাম আমি। ওরা আমাকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করলো না।

চার দিনের দিন সকালবেলা বৃদ্ধ এসে আমার পাশে বসলো।—আল্লাহর দোয়ায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলে, বাবা। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। সবই তাঁর ইচ্ছে—

একটু থেমে বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বাবা, কে তুমি? কোত্থেকেই বা আসছিলে?

আমি বললাম, আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করবেন। আমার নাম সিন্দবাদ নাবিক। অনেক সমুদ্র যাত্রার ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে আমার জীবনে।

এরপর আমার সমুদ্র-অভিযান অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনী বললাম তাকে।

বৃদ্ধ মন্ত্র মুগ্ধের মতো শুনলো সব। তারপর বললো, বেটা আর দেরি না করে এবার তোমার মূল্যবান সামানপত্র সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে যাও। কারণ এ জিনিস শুধু সুন্দরই না—একেবারে দুষ্প্রাপ্য। অন্য লোকের লোভ হতে পারে।

আমি অবাক হই। —আপনি কিসের কথা বলছেন? কি এমন অমূল্য বস্তু আমার সঙ্গে আছে?

—তুমি যে গাছের ডালগুলো সঙ্গে এনেছো সেগুলো মূল্যবান চন্দন কাঠ। যদি বেচতে চাও, আমার সঙ্গে বাজারে চলো। আমি তোমাকে নায্য দাম পাইয়ে দেব।

আমি বললাম, আপনি সদাশয় ধর্মপ্রাণ, সঙ্গে যাওয়ার কী আছে, আপনি নিজেই যান। যা ভালো বিবেচনা করবেন, সেই দামে বেচে আসুন।

বৃদ্ধ বললে; ঠিক আছে, চলো না, এখানকার বাজারটাও তোমার দেখা হবে।

আমি আর 'না' করলাম না।

বাজারে এসে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এক দঙ্গল দালাল ঘিরে ধরেছে—আমার চন্দন কাঠের ডালগুলো নানাভাবে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে।

এরপর বৃদ্ধ ডালগুলো নীলামে তুললো। একজন দাম দিলো এক হাজার দিনার। আর একজন বললো, দুই হাজার। আর একজন—তিন। এইভাবে দাম বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে দশ হাজার দিনার পর্যন্ত উঠলো। বৃদ্ধ আমার দিকে তাকায়, কী, ছেড়ে দেবে?

কি করবো ভাবছি, বৃদ্ধ বললো, এখন বাজার ভীষণ মন্দা। সব জিনিসের দরই পড়তির দিকে। আমার মনে হয়, বেচে দেওয়াই ভালো। আচ্ছা যাক—আরও একশো দিনার বেশি দেবো আমি। আমাকেই দিয়ে দাও তুমি।

—ইয়া আল্লাহ, আপনি নিজে কিনবেন? তার জন্যে বাজারে আসতে হলো। এত যাচাই করতে হলো। আপনি চান জানলে, আমি এমনিতেই দিয়ে দিতাম আপনাকে। যা উপকার করেছেন আমার, তা কি কোন মূল্য দিয়ে শোধ করা যাবে?

বৃদ্ধ তার এক অনুচরকে বললো, কাঠগুলো আমাদের গুদামে নিয়ে যাও।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, চলো বাবা, ঘরে ফেরা যাক।

বাড়ি ফিরে এসে বৃদ্ধ আমাকে গুণে দশ হাজার একশো সোনার মোহর দিয়ে বললো, আমি একটা বাক্স দিচ্ছি, এগুলো বাক্সে বন্ধ করে সঙ্গে নাও।

এরপর আমরা দু'জনে একসঙ্গে বসে খানাপিনা করলাম। বৃদ্ধ আমাকে বললে, বেটা তোমার কাছে একটি জিনিস আমার চাইবার আছে—

আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম, আপনি কোনও সংকোচ করবেন না। বলুন কী চান? আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

বৃদ্ধের চোখ নেচে উঠলো, বাবা, আমি বুড়ো হয়েছি। আর বোধহয় বেশিদিন বাঁচবো না। আমার আপন বলতে সংসারে একটি মাত্র মেয়ে। দেখতে শুনতে বেশ সুন্দরী। আদব কায়দাও বড় ভালো। আমার মরার পর এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র মালিক হবে সে-ই। এই কারণে, আমার সম্পত্তির লোভে, আমার মেয়েকে শাদী করার জন্যে হাজারো ছেলে পাগল। কিন্তু আমি জানি, আমার মেয়ে তাদের লক্ষ্য নয়, তারা কব্জায় পেতে চায় আমার এই বিপুল বৈভব। তাই ভয় হয়, মেয়েটার একটা হিল্লে করে না যেতে পারলে, একটা সুপাত্র দেখে শাদী দিয়ে যেতে না পারলে সে বোধহয় সুখ শান্তি পাবে না। কিন্তু বাবা, অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত এমন একটা ছেলের সন্ধান পেলাম না, যে সত্যিই আমার সম্পদের লোভে নয়, মেয়েটির রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে শাদী করতে পারে। তোমাকে দেখা ইস্তক আমার মনে বড় আশা হয়েছে। তোমার মতো সৎ, নিষ্ঠাবান, উদার-হৃদয় ছেলেই আমি খুঁজছিলাম। আমার একান্ত অনুরোধ, বাবা, তুমি আমার মেয়েটি গ্রহণ কর। আমি জানি, টাকা পয়সা, ধন দৌলতের উপর তোমার কোনও মোহ নাই। তুমিই পারবে আমার মেয়েকে সুখী করতে। আর আমিও শান্তিতে মরতে পারবো।

কোনও কথা না বলে আমি মাথা নত করে বসে থাকি। বৃদ্ধ বলে, আমার খুব বেশি আব্দার নাই, বাবা। শুধু যে কটা দিন বাঁচি, মেয়েটাকে নিয়ে তুমি আমার কাছে থাক, এই আমার ইচ্ছা। তারপর, তোমার ইচ্ছা হয়, আমার সব বিষয় সম্পত্তি বেচে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যেও।

আমি বলতে পারলাম, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে আর আলাদা কিছু নাই। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো। কারণ এইটুকু জানি, আজ যে এই হেসে গেয়ে চলে ফিরে বেড়াতে পারছি সে তো শুধু আপনারই কল্যাণে। বলতে গেলে, এ আমার দ্বিতীয় জীবন লাভ। আপনি যা বলবেন, তাই আমি করবো।

বৃদ্ধের চোখ আনন্দে নেচে ওঠে। —যাক, বাবা, এতদিনে আমি নিশ্চিত হলাম। কি বলে যে তোমাকে দোয়া জানাবো, ভাবতে পারছি না।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো চৌদ্দতম রজনীতে আবার সে শুরু করেঃ

কাজী, ও সাক্ষী ডেকে সেইদিন শাদীপর্ব সমাধা করা হলো। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। মহাধূমধাম করে অনেক লোকজন খাওয়ানো হলো। গরীব দীন ভিখারীরা খানাপিনা ছাড়াও নগদ বিদায় নিয়ে পাত্র-পাত্রীর শতায়ু কামনা করে চলে গেলো।

এতদিন এখানেআছি, কিন্তু সেই শাদীর রাতেই প্রথম দেখলাম বৃদ্ধের মেয়েকে। সে তখন আমার বিবি, সে আমার এখনও বিবি। নানা রত্নাভরণে সেজেগুজে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। তার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। অনেকদিন বাদে একটি সুন্দরী নারীর কবোষ্ণ দেহ বুকের মধ্যে টেনে নিজেকে হারিয়ে দিলাম।

এইভাবে সুখের সায়রে গা ভাসিয়ে দিয়ে অনেকদিন কাটালাম সেখানে। তারপর একদিন আমার শ্বশুর দেহ রাখলো। যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে সমাহিত করা হলো। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সারা দেশের লোক ভেঙ্গে পড়েছিলো সেদিন। আজকালকার দিনে অমন ধর্মপ্রাণ সদাশয় মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। বিরাট লম্বা। শোকমিছিলের পুরোভাগে ছিলাম আমি। এমন একজন মানুষের জামাই হয়ে গর্বে বুক ফুলে উঠেছিলো আমার।

এদেশের মানুষ ফি বছর বসন্তকালে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। সারা বছর ধরে প্রতীক্ষা করে তারা বছরের একটি দিনের জন্য। বসন্তকালের এই নির্দিষ্ট দিনে তারা এক অদ্ভুত খেলার ভাগীদার হয়। এখানকার মানুষ পিঠে ডানা বেঁধে পাখীর মতো আকাশে ওঠার এক বিচিত্র কৌশল জানে। বসন্তকালের সেই নির্ধারিত দিনে সবাই দল বেঁধে এরা আকাশে ওড়ে। উড়তে উড়তে নিঃসীম নীল আকাশের পারাবারে হারিয়ে যেতে চায় এরা। কেউ কেউ যে একেবারে হারিয়ে যায় না, তাও নয়। সবাই মিলে সকালে আকাশে ওঠে। সন্ধ্যার আগে আবার নিচে নেমে আসে। কিন্তু যারা ফেরে না তারা আর কোনও দিনই ফেরে না। তাই এই আকাশ অভিযান এক দিকে যেমন সুখদায়ক আর এক দিকে তেমনি দুশ্চিন্তারও বাহক। তাই সমুদ্রযাত্রার মতো এই আকাশ অভিযানের সময় স্ত্রী পুত্র পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করার রীতি আছে।

সেবার আমারবড় সাধ হলো, আমিও আকাশে উড়বো। কিন্তু কেউই আমার কথায় আমল দিলো না। এবং কিভাবে ডানা মেলে আকাশে ওড়া যায়, তার কৌশলও কেউ শিখিয়ে দিলো না।

কিন্তু আমার বিবাগী মন কিছুতেই বাগ মানে না। শেষে অনেক চেষ্টা চরিত্র করে একজনকে রাজি করলাম। সে আমাকে শিখিয়ে দিলো ডানা বেঁধে ওড়ার কায়দা। সে বললো, চলো, আমি উড়বো তোমার সঙ্গে।

নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে চলেছি আমরা। মনের আনন্দে গান গাইছি। হঠাৎ বিপর্যয় ঘটলো, একটা দমকা হাওয়া এসে ওলোট পালট করে দিলো আমাদের। আমার সঙ্গীটি ডিগবাজি খেয়ে প্রচণ্ড বেগে নিচে পড়ে গেলো। আমি নিচেই পড়তাম, আল্লাহর অপার করুণা, পড়তে পড়তে একটা পাহাড়ের চূড়ায় আটকে গেলাম। আমার পাখা দুখানা তার আগেই ভেঙ্গে নিচে পড়ে গেছে।

এখন এই অবস্থায় কীভাবে আমার বিবির কাছে ফিরে যাবো সেই ভেবে আমি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকি। এখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। একটা পাথরের টিলার ওপর বসে বসে কাঁদতে থাকলাম। এই সময় দুটি প্রিয়দর্শন বালকের দেখা পেলাম। এত রূপ আমি কোন মানুষের দেখিনি।

আমি ধীর পায়ে উঠে গেলাম তাদের সামনে। মাথা নেড়ে শুভেচ্ছা জানালাম। আমাকে দেখে তারাও বেশ খুশি—স্বাগত জানালো। এবার মনে কিছুটা ভরসা পেলাম। বললাম, আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন, আপনারা কে? এখানেই বা কি করছেন?

আমরা আল্লাহর বরপুত্র।

ওদের দু'জনের হাতে দুখানা ছোট্ট সোনার লাঠি ছিলো। একজন একখানা আমার হাতে দিয়ে বললো, এই পথে চলে যাও।

লাঠিখানা হাতে নিয়ে আমি ওদের দেখানো পথ ধরে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে শুধুই ভাবছি, কি সুন্দর ছেলে দুটি। কি করেই বা এলো এখানে।

কিছু দূর এগোতেই রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে এক জায়গায়। সেই পথে পা বাড়াতে যাবো হঠাৎ নজরে পড়লো সামনে এক বিশালাকায় বিষধর সাপ। তার মুখে একটা মানুষ। প্রায় তিনভাগই মুখের মধ্যে পুরে ফেলেছে।

আমি আর এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারলাম না এই বীভৎস দৃশ্য। প্রাণপণ শক্তিতে লাঠিটা ছুঁড়ে মারলাম সাপটার দিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই ছোট্ট সোনার লাঠিটার কি যাদু, ঐ লাঠিটার আঘাতে সাপটা লুটিয়ে পড়ে গেলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে খতম।

লোকটাকে টেনে বের করলাম তার মুখ থেকে। আর একটু হলেই পুরো দেহটাই সে পেটে পুরে ফেলতো।

এই লোকটি আসলে কোনও মানুষ নয়। সে বললো, আমি জীন। উড়তে উড়তে তোমার মুখে তোমাদের ঈশ্বরের নাম শুনে আমি কক্ষচ্যুত হয়ে ঐ সাপের মুখে গিয়ে পড়ি।

আমি বললাম, আমার একটা উপকার করবে?

—স্বচ্ছন্দে। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করলে, আর তোমার উপকার করবো না? বলো কি করতে হবে।

—আমার পাখা দুখানা ভেঙ্গে গেছে। যদি তুমি আমাকে আমার বিবির কাছে পৌঁছে দাও—

—এ আর এমন বেশি কি? আমার পিঠে উঠে বসো। এক্ষুণি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি তোমার বাড়ি।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে আমাকে বাড়ির দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে গেলো।

আমার বিবি তো ততক্ষণে কেঁদে কেঁদে সারা। তার ধারণা, আমি আর বেঁচে নাই। যাই হোক, সে বললো, এই হতচ্ছাড়া দেশে আর এক দন্ড থাকবো না আমি। বিষয়সম্পত্তি যা আছে সব বেচেটেচে দাও। বাকী জীবনটা বাগদাদে গিয়েই বাস করবো। বাবার তাই ইচ্ছা ছিলো, তার মৃত্যুর পর আমি যেন তোমার দেশেই চলে যাই। আমার বাবা অনেক রেখে গেছেন। এ সবই এখন তোমার। টাকা পয়সার তো অভাব নাই, তবে আর কী, একখানা ভালো দেখে সওদাগরী জাহাজ কিনে ফেলো। সামানপত্র সব বোঝাই করে, আল্লাহর নাম নিয়ে পাড়ি দেওয়া যাক।

আমি বললাম, সেই ভালো।

যে-সব জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়ার অসুবিধা সবই এক এক করে নীলামে চড়িয়ে বেচে দিলাম। দাম নেহাত কম পাওয়া গেলো না। বেশ ভালো দেখে আনকোরা একখানা জাহাজ কিনলাম। সামানপত্র বোঝাই করে, দিনক্ষণ দেখে, একদিন বসরাহর দিকে রওনা হয়ে পড়লাম।

কিছুদিনের মধ্যে প্রথমে আমরা বসরাহ, পরে বাগদাদে এসে পৌঁছলাম। আমার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে আমি বাড়ি গেলাম। সেখানে আমার আত্মীয় পরিজন সবাই দেখে খুশির আনন্দে নেচে উঠলো। আমার নতুন বিবিকে বরণ করে ঘরে তুললো তারা। দীর্ঘ সাতাশ বছরে পরে আমি দেশে ফিরে আসছি। আমার বন্ধুবান্ধবরা উপদেশ দিলো, সিন্দবাদ, এইভাবে জীবনের প্রায় সব কটা দিনই তো বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিলে। এবার একটু ঘরে সুস্থির হয়ে বসো।

আমি বললাম, আর নয় যথেষ্ট হয়েছে। জীবনের দেখার আর কিছুই বাকী রাখিনি। এবার আর আমার জন্মভূমি বাগদাদ ছেড়ে বাইরে একপাও যাবো না। এত ঝড়ঝন্‌ঝা বিপদ আপদ কাটিয়ে আজও যে আমি বেঁচে-বর্তে আছি, সে তো সেই একমাত্র করুণাময় আল্লাহর দয়ায়।

এই হলো আমার সপ্তম এবং শেষ সমুদ্রযাত্রার কাহিনী।

এবার বৃদ্ধ সিন্দবাদ কুলি সিন্দবাদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার কাহিনী শুনলে তো মিতা। তাহলে এখন ভেবে দেখ, তুমি যত হাড়ভাঙা পরিশ্রমই করে থাক— আমার তুলনায় তা কত নগণ্য। একটা দিকে তোমার নিশ্চিন্ত ভরসা আছে, সারাদিন খাটাখাটুনির পর ঘরে ফিরে যেতে পারবে তুমি। কিন্তু আমার কথা ভাবো, ঘর ছাড়ার পর আবার যে কখনও ঘরে ফিরতে পারবো সে ভরসা ছিলো কী? ফিরে আসতে পেরেছি—সে একমাত্র তাঁরই কল্যাণে।

একথা সত্যি, আজ আমি বাগদাদের সেরা ধনী। আর তুমি দীন হতে দীনতম এক

কুলি। কিন্তু এটা তো মানো, আমার যে উদ্যম আমার যে জীবনমরণ পণ তার পুরস্কার কি আমি পাবো না?

কুলি সিন্দবাদ বৃদ্ধের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বলে, আমার দুঃখের, ব্যথার গানগুলো শুনে আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না, মালিক। আমি বুঝতে পেরেছি আমার ভুল। এ সংসারে যে যেমন কর্ম করে, সে তেমনই তার মূল্য পায়।

এই কাহিনী শেষ হলেও দুই সিন্দবাদের দোস্তী খতম হয় না। বরং আরও বেড়ে যায়। প্রতিদিন সে নিয়ম করে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে আসে—বৃদ্ধেরই অনুরোধে। খুব জোর খাওয়াদাওয়া গান বাজনা চলে। কুলি সিন্দবাদ, সারাদিন খাটুনির পর, সন্ধ্যাবেলা আবার নতুন জীবনের স্বাদ ফিরে পায়।

উজির কন্যা শাহরাজাদ সিন্দবাদ নাবিকের এই অপূর্ব কাহিনী শেষ করে চুপ করে বসে থাকে। এই সময় অবশ্য রাত্রিও শেষ হয়ে আসে।

দুনিয়াজাদ ছুটে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, কি সুন্দর গল্প তোমার দিদি। আর কি মিষ্টি করেই না বলতে পারো। শুনতে শুনতে চোখের ঘুম উবে যায়। আচ্ছা, দিদি, সত্যি কি সিন্দবাদের মতো ঐরকম দুঃসাহসিক নাবিক কেউ ছিলো? এইভাবে সে বার বার সাত বার নিজের জীবন তুচ্ছ করে বিপদের সঙ্গে লড়াই করেছিলো?

—মিথ্যে হবে কেন, বোন? এতো ইতিহাস। যাই হোক, আজকের মতো ঘুমিয়ে পড়ো। কাল রাতে নতুন কাহিনী শুরু করবো। দেখবে কি মজার।

সুলতান শারিয়ার শাহরাজাদকে আদর করতে করতে বললো, সিন্দবাদের মতো এমন দুঃসাহসিক হয়তো না, কিন্তু আমি আর আমার ছোট ভাই শাহজামান একবার এক অভিযানে বেরিয়েছিলাম, সে কাহিনীও বড় চমৎকার। পরে একদিন শোনাবো তোমাদের। সে যাক, কাল রাতে কী কিস্‌সা শোনাবে শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ সুলতানের কোলে মাথা রেখে বলে, কাল শোনাবো, সুন্দরী জুমুরুদ আর আলী শার-এর কাহিনী।

শাহরাজাদের চিবুকে হাত বুলিয়ে ঠোঁটে সোহাগ করতে করতে শারিয়ার ভাবে, এই সব মজাদার কিস্‌সাগুলো না শুনে তো মেয়েটাকে মারা যাচ্ছে না। জানি না কত গল্প সে জানে। আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে সে।

যথাকার্য সমাধার পর ওরা দু'জনে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিন সুলতান শারিয়ারের দরবারে পৌঁছতে কিছুটা দেরিই হয়ে থাকবে। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি তার ওপর আদর সোহাগের অবসাদ—সব মিলে প্রিয় বাহুডোর খুলে আসতে হয়ত বা কিছুটা দেরিই হয়েছিলো।

দরবারে সবই উদ্বিগ্ন। চিন্তিত। সুলতানের তবিয়ৎ কি আচ্ছা নাই। এমন দেরি তো বড় একটা হয় না তার।

যাই হোক, সুলতান দরবার কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জল্পনা কল্পনার গুঞ্জন একেবারে থেমে গেলো। শাহরাজাদ পিতা উজির সুলতানের বাহুতে কন্যার মাথার ওড়নাখানা দেখে আঁৎকে ওঠে। মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে তার। তাহলে বুঝি শাহরাজাদ আর বেঁচে নাই। এতদিন সে কোনও রকমে গল্প বলে ভুলিয়ে রেখেছিলো, কিন্তু আজ হয়তো সে পারেনি। সুলতান তার মুণ্ডুচ্ছেদ করে এসেছে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সে অপেক্ষা করতে থাকে। এই বুঝি সুলতান তার কন্যার দণ্ডবিধানের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু না, সে সব কিছুই বললো না শারিয়ার। প্রতিদিন সে যেমন বলে। 'কই কি কাজকাম আছে বলো', সেই কথাই আজও জিজ্ঞেস করলো।

সারাটা দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে সন্ধ্যা হতেই আবার সে ফিরে আসে

শাহরাজাদের ঘরে। তারপর প্রাত্যহিক সুরতরঙ্গ সমাধা করে আবার উন্মুখ হয়ে বসে গল্প শোনার জন্যে।

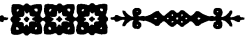

তিনশো ষোলতম রজনীতে শাহরাজাদ নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

দুনিয়াজাদ এতক্ষণ নিচে গালিচার ওপর ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিলো। এবার সে দিদির পাশে এসে বসে।

শাহরাজাদ শুরু করে—

অনেকাল আগের কথা। খোরশান শহরে এক ধনী ব্যবসায়ী থাকত। তার নাম ছিলো গ্লোরি। আলী শার নামে তার চাঁদের মত ফুটফুটে একটা ছেলে ছিলো। খুব বুড়ো হয়ে পড়ায় ব্যবসাদারের শরীরটাও অকেজো হয়ে পড়েছিলো। শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে বুড়ো একদিন ছেলেকে ডেকে বলে, আমি তো চললাম, যাবার আগে তোকে কটা কথা বলে যাই।

ছেলে জিজ্ঞেস করে,—কী কথা আব্বাজান?

ব্যবসায়ী বলে,—বাপজান, এ দুনিয়ার সঙ্গে কখনো যেন জড়িয়ে না পড়িস। বলতে গেলে সারা দুনিয়াটাই তো একটা কামারশালা। তোকে হয় পোড়াবে, নয়ত ওর আগুনের ফুলকিতে তোর চোখ দুটো কানা করে দেবে। আর তাও যদি না পারে তাহলে ধোঁয়ার চোটে দম বন্ধ করে দেবে। তাই ত কবিরা বলেন—

জীবনের এই আঁধার পথে নেইকো বন্ধু নেইকো আশা।
কোথাও খুঁজে পাবে নাকো প্রাণ-পিয়াসী ভালোবাসা।
ভালো যদি বাসতে চাওরে, ভালোবাস নির্জনতা।
নির্জনতা একাই খাঁটি, তার নেইকো কোন আবিলতা।

অথবা

এই দুনিয়ার দেখবে ছবি? দুই পাশেতেই আঁকা সে কি?
হয়ত হবে!—তাই তো মোরা সবাই দেখি!
সামনেতে তার ভণ্ডামি আর আঁকা আছে মিথ্যা আচার
পেছনেতে মিথ্যা আঁকা, আর যা আছে তাই তো মেকি!

আর একজন কবি এ বিষয়ে কি বলেছেন শোনো—

ভ্রান্ত এক নিষ্ফলতা এ পৃথিবী জামার মতন পরে আছে।
কোটের খোলস যেন। কোন দিন সেই শূন্য আঙ্গিনার মাঝে
বন্ধু যদি কদাচিৎ মিলে যায় আল্লার দয়ায়। দাওয়াই-এর মত
তাদের প্রলেপ দিও অতি সন্তর্পণে, সারে যেন পৃথিবীর ক্ষত।

আব্বাজানের কথা শুনে আলী শাহ বলে,—আমি তোমার কথাগুলো মনে রাখব। আর কিছু বলবে আব্বাজান?

বুড়ো বলে,—পারলে কারো ভালো করবি, তবে তার বদলে কিছু আশা করবি না। মনে রাখবি ভালো কাজ করার সুযোগ সব সময় আসে না।

—আমি মনে রাখব আব্বাজান।

—শোনো যে সব ধনদৌলত রেখে গেলাম, সেগুলো নষ্ট করবি না, উড়িয়ে দিবি না। এ দুনিয়ায় যার পয়সা আছে লোকে তাকেই মানুষ বলে মানে। একটা বয়েৎ শোনো—

সেদিন আমার বদান্যতায় কুৎসা যারা করেছিলো
আজো তারা কুৎসা রটায়—যদিও আজ শিথিল মুঠোর পেশী।
সোনার খনি খুঁড়তে গিয়ে শত্রু যত হয়েছিলো
আজকে আমি দীন দরিদ্র, শত্রু তবু অনেক বেশী।

অভিজ্ঞতা যার বেশী তাকে কখনো অবহেলা করবি না। পাকা মাথার সঙ্গে পরামর্শ না করে কখনো বিদেশে যাবি না।

কবি বলেন—

সামনে থেকে দেখতে গেলে একটি কাচেই কাজ হবে।

পেছন থেকে দেখতে গেলে আরো একটি নিতে হবে।

আমার শেষ কথা—কখনো সরাব ছুঁবি না। দোজখের দোর হলো, সরাব। সরাব খেলে ভালোমন্দ জ্ঞান থাকে না। মাতালকে লোকে সব সময় ছোট নজরে দেখে। আমার কথাগুলো মনে রেখো বাপজান। অন্তর থেকে তোকে দোয়া করছি। এ দোয়া তোকে সব সময় ঘিরে থাকবে।

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে বুড়ো হাঁপাতে থাকে, একটু চোখ বোজে। দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাত দুখানি তোলার চেষ্টা করে। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে মোনাজাত জানায়। আল্লাহর ওপর তার অসীম বিশ্বাসে সে যেন তাঁর পদপ্রান্তে পৌঁছতে পারে।

আশপাশের ছেলে-বুড়ো-জোয়ান, ধনী-দরিদ্র সকলেই এসেছিলো বুড়োর শেষকৃত্যের সময়। কবরের ফলকে আলী শার লিখে দিলো ঃ

আমি যখন বেঁচে ছিলাম তখন ছিলাম ধূলি
কেমন করে ভুলি!
এখন আমি ধূলির মধ্যে ধূলি হলাম
এ যে অন্যরকম ধূলি!

বাবা মারা যাবার পর আলী শার দোকান দেখাশোনা করতে লাগলো। তাঁর প্রতিটি উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললো কি? না, বরং বলতে গেলে, বাপের একটা নির্দেশও সে মানলো না। প্রথম থেকেই আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সে এড়িয়ে চলতে লাগলো। এসে জুটল একদল সুযোগ-সন্ধানী লোক। বছর ঘুরে গেলো। এর মধ্যে আলী শার-এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কতকগুলো বদমাশ মাতোয়ালা ছোকরার কাছে নিজেকে যেন বিকিয়ে দিলো সে। এসব বদমাশদের প্রায় সব কটার মা বা বোন দেহ বিক্রী করে পেট চালায়। ধীরে ধীরে ব্যভিচারের জোয়ারে ভেসে গেলো আলী শার। সরাবের সায়রে ক্রমেই সে নাকানি চোবানি খেতে থাকে। নানা পাপাচারে মনের চেহারাটাও তার পালটে গেলো। নিজেকে নিজে চোখ টেরে সে বলে, আব্বাজানের ধনদৌলত সে ভোগ না করলে অন্যলোকে করবে। তাই অন্য লোককে করতে না দিয়ে সে নিজেই ভোগ করবে। ভোগের পরে এলো দুর্ভোগ। হাতের টাকাপয়সা শেষ হয়ে গেলো। রাতের খরচ মেটাতে একদিন দোকানটাও বিক্রী করে দিলো। শেষ পর্যন্ত বসত বাড়ি বেচতে হলো, বেচলে হলো সমস্ত আসবাবপত্র। দামী পোশাকগুলোও বেহাত হয়ে গেলো। সব হারিয়ে এক সময় নিঃস্ব ফকীর বনে গেলো আলী শার।

এভাবে সব কিছু খুইয়ে নিজের অবিমৃশ্যকারিতার চেহারাটা তার চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠল। আব্বাজানের কথাগুলো বড় যে বুকে বাজে এখন। এতদিন যারা বন্ধুবান্ধবের বেশে তার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলো তারা সব সরে পড়তে লাগল নানান অজুহাত দেখিয়ে। দিনের খানাটাও আর জোটাতে পারে না আলী শার। ভিক্ষা করা ছাড়া আর উপায় রইলো না তার। ভিক্ষার থালা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাঁড়ায় আলী শার। ঘুরতে ঘুরতে বাজারের কাছে

এসে পড়ে একদিন, দেখে কিছুলোক জটলা করছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। কি হয়েছে দেখার জন্য ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখে ভিড়ের ঠিক মাঝখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে—বেশ ফুটফুটে সুন্দর দেখতে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেলো।

তিনশ সতেরতম রজনীতে শাহরাজাদ আবার বলতে শুরু করলো ঃ

মেয়েটিকে বিক্রীর জন্য বাজারে আনা হয়েছে। ছোটখাট দেখতে মেয়েটি। ঠোঁট দুখানি যেন গোলাপের পাঁপড়ি। মুখখানি পানের মত। উজ্জ্বল রঙ। রোদের আলোয় চিকচিক করছে। আলী শারের মনে হলো স্তনভারে আনত যেন মেয়েটি। বুকের দিকে তাকিয়ে আলী শার বুকটা ঢিপঢিপ করে। গুরুভার নিতম্বটিকে পোশাকে ধরে রাখতে পারছে না। একমুঠো সরু কোমর। সব মিলিয়ে অপরূপ! আলী শার বিড়বিড় করে বলে—

কুঁচ বরণ কন্যা সে যে কোকিল কালো কেশ।
নিঃশ্বাসে তার মৃগ-গন্ধ চাকন চুকুন বেশ।
তার কুচের ওপর দেখতে পাবে মুক্তামালার মঞ্জুরী
শিশির-গলা মুক্তা-ঝুরি কোন বেহেস্তের অপ্সরী!
সেই বুকেতে তুষার ধবল চাঁদের কিরণ পড়ে—
তার রূপোর আলোয় ভুবন কালো নয়ন নাহি সরে।

মেয়েটির রূপের মাদকতায় ডুবে যায় আলী শার। চার পাশের কথা, নিজের অবস্থা সব ভুলে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে মেয়েটাকে। ভীড়ের মধ্যে বাজারের ব্যবসায়ীরাই ছিলো সংখ্যায় বেশী। ওরা বলাবলি করছে একে বাঁদী করে নেওয়ার ক্ষমতা এখানে একমাত্র গ্লোরিদেরই আছে। তারা অবশ্য গ্লোরির ছেলের গোল্লায় যাওয়ার খবরটা তখনো শোনেনি।

মেয়েটিকে যে বেচতে এনেছে তার প্রধান দালাল মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ভিড়টা একবার ভালোভাবে দেখে নিয়ে সে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, আসুন, এই মরুভূমির দেশের আমির, ওমরাহ, ব্যবসাদার সবাই এসে দেখুন। চাঁদের রানী আর গোলাপের রানী এই সুন্দরীর নাম—জুমুরুদ। কোন পুরুষ এখনো একে ছোঁয়নি। রাতে বিছানায় সব মেয়েকেই নিয়েই শোয়া যেতে পারে কিন্তু এর মত মজা কেউ দিতে পারে না। এ যেন একঝুড়ি ফুল—যার গন্ধে নেশা ধরবে, মৌতাত লাগবে। নিন, নিন, নীলাম ডাকতে শুরু করুন। নীলামের নাম শুনে ভয় পাবেন না। যার যেমন খুশী দর হাঁকতে পারেন। আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে চাঁদের সলতানিয়তের মহারানী লজ্জাবতী কুমারী জুমুরুদ—এখনো সে কোন পুরুষের সঙ্গে শোয়নি,—ফুলের মত শরীর—ডাকুন, ডাকুন—

প্রথমে এক ব্যবসায়ী চেঁচিয়ে বলে উঠল,—আমি পাঁচশ দিনার দর দিলাম। অন্য একজন সঙ্গে সঙ্গে বলল পাঁচশ দশ। ভিড়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিলো কুৎসিত চেহারার একটা বুড়ো, নাম রশিদ-অল দিন। তার নীল চোখের কোণে পিচুটি জমে শক্ত হয়ে আছে। ভীড় ঠেলে সে সামনে এসে দাঁড়াল। চিলের মত গলার আওয়াজ তুলে বলে,—ছয়শ। আর একজন ছয়শ দশ বলতেই বুড়োটি প্রায় লাফিয়ে উঠল, একহাজার দিনার।

যারা এতক্ষণ ডাকছিলো তারা চুপ করে গেলো। দালাল বিক্রেতার কাছে গিয়ে বলে, এক হাজার দিনারে কি মেয়েটাকে ছেড়ে দেবেন?

—হ্যাঁ ছেড়ে দেব। কিন্তু বেচে দেওয়ার একটা শর্ত আছে যে! মেয়েটাকে আমি কথা দিয়েছি ওর পছন্দমত লোকের কাছেই আমি ওকে বেচতে পারব। তুমি মেয়েটাকে একবার জিজ্ঞেস কর।

মেয়েটির কাছে গিয়ে দালাল, বলে,—জুমুরুদ তুমি এই বৃদ্ধ রশিদ অল-দিনের কাছে বিক্রি হবে?

রশিদ অল-দিনকে জুমুরুদ একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিলো। দেখে বুড়োটা ওর দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। জুমুরুদ কেঁদে ফেলো,—দালাল তুমি কি এই বুড়োটাকে চেননা? এই ভামটা দিনের আলো সহ্য করতে পারে না। দিনের বেলা তাই বাইরে বেরুতে পারে না।

ওর মত লোকেদের জন্য একটা কবিতা আছে, শোনো ঃ

আমি তার রাঙা ঠোঁটে চুমু চেয়েছিলাম, সে
অপরাধ নেয়নি কো—শুধু এক ঊর্ধ্ব গ্রীব জিরাফের বেশে
উদাসীন চোখ দুটি দিয়েছিলো মেলে—
রাঙা অধরের কোণ থেকে একটি জবাব শুধু পড়েছিলো হেলে
আমার প্রার্থনার—শ্বেত পক্ক কেশ আমি ভালোবাসি না যে—
তুলোর মত তারে লালা দিয়ে দ্রব করি রাঙা মোর অধরের মাঝে।

দালাল বললো—তোমাকে কথা যখন দিয়েছি তখন তুমি এই বুড়োকে নাও পছন্দ করতে পার। তাছাড়া তোমার মত রূপ এক হাজার দিনারে পাওয়া যায় না। নিদেন পক্ষে দশ হাজার দিনার হওয়া উচিত।

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দালাল বলল—এই ভদ্রলোকের দেওয়া দামে আর কেউ নেবেন?

—আমি নেব।

জুমুরুদ দেখল, রশিদ অল-দিনের মত কুৎসিত নয়। ওর চোখের কোনায় পিচুটিও লেগে নেই। কিন্তু এ লোকটাও বুড়ো। যদিও বয়স লুকোবার জন্য চুল দাঁড়িতে কলপ মেখে আছে। জুমুরুদ চেঁচিয়ে ওঠে— ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এই লোকটা! কি লজ্জা মাগো! এ বুড়োটা ছোঁড়া হওয়ার জন্য মুখে রঙ মেখেছে!

এই বলে সে একটা বয়েৎ ধরল—

আমি তোমার সঙ্গী হতাম, সত্যি বলি শোনো—
প্রাণের অর্ঘ দিতাম তোমার পায়—
তোমায় আমি গুরু বলে নিতাম তুলে শিরে
যদি তোমার শ্মশ্রু গুম্ফ থাকত সাদা হয়ে।
কিন্তু তুমি রঙ মেখেছ, লাল করেছ দাঁড়ি।
তোমার সাথে আর কি যেতে পারি?
তোমায় দেখে ভয় করে যে, করব কি আর বল—
তোমায় দেখে ঝরে যাবে প্রেম অমৃত ফল।

—বাঃ, বাঃ, কি অমৃতকথা বলছ গো! উচ্ছ্বাসে বলে উঠল দালাল।

—তুমি সাচ্চা বাতই বলেছ।

দ্বিতীয়জন নাকচ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরএকজন জুমুরুদকে কিনতে চাইলো। লোকটার একটা চোখ কানা। জুমুরুদ হেসে বলল—ওগো আমার এক চোখা নাগর শোনো ঃ

মিথ্যেবাদী আর কানার মাঝে তফাৎ কিছু জান? জান না?
জানবে কেমন করে? কানা মানুষ মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী কানা।

এবার দালাল আরো একজনকে দেখাল। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা লোক। একগাল দাঁড়ি, তলপেট পর্যন্ত নেমে এসেছে। জুমুরুদ বলল—এই লোমওয়ালা লোকটার সঙ্গে যেতে বলছ? শোনো তবে ঃ

বাঁদিকে আর ডানদিকে তার গালপাট্টা দাড়ি।
তাই দেখে হায় কাঁপতে কাঁপতে চুপসে গেলো নারী।

—চারজনকেই অপছন্দ? দালাল আর ধৈর্য রাখতে পারে না। নাঃ, এ আমার কম্ম নয়! তোমার জিনিস তুমিই বাছো বাপু। এঁরা সব নামিদামী আর মান্যগণ্য ব্যবসায়ী—এদের মধ্য থেকে একজনকে তুমি পছন্দ করে নাও। তোমাকে সওদা করে তিনিও বাড়ি চলে যান।

মেয়েটি এবার ভিড়ের দিকে চোখ তুলে তাকাল। প্রত্যেকটি লোককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। চোখ ঘুরতে ঘুরতে এসে আলী শারের ওপর আটকে গেলো। ভিড়ের মধ্যে যারা দাঁড়িয়েছিলো তাদের সঙ্গে আলী শার রূপ বা স্বাস্থ্যের কোন তুলনাই হয় না। ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে জুমুরুদ দালালকে বললো—একেই খুঁজছি আমি, একেই আমার চাই। ও আমাকে কিনে নিক। ওকে দেখে আমার চোখে রঙ ধরেছে। কি সুন্দর মুখ! কি দারুণ স্বাস্থ্য! ওর আলিঙ্গনের জন্য মনটা আমার আকুলি-বিকুলি করছে। ওর গরম রক্তের আঁচ আমার গায়ে এসে লাগছে, আমি ক্রমেই পাগল হয়ে উঠছি। ও যেন কেমন মিষ্টি হাওয়া! ওকে দেখেই বোধ হয় কবি বলেছেন ঃ

আমার যারা যুবক ছিলাম, তোমরা যারা বৃদ্ধ।
তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে সবাই হলো তৃপ্ত।
যৌবন রে, তুমি দেখ নয়ন মেলে
রূপটা তোমার ঢাকার তরে যাচ্ছে ফেলে ফেলে
হাজার হাজার ওড়না যত
এই দুনিয়ায় সব হারানো মানব শিশুর মত।

আর এক কবি বলেছেন ঃ

প্রিয়, তুমি বুঝতে পার নাক?
এমনি করে রূপটাকে তাই লুকিয়ে রাখ।
এ রূপতো লুকিয়ে রাখার নয়
এ রূপ যে বিশ্বভুবন ছড়িয়ে দিতে হয়
ভারি তোমার জঙ্ঘা দুটি, সরু তোমার কটি;
প্রিয়া-মিলন লাগি তোমার একটু কি নাই ত্বরা?
তেমার অঙ্গে আমার অঙ্গ মিশিয়ে দিতে কি সুখ!
প্রিয় যখন আসবে উঠে তখন আমার কি দুখ!
ক্ষুধার্তকে অন্নদান,
ঈশ্বর বিধান।
জীবহত্যা পুণ্য নয়
এ কথা সর্বশাস্ত্র কয়।
প্রিয়, হে প্রিয় আমার
তোমার বিহনে মোর জগত আঁধার।

ওকে দেখে কবিতা কি ফুরোতে চায়?

কোঁকড়া চুলের ওই যে হরিণ শিশু
গালেতে যার অস্ত রবির রঙ্গীন আলো
শপথ নিয়ে বলতে পারি
আমার ঘরে আসবে বলে কথা যে সে দিয়েছিলো।
সেই কথাটা বলতে গিয়ে লাজে
এখনো সে চক্ষু দুটি বন্ধ করে আছে।
মিলন শেষে, আছেই আমার জানা
ও আমার সাথে করবে প্রতারণা।
কিন্তু ধর....

দালাল মেয়েটার কবিতার তোড় দেখে অবাক হয়ে গেলো। বিক্রেতার কাছে গিয়ে কথাটা সে বলেই ফেলল।

বিক্রেতা হেসে বললো—মেয়েটার রঙ্গরস দেখে তোমর তাজ্জব বনে যাবারই কথা। ওর রূপ তো দেখছো। মেয়েটা খালি যে অন্যের কবিতাই বলতে পারে তা না; ও নিজেও একজন কবি। সাতটা কলমে সাতটা কবিতা লিখতে পারে এক সঙ্গে। তাছাড়া ও সুন্দর দুটি হাতের কত গুণ আছে জান? রেশমী কাপড়ের ওপর সুন্দর সুন্দর নকসা তুলতে পারে ও। ওর হাতের তৈরী কার্পেট বা পর্দা করতে ওর সময় লাগে মাত্র সাত থেকে আট দিন। ওকে যে কিনবে, কয়েক মাসের মধ্যেই তার দাম উশুল হয়ে যাবে।

এতগুণ মেয়েটার! দালাল বললো—এ ধন যার ঘরে যাবে, সে কত ভাগ্যবান! মেয়েটা নিজেই এক অমূল্য রত্ন। ওকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। আলী শার কাছে গিয়ে ওর হাত দুখানা টেনে চুম্বন করে বললো—

ভোর হতে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেলো।

তিনশ ঊনিশতম রজনীতে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ ঃ

দালাল বলে—তোমার নসিবকে হিংসে করতে হয়। কত লোক তো কিনতে চাইলো, সে তো চোখের সামনেই দেখলে। কেউ পারলো না। এই সুন্দরীর যে-সব জিনিস আছে, সে কথা কী আর বলব! হাজার হাজার দিনার দিলেও এসব জিনিস পাওয়া যায় না। শিকে যে শেষ পর্যন্ত তোমার ভাগ্যেই ছিঁড়ল! মেয়েটার যখন তোমাকেই পছন্দ তখন বিক্রেতা তোমার হাতেই তুলে দেবেন ওকে। নিয়ে যাও মেয়েটিকে দোস্ত—জীবনে সুখ পাবে। ও ভাগ্যবতী!

এসব দেখেশুনে আলী শারের মাথা নীচু হয়ে যায়। ফুটে ওঠে মুখে অপ্রস্তুতের হাসি। কিছু যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে তা-ই বোঝার চেষ্টা করছে। ফিসফিস করে বলে, অদৃষ্টের কি পরিহাস! ওরা সবাই ভাবছে, মেয়েটাকে কেনার মতো যথেষ্ট পয়সা আমার আছে। হায় আল্লা! একটুকরো রুটির দাম যেখানে জিজ্ঞেস করতে পারি না, সেখানে ....। এখানে আমার মুখ না খোলাই ভালো। সবার সামনে বেইজ্জত হই আর কি! —ও মাথা নীচু করেই রইলো।

জুমুরুদ বিলোল কটাক্ষে আলী শারকে ঘায়েল করতে চাইলো। মুখ ঘুরিয়ে ফিসফিস করে দালালের হাত ধরে বললো—ওর কাছে আমাকে নিয়ে চলো ওর সঙ্গে কথা বলব। আমাকে যাতে ও কিনে নেয় তার জন্য ওকে আমি বোঝাব। আমি ওর সঙ্গেই যাব—আর কারুর সঙ্গে না—না—না।

দালাল কি আর করে! তাকে নিয়ে আলী শার কাছে দাঁড় করিয়ে দিলো। আলী শার

সামনে যেন বেহেস্তের হুরী। জুমুরুদ বলে—ওগো আমার ভালোবাসা, তোমার যৌবন আমার শরীরে যে আগুন ধরিয়ে দিলো! দাম বলছ না কেন? আমাকে খুব দামী বলে মনে হলে না হয় দাম বেশীই বলো। আর কম মনে হলো কমই বলো। যাহোক একটা কিছু বলো। যে দাম দেবে তাতেই আমি চলে যাব। আমি শুধু তোমার সঙ্গেই যাব।

আলী শারের চোখ ফেটে জল আসে আর কি! মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলে—বেচার দিব্যি তো কেউ দেয়নি, কেনার কথাই বা ওঠে কেন?

—হাজার দিনার বেশী মনে হচ্ছে?

আলী শার মাথা ঝাঁকিয়ে চলে।

—ঠিক আছে, আট শতে কেনো। সাতশ? তাও না? থাক তুমি একশ দিনার দিয়ে দাও।

আলী শার বলে অত নেই আমার কাছে।

—কত কম পড়ছে? পুরো একশ দিনার না দিতে পারলে পরেই না হয় দিও। —জুমুরুদ হেসে আলী শার গায়ে ঢলে পড়ে।

শক্ত হয়ে যায় আলী শার। অক্ষম পুরুষের প্রাণে জ্বালা ধরে। জ্বালা চেপে রেখে সে বলে—একশ দিনার তো দূরের কথা আমার কাছে এক কানা কড়িও নেই। তুমি ফালতু সময় নষ্ট করছ। যাও, অন্য খদ্দের দেখ।

ওর কাছে এক পয়সাও নেই সেটা জুমুরুদ বুঝলো। জুমুরুদ বললো— ঠিক আছে। কেনার জন্যে তোমায় কোন পয়সা দিতে হবে না। আমার হাত ধরে এই জামাটা পরিয়ে দাও আর একখানা হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধর। ব্যস, আমি তোমার হয়ে যাব। আমাকে যে তুমি নিলে এতেই তা বোঝা যাবে।

যন্ত্রচালিতের মত আলী শার জুমুরুদকে জামা পরিয়ে দিয়ে ডান হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরার জন্যে হাতখানা ঘুরিয়ে আনলে, আর ঠিক সেই সময় জুমুরুদ হঠাৎ একটা দিনার ভর্তি থলি তার হাতে গুঁজে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে—এতে এক হাজার দিনার আছে। মনিবকে ন'শ দিয়ে দাও। বাকী একশ নিজের কাছে রাখ। সামনে কষ্টের দিন আসছে কাজে লাগবে তখন।

আলী শারও ওর কথা মত ন শ' দিনার দিয়ে জুমুরুদকে ঘরে নিয়ে গেলো।

আলী সার দীনকুটির দেখে জুমুরুদ মোটেই অবাক হলো না। অপরিসর একখানি ঘর। আসবাবপত্র বলতে শত ছিন্ন ময়লা আর তেলচিটে একখানি মাদুর। মাদুরখানা যে কবে কেনা হয়েছিলো তা বলা মুশকিল। এছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। একটা হাজার দিনারের থলি আলি শার হাতে দিয়ে জুমুরুদ বলে—এক্ষুণি বাজারে যাও। সুন্দর আসবাব আর একখানা চমৎকার কার্পেট কিনবে। ভালো ভালো খাবার দাবার আনবে। শরাবও এনো ভালো দেখে। আর আনবে আমার জন্যে একখানা বড়সড় চৌকো দামাস্কাস সিল্কের কাপড়ের টুকরো। বাজারের সেরা জিনিসটি কিনবে। কাপড়ের রংটা চাই টকটকে লাল। এক লাচি সোনালী সুতো, এক লাচি রুপালী সুতো আর নানান রং-এর সাত লাচি সুতো আনবে। দাঁড়াও আরো আছে। বড় বড় কয়েকটা সূঁচ আর আমার আঙ্গুলে পরার জন্য একটা টোপর। মনে থাকবে তো সব? ভুলো না যেন। যাও তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

বেশ কিছুক্ষণ পর বাজার সেরে আলী শার বাড়ি ফিরলো। জুমুরুদ প্রথমেই মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে ফেললো। তার ওপর তোশক পাতলো। বালিশ তাকিয়া সুন্দর করে সাজানো হলো। ঘরটার আগেই সে ঝেড়ে পুছে রেখেছিলো। এবারে মোমবাতি ধরালো। তোশকের ওপর পাতল সাদা ধবধবে চাদর।

সব কাজ সারা হলে দু'জনে মনের আনন্দে খানাপিনা শুরু করলো পাশাপাশি বসে। শরাব খেলো, অনেক কথা, অনেক ভাবনা দু'জনে দুজনকে বললো। অবরুদ্ধ বাসনার উন্মেষ

হতে লাগলো ধীরে ধীরে। এবার বিছানায় যাবার পালা। দু'জনেই ক্লান্ত। নতুন বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলো দু'জনে। নতুন বিছানার নতুন গন্ধের মাঝে গভীর আবেগে একে অন্যকে জড়িয়ে কাছে টেনে নিলো। জুমুরুদ্যের যৌবনে অনাঘ্রাত ফুল এই প্রথম নিবেদন করলো তার বাঞ্ছিতের কাছে। মুহূর্তের জন্যও ছাড়াছাড়ি হলো না। অচ্ছেদ্য বাহুবন্ধনে আরো গভীর কোন সুখের দেশে পাড়ি জমায় তারা। কিন্তু সুখের রাত যেন বড়ই ক্ষণস্থায়ী। রাত ভোর হয়ে এলো। এক জোড়া যুবক-যুবতী ভোরের আলোয় যেন স্নান করলো।

সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জুমুর্দ্যদ কাজে বসে গেলো। রাতের সুখটুকু গায়ে লেপটে রয়েছে। গাল দুটো একটু বেশী লালচে লাগছে। দামাস্কাস সিল্কের টুকরো দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে একটা বাহারি পর্দা তৈরী করে ফেললো সে। নানান পশুপাখীর নকসা কি সুন্দর করে তুলে ফেললো পর্দায়। পর্দার মাঝে বিরাট বিরাট গাছের ছবি। ডালগুলি ফলভারে নুয়ে পড়েছে। গাছের ছায়ায় বসে দুদণ্ড জিরোতে মন চায়। সমস্তটা মিলিয়ে এক অনবদ্য প্রাণবন্ত প্রকৃতির ছবি। এত বড় কাজটা তুলতে জুমুরুদ্যদের সময় লেগেছে মাত্র আট দিন। জুমুরুদ্যদের দক্ষতা দেখে আল্লাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালো আলী শার।

পর্দার কাজ শেষ হলে ভালো করে সেটাকে ভাঁজ করে নিলো জুমুরুদ; তারপর সেটা আলী শারের হাতে দিয়ে বললো—বাজারের কোন দোকানদারের কাছে এটা নিয়ে যাও। পশ্চাশ দিনারের কমে বেচো না যেন। সেই সঙ্গে আর একটা কথা ভালো করে শুনে যাও। একদম ভুলো না, অচেনা কোন ফেরীওয়ালার কাছে পর্দাটা বেচো না। বেচলে, আমাদের দু'জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। বুঝেছ? অনেক শত্রু আমাদের রয়েছে। সুযোগের অপেক্ষায় অনেকেই রয়েছে ওৎ পেতে। তাই, অচেনা কাউকে বেচবে না, সাবধান!

কথাগুলি শুনলো আলী শার; তারপরে বাজারে গিয়ে চেনা একটি দোকানদারকে পঞ্চাশ দিনারে সেই সুন্দর পর্দাটা বেচে দিলো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো কুড়িতম রজনী ঃ

পরের দিন গল্প শুরু করতে দেরী হয়ে গেলো অনেকটা। শাহরিয়ারের মনের তাপ জুড়োতেই মাঝ রাত প্রায় কাবার হয়ে এলো। দুনিয়াজাদ অধীর হয়ে বলে, কই, শুরু কর।

—হ্যাঁ বলছি।

ফেরা পথে অনেক সিল্কের কাপড় আর সোনালি-রূপালি সুতোর গুলি কিনে নিয়ে এলো আলী শার। এগুলি দিয়ে তৈরি হবে অনেক সুন্দর-সুন্দর পর্দা বা কার্পেট। দেরী করলো না জুমুরুদ; কাজ শুরু করে দিলো। ঠিক আট দিনের মাথায় সে একখানা বেশ চমৎকার কার্পেট বুনে ফেললো। প্রথমটির চেয়ে এটি অনেক বেশী সুন্দর। এটিও বিক্রী হলো পঞ্চাশ দিনারে। এইভাবে সারা বছর ধরেই তারা কাজ করে গেলো। কাজের চাপে তাদের ভালোবাসার গায়ে এতটুকু জঙ ধরেনি; বরং, দিন-দিন তা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। প্রেম-সাগরের দুর্বার তুফানে ভেসে গিয়েছে তারা।

একদিন আলী শার একটা পোঁটলা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। সেই পোঁটলাতে ছিলো জুমুরুদ্যদের হাতে তৈরি একটা কার্পেট। বাজারে গিয়ে কিন্তু কোন ব্যবসাদারের কাছে বেচলো না; একটা দালাল ধরলো। তাকে সঙ্গে নিয়ে দালালটা দোকানে-দোকানে ঘুরে চেঁচাতে লাগলো। এমন সময় একজন খ্রীস্টান যাচ্ছিল তাদের পাশ দিয়ে। এই সব খ্রীস্টানরা সাধারণত বাজারে ঢোকার পথে এক জায়গায় দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। কেনা-বেচার কাজে ক্রেতা-বিক্রেতাদের প্রয়োজনবোধে হাতে-পায়ে ধরতে পর্যন্ত তাদের বাধে না।

খ্রীস্টান দালালটা আলী শার দালালকে বললো—আমাকে কার্পেটটা দাও। আমি তোমাকে ষাট দিনার দেব।

কিন্তু জুমুরুদের সতর্কবাণী আলী শার ভুলে যায় নি। লোকটা অচেনা তো বটেই। তার ওপরে সে খ্রীস্টান। খ্রীস্টানদের সে দু চোখে দেখতে পারত না, ঘৃণা করত। ওকে সে কার্পেট বেচবে না।

খ্রীস্টান ছাড়নেওয়ালা নয়। সে দাম চড়িয়ে দিয়ে বললো—একশ দিনার।

আলী শারের দালাল তার কানে-কানে বললো—এমন পয়মন্ত খদ্দের ছেড়ে দেবেন না হুজুর।

আলী শার যাতে কার্পেটা তাকেই বিক্রী করে এই জন্যে খ্রীস্টানটা অবশ্য আগেই তার দালালকে দশ দিনার ঘুষ দিয়ে রেখেছিলো। দালালটি তাকে এমনভাবে বিরক্ত করতে লাগলো যে বেচারা শেষ পর্যন্ত সেই খ্রীস্টানকেই একশ দিনারে কার্পেটটা বেচে দিতে বাধ্য হলো। কিছুটা ভয়ও যে সে পেলো না সে কথা সত্যি নয়। ভয়ে-ভয়ে দিনারগুলি হাতে নিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বাজার থেকে বেরিয়ে এলো সে।

বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ এক সময় কী জানি কেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো আলী শার। খ্রীস্টানটা তার পিছু নিয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়লো সে; তারপরে সে জিজ্ঞাসা করলো—এ মহল্লায় তো কোন খ্রীস্টান থাকে না; এদিকে কোন খ্রীস্টানকেও তো আসতে দেখিনি কোনদিন। তা, এপথে আপনার আগমন কেন?

খ্রীস্টান বললো—মাপ করবেন, মালিক। এই রাস্তার মোড়ে আমার একটা কাজ রয়েছে, তাই আসছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

কী আর বলবে আলী শার। বাড়ির দিকে সে হাঁটতে শুরু করে। বাড়ির মুখে এসে হঠাৎ কী মনে করে সে আবার পেছন ফিরে একবার তাকালো। কী ব্যাপার! খ্রীস্টানটা রাস্তার ওপার থেকে তারই দিকে এগিয়ে আসছে যে! রাগে গরগর করে উঠল আলী শার; চেঁচিয়ে বললো—ব্যাটা হতচ্ছাড়া কোথাকার! আমার তুই পিছু নিয়েছিস কেন?

খ্রীস্টানটি হাত কচলিয়ে বললো—আমি হঠাৎই এদিকে এসে পড়েছিলাম, মালিক। বিশ্বাস করুন, এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একটু পানি খাওয়াবেন? আল্লাহ্ আপনাকে অনেক দেবেন।

আলী শার ভাবলো—কোন মুসলমান পাগলা কুকুরকে পানি দিতে পারবে না এমন কথা আল্লাহ্ কোথাও বলেন নি। সেই জন্যে সে পানি আনার জন্যে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো। পানি নিয়ে ফিরে আসছে এমন সময় জুমুরুদের সঙ্গে দেখা। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়েই জুমুরুদ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। আলী শারকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললো—ফিরতে এত দেরী হলো কেন তোমার? খু-উ-ব ভাবনা হচ্ছিল আমার। কার্পেটটা তুমি কোথায় বেচলে? কোন নামকরা দোকানদারকে, না, কোন অচেনা খদ্দেরকে?

বেশ অস্বস্তিতে পড়লো আলী শার। কোনরকমে ঢোক গিলে জবাব দিলো সে—আজ বাজারে কী ভিড় তা তোমাকে কী বলব? তাই ত ফিরতে এত দেরী হয়ে গেলো। তবে কার্পেটটা আমি এক চেনা দোকানদারকেই বেচেছি।

জুমুরুদ বললো—আল্লাহ্র নামে বলছি, আজ আমার মনটা কেমন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। তা তুমি পানি নিয়ে চললে কোথায়?

আলী শার বললো—দালালের বড় তেষ্টা পেয়েছে। আমার পিছু পিছু বেচারা তাই বাড়ি পর্যন্ত এসে পড়েছে।

আলী শার জবাবে খুব একটা খুশী হতে পারলো না জুমুরুদ। পানি নিয়ে বেরিয়ে

গেলো আলী শার। উদ্বেগাকুল কণ্ঠে আবৃত্তি করলো জুমুরুদ—

হায়রে মূঢ় মানুষ তুমি ভাবছ বুঝি
একটি চুমু হবে তোমার চিরদিনের পুঁজি?
ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল দিয়ে
একটু দূরে দেখ্ তাকিয়ে
রাহুগ্রস্ত চাঁদের হাসি
কারে বেড়ায় খুঁজি।

পানি এনে আলী শার দেখলো খ্রীস্টানটি এরই ভেতরে খোলা দরজা দিয়ে সটান বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখের ওপরে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো যেন। ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সে—শালা কুত্তার বাচ্চা কুত্তা। আমার অনুমতি না নিয়ে আমারই ঘরের দাওয়ায় আসিস—তোর এত বড় সাহস।

খ্রীস্টানটি হাত কচলিয়ে বললো—আমার গোস্তাকি মাপ করুন হুজুর। হাঁটতে-হাঁটতে আমার পা দুটো এমনি টনটন করছিলো যে আর আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। তাইত বাধ্য হয়ে চৌকাঠের এদিকে এসে পড়েছি। অবশ্য দরজা বারান্দার মধ্যে তফাত-ই বা কতটুকু? তাই না? একটু জিরিয়ে নিয়ে চলে যাব। আমাকে জোর করে বার করে দেবেন না। আল্লাহ্ও আপনার ওপরে জোর করবেন না।

এই বলে লোকটি আলী শারের হাত থেকে পানির পাত্রটি নিলো; তারপরে অনেকটা পানি ঢকঢক করে খেয়ে পাত্রটি তার হাতে ফিরিয়ে দিলো।

আলী শার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। লোকটি চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে পেছন ফিরতে সাহস করলো না। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের ভেতরেও লোকটির ওঠার যখন কোন লক্ষণ দেখা গেলো না তখনই চেঁচিয়ে উঠে বললো—বাড়ি থেকে বেরোবি, না, মতলবটা তোর কী? বেরো, বেরো, এখনই বেরিয়ে যা।

লোকটি বললো—মালিক, এ-দুনিয়ায় এমন কিছু মানুষ আছেন ভালো কাজ করার জন্যে যাঁদের লোকে চিরকাল মনে রাখে। আপনি দেখছি তাঁদের মত ভাগ্যবানদের খাতায় নাম লেখাতে চান না। কোন এক কবি আপনাদের মত মানুষদের জন্যেই বিলাপ করে লিখেছেন—

যাদের মনটা ছিলো নদীর দিলের মত
না চাইতেই সবাই পেত জল
আজ তারা নেই। আজকে মানুষ কৃপণ হলো যত।
পানি-পিয়াসী পথিক দেখে নাড়ছে তারা কল,
বলছে ডেকে, জল নিয়ে যাও শূন্য কলস ভরি
তার আগেতে বাপু তোমায় ফেলতে হবে কড়ি।

তেষ্টায় আমার কলিজা ফেটে যাচ্ছিল। মেহেরবানি করে আপনি পানি দিয়েছেন। আমার তেষ্টা মিটেছে। কিন্তু ক্ষিদের জ্বালায় আমার জান যায়-যায়। আপনাদের এঁটোকাঁটা কোথাও যদি কিছু পড়ে থাকে তাই আমাকে দিন না খানিক, সেটুকু পেলেও আমার যথেষ্ট হবে। আর তাও যদি ফেলে দিয়ে থাকেন তাহলে অন্তত এক টুকরো পোড়া রুটিই দিন, আর সেই সঙ্গে এক টুকরো পেঁয়াজ। আজ তাই আমার কাছে কাবাব বলে মনে হবে।

আলী শার তো ক্ষেপে লাল। সে চিৎকার করে বললো—না। আর একটা কথাও না, বেরোও—আভি নিকালো। এ-বাড়িতে আর কিছু পাবে না তুমি—ভাগো...ভাগো...

কিন্তু কিছুই হলো না। একভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো লোকটা; বললো—মাপ

করবেন, হুজুর। বাড়িতে আপনার সত্যিই যদি কিছু না থেকে থাকে তো একশটা দিনার তো রয়েছে। কার্পেট বেচে সেগুলি আপনি পেয়েছেন। তাই থেকে কিছু খাবার কিনে দিন, খাই। দোকান তো পাশেই। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করবেন। কেউ অন্তত বলতে পারবে না যে আপনার বাড়ি থেকে শুধু হাতে আমি ফিরে গিয়েছি। আপনার আমার মধ্যে যে নুন-রুটি দেওয়া-নেওয়া হয়নি সেকথাও বলতে পারবে না কেউ।

আলী শার ভাবলো—এ ব্যাটা সত্যিকার পাগল। গলা ধাক্কা দিয়ে ওকে রাস্তায় বার করে দিই; তারপরে দেব কুকুর লেলিয়ে। এই ভেবে, লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাইরে বার করে দেওয়ার জন্যে যে-ই না সে হাতটা তুলেছে অমনি লোকটা বলে উঠলো—আমি আপনার কাছে চেয়েছি এক টুকরো রুটি আর এক টুকরো পেঁয়াজ। এর বেশী তো কিছু চাইনি। ওতেই আমার ক্ষিদে মিটে যাবে। আমার জন্যে ওর বেশী আপনি মোটেই খরচ করবেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এর বেশী আরা কিছু চান না।

এক চিলতে শুকনো রুটি
তাই ত জ্ঞানী রাজার খানা।
শহর-বোঝাই সুখাদ্য খেয়েও
পেটুক জনের পেট ভরে না।

তিতিবিরক্ত হয়ে ভাবলো আলী শার—এ লোকটার হাত থেকে রেহাই নেই তার। এই ভেবে সে খাবারই কিনতে গেলো। বেরনোর আগে লোকটাকে এক পা-ও নড়াচড়া করতে নিষেধ করলো; তারপর দিয়ে গেলো দরজায় তালা। বাজার থেকে কিনে নিয়ে এলো মধুমাখানো ছানার পিঠে, শশা, কলা অরা গরম-গরম রুটি। চেঁচিয়ে বললো—এখন গেলো।

এত গালাগালিতেও মানুষটি চটলো না; বললো—মালিক, আপনি সত্যিই মহানুভব! এত খাবার এনেছেন যে দশজনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। আপনিও বসুন। এক সঙ্গে খাই।

আলী শার বললো—অত আদিখ্যেতা তোমাকে দেখাতে হবে না। তুমি একাই গেলো। তা ছাড়া আমার ক্ষিদে নেই।

কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা। সে বললো—সব জাতের মধ্যে একটা রীতি রয়েছে যে অতিথিদের সঙ্গে বসেই গৃহস্বামীকে খানা খেতে হয়। যে খায় না সে বেজন্মা।

ভোর হয়ে আসতেই গল্প থামিয়ে চুপ করে রইলো শাহরাজাদ।

তিনশো একুশতম রজনী ঃ

আগের রাতের জের টানলো শাহরাজাদ।

খ্রীস্টানটির সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলো না আলী শার; কিছুতেই সে এড়াতে পারছিলো না লোকটাকে। অগত্যা তার পাশেই বসে পড়লো আলী শার, শুরু করলো খেতে। মনের মধ্যে তার তখন নানান চিন্তা। ভাবতে-ভাবতে আনমনা হয়ে যায় আলী শার। সেই সুযোগে লোকটা একটা কলা ছাড়িয়ে দুখানা করে ফেললো। তারপরে আফিঙে জ্বাল দেওয়া একটা বড় ভাঙের ডালা সেই টুকরোর মধ্যে পুরে দিলো। এই ভাঙের টুকরো যেমন-তেমন একটা হাতিকে খাওয়ালে এক বছর তার ঘুম ভাঙার কথা নয়। সেই কলার গায়ে মধু মাখিয়ে তার ওপরে ছানার মোটা প্রলেপ দিয়ে আলী শারের হাতে তুলে দিয়ে লোকটা বললো—আপনার জন্যেই এটা আমি মনের মত করে তৈরি করেছি, মালিক। বিশ্বাসের প্রতিদান হিসাবে আপনাকে এটা আমি খেতে দিলাম। অনুগ্রহ করে খেয়ে নিন।

চমকে উঠলো আলী শার। তাড়াতাড়ি কলাটা হাতে তুলে নিয়ে সে, তারপর গিলে ফেললো গোগ্রাসে। পেটের মধ্যে যেতে-না-যেতেই হঠাৎ সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

আলী শার জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই লোকটা চিতা বাঘের মত লাফিয়ে উঠলো; তারপরে রাস্তায় বেরিয়ে এলো নিঃশব্দে। জন কয়েক লোক একটা খচ্চর নিয়ে রাস্তার ধারে ঘাপটি মেরে বসেছিলো। তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো লোকটা। তাদের ভেতরে সেই বুড়ো লম্পট রশিদ অল-দিনও দাঁড়িয়েছিলো। খ্রীস্টানকে দেখে বুড়োর ফ্যাকাসে চোখ দুটো লালসায় চকচক করে উঠলো। জুমুরুদ নীলাম ডাকার দিন তাকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সেইদনিই বুড়ো প্রতিজ্ঞা করেছিলো যেমন করেই হোক, যে কোন মূল্যেই হোক জুমুরুদকে তাকে পেতেই হবে। আসলে লোকটা ছিলো একজন গোঁড়া খ্রীস্টান। বাজারে ঠাঁই পাওয়ার জন্যেই ইসলামের ভেক নিয়েছিলো সে। সে জানত মুসলমানপ্রধান বাজারে এই কৌশল ছাড়া সে কোন পাত্তা পাবে না। এই মাত্র সে খ্রীস্টানটা আলী শারকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে এসেছিলো সে এই রসিদের ভাই—নাম বরসুম।

আলী শারকে কেমন করে খতম করে এসেছে সে সব কথা বরসুম তার দাদাকে খুলে বললো। পরিকল্পনা মত সব কাজই হয়েছে। এবার শেষ করতে হবে বাকি কাজটুকু। সেই কাজ করার জন্যে সবাই তাড়াতাড়ি আলী শার বাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলো। বেচারা আলী শার জুমুরুদের জন্যে বাড়ির ভেতরেই ছোট্ট একটা হারেম তৈরি করে দিয়েছিলো। লোকগুলো হুড়মুড় করে সেই হারেমের মধ্যে ঢুকে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে জুমুরুদের মুখে কাপড় বেঁধে দিলো দস্যুরা। বাইরে দাড়িয়েছিলো খচ্চর। লোকগুলো সেই খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তাকে সোজা নিয়ে হাজির করলো রসিদের বাড়িতে। সব কাজই শেষ হয়ে গেলো খুব তাড়াতাড়ি।

জুমুরুদকে নিয়ে নীল চোখো বুড়ো তার শোয়ার ঘরে ঢুকলো। চোখমুখের আবরণ খসিয়ে নেওয়ার পরে জুমুরুদ দেখলো বুড়ো রসিদ তার গা ঘেঁষে বসে রয়েছে। বুড়োর চোখ দুটো তখন লালসায় চকচক করে উঠেছে। চোখের কোনে তার ড্যালা-পাকানো পিচুটি থিকথিক করছে।

বুড়ো বললো—সুন্দরী, এখন তুমি আমার মুঠোর মধ্যে। আলী শারের মত বুড়বাকের ক্ষমতা নেই আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমার এই দু হাতের আলিঙ্গনের মধ্যে একদিন তুমি ধরা দেবে, সুন্দরী; আমার ভালোবাসার দুর্বার বেগও সহ্য করতে হবে তোমাকে। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক। তার আগে ওই নোংরা ধর্মবিশ্বাস তোমাকে ছাড়তে হবে। হ্যাঁ, শপথ করেই ছাড়তে হবে। তারপরে তুমি হবে খ্রীস্টান—আমার মত। তারপরে বসতে পারবে আমার কোলে। আমার ইচ্ছে মত যদি না চলো, অথবা উলটো-পালটা কিছু করে বস তাহলে তোমার ওপর এমন নির্মম অত্যাচার শুরু হবে যে সে কথা কোনদিনই তুমি ভুলতে পারবে না। জানালা দিয়ে দেখ। কী দেখছ? একটা ঘেয়ো কুকুর। অবাধ্য হলে, তোমার অবস্থাও হবে অবিকল ওইরকম।

জুমুরুদের সুন্দর গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো। ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠলো তার। সে বললো—ওরে বদমাশ। ঢেড়ে বুড়ো। আমাকে কেটে কুঁচি করে ফেললেও আমার ধর্ম আমি ছাড়ব না। আমার ওপরে যত ইচ্ছে তুই অত্যাচার করতে পারিস, যত ইচ্ছে তুই মারধোর করতে পারিস আমাকে—আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি আমাকে তুই কোনদিনই পাবি নে। ধেড়ে বোকা পাঁঠার মত কোনদিন তুই যদি আমার ঘাড়ে চেপে বসিস তাহলেও আমার মন তাতে কিছুতেই সায় দেবে না। তোর পাপ কোনদিন অপবিত্র করতে পারবে না আমাকে। আর তার জন্যে খোদাতাল্লা কোনদিনই তোকে ক্ষমা করবেন না।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না বুঝতে পেরে বুড়ো তার কয়েকটা ক্রীতদাসকে ডেকে বললো—উপুড় করে শুইয়ে দে হারামজাদীকে। চেপে ধর—বেশ শক্ত করে চেপে ধর।

তারপরে প্রকাণ্ড একটা চাবুক নিয়ে বুড়ো তাকে প্রচণ্ড জোরে মারতে থাকে।

চাবুকটা কেটে কেটে তার পিঠের ওপরে বসে যায়। এক-একটা চাবুক পিঠে পড়ে আর জুমুরুদ যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলতে থাকে—আল্লাহ্ ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই। আল্লাহর রসুল হজরৎ মোহাম্মদ।

যতক্ষণ পারলো বুড়ো তাকে চাবুক মেরে চললো। তারপর হাত দুটো অবশ হয়ে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললো—একে তোরা রান্নাঘরে নিয়ে যা। তোদের সঙ্গে ও থাকবে। ওকে কোন খাবার বা সরাব দিবি নে। যা—নিয়ে যা হারামজাদীকে।

এদিকে বেচারা আলী শার পরের দিন পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলো। নেশা কেটে গেলে কিছুটা ধাতস্থ হলো সে; তারপরেই জুমুরুদ-জুমুরুদ বলে ডুকরে কেঁদে উঠলো। জবাব দেওয়ার কেউ ছিলো না—দিলোও না কেউ জবাব। অগত্যা নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো আলী শার। টলটে-টলতে ঘরের ভেতরে গেলো। ঘর শূন্য; জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে রয়েছে চারধারে। জুমুরুদ নেই।

ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ে গেল আলী শারের। মনে পড়ে গেলো খ্রীস্টান লোকটার কথা। সে বেশ বুঝতে পারলো সেই বদমাইস জুমুরুদকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তার প্রাণের প্রতিমাকে লোকটা এইভাবে ধরে নিয়ে গেলো। এ যে সে সহ্য করতে পারছে না, মেঝেতে পড়ে সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো—দু হাত দিয়ে ছিঁড়তে লাগলো মাথার চুল। টেনে-টেনে ছিঁড়তে লাগলো গায়ের জামা। দু গাল বেয়ে তার ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো চোখের জল। হায়রে আজ সে সর্বস্বান্ত।

মনের আবেগ সামলাতে না পেরে সে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেলো। কুড়িয়ে নিলো দুখানা বড়-বড় পাথর। রাস্তা দিয়ে পাগলের মত ছুটতে-ছুটতে সেই পাথর দুটো সে তার বুকে ঠুকতে লাগলো। মুখে তার এক বুলি—'ও জুমুরুদ, তোমাকে ওরা কোথায় ধরে নিয়ে গেলো। কোথায় ধরে নিয়ে গেলো!' কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তায় লোক জড় হয়ে গেলো; শিশুরা তাকে পাগল মনে করে হৈচৈ করতে করতে তার পিছু পিছু ছুটলো। যে সব বয়স্কেরা তাকে চিনত তারা তার দুঃখে জানালো সহানুভূতি। ব্যাপারটা জানতে পেরে তারাও দুঃখ করে বলতে লাগলো—বেচারা গ্লোরির ছেলে! সত্যিই ওর দুঃখের শেষ নেই আজ।

কোন দিকে যাবে বুঝতে না পেরে চারদিকে ছোটাছুটি করলো আলী শার। পাথর ঠুকে-ঠুকে ঝাঁজরা করে ফেললো তার বুকের পাঁজর। এইভাবে ছুটতে-ছুটতে সে একটি সৌম্যদর্শনা বৃদ্ধার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার এহেন অবস্থা দেখে বৃদ্ধা বললেন—বাছা, আল্লাহ্ তোমাকে শান্ত করুন, রক্ষা করুন তোমাকে। তোমার এ-দশা কেন হলো বাছা?

আলী শার বললো—

প্রেম-হীনতাই অসুখ আমার
হে ডাক্তার,
আমার রোগের অন্য কারণ নাই।
ওই নারীকে আমি যে চাই—
দাও না ফিরে ওকে।
ও-যে আমার ব্যথার প্রলেপ
আনন্দ মোর শোকে।

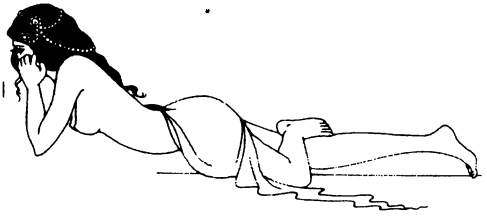

বৃদ্ধাটি পরম স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। সে বেশ বুঝতে পারলো মানুষটি বিরহের আগুনে জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে। তাই সে বললো—বাছা, আমাকে সব তুমি খুলে বলো। ভয় বা সংকোচ করো না। কিসের কষ্ট তোমার। তোমাকে সাহায্য করার জন্যেই বোধ হয় রসুল আল্লাহ্ আমাকে এই পথে পাঠিয়েছেন।

তার জীবনের কথা, খ্রীস্টান দালালের কথা সব তাঁকে খুলে বললো আলী শার। বৃদ্ধাও তার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। তারপরে আলী শার দিকে তাকিয়ে বললো—তুমি এখনই বাজারে চলে যাও। সেখান থেকে ফেরি করার একটি ঝুড়ি কিনে আনবে; সেই সঙ্গে আনবে নানান জাতের কাচের চুড়ি, দুল, আর পুঁতির মালা। বড়-বড় বাড়ির ঝি-চাকরানীদের এই সব বিক্রী করার জন্যে বুড়ি ফেরিওয়ালীনিরা যেমন বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় আমিও তেমনি ওই ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে, সেইরকম বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াব। এই শহরের কোন বাড়ি বাদ দেব না। জুমুরুদের হদিশ না পাওয়া পর্যন্ত বাড়ি-বাড়ি আমি ফেরি করব। আল্লাহর ইচ্ছায় সে আমাদের কাছেই ফিরে আসবে। তুমি আর ভেব না। জলদি বাজারে চলে যাও।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ থামলো।

তিনশো বাইশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার শুরু করলো গল্প বলতে।

আনন্দে চোখে জল বেরিয়ে এলো আলী শারের। বৃদ্ধার দুটো হাত ধরে চুমু খেলো সে। তারপরে সে যা যা চেয়েছিলো সব কিনে এনে দিলো বাজার থেকে। এর মধ্যে একজন রূপকার এসে তাঁকে ফেরিওয়ালীর সাজে সাজিয়ে দিয়ে গেলো। মুখে দেওয়া হলো তামাটে রঙের প্রলেপ, যেন দেখলেই মনে হয় রোদে ঘুরে-ঘুরে মুখটা পুড়ে গিয়েছে। মাথায় জড়ালো একখানা কাশ্মীরী শাল। পরলেন বিরাট একটা সিল্কের বোরখা। ঝুড়িটা চাপালো মাথার ওপরে। হাতে নিলো একটা লাঠি। বয়সের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেলো চেহারাটা। তারপরে ঠুকঠুক করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় যত ব্যবসায়ী আর ইনামদার ছিলো তাদের হারেমের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘুরতে-ঘুরতে এসে পৌঁছলো রসিদ অল-দিনের দরজার কাছে। হতচ্ছাড়া খ্রীস্টান রসিদ। আল্লাহ্ তাঁর দোজখে অনন্ত কাল ধরে তাকে পুড়িয়ে মারবেন।

বৃদ্ধা যখন রসিদ অল-দিনের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো ঠিক সেই সময় অর্ধমৃতা জুমুরুদকে টেনে-হিঁচড়ে রান্নাঘরে ক্রীতদাসদের মধ্যে নিয়ে আসা হলো। বেচারার ওপরে এতক্ষণ ধরে অত্যাচার চলছিলো। প্রচণ্ড ঘুষির চোটে কপাল ফেটে গালের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল তার। যন্ত্রণায় তখন কাতরাচ্ছিল জুমুরুদ। কাতরানির শব্দ জানালা দিয়ে বেরিয়ে তাঁর কানে এসে ঢুকলো।

কড়া নাড়লো বৃদ্ধা। একটি ক্রীতদাস এসে দরজা খুলে দিলো। তাঁকে অভিবাদন জানালো ক্রীতদাসটি। বৃদ্ধা বললো—বাছা, অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস রয়েছে আমার ঝুঁড়িতে, তোমাদের এখানে এমন কেউ কি নেই যে কিছু জিনিস কিনতে পারে?

ক্রীতদাস বললো—আছে আছে। এমন লোক নিশ্চয় রয়েছে। আপনি আসুন।

এই বলে সে বৃদ্ধাটিকে সোজা রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে দিলো। তারপরে বাড়ির প্রায় সব দাসদাসীরাই ঘিরে দাঁড়ালো। তিনি চুড়ি, হার, দুল এত সস্তায় বেচতে আরম্ভ করলেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনেকেরই মন জয় করে ফেললেন।

তাদের খুশী করে তিনি দেখতে পেলেন একটু দূরে মাদুরে শুয়ে একটি মেয়ে কাতরাচ্ছে। সবই বুঝতে পারলো সে। এ সেই জুমুরুদ। একেই তো সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে সে তার কাছে উঠে গেলো; তার পাশে বসে ফিসফিস করে তাকে বললো—বাছা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তোমার সব কষ্ট দূর করবেন। তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে তিনিই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তুমিই তো সেই গ্লোরির ছেলে আলী শারের প্রেমিকা ক্রীতদাসী জুমুরুদ!

তারপরে ছদ্মবেশে সেখানে ফেরীওয়ালীর বেশে সে কেমন করে এসেছে সে সব

কথা সে তাকে বললো। তারপরে বললো—কাল সন্ধ্যেবেলা পালানোর জন্যে তৈরি থেকো। এই রান্নাঘরের জানালার পাশেই থাকবে। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তার ওপাশে অন্ধকার থেকে শিস শুনলে তুমিও পালটা শিস দিয়ো। তারপরে পাঁচিল টপকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ো। সেইখানে আলী শার তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে জুমুরুদ তাঁর হাত দুটি ধরে চুমু খেলো।

রসিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বৃদ্ধা সরাসরি আলী শারকে সব কথা জানিয়ে বললো—কাল সন্ধ্যাবেলা রসিদের বাড়ির জানালোর নিচে তুমি অবশ্যই গিয়ে দাঁড়াবে। আর যা-যা বললাম সেই সব ঠিক-ঠিক করবে। বুঝেছ?

আলী শার কী বলে যে বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ জানাবে বুঝতে পারলো না। নিদেনপক্ষে একটা উপহার দিতে পারলেও হয়ত সে সোয়াস্তি পেত। কিন্তু উপহারের কোন প্রয়োজন ছিলো না তাঁর। আল্লাহর নির্দেশেই সে সব করেছে।

তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বৃদ্ধা বিদায় নিলো। আগামীকাল যাতে সে সফল হতে পারে সেজন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালো। জুমুরুদ তাকে যে সাবধান করেছিলো সে কথাটা মনে পড়ে গেলো আলী শারের। কী যে হয়ে গেলো! কী করে এখন সে জুমুরুদের কাছে মুখ দেখাবে?

পরের দিন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নির্ধারিত স্থানে হাজির হলো আলী শার। সুযোগের অপেক্ষায় চুপচাপ বসে রইলো। ধীরে-ধীরে এগিয়ে চললো রাত্রি। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় গত দুটি রাত তার চোখের পাতা পড়ে নি। বসে থাকতে-থাকতে এক সময় সে ঘুমের কোলে ঢোলে পড়ে। তারপরে কোন আর জ্ঞান ছিলো না তার। প্রয়োজনের সময় যে জেগে থাকে ভাগ্য তার হাতে বাঁধা—ভগবানের রাজত্বে এইটাই নিয়ম।

কিন্তু ভবিতব্য কেউ এড়াতে পারে না। তা না হলে, ওই রাত্রিতেই এক দুর্ধর্ষ ডাকাত কেনই বা ওই অঞ্চলে হঠাৎ এসে পড়বে? আর এলোই যদি, তাহলে ডাকাতির সুযোগ-সুবিধে খুঁজে বার করার জন্যে কেনই বা সেদিন রসিদের বাড়ির পাশে ওৎ পেতে বসে থাকবে? এইভাবেই নিয়তি আলী শারকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়; আর এইভাবেই সে ডাকাতকেও টেনে আনে।

যাই হোক, রসিদের বাড়ির চারপাশে ডাকাতটা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই সময় অন্ধকারে তার গায়ে কী যেন একটা লাগলো। চমকে উঠলো ডাকাত। জিনিসটা আর কিছু নয়। আলী শার ঘুমন্ত দেহ। তার পরণে অনেক দামী পোশাক ছিলো। ডাকাতটা সেই সব পোশাক তার গা থেকে খুলে নিলো। হঠাৎ রসিদের বাড়ির একটা জানালা খুলে যেতেই ডাকাতটা চমকে পাশে সরে গেলো। ওপরের দিকে তার মনে হলো একটি মেয়ে শিস দিয়ে যেন তাকে ডাকছে। ডাকাতটার লোভ গেলো বেড়ে। সে-ও একটা শিস দিলো। তারপরেই সে অবাক হয়ে দেখলো একটা মেয়ে জানালা বেয়ে দড়ি ধরে পাঁচিল টপকাচ্ছে। মেয়েটা লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ার আগেই ডাকাতটা তাকে পিঠের ওপরে চাপিয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় দিলো। ব্যাটার গায়ে অসুরের মত ক্ষমতা। বেচারা আলী শার যেমন ঘুমিয়েছিলো তেমনি ঘুমিয়ে রইলো। জানতেও পারলো না কিছু।

ডাকাতটা বেশ জোরেই দৌড়াচ্ছিল। তার পিঠে চড়ে যাচ্ছে জুমুরুদ তা বুঝতে পারে নি। তাই সে বাহককে লক্ষ্য করে বললো—তবে যে বুড়ির কাছে শুনলাম শোকে-দুখে তুমি একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছ। কিন্তু এখন তো দেখছি আলী শার, ঘোড়ার চেয়েও জোরে দৌড়চ্ছ তুমি।

'কোন উত্তর দিলো না ডাকাতটা। শুধু তার গতিটা বাড়িয়ে দিলো। চুলের মুঠি ধরে ঘাড়টা বাঁকিয়ে তার মুখটা দেখার চেষ্টা করলো জুমুরুদ। একী, ডাকাতটার চুলগুলো যে শনের মত শক্ত। তখনই সে বুঝত পারলো তাকে অন্য কেউ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আঁতকে অস্থির হয়ে সে ডাকাতটার মুখে জোরে একটা ঘুসি মারল, চিৎকার করে উঠলো—কে রে তুই? কী রে তুই?

তখন শহর ছেড়ে তারা বিরাট একটা মাঠের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। এখানে চিৎকার

করলেও কেউ শুনবে না। চারিদিকে অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা থম-থম করছে। ডাকাতটা তাকে পিঠ থেকে নামিয়ে বললো—আমি একজন কুর্দ। আমার নাম জোবান। আহমদ অল-দানাফ-এর দলে আমার চেয়ে গায়ে বেশী জোর আর কারও নেই; বদমাইসিতে আমার জুড়িদার সেখানে নেই বললেই হয়। আমাদের দলে আমার মত চল্লিশজন দুঃসাহসী বীর রয়েছে। অনেক দিন আমরা নরম তুলুতলে মাংস পাইনি। কালকের রাতটা আমাদের যে কী আনন্দে কাটবে তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। তোমার জীবনে অত সুখ কোনদিন তুমি পাওনি সুন্দরী। সত্যি সত্যিই তুমি ইনামদার। কাল রাত্রিতে একের পর এক আমরা তোমার ওপরে চাপব; তোমার তলপেটে সুড়সুড়ি দেব; তার পরেই তোমার ওই দুটি উরুর মাঝখানে অন্ধকারে ডুবে যাব। কেবল আমি একা নই—আমরা সবাই—একজন একজন করে চল্লিশজন।

বাপস। বলে কী। কী সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে পড়েছে সে। অবস্থাটা ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লো জুমুরুদ। নিজের গালেই চড় মারতে লাগলো। কী ভুলই না সে করেছে! এসে পড়েছে একেবারে চল্লিশ জোড়া হাতের মধ্যে।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বেচারা কাঁদতে শুরু করলো। অজস্র চোখের জল তার গাল দুটি ছাপিয়ে ঝরতে লাগলো অঝোর ধারায়। সে বুঝতে পারে ঠিক এই মুহূর্তে তার জীবনে ভয়ানক একটি দুর্যোগ নেমে এসেছে। সে কোপে পড়েছে শয়তানের। বেশী চেঁচামেচি করে এখন আর লাভ নেই তার। শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে পরমেশ্বরের কাছে সে মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকে।

সে মনে মনে বলে—আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন দেবতা নেই। তাঁর প্রতি রয়েছে আমার অচলা ভক্তি। তাঁর নির্ধারিত ভাগ্য আমাদের মেনে নিতেই হবে। নিয়তির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেলো।

তিনশো তেইশতম রজনী ঃ

রাত্রিতে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ।

সেই ভীষণদর্শন কুর্দ জোয়ান জুমুরুদকে পিঠে চাপিয়ে আবার ছুটতে শুরু করলো। ছুটতে ছুটতে অনেকক্ষণ পরে পাহাড় ঘেরা একটা গুহার সামনে এসে থামলো। এই গুহাটি চল্লিশ চোরের প্রধান ঘাঁটি। ওদের দলের সর্দারও এইখানে থাকে। গুহার সামনে এসে জুমুরুদকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিলো। জোয়ানের বুড়ো মা-ও এইখানে থাকে। দলের সকলকে দেখাশোনা করে, রান্নাবাটনাও করে দেয় তাদের। গুহার দায়িত্ব তারই হাতে।

জুমুরুদকে নামিয়ে দিয়ে জোয়ান তার মাকে হাঁক দিলো, মা বেরিয়ে এলে জুমুরুদকে তাঁর হাতে জমা দিয়ে জোয়ান বললো—আমি না ফেরা পর্যন্ত এই হরিণ শিশুটাকে দেখো। ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে দেখা করতে চললাম। কাল দুপুরের আগে ফিরতে পারব না। আজ রাত্রে কয়েক জায়গায় চুরি করতে হবে কিনা? ভালো করে তোয়াজ করো মেয়েটাকে। এতগুলো মানুষের ভালোবাসা সহ্য করার মত ওর তাগদ চাইত।

এই বলে জোয়ান যেমন ছুটে এসেছিলো তেমনি দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

জোয়ান চলে যাওয়ার পর বুড়ি এক মগ জল এনে দিয়ে বললো—বাছা, কী সুখই না তোমার হবে! চল্লিশটা জোয়ান মদ্দ তোমাকে যখন দলাই-মালাই করবে তখন কী আনন্দ-ই না পাবে তুমি? অবশ্য ওদের মধ্যে সর্দারটারই তাগদ সব চেয়ে বেশী। ও একা চল্লিশ জনের মহড়া নিতে পারে। ঈশ্বর তোমার রূপ আর যৌবন দুই-ই দিয়েছেন। ওদের মনে ধরবে তোমাকে। তোমার কপাল ভালো।

সব কথাই শুনলো জুমুরুদ; কোন কথার জবাব দিলো না। বোরখা খুলে মাথার

নিচে রেখে শুয়ে পড়লো। সারারাত একটুও পারলো না ঘুমাতে। সমস্ত রাত ধরে নিজের মনকে শক্ত করলো সে। ভোরবেলা নিজের মনে মনে বললো—এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া শয়তানেরও সাধ্য নেই। এখানে থাকার কথাও ভাবা যায় না। চল্লিশটা দানো আমার দেহটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে, আর তারই জন্যে আমি অপেক্ষা করে বসে থাকব? কভী নেহি। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমার আত্মা, আমার দেহকে যেমন করে হোক রক্ষা আমি করবই।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সে বুড়ির সামনে এসে বললো—মা, তোমার আদর-যত্ন আর বাড়ির বিশ্রামে শরীরটা আমার একেবারে তাজা হয়ে উঠেছে। লোকজনের আদর আপ্যায়ন করতে আর আমার অসুবিধে হবে না। কিন্তু এতক্ষণ আমরা কী করব বলত? তার চেয়ে বাইরে চলো। রোদে বসে তোমার মাথার উকুন বেছে দেব।

কথা শুনে বুড়ি তো আনন্দে একেবারে গদগদ; বলে—তুমি কী সোনা মেয়ে গো! ভালোই বলেছ...

তারপরেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—দেখ, এখানে আসা অবধি একদিনও জল ঢালতে পারিনি। আমার মাথাতো নয়—একখানা ধর্ম্মশালা, হ্যাঁ, হ্যাঁ—উকুনের অতিথিসালা। জন্তু জানোয়ারদের মাথায় যতো রকমের উকুন থাকে তারা সবাই আমার মাথায় বাসা বেঁধেছে—সাদা উকুন, কালো উকুন, বুড়ো উকুন, চ্যাপসা উকুন—উকুনে উকুনে একেবারে ছয়েল্লাকার। সৈন্য সামন্তের মত রাত্রি বেলা তারা সব দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়—ছড়িয়ে পড়ে সারা গায়ে। একটা দেখেছিলাম আবার লেজওয়ালা, আর কী বিচ্ছি গন্ধ গো, উঁ! চলো চলো! আমাদের সঙ্গে যতদিন আছ বাছা, তোমার ভালোমন্দ সব আমি দেখব। কথা দিলাম।

এই বলে জুমুরুদকে সঙ্গে নিয়ে বুড়ি বাইরে এসে বসলো।

মাথার কাপড় সরিয়ে উকুন বাছতে বসলো জুমুরুদ। বুড়ি ঠিকই বলেছে। রাশি-রাশি উকুন তার মাথার উপরে কিলবিল করছে। কয়েক মুঠো উকুন তুলে বাইরে ফেলে দিলো সে। তারপরে শক্ত চিরুনী দিয়ে চুলের গোড়াশুদ্ধ দিলো আঁচড়িয়ে। আর একটা একটা উকুন তুলে দুই আঙুলের ভেতের ধরে মারতে থাকে মটমট করে। তারপরে চুলের ফাঁকে-ফাঁকে আঙুল দিয়ে আস্তে-আস্তে ইলিবিলি কাটতে থাকে। আরামে বুড়ি ঢুলতে থাকে। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

বুড়িকে ঘুমাতে দেখে আর দেরী করলো না সে। গুহার ভেতরে ঢুকে পুরুষের পোশাক পরলো। ডাকাতরা কোত্থেকে একটা বিশাল পাগড়ী চুরি করে এনেছিলো। সেটাকে সে চাপাল মাথার ওপরে। কাছেই একটা ঘোড়া খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ঘাস খাচ্ছিল। এটাকেও তারা চুরি করে এনেছিলো। ঘোড়াটাকে ধরে জিন লাগালো সে। তারপরে তার ওপরে উঠে আল্লাহর নাম নিয়ে দমে ছুটিয়ে দিলো ঘোড়াটা।

সারাদিন ছুটতে-ছুটতে নেমে এলো রাত। ঘোড়া থামিয়ে বিশ্রাম নিলো জুমুরুদ; ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আবার ছুটিয়ে দিলো ঘোড়া। চলার ফাঁকে-ফাঁকে একটু থেমে কয়েকটা ফলমূল সে খেয়েছে মাত্র, ঘোড়াটাকেও দিয়েছে ঘাস-বিছালি খেতে। আবার ছুটেছে ঘোড়া নিয়ে।

এগার দিনের দিন মরুভূমি ছাড়িয়ে সে এসে দাঁড়ালো ঘাসের দেশে। ভারি সবুজ দেখতে ঘাসগুলি। এরকম সবুজ ঘাস সচরাচর দেখা যায় না। এখানে খাবার জলও রয়েছে, রয়েছে বড়-বড় চোখ-জুড়ানো গাছের সারি। আবার গাছে-গাছে ফুটছে ফুল। গাছের ছায়া, ঝর্ণার জল, আর গোলাপের গন্ধ সব মিলিয়ে পরিবেশটি বেশ মনোরম। গাছে-গাছে পাখির ডাক, হরিণ শিশুর দৌড় ঝাঁপ, আর ঈশ্বরের জগতে বিচিত্র পশুর সমাবেশ স্থানটিকে নয়নাভিরাম করে তুলেছে। বসন্ত যেন এখানে চির-বিরাজমান।

এই মনোরম পরিবেশে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে জুমুরুদ আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কিছুটা দূরে একটা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা রাস্তা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। সেই রাস্তা ধরে সে এগিয়ে চললো। চলতে-চলতে বিরাট এক শহর চোখে পড়লো তার। শহরের মসজিদের চূড়াগুলি সূর্যের অলোতে ঝকমক করছিলো। অনেক দূর থেকেই সেই ঝকমকানি তার চোখে এসে লাগছিলো।

শহরের কাছাকাছি আসতেই জুমুরুদ শুনতে পেলো এক সঙ্গে অনেক লোক চেঁচাচ্ছে। শহরের ফটকের সামনে আসতেই তার মনে হলো লোকগুলো যেন বিজয়োল্লাস করছে। সে কাছে আসতেই দরজা খুলে গেলো। আমির, ওমরাহ, ইনামদার, আর বিভিন্ন দলের নেতারা তাকে সম্বর্ধনা জানালো। তাকে কুর্নিশ করে নিচু হয়ে শুয়ে মাটিতে চুমু খেলো তারা।

জুমুরুদ তো অবাক। রাজা বা বাদশাহরা দেশ জয় করে ফিরে এলে সাধারণত এই ধরনের সংবর্ধনা জানান হয়। জনতা একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে—আল্লাহ আমাদের সুলতানকে দিগ্বিজয়ী করুন। হে সুলতান, আপনার আগমনে প্রজাদের মঙ্গল হোক। আল্লাহ আপনার রাজ্যশাসন আরও জোরদার করে তুলুন।

এমন সময় হাজার-হাজার সৈন্য সারিবন্দী হয়ে এগিয়ে আসে; সরিয়ে দিতে থাকে উৎফুল্ল জনতাকে। সুসজ্জিত উটের পিঠে চেপে এগিয়ে এলো একজন ঘোষক, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সে সুলতানের শুভাগমন ঘোষণা করলো।

ছদ্মবেশী জুমুরুদ এসবের অর্থ বুঝতে পারে না। নগর প্রধান পাশে-পাশে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আসছিলো। তাকেই সে বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে—মালিক, ব্যাপারটা কী বলুন তো? আমাকে নিয়েই বা কী করতে চান আপনারা?

জবাবে সামনে এগিয়ে এলো রাজপ্রাসাদের রক্ষী। আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে বললো—জাঁহাপনা, আল্লাহর কী করুণা! তাই তিনি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁকে সেলাম। এদেশের রাজমুকুট তিনিই আপনার মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলময় আল্লাহ আপনার মত সুন্দর তরুণ সুলতানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কী চকচক করছে আপনার মুখ! যেন খাস তুর্কী এক যুবক। খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ! তিনি কোন ভিক্ষুককে পাঠাতে পারতেন, বা পাঠাতে পারতেন কোন সামান্য লোককে। কিন্তু তা তিনি পাঠাননি। এজন্যেও তাঁকে ধন্যবাদ। সেই ভিক্ষুক এলেও আমরা তাকেও সুলতান বলে মেনে নিতাম। তাঁকেও আমাদের এই রকমই সংবর্ধনা জানাতে হোত।

ভোরের আলো ফুটে উঠলো। চুপ করে গেলো শাহরাজাদও।

তিনশো চব্বিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার শুরু করলো গল্প—

রাজপ্রাসাদের রক্ষী বলে গেলো—আপনি বোধহয় আমাদের দেশের রীতি শুনেছেন। আমাদের দেশের সুলতান যদি কোন পুত্র সন্তান না রেখে মারা যান যে পথ দিয়ে আপনি এলেন সেই পথের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি; ভাবি কবে, আল্লাহ আমাদের নূতন সুলতান পাঠাবেন। সুলতানের মৃত্যুর পরে যিনিই এই পথে প্রথম আসবেন ঠিক আপনার মত তাঁকেই আমরা সুলতান বলে বরণ করে নিই। তাঁকেও আমরা ঠিক এইভাবে কুর্নিশ করি। আমাদের পরম সৌভাগ্য আল্লাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর সবচেয়ে সুন্দর সুলতানকে আমাদের রাজ্যে পাঠিয়েছেন। এমন সুন্দর আর সুঠাম চেহারার সুলতান আর কোনদনিই আমরা দেখিনি, বা শুনিনি।

জুমুরুদের মাথায় নানান ফন্দি ফিকির ঘুরে বেড়ায়। প্রাসাদ রক্ষীর কথা শুনে সে চট করে ঠিক করে নিলো যে সে এমন কিছু করবে না যাতে তার আসল রূপটা ধরা পড়ে যায়।

তার মুখে তাই কোন ভাবান্তর দেখা দিলো না। সে সবাইকে ডেকে বললো—অনুচরবৃন্দ, আমার কথা আগে শোনো। আমি তুর্কী বটে; কিন্তু সামান্য বা অজ্ঞাতকুলশীল কোন বংশে আমার জন্ম হয়নি। সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াব বলে আমি দেশ ছেড়েছি। অবশ্য, দেশ ছাড়ার আগে আত্মীয়স্বজনদের জন্যে আমার মনোমালিন্য কিছু হয়েছিলো। পথ আমাকে এক নূতন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। এই অভিজ্ঞতার সুযোগ আমি ছাড়তে রাজি নই। কথা দিলাম, আমি তোমাদের সুলতানের মুকুট পরব।

এই বলে সে সকলের আগে-আগে চলতে লাগলো। হর্ষধ্বনি আর বিজয়োল্লাসের মধ্যে দিয়ে সে শহরে এসে ঢুকলো। তারপরে শোভাযাত্রার সঙ্গে সে এসে দাঁড়াল রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে। আমীর-ওমরাহ, প্রাসাদরক্ষী, সভাষদেরা ঘোড়া থেকে তাকে নামিয়ে নিলো। সংবর্ধনার জন্যে বিরাট হলো ঘরে তাকে নিয়ে গেলো তারা। গায়ে চড়ালো রাজ পোশাক। মৃত সুলতানের মুকুট তার মাথার ওপরে পরিয়ে দিয়ে সবাই মাটিতে লুটিয়ে তাকে সম্মান জানালো। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে পাঠ করলো আনুগত্যের শপথ বাক্য।

জুমুরুদ রাজ্য শাসন শুরু করলো। কোষাগারের দরজা খুলে দেওয়া হলো। বিলি করা হলো ধনদৌলত। বংশ পরম্পরায় বহু যুগ ধরেই রাজকোষ উপছে পড়ছিলো। রাজকোষের বেশীটাই সে বিলিয়ে দিলো সৈন্য আর দরিদ্রদের মধ্যে। দু'হাত তুলে তারা আশীর্বাদ করলো—'আমাদের সুলতান দীর্ঘজীবী হোন। বহুকাল ধরে তিনি আমদের শাসন করুন।' বড়-বড় ওমরাহদের বিভিন্ন পদে ভূষিত করলো। আমীর, প্রাসাদরক্ষী, তাদের মহিষী আর হারেমের মেয়েদের সে জানালো তার শুভেচ্ছা। তুলে নিলো অনেক কর আর শুল্ক। মুকুব করে দিলো বকেয়া কর। বন্দীশালার দরজা খুলে দেওয়ার আদেশ দিলো। মুক্তি দিলো বন্দীদের। সমস্ত মকোদ্দমা নিলো তুলে। ফলে, ছোট-বড় সকলের ভালোবাসা তার উপরে বর্ষিত হলো অবশ্য ওর পেছনে আরও বড় কারণ ছিলো। পুরুষ হয়েও সে হারেমের দরজা মাড়ায় না, এ-তো পয়গম্বর ছাড়া আর কেউ নয়! কী সংযম! আসল সত্যটা অবশ্য কারুরই জানার কথা নয়। রাত্রে তাকে পাহারা দিত দুটি বাচ্চা খোজা। ইচ্ছে হলে তারা ঘুমোতেও পারত। এরা ছাড়া রাত্রে আর কারও প্রবেশাধিকার ছিলো না।

প্রজারা সুখেই ছিলো। সুখ ছিলো না জুমুরুদের মনে। দিন রাত সে আলীশার কথাই ভাবত। তার কথা মনে করে বড় দুঃখে দিন কাটাত জুমুরুদের। তার মনের অবস্থা কারুরই জানার কথা নয়। গোপনে-গোপনে সে আলী শারের অনুসন্ধান করে; কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। একান্তে চুপচাপ বসে কাঁদে। উপোস করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায় যাতে সে তার মনের মানুষকে খুঁজে পায়। সে সাচ্চা মুসুলমান। তাই তার স্থির বিশ্বাস আলী শারকে সে খুঁজে পাবেই।

প্রতীক্ষায় একটা বছর কেটে যায় তার। হারেমের রমণীরা হতাশায় ভেঙে পড়ে বলে—হায়, আমাদের কী দুর্ভাগ্য! আমাদের সুলতান জিতেন্দ্রিয় তপস্বী।

একটা বছর গেলো কেটে। জুমুরুদ একটা পরিকল্পনা তৈরি করলো। সেই পরিকল্পনাটি তাড়াতাড়ি যাতে কার্যকরী হয় সেই জন্যে সে রাজ্যের উজির আর অন্যান্য মন্ত্রীদের ডেকে এনে বললো—আমার রাজ্যে যত রাজমিস্ত্রী আর প্রযুক্তিবিদ রয়েছে সবাইকে খবর দিন। এক প্যারাসাঙ [আনুমানিক সওয়া তিন মাইল] লম্বা আর এক প্যারাসাঙ চওড়া একটা জায়গা সমান করে তার চারদিকটা ঘেরার ব্যবস্থা করুন। তার ঠিক মাঝখানে থাকবে বড় গম্বুজাকৃতি একটি প্রাসাদ। প্রাসাদের ভেতরে থাকবে একটি সিংহাসন। মেঝেতে বিছানো থাকবে সবচেয়ে সুন্দর লাল পারস্য দেশের একটা গালিচা। রাজ্যের প্রধানদের জন্যেও বসার ব্যবস্থা সেখানে থাকবে।

তার নির্দেশতম সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলো। এইখানে শহরের আর প্রাসাদের সমস্ত গণ্যমান্য মানুষদের সে ডাকলো। বিরাট ভোজ হলো। এমন এলাহি ভোজ আগে

কেউ কোনদিন দেখেনি; স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। ঝর্নার মত সরাবও উপছিয়ে পড়লো চারপাশে।

খানাপিনার শেষে জুমুরুদ সবাইকে বললো—প্রতিটি মাসের প্রথমে আমি আপনাদের এইখানে নিমন্ত্রণ করব। যোগ্যতা অনুযায়ী আপনারা এইখানে আসন গ্রহণ করবেন। সেই একই সময়ে আমার রাজত্বের সমস্ত প্রজারা আপনাদের সঙ্গেই ভোজের অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। সমস্তই যিনি দেন সেই খোদাতালাকে তারা ধন্যবাদ জানাবে ঘোষকের মারফৎ। প্রচারিত হবে আমার এই নির্দেশ। যে অমান্য করবে তাঁর ফাঁসী হবে।

পরের মাসের প্রথমেই শহরের পথে-পথে ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেলো—ক্রেতা-বিক্রেতা, ধনী-নির্ধন, ক্ষুধার্ত-অক্ষুধার্ত,—আমাদের সুলতান সবাইকে তাঁর নূতন প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেছেন, সেখানে তোমরা খানাপিনা করবে আর খোদাতালাকে ধন্যবাদ জানাবে। যে নিমন্ত্রনে যাবে না তার ফাঁসী হবে। যে যেখানে ছিলো সবাই দোকান-পাট, কেনা-বেচা বন্ধ করে নিমন্ত্রণে চলে এলো; চলে এলো হাতের কাজ ফেলে। না এলে, গর্দান যাবে।

দলে-দলে, কাতারে-কাতারে, হাজারে-হাজারে লোক বন্যার মত নূতন প্রাসাদের দরজায় আছাড় খেয়ে পড়লো। সিংহাসন আলো করে বসে রয়েছেন সুলতান; তাঁকে ঘিরে বসে রয়েছেন আমীর-ওমরাহের দল। নানা রকম খাবার পরিবেশন করা হলো প্রজাদের, ভেড়ার মাংস, বিরিয়ানি, দই আর চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি কিস্ক নামে অপূর্ব এক রকমের খাবার। খাবার সময় সুলতান তাদের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলো, প্রজারাও তা লক্ষ্য করতে ভোলে নি। খেতে-খেতে একজন তো তাদের পাশের লোককে ফিসফিস করে বলেই ফেলে—আল্লাহ কসম। আমার ভয় করছে। সুলতান আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছেন কেন?

যে যার আসনে বসে অমাত্যরা তাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন—'খাও, খাও; বাছারা পেট পুরে খাও। কোন লজ্জা করো না। যে যত বেশী খাবে সে-ই তত সুলতানকে খুশী করতে পারেব।' নিজেরাও তারা বলাবলি করতে থাকে—সুলতান আমাদের খুব ভালোবাসেন। আমাদের মঙ্গলের জন্যে তাঁর কত চিন্তা। এরকম সুলতান জীবনে আর কখনও দেখি নি আমরা।

এমন অপরূপ খাবার কোনদিন তারা যেন খায়নি—এইভাবে প্রতিটি খাবার তারা চেখে চেখে তারিফ করে খাচ্ছিল; কিন্তু তাদের ভেতরে একটা লোক ছিলো যে হচ্ছে সব চেয়ে পেটুক। সেই লোকটা থালার পর থালা টানছে আর নিঃশেষে তা উড়িয়ে দিচ্ছে। এই হাভাতে লোকটা হলো সেই খ্রীস্টান বরসুম। ওই লোকটাই তার দাদা রসিদ অল-দিন আর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে আলী শারকে অজ্ঞান করে জুমুরুদকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। প্রচুর মাংস আর বিরিয়ানি খাওয়ার পরেও তার থালা সকলের আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছিল। নিজের থালা শেষ করে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলো সে। ঘিয়ে সপসপ করছে একথালা বিরিযানি একটু দূরে রাখা ছিলো। গরম মশলার গন্ধে মাতোয়ারা এই থালাটা তার নাগালের বাইরে থাকায় সে একজনের ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো; তারপরে যতটা পারলো মুঠো করে এক খাঁমচা বিরিয়ানি নিয়ে গপ করে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। মনের আনন্দে চোখ দুটো বুজে এলো তার।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো পঁচিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রজনীতে আবার গল্প শুরু করলো শাহরাজাদ।

যে লোকটি বরসুমের পাশে বসে খাচ্ছিল সে খেঁকিয়ে উঠলো তার রকম দেখে—'ছি-ছি। কী রকম হ্যাংলা গো তুমি। ওরকম লম্বা হাত বাড়িয়ে খাবারটা তুলে নিতে তোমার একটুও লজ্জা করলো না? পাতে যেটুকু পড়বে সেইটুকু খাওয়াই তো শিষ্টাচার—এটা তুমি জান না?'

আর একজন বললো—'অত যে খাচ্চ। পেট ছাড়লে তখন বুঝবে ঠেলা!' একটা ভাঙখোর মজা করে বললো—আমার কাছে উঠে এসো বাপধন; আমার খাবারটা ভাগ করে খাব। আমি খাব একমুঠো। বাকিটা সব তুমিই গেলো।

বরসুম চোখ পাকিয়ে বলে—ওরে গেঁজেল ভাঙখোর। তোর দাঁতই নেই; ভালো মাংস খাবি কী করে? ওসব রান্না আমাদের মত ভদ্রলোকদের জন্য।

এই বলে সে ভাঙখোরের থালার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো; সঙ্গে-সঙ্গে সুলতানের চারটি রক্ষী তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো; টেনে ফেলে দিলো তার মুখ থেকে মাংসের টুকরোটা। বরসুমকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলো জুমুরুদ। তাকে চিনতে পেরে দেহরক্ষীরা সুলতানের কাছে ধরে নিয়ে এসে ঘাড় নিচু করে দাঁড় করিয়ে দিলো। সবাই তো হতভম্ব। ব্যাপারটা কী হলো! একজন চুপিচুপি পাশের লোককে বললো—'হাড় কিপ্‌টে পেটুক হলে কী দশা হয় দেখ। অন্যের খাবার তুলে নেওয়াটা কি সোজা পাপ।' সে ভাঙখোরটা মন্তব্য করলো—আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন। ভাগ্যিস আমার বিরিয়ানিটা নেওয়ার জন্য ওকে বলিনি। বললে, আরও কী সাংঘাতিক শাস্তি ও পেত কে জানে।' খানাপিনা থামিয়ে সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

জুমুরুদের চোখে তখন আগুন জ্বলছে। স্বর যথাসম্ভব সংযত করে সে বলে—তোমার চোখ দুটো দেখছি নীল। এ চোখ পাপের চোখ। তোমার নাম কী? কী কর তুমি? তুমি তো এদেশের মানুষ নও। এদেশে এসেছ কেন?

খ্রীস্টান লোকটার মাথায় ছিলো একটা সাদা পাগড়ী। অবশ্য মাথার ওপরে সাদা পাগড়ী চাপালেই মুসলমান রেহাই পায় না। বরসুম বললো—মালিক সুলতান, আমার নাম আলী। আমি ফিতে তৈরি করে খাই। আপনার দেশে এই ব্যবসা করেই আমি দুবেলা দুখানা রুটির যোগাড় করে বেঁচে আছি।

জুমুরুদ ওর একটা বাচ্চা খোজাকে বললো—আমার টেবিলে আল্লাহর দোয়া দেওয়া বালি রয়েছে। নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। সেই সঙ্গে আমার কলমটাও নিয়ে আসবি।

জিনিসপত্র আনা হলে, জুমুরুদ সামনের টেবিলে খুব সাবধানে বালিগুলি বিছিয়ে দিলো। কলম দিয়ে কী সব যে আঁকিবুকি কাটলো। দেখা গেলো সে একটা বাঁদর এঁকেছে। সেই সঙ্গে টেনেছে কয়েকটা রেখা। সেগুলি ঠিক কী তা বোঝা গেলো না। চারপাশ চুপচাপ। কিছুক্ষণ ছবির দিকে একমনে তাকিয়ে রইলো জুমুরুদ। তারপরে সবাই শুনতে পায় এই ভাবে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো—তুই একটা কুত্তা! সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে তুই মিথ্যে কথা বললি! তুই তো খ্রীস্টান, তাই না? তোর নাম বরসুম। এদেশে তুই এসেছিস একটা ক্রীতদাসীর খোঁজে। মেয়েটাকে তুই তার বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলি। শয়তান, এই সিদ্ধবালির সামনে কিছুই লুকানো যায় না। কুকুরের অধম তুই—স্বীকার কর তোর দোষ।

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে বরসুম। জোড়হাত করে বলে—ক্ষমা করুন, হুজুর। দোয়া মাগছি। আমি আপনার কাছে আর কিছু লুকাব না। ভগবান আপনাকে রক্ষা করবেন। সত্যি-সত্যিই আমি খ্রীস্টান। নিচু ঘরে আমার জন্ম। আমাদের বাড়ি থেকে একটা ক্রীতদাসী পালিয়ে গিয়েছে। তাকেই খুঁজতে আমি এদেশে এসেছি। অবশ্য মেয়েটাকে আমিই চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। অত্যাচারও তার ওপরে যথেষ্ট করা হয়েছে।

উপস্থিত প্রজাদের মধ্যে সবাই প্রায় ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলো—আল্লাহর কসম, তামাম দুনিয়ায় এমন সবজান্তা সুলতান আর কোথাও আমরা দেখিনি। বালি দিয়ে কী চমৎকারই না তিনি সব বলে দিলেন।

জহ্লাদকে ডেকে বললো জুমুরুদ—শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে এর জ্যান্ত ছাল

ছাড়িয়ে নেবে। সেই ছাল শুকনো করে শহরের দরজার গায়ে পেরেক দিয়ে দেবে সেঁটে। ওর দেহটা ঘুঁটে দিয়ে পোড়ানোর পরে সেটা ফেলে দেবে নর্দমায়।

আদেশ পালন করতে জহ্লাদের দেরী হলো না। সেই শাস্তি অনুমোদন করে যে যার ঘরে ফিরে গেলো।

ঘটনাটা নিয়ে বরসুমের প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলো। একজন বললো—'আল্লাহর কসম, বিরিয়ানির ওপরে আর কোনদিন লোভ দেখাব না। খেতে ভালো লাগলেও, আর না বাবা!' ভাঙখোর ভয়ে পেটটা চিপে ধরে বললো—'ওই শয়তান বিরিয়ানির হাত থেকে আল্লাহ আমাকে খুব বাঁচিয়েছেন।' সেদিন সকলেই এক বাক্যে শপথ নিলো আর কোন দিন তারা ওই বিরিয়ানির ধার দিয়ে হাঁটবে না।

পরের মাসে প্রথম সপ্তাহে যথারীতি আবার ভোজের আয়োজন হলো। এবার বিরিয়ানির প্লেট থেকে সবাই দূরে গিয়ে বসলো। নিজের নিজের পাতের খানা আর সরাব খেয়ে তারা অবশ্য সুলতানকে খুশী করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো। সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস দেখা গেলো নিজের পাত ছাড়া কেউ আর পরের পাতের দিকে নজর দিচ্ছে না।

ভোজ পুরোদমে চলছে এমন সময়ে সবাইকে ধাক্কা দিয়ে একটা ভীষণ-দর্শন লোক ভোজঘরে এসে ঢুকলো। এই লোকটাই কেবল বিরিয়ানির থালার সামনে বসলো। ভয়ে-ভয়ে সবাই দেখলো লোকটা দু'হাতে করে বিরিয়ানি খাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে জুমুরুদ চিনতে পারলো লোকটাকে। এ সেই ভীষণ চেহারার কুর্দ—চল্লিশ চোরের এক চোর। এদের সর্দার হলো আহমদ অলদানাফ। সেদিন দুপুরে মেয়েটাকে নিয়ে শোবে বলে সে দলবল নিয়ে গুহায় ফিরে এসেছিলো। মেয়েটা পালিয়ে গিয়েছে শুনে সে ভীষণ চটে গিয়ে নিজের হাতেই ঘুষি মেরে বলেছিলো—দুনিয়ায় যেখানেই থাক মেয়েটাকে সে ধরে আনবেই। সে যদি পাতাল বা গুটিপোকার মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাহলেও তার রেহাই নেই। খুঁজতে-খুঁজতে সে এইখানে এসে পড়েছে। ভগবানের মার একেই বলে। যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে-ই এখানকার সুলতান। ওর নিয়তিই শেষ পর্যন্ত ওকে এইখানে টেনে আনলো—এইখানেই ওর মৃত্যু লেখা ছিলো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প বলা থামিয়ে দিলো শাহরাজাদ।

তিনশ ছাব্বিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু হলো গল্প।

বিরিয়ানির থালার সামনে বসে বিরিয়ানির ভেতরে সটান হাত ঢুকিয়ে দিলো জবান। সেই দেখে সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠলো—'আরে আরে, কর কী! কর কী! তোমার জ্যান্ত ছাল তুলে দেবে জহ্লাদ। ওই পাপের খানায় হাত দিয়ো না বাপু; সাবধান'। চারপাশ থেকেই শব্দ শোনা যায়—আরে আরে গিদধোড় কাঁহাকার...

চারপাশ তাকিয়ে চোখ দুটো পাকিয়ে জবান দাঁত খিঁচিয়ে বললো— থাম ব্যাটারা! বিরিয়ানি আমার খুব ভালো লাগে। ওই খেয়েই পেট ভরাব আজ।

পাশ থেকে একজন বললো—পেট ভরাবে? আর জ্যান্ত যখন গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবে? খেয়েছ কি মরেছ। ফাঁসীতে লটকাতে হবে। তখন বুঝবে বিরিয়ানি খাওয়া কাকে বলে।

কে কার কথা শোনে? যে-হাতটা সে বিরিয়ানির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো সেই হাত দিয়েই সে থালাটা টেনে নিলো; থালার ওপরে ঝুঁকেও গন্ধ শুকলো প্রাণভরে। মুখ থেকে খানিকটা

লালাও পড়লো গড়িয়ে তার কাছে বসেছিলো সেই ভাঙখোরটা। এসব দেখে তার নেশা গেলো ছুটে। সে তাড়া তাড়ি দূরে সরে গেলো। বাপরে! এসবের মধ্যে সে আর নেই।

কাকের পায়ের মত মিশেমিশে কালো জবানের দুটো হাত। খাবলা খাবলা বিরিয়ানি তুলে নেওয়ার সময় সেই হাত দুটোকে মনে হচ্ছিল উটের পায়ের মত। বিরাট বিরাট বলের মত করে দলা পাকিয়ে বিরিয়ানি হাতে তুলে নিয়ে গলার ভেতরে ছুঁড়ে দেয়; তারপরে কোঁৎ করে গিলে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটা আওয়াজ করে—মনে হবে গুহার ভেতরে ভীষণ একটা বাজ পড়লো বুঝি। সেই আওয়াজ প্রাসাদের গায়ে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনি তোলে। থালাটার ওপরে চুর করে বিরিয়ানি সাজানো ছিলো। কয়েকটা খাবলা তুলে নেওয়ার পরে বিরাট একটা গর্ত দেখা গেলো সেখানে। সকলেই দেখে সেই গর্তের নিচে থালাটা বেরিয়ে পড়েছে।

সেই ভাঙখোর চিৎকার করে উঠলো—ওরে বাবা! এক মুঠোয় যে সবটাই তুলে নিয়েছে রে! আল্লাহ আমায় বাঁচিয়েছেন। ভাগ্যিস আমাকে বিরিয়ানি করে পাঠাননি। ওর যে ছাল ছাড়ানো হবে সেটা ওর কপালেই লেখা রয়েছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। উঃ! কী গেরাস যে বাবা। ওই গেরাসের বাছাধন, তুমি খতম।

কোন ভ্রূক্ষেপ নেই কুর্দ ডাকাতের। কে কী বলছে গায়ে মাখলো না সে। দ্বিতীয় গ্রাস তোলার জন্য হাতটা সে আবার ঢুকিয়ে দিলো বিরিয়ানির ভেতরে। খপ করে একটা আওয়াজ হলো। মুঠো ভর্তি করে দলা পাকাতে লাগলো বিরিয়ানিটা। গ্রাসটা মুখে পোরার ঠিক আগে জুমুরুদ রক্ষীকে বললো—ওই গ্রাসটা মুখে পোরার আগেই লোকটাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।

রক্ষীরা ঝাঁপিয়ে পড়লো জবানের ওপরে। মুখ নিচু করে গ্রাসটা মুখে তুলছিলো বলে সে রক্ষীদের দেখতে পায়নি। হাত দুটো পিঠ মোড়া করে তাকে সুলতানের কাছে হাজির করা হলো। সবাই বলাবলি করতে লাগলো—কেমন সাজা! পইপই করে বারণ করলাম—ব্যাটা, বিরিয়ানি ছুঁসনে। শুনলে আমাদের কথা? এবার বোঝ ঠেলাটা, ওই অভিশপ্ত বিরিয়ানি যে ছোঁবে তারই সর্বনাশ হবে।

জুমুরুদ জিজ্ঞাসা করে—কী নাম তোমার? কর কী? আমাদের শহরে এসেছ কেন?

জবান বললো—আমার নাম আট্‌মান। পেশায় মালী। শহরে এসেছি কাজের খোঁজে।

সেই মন্ত্রপূত বালি আর কলম নিয়ে আয়—রক্ষীদের আদেশ দিলো জুমুরুদ।

বালি আর কলম এলো। আগের মতই বালির ওপরে আঁকাজোকা শুরু হলো। অনেকক্ষণ কী জানি কী সব হিসাব করে হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠলো জুমুরুদ—মিথ্যেবাদী, তোর কপালে দুঃখ আছে। গুণে দেখলাম, তোর আসল নাম হচ্ছে জবান। তোর পেশা হলো চুরি, ডাকাতি, আর খুন করা। শুয়োরের বাচ্চা। ঠেঙিয়ে তোর মুখ থেকে সত্যি কথা বলাব।

জবান বুঝতে পারলো না যাকে সে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো এই সুলতানই মেয়ে! ভয়ে লোকটা কেমন নীল হয়ে গেলো। দাঁতে দাঁত লেগে একটা কটকট আওয়াজ বেরুতে লাগলো তার মুখ থেকে। ঠোঁট দুখানা সামনে পড়েছে ঝুলে। সত্যি কথা বললে রেহাই পেতে পারে এই ভেবে সে বললো—মালিক আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। এখানে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে বুঝতে পারছি। এই শহর ছেড়ে আমি সোজা বেরিয়ে যাব। কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন এমুখো হব না।

জুমুরুদ বললো—তোর মত শয়তানকে বাঁচিয়ে রাখলে গুনাহ হবে। তুই মুসলমানের কুলাঙ্গার...একে বাইরে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নে। লোকে যাতে দেখতে পায় এই ভাবে প্রাসাদের সামনে ওর চামড়াটা ঝুলিয়ে রাখবি। খ্রীস্টানের লাশটা যেভাবে পাচার করেছিলি এর লাশটাও সেইভাবে নর্দমায় ফেলে দিবি।

রক্ষীরা তাকে টানতে-টানতে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় ভাঙখোরটা বিরিয়ানির দিকে পেছন করে বসলো, বললো—ওরে বিরিয়ানি, গরম মশলা দেওয়া বিরিয়ানি, আর

কোন দিন তোর মুখ আমি দেখব না। তুই মহাপাপী তোর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তোকে দেখে আমার ঘেন্না হয়। তোর মুখে আমি থুথু ফেলি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেলো।

তিনশো সাতাশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু করলো।

আগের মতই তৃতীয় ভোজের আয়োজন হলো। সিংহাসনে বসে আছেন সুলতান। চারপাশ ঘিরে পাত্র-মিত্র-সভাসদ। সামনে প্রজারা প্রাণভরে আহার করছে, পান করছে সরাব, স্ফূর্তিতে চেঁচাচ্ছে। একটা জায়গা ছাড়া প্রাসাদের সারা কক্ষটাই গিয়েছে ভরে। বিরিয়ানির থালাটা যেখানে ছিলো সেখানে কেউ বসে নি। সব বসেছে পেছন করে। সাদা দাড়ীওয়ালা একটা লোক ঘরে ঢুকে বিরিয়ানির সামনে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিলো সেইখানে বসে পড়লো। লোকটাকে চিনতে পারলো জুমুরুদ। লোকটা হচ্ছে রসিদ অল-দিন। এই লোকটাই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো।

রসিদ অল-দিন এখানে এলো কী করে? মেয়েটার খোঁজ করতে তার ভাই বরসুম তো আগেই এসেছিলো বেরিয়ে। একমাস কেটে গেলো তবু তো ফিরলো না। ভাই-এর খোঁজ করতে তাই এবার সে নিজেই বেরিয়ে পড়লো। নিয়তিই তাকে টেনে আনলো এইখানে। আর এমনি কপাল যে ঘরে ঢুকেই সে বসে পড়লো বিরিয়ানির সামনে। জুমুরুদ ভাবে—আল্লাহর কী অদ্ভুত খেয়াল। সব বদমাইশ-এর ওই একই রা। কিন্তু এরকম হওয়া তো ঠিক নয়। প্রজাদেরও বিরিয়ানি খেতে হবে। আমি আজই আদেশ দেব যে খাবে না তার ফাঁসী হবে। কিন্তু তার আগে ওই বুড়ো শয়তানটাকে টিট করে দিই।

রক্ষীদের বললো—বিরিয়ানির সামনে যে বুড়োটা বসে রয়েছে ওকে ধরে নিয়ে এসো।

টানতে টানতে রক্ষীরা বুড়োটাকে তার সামনে এনে হজির করলো।

—কী তোমার নাম? পেশা কী? এদেশে এসেছ কেন?

রসিদ বললো—হে পুণ্যতম সুলতান, আমার নাম রুস্তম। আমার কোন পেশা নেই। নেশা আমার ঘুরে বেড়ানো। আমি দরবেশ।

আবার সেই বালি এলো; এলো কলম। আবার সেই আঁকাজোঁকা চললো। আবার কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ সুলতান—ভাবাবেগে তন্ময়। তারপরেই সে চেঁচিয়ে উঠলো—দরবেশ না, শয়তান তুই। সুলতানের সামনে মিছে বাত! তোর নাম রসিদ অল-দিন। মেয়েদের ওপরে অত্যাচার করাই তোর নেশা; পরের বাড়ি থেকে মেয়ে চুরি করাই তোর পেশা। বাইরে তুই মুসলমান সেজে বেড়াস; ভেতরে তুই পাকা খ্রীস্টান। নানান বদ কাজ করার ফলে নিজের ধর্মেও তুই পতিত। আমার প্রজাদের কাছে সব স্বীকার কর। নইলে ধড় থেকে তোর মুণ্ডটা নামিয়ে দেব।

মাথাটা বাঁচানোর তাগিদে সব কবুল করলো রশিদ।

জুমুরুদ রক্ষীদের বললো—লোকটার পা দুটো ওপর করে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখ। এক একটা পাছায় হাজারটা করে জুতো মার।

জুতো মারা শেষ হলে জুমুরুদ বলে—আগের দুটো কুত্তার চামড়ার সঙ্গে এর চামড়াটা ঝুলিয়ে রাখ।

রশিদকে টেনে বার করে নিয়ে যাওয়ার পরে সবাই আবার খাবারে মন দিলো। সুলতানের দিব্যজ্ঞান আর বিচারের দক্ষতায় তারা মুগ্ধ।

দিন যায়। কিন্তু যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে কোথায়? জুমুরুদের মনে সুখ নেই। রাজপ্রাসাদে ফিরেও কিছুই ভালো লাগে না তার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনেই সে

বলে—আল্লাহ পরম করুণাময়, প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা যেন আমার থাকে।...হে ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান তুমি। আমাকে করুণা কর। আমার আলী শারকে ফিরিয়ে দাও। এ-দুনিয়ায় আমার মত কত হতভাগিনী রয়েছে। হে আল্লাহ, তাদের মনে তুমি শান্তি দাও প্রভু।

আলী শারের স্মৃতিটা তাকে তুঁষের আগুনের মত দগ্ধ করছে। সারা রাত তার চোখে ঘুম নেই। চোখের জলে শেষ হয়ে যায় রাত। আবার আশায় সে পরের মাসের জন্যে বুক বাঁধে।

সেই প্রাসাদ, সেই ভোজনকক্ষ, সেই প্রজাবৃন্দ, আর সেই একই পরিবেশ! অমাত্যপরিবৃত হয়ে সুলতান বসে বসে প্রজাদের ভোজন দৃশ্য দেখছে। জুমুরুদ দুরু দুরু বুকে বলে—আল্লাহ, যোশেফকে তুমিই তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলে। আলী শারকে তুমি আমার কাছে এনে দাও। আলী শারকে এনে দাও তার এই ক্ষুদ্র বাঁদীর কাছে। ভুল পথে যারা চলে তুমিই তো তাদের ঠিক পথ দেখিয়ে দাও।

তার প্রার্থনা শেষ হতে-না-হতেই, ভোজনকক্ষে এক দিব্যকান্তি যুবক এসে ঢুকলো। প্রশস্ত বুকের ছাতি তার, সিংহের মত সরু কোমর। চলার মধ্যে বেশ একটা সম্ভ্রান্ত ভাব। পথশ্রমে যুবকটিকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে চারদিকে সে একবার তাকালো। দেখলো, কোথাও কোন ফাঁকা জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে সে বিরিয়ানির সামনেই বসে পড়লো। ভয় পেয়ে সকলে তার দিকে তাকালো।

আগন্তুককে দেখেই চিনতে পেরেছে জুমুরুদ। হঠাৎ কী যেন বলতে গিয়ে সে সামলে নিলো নিজেকে। ঠোঁট দুখানা তার তখন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। বুকটা করছে দুরু দুরু। পেটে দিচ্ছে মোচড়। হৃদপিণ্ডের শব্দটা কি কেউ শুনতে পাচ্ছে?

হ্যাঁ। এই আলী শার।

ভোর হয়ে এসেছে দেখে চুপ করে যায় শাহরাজাদ।

তিনশো আঠাশতম রজনী ঃ

আবার রাত্রি এলো। আবার গল্প শুরু হলো শাহরাজাদের।

জাঁহাপনা, আলী শার যে জুমুরুদকে উদ্ধার করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে-কথা নিশ্চয় আপনার মনে রয়েছে! এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে গেলো তার। পরের দিন দোকানদাররা যখন দোকানপাঠ খুলতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময় ঘুম ভাঙলো তার। থতমত খেয়ে গেলো বেচারা। রাস্তায় শুয়ে আছে কেন? মাথায় হাত দিয়ে দেখে পাগড়ী নাই। গায়ে যে দামি কুর্তা ছিলো। সেটাও কোথায় আত্মগোপন করেছে। ধীরে-ধীরে সব কথা মনে পড়ে গেলো তার। দীর্ঘ নিঃশ্বাস একটা ফেলে সামনের বাড়িটার দিকে একবার সে তাকালো। তারপরে বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে গিয়ে সেই বৃদ্ধার কাছে সে সব খুলে বললো।

বৃদ্ধাটি ফিরিওয়ালীর বেশে আবার বেরিয়ে গেলো; কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললো—সে ওখানে নেই। কী আর করবে বাছা! সবই তোমার নসীব। ও মেয়েকে খুঁজে পাওয়ার আশা তুমি ছেড়ে দাও। আল্লাকে ডাক। তিনিই তোমার একমাত্র ভরসা। তোমার এই দুঃখে একমাত্র তিনিই তোমাকে শান্তি দিতে পারবেন। তোমার ভুলের জন্যেই এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেলো।

চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো আলী শারের। এখন মৃত্যুই তাকে চিরশান্তি দিতে পারে। বৃদ্ধার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদলো। কাঁদতে-কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। সেবা যত্ন করে বৃদ্ধা তার জ্ঞান ফেরালো। কিন্তু আলী শার বিছানা নিলো। রুচি নেই আহারে, সুখ নেই বিহারে, ঘুম নেই চোখে, কবরেই চলে যেতে হোত তাকে। কেবল বৃদ্ধারই সেবা যত্নে সেটা হয়নি। সব সময়েই সে তাকে সাহস দিত। একটা বছর বিছানায় শুয়ে ছিলো আলী শার। একটা বছরই বৃদ্ধা তার সেবা করছে। বাড়াবাড়িটা কমলো বটে; কিন্তু দুর্বলতা গেলো না। আলী

শারের রোগশয্যার পাশে বসে বৃদ্ধাটি তাকে অনেক বিরহের কবিতা শুনিয়েছিলো। তাদের মধ্যে একটি হলো ঃ

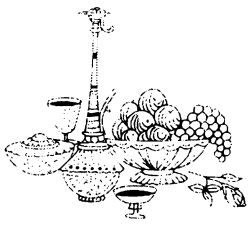

এই যে আমার হৃদয় জর-জর
নয়ন-কোণে অশ্রুত ঝর-ঝর
আমার মনের আগুনটারে নিবিয়ে দিয়ে যায়।
আমার রঙিন সূতা টুকরো করে
আশার তীক্ষ্ণ অসির জোরে
সেই সাথে এক বেদন কাঁপায় মোরে
শাশ্বত এক রঙিন কামনায়।

অনেক-অনেক বিরহ-বিচ্ছেদের কবিতা শুনিয়ে বৃদ্ধাটি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে; কিন্তু আলী শার জানত জুমুরুদকে না পেলে ও কিছুতেই শান্তি পাবে না, বাঁচবে না কিছুতেই। দুর্বলতাও তাই তার কাটে না। ছেলেটিকে কী-ভাবে সুস্থ করে তুলবো এই কথা ভেবে-ভেবে সারা হলো বৃদ্ধা। এক সময় সে বললো—বাছা, এমনি ভাবে শুয়ে-শুয়ে কাতরালে জুমুরুদকে তুমি পাবে কেমন করে? পুরুষ মানুষ তুমি। শক্ত হও, দুর্বলতা দূর কর। শহরে-শহরে ঘুরে বেড়াও, ঘুরতে থাক দেশে-দেশে। তবেই তো একদিন-না-একদিন তাকে তুমি খুঁজে পাবে। এমন করে বিছানায় পড়ে থাকলে কোনদিনই তাকে তুমি পাবে না।"—এইভাবে রোজই তাঁকে উত্যক্ত করতে থাকে। মাঝে-মাঝে সাহসও যে দেন না সেকথাও সত্যি নয়।

তারপরে একদিন আলী শার আলস্য ছেড়ে সত্যি-সত্যিই উঠে বসে। আলী শারকে নিয়ে গোছল করিয়ে দেয় বৃদ্ধা। পেস্তা দেওয়া সরবৎ খেতে দিলো তাকে। নিজের হাতে মুরগীর ঝোল রান্না করে দেয়, এইভাবে মাসখানেক পরে ঘুরে বেড়ানোর মত শক্তি ফিরে এলো আলী শারের দেহে। মনে এলো বল। তারপরে বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একদিন আলী শার বেরিয়ে পড়লো জুমুরুদকে খুঁজতে। ঘুরতে-ঘুরতে হতাশ হতে-হতে আজই সে এই শহরে এসে পৌঁছেছে। জুমুরুদ এখানকারই সুলতান। তারপরে সে বিরিয়ানির সামনে বসেছে।

বেশ ক্ষিদেও পেয়েছে তার। খাওয়ার জন্যে আস্তিন গুটিয়ে সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। খেতেও শুরু করেছে। বিরিয়ানি খেতে দেখে আশপাশের লোকেরা আঁৎকে উঠে তার দিকে তাকালো। ওটা খেতে সকলেই তাকে নিষেধ করলো। তাদের কথা তার কানে গেলো না। তখন সে ভাঙখোরটা বলে উঠল—সাবধান, সাবধান! ওদিকে তাকিয়ো না যাদু। মুখে দিয়েছ কি তোমার দফা রফা। গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে ফাঁসীতে লটকে দেবে। মরণ তোমার কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আলী শার বললো—যে ভাবে আমার দিন কাটছে তাতে আমার কাছে মরণই অনেক ভালো। অত ডেকেও মরণকে পাই নি। আজ যদি তোমাদের কথা মত মৃত্যুই আমার হয়, ভালোই তো। বিশেষ করে সেই জন্যেই আমি এটা খাব।

আর কোন দিকে না তাকিয়েই সে বিরিয়ানিটা খেতে শুরু করলো।

জুমুরুদ সব লক্ষ্য করছিলো। ভাবছিলো—আহা বেচারা, পেট পুরে খেয়ে নিক। তারপরে ডাকিয়ে আনব।

তার ঠোঁট দুখানা কেবল নড়তে থাকে। বিড়বিড় করে সে বলে—আল্লাহ তুমি এই বাঁদীর কথা শুনেছ। তারপরে সে রক্ষীদের বললো—ওই যে লোকটি বিরিয়ানি খাচ্ছে ওকে বেশ ভদ্রভাবে বলবে আমার কাছে এসে দুটো কথা শুনে যেতে।

আদেশ পেয়ে রক্ষীরা তার কাছে গিয়ে কুর্নিশ করে বললো— মালিক, আমাদের মহামান্য সুলতান আপনাকে স্মরণ করেছেন।

উঠতে উঠতে আলী শার বললো—তাই নাকি? চলো যাচ্ছি সুলতানের কথা অমান্য করা যায় না।

আলী শার এগিয়ে গেলো সুলতানের দিকে।

প্রজারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করলো—আবার তাই হলো নাকি গো! এবারের লোকটা আগেকারগুলোর মত বিশ্রী নয়। কী জানি, কী হবে বাপু?

কেউ কেউ বললো—ওর ভেতরে পাপ থাকলে সুলতান ওকে পেট ভরে খেতে দিতেন না। আগের মত এক গেরাস। ব্যস। তারপরেই ফাঁকা—বিলকুল ফাঁকা।

আর একজন বললো—দেখছ, প্রহরীরা কই ওকে তো টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেলো না। লোকটা তো নিজের পায়েই হেঁটে গেলো। ওকে যথেষ্ট সম্মানও দেখাল প্রহরী। ব্যাপারটা কী!

সুলতানের সামনে গিয়ে মাটিতে চুমু খেলো আলী শার।

খুব ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলো জুমুরুদ—গলাটা একটু যেন কেঁপে-কেঁপে উঠলো—ওহে যুবক, তোমার নাম কী? পেশাটা কী তোমার? এই শহরে এসেছ কেন?

আলী শার বললো—মহামান্য সুলতান, আমার নাম আলী শার। গ্লোরির ছেলে আমি। খোরেসানে আমার বাবা একজন বড় ব্যবসাদার ছিলেন। আমারও পেশা তাই। আমার দুর্ভাগ্য এদেশে আমাকে টেনে এনেছে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেলো।

তিনশো ঊনত্রিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু করলেন শাহরাজাদ।

আলী বললো—প্রিয়তমাকে হারিয়ে আমি এখন তার-ই খোঁজে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খুঁজতে-খুঁজতে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি এই শহরে। তার মিষ্টি ডাক, মিষ্টি স্বপ্ন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় পাব তারে! দস্যুরা তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। দিকহারা এক জাহাজে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি যেন। কোথায় তাকে পাব কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। এই না-পাওয়ার বেদনা যে কী, কী করে আপনাকে বোঝাবো জাঁহাপনা?

বলতে-বলতে দু'চোখ ছাপিয়ে জল ঝরতে লাগলো তার। দয়িতার বিরহে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপরে।

খোজা ছেলে দুটি তার চোখেমুখে গোলাপ জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলো তার।

জুমুরুদ বলে—মন্ত্রপূত বালি আর আমার কলমটা নিয়ে আয়।

আগের মতই টেবিলের ওপরে বালি ছিঁটিয়ে কলম দিয়ে সে নানা রকম আঁকজোক কাটলো। নিজেকে সংযত করার জন্যে কিছুটা সময় সে নিলো। হাজার হোক সে সুলতান। তার চারপাশে হাজার-হাজার প্রজা, পাত্র-মিত্র আর অমাত্যেরা বসে রয়েছে। এতটুকু বেচাল হলেই মাটি হয়ে যাবে সব। অথচ, নিজেকে সামলে রাখাও যে ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

অনেকক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়াই করে মুখ তুললো জুমুরুদ। সকলেই শুনতে পায় এমনিভাবে বেশ মিষ্টি করেই বললো—গ্লোরির ছেলে তুমি আলী শার। তুমি যে সাচ্চা মানুষ তা আমার গণনাতেই ধরা পড়েছে। তুমি যা বললে তার সবটুকুই ঠিক। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি তোমার ভালোবাসার মানুষকে খুব শিগগিরই তুমি খুঁজে পাবে। আর দুঃখ করো না।

ভোজ শেষ হওয়ার পরে আলী শারকে গোছল ঘরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলো জুমুরুদ। গোছল শেষ হলে রাজকীয় পোশাকে সাজিয়ে আস্তাবলের সব চেয়ে ভালো একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আলী শারকে রাজপ্রাসাদে হাজির করার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলো জুমুরুদ।

সুলতানের এ-হেন নির্দেশ শুনে প্রজারা তোওবা-তোওবা করতে লাগলো। বলে,

ব্যাপারটা কী, অ্যা! এত খাতির, এত সম্মান!!-- কেউ কেউ মন্তব্য করলো—'বুঝলে না চাচা! চাঁদপনা মুখ দেখে সুলতানের মন গলেছে। একি আর তোমার মুখ হে? এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই।' আর একজন মাথা নেড়ে বললো—'উহুঁ' ব্যাপারটা অত সোজা নয়, মিঁয়া। ওকে বিরিয়ানি খেতে তো তোমরা দেখেছ? অথচ ওই বিরিযানি ছুঁলেই কী কাণ্ডটাই না হচ্ছিল—তা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ। এর বেলাতেই সব ওলট-পালট হয়ে গেলো কেন? না, ব্যাপারটা মোটেই অতটা সোজা নয় হে, অতটা সোজা নয়।

মাথা নাড়তে-নাড়তে, নানান জল্পনা করতে-করতে সবাই বাড়ির পথ ধরলো।

রাতের অপেক্ষায় বসে রয়েছে জুমুরুদ। বসে-বসে ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছে, হয়ে উঠছে অস্থির। কখন তাকে কাছে পাব। উঃ, কতকাল পরে আবার দু'জনে কাছাকাছি আসব।

পশ্চিম আকাশে ধীরে-ধীরে ঢলে পড়লো সূর্য। শুরু হলো সন্ধ্যের আজান। মসজিদে প্রার্থনার জন্যে লোক চলাচল শুরু হলো। জুমুরুদের আর তর সইছে না। পোশাক পালটিয়ে নরম বিছানায় সে গা এলিয়ে দিলো। পরণে তার স্বচ্ছ সেমিজ। অন্ধকারে থাকার জন্যে আলোর

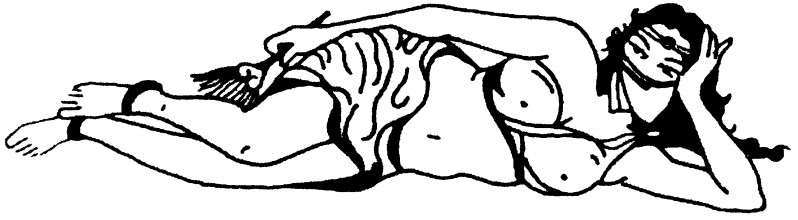

সামনে সে পর্দাটা দিলো টেনে। আলী শারকে নিয়ে আসার জন্যে শুয়ে শুয়েই সে নির্দেশ দিলো খোজা ছেলে দুটাকে।

সুলতানের এ-হেন অদ্ভুত ব্যবহারে অমাত্যরাও অবাক। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো—নিশ্চয় সুলতান ওই দরবেশটার প্রেমে পড়েছে। তবু যদি মেয়েছেলে হোত। আজ রাত্রিতে ওরা সম্ভবত এক জায়গাতেই থাকবে। কাল সকালে দেখবে ও নির্ঘাত প্রধানমন্ত্রী অথবা সেনাধ্যক্ষ হয়ে গিয়েছে।

এদিকে আলী শারকে ভেতরে পৌঁছে দিয়ে খোজা দুটি দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলো। আবছা অন্ধকারে সুলতান দেখতে পেলো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আলী শার চুম্বন করছে। সুলতানও হাত তুলে তাকে অভিবাদন জানালো। সুলতানের মঙ্গলকামনা করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো আলী শার। ভাবলো, আগ বাড়িয়ে কিছু বলব না।

জুমুরুদ ভাবলো—আমার পরিচয় যদি এখনই দিই তাহলে ওতো আবেগের চোটেই মরে যাবে। তাই সে অন্ধকারে আলী শারের দিকে পেছন করে বসলো। ওহ ছোকরা, কাছে এগিয়ে এসো! গোছল করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মালিক।

—হাত-পা ভালো করে সাফ করেছ? সুগন্ধী তেল পেয়েছিলে? এখন তবিয়ৎ ভালো লাগছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মালিক।

গোছলের পরে তোমার ক্ষিদে পেয়েছে তো? ওই দেখ, তোমার সামনেই একটা সোনার থালায় খানা রয়েছে—মুরগীর মাংস, তন্দুরী—সব পাবে। খনিকটা খেয়ে নাও।

পেট পুরে খেয়ে নিলো আলী শার।

এখন নিশ্চয় তোমার তেষ্টা পাচ্ছে? এইখানে নানা রকমের সরাব রয়েছে। যত পার খেয়ে নাও। তারপরে আমার কাছে এসে বস।

সব সরাবই চেখে দেখলো আলী শার। যতটা পারলো খেলো, তারপরে কাঁপতে-কাঁপতে সুলতানের বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো।

পিছন ফিরেই হাত ধরে সুলতান তাকে বিছানার ওপরে বসতে দিলো; তারপরে বললো—যুবক তুমি আমাকে খুব খুশি করেছ। তোমার মত সুন্দর মুখ আমি খুব পছন্দ করি। পায়ে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। একটু টিপে দেবে?

কামিজের আস্তিন গুটিয়ে নিচু হয়ে আলী শার সুলতানের পা টিপতে লাগলো দুলে দুলে। কিছুক্ষণ পরে সুলতান বললো—এবার পা আর উরু দুটো টিপে দাও।

পা আর উরুর কাপড় তুলে টিপতে গিয়ে আলী শার অবাক হয়ে যায়। অবাক কাণ্ড। পা আর উরুতে তো কোন লোম নেই। আর কী নরম তুলতুলে। মনে-মনে বললো—পুরুষ মানুষের পা এরকম হয়? আমি বাপু কোন পুরুষের পা এরকমটি দেখিনি।

—তুমি তো বেশ চমৎকার টিপতে পার ছোকরা! তোমার হাত বেশ পাকা দেখছি। আর একটু ওপরে টিপে দাও; এই কোমেরের কাছাকাছি।

আলী শারের হাত হঠাৎ ঘেমে উঠলো। ভয়ে-ভয়ে বললো—আমাকে মাপ করুন, মালিক। উরুর ওপরে কী রকম করে টিপে দেব বুঝতে পারছি নে। যতটুকু বুঝি ততটুকু করেছি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে থেমে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো ত্রিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার গল্প বলতে শুরু করলো শাহরাজাদ।

আলী শারের কথায় যেন জ্বলে উঠলো সুলতান; একটু উঁচু গলাতেই বলে—আমার কথার অবাধ্য হচ্ছ, সাহস তো মন্দ নয়, যা বলছি কর। একটু দেরি হলেই আজ রাতে তোমার শিরশ্ছেদ করা হবে। আমাকে তৃপ্তি দাও। তার বিনিময়ে তোমাকে সব চেয়ে বেশী স্নেহ করব, ভালোবাসব। আমীরের আমীর, সেনাধ্যক্ষের ওপরে বসিয়ে দেব তোমাকে। যা বলছি চট পট তামিল কর।

—কিন্তু জাঁহাপনা, আপনি ঠিক কী চাইছেন তাইত বুঝতে পারছিনে। কী ভাবে আপনার হুকুম তামিল করব বলে দিন।

তোমার পা-জামাটা খুলে ফেলো। আমার পাশে উপুড় হয়ে শোও।

হাঁটু গেড়ে হাত জড় করে আলী শার বললো—সারা জীবনে কখনও আমি এসব কাজ করিনি। আপনি যদি এসব কাজ করতে আমাকে বাধ্য করেন তাহলে আল্লাহর কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। আমি এখনই এদেশ ছেড়ে চলে যাব।

প্রচণ্ড ক্রোধের ভান করে সুলতান বলে—আমার আদেশ, পা-জামা খোলো? আমার পাশে উপুড় হয়ে শোও। নইলে এখনই তোমার গর্দান যাবে। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ কর। কী সুন্দর তোমার চেহারা। তুমি আমার কাছে শোবে এসো। এর জন্যে তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে না।

কী আর করে আলী শার? সুলতানের আদেশ মত পা-জামা খুলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। তার পিঠের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সুলতান। আবেগে জড়িয়ে ধরলো আলী শারকে।

আলী শার ভাবলো—এবার আমার শেষ। তারপরেই হঠাৎ সে চমকে উঠলো। পিঠের ...রে তার গোলাকার কী যেন দুটি বস্তুর চাপ লাগছে যেন। সিল্কের মত নরম পেলব সে অনুভূতি। সুলতানের দেহ থেকে একটু একটু ঘাম বোধ হয় চুইয়ে পড়েছিলো। সেই

ঘাম তার পিঠে লাগলো, হায় আল্লা, মেয়েদের মত এত নরম রোমাঞ্চকর সুলতানের দেহ। বেচারার প্রাণ তখন যায়-যায়। সে মড়ার মত চুপচাপ পড়ে রইলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক তার পিঠের ওপরে শুয়ে রইলো সুলতান। ওপাশ থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বেচারা বেশ ঘাবড়ে গেলো। তারপরে একসময় পিঠ থেকে নেমে এলো সুলতান। এবার সুলতান আলী শারকে তার পিঠে চাপানোর চেষ্টা করলো। বেচারা আলী শার। এবারে আর তার নিস্তার নেই। তার মনে হলো সুলাতন পুরুষাঙ্গাহীন। এখন যদি প্রমাণিত হয় যে সে-ও ওই রকম পুরুষাঙ্গহীন তাহলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না। কথাটা ভাবতে গিয়েই সে আরও ঘাবড়ে গেলো, সারা হয়ে গেলো ভয়ে। দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগলো তার।

আলী শারের তখন শেষ অবস্থা। এমন বিপাকেও কেউ পড়ে—ইয়া আল্লাহ! জোরে-জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো তার। তার শরীরের ঘামে ভিজে গেলো সুলতানের দেহ।

সুলতান বললো—কই, তোমার হাতটা দাও।

প্রাণের মায়া বড় মায়া। ভয়ে-ভয়ে হাত খানা বাড়িয়ে দিলো আলী শার। অন্ধকারে যেখানে গিয়ে তার হাত পড়লো তাতেই সে চমকে উঠলো।

এতো পুরুষ নয়। —আলী শারের চিন্তার জগতে বিপর্যয় নেমে এসেছে ততক্ষণে। —এরকম আশ্চর্য ঘটনা আমার জীবনে কোনদিনই ঘটতে দেখিনি। বিদ্যুৎ চমকের মত কী করে যে কী হয়ে তা সে বুঝতে পারলো না। একটা উদগ্র কামনা তাকে গ্রাস করে ফেললো।

সেই চরম মুহূর্তটির জন্যে জুমুরুদ-ও অপেক্ষা করছিলো। এবার প্রচণ্ড জোরে সে হেসে উঠলো। ফুলে-ফুলে উঠলো তার দেহটা। সেই হাসির গমকে পিঠে থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো আলী শার। হাসতে-হাসতে জুমুরুদ বললো—মালিক, তোমার প্রিয়তমা বাঁদীকে তুমি চিনতে পারলে না।

কিছুই বুঝতে পারলো না আলী শার। কে মালিক, কে বাঁদী—কিছুই মাথায় ঢুকলো না তার। জিজ্ঞাসা করলো—জাঁহাপনা, কিসের মালিক, বাঁদীই বা কে, কিছুই মালুম হচ্ছে না আমার।

হেসে বললো জুমুরুদ—আলী শার, আমিই তোমার জুমুরুদ, আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?

কথাটা শুনেই আকুল আগ্রহে চমকে উঠে পড়লো আলী শার; আপনার প্রাণ-পিয়াসী প্রিয়তমকে এবার চিনতে তার মোটেই দেরী হলো না। চিনতে পেরেই প্রচণ্ড আবেগে জড়িয়ে ধরলো তাকে। আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিলো তার চোখ, মুখ, বুক, সারা দেহ।

জুমুরুদ বলে—কী গো মালিক, আর না-না করবে।

উত্তর দেওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত আলী শারের এখন নেই। সিংহের মতই আলী শার তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে সব বাধা, সব দুশ্চিন্তা কেটে গেলো তার। জুমুরুদকে কোলের ওপরে তুলে নিলো সে। তাকে নিয়ে কী করবে কী না করবে কিছুই ভেবে পেলো না সে। জুমুরুদের বুকের মধ্যেও তখন কামনার দাপাদাপি চলছে। আলী শারের প্রচণ্ড, উদ্দাম উচ্ছ্বাসকে সে এতটুকু বাধা দিলো না, জৈব ক্ষুধায় তখন দু'জনেই সমানভাবে ক্ষুধাতুর। দুটি দেহের পুনর্মিলনের অভিসার সারা রাত ধরেই চলতে থাকে তাদের। একজনের মুখ নিসৃত আওয়াজ আর একজনের নিশ্বাসের আর্তিতে চাপা পড়ে গেলো। সুলতানের শয়ন কক্ষ সেই বিচিত্র স্বরধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো।

সেই শব্দে প্রহরাধীন খোজা দুটি কেমন ভয় পেয়ে গেলো। সুলতান কোন

বিপদে পড়েছেন বুঝতে পেরে ভয়ে ভয়ে তারা দরজার ফোকরে উঁকি দিতে লাগলো। সুলতানের পিঠটাই কেবল তাদের চোখে পড়লো। আবার দেখলো, সেই লোকটা সুলতানকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। দু'জনের শরীরই নড়ছে। মারামারি, কুস্তি হচ্ছে নাকি দু'জনের? দু'জনের শরীর এমন ভাবে লেপটে রয়েছে যে কাঁচি দিয়ে না কাটলে বোধ হয় তাদের আলাদা করা যাবে না। মাঝে-মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠছে তারা, ফুলে-ফুলে উঠছে।

রাত পুইয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো একত্রিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শাহরাজাদ গল্প বলতে শুরু করলো।

এসব দেখে ফুটো বন্ধ করে শেষ পর্যন্ত সরে এলো তারা। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো—আমাদের সুলতানকে মোটেই বেটাছেলের মত লাগছে না, তাই না রে। যেন একটা মেয়েমানুষ। কেমন যেন করছেন দেখলি!

ব্যাপারটা তারা আর ঘাঁটাঘাটি করলো না। তবে আসল ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি তাদের।

পরের দিন ভোরবেলা জুমুরুদ আবার সেই সুলতানের পোশাকই পরল। পাত্রমিত্র সবাইকে ডেকে পাঠালো প্রাসাদের বাগানে। সবাই উপস্থিত হলে সে বললো—আমার প্রিয় বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দ, আমি যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম তোমরা সেই পথের ধারে অপেক্ষা কর। আমার আদেশ, আমার মত তোমরা আর কাউকে নিয়ে এসে তোমাদের সিংহাসনে বসাও। আমি স্বেচ্ছায় এই সিংহাসন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ঠিক করেছি এই যুবকের সঙ্গে আমি ওর দেশে চলে যাব। ওকেই আমি আমার সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি। আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন।

পারিষদবর্গ শান্ত হয়ে সুলতানের নির্দেশ শুনলো। ইতিমধ্যে দুটি খোজা প্রচুর খাবার, ধনরত্ন, মণিমাণিক্য সাজপোশাক উট আর খচ্চরের পিঠে ফেললো সাজিয়ে। সব শেষে জুমুরুদ আর আলী শার সুসজ্জিত একটা উটে টানা পাল্কির ভেতরে গিয়ে বসলো। সঙ্গে নিলো কেবল সেই দুটি খোজাকে। খোরাসান শহরে নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে গেলো তারা। গরীব দুঃখীদের দু হাত দিয়ে দান করলো। দান করলো বিধবাদের, পিতৃ-মাতৃহীন ছেলেমেয়েদের। বন্ধুবান্ধবদের উপঢৌকন পাটাল ভালো-ভালো। ওরা ফেরার আগেই সেই বৃদ্ধাটি দেহ রেখেছিলেন। ওরা তাঁর কবরের ওপরে সুন্দর একটা বেদী তৈরি করে দিলো।

অনেক দিন সুখে-শান্তিতে ঘর করলো ওরা। একটি পুত্র সন্তানও হলো ওদের। আনন্দে ভরে গেলো ঘর। সেই আনন্দ ভেঙে গেলো যখন আল্লাহ্ ওদের একজনকে তুলে নিলেন।

এই হলো গ্লোরি, তার ছেলে, আর জুমুরুদের গল্প।

জাঁহাপনা এবার আপনাকে যে গল্পটা শোনাব সেটা এর চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। গল্পটি গড়ে উঠেছে ছ'টি মেয়েকে ঘিরে, নানান রঙের ছ'টি মেয়ে। গল্পের চেয়ে এর কবিতা গুলি দারুন চমৎকার! এতদিন তো আপনাকে অনেক কবিতাই শুনিয়েছি ঃ কিন্তু এর কবিতার কাছে ওগুলি যে কিছু নয় সেকথা আপনাকে আমি হলফ করেই বলতে পারি। এর পরেও যদি আপনার ভালো না লাগে আপনি আমার গর্দান নিয়ে নেবেন যখন খুশী।

শুরু হলো শাহরাজাদের গল্প ঃ

জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চয় বাদশাহ আল-মামুনের নাম শুনেছেন। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি সেই ধার্মিক মামুন। একদিন তিনি পাত্রমিত্রদের নিয়ে রাজপ্রাসাদের সিংহাসনে বসেছিলেন। পাত্রমিত্রদের মধ্যে ছিলেন না কে? ছিলেন উজির, আমীর, ছিলেন নামী-নামী

পণ্ডিতেরা, আর সভাকবি। এঁদের মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন বসোরার মহম্মদ। খুব সুন্দর সুন্দর গল্প বলতে পারতেন তিনি। বাদশাহ তাঁকে কাছে ডেকে বললেন—মহম্মদ, সুন্দর একটা গল্প বলত। যা কোনদিন এখানে বলো নি সেই রকম একটা গল্প বলো।

মহম্মদ বললেন—সে আর এমন কী কথা। শোনা গল্প বলব, না, নিজের চোখে দেখেছি এমন কোন কাহিনী শুনবেন?

বাদশাহ বললেন—সে তুমি বুঝবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে গল্পটা ভালো হওয়া চাই। সবাই যেন শুনে তোমার তারিফ করতে পারে।

মহম্মদ শুরু করলো গল্প ঃ

আমি একটি ধনী লোককে চিনতাম, তাঁর নাম আলী। তিনি থাকতেন অল-ইয়ামনে। নিজের দেশ ছেড়ে তিনি বাগদাদে এসে বাস করছিলেন। বাগদাদের শান্ত জীবনযাত্রা তাঁর খুব ভালো লাগত। জীবনটাকে ভোগ করার কোন আয়োজনেরই অভাব সেখানে ছিলো না। সেইটাও টেনে রেখেছিলো তাঁকে। বাগদাদে তিনি বেশ মানিয়ে নিতে পারবেন এই ভেবে অল-ইয়ামনে তাঁর যে সব সম্পত্তি ছিলো সেই সব সম্পত্তি নিয়ে এলেন বাগদাদে; মায় তাঁর হারেমটি পর্যন্ত। সেই হারেমে ছিলো ছ'টি বাঁদী। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে ওই ছ'টি মেয়েই রূপে-রঙে-ঢঙে একেবারে স্বতন্ত্র প্রকৃতির—কারুর সঙ্গেই কারুর মিল ছিলো না এতটুকু। ছ'জনেই যেন ছ'টি হুরি। যেমন গায়ের রঙ, তেমনি তাদের স্বাস্থ্য। তাদের মধ্যে কে যে বেশী সুন্দরী তা বাছাই করা একেবারেই অসম্ভব ছিলো।

প্রথম মেয়েটি ফর্সা, দ্বিতীয়টি বাদামী; তৃতীয় মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী—একটু মোটাই বলা যায়; চতুর্থ জনের চেহারা একাহারা। পঞ্চম জনের গায়ের রঙ পীতাভ বা সোনালি। ষষ্ঠজনের গায়ের রঙ আবলুস কাঠের মত কালো। বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহিত্য-কলা, সঙ্গীত-নৃত্য—কোন বিষয়েই কম যায় না কেউ।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেলো।

তিনশো বত্রিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ ঃ

আদর করে আলী সাহেব ছ'টি মেয়েকে ছ'টি নামে ডাকতেন। ফর্সা মেয়েটির নাম ছিলো বদরুন্নেসা (চন্দ্রমুখী), বাদামী রঙের মেয়েটির নাম ছিলো শোলা (বহ্নিশিখা), স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির নাম হচ্ছে বদর-এ-কামিল (পূর্ণিমা) পাতলা মেয়েটির নাম বেহেস্তের হুরী, পীতাভটির নাম মেহেরুন্নিসা (সূর্যমুখী), আর কৃষ্ণাঙ্গিনীটির নাম কাজল।

কিছুদিনের মধ্যেই বাগদাদের সব কিছুই আলীর ভালো লাগতে শুরু করলো। অবশ্য ভালো লাগার কথাই। তখন দুনিয়াজোড়া বাগদাদের নাম। আকাশই বলুন, বাতাস-ই বলুন, আর খানাপিনাই বলুন—বাগদাদের সব কিছুই সুন্দর, চিত্তাকর্ষক। একদিন সকালে আলী সাহেবের মেজাজটা খুব ভালো ছিলো। গল্প করার জন্যে তাঁর মেয়েদের ডেকে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে মেয়েরা পান ভোজন করবে, করবে নানান রঙ্গতামাসা নাচে-গানে তারা মাতিয়ে রাখবে সাহেবকে।

যথারীতি হাজির হলো মেয়েরা। শুরু হলো হাসি ঠাট্টা, রঙ তামাসা, গল্পগুজব। দুনিয়ায় হেন জিনিস নেই যা বাদ পড়লো। অনেকক্ষণ এইভাবে চলার পরে আলী সাহেবের মেজাজ আরও সরিফ হয়ে গেলো। খুশীতে ভরে উঠলো মেয়েদের মনও। রঙ-তামাসার ফোয়ারা উঠলো চারপাশে। ঢল-ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। হাসতে-হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো।

এমন সময় আলী সাহেব এক পেয়ালা সরাব নিয়ে বদরুন্নেসার কাছে গিয়ে বললেন ঃ সুন্দরী, তোমার গানে তো মধু ঝরে। তোমার সেই সুরেলা কণ্ঠে মজাদার একটা গান শোনাও না আমাদের।

জাঁহাপনার মর্জি। —এই বলে বীণা হাতে তুলে নেয় মেয়েটি। ধীরে-ধীরে ঝঙ্কার ওঠে বীণার তারে; মিঠে সুরেলা ঝঙ্কার। —সুরের সেই আবেশে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ; নিষ্প্রাণ পাথরের বুকেও বুঝি বা জীবনের স্পন্দন জেগে ওঠে। ঝঙ্কারের সঙ্গে তাল দিয়ে গাছপালারাও বুঝিবা নেচে-নেচে ওঠে। বীণার সুরের সঙ্গে তাল মিশিয়ে গান ধরলো বদরুন্নেসা ঃ

আগুনের প্রলেপ দিয়ে আমার চোখে
প্রিয়তমের রূপটি আছে আঁকা।
আমার জাফরানী এই বুকের মাঝে
তার ছবি আছে গাঁথা।
আমার চোখের সুমুখ থেকে
যায় যদি সে চলে,
আমি তখন থাকব চেয়ে
আমার হৃদয় তলে।
আবার যদি সামনে থাকে মোর
(আমি) থাকব তখন আঁখির নেশায় ভোর।

গান শেষ হলো; কিন্তু রেশ আর কাটে না তার। আলী সাহেব তো খুব খুশী। সরাবের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে আদর করে এগিয়ে দিলেন মেয়েটির দিকে। পেয়ালা নিঃশেষ করে মেয়েটি তাঁর হাতে সেটি ফিরিয়ে দিলো কুর্নিশ করে। পেয়ালাটি দ্বিতীয়বার পূর্ণ করে বাদামী রঙের মেয়েটির কাছে গিয়ে তিনি বললেন—শোলা সুন্দরি গানের গলা তো তোমার খাসা। উচ্চারণও বড় সুন্দর। তোমার গান শুনলে মানুষের সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যায়। তোমার মনের মতে করে শোনাও না আমাদের একখানা গান।

যথা আজ্ঞা, জাঁহাপনা। —এই বলে বীণা তুলে নিলো মেয়েটি। করুণ সুরে বাজালো প্রথমে। সুরের আর্তিতে ভরে গেলো চারপাশ। সেই সুর হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে ঘুমন্ত বেদনার ঢেউকে জাগিয়ে তুললো। তার উদ্বেল তরঙ্গগুলি কল্পনার তটপ্রান্তে আছাড় খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। তারপর ধীরে ধীরে গান করতে লাগলো। সুরের মৃদু আলাপের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটিও কাঁপতে লাগলো তালে-তালে ঃ

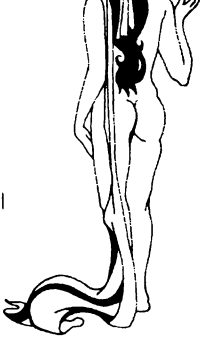

আমার প্রিয়তমের মুখটি রাঙা
গোলাপ ফুলের মত।
তার কাছেতে শিখছে বসে
রূপবিলাসী যত।
যে সব হতভাগ্য নারী
কাজ করে যায় অবিরত
আল্লা তাদের আদর করে
জুড়িয়ে দিলেন মনের ক্ষত।
তাদের হাতে তুলে দিলেন
মানুষ ধরার ফাঁদ।
বিশ্বে তো এর নেইক জোড়া
তাইতো পরমাদ।

কী সুন্দর গান! হৃদয়টাকে একেবারে তরল করে দেয়। আলী সাহেবও খুশীতে ডগমগ। হাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সোহাগ করে মেয়েটির হাতে সেটি তুলে দিলেন। মেয়েটি কুর্নিশ করে পেয়ালাটা নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ফেললো। আলী আবার পেয়ালা ভরে নিয়ে স্থূলাঙ্গিনীর কাছে গিয়ে বললেন—ও বদর-এ কামিল, তোমার বপুটি কিঞ্চিৎ স্থূল। তাতে হয়েছে কী? সোজা সরল, মিষ্টি ব্যবহারে তোমার জুড়িদার নেই। তুমি যেমন সোজা, সেই রকম একখানা গান আমাদের শোনাও দেখি।

এই শুনে মেয়েটি বীণা তুলে নিলো হাতে। ধীরে-ধীরে বাজাতে লাগলো বীণা। এমন বাজনা যার সুরে পাষাণ হৃদয়ও গলে যায়। প্রথমে গুনগুন করে শুরু করে তারপরে আসল গানটি ধরলো ঃ

একটি হাসির তরে আমি বিশ্ব দিতে পারি,
যদি আমি ভাঙতে পারি তোমার জুরিজারি।
তোমার মুখে একটি কথা শুনতে যদি পাই,
মাটির পরে হাঁটবে রাজা অন্যাথা তার নাই।
রাজাদের সব টুটবে মুখের বাঁধ,
তোমার যদি হাঁটার জাগে সাধ।
খুশ করতে পারলে তোমায়
থাকব তোমার পায়ের তলায়;
তোমায় যদি হারাতে হয় ভাসব আঁখি লোরে।
বিশ্বটাকে ছাড়তে পারি একটি চুমুর তরে।

এবারেও আলী সাহেব খুব খুশী হলেন। ঠোঁট দিয়ে সরাবের পেয়ালা ভিজিয়ে এগিয়ে দিলেন মেয়েটির কাছে। সরাবের পেয়ালা গ্রহণ করলো মেয়েটি। পেয়ালাটা আবার পূর্ণ করে নিলেন তিনি। পাতলা মেয়েটির কাছে গিয়ে বললেন—ওগো বেহেস্তের হুরি, তোমার পরিচয় তো তোমার নামেই। বীণার তারে সুর তুলে আমাদের একটা গান শোনাও দেখি।

জাঁহাপনার যা আদেশ—এই বলে বীণাটি হাতে তুলে নিলো সে।

তারপরে গান ধরলো—

আমার প্রেম সে তুচ্ছ করে
এর যে আমি বিচার চাই।
প্রেম করে যে ভুল করেছি, তার
জরিমানা লক্ষ হাজার
দেওয়ার মত জজটি কোথায় পাই।
সওয়াল শেষ হওয়ার পরে
উদাসীনতার তরে
ফরিয়াদী ডিক্রী পাবে
এমন জজ যে চাই।

গান তো নয়—একেবারে সুরের ঝর্ণা। সেই ঝর্ণার তালে-তালে পায়ের নূপুর বেজে চলেছে ঠুন-ঠুন করে। আলী সাহেব বেজায় খুশী—একেবারে বেহেড হয়ে গেলেন। আমেজটা একটু থিতিয়ে এলে হাতের পেয়ালাটায় একটু ঠোঁট দিয়ে মেয়েটির হাতে সেটি তুলে দিলেন। মেয়েটিও কুর্নিশ করে সেটি নিঃশেষ করে ফেললো শূন্য পেয়ালাটি আবার ভরিয়ে নিয়ে সোনালি রঙের মেয়েটির সামনে এগিয়ে গেলেন আলী সাহেব।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে দিলো শাহরাজাদ।

তিনশ তেত্রিশতম রজনী ঃ

সরাবের পেয়ালাখানি হাতে নিয়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে আলী সাহেব বললেন—মেহেরুন্নেসা, কী সুন্দর রঙ তোমার। গলানো সোনার রঙ-ও তোমার ওই রঙের কাছে কিছু নয়। তুমি একখানা প্রেমের গান শোনাও দেখি। যে প্রেমের কাছে মানুষ নিজের জীবনকেও তুচ্ছ বলে মনে করে। যার কাছে জগত-সংসার-ও অসার। এই রকম একটা গান গাও।

আলী সাহেবের আদেশে কুর্নিশ করে বীণাটা তুলে নেয় মেহেরুন্নেসা। বেহাগের সুর ধরে, সঙ্গে তার কণ্ঠ মেলায়। ছন্দের তালে-তালে নেচে ওঠে তার কটি দেশ, হিল্লোল জেগে ওঠে তার শিরায় শিরায়, অঙ্গের লাবনিতে। ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে গানের কলি ঃ

তার চোখ থেকে যে ছিটকে এলো, ভ্রমর কালো
হুল বেঁধানো বিষম বাঁকা শর।
নিবিয়ে দিলো আমার চোখের রঙিন যত আলো
তখন বলি হৃদয়টারে আহত জর্জর
'হায় অভাগা হৃদয় আমার শোনো,
বিষের ক্ষতে ভুগছ তুমি জেনো।
কোথায় তুমি দাওয়াই পাবে বল?
বৃথাই তোমার ঝরবে আঁখিজল।'
তবু যদি হৃদয় কিছু বলে
তারে আমি শুনতে নাহি পাই;
কেমন করে শুনব বল
হৃদয় সেথায় নাই।
সে যে আজ হারিয়ে গেছে
পথের ধূলির মাঝে—
কামনার ফাঁস পরেছে
লাগবে কী আর কাজে।

হৃদয়ের নিভৃত কন্দরের রুদ্ধ দরজায় আঘাত করলো মেয়েটি, জাগিয়ে তুললো সুপ্ত বেদনার আর্তিকে। কেমন যেন উদাস হয়ে গেলো আলী সাহেবের মনটিও। সরাবের পেয়ালায় ঠোঁট দিয়ে তিনি সেটি এগিয়ে দিলেন মেয়েটির দিকে। কৃতজ্ঞচিত্তে মেয়েটি তা গ্রহণ করলো। সুরাপাত্র আবার পূর্ণ করে এগিয়ে গেলেন তিনি কৃষ্ণাঙ্গীর কাছে, বললেন—চোখের নীল অঞ্জন তুমি। চেহারাটা কৃষ্ণ ভ্রমর হলে কি হবে? মনটা তোমার বরফের মত সাদা। তোমাকে দেখলে আল্লাহর পরম করুণার কথা মনে পড়ে যায়। এ-দুনিয়ার ব্যথাবেদনার যেন প্রতীক তুমি! তোমার মুখের দিকে তাকালে জীবনের সব দুঃখ, ব্যথা আর বেদনার কথা আমি ভুলে যাই। মনটা যে তোমার গোলাপের মত সুগন্ধী। তোমার মনের মত একটা গান শোনাও না আমাদের।

মাথা নিচু করে প্রভুর নির্দেশে মেয়েটি বীণা তুলে নিলো হাতে।

বীণার তারে সুরের ফুলঝুরি ছড়িয়ে পড়লো। দুঃখের সুরে কতখানি মাদকতা রয়েছে আলী সাহেব তা যেন বুঝতে পারলেন। বিভিন্ন সুরের আমেজে মুগ্ধ হয়ে উঠলো সবাই। তারপরে মেয়েটি তার সেই প্রিয় গানখানি গাইলো ঃ

আমাদের প্রেমের যে স্বর্ণ শিখা জ্বলছে তার জন্য
শোক কর; কারণ আমার প্রেমিক অন্য
নারীদের প্রীতির চোখে দেখে। কিন্তু গোলাপকে
ভালোবাসতে তোমরা বাধা দিয়ো না আমাকে।

যে হৃদয় গোলাপের স্বপ্নে মাতোয়ারা হায়,
তাকে নিয়ে কী কাজ হবে দুনিয়ায়!
আমার সামনে কুড়িটি পেয়ালা সাজানো
সেগুলি সব সরাব দিয়ে ভরানো
আর রয়েছে কেবল চুমু খাওয়ার জন্য
একটি পুরানো গিটার, আমার প্রিয়তম সে-ই;
কিন্তু আমার কাছে কোন সুগন্ধী নির্যাস নেই।
আমার গোলাপগুলি সোনালি আগুন হয়ে উঠেছে
কিন্তু আরো অনেক অনেক ফুল ফুটেছে
তারা হয়নিক হতমান,
এবং স্বর্গে চিরবসন্ত বিরাজমান।
ভগবান, যাকে সবাই ভালোবাসে, তাকে
ভালোবাসা কি অপরাধ বলে গণ্য হয়ে থাকে!

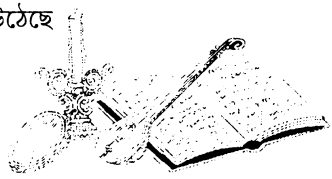

এমন সুন্দর গান অনেকদিন শোনেননি আলী সাহেব। মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেলো তাঁর। সরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে এগিয়ে দেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটি এক চুমুকে পেয়ালাটি উজাড় করে দিলো।

এবার ছ'জনেই উঠে এসে আলী সাহেবকে কুর্নিশ করে মাটিতে চুম্বন করলো। মেয়েরা জানতে চাইলো কার গান তাঁর সব চেয়ে ভালো লেগেছে। গানের সুরই বা কার ভালো, বীণার ঝংকারই বা কার সব চাইতে ভালো?

আলী সাহেব তো মহা ফাঁপরে পড়লেন! এ-সমস্যার সমাধান তিনি কেমন করে করবেন? রাখবেন কাকে, কাকে ফেলবেন? প্রত্যেকেরই গান, সুর, ঝংকার এত সুন্দর হয়েছে, প্রত্যেকেরই দেহ-হিল্লোল এত অনবদ্য হয়েছে যে তাদের আলাদা করে বিচার করাটা কেবল কষ্টকরই নয়, একেবারে অসম্ভব।

তবু যখন সমস্যা একটা উঠেছে তার সমাধানের একটা চেষ্টা করা উচিৎ। সেই সৎচেষ্টাতেই তিনি চোখ দুটি বুজিয়ে প্রতিটি গান আলাদা আলাদা করে ভাবার চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকার পরে অপ্রত্যয়ের ঘাড় নাড়লেন তিনি। এ অসম্ভব, এ অসম্ভব। কারোও কোন খুঁৎ নেই; কেউ কিছু কম যায় না।

আলী সাহেব বললেন—আল্লাহকে ধন্যবাদ, তোমাদের মত গুণবতী মেয়েদের আমি পেয়েছি। এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। তোমরা আমার গর্ব। আমি সাচ্চা কথাই বলছি, তোমাদের আমি সমানভাবে ভালোবাসি। আমি তোমাদের কাউকেই আলাদা করে দেখতে পারব না। তার চেয়ে তোমরা আমার কাছে এসো। সবাই মিলে আমাকে আঁদর কর।

যে কথা সেই কাজ। ছ'টি মেয়েই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো আলী সাহেবের বুকে। নানানভাবে সোহাগে-আদরে ভরিয়ে তুললো তাঁকে।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর আলী সবাইকে গোল করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। নিজে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন—সোহাগীরা তোমাদের মধ্যে থেকে একজনকে শ্রেষ্ঠ বলে বেছে নেওয়ার সাধ্য আমার নেই। আর সে-চেষ্টা করাও আমার পক্ষে উচিৎ হবে না। তাতে সুবিচার হবে না, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে সেটা বিচার করার ভার আমি তোমাদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। তোমরা সকলে নিশ্চয় কোরান পড়েছ। ভালোভাবেই পড়েছ; সেই সঙ্গে অন্য পড়াশুনাও তোমাদের কম নেই। পুরানো ইতিহাস বা পিতৃপুরুষদের নানান কাহিনীও তোমাদের জানা রয়েছে ভালো করেই। আমি দুজন-দুজন করে ঠিক করে দেব।

একজন নিজের গুণপনা আর রূপের কথা বলবে। যত সুন্দর করে পার বলবে। তোমার বিরোধী যে থাকবে সে সঙ্গে সঙ্গে তোমার বক্তব্য খন্ডন করবে। অর্থাৎ, তুমি যাকে উত্তম বলবে সে সেটাকে নিকৃষ্ট বলে প্রতিপন্ন করবে। এইভাবে তিনটি জোড় হবে তোমাদের। বিতর্ক চলবে দু'জনের মধ্যে, প্রথমে ফরসা আর কালো বাঁদী, তারপরে পাতলা আর মোটা; শেষকালে সোনালী আর বাদামী। হ্যাঁ; এই সঙ্গে একটা কথা বলে দিই। তর্ক চলার সময় আজেবাজে কথা বলবে না; ব্যবহার করবে না অশ্লীল কোন শব্দ। ভালো-ভালো কথা বলবে। প্রয়োজন মনে করলে জ্ঞানী লোকের বা নামকরা কবির উদ্ধৃতি দিতে পার।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামাল।

তিনশো চৌত্রিশতম রজনী ঃ

পরের দিন দুপুর রাতে যথারীতি গল্প শুরু করলো শাহরাজাদ।

বাঁদীরা সকলেই এক সঙ্গে রাজি হয়ে গেলো। বিতর্কের শর্ত অনুযায়ী প্রথম জুড়িটি বলতে উঠলো—ফরসা আর কালো বাঁদী। বদরুন্নেসা সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কাজলের। চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বদরুন্নেসাই শুরু করলো প্রথম ঃ

আরে কালো মেয়েটা, সাদা বা ফরসা রঙ নিয়ে জ্ঞানীরা কী বলছেন শোনো তাহলে, বলছেন—আলো সাদা, চাঁদের আলো সাদা, আর সাদা হচ্ছে বীর্যবান পুরুষ। ভাগ্য ভালো হলে ফরসা মানুষের কপাল চকচক করে। তাই বোধ হয় সেই বিখ্যাত কবি আমার জন্যেই বলেছেন—

সৃষ্টি করার সময় মেয়েটিকে
ভগবান মুক্তার ফেনা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন।
তারপরে শিশিরে মেদিগাছ ভিজিয়ে
তৈরি করেছিলেন তার অপরূপ তনূ।
সেই সঙ্গে সাদা গোলাপও নিয়েছিলেন কিছু;
কিন্তু শেষ কালে আরও কিছু তিনি যোগ করেছিলেন—
সেগুলি হলো তাঁর উজ্জ্বল বাগান, আর
তার সঙ্গে দোদুল্যমান পান্থপাদপ।

কবিতাটি শেষ করে বদরুন্নেসা বললো—এই শেষ নয়। আরও, আরও আছে শোনো। দিনের আলো সাদা, কমলা ফুল সাদা, আর সাদা ভোরের শুকতারা।

এবারে শোনো এই সাদা নিয়ে কোরাণে কী বলেছে। একবার মুসার হাতে কুষ্ঠরোগ হলো। আল্লাহ মুশাকে বললেন—তোমার হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে দাও; সঙ্গে সঙ্গে হাতটা সাদা হয়ে যাবে। পবিত্র হবে হাত। যা ক্ষয়ে গিয়েছিলো তা উঠবে ভরে।

আমাদের ধর্মগ্রন্থে বলেছে—যাদের মুখ ফরসা, যাদের মুখ পোড় খায়নি, আল্লাহ কেবল তাদেরই করুণা করেন।

সব রঙের রানী হলো আমার গায়ের রঙ। সেই রঙেই আমার রূপের জলুস, আর সেই রূপেই আমার রঙ খোলতাই।

দামি-দামি পোশাক আর দামি-দামি অলঙ্কার কাদের গায়ে মানায় জানিস? আমার মত গায়ের রঙ যাদের তাদের। এসব কথা কে না জানে?

ওই যে বেহেস্তের বরফ যা এই দুনিয়ার বুকে নেমে এসেছে তার রঙও সাদা। ধার্মিকরা যে ফেজ পরেন তার রঙও সাদা। এ-রঙ রঙ-তামাসা করার বস্তু নয়।

আমার রঙ নিয়ে আর কত বলব? এ-দুনিয়ায় যত ভালো-ভালো কথা রয়েছে

আমাকে বাদ দিলে তাদের একটা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আমার ফর্সা রঙ সূর্যের আলোর মত সত্য। তাই আমাকে নিয়ে আর কিছু বলছি নে। এবার তোর ওই পোড়া রঙ নিয়ে কিছু বলব। ওরে কালো, শ্মশানের কাক। দোয়াতের কালি, ঘরে যে ঝুল পড়ে তার রঙও তো কালো! কালো কাকের রঙ। কিন্তু কাক কি ভালো গান গাইতে পারে?

একজন কবি এই সাদা-কালো নিয়ে কী সুন্দর কবিতাই না একটা লিখেছেন। মন দিয়ে শোনো ঃ

বন্দী রাজার অর্থ দিয়ে একটি তারা মুক্তা কিনে।
কিন্তু এক বস্তা কয়লা বেচে একটি শিলিঙ দামে;
সাদা মুখ আর সাদা পাখায় স্বর্গটাকে নাও চিনে,
নইলে স্বর্গ থাকত নাক—শুধু নামে।
তোমরা যদি রাজি থাক—বলতে পারি সত্যি কথাটাই
নরক আমরা যাকে বলি সেত শুধু কালোতে বোঝাই।

ধার্মিক নোওয়ার একটা গল্প বলি শোনো। তার দুই ছেলে—সাম ও হাম। ছেলে দুটিকে পাশে বসিয়ে একদিন তিনি ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় নোওয়ার কাপড় গেলো উঠে। পুরুষাঙ্গ বেরিয়ে পড়েছে দেখে খুব হাসতে লাগলো হাম। মানুষের ইতিহাসে নোওয়া হলেন দ্বিতীয় পুরুষ। তাঁর সেই বিচিত্র জীবনের গৌরব কাহিনী কে না জানে? সাম কিন্তু হাসেনি। বাবার ধর্ম, বাবার গৌরব যে কত বড় তার কিছু কিছু সে জানত। কোন কথা না বলে চুপচাপ উঠে সে তাঁর কাপড়টা ঠিক করে গুছিয়ে দিলো। ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙে গেলো তাঁর। জেগে উঠে হামকে হাসতে দেখে তিনি তাকে অভিশাপ দিলেন। সামের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হামের মুখ কালো হয়ে গেলো; সাদা হয়ে গেলো সামের মুখের রঙ। সামের বংশধররা হলেন ঋষি, ধর্মপ্রচারক, পুরোহিত, আর রাজারা। আর অভিশপ্ত হাম কী করলো জান? ওই কালো মুখ পাছে কেউ দেখতে পায় এই ভয়ে সে সংসার ছেড়ে পালিয়ে গেলো। তার বংশে জন্ম নিলো সুদানের কালো কুচ্ছিৎ নিগ্রোরা। এদের বংশে আজ পর্যন্ত কোন সাধু-সন্ত, পয়মন্ত, অথবা দেবদূত জন্মাননি। এ-কথা কেবল জ্ঞানীগুণীরাই নয়, সাধারণ মানুষও জানে।

আলী সাহেব বদরুন্নেসাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি এবার চুপ কর। এবারে কাজল বলবে।

কাজল এতক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিলো। এবারে সে বদরুন্নেসার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো—তুই কিছুই জানিস নে। কিছু বুঝিসই না তা বলবি কী করে? কোরাণে কী বলেছে শোনো ঃ পরমেশ্বর আল্লাহ শপথ নিতেন গভীর রাতে। দুপুর বেলাতেও যে নিতেন না সে কথা ঠিক নয়। তবে মাঝ রাতটাকেই তিনি পছন্দ করতেন বেশী। তা বাপু হে, মাঝরাতটা কি সাদা, না কালো? ভালো করে মাথাটা খাটিয়ে ভেবে দেখ।

এবার বলি কালো চুলের কথা। কালো চুল কীসের প্রতীক বলো দেখি? বলতে পারলি নে? শোনো তবে। কালো চুল হলো যৌবনর প্রতীক। বার্ধক্যের প্রতীক সাদা চুল। বার্ধক্যেই ভোগ-বাসনা- কামনার শেষ। এক কথায় পূর্ণচ্ছেদও বলতে পারিস।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো পঁয়ত্রিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে গল্প বলতে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ।

কাজল বললো—কালো যদি রঙের রাজাই না হবে, তো আল্লাহ কেন চোখের মণি আর কলিজার রঙ কালো করেছেন বলো? কোন এক কবি কী সুন্দর কথাই না বলেছেন ঃ

কৃষ্ণবর্ণ দেহের মাঝে আগুন ভরা আছে।
কৃষ্ণ কালো শিরায়-শিরায় ভোগ-বাসনা নাচে।
কালো দেহে উপছে ওঠে যৌবন চঞ্চল।
হে বিধাতা, রক্ষা কর, ফেলছি আঁখি জল
ডিমের খোলা নিয়ে আমার বাঁচার ইচ্ছা নাই।
খোলটাকে ভালোবাসা সেইত বিপর্যয়। তাই
সেই খোলস নিয়ে বাঁচার কথা ভাবতে গেলে হায়
আমার বাঁচাই হবে দায়।
সত্যি আমি দেখতে নারি মৃতের সাদা ঢাকনা;
পক্ককেশীর ভালোবাসা, সে তো কবরখানার কান্না।

এই প্রসঙ্গে আরও একজন কবি কী বলেছেন শোনো ঃ

অমন করে চাইছ কেন? ভাবছ বুঝি কী জঞ্জাল!
কালো মেয়ের অন্বেষণে বুদ্ধি আমার উধাও হলো নারে!
ডাক্তারেরা, বলছি শোনো, বলছে চিরকাল
কালো চিন্তা বুদ্ধিমানে, পাগল করে ছাড়ে।

আরও রয়েছে। শুনবে? শোনো তাহলে ঃ

দুপুর রোদে কোনদিনই কাউকে আমি ভালোবাসিনি
শ্বেতীর মত সাদা মেয়েদের আমি ঘৃণা করি
ওরাসব বস্তাপচা ময়দার মত।
ওদের ভালোবেসে কোন ফয়দা নেই।
এক ঘণ্টার বেশী ওদের সঙ্গে প্রেম করা যায় না।
কালো মেয়েদেরই আমি ভালোবাসি বেশী
সেখানে কোন রাত্রির বালাই নেই
চাঁদ থাকবে কেমন করে?

খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এক জায়গায় কখন জড় হয়? রাত্রিতে। প্রেমিক-প্রেমিকারা কাকে খুঁজে বেড়ায়? ছায়াকে কেন বলতো? কারণ, ছায়ার রঙ কালো। রাত্রির অন্ধকার ডানা মেলে ওদের ঢাকা দিয়ে রাখে যাতে দিনের আলো তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে। দিনের আলোতে ওসব হলে তো তুই-ই ঢাক নিয়ে বেরিয়ে পড়বি। ফুলশয্যা শেষ হয়ে গেলে দম্পতীরা কী বলে আক্ষেপ করে বলো দেখি। বলে, হায়রে, এত তাড়াতাড়ি রাত পুইয়ে গেলো? কেন বলে? বলে এই জন্যে যে রাতকে তারা পছন্দ করে, ভালোবাসে। কালো যে কত ভালো তার প্রমাণ কি আরও চাও? একটা বয়েৎ শোনো ঃ

সাদায়-কালোয় মেশা ছেলে যত
চর্বি খেয়ে বেঁচে থাকে যারা
তাদের আমি ভালোবাসি নাত।
একটা কালো ছেলে যার অঙ্গ দোহারা
সত্যি কথা বলছি—সেত
ওদের বিশজনদের মত।
অর্থাৎ? মনের কথা বলছি আমি বলে
তুমি অবাক হলে?
কালো ঘোড়া জোরসে ছুটে চড়তে ভালোবাসি।
সাদা খোঁড়া হাতি যত বুড়োর জন্যে রাখি।

আরও একটা শুনবে? বহুৎ আচ্ছা, শোনো ঃ

কালো রাতই চুমু খাওয়ার শয্যা।
সাদা সকাল সেত দারুণ লজ্জা।
আমার যদি চেয়ে নেওয়ার থাকত অধিকার,
আমি কালো রাতই চেয়ে নিতাম সন্দেহ নেই তার।
বিধির কাছে আর্জি দিতাম—এ জীবনে যত আছে আলো
সবই যেন ভরিয়ে দে'যায় নিতল ঘন কালো।

ওরে, সাদা, কালোর প্রশংসা আর বেশী করব? রঙের জগতে কালোই একমাত্র সাঁচ্চা; বাকি স-ব কাঁচা। ব্যস—এইখানেই শেষ। যা বলেছি এই যথেষ্ট। কথায় বলে না, অল্প কথায় যুক্তি বেশী। কালোর প্রশংসা শেষ করে এবারে শুরু করছি তোর কথা। পুরুষকে আমি যতখানি টানতে পারি তুই ততটা পারিস নে। তোর অঙ্গটা একেবারে খেলো—এলোমেলো-ও বলতে পারিস। তোর সাদা রঙটাত কুষ্ঠর মত একটা দুষ্ট রোগ। কী বিশ্রী গন্ধ বলত—একথা সবাই জানে। একটু আগে নিজেকে তুই বরফের সঙ্গে তুলনা করেছিলি না? তাহলে শোন। দোজখের নাম শুনেছিস তো? সেখানে পাপীদের ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলার জন্যে বরফ জমিয়ে রাখা হয়। ঠাণ্ডা বলে ঠাণ্ডা! আগুনের চেয়েও সাংঘাতিক। আর তার রঙটা হচ্ছে বরফের মত সাদা। প্রেমিক-প্রেমিকা তাই বরফটাকে বরবাদ করে দিয়েছে। তার চায় উম্। তুই আমাকে লেখার কালির সঙ্গে তুলনা করেছিলি তাই না? আল্লাহর কিতাব কীসে লেখা হয়েছে রে? এই কালো কালিতেই। মৃগানাভির গুণ কী জানিস তো? তার রঙটা কী? কালো। তাইত কবি বলেন ঃ

সবার সেরা মৃগনাভী রঙটা তার কালো
পচা নাসপতি হলো সাদা
আমার চোখে কালো মেয়ে সবার চেয়ে ভালো
অন্য সবাই জীবন-পথে বাধা।
কালো চোখের মণি দিয়ে দেখতে তুমি পাও।
অন্ধ জনের সাদা চোখে সমস্ত উধাও।

ব্যস...ব্যস! দারুণ বলেছ তোমরা। তোমাদের তারিফ না করে পারছিনে—বললেন আলী সাহেব—তোমাদের বিতর্ক খুব ভালো হয়েছে। এবারে দ্বিতীয় দল এগিয়ে এসো।

এই কথা শুনে কালো আর ফরসা মেয়ে নিজেদের জায়গায় ফিরে গেলো। এগিয়ে এলো মোটা আর পাতলা মেয়ে।

আলী সাহেবের নির্দেশে প্রথমে শুরু করলো মোটা মেয়ে বদর-এ-কামিল। শুরু করার আগেই সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। জামা খুললো, বসন খুললো। একটা একটা করে সব খুলে ফেলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে গেলো। ঘুরে-ঘুরে দেখালো তার প্রতিটি অঙ্গ। দেখাল কবজি, পায়ের গোড়ালি। দেখাল উরু আর পায়ের গোছা; উদ্ধত কুচযুগের নিচে সুন্দর রেখায় তার উদরটি অঙ্কিত রয়েছে সেটি দেখালো। দেখাল পরিপুষ্ট পরিসরমর্দন কুচযুগল; গুরুভার নিতম্ব দেখাল। অবশ্য সেমিজে ঢাকা ছিলো সব; কিন্তু সে নামকে ওয়াস্তে। ফিনফিনে পাতলা সেমিজ ভেদ করে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সেই ঠুনকো আবরণ তার উদ্ধত যৌবনকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছিলো না। বিলোল কটাক্ষে নগ্ন দেহে মৃদুকম্পন তুলে সে আলী সাহেবের কামনার আগুনে ধূনা ছিটিয়ে দিলো যেন; তারপরে পাতলা মেয়েটির সামনে গিয়ে বললো—

শেষ হয়ে এলো রাত। শাহরাজাদ থামালো তার গল্প।

তিনশো ছত্রিশতম রজনী ঃ

পরদিন রাত্রিতে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ ঃ

বদর-এ-কামিল বেহেস্তের হুরীর সামনে কোমরে হাত দিয়ে চোখ নামিয়ে বললো—আল্লাহর মেহেরবানীতে গুহা-পাহাড়-পর্বত এ-দুনিয়ার সর্বত্র নরম গালিচা পাতা। নরম তুলতুলে জিনিস বড়ই পছন্দ করেন তিনি। আমার গায়ে এই যে চর্বি দেখছো এই নরম তুলতুলে জিনিসটিও সে-ই আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর দয়ায় আমার শরীরে তাই পদ্মগন্ধ, মধুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। আমার গায়ে প্রচুর মাংসও দিয়েছেন তিনিই, দিয়েছেন প্রচুর শক্তি। এক ঘুষিতে শত্রুকে আমি মাটিতে পাট করে ফেলে একেবারে লোপাট করে দিতে পারি। সে তাগদ আমার রয়েছে।

ওরে রোগা-প্যাটকা মেয়ে, তালপাতার সেপাই—বিজ্ঞ মানুষেরা এ বিষয়ে কী বলেন তা আমার কাছ থেকে শোনো ঃ আনন্দ বলতে জীবনে তিনটি জিনিসে রয়েছে। সেই তিনটি জিনিস হলো— মাংস খাও, মাংসের ওপরে চড়, আর মাংস নিয়ে খেলা কর।

কথাটা ঠিক। স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের দেখলে কার না ভালো লাগে! চড়াই-উৎরাই দেখে কেউ কি মুখ ফেরায়? আমাদের আল্লাহ নরম চর্বি কত ভালোবাসেন জানিস? সেই জন্যেই তো তিনি হৃষ্টপুষ্ট মেদহবহুল মেষশাবক আর বাছুরকে কোরবানি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

জামাকাপড় খুলে প্রকৃতির পোশাকে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার দিকে একবার নয়ন মেলে তাকা। এ যেন প্রকৃতির সাজানো একটা বাগান। বুকে ধরেছে ডালিম, গালে ধরেছে লাল পিচফল, আর আমার কোমরের নিচে ধরেছে তরমুজ।

ইজরাইল ছেড়ে মিশরে উড়ে গিয়েছে তিতির পাখি। সেই থেকে ইজরাইলের ছেলেমেয়েরা আর তিতিরের মাংস খেতে পায় না। কী দুঃখ তাদের? তা খুকুমনি, এই তিতিরের মাংস কতটা হয় তা জান? আর খেতে কত সুস্বাদু সে সম্বন্ধেও কি জ্ঞান রয়েছে তোমার? অত মাংস ওর গায়ে রয়েছে বলেই না ওর এত কদর?

মাংসের দোকানে গিয়ে মাংস বাদ দিয়ে হাড় কিনতে কাউকে দেখেছ কোনদিন? না, কোনদিন সেই তাজ্জব ব্যাপার তুমি শুনেছ? মাংসের দোকানদার তার ভালো-ভালো খদ্দেরদের জন্যে লুকিয়ে রাখে রান আর গর্দানের মাংস। সে কি এমনি এমনি?

আমার মত কোন স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে দেখেই কবি বলেছেন ঃ

দেখ দেখ ধনি তার হাঁটার লাবনী।
গুরু নিতম্বভারে তার কাঁপিছে মেদিনী।
পরনে বিদরে মোর চকিত-নয়নী।
দেখ ওই বিশ্রামিছে চতুরা ভামিনী।
মূর্তিমতী কামনার রানী।
দেখ দেখ নাচত ও বররঙ্গিনী
বঙ্কিম নয়নে তার ক্ষণে-ক্ষণে ছুটত দামিনী,
জঙ্ঘা কাঁপিছে তার
কাঁপে হৃদি বসুধার
হৃদয় ভরলো আজ জীবন সফল বলে মানি।

আর তোর চেহারাটা দেখ একবার! একেবারে বসানো দাঁড়কাক। কাকের মত সরু সরু পা, লোহার শিকের মত উরু তোর! তোর বুক দেখে কার সুখ হয় বলতে পারিস? কী শক্ত তোর দেহের হাড়! ভুল করে কোন পুরুষ তোকে জড়িয়ে ধরলে, খোদার কসম সে জখম হতে

বাধ্য। তোর মত মেয়েকে দেখেই কবি বলেছেন ঃ

আল্লা করুন, কভু যেন রোগার ঘাড়ে চাপতে না হয়,
রোগা নারী বেশ আনাড়ি তাইত তারে বিষম ভয়।
তাদের বুকে কোথাও যদি এক চিলতে আরাম পাই
ভোর বেলাতে দেখব উঠে শিরায় আমার রক্ত নাই।

আলী হাত তুলে বলেন—ব্যস, ব্যস। আর না বেহেস্তের হুরী এবার তোমার পালা। এবার তুমি জবাব দাও। বেহেস্তের হুরী হচ্ছে ছ'টি মেয়ের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট। মোটা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে সে বলতে শুরু করলো ঃ

আমাকে এই দেহ কে দিয়েছেন জানিস? দিয়েছেন পরম করুণাময় আল্লাহ। তাঁকে আমি শতকোটি সেলাম জানাই। লম্বা ইয়েলো গাছ যখন বাতাসে দোলা খায় সেই অপরূপ দৃশ্য তুই দেখেছিস? তার ডালগুলি কী সুন্দর নাচে বলো দেখি! প্রচণ্ড ঝড়ে বাঁশ যখন মাথা নাচায় তখন কী ভালোই না লাগে! পদ্ম ডাঁটার ওপরে যে ফুল ফোটে তার চেয়ে সুন্দর জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু রয়েছে? ইয়েলো গাছের ডাল, মাতাল বাঁশ, আর পদ্মফুলের ডাঁটা এরা সবাই তো হালকা, পাতলা, আর সরু। নেহাৎ গরু ছাড়া এদের কেউ খারাপ বলতে সাহস করবে? কক্ষনো না।

আমার শরীর হালকা। তাই তাড়াতাড়ি আমি যেমন বলতে পারি তেমনি তাড়াতাড়ি চলতে পারি। হালকা শরীর নিয়ে চলাফেরা করা কত আরামের বলত? আমি হাঁটি সোজা মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে। কচ্ছপের মত থপথপ করে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে হাঁটার অভ্যাস আমার নেই। মোটা লোকদের দেখলেই তাই আমার গা-টা ঘিনঘিন করে।

তাছাড়া, প্রেম নিবেদন করার সময় কোন পুরুষ কি তার প্রেমিকাকে বলে—প্রিয়তমে, তোমার হাতির মত মোটা দেহটা কী সুন্দর! দেখে আর ভালোবেসে আমার জীবন সার্থক হলো! অথবা, তোমার দেহে পর্বতপ্রমাণ এই মেদের স্তূপ দেখে আমি একেবারে বিমোহিত হয়ে গিয়েছি। আমি তোমাকে কত ভালোবাসি! এরকম কথা কোন পুরুষকে বলতে শুনেছিস কখনও?

বরং তারা বলে—তোমার কোমরটি কত সরু, সিংহীর কটিদেশের মত এক বিঘৎ। মুঠোর মধ্যে ধরা যায় তোমাকে। আর কী নরম তুলতুলে তোমার দেহ—মোওয়া ছানার মত। কী সুন্দর হালকা পায়ে ঘুরে বেড়াও তুমি, মনে হচ্ছে যেন পাখির ডানার ওপরে ভর দিয়ে তুমি উড়ে বেড়াচ্ছ। এক টুকরো ধুলো পর্যন্ত পড়ে না তোমার গায়। কত অল্প খাওয়ায় তোমার পেট ভরে। তোমার গালে চুমু খেতে পেলে বেহস্তেও ঘুমোতে আমি রাজি নয়। হে প্রিয়তমে, যখন তুমি আমাকে তোমার ওই দুটি হালকা বাহুলতা দিয়ে জড়িয়ে ধর তখন কী একটি অপূর্ব আবেশে আমার মন ভরে যায়। তুমি চড়াই পাখির চেয়েও চঞ্চল, হরিণীর চেয়েও তুমি প্রাণবন্ত। বাঁশের মত যেমন করে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা তোমাকে বাঁকানো যায়, ভাঙার ভয় থাকে না এতটুকু। আর তোমার হাসি? সে তো তোমার মতই হালকা। আর তোমার শরীরটা হালকা বলেই তো ইচ্ছামত তোমাকে আমার বুকের ওপরে টেনে নিতে পারি। আমার উলঙ্গ হাঁটুর ওপরে, হে আমার প্রিয়তমে, তুমি পশমী চাদর।

ওরে ও ধ্যাবড়া মেয়ে, তোর ওই থ্যাবড়া দেহ কি কোনদিন পুরুষদের মনে আগুন জ্বালাতে পেরেছে? পারেনি, কোনদিন পারেনি। পেরেছে আমাদের মত পাতলা মেয়েরাই। আমাদের মত পাতলা মেয়েরাই পুরুষদের পাগল-ছাগল বানিয়ে দেয়, তাদের নামিয়ে আনে আমাদের পায়ের কাছে। আঙুরলতা যে কঞ্চি জড়িয়ে ওপরে ওঠে পুরুষরাও তেমনি আমাকে জড়িয়ে ফুটতে চায়, আমার সর্বাঙ্গ চুম্বন করতে-করতে তার প্রেম কুসুমকে ফোটাতে থাকে। সজল-নয়না ময়না পাখি আমি। মালিক কি আমাকে বেহস্তের হুরী বলে ফালতুই আদর করেন?

ভোরের পাখি ডেকে উঠলো দেখে থেমে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো সাঁইত্রিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার গল্পের জের টানলো শাহরাজাদ ঃ

বেহেস্তের হুরী বললো—আমার কথা আর তোকে কিছু বলব না। এবার তোর ওই মোটা দেহ নিয়ে গোটা কত কথা বলি। মন দিয়ে শোনো। ওরে ও থলমলে চর্বিওয়ালি, তোর ওই চাতুরালি ছেড়ে সত্যি কথাটা বলো দেখি। তুই যখন হাঁটিস তখন নিজের চেহারাটা কি তুই দেখতে পাস? পাস না। কিন্তু আমরা পাই। তখন তোকে দেখে শোকে আমরা একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। মরি, মরি কী শোভা! হাঁসের মত বিশ্রী ঢঙে পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটিস। দেমাকে একেবারে ফেটে পড়িস। আমরা তো হেসে বাঁচি নে আর। খোরাকটা তোর হাতির মত। যতই মাতামাতি করিস সঙ্গমের সময় কোন পুরুষকে তুই তৃপ্তি দিতে পারিস নে। তোর ওই পাহাড়ের মত উরু আর ভুঁড়ি। ওই তিন পাহাড়ের ফাঁকে গুহার খোঁজ করতে করতে কতগুলি পুরুষাঙ্গ যে দিশেহারা হয়ে পড়ে তা কে বলবে! কোন রকমে খুঁজে পেলেই কি কোন সুরাহা হবে? তোর ওই ভুঁড়ির ঠেলায় তুড়ি দিয়েই সে ছিটকে আসবে বেরিয়ে। তোর কাছে পুরুষ মানুষ আসবে কোন সুখে?

কোন গুণেই বাজারে বিকোবি না তুই। কোন মাংসওয়ালা তোর ওই ওজন দেখে হয়ত তোকে কিনতে পারে; কিন্তু কোন ভদ্দরলোক তোর ধারে ঘেঁষবে না। তোর আত্মাও তোর চেহারার মত থ্যাবড়া। তোর রঙ-তামাশাও তোর ওই শরীরের মতই খাসা। ও বাপু কারুর মাথায় ঢোকার কথা নয়। তোর ওই ফুলো-ফুলো গালে কোন পুরুষই ঠোঁট ছোঁয়াবে না। তোর হাসির চোটে কানের পর্দা যাবে ছিঁড়ে।

তোর হাত তো নয় যেন বাড়ির থাম। ওর ভেতরে কোন প্রেমিকই ধরা দেবে না। তোর নিঃশ্বাসে তো ঝড় বইতে শুরু করে। ওর ধাক্কা কে সহ্য করবে বল? তোর শরীর থেকে সবসময়েই ঘাম ঝরছে। ঘাম তো নয়, একেবারে ফোয়ারা। ধর, কোন লোক তোকে একটু আদর করলো। তুই করবি কী তাকে জড়িয়ে ধরবি। ব্যস! ব্যাচারার জামা-কাপড় সব সপসপে হয়ে যাবে। শুধু কি তাই? তোর তেল-চিটচিটে ঘামের দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে রে, উঠে আসবে।

ঘুমোলে তোর নাক ডাকে ঘড়র....ঘড়র....ঘো-ঙ! নিঃশ্বাস ফেলিস মোষের মত—ভোঁয়োস....ভঁ স। নড়ে বসতেই তুই হাপরের মত হাস-পাস করিস। শুয়ে থাকতেও তোর কষ্ট। শরীরের ওজন যেন তোর ওপরে চেপে বসে। দিন-রাত তোর খিদে লেগেই রয়েছে। কাকের মত মুখ নাড়ছিস হরদম। তুই এত মোটা যে প্রকৃতির ডাকে তুই বেসামাল হয়ে পড়িস। চলার সময় পায়ের তলায় পাপোশ পড়লেই তার দফা একেবারে রফা হয়ে যাবে। স্নান করার সময় শরীরের সব জায়গায় হাত পৌঁছয় না তোর। ফলে, বোটকা গন্ধ ছাড়ে তোর গা থেকে।

সামনে থেকে তোকে দেখতে লাগে হাতির মত; পাশ থেকে তুই উট; আর ভিস্তির মত তোকে দেখতে লাগে পেছন থেকে। এ আমার কথা নয়—কবির কথা ঃ

ওরে ও ধ্যাবড়া মুখী, গ্যাবড়া মুখী এক বস্তা ময়দা হেন,
হাঁটলে পরে তোর পায়ের ভারে ভূমিকম্প হয়রে যেন।
পশ্চিমে তুই নেচে বেড়াস সদ্য যেন ঘূর্ণী বায়ু
প্রাচ্যে হেলা যায় রে বাপু শান্তশিষ্ট মোদের আয়ু।

হা-হা করে হেসে উঠলেন আলী সাহেব; বললেন—বাপস! কী সব সাংঘাতিক কথা? তা, তোমরা দু'জনে বলেছ ভালোই। তোমরা যে যার জায়গায় বসে পড়। এবারে তোমরা এসো। প্রথমে বলো মেহেরুন্নেসা।

সোনালি মেয়েটি বলতে শুরু করলো—দিনের আলো আমার গায়ে। আমার রঙ

নিয়ে কোরানে অনেক কথাই লেখা রয়েছে। আমাকেই প্রশংসা করে আল্লাহ বলেছেন—সোনালি বা হলুদ রঙ চোখে আমার খুব ভালো লাগে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার রঙটা খুবই সুন্দর।

আমার রঙে আছে যাদু। রূপের শেষ কথাটা হচ্ছে আমার রূপ; আনন্দের শেষও আমারই ভেতরে। সোনার দাম যে এত বেশী তার কারণ হচ্ছি আমি। সূর্য-চন্দ্র-তারকা আমার রঙ নিয়েই সুন্দর। সোনালি আপেল বা পীচ দেখতে কত ভালো লাগে। বিশ্বে যত দামী-দামী পাথর রয়েছে তাদের রঙ আমারই গায়ের রঙ। ফসল পাকলে আমার রঙ ধরে। শরৎকালে ফসল পাকে। ফসলের রঙ সোনা হয়ে যায়। সেইজন্যেই তো শরৎ এত আদরের। সূর্যের তাপে গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে যায়। তাইত সবুজ এত ভালো লাগে দেখতে।

এবার বাদামী রঙ, অর্থাৎ, তোর কথাই বলি। বাদামী রঙ যার তারই দাম কম। কেন কম বলো দেখি! শুধু ওই রঙের জন্যে। তোর রঙটা খুবই সাধারণ; আর সাধারণ বলেই তো এত বিশ্রী। কেউ তা পছন্দ করে না।

এমন কোন ভালো মাংস দেখেছিস যার রঙ বাদামী? কোন ফুল বা পাথরই বাদামী নয়। অবশ্য অনেকদিন পরিষ্কার না করলে তামার রঙ বাদামী হয়ে যায়।

সবচেয়ে বড় কথাটা কী জানিস? তুই ফরসাও নস, কালোও নস। এ দুটো রঙের জন্যে যত প্রশংসা মানুষে করে তার এক কণাও তোর কপালে নেই।

আলী সাহেব বললেন—হয়েছে। তুমি এবার থাম। বলতে দাও শোলাকে।

বাদামী মেয়ে শোলা, একগাল হাসলো। মেয়েটি হাসলে মুক্তো ঝরে যেন, কী সুন্দর তার দাঁতের পংক্তি যেন মুক্তোর সারি। মধুর মত ঘন গাঢ় বাদামী ওর গায়ের রঙ। গড়নটিও কত চমৎকার। হাত-পা-চোখ-কান-মুখ-বুক সবই একেবারে মাপা, যাকে বলে নিখুঁৎ। ঢেউ-খেলান কোমর সব সময়েই নাচের তালে তালে দুলতে থাকে। দোহরা দুখানা হাত দুপাশে ঝুলছে। মাথায় এক রাশ কালো মেঘের মত চুল। সেই চুল নেমে এসেছে তার ভারি নিতম্বের ওপরে। সেই চুল দুলিয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সে দেখাল আলী সাহেব, আর সেই সোনালি মেয়েটিকে। তারপরে সে মেহেরুন্নেসার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—আল্লাহকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে ধুমসো করে পাঠাননি, পাঠাননি রোগা ডিগডিগে বা বিকলাঙ্গ করে। শ্বেতীর মত সাদা, কামলা রোগীর মত হলদে, কিংবা কাঠ কয়লার মত ময়লা করেও এ-দুনিয়ায় তিনি আমাকে পাঠাননি। আমার গায়ের রঙ সব রঙকেই টেক্কা দিয়েছে। নানান রঙের মশলা দিয়ে আল্লাহ আমার গায়ের রঙ তৈরি করেছেন। আর তাঁর তুলির টানে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কী সুন্দরই না ফুটে উঠেছে। আল্লাহ যে কত বড় শিল্পী আমাকে দেখলেই তা বোঝা যায়।

এ-দুনিয়ার সব কবিই আমার মত মেয়ের দিকে মশগুল হয়ে তাকিয়ে থাকে। হাজার-হাজার বন্দনাগীতি তারা আমার জন্যেই রচনা করেছে। সেসব কথা বলতে গেলে এক জীবনে কুলোবে না তাই সে চেষ্টা না করে আমি কেবল দু-চারটে কবিতা বলছি।

ভোর হয়ে এলো দেখে থেমে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো আটত্রিশতম রজনী ঃ

পরের দিন আবার শুরু করলো শাহরাজাদ ঃ

সবাই কি আর হতে পারে আমার প্রিয়তমার মত
রঙিলা সে, চটুল গতি, নয়কো মোটা, নয়কো রোগা,
ছোট একটি নারী সে যে রবির আলোয় পল্লবিত
রঙিন স্বপন সম আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা।

তোর গায়ের রঙ তো রঙই নয়। সবুজ সতেজ প্রকৃতিতে ও-রকম কোন রঙই

নেই। গাছের পাতা হলদে হলে ঝরে যায়; সবুজ জীবন হলদে হয়ে মরে যায়। তোর রঙটা তাই জীবনের প্রতীক নয়, ইঙ্গিত হলো মৃত্যুর।

গিরিমাটির রঙ হলদে। হরিতালের রঙও তাই। এ দুটো জিনিস দিয়ে যে ওষুধ তৈরি হয় তা গায়ে লাগলে রোম যায় উঠে। সবুজ ঘাস কী নরম বলো তো? শুকিয়ে গলে গেলে সেই ঘাস এমন শক্ত হয়ে যায় যে গরুও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দোজখেতে জাকুম নামে এক ধরনের গাছ জন্মায়। তাতে খুনী, বদমাস, আর শয়তানদের মাথা ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেই গাছে তোর মুখের মত এক রকম তামাটে ফলও ধরে। তোর মত মেয়েদের দেখেই কবি বলেছেন—খোদা আমাকে একটি স্ত্রী দিয়েছিলেন। তার রঙটা ছিলো হলদে। সেই থেকে আমি সারাটা জীবন মাথার যন্ত্রণায় ভুগেছি। একবার আমি বলেছিলাম, দোহাই তোমার। এবার আমরা যে যার পথ দেখি এসো। শুরু হলো আমাদের মধ্যে বিরোধ; আর তারই ফলে, দাঁতগুলি হারাতে হয়েছে আমাকে।

আলী সাহেব তো হেসেই অস্থির। হাসির দাপটে মাথাটা তাঁর নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। মেয়ে দুটিকে তিনি দু'হাতে জড়িয়ে ধরেন। বাকি চারজনকে কাছে ডেকে নেন তিনি। সকলেই সমমূল্যের দামি-দামি পোশাক আর গহনা উপহার দেন।

গল্প শেষ করে বাসোরার মহম্মদ বললো—এই হলো ছটি মেয়ের গল্প। এর পরে তারা আলীর সঙ্গে বাগদাদেই সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগলো।

আল মামুনের বাদশার গল্পটা শুনতে বেশ ভালোই লাগলো। তিনি মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওই মেয়েদের মালিকের বাড়ি তুমি চেন? মেয়ে কটিকে আমাকে বেচবে কিনা তুমি মালিককে জিজ্ঞাসা করে এসো।

মহম্মদ বললো—আজ্ঞে জাঁহাপনা, যতদূর জানি, মেয়েগুলিকে আলী সাহেব খুব ভালোবাসেন। তাদের ছেড়ে দিতে তিনি রাজি হবেন না।

বাদশাহ বললেন—ষাট হাজার দিনার নিয়ে তার বাড়ি যাও। মেয়ে পিছু দশ হাজার দর দেবে। আলী সাহেবকে বলো আমি মেয়েদের কিনতে চেয়েছি।

বাসোরার মহম্মদ তথাস্তু, জো হুকুম বলে ষাট হাজার দিনার নিয়ে আলী সাহেবের বাড়ি হাজির। সব কথা খুলে বলে আলী সাহেবের হাতে মহম্মদ টাকাটা তুলে দিলো। একে বাদশার অনুরোধ। তার ওপরে ষাট হাজার দিনার! লোভে আলী সাহেবের চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। অথচ, মেয়েগুলিকেও তিনি বড় ভালোবাসতেন। কী করবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে-ভাবতে শেষ পর্যন্ত লোভের কাছে হেরে গেলেন তিনি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছটি মেয়েকেই তিনি তুলে দিলেন বাদশাহর হাতে। মেয়েদের নিয়ে মহম্মদ সোজা চলে গেলো বাদশাহর কাছে।

মেয়েদের গায়ের রঙ দেখে বাদশাহর চোখ ট্যারা হয়ে গেলো। এমন রঙের ফুলঝুরি তিনি আর কোথাও দেখেননি। ওদের দেহের গঠন আলাদা, ওদের রঙ-তামাসা, হাসি। সবই মনোরম।

বাদশাহ খুব খুশি হলেন ওদের পেয়ে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি ঢঙ রয়েছে, আকর্ষণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে একটা। হারেমে ওদের জন্যে ভালো ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। অনেকদিন ধরে নাচে, গানে, রঙ-তামাসায় বাদশাহকে তর করে রাখলো।

বেচারা আলী সাহেব! মেয়েদের বেচে দিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন তাঁর আর কাটে না। ষাট হাজার দিনারের লোভ তিনি ছাড়তে পারলেন না? ছিঃ-ছিঃ! অনুতাপে মরে গেলেন তিনি। মেয়েরা তাঁকে যে আনন্দ দিয়েছিলো তার তুলনায় ষাট হাজার দিনারের দাম

কতটুকু! নিজের ওপরে ধিক্কার জন্মে গেলো তাঁর। এভাবে জীবন কাটানো তাঁর কাছে অসম্ভব হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো আলী সাহেবের। বাদশার কাছে নিজের মনোবেদনা জানিয়ে তিনি একটা চিঠি লিখলেন।

আমার বিষণ্ণ হৃদয় প্রজাপতি
ওই ছ'টি পুষ্পলাবী মধুকন্যাকে চুম্বন করার জন্যে
পাখা মেলে উড়ে যায়।
ওরাই আমার চোখের দৃষ্টি
আমার বাঁচার রসদ
আমার তৃষ্ণার পানি
আমার জীবন
এক সঙ্গে সব।
সেই উপহার পেলে
আমি আমার চোখ দুটি বুজিয়ে ফেলতে পারি
ওই ছটি কন্যাকে আমি দুচোখ দিয়ে দেখতে চাই....
আমার জীবন প্রদীপের তৈল, আমার কামনা
আমার বেঁচে থাকার উষ্ণতা ওরা,
কিন্তু তৈজসে যার বাতি নেই, সেখানে কোন আলো জ্বলে না।

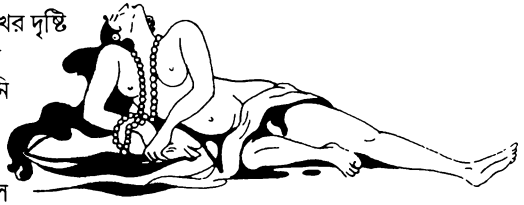

যথা সময়ে আল মামুন পত্রটি পেলেন। বাদশার উদার হৃদয়ের কথা দুনিয়ায় কে না জানে? আলী সাহেবের বেদনার ঝঙ্কার বাদশার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করলো। তাড়াতাড়ি ছ'টি মেয়েকে ডেকে পাঠালেন তিনি। প্রত্যেককে দিলেন প্রচুর উপহার। এছাড়া প্রত্যেককে দিলেন দশ হাজার করে দিনার। দিলেন বহুমূল্য অলঙ্কার। তারপরে তাদের ফিরিয়ে দিলেন আলী সাহেবকে।

দূর থেকে মেয়েদের আসতে দেখে আলী সাহেব ছুটে গিয়ে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। বাদশার হারেমে থেকে ওদের রঙ আরও ফুটেছে। স্বাস্থ্যও হয়েছে বেশ সুন্দর। বাদশার একটা পত্র তারা আলী সাহেবের হাতে দিলো। মেয়েদের মূল্য বাবদ আলী সাহেবকে যে ষাট হাজার দিনার দিয়েছিলেন বাদশা সেটা মুকুব করে দিয়েছেন। আলীর আনন্দ আর ধরে না।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আলী সাহেব তাদের নিয়ে সুখে দিন কাটালেন।

—জাঁহাপনা, নানান রঙের ছ'টি গল্প এইখানেই শেষ।

শাহরাজাদ বলে—এখন আপনাকে যে গল্পটা বলতে চাইছি তার নাম হলো তাম্র নগরীর গল্প। আজ পর্যন্ত আপনাকে যে সব গল্প বলেছি এটি হচ্ছে তাদের চেয়ে অনেক ভালো। অর্থাৎ, এর কাছে সেগুলি কিছুই নয়। জাঁহাপনার মর্জি হলে গল্পটা কাল রাত থেকে শুরু করতে পারি।

দুনিয়াজাদ অস্থির হয়ে বললেন—না, না। আজই তুমি শুরু কর গল্পটা। কিছুটা তো বলো।

মুচকি হেসে শুরু করলো শাহরাজাদ ঃ

জাঁহাপনা, আল্লাহই রাজার রাজা। কোন এক সময় এক নগরীতে একটি রাজা রাজত্ব করতেন। সেই নগরীর নাম ....

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো ঊনচল্লিশতম রজনী ঃ

এক সময় দামাস্কাসে রাজত্ব করতেন ওমিয়াদ বংশের খলিফারা। সেই বংশে একজন খলিফা ছিলেন। তাঁর নাম হলো আবু আল-মালিক বিন মারবান। গুণী ব্যক্তিদের তিনি সম্মান দেখাতেন, করতেন আপ্যায়ন। দেশ-বিদেশের নানান কাহিনী শুনতে তিনি খুব

ভালোবাসতেন। এই সব গল্প বলতেন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা। ডেভিডের পুত্র আমাদের মালিক সুলেমানের গল্প শুনতেই বিশেষ করে ভালোবাসতেন তিনি। সুলেমানের গুণাবলী, বিচক্ষণতার কাহিনী, মরুভূমির সবরকমের পাশবিক অত্যাচারকে তিনি যে দমন করেছিলেন সেই কাহিনী, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেসব ইফ্রিদ আর জিন ঘুরে বেড়ায় তাদের কেমন করে যে তিনি বশে এনেছিলেন সেই সব কাহিনী বারবার তিনি শুনতে চাইতেন।

একদিন এক ভূ-পর্যটক তাঁর রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। এঁর নাম তালিব-বিন-সাল, খলিফাকে ইনি নানান কাহিনী শোনালেন। সেই সঙ্গে শোনালেন তামার জালার গল্পটাও। গল্পটা এমনই অদ্ভুত যে খলিফা তা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তামার জালাটা কালো ধোঁয়ায় ভর্তি। এই ধোঁয়া নাকি ধোঁয়া নয়, আসলে দৈত্য-দানোর গায়ের রোঁয়া। এ কি বিশ্বাস করা যায়?

খলিফার বিশ্বাস উৎপাদন করানোর জন্যে তালিব-বিন-সাল বললেন—জাঁহাপনা, আপনি ধার্মিক ব্যক্তি, মহাপ্রাণ। আপনাকে মিথ্যা কথা বলার সাহস আমার নেই। আপনাকে সত্যি ঘটনাই বললাম।

অনেককাল আগে সুলেমানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলো জিন। তারই শাস্তিস্বরূপ তাকে তিনি ওই তামার জালাটার ভেতরে আটকে রেখেছিলেন। তারপরে মুখটা বেশ ভালো করে এঁটে পশ্চিম আফ্রিকার মঘরিব-এর বাইরে বিলাপ-সাগরে সেই জালাটা ফেলে দেওয়া হয়েছিলো। জালাটা তলিয়ে যাওয়ার আগে কিছু ধোঁয়া বেরিয়ে এসেছিলো বাইরে। সেই ধোঁয়া হচ্ছে ইফ্রিদের জমাট বাঁধা আত্মা। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে আবার সে তার নিজের রূপ ফিরে পেলো।

খলিফা তো অবাক! এও কখনো হয়! নিজের চোখে দেখতে হবে তো ব্যাপারটা। তিনি তালিব-বিন-সালকে বললেন—ইফ্রিদের ধোঁয়ায় ভরা কয়েকটা জালা আমি দেখতে চাই। এটা কি সম্ভব? কী বলো তুমি? সম্ভব হলে, আমার সঙ্গে চলো। নিজের চোখে দেখে আসি ব্যাপারটা।

তালিব-বিন-সাল বললেন—ধর্মাবতার, আপনি অযথা কষ্ট করবেন কেন? আপনার আদেশে এখানেই দেখানো যাবে। এ আর এমন কথা কী? এর জন্যে একটু কষ্ট করে আপনাকে একটা চিঠি লিখতে হবে—এই যা। আপনার প্রতিনিধি হিসাবে আমীর মুশা মঘরিব প্রদেশ শাসন করছেন। তাঁকেই একটা চিঠি লিখে দিন। লিখবেন—পাহাড় যেখানে শেষ হয়ে সমুদ্রে মিশেছে সেইখানে এক টুকরো শুকনো জমি রয়েছে। তারই কাছে সমুদ্রে তামার জালাগুলো রয়েছে। আপনার নির্দেশ পেলে মুশা সেই জালাগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

—তাহলে, তুমি নিজেই যাও। আমার মোহরের ছাপ দিয়ে চঠি লিখে দিচ্ছি তাকে। জালাগুলো এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। লোকজন যা চাই নিয়ে যাও। যাও, তাড়াতাড়ি।

নিজের হাতে একটা চিঠি লিখলেন খলিফা; তাতে মোহর দিলেন নিজের। তারপরে সেটি তুলে দিলেন তালিবের হাতে। তালিব সেটি নিয়ে সোজা চলে গেলেন মুশার কাছে মঘরিবে।

যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে তালিবকে সংবর্ধনা জানালেন মুশা। চিঠিটা খুলে পড়লেন। তারপরে সেটি তাঁর ঠোঁট আর মাথায় বুলিয়ে তিনি বললেন—বুঝেছি! মহামান্য ধর্মাবতার খলিফার আদেশ। আমাকে তা পালন করতেই হবে।

মুশা তাঁর সেনাধ্যক্ষ আব্দ আল-সামাদকে ডেকে পাঠালেন। দুনিয়ার হেন জায়গা নেই যেখানে আব্দ আল-সামাদের গতিবিধি ছিলো না। বেশ বয়স হয়েছে তাঁর। বংশধরদের জন্যে তিনি এখন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা লিখে রাখছেন। অনেক লোমহর্ষক কাহিনীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর ছিলো।

আব্দ আল-সামাদ হাজির হলে মুশা তাঁকে বললেন—ধর্মাবতার বিশেষ একটি দূত

এখানে পাঠিয়েছেন সামাদ সাহেব। জিনের আত্মা-ভর্তি কয়েকটা তামার জালা তাঁর চাই। ডেভিডের পুত্র সুলেমান এই জিনগুলোর আত্মা জালায় বন্দী করে রেখেছিলেন। জালাগুলো নাকি রয়েছে সমুদ্রের তলায়। সেগুলিকে খুঁজে আনতে হবে। মঘরিব প্রদেশের একেবারে শেষ সীমান্তে পাহাড় রয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ এসে সেই পাহাড়েরই গায়ে প্রচণ্ড আবেগে আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হয় যাচ্ছে, তারই পাশে সমুদ্রের ভেতরে ওগুলি নাকি রয়েছে। অনেক দিনই আমি এদেশ শাসন করছি। এদেশের সবই প্রায় আমার জানা। কিন্তু তালিব সাহেব সমুদ্রের যে অংশটার কথা বলছেন তা আমি কোনদিনই শুনিনি। কোন পথ ধরলে সেখানে পৌঁছানো যাবে তাও আমার অজানা। কিন্তু সারা দুনিয়ায় তো আপনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যা আপনি জানেন না। তালিব সাহেব যে পাহাড় আর সমুদ্রের কথা বলছেন তাদের আপনিও নিশ্চয় জানেন—তাই না?

মুশার কথা শুনে বৃদ্ধ সামাদের কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন—মুশা বিন নুশায়ের, মনে পড়েছে। পাহাড় যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একা আর সেখানে যেতে সাহস করছিনে। ইচ্ছে থাকলেও, শক্তিতে কুলোবে না এখন। পথ দুর্গম। পথের ধারে তেষ্টা মেটানোর মত কোন পানি নেই। সেখানে পৌঁছতেই লেগে যাবে দু'বছর কয়েক মাস। ফিরতে লাগবে আরও বেশী সময়; অবশ্য, সেই ভয়ঙ্কর জায়গা থেকে একেবারেই ফেরা যাবে কি না সেদিক থেকেও সন্দেহ কম নেই। সে দেশে জীবন্ত মানুষের কোন চিহ্ন নেই। দাঁড়ে যেমন পাখি ঝুলে পাহাড়ের ওপরে মানুষগুলো সেইরকম ঝুলে রয়েছে। বাইরে থেকে কেউ আজ পর্যন্ত সেই শহরে ঢুকতে পারেনি। এই শহরের নাম 'তাম্র নগরী'।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বৃদ্ধ সামাদ আবার বলেন—আমীর আপনার কাছে আমি কিছুই লুকোইনি, লুকোবোও না। ওপথ কেবল দুর্গমই নয়, রীতিমত ভয়াল, ভয়ঙ্কর রকমের বিপজ্জনক। পথে একটা মরুভূমি পড়বে। ইফ্রিদ আর জিনেরা সেই পথ আর মরুভূমি পাহারা দিচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা। আজ পর্যন্ত কোন মানুষ ও অঞ্চলে বসবাস করতে পারেনি। আমীর মুশা, আপনি নিশ্চয় জানেন যে আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত চিরকালই মানুষের কাছে নিষিদ্ধ স্থান। আজ পর্যন্ত মাত্র দুটি মানুষই সেখানে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন ডেভিডের পুত্র সুলেমান, আর একজন হচ্ছেন জোড়া সিঙ্গের আলেকজান্দার। তাঁদের পরে আর কেউ সেখানে যাননি। জায়গাটা হচ্ছে অনন্ত এক নীরবতার রাজত্ব। ধূ-ধূ করছে মরুভূমি—খাঁ-খাঁ করছে বালি। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই বালি তাথৈ-তাথৈ নৃত্য করছে। কবরখানার এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা সেখানে থমথম করছে।

আমীর মুশা বললেন—সবই সত্যি সামাদ সাহেব; স্বীকার করছি, ওপথে বিপদ আছে আপদ রয়েছে। কিন্তু ও-সবই তো উপেক্ষা করতে হবে। আপনি যদি যেতে না চান তো আমাকেই যেতে হবে। জাঁহাপনার নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে চলবে না।

সামাদ বললেন—আমি ছাড়া আর কেউ বোধ হয় একাজ পারবে না। ওদেশে পৌঁছানোর পথ আমারই কেবল জানা রয়েছে। এক কাজ করুন আমীর মুশা। সঙ্গে নিন দুহাজার উট। এক হাজার বইবে জল, এক হাজার খাবার-দাবার। বেশী সৈন্য সামন্ত নেওয়ার দরকার নেই। আমরা যেদেশে যাচ্ছি তারা কেউ জীবন্ত মানুষ নয়। তারা সব প্রেতলোকের বাসিন্দা, ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ওদের গায়ে লাগবে না। রেগে গেলে ওদের ঠেকিয়ে রাখার শক্তি সৈন্য-সামান্তের নেই। তাই ফালতু বেশী অস্ত্রশস্ত্র আর লোকজন নিয়ে গিয়ে লাভ কী? এতে ওরা আরও ক্ষেপে যেতে পারে। সব গোছগাছ করে নিন। আমিও তৈরি থাকব। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

তিনশো চল্লিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে পুরানো গল্পের জের টানলো শাহরাজাদ।

সামাদ চলে যেতেই বেশ ঘাবড়ে গেলেন আমীর মুশা। যাই হোক, আল্লাহর নাম নিয়ে সব কিছু গোছগাছ করতে শুরু করে দিলেন। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখার অধিনায়ক আর সর্বাধিনায়কদের ডেকে পাঠালেন তিনি। নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করে সকলের সামনেই পুত্র হারুণকে তিনি সিংহাসনে বসালেন। ঠিক হলো, তাঁর অবর্তমানে হারুণই রাজ্যশাসন করবেন।

হারুণকে সিংহাসনে বসিয়ে আল সামাদ যা যা বলে গিয়েছিলেন সেই-সেই জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন মুশা। তাঁর সঙ্গে তালিব-বিন-সাল আর বৃদ্ধ সামাদ ছাড়া আর কয়েকজন বাছাই করা যোদ্ধাও চললো। সব যোগাড়যন্ত্র শেষ হলে ভালো দিন দেখে আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা।

দু'হাজার উটের বিরাট বাহিনী এগিয়ে চললো ধীরে-ধীরে। দিনের পর দিন কেটে গেলো। মাসের পর মাস। এমনিভাবে কয়েকটি মাস কাটার পরে দল বিশাল একটা বালির সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়লো। সে এক নিস্তব্ধ মরুভূমি—যেদিকে তাকাও শুধু বালি আর বালি। কোন প্রাণেরই চিহ্ন নেই সেখানে।

একদিন হঠাৎ দিগন্তরেখার ধারে এক টুকরো চকচকে মেঘের মত কী জানি একটা জিনিস তাদের চোখে এসে পড়লো। মেঘ? না, মেঘের মত কিছু একটা? উটের মুখ তারা সেইদিকে ঘুরিয়ে দিলো। কিছুটা এগিয়ে যেতেই তারা বুঝতে পারলো, ওটা মেঘ নয়। চক-মেলানো একটা বাড়ি। সাদা উঁচু ইস্পাতের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। চারটি সোনার থামের ওপরে বাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির পরিধি হবে হাজার দশেক ফুটের মত। বাড়িটার গম্বুজ শীসে দিয়ে তৈরি, হাজার-হাজার কাক যাতে বসতে পারে সেইজন্যে গম্বুজের চারধারে বিরাট একটা কার্নিশ। এখানে তাহলে প্রাণী বলতে কি ওই হাজার-হাজার কাক? কাক ছাড়া আর কোন প্রাণীই তো চোখে পড়ছে না, বিশাল পাঁচিলের তলায় প্রধান ফটক। দরজার পাশে একটা ফলক। কালো পাথরের চারধারে সোনার মোটা দাগ। সেই কোলো পাথরের ওপরে রোমান হরফে কয়েক ছত্র লেখা। লেখার হরফগুলি কোন লাল ধাতু দিয়ে তৈরি। রোমান হরফ কেবল সামাদই পড়তে পারতেন। কবিতাটি পড়ে মুশাকে তার অর্থটা তিনি বুঝিয়ে দিলেন।

এইখানে প্রবেশ কর।
তাহলেই তোমরা রাজাদের কাহিনী কী তা জানতে পারবে।
আমার এই গম্বুজের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করেই
তারা হাওয়ায় মিশে গিয়েছে।
সূর্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা
ছায়ার মত হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।
মৃত্যুর ঝড়ের সামনে
কুটোর মত উড়ে গিয়েছে তারা।

বাণীটার অর্থ বুঝতে পেরে মুশা খুব দুঃখ পেলেন। ফিসফিস করে বললেন আল্লাহ ছাড়া ভগবান নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দলবল নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে পড়লেন মুশা। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা বিরাট কালো একটা গ্রানাইট পাথরের মিনার দেখতে পেলেন। মিনারের চারপাশে এত কালো কাক বসেছিলো যে দরজার বাইরে থেকে তাঁরা বুঝতেই পারেননি যে ওটি একটি মিনার। স্তম্ভের চারপাশে অজস্র কবর। সমাধিগুলির ওপরে একটা বিরাট

পাথরের স্তম্ভ। তারই গায়ে রোমান হরফে সোনার পাতে একটি কবিতা উৎকীর্ণ করে রয়েছে ঃ

যৌবনের উন্মত্তা বিকারের ঝোঁকের মত গেছে কেটে—তথাপি
অনেক অনেক কিছু আমি দেখিলাম। কদাপি
কি ভোলা যায় যৌবনের জয়োদীপ্ত বলক্ষিপ্ত দিন
যদিও স্বীকার করি আজ আমি ধূলিমাঝে হয়েছি বিলীন?
উন্মাদ যুদ্ধের নেশায় রোষদৃপ্ত অশ্বক্ষুরধ্বনি
আজও আমি কান পেতে শুনি।
অগ্নিবর্ষী ঝড়ের আবেগে অজগর শহরের করেছি বিনাশ
বারবার। ত্রস্ত নর-নারী যত সভয়ে ফেলেছে নিঃশ্বাস।
আমার রথের চাকায় রাজাদের করেছি জবাই
কোন ক্ষমা করি নাই।
কিন্তু বর্তমানে,
যৌবনের উদ্দামতা বিকারের স্বপ্ন শুধু আনে।
বালির চরেতে আঁকা ফেনার অক্ষর
বিবর্ণ, বিশীর্ণ যেন মৃত যাদুঘর।
মৃত্যু আমাকে করেছে আজিকে বন্দী—
ব্যর্থ আমার সেনানী, ব্যর্থ ফিকির ফন্দি।
হে পথিক শোনো,
আমার মৃত্যুর বাণী কান দিয়ে শোনো
কারণ, আমার জীবনের কথা সে তো নয়।
আত্মার করো না অপচয়।
কালই হয়ত এ মাটি বলিতে পারে
জঠরের মাঝে আমি যে নিয়েছি তারে।

কবিতা পড়ছেন সামাদ। মুশা আর তাঁর সঙ্গীদের বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। সমাধিগুলির সামনে নির্বাক হয়ে তাঁরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। আল্লাহর অভিশাপে বেচারাদের কী কষ্টই না ভোগ করতে হয়েছে?

এবারে তাঁরা স্তম্ভটির দিক এগিয়ে গেলেন। মিনারের নিচেও আবলুস কাঠের একটা বিরাট দরজা। সেই দরজার গায়েও আর একটি সোনার পাতে রোমান হরফে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে—

মহাকালের নামে
সেই পরম শক্তিমানের নামে
সেই চিরস্থিতিশীল পরমেশ্বরের নামে,
বলছি,
তোমরা যারা এখানে এসেছ তোমাদের বলছি
তোমরা কোনদিন আয়নার দিকে তাকিয়ো না।
তোমাদের একটি নিঃশ্বাসই তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো
করতে পারে।
মায়াটাই মানুষের পা মচকানোর ফাঁদ।
আমার শক্তির কথা তোমাদের বলি ঃ
আমার ঘোড়া ছিলো দশ হাজার

তাদের সহিস ছিলো বন্দী রাজার দল
আমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে
হারেমে আমার ছিলো হাজারটা অনূঢ়া রাজকুমারী।
তাদের কুচগুলি চাঁদের মত মিষ্টি।
সারা বিশ্ব থেকে তাদের আমি সংগ্রহ করেছিলাম।
পূর্ব আর পশ্চিম
আমার কাছে মাথা নত করেছিলো সবাই।
ভেবেছিলাম আমার ক্ষমতা অনন্ত
তারপর তারপর
যিনি অজর অমর সেই তাঁর কাছ থেকে
আমার ডাক এলো।
আমি আমার হাজার হাজার সেনানীদের ডাকলাম
ডাকলাম আমার অধীনস্থ শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গকে
তাদের সামনে আমার কোষাগার খুলে দিয়ে বললাম ঃ
'আমার এই পাহাড় প্রমাণ সোনা-দানা, হীরা-মুক্তা
তোমরা সব নিয়ে যাও।
প্রতিদানে আর একটা দিন কেবল আমাকে
বাঁচিয়ে রাখ।'
মাটির দিকে মাথা নিচু করে
চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো তারা।
আমার মৃত্যু হলো।
মৃত্যু এসে অধিকার করলো
আমার সিংহাসন।

সামাদের কবিতা পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা কান্নার স্রোতে দুর্নিবার বেগে এলো বেরিয়ে। অনেকক্ষণ কান্নার পরে চোখের জল মুছে একজন একজন করে ভেতরে ঢুকলেন সবাই। বিরাট বিরাট হলঘর শূন্য—আদিগন্ত নিঃস্তব্ধতার মধ্যে নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছে। কয়েকটা এই রকম হলঘর পেরিয়ে সব শেষে তাঁরা একটি বড় সাজানো গোছানো ঘরে এসে দাঁড়ালেন। এ ঘরখানা বেশ বড়—অন্য ঘরগুলির চেয়ে অনেক বড়। মাঝখানে বিরাট একটা টেবিল পাতা। টেবিলটি চন্দন কাঠের। টেবিলের ঠিক মাঝখানে ছোট একটি গাথা উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে—

এই টেবিলের চারপাশে
একদিন অনেক শকুনি রাজারা বসে থাকত
তাদের সঙ্গে বসে থাকত কানা রাজার দল।
এখন তারা সবাই অন্ধকারে শুয়ে আছে,
এখন তারা কেউ আর উঠতে পারে না,
এখন কেউ আর পায় না দেখতে।

ধাঁধাঁ লাগে মুশার। এ কবিতার অর্থ কী? এর উদ্দেশ্যটাই বা কী? এক টুকরো চামড়া বার করে বয়েতটা লিখে নিলেন তিনি। তারপরে প্রাসাদ ত্যাগ করে তাম্রনগরীর দিকে যাত্রা করলেন তাঁরা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প বলা থামালো শাহরাজাদ।

তিনশো একচল্লিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ।

তিনদিন ধরে একটানা চলছেন তাঁরা। তৃতীয় দিন বিকালের দিকে দিকচক্রবালের কাছাকাছি একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়লো তাঁদের। দেখতে পেয়েই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁরা। একটা ঘোড়াসওয়ার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সূর্যাস্তের লাল রঙ তার গায়ের ওপরে পড়ে চকচক করছে। কিছুটা এগিয়ে গিয়েই বোঝা গেলো ওটা একটা মূর্তি। উঁচু বেদীর ওপরে বসানো। ঘোড়াসওয়ারের ডান হাতে বিরাট একটা তরোয়াল, লোহার। তরোয়ালশুদ্ধ হাতখানা জামার ওপরে তোলা। সেই তরোয়ালের ওপর শেষ সূর্যের আলো পড়ায় দূর থেকে লাল দেখাচ্ছিল। দূরে দিকচক্রবালে তখন লাল আলোর ফুলঝুরি ঝরছে। ধীরে ধীরে তাঁরা মূর্তিটার কাছে এসে পৌঁছলেন। বেদী, ঘোড়া, আর তার সওয়ার সব কিছুই তামার পাতে তৈরি। একমাত্র তরোয়ালটিই যা লোহার। বেদীর ওপরে একটি বয়েৎ। লেখার ধরনটি দেখলে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে ঃ

এই নিষিদ্ধ দেশে
যদি তুমি পথ হারিয়ে ফেলো
তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে তুমি আমাকে ধাক্কা দাও।
সেই ধাক্কা খেয়ে
যেদিকে আমি মুখ করে দাঁড়াব
সেইটি তোমার পথ।

মুশা এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটার গায়ে একটা ধাক্কা মারলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মূর্তিটা ঘুরে তাঁরা যেদিকে এগোচ্ছিল তার ঠিক উলটো দিকে মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। আব্দ অল সামাদ ভুল পথে যাচ্ছিলেন। মূর্তির নির্দেশিত পথটাই যে আসল পথ তা তিনি বুঝতে পারলেন। নির্দিষ্ট পথে আবার তাঁরা চলতে শুরু করলেন।

চলছেন, চলছেন, চলছেন। একটানা অনেকদিন ধরে তাঁরা চলছেন। পথে পড়লো বালি আর বালি। চারদিকে চুপচাপ। সেই নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললেন তাঁরা। নেই কোন জীবন্ত প্রাণী; সবুজ পান্থপাপদ দূরস্থান, একমুঠো সবুজ ঘাসও কোথাও পড়লো না চোখে। তবু তাঁদের হাঁটার বিরাম নেই। তবু তাঁরা চলছেন...চলছেন চলছেন।

বেশ কিছুদিন চলার পরে একদিন রাত্রিশেষে তাঁরা বিশাল একটা কালোপাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেই পাহাড়ের গায়ে একটা অদ্ভুৎ প্রাণী। কে বা কারা তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। প্রাণীটার আধখানা মাটির তলায় পোঁতা; বাকি অর্দ্ধেকটা মাটির ওপরে। ওপরের চেহারা ভয়ঙ্কর একটা দৈত্যের মত। মনে হলো, দোজখের কোন শয়তান সম্ভবত অনন্তকাল ধরে এই জীবটাকে শাস্তি দিচ্ছে। দুটো কালো রঙের পাখনাও রয়েছে তার। চারটে হাত তার। দুটো হাত সিংহের থাবার মত। বড়-বড় নখ বেরিয়ে রয়েছে। মাথাটা দেখতে গাধার মত। তার ওপরে কালো-কালো কোঁকড়া চুল ঝড়ো হাওয়ায় দুলছে। ভাঁটার মত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। মাথার দুপাশে দুটো লম্বা-লম্বা শিং। চোখের ভুরু দুটো পাগলা ষাঁড়ের ভুরুর মত দেখতে। জীবটার চোখ তিনটে। তাদের মধ্যে একটা দুটো ভুরুর মাঝখানে স্থির হয়ে বসে রয়েছে। শিকার ধরার আগে চিতাবাঘ যেমন করে তাকায় এই চোখটার দৃষ্টি সেই রকম ভয়ঙ্কর। রঙটাও তার সবুজ। কিন্তু সেই জীবটার দেহের রঙ একেবারে কালো মিশমিশে। শরীরটা বিরাট একটা তালগাছের মত।

মুশার দলকে সামনে দেখে দৈত্যটা গর্জন করে শেকল ছেঁড়ার চেষ্টা করলো।

ভাগ্যিস দৈত্যটাকে কালো পাথরের দেওয়ালে শেকল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। তা না হলে, শেকল ছিঁড়ে সে একটা কাণ্ড করে বসত। শেকল ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতো সে, আর তা না পেরে আর্তনাদ করছে দারুণ। মুশার দল তো ভয়েই অস্থির। ভয়ে-বিস্ময়ে যেখানে তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এক পাও আর এগোতে সাহস করলেন না।

সামাদকে জিজ্ঞাসা করলেন মুসা—এই দৈত্যটার কী হয়েছে? আপনি কিছু জানেন?

ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না। মনে হচ্ছে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ও জবাব দেবে। আচ্ছা, দাঁড়ান; আমিই জিজ্ঞাসা করছি।

এক মুহূর্ত দেরী না করে সামাদ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দিন-দুনিয়ার মালিক পরমেশ্বর আল্লাহ এ জগতের সব দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তোমাকেও সৃষ্টি করেছেন তিনি। আল্লাহ নামে তোমাকে অনুরোধ করছি, আমি যা যা তোমাকে প্রশ্ন করছি, তুমি তাদের জবাব দাও। তুমি কে? কী তোমার পরিচয়? কত দিন তুমি এইখানে এইভাবে শাস্তি পাচ্ছ?

প্রশ্নগুলি শুনে কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ করে উঠলো দৈত্যটা। তারপরে সে বললো—আমার নাম দাহিশ বিন আল-আমাশ। আমি ইব্লিসের একজন ইফ্রিদ। জিনের বাবা আমি। অদৃশ্য কোন শক্তি আমাকে এখানে বেঁধে রেখেছে। অনন্তকাল ধরে আমার এই শাস্তি ভোগ চলবে।

সমুদ্রের রাজা এক সময় এই দেশ শাসন করতেন। লাল-পাথরের একটি মূর্তি "তাম্রনগরী" পাহারা দিত। মূর্তিটাকে আমি দেখাশুনা করতাম। থাকতামও তারই ভেতরে। নানান দেশ থেকে কাতারে-কাতারে মানুষ আসত আমার দৈববাণী শুনতে।

আমি ছিলাম সমুদ্রের রাজার একটি সামন্ত। ডেভিডের ছেলে সুলেমানের ফরমান অমান্য করে অনেক জিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। সমুদ্রের এই রাজা সেই জিনদের দলপতি হয়েছিলেন। আসলে এই রাজা কোনদিনই জিনদের প্রভু ছিলেন না। জিনদের প্রভুর সঙ্গে এই রাজার একদিন প্রচণ্ড লড়াই হলো। এই লড়াই-এ রাজা আমাকে তাঁর প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করলেন। লড়াইটা অকারণে শুরু হয়নি। এর পেছনে যে কারণটা ছিলো সেটাই আমি বলছি—

সমুদ্রের রাজার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলো। তার রূপের কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো দুনিয়ার সর্বত্র। একদিন সুলেমানের কানেও সেই সংবাদটা পৌঁছলো। সুলেমানের বিবি ছিলো অনেক। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? বিবির ভাঁড়ারে আরও একটি রত্ন সংগ্রহ করার বাসনা হলো তাঁর। রাজার মেয়েকে শাদী করার প্রস্তাব দিয়ে তিনি একদিন দূত পাঠালেন। দূতের হাতে শাদীর প্রস্তাব ছাড়া আর দুটি নির্দেশ ছিলো তার। একটি হলো, সেই লাল পাথরের মূর্তিটা ভেঙে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়টি ছিলো, আল্লাহ ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই; আর সুলেমানই হচ্ছেন সেই আল্লাহর প্রেরিত একমাত্র ধর্মপ্রচারক।—

এই দুটি নির্দেশ তাঁকে মেনে নিতে হবে।

দূতের কাছ থেকে এই নির্দেশ পেয়ে সমুদ্রের রাজা তাঁর সমস্ত উজিরদের ডাকলেন; সেই সঙ্গে ডাকলেন আমাকে। আমরা সবাই জমায়েৎ হলে তিনি বললেন—সুলেমান আমাকে সাবধান করে দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে আমাকে। তার প্রথম নির্দেশ তার সঙ্গে আমার মেয়ের শাদী দিতে হবে। তার দ্বিতীয় নির্দেশ জিনদের সেনাপতি দাহিস দিন আল-আমাশ যে পাথরের মূর্তির ভেতর থাকে সেই মূর্তিটা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এবার তোমরাই বলো এ নির্দেশ আমি মানব কি না।

উজিররা বললেন—জাঁহাপনা আপনি সুলেমানকে মোটেই ভয় পাবেন না।

আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—আমাদের সৈন্যরা সব ওঁর মত শক্তিশালী।

রাজা আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম—জাঁহাপনা, আদেশ দিন, ওই দূতটাকে ধরে আমি উত্তম মধ্যম দিয়ে দিই। তাহলেই সুলেমানের চিঠির উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

আমার কথামতই কাজ হলো। ভালো করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো দূতকে—যা ব্যাটা, তোর মালিককে সব বলিস। যা—

অপমানিত দূত সুলেমনের কাছে ফিরে গেলো। দূত অবধ্য। তাকে অপমান করার নীতি সভ্য সমাজে কোথাও নেই। দূতের কাছে সব শুনে সুলেমান প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়লেন। চোখদিয়ে তাঁর আগুন বেরোতে লাগলো। সেই সঙ্গে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে জড় হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর সৈন্যদের ভেতরে মানুষ ছিলো, জিন ছিলো, এমন কি পশু পাখিও ছিলো। মানব সেনানীর ভার দিলেন আসব বিন বারখিয়ার হাতে; ইফ্রিদের রাজা দিমর‍্যিাৎ সমস্ত জিন সৈন্যদের পরিচালনার ভার নিলেন; সেই সঙ্গে নিলেন পশু আর পাখিদের দায়িত্ব। সমগ্র আর বিচিত্র সেনাবাহিনীর সর্বময় দায়িত্ব নিলেন সুলেমান নিজে। তাঁর সেই বিরাট বাহিনীটি জল, স্থল, অন্তরীক্ষ—এই তিনটি দলে ভাগ হয়ে গেলো। তারপরে শুরু হয় যুদ্ধ যাত্রা।

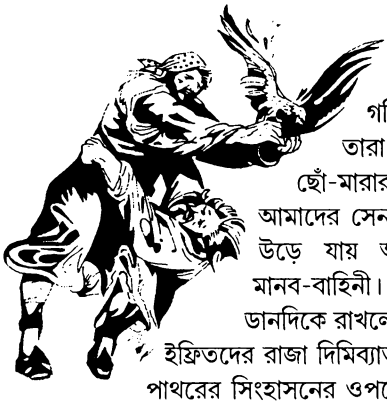

চার সারিতে পশুদের সেনাবাহিনী সাজানো হলো পাশাপাশি। বড়-বড় পাখিরা উড়তে লাগলো মাথার ওপরে। আমাদের সৈন্যদের গতিবিধি গুপ্তচরের মত আকাশ থেকে দেখে নিলো তারা। সুযোগ পেলেই পাখিগুলো এক একবার ছোঁ-মারার ভঙ্গীতে নীচে আসে তীরের মত; তারপরে আমাদের সেনানীদের কারও কারও চোখ খুবলে নিয়ে আবার উড়ে যায় আকাশের ভেতরে। তারপরে এগিয়ে এলো মানব-বাহিনী। সকলের শেষে জিন। সর্বাধিনায়ক সুলেমান তাঁর ডানদিকে রাখলেন উজির আসফ বিন বারখিয়া আর বাঁয়ে নিলেন ইফ্রিতদের রাজা দিমিব্যাতকে। স্বয়ং সুলেমান চললেন সোনা দিয়ে মোড়া পাথরের সিংহাসনের ওপরে চেপে সকলের মাঝখানে। চারটে হাতি টেনে নিয়ে চললো তাঁর সিংহাসন।

শুরু হলো যুদ্ধ।

সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হলো প্রচণ্ড কোলাহল। বেজে উঠলো দাদামা আর কাড়ানাকড়া। অশ্বারোহীরা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এলো। সে শব্দের সঙ্গে মিশে গেলো জিনদের চিৎকার। কর্কশ আওয়াজ শুনে শিকারী পাখিরা আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে শত্রু সেনাদের ওপরে। বাঘ-সিংহ-চিতা-হায়নারা ছুটে এসে আমাদের সৈন্যদের মুখে করে ধরে নিয়ে গিয়ে বসে-বসে কড়মড় করে চিবোতে লাগলো তাদের হাড়। লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের দাপাদাপিতে মাটি উঠলো কেঁপে। লক্ষ লক্ষ পাখির পাখার ঝাপটায় আকাশটা ফালাফালা হয়ে গেলো। আহতদের আর্তনাদে খানখান হয়ে গেলো আকাশ বাতাস। সে এক বীভৎস দৃশ্য। মনে হলো যেন সারা দোজখই নেমে এসেছে পৃথিবীর ওপর।

বিদ্রোহী জিনদের সেনাপতি আমি। আমিও আমার সৈন্যদের যুদ্ধ করতে আদেশ দিলাম। আমার সৈন্যরা দিমির‍্যাত পরিচালিত জিনদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সামনে থেকে সেনাবাহিনী পরিচালনা করলাম আমি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করলো শাহরাজাদ।

তিনশো বিয়াল্লিশতম রজনী ঃ

পরের দিন আবার শুরু করলো শাহরাজাদ।

আমি ভাবলাম সুলেমানকে খুঁজে বার করে নিজের হাতে তাঁকে শেষ করে ফেলব। যেই তাঁর কাছাকাছি গেছি অমনি সুলেমান তাঁর আগ্নেয়গিরির মত মুখব্যাদন করে আগুনের গোলা ছুঁতে লাগলেন। তাঁর ওপরে সোঁ করে লাফিয়ে পড়ব বলে আমি আকাশের অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিলাম। আগুনে গোলার হলকা আমাকে নীচে নামিয়ে আনল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। জ্বলন্ত কয়লা লেগে আমার সারা শরীরটা জ্বলতে লাগলো। জ্বলন্ত কয়লার গোলা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়তে লাগলো আমাদের সৈন্যদের ওপরে।

এভাবে কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায় বলো? তবু আমি হাল ছাড়িনি—আপ্রাণ লড়তে লাগলাম সৈন্যদের নিয়ে। কিন্তু সুলেমানের সৈন্য এত বেশী, আর এত বিচিত্র ধরনের যে পিছু হটা ছাড়া আমাদের আর উপায় রইলো না। সৈন্যদের পিছু হটার নির্দেশ দিলাম আমি। আর সে সঙ্গে আমিও প্রাণপণ শক্তি উড়ে পালানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলোমা না। পশু-পাখি-মানুষ আর জিন দিয়ে সুলেমান আমাকে ঘিরে ফেললেন। আমাদের অনেকেই একেবারে মারা গেলো; অনেকেই জানোয়ারদের পায়ের চাপে চ্যাপটা হয়ে গেলো। সুলেমানের পাখিরা আমাদের সৈন্যদের মধ্যে অনেকেরই চোখ নিলো খুবলে, মাংস খেলো ছিঁড়ে খুঁড়ে।

প্রায় তিন মাস পালিয়ে বেড়ানোর পরে ধরা পড়লাম আমি। শাস্তিস্বরূপ তারা আমাকে এই কালোপাহাড়ের গায়ে শক্ত করে বেঁধে রাখল। এ শাস্তি আমাকে চিরকালই ভোগ করতে হবে। আমার সৈন্যদের ধোঁয়ায় রূপান্তরিত করে তামার জালার ভেতরে বন্দী করে রাখা হলো। সেই জানলাগুলির মুখ ভালো করে এঁটে সুলেমান তাঁর নিজের শীলমোহরের ছাপ দিয়ে দিলেন। তারপরে সেগুলিকে সমুদ্রের গর্ভে ফেলে দেওয়ার দিলেন নির্দেশ। সেই সমুদ্রের ঢেউ তাম্র-নগরীরর প্রাচীরে এসে ক্রমাগত ধাক্কা খাচ্ছে।

যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই আমার এই অবস্থা। এই দেশের আর সকলের নসীবে কী ঘটছে তার আমি জানি নে। তবে তাম্র-নগরীর ভেতরে গেলে কাউকে-না-কাউকে নিশ্চয় তোমরা দেখতে পাবে। তারাও হয়ত আমারই মত বন্দী। তাদের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয় তোমরা তাদের-ও কাহিনী শুনতে পাবে।

কাহিনী শেষ করে দৈত্যটা প্রচণ্ড বেগে গা ঝাড়া দিলো একটা। সেই শব্দে চারপাশে বিরাট একটা আলোড়ন জেগে উঠলো। ভয় পেয়ে মুশা তাঁর দলবল নিয়ে একটু পিছিয়ে গেলেন। দৈত্যটার কাহিনী শুনে মুশার একটু দয়াও হয়েছিলো। হয়ত, বাঁধনটা তার খুলেও দিতেন তিনি; কিন্তু তার এই বর্বর ব্যবহারে, তাঁর মায়া নষ্ট হয়ে গেলো। দৈত্যটিকে পেছনে ফেলে তাঁরা তাম্র-নগরীর দিকে যাত্রা করলেন। ওই তো কাছেই তাম্র-নগরী। তার মিনারের, স্তম্ভের, প্রাচীরের গায়ে সূর্যাস্তের অজস্র লাল রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত পায়েই এগিয়ে গেলেন তাঁরা।

তাম্র-নগরীতে পৌঁছবার আগেই অন্ধকার নেমে এলো; তারপরে এলো রাত। সমস্ত নগরীটিই নিস্তব্ধ অন্ধকারে থমথম করছে। কী যেন একটা ভয়ে তাঁদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

কী করা উচিৎ পরামর্শ করলেন মুশা। তারপরে ঠিক হলো—রাত্রিতে নগরীতে প্রবেশ করে কাজ নেই। ভোর হলেই না হয় যাওয়া যাবে। তাই হলো। সিংহ দরজার কাছে তাঁবু খাটিয়ে সকলেই শুয়ে পড়লেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ার ফলে শোওয়া মাত্র সবাই গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লেন।

ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটে উঠেছে। সবাইকে জাগিয়ে দিলেন মুশা। তাড়াতাড়ি সব কিছু বেঁধে ছেঁদে রওনা হলো দলটি। যে-কোন একটা দরজা দিয়ে ভেতরে চলো। ভোর

পেরিয়ে সকাল এগিয়ে এলো। চারপাশে আলো ঝলমল করছে। সেই আলোতে তাম্র-নগরীর তামার পাঁচিল গেলো দেখা। কী চমৎকার ঝকমক করছে। দেখলেই মনে হবে, এইমাত্র যেন পাঁচিলটা কারখানা থেকে তৈরি হয়ে এসেছে। খুব উঁচু পাঁচিল চারপাশে পাহাড়টাকে আড়াল করে রেখেছে। পাহাড়ের সঙ্গে তামার পাতগুলি বেশ শক্ত করে আঁটা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ওটা পাহাড়েরই একটা অঙ্গ।

প্রযুক্তিবিদ্যার এমন নিখুঁৎ কাজ আগে কেউ দেখেনি। অবাক বিস্ময়ে সবাই সেই পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু দরজা কোথায়? তাজ্জব ব্যাপার! সকলের চোখই দরজা খুঁজতে ব্যস্ত। সেই দরজার অনুসন্ধানে পাঁচিলের পাশ দিয়ে সবাই হাঁটতে লাগলেন। ভেতরে ঢোকার পথ নিশ্চয় কোথাও না কোথাও রয়েছে।

অনেকক্ষণ কেটে গেলো। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোন দরজাই মিললো না। নিদেন পক্ষে একটা আধটা ফোকর পেলেও চলত। তা-ও চোখে পড়ে না কারও। এত বড় একটা নগরী। এখানে একটা প্রাণীকেও তাঁরা ঢুকতে বা বেরিয়ে আসতে দেখলেন না। সত্যিই বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

এদিকে বেলা বাড়তে লাগলো। অথচ নগরীর ভেতর থেকে আওয়াজ নেই। জীবন্ত প্রাণী থাকলেই কিছু-না-কিছু একটা শব্দ হয়। কিন্তু এখানে সেরকম একটা শব্দও তাঁদের কানে এলো না। নিজেদের পায়ের শব্দ আর কথা বলার শব্দ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই।

কিন্তু মুশা হাল ছাড়ার পাত্র নন। সকলকেই তিনি উৎসাহ দিতে লাগলেন। আগে চলো, আগে চলো, চলতে চলতে এগিয়ে এলো বিকাল। তারপরে একসময় তাও গড়িয়ে গেলো। সামনে সেই নিশ্ছিদ্র তামার প্রাচীর। মনে হলো যেন পৃথিবী ফুঁড়ে তাদের সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে। এর না আছে আদি না আছে অন্ত। সন্ধ্যার অন্তরালে একটা প্রাগৈতিহাসিক ছায়া যেন তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

ধীরে ধীরে নেমে এলো রাত্রি। বিশ্রাম করার জন্যে সবাইকে নির্দেশ দিলেন মুশা। আগের দিনের মত তাঁবু খাটিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। একা জেগে রইলেন কেবল মুশা। ভাবতে লাগলেন এ-হেন পরিস্থিতিতে কী করবেন তিনি, কী তাঁর করা উচিৎ। যেমন করে হোক ভেতরে ঢোকার পথ তো একটা তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে। সৈন্যদের ওপরে তাঁবু রক্ষার ভার দিয়ে সামাদ আর তালিব বিনকে নিয়ে তিনি পাহাড়ে ওঠার জন্যে রওনা হয়ে গেলেন। দেখতে হবে ভেতরে কী রয়েছে। চারপাশটাও একবার দেখা দরকার। কেন ভেতরে ঢোকার পথ পাওয়া যাচ্ছে না। তাও খুঁজে বার না করলে আর চলছে না।

রাত্রি শেষ হতে চললো দেখে গল্প বলা থামিয়ে দিলো শাহরাজাদ।

তিনশো তেতাল্লিশতম রজনীতে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ ঃ

সটান পাহাড়ে উঠে গেলেন তিনজন। চারপাশে একেবারে নিতল কালো অন্ধকার তার ডানা মেলে চুপচাপ বসে রয়েছে। সেই দুকূলপ্লাবনী অন্ধকারে চোখগুলি থিতিয়ে নিতে সময় গেলো তাঁদের। হঠাৎ পূব দিক থেকে একটা জোরালো আলো এসে পড়লো। দেখা গেলো পাহাড়ের পেছন থেকে চাঁদ উঠছে। দেখতে-দেখতে চাঁদটা পাহাড়ের ওপরে উঠে এলো। এবার পাহাড় আর সমতল সবই ভরে গেলো অপরূপ একটি রূপালি আলোতে। সেই আলোয় তাম্র-নগরীর ভেতরে তাকালেন তাঁরা। যা দেখলেন, তাতে তাদের চোখ আপ্লুত হয়ে উঠলো বিস্ময়ে। বিস্মিত হতবাক হয়ে গেলেন তাঁরা।

এ যেন এক স্বপ্নময় শহর।

সারা শহর চাঁদের আলোতে ভেসে যাচ্ছে। অনেক দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

সব কিছু। সে আলোকে তাঁরা দেখতে পেলেন বড়-বড় প্রাসাদ আর তাদের গম্বুজগুলি সারা শহর ছড়িয়ে রয়েছে। কী সুন্দর তাদের গঠন-ভঙ্গিমা। দেখা যাচ্ছে বড়-বড় প্রাসাদের ছাদ, আর অলিন্দ। শহরের মাঝখান দিয়ে বেশ বড় একটা খাল যাচ্ছে বয়ে। তার দুপাশে অজস্র সবুজ গাছের সারি। সেই সব গাছে ছায়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে খালের জল বয়ে চলেছে। প্রাচীরের বাইরেই সমুদ্র। দূর থেকে দেখতে লাগছে অনেকটা ধাতুর পাহাড়ের মত। তামার প্রাচীর, বাড়ির ছাদ, সমুদ্র, খাল, আর পশ্চিমের পাহাড়ের ছায়া সব মিলিয়ে ওই চাঁদের আলোয় রাত্রের মিঠে হাওয়া এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

সেই আলোতে বিস্তীর্ণ সমাধিক্ষেত্র নিঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে। কোন মানুষ নেই, মানুষের কোন চিহ্ন ওখানে নেই। সমাধিক্ষেত্রের ওপরে তামার ঘেরা টোপ, পাথরে কুঁদা অশ্বারোহীর বিরাট মূর্তি, আকাশের পাখি, বিরাট-বিরাট প্রাসাদ যেন কোন এক মায়ামন্ত্র বলে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। বাদুড় বা প্যাঁচা—তারাও বোধ হয় এই বিশাল স্তব্ধতাকে এড়িয়ে চলেছে।

তাম্র-নগরী সুপ্ত। এ ঘুম বোধ হয় আর ভাঙবে না তার।

এ এক অভিশপ্ত পুরী।

সবই দেখলেন মুশা; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। সঙ্গীদের নিয়ে নীচে নেমে এলেন তিনি। পাহাড় থেকে নেমে আবার তাঁরা প্রাচীরের সামনে এসে থামলেন। প্রাচীরের দিকে তাকাতেই চারটি উৎকীর্ণ লিপি চোখে পড়লো তাঁদের। এগুলির হরফ-ও রোমান। সেখ আব্দ-অল-সামাদ লিপিগুলি একটি একটি করে পড়ে তাদের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন সবাইকে।

প্রথম কবিতাটি পড়লেন সামাদ—

হে মানুষের সন্তান, তোমরা কেবল
ভবিষ্যতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ যোগ করে যাচ্ছ;
কিন্তু মৃত্যুর ধূসর শূন্যতা
তোমাদের সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট করে দিচ্ছে।
সকলের ওপরে এক প্রভু রয়েছেন—
তিনি সৈন্যবাহিনীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন
রাজচক্রবর্তীদের জন্যে তিনি ছোট-ছোট
অন্ধকারে কুঠরি ঠিক করে দিয়েছেন।
রাত্রির অন্ধকারে তারা সব ধূলিশয্যা থেকে উঠে
সব একাকার হয়ে যায়।

বুকের বেদনা চেপে রাখতে পারলেন না মুশা; বলে উঠলেন—উঃ! কী নিষ্ঠুর!! আত্মা অবিনশ্বর। এ-দুনিয়ায় আল্লার চোখে সবই সমান। কিন্তু আত্মাকে তো ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় না। সে জাগবেই। সত্যি বলছি সামাদ সাহেব, বয়েৎটি আমার মনে গেঁথে গেলো।

দ্বিতীয় কবিতাটি পড়লেন সামাদ—

হে মানুষের সন্তান, চোখের ওপরে
তোমরা হাত চাপা দাও কেন?
ভয়ে-ভয়ে তুমি এই পথে খেলা কর কেন?
এই পথই তো তোমাকে আর একটি ঠিকানায় নিয়ে যাবে।
সেই রাজারা আজ কোথায়?
কোথায় বা সেই সব বলদীপ্ত মানুষগুলি?
হে মানুষের সন্তান,

সেই ইরাকের প্রভু আজ কোথায়?
কোথায় আজ সেই ইস্পাহানের সম্রাট?

এই কবিতাটিও বড় ভালো লাগলো মুশার। তৃতীয় কবিতাটি পড়তে লাগলেন সামাদ ঃ

হে মানুষের সন্তান, পথের ওপরে
অপরিচিত একটি মানুষকে তুমি দেখতে পাচ্ছ,
তুমি তাকে ডাকলে, সে থামলো না।
সেই তো তোমার জীবন।
এখন সে ভারত আর চীন সম্রাটের সঙ্গে
তাড়াতাড়ি দেখা করতে ছুটছে
সিনহা আর নুবিয়ার সম্রাটের সঙ্গে
তার যে জরুরী দরকার।
তাঁরা তো তোমারই মত
দুর্নিবার কোন এক নিঃশ্বাসের ঝড়ে
পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে নীচে।

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন মুশা—কোথায় গেলো সেই নুবিয়া আর সিনহার সুলতানেরা? সব শেষ হয়ে গিয়েছে তাদের। এক দুর্নিবার ঝড়ে প্রভুত্বের শিখর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়েছে তারা।

শেষ কবিতাটি পড়তে শুরু করলেন সামাদ—

হে মানুষের সন্তান, কৃশাঙ্গী মৃত্যু
তোমার কাঁধের ওপরে পাখির মত বসে রয়েছে,
তোমার সুরার পেয়ালার দিকে তাকিয়ে রয়েছে
তাকিয়ে রয়েছে তোমার প্রিয়ার কুচ যুগের দিকে।
বিশ্বের চাতুরীর জালে ধরা পড়েছ তুমি—
আর মাকড়সা তোমারই পেছনে ওৎ পেতে বসে রয়েছে—
শূন্যতাই এই মাকড়সার আর একটি নাম।
পাহাড়ের শিখরের মত যাদের আশা ছিলো উঁচু
তারা আজ কোথায়?
তারা প্যাঁচারই আগে থাকত কবর খানায়
আজ তারা প্রাসাদের বাসিন্দা।

অন্তরের বেদনা চোখ দিয়ে উপছে পড়লো মুশার। চোখ দুটো দিয়ে তাঁর জলের ধরা গড়িয়ে পড়লো। কপাল টিপে মুখ নিচু করে আপনার মনেই তিনি বললেন—হে জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা, মেরেই যদি ফেলবে তাহলে অযথা আর মানুষের জন্ম দিলে কেন? আমরা তুচ্ছ মানুষ। পরম পিতা আল্লাহই আমাদের আসল ঠিকানা জানেন। এই প্রশ্নের জবাব কী হবে একমাত্র তিনিই জানেন। আমাদের কাজ কেবল তাঁর আরাধনা করা, তাঁর নির্দেশ বিনা অভিযোগে মেনে নেওয়া।

সঙ্গীদের সঙ্গে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলেন মুশা। তাঁবুতে ফিরে নির্দেশ দিলেন সেনানীদের—এখনই দু'খানা মই তৈরি কর। সেই মই বেয়ে আমরা তামার প্রাচীর টপকে ভেতরে যাব। একখানা মই থাকবে বাইরে; সেটা দিয়ে উঠবে। একটা থাকবে ভেতরে, সেটা দিয়ে নামবে।

সেনানীরা সঙ্গে-সঙ্গে পাহাড় থেকে কাঠ কেটে নিয়ে এলো। ফালাফালা করলো কাপড়। সেই ফালা কাপড় আর কোমর বন্ধনী দড়ির মত করে নিলো। সেই সঙ্গে নিলো কিছু উটের লাগাম। তাই দিয়ে বেশ শক্ত করে দুটো মই তৈরি করে ফেললো। পাথরের ছোট

টুকরো দিয়ে শক্ত করে নিলো মই-এর গোড়া। মই লাগানো হলো দেওয়ালের গায়ে। আল্লাহর নাম করে উঠতে লাগলো সবাই। আগে উঠলেন মুশা নিজে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো চুয়াল্লিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাতে আবার শুরু হলো শাহরাজাদের কাহিনী।

তাম্র নগরীতে ঢোকার আগে মুশা জন কয়েককে রেখে গেলেন তাঁবু পাহারা দেওয়ার জন্যে। বাকি সকলকে নিয়ে তিনি উঠলেন প্রাচীরের মাথায় প্রাচীরটা বেশ চওড়া। কিছুটা পথ প্রাচীরের ওপর দিয়েই হেঁটে গেলেন সকলে; থামলেন দুটো উঁচু বুরুজের মাঝখানে। বুরুজ দুটো দু'খানা তামার দরজা দিয়ে শক্ত করে আঁটা। দরজা দুটো এমনভাবে আঁটা যে তাদের ফাঁক দিয়ে একটা সূঁচ-ও গলানো যায় না। দরজার পাল্লার ওপরে সোনার তৈরি নিরস্ত্র একটি অশ্বারোহীর মূর্তি। একখানা হাত দিয়ে কী যেন বলতে চাচ্ছে সে। ভালো করে পড়তেই দেখা গেলো রোমান হরফে একটি নির্দেশ লিপি। লিপিটি যথারীতি পাঠোদ্ধার করার পরে বোঝা গেলো সব। লেখা রয়েছে—নাভির কাছে একটা পেরেক আছে। বারোবার সেটা টিপে দাও।

তাড়াতাড়ি মূর্তিটার কাছে এগিয়ে এলেন মুশা। মূর্তিটার নাভির কাছে সত্যিই একটা সোনার পেরেক রয়েছে। গুণে-গুণে বারোবার সেই পেরেকটা টিপে দিলেন মুশা। আর সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজিকের মত পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে গেলো। দেখা গেলো, দরজার পাশ দিয়ে লাল গ্রানাইট পাথরের বিশাল একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গিয়েছে। দেরি না করে মুশা তাঁর দলবল নিয়ে নিচে নামতে শুরু করলেন। নেমে এসে একটা হলো ঘরের মধ্যে দাঁড়ালেন তাঁরা। হল ঘরের সামনে রাস্তার ওপরে কয়েকজন প্রহরী পাহারা দেওয়ার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের এক হাতে ধনুক, আর এক হাতে তরবারি।

মুশা বললেন—ওরা যাতে আমাদের বাধা না দেয় সে কথা ওদের বলতে হবে আমাদের।

প্রহরীদের কাছে গিয়ে দলবল নিয়ে মুশা দাঁড়ালেন; বললেন—আমি এদের দলপতি। আপনাদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখতে চাই। আমরা ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলব।

কেউ নড়লো না, চড়লো না। যেমন দাঁড়িয়েছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।—নিথর নিস্পন্দ। আগন্তুকের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখলো না। তবে কি এরা আরবি বুঝতে পারছে না?

সামাদকে বললেন মুসা—আপনার জানা যত ভাষা রয়েছে সেই সব ভাষাতে এদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, এরা বুঝতে পারে কি না।

গ্রীক ভাষা দিয়ে শুরু করলেন সামাদ। কোন কাজ হলো না। হিন্দু, হিব্রু, ইথিওপিয়ান, এমনকি শেষ পর্যন্ত পারশিয়ান আর সুদানিজ ভাষাতেও কথা বললেন তাঁদের সঙ্গে। বৃথা চেষ্টা। কেউ কোন সাড়া পর্যন্ত দিলো না।

মুশা বললেন—আমরা কেউ ওঁদের অভিবাদন জানাই নি। সেই জন্যেই সম্ভবত এঁরা আমাদের ওপরে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি একটা কাজ করুন সামাদ সাহেব। দুনিয়ায় যত রকমের অভিবাদনের রীতি রয়েছে সে সবগুলিই আপনি এঁদের কাছে দেখান তাতে কোন কাজ হয় কি না দেখি।

ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধ সামাদ বিভিন্ন দেশের রীতিতে অভিবাদন জানালেন। না; এতেও তাদের মুখে কোন কথা ফুটলো না। কেউ সাড়া দেবে না বলেই যেন মনে হচ্ছে। আর ফালতু চেষ্টা আর সেই সঙ্গে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সবাইকে পিছু পিছু আসার নির্দেশ দিয়ে মুশা রাস্তায় নেমে চলতে শুরু করলেন। প্রহরী যেমন ছিলো তেমনি নির্বকার ভাবেই পড়ে রইলো।

যেতে-যেতে সামাদ বললেন—আল্লাহ দুনিয়ায় অনেক ঘুরেছি আমি, দেখেছি

অনেক। কিন্তু এমন তাজ্জব ব্যাপার কোন দিনই আমাদের চোখে পড়েনি। এ যেন আমাকে একেবারে হতবুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

হাঁটতে-হাঁটতে দলটি একটা বাজারে এসে পড়লো। দোকান পাট সব খোলা। হাটের ভেতরে গিজগিজ করছে লোকে। থরে-থরে জিনিসপত্র সব সাজানো দোকানে। জোর বাজার চলছে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে। কিন্তু কী অদ্ভুৎ! কেউ নড়াচড়া করছে না। যে যার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতবড় বাজার। এত লোক। কিন্তু টু শব্দটিও নেই কোথাও। দেখে মনে হচ্ছে, পরদেশী দেখে সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভিনদেশী মানুষেরা চলে গেলে আবার যে যার কাজে মন দেবে। কিন্তু তাঁদের দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করছে না। নাকি, অবজ্ঞা দেখিয়েই তারা ওঁদের আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে নীরবে।

বাজার থেকে বেরিয়ে তাঁরা আবার চলতে শুরু করলেন। চলতে-চলতে আর একটা ছন্দওয়ালা বাজারে হাজির হলেন তাঁরা। কিন্তু সেই একই ব্যাপার। লোক আছে, লস্কর আছে, জিনিস আছে, পত্র আছে, ক্রেতা আছে, বিক্রেতা আছে। যা নেই তা হচ্ছে আলোড়ন; মুশার দলের লোকের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না।

রাস্তার ওপরের দৃশ্যও সে-ই একই। দুপাশে চক মেলানো বাড়ি। রাস্তায় অনেক লোকজন। তাঁরা চলছেন। কেউ তাঁদের লক্ষ্য করছে না; আহ্বানও করছে না, বিরক্ত-ও হচ্ছে না। এমন কি তাঁদের দেখে কারও মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠেনি। পথের ধারে সোনার দোকান, রেশমী কাপড়ের দোকান, মশলার দোকান, গন্ধ দ্রব্যের দোকান। কিন্তু সব চুপচাপ সবই নিশ্চল।

একটা বাজারের সীমান্তে এসে থামলেন তাঁরা। সামনেই বিরাট একটা তামার চাদর। তারই ওপরে রোদ পড়ে ভীষণ চকচক করছে সব। ওরই আলোতে ঝলমল করছে বাজার। তামার চাদরের ওপাশে শ্বেতপাথরের বিরাট একটা প্রাসাদ। তার দুধারে দুটো কেল্লা। কেল্লার পুরোটাই তামার তৈরি। কেল্লার মাথাটা এত উঁচু যে মাথা তুলে দেখতে গেলেই মাথাটা ঘুরে যায়। কেল্লার সেই তামার দেওয়ালে সোনার পাতে আঁকা-নানা রকম পশুর ছবি। সেই সব পশুদের আবার পাখা রয়েছে। প্রাসাদের সামনে প্রহরীরা সব সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের কারও হাতে তরবারি, কারও হাতে বল্লম। সূর্যের আলো পড়ায় তরবারি আর বল্লমগুলি যেন আগুনের মত জ্বলছিলো। প্রাসাদের যে বিরাট দরজা সেটিও সোনায় তৈরি।

মুশা তাঁর দলবল নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঢুকেই একটা বড় গ্যালারি দেখতে পেলেন। নিরেট পাথরের বিরাট বিরাট থামের ওপরে প্রাসাদটা দাঁড়িয়ে। গ্যালারির মাঝখানে সুন্দর এক ফালি চাদর। রঙিন পাথর দিয়ে সেটি তৈরি। গ্যালারিটাকে একটা দুর্গ বলে মনে হচ্ছে। এর দেওয়ালে দেওয়ালে কত রকমের অস্ত্র শস্ত্র যে ঝুলছে তার আর ইয়ত্তা নেই। অস্ত্রগুলির হাতলে মূল্যবান পাথর বসানো। সেই গ্যালারিতে বসে-বসে অনেক দর্শক সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখছে। কালো মেহগনি কাঠের ওপরে সোনার পাতা দিয়ে মোড়া আসনগুলি।

আশ্চর্যের কথা মুশার সৈন্য সামন্তদের দেখে কেউ কিন্তু আদৌ বিচলিত হলো না। এমন কি তাঁদের কেউ বাধাও দিলো না। নির্বিবাদে এগিয়ে চললেন তাঁরা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো পঁয়তাল্লিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে যথারীতি গল্প শুরু করলো শাহরাজাদ।

গ্যালারির বাঁকানো কার্নিশের দিকে নজর পড়লো তাঁদের। সেখানেও সোনার পাতে রোমান হরফে একটা কিছু লেখা রয়েছে। সামাদ তার পাঠোদ্ধার করে বললেন ঃ

হে মানুষের সন্তান,
তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দাঁড়াও,
দেখবে, মৃত্যু তোমার পিছনে রয়েছে।
আদম তাকে দেখেছিলো, দেখেছিলো নিমরড;
পারস্যের সম্রাটরাও দেখেছিলো তাকে।
আর দেখেছিলো বিশ্বজয়ী আলেকজান্দার।
হামাম, কারুম, আর সাদাদ-ও দেখতে
ভুল করে নি তাকে।
এ-জগৎ ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ এসেছিলো
তাদের ওপরে—
একটি প্রশ্নও করা হয়েছিলো তাদের
যে প্রশ্ন এ-জগৎ করতে পারত না তাদের।
হে অমৃতের পুত্রগণ, শোনো ঃ
মৃত্যুর ভয়ই মানুষের মধ্যে জ্ঞানের
উন্মেষ করে;
এ জীবনে যতটুকু ভালো কাজ তুমি করবে
এই রক্তাক্ত জীবনে
সেই গুলিই ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

ছত্র কটি লিখে নিলেন মুশা। সেই দেখে আরও কয়েকজন লিখে নিলেন বয়েতটি। তারপরে দলটি গ্যালারির পাশ দিয়ে আর একটি ঘরে ঢুকলো। এই ঘরের মাঝখানে স্বচ্ছ পাথরের মুখ দিয়ে জলের ফোয়ারা বেরিয়ে আসছে। ভেতরে ছাদটা ঢাকা ছিলো সোনালি সূতোয় কাজ করা সিল্কের কাপড়ে। শিল্পশৈলীর এ এক অপরূপ নিদর্শন। ফোয়ারার জল চারটি নালি দিয়ে বয়ে চলেছে। মেঝের ওপর দিয়ে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে নালিগুলি কাটানো হয়েছে। চারটি নালির চারটি তলা বিভিন্ন রঙ দিয়ে তৈরি। প্রথমটি লাল পাথরের, দ্বিতীয়টি পোখরাজের, তৃতীয়টি পান্নার মত সবুজ পাথরের, চতুর্থটি তৈরি হয়েছে নীলকান্ত মনি দিয়ে। নালির ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় জলগুলিও ভিন্ন-ভিন্ন রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সিল্কের ছাদ থেকে আলো এসে পড়েছে সেই সব নালির জলের ওপরে। সেই রঙ ছিটকে পড়ছে শ্বেত পাথরের দেওয়ালের ওপরে। প্রতিবিম্বিত হয়ে সেই রঙ বিশাল সমুদ্রের আমেজ এনে দিচ্ছে ঘরের মধ্যে।

দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে আর একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো দলটি। সেই ঘরে জমা হয়ে রয়েছে পুরানো আমলের সোনা রূপার মুদ্রা, হীরা, মুক্তা, মনি, জহরৎ। কিন্তু এত দামী-দামী পাথরগুলি ঘরের মেঝেতে ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে ঘরের ভেতর দিয়ে হাঁটতে কষ্ট হয়।

এই ঘরের ভেতর দিয়ে দলটি আর একটি ঘরে প্রবেশ করলো। এই ঘরে ছিলো নানান জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র—বহু দুষ্প্রাপ্য আর মূল্যবান ধাতু দিয়ে গড়া সেগুলি। রঙিন পাথর বসানো সোনার ঢাল, সাবেকী আমলের শিরস্ত্রান, ভারতীয় তরবারি, বর্শা, বল্লম ইত্যাদি। এসব অস্ত্র সব

ডেভিড অথবা সুলেমানের আমলের। অস্ত্রগুলি সব চকচক করছে। মনে হলো, যেন সবে তৈরি হয়ে এসেছে।

চতুর্থ ঘরটি জামা-কাপড়ে বোঝাই। দেওয়ালের ধারে চন্দন কাঠের আলমারিতে সাজ পোশাক সব যত্ন করে তোলা রয়েছে। দুর্মূল্য সিল্ক আর মসলিনে তৈরি এই সব পোশাক। এর পরের ঘরটিতে নানা রকমের বাসন কোসন ছিলো। ফুলদানি থেকে শুরু করে খানাপিনার, মায় স্নানের বাসন পর্যন্ত রয়েছে। এসব বাসনই সোনা বা রূপোর তৈরি। স্নানের পাত্রটি স্বচ্ছ পাথরের, মূল্যবান পাথরের তৈরি পান পাত্র। খাবার বাসনগুলি দামী দামী নানান রঙিন পাথরের তৈরি।

মনে হয় যেন বেহেস্তের ঐশ্বর্য এক জায়গায় এসে জড় হয়েছে এইখানে। দেখে-দেখে আশা মেটে না কারও। হঠাৎ তাঁদের মনে হলো, অনেকক্ষণ ঘুরছেন তাঁরা; এবার ফেরার সময় হয়েছে। যে পথে এসেছেন সেই পথ ধরে ফেরাই সুবিধেজনক।

পেছন ফিরলেন তাঁরা। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের একটা দেওয়ালের ওপরে তাঁদের চোখ আটকে গেলো। সোনার কাজ করা মহামূল্যবান সিল্কের বিরাট একটি পর্দা ঝোলানো রয়েছে সেইখানে। তাতেই ঢাকা পড়েছে দেওয়ালটা।

পর্দাটা তুলতেই বিরাট একটা দরজা দেখা গেলো। আবলুস কাঠের দরজায় রূপোর তালা ঝোলানো। কিন্তু ঘরটা খোলা যায় কেমন করে? ওর চাবিটা কোথায়? তালাটা খোলার কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না তারই জন্যে সামাদ সাহেব চারপাশে দেখতে লাগলেন। তালাটার নিচে ছোট একটা স্প্রিং লাগানো। সেইখানে চাপ দিতেই তালাটা গেলো খুলে। তালাটা খুলে যেতেই সবাই ঢুকে পড়লেন ভেতরে। মার্বেল পাথরের বিরাট গম্বুজ রয়েছে ঘরের ভেতরে। আয়নার মত চকচক করছে পাথরের জানালা। তাতে নানান রকমের মূল্যবান পাথরের কাজ। বাইরের আলো সেই সব পাথরের ওপরে পড়ে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে। অপরূপ সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপরে পাতা সোনার কাজ করা কার্পেট। তার ওপরে বসানো পাখি। তার ঠোঁট দুটো রুবির; পাখার পালক পান্নার। তাছাড়া রয়েছে সুন্দর সুন্দর ফুলের শোভা। কেবল গন্ধটাই নেই তাদের। চারধারে গাছের ডালে বসে রয়েছে পাখিরা। এখনই যেন সঙ্গৎ শুরু হবে। ঘরের মাঝখানে একটা উঁচু বেদী।

কয়েকজনকে নিয়ে মুশা সেই বেদীর ওপরে এসে দাঁড়ালেন। একটা জিনিস দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। মনিমুক্তার কাজ করা একটি মখমলের চাঁদোয়ার তলায় বড় একটি পালকের ফুলের মত একটি মেয়ে শুয়ে রয়েছে। টানা টানা ভুরুর দু'ধারে পদ্ম পাপড়ীর মত চোখ বুজিয়ে মেয়েটি ঘুমোচ্ছে। তার মাথার সোনার মুকুটখানি তার চুলগুলিকে জড়িয়ে রেখেছে, হাওয়ায় এলোমেলো হতে দেয় নি। মুক্তার হারটি তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে সলজ্জভঙ্গীতে পড়ে রয়েছে। দুধারে মেয়েটির মাথার কাছে দুটি ক্রীতদাসী দাঁড়িয়ে। একজন ফর্সা, আর একজন কালো, একজনের হাতে উন্মুক্ত কৃপান, আর একজনের হাতে বর্শা। মেয়েটির পায়ের কাছে একটি পাথরের ফলকে লেখা ঃ আমার নাম তদমুর। আমালকাইৎসের রাজকন্যা। এ শহর আমার। চারদিকে ধনরত্ন যা পড়ে রয়েছে তা তোমরা ইচ্ছেমত নিয়ে যেতে পার। এখানে যে আসবে সব কিছু তারই। কিন্তু সাবধান। আমার রূপে অন্ধ হয়ে কেউ যেন আমাকে স্পর্শ করো না। যে করবে তার সর্বনাশ হবে।

ঘুমন্ত রাজকুমারীকে দেখে মুশা কেমন যেন সংবিৎ হারিয়ে ফেলছিলেন। সাবধান বাণীটি পড়ে হঠাৎ নিজেকে সামলিয়ে নিলেন তিনি।

মুশা বললেন—এখন থেকে এখান আমাদের চলে যেতে হবে। দুনিয়ার সব আশ্চর্য জিনিসই তো আমরা দেখলাম। এ দৃশ্য জীবনে কেউ ভুলতে পারবে না। এবার যেতে

হবে সমুদ্রের দিকে। খুঁজে বার করতে হবে তামার জালাগুলি। সৈন্যগণ, তোমরা যার যা খুশি ধনরত্ন নিয়ে যেতে পার। কিন্তু সাবধান, রাজকুমারীর অঙ্গস্পর্শ কেউ করবে না।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে চুপ করে রইলো শাহরাজাদ।

তিনশো ছেচল্লিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু হলো গল্প।

সকলকেই সাবধান করে দিলেন মুসা।

তালিব বিন-সান বললেন—আমীর, এই মেয়েটির রূপের কাছে এই প্রাসাদের সব কিছুই তুচ্ছ। ওকে দামাসকাসে তুলে নিয়ে গিয়ে খলিফাকে উপহার দিতে না পারলে আমার দুঃখের আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। আমার বিশ্বাস, ইফ্রিতের জালা বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই মেয়েটিকে নিয়ে গেলে খলিফা আরও বেশী খুশি হবেন।

মুশা বললেন— রাজকন্যাকে আমরা স্পর্শ করতে পারব না।

তালিব বললেন—স্পর্শ করলে রাজকুমারী খুশিই হবেন। এটুকুর জন্যে উনি কিছু মনে করবেন না।

এই বলে রাজকুমারীকে কোলপাঁজা করে তুলে নিলেন তালিব। সঙ্গে-সঙ্গে একজন ক্রীতদাসীর কৃপাণের আঘাতে তাঁর ছিন্ন মুণ্ডু মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। দ্বিতীয় ক্রীতদাসীর বর্শার ফলক তালিবের বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেলো। তালিবের মৃতদেহটা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেলো যে কেউ বুঝতে পারলো না কী হলো। প্রাসাদের ভেতরে মুশা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ ছেড়ে, হাঁটতে লাগলেন সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের পাড়ে এসে কয়েকজন জেলেকে দেখতে পেলেন। হ্যাঁ; এরাই প্রথম কথা বললো তাঁর সঙ্গে। জেলেদের এক বুড়ো সর্দারকে ডেকে তিনি বললেন—আমাদের মালিক খলিফা আব্দ আল-মালিক-এর নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। ধর্মপ্রচারক সুলেমানের সময় কতকগুলি ইফ্রিতকে তামার জালায় পুরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো। আমরা সেইগুলির খোঁজে এসেছি। এ ব্যাপারে তুমি আমাদের একটু সাহায্য করবে? আর একটা কথা রয়েছে আমার। এই শহরের লোকজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন জান?

বুড়ো জেলে বললো—সমুদ্র তীরের সমস্ত জেলে আল্লার নির্দেশে চলে আসছে। পরম পিতা আল্লার ধর্ম প্রচারকের নির্দেশও আমরা মেনে চলি। তাম্র নগরীর মানুষদের এই অবস্থা অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। বিচারের দিন পর্যন্ত ওই রকমই চলবে।

ইফ্রিতের জালা পেতে আপনার কষ্ট হবে না। অনেক ইফ্রিৎ বন্দীই এখানে রয়েছে। জালার ঢাকনা খুলে ইফ্রিৎ বার করে মাছের সঙ্গে রান্না করে আমরা খাই। যতগুলি ইফ্রিৎ আপনার দরকার সবই আপনাকে আমি দিতে পারব। তবে খুব সাবধান। ঢাকনা খোলার আগে নিজের হাতে জালার মুখটা টিপে রাখবেন। ওদের দিয়ে শপথ করিয়ে নেবেন—ধর্ম প্রচারক মোহম্মদের নির্দেশ আমরা মানবো। ডেভিডের পুত্র সুলেমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব।

খলিফা আব্দ আল-মালিকের প্রতি আমাদের আনুগত্য দেখানোর জন্যে দুটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে উপহার স্বরূপ আপনার সঙ্গে পাঠাব। এমন রূপ দুনিয়ায় আপনি দেখতে পাবেন না।

এর পরে বুড়ো জেলে মুশার হাতে বারোটি মুখ আঁটা তামার জালা তুলে দিলো। প্রত্যেকটির ওপর সুলেমানের মোহর রয়েছে। সমুদ্রের দুটি মেয়েকেও এনে দিলো সেই সঙ্গে। সত্যিই অপূর্ব দেখতে মেয়ে দুটি। পিঠ ভর্তি ঢেউ খেলানো চুল। মুখখানা চাঁদের মত সুন্দর। বর্তুলাকার বক্ষ। নিম্নাঙ্গ আরও আকর্ষণীয়। গুরুভার নিতম্ব, সবল কদলী কাণ্ডের মত উরুদ্বয়। মনুষ্য

জগতে এ রূপ সত্যিই দুর্লভ। চলতে গেলে মাছের মত একটু ডান দিকে একটু বাঁ দিকে হেলে। সে তো চলে না নাচে। কেউ দেখছে বুঝতে পারলে নাচের ভঙ্গী আরও বেড়ে যায়। মিষ্টি গলার স্বর। হাসিটি আরও মিষ্টি। নেশা ধরে যায় যেন। জানা-অজানা কোন ভাষাতেই ওরা কথা বলতে পারে না, বুঝতে পারে না। কিন্তু বললে কেবল হাসে।

মুশা আর তাঁর সঙ্গীরা জেলেদের অজস্র ধন্যবাদ জানালেন। তারা তাঁদের অনেক সাহায্য করেছে। মুশা তাদের সর্দারকে বললেন—তোমরা আমাদের সঙ্গে দামাসকাসে চলো—আমরা তোমাদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছে বিরাট বহর। কোন কষ্ট হবে না তোমাদের। তাছাড়া, ফুলের শহর, ফলের শহর হচ্ছে এই দামাসকাস, বড় মিষ্টি শহর। খুব ভালো লাগবে তোমাদের।

মুসার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো জেলেরা।

এবার ফেরার পালা। ফেরার সময় আবার তাঁরা তাম্র-নগরীতে প্রবেশ করলেন। যে যার ইচ্ছামত যতটা পারলেন সোনা, দানা, হীরা, মুক্ত, জহরৎ, দামী-দামী পাথর বোঝাই করলেন বস্তায়, উটের পিঠে। তারপরে ফিরে এলেন তাম্র-নগরীর প্রাচীরের বাইরে যে তাঁবু ফেলা ছিলো সেইখানে। তারপরে গোটানো হলো তাঁবু। মুশার বাহিনী দামাস্কাসের পথ ধরলো। তাম্র-নগরীতে পড়ে রইলো কেবল তালিব বিন-সাল। কামনার আগুনে বেচারা নিজের প্রাণটা পুড়িয়ে দিলো নিষ্প্রাণ নগরীর চত্বরের মধ্যে।

দামাস্কাসে ফেরার পথে তাঁদের আর কোন বিপদে পড়তে হয়নি। মুশার মুখে সব শুনে খলিফা আব্দ আল-মালিক খুব খুশী হলেন; বললেন ঃ আমার নসীব খারাপ। তাই তোমাদের সঙ্গে তাম্র-নগরীতে যেতে পারলাম না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই যাতে আমি নিজে একবার সেই শহরটা ঘুরে আসতে পারি। তাম্র-নগরীর রহস্য তখনই আমি ভেদ করার চেষ্টা করব।

খলিফা এবারে নিজের হাতে এক এক করে জালার ঢাকনাগুলিকে খুলে দিলেন। জালাগুলি থেকে প্রথমে ধোঁয়া বেরিয়ে এলো; তারপরে বেরিয়ে এলো বিশালকায় ভীষণ দর্শন বারোজন ইফ্রিত।

তারা খলিফার পায়ের ওপরে পড়ে বললো—মালিক সুলেমানের বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলাম। তার জন্যে আপনার কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের বাঁচান।

বলতে-বলতে ঘরের ছাদ ফুটো করে ইফ্রিৎগুলো সব শূন্যে মিলিয়ে গেলো। উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে ওদের দেখলো।

মেয়ে দুটির রূপ, যৌবন, মিষ্টি হাসি আর মিষ্টি চাহনি দেখে খলিফা তো বেজায় খুশী, ফোয়ারার পাশে বসিয়ে দেওয়া হলো তাদের। কিন্তু বেশীদিন বাঁচল না তারা। অত গরম সহ্য করতে না পেরে কিছুদিনের মধ্যেই তারা মরে গেলো।

খলিফার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে মুশা জেরুজালামে ফিরে গেলেন। যে-সব উৎকীর্ণ লিপি তাম্র-নগরী থেকে তিনি টুকে নিয়ে এসেছিলেন সেগুলি সামনে রেখে তাদের গভীর তত্ত্বগুলি বোঝার চেষ্টা করলেন; তারপরে ধ্যান করতে-করতে একদিন জেরুজালামেই দেহ রাখলেন তিনি। ভগবানের এত বড় সাধক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছেন।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ বললো—এই হলো তাম্র-নগরীর গল্প।

শাহরিয়ার বললো—সত্যি, গল্পটি খুবই চমৎকার।

শাহরাজাদ বললো—রাত শেষ হতে এখনও বাকি রয়েছে। ইবন আল-মনসুরের জীবনে যেসব অদ্ভুত আর দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটেছিলো তাদেরই কিছু আজ জাঁহাপনাকে শোনাব। রাতটা বৃথা নষ্ট করে লাভ কী?

শাহরিয়ার জিজ্ঞাসা করলেন—এই ইবন আল-মনসুরটি কে? এঁর নাম তো কোনদিন শুনিনি।

শাহরাজাদ বললো—শুনুন তাহলে।

জাঁহাপনা, এর আগে আপনাকে খলিফা হারুণ অল-রসিদের কাহিনী বলেছি। নিজের রাজ্য আর প্রজাদের মঙ্গলের চিন্তায় রাত্রে তাঁর ঘুম হোত না। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আলি এপাশ-ওপাশ করছেন। ঘুমানোর অনেক চেষ্টা করে বুঝলেন ঘুম আর আসবে না। তখন বিরক্ত হয়ে গায়ের চাদরখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন তিনি। শয়নকক্ষের বাইরে মসরুর তরবারি হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। হাতে তালি দিয়ে খলিফা তাকে ডাকলেন। সে কাছে এসে কুর্নিশ করতেই তিনি বললেন—

মসরুর, আদৌ ঘুম আসছে না চোখে। মাথাটা বোধহয় গরম হয়েছে। এখন কী করি বলত?

মসরুর বললো—ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। এই রাত্রে রাস্তার ওপরে একটু পায়চারি করবেন? মাথাটা তাহলে ঠাণ্ডা হবে; সেই সঙ্গে শান্ত হবে মন। তারপরে বোধহয় ঘুমোতে আর অসুবিধে হবে না। প্রাসাদের বাইরে রাত্রিটি কী ঠাণ্ডা, কী চমৎকার! আসুন, আমরা গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ফুলের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে ঘুরে আসি। তারাতে ছেয়ে গিয়েছে আকাশ; একটু পরেই চাঁদ উঠবে। চাঁদের আলো নদীর জলে নামবে গোছল করতে। খুব ভালো লাগবে আপনার।

খলিফা বললেন—না, মসরুর, আজ রাত্রিতে এসব ভালো লাগবে না আমার।

মসরুর বললো—তাহলে থাক। জাঁহাপনা, আপনার হারেমে তিনশ মেয়ে রয়েছে। প্রত্যেকের জন্যেই আলাদা-আলাদা ঘর রয়েছে। আপনি আসছেন বলে প্রত্যেককেই আমি সংবাদ দিয়ে আসি। তারা সব তৈরি থাকবে। লুকিয়ে-লুকিয়ে আপনিও তাদের নগ্ন চেহারা দেখবেন। ভালো লাগতে পারে আপনার।

—মসরুর, এই প্রাসাদ আমার, মেয়েরাও আমার। কিন্তু ওদের সঙ্গ পেতে আজ রাত্রিতে আমার ভালো লাগছে না।

—জাঁহাপনা, আপনার সাম্রাজ্যে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির অভাব নেই, অভাব নেই সাধু আর কবিদের। আদেশ পেলে, তাঁদের আমি নিয়ে আসতে পারি। সাধু-সন্তদের উপদেশ আপনাকে শান্তি দিতে পারে; জ্ঞানীরা শোনাবেন তাঁদের সদ্যলব্ধ আবিষ্কারের কাহিনী, কবিরা শোনাবেন মনোহর সুরে তাঁদের ভালো-ভালো কবিতা।

—মসরুর, আজ রাত্রিতে তাও আমার ভালো লাগবে না।

—জাঁহাপনা, এ-প্রাসাদে দুনিয়ার উৎকৃষ্ট সরাব রয়েছে।

—আমার কিছু ভালো লাগছে না।

—জাঁহাপনা, আমার মাথাটা কেটে নেবেন? তাহলে হয়ত আপনার মনের অবসাদ কেটে যাবে।

রাত শেষ হয়ে এলো দেখে শাহরাজাদ থামলো।

তিনশো সাতচল্লিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু হলো গল্প।

মসরুরের কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন খলিফা হারুন অল রসিদ। তারপরে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন—ভালো বলেছ। আজ হোক, কাল হোক, একদিন সে-প্রয়োজন আসতে পারে হয়ত। যাক, তুমি প্রাসাদে ঢুকে দেখে এসো। যাকে দেখে বা যার কথা শুনে আমার ভালো লাগতে পারে এমন কেউ সেখানে রয়েছে কিনা জেনে এসে আমাকে সংবাদ দাও।

খলিফার নির্দেশ পেয়ে বেরিয়ে গেলো মসরুর; আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে এসে

কপাল চাপড়ে বললো—জাঁহাপনা, বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা—সে রকম কাউকেই পেলাম না।

কাউকেই পেলেনা?

—আজ্ঞে, আপনার ভালো লাগতে পারে এমন কেউ আমার চোখে পড়লো না। তবে বুড়ো শয়তান ইবন আল-মনসুর গুঁড়িশুঁড়ি দিয়ে এক কোণে শুয়ে রয়েছে দেখলাম।

—কোন ইবন আলের কথা বলছ তুমি? দামাস্কাসের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জাঁহাপনা; সেই বদমাইশটার কথাই বলছি।

—যাও, তাকে শীগগির এইখানে নিয়ে এসো।

মসরুর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে খলিফার সামনে নিয়ে এলো। আল মনসুর কুর্নিশ করে বললেন—আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, জাঁহাপনা।

প্রত্যাভিবাদন করে খলিফা বললেন—ইবন আল-মনসুর, আপনার জীবনের কিছু দুঃসাহসিক কাহিনী আমাকে শোনাবেন?

—জাঁহাপনা, নিজের চোখে যা দেখেছি সেই রকম কোন কাহিনী আপনি শুনবেন, না, যা শুনেছি সেইরকম কোন কাহিনী?

—নিজের চোখে যা দেখেছেন এরকম বিস্ময়কর কোন কাহিনীই বলুন। কানে শোনার চেয়ে চোখে দেখার ঘটনা অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক। নিন, তাড়াতাড়ি শুরু করুন।

—তাহলে, শুনুন জাঁহাপনা। সেই রকম একটি কাহিনীই আপনাকে আমি বলছি। মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, চোখ-কান-মন সব সজাগ রাখবেন। জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, প্রতি বছরই কয়েক দিনের জন্যে আমি বাসোরাহয় যাই। সেখানে আপনার নায়েব আমীর মুহম্মদ আল-হাসামী থাকেন। তাঁরই সঙ্গে দিনকত কাটিয়ে আসি। একবার তাঁর প্রাসাদে গিয়ে দেখি আমীর সাহেব সেজেগুজে তৈরি। শিকারে যাবেন তিনি। ঘোড়ার ওপরে বসে রয়েছেন আমীর। যাত্রা শুরু করলেই হয়। আমাকে দেখেই বললেন—উঠে এসো সাহেব। শিকারে ঘুরে আসবে।

আমি বললাম—মাফ করুন, জাঁহাপনা; ঘোড়া দেখলেই আমার গা বমি-বমি করে। সেজন্যে আমি গাধাই বেশী ভালোবাসি। শিকারে যেতে পারি, কিন্তু গাধার পিঠে, তাকে কি চলবে?

আমার কথা শুনে আমীর তো হো হো করে হেসে উঠলেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে। শিকারে তোমার যাওয়ার ইচ্ছে নেই বুঝতে পারছি। তুমি তাহলে প্রাসাদেই থাক। আমি থাকব না বলে কোন অসুবিধে হবে না তোমার। না ফিরে আসা পর্যন্ত থেকো কিন্তু, পালিয়ে যেয়ো না।

শিকারে চলে গেলেন আমীর। আমি রয়ে গেলাম প্রাসাদে। দিন কয়েক থাকার পরে ভাবলাম—প্রতি বছরই তো আমি এখানে আসি। বেড়ানোর মধ্যে প্রাসাদ থেকে বাগান, আর বাগান থেকে প্রাসাদ। তা বাপুহে, এইভাবে চললে, শেখার কথা দূরস্থান—কিছু জানতেও পারবে না, দেখতেও পাবে না, একবার শহরটাকেও তুমি ঘুরে দেখলে না। এবার সুযোগ এসেছে। সুযোগ তোমার হাতে অনেক। আমীরও নেই। এবার আল্লার নাম করে বেরিয়ে পড়। বাসোরার পথে পথে কত মজার-মজার জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে প্রাণ ভরে একবার দেখে নাও। তাছাড়া, পেটের কথাটাও ভাবতে হবে বৈকি! স্রেফ বসে থাকলে, এই সব গুরুপাক খাবার হজম হবে কেমন করে? হাঁটা চলা করলে ক্ষিদেও পাবে, মনও প্রফুল্ল থাকবে। গুরুপাক খাওয়া আর ততোধিক জমকালো পোশাকে হাঁপ ধরে যাচ্ছে। তাই প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে ঘুরতে শুরু করলাম।

জাঁহাপনা, বাসোরাতে রাস্তা রয়েছে প্রায় সত্তরটি। তাদের প্রত্যেকটিই প্রায় আড়াইশ মাইল করে লম্বা। এ সবই আপনি জানেন। একবার ঘুরতে-ঘুরতে রাস্তার গোলক ধাঁধায় আমি হারিয়ে গেলাম। পাছে লোক আমাকে বেয়াকুফ ভাবে এইজন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও পারলাম না। আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি পাছে এটা কেউ বুঝতে না পারে সেইজন্যে আরও জোরে

হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে-হাঁটতে ভেতরটা আমার শুকিয়ে গেলো; মনে হলো গায়ের চর্বিটুকুও বুঝি গলে যায়। সেই নিদারুণ রোদে, তেষ্টাও পেলো খুব।

জল না পাই, একটু ছায়া পেলেও চলে। এই ভেবে একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম। ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিতেই হবে। নাহলে, মারা যাব। গলিতে ঢুকে সুন্দর একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। বেশ বড় বাড়ি। দরজার ওপরে একটা সিল্কের পর্দা ঝুলছে—পর্দাটা আবার অর্দ্ধেক গোটানো। সামনে সুন্দর একটা বাগানও রয়েছে। সেই বাগানের ভেতরে মার্বেল পাথরে বাঁধানো সারি-সারি বসার আসন। মাথার ওপরে আঙুর গাছের লতা ছায়া ফেলেছে সেই আসনগুলির ওপরে। এই রকম একটা আসনে গিয়ে আমি বসলাম।

কপালের ঘাম মুছে ফেলে সবেমাত্র বসেছি এমন সময় হঠাৎ মেয়েলী গলার একটা গানের কলি আমার কানে ভেসে এলো। গানটি দুঃখের। অবাক হয়ে গানটা শুনলাম আমি ঃ

আমার হৃদয় গুহা থেকে চঞ্চল হরিণটি
যখন উধাও হয়ে গেলো, দুঃখ এসে তখন
সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করে দিলো। আমাকে
সে ছেড়ে গেলো কেন? আমাকে যাতে
কুমারীরা ভালোবাসে সেই জন্যে
আমি তো কোন ছলাকলার আশ্রয় নিইনি
চুম্বন অথবা অলকদামের।

আমার মনে হলো এই গানের ভেতরে অদ্ভুত কোন রহস্য রয়েছে। এমন সুন্দর কণ্ঠের মত মেয়েটি যদি সুন্দর হয় তাহলে এ-বিশ্বে সে-ই হবে অদ্বিতীয়া।

আমি ধীরে-ধীরে উঠে ভেতরে ঢোকার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। চেষ্টা করলাম পর্দাটা একটু তুলে ধরার। কিছুই দেখা গেলো না। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি বাগানের ঠিক মাঝখানে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় তাদের মধ্যে একজন বাঁদী। আর একটি মেয়েই গান গেয়েছিলো। সে মেয়েটি দেখতে সত্যিই সুন্দরী। বাঁদীর হাতে একটা বীণা।

তাদের দেখে একটা বয়েৎ মনে পড়ে গেলো আমার ঃ

মেয়েটির প্রতিটি চোখের কোনে একটি
ক্ষুদে দুষ্টু ব্যাবিলনের আগুন জ্বলছে।
জুঁই ফুলের মত সাদা তার ঘাড়ের ওপরে
আলো, তরোয়াল আর কুসুমদান।
রাত্রির অন্ধকার তার সেই
শ্বেত সৌন্দর্যকে অভিনন্দন জানায়।
তার কুচ দুটি কি নরম মাংস পিণ্ড—
পরম স্নেহে গোল করা
কিংবা হস্তপৃষ্ঠ আইভরী।
অথবা এমনও হতে পারে যে
ওই দুটি কুচ পরম স্নেহে দলা পাকানো
সাদা মাংসের তাল,।

বিশ্বাস করুন, জাঁহাপনা; সেই রূপ দেখে নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারিনি। একটি আবেশে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম—ইয়া আল্লা। সম্ভব হলে চোখ দিয়ে তাকে আমি গিলেই ফেলতাম।

কে চেঁচাল দেখার জন্যে মেয়েটি মাথা ঘোরাল তার। পর পুরুষ দেখে সে তাড়াতাড়ি নিজের নাকাবে তার মুখটা ঢেকে ফেললো। আমার এই অভদ্র ব্যবহারে রেগে গিয়ে বাঁদীটাকে আমার কাছে পাঠালো। বীণাটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বাঁদীটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বললো—এই যে শেখ, বলি, ব্যাপারটা কী? পরের বাড়ির অন্দর মহলে ঢুকে বাড়ির মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা করে না তোমার? এদিকে তো দেখছি বুড়ো বয়েস; চুল, দাড়ি দুই-ই পেকেছে। সময় হয়েছে কবরে যাওয়ার। মেয়েদের রূপ দেখার জন্যে এত নোলা কিসের, অ্যাঁ। এর আগে কী করেছিলে?

বসে-থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমি বেশ চেঁচিয়েই বললাম—তোমার কথা কিছুটা সত্যি। বয়সটা তো আর লুকানোর উপায় নেই। কিন্তু যদি নোলা বা লজ্জার কথা বলো সেটা হলো অন্য ব্যাপার।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো আটচল্লিশতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ ঃ

মনসুর বললেন—আমার কথা শুনে মেয়েটি গটমট করে আমার সামনে এগিয়ে এসে বললো—তোমার ওই সাদা চুলের চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে? চুল পেকেছে বলেই তো লজ্জা শরম সব শেষ হয়েছে। নইলে, অন্য লোকের হারেমের দরজায় এসে কোন আহম্মক এভাবে উঁকি দেয়?

কুর্নিশ করে বললাম—আল্লার দিব্যি, আমার পাকা দাড়ির বদনাম করো না। এখানে ঢোকাটা লজ্জা শরমের ব্যাপারই নয়।

—তাহলে ব্যাপার কী জানতে পারি?

—তেষ্টা। তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তাইত ঢুকে পড়েছি; মানে, নেহাৎ জানের দায়ে।

—ঠিক আছে। আল্লার কসম খেয়ে যখন বললেন তখন আপনাকে বিশ্বাস করলাম।

এই বলে মেয়েটি ফিসফিস করে তার বাঁদীকে বললো—যাও, ভদ্রলোককে এক গ্লাস শরবৎ এনে দাও।

বাঁদীটা দৌড়েই গেলো; তারপরে সোনার গ্লাসে শরবৎ নিয়ে হাজির হলো। এক হাতে তার ঢাকা দেওয়া শরবতের গ্লাস, আর এক হাতে তোয়ালে। শরবতের গ্লাসটা আমার হাতে সে এগিয়ে দিলো। কী সুগন্ধ ঠাণ্ডা শরবৎ! ঢকঢক করে না খেয়ে চেকেচেকে একটু একটু করে খাই, আর সুন্দরীর দিকে আড়চোখে তাকাই। অর্থাৎ তাকেও পান করাই বলে; তবে কিনা রূপসুধা। যত ধীরেই ধীরেই খাই না কেন, খাওয়া এক সময় শেষ হলো; সেই সঙ্গে ছলনা। খালি গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে চোখ আর মুখ মুছে ফেললাম। সেই গন্ধমাখা তোয়ালে দিয়ে ঘাড়, গদ্দান সব ভালো করে মুছলাম। তা-ও শেষ হলো এক সময়। অগত্যা তোয়ালেটাও ফিরিয়ে দিতে হলো। এবার? না; চলে আসতে পারলাম কই? একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার নড়বার কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে মেয়েটি ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললো—এবার পথ দেখ।

আবিষ্টের মত বললাম—যেতে তো হবেই। কিন্তু একটা চিন্তা আমাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। এইজন্যে মোটেই শান্তি পাচ্ছি নে! কী করব ভেবে পাচ্ছি নে তা-ও।

—চিন্তা কীসের?

প্রতিটি ঘটনাকে যদি উলটো দিক থেকে দেখি তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে?

টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি এক সঙ্গে করে দেখলে সেটাই বা কী দাঁড়াবে? এ সব ঘটনা তো মহাকালের অঙ্গ।

—ওসব বড়-বড় ব্যাপার, বড়-বড় চিন্তা। ইহকালের নোংরামী অথবা পাপের জন্যে আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। যাক গে ওসব কথা। তা মশাই, তোমার এমন কী সমস্যা দেখা দিলো যার সমাধানের জন্যে আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

বললাম—আমি এই বাড়ির মালিকের কথা ভাবছিলাম। তাঁর কথা বেশ মনে পড়ছে আমার। আর এক বাড়িতে গল্প করতে-করতে তিনি আমাকে এই বাড়ির কথা বলেছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ; বেশ মনে পড়ছে। আল্লাহর নামে বলছি তিনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বন্ধুও বলতে পারি।

—তোমার সেই শ্রেষ্ঠ বন্ধুটির নাম মনে রয়েছে?

আলবাৎ। তাঁর নাম হচ্ছে আলি বিন মহম্মদ। তাঁর মত নামকরা জহুরী বাসোরায় দুটি ছিলো না। কত লোক খাতির করত তাঁকে। অনেক কাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। মনে হচ্ছে তিনি আর নেই। তাঁর কি কোন সন্তান নেই?

মেয়েটির চোখদুটি কানায় কানায় ভরে উঠলো; তারপরে সেই জল মুক্তার বিন্দুর মত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো; বললো—আল্লা বিন মুহম্মদের আত্মাকে শান্তি দিন। আপনি যখন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তখন আপনাকে বলতে বাধা নেই। তিনি একটি মেয়ে রেখে গিয়েছেন। তার নাম বুদুর। মেয়েটিই তাঁর তাবৎ সম্পত্তির মালিক।

তুমি; তুমিই বোধহয় সেই বুদুর—না?

হ্যাঁ; আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। —তার মুখে হাসি ফুটলো।

আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে আশীর্বাদ করেন, মঙ্গল করেন তোমার। তোমার ওই ভারি সিল্কের নাকাব ভেদ করে দেখছি কী দুঃখ তোমার? এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে তোমার দুঃখটা কী? কী দুঃখ তোমার? খুলে বলো। আল্লা বোধ হয় সেই জন্যেই আমাকে এইখানে পাঠিয়েছেন। তোমার সব দুঃখ কষ্ট আমি সারিয়ে দেব।

কিন্তু গোপনীয় কথা কেন আপনাকে বলব? আপনার নাম জানিনে, পরিচয় জানি নে। আপনার চরিত্রও আমার অজানা।

আমি কুর্নিশ করে বললাম—এ দাসের নাম ইবন্ আল-মনসুর। নিবাস দামাস্কাসে। সকলের মালিক খলিফা হারুণ অল-রসিদ আমাকে স্নেহ করেন। বন্ধুর মর্যাদা দিয়ে আমাকে তিনি কিনে নিয়েছেন।....

আমার কথা শেষ হতে না হতেই বুদুর বললো—আর পরিচয়ের দরকার নেই। আসুন, আসুন। ভেতরে আসুন। আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখানোর সুযোগ আমাকে দিন।

এই বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে সোজা ভেতরের ঘরে চলে গেলো। বসার ঘরটা বাগানের ধারেই। সেইখানে আমরা তিনজনে বসলাম। ভালোভালো খানা এলো। খানা খেতে খেতে বুদুর বললো—আমার মুখে দুঃখ-কষ্টের ছাপ দেখে কারণ জানতে চেয়েছেন। সবই আপনাকে বলব; কিন্তু একটি শর্তে। এই কাহিনী আপনি গোপন রাখবেন। এ হলফ আপনাকে করতে হবে।

যেটা গোপন বলে মনে করব সেটা গোপনেই থাকবে। আমার এই মনটা বদ্ধ ইস্পাতের বাক্সের মত। এর চাবি গেছে খোয়া।

বেশ, আমার তাহলে কাহিনী শুনুন।

বাঁদী আমার পাতে কিছু গোলাপজাম তুলে দিলো। বুদুর শুরু করলো তার কাহিনী ঃ গল্পের সারাংশ, অর্থাৎ, বলতে গেলে আমারই কাহিনী, এই যে যখন ভালোবাসলাম তখন আমার মনের মানুষ আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলো বুদুর।

আমি বললাম—আল্লাহ তোমাকে দুহাত ভরে রূপ দিয়েছেন। তুমি যাকে ভালোবেসেছিলে সে নিশ্চয় তোমার মত রূপবান, স্বাস্থ্যবান কোন যুবক। কী নাম তার?

আপনি যথার্থই বলেছেন মনসুর সাহেব। সে সত্যিই সুন্দর। তার নাম জুবাইর বিন উমাইর। তিনি একজন আমীর। তাঁর মত রূপবান যুবক এই বসোরাহয় অথবা ইরাকে আর একটিও নেই।

ঠিকই বলেছ তুমি। অমন না হলে তোমার ভালোবাসা সে কেমন করে পাবে? তোমার ভালোবাসার কাহিনী কিছু বলো।

কাহিনীর কথা বলছেন? সে যে অনেক, অনেক। অন্তরঙ্গ হতে-হতে আমদের দুটি হৃদয় কালের রজ্জুতে বাঁধা পড়েছিলো। কিন্তু জুবাইর শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো—তাও একটি মাত্র সন্দেহের বশে।

চেঁচিয়ে উঠলাম আমি—ই আল্লা! তোমার মত মেয়েকে সন্দেহ? ঝড়ো হাওয়ায় পদ্মফুল কাদায় লোটাতে পারে। তাই বলে তাকে সন্দেহ করতে হবে? সন্দেহ খাঁটি হলেও তোমার মুখের দিকে তাকালে সব সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়া উচিৎ।

ম্লান হেসে বললো বুদুর—তবু যদি কোন পুরুষঘটিত ব্যাপার হোত। কিন্তু ব্যাপারটা একটা মেয়েকে নিয়ে। এই যে দেখছেন, এই মেয়েটিকে নিয়ে সন্দেহ।

বললাম—আল্লাহ, জুবাইরকে করুণা করুন। এমন কথা শয়তানেও বিশ্বাস করবে না। একটা মেয়েকে আর একজন মেয়ে কেমন করে ভালোবাসবে? ভারি বিশ্রী ব্যাপার তো! সন্দেহ হলো কেমন করে?

গোছল করার সময় এই মেয়েটি আমার গা ঘষে দেয়। ওই সময়টা ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। একদিন গোছলের পরে ও আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। আমার গায়ে জড়ানো ছিলো মাত্র একটা তোয়ালে। গরম কমানোর জন্যে মেয়েটি আমার গা থেকে সেই তোয়ালেটা সরিয়ে দেয়। চুল বাঁধা শেষ হলে আমার রূপ দেখে কী ভেবে গলা জড়িয়ে ধরে আমার গালে চুমু খেয়ে বললো—যদি পুরুষ হতাম তাহলে ভালোবাসা কাকে বলে তা তোমাকে বুঝিয়ে দিতাম। এর চেয়ে ঢের বেশী দেখাতে পারতাম তোমাকে।

এই কথা বলে মেয়েটি নানান ঢঙে আমাকে চটকাতে লাগলো। ছেলে-মানুষ তো। কতটুকুই বা আর জানে? ও এই সব করছে, হঠাৎ আমীর ঘরের ভেতরে ঢুকে এলো। আমাদের দুজনকে ওইভাবে দেখামাত্র সে ঘর ছেড়ে চলে গেলো। যে ভালোবাসা কাউকে দেওয়া যায় না। সেই ভালোবাসাই আমাদের দুজনকে আনন্দ দিতে পারে।

চিরকুট পেয়েই বাইরে বেরিয়ে এলাম। অনেক খুঁজলাম তাকে। পেলাম না। সে চলে গিয়েছে। তারপর থেকে তার সঙ্গে আর কোনদিনই আমাদের দেখা হয় নি। কোন খবরও দেয় নি সে।

তোমাদের শাদী হয় নি?

না। লোকজন সাক্ষী রেখে আমাদের শাদী হয় নি। ভালোবাসাই ছিলো আমাদের বন্ধন। আমরা একসঙ্গে থাকতাম। কোনো অনুসন্ধান করি নি আমরা।

আমি একবার চেষ্টা করব? দুটো হৃদয় আবার জোড়া দিতে পারলে আমিই সবচেয়ে বেশী খুশি হব। তুমি রাজি?

বুদুরের চোখে জল। সে বললো—আমাদের দু'জনের পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। ঈশ্বর আপনাকে দুটি পথের মাঝখানে এনে দিয়েছেন। সব সময় মনে রাখবেন যার হৃদয়ে

কোন দয়ামায়া নেই আপনি সেই লোকের উপকার করতে যাচ্ছেন। একখানা চিঠি লিখে আপনার হাতে আমি দেব। সেটি আপনি জুবাইরকে দেবেন। আপনার কথা যাতে সে শুনে সেদিকে চেষ্টা করবেন। এর বেশী আর কিছু বলার নেই আমার।

তারপরে বাঁদীকে দিয়ে দোয়াত কলম আনিয়ে সে চিঠি লিখলো—

প্রিয়তম,

কতকাল আর বিরহ সইব বলো? বেদনা আর মনকষ্ট রাতের ঘুম আমার কেড়ে নিয়েছে। অনেকদিন হলো তুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েছ। স্বপ্নে দেখলে তোমাকে ঠিক আমি চিনতে পারি নে।

তুমি দরজা খুলে চলে গিয়েছ। পাড়ার লোকে খোলা দরজা দিয়ে কত কথা বলে যায়। আমার গায়ে কাদা ছিটোয়। প্রিয়তম, আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি। ওঠো; চোখ তুলে দেখ। সন্দেহ ঝেড়ে ফেলো। দেখবে, যেদিন এক হব সেদিনের কথা ভাবতেও কি আনন্দ। আমাদের মিলনে ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদই করবেন। ঈশ্বরও তাই চান। তুমি আর মুখ ফিরিয়ে থেকো না। —ইতি।

এই সময় ভোরের পাখি ডেকে উঠলো। চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো ঊনপঞ্চাশতম রজনী ঃ

পরের দিন রজনীতে আবার গল্প বলতে শুরু করলো শাহরাজাদ ঃ

চিঠি লিখে, ভাঁজ করে, খামে সেটি বন্ধ করে তার ওপরে মোহরের ছাপ দিলো বুদুর। তারপরে এক হাজার দিনারের সঙ্গে সেটি আমার পকেটে গুঁজে দিলো সে। আমি বাধা দিয়েও পারলাম না। তার মৃত পিতার প্রতি আনুগত্যের সুবাদেই এটা আমার করা উচিৎ বলেই মনে করলাম আমি। আর বিলম্ব না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম; তারপরে সোজা হাজির হলাম জুবাইর বিন উমাইর-এর বাড়িতে। উমাই এর বাবার সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচয় ছিলো আমার। তিনিও আজ আর বেঁচে নেই।

তাদের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম শিকারে গিয়েছে উমাইর। কী আর করি! অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে। সুতরাং বসে রইলাম। তবে বেশীক্ষণ বসতে হয় নি। তাড়াতাড়িই ফিরে এলো উমাইর। আমার নাম ধাম পরিচয় পেয়ে হাত জোড় করে অনেক ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললো—এতক্ষণ আমি ছিলাম না বলে দুঃখিত। কিন্তু আমার আতিথ্য গ্রহণ আপনাকে আজ করতেই হবে। এ-বাড়ি আপনার নিজেরই বলে ভাববেন। কোন রকম সংকোচ করবেন না।

কী বলব জাঁহাপনা? ছেলেটা আস্ত.একটা দাবানল। অগ্নিশিখা নয়। মেয়েটার মুখে দুঃখের ছাপ কেন পড়েছে তা যেন এবার বুঝতে পারলাম। দুচোখ ভরে তাকেই দেখতে লাগলাম।

উমাইর ভাবলো ভেতরে যেতে আমি বোধ হয় সঙ্কোচ বোধ করছি। তাই সে আমার হাত দুখানা ধরলো। আমিও ধরলাম তার হাত; মনে হলো, চন্দ্র, সূর্য, তারা—সারা বিশ্বটাকেই আমি যেন আঁকড়ে ধরেছি। খানার সময় তখন উপস্থিত। পরম সমাদরে সে আমাকে খানা খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেলো। ক্রীতদাসরা সামনে পেতে দিলো সাদা চাদর। চাদরের ওপরে সাজিয়ে দিলো খোরাসানের সোনা আর রূপোর থালা। তারপরে এলো থালাভর্তি কত রকমের রান্না মাংস। শুকনো, ঝোল, ঝাল। সব কটাই চমৎকার খেতে। সব চেয়ে সুখাদ্য ছিলো পাখির মাংস। পেস্তা, বাদাম,

আর আঙুরের রসে ভেজানো সেই মাংস। তারপরে গরম রুটির সঙ্গে অদ্ভুৎ প্রক্রিয়ায় মেশানো এক রকমের মাছ। অবশ্য তার সঙ্গে সেই বিখ্যাত স্যালাডও ছিলো যা মুখে দেওয়ামাত্র গলে জল হয়ে যায়। ক্ষিদেটাও চনমন করে ওঠে। তারপরে সেই সুগন্ধী চাল—তার আর তুলনা নাই। কী বলব জাঁহাপনা একেবারে কব্জী ডুবিয়ে খেয়েছি। সে কী অপরূপ গন্ধ বিরিয়ানীর! সরাবের কথা নাইবা আর বললাম।

জাঁহাপনা, আপনি ভাববেন না যে কাজের কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ আমি ভোজনবিলাসী হয়ে পড়েছিলাম। সত্যি কথাটা বলতে কি প্রথমটা খাবারের দিকে নজর না দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম আমি। রীতি অনুসারে খাওয়া শুরু করার জন্যে নিমন্ত্রকই আহ্বান জানায়। সেই রীতিটি মেনে নেওয়ার আগেই আমি বললাম—আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি, আপনার এই সব সুখাদ্য আমি স্পর্শ করব যতক্ষণ না আপনি কথা দেন যে আমার প্রার্থনা আপনি মঞ্জুর করবেন।

আপনার প্রার্থনা কী না জেনে কী করে তা মঞ্জুর করব? তবে আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ না করে চলে যাবেন এ কিছুতেই আমি হতে দেব না। আপনার প্রার্থনা নিশ্চয় মঞ্জুর হবে।

তার কথার জবাবে পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে তার হাতে দিলাম। চিঠিখানা খুলে পড়লো সে। পড়তে-পড়তে চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো তার। চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষতে-পিষতে বললো—ইবন্ আল-মনসুর, আপনার যা ইচ্ছে হয় আমাকে বলবেন। আমি তা মেনে নেব। কিন্তু দয়া করে এই চিঠিটার বিষয়ে আমাকে আর কিছু বলবেন না। চিঠির জবাব আমি দেব না; বা, এ ব্যাপারে আপনাকেও কিছু বলব না।

তার কথা শুনে উঠে চলে আসছিলাম। পেছন থেকে আমার জামা টেনে ধরে সে বললো—আপনি আমার অতিথি! আমি কেন ওকে ছেড়ে আসছি যদি শোনেন তাহলে এ-ব্যাপারে আপনিও আমাকে জোর করবেন না। আপনি ভাববেন না যে ওর চিঠি বা খবর নিয়ে আপনার আগে আর কেউ আসে নি। আমাকে আগে কিছু বলবেন না। ও আমাকে কী বলতে চেয়েছে আপনাকে আমি সব কিছু বলে দেব।

আশ্চর্যের ব্যাপার, সত্যিই ছেলেটি সব বলে দিলো। তারপরে বললো—আমার কথা শুনুন, এর ভেতরে নিজেকে আপনি ফালতু জড়িয়ে ফেলবেন না। বরং এখানে বিশ্রাম করুন, যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকুন। আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন আমাকে।

তার কথায় কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু আতিথ্য গ্রহণ না করে পারলাম না। সারাদিন খানাপিনা আর খোসগল্পে আমীরের সঙ্গে কাটিয়ে দিলাম। কোন গানও শুনলাম না, বাজনাও শুনলাম না। অথচ ও দুটোই হচ্ছে ভোজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। বেশ অবাকই হলাম আমি। কথাটা বলেই ফেললাম। আমীরের মুখখানায় কে যেন সঙ্গে-সঙ্গে এক শিশি কালি ঢেলে দিলো। বুঝলাম, ভেতরে সে বেশ একটা অস্বস্তি বোধ করছে। একটু থেমে সে বললো—ভোজের আসরে গান বাজনার পাট অনেক দিনই আমি চুকিয়ে দিয়েছি। তবে আপনি যদি চান সে-ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।

এই বলে উমাইর ক্রীতদাসীকে গান গাইতে বললো। ক্রীতদাসীটি কাপড়ে জড়ানো একটা ভারতীয় বীণা নিয়ে এসে আমাদের সামনেই বসে পড়লো; তারপরেএকটা গৎ বাজিয়ে শোনালো ঃ

মধুর পেয়ালা আছে, সঙ্গে আছে পেয়ালা মদের
তুমি কি এখনও তা পান করনি?
যে যাতনা আমাদের আনন্দ দেয়
যে চুম্বন আমাদের শীতল করে

যে চুম্বন আমাদের বিরক্ত করে
তা কি তুমি অনুভব করনি?
যে গোলাপ অন্ধকারে পুড়ে যায়
তার সুবাস কি এখনও তুমি পাওনি?

গানের রেশ কাটতে-না-কাটতেই উমাইর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। গাইয়ে মেয়েটি বললো—শেখ, আপনিই এর জন্যে দায়ী। ওঁর সামনে অনেক দিনই আমি গান গাইনি, বা বাজনা বাজাইনি। দুঃখের গান শুনলোইে ওর ভেতরটা কেমন যেন জ্বলেপুড়ে যায়। তারপরই উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

সত্যি সত্যিই আমি বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ হলো আমার! তাকে আর বিরক্ত করতে নিষেধ করে মেয়েটি আমাকে আমার শোওয়ার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিলো।

পরের দিন ভোরবেলাতেই চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম আমি। একজন নফরকে ডেকে বললাম—আমি চললাম। তোমার মনিবকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে বলে দিয়ো।

এমন সময় অন্য একটি নফর এসে আমার হাতে এক হাজার দিনার আর একটা চিরকুট দিয়ে গেলো। শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাকে বিদায় দিয়েছে উমাইর। গতকাল অজ্ঞান হওয়ার ফলে আপনার যে অসুবিধে হয়েছিলো তার জন্যে সে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। তাকে আবার আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। যে কাজের জন্যে এসেছিলাম তার কিছুই হলো না। হতাশ হয়ে আমি বুদুরের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

বাড়ির সামনে বাগানের কাছে এসে দেখলাম বুদুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। কোন কথা বলার আগেই সে বললো—ইবন আল-মনসুর, কোন কাজ হলো না ত। হবে না যে তা আমি জানতাম।

তারপরে আমাদের মধ্যে যেসব কথা হয়েছিলো সেসব কথা বুদুর হুবহু বলে গেলো।

আমি তো অবাক। ও আমার পেছন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলো নাকি?

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি এসব জানলে কেমন করে? তুমি কি ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে ছিলে?

আল মনসুর, প্রেমিকার কাছে কোন কথাই লুকানো থাকে না। সবই আমার অদৃষ্ট। আপনার কোন দোষ নেই।

তারপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বললো—প্রেমের দেবতা, মনের দেবতা, আত্মার দেবতা—আল্লা আমাকে শক্তি দাও। আমার এই প্রেমিকহীন জীবনে আমি ভালোবাসতে পারি। হে ঈশ্বর, জুমাইয়ের বুকে যদি এতটুকু প্রেম বলে কিছু থাকে সেইটুকু নিয়ে ওর বুক জুড়ে যন্ত্রণা দাও। জ্বলতে-জ্বলতে ও যখন আমার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে হাজির হবে তখন আমি ওর দিকে ফিরেও তাকাব না।

তারপর মেহনতের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলো বুদুর। আমি আমীর মুহম্মদের সঙ্গে দেখা করে বাগদাদে ফিরে এলাম।

পরের বছর যথারীতি আবার বাসোরায় ফিরে গেলাম। একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি, জাঁহাপনা, আমীর মুহম্মদ একবার আমার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছিলেন। বছরে একবার করে সেই টাকা আমি কিস্তিতে নিয়ে আসতাম। সেই কারণেই বাসোরাতে আমাকে যেতে হয়। সেবারে বাসোরায় পৌঁছিয়েই মনে হলো বুদুরের খবরটা একবার নিয়ে যাই। প্রেমিক যুগলের সংবাদ অনেকদিন পাইনি কি না।

বুদুরের বাড়ির বাগানের কাছে গিয়েই দেখি দরজা বন্ধ। চারপাশ চুপচাপ। বুকটা

হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠলো। দরজার জাফরীর ভেতর দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার সন্দেহটা ঘনীভূতই হলো। দেখি নতুন একটা কবর বসেছে। কবরটা মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। তার ওপরে একটা উইলো গাছ। গাছের ডালটা কবরের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। কবরের ওপরে কী একটা যেন লেখাই রয়েছে। দূর থেকে সেটা পড়তে পারলাম না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক থেকে। মেয়েটা শেষপর্যন্ত মরে গেলো? আহা বেচারা! যৌবনের ফুল ভোগে লাগলো না—বৃথাই ঝরে নষ্ট হয়ে গেলো! এমন রূপ—এত যৌবন—ভোগে লাগলো না!

রাত শেষ হয়ে এলো। চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো পঞ্চাশতম রজনী ঃ

পরের দিন শাহরাজাদ আবার গল্প বলতে শুরু করলো।

ভারাক্রান্ত মনে উমাইরের বাড়িতে ফিরে এলাম। সেখানে আর এক বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। বাড়ি ঘর দোর সব ভেঙে চুরমার। খাঁ-খাঁ করছে সব। সেই প্রাচীর একেবারে ধূলিসাৎ। অমন সুন্দর বাগান কাঁটা ঝোপে ভরপুর। দরজা-জানালাও গিয়েছে ভেঙে। কোন লোকজন নেই। আমার কথার উত্তর দেবে কে? শেষ পর্যন্ত ছেলেটাও গেলো মরে! ইয়া আল্লাহ। একটা বয়েৎ মনে পড়ে গেলো আমার।

দ্বারের গোবরটা দেখেই আমার চোখে জল এলো,
সেই আতিথেয়তার যুবরাজ আজ কোথায়?
আমার সঙ্গে যাঁরা বসতেন
সেই আনন্দময় অতিথিরা আজ কোথায়?
মাকড়সারা প্রশ্ন করছে—
উত্তর দিচ্ছে বাতাস।

দুঃখে আমার বুকটা যেন ভেঙে যাচ্ছিল। কালো একটা ক্রীতদাস পেছন থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—চুপ কর বুড়ো। অমন করে চেঁচাচ্ছো কেন অ্যাঁ! দরজার কাছে অনবরত ভ্যাজ ভ্যাজ করছ।

বললাম—না না। চেঁচাব কেন? মনের দুঃখে কত কথাই না আজ মনে পড়েছে। আমার এক বন্ধু মারা গিয়েছে তারই জন্যে দুঃখ করছি আর কি।

—কে তোমার বন্ধু গো?

—জুবাইর বিন উমাইর।

—বালাই, ষাট। তিনি মরতে যাবেন কেন? ঈশ্বরের কৃপায় তিনি ভালোই আছেন। লোকে কত মান্যিগণ্যি করে তাঁকে।

—তা'লে এই বাড়ি ঘর-বাগান সব গেলো কোথায়? এমন খাঁ-খাঁ করছে কেন?

—ভালোবাসার জন্যে।

—কী বললে! ভা-লো-বা-সা।

—হ্যাঁ, সাহেব, হ্যাঁ। আমীর উমাইর বেঁচে আছেন—এইটুকু শুধু বলতে পারি। তবে তিনি এখন মরোমরো। দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকেন। উঠতে পারেন না। কোন শক্তিই নেই ওঠার। বিছানার সঙ্গে একেবারে লেপটে রয়েছেন। ক্ষিদে পেলেও বলতে পারেন না, আমাকে খেতে দাও, তেষ্টা পেলেও বলতে পারেন না, আমাকে জল দাও।

নিগ্রো ক্রীতদাসটির কথা শেষ হ'তে না হতেই আমি বললাম—তুমি শিগগির

ভেতরে যাও। উমাইরকে বল—মনসুর সাহেব এসেছেন। আমি এইখানে অপেক্ষা করছি—সেটাও বলে দিও।

ভেতরে ঢুকে গেলো ক্রীতদাসটি; তারপরে ফিরে এসে আমাকে নিয়ে আবার ভেতরে ঢুকলো। যেতে-যেতে সে বললো—সাবধান, আমীর সাহেবের সঙ্গে কথা বলবেন না। বলবেন কোন্ কম্মে? কানে তো কিছুই শুনতে পান না তিনি। গায়ে হাত দিয়ে ইশারা করলে তবেই বোঝেন কিছুটা। আপনাকে কয়েকটা ইশারা শিখিয়ে দেব।

ঢুকলাম ভেতরে। দেখলাম, আমীর উমাইর একটা পালঙ্কের ওপরে শুয়ে রয়েছেন। এমন হাড্ডিসার হয়ে পড়েছেন যে বুকের পাঁজরাগুলিও স্বচ্ছন্দে গোনা যায়। রক্তশূন্য। প্রথমে তো আমি চিনতেই পারিনি। চোখেও তার দৃষ্টি বলতে কিছু নেই। কুর্নিশ করলাম; অভিবাদন জানালাম। কাকস্য পরিবেদনা। ওপাশ থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই।

ক্রীতদাসটি আমকে ফিসফিস করে বললো—কবিতা ছাড়া কিছু শুনতে পান না উনি।

কথাটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। একটু অসহায়-ও মনে হলো নিজেকে। অবশ্য এ-অবস্থা বেশীক্ষণ থাকে নি। যেন অনেক দূর থেকে বলছি এই রকম উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা বলতে শুরু করলাম—

এখনও বুদুর তোমার ক্ষত-বিক্ষত আত্মাকে
শিক্ষা দিচ্ছে। অথবা, তুমি কি এখনও তার
নির্দেশ দেখতে পাচ্ছ না? অথবা, এখনও কি
তুমি বিনিদ্র রজনী যাপন করছ?
তুমি মূর্খ, মূর্খ, প্রেমিক মূর্খ তুমি।

এতেই কাজ হলো। ধীরে-ধীরে চোখ খুললো জুমাইর। ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—স্বাগতম, ইবন্ বিন-মনসুর। আমার অবস্থা তো দেখছেন। সব বিলিয়ে দিয়ে আজ আমি ফকির।

—আজ্ঞে, আপনার কি কোন কাজে লাগতে পারি?

—কেবল আপনিই পারেন আমাকে বাঁচাতে। আমার একখানা চিঠি কি আপনি দয়া করে বুদুরের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমার সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন? আপনি ছাড়া আর কেউ একাজ পারবে না।

আপনার আদেশ শিরোধার্য।

অবাক কাণ্ড! মুখ থেকে কথাটা বেরোতে না বেরোতে উমাইর পালঙ্ক থেকে উঠে বসলো। তারপরে হাতের তালুতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে লিখতে শুরু করলো—

প্রিয়তমে,

আমি বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছি। হতাশার অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। এক সময় ভেবেছিলাম ভালোবাসাটা বোকামি; ভেবেছিলাম, ওর মত সহজ আর হালকা জিনিস আর নেই। কিন্তু তোমার অদৃশ্য ভালোবাসার উত্তাল তরঙ্গের ধাক্কায় প্রতিদিনই আমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। ভালোবাসাকে একদিন তুচ্ছ করেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে এ মহাসাগরের সীমাও নেই, তলও নেই। হৃদয় আমার আজ ক্ষতবিক্ষত। তোমার কাছে না গেলে এ ক্ষত আমার সারবে না। তোমার বুকে আমার স্থান দাও। বিগত দিনের কৃতকর্মের জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি নতজানু হয়ে। আমাকে দয়া করে ক্ষমা কর। ভেবে দেখ, একদিন আমরা দু'জনে দুজনকে কত ভালোই না বাসতাম। তোমার বিরহে আমি মারা যাব। এতটা নিষ্ঠুর নিশ্চয় তুমি হবে না...ইত্যাদি—ইতি...

চিঠিখানা ভাঁজ করে খামের মুখ বন্ধ করলো উমাইর। তারপরে শিলমোহর করে আমার হাতে তুলে দিলো। বুদুরের কী হয়েছে তাও জানি নে। তা সত্ত্বেও, খামটা আমি নিলাম। আবার ছুটলাম বুদুরের বাড়ির দিকে। সামনের বাগান পেরিয়ে সোজা ভেতরে চলে গেলাম। কাউকে কিছু বললাম না।

বসার ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলাম। মেঝেতে কার্পেট পাতা। দশটা ফরসা রঙের বাঁদী গোল হয়ে বসেছে বুদুরকে মাঝখানে রেখে। মনে হয় যেন সূর্য উঠেছে। চেহারায় চেকনাই দিয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশী। স্বাস্থ্যটাও বেশ ভালো হয়েছে। যৌবনের পুরো জোয়ার লেগেছে তার শরীরে। পরিধানে ছিলো ওর সকালের পোশাক। কুর্নিশ করে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার কথার জবাবে সে একটু হেসে বললো—আসুন, আসুন—ইবন আল-মনসুর; কোন সংকোচ করবেন না। এতো আপনারই বাড়ি।

—আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। সব ভালো তো? তা এখনও তোমার গায়ে সকালের পোশাক কেন?

—আর বলবেন না, মনসুর সাহেব। সেই মেয়েটি মারা গিয়েছে। ওই বাগানে তার কবর। বলতে-বলতে ফুঁপিয়ে ওঠে মেয়েটি। বাঁদীরা তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।

ভেবেছিলাম কথা বলব না। কিন্তু শেষে বললাম—পরম করুণাময় ঈশ্বর, তোমার মঙ্গল করুন, তার আত্মাকে শান্তি দিন। তুমি মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতে, দেখেছি। মেয়েটিও ভালোবাসত তোমাকে। তার জন্যে যে তোমার কান্না পাবে সে কথাও ঠিক। খোদাতালা তাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়েছেন।

—হ্যাঁ; মেয়েটা আমার খুব প্রিয় ছিলো।

বেশ নরম হয়ে পড়েছে বুদুর। ভাবলাম, এই সময়। আর দেরি না করে উমাইর চিঠিটা তাকে দিয়ে বললাম—তোমার জবাবের ওপরে তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, বুদুর। তোমার উত্তরের আশায় বেচারার প্রাণটুকু এখনও কোনমতে টিকে রয়েছে।

চিঠিটা পড়তে-পড়তে বুদুরের মুখে তেতো হাসি ফুটে বেরোল। তারপরে সে বললো—এত গত বছরই না সে ঘেন্নায় আমার চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিলো? আর এরই মধ্যে আমার অভাবে সে একেবারে মরমর! থাক; আমার উদ্দেশ্য সার্থক। গত বছর আমি তাকে আর কোন খবর দিই নি। আমার উদাসীনতা তাকে ক্রমেই হতাশ করেছে। সে যাতে আবার আমাকে ভালোবাসতে শুরু করে তার জন্যে আমি কী না করেছি। কিন্তু প্রতিবারই সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করলো শাহরাজাদ।

তিনশো একান্নতম রজনী ঃ

পরদিন রজনীতে আমার শুরু করলো শাহরাজাদ।

আমি বললাম—ঠিকই করেছ তুমি। সে যে অন্যায় করেছে তার জন্যে সামান্য একটু গালাগালি দিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়াটা তোমার উচিৎ হবে না। তবে একটা কথা আমি বলি। ক্ষমা কিন্তু মানুষের আত্মার একটি মহৎ গুণ। তা ছাড়া আরও একটা কথা রয়েছে। এই বিশাল প্রাসাদে এই রূপ আর যৌবন নিয়ে একা একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে লাভ কী হবে তোমার? সে যদি মরেই যায়, তাহলে তুমিই কি শান্তি পাবে? সারা জীবনটা কি তোমার কষ্ট আর অনুশোচনায় কাটবে না?

—আপনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। আমি তার চিঠির জবাব দেব।

তারপরে কাগজ-কলম নিয়ে সে লিখতে বসলো। জাঁহাপনা, আপনাকে কী বলব সে চিঠির যেমন ভাব তেমনি ভাষা। ভাবে ভাষায় একেবারে গলাগলি। আপনার রাজত্বের

সবচেয়ে ভালো লেখকও বোধ হয় ওভাবে লিখতে পারবেন না। আমি অবশ্য হুবহু উদ্ধৃতি দিতে পারব না; সেই চিঠির বিষয়বস্তুটাই কেবল আমি নিজের ভাষায় বলছি—

প্রিয়তম,

আমাদের যে কেন বিচ্ছেদ ঘটেছিলো অনেক চেষ্টা করে তা আমি জানতে পারি নি। অতীতে আমার কোন অপরাধে হয়ত সেই বিচ্ছেদ সম্ভব হয়েছিলো। তবে, সে-অতীতের আজ মৃত্যু হয়েছে। অতীতের সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে অসূয়াটুকুরও।

তুমি আমার কাছে কবে ফিরে আসবে তারই পথ চেয়ে বসে থাকব প্রিয়তম। তোমার গালে চোখ দুটো ডুবিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব আমি। কতকাল যে ঘুমোইনি, তা জান? এবার সোনার মিষ্টি ঘুম আসছে, জেনে কতই না আনন্দ হচ্ছে।

যে পানীয় জীবনের সব তৃষ্ণা মেটাতে পারে তুমি এলে আমরা দু'জনে সেই পানীয় আকণ্ঠ পান করব। কেমন? পান করতে করতে যদি মাতাল হয়ে যাই তাহলেও কেউ আমাদের কিছু বলবে না, বলার কেউ নেই।

তোমার আসার পথ চেয়ে রইলাম।

—ইতি

বুদুরের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে বললাম—এই চিঠিখানা তাকে নিঃসন্দেহে চাঙ্গা করে তুলবে। সব দুঃখের অবসান হবে তার।

আমি বেরিয়ে আসব এমন সময় আমার জামার আস্তিন ধরে বললো—মনসুর সাহেব, আজ রাত্রেই আমরা দু'জনে বেহেস্তের রাত তৈরি করতে পারি—একথা তাকে বলতে পারেন।

আমার যা আনন্দ হচ্ছিল তা আর আপনাকে কী বলব জাঁহাপনা! প্রায় ছুটতে ছুটতে আমীর উমাইর-এর বাড়ি চলে গেলাম। দেখলাম, আমীর সাহেব দরজার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে বসে রয়েছে।

চিঠিখানা পড়তে-পড়তেই তার চোখ দুটো জলে ভরে টইটুম্বর হয়ে গেলো। আনন্দে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। হঠাৎ সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। ধীরে-ধীরে জ্ঞান ফিরে এলে সে জিজ্ঞাসা করলো—ও কি নিজের হাতে এ চিঠি লিখেছে?

বললাম বিলক্ষণ! পায়ে করে কেউ চিঠি লিখতে পারে এতো আমি জানতাম না।

আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই পেছনের দরজায় চুড়ির ঝুনঝুন শব্দ আর সিল্কের কাপড়ের খসখস আওয়াজ আমার কানে এলো। মনে হলো, কোন মহিলা যেন পড়িকি-মরি ভাবে ছুটে আসছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ; যা ভেবেছি তাই। হুড়মুড় করে ছুটে এলো বুদুর। সে এক অপরূপ দৃশ্য জাঁহাপনা। ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা বিপরীত দিক থেকে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে একেবারে এক হয়ে গেলো। কথা বলার শক্তি কারও নেই। থাকবে কেমন করে? এক জনের ঠোঁট যে আর একজনের মুখের মধ্যে।

তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলো আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে জুমাইর বুদুরের হাত ধরে তাকে বসতে বললো। কিছুতেই বসবে না বুদুর। অনেক অনুনয় বিনয়, সাধ্য-সাধনাতে তাকে বসানো গেলো না। জুমাইর তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। ই আল্লা, তরীটা তীরে এসে শেষ পর্যন্ত ডুবে যাবে নাকি?

আমি বললাম—কী হলো বুদুর? বস!

—আমাদের মধ্যে চুক্তি হলেই আমি বসব।

—কিসের চুক্তি?—কিছুটা অবাক হয়েই প্রশ্নটা করি আমি।

বুদুর বললো—সেটা আমাদের দু'জনের ব্যাপার। —এই বলে সে তার মনের মানুষের কানে-কানে কী সব কথা যেন ফিসফিস করে বললো। আমি অবশ্য শুনতেও পাই নি, বুঝতেও পারি নি।

জুমাইর বললো—বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয় সেটা এখন করতে হবে।

এই বলে একটা ক্রীতদাসকে ডেকে সে যেন কিছু একটা নির্দেশ দিলো। সাক্ষী। শাদীর শর্তাবলী লেখা হলো দু'জনের। তারপরে দুজনকে শাদীর হলফনামা পড়ানো হলো। তারা যখন চলে গেলো বুদুর তাদের প্রত্যেককে এক হাজার করে দিনার দিয়ে দিলো। খুব তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেলো। তারা যখন চলে গেলো কাজীদের সঙ্গে আমিও চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি এমন সময় আমীর বাধা দিয়ে বললো—দুখের দিনে আমাদের বন্ধু ছিলেন আপনি। সুখের দিনে আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন এ কেমন কথা?

কী আর করি। "আনন্দের ভোজে কে না যোগ দিতে চায় বলুন। বলুন, জাঁহাপনা।"

সারা রাত ধরে খানা পিনা আর হই হুল্লোড় চললো। আমার জন্যে ঘর একটা আগেই ঠিক করা ছিলো। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঘরে বিশ্রাম নিতে আমি চলে গেলাম।

পরদিন ঘুম ভাঙতে স্বাভাবিক ভাবেই দেরি হয়ে গেলো আমার। গোছল সেরে প্রার্থনায় বসলাম। তারপরে বসার ঘরে গিয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে নবদম্পতী এসে হাজির হলো। বাঃ! এক রাত্রির মধ্যেই তাদের চেহারা একেবারে পালটে গিয়েছে। চেনাই যাচ্ছে না আর। সুখ আর তৃপ্তিতে ঝকঝক করছে তাদের মন। সদ্য গোছল করে এসেছে তারা—দেখতে তাজা গোলাপ ফুলের মত। খুব ভালো লাগছিলো আমার। তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম—ভালোয় ভালোয় সব চুকে গিয়েছে। তোমাদের এই মিলনে আমারও কিছু ভূমিকা রয়েছে। এবার আমার বিদায় নেওয়ার পালা। যাওয়ার আগে একটা কৌতূহল মেটানোর ইচ্ছে রয়েছে।

—কী আপনার কৌতূহল?—প্রশ্ন করলো আমীর।

জিজ্ঞাসা করলাম—প্রথম দিন যখন তোমার বাড়িতে এলাম সেদিন দেখলাম তুমি বেশ চটে রয়েছ। কেন বলত? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—তোমাদের বিচ্ছেদ হয়েছিলো কেন? বুদুরের কথা আমি অবশ্য আগেই শুনেছি। বুদুরের বাচ্চা বাঁদী ওর খোঁপা বেঁধে দিচ্ছিল। তাই দেখে তুমি রেগে ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলে। এটা অবশ্য ওরই কথা। কিন্তু আমার মনে একটা খটকা লেগেছে। একমাত্র ওই তুচ্ছ ঘটনাটাই কি তোমার সেদিন বেরিয়ে আসার কারণ ছিলো? আমার ধারণা, এর পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন বড় কারণ রয়েছে। সেটা কী?

আমীর মৃদু হেসে বললো—আপনি যথেষ্ট বিজ্ঞ, এবং বুদ্ধিমান। বুদুরের সেই মেয়েটা মরে গিয়েছে। আমার রাগও তাই কমে গিয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিটা প্রথম কেমন করে হলো সেটা বলতে এখন আর কোন অসুবিধে আমার নেই।

—তাহলে বলো।

—ব্যাপারটা খুবই সামান্য। আমরা একবার নৌকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে বুদুরও ছিলো। ওদের কয়েকটা ব্যাপার দেখে মাঝি আমাকে আড়ালে বললো—মালিক, যে মেয়ে তার স্বামীর চেয়ে বাঁদীকে বেশী ভালোবাসে আর সেই বাঁদীকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মস্করা করে, সেই বউকে কি কোন স্বামী বরদাস্ত করতে পারে? জানেন, ওরা একদিন আমার নৌকায় বসে জড়াজড়ি করে প্রেমের গান গাইছিলো। কী সাংঘাতিক সে গান। শুনে তো আমি ভির্মি খাই আর কী! শুনবেন?

আমার ভেতরে যতটুকু উষ্ণতা রয়েছে
সবই ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।
কারণ আমার প্রেমিক আর আগের মত নেই।
তার প্রেম তাই গরল হয়ে গেলো।
আজকাল আমি যতই ছলা-কলা দেখাই না কেন
তার পরিবর্তন হয়েছে অনেক।
তার হৃদয়টা এখন মাথায় রূপান্তরিত
তার বাকি সবই নরম তুলতুলে।

মাঝির কথা শুনে আমার মাথা গেলো ঘুরে; চোখে নামলো অন্ধকার! সত্যিই তো!! একদিন দৌড়ে গেলাম বুদুরের বাড়ি। যা দেখলাম সে কথা আপনি আগেই বলেছেন। মাঝির সন্দেহটা তাহলে মিথ্যে নয় সেটা আমি নিজের চোখেই দেখে এলাম। যাক গে; সে সব এখন অতীত। যা অতীত তা অতীত-ই থাক। আমরা দু'জনে ওসবই ভুলে যাব।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো বাহান্নতম রজনী ঃ

পরের দিন রজনীতে আবার শুরু করলো শাহরাজাদ ঃ

কথা শেষ করে আমীর আমার দিকে একটা দিনারের থলে এগিয়ে দিয়ে বললো—আপনি আমাদের জন্যে যা করেছেন সারা জীবনে তা আমরা ভুলতে পারব না। আপনি মাঝখানে না দাঁড়ালে হয়ত আমরা মারাই যেতাম। এটার মধ্যে তিন হাজার দিনার রয়েছে। আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এটা আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে। তা না হলে আমরা দুঃখ পাব।

আমি তাদের আর দুঃখ দিতে পারলাম না। থলেটা নিয়ে তাদের আশীর্বাদ করে বেরিয়ে এলাম।

যা বাবা! ওটা কিসের আওয়াজ! মনসুর সাহেব গল্প থামিয়ে যে দিক থেকে আওয়াজটা আসছিলো সেই দিকে তাকালেন। তাজ্জব কী বাত্ রে বাবা! খলিফা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। আর এদিকে মনসুর সাহেব আপন মনে গল্প বলে যাচ্ছেন। মনসুরের সুন্দর গল্পটি শুনতে শুনতে খলিফার বিক্ষিপ্ত চিন্তা কখন শান্ত হয়েছে, কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন তা তিনি টেরই পান নি। পাছে হারুন অল-রসিদের ঘুম ভেঙে যায়। এই ভয়ে পা টিপে-টিপে তিনি বেরিয়ে এলেন খাস কামরার বাইরে। আরও আস্তে-আস্তে প্রধান খোজা প্রধান ফটক খুলে দিলো। মনসুর বাইরে চলে গেলেন।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ চুপ করে বসে রইলো একটু; তারপরে শাহরিয়ারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললো—আশ্চর্য জাহাপনা, যে গল্প শুনে হারুন অল-রসিদ ঘুমিয়ে পড়লেন সেই গল্প শুনে আপনার চোখে ঘুমের বাষ্পটুকুও তো দেখা যাচ্ছে না!

শারিয়ার বললেন—ঘুম যাতে না আসে সেই জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আমি। ঘুম আসবে কেমন করে? তুমি একটা শিক্ষামূলক গল্প বলো দেখি, শুনি।

—কী ধরণের গল্প জাঁহাপনা?

ধর, কোন মেয়েদের গল্প—যে মেয়েরা স্বামীদের মনে কেবল নারী দেহের কামনা জাগায়, আর তাকে ভোগের পথে টেনে কবরের দিকে টেনে নেয়—এই রকম একটা গল্প। এই জাতীয় মেয়েদের কী রকম শাস্তি হবে তোমার গল্পের মধ্যে সেটার-ও ইঙ্গিত থাকে যেন।

শাহরাজাদ কিছুক্ষণ ভাবলো; তারপরে বললো—জাঁহাপনা, এই জাতীয় একটা ভালো গল্প আমার মনে পড়েছে। সেইটাই বলছি। আপনি শুনুন।

ওয়াঁর্দার

এক সময় কায়রোতে ওয়াঁর্দা নামে একটি লোক থাকত। পেশায় লোকটা ছিলো কসাই। কায়রো শহরে লোকটার একটা মাংসের দোকান ছিলো। তার দোকানে একটি মেয়ে রোজ মাংস কিনতে আসত। মেয়েটির গায়ের রঙ বিবর্ণ, চোখ দুটো বড় ক্লান্ত। তার সঙ্গে থাকত একটা বিশেষ কুলি। কুলিটার মাথায় থাকত একটা ঝাঁকা। দোকানে এসে ভেড়ার সব চেয়ে মাংসল অংশটা কিনত; সঙ্গে নিত ভেড়ার এক জোড়া রাং। মাংস কিনে দাম দিয়ে যেত একটি করে সোনার ছোট মোহর। টুকরোটার দাম ছিলো দুই দিনার। মাংসটা কুলির ঝুড়িতে চাপিয়ে বাজারে অন্য অনেক দোকানেই সে ঘুরে-ঘুরে জিনিস কিনত। মেয়েটির গতিবিধিও ছিলো প্রায় একই রকম। কারও সঙ্গেই সে প্রায় কথাবার্তা বলত না।

অনেক দিন ধরে একইভাবে আসা-যাওয়ার পরে কেমন যেন কৌতূহল হলো ওয়াঁর্দার। মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু মেয়েটি তো নির্বাক। জানবে কেমন করে? তাই সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

একদিন সুযোগ এলো। সেদিন মেয়েটির কুলি একাই যাচ্ছিল দোকানের পাশ দিয়ে। তাকে ডাকল কসাই। সে এসে দাঁড়ালে তার হাতে বড় একটা ভেড়ার মাথা দিয়ে বললো—বাবুর্চিকে বলবে মাথাটা যেন সে গোটাই রান্না করে। আমি ছাড়িয়ে ঠিক করে দিয়েছি। আর বেশী কাটাকুটি করলে ওর স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। ...তা হ্যাঁগো সাহেব, ওই যে মেয়েটি রোজ তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাজারে আসে ও কে বলত! ওর ব্যাপারটা আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না। ও থাকে কোথায়? মেয়েটি প্রতিদিন মাংসের সঙ্গে একটা করে অন্ডকোষ নিয়ে যায় কেন? ওকে সব সময় এত ক্লান্ত দেখায় কেন? কিছু বলতে পার?

কুলিটি বললো—আপনার খুব জানার ইচ্ছে, তাই না? আমি অবশ্য বেশী কিছু জানি না। তবে এই গরীবকে দয়া করে বিনা পয়সায় আপনি অত বড় একটা ভেড়ার মাংস দিলেন, আপনাকে না বলে পারি? ...; যেটুকু জানি তাই আপনাকে বলছি।...

—তাই বলো।

বাজার করা শেষ হয়ে গেলে আমার মালকিন ওই কোণের খ্রীষ্টানের দোকানে গিয়ে একদিন খাওয়ার মত সরাব কেনে। তার পরে আমাকে সঙ্গে করে ধনী উজিরের বাগানবাড়িতে যান। সেখানে একখানা কাপড় দিয়ে আমার চোখ দুটো বেঁধে দেন; তারপরে আমার একটা হাত ধরে নিয়ে যান একটা সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ি দিয়ে আমরা নিচে নামতে থাকি। খানিকটা যাওয়ার পরে কেউ একজন আমার মাথা থেকে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে আমার হাতে আধ দিনার গুঁজে দেয়। তারপরে সেই চোখ-বাঁধা অবস্থায় আমাকে আবার ওপরে পৌঁছে দেয়। আমিও চলে আসি। তার পরের দিন ওই একই ব্যাপার ঘটে। অত মাংস, বাদাম, মোমবাতি দিয়ে কী করেন তা আমি জানি নে।

কসাই বললো—আমার কৌতূহলটা তুমি আরও বাড়িয়ে দিলে ভাই।

এমন সময় দোকানে দু'চার জন খদ্দের এসে পড়ায় সেদিন এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু কথা হয় নি। কিন্তু ওয়াঁর্দার ভাবনাটা কাটলো না। এমন কি সারা রাত ধরেই মেয়েটির কথা সে ভাবতে লাগলো।

পরের দিন যথা রীতি সেই মেয়েটি সেই কুলিটাকে নিয়ে দোকানে মাংস কিনে আর তার দাম দিয়ে বাজারের মধ্যে ঢুকে গেলো। সে মনে-মনে ঠিক করে নিলো যেমন করে হোক ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে—আর আজই। কখন সে বাজার থেকে বেরিয়ে যাবে সেই

তক্কে রইলো সে। মেয়েটি যেই বাজার থেকে বেরোল অমনি কসাই একটা বাচ্চা ছেলের ওপর দোকানের ভার দিয়ে তার পিছু নিলো। তার হাতে যে পাঁঠা-কাটা ভোজালিটা ছিলো সেটাও ভুলে সে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো।

মেয়েটি যাতে তাকে দেখতে না পায় এইভাবে আড়ালে-আড়ালে লুকিয়ে সে তার পিছু পিছু চলতে লাগলো। ধনী উজিরের বাগানের সামনে হাজির হলো মেয়েটি। সে-ও একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলো কুলির চোখ বেঁধে হাত ধরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে মেয়েটি। তারপর আবার কিছুক্ষণ পরে চোখের বাঁধন খুলে কুলিটি বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে। আরও একটু অপেক্ষা করলো ওয়াঁর্দা। তারপরে গাছের আড়ালে নিজেকে ঢেকে খুব সন্তর্পণে সে মেয়েটিকে অনুসরণ করলো। যেতে-যেতে একটা বড় পাথরের চাঁই-এর সামনে এসে দাঁড়ালো মেয়েটি। চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখলো। তারপরে পাথরের একটা বিশেষ জায়গায় আঙুলের চাপ দিলো। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়লো। সেই গর্তের মুখে দেখা গেলো একটা সিঁড়ি। মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গর্তের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওয়াঁর্দা-ও সেই পাথরের কাছে এগিয়ে গেলো। চাপ দিলো পাথরের গায়। তারপরে সিঁড়ির ওপরে নেমে এলো। এর পরে কসাই-এর জবানীতে শুনুন কাহিনীটা।

গর্তের মুখটা বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেলো। কোন দিকে যাব তা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। তারপরে দেখলাম কোথা দিয়ে যেন একটু আলো আসছে। সেই আলো ধরে বুড়ো আঙুলের ওপরে ভর দিয়ে খুব আস্তে-আস্তে আমি এগিয়ে গেলাম। উত্তেজনায় আমার বুক ধড়পড় করে কাঁপছিলো তখন। কিছুটা যাওয়ার পরেই একটা দরজা পেলাম। দরজার ওপরে কান পেতে শুনলাম ভেতরে খুব হাসির হুল্লোড় চলছে। কে যেন শূয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে ভেতরে সেই সঙ্গে ভেসে আসছে নানান ধরণের আওয়াজ। দরজার গায়ে একটা ফোকর ছিলো। সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে আলো আসছিলো বাইরে। সেই ফোকরে চোখ রেখে দেখলাম। হ্যাঁ; সেই মেয়েটাই বটে। মেয়ে একটা পালঙ্কে শুয়ে রয়েছে; আর একটা বেশ বড় বাঁদর মেয়েটাকে দলাই-মালাই করছে। বানরের মুখ অনেকটা মানুষের মুখের মত।

একটু পরে মেয়েটা উঠে পড়লো; তারপরে জামা কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে আবার সে পালঙ্কের ওপরে শুয়ে পড়লো। বাঁদরটা উলঙ্গ মেয়েটার বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো; তারপরে সজোর জাড়িয়ে ধরলো মেয়েটিকে। সারা শরীর দিয়ে ঢেকে দিলো তাকে।

কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে বাঁদরটা উঠে পড়ে একটু বিশ্রাম নিলো। তারপরে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটির ওপরে। আবার আগের মত মেয়েটির বুকের ওপরে শুয়ে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে নিলো তাকে। আর আশ্চর্যের কথা, প্রতিবারই মেয়েটি গভীর সুখে বানরটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো, সোহাগ করলো—মানুষ যেমন সঙ্গমের সময় নারীকে সোহাগ করে ঠিক সেই রকম। এই রকম বার দশেক করার পরে দু'জনেই এলিয়ে বিছানার ওপরে ঢলে পড়লো; তারপরে পড়লো ঘুমিয়ে। আর কারও সাড়াশব্দ নেই।

ভোর হয়ে আসছে দেখে থেমে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো তিপান্নতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার শুরু করলো গল্প ঃ

কসাই বললো—আমার অবস্থাটা সহজেই আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন। আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। এরকম মেয়ে থাকে? ওরা ঘুমোচ্ছে। এমন সুযোগ আর আসবে না বুঝতে পেরে কাঁধ দিয়ে চাপ মেরে দরজা খুলে লাফ দিয়ে ঢুকলাম। হাতে আমার কসাই-এর ছুরিটা তখন কাঁপছে। লোকে বলে এই ছুরিটা মাংস কাটার আগে হাড়ে গিয়ে পৌঁছয়। এত ধার ছুরিটার।

সেই ছুরি নিয়ে ঘুমন্ত বাঁদরটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে তার শিরটা ধড় থেকে নামিয়ে দিলাম। মরার আগে গলার ভেতর থেকে একটা বীভৎস আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। রক্তে ভেসে গেলো সারা ঘর। ভীষণ ধড়পড় করতে-করতে স্থির হয়ে গেলো দেহটা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো মেয়েটির। চোখ খুলে দেখে রক্তে মাখা ছোরা হাতে নিয়ে আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বুঝতে পেরেই সে এমন জোরে চেঁচাতে আরম্ভ করলো যে মনে হলো সে বুঝি মরেই যাবে। চেঁচাতে-চেঁচাতে হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে গেলো। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম তাঁর। তারপরে মেয়েটা ধাতস্থ হলো। চিনতে পারলো আমাকে।

—তুমিই সেই ওয়াঁর্দা। একজন ভালো খদ্দেরকে কী পুরস্কার দিলে!

বললাম—ওই জানোয়ারটার হাত থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম। কিন্তু তোমাকে আনন্দ দেওয়ার মত কি পুরুষ নেই দুনিয়ায়? একটা জানোয়ারের সঙ্গে তোমাকে ....;

মেয়েটি বললো—আগে আমার কাহিনীটা মন দিয়ে শোনো ওয়াঁর্দা। তাহলে আমাকে খানিকটা বুঝতে পারবে।

বলো—তোমার কাহিনী কী শুনি।

মেয়েটি বললো—আমি ধনী উজিরের একমাত্র মেয়ে। পনের বছর বয়স পর্যন্ত বাবার বাড়িতে আমার সুখেই কেটেছিলো। আমাদের একটা নিগ্রো ক্রীতদাস ছিলো। একদিন আমি তারই পাল্লায় পড়লাম। তুমি বোধ হয় জান, মেয়েদের ভেতরের কামনা জাগাতে ওদের জুড়ি আর কেউ নেই। বিশেষ করে তরুণী মেয়েদের যৌবনের ক্ষিদে মেটাতে ওরা ওস্তাদ। তা ছাড়া, আমার গড়নটা এমনি ছিলো যে সেই বয়সেই আমাকে বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে বলে মনে হোত। ওই নিগ্রোর কাছেই আমি প্রথম যৌবনের স্বাদ পেলাম। ক্ষিদেটাও এমন বেড়ে গেলো যে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওই নিগ্রোর সঙ্গে সহবাস না করলে আমার চলত না।

ভালোই চলছিলো; কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় নিগ্রোটি হঠাৎ মারা গেলো একদিন। পুরুষের সঙ্গে সহবাসের স্বাদ যে পেয়েছে সে কি চুপ করে থাকতে পারে? পুরুষ সঙ্গ না পেয়ে আমি দিন-দিন অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম। এমনি সময় আমাদের বাড়ির এক বুড়িকে সব খুলে বললাম। সে বললো—এ জগতে ওসব ব্যাপারে নিগ্রোদের চেয়ে উপযুক্ত মানুষ আর নেই বাছা। তোমার যে কষ্ট হবে সে আর এমন কথা কী? তবে নিগ্রো যদি না-ই পাও তাহলে অগত্যা গরিলার মত দেখতে কোন একটা বাঁদরই বেছে নাও। এসব কাজে বাঁদররাও বিশেষ দক্ষ।

কিন্তু ওই জাতীয় বাঁদরই বা পাই কোথায়? আমার যে আর তর সইছে না। বাঁদর খোঁজার চেষ্টায় ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমন সময় দেখলাম আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে একটা লোক কতগুল বাঁদর নিয়ে যাচ্ছে। আমার বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগলো। লোকটা আমার জানলার দিকে এগিয়ে এলো। নাকাব সরিয়ে বানরগুলির দিকে তাকালাম আমি। কী করব, কী করব ভাবছি; এমন সময় দেখলাম লোকটার দলের বেশ একটা বড় ধরনের বাঁদর আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই বড় বাঁদরটা আমাকে দেখে কী ভাবলো কে জানে। হঠাৎ সে তার শেকল ছিঁড়ে লাফ দিয়ে রাস্তার ওধারে চলে গেলো; তারপরেই হাওয়া। লোকটা অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও বাঁদরটাকে খুঁজে না পেয়ে হায়রানি হয়ে শেষ পর্যন্ত চলে গেলো। বাঁদরটা

এতক্ষণ আমাদের বাগানের এক কোণে লুকিয়েছিলো। লোকটা চলে যাওয়ার পরে সে সটান আমার ঘরের ভেতরে চলে এলো। আসর সঙ্গে-সঙ্গে এক মুহূর্ত দেরী না করে সে আমাকে জাপটে ধরে ফেললো। প্রথম-প্রথম আমার গা-টা ঘিনঘিন করত; তারপরে, অভ্যাস হয়ে গেলো। এখন বেশ আরামই হয়।

শেষে একদিন বাবা সব ধরে ফেললেন। আমাকে সেদিন তিনি বেদম প্রহার করেছিলেন। কিন্তু ওকে ছাড়া আমি বাঁচব কেমন করে? তাই ওকে লুকিয়ে রাখার জন্যে এই মাটির তলায় ওর ঘর বানিয়ে দিয়েছি। এতে ও বাঁচলো; আমি যথারীতি আনন্দ পেতে লাগলাম। রোজই ওর জন্যে আমি খাবার এনে দিই, এনে দিই সরাব। কিন্তু এখন আমার কী হবে? আমি কাকে নিয়ে বাঁচব?

বলতে বলতে মেয়েটা ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললো।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কেঁদো না। তোমার কাজ চলা নিয়ে কথা। বাঁদরের বদলে আমিই তোমার কাজ চালিয়ে যাব। দেখবে, ওই বাঁদরটার চেয়ে আমার ক্ষমতা মোটেই কম নয়। আমি বেশ ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারি। লোকে বলে শুধু ঘোড়া নয়, আর সব ব্যাপারেই কারও ওপরে চড়ার সুযোগ পেলে আর কিছু আমি চাই নে।

আমার প্রস্তাবে রাজি হলো মেয়েটি। কেবল সেদিনই নয়; তারপর থেকে প্রতিদিনই আমি তার কাছে যেতাম আর তাকে বহুৎ আনন্দ দিতাম। তাকে আনন্দ দিতে আমারও বেশ ভালো লাগত। একদিন সে স্বীকারই করে ফেললো যে এসব ব্যাপারে বাঁদরের চেয়েও আমার শক্তি আর কৌশল অনেক বেশী। ফলে উৎসাহ পেয়ে আমি দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে তার কাছে যেতে লাগলাম।

কিন্তু এসব জিনিস একভাবে বেশী দিন চলে না। প্রথমে লোভে পড়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম বটে; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই আমার শক্তি কমে গেলো। সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে মানুষ যেমন অনতিবিলম্বেই হাবুডুবু খেতে থাকে আমার অবস্থাও সেই রকম দাঁড়ালো। তীরে বোধ হয় আর পৌঁছতে পারব না। এদিকে মেয়েটির কামনায় যেন ঘি পড়লো। তার কামনা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। প্রতিদিনই সে উগ্র থেকে উগ্রতর হয়; আমাকে গ্রাস করে ফেলে। দুর্বার হয়ে ওঠে সে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকে ছাড়িয়ে সে সামনে এগিয়ে যায়। পেছোতে সে আমাকে কিছুতেই দেবে না। আমারও শক্তি নেই তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার। এমন বিপদেও পুরুষ মানুষে পড়ে? ই আল্লা!

পরিস্থিতিটা এই রকম জটিল হয়ে উঠলে একটি বুড়ির সঙ্গে আমি কিছুটা শলাপরামর্শ করলাম। বুড়িটা তুকতাক জানত; তা ছাড়া, গোপন রোগ সারানোর দাওয়াই তো জানত অনেক। অনেকের অনেক রোগই সে নাকি সারিয়ে দিয়েছে। সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বললাম—দস্যি মেয়েটার ক্ষিদে মেটাতে পারি এমন একটা দাওয়াই আমাকে দাও। এমন একটা ওষুধ দাও যেটা খাইয়ে তাকে শান্ত করতে পারি।

দাদি বললো—রোগটা বড় সোজা নয়রে সাহেব।

—দেখ দাদি, তুমি তো বাপু আজকের মানুষ নও। সব চুলই তোমার পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। তোমার নামডাক কত! আমি জানি, অনেক লোককেই তুমি ওষুধ দিয়েছ। তুমিই পারবে আমাকে বাঁচাতে।

—দেখি, কী করতে পারি।

এই বলে বুড়ি একটা মাটির হাঁড়ি নিলো। তার ভেতরে ঢাললো মিশরীয় নুপিন গাছের একমুঠো বীজ, এক গ্রাস ভিনিগার, দু' ছটাক হপ গাছের ছাল; আরও কিছু গাছ-গাছড়ার ছাল। তাদের নাম আমি জানিনে। তারপরে জলে ভর্তি করে সেই হাঁড়িটা বসিয়ে দিলো গনগনে উনোনে। টগবগ করে ফুটতে লাগলো জল। ঘন্টা দুই পরে উনুন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে ছেঁকে শিশিতে পুরে বুড়ি বললো—এই নাও দাওয়াই। এতেই কাজ হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু এ ওষুধটা খাওয়াবো, না, লাগাব? না, বাবা। এসব কাজ আমার দ্বারা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে যাহোক একটা বিহিত করে এসো।

—ঠিক আছে। চলো।

বুড়িকে সঙ্গে করে লুকিয়ে মাটির নিচের ঘরটিতে নিয়ে গেলাম। বুড়ি আমাকে চুপিচুপি বললো—অন্য দিনের মতই তুমি কাজ করে যাবে। সে যেন তোমার মতলবটা বুঝতে না পারে। কাজ শেষ হওয়ার পরে সে যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন তুমি আমাকে ডেকে নিয়ে যেয়ো।

এই বলে বুড়ি অন্ধকার বারান্দার একটি কোণে ঘাপটি মেরে বসে রইলো। ভাবলাম, আজ আমার জীবন-মরণ সমস্যা। সুতরাং, বুড়ির নির্দেশ মতই চলতে হবে আমাকে।

গায়ে তখন আমার মত্ত হাতির বল। অন্য দিনের চেয়ে সেদিন মেয়েটিকে আমি অনেক বেশী আনন্দ দিলাম। দশবারের বার আনন্দের ধাক্কাটা সহ্য করতে না পেরে সে অজ্ঞান হয়ে গেলো। সেই সুযোগে লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বুড়িকে ডেকে নিয়ে এলাম। বুড়িও তাড়াতাড়ি তার ওষুধ নিয়ে এলো। ওষুধটা প্রথমে সে গরম করলো। তারপরে মেয়েটার পা দুটো ফাঁক করে দুই উরুর মাঝখানে গরম গরম সেই ওষুধটা ঢেলে দিলো। একটা রঙিন ধোঁয়া মেয়েটার নিম্নাংগ ঢেকে ফেললো। বেশ বোঝা গেলো, ধোঁয়াটা ধীরে-ধীরে তার শরীরের ভেতরে ঢুকছে। ওষুধটা যথেষ্ট কড়াই বলতে হবে; কারণ, তার দুটি উরুর ফাঁক থেকে হঠাৎ পোকার মত কী যেন দুটি জিনিস বেরিয়ে এলো। ভালো করে নজর দিয়ে দেখলাম—পোকা দুটো বেশ বড়—অনেকটা বান-মাছের মত! একটার রঙ কালো, আর একটার হলুদে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো চুয়ান্নতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে শুরু হলো শাহরাজাদের গল্প ঃ

বান মাছের মত দুটো পোকা দেখে চেঁচিয়ে উঠলো বুড়ি—হয়েছে; ওষুধে কাজ হয়েছে। আল্লাকে ধন্যবাদ জানাও। মেয়েটার এই ভীষণ যৌনক্ষুধার কারণই ওই দুটো পোকা। তুমি বলছিলে না? এই দেখ। নিগ্রোটার সঙ্গে সহবাসের ফলে জন্মেছে এই কালো পোকাটা; আর বাঁদরের সঙ্গে সহবাসের ফলে জন্মেছে এই হলদেটা। ওই দুটো পোকার জন্যেই ওর এই অবস্থা। পোকা দুটো গেলো। এবার ও স্বাভাবিক হয়ে আসবে আর পাঁচটা মেয়েদের মতই। অমন খাই খাই, গেলুম-গেলুম ভাবটা আর থাকবে না ওর।

বুড়ি ঠিকই বলেছিলো। পরের দিন যখন তার কাছে গেলাম তখন সে বেশ শান্তভাবেই আমাকে গ্রহণ করলো। কামনার আর সেই উগ্রতা নেই। অনর্থক বিলম্ব না করে আমি তাকে শাদীর প্রস্তাব দিলাম, এতদিন আমার সঙ্গে শুয়েছে সেইজন্যে সে আর আপত্তি করলো না। আমাদের শাদীও হয়ে গেলো। আমাদের দু'জনের জীবনে নেমে এলো বেহেস্ত। সুখের সাগরে ভেসে গেলাম আমরা। সেই বুড়িকে আমাদের বাড়িতে এনে আদর যত্ন করে রাখলাম। আমাদেরই পরিবারের একজন হয়ে গেলো সে। বুড়ি আমাদের দুজনকেই বাঁচিয়েছে। স্বাভাবিক সুন্দরভাবে কেমন করে বাঁচা যায় সে ওষুধও সে আমাদের দিয়েছে। আল্লাহ ভালোই আছি আমরা।

শাহরাজাদ বললো—যে সব মেয়েরা সব সময় খাই-খাই করে তাদের রোগ সারানোর গল্প আপনি শুনলেন জাঁহাপনা।

শারিয়ার বললেন—এই ওষুধটার কথা আমি গতবছর জেনেছি। আর এই গল্পটাও গতবছরের। ওই বদমাস মেয়েটাকে ধোঁয়া দিয়ে সারানো হয়েছিলো তা-ও আমি শুনেছি। মানে, মেয়েটাকে আমি দেখেছি। শাহরাজাদ, ও সব শেকড়-বাকড়ের কথা আজ থাক। যা আগে শুনিনি এমন একটা দারুণ গল্প তুমি আমাকে বলো। আজ মনটা বিশেষ ভালো নেই আমার। মনে উত্তেজনা জাগে এই রকম একটা গল্প বলো।

শাহরাজাদ একটু ভেবে বললো—তাহলে শুনুন জাঁহাপনা।

প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে ড্যানিয়েল নামে একজন সাধুপ্রকৃতির পণ্ডিত মানুষ বাস করতেন। তাঁর শিষ্য ছিলো অনেক। শিষ্যেরা প্রতিদিন তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখতে আসতেন। দুঃখের কথা, এই জ্ঞানী তাপসের কোন সন্তান ছিলো না। মৃত্যুর পরে তাঁর শিক্ষা বা পুঁথিপত্র তাঁর বংশের কেউ পাবে না এইকথা ভেবে তিনি বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন, একটি সন্তানের জন্য তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। পরম করুণাময় আল্লাহর প্রাসাদে কোন দ্বাররক্ষী নেই। সেই জন্যেই হয়ত তাঁর প্রার্থনা অতি সহজেই আল্লাহর কানে গিয়ে পৌঁছল। আল্লা তাঁকে নিরাশ করলেন না। সন্তান সম্ভবা হলেন।

দিন যায়; মাস যায়। ড্যানিয়েলের পত্নী মাস গুণতে থাকেন।

একদিন ড্যানিয়েল তাঁর পত্নীকে ডেকে বললেন ঃ অনেক বুড়ো হয়ে পড়েছি। যে কোন সময়েই আমার মৃত্যু হতে পারে। তোমার গর্ভের সন্তান শীঘ্রই ভূমিষ্ঠ হবে। মৃত্যুর পরে বইপত্র অথবা পাণ্ডুলিপি ঠিক জায়গায় থাকবে বলে মনে হচ্ছে না, আমার প্রয়োজনের সময় সে হয়তো সেগুলি ঠিক কাছে পাবে না।

লিখতে বসলেন ড্যানিয়েল। জীবনে যা শিখেছেন সে-সবই তিনি ছোট করে লিখে রেখে যেতে চান। কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যেই তাঁর অগাধ জ্ঞান পাণ্ডিত্যের বিষয়ে লিখে যাবেন। স্বভাবতই সে সব ছোট্ট করে লিখতে হবে। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের সারাংশটুকু আর পাঁচ হাজার পাণ্ডুলিপি—এসব জিনিস কয়েক পাতা কাগজের মধ্যে ধরানো কি সহজ কাজ; কিন্তু সেই অসাধ্য কাজ তিনি করলেন। লেখার শেষে বারবার কাগজগুলি পড়লেন। না, এতো আর কমানো যাবে না। এই পাঁচ পাতায় আনতে তাঁকে সারাটা বছর খাটতে হয়েছে; সেই পাঁচ পাতাকে কমিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি এক পাতায় দাঁড় করালেন।

মৃত্যু যে তাঁর ক্রমশই এগিয়ে আসছে সে কথাটা বুঝতে পারলেন ড্যানিয়েল। বুঝতে পেরে তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপি তিনি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। কেউ যাতে সেগুলি আবিষ্কার করতে না পারে এই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। নিজের ছেলের জন্য কেবল রাখলেন সেই এক পৃষ্ঠা কাগজ। তারপরে পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীকে ডেকে বললেন—শোনো, আমার সময় হয়ে এসেছে। বেহেস্ত আমাদের যে সন্তান দিয়েছেন তার মুখ দর্শন করার সময় আমার আর হলো না। ঈশ্বরর বোধ হয় সে অভিপ্রায় নয়। বংশধর হিসাবে আমি তার জন্যে কেবল এই কাগজটুকু রেখে গেলাম। বড় হয়ে ছেলে যখন তার বাবার সম্পত্তি দাবী করবে তখন তার হাতে তুমি এই কাগজটা তুলে দিয়ো। সে যদি এই কাগজটি পড়ে এর মর্ম উদ্ধার করতে পারে তাহলে সে তার সময়ে সবচেয়ে বিজ্ঞবান বলে পরিচিত হবে। তার নাম রেখ হাসিব।

বলতে-বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ড্যানিয়েল।

শেষকৃত্যের সময় তাঁর সমস্ত শিষ্য আর শহরের মানুষেরা এসেছিলেন। তাঁর তিরোধানে কেঁদেছেন সবাই, শোক করেছেন সকলেই।

ড্যানিয়েলের মহাপ্রয়াণের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। নামকরণের সময় পিতার ইচ্ছামত নবজাতকের নাম হলো—হাসিব। জ্যোতিষীদের ডেকে আনা হলো নবজাতকের ভাগ্য গণনা করার জন্যে। অনেক আঁকজোঁক কষে জ্যোতিষী বললেন—পুত্রবতী, তোমার সন্তান দীর্ঘজীবী। তবে যৌবনে ওর একটা ফাঁড়া রয়েছে। সেই ফাঁড়াটা কেটে গেলে সে অনেক দিন বাঁচবে। বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করবে অনেক, নামও হবে তাঁর; অর্থের রোজগার করবেও অনেক—যদি অবশ্য ওই ফাঁড়াটা ওর কেটে যায়।

এই বলে পাওনাগণ্ডা নিয়ে জ্যোতিষী বিদায় নিলেন।

দিনে-দিন বাড়তে লাগলো শিশুটি। পাঁচ বছর বয়সে তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হলো। কিন্তু লেখাপড়া হলো না তার। বিদ্যালয় ছাড়িয়ে তাকে পেশাগত ব্যবসায় লাগিয়ে দিলেন। বিধবা মায়ের ভরণ পোষণ তো তাকেই করতে হবে। কথাটা ঠিকই; কিন্তু করবেটা কে? ছেলে তো ওদিকে বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজকর্মের ধার দিয়েই সে যাচ্ছে না। বয়স হলো পনের। না শিখলো লেখাপড়া, না শিখলো কাজকর্ম। বিধবা মা কেবল কেঁদে বেড়ান। প্রতিবেশীরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—শাদী না দিলে তোমার ছেলের ওই বাউণ্ডেলেমী কাটবে না। ঘাড়ে বউ পড়লেই ও খাটবে। আর পাঁচজন যেভাবে রোজগার করছে ও-ও সেইভাবেই করবে।

পাড়াপড়শীর কথা শুনে অনেক খুঁজে-পেতে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন তিনি। সবাই ভেবেছিলো, অমন সুন্দর বউ পেয়েছে, কাজ এবার সে নিশ্চয় করবে, করবে রোজগারপাতি। ওমা! কার ঝাড় কে বাঁশ কাটে! যাদৃশী ভাবনা যস্য। সেই আগের মত খালি ঘুরে বেড়ায়—কাজকর্মের ধার দিয়েও যায় না।

প্রতিবেশীদের মধ্যে কিছু মানুষ কাঠ কেটে সংসার চালায়। তারা একদিন হাসিবের মায়ের কাছে এসে বললো—এক কাজ কর। একটা গাধা, কিছু দড়ি, আর একটা কুড়োল কিনে দাও তোমার ছেলেকে। আমরা ওকে নিয়ে যাব পাহাড়ে; কাঠ কেটে আনবে। কাঠ বেচে যা লাভ হবে ওকেই না হয় দিয়ে দেব। তোমার আর তোমার বউ-এর পেট চলে যাবে তাহলে।

আনন্দে রাজি হয়ে গেলেন হাসিবের মা। সব কিছু কিনে এনে ছেলেকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—ওদের সঙ্গে যাও। কোন ভয় নেই তোমার। তোমরাও ঘাবড়িয়ো না, ওর বাবা আর আমার পুণ্যে ছেলের কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের আশীর্বাদ ওর মাথায় ছাতার মত বিছিয়ে থাকবে।

কাঠুরেরা হাসিবকে নিয়ে কাঠ কাটতে চলে গেলো পাহাড়ে কী করে কাঠ কাটতে হয়, কাটা কাঠ কেমন করে গাধার পিঠে চড়াতে হয় সব তারা শিখিয়ে দিলো তাকে।

হাসিবেরও বেশ ভালো লাগলো কাজটা। খুব কম সময়ের মধ্যেই সব কাজ সে শিখে নিলো। পাহাড়ের সবুজ বনানী, খোলা আকাশ আর মিষ্টি বাতাস—সব কিছুই ভালো লেগে গেলো তার। কাঠ কেটে ভালোই রোজগার হতে লাগলো হাসিবের। মা আর বউ-এর অভাব মিটলো কিছুটা।

একদিন কাঠুরেরা পাহাড়ের কোলে কাঠ কাটছে এমন সময় হঠাৎ ভীষণ জোরে বৃষ্টি নামলো। সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ বজ্রপাত। সকলে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো একটা গুহার ভেতরে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে আগুন জ্বালালো সেখানে। হাসিবের কাজ হলো চুল্লীতে শুকনো কাঠ যোগান দেওয়া। গুহার বাইরে থেকে কাঠ চেলা করে আনতে হচ্ছে হাসিবকে। কাঠ চেরাই করতে-করতে কুড়োলটা হঠাৎ ঝোপের ভেতরে গিয়ে একটা শক্ত জিনিসের

ওপরে আঘাত করলো—ঠং করে শব্দ হলো একটা। মনে হলো সেই জায়গার মাটিটা ফাঁপা। সঙ্গে-সঙ্গে হাসিব মাটি খুঁড়তে শুরু করলো। মাটি কিছুটা সরে যাওয়ার পরেই একটা পাথরের চাঁই দেখতে পেলো। মাঝখানে তামার বড় একটা ঝুড়ি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে দিলো শাহরাজাদ।

তিনশো পঞ্চান্নতম রজনী ঃ

হাসিব গিয়ে কথাটা বলতেই সবাই হুড়মুড় করে দৌড়ে গেলো। ধরাধরি করে পাথরের চাঁইটা তুলে ফেললো সকলে। পাথরের নিচে বিরাট একটা গর্ত। উঁকি দিতেই মনে হলো ভেতরের দিকে একটা সুড়ঙ্গ চলে গিয়েছে। সেই সুড়ঙ্গের তলায় যেন সারি সারি জালা সাজানো। জালাগুলোর সব মুখ বন্ধ। মাটির ওপর থেকে নিচে নামার কোন সিঁড়ি নেই। জালাগুলির গলায় দড়ি বেঁধে ওপরে তুলে আনতে হবে। হাসিবই দড়িতে ঝুলে নিচে নেমে পড়লো।

নিচে নেমে হাসিব কুড়োল দিয়ে একটা জালা ফাটিয়ে ফেললো। কিছুটা খাঁটি হলদে মধু গড়িয়ে পড়লো বাইরে। নিচে থেকে চেঁচিয়ে ব্যাপারটা সে সবাইকে জানিয়ে দিলো। কাঠুরেরা এ কথাটা মোটেই ভাবে নি; ভেবেছিলো ওই জালাগুলির মধ্যে নিশ্চয় মোহর টোহর জাতীয় কিছু মূল্যবান সম্পত্তি রয়েছে। যাই হোক, যা পাওয়া যায় তাই ভালো। ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে দিলো তারা। হাসিব সেই দড়িগুলি জালার মুখে বেঁধে দিলো। তারপরে জালাগুলিকে একটা একটা করে ওপরে টেনে তোলা হলো। সেগুলিকে তারা গাধার পিঠে তুললো; কিন্তু হাসিবকে কেউ গর্ত থেকে আর তুললো না। জালাগুলি গাধার পিঠে ভালো করে বেঁধে তারা রওনা হলো বাজারের দিকে। যেতে-যেতে নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগলো ঃ গর্ত থেকে ওকে তুললে এই মালের ভাগ দিতে হোত না? শুধু শুধু ওকে ভাগ দিতে যাব কোন্ দুঃখে? সংসারের কুলাঙার ওটা। ওর মরে যাওয়াই ভালো।

বাজারে এসে একজনকে শিখিয়ে পড়িয়ে হাসিবের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলো তারা। সে তার মাকে বললো—আমরা পাহাড়ের গায়ে যখন কাঠ কাটছিলাম তখন তোমার ছেলের গাধাটা কোথায় যে চলে গেলো বুঝতে পারলাম না। গাধাটার পেছনে পেছনে তোমার ছেলেও গেলো চলে। কী বৃষ্টি!! আমরা একটা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ একটা বাঘ কোথা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে তোমার ছেলে আর গাধাকে মেরে ফেললো।

হাসিবের মা আর বউ শোকে-দুঃখে কান্নায় গড়াগড়ি দিতে লাগলো, লাগলো বুকে চাপড়াতে। এ কান্না কি আল্লার দরবারে পৌঁছবে না।

কাঠুরেরা মধুর জালাগুলি বেচে প্রচুর লাভ করলো। লাভের পয়সা দিয়ে প্রত্যেকে দোকান সাজিয়ে বসলো। বেশ ভালোভাবেই দিন কাটে তাদের,—হাসে, খেলে, স্ফূর্তি করে। উৎসবে আয়োজন করে প্রচুর খানাপিনার।

এদিকে হাসিবকে তো তারা ফেলে চলে গেলো। বেচারা গর্ত থেকে ওঠার অনেক চেষ্টা করলো; কিন্তু পারলো না। চেঁচিয়ে গলা ফাটাল। কেউ তার ডাকে সাড়া দিলো না। কেঁদে বুক ভাসালো; কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। কুড়োল দিয়ে দেওয়ালে গর্ত করার চেষ্টা করলো; কিন্তু গ্রানাইট পাথরের বুকে ঘা খেয়ে ছিটকে পড়লো কুড়োল। ভয় ধরে গেলো তার। কী করবে সে? ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যাই করবে ঠিক করলো। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে মাথা ঠুকতে লাগলো। হঠাৎ দেখে পাথরের ফোকর থেকে বিরাট একটা কাঁকড়া বিছে তার দিকে দৌড়ে আসছে তাকে কামড়ানোর জন্যে। আত্মহত্যার কথা উবে গেলো তার মন থেকে। কুড়োলটা তুলে নিয়ে এক কোপে দু টুকরো করে ফেললো কাঁকড়া বিছেটাকে। তারপরেই সে চোখ চিরে দেখতে লাগলো। কাঁকড়া বিছেটা এলো কোন দিক থেকে? যেখান থেকে বিছেটা

এসেছে সেখান থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা বেরিয়ে আসছিলো। কুড়ুলের মাথা দিয়ে সে খুব জোরে ঘা মারলো সেখানে। দরজার কিছুটা অংশ ফাঁক হয়ে গেলো। আরও জোরে চাড় দিতেই ওপাশটা ধ্বসে গেলো।

হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসলো হাসিব। মাটির ওপরে বিরাট লম্বা একটা গ্যালারী। তার ওপাশে আলো জ্বলছিলো। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলো হাসিব। ঘুরতে-ঘুরতে একটা বড় কালো ইস্পাতের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজার গায়ে রূপোর তালা আর সোনার চাবি ঝুলছিলো। দরজা খুলেই সে অবাক হয়ে গেলো। সামনে একটা সরোবর। তার ওপরে খোলা, মুক্ত আকাশ। পায়ের তলায় পান্নার পাহাড়। সেই সোনার সিংহাসন, সোনা আর রূপোর বসবার আসন, পান্নার পাহাড়—সবই কী সুন্দরই না প্রতিবিম্বিত হয়েছে ওই সরোবরের জলে। বসবার আসনগুলি গুণে দেখলো হাসিব—ঠিক বারো হাজার। কোন কিছু না ভেবে চিন্তেই হাসিব সিংহাসনের ওপরে বসে পড়লো। বসে-বসে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো সে। এত বড় সুন্দর সরোবর, এত সুন্দর পাহাড়—ব্যাপারটা কী?

সিংহাসনে বসে পা দুলাতে লাগলো হাসিব। তার কানে এলো করতালের মৃদু তরঙ্গ। সিংহাসনের পেছনে তাকিয়ে দেখলো পান্না-পাহাড়ের ওপর দিয়ে বিরাট একটা মিছিল আসছে সরোবরের দিকে। মিছিলটা হেঁটে আসছিলো না, আসছিলো হাওয়ায় ভেসে। অনেক দূর থেকে আসছিলো বলেই বোধ হয় হাসিব বুঝতে পারলো না তারা মানুষ না অন্য কিছু। আরও কাছে এগিয়ে এলো মিছিল। একদল মেয়ে লোক—খুব সুন্দরী দেখতে। কিন্তু কী অদ্ভুৎ ব্যাপার! তাদের নিম্নাংগে কোন পা নেই, অংশটা লম্বা সরীসৃপের মত। তাই তারা হাঁটতে পারে না, সরীসৃপের মত ঘসড়ে-ঘসড়ে হাঁটে। তারা সুন্দর গলায় গান গাইছিলো। একজন গ্রীক ভাষায় রানীর প্রশস্তি গাইছিলো। এরা নিশ্চয় সর্প-কুমারী। রানীর অবশ্য তখনও দেখা নেই। মাত্র চারজন সর্প-কন্যা হাজির হয়েছে। তারা মাথার ওপরে বয়ে আনছে বিশাল একটা সোনার গামলা। ওই গামলায় বসে আছেন তাদের রানী। রানী হাসছেন। চারজন সিংহাসনের কাছে এসে দাঁড়াতেই হাসিব তড়াক করে লাফ দিয়ে নিচে নেমে এলো। রানীকে তারা সিংহাসনে বসালো। রানীর নাকাব ঠিক করে দেয়; তারপরে ঘিরে দাঁড়ালো তাঁকে। অন্যান্য সর্প-কন্যারা বাকি আসনে বসে যায়।

রানী উপস্থিত সকলের সামনে গ্রীক ভাষায় বক্তৃতা শুরু করলো। সুন্দর সুরেলা কণ্ঠ রানীর। বক্তৃতা শেষে করতালের আওয়াজ হলো, সঙ্গে-সঙ্গে সকলে রানীর স্তব করতে লাগলো। এই স্তুতি গ্রীক ভাষায় গাওয়া হলো। স্তবের পর যার যার আসনে বসে পড়লো।

স্তব গানের পর রানী এবার হাসিবের দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো। রানী অবশ্য ওর উপস্থিতি টের পেয়েছিলো। ওকে ইশারায় কাছে ডাকলো। তা অবশ্য হাসিব একটু ভয়ও পেয়েছিলো, তবু দ্বিধাগ্রস্তভাব নিয়ে ও এগিয়ে গেলো রানীর দিকে। সোজাসুজি একখানা আসন দেখিয়ে রানী ওকে বসতে অনুরোধ করলো। আসনে বসার পর রানী বললো,—এ দুনিয়ার তলায় আমার সাম্রাজ্যে তোমাকে স্বাগতম জানাই। ভাগ্যবান লোকই কেবল এখানে আসতে পারে। সংকোচ আর ভয় ঝেড়ে ফেলো যুবক। তোমার নাম বলো। আমার নাম যমলিকা। এই যে দেখছ সব সর্প-কন্যা, এরা আমার প্রজা। এবার বলো, কে তুমি? কি করে তুমি এই সরোবরের পাড়ে এসে পড়লে? এই সরোবর আমার শীতাবাস। শীতকালে আমার গ্রীষ্মাবাস মাউন্ট কাফ ছেড়ে এখানে চলে আসি বছরের কয়েক মাসের জন্য।

যুবক হাসিব নত হয়ে ভূমি চুম্বন করে রানীর ডানদিকের পান্না আসনে বসে বললো—আমার নাম হাসিব। ড্যানিয়েলের পুত্র। বাবা আমার জন্মের আগে মারা গেছেন। সারা দুনিয়ার লোক জ্ঞানী আর তাপস বলে তাঁকে জানত। মান্য করত। আমি আমার পিতার মত একজন ঋষি বা জ্ঞানী হতে পারতাম, নিদেনপক্ষে একজন ব্যবসায়ীও হতে পারতাম। আমার ওসব

হতে ভালো লাগলো না। পড়াশুনা শিখলাম না, ব্যবসা করলাম না। খালি ঘুরে-ঘুরে বেড়ালাম। বনের পশুপাখী, পাহাড়ের খোলা আকাশ আমাকে ভীষণ টানত। আমি কাঠুরে হলাম। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থেকে আমি মরতে চাই নি। আমার মৃত্যুর পর কেউ যেন আমার ওপরে সমাধি বেদী না করে। মৃত্যুর পরও আমি শান্তি পাব না তাহলে।

এরপর আনুপূর্বিক সব সে খুলে বললো। অন্যান্য কাঠুরেদের সঙ্গে কিভাবে এখানে এলো, আর মাটির তলায় এই সাম্রাজ্যে কেমন করে পৌঁছলো—সব বললো।

হাসিবের কাহিনীতে রানী খুশী হয়ে বললেঃ

—হাসিব, তুমি সেই গর্তে অনেকক্ষণ বন্দী ছিলে। তারপরে এখানে এসেছো, তাও অনেকক্ষণ হলো। তোমার নিশ্চয়ই খিদে তেষ্টা পেয়েছে।

এই বলে রানী একজন সর্প-কন্যাকে ইশারা করতেই, একটি সোনার থালা ভর্তি খাবার নিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে এলো। থালায় কি নেই? —আছে আঙুর, আপেল, পেস্তা, মটকা, ডুমুর আর ভালো ভালো মর্তমান কলা। চেটেপুটে খেয়ে নিলো হাসিব, খুব খিদেও পেয়েছিলো। ঢেকুর তুললো। এরপর এক গেলাস সুগন্ধী সরবত ঢকঢক করে খেয়ে নিলো। সরবতের গেলাসটা ভারি

চমৎকার। একটা বড় চুনি কেটে গেলাসটা তৈরি। লাল টুকটুক করছে। যে মেয়েটি খাবার দিয়েছিলো সেই থালা নিয়ে চলে গেলো।

রানী বললো—যুবক তুমি নিশ্চিন্ত হও। যতদিন খুশি তুমি আমার সাম্রাজ্যে থাকতে পার। তোমার কেউ ক্ষতি করবে না। এই সরোবরের ধারে গাছের ছায়ায় বা পাহাড়ের ঢালে প্রকৃতির কোলে সপ্তাহ খানেক থেকে যাও। আমি তোমাকে আমন্ত্রণ করছি। তোমার সময় আমি ভরিয়ে দেব গল্প বলে। তুমি যখন আবার মানব দেশে ফিরে যাবে এই গল্প তোমার কাজে লাগবে।

রানীর প্রজা বারো হাজার সর্প কন্যা আর জ্ঞানী তাপস ড্যানিয়লের ছেলে হাসিবকে রানী যমলিকা গল্প বলবে। সর্পকনারা বসে আছে সোনা-রূপার আসনে আর হাসিব বসে আছে পান্না-আসনে। গল্প শুরু হলোঃ

কোন এক রাজ্যে বানু-ইসরায়েল নামে এই নৃপতি রাজত্ব করতেন। রাজা মৃত্যু শয্যায় তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র বুলুকিয়াকে ডেকে বললেন!—বুলুকিয়া, আমার মৃত্যুর পর আমার সিংহাসনে বসে তুমি প্রথমেই একটা কাজ করবে।—রাজপ্রাসাদের যাবতীয় সম্পত্তির যে যত ক্ষুদ্র আর ছোট হোক না কেন, একটা ব্যক্তিগত ফর্দ বানাবে। আর, ভালোভাবে পরীক্ষা না করে প্রাসাদের বাইরে কোন জিনিস বেরোতে দেবে না।

নৃপতির পরোলোকগমনে পুত্র বুলুকিয়া সিংহাসনে বসেই বাবার আদেশ মেনে কাজ শুরু করে দিলো। সমস্ত ঐশ্বর্য, জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করলো। অনেকগুলো হলঘরে ধনদৌলত জমিয়ে রাখা হত। হলগুলোর দরজা খুলে ঘুরে ঘুরে দেখলো। দেখতে-দেখতে একটা গোপন ঘরের সামনে চলে এলো। ঘরের মাঝখানে দুটো পাথরের থামের ওপর একটা আবলুস কাঠের সিন্দুক দেখতে পেলো। সিন্দুকের ডালা খুলে একটা সোনার বাক্স দেখতে পেলো। সোনার বাক্সে ছিলো এক সোনার পুঁথি। পুঁথি খুলে দেখলো গ্রীক ভাষায় লেখা রয়েছে—

যে ব্যক্তি মানব, জিন, পক্ষী ও পশুর নৃপতি ও মনিব হইতে চাহেন তাঁহাকে একটি অঙ্গুরীয় পরিধান করিতে হইবে। ধর্ম প্রচারক সুলেমান সাহেব এই অঙ্গুরীয়টি পরিধান

করিয়াছিলেন। সে মহাত্মন, সপ্ত সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ। তাঁহার আঙুলে অঙ্গুরীয়টি বিদ্যমান। এই দৈবজ্ঞ অঙ্গুরীয় আদি পিতা আদম বেহেস্তে পরিয়া থাকিতেন। বেহেস্ত হইতে পতনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার আঙুলে ইহা ছিলো। আদমের নিকট হইতে দেবদূত গ্যাব্রিয়েল ইহা পাইয়াছিলেন। তৎপর, তিনি ইহা মহাত্মন সুলেমানকে প্রদান করিয়াছিলেন। সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া নির্দিষ্ট দ্বীপে পৌঁছিবার ক্ষমতা কোন তরীরই নাই। এক রকম যাদু বৃক্ষ-রস বিদ্যমান যাহা পদপ্রান্তে লেপন করিলে অনায়াসে সমুদ্র লঙ্ঘন করা সম্ভব। এই বৃক্ষরস সহজলভ্য নহে। কেবলমাত্র ভাগ্যবান মানবসন্তান ইহা হস্তগত করিতে পারে। পাতালে রাজত্ব করেন রানী যমলিকা। তাঁহার সাম্রাজ্যে এবম্বিধ বৃক্ষ জন্মাইয়া থাকে। সেই সাম্রাজ্যে এই সন্দেশ রানী ব্যতীত অন্য কাহারো গোচরে নাই। রানী যমলিকা বৃক্ষলতা-গুল্মাদির ভাষা বুঝিতে পারেন। তাহাদের সহিত তিনি নিয়মিত বাক্যালাপও করিয়া থাকেন। বৃক্ষ-লতা-ফুল-ফল ধর্ম এবং চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার বিপুল জ্ঞান রহিয়াছে। অতএব, যে ব্যক্তি সেই দৈবজ্ঞ অঙ্গুরীয় অর্জন করিতে চাহেন, তাঁহাকে সর্বপ্রথমে পাতালে যমলিকার সাম্রাজ্যে গমন করিতে হইবে। সেই অঙ্গুরীয় যে মানবসন্তান হস্তগত করিতে পারিবেন তিনি কেবল সমুদয় প্রাণীজগতের অধীশ্বরই হইবেন না, উপরন্তু যবনিকা প্রদেশে গমন করিয়া অমৃতবারি পান করিতে সক্ষম হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অমৃতসুধা পানে রূপ, যৌবন অর্জিত হয় এবং জ্ঞান ও অমরত্ব লাভ করা যায়।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প বলা থামালো শাহরাজাদ।

তিনশো ছাপ্পান্নতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শাহরাজাদ গল্প শুরু করলো ঃ

চামড়ার পুঁথি পড়ে বুলুকিয়া তার রাজ্যের সমস্ত মৌলভী, জাদুকর আর দরবেশদের ডেকে পাঠালেন। সকলে সভায় এলে সে জিজ্ঞাসা করলো—আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি আমাকে পাতালের রানী যমলিকার সাম্রাজ্যে নিয়ে যেতে পারেন?

এই কথা শুনে সকলে মহাজ্ঞাণী অ্যাফানকে দেখিয়ে দিলেন। বিরাট পণ্ডিত এই বৃদ্ধ দুনিয়ার সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি যাদুবিদ্যা জানেন, মহাকাশ ও জ্যামিতি বিদ্যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্বে। অপরসায়ন বা ইন্দ্রজালেও তিনি সিদ্ধদস্ত।

আসন ছেড়ে রাজার কাছে উঠে গিয়ে অ্যাফানকে জিজ্ঞাসা করলো—মহাজ্ঞানী অ্যাফান সেই পাতালের রানীর কাছে আমাকে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন কী?

—হ্যাঁ; পারব।

উজিরের ওপরে রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে বুলুকিয়া রাজার পোশাক ছেড়ে পরিব্রাজকের বেশ ধরলো। পায়ে দিলো তীর্থযাত্রীর পাদুকা। তারপরে, অ্যাফানের সঙ্গে নগর ত্যাগ করে চলে গেলো। প্রথমেই পড়লো মরুভূমিতে। অনেকটা পথ এগিয়ে অ্যাফান একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন—এইটি হলো উপযুক্ত স্থান। ইন্দ্রজালের সাহায্যে আমাদের পথ খুঁজে নিতে হবে।

তারপরে বৃদ্ধটি একটা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের চারধারে টেনে দিলেন একটা গণ্ডী। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন যাদু মন্ত্র। মন্ত্রটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে পাতালের একটা পথ বেরিয়ে পড়লো। এইটিই পাতাল সাম্রাজ্যের প্রবেশের পথ। ওই পথে দু'জনে একসঙ্গে যেতে পারে না। বৃদ্ধ নানারকম আদিভৌতিক ক্রিয়াকলাপ করলেন। তারপরে পথটি প্রশস্ত হলো। এই পথ দিয়ে দু'জনে এই সরোবরের তীরে এসে পৌঁছলো। সরোবরটি তোমারই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ হাসিব।

তাঁদের আমি সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। আমার সাম্রাজ্যে যাঁরাই আসেন তাঁদের আমি এইভাবেই সম্বর্ধনা করে থাকি। তাঁরা তাঁদের আসার উদ্দেশ্য আমাকে জানালেন। তুমি আগেই দেখেছ সর্পকন্যারা আমাকে গামলার ওপরে চাপিয়ে বয়ে নিয়ে আসে। সেদিনও আমি তাঁদের সেইভাবেই পান্না পাহাড়ে নিয়ে আসি। আসা-যাওয়ার পথে গাছপালারা তাদের ভাষায় আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ফুলের গন্ধের ভেতর দিয়ে আমরা সেদিন আসছিলাম। মৃদু সুরে বাজনা বাজাচ্ছিল সর্পকন্যারা। চলতে-চলতে এক গোছা লতার সামনে এসে দাঁড়ালাম। থোকা-থোকা লাল ফুল ফুটেছিলো তাদের মাথায়। ফিসফিস করে ফুলগুলি আমাকে বললো—আমার রস বড় চমৎকার। এই রস পায়ে লাগালে অনায়াসেই মানুষ পায়ে হেঁটে সমুদ্র পার হতে পারে।

আমি অতিথিদের বললাম—আপনারা যে গাছ খুঁজছেন—এ সেই গাছ।

তাঁদের হাতে একটা পাত্র দিলাম আমি। অ্যাফান খুশী মত ফুল তুলে রস নিংড়ে সেই পাত্রটা বোঝাই করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—মহাজ্ঞাণী অ্যাপান, আপনারা দু'জনে সমুদ্র পাড়ি দিতে যাচ্ছেন কেন?

অ্যাফান বললেন—তাহলে শোনো মহারাণী। সপ্ত সমুদ্রের পারে একটি দ্বীপ রয়েছে। সেখানে মহাত্মা সুলেমান কবরে শুয়ে রয়েছেন। তাঁর হাতের আঙটিটি আমরা খুলে আনতে চাই। সেই আঙটির দৌলতে তিনি সমস্ত জীবজগতের অধীশ্বর হতে পেরেছিলেন।

বললাম—এতো বড় অসম্ভব ব্যাপার। সুলেমানের আঙটি তাঁর পরে আর কেউ পরতে পারে নি; পারবেও না। আমার কথা বিশ্বাস করুন। এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করুন আপনারা। হঠকারিতা করলে বিপদে পড়বেন। বুলুকিয়া, তুমি যুবক। তোমার সামনে অনন্তকাল পড়ে রয়েছে। পাগলামি করো না। বরং আমি তোমাকে একটা গাছ দেখিয়ে দিচ্ছি। এই গাছের পাতা খেলে তুমি অনন্ত যৌবন লাভ করবে।

কিন্তু আমার কথা তাঁরা কানেই তুললেন না। যে-পথে এসেছিলেন সেই পথেই চলে গেলেন।

এই বলে থামলেন রানী; একটা কলা তুলে হাসিবকে দিলেন, নিজে মুখে পুরলেন একটা ডুমুর। তারপরে বললেন—বুলুকিয়ার গল্প এখনও শেষ হয়নি। সমুদ্রের ওপরে কেমন করে তাঁরা দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছিলেন সে-কাহিনী তোমাকে আমি পরে বলব। তার আগে, আমার সাম্রাজ্য ঠিক কোনখানে অবস্থিত, এর চারপাশে পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাজ্য রয়েছে, আর প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেই বা কারা থাকে—এসব জানতে ইচ্ছে করে না তোমার? পান্নার পাহাড়ের ওপর দিয়ে কাফে চলে গিয়েছে। কাফ-য়ের ঠিক কোন্ জায়গায় জিনিস্তান সে কথাও তোমাকে আমি বলব। এই জিনিস্তান হচ্ছে জিনেদের রাজধানী। এখানকার রাজার নাম হচ্ছে জান বিন জান। হীরার মালভূমিতে পাহাড় কেমন করে বেঁচে থাকে সেকথাও তোমাকে বলব আমি। একটা যুদ্ধক্ষেত্রের কথা তোমাকে বলব। এখানে পুরানো বীরদের গাথা সঙ্গীত ছড়িয়ে রয়েছে।

হাসিব বললো—মহারানী, আমাকে আপনি রাজা বুলুকিয়ার অভিযানের কাহিনীই বলুন।

রানী বলতে শুরু করলেন—রাজা বুলুকিয়া আর অ্যাফান আমার সাম্রাজ্য ছেড়ে দেশে ফিরে গেলেন। তারপরে সপ্তসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্যে প্রথম সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। পাড়ে বসে সেই ফুলের রস নিজেদের পায়ের তলায় মাখলেন। তারপরে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন খুব সাবধানে। কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলেন—বেশ হেঁটে যাচ্ছেন তাঁরা। ডুবে যাওয়ার ভয় আর নেই। আর দেখে কে? সময় যাতে বৃথা নষ্ট না হয় এইভাবে দৌড়তে লাগলেন তাঁরা। এইভাবে তিনটে দিন আর তিনটে রাত তাঁরা অতিক্রম করলেন। চতুর্থ দিন সকালেএকটা দ্বীপে পৌঁছলেন। কী সুন্দর দ্বীপ! এটা কি তাহলে বেহেস্ত?

এই সময় ভোরের পাখি ডেকে উঠলো। গল্প থামালো শাহরাজাদ।

পরের দিন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার গল্প বলতে শুরু করলো।

দ্বীপের বেলাভূমি যেন গৈরিক বসন পরে রয়েছে। দূরে চুণির পাহাড়। বেলাভূমির পরেই শুরু হয়েছে বিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেতের বাগান। ফুটেছে নানান জাতের সুগন্ধী ফুল। তাদের গন্ধে ভরে উঠেছে বাতাস। গোলাপের পাশে পদ্মফুল বড়ই সুন্দর মানিয়েছে। বেগনে ফুলের পাশে সাদা গন্ধরাজকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বনে-বনে পাতার অবিশ্রাম মর্মর ধবনি মনকে আনমনা করে তুলে। ঘৃতকুমারীর জংগলের মাঝে বড়-বড় ফুলগাছের বিন্যাস সত্যিই বড় সুন্দর। সমুদ্রের গর্জনের ফাঁকে-ফাঁকে গাছের আড়াল থেকে ভেসে আসছে ঘুঘুপাখির ডাক। নাইটেংগল পাখি শোনাচ্ছে তার প্রেমবিধুর রানী গোলাপের কানে-কানে। গোলাপ সেই কাহিনী শুনছে সমঝদারের মত তার মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে। আখের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছলছল শব্দে বয়ে চলেছে তরঙ্গিণী। প্রকৃতি রূপ, রস, আর গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। এখানে যেন কোন দুঃখ নেই। কোন শোক নেই, এই ধরাধামেই কি বেহেস্ত নেমে এসেছে? তাঁরা দু'জনে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন চারপাশ। বুলুকিয়া আর অ্যাফান মনোরম দৃশ্য দেখে দেখে সকাল বিকেল ঘুরে বেড়ালো। ছায়াবীথি শরীর মন তাজা করে দিলো। গোলাপের ওপর শিশির টলমল করছে মুক্তার মত। বুলুকিয়া তার ওপর গাল রেখে ফুলের সুবাস ও পেলব স্পর্শ নেয়। শ্রান্ত মন হয়ে উঠলো স্থির। এভাবে ওরা সন্ধ্যে পর্যন্ত মন্থর পায়ে এক বীথি থেকে অন্য বীথিতে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যা নেমে আসে। ওরা রাত কাটাবার জন্য একটা গাছে উঠে বসে। ঘুমে চোখের পাতা একটু জুড়ে আসতেই দ্বীপটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। প্রচণ্ড একটা গাঁগাঁ শব্দ ভেসে এলো। দ্বীপটার নীচে থেকে কে যেন ঝাঁকুনি দিচ্ছে। মনে হলো সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেতর থেকে একটা দৈত্য উঠে আসছে। প্রকাণ্ড একটা পাথর তার মুখে। আগুনের মত সেটা জ্বলছে। তাতে সমস্ত দ্বীপটা আলোকিত হয়ে উঠলো। দৈত্যটার পেছনে আরো কতগুলো দৈত্য অমনি করে উঠে আসছে। অসংখ্য বাঘ সিংহ আর চিতা এসে দাঁড়ালো সমুদ্রের তীরে। অগুণতি পশুর সংখ্যা আল্লা ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। সমুদ্রে দৈত্যাকার পশুদের সঙ্গে ডাঙ্গার পশুরা মিলেমিশে সারাটা রাত কাটালো বেলাভূমিতে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দৈত্য যে পথে এসেছিলো সেই পথেই ফিরে গেলো সে। তার পেছনে পেছনে একই ভাবে মিলিয়ে গেলো আর সব সামুদ্রিক জানোয়ারগুলো। এদিকে বনের পশুরাও বনে ফিরে গেলো।

এই লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে বুলুকিয়া ও অ্যাপান আতঙ্কে আর দুশ্চিন্তায় দু চোখের পাতা সারা রাত আর এক করতে পারেনি। দু'জনে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে সমুদ্র তীরে দৌড়ে গিয়ে পায়ের পাতায় সেই ফুলের নির্যাস ঘষতে লাগলেন।

এবার দ্বিতীয় সমুদ্র পেরোতে লাগলেন পায়ে হেঁটে। দিন রাত এক নাগাড়ে বহুদিন হেঁটে এক বিশাল পর্বতমালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ছোট একটি উপত্যকা দেখা গেলো। ছোট ছোট সুন্দর নুড়ি পাথরে পূর্ণ উপত্যকাটি। সেগুলি সাধারণ পাথর থেকে একেবারে আলাদা। দিনটা তারা শুটকি মাছ খেয়ে কাটালেন। বিকালে এসে বসলেন আবার বেলাভূমিতে। দেখলেন সূর্যাস্ত। সমুদ্রের সূর্যাস্ত এর আগে ওরা অনেক দেখেছে। কিন্তু এই নির্জন নিষ্প্রাণ পাথরের দ্বীপে সূর্যাস্তের একটা অব্যক্ত কথা ওরা যেন বুঝতে চাইছে। সূর্যাস্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট আওয়াজ শুনে পেছনে ফিরতেই দেখলেন একটা বিরাট বাঘ ওদের দিকে ছুটে আসছে। দৌড়ে আর পালাবে কোথায়? তাড়াতাড়ি পায়ের পাতায় গাছের রস মেখে সমুদ্রের ওপর দিয়ে দৌড়োতে লাগলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বাঘটা ফ্যালফাল করে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। হঠাৎ পিছনের দিকে ফিরে পড়ি কি মরি করে লেজটা একটু গুটিয়ে বাঘটা দিলো ছুট।

এবার ওরা তৃতীয় সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। মেঘে মেঘে সারা

আকাশ ঢেকে রয়েছে। নিকষ কালো সমুদ্রের রঙ। ঝড়ের বেগে বিরাট ঢেউগুলি রাগে ফুঁসছে। ওরা যেন মত্ত হাতির পিঠের ওপর দিয়ে হাঁটছে। অনেক দিন ধরে ওরা ঘুমুতে পারেনি। তারপর একনাগাড়ে এই হাঁটা। ঝড় ঝন্‌ঝার মধ্যে পড়ে ওরা আর পা চালাতে পারছে না। হাঁটু ভেঙ্গে আসছে। তবু দেহটাকে টেনে টেনে হেঁটে চলেছে দু'জনে। সৌভাগ্যবশতঃ ভোর রাতে এসে পৌঁছলো একটা দ্বীপে। পাড়ে পৌঁছেই শুয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়লো। ঘুম থেকে জেগে উঠে ওরা দ্বীপটার গভীরে ঢুকে পড়। চারদিকেই ফলের গাছ, আর কত না ফল ধরে আছে সেগুলিতে। সব ফলই যেন চিনি ভরা। পেট ভরে দু'জনে ফল খেলো। বুলুকিয়া মিষ্টি খাবার খুব ভালোবাসে। ও একটু বেশীই খেয়ে ফেললো। সারাদিন ধরে ফল খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। সে অ্যাফানকে বললো ঃ

—এখানে আরো দিন দশেক থেকে যাই, কি বলুন? এত সুন্দর সুন্দর নানারকমের লোভনীয় ফলগুলি পুরো স্বাদ নিতে গেলে কম করে দশ দিন তো লাগবেই।

ওর অনুরোধে সায় দিলেন অ্যাফান। তা ছাড়া, একটু বিশ্রামও তো দরকার।

ফলগুলির চরিত্র বড় অদ্ভুৎ। চিনির আধিক্যে ফলের গায়ে মিছরির মত জমাট বেঁধে রয়েছে। দশ দিন ধরে বুলুকিয়া কেবল রাশি-রাশি ফলই খাচ্ছে। এত চিনি পেটে তার সইবে কেন? দশ দিনের দিন তার পেট কামড়াতে শুরু করলো। কিন্তু আর তো দেরী করা চলে না। পায়ের পাতায় সেই রস মেখে আবার শুরু হলো যাত্রা। চতুর্থ সাগরে পড়লো ওরা।

একটানা চার দিন আর চার রাত হাঁটার পরে তারা একটা ছোট দ্বীপে এসে হাজির হলো। সমস্ত দ্বীপটাই সাদা বালিতে ভরা। চেনা-অচেনা নানান জাতের সরীসৃপ এখানে গর্তের ভেতর থাকে। মাঝে-মাঝে ডিম পাড়তে বাইরে আসে। রোদের আলো সেই ডিম তা দিয়ে ফোটায়। এখানে গাছ দূরের কথা এক মুঠো ঘাসও কোথাও নেই। এখানে থাকা যে আদৌ নিরাপদ নয় ওরা সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু কী আর করবে। তাই একটুখানি বসে পায়ের গোড়ায় নতুন করে রস ঘষতে থাকে। সমুদ্র পেরিয়ে একবার ডাঙায় উঠলে আবার রস লাগাতে হয়। সেই রস মেখে আবার তারা সমুদ্রে নেমে পড়লো।

পঞ্চম সমুদ্র পেরোতে তাদের লাগলো মাত্র এক দিন আর এক রাত। ভোর বেলা তারা এসে পৌঁছলো একটা অদ্ভুত দ্বীপে। এখানকার পাহাড়গুলির চূড়ায় সোনার তাল জমাট বেঁধে রয়েছে। দ্বীপে অনেক—অসংখ্য গাছ। গাছে-গাছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র। রাত্রিতে তারা তারার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে। পাহাড়ের স্বচ্ছ পাথরের ওপরে ফুলের রঙ প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সমস্ত দ্বীপটি একটি অপরূপ মায়ার রাজত্বে পরিণত হয়। দিনেও ফুলগুলি জ্বলে; তবে বোঝা যায় না।

অ্যাফান বুলুকিয়াকে বললেন—এই হলো সোনালি ফুলের দ্বীপ। অনেক-অনেক কাল আগে সূর্যের এক টুকরো ছিটকে এসে পড়েছিলো এইখানে। এই দ্বীপটা সেই টুকরো।

সারা রাতই অদ্ভুৎ আলোর রোশনাই দেখে তাঁরা কাটালেন সেইখানে। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পায়ে রস মেখে আবার তাঁরা নেমে পড়লেন সমুদ্রে। এইটি হলো ষষ্ঠ সমুদ্র।

ভোর হয়ে আসছে দেখে থেমে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো সাতান্নতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু হলো গল্প ঃ

ষষ্ঠ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওঁরা এক মনোরম বেলাভূমিতে এসে পড়লেন। এই দ্বীপটি ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বনের শেষে শুরু হয়েছে সমুদ্র; আর সমুদ্রের পরে শুরু হয়েছে অরণ্যানি। সেই মনোরম বনের ছায়ায় বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে তাঁরা গভীর বনের দিকে

এগিয়ে চললেন। কিছুটা গিয়েই তাঁদের আনন্দ পরিণত হলো আতংকে। এসব কীসের গাছ? গাছে কোন ফল নেই—ঝুলছে কেবল অগণিত মানুষের মাথা। মাথার চুলগুলি বোঁটার মত গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। মুখগুলির অভিব্যক্তি সব এক নয়। কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে। গাছ থেকে যেগুলো খসে পড়েছে সেগুলো মাটিতে পড়েই ভীষণভাবে জ্বলতে শুরু করে। এই সব আজব ফলের কাছে এগোতে সাহস হলো না তাঁদের। পায়ে-পায়ে তাঁরা ফিরে আসেন বেলাভূমিতে। তারপরে একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁরা বসে রইলেন চুপচাপ। হঠাৎ বারোটি সাগরকন্যা বেলাভূমিতে উঠে নাচতে শুরু করলো। তাদের সব কটিই দেখতে সুন্দর। প্রত্যেকের গলাতেই মুক্তার হার। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে নানান ছলাকলা দেখালো তারা। আকাশে চাঁদ উঠলো। চাঁদের আলোয় রূপালি ঢেউ উঠলো চারপাশে। এইবারে গান ধরলো মেয়েরা। গান গাইতে গাইতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রে। শুরু হলো তাদের জলকেলি। কেউ কেউ আবার উঠে এলো ডাঙায়।

এদিকে আর এক কাণ্ড। বনের গাছগুলি প্রতি মুহূর্তে যেন এক হাত করে লম্বা হচ্ছে। হয়ত তারা চাঁদকেও ঢেকে ফেলবে। গাছের ছায়া গায়ে এসে পড়তেই তাঁদের চমক ভেঙে গেলো। এতক্ষণ মোহিত হয়ে মেয়েগুলির নাচ দেখছিলেন। এখন সেই গাছগুলিকে দেখে আর তাঁরা সেখানে থাকতে সাহস করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে পায়ে বৃক্ষরস ঘষে সপ্তম সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন তাঁরা।

সপ্তম সমুদ্রে পাড়ি দিতে লাগলো সবচেয়ে বেশী সময়। একটানা দিনরাত হেঁটে চললেন তাঁরা। পায়ের তলায় বৃক্ষরস লাগানো। তাই তাঁরা বসতেও পারেন না, শুতেও পারেন না। টানা ছ'টি মাস চললো এইভাবে। সঙ্গে খাবার-দাবারও বিশেষ কিছু ছিলো না তাঁদের। মাঝে মাঝে মাছ লাফিয়ে উঠছে সমুদ্র থেকে। তাঁরা ধরে ধরে কাঁচা মাছই খেয়েছেন। অনেক কষ্টের পরে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সপ্তম সমুদ্রের ধারে একটি দ্বীপে এসে পৌঁছলেন। নথিতে যেভাবে বলা ছিলো দূর থেকে হুবহু ঠিক সেইরকম দেখতে পেলেন তাঁরা। অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণার শেষে অতি প্রার্থিত ভূমিতে পদস্পর্শ করলেন তাঁরা। এই সেই সপ্ত সমুদ্রের দ্বীপ আর এখানেই সুলেমানের দেহ কবরে শায়িত আছে। সুলেমানের আঙুলে রয়েছে সেই আংটি।

এই দ্বীপটি খুবই সুন্দর। চারদিকে অসংখ্য ফল আর ফুলের গাছ। থরে থরে ফলগুলি পেকে রয়েছে। বেশ কয়েকটি ছোট ঝর্ণা পাহাড় থেকে নীচে নেমে এসেছে। কাঁচা মাছ খেয়ে ওদের থাকতে হত। তাও সব সময় পাওয়া যেত না, অভুক্তই থাকতে হত ওঁদের। তার ওপর দীর্ঘ পরিভ্রমণে শরীর শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন। দেখে শুনে একটা আপেল গাছের দিকে ওঁরা এগিয়ে গেলেন। ফলের ভারে ডালগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। বুলুকিয়ার তর সইলো না। তাড়াতাড়ি যেই না হাত বাড়িয়ে একটা আপেল ছিড়তে গেলো অমনি গাছটা ধমকে উঠলো ঃ

—এই গাছের ফলে হাত দিলে তোমাকে দু টুকরো করে ফেলা হবে।

সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাটকায় দৈত্য ওঁদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

বুলুকিয়া থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললো—দৈত্যরাজ, ক্ষিদে তেষ্টায় আমরা মরে যাচ্ছি। এ আপেল আমরা খেতে পাব না? কেন আপনি নিষেধ করছেন?

—তোমরা ভুলে গেছ, আমি কি করব! তোমরা মানুষের বাচ্চা। তোমাদের আদি পিতা আদম আল্লার নিষেধ অমান্য করে আপেল খেয়েছিলো, ভুলে গেছো? তা, তোমরা তো আল্লাকে মান না, যখন তখন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর। তাই আমিই এ গাছ পাহারা দিই। এটা আমার কর্তব্য। এ গাছের ফলে যে হাত দেবে তাকে দুখানা করে দিই। যাও ভাগো, অন্য জায়গায় খাবারের চেষ্টা করো।

বুলুকিয়া আর অ্যাফান প্রাণের ভয়ে ওখানে আর দাঁড়ালো না। দ্বীপের আরো ভেতরে গিয়ে অন্য ফল খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করলো। একটু বিশ্রাম নিয়ে সুলেমানের কবর স্থান খুঁজতে শুরু করলো।

পুরো একটা দিন আর রাত দ্বীপে ঘুরে বেড়ালো। শেষে ওরা একটা পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছল। পাহাড়ের পাথরগুলির রং নানারকমের। পাহাড়ের গা থেকে মৃগ নাভির সুগন্ধ ভেসে আসছে। সামনে চমৎকার একটা গুহা। ছাদ আর দেয়াল সব হীরের তৈরী। সূর্য্যের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। ওরা বুঝতে পারলো এটা সেই গুহা যেখানে সুলেমানের কবর আছে। ওরা গুহার ভেতরে ঢুকলো। যতই এগোচ্ছে গুহার জ্যোতি ততই বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ছাদটাও যেন উঁচু হতে হতে আকাশ ছুঁয়ে ফেললো। ওরা হেঁটে চলেছে অনন্তকাল ধরে। বাইরে বোধ হয় কয়েকটা দিন আর রাত গড়িয়ে গেছে, তবু ওরা হেঁটে চলেছে। একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে না। একটা ঘোরে সামনে খালি এগোচ্ছে। হঠাৎ ওদের একজনের মনে হলো এ গুহার কি অন্ত নেই? সঙ্গে সঙ্গে গুহাটা যেন একটি হল ঘরের সামনে শেষ হলো। হল ঘরটি একটা গোটা হীরে কেটে তৈরী করা হয়েছে। আর তার কি জ্যোতি বের হচ্ছে! ওরা ঘরের ভেতরে ঢুকলো। মনে কোন বোধ নেই, নেই কোন অনুভূতি। একটু বিবশ সত্বা নিয়ে দেখে ঘরের ঠিক মাঝখানে নিরেট সোনার পালঙ্গে ডেভিডের পুত্র সুলেমান শুয়ে আছেন। সবুজ মুক্তার জামা পরে শুয়ে আছেন তিনি। দেহ থেকে একটা দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ জামাটি তিনি জীবদ্দশায় পরতেন। ডান হাতে সেই যাদু আংটিটি। আংটিটি ক্রমাগত জ্যোতি ছড়াচ্ছে। এ জ্যোতি হীরার দ্যুতিকেও হার মানায়। আংটি পরা হাতটি বুকের ওপর রাখা। বাঁ হাত প্রসারিত। হাতে রাজদণ্ড এবং তাতে একটি মাঝারি আকারের চুনি বসানো।

অপার্থিব এক পরিবেশে ওঁরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বিমূঢ় হয়ে। হয়ত সেই ক্ষণটি কয়েকটা দিনরাত কাবার করে দিয়েছে। এক সময় অ্যাফানের ধ্যান ভাঙ্গে কিন্তু আর এগোতে সাহস করলো না। বুলুকিয়াকে ফিসফিস করে বললেন ঃ

—অনেক বিপদ, অনেক ফাঁড়া কেটে আমরা এখানে এসেছি। একটুর জন্য ফিরে যাব তা হয় না বুলুকিয়া। তুমি এখানে দাঁড়াও, মহাপুরুষ যেখানে নিদ্রিত আমি একাই সেখানে যাব। তোমাকে যেটা শিখিয়ে দিয়েছিলাম তুমি সেই মোহিনীমন্ত্র বলতে থাকবে। আর আমি মন্ত্র বলার মধ্যে ঝটপট আংটি খুলে আনব। আংটি খোলার মন্ত্র উচ্চারণে একদম ভুল করবে না, বুঝেছো?

বুলুকিয়া মোহিনী মন্ত্র পাঠ শুরু করলেন জোরে জোরে। অ্যাফান ধীরে ধীরে এগিয়ে যান সিংহাসনের দিকে। আস্তে আস্তে দৃঢ়ভাবে আঙ্গুলে হাত ছুঁয়ে আংটিতে চাপ দিয়ে বার করতে চেষ্টা করতে থাকেন। যুবক বুলুকিয়া উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকেন। মন্ত্রটা উল্টো-পাল্টা হয়ে গেলো। শক্ত মন্ত্র আগে না বলে আহ্বান মন্ত্র ভুল করে অগে বলে দিলো। এ ভুল মারাত্মক। ফলে দীপ্যমান ছাদ থেকে এক ফোঁটা তরল হীরা বৃদ্ধের মাথায় পড়ল। সমস্ত শরীরটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। পলকের মধ্যে বৃদ্ধের নশ্বর দেহ এক মুঠো ছাইয়ে পরিণথ হয়ে গেলো। সুলেমানের সিংহাসনের পায়ের কাছে ধুলাটুকু পড়ে রইলো শুধু।

বুলুকিয়ার উত্তেজনা তড়িতে আতঙ্ক আর পাপবোধে পরিণত হলো—ছিঃ ছিঃ লোভে পড়ে দেবতার ঘরে ডাকাতি করতে এসেছিলো। দুঃখে ক্ষোভে চোখ ফেটে জল এলো তার। অ্যাফানের দেহাবশেষ শেষবারের মত দেখে ঘুরে এক দৌড়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গেলো সে। ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের দিকে গেলো। পায়ে অবশ্য সেই বৃক্ষরস লাগাতে পারেনি। কিন্তু লাগাবে কি করে? রস ভর্তি পাত্র তো অ্যাফানের কাছে ছিলো। সুতরাং—

ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে গেলো।

তিনশো আটান্নতম রজনী ঃ

পরদিন রজনীতে শাহরাজাদ আবার শুরু করলো।

রানী যমলিকা বলছেন, বুলুকিয়া দুঃখে আফশোষে নিজের চুল ছিঁড়তে থাকে। আমি তাকে অনেক নিষেধ করেছিলাম এই দুঃসাহসিক অভিযানে না যাবার জন্য। দুর্ভাগ্য সে এড়াতে পারবে না—এ আমি জানতাম! একা একা নির্জন দ্বীপে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালো। কি করবে কোথায় যাবে কিছুই জানে না সে। নিজের কর্ম ফলে এখানে সে স্বজনহারা হয়ে পড়লো।

ঘুরতে ঘুরতে একটা বিরাট ধুলোর ঝড় দেখতে পেলো। ঝড়ের ভেতর থেকে প্রচণ্ড গোলমালের শব্দ আসছে। বাজ পড়ার চেয়েও জোরদার শব্দ। তরবারি, বর্শার ঝনঝনানির শব্দ যেন অমানুষিক আর্ত চীৎকারে ওর বুকে কাঁপন ধরায়। হঠাৎ ধুলো ঝড় থেমে গেলো। অসংখ্য জিন, ইফ্রিত, প্রেতাত্মা আকাশ, বাতাস, মাটি, বালি, জঙ্গল, সমুদ্র ইত্যাদির যেখানে যত ভূত প্রেত দত্যিদানব ছিলো সব কোথা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠলো।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো বুলুকিয়া। দৌড়ে পালাতে গিয়েও পারলো না সে। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এই অপার্থিব দলের দলপতি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো—কে তুই? বছরে একবার আমরা আসি মহাত্মা ডেভিডের পুত্র সুলেমানের কবর দেখতে। তুই এখানে কি করে এলি?

—হে দলপতি আমার নাম বুলুকিয়া। আমি বানু ইজারায়েলের সুলতান। সমুদ্রে পথ হারিয়ে এখানে এসেছি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? আপনি কে? আর এই সঙ্গীসাথীরা কারা?

—আমরা জান বিন জান-এর উত্তরসুরি বলে দাবী করি। আমাদের মহাশক্তিধর নৃপতি সাখ্‌র-এর রাজ্য থেকে এই এখানে এলাম। তিনি শ্বেতভূমির সুলতান। বহুকাল আগে আদ্‌-এর পুত্র শাদ্দাদ রাজত্ব করতেন সেখানে।

—আজ্ঞে, সেই শ্বেতভূমি কোথায় যেখানে সাখ্‌র বাস করেন?

—কাফ্‌ পাহাড়ের পেছনে সেই রাজ্য। এখান থেকে মানুষের সেখানে যেতে লাগে পঁচাত্তর মাস। কিন্তু আমরা চোখের পলকে এই রাস্তা পাড়ি দিই। তুমি একজন রাজার ছেলে রাজা। তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যেতে পারি।

বুলুকিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলো। কেজন জিনের কাঁধে চড়ে চোখের পলকে রাজা সাখ্‌র-এর রাজ্য এসে গেলো।

এক জাঁকজমকপর্ণ সমতলে সে নিয়ে গেলো বুলুকিয়াকে। সমতলভূমিতে নালাগুলি সোনা বা রূপোয় বাঁধা। নালাগুলিতে মৃগনাভি আর কুমকুমের সৌরভ। ধারে ধারে কৃত্রিম গাছ লাগানো। সে গাছের পাতাগুলি পান্না দিয়ে আর ফলগুলি চুনি দিয়ে তৈরি। সমস্ত সমতলটা সবুজ মসলিন দিয়ে ঢাকা। মসলিনের কাপড় আবার সোনার খুঁটির ওপরে বাঁধা। তাঁবুর ভেতর সোনার সিংহাসনে রাজা সাখ্‌ব বসে আছেন। তাঁর ডানদিকে বসে সামন্ত রাজারা আর বাঁদিকে উজির, নাজির, সেনাধ্যক্ষ, জ্ঞানী আর গুণীরা বসে আছেন।

আভূমি নত হয়ে বুলুকিয়া মাটিতে চুম্বন করে প্রশস্তি গাইলো রাজার। সাখ্‌র সাদরে অভ্যর্থনা করে বুলুকিয়াকে পাশের একটি স্বর্ণাসনে বসতে বললেন। বুলুকিয়া আনুপূর্বিক সব বলে গেলো। কোন কিছু বাদ দিলো না। শুনে রাজসভার সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এবার বিরাট একটা কাপড় বিছান হলো সকলের সামনে। খানা শুরু হবে। জিনেরা সব চিনে মাটির থালা বাসন এনে রাখলো। সোনা রূপার বাসনও এলো। বাসনগুলি ভর্তি খাবার-দাবার। পঞ্চাশটা সিদ্ধ উটের মাংস আর পঞ্চাশটা ঝলসানো উটের মাংস সোনার বাসনে সাজান হলো। পঞ্চাশটা ভেড়ার মাথা রূপার বাসনে ভর্তি করা হলো। সব গরম গরম, ধোঁয়া উঠছে। চিনে মাটির বাসনে যত্ন করে বড় বড় ফল খোসা ছাড়িয়ে সাজিয়ে দিলো তারা। সব সাজান

হয়ে গেলে জিন আর তার অতিথিরা পেট পুরে খেলেন। যা যা দিয়েছিলো সবাই চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন। ভুক্তাবশিষ্টও কারো থালায় রইলো না।

খানাপিনা শেষ হলে বললেন—আপনি আমাদের কাহিনী নিশ্চয় শোনেননি। সংক্ষেপে আমি আপনাকে সব বলছি। মানুষের মধ্যে ফিরে গিয়ে আমাদের কাহিনী প্রচার করবেন যাতে ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্কে কেউ যেন অজ্ঞ না থাকে।

রাত ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে রইলো।

তিনশো ঊনষাটতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু হলো গল্প।

রাজা সখ্‌র বুলুকিয়াকে বললেন—আদিতে আল্লা আগুন সৃষ্টি করলেন। দুনিয়ার সাতটি জায়গায় তিনি আগুন বন্ধ করে রাখলেন। সাতটি বিভিন্ন স্তরে আগুন রেখেছিলেন তিনি। কয়েক হাজার বছর ধরে তিনি অবশ্য এই কাজটি করেছিলেন। প্রথমে যে অঞ্চলে রেখেছিলেন তার নাম জাহান্নাম। যেসব বিদ্রোহীরা পাপের অনুশোচনা করবে না তাদের জন্য এই আগুন। দ্বিতীয় অঞ্চলের নাম দেন লাজা। উপসাগরের মত গর্ত খুঁড়ে আগুন লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই আগুন ধর্মপ্রচারক মহম্মদের বংশধরেরা ব্যবহার করবে। তাদের ভুলত্রুটিগুলো যাতে অন্ধকারে থাকে তাই এই ব্যবস্থা। এরা পরবর্তীকালে নিজেদের ভুল স্বীকার করতে চাইবে না। তৃতীয় অঞ্চলের নাম হলো জাহিন। একটা ফুটন্ত কড়ায় সে অঞ্চল জ্বলছে। এটি তৈরী হলো গগ ও ম্যাগগের জন্যে। চতুর্থ অঞ্চলের নাম দিলেন সইর। এবলিসের জন্য এটি নির্দিষ্ট হলো। এবলিস হলেন বিদ্রোহী দেবদূতের দলপতি। বিদ্রোহী দেবদূতের সেনাপতি আদমকে অস্বীকার ও অমান্য করেছিলেন। এইভাবে তিনি সর্বশক্তিমানের কঠোর আদেশ উপেক্ষা করেছিলেন। তিনি পঞ্চম স্থানের নাম দিয়েছিলেন সাখ্‌র। অধার্মিক, মিথ্যেবাদী ও অহংকারীদের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এখানকার আগুন। তারপর তিনি মাটির নীচে বিশাল এক গর্ত করলেন। এখানে গুমোট আবহাওয়া আর মড়ক সৃষ্টি করে এর নাম দিলেন হিৎমৎ। সপ্তমটির নাম দিলেন হাওয়াই। এটি তিনি সুরক্ষিত করে রাখলেন। ইহুদী ও খ্রীস্টান বেশী হয়ে গেলে এখানে রেখে দেবেন আর যারা আল্লায় বিশ্বাস রাখবেন তাদের জন্যও এ স্থান নির্দিষ্ট রাখলেন। প্রথম জাহান্নামে সত্তর হাজার আগুনের পাহাড় আছে। প্রত্যেকটি পাহাড়ে সত্তর হাজার করে উপত্যকা আছে। প্রতিটি উপত্যকায় আছে সত্তর হাজার সহর। প্রতিটি সহরে সত্তর হাজার বুরুজ আছে। প্রতিটি বুরুজে সত্তর হাজার বাড়ি আর প্রতিটি বাড়িতে সত্তর হাজার বেঞ্চি। এরকম বেঞ্চিতে আলাদা আলাদা নিপীড়ন ও শাস্তির বন্দোবস্ত আছে। এগুলো আপনিও গুণে দেখতে পারেন। অবশ্য নিপীড়ন ও শাস্তি কত রকমের তার খবর একমাত্র আল্লাই রাখেন। পাপীকে এই নিপীড়ন ও শাস্তির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথম অঞ্চল সাতটির মধ্যে সবচেয়ে কম কষ্টকর। সেটি পেরোবার সময় বাকী ছটি অঞ্চল কেমন ভয়ানক তা আঁচ করতে পারবেন।

আমি আগুন সম্পর্কে এতটা বললাম কেন জানেন? আমরা জিনেরা অগ্নিপুত্র, তাই।

আপনাকে সব বুঝিয়ে বললাম। আমরা যে অগ্নি সন্তান তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আরও বলছি শুনুন ঃ

—আল্লা প্রথমে দুটি জীব সৃষ্টি করলেন। এরা দু'জনেই জিন। তাঁর প্রহরী হিসেবে তাদের নিযুক্ত করলেন। নাম খলিত ও মলিত। একজনের রূপ হলো সিংহের অন্যজনের হলো নেকড়ের। সিংহকে তিনি পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করলেন আর নেকড়ে হলো স্ত্রীলোক। সিংহ খলিতের পুরুষাঙ্গ হলো কুড়ি গজ লম্বা। নেকড়ের যৌনাঙ্গ অনেকটা কচ্ছপের মত। যৌনাঙ্গটি খলিতের পুরুষাঙ্গ ধারণ করার মত উপযোগী করেই আল্লা সৃষ্টি করেছিলেন।

একজনের গায়ের রং হলো সাদা-কালো অন্যটির রং হলো সাদা-গোলাপী। আল্লা এদের দুজনকে মিলিয়ে দিলেন। ক্রমে এদের বহু সন্তান সন্ততি হলো—সরীসৃপ, ড্রাগন, বিছা আর যেসব জীব হুল ফোটাতে পারে তারা। ওদের সন্তানকে সাতটি অঞ্চলে নিন্দিত পাপীদের যন্ত্রণা দেবার জন্য বহু সংখ্যায় ছড়িয়ে দিলেন আল্লা। আল্লা খলিত ও মলিতকে দ্বিতীয় সঙ্গমের জন্য আদেশ দিলেন। এবারে সাতটি পুরুষ আর সাতটি নারী হলো তাদের। আল্লার নির্দেশ মান্য করে তারা বড় হতে থাকে। তাদের একজনকে সর্বশক্তিমান আল্লা বেছে নিলো। খলিত ও মলিতে অসংখ্য মিলনের ফলে লক্ষ লক্ষ প্রজন্মের জন্ম হলো। সৌভাগ্যবান দলপতির নাম এবলিস। পরবর্তীকালে মানুষের আদি পিতা আদমের কাছে মাথা নত না করে বিদ্রোহী হয়েছিলো। এ আদেশ আল্লাই দিয়েছিলো। এর ফলে চতুর্থ অঞ্চলে সে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই আল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন আগে। এবার সকলে এককাট্টা হলো। এবলিস তার সাঙ্গপাঙ্গ আর সন্তান-সন্ততিদের জায়গা হলো দোজখে। বাকী ছজন যুবক আর অন্যান্য মেয়েরা ছিলো তারা আল্লার কাছে বিনীত থেকে গিয়েছিলো। আমরা ওদেরই বংশধর। সংক্ষেপে আপনাকে আমাদের বংশগাথা বললাম। আমাদের পর্বত প্রমাণ খাওয়া দেখে অবাক হয়েছেন নিশ্চয়ই। সব শুনলে আপনি অবাক হবেন না। আমি বলেছি আমাদের আদি পুরুষ ও নারী ছিলো সিংহ ও নেকড়ে। তাদের সন্তান আমরা। তাই আমাদের খোরাক বেশী। আমরা এক-একজন রোজ দশটি উট, কুড়িটি ভেড়া আর বড় বড় চল্লিশ হাতা ঝোল খাই। এক-একখানি হাতা বড় কড়াই-এর সমান।

আমাদের ব্যাপারে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরে দিলাম। আপনি মানুষের মধ্যে যখন ফিরে যাবেন তখন এ জ্ঞান আপনার অপরিসীম কাজে লাগবে। আরো বলছি শুনুন ঃ

এ পৃথিবীর নোংরা বা আবর্জনা বরফগলা জলে ধুয়ে যায়। এ বরফে কাফ চূড়া থেকে গলে নেমে আসে। পৃথিবীর গর্ভের উত্তাপ সমস্ত জীবজগৎ ধ্বংস করে ফেলত যদি না এই বরফ থাকত। পৃথিবীর নিজেরই সাতটি স্তর আছে। এই স্তরগুলো ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছে প্রভূত শক্তিশালী জিনি। জিনি একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়টি আবার ষাঁড়ের ঘাড়ে স্থাপিত। বিশাল একটা মাছ ষাঁড়টিকে ধরে আছে। আর মাছটি অনন্ত সমুদ্রে অবিরাম সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

অনন্ত সাগরের তলদেশ হলো দোজখের ছাদ। দোজখের সাতটি অঞ্চল বিরাট একটা সাপ মুখে আটকে রেখেছে। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত আটকে রাখবে। সেই শেষ বিচারের দিন সাপটি দোজখ আর তার অধিবাসীদের উগরে দেবে আল্লার সামনে। ওদের অন্তিম বিচারের রায় দেবেন আল্লা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে চুপ করে রইলো শাহরাজাদ।

তিনশো ষাটতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রে শাহরাজাদ আবার শুরু করলো।

এই হলো আপনাদের ও পৃথিবীর সৃষ্টি কথা।

আরও একটা ব্যাপার জেনে যান। আমাদের বয়স কখনো বাড়ে না। আমরা বৃদ্ধ হই না। অথচ, আমাদের চারপাশের দুনিয়া, তার প্রকৃতি, মানুষ তার পশু পাখী সমস্ত জীবজগৎ দ্রুত বার্ধক্যের দিকে, জরার দিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা অনন্ত যৌবন লাভ করেছি। জীবন ফোয়ারার অমৃত আমরা পান করেছি। এই ফোয়ারা অতন্দ্র পাহারা দিচ্ছেন খিজর সেই ছায়ালোকে। পুণ্যাত্মা খিজর সমস্ত ঋতুকে এক করে দিয়েছেন, রাজকীয় সবুজে সাজিয়েছেন গাছপালা। স্রোতস্বিনীকে বাঁধভাঙ্গা গতি দিয়েছেন। তৃণভূমিতে সবুজ

গালিচা পেতে দিয়েছেন আর সূর্য ডুবে গেলে আকাশ জুড়ে গোধুলির আলো নিজের হাতে এঁকে দিয়েছেন।

বুলুকিয়া, আপনি মনোযোগ দিয়ে আমার সব কথা শুনেছেন। আপনাকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই—অবশ্য যদি পছন্দ হয় আপনার। একজন আপনাকে ঘাড়ে করে এখান থেকে আপনার দেশে পৌঁছে দেবে।

বুলুকিয়া জিন নৃপতিকে তার আতিথেয়তার জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো। তারপর জিনেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলবান জিনের ঘাড়ে চড়ে বসলো। পলকের মধ্যে বুলুকিয়ার রাজ্যের সামনে নামিয়ে দিয়ে জিন বিদায় নিলো।

কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে প্রথমে স্থির করে নিলো বুলুকিয়া। দুটি সমাধির মধ্য দিয়ে রাজধানীতে যাবার রাস্তায় সে পা বাড়ালো। সমাধির মধ্যখানে বসে বসে এক যুবক উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে চলেছে। বুলুকিয়া দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে তোমার? দুই কবরের মাঝখানে বসে কাঁদছ কেন? আমাকে সব খুলে বলো, তোমার সব কষ্ট আমি দূর করে দেব।

জলভরা চোখ তুলে যুবকটি বললো—আপনি অযথা কেন আমার জন্য কষ্ট করবেন? আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন চলে যান। আমার দুর্ভাগ্য তাই আমি কাঁদছি। নীরবে কাঁদব বলেই কবরের মাঝে এসে বসেছি। দুঃখের পাথর চোখের জলে ভেজাতে পারি কিনা দেখছি।

—সত্যি খুব দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ভাই! তোমার দুঃখের কথা আমি শুনব। বলো আমাকে। তোমার দুঃখের কাহিনী আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পার।

বুলুকিয়া যুবকটির পাশে পাথরের ওপর বসে পড়লো। ওর হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে একটু চাপ দিলো। বুলুকিয়া তার সমস্ত ঘটনা ওকে বলে গেলো। এরপর বললো—আমার কাহিনী তো শুনলে এবার তোমারটা বলো। তোমার কাহিনী আমার মনে নিশ্চয় সাড়া জাগাবে।

যুবকের সুন্দর মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এলো। ধীরে ধীরে চোখ তুলে নিজের কাহিনী বলতে লাগলো ঃ

ভাই, আমিও এক রাজার ছেলে। আমার গল্প অদ্ভুত আর আশ্চর্যজনক। আমার জীবনের কাহিনী শুনলে বিষাদে আপনার মন ভরে উঠবে।

যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছলো। কপালটা চেপে ধরে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আবার শুরু করলো।—আমার জন্ম কাবুলে। সেখানে আমার বাবা টিগমাস বানু-সালানো এবং আফগানিস্থান রাজ্য শাসন করতেন। আমার বাবার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো, লোকে তার নামে ধন্য ধন্য করত। বাবার সাতজন সামন্ত রাজা ছিলো। প্রত্যেকের শাসনাধীন শহর ছিলো একশটি আর একশটি করে দুর্গ। বাবার অধীনে একশতটি দুঃসাহসিক ঘোড়া সওয়ার এবং একশজন অতি সাহসী যোদ্ধা ছিলো। আমার মা ছিলেন খোরাসানের সুলতান বাহরোয়ানের মেয়ে। আমার নাম জানশাহ।

ছোটবেলা থেকে আমার বাবা আমাকে লেখাপড়া, নানা কলাবিদ্যায় এবং বলবত্তায় পারদর্শী করে তোলেন। আমার যখন পনের বছর বয়স তখন আমার বাবার রাজ্যে আমার নাম ছিলো সেরা অশ্বারোহীদের প্রথমে। আমার দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকার করতে যেতে ভালো লাগতো। কখনো কখনো ঘোড়ায় চড়ে দূর থেকে দূরে চলে যেতাম।

একদিন বাবা তাঁর পারিষদবর্গ নিয়ে শিকারে গেলেন। আমিও বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। তিনদিন ধরে বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে নানান মজার খেলা খেলেছিলাম। তিনদিনের দিন সূর্যাস্তের সময় আমরা তাঁবু খাটিয়ে বসে বিশ্রাম করছি এমন সময় ছোট একটি হরিণ শিশু লাফিয়ে লাফিয়ে কোথা থেকে আমাদের সামনে এসে পড়লো। আমি একটা তাঁবুতে বসে সাতজন সৈন্যের সঙ্গে বিশ্রাম করছিলাম। দেখলাম হরিণটা লেজ তুলে দৌড়ে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের নিয়ে হরিণটার পেছনে পেছনে ধাওয়া করলাম। অনেকক্ষণ ধরে ধাওয়া করতে করতে একটা বিরাট নদীর ধারে এসে পড়লাম। এবার ওকে ঘিরে ধরতে পারব। পালাবে কোথায়! হরিণটা একবার আমাদের দেখলো পেছন ফিরে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারের দিকে সাঁতারাতে লাগলো। আমরাও ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে নদীর কিনারায় একটা মাছের নৌকা ঠেলে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তাতে চড়ে বাইতে লাগলাম। আমাদের ঘোড়াগুলিকে একজন সৈন্যের ওপর ভার দিয়ে এসেছিলাম। যাহোক আমরা মাঝ নদীতে এসে পড়লাম তাড়াতাড়ি। নৌকা আর আমাদের বাগে থাকছে না। ইতিমধ্যে ঝড় বইতে শুরু করেছে। তাছাড়া নদীর স্রোতও ছিলো প্রচণ্ড। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ আগে হয়েছিলো, এখন ঘোর অন্ধকার। দিক-বিদিক শূন্য হয়ে নৌকা যে কোথায় ভেসে চললো বুঝতে পারছি না। সমস্ত চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হলো। সারারাত ধরে প্রবলবেগে নৌকা ভেসে চললো। এ সময় কোন পাথরে বা পাহাড়ে ধাক্কা খেলে আর রক্ষা নেই। এই আতঙ্ক আমাদের আরো কাহিল করে দিলো। পরের দিনও একই ভাবে ভেসে চললাম। আল্লার মেহেরবানীতে আমাদের কোন দুর্ঘটনা ঘটলো না। দ্বিতীয় রাত্রির শেষের দিকে স্রোতে ভেসে আমাদের নৌকা পাড়ে এসে ভিড়লো। আমরা লাফিয়ে নৌকা থেকে নেমে পড়লাম।

এরমধ্যে যে সৈন্যের ওপর আমাদের ঘোড়ার দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলাম, সে আমার বাবাকে সব জানিয়ে দিলো। বাবা, মহামান্য টিগবাস ধরে নিলেন, আমরা নদীতে ডুবে গেছি। শোকে দুঃখে হতাশায় মাথার রাজমুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নিজের হাতে। দিকে দিকে দূত পাঠালেন আমাদের খোঁজে। আমি হারিয়ে গেছি, এ খবরটা আমার মায়ের কাছেও পৌঁছোতে দেরী হয়নি। দুঃখিনী মা আমার নিজের মুখ নিজেই আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে তুললেন। মুঠো-মুঠো চুল ছিঁড়ে ফেললেন। গভীর দুঃখে বুক চাপড়াতে লাগলেন। নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন এবং সবশেষে শোক বস্ত্র পরলেন।

এদিকে আমরা তীরে নেমে একটু ভেতরে ঢুকে দেখি সুন্দরএকটা ছোট্ট নদী। একটা লোক তার পাড়ে বসে তার পা দুটো জলে ডুবিয়ে রেখেছে। আমরা তাকে অভিবাদন জানিয়ে জানতে চাইলাম আমরা কোথায় এসে পড়েছি। লোকটা আমাদের অভিবাদন প্রত্যুত্তর না দিয়ে শকুনের মত তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো। শকুন মরা জন্তুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে আনন্দে যেমন চিৎকার করে তেমনি চেঁচাল। আমাদের বুক কেঁপে উঠলো সেই চিৎকারে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ হয়ে গেলো।

তিনশো একষট্টিতম রজনী ঃ

পরের দিন রজনীতে শাহরাজাদ গল্প শুরু করলো।

—লোকটা তারপর উঠে দাঁড়ালো। আশ্চর্য ওর কোমর দুভাগ করা। ওপরের ভাগটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে আর নীচের অংশটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মত বহু লোক ছুটে আসছে ঝর্ণার ধার দিয়ে। ঝাঁকুনি দিয়ে দেহটা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে ওপরের অংশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার সঙ্গীদের তিনজনকে কাছাকাছি পেয়ে ঘিরে ধরে হালুম হালুম করে খেতে শুরু করল। তিনজন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে নৌকার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়লাম। জলে ডুবে মরে যেতে রাজি—কিন্তু এই রাক্ষসদের হাত থেকে যে করেই হোক রেহাই পেতে হবে। নৌকাটাকে জলে ঠেলে দিয়ে স্রোতে ভেসে চললাম আমরা। নদীর তীর ধরে ছুটে আসছে অসংখ্য উরু, ঠ্যাং; আমাদের ধরার চেষ্টা করছে। দেহগুলো আমার হতভাগ্য সঙ্গীদের খেতে ব্যস্ত। ওদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এই রাক্ষসগুলোর পেটটাও পুরো ছিলো না দেহটার সঙ্গে। এই অর্দ্ধেক পেটেই কিভাবে খাচ্ছিল আমার সঙ্গী তিনটিকে! উঃ ভাবলেও শরীর কেমন করে। হতভাগ্য সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপন করে ভাবছি, সমস্ত ঘটনাটা কি দ্রুতই না ঘটে গেলো। এ যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

পরের দিন ছোট্ট একফালি জমিতে আমাদের নৌকা ভিড়লো। এখানে গাছে গাছে ফল ধরে আছে। বাগানে জানা অজানা কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে। নৌকা ছেড়ে এবার আর নিজে নামলাম না। সঙ্গীদের পাঠিয়ে দিলাম জায়গাটা ভালো করে দেখে আসবার জন্য। প্রায় আধবেলা কাটিয়ে ওরা ফিরলো। ওরা ডানে ও বাঁয়ে ভালো করে দেখেছে, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি। মার্বেল পাথরের একটা বড় প্রাসাদ দেখে এসেছে। প্রাসাদের সামনে স্বচ্ছ শামিয়ানা টাঙ্গানো। চারপাশে বাগান। বাগানে সুন্দর একটি দীঘি। ওরা সবাই মিলে প্রাসাদে ঢুকেছিলো। বিরাট একটা হলঘর। আবলুষ কাঠের বহু আসন মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে সাজানো। আশ্চর্যের ব্যাপার কি বাগানে কি প্রাসাদে ওরা কোন প্রাণীর চিহ্ন দেখতে পায়নি।

ওদের ভালো করে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিন্ত হলাম। নৌকা ছেড়ে প্রাসাদে যাব বলে ঠিক করলাম। বাগানের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে গাছ থেকে পাকা আর টাটকা ফল খেয়ে তাজা হয়ে নিলাম আগে। বিশ্রাম নেবার জন্য প্রাসাদে ঢুকলাম আগে। সোজা সিংহাসনে গিয়ে বসলাম আর আমার সঙ্গীরা আবলুষ কাঠের আসনে বসলো। সিংহাসনে বসার পর আমার বাবা-মা আর বাবার সিংহাসনের কথা মনে পড়লো। নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, কেঁদে ফেললাম। আমার দেখাদেখি আমার সঙ্গীরাও কেঁদে ফেললো।

নিজেদের দুঃখে নিজেরা কাতর। এমন সময় বিশাল সমুদ্র গর্জনের মত শব্দ কানে এলো। সামনে তাকিয়ে দেখি উজির, পাত্রমিত্র অমাত্যের দল হলঘরে ঢুকছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এরা সবাই বাঁদর। নানান আকারের বাঁদর, ছোটবড় সব রকমেরই এই মিছিল রয়েছে। এবার আর উপায় নাই, মৃত্যু অবধারিত। দৈত্যাকার চেহারার বাঁদরটিকে উজির বলে মনে হলো। সে আমার সামনে এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে কথা বললো। আশ্চর্যের ব্যাপার, মানুষের ভাষায় কথা বলছে ঃ

—আমি আর আমার লোকজন আপনাকে সুলতান বলে মেনে নিচ্ছি। আপনার এই তিন সঙ্গী আমাদের সৈন্যবাহিনীর তিন প্রধান হবেন।

তারপর মহা সমারোহে কচি হরিণের মাংস দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করলো। খানাপিনার শেষে আমাদের উজির বললো—জাঁহাপনা, প্রাসাদের বাইরে আপনার সৈন্যবাহিনী ও প্রজারা অপেক্ষা করছে। চলুন, বাইরে এসে দেখবেন। ওরা তৈরী হয়ে আছে, এই মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হবে। আমাদের প্রাচীন শত্রু প্রেতের রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ হবে।

বহু ধকল গেছে শরীর আর মনের ওপর দিয়ে। ওদের বিদায় দিয়ে তিনজন সঙ্গী নিয়ে সমূহ পরিস্থিতির আলোচনা করতে বসলাম। ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর ঠিক হলো—প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাব এখনই। আর যত তাড়াতাড়ি হয় এদেশ ছেড়ে পালাতে হবে। প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে ঘুর পথে নদীর তীরে চলে এলাম। কিন্তু আমাদের নৌকাটা নেই। কেউ

সরিয়ে নিয়েছে বুঝলাম দাগ দেখে। কি আর করব, ফিরে এলাম সেই প্রাসাদেই। অবসন্ন শরীরে আর জেগে থাকতে পারলাম না, ঘুমিয়ে পড়লাম সবাই।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি উজির এসে কুর্নিশ করে বললো—জাঁহাপনা, সব তৈরি। প্রেতদের সঙ্গে যুদ্ধের সব তৈরি।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি কয়েকজন লোক বিরাট বিরাট চারটে কুকর ধরে আনছে। আমাদের চারজনকে কুকুরের পিঠে চড়তে হবে। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম নেই। কুকুরের পিঠে চড়তে হলো। কুকুরগুলো শিকলে বাঁধা ছিলো। তারা আগে আগে চললো আমাদের পিঠে করে। সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব তো আমাদেরই দিতে হবে। আমাদের পেছনে উজির বিশাল বানর সৈন্যের দলপতি হিসাবে চলেছে। আর তার পেছনে লাখ লাখ বানর সৈন্য আকাশ বাতাস তোলপাড় করে চেঁচাতে চেঁচাতে চলেছে।

আমরা একদিন একরাত খালি কুচকাআওয়াজ করতে করতে এগিয়ে চললাম। বিরাট একটা কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে প্রেতেরা লুকিয়ে ছিলো। আমাদের দেখে হঠাৎ বেরিয়ে এলো। বিচিত্র ধরণের সব চেহারা। ভয়ংকর দর্শন, বুকের রক্ত জমে যাবার অবস্থা। কারো উটের মত দেহে ষাঁড়ের মাথা, কারো হায়নার মাথা, কারো বা দেহই নেই। জীবনে যা দেখিনি বা কল্পনাও করিনি এমন সব চেহোরা ওদের।

আমাদের দেখতে পেয়ে ওরা পাহাড় থেকে নেমে এসে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ালো। তার পর অঝোর ধারায় পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করলো। আমার সৈন্যবাহিনীরাও ওদের ছুঁড়ে দেওয়া পাথর তুলে নিয়ে সামনে পাল্টা ছুঁড়তে লাগলো। ক্রমেই যুদ্ধের চেহারা ভয়ংকর রূপ নিলো। এবং যুদ্ধটা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। আমার আর আমার তিনজন সঙ্গীর কাছে তীরধনুক ছিলো। তীর ছুঁড়ে কয়েকটাকে ঘায়েল করলাম। বহু মরেও গেলো। আমার সৈন্যবাহিনী তা দেখে আনন্দে চেঁচায় ও উৎসাহ বোধ করে। যুদ্ধে জয় আমাদেরই হলো। প্রেতেরা পালাচ্ছে, ওদের পিছু ধাওয়া করলাম।

আমরা চারজন কুকরের পিঠে চেপে সবার আগে দৌড়াচ্ছি। ধাওয়া করার আনন্দে বিশৃংখল। এই সুযোগে আমাদের পালাতে হবে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে। সবাই ছুটছে, সবাই ব্যস্ত, মার মার, ধর ধর শব্দ। আমাদের দিকে কেউ নজর রাখছে না। পিছনে ফিরলাম আমরা। প্রেত আর বানর সৈন্যের চোখের ওপর দিয়ে আমরা মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

কুকুরের পিঠে চেপে আমরা অনেকক্ষণ দৌড়ালাম। কুকুরগুলোর জিভ বেরিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। ওদের বিশ্রাম দেওয়ার জন্য থামতে দেখি বিরাট এক ঝকমকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে হিব্রু ভাষায় লেখা ঃ

> হে বন্দী ভাগ্য যাহাকে বাঁদর নৃপতি সৃষ্টি করিয়াছিলো এবং তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতির উদ্দেশ্যে তুমি যদি দৌড়াইয়া থাক, তোমার মুক্তির পথ বলিতেছি। দুইটি পথ তোমার সম্মুখে রহিয়াছে।—হ্রস্বতর পথটি ডানদিকে গিয়াছে। উক্ত পথ সমুদ্রের বেলাভূমিতে মিশিয়াছে। বেলাভূমি পৃথিবীটা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পথটি বিশাল মরুভূমির অভ্যন্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মরুভূমির রাক্ষস, দৈত্য ও জিনে পরিকীর্ণ। অপর পথটি বামদিক দিয়া গিয়াছে। ইহা দীর্ঘতর পথ। চারিমাস লাগিবে পথের কিনারায় পৌঁছিতে। উক্ত পথটি একটি উপত্যকার অভ্যন্তর দিয়া গিয়াছে। উপত্যকার নাম পিপীলিকার উপত্যকা। দ্বিতীয় পথ ধরিয়া কোনক্রমে পিপীলিকার সংশ্রব এড়াইতে পারিলে তুমি অগ্নি পর্বতের পাদদেশে আসিতে পারিবে। উক্ত পাদদেশে ইহুদীদের নগরী বর্তমান। আমি, ডেভিডের পুত্র সুলেমান তোমার মুক্তি উপায় নির্ধারণ করিয়া রাখিলাম।

ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে রইলো।

তিনশো বাষট্টিতম রজনী ঃ

পরদিন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার গল্প শুরু করলো ঃ

বাঁদরের হাত থেকে পালিয়ে ওরা পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি পড়ে বাঁদিকে যাত্রা শুরু করলো। জাঁহাপনা এবার যুবক জানশাহ্‌র মুখেই শুনুন ঃ

বাঁদিকের পথ ধরে চলতে লাগলাম। এই রাস্তা ইহুদী শহরে গেছে। মাঝখানে পিঁপড়ে উপত্যকা পড়বে, আমাদের সেটা মনে রাখতে হবে।

আমরা একটি দিনও পুরো যাইনি আমাদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে—ভূমিকম্প শুরু হলো নাকি! পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি কি, আমার সেই বানর উজীর। সর্বনাশ! আমাদের আর পালানো হলো না। দ্রুত গতিতে আমাদের ঘিরে ফেললো চারদিক থেকে। অনেকে চেঁচাচ্ছে, নাচছে হুটোপুটি করছে। এর মধ্যে উজীর আমার সামনে এগিয়ে এলো। তামাম বানরদের প্রতিনিধি সে। যুদ্ধে জেতার জন্য অভিনন্দন জানালো। বহুদিন পর ওরা জয়ী হলো—একটা ছোটখাট বক্তৃতাই দিয়ে ফেললো উজীর।

দিব্যি সভা চালিয়ে গেলো উজীর। রাগে আমাদের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। আমরা সতর্ক হলাম—কোন মতেই আমাদের মনের অবস্থাটা ওদের বুঝতে দেওয়া হবে না। হৈ হৈ করে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে চললো। আমার নতুন রাজ্যে আমার নাকি অভিষেক হবে। যুদ্ধ জয় করেছি একি চাট্টিখানি কথা! ধরা পড়ার আগে আমরা একটি উপত্যকায় চলে এসেছিলাম। পিছন ফিরে চললাম নতুন রাজ্যপাটে। হঠাৎ উপত্যকার মাটি ফেটে গেলো। পিলপিল করে পিঁপড়ে বেরিয়ে এলো। আর তাদের কি আয়তন! বাপস। পলকের মধ্যে বানর আর পিঁপড়ের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেলো। উঃ সে কি লড়াই! পিঁপড়েগুলো তাদের সাঁড়াশির মত দাঁতের ফাঁকে এক একটা বানরকে ধরে দুটুকরো করে ফেলছে। দশ পনরটা করে বাঁদর পিঁপড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে টেনে টেনেই ছিঁড়ে ফেলছে একট একটা পিঁপড়েকে। জীবনে এরকম লড়াই দেখিনি।

লড়াই বেশ জমে উঠেছে। ওরা লড়াই করুক মজাসে। আমরা কুকুরের পিঠে করে পালাই। কিন্তু আমাদের সকলের পালান হলো না। আমার তিনজন সঙ্গীকে এখানেই রেখে যেতে হলো। বেচারী তিনজন কেমন করে যেন পিঁপড়ের দাঁতের সামনে পড়ে গিয়েছিলো। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সঙ্গে-সঙ্গে। কি দুর্ভাগ্য আমার! আপদে বিপদে প্রতিবার পরামর্শ করে আমরা রেহাই পেয়েছি। এখন আমি একেবারেই একা। ওদের আত্মার জন্য সদগতির প্রার্থনা জানিয়ে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে একটা নদীর সামনে এসে পড়লাম। নদীর তীরে শেষ সঙ্গী কুকুরটিকে বিদায় দিলাম। সাঁতরে নদী পার হলাম। নদীর মধ্যে কোন বিপদ হয়নি। জামা কাপড় শুকিয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গতে সুস্থ মনে ভাবলাম, আর আমার ভয় নেই। পিঁপড়ে বা বাঁদর আর কেউ নদী পার হয়ে আমাকে ধরতে আসবে না।

এবার শুরু হলো পায়ে চলা। দিনের পর দিন হেঁটে চললাম। লতাপাতা আর গাছের শেকড় খেয়েই কাটলো আমার। অবশেষে সেই পর্বতের লেখার নির্দেশ মত ইহুদীদের শহরে এসে পৌঁছলাম। একটা জিনিস সেই লিপিতে বলেনি। এটা আমার পরে নজরে এসেছে। একটা নদী খালি পায়ে হেঁটে পেরোতে হয়। অথচ নদীর পাড়ে আমাকে পুরো এক সপ্তাহ বসে থাকতে হয়েছিলো। এই নদীর কথা লিপিতে বলা ছিলো না। একটা বিশেষ দিনে নদীটা পেরোতে পেরেছিলাম। পরে শুনেছি; নদীতে শনিবার দিন জল থাকে না। ঐ দিন ইহুদীদের ভোজ হয়।

নদী পেরিয়ে শহরে ঢুকলাম। রাস্তায় কাউকেও দেখলাম না। ছিমছাম রাস্তা। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সামনেই প্রথমে যে বাড়িটা পেলাম সেখানেই ঢুকে পড়লাম। দরজা ঠেলে ভেতরে চলে এলাম, একটা বড় হলঘর। কয়েকজন লোক গোল হয়ে বসে আছেন। তাদের

দেখে বেশ গণ্যমান্য বলে মনে হলো। ঘরে ঢুকে নিজেকে নিরাপদ বলে ভাবলাম—ফাঁড়া বোধ হয় কেটে গেলো। ওদের কাছে সালাম জানিয়ে বললাম ঃ

—আমার জানশাহ্। আমি সুলতান টিগমাসের পুত্র। কাবুলে এবং বানু সালানের অধিপতি আমি। অনেক বিপদ কাটিয়ে এখানে এসেছি আমি। এখান থেকে আমার রাজ্য কত দূরে আর কোনদিকে দয়া করে বলে দেবেন? আমি ক্ষুধার্ত!

যারা বসেছিলেন সকলেই আমার দিকে তাকালেন। একজনই আমার সঙ্গে কথা বললেন। তাকে দেখে মনে হলো উনি বোধ হয় ওদের দলের মাথা। উনি আমাকে ইশারায় বললেন—আগে খানাপিনা করে নাও চুপচাপ। কথা বলো না।

আঙ্গুল দিয়ে একটা খাবারের থালা দেখিয়ে দিলেন। থালায় অনেকখানি রান্না করা মাংস। এরকম রান্না করা মাংস আমি কোনদিন খাইনি। পাশেই সরাব ছিলো। নিজের মনে মাংস আর সরাব খেলাম। তারপর চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর সেই দলপতি আমার কাছে উঠে এসে কথা বললেন। অদ্ভুত সে সব কথা। সাংকেতিক ভাষায় বললেন ঃ

—কে? কখন? কোথায়?

আমি ইশারা করে জেনে নিলাম উত্তর দিতে পারব কি না।

ইশারায় জানালেন, মাত্র তিনটি কথা বলতে পার।

আমি বললাম—ব্যবসায়ীর দল, কালুল, কখন?

বৃদ্ধ ইশারায় জানালেন—জানা নেই।

তারপরে আমাকে ইশারায় বেরিয়ে যেতে বললেন—খানাপিনা শেষ হয়েছে, যাও কেটে পড়।

সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে আশ্চর্য হলাম—সবাই দেখি ইশারা করছে। এতো মহা সমস্যায় পড়া গেলো দেখি! কে সাহায্য করতে পারবে ভাবছি। একটা চীৎকার কানে এলো।

—এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা যে রোজগার করতে চাও, তার সঙ্গে সুন্দরী ক্রীতদাসীও পাবে, আমার সঙ্গে চলে এসো—মাত্র এক প্রহরের কাজ করলেই পেয়ে যাবে।

এদিক ওদিক ঘুরে কোন লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। যে লোকটা চেঁচাচ্ছিল তার কাছে গিয়ে বললাম—আমি করে দেব, এক হাজার সুবর্ণমুদ্রা আর মেয়েটাকে চাই।

আর কোন কথা না বলে লোকটা আমার হাত ধরে একটা বাড়িতে নিয়ে গেলো। বেশ ধনী লোকের বাড়ি। সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্রে সারা বাড়ি ভর্তি। বাড়ির ভেতর একজন বুড়ো ইহুদী বসেছিলো একটা আবলুস কাঠের আসনে। সেই লোকটা বুড়োকে কুর্নিশ করে বললো—এই যে একজনকে পেয়েছি। লোকটা ভিনদেশী মনে হয়। তবে যুবক তো, খাটতে পারবে তিন মাস ধরে সমানে। হেঁকে যাচ্ছিলাম, এই লোকটাই সাড়া দিলো এত দিনে।

বুড়ো সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে ওর পাশে আমাকে বসিয়ে ভালো ভালো খাবার আর পানীয় এনে দিলো। খাবার দাবার খুব উপাদেয় ছিলো বলতে পারি। তারপর থলে থেকে গুণে গুণে এক হাজার দিনার দিলো আমাকে। ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিনারগুলো দেখলাম; না, এগুলো অচল বা জাল নয়। আমার খুব আশ্চর্য লাগছিলো ব্যাপার স্যাপার দেখে। যা হোক কয়েকজন নফরকে বলে আমার জন্য উৎকৃষ্ট পোশাক আনিয়ে দিলো। ওগুলো পরে ফেললাম। যে মেয়েটি আমার হবে, তাকেও আনিয়ে দিলো। এতো অদ্ভুত ব্যাপর! কি করতে হবে, কি কাজ তার নামে পাত্তা নেই অথচ কাজের মজুরী মেয়েটাকে এনে দেখানো সবই আগাম হলো। ভারি মজা লাগছে আমার।

ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে রইলো।

তিনশো তেষট্টিতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রে শাহরাজাদ বলতে শুরু করলো ঃ

রেশমের জামা পরিয়ে মেয়েটার ঘরে পৌঁছিয়ে দিলো আমাকে। মেয়েটি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। আমাকে ঘরের মধ্যে রেখে নফররা বেরিয়ে গেলো। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। যা হোক সুন্দরী নারী সামনে বসে আছে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। রাত কাটালাম মেয়েটির সঙ্গে। বুড়ো বলেছিলো মেয়েটি কুমারী, অস্পর্শিত। সহবাসে বুঝলাম কথাটা বুড়ো মিথ্যে বলেনি। এভাবে তিনদিন তিনরাত কেটে গেলো। তিনদিন তিনরাত ঘর থেকেই বের হইনি। ভালো ভালো খানা খাওয়া ছাড়া আর যা কিছু করার ওই মেয়েটার সঙ্গে ছাড়া করার মত অন্য কিছু ছিলো না।

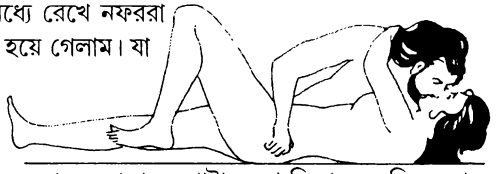

চারদিনের দিন সকালবেলা বুড়ো আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললো—তোমার কাজের পাওনা তো অগ্রিমই পেয়েছ। এখন কাজ করতে পারবে তো?

কি কাজ, কেমন কাজ কিছুই জানি না। তবু কাজ তো করতেই হবে। আমি শুধু বললাম—হ্যাঁ, আমি তৈরী।

বুড়োর নির্দেশে দুজন ক্রীতদাস আমাকে নিয়ে গেলো দুটো লাগাম বাঁধা খচ্চরের কাছে। একটির ওপর একজন আগে থেকে বসেছিলো। লোকটা আমাকে অন্যটার ওপর বসতে বললো। ঠিক ঠাক করে বসতে না বসতেই খচ্চর দুটো খুব জোরে ছুটতে আরম্ভ করলো। কোন মতে নিজেকে সামলে নিলাম। সকাল থেকে একটানা দুপুর পর্যন্ত খালি ছুটে গেলাম। অবশেষে আমরা একটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। পাহাড়টা ভীষণ খাড়াই। মানুষ বা কোন জন্তুর পক্ষে এ পাহাড়ে চড়া অসম্ভব। খচ্চর থেকে দু'জনে নেমে পড়লাম। লোকটা বললো ঃ

—এই নাও ছুরি। এটা দিয়ে তোমার খচ্চরটার পেট ফাঁসিয়ে দাও। কাজ করার সময় শুরু হয়ে গেছে—কাজ শুরু কর।

আমিও কাজ শুরু করে দিলাম। ছুরিতে পেট ফাঁসিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খচ্চরটা মরে গেলো। লোকটার নির্দেশ মত খচ্চরের ছাল ছাড়িয়ে নিলাম।

এবার লোকটা বললো—চামড়ার ওপর শুয়ে পড় ঝটপট। আমি চামড়াটা সেলাই করে দেব।

যেভাবে সে বলেছে সেভাবে আমি আদেশ মেনে চলেছি। চামড়াটা পেতে শুয়ে পড়ি। লোকটা সাবধানে সেলাই করতে লাগলো যাতে আমার গায়ে ফুটে না যায়। সেলাই করতে করতে সে বললো—শোনো মন দিয়ে এখনি একটা বিরাট বাজ পাখী এসে পড়বে। তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখিটা ওর পায়ে খামচে তোমাকে ওর বাসায় নিয়ে যাবে। এই দুর্গম পাহাড়ের চুড়ায় ওর বাসা। আকাশে ওড়ার সময় একদম নড়বে না। নড়লে ভয় পেয়ে আকাশ থেকে ধপ করে ফেলে দেবে তোমাকে। তাহলে কি হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। পাহাড়ের চুড়ায় যেই তোমাকে রাখবে সঙ্গে সঙ্গে ছুরি দিয়ে চামড়াটা কেটে বেরিয়ে আসবে। পাখীটা তোমাকে দেখে ভয়ে পালাবে। এবার তোমার আসল কাজ করতে হবে। চূড়ায় দেখবে বহু মূল্যবান পাথর রয়েছে। তুমি ওপর থেকে ওগুলো গড়িয়ে নীচে ফেলে দেবে। বুঝেছো? পাথর ফেলে দেওয়া হয়ে গেলে নীচে নেমে আসবে। আমরা দুজন ফিরে চলে যাবো।

কথা বলতে বলতে ইহুদীটা সরে গেলো আমার কাছ থেকে। মুখ ঢাকা ছিলো বলে বুঝতে পারিনি, কখন চলে গেছে। ওর কথা শেষ হতে না হতে আমাকে হেঁচকা টানে আকাশে তুললো, টের পেলাম। আমি মড়ার মত পড়ে আছি। এক জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিলো মনে হলো। না আকাশ থেকে ছাড়েনি, পিঠের নীচে শক্ত পাথর রয়েছে টের পেলাম। ছুরি দিয়ে টুকরো

টুকরো করে চামড়া কেটে বেরিয়ে এলাম। সবে মাথাটা বার করছি পাখীটা ভয়ে বিকট চীৎকার করে পালিয়ে গেলো। আমার আসল কাজ শুরু হলো এবার। চুনি পান্না আরো মূল্যবান সব পাথর আগে এক জায়গায় জড়ো করে নিলাম। সব একসঙ্গে নিচে ফেলে দিলাম ইহুদীটার কাছে। ওপরের কাজ শেষ করে এবার নীচে নামব, আমার মজুরি নিয়ে বাড়ি যাব। কত কাজ পড়ে আছে। কিন্তু নামব কি করে? চূড়ার কার্নিশের পরে বিশাল খাড়াই। এদিকে ওদিকে ঘুরে দেখালম, নাঃ কোন রাস্তাই নেই নামবার। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। দামী দামী পাথরগুলো বস্তায় বেঁধে ইহুদীটা ওর খচ্চরের ওপরে চেপে দ্রুত বেগে চলে যাচ্ছে আমি ওপরে নির্বাসিত।

দুঃখে, কষ্টে, আতঙ্কে চুড়ায় বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। তারপর আল্লার নামে সোজা হাঁটতে লাগলাম যা হবার হবে। না পড়ে যাইনি, হেঁটে চললাম একনাগাড়ে দুমাস ধরে। আশে পাশে সব পাহাড়ের চুড়া মালার মত গাঁথা। শেষ চূড়ায় সে পৌঁছনোর পর পরম করুণাময় আল্লার কৃপায় এক উপত্যকা দেখতে পেলাম। ছোট ছোট নদী বয়ে চলেছে তার ওপর দিয়ে। তাছাড়া আল্লার দুনিয়ায় প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সব যেমন ঢেলে দেয়, এখানেও তাই দেখছি। সবুজ গাছে গাছে ফল ধরে আছে, নানান রং-এর আর গন্ধের ফুল ফুটে আছে। জানা অজানা অসংখ্য পাখীর কলরব। প্রকৃতি যেন তার ভাণ্ডার এখানে উজাড় করে দিয়েছে। সামনে আকাশ ছোঁয়া বিশাল একটা প্রাসাদ। প্রাসাদপুরী ঢোকার সিংহদ্বারের সামনে একটা আসনে একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। তিনি আমার পথরোধ করলেন। তাঁর মুখে যেন বেহেস্তের দ্যুতি। তাঁর হাতে রাজদণ্ড—চুনির তৈরি। মাথায় হীরার মুকুট। ইনি নিশ্চয়ই রাজা হবেন। আমি কুর্নিশ করলাম।

প্রত্যাভিবাদন করে মধুর কণ্ঠে বললেন—বৎস, আমার পাশে বস।

আমি বসলাম। উনি বলে চলেছেন—এখানে কখন এসেছ বাছা? কোথা থেকেই বা আসছ? তোমার আগে কোন মানুষ এদেশে আসেনি! কোথায় যাবে বাবা?

এত অন্তরঙ্গ কথা এত মধুর ব্যবহার বহুকাল শুনিনি। আমার হৃদয়ের সব কথা যেন ঠেলে বের হতে চাইছে এক সঙ্গে। কথাগুলো এক সঙ্গে ঠোকাঠুকি করছে। জবাবে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। কথার চাপে বুকটা ফুলে ফুলে উঠলো। অবরুদ্ধ অভিমানে, ক্ষোভে আমার চোখের জল বাধা মানে না। আমি ফোঁপাতে থাকি। বৃদ্ধ বললেন ঃ

—এভাবে কেঁদ না বাছা। তোমার কান্নায় আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে যে! নিজেকে শক্ত কর। বুঝতে পারছি দুর্বল হয়ে পড়েছ। ঠিক আছে এখন আর কিছু বলতে হবে না। আগে খানাপিনা করে চাঙ্গা হয়ে নাও তারপর সব শুনছি।

আমাকে সঙ্গে করে তিনি একটা হলঘরে নিয়ে গেলেন। বহু রকমের পানীয় আমাকে দেওয়া হলো। পাশে বসে আমাকে খাওয়ালেন বৃদ্ধ। বেশ তাজা মনে হলো নিজেকে। এবার আমার কাহিনী শুনতে চাইলেন তিনি। আনুপূর্বিক সব বলে গেলাম তাঁকে। আমার বলার শেষে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এ প্রাসাদ কার?

তিনি বললেন—বৎস, প্রাচীনকালে এই প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন সুলেমান। তারই নির্দেশে আমি পক্ষীদের সর্বাধিনায়ক। দুনিয়ার তামাম পক্ষী এখানে একবার আসবেই তাদের আনুগত্য প্রর্দশনের জন্য। তুমি দেশে ফিরে যেতে চাইলে আমি একটা পক্ষীকে বলে দেব। তারা আমার আদেশে যেখানে যেতে চাও সেখানে নিয়ে যাবে ভালোভাবে। তবে তারা এখনো এখানে এসে পৌঁছোয় নি। তারা না আসা পর্যন্ত তুমি এই প্রাসাদে ঘুরে বেড়াতে পার। তোমার ইচ্ছে মত যে কোন ঘরে প্রবেশ করতে পার শুধু একখানা ঘর বাদে। সেই ঘরখানা সোনার চাবিতে খোলে। এই সব চাবির মধ্যে সোনার চাবিটি দেখতে পাবে।

এই বলে চাবির গোছাটি আমাকে তুলে দিয়ে পক্ষী-অধিপতি চলে গেলেন। আমি

এবার ইচ্ছে মত ঘুরতে পারব। প্রথমে আমি হলঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। এসব ঘরে পাখীদের থাকবার চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। অবশেষে সেই ঘরখানা যেটা সোনার চাবি দিয়ে খোলে তার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। ঘরটাকে ছুঁতেও ভয় লাগে। বৃদ্ধের আদেশ-বাণী এখনো আমার কানে বাজছে।

ভোর হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে থাকে শাহরাজাদ।

তিনশো চৌষট্টিতম রজনী ঃ

পরের রজনীতে আবার গল্প শুরু করলো শাহরাজাদ।

জানশাহ্ বুলুকিয়াকে তার কাহিনী বলে চলেছে ঃ

—এদিকে আমার মনের ভেতরে অদম্য কৌতূহল। তাকে চেপে রাখা বেশ কষ্টকর। কৌতূহল ক্রমে যুক্তি ও নিষেধ ভাসিয়ে দিলো। মনের সঙ্গে লড়াই করে সম্পূর্ণ পরাস্ত হলাম আমি। কাঁপতে কাঁপতে ঘরখানা সোনার চাবি দিয়ে খুললাম আমি। কী জানি ভেতরে কি আছে। অজানা নিষিদ্ধ বস্তুর টানে কম্পিত চরণে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

নাঃ, ভয়ের কিছু নেই। বরং মনোহর দৃশ্যে আমার চোখ ভরে গেলো। দরজা খুলে ভালোই হয়েছে। নচেৎ এত সুন্দর জিনিস দেখা হত না। ঘরের ভেতরে বিরাট একটা শামিয়ানা টাঙ্গানো। মেঝেটা নানারকম মূল্যবান পাথরে তৈরি। একটা রূপোর গামলার মত বড় পুকুরে ফোয়ারা থেকে মিষ্টি আওয়াজে জল বের হচ্ছে। পুকুরের চারধারে অনেকগুলি সোনার পাখী বসানো। পাশে একটা সিংহাসন বড় চুনি কেটে তৈরি করা।

ধীরে ধীরে সিংহাসনের সিঁড়ি বেয়ে আমি ওপরে উঠতে লাগলাম। সিংহাসনের মাথায় লাল সিল্কের চাঁদোয়া। সিংহাসনে বসে একটু চোখ বুজলাম। চোখ খুলে দেখলাম তিনটি মেয়ে পুকুরে নেমে নাইতে লেগেছে। দেখে, বুলুকিয়া ভাই, কি বলব, আমারও সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হলো। পাগলের মত ঐ গামলার পুকুরের ধারে ছুটে গেলাম। পাড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠি ঃ

—যুবতী মেয়েরা, সোনা মেয়েরা, রানীর দল। আমাকে দেখতে পেয়ে মেয়েরা তারস্বরে চিৎকার করতে করতে জল থেকে দ্রুত উঠে পালক দিয়ে নিজেদের গোপন স্থান ঢাকার চেষ্টা করে। তাদের মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। ওরা তাড়াতাড়ি পুকুরের পাড়ের গাছের মগ ডালে গিয়ে উঠলো। ঘাড় কাত করে নিচে আমাকে দেখতে থাকে। ওদের দৃষ্টিতে যেন ঠাট্টার আভাস। আমিও সেই গাছে চড়ে ওপরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি ঃ

—তোমরা রানীর মত সুন্দরী! তোমরা কারা বলো না গো! রাজ টিগমাসের ছেলে আমি। আমার নাম জানশাহ্। আমার বাবা কাবুল ও বানু-সাহ্লানের সুলতান।

ওদের মধ্যে কম বয়েসী মেয়েটি আমার কথার জবাব দিলো। মেয়েটি তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরীও বটে। ও বললো ঃ

—আমরা তিন বোন রাজা নস্র-এর মেয়ে। আমার বাবা হীরা প্রাসাদে থাকেন। গোছল করতে আর মজা করার জন্য আমরা এখানে আসি।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম—আমাকে দেখে কি তোমাদের একটুও ভালো লাগে নি? নিশ্চয়ই লেগেছে, কি বল? তবে এসো, আমার সঙ্গে খেলবে আর আনন্দ করবে!

মেয়েটি সেই মগডাল থেকেই বললো—জানশাহ্, যুবতী মেয়েরা জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পারে নাকি? আমার পরিচয় আরো ভালোভাবে নিতে হলে আমার সঙ্গে আমাদের প্রাসাদে চলো বাবার কাছে।

আমার দিকে বিলোল কটাক্ষ হেনে মেয়েটি তার দু বোনকে নিয়ে চলে গেলো যেন উড়ে। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম হৃদয়ে।

ওরা চলে গেলো। হায় হায়, আমার যে সব জ্বলে যাচ্ছে, কিভাবে নেবাই এ জ্বালা? মনোকষ্টে গাছ থেকে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম।

গাছতলায় কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলাম, জানি না। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি মাথার কাছে সেই বৃদ্ধপক্ষী অধিপতি বসে আছেন। আমার চোখে মুখে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। চোখ খুলতে দেখে তিনি বললেন ঃ

—অবাধ্যতার শাস্তি কেমন দেখলে তো? এই নিষিদ্ধ স্থানের দরজা খুলতে তোমাকে পই পই করে মানা করি নি?

জবাব দেবার মুখ নেই আমার। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ফোপাতে থাকি।

—কি হয়েছে তোমার এবার বুঝতে পারলাম। পায়রার সাজে মেয়েদের তুমি দেখেছিলে। ওরা মাঝে মাঝে গোছল করতে এখানে আসে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন ওরাই এসেছিলো। —কাঁদতে কাঁদতে বলি—হীরা প্রাসাদ কোথায় দয়া করে বলে দিন। কোন পথে সেখানে যাব বলে দিন।...সেই হীরা প্রাসাদে নাকি মেয়ে তিনটে থাকে ওদের বাবা নাস্‌র-এর সঙ্গে।

—সর্বনাশ! সেখানে যাবার কথা চিন্তা করো না। রাজা নাসর কে জান? জিনদের অত্যন্ত শক্তিশালী নেতা সে। তুমি ক্ষেপেছ? ওর মেয়ের সঙ্গে তোমার শাদি ও কখনই দেবে না। ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। তার চেয়ে নিজের দেশে কি করে ফিরবে তাই ভাব। তৈরি হয়ে নাও। বড় বড় পাখীরা শিগগির এখানে আসছে। ওদের বলে দেবো। তোমাকে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে দিয়ে আসবে।

—আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ওকে যে আমি দেখতে না পেয়ে মরে যাব। আপনি আমার বাবার মত, ওকে যাতে আবার দেখতে পাই আপনি দয়া করে তার ব্যবস্থা করে দিন। আমি আমার দেশে ফিরতে চাই না। আমার লোকেদের দেখতে চাই না—শুধু একবারটি দয়া করুন, আপনার পায়ে পড়ি।

বৃদ্ধের পায়ে মাথা রেখে শুয়ে পড়ি। মেয়েটির রজনীগন্ধার রূপ দূর থেকে কেবল দেখেছি, কিন্তু তার সুবাস তো পেলাম না। তার স্পর্শ তো পেলাম না, না পেলে তো বাঁচব না। আভিমানে আব্দারে আঝোরে কাঁদতে থাকি।

এই সময় রাত ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ হয়ে গেলো।

তিনশো আটষট্টিতম রজনী ঃ

জানশাহ্ বৃদ্ধের পায়ে পড়ে কাঁদছে। পক্ষী অধিপতি তাকে দু-হাত দিয়ে তুলে ধরে বললেন—বুঝেছি, মেয়েটার জন্য তোমার ভেতরে আগুন জ্বলছে। ওকে না পেলে এ আগুন আর নিভবে না। ঠিক আছে, এতই যখন তোমার ইচ্ছে, যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শোনো। আর আমার কথা মত চললে মেয়েটিকে তুমি পাবে। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে চুপচাপ। ওরা আবার আসবে গোছল করার জন্য। পালক খুলে রেখে যথারীতি জলে নামবে। তুমি ঝট করে ওদের পালকের পাখনাগুলি সরিয়ে ফেলবে। পাখনাগুলি ফেরত পাওয়ার জন্য ওরা তোমাকে খুব ভালো ভালো কথা বলবে। তোমার মন জয় করার জন্য তোমার গুনগান করবে। এমন কি বিবসনা হয়ে তোমাকে সোহাগ জানাবে। কিন্তু সাবধান! একবার যদি ওরা তোমাকে ভিজিয়ে পাখনাগুলি নিয়ে যেতে পারে ওরা আর কখনো এখানে আসবে না। সুতরাং ওরা যাই বলুক আর যা-ই করুক পাখনা ফেরত দেবে না কিছুতেই। ওদের বলবে, শেখ আসুক আগে তার পর তোমাদের পোশাক ফেরত পাবে। আমি এখানে না আসা পর্যন্ত ওদের ওপর কিচুতেই নরম হবে না। নিজেকে শক্ত করে রাখবে। আমি এসে গেলে সব ব্যবস্থা করে দেবো, তোমার বাসনা পূর্ণ করে দেবো।

পক্ষী অধিপতিকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম। উনি চলে গেলেন আর আমিও গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ লুকিয়ে আছি বাতাসে পাখা ঝাপ্‌টের শব্দ শুনতে পেলাম, শুনলাম ওদের হাসাহাসিও। হ্যাঁ, ওরা আসছে। উড়ে এসে পুকুরের পাড়ে বসলো, এদিক ওদিক দেখলো আড়ি পেতে ওদের কেউ দেখছে কিনা। যে মেয়েটি সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলেছিলো সে বোনদের বললো ঃ

—দিদি, বাগানে কেউ লুকিয়ে নেই তো রে! সে দিন যে ছেলেটিকে দেখেছিলাম তার কি হলো বলতো?

—সান্‌সা, ও নিয়ে তোর আর মাথা ঘামাতে হবে না। আয় জলে নামি।

ওরা পাখাগুলি খুলে ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুন্দর ভঙ্গী করে কি দারুণ সাঁতারই না কেটে চলেছে, যেন তিনটি চাঁদ জোয়ারের জলে পাড়ি দিচ্ছে। ওদের গায়ের রং-এর ঔজ্জ্বল্যে ফোয়ারার জলগুলি যেন রূপো বনে গেলো।

আমিও লক্ষ্য করে আছি কখন ওরা তীর ছেড়ে পুকুরের মাঝখানে চলে যায়। সাঁতার কাটতে কাটতে হুল্লোড় করে ওরা পুকুরের মাঝখানে যেতেই তীর বেগে বেরিয়ে ছোট মেয়েটির পোশাক তুলে নিলাম। আচমকা আমাকে দেখে ওরা সমানে চেঁচাতে থাকে। কোন কথা না বলে আমি শুধু ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলো বিবসনা সুন্দরী তিনজন। জলের ওপরে শুধুমাত্র মাথাগুলি ভাসিয়ে রেখে আমার দিকে তীরের কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। চোখে মিনতি। না, ভুলব না ওসব ছলনায়। নিজেকে শক্ত রেখে হাঃ হাঃ করে হেসে পাখনার পোশাক মাথার ওপর তুলে নাচাতে থাকি। ছোট মেয়েটি, যার নাম সানসা, সে আমায় বললো ঃ

—তুমি একজন যুবক, তার ওপর মানী লোক, যে জিনিস তোমার নয় তা কি করে নিলে?

—ওপরে উঠে এসো আগে তারপর আমার সঙ্গে কথা বলো।

—নিশ্চয় তোমার সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু বিবসনা তো উঠতে পারি না! আমার পোশাকটা দাও, ওটা পরে নিয়ে তবে তো ওপরে উঠবো। তারপর যেমন তোমার খুশী আমার সঙ্গে কথা বলো আদর করো।

—তুমি আমার দিল! দুনিয়ার সেরা সুন্দরী তুমি! তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না। কিন্তু ওতো দিতে পারছি না গো! তোমার পোশাক ফেরৎ দেওয়া মানে তো আমার নিজের হাতে নিজের বুকে ছুরি বসানো। আমার বন্ধু, পক্ষী অধিপতি যতক্ষণ না এসে পড়ছেন, তোমার পোশাক ফেরত পাচ্ছ না, বুঝেছো সুন্দরী!

আমার কথা শুনে ওরা এ-ওর দিকে দেখে ফিসফিস করে কি যেন বললো। তারপর সানসা বললো ঃ

—তুমি শুধু আমার পোশাকটাই নিয়েছ। এক কাজ কর, তুমি পেছন ফিরে দাঁড়াও, আমার দিদিরা জল থেকে উঠে ওদের পোশাক পরে নিক। ওদের পোশাক থেকে কয়েকটা পালক ছিঁড়ে দেবে আমাকে। আমার দেহের গোপন স্থানগুলি ঢেকে জলের ওপর উঠে আসব। লক্ষীটি, আমার এই মিনতিটুকু রাখো।

—এটা হতে পারে। বলে আমি চুনী সিংহাসনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াই।

বড় বোন ওপরে উঠে এসে ঝটপট পালকের পোশাক পরে নিলো। ওদের পোশাক

থেকে অনেকগুলি পালক ছিঁড়ে দিয়ে একটা ছোট আচ্ছাদনের মত তৈরি করে সানসা উঠে এসে পরে নিয়ে বললো—তুমি এবার বেরিয়ে আসতে পার।

ছুটে বেরিয়ে এসে সানসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওর গায়ে অসংখ্য চুমু খেতে থাকি। অবশ্য ওরা পোশাকটা ও হাত দিয়ে যাতে ধরতে না পারে তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। এক হাতে ওটা শক্ত করে ধরে রাখি। পা থেকে জড়িয়ে ধরে তুলে নিয়ে ও আমাকে আদর করতে থাকে, সোহাগ জানায়। নানা খোসামুদি কথা বলে পোশাকটা চাইতে থাকে বার বার। উহুঁ, আমি কিন্তু ভুলছি না। ওসব কথায় বা কাজে আমি টলছি না। ওকে চুনী সিংহাসনের কাছে কোন মতে টেনে নিয়ে আসি। সিংহাসনে বসে পড়ে ওকে আমার কোলে বসিয়ে নিলাম। ও বাধা দিতে পারলো না। বাস্ নিশ্চিন্ত!

পালাবার উপায় না দেখে আমার কামনায় সাড়া দিলো সানসা। দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। চুম্বনের প্রত্যুত্তরে চুম্বন করলো, আলিঙ্গনের জবাবে শক্ত হাতে আলিঙ্গন করলো। পলে দু'জনের শরীর যেন মিশে যেতে থাকে। আবেগে আর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সানসা। বড় বোন দুজন আমাদের পাহারা দিতে থাকে। ওদের মুখে মৃদু হাসি। আমাদের আনন্দে যাতে বাধা না পড়ে সে জন্য ওরা কোন কথা বলে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমার আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন। তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওঁর হাত চুম্বন করলাম। আমাদের বসতে বলে তিনি বললেন ঃ

—মা, তুমি এই ছেলেটিকে পছন্দ করেছ, ও তোমাকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছে, এতে আমি খুবই খুশী হয়েছি। উচ্চবংশের ছেলে জানশাহ্। তোমার বাবা রাজা নাসর্-ও মনে হয় এতে খুশী হবেন। তোমাদের শাদীতে ওঁর বোধহয় আপত্তি হবে না। ওর বাবা রাজা টিগমাস আফগানিস্থানের সুলতান। তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলবে, তাঁকে রাজি করাতে হবে মা।

—আমি আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম।

সানসা মাথা নীচু করে বললো। বৃদ্ধও মাথায় হাত রেখে বললেন,

—যদি সত্যিই ওকে গ্রহণ কর তাহলে আমার সামনে শপথ কর যে আজীবন তোমার স্বামীর প্রতি নিষ্ঠাবতী থাকবে আর কোনদিন ওকে ছেড়ে চলে যাবে না।

সানসা মাথা তোলে। পক্ষী অধিপতি দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন—এসো আমরা সেই সর্বসক্তিমান পরম করুণাময় আল্লাকে ধন্যবাদ দিই। তাঁরই ইচ্ছায় তোমাদের মিলন হলো। তোমরা সুখী হও! তোমাদের মধ্যে আর কোন বাধা রইলো না। জানসাহ্, ওর পোশাক ফেরত দিয়ে দাও। ও কথা দিচ্ছে কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবে না।

বৃদ্ধ এবার আমাদের হল ঘরে নিয়ে গেলেন। মেঝেতে সুন্দর গালিচা বিছান। তার ওপর অনেকগুলি থালা। থরে থরে ফল সাজান রয়েছে থালাগুলিতে। সানসা ওর দিদিদের বিদায় দেবার জন্য বৃদ্ধের কাছে অনুমতি চাইলো। ওরা ওর বাবার কাছে গিয়ে ওদের শাদীর খবর দেবে। দেবে আমরা হীরা প্রাসাদে তাড়াতাড়ি পৌঁছাচ্ছি সে খবরও।

বোনেরা চলে গেলে সানসা সুন্দর করে ফল কেটে সাজিয়ে দিলো আমাদের সামনে। ওর সৌজন্য বোধ কতখানি টের পেলাম। হাজার হোক রাজার মেয়ে তো!

এদিকে রাত হয়ে এসেছে। আমরা দু'জনে চলে গেলাম একটি ঘরে। সারাদিনের ক্লান্তি এবার দুটি দেহের মিলনে শ্রান্ত হলো। এক অনাস্বাদিত আনন্দে সারা রাত কেটে গেলো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প বলা বন্ধ করলো।

তিনশো ঊনসত্তরতম রজনী ঃ

জানশাহ্ তার কাহিনী বলতে থাকে।

ভোর হতেই সানসা ঘুম থেকে উঠে ওর পালকের পোশাক পরে সেজেগুজে তৈরী। আমাকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য আমার কপালে ছোট্ট একটি চুমু দিয়ে বললো—ওগো, ওঠো! তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। এক্ষুণি বের হতে হবে। বাবার হীরার প্রাসাদে যেতে হবে না!

বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। আমার তৈরী হতে বেশী সময় লাগলো না। দু'জনে পক্ষী অধিপতির কাছে গেলাম। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমার এমন সৌভাগ্য হত না। সানসাও আমাকে পেয়ে খুশী। আমরা দু'জনে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সানসা বললো—এই শোনো, এবার তুমি আমার পিঠে উঠে শক্ত করে ধরে বসে পড়। দুষ্টুমি করো না। আমাকে অনেকখানি উড়ে যেতে হবে প্রাসাদে পৌঁছতে।

আকাশে উঠে বায়ু বেগে উড়ে চললো সানসা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নেমে পড়লাম হীরা প্রাসাদের প্রবেশ পথের সামনে। ধীরে প্রাসাদের ভেতের হেঁটে চললাম। আমাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করার জন্য কটা জিন বাইরে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলো।

সানসার বাবা রাজা নাসর্ জিনদের নেতা। তিনি আমাকে দেখে খুশী হয়েছেন বলে মনে হলো। আলিঙ্গন করে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দামী পোশাক এনে পরতে দিয়ে আমাকে রাজসিক অভ্যর্থনা জানালেন। একটা হীরের মুকুট আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন। সানসার মা আসতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়ের পছন্দ দেখে রানীও খুশী। তিনি তাঁর মেয়েকে কতগুলি হীরে উপহার দিলেন বরণ করে।

এবার আমাদের হামামে নিয়ে যাওয়া হলো। নানা সুরভিত এবং নানা রং-এ রাঙ্গানো জলে গোছল করলাম। গোলাপ জল, কস্তুরি মেশানো জল আরো কত কি জল যে ছিলো। ঠাট্টা তামাসার মধ্যে উভয়ের গোছল শেষ হলো। শরীর ও মন তরতাজা হয়ে উঠলো। এর পর শুরু হলো ভোজন পর্ব। আমাদের সম্মানার্থে এক নাগাড়ে তিন দিন তিন রাত ধরে ভোজ চললো মহাসমারোহে। রাজ্যের যে যেখানে ছিলো সবাই এ ভোজে যোগদান করলো।

এভাবে মহাআনন্দে কয়েকদিন আমার শ্বশুরবাড়িতে কেটে গেলো। এবার দেশে ফিরতে হবে। তাই রাজা নাসর্কে জানালাম, আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার মা-বাবাকে তো বৌ দেখাতে হবে। ছাড়তে কষ্ট হলেও রাজা ও রানী আমাদের যাবার অনুমতি দিলেন। একটা প্রতিশ্রুতি আমার কাছ থেকে তাঁরা নিয়ে নিলেন যে, বছরে একবার আমাকে সানসাকে সঙ্গে নিয়ে হীরাপ্রাসাদে কিছুদিন বেড়িয়ে যেতে হবে।

রাজা নাসর্ বিশাল এক সিংহাসন তৈরী করিয়ে আমাকে ও সানসাকে তাতে বসিয়ে কিছু মেয়ে জিন আমাদের তদারকির জন্য সঙ্গে দিয়ে পুরুষ জিনেদের কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। তারা আকাশ পথে উঠে দু বছরের পথ দুদিনে শেষ করে আমাদের কাবুলে পৌঁছে দিলো।

আমার বাবা-মা ধরে নিয়েছিলেন আমি আর বেঁচে নেই। প্রাসাদে আমাকে নামতে দেখে তাঁরা দু'জনে যারপর নাই খুশী হয়েছিলেন। সানসার সঙ্গে আমার শাদী হয়েছে শুনে আনন্দে তাঁরা কেঁদে ফেললেন। আমাদের দুজনকে কাছে টেনে নিয়ে কখনো জড়িয়ে ধরছেন কখনো মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। আনন্দের আতিশয্যে মা মুর্ছিতা হয়ে পড়লেন। সানসা তার নাকে মুখে গোলাপ জল ছিটিয়ে সুস্থ করে তুললো।

সারা সলতানিয়ত জুড়ে খুশীর বন্যা বয়ে গেলো। খানাপিনা ও দানখয়রাতি চলতে লাগলো দেদার। শাদীর কিছু অনুষ্ঠান বাকী ছিলো, সেগুলি সম্পন্ন করা হলো। সব কিছু চুকে

গেলে বাবা সানসাকে ডেকে বললেন—তোমার মত চোখ জুড়ানো রূপের মেয়ে দুনিয়ায় দুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না মা। আমার রাজ্যের আকাশে চাঁদ হয়ে থাকবে তুমি। তোমার খুশীতে আমরা সবাই খুশী হব। এবার বলো এমন কি পেলে তুমি খুশী হবে।

—মনোরঞ্জনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই আমার আছে বাবা। আপনাদের দোয়া আমাকে সবচাইতে বেশী খুশী করবে।

—তোমার মহান বংশের মেয়ের মতই উপযুক্ত কথা বলেছ মা। তবুও তুমি কিছু চাও যা দিয়ে আমি তৃপ্ত হই।

—বেশ আপনি এমন একটা জায়গা বেছে দিন যেখানে চারদিকে থাকবে বাগান। ফুল আর ফলের গাছ থাকবে সে বাগানে। ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাবে বাগানের ভেতর দিয়ে। আমরা দু'জনে সেখানে থাকবো। এর বেশী কিছু আমার চাওয়ার নেই।

—বেশ তাই হবে মা।

বাবার আদেশে কাজ শুরু হলো। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা নতুন জায়গায় বাস করতে শুরু করলাম। সুখে আর তৃপ্তিতে আমাদের দিন কাটতে লাগলো।

এভাবে বছর ঘুরে গেলো। সানসা বাপের বাড়ি যাবার জন্য তৈরী হয়ে। আমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলো। কিন্তু হায়! ওর বাপেরবাড়ি যাওয়াটাই কাল হলো!

আমরা সেই সিংহাসনে গিয়ে বসালম। বাহক আমাদের উড়িয়ে নিয়ে চললো। রাত্রে যাত্রা স্থগিত থাকত। জলের ধারে বা গাছের নীচে বিশ্রাম নিতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একটা নদীর ধারে থাকলাম। সানসা গোছল করবে আমাকে বললো। আমি এ সময়ে গোছল করতে অনেক নিষেধ করলাম। বললাম, হীরা প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছে গোছল করা যাবে। কিন্তু ও আমার কথা শুনলো না। ভীষণ জেদী মেয়ে। কয়েকটি বাঁদীকে সঙ্গে নিয়ে গোছল করতে চলে গেলো। পাড়ে পোশাক খুলে রেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সবাই। বাঁদীদের মাঝে সানসাকে পরীর মত মনে হচ্ছিল। হৈ হুল্লোড় করে সবাই গোছল করছে, হঠাৎ সানসার আর্তনাদে সব থেমে গেলো। ওকে ধরাধরি করে তীরে নিয়ে আসা হলো। দৌড়ে গেলাম ওর কাছে। নদীর কিনারায় শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। ঝুঁকে পড়ে কত ডাকলাম—কিন্তু সাড়া নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। বিষাক্ত সাপে কামড়েছে ওকে, বাঁদীরা পায়ের গোড়ালি তুলে দেখাল্লো।

শোকে দুঃখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম বেশ কিছুদিন। ওরা ভেবেছিলো আমিও মরে গেছি। মরণ কেন যে আমারও হলো না! দুর্ভাগ্য আমাকে বাঁচিয়ে রাখল। সানসার জন্য শোহ সহ্য করতে। বুকটা আমার ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি ওর জন্য সমাধি তৈরী করলাম। ঐটা আমার জন্য। এখন মৃত্যুর দিন গুণছি। ওর পাশেই সমাধিতেই আমার চির নিদ্রা হবে। যে কদিন বেঁচে থাকি। চোখের জলে আর তার স্মৃতিতে বাঁচতে হবে। সানসা যেদিন আমাকে কাছে ডেকে নেবে সেদিনের অপেক্ষায় আছি। আমার দেশের বহু দূরে এখানে বসে আছি। পৃথিবীর মরুভূমি সব এখন আমার বুকে এসে স্থান নিয়েছে। আমার নিয়তিই আমাকে এখানে এনেছে।

বিষাদগ্রস্ত এক সুন্দর যুবক তার কাহিনী শোনাতে শোনাতে তার দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। বুলুকিয়া বলে ঃ

—ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, ভাই তোমার কাহিনী আমার দুঃসাহসিক সব কাহিনীর চেয়ে ঢের বেশী চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক। ভেবেছিলাম আমার কাহিনীই সেরা কাহিনী। ভাই, আল্লাকে ডাক, তিনিই তোমার হৃদয়ে শান্তি দেবেন। ভুলে যাওয়া ছাড়া শান্তি পাবার আর কোন দাওয়াই নেই।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প বলা বন্ধ করে দেয়।

তিনশো সত্তরতম রজনী ঃ

পরের দিন রাত্রে শাহরাজাদ শুরু করে।

বুলুকিয়া অনেকক্ষণ ওর পাশে বসে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না জানশাহ্। ওর ভীষণ জেদ দেখে ভয় পেয়ে যায় বুলুকিয়া। আবার অনেক সান্ত্বনার কথা বলে ওর হাতে চুমু খেয়ে আপন রাজধানীর দিকে পা বাড়াল। পাঁচ দিন অনুপস্থিতের পর ফিরলো রাজধানীতে। পথে আর তেমন কিছু ঘটে নি।

তার পর থেকে আমি আর বুলুকিয়ার কোন খবর পাই নি। তুমি এখানে এসেছ, আমি ওর কথা ভুলেই গেছি। ক্ষীণ আশা ছিলো ও হয়ত ফিরে আসবে। তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে চলে যেও না। কয়েকটা বছর থাক, তোমার সঙ্গ উপভোগ করি। বিশ্বাস কর আমার কোন কিছুরই অভাব নেই। অনেক গল্পও জানি। বুলুকিয়া বা বিষাদগ্রস্থ যুবকের কাহিনী যেগুলোর কাছে পানসে মনে হবে। তুমি খুব ভালো শ্রোতা, এতে আমি খুশী। এসব মেয়েরা আমাকে খানা পরিবেশন করে, সারা রাত ধরে গান গায়। আমার খুশীর নিদর্শন হিসাবে তোমাকে আপ্যায়ণ করব।

পাতালের রানী গল্প শোনাল, খানাপিনা চললো তারপর সর্পকন্যাদের নাচগানও হলো। এবার সবাই রাণীর গ্রীষ্মাবাসে চলে যাবে। তার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে। হাসিবের তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। এই এদের সঙ্গে যেতে হবে নাকি! ও মা আর বউকে ভালোবাসে, তাদের ছেড়ে আর কতকাল থাকবে? মনে সাহস সঞ্চার করে বলে ঃ

রানী, আমি সামান্য এক কাঠুরে। আপনি আপনার সঙ্গ দান করে আমার জীবনে আনন্দ দেবেন, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু বাড়িতে আমার বউ রয়েছে, মা আছেন, তাদের কাছে যেতে না পারলে তারা ভেবে ভেবে শেষ হয়ে যাবে। আর এভাবে আমিও বা কি করে বেঁচে থাকি, বলুন? আমার বিরহে ওদের মৃত্যুর আগে আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই। আমাকে যেতে দিন। অবশ্য সারা জীবন আমার একটা দুঃখ থেকে যাবে যে, আপনার সেই সব দারুণ গল্পগুলি শোনা হলো না।

রানী হাসিবের কথা শুনে বুঝলো যে ছেলেটি ঠিকই বলছে। তাছাড়া হাসিব চলে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রানী বললো ঃ

—ঠিক আছে হাসিব। তোমার বৌ আর মার কাছে চলে যেতে আমি আপত্তি করব না। কিন্তু তোমার মত এমন ভালো একজন শ্রোতা চলে যাবে ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। তাই তোমার কাছ থেকে আমি একটা প্রতিশ্রুতি চাইছি, না পেলে আমি তোমাকে ছাড়ব না। জীবনে কোনদিন হামামে গোছল করো না। এই শপথ তোমাকে করতে হবে। শপথ ভেঙ্গে ফেলো যদি কোনদিন, তবে সেদিনই তুমি শেষ হবে। এখন আর বেশী কিছু বলব না।

এই অদ্ভুত শপথে হাসিব খুব অবাক হয়ে যায়। তাহলেও ও শপথ করলো। রানীর বিরোধীতা তো আর করা যায় না এই মুহূর্তে। রানী ওকে বিদায় জানালো। একজন সর্পকন্যা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে রানীর সাম্রাজ্যের বাইরে রেখে আসার জন্য। একটা ভাঙ্গাচোরা বাড়ির তলা থেকে উঠে এলো। রাস্তাটা লুকানো। সেই মধুর গর্তের বিপরীত দিকে বেরিয়ে পড়লো হাসিব।

ভোর হয়ে আসছে। হাসিব তার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে। তার মা দরজা খুলে দিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন। হাসিবের বুকে মাথা রেখে বৃদ্ধা চোখের জল ফেলতে থাকেন। চেঁচামেচি আর কান্নার ফোঁপানি শুনে ছুটে এলো হাসিবের বউ। স্বামীর হাত চুম্বন করলো। বাড়ির ভেতরে চলে এলো তিনজন। আনন্দের জোয়ার

বয়ে যায় বাড়িতে। হাসিব সকলের খোঁজখবর নেয়। ওর সঙ্গে আর যারা গিয়েছিলো কাঠ কাটতে তারা তো ওকে মধুর গর্তে ফেলে রেখে এসেছিলো। হাসিব ওদের কথাও জিজ্ঞেস করে। ওর মা সবই বললেন। কাঠুরেরা ওঁকে বলেছিলো নেকড়ে হাসিবকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু ওদের যে কি হলো? ওরা রাতারাতি সব বড়লোক বনে গেলো। কেউ কেউ বড় বড় সুন্দর দোকান সাজিয়ে বসেছে। ওরা ক্রমেই ধনী থেকে আরো ধনী হয়ে উঠছে।

হাসিব অনেকক্ষণ কি যেন ভেবে বললো—মা কাল তুমি সকালে বাজারে গিয়ে বলবে যে আমি ফিরে এসেছি। আমার সঙ্গে দেখা করলে খুশী হব।

পরের দিন হাসিবের মা বাজারে গিয়ে সবাইকে ছেলের কথা জানিয়ে দিলেন। সেই কাঠুরেরা পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলো নিজেদের। হাসিবের মাকে বললো, তারা হাসিবের সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশী হবে। ওরা ঠিক করলো হাসিবের প্রত্যাবর্তনে বেশ ঘটা করে সম্বর্ধনা দিতে হবে। তাই হাসিবের মার হাতে মূল্যবান রেশমী বস্ত্র, বুটিদার কিংখাব দিয়ে দিলো ওদের দোকান থেকে। সকলে দোকানের সেনার জিনিসটি দিলো। দোকান বন্ধ করে হাসিবের বাড়ি যাবার আগে সকলে পরামর্শ করে ঠিক করলো, প্রত্যেকের লাভের অংশ থেকে কিছুটা তো দেবেই উপরন্তু বাঁদী আর বাড়ির অংশও দেবে ওকে। এসব ঠিকঠাক করে ওরা হাসিবের বাড়িতে হৈ হৈ করে চলে এলো। হাসিবকে সালাম জানিয়ে হাত দুখানা টেনে চুম্বন করে বললো ঃ

—ভাই হাসিব, আমাদের মাফ করো। তোমার ওপর আমরা ভয়ানক অন্যায় করেছি। ভাই, যা এনেছি সঙ্গে এটুকু তোমাকে নিতেই হবে। এতে তো তোমারও ভাগ আছে। না নিলে বুঝব আমাদের তুমি ক্ষমা করলে না।

মনের মধ্যে ক্ষোভ জমিয়ে রেখে আর কি হবে? তাতে পড়শীদের সঙ্গে শত্রুতা বাড়া ছাড়া লাভ আর কিছু নেই। ওদের উপহার গ্রহণ করে সে বললো ঃ

—হ্যাঁ, যা হবার তো হয়েই গেছে, মাথা খুঁড়লেও তা ফিরবে না জানি।

হৈচৈ করে মহা ফুর্তিতে ওরা চলে গেলো। হাসিবের অবস্থা ফিরে গেলো। একটা বড় দোকান খুললো বাজারে। কিছুদিনের মধ্যে শহরে একটা সুন্দর বাড়ি তৈরী করলো।

একদিন দোকানে যাচ্ছে বাজারের পথ ধরে। বাজারে ঢোকার মুখে একটা হামাম আছে। হামামের পাশ দিয়েই যাচ্ছিল সে। হামামের মালিক সামনে বসে হাওয়া খাচ্ছিল। হাসিবকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে বললো ঃ

—আসলাম্ আলেকুম্।

—ওআলেকুম সালাম।

হাসিব দাঁড়িয়ে পড়লো। হামাম মালিক বললো—আসুন না আমার হামামে। আপনার পদধূলি পড়লে আমার হামাম ধন্য হবে। আমার সৌভাগ্য হলো না যে আপনাকে সেবা করি। গা রগড়াবার নতুন বুরুশ এনেছি, নরম লোম, আপনার ভালোই লাগবে। রগড়াতে রগড়াতে আপনার ঘুম এসে যেতে পারে। লুফ গাছের ফলের রেশমী আঁশে সাবান মাখিয়ে দেবো। ভালো কস্তুরী সাবান এনে রেখেছি।

আল্লার কসম, আপনার লোভনীয় আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছি না। আমি শপথ করেছি কোনদিন হামামে ঢুকব না।

ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প বলা বন্ধ করলো।

পরদিন রাত্রে আবার গল্প শুরু হলো।

এমন উদ্ভট শপথের কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে নাকি? জীবন বিপন্ন হতে পারে হামামে ঢুকলে এই সব আজগুবি কথা হামামের মালিক বিশ্বাস করলো না। তাই বললো ঃ

—এসব শপথটপথ কিছু না। আপনি আমায় এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন বলুন তো? কি অপরাধ করলাম মালিক? আল্লার নামে আমিও শপথ করছি, আমার হামামে যদি আপনাকে ঢোকাতে না পারি তবে আমি আমার তিন তিনটে বিবিকে তালাক দেব, দেব, দেব।

—আল্লার কসম খেয়ে বলছি, আমি যা বলেছি তা একটুও মিথ্যে নয়।

এতো বেশ মুশকিল হলো! হামামের মালিক শপথ করেছে সেটা ও বুঝবে। হাসিবের কাছে হামামে গোছল করা একেবারে অসম্ভব। হাসিব চলে যাচ্ছিল, ওর পাশে ঝাঁপিয়ে পড়লো হামামের মালিক।

—আপনি চলে গেলে আমার শপথ রাখতেই হবে মালিক। ফালতু শপথ রাখতে গিয়ে বিবিদের তালাক দিতে হবে। কথা দিচ্ছি, হামামে গোছল করার জন্য যদি কিছু হয় তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার নিজের। তবু আপনি চলে যাবেন না।

ওদের বাদানুবাদে রাস্তায় বহু লোক জমে যায়। সব শুনে ভীড়ের লোকও হাসিবকে চাপাচাপি করতে থাকে। লোকটা তাকে বিনি পয়সায় গোছল করাতে চায়, গোছল না করলে তার বিবিদের হারাতে হবে। হাসিব কোন কথাই শুনতে চায় না। ও চলে যাবেই। না, মিষ্টি কথায় কাজ হবে না, সবাই মিলে ঠিক করলো দু-এক ঘা লাগাতে হবে। হাসিবকে কয়েক ঘা লাগিয়ে সবাই চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলো হামামে। পরিত্রাহি চিৎকার করেও হাসিবের রেহাই নেই। জোর করে ওর জামা-কাপড় খুলে নিয়ে হড়হড় করে জল ঢালতে থাকে। বিশ তিরিশ গামলা জল ঢেলে বেশ করে গা রগড়ে সাবান মাখিয়ে গোছল করাতে থাকে মহানন্দে। গরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দিলো। মাথায় পরিয়ে দিলো এক বিশাল পাগড়ি। তাতে মনোরম কাজ করা। হামামের মালিককে আর শপথ মানতে হবে না। খুশী মনে এক গেলাস গোলাপ জলের শরবত এনে বলে ঃ

—গোছল আপনাকে ফুর্তি দিক, স্বাস্থ্যবান করুক। নিন, এই শরবতটা খেয়ে ফেলুন। একেবারে তরতাজা বোধ করবেন। আপনি আমাকে বাঁচালেন, বিবি ছাড়া বাঁচা যায়? কি বলেন?

এদিকে হাসিবের অবস্থা শোচনীয়। সময় যত বয়ে যায় বুকের ভিতরটা যেন শুকিয়ে যেতে থাকে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত মেরুদণ্ড বয়ে সোজা নীচে নামতে থাকে। কি করবে আর করবে না কিছুই বুঝতে পারে না বেচারী। কি একটা বলার জন্য এর ঠোঁট দু'খানা নড়ে ওঠে। এমন সময় হঠাৎ রাজার সেপাইতে ভরে যায় হামাম। উন্মুক্ত তরবারি হাতে হামামকে ঘিরে ফেলে সেপাইরা। হাসিবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে যেভাবে ছিলো ঠিক সেইভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো রাজবাড়িতে। গোছলের পর পোশাকও ভালো করে পরতে পারেনি। রাজপ্রাসাদে এনে প্রধান উজিরের সামনে ফেলে দিলো। উজীর হাসিবের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন।

হাসিবকে দেখে উজীর খুব খুশী। আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে ওর সঙ্গে রাজার কাছে যেতে অনুরোধ করলো। নসিবে যা আছে তাই হবে ভেবে হাসিব উজীরের পেছন পেছন চললো। ওরা এসে পড়লো একটা হলঘরে। সারি সারি মান্যগণ্য লোক পদমর্যাদা অনুসারে বসে আছেন। সামন্তরাজা, প্রধান পারিষদ আর খোলা তরবারি নিয়ে জল্লাদরা দাঁড়িয়ে আছে। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুবেগে মাথা উড়িয়ে দেয় এসব জল্লাদ। ঘরের মাঝখানে এক বিশাল সোনার

পালঙ্কে রাজা শুয়ে আছেন। তাঁর মাথা ও মুখ রেশমী কাপড়ে ঢাকা। তিনি বোধহয় ঘুমুচ্ছেন।

রাজার অবস্থা দেখে তো হাসিবের হয়ে গেলো। নাঃ এবার মৃত্যু আর দূরে নেই। শপথ ভাঙ্গার জন্য সতর্ক বাণী এবার ফলবে তাহলে। পালঙ্কের নীচে দড়াম করে আছড়ে পড়ে কেঁদে বলতে থাকে, ও কিছু জানে না, কোন দোষ করেনি। উজীর তাড়াতাড়ি ওকে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় খুব ভদ্রভাবে। তারপর সে বলে ঃ

—আপনি ড্যানিয়ালের পুত্র। আপনি আমাদের রাজা মহাশক্তিধর কারজাদানকে রক্ষা করবেন তার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। রাজার সারা দেহ আর মুখে সাংঘাতিক কুষ্ঠব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর অবস্থা ভালো নয়। আপনি মহান ড্যানিয়ালের পুত্র বলে রাজার এই কালব্যাধি নিরাময় করতে পারবেন। এটা আমরা জানি।

সঙ্গে সঙ্গে সামন্তরাজা, প্রাসাদরক্ষী ও জল্লাদের দল সমস্বরে বলে উঠলো—একমাত্র আপনিই পারেন রাজা কারাজাদানকে রক্ষা করতে।

ভয়ে আর ভাবনায় হাসিব যেন কেমন হয়ে যায়। কাঁপা গলায় চেঁচাতে চেষ্টা করে—আল্লার নামে শপথ করে বলছি আমি মহান কেউ নই, ওরা আমাকে ভুল করে ধরে নিয়ে এসেছে। —উজীরের দিকে ফিরে বললো—আমার বাবার নাম ড্যানিয়েল, এটা ঠিক। কিন্তু আমি একেবারেই মূর্খ। ছেলেবেলায় আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন কিন্তু আমি কিছুই শিখিনি। হেকিমি শেখাবার চেষ্টা করেছিলো, মাসখানেক পরে তাও ছেড়ে দিয়েছি। তালিমদারও ভালো ছিলো না। শেষে আমার মা আমাকে একটা খচ্চর আর কিছু দড়ি কিনে দেন। আমি কাঠুরে হলাম। আমি যা শিখেছি সব বললাম।

কিন্তু উজীর নাছোড়বান্দা, সে বললো—নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করবেন না। দুনিয়ার চারদিক খুঁজলেও আপনার মত ভালো একজন চিকিৎসক পাওয়া যাবে না।

এবার হাসিব হাউমাউ করে ওঠে—উজীর সাহেব, আমি তো রোগ বা তার নিদান সম্পর্কে কিছুই জানি না, আমি কেমন করে রাজাকে সারিয়ে তুলব।

—এখানে মিথ্যা কথা বলে কোন লাভ হবে না। আমরা ভালোভাবে জানি যে রাজাকে সারিয়ে তোলা আপনার হাতের মুঠোয়।

—কি করে? —হাসিব মাথার ওপর দুহাত তুলে দেখায়—এই দেখুন আমার হাত, কি আছে এই হাতে?

উজীর বললো—আপনি নিদান দিতে পারেন কারণ পাতালের রানীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। রানীর কুমারী দুগ্ধ খেলে বা মলমের মত লাগালে যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেলো।

তিনশো বাহাত্তরতম রজনী ঃ

পরের রাতে শাহরাজাদ গল্প শুরু করে।

এবার হাসিব বুঝতে পারে ঐ হামামে ঢোকার জন্যই এসব হচ্ছে। নিজের দোষ অস্বীকার করার জন্য চেঁচিয়ে বলে ঃ

—আমি জীবনে এরকম দুধ দেখিনি, বিশ্বাস করুন। পাতালের রানীর নামও শুনিনি কোনদিন। কে সে তাও জানি না।

উজিরের ঠোঁটে মৃদু হাসি ঝিলিক মারে।

—আপনি যদি না-ই বলেন, তবে আমি বলছি। আপনার কথা যে কত অসার তা আমি এক্ষুণি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আমি জানি আপনি পাতালের রানীর কাছে থেকেছেন। কি করে বুঝলাম? সেই প্রাচীনকাল থেকে যারাই রানীর সঙ্গে থেকেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই পেটের

চামড়া কালো হয়ে গেছে। রানীর হামামে না গেলে কিন্তু চামড়া কালো হয় না। একখানা গ্রন্থ থেকে আমি শিখেছি। আপনাকে যে হামাম থেকে নিয়ে এসেছে আমার গুপ্তচররা ওখানে নজর রাখত। যারা গোছল করতে যেত তাদের চামড়া লক্ষ্য করত। আপনার গোছলের সময় আমার গুপ্তচরেরা আমাকে দৌড়ে এসে খবর দিয়ে যায়। আপনারও পেটের চামড়া কালো হয়ে যায় গোছলের সময়। আমার সঙ্গে আর চালাকি করবেন না।

হাসিব জেদী কণ্ঠে বলে—তাহলেও আমি অমন কোন রানীকে দেখিনি।

এবার উজীর এগিয়ে এসে ওর পরনের তোয়ালেটা এক ঝটকায় খুলে পেটটা বার করে দিলো। মোষের মত রং পেটের। সেটা দেখা গেলো।

এটা হাসিবও জানত না। ওর যেন কেমন একটা ঘোর লাগছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে।

—আমি বলছি আমি ঐ কালো পেট নিয়েই জন্মেছি। আপনার লোকেরা যখন হামামে ঢোকে তখন আমার পেটের ওই রং হয়নি।

উজীর হা-হা করে হেসে উঠলো।

—আমার গুপ্তচরেরা দেখে এসেই আমাকে বলেছে, আমি তা বিশ্বাসও করেছি।

রানীকে হাসিব কথা দিয়েছিলো, রানী কোথায় থাকে প্রাণ গেলেও সে কথা কাউকে বলবে না। তাই বারবার হাসিব শপথ করে বলতে থাকে, ও রানীকে দেখেনি।

উজীর দু'জন জল্লাদকে ইশারা করলো। ওরা ওকে উলঙ্গ করে হাত দুখানি বেঁধে ছাদের আড়ার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে পায়ের পাতায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করতে থাকে। বেচারা যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। ওর মনে হচ্ছিল শপথ ভাঙ্গার জন্য এবার ওকে সত্যিই প্রাণ দিতে হবে। এদিকে প্রহার চলছে তো চলছেই। যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে কেঁদে ফেলে বলে, সব সত্যি কথা ও বলবে।

হাসিবকে নামান হলো। দামী রাজকীয় পোশাক এনে উজীর নিজে পরিয়ে দিলেন। আস্তাবলে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সব চেয়ে ভালো ঘোড়াটা বেছে দিলেন। উজীরও নিজে যুদ্ধের ঘোড়ায় চেপে হাসিবকে নিয়ে চললেন। সঙ্গে চললো একদল সৈন্যবাহিনী প্রহরী হিসাবে। এসে দাঁড়ালো ওরা সেই ভাঙ্গাবাড়ির কাছে। রানী যমলিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এই বাড়িটা থেকেই হাসিব বেরিয়ে এসেছিলো।

উজীর বইপত্র পড়ে যাদুবিদ্যা শিখেছিলো। কি একটা ধূপের মত জিনিস পুড়িয়ে সে মন্তর পড়তে থাকে বাড়িটার দরজায়। হাসিবকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো যাতে রানী হাসিবকেই দেখা দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ভূমিকম্প শুরু হয়। কাছাকাছি যারা ছিলো সবাই ছিটকে পড়ে দূরে। একটা বড় গর্ত দেখা দিলো। গর্তের মুখে রানীর মাথা দেখা গেলো। চারটি সর্পকন্যার কাঁধে গামলায় চেপে বসে আছেন। নিঃশ্বাসে তার আগুন বেরুচ্ছে। যমলিকার মুখ তপ্ত সোনার মত জ্বলজ্বল করছে। রানী হাসিবকে দেখে চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন।

আমার কাছে তুমি এজন্য শপথ নিয়েছিলে?

আল্লার নামে শপথ করে বলতে পারি মহারানী, এতে আমার কোন দোষ নেই। ওই উজীরের সব দোষ। ওই সব করেছে। মারতে মারতে আমাকে প্রায় খুন করে ফেলছিলো!

—আমি সব জানি। সেজন্য তোমাকে কোন শাস্তি দিচ্ছি না। তোমাকে জোর করে ধরে এনেছে, আমাকেও দেখা দিতে জোর করে বাধ্য করেছে। অবশ্য রাজার নিরাময় হওয়া প্রয়োজন। তুমি দুধ নিতে এসেছ আমার কাছে। এই দুধে রাজা ভালো হয়ে যাবেন। আমি তোমাকে দুধ দেব। তুমি আমার কাছে অতিথি হয়ে থেকেছ। সবচেয়ে বড় কথা তুমি অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোতা। এরকম শ্রোতা আর পাইনি। আমি খুব খুশী হয়েছি তোমার ওপর। তোমাকে দুই পাত্র দুধ দেব। আমার আরো কাছে এসো। কানে কানে বলি, কি করে ওটা ব্যবহার করবে।

হাসিব রানীর আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে শোনে—শোনো হাসিব, একটা পাত্রে লাল দাগ দিয়ে দিয়েছি, ওটার দুধে রাজার রোগ সেরে যাবে। আর অন্যটার দুধ উজীরের জন্য দিয়েছি। তোমায় মেরেছে, না? যখন উজীর দেখবে যে রাজা ভালো হয়ে গেছে, তখন আমার দুধ খাইতে চাইবে উজীর যাতে তার কোন অসুখ না হয়। এবার তুমি দ্বিতীয় পাত্রের দুধটা খেতে দেবে। এই কথা বলে রানী পাত্র দুটি হাসিবের হাতে তুলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রানী আর তার বাহনের মাথার ওপর মাটি আবার জুড়ে গেলো। রাজ প্রাসাদে পৌঁছে রানীর কথামত কাজ করলো হাসিব। রাজার কাছে গিয়ে প্রথম পাত্র থেকে দুধ খাইয়ে দিলো তাঁকে। দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার সারা দেহে ঘাম শুরু হলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত চামড়া মামড়ি হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো। জায়গাগুলিতে নতুন নতুন চামড়া গজাতে থাকে। যথারীতি উজীরও সেই দুধ খেতে চাইলো। দেওয়ার অপেক্ষা না করে নিজেই দ্বিতীয় পাত্র তুলে গলায় ঢেলে দিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে নিলো। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে উজীরের সারা দেহ ফুলতে থাকে ধীরে ধীরে। দেখতে দেখতে হাতির মত হয়ে উঠলো দেহটা। তারপর বিকট আওয়াজ করে হঠাৎ ফেটে যায়। প্রভাবে উজীর মারা গেলো।

পুরো সুস্থ হয়ে রাজা সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন শুরু করলেন। প্রথমে তিনি হাসিবকে কাছে ডেকে এনে তাঁর পাশে বসালেন। তাঁর জীবনদাতাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে মৃত উজিরের পদে নিযুক্ত করলেন। বহু হীরে দিয়ে তৈরী রাজসিক পোশাক পরিয়ে হাসিবকে যথাযোগ্য সম্মান দেখালেন। রাজ্যের সর্বত্র এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করালেন।

রাজা আদেশ দিলেন ঃ

—আমাকে যারা সম্মান দেখাবে তারা অবশ্যই হাসিবকেও সম্মান দেখাবে।

এ সময় ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে গেলো।

তিনশো তিয়াত্তরতম রজনী ঃ

হাসিব লেখাপড়া শিখে বেহেস্তে যাবার আগে তার বাবার লেখা তার মার কাছে রাখা একটুকরো কাগজে এটা দেখতে পেলো।

"সব শিক্ষাই অসার, কারণ সময় হলে আল্লাই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে সব শিখিয়ে দেবেন।"

শাহরাজাদ বললো ঃ

জাঁহাপনা এই হলো ড্যানিয়েলের পুত্র হাসিব ও পাতালের রানী যমলিকার গল্প।

—আল্লা আরও বেশী জানেন।

গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহরিয়ার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ

—আমার আরো বেশী ক্লান্তি লাগছে। মন অবসন্ন হয়ে পড়ছে যে শাহরাজাদ সাবধান! আমার যদি এরকম অবস্থা চলতে থাকে তাহলে তো বুঝতেই পারছ কাল সকালে তোমার মুণ্ডু আর ধড় এক জায়গায় থাকবে না।

দুনিয়াজাদের বুক কেঁপে ওঠে। ভয়ে সে কুঁকড়ে যায়। কিন্তু শাহরাজাদের মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্ন নাই। সে নির্বিকারভাবে বলে, যাইহোক, বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেবার জন্য আমি দু-একটা চুটকী গল্প বলছি, শুনুন জাঁহাপনা।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

শুনুন জাঁহাপনা, একদিন খলিফা হারুন অল-রসিদ তাঁর উজির অল বারমাকী, প্রিয়পাত্র গাইয়ে ওস্তাদ আবু ইশাক এবং বয়স্য কবি নবাসকে সঙ্গে নিয়ে বাগদাদের পথে-পথে ঘুরছিলেন। চলতে চলতে এক সময় তারা এসে পড়লেন শহরের এক প্রান্তে। এইখানে

বসরাহ থেকে রাস্তা এসে মিশেছে বাগদাদে। সুলতান দেখলেন, একটি বৃদ্ধলোক গাধার পিঠে চেপে শহরের দিকে আসছে। হারুন অল-রসিদ জাফরকে বললেন, জাফর, লোকটাকে জিজ্ঞেস করতো—কোথায় সে চলেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে জাফর ভেবে পেলো না, খলিফার কী উদ্দেশ্যে। কেনই বা তাঁর এই কৌতূহল। যাই হোক, সে বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে ইশারায় তাকে থামতে বললো। বৃদ্ধ লাগামটা ঢিলে করে গাধাটাকে দাঁড় করালো। জাফর জিজ্ঞেস করলো হ্যাঁ গো, শেখ সাহেব, কোথায় চলেছো? কোথা থেকেই বা আসছো?

বৃদ্ধ জবাব দেয়, বসরাহ থেকে আসছি। বাগদাদেই যাবো।

জাফর বলে, এই লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এলেই বা কেন?

—খোদা মেহেরবান, শুনেছি, এখানে এই বাগদাদ শহরে অনেক নামকরা ধন্বন্তরী হেকিম আছেন। আমি তারই সন্ধানে এসেছি। চোখের ব্যামোয় বহুৎ কষ্ট পাচ্ছি। যদি কেউ ভালো সুর্মা বানিয়ে দিতে পারেন, এই আশায় এখানে আসছি।

জাফর বললো, সারা না সারা খোদাতালার হাত; আমি একটা কথা বলবো শেখ সাহেব, এমন ধন্বন্তরী দাওয়াই আমি বানিয়ে দিতে পারি যা লাগালে এক রাতের মধ্যে তোমার চোখের সব অসুখ সেরে যাবে। এতে তোমার পয়সাও বাঁচবে ঢের।

বৃদ্ধ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। স্বগতভাবে বলে, একমাত্র আল্লাহই এর ইনাম দিতে পারে।

কিন্তু কথাটা শুনতে পায় জাফর। খলিফার কাছে সরে গিয়ে ইশারায় জানায়। তারপর বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে এসে বলে, দেখ চাচা তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে, তাই সেধে এসে তোমার উপকার করতে চাইছি। তাহলে আমার দাওয়াই বানাবার মাল-মশলা তোমাকে বাৎলে দিই? ভালো করে মন দিয়ে শোনো ঃ তিন ছটাক নাকের প্রশ্বাস, তিন ছটাক সূর্যের আলো, তিন ছটাক চাঁদের আলো, আর তিন ছটাক চিরাগের আলো নেবে। একটা তলা খোলা হামানদিস্তায় ভালো করে মেশাবে সবগুলো। তারপর খোলা হাওয়ায় রেখে দেবে সেগুলো। এই ভাবে তিন মাস হাওয়া খাওয়াবে। তার পর আরও তিনমাস ধরে সেই মেশানো মশলাগুলো খুব আচ্ছা করে ডলাইমলাই করবে। তারপর একটা পিরিচে ঢেলে নেবে। পিরিচ সুদ্ধ মশলাগুলো আরও তিন মাস রোদে শুকোতে দেবে। এরপর তোমার দাওয়াই তৈরি হয়ে যাবে। একটা রাতে এই সূর্মা তিনশোবার লাগাবে তোমার চোখে। সন্ধ্যা থেকে সুবা অবধি। যদি আল্লাহ সহায় থাকেন, তবে দেখবে, এক রাতেই তোমার চোখের সব ব্যামো সেরে গেছে।

বৃদ্ধ তো কৃতজ্ঞতায় গদগদ। গাধার পিঠে বসেই মাথা নুইয়ে জাফরকে সালাম ঠুকে বললো, আপনি সেরা হেকিম। আপনার ঐ দাওয়াই-এর দাম কী দিয়ে শোধ করবো? যাই হোক, আপনি আর দেরি করবেন না, কষ্ট করে মাল-মশলাগুলো এখনি জোগাড় করে আমার দাওয়াই বানিয়ে দিন। একটু তাড়াতাড়ি করুন, নাহলে ওরা হয়তো উধাও হয়ে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি, দেশে ফিরে গিয়ে আপনার জন্যে একটা বহুৎ মজাদার বাঁদী পাঠিয়ে দেব। মেয়েটার লাল টুকটুকে খুদে ডুমুরের মতো পাছাখানা দেখে আপনি ভিরমি খেয়ে যাবেন। মেয়ে-মানুষটা এমন সুন্দর করে কাঁদতে পারে, দেখবেন, আপনার ঐ পাংশুটে মুখখানা থুথুয় লেপে দেবে, আর খড়খড়ে দাড়িগুলো জবজবে করে ভিজিয়ে ছাড়বে।

এই বলে বৃদ্ধ তার গাধার লাগাম ঝাঁকিয়ে তড়বড় করে এগিয়ে চলে গেলো।

খলিফা তো হেসে খুন। জাফর বোকা বোবার মতো পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটাও কথা বলতে পারলো না। লজ্জায় সে তখন আড়ষ্ট।

কবি আবু নবাস শুধু বিজ্ঞের মতে এগিয়ে এসে জাফরকে বাহবা দিতে লাগলো। যেন পুত্রের কৃতকর্মের জন্য এক পিতার বুক দশ হাত ফুলে উঠেছে।

এই ছোট্ট সুন্দর কাহিনীটা শুনে সুলতান শাহরিয়ারের মুখ হাসিতে ঝলমল করে ওঠে। শাহরাজাদকে বললো, এই রকম আর একটা মজাদার কিস্‌সা শোনাও, শাহরাজাদ।

দুনিয়াজাদ বলে, কী সুন্দর, কী মিষ্টি তোমার বলার কায়দা দিদি!

কিছুক্ষণ বিরতির পর শাহরাজাদ আবার এক কাহিনী বলতে শুরু করে।

ইয়েমানের সুবাদার উজির বদর অল-দিনের এক পরম রূপবান কনিষ্ঠভ্রাতা ছিলো। তার অতুলনীয় রূপের জেল্লায় মুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখতো সবাই। বদর অল-দিনের মনে ভয় হতো, না জানি কোন খারাপ সংসর্গে মিশে ভাই তার বয়ে যাবে। তাই সে সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতো। তার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা মিশতে দিত না। এই আশঙ্কায় সে তাকে মাদ্রাসায় পাঠাতো না। এক প্রবীণ প্রাজ্ঞ সদাশয় শিক্ষককে তার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলো। এই বৃদ্ধ মৌলভী প্রতিদিন তার বাড়িতে এসে তাকে পড়িয়ে যেত। বাড়ির একটি নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করে বহুক্ষণ ধরে সে তাকে পড়াশুনা করাতো। সে ঘরে কারুরই প্রবেশ অধিকার ছিলো না, এমনকি স্বয়ং উজির সাহেবও যেত না।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ মৌলভী খুব সুরৎ কিশোরের প্রেমে মশগুল হয়ে পড়লো। অচিরেই মৌলভীর বুড়ো হাড়ে বহুকালের সুপ্ত বসন্ত চেগে উঠলো।

একদিন সে আর মনের আকুলি-বিকুলি চেপে না রাখতে পেরে কিশোরের কাছে তার মহব্বৎ পেশ করে বসলো, তোমাকে দেখা ইস্তক আমার বুকের মধ্যে আঁকু পাঁকু করছে। তোমাকে ছাড়া এ জিন্দগী আমার বরবাদ হয়ে যাবে—আমি বাঁচতে পারবো না।

বদর অল-দিনের ভাই বৃদ্ধ মৌলভীর এই আকুল আবেদনে বিচলিত হয়ে পড়ে। বলে, কিন্তু আমার বড়ভাই সব সময় আমাকে চোখে-চোখে রাখে। তার নজর এড়িয়ে আপনাকে আমি কি করে খুশি করতে পারি?

বৃদ্ধ বলে, উপায় আমি ভেবেছি। রাত্রে যখন তোমার বড়ভাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন তুমি ওপাশের ছাদে গিয়ে দাঁড়াবে। আমি দেওয়ালের ওপাশে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। তোমার সাড়া পেলেই আমি দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে আসবো। তারপর তোমাকে নিয়ে দেওয়াল টপকে ওপাশে চলে যাবো। কেউ জানতে পারবে না।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সুলতান শাহরিয়ার মনে মনে ভাবে, শাহরাজাদকে এখন মারা চলবে না। ছেলেটাকে নিয়ে বৃদ্ধ মৌলভী কী কাণ্ড করে একবার জানতে হবে।

তিনশো পঁচাত্তরতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

শাহরাজাদ বলতে থাকে।

ছেলেটি বললো, ঠিক আছে তাই হবে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সে ঘুমাবার ভান করে শুতে চলে গেলো। কিন্তু বিছানায় ঘাপটি মেরে পড়ে রইলো। কিছু পরে বড় ভাই বদর অল-দিন দিনের কাজকর্ম সেরে নিজের ঘরে চলে গেলে সে চুপিচুপি ছাদের কিনারে এসে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধ মৌলভী আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলো সেখানে। শয়তানটা তাকে দেওয়ালের ওপারে নিয়ে চলে গেলো। তারপর সোজা নিয়ে গিয়ে তুললো তার নিজের শোবার ঘরে।

নানা রকম সুন্দর সুন্দর ফলমূল এবং দামী দামী সরাবে সাজানো ঘর। স্ফূর্তি করার সব সাজ-সরঞ্জাম সেখানে হাজির। ঘরের মেজেয় ফুটফুটে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। মৌলভী একখানা সাদা মাদুর বিছিয়ে ছেলেটিকে পাশে নিয়ে বসলো।

তারপর চলতে থাকলো তাদের পানাহার। একের পর এক মদের পেয়ালা নিঃশেষ করে ওরা। চলতে থাকে লঘু সুরের প্যালা মারা গান। মৃদুমন্দ হাওয়া, মধুক্ষরা জ্যোৎস্নালোক, সরাবের মদিরতা আর হাল্কা সুরের সঙ্গীত এক অপূর্ব মোহময় স্বপ্নলোকের ইন্দ্রজাল রচনা করছিলো তখন।

এইভাবে মধুর আবেশের মধ্যে অনেকক্ষণ কেটে গেছে। আরও কত সময় কাটতো কে জানে। কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটে গেলো।

বদর অল দিন নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলো। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, ভাই-এর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু তার শোবার ঘরে এসে অবাক হলো, বিছানায় সে নাই। সারা বাড়ি আঁতিপাতি করে খোঁজা হলো। কিন্তু না, কোথাও তাকে পাওয়া গেলো না। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় সে ছাদের সেই প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বদর অল দিন দেখতে পেলো, প্রাচীরের ওপাশের বাড়ির একটি ঘরে বসে তার ভাই মৌলভীর সঙ্গে মদের পেয়ালা হাতে মশগুল!

হঠাৎ মৌলভীর নজর পড়ে ছাদের দিকে। স্বয়ং উজির বদর অল দিন ছাদের প্রান্তে দণ্ডায়মান। মৌলভী প্রমাদ গুণলো। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে লঘু গানের বয়ান বদলে এক উচ্চ মার্গের সঙ্গীত শুরু করে দিলো।

বদর অল দিন সব ভুলে তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে সেই সুমধুর মার্গ-সঙ্গীত। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তারিফ করতে থাকে, বহুৎখুব—তোফা।

এই রাতে মৌলভীর ঘরে ভাইকে মদের পেয়ালা হাতে দেখেও তার আর খারাপ লাগে না। বরং মনে হয়, তার ভাইকে কালোয়াতী গানের তালিম দিতে নিয়ে গিয়ে মৌলভীসাহেব ভালোই করেছে। নিশ্চিন্ত মনে সে নিজের ঘরে ফিরে যায়।

এর পর মৌলভীটা ছেলেটিকে নিয়ে সুখের সমুদ্রে সুধা পান করতে থাকে।

শাহরাজাদ বলে ঃ

—এবারে এক অদ্ভুত বটুয়ার কাহিনী বলবো।

কোন এক রাতে খলিফা হারুন অল রসিদের চোখে ঘুম আসছিলো না। ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি পায়চারী করে কাটাচ্ছিলেন তিনি। এক সময় উজির জাফরকে ডেকে পাঠালেন।

জাফর ছুটে আসতে খলিফা বললেন, আজ রাতে বোধহয় আর চোখে ঘুম আসবে না, জাফর। তাই তোমাকে ডেকে পাঠালাম। বাকীটা রাত যাতে ভালোভাবে কাটে তার ব্যবস্থা কর।

জাফর বলে, ধর্মাবতার আলী নামে আমার এক দোস্ত আছে—সে পারসী শেখ। এক সময় অনেক মজাদার কাহিনী সে আমাকে শুনিয়েছিলো।

হারুন অল রসিদ বললেন ডাকো তাকে এক্ষুণি। আমি শুনবো তার কিস্‌সা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সুলতান সমীপে হাজির করা হলো। জাফর তাকে পাশে বসিয়ে বললো, শোনো আলী, খলিফার চোখে আজ ঘুম আসছে না। রাতটা যাতে ভালোভাবে কাটে সে জন্য তোমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তোমার গল্পের জাদুতে সারাটা রাত খলিফাকে ভুলিয়ে রাখতে হবে।

খলিফা বললেন, শুনলাম; তোমার গল্পের এমন গুণ শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসে। তাই কী? তা হলে এমন একটা গল্প ফাঁদো, যা শুনতে শুনতে আমি ঘুমে গলে যেতে পারি।

আলী সবিনয়ে মাথা নুইয়ে বলে, জো হাকুম জাঁহাপনা। এবারে আজ্ঞা করুন কী ধরনের কাহিনী আপনি শুনতে ইচ্ছা করেন। বানানো কিস্‌সা—না, আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা?

সুলতান বললেন, তুমি নিজে যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত—সেইরকম একটা শোনাও।

আলী বলতে শুরু করে ঃ

একদিন আমি দোকান খুলে বসে আছি, এক সময় একটা কালো নিগ্রো এলো আমার দোকানে। দোকানে সাজানো নানারকম জিনিসপত্র দেখতে থাকলো। এটা ওটা নিয়ে দরাদরি করতে লাগলো। তারপর, আমি লক্ষ্য করলাম এক সময় টুক করে একটা বটুয়া তুলে নিলো সে। ও ভাবলো, আমার নজরে অসেনি। তারপর অতি সহজভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে হন হন করে চলতে থাকলো। এমন একটা ভাব, যেন কিছুই হয়নি। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে তার কামিজের খুট চেপে ধরলাম, এ্যাই—আমার বটুয়া দাও।

লোকটা রাগে ফুঁসে উঠলো, এটা আমার বটুয়া। এর মধ্যে আমার সামানপত্র আছে।

আমি ঐ ডাহা মিথ্যুকটার কথা শুনে চিৎকার করে উঠলাম। পথচারীদের ডেকে জড়ো করলাম। শোনাও মুসলমান ভাইসব, এই বিধর্মী লোকটা আমার দোকান থেকে এই বটুয়াটা চুরি করে পালাচ্ছে।

আমার চেঁচামেচিতে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেলো। সমব্যবসায়ীরা পরামর্শ দিলো, আর দেরি করো না। লোকটাকে এখুনি কাজীর কাছে নিয়ে যাও।

তাদের সাহায্যে নিগ্রোটাকে টানতে টানতে আমি কাজীর কাছে নিয়ে গেলাম। কাজীর প্রথম প্রশ্ন ঃ কে বাদী, কে আসামী?

আমি বলতে যাবো, তার আগেই নিগ্রোটা কাজীকে সালাম ঠুকে বলতে লাগলো, আল্লাহর দোয়ায় আপনি ন্যায়বান ধর্মাবতার। আপনার কাছে আমার নিবেদন, এই বটুয়া আমার সম্পত্তি। এর মধ্যে যা কিছু আছে তাও আমার জিনিস। আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো এটা। আজ ওর দোকান থেকে উদ্ধার করেছি আমি।

কাজী প্রশ্ন করে ঃ কবে হারিয়েছিলো?

গতকাল। এর চিন্তায় কাল সারাটা রাত আমি ঘুমাতে পারিনি, ধর্মাবতার।

কাজী বললো, ঠিক আছে। বটুয়াটা আমার সামনে রাখ। এর মধ্যে কী কী জিনিসপত্র আছে তার একটা ফর্দ বানাও।

নিগ্রোটা বলতে থাকলো ঃ এর মধ্যে আমার দুখানা স্ফটিকের কাজলকৌটো আছে। এ ছাড়া দুখান রূপোর কাজল পরানো কাঁটা, একখানা রুমাল, দুটো বাহারী হাতল লাগানো সরবতের গেলাস, দুটো চিরাগবাতি, দুখানা বড় চামচ, দুখানা কুর্শির গদি। খেলার মেজে পাতার জন্য দুখানা গালিচা, দুটো জলের বোতল, দুখানা মুখ ধোবার গামলা, একখানা রেকাবী, একটা রসুইপাত্র, একটা মাটির পানি রাখার কুঁজো, একখানা রসুইখানার সিক, একখানা বড় কুরুশ কাঁটা, দুখানা মদের থলে, একটা অন্তঃসত্ত্বা বেড়াল, দুটো মাদীকুত্তা, একটা চালের হাঁড়ি, দুটো গাধা, দুই প্রস্ত মেয়েদের শোবার ঘরের সামানপত্র, একখানা শণপাটের পোশাক, দুটো মেয়েদের ঢিলেঢালা কামিজ, একটা গরু, দুটো বাছুর, দুটো দ্রুতগামী আরবী উট, দুটো ভেড়া, একটা বড় উট, দুটো বাচ্চা উট, একটা মোষ, দুটো ষাঁড়, একটা সিংহী, দুটো সিংহ, একটা মাদী ভালুক, দুটো খেঁকশিয়াল, একখানা গদীআঁটা আরামকেদারা, দুখানা বিছানা, একখানা বিরাট

প্রাসাদ—তার মধ্যে দুখানা ইয়া বড় বড় মজলিশি দরবার কক্ষ, দুখানা সবুজ তাঁবু, দুখানা চাঁদোয়া, দুই দরজাওয়ালা একটা রসুইখানা এবং এক দল কুর্দ নিগ্রো। এ সবই আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এইগুলো আছে ঐ বটুয়ায়—আমি হলফ করে বলছি, হুজুর, বটুয়াটা আমার।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো ছিয়াত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

কাজী আমার দিকে ফিরে বললো, এখন তোমার কী বক্তব্য আছে, বলো।

আমি আর কী বলবো, নিগ্রোটার সেই আজগুবী কথাবার্তা শুনে আমার তো আক্কেল গুড়ুম। যাই হোক, একটুক্ষণের মধ্যে নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে আমি কাজীকে বললাম আল্লাহ আপনার আরও খ্যাতি, মান বাড়াবেন হুজুর। আমার ঝোলাটায় একটা সভামঞ্চের ভাঙ্গচুর আছে। আর আছে একটা গোটা ইমারৎ কিন্তু কোনও রসুইখানা নাই। আছে একটা পেল্লাই বড় কুকুরশালা, একটা ছেলেদের মাদ্রাসা। একদল আমুদে দাবাড়ে, একটা ডাকাতের আস্তানা, একদল ফৌজ আর তাদের সেনাপতি, গোটা বসরাহ আর বাগদাদ শহর, আদের পুত্র আমির সাদ্দাদের প্রাচীন প্রাসাদ, একটা কামারশালা, একখানা মাছ ধরা জাল, একখানা মেষপালকের লাঠি, পাঁচটি খুবসুরৎ ছোকরা, বারোটি কুমারী কন্যা এবং মরুযাত্রীদের এক হাজার সর্দার। এই সবই আছে ঐ ঝোলায়। আমি দাবি করছি—এই আমার প্রমাণ, ঝোলাটা আমার।

আমার জবাব শোনামাত্র নিগ্রোটা কান্নায় ফেটে পড়লো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বলতে লাগলো, ধর্মাবতার আমার বটুয়াটা সকলের কাছে সুপরিচিত। যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে বটুয়াটা আমার সম্পত্তি। আমি আপনার কাছে আগে যে ফর্দ পেশ করেছি তা ছাড়াও আরও কতকগুলো জিনিস ওই বটুয়ায় আছে। সেগুলো শুনুন ঃ দুটো বাজেয়াপ্ত শহর, দশটা গম্বুজ, দুটো রসায়ন কারখানা, চারজন দাবাড়ে, একটা মাদী ঘোড়া, দুটো ঘোড়ার বাচ্চা, একটা পাল দেওয়া ঘোড়া, দুটো টাট্টু ঘোড়া, দুখানা তলোয়ার, দুটো খরগোস, দুটো বকাটে ছোকরা, দুজন মেয়েমানুষের দালাল, এক অন্ধ, দুজন জ্যোতিষী, একজন খোঁড়া মানুষ, দুজন অসাড়লোক, একজন জাহাজের কাপ্তেন, এক জাহাজ ভর্তি নাবিক, এক পাদরী, একজন পাঠান ধর্মযাজক, একজন সমাজপতি, দুজন সাধু এবং একজন কাজী। এছাড়া আরও আছে দুজন সাক্ষী। তারাই বলবে বটুয়াটা আমার।

এর পর কাজী আবার আমার দিকে ফিরে বললো, এর জবাবে তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলতে পার।

আলী বলতে থাকে ঃ তখন আমার মাথা গরম হয়ে গেছে, জাঁহাপনা। কিন্তু নিজেকে সহজ এবং সংযত করে কাজীকে বললাম আল্লাহ আমাদের কাজীকে আরও উদার, নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি দিন। আমি এর আগে যে সব সামানপত্রের কথা আপনাকে বলেছি তা ছাড়াও আরও কতকগুলো জিনিস আমার ঐ ঝোলাটায় আছে, ধর্মাবতার। সেগুলো বলছি ঃ মাথা ধরার দাওয়াই, একটা সেনাবাহিনীর সাজ-পোশাক, বর্ম এবং অস্ত্রাগার, এক হাজার লড়াকু ভেড়া, একটা হরিণ চরানোর খোয়াড়, মেয়ে পাগল একদল মানুষ, কেতাদুরস্ত কতকগুলো ছোকরা, ফুল ফলের গাছে ভরা বাগিচা, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, আপেল, ডুমুর জলের বোতল, পেয়ালা, সদ্য শাদী হওয়া যুগল দম্পতী, বারোটা পুর্তিগন্ধময় বাতকর্ম, অনেকগুলো কাপুরুষ, একটা শস্যশ্যামল মাঠ ভর্তি মানুষ, নিশান এবং পতাকা, হামাম নিসৃত সুগন্ধী হাওয়া, কুড়িজন গায়িকা, চারজন গ্রীক রমনী, পঞ্চাশজন তুরস্ক কন্যা, সত্তরজন পারসী জেনানা, নব্বইজন জর্জিয়া নারী, ইরাকের বেহেস্ত প্রদেশ, দুটো আস্তাবল, একটি মসজিদ, অনেক হামাম, একশো সওদাগর, একটা হাতুড়ী, একটা পেরেক, একটা বাঁশীবাদক নিগ্রো, এক হাজার দিনার, নানা জিনিসপত্রে ঠাসা কুড়িটা প্যাটরা, কুড়িজন নাচনেওয়ালী, পঞ্চশটা ভাঁড়ার ঘর, গোটা কুফা শহরটা, এছাড়া গাজা, দামিয়েট্টা এবং

শাবন শহর, সুলেমানের খুসরাম আমুশিরবান প্রাসাদ কক্ষ এবং ইসপাহানের মাঝখানের পুরো ভূখণ্ড। এছাড়া, আল্লাহ কাজীকে দীর্ঘায়ু করুন, একখানা শবাধার শবাচ্ছাদন এবং কাজী সাহেব যদি আমার অধিকার স্বীকার না করেন সেই জন্যে দাড়ি কামানোর একখানা ক্ষুরও আছে ঐ ঝোলায়। আবারও বলছি, ঝোলাটা আমার ঝোলা।

এই সব কথা শোনার পর কাজী আমাদের দু'জনের দিকে তাকালো। তারপর বলতে থাকলো, খোদা হাফেজ, হয় তোমরা দু'জনেই পাজী বদমাইস আইনকে নিয়ে রঙ্গ তামাশা করতে এসেছ না হলে এই বটুয়াটা কোনও অলৌকিক বস্তু।

এর পর কাজী বটুয়াটার মুখ খুলে ফেললো। তার মধ্যে কমলা রঙের একটা বড়ি আর কতকগুলো জলপাই এর আঁটি ছিলো মাত্র।

কাজী ব্যাচারা ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গেছে। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে বললাম, না না, এ ঝোলা আমার না, এ নিশ্চয়ই ঐ নিগ্রোটার। ওকেই দিয়ে দিন।

এই বলে আমি সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

এই কাহিনী শুনে খলিফা হারুন অল রসিদ হেসে গড়িয়ে পড়লেন। খুশি হয়ে আলীকে নানা ইনাম উপহার দিয়ে বিদায় করলেন।

এরপর খলিফা শোয়ামাত্র নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে থাকলেন।

শাহরাজাদ বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, আপনি ভাববেন না, এর চেয়ে মজাদার কিসসা আপনাকে আর শোনাবো না। হারুন অল রসিদের আর একটা কাহিনী শুনুন।

শাহরিয়ার বললে, আমি তো শোনার জন্যেই ঘুম কামাই করে বসে আছি শাহরাজাদ।

এবার শুনুন হারুন অল রসিদের মহব্বতের কাহিনী ঃ

একদিন রাত্রে খলিফা হারুন অল রসিদ দুই সুন্দরীকে দু-পাশে নিয়ে মধুযামিনী যাপন করছিলেন। এদের একজন মদিনা এবং অপরজন কুফার মেয়ে। খলিফা দুজনকেই সমান ভালোবাসেন। তিনি কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলেন না সেরাত্রে তিনি কাকে নিয়ে সুখ সম্ভোগ করবেন। কারণ একজনকে খুশি করতে গেলে আর একজন ব্যাজার হবে।

তাই তিনি ঠিক করলেন যে মেয়ে তাকে খুশি করতে পারবে তাকেই তিনি দেবেন সে রাতের পুরস্কার। সঙ্গে সঙ্গে মদিনার মেয়ে খলিফার হাত টিপতে লাগলো। আর কুফা কন্যা টিপতে থাকলো তাঁর পা। সুযোগটা তারই মিললো বেশি। পায়ের পেশী টিপতে টিপতে ক্রমশ তার হাত উপরের দিকে চালান হতে থাকে। এইভাবে কখনও বা তার হাত নিষিদ্ধ প্রদেশে ঢুকে পড়ে।

এই কায়দায় এক সময় তার জিৎ হয়। খলিফার ধমণীতে আগুন ধরে। কুফা কন্যার হাতের মুঠোয় বেহেস্ত ধরা পড়ে।

এই না দেখে মদিনার মেয়ে আঁৎকে ওঠে।

—তুমি তো বাজী মাৎ করে দিলে!

এই বলে সে কুফার মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে নিচে নেমে অসে। কুফা কন্যা আহত হয়ে বলে, এ তোমার ভারি অন্যায়। আমার হকের ধন তুমি কেড়ে নেবে কেন?

এবার সে মদিনা-মেয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে। মদিনা কন্যা তাকে আবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে, এ আমার জিনিস, আমি ছাড়বো না। তুমি শুরু করতে পার, কিন্তু আমি এর দফা রফা করবো। সুতরাং এ জিনিস আমার।

খলিফা এতক্ষণ দু'জনের বাকবিতণ্ডা শুনছিলেন। এবার তিনি মনে মনে ঠিক করলেন না, দুজনকেই খুশি করতে হবে।

শাহরাজাদ বললো, কিন্তু জাঁহাপনা, এই ছোট ছোট গল্পগুলোর চেয়ে আরও একটা ভালো গল্প আপনাকে শোনাচ্ছি।

দুই নারীর ঝগড়া বেঁধেছে—ভালোবাসার জন্য যুবক শ্রেষ্ঠ না—বয়স্ক মানুষ শ্রেষ্ঠ।

এই গল্পটা বলেছিলো আবু অল আইনা ঃ

এক সন্ধ্যায় আমি ছাদের ওপরে উঠেছিলাম। উদ্দেশ্য—একটু মুক্ত বায়ু সেবন। পাশের বাড়ির ছাদ থেকে দুটি নারী কণ্ঠের বিতর্ক কানে আসছিলো। ওরা দু'জনে আমার দুই প্রতিবেশীর বিবি। ওদের প্রত্যেকেরই একজন করে ভালোবাসার পাত্র আছে—ওদের কথোপকথন থেকে বুঝতে পারলাম। দু'জনেরই স্বামী বয়সে বৃদ্ধ। একজনের ভালোবাসা একটি উঠতি বয়সের যুবক। আর একজনের ভালোবাসার মানুষ পাকা বয়সের এক শক্তসমর্থ পুরুষ। ওরা এমন তর্কে মশগুল যে, অন্য কেউ তাদের কথা শুনে ফেলতে পারে সে দিকে আদৌ খেয়াল ছিলো না।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো সাতাত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ওদের একজন বলছিলো ঃ আচ্ছা ভাই, তোমার ভালোবাসার ঐ ইয়া লম্বা লম্বা দাড়ি তুমি কি করে সহ্য কর? অমন জাঁদরেল বদখদ চেহারার মানুষ দেখলে কি দিল্-এ মহব্বৎ জাগে কারো? উফ্, সে যখন তোমায় চুমু খায় তোমার গাল বুক ঠোঁট চিরে যায় না? ওর গোঁফের চুল তোমার ঠোটের ফাঁক দিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকে যায় না? ঐরকম অত্যাচার তুমি কী করে সহ্য কর ভাই? আমার কথা শোনো, তোমার ভালোবাসার পাত্রটি পালটাও। আমার মতো একটা খুব সুরৎ নওজোয়ান ছোকরা জোগাড় কর। তার আপেলের মতো টুকটুকে রাঙ্গা গালে চুমু খেয়ে কত মজা পাবে। তার মাখনের মতো নরম ঠোটের মাংস তুমি মুখে পুরে নিয়ে প্রাণ ভরে চুষতে পারবে। আরও কত নতুন উপাদেয় বস্তুর সন্ধান পাবে তার মধ্যে। তা কি তোমাকে ঐ রুক্ষ দাড়িওলা দিতে পারবে?

অন্যজন বলে, তুমি একটা আস্ত আহম্মক ভাই। তোমার কোনও বুদ্ধিও নাই, রুচিও নাই। তুমি কি জান না, একটা গাছ তখনই মনোহর মনে হয় যখন সে পাতায় ছেয়ে থাকে। শসার খোসা যখন জড় হয় তখনই খেতে বড় স্বাদের হয়। দাড়িবিহীন এবং টাক মাথার মানুষের চেয়ে হতকুৎসিৎ আর দুনিয়াতে কিছু নাই। দাড়ি গোঁফ পুরুষের শোভা আর নারীর শোভা আজানুলম্বিত কেশ। আল্লাই এই ব্যবস্থা করেছেন। এর পরে কী তুমি আমাকে দাড়ি গোঁফ গজায়নি—তেমন একটা খোকাকে আমার নাগর করতে বলবে? তুমি কী বলতে চাও একটা ছোকরার বুকের তলায় শুতে না শুতেই আমার কামনার জলাঞ্জলি হয়ে যাক। আরে, ওরা তো ওঠে আর নামে। সঙ্গে সঙ্গেই নেতিয়ে পড়ে যায়। নিজেকে ঠকিও না বোন। আমি আমার ভালোবাসাকে ছাড়তে পারবো না। তার মতো দম ছেলেছোকরাদের হতে পারে না। একবার উঠলে আর সে নামতে চায় না। তার কায়দাকানুনই আলাদা। তার আলিঙ্গন, তার বন্ধন, তার চুম্বন, তার রিরংসা তার শৃঙ্গার তার রাগমোচন এক অপূর্ব আলৌকিক বস্তু।

এই সব শুনে ছোকরাসাহেবের প্রেমিকার চোখ কপালে ওঠে।

—তাই নাকি! সত্যি বলছি ভাই, আজ তুমি আমাকে নতুন জ্ঞান দিলে।

একটুক্ষণ পরে শাহরাজাদ আরএকটা গল্প বলতে শুরু করে ঃ শসার শাহজাদা।

একদিন আমির মুইন ইবন জাইদ শিকারে বেরিয়েছিলো। সে দেখতে পেলো একজন আরব গাধার পিঠে চেপে মরুপ্রান্তর পার হয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই সে সালাম জানিয়ে বললো, কোথায় চলেছেন আরব ভায়া? আপনার পিছনে ঐ বস্তুটায় জড়ানো বস্তুটাই বা কী?

আমি আমির মুইনের কাছে যাচ্ছি। আমার জমিতে শসা ধরেছে। তারই কিছুটা তাকে দিতে নিয়ে যাচ্ছি। আমার ক্ষেতের প্রথম ফসল তাকে নিবেদন করে তবে আমি খাবো। এই গোটা সলতানিয়তে তিনিই সবচেয়ে সদাশয় ব্যক্তি। আমার বিশ্বাস তিনি আমাকে উচিৎ ইনাম দেবেন।

বলা বাহুল্য ইতিপূর্বে সে কখনও আমির সাহেবকে স্বচক্ষে দেখেনি।

আমির জিজ্ঞেস করে, কত দাম আশা করছেন?

—তা কমসে কম এক হাজার সোনার দিনার—

—কিন্তু আমির যদি বলেন, দামটা বড্ডো বেশি হচ্ছে—?

—তা হলে আমি বলবো, অন্ততঃ পাঁচশো দিন।

—তবুও তিনি যদি মনে করেন, দামটা চড়া-ই চাইছেন?

—বেশ তবে তিনশোই দিন।

—তাও যদি তার কাছে বেশি মনে হয়?

—একশো—

—যদি এই একশো দিনারও তিনি ন্যায্য মনে না করেন?

—পঞ্চাশ—

—এর পরেও যদি তিনি বলেন, না, এ দামও বেশি হচ্ছে?

—তিরিশ—

—তাও যদি তাঁর মনমতো না হয়?

—তাও যদি মনমতো না হয়? তা হলে আমার গাধাটাকে তাঁর হারেমের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো।

আরব শেখের কথা শুনে মুইন হো হো করে হেসে ওঠে। দিল খোলা হাসি। তারপর ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালিয়ে তীরবেগে ছুটে আসে নিজের প্রাসাদে। দেওয়ানকে ডেকে বলে, একজন আরব দেশের শেখ একটা গাধায় চেপে আমার প্রাসাদে আসছে। তার সঙ্গে আছে কিছু শসা। সে এলে তাকে আদর আপ্যায়ন করে আমার দরবারে নিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ পরে সেই আরব-শেখ এসে হাজির হলো। দেওয়ান তাকে খুব খাতির করে দরবার কক্ষে নিয়ে গেলো। সেখানে পারিষদ পরিবৃত হয়ে বসেছিলো আমির মুইন। দরবারে চারপাশে উন্মুক্ত অসি হাতে জবরদস্ত প্রহরীরা দণ্ডায়মান। এই সব জাঁকজমকের মধ্যে আরব শেখ সেই শিকারী বেশি আমির মুইনকে একদম চিনতে পারলো না।

প্রশ্ন হলো ঃ ঐ বস্তাটায় কী নিয়ে এসেছ আমার জন্যে, আরব-ভাই?

লোকটি উত্তর দেয় ঃ হুজুরের ভোগের জন্য এই গরীব সামান্য কিছু কচি শশা নিয়ে এসেছে। আমার জমির প্রথম ফলন।

—থোফা-চমৎকার! তা কী ইনাম আশা কর?

—জী হুজুর, এক হাজার দিনার—

—একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

—তা হলে পাঁচশোই দিন, হুজুর।

—উঁহুঁ, তাও বেশ বেশি।

—তিনশো?

—না, তাও বেশি।

—তা হলে একশো।

—না না, একশোও হয় না।

—পঞ্চাশ?

—তাও বেশি।

—অন্তত তিরিশ।

—তিরিশ দিনারও বেশি দাম।

এবার শেখ চিৎকার করে ওঠে। ওপরে খোদা আছেন আজ আমার নসীবটাই খারাপ। মরুপ্রান্তরে একটা হোদলকুৎকুৎ লোকের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হয়েছিলো। তখনই জানি দিনটা ভালো যাবে না। না না, আমার শসা আমি তিরিশ দিনারের কমে কিছুতেই দিতে পারবো না আমিরসাহেব।

আমির শুধুমাত্র মৃদু হাসলো। কোনও কথা বললো না। এবার আরব-শেখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিরকে লক্ষ্য করতে থাকলো। এঁকেই তো সে কিছুক্ষণ আগে মরুপ্রান্তরে দেখেছিলো না? এবারে সে প্রায় নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে।

এতক্ষণ আমির নিজেকে চেপে রেখেছিলো, কিন্তু এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে তার এক গোমস্তাকে হুকুম করলো। এই শেখকে প্রথমে এক হাজার দিনার দাও। তারপর পাঁচশো, তারপর তিনশো, তারপর একশো, পরে পঞ্চাশ এবং সব শেষে তিরিশ দিনার গুণে গুণে দেবে। এবং বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দেবে, আমির খুশি হয়ে এই এক হাজার নয়শো আশি সোনার দিনার তাকে বকশিস দিচ্ছেন—ঐ আধ বস্তা শসার দাম হিসাবে এটাকা তিনি দিচ্ছেন না। এরপর তাকে খাইয়ে ধুইয়ে তার গাধার পিঠে চাপিয়ে বিদায় করে দেবে। একজন আরব যে আমাকে বোকা বানিয়ে আধবস্তা শসার দাম হিসেবে এই টাকা আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে না সেটা তাকে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে জানিয়ে দেবে এ হচ্ছে আমিরের বদান্যতা।

এর পর শাহরাজাদ আর একটি নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

এই গল্পটি আবু সুবাইদ বলেছিলো ঃ

একদিন আমি বাগানে ফল কিনতে গেছি, হঠাৎ নজরে এলো, একটা আখরোট গাছের তলায় বসে এক রমণী চুলের প্রসাধন করছে। আরও কাছে যেতে দেখতে পেলাম সে বয়সে প্রবীণা—মাথার সব চুলই সাদা। কিন্তু কী আশ্চর্য তার দেহের কোথাও বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। ঢলঢলে যৌবন তার সারা অঙ্গে। সুন্দর মুখশ্রী, দুধে-আলতা গায়ের রঙ, ডাগর-কচি তনু।

আমাকে দেখেও কিন্তু সে বোরখা দিয়ে দেহ ঢাকা দিলো না। যেমন করে হাতীর দাঁতের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল তেমনি ভাবেই আঁচড়াতে থাকলো। একেবারে নির্লিপ্ত নির্বিকার। আমাকে দেখে কোন ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা গেলো না।

তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সুন্দরী, তোমার চুলেই শুধু পাক ধরেছে, কিন্তু তুমি তো আসলে সুঠাম সুন্দরী যুবতী এখনও। তা কলপ লাগিয়ে সাদা চুলকে কালো করে নিলেই তো পারো! তা হলেই তো মনমোহিণী রূপ হবে তোমার!

এই কচি কাঁচা বয়েস তোমার, এই বয়সে চুলগুলো কালো করে নাও না কেন? কী ব্যাপার?

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো আটাত্তরতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

মেয়েটি মাথা তুলে তাকায়। টানাটানা কাজল কালো চোখ। আমার প্রশ্নের সে জবাব দেয় ঃ

আমার পাকা চুলে রঙ ধরিয়ে কালো তো করেছিলাম। কিন্তু আমার পোড়া কপাল, সাদা হয়ে গজাচ্ছে, মিথ্যে কালিমা দিয়ে তাকে আর কাঁহাতক ঢেকে রাখা যায়? ধৈর্যে কুলালো না, তাই সময়ে আবার সব সাদা হয়ে গেলো। তা যাক, ওনিয়ে আর দুঃখ করি না। ভয় হয়, আমার এই দুরন্ত যৌবনের জোয়ারকে। তাকে অনেক ঢেকেঢুকে ধরে বেঁধে সন্তর্পণে আগলে রাখতে হয়। কিন্তু সে তো আর পারা যায় না। আসল কথা—জোরজার করে কিছুই ঢেকে চেপে রাখা যায় না। আমার দেহের যৌবন, আমার এই পিনোদ্ধত বুক—কী করে আড়াল করে রাখতে পারি বলো? সুতরাং মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে বলে দুঃখ করি না। আমার দেহে তো এখনও ঢলঢলে যৌবন আছে—সে তো বয়সের ভারে বৃদ্ধ হয়ে পড়েনি।

শাহরাজাদ একটুক্ষণের জন্য থামে। তার পর আবার এক কাহিনী শুরু করে ঃ

একদিন উজির জাফর খলিফা হারুন অল রসিদকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলো। নানা উপাচারে খলিফাকে খানাপিনা করাচ্ছে সে, এমন সময় খলিফা জাফরকে বললেন, জাফর তোমার বাড়িতে দেখছি ভারি সুন্দর বাঁদী রেখেছো। আমার খুব ইচ্ছা মেয়েটাকে আমি তোমার কাছ থেকে কিনে নেব।

জাফর বললো, কিন্তু ধর্মাবতার, আমি ওকে বিক্রি করতে চাই না।

খলিফা বললেন, তা হলে এমনিতেই দাও।

জাফর বলে, তাও আমি দিতে পারাবো না, জাঁহাপনা।

এবার খলিফা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। আমি বার বার তিন কসম খেয়ে বলছি জাফর আমার কথা যদি না মান—যদি ন্যায্য দাম নিয়ে বিক্রি না কর, অথবা এমনিতে না দাও তা হলে আজই আমি আমার প্রধান বেগম জুবেদাকে তালাক দিয়ে দেব।

জাফর সমানে গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো, আমিও বার বার তিনবার কসম খেয়ে বলছি, আপনার কথা যদি মানতেই হয় তবে, আমার বালবাচ্চাদের মা—আমার বিবিকে বয়ান তালাক দিয়ে দেব আমি। তারা দু'জনেই মদের ঝোঁকে এইরকম মারাত্মক কসম খেয়ে বসলো কিন্তু একটুক্ষণ পরে দু'জনেই বুঝতে পারলে কাজটা ভালো হয়নি। তখন কীভাবে এই সঙ্কট থেকে রেহাই পাওয়া যায় তারই উপায় খুঁজতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে খলিফা একটা মতলব বের করলেন।

—জাফর, এসো আমরা কাজী ইউসুফের পরামর্শ চাই। তিনি আইনজ্ঞ মানুষ, নিশ্চয়ই এর একটা বিধান করে দিতে পারবেন।

তখুনি কাজী ইউসুফের কাছে লোক পাঠানো হলো। এত রাতে খলিফা ডেকে পাঠিয়েছেন, ইউসুফ চিন্তিত হলো, নিশ্চয়ই এমন কোনও কাণ্ড তিনি করে বসেছেন যার ফলে ইসলাম বিপন্ন হতে বসেছে। তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা খচ্চরে চেপে কাজী ইউসুফ আগন্তুক পেয়াদাকে বললো, তুমি এই বাক্সটা নিয়ে রওনা হও, আমি এখুনি আসছি।

কাজী ইউসুফ এলো। খলিফা এবং জাফর তারই প্রতীক্ষায় সময় গুণছিলো। কাজী ইউসুফের সম্মানে দু'জনেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। খলিফা একমাত্র ইউসুফকেই এই সম্মান দিতেন আর কাউকেই না। খলিফা বললেন, আমি আপনাকে বড় বিপদে পড়ে ডেকে পাঠিয়েছি।

খলিফা আগাগোড়া সব ঘটনা খুলে বললেন তাকে।

—ধর্মাবতার, আবু ইউসুফ বললো, ব্যাপারটা একেবারেই জটিল কিছু না, পানির মতো সোজা সরল।

তারপর জাফরের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি বাঁদীর অর্ধেকটা খলিফাকে বিক্রি করবেন, বাকী অর্ধেকটা দান করবেন।

কাজীর বিচারে খলিফা খুশিতে নেচে ওঠেন। এতে শুধু যে তিনি নিদারুণ সঙ্কট থেকে অব্যাহতি পেলেন তাই নয়, তার আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরী বাঁদীটাকেও পাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। খলিফা বললেন, মহামান্য কাজী সাহেব, আপনি আর কালবিলম্ব করবেন না। তাড়াতাড়ি আইনের খুঁটিনাটি সেরে নিন যাতে আমি মেয়েটিকে নিয়ে এখুনি চলে যেতে পারি।

তখনি বাঁদীকে সামনে হাজির করতে বলা হলো। কাজী ইউসুফ বললো একজন ক্রীতদাসকে ডাকুন।

সঙ্গে সঙ্গে এক দশাসই চেহারার ক্রীতদাসকে আনা হলো।

ইউসুফ বললো, এই ক্রীতদাসের সঙ্গে আমি বাঁদীটার শাদী দিয়ে দিচ্ছি। শাদীর পর সে তার বিবিকে সঙ্গে সঙ্গেই বয়ান তালাক দিতে পারে। তার খেসারৎ হিসাবে তাকে দেন মোহর দিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। শাদীর সঙ্গে সঙ্গেই সে তাকে এক হাজার দেন মোহর দিয়ে তালাক দিয়ে দেবে। তালাক হয়ে গেলে তার পর এই বাঁদীকে খলিফা অনায়াসেই ইসলাম বিধি অনুসারেই রক্ষিতা করতে পারবেন।

ইউসুফ এবার ক্রীতদাসকে উদ্দেশ করে বললো, তুমি একে শাদী করতে চাও?

নফরটা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো, চাই।

—তা হলে এই মুহূর্তে এই বাঁদীর সঙ্গে তোমার শাদী হয়ে গেলো। আচ্ছা, এই নাও এক হাজার দেন মোহর। এবার এই দিনারগুলো তোমার সদ্য শাদী করা এই বিবিকে দিয়ে বলো, এক তালাক, দুই তালাক বয়ান তালাক দিলাম তোমাকে। এই নাও তোমার খেসারতের দেন মোহর।

ক্রীতদাসটা অবাক হয়ে বললো, কিন্তু এই মাত্র তো আপনি আমার সঙ্গে ওর শাদী দিলেন। এখন সে আমার আইনসম্মত বিবি। কেন তাকে তালাক দিতে যাবো? না—দেব না। আমি আমার বিবিকে ঘরে নিয়ে যাবো। আমরা সুখে ঘর সংসার করবো।

ক্রীতদাসের এই উদ্ধত্য দেখে ক্রোধে ফেটে পড়েন খলিফা। কাজীকে উদ্দেশ করে বললেন, একটা ক্রীতদাসের এত বড় স্পর্ধা!

ইউসুফ খলিফাকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করলো।—আপনি শান্ত হোন ধর্মাবতার, আমি সব সমাধান করে দিচ্ছি। ক্রীতদাস আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আইনতঃ কোনও অপরাধ করেনি। কারণ বাঁদী এখন তার শাদী করা বিবি। সে যদি রাজি না হয়, তরে তাকে তালাক নাও দিতে পারে। কিন্তু তারও বিধান ইসলামেই দেওয়া আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি শুধু এই ক্রীতদাসকে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে দান করে দিন।

হারুন অল রসিদ তৎক্ষণাৎ বললেন, ওকে আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম।

এইবার কাজী ইউসুফ বাঁদীকে বললো, এই ক্রীতদাসটাকে আমি তোমাকে উপহার দিলাম—নেবে একে?

বাঁদীটা বললো, হ্যাঁ, নেব।

কাজী ইউসুফ এবার সোচ্চার কণ্ঠে বললো, ব্যাস, কেল্লা ফতে। তোমাদের শাদী বাতিল হয়ে গেলো। এখন থেকে এই ক্রীতদাস আর তোমার স্বামী নয়, নফর মাত্র। এই-ই ইসলামের বিধান। আমার বিচার খতম; এবার ধর্মাবতার আপনি অনায়াসে এই মুক্ত বাঁদীকে আপনার রক্ষিতা করে নিয়ে যেতে পারেন।

কাজীর এই বিচার বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে খলিফা লাফিয়ে উঠলেন।

—আপনার তুল্য বিচারক তামাম দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই, কাজীসাহেব।

খলিফার হুকুমে তখনি একখানা বিরাট রেকাবী ভর্তি সোনার মোহর এনে কাজী আবু ইউসুফের সামনে ধরা হলো। খলিফা বললেন, আমি খুশি হয়ে আপনাকে দিচ্ছি। মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন।

ইউসুফ খলিফার বদান্যতায় গদগদ হয়ে বললো, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন। ধর্মের পথে অবিচল থেকে আপনি প্রজাপালন করতে থাকুন।

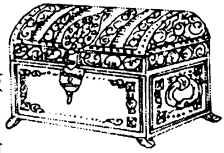

তারপর সেই পেয়াদাকে বললো, আমার বাক্সটা নিয়ে এসো।

মোহর ঠাসা রেকাবীখানা বাক্সে পুরে নিয়ে কাজীসাহেব স্বগৃহে ফিরে গেলো।

এই ছোট্ট কাহিনী থেকে একটি আইনের জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া গেলো।

শাহরাজাদ একটুক্ষণ থেমে আর একটি কাহিনী বলতে শুরু করলো।

আবু নবাস আর জুবেদার গোসলের কাহিনী ঃ

হারুন অল রসিদ তার চাচার মেয়ে বেগম জুবেদাকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তার মনোরঞ্জনের জন্য তিনি একটি সুন্দর নয়নাভিরাম বাগিচা বানিয়া দিয়েছিলেন। বাগিচার মাঝখান একটি বিরাট ফোয়ারা। তার চারপাশে পুকুর-সদৃশ এক চৌবাচ্চা—হাল্কা নীল জলে ভরা। বাগিচার চারপাশে ঘন ঝাঁপড়া গাছ বসানো। এই গাছের পাতার আচ্ছাদন বাগিচাটাকে বাইরের জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই বাগিচায় বেগম জুবেদা অসংবৃত বেশবাসে ঘুরে বেড়ায়, সাঁতার কাটে, গোসল করে। বাইরের কোন জনপ্রাণীর দৃষ্টি এখানে পৌঁছবার কোনও উপায় নাই। এমন কি সূর্যের আলোও ঢুকতে পায় না এখানে।

একদিন, প্রচণ্ড খরতাপে দগ্ধ হচ্ছিল দুনিয়া, দুপুরে বেগম জুবেদা বাগানে ঢুকে সাজপোশাক খুলে ফেলে ঝরনার ধারে এসে দাঁড়ালো। এক পা এক পা করে নেমে সে হাঁটুজলে গিয়ে দাঁড়ালো। আরও গভীরে যেতে তার ভয় করে। একে ঠাণ্ডা জল তার ওপর সে খুব ভালো করে সাঁতার কাটতে জানে না। তাই সে কোমর ছুঁইছুঁই জলে দাঁড়িয়েই ঘটি করে জল ভরে কাঁধে ঢালতে থাকলো।

পা টিপে টিপে খলিফা তার পিছনে এসে ঢুকেছিলেন বাগানে। দূর থেকে ঝরনার পাশে জুবেদার উলঙ্গ শরীর দেখার লোভ তিনি আর সামলাতে পারেন নি। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি জুবেদার শঙ্খশুভ্র শরীরের লাবণ্য নিরীক্ষণ করতে থাকেন। খলিফা গাছের একটা ঝুলন্ত শাখা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ তার হাতের ভারে ডালটা মড়মড় শব্দ করে ভেঙ্গে পড়ে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো ঊনআশিতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

হঠাৎ এই শব্দে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে জুবেদা। দু' হাতে নিজের শরীরের নিম্নাঙ্গ ঢাকার চেষ্টা করে এদিক ওদিক চাইতে থাকে । কোনও অদৃশ্য চোখের লোলুপতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা, ছোট দুখানা হাতের আচ্ছাদনে তার অর্ধাংশও ঢাকা পড়ে না। সবই খলিফার দৃষ্টিগোচর হয়।

এর আগে খলিফা কখনও তার চাচার মেয়ে জুবেদাকে এই অবস্থায় দেখেন নি।

এমন ঝকঝকে প্রকাশ্য দিবালোকে এই তিনি প্রথম তাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখার সুযোগ পেলেন। জুবেদার গোপন অঙ্গের শোভা দেখে তিনি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে আবার পা টিপে টিপে, যেমন করে এসেছিলেন তেমনিভাবে, বাগিচা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মন তার এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে গেলো। গুন গুন করে তিনি গাইতে থাকলেন ঃ

ঝরনার ধারে দেখে এলাম তারে ...

কিন্তু অশান্ত হৃদয় উথাল পাথাল করতে থাকে। কিছুতেই মনকে সহজ শান্ত একাগ্র করতে পারলেন না। তাই গানের পরের কলি আর গুছিয়ে বানাতে পারলেন না তিনি। চেষ্টার কোনও অন্ত ছিলো না, কিন্তু কিছুতেই তিনি মেলাতে পারলেন না পরের ছত্র। তাই অপ্রকাশের যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে থাকেন। শুধু সেই একটা কলিই—ঝরনার ধারে দেখে এলাম তারে—ফিরে ফিরে গাইতে লাগলেন।

এইভাবে আর কতক্ষণ অসহায়ভাবে কাটাতে পারা যায়। অসমাপ্ত কবিতাটা বুকের মধ্যে আঁকুপাকু করতে থাকে কিন্তু মুখের ভাষায় সে মূর্ত হতে পারে না।

অবশেষে সে কবি আবু নবাসকে ডেকে পাঠায়।

—দেখ তো কবি, আমি একটা গানের কলি বানিয়েছি ঃ ঝরনার ধারে দেখে এলাম তারে—। কিন্তু পরের ছত্র মনে আসছে তবে মুখে আসছে না। তুমি মিলিয়ে দাও তো—

আবু নবাস বলে, যো হুকুম, জাঁহাপনা।

খলিফাকে অবাক করে দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ পুরো গানটি বানিয়ে দিলো ঃ

ঝরনার ধারে, দেখে এলাম তারে,
এখনও তার রূপের ছবি চক্ষে আমার ভাসে।
তার বুকের পাহাড়ে, পিছলে পড়ি আছড়ে,
ক্ষতি কিবা তার, মৃত্যুই যদি আসে।

খলিফা হতবাক হয়ে ভাবেন, যে কথাগুলো এতক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা করেও তিনি ভাষায় রূপ দিতে পারলেন না আবু নবাস মুহূর্তের মধ্যে কী করে তাকে সহজ সুন্দর করে প্রকাশ করে দিলো। ঠিক ঠিক এই কথাগুলোই তো উনি বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। কিন্তু আবু নবাস কত সহজে পারলো! নিশ্চয়ই সে এক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী!

কবিকে প্রচুর ইনাম দিয়ে খুশি করলেন খলিফা।

শাহরাজাদ বললো, এবারে আবু নবাসের কবি প্রতিভার দু-একটা নমুনা শোনাচ্ছি জাঁহাপনা।

এক নিদ্রাবিহীন রাতে খলিফা হারুন অল-রসিদ প্রাসাদের দরজায় অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন, তাঁর এক প্রিয়পাত্রী বাঁদী তার বিলাস গৃহের দিকে চলেছে। খলিফা তাকে অনুসরণ করতে করতে তার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। খলিফা তাকে জাপটে ধরে বোরখা আর নকাব খুলে ফেলার জন্য জবরদস্তি করতে লাগলেন। বাঁদীর সঙ্গে সুখ-সম্ভোগ করার জন্য তার সমস্ত সত্ত্বা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু বাঁদীটি করুণভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলো। আজকের রাতটা আমাকে ক্ষমা করুন। জাঁহাপনা। আজ আমার শরীর খারাপ, আমি কথা দিচ্ছি, কাল রাতে আমি আপনার কামনা-চরিতার্থ করে দেব। আজ আমার শরীরটা ঠিক নাই, আজকের রাতটায় আমাকে রেহাই দিন। খোদা মেহেরবান, কাল রাতে সুগন্ধী আতর মেখে মোহিনীরূপ ধরে আমি আপনার সামনে হাজির হবো।

সুতরাং খলিফা আর কোনও জোরজার করলেন না। ফিরে এসে আবার পায়চারী করতে থাকলেন।

পরদিন তিনি খোজা-সর্দার মাসরুরকে পাঠালেন সেই বাঁদীর কাছে। বললো, খলিফা আপনার কাছে পাঠালেন আমাকে। কাল রাতে তার সঙ্গে আপনার যে-কথা হয়েছিলো তা কি আপনার স্মরণে আছে?

সেদিনও বাঁদীর দেহ-মন ভালো ছিলো না। সকাল থেকেই শরীরটা জুৎসই মনে হচ্ছিল না। মাসরুরকে সে বললো, খলিফাকে গিয়ে বলো, নিভৃত রাতের সব কথাই লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর গভীরে—

মাসরুর এসে যখন বাঁদীর এই জবাব খলিফাকে শোনালো সেই সময় কবি আবু নবাস, অল বাক্কাসী এবং আবু মুসাব তার সমীপে এসে হাজির হলো। খলিফা তাদের বললেন, 'নিভৃত রাতের সব কথাই লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর গভীরে' এই কথাকে কেন্দ্র করে তোমরা সবাই এক একটা কবিতা বানাও, দেখি।

প্রথমে অল রাক্কাসী একটানা বলে গেলো ঃ

ওরে আমার অশান্ত অবুঝ হৃদয়—সাবধান,
যেওনা যেওনা সেখানে, এলেও তাকে দিও না ঠাঁই
কথা তার মিষ্টি মধুর, কিন্তু কেমন বেয়াড়া
তার দুর্বোধ্য হাসির তুলনা বুঝি নাই
তাইতো সে বলতে পারে হেঁয়ালী ক'রে
'নিভৃত রাতের সব কথাই লুকিয়ে থাকে
দিনের আলোর গভীরে।'

এরপর আবু মুসাব এগিয়ে এসে শুরু করে ঃ

হাতের পুতুল হয় এ হৃদয় আমার,
পুড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে চায়।
মোহময় রাতের আঁধারে,
ইশারায় ডাকে বারে বারে ;
ছিনিমিনি খেলা ক'রে কী সাধ মেটায়?
সে আমায় বিদ্ধ করে রাখে শুধু
দুর্বোধ্য ভাষার তীরে ঃ
'নিভৃত রাতের সব কথাই লুকিয়ে থাকে
দিনের আলোর গভীরে।'

সব শেষে আবু নবাস বলতে শুরু করে ঃ

দুঃসহ সুন্দরী—আনন্দের ঝরনা,
অনিন্দ্য মধুর ভাষিণী—কী দেব বর্ণনা!
ঘন তমশাবৃত মধ্যরাতের তারা,
একমাত্র সাক্ষী ছিলো যারা,
তারা তো সবাই জানে,

কী তার মানে?
আর জানে সেই তরুবর,
মৃদুমন্দ সমীরণে তার শাখার মর্মর
বারবার ধ্বনিত হয়েছিলো আমার বুকে।
তোমার কথার কুহকে
ভুলালে আমায়।
দুঃখের বেদনা চেপে ফিরে আসি আশায় আশায়
ফিরে রাতে ফিরে পাব বলে।
কিন্তু হায় এ রাত্রিও গেলো বুঝি চলে।
তোমার শব্দের ইন্দ্রজাল আমাকে রয়েছে ঘিরে,
'নিভৃত রাতের সব কথাই লুকিয়ে থাকে
দিনের আলোর গভীরে।'

কবিতাগুলো শোনার পর খলিফা খুশি হয়ে প্রথম দু'জন কবিকে অনেক টাকা পুরস্কার দিলেন। কিন্তু কবি নবাস-এর ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন।

—নবাস আমি তোমার গর্দান নেব।

নবাস বিচলিত হয় না, আমার কী অপরাধ, জাঁহাপনা?

—তোমার কবিতায় যা বর্ণনা করলে তা শুনে আমি নিঃসন্দেহ যে, ঐ বাঁদীটার সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার কোনও গোপন সম্পর্ক আছে! কারণ সে সব ব্যাপার একমাত্র আমি আর সেই বাঁদী ছাড়া তৃতীয় কোনও প্রাণীর জানার কথা নায়। নিশ্চয়ই তুমি তার কাছ থেকে সব শুনেছ।

খলিফার কথা শুনে আবু নবাস হো হো করে হেসে ওঠে, আমাদের মহানুভব সুলতান জানেন না, সত্যিকার শিল্পীর কাছে কোনও সত্যই গোপন করা যায় না। সে তার অন্তর দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত গোপন রহস্য জেনে নিতে পারে। কবিদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, কবিরা পাগলের মতো উদ্দাম অসংলগ্ন হয়, প্রেরণাই তাদের পরিচালনা করে ভালোর দিকে অথবা খারাপ পথে। তারা অনেক সুন্দর সুন্দর নীতি কথা উপহার দেয় আমাদের। কিন্তু নিজেরা তা মেনে চলে না।

আবু নবাসের এই সব যুক্তি-তর্কে খলিফা ক্ষান্ত হন। খুশিও হন। অন্য দু'জনকে যে ইনাম দিয়েছিলেন তার দ্বিগুণ দিলেন তাকে।

এই কাহিনী শোনার পর সুলতান শাহরিয়ার বললো, খোদা হাফেজ, আমি হলে কিন্তু আবু নবাসকে রেহাই দিতাম না। আসল রহস্য টেনে বের করতাম। তারপর তার গর্দান নিতাম। আমার এখনও ধারণা, বাঁদীটার সঙ্গে তার গুপ্ত প্রেম ছিলো। এবং তার কাছ থেকে জেনেই সে ঐ কবিতা বানিয়েছিলো। আমি বিশ্বাস করি না, কবি হলেই তারা গোপন যা কিছু সবই জানতে পারে। শাহরাজাদ, তুমি ভবিষ্যতে ঐ লম্পট কবিটাকে নিয়ে আর কোনও কিসসা শোনাবে না আমাকে। লোকটা ইসলাম, কানুন বা খলিফা কারুর উপরই শ্রদ্ধাবান নয়।

শাহরাজাদ বলে, তাই হবে জাঁহাপনা, আবু নবাসের আর কোনও কাহিনী আপনাকে শোনাবো না। আচ্ছা, এবারে একটা গাধার গল্প বলছি, শুনুন ঃ

একদিন এক দিল খোলা আমুদে লোক একটা রশিতে বেঁধে একটা গাধাকে টানতে টানতে বাজারের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে, একটা সেয়ানা চোর গাধাটাকে

চরি করার মতলব ভাঁজতে লাগলো। চোরটা তার সাগরেদকে বললো, গাধাটাকে হাওয়া করতে হবে। কিন্তু খুব সাবধান, লোকটা যেন জানতে না পারে। কী করে করা যায় বলো তো?

সঙ্গীটা বলে, কিসসু ভেবো না ওস্তাদ, তুমি আমার পিছনে পিছনে এসো। দেখ, আমার কীরকম হাত সাফাই।

এমন সময় রাত্রির আঁধার কাটতে থাকে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো আশিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সাগরেদটা অতি সন্তর্পণে গাধা-মালিকের পিছনে পিছনে চলতে থাকে। দাঁও বুঝে এক সময় সে গাধার গলা থেকে দড়ির ফাঁসটা খুলে নিজের গলায় পরে নেয়। এই ফাঁকে ওস্তাদ গাধাটাকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। লোকটা গাধার গলার দড়ি নিজের গলায় পরে এমন ল্যাকপ্যাক করে চলতে থাকে যে লোকটার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে না। সে ভাবে, গাধাটা কুঁড়ের বাদশা। গতরটাকে একেবারে চালাতে চায় না।

কিছুক্ষণ পরে সাগরেদটা যখন দেখলো তার ওস্তাদ গাধাটাকে নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে, তখন সে হঠাৎ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো মাঝ রাস্তায়। গাধার মালিক তখনও দড়ি ধরে টান দিতে থাকে আর ভাবে গাধাটা কী ঘ্যাঁচড়া। কিন্তু একপাও যখন তাকে নড়াতে পারে না তখন সে রাগে জ্বলে ওঠে, পিছন ফিরে তাকায়। মুহূর্তের মধ্যে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, একী? গাধা—তার গা-ধা—, এ সে জলজ্যান্ত একটা মানুষ! নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। সে কী ভুল দেখছে না কী? কিন্তু না, ভুল হবে কী করে? পথ-চলতি আর পাঁচটা মানুষের মতো এ-ও তো দেখছি একটা মানুষ। তা হলে তার গাধা—গাধা কোথায় গেলো? বোকার মতো সে প্রশ্ন করে, তুমি কী?

—আমি আপনার গাধা, মালিক। কেন আমাকে চিনতে পারছেন না?

চোরের সাগরেদটা খুব ধীর শান্তভাবে কথাগুলো বলে।

এবার গাধার মালিক ভড়কে যায়, গাধা আবার কথা বলে নাকি?

লোকটা বলে, আমি কিন্তু জন্মাবধি গাধা নই, মালিক। আমি মানুষেরই বাচ্চা। কিন্তু আমার কর্মদোষে আজ আমি অভিশপ্ত—তাই গাধা হয়েছি।

মালিক অবাক হয়, সে কেমন?

—আমি ছোটবেলায় বড় দুরন্ত, বেয়াড়া ছিলাম। এই নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই মা-এর সঙ্গে আমার ঝগড়া লাগতো। আমি পাড়াপড়শীর বাড়ি ঘর গাছপালা তছনছ করে ফেলতাম। তাদের ছেলেমেয়েদের বিনা কারণে মারধোর করতাম। সেই জন্যে মা আমার ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে একদিন আমাকে অভিশাপ দিয়ে গাধা বানিয়ে ফেললো। সেই থেকে আমার এই হাল। আমি মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে চলে গেলাম। কিন্তু রেহাই পেলাম না। একটা লোক আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিলো। এবং সেখান থেকে কিনে আনলেন আপনি। সেই থেকে আমি আমার সাধ্যাতীত মোট বয়ে চলেছি আপনার। যখন একান্তই বইতে পারিনি, হয়তো বা একটুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে জিরিয়ে নিতে চেয়েছি। কিন্তু আপনি আমাকে দাঁড়াতে দেন নি, পেটের মধ্যে খোঁচা মেরে আমাকে তখুনি চলতে বাধ্য করেছেন। এতকাল আমার মুখে কোনও ভাষা ছিলো না। তাই শত চেষ্টা করেও আপনাকে আমার মনের কথা জানাতে পারি নি। আজ আমার মুখে কথা ফুটেছে। আপনার কাছে আমার আর্জি, আমাকে মেহেরবানী করে খালাস করে দিন। আমি আমার মা-এর কাছে ফিরে যাই। তিনি আমাকে অভিশাপ থেকে মুক্তি দিলে আবার আমি পুরোপুরি আগের মতো মানুষ হতে পারবো।

লোকটার কথা শুনে গাধার মালিক হা হুতাশ করতে লাগলো, হায় হায় এ আমি কী পাপ করেছি। না জেনে তোমাকে কত কষ্টই না দিয়েছি। দোহাই আল্লাহ, তুমি আমার অপরাধ নিও না। আমার অনুতাপের শেষ নাই। ছিঃ ছিঃ, এ আমি কী করেছি। আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আজই তোমার মা-এর কাছে ফিরে যাও তুমি। জানি না, আল্লাহ আমার এ গোস্তাকি মাফ করবেন কিনা।

আর তিল মাত্র দেরি না করে গাধার মালিক তার গলার দড়ি খুলে দিলো। অনুতাপে দগ্ধ হতে হতে সে বাড়ি ফিরে বিছানায় ঢলে পড়লো।

দিন কয়েক পরে গাধার মালিক বাজারে এলো অন্য একটা গাধা কেনার জন্য। হঠাৎ তার নজর পড়লো একটা গাধার ওপর। আরে! এ যে তারই সেই আগের গাধাটা! বিক্রির জন্যে বাজারে তোলা হয়েছে! কী ব্যাপার, কিছু ঠাওর করতে পারে না সে। মনে মনে ভাবে হয়তো, এই পাজী বদমাইশটা আবার তার মাকে জ্বালিয়েছে। তাই আবার তাকে গাধা করে বাজারে বেচে দিয়ে গেছে। যাই হোক, এই নচ্ছারটাকে আর সে বাড়ি নিয়ে যাবে না।

রাগে গাধাটার মুখের ওপর থু থু করে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে সে অন্য একটা গাধার দিকে চলে গেলো। সারা বাজার ঘুরে ঘুরে সে অন্য একটা গাধা কিনে নিলো। লোকটা বুঝতেও পারলো না, হাড়ে হাড়ে বজ্জাত, খল সেই গাধাটার জুড়ি সারা বাজারে পাওয়া যাবে না।

সেই রাতে শাহরাজাদ আরও একটা গল্প শোনালো সুলতান শাহরিয়ারকে—জুবেদার গল্প ঃ

খলিফা হারুন অল রসিদ একদিন খাড়া দুপুরবেলা বেগম জুবেদার শোবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ইচ্ছা ছিলো, একটু বিশ্রাম করবেন। কিন্তু বিছানায় গিয়ে বসতেই তার নজরে এলো, চাদরের ঠিক মাঝখানে একটা তাজা ঘোলাটে দাগ। খলিফার মুখ কালো হয়ে গেলো। চোখে অন্ধকার দেখলেন তিনি। একি দৃশ্য! রাগে সারা শরীর রিরি করে উঠলো; গর্জে উঠলেন তিনি, এসব কী, জুবেদা? বিছানায় দাগ কেন?

জুবেদাও অবাক। ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলো। মাথাটা নামিয়ে বিছানায় ওপর ঝুঁকে পড়ে আঘ্রাণ করে বোঝার চেষ্টা করলো।

—এ তো, মনে হচ্ছে পুরুষের বীর্য, ধর্মাবতার।

কী এক অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন খলিফা। —কী তাজ্জব ব্যাপার! পুরুষের তাজা বীর্য—এই দিনে দুপুরে তোমার বিছানায় কীভাবে আসতে পারে? আমি তো তোমার ঘরে আজ এক সপ্তাহ পরে এলাম! তোমার সঙ্গে এ শয্যায় আমি অনেকদিন শুইনি। তবে?

জুবেদা আহত কণ্ঠে বলে, আপনি কী আমাকে সন্দেহ করছেন, জাঁহাপনা? আপনার অবিশ্বাসের কাজ কী আমি কখনও করেছি? না, করতে পারি? আপনি কী মনে করছেন, আমি পরপুরুষের অঙ্কশায়িণী হয়েছিলাম?

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

খলিফা উত্তেজিত ভাবে বলতে থাকেন, আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। এখুনি কাজীকে তলব পাঠাচ্ছি। কাজী আবু ইউসুফ বিচক্ষণ বিচারক, এ ব্যাপারে তার কী মত, আমার জানা দরকার। আমার পূর্ব পুরুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য, শোনও আমার চাচার মেয়ে—আমার বেগম, কাজীসাহেব যদি তার রায়ে বলেন তুমি দোষী, আমি তোমাকে উপযুক্ত সাজা দিতে দ্বিধা করবো না।

কাজী এলো। খলিফা হারুন অল রসিদ তাকে বললো, এই দেখুন কাজীসাহেব,

আমাদের বিছানায় এই তাজা দাগটা পরীক্ষা করুন। আপনার কী মনে হয়, আমাকে বলুন।

কাজী বিছানায় উঠে এলো। দাগটার মাঝখানে তর্জনী রাখলো। তারপর আঙ্গুলটা চোখের সামনে তুলে ধরে ভালো করে নিরীক্ষণ করলো। নাকের কাছে ধরে আঘ্রাণ নিলো। তারপর সাফ জানিয়ে দিলো, ধর্মাবতার, এ মানুষের বীর্য।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো একাশিতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয়। শাহরাজাদ বলতে থাকে।

কাজী আরও বলে এবং সদ্য নির্গত—একেবারে তাজা।

খলিফা ছটফট করে উঠলেন। কিন্তু তা কী করে সম্ভব, কাজীসাহেব? সাতদিন পরে আমি বেগমের ঘরে আজ এসেছি। বিছানায় বসার আগেই আমার নজরে পড়েছে এ জিনিস।

কাজী মুহূর্তে সব ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলো। বেগম জুবেদা তার ওপর খঙ্গ-হস্ত হবেন সন্দেহ নাই। তাঁর বিরাগভাজন হওয়ার পরিণাম যে শুভ হতে পারে না তা সে তৎক্ষণাৎ অনুধাবন করতে পারলো। ওপরের দিকে চেয়ে দেখতে থাকলো সে। মনে হতে পারে, সে এই ব্যাপারটা আরও ক্ষতিয়ে তলিয়ে চিন্তা করছে।

হঠাৎ তার নজরে পড়লো, ছাদ ঘেঁসে দেওয়ালের মাথায় একটা ফোকর। আর সেই ফোকরে একটা বাদুর—ডানা মেলে ঝুলছে। আবু ইউসুফের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

—আমাকে একখানা তরোয়াল দিতে পারেন?

খলিফার দিকে চেয়ে কাজী ইউসুফ বললো। খলিফার নির্দেশে তৎক্ষণাৎ একখানা তরোয়াল এনে দেওয়া হলো তার হাতে। কাজী বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে তরোলায়খানা দিয়ে বাদুড়টাকে মারলো এক কোপ। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বাদুড়টা ছিটকে পড়লো মেজেয়। তরোয়ালের আঘাতে সে ঘায়েল হয়েছে। ওঠবার আর শক্তি নাই। কাজী বললো, এই যে বাঁদুড়টা দেখছেন জাঁহাপনা, এদের বীর্য আর মানুষের বীর্য দেখতে অবিকল একরকম। কোনও ফারাক বুঝতে পারবেন না। আমাদের হেকিমী শাস্ত্রে সেই কথাই সবিস্তারে লেখা আছে। আমার ধারনা বেগম জুবেদা যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন এই বাদুড়টা বেগম সাহেবার উপর উপগত হয়েছিলো। এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফল এই বীর্যপাত। তার এই অপকর্মের জন্য আমি তাকে নিজে হত্যা করে সাজা দিলাম।

এতক্ষণে খলিফা ধাতস্থ হলেন। বুঝতে পারলেন, তার বেগম জুবেদা নিতান্তই নির্দোষী। তার অজ্ঞাতসারে যা ঘটে গেছে তার জন্য তাকে দোষী করা যায় না।

শুধু হারুন অল রসিদ নয়, জুবেদার মুখের কালো মেঘ কেটে গিয়ে খুশির বন্যা ছড়িয়ে পড়লো সারা দেহ মনে। খলিফা নানা মূল্যবান উপহার সামগ্রী এবং অনেক নগদ মোহর ইনাম দিলেন তাকে। বেগম জুবেদাও দিলো মূল্যবান রত্নাভরণ। এবং বললো, আসুন কাজীসাহেব, আজ আপনি আমাদের সঙ্গে খানা করবেন।

মেজেয় পাতা পারস্য গালিচার ওপর খলিফা আর বেগমের মাঝখানে বসে পরিতৃপ্তি করে খানাপিনা করলো কাজী আবু ইউসুফ। বেগম জুবেদা নিজে হাতে বড় বড় পাকা মর্তমান কলা তুলে দিলো কাজীর হাতে, আমার নিজের বাগানের ফল, এ সময়ে এ ফল আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার বাগানে ফলিয়েছি, খান। কলা খেতে আপত্তি নাই তো কাজী সাহেব?

কাজী ইউসুফ বললো, না আপত্তি কেন? আপনি লক্ষ্য করবেন, বিচারের রায়

মনের মধ্যে এইরকম পরিপুষ্ট হয়ে না থাকলে আমি প্রকাশ করি না। এই কলা আপনার অকালের ফল। কিন্তু বেশ পুষ্ট, পাকা।

বেগম জুবেদা তার বাগানের আরও কিছু সুমিষ্ট ফল এনে রাখলো কাজীর সামনে। এক এক করে কাজী সবই উদরস্থ করলো। জুবেদা জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে কোন্‌টা ভালো লাগলো—আপনার রায় শুনতে চাই।

কাজী মৌন হয়ে চিন্তা করলো ক্ষণকাল। তারপর বললো, দেখুন বেগম সাহেবা, সবগুলোই আমি বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছি। এখন আপনি জানতে চাইছেন, কোন ফলটা সেরা। এ প্রশ্নে জবাব দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। তার কারণ ওরা এখন সবাই আমার উদরে। এককে ছেড়ে অন্যকে বেশি প্রশংসা করলে বাকীরা আমার পেটে বিদ্রোহ করবে। আমার বদ হজম হোক এটা নিশ্চয়ই চান না।

জুবেদা এবং হারুন অল রসিদ সশব্দে হো হো করে হেসে ওঠেন।

সুলতান শাহরিয়ার, শাহরাজাদের এই কাহিনী থেকে একটা কথাই বুঝলো, স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ তার বেগমকে কিছুক্ষণের জন্যও দোষী সাব্যস্ত করে খুব সঙ্গত কাজ করেন নি।

শাহরাজাদ সুলতানের এই মানসিক প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গল্পের মধ্যে ডুবিয়ে দেবার জন্য নতুন এক কাহিনী ফেঁদে বসলো।

শাহরাজাদ বলে, এবার পুরুষ না নারী সেই কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

শোনা যায়, পারস্যের মহান সুলতান খুসরাও মাছ খেতে খুব ভালোবাসতেন। একদিন তিনি তার পরমা সুন্দরী বেগমকে নিয়ে ছাদের ওপরে বসেছিলেন। এমন সময় এক জেলে কিছু মাছ নিয়ে সেখানে হাজির হলো। তার ডালা থেকে একটা বিরাট বড় মাছ বের করে সে সুলতানের সামনে তুলে ধরলো। সুলতান তো দেখে মহা খুশি। জেলেকে চার হাজার দিরহাম ইনাম দেবার হুকুম দিলেন তিনি। কিন্তু সুলতানের এই বদান্যতা বেগম সাহেবা সিরিনের মোটেই পছন্দ হলো না। লোকটা চলে গেলে সে সুলতানকে বললো, সামান্য একটা মাছের জন্য এত ইনাম দেবার কী প্রয়োজন? এটা নেহাতই খামখেয়ালী বাজে খরচা। তুমি ওকে অত টাকা দিও না। এর ফলে হবে কি, যখনই কোনও লোক কোনও কিছু নিয়ে আসবে সেও এই রকমই আশা করবে। কিন্তু সবাইকে যদি তুমি এইভাবে খয়রাতি কর, তাহলে লাটে উঠতে হবে যে!

সুলতান বললো, কিন্তু আমি একবার যা দান করেছি তা ফেরত নেওয়া কী সম্ভব? এতে আমার ইজ্জত থাকবে? যা হবার হয়ে গেছে, ছেড়ে দাও।

সিরিন অবাক হয়, তুমি কী বলছো! ব্যাপারটা কী ছেলে খেলা? ছেড়ে দেব বললেই ছেড়ে দেওয়া চলে? তার চেয়ে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে আমি সে ব্যবস্থাই করছি। তুমি ডাকো তাকে?

সুলতান কিছুতেই বুঝতে পারেন না বেগম সাহেবা কীভাবে দুকূল রক্ষা করতে পারবে? জেলের কাছ থেকে টাকাটাও ফেরৎ নেবে অথচ তার ইজ্জত বাঁচবে—তা কী করে সম্ভব?

সিরিন বলে আমি একটা ফন্দী এঁটেছি। জেলেটাকে ডেকে তুমি জিজ্ঞেস কর, মাছটা পুরুষ না মেয়ে। লোকটা একটা কিছু জবাব দেবে। যদি সে বলে, পুরুষ, সঙ্গে সঙ্গে বলবে, না না, পুরুষ মাছ আমি খাই না, তুমি নিয়ে যাও আমি মেয়ে মাছ ছাড়া খাই না। আর যদি

বলে মেয়ে, তুমি বলবে তোমার পুরুষ মাছের দরকার। ব্যাস অতি সহজ ভাবেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

সুলতানের বিবি অন্ত প্রাণ। তাকে তিনি কিছুতেই অখুশি রাখতে পারেন না। ব্যথিত মনেই তিনি জেলেকে ডেকে পাঠালেন।

—ওহে, মাছটা তো দিয়ে যাচ্ছো, তা—মাছটা কী? পুরুষ না মেয়ে?

সুলতানের কথায় জেলে প্রথমে ঘাবড়ে যায়। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। একটুক্ষণ চিন্তা করে সে বলে, জাঁহাপনা এ মাছ পুরুষও না মেয়েও না, একে বলে ক্লীব।

জেলের কথা শুনে সুলতান তো মহা খুশি। ছেলেও না মেয়েও না—ক্লীব। এমন আজব বস্তু তো বড় একটা দেখা যায় না। সে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলো জেলেকে চার হাজারের বদলে আট হাজার দিরহাম ইনাম দিয়ে দাও। জেলেটা তো আনন্দে গদগদ হয়ে গুণে গুণে আট হাজার দিরহাম থলেয় ভরে বাড়ির পথে হাঁটা দিলো।

তখনও সে প্রাসাদ প্রাঙ্গণ পার হতে পারেনি, হঠাৎ তার থলেটার মুখের বাঁধন খুলে গিয়ে সমস্ত দিরহামগুলো আঙ্গিনায় ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়লো। মাথার ডালাটা মাটিতে নামিয়ে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে একটা একটা করে দিরহামগুলো কুড়িয়ে গুণে গুণে আবার থলেয় ভরতে থাকলো। যতক্ষণ না শেষ দিরহামটাও সে খুঁজে পেল ততক্ষণ চললো তার সেই একান্ত অনুসন্ধান।

ছাতের ওপর বসে বসে সুলতান খুসবাও এবং বেগম সিরিন এই দৃশ্য দেখে মজা পেল অনেক।

এই সময় রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো বিরাশিতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

সিরিন বলে, দেখ লোকটা কী লোভী, একটা মাত্র দিরহাম সে খুঁজে পাওয়ার জন্য কী পরিশ্রম না করলো। অথচ এই টাকাগুলো তার আদৌ হকের ধন নয়। তুমি দয়া করে দিয়েছ তাই সে পেয়েছে।

সুলতান বললো, ঠিক—ঠিক বলেছ বেগম সাহেবা, লোকটা এক্কেবারে কঞ্জুস। দাঁড়াও ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সুলতানের হুকুমে তখনি জেলেটাকে হাজির করা হলো। সুলতান বললো, তুমি তো লোকটা বড় কৃপণ হে। এমন চিড়িয়ার মতো দিল কেন তোমার? একটামাত্র দিরহাম তুমি খুঁজে পাচ্ছিলে না। তাতে এমন ভাব দেখাচ্ছিলে যেন, তোমার বিশাল সলতানিয়ৎ দরিয়ায় ডুবে যাচ্ছিল। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কলিজাটা মানুষের না। যে দিরহামটা খোঁজার জন্য এত কসরৎ করলে, যদি সেটা খুঁজে নাই-ই পাওয়া যেত কী এমন যেত আসতো তোমার? তোমার আশার অনেক বেশি তো তুমি আজ পেয়েছ। তার থেকে দু-চারটে যদি হারিয়েই যায়, ক্ষতি কতটুকু? তোমার থলে থেকে যেটা পড়ে গিয়েছিলো সেটা হয়তো কোনও গরীবগুর্বো মানুষ কুড়িয়ে পেত। তার অনেক কাজে আসতো। কিন্তু তুমি বড় অর্থ গৃধ্নু। একটা দিরহামের মায়া তুমি কাটাতে পারো না?

আভূমি আনত হয়ে জেলেটা কুর্নিশ জানায়, খোদা সুলতানকে শতায়ু করুন, দিরহামটা খুঁজে না পেলে যে আমার একটা বিরাট লোকসান হয়ে যেত সে কথা ঠিক নয়, জাঁহাপনা। সামান্য একটা দিরহামের কী মূল্য আমিও জানি। তার জন্য অত সময় এবং অত ধৈর্য ব্যয় করা সঙ্গত না তাও মানি। আমি কিন্তু ঐ দিরহামটাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য ঐরকম

ব্যাকুল হইনি। আমি উদভ্রান্ত হয়েছিলাম অন্য কারণে। আমার রোজগারের পয়সা হলে একটা কেন পাঁচটা দিরহাম আমি ভিখিরিকে দান করেও দিতে পারতাম। কিন্তু এ অর্থ আমার সুলতানের কাছ থেকে পাওয়া ইনাম। এর মূল্য কোনও টাকাপয়সা দিয়ে বিচার করা যাবে না হুজুর। এ আমার কাছে অমূল্য সম্পদ। এর প্রতিটি দিরহাম আমার কাছে লক্ষ মোহরের চাইতেও বেশি।

জেলের এই স্তুতি বাক্য শুনে সুলতান গলে জল হয়ে গেলো। গর্বে তার বুক দশ হাত ফুলে উঠলো। না লোকটা সত্যিই বোদ্ধা। দানের মর্যাদা সে বোঝে। সুলতান হুকুম করলো জেলেকে আরও চার হাজার দিরহাম ইনাম দিয়ে দাও। আর সারা সলতানিয়াতের প্রজাদের ঢ্যাঁড়া পিটে জানিয়ে দাও ঃ মেয়েমানুষের পরমর্শে যেন পুরুষ কোনও কাজ না করে। তাদের কথায় চললে, সাধারণ ভাবে যা লোকসান হওয়ার কথা তার চতুর্গুণ লোকসান বাড়বে।

এই কাহিনী শুনে সুলতান শাহরিয়ার সুলতান খুসরাও-এর প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, সুলতান খুসরাও-এর ফরমান অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। মেয়েরাই যত নষ্টের গোড়া। তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে সংসারের।

সুলতানের কথা শুনে শাহরাজাদ স্মিত হেসে আর একটা গল্প শুরু করে ঃ

একদিন রাতে খলিফার চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসছিলো না। উজির জাফরকে ডেকে খলিফা তার অনিদ্রার দুঃখ জানাচ্ছিলেন এমন সময় দেহরক্ষী মাসরুর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো। তার উচ্চকিত হাসির শব্দে খলিফা বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে মাসরুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এতে হাসির কী হলো? তোমার কী মাথার কিছু বিকৃতি ঘটেছে? তা না হলে এইরকম বেয়াদপের মতো হেসে ওঠার মানে কী?

হারুন অল রসিদের এই ধমকে মাসরুর লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে।

—আমার গোস্তাক্তি মাফ করবেন, জাঁহাপনা। আমি আপনার কোনও কথা শুনে হাসি নি। আপনাকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা আমার কী করে হতে পারে? আমি হাসলাম একটা হাসির কথা মনে পড়ে গেলো বলে।

—কী কথা?

গতকাল টাইগ্রীসের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একদল লোক ইবন অল কবিবী নামে ভাঁড়কে ঘিরে তার কিসসা শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলো। আমিও শুনেছিলাম তার রসের গল্প। সেই কথা মনে হতে হাসি আর চাপতে পারলাম না, জাঁহাপনা।

খলিফা বললেন, তাই নাকি! তা হলে তো শুনতে হয় তার রসাল কিসসা। বেশ, তলব করে নিয়ে এসো তাকে। দেখা যাক, তার হাসি মস্করার গল্প শুনে মেজাজটা হাল্কা হয় কিনা। তা হলে হয়তো ঘুমও আসতে পারে।

তক্ষুণি মাসরুর ছুটে গেলো সেই ভাঁড় ইবন কবিবীর সন্ধানে। খুঁজে পেতে তাকে ধরে নিয়ে এলো খলিফার প্রাসাদে। খলিফার সামনে হাজির করার আগে মাসরুর তাকে কড়ার করতে বললো, দেখ ভাঁড় আমার জন্যেই তুমি আজ খলিফার সামনে দাঁড়াতে পারছো। তা শোনো, তোমার কিসসা শুনে খলিফা খুশি হয়ে যা বকশিস করবেন তার তিনভাগ আমাকে দেবে আর এক ভাগ নেবে তুমি।

লোকটা চোখ কপালে তুললো, তুমিই তিন ভাগ নিয়ে নেবে? আমার একটা কথা রাখ। যা পাবো তার দু ভাগ তোমাকে দেব, আমি নেব এক ভাগ। মাসরুর আরও কিছু দর

কষাকষি করতে চেয়েছিলো, কিন্তু দেরি হয়ে যাবার আশঙ্কায় সে বললো, ঠিক আছে, চলো।

ভাঁড়টাকে দেখে খলিফা তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি নাকি খুব লোক হাসাতে পার? তা আমাকে দু-একটা শোনাও দেখি তোমার চুটকী। কিন্তু একটা কথা, তোমার চুটকী শুনে যদি আমার মজা না লাগে, হাসি না পায় তবে চাবুকের ঘা খেতে হবে, মনে থাকে যেন?

খলিফার সামনে এমনিতেই দাঁড়াতে তার হাত-পা কাঁপছিলো, এখন এই চাবুকের ভয়ে হাসি তামাশা বেমালুম সব তার মগজ থেকে উবে গেলো। অনেক চেষ্টা করেও একটা চুটকী সে মনে করতে পারলো না। যতই সে ভাবতে চেষ্টা করে ততই সব গুলিয়ে যেতে থাকে। ঘামে সারা শরীর নেয়ে যায়। হাত-পা সিটকে ধরে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না—তো তো করতে থাকে।

খলিফা ধমক দেয়, থামো, আর ন্যাকামী করতে হবে না। এই কে আছিস, একশো ঘা চাবুক লাগাও। যদি বা চাবুকের চোটে বাছাধনের মগজ খোলসা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাতক এসে লোকটাকে মাটিতে ফেলে চাবুকের ঘা বসাতে থাকে। ভাড়টা মুখ বুজে নীরবে সহ্য করে এই সাজা প্রতিটি চাবুকের ঘা গুণতে থাকে সে। এক-দুই-তিন ...এইভাবে তিরিশ ঘা পর্যন্ত সে একটিও শব্দ উচ্চারণ করে না। কিন্তু তার পরেই সে তড়াক করে উঠে বসে, এর পরের চাবুকগুলো মাসরুরকে মারার হুকুম দিন জাঁহাপনা।

খলিফা অবাক হন, কেন? মাসরুরকে কেন?

ভাঁড় বলে, এখানে আসার আগে মাসরুর আমাকে কড়ার করিয়ে নিয়েছে, আপনার কাছ থেকে যা পাবো তার দুভাগ সেই নেবে, আমি পাবো একভাগ মাত্র।

খলিফা গর্জে উঠলেন, কোথায় মাসরুর, ধরে নিয়ে এসো তাকে। লাগাও চাবুক। প্রহরীরা বেঁধে নিয়ে এসে হাজির করে মাসরুরকে। সপাং সপাং করে চাবুকের ঘা পড়তে থাকে তার পিঠে। কয়েক ঘা মাত্র মারা হয়েছে হঠাৎ খোজা-সর্দার হা হাঁ করে ওঠে, থামো থামো। আর ওকে নয়। বাকীটা আমার পিঠে মারো।

এই সব কাণ্ড দেখে খলিফা হেসে গড়িয়ে পড়েন। হাসতে হাসতে তার দেহ মনের সব গ্লানি সাফ হয়ে যায়। ঝরঝরে তাজা মানুষ হয়ে ওঠেন তিনি। জাফরকে বলেন, ওদের তিনজনকে হাজার দিনার করে বকশিস দিয়ে দাও।

তখনও রাত বেশ কিছু বাকী। শাহরাজাদ আরও একটা ছোট গল্প বলতে শুরু করে—এক মাদ্রাসার মৌলভীর কিসসা ঃ

এক বাউণ্ডেলে ছিলো। তার একমাত্র ব্যবসা পরের ঘাড় ভেঙে খাওয়া। পেটে বোমা মারলে তার 'ক' বেরুবে না—এইরকম বিদ্যাধর সে। একদিন সে মতলব ভাঁজলো মাদ্রাসার মৌলভী হবে সে। নানারকম বোলচাল দিয়ে এবং কায়দা কৌশল করে হলেও সে একটা মাদ্রাসা খুলে বসলো। ভাবতে অবাক লাগে, সাধারণ ভাষাজ্ঞান বিন্দুমাত্র নাই, অথচ সে মৌলভী হয়ে গেলো। এমন মুরুব্বী চালে সে কথাবার্তা বলতো যাতে মনে হবে তার মতো ভাষাবিদ বুঝি সে তল্লাটে আর দুটি নাই। সাধারণ মানুষ তার বোলচালে ভাবলো, সত্যিই বুঝি বা সে বিদ্যার দিগ্গজ। নিজেদের ছেলেদের পাঠাতে লাগলো তার মাদ্রাসায়। কিন্তু লোকটা লেখাপড়া শেখানোর ধারে কাছ দিয়েও যায় না। রোজ সে বেত হাতে ভারিক্কী চালে

মাদ্রাসায় এসে বসে। ছাত্ররা কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে কটমট করে তাকায়। ছেলেরা ভয় পেয়ে সরে যায়।

ছেলেরা নিয়মিত বই বগলে মাদ্রাসায় হাজির হয়। নিজেরাই পড়ে, আবার নিজেরাই বই বগলে করে বাড়ি চলে যায়। এইভাবে দিনে দিনে মৌলভীর মাদ্রাসা বেশ জমে ওঠে। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলে। টাকাও রোজগার হতে থাকে ঢের।

একদিন মৌলভী রোষকষায়িত চোখে বেত হাতে বসেছিলো তার কুর্শিতে। এমন সময় এক অশিক্ষিত জেনানা একখানা খৎ হাতে সেখানে এসে হাজির হলো। সবিনয়ে মেয়েটি চিঠিখানা মৌলভীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, মেহেরবানী করে খৎখানা যদি একবার পড়ে দেন—

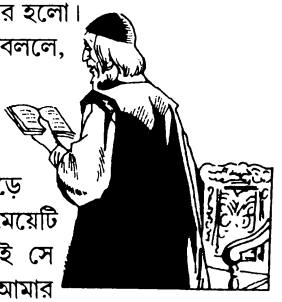

মৌলভী তখন দিশাহারা হয়ে পড়ে। এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায়—ভাবতে পারে না সে। কুল-কিনারা না পেয়ে সে ব্যস্ত বাগীশের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা দিয়ে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা। চিঠিখানা পড়ানো তার বিশেষ দরকার। তাই সে মৌলভীর পথ রোধ করে কাকুতি মিনুতি করে, দয়া করে আমার চিঠিখানা পড়ে দিয়ে যান মৌলভী সাহেব—

মৌলভী বলে, আমার এখন সময় নাই। তাড়া আছে, তুমি অন্য সময় এসো। দুপুরবেলার নামাজের আজান হচ্ছে। আমি আর দেরি করতে পারবো না। আমাকে মসজিদে যেতে হবে।

—আল্লাহ আপনার ভাল করবেন, মেয়েটি প্রায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চায়, আমার স্বামী আজ পাঁচসাল বিদেশে গেছে। এতকাল বাদে এই তার প্রথম খৎ এসেছে। আমি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছি না। আপনি আমাকে বাঁচান, একটিবার পড়ে শোনান, সে কেমন আছে, কোথায় আছে, কবে আসবে—কী লিখেছে।

মেয়েটি প্রায় জোর করেই চিঠিখানা গুঁজে দিলো তার হাতে। আর কোনও কাটাবার পথ নাই দেখে চিঠিখানা নিতে সে বাধ্য হলো। ভাঁজ খুলে উল্টো করে মেলে ধরলো। তারপর বিড়বিড় করে পড়ার ভান করতে করতে নানারকম বিচিত্র মুখভঙ্গী করতে থাকলো সে। কখনও বা কপাল চাপড়ালো, কখনও বা মাথার টুপী খুলে নামিয়ে রাখলো, আবার কখনও বা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

মৌলভীর এই রকম ভাবভঙ্গী দেখে বেচারী মেয়েটির বুঝতে আর বাকী রইলো না, খবর শুভ নয়। হয়ত বা তার স্বামী আর বেঁচে নাই। ভয়ার্ত কণ্ঠে কোনও রকমে সে প্রশ্ন করতে পারে, কী খবর মৌলভী সাহেব? সে কি তবে বেঁচে নাই? আল্লার দোহাই, আমার মুখের দিকে চেয়ে সত্যি কথা বলুন, কোনও কিছু লুকাবেন না।

মৌলভী তখনও মুখে রা কাড়ে না। শুধু ফ্যাল ফাল করে চেয়ে থাকে মেয়েটির মুখের দিকে।

আকুলভাবে সে প্রশ্ন করে, চুপ করে থাকবেন না মৌলভী সাহেব। বলুন, আমি কী এই সাজপোশাক ছিঁড়ে ফেলবো?

মৌলভী গম্ভীরভাবে শুধু বলে, ফেলো।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, আমি কী কপাল চাপড়াবো, বুক চাপড়াবো?

—চাপড়াও।

—আমি কী ডুকরে ডুকরে কাঁদবো?

—কাঁদো।

শোকে প্রায় উন্মাদের মতো মেয়েটি ছুটে মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে যায়। কপাল বুক চাপড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। সাজ-পোশাক কুটি কুটি করে, ছিঁড়তে ছিঁড়তে ছুটে চলে বাড়ির পথে। পাড়া-পড়শীরা ছুটে আসে। কী হলো, কী ব্যাপার।

মুখে বলার অপেক্ষা রাখে না, সবাই পলকে বুঝতে পারে অভাগীর কপাল পুড়েছে। তার স্বামীটার ইন্তেকাল ঘটেছে।

কী আর সান্ত্বনা দেবে তারা। এমন দুঃখের দিনে কিইবা সান্ত্বনা দেওয়া যায়। তবু অনেকে বোঝাবার বৃথা চেষ্টা করে, কেঁদে আর কী হবে বলো। আল্লাহ যাকে টেনে নিয়েছেন তাকে তো, হাজার মাথা কুটলেও ফেরৎ পাবে না বাছা। যাও, ঘরে যাও।

এই সময় গ্রামের একজন শিক্ষিত শেখ, তারই এক আত্মীয়, এগিয়ে এসে বলে, কই দেখি খতে কি লিখেছে।

চিঠিখানা পড়ে থ হয়ে যায় সে। একি! কে বলেছে তোমার স্বামী মারা গেছে। কে পড়ে দিয়েছে তোমার চিঠি? সে সব তো কিছু লেখা নাই। আমি পড়ছি শোনো ঃ

'চাচার মেয়ে, তোমাকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আমি খুব বহাল তবিয়তেই আছি। এক পক্ষর মধ্যেই দেশে ফিরবো। কতদিন তোমার সঙ্গে মিলন হয়নি। এই লেফাফার মধ্যে আমি একটুকু শনের সুন্দর কাপড় তোমাকে উপহার পাঠালাম। আল্লাহ তোমার সহায় থাকুন।'

এই কথা শোনার পর মেয়েটি চিঠিখানা নিয়ে আবার মাদ্রাসার দিকে ছুটে চলে। মৌলভীকে সে জিজ্ঞেস করবে তাকে এই রকম ধোকা দেবার কারণ কী? সে তার কী সর্বনাশ করেছে!

মাদ্রাসার দরজায় ঢুকতেই মৌলভীর দেখা পেলো সে। —একটা গরীব মেয়েছেলেকে এইভাবে ধোঁকা দিয়ে আপনার কী লাভ হলো মৌলভী সাহেব? কেন এমন প্রতারণা করলেন আমার সঙ্গে? আমার স্বামী তো লিখেছে, সে খুব ভাল আছে। এবং দিন পনেরোর মধ্যেই সে দেশে ফিরবে। খামের মধ্যে একখানা ছোট কাপড়ের টুকরো পাঠিয়েছে সে।

মৌলভী বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, তুমি ঠিকই বলেছ, মা। আমি ঐ সময় ভীষণ চিন্তিত অন্যমনস্ক ছিলাম। কী বলতে কী বলে ফেলেছি আমার কিছু মনে নাই। যাইহোক, শুনে সুখী হলাম, তোমার স্বামী সুস্থ আছেন, এবং শিগগিরই দেশে ফিরছেন।

এরপর শাহরাজাদ মেয়েদের সেমিজের কারুকর্মের কথা বলতে থাকে।

খলিফা অল-মামুনের ভাই অল আমিন একদিন তার চাচা অল মাহদীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখলো একটি পরমা সুন্দরী বাঁদী কিনে এনেছে তার চাচা। বড় চমৎকার সে গান বাজনা জানে।

মেয়েটিকে দেখামাত্র সে তার মহব্বতে মজে গেলো।

ব্যাপারটা অল মাহদীর নজর এড়ায় না। ভাবে, ভাইপো আমার সুন্দরী বাঁদীর মোহে পড়েছে। অল আমিন যখন পাশের ঘরে বিশ্রাম করছিলো সেই সময় অল মাহদী বাঁদীকে বললো, খুব ভাল করে সেজেগুজে তুমি আমার ভাইপোর ঘরে যাও। ও তোমার ওপর নজর দিয়েছে। মনে হয় তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে।

বাঁদীটা সবচেয়ে দামী সাজ-পোশাক আর রত্নাভরণে নিজেকে সুন্দর করে সাজালো। তার রূপের জেল্লা-—তার ওপর এই রকম মোহিনী সাজ—যে কোনও পুরুষের বুকেই আগুন ধরাতে পারে।

পায়ে পায়ে সে অল আমিনের ঘরে এসে দাঁড়ায়। কাজল কালো সুর্মাটানা চোখের বান হানে। আমিনের বুকে রক্তের নাচন শুরু হয়।

মেয়েটি মুচকী হেসে খানিকটা কাছে সরে আসে। ফিস ফিস করে বলে, আমাকে তোমার পছন্দ?

আমিন কী করে বোঝাবে তাকে; প্রথম দর্শনেই সে মরেছে।

আমিন জানতো, তার চাচা কচি ডাসা মেয়ের সন্ধান পেলে সব কাজ ফেলে তার পিছনে ধাওয়া করে। এ কথা আমি কেন, পাড়া-পড়শীরা সবাই জানে। এই কচি সুন্দরীকে সে অনেক আশা করে কিনে এনেছে। মেয়েটির দেহে এখনও যৌবনের পুরো ঢল নামেনি। এই রকম মেয়েই তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। তার মুখের জিনিসে আমিন ভাগ বসাতে পারবে না। মেয়েটিকে বললো। পছন্দ আমার খুবই। কিন্তু তুমি চাচার কাছে ফিরে যাও। তোমাকে আমি গ্রহণ করতে পারবো না।

মেয়েটি আমিনের চোখে চোখ রাখে, কেন?

—চাচা তোমাকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছে। আমি তার ভোগে ভাগ বসাতে চাই না।

চাচাকে চিঠি লিখলো ঃ কচি কাঁচা আপেল গাছ থেকে পেড়ে সব মালী বাজারে নিয়ে যায়—সে তার কী দাম আশা করতে পারে? বাজারে তার তো কোনও চাহিদাই নাই!

অল মাহদী চিঠিখানা পড়ে ভাবলো, ভাইপো ভুল বুঝেছে। সে ভেবেছে বাঁদীটা এখনও নেহাতই বালিকা। মেয়েটিকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা করে, শুধুমাত্র একটি পাতলা ফিনফিনে রেশমী শেমিজ পরিয়ে, হাতে একখানা বীণা দিয়ে আবার আমিনের ঘরে পাঠিয়ে দিলো সে। শেমিজটার ওপরে সুন্দর সূচীকর্ম করা ছিলো। সুতোর বুননে একটি চমৎকার কবিতার কয়েকটি ছত্র ফুটে উঠেছিলো ঃ

এখনও সে কোনও হাতের স্পর্শ পায়নি,
একেবারে আনকোরা, অপাপ বিদ্ধা।
অতি সঙ্গোপনে আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম,
ভয় ছিলো, কোনও লোভাতুর শ্যেন দৃষ্টি বুঝি তাকে বিক্ষত করে।
কিন্তু না, বিশ্বাস করো, আজও আনকোরা—অপাপ বিদ্ধ,
সে শুধু এখন তোমারই,
প্রাণ ভরে আঘ্রাণ করো।

মেয়েটির যাদুকরী যৌবনের আকর্ষণে অল আমিন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। কবিতার কলিগুলো তার শিরায় শিরায় অনুরণিত হতে থাকলো।

শাহরাজাদ আবার বলতে থাকে ঃ

একদিন খলিফা মুতাবাক্কিল অসুস্থ বোধ করে হেকিমকে ডেকে পাঠালেন। হেকিম যুহান্না একটি চমৎকার দাওয়াই-এর ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলো। খলিফা দিন-কয়েকের মধ্যে সেরে উঠে। হেকিমকে ডেকে তিনি নানা উপহার ইনাম দিলেন।

দেশের নানা প্রান্তর থেকে নানাজনে খলিফাকে অভিনন্দন জানিয়ে বহু বিচিত্র রকমের উপঢৌকন পাঠাতে লাগলো। অল ফাও ইবন কাহকন তাঁকে একটি পরমা সুন্দরী কুমারী বাঁদী পাঠালো। তার সুললিত দেহবল্লরী পুরুষের বুকে তুফান তোলে। তার সুডৌল আপেল সদৃশ ডাসা দুটি স্তন যে কোন নারীর হিংসার বস্তু। সেই সুন্দরী শুধু তার রূপ

যৌবনের পশরা নিয়েই খলিফার সামনে হাজির হলো না, সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো একটি মহামূল্যবান সুধাপাত্র। সুদক্ষ কারিগরের নিপুণ হাতের কাজ করা ওই সুরাপাত্রখানি সত্যিই লোভনীয়। বাঁদী একটি সোনার পেয়ালায় সুধাপাত্র থেকে মদ ঢেলে খলিফার হাতে তুলে দেয়। এই পেয়ালাটার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলা বসিয়ে লেখা ছিলো ঃ

হেকিমের ছুরি, কিংবা
মোক্ষম দাওয়াই অথবা মলম
কোন কোন অসুখের হতে পারে উপশম
কিন্তু যদি আগাগোড়া দেহটাই নড়বড়ে হয়,
তখন মদের পেয়ালা ছাড়া আর কিছুতেই কিছু নয়।

এই সময় খলিফার পাশে হেকিম যুহান্না উপস্থিত ছিলো। বাঁদীর হাতের ঐ পেয়ালার বাণী পড়ে সে হো হো করে হেসে ওঠে।

নিন জাঁহাপনা, আপনার আসল দাওয়াই এসে গেছে। আমার ওষুধে যা ফল পেয়েছেন, তার অনেক বেশি ফল পাবেন এই সুন্দরী বাঁদী আর তার সুরা পাত্র পান করে। দুনিয়াতে যত রকম প্রাচীন এবং আধুনিক দাওয়াই আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে এই দুটোই সেরা।

এরপর শাহরাজাদ অন্য কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

এই কাহিনীটা মসুলের বিখ্যাত কালোয়াতী গায়ক ইশাকের ঃ

একদিন রাত্রে প্রচুর মদ্যপান করে আমি বাড়ি ফিরছিলাম। ভীষণ প্রস্রাবের বেগ দিচ্ছিল। আমার তলপেটটা টনটন করছিলো। আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। রাস্তার একধারে বিরাট প্রাচীর দেখে সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে প্রস্রাব করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরে জলধারা নির্গত হওয়ার পর শরীরটা বেশ হাল্কা মনে হলো। মাটি নিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাবো এমন সময় ওপর থেকে কি একটা কঠিন বস্তু এসে আঘাত করলো আমার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলাম। আঁতকে ছিটকে সরে গেলাম কয়েক হাত। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ে দেখি প্রাসাদের ওপর থেকে কে বা কারা রেশমীর দড়িতে বেঁধে নামিয়ে দিয়েছে একটা সুন্দর কাঠের বাক্স। ওপরটা খোলা। বাক্সের ভিতরে পাতা একখানা সুন্দর কাজকরা সুগন্ধী আসন।

সে দিন মদের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিলো। বেশ নেশা হয়েছিলো। নেশার ঝোঁকেই বুঝিবা কোনও কিছু চিন্তা ভাবনা না করে সোজা গিয়ে বাক্সটার মধ্যে বসে পড়লাম। তখন আমাকে এক অদ্ভুত মজায় পেয়ে বসেছিলো।

একটু পরে রেশমীর দড়িতে টান পড়লো। ধীরে ধীরে বাক্সটা ওপরে উঠতে লাগলো। আমার কোন বিকার নাই, যেমন বসেছিলাম তেমনি বসে রইলাম। বাক্সটা আমাকে নিয়ে ক্রমশ উপরে উঠতে উঠতে প্রাসাদের এই অলিন্দে উঠে এলো। কয়েকটি মেয়ে, মনে হল পরিচারিকা টরিচারিকা হতে পারে, আমাকে ইশারায় নেমে ঘরের ভিতরে এসে কুর্শিতে বসতে বললো। আমি সুবোধ বালকের মতো তাদের নির্দেশ মতো বাক্স ছেড়ে বেরিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলাম। মেয়েগুলো আমাকে বসিয়ে রেখে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ বাদে আর একটি সুবেশা তরুণী এসে আমাকে বললো, আমার সঙ্গে আসুন।

আমি মন্ত্রচালিতের মতো তাকে অনুসরণ করলাম। সে আমাকে অনেক বারান্দা, অনেক দরজা পার করিয়ে একটি সুন্দর সাজানো গোছানো ঝকঝকে তকতকে

বিলাসবহুল শয়ন কক্ষে নিয়ে এসে বললো, আপনি এই গদী-আঁটা আরাম কেদারাটায় বসুন।

আমি তার আজ্ঞামতো মুখটি বুজে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলাম। নেশাটা ততক্ষণে থিতিয়ে এসেছে। এদিক ওদিক যতই যা কিছু নজরে পড়ে ততই কেমন ঘাবড়ে যাই। একিরে বাবা, এ আমি কোথায় এলাম! এমন সব দামী দামী বাহারী সাজ-পোশাক, আসবাব পত্র—এ তো সাধারণ মানুষের ঘরে থাকার কথা নয়। তবে কি—নেশার ঘোরে প্রাসাদেরই অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছি নাকি?

সামনে একটা বিরাট রেশমী পর্দা। একটু পরে ধীরে ধীরে পর্দাটা উঠে গেলো। দেখলাম গোটা দশেক সুন্দরী রমণী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে একজন পূর্ণ শশী নিন্দিতা অনিন্দ্য সুন্দরী। সারা ঘর দামী আতর-সুবাসে মদির হয়ে গেলো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সালাম জানালাম। মধ্যমণি স্মিত হেসে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, আমার কী সৌভাগ্য, আজ এলেন আমার ঘরে। আপনি মুসাফীর, এই প্রথম দেখলাম কিন্তু মনে হচ্ছে, যেন কত কালের চেনা। তা দাড়িয়ে রইলেন কেন, মেহেরবানী করে বসুন।

আমি বসলাম। সেও আমার পাশে বসলো। ততক্ষণে আমার নেশা ফেশা কেটে জল হয়ে গেছে। খুব শান্ত সংযত হয়ে বসে রইলাম তার পাশে।

সুন্দরী প্রশ্ন করে, এই রাতে, এই পথে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? আর ঐ বাক্সেই বা বসলেন কেন? আপনি কী জানতেন, আমি বাক্সটা নামিয়ে দিয়েছিলাম?

আমার জবাব ঃ পথে চলতে চলতে ভীষণ প্রস্রাব পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু খোলামেলা পথের ধারে বসি কি করে? তাই একটু আড়াল খুঁজতে খুঁজতে আপনাদের প্রাচীরের সামনে এসে বসে পড়লাম। প্রস্রাব শেষে উঠতে যাবো, এমন সময় মাথায় একটা বাড়ি খেলাম। তাকিয়ে দেখি, একটা ঢাকনা খোলা রেশমীর সুতোয় বেঁধে উপর থেকে নামানো হচ্ছে। আমি তখন মদে চুর হয়ে আছি, মাথায় কেমন বদ বুদ্ধি খেলে গেলো। ভাল মন্দ কী হতে পারে না পারে ভাবতে চাইলাম না, বাক্সের মধ্যে এসে বসে পড়লাম। বিশ্বাস করুন, বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বসিনি আমি। নেহাতই মজা—নেহাতই খেয়াল। বলতে পারেন সরাবের শয়তানী।

মেয়েটি আমার কথার মধুর প্রতিবাদ করে, আহা, শয়তানী হতে যাবে কেন? আমি খুব খুশি হয়েছি, সাহেব। মনে হচ্ছে যেন, কতকাল ধরে আপনারই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আর কালগুণে বসেছিলাম আমি। আপনি এলেন বসন্ত ফাল্গুনে। আমি বড় আনন্দ পেলাম। তা সাহেবের কী করা হয়?

আমি যে খলিফার সভা গায়ক ইশাক সে কথা তাকে বলবো কী করে? তাহলে পরদিন সকালে সারা শহরে টিটি পড়ে যাবে না? খলিফার প্রিয় গায়ক-ইশাক তামাম আরব-জোড়া যার নাম সে কিনা লম্পটের মতো চোরের মতো ঢুকছে এক রমণীর অন্দর মহলে! নিজের পরিচয় গোপন করে বললাম, এ বান্দা, এই শহরেই তাঁতীবাজারে কাপড় বুনে।

মেয়েটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—কী সুন্দর আপনার বলার ঢং। আর কী চমৎকার আপনার ব্যবহার। আপনি তো আপনার তাঁতীকুলের শিরোমণি। আপনাকে দেখে কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিলো, আপনি কবিটবি বা তেমনি একজন কেউকেটা কিছু হবেন। কাব্য-টাব্য চর্চা করেন নিশ্চয়ই! কোনও নাম করা কবির পয়ার কিছু জানেন?

—খুবই সামান্য।

—তা যদি মেহেরবানী করে দু-একটা সায়ের শোনান।

না না, শোনাবার মতো তেমন কিছু জানি না। এই মানে মাঝে-মধ্যে একটু আধটু পড়ি-টড়ি আর কি? আমি বলি, তার চেয়ে আপনি আমাকে দু-চারটে শোনান। আজ রাতে আমি তো আপনার মেহেমান। আমার মনোরঞ্জন করাই তো আপনার কাজ—

মেয়েটি বলে, নিশ্চয়ই শোনাবো। আমি যা জানি সব শোনাবো আপনাকে।

এক এক করে অনেকগুলো ভালো কবিতা আবৃত্তি করলো সে। বিখ্যাত সব কবির লেখা। প্রাচীনদের মধ্যে ইমুরু অল কাইস, জুহাইর, আন্তার, নবীঘা, আমির ইবন কলুতুম এবং তারাফা। আর একালের কবিদের মধ্যে ছিলো আবু নবাস, অল বাক্কাশী আর আবু মুসারের কবিতা। সবচেয়ে ভালো লাগলো মেয়েটির আবৃত্তি করার নিজস্ব এক সুন্দর ভঙ্গী। তার সুললিত কণ্ঠের উচ্চারণ আজও আমার কানে বাজে।

মেয়েটি বললো, আশা করি এতক্ষণে লজ্জার জড়তা আপনার কেটে গেছে। এবার নিশ্চয়ই দু-একটা শোনাবেন—

আমি কাকুতি মিনতি জানাই, আপনি বিশ্বাস করুন, সুন্দরী, লজ্জা বা ভয়ের জন্য নয়, জানা থাকলে সানন্দে আপনাকে শোনাতাম। কিন্তু সত্যিই আমি ও-সব রসে একেবারে বঞ্চিত। যাই হোক, আপনার যখন এতই ইচ্ছা, দু-একটা পদ্য আমি বলছি। যদি কোথাও ছাড় হয়ে যায় বা ভুলচুক হয়, মেহেরবানী করে শুধরে দেবেন।

খুব নাম করা বাছা বাছা দুটি কবিতা মোটামুটি চলনসই কায়দায় আবৃত্তি করলাম। সঙ্গত এবং অতি সহজ ভাবেই আমার কণ্ঠে সুর এসে পড়ে। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে আবৃত্তি দুটি সুর-বিহীন করার সচেতন প্রয়াস করেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার আবৃত্তি শুনে সুন্দরী বিশেষ পুলকিত হয়েছিলো।

—হায় বাপ্, কী সুন্দর ভরাট আপনার গলা। যেন মধু ঝরছিলো! তাঁতী-বাজারে এমন হীরে পাওয়া যায় তাতো জানা ছিলো না?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো পঁচাশিতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

নানা উপাচারে সাজিয়ে খানাপিনার ব্যবস্থা করা হলো। মেয়েটি নিজে-হাতে আমাকে পরিপাটি করে খানাপিনা পরিবেশন করলো। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মেজে পরিষ্কার করে সরাবের ঝারি এবং সুদৃশ্য পেয়ালা এনে রাখলো সে। এক পাত্র মদ ঢেলে সে আমার হাতে দিলো।

—এবার আপনার দু-একটা কিসসা শুনতে চায় এই বাঁদী।

আমি বললাম, বহুৎ আচ্ছা, বেশ শোনাচ্ছি।

বেশ কয়েকটা মজাদার কিসসা শোনালাম তাকে। আমার গল্প বলার কায়দায় কখনও সে হেসে খুন, আবার কখনও বা ভয়ে শিউরে উঠতে লাগলো। সবই একালের শাহবাদশাহদের দরবারের কাহিনী।

এক সময়, গল্পের মাঝখানেই সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, তাজ্জব কী বাত, সামান্য একজন তাঁতীর পক্ষে খলিফার দরবারের এমন নিখুঁত খুটিনাটি সবিস্তারে বর্ণনা কী করে দেওয়া সম্ভব?

অবাক হওয়ারই কথা। কিন্তু আমার সৌভাগ্য, খলিফার দরবারের এক কর্মচারী

আমার জীগরী দোস্ত। প্রতি দিন সে দরবার থেকে ফিরে এসে সব বৃত্তান্ত আমাকে শোনায়। তা না হলে এত সব ভেতরের কথা, আমি এক নগণ্য তাঁতী, জানবো কেমন করে?

সে যাই হোক, আপনার মনে রাখার ক্ষমতারও তারিফ করতে হয়। এমনভাবে বলছেন, যেন সব নিজের চোখে দেখা—

সুন্দরীর লাস্যময় ভঙ্গী, চোখের বাণ, অধরের মধুর হাসি এবং দেহের সুবাস আমাকে সারাটা রাত মোহিত করে রেখেছিলো। সে-দিনের সেই সুন্দর রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তের সুখ-স্মৃতি আজও আমাকে পুলকিত করে। তেমন সুখের রমণীয় রাত্রি তার আগে আমার জীবনে একটিও আসেনি।

মেয়েটি বলে, আপনার কথাবার্তায় কী সুন্দর মার্জিত ভাব। আপনার শান্ত সৌম্য চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দেখে মনে হয় আপনি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষ থেকে কত আলাদা। আর একটা অনুরোধ আপনাকে জানাবো, যদি মেহেরবানী করে আমার সঙ্গে একটু গানবাজনা করেন। আমার খুব ইচ্ছে—খুব খুশি হবো।

সঙ্গীত আমার পেশা। তাই এই আনন্দ পরিবেশে গান গাইবার কোন স্পৃহা আমার নাই। বললাম, এক সময় গান শেখার শখ হয়েছিলো, কসরৎ করেছিলাম যথেষ্ট। কিন্তু আমার গানের ইন্দ্রজালে যখন শুরু গর্দভরাই ছুটে আসতে লাগলো তখন থেকে পাড়াপড়শী ইয়ার দোস্তদের একান্ত অনুরোধে তা বন্ধ করে দিয়েছি। আর কখনও গাইনি।

আমার কথা শুনে সুন্দরী হেসে লুটিয়ে পড়ে।—ইয়া আল্লাহ, কী মজার মানুষ আপনি! কী সুন্দর করে কথা বলেন।

—বিশ্বাস করুন, গান আমার আসে না। তা না হলে আপনার মতো রূপসী কন্যা আমাকে এত খোসামোদ করছেন—আমি রাখতাম না?

তার চেয়ে আপনি গেয়ে শোনান। আপনার কণ্ঠের আওয়াজ শুনে আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি ও বিদ্যায় আপনি পটিয়সী। আজকের এই মধুযামিনী আরও মধুময় হয়ে উঠুক আপনার সুরের মুর্ছনায়। আর দেরি নয় সুন্দরী, আপনি শুরু করুন।

আমি ভেবেছিলাম, আর পাঁচটা মেয়েছেলে যেমন সাধারণভাবে গায় সেও তেমনি কিছু একটা গাইবে। কিন্তু তার অপূর্ব কণ্ঠ, তালমান লয় জ্ঞান শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেলো। এতো তাবড় তাবড় নাম জাদা ওস্তাদদেরও তাক লাগিয়ে দেবে!

আমাকে বিস্ময়ে হতবাক দেখে সে খুব খুশি হলো।

—জানেন, কার লেখা গীত এটা?

আমি যথারীতি অজ্ঞতার ভান করে বললাম, না; বলতে পারবো না।

—সে কী! তামাম দুনিয়ার কারো কি অজানা এই গীত? আবালবৃদ্ধবণিতা কে না জানে এর গায়ক আর গীতকারের নাম? আপনি জানেন না, এর গীতকার কবি আবু নবাস, আর গেয়েছেন মসুলের বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ ইশাক?

আমার মুখের কোনও ভাব পরিবর্তন হলো না। বললাম, ইশাকের গান আমি শুনেছি। কিন্তু আপনার কাছে সে দাঁড়াতে পারবে না। এমন গলা সে পাবে কোথায়?

—থাক থাক, খুব হয়েছে, অত মিথ্যে তোষামদে আমার মন ভরবে না, সাহেব, গুণী লোকের মর্যাদাহানী করে বাহবা পাওয়া যায় না। ইশাকের জুড়ি তামাম আরব দুনিয়ায় নাই। এ আপনি কী বলছেন? আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইশাকের গান আপনি শোনেন নি কখনও।

এই বলে আবার সে গাইতে থাকলো। এবং মাঝে মাঝে থেমে সে আমাকে ইশাকের মহিমা বোঝাতে লাগলো। এইভাবে সারাটা সুন্দর রজনী এক সময় অতিক্রান্ত হয়ে

গেলো। গান থেমে গেছে, কিন্তু তার মধুর রেশ তখনও সেই ঘরের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছিলো। এক অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিলো আমার মনপ্রাণ। কেমন করে কোথা দিয়ে যে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেলো সেই রাতটা টেরই পেলাম না। সুখের সুন্দর মুহূর্তগুলো বুঝি এমনিভাবেই তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

একজন বয়স্কা ক্রীতদাসী এসে জানালো, রাত আর নাই। সকাল হতে চলেছে। এবার আসর বন্ধ করতে হবে। না হলে পালাবার পথ বন্ধ হযে যাবে।

সেই বিদায়বেলায় তার চোখের করুণ চাহনী আমি কখনও ভুলবো না। একটিমাত্র রাতের পরিচয়, কতটুকুই বা সময়, কিন্তু তার মধ্যেই যেন আমরা অনেক অনেক শীত গ্রীষ্ম বসন্ত অতিক্রম করে ফেলেছি। মনে হলো এই অচেনা অজানা অনিন্দ্য সুন্দরী যেন কতকালের চেনা, কত গভীর নিবিড় অন্তরের অচ্ছেদ্য বন্ধনে যেন আমরা বাঁধা। তাই এই বিদায়ের বেলায় বিচ্ছেদের বাণ বুকে বড় বেশি করে বাজে।

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মেয়েটি বলে, আপনি সারা রাত ধরে যেভাবে আমায় সুখসঙ্গ দান করলেন তার জন্য বহুৎ সুক্রিয়া।

আমি বলি, থাক না, ধন্যবাদের কী বা প্রয়োজন। আমি কী দিতে পেরেছি জানি না, কিন্তু যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। একে সামান্য শুকনো ধন্যবাদে খাটো করে দেবেন না।

মেয়েটি অবাক হয়, আপনি সত্যিই সমঝদার মানুষ। ক্বচিৎ কখনও সখনো, বরাতে থাকলে, এমন গুণী-জ্ঞানী মানুষের সঙ্গ লাভ করা যায়—

আমি আর দাঁড়ালাম না। এখনি দিনের আলো ফুটবে। তাড়াতাড়ি আবার সেই বাক্স চেপে তরতর করে রাস্তায় নেমে পড়ি।

সকালবেলায় নামাজ সেরে শুয়ে পড়লাম। সারাটা দিন পড়ে পড়ে ঘুমালাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তাড়াতাড়ি সাজ পোশাক করে প্রাসাদের দিকে রওনা হলাম। প্রাসাদের সচিব আমাকে জানালো, খলিফা বাইরে বেরিয়েছেন। তিনি না ফেরা পর্যন্ত আমি যেন অপেক্ষা করি। কারণ সে রাত্রে খলিফা এক উৎসবের আয়োজন করেছেন। জোর খানাপিনা নাচ গান হবে।

আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলো। তখনও খলিফা ফিরলেন না দেখে আমি প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার তখন রক্তে নাচন শুরু হয়েছে। চলতে চলতে এক সময় আবার সেই প্রাসাদ-প্রাচীরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। কি যেন এক অদ্ভুত নেশার পেয়ে বসেছিলো আমাকে। না হলে, সে রাতে আবার সেই সুন্দরীরর ঘরে যাবার তো আমার কথা ছিলো না। তবু আমি কলের পুতুলের মতো সেই বাক্সটার মধ্যে বসে পড়লাম। পলকের মধ্যে আবার আমি উঠে এলাম প্রাসাদ-অলিন্দে। সেই নির্বাক মেয়েগুলো আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে গেলো সুন্দরীর ঘরে।

আমাকে দেখে সে হো হো করে হেসে উঠলো। —খোদা হাফেজ, মনে হচ্ছে এইখানে আপনি পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিতে চান!

আমি মাথা নত করে সালাম জানিয়ে বললাম, তা যদি হয় মন্দ কী। আমি আপনার অতিথি, হিসেব মতো অতিথির সৎকার যথাযোগ্যভাবে তিন দিন করার নিয়ম। আজ আমার দ্বিতীয় দিন। তৃতীয় দিনের পরেও যদি আমি আবার হ্যাংলার মতো আসি তখন নিশ্চয়ই কথা শোনাতে পারেন আপনি।

সে রাত্রিও বেশ হাসি গল্প গানবাজনার মধ্যে দিয়ে কেটে গেলো। খুব আনন্দ পেলাম। রাত্রি শেষে আবার যখন বিদায় জানিয়ে বাক্সে গিয়ে বসলাম তখন আমি খলিফার রোষের কথা ভেবে আতঙ্কিত হতে থাকলাম। ভাবলাম, খলিফা আমার কোনও কৈফিয়ৎই মানবেন না। একমাত্র এই রোমাঞ্চকর অভিসারের কাহিনী যদি তাকে বলতে পারি তবেই হয়তো ঠান্ডা হতে পারেন। সেই মুহূর্তে আমার নিচে নামা হলো না। আবার ফিরে গেলাম সুন্দরীর ঘরে।

—কী ব্যাপার, ফিরে এলেন যে?

আমি বললাম, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আপনি তো গান খুব ভালোবাসেন। কিন্তু আমি তো আপনার সে-সাধ মেটাতে পারলাম না। আমার এক সম্পর্কে ভাই আছে, সে খুব ভাল গায়। ভেবেছি আজ রাতে তাকে নিয়ে আসবো আপনার ঘরে। তার গলা শুনলে আপনি খুব খুশি হবেন। তা ছাড়া দেখতে তিনি সুপুরুষ—। ওস্তাদ ইশাকের প্রায় সব গানই সে সুন্দর করে গাইতে পারে। আপনি যদি আজ্ঞা করেন তাহলে আজ রাতেই তাকে নিয়ে আসতে পারি। আর কথা দিচ্ছি, অদ্যই শেষ রজনী। এর পর আপনাকে আর বিরক্ত করবো না।

রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো ছিয়াশিতম রজনীর দ্বিতীয় যামে আবার সে শুরু করে ঃ

মেয়েটি বলে, আপনার কি মাথাটাথায় কিছু গোলমাল ঘটেছে? তা —আপনার ভাইকে যদি এখানে আনতে চান আনুন, আপত্তির আর কী থাকতে পারে। বলছেন, তিনি গানটান জানেন। বেশ ভালই হবে, নিয়ে আসবেন তাকে।

তার অনুমতি আদায় করে আমি ফিরে এলাম বাক্সের কাছে। তরতর করে নেমে পড়লাম নিচে।

বাড়ি ফিরে দেখি, খলিফার প্রহরী দরজায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখা মাত্র গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলো তারা খলিফার দরবারে। পথে যেতে যেতে অনেক গালমন্দ করতে লাগলো লোকগুলো।

দরবারে ঢুকেই দেখি, রোষ কষায়িত নয়নে খলিফা বসে আছেন তখ্‌তে। চোয়ালের পেশী কঠিন হয়ে উঠেছে। আমাকে দেখামাত্র তিনি গর্জে উঠলেন, এ্যাই কুত্তাকা বাচ্চা, এত বড় স্পর্ধা তোমার, আমার হুকুম অগ্রাহ্য করতে সাহস পাও। জান এই বেয়াদপির কী সাজা?

—দোহাই ধর্মাবতার, আমার সব কথা আগে শুনুন, তার পর সাজা দিতে হয় দেবেন। কিন্তু মেহেরবানী করে না শুনে কিছু করবেন না, হুজুর, এই আমার আর্জি।

—বলো কী তোমার কৈফিয়ৎ।

—এই প্রকাশ্য দরবারে সে-কথা বলা যাবে না, জাঁহাপনা। নিভৃতে বলতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে দরবারের সবাইকে বাইরে চলে যেতে বললেন তিনি। তখন আমি তাঁকে গত দুটি রাত্রির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

—আজ রাতে সে আমাদের দু'জনের জন্যেই পথ চেয়ে থাকবে। আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছি জাঁহাপনা, আজ আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

এতক্ষণে খলিফা মামুনের মুখে হাসি ফুটলো।

—তাই বলো, তা তুমি এক্ষেত্রে আমার হুকুম অমান্য করে খুব একটা অপরাধ করনি। ঠিক আছে, যাবো। তুমি যে সেখানে বসেও আমার কথা চিন্তা করেছ তার জন্য আমি খুশিই হয়েছি, ইশাক। তাহলে ওই কথাই রইলো, সন্ধ্যা হতে না হতে তৈরি হয়ে চলে আসবে এখানে।

আমি বলি যথা সময়ে বান্দা হাজির হবে জাঁহাপনা। কিন্তু আপনার কাছে একটা

আমার আর্জি, আমার আসল পরিচয়টা ফাঁস করে দেবেন না সেখানে। তাহলে বড় বেইজ্জৎ হব। আমি বিশ্বাস ঘাতক হবো—তার কাছে। দোহাই আপনার—

খলিফা হাসলেন, ঠিক আছে, আমার মনে থাকবে। ও-নিয়ে তুমি কোনও দুশ্চিন্তা করো না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই খলিফা এক সওদাগরের ছদ্মবেশ ধরে আমাকে নিয়ে পথে নামলেন। চলতে চলতে এক সময় সেই প্রাসাদ-প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়ালাম দু'জনে। একটু পরেই সেই বাক্সটা নেমে এলো। আমরা দু'জনেই চেপে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম সুন্দরীর সুরম্য শয্যাকক্ষে।

সে রাতে সে আরও সুন্দর করে সেজেছিলো। তাকালে চোখ আর ফেরানো দায়। আমি লক্ষ্য করলাম, খলিফা অপলকভাবে তাকিয়ে দেখছে তাকে। তার রূপের জৌলুস তাকে প্রায় পাগল করে তুলেছে।

তারপর সুন্দরী যখন সুমধুর তানে গান ধরলো খলিফার অবস্থা তখন কাহিল। বুঝতে পারলাম তিনি আর তাঁর মধ্যে নাই তখন। সুন্দরীর ধ্যানে তাঁর চৈতন্যর দফা-রফা হয়ে গেছে। বেহেড মাতালের মতো অসংলগ্ন প্রলাপ বকতে লাগলেন তিনি। আমি প্রমাদ গুনলাম।

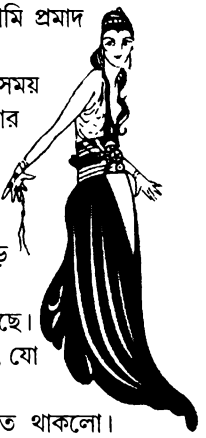

আনন্দে উল্লাসে দিশাহারা খলিফার দিল্ তখন দরিয়া সদৃশ। এক সময় তিনি আমাকে আরও কাছে সরে আসতে বললেন, ইশাক, এসো আমার কাছে এসো। তুমি কেন তোমার গান শুরু করছ না, ইশাক। তোমার গান শুনে তামাম দুনিয়া পাগল হয়, আর আজ রাতে এই সুন্দরীর পাশে মুখ বুজে বসে রয়েছ! এমন সহেলী রাত কী রোজ রোজ আসবে ইশাক। গাও, তোমার সব চাইতে ভালো গানগুলো শোনাও তাকে। বড় গুণী মেয়ে, গুণের কদর করবে।

মরমে মরে গেলাম আমি। আমার সব ছলনা ধরা পড়ে গেছে। মেয়েটির কাছে আমি মিথ্যেবাদী হয়ে গেলাম। মাথা হেট করে বললাম, যো হুকুম জাঁহাপনা।

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে আমাদের দু'জনকে দেখতে থাকলো। তারপর এক সময় কোনও কথাবার্তা না বলে ভীত-চকিত এক হরিণীর মতো পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেললো। সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এই ছদ্মবেশী সওদাগর স্বয়ং খলিফা ছাড়া আর কেউ নন। আমার 'জাঁহাপনা' হুজুর এই সব সম্বোধন তার মনে অনেকক্ষণ ধরেই সন্দেহের উদ্রেক করেছিলো। এবার আমার পরিচয় ফাঁস হওয়াতে সে নিঃসন্দেহ হয়ে গেলো ইশাকের সঙ্গীটি সুলতান ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। যেহেতু সুলতানের সামনে কোনও নারীই বেআব্রু থাকতে পারে না, সেই কারণে সে পর্দার আড়ালে চলে গেলো।

খলিফা ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, আমাকে কী মনে ধরলো না? পালিয়ে গেলো কেন ইশাক?

এ কথার আমি আর কী জবাব দেবো। খলিফা এবার কিছু রাগ প্রকাশ করলেন, খোঁজ নাও তো, মেয়েটি কে? এই বাড়ির মালিককে একবার তলব কর।

আমি খলিফাকে ফিসফিস করে বললাম, ওসব কথা শুনলে এরা যে আপনাকে সন্দেহ করবে, জাঁহাপনা।

খলিফা জিভ কামড়ালেন। আমাকেও তর্জন করলেন, তোমারই বা কী বুদ্ধি! এরকম 'জাঁহাপনা টাঁহাপনা' না বললেই কী হতো না!

—ইস্, তাই তো ভারি বেকুফের মতো কাজ হয়ে গেছে—

খলিফা বললেন, আর লুকিয়ে কোনও লাভ নাই। সবই সে জেনে ফেলেছে। যাই হোক, বাড়ির মালিককে একবার খোঁজ করতো।

বৃদ্ধা দাসীটার কাছ থেকে জানতে পারা গেলো সেই প্রাসাদের মালিক খলিফারই দরবারের উজির শাহল্। এই সুন্দরী মেয়েটি তারই।

খলিফার হুকুমে উজির এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়। মুখে চোখে দারুণ বিস্ময় আর আতঙ্ক। খলিফাকে এইভাবে এখানে দেখবে তা সে স্বপ্নে ভাবতে পারেনি।

খলিফা অল মামুন হো হো করে হেসে ওঠেন, এ তোমার মেয়ে?

—হ্যাঁ, হুজুর।

—কী তার নাম?

—কাদীজা।

—শাদী হয়েছে?

—না, হুজুর।

খলিফা বললেন, আমার ইচ্ছা, তোমার মেয়েকে আমি ধর্ম মতে শাদী করে বেগম করবো। তোমার কী মত, বলো।

উজির বলে, আমি এবং আমার মেয়ে জাঁহাপনার একান্ত আজ্ঞাবহ, হুজুর। আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

তোমার মেয়েকে আমি একলক্ষ দেন মোহর দেবো, উজির। কাল সকালে আমার প্রাসাদে গিয়ে তুমি টাকাটা নিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে তোমার মেয়েকে তুমি রাজি করাও। তাকে আমার বেগম হওয়ার মতো করে তৈরি কর। আমি তোমার মেয়ের পরিবার পরিজনদের জন্য এক হাজারটি গ্রাম এবং এক হাজারটি খামার যৌতুক দেবো। তুমি সবাইকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিও।

এই বলে খলিফা উঠে দাঁড়ালেন। আমিও। এবার আমরা সদর ফটক দিয়েই রাস্তায় বেরুলাম। বাক্সে ঝুলে নামার আর দরকার হলো না।

খলিফা আমাকে সতর্ক করে বললেন, এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু বলবে না, ইশাক।

খলিফা এবং কাদীজা যতকাল জীবিত ছিলেন একথা কারো কাছে কখনও আমি বলিনি। এতটা বয়স হলো, জীবনে অনেক নারী আমি দেখেছি, কিন্তু কাদীজার মতো পরমা সুন্দরী একটাও চোখে পড়েনি। আল্লা জানেন, তার সমান সুন্দরী তিনি আর কাউকে বানিয়েছেন কিনা।

গল্প শেষ হলে দুনিয়াজাদ উঠে এসে শাহরাজাদকে জড়িয়ে ধরে। কী সুন্দর কিসসা, দিদি। আর কী অপরূপ মিষ্টি করেই না তুমি বলতে পারো।

শাহরাজাদ বলে, এর পর তোমাদের আর একটা কিসসা শোনাই।

মক্কায় প্রতি বছর একটা সময়ে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। তারা দলে দলে কাবাহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া চায়। একদিন এইভাবে একদল তীর্থযাত্রী কাবাহ প্রদক্ষিণ করছিলো আর যে যার নিজের নিজের মনের কামনা বাসনা নিবেদন করছিলো। পুণ্যার্থীদের একজনের অদ্ভুত ধরণের মনস্কামনা শুনে সবাই ক্ষেপে আগুন হয়ে ওঠে। লোকটা কাবাহ প্রদক্ষিণ করতে করতে বারবার একটিমাত্র কথাই আওড়াচ্ছিল ঃ

'আল্লাহ, মেয়েটা যেন তার স্বামীকে ঘৃণা করতে শেখে। তাহলে আমার বরাত খুলে যাবে। আমার সারা জীবনের একমাত্র বাসনা তাকে নিয়ে আমি শোবো।'

এই ধরনের অপবিত্র নোংরা কথা ধর্মস্থানে যদি কেউ উচ্চারণ করে তবে কি মুখ বুজে সহ্য করা সম্ভব? তাই ক্ষিপ্ত জনতা তার ওপর চড়াও হয়ে কিল চড় লাথি ঘুসি ইত্যাদি বেপরোয়াভাবে চালাতে থাকে। এতই তারা ক্রোধান্বিত হয় যে, বেধড়ক মার-ধোর দিয়েও তারা ক্ষান্ত হলো না। সবাই মিলে তাকে কাবাহ আমিরের কাছে টেনে নিয়ে গেলো। এই আমিরই মক্কার সর্বময় কর্তা। তার ওপর আর কারো কোনও কথা চলে না। সুলতানেরও না।

সব শুনে সে রায় দিলো, লোকটাকে ফাঁসীতে ঝোলাও।

এই সময় রাত্রির অন্ধকার কেটে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো সাতাশিতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

কিন্তু লোকটা আছাড় খেয়ে পড়লো আমিরের পায়ে, দোহাই ধর্মাবতার, আপনি আল্লাহর পয়গম্বর। আমার সব কথা না শুনে এই গুরুদণ্ড আমাকে দেবেন না।

আমির বলল, ঠিক আছে, বলো তোমার কী বলার আছে।

লোকটা তখন বলতে থাকে ঃ

আমি দুটি ব্যবসা করি। রাস্তার যতো নোংরা জঞ্জাল সাফ করা আমার প্রথম কাজ। এছাড়া কসাই এর দোকান থেকে ভেড়ার নাড়িভুড়ি কুড়িয়ে পরিষ্কার করে বিক্রি করি। এই আমার জীবিকা।

একদিন আমার গাধাটার পিঠে এইরকম সংগৃহীত নাড়িভুড়ি চাপিয়ে আমি তার পিছনে পিছনে চলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম একদল লোক ভীতচকিত সন্ত্রস্ত হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে। আর তাদের পিছু পিছু ইয়া বড় বড় লাঠি সোটা নিয়ে তাড়া করে আসছে কতকগুলো সশস্ত্র নিগ্রো ক্রীতদাস। তাদের একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, কী হয়েছে?

লোকটা বললো, হারেমের মেয়েরা এই পথ দিয়ে যাবে। তাই পথঘাট জনশূন্য করার হুকুম হয়েছে।

তার কথা শুনে আমার হৃদকম্প শুরু হলো। এখন আমি কী করি, কোথায় লুকাই। দিশাহারা হয়ে গাধাটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি রাস্তার দিকে পিছন ফিরে একটা বাড়ির দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলাম কোনভাবেই যাতে আমার নজর না যায় খানদানী ঘরের মেয়ের ওপর।

একটুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম বহু দাসী খোজা পরিবৃত হয়ে হারেমের মেয়েরা পার হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রায় দেওয়ালে সেটে গেছি তখন। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি পাওয়া গেলো না। দুটো নিগ্রো এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। দুদিক থেকে দু'জনে ঝাপটে ধরলো আমাকে। আমি তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছি। মুখ ফিরে দেখলাম, আর একটা নিগ্রো আমার গাধাটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর দেখলাম গোটা তিরিশেক মেয়ে আমাকে ড্যাব ড্যাব করে দেখছে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে ডানা কাটা হুরীর মতো অপূর্ব সুন্দরী। তার কাজল কালো টানাটানা চোখ, টিকলো নাক, আপেলের মতো টুকটুকে গাল, পাকা আঙুরের মতো অধর বেহেস্তের হুরীকেও হার মানায়।

আমার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বেঁধে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো নিগ্রো দুটো। আমি যতই বলি, আমি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কোনও কিছুই দেখিনি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। পথচারীরাও আমার হয়ে ওকালতী করলো অনেক। কিন্তু নিগ্রো দুটো কোনও কথাই কানে তোলে না। কয়েকজন রুখে এলো আমার হয়ে, একি অন্যায় কথা, এর কী দোষ? কেন একে পাকড়াও করেছ। পথঘাট সাফা রাখা এর কাজ। রাস্তা ছাড়া ও যাবে কোথায়? তা ছাড়া হারেমের কোনও জেনানার দিকে তো নজর দেয় নি। ওতো দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলো। এইরকম একজন নিরীহ নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন না।

কিন্তু আমাকে যারা পাকড়াও করেছিলো তাদের কানে ঢুকলো না তার কথা। টানতে টানতে আমাকে নিয়েই চললো তারা।

আমি শুধু ভাবতে লাগলাম এমন কি অপরাধ আমি করলাম যার জন্য এরা আমাকে এইভাবে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। একবার মনে হলো, আমার গাধার পিঠে-বোঝাই কাঁচা নাড়িভুঁড়ির দুর্গন্ধে হয়তো কোন গর্ভবতী মেয়ের গা গুলিয়ে গিয়ে থাকবে। আর তারই রোষে পড়েছি আমি! অথবা আমার এই শতছিন্ন ময়লা সাজপোশাক দেখে তারা কুপিত হয়েছে! যা হোক, এ বিপদ থেকে এখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই বাঁচাতে পারবে না আমাকে।

সহৃদয় পথচারীদের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে তারা আমাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যেতে থাকলো। আমাদের সামনে সামনে চলেছে হারেমের বিশাল বাহিনী।

চলতে চলতে এক সময় তারা এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সদর ফটকে এসে ঢুকলো। ভিতরে ঢুকে আমাকে এক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। প্রাসাদের আদালত যে এত চমৎকার সাজানো গোছানো জমকালো ভাবতে পারে না সে। কাজীর বিচার, নির্ঘাৎ গর্দান যাবে আমার। এইভাবে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। আমার পরিবারের কেউই তো জানতে পারবে না, জলজ্যান্ত মানুষটা কাজে গেলো, আর ফিরলো না। হাজার খুঁজেও কি তারা আমার লাশের হদিশ করতে পারবে?

অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকি আমি। একটু পরে একটি ক্ষুদে ছোকরা বান্দা এসে আমাকে সঙ্গে করে একটা হামামে নিয়ে গেলো। সেখানে দেখলাম, তিনটি মেয়েছেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখা মাত্র তারা বললো, তোমার ঐ জগঝম্প সাজপোশাকগুলো খুলে ফেলো।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাদের কথা মতো বিবস্ত্র হলাম। ওরা আমাকে গরম জলের ফোয়ারার পাশে নিয়ে গেলো। শ্বেত পাথরের মেঝেতে আমাকে শুইয়ে ফেলে সাবান খোসা আর গরম জল দিয়ে উল্টেপাল্টে আচ্ছা করে ডলাইমলাই করতে থাকলো। সাতজন্মে আমি গায়ে সাবান মাখি নি। পানির অভাবে ভালো করে গোসল করতে পারি নি। এক পরত মলয়া জমে জমে দেহের আসল রঙ কবে যে চাপা পড়ে হারিয়ে গিয়েছিলো আমি নিজেই বুঝতে পারি নি। সাবান খোসা দিয়ে সাফা করার পর নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেই আমি অবাক হয়ে যাই। এমন কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ কি আমার কখনও ছিলো? ওইরকম শঙ্কা ভয়ের মধ্যেও মুহূর্তের জন্য আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে। ঘষা মাজা শেষ

হয়ে গেলে ওরা আমাকে আতর সুবাসিত চৌবাচ্চার জলে চুবিয়ে দিলো। অনেকক্ষণ ধরে অবগাহণ করে গোসল করলাম। তারপর ওরা আমাকে শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভালো করে গা হাত-পা মুছিয়ে দিলো। এর পর পাশের আর একটা কামরায় নিয়ে গিয়ে নতুন সাজপোশাক পরালো। এমন জমকালো বাদশাহী সাজে আমি শুধু আমির বাদশাহদের সাজতে দেখেছি। সাধারণ মানুষ এসব পরার স্বপ্নও দেখতে পারে না। আমি ভাবতে থাকলাম, এবার যদি ওরা আমাকে ফাঁসীর দড়িতেও ঝোলায় তাতেও আমার দুঃখ নাই। জীবনটা তো রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে, জঞ্জাল সাফা করে আর ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করেই কাটলো। লোকে আমাকে ধাঙড় বলে দশ হাত দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আমি অস্পৃশ্য, অসূচী। কিন্তু আজ এই ইন্তেকালের সময় আমার সব সাধ পূরণ হয়ে গেলো। কয়েক দণ্ডের জন্য হলেও আমি তো শাহজাদার মতো সাজতে পেরেছি। আমার আর কোনও দুঃখ নাই।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো অষ্টআশিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পরিপাটি করে সাজিয়ে গুজিয়ে ওরা আমার গায়ে গোলাপজল আর দামী আতরের খুসবু ছিটিয়ে দিলো। তারপর আমার হাত ধরে নিয়ে চললো। চলেছি—যেন এক শাদীর পাত্র। এক্ সুরম্য শয্যাকক্ষে নিয়ে গিয়ে আমাকে সোনার পালঙ্কে মখমলের বিছানায় বসতে বললো তারা। এমন সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর আমি জীবনে কখনও দেখিনি। মুখে আমার এমন কোনও ভাষা নাই, সে ঘরের বাহারের বর্ণনা দিতে পারি। দামী দামী আসবাব আবরণে সারা ঘরটা চমৎকার করে সাজানো।

রাস্তায় যে মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিলো বেহেস্তের ডানা কাটা হুরী, তাকে দেখলাম পালঙ্কের মাঝখানে গা এলিয়ে শুয়ে আছে। পাতলা ফিনফিনে মসুলের সূক্ষ্ম কাজ করা শুধুমাত্র একটা রেশমী-কামিজ তার গায়ে। আর কোনও পোশাক নাই। পালঙ্কের চারপাশ ঘিরে রয়েছে এক দঙ্গল বাঁদী। মেয়েটি ইশারায় বললো, তার কাছে ঘেঁষে বসতে। বাঁদীদের হুকুম করলো, খানাপিনা সাজাও।

পলকের মধ্যে মেঝেয় কাপড় পাতা হলো। নানা রকম নাম-না-জানা সুগন্ধী খানা-পিনা এনে সাজিয়ে দিলো তারা। এ-সব খানা আমি জীবনে কখনও, আস্বাদ করা দূরে থাক, চোখে দেখিনি। কত রকম মাংসেরই খাবার। আঘ্রাণেই পেট ভরে যায়।

খিদেও পেয়েছিলো যথেষ্ট, খুব তৃপ্তি করে খেলামও। খানা শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে ফল খেলাম দু একটা। নানা রকম সরাবের পাত্র সাজানো হয়েছিলো। এবার সুন্দরী নিজ হাতে সোনার পেয়ালায় সরাব ঢেলে তুলে দিলো আমার হাতে। নিজেও নিলো এক পেয়ালা।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে পেয়ালা নিঃশেষ করলাম আমরা। মৌতাত বেশ জমে উঠলো। গুলাবী নেশায় ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে থাকে আমার চোখ। সুন্দরীও তখন নেশায় বুদ হয়ে গেছে।

এবার সে ইশারা করতেই দাসী বাঁদীরা সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। মেয়েটি এক হ্যাঁচকাটানে আমাকে তার বুকের ওপর নিয়ে গিয়ে ফেললো। আমি একেবারে তার দেহের সঙ্গে সেঁটে গেলাম। ওর বুকের ডাসা স্তন দুটি নিপীড়িত হতে থাকলো আমার বুকের তলায়।

তারপরের ব্যাপার আর আপনার সামনে বলতে পারবো না, আমির সাহেব। তবে সহজেই অনুমান করতে পারছেন। আমার খেটে খাওয়া শক্ত সমর্থ দেহের উত্তপ্ত

মাংস পেশীর নিষ্পেষণে তার কামজরজর কুসুম পেলব দেহবল্লরী এক সময় অসাড় হয়ে নেতিয়ে পড়লো।

আমি আর সে সারাটা রাত স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো জড়াজড়ি করে কাটালাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো দেখি, ভোর হয়ে আসছে। সে বললো, আর না, এবার তোমার যাবার সময় হয়ে গেছে, উঠে পড়। লক্ষ্য করলাম, মেয়েটির মুখে চোখে কামনার কোনও চিহ্ন নাই—এক অনাবিল প্রশান্তির ছাপ নেমে এসেছে।

আমি উঠে পোশাক পরে নিলাম। সে আমাকে একখানা কাজ করা রেশমী রুমাল উপহার দিয়ে বললো, এটা কাছে রেখ, আমার কথা মনে পড়বে।

রুমালের এক কোণে কী যেন বাঁধা ছিলো। আর এক কোণে লেখা ছিলো 'গাধাটাকে খাবার কিনে দিও।'

—তোমাকে আমার মাঝে মাঝে প্রয়োজন হবে। লোক পাঠাবো—তার সঙ্গে চলে আসবে, কেমন?

আমি ঘাড় নেড়ে বলি, সে তো আসবোই—

গাধাটাকে নিয়ে নাড়িভুঁড়ির আড়তে গেলাম। মালগুলো বিক্রি করে দিলাম। রুমালখানা বের করে খুঁটে বাঁধা বস্তুটা নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করতে করতে ভাবলাম, হয়তো বা কিছু তামার পয়সা বাঁধা আছে। কিন্তু গিটটা খুলতেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। পঞ্চাশটা সোনার পয়সা। এক সঙ্গে এতগুলো মুদ্রা দেখিনি কখনও। একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে পয়সাগুলো পুঁতে রেখে আবার দোকানের সামনে এসে রোয়াকে বসলাম।

নিজের মনেই গত রাতের অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর অভিযানের স্মৃতিচারণ করতে থাকলাম। এইভাবে সারাটা দিন কেমন করে কেটে গেছে, বুঝতে পারিনি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমি তখনও একভাবে ঠায় বসে আছি দোকানের রোয়াকে, এমন সময় একটা লোক এসে আমাকে বললো, চলো যেতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করি, কোথায়?

—চলো, গেলেই জানতে পারবে।

আমি লোকটাকে অনুসরণ করে চলি।

আবার সেই প্রাসাদের হারেমে এসে পড়লাম। সেই বিলাসবহুল সুরম্য শয্যা কক্ষে। সেই স্বল্পবসনা সুন্দরী ঠিক তেমনিভাব মখমলের শয্যায় গা ডুবিয়ে শায়িতা। পালঙ্কের চারপাশে বোবা বাঁদীরা দণ্ডায়মান।

আমি আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে। সে আমাকে ইশারায় বসতে বললো তার পাশে। তুড়ি বাজাতেই খানাপিনা সাজানো হলো মেজ-এ। তেমনি নানা জাতের মুখরোচক সব সুন্দর সুন্দর খাবার। তৃপ্তি করে খেলাম।

তারপর সে নিজের হাতে ঢেলে দিলো আমাকে সরাব। নিজেও নিলো। ধীরে ধীরে নেশা জমতে থাকে। ইশারা করতেই বাঁদীরা বাইরে চলে যায়। আমাকে টেনে নেয় সে বুকে। তারপর আমার কঠিন বাহুর বন্ধনে তার মোমের মতো দেহখানা গলে গলে নিঃশেষ হতে থাকে। সারাটা রাত এই ভাবে সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সুধাপাত্র পূর্ণ করে নেয়। বিনিময়ে সকালবেলা সে আমাকে একখান কাজ-করা রেশমী রুমালে বেঁধে পঞ্চাশটা সোনার দিনার ইনাম দেয়। আমি আবার ফিরে যাই সেই গর্তটার পাশে। আগের পয়সাগুলোর সঙ্গে এক করে রেখে দিই সেদিনের দিনারগুলো।

এইভাবে এক এক করে আটটা রাত্রির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, আর কিছু স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করি আমি। প্রতি রাত্রেই খানাপিনা অঢেল এলাহী বন্দোবস্ত করে সে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা যথারীতি সেই সুন্দরীর ঘরে খানাপিনা সেরে সবে আমার সাজ-পোশাক খুলতে আরম্ভ করেছি, এমন সময় একটি বাঁদী এসে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলে আবার তক্ষুণি দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো। আমি লক্ষ্য করলাম; একটা অজানা আতঙ্কের রেখা ফুটে উঠলো তার কপালে। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো সে। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলো ছাদের ওপরে চিলে কোঠায়। ছোট্ট খুপরীর মতো একটা ঘর। সেখানে পুরে শিকল তুলে দিয়ে সে চলে গেলো।

অন্ধকারাচ্ছন্ন খুপরীর দু পাশে দুটো ছোট্ট ঘুলঘুলি। কানে এলো অশ্ব খুর ধ্বনি। একদল লোক ঘোড়া ছুটাতে ছুটাতে এসে থামলো প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। বেশ পরিষ্কার দেখতে পেলাম। এক অপূর্ব সুন্দর সুঠামদেহী এক নওজোয়ান, আর তার জনাকয়েক নফর চাকর। ঘোড়া থেকে নেমেই প্রায় ছুটে এসে সে ঢুকে পড়লো সুন্দরীর শয্যা কক্ষে।

আমি অন্য একটা ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে সে-ঘরের খোলা জানালা দিয়ে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করতে থাকলাম। ক্ষিপ্র হাতে সে তার সাজ-পোশাক খুলে ছুঁড়ে দিলো। যুবকের দেহ-সৌষ্ঠব দেখার মতো। যেন এক দুর্ধর্ষ জাঁদরেল বীর সেনাপতি। ক্ষুধার্ত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো সে মেয়েটির দেহের ওপর। তার কামোত্তেজিত নাকের শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ কানে আসতে লাগলো। মনে হয়, যেন কোনও কামার-শালার হাপর চলেছে। আর রিরংসায় জরজর মেয়েটির চীৎকার শুনে বুঝতে কোনও কষ্ট হলো না, এই রকম আসুরিক পৌরুষের দাপট আর দংশন না হলে নারীর কামনার ক্ষুধা মেটানো যায় না। সারারাত ধরে আমি লক্ষ্য করতে থাকলাম ওদের নানা রকম শৃঙ্গার, রাগমোচন আর রতিরঙ্গ। নিজেকে বড় দীন ভিখারী অসহায় মনে হতে লাগলো। আমার দেহে তো তাগদ নাই—ওই ভাবে কী আমি তুষ্ট করতে পারি?

রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো ঊননব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে।

রাত্রি শেষ হতে এক এক করে অনেকবার তারা রতিরঙ্গে মাতলো। তারপর ভোরের আলো ফোটার আগে ওর স্বামী আবার সাজ পোশাক পরে সশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে সুন্দরী এসে শিকল খুলে আমায় আবার ঘরে নিয়ে আসে। —আমার স্বামীকে দেখলে?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। খুব সুন্দর সুপুরুষ দেখতে। তা এমন বীর সেনাপতির মতো তাগদ তার, তোমার তো সব কামনা বাসনাই সে ভালো করে মেটাতে পারে, তাকে ফেলে আমার মতো একটা ধাঙড়-মেথরকে ঘরে নিলে কেন তুমি?

মেয়েটি বললো, ঠিকই বলেছ, আমার স্বামীর যা ক্ষমতা, কম পুরুষেরই তা থাকে। কিন্তু সে-ই বুঝি হয়েছে আমার কাল। তুমি তো সারারাত ধরে দেখলে, আচ্ছা তুমিই বলো, একটা মরদের এত পৌরুষ কী কোনও মেয়ে সব সময় সহ্য করতে পারে। হয়তো কখনও সখনও তাকে পুরোপুরি খুশি করতে পারি না, তাতে সাহেবের গোঁসা হয়ে যায়। একদিন হয়েছে কি, শোনো ঃ আমি আর আমার স্বামী সন্ধ্যাবেলা বাগিচার ভিতরে বসে আছি। হঠাৎ কী হলো, আমাকে বসিয়ে রেখে সে উঠে চলে গেলো। আমিও পায়ে পায়ে তার পিছনে

পিছনে আসলাম। তারপর যা দেখলাম তা আর কী বলবো। আমাদের বাসন মাজার এক আধবুড়ি ঝিকে নিয়ে সে রসুইখানার মেঝেয় একখানা মাদুর পেতে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। সারা শরীর আমার রী রী করে জ্বলতে লাগলো। কি কুৎসিৎ তার রুচি প্রবৃত্তি। সেই দিনই আমি কসম খেলাম। এর উচিৎ জবাব একটা দিতেই হবে। মনে মনে ঠিক করলাম, ও শুয়েছে বাসন মাজা ঝিকে নিয়ে। আর আমি শোবো রাস্তার সবচেয়ে নোংরা কুৎসিৎ কোনও ধাঙড় মেথরকে নিয়ে। সেই কারণে পরদিন থেকে রাস্তায় বেরুতে শুরু করলাম। কোথায় পাওয়া যায় সবচেয়ে নোংরা কুৎসিৎ—সমাজের সবচেয়ে নিচুতলার একটা মানুষ, তারই সন্ধানে। পর পর পাঁচদিন খোঁজার পর সে-দিন তোমার দেখা পেলাম। এই কদিন তোমাকে নিয়ে শুয়ে আমি আমার গায়ের ঝাল মিটিয়েছি। যোগ্য প্রতিশোধ আমি নিতে পেরেছি তার ওপর। ব্যাপারটা সে আঁচ করেছে। তাই কাল রাতে আমার ঘরে আবার এসেছিলো। যাক আপাতত একটা ফয়সালা হয়ে গেছে। আমাকে সে কথা দিয়েছে, আর কখনও ঐরকম নোংরা কাজ সে করবে না। কিন্তু পুরুষ মানুষকে আমি বিশ্বাস করি না। তবে এও তোমাকে আমি বলে রাখছি, ফের যদি সে কথার খেলাপ করে আবার আমি তোমাকে ডাকবো। যাক, আপাতত তুমি বিদায় হও। পরে দরকার হলেই আবার ডাকবো।

সে দিন যাবার আগে সে আমাকে এক থোকে আরো চারশো সোনার দিনার ইনাম দিয়েছে। আমি সেই থেকে পথ চেয়ে আর দিন গুণে বসে আছি। কবে তার স্বামী আবার কোনও একটা মেয়েমানুষের কাছে যাবে, কবে আমার আবার ডাক পড়বে। কিন্তু দিনে দিনে মাস যায় মাসে মাসে বছরও কাটে, আমার দয়িতা আমাকে ডাকে না। তাই আমার মনের মধ্যে ঝড় উঠেছে। আমি আর থাকতে না পেরে বহু পথ হেঁটে, অনেক কায়-ক্লেশে এই মক্কায় এসেছি খোদাতালার দরবারে আমার মনের দুঃখ জানাতে। যদি তিনি আমার কাতর প্রার্থনা শুনে প্রসন্ন হন—এই ভরসায় কাবাহ প্রদক্ষিণ করার সময় আমার একমাত্র বাসনাই তাকে জানাচ্ছিলাম। আপনিই বলুন, আমির সাহেব, কী আমি অপরাধ করেছি?

লোকটাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। খুব একটা মারাত্মক কিছু দোষ ওর নাই।

রাত্রি তখনও অনেক বাকী। শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা, এবার দু'একটা ছোট গল্প শুনুন। তারপর কাল থেকে আবার বড় গল্প আরম্ভ করবো।

সুলতান শাহরিয়ার বললো, গল্পের যাদুকর আমির ইবন মাসাদার কোনও কিস্‌সা তুমি জান শাহরাজাদ?

শাহরাজাদ মৃদু হেসে বলে, খুব জানি। বলুন তার কোন্ গল্প শুনতে চান?

শারিয়ার বলে, আবু ইসার একটা কাহিনী শোনাও।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

একদিন হারুন আল রসিদের পুত্র আবু ইসা তার এক মাসতুতো ভাই আলী ইবন হিমাস-এর বাড়ি বেড়াতে এসেছিলো। আলী বিত্তশালী ব্যক্তি। অগণিত দাস দাসীর সে মালিক। আলীর এক অসাধারণ রূপ-লাবণ্যবতী বাঁদী ছিলো। নাম তার সুর্মা।

প্রথম দর্শনেই আবু ইসা সুর্মাকে ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু দুঃখ মনে চেপেই সে

ঘরে ফিরে আসে। আলীর কাছে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে ইসার বিরহ-বেদনাও ততই বাড়তে থাকে। সুর্মার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে বারবার কিন্তু ভুলতে পারে না।— আবার সে আলীর কাছে যায়। লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে সে তখন তার মনের গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করে ফেলে।

—মেয়েটিকে খুব পছন্দ, ভাইজান। যদি তুমি ওকে বিক্রি কর, আমি দাম দিয়ে কিনে নেবো।

কিন্তু আলী সে কথায় রাজী হয় না। বলে ও আমার হারেমের সেরা সুন্দরী। এমন কি সারা আরবেও তার জুড়ি খুব বেশি নাই। তাছাড়া ওকে আমি ভোগ করার জন্যে কিনেছি—দশ হাজার দিনার দিয়ে। কেনা-বেচার কারবার করার জন্য তো রাখিনি, ভাই।

এরপর আর কথা চলে না। ব্যথিত মনে আবার সে ফিরে আসে প্রাসাদে। কিন্তু কিছুতেই সুর্মাকে মনের আড়াল করতে পারে না। শেষে একটা নতুন ফন্দী আসে তার মাথায়। তার বড় ভাই খলিফা অল-মামুনকে গিয়ে সব কথা খুলে বলে, সুর্মাকে না পেলে আমার জিন্দগী বরবাদ হয়ে যাবে, আমি ওকে চাই-ই।

ভাইয়ের মনের অবস্থা বিবেচনা করে অল মামুন বলে, ঠিক আছে, ঘোড়ায় চাপো, চলো যাই দেখি তার কাছে। কী হয় দেখা যাক।

দুই ভাই ঘোড়া ছুটিয়ে আলীর প্রাসাদে এসে নামে। স্বয়ং খলিফা এসেছেন তার ঘরে—কী ভাবে তাকে আদর অভ্যর্থনা করবে, ভেবে পায় না। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায় আলী। তারপর বলে, আমার কি পরম সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন আমার গরীবখানায়।

বিরাট প্রশস্ত একখানা সভাকক্ষ। দামী দামী আসবাবপত্রে ঝকঝকে করে সাজানো। চারপাশের দেওয়ালে ঝোলানো বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা দুষ্প্রাপ্য সব ছবি। সারা ঘরটা বসরাহর কাজকরা সেরা কার্পেট মোড়া। বড় বড় মোটা মোটা থামের গায়ে ইমারতী নক্সা দেখে মনে হয় গ্রীক কারিগরদের হাতে গড়া এই বিশাল ইমারত।

খলিফা আর ইসাকে সঙ্গে নিয়ে চারপাশ ঘুরে দেখাচ্ছিল আলী। এক সময় খলিফা বললো, বাঃ বেশ। তা একটু খানা-পিনার ব্যবস্থা কর আলী। বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।

আলী লজ্জিত হয়। হাতের তুড়ি বাজাতেই প্রায় শ'খানেক সুবেশা নারী হাতে খাবারের রেকাবী নিয়ে সার বেঁধে এসে দাঁড়ালো। এক একজনের হাতে এক এক রকমের খানা। এলাহী ব্যাপার।

আহারাদি শেষ হয়ে গেলে, সরাবের পাত্র-পেয়ালা আসে। আর আসে নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে দশটি মেয়ে। সকলেরই সাজ-পোশাক এক—মিশমিশে কালো রেশমের পোশাক পরে এসে দাঁড়ালো চাঁপা কলির মতো সুতনুকারা। দশখানা সোনার কুর্শি বৃত্তাকারে সাজানো ছিলো। একে একে এসে অধিকার করে বসলো তারা। নানারকম তারের বাদ্যযন্ত্র তাদের হাতে। বাজনার তালে-তালে ধ্বনিত হতে থাকলো সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত লহরী।

এই দশজনের মধ্যমণি ছিলো একটি মেয়ে। অল-মামুনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেলো তার দিকে। প্রশ্ন করলো, কী তোমার নাম?

মেয়েটি বিনীত ভাবে বলে, আমার নাম লহরা, জাঁহাপনা।

খলিফা বলে, ওই নামেরই যোগ্যা তুমি। আচ্ছা লহরা, এবার তুমি একা একখানা গান শোনাও দেখি—

কোকিলকণ্ঠী লহরা গাইতে থাকে ঃ

এই যে আমার কোমলতা
এই যে আমার চকিত চপল চাহনি

আর এই যে আমার ক্ষীণ কটি তনু;
এর লোলুপতায় লুব্ধ হয়ে আসে যারা
বিশ্বাস করি না—বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না তাদের।
কিন্তু ভালোবাসা যদি অন্তরীণ হয়,
আমিও মোমের মতো গলবো,
ধূপের সৌরভে মাতিয়ে দেব প্রাণ;
সারা রাত ধরে সুদূর আকাশে শুকতারা হয়ে জ্বলবো,
ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবো হৃদয়, গাইবো শুধু ভালোলাগার গান....

খলিফা অল মামুন তারিফ জানায়, বহৎ খুব। তোফা! বড় চমৎকার তোমার গলা লহরা। আচ্ছা বলতো, কার লেখা এই গান?

—গীত রচনা অমর্ ইবন মাদি করিব অল-জুবাইদী এবং সুর দিয়েছেন মাবিদ।

মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শূন্য করে নামিয়ে রাখে খলিফা। খলিফার দেখাদেখি ইসা এবং আলী পেয়ালা নিঃশেষ করে রেখে দেয়। মেয়ে দশটি কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও দশটি মেয়ে সোনার জরির কাজ করা নীল রেশমী পোশাকে সেজে প্রবেশ করে। সকলের হাতে নানারকম বাদ্যযন্ত্র সুরের ঝঙ্কার ওঠে ঘরময়। এই দশজনের মধ্যে সেরা যে মেয়ে তার দিকে নজর রাখে খলিফা।

—তোমার নাম কী?

মেয়েটি জবাব দেয়, আমার নাম বন-হরিণী—

রাত্রির তমসা কেটে যায়, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো নব্বইতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

খলিফা বলে, তা তোমার একটা গান শুনতে চাই, বন-হরিণী—

বন-হরিণী বলে, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করছি, জাঁহাপনা।

গান ধরে সে ঃ

আমি উচ্ছল, উদ্দাম, নির্ভয়,
আমি এক মক্কার বন-বিহারিণী,
কোনও শিকারীই বিদ্ধ করতে পারে না আমায়।
যারা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ব্যর্থ হয়
তারাই আমার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দোষ ধরে,
কিন্তু ওরাও মনে মনে মানে, আমার মতো
নিখুঁত নিটোল সুন্দর দেহবল্লরী
এবং আমার কালো হরিণ চোখ
কারই বা আছে—

খলিফা প্রশ্ন করে, কার লেখা বলো তো গানটা?

বন-হরিণী বলে, কথা জাবির আর সুর সুরেজ-এর।

খলিফা আর একবার সরাবের পেয়ালা শূন্য করে নামিয়ে রাখে। মেয়েগুলো বিদায় হয়। সঙ্গে সঙ্গে আসে আর একদল—তারাও সংখ্যায় দশ। সকলের হাতেই বাদ্যযন্ত্র। ওরা সকলেই পরেছে টকটকে লালরঙের সিল্কের পোশাক। খলিফা সকলের সেরা সুন্দরীকে প্রশ্ন করে—কী তোমার নাম?

মেয়েটি জবাব দেয়, আমার নাম রমজানী।

—তোমার একখানা গান শোনাও, দেখি।

রমজানী শুরু করে ঃ

অলঙ্কার আভরণ
তা সে লাল নীল হলদে অথবা সাদা
যে রঙেই রংদার হোক
কিছু যায় আসে না;
সব মেয়ের কাছে কদর তাদের সমান।
প্রতি রাত্রির শেষে সকাল বেলায়
যদি শয্যার পাশে
এমনি কিছু একটা কুড়িয়ে সে পায়
তার চাইতে আর কিছুই কাম্য থাকে না তার—

খলিফা জিজ্ঞেস করে, কে লিখেছে?

রমজানী বলে, গীতকার আদি ইবন জাইদ। বহু প্রাচীন গান।

খলিফা পেয়ালার চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলো বিদায় নেয়। একদল যায় কিন্তু আর একদল আসে। সোনালী রঙের সাজ পোশাকে সেজে দশটি মেয়ে এসে কুর্শিতে বসে পড়ে। সকলের সেরা মেয়েটিকে ডেকে খলিফা তার নাম জিজ্ঞেস করে। মেয়েটি বলে, আমার নাম শিশিরকণা।

খলিফা বলে, তোমার একটা গান শুনবো।

শিশিরকণা গাইতে শুরু করে ঃ

আমি তার রক্তাক্ত গালের গুলাবী সরাব
বুদ হয়ে পড়ে থাকি নির্লিপ্ত নেশায়
আহা কী যে মধু কত সুখ, কী করে বোঝাই
পথে পথে ফিরি আমি
উদাস পাগল-প্রাণ
প্রেমের ভিখারী...

খলিফা করতালি দিয়ে বাহবা দেন চমৎকার। এ গান কার লেখা, শিশিরকণা?

মেয়েটি বলে, গান লিখেছেন কবি আবু নবাস আর গেয়েছেন ওস্তাদ ইশাক।

মেয়েগুলো বিদায় নিলে খলিফা আলীকে উদ্দেশ্য করে বলে, খুব আনন্দ পেলাম। এবার তাহলে চলি, আলী।

আলী বলে, আর একটুক্ষণ অপেক্ষা করুন, জাঁহাপনা। আর একটি বাঁদীকে হাজির করতে চাই আপনার সামনে। আমার প্রাসাদের সব চেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে। দশহাজার মোহর দিকে কিনেছি তাকে। আমার বিশ্বাস সে আপনাকে মুগ্ধ করতে পারবে। যদি না পারে তা হলে তাকে বিদায় করে দেবো।

খলিফা বলে, ঠিক আছে; নিয়ে এসো তাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সারা ঘর আলো করে এসে দাঁড়ালো এক পরমাসুন্দরী লাস্যময়ী নারী। খলিফা অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

এমন রূপবতী কন্যা সচরাচর চোখে পড়ে না। ধীর পায়ে এসে সে একখানা কুর্শিতে বসে পড়ে।

খলিফা লক্ষ্য করে তার ভাই ইসা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঘনঘন মদের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে সে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে তার। দেহের রক্ত সবই বুঝি মুখে জমা হয়ে গেছে। অল মামুন জিজ্ঞেস করলো, কী, কী হলো?

ইসা ঘাড় নেড়ে কোনও রকমে বলতে পারে, না, কিছু না। সুন্দরী বাঁদীর রূপের ফাঁদে তার প্রাণপাখী আটকে গিয়ে ধড়ফড় করতে শুরু করেছে। আবার জিজ্ঞেস করে, মেয়েটার সঙ্গে কী আগে তোমার আলাপ পরিচয় ছিলো?

—না। কিন্তু আসমানের চাঁদকে কে না চেনে, ধর্মাবতার!

খলিফা এবার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

—সুর্মা, আমার নাম সুর্মা, জাঁহাপনা।

—তোমার একখানা গান শোনাও।

সুর্মা গান ধরে ঃ

ও আমার দিল্-এর মালিক
ও আমার মনের মানুষ
তুমি কী নির্মম নিষ্ঠুর
তোমার কলিজা কী পাথরে গড়া?
কিন্তু আমি তো জানি
তোমার অন্তর পল্লবিত কুসুমের মতো
মধুর নির্যাসে ভরা—

খলিফার প্রশ্নের জবাবে সুর্মা জানায় গানের কথা লিখেছে খুজাই আর সুরারোপ করেছে জুরজুর।

আলী এতক্ষণ ধরে আবু ইসা-কে লক্ষ্য করছিলো। সুর্মাকে দেখা অবধি সে এক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এবার সে বললো, ভাই ইসা তুমি আমার আজ মহামান্য মেহমান। তোমাকে অসুখী রাখলে আমার গুণাহ হবে। আমি বুঝেছি, সুর্মার জন্য তোমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তুমি শান্ত হও, ভাই, সুর্মাকে আমি তোমার হাতেই সঁপে দিচ্ছি। আশা করবো, ওকে পেয়ে তুমি সুখের জীবন গড়ে তুলতে পারবে।

আবু ইসা বলে, কিন্তু এখানে মহামান্য ধর্মাবতার উপস্থিত। কোনও দানই দান করা যায় না তাঁর অনুমতি ছাড়া।

খলিফা মামুন বলে, আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি, ইসা। সুর্মাকে তুমি বরণ করে ঘরে নিয়ে চলো।

শাহরাজাদ বললো, এই কাহিনী থেকে আলী এবং তার সময় কালের মানুষের অতিথি সেবার কিছুটা ছবি পাওয়া গেলো।

এরপর শাহরাজাদ বলতে থাকে আর এক কাহিনী।

এ কাহিনী পীর উমরঅল হুমসির ঃ

অতি প্রাচীন কালে বাগদাদ শহরে এক পরম বিদূষী রমণী বাস করতেন। সেই সময়ের সারা ইরাকে তাবৎ গুণী-জ্ঞানীরা তাকে জ্ঞান গরিমার সর্বোচ্চ আসনে বসিয়েছিলো। আজও সে এক কিংবদন্তী হয়ে আছে। তার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির বহু কাহিনী আজও গাথায় গল্পে মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। লোকে তাকে গুরুর গুরু বলে ডাকতো। বহু দূর দেশ থেকে শত সহস্র নরনারী আসতো তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে। যখনই কোথাও কোনও কঠিন বিতর্ক উঠতো; মীমাংসার জন্য ছুটে আসতো তার কাছে। অনেক দুঃসাধ্য সমস্যার অতি সহজ সরল সমাধান করে দিতে পারতো সে। বিজ্ঞান, আইন, দর্শন, সাহিত্য তা যে কোনও বিষয়ের প্রশ্নই হোক না কেন, অত্যন্ত সাবলীল সহজ ভাবে উত্তর করে দিতে পারতো সে।

একদিন আমি আমার এক প্রবীণ বন্ধু অল সালিহানীকে সঙ্গে নিয়ে যথা নির্দিষ্ট এক সভাকক্ষে প্রবেশ করলাম। বিতর্ক শোনার জন্য বাগদাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেদিন সেই সভাগৃহে সমবেত হয়েছিলো।

বিদুষী রমণীর নাম দাহিয়া। সে বসেছিলো একটা পর্দার আড়ালে।

আমি পূর্বাহ্নেই আমার নাম ধাম পাঠিয়েছিলাম তার কাছে। তার সঙ্গে আমি তর্কযুদ্ধে নামতে চাই। তাও তাকে জানিয়েছিলাম। বিষয়টা ধর্মের বিধান।

আমরা আসন গ্রহণ করলাম।

দাহিয়ার অনুজ ভাই দেখতে ভারি সুন্দর ফুটফুটে চাঁদের মতো বালক। আমার বন্ধু সদাশয় সালিহারী—ছেলেটিকে দেখামাত্র আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। চোখ আর ফেরাতে পারে না। ব্যাপারটা দাহিয়ার নজর এড়ায় না। আমার বন্ধুর পরিচয় জিজ্ঞেস করলো সে। তারপর বললো, বৃদ্ধেরা ছোট ছোট মেয়েদের চাইতে বালকদের বেশি পছন্দ করে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো একানব্বইতম রজনীর মধ্য যামে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

আমার বন্ধু বললো, আপনি যথার্থই বলেছেন। কারণ আল্লাহ বালকদের দেহ-সৌষ্ঠব মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি নিখুঁত এবং সুন্দর করে তৈরি করেন। আর আমার দৃষ্টি সব সময়ই সেরা সুন্দরের দিকে।

পর্দার আড়াল থেকে উচ্চকিত হাসির আওয়াজ আসে।

—চমৎকার। কিন্তু আপনি যদি আপনার গোঁ ধরে বসে থাকেন, আমি আপনাকে ছাড়বো না। আমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামতে হবে। আমার বক্তব্য —মেয়েদের দেহই বেশি সুন্দর হয়।

তার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তাব গ্রহণ করলো আমার সদাশয় বন্ধুটি। বললো, আমার প্রমাণের অর্ধেকটা যুক্তি দিয়ে বোঝাবো। বাকী অর্ধেকটা প্রমাণ করে দেবো পবিত্র গ্রন্থের বাণী এবং সুন্নী সূত্রাবলী থেকে।

কোরাণে আছে ঃ পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেয়, কারণ আল্লাহ তাদের শ্রেষ্ঠ উপাদানে সৃষ্টি করেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে একজন পুরুষ একজন নারী অপেক্ষা সম্পত্তির দ্বিগুণ ভাগ পাবে। ভাই-এর অংশ বোনের দুই গুণ হবে। পবিত্র বাণীর নির্দেশ একজন নারী একজন পুরুষের অর্ধেকের সমান।

সুন্নী পয়গম্বর বলেছেন পুরুষের অবদান নারীর দ্বিগুণ।

তর্কের খাতিরেও বলবো, সমস্ত কাজে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পুরুষরাই প্রথমে এগিয়ে আসে। পুরুষরা সক্রিয় এবং নারীরা নিষ্ক্রিয়। সুতরাং অতীতের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বলা যায়, মেয়েরা সব সময়ই পুরুষের নিচে থেকেছে।

দাহিয়া বলে ঃ আপনার যুক্তি যথার্থ, সন্দেহ নাই। আমি জানি আল্লাহ কোরাণে সাধারণ জ্ঞানে নারী অপেক্ষা পুরুষকেই বেশি পছন্দ করেছেন। কিন্তু তিনি কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নি। যদি আপনি সর্বাঙ্গ সুন্দরের কথাই তোলেন তবে শুধুমাত্র তা বালকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কেন? দাড়ি গোঁফওয়ালা বয়স্করা কী দোষ করলো? কিংবা কোনও সদাশয় প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ?

সুতরাং নিখাদ- সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা ঐভাবে হতে পারে না।

আমার বন্ধু বলে ঃ

একশোবার বলবো আমি দাড়ি গোঁফওয়ালা, অথবা বুড়োদের চেয়ে সুকুমার কিশোর বালককেই বেশি ভালোবাসি। আপনি নিশ্চয়ই মানবেন, একটি নবযৌবনা উদ্ভিন্না তরুণী অপেক্ষা একটি সুন্দর সুঠামদেহী তরুণ বালকের আকর্ষণ অনেক বেশি। তার বিস্তৃত বক্ষটি তার শাল-প্রাংশু বাহুভূজ তার গানের লালিমা তার বিনয় নম্র স্মিত হাসি তার মোলায়েম কণ্ঠস্বর—সবই সুন্দরের প্রতীক। পয়গম্বর নিজেও বলেছেন, দাড়ি গোঁফবিহীন উঠতি বয়সের ছেলেদের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো না। ওদের চোখের লাস্য হুরীদের চোখের চাইতেও মারাত্মক।

কবি আবু নবাস বলেছেন ঃ

আমার হৃদয়ের ভালোবাসায়
সে চির-যৌবনা হয়ে বেঁচে থাক।
তার প্রস্ফুটিত শতদল,
আর কিশোরের মতো জঙ্ঘা,
আমার রক্তে তুফান তোলে—

কিশোরের দেহ-সৌষ্ঠব যদি না যুবতীর চেয়ে সুন্দরই হবে তবে কবি তার সঙ্গে তুলনা করবেন কেন?

কিশোরের রূপ-লাবণ্যই শুধু আমাদের মুগ্ধ করে না, তাদের বিনম্র ব্যবহার, কণ্ঠের সুললিত ভাষায় আমাদের চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়ে দেয়।

দাহিয়া এবার জবাব দেয় ঃ

আপনার ঐ সব অদ্ভুত যুক্তি শুনে আমি হতভম্ব। যাই হোক, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমার মনে হয়, তামাশা করার জন্যেই আপনি এই সব ছেঁদো যুক্তির অবতারণা করেছেন। কিন্তু এটা তো রঙ্গ তামাশার মজলিশ নয়। আমরা এখানে সমবেত হয়েছি কিছু সারগর্ভ আলোচনা করবো বলে। সত্যের অনুসন্ধান করাই এই বিতর্কের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই বলছি, কাঠ গোঁয়ারের মত নিজের ফালতু জিদ ধরে বসে থাকবেন না, আমি যা বলছি তা মেহেরবানী করে মগজে ঢোকাবার একটু কোসিস করবেন।

আল্লাহ নামে কসম খেয়ে বলুন তো, কোথায় কোন্ তরুণকে আপনি দেখেছেন যার অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং রূপলাবণ্য এক সুন্দরী তরুণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ? একটি তরুণীর ত্বক শুধু শুভ্র আর হালকাই নয় রেশমের মতো কোমলও। তার বক্ষপ্রদেশ এক মনোরম উপত্যকা। তার মুখ প্রস্ফুটিত ফুলের কোরক। আর অধর শিশিরসিক্ত পাকা আঙুরের মতো। আপেল সদৃশ গাল। তার স্তনযুগল যেন ছোট দুটি কচি লাউ। তার কপালের চেকনাই আর চোখের বান পুরুষের বুকে আগুন ধরায়। যখন সে কথা বলে—যেন মুক্তো ঝরে। আর যখন সে খলখল করে হেসে ওঠে, মনে হয় শান্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে যেন কোন নদী গান গেয়ে বয়ে চলেছে।

মধুর চেয়ে মধুময় এবং মাখনের মতো নরম তুল-তুলে সে হাসির বন্যা। কথা বলার সময় যখন তার গালে টোল খায়—সে সৌন্দর্যের তুলনা কোথায়? তার নাভিস্থল, জঙ্ঘা কী সুন্দর। তার উরু, পায়ের গোছা দেখে মনে হয় সন্দেশের ছাঁচে ঢালা। আপনি বয়সের ভারে ক্লান্ত, কী করে বুঝবেন এই সব যৌবনের জয়োল্লাস? তবে হয়তো খলিফাদের রোজনামচায় পড়ে থাকবেন, নারীর দেহরূপ বর্ণনায় তাঁরা কেমন পঞ্চমুখ ছিলেন। নারীর রূপ-লাবণ্যের গুণগান করতে করতে বহু জায়গায় তারা, তাদের অন্তরের শ্রদ্ধাভারে, অবনত হয়েছেন। যার প্রবল পরাক্রমে পৃথিবী পদানত সেই সিংহপুরুষরাও রূপবতী নারীর পায়ে মাথা কুটেছেন—সে কাহিনী কী আপনার অজ্ঞাত? শুধু একটি মাত্র নারীর জন্য কত শত সহস্র মানুষ, সারা জীবনের সঞ্চিত ধনরত্ন, মা বাবা, আত্মীয় পরিজন পরিত্যাগ করে আত্ম-নির্বাসন নিয়েছেন—তাও কী আপনাকে বলে দিতে হবে? শুধু তাদের মহিমাতেই দুনিয়া বেহেস্ত মনে হতে পারে। নারীর আকাঙ্ক্ষাতেই সূক্ষ্ম মসলিন আবিষ্কৃত হয়েছিলো। যত সূক্ষ্ম সূচীকর্ম দেখেন তা শুধুমাত্র নারীর মনোরঞ্জনের জন্যেই তৈরি হয়। শুধু তাদেরই কল্যাণে আমরা নানা সুগন্ধী আতর সংগ্রহ করে রাখি। কী, সত্যি কিনা বলুন? নারীর রূপ ঘর আলো করে রাখে। আবার তাদেরই কারণে কত তখ্‌ত হাত বদল হয়। কত দেশের নদীর জল রক্তে লাল হয়ে যায়।

আপনি পয়গম্বরের বাণী উদ্ধার করে বললেন, কচিকাঁচা কিশোর তরুণদের চেখের পানে চেও না—ওদের চোখে একমন এক যাদু আছে যা বেহেস্তের পরীদের চোখেও নাই।

তবে দেখুন, তুলনা যখন তিনি করলেন, হুরীর সঙ্গেই করলেন। আর এই হুরী কোনও পুরুষ নয়—নারী।

আপনি সব সময়ই উঠতি বয়েসী কিশোর বালকের রূপ-লাবণ্যে পঞ্চমুখ হতে গিয়ে নারীর অঙ্গশোভার সঙ্গেই তুলনা করেছেন। বলিহারী যাই আপনার কদর্য রুচীর! এ জন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।

আপনি কী পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সেই বিখ্যাত উপদেশের বাণী বিস্মৃত হয়েছেন? ভালোবাসা করার জন্য ছেলে খুঁজে বেড়াবে কেন? আল্লাহ কী তোমার কাম চরিতার্থের জন্য নারী পয়দা করেন নি?' আমি আপনার ঐ ছোকরা-শিকারী কবি মশাইকে খুব ভালো করেই জানি। আবু নবাস তো ছোকরা-খেকোর বাদশা। তারই একটা কবিতা থেকে শোনাচ্ছি ঃ

এমন চাঁদপানা মুখ তোমার
কিন্তু পাছাখানা ভারি কই?
চুলগুলোও ছেঁটে ফেলেছো?
কিন্তু তোমার ঠোঁটের ঐ টসটসে আঙুর দুটো
চুষতে ভারি মিষ্টি লাগে।
শোন, খোকা, তোমার দেহে যে যাদু আছে,
তার দৌলতে, এই ধরায়
তুমি দু' জাতেরই মহব্বৎ কুড়াবে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

•

তিনশো বিরানব্বইতম রজনী ঃ
আবার গল্প শুরু হয় ঃ
খোদা মেহেরবান, তিনি নারী ও পুরুষকে পরস্পরের আনন্দ বিধানের জন্য

দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তিনি যত পীর পয়গম্বর এবং ধর্মাত্মাদের ধরায় পাঠিয়েছেন তাদের সকলকেই আশ্বাস দিয়েছিলেন, তোমাদের যে কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠাচ্ছি তা যদি যথাযথ ভাবে সমাধা করে আসতে পারো তবে ফিরে এসে এই বেহেস্তে সুন্দরী নারীর সুধাপান করতে পাবে। যদি সর্বমঙ্গলময় ভাবতেন, নারী সঙ্গ ছাড়াই পরমানন্দ পাওয়া যায় তবে তিনি কী দুনিয়ায় নারী সৃষ্টি করে পাঠাতেন? আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, এই তিনটি বস্তুর জন্য দুনিয়া আমার কাছে এত প্রিয়, নারী, সুগন্ধ এবং নামাজকালে আত্মার প্রশান্তি।

যাই হোক, আমি দেখছি এই তর্ক-আলোচনা আমাকে ক্রমশ উত্তেজিত করে তুলছে। কিন্তু আমিও এক নারী। উত্তেজনা নারীর সহজাত শিষ্টতা নষ্ট করে। আপনি বয়সে প্রবীণ এবং প্রাজ্ঞ, আপনার সঙ্গে অশোভন তর্কযুদ্ধে আমি মাতামাতি করতে চাই না। সুতরাং এ আলোচনা এখানেই ইতি হোক, এই আমার ইচ্ছা। আমি এখানে যে-সব যুক্তির অবতারণা করেছি তা-যদি কারো অন্তরে আঘাত হেনে থাকে তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত।

শাহরাজাদ তার গল্পের ইতি করে বললো, এই ছোট ছোট হাসি মজাকের কাহিনীগুলোর এখানেই ইতি করে দিচ্ছি, জাঁহাপনা। এরপর আবার অন্য জাতের কিস্‌সা শোনাবো।

সুলতান শাহরিয়ার বললো, তোমার এই ক্ষুদে গল্পগুলো বড় মজার, বেশ ভালো লাগলো। এবার তোমার বড় কিস্‌সা শোনাও।

একদিন রাতে খলিফা হারুন-অল রসিদ-এর চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসছিলো না। উজির জাফর অল বারমাকীকে ডেকে তিনি বললেন, আমার বুকে যেন একটা পাথর চেপে বসে আছে, জাফর। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। আমি এখন বাগদাদের পথে পথে একটু ঘুরবো। তারপর চলো টাইগ্রিসের ধারে যাবো। বাকী রাতটুকু এইভাবে কাটানো ছাড়া আর উপায় নেই।

জাফর তখুনি খলিফাকে এক সওদাগরের ছদ্মবেশ পরালো। নিজেও আর এক সওদাগরের ছদ্মবেশ পরে মাসরুর-দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের খিড়কীর দরজা দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। চলতে চলতে একসময় তারা টাইগ্রিসের উপকূলে এসে পড়ে।

নদীর ঘাটে একখানা ছোট্ট নৌকা। তার মাঝি এক বৃদ্ধ। খানাপিনা শেষ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে নৌকার ছৈ-এর ভিতরে সে শোবার তোড়জোড় করছিলো। জাফর এগিয়ে গেলো, ও মাঝি ভাই, তোমার নৌকায় করে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসবে? আঃ এই চাঁদনী রাত, এমন সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া, তোফা লাগবে, কি বল, বুড়ো কত্তা? বেশিক্ষণ তোমাকে কষ্ট দেবো না, একটু হাওয়া খেয়েই ফিরে আসবো, এই নাও ধরো এই দিনারটা রাখো— এই রাতে এত তখ্‌লিফ হবে তোমার—

এ আপনি কি বলছেন সাহেব, বৃদ্ধ মাঝি ভীত চকিত হয়ে বলে, আপনারা কী সরকারের হুকুম জানেন না? ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন না, খলিফা নৌকা-বিহারে বেরিয়েছেন। এখুনি এদিকে এসে পড়বেন।

খলিফা হারুন অল রসিদ জিজ্ঞেস করেন, তুমি সত্যিই জান, ঐ নৌকায় খলিফা নিজে আছেন?

বৃদ্ধ বলে, আল্লাহ সাক্ষী, তামাম বাগদাদে এমন একজনও কী কেউ আছে, একথা জানে না? ঐ দেখুন, খলিফা তার উজির জাফর এবং দেহরক্ষী মাসরুরকে নিয়ে নৌকাখানা এখানে এসে পড়লো বলে। এ ছাড়া নৌকায় আছে চাকর নকর বাঁদী এবং গাইয়ে, বাজিয়ে, নর্তকীরা। ঐ শুনুন, খলিফার ফরমান জারী করছে তাঁর সচিব; যে যেখানে আছো

নদীর ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও। তা-সে যেই হোক, ধনী, নির্ধন, ছোট বড়, জ্ঞানী বা নির্বোধ যে-ই এই হুকুম অমান্য করবে, তাকে নৌকার মাস্তুলে ঝুলিয়ে ফাঁসী দেওয়া হবে। সুতরাং যে যেখানে আছো শিগ্গির কূলে উঠে পড়।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো চুরানব্বাইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে

খলিফা অবাক হয়ে জাফরকে বলেন, এ কী তাজ্জব ব্যাপার! এরকম কোন ফরমান তো আমি জারি করিনি। তাছাড়া গত এক বছরের মধ্যে নৌকাবিহারেও বের হইনি কখনও।

জাফরও হতবাক হয়ে পড়ে। কী ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারে না। মাঝির হাতে সে দুটো দিনার গুঁজে দিয়ে বলে, নাও, নৌকা খোলো। চলো, ঐ যে দেখছো, নদীর ভিতরে কতগুলো প্রায় ডুবুডুবু খিলান, ওর আড়ালে নিয়ে চলো নৌকাখানা। ওখানে থেকে খলিফার নৌকার সবকিছুই দেখতে পারবো আমরা। কিন্তু ওদের কেউ আমাদের দেখতে পারবে না।

খানিকক্ষণ না না করে শেষ পর্যন্ত রাজি হলো বুড়ো। তিনজনকে নৌকায় তুলে বেশ চাতুর্যের সঙ্গে নৌকাটাকে ধীরে ধীরে ঐ খিলানের আড়ালে নিয়ে গিয়ে থামলো। একখানা কালো কাপড় এনে ঢেকে দিলো ওদের সারা শরীর। এর ফলে একেবারেই আর দেখে ফেলার কোন আশঙ্কা রইলো না।

কিছুক্ষণেরর মধ্যেই সেই অজ্ঞাত খলিফার বজরাখানা আরও নিকটতর হয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো চারপাশ। বজায়ার পাটাতনে অসংখ্য ক্রীতদাস। লাল আর হলুদ রঙের উর্দি-পরা ছোট ছোট নফরগুলো বজরার ওপর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ওদের মাথায় সাদা মসলিনের পাগড়ী। কতকগুলো বজরার চারপাশে চিরাগ হাতে পাহারা রত কয়েকজন। নদীর মাঝখানে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করছে—ধারে কাছে কোনও কেউ আছে কিনা।

এরা তিনজন খিলানের আড়ালে ঘাপটি মেরে সব দেখতে থাকে। তাদের অনুমান, নফর চাকর, ক্রীতদাসের সংখ্যা নেহাত কম করে হলেও দুশোর কম হবে না। বজারার পাটাতনের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট মঞ্চ। সেই মঞ্চকে বৃত্তাকারে ঘিরে তারা সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান। মঞ্চের ওপরে সোনার তখ্‌ত্। সেই স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন এক সুদর্শন যুবক। সাজে পোশাকে কায়দা-কেতায় সে যেন পুরোদস্তুর এক বাদশাহ। তার একপাশে ঠিক জাফর-এরই মতো চেহারার একটা মানুষ এবং অন্যপাশে একজন দেহরক্ষী তার হাতে খোলা তরোয়াল—মাসরুরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

খলিফা উত্তেজিত হয়ে বলেন, জাফর মনে হচ্ছে, এ আমাদেরই খানদানের কোনও ছেলে। হয় সে অল মামুন না হয় অল আমিন। আর দু'জনের একজনকে কিন্তু বিলকুল তোমারই মতো দেখতে—না? আর ঐ লোকটা—আরে হ্যাঁ, ও তো মাসরুরই মনে হচ্ছে! তাজ্জব কাণ্ড! আর দ্যাখ, জাফর ওই যে মাইফেল বসেছে—ঠিক যেন আমার জলসাঘরে গাইয়ে বাজিয়েরা গান বাজনা করছে, তাই না?

জাফর বলে, ইয়া আল্লাহ, এতো বিলকুল একই রকম সব। আমি তো কোনই ফারাক দেখতে পাচ্ছি না, ধর্মাবতার।

আস্তে আস্তে সেই আলো ঝলমল বজরাখানা ওদের সামনে দিয়ে আরও আগে এগিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে তার দৃষ্টিপথের দূর সীমাও অতিক্রম করে এক সময়। বুড়ো মাঝিটা

এতক্ষণ শ্বাস রোধ করে পড়েছিলো। এবার সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, বাব্বা, বাঁচা গেলো। ভাগ্যিস কারো নজর পড়েনি আমাদের দিকে।

নৌকাটা আবার এনে ঘাটে ভেড়ালো মাঝি। ওরা তিনজন নৌকা থেকে নেমে কূলে দাঁড়ালো। খলিফা মাঝিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আচ্ছা মাঝি, এই দৃশ্য কী রোজই দেখ তোমরা? রোজ রাতেই এই খলিফা নৌকা বিহারে আসেন এইদিকে?

—একদম ঠিক; মালিক। রোজ রাতেই খলিফা তার সঙ্গী সাথী দলবল নিয়ে এই নৌকা বিহার করেন। এবং এই কারণে রাতের বেলায় কোনও নৌকা নদীর মাঝে থাকতে পারে না। এই ফরমান গত এক বছর ধরে চলছে।

খলিফা বলেন, আমরা বিদেশী-মুসাফির, এতসব খবর তো কিছু জানতাম না। যাইহোক, তোমার জন্যে আজ এক নতুন জিনিস চোখে দেখলাম। এসব দেখতে পাওয়া সাধারণ মানুষের কাছে তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। আচ্ছা মাঝি আমরা কাল আবার আসবো, তোমাকে যদি গোটাদশেক দিনার ইনাম দিই, আমাদের জন্য একটু কষ্ট করবে?

মাঝির চোখ নেচে ওঠে, একশোবার মালিক, কষ্ট আর কী? কাল ঠিক সময় আমি নৌকা নিয়ে এই ঘাটে তৈরি হয়ে থাকবো। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান।

জাফর আর মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে খলিফা প্রাসাদে ফিরে আসেন। তারপর বাকী রাতটা তিনি এই অদ্ভুত অজ্ঞাত খলিফার কাণ্ডকারখানা নিয়ে জাফরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কাটালেন।

পরদিন সারাদিন ধরে খলিফা উজির আমির অমাত্য আমলা এবং সেনাপতি পরিবৃত হয়ে দরবারের বিচার আচার প্রভৃতি নানা কাজে ব্যস্ত ব্যাপৃত থেকে সন্ধ্যার পর আবার সেই সওদাগরের ছদ্মবেশ পরে তৈরি হয়ে নিলেন। তারপর যথাসময়ে উজির জাফর এবং দেহরক্ষী মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে টাইগ্রিসের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। নদীর ঘাটে মাঝি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আর দেরি না করে তারা নৌকায় চেপে বসলে মাঝি তাদের নিয়ে সেই খিলানের পাশে গিয়ে লুকিয়ে রইলো। কখন সেই আলো ঝলমল্ বজরাটা আবার তাদের দৃষ্টিগোচরে আসবে তারই প্রতীক্ষা করতে থাকলো তারা।

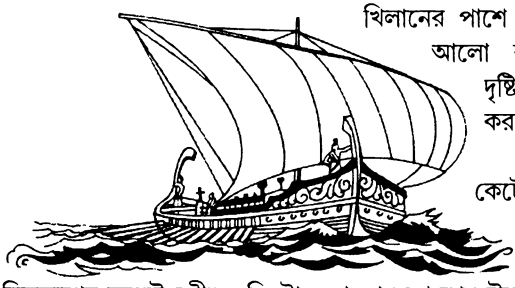

এইভাবে অধীর আগ্রহে অনেকক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ তারা কান পেতে শুনলো, এক মধুর সঙ্গীত আর নূপুর নিক্কনের আওয়াজ ভেসে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর এদিকটায় আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো সেই বজরা। তেমনি ভাবে সাজানো গোছানো ঠিক যেমনটি দেখেছিলো তারা গতকালে রাতে। সেই শ-দুই সুসজ্জিত নফর চাকর ক্রীতদাস পরিবেষ্টিত মঞ্চোপরি স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট অজ্ঞাত খলিফা আর তার দুই পার্শ্বচর। সেই একই কায়দায় মাইফেল বসেছে মঞ্চের ওপর।

খলিফা বললেন, নিজের চোখে না দেখলে, কেউ আমাকে এই আজব কাহিনী শোনালে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না; জাফর। এখনও আমি আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না!

এরপর মাঝির হাতে দশটা দিনার গুঁজে দিয়ে খলিফা তাকে বললেন, এই নাও

ধর। এবার তোমার নৌকাখানা ঐ বজরার পাশে নিয়ে চলো দেখি, কত্তা। তোমার কোনও ভয় নাই, আমরা আছি। ওরা আমাদের নজরই করতে পারবে না। কারণ আমরা অন্ধকারে আছি। আর ঝলমলে আলোয় ওদের চোখ এখন ধাঁধিয়ে গেছে। আজ আমরা আরও কাছে থেকে দেখবো।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো পঁচানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বুড়ো মাঝি দিনারগুলো হাত পেতে নিলো। কিন্তু বজরার একেবারে কাছে ঘেঁষতে প্রথমে খানিকটা গররাজিই হয়েছিলো কিন্তু বারবার অভয় পাওয়ার পর সে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলো নৌকাখানা। বজরার পিছনে পিছনে চলতে থাকলো।

কিছুক্ষণ পরে ওরা একটা বাগানের পাশে এসে পড়ে। এইখানে নদীর পাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে। একটা ঘাট। বজরা ভিড়লো সেই ঘাটে। অজ্ঞাত খলিফা তার সঙ্গী সাথী দল বল নিয়ে নেমে কূলে উঠে এলো।

একটু পরে বুড়ো মাঝিও ভিড়িয়ে দিলো তার নৌকাখানা। খলিফাও জাফর আর মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়লেন।

খলিফা দেখলেন অজ্ঞাত খলিফার দলবলের লোকেরা মিছিল করে চলেছে। তাদের পুরোভাগে সেই অজ্ঞাত খলিফা! ওরাও তিনজন ওদের অনুসরণ করে চলতে থাকে।

হঠাৎ কয়েকজন সিপাই তাদের দিকে তেড়ে আসে, এ্যাই, কোন্ হ্যায়? এখানে কেন এসেছো তোমরা? চলো; খলিফার কাছে চলো।

তিনজনকেই পাকড়াও করে নিয়ে যায় সেই খলিফার কাছে। সে প্রশ্ন করে, কে তোমরা?

জাফর জবাব দেয়, আমরা বিদেশী বণিক। এদেশে সবে এসেছি। পথঘাট সবই আমাদের অচেনা। তাই এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা তো বুঝতে পারিনি, খলিফার এই বাগিচা এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ? আমরা পথ হারিয়ে এখানে ঢুকে পড়েছি। তারপরই আপনার সেপাইরা আমাদের পাকড়াও করেছে।

যুবকটি বলে, ঠিক আছে তোমরা যখন বিদেশী মুসাফির, তোমাদের কোনও ভয় নাই। তোমরা যদি মুসাফির না হতে তোমাদের গর্দান নিতাম আমি। যাক, এবার তোমরা আমার মেহেমান, আমাদের সঙ্গে এসো, আজকে রাতটা আমরা একসঙ্গেই খানাপিনা, আনন্দ ফুর্তি করবো।

ওরা তিনজন ওদের মিছিলের সামিল হয়ে চলতে চলতে একসময় এক বিশাল প্রাসাদের আঙ্গিনায় এসে পড়লো। খলিফা হারুন অল রসিদ অবাক হয়ে দেখলে, এ প্রাসাদ তার টাইগ্রিস তীরের বিলাস মহল-এর চেয়ে কোনও অংশে খাটো নয়। সদর দরজায় খোদাই করে লেখা একটি শায়ের ঃ

একদিন ঝলমল করতো এই প্রাসাদ
রঙে আর বাহারে,
আজ রং ফিকে হয়ে গেছে,
বাহার নিয়েছে বিদায়।
তবু এর খানদানের জৌলুস কমেনি একটুও,

মেহমান আর মালিকের মধ্যে ফারাক নাই কোনও।

একখানা বিরাট প্রশস্ত মহল। সারা ঘর হলুদ রেশমের গালিচায় মোড়া। তার ঠিক মাঝখানে একখানা সোনার তখত্। নকল খলিফা গিয়ে বসলো। সবাইকে চারপাশে নিচে গালিচায় বসতে বললো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খানাপিনার আসর জমে উঠলো। নানারকম লোভনীয় মুখোরোচক খাবারদাবার এসে গেলো। সকলেই হাতমুখ ধুয়ে বেশ পরিতৃপ্তি করে আহারাদি শেষ করলো। এরপর পরিবেশন করা হলো সরাব। সবারই সামনে পেয়ালা পূর্ণ করে দিয়ে গেলো বাঁদীরা। কিন্তু খলিফার সামনে মদের পাত্র ধরতেই তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আমার এসব চলে না।' বাঁদী তখন জাফরকে, দিতে যায়। নকল খলিফা জাফরকে উদ্দেশ করে বললো, আপনার দোস্ত নিলেন না কেন?

জাফর বললো, উনি এসব অনেক কাল আগেই ছেড়ে দিয়েছেন।

—তা হলে, অন্য কিছু খান তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে নকল খলিফার ইশারাতে পিস্তার শরবৎ এনে দেওয়া হলো খলিফাকে। এবার আর তিনি আপত্তি করলেন না। বেশ রসিয়ে রসিয়ে চুমুক দিতে থাকলেন।

যখন মৌতাত বেশ জমে উঠেছে, নকল খলিফা তার হাতের ছড়িখানা তিন বার নিচে ঠুকলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের দেওয়ালের একটা বন্ধ দরজা খুলে গেলো। একটি হাতীর দাঁতের ছোট্ট একটি সিংহাসন কাঁধে করে নিয়ে এলো দু'জন নিগ্রো ক্রীতদাস। নকল খলিফার সিংহাসনের পাশে নামিয়ে রাখলো। খলিফা আবার তাকিয়ে দেখলেন, সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট এক পরমাসুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী বাঁদী। তার সারা অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সূর্যকিরণমালা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো সে। হাতে তুলে নিলো একখানা ভারতীয় তারের বাদ্যযন্ত্র। মধুর কণ্ঠে সে গান ধরলো ঃ

দূরে আমায় সরিয়ে রেখে কেমন করে শান্ত ছিলে প্রিয়?
বাঁচবো বলো কিসের টানে, মাঝে মাঝে সঙ্গ-সুধা দিও।
আতর দানী শূন্য আমার গুল বাগিচায় শুকিয়ে গেছে ফুল
হারিয়ে গেছে প্রেমের বাঁশি, তাইতো আমি পাইনে কোন কূল।

গান শেষ হতে না হতে নকল খলিফা বিকট আওয়াজ তুলে আর্তনাদ করে ওঠে। নিজের দেহের বাদশাহী সাজ-পোশাক কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। দেহের দামী দামী রত্নাভরণ ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়লো চার ধারে। যুবকটি জ্ঞানশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়লো নিচে।

প্রহরীরা শশব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে। নিজেদের গায়ের লাল কুর্তা খুলে তার নগ্ন দেহে চাপা দিয়ে ঢাকে।

খলিফা ও জাফর দু'জনেই বিস্ময়ে হতবাক! একি কাণ্ড! ছেলেটার সর্বাঙ্গে কী সাংঘাতিক চাবুকের দাগ? সোনার বর্ণ শরীর কষাঘাতের কালো-কালো দাগে দাগে ছয়লাপ হয়ে গেছে! খলিফা জাফরের কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, দাগী ফেরারী আসামী। না হলে সারা গায়ে অত চাবুকের দাগ কেন?

জাফর একটা কিছু বলতে যাবে এমন সময় তারা দেখলো, আবার নতুন একপ্রস্থ শাহী সাজ-পোশাক এনে নফররা তাকে নতুন করে খলিফার সাজে-সাজালো। তারপর যথা পূর্বং আবার তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলো। দিব্যি আবার সে সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেলো। এমন একটা ভাব, যেন কিছুই ঘটেনি।

খলিফারা তিনজনে মিলে তখন ফিস ফিস করে কী সব বলাবলি করছিলেন। তাই দেখে নকল খলিফা জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, কানাকানি করে কী সব কথাবার্তা হচ্ছে?

জাফর জবাব দেয়, আমার দোস্ত বলছিলেন; তিনি নানা দেশ ঘুরেছেন, অনেক সুলতান বাদশাহও দেখেছেন, তাদের শখ-শৌখিনতা বিলাস-বাসনও কম দেখেননি তিনি। কিন্তু আজকের মতো এমন বিলাসিতা তিনি দেখেন নি কখনও। আপনি এক পলকের মধ্যে আপনার যে সাজ-পোশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন কমসে কম তার ইনাম দশ হাজার দিনার হবে। অথচ এই ক্ষতির জন্য আপনার কোনই ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেলো না। তাই, তিনি আমাকে একটা শায়ের শোনাচ্ছিলেন ঃ

তোমার ভাঁড়ার অফুরান, রিক্ত হয় না প্রভু।
আমার যাহা যায়, আর ফেরে না কভু॥

এই তোষামুদে গলে গেলো যুবক। জাফরকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং দামী একটা বাদশাহী পোশাক বকশিস দেওয়ার জন্য তার লোককে হুকুম দিলো সে।

এরপর আবার পান, গান এবং আলাপনের পর্ব চলতে থাকে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো ছিয়ানব্বইতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

কিন্তু খলিফা হারুন-অল-রসিদ সেই চাবুকের দাগের কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না। যতই তিনি ভাবেন, এই মোহিনী মধুর পরিবেশে ওসব কথা মনে করবেন না। কিন্তু কিছুতেই মন মানে না। বার বার ঘুরে ফিরে ঐ একটা কথাই তাকে কুরে কুরে বলতে থাকে। জাফরকে সে আবার ফিস ফিস করে বলে, জাফর, ওকে একবার জিজ্ঞেস করে জানো তো—দাগগুলো কীসের, কীজন্য?

জাফর, বলে, আমার মনে হয়, এখন ওসব কথা না তোলাই ভালো। একটু ধৈর্য ধরে থাকুন।

খলিফা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বড় বড় করে বলেন, এই মুহূর্তে, এখনই তুমি যদি তাকে সে-কথা জিজ্ঞেস না কর, জাফর, তবে আমার মাথা আর আববাসের তাজিয়ার কসম খেয়ে বলছি, প্রাসাদে ফিরে গিয়ে তোমার ধড়ে আর কাল্লা থাকবে না।

নকল খলিফা আবার নজর করলো, ওরা ফিস ফিস করছে।

—কী ব্যাপার, আবার কী গোপন শলা-পরামর্শ হচ্ছে?

জাফর বলে, না, তেমন খারাপ কিছু নয়, জাঁহাপনা।

—যাই হোক, আল্লাহর নাম নিয়ে বলুন, সত্যিই কী কথা বলছিলেন আপনারা?

জাফর বলতে থাকে, আমার দোস্ত বলছিলেন, আপনার সারা দেহে কালো কালো কীসের অত দাগ? কোনও ডান্ডা অথবা চাবুকের কী? দেখার পর থেকে তিনি অবাক হয়ে গেছেন। আসল ব্যাপারটা কী জানবার জন্য আমার বন্ধু বিশেষ ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। তাঁর ধারণা, নিশ্চয়ই কোনও দুঃসাহসিক ব্যাপারে আমাদের জাঁহাপনা জড়িয়ে পড়েছিলেন।

যুবক হাসলো। —এই ব্যাপার! আপনারা মুসাফির মেহেমান, আপনাদের খুশি রাখাই আমার কাজ। সেই কারণে আপনাদের আজ শোনাবো আমার সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী।

সে বলতে থাকে ঃ

আজ আপনারা আমার মেহেমান, আমার মালিক। তা হলে সত্যি কথা শুনুন,

আসলে আমি ধর্মাত্মা খলিফা হারুন-অল-রসিদ নই। আমার পিতৃদত্ত নাম মহম্মদ আলী। আমার বাবা এই বাগদাদ শহরের এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর— তিনি জহুরী সমিতির শাহবান্দর ছিলেন।

আমার বাবা মারা যাওয়ার সময় প্রচুর ধন সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন আমার জন্য। সোনা চাঁদী, হীরে, চুনী, পান্না, মুক্তোয় বোঝাই করে রেখে গিয়েছিলেন সিন্দুক। এ ছাড়া অনেক ঘরবাড়ি ইমারৎ, জমি-জিরেৎ, বাগিচা, বাগান, দোকান গুদাম এবং এই বাদশাহী ঢংএর প্রাসাদখানার মালিক হলাম আমি। এই যে দেখছেন দাসী বাঁদী চাকর নফর পেয়াদা বরকন্দাজ এ সবই তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তি।

একদিন আমি আমার দোকানে বসে আছি—এমন সময় দেখলাম একটি সুসজ্জিত খচ্চরের পিঠে চেপে এক পরমাসুন্দরী কন্যা তিনটি সখি সহচরী সঙ্গে করে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। তাকে স্বাগত জানাতে আমি শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সে নেমে আমার দোকানে এসে বসলো।

—আপনিই জহুরী মহম্মদ আলি?

—আমি শুধু মহম্মদ আলিই নই—আপনার বান্দাও।

মেয়েটি মধুর হাসি হেসে বললো, আপনার দোকানে খুব বাহারী ছোট মানতাসা আছে?

আমি বললাম, আমার দোকানে যা আছে সবই আপনাকে দেখাচ্ছি; যেটা পছন্দ, নিন। নিলে আমি খুব খুশি হবো। আর যদি আপনাকে খুশি করতে না পারি সে দুঃখ আমার জীবনে যাবে না।

সে-সময় আমার দোকানে সত্যিই খুব সুন্দর সুন্দর গহনাপত্র থাকতো। এক এক করে সব তাকে বের করে দেখালাম। সে-ও খুব আগ্রহ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সব। তারপর আমাকে বললো, আমি আরও ভালো কিছু খুঁজছিলাম। এর থেকে কিছু চলবে না।

আমার বাবা তার শেষ বয়সে এককানা হীরে বসানো সুন্দর কাজ করা মানতাসা কিনেছিলেন, মনে পড়লো। সেই সময়ে তার দাম নিয়েছিলো একলক্ষ দিনার। অলঙ্কারখানা আমি সিন্দুকে যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছিলাম। সিন্দুক খুলে সে-খানা বের করে দেখালাম তাকে। খুব একটু গর্বের ভাব করেই বললাম, দেখুন দেখি, পছন্দ হয় কিনা। অনেক সুলতান বাদশাহর ঘরেও এ বস্তুর জোড়া খুঁজে পাবেন না।

সুন্দরী দেখেই আনন্দে নেচে উঠলো, এই জিনিসই আমি জিন্দগীভর খুঁজে বেড়াচ্ছি—কত দাম?

—আমার বাবা এটা এক লক্ষ দিনার দিয়ে খরিদ করেছিলেন। আপনার যদি পছন্দ হয় আমি ধন্য হবো। দাম কিছু দিতে হবে না।

সে আমার দিকে গভীর আয়ত চোখ মেলে অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকালো। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। তারপর হো হো করে হেসে বললো, পুরো দাম দিয়েই আমি কিনতে চাই। আপনি যা দিয়ে কিনেছেন, তার চেয়ে আরও পাঁচহাজার বেশি দেবো আমি। এটা আপনার টাকার সুদ অথবা নাফা হিসেবেও ধরতে পারেন।

আমি বলি, এই অলঙ্কার এবং এর বর্তমান মালিক আজ থেকে দুই-ই আপনার হলো। এর বেশি কিছু আমার বলার নাই।

মেয়েটি আবার মধুর করে হাসলো, আমি তো দাম ঠিক করেই দিয়েছি আপনাকে। এর বাইরে কিছু হলে আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো। কিন্তু তা আমি চাই না।

সে আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়িয়ে দোকান থেকে নেমে সোজা গিয়ে খচ্চরে চেপে বসে চলে গেলো। যাওয়ার আগে সে বেশ একটু গলা চড়িয়েই বলে গেলো, মেহেরবানী করে গহনাখানা নিয়ে আপনি আমার প্রাসাদে আসুন, আমি আপনার দাম মিটিয়ে দেবো। আজ আমার এতদিনের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে—তা সে শুধু আপনারই কল্যাণে।

আমি আর তার কথার ওপরে কোনও কথা বলতে সাহস করলাম না। কর্মচারীদের বললাম, দোকান বন্ধ করে মেয়েটিকে অনুসরণ করে যাও, দেখে এসো তার প্রাসাদ।

রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো সাতানব্বইতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

পরদিন আমি তাকে অলঙ্কারটা দিলাম। সে আমাকে তার বসার ঘরে একটা টুলের ওপর বসতে অনুরোধ করে অন্দরে চলে গেলো।

আমি বসে আছি, একটুক্ষণ পরে অন্য একটি মেয়ে এলো। মালিক, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, একটু ভেতরের ঘরে আসুন। অবশ্য আপনার মতো মানুষকে নিয়ে যাওয়ার মতো আমাদের ঘরদোর তেমন নাই।

তাকে অনুসরণ করে পাশের আর একটা ঘরে গিয়ে আর একটা টুলে বসলাম। সে চলে গেলো।

তার কিছুক্ষণ পরে অন্য একটা মেয়ে এসে বললো, মালিক আপনি আমার সঙ্গে পাশের ঘরটায় আসুন। একটু বিশ্রাম করুন। তার মধ্যে আপনার টাকা তৈরি হয়ে যাবে।

সবে সে-ঘরে আমি ঢুকেছি, এমন সময় সামনের দরজার পর্দা ঠেলে চারটি কচি বাঁদী একখানা সোনার সিংহাসন বয়ে নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলো। সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা সেই মেয়েটি। গলায় গহনাটি পরে এসেছে।

বোরখা না-পরা অবস্থায় এই তাকে প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। মনে হলো, তখুনি বুঝি আমি পাগলের মতো চিৎকার দিয়ে উঠবো।

সুন্দরী তার দাসীদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করতেই তারা পর্দার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তখন সে উঠে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে।

—তুমি আমার চোখের মণি, তোমার মতো সুন্দর আর কাউকেই দিখিনি আমার জীবনে। আমি তোমাকে দেখামাত্র মন প্রাণ সঁপে দিয়েছি। আর তুমি কিনা নিষ্ঠুরের মতো আমাকে দূরে দূরে রাখতে চাইছো?

আমি কোনও রকমে বলতে পারি, দুনিয়ার সব রূপই তো তোমার দেহে বাধা পড়ে আছে, সুন্দরী। তুমি নিজে জানো না কী ঐশ্বর্যের মালকিন তুমি। আমি তো এমন রূপ কখনও চোখে দেখিনি।

তারপর সে বললে, মহম্মদ আলি, আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি। প্রথম যখন দেখেছি তখনই। তোমার দোকানে যা বলেছি, সে-সবই আমার ছল—তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসার কৌশলমাত্র।

সে আমার আরও কাছে সরে আসে। দু'হাত বাড়িয়ে টেনে নেয় আমাকে। আমি তার বুকের কাছে বুক পেতে অধরে অধর রেখে তার চোখের অতলান্ত নীল সমুদ্রে অবগাহন করতে থাকি। বাহুর বন্ধনে তাকে আরও নিবিড় করে নিঃশেষ করে চেপে ধরি আমার বুকে। চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিই ওর অধর কপোল

চিবুক। সে-ও আমার দেহের সঙ্গে আরও একাত্ম হতে চায়। তার সুডৌল স্তন দুটি নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করে ফেলতে চায় আমার বুকে। ওর দেহের স্পন্দন আমি অনুভব করতে পারি আমার রক্তচঞ্চলধমনীতে। ওর মুখে তখন কোনও ভাষা নাই। কিন্তু আমি আমার সকল সত্ত্বা দিয়ে ওর না-বলা কথার প্রতিটি শব্দ বুকের মধ্যে শুনতে পাই। সে বলছে, আমি তোমারই—ওগো আমি একান্তভাবেই তোমার। আমার এই সুতনুকা দেহ, সে-তো এতকাল ধরে তিল-তিল করে একমাত্র তোমার জন্যেই গড়ে তুলেছি। আমার এই জাগ্রত যৌবনের উদ্দাম উচ্ছল কামনার তরঙ্গ, সে তো তোমারই যৌবন-সৈকতে আছাড় খেয়ে খান খান হতে চায়—তা কি তুমি জান না?

আমি এখন, এই অবস্থায়, আমার এবং তার দেহমন যা একান্তভাবেই কামনা-আকুল—তা থেকে বঞ্চিত হওয়া বা করা, কোনওটাই সঙ্গত মনে করি না।

মুহূর্তের মধ্যে আমরা দু'জনে উত্তাল তরঙ্গ মালায় উথাল-পাথাল হ'তে হ'তে কোথায় কেমন করে তলিয়ে যাই—বুঝতে পারি না।

কতক্ষণ কী ভাবে কেটে গেছে, জানি না। চোখ মেলে দেখলাম, আমরা জড়াজড়ি করে পাশের পালঙ্কে শুয়ে আছি। ওর দেহটা আমার দেহে লেপটে রয়েছে তখনও। সেও চোখ মেলে তাকালো, বাব্বা কী মায়ের দুধই তুমি খেয়েছিলে, মহম্মদ আলি। আমার শরীরের আর কিছু নাই। আমার এত সাধের কুমারী যৌবন, আজ তোমার কাছে সঁপে দিয়ে সার্থক হলো। এর আগে আমি কখনও কোনও পুরুষের ছায়া মাড়াই নি। তুমিই আমার প্রথম পুরুষ—প্রথম ভালোবাসা।

আমি বলি, আমার জীবনেও তুমিই প্রথম মেয়ে—আমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলে—ভালোবাসা করতে শেখালে—

—কিন্তু আমি কে? কী আমার পরিচয়, কই কিছুই তো জানতে চাওনি মহম্মদ? তুমি কি ভেবেছো, আমি বাগদাদের এক বোরখা পরা বেবুশ্যা—ইশারায় ডাকলেই যাদের অঙ্ক-শায়িনী করা যায়? অথবা ভারী পর্দার আড়ালের যে-সব কাম-কাতর বিবি-বেগম মালিকের অনুপস্থিতির মওকায় খিড়কীর দরজা খুলে জোয়ান মরদকে ঘরে ঢোকায়—তাদের কেউ একজন? না গো না, আমায় তুমি তেমন খারাপ ভেবো না। আমি তোমায় শুধু দেহ নয়, মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আজ সেধে তোমায় ঘরে ডেকে এনে স্বেচ্ছায় দেহ-দান করলাম বলে আমাকে খাটো করে দেখোনা, সোনা। আমি কোনও দিক থেকেই ছোটো নই। আমার বাবা—ইয়াহিয়া ইবন খালিদ আল-বারমাকী। আমি খলিফার উজির জাফরের ছোট বহিন।

এই কথা শোনামাত্র আমার সারা শরীর হীম হয়ে আসে। চোখে সর্ষেফুল দেখতে থাকি। ভয়ে বুক কাঁপতে থাকে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরি। হায় আল্লাহ, একি করলাম আমি? কেন তার ডাকে চঞ্চল হয়ে ছুটে এলাম। এখন কী করে আমি জান বাঁচাই। এমন খানদানী ঘরের ইজ্জৎ আমি নষ্ট করেছি—এ পাপ আমি কোথায় রাখবো?

দারুণ দুঃসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠি আমি, এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছো? আমি তো চাই নি? আমার কোনও দোষ নাই, কিন্তু! তুমিই আমাকে এই পথে নামালে—

মেয়েটি হাসে, কে তোমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে? সব দায় আমার। তোমাকে যা বলেছি, তুমিই তাই করেছ। এতে তোমার কোনও গোস্তাকি নাই। আমি তোমাকে শাদী করবো—তোমার আপত্তি আছে?

আমি কেমন ভেবাচেকা খেয়ে যাই, শাদী? আমার সঙ্গে? আপত্তি? না না, আমার কেন আপত্তি থাকবে? আমি রাজি। কিন্তু তুমি? তুমি নিজে তোমার শাদী দিতে পারো নাকি?

—হ্যাঁ পারি। আমি নিজেই আমার মালিক। আমার মতামতের উপরে কারো কোনও কথা বলার এক্তিয়ার নাই। আমার কথাই শেষ কথা। এখন তুমি বলো, রাজি কি, না?

আমি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বলি, বললাম তো আমি রাজি—রাজি—রাজি।

তক্ষুণি কাজী এলো। শাদী নামা তৈরি হলো। আমার হবু বিবি কাজী এবং সাক্ষীদের বললো, এ হচ্ছে, মহম্মদ আলী, এই শহরের পূর্বতন শাহবানদরের ছেলে, একটি এক লক্ষ টাকার অলঙ্কার দিয়ে আমাকে শাদী করার প্রস্তাব করেছে। আমি তাতে রাজি।

সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীরা শাদী নামায় সই-সাবুদ করে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা নিয়ে বিদায় হলো।

আমরা তখন সেই নিভৃত নিরালা কক্ষে দু'জনে একা। মুখোমুখি বসে রইলাম—অনেকক্ষণ। অনেক মনের কথা বললাম আমরা। এইভাবে আরও ঘনিষ্ট আরও নিবিড় হতে থাকলাম আমরা। আরও মনের কাছাকাছি হয়ে এলাম।

দাসীরা সুরাপাত্র এনে বসিয়ে দিলো আমাদের সামনে। পেয়ালা পূর্ণ করে আমার অধরে ধরে সে। আঙুরের মতো টসটসে রসে ভরা তার বিম্বাধর এগিয়ে আসে। আমি সুরাও পান করি, সুধাও খাই। একই সঙ্গে।

দুনিয়াটা আমার চোখের সামনে নানা রঙের ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। যা দেখি যা ভাবি—সবই মধুর সবই সুন্দর মনে হয়।

নেশাটা যখন বেশ জমে ওঠে, সে বীণা তুলে নিয়ে গাইতে থাকে। তার গানের মূর্ছনায় হৃদয়ে বসন্তের ছোঁয়া লাগে।

গান শেষ হলে খানা-পিনা শেষ করে আমরা বাসর-শয্যায় শুয়ে পড়ি।

রাত্রি শেষ হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো আটানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এক এক করে তার দেহের সব আবরণ আমি খুলে দিই। অবাক নয়নে আমি তার মুক্তোর মতো নগ্ন নিটোল নিখুঁত সুন্দর শরীরখানা দেখে মুগ্ধ হই। আহা, বিধাতার একি অপূর্ব যাদু!

সেদিনের সে মধু-যামিনীর স্মৃতি আমার জীবনে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। শুধু সেই একটি রাতই নয়, তারপর আরও অনেক রাত্রি মধুময় হয়ে উঠেছিলো—তার হাসি, গানে, আদর, সোহাগ আর সুরত-রঙ্গে।

এইভাবে পুরো একটা মাস কেটে গেলো। আমরা দু'জনে দু'জনকে এক পলকের জন্যও ছেড়ে থাকলাম না। সারা রাত শুধু নয়, সারাদিনও ছিলো সে আমার শয্যাসঙ্গিনী। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, খদ্দের-মহাজন, কেনা-বেচা সব ভুলে তাকে বুকে করে পড়ে রইলাম সেই পালঙ্ক-শয্যায়।

এরপর একদিন সকালে সে আমাকে বললো, আজ আমি হামামে যাবো। গোসল করবো। কিন্তু প্রিয়তম, তোমাকে চোখের আড়াল করে আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবো না।

আমি বললাম, আমারও সেই দশা। যাইহোক, হামাম থেকে তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমি তোমার জন্যে অধীর হয়ে বসে থাকবো।

সে আমাকে বলে গেলো, আমি যাবো আর আসবো। তুমি সোনা, এখানে ঠিক এমনিভাবে চুপটি করে বসে থাকো। এক-পা কোথাও যাবে না। আমি এসে যদি দেখি, তুমি নাই, তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবো কিন্তু।

আমি বললাম, তোমার ভাবনার এত কী দরকার। নিশ্চিন্ত মনে গোসল করতে যাও। ফিরে এসে দেখবে, বান্দা এখানে ঠিক এমনি করেই বসে আছে তোমার পথ চেয়ে।

আমার বিবি হামামে চলে যেতেই ও-পাশের দরজার পর্দা সরিয়ে এক বৃদ্ধা ঘরে ঢুকলো। আমার সামনে এসে বিনীতভাবে বললো, খলিফার বেগম জুবেদা আপনাকে তলব করেছেন। এখুনি আপনি একবার তার সঙ্গে দেখা করুন। এই তাঁর ইচ্ছা।

আমি বললাম, কিন্তু এখন তো আমি এখান থেকে যেতে পারবো না কোথাও। আমার বিবি হামামে গেছেন, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার নড়ার উপায় নাই।

বৃদ্ধা শঙ্কিত হয়ে উঠলো, সর্বনাশ, আপনি তবে যাবেন না? বেগম জুবেদা একথা শুনলে আপনার গর্দান যাবে যে! আপনি কী তার মেজাজের কথা জানেন না কিছু?

আমি বললাম, আমি কেন, সারা বাগদাদের সবাই জানে বেগম জুবেদা ভীষণ জেদী একরোখা। তার জবান দিয়ে একবার যা বের হবে তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত না হয়ে কোনও উপায় নাই। কিন্তু এ অবস্থায়, আমি আমার বিবির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার কী যাওয়া সঙ্গত হবে?

বৃদ্ধা বলে, নিজের ঘরের বিবি তাকে যা হোক করে বোঝালে ঠান্ডা হবে, কিন্তু বেগম জুবেদা কুপিত হলে জানে বাঁচা মুসকিল হবে। এখন আপনিই ভেবে দেখুন, কী করবেন? যদি যেতে চান আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। আর যদি না যান, আমি একাই ফিরে যাবো তাঁর কাছে। আমার যা বলার বলবো তাঁকে। তারপর...

আমার তখন হৃদকম্প শুরু হয়ে গেছে। আমি বললাম, ঠিক আছে চলুন, আমি যাবো।

বেগম জুবেদা আমাকে স্মিত হেসে স্বাগত জানালেন। একটি আসন দেখিয়ে বসতে ইশারা করলেন।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছি আমি। কলের পুতুলের মতো একটি গদী আঁটা কুর্শিতে বসলাম। তাঁর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাবার মতো দুঃসাহস আমার ছিলো না। আড়চোখে তাকিয়ে একবার দেখে নিলাম তাঁকে। মুচকি মুচকি হাসছিলেন তিনি। হঠাৎ তার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম আমি।

—হ্যাঁ গো চোখের মণি, তুমিই নাকি আমাদের উজির-ভগ্নীর নাগর?

—আমি আপনার বান্দা, বেগমসাহেবা।

—আহা চুক চুক, ওরা তবে এক বিন্দু বাড়িয়ে বলে নি দেখছি। যেমন তোমার গলার মিঠে আওয়াজ, তেমনি তোমার আদব কায়দা। নাঃ, জাফরের বোনের পছন্দ আছে বলতে হয়। বেছে বেছে আসলি হীরাই জোগাড় করেছে! তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু আরও খুশি করতে গেলে একটা গান শোনাতে হবে যে!

আমি বললাম, তেমন জানি না, তবে যা জানি তাই শোনাচ্ছি।

সেতার হাতে তুলে নিয়ে একটা ছোট্ট দেখে গান গাইলাম। ভালোবাসার গান। বেগম জুবেদা খুব খুশি হয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাকে কোনও দিকেই বঞ্চিত করেন নি। যেমন রূপ তেমনি গুণ! এবার যাও, তোমার জানের কলিজা, প্রাণের বিবি হয়তো এতক্ষণে হামাম থেকে ফিরে তোমাকে দেখতে না পেয়ে বিরহে মূর্ছা গেছে। এখন যাও, পরে আবার সময় মতো ডেকে পাঠাবো। তখন এসো। যাও, তাড়াতাড়ি যাও তার কাছে। হয়তো সে ভাবছে, আমি তার ভালোবাসায় ভাগ বসাতে তোমাকে ভাগিয়ে এনেছি এখানে।

লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে আমার গাল। আমি আর তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। প্রায় ছুটেই বেরিয়ে যাই মহল থেকে।

আমি যখন আবার ফিরে এলাম আমার বিবি তখন মুখ গুঁজে পড়েছিলো বিছানায়। আমি ভয়ে ভয়ে তার পায়ের কাছে বসি। মৃদু কণ্ঠে ডাকি, ওগো শুনছো?

সে উত্তর দেয় না। আবার ডাকি, শুনছো, আমি এসেছি।

তবু সে কথা বলে না। আমি ওর পায়ের পাতায় ঠোঁট রেখে চুমু খাই— আদর করতে থাকি।

প্রচণ্ড জোরে সে একটা লাথি ছোঁড়ে। আমি ছিটকে মেজেয় পড়ে যাই। গর্জে ওঠে সে। তুমি একটা ঠগ প্রতারক। ভালোবাসা তোমার প্রাপ্য নয়। মহব্বতের মর্যাদা তুমি দিতে শেখোনি। কথার খেলাপ করে, ভালোবাসাকে পায়ে দলে তুমি গিয়েছিলে বেগম জুবেদার মনোরঞ্জন করতে? আল্লা কসম, তোমার মতো একটা অপদার্থ নির্লজ্জ বেহায়া মানুষের সঙ্গে আমি আমার গাঁটছড়া বেঁধে আর থাকবো না। তা সে লোকে যে যাই বলুক। আমার ভাবতেই ঘেন্না করছে, তোমার মতো একটা নষ্ট-চরিত্রের লম্পটকে শাদী করেছি। আমি এক্ষুণি যাবো বেগম জুবেদার কাছে। মুখের ওপর আমি শুনিয়ে দিয়ে আসবো; অন্য মেয়ের ভাতারকে নিয়ে অত ফষ্টি নষ্টি করা তার সাজে না।

এই বলে সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে হাতে তুড়ি বাজায়। সঙ্গে সঙ্গে সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে হাবসী নিগ্রো সাবাব। হাতে তার খোলা তরোয়াল।

—এই বিশ্বাসঘাতকের গর্দান চাই।

সে চিৎকার করে ওঠে। সাবাব এগিয়ে এসে আমার চোখে ফেটি বেঁধে ফেলে।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো নিরানব্বইতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

সেই সময় প্রাসাদের ছোট বড় কচি বুড়ো, সব দাস দাসী ছুটে আসে। এই এক মাস ধরে ওরা সবাই আমাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিলো। তারা সকলে একসঙ্গে করুণভাবে কাকুতি মিনতি জানাতে থাকলো, মালকিন এবারকার মতো মাফ করে দিন। আমাদের মালিকের কোনও দোষ নেই। তিনি বুঝতে পারেন নি, আপনি এত ক্ষিপ্ত হতে পারেন। মালিক তো আর জানতেন না, বেগম জুবেদা আপনার দুষমন্। আপনার ক্ষতি করার জন্য তিনি রাতে ঘুমান না। আপনাদের এই হিংসা-হিংসীর খবর তিনি রাখবেন কী করে? সুতরাং তাঁর কতটুকু দোষ? তাই আমরা সবাই মিলে আপনার কাছে তাঁর প্রাণ-ভিক্ষা করছি।

—ঠিক আছে, আমার বিবি কিছুটা নরম হলো, তোমরা যখন বলছো, আমি ওকে জানে মারবো না। কিন্তু এমন সাজা দেবো, যা ওর জিন্দেগীভর ইয়াদ থাকে। আর যাতে সে কখনো জুবেদার ডাকে কুত্তার মতো ছুটে না যায় তার দরজায়, সেই ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।

এরপর আমার বিবির হুকুম মতো সাবাব তলোয়ার রেখে ডান্ডা তুলে নেয় হাতে। সারা শরীরে পিটে পিটে আমার হাড়গোড় সব ভেঙ্গে চুর চুর করে দেয়। শুধু ডান্ডাই নয়, চাবুকের কষাঘাতেও জর্জরিত করে সে আমার সর্বাঙ্গ। তাও একটা দুটো নয়—পাঁচ পাঁচশো চাবুকের ঘা পড়েছিলো আমার এই দেহে।

এরপরে আমার কী অবস্থা হতে পারে নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পারছেন। সারা শরীরটা আমার তালগোল পাকিয়ে একটা গোবরের ডেলার মতো হয়ে গিয়েছিলো। সেই অবস্থায় আমাকে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় জঞ্জালের বাক্সে ফেলে দিয়েছিলো সে।

আমার জ্ঞান ফিরে এলে কোন রকমে দু'পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি। অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে, ছেঁচড়ে কোনও রকমে আবার বাড়িতে এসে পৌঁছতে পেরেছিলাম।

বেদম জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে রইলাম ক'দিন। বাঁচার কোনও আশাই ছিলো না। একমাত্র তাঁর দয়াতেই প্রাণে বেঁচে গেলাম। দিক কয়েক পরে খানিকটা সুস্থ হয়ে একজন নাম করা হেকিমকে ডেকে আমার ভাঙ্গা হাড়-গোড়গুলো ঠিকঠাক করাতে পারলাম। তার মলম মালিশ আর দাওয়াই-এ আস্তে আস্তে সেরে উঠলাম একদিন।

অনেকদিন পরে আবার দোকান খুলে বসলাম। কিন্তু আমার মনে কোনও শান্তি ছিলো না। সারাক্ষণ শুধু আমার বিবির নিষ্ঠুর আচরণ আমাকে হনন করতে থাকলো। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য আমি আমার দোকানের সব দামী দামী রত্নালঙ্কার বেচে সেই পয়সায় চারশো নফর চাকর ক্রীতদাস কিনে তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রতি রাতে টাইগ্রিসে বজরা ভাসিয়ে নৌকা বিহার করতে লাগলাম। এর ফলে আমার মনের দীনতা অনেক কমে আসতে থাকলো। নকল খলিফার সাজে সেজে লোক লস্কর নিয়ে প্রতি রাতে এই প্রমোদ বিহারে বেরিয়ে নিজেকে একজন কেউ-কেটা মনে হতে লাগলো। আস্তে আস্তে আমি ভুলে যেতে পারলাম আমার বিবির দুর্ব্যবহার।

এই আমার দুঃখের কাহিনী। আর এই কারণেই আমার সারা অঙ্গে ঐ কালো কালো দাগ।

যাইহোক, আজ রাতে আপনাদের সঙ্গ পেয়ে অন্য রাতের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছি আমি।

সব শুনে খলিফা হারুন-অল-রসিদ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আল্লাহই একমাত্র সত্য, তাঁর ইচ্ছাতেই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ হয়। আমাদের কার নসীবে কী যে তিনি লিখে রাখেন তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

খলিফা উঠে দাঁড়ান, এবার তাহলে আমরা চলি।

জাফর এবং মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রসাদে ফিরে আসেন। জাফরকে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা জাফর, বলতে পারো ঐ যুবকের এই দুর্ভাগ্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন্ নারীটি দায়ী?

জাফর বলে, আমার মতে আমার ভগ্নীর অন্যায় আচরণই এর জন্যে একমাত্র দায়ী।

পরদিন সকালে দরবারে প্রবেশ করে খলিফা জাফরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কাল রাতে যে ছেলেটি আমাদের আদর আপ্যায়ন করেছিলো তাকে এখানে হাজির কর।

উজির দরবার ত্যাগ করে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই নকল খলিফাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। যুবক যথাবিহিত কুর্নিশ করে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল খলিফার সামনে।

হারুন-অল-রসিদ মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, এসো, আমার পাশে এইখানে এসে বসো। মহম্মদ আমি, আমি তোমাকে ডেকেছি কেন, জান? গতকাল রাতে তোমার প্রাসাদে তিনজন বিদেশী মুসাফিরকে তোমার জীবনের বড় অদ্ভুত এক করুণ কাহিনী নাকি শুনিয়েছিলে! সেই কাহিনী আমি তোমার নিজের মুখে শুনতে চাই।

যুবক বললো, বলার আগে আমি আপনার কাছ থেকে অভয় প্রার্থনা করি, জাঁহাপনা! আপনি আমাকে সাজা দেবেন না। সেই জন্যে মেহেরবানি করে আমাকে আপনার অভয়-রুমাল দিন।

খলিফা একখানা রুমাল ছুঁড়ে দিলো তার হাতে। এরপর যুবক তার জীবনের সেই সুখ-দুঃখের বিস্ময়কর কাহিনী আগাগোড়া খুলে বললো তাঁর সামনে। এবং বলা শেষ হলে খলিফা প্রশ্ন করলেন, তোমার বিবির জন্য এখনও কী তোমার প্রাণ কাঁদে, আলি? আবার তাকে ফিরে পেতে চাও? তোমার প্রতি যে-দুর্ব্যবহার সে করেছিলো, সে-সব কী মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলে তাকে আবার আগের মতো করে গ্রহণ করতে পারবে?

যুবক বললো, এ ব্যাপারে ধর্মাবতার যা ভালো মনে করবেন তা-ই আমি মাথা পেতে নেবো।

খলিফা তখন জাফরকে বললেন, তোমার ভগ্নীকে নিয়ে এসো আমার কাছে।

'যথা আজ্ঞা' বলে জাফর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরে বোনকে সঙ্গে নিয়ে আবার দরবারে ফিরে আসে।

খলিফা বললেন, আমার সম্ভ্রান্ত আমির ইয়াহিয়ার কন্যা তুমি, ভালো করে এই যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখ তো, একে চিনতে পারো কিনা?

ধর্মাবতার, সে বলে, মেয়েরা পরপুরুষকে দেখে চিনবে কী করে?

খলিফা মুচকি হেসে বলেন, ঠিক আছে, আমি ওর নাম বলছি—মহম্মদ আলি। ওরা বাবা এই শহরের এক সম্ভ্রান্ত জহুরী ছিলেন। সে যাক, যা ঘটে গেছে তা ঘটে গেছে। এখন আমার ইচ্ছা, এই ছেলেটির সঙ্গে তোমার শাদী হোক।

মেয়েটি বললো, জাঁহাপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আপনি যা আদেশ করবেন আমি তা শিরোধার্য করে নেবো।

তৎক্ষণাৎ কাজী এবং সাক্ষী-সাবুদদের ডেকে পাঠালেন খলিফা। তাঁর সামনে আবার তাদের শাদী হলো।

মহম্মদ আলিকে খলিফা তার একান্ত প্রিয় এক আমির করে নিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মহম্মদ আলি খলিফার পাশে পাশে থেকে পরমানন্দে কালাতিপাত করেছিলো।

এই কাহিনী থেকে খলিফার আর একটা দিক আমরা জানতে পারলাম। বিচ্ছেদের মিলন ঘটিয়ে আবার সুখের জীবন ফিরিয়ে দিতে খলিফার চেষ্টার অন্ত ছিলো না। এইভাবে কত ভাঙা ঘর যে জোড়া লাগিয়ে ছিলেন তিনি তার সীমা সংখ্যা নাই।

শাহরাজাদ এক মুহূর্তের জন্য থামে। তারপর বলে, এ গল্পের এখানেই শেষ। এরপর আরও একটা ছোট কাহিনী শোনাবো আপনাকে। খুব চমৎকার গল্প—গুলাবী এবং রোশন এর কাহিনী বলছি শুনুন ঃ

কোনও এক সময়ে এক প্রবল পরাক্রান্ত শাহেনশাহর ইবরাহিম নামে এক উজির ছিলো। এই উজিরের ছিলো এক রূপবতী কন্যা। তার নাম গুলাবী। তাকে নিয়েই আমাদের আজকের কাহিনী।

মেয়েটির যেমন রূপ তেমনি গুণ। তার মিষ্টি কথাবার্তায় সুন্দর আদব-কায়দায় সকলেই মুগ্ধ হতো। লেখাপড়াও সে যথেষ্টই করেছিলো। বহু নামকরা কবির শায়ের-বয়েৎ অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতো সে।

শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো। বাদশাহ শাহরিয়ার দেখলো, রাত্রি অতিক্রান্ত হতে চলেছে।

চারশোতম রজনীতে আবার শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

প্রত্যেক উৎসব অনুষ্ঠানে সুলতান গুলাবীকে ডাকতো। আনন্দের মুহূর্তগুলো সুন্দরতর হয়ে উঠতো তার উপস্থিতিতে। সুলতানের সে পাশে পাশেই অবস্থান করতো। তার রূপ এবং রসবোধ দুই-ই সুলতানকে মুগ্ধ করতে পারতো।

একদা সুলতানের অভ্যাগতরা প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বল খেলছিলো। গুলাবী জানালার পাশে বসে বসে সেই খেলা দেখছিলো। হঠাৎ তার নজর পড়লো সুঠাম দেহী সুন্দর সুপুরুষ এক যুবকের দিকে। গুলাবীর চিত্তে চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। নিজেকে আর শান্ত করতে পারে

না। ছেলেটির যেমন বাহুভূজ তেমনি বিশাল বিস্তৃত বক্ষপট, ক্ষীণকটি, বলিষ্ঠ গর্দান। আর কী সুন্দর হাসে সে—দাঁতগুলো যেন মুক্তোর মতো ঝিকমিক করে ওঠে।

গুলাবী মুগ্ধ নয়নে তার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে। দেখে দেখে তার আর আশ্ মেটে না। ছেলেটিকে আরও কাছে পাওয়ার জন্য, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রাণ আকুলি বিকুলি করতে থাকে। একটু পরে গুলাবী তার ধাইকে ডেকে বলে, ধাইমা ঐ যে খুবসুরৎ ছেলেটিকে দেখছো, ওকে চেন? নাম ধাম জান কিছু?

—কার কথা বলছো বেটা, কিছুই তো ঠাওর করতে পারছি না। সব ছেলেগুলোই তো দেখতে চাঁদের মতোন?

গুলাবী বলে, সে কি! তুমি বুঝতে পারছো না, ধাইমা। ঐ তো—ঐ যে দেখছো না? আচ্ছা দাঁড়াও আমি তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

একটা আপেল হাতে নিয়ে সে ছুঁড়ে মারে। ছেলেটির গায়ে লাগতেই সে জানালার দিকে তাকায়। গুলাবীর চোখে চোখ পড়ে। পলকে দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হয়। ছেলেটির মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সেই মুহূর্তে, দুটি হৃদয়েরও বিনিময় ঘটে যায়। ছেলেটি আপনমনেই একটি কবিতার কয়েকটি কলি আওড়ায়—

তীর বিদ্ধ আমি—
আমি এক আহত সৈনিক।
কে তুমি ধনুর্ধর,
এমন অব্যর্থ তোমার শর?
দুষমন, অথবা দুরন্ত প্রেমিক!

গুলাবী তার ধাইমাকে আবার জিজ্ঞেস করে, এবার তো বুঝতে পেরেছো, কার কথা আমি বলছি। ওর নাম কী?

ধাইমা বলে, রোশন।

গুলাবী বলে, রোশনই বটে। সার্থক নাম রেখেছেন ওঁর মা-বাবা!

তারপর গুলাবী বিড় বিড় করে নিজের খেয়ালে কী সব আওড়াতে থাকে। একটু পরে সে বলে, ধাইমা কাগজ কলম নিয়ে এসো তো। আমি একটা কবিতা বানিয়েছি—লিখবো।

ধাইমা তাকে কাগজ কলম এনে দেয়। গুলাবী লিখতে থাকে ঃ

প্রাজ্ঞ পিতার প্রিয়-পাত্র পুত্র,
তোমার নাম রেখেছেন তিনি রোশন—জগতের আলো।
তা জগতেরই আলো বটে—
তোমার রূপের রোশনাই-এ তামাম দুনিয়া আলোকিত হয়ে আছে।
পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদের মতো তোমার স্নিগ্ধ কোমল দ্যুতি
আমার মনের সব অন্ধকার কেড়ে নিয়ে গেছে।
তোমাকে দেখার পর থেকে আমি নিশ্বাসে আঘ্রাণ করছি
তোমার দেহের সুরভিত সুবাস। তুমি এসো—

কবিতাটা লিখে কাগজখানা ভাঁজ করে সে একটা সুন্দর কাজকরা বটুয়ার মধ্যে পুরে বালিশের তলায় রেখে দেয়। ধাইমা দূর থেকে সবই লক্ষ্য করছিলো। গুলাবী ঘুমিয়ে পড়লে, সে অতি সন্তর্পণে বালিশের তলা থেকে বাটুয়াটা বের করে। কবিতাটা পড়ে বুঝতে পারে, তার নবযৌবনাউদ্ভিন্না মালকিনের মনে এই প্রথম বসন্তের বর্ষণ শুরু হয়েছে।

মহব্বতের ঢল নামতে আর বেশি দেরি নাই; চিঠিখানা আবার ভাঁজ করে বটুয়ার ভরে যথাস্থানে রেখে দেয় সে।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো, বৃদ্ধা তার পাশে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর সোহাগ করতে করতে বলে, বেটী, জন্মের পর থেকে তোমাকে আমি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। এই অবস্থায় যা স্বাভাবিক তাই তোমার মধ্যে ফুটে ওঠার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে। এ খুবই শুভ লক্ষণ। জীবনে যখন প্রথম প্রেম আসে, তার উদ্দাম উচ্ছলতা সহ্য করার শক্তি সকলের থাকে না। কেউ বা ভেসে যায়। কেউ বা তলিয়ে যায়। মহব্বতের আগুনে পুড়ে কত হৃদয় খাঁটি সোনা হয়। আবার কেউ অঙ্গার হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রেমের চিন্তা বড় মারাত্মক, সে নিয়ত দহন করে। কিন্তু এই দহন জ্বালার কিছুটা উপশম হয় যদি তার প্রণয়-চিন্তার ভাগ দেয় সে অন্য কাউকে।

গুলাবী বলে, ধাইমা, তুমি কী জান এই মহব্বতের জ্বালার কী দাওয়াই?

ধাইমা বলে, জানি বাছা, জানি।

গুলাবী আকুল হয়ে বলে, বলো না, ধাইমা, কেমন করে জুড়াবো আমার এ জ্বালা?

ধাইমা বলে, তুমি এক কাজ কর বেটী, তাকে খৎ লেখো। খুব সুন্দর করে খুব মোলায়েম করে তাকে জানাও তোমার প্রেমের আকুলতা। দেখবে, সে তোমাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে। তোমার মন প্রাণ খুলে মেলে ধরো তার কাছে। কোনও কিছু গোপন রাখবে না। দেখবে—সেও উন্মুক্ত করে দেবে তার হৃদয়।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো একতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

বৃদ্ধার কথা শুনে গুলাবী পুলকিত হয়। ভাবে, যথার্থই বলেছে সে। তবু নিজেকে খুলে মেলে ধরতে পারে না তার কাছে। সে যে ছেলেটির প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছে সে-কথা বিলকুল চেপে যায়। প্রথমে ছেলেটির কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, তার মনের কথা। যদি সে বুঝতে পারে, ছেলেটিও তাকে ভালোবেসে ফেলেছে, তবেই সে নিজেকে খুলে ধরবে তার কাছে। তার আগে নয়। সুতরাং এখনই এই বৃদ্ধাকে সে-কথা সে বলবে না।

বৃদ্ধা গুলাবীর মনের কথা আঁচ করে বলে, বেটী, গতকাল রাতে আমি এক খোয়াব দেখেছি। একটি সুন্দর ছেলে আমার সামনে এসে বলছে 'তোমার মালকিন গুলাবী এবং রোশন প্রেমাসক্ত হয়েছে। তুমি ওদের গাঁটছড়া বাঁধার একমাত্র উপায়। আর দেরি করো না, গুলাবীর খৎ নিয়ে গিয়ে রোশনের হাতে পৌঁছে দাও তুমি। রোশন তার জবাব দেবে। এবং তা গুলাবীর কাছে পৌঁছে দেবার ভার তোমাকেই নিতে হবে। এই মহান কর্তব্য থেকে তুমি যদি বিচ্যুত হও তবে দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে।' স্বপ্নে যা দেখেছি তোমাকে বললাম, এবার ভালো-মন্দ বিচারের ভার তোমার, বেটী।

গুলাবী আনন্দে নেচে ওঠে, ধাইমা, একটা কথা বলবো, কাউকে বলবে না, বলো?

—তোমার কী কোনও সন্দেহ হয় বেটী? আমি তোমাকে জান দিয়ে ভালোবাসি। তোমার কোন ক্ষতি হয় তেমন কোনও কাজ কী আমার দ্বারা সম্ভব?

গুলাবীর আর ধৈর্য মানে না। বালিশের তলা থেকে কাগজখানা বের করে সে বৃদ্ধার হাতে দেয়, পড়, আমি তাকে কবিতায় জানিয়েছি আমার মনের ভাষা। আমার এই মনের কথা তুমি তার হাতে পৌঁছে দাও, ধাইমা। সে যা জবাব দেয় আমাকে নিয়ে এসে দাও। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।

তখুনি ধাইমা রোশন-এর বাড়িতে ছুটে যায়। তার হাতে তুলে দেয় গুলাবীর কাগজখানা। রোশন খুলে পড়ে। আনন্দে ভরে ওঠে তার মন। সেও কবিতা করেই জবাব লেখে ঃ

আমার প্রাণ আজ পাখী হয়ে
দূর নীল নভে ডানা মেলে
উধাও হতে চায়।
আমি তো তাকে বাধা দিতে পারি না
সে যে আজ পিঞ্জর ছাড়া—
শুধু মুক্তির গান গায়।
এসো, ওগো আমার প্রিয়া
হৃদয় দুয়ার খুলেছি আজ
পরেছি দেখো নতুন সাজ
সঁপেছি তোমায় সকল হিয়া।

কাগজখানা ভাঁজ করে রোশন ধাইমার হাতে দিয়ে বলে, আপনিই আমার একমাত্র ভরসা, মা। সে যদি আমাকে একটু অনুগ্রহ করে সে আপনারই জন্যে করবে।

ধাই বলে, আমার যথাসাধ্য আমি করবো, বাবা।

বৃদ্ধা আর সেখানে দাঁড়ায় না। দ্রুত পায়ে ফিরে আসে গুলাবীর কাছে।

চিঠিখানা হাতে পেয়ে গুলাবী প্রথমে অধরে স্পর্শ করে। তারপর খুলে পড়ে।

সে আবার জবাব লিখতে বসে ঃ

ধৈর্য ধর,
একই জালে বন্দী হয়েছি আমরা,
তবু কি করে বুঝবো বলো
তোমার দিল্-ও টুকরো টুকরো
হয়ে যাচ্ছে আমারই মতো!
রাত্রির কালোছায়া তোমাকে আড়াল করে রেখেছে
আমার দৃষ্টিপথ থেকে,
কিন্তু আমি তো জানি
আমাদের দু'জনেরই বুকে জ্বলছে তুষের আগুন।
নীরবে মুখ বুঁজে থাকাই শ্রেয়;
আমার নাকাব নাই বা খোলা হলো
তোমার ইয়ার বন্ধুদের সামনে!
আমি তো তোমারই—একান্তভাবে।

রাত্রির অন্ধকার সরে যেতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো দুইতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

গুলাবীর লেখা শেষ হলে কাগজখানা ভাঁজ করে আবার সে ধাইমার হাতে দিয়ে বলে, যাও ধাইমা, তাড়াতাড়ি জবাব নিয়ে এসো। আমি আর দেরি সইতে পারছি না।

ধাইমা দ্রুতপায়ে চলে যায়। কিন্তু সেবার বিধি বাম হলো, রোশনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে উজিরের প্রধান সচিবের মুখোমুখি হয়ে পড়ে সে।

—শোনো, কোথায় যাচ্ছো এত রাতে?

—হামামে।

বৃদ্ধা থতমত খেয়ে পালাতে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানাও আঁচল থেকে খুলে যায়। দরজার সামনে বারান্দায় গিয়ে পড়ে। একটা খোজা ছুটে এসে কুড়িয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। তারপর সোজা গিয়ে তুলে দেয় উজিরের হাতে। বলে, কাগজখানা দরজার সামনে পড়ে ছিলো, হুজুর। তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম।

উজিরের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। হাতের লেখা দেখে চিনতে অসুবিধে হয় না—এ তার কন্যারই লেখা।

রাগে দুঃখে অপমানে উজিরের কান্না পায়। সে চীৎকার করতে করতে বেগমের কাছে ছুটে আসে। স্বামীর ঐ মূর্তি দেখে বেগম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনার চোখে জল কেন, মালিক?

উজির কাগজখানা বাড়িয়ে দেয়—দেখ, পড়।

বেগম কাগজখানা নিয়ে পড়ে। তারও বুঝতে কষ্ট হয় না—এ তারই কন্যার হাতে লেখা। তারও দু'চোখ জলে ভরে যায়। কিন্তু নিজেকে সে সংযত করে নিতে পারে তখুনি। উজিরকে বলে, এ নিয়ে চোখের জল ফেলা বৃথা, মালিক। তার চাইতে এখন ভাবতে হবে কী ভাবে এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, কলঙ্ক থেকে রেহাই পাওয়া যায় কী ভাবে?

তারপর নানা কথায় উজিরকে সান্ত্বনা দিতে থাকে বেগম।

—মেয়ের কথা ভেবে আমি ভয় পাচ্ছি। তুমি তো জানো, সুলতান স্বয়ং তাকে কতো ভালোবাসেন। এখন আমার দুদিকে ভয়। প্রথমতঃ সে আমাদের সন্তান। দ্বিতীয়তঃ সে সুলতানের ভীষণ পেয়ারের। এ ব্যাপারে তোমার কী মত?

বেগম বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আগে আমাকে একটু আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতে দিন।

বেগম যথাবিহিত রুজুআদি সেরে শুদ্ধাচারে নামাজ সারে।

প্রার্থনা শেষে সে বলে, বাহার অল কুনুজ সাগরেরর মাঝখানে একটা পাহাড় আছে। তার নাম 'নির্বাসিত মাতা'। দারুণ বিপদকাল ছাড়া কেউই সেখানে যেতে পারে না। ওখানে একখানা ইমারত বানিয়ে মেয়েকে রেখে আসুন আপনি। এতে সুলতানের রোষ এবং মেয়ের ইজ্জত দুই-ই বাঁচবে।

বেগমের কথা উজিরের মনে ধরে। পাহাড়ের দুর্গম চূড়ায় একখানা প্রাসাদ বানাবে ভাবলো সে। প্রাসাদে এক বছরের মতো খানা-পিনার ব্যবস্থা রাখা হবে। গুলাবীকে সেখানে নির্বাসিতা বন্দিনী করে রাখবে সে। অবশ্য দাসী বাঁদী চাকর নফর সবই থাকবে তার সঙ্গে—তার দেখা-শোনার জন্য।

বড় বড় রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী এবং ভাস্করদের ডেকে সেখানে কাজে পাঠিয়ে দিলো উজির। কিছুদিনের মধ্যেই তারা এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো এক সুরম্য প্রাসাদ বানিয়ে ফেললো সেখানে।

উজির যখন শুনলো, তার কথামতো সব তৈরি হয়ে গেছে, একদিন গভীর রাতে গুলাবীকে জাগিয়ে তুলে লোক লস্কর লটবহর সহ তাকে নিয়ে সেই পাহাড়-প্রাসাদে রওনা হয়ে গেলো।

এতদিন সবকিছু গোপনে গোপনে সমাধা করেছে সে। গুলাবী এ সবের কিছুই বুঝতে পারেনি। আজ তার বাবা হঠাৎ তাকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার তোড়জোড় করছে দেখে সে বিরহ-ব্যথায় ভেঙ্গে পড়লো। কান্নায় ভেসে যেতে লাগলো তার বুক। যাবার আগে দরজার পাল্লায় লিখে রেখে গেলো।

তোমার জন্য আমার প্রাণমাতানো
চুম্বন রইলো, হে প্রিয়
জানি না, কোথায় চলেছি আমি
এই রাতে পাখীরা তরুশাখায় বসে
চোখের জল ফেলছে,
কিন্তু আমার নিয়তি
আমাকে ছাড়বে কেন?

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চারতম রজনীতে আবার বলতে শুরু করে ঃ

চোখের জলে সুর্মা গুলে হৃদয় নিঙড়ে এই ব্যথার বাণী সে দরজার ওপর লিখে রেখে ডুলিতে গিয়ে বসলো। মনে মনে বিদায় জানালো তার ভালোবাসাকে।

ঊষর মরুভূমি, বন্ধুর পাহাড় পর্বত, অনেক শহর গ্রাম অতিক্রম করে চলতে থাকে তারা। অবশেষে অল কুনুজ সমুদ্রতীরে এসে থামলো। সেখানে তাঁবু ফেলা হলো। দুমদাম কাজে লেগে পড়লো লোকজন, মিস্ত্রী। খুব চটপট একখানা বিশাল নৌকা বানিয়ে ফেললো তারা।

প্রহরী-পরিবেষ্টিত করে দাসী বাঁদী নফর চাকর সঙ্গে দিয়ে গুলাবীকে নৌকায় চাপিয়ে দিলো উজির। প্রহরীদের বলে দিলো, মেয়েকে প্রাসাদে পৌঁছে দিয়েই তারা যেন আবার সকলে এপারে ফিরে আসে। আসার পর নৌকাখানা পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিলো সে।

এদিকে সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজাদি সেরে বেগম ঘোড়ায় চেপে সুলতানের দরবারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। পথে উজিরের প্রাসাদ, রোশন দেখলো। প্রাসাদে কোনও জনমানবের সাড়া নাই। অবাক লাগলো তার। ঘোড়া থেকে নেমে সে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ তার চোখে পড়ে, দরজায় লেখা গুলাবীর সেই কবিতার কয়েকটি ছত্র। বুঝতে আর বাকী থাকে না, নয়নতারা, তার বুকের কলিজা গুলাবী আর সেখানে নাই। মাথাটা তার ঘুরে গেলো। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এলো। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না, সেইখানেই লুটিয়ে পড়লো রোশন।

অনেকক্ষণ পর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বুকের মধ্যে হু হু করে যায়। এখন সে কী করবে, কোথায় যাবে, কোথায় তার প্রিয়তমার সন্ধান পাবে—কিছুই বুঝতে পারে না। এইভাবে ভাবতে ভাবতে প্রায় পাগলের মতো সে পথে বেরিয়ে পড়ে। এক বস্ত্রে। উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে মরুপ্রান্তর পার হয়ে চলতে থাকে।

একটানা কত পথ যে অতিক্রম করে, কে তার হিসাব রাখে। এক নদীর ধরে এসে সে থামে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। অঞ্জলি ভরে জল পান করে। নদীর স্বচ্ছ জলে তার নিজের মুখের চেহারা দেখে আঁৎকে ওঠে। একি ছিরি হয়েছে তার চেহারার!

তা সে ক্ষণকালের জন্যই। রোশন ভাবে হোক গে, কী হবে এই রূপ আর যৌবন দিয়ে? যদি সে তার প্রিয়তমা গুলাবীকেই না পেলো, এ রূপ-যৌবনের কী বা প্রয়োজন?

আবার সে বিরাম বিহীন ভাবে চলতে থাকলো। কত পাহাড় পর্বত নদী নালা গ্রাম শহর পিছনে ফেলে সে শুধু একটানা পথ চলে। কোথায় চলেছে কিছুই জানে না। শুধু চলার নেশাতেই চলেছে।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন সে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে এক সমুদ্র-সৈকতের বালুকা-বেলায় এসে বসে পড়ে। দেহে আর কোনও শক্তি নাই। আর সে চলতে

পারে না। কয়দিন পেটে একটাও দানাপানি পড়েনি। খিদেটা শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। এখন আর অনুভবই করতে পারে না—সত্যিই তার খিদে বলে কিছু আছে কিনা।

বালির ওপরে পড়ে পড়ে সে ধুঁকছিলো, এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ায় এক দরবেশ ফকির। রোশনের অবস্থা নিরীক্ষণ করে সে বুঝতে পারে, এভাবে এখানে পড়ে থাকলে,নির্ঘাৎ মারা যাবে ছেলেটা।

কোনরকমে তাকে উঠে দাঁড় করায় সে। বলে, বেটা, এখানে তুমি কেন এসেছো. চলো, আমার ডেরায় চলো।

অদূরেই দরবেশ-সাহেবের আস্তানা। সমুদ্রের এক পাশে ছোট পর্বতমালা। তার নিচে একটি গুহায় সে বাস করে। রোশনকে কোন রকমে গুহার ভিতরে নিয়ে আসে। কিছু ফলমূল এবং একটু সরবৎ খেতে দেয় সে। তারপর ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গলে রোশন দরবেশকে জিজ্ঞেস করে, আমি কোথায়?

—তুমি আমার দরগায় এসেছো, বেটা। তোমার কোনও ভয় নাই!

—আপনি কে?

রোশনের প্রশ্ন শুনে দরবেশ-এর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে, আমি এক ফকির, বাবা। আল্লাহর নফর।

—আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছেন আপনি?

—তা না হলে তুমি যে মারা যেতে বাবা। জানি না কি কারণে, তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিলো, পথশ্রমে তুমি বড় ক্লান্ত, অনেকদিন তোমার নাওয়া খাওয়া কিছু হয় নি। ঐ ভাবে ঐ সমুদ্রের চরে পড়ে থাকলে জন্তু-জানোয়ারদের শিকার হতে বাবা। তাই তোমাকে আমার ডেরায় নিয়ে এসেছি। এখন বলতো, কোথায় তুমি চলেছো, আর কেনই বা এত কষ্টের পথ অতিক্রম করে এসেছো।

রাত্রির অন্ধকার কেটে যায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পাঁচতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পীর সাহেব জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী, বেটা?

—আমার নাম রোশন।

এরপর রোশন তার বিরহের উপাখ্যান আদ্যোপান্ত সব শোনায় তাকে। কথা বলতে বলতে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে।

পীর সাহেব বলে, শোক করো না, বেটা। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি আজ বিশটা বছর এই গুহায় আস্তানা গেড়ে বসে আছি। এদিকে কোনও জনবসতি নাই। মানুষের মুখ ক্বচিৎ কখনও দেখতে পাই। তবে এই কয়েকদিন আগে মানুষের একটা দলবল এখানে এসেছিলো। দেখে মনে হলো, অনেক বড় ঘরের ব্যাপার। অনেক লোক লস্কর, লটবহর সঙ্গে ছিলো তাদের। এই সমুদ্রের তীরে বসে অনেক লোকজন মিলে ওরা একখানা নৌকা তৈরি করলো। তারপর সেই নৌকায় চেপে সমুদ্রের মাঝখানে ঐ যে দেখছো একটা পাহাড়—সেই পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। আমি আমার গুহার সামনে বসে বসে সব প্রত্যক্ষ করলাম। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হলো না। তবে একটা ব্যাপারে খটকা লাগলো, নৌকাটা যখন সমুদ্রের জলে ভেসে চলতে থাকলো তখন, নারী-কণ্ঠের এক আর্তনাদ আমি শুনতে পেয়েছিলাম। যাইহোক, নৌকাটা চলতে

চলতে এক সময় গিয়ে ঐ পাহাড়ের পাদদেশে ভিড়লো। তারপর কিছু লোকজন নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এলো এখানে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম, ওরা নৌকা থেকে নেমে, অত মেহনত করে বানানো বজরাটাকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিলো।

সেই থেকে এই হেঁয়ালীর কোনও অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি। এখন তোমার এই কাহিনী শুনে সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো, বেটা। তোমার প্রিয়তমাকে ওরা ঐ পাহাড়ে বন্দিনী করে রেখে গেছে।

রোশন জিজ্ঞেস করে, নৌকাটাকে পুড়িয়ে দিয়ে লোকগুলো কোথায় গেলো?

পীর সাহেব বললো, যে পথ দিয়ে এসেছিলো আবার সেই পথ—এই মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ঐ দিকে চলে গেছে তারা।

রোশন কাঁদতে থাকে। কাঁদতে থাকে পীর সাহেবও। বলে, দুঃখ করো না, বাবা, আল্লাহ মেহেরবান। আজ রাতে আমি তাঁর কাছে তোমার জন্য মোনাজাত করবো। তারপর যা' আদেশ পাই, সেইভাবে তুমি কাজ করবে।

এখন রোশনের কথা থাক। গুলাবীর কাহিনী শুনুন ঃ

পাহাড়ের সেই সুরম্য প্রাসাদে প্রবেশ করে গুলাবী অবাক্ হয়। এত সুন্দর মনোহর ইমারত সে কখনও দেখেনি। সারা প্রাসাদটা বিলাস উপচারে ভরা—বেশ সাজানো গোছানো ঝকঝকে তকতকে। কিন্তু সবই তার কাছে বিষাদময় হয়ে ওঠে। প্রিয়তম ছাড়া কোনও কিছুই তার কাছে ভালো লাগে না। প্রাসাদের ছাদে গিয়ে দাঁড়ায় সে। সেখান থেকে দূর দিগন্তে যতদূর চোখ যায়—শুধু জল আর জল। অনন্ত জলরাশি। মাথার ওপরে নীল আকাশ। আর সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় নাম না জানা কত রকমের পাখী।

গুলাবী একখানা জাল পাতে। যদি ঐ পাখীরা এসে ধরা দেয়। যদি তাদের কেউ বন্দী হয়ে তার সঙ্গী হয়। কিন্তু কেউ ধরা দিতে আসে না। কেউ তার বিরহ-ব্যথার ভাগ নিতে চায় না। সে এই নিঃসঙ্গ পুরীতে একা। বড় অসহায়। অথচ তার কোনও দীনতা নাই। খানাপিনা সাজ-পোশাক বিলাস-বৈভবের কোনও অভাব নাই। কিন্তু কী হবে এত ভোগের সামগ্রী দিয়ে। যেখানে তার প্রিয়তম নাই সেখানে সবই নিরর্থক। ঊষর মরুভূমির মতো সবই রিক্ত শূন্য মনে হয় তার কাছে।

গুলাবী তার বিরহ-ব্যথা নিয়ে দিন কাটাক, এবার আমরা আবার রোশনের দিকে চোখ ফেরাই ঃ

পীর সাহেব বললো, আমি কাল রাতে তোমার কথা ভেবেছি। আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছি। তুমি এক কাজ কর, একটু এগোলেই সামনে একটা খেজুর-বন দেখতে পাবে। ওখানে অনেক মরা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। তার কয়েকটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে এসো এখানে।

ফকিরের কথা মতো রোশন খেজুর কাঠের গুঁড়ি এনে জড়ো করে সেখানে। একটার সঙ্গে আর একটা বেঁধে সে ভেলা তৈরি করে। কিছু খড় বিচালি এনে পাটাতন বানায়।

পীর সাহেব বলে, এবার আল্লাহর নাম করে উঠে বসো। খেয়াল রাখবে, সমুদ্রের মাঝখানের ঐ পাহাড়ে তোমাকে পৌঁছতে হবে।

ভেলা ভেসে ভেসে চলে।

সমুদ্র শান্ত ছিলো। হঠাৎ সে উত্তাল হয়ে ওঠে। রোশন দিশাহারা হয়ে পড়ে। উন্মত্ত চৈত্রের তাণ্ডবে কোথায় যে সে চলে যায়, কিছুই বুঝতে পারে না।

এক সময় ঝড় থামে। রোশন চৈতন্য ফিরে পেয়ে দেখে ভেলা কোথায় ভেসে গেছে, সে এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছেছে। সমুদ্র ঝঞ্ঝায় তার সারা দেহ ব্যথায়

টনটন করছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নাই। দেখতে পেল, একটা খোজা তার দিকে এগিয়ে আসছে।

—আপনি কে, মালিক? এখানে এইভাবে এলেন কী করে?

—আমি এক সওদাগর। সমুদ্র-ঝড়ে আমার জাহাজ ডুবে গেছে। আমি ভাসতে ভাসতে এসে ভিড়েছি এখানে। দেশ আমার ইস্পাহান।

রোশনের দুর্দশার কাহিনী শুনতে শুনতে খোজাটা কেঁদে ফেলে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে।

একমাত্র আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করবেন। ইস্পাহান আমারও স্বদেশ। আমার ভালোবাসা, আমার চাচার মেয়ে আজও আমার পথ চেয়ে বসে আছে সেখানে। একদিন আমাদের জাতভাইরাই আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়। তখন আমার বয়স খুবই কম। ওরা আমার বীচি দুটো কেটে খোজা বানিয়ে বাজারে বেচে দেয়। এমনি বান্দা হিসেবে বেচলে যা দাম পেত, তার অনেক বেশি দাম তারা পেয়েছিলো আমাকে খোজা বানিয়ে। সে থাক, আমার দুঃখের কিস্‌সা পরে শোনাবো আপনাকে। এখন আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।

পাহাড়ের চূড়ায় একখানা বিশাল প্রাসাদ। তার বাইরের মহলে রোশনকে নিয়ে যায় সে।

—এইখানে আমি থাকি। খাইদাই ঘুমাই। বলতে গেলে প্রাসাদের সদর পাহারা দেওয়া ছাড়া আমার কোনও কাজ নাই। তা পাহারা দেবারই বা কী দরকার। সদর দরজা সারা বছর বন্ধ থাকবে। খুলবে শুধু একদিন।

রোশন বুঝতে পারে না। প্রশ্ন করে, মানে?

খোজাটা বলে, প্রাসাদের অন্দর থেকে বাইরে বেরুবার কোনও নিয়ম নাই। ভেতরে ঢোকারও তাই। পুরো একটা বছরের যাবতীয় খানাপিনা সামানপত্র একেবারে ভিতরে পুরে দেওয়া হয়েছে। এক বছর বাদে আবার আসবে নৌকা বোঝাই মালপত্র। সেইদিন আবার এ দরজা খোলা হবে, তার আগে নয়।

রোশন দেখলো, চারপাশে গাছ-গাছালিতে ঘেরা সুন্দর সাজানো গোছানো প্রাসাদ। প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ফুলের বাগিচা। তার মাঝখানে একটা ফোয়ারা অবিরত ধারায় বর্ষণ করে চলেছে। কিন্তু এমন নয়নাভিরাম সৌন্দর্যও তার কাছে ম্লান মনে হয়—করুণ কান্নার আওয়াজ শুনে।

—কে কাঁদে?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো সাততম রজনী। আবার সে বলতে থাকে ঃ

খোজা বলে, এক বাদশাহর উজির তার কন্যার নির্বাসনের জন্য বানিয়েছেন এই প্রাসাদ। দিন কয়েক আগে তিনি রেখে গেছেন তাকে। এই প্রাসাদের হারেমে তিনি বসে বসে তার দয়িতের জন্য চোখের জল ফেলছেন। এ কান্নার আওয়াজ তারই।

রোশনের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে। স্বগতভাবে উচ্চারণ করে, যাক, এতদিনে আমি ঠিক জায়গাতে এসে পৌঁছেছি। নিমেষে তার দেহ-মনের সব ক্লান্তি সব অবসাদ দূর হয়ে যায়।

কিন্তু এখানে এইভাবে কতকাল তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে—কিছুই আন্দাজ করতে পারে না সে।

এই নির্বাসন-প্রাসাদে আসার পর থেকে গুলাবীর চোখে ঘুম নাই। মুখে আহার রোচে না। প্রায় এক রকম অনাহার অনিদ্রাতে কেঁদে-কেঁদে দিন কাটতে থাকে তার। প্রাসাদের কারাপ্রাচীরে মাথা কুটে সে, খোদা, আমাকে মুক্তি দাও এই কয়েদখানা থেকে।

কিন্তু কোনই ফল হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয় গুলাবীর, ছাদের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে শেষ করে দেবে সে। ভালোবাসার এই বিরহযন্ত্রণা আর কতকাল সইতে পারে মানুষ? দূরে নীল আকাশের দিকে তাকায়। ওখানে মুক্ত বিহঙ্গরা ডানা মেলে ভেসে বেড়ায়। গুলাবী ভাবে, বনের পাখী, তারাও কত স্বাধীন, মুক্ত।

ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব নানা চিন্তায় সে বিভোর হয়েছিলো। হঠাৎ একপাশে নজর পড়লো। একটা পাহাড়ী গাছের লম্বা ডাল ছাদের কার্নিশ ছুঁয়েছে প্রায়। গুলাবী আশার আলো দেখতে পায়। ডালটাকে ধরতে পারলে নিচে নামা যেতে পারে। কিন্তু কার্নিশের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাতে প্রাণ হারাবার ভয় আছে। তা থাক। গুলাবী আর প্রাণের মায়া করে না। এমন পোড়া ব্যর্থজীবন রেখেই বা কী হবে? সে মরিয়া হয়ে কার্নিশের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডালটাকে আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ে। অনেক কায়দা কসরত করার পর নিজেকে সে আয়ত্তে আনতে পারে। কোনও রকমে একটা মোটা ডালে উঠে বসে। তারপর ধীরে ধীরে নেমে আসে নীচে।

দুর্গম পাহাড়ের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে একসময় সে সমুদ্রের সমতটেও নামতে সক্ষম হয়।

তার সারা অঙ্গে দামী দামী রত্নাভরণ, বাদশাহী জমকালো সাজপোশাক।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো নয়তম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

গুলাবী দেখতে পায় এক ধীবর নৌকায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জলে জাল ফেলছে। জেলেরও নজর পড়ে গুলাবীর ওপর। কপালের ভুরু কুঁচকে ওঠে তার। এখানে নির্জন সমুদ্র অঞ্চলে এমন রূপবতী সুন্দরী আমির সুলতানতনয়া সদৃশ এই নারী এলো কী করে? হয় সে বেহেস্তের হুরী পরী, নয় সে নির্ঘাৎ অন্য কোথাও থেকে এসেছে এখানে। নৌকাটাকে লগি দিয়ে ঠেলে সে কূলের কাছে নিয়ে আসে।

গুলাবী তাকে ইশারা করে ডাকে। লোকটা আরও কাছে এলে সে বলে, ভয় নাই, আমি কোনও দৈত্য-দানবী বা জীন-পরী নই। কিংবা ভেবো না সমুদ্রের নিচে আমার বাস। আমি এক রক্ত-মাংসে গড়া নারী। একান্তই মানুষের সন্তান। আমারও দেহে কামনা বাসনা ছিলো। আমিও ভালোবেসেছিলাম আমার দয়িতকে। কিন্তু কি করবো বলো, কপালে আমার সুখ লেখা নাই। বিধি বাম হলো, আমি আজ নির্বাসিতা নারী। তোমার নৌকায় আমায় একটু জায়গা করে দেবে জেলের পো? আমি তোমায় সোনাদানা দেবো। দেবো এই মুক্তোর মালা। জান তো, এ মুক্তো পাওয়া যায় এই সমুদ্রেরই ঝিনুক খোলে? আর দেরি করো না জেলের পো। তাড়াতাড়ি কাছে এসো। আমাকে উঠিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যাও। নইলে ওরা—যারা আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছিলো, তারা যদি জানতে পারে, আবার আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুরবে ঐ পিঁজরাপোলে। দোহাই, তুমি আর দেরি করো না।

গুলাবীর রোদনভরা আকুলতায় বিচলিত হয় জেলে। তার চোখও জলে ভরে ওঠে। সেও ইয়াদ করতে পারে, তার প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমের বিরহ যন্ত্রণা। বহুকাল পরে প্রায় বিস্মৃত সেই সব স্মৃতি আবার জেগে ওঠে মনে।

জেলে নৌকাখানা কূলে ভেড়ায়।

—এসো, আমার নায়ে এসো। যেখানে তুমি যেতে চাও বলো, নিয়ে যাবো আমি।

গুলাবী নৌকায় চেপে বসে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেলে দাঁড় টেনে সমুদ্রের কিনারা ছেড়ে অনেক ভেতরে চলে যায়। এমন সময় সমুদ্রে তুফান ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে জেলে নিশানা হারিয়ে ফেলে। শক্ত হাতে হাল ধরেও সে আর নৌকাটাকে বাঁচাতে পারে না। প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় কোথা দিয়ে কী ভাবে ওলোট পালোট খেয়ে কোথয় যে তলিয়ে যায় নৌকাখানা কিছুই ঠাওর করতে পারে না কেউ।

এক সময় সমুদ্র শান্ত হয়। এক শহর সমীপে সমুদ্রতটের বালির চড়ায় নৌকাখানাকে আটকে থাকতে দেখা যায়। সেইদিন বিকালে সেই শহরের সুলতান দিরবাস বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছিলো। একখানা নৌকা বালির চড়ায় আটকে থাকতে দেখে সে তার পারিষদদের সঙ্গে নিয়ে নৌকাটার কাছে আসে। দেখে অবাক হয়, পাটাতনের ওপর শুয়ে আছে এক পরমাসুন্দরী কন্যা। সুলতান ভাবে, এ নিশ্চয়ই কোনও সমুদ্র-কন্যা হবে। না হলে এত রূপ কখনও কোনও ধরার মেয়ের হয়?

—কে তুমি?

সুলতানের ডাকে গুলাবীর আচ্ছন্নভাব কেটে যায়। চোখ মেলে সে তাকায়। সুলতান আবার প্রশ্ন করে, কোন দেশের কন্যা তুমি, এখানেই বা এলে কী করে?

এবার গুলাবীর সব মনে পড়ে। উঠে বসে সে। বলে, আমার বাবার নাম ইবরাহিম। তিনি শাহেনশাহ সামিখের উজির। আমার এই সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য বড় বিচিত্র। তা হলে আগাগোড়া সবটাই শুনুন, তবে বুঝতে পারবেন।

গুলাবী কোনও কথাই গোপন করলো না। তার প্রেম বিরহ বিচ্ছেদ, নির্বাসনের সব কাহিনীই তাকে বিস্তারিতভাবে বললো।

—আমার নসীব খারাপ, চোখের পানি ফেলে আর কী করবো। তবু তো পোড়া চোখে পানি বাধা মানে না। আমার ভালোবাসার এই যে অদ্ভুত কাহিনী এ কি তুচ্ছ অশ্রুধারায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে?

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো দশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

গুলাবীর মুখে তার জীবনের ব্যর্থপ্রেমের কাহিনী শুনে সুলতান ব্যথিত হয়ে বলে, ভয় নাই। তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এবার আর কাঁদতে হবে না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো এবং আমার বিশ্বাস, তোমার 'ভালোবাসাকে' আমি পৌঁছে দিতে পারবো তোমার কাছে। এখন চলো, আমার প্রাসাদে চলো। সেখানে তুমি অবস্থান কর। আমি তোমার 'ভালাবাসা'র সন্ধানে লোকজন পাঠাচ্ছি।

সুলতান তার উজিরকে বললো, নানারকম মূল্যবান সাজ-পোশাক উপহার উপঢৌকন এবং আমার একদল সৈন্য সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ সাখিমের দরবারে যাও তুমি। সেখান থেকে রোশন নামে এক নওজোয়ান যুবক প্রার্থনা করে নিয়ে আসবে। বাদশাহকে বলবে গুলাবীর জান-বাঁচাবার জন্য রোশনকে অতি অবশ্য দরকার। তাকে যেন শাহেনশাহ সাখিম এখানে পাঠিয়ে দেন।

সুলতান দিরবাস বাদশাহ সাখিমকে একখানা চিঠিতেও সে কথা খুলে লিখে দিলো। যাওয়ার সময় উজিরকে সে বললো, তোমার কাজে যদি আমি খুশি হই, তবে

তোমাকে আমি আরও দায়িত্ব ছেড়ে দেবো। কিন্তু যদি শূন্য হাতে ফিরে আস, তবে তোমার পদাবনতি ঘটবে, উজির। মনে থাকে যেন।

উজির যথাবিহিত কুর্নিশ করে বলে, যো হুকুম, জাঁহাপনা।

বাদশাহ সাখিমের দরবারে পৌঁছে উজির সুলতান দিরবাস-এর ভেট সওগাত এবং চিঠিখানা পেশ করে। বাদশাহ সাখিম চিঠিখানা পড়ে কাঁদতে থাকে, ইয়া আল্লাহ, রোশনকে কোথায় পাবো। সে যে কোথায় চলে গেছে, আমরা তো তার কোন হদিস জানি না। তাকে যদি তুমি ফিরিয়ে আনতে পারো উজির, তোমার সুলতান আমাকে যে ডালি পাঠিয়েছেন আমি তোমাকে তার দ্বিগুণ সওগাত দেবো। এখন তুমি এসব জিনিস ফেরত নিয়ে যাও তোমার সুলতানের কাছে। তাকে গিয়ে বলো, আজ অনেক দিন হলো রোশন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কেউ তার সন্ধান করতে পারছে না। বুঝতেই পারছি না, সে আজ কত দূরে—কেমন আছে, অথবা আদৌ সে বেঁচে আছে কি না।

উজির বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, রোশনকে সঙ্গে না নিয়ে আমি আমার সুলতানের সামনে যেতে পারবো না। তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন, যদি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না পারি তবে আমাকে তিনি আর এই উজিরের পদে রাখবেন না। এখন আমি শূন্য হাতে কি করে দেশে ফিরে যাবো, জাঁহাপনা।

বাদশাহ তার নিজের উজির ইবরাহিমকে বললো, এই উজিরের দলের সঙ্গে তোমরা ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বেড়াও। খুঁজে তাকে বের করতেই হবে।

ইবরাহিম বললো, জাঁহাপনার যা মর্জি।

ওরা অনেক দিন ধরে নানা দেশের নানা শহর প্রান্তর গ্রামগঞ্জ তল্লাস করে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু রোশনের কোনও সন্ধান পেলো না।

ভোর হয়ে আসছে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ কর বসে রইলো।

চারশো এগারোতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

আবার তারা নগরে প্রান্তরে ঘুরতে লাগলো। পথের মধ্যে যাদের সঙ্গেই দেখা হয় সকলকেই জিজ্ঞেস করে রোশনের কথা। কিন্তু কেউই কোনও আলোর নিশানা দেখাতে পারে না।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন তারা সেই সমুদ্র-সৈকতে এসে হাজির হয়। এই সমুদ্রের মাঝখানে সেই 'নির্বাসিতা মাতা' পাহাড়। সুলতান দিরবাসের উজির ইবরাহিমকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ঐ পাহাড়টার ওরকম নাম রাখা হয়েছে কেন?

ইবরাহিম বলে, এর পিছনে একটা মজার কাহিনী আছে। অনেক কাল আগে চীন দেশে এক জিনিয়াহ ছিলো। সে ঘটনাক্রমে একটি মনুষ্য সন্তান যুবকের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। জীনের রোষ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে সে তার দয়িতকে এই নির্জন দ্বীপ-পাহাড়ে এনে লুকিয়ে রাখে। জীনের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে সে আকাশ-পথে উঠে এসে এই পাহাড়ে সেই যুবক প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতো। তার ঔরসে বার-কয়েক সেই জিনিয়াহ গর্ভবতী হয় এবং কয়েকটি ছেলেমেয়ের জন্ম দেয় এই পাহাড়েই। নাবিকরা জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় সেই ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পেতো তখন। সেই থেকে এই পাহাড়ের নাম 'নির্বাসিতের মা' হয়ে গেছে।

নৌকায় চেপে পাহাড়ের পথে যেতে যেতে ইবরাহিম এই কাহিনী শোনাচ্ছিল তার সঙ্গী সুলতান দিরবাসের উজিরকে। একটু পরে পাহাড়ের পাদদেশে এসে নৌকা ভিড়ালো। দ্বাররক্ষী খোজা এসে সালাম জানালো তাদের। ইবরাহিম যে তার মনিব, তা সে দেখেই চিনতে পেরেছে। দু'জন উজিরকে সঙ্গে নিয়ে সে প্রাসাদে উঠে এলো। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে নফর চাকরদের মধ্যে এক ভবঘুরে যুবককে দেখে ইবরাহিম চিনতে পারে—এই সেই রোশন!

ইবরাহিম খোজাকে জিজ্ঞেস করলো, এই মুসাফির যুবকটি কে? কী তার পরিচয়? কেনই বা এখানে সে এসেছে?

খোজা বলে, বেচারি এক সওদাগর। সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেছে। সহায়সম্বলহীন হয়ে সে কোনমতে-প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। আমাদের এই ঘাটেই একদিন এসে ভিড়েছিলো। তারপর থেকে এখানেই আছে। মানুষটি বড় ভালো। একেবারে ফকির দরবেশের মতো। কারো সাতে-পাঁচে নাই। নিজের মনেই সে ঘুরে বেড়ায়। খুব কম কথা বলে। নাওয়া খাওয়া করে না বললেই চলে।

ইবরাহিম তখন আর কিছু না বলে প্রাসাদের অন্দরে ঢোকে। কিন্তু হারেমের কোথাও তার কন্যা গুলাবী দেখতে না পেয়ে সে দাসী-বাঁদীদের প্রশ্ন করে, আমার মেয়ে কোথায়?

তারা ভীত-চকিত হয়ে বলে, আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এই দুর্গের মতো প্রাসাদ থেকে কী করে সে অন্তর্ধান হয়ে গেলো! শুধু এইটুকু জানি, সে আর এ প্রাসাদে নাই। আমরা তার কোনও হদিশ করতে পারিনি।

দাসী-বাঁদীদের কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে উজির ইবরাহিম। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে আক্ষেপ করতে থাকে, ইয়া আল্লাহ, তোমার লীলা বোঝা ভার। যার কপালে যা লিখে রেখেছো, তা থেকে একচুল এদিক ওদিক হবার জো নাই।

ইবরাহিম ছাদের ওপরে উঠে আসে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে একটা গাছের ডালের দিকে নজর পড়ে। ডালখানা এসে ছুঁয়েছে প্রাসাদের কার্নিশ। ইবরাহিমের আর বুঝতে কষ্ট হয় না, তার কন্যা গুলাবী এই ডাল বেয়ে নিচে নেমে কোথাও চলে গেছে।

রক্ষী-বাহিনীকে বলা হলো সারা পাহাড়ের প্রতিটি কন্দর তন্নতন্ন করে খুঁজে পেতে দেখতে।

কিন্তু রক্ষীরা অনেক খুঁজেও গুলাবীর কোনও সন্ধান আনতে পারলো না। ইবরাহিম ভাবলো; পাহাড়ের জন্তু-জানোয়ারদের মুখে পড়ে তার কন্যা গুলাবীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে।

এদিকে এই সংবাদ রোশনের কানে যেতেই সে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার এই অনড় অসাড় অবস্থা দেখে প্রাসাদের নফর চাকররা ভাবে, যুবক ধ্যানস্থ হয়েছে। এখন সে খোদ খোদাতালার সঙ্গে কথা বলছে।

অন্যদিকে সুলতান দিরবাসের উজির দেখলো, উজির ইবরাহিম কন্যার শোকে মুহ্যমান। এ অবস্থায় তার পক্ষে রোশনের সন্ধান করে বেড়ানো আর সম্ভব হবে না। তাই সে ভাবলো একা একা উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে এদিক ওদিক ফালতু ঘোরাঘুরি করে কোনও ফয়দা নাই। সুতরাং শূন্যহাতে স্বদেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি নাই। সুলতানের রোষে তার অশেষ ক্ষতি হবে জেনেও সে দেশের পথেই রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। প্রথমে সে গুলাবীর পিতা ইবরাহিমের কাছে গেলো বিদায় নিতে। বললো, আপনার যা মনের অবস্থা তাতে আর আপনাকে বিরক্ত করবো না। আমি দেশে ফিরে চললাম। শুধু যাওয়ার সময় আপনার প্রাসাদের ঐ অসহায় যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। ওর মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, জীবনে সে কোনও পাপ করতে পারে না। অথচ কী কপাল দোষে আজ তার এই

দুরাবস্থা। আমি রোশনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলাম না, সে কারণে সুলতান আমার ওপর কুপিত হবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র এই ভরসা নিয়ে যাচ্ছি, এই যুবকের সুন্দর অপাপবিদ্ধ চেহারায় মুগ্ধ হয়ে যদি-বা তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে কিছু কম সাজা দেন। পরে আমি তাকে তার স্বদেশ ইস্পাহানে পাঠিয়ে দেব। আমাদের শহর থেকে ইস্পাহান তো বেশি দূরে নয়।

ইবরাহিম বলে, আপনার যা অভিরুচি। আমার কোনও আপত্তি নাই।

দুই উজির দুই পথ ধরলো। নিজের নিজের দেশের পথ।

দিরবাসের উজির রোশনকে একটা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তার পাশে পাশে নিয়ে চললো। তখনও রোশনের আচ্ছন্ন ভাব কাটেনি।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেলো। ধীরে ধীরে রোশন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পায়। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে উজিরের দিকে তাকায়, আমি কোথায়?

একজন নফর ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে, আপনি সুলতান দিরবাসের উজিরের সঙ্গে তাঁর শহরের পথে চলেছেন।

উজির বললো, এবার ওকে গুলাব জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে, খানাপিনা খেতে দাও! সময় সময় খেয়াল রাখবে, ওর কোন কিছু অসুবিধা হচ্ছে কি না।

শহরের কাছে আসতে দূত দ্রুতগতিতে ছুটে গেলো সুলতান দিরবাসের কাছে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সে ফিরে এসে উজিরকে জানালো, সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি হুকুম পাঠিয়েছেন, যেহেতু তুমি ওয়াদা মতো রোশনকে খুঁজে-পেতে সঙ্গে আনতে পারোনি, সেই কারণে আমি তোমার মুখ দর্শন করতে চাইনি। প্রাসাদে আসতে হবে না তোমাকে। তুমি শহরের ভিতরে ঢুকবে না।

দিশাহারা উজির বুঝতে পারে না, এখন কী করণীয়। বেচারী জানে না, যে-গুলাবীর জন্য উজির ইবরাহিম আজ শোকাকুল সেই গুলাবী এখন সুলতানের হেফাজতে। আর যে-রোশনকে খুঁজে আনতে পারেনি বলে আজ তার নিজের এই নির্মম দশা সেই রোশন তারই দলবলের সঙ্গে চলেছে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

সুলতান দিরবাসের হুকুম শুনে উজিরের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। অনেক চিন্তা ভাবনা করেও নিজের বুদ্ধি দিয়ে কোনও উপায় উদ্ভাবন করতে পারে না। ভাবে, ঐ যুবক খোদাতালার এক নিষ্ঠাবান ভক্ত। এ ব্যাপারে সে হয়তো তাকে কোনও নিশানা বাৎলে দিতে পারে।

রোশনের কাছে গিয়ে সে বলতে থাকে, এক কঠিন সমস্যায় পড়েছি আমি। নিজে নিজে ভেবে ভেবে কোন কুল-কিনারা করতে পারছি না। তুমি আল্লাহর সেবক, আমার বিশ্বাস তুমিই আমাকে পথ বলে দিতে পারবে। আমার সুলতান একটি কাজে আমাকে দূরদেশে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমার খারাপ নসীব, আমি কাজটা সমাধা করতে পারিনি। এখন তার দূত এসে আমাকে খবর দিয়ে গেলো, যেহেতু আমি কাজটা করে আসতে পারিনি সেই কারণে তিনি আমার মুখ দর্শন করবেন না। তাঁর হুকুম, আমি যেন তাঁর শহরে প্রবেশ না করি।

—কী কাজে তিনি পাঠিয়েছিলেন আপনাকে?

তখন উজির তাকে আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বললো। সব অবগত হলো রোশন। ভিতরে ভিতরে দারুণ বিচলিত বোধ করলেও বাইরে কিছু প্রকাশ করলো না সে। সহজ ভাবেই বললো, কিছু ভয় করবেন না, আমাকে সুলতানের সামনে নিয়ে চলুন। আমি তাঁকে বলবো, রোশনের সন্ধান আমি জানি।

উজিরের চোখ আনন্দে নেচে ওঠে, তুমি কী সত্যিই জান, বাবা?

রোশন বললো, আমি মিথ্যে বলবো কেন? সত্যিই জানি।

উজির আর তিলমাত্র বিলম্ব করতে পারে না। রোশনকে সঙ্গে নিয়ে সে সুলতানের দরবারে গিয়ে হাজির হয়।

উজিরকে দেখামাত্র সুলতান গর্জে ওঠে, রোশন কোথায়? পেয়েছো কোনও সন্ধান?

উজিরের বদলে রোশন জবাব দেয়, সুলতান মহানুভব, আমি জানি, রোশন কোথায় লুকিয়ে আছে।

সুলতান ইশারায় তাকে কাছে আসতে বললো। রোশন তাঁর সামনে এগিয়ে যেতে সে প্রশ্ন করে, সে-জায়গাটা কোথায়? কতদূর?

—খু-উ-ব কাছে। একেবারে আপনার নাকের ডগায় বলতে পারেন, জাঁহাপনা। আমি তার সন্ধান আপনাকে নিশ্চয়ই জানাবো। কিন্তু তার আগে মেহেরবাণী করে বলুন, কেন, কী কারণে তাকে আপনার প্রয়োজন? অবশ্য আপনার যদি জানাতে কোনও আপত্তি না থাকে।

আপত্তির কিছু নাই। সবই তোমাকে বলতে পারি। তবে শুধু তোমাকেই। কারণ, এ আমার নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার। দরবারের সবাইকে তা জানাতে চাই না। আমি তোমাকে নিভৃতে সব খুলে বলবো।

সুলতান রোশনকে সঙ্গে নিয়ে দরবার ছেড়ে এক গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করে। সমস্ত কথা সে খুলে বলে তাকে।

রোশন বলে, আপনি এক কাজ করুন, আমাকে জমকালো একটা সাজ পোশাক এনে দিন। আমি ওটা পরে যখন দাঁড়াবো, তখনই রোশন এসে হাজির হবে আপনার সামনে।

সুলতান তাকে এক মহামূল্যবান সূক্ষ্ম কারুকার্যকরা সাজ-পোশাক এনে দিলো। রোশন তার ছিন্ন বেশ-বাস পরিত্যাগ করে শাহী-সাজে সেজে সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, আমি, আমিই সেই রোশন, জাঁহাপনা।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তেরোতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়। শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

রোশন তার সমূহ বিরহ উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণনা করলো সুলতানের কাছে। সুলতান বলে, খোদা হাফেজ, সত্যিকারের মহব্বতের কখনও মৃত্যু হয় না। তোমাদের দু'জনের মধ্যেই যে তীব্র আকুলতা আমি দেখলাম, ভালোবাসার ইতিহাসে তা সোনার জলে লেখা থাকবে। যতদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা থাকবে, তোমাদের এই অমর প্রেমের জ্যোতির্ময় শিখা দূর আসমানের ধ্রুবতারার মতো জ্বলতেই থাকবে।

রোশন জিজ্ঞেস করে, এখন গুলাবী কোথায় আছে, জাঁহাপনা?

—সে আমার প্রাসাদেই আছে।

সুলতান কাজী আর সাক্ষী-সাবুদদের ডেকে পাঠালো। কাজী এসে শাদীনামা তৈরি করে দিলো। রোশনকে নানা মূল্যবান দান-সামগ্রী দিলো সুলতান। এবং বাদশাহ সামিখের কাছে এক দৌত্যদল পাঠানো।

বাদশাহ সামিখ সংবাদ পেয়ে সবিশেষ আনন্দিত হয়ে সুলতান দিরবাসকে এক পত্রে জানালো, আমি খুব আনন্দিত। আমার ইচ্ছা, শাদী উপলক্ষে খানাপিনার উৎসব আমার প্রাসাদেই হোক।

বহু উট, গাধা, খচ্চর এবং ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করা হলো বিরাট দানসামগ্রী। অনেক দাস-দাসী লোকজনের এক বিশাল বাহিনী পাঠালেন তিনি সুলতান দিরবাসের প্রাসাদে।

সেই স্মরণীয় দিন প্রায় এসে গেলো। ওরা সকলে ইস্পাহানে এসে উপস্থিত হলো। সে-দিনের সেই আলোকসজ্জা, সেই সমারোহ ভুলবার নয়। সারা দেশের যত গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে—সবাই এসে জড়ো হলো বাদশাহের প্রাসাদে। তিনদিনব্যাপী চলতে থাকলো সেই আনন্দ উৎসব। লোকে পেটপুরে খেয়ে সাজপোশাক উপহার নিয়ে খুশি মনে ঘরে ফিরে গেলো।

উৎসবের শেষে রোশন গুলাবীর ঘরে গিয়ে তাকে বুকে টেনে নেয়। এতকালের এত বিরহবেদনার এইখানেই ইতি হয়ে যায়।

দু'জনের গাল বেয়ে ঝরে পড়ে আনন্দের অশ্রুধারা।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলতে পারে না। শুধু বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে তারা।

শাহরাজাদ বলে, এর পর আপনাকে অন্য ধরনের এক আশ্চর্য কাহিনী শোনাবো, জাঁহাপনা। আবলুস কাঠের এক যাদু-ঘোড়ার কাহিনী শুনুন এবার ঃ

সেকালের পারস্য দেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত শাহেনশাহ ছিলেন। তাঁর নাম সাবুর। তাঁর তুল্য অতুল ঐশ্বর্য সে সময় আর কোনও সুলতান বাদশাহরই ছিলো না। শুধু ধনে নয়, জ্ঞানে গুণে গরিমাতেও কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলো না। ও-রকম উদার মহৎ দানশীল মহামতি শাহেনশাহ বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর কাছে হাত পেতে কেউ কখনও বিমুখ হতো না। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, আর্তের সেবা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত ছিলো। গরীব, নিরস্ত্র অসহায়ের তিনি একমাত্র সম্বল। তাঁর প্রাসাদের দ্বার সদাই উন্মুক্ত থাকতো তাদের জন্য। কিন্তু উদ্ধত অবিনয়ী, বিদ্রোহীকে তিনি কখনই বরদাস্ত করতেন না। সেখানে তিনি কঠোর, নির্মম, নিষ্ঠুর।

বাদশাহ সাবুরের তিন কন্যা। সকলেই পরম রূপ-লাবণ্যবতী। বেহেস্তের ডানাকাটা পরী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। যেন রাতের আসমানে একই সঙ্গে তিনটি পূর্ণ চাঁদের হাট। অথবা বলা যায়, গুলবাগিচায় একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত তিনটি গুলাব। সাবুরের একটি পুত্র-সন্তানও ছিলো—কামার অল্ আক্‌মর—অর্থাৎ চাঁদের মেলায় সব থেকে সেরা এক চাঁদ।

ফি বছর বাদশাহ সাবুর দু'বার খুব জাঁকজমক করে উৎসবানুষ্ঠান করতেন। বসন্তকালে যে উৎসবটি করা হতো তার নাম নওরোজ। আর শরৎ কালের নাম মীরগান।

উৎসব-কালে প্রাসাদের সমস্ত ফটক উন্মুক্ত করে দেওয়া হতো। দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে জমায়েৎ হতো প্রাসাদে। বাদশাহের হুকুমে দু'হাতে দান ধ্যান করা হতো। পেট ভরে ফলার খাওয়ানো হতো। বাদশাহ খুশি হয়ে কোনও কোনও কয়েদীদের মেয়াদ কমিয়ে দিতেন। কেউ বা একেবারেই খালাস পেত। দরবার এবং দপ্তরের কর্মচারীদের পদোন্নতি হতো। বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার জন্য বিভিন্ন শাহীখেতাব বিলি করা হতো। সেনাবাহিনীর মধ্যেও নানা ইনাম পুরস্কার বিতরণ করতেন তিনি। শাহেনশাহকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সারা মুলুক থেকে হাজারো জ্ঞানী গুণী, ধনী নির্ধন আসতো তাঁর কাছে। যারা সওদাগর আমির ওমরাহ জাতের—তারা বাদশাহকে মূল্যবান ধনরত্ন চাকর নফর দাসী-বাঁদী, খোজা এবং নানারকম বাহারী বস্তু নজরানা দিয়ে যেত।

বসন্ত সময়ে নওরোজ উৎসবে বাদশাহ এক বিদ্যোৎসভার আয়োজন করতেন। বিজ্ঞান, জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল বাদশাহর।

এইরকম এক বসন্ত-উৎসবের দিনে নানা মুলুক থেকে তিনজন বিখ্যাত বিশারদ এসেছিলো তাঁর কাছে। এবং এদের সকলেই অলৌকিক গুপ্তবিদ্যা এবং নানা কলা-কৌশলের অধিকারী।

তারা তিনজন তিনদেশের মানুষ। তাদের ভাষা আলাদা। একজনের হিন্দি, একজনের রুমি এবং অন্যজনের ভাষা পারসী।

প্রথমে হিন্দী-ভাষী পণ্ডিত কুর্ণিশ জানিয়ে বাদশাহকে বললো, আমি আমার দেশ এবং সম্রাটের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, জাঁহাপনা। আপনার আদর-আপ্যায়নে আমি আহ্লাদিত হয়েছি। আপনাকে একটি আশ্চর্য বস্তু উপহার দিতে চাই, শাহেনশাহ।

এই বলে সে বাদশাহ সাবুরের সামনে একটি অভিনব বস্তু স্থাপন করলো। একটি সোনার তৈরি মনুষ্যমূর্তি। বহু দুষ্প্রাপ্য মহামূল্যবান হীরক-খচিত তার সর্বাঙ্গ। হাতে একটা সুবর্ণ-শিঙা।

বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, মূর্তিটা কীসের জন্য এনেছেন, পণ্ডিতজী?

পণ্ডিতপ্রবর জবাব দিলো, এই মূর্তি এক অলৌকিক দৈব গুণের অধিকারী, জাঁহাপনা। একে যদি আপনি আপনার শহর-প্রান্তের সদর ফটকের মাথায় স্থাপন করেন, তবে এ এক দক্ষ অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দিবারাত্র আপনার শহর পাহারা দিতে থাকবে। বাইরের কোন শত্রুর ক্ষমতা নাই, যে আপনার শহর আক্রমণ করতে পারবে। দূর প্রান্তরে শত্রুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের এই শিঙায় সে মুখ লাগাবে। আর তৎক্ষণাৎ গভীর আর্তনাদ করে সমস্ত শহরবাসী, সৈন্য সামন্ত-সকলকে হুঁশিয়ার করে দেবে। এই শিঙার এমনই গুণ, এর সিংহনিনাদে শত্রুর কলিজা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। প্রাণভয়ে সেনাবাহিনী ছত্রাকার হয়ে পালিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু এর আওয়াজের এমনই যাদু, কেউই পালাতেও পারে না। দেহ অসাড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ভয়ে, আতঙ্কেই তারা অক্কা পায়।

বাদশাহ সাবুর আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন, ইয়া আল্লাহ, তাজ্জব কি বাৎ। আপনি যা বললেন, তা যদি সত্যি হয়, পণ্ডিতজী, আপনার কোনও বাসনাই অপূর্ণ রাখবো না আমি।

এরপর রুমি-পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো। শাহেনশাহ মহানুভব, আমি এই রূপোর গামলায় চব্বিশটা সুবর্ণ-ময়ুরী পরিবৃত একটি সুবর্ণ ময়ুর উপহার দিতে এনেছি আপনাকে।

সাবুর জিজ্ঞেস করেন, এ দিয়ে কী হবে?

রুমি পণ্ডিত বলে, সারাদিন রাতে এই ময়ূরটা একঘণ্টা অন্তর অন্তর এই ময়ুরীগুলোর সঙ্গে কাম-সংসর্গে মিলিত হবে। দিন-রাতে চব্বিশ ঘণ্টায় চব্বিশটির সঙ্গে সে রতি-রঙ্গ করবে। প্রতিবার রাগমোচনের সময় প্রচণ্ড শব্দে সে পাখা ঝাপটাবে। এবং তা থেকে প্রতি ঘণ্টায় ঘড়ির সময়-সংকেত বোঝা যাবে। এইভাবে দিনে দিনে যখন মাস ফুরিয়ে যাবে তখন ময়ূরটা মুখ ব্যাদন করবে একবার। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে নির্গত হয়ে আসবে প্রতিপদের একখানা চাঁদ।

বাদশাহ অবাক হয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ, এবার বললেন, আপনার কথা যদি সত্যিই ঠিক হয়, পণ্ডিতপ্রবর, তবে আপনারও কোন বাসনা অপূর্ণ রাখবো না আমি।

এবার উঠে দাঁড়ায় পারস্য-পণ্ডিত। বাদশাহকে যথারীতি কুর্ণিশ ও সৌজন্য দেখিয়ে সে বলতে থাকে, জাঁহাপনা আমি আপনার জন্যে এনেছি একটি সামান্য ঘোড়া। তাও আবার জ্যান্ত নয়। কাঠের তৈরি একটা খেলনা বলতে পারেন।

এই বলে পারস্য-পণ্ডিত বাদশাহের সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ আবলুস কাঠের একটি ঘোড়া দাঁড় করিয়ে দিলো।

—দুষ্প্রাপ্য আবলুস কাঠের তৈরি এই কালো ঘোড়াটি এক অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন।

বাদশাহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন, অতি মূল্যবান মণিমুক্তা হীরেজহরতে খচিত জীনলাগামে সুসজ্জিত ঘোড়াটা দেখতে বড়ই বাহারী, চমৎকার! দেখতে দেখতে ভুলে যেতে হয়, জানোয়ারটা প্রাণহীন একটা কাঠের পুতুল মাত্র।

পারস্য-পণ্ডিত বলতে থাকে, এমনি আশ্চর্য ব্যাপার, ঘোড়াটার ওপর চেপে বসলে সোওয়ারকে নিয়ে সে ওপরে শূন্যে উঠে যায়। তারপর তার ইচ্ছা মতো বায়ুবেগে উড়ে চলে। একটা জ্যান্ত ঘোড়ার এক বছরের পথ একলহমায় অতিক্রম করে যেতে পারে সে।

একদিনে একই সময়ে রকম তিনটি পরমাশ্চর্য বস্তুর সন্ধান পেয়ে বাদশাহ সাবুর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। কিছুক্ষণ তাঁর মুখে কথা সরে না। তারপর নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

—এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে সত্যি সত্যিই ঘটতে পারে আমি এখন ভাবতেই পারছি না। যাই হোক, যা আপনি বললেন তা যদি সত্যিই ঘটাতে পারেন, যা চাইবেন তাই আপনাকে দেব আমি।

তিনদিন ধরে এই তিনটি অলৌকিক বস্তুর প্রত্যক্ষ পরীক্ষা নিলেন তিনি। সোনার মূর্তি শিঙে ফুঁকলো। সোনার ময়ূর প্রতি ঘণ্টায় ময়ূরী সহবাস করে সময় নির্দেশ করলো। এবং সব শেষে পারস্য-পণ্ডিত তার আবলুস কাঠের ঘোড়ায় চেপে শোঁ-শোঁ করে শূন্যে উঠে গিয়ে বিদ্যুৎগতিতে এক বিশাল বৃত্ত পথপ্রদক্ষিণ করে আবার যথা নির্দিষ্ট স্থানে এসে অবতরণ করলো।

এই সময় রাতের আঁধার সরে যেতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ষোলতম রজনী সমাগত আবার সে বলতে থাকে ঃ

তিন পণ্ডিতের এই অলৌকিক বিদ্যা দেখে বাদশাহ সাবুর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আনন্দ শিহরণে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না তিনি। মাটিতে গড়িয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করে নিয়ে পণ্ডিতপ্রবরদের জিজ্ঞেস করেন তিনি, আপনাদের অপার দৈব ক্ষমতা দেখে আমি মুগ্ধ। এখন বলুন, আপনারা কী চান? আমি আপনাদের সব বাসনা পুরণ করবো।

তিনজনে সমবেতভাবে জানালো, বাদশাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন জেনে বড় আহ্লাদ হচ্ছে। আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চান তিনি। আমরা তিনজনেই এক বস্তুর প্রার্থী। বাদশাহ তিন কন্যার পিতা। আমরা তিনজনে তাঁর এই কন্যাদের পাণি-প্রার্থনা করছি। আমরা তাঁর জামাতা হতে চাই।

বাদশাহ সাবুর সানন্দে বললেন, আমি পরম আনন্দের সঙ্গে আমার কন্যাদের সঙ্গে আপনাদের শাদী দিয়ে দিচ্ছি। এবং এক্ষুণি। শুভ কাজে দেরি করতে নাই।

তখুনি কাজীকে ডাকা হ'লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো সে। সঙ্গে সঙ্গেই শাদীনামা বানানো হলো।

পর্দার ওপাশে বসেছিলো তিনকন্যা। আর এপাশে বাদশাহ কাজী এবং তিন পণ্ডিত। পর্দার আড়ালে বসে মেয়েরা তাদের স্ব স্ব হবু স্বামীকে নিরীক্ষণ করতে থাকলো।

সবচেয়ে ছোট কন্যার বরাতে জুটেছে লোলচর্ম পক্কিত কেশ এক বৃদ্ধ। বয়সের গাছপাথর নাই তার। কম করে হলে একশ বছর হবে। মাথাটা বলতে গেলে একরকম ন্যাড়াই। পিছনের ঘেরে দু-চার গাছি সাদা রোঁয়া এখনও লেগে লেগে আছে। ভ্রূ দুটো একেবারে চাঁছা মোছা। ইয়া বড় বড় গাধার মতো তার কান। কিন্তু এই বুড়ো হাড়েও শখ মরেনি, দাঁড়ি গোঁফ কুচকুচে কালো রঙে রঙ করে এক অদ্ভুত সঙ সেজেছে। একেবারে বেমানান বিশ্রী লাগছে। তার ঘোলাটে চোখে ছানির পর্দা, নাকটা থ্যাবড়া, কপাল বলিরেখায় কণ্টকিত। জরায় বার্ধক্যে মুখের চামড়া কুঁচকে এক অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে। বুনো শুয়োরের মতো দাঁতালো দাঁত। নিচের ঠোঁটটা অস্বাভাবিক ভাবে ঝুলে পড়েছে। মনে হয়, ঠিক যেন উটের অণ্ডকোষ! এক কথায় বলতে গেলে এই বৃদ্ধ পণ্ডিত এক মূর্তিমান আতঙ্ক বিশেষ। হত কুৎসিত বীভৎস-দর্শন একটা দানবের হতশ্রী তার সর্বাঙ্গে।

কিন্তু অন্যদিকে ছোট কন্যার রূপলাবণ্যের কোনও তুলনা হয় না।

তার মতো পরমাসুন্দরী সারা আরব দুনিয়ায় একশো বছরের মধ্যে কেউ জন্মায়নি। শুধু কি দেখতেই সে নিখুঁত সুন্দরী; তার মতো কোমল স্বভাবের কন্যাই বা কটা মেলে। হরিণীর মতো চঞ্চল সে, ঝরণার মতো উচ্ছল। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সন্ধ্যাসমীরণ তার পায়ে মাথা কুটে। আসমানের চাঁদ সালাম জানায়। তরুশাখা আন্দোলিত করে আলিঙ্গন জানাতে চায়। বাগিচার ফুল বলে; ধন্য আমরা শাহজাদী, তোমার স্পর্শ পেয়ে আমাদের ফুটে ওঠা সার্থক হয়।

ছোট কন্যা যখন তার হবু বরকে প্রত্যক্ষ করলো, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না কিছুতেই। ছুটে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো।

বোনের এই অবস্থা দেখে তার ভাই কামার অল আকমর সস্নেহে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে বোন, কাঁদছিস কেন?

—কী হয়েছে, কী হতে চলেছে, কিছুই কী জান না, বড় ভাই?

কামার অল বলে, না বোন, কিছুই জানি না আমি। একটা দিন শিকারের সন্ধানে প্রাসাদের বাইরে ছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই এমন কী ব্যাপার ঘটতে পারে? তোর চোখে পানি? এতো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, বোন? কিছুই বুঝতে পারছি না। আর দেরি না করে চটপট সব খুলে বলো, দেখি!

—সবই বলবো, বড় ভাই। তোমার কাছে লুকোবার আমার কী আছে? কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো, এত বড় অন্যায় আমি কিছুতেই মেনে নেবো না। তোমার বাবা, নিশ্চিতভাবেই ক্রোধে ফেটে পড়বেন আমার এই ব্যবহারে। কিন্তু দাদা, এভাবে আমার এই জীবন-যৌবন ব্যর্থ হতে দিতে পারি না আমি। তোমার বাবার খামখেয়ালের পুতুল নই আমি। তিনি আমার জিন্দগীটা বরবাদ করে দেবেন, আর আমি তা মুখ বুজে সহ্য করবো—সে কিছুতেই হয় না—হতে পারে না। তোমার বাবার খপ্পর থেকে পালিয়ে যাবো—যাবোই। কেউ জানবে না, আমি এই ঐশ্বর্য-সুখের প্রাসাদপুরী থেকে চুপিসারে পালিয়ে যাবো। এবং এও জেনে রাখো, দাদা, একেবারে শূন্য হাতে বেরিয়ে যাবো আমি। প্রাসাদের কোনও ধনদৌলত সঙ্গে নেব না।

কামার অল অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু কী, ব্যাপার কী? কিছুই তো আমি বুঝতে পারছি না, বোন! খুলে বল আগে শুনি। হঠাৎ এতো উত্তেজিত হয়ে পড়লে কেন?

ছোট বোন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে থাকে, তুমি আমার একমাত্র ভাই, তোমার কাছে কিছুই গোপন করবো না, দাদা। বাবা আমাকে একশো বছরের এক বুড়ো পণ্ডিতের

সঙ্গে শাদী দেবেন। তিনি নাকি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন তিনি, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

কামার অল অবাক হয়, কিন্তু হঠাৎ ঐ বুড়ো পণ্ডিতকে কথাই বা দিতে গেলেন কেন শাহেনশাহ?

—সেই পারস্য পণ্ডিত বাবাকে যাদু করেছে। একটা কাঠের ঘোড়া এনে বাবাকে সে বললো, এর পিঠে চেপে বসলে সোয়ারকে নিয়ে সে আসমানে উঠে গিয়ে সহস্র যোজন পথ নিমেষে অতিক্রম করে যেতে পারবে।

পণ্ডিতের কথা শুনে বাবা বলেছিলেন, যদি সত্যিই তা হয়, তবে যা সে চাইবে তাই তিনি দেবেন তাকে। কি আশ্চর্য, পণ্ডিতের কী ভেল্কিবাজী, ঘোড়াটা সত্যি সত্যিই তাকে নিয়ে মহাশূন্যে উঠে বিশাল বিস্তৃত বৃত্তপথে কয়েকবার পাক দিয়ে আবার এসে নেমে পড়লো!

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই।'

পণ্ডিত আমাকে শাদী করতে চাইলো। বাবা, সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলেন। তোমাকে কি বলবো বড় ভাই, লোকটা কি কুৎসিত কদাকার, একটা বুড়ো-হাবড়া। তুমি নিজে চোখে একবার তাকে দেখে এসো, তা হলেই সব বুঝতে পারবে।

কামার অল সান্ত্বনা দেয়, অধৈর্য হয়ো না, বোন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এখনি বাবার সঙ্গে দেখা করছি।

ভাই-এর কথা শুনে ছোট বোন কিছুটা আশ্বস্ত হয়। কামার অল বাবার কাছে গিয়ে বলে আব্বাজান, এসব কী শুনছি? আপনি নাকি একটা যাদুকরের ভেল্কীতে ভুলে ছোটকে তার সঙ্গে শাদী দেবেন, কথা দিয়েছেন? এমন কী অলৌকিক বস্তু সে আপনাকে উপহার দিয়েছে, যার জন্যে আপনি আমার বোনের জীবনটা বরবাদ করে দিতে উদ্যত হয়েছেন? এ আপনার ভীষণ অন্যায়, বাবা। এ ব্যাপার কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যেতে পারে না।

পারস্য-পণ্ডিত পাশেই ছিলো। কামার অলের সব কথাই সে শুনতে পেল। প্রচণ্ড ক্রোধে সে ফেটে পড়তে চাইলো।

বাদশাহ সাবুর বললেন, কামার অল, তুমি তো সেই অলৌকিক ঘোড়ার দৈব ক্ষমতা দেখনি। একবার যদি নিজের চোখে দেখ, তা হলে বুঝতে পারবে, কী মহামূল্যবান বস্তু তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন। তার বদলে আমার কাছে সামান্যই চেয়েছেন তিনি।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সতেরতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

বাদশাহ সাবুর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে আসেন। ক্রীতদাসদের হুকুম করেন, ঘোড়াটা বাইরে বের করে নিয়ে আসতে।

কালো কাঠের ঘোড়াটাকে দেখে শাহজাদা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। এমন সুন্দর গড়ন সে খুব কমই দেখেছে। কামার অল দুর্ধর্ষ ঘোড়সোয়ার, পলকে সে ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে উঠে বসে। লাগামে ঝাঁকানি দেয়। কিন্তু কাঠের ঘোড়াটা নড়ে না। খেলনার মতোই দাঁড়িয়ে থাকে। বাদশাহ পণ্ডিতকে বলে, কী ব্যাপার, নড়ে না কেন? নিশ্চল পুতুলের মতোই দাঁড়িয়ে রইলো কেন? আমার ছেলের মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিন, পণ্ডিতপ্রবর। তা না হলে যে তার কাছে মিথ্যোবাদী হয়ে যাবো আমি।

পারস্য পণ্ডিত কামার অলের কথায় রুষ্ট হয়ে ছিলো। তার কারণ বাদশাহ কন্যার সঙ্গে তার শাদীতে সে বাধ সেধেছে। গম্ভীর কণ্ঠে সে কামার অলকে বললো, জীনের ডান

পাশে একটা সোনার বোতাম দেখছেন? ওটাই আসল চাবি কাঠি। টিপে ধরুন, দেখবেন ঘোড়া ওপরে উঠতে শুরু করেছে...

কামার অল তৎক্ষণাৎ সেই সোনার বোতামে মোচড় দিতেই শোঁ শোঁ শব্দ করে মহাশূন্যে উঠে যায় ঘোড়াটা। আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে সকলে, ঘোড়ার আকার ক্রমশই ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর এক বিন্দুর মতো হয়ে পলকের মধ্যে দৃষ্টিপথের ওপরে চলে গেলো।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলো। বাদশাহ উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কামার অল ফিরে আসে না। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে সে পণ্ডিতের দিকে তাকায়, এখন কী উপায় পণ্ডিতপ্রবর, কী করে তাকে নামিয়ে আনা যায়?

পণ্ডিত বলে, জাঁহাপনা, আমার করার কিছুই নাই। আপনার পুত্রকে আর ফিরে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি না আমি। একমাত্র শেষ বিচারের দিনেই তার সঙ্গে দেখা হতে পারবে।

বাদশাহ আর্তনাদ করে ওঠেন, সে কি?

পণ্ডিত বলে, জীনের বাঁ পাশে আর একটা সোনার বোতাম আছে। সেটা টিপে নিচে নেমে আসা যায়। কিন্তু আপনার পুত্র আমার সব কথা শোনার আগেই সে ডান পাশের বোতাম টিপে ওপরে উঠে গেলো। আমি কী করবো বলুন জাঁহাপনা? আমার কী গোস্তাকি?

বাদশাহ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। নিগ্রো নফরদের ডেকে হুকুম দিলেন এই পারসী বদমাইশটাকে বেদম প্রহার করে অন্ধকার কারাগারে কয়েদ করে রেখে দাও।

তারপর পুত্রশোকে বাদশাহ বুক চাপড়াতে লাগলেন। বাদশাহী সাজপোশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে থাকলেন। মাথার মুকুট খুলে ফেললেন। দাঁড়ি গোঁফ ছিঁড়তে লাগালেন। প্রাসাদে প্রবেশ করে সমস্ত দরজা জানালা রুদ্ধ করে দিলেন। মেজেয় পড়ে হাত পা ছুঁড়ে গোঁঙাতে লাগলেন। বেগম সাহেবাও তাঁর পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে সারা হতে থাকলেন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তিন কন্যা, উজির, আমির, আমলা দাস দাসী নফর চাকর বাঁদী সকলেই। সারা শহরে উঠলো কান্নার গগন-বিদারী আর্তনাদ। এমন যে আনন্দ উৎসবের হাট, পলকে প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেলো। সারা প্রাসাদে সারা শহরে নেমে এলো হতাশা, শোক দুঃখ তাপের এক কালো ছায়া।

শাহাজাদাকে পিঠে নিয়ে ঘোড়াটা ঊর্ধ্বলোকে একটানা উঠে যেতে থাকে। কোনও দিকেই তার গতি ফেরানো যায় না। এইভাবে উঠতে উঠতে সে এক সময় সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়ে। কামার অল বুঝতে পারে, মৃত্যু অবধারিত, কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যের দাবদাহে সে দগ্ধ হয়ে যাবে। সেই ভয়াবহ অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখোমুখি এসে পড়েছে সে। এই তো মউৎ এড়াবার কোনও পথ নাই। কামার অল ভাবে, পণ্ডিত তার উপর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। তার বাড়াভাতে ছাই দিতে গিয়েছিলাম আমি। তারই উচিত পুরস্কার সে আমাকে দিয়েছে। লোকটা মহা শয়তান। আমারই উচিত হয়নি, তার এই যাদুযন্ত্রে চেপে বসা। কিন্তু সে-সব কথা এমন ভেবে কী লাভ? কী করে এখন নিজেকে বাঁচানো যায়? একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও উপায় নাই।

হঠাৎ কামার অল-এর মাথায় এক প্রশ্ন জাগে? আচ্ছা, ওপরে ওঠার জন্য যেমন এই বোতাম নিচে নামার জন্যও তো তেমনি কিছু একটা থাকবে? তা না হলে ঐ পণ্ডিতই বা নেমেছিলো কী করে?

আতি-পাতি করে এপাশ ওপাশ হাতড়াতে থাকে সে। হাতড়াতে হাতড়াতে এক সময় জীনের বাঁ পাশে এক জায়গায় আর একটা ছোট্ট বোতাম তার হাতে ঠেকে। খুবই

ছোট্ট—একটা আলপিনের মাথার টুপির মতো প্রায়। আল্লাহর নাম নিয়ে সেই বোতামটায় সে চাপ দেয়। আর কী আশ্চর্য, তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয়ে আসে। ঘোড়াটা এক পলকের জন্য, সেই নিঃসীম মহাশূন্যে অনড় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর আবার শোঁ-শোঁ করে নিচের দিকে নামতে থাকে। যেমন তীরবেগে উঠেছিলো, তেমনি তীরবেগেই নামতে থাকলো। এইভাবে নামতে নামতে সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবীর পরিধির মধ্যে এসে পড়ে। তারপর যতই মাটির নিকটবর্তী হতে থাকে গতি ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এবং মাটির তলদেশ স্পর্শ করার সময় এক চুল ঝাঁকানিও লাগে না তার।

কামার অল জামান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায়। তাঁরই অপার মহিমায় আজ তার জীবন রক্ষা পেলো। এতক্ষণে সে ঘোড়ার কলকব্জার হদিশ পেয়ে গেছে। কী ভাবে উপরে নিচে ওঠা নামা করা যায় তা তার জানা হয়ে গিয়েছিলো। এবারে সে সামনে পিছনে চালাবার চাবিকাঠির সন্ধান পেয়ে গেলো। নিচে নেমে আসার একটু পরেই সে আবার উঠে গেলো। আর একটা চাবি টিপে সামনের দিকে এবং অন্য আর একটা চাবি টিপে পিছনের দিকে ইচ্ছা মতো চালনা করে সব ব্যাপারটা রপ্ত করে ফেললো।

এইভাবে সে বহু নদী সমুদ্র গিরিপর্বত অতিক্রম করে নানা সুন্দর সুন্দর দেশ পরিভ্রমণ করতে থাকলো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আঠারোতম রজনী। আবার সে বলতে থাকে ঃ

চলতে চলতে এক সময় সে এক সুন্দর সাজানো গোছানো শহরের ওপর এসে পড়ে। বড় মনোরম সেই শহরের শোভা। কামার অল ভাবলো, এইখানে সে নামবে। শহরটার মাথার ওপরে বারকয়েক চক্কর দিলো সে। তারপর একটা পছন্দসই জায়গা দেখে আস্তে আস্তে নামতে থাকে।

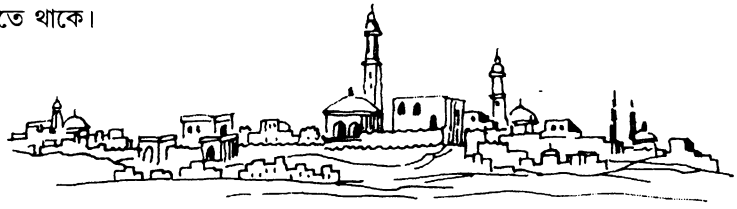

সূর্য তখন পাটে বসেছে। দিনের আলো নিভে আসছে। প্রায় গোধূলি লগ্ন। শহরটার শোভা দেখে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায় কামার অলের। মনে মনে ভাবে, সেদিনের রাতটা সে সেই শহরেই কাটাবে। কাল সকালে সে ফিরে যাবে নিজের মুলুকে, নিজের শহরে। বাবা, মা, বোনদের সে শোনাবে তার বিচিত্র অভিযানের অদ্ভুত এই কাহিনী।

মাটির কাছাকাছি আসতে সে দেখলো, একটা প্রাসাদের ঠিক ওপরে এসে গেছে তার ঘোড়া। যদি আর কোনও ভাবে না চালায় তবে সে ঐ বিশাল ইমারতের ছাদে গিয়ে নামবে।

প্রাসাদটা শহরের ঠিক মাঝখানে। তার চূড়ায় চল্লিশজন সশস্ত্র নিগ্রো প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। তাদের সকলের হাতেই উন্মুক্ত তরোয়াল, কাঁধে তীর ধনুক, বর্শা।

শাহজাদা কামার অল আকমর ছাদের এক প্রান্তে এসে নামলো। তখন সবে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। শাহজাদা ছাদের ওপরে ঘোড়ার পিঠে চুপচাপ বসে রইলো অনেকক্ষণ। রাত্রি আরও গভীর হলো। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন সে ঘোড়ায় পিঠ থেকে ছাদের ওপরে নেমে পড়লো।

সারাটা দিন কিছু পেটে পড়েনি। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু কীই বা উপায়? পিপাসাতেও গলা শুকিয়ে কাঠ। পানিই বা কোথায় পাবে সে?

অবশেষে মরিয়া হয়ে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকে। নামতে নামতে একেবারে নিচে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে নেমে আসে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এত বড় প্রাসাদে কোনও জন-মানবের অস্তিত্ব বুঝতে পারে না সে। মনে হয়, একেবারে পরিত্যক্ত পুরী।

এদিক ওদিক বেশ ভালো করে খুঁজে পেতে দেখে সে। কিন্তু না; কোথাও কেউ নাই। কামার অল ভাবে, আবার সে ছাদেই ফিরে যাবে। আজকের রাতটা কোনরকেমে ছাদেই শুয়ে সে কাটাবে। তারপর সকাল হতে না হতে নিজের শহরে ফিরে যাবে।

এই ভেবে সিঁড়ির দিকে আবার ফিরে আসতে থাকে সে, হঠাৎ একটা ক্ষীণ আলোর রোশনাই এসে লাগলো তার চোখে। লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো, প্রাসাদের একবারে অন্তরপ্রদেশ থেকে আসছে সেই আলোর রশ্মি।

আলোর নিশানা ধরে পায়ে পায়ে সে এগিয়ে আসতে থাকে প্রাসাদের অন্দরমহলে। একেবারে হারেমের দরজার সামনে। সেখানে একটা খাটিয়ায় শুয়েছিলো একটা নিগ্রো খোজা। প্রচণ্ড নাসিকা গর্জন তুলে সে ঘুমোচ্ছে। তার মাথার কাছে রাখা একটা চিরাগ। এই বাতির আলোর নিশানা ধরেই আসতে পেরেছে সে।

দরজাটাকে আড়াআড়ি করে এমন ভাবে তার বিশাল লাশটা পড়ে আছে কার বাপের সাধ্যি, ডিঙিয়ে কেউ ঘরের ভিতরে ঢুকতে পারে। পাশে একখানা খাঁড়ার মতো প্রকাণ্ড তলোয়ার—একেবারে খোলা। এবং মাথার ওপরে থামের আংটায় ঝুলানো একটা সিকেয় তার কিছু খাবার।

দৈত্যের মতো বিশাল বপু ঐ নিগ্রোটাকে দেখে কামার অলের বুক কাঁপতে থাকে। ওরে বাস, একেবারে সাক্ষাৎ দোজকের দূত। হায় আল্লাহ, এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে? তোমার দোয়াতে একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। কিন্তু এবার বোধহয় বেঘোরেই প্রাণটা হারাতে হবে। কিন্তু খিদেয় আমার পেট জ্বলছে, চোখের সামনে এইসব দাবার দেখে চুপ করেই বা থাকি কি করে। নসীবে যা থাকে হবে, খাবারের সিকেটা খুলে নিয়ে যেতেই হবে আমাকে।

অতি সন্তর্পণে সে সিকেটা খুলে নিয়ে আবার পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে। নানা রকম মুখরোচক খাবার-দাবারে ঠাসা ছিলো সিকেটা। চলতে চলতেই সে একটু একটু করে মুখে পুরতে থাকে। কী সুন্দর স্বাদ! প্রাসাদ প্রাঙ্গণের একপাশে একটা ফোয়ারা দেখতে পেয়ে সে-দিকে এগিয়ে যায়। খাবারগুলো সব খেয়েদেয়ে ফোয়ারার কাছে এসে প্রাণভরে পানি খায়। তারপর আবার ফিরে আসে খোজাটার পাশে। খুব সাবধানে যথাস্থানে টাঙিয়ে রাখে সিকেটা, এবং আলতোভাবে তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে আবার বেরিয়ে আসে। খোজাটা তখনও দৈত্যের মতো পড়ে পড়ে নাক ডাকতে থাকে।

শাহরাজাদ দেখলো রাত শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ঊনিশতম রজনী ঃ

শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

চলতে চলতে সে এক সময় আর একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজার সামনে একটা মখমলের পর্দা ঝুলছিলো। পর্দাটা তুলে ভিতরে ঢুকতে দেখলো, একটা প্রশস্ত শয্যাকক্ষ। মাঝখানে একটা শশাঙ্ক শুভ্র নয়নাভিরাম হাতীর দাঁতের পালঙ্ক। হীরে চুনী

পান্না মুক্তো বসানো। চারটি ডাগর-ডাঁসা মেয়ে মেজেয় শুয়ে ঘুমে অচেতন। কামার অল পায়ে পায়ে পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়ায়। উদ্দেশ্য—শয্যাশায়িনীকে দেখা।

নব-যৌবন-উদ্ভিন্না অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী এক কণক কন্যা আলুলায়িত কেশে সারা মুখ আবৃত, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সকাল বেলা সূর্য ওঠার কালে পূর্ব দিগন্ত যে অবর্ণনীয় রূপচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেই আলোকসামান্য রূপের জেল্লা তার সর্বাঙ্গে।

কামার অল আকমর-এর সারা দেহে শিহরণ খেলে যায়। এমন সুন্দর মেয়ে সে এই প্রথম দেখলো। ধীরে মুখটা নামিয়ে এনে সে মেয়েটির গালে আলতোভাবে একটি চুম্বন এঁকে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। চোখ মেলে তাকায়। হরিণীর মতো কাজল-কালো টানাটানা চোখে এক নিদারুণ বিস্ময় ফুটে ওঠে।

—কে তুমি? কেন এসেছ, কতক্ষণ এসেছ, কেমন করে ঢুকেছ এখানে?

এক সঙ্গে এক রাশ প্রশ্ন। কোন্‌টার জবাব দেবে কামার অল?—আমি তোমার বান্দা।

—কে তোমাকে নিয়ে এলো এখানে?

কামার অল বলে, খোদা, আমার নসীব, আমার সৌভাগ্য।

তরুণীর নাম সামস্ অল নাহার। খুব সহজভাবেই সে প্রশ্ন করে, তুমি কী হিন্দুস্থানের কোনও বাদশাহজাদা? গতকাল সে আমার বাবার কাছে এসে আমাকে শাদী করার প্রস্তাব করেছিলো। কিন্তু আমার বাবা তাকে জামাতা করতে রাজী হন নি?

কামার অল জানতে চায়, কেন?

—সে নাকি দেখতে ভীষণ বিশ্রী ছিলো, তাই। কিন্তু তোমাকে দেখে কুশ্রী বলবে কে? তোমার মন-ভোলানো রূপের বাহারে আমি তো প্রথম দর্শনেই মোহিত হয়ে গেছি।

সামস্ অল নাহারের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে কামার অলের মন খুশিতে ভরে যায়। মুগ্ধ হয়ে অপলকভাবে দেখতে থাকে ওকে। সামস্ অল দুহাত বাড়িয়ে কামার অলকে কাছে টেনে নেয়। তারপর দু'জনে দু'জনের বাহু বন্ধনে বাধা পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। দেহ দিয়ে দেহের সুধা পান করার এক অপার আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে ওরা।

তারপর রাত্রি গভীরতর হতে থাকে। কামনার আগুনও জ্বলে ওঠে ওদের দেহে। নানারকম আদর সোহাগ চুম্বনে মেতে ওঠে ওরা। হঠাৎ একসময় মেজেয় শোয়া একটি দাসীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। অবাক চোখে তাকায় সে। তাদের শাহাজাদীর শয্যায় অচেনা অজানা এক নওজোয়ানকে দেখে আঁৎকে ওঠে, আপনার পাশে কে, শাহজাদী?

সামস্ অল বলে, আমি জানি না। ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এ। প্রথমে মনে হয়েছিলো, কাল বাবা যে শাহজাদাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন, বুঝি সে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে জানলাম, না, তা নয়।

দাসীটা বলে, না না, সে হতে যাবে কেন? সে তো হত-কুৎসিত কদাকার ছিলো দেখতে। আমি নিজে চোখে তাকে দেখেছি। আর এঁর তো চাঁদের মতো সুরৎ। মনে হয় কোনও এক বাদশাহর ছেলে। কাল যে আপনাকে শাদী করার জন্য এসেছিলো সে আপনার নফর চাকর বান্দা হওয়ার যোগ্য নয়।

এরপর দাসীটা খোজাটার কাছে গিয়ে জাগালো তাকে।

—খুব তো নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছো। এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেলো! এবার তোমার গর্দান যাবে।

খোজাটা ধড়মড় করে উঠে বসে, এ্যাঁ! কী হয়েছে?

—কী হয়েছে? কী হয়নি, তাই বলো! তুমি আছো হারেমের পাহারায়। অথচ

নাক ডাকিয়ে সারারাত ঘুমাও। তোমার নাকের ডগা দিয়ে শাহজাদীর ঘরে ঢুকেছে এক শাহজাদা, সে খবর রাখ কী?

খোজাটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ তোলে? আঁ, কী বললে? শাহজাদীর ঘরে ঢুকেছে পর-পুরুষ?

তড়াক্ করে সে লাফিয়ে দাঁড়ায়। তলোয়ারখানা হাতে নিতে যায়। কিন্তু একি! কোথায় গেলো তার তলোয়ার? খালি খাপখানা দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালে? এবার সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। থর থর করে কাঁপতে থাকে সারা শরীর। দিশাহারা হয়ে ছুটে আসে শাহজাদীর ঘরে। কামার অল তখনও শাহজাদীর বাহুপাশে আবদ্ধ মধুর আলাপ রত।

এই প্রেমালাপনের দৃশ্য দেখে নিগ্রোটার মুখ হাঁ হয়ে যায়। কথা বেরোয় না কয়েক মুহূর্ত। তারপর ভয়ে জবুথবু হয়ে জিজ্ঞেস করে, মালিক, আপনি কী কোন জীন বা আফ্রিদি? না, মানুষ?

নিগ্রোটার কথায় রোষে ফেটে পড়ে কামার অল। —এত বড় স্পর্ধা তোর, তামাম পারস্য মুলুকের শাহেনশাহ আমার বাবা সাবুর। তাঁর একমাত্র পুত্র আমি। আর আমাকে বলিস কিনা—জিন, না, আফ্রিদি?

এই বলে সে সিংহবিক্রমে লাফিয়ে ওঠে শয্যা ছেড়ে। তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে বলে, আমি তোর সুলতানের জামাতা। তার এই কন্যার সঙ্গে আজ রাতে আমার শাদী হয়েছে। তাই তার শোবার ঘরে তাকে নিয়ে আমি মধুযামিনী কাটাচ্ছি। এত বড় সাহস তোর, ঘরে ঢুকেছিস...

খোজা নিগ্রোটা এবার খানিকটা ধাতস্থ হয়।—মালিক, আপনি যদি সত্যি শাহজাদা হন তা হলে একশোবার বলবো, আমাদের শাহজাদীর যোগ্য বর হয়েছে। আপনার মতো এমন খুবসুরৎ শাহজাদা আমি আর দেখিনি কখনও। খুব ভালো হয়েছে—চমৎকার মানানসই হয়েছে।

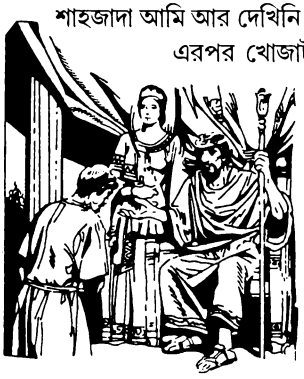

এরপর খোজাটা ঘর ছেড়ে চলে গেলো। চলে গেলো একেবারে সোজা সুলতানের শোবার ঘরে। মাথার চুল ছিঁড়ে, কপাল বুক চাপড়াতে থাকলো, সর্বনাশ হয়ে গেছে, জাঁহাপনা।

সুলতান তো অবাক, আরে, কী হয়েছে বলবি তো? শুধু শুধু হা-হুতাশ করে মাথার চুল ছিঁড়লে আর কপাল বুক চাপড়ালে বুঝবো কী করে? খুলে বল আগে। কী এমন বিপদ ঘটলো? যা বলার খুব চটপট সংক্ষেপে বল, একদম কোনও ভণিতা করবি না। তোর ঐ বিকট চিৎকার আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। নে, যা বলার তাড়াতাড়ি বল।

শাহজাদা দেখলো, প্রভাত সমাগত। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো কুড়িতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

নিগ্রোটা বিকট আওয়াজ করে আর্তনাদ তোলে, জাঁহাপনা, আর এক মুহূর্ত দেরি করবেন না। শিগ্গির চলুন, দেখবেন, আপনার কন্যার শোবার ঘরে এক আফ্রিদি জিন এসেছে। শুয়ে আছে শাহজাদীর সঙ্গে। এক শাহজাদার রূপ ধরে এসেছে সে।

সুলতান তখন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। মনে হলো, তখুনি বুঝি বা তিনি নিগ্রোটার গর্দান নামিয়ে দেন।

—তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার মেয়ের ঘরের দরজায় নজর রাখিস না। তোর চোখের সামনে দিয়ে অন্য লোক তার ঘরে কী করে ঢোকে? সারাদিন রাতের জন্য পাহারা করে রাখা হয়েছে তোকে। পাহারা না দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাস নাকি, বাঁদর?

সুলতান আর বেশি বাক্য ব্যয় না করে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেলো শাহজাদী সামস্ অল নাহারের ঘরের দরজায়। দাসীগুলো ভয়ে বিবর্ণা, থর থর করে কাঁপছিলো।

—শাহজাদীর কী হয়েছে?

সুলতান কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

দাসীদের মধ্যে একজন কাঁপতে কাঁপতে বললো, আমরা কিছুই জানি না, জাঁহাপানা। ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গতে দেখি, শাহজাদীর শয্যায় চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর এক শাহজাদা। খুব ঘনিষ্ট হয়ে দু'জনে গল্প করছিলেন। দেখে মনে হলো, কত কালের যেন চেনা জানা। সত্যি কথা বলতে কী, জাঁহাপনা, এমন রূপবান পুরুষ আমরা জীবনে কখনও দেখিনি। তবে সন্দেহ হয়, সত্যিই সে শাহজাদা, না, আফ্রিদি। যেই হোন তিনি, তাঁকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

সুলতানের রাগ কিছুটা প্রশমিত হয়ে আসে। খুব আস্তে আস্তে পর্দা উঠিয়ে তিনি দেখতে থাকেন, এক অপূর্ব সুন্দর যুবক তাঁর কন্যার বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন। তার মুখখানা বিলকুল চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর।

সুলতান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, এমন সময় ঘুমের ঘোরেই শাহজাদী ছেলেটিকে আদর করতে থাকে। মুখখানা আরও কাছে টেনে এনে ছেলেটির একটা গালে অধর রাখে। এবার আর স্থির থাকতে পারেন না সুলতান। কোমর থেকে তলোয়ার খুলে বাগিয়ে ধরে ভিতরে ঢোকেন তিনি। পিতৃত্বের সহজাত ঈর্ষা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে দু'জনেরই তন্দ্রা কেটে যায়। কামার অল জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবা?

সামস অল ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

কামার অল তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে তলোয়ারখানা উঁচিয়ে ধরে গর্জে ওঠে। সুলতান মুহূর্তেই বুঝে নেয়, যুবকের সিংহবিক্রম প্রতিরোধ করার তাকত তার নাই। সঙ্গে সঙ্গে দুই কদম তিনি পিছিয়ে গেলেন। তলোয়ারখানা নামিয়ে নিলেন। মুখে মধুর সম্ভাষণ টেনে বললেন, বেটা, তুমি মানুষ না জিন—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ইয়া আল্লাহ, আপনি শাহজাদীর পিতা হতে পারেন। কিন্তু আপনার এই কথায় আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না। আপনার কন্যাকে আমি প্রাণাধিক ভালোবেসে ফেলেছি। না হলে, আপনাকে এই মুহূর্তে আমি খতম করে ফেলতাম। শুধু রেহাই পেলেন। শাহজাদীর বাবা বলে আপনার এতবড় সাহস, আমি পারস্য অধিপতির পুত্র, আমাকে কিনা বলেন, জিন, না, দৈত্য? যদি আমরা ইচ্ছা করি, তবে এক লহমায় আপনাকে তখত্ থেকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি। আপনার এই প্রাচীর-প্রাকার সুরক্ষা, আর আপনার মান ইজ্জৎ সব মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি, সে কথা জানেন?

সুলতান এবার নিশ্চিত হন। না, এ কোনও জিন আফ্রিদি নয়। সাচ্চা এক সুলতান বাদশাহরই ছেলে। মনে মনে শ্রদ্ধা এবং ভয়—দুই জেগে ওঠে।

—যদি তুমি সত্যিই কোনও শাহজাদা হও, তবে আমার বিনা আমন্ত্রণে আমার প্রাসাদের হারেমে এসে ঢোকার দুঃসাহস কী করে হয় তোমার? তুমি এক বাদশাহর সন্তান হয়ে অন্য এক সুলতানের কন্যার ইজ্জতই বা নষ্ট কর কী করে? তুমি আমার মাথা হেঁট করে দিয়েছ। কিন্তু তুমি কী জান, আমার এই কন্যার জন্য আমি কত সুলতান বাদশাহ এবং তাদের

পুত্রদের প্রাণ সংহার করেছি। তারা আমার কন্যাকে জোর জবর-দস্তি করে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিলো। এবং তারই ফলে এই সব কাণ্ড আমাকে করতে হয়েছে। আজ তুমি আমার মেয়ের ঘরে চোরের মতো ঢুকেছ। তাকে গোপন শাদী করে তার ইজ্জত নিয়েছ। ...কিন্তু ভেবে দেখ, এখন আমি যদি আমার লোকজনদের হুকুম দিই, তোমার গর্দান থাকবে?

কামার অল বলে, তা হলে এও জেনে রাখুন সুলতান, আপনার ঘাড়েও মাথা থাকবে না। আপনার মগজে যদি বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু থাকে তাহলে ঐ ধরনের খামখেয়ালীর কাজ করতে সাহস পাবেন না আপনি। আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো আমার চেয়ে ভালো পাত্র আপনি কোথাও জোগাড় করতে পারবেন? আমার মতো বীর্যবান এবং সম্ভ্রান্ত শাহজাদা কী ভুরি ভুরি মিলবে আপনার কন্যার জন্য?

—সে কথা ঠিক। পাত্র হিসাবে তোমার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু কাজীকে ডেকে বিধান সম্মত ভাবে শাদী না হলে গোপন-শাদী আমি মানি না।

কামার অল বলে, আপনার কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেই কারণে এখন আপনি যদি আপনার সেপাই পেয়াদাকে ডাকেন তাহলে কী আপনার আখেরে ভালো হবে? একবার যদি সেই ভুল করেন, হাতের তীর ছিলা ছেড়ে চলে যায়, তবে হাজার চেষ্টা করেও আর নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না। আপনার তখত্, সলতানিয়ৎ, সম্মান সবই ধূলোয় মিশে যাবে, সুতরাং রাগ রোষে মাথা গরম করে কিছু করবেন না। খুব ঠাণ্ডা মগজে বেশ ভালো করে ভেবে দেখুন। পরে আমাকে কোনও দোষ দিতে পারবেন না। আমি আপনাকে যথেষ্ট সুপরামর্শই দিচ্ছি। এবং আপনার মঙ্গলের জন্যই।

রাত্রির অন্ধকার সরে যেতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো একুশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে শুরু করে ঃ

কামার অল বলতে থাকে, দুটো পথ আপনার সামনে খোলা আছে। হয় আপনি এখনি আমার সঙ্গে একা অসি-যুদ্ধে আসুন, আমি আপনাকে এক ঘায়ে কূপোকাৎ করে সিংহাসন অধিকার করবো, না হয় আজ সারা রাত আপনার কন্যার সঙ্গে আমাকে সহবাস করতে দিন। কাল সকালে আপনার তামাম সলতানিয়তের যত সৈন্যসামন্ত আছে, সব ডেকে আনুন, আমি লড়বো তাদের সঙ্গে। ভালো কথা, সংখ্যায় তারা কত হবে?

সুলতান বলে চল্লিশ হাজার। এর মধ্যে আমার নফর চাকর ক্রীতদাস বা তাদের অনুচরদের ধরিনি। তারাও নেহাত নগণ্য নয়।

কামার অল বলে, অতি উত্তম, কাল ভোরে তাদের সকলকে ডাকুন। আমাকে দেখিয়ে তাদের বলুন, 'এই মানুষটি আমার কন্যার পাণি-প্রার্থী। কিন্তু আমি তাকে বলেছি, আমার সমগ্র সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তাদের হারাতে হবে। তবেই পাবে তাকে, তার আগে নয়।' তারা যদি রাজি হয়, আমার সঙ্গে লড়াই করার স্পর্ধা নিয়ে এগিয়ে আসে, এবং সম্মুখ সমরে আমাকে যদি নিহত করতে পারে তবে আপনার মান ইজ্জৎ সবই রক্ষা পাবে। আর যদি না পারে—? যদি তারা পরাজিত হয়ে পালায়, তবে? তখন কিন্তু মাথা নুইয়ে আমাকে আপনার জামাতা করেই নিতে হবে, সুলতান।

সুলতান মনে মনে মতলব ভাঁজে। যুবকের এই প্রস্তাবই মেনে নিতে হবে। তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নামা বুদ্ধিমানের কাজ না। বয়সের ভারে সে এখন ক্লান্ত, যৌবনের শক্তি এবং সিংহবিক্রমে যখন ভাটা পড়েছে, এ অবস্থায় এই রকম এক নওজোয়ান যোদ্ধার সঙ্গে একা একা লড়াই-এ নামা উচিত হবে না। কিন্তু আমার গোটা সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে সে

লড়বে? লোকটা কী পাগল? যাক নিজের নির্বুদ্ধিতাতেই সে খতম হবে, কোনও চিন্তা নাই। সুলতান নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবে, কাল সকালেই বাছাধনের গর্দান গড়াগড়ি যাবে আমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে। জাত মান কূল সবই রক্ষা পাবে। সুতরাং এই পথই অনুসরণ করা শ্রেয়ঃ মনে করলেন তিনি।

—ঠিক আছে, আজ রাতটা তুমি যে ভাবে কাটাতে চাও কাটাও, আমি কোনও বাধা দেব না। কিন্তু কাল সকালে তোমার মউৎ কেউ রুখতে পারবে না।

সুলতান সদর্পে সেখান থেকে নিজের কক্ষে চলে গেলেন। খোজাকে বললেন এখুনি উজিরকে খবর দে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎকণ্ঠিত উজির হাজির হলে, সুলতান তাকে সব ঘটনা খুলে বলে বললেন, আর তিল মাত্র দেরি করবে না, এখুনি যাও, সেনাবাহিনীকে তৈরি হতে বলো। সকালেই তারা যেন আমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে হাজির থাকে। আমি ঐ উদ্ধত শাহাজাদাকে সমুচিত সাজা দিতে চাই।

উজির আশ্বাস দিয়ে বলে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যান, জাঁহাপনা। যা করার সব আমি করছি। লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ, না হলে গোটা ফৌজের সঙ্গে লড়াই করার কথা বলে। আপনার সৈন্যবাহিনীতে এমন সব জাঁদরেল যোদ্ধা আছে, তাদের একজনের সঙ্গেই সে লড়তে পারবে না, তা আবার গোটা বাহিনী! ছোঃ!

সুলতান গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু তা বলে, তুমি শুধু সেনাপতিদেরই ডেকো না। আমি চাই আমার পুরো সেনাবাহিনীই হাজির থাকবে আমার প্রাসাদের সামনে।

উজির আর কথা বাড়ায় না, আপনি যখন বলছেন, তাই হবে, জাঁহাপনা।

উজির সোজা চলে যায় ফৌজ দপ্তরে। সেখানে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ব্যবস্থা সব পাকা করে রাখে।

সুলতান শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকেন, ছেলেটি ভারি সুন্দর। যেমন তার রূপ, তেমনি তার বীরের মতো সুঠাম দেহ। আর কী সুন্দর কথা বলার কায়দা। এমন খানদানী ব্যবহার রক্তে না থাকলে রপ্ত করে হয় না। আহা, এমন সুন্দর চাঁদের মতো ছেলেটা যদি তার জামাই হতো, কী-ভালোই না হতো! কিন্তু সবই নসীবের লেখা, তাকে আজ হাতের মুঠোয় পেয়েও চিরদিনের মতো হারাতে হচ্ছে। কাল সকালেই আমার ফৌজদের তলোয়ারের ঘায়ে লুটিয়ে পড়বে তার গর্দান! উফ্, ভাবতেও কষ্ট লাগে। কিন্তু উপায়ই বা কী? তার মতো গোঁয়ার ছেলের এ ছাড়া আর কী পাওনা থাকতে পারে? সে যদি আমার কাছে ক্ষমা চাইতো। না না, তাই বা কী করে সম্ভব? ক্ষমা করাই সে শিখেছে, ক্ষমা চাওয়ার কথা সে ভাববে কী করে? সে তো বাদশাহজাদা!

তবু আর একবার তার কাছে যাওয়া যাক। যদি সে মাথা নোয়ায়। তা হলে সব কূলই বজায় থাকে। মেয়েটাও সুখী হতে পারে, সে নিজেও জামাতা-গর্বে গর্বিত হতে পারে। আর সবার ওপরে সম্ভ্রম ইজ্জৎ, জাত মান কূল সব রক্ষা হয়। কিন্তু তা কী হবে?

সুলতান বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু না, আবার সেখানে যেতে পা চলে না। যদি সে ভাবে, আমি সন্ধির ছুতোয় তার কাছে গিয়েছি? না না না, আমি তাকে তেমন কিছু ভাববার সুযোগ দেব না। যাব না।

ভোর না হতেই যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। রণসাজে সজ্জিত হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত এসে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে থাকে।

শাহাজাদা কামার অলকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান দরবার-কক্ষে প্রবেশ করে তখতে

আরোহণ করেন। বান্দাদের হুকুম করেন, এই শাহজাদার জন্য আমার আস্তাবলের সবচেয়ে সেরা তাজা ঘোড়াটা নিয়ে এসে জমকালো যুদ্ধ সাজে সাজিয়ে দে।

সুলতানের এই হুকুম শুনে কামার অল বলো, আমার জন্যে কোন যুদ্ধের ঘোড়া দরকার হবে না।

সুলতান অবাক হয়ে তাকান, তবে কী তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে নাকি?

—না, আমার নিজেরই ঘোড়া আছে। আপনার ঘোড়ার কোনও দরকার নাই।

সুলতান আরও অবাক হন, তোমার ঘোড়া? কোথায় তোমার ঘোড়া?

কামার অল বলে, হ্যাঁ, আমার ঘোড়া! যাতে চেপে আমি এসেছি আপনার প্রাসাদে। আমি সেই ঘোড়ায় চেপেই লড়াই করবো।

—কোথায় তোমার ঘোড়া? কোথায় রেখে এসেছ?

—কামার অল ছাদের ওপরের দিকে তর্জনী তুলে বলে, প্রাসাদের ছাদে আছে সে।

সারা দরবার কক্ষ ক্ষণ-কালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। কারো মুখে কোনও কথা সরে না। ছেলেটা বলে কী? সত্যিই ওর মাথার গোলমাল আছে। সুলতান ভাবে, শেষ পর্যন্ত একটা উন্মাদকে হত্যা করে কী সে মহাপাতক হতে যাচ্ছে?

সুলতান বললেন, এসো আমার সঙ্গে এসো। তোমার জন্যে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে কারা এসে হাজির হয়েছে, দেখবে, এসো।

কামার অলকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান দরবার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। হাজার হাজার বর্মশিরস্ত্রাণ পরা অসি-বর্শা হাতে সৈন্যসামন্ত জড়ো হয়েছে প্রাসাদের সামনে পোলো-খেলার মাঠে। পুরাভাগে সেনা-বাহিনীর প্রবীণরা ঘোড়ার পিঠে চেপে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। সুলতান বললেন, এই আমার সমগ্র সেনা-বল। এদের সঙ্গে একা তুমি লড়বে বলে বড়াই করেছ। সে যাক, এখন তৈরি হয়ে নাও। আমার সৈন্যরা প্রস্তুত।

তারপর তিনি তাঁর সেনাপতিদের ডেকে বললেন, এই যুবক এসেছে আমার কন্যাকে শাদী করবে বলে। জামাতা হবার পক্ষে উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই। যেমন এর রূপ-যৌবন তেমন তার সাহস বিক্রম। কিন্তু এ আমার কাছে মাথা নোয়াতে রাজি নয়। বলে, এমনি না দিলে, জোর করে নিয়ে যাবে আমার মেয়েকে। এর ধারণা, আমার এই বিশাল সৈন্য-বাহিনীকে একাই জব্দ করতে পারবে। আমি একে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি, আমার সৈন্যবল অসীম। কিন্তু সেকথা কানেই তুলতে চায় না এই বীরপুরুষ। যাক, এবার তোমরাই তৈরি হও। এখনই শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাবে। একটা কথা, তোমরা সংখ্যায় অনেক, আর এ একা। তোমাদের একমাত্র কাজ হবে, একে প্রতিহত করা—নিহত করা নয়!

তারপর সুলতান কামার অল-এর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, বেটা, বুকে সাহস সঞ্চয় কর, লড়াইএ তুমি জয়ী হলে আমিই সবচেয়ে বেশি খুশি হবো।

কামার অল বলে, কিন্তু সুলতান, একি আপনার আচরণ! আমি মাটিতে দাঁড়িয়ে, আর আপনার সেনাপতিরা ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করবে? একি মহারথী প্রথা?

সুলতান বলে, কিন্তু বেটা, আমার কী দোষ, আমি তো তোমাকে আমার আস্তাবলের সবচেয়ে সেরা লড়াকু ঘোড়াই দিতে চেয়েছিলাম? তুমিই তো নিলে না! এখনও বলছি, আমার অশ্বশালায় চলো, যেটা তোমার পছন্দ, তুমি নিজেই বেছে নাও, আমি খুব খুশি হবো।

কামার অল বলে, আপনার কোনও ঘোড়া আমার প্রয়োজন নাই। আমার নিজের ঘোড়াতে চেপেই আমি লড়াই করতে চাই।

—কিন্তু কোথায় সে ঘোড়া?

কামার অল আবার প্রাসাদের ছাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ঐ ছাদের এক পাশে রাখা আছে।

—ছাদের ওপরে রাখা আছে? তোমার ঘোড়া?

সুলতান অবিশ্বাসের হাসি হাসেন। সমবেত সেনাপতিরা, উজির আমির সকলে বিস্মিত হয়, লোকটা বলে কী?

কামার অল বলে, হ্যাঁ, আমার ঘোড়া। কাল সন্ধ্যায় আমি ঐ ঘোড়ায় চেপেই এই প্রাসাদে এসেছি।

সুলতান সেনাপতিদের বলেন,যাও তো, দেখে এসো। ছাদের ওপরে ঘোড়া কী করে যেতে পারে! তাজ্জব কি বাত্!

সুলতানের নির্দেশে সেনাপতিরা প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

একি, সত্যিই তো একটা তাগড়াই ঘোড়া ছাদের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে? কুচকুচে কালো, গা বেয়ে যেন তেল ঝরে পড়ছে এমন চমৎকার ঘোড়া তারা আগে কখনও দেখেনি। সেনাপতিরা আরও নিকটে যায়। কিন্তু একি, এতো একটা কাঠের ঘোড়া—খেলনা মাত্র! সবাই সমস্বরে হো হো করে হেসে ওঠে।

—যুবকটি নিশ্চয়ই এক বদ্ধ উন্মাদ। আহা, হয়তো কোনও সুলতান বাদশাহরই সন্তান। মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। প্রধান সেনাপতি বলে, সবাই মিলে ধরাধরি করে ঘোড়াটাকে সুলতানের সামনে নিয়ে চলো। তামাশাটা তিনি বুঝতে পারবেন।

সেনাপতিরা ঘোড়াটাকে কাঁধে করে নিচে নামিয়ে আনে। সুলতানের সামনে রেখে বলে, সব বুজরুকী, জাঁহাপনা। এটা একটা কাঠের খেলনা ঘোড়া।

রাত্রির অন্ধকার কেটে যায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো বাইশতম রজনী ঃ

সে শুরু করে ঃ

প্রধান সেনাপতি বলে, আমার মনে হচ্ছে, জাঁহাপনা ইনি কোনও সম্ভ্রান্ত সুলতান বাদশাহর সন্তান। কিন্তু কোনও কারণে এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। তা না হলে এ ধরনের অদ্ভুত প্রস্তাব কেউ রাখতে পারে না। আমার সেনাবাহিনীর বিক্রম আমি জানি। তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়বে এই বাদশাহাজাদা— তাও এই কাঠের পুতুল নিয়ে? হা হা—

সুলতান থামিয়ে দিয়ে বলেন, থামো, আত্ম গর্বে ফুলে উঠো না। শত্রুকে কখনও খাটো করে ভাবতে নাই।

তারপর কামার অলকে উদ্দেশ করে বললেন, এই তোমার ঘোড়া? একটা কাঠের খেলনা? এই দিয়ে তুমি লড়বে আমার এই বিপুল বাহিনীর সঙ্গে?

—কামার অল খুব সহজ শান্তভাবে জবাব দেয়, হ্যাঁ। এই আমার আজব ঘোড়া। এরই ভেল্কী দেখে আপনি ভিরমি খাবেন। একটু সবুর করুন, এখনই প্রমান পেয়ে যাবেন।

এই বলে সে ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে যায়। তার গলায় হাত রাখে। শুনুন সুলতান, এই কাঠের ঘোড়ায় চেপে আমি আপনার সেনাবাহিনীকে—ডাইনে বাঁয়ে ঘায়েল করতে থাকবো।

সুলতান হাসতে হাসতে বলে, একশোবার। সব বীরপুরুষই তাই করে। শত্রুকে শায়েস্তা করাই বীরের ধর্ম। সেখানে কেউ কাউকে রেহাই দেবার কথা ভাবে না। তুমিও কাউকে রেহাই দেবে না, মনে রেখ, তারাও তোমাকে রেয়াত করবে না।

এরপর কামার অল এক লাফে ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসে। হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত, শত সহস্র প্রাসাদ-পুরবাসী নরনারী- সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে ঘোড়সওয়ার কামার অল-এর দিকে। সবাই সংশয়ে দোদুল্যমান। একটা কাঠের ঘোড়া সজীব হয়ে লড়াই করবে—এমন তাজ্জব কথা কী—শুনেছ কেউ? সেই অভাবনীয় অলৌকিক দৃশ্য আজ তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। দারুণ কৌতূহলের চাপা গুঞ্জনে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ গমগম করতে থাকে।

তাকে প্রতিরোধ করার জন্য অশ্বারোহীরা আরও সামনে এসে সারিবদ্ধ-ভাবে তলোয়ার বাগিয়ে দাঁড়ায়। একজন নির্দেশ দেয়, যখনই সে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করবে আর তিল মাত্র অপেক্ষা করবে না তোমরা। ঝোপ বুঝে কোপ মেরে একেবারে সাবাড় করে দেবে।

কিন্তু অন্য একজন বলে, ইয়া আল্লাহ, এমন চাঁদের মতো ছেলে, একে আমরা হত্যা করবো কি করে? এমন সুন্দর ফুলের মতো নরম শরীরে খাড়ার ঘা বসাবো কি করে? সারা আরব দুনিয়া ঢুঁড়লে এমন সুঠামদেহী সুন্দর সুপুরুষ ক'টা পাওয়া যাবে?

আর একজনের মন্তব্য ঃ আমরা যত সহজে ওকে কাবু করতে পারবো ভাবছি, ব্যাপারটা, আমার মনে হয়, তত সহজ নয়। আমরা ভাবছি, সে পাগল , কিন্তু তার আদব-কায়দা, কথাবার্তায় তো আদৌ মনে হয় না? মাথার কোনও গোলমাল আছে? আর তা যদি না থাকে, তবে সে কি এতই মূর্খ, আমাদের এই বিশাল সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে লড়ার পাঁয়তারা করবে? হারাতে ওকে হবেই, কিন্তু খুব সহজে আমরা জিততে পারবো তাও ভাবা উচিত না। যাই হোক, প্রাণপন লড়ে আমাদের মান ইজ্জৎ বাঁচাতেই হবে।

জিনের ওপর ঠিক হযে বসে, রেকাবীতে পা ঢুকিয়ে, লাগাম হাতে ধরে কামার অল আকমর। তারপর ডানদিকের বোতামটায় আঙ্গুল রাখে। অল্প একটু চাপ দিতেই, সকলকে স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক্ করে দিয়ে ঘোড়াটা ঈষৎ কেঁপে উঠে। শোঁ শোঁ করে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যেতে থাকে। সুলতান,উজির আমির এবং তাবৎ সৈন্যবাহিনীর সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁ করে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। সকলেরই বাহ্যজ্ঞান তখন লোপ পেয়ে গিয়েছিলো।

স্বল্পক্ষণের মধ্যে সুলতান সম্বিত ফিরে পান। চিৎকার করে ওঠেন তিনি, পালিয়ে গেলো, পাকড়াও! জলদি—

সেনাধ্যক্ষ শান্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, ডানাওলা পাখীকে কি তাড়া করে ধরা যায়? সে তো আমাদের তীর বর্শার পাল্লা ছাড়িয়ে অনেক—অনেক ওপরে উঠে গেছে। তাকে পাকড়াও কী ভাবে করা সম্ভব।

সমগ্র সৈন্য-বাহিনী আকাশের দিকে চোখ রেখে দেখতে থাকলো,ঘোড়াটা উঠতে উঠতে এক সময় তীরবেগে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো।

উজির বললো, এ কোনও সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। নিশ্চয়ই কোনও জিন আফ্রিদি অথবা কোনও যাদুকর। যাক, চলে গেছে, বাঁচা গেছে। আল্লাহ রক্ষা করেছেন।

দুর্বোধ্য এক বিস্ময় নিয়ে সুলতান প্রাসাদের অন্দরে যান। সামস্ অল নাহারকে সমস্ত ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে বলে বোঝাবার চেষ্টা করেন, আসলে সে কোনও মনুষ্যসন্তান নয়, মা। হয় কোনও জিন আফ্রিদি, নয় কোনও যাদুকর।

কিন্তু শাহাজাদী সে কথা বিশ্বাস করে না। অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে। কপাল বুক চাপড়াতে চাপড়াতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সুলতান তাকে আদর করে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকেন।

—আল্লাহকে শত সহস্র ধন্যবাদ জানাও, মা। তিনি আমাদের এই অলৌকিক

দৈব-দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার করেছেন। কে জানে, তার খেয়াল হলে এক লহমাতে সে আমার গোটা সৈন্যবাহিনীই খতম করে দিতে পারতো কিনা! লোকটা একটা আস্ত শয়তান, ঠগ, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, শূয়ার!

কিন্তু এতেও শাহজাদী শান্ত হও না । আরও আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে।

—খোদা মেহেরবান,সে আর যদি ফিরে না আসে, এই আমি বলে রাখলাম, আব্বাজান, নাওয়া-খাওয়া কিছুই আমি করবো না। যতদিন না সে এসে আমাকে গ্রহণ করে, আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরবো।

সুলতান ভাবলেন, বৃথাই তাকে সান্ত্বনা দেওয়া। কোনই ফল হবে না। সারা দুনিয়া তার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো। বিড়বিড় করে কী সব আবোল তাবোল আওড়াতে থাকলেন।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো তেইশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

উল্কার গতিতে ঘোড়াটাকে উপরে মহাশূন্যে তুলে এনে কামার অল সামনের দিকে ছুটে চললো। এই দিকে তার স্বদেশ। চলতে চলতে সে ভাবে, প্রিয়া রইলো তার পিতার প্রাসাদে বন্দী হয়ে। তাকে সে একদিন উদ্ধার করে নিয়ে যাবেই। তা সে যে ভাবেই হোক। প্রিয়তমার বাবার সলতানিয়তের নাম সে জেনেছে ইয়ামান। আর শহরটার নাম সানা।

বলতে গেলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বায়ু বেগে ছুটতে ছুটতে, ঘোড়াটা তার নিজের শহর-সীমায় এসে পড়ে। বিরাট একটা চক্কর দিয়ে সে নিচে নেমে পড়ে। একেবারে তার নিজের প্রাসাদের ছাদের ওপর। ঘোড়াটাকে সেইখানেই দাঁড় করিয়ে তরতর করে সে নিচে নেমে যায়—সিঁড়ি বেয়ে।

সারা প্রাসাদে তখন কবরের নিস্তব্ধতা। কামার অল বুঝতে পারে না, কেন এই নীরব নিঃঝুম আবহাওয়া! এ-ঘর ও-ঘর সে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কোথাও কোনও টুঁ শব্দটি নাই। মনে হয় এক নিদারুণ শোকের ছায়া ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। কামার অল ভাবে, নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। হয়তো কেউ মারা গিয়েছে। আর ভাবতে পারে না সে। হন হন করে সে তার বাবার একান্ত ব্যক্তিগত কামরায় ঢুকে পড়ে। বাবাকে জীবিত দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়। সেই একই ঘরে তার মা এবং তিন বোনও শোকে দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছিলো। কামার দেখলো, তার মায়ের চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু নির্গত হয়ে চলেছে। বাবা সন্দিগ্ধ চোখে মুখ তুলে তাকালেন। নিজের চোখকে নিজেই তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না—এই কী তার কামার অল? কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব! তিনি হয়তো জেগে জেগেই খোয়াব দেখছেন।

—আব্বাজান, আমি কামার অল, আমি ফিরে এসেছি—

হঠাৎ কামার অল-এর আবেগ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সারা প্রাসাদ গম গম কর ওঠে। সুলতান সবিস্ময়ে উঠে ব'সে চোখ রগড়াতে থাকেন। তাইতো এতো কোনও স্বপ্ন নয়। এ যে তার বুকের কলিজা—কামার অল। বাদশাহ সাবুর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না—পুত্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন তিনি। অনেক-অনেক্ষণ ধরে।

মা এবং বোনরা আকুল হয়ে উঠে এসে কামার অলকে জড়িয়ে ধরে, হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে। ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন মা। কপালে চিবুকে চুমায় চুমায় ভরে দিতে থাকেন।

অনেকক্ষণ পরে যখন তারা খানিকটা ধাতস্থ হলো, কামার অল তার অদ্ভুত

লোম-হর্ষক এবং রোমঞ্চকর অভিযানের কাহিনী বলতে লাগলো তাদের কাছে। সে কাহিনী আবার এখানে পুনঃ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

বাদশাহ সাবুর ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছেন। সারা দেশে ঢ্যাঁড়া পিটে জারি করা হলো, সুলতানের প্রাসাদে সাত দিন ব্যাপী খানাপিনা গান-বাজনা নৃত্যের উৎসব আয়োজন করা হয়েছে। বাদশাহজাদা কামার অল আকমর সশরীরে সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছে—এ উৎসব তারই জন্য। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপামর সকল মানুষের সাদর নিমন্ত্রণ রইলো প্রাসাদের এই উৎসবে।

সারা শহর, প্রাসাদ, জলপথ সুন্দর করে সাজানো হতে লাগলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসানো হলো তোরণ-মঞ্জিল। দোকানপাট উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আলোর মালায়।

প্রাসাদকে সাজানো হলো এক মনোহারী সাজে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেলো দেওয়াল কার্নিশ। হাজারো বাতির ঝাড় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো সদর ফটকের সামনে। লোকে লোকারণ্য। মহা ধূমধামে দান ধ্যান খানা পিনা নাচ গান হৈ-হল্লা চলতে থাকলো সাত দিন ব্যাপী। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে নানা মর্যাদার খেতাব বিলি করলেন সুলতান। কয়েদীদের মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া হলো। যাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে ছিলো তাদের অনেককে খালাস করে দেওয়া হলো।

বাদশাহ সাবুর শাহজাদা কামার-অল-আকমরকে সঙ্গে নিয়ে শহরের প্রতিটি বাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরে এলেন। সবাইকে জানিয়ে এলেন তাঁর হারানো মণি কামার অল আবার বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছে!

প্রজারা স্বচক্ষে আবার দেখতে পেলো তাদের ভাবী বাদশাহকে। আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠলো শহরের আকাশ বাতাস।

তারপর একদিন আনন্দ উৎসব শেষ হয়ে যায়। কামার অল বাবাকে জিজ্ঞেস করে, যে-পারসী-পণ্ডিত আপনাকে এই ঘোড়াটা দিয়েছিলো, সে কোথায় গেলো, আব্বাজান?

পণ্ডিতের কথা উঠতেই বাদশাহ ক্ষেপে ওঠেন, ওর নাম মুখে এনো না, লোকটা একটা সাক্ষাৎ শয়তান, যাদুকর। ওরই জন্যে আমি এত দুঃখ শোক ভোগ করলাম। ওকে আমি প্রহার করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেছি! জানি না, বেঁচে আছে কি নাই। আল্লাহ ওকে ক্ষতম করুন। তোমার সঙ্গে আমার এই ছাড়াছাড়ির একমাত্র কারণ সে। তার ধোঁকাবাজীতে না ভুললে, আমাকে এত দুঃখ আর তাপ সইতে হতো না। আমি তাকে ক্ষমা করতে পারবো না কখনও।

কামার অল বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো আমি ফিরেই এসেছি আব্বাজান! তাছাড়া দোষটা যে পুরোপুরি তারই, তাই বা কী করে বলা যায়? আমারও তো উচিত ছিলো, ঘোড়াটা চালাবার সব কায়দা কৌশল তার কাছ থেকে জেনে নেওয়া। তখন সে-ধৈর্য তো আমার ছিলো না। ঘোড়াতে চেপেই, তার কথা শেষ না হতেই, আমি বোতাম টিপে ধরেছিলাম। দোষ বলতে গেলে পুরোটাই আমার বাবা। আপনি ওকে জানে মারবেন না, ছেড়ে দিন, এই আমার আর্জি।

কামার অল-এর ইচ্ছায় না করতে পারলেন না বাদশাহ। পারসী-পণ্ডিতকে কারাগার থেকে মুক্ত করে প্রচুর অর্থ ও এক নতুন সাজপোশাক উপহার দিয়ে বললেন, এবার তুমি দেশে ফিরে যেতে পার।

কিন্তু ছোট কন্যার সঙ্গে শাদীর কথাটা বেমালুম চেপে গেলেন তিনি। পণ্ডিতও

সে ব্যাপারে আর কোনও কথা তুললো না। বাদশাহ ভেবে রেখেছিলেন, পণ্ডিত যদি তার ছোট কন্যাকে শাদী করতে চানও, তৎক্ষণাৎ তিনি 'না' বলে দেবেন, তাতে জবান যদি নষ্ট হয়, হবে। কিন্তু তাই বলে একটা যাদুকর শয়তান শঠের হাতে মেয়েকে তুলে দেবেন না তিনি। পণ্ডিত জেনে শুনে তার পুত্রকে ঘোড়ায় চাপতে দিয়েছিলো—মেরে ফেলার জন্য। না হলে, গোড়াতেই সে বলতে পারতো। সব কিছু না শিখে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপাই চলবে না। কিন্তু তা সে করেনি। যেহেতু কামার অল তার ছোট বোনের সঙ্গে পণ্ডিতের শাদীতে বাধ সেধেছিলো সেই কারণে, প্রতিশোধ নেবার জন্যে, সে তাকে মরণের ফাঁদে ফেলে দিয়েছিলো। আল্লাহ মেহেরবান, তাই কামার অল ফিরে আসতে পেরেছে। অন্য কেউ হলে জ্বলন্ত সূর্যের গোলার মধ্যে ঢুকে পড়ে নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। এমন শয়তানের হাতে কেউ মেয়ে দেয়।

বাদশাহ সাবুর ঘোড়াটার কি বিধি ব্যবস্থা করবেন, কিছুই ঠিক করতে পারেন না। তাই তিনি কামার অলকে ডেকে পাঠালেন।

—বল তো বাবা, ঐ অপয়া কালো-ঘোড়াটাকে নিয়ে কী করা যায়? আমার মনে হয়, অমন সর্বনেশে জিনিস ঘরে না রাখাই ভালো। ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিই, কী বলো?

কামার অল বলে, কেন আব্বাজান, এখন তো আমি ওর সব কায়দা কৌশলই রপ্ত করে নিয়েছি। তখন কিছু জানা ছিলো না বলে অমনটা হতে পেরেছিলো। কিন্তু এখন তো আর সে ভয় নাই।

বাদশাহ সাবুর কিন্তু পুত্রের কথায় সায় দিতে পারে না।

—না বেটা, আমার মনে হয় এখনও ওর অর্ধেক কলাকৌশল তোমার জানা হয় নি। তার চেয়ে বলি কি, ওটার পিঠে তুমি আর চেপো না। ও আমার আতঙ্ক, আমার দুশমন। ওতে চড়া মোটেই নিরাপদ নয়, বাবা।

কামার অল তখন সানার সুলতান প্রাসাদে শাহজাদীর সঙ্গে এক রাতের সহবাস, সুলতানের ক্রোধ, এবং তার হাত থেকে, এই কালো-ঘোড়ার দৌলতে, অব্যাহতি পাওয়া-সব খুলে বললো।

বাদশাহ সাবুর তবু বুঝতে চান না, সবই নিয়তির খেলা, বাবা। মৌৎ যেভাবে লেখা থাকে, কেউ খণ্ডন করতে পারে না তা। তোমার মৃত্যু সানার সুলতানের হাতে ছিলো না বলেই সে তোমাকে হত্যা করতে পারে নি। অথবা এরপর অন্য কোনও সময় তারই হাতে তোমার মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে আছে! তখন তুমি যে খানেই থাকো, ঘটনাচক্রে তার সম্মুখে তোমাকে যেতেই হবে। এবং সে তোমাকে নিহত করবেই। সুতরাং তুমি যা বলছো, সে কোনও কথা নয়। যাই হোক, আমি চাই না,ঐ ঘোড়াটায় তুমি আবার কখনও চড়ো।

দিন যায়। কিন্তু সামস অল নাহারকে কিছুতেই ভুলতে পারে না কামার অল আকমর। প্রতিটি পল স্মৃতি কুরে কুরে খায় তার বুকের পাঁজর। কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না—সেই একটা রাতের মধুর মিলন-স্মৃতি। এক হলেও, সহস্র রজনীর স্বাদ সে কামার অলকে দিয়েছে। তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে খুলে ধরেছিলো সামস্ অল নাহার। সেই রাতের আধো আলো আধো অন্ধকারে সব সে দেখেছে, সব সে চেখেছে। সামস্ নিজেকে সঁপে দিয়েছে তার হাতে। এখন সে তার। সুতরাং এইভাবে, তাকে ছেড়ে দূরে দূরে থাকা তো তার পক্ষে সম্ভব না। যে ভাবেই হোক, যেমন করেই হোক, তাকে ওখান থেকে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সেখানে সে যাবে কেমন করে। তার বাবা বাদশাহ সাবুরের নির্দেশ সে যেন আর ঐ কালো ঘোড়ায় না চাপে। সে ঘোড়ায় না চেপে সে কী করে যাবে তার প্রাসাদে? তাকে চুরি করে আনা ছাড়া অন্য কোনও পথ

নাই। কারণ তার বাবা সানার সুলতান এবং সারা শহরবাসী তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তাকে একবার কব্জায় পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেবে।

একদিন বাদশাহ সাবুর এক গান বাজনার মাইফেলের আয়োজন করেছিলেন। শহরের নামকরা বাঈজীরা এসেছিলো মুজরো করতে। মাইফেলের আসরে বসে সেদিন সন্ধ্যায় একখানা বিরহ-সঙ্গীত শুনে কামার অল-এর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে সামস্ অল নাহার-এর বিরহে আরও বেশি কাতর হয়ে পড়ে সে। শত চেষ্টা করেও মনকে প্রবোধ দিতে পারে না। তাই বাবার নির্দেশ অমান্য করেই সে আবার কালো ঘোড়ায় চেপে বসে। ডান দিকের বোতাম টিপে ধরতেই ঊর্ধাকাশে উঠে চলে যায় এক নিমেষে। তারপর উড়তে উড়তে এক সময় সে চলে আসে সানায়। সেই প্রাসাদ-এর ছাদে গিয়ে নামে। রাত তখন গভীর। সবাই ঘুমে অচেতন! কামার অল সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নিচে। তারপর পায়ে পায়ে চলে আসে নিগ্রো খোজাটার পাশে। সেই একই দৃশ্য। দৈত্যের মতো বিশাল লাসখানা এলিয়ে দিয়ে সে বিকট আওয়াজ তুলে নাসিকা গর্জন করছে। মাথার কাছে সিকেয় ঝোলানো খাবার-দাবার এবং দেয়ালে দাঁড় করানো একখানা তরোয়াল।

কামার এবার আর সিকেটাও খুলে নিলো না, নিলো না তরোয়ালখানাও। পা টিপে টিপে সে পেরিয়ে গেলো দ্বিতীয় দরজার সামনে। যথারীতি সেই মখমলের পর্দা ঝুলছিলো। কামার অল পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢোকে। শয্যার চারপাশে বসে দাসী মেয়েগুলো সামস্ অল নাহারকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, দুঃখ করবেন না শাহজাদী, আমাদের বিশ্বাস তিনি আবার আসবেনই। যে ভালোবাসার স্বাদ তিনি পেয়েছেন, তা কখনই ভুলতে পারবেন না। আপনি কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছেন। এ ভাবে না খেয়ে না ঘুমিয়ে যদি কাটাতে থাকেন ক'দিন বাঁচবেন? কিন্তু বাঁচতে যে আপনাকে হবেই, মালকিন? আপনার ভালোবাসার জন্যই আপনাকে ভালোভাবে বাঁচতে হবে। আর বাঁচতে গেলে খেতে হবে, ঘুমাতেও হবে। নিন, উঠুন, কিছু একটু মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। আমরা বলছি, তিনি বেশিদিন আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চব্বিশতম রজনী। আবার সে কাহিনী শুরু করে ঃ

এদিকে সকালে বাদশাহ সাবুর খবর পান, কামার অল প্রাসাদে নাই। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বাদশাহ স্বয়ং সারা প্রাসাদ তন্নতন্ন করে খুঁজলেন! কিন্তু না, কোথায়ও তাকে পাওয়া গেলো না। হঠাৎ তার খেয়াল হলো কালো ঘোড়ার কথা। ছাদের ওপরে উঠে এসে দেখলেন, ঘোড়া নাই। কামার অল তার কথা অমান্য করে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে। রাগে তিনি কাঁপতে লাগলেন। আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করতে থাকলো। আবার যদি তার কোনও বিপদ ঘটে? নিশ্চয়ই সে সানার প্রাসাদে গেছে। শাহজাদীর সঙ্গে মুলাকাত করতে। কিন্তু সে-মেয়ের বাবা, সেখানকার সুলতান নাকি একরোখা মানুষ। যদি তার কোপে পড়ে সে প্রাণ হারায়—। না না, সে কথা ভাবতে চান না তিনি। ভাবতে পারেন না তিনি—

সাবুর মনে মনে ঠিক করলেন, এবার কামার অল ফিরে এলে ঐ ঘোড়াটাকে আগে তিনি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবেন, তার পরে অন্য কথা। তার মনের সব শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে ঐ ঘোড়াটা।

পর্দা উঠিয়ে কামার অল কান পেতে শুনতে থাকে দাসী মেয়েদের সান্ত্বনার কথাগুলো। কিন্তু সে সান্ত্বনায় সামস্ অল নাহার একতটুকু শান্ত হতে পারে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে থাকে; না না, তোরা আমাকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছিস, সে আর ফিরে আসবে না। আমার বাবা তাকে পছন্দ করে না। সে জানে—এখানে এলে আর তাকে আস্ত রাখবে না আমার বাবা।

কামার অল পায়ে পায়ে পালঙ্কের পাশে দাঁড়ায়। কেউ তাকে লক্ষ্য করতে পারে না। সবাই তখন সামস্ অল নাহারকে নিয়ে ব্যস্ত।

শাহজাদীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেছে, কামার অল মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললো, এই তো আমি এসেছি পিয়ারী। তুমি কি ভেবেছিলে, তোমার বাবার ভয়ে আমি আসবো না? কিন্তু আসল মহব্বৎ কোনও কিছুর তোয়াক্কা করে না। মৃত্যুভয়ে সে ভীত হয় না। জন্মালে একদিন মরতেই হবে। এতো সবাই জানে। তাই বলে কেউ কি সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করে না?

এও আমার ভালোবাসার জন্যে যুদ্ধ মনে কর, সামস্। তোমাকে একবার দেখতে পাবো, তার জন্যে যদি আমাকে মরতেই হয়, হাসিমুখে বরণ করে নেবো, সে মরণ আমার মহব্বৎকে আরও মহৎ করবে, জান্।

বাঁদীরা সব পলকে সরে যায়। সামস্ অল নাহার মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কামার অল-এর মুখের দিকে। ভাবতে পারে না সে—এ দৃশ্য আবার সে দেখবে। কামার অল—তার প্রিয়তম আবার এসে দাঁড়াবে তার পালঙ্কের অতি পাশে, তা সে ভাববেই বা কি করে? তার বাবা কামার অলের ওপর খড়্গ হস্ত হয়ে আছে। একবার সে তার কব্জা থেকে পালিয়ে গেছে, কিন্তু আর একবার যদি সে ফিরে পায় তবে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবে। একথা কামার অলও খুব ভালো করেই জানে। তাই, সে যে আবার ফিরে আসতে পারে, ভাববে কি করে!

তবুও তো সে এসেছে। অনেক বিপদ খাঁড়া মাথায় করে সে তো এসে দাঁড়িয়েছে? সামস্ আর ভাবতে পারে না; দু'হাত বাড়িয়ে কামার অলকে টেনে নেয় বুকে। কেঁদে কেঁদে বুকের ব্যথা হাল্কা করে। কামার অলও চোখের জল রাখতে পারে না।

—জান সামস্, তোমার জন্য সারা দিন-রাত কী ভাবে কেটেছে আমার। মুখে খানা রুচেনি, শুয়ে ঘুম আসেনি একদিনও। তুমি কেমন ছিলে?

সাম্স অল নাহার চুমায় চুমায় ভরে দেয় কামার অল-এর অধর গাল বুক।

—কেমন ছিলাম, কেমন থাকতে পারি বুঝতে পারছো না মণি, তোমার বিরহে আমার কী চেহারা হয়েছে একবার চেয়ে দেখ। আর ক'দিন যদি তোমাকে না দেখতে পেতাম, তাহলে তুমি ফিরে এসে আর আমাকে দেখতে পেতে না, সোনা। তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না। জীবনে যদি ভালোবাসা এলো আর সে ভালোবাসাকে যদি ধরেই না রাখতে পারলাম, তবে কাজ কী বলো এই ব্যর্থ জীবনে? তাই ঠিক করেছিলাম তুমি যদি আর ফিরে না আস জহর খেয়ে খতম করে দেব এ ছার জীবন।

কামার অল, সামস্-এর মুখে হাত চাপা দেয়, ওকথা মুখে আনতে নাই সাম্স। আমি যেখানেই থাকি আর যত দূরেই থাকি, তুমি নিশ্চিত জেনো, আমি তোমারই আছি—তোমারই থাকবো। আমাদের এই নিখাদ ভালোবাসায় কোনও দিন চিড় খাবে না।

এক অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ খেলে যায় সামস্ অল নাহারের সারা শরীরে। আরো নিবিড় করে কামার অলকে জড়িয়ে ধরে সে।

কামার অল বলে, সামস্, বড্ড খিদে পেয়েছে, অনেকদিন খাওয়া-দাওয়া নাই।

খিদেও ছিলো না, কিন্তু এখন পেট চুঁই চুঁই করছে। মেয়েদের বলো, কিছু খানাপিনা আনুক। আমরা দু'জনে একসঙ্গে খাবো, কেমন?

সামস্ অল হাসে, বেশ তো!

তখনই নানারকম খানাপিনায় মেজ সাজিয়ে দেয় মেয়েরা। কামার অল নিজে হাতে সামসকে খাইয়ে দিতে থাকে। সামস অল-ও কামার -অলকে। অনেক দিন বাদে আবার তারা প্রাণভরে খানাপিনা করে।

হাসি আনন্দ আদর সোহাগে রাতের প্রহর কাটাতে থাকে। খুশিতে উপচে ওঠে দু'জনের হৃদয়। একসময় কামার অল বুঝতে পারে, রাত্রি প্রায় শেষ হতে চলেছে এবার বিদায়ের পালা। ভারাক্রান্ত মনে সে সামস্‌কে বলে, ভোরের আগেই আমাকে পালাতে হবে। না হলে খোজাটা জেগে গেলে মুসকিল হবে। তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি, সোনা, প্রতি সপ্তাহে একবার এসে তোমাকে দেখে যাবো।

—না না, সে হবে না নয়নমণি, আর আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। একটি দিনও না—একটি মুহূর্তও না।

সামস্ অল নাহারের এই আকুলতায় সব গোলমাল হয়ে যায় কামার অল-এর। বলে, কিন্তু এখানে আমার থাকা কি নিরাপদ হবে সামস্। তোমার বাবার রোষ তো তুমি জান।

সামস্ অল বলে, জানি, খুব ভালো করেই জানি এখানে তুমি আমার কাছে রয়ে গেলে, কাল সকালেই তোমাকে চিরকালের মতো হারাবো আমি। সে-কথা আমি বলবো না, কামার অল। কিন্তু তোমাকে ছেড়েও আমি থাকতে পারবো না। আমি তোমার সঙ্গেই যাবো। তা সে যদি আমাকে জাহান্নামেও নিয়ে যাও, আমার কোনও আপত্তি নাই। তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমি কোন কষ্টই কষ্ট বলে মনে করি না। সোনা, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার বাবা পারস্যের শাহেনশাহ, তাঁর মান-ইজ্জৎ আমি খোয়াতে চাই না। তিনি যদি আমাকে ঘরে নিতে নারাজ হন কোনও দুঃখ করবো না। তুমি আমাকে অন্য কোথাও রাখবে। তা সে যত কষ্টকর জায়গাই হোক, সুলতান-দুহিতা প্রথম প্রথম হয়তো একটু আমার অসুবিধা হবে, দেখে নিও, হাসিমুখে আমি সব সয়ে নেবো। তোমার মহব্বতের কাছে আমার সে কষ্ট তুচ্ছ হয়ে যাবে।

কামার অল আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে, তুমি যাবে সামস্? আমার সঙ্গে যাবে তুমি? এই বিত্ত-বৈভব, এই অঢেল সুখ-সাচ্ছন্দ্য, তোমার বাবা, তোমার সলতানিয়াৎ সব ছেড়ে যেতে পারবে আমার সঙ্গে? আমি সত্যিই কোনও কথা দিতে পারি না সামস্ অল। আমার বাবা তামাম পারস্যের শাহেন শাহ, একথা ঠিক। কিন্তু আমার তো নিজস্ব কোনও সম্পদ নাই, তিনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন তবে আমি অতি সাধারণ এক বিত্তহীন কামার অল। সে ক্ষেত্রে তুমি বাদশাহজাদী, আদরের দুলালী, হয়তো সত্যিই অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।

সামস্ অল নাহার কামার অলকে থামিয়ে দিয়ে বলে, সে সব কথা আমিই তোমাকে বললাম, সোনা। ভালোবাসার জন্য আমি সব হাসিমুখে কেমন করে সইতে পারি, একবার, না হয় পরীক্ষা করে দেখ।

কামার অল বলে, ভোর হতে চললো; তাহলে আর দেরি নয় সামস্, তৈরি হয়ে নাও, এখনই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। না হলে খোজাটা জেগে গেলে, বিপদ হবে।

শাহজাদী শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে। সিন্দুকের তালা খুলে বের করে কিছু সাজ-পোশাক, রত্নাভরণ এবং মহামূল্যবান বিলাস-বস্তু। একটা থলেয় ভরে বলে, চলো, আর কিছু নেবার নাই।

দাসী-মেয়েরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কোনও বাধা দিতে পারে না—সোরগোল তুলে সাড়া জাগাতেও পারে না।

সামস্ অলকে হাতে ধরে কামার অল ছাদের ওপর ওঠে আসে। ঘোড়াটার জিনের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয় থলেটা। তারপর দু'হাতে তুলে শাহজাদীর হাল্কা দেহখানা ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে তার পিছনে। সামসের পাতলা শরীরটা কামার অল-এর বিশাল বিস্তৃত বক্ষপটের মধ্যে হারিয়ে যায়।

ডানদিকের বোতামটা টিপে ধরতেই শোঁ শোঁ করে ওপরে উঠতে থাকে কালো ঘোড়া। উল্কার বেগে। কামার অল সামসের কানের কাছে মুখ রেখে বলে, খুব ভয় করছে!

সামসের কণ্ঠে শিশুর সারল্য,—ভয় করবে কেন? আমি তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছি। তামাম দুনিয়ায় এর চাইতে নির্ভয় জায়গা তো আমার আর নাই, সোনা।

কামার অল-এর বুক ভরে যায়। ভালোবাসার কথা এত ভালো করে বলতে পারে সামস্—

একটুক্ষণের মধ্যেই তারা পারস্যের প্রাসাদ-শিখরে এসে নেমে পড়ে।

কামার অল-এর ঘোড়া আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাসী মেয়েরা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে ঃ ওরে বাবারে, কী সর্বনাশ হলো রে, কই গো, কে কোথায় আছ, ছুটে এসো, শাহজাদীকে চুরি করে পালিয়ে গেল/লো সেই লোকটা—

ধড়মড় করে উঠেই তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে খোজাটা। হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে, ছুটে আসে। ছুটে আসে সুলতানও, আলু থালু বেশবাস, খালি পা, ঘুমে চোখ জড়ানো।

—কী? হয়েছেটা কী? এত চেঁচামেচি চিৎকার কেন এই রাতে?

মেয়েরা তখনও ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলো। একজন বললো, সেই মানুষটা আবার এসেছিলো, শাহজাদীকে চুরি করে নিয়ে উড়ে পালিয়ে গেলো।

সুলতান হুঙ্কার ছাড়ে, তোরা কোথায় ছিলি?

—জী হুজুর, আমরা ঘুমে অচৈতন্যি হয়েছিলাম—

—আর এই বাঁদর খোজাটা—

নিগ্রোটার হাতে তখন ইয়া বড় তরোয়ালখানা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো।

সুলতান ক্ষণকাল আর অপেক্ষা করলেন না সেখানে। ছুটতে ছুটতে ছাদের ওপরে উঠে এলেন। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ঘোড়াটা ততক্ষণে মেঘের কাছাকাছি। সুলতান চিৎকার করে বলতে থাকেন, শোন শাহজাদা কামার অল, আমার একটা মিনতি শোনো, দোহাই বাবা, আমার একমাত্র নয়নের মণি বুকের কলিজাকে এইভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যেও না। ফিরিয়ে দিয়ে যাও, ফিরিয়ে দিয়ে যাও। নেমে এসো, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার সঙ্গে শাদী দিয়ে দেব। ফিরিয়ে দাও তাকে।

কিন্তু সুলতানের সে আকুল আবেদনে সাড়া দিলো না কামার অল। কী করেই বা দেবে? তখন তারা মানুষের কণ্ঠস্বরের নাগাল ছাড়িয়ে আরো অনেক ওপরে উঠে গেছে।

সুলতান ভাবেন, কামার অল তার কথায় সাড়া দেবেন না। তারপর তিনি আরও জোরে চিৎকার তোলেন, সামস্ অল—ফিরে আয় মা, তোমার বুড়ো মায়ের মুখ চেয়েও একটিবারের জন্য ফিরে আয়, বাছা। আজ বাদে কাল সে দেহ রাখবে, একবার তাকে দেখে যা। আমি কথা দিচ্ছি মা, তোরা যা চাইবি তাই হবে। শুধু একটি বারের জন্য ফিরে আয়।

কিন্তু ফিরে এলো না কেউ। শুধু নিজেরই প্রতিধ্বনি বার বার ফিরে ফিরে এসে বিদ্রূপ করতে থাকলো।

রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁচিশতম রজনী। আবার সে বলতে থাকে ঃ

কামার অল বলে, এই আমাদের প্রাসাদ। কিন্তু তোমাকে এখন কোথায় নিয়ে যাই, সেই কথাই ভাবছি। সোজা যদি বাবার সামনে হাজির করি তোমাকে আর তিনি যদি রুষ্ট হয়ে তোমাকে কোনও কটুকথা বলেন, সে তো আমি সইতে পারবো না সোনা। সুতরাং ভাবছি, এখনই প্রাসাদে না ঢুকে তার চেয়ে বরং চলো বাগিচামহলে গিয়ে উঠি। তোমার কী মত?

আমার আবার আলাদা মত কী হবে? তোমার মতেই আমার মত। তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে। তবে একটা কথা, তোমাকে ছাড়া আমি একটা রাতও থাকতে পারবো না।

কামার অল হেসে সামস্-এর পাপড়ি নরম গালে আস্তে একটা ঠোনা মারে।

—আমিই কী ভাবছো, তোমাকে ছেড়ে একটা রাত কাটাতে পারি? চলো আমরা এই প্রাসাদে ঢুকবো না। বাগিচা বাড়িতেই যাই।

আবার সে ঘোড়াটাকে খানিকটা ওপরে ওঠায়। তারপর অদূরে অবস্থিত সুরম্য বাগিচা-মহলের সামনে গিয়ে নেমে পড়ে। বড় মনোরম জায়গা। যে দিকে তাকায় সামস্, শুধু ফুলে ফুলে ভরা। কত সহস্র রকম জানা অজানা ফুলের গাছ। বাগিচার মাঝখানে একটি স্ফটিকের ফোয়ারা। তার চার পাশে স্বচ্ছ নীল জলে কেলি করে মাছেরা। সামস্ অল নাহারের দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। কামার অল বলে, এখানে দু-একটা দিন তুমি থাকো—আমিও থাকবো। তারপর সুযোগ মতো বাবাকে বলবো তোমার কথা। আমি তার একমাত্র পুত্র সন্তান। তার মনে বড় আশা, আমার শাদী হবে খুব জাঁকজমক করে। দেশ-বিদেশ থেকে আসবে হাজার হাজার অতিথি অভ্যাগতরা। তাদের সামনে শাদী হবে তার পুত্র—পারস্যের ভাবী শাহেন শাহর। আমি এখন যাচ্ছি, বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে। কাল রাতে তাকে না বলে চলে গেছি, না জানি কত দুর্ভাবনায় কাতর হয়ে আছেন তিনি। ঘোড়াটা এখানে রইলো। একটু নজর রেখো, কেমন?

সামস্ অল নাহার বলে, ঠিক আছে, বাবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

ছেলেকে দেখে বাদশাহ সাবুরের ধড়ে প্রাণ আসে। সারাটা রাত বিনিদ্র রজনী কেটেছে তাঁর। নানা অশুভ চিন্তায় দেহমন অসাড় হয়ে গিয়েছিলো, কামার অলকে দেখে তিনি খুশিতে উপচে পড়েন। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, এইভাবে বুড়ো বাপের মনে কষ্ট দিতে আছে, বেটা?

কামার অল বলে, আপনার জন্যে একটা মজার জিনিস আনতে গিয়েছিলাম, আব্বাজান।

—কী জিনিস বাবা?

—আপনিই বলুন, আব্বাজান, কী হতে পারে?

বাদশাহ সাবুর হদিশ করতে পারেন না কিছু। অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, খোদা হাফেজ, আমি তো কিছুই ঠাওর করতে পারছি না বাবা। কী ব্যাপার, কী এমন বস্তু আনতে গিয়েছিলে আমার জন্যে?

—সানার সুলতান-কন্যাকে সঙ্গে এনেছি, আব্বাজান। সে আপনার ছেলের বেগম হবে। তার মতো খুব সুরৎ মেয়ে তামাম আরব পারস্যে মিলবে না আর একটা। যেমন রূপ তেমনি তার আদব কায়দা!

বাদশাহ চিৎকার করে ওঠেন, কোথায় সে?

—আমি তাকে বাগিচামহলে রেখে এসেছি, আব্বাজান। তাকে আপনি জাঁকজমক করে ঘরে আনবেন। সেইজন্যে সরাসরি আপনার কাছে হাজির করিনি।

বাদশাহ সাবুর ছেলের বুদ্ধির তারিফ করেন, ভালো করেছ। সে আমার ছেলের বেগম হবে। লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে, শাদী-কেতায় তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে হাজার হাজার মানুষের মিছিল করে প্রাসাদে আনতে হবে তো। তাকে নিয়ে তুমি যদি জীবনে সুখী হও তার চেয়ে আনন্দ আর কী হতে পারে আমার? তোমার মুখে হাসি দেখলে আমার সব চিন্তা ভাবনা মুছে যায়।

তখুনি তিনি উজিরকে নির্দেশ দিলেন, উজির আর দেরি নয়, মিছিলের আয়োজন কর, প্রাসাদ শহর পথঘাট সাজাতে বলো। আমার ছেলের বেগম বরণ করে আনতে হবে।

বাদশাহ নিজ হাতে রত্ন-সিন্দুক খুললেন। এই সিন্দুকেই রাখা আছে পারস্যের সেরা সম্ভার। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত করে গেছে এতাবৎ কালের বাদশাহ। সাবুর বেছে বেছে বের করলেন সবচেয়ে দামী দামী জড়োয়ার সব গহনাপত্র। সবই হীরা মণি মুক্তাখচিত অমূল্য রত্নালঙ্কার। বংশানুক্রমে এই প্রাসাদের বেগমরা যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করে এসেছে এই রত্ন আভরণ—।

অলঙ্কারগুলো ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আমাদের খানদানের অলঙ্কার। অধিকার সূত্রে এসব এখন তারই প্রাপ্য। তুমি তাকে নিজে হাতে সাজিয়ে নিয়ে আসবে প্রাসাদে।

উজির আয়োজন করেছিলো শোভাযাত্রার। বিশাল বিরাট। প্রায় গোটা শহরের মানুষই বুঝি বা সেই মিছিলে সামিল হয়েছে। ধীরে মন্থর-গতিতে চলেছে শোভাযাত্রা। কামার অল-এর আর সহ্য হচ্ছিল না এই বিলম্ব। তার প্রাণ আকুলি বিকুলি করছে সামস্-এর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে।

কামার অল মিছিলের সঙ্গ পরিহার করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য একটা সরু পথ দিয়ে সরে পড়ে। কিছুক্ষণের মধে সে পৌঁছে যায় বাগিচা মহলে—সামস্ অল নাহারের বিশ্রামকক্ষে। কিন্তু একি! সামস্ অল কোথায়— ঘরে তো নাই সে! ফিরে তাকিয়ে দেখে, ঘোড়াটাকে যেখানে রেখে গিয়েছিলো সে, সেখানে ঘোড়াটাও নাই! তবে? আর ভাবতে পারে না কামার অল? মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। সম্বিৎ ফিরে আসে। কিন্তু তখনও সে বুঝতে পারে না ব্যাপারটা, সামসের পক্ষে ঘোড়া চেপে অন্য কোথাও চলে যাওয়া কী সম্ভব? না না, সে কী করে হতে পারে। কলের ঘোড়া চালাবার কায়দা কসরৎ না জানলে চালাবে কী করে? এবং-এ পর্যন্ত সামস্ অল কখনও জানতেও চায়নি, কী ভাবে চালাতে হয়। অন্য কোনও মানুষের পক্ষেও তাই। চালাবার কৌশল একমাত্র সেই পারস্য-পণ্ডিত ছাড়া তো কারোই জানা নাই। তবে কী সে-ই?

রাতের অন্ধকার হাল্কা হয়ে আসে। প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো ছাব্বিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

বাগিচার মালির কাছে ছুটে যায় কামার অল।

—বাগিচায় অন্য কোনও লোককে ঢুকতে দেখেছো? কোন ঝুট বলবে না, তা হলে তোমায় গর্দান যাবে—

ভয়ে থর থর করে কাঁদতে থাকে লোকটা। আল্লাহ কসম, অন্য কাউকেই দেখিনি। শুধু সেই পারসী-পণ্ডিত একবার ঢুকেছিলেন। দু-একটা ফুল তুলেছিলেন নজর করেছি। কিন্তু সে এখনও বাইরে যায়নি। ভিতরেই কোথাও আছে।

এবার আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না কামার অল-এর। আর কেউ নয়, সেই

শয়তানটাই তার প্রিয়তমাকে উধাও করে নিয়ে পালিয়েছে। দুঃখে বিষাদে সারা দেহমন ছেয়ে যায়। এখন সে কী করবে, কী করা উচিত কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। দিশাহারা হয়ে মিছিলের দিকে ছুটে চলে। বাদশাহ সাবুরের সঙ্গে দেখা করে বলে, আব্বাজান, সর্বনাশ হয়েছে! সেই শয়তান পণ্ডিতটা সামস্ অল নাহারকে নিয়ে পালিয়েছে। মিছিল ফিরিয়ে নিয়ে আপনি প্রাসাদে চলে যান। আমি চললাম, যতদিন না তাকে খুঁজে পাই, আমি ফিরবো না।

বাদশাহ আতঙ্কিত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে।

—আমার কথা শোন বাবা, প্রাসাদে ফিরে চল। তোমাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারবো না। ফিরে চল, তারপর আমি একটা ব্যবস্থা করছি।

—সে হয় না, বাবা, আমি এর শেষ দেখে নিতে চাই। কত বড় শঠ শয়তান সে, আমি একবার দেখবো।

বাদশাহ বলেন, কিন্তু বাবা, ও যে যাদুকর। তার ভেল্কিবাজীর কাছে তোমার দেহবল তুচ্ছ। সে তোমাকে মন্ত্রবলে নিমেষে হত্যা করে ফেলবে। তার চেয়ে তুমি প্রাসাদে চল। আমি তোমার জন্য তামাম আরব বাদশাহদের সুন্দরী কন্যা জোগাড় করে আনবো। তার মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয় তার সঙ্গে শাদী দিয়ে দেব।

কামার অল রুদ্ধকণ্ঠে বলে, এ আপনি কী বলছেন, আব্বাজান! সামস্ ছাড়া আমি অন্য নারীর চিন্তাও করতে পারবো না। আপনি আমাকে বাধা দেবেন না বাবা, কেউ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আল্লাহ যখন আমাকে রক্ষা করেছেন আমি আর কাউকেই ডরাই না।

বাদশাহকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে ঘোড়ার পিঠে চাবুক বসায়। তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে যায় কামার অল। হাপুস-নয়নে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসেন বাদশাহ সাবুর।

নিমেষের মধ্যে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে সারা শহরে। প্রাসাদে বিরাজ করতে থাকে কবরের নিস্তব্ধতা।

একেই বলে নিয়তি। সেই পারসী যাদুকর সেইদিন ঘটনাক্রমে বাগিচায় ঢুকেছিলো কিছু ফুল সংগ্রহ করতে। কিন্তু বাগানে ঢুকেই সে বুঝতে পারলো কাছে-পিঠেই এমন কেউ আছে—যার গায়ের অতি মূল্যবান আতরের খুশবু সারা বাগানে ভুর ভুর করছে। পায়ে পায়ে সে বাগিচামহলের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। জানলা দিয়ে ঘরের পালঙ্ক-শয্যা পরিষ্কার চোখে পড়ে। যাদুকর দেখলো, এক পরমাসুন্দরী রমণী শয্যায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটো বোজা। হয় বা ঘুমিয়ে গেছে, হয়ত নয়; এমনিই চোখ বন্ধ কর অন্তস্থ হয়ে আছে। ওপাশে নজর পড়তেই দেখলো, তার সেই যাদু ঘোড়া—দরজার একপাশে দাঁড় করানো। এবার বুঝতে কষ্ট হলো না, ঘোড়াটা কামার অলই রেখে গেছে এখানে। এবং এই অলোক-সামান্যাও তারই এক সংগ্রহ।

বুড়ো যাদুকরের চোখ আনন্দে নেচে ওঠে। মাথায় এক বদবুদ্ধি খেলে যায়। ঘোড়াটার পাশে গিয়ে সে ভালো করে দেখে নেয়। যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক আছে কিনা। তারপর আস্তে আস্তে এসে সামস্ অল-এর ঘরে ঢুকে আভূমি নত হয়ে সশব্দে লম্বা একটা কুর্ণিশ জানিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সামস্-এর তন্দ্রাভাব কেটে যায়। চোখ মেলে দরজার দিকে এক পলক তাকিয়েই আঁৎকে উঠে আবার সে বন্ধ করে নেয় চোখ দুটো।

—কে তুমি?

—আমি শাহজাদা কামার অল আকমর-এর বান্দা, বেগমসাহেবা? তার একটা খবর বয়ে এনেছি আপনার কাছে।

—কী খবর?

সামস্-অল ঐ কুৎসিত কদাকার বুড়োটার দিকে তাকাতে পারে না।

—যাদুকর বিগলিত কণ্ঠে বলে, শাহজাদা আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন, এই শহরেই অন্য একটা বিলাসমহলে আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছেন তিনি।

এখানে আপনার কষ্ট হতে পারে সেইজন্যে তিনি আরও সুন্দর আরও ভালো একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিকঠাক করছেন। সেখানে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি, মেহেরবানী করে আমার সঙ্গে চলুন আপনি।

সামস্ অল নাহার বিরক্ত বোধ করে, তা তিনি নিজে না এসে তোমাকে পাঠালেন কেন?

—সে কি! আপনি জানেন না? তার মা-এর অবস্থা খুব খারাপ। তাঁকে ছেড়ে এখন তিনি ওঠেন কি করে? তাই আমাকে পাঠালেন। আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেবো।

সামস্ অল বলেই ফেলে,..তা আর কোনও লোক পেলেন না তিনি? তোমার মতো একটা ভয়ঙ্কর জীবকে পাঠিয়েছেন? উফ্, তোমার কী বিশ্রী চেহারা। দেখলে গা গুলিয়ে যায়!

যাদুকর আরও বিনয়াবনত হয়ে বলে, জী—সেই কারণেই তো আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার মুখের দিকে তাকালে কোনও মেয়ের চরিত্র নষ্ট হবে না—সে কথা জেনেই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। তা না হলে প্রাসাদে কী চাকর নফরের অভাব ছিলো? কিন্তু অন্য কাউকেই বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি। উনি জানেন, আমার দিকে লোভের নজর দিয়ে তাকাবে না কোনও মেয়ে। আর আমি একশো বছরের একটা বুড়োহাবড়া—সে-সব বালাই তো আমার দেহমন থেকে বিদায় হয়েছে অনেককাল। তা আর বিলম্ব করবেন না, বেগমসাহেবা। দেরি দেখলে শাহজাদা আবার চিন্তিত হতে পারেন।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো সাতাশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

যাদুকরের এই সব মধুঢালা কথাবার্তায় সামস্ অল নিঃসন্দেহ হতে পারে।

—ঠিক আছে, চলো যাচ্ছি। কিন্তু যাবো কিসে? কী এনেছো?

যাদুকর বলে,যে ঘোড়ায় চেপে আপনি এসেছেন, সেই ঘোড়াতেই নিয়ে যাবো।

সামস্ অল না না করে ওঠে, ওরে বাবা, ও ঘোড়ায় আমি একা চাপতে পারবো না।

যাদুকর হাসে। মনে মনে ভাবে, এবার যাবে কোথায়, বাছাধন। এখন তুমি আমার কব্জায়। যেখানে তোমাকে নিয়ে যাবো, সেখানেই যেতে হবে। দাঁড়াও একবার তোমাকে জিনের ওপরে চাপাই আগে, তারপর দেখবে আমার খেল্—

—সেজন্যে আপনি কিছু ভয় করবেন না, বেগমসাহেবা, আমি আপনার সঙ্গে চাপবো। তা না চাপলে, এ তো আর জ্যান্ত ঘোড়া নয়, আপনি চালাবেন কী করে?

যাদুকর সামস্ অলকে জিনের ওপর চাপিয়ে নিজে তার পিছনে বসলো। তারপর ডানদিকের বোতামটা টিপে ধরে বললো, কোন ভয় নাই, বেগমসাহেবা, একটুও নড়াচড়া করবেন না। আমি আপনাকে ধরে থাকছি। এক লহমাতেই পৌঁছে যাবো।

শোঁ শোঁ করে আকাশের ওপরে প্রায় মেঘের কাছাকাছি উঠে যায় যাদুকর। তারপর আর একটা বোতাম টিপে সে তীরবেগে সামনের দিকে ছুটে চলে। সামস্ অল দেখে, নিচে শহরের প্রাসাদ ইমারত ছাড়িয়ে ঘোড়াটা ছুটে চলেছে মরুপ্রান্তরের উপর দিয়ে।

তারপর এক সময় বিশাল বিস্তৃত মরুভূমিও পার হয়ে যায় ঘোড়াটা। গাছপালা, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, নদী, জনবসতি আসে। নিমেষেই তারা পিছনে পড়ে থাকে। তখন ঘোড়াটা উল্কার বেগে ছুটে চলেছে।

সামস্ অল নাহার বুঝতে পারে না এ সে কোথায় চলেছে? লোকটা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ভয়ার্ত কণ্ঠে সে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, একি? এদিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে? আমাকে তো শোনালে, শহরের কাছেই যেতে হবে। কিন্তু কত নদী, মরুভূমি ছাড়িয়ে এলাম, এখনও কী দেরি আছে?

যাদুকরের চোখে শয়তানের হাসি।

—এই তো এসে পড়েছি।

কিন্তু এসে পড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। সামনে ছুটেই চলতে থাকলো। এবার সামস্ অল বুঝতে পারে যে সে, শয়তানের খপ্পরে পড়েছে। ক্রুদ্ধ হয়ে ফুঁসে ওঠে সে। এ কেমন চালাকী! তুমি না শাহজাদার বিশ্বাসী চাকর? এই তোমার ব্যবহার?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যাদুকর, হো হো হো করে। আমি চাকর? তোমার নাগরের চাকর? আহা, কী এমন সুখের কথা?

নিমেষে মুখে ফুটে তার ভয়ঙ্কর এক হিংস্রতা।

—শোনো, সুন্দরী, তুমি যেই হও, এখন থেকে আমার পেয়ারের বাঁদী হয়ে থাকবে। এই আমার শেষ কথা।

একটা নদীর পাড়ে একটা বাগানের পাশে এসে ঘোড়াটা নেমে দাঁড়ায়। যাদুকর বলে, উফ্ বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। চলো, একটু পানি খাবো।

সামস্ অল নাহার ঘোড়া থেকে নেমে এসে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

—এত বড় শয়তান তুমি, ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে তোমার আস্তানায় নিয়ে যেতে চাইছো? সে কিছুতেই হবে না।

—আহা-হা, অত চটছো কেন সুন্দরী। তোমাকে আমি তোমার নাগর কামার অল-এর চাইতে আরও বেশি সুখে রাখবো। জানো, আমি কে? তামাম আরব পারস্য দুনিয়ার মানুষ আমার যাদুর কথা জানে। আমি মন্ত্রবলে অসাধ্য-সাধন করতে পারি। আমার প্রাসাদে চলো, দেখবে। বাদশাহ সাবুর সে-প্রাসাদ জিন্দগীতে বানাতে পারবে না। আমি মন্ত্রবলে তৈরি করেছি এক নতুন বেহেস্ত। তুমি হবে তার মালকিন। কত-শত সহস্র বাঁদী তোমার সেবা যত্ন করবে। যে সুধা পান করলে মানুষ অমর হয় সেই সুধা আছে আমার কাছে। তোমাকে দেব, তুমি খেয়ে চির-যৌবনা হয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। বলো তোমার নাগর কামার অল পারবে এসব দিতে? পারবে কী করে, বলো? এ বস্তু তো কড়ি দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না। যাদুবলে সংগ্রহ করেছি আমি। আমার বয়স কত জান? একশো বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু দেখ, আমার শরীরে কী তাকত। হাজার পালোয়ানকে এক লহমায় কুপোকাৎ করে দিতে পারি। ভাবছো, আমি বুড়ো হয়েছি, তোমার যৌবন-কাম ব্যর্থ হয়ে যাবে? তবে জেনে রাখ সুন্দরী, আমি দেখতে কুরূপ হতে পারি, বয়েস আমার একশোরও বেশি হতে পারে, কিন্তু এখনও আমি তোমার মতো শত সুন্দরীকে সমানভাবে তুষ্ট রাখতে পারি। সুতরাং মন থেকে ওই সব ভালোবাসার প্যানপ্যানানি মুছে ফেলো। মেয়েরা চায় বিলাস-ব্যসন, আর চায় রতি-রঙ্গের জাঁদরেল যন্তর। ও দুটো আমার কাছ থেকে যা পাবে, কামার অল এর কাছ থেকে তা কখনই পাবে না। কামার অল একটা লম্পট, চোর। আজ যে মেয়েকে নিয়ে নাচে, কাল তাকে

আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দেয়। এই যে কলের ঘোড়াটা দেখছো, এটার মালিক কে জানো? আমি। সে আমার জিনিস চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো তোমাকে ভুলিয়ে ভাগিয়ে আনতে।

সামস্ অল নাহার চিৎকার করে ওঠে, থামো! তোমার অনেক বুজরুকি আমি শুনেছি, আর শুনতে চাই না। এখন জানে বাঁচতে চাও তো কেটে পড়। না হলে কপালে তোমার দুঃখ আছে।

যাদুকর হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়ে, আমার কপালে দুঃখ জিনিসটা লিখতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, সুন্দরী। আমি সুখের সাগরে ভেসে বেড়াই। তোমাকেও অবশ্য সঙ্গী করে নেব, ভয় নাই।

এমন সময় দু'জন জাঁদরেল সেনাপতি গোছের লোক পিছন দিক থেকে অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো যাদুকরের ওপর।

—এ্যাই, ওঠ, চলো, শাহেনশাহর কাছে যেতে হবে।

পারস্যের সীমানা ছাড়িয়ে রুমমুলুকে এসে ঘোড়াটাকে নিচে নামিয়েছিলো যাদুকর। উদ্দেশ্য ছিলো খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে পানি পান করে আবার আকাশে উড়বে। রুম ছাড়িয়ে, আরও সুদূরে, অন্য কোনও দূরদেশে পাড়ি জমাবে। কিন্তু তা আর হলো না।

কাছেই রুমের শাহেনশাহর শহর। বাদশাহ প্রতিদিন বিকালে মুক্ত বায়ু সেবন করতে আসেন এই নদীর ধারে। সে-দিনও যথারীতি উজির আমির সেনাপতি নবাব বান্দা সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। হঠাৎ তাঁর কানে ভেসে এল নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ। ভালো করে নজর করতে, বুঝতে পারলেন অনেকটা দূরে একখণ্ড সবুজ ঘাসের ওপর বসে আছে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে, আর তার পাশে এক বুড়ো। তরুণীর আর্তকণ্ঠ শুনে তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই লোকটা কোনও দুর্বৃত্ত, বদমাইশ। অসহায় অবলাকে জোর করে কোথাও নিয়ে যেতে চাইছে। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সেনাপতিদের বললেন, ঐ লোকটাকে ধরে নিয়ে এসো।

বুড়ো যাদুকর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। হঠাৎ এখানে কেউ এসে পড়তে পারে, মনে হয়নি।

—এ্যাঁ, আমাকে কেন পাকড়াও করছেন? কী করেছি আমি।

সেনাপতিরা বলে, সে কৈফিয়ৎ শাহেনশাহর কাছেই দেবে, চলো।

কিন্তু তবু যাদুকর নড়তে চায় না। সেনাপতিদ্বয় তার দুই গালে বিরাশিসিক্কার দু'খানা ঘুষি লাগাতেই বাছাধন কঁকিয়ে ওঠে, যাচ্ছি-যাচ্ছি।

বাদশাহ দেখে অবাক হয়, লোকটা কী ভয়ঙ্কর কুৎসিত কদাকার। এমন হত-কুৎসিত মানুষ তিনি জীবনে দেখেননি কখনও। আর এ-রকম অলোক সামান্যা সুন্দরী যুবতীও তিনি কমই দেখেছেন। বাদশাহ সামস্ অলকে জিজ্ঞেস করে, তোমার বাপ-মা কী নিষ্ঠুর পাষণ্ড। তোমার মতো এক অপূর্ব রূপসী মেয়েকে এই কবরের মড়া একটা বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে?

পারসী যাদুকর বলে, জাঁহাপনা, ও আমার চাচার মেয়ে, আমি ওকে শাদী করেছি।

—মিথ্যো কথা, সামস্ অল নাহার ফুঁসে ওঠে। একদম ডাহা মিথ্যে কথা, জাঁহাপনা। লোকটা মহা শয়তান, বদমাইশ যাদুকর। আমাকে ভাঁওতা দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেও আমি ওকে চিনতাম না। জীবনে কখনও দেখিনি। পারস্যের শাহজাদা আমার স্বামী। সেখান থেকে ও আমাকে ধাপ্পা দিয়ে বের করে নিয়ে এসেছে।

বাদশাহ বললেন, আমি সবই বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে এখনই দাওয়াই দিচ্ছি।

বাদশাহর হুকুমে সেনাপতিরা বেদম প্রহার করতে থাকলো যাদুকরকে। তাদের এক একটা ঘুষিতে তার হাড় পাঁজর গুঁড়ো গুড়ো হয়ে যেতে লাগলো। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে সে। কিন্তু মুখে দোষ স্বীকার করে না।

বাদশাহ বললেন, আচ্ছা এখন ওকে কারাগারে কয়েদ করে রেখে দাও। পরে আবার দেখা যাবে।

সামস্ অল নাহার এবং সেই আজব কাঠের ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ প্রাসাদে ফিরে এলেন। বাদশাহ ভেবে অবাক হন এই কাঠের ঘোড়ায় করে তারা এলো কী করে। অদ্ভুত ব্যাপার তো, মাথার মধ্যে শুধু এই একটা চিন্তাই ঘোরাফেরা করতে থাকে।

এবারে বাদশাহজাদা কামার অল আকমরের কথা শুনুন।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে মরুপ্রান্তর, নদী নালা পাহাড় বন্দর। কত সবুজ ফসলের মাঠ অতিক্রম করে, কত গ্রাম গঞ্জ পিছনে ফেলে বিরাম-বিহীনভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে থাকে সে।

রাত্রির অন্ধকার হাল্কা হতে থাকে। প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটাশতম রাত্রি ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

এইভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। দিনে দিনে মাস অতিক্রান্ত হয়। অনেক শহর গ্রাম পার হয়ে যায় সে। পথের মাঝে যাকে দেখে তাকেই জিজ্ঞেস করে, সেই আজব ঘোড়া, সেই বুড়ো যাদুকর আর এক সুন্দরী কন্যার কথা। কিন্তু কেউই তার জিজ্ঞাসার কোনও জবাব দিতে পারে না। সবাই একই কথা বলে, না তেমন কোনও ঘোড়া বা নর-নারীকে দেখেনি তারা—শোনেও নি কারো মুখে তেমন কিছু।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন সে সানা-শহরে এসে পড়ে। কামার অল ভেবেছিলো, যদি সামস্ অল এখানে ফিরে এসে থাকে। কিন্তু সানা-বাসীরা বললো, শাহজাদীর শোকে বাদশা-বেগম শয্যাশায়ী হয়ে আছে। না, তিনি ফিরে আসেন নি। ফিরলে সারা সলতানিয়ৎ আবার আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়বে না?

হতাশ মনে কামার অল আবার অন্য পথে চলতে থাকে। এইভাবে চলতে চলতে কপালক্রমে একদিন সে রুম মুলুকে এসে হাজির হয়। জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে থাকে সে। যদি কেউ কোনও সন্ধান দিতে পারে, সেই আশায়। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারে না। কেউ দেখাতে পারে না আশার আলো।

একদিন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়, কামার অল একটা সরাইখানায় এসে থামে। রাতটা সেখানেই সে কাটাবে—সেইরকম ইচ্ছা। সরাইখানার সামনের ঘরে এক দল সওদাগর গোল হয়ে বসে খানাপিনা আর গল্প-গুজব করছিলো। কামার অল তাদের কাছাকাছি একটা আসনে বসে পড়লো।

সওদাগরদের একজন বলতে থাকে, এক আজব কাহিনী শুনে এলাম। কামার অল কান খাড়া করে শোনে।

সওদাগররা সবাই উৎসকুক হয়ে তাকায়, কী এমন আজব কাহিনী ভাই সাহেব?

—আমি রুমের শহরে সওদা বিক্রি করতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরছি। সেখানকার লোকের মুখে মুখে ফিরছে শুধু একটাই কথা।

—কী কথা?

বাদশাহ নাকি একদিন নদীর ধারে এক জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলেন। সেখানে

তিনি একটা কদাকার বুড়োর সঙ্গে একটা অসাধারণ সুন্দরী রূপসী মেয়েকে ধরে এনেছেন।

সওদাগররা চুপসে গেলো, তারা ভেবেছিলো এমন কথা শোনাবে যে যাতে একেবারে তাক্ লেগে যায়। সবাই সমস্বরে বললে, এ আর এমন কী ঘটনা।

এমন কাণ্ড আজকাল আকছার হচ্ছে। কত মেয়ে কত মানুষের সঙ্গে ভেগে যাচ্ছে—তা নিয়ে আবার গল্প কী—?

সওদাগরটি বলে, আহা র'সো, আসল কথা তো এখনো বলিনি।

আবার সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকায়। সওদাগরটি বলে, ঐ বুড়োটা আর সুন্দরী মেয়েটা নাকি একটা আজব কাঠের ঘোড়ায় চেপে আসমান দিয়ে উড়ে এসে নেমেছিলো। ঘোড়াটা আর মেয়েটিকে বাদশাহ প্রাসাদে রেখে দিয়েছেন। আর বুড়োটাকে রেখেছেন কয়েদখানায়।

সওদাগরটি অনেক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রসিয়ে রসিয়ে নানা রকম রঙিন বর্ণনা সহকারে কাহিনীটা বলতে থাকে। তার বিস্তারিত বিবরণ এ কাহিনীর উদ্দেশ্য নয়।

কামার অল-এর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। এতদিন ধরে সে যার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে আজ তার হদিস্ পেয়ে মন চনমন করে ওঠে। গায়ে পড়ে সে সওদাগরটিকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা জনাব, কোন্ শহরের কথা বললেন?

—এখান থেকে কতদূর। কোন্ পথে যাওয়া যায়?

সওদাগর তখন তাকে রুমে যাওয়ার সোজা পথের নিশানা বাতলে দিলো।

আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে সে রাতেই সে বেরিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে-চলতে এক-সময় রুম শহরের প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছয়। ফটকের পাহারাদার বিদেশী কামার অলকে দেখে বলে, এখানকার নিয়ম অন্য দেশের কোনও মানুষ এ-শহরে ঢুকতে চাইলে আগে তাকে বাদশাহর দরবারে যেতে হবে। বাদশাহ যদি অনুমতি দেন তবেই সে শহরে ঢুকতে পারে।

কামার অল বলে, বেশ তো আমাকে নিয়ে চলো, তোমাদের বাদশাহর দরবারে।

কিন্তু রাত তখন অনেক। পাহারাদার বলে, এত রাতে তো বাদশাহর সঙ্গে দেখা হবে না। আজ আপনাকে এখানেই কয়েদখানায় রাত কাটাতে হবে।

কিন্তু ফটকের কোতোয়াল কামার অল-এর অদ্ভুত সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। ভাবে, আহা এমন খুবসুরৎ নওজোয়ান—একে সে কয়েদখানায় ঢোকাবে?

কোতোয়াল কামার অলকে তার নিজের ঘরে বসায়। একসঙ্গেই খানাপিনা করে। এক সময় সে জিজ্ঞেস করে, তা সাহেব, কোথা থেকে আসছেন?

—আমি পারস্য থেকে আসছি।

কোতোয়াল হেসে ওঠে, কিছু মনে করবেন না, পারসীদের সম্বন্ধে ধারণা আমাদের খুব খারাপ। শুনেছি তাদের মধ্যে ভালো লোক খুবই কমই আছে। ঠগ, জোচ্চোর, বদমাইশ, শয়তানদের সংখ্যাই নাকি বেশি। এই তো কিছুদিন আগে একটা বুড়ো পারসী এসেছে আমার এই কয়েদখানায়। অনেক পারসীকে দেখেছি, আলাপও করেছি অনেকের সঙ্গে। নানারকম মিথ্যা আজগুবি কিস্সা তারা শোনায়। কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে এই বদখদ বুড়ো কয়েদীটা। লোকটা চোখে মুখে মিথ্যে কথা বলে। এমন ঠগ শয়তান আমি জীবনে দেখিনি কখনও।

কামার অল উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী রকম? কী ধরনের মিথ্যে কথা সে বলেছে।

—লোকটা হামবড়াই। তার ধারণা সে একটা পীরপয়গম্বর। তার মতো ধন্বন্তরী

হেকিম নাকি সারা দুনিয়ায় নাই। আমাদের বাদশাহ একদিন শিকারে বেরিয়ে এক জঙ্গলের পাশে এই বুড়োটাকে দেখতে পান। লোকটা এক অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে পালাচ্ছিল। ওদের সঙ্গে একটা কাঠের ঘোড়া পাওয়া গেছে। এই কালো কাঠের ঘোড়াটা এক তাজ্জব জিনিস। কাঠের ঘোড়াটায় কল বসানো আছে। সেই কল টিপলে নাকি সে আকাশে উঠে ছুটতে থাকে। প্রাসাদেই রাখা আছে ঘোড়াটা।

কামাল জানতে চায়, আর সেই মেয়েটা?

—শুনছি, তাকে তো বাদশাহ শাদী করবেন। তার মতো সুন্দরী নাকি তামাম আরব পারস্যে দুটি নাই। বাদশাহ তার রূপের মোহে মাতাল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মেয়েটার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সব-সময় বিড়বিড় করে আপন মনেই কী সব বলতে থাকে। খায় না, নায় না। কারো সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলে না। বাদশাহ তাকে সারিয়ে তোলার জন্য দু'হাতে অকাতরে পয়সা খরচ করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে নামজাদা হেকিম বদ্যিরা আসছেন। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারছেন না। বুড়োটা সারা দিন-রাত তড়পায়, আমাকে নিয়ে চল বাদশাহর কাছে। এক লহমায় আমি তার সব রোগ সারিয়ে দেব। কিন্তু ঐ উন্মাদের কথা কে শুনবে? লোকটা রাতেও ঘুমায় না। সারারাত ধরে চেঁচামেচি চিৎকার করেই চলেছে। আমাদের এক পলক স্বস্তিতে থাকতে দেয় না ব্যাটা।

কামার অল ভাবে, যাক একটা হদিশ পাওয়া গেলো। তখন সে কী ভাবে এগুবে তারই মতলব করতে লাগলো। রাত যখন আরও গভীর হয়ে এলো তখন কোতোয়াল বললো, এবার সাহেব, আপনাকে কয়েদখানার ভিতরে ঢুকতে হবে যে।

কামার অল বলে, আমি তো প্রস্তুত। চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।

ভিতরে ঢুকেই সে একটা গোঁঙানী শুনতে পেলো। সেই বুড়ো যাদুকরটা নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বকে চলেছে।

—হায় হায় একি সর্বনাশ করলাম আমি। কেন মরতে ঐ নদীর পাশে নামতে গেলাম! অমন সুন্দর কচি ডাগর ছুঁড়িটা রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করবো আশা করেছিলাম—কিন্তু শয়তান বাদশাহটা তা হতে দিলো না। আমার বাড়াভাতে ছাই দিয়ে দিলো! একটুখানি চালের ভুলের জন্য আমার এই সর্বনাশ হয়ে গেলো। উঃ!

কামার অল আকমর কাছে সরে এসে চোস্ত পারসী ভাষায় বুড়োকে জিজ্ঞেস করে, অমন চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করছো কেন, কী হয়েছে? তোমার কী ধারণা, দুনিয়াতে একাই তুমি দুঃখী হতভাগ্য!

কামার অল-এর এই সহৃদয় সহানুভূতি পেয়ে বুড়োটা নড়ে চড়ে বসে। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে কামার অলের মুখখানা দেখতে পায় না। হয়তো বা দেখতে চায়ও না। গলাটা খাটো করে কামার অল-এর কানের কাছে সরে এসে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলতে থাকে। কী ভাবে সে মেয়েটিকে ধাপ্পা দিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল, এবং কী ভাবেই বা বাদশাহর হাতে ধরা পড়ে প্রচণ্ড প্রহার খেয়েছিলো এবং তার বিস্তারিত কাহিনী শোনালো তাকে। কানে কানে ফিস ফিস করে বললো বটে কিন্তু কয়েদখানার কোনও কয়েদীরই একাহিনী শুনতে আর বাকী নাই। যখনই কোনও নতুন কয়েদী আসে, বুড়ো ছলে ছুতোয় তার কাছে যাবেই এবং তার এই মহান্ কীর্তি-কলাপের কিস্‌সা তাকে শোনাবেই।

বুড়োর কাহিনী শুনতে শুনতে রাত কাবার হয়ে যায়।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো ঊনত্রিশতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

পরদিন সকালে কয়েদখানায় কোতোয়াল কামার অলকে বের করে বাদশাহর দরবারে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। যথাবিহিত কুর্নিশ করে বলে, এই নওজোয়ান কাল রাতে এই শহরে এসে পৌঁছয়। তাই কাল আপনার দরবারে হাজির করতে পারিনি, জাঁহাপনা। সারারাত ওকে কয়েদখানায় রেখেছিলাম। আজ সকালে হুজুরের সামনে পেশ করছি।

বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, কী তোমার নাম? কোথা থেকে আসছো? তোমার ব্যবসাই বা কীসের। আমার শহরে কেন ঢুকতে চাও?

কামার অল বলে আমার নাম হর্‌জা—শুদ্ধ পারসী শব্দ। পারস্য আমার দেশ। জাত-ব্যবসা হেকেমী। আমি দেশে-বিদেশে মানুষের রোগ সারিয়ে বেড়াই। এই আমার কাজ। যে-সব দুরারোগ্য ব্যাধি—বিশেষ করে মানসিক ব্যাধি অন্য কোনও হেকিম বদ্যি সারাতে পারে না তখনই আমার ডাক পড়ে। লোকে বলে আমি নাকি ধন্বন্তরী। আমার হাতে রুগী সারেনি—এমন একটাও হয়নি। আমার নিজের গুণ-কীর্তন আমি আদৌ পছন্দ করি না। জাঁহাপনা। দেশ-বিদেশের সুলতান বাদশাহরা সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে যে-সব মোহর ফলক উপহার দিয়েছেন সেগুলোর মালা করে গলায় ঝোলাবার সাধ্য আমার নাই। তার ওজনের ভারে আমি চলতেই পারবো না। আর তাছাড়া ওসব ভড়ং আমার পছন্দও নয়। আমাকে দুনিয়া শুদ্ধ মানুষ চেনে। খাতির করে। ওসব গলায় পরে সং সেজে কী হবে? আমি কোনও মন্তর-তন্তর পড়ে রোগ সারাই না। স্রেফ দাওয়াই দিয়েই সারিয়ে তুলি। অনেকে আছে ঝাড়ফুঁক করে, রোগীর বুকে পিঠে মুখে কিল চড় থাপ্পড় ঘুষি চালায়, চুল কান ধরে টানা হেঁচড়া করে। কিন্তু আমার ওই ফেরেব-বাজীর ব্যবসা নয়। রোগী দেখবো। রোগ ধরবো। দাওয়াই দেব। সেরে যাবে। ব্যস্, আমার ইনাম নিয়ে আমি ঘরে ফিরে যাবো। আর যদি না সারাতে পারি, একটি পয়সা নেব না। নাকে খত দিয়ে বিদেয় হবো। বান্দার এই পরিচয়, জাঁহাপনা।

বাদশাহ বাহবা দিলেন, বহুত বড়িয়া বাত। চমৎকার। তুমি যথা-সময়েই এসে পড়েছো আমার কাছে। ঠিক এই রকম একজনকেই আমি খুঁজছিলাম, হেকিম।

এরপর বাদশাহ তার বেড়াতে যাওয়ার কাহিনী দিয়ে শুরু করে বৃদ্ধকে কয়েদ করা পর্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বললো কামার অলকে। তারপর মেয়েটির মাথার গোলমাল শুরু হলে, কোন্ হাকিমকে দিয়ে কবে কবে দেখিয়েছিলেন তারও লম্বা ফিরিস্তি দেন।

—এখন তুমি যদি সত্যিই তাকে সারিয়ে তুলতে পার, তোমার কোনও ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখবো না হেকিম। যা চাইবে তাই পাবে। আমার কী মনে হয় জান, মেয়েটির রূপে পাগল হয়ে কোনও একটা জিন বা আফ্রিদি তার কাঁধে ভর করে আছে।

কামার অল বলে, আল্লাহর অপার করুণা বর্ষিত হোক; এখন আমাকে রোগের লক্ষণ-গুলো ঠিক ঠিক বলুন তো, জাঁহাপনা। কী কী উপসর্গ তার দেখেছেন? এবং কবে থেকে এরকমটা হচ্ছে।

—হচ্ছে সেই প্রথম দিন থেকেই। যেদিন তাকে আর সেই যাদুকর বুড়োটাকে এবং সেই আবলুস কাঠের ঘোড়াটাকে নিয়ে এলাম সেইদিন থেকেই সে অসুখে পড়ে।

কামার অল জিজ্ঞেস করে, সেই বুড়োটা এখন কোথায়?

—তাকে আমি এখনও কয়েদখানাতেই রেখে দিয়েছি।

—আর সেই ঘোড়াটা?

—ওটা আছে আমার খাজাঞ্চীখানায়। অমন মহামূল্য সম্পত্তি তো আর বাইরে রাখা যায় না।

—তাতো বটেই।

মনে মনে ঠিক করলো, সবকিছু করার আগে আর একবার ঘোড়াটাকে স্বচক্ষে দেখে নিতে হবে। বলা যায় না, বুড়ো শয়তানটা কোনও কারসাজী করে রেখেছে কিনা। যদি দেখি; ঘোড়াটা ঠিক আছে, তা হলে আমার বাজী মাৎ করতে বেগ পেতে হবে না। কিন্তু ঘোড়াটা যদি কোনক্রমে বিকল হয়ে থাকে, তা হলে সামস্‌কে উদ্ধার করার অন্য উপায় বের করতে হবে। বাদশাহর দিকে ফিরে কামার অল বলে, আগে আমি ঐ ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। হয়তো রোগের আসল কারণ ওর মধ্যেই নিহিত আছে।

বাদশাহ বললেন, বেশ তো, এ আর এমন কি কথা, এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি।

কামার অলকে সঙ্গে নিয়ে বাদশাহ খাজাঞ্চীখানায় চলে আসেন। কামার অল এক এক করে সব বোতাম যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখে নেয়। না, ঠিক আছে। কামার অল খুশিতে নেচে ওঠে।

—আমার মনে হচ্ছে এই ঘোড়া থেকেই তার রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। যাক, এবার আমি রুগীকে দেখবো! আমার বিশ্বাস, রোগ আমি ধরতে পেরেছি। দাওয়াই আমি নিজে হাতেই বানাবো। কিন্তু তার জন্যে রুগীর সঙ্গে এই ঘোড়াটাকে দরকার হতে পারে জাঁহাপনা।

বাদশাহ কামার অলকে নিয়ে সামস্ অল নাহারের শয্যাকক্ষে আসেন। সামস্ অল, কামার অলকে লক্ষ্য করে, তাদের দেখামাত্র তার পরণের সাজ-পোশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে থাকলো। কখনও বা হা হা হি হি করে হাসতে লাগল, আলুথালু চুল, অসংবৃত বেশবাস। কখনও সে হাততালি দেয়, গান গায়। আবার কখনও বা কপাল বুক চাপড়াতে থাকে।

কামার অল বুঝলো, এ-সবই তার চালাকী। কী করে সুলতানকে সেখান থেকে সরানো যায় তারই কায়দা খুঁজতে থাকে সে।

কামার অল সামসের কাছে এগিয়ে যায়। খুব ধীরে ধীরে বলে, দিন দুনিয়ার মালিক যিনি তারই দোয়ায় আপনার সব রোগ সেরে যাবে।

কামার অল-এর কথা শেষ হতেই সামস্ তার মুখের দিকে ফিরে তাকায়। বুকের মধ্যে এক অসহ্য আনন্দের জোয়ার ঠেলে উঠতে চায়, কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে পারে না। হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে মেজেয় লুটিয়ে পড়ে যায়।

বাদশাহ ভাবলেন, হেকিম বদ্যিদের সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে তার। কোনও মানুষকেই সে বরদাস্ত করতে পারে না, বিশেষ করে হেকিমদের একেবারে না। কামার অল সামস অলকে ওঠাবার চেষ্টা করে। কানের কাছে ফিসফিস করে বলে, সামস্ অল নাহার, আমার চোখের মণি, সোনা, ওঠো, এইভাবে জীবনটাকে বরবাদ করে দিও না। আমার দিকে চোখ মেলে তাকাও। দেখ, আমি এসেছি। আর তোমার ভাবনা কী। এতদিন কষ্ট করে আছ, আর দু একটা দিন কষ্ট করে কাটাও, আমি তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবোই, সোনা। এখন খুব সাবধানে—সতর্কভাবে চলতে হবে আমাদের। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কোন রকম সন্দেহ না করে। অনেক ধৈর্য ধরে মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ হাসিল করতে হবে। চালে একটু ভুল হলেই সব মাটি হয়ে যাবে। তা হলে আমি আর জান নিয়ে ফিরতে পারবো না। যদি আমরা এই নারী-মাংসলোভী অত্যাচারী বাদশাহর মনে একবার গভীর আস্থা এনে দিতে পারি,

তা হলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে উঠবে। এজন্যে তোমার সাহায্য সবচেয়ে বেশি দরকার। বাদশাহ পাশের ঘরেই বসে আছেন, আমি তাকে গিয়ে বলছি তোমাকে জিনে ধরেছে। সেই কারণেই তোমার মধ্যে একটা উন্মাদের ভাব দেখা গেছে। এবং এও তাকে আমি আশ্বাস দেবো, আমার চিকিৎসায় থাকলে ও নির্ঘাৎ সেরে যাবে। তুমিও—এরপর যখন বাদশাহর সঙ্গে কথা বলবে, অপেক্ষাকৃত একটু শান্তভাবে, সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো বলবে। এর ফলে বাদশাহ ভাববেন আমার চিকিৎসাতে অনেকটা ফল হয়েছে।

সামস্ অল নাহার মৃদু হেসে বলে, ঠিক আছে, দেখো কেমন পাকা অভিনয় করি। এতদিন যে পাগলী সেজে ছিলাম, কেউ কি এক বিন্দু সন্দেহ করতে পেরেছে?

শাহজাদা কামার অল পাশের ঘরে এসে বাদশাহকে বলে, জাঁহাপনা আমি একেবারে নিঃসন্দেহ, ওকে জিনে ধরেছে। আল্লাহ অনেক মেহেরবান, যথাসময়ে আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি। আর যদি ক'টা দিন দেরি হতো, বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেত সে। তবে আমি যখন এসে পড়েছি, আর কোনও ভয় নাই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারেন, শাহজাদীকে আমি নির্মুল করে সারিয়ে দেবো। আমি একটা দাওয়াই তাকে দিয়ে এলাম। ফল হাতে হাতেই বুঝবেন। যান, ও-ঘরে যান, নিজের চোখেই দেখে আসুন, ওর সঙ্গে কথা বলুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন, কতটা উপকার হয়েছে।

বাদশাহ অবাক হয়, বলো কী হেকিম? তোমার ওষুধের এত গুণ?

—আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আপনার মনের ইচ্ছা তার কাছে খুলে ধরুন। দেখবেন সে কী জবাব দেয়।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাদশাহ পাশের ঘরে ঢোকেন। বাদশাহকে দেখা মাত্র সামস্ অল নাহার যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

—বাঁদীকে যে এই অসময়ে স্মরণ করেছেন, এ জন্য আমি ধন্য হলাম, জাঁহাপনা।

রাত্রির অন্ধকার কাটে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তিরিশতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

হঠাৎ তার এই অসাধারণ পরিবর্তন দেখে বাদশাহর আনন্দ আর ধরে না। দাসী বাঁদী খোজাদের ডেকে তিনি হুকুম করেন, শিগ্গির—ওকে হামামে নিয়ে গিয়ে ভালো করে ঘষে মেজে গোসল করাও। খুব জমকালো সাজপোশাকে সাজাও। আমার প্রাসাদের খানদানী রত্নাভরণে মুড়ে দাও ওর সর্বাঙ্গ।

দাসী বাঁদী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়। সামস্ও তাদের কথার যথারীতি জবাব দেয়। ওরা ওকে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসল করিয়ে সুন্দর করে পরীর সাজে সাজায়। সত্যিই রুপের তুলনা মেলা ভার। বেহেস্তের ডানাকাটা পরীই বটে!

শাহজাদা কামার অলের প্রতি বাদশাহ অপরিসীম প্রসন্ন হয়ে ওঠেন।

—তোমাকে কী বলে সম্বোধন করবো বুঝতে পারছি না হেকিম। তুমি সামান্য এক চিকিৎসক নও, তোমার ভিতরে যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে তা কেবলমাত্র পীর পয়গম্বরদেরই থাকতে পারে। তুমি এক বিরাট দার্শনিক—একথা বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। অনেকদিন পরে আজ আমার এবং তার মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছে সে তো শুধু তোমারই কল্যাণে। আল্লাহ তোমাকে চিরায়ু করে রাখুন। দুনিয়ার অনেক মানুষের দুঃখ মোচন করতে পারবে তুমি।

কামার অল বললো, জাঁহাপনা আপনি আর দেরি করবেন না। লোক লস্কর দাস দাসীসহ শাহজাদীকে সঙ্গে নিয়ে আপনি আজই কোনও স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশে চলুন। সেখানেই আমি চিকিৎসার শেষ পর্ব শুরু করবো। ঐ কাঠের ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিতে হবে। ওটা আসলে কিন্তু কাঠের ঘোড়া নয়, রোগের আসল উৎপত্তিই ওখানে। ওই হচ্ছে জীনের বাহন। এ অবস্থায় এখানে এই প্রাসাদে থেকে ঐ জীনকে একে বারে তাড়ানো শক্ত হবে। আপাততঃ সে হয়তো শাহজাদীকে ছেড়ে প্রাসাদের কোনও কক্ষে লুকিয়ে থাকবে। তারপর আমি ফিরে এলেই আবার এসে ভর করবে তার ওপর। সেই কারণে আমার পরামর্শ, ঘোড়াটাকেও সঙ্গে নিতে হবে। ফাঁকা জায়গায় তাকে আমি কব্জায় আনতে পারবো। হয়তো কিছু সময় লাগবে, কিন্তু আমি যখন তাকে পুরোপুরি হাতের মুঠোয় আনতে পারবো তখনই তাকে জালার মধ্যে পুরে দরিয়ার জলে ফেলে দেবো।

রুম অধিপতি সেইদিনই রওনা হয়ে গেলেন। অনেক লোকলস্কর দাসদাসী সঙ্গে নিলেন। কামার অল-এর কথামতো কাঠের ঘোড়াটাও বয়ে নিয়ে চললো বাহকরা।

এক পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম পরিবেশে তাঁবু ফেলা হলো। কামার অল বাদশাহকে বললো, কাল সকালে আমি শাহজাদীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চাপবো। জীনের সঙ্গে তখনই হবে আমার বোঝাপড়া। সে আমাকে খতম করার কায়দা করবে। কিন্তু আমাকে ঘায়েল করার সাধ্য জীনের হবে না। প্রথমে খুব দাপাদাপি করবে, কিন্তু আমি তাকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরবো, কিছুতেই পালাতে পারবে না। একটা কথা, জাঁহাপনা, আপনি বা আপনার সৈন্যসামন্ত, লোকজন কেউ যেন ওই জীনের নজরবন্দীর আঁওতায় যাবেন না। তা হলে সে হয়তো তখন শাহজাদীকে ছেড়ে আপনার অথবা অন্য কাউকে ভর করতে পারে। আমি যখন ওকে পুরোপুরি ভাবে কব্জায় আনতে পারবো, তখন আপনাকে কাছে ডাকবো। তার আগে—আপনারা অনেকটা দূরে দূরে থাকবেন।

বাদশাহ বললো, কতটা দূরে কোথায় আমরা থাকবো, তুমি বলে দেবে। তার এক পা এদিক ওদিক যাবো না কেউ।

পরদিন সকালে তাঁবু থেকে ক্রোশখানেক দূরে কাঠের ঘোড়াটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। কামার অল একটা জায়গা দেখিয়ে বাদশাহকে বললো, আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন, জাঁহাপনা। আপনার সৈন্যসামন্ত লোকজনদের বলুন, তারা যেন এখান থেকে সামনের দিকে এগিয়ে না যায়। আমি শাহজাদীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়াটার কাছে যাচ্ছি। শাহজাদীকে দেখে জীনটা হয়তো খানিকটা বেগড়বাই করতে পারে। হয়তো সে ছুটে এসে আপনার সেনাদেরও ঘায়েল করার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু তাতে ভয় পাওয়ার কিছুই নাই। আমি ওকে সামলে নেব।

বাদশাহর বুক দুরু দুরু করতে থাকে। যদি জীনটা হেকিমকে হারিয়ে দিয়ে ওকে মেরে ফেলে! তা হলে তো সে আর শাহজাদীকে ছেড়ে যাবে না! আবার এও ভাবে, হেকিমের যা হিম্মৎ—তার সঙ্গে জীনটা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না। নির্ঘাৎ সে ঐ জীনটার জান খতম করতে পারবে।

অনেক দূরে একটা ফাঁকা প্রান্তরে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কামার অল আর শাহজাদী হাঁটতে হাঁটতে একসময় তার কাছে এসে দাঁড়ালো। কামার অল দেখে নিলো, সেখান থেকে বাদশাহ আর তার সৈন্যবাহিনীকে দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নজর করলে তবে বোঝা যায় অনেক দূরে একদল মানুষ নিশ্চল পাথরের মতো

দাঁড়িয়ে আছে। কামার অল প্রথমে সামস্ অলকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিলো, তারপর নিজে লাফিয়ে উঠে তার সামনে বসলো।

—সামস্ অল, আমার বগলের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আমার কাঁধ দু'খানা বেশ শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকো। আমি এক্ষুনি বোতাম টিপবো।

সামস্ বলে, ঠিক আছে, তুমি চালাও।

তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটা একবার নড়ে চড়ে ওঠে। তারপর শোঁ শোঁ করে আকাশের দিকে উঠে যেতে থাকে।

বাদশাহ দূর থেকে আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিল, ঘোড়াটা শূন্যে উঠে যাচ্ছে। তখনও তাঁর মনে অণুমাত্র সন্দেহ জাগেনি। হেকিমের ওপর অগাধ বিশ্বাস এবং আস্থা তাঁর। তিনি ভাবলেন, জীন হয়তো তাকে ঘায়েল করার কসরৎ করছে। কিন্তু সে তো পারবে না, এখুনি হেকিম তাকে শায়েস্তা করে ফেলবে।

ঘোড়াটা ততক্ষণে মহাশূন্যে সুদুর নীলিমায় বিলীন হয়ে গেছে। আর কিছুই দেখা যায় না। তখনও বাদশাহ ভাবলেন, হেকিম নিশ্চয়ই এখনই তাকে আবার মাটিতে এনে ফেলবে।

প্রধান সেনাপতি বললো, কিন্তু ফেরার তো কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, জাঁহাপনা।

বাদশাহ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেন, সবুর কর সেনাপতি, এবার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে। এখুনি বাছাধন জীনের কী দশা হয়, দেখতে পাবে। ওখানে যে পেল্লাই একটা তামার জালা দেখছো, ঐ জালায় তাকে ভরা হবে।

কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর এবং দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো, তখনও ঘোড়াটা ফিরে এলো না দেখে বাদশাহ চিন্তিত হলেন।

—তাইতো, ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না!

সেনাপতি বললো, আমার কিন্তু গোড়া থেকেই কেমন সন্দেহ হয়েছিলো জাঁহাপনা। কিন্তু আপনার মুখের সামনে সাহস করে বলতে পারিনি তখন। এই হেকিম লোকটা আসলে একটা ঠগ। ও আপনাকে ধোঁকা দিয়ে শাহজাদীকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

বাদশাহ আঁৎকে উঠলেন, এ্যাঁ, বলো কী? এখন কী করা যায়।

সেনাপতি বলে, এখন হা-হুতাশ ছাড়া করার আর কিছুই নাই, জাঁহাপনা। পাখী পালিয়েছে।

বাদশাহ ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো, এ সবই সেই কদাকার বুড়োটার কারসাজী। গর্জে উঠলেন তিনি, ওই শয়তানটাকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো আমার সামনে।

তখুনি বাদশাহ প্রাসাদে ফিরে গেলেন। বুড়ো যাদুকরকে হাজির করা হলো সেখানে। বাদশাহ হুঙ্কার ছাড়লেন, এ্যাই ব্যাটা বাঁদর, বল, কেন তুই আমার কাছে গোপন করে রেখেছিস্—ঘোড়াটা আসলে একটা জীন? হায় হায়, হেকিমটা শাহজাদীকে সারিয়ে তুললো, কিন্তু তা আর আমার কপালে জুটলো না। না-জানি ওদের কী হলো? আমার অতগুলো মহা মূল্যবান রত্নালঙ্কার পরিয়েছিলাম শাহজাদীকে—সবই খোয়া গেলো শুধু তোর জন্য? আমি তোর গর্দান নেব, শয়তান। সেই তোর উপযুক্ত সাজা।

বাদশাহর হুকুমে তখুনি ঘাতকের খাড়ার ঘায়ে পারসী যাদুকরের ধড় মুণ্ডু আলাদা হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

এবার কামার অল আর সামস্ অল-এর কথা শুনুন ঃ

বোতাম টিপতেই নিমেষে ঘোড়াটা আকাশের ওপরে উঠে গেলো। কামার অল আর একটা বোতাম টিপে তীরবেগে চলে এলো পারস্যে তার নিজের শহরের উপরে। তারপর নেমে পড়লো তার প্রাসাদের ছাদে।

পুত্রকে আবার ফিরে পেয়ে বাদশাহ সব শোক তাপ ভুলে গেলেন। আবার প্রাসাদ ভরে উঠলো হাসি আর গানে। সানার শাহজাদী সামস্ অল নাহারকে সাদরে তিনি বরণ করে নিলেন। খানা-পিনা দান-ধানের মহোৎসব আরম্ভ হয়ে গেলো।

ভবিষ্যতে আর যাতে মনের শান্তি ব্যাহত না হতে পারে সেজন্য বাদশাহ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে হুকুম দিয়ে সেই আবলুস কাঠের কালো ঘোড়াটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। তার কলকব্জা যন্ত্রপাতি সব দরিয়ায় জলে ফেলে দেওয়া হলো।

প্রভাত আগত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো বত্রিশতম রজনীতে আবার সে শুরু করলো ঃ

কামার অল সানার সুলতানকে একখানা খৎ লিখে পাঠালো। চিঠিতে তার দুঃসাহসিক অভিযানের সব কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলো সে। আরও লিখলো শাহজাদী সামস্ অল নাহারকে সে শাদী করে তার বেগম করেছে। তিনি যেন কোনও দুশ্চিন্তা না করেন। চিঠির সঙ্গে নানা মূল্যবান উপহার উপঢৌকন সঙ্গে দিয়ে দূত পাঠালো সে সানায়।

সানার সুলতান কন্যার খবর পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কামার অল-এর পাঠানো উপহার সামগ্রী গ্রহণ করে জামাতাকেও অনুরূপ উপহার পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

কামার অল-এর মনে আশঙ্কা ছিলো, হয়তো সামস্ অলের বাবা তাকে ক্ষমার চোখে দেখবেন না। হয়তো তিনি তার উপহার প্রত্যাখ্যান করে ফেরৎ পাঠাবেন। কিন্তু দূত যখন ফিরে বললো, তিনি খুব খুশি হয়েছেন তখন কামার অল এবং সামস্-এর মন আনন্দে নেচে উঠলো।

সেই থেকে যতদিন সানার সুলতান জীবিত ছিলেন ফি বছর নানা নতুন নতুন উপহার উপঢৌকন পাঠিয়েছিলো কামার অল। তার বাবা বাদশাহ একদিন দেহ রাখলেন। কামার অল সারা পারস্য মুলুকের শাহেনশাহ হলো। সানার নতুন সুলতানের সঙ্গে ছোট বোনের শাদী দিয়ে দিয়েছিলেন কামার অল আকমর।

কামার অল-এর আসনকালে প্রজারা সুখে স্বচ্ছেন্দে দিন কাটিয়েছিলো। তার ন্যায় বিচার এবং সুশাসন প্রজাদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিলো। বাদশাহ কামার অলকে তারা প্রাণাধিক ভালোবেসেছিলো। এইভাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিপুল গৌরবে স্বদেশ রক্ষা এবং প্রজাপালন করে সময় কালে সে দেহ রক্ষা করেছিলো। তার প্রাণাধিক প্রিয় বেগম সামস্ অল নাহারেরও ইন্তেকাল হলে, তার মরদেহও কামার অল আকমরের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়েছিলো।

শাহেন শাহ কামার অল আকমরের গুণগাথা আজও মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। মহৎ মানুষের কখনই বিনাশ হয় না। মরেও সে মানুষের অন্তরে অমর হয়ে থাকে।

উজির-কন্যা শাহরাজাদ কাহিনী শেষ করে থামলে, সুলতান শারিয়ার তারিফ করে বললো, দারুণ কিস্সা শোনালে শাহরাজাদ! কালো কাঠের অদ্ভুত ঐ ঘোড়াটাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। জানতে ইচ্ছে করে, কীভাবে তৈরি করা হয়েছিলো তাকে। আজকের দিনে কী এমন কোনও কারিগর নাই, যে তৈরি করে দিতে পারে ঐ রকম একটা উড়ন্ত-যান।

শাহরাজাদ বলে, ঘোড়াটা যদি না ভেঙ্গে দিতেন বাদশাহ সাবুর তা হলে আমার মনে হয়, আজকের মানুষ ওটা দেখে আরও অনেক উড়ন্ত ঘোড়া তৈরি করতে পারতো। কিন্তু তার আর আশা নাই।

হতাশ কণ্ঠে শাহরিয়ার বলে, ঘোড়াটা যখন বাদশাহ সাবুর ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন, বড় আঘাত পেয়েছিলাম মনে। সেই থেকে বড্ড খারাপ লাগছে।

শাহরাজাদ বলে, আপনার খোস-মেজাজ যাতে আবার ফিরে আসে তার জন্যে এবারে একটা অন্য ধরনের মজার কিস্সা শুনুন, জাঁহাপনা। এ কাহিনী শুনতে শুনতে এমনি নেশায় মশগুল হয়ে যাবেন আপনি যে, মনে আর কোনও আক্ষেপ হতাশা থাকবে না।

ডিলাইলাহ নামে এক ধূর্ত বুড়ি আর জাইনাব নামে এক মেয়েছেলের ঠগের কাহিনী।

শাহরিয়ার বলে, বলো বলো, শুনি। এই সব কিস্সা শুনতে আমার দারুণ মজা লাগে।

খলিফা হারুণ অল রসিদের সময়ে বাগদাদ শহরে আহমদ্ এবং হাসান নামে দুই মহা ধড়িবাজ চোর -কূল-শিরোমণি বাস করতো। চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা—সেই বিদ্যায় তারা দু'জনেই মহা ওস্তাদ। তাদের কায়দা কৌশল বড়ই বিচিত্র; অদ্ভুত। চুরি করার নিত্য নতুন অভিনব ফন্দী তাদের মাথায় গজাতো। তাদের লোক ঠকানো, প্রতারণা, জালিয়াতির বহু বিচিত্র কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে—আজও।

খলিফা ভাবলেন, এই চোর দুটোকে কিছুতেই হাতে-নাতে ধরা যাচ্ছে না। এমনই তাদের কায়দা কৌশল এবং প্রখর বুদ্ধি যে, আইনের ফাঁক দিয়ে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যায় প্রতিবারই।

অবশেষে তিনি ঠিক করলেন, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। তাই, আহমদ আর হাসানকে ডেকে খলিফা তাদের দু'জনকে কোতোয়ালের দুই প্রধান পদে বহাল করলেন। শহর রক্ষার ভার পড়লো দুই চোরের হাতে। খলিফা বললেন, আমার শহরের সব চোর বদমাইশদের খুঁজে বের করতে হবে। আমি চাই আমার প্রজারা নিশ্চিন্তে ঘুমাক। তাদের বিষয় সম্পত্তি যাতে খোয়া না যায়, তার পুরো দায় তোমাদের দুজনের ওপর।

খলিফা দু'জনকে মূল্যবান সাজ-পোশাক এবং প্রতিমাসে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বেতনের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রত্যেকের চল্লিশজন করে ঘোড়সওয়ার সিপাই এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের বরাদ্দ করা হলো। আহমদের ওপর ন্যস্ত হলে স্থলের শান্তি ও সুরক্ষার দায়িত্ব। আর হাসান পেল জলপথের ভার।

সেইদিনই তারা দুজন কোতোয়াল খালিদকে সঙ্গে করে শহর পরিক্রমায় বের হলো। তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললো চল্লিশ চল্লিশ আশিটি ঘোড়সওয়ার সিপাই। কোতোয়াল পথে পথে ঘুরে ঘোষণা করলো, আজ থেকে মহামান্য খলিফার আদেশে আহমদ আর হাসানকে স্থল ও জল কোতোয়ালের দুই প্রধান পদে বহাল করেছেন। শহরবাসীরা শুনুন, আপনাদের ধন-সম্পদের নিরাপত্তার জন্য আজ থেকে এরা দু'জন প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। যদি কখনও কারো কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় এদের সঙ্গে মোলাকাৎ করবেন। এরা আপনাদের সেবা করতে পারলে কৃতার্থ মনে করবেন।

এই সময়ে বাগদাদ শহরে এক ধূর্ত বুড়ী ডিলাইলাহ আর তার প্রতারক মেয়ে জাইনাব বাস করতো। ডিলাইলাহর দুটি মেয়ে। বড়টির সে শাদী দিয়েছে। কিন্তু ছোটটি বিয়ে বা শাদী কিছু করেনি। নানা ছলা-কলায় লোক ঠকানোই তার একমাত্র ব্যবসা। এই মা-মেয়ের কুখ্যাতি সারা শহরের প্রতিটি মানুষই জানতো।

এরপর তৃতীয় খণ্ডে

৩

সময় এক আরব্য রজনী

সৌম্য

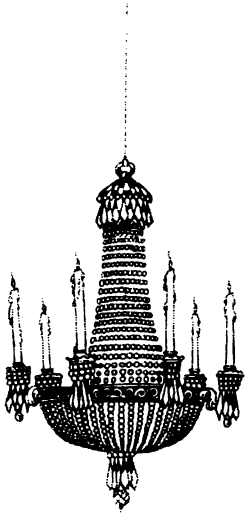

সহস্র এক আরব রজনী

কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

মৌসুমী প্রকাশনী ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

ডঃ জে. সি. মারদ্রুস

সহস্র এক আরব রজনী

অসংক্ষেপিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

তৃতীয় খণ্ড

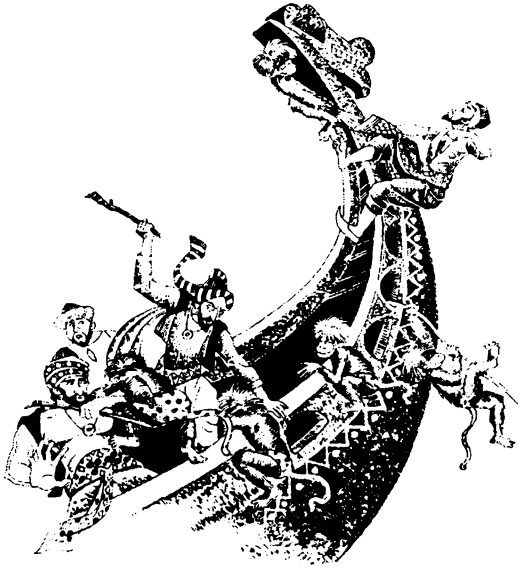

ভাষান্তর : ক্ষিতীশ সরকার

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সত্য চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ
১লা অক্টোবর, ১৯৮২

পরিমার্জিত শোভন সংস্করণ
জুন, ২০১১

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯
কম্পোজ
বর্ণায়ন
৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
মুদ্রক
পপুলার এন্টারপ্রাইজ
৩৫এ/৩ বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কল-৬৭

দাম : ২০০ টাকা

ডিলাইলাহর স্বামী সে সময়ে একজন বেশ নামজাদা মানুষ ছিলো। খলিফার সারা মুলুকে সে চিড়িয়া সরবরাহ করতো, এই কারণে খলিফা তাকে খুব খাতির করতেন। সে সময়ে বাগদাদের সম্ভ্রান্ত সমাজে তার বেশ নাম ডাক ছিলো। কিন্তু সে সবই অতীত স্মৃতি। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব প্রতিপত্তিও মুছে যেতে দেরি হলো না। কালক্রমে মানুষ একেবারেই বিস্মৃত হলো তাকে। মরার সময় সে তার দুই কন্যা আর বিবিকে রেখে গিয়েছিলো। আজ তার বিধবা বিবি ডিলাইলাহ এবং ছোট মেয়ে জাইনাব লোক ঠকিয়ে, প্রতারণা করে দিন কাটায়। জাইনাবের মতো শয়তান মেয়েছেলে খুব কম দেখা যায়। তার শিরায় শিরায় বদবুদ্ধি। সাপের মতো সে হিংস্র। ছলে বলে কৌশলে যেন তেন প্রকারণে সে তার অভীষ্ট সিদ্ধ করবেই করবে। যদি কারো পিছনে লাগে, তা সে যদি সাক্ষাৎ শয়তানও হয়, তার কোনও ভাবেই নিস্তার পাওয়ার জো নাই। তাকে সে সমুচিত শিক্ষা দেবেই—এই তার পণ।

কোতোয়াল যখন আহমদ আর হাসানকে নিয়ে তাদের দপ্তরের ফরমান জারি করে বেড়াচ্ছিল, সেই সময় বুড়ি ডিলাইলাহ আর তার মেয়ে জাইনাব জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করলো সব। জাইনাব বলে, জান মা এই আহমদ লোকটা কে? একটা নাম-করা দাগী আসামী। অন্য এক দেশ থেকে পালিয়ে এখানে এসে ঢুকেছে। ওর কীর্তি-কলাপ আমি সবই জানি। ওর স্বদেশ মিশর। সেখানকার কোতোয়াল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। এখানে আসার পর সে যে ধরনের চুরি, প্রতারণা জালিয়াতি চালিয়েছিলো তাতে খলিফাও চিন্তায় পড়েছিলেন। হালে পানি না পেয়ে তিনি চোরকেই বহাল করেছেন চুরি রাহাজানি বন্ধ করতে। আর ঐ হাসানটা তার দোসর। ওরা দু'জনে আজ খলিফার ডান হাত আর বাঁ হাত। খলিফার প্রাসাদে তাদের জন্যে এখন পাতা পড়ে। তোফা আছে বটে—চল্লিশটা করে সাগরেদ, হাজার দিনার মাসোহারা, তা ছাড়া কত কী ইনাম উপহার নিত্য জুটছে। আর আমরা কী কষ্টে কাল কাটাচ্ছি, দেখ মা। খলিফার প্রাণে এতটুকু দয়া মায়া নাই। অথচ বাবা যখন বেঁচেছিলো, কি খাতির না করতেন খলিফা। বাবাকে কত ইনাম উপহার দিতেন। বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে গেছেন তিনি। অবাক দুনিয়া। এখন আমাদের কী ভাবে দিন কাটছে, খেতে পরতে পাচ্ছি কি পাচ্ছি না, একটিবার খোঁজ খবরও করেন না।

বুড়ি ডিলাইলাহ মাথা দুলিয়ে বলে, খোদাতালা মাথার ওপরে আছেন। তিনি সবই দেখছেন। তবে দুনিয়াতে কৃতজ্ঞ লোকের সংখ্যা খুবই কম। এই-ই জগতের নিয়ম। এই রকমই হয়! ও নিয়ে মন খারাপ করিস না।

জাইনাব ক্ষেপে ওঠে, না মা এ সব মুখ বুজে আর বরদাস্ত করা সম্ভব না। একবার তুমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াও দেখি। তোমার ছল-চাতুরীর কাছে ওরা সব নস্যি। তোমার জালিয়াতির জাল একবার মেলে ধরো তো। খলিফার থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে হবে। এমনভাবে লোক ঠকানোর ফন্দী ফাঁদবে, যা শুনে খলিফার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে! তখন বুঝবেন তিনি, কত ধানে কত চাল। তোমার শয়তানী বুদ্ধির বহর দেখে তিনি তাজ্জব বনে যাবেন। তখন দেখে নিও, খলিফার টনক নড়বে। তোমাকেও তাঁর দরবারে ভালো চাকরীতে বহাল করতে বাধ্য হবেন তিনি।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তেত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

ডিলাইলাহ কন্যার কথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এই আমি আমার মাথার বেণী ধরে কসম খাচ্ছি, জাইনাব, এমন শয়তানীর চাল আমি চালবো—এক চালেই বাজী মাৎ হয়ে যাবে। বাছাধন আহমদ আর হাসান হালে পানি পাবে না।

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে তখুনি সে উঠে পড়ে কাজে লেগে গেলো।

এক সুফী দরবেশের মতো করে লম্বা গেরুয়ার আলখাল্লা পরলো সে। তার উপরে চাপালো একখানা জবর জং বোরখা। গলায় পরলো নানা রঙের রকমারী পুতির একখানা মালা। রেশমী সুতোয় বেঁধে জলে ভরে একটা বদনা ঝুলিয়ে নিলো গলায়। তার মধ্যে তিনটি সোনার দিনার রেখে বদনার মুখে এক গোছা খেজুরের ছোবড়া গুঁজে দিলো। নানারকম আকার এবং ওজনের অনেকগুলো ধাতব চাকতি আর মড়ার খুলী দিয়ে গাঁথা বিদঘুটে বিচিত্র আজানু এক জগঝম্প মালা গলায় ধারণ করলো সে। তার সাকুল্যে ওজন হবে এক আঁটি জ্বালানী কাঠের সমান। যুবতীরা যে ধরনের নিশান নিয়ে চলে সেই রকম লাল হলদে আর সবুজের ডোরাকাটা একখানা নিশান নিলো এক হাতে।

এই কিম্ভূত কিমাকার এক ছদ্মবেশ ধারণ করে সে পথে নামলো। জোর চিৎকার করে আওয়াজ তুলতে থাকলো, আল্লাহ—আল্লাহ। মাঝে মাঝে সে নানারকম প্রার্থনার বুলি কপচাতে থাকে। এক কথায় প্রথম দর্শনে সবাইকে আঁৎকে উঠতে হবে—এমন তার সাজ-পোশাক, চাল-চলন এবং গলার বিচিত্র আওয়াজ।

সারাটা শহর এইভাবে সে চলতে চলতে এক সময় এক গলির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বিশাল একখানা শ্বেত পাথরের ইমারত—তার সদর ফটকে সুসজ্জিত এক মুর প্রহরী। বিরাট দরজার চৌকাঠ আর পাল্লা আগাগোড়া সুগন্ধী চন্দন কাঠে তৈরি। সুন্দর সুন্দর নানারকম কাজ করা পিতলের বলয় বসানো। বড় বাহারী দেখতে।

বাড়িখানা খলিফার দেহরক্ষী মুসতাফার। লোকটা ভীষণ ভয়ঙ্কর। লোকে বলে বাঘ। কথার আগে তার ঘুষি চলে। একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে শাদী করে সুখে দিন কাটাচ্ছে। নিজের ঘরের বিবি ছাড়া পর-নারীর দিকে তার কদাচ নজর নাই। কোনও দিনই সে বাড়ির বাইরে রাত কাটায় না। কিন্তু তার এমনই নসীব, রোজ রাতে বিবির সঙ্গে সহবাস করেও এযাবৎ একটা সন্তান পয়দা করতে পারেনি সে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মাথার সাদা চুলের দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকায়। দিনে দিনে বয়স বাড়ছে। বুড়ো হতে আর বেশি দেরি নাই। অথচ আজও তার একটি ছেলে পুলে কিছু হলো না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ কি তাকে এই রকম নিঃসন্তান করেই রাখবেন? মনটা কেমন যেন বিষিয়ে ওঠে। এই সময় তার বিবি এসে দাঁড়ায় সামনে। এক সময়ে প্রাণের-পিয়ারী এই বাঁজা মেয়েমানুষটাকে দেখে আজকাল তার পিত্ত জ্বলে খায়। তার ধারণা তারই দোষে সে আজ সন্তান-সুখ বঞ্চিত। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ঝাঁঝালো গলায় চিৎকার করে ওঠে, এখানে কী? কেন এসেছিস্ আমার সামনে, হতচ্ছাড়া অপয়া কোথাকার! যেদিন থেকে তুই আমার ঘরে এসেছিস সেইদিন থেকে আমার সব সুখ শান্তি উবে গেছে। যা ভাগ, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

মেয়েটি অবাক হয়ে বলে, সে কি আমার দোষে?

—আলবৎ তোর দোষে। প্রথম শাদীর রাতে, মনে পড়ে? আমাকে দিয়ে হলফ করিয়ে নিয়েছিলি, জীবনে আমি যেন অন্য মেয়েকে ঘরে না আনি, মনে পড়ে? আমি তো আমার কথা রেখেছি। কিন্তু তাতে লাভটা কী হলো? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকতে বসেছে, আজ পর্যন্ত একটা বাচ্চা বিয়োতে পারলি না! দরবারের যত দেওয়ান আমির সবাইকেই

দেখছি—কী সুন্দর সুন্দর ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েছে তারা। আর আমি? দুনিয়ার অযাত্রা একটা অপুত্রক হয়ে হা-হুতাশ করে মরছি। এ সংসারে যে বংশরক্ষা করে যেতে পারে না সে তো সমাজের পতিত ঘৃণ্য জীব। আমাকে সেই অখ্যাতি মাথায় বয়ে বাঁচতে হচ্ছে। এর চাইতে জহর খেয়ে মরাও অনেক ভালো। দুঃখ বল আর রাগই বল, সবই আমার শুধু এই একটা কারণে। তুই একটা বাঁজা-বেহদ্দ মেয়েমানুষ; আমার সারা জীবনের বীর্যপাতই বিফলে গেলো।

স্বামীর এই ধরনের দোষারোপে মুহূর্তে মধ্যে মুখ নীলবর্ণ হয়ে গেলো তার।

—মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। আমার একবিন্দু দোষ নাই। সন্তান ধারণের সব ক্ষমতাই আমার আছে। আসলে তোমারই মরা বীর্য।

মুসতাফা বলে, ঠিক আছে, প্রমাণ আমি করে দিচ্ছি। আজই আমি আর একটা শাদী করে ঘরে অন্য এক মেয়েছেলে নিয়ে আসছি। তারপর যথাসময়ে প্রমাণ করে দেবো, আমার বীর্য মরা, না জ্যান্ত।

বৌটা বললো, আমার নসীবে যা লেখা আছে তা তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না। সতীনের সঙ্গে যদি ঘর করা কপালে থাকে, তাই হবে।

এই বলে কাঁদতে কাঁদতে সে সে-ঘর ছেড়ে চলে গেলো। কিন্তু মুসতাফা কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর অনুতাপের আগুনের দগ্ধ হতে থাকলো সে। বারবার মনে হতে লাগলো, মানুষটাকে অত শক্ত শক্ত কথা না বললেই বুঝি ভালো হতো।

এতক্ষণ আপনারা বাড়িটার ভিতরের কিছু ঘটনা শুনলেন। এবার শুনুন, ধূর্ত বুড়ি ডিলাইলাহর কথা।

ডিলাইলাহ জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো আমীরের বিবি বিষণ্ন বদনে বসে বসে কী যেন চিন্তা করছে। তার গা ভর্তি গহনা; পরণে মূল্যবান সাজপোশাক। ডিলাইলাহ আড়চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখে নেয়। নিজের মনে মনেই বলে, শোনো ও ডিলাইলাহ, এই তোমার সুবর্ণ সুযোগ। এবার তোমার ঝুলি থেকে বুদ্ধির প্যাঁচ-পয়জার বের করে কাজে লাগাও। মেয়েটাকে ঘরের বাইরে বের করে নিয়ে গিয়ে তার গায়ের গহনাপত্র এবং সাজপোশাক যদি তুমি খুলে নিতে পারো তবেই বুঝবো তোমার কেরামতি।

ডিলাইলাহ হঠাৎ উচ্চৈস্বরে আল্লাহ—আল্লাহ করতে থাকে। আশেপাশের বাড়ির জানলার পর্দা সরে যায়। বাড়ির মেয়েরা উৎসুক হয়ে দেখতে থাকে। এক সুফী দরবেশ এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বুড়ির দোয়া মাগে।

. মুসতাফার বিবি ভাবে, আল্লাহ বুঝি মুখ তুলে চেয়েছেন, তাই বোধহয় তিনি আমারই জন্য একে এখানে পাঠিয়েছেন। একটা বাঁদীকে ডেকে বলে, যা তো দরজার পাহারাদার আবু আলীকে একটু তোয়াজ করে বল গিয়ে যে, আমি ঐ বুড়ি মার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই! সে যেন মেহেরবানী করে তাঁকে ভিতরে আসতে দেয় একবার। আমি তার দোয়া নেবো।

বাঁদীটা ছুটে আসে পাহারাদার আবু আলীর কাছে। বলে, ও আবু আলী ভাই, মালকিন খাতুন আপনাকে অনুরোধ করছেন, এই বুড়ি মাকে যদি তুমি একটিবারের জন্য ভিতরে ঢুকতে দাও। তিনি তার আশীর্বাদ নিতে চান।

দ্বাররক্ষী আবু আলী বুড়ির কাছে গিয়ে তার হাতে চুম্বন করতে যায়। কিন্তু বুড়ি নাক সিটকে দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, আমাকে ছুঁয়ো না। ঠিক মতো রুজু করে নামাজ করো না তুমি। তফাৎ যাও—আল্লাহ যেন তোমাকে এই গোলামী থেকে মুক্তি দেন, এই প্রার্থনা করি। তফাৎ যাও—। তবে শোনো ও আবু আলী, তুমি

আল্লাহর সুপুত্র। আজ নসীবের ফেরে তোমাকে এই খারাপ কাজ করতে হচ্ছে। তুমি সদাই তার নামগান কর। দেখবে, সব দুঃখ ঘুচে যাবে। মনে শান্তি পাবে।

আবু আলী হাত পেতে বললো, মা জননী, আপনার ঐ পানি আমাকে একটুখানি দিন।

বুড়িটা বদনার মুখ থেকে খেজুরের ছোবড়াগুলো টেনে বের করে। হঠাৎ ঝন ঝন আওয়াজ তুলে সেই দিনার তিনখানা নিচে পড়ে যায়। এমন একটা ভাব দেখালো সে, যেন আল্লাহর আশীর্বাদে—আসমান থেকে পড়লো।

তাড়াতাড়ি আবু আলী দিনারগুলো কুড়িয়ে তুলে ভাবে, এ তো যে সে পীর নয়। একেবারে সাক্ষাৎ আল্লাহর দূত। কে জানে কী অলৌকিক ক্ষমতাধারিণী সে। আবু আলী দিনার তিনটে ফেরৎ দিতে যায়, এই নিন মা, আপনার হাত থেকে বোধ হয়ে পড়ে গেলো।

—পয়সা? পয়সা কড়ি নিয়ে কী করবো আমি? এই সব তুচ্ছ পার্থিব সম্পদে আমার কোনও প্রয়োজন নাই, বাছা। ওতে আমার মন ভরে না। আমি চাই এমন অমূল্য বস্তু, যা পয়সা কড়ি দিয়ে কেনা যায় না। তার নাম খোদাতালার মহব্বৎ। ওগুলো তোমার কাছেই রেখে দাও, কাজে লাগবে।

আবু আলী মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সব যেন কেমন গোল পাকিয়ে যায়।

খাতুনের বাঁদী ডিলাইলাহকে পথ দেখিয়ে বাড়ির অন্দরে নিয়ে যায়। বুড়ি দেখে অবাক হয়। এমন রূপবতী নারী সে কমই দেখেছে। খাতুন সত্যিই অসামান্যা সুন্দরী।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চৌত্রিশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু করে ঃ

সুন্দরী খাতুন বুড়ির পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

বুড়ি বলে, আহা ষাট বাছা, উঠে বসো। আল্লাহ আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে, আমাকে তোমার দরকার। কিছু বলবে?

খাতুন বুড়িকে খুশি করবে কি ভাবে ভেবে পায় না। শরবৎ, ফল এনে সামনে ধরে। কিন্তু বুড়ি বলে, আমি তো কিছু খাবো না বাছা। আমার রোজা চলছে! সারা বছর ধরে চলে আমার রোজা। মাত্র পাঁচটা দিন বাদে। ও সব থাক, এখন বলো মা, কী তোমার দুঃখ। কী তুমি আমাকে বলতে চাও, নির্ভয়ে বলো। আমি তাঁর নির্দেশেই তোমার কাছে এসেছি। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার দুঃখ মোচন করতে।

খাতুন বলতে থাকে, শাদীর প্রথম রাতে আমি আমার স্বামীকে শপথ করিয়েছিলাম, জীবনে সে আর দ্বিতীয় বিবি ঘরে আনবে না। আজ পর্যন্ত কথার খেলাপ সে করেনি। আমরাও যথারীতি প্রতি রাত্রে সহবাস করে আসছি। কিন্তু খোদা মুখ তুলে চাইলেন না। আমাদের কোনও বাল-বাচ্চা হলো না। আমার স্বামী দারুণ দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। অন্য পাঁচজনের ছেলেপুলে দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না। আজ আমাকে সাফ সে বলে দিয়েছে, অন্য একটা শাদী করবে। কিন্তু মা, আমার কী দোষ, সতীন নিয়ে ঘর করবো কী করে আমি? আমার স্বামীর ধারণা আমি বাঁজা। কিন্তু জানি আমার শরীরে কোনও খুঁত নাই। তার বীর্যেই কোনও তেজ নাই। কিন্তু সে-কথা মানতে চায় না। রাগে সে আমার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ে। আজ বলে গেছে, ফেরার সময় সে আর একটা মেয়েকে শাদী করে নিয়ে আসবে। তার ধারণা, তার গর্ভে সে বাচ্চা পয়দা করতে পারবে। পয়সা কড়ি ধনদৌলতের কোনও কমতি নাই আমার স্বামীর। দরবার থেকে

মোটা মাইনে পায়। অনেক জমি জিরেৎ বাড়ি ঘর আছে। এখন অন্য মেয়ে ঘরে আসলে সে-ই তার মালকিন হয়ে বসবে। আমার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবো আমি। আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন মা। একটা উপায় বাৎলে দিন।

বুড়ি অভয় দিয়ে বলে, তুমি মনে কোনও ভয় রেখ না, মা। আমি কে, এবং কী আমার ক্ষমতা কিছুই তোমার জানা নাই। তবে এটা জেনে রাখ, আমি স্বয়ং আল্লার দূত। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে। তোমার যাতে কোনও দুঃখ কষ্ট না থাকে তারই ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছেন তিনি। তুমি কিচ্ছু ভোবো না, মা। আমি সব সমস্যার সুরাহা করে দেব। শুধু যা বলবো, সেই মতো তোমাকে চলতে হবে!

খাতুন বলে, আপনি যা বলবেন, মা, আমি তাই করবো। বলুন কী করতে হবে?

—এই শহরে এক পীরের দরগা আছে। আমি তোমাকে নিয়ে যাবো সেখানে। তোমার মনের যা কামনা বাসনা, সেখানে জানাবে তুমি। মানত করবে। তা হলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, মা। ঐ দরগার এমন মাহাত্ম্য সেখানে যে যা মানত করে তাই সে পায়। কত দীন ভিখারী ঐ পীরের দরগায় সিন্নি দিয়ে বিরাট বড়লোক হয়েছে, কতো বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হয়েছে তার সীমা সংখ্যা নাই। তুমি চলো, তোমার মনের বাঞ্ছা পূরণ হবে।

খাতুন বলে কিন্তু মা, সেই যে শাদীর দিন আমি এ বাড়ির অন্দরে ঢুকেছি, আজ পর্যন্ত কোনও কারণেই বাইরে বেরোই নি। এ বাড়ির পর্দা বহুৎ কড়া। মেয়েদের বাইরে যাওয়ার কোনও নিয়ম নাই। তা সে উৎসব আনন্দের আমন্ত্রণই হোক, কিংবা শোক তাপের সঙ্গ দানের কর্তব্যই থাক, কোনও কারণেই বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি মেলে না আমার।

বুড়ি ডিলাইলাহ বলে, কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাকে একটি বারের জন্য সেখানে যেতেই হবে মা। পীর তো তোমার কাছে আসবে না, দরকার হলে তোমাকেই যেতে হবে সেখানে। তোমার কোনও চিন্তা নাই, বাছা। শুধু একবার সেখানে যাবো আর ফিরে আসবো। কতটুকুই বা সময় লাগবে। তোমার স্বামী ঘরে ফেরার অনেক আগে তুমি ফিরে আসবে। কেউ জানতে পারবে না। আর এ-সব কাজ বাড়ির মরদ মানুষদের জানিয়ে কখনও করতে নাই। তাতে কোনও সুফল হয় না। আমি তোমাকে পীরের সামনে হাজির করবো। তিনি তোমাকে একবার শুধু দেখবেন। তারপর তোমার মনের বাসনা জানাবে তাকে। ব্যস, আর কোনও ব্যাপার নাই। তিনি তোমাকে দোয়া করবেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে আজ রাতেই শুদ্ধ মনে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করো। দেখবে যথাসময়ে পুত্র সন্তান লাভ করবে। সহবাসের সময় মনে মনে যা কল্পনা করবে, সেই রকম সন্তানই পাবে তুমি। যদি ছেলে চাও, ছেলেই পাবে। যদি মেয়ে কামনা কর, মেয়েই হবে। মোটকথা, মিলনের সময়, তোমার কোলে যে আসবে সেই শিশুর আদলটা মনের মধ্যে ছবির মতো করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করো। দেখবে অবিকল সেই রকম খুবসুরৎ হবে সে।

খাতুনের মনে আশার আলো জ্বলে ওঠে। তাড়াতাড়ি সে বাক্স প্যাঁটরা খুলে সবচেয়ে সুন্দর সাজপোশাক এবং দামী-দামী রত্নালঙ্কার বের করে নিজেকে পরিপাটি করে সাজায়। বাঁদীকে ডেকে বলে, আমি একটু পরে আসছি। বাড়িটা খালি রইলো, নজর রাখিস।

সদর দরজার পাহারাদার আবু আলী প্রশ্ন করলো, আপনি কোথায় যাবেন, মালকিন?

খাতুন বলে, এক ধন্বন্তরী পীরের দরগায়। এই মা আমাকে মেহেরবানী করে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে গেলে বন্ধ্যা মেয়েরা পুত্রবতী হয়।

আবু আলী বলে, আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে নির্ভয়ে যান মালকিন। ইনি মানুষের রূপ ধরে নেমে এসেছেন। আসলে ইনি সাক্ষাৎ আল্লাহর দূত। আপনার সব মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দিতে পারেন ইনি। এই দেখুন, উনি আমার ওপর খুশি হয়ে এই তিনটে দিনার

দিয়েছেন আমাকে। এ আমি মাথায় করে রাখবো। উনি আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছেন আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

দু'জনে রাস্তায় নেমে চলতে থাকে, চলতে চলতেই কথা হয়। বুড়ি বলে, পীর-এর এমনই মহিমা সেখানে গেলে যে তুমি শুধু সন্তানবতী হবে তাই নয়, তোমার সঙ্গে তোমার স্বামীর আর কোনও ঝগড়া বিবাদ হবে না কখনও। তার বদলে সে তোমাকে মাথায় করে রাখবে। ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে।

খাতুন বলে, তাঁর চরণে মাথা রাখার জন্যে প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠেছে, মা। আর কতদূর যেতে হবে, একটু পা চালিয়ে চলুন।

সচলতে চলতে ধূর্ত বুড়িটা ফন্দী আঁটতে থাকে, পথে তো বের করে এনেছি। এবার ওর গহনাপত্র কী করে হাতানো যাবে! চারপাশে এতো লোকজন; জোর জবরদস্তি করে ছিনতাই করা সম্ভব হবে না। অন্য পথ দেখতে হবে।

ডিলাইলাহ এবার ফিস ফিস করে খাতুনকে বলে, তুমি আমার অনেকটা পিছনে পিছনে থাক। কারণ লোকে দেখলে নানারকম সন্দেহ করতে পারে।

খাতুনের মনে তখন একই চিন্তা। কখন সে পীরের দরগায় পৌঁছবে। কখন জানাবে তার বাসনা। সে বললো, ঠিক আছে মা, আমি দূরে দুরেই থাকছি।

একটু পরে তারা বড়বাজারে এসে পৌঁছয়। বাজারের বিখ্যাত তরুণ সওদাগর সিদি মুসিন-এর দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বুড়ির কানে আসে, সওদাগর সিদি মুসিন খাতুনের রূপে মুগ্ধ হয়ে আপন মনেই তারিফ করছে, ইয়া আল্লাহ, এ যে বেহেস্তের ডানাকাটা হুরী!

বুড়ী খাতুনকে বলে, বাছা তুমি এখানে একটু দাঁড়াও তো। এই দোকানী আমার এক শিষ্য, ওর সঙ্গে দুএকটা কথা বলে আসি।

বুড়ি এসে সিদি মুসিনের দোকানে ঢোকে। খাতুন দূরে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়ি জিজ্ঞেস করে, বাছা, তুমি তো সওদাগর সিদি মুসিন?

যুবক সসম্ভ্রমে বুড়িকে স্বাগত জানায়, জী হাঁ। আপনি আমাকে জানলেন কী করে?

রাত্রির শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁয়ত্রিশতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

এক সদাশয় সওদাগরই তোমার কাছে পাঠিয়েছে আমাকে। ঐ যে মেয়েটিকে দেখছো, ও আমার কন্যা। ওর বাবা এককালে শহরের এক নামজাদা সওদাগর ছিলো। কিন্তু সে আজ নাই। মরার আগে বিষয়-আশয় যথেষ্টই রেখে গিয়েছে। আমি; দেখতে পাচ্ছ, সংসারের মায়া কাটিয়ে অনেক ওপরে চলে গেছি। এখন ঐ মেয়েই হয়েছে আমার পথের একমাত্র বাধা। নিশ্চিন্ত মনে প্রাণ-ভরে আল্লাহর সাধন ভজন করবো, তাও পারছি না। এখন তার শাদীর বয়স হয়েছে, ভাবছি তোমার মতো কোনও সুপাত্রর হাতে যদি ওকে সঁপে দিতে পারি, তবে আমি নিশ্চিন্ত হই। আল্লাহর দরবারে আমি আমার আর্জি জানিয়েছিলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ করলেন, তোমার কাছে আসতে। এখন দেখ, তোমার যদি পছন্দ হয় মেয়েটিকে, আমি এই দায় থেকে রেহাই পাই। অন্য কোনও ব্যাপারে চিন্তা করো না বাবা। টাকা পয়সার আমার কোন অভাব নাই। আমি আল্লাহর পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। অর্থে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। ওকে শাদী করলে, আমার যা সম্পত্তি ধনদৌলত আছে সবই পাবে তুমি। সে টাকায় এই বাজারে আরও দু'খানা দোকান কিনে দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।

সাধারণ মানুষের কী কাম্য বাবা? পয়সা, আরাম এবং নারী। ওকে শাদী করলে সবই পাবে তুমি।

সিদি মুসিন বলে, মা আপনার প্রথম দু'টো কথা বড় চমৎকার। পয়সা এবং আরাম। এ আমি সত্যিই চাই। এবং পেয়েছিও। কিন্তু নারী সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নাই। আমার মা, এখন তিনি বেঁচে নেই, বলেছিলেন, বাবা বিয়ে করে সংসারী হও। জীবনে সুখ পাবে। আমার তখন পয়সা বানাবার নেশা। মাকে বলেছিলাম, এখন না মা, আগে পয়সা রোজগার করতে দাও, তারপর ওসব ভাববো। আজ আমার পয়সা যথেষ্টই হয়েছে। কিন্তু মায়ের সাধ আমি পূরণ করতে পারিনি।

ধূর্ত বুড়ি বলে, তা হলে আর দেরি করে কী লাভ বাছা। আমাদের সঙ্গে চলো, আমার মেয়েকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেখে নাও, তার শরীরে কোনও খাদখুঁত কিছু আছে কিনা। হ্যাঁ বাবা, একটা কথা, পথে চলার সময় একটু দূরে দূরে চলবে। লোকে যাতে বুঝতে না পারে, তুমি আমাদেরই সঙ্গে যাচ্ছো।

তরুণ সওদাগর সিদি মুসিনের চোখে রঙ লাগে। মনের মধ্যে বহুদিনের সুপ্ত কামনার দীপশিখা দপ করে জ্বলে ওঠে। তাড়াতাড়ি সে একহাজার দিনারের একটা বটুয়া জেবে পুরে উঠে দাঁড়ায়। নিজের মনেই বলে ঃ মানুষের ভাগ্য কখন যে কী ভাবে খুলে যায় কেউ বলতে পারে না।

সওদাগর রাস্তায় নেমে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে শয়তান বুড়িটার পিছনে পিছনে চলতে থাকে। ডিলাইলাহ ভাবতে থাকে, এখন কী ভাবে জাল গুটিয়ে ওপরে ওঠান যাবে।

যেতে যেতে সে রঙের কারবারী হজ মহম্মদের দোকানের সামনে এসে পড়ে। এই হজ মহম্মদ লোকটা ভীষণ বদ। মেয়েছেলে দেখলে তার জিভে জল আসে। তা সে ছুঁড়িই হোক আর বুড়িই হোক।

খাতুনকে দেখে লোকটার চোখের তারা নেচে ওঠে। খাসা মাল!

ধূর্ত বুড়ি ডিলাইলাহর কিছুই চোখ এড়ায় না। ভাবে, এখানেই কাজ হাসিল হবে। ওদের দু'জনকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সোজা সে দোকানের ভিতরে ঢুকে যায়।

—আপনার নাম হজ মহম্মদ?

—জী হাঁ। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

বুড়ি বলে, পারবেন না, বাবা। আমরা এ শহরের বাইরে থাকি। বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে আসছি। ওই যে বাইরে ওদের দেখছেন, ওরা আমার ছেলে আর মেয়ে। এই শহরের বাইরে আমার একখানা বাড়ি আছে। বাড়িখানা আদ্যিকালের। আমার ঠাকুর্দার বাবার আমলের। একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থা। সব সময় ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। কখন বুঝি বা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। পাড়া-পড়শীরা পরামর্শ দেন, এভাবে ও-বাড়িতে থাকা আর ঠিক না। ভালো করে মেরামত না করে ওখানে বাস করতে থাকলে কবে আত্মঘাতী হতে হবে। আমিও ভাবলাম, কথাটা ঠিক। তাই মিস্ত্রী লাগিয়েছি—বাড়িটাকে ঠিকঠাক করার জন্য। কিন্তু মুসকিলে পড়েছি এই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে। এখন উঠি কোথায়? শহরের এতোটা পথ এলাম, কোথাও কোনও খালি ডেরা নাই। তবে লোকে আপনার নাম করে বললো, আপনার কাছে গেলে আপনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেনই।

হজ মহম্মদ হাসে। সে হাসি শয়তানের। বলে, লোকে আমাকে জানে তো, আমার দয়ার শরীর। কারো দুঃখ কষ্ট আমি দেখতে পারি না চোখ মেলে। কেউ কোনও বিপদে পড়ে আমার সামনে এসে একবার হাজির হলে আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

আমার যত অসুবিধাই হোক একটা কিছু ব্যবস্থা আমাকে করে দিতেই হয়। ঐ যে বললাম, দয়ার শরীর, কারো দুঃখ কষ্ট চোখ মেলে দেখতে পারি না। কিন্তু মা, আমি আপনাদের রাখবো কোথায়? এই আমার দোকান আর ওপরে আমার একটাই শোবার ঘর। তা আমি না হয় দোকানেই শোবো। কিন্তু একটা অসুবিধে দাঁড়াচ্ছে, গ্রাম থেকে চাষীরা আসে আমার কাছে নীল বিক্রী করতে। ওদের দিয়েই আমার এই রঙের কারবারটা চলে। সুতরাং তাদের একটু আদর যত্ন করতেই হয়। তাই মাঝে-মধ্যে ওরা যখন এসে আটকে যায় আমার ঐ ঘরেই রাত কাটায়। সে-ঘর যদি আপনাদের ছেড়ে দিই, তা হলে আমার চাষী-ভাইরা থাকবে কোথায়?

বুড়ি বলে, মামলা তো মাসখানেকের। তার মধ্যে বাড়ির মেরামতীর কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই একটা মাসের জন্য ওপরের ঘরখানা যদি দু'টো ভাগ করে একদিকে আমাদের থাকতে দেন, বড় উপকার হয়।

হজ মহম্মদ এই তালই ভাঁজছিলো।

—তা কথাটা মন্দ বলেন নি, মা। ঘরটার মাঝখান দিয়ে যদি একটা দরমার বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া যায়, তা হলে দুদিকই রক্ষা হয়। ঠিক আছে, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বুড়ি বললো, আপনার চাষী-ভাইরা আপনার যেমন মেহেমান, আমাদেরও তারা মেহেমান হয়ে যাবেন। কোনও সংকোচ করার কিছু নাই। আমরা সবাই মিলে-মিশে থাকতে পারবো। এক সঙ্গে খানাপিনা করতে পারবো, কোনও অসুবিধা হবে না।

হজ মহম্মদ দেরাজ থেকে তিনটি চাবির একটা গোছা বুড়ির হাতে দিয়ে বললো, এই সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে চলে যান। এই চাবিটা দিয়ে সামনের দরজা খুলবেন। তারপরে এই চাবিটায় খোলা যাবে বসবার ছোট্ট বৈঠকখানাটা। আর এটা দিয়ে খুলবেন শোবার ঘরখানা।

বুড়ি চাবিগুলো নিয়ে খাতুন আর সওদাগরকে সঙ্গে করে ওপরে উঠে যায়।

রাত্রির অন্ধকার হালকা হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো ছত্রিশতম রজনী। আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সামনের দরজা খুলে খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে বুড়িটা ভিতরে ঢুকে যায়। সওদাগরকে চোখের ইশারায় বাইরেই অপেক্ষা করতে বলে। শোবার ঘরে ঢুকে বুড়ি বলে, বেটা, এইখানে তুমি বসো। একটু পরে পীরসাহেব আসবেন। তিনি এই বাড়িরই নিচতলায় এখন নামাজ করছেন। কোনও লজ্জা সংকোচ করার ব্যাপার নাই, মা। খোদ আল্লাহর দরবারে এসে গেছ তুমি। বোরখাটা খুলে আরাম করে বসো এখানে। আমি এখুনি আসছি।

বুড়িটা আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালো না। বাইরে বেরিয়ে গেলো।

সওদাগর বাইরে দাঁড়িয়েছিলো। তাকে সঙ্গে করে পাশের ছোট্ট খুপরী মতো বসার ঘরটায় নিয়ে গিয়ে বললো, এইখানে তুমি আরাম করে বসো, বাবা। আমি আমার মেয়েকে একটু বাদেই তোমার কাছে নিয়ে আসছি। নিজের চোখে তাকে বাজিয়ে দেখে নিও।

এরপর সে খাতুনের কাছে ছুটে আসে।

—পীরসাহেব এসে গেছেন, মা। এবার আমরা তাঁর দর্শন পাবো।

খাতুন আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়ে, আমার কী সৌভাগ্য, মা।

বুড়ি বলে, কিন্তু মা পীর সাহেব এসব জাকজমক আড়ম্বর দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। সাজগোড়, রত্ন অলঙ্কার, এসবই তার চোখের বিষ। এসব পরে তো তার দর্শন পাওয়া যাবে না। তার সামনে যেতে গেলে পার্থিব সব সম্পদ ত্যাগ করে যেতে হবে। তোমার

কোনও লজ্জা করার কারণ নাই। তিনি কোনও মানুষ নন, তাঁর কাছে লজ্জা কীসের? এক কাজ কর মা, তোমার সাজ-পোশাক গহনাপত্র সব খুলে এখানে রেখে তার কাছে যাও। আমি আছি, আমি তোমার জিনিসপত্র সব দেখবো।

খাতুন-এর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় জাগলো না। তৎক্ষণাৎ সে একটি মাত্র রেশমী শেমিজ ছাড়া সব সাজ-পোশাক এবং গহনাপত্র পরিত্যাগ করে একেবারে প্রায় নগ্ন হয়ে দাঁড়ালো।

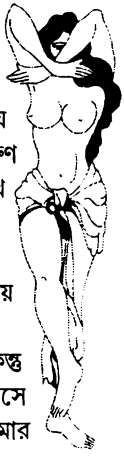

খাতুনের পরিত্যক্ত সাজ-পোশাক আর গহনাপত্র একটা পুঁটুলি করে বেঁধে ডিলাইলাহ বলে, আমি এ-গুলো পীরের পায়ে ঠেকিয়ে এনে এখানে রেখে দিচ্ছি। তাঁর ছোঁয়া পেলে পবিত্র হবে।

ডিলাইলাহ পুঁটুলিটা সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সিঁড়ির এক জায়গায় গুঁজে রেখে সে সওদাগরের কাছে যায়। ছোট্ট একটা খুপরীতে বসে বসে তরুণ সওদাগর ঘামছিলো। ধৈর্য আর কিছুতেই বাঁধ মানছিলো না। বুড়িকে একা দেখে সে জিজ্ঞেস করে, কী হলো, মা? এতো দেরি হচ্ছে কেন?

—আর বলো না, বাছা আমার নসীবের দোষ।

বুড়ি কপাল চাড়পাতে থাকে। সওদাগর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকায় কেন, কী হয়েছে?

—আর কী হয়েছে? তোমাকে বলেছিলাম না, একটু তফাৎ রেখে চলতে। কিন্তু তুমি বোধ হয় তা পারনি। কিছু লোকের সন্দেহ হয়েছে। একটু আগে তারা এসে আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেলো। তুমি কে, তোমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক এই সব প্রশ্ন। আমার মেয়ে সোজাসুজিই তাদের বলেছে ঃ ছেলেটির সঙ্গে আমার শাদী হবে। আমার মা তাকে পছন্দ করেছেন। আমার পছন্দ অপছন্দের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তারা বললো, ঠিক আছে, শাদী হবে উত্তম কথা। কিন্তু সওদাগর ছেলেটার শরীরে যে কুষ্ঠ আছে—সে কথা কী সে কবুল করেছে?

সত্যি কথা বলতে কি বাছা, এই কথা শুনে মেয়ে আমার কেঁদে আকুল। আমি তাকে ভরসা দিয়েছি, তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি যেমন তার কাছে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে, সেও তেমনি সব সাজপোশাক খুলে তোমার সামনে দাঁড়াবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সর্বাঙ্গ তুমি পরীক্ষা করে নেবে। যদি কোনও অসুখের দাগ দেখতে পাও, আমিই রাজি হবো না। কী বলো বাবা, খারাপ বলেছি?

সওদাগর তাজ্জব বনে যায়। এমন ডাহা মিথ্যে কথা কে বলে গেলো? আল্লা সাক্ষী মা, আমার দেহে কোনও রোগ নাই। আমি সব সাজপোশাক খুলে ন্যাংটা হয়ে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন।

সিদি মুসিন উত্তেজিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বুড়ি বলে, ঠিক আছে, আমি তোমাকে মেয়ের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, সে-ই নিজের চোখে পরীক্ষা করে দেখুক। হ্যাঁ বাবা, তোমার এই সাজপোশাক পয়সা কড়ি এখানে রেখে যাওয়া তো ঠিক হবে না। এগুলো আমি ভালো জায়গায় রেখে আসি। তুমি এখানে বসো। আমি এখুনি এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

ধূর্ত ডিলাইলাহ সওদাগরের সাজপোশাক এবং টাকার থলেটা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সে খাতুনের সাজপোশাক এবং গহনার পুঁটুলিটাও সঙ্গে নিতে ভোলে না। রাস্তায় নেমে সে অদূরে অবস্থিত একটা মশলাপাতির দোকানে ঢুকে বলে, দোকানী আমার এই পুঁটুলি দু'টো একটু রাখতো ভাই, আমি একটা গাধা ডেকে আনি।

তারপর বুড়িটা হন হন করে চলে আসে হজ মহম্মদের দোকানে। হজ মহম্মদ বুড়িকে দেখে বলে, কী গো বুড়িমা, ঘর পছন্দ হয়েছে?

—খুব হয়েছে, বাবা চমৎকার ঘর আপনার। কী বলে যে আশীর্বাদ করবো। আমি যেমনটি আশা করেছিলাম, আপনার ঘরখানা তার চেয়ে ঢের ভালো, বাবা। এখন দেখি যাই একটা কুলিটুলি পাওয়া যায় কিনা। সামান পত্রগুলো তো আনতে হবে এখানে। আমার বাড়ি থেকে ফিরে আসতে তো খানিকটা সময় লাগবে, বাবা। সেইজন্যে বলছি, এই দিনার ক'টা রাখুন, কিছু রুটি গোস্ত এনে ওদেরও খেতে দিন, আপনিও খান। আমি যাবো আর আসবো।

হজ মহম্মদ বলে, তা তো বুঝলাম, কিন্তু দোকানে তো অন্য কোনও লোক নাই মা, দোকান ফেলে আমি যাবো কী করে?

বুড়ি বলে, এখনকার দোকান-পাট তো আমার চেনা নাই, বাবা। তা হলে আমিই এনে দিয়ে যেতাম। আচ্ছা, আমি আপনার দোকান পাহারা দিচ্ছি, আপনি যান, খাবারটা নিয়ে আসুন। কতক্ষণ লাগবে?

হজ-মহম্মদ বলে একটু ভালো খাবারের দোকান খানিকটা দূরে। তবে বেশি দেরি হবে না, আপনি এখানে বসুন, আমি তাড়াতাড়িই ফিরবো।

হজ মহম্মদ আর অপেক্ষা করে না, বুড়িকে বসিয়ে, একখানা রেকাবী এবং একটা বাটি সঙ্গে নিয়ে সে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে যায়। বুড়িটাও ছুটে যায় মশলাপাতির দোকানটায়। পুটুলি দু'টো নিয়ে আবার ফিরে আসে হজের দোকানে। দোকানের যা কিছু দামী দামী জিনিসপত্র দেখতে পেলো, একটা বস্তায় চটপট ভরে নিলো সে।

এই সময় একটা ছেলে একটা ভাড়াটে গাধা নিয়ে ভাড়ার সন্ধান করতে করতে সেই দোকানের সামনে এসে পড়ে। বুড়ি জিজ্ঞেস করে, ভাড়া যাবে?

ছেলেটি বলে, যাবো না কেন? ভাড়া যাওয়াই তো আমার কাজ। কী সামান যাবে?

ছেলেটির কথায় জড়তা। বুড়ি বুঝলো চরস খেয়ে ছোকরাটা বুঁদ হয়ে আছে। যাক ভালোই হলো।

—তুমি আমার ছেলেকে জান? এই দোকানের মালিক হজ মহম্মদকে চেন?

ছেলেটি বলে, কী যে বলেন, বুড়িমা, খুব আচ্ছা তরা জানি। আমার চাইতে তাকে আর ভালো করে কেউ জানে না। কিন্তু ব্যাপার কী? কী হয়েছে। দোকানের সামানপত্র এমন লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছেন কেন?

রাত্রি শেষ হয়ে যায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সাঁইত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

দুঃখের কথা আর বলো না, ছেলে। আমার বেটার কারবার ডকে উঠেছে। দেনার দায়ে সে আজ দেউলিয়া। পাওনাদাররা শুনবে কেন, কাজীর কাছে মামলা দায়ের করে দিয়েছে। কাজী আমার ছেলেকে কয়েদ করেছে। দোকানের সামানপত্র ক্রোক করার পরোয়ানা আসবে এখুনি। তার আগে যতটা পারি জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলি। কিন্তু এতোসব বড় বড় রঙের জালাগুলো তো আর সড়ানো যাবে না। আমার বাছার এমন সাধের দোকান কাজীর পেয়াদা এসে লুঠ করে নিয়ে যাবে, তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।

ছেলেটা বোকার মতো তাকায়, তা হলে কী করে এই সব পেল্লাই পেল্লাই রঙের জালাগুলো সরাবে?

—সরাতে পারবো না। তবে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নষ্ট তো করে দেওয়া যায়?

ছেলেটি বুড়ির বুদ্ধির তারিফ করে ভারিক্কি চালে ঘাড় নাড়ে। হুঁ, তা অবশ্য যায়।

বুড়ি বলে, কিন্তু ছেলে, আমার গায়ে তো বেশি জোর নাই। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?

—কী করতে হবে বলুন?

—এই ডাণ্ডা দিয়ে জালাগুলো সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দাও। আমি ততক্ষণে এই বস্তাটা তোমার গাধার পিঠে চাপিয়ে অন্য জায়গায় রেখে আসি। কিছু ভেবো না; তোমার যা ভাড়া—তার অনেক বেশিই দেবো। নাও, এই বস্তাটা তোমার গাধার পিঠে বেঁধে দাও।

ছেলেটি বুড়িকে বিদায় করে ডাণ্ডা দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে মাটির জালাগুলো গুঁড়ো করে দেয়। সারা ঘর নীলের গোলায় কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে। এমন সময় হজ মহম্মদ দূর থেকে দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ছেলেটার হাতের ডাণ্ডা চেপে ধরে বলে, এ্যাই, এসব কী হচ্ছে?

ছেলেটি হজ মহম্মদকে চেনে। দাঁত বের করে খিকখিক করে হাসতে হাসতে সে বলে, এবার আসুক না ব্যাটারা, ঘণ্টা পাবে। আমি সব খতম করে দিয়েছি—

হজ মহম্মদ কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। তার সারা জীবনের সাধনা এই রঙের দোকান, আজ কয়েক পলকের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেলো কী করে!

—এ্যাই ব্যাটা উল্লু বাঁদর বদমাইশ কাঁহাকা, এ তুই কী করেছিস। আমার যে সব শেষ হয়ে গেলো!

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকায়। হজ মহম্মদকে কখনও চোখের জল ফেলতে দেখেনি সে। আজ সে কাঁদছে।

—কিন্তু আমার কী দোষ; শেখসাহেব। আপনার মা-ই তো আমায় সব ভাঙ্গতে বলে গেলেন।

—আমার মা? আমার মা তো অনেকদিন গত হয়েছে।

ছেলেটি আরও অবাক হয়, তবে যে এক বুড়িমাকে দেখলাম এই দোকানের জিনিসপত্র বস্তায় ভরছিলো? সে তবে কে? সেই তো আমাকে বলে গেলো, তার ছেলে—মানে আপনাকে কাজী নাকি কয়েদ করেছে। দেনার দায়ে আপনার দোকান আজ ক্রোক করতে আসবে তার পেয়াদা। তাই তো বুড়িমা আমাকে বললো, 'যতটা পারি বাঁচাই, বাকীটা তুই ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে রাখ—যাতে কাজীর পেয়াদা এসে কিছু না নিয়ে যেতে পারে।' সবুর করুন শেখসাহেব, সামানপত্র সামলে রেখে এখুনি ফিরে আসবে বুড়িমা। এসে আমার গাধা আর ভাড়া মিটিয়ে দেবে।

. —তোর মুণ্ডু দেবে। যাকে আমি দোকানে বসিয়ে গিয়েছিলাম সে আমার মা হতে যাবে কেন? তাকে তো আমি আমার ওপরের ঘরখানা ভাড়া দিয়েছি আজ!

—আপনি তাকে আগে থেকে চিনতেন?

—না না, চিনবো কি করে। সবে আজ সকালেই তো সে এসেছে আমার কাছে। তার ছেলে আর মেয়েকে সঙ্গে করে। আমি তো তাদেরই জন্য খাবার কিনতে গিয়েছিলাম। হায় আল্লাহ এ কী সর্বনাশ হলো আমার। এখন আমার দিন চলবে কী করে? ও বাবা গো, মা গো, আমি এখন কী করবো?

হজ মহম্মদের চেঁচামেচি চিৎকারে পথচারী দোকানদার প্রতিবেশী সবই এসে ভীড় করে। সকলের মুখে একই জিজ্ঞাসা—কী ব্যাপার, কী হয়েছে?

হজ মহম্মদ বলে, আমার নতুন ভাড়াটের ছেলেমেয়েদের জন্য আমি খানা

কিনতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি আমার দোকানের এই হাল করেছে এই ছেলেটা। রঙের সব জালাগুলোকে দেখুন, ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। আমার এতো সাধের আলমারী। টেবিল তাক সব টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। এখন আমি কী করবো।

একজন প্রশ্ন করে, দোকানে কাকে বসিয়ে গিয়েছিলেন? সে কোথায়?

—সে-ই তো আমার নতুন ভাড়াটে—এক বুড়ি।

—সে কী আপনার চেনা-জানা?

হজ মহম্মদ বলে, আজ সকালের আগে কখনও দেখিনি আমি।

একজন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, একবেলার পরিচয়, তার হাতে দোকান ছেড়ে দিয়ে বাইরে গেলেন, আপনি?

সে যে আমার ভাড়াটে হয়েছে। ওপরে তার ছেলেমেয়ে রয়েছে এখনও। আমি তাদের জন্যই খাবার আনতে গিয়েছিলাম।

হজ মহম্মদ কপাল বুক চাপড়াতে থাকলো।

ছেলেটাও এতক্ষণে বুঝতে পারে, গাধাটাও আর ফেরত পাওয়ার আশা নাই। সেও হা-হুতাশ করে কপাল চাপড়াতে থাকে। আমার গাধা—আমার গাধা পাবো কোথায় গো?

ছেলেটা হজ মহম্মদকে পাকড়াও করে, আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। আপনার দোকানের লোক আমার গাধা নিয়ে পালিয়েছে। এজন্যে আপনিই একমাত্র দায়ী। আমার গাধাটা ফেরত দিন।

হজ মহম্মদও রুখে আসে, তবে রে হতচ্ছাড়া, আমার সর্বনাশ করে, আবার বলে কিনা গাধা ফেরত দাও।

তৎক্ষণাৎ দুইজনের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি শুরু হয়ে যায়। হজ বলে কেন আমার দোকানটার সর্বনাশ করলি—তোকে আমি ফাটকে দেবো। আর ছেলেটা বলে, ওসব বুজরুকী ছাড়ো, আমার গাধা ফেরত দাও, না হলে তোমাকে আমি কাজীর কাছে নিয়ে যাবো।

উপস্থিত জনতা ওদের মারামারি দেখে মজা অনুভব করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন বলে, হজ মহম্মদ, বুড়িটা যখন তোমার ভাড়াটে, আর সে যখন ছেলেটার গাধাটা নিয়ে পালিয়েছে, আমার মতে গাধাটা অথবা একটা গাধার খেসারত তোমাকেই দিতে হয়।

কিন্তু কে শোনে কার কথা, তখন হজ মহম্মদ আর ছেলেটার মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এবার শুনুন, সওদাগর সিদি মুসিন আর খাতুনের কথা ঃ

সিদি মুসিন সাজ-পোশাক খুলে দিয়ে একেবারে দিগম্বর হয়ে অধীর আগ্রহে বসে থাকে সেই ছোট্ট খুপরীটাতে। বুড়ি তাকে বলে যায়, এখুনি সে এসে তার মেয়ের ঘরে নিয়ে যাবে তাকে। কিন্তু তিলে তিলে অনেক সময় কেটে যায়। বুড়ি ফিরে না। সিদি মুসিন অধৈর্য হয়ে বৈঠকখানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

এদিকে খাতুনের অবস্থাও তাই। বুড়িটা তাকেও ধোঁকা দিয়ে, সাজ-পোশাক গহনাপত্র নিয়ে, প্রায় বিবস্ত্রা করে, বসিয়ে রেখে সেই যে বেরিয়ে গেলো আর ফিরলো না। খাতুন ভাবে নিচে থেকে ফিরে আসতে এতো দেরি হওয়ার কারণ কী? অধৈর্য হয়ে সেও ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। হঠাৎ পিছন থেকে একটা কর্কশ আওয়াজ শুনে সে চমকে

উঠে পিছনে ফিরে তাকায়। কিন্তু চোখ আর খুলে রাখতে পারে না। সেই নওজোয়ান সওদাগর একেবারে বিবস্ত্র —উলঙ্গ।

সিদি বেশ তেজের সঙ্গেই কৈফিয়ৎ চায়, তোমার মা কোথায়? এক্ষুনি ডাকো তাকে। আমি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করবো না। এখুনি শাদীর ব্যবস্থা করতে হবে।

খাতুন অবাক হয়ে বলে, আমার মা? সে তো কতকাল আগে মারা গেছে। তুমি কী সেই পীরের সাগরেদ নাকি?

সিদি আবার ভেঙ্গে পড়ে, এ তুমি কী বলছো, মণি, তোমার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠেছি। তোমার মা আমাকে কথা দিয়েছে, আজই এক্ষুনি তোমার সঙ্গে শাদী করিয়ে দেবে আমার।

খাতুন-এর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে থাকে। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে ওঠে। তবে কি বুড়িমা—আর সে ভাবতে পারে না কিছু।

সিদি মুসিনও বুঝতে পারে, ব্যাপারটা বড় সুবিধের না। এখন এই অবস্থায় সে কী করবে, কী করা উচিত কিছুই ঠাওর করতে পারে না।

খাতুনও আতঙ্কিত হয়ে নির্বোধের মতো সিঁড়ির দিকে ছুটে যায়। ভাবখানা এই—যেন সিঁড়ি দিয়ে নামলেই বুড়িটার সঙ্গে দেখা হবে। সিদিও তার পিছনে পিছনে নামতে থাকে।

এই সময় হজ মহম্মদ আর ছেলেটার কাজিয়া তুঙ্গে উঠেছে। ওপরে উঠে আসার জন্যে তারা সিঁড়ির কাছে ছুটে আসে। পিছনে বিরাট জনতা। সিঁড়িতে পা দিয়েই মহম্মদ দেখে, মেয়েটি আর ছেলেটি দু'জনেই উলঙ্গ। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। হজ মহম্মদ আর তার পিছনে একরাশ জনতাকে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ে খাতুন। শেমিজটাকে প্রাণপণে টেনে হাঁটুর কাছে নামাতে চায়। আর সিদি মুসিন— সে বেচারা দু'হাত দিয়ে ঢেকে কোনও রকমে লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ প্রয়াস করতে থাকে।

হজ মহম্মদ গর্জে ওঠে, এই খানকির বেটি খানকি, তোর মা মাগী কোথায় আগে বলো?

খাতুন হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে, আমার মা তো বহুদিন আগে মারা গেছে! আমাকে যিনি সঙ্গে করে এনেছেন তিনি তো এখানকার পীরের শিষ্যা।

তার এই কথা শুনে হজ মহম্মদ তার দোকানের শোক ভুলে গেলো, ছেলেটা তার হারানো গাধার দুঃখও ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো পিছনের জনতাও। কারুরই আর বুঝতে বাকী রইলো না তারা সবাই ঐ ধূর্ত ঠগ বুড়িটার শিকার হয়েছে।

হজ মহম্মদ, ছেলেটা আর সওদাগর সিদি মুসিন তিনজনে ঠিক করলো, শয়তান বুড়িটাকে শায়েস্তা করতেই হবে। কিন্তু তার আগে এই অসহায় মেয়েটার লজ্জা নিবারণের একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা পোশাক এনে পরতে দেওয়া হলো খাতুনকে। খাতুন তখন লজ্জা ভয় শঙ্কায় দিশাহারা। কোনও রকমে পোশাকটা পরে দ্রুত পায়ে সে বাড়ির পথে পা বাড়ায়।

হজ মহম্মদ ছেলেটাকে বললো, সবই নসীবের লেখা, বিবাদ কাজিয়া করে আর ফয়দা কী বলো। তার চাইতে কোতোয়ালের কাছে চলো, নালিশ করে আসি।

সওদাগরের দিকে তাকিয়ে সে বললো, আপনি চলুন আমাদে সঙ্গে কোতোয়াল খালিদের কাছে। এজাহার দিয়ে আসবেন।

সব শুনে আমির খালিদ বললো, এতো বড় তাজ্জব কাণ্ড, আল্লার নাম নিয়ে বলছি, তোমরা যে কাহিনী শোনালে সবই আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু একটা কথা, এই বিরাট

বাগদাদ শহরে সেই শয়তান বুড়িটাকে কী করে আমি ধরবো? হারেমে হারেমে ঢুকে সব মেয়ের বোরখা খুলে পরীক্ষা করে দেখা কী আমার পক্ষে সম্ভব? আমার পক্ষে কেন, কারো পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

—তা হলে কী উপায় হবে?

ওরা তিনজন হা-হুতাশ করতে থাকে। হজ মহম্মদ কপাল চাপড়ায়, আমার দোকান—

ছেলেটা কেঁদে ফেলে, আমার গাধা—

আর সওদাগর সিদি মুসিন মাথা ঠুকতে থাকে, আমার এক হাজার দিনারের বটুয়া—

কোতোয়াল খালিদ বলে, তোমরা, যদি বুড়িটাকে ধরে এনে দিতে পার, আমি তার যোগ্য সাজা দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। এমন দাওয়াই তাকে দেবো, বাছাধন সব কবুল করতে পথ পাবে না। কিন্তু তাকে যদি হাতের মুঠোয় না পাই, আমার কিছু করার নাই।

খালিদের কথায় তারা আপাততঃ শান্ত হয়ে যুক্তি করে, যেভাবেই হোক তাকে তাকে থাকতে হবে, বুড়িটার হদিশ করতেই হবে।

এবারে ধূর্ত বুড়ি ডিলাইলাহর কথা বলি ঃ

মালপত্র চাপিয়ে সে গাধাটাকে তাড়িয়ে নিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। একেবারে সোজা বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছায়। আল্লাহর কৃপায় পথে কোনও ঝঞ্ঝাট হলো না, নিজের বাড়ির দোড়গোড়ায় পৌঁছে বুড়িটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। যাক্ বাবা, ভালয় ভালয় পৌঁছে গেছি!

জাইনাব জানলার ধারে মা-এর প্রত্যাশায় বসেছিলো। আনন্দে সে লাফাতে লাফাতে এসে দরজা খুলে দেয়।

—মা, মাগো, তুমি দেখি বাজী মাৎ করে এসেছো?

—তবে কী ভেবেছিলি কোতোয়ালের হাতকড়া পরে ফাটকে যাবো?

ডিলাইলাহর চোখে শয়তানীর হাসি নাচতে থাকে। দেমাক করে বলতে থাকে, আমার নাম ডিলাইলাহ। তোর কোতোয়াল খালিদ বল, আর আহমদ হাসান বল, সাতঘাটের পানি খাইয়ে দিতে পারি আমি। আমার সঙ্গে খলিফা যে'ব্যাভার'-খানা করলো তাতে কি আমি চুপ করে বসে থাকবো ভেবেছিস? ওর সুলতানী করার সাধ আমি ঘুচিয়ে দেব। আমার সঙ্গে চালাকী!

জাইনাবের আনন্দ আর ধরে না। মা, মা গো, তোমার কেরামতির কাহিনীটা একবার শোনাও না, মা।

ডিলাইলাহর মুখে দুর্গ জয়ের অহঙ্কার ফুটে ওঠে, এক ঢিলে চার পাখী মেরেছি। এক আমিরের বিবি আর এক ছোকরা সওদাগরের সাজ-পোশাক গহনাপত্র টাকাকড়ি লোপাট করে একেবারে উদাম করে রেখে এসেছি। আর এক দোকানদারের দোকানের সব ভালো ভালো দামী দামী জিনিসপত্র ফাঁক করে দিয়েছি। আর এই গাধাটা দেখছিস, এটাও বাগিয়ে নিয়ে এসেছি একটা ছেলের কাছ থেকে।

জাইনাব শিউরে ওঠে, বলো কী মা, এতোগুলো কাজ একবেলার মধ্যে সেরে ফেললে?

—তবেই বোঝ, আমার কারসাজী?

—কিন্তু মা, তোমার কী ধারণা, ওরা তোমাকে পথে-ঘাটে দেখে চিনতে পারবে না? তখন? তখন কী করে বাঁচবে তুমি? একবার ধরা পড়লে, জন্মের সাধ তো তোমার ঘুচিয়ে দেবে কোতায়াল।

—তুই থাম তো জাইনাব। তোর ঐ আমির খালিদকে আমি ট্যাঁকে গুঁজে রাখতে পারি। খালি ভয় আমার ঐ ছোঁড়াটাকে। বেটাচ্ছেলে, আমাকে চেনে। সে যাক গে, ও-নিয়ে আমি চিন্তা করি না।

ডিলাইলাহ একটু দম নেয়। তারপর আবার বলতে থাকে ঃ এ আর কী দেখলি আমার কেরামতী। আসল কাজে তো এখনও হাতই দিইনি।

জাইনাব আতঙ্কিত হয়ে বলে, কিন্তু মা, আমার বড্ড ভয় করছে। যদি তুমি ধরা পড়ে যাও—

—আমাকে যে ধরবে সে এখনও মায়ের গব্‌ভে। ওসব ভয় আমাকে দেখাস নে। জানিস আমি হচ্ছি পাকাল মাছ, হাতে মুঠো করে ধরেও ধরে রাখা যায় না। পালিয়ে আমি যাবোই।

রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ঊনচল্লিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

সুফী দরবেশের আলখাল্লা ছেড়ে সে আমির উজিরের বাড়ির হারেমের আয়ার সাজ পরে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। আবার কাকে ঘায়েল করা যায়, তারই ফন্দী আঁটতে আঁটতে বাগদাদের শহর পথ পরিক্রমা করে চলে সে।

বাজার। রাস্তার দুধারে বাহারী রঙদার বিলাসদ্রব্যের দোকান। নানারকম কায়দায় সুন্দর সুন্দর জিনিস সব এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে, দেখে চোখ ঝলসে যায়। ডিলাইলাহ এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চলছিলো। হঠাৎ তার নজরে পড়লো, একটা বড় লোকের চাকরানীর কাঁধে ফুটফুটে সুন্দর একটা ছেলে। এক নজরেই বোঝা যায়, কোনও আমির বাদশার খানদানী ঘরের দুলাল। সারা অঙ্গে তার সজের কী বাহার। জমকালো জরির কাজ করা কুর্তা কামিজ। মাথায় শিরোপা। হীরা চুনী পান্না মুক্তা বসানো—মহামূল্যবান টুপী। তার গলায় ইয়া বড় একটা মুক্তোর মালা। মাঝে মাঝে হীরা বসানো। একটা বাড়ি থেকে চাকরানীটা ছেলেটিকে কাঁধে করে রাস্তায় নামলো। এই বাড়িটা বাগদাদ শহরে বিখ্যাত। শহরের সওদাগর-সমিতির সভাপতির বাড়ি। সুতরাং প্রায় সব লোকেই চেনে। এই বাচ্চা যে সওদার সভাপতির সে-কথা হয়তো না বললেও বোঝা যায়।

ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে চাকারানীটা তার সঙ্গে গপ্পো করতে করতে বাড়ির সামনেই পায়চারী করতে থাকলো। তাদের কথাবার্তা থেকে একটা কথা পরিষ্কার সে জানতে পারে, সওদাগরের বাড়িতে আজ উৎসব আছে। তার কন্যার বাগদানের উৎসব। ছেলেটা বড় দামাল। বাইরের অভ্যাগতদের সামনে ওর মাকে নাজেহাল করবে, এই আশঙ্কায় চাকরানীর কাছে দিয়ে বলেছে, বাইরে নিয়ে যা। মেহেমানরা চলে গেলে, নিয়ে আসবি।

ডিলাইলাহ ভাবে, যেভাবেই হোক ছেলেটাকে গায়েব করতে হবে। সচ্ছন্দভাবেই সে চাকরানীটার সামনে এগিয়ে যায়। আর বোলো না বাছা, আমার বড় দেরি হয়ে গেলো।

চাকরানীটা কিছুই বুঝতে পারে না। ডিলাইলাহর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। এই ফাঁকে ডিলাইলাহ তার হাতে একটা অচল দিনার গুঁজে দিয়ে বলে, এটা রাখো, তোমার মালকিনকে গিয়ে একবার খবর দাও, বাছা, তার পুরোনো আয়া উম অল খায়ের এসেছে দেখা করতে। আজ এই শুভ দিনে আমার দোয়া জানাতে এসেছি আমার বেটিকে। আমার নিজ হাতে মানুষ করা লেড়কী। আজ তার শাদীর পাকা দেখা। এ আনন্দ আমি কি চেপে রাখতে পারি। তাই না ডাকলেও ছুটে এসেছি, যাও তুমি মালকিনকে একবার গিয়ে বলো, তাহলেই তিনি সব বুঝতে পারবেন।

চাকরানীটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে; এ তো ভারি আল্লাদের কথা মা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষুণি মালকিনকে আপনার কথা বলছি।

কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই চুপসে যায় চাকরানীটা। বলে, কিন্তু কী করে ভিতরে এখন যাবো, মা?

—কেন?

—এই বাচ্চাটা বড়ই দুরন্ত দামাল। মালকিন আজ বাদশাহী সাজপোশাকে সেজে আছেন, ওকে ভিতরে নিয়ে গেলে এক পলকে তার মা-এর সাজ-পোশাক একেবারে মাটি করে দেবে। সেই ভয়েই তিনি আমাকে বাইরে পাঠিয়েছেন। এখন তো একে নিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারবো না মা।

—ওঃ, এই কথা! তা দাও ওকে আমার কোলে, আমি ততক্ষণ ওর সঙ্গে আলাপ জমাই। তুমি চটপট খবর দিয়ে চলে এসো, কেমন?

সহজ সরল নির্বোধ চাকরানীটা অতশত প্যাঁচ-পয়জার ভাবতে পারে না। বলে, তা হলে তো খুব ভালো হয় মা। আপনি একটু ধরুন। আমি যাবো আর আসবো।

সরল বিশ্বাসে চাকরানীটা তার কোলে শিশুটিকে তুলে দিয়ে দোতলায় উঠে যায়।

এদিকে তক্ষুণি ধূর্ত শয়তান বুড়িটা শিশুটিকে কোলে নিয়ে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূরে বাঁ পাশের একটা সরু অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে সদর রাস্তার গোচর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঝটপট সে শিশুটির গা থেকে মূল্যবান হীরে জহরতগুলো খুলে নিয়ে বটুয়ায় ভরে ফেলে। তারপর ভাবে, একে দিয়ে আরও অনেক রোজগার করা যাবে।

দ্রুতপায়ে সে বাজারের স্যাকরা-পট্টিতে চলে আসে। এখানকার নামজাদা জহুরী এক ইহুদী। লোকটা পয়সার কুমির। কিন্তু বাগদাদের ব্যবসায়ী মহলে তার কোনও প্রতিষ্ঠা নাই।

দোকানের গদীতে বসে খদ্দেরের আশায় পথের দিকে তাকিয়েছিলো। ডিলাইলাহর কোলে সওদাগর-সভাপতির পুত্রকে দেখে তার চোখ দুটো জুলজুল করে ওঠে। এই সওদাগর-সভাপতির ওপর তার মনে মনে দারুণ হিংসা। পয়সায় ইহুদী অনেক বড়, কিন্তু তার মতো ইজ্জৎ সে পায় না। লোকে তাকেই সন্মান করে সমিতির সভাপতি বানিয়েছে। কিন্তু ইহুদীকে ডাকেনি।

ডিলাইলাহ দোকানের ভিতরে ঢোকে। ইহুদী স্বাগত জানিয়ে বসতে বলে। ভাবে, সওদাগর-সভাপতির বাড়ির বায়না—মোটা মাল বিক্রি হবে। কণ্ঠে মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করে, কী চান মা?

—আপনিই তো আমাদের মহাজন, ইহুদী আজারিয়াহ?

—আপনি ঠিকই চিনে এসেছেন।

ডিলাইলাহ বলতে থাকে, এই বাচ্চাটার বড় বোনের আজ শাদীর পাকা কথার উৎসব হচ্ছে বাড়িতে। ওহো, আমি কোন্ বাড়ি থেকে এসেছি, দেখুন, তাই-ই বলতে ভুলে গেছি।

ইহুদী আজারিয়াহ বলে, আমি জানি, আপনি আমাদের সওদাগর শাহবান্দার-প্রাসাদ থেকে আসছেন। এই বাচ্চা দেখেই বুঝতে পেরেছি। তা বলুন, কী কাজে লাগতে পারি আমি?

ডিলাইলাহ বলে, অনেক আত্মীয় ইয়ার দোস্ত আমির ওমরাহ সওদাগর আসবেন আজ। খুব জাঁকজমক করছে আমাদের মালিক।

—জানি। আমারও নেমন্তন্ন আছে সেখানে। দোকানপাট বন্ধ করেই যাবো।

ডিলাইলাহ মুহূর্তের জন্য মিইয়ে যায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললে, মালকিনের ইচ্ছা তার এই বাচ্চাটাকে একেবারে শাহজাদার মতো করে সাজাতে হবে। তিনিই আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে। আপনার দোকানের সেরা জহরৎ দিয়ে সাজিয়ে দিন-মালকিনের তাই ইচ্ছে।

ইহুদী শুনে গদগদ হয়, এ আর বেশি কথা কী। এমন সব দামী-দামী জড়োয়া-জহরৎ দিচ্ছি, আপনার মালকিনের পছন্দ হবেই হবে।

জহুরী বেছে বেছে দু'খানা বাহুর তাগা, দু'খানা বালা, এক জোড়া মুক্তোর

কানবালা, একখানা কোমরের দোয়াল, দুই রকম জামার বোতাম এবং হাতের কয়েকটি আংটি ডিলাইলাহর হাতে তুলে দিয়ে বললো, দেখান আপনার মালকিনকে। আমার মনে হয় অপছন্দ হবে না।

ডিলাইলাহর চোখ নেচে ওঠে। সবগুলো গহনায় হীরে চুনী পান্না প্রভৃতি নানারকম রত্ন বসানো। অনেক দাম হবে বোধ হয়। জহুরীকে বলে, বহুৎ বাহারী চমৎকার জিনিস সব। আমি মালকিনকে দেখিয়ে দামটা দিয়ে যাচ্ছি। কত লাগবে, আপনি ক'ষে বলে দিন।

জহুরী বলে, দামের জন্য চিন্তা কী। সে পরে হবে 'খন। আগে তো তাঁর পছন্দ হোক। তারপর দামের জন্য কী আটকাবে?

মুখে এই বললেও কাগজ কলম নিয়ে হিসেব কষে সে বলে, এই আপনার গিয়ে সব সুদ্ধ দাম পড়ছে একহাজার দিনার মতো। ও-জন্যে কিচ্ছু ভাববেন না। দাম না হয় আমি পরে নিয়ে আসবো। আপনি নিয়ে যান; তিনি পছন্দ করুন—সেইটেই আমার কাছে বড় কথা।

ডিলাইলাহ বলে, বাচ্চাটা এখানে ততক্ষণ থাক, আমি দৌড়ে যাবো আর ছুটে আসবো।

ইহুদী হাসে, বুঝেছি আপনার কোথায় আটকাচ্ছে। ওসব কিচ্ছুর দরকার নাই। ছেলেকে জমা রেখে আপনি নিয়ে যাবেন, আর আমি তাই হতে দেবো? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এসব আপনি ভাবলেন কী করে। যান, চলে যান। আপনাকে এ নিয়ে আর কিছু চিন্তা করতে হবে না। ছেলেকে যদি এমনিই রেখে যেতে চান, থাকুক। এখানে খেলা করুক। কিন্তু আমার কোনও প্রয়োজন নাই।

ছেলেটিকে ইহুদীর দোকানে বসিয়ে রেখে ডিলাইলাহ সোজা বাড়ির পথে হন হন করে হেঁটে চললো।

জাইনাব ঠগের সেরা মাকে ফিরতে দেখে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, আবার কাকে ফাঁসিয়ে এলে, মা?

মা নির্বিকারভাবে বলে, এমন বড় কিছু না, ছোট্ট একটা কারবার করে এসেছি। শাহবানদরের ছোট ছেলেটার গায়ের কিছু জহরৎ খুলে নিয়ে ওকে স্যাকরা-বাজারে জহুরী আজারিয়াহ ইহুদীটার হেপাজতে রেখে তার বদলে ওর কাছ থেকে এই সামান্য হাজার খানেক দিনারের মতো জরোয়া গহনা নিয়ে এসেছি।

কিন্তু মা, জাইনাব শঙ্কিত হয়ে বলে, এই রকম বেপরোয়া হয়ে এমন সব কাজ তুমি করে আসছ, এরপর ভেবে দেখেছো বাগদাদের হাটে বাজারে আর তুমি বেরুতে পারবে?

—তুই থাম তো ছুঁড়ি! আমাকে আর জ্ঞান দিস নি। বলি, তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছিলাম। আমার কাজে বাধা দিবি না। যা আমি করবো ভেবেছি, তার এক কণাও এখনও করা হয়নি আমার।

এদিকে সেই নির্বোধ চাকরানীটা দোতলায় উঠে যায়। বিরাট বিশাল ভোজসভার আয়োজন হয়েছে মাঝের বড় ঘরে। সওদাগর বিবির কানে ফিস ফিস করে সে বলে, মালকিন, আপনার পুরোনো আয়া উম অল খ্ইর এসেছে। নিচে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। শাদীর পাকা-দেখা শুনে সে মেয়েকে দোয়া জানাতে এসেছে।

এই কথা শুনে সওদাগর-বিবি প্রায় চিৎকার করে ওঠে, তোর ছোট মালিককে কোথায় রেখে এলি?

মেয়েটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো, ঐ আয়ার কাছে তাকে রেখে এসেছি, মা। ভাবলাম, ওকে ওপরে আনলে আপনি রাগ করবেন। ও আপনার সাজ-পোশাক নষ্ট করে দেবে, তাই। এই দেখুন আপনার আয়াটা আমাকে একটা দিনার বকশিশ দিয়েছে।

সওদাগর-বিবি দিনারটা হাতে নিয়ে দেখে, জাল। পিতলের তৈরি। সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে সে, শিগ্গির ছুটে যা, খানকি মাগী, নিয়ে আয় আমার বাছাকে।

চাকরানীটা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। হুড়পাড় করে সে নিচে নেমে এসে দেখে পাখী পালিয়েছে। কোথায় আয়া? কোথায় তার ছোট মালিক? হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে। তার চিৎকার শুনে অন্যান্য মেয়েরা ছুটে নেমে আসে নিচে। নিমেষের মধ্যে দারুন চেঁচামেটি-চিৎকার মহা-সোরগোল পড়ে যায়। সওদাগর সভাপতি নিজেও ছুটে আসে, কী ব্যাপার? কী হয়েছে? এতো গোল কীসের? যখন তার বিবির মুখ থেকে শুনলো, ছেলেকে নিয়ে ভেগেছে একটা শয়তানী ছেলে-চোর, সওদাগর পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে খুঁজতে থাকলো। তার সহগামী হলো উপস্থিত অভ্যাগত আমন্ত্রিত সকলেই। নানা দিকে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়লো তারা শিশুর সন্ধানে। শত সহস্র পথচারীদের জিজ্ঞেস করলো, কেউ একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলেকে কোনও বুড়ির কোলে দেখেছে কি না। কিন্তু কেউ কোনও হদিস দিতে পারলো না। দোকানদার, ফিরিওলা, ভিস্তিওলা কাউকেই জিজ্ঞেস করতে বাদ রাখলো না তারা। কিন্তু কেউই আশার কথা শোনাতে পারে না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তারা স্যাকরা বাজারে এসে ছেলের সন্ধান পেলো। ইহুদী আজারিয়াহর দোকানের দরজার পাশে বসে সে একমনে খেলা করছিলো। তার সাজ-পোশাক এলোমেলো, গায়ের হীরে জহরৎ কিচ্ছু নাই। শাহবান্‌দার ক্রোধে আনন্দে অধীর হয়ে ইহুদীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এ্যাই শয়তান পাজী বুড়ো, আমার ছেলে তোর কাছে কেন, বল? কী করে এলো এখানে? নিশ্চয়ই গহনার লোভে চুরি করিয়ে এনেছিস। তোর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলবো, বদমাইশ। বল, ওর গায়ের হীরে জহরৎ কোথায় রেখেছিস?

বুড়ো ইহুদী ভয়ে কাঁপতে থাকে। শাহবান্‌দারের দাপট সে জানে। তার ওপর এখন তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল জনতা। তার একটা ইশারাতে তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে তারা।

—দোহাই, মালিক, আমার অপরাধ নেবেন না। আমি কোনও দোষ করিনি, কোন চুরি ছেনতাই আমার ব্যবসা নয়।

সওদাগর রাগে ফেটে পড়ে, ওরে আমার পীর রে। তুমি চুরি করনি তো আমার ঘরের ছেলে তোমার দোকানে এলো কী করে? ঐটুকু দুধের বাছা, হেঁটে হেঁটে একাই চলে এলো এতোটা পথ?

—জী না, একা আসবে কী করে? আপনার বাড়ির এক বুড়ি আয়া তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো। আজ আপনার মেয়ের বাকদান। অনেক অতিথি মেহেমান আসবেন। তাই মালকিনের কথামতো সে আমার দোকানে এসে হাজারখানেক দিনারের গহনাপত্র নিয়ে গেছে তাঁকে দেখাতে। আপনি বিশ্বাস করুন শাহবান্‌দার সাহেব, আপনার ছেলেকে জামানত রাখতে চাইনি আমি। আমার কী দরকার, আপনি পাঠিয়েছেন, আমি বিশ্বাস করে গহনা ছেড়ে দেবো না?

শাহবান্‌দার এবার জ্বলে ওঠে, ওহে কালাবাঁদর, আমার মেয়ের গহনাপত্রের কী কিছু অভাব আছে? তোমার দোকানে লোক পাঠিয়ে গহনা না নিয়ে গেলে আমার মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়াতে পারবে না। ও সব বুজরুকী রাখ, ছেলের গায়ের হীরে-জহরৎ কোথায় রেখেছ, বের কর?

এমন সময় সেখানে সেই হজ মহম্মদ, গাধার মালিকটা আর সওদাগর সিদ্দি মুসিন এসে হাজির হয়। ঘটনার বিবরণ শুনে তারা সকলে কীভাবে সেই শয়তান বুড়িটার কাছে

প্রতারিত হয়েছে তার বিস্তারিত কাহিনী বলে। সব শুনে শাহবান্‌দারের প্রত্যয় হয়, ইহুদীটার কোনও দোষ নাই। সে তাকে বলে, ঠিক আছে, হীরে-জহরৎ যা গেছে তার জন্য আমি তোয়াক্কা করি না। আমার ছেলেকে ফিরে পেলাম এই যথেষ্ট। তবে এও বলে রাখলাম আপনাদের, সে বুড়ি শয়তান মাগী আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না। আজ আমার বাড়িতে কাজ—এখন এ নিয়ে আর হৈ-হুজ্জুৎ করতে চাই না।

শাহবানদার ছেলেকে নিয়ে চলে গেলো। ইহুদী জহুরী সেই তিন প্রতারিতকে প্রশ্ন করে, আপনারা এর কোনও বিহিত করবেন না?

তারা জানায়, সকালে তারা কোতোয়াল খালিদের কাছে এজাহার দিয়ে এসেছে। কিন্তু সে তাকে খুঁজে বের করে সাজা দেবার কোন ভরসা দিতে পারেনি। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার হাতে তুলে দিলে সে তাকে উপযুক্ত সাজা দেবে, এই কথা দিয়েছে।

ইহুদী বলে, তা হলে আসুন আমরা সবাই একজোট হয়ে তাকে ধরে ফেলার ব্যবস্থা করি। আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কেউ কী আগে ঐ বুড়িটাকে চিনতেন?

গাধার মালিকটা এগিয়ে এসে বলে, আমি চিনতাম।

ইহুদী বলতে থাকে, সবাই মিলে একসঙ্গে দল বেঁধে তাকে খুঁজে বেড়াতে থাকলে কোনও কাজ হবে না। চারজন চারদিকে নজর রাখুন। পথে-ঘাটে যত বুড়ি মেয়েছেলে চোখে পড়বে তাদের সবাইকে ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন না বুঝতে পারে আমরা কিছু লক্ষ্য করছি।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো একচল্লিশতম রজনীর মধ্যযামে আবার সে বলতে আরম্ভ করলো ঃ

গাধার মালিকটাই প্রথমে দেখা পেলো ডিলাইলাহর। যদিও সে-দিন আর এক অভিনব ছদ্মবেশে সেজে পথ চলছিলো, তবুও কিন্তু তার নজর এড়াতে পারলো না। বুড়িটার অদ্ভুত ধরনের চলার ভঙ্গী তার অনেক দিনের চেনা। দৌড়ে এসে সে বুড়িটার পথ রোধ করে দাঁড়ায়, হুঁ হুঁ আমার চোখকে ফাঁকি, এবার কোথায় পালাবে গাধা-চোর? তোমার লোক-ঠকানোর ব্যবসা আমি বের করে দিচ্ছি।

ডিলাইলাহ ফিস ফিস করে বলে, আঃ অত চেঁচাচ্ছো কেন? মামলাটা কী বাবা?

—মামলা আবার কী? আমার গাধা কই—গাধা?

ডিলাইলাহ আরও নরম সুরে বলে, আস্তে কথা বলো, বাবা। আচ্ছা, শুধু তোমার গাধাটা ফেরত পেলেই তুমি খুশি হবে, না অন্য সকলের সামান-পত্রও চাও?

ছেলেটি বলে, অন্য লোকের জিনিসে আমার কী কাম? আমার গাধা, আমি ফেরত পেলেই খুশি হবো।

ডিলাইলাহ কণ্ঠে মধু ঢেলে বলে, আমি জানি তুমি গরীব লোক। তোমার জিনিসে আমার কোনও লোভ নাই, বাবা। আমি ছিনতাই করতে চাই আমির বাদাশাহদের ধন-দৌলত। তোমার গাধাটা আমি তোমাকে ফেরত দেবো বলেই ঐ মূর-নাপিতের দোকানের সামনে বেঁধে দিয়েছি। তুমি যাও, পাবে। দোকানের মালিকের নাম হজ মাসুদ। ওকে বলা আছে, গিয়ে চাইলেই তোমাকে দিয়ে দেবে। আচ্ছা, তোমাকে যেতে হবে না, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমিই গিয়ে নিয়ে আসছি। এই রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই বাঁক ঘুরলেই তার দোকান। একটুক্ষণ তুমি অপেক্ষা কর, আমি তোমার গাধাটাকে নিয়ে আসছি।

ছেলেটাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ডিলাইলাহ নাপিতের দোকানে ঢোকে।

চোখে ততক্ষণে অশ্রুধারা নামিয়ে ফেলেছে সে। নাপিতের হাত ধরে কাঁদতে বলে, হায় হায় আমার সব শেষ হয়ে গেলো।

—কেন? কেন, কী হয়েছে বুড়ি মা?

নাপিত হজ মাসুদ উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে। বুড়ি বলে, আমার ছেলে তোমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বাবা। এই গাধাটাকে ভাড়া খাটাতো সে। কিন্তু একদিন দারুন খরাতে ঘুরে ঘুরে হঠাৎ ওর মাথাটা বিগড়ে যায়। তারপর থেকে অনেক চেষ্টা করেও ওর মাথার দোষ সারাতে পারিনি। বরং দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। উপসর্গ বলতে অন্য কিছু নয়, সারাদিন তার মুখে একই বুলি, আমার গাধা, আমার গাধা কোথায় গেলো? আমার গাধা আমাকে ফেরত দিয়ে দাও—এই সব আর কি। শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে তার ঐ এক কথা, আমার গাধা আমাকে দিয়ে দাও—। আমি ওকে অনেক হেকিম-বদ্যি দেখিয়েছি। কিন্তু কেউই সারাতে পারেনি। তারপর এই শহরের সবচেয়ে নামজাদা হেকিমের কাছে আমি গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে এক মোক্ষম দাওয়াই রাৎলে দিয়েছে। কিন্তু সে দাওয়াই ওকে দেবার সাধ্য আমার নাই। তোমার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব হবে না, বেটা।

হজ মাসুদ বলে, কী এমন কাজ মা, যা আপনি পারবেন না—অথচ আমি পারবো? যাক, বলুন, আমি জান দিয়েও করে দেবো আপনার কাজ।

ডিলাইলাহ হজ মাসুদের হাতে একটা দিনার গুঁজে দিয়ে বললো ঃ হেকিম জী বলেছেন ঃ ছেলের এই পাগলামীর আসল কারণ ওর দু'টো শ্বাদন্ত। এই দু'খানা উপড়ে ফেলে সেখানে গরম দু'খানা লোহার গজাল গেঁথে দিলেই ওর পাগলামী ভালো হয়ে যাবে।

ডিলাইলার কথা শুনে মাসুদ বলে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আপনার ছেলের পাগলামী আমি এক্ষুণি সারিয়ে দিচ্ছি।

মাসুদ তার দুই সহচরকে হুকুম করলো। দু'খানা পেরেক উনুনে পোড়াতে দাও। আমি ওকে ডেকে আনি।

মাসুদ দোকানের বাইরে এসে গাধার মালিককে দেখতে পেয়ে বলে, ও ছেলে, দোকানে চলো। তোমার গাধা ফেরত নিয়ে এসো।

ছেলেটা হন্তদন্ত হয়ে মাসুদের পিছনে পিছনে দোকানে ঢোকে। মাসুদ তাকে পাশের কামরায় নিয়ে গিয়ে আচমকা পেটের ওপর এক ঘুষি মারে। ছেলেটা চিৎপাৎ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অনুচর দু'টো এসে তাকে চেপে ধরে। এর ফলে আর সে নড়া-চড়া করতে পারে না। মাসুদ ওর বুকের ওপর চেপে বসে, গলাটা টিপে ধরে। ছেলেটার দম বন্ধ হয়ে আসে। আপনা থেকেই মুখটা হাঁ হয়ে যায়। তখন একখানা সাঁড়াশী দিয়ে পটাপট দু'খানা স্বদন্ত তুলে ফেলে সে। গজাল দু'খানা ততক্ষণে তেতে লাল হয়ে গিয়েছিলো। মাসুদ নির্মম হাতে সেই দাঁতের গর্তে দু'খানা গজাল ঠুকে বসিয়ে দিয়ে বলে, এই তো হয়ে গেলো। এবার তুমি তোমার গাধাকে নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি চলে যাও, কেমন! দাঁড়াও তোমার মাকে ডাকি, যা যা বলেছিলেন, ঠিক ঠিক মতো করতে পেরেছি কি না তাঁকে দেখাই।

নাপিতের সাগরেদ দু'টো তখনও ছেলেটাকে চিৎপাৎ করে ধরে রাখলো। আর ছেলেটা দারুণ যন্ত্রণায় হাঁপাতে থাকলো। নাপিত তার মাকে ডাকতে চলে গেলো পাশের ঘরে।

কিন্তু একি! ঘরতো ফাঁকা। কেউ নাই। বুড়ি মা কোথায় গেলো? এই তো সে এখানেই বসেছিলো!

নাপিত মাসুদ অবাক হয়। দোকানের বাইরে এদিক-ওদিক উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু না, কোথাও সে নাই। হঠাৎ তার খেয়াল হয় দোকানের ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর,

সাবান, আয়না চিরুনী বদনা গামলা—কিছুই নাই। সব সাফ করে নিয়ে গেছে। বুঝতে আর বাকী থাকে না—এতক্ষণ সে এক শয়তান বুড়ির পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে।

সে এক জাঁদরেল সিদেঁল চোর। আর আজ এই দিন-দুপুরে তারই নাকের ডগা দিয়ে তার দোকানের সর্বস্ব লোপাট করে নিয়ে গেছে একটা মেয়ে-ছেলে? এতোবড় ক্ষমতা-রাগে গরগর করতে থাকে সে। পিছনের ঘরে ছুটে গিয়ে রেগে ছেলেটার দুই গালে প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাত করে কৈফিয়ৎ তলব করে, বল, তোর মা মাগী কোথায় গেছে? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। আমার ভয়ে গৃহস্থের চোখে ঘুম আসে না, আর আমার দোকানেই বাটপাড়ি! এখনও বাঁচতে চাস তো তোর মা কোথায় থাকে আস্তানার পাত্তা বল।

ছেলেটির তখন মৃতকল্প দশা! বলে, আল্লাহ কসম, আমার মা অনেক কাল আগে দেহ রেখেছে। আমি অনাথ। গাধা খাটিয়ে খাই।

মাসুদ বলে, ওসব কসম আমি বিশ্বাস করি না। ঐ বুড়ো খানকিটা আলবাৎ তোর মা। বলো সে কোথায়? সে আমার সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেছে।

যখন তারা এই রকম তর্ক-বিতর্ক করে চলেছে, এমনসময় দোকানের সামনে দিয়ে সেই তিন প্রতারিত হজ মহম্মদ, সওদাগর সিদি আর জহুরী ইহুদী ধূর্ত বুড়ির অনুসন্ধান করে ফিরছিলো। গাধার মালিকের আর্তনাদ শুনে তারা নাপিতের দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়লো।

ছেলেটার তখন দু'গাল বেয়ে রক্ত-নদীর ধারা বয়ে চলেছে! যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছিল। ওর তিন সতীর্থকে দেখতে পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে; আমাকে মেরে ফেললো, এই বিধর্মী বদমাইশটা। আপনারা আমাকে বাঁচান।

ওরা দেখলো ছেলেটার মুখের অবস্থা অবর্ণনীয়। দু'খানা তাজা দাঁত উপড়ে তুলে ফেলেছে তার। উত্তপ্ত লৌহশলাকার ছেঁকায় তার মুখের প্রায় আধখানাই পুড়ে আংরা হয়ে গেছে। নাপিতের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তারা মারমুখী হয়ে উঠতে হজ মাসুদ আদ্যোপান্ত সব ঘটনা তাদের সামনে খুলে বলে। তখন ওরা বুঝতে পারলো, আসল দোষী সেই ধূর্ত শয়তান বুড়িটা। তাকে শায়েস্তা না করা পর্যন্ত তাদের গায়ের ঝাল যাবে না। সবাই মিলে আবার হলফ করলো, যেভাবেই হোক, যতদিনেই হোক এর বিহিত তারা করবেই।

শাহরাজাদ দেখলো, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো বিয়াল্লিশতম রজনী। আবার সে বলতে থাকে ঃ

অনেকদিন ধরে অনেক পথ ঘুরে, অবশেষে একদিন তারা বুড়ি ডিলাইলাহকে পাকড়াও করতে পারলো। গাধার মালিকই চিনতে পেরেছিলো তাকে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি চিৎকার করে সে লোকজন জড়ো করে ফেললো। হজ মহম্মদ সওদাগর সিদি মুসিন এবং ইহুদী জহুরী আজারিয়াহ আর মুর নাপিত হজ মাসুদও এসে পড়লো ঘটনাস্থলে। ওরা পাঁচজনে মিলে বুড়িকে টানতে-টানতে কোতোয়াল আমির খালিদের প্রাসাদে নিয়ে আসে।

খালিদ তখন খানা-পিনা করে নাক ডাকিয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। পাহারাদার বললো, কী ব্যাপার? এখন সাহেবের সঙ্গে মুলাকাত হবে না। তিনি এখন শুয়েছেন। আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, আর এই জেনেনা লোককে আমি অন্দরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর কোতোয়াল সাহেব ঘুম থেকে উঠলে তাকে আপনাদের মামলা জানাবেন।

ওরা পাঁচজন বৈঠকখানায় বসে রইলো, আর একটি খোজা এসে বুড়ি ডিলাইলাহকে প্রাসাদের অন্দরমহলে নিয়ে গেলো।

এক সদাশয় শুভ্রকেশ বৃদ্ধাকে এই সময়ে কোতোয়ালের কাছে আসতে দেখে

কোতোয়াল-বিবি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, আপনার কী মামলা, মা? কেন এসেছেন তাঁর কাছে?

বুড়ি হেসে বলে, না, আমার কোনও মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার নাই। খালিদ সাহেবের সঙ্গে আমার কথাবার্তা সব হয়ে গেছে। আমার স্বামীর বান্দা কেনা-বেচার ব্যবসা। তিনি কাজের তাগিদে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ান। এবার যাওয়ার আগে আমার কাছে পাঁচটা ম্যামলুক রেখে বলে গেলেন ঘরে পয়সা কড়ি যা রেখে গেলাম, আমার দেশে ফেরার আগে যদি তা ফুরিয়ে যায় তবে এই পাঁচটা বান্দা কোনও আমির বাদশাহর কাছে বিক্রি করে সংসার চালিও। খালিদ সাহেবকে বলতেই তিনি বললেন, পাঁচটাই তার দরকার। তাই ওদের আজ নিয়ে এসেছি। ওই দেখ মা, বৈঠকখানার বারান্দায় ওরা বসে আছে—ওই পাঁচটি আমার সেরা বান্দা। দারুন কাজের লোক। আর বুদ্ধি সুদ্ধিও ঢের!

খালিদ-বিবি জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো, সত্যিই পাঁচটিই বেশ ভালোজাতের মানুষ। বললো, তা কত দাম কিছু ঠিক হয়েছে মা?

বৃদ্ধা বেমালুম বলে ফেললো, এক হাজার দুশো দিনার—একেবারে জলের দাম। নেহাত বিপদে পড়েছি, পয়সাকড়ির দরকার তাই। না হলে বাজারে নিলামে তুললে অনেক বেশি ইনাম পাওয়া যেত।

আমির-বিবিরও তাই ধারণা। মাত্র বারোশো দিনারে এই রকম পাঁচ পাঁচটা ম্যামলুক মেলানো ভার। বাজারে গেলে, চাই কি, এক একটার দাম হাজার দিনার হাঁকবে।

খালিদ গৃহিণী আদর যত্নর মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দেয়। ইশারা করতেই একটি চাকরানী এসে এক গেলাস পেস্তার শরবৎ এনে রাখে। খালিদ বৌ বলে, মেহেরবানী করে চুমুক দিন। আচ্ছা মা, দাম নেওয়া ছাড়া কী আর কোনও দরকার আছে তাঁর সঙ্গে? তিনি এইমাত্র খানা-পিনা সেরে শুয়েছেন। ঘুম থেকে উঠতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। এতক্ষণ কী আপনি অপেক্ষা করবেন? না, আমি দামটা দিয়ে দেব, নিয়ে যাবেন? পরে সময় মতো একবার এসে ভেট করে যাবেন?

বৃদ্ধার তীর অব্যর্থ। এইভাবেই সে তাকে গেঁথে ফেলতে চেয়েছিলো। বললো, পয়সা ছাড়া তো তার সঙ্গে আমার অন্য কোনও দরকার নাই, মা।

—তা হলে আমি দেখি আমার কাছে আছে কিনা, থাকে যদি আপনাকে দিয়ে দিই দামটা। না হলে স্রেফ এই টাকাটার জন্যে আপনি এতোটা সময় বসে বসে হয়রান হবেন?

অন্য ঘরে চলে গেলো সে। কয়েক মুহূর্ত পরে একটা বটুয়া এনে বললো। কিন্তু পুরো বারোশো তো এখন হচ্ছে না, মা। এতে এক হাজার আছে।

প্রায় ছোঁ মেরেই থলেটা হাতে নিয়ে বুড়ি ডিলাইলাহ বলে, ঠিক আছে। এতেই আমার একটা দিন দিব্যি চলে যাবে। আমার ফেরার সময় হয়ে এসেছে।

—কিন্তু আপনার আরও দুশো দিনার বাকী রয়ে গেলো যে মা?

— তা থাক। ধরো একশো দিনার দিলাম তোমার শরবতের দাম। আর একশো না হয় পরে কখনও নিয়ে যাবো।

খালিদ-গৃহিণী ভাবে, যাক, মুফতে দুশো দিনার বাণিজ্য হয়ে গেলো। ভাগ্যে খালিদ-সাহেব গতকাল তাকে টাকাটা দিয়েছিলো অন্য একটা সামান কেনার জন্য!

ধূর্ত বুড়ি এবার পলায়নের পথ খোঁজে। —তা হলে মা, আমি আর অপেক্ষা

করবো না। কিন্তু ঐ সদর দরজার সামনে আমার এতোদিনের চেনা-জানা-বান্দাগুলো বসে আছে। দিনে দিনে মায়া-মমতা জড়িয়ে গেছে, এখন এখানে ফেলে রেখে ওদের মুখের সামনে দিয়ে চলে যেতে আমার কলিজা ফেটে যাবে। তুমি বরং আমাকে খিড়কীর দরজা দিয়ে বের করে দাও মা।

খালিদ-গৃহিণী নিজে তাকে সঙ্গে করে খিড়কীর দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বাইরে বের করে দেয়।

ডিলাইলাহ হন হন করে হেঁটে বাড়িতে ফিরে আসে। জাইনাব এসে হেসে জিজ্ঞেস করে, আজ আবার কাকে জগ দিয়ে এলে মা?

ডিলাইলাহ বলে আজ বড় মজার কাণ্ড করে এসেছি রে। সেই গাধার মালিক, রঙের কারবারী হজ মহম্মদ, সওদাগর ছেলে সিদি মুসিন, ইহুদী জহুরী, আর নাপিত হজ মাসুদকে আজ কোতোয়াল খালিদের বিবির কাছে এক হাজার দিনারে বেঁচে দিয়ে এসেছি। ওই কুর্ত্তার বাচ্চা গাধার মালিকটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। বার বার ঐ ছোঁড়াটাই আমাকে চিনে ফেলছে। এবারও ওরই জন্যে আমি ধরা পড়েছিলাম। আমাকে ধরতে পেরে ওদের কী আনন্দ! কোতোয়ালীতে নিয়ে গিয়ে তুললো। তা আমিও পাঁকাল মাছ। ওদের গায়ে কাদা লেপে দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এসেছি। নে, এখন ঠ্যালা বোঝ। শয়তানের বেহদ্দ যখন শুনবে, ওদের জন্যেই তার হাজার দিনার খোয়া গেছে, তখন ও কী আর ওদের আস্ত রাখবে, ভেবেছিস!

জাইনাব এবার সত্যিই ভয়ে কেঁপে ওঠে, মা, ঢের হয়েছে, এবার ক্ষান্ত দাও, একেবারে সাক্ষাৎ কোতায়ালকে চোট করে এসেছো তুমি। ভেবেছো, সে তোমাকে ছেড়ে দেবে? কথায় আছে না 'স্যাকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা।' তুমি লোকের চোখে ধুলো দিয়ে দিনে দিনে যা সংগ্রহ করছো, খালিদ তোমাকে একবার কব্জায় পেলে তার দশগুণ বের করে নেবে তোমার কাছ থেকে।

এইভাবে অনেক উপমা উদাহরণ দিয়ে মাকে নিরস্ত করার প্রয়াস করতে থাকলো জাইনাব, অনেক হয়েছে। এই পয়সাই সারা জীবনে আমরা খেতে পারবো না। আর বেশি ঝুঁকি নিয়ে কাজ নাই। অতিলোভে তাঁতী নষ্ট!

এদিকে কোতোয়াল খালিদ নিদ্রা পরিহার করে যখন বাইরে এলেন, তার বিবি এসে তাঁকে সুখবরটি পরিবেশন করে বললো। খোদা মেহেরবান, আশা করি তোমার সুখ-নিদ্রা হয়েছে। তা, তুমি বেশ ভালো সওদা করেছো তো! কিন্তু আমাকে জানাও নি কেন গো?

খালিদ বোকার মতো বিবির মুখের দিকে তাকায়, ভালো সওদা? কীসের সওদা?

—আহা, কী তোমার ভুলো মন, তুমি যে পাঁচ পাঁচটা ম্যামলুক বান্দা কিনেছো, সে কথা কী বেমালুম ভুলে বসে আছো?

—বান্দা! আমি কোনও বান্দা ফান্দা কিনিনি কারো কাছ থেকে। কে তোমাকে এই সব আজগুবি খবর দিলো?

—বা বা, বলিহারী তোমার স্মরণ শক্তি! একটা বৃদ্ধার কাছ থেকে তুমি বারোশো দিনারে পাঁচটা বান্দা কেননি? আজ তো, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে সেই বুড়ি এসেছিলো, ঐ দেখ বাইরের বৈঠকখানায় বান্দাগুলো বসে আছে। তা আমি তাকে দাম মিটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছি। বুড়ো মানুষ, কাঁহাতক তোমার জন্যে বসে থাকবে? কিন্তু যাই বলো, এতো সস্তা—যেন একেবারে...

—থামো, গর্জে ওঠে খালিদ, বারশো দিনার দিয়ে দিয়েছো তাকে?

বৌটা বুঝতে পারে না, অন্যায়টা সে কী করেছে। বলে, হ্যাঁ।

কোতোয়াল আর এক তিল বসে না। প্রায় ছুটেই বাইরে চলে আসে। কিন্তু সেখানে সেই পাঁচটি প্রতারিত সন্তান ছাড়া অন্য কোনও নফর বান্দাকে দেখতে পায় না সে। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ গোল করে খালিদ পাহারাদারকে প্রশ্ন করে, বান্দাগুলো কোথায়?

—পাহারাদার বোকার মতো এদিক ওদিক তাকায়, জী বান্দা?

—হ্যাঁ পাঁচটি বান্দা, তোমার মালকিন, আজ দুপুরে এক বৃদ্ধার কাছ থেকে কিনেছে। সেই পাঁচটা বান্দা কোথায়?

হুজুর, আমি তো তেমন কোনও খবর জানি না।

খালিদ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে তড়ফায়, আমি তো কোনও খবর জানি না—তা কিছুই যখন খবর রাখ না, তো এখানে সুরৎ-এর বাহার দেখাবার জন্যে থাকার কী দরকার? বিদেয় হও—যত্তোসব বাঁদর কা বাচ্চা—

পাহারাদার কাচুমাচু মুখে বলে, আপনি যখন ঘুমিয়েছিলেন, সেই সময় এই পাঁচজনের সঙ্গে এক বুড়ি এসেছিলো। সে-বুড়িকে আমি অন্দরে পাঠিয়ে দিয়েছি, হুজুর।

খালিদ বলে, ওঃ তোমরা? তা এখানে নবাবের মতো বসে আছো কেন? গতর তোলো? যাও কাজে হাত লাগাও। তোমাদের মালকিন আমার কাছে বিক্রি করে গেছে তোমাদের।

খালিদের কথা শুনে ওরা পাঁচজনে সোরগোল তুলে কেঁদে ওঠে। —এ আপনার কেমন তরো বিচার হলো আমির সাহেব? আপনার নামে খলিফার কাছে নালিশ করবো আমরা। আমরা খলিফার অনুরক্ত প্রজা। নিয়ম মাফিক কর দিই—আমরা স্বাধীন—মুক্ত মানুষ। আমরা কি নফর বান্দা যে, আমাদের নিয়ে কেনাবেচার বেসাতি করবেন? ঠিক আছে, আগে খলিফার কাছে চলুন, তারপর যা বিধি-ব্যবস্থা তিনিই করবেন।

গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ চুপ করে গেলো। শারিয়ার দেখলো, রাত শেষ হয়ে আসছে।

চারশো তেতাল্লিশতম রজনীতে আবার শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

খালিদ গর্জে ওঠে, যদি তোমরা নফর বান্দা না হবে, তাহলে তোমরা কী? নিশ্চয়ই চোর ছ্যাঁচোর বদমাইশ গুণ্ডা? ঐ শয়তান বুড়িটার সঙ্গে সাট করে আমার বিবিকে ধোঁকা দিয়ে পয়সা বের করে নিয়েছ। আমি কী তোমাদের অত সহজে ছাড়বো, ভেবেছো? বিদেশী মুসাফীরদের কাছে প্রত্যেককে একশো দিনারে বেচে দেবো।

খালিদ আর ঐ পাঁচজন প্রতারিতের মধ্যে যখন এইরুপ বাকবিতণ্ডা বচসা চলছে, এমন সময় খালিফার দেহরক্ষী শেরকা বাচ্চা মুস্তাফা সেখানে এসে হাজির হয়।

ইতিপূর্বে মুস্তাফা এসে তার বিবির প্রতারিত হওয়ার সমস্ত বিবরণ দিয়ে খালিদের কাছে এজাহার দিয়ে গিয়েছিলো। সে সম্পর্কে খালিদ কী হদিশ করতে পারলো কী পারলো না, তারই খোঁজ নিতে এসেছে সে।

সেইদিনের সেই ঘটনার পর থেকে প্রতিনিয়ত খাতুন তাকে খোঁচাচ্ছে, 'শুধু তোমার জন্যে আজ আমার এই দশা হলো। তুমি যদি আমাকে ভয় না দেখাতে—অন্য মেয়ে ঘরে আনবে বলে, তাহলে তো আমি সেই পীরের দরগায় যাওয়ার জন্যে ঐ বদমাইশ বুড়িটার সঙ্গে পথে বের হতাম না। তুমি যদি সে-দিন আমাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত না করতে তা হলে এই সর্বনাশ আমার হতো না।

খালিদকে দেখামাত্র সে জ্বলে ওঠে, কী খালিদ, সেই শয়তান বুড়িটার খোঁজ পেলে?

খালিদ মাথা হেঁট করে থাকে। মুস্তাফা এবার গর্জে ওঠে,তুমি একটা অপদার্থ কোতোয়াল। সারা শহরটা চোর বদমাইশ–এর আস্তানা হয়ে গেলো, সে দিকে

তোমার কোনও হুঁশ নাই। শুধু নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছো! যেমন তোমার অপদার্থ পাহারা পেয়াদা তেমনি তোমার গোবর-ঠাসা মগজ। একেবারে অকম্মার ঢেঁকি। তা না হলে, সাত সকালে দিনের আলোয় খলিফার আমিরের বাড়িতে ঢুকে তার বিবিকে রাস্তায় বের করে নিয়ে সর্বস্ব লুটে নেবার সাহস হয় কী করে ঠগ চোরদের? আমার যা লোকসান হয়েছে, তার জন্যে আমি একমাত্র তোমাকেই দায়ী করবো—আর কাউকে জানি না আমি।

তখন বুকে সাহস পেয়ে ঐ পাঁচ প্রতারিতও চিৎকার করে ওঠে, আমির সাহেব, আমাদের সকলের অবস্থাও ঠিক একই রকম। আমরাও সেই ধূর্ত বুড়ির ধাপ্পায় ভুলে যথাসর্বস্ব খুইয়েছি। তারই নালিশ করতে এসেছিলাম আমরা এই কোতোয়ালের কাছে—আর্জি ছিলো ন্যায্য বিচার।

—কীসের বিচার?

তখন পাঁচজনে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতারিত হওয়ার করুণ কাহিনী শোনালো তাকে।

আমির মুস্তাফা গম্ভীর হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, হুম্, তোমাদের দশাও দেখছি একই রকম। সবই এই কোতোয়ালের অকর্মণ্যতা—কোনও গুরুত্বই সে বুঝতে পারেনি।

খালিদ বিনীত হয়ে বলে, আমির সাহেব, আপনার বিবির কাছে আপনি খাটো হয়ে যাচ্ছেন, এটা আমি বুঝি। আপনি খলিফার দরবারে এখন একজন জাঁদরেল আমির। এই সামান্য একটা ঠগ জোচ্চোরকে শায়েস্তা না করতে পারলে ইজ্জৎ থাকে কী করে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমির সাহেব, আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, যেন-তেন প্রকারে সেই শয়তান বুড়িকেই আমি ধরবোই।

আমির তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলে, তোমার কেরামতী আর দেখতে চাই না। আমি নিজেই এর ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা শোনো, মুস্তাফা প্রতারিত পাঁচজনের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমাদের মধ্যে কেউ আছ যে, ঐ বুড়িটাকে দেখলে চিনতে পারবে?

সবাই সমস্বরে বলে, আমরা সকলেই তাকে চিনতে পারবো, হুজুর।

গাধার মালিক বিশেষভাবে বলে, হাজারটা শয়তানীর মধ্যেও যদি সে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে, আমি তাকে এক নজরেই টেনে বার করতে পারবো। আমি বলি কি, হুজুর, আমার সঙ্গে আপনি মেহেরবানী করে জনা-দশেক সিপাই দিন। তারপর দেখুন, আমি তাকে আপনার কাছে হাজির করতে পারি কি না।

সঙ্গে সঙ্গে দশজন সিপাই সঙ্গে দিয়ে ওদের পাঁচজনকে, শয়তান বুড়িটাকে পাকড়াও করে আনার উদ্দেশ্যে, পাঠানো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুড়ির সন্ধানও তারা পেয়ে গেলো। ওদের দেখামাত্র ঊর্ধশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সিপাইরা তাকে ধরে ফেলে। পিঠমোড়া করে বেঁধে কোতোয়ালের কাছে নিয়ে আসে।

কোতোয়াল খালিদ গর্জে ওঠে, চুরির মাল-পত্র সব কোথায় রেখেছো?

ডিলাইলাহ অবাক হওয়ার ভান করে বলে, জীবনে আমি কারো একটা কুটো চুরি করিনি। বুঝতেই পারছি না, কেন আমাকে ধরে এনেছেন আপনি?

খালিদ ক্রোধে কাঁপতে থাকে, বুঝিয়ে আমি দিচ্ছি। এ্যাই, এই মেয়েছেলেটাই আজকের রাতের মতো কয়েদখানার আঁধার ঘরে বন্ধ করে রাখ।

কিন্তু কয়েদখানার সর্দার বললো, আমাকে মাফ্ করবেন, হুজুর, আমি পারবো না?

খালিদ চিৎকার করে ওঠে, কেন, কেন পারবে না?

সর্দার বলে, এই বুড়ির ছলচাতুরী বড় মারাত্মক। সে যে কী ভাবে আমার লোকজনদের চোখে ধুলো দিয়ে হাওয়া হবে, তা কেউ জানে না। তাই আমি এতো বড় ঝুঁকি কাঁধে নিতে পারবো না, হুজুর।

খালিদ গুম মেরে গেলো কিছুক্ষণ। তারপর পঞ্চ প্রতারিতদের প্রতি নির্দেশ করে বললো, ঠিক আছে, আজ সারারাত একে তোমরা সকলে মিলে পাহারা দেবে। তারপর কাল সকালে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। চলো, বুড়িটাকে আমরা বাগদাদ শহরের সীমানার বাইরে গিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখি।

খালিদ ঘোড়ায় চাপলো। সিপাইরা বুড়ি ডিলাইলাহকে টানতে টানতে নিয়ে চললো। শহরের প্রাচীর সীমা পার হয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে ডিলাইলাহর চুল জড়িয়ে বাঁধা হলো। তারপরই পাঁচজন প্রতারিতকে পাহারায় মোতায়েন করে বাকী লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়াল ফিরে এলো তার বাড়িতে।

সবাই মিলে, বিশেষ করে গাধার মালিক বুড়ির আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগলো। যত রকম মুখ খারাপ করে গালাগাল, খিস্তি খেউর সম্ভব—কিছুই বাদ করলো না।

কিন্তু কতক্ষণ আর এইভাবে এক ঘেয়ে গালিগালাজ করে কাটানো যায়। গত কয়েকটা দিন বুড়ির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে সকলেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। এদিকে রাত বাড়তে থাকে। ওদেরও চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। খানাপিনা শেষ করে নেয় সকলে। তারপর আর একদণ্ড তারা চোখ মেলে থাকতে পারে না। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

নিশুতি নিঃঝুম রাত। ডিলাইলাহকে বৃত্তাকারে ঘিরে পড়ে পড়ে নাক ডাকতে থাকে সেই পঞ্চ-প্রহরী। তখনও কিন্তু ধূর্ত বুড়ি জেগে। রাত আরও গভীর হতে থাকে। হঠাৎ ডিলাইলাহ দেখলো, দুটি দস্যু ঘোড়ায় চেপে এইদিকে আসছে। রাতের নিস্তব্ধতায় ওদের অনুচ্চ আলাপও বেশ পরিষ্কার শুনতে পায় সে।

একজন বলছেঃ আচ্ছা ভাইসাব এই সুন্দর বাগদাদ শহরে সব চাইতে মজার কাজ তুমি কী করেছো?

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো চুয়াল্লিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

—আল্লাহর দোয়ায় আমি আমার সব চাইতে পেয়ারের খানা বেশ পেট ভরে খেয়েছি। খুব খাঁটি মধু-মাখানো পিঠে আর মাখন আমার খুব প্রিয় খাদ্য। এখনও তার সুবাস নাকে লেগে রয়েছে।

এই সময় তারা ডিলাইলাহর আরও কাছে এসে পড়ে।

—কে তুমি? এখানে এসেছো কেন?

ডিলাইলাহ গলায় মধু ঢেলে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলে, শেখ্ সাহেব, আপনারা আমাকে বাচাঁন।

আরব দস্যুদের একজন বলে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান তাকে ডাকো। তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্তা। কিন্তু এই খুঁটির সঙ্গে কে তোমাকে বেঁধে রেখেছে?

—তা হলে আমার দুঃখের কাহিনী শুনুন মুসাফির, আমার একটি দুশ্মন আছে। সে মধু দিয়ে পিঠে আর মাখনের মিঠাই বানাতে ওস্তাদ। সারা বাগদাদ শহরে এইজন্যে তার খুব নাম-ডাক। তার মতো জিভে জল আনা মধু আর সরের মিঠাই আর কেউই বানাতে পারে না। এই লোকটা আমাকে একদিন খুব মারধোর করেছিলো। তারই প্রতিহিংসায় জ্বলছিলাম আমি। ওর দোকানে গিয়ে মিঠাই মণ্ডার বারকোষে থু থু ছিটিয়ে দিলাম। কোতোয়ালের কাছে সে আমার নামে নালিশ করেছিলো। তারই সাজা হিসেবে সে আমাকে এই খুঁটিতে বেঁধে রেখে গেছে। একমাত্র একটা শর্তেই সে আমাকে খালাস দিতে পারে। সে হলো

কোতোয়ালের সামনে দশখানা থালা-ভর্তি মধু-পিঠা খেতে হবে। যতদিন আমি তা খেতে না পারবো, ততদিন আমাকে এইভাবে সাজা পেতেই হবে। সকাল হতে না হতেই কাল আমার সামনে দশথালা মধু-পিঠা এনে ধরা হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন শেখ সাহেব, কোনও মিঠাই–এর গন্ধ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। বমি এসে যায়। বিশেষ করে ঐ মধুর পিঠা দেখা মাত্র আমার কাঁপুনী দিয়ে জ্বর আসে। অথচ ভাবুন, ঐ অখাদ্য খাবার একটা দু'টো নয়, দশ-দশ থালা আমাকে উদরস্থ করতে হবে। তবে আমি ছাড়া পাবো! ইয়া আল্লাহ, আমার কপালে আরও ক'দিন এই সাজা লেখা আছে একমাত্র তুমিই জান। না খেয়ে খেয়ে একদিন এখানেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হবে।

বাদাবী-দস্যু টোপ গিললো, আমরা আরব, তুমিও আরব। তোমার দুঃখে আমাদের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমরা বাগদাদ শহরের নামজাদা মধু-পিঠের লোভেই এখানে এসেছি। আর সেই পিঠের গন্ধ তুমি সহ্য করতে পার না? যাই হোক, তোমার কষ্ট দেখে আমাদেরও খুব খারাপ লাগছে। যদি চাও, তবে তোমার হয়ে আমরা তোমার পিঠেগুলো উদরস্থ করতে পারি।

কিন্তু ওরা তো আপনাদের তা খেতে দেবে না। কোতোয়ালের হুকুম আছে, শহরের বাইরে একটা খুঁটিতে বাঁধা আছে যে, তাকে খাওয়াতে হবে দশথালা মধুর পিঠা। মধু-পিঠা যদি খেতে চান তবে এই খুঁটিতে বাঁধা থাকতে হবে।

বাদাবীদের একজন অপরজনকে বললো, আমি তো অনেক মধুর পিঠে খেয়ে পেট ডাঁই করে এসেছি। আমি চলি, তুমি বরং খাও।

সে চলে গেলো। অন্য বাদাবীটা তখন বললো, কিন্তু আমি যদি তোমার জায়গায় বাঁধা হয়ে থাকি, তবে তো, কাল সকালে কোতোয়ালদের লোক এসে আমাকে দেখে চিনে ফেলবে। তারা ভাববে, মেয়েছেলেটা গেলো কোথায়?

ডিলাইলাহ বললো, আমিও সে-কথা ভেবেছি। শুনুন, আপনি আপনার সাজপোশাক আমাকে দিন, আর আমি আমার এই সাজপোশাক আর বোরখা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। বোরখায় তো আপনার সর্বাঙ্গ ঢাকাই থাকবে। ওরা চিনবে কী করে—আপনি পুরুষ না মেয়ে?

বাদাবী বললো, হুঁ, ঠিক বলেছো।

তারপর দু'জনে পরস্পরের সাজপোশাক বদলে নিলো। বাদাবীর পোশাক পরে ডিলাইলাহ ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে বসে। আর বাদাবী ডাকাতটা বোরখা পরে সেই খুঁটিটার সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে বাঁধে।

সকাল হতে পঞ্চ-প্রহরীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। গাধার মালিক এগিয়ে গিয়ে বন্দীকে প্রশ্ন করে, কী গো বুড়ি, তোমার ঘুমটুম কেমন হলো?

বাদাবীটা তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করে, মেরা পিঠা কাঁহা, পিঠা লে আও।

—এ্যাঁ! এ যে পুরুষ মানুষের গলা! একি হলো?

গাধার মালিক প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, এখানে তুমি কী করছো? আর ঐ বুড়িটাকেই বা ছেড়ে দিলে কেন?

কিন্তু বাদাবী দস্যু সে কথার জবাব দেয় না। তার সেই এক কথা। আমার পিঠে কোথায়, জলদি নিয়ে এসো। আমার বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। সারাটা রাত আমার কিছুই খাওয়া হয়নি। সুতরাং ঝটপট নিয়ে এসো।

গাধার মালিক তবু প্রশ্ন করে, বুড়িটা গেলো কোথায়?

—তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। সে তো মধু-পিঠে খেতে পারবে না। খামোকা তাকে আটকে রেখে কী লাভ? তাই আমি তাকে খালাস করে দিয়েছি।

পঞ্চ-প্রতারিত বুঝতে পারে, এই দুর্ধর্ষ বাদাবী ডাকাতকেও বুড়িটা প্রতারণার ফাঁদে আটকে রেখে হাওয়া হয়ে গেছে। ওদের চোখে মুখে হতাশার করুণ ছবি ফুটে ওঠে। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, আল্লাহ যাকে ছেড়ে দেবে, মানুষ তাকে কী বেঁধে রাখতে পারে?

এরপর কী করা যায়, কী তারা বলবে কোতোয়ালের কাছে, তাই ভেবে সবাই তখন আকুল। এমন সময় ঘোড়ায় চেপে কোতোয়াল এসে হাজির হলো সেখানে। তার সঙ্গে একদল সশস্ত্র সিপাই।

বাদাবী তখন কোতোয়ালকে উদ্দেশ্য করে হুঙ্কার ছাড়ে, কই, আমার মধুর পিঠে কোথায়?

খালিদ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার, এ সব কী? বুড়িটা কোথায় গেলো? এ তো একটা দামড়া।

পঞ্চ-প্রহরী মাথা চুলকায়, বলে, এই হচ্ছে নসীব। ঐ ধূর্ত বুড়িটা এই বাদাবীকে বোকা বানিয়ে এখানে বেঁধে রেখে সে তার ঘোড়া নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আপনার দোষেই সে আজ পালিয়ে গেলো। চলুন, আপনাকে আমরা খলিফার দরবারে নিয়ে যাবো। আপনি যদি জনকয়েক সিপাই আমাদের সঙ্গে দিতেন, সে তো এইভাবে পালাতে পারতো না। সুতরাং এর জন্যে একমাত্র আপনিই দায়ী। আপনি কী ভেবেছিলেন, আমরা আপনার কেনা গোলাম? সারারাত জেগে আপনার হুকুম তামিল করবো?

তখন খালিদ বাদাবীকে জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কী বলো তো? তুমি এখানে এলে কী করে?

বাদাবী-দস্যু সমস্ত কাহিনী খুলে বললো তাকে।

—আমাকে সে বলেছে, এখানে এই খুঁটিতেই বাঁধা থাকলে সকাল বেলায় থালা-থালা ভর্তি মধু-পিঠে আর মাখন পিঠে খেতে পাওয়া যাবে। তা সকাল তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। কোথায়, আমার পিঠে কোথায়, নিয়ে এসো।

বাদাবীর কথা শুনে খালিদ আর তার সিপাইরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু পঞ্চ প্রতারিতরা রাগে গর্‌গর্‌ করতে থাকে।

—ওসব হাসি-টাসি রাখুন। এখন খলিফার কাছে যেতে হয়ে আপনাকে। আমরা এর একটা বিহিত চাই।

বাদাবীটা তখন তড়পাতে থাকে, এখনও বলছি, ওসব ধোঁকাবাজী ছাড়ো, মধু-পিঠা নিয়ে এসো।

কিন্তু তার কথায় কেউ-ই কর্ণপাত করলো না। সবাই শুধু হাসতে থাকে। অবেশষে বাদাবী বুঝতে পারে, ঐ বুড়িটা তাকে ধোঁকা দিয়ে তার সাজ-পোশাক আর ঘোড়াটা নিয়ে কেটে পড়েছে। মধু-পিঠা আর মাখন-পিঠার গল্প—সব বানানো।

খালিদ দেখলো, মামলা বড় জটিল আকার ধারণ করছে। এ অবস্থায় কানে তুলো দিয়ে বসে থাকলে ভবিরা ভুলবে না। তাই সে বাধ্য হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে খলিফার দরবারে এসে হাজির হয়।

রাত্রি শেষ হতে চলেছে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁয়তাল্লিশতম রজনী। শাহরাজাদ আবার কাহিনী শুরু করে ঃ

খলিফার সাক্ষাৎ মঞ্জুর হলো। খালিদ তার দলবল নিয়ে দরবার-কক্ষে প্রবেশ

করে। খলিফা হারুন অল রসিদ তখ্‌তে আসীন। তাঁর একপাশে দেহরক্ষী মুস্তাফা দণ্ডায়মান। উজির আমিরে ঠাসা পরিপূর্ণ দরবার মহল।

খলিফা নিজেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি সেই গাধার মালিককে জেরা করতে শুরু করলেন। এবং শেষ করলেন কোতোয়াল খালিদকে দিয়ে। প্রত্যেকে যে-যার কাহিনী বলে গেলো। খলিফা হারুন অল রসিদ বিষম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

—তাজ্জব কাণ্ডকারখানা! যাইহোক, আবার পূর্ব-পুরুষদের সুনাম যাতে রক্ষা হয়, সে-জন্য যার যা খোয়া গেছে সবই পূরণ করে দেওয়া হবে আমার ধনাগার থেকে। গাধার মালিক তার গাধা পাবে। সওদাগর পাবে হাজার দিনারের বটুয়া, রঙের কারবারীর দোকানের যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করে দেবো আমি। ইহুদী জহুরীর সোনাদানা যা গেছে, তাও সে পাবে। নাপিতের জন্য একটা দোকান তৈরি করে দেওয়া হবে, আর এই বাদাবী—সেও ফেরত পাবে তার সাজ-পোশাক এবং একটি আরবী ঘোড়া। এ ছাড়াও তাকে দিতে হবে দশখানা থালা-ভর্তি বাগদাদের বিখ্যাত মধু-পিঠা। খেয়ে যাতে তার প্রাণ ভরে যায়। কিন্তু সবার আগে আমার হুকুম—সেই বুড়িটাকে আমার সামনে হাজির করতে হবে। শোনো খালিদ এবং মুস্তাফা, তোমরা এখন বেরিয়ে পড়। আজ সন্ধ্যার আগে সেই বুড়িকে এখানে ধরে নিয়ে এসো। তারপর আজ রাতে আমার এইখানেই খানা-পিনা করবো। কিন্তু খালি হাতে ফিরবে না। মনে রেখো রাতের খানা তোমাদের এখানেই খেতে হবে। যাও, এই আমার হুকুম।

আমির খালিদ প্রমাদ গুনলো। খলিফার এই কথার অর্থ সে ভালোভাবেই জানে। নিজের ক্ষমতা জানিয়ে সে নিষ্কৃতি চায়, আমাকে রেহাই দিন, জাঁহাপনা। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। ঐ ধূর্ত শয়তানীকে কব্জায় আনা আমার কম্মো নয়। ও যে কী-ভাবে কখন চোখে ধুলো দিয়ে বুড়বাক বানিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে তা কল্পনারও অতীত। মেহেরবানী করে এ ভার আপনি অন্য কাউকে দিন। আমি পারবো না।

খলিফা হো হো করে হেসে উঠলেন। —তাহলে আর কোতোয়াল হয়ে বসে থেকে কী করবে। অন্য কোনও কাজ দিতে হবে তোমাকে, কী বলো?

খালিদ বলে, ধর্মাবতার! আপনার সুযোগ্য দক্ষিণ হস্ত শহরের সেরা সিপাই-প্রধান আহমদকেই এই দায়িত্ব দিন। আমার মনে হয় তার চোখে ফাঁকি দিয়ে সে বুড়ি নিস্তার পাবে না। তার বিচক্ষণতা এবং বেতন আমার চেয়ে অনেক বেশি। এ কাজ তারই উপযুক্ত। এতোদিনে সে শুধু আপনার কাছ থেকে দামী দামী উপহার মোটা অঙ্কের ইনাম নিয়ে আসছে। কাজের নমুনা কিছুই দেখায়নি। এবার তাকে এই ভারটা দিন, জাঁহাপনা। তারপর বোঝা যাবে তার এলেম।

খলিফা মাথা নাড়লেন, ঠিক, ঠিক বলেছো খালিদ। কই, আহমদ, এদিকে সামনে এসে দাঁড়াও।

তৎক্ষণাৎ আহমদ খলিফার সামনে এসে আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো।—মহামান্য ধর্মাবতার, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য, আদেশ করুন, জাঁহাপনা!

—শোনো আহমদ, খলিফা বলতে থাকেন, ধূর্ত ঠগ বুড়ি মেয়েছেলে এই বাগদাদ শহরের নিরীহ মানুষকে প্রতারণা করে বেড়াচ্ছে। সে-সব কাহিনী তুমিও নিশ্চয়ই এখানে শুনেছো। এখন আমার কথা হচ্ছে, এ ধরনের ব্যাপার আমার শহরে চলতে দিতে পারি না। আমি তোমাকে ভার দিচ্ছি, যে ভাবে পারো আজই ঐ মেয়েছেলেটাকে আমার সামনে হাজির কর।

আহমদ আর বিলম্ব করলো না। চল্লিশজন সিপাই ঘোড়-সওয়ার নিয়ে সে শহরের পথে বেরিয়ে পড়লো। বাদাবী দস্যু এবং সেই পঞ্চ প্রতারিতরা দরবারেই রয়ে গেলো।

আহমদের প্রধান সাগরেদ চল্লিশ সিপাই-এর সর্দার আলী এইসব তল্লাসী এবং গ্রেপ্তারে মহা-ওস্তাদ। তার প্রধান কারণ এক সময়ে সে-ও চোর ডাকাত দলের পাণ্ডা ছিলো। আটঘাট তার সবই নখদর্পণে। সে বললো, আহমদ সাহেব ঐ বুড়িকে পাকড়াও করা খুব একটা সহজ কাজ হবে মনে করবেন না। সারা বাগদাদে অমন হাজার-হাজার বুড়ি মেয়েছেলের দেখা পাবেন আপনি। তার মধ্যে কে যে শয়তানী কী করে ধরবেন?

আহমদ পাল্টা প্রশ্ন করে, তাহলে কী করবে, ভাবছো?

—আমার মনে হয় কী জানেন, এ বিষয়ে হাসান সাহেবের যুক্তি-পরামর্শ নিলে ভালো হতো। তাঁর মাথায় অনেক ভালো বুদ্ধি খেলে। এই ধরনের ধূর্ত শয়তান ঠগদের সেই কাবু করতে পারবে। কারণ আমরা বরাবরই ডাকাতি রাহাজানি ছিনতাই লুঠপাঠ করে কামিয়েছি, আর হাসান সাহেব তো পয়সা কামিয়েছেন লোককে ধোঁকা দিয়ে, ঠকিয়ে, চালাকী করে, বুদ্ধি খাটিয়ে। সুতরাং এ ব্যাপারটা তিনিই ভালো রপ্ত করতে পারবেন।

—না না না, আহমদ প্রায় চিৎকার করে ওঠে, এতোবড় নাম কেনার সুযোগ যখন আমার কপালে জুটেই গেছে সে সৌভাগ্যের বখরা আমি অন্য কাউকে দিতে চাই না।

এই সময় তারা চলতে চলতে হাসানের বাড়ির সামনে এসে পড়েছিলো। কিন্তু আহমদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে গলা ফাটিয়ে তখনও বলে চলেছে, একটা বুড়িকে পাকড়াও করা এমন কী শক্ত কাজ। অথচ তার জন্যে দরবারে আমার কী ইজ্জত বাড়বে একবার ভাবো তো! আর এই জিনিসের ভাগ দেবো আমি হাসানকে? সে কখনো হতে পারে না।

আহমদের অশ্বারোহী বাহিনীর খুরধ্বনি শুনে সে জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। সেখান থেকেই সে আহমদের সব কথা স্পষ্ট শুনতে পেলো। মনে মনে ভাবলো, ঠিক আছে আহমদ, তুমি আজ খলিফার বড় পেয়ারের লোক হয়েছো। কিন্তু আমারও নাম হাসান, দেখি তোমার দৌড় কতদূর।

শহরের মাঝখানে এসে আহমদ তার সেপাইদের চারভাগে বিভক্ত করে শহরের চারদিকে অনুসন্ধান করতে পাঠিয়ে দিলে। বললো, তোমরা তল্লাসী চালিয়ে সবাই মুস্তাফার বাড়ির গলির মুখে চলে আসবে সবাই। আমি সেখানে অপেক্ষা করবো।

নিমেষের মধ্যে সারা শহরময় রটে গেলো; আহমদের সিপাইরা শহরের বাড়ি বাড়ি খানাতল্লাসী করে সেই ধূর্ত বুড়িকে গ্রেপ্তার করতে বেরিয়েছে। কথাটা ডিলাইলাহ জাইনাবের কানে পৌঁছতেও দেরি হয় না। জাইনাব বলে মা, এখন কী উপায় হবে?

ডিলাইলাহ বলে, ঘাবড়াসনে বেটা, কিছু ভয় নাই। আমি খবর পেয়েছি, আহমদের সঙ্গে হাসান নাই। সে একা তার দলবল নিয়ে বেরিয়েছে। এই আহমদটা একটা মাথা-মোটা। ঘটে এক ফোঁটা বুদ্ধি নাই, ওকে আমি আদৌ ডরাই না। হ্যাঁ,ভয়ের কথা হতো,যদি হাসান ওর সঙ্গে থাকতো। লোকটা মহা ঠগবাজ। আর লোক ঠকাতে গেলে মগজে বুদ্ধি ধরতে হয়। তা তার আছে। সেইজন্যেই ওকে আমার ভয় ছিলো। খলিফা যদি আমাকে পাকড়াও করার জন্য হাসানকে ভার দিত, আমি বলতে পারি আমাকে সে গ্রেপ্তার করতে পারতো। কিন্তু আহমদের চৌদ্দ পুরুষেরও সাধ্যি হবে না, আমাকে কব্জা করতে। তবে আজকে আমার শরীরটা ভালো নাই বাছা, আমি আর পথে বেরুবো না। এক কাজ কর, আজ তুই একটু খেল দেখিয়ে দে ওদের। প্রমাণ করে দে দেখি, মা-এর চেয়ে মেয়ে কিছু কমতি যায় না! ঐ চল্লিশটা সিপাইকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যা তারা জীবনে ভুলতে পারবে না। কী, পারবি না?

জাইনাব হাসে, তোমার দোয়া থাকলে কোন্ কাজ আটকায়, মা?

রাত্রি শেষ হয়। অন্ধকার কেটে আসে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো ছেচল্লিশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু করে সে ঃ

জাইনাবের শরীর খানা সার্পিনীর মতো লকলকে। গভীর আয়ত টানাটানা চোখ,সুন্দর মুখের গড়ন, উদ্যত বুক, সরু কোমর, ভারী নিতম্ব। এক কথায় কামনার বহ্নিশিখা। খুব জমকালো সাজ-পোশাকে সাজগোজ করলো সে। আর খুব পাতলা রেশমী বোরখায় ঢাকলো তার অঙ্গ। বলা যায়, আরও বেশী করে দেখাবার জন্য, প্রলুব্ধ করার জন্যই এই ঢাকনা পরলো সে। এই রকম মোহিনী মূর্তি ধরে মায়ের কপালে চুমু খেয়ে সে বললো, মা আমার এই কুমারী যৌবনের কসম খেয়ে তোমাকে বলছি, ঐ চল্লিশটা সিপাইকে আজ আমি বাঁদর নাচ নাচাবো, তবে ছাড়বো।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে সোজা মুস্তাফার বাড়ির দিকে রওনা হলো। মুস্তাফার বাড়ির কাছাকাছি মসুলের হজ করিমের শরাবখানা। দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলো সে। জাইনাব মিষ্টি করে হাসির বান ছুঁড়লো তার দিকে।

হজ করিম ধন্য হয়ে গেলো। সে বারবার মাথা হেলিয়ে তাকে স্বাগত জানাতে থাকলো। জাইনাব কাছে এগিয়ে গিয়ে হজ করিমের হাতে পাঁচটা দিনার গুঁজে দেয়।

—এই পাঁচটা দিনার রাখুন করিম সাহেব। আমি আপনার বড় ঘরটা এক দিনের জন্য ভাড়া নিচ্ছি। আমার কিছু ইয়ারদোস্তরা ফুর্তি করতে আসবে।সেইজন্যে আপনার কাছে আমার আর্জি, এই একটা দিনের জন্য আপনি আপনার উটকো খদ্দেরদের ঢোকাবেন না। আপনার কোনও লোকসান হবে না, সে ভরসা আপনাকে দিচ্ছি।

হজ করিম বললো, শুধু আপনার জন্য, আপনার ঐ সুন্দর চোখের জন্য আমি আপনাকে মাগুনায় ঘরখানা ছেড়ে দিচ্ছি। শুধু আমার একটা অনুরোধ, আপনার মেহেমানদের আপ্যায়ন করার জন্য শরাব খাওয়াতে কার্পণ্য করবেন না।

জাইনাব হেসে বলে আমার দোস্তরা এক একটা মদের পিঁপে। শরাবে তাদের অরুচি নাই। আপনার দোকানে যত মদ আছে সবই সাবাড় করে দেবে তারা।

এই বলে জাইনাব আবার নিজের বাড়ি ফিরে যায়। সেখানে বাঁধা ছিলো সেই ছেলেটার গাধা আর বাদাবীর ঘোড়া। সে ভাড়া নিয়ে তাদের পিঠে বোঝাই করে গালিচা, আসন, তাকিয়া, পেয়ালা, পিরিচ এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম। তাঁর পর আবার ফিরে আসে হজ করিমের শরাবখানায়।

সে খুব কায়দা করে সরাইখানার সদর দরজা থেকে আরম্ভ করে ভিতরের ঘর পর্যন্ত চমৎকারভাবে সাজায়। ঘরের মেজেয় দামী গালিচাখানা বিছিয়ে দেয়। আর বড় বড় মদের বাহারী ঝারি বসিয়ে দেয় সদর দরজার দুইপাশে। তার সঙ্গে নানারকম লোভনীয় বাদশাহীখানার রেকাবীও থরে থরে সাজিয়ে রাখে সেখানে। নিজেও দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আহমদের দশজন অশ্বারোহী সিপাই এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে আহমদের প্রধান সাগরেদ আলীও ছিলো। তার সাজগোজ একেবারে জাঁদরেল সেনাপতির মতো। ন'জন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে সে শরাবখানার ভিতরে ঢুকে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে, ক্ষিপ্র হাতে জাইনাব তার মুখের নাকাব সরিয়ে দেয়। আলী অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়, তুমি এখানে কী করছো খুকি?

আলীর শরীরে রক্ত চনমন করে ওঠে। মেয়েটার দেহে যাদু আছে। জাইনাব বলে, আপনিই কী কাপ্তান আহমদ?

—খোদা হাফেজ, না আমি নই। কিন্তু আমি ওই সিপাইদলের সেনাপতি। আমার নাম আলী। তা, আহমদকে খুঁজছো কেন? শোনো সুন্দরী, তোমার জন্য আমি যা করতে পারি, স্বয়ং আহমদ তা করতে পারবে না। বলো তোমার কী চাই?

জাইনাব ফিসফিস করে বলে, আপনিই তো জাঁদরেল, কেন পারবেন না আপনি? নিশ্চয়ই পারবেন। তা এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? চলুন ভিতরে চলুন। একটু আরাম করবেন।

জাইনাব দশজনকেই সঙ্গে করে বড় ঘরের ফরাশে নিয়ে গিয়ে বসায়। গোল হয়ে বসে সকলে। তাদের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট বড় মদের ঝারি বসিয়ে দেয় সে। এই ঝারির শরাবে সে মিশিয়ে রেখেছিলো এক ঢেলা আফিং। পর পর দু পোয়ালা পেটে যেতেই বাছাধনরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো। তারপর পলকের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো তারা। জাইনাব তাদের পা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলো খিড়কীর দরজায়। দরজা খুলে ওদের গড়িয়ে দিলো কদর্মাক্ত নোঙরা আস্তাবলে। এইভাবে এক এক করে সবাইকে টেনে নিয়ে এসে সে গাদা করে রাখলো সেখানে।

এরপর আবার সে ফরাশ-টরাশ ঠিকঠাক করে ঝেড়ে-পুছে আবার এসে দাঁড়ালো সদর দরজার পাশে। কিছুক্ষণ বাদে আরও দশজন আহমদের সিপাই এসে দাঁড়ায় সেখানে। ঠিক একই কায়দায় তাদেরও কুপোকাৎ করে একইভাবে শরাবখানার পিছনে গাদা দিয়ে রেখে দেয় সে। এইভাবে তৃতীয় এবং চতুর্থ বাহিনীর কুড়িজনকেও সে চোখের বাণ মেরে, আফিং-মেশানো মদ খাইয়ে অচৈতন্য করে শরাবখানার পিছনে গাদা করে রেখে আসে।

জাইনাব আবার ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে সদরে এসে দাঁড়ায়। আসল মক্কেল এখনও আসেনি। কিন্তু জাইনাব জানে, ফাঁদ যখন সে পেতে বসে আছে, আসতে তাকে হবেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিকট হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দাঁড়ালো সে। তার চোখ দু'টো ভাঁটার মতো জ্বলছিলো। চোয়াল পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছিলো। ইয়া বড় হাতের চাবুকখানা বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে সে গর্জে ওঠে, কোথায় সেই সব কুত্তার বাচ্চাগুলো।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো আহমদ। শরাবখানার দেয়ালের একটা গজালে লটকে দিলো লাগামটা। —আমি তাদের তো এই রাস্তার মুখটায় জড়ো হয়ে থাকতে বলেছিলাম। তা শরাব-এর লোভ আর ছাড়তে পারেনি বেল্লিকরা। একেবারে নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে।

জাইনাব দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে এমন মায়াবিনীর হাসি হাসে, তার টাল আর সামলাতে পারে না বেচারা আহমদ। ওর চোখ দু'টো চেটে চেটে খেতে থাকে জাইনাবের কামলোভাতুর শরীরখানা। তাক বুঝে জাইনাবের সরু কোমরখানা দুলে ওঠে। তার ভারী নিতম্ব আর কচি কদু-সদৃশ স্তনদুটি আহমদের বুকের রক্তে তুফান তুলে। চোখের বিদ্যুৎ হেনে জাইনাব এক অপূর্ব লাস্যময়ী ঢং করে জিজ্ঞেস করে, কার কথা বলছেন, মালিক?

আহমদের অবস্থা তখন সপ্তমে। বুকের রক্তে নাচন ধরেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে, সারা শরীর কেমন শিরশির করছে।

জাইনাব তখন দুই পা ফাঁক করে এমন একটা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে দাঁড়িয়েছে যা দেখে আহমদের সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। কোনও রকমে বলতে পারে, আমার

চল্লিশজন সিপাই এখানে আসার কথা ছিলো, কিন্তু সুন্দরী, আমি বুঝতে পারছি না, তারা এখনও এলো না কেন? কিম্বা এসে তোমার দোকানে ঢুকে মদ গিলতে শুরু করেছে কিনা?

জাইনাব একদম সামনে নেমে এসে আহমদের হাত ধরে ওপরে তুলতে তুলতে বলে, আপনি ভিতরে বিশ্রাম করুন। আপনার চল্লিশজন সিপাই-ই এসেছিলো। আপনার জন্যে অপেক্ষাও করছিলো। হঠাৎ ওরা দেখতে পেলো, রাস্তার ওপাশ দিয়ে ডিলাইলাহ বুড়ি হনহন করে পালাচ্ছে। তাই সবাই তার পিছনে ধাওয়া করেছে। আপনার প্রধান সাগরেদ আলীসাহেব আমায় বলে গেছেন, আপনি আসবেন। আপনি এলে যেন আপনাকে খুব আদর-আপ্যায়ন করি, তাও আমাকে হুকুম করে গেছেন। আর এও বলে গেছেন, ডিলাইলাহর জন্য আপনি যেন বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেন। একবার যখন তার হদিশ করতে পেরেছে, ধরে তাকে নিয়ে আসবেই আপনার কাছে। শুনলেন তো সব, এবার তা হলে চলুন, ভিতরে গিয়ে আরাম করে বসবেন। তারপর একটু পরেই বামাল সুদ্ধ এসে হাজির হবে আপনার লোকজন।

মন্ত্রমুগ্ধ মানুষের মতো আহমদ জাইনাবের কাঁধে ভর দিয়ে শরাবখানার ভিতরে ঢুকে পড়ে। জাইনাব ওকে বড় ঘরের ফরাশে নিয়ে গিয়ে বসায়। আহমদের রক্তে তখন আগুন ধরে গেছে।

—শরাব লে আও।

জাইনাব পেয়ালা ভরে সেই আফিং মেশানো মদ এনে আহমদের মুখে ধরে। এক চুমুকেই সাবাড় করে দেয় সে। আর এক পেয়ালাও খেয়ে ফেলে। তারপরই ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। জোর করে চোখ খুলে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে দু-একবার। হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিয়ে জাইনাবকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। প্রায় অস্পষ্ট জড়ানো কণ্ঠে মিনতি করে ডাকে, আমার বুকে এসো গো সুন্দরী, তোমাকে গড়িয়ে দেবো—সতনরী হার—

ওর কথা আর শেষ হয় না। জাইনাব নিজেকে সরিয়ে নেয়। আহমদের বিপুল বিশাল দেহখানা এলিয়ে পড়ে যায় ফরাশে। আহমদ-এর গায়ে অনেক রত্নাভরণ ছিলো। এক এক করে সব সে খুলে নেয়—এমন কি তার দামী সাজ-পোশাকটা পর্যন্ত। শুধু একটা ইজার রেখে দেয় তার কোমরে। তারপর একই কায়দায় টানতে টানতে নিয়ে যায় খিড়কীর ওপারে। তার অনুচর চল্লিশজনের গাদার উপর চাপিয়ে দেয় তার দেহটাও।

এরপর যাবতীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধে নিয়ে খিড়কীর ওপাশে বেঁধে রাখা সেই গাধা আর ঘোড়াটার পিঠে চাপিয়ে সোজা বাড়ির পথে পাড়ি দেয় জাইনাব।

মেয়ের কীর্তি শুনে মা ডিলাইলাহর আর আনন্দ ধরে না।

—এই না হলে আমার মেয়ে। ধন্যি আমি, তোকে গভ্‌ভে ধরেছিলাম বেটি!

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সাতচল্লিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

আহমদ আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা পুরো দু'টো দিন পড়ে পড়ে ঘুমালো। তৃতীয় দিনের সকালে যখন তারা জাগলো, প্রথমে বুঝতেই পারলো না, কোথায় তারা পড়ে আছে। কিছুক্ষণ বাদে ঘুমের জড়তা কেটে গেলে একে একে সবই মনে পড়তে থাকলো। লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে কারো মুখে আর কোনও কথা নাই। সবাই মাথা নিচু করে বসে থাকে। কারো পরণেই পোশাক-আশাকের কোনও বালাই নাই। একটি মাত্র ইজার ছাড়া সবই লোপাট হয়ে গেছে। এখন এই প্রায় ন্যাংটো অবস্থায় তারা পথেই বা বের হবে কী করে। সেই চিন্তাতেই সবাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে হাসানকে তাদের দলে নেওয়া হয় নি। এ দশা দেখলে এখন সে টিট্‌কারি দিতে কসুর করবে?

কিন্তু উপায়ই বা কী? অগত্যা আহমদ ঐ অবস্থাতেই দলবল নিয়ে রাস্তায় নামলো। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। তা পড়বি তো পড়—একেবারে সেই হাসানেরই সামনে পড়ে গেলো তারা। পলকেই বুঝে নিলো সে ব্যাপারখানা। আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে গান গেয়ে ওঠলো। কিন্তু ভাবখানা এই—যেন সে কিছুই লক্ষ্য করেনি।

ডবকা ছুঁড়ি ভাবে মনে, সব পুরুষই এক
কারণ পাগড়ী পরে মাথায়, সবাই সাজে শেখ
কিন্তু সে কি জানে, কেউ বা তাদের গেঁয়ো ভূত কেউ বা কেতায় চোস্ত;
কেউ বা তাদের সফেদ গোরা জ্ঞান গরিমায় শ্রেষ্ঠ,
আবার কেউ বা তাদের হাঁদা বোকা উজবুক ভোঁদড়
গড্ডুরের মতো সুন্দর কেউ; আবার কেউ শকুনের দোসর।

গান শেষ করার পর সে চমকে ওঠার ভান করে। যেন এতক্ষণ আহমদকে আর তার ধনুর্ধরদের নজরই করেনি সে।

খোদা মেহেরবান, একি জাঁদরেল আহমদ ভাই; আজ এই সাত সকালে একি দৃশ্য দেখতে হলো আমাকে।

আহমদ বলে, হাসান তুমি বড় রসিক। তবে জেনে রাখো কেউই নিয়তি এড়াতে পারে না। নসীবে যা লেখা আছে তা খণ্ডন করবে কী করে? একটা সামান্য মেয়ের পাল্লায় পড়ে আজ আমাদের এই হাল, ভাবতে পারো? একেবারে বুড়বাক বানিয়ে দিয়েছে আমাদের। চেন তুমি তাকে?

হাসান বলে, আমি তাকে চিনি, তার মাকেও চিনি। ওদের দু'জনকে ধরে এনে দিতেও পারি। দেখতে চাও?

আহমদ অবাক হয়, সে কী করে সম্ভব?

—সম্ভব। সবই সম্ভব। কী করে যে সম্ভব হতে পারে তা তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতে পারি মাত্র একটি শর্তে।

—কী শর্ত?

—তুমি শুধু খলিফার কাছে অক্ষমতা জানিয়ে বলবে তোমার হিম্মতে কুললো না। ওদের তুমি পাকড়াও করতে পারবে না এবং তুমি আমার হয়ে ওকালতী করে খলিফাকে বলবে, হুজুর হাসানের ওপর দায়িত্ব দিন, সে এর বিধি ব্যবস্থা করতে পারবে।

হাসানের পরামর্শ মতো আহমদ তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে আসে। সাজ-পোশাক পরে মাথা হেঁট করে সে খলিফার সামনে দাঁড়ায়।

খলিফা প্রশ্ন করেন, সেই বুড়িটা কোথায়? তাকে ধরে এনেছো?

আহমদ মাথা চুলকায়, দোহাই ধর্মাবতার, আমার অপরাধ নেবেন না, এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। আপনি হাসানকে এ কাজে বহাল করুন, ও আপনার সামনে হাজির করে দেবে তাকে। এসব কাজ ও-ই আমার চেয়ে ভালো বোঝে। ও শুধু ঐ ধূর্ত বুড়িকেই ধরে আনতে পারবে না, সারা শহরের যত ঠগ জোচ্চোর—সবাইকে সে শায়েস্তা করে দিতে পারবে।

খলিফা প্রশংসার দৃষ্টিতে হাসানের দিকে তাকান, তাই নাকি হাসান? ওই বুড়িকে তুমি চেন? তোমার কী ধারণা, ঐ বুড়িটা শুধু মাত্র আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে এতো সব বিচিত্র কাণ্ডকারখানা করে চলেছে?

—আপনি যথার্থই বলেছেন, ধর্মাবতার। তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

খলিফা অবাক হয়ে বলেন, তোমার কথা যদি সত্যি হয় হাসান, তবে জেনে রাখ, আমি আমার পূর্বপুরুষদের নামে কসম খেয়ে বলছি, যে সব টাকা পয়সা গহনা-পত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী সে লোক ঠকিয়ে হাতিয়ে নিয়েছে, সেগুলো যদি সব আবার ফেরত দিয়ে দেয়, তা হলে, তার সব গুনাহ আমি মাফ্ করে দেবো।

হাসান বললো, আপনার জবান যে সাচ্চা—তার প্রমাণ আমার হাতে দিন, জাঁহাপনা।

খলিফা তার একখানা রুমাল হাসানের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। হাসান সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে দরবার মহল ত্যাগ করে বেরিয়ে সোজা চলে গেলো ডিলাইলাহর বাড়ি।

জাইনাব দরজা খুলে দিলো। হাসান জিজ্ঞেস করে, মা কোথায়?

জাইনাব বলে, ওপরের ঘরে।

হাসান বললো, তাকে গিয়ে বলো, সিপাহশালা হাসান এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এই দ্যাখো, স্বয়ং খলিফার রুমাল, তিনি ভরসা দিয়েছেন তোমার মা লোক ঠকিয়ে যে সব টাকা-কড়ি সোনা-দানা এবং অন্যান্য সামানপত্র হাতিয়ে নিয়েছে, সেগুলো যদি আবার তাদের ফেরত দিয়ে দিতে রাজি থাকে তবে তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। এরকম সুযোগ আর পাবে না সে। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাও, তা না হলে আমাকে বল-প্রয়োগ করতেই হবে।

জাইনাবের মুখে সব কথা শুনে ডিলাইলাহ নিচে নেমে এসে হাসানকে বলে, রুমালখানা আমাকে দিন। আমি সব সামানপত্র সঙ্গে নিয়ে খলিফার কাছে যাচ্ছি।

হাসান খলিফার রুমালখানা ডিলাইলাহর দিকে ছুঁড়ে দেয়। ডিলাইলাহ সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে গলায় বাঁধে। গাধা আর ঘোড়াটার পিঠে বোঝাই করে সেই সব সামানপত্র আর কন্যা জাইনাবকে সঙ্গে করে খলিফার দরবারের পথে রওনা হয়।

হাসান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব সামানপত্র পরীক্ষা করে বলে, সবই ঠিক আছে দেখছি কিন্তু আহমদ আর তার চল্লিশটি ধনুর্ধরের সাজ-পোশাকগুলো তো দেখছি না।

ডিলাইলাহ হাসে, ওগুলো আমি হাতাই নি হাসান সাহেব।

হাসান হো হো করে হেসে ওঠে,—বিলকুল ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় তার পিছনে জাইনাবের হাত আছে—কী? ঠিক না? ঠিক আছে ওগুলো এখন থাক।

হাসান তাদের সঙ্গে নিয়ে খলিফার দরবারে এসে হাজির হয়।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটচল্লিশতম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

সেই ধূর্ত বুড়িকে দেখামাত্র খলিফা হারুন অল রসিদ গর্জে ওঠেন, তুমিই সেই ঠগ! এতো বড় স্পর্ধা তোমার, আমার মুলুকে বাস করে আমারই নাকের ডগা দিয়ে এই সব প্রতারণা ধান্দাবাজী চালিয়ে যাচ্ছো? এখুনি তোমার আমি গর্দান নেবো।

ডিলাইলাহ অবাক হয়ে হাসানের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি না আমাকে বলেছিলেন হাসান সাহেব, ধর্মাবতার এই রুমাল দিয়ে অঙ্গীকার করেছেন!

হাসান তখন এগিয়ে এসে খলিফাকে কুর্নিশ করে বলে; ধর্মাবতার, বোধ হয় আপনার অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়েছেন। আপনার দেওয়া ঐ রুমালখানা ডিলাইলাহর গলায় বাঁধা আছে, জাঁহাপনা। আপনি কিছুতেই অন্য রকম হুকুম দিতে পারেন না।

খলিফা আত্মস্থ হন। —ওঃ, হ্যাঁ, তাই তো! আমি তো তোমাকে

জবান দিয়েছিলাম—। ঠিক আছে, জবানের তো নড়চড় হতে পারে না, হাসানকে যখন কথা দিয়েছি, সেইজন্যে তোমাকে মাফ্ করে দিলাম। কী নাম তোমার?

—আমার নাম ডিলাইলাহ। আপনার আগেকার চিড়িয়া সর্দারের বিধবা বিবি আমি।

খলিফা বললেন, তোমার নামের সঙ্গে একটা যোগ্য খেতাব থাকা দরকার। আমি তোমার নাম দিতাম ধূর্ত ডিলাইলাহ। সে যাক, এখন সাফ সাফ বলতো এই ক'দিন ধরে সারা শহরের নিরীহ মানুষের মনে এমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার করেছো কেন তুমি? তোমার ভয়ে লোকে এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না। আমার বাগদাদ শহর—সুখের শান্তির জায়গা। এখানে মানুষ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটায়। কিন্তু তোমার দাপটে তো সব তছনছ হয়ে যাবার দাখিল হয়ে পড়েছিলো। কী ব্যাপার, কেন এরকম আরম্ভ করেছিলে? আসলে কারণটা কী?

ডিলাইলাহ বলে, তবে শুনুন ধর্মাবতার, আমার কোনও লোভ-লালচ নাই! বাঁচতে গেলে পয়সার প্রয়োজন আছে ঠিকই, তাই বলে ধনদৌলতে ঘরবাড়ি ভরে ফেলবো—আমির বাদশাহ হবো, এমন লালসা আমার কোনও দিনই ছিলো না, আজও নাই। আমি যা চাই, তা হলো যশ, মান খ্যাতি। খলিফার দরবারে স্বীকৃতি। আমার মৃত স্বামী একদিন আপনার দরবারে এক উঁচু পদে বহাল ছিলেন, দেশের মানুষের কাছ থেকে অনেক সুনাম আদায় করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা আমাদের একেবারেই ভুলে গেছেন। আমাদের আজ আর কোনও বাদশাহী স্বীকৃতি নাই। আমি তারই প্রত্যাশী, জাঁহাপনা। টাকা পয়সার আমার তেমন প্রয়োজন নাই। আমি ধর্মাবতারের দরবারে সামান্য একটু জায়গা পেলেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

এই সময় সেই গাধার ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে চাপা আক্রোশে বলতে থাকে, আল্লাহ এর বিচার করবেন, এই বুড়ি আমার একমাত্র সম্বল গাধাটাকে লোপাট করেই ক্ষান্ত হয়নি। আমাকে এই মুর নাপিতের দোকানে ঢুকিয়ে আমার দু' দু'খানা দাঁত উপড়ে নিয়ে তার জায়গায় দু'খানা তপ্ত লোহার গজাল বসিয়ে দিয়েছিলো। আল্লাহ এর বিচার করবেন।

এরপর সেই বাদাবী দস্যু উঠে বলতে থাকে, এতো বড় সে ধাপ্পাবাজ, আমাকে পেটপুরে মধু-পিঠা খাওয়ার মিথ্যা লোভ দেখিয়ে আমার সাজ-পোশাক আর ঘোড়াটা নিয়ে সে চম্পট দিয়েছিলো।

এরপর সেই রঙের কারবারী, সওদাগর, সিদি মুসিন, জহুরী ইহুদী, কাপ্তান মুস্তাফা এবং কোতোয়াল খালিদ সবাই এক এক করে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষয়ক্ষতির কথা জানিয়ে অভিসম্পাত দিতে থাকলো!

সকলের বক্তব্য শোনার পর উদার মহৎ-প্রাণ খলিফা যার-যা খোয়া গিয়েছিলো সব তিনি ফেরত দিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে নিজের ধনাগার থেকে প্রত্যেককে তার যোগ্যতা মতো ইনামও দিলেন তিনি। গাধার মালিককে গাধার সঙ্গে আরও এক হাজার দিনার নগদ অর্থ দিয়ে বলা হলো, এই টাকায় সে তার নতুন দাঁত বাঁধিয়ে নেবে। এছাড়াও তাকে একটা চাকরী দিলেন তিনি। সারা দেশের যত গাধার রাখাল আছে সে হবে তাদের সর্দার।

সকলেই তাদের মনের দুঃখ ব্যথা ভুলে গিয়ে খুশি মনে দরবার থেকে বিদায় নিলো। খলিফার ন্যায় বিচার এবং বদান্যতার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো সকলে।

তখন খলিফা ডিলাইলাহকে প্রশ্ন করলেন, এবার ডিলাইলাহ, তোমার কী চাই বলো?

ডিলাইলাহ যথাবিহিত কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, ধর্মাবতার, আপনি আমার মৃত স্বামীপদে আমাকে বহাল করুন এই আমার এক মাত্র বাসনা। পাখীদের কী ভাবে বশ করতে হয়, আমার স্বামীর কাছ থেকে আমি তা বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছি। পাখিদের খাওয়ানো ধোয়ানো—পরিচর্যার সব কায়দা-কানুন আমার নখদর্পণে। তা ছাড়া ওদের শেখানো

পড়ানোর ব্যাপারেও আমি দারুণ ওস্তাদ। ওদের মুখে চিঠি ধরিয়ে, ইশারা করে তালিম দিয়ে উড়িয়ে দিলে ঠিক জায়গাতে চিঠি বিলি করে আসবে তারা। আমার স্বামী বেঁচে থাকতে আপনি যে বিরাট চিড়িয়াখানাটা বানিয়ে দিয়েছিলেন, আপনি জানতেন আমার স্বামীই সেটা দেখা শোনা করতেন, কিন্তু আসলে আমিই তার সবকিছু তদারক করতাম। সেই চিড়িয়াখানাটা পাহারা দিত চল্লিশজন নিগ্রো আর চল্লিশটা আফগান কুকুর। এই কুকুরগুলো যুদ্ধবিদ্যায় ওস্তাদ।

খলিফা চিৎকার করে ওঠেন, সাবাস! তুমি তো সবই জান দেখছি! আর দেরি নয়, আজই, এক্ষুণি তোমাকে আমি আমার প্রধান চিড়িয়া-রক্ষকের পদে বহাল করলাম। চিড়িয়াখানার সব ভার তোমার ওপরেই রইলো। এখনও সেই চল্লিশটা নিগ্রো আর চল্লিশটা আফগান যোদ্ধা কুকুর সেখানে আছে। আজ থেকে তারা সবই তোমার হেপাজতে গেলো। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, ডিলাইলাহ, আমার ঐ শেখানো পড়ানো পায়রাগুলো আমার প্রাণ। ওদের একটা খোয়া গেলে তোমাকে তার জবাবদিহি করতে হবে। অবশ্য তোমার এলেম সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমিই এর যোগ্য।

ডিলাইলাহ বললো, আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার মেয়ে জাইনাবকে আমি সঙ্গে নিতে চাই, জাঁহাপনা। সে আমার সঙ্গে চিড়িয়াখানাতে থেকে কাজকাম দেখাশুনা করতে পারবে।

খলিফা বললেন, ঠিক আছে, আমি অনুমতি দিলাম।

ডিলাইলাহ খলিফাকে কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নেয়। বাড়ি ফিরে এসে সে তার ঘরের সমস্ত সামানপত্র বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে চিড়িয়াখানার পথে রওনা হয়।

আজ ডিলাইলাহর শাহী সাজ-পোশাক। মাথায় সোনার তাজ পরে সে সদর্পে পথ চলে। সবাই তাকে দেখুক, সে আজ বাদশার কত বড় সরকারী কর্মচারী! গোটা চিড়িয়াখানার সে সর্বময় কর্তা। তার কথায় চল্লিশজন ইয়া তাগড়াই নিগ্রো নিয়ত উঠ্ বোস করছে। চল্লিশটা লড়াকু কুকুর আজ তার দখলে। বলতে গেলে, তার হাতে অসীম ক্ষমতা। খলিফার বিশাল মুলুকের নানা সুবাদারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার সে-ই একমাত্র চাবিকাঠি। তার ইশারাতেই পায়রা আকাশে উড়বে। যথানির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে নেমে চিঠি বিলি করে আবার ফিরে আসবে।

রাত্রিবেলায় ডিলাইলাহ চল্লিশটা কুকুর চিড়িয়াখানার চারপাশে ছেড়ে দিয়ে রাখে। কার সাধ্য, কোনও চোর বদমাশ ভেতরে ঢোকে। একেবারে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেবে না তারা?

প্রতিদিন সকালে বিকালে সে দরবারে গিয়ে খলিফার সঙ্গে দেখা করে। কোথায় কোন্ সুবাদারকে কী খৎ পাঠাতে হবে বলে দেন তিনি। ডিলাইলাহ যথানিয়মে কাজ করে যেতে থাকে।

চিড়িয়াখানার ভিতরে তার সুরম্য আবাসগৃহে বসে দেওয়ালে ঝুলানো আহমদ আর তার চল্লিশ ধনুর্ধরের সেই সাজ-পোশাকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে মনে কী এক অপূর্ব আত্মপ্রসাদ অনুভব করে ডিলাইলাহ।

এইভাবে এককালের ঠগ প্রবঞ্চক ডিলাইলাহ এবং ছলনাময়ী জাইনাব বাদশাহী মর্যাদার শিখরে বসে দেশজোড়া নাম যশ খ্যাতি আর প্রচুর ইনামের অধিকারিণী হয়ে ওঠে।

কিন্তু এভাবেও সব দিন চলে না। বিধাতার ইচ্ছা বোধহয় অন্যরূপ ছিলো। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের চাকাও ঘুরে যায়।

এরপর জাঁহাপনা, শাহরাজাদ গল্পের প্রথম অধ্যায় শেষ করে বলে, আলী চাঁদ আর তার অভিযানের কাহিনী বলার সময় এসে গেছে। ডিলাইলাহ এবং জাইনাবের সঙ্গে এই আলীচাঁদ-এর কাহিনী অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এদের সঙ্গে ডিলাইলাহর ভাই মাছের কারবারী জুরেক এবং সেই ইহুদি জহুরী ও যাদুকর আজারিয়াহর কাহিনীও শুনুন। সব মিলে এমন মজাদার কিস্‌সা—এর আগে কখনও শোনেননি আপনি।

শারিয়ার ভাবে, মেয়েটাকে তো মারা যাবে না কিছুতেই। এমন কিস্‌সার শেষটুকু না শুনলে তো চলছে না। দেখাই যাক, আলীচাঁদকে নিয়ে সে কি—কিস্‌সা বানায়।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখে প্রভাত সমাগত, গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো ঊনপঞ্চাশ রজনী। আবার সে যথারীতি গল্প শুরু করলো ঃ

বাগদাদে আহমদের সময়ে আর একজন সেয়ানা চোর ছিলো। তার নাম আলীচাঁদ। তাকে কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যেত না। পাঁকাল মাছের মতো পিছলে বেরিয়ে যেত। আলীচাঁদের আসল বাস কাইরোয়। এবং এই নামটাও তার তার নিজের নাম নয়।

বাগদাদে আসার আগে সে কাইরোতেও এই চুরি ডাকাতিই করতো। কেন তাকে স্বদেশ ছেড়ে বাগদাদে পালিয়ে আসতে হয়েছিলো আগে সেই কাহিনী শুনুন।

একদিন আলীচাঁদ দুঃখিত এবং বিষণ্ণ মনে তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে বসেছিলো তাদের আস্তানায়। দলের সবাই কাঁচা খিস্তি খেউর-এ মত্ত ছিলো, কিন্তু সেদিন আলীচাঁদের কিছুই ভালো লাগছিলো না। সে এক কোণে বসে বসে অন্য কথা ভাবছিলো।

ওস্তাদ, একজন এগিয়ে এসে বললো, এইভাবে বসে না থেকে চলো কাইরোর পথে বাজারে একটু ঘুরি। হয়তো ভালো মতো মালকড়ি কিছু মিলেও যেতে পারে।

নিরাসক্তভাবে আলী বললো, তোরা থাক, আমি একাই চলি।

আলী রাস্তায় নামে। চলতে চলতে সে লালপথে চলে আসে। কাছেই একটা শরাবখানা—এইখানেই ওরা নেশাভাঙ করে। ভিতরে ঢুকতে যাবে সে, এমন সময় দেখা হলো এক ভিস্তিওলার সঙ্গে! লোকটার কাঁধে চামড়ার থলে ভর্তি জল, হাতে দু'খানা তামার পেয়ালা। লোকটা সারাদিন শহরের পথে পথে জল বিক্রি করে। সদাই তার মুখে নানা সুরের নানা ঢংএর গান শহরবাসীরা নিত্য শোনে। সেদিনও সে গান গাইছিলো মুখে আর বোল বাজাচ্ছিল পেয়ালায় পেয়ালা ঠুকে।

আলী এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়ে। বুড়োটা বেশ মজার গান ধরেছে আজ। হঠাৎ তার মেজাজখানা অনেকটা শেরিফ হয়ে ওঠে। ভিস্তিওলাকে ইশারায় কাছে ডাকে।

লোকটা কাছে এসে একটা পেয়ালায় জল ঢালতে উদ্যত হয়, কী সাহেব দেব নাকি? আমার পানী শহরের সেরা। একবার যে খেয়েছে, সেও পস্তাবে আর যে না খেয়েছে, সেও পস্তাবে। বিলকুল চিড়িয়া কা আঁখো কা তরা সাফা। দেখুন খেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।

আলী ইশারায় বলে, দাও।

কিন্তু জলের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে সে পান করে না। ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ভিস্তিওলা অবাক হয়, ইয়া আল্লা ফেলে দিলেন, সাব?

—আর এক পেয়ালা দাও।

দ্বিতীয়বারও সে একই কায়দায় জলটুকু ফেলে দেয়।

এবার ভিস্তিওলা চটে যায়। যদি পিয়াসই না পেয়ে থাকে তবে ঝুটমুট নিয়ে ফেলে দিচ্ছেন কেন, মালিক?

—এমনি, মজা লাগছে। দাও, আর এক পেয়ালা দাও।

ভিস্তিওলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেয়ালা পূর্ণ করে আলীর হাতে দিতে দিতে বলে, এইভাবে পিয়াসের পানি নিয়ে যদি ছেলেখেলা করতে থাকেন তবে আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার কাজে চলে যাই।

এবার আলী জলটুকু গলায় ঢেলে দেয়। তারপর জেব থেকে একটা সোনার মোহর বের করে ভিস্তিওলার হাতে দিয়ে বলে, এবার হয়েছে তো?

আলী ভেবেছিলো সোনার দিনারটা হাতে পেয়ে লোকটা খুশিতে গদগদ হয়ে তাকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে চলে যাবে। কিন্তু সে-সব কিছুই করলো না সে। দিনারটা হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে আলীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েক বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বললো।

—খানদান দুসরা চিজ! পয়সা থাকলেই বা ছড়ালেই তা কব্জায় আনা যায় না।

ভিস্তিওলার এই রকম কথায় আলীর হাড়পিত্ত জ্বলে ওঠে। ঠাই ঠাই করে গোটাকতক রদ্দা বসিয়ে দেয় তার মাথায়।

—ওরে বুড়ো বোকা বেহুদা, তোর তিন পেয়ালা পানির দাম কতো? তিন পয়সাও হবে না! তার জায়গায় আমি তোমাকে নগদ একটা সোনার দিনার দিলাম, তার বদলে আমাকে এই রকম খারাপ কথা বলছো? তোমার টুঁটি আমি ছিঁড়ে ফেলবো, বদমাইশ, জানো আমি কে?

রাগে তার মাথায় খুন চেপে যায়। আলীর এক একটা ঘুষির ওজন নেহাৎ কম নয়। মারতে মারতে লোকটাকে সে ফোয়ারা-বাগিচার দেওয়ালের কাছে এনে ফেলে।

—খানকির বাচ্চা, তোকে আজ আমি খতম করে ফেলবো। জিন্দগীতে একটা সোনার দিনার চোখে দেখেছিস কখনও? তোর কতটুকু পানি আমি খেয়েছি বা নষ্ট করেছি? সব মিলে একটা পোয়াও হবে না। তার দাম কত?

বুড়ো ভিস্তিওলা বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার পানির দাম তিন দিরহামের বেশি হবে না।

—তবে? তবে কেন তুমি ঐ রকম খানদান তুলে কথা শোনালে আমাকে? আমার মতো এই রকম দিল-দরিয়ার মানুষ কোথাও দেখেছো কখনও?

বুড়ো বলে, আল্লাহ সাক্ষী, দেখেছি, এমন দরাজ দিলের মানুষ আমি দেখেছি যা তামাম দুনিয়া চুঁড়লে তার জুড়ি মিলবে না!

আলীচাঁদ জিজ্ঞেস করে, কে সে? কার কথা বলছো?

আলীচাঁদের হাতের মুঠিতে তখনও লোকটার চুলের গোছা ধরা। ভিস্তিওলা বললো, মেহেরবানী করে আমাকে যদি ছেড়ে দেন, কোথাও গিয়ে একটু বসেন তবে শোনাতে পারি সে কাহিনী ঃ

এই সময় রাত্রি শেষ হচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঞ্চাশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

আলী আর ভিস্তিওলা বাগিচার ভিতরে ঢুকে ফোয়ারার পাশে শান-বাঁধানো চবুতরায় সিঁড়ির ধাপে গিয়ে বসে। তারপর সেই বুড়ো তার কাহিনী বলতে শুরু করে।

শুনুন মালিক, আমার বাবা ছিলো এই শহরের সব ভিস্তিওলাদের সর্দার। শুধু যারা ধরাবাঁধা বাড়ি বাড়ি পানি দিয়ে বেড়াতো তারা নয়, আমার মতো পথে পথে যারা যেসব ভিস্তিওলা পানি ফিরি করে ফিরতো তাদের সকলেরই প্রধান ছিলো সে। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে আমি পেলাম পাঁচটি উট একটি খচ্চর, একখানা দোকান এবং

একখানা মকান। আমার মতো লোকের পক্ষে এই-ই অনেক। কিন্তু গরীবরা কিছুতেই তুষ্ট হতে পারে না। যদি কখনও কোনও কারণে তারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারে তখন আর তারা তা ভোগ করে যেতে পারে না। আনন্দের চোটেই অক্কা পায়।

আমি ভাবলাম, আমার এই বিষয় আশয়কে আরও অনেক বাড়াতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য যাহোক একটা কিছু করতে হবে।

আমাকে শহরের অনেক খানদানী মানুষ এবং সওদাগররা খুব বিশ্বাস করতো। মক্কায় হজ-এ যাবার দিন এসে গেলো। আমি আমার উটগুলো আর খচ্চরটা ভাড়া খাটানোর জন্যে হজে যাবো বলে ঠিক করলাম।

কিন্তু ঐ যে বললাম, গরীব মানুষ কখনও বেশি পয়সার মুখ দেখতে পায় না, আর যদি কখনও দেখেও ভোগ করতে পারে না। তার আগেই তার মৃত্যু হয়।

সেবার আমার এমনই বরাত, আমি যখন মক্কার পথে যাবো ঠিক করলাম, তার আগেই তীর্থযাত্রীরা রওনা হয়ে গিয়েছিলো। পথে আমি একা পড়লাম। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ডাকাতের হাতে পড়ে মালপত্র সব খুইয়ে বসলাম। কিন্তু মহাজনরা শুনবে কেন, তাদের দেনা শোধ করতেই হবে। তাই আমার উটগুলো আর খচ্চরটাকে বিক্রি করে মোটামুটি জনাকয়েক পাওনাদারের দেনা চুকালাম। কিন্তু আরও অনেকে রয়ে গেলো। তখন ভাবলাম, এই অবস্থায় আমি যদি দেশে ফিরি, আমার মহাজনরা আমাকে রেহাই দেবে না। দেনা চুকিয়ে দিতে না পারলে তারা আমাকে ফাটকে দেবে। সুতরাং আমি সিরিয়ার এক তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে দামাসকাসে চলে গেলাম। তারপর সেখান থেকে আলেপ্পো হয়ে বাগদাদে গিয়ে পৌঁছলাম।

বাগদাদের ভিস্তিওয়ালা সমিতির সভাপতির সঙ্গে দেখা করে তাকে আমার দুঃখের কাহিনী শোনালাম সব। আর শোনালাম, আমার চোস্ত আরবী উচ্চারণে কোরাণ পাঠ। মিয়াঁ সাহেব আমার ওপর খুব সদয় হলো। তার পয়সায় আমাকে একখানা চামড়ার ভিস্তি আর দু'খানা তামার পেয়ালা কিনে দিয়ে বললো, যাও, পথে পথে পানি বিক্রি করে খাওগে।

কিন্তু অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। সারা বাগদাদ শহরের দোরে দোরে পথে ঘুরেও আমি দু'খানা রুটির পয়সা রোজগার করতে পারলাম না।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, কাইরো আর বাগদাদের মানুষের মধ্যে অনেক ব্যাপারে আদপেই কোনও মিল নাই। বাগদাদের মানুষ পয়সা দিয়ে পানি কিনে খেতে অভ্যস্ত নয়। পিপাসার্ত কেউ যে-কোনও বাড়িতে বা দোকানে যদি পানি চায়, সাগ্রহে দেয় সকলে। তারা বলে, পানি মানুষের প্রাণতুল্য—এবং এ-বস্তুটি আল্লাহ তৈরি করে পাঠিয়েছেন মানুষের প্রাণ ধারণের জন্য। পয়সার বিনিময়ে যারা তা বিক্রি করে, তারা কাফের। এবং এই কারণে এ ব্যবসা যেমন কেউ করেও না, তেমনি বড় একটা দরকারও হয় না।

যাকেই জিজ্ঞেস করি, 'পানি খাবেন?' সেই 'না' বলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। একজন আমাকে কিছুটা করুণা করেই উপদেশ দিয়ে গেলো, তুমি বড় বাজে ব্যবসায় সময় নষ্ট করছো। এ ধান্দা ছেড়ে অন্য কিছু করার উপায় দেখ।

আর একজনকে বলতেই সে প্রায় ক্ষেপে গেল আমার ওপর, তুমি কি আমাকে খানা খাইয়েছো, যে পানি দিতে চাইছো? আগে খেতে দাও, তারপর তোমার পানি দিও।

আর একজনের মন্তব্য, আল্লাহর তৈরি পানি বিক্রি করে নাফা করছো? ঠিক আছে, এখানে সুবিধে হবে না, পথ দেখ।

এতো সত্ত্বেও আমি কিন্তু হাল ছাড়তে চাইলাম না। বাজারের দোকানে দোকানে

ফিরি করে বেড়াতে থাকলাম। কিন্তু লাখোপতি সওদাগর থেকে কুলি মজুর কেউই আমার খদ্দের হতে এগিয়ে এলো না। কেউ দয়া দেখিয়েও বললো না, আচ্ছা, এসেছো যখন, দাও এক পেয়ালা।

এইভাবে দুপুর গড়িয়ে গেলো। কিন্তু তখনও সামান্য দু'খানা রুটির পয়সা রোজগার হলো না আমার। গরীবদের খিদে পায় বেশি। কিন্তু খিদের চাইতে লজ্জা-সঙ্কোচ তাদের আরও বেশি। বড় লোকদের লজ্জা-শরম গরীবদের চাইতে কম। আমি আপনার ব্যবহারে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছি। আপনার পয়সা আছে, আপনি বড় লোক। কিন্তু একটা কথা ইয়াদ রাখবেন, পানি পয়দা করেছেন খোদাতাল্লা। তাঁর জিনিস, যা না পেলে আপনি জীবন ধারণ করতে পারেন না, এমনি ভাবে খেয়াল খুশিমতো নষ্ট করলেন কেন? আপনাকে হয়তো কড়াভাবেই কথাগুলো বললাম, কিছু মনে করবেন না। ঘরে গিয়ে একা একা চিন্তা করবেন। দেখবেন, আমি যা বললাম তার অর্থ মালুম হবে।

যাই হোক, আমার কিস্‌সা শুনুন ঃ বাগদাদের পথে পথে পানি ফিরি করে সাকুল্যে কিছুই রোজগার হলো না। সারাদিন পেটে দানা-পানি পড়েনি। খিদের জ্বালায় ছটফট করতে থাকলাম।

—ইয়া, আল্লাহ, এই কী তোমার বিচার? এক টুকরো রুটিও কী আমার বরাতে লেখোনি? এর চাইতে আমার নিজের দেশে ফাটকে কয়েদ খাটাও তো ভালো ছিলো? এই বিদেশ বি-ভূঁই-এ অনাহারে মারা যাবো? এখানে কেউ পয়সা দিয়ে পানি কিনে খায় না।

রাস্তার ধারের একটা বাড়ির রোয়াকে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী রোমন্থন করতে করতে আপন খেয়ালে বিড়বিড় করে চলেছি, এমন সময় দেখলাম বাজারের লোকজনের মধ্যে হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠলো। নানা দিক থেকে ছেলে বুড়ো সবাই ছুটে আসতে লাগলো রাস্তার মোড়ে। যেখানেই বেশি লোকের ভীড় অতি স্বাভাবিক কারণেই সেদিকে আমার নজর। তাই আমিও পানির ভিস্তিটা কাঁধে ঝুলিয়ে সেইদিকে ছুটে যাই। মানুষের ভীড় ঠেলে যখন রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালাম, দেখি, এক বিরাট জমকালো মিছিল চলেছে। একই সাজের বাহারী পোশাক পরে রাস্তার দু'পাশ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে চলেছে সিপাইবাহিনী। সকলের হাতে ইয়া বড় বড় লাঠি। কোমরে ঝোলানো তলোয়ার। সিপাইদের সর্দারকে দেখলাম—পেল্লাই চেহারা। মুখের দিকে তাকালে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। রাস্তার ওপরে দু'পাশের দণ্ডায়মান মানুষ মাথা নুইয়ে তাকে সালাম জানাতে লাগলো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করি, কীসের মিছিল? আর ইনিই বা কে?

লোকটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো, একটা ছোট ছেলেও জানে, আর তুমি জান না? ওঃ, তুমি তো পরদেশী, তাই! তোমার কথার টান শুনেই বুঝেছি, তুমি মিশরের বাসিন্দা। তা শোনো, ঐ যে সিপাইদের সেনাপতি দেখছো, ওঁর নাম আহমদ। খলিফার একেবারে ডান হাত। সারা শহরের শান্তি বজায় রাখার ভার ওঁকে দিয়েছেন খলিফা। মাসে হাজার দিনার ইনাম পায়। হুঁ হুঁ বাবা, যে সে আদমী নন। খোদ খলিফার খাস পেয়ারের লোক। আহমদ সাহেবের মতো আর একজন সেনাপতি আছে খলিফার। তার নাম হাসান। তিনিও মাসে হাজার দিনার পান। আর এই সিপাইরা পায় প্রত্যেকে একশো দিনার। প্রাসাদ থেকে ওরা এখন শহর দেখতে বেরিয়েছেন। এরপরে খানা-পিনা করতে যাবেন।

আমি আর কাল-বিলম্ব না করে আমার স্বদেশী টানে জোরে হাঁকতে থাকি। পানি চাই—পা—নি—

তামার পেয়ালা দু'টো ঠুকে ঠুকে ঠুন ঠুন আওয়াজ তুলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ

করার চেষ্টা করি। একটু আগে আপনি যেমন শুনছিলেন ঠিক তেমনি মিঠে আওয়াজ।

সেপাই সেনাপতি আমার গলার স্বর শুনে আমার পাশে এগিয়ে এলেন, তুমি তো মিশরের লোক, তাই না ভাইসাব? আমি তোমার কথার টান শুনেই বুঝতে পেরেছি। দাও, আমাকে এক পেয়ালা পানি দাও।

আমি পর পর তিনবার তাঁকে তিন পেয়ালা পানি ভরে দিলাম। কিন্তু ঠিক আপনারই মতো তিনিও দু-দুবার পেয়ালার পানি মাটিতে ফেলে দিলেন। খেলেন শেষ পেয়ালা। একেবারে এক ঢোকে—ঠিক আপনারই মতো করে। তারপর বললেন, আমার কাইরো ভাইরা দীর্ঘজীবী হোন। আচ্ছা, তুমি কেন পানি বিক্রি করতে স্বদেশ ছেড়ে এই বাগদাদে এসেছো? এদেশের মানুষ এ ব্যবসাটাকে ভালো নজরে দেখে না। আর পয়সাও রোজগার হয় না এতে।

আমি সংক্ষেপে আমার ধার-দেনার কাহিনীটুকু বললাম তাকে। সেনাপতি সাহেব দয়া-পরবশ হয়ে আমাকে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বকশিশ দিলেন। তারপর সিপাইদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এই ভিস্তিওলা ভাইটি আমার দেশের লোক। দায়ে ঠেকে আজ সে বাগদাদে এসে এই কাজ করছে। তোমরা যে যা পারো, একে একটু খয়রাতি করো।

সেনাপতি সাহেবের অনুরোধ মানেই হুকুম। তাই প্রত্যেক সেপাই এক পেয়ালা করে পানি খেয়ে একটা করে দিনার হাতে তুলে দিলো আমার। এক দণ্ডের মধ্যে আমি শতাধিক দিনারের মালিক হয়ে গেলাম। সেনাপতি আহমদ বললেন, আমরা রোজই এই সময় এই পথ দিয়ে যাই। তুমি দিনকয়েক এখানে দাঁড়িয়ে থেকো। তা হলেই অনেক টাকার জোগাড় হয়ে যাবে। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে তোমার দায় দেনা শোধ করে দিও।

এইভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই আমার থলেটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। গুণে দেখলাম হাজারেরও বেশি হয়ে গেছে। বুকে বল ফিরে পেলাম। যাক, এবার তাহলে দেশে ফিরতে পারবো। সব মানুষের কাছে তার নিজের দেশই সেরা। তার চাইতে মধুর আর কিছুই হতে পারে না। ভাবলাম, দেশে ফিরে সব আগে আমি দেনা পরিশোধ করবো।

ভিস্তি-সর্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশের পথে রওনা হলাম একদিন।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো একান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

একদল যাত্রী কাইরোর দিকে যাচ্ছিল, আমি তাদের দলে ভিড়ে গেলাম। হ্যাঁ ভালো কথা, বলতে ভুলে গেছি, সেনাপতি আহমদ সাহেব আমাকে একটা তাগড়াই খচ্চর আর একশোটা মোহর দিয়ে বলেছিলেন, শোনো ভাই, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে।

—বলুন মালিক কী কাজ, আলবৎ করে দেবো।

আহমদ বললেন, কাজটা খুব গোপনীয়। কেউ যেন টের না পায়। আচ্ছা তুমি কাইরোর কী অনেক মানুষকে চেনো?

—তা চিনি বইকি। শেরিফ আদমিদের সবাইকে চিনি আমি।

—ঠিক আছে, এই খৎখানা ধরো। কাইরোর চাঁদ আলীকে দিতে হবে।সে আমার পুরানো দোস্ত। খুঁজে বের করতে পারবে তাকে? চিঠিখানা দিয়ে শুধু তাকে বলবে, তোমাদের ওস্তাদ এখন বাগদাদে স্বয়ং খলিফা হারুন-অল রসিদের দক্ষিণ হস্ত হয়ে বহাল তবিয়তে আছে। সে যেন আর দেরি না করে বাগদাদ শহরে চলে আসে আমার কাছে।

কাপ্তান আহমদের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে তাকে সালাম জানিয়ে আমি কাইরোর যাত্রীদলের সঙ্গে সামিল হয়ে গেলাম।

পুরো পাঁচ দিনের পথ। বাগদাদ থেকে কাইরো। দেশে ফিরে এসে জনে জনে ডেকে তাদের পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে আমি ঋণমুক্ত হলাম। কাপ্তেন আহমদকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালাম। একমাত্র তাঁরই কল্যাণে আজ আমি দেশে ফিরে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলাম।

আবার আমার জাত-ব্যবসায় নেমে পড়লাম। কাঁধে পানিভর্তি ভিস্তি ঝুলিয়ে দু'টো তামার পেয়ালায় ঠুনঠুনি বাজিয়ে আবার পথে পথে পানি ফিরি করে বেড়াতে থাকলাম। দিবারাত্র সব সময় আমি আহমদ সাহেবের খৎখানা বয়ে বেড়াচ্ছি। চাঁদ আলীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে চিঠিখানা। কিন্তু তামাম বাগদাদ শহর ঢুঁড়েও তার কোনও হদিস করতে পারিনি আজ পর্যন্ত।

ভিস্তিওলা এই পর্যন্ত বলে থামলো। চাঁদ আলী আনন্দের আতিশয্যে ভিস্তিওলাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে এলোপাতাড়ি চুম্বন করতে থাকে, আল্লাহই তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছে। আমি—আমিই সেই চাঁদ আলী। কই, দাও আমার ওস্তাদের চিঠিখানা।

ভিস্তিওলাও বিস্মিত হয়। এক মুহূর্ত হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে চাঁদের মুখের দিকে। তারপর আনন্দে ভরে ওঠে ওর মুখ। বলে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই দেব। দেবার জন্যেই তো এতোদিন ধরে সঙ্গে সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছি, মালিক, এই নিন।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে চাঁদ আলী বলে, তোমার সঙ্গে হয়তো খানিকটা খারাপ ব্যবহার করেছি। তার জন্যে কিছু মনে করো না, ভাই। আহমদ সাহেব আমাদের দলের ওস্তাদ ছিলেন। আমি তাঁর পেয়ারের সাগরেদ।

চিঠির বয়ানঃ

প্রাণাধিক পুত্রসম চাঁদ আলীর প্রতি মহামান্য খলিফার সিপাই-প্রধান আহমদের আন্তরিক অভিনন্দন।

চাঁদ, আসমানের চাঁদ, আমার দিল-কা কলিজা, তোমার কাছে উড়ে যাবো, আমার প্রাণের কথা বলবো, সে ক্ষমতা আমার নাই। আল্লাহ আমাকে পাখীর মতো দু'খানা ডানা দেননি।

তুমি হয়তো শুনে খুশি হবে এখানে আমি চল্লিশটা কেতা-দুরস্ত পাজি বদমাইশের কাপ্তান বনে বহাল-তবিয়তে দিন কাটাচ্ছি। আমার সাগরেদ সিপাইগুলো সবাই পুরোনো দাগী-আসামী। হাজারো রকমের চুরি ডাকাতি ছিনতাই-এ তারা চোস্ত ছিলো এক সময়। আজ সুলতানের অনুগ্রহে সবাই শাহী তক্‌মা পেয়েছে। খলিফা আমাকে শহর রক্ষার ভার দিয়েছেন। তিনি হাজার দিনার বেতন দেন আমাকে। এছাড়া উপরি রোজগার তো আছেই।

পেয়ারের চাঁদ, যদি তুমি গুছিয়ে নিতে চাও, আর কাল-বিলম্ব না করে পত্রপাঠ আমার কাছে চলে এসো। তোমার যা শয়তানী বুদ্ধি আমি দেখেছি, তাতে তুমি এখানে এলে, বাজী মাৎ করে দিতে পারবে। বাগদাদের পথেঘাটে পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে। তোমার মতো চৌকস্ নওজোয়ান আমার পাশে এসে দাঁড়ালে আমরা কামাল করে দিতে পারবো। তুমি আমার মনের মতো সাগরেদ। তোমাকে যে-সব ফন্দী-ফিকির প্যাঁচ-পয়জার আমি হাতে কলমে শিখিয়েছি তার দু চারটে নমুনা যদি এখানে একবার ছাড়ো, খলিফা তোমাকে মাথায় করে রাখবেন। আর তাছাড়া আমি তো আছিই, খলিফার কাছে তোমার গুণগান আমি গাইবো, যাতে তিনি তোমাকে একটা উঁচু পদে বহাল না করে পারবেন না।

আর দেরি করো না, খুব তড়ি-ঘড়ি চ'লে এসো, বেটা। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে রইলাম। আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন।

চাঁদ আলী চিঠিখানা পড়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। হাতের ছড়িখানা ঠুকে ঠুকে সে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে নাচন-কোদন শুরু করে দেয়। আজ

তার কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। তার গায়ের ধাক্কায় রাস্তার ভিখিরিরা হুমড়ী খেয়ে পড়ে। চাঁদ শুধু নেচেই চলে। আর ঘন ঘন চিঠিখানায় ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খায়।

ভিস্তিওলা বলে, তা হলে এবার আমি চলি, মালিক।

চাঁদ ওর গলা জড়িয়ে ধরে। জেবে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো মোহর বের করে ভিস্তিওলার ঝুলিতে ভরে দেয়। তারপর ছুটতে ছুটতে চলে যায় তার মাটির তলার গুপ্ত ডেরায়।

—শোন, সাগরেদ দোস্তরা। আমি ঠিক করেছি, বাগদাদে চলে যাবো। সেখান থেকে আমার ওস্তাদ আহমদ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। এখন বল, তোমাদের কি মত?

চোরচোট্টাগুলো সমস্বরে প্রতিবাদ জানায়, সে কী করে হয়, ওস্তাদ? ভাঁড়ারে রেস্ত বলতে কিচ্ছু নাই। এই অবস্থায় আমাদের এখানে ফেলে রেখে তুমি কেটে পড়বে?

চাঁদ বলে, কী করবো বলো, নিয়তি আমাকে ডাকছে। আমার পুরানো সাথী ওস্তাদের ডাকে সাড়া দিতেই হবে।

সাঙ্গপাঙ্গরা ক্ষোভ জানায়, এ অসহায় অবস্থায় আমাদের ফেলে তুমি বাগদাদে চলে যাবে, ওস্তাদ, একী তোমার ধর্মে সইবে?

চাঁদ বলে, না; একেবারে সহায়-সম্বলহীন করে তোমাদের ছেড়ে যাবো না। আমি বাগদাদে যাবার পথে দামাস্কাসে কাটাবো কয়েকটা দিন। সেখান থেকে কিছু মালকড়ি বাগিয়ে তোমাদের জন্যে পাঠিয়ে দেবো। তা দিয়ে তোমাদের যাতে বছরখানেক চলে যায়, তার ব্যবস্থা আমি করে যাবো।

মুসাফিরের সাজ-পোশাকে সেজেগুজে তৈরি হলো চাঁদ। কোমরে দু'খানা ছুরি গুঁজে নিলো। মাথায় পরলো বিচিত্র ধরনের এক টুপী হাতে নিলো ইয়া বড় একখানা বাঁশের লাঠি। তারপর তেজি ঘোড়ার পিঠে চেপে সঙ্গী-সাথীদের কাঁদিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো বাহান্নতম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

কাইরো ছেড়ে দামাসকাসের পথে চলতে চলতে এক তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো চাঁদের। দলের কর্তা দামাসকাসের বণিক-সভার শাহবান্দর। বহুৎ খানদানি মানুষ। মক্কা থেকে হজ করে দেশে ফিরছিলো।

আলী নওজোয়ান, খুবসুরৎ তরুণ। এখনও তার দাড়ি গোঁফ গজায়নি। হাজী সাহেবের নজরে ধরে গেলো দেখা মাত্র। শাহবান্দর সাহেব দলের লোকজনরাও চাঁদকে পেয়ে ভুলে গেলো। স্বল্প সময়ের মধ্যেই সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো। অবশ্য তার একাধিক কারণও ছিলো। দামাসকাসের পথ বড় বিপদ-সঙ্কুল। মাঝে মাঝেই ডাকাতি রাহাজানি হয়। বিশেষ করে বাদাবী দস্যুদের আক্রমণে যাত্রীদল সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। ঐ রকম কয়েকটি ডাকাতদল আর বাদাবী দস্যুদের আক্রমণ থেকে চাঁদআলী তাদের রক্ষা করেছিলো। তার অসীম সাহস এবং সিংহ-বিক্রমের সামনে ডাকাতরা কাছে এগোতে পারেনি। এছাড়া মাঝে মাঝে জঙ্গলের জানোয়ার সিংহের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলো সে। এই সব কারণে হাজী সাহেবের মাথার মণি হয়ে ওঠে চাঁদ আলী।

দামাসকাসে পৌঁছে সে নিজের দলের লোকজনদের প্রত্যেককে পাঁচটি করে দিনার ইনাম দিলো। আর চাঁদ আলীকে দিলো এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

চাঁদ ভাবলো, এতো টাকা সঙ্গে নেবার কোনও প্রয়োজন নাই। সামান্য কিছু রাহাখরচ রেখে বাকী সবটাই সে পাঠিয়ে দিলো কাইরোয় তার সাগরেদদের আস্তানায়।

এইভাবে সে একদিন বাগদাদ শহরে এসে পৌঁছলো। এবার তার প্রথম কাজ —তার শিক্ষাগুরু ওস্তাদ আহমদের বাড়ি খুঁজে বের করা। শহরে ঢুকেই সে যাকে সামনে পেলো তাকে জিজ্ঞেস করলো, আহমদের ঠিকানা। কিন্তু পরদেশী ভেবেই হোক, কিংবা অন্য কোনও আশঙ্কাতেই হোক, কেউ তার কথার জবাব দিলো না বড় একটা।

জনে-জনে জিজ্ঞেস করতে করতে এক সময় সে অল-নাফ্জ চৌমাথায় এসে পড়লো। চাঁদ দেখলো একপাশে একটা ফাঁকা মাঠে কতকগুলো খুদে মস্তান গুলতানী করছে। তাদের দলের পাণ্ডাটি আরও খুদে—কিন্তু বিচ্ছু। এর আসল পরিচয় —ঠগের সেরা জাইনাবের বড় বোনের আটাশে ছেলে মহম্মদ।

আলী ভাবলো, বাচ্চারা অনেক বেশি খোঁজ-খবর রাখে। এদের দিয়েই কাজ হতে পারে। ওদের আরও কাছে এগিয়ে সে ডাকলো, এই শোনো।

আটাশে ছেলে মস্তান মহম্মদ ভারিক্কি চালে এগিয়ে এলো চাঁদের সামনে?

—কী, ডাকছো কেন?

কাছেই একটা মণ্ডা-মিঠাই-এর দোকান ছিলো। বারকোষে সাজানো নানা হালওয়া মণ্ডা। চাঁদ সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে মহম্মদকে বলে, নেবে তোমরা? হালওয়া খাবে, চলো।

মহম্মদ বলে, তা দিলে, না করবো কেন?

—তবে চলো আমার সঙ্গে।

চাঁদ আলী দোকানে ঢুকে একখানা রেকাবীর পুরো হালওয়াটা কিনে মহম্মদের হাতে তুলে দেয় এবং দেবার সময় কায়দা করে একটা দিনারও গুঁজে দিতে যায়। কিন্তু মহম্মদ ধনুকের মতো বেঁকে দাঁড়ায়, এ কী? আপনি আমাকে ঘুষ দিতে চাইছেন? নিন ধরুন, আপনার পয়সা আর হালওয়া। চাই না আমরা। ভেবেছেন পয়সা দিয়ে আমাদের কিনে নেবেন। আমরা অত কচি ছেলে নই—হুঁ হুঁ বাবা—

চাঁদ মহম্মদের এবম্বিধ অসভ্য আচরণে বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু মনের রাগ মনে চেপে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, ও হো হো, পয়সা দেখে তোমাদের গোসা হয়ে গেলো। তাজ্জব কি বাত্, তা আমি তোমাকে ঝুট-মুট পয়সা দিচ্ছি না। তার বদলে আমার একটু কাজ করে দিও।

গম্ভীর চালে সে প্রশ্ন করে, কী কাজটা শুনি?

আমাকে একটা বাড়ির নিশানা বলে দিতে হবে। আমি পরদেশী মানুষ। তোমাদের শহরে এসেছি—এইটুকু সাহায্য কি করবে না?

আটাশে ছেলে ঠোঁট উল্টে বলে, ওঃ এই কথা! তা কার বাড়ি যাবে?

—খলিফার সিপাই-সর্দার কাপ্তান আহমদের বাড়ি।

—অঃ! আচ্ছা, আমার পিছনে পিছনে এসো।

মহম্মদ এমন একটা ভঙ্গী করলো, যা দেখে মনে হয়, আহমদের বাড়িটা যেন সে নেহাৎ করুণা করেই তাকেই দেখাবে। একটু এগিয়ে নিচে থেকে তুলে নিলো একটা মাটির ঢিল। ঠাঁই করে ছুঁড়ে মারলো একটা বাড়ির দরজায়।

—ঐ। ঐ হচ্ছে আহম্মকের—থুড়ি আহমদের আস্তানা।

দরজায় ঢিল পড়ার আওয়াজে পাল্লা খুলে বেরিয়ে আসে আহমদ। চোখে মুখে ক্রোধ। কিন্তু তার আগে মহম্মদ তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে সেখান থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। আহমদ এদিক ওদিক উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু সামনে চাঁদ আলীকে ছাড়া আর কাউকেই নজরে পড়ে না।

—আরে চাঁদ আলী তুমি!

আহমদ ছুটে এসে আলীকে জড়িয়ে ধরে বুকে।

চাঁদ আলী বলে ওস্তাদ, তোমার বাড়ি খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। যাকে জিজ্ঞেস করি, কেউই কোনও জবাব দেয় না। কেন বলো তো?

—ভয়ে। স্রেফ ভয়ে। আমি শহরের সেপাই সেনাপতি। আমার নাম শুনলে লোকের হৃদকম্প জাগে। তারা ভেবেছে, কী বলতে কী বলে ফেলবে, শেষে আমার রোষে পড়বে। তাই পাশ কাটিয়ে গেছে। তা চলো, বাড়ির ভিতরে চলো। দেখবে কি পেল্লাই আমার বাড়ি—যেন একখানা প্রাসাদ।

সত্যিই, আহমদের বাড়িখানা চমৎকার সাজানো গোছানো। বাহারী গালিচা পর্দা আর দামী মেহগনি কাঠের সব আসবাবপত্র। বাড়ির ভিতরে বড় ঘরখানায় আহমদের চল্লিশজন সিপাই থাকে। তাদের সকলের সঙ্গে চাঁদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয়।

—এ হচ্ছে আমার দেশোয়ালী সাগরেদ। এমন তুখোড় ধড়িবাজ মস্তান সারা কাইরোতে নাই।

তারপর আহমদ চাঁদকে তার শোবার ঘরে নিয়ে আসে।

—এই হচ্ছে সেই বাদশাহী সাজ-পোশাক। খলিফা যেদিন আমাকে এই শহরের সেপাই-সেনাপতির পদে বহাল করেছিলেন সেদিন তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। এমন জমকালো সাজ তোমার মতো খুবসুরৎ নওজোয়ানকেই মানায়। তাই তোমার জন্যেই তুলে রেখেছি। আমি জানতাম, একদিন না একদিন তোমার সঙ্গে আমার ভেট হবেই। আমি খলিফার ডান হাত। আমার তাঁবে চল্লিশজন সেপাই-সান্ত্রী ওঠ্ বোস্ করে।

সেইদিন সন্ধ্যায় চাঁদ আলীর সম্মানে আহমেদ এক ভোজসভার আয়োজন করলো। সে উৎসবে আহমদের সিপাইরাও সামিল হলো। খুব হৈ-চৈ আনন্দ করে কাটলো চাঁদ আলীর।

পরদিন সকালে আহমদ সেজেগুজে খলিফার দরবারে যাওয়ার সময় আলীকে বলে গেলো, ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুবে না কোথাও। নতুন জায়গা—পথ-ঘাট বা ঘাঁৎ-ঘোঁৎ কিছুই জানা নাই তোমার। একা একা পথে বেরুলে নানারকম বিপদ আপদ ঘটতে পারে। সুতরাং কয়েকটা দিন এই ঘরে বসেই বিশ্রাম কর। তারপর আমি সব বিধি-ব্যবস্থা করবো। কিন্তু সাবধান, যা বলে গেলাম তার এদিক ওদিক করো না। চারদিকে আমার শত্রু। আর বাগদাদের বদমাইশ মানুষগুলো সব সময় ওৎ পেতে বসে আছে, আমাকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে। তোমাকে দেখলেই তাদের মগজে বদ ফন্দী চেপে উঠবে। ওসব ঝামেলায় না গিয়ে চুপটি করে ঘরে বসে থাক ক'টা দিন। মনে রেখ, বাগদাদ শহরটা কাইরো নয়। এখানে খলিফার চর কাইরোর মাছির মতো ভনভন করছে সর্বত্র। আবার কাইরোয় যেমন যত্রতত্র হাঁস মুরগী মরাল চরে বেড়ায়, তেমনি ছুঁচো পাজি লোচ্চা বদমাইশ গিজ-গিজ করছে এই বাগদাদের পথে ঘাটে।

—কিন্তু ওস্তাদ, চাঁদ আলী ক্ষোভের সঙ্গে বলে, ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে মেয়েমানুষের মতো বোরখা পরে বসে থাকার জন্যে তো আমি বাগদাদে আসিনি!

আহমদ হাসলো, না তা কেন, তোমার যেখানে খুশি যাবে, বেড়াবে। কিন্তু আমি বলি কি, মাত্র দু'একটা দিন চুপচাপ থাকো। তারপর আমিই তোমাকে পথঘাট ডেরা-আস্তানা সব চিনিয়ে দেবো।

আহমদ আর দাঁড়ালো না। তার ধনুর্ধরদের নিয়ে দরবারে রওনা হয়ে গেলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো তিপ্পান্নতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

পাক্কা তিন-তিনটে দিন চাঁদ আলী অনেক ধৈর্য ধরে আহমদের ঘরে বন্দী হয়ে কাটালো। কিন্তু চারদিনের দিন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে চাইলো। আহমদকে কাতরভাবে জানালো, ওস্তাদ আর তো পারি না। এবার আমাকে হুকুম দাও। আমি আমার চুরি বিদ্যার এমন সাংঘাতিক এক বাহাদুরী দেখাই খলিফা যাতে তাজ্জব বনে যান।

আহমদ আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডান হাতখানা বাড়িয়ে বলে, ধৈর্য ধর বৎস, ধৈর্য ধর। সব জিনিসেরই একটা সময় আছে। অত তাড়াহুড়া করলে কী চলে? তোমার পুরো ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। দেখ, আমি কী করি। সময় সুযোগ মতো খলিফার কানে তোমার নাম আর কীর্তি-কলাপ পৌঁছে দেব। এমনভাবে তাঁকে টোপ দেব, যাতে তিনি নিজে থেকেই বলেন, 'তাকে নিয়ে এস আমার কাছে।' ব্যস, তারপর আর কিছুর দরকার হবে না। সোজা—দরবারে নোকরী হয়ে যাবে।

মুখের ওপর আর কিছু বলতে পারলো না চাঁদ আলী। কিন্তু মনে মনে খুব খুশি হতে পারলো না। আহমদ বেরিয়ে যেতেই বাইরে বেরুবার মতলব ভাঁজতে লাগলো সে। ভাবলো, এইভাবে কয়েদ হয়ে আর এখানে পড়ে থাকবে না সে। তিলমাত্র অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ সে রাস্তায় নেমে পড়লো।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এপথে ওপথে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে একটা কাফের সামনে এসে দাঁড়ায়। খিদেও পেয়েছিলো, ভিতরে ঢুকে ভালোমন্দ কয়েকটা পদ নিয়ে খেখো। হঠাৎ তার নজরে পড়লো, রক্তরাঙা রেশমীর পোশাকে সেজে-গুজে এক দল আবলুস কালো নিগ্রো সেই পথ দিয়ে আসছে। তাদের কোমরে চামড়ার পেটিকা, মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে ইস্পাতের ধারালো খাঁড়া। পাশাপাশি দু'জন, তাদের পিছনে আরও দু'জন এবং তাদের পিছনে কোনও হারেমের এক বৃদ্ধ জেনানা। তার পিছনে আরও চারজন নিগ্রো প্রহরী। বৃদ্ধার মাথায় মহামূল্যবান রত্নখচিত এক স্বর্ণমুকুট। মুকুটের ওপরে একটি রূপোর পায়রা বসানো।

এই বৃদ্ধাই ধূর্ত ডিলাইলাহ। সে এখন খলিফার, চিড়িয়াখানার হর্তাকর্তা। দরবারের কাজকর্ম সেরে চিড়িয়াখানায় ফিরে চলেছে।

চাঁদ আলী কাফের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ডিলাইলাহ চাঁদকে চেনে না। এ শহরে তাকে সে কখনও দেখেনি। চাঁদপনা মুখের দিকে সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। নিগ্রোদের একজনকে ফিসফিস করে বলে, ছেলেটি কে, একবার খবর নিয়ে এসো তো দোকানীর কাছে।

নিগ্রোটা ফিরে এসে বলে, দোকানী কিছু বলতে পারলো না, মালকিন। ছেলেটি মনে হয়, পরদেশী।

ডিলাইলাহ ফিরে এসে জানাইবকে বলে, আজ বাজারের কাছে একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলেকে দেখলাম। কিন্তু নাম ধাম পরিচয় কিছুই পাত্তা করতে পারলাম না। ছেলেটি দেখতে ভারি চমৎকার। কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেবল চোট্টা আহমদের কথাই মনে পড়ছিলো। আমার যাদুমেজ আর বালি নিয়ে আয় তো। আমি মন্তর পড়ে দেখবো—ছেলেটা কে? কেন যেন ছেলেটিকে দেখা ইস্তক আমার মনে হচ্ছে, ওর হাবভাব বড় সুবিধের নয়। মনে হয় কোনও বদ মতলবে অন্য দেশ থেকে এসেছে সে বাগদাদে। অথবা কোনও খারাপ কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে এ শহরে। যাইহোক, গুণে পড়ে দেখলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের শত্রুর অভাব নাই, হয়তো কেউ শয়তানী করার জন্যেই তাকে লাগাবে আমাদের পিছনে।

জাইনাব বালি আর যাদুমেজ এনে রাখলো মায়ের সামনে। ডিলাইলাহ টেবিলের

ওপর বালিগুলো ছড়িয়ে বিছিয়ে কি সব আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্রতন্ত্র আওড়াতে থাকলো। একটুক্ষণ পরে সে চিৎকার করে উঠলো, জাইনাব, বেটি, মিল গয়া!

জাইনাব কৌতূলহী দৃষ্টি মেলে তাকায়, কী মা? কী পেলে?

—ঐ সুঠাম সুন্দর ছেলেটির নাম চাঁদ আলী। কাইরো থেকে এসেছে। আহমদের সে পেয়ারের দোস্ত। সে-ই তাকে বাগদাদে ডেকে এনেছে আমাদের দু'জনকে চিট করার জন্যে! তুই যে মদের সঙ্গে আফিং খাইয়ে ওদের কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে বেআব্রু বেইজ্জৎ করেছিলি তারই বদলা নেবার জন্যে আহমদ তাকে কাইরো থেকে ডেকে এনেছে। ছেলেটি কাইরোর সবচেয়ে সেরা ঠগ ধড়িবাজ ধূর্ত। দেখছি, খোদ আহমদের বাড়িতেই উঠেছে সে।

—আচ্ছা মা, জাইনাব বলে, তুচ্ছ একটা দুগ্ধপোষ্য বালক—এখনও যারা গোঁফদাড়ি গজায়নি, তাকে নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছো কেন?

ডিলাইলাহ মাথা নেড়ে বিজ্ঞের মতো উপদেশ দেয়, উঁ হুঁ হুঁ, দাড়িগোঁফ উঠুক আর নাই উঠুক, ছেলেটি কিন্তু ধারালো ইস্পাতের ফলা। কী ভাবে, কখন, কেমন করে বুকে গেঁথে বসবে কিছুই বলা যায় না। অন্ততঃ আমার গণনায় তাই বলছে, মা। আর তুমি তো জানো, আমার যাদু-বিচার কখনও মিথ্যা হয় না।

জাইনাব বলে, তা জানি মা। কিন্তু কী এমন তালেবর যে, আমাদের ধোঁকা দিয়ে সে পার পেয়ে যাবে? যাইহোক, তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আমি এখুনি তার সঙ্গে ভেট করে আসছি।

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে চোখে সুর্মা কাজল পরে, দামী-রেশমী সাজপোশাক এবং রত্নালঙ্কারে সুন্দর করে সেজেগুজে জাইনাব রাস্তায় বের হলো।

খুব ধীর পায়ে সে বাগদাদের বাজার পথে চলতে থাকে। পাছা দোলে না, কোমর বাঁকে না এমনি শান্ত, সংযত তার পদক্ষেপ। রোয়াকবাজ ছেলেরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে। কেউ বা একটু মুচকি হাসি, তের্ছা নজর হানে। কেউ বা শিস দেয়, সিটি বাজায়। আবার কেউ বা বুক চাপড়ে গেয়ে ওঠে ঃ

ও আমার ময়না
আর তো প্রাণে সয় না...

জাইনাব কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করে না। চুড়ির ঠুনঠুন আর মলের ঝুমুর ঝুমুর মিষ্টি আওয়াজ তুলে সহজ স্বাভাবিক ভাবে পথে চলে। সে আওয়াজে রকবাজ ছোকরাদের বুকে তুফান তোলে।

আরও একটু এগোতে চাঁদ আলীর দেখা পায় জাইনাব। মা-এর বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিল আছে ছেলেটির চেহারার। প্রায় নিখুঁত সুন্দর, চাঁদের মতো ফুটফুটে, সুগঠিত সুঠাম দেহ! জাইনাবের আর বুঝতে বাকী থাকে না, এই সেই চাঁদ আলী।

চাঁদ আলী আসছিলো আর জাইনাব যাচ্ছিল। সামনা-সামনি হতেই জাইনাব আলীকে ইচ্ছে করেই কনুই দিয়ে ধাক্কা মারে। যেন হঠাৎ লেগে গেছে, এই রকম ভাব দেখিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলে, কিছু মনে করবেন না, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম।

কোমল তনুর স্পর্শে আলীর সারা দেহে তড়িৎ প্রবাহ খেলে যায়। মুগ্ধ নয়নে সে জাইনাবের ঢলঢলে যৌবনের যাদু নিরীক্ষণ করতে থাকে।

জাইনাব মিষ্টি করে হাসতে জানে। সে হাসির শাণিত ছুরিকা পলকে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে যে-কোনও পুরুষের বুকে। আলীই আজ তার শিকার।

আলী আর বুঝি নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়, কপালে স্বেদবিন্দু জমতে থাকে। কোনও রকমে সে বলতে পারে, তুমি কী সুন্দর! কার সন্ধানে পথে বেরিয়েছ?

খিল-খিল করে হেসে ওঠে জাইনাব। সে হাসি শব্দে মুক, কিন্তু অভিব্যক্তিতে মুখর। বলে, ধর তোমার মতো কোনও এক সুন্দর সুপুরুষ নওজোয়ানের সন্ধানে—

আলির স্বর্ণচাঁপার মতো মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে ওঠে।

—শাদী করোনি?

—করেছি; আমি এখানকার এক সওদাগরের মেয়ে। আমার স্বামীও সওদাগর। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মাঝে মাঝেই তাকে বিদেশ যেতে হয়। এখন আমার স্বামী বাইরে গেছে। ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। তাই আজ আমি প্রথম ঘরের বাইরে বেরিয়েছি—তোমার মতোই একজন নাগর খুঁজতে। মৌজ করে খানাপিনা করবো দু'জনে। তারপর...

আলীর বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে থাকে। কান গরম হয়ে ওঠে। জাইনাব বলে, আমার চাকরকে নানারকম খানা পাকাতে বলে এসেছি। আজ আমার দেহমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তোমার মতো সুন্দর কারো সঙ্গে রাত কাটাবার জন্যে। এতোটা পথ এলাম, অনেক ছেলে-ছোকরাই আমার পিছনে লেগেছিলো, সত্যি কথা বলতে কি, তাদের কাউকেই আমার মনে ধরেনি। কিন্তু তোমাকে দেখামাত্রই আমি মোহিত হয়ে গেছি। এখন তুমি যদি মেহেরবানী করে আজ আমার ঘরে চলো, আমার সাথী হও, তাহলে রাতটা সুরা, সুধায় ভরে ওঠে। যাবে?

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চুয়ান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলী বলে, তোমার মতো ষোড়শী সুন্দরীর আমন্ত্রণ কী আমি উপেক্ষা করতে পারি। যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। এতো আমার পরম সৌভাগ্য—

· জাইনাবের পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চলতে থাকে আলী। শহরের অনেক আঁকা-বাঁকা গলিপথ (সবই তার কাছে একেবারে অচেনা) অতিক্রম করতে করতে আলি ভাবে, এই শহরে সে সম্পূর্ণ নবাগত এক মুসাফির। এখানকার পথঘাট মানুষ জন কিছুই সে চেনে না। হঠাৎ এক সুন্দরীর আহ্বানে তার ঘরে যাওয়া কী ঠিক হবে। অন্যের শাদী করা বিবি সে। হয়তো সে এখন বাড়িতে নাই। কিন্তু ফিরতেই বা কতক্ষণ? আচম্বিতে মাঝ রাতে সে যদি এসে উপস্থিত হয়? যদি দেখে, তার বিবি অন্যের অঙ্কশায়িনী হয়ে পড়ে আছে! তখন অতি স্বাভাবিক কারণেই তার মাথায় খুন চেপে যেতে পারে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—অবধারিত মৃত্যু। উফ্, আলী আর ভাবতে পারে না—না না, এসব সে ভাবতে চায়ও না। মহাজনরা বলে গেছেন, 'বিদেশে অচেনা নারীর সঙ্গে অবৈধ সঙ্গম পরিহার করবে!'

—নাঃ, আর সে এগোবে না, আলী ভাবতে থাকে, এই রূপসী নারী তাকে কোন্ বিপদের গুহায় নিয়ে যেতে পারে, কে জানে?

আলী এতক্ষণ জাইনাবের সঙ্গে অনেকটা দূরত্ব রেখে পথ চলছিলো। এবার সে পা চালিয়ে তার পাশে এসে বললো, শোনো সুন্দরী, আজকের মতো আমাকে ক্ষমা করো। তুমি বরং অন্য কাউকে সঙ্গী করে নিয়ে যাও আজ। খুব সুরৎ নওজোয়ানের অভাব হবে না এ শহরে। কিন্তু আমাকে আজকের মতো ছেড়ে দাও। এ শহরে আমি সদ্য এসেছি। অন্যের আশ্রয়ে অতিথি হয়ে উঠেছি। এ অবস্থায় তাকে না জানিয়ে সারারাত বাইরে কাটানো কোনও মতেই উচিত কাজ হবে না। কথা দিচ্ছি, পরে একদিন তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবো আমি।

জাইনাব আব্দারের সুরে নাছোড়বান্দা বায়না ধরে, নাঁ—আঁ—, সে কিছুতেই হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। তোমাকে দেখার পর থেকে দিল আমার তড়পাচ্ছে। আজ আর আমি অন্য কাউকে নিয়ে রাত কাটাতে পারবো না। আমার সারা মন জুড়ে বসে গেছ তুমি। এখন না বললে হবে কেন?

এ আবদার উপেক্ষা করতে পারে না আলী। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবার জাইনাবের পিছনে পিছনে চলতে থাকে সে।

অনেক পথের গোলকধাঁধা পেরিয়ে এক সময় এক বিশাল ইমারতের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায় দু'জনে। ফটকের দরজা তালাবন্ধ ছিলো। জাইনাব তার কামিজ কুর্তার মধ্যে হাতড়াতে থাকে। চাবিটা গেলো কোথায়? তাজ্জব ব্যাপার! তবে কী পথে পড়ে গেলো? আলীর দিকে তাকিয়ে একটু চড়া গলাতেই বললো সে, মনে হচ্ছে চাবিটা হারিয়েছে। তা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তালাটা খোলার কিছু একটা ব্যবস্থা কর।

আলি বলে, চাবি ছাড়া তালা খুলবো কী করে?

—তবুও চেষ্টা তো করবে?

—গায়ের জোর দিয়ে হয়তো তালাটা ভেঙ্গে ফেলতে পারি। কিন্তু তা চাই না।

—বাঃ, চাই না বললেই হলো, তা বলে ঘরে ঢুকবো না?

স্বচ্ছ নাকাবের তলা থেকে জাইনাব এমন এক কটাক্ষ বাণ ছুঁড়লো, যার ফলে আলীর হৃদয়ের সব বন্ধ তালাগুলো সব পটপট করে খুলে পড়ে গেলো।

কলের পুতুলের মতো আলী তালাতে হাত রাখে। আর কী আশ্চর্য, তালাটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায়।

জাইনাব আলীকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। সারা ঘর দামী পারস্য গালিচায় মোড়া। দেওয়ালে

ঝুলানো নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র। জাইনাব একটা আসনে বসে আলীকে পাশে বসতে বললো। সামনের টেবিলে সাজানো ছিলো নানারকম মুখোরোচক খানাপিনা। দু'জনে তৃপ্তি করে খেলো! তারপর জাইনাব মদের পেয়ালা পূর্ণ করে আলীকে দিলো এবং নিজেও নিলো। আলী লক্ষ্য করলো, জাইনাব সারাক্ষণ সহজ অথচ সংযতভাবে আলীর স্পর্শ, মর্দন এবং চুম্বন পরিহার করে চললো। যতবারই আলী তার অধরে চুমু এঁকে দিতে চায়, জাইনাব হাত চাপা দিয়ে ঢেকে ফেলে। ফলে, হাতের তালুতেই তার চুম্বন আবদ্ধ আহত হয়ে ফিরে আসে। জাইনাব বাধা দিয়ে বলে ধৈর্য ধর সাহেব, ধৈর্য ধর। এমন জমকালো আলোয় কী কামনা-বাসনার দরজা খোলে? বাতি নিভাতে দাও, অন্ধকার আচ্ছন্ন করুক। তারপর দেখে নিও, আমার খেলা। তখন দেখবো, কেমন তোমার পৌরুষ।

খানাপিনা শেষ করে ওরা দু'জনে ঘরের বাইরে প্রাঙ্গণে কূয়ার পাশে আসে মুখ হাত ধুতে। একটা বালতিতে করে জল তুলতে থাকে জাইনাব। হঠাৎ সে কপাল চাপড়াতে থাকে।

—হায় হায়, একি সর্বনাশ হলো আমার?

দারুণ আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আসে আলী।

—কী ব্যাপার, কী হলো?

—আর কী হলো—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। পানির বালতি তুলতে গিয়ে আমার আঙ্গুল থেকে হীরের আংটিটি খুলে পড়ে গেছে। এখন কী হবে সোনা? গতকাল

বাইরে যাবার আগে আমার স্বামী পাঁচশো দিনার দিয়ে কিনে এনে দিয়েছিলো আমাকে। পরার সময়ই একটু ঢিলে-ঢালা হয়েছিলো। কিন্তু এইভাবে কূয়ার পানিতে পড়ে যেতে পারে, ভাবিনি। কূয়ায় অবশ্য বেশি পানি নাই। নেমে হাতড়ালেই পাওয়া যাবে। সমস্যা হলো, এই রাতে নামবে কে? লোকজন তো কাউকেই পাবো না! যাই হোক, সাজ-পোশাক খুলে ন্যাংটো হয়ে আমিই নামি, কী বলো? তুমি বাপু দেওয়ালের দিকে মুখ করে দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখো। একদম এদিকে তাকাবে না। আমি ন্যাংটো হবো।

আলীর পৌরুষে আঘাত লাগে, আমি থাকতে তুমি নামবে কূয়ার নিচে, সে কি হয়? আমি নেমে গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসছি তোমার আংটি। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো।

জাইনাবকে আর কিছু বলা বা করার কোনও সুযোগ না দিয়ে পলকের মধ্যে সে সাজ-পোশাক খুলে ফেলে।

রশিটা ধরে তরতর করে নেমে যায় নিচে। জাইনাব লক্ষ্য করলো, আলী বালতিটার ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একমুহূর্ত কী যেন ভাবলো আলী। পা ডুবিয়ে জলের শীতলতা অনুভব করলো বোধহয়। তারপর ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের নিচে তলিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে জাইনাব বালতিটাকে ক্ষিপ্রহাতে টেনে উপরে উঠিয়ে এনে বললো, এবার তোরা বাবা, আহমদকে ডাক রে হাঁদা। সে এসে তোকে বাঁচাক। আমি চললাম।

জাইনাব আর দাঁড়ালো না সেখানে। আলীর সাজ-পোশাকগুলো বোরখার তলায় বগল-দাবা করে নিমেষে হাওয়া হয়ে গেলো সে।

এই বিশাল ইমারতখানা খলিফার দরবারের এক সম্ভ্রান্ত আমিরের। জাইনাব আগেই খোঁজ নিয়েছিলো, বাড়ির ফটকে তালা দিয়ে সে কোথাও কোনও কাজে বেরিয়েছে।

একটু পরে আমির সাহেব তার চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে দেখে সদর দরজা হাট করে খোলা। তালাটা ভাঙ্গা। আমির ভাবে ঘরে চোর ঢুকেছিলো। কিন্তু সারা ঘর-দোর পরীক্ষা করে বুঝতে পারে, যেখানে যা যা ছিলো সবই ঠিক-ঠাক আছে—একমাত্র টেবিলের খানাপিনা ছাড়া কিছুই খোয়া যায়নি! আমির অবাক হয়, এমন অদ্ভুত চোরের কথা তো কখনও সে শোনেনি!

মুখ হাত ধুয়ে কূয়ার কাছে আসে আমির। চাকরটা জল তোলার জন্য বালতি নামায়। কিন্তু সামান্য এক বালতি জল সে আর কিছুতেই টেনে তুলতে পারে না। পেল্লায় ভারি মনে হয়। কূয়ার নিচের দিকে নজর করে। কালো কিম্ভূত-কিমাকার একটা বস্তু বালতির ওপর বসে থাকতে দেখে সে আঁতকে ওঠে।

—হেই বাপ্, ওটা কী?

আমির অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী রে, কী হলো?

চাকরটার তখন কাঁপুনি ধরে গেছে, হুজুর, কূয়ার নিচে দৈত্য!

—দৈত্য?

আমিরও কেমন ভীতচকিত হয়ে ওঠে। চাকরটা বলে, ঐ দেখুন বালতিটার মধ্যে বসে আছে—কালো দৈত্যের মতো কী একটা জিনিস, ঠিক বুঝতে পারছি না। বুনোশুয়োরও হতে পারে?

—তোবা তোবা, বলিস কী রে? যা শিগ্গির মৌলভী সাহেবদের ডেকে নিয়ে আয়। কোরাণশরীফ পাঠ করাতে হবে! তোবা তোবা—

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঞ্চান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চাকরটা ছুটে গিয়ে চারজন কোরাণ-পাঠককে ডেকে আনে। ওরা সকলে কূয়ার চারপাশে দাঁড়িয়ে কোরাণশরীফ পাঠ করতে থাকে। সেই সময় আমির আর চাকর মিলে টেনে তোলে বালতিটা। আর সঙ্গে সঙ্গে কাদা-পাঁকে লেপা চাঁদ আলী লাফিয়ে দাঁড়ায়।

—আল্লাহ হো আকবর—

এতক্ষণে আমির বুঝতে পারে, আসলে সে কোনও দৈত্য আফ্রিদি নয়। রক্ত-মাংসে গড়া মনুষ্য-সন্তানই বটে। এতক্ষণে ভয়ে জড়সড় হয়েছিলো, এবার সে গর্জে ওঠে, কী রে ব্যাটা, চুরি করতে ঢুকেছিলি?

আলী বলে, আল্লা কসম, আমি চোর না। গরীব বেচারা একজন জেলে। মাছ ধরতে গিয়েছিলাম টাইগ্রিস। সারাদিন খেটে-খুটে পরিশ্রান্ত হয়ে নদীর ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর আর কিছু জানি না। ঘুম ভাঙ্গলো দেখি, আমি জলের মধ্যে শুয়ে আছি। আমাকে আপনারা জানে বাঁচিয়েছেন, এজন্য বহুৎ সুক্রিয়া জানাচ্ছি। খোদা মেহেরবান, না হলে বে-ঘোরে পড়ে আজ জানে মারা যেতাম।

আমির ভাবলো, লোকটার কথা সত্যিও হতে পারে। হয়তো কোনও আফ্রিদি দৈত্য ওকে তুলে এনে ফেলে গেছে এই কূয়ার মধ্যে। চাকরটাকে বললো, যা তো, একটা পুরোনো পাতলুন নিয়ে এসে ওকে পরতে দে।

ব্যাপারটা অনুসন্ধানের জন্য আলীকে সে শহর-সেনাপতি আহমদের কাছে পাঠিয়ে দিলো।

আলীর জন্য সারাটা বিকাল-সন্ধ্যা আহমদ বাগদাদ শহর চষে বেড়িয়েছে। কিন্তু কোনও হদিশ করতে পারেনি। এখন এই শোচনীয় অবস্থাতেও তাকে ফিরে পেয়ে আহমদের ধরে প্রাণ ফিরে আসে।

অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করে, এ কী তোমার দশা হয়েছে আলী? কী করে হলো? কোথায় গিয়েছিলে? কার পাল্লায় পড়েছিলে?

আলী তার কাহিনী শোনালো। আহমদ মুখ টিপে হাসলো, হাসলো তার চল্লিশজন ধনুর্ধররাও। আহমদ ঠাট্টা করে বললো, তুমি না কাইরোর জাঁদরেল মস্তান! বাগদাদে এসে প্রথমেই কূপোকাৎ! কাপড়চোপড় কেড়ে নিয়ে বেমালুম ন্যাংটো করে ছেড়ে দিয়েছে!

হাসানও উপস্থিত ছিলো সেখানে। হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ গো, কাইরোর কামাল, বাগদাদের একটা মেয়ের প্যাঁচে তুমি ধরাশায়ী হয়ে পড়লে? জানো, ঐ মেয়েটি কে?

আলী বলে, জানি। সে এক সওদাগরের মেয়ে। তার স্বামীও সওদাগর।

—বিলকুল ঝুট্! ওর বাবা ছিলো খলিফার চিড়িয়াখানার সর্দার। আর মা হচ্ছে বাগদাদের সেরা ধূর্ত মহিলা ডিলাইলাহ। এখন সে খলিফার চিড়িয়াখানার সরদারণী হয়েছে। ওর নাম জাইনাব! ঠগের সেরা ঠগ। এখনও সে কুমারী—একেবারে আনকোরা বুনো ওল। স্বামী-ফামীর তোয়াক্কা করে না সে। মা আর এই বেটি দু'জনে মিলে সারা বাগদাদ শহরের মানুষকে পুতুল নাচাচ্ছে। কেন, তুমি কি শোননি, আমাদের এই কাপ্তান আহমদ সাহেব আর এর চল্লিশজন সাগরেদকে সে একদিন ন্যাংটো করে এক শরাবখানার আস্তাবলে ফেলে রেখে দিয়েছিলো? যাই হোক, এখন তোমার কী ইচ্ছা, বলো?

আলী বললো, আমি ওকে শাদী করবো। আপনি আমাকে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করুন, হাসান সাহেব।

—বহুৎ আচ্ছা। করতে পারি সাহায্য, কিন্তু একটা শর্তে। অন্য কারো কথায় চলতে পারবে না। আমি যা যা বলবো তাই শুনতে হবে। আমি যা যা করতে বলবো, করতে হবে।

আলী বললো, আজ থেকে আমি তোমার সাগরেদ হলাম, ওস্তাদ। বলুন আমাকে কী করতে হবে?

হাসান বলে তা হলে আর সময় নষ্ট করে কী হবে। এখন থেকে কাজে নেমে পড়া থাক। শোনো, সাজ-পোশাক খুলে একেবারে উদোম উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াও তুমি। কী? লজ্জা করবে?

—আরে দুর, শরম কা কেয়া বাত—

আলী নিমেষের মধ্যে কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়ালো হাসানের সামনে! একটা কালো কালির ডিবা এনে হাসান নিজে হাতে তার সর্বাঙ্গ কালিতে লেপে দিলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার চাঁপার বর্ণ দেহখানা আবলুস কালো এক নিগ্রোর মতো হয়ে গেলো।

হাসান আনন্দে নেচে ওঠে, বেড়ে লাগছে দেখতে! একেবারে হাবসী এক নিগ্রো নফর, কী বলো?

ঠোঁটে আর চোখের নিচে লাল সুর্মা লাগিয়ে দিলো হাসান। একেবারে সোনায় সোহাগা হয়ে গেলো। কেউ দেখে আর বুঝতে পারবে না, আসলে সে নিগ্রো কিনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই রঙ শুকিয়ে গেলো, হাসান একখানা কৌপীন-সদৃশ স্বল্পবাস কোমরে জড়িয়ে দিলো আলীর। বললো, ব্যস! এবারে ষোল আনা নিগ্রো বনে গেলে তুমি। এখন তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। পাচক সেজে ডিলাইলাহর রসুইখানার খানসামার সঙ্গে ভাব জমাতে যেতে হবে। পারবে তো?

আলী বলে, সে আর এমন কঠিন কী কাজ? খুব পারবো। আমার মতো চোস্ত নিগ্রো-ভাষা কম লোকেই জানে। এতোকাল তো ওদের চরিয়েই খেয়েছি।

হাসান বলে, তবে তো আর কথাই নাই। তুমি শুধু ডিলাইলাহর নিগ্রো পাচকটার সঙ্গে আলাপ সালাপ করে ভাব জমিয়ে ফেলবে। এই পাচকটাকে ডিলাইলাহ খুব বিশ্বাস করে। সে শুধু ডিলাইলাহ আর তার মেয়ে জাইনাবেরই খানা তৈরি করে না, চিড়িয়াখানার পাহারাদার চল্লিশজন সিপাই, আর শিকারী কুকুরগুলোর জন্যও খানা পাকায়। ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে বলবে, 'দোস্ত অনেকদিন তাড়ি আর ভেড়ার বাচ্চার কাবাব খাইনি। খেতে বড় সাধ, কিন্তু একা একা জমে না। তোমার মতো একজন সমজদার ইয়ার পেলে আমি আসর বসাতে পারি। তখন সে বলবে 'মালকিনের কড়া হুকুম, রসুইখানা ছেড়ে বাইরে কোথাও যেন না যাই। তা তোমার যখন এতো ইচ্ছে, এসো না—আমার রসুইখানায়। খুব চমৎকার করে বানিয়ে দেবো ভেড়ার কাবাব। কত খাবে। এক পয়সা খরচা হবে না। সবই ডিলাইলাহর ওপরে চালিয়ে দেবো।' ব্যস! আর দেখতে হবে না, তুমি সঙ্গে সঙ্গে তার নেমন্তন্ন মেনে নেবে। তা হলেই বাজী মাৎ হয়ে যাবে।

আলী বুঝতে পারে না, কিন্তু কী করে?

হাসান হাসে, বলছি। কায়দা করে তুমি কম খেয়ে পাচকটাকে আকণ্ঠ গেলাবে। লোকটার নেশা যত চড়তে শুরু করবে, দেখবে আপনা থেকেই সে গড়গড় করে অনেক গুপ্ত কথা বলতে শুরু করে দেবে। তখন তুমি কথার ছলে এক এক করে সব গোপন তথ্য সংগ্রহ করে নেবে তার কাছ থেকে। কী ধরনের খাবার-দাবার সে বানায় ডিলাইলাহ আর জাইনাবের জন্য, পাহারাদার সিপাই আর কুকুরগুলোর জন্যই বা কতটা কী খানাপিনার ব্যবস্থা আছে, রসুইখানায় ঢোকার পথ, কোথায় থাকে তার দরজার চাবী—এই সব খবরাখবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতে হবে তোমাকে। নেশার ঝোঁকে সে তোমাকে সব বলে দেবে। এরপর তুমি একটা আফিঙের ডেলা ফেলে দেবে তার তাড়ির মগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে তার মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। বুঝবে দাওয়াই-এ কাজ হয়েছে। তখন লোকটাকে উলঙ্গ করে ওর

সাজ-পোশাক তুমি পরে নেবে। ওর সব্জীকাটার ছুরিখানা গুঁজে নেবে তোমার কোমরে। এরপর একটা খালি ঝুড়ি নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়বে বাজারে। উদ্দেশ্য কিছু গোস্ত আর সব্জী কেনা।

সওদা শেষে আবার ফিরে যাবে রসুইখানায়। ভাঁড়ার থেকে তেল, মাখন, মসলা, চাল, ডাল ইত্যাদি যা যা দরকার সব পরিমাণ মতো বের করে নেবে! কতটা কী দরকার হতে পারে সে তো তুমি আগেই জেনে নিয়েছ। সুতরাং কোনও অসুবিধে হওয়ার কতা নয়। তারপর যা যা খানা পাকান হয় রোজ, সেই সব খাবারগুলো বেশ যত্ন করে তৈরি করে ফেলবে তুমি। হ্যাঁ, খাবার গুলোর গন্ধ শুঁকেই জিভে জল আসে যেন। আর মনে রেখো, প্রতিটি খানায় এক ডেলা করে আফিং মিশিয়ে দেবে।

ডিলাইলাহ, তার কন্যা জাইনাব, চল্লিশজন অনুচর আর পোষা কুকুরগুলোর জন্য খাবার সাজিয়ে পাঠিয়ে দেবে। এর পরের খেলাটা জমবে ভালো। সবাই যখন খেয়ে-দেয় ঢলে পড়বে, তখন এক এক করে সক্কলের সাজ-পোশাক গহনাপত্র সব খুলে নিয়ে সোজা চলে আসবে আমার কাছে। কেমন? পারবে তো?

আলী বলে, খুব পারবো।

হাসান বলে, হ্যাঁ, জাইনাবকে সত্যিই যদি তুমি তোমার বিবি বানাতে চাও তবে হ্যাঁ, তোমাকে আরও একটা কাজ করতে হবে।

—কী কাজ, ওস্তাদ?

হাসান বলে, চিড়িয়াখানা থেকে খলিফার সবচেয়ে প্রিয় চল্লিশটা শেখানো পায়রাকে একটা খাঁচায় পুরে নিয়ে আসতে হবে।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে বসে থাকে।

চারশো ছাপ্পান্নতম রজনী। আবার সে কাহিনী শুরু করে ঃ

ফৌজী কেতায় আলী ডান হাত কপালের কাছে এনে পায়ের সঙ্গে পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর 'জো হুকুম, ওস্তাদ' বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বাজারের মধ্যে দেখা হয়ে যায় পাচক নিগ্রোটার সঙ্গে। আলী স্মিত হেসে তাকে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে।

—এই যে দোস্ত, কেমন আছ?

—এই—চলছে আর কি।

আলী বলে, খেটে খেটে মরে গেলাম, মাইরী। তা একদিন একটু মৌজ-মৌতাত করা যাক না? এক হাঁড়ি তাড়ি আর কচি ভেড়ার মাংসের কাবাব, কী জমবে না?

নিগ্রো পাচকটা জুলজুল করে তাকায়, তা মন্দ কী?

—তা হলে তোমার সময় মতো এসো একদিন আমার ডেরায়।

নিগ্রোটা বলে, সে পারবো না, ভাই। আমার মালকিন বড় কড়া। বাইরে কোথাও যাওয়ার নিয়ম নাই। তার চাইতে তুমিই বরং চলে এসো আমার রসুইখানায়। নিজের গাঁট থেকে খরচা করে কী লাভ? মালকিনের ওপর দিয়েই মজাটা লুটা যাবে।

আলী সানন্দে সম্মতি জানায়। তখুনি সে নিগ্রোটার সঙ্গে চলে আসে তার রসুইখানায়। হাসানের কথামতো খানাপিনা চলতে থাকে। চলতে থাকে নানা কথাবার্তা। ধীরে ধীরে নেশায় বুঁদ হতে থাকে পাচকটা। সেই সুযোগে তার পেট থেকে সব কথা টেনে বের করে নেয় আলী। কোথায় ভাঁড়ার ঘরের চাবি থাকে, ডিলাইলাহ কী খায়, চল্লিশজন সিপাই বা

কতটা কী খায় এবং কুকুরগুলোর খাবার কী দেওয়া হয়—সব সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেবার পর ওর তাড়ির মগে এক ডেলা আফিং ফেলে নিমেষের মধ্যেই ওকে বেহুঁশ অজ্ঞান করে ফেলে।

ডিলাইলাহর আর তার কন্যার জন্য দুপুরের খানা পাঁচ পদের তৈরি হয়। রাতেও হয় পাঁচ রকমের। শুধু আজ তারা আরও দুটি বাড়তি পদের ফরমাশ করেছে। রোজ হয় ডাল, কড়াইশুঁটি ভাজি, একটা ঝোল, মৃদু জ্বালে সেদ্ধ মাংস এবং গুলাবী মণ্ডা। শুধু আজকের জন্য দুটি বিশেষ পদের হুকুম হয়েছে—মধু আর জাফরান দিয়ে তৈরি চালের বিরিয়ানী এবং পেস্তা বাদাম আখরোট দিয়ে তৈরি বেদানার হালওয়া।

চল্লিশজন সিপাই-পাহারাদারের নিয়মিত খাবার ঃ সেদ্ধ বরবটী মাখন দিয়ে ভেজে দিতে হয়। সঙ্গে কুচানো-পিঁয়াজ আর এক মগ করে তাড়ি। আর কুকুরদের জন্য বরাদ্দ-—কুকুর পিছু আধ পোয়া মাংস। তার সঙ্গে মা-মেয়ের উচ্ছিষ্ট হাড়গোড়।

পাচকটা মোষের মতো নাক ডাকাতে শুরু করলো। আলী ওর গায়ের বেশ-বাস খুলে নিজে পরে নিলো। ভাঁড়ারের চাবিটা খুঁজে বের করে নিলো। পাচকের সব্জীকাটা ছুরিখানা কোমরে গুঁজে একটা খালি ঝুড়ি মাথায় করে বাজার-হাট করতে বেরিয়ে পড়লো সে।

কেনা-কাটা শেষ করে রসুইখানায় ফিরে এসে খুব যত্ন করে খানা পাকালো আলী। এবং প্রতিটি খাবারে এক ডেলা আফিং মিশিয়ে দিলো। তারপর যথা সময়ে ঘরে ঘরে খানাপিনা সাজিয়ে রেখে এলো সে। কেউই কিছুমাত্র সন্দেহাকুল ভাবে তাকালো না তার দিকে।

আলী দেখলো, একমাত্র রসুইখানার বেড়ালটা ছাড়া সবাই অঘোরে ঘুমে ঢলে পড়েছে। প্রথমে সে বুড়ি ডিলাইলাহকে ন্যাংটো করলো। উফ্ কী কুৎসিত কদাকার তার দেহ। আলী পাশের ঘরে ঢোকে। জাইনাব অসাড় হয়ে পড়েছিলো। এক এক করে তার দেহের সব আবরণ ও আভরণ খুলে নেয় সে। মাখনের মতো নরম নিভাঁজ পেলব তার শরীর। কামনার আগুন জ্বলে ওঠে তার বুকে। কিন্তু নিজেকে সংযত করে রাখে। আজ বাদে কাল যাকে সে ঘরের বিবি বানাবে বলে ঠিক করেছে, তার কুমারীত্ব হরণ করতে সে চায় না। শুধু ওর সারা দেহে হাত বুলিয়ে স্পর্শ-সুখ অনুভব করে। পায়ের তলায় বসে ওর সুন্দর পা দু'খানা নিয়ে আদর করতে থাকে। এক সময় পায়ের তালুতে সুড়সুড়ি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ঘোরেই প্রচণ্ড বেগে একটা লাথি ছোঁড়ে জাইনাব। আর লাগবি তো লাগ—একেবারে আলীর মুখেই গিয়ে লাগে। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে এবং হাসতে হাসতে সে সরে যায়।

এরপর আলী এক এক করে নিগ্রো সিপাইদের ন্যাংটো করে সাজ-পোশাক খুলে নেয়। তারপর ছাদের ওপরে ওঠে গিয়ে পায়রাগুলোকে একটা খাঁচার মধ্যে ভরে ফেলে। কাপড়-চোপড় গহনাগাটিগুলোকে একটা পোঁটলায় বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে, পায়রার খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে পথে নেমে পড়ে। সদর দরজাটা হাট হয়ে খোলাই পড়ে থাকে। আলী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। সোজা চলে আসে সে আহমদ হাসানের কাছে।

—সাবাস বেটা, হাসান আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, বাজী মাত্ করে দিয়ে এসেছো। এই না হলে আমার সাগরেদ! জাইনাবের সঙ্গে তোমার শাদী আমি দেবোই দেবো।

সকালে সব আগে ঘুম ভাঙ্গে ডিলাইলাহর। তখনও মাথাটা ঝিম ঝিম করছিলো তার। বুঝতে পারে, তার শরীরে কোনও আবরণ নাই। ধড়মড় করে উঠে বসে সে বিছানায়। গত রাতের কথা মনে করার চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই তার খাবারের মধ্যে আফিঙ মিশিয়ে

দিয়েছিলো কেউ। তাড়াতাড়ি সে অন্য একটা সাজ-পোশাক পরে সোজা ছাদের ওপরে উঠে আসে। যা আশঙ্কা করেছিলো, ঠিক তাই ঘটেছে। খলিফার খবরবাহী পোষা পায়রাগুলোর একটাও নাই। ঘরগুলো সব ফাঁকা। মাথায় হাত দিয়ে সে ছাদের ওপরেই বসে পড়ে, এখন কী হবে? খলিফা শুনলে তার গর্দান যাবে।

নেমে এসে সে কুকুরগুলোর আস্তাবলে যায়। সবগুলো চিৎপটাং হয়ে মরার মতো পড়ে আছে। বুড়ি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে নিগ্রো প্রহরীদের ডেরায় ঢোকে। সেখানেও সেই একই দৃশ্য। উলঙ্গ অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে সবাই। এরপর সে ছুটতে ছুটতে জাইনাবের ঘরে যায়। তার আদরের দুলালী—তার কী দশা করে গেছে, কে জানে।

জাইনাবের দেহেও কোনও বস্ত্রাবরণ নাই। কুসুমের মতো কোমল তনুলতা এলিয়ে পড়ে আছে শয্যায়। ডিলাইলাহর বুকে কেঁপে ওঠে। জাইনাব—তার কুমারী কন্যা। তবে কি তার কুমারীত্ব নষ্ট করে দিয়ে গেছে? ভয়ে ভয়ে সে আরও কাছে আসে ঘুমন্ত জাইনাবের। দেহের নিম্নাঙ্গ ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। না, লোকটা সে-সব কিছু করেনি। কিন্তু কেন করে নি। এমন ঢলঢলে যৌবন তার মেয়ের। এমন রূপ ও এমন লাবণ্য সারা বাগদাদেই বা আছে ক'টা। সেই মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তার সর্বনাশ করেনি—সে কে?

ডিলাইলাহ দেখতে পায়, একটুকরো কাগজ—জাইনাবের বুকের ওপর। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সে খুলে পড়ে ঃ

আমি কাইরোর চাঁদ আলী! আমার মতো সাহসী যোদ্ধা বীরপুরুষ সারা কাইরোতে কেউ নাই। আমার মনে হয় বাগদাদেও। এ ছাড়াও লোকে আমাকে ভদ্র বিনয়ী উদার বলে জানে। তুমিও তা বুঝতে পারবে, যখন জানবে, আমার পুরো কব্জাতে পেয়েও তোমার কুমারীত্ব আমি নষ্ট করিনি।

চিঠিখানা পড়ে আলীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার হৃদয়। সত্যি তো, ছেলেটি বড় সুন্দর। এমন কটি ডাঁসা মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়ে কেউ কি কখনও ছেড়ে দেয়!

জাইনাব জেগে ওঠে। ডিলাইলাহ তাকে সব জানায়।

—তুই যা-ই মনে কর মা, এই ছেলেটার কথা যতই আমি ভাবছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, সে তোকে আস্ত রেখে গেছে। কিন্তু আমি তো তোকে নিজ হাতে পরীক্ষা করে দেখলাম। না, সে কিচ্ছু করেনি। এ জন্যে তোরও কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, মা। সে তোর কত ইজ্জৎ করেছে, বল! আমার সব চুরি করে নিয়ে গেছে। খলিফার দরবারে আমার বিচার হবে, জানি। তা হোক, তা সত্ত্বেও তাকে আমি কিছুতেই একটা সাধারণ ঠগ-প্রবঞ্চক বলে মনে করতে পারছি না, জাইনাব। ওর কলিজাটা বড় সাচ্চা। তা না হলে এই লোভ কেউ সামলাতে পারে না।

মায়ে ঝিয়ে বসে বসে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলো। ডিলাইলাহ বললো, আমি এখুনি যাবো আহমদের কাছে। একবার স্বচক্ষে দেখে আসবো তাকে।

দরজার কড়া নাড়তেই হাসান বলে, ঐ, ঐ বুড়ি ডিলাইলাহ এসেছে। আমি ওর খট খট আওয়াজেই চিনতে পেরেছি। যাও, দরজা খুলে দাও।

আলী গিয়ে দরজা খুলে দেয়। ডিলাইলাহ এক মুখ হাসি ছড়িয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। মেজের এক পাশে কাপড় বিছিয়ে হাসান আহমদ আর আলী বসে খানা করছিলো। রেকাবীতে সাজানো শশা রুটি আর পায়রার মাংস। হাসান এবং আহমদ দু'জনেই এক সঙ্গে স্বাগত জানায় বুড়িকে, আসুন, আসুন, মেহেরবানী করে বসুন। গরীবের ঘরে যখন পা দিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে একটু পায়রার মাংস দিয়ে নাস্তা করে যান।

—পায়রার মাংস?

আঁৎকে ওঠে ডিলাইলাহ। তবে কী পায়রাগুলো—না, না, সে কথা সে ভাবতে পারে না। চিৎকার করে ওঠে সে, আপনাদের একটুও শরম হচ্ছে না? এই খবর-বওয়া পায়রাগুলো খলিফার প্রাণাধিক প্রিয়—কলিজার সমান। আর সেগুলো চুরি করে এনে আপনারা ফলার করছেন?

হাসান হাসতে হাসতে বলে, খলিফার পায়রা? কে, কে চুরি করেছে আপনার চিড়িয়াখানা থেকে?

—কেন, কিছুই জানেন না নাকি? এই কাইরোর মস্তান, আপনাদের চাঁদ আলীই চুরি করে এনেছে আমার হেপাজত থেকে।

চাঁদ আলী অবাক হওয়ার ভান করে বলে, সে কী? আমি ভেবেছিলাম এমনি সাধারণ পায়রা। কী করে জানবো ওগুলো খলিফার খবর চালাচালির পায়রা? হায় হায়, কী হবে? আমি তো মনের আনন্দে সবগুলোকে জবাই করে কড়াই-এ চাপিয়েছি...

ডিলাইলাহ রেকাবী থেকে একটা পায়রার ঠ্যাং ধরে ওপরে তুলে নাকের কাছে ধরে। কী যেন আঘ্রাণ করে। তারপর মুচকি হেসে আবার রেখে দেয়।

—ভালো তামাশা করতে জানতো, ছেলে? এ তো আমার সে পায়রা নয়!

হাসান আহমদ আলী সকলেই অবাক হয়। —সে কি? নাকে শুঁকে কী করে বুঝলেন, ও-পায়রা সে-পায়রা না?

ডিলাইলাহ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, খলিফার সোহাগের পায়রাগুলোকে রোজ দামী আতর মাখানো হয়। সে-আতরের খুশবু সেদ্ধ করলে বা কাবাব করলেও নষ্ট হবার নয়। তার সুবাস থাকবেই। কিন্তু এ পায়রার মাংসে তেল মসলার গন্ধ ছাড়া অন্য কিছু নাই।

এবার সকলে হো হো করে হেসে ওঠে, বহুৎ আচ্ছা। চিন্তা করবেন না, আমরা অত আহাম্মক নই, খলিফার পেয়ারের পায়রাগুলোকে আদরেই রেখেছি।

ডিলাইলাহ বলে, আপনাদের যা খুশি করুন। খলিফার জিনিস নিয়ে তামাশা করবেন না। ওগুলো আমাকে ফিরিয়ে দিন।

হাসান বলে, দেবো, নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবো। খলিফার সম্পত্তি জোর করে আটকে রাখার এক্তিয়ার কারো নাই। কিন্তু একটা শর্তে—

—কী শর্ত?

—আলীর সঙ্গে আপনার কন্যা জাইনাবের শাদী দিতে হবে।

ডিলাইলাহ হাসে, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে কি জানেন, মেয়ে লায়েক হয়েছে। তার নিজস্ব একটা মতামত আছে। সে যদি রাজি থাকে, আমি পা বাড়িয়েই আছি। কিন্তু আমার ইচ্ছাতেও তো আমাদের বংশের কোনও শাদী-নিকা হতে পারে না। আমার মাথার ওপরে আছেন বড় ভাই, জুরেক—এই শহরেই শুঁটকী মাছের ব্যবসা করেন তিনি। তাঁর মত করাতে হবে আপনাদের। তবে আমি কথা দিচ্ছি, মেয়েকে এবং আমার বড় ভাইকে আমি আমার সাধ্যমত বোঝাবার চেষ্টা করবো।

হাসান ইশারা করতে চাঁদ আলী পায়রার খাঁচাটা এনে ডিলাইলাহর হাতে তুলে দেয়। ডিলাইলাহ আর দেরি করে না, দ্রুত পায়ে হেসে ফিরে আসে নিজের ডেরায়।

—জাইনাব মা, ডিলাইলাহ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আলী তোকে শাদী করতে চায়। বড় সুন্দর ছেলে।

জাইনাব বলে, আমার কোনও অমত নাই মা। ওর মতো ভালো ছেলে হয় না।

তা না হলে যে সুযোগ সে পেয়েছিলো তাতে আমার সর্বনাশ করে দিতে পারতো। কিন্তু তা সে করেনি।

ডিলাইলাহ বলে, তা তো হলো মা, কিন্তু তোর মামাকে রাজি করাবি কি করে? এই শাদীর কথা শুনলেই তো সে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেবে।

এদিকে আলী হাসানকে জিজ্ঞেস করে, ওর মাতুল জুরেক লোকটি কেমন? তার দোকানই বা কোথায়?

হাসান বলে, লোক যেমনই হোক, তাকে রাজী করাতেই হবে। তা না হলে জাইনাবকে পাওয়ার কোনও আশা নাই। যদিও বৃদ্ধ জুরেক আজ শুঁটকী মাছের ব্যবসা করে, এক সময়ে এই মহাবিদ্যার ব্যবসায়ে তামাম ইরাকে নাম ডাক ছিলো তার। এক ডাকে চিনত সকলে। চুরি ডাকাতি রাহাজানি প্রতারণা প্রবঞ্চনায় তার জুড়ি ছিলো না কেউ। তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে নিত্য-নতুন লোক ঠকানোর ফন্দী-ফিকির বের হতো। আজ বুড়ো হয়েছে সে, গায়েব তাগদ কমে এসেছে। এখন আর ঐ সব ঝামেলার কাজে যেতে চায় না। সেই কারণে—শুঁটকী মাছের কারবার করছে বাজারে বসে বসে। তা এখনও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা সঙ্গ ছাড়েনি বুড়োর। ঐ দোকানেই তাদের আড্ডা বসে। অনেক বদ কর্মের সলা-পরামর্শ চলে গোপনে গোপনে। এখনও এই বুড়ো হাড়ে সে অনেক ভেল্কীই দেখাতে পারে। আমি আর আহমদ তো চোর গুণ্ডা ধাপ্পাবাজদের নাটের গুরু ছিলাম এককালে। আর তুমিও আমাদের যোগ্য সাগরেদ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সবাইকে সে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে দিতে পারে এখনও। তার মতো শঠ শয়তান ধূর্ত ধড়িবাজ আমার জীবনে দুটি দেখিনি। সুতরাং সাবধান বৎস, খুব সাবধান। আমার মনে হয়, ও বুড়োর কাছে আর্জি পেশ করে কোনও ফয়দা উঠাতে পারবে না তুমি। লাভের মধ্যে হবে—এই কচি বয়সে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবে। তোমার জায়গাতে যদি আমি হতাম আলী, তবে কসম খেয়ে বলছি, ঐ সুন্দরী জাইনাবের দিকে আমি হাত বাড়াতাম না। একেবারে গনগনে আগুন—পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে হবে। তার চেয়ে বলি কি, জীবনে চলার পথে অনেক খুবসুরৎ মেয়ের দেখা পাবে। তাদের কাউকে না হয় বিবি করে ঘরে এনো। কিন্তু এ দুরাশা তুমি ত্যাগ কর আলী, আমার কথা শোনো।

আলী বলে, কিন্তু ওস্তাদ, আমি যে তার কাজল-কালো চোখ দু'টো কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সদা-সর্বদা আমাকে হনন করছে। না না না, জাইনাবকে না পেলে আমি বাঁচবো না। ওকে আমার চাই-ই। কিসের অত ডর, আমি যাবো তার দোকানে। দেখি কি করে সে!

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটান্নতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

বাজারে গিয়ে জুরেকের সঙ্গে দেখা করলো আলী।

—আমি আপনার ভাগ্নী জাইনাবের পাণি-প্রার্থী! তাকে আমার খুব পছন্দ। আমার মনে হয় সেও গররাজী নয়। সুতরাং আমি চাই, আপনি আমাদের শুভ-মিলন ঘটিয়ে দিন।

বৃদ্ধ জুরেকের চোখে শয়তানের হাসি। আলীর আপদামস্তক নিরীক্ষণ করে বলে, তা সাহেবের কী করা হয়?

—জী, 'বড় বিদ্যা'র ব্যবস্থায় করি। আপনি তো এ বিদ্যায় সবার সেরা ছিলেন এককালে, সে খবর আমি জানি। আপনার ভগ্নী এবং ভাগ্নী দু'জনেই বাগদাদের সেরা ঠগ। আমার কাজকামের নমুনা অবশ্য এখানে সামান্যই দেখাতে পেরেছি। তবে কাইরো—আমার স্বদেশে আমাকে সবাই এক ডাকে চেনে। রোজগারপাতিও আপনাদের দোয়াতে কিছু কম করি না।

—হুম্, বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে যায়, তা তোমার কাজের খানিকটা নমুনা তো আমাকে দেখাতে হবে।

—হুকুম করুন, চাচা। কোনও কাজই আমি দুঃসাধ্য মনে করি না।

বৃদ্ধ বলে, শাদীর দেনমোহর দিতে হবে তো?

—নিশ্চয়ই দেবো। কি চান, বলুন?

বৃদ্ধ বললো, এই শহরে এক ইহুদী যাদুকর জহুরী আছে। তার নাম আজারিয়াহ। তার একমাত্র কন্যার একটি সোনার সাজ-পোশাক, একটি সোনার মুকুট এবং একজোড়া সোনার জুতো আছে। আমার মতে জাইনাবকে শাদী করতে হলে তোমাকে এই জিনিসগুলো দিয়েই দেনমোহর দিতে হবে। কী, পারবে?

আলী বলে, এ আর এমন কঠিন কী কাজ, কেন পারবো না?

—একটু উঁচুদরের ঠগবাজের কাছে, আপাতভাবে মনে হবে, ব্যাপারটা খুবই সহজ। আসলে কিন্তু অতটা সহজ নয়। ঐ ইহুদীটা মায়ামন্ত্র জানে। সে একটা বিরাট প্রাসাদে বাস করে। আগাগোড়া প্রাসাদটা সোনা আর রূপোর ইট দিয়ে গড়া। শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে তার ইমারত। কিন্তু আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত দিনের বেলায় কেউ খুঁজে পায়নি তার প্রাসাদ। জহুরী আজারিয়াহ যখন সকালবেলা বাজারে চলে আসে, তখন সে মন্ত্রবলে বাড়িটাকে অদৃশ্য করে রেখে আসে। ফলে, কোন চোর ডাকাতই তার প্রাসাদে ঢুকে কন্যার মহামূল্যবান আবরণ আভরণ চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে যেতে পারে না। এখন তা হলে বোঝ, কাজটা কতখানি সহজ।

আলী বলে, সে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমার ফন্দী ফিকিরের কাছে আপনার যাদুকর নস্যি। এক চালে সব টেনে বের করে এনে দেবো আপনার কাছে।

বৃদ্ধ জুরেকের চোখে অবিশ্বাসের হাসি। কিন্তু মুখে বলে, সাবাস্ বেটা, এই না হলে কাইরোর কামাল!

আলী সোজা চলে আসে স্যাকরা- পট্টিতে—ইহুদী জহুরী আজারিয়াহর দোকানের সামনে। দূর থেকে দেখেই সে চিনতে পারে জহুরীকে। লোকটার চেহারা কদাকার। প্রথম দর্শনে আঁৎকে উঠতে হয়। সচরাচর এমন কুৎসিত মানুষ চোখে পড়ে না। মাথার চুল বকের পালকের মতো শাদা। খুদে খুদে চোখ দু'টোর নিচের চামড়া জড়ো জড়ো হয়ে গেছে। আকর্ণ-বিস্তৃত মুখ। একটাও দাঁত নাই। নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে। নাকটা অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ, টিয়াপাখির মতো। গায়ের রঙ এককালে সোনার মতো ছিলো। কিন্তু জরাবার্ধক্যে কিছুটা ম্লান হলেও বেশ গৌরকান্তিই বলা যায়। শরীরটা হাড্ডিসার। মাংস নাই বললেই চলে। চোখের দৃষ্টি শকুনের মতো।

বুড়ো আজারিয়াহ তখন একটা নিক্তিতে সোনা ওজন করে থলেয় ভরছিলো। দরজার সামনে একটা খচ্চর দাঁড়িয়েছিলো। বুড়োটা সোনা ভর্তি থলেগুলো এক এক করে খচ্চরটার পিঠে চাপিয়ে দিলো। তারপর দোকানের দরজা বন্ধ করে খচ্চরটাকে মন্ত্র পড়ে অদৃশ্য করে তার পিছনে পিছনে চলতে থাকলো।

আলীও অনুসরণ করে চললো বুড়োটাকে। শহর ছাড়িয়ে মাঠ। মাঠের পথ ধরে বুড়োটা এগিয়ে চলে। পিছনে পিছনে আলীও। কিন্তু যতদূরই যায় কোনও জন-বসতির কিছুমাত্র দেখতে পায় না সে। চারদিকে শুধু ধূ-ধূ করা প্রান্তর। আলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ভাবে, লোকটা কি তার চলা শেষ করবে না আজ? ঠিক সেই সময় যাদুকর জহুরী দাঁড়িয়ে পড়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ায়। আর কী আশ্চর্য, তখুনি, সেই মাঠের মধ্যে বিশাল একখানা

প্রাসাদ সাকার হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ জুরেক যা বলেছিলো, অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। আগাগোড়া প্রাসাদটা সোনা আর রূপোর ইটে গড়া। স্ফটিকের তৈরি অগণিত দরজা জানালা।

যাদুকর জহুরী খচ্চরটার পিঠে চেপে ক্ষণকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর ওকে দেখা গেলো প্রাসাদের এক গবাক্ষে। তার হাতে একটা বড় বারকোষ। তাতে সাজানো একটি সোনার সাজ-পোশাক, একটি রত্নখচিত স্বর্ণমুকুট, আর একজোড়া সুবর্ণ পাদুকা। বুড়োটা বেশ গলা চড়িয়েই বলতে থাকে এই যে, শোনো কাইরোর পীর মস্তান, তুমি নাকি তামাম ইরাক, পারস্য এবং আরবের আতঙ্ক! তা এসো, দেখি কত হিম্মত তোমার, চুরি করে নিয়ে যাও তো আমার মেয়ের এই পোশাক আভরণ। যদি তুমি সত্যিই তেমন গুণধর হও, আমি জবান দিচ্ছি, আমার এই বিশাল বিষয় সম্পত্তির একমাত্র মালিক আমার মেয়েকে শাদী দেবো তোমার সঙ্গে।

আলী ভাবলো, জুরেকের প্রস্তাব বুড়োকে জানানো দরকার। শুধু শুধু চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে তো সে তার পিছু ধাওয়া করে আসেনি। সে কথা তাকে জানানো উচিত মনে করলো আলী। ইশারা ইঙ্গিত করে বোঝাতে চাইলো, সে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

বুড়োটা ইশারা করে ডাকলো, ওপরে এসো।

আলী চলে এলো দোতলায়, বুড়োর ঘরে।

জহুরী জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

—জী, চাঁদ আলী।

—কী বলতে চাও? কেন এসেছো আমার কাছে?

আলী বলে, আমি শহরের শুঁটকী মাছ ব্যবসায়ী জুরেকের ভাগ্নী জাইনাবকে শাদী করতে চাই। কিন্তু বুড়োটা আমার কাছে দেনমোহর হিসেবে দাবী করছে এক অদ্ভুত বস্তু।

—কী বস্তু?

—আপনার মেয়ের ব্যবহারের সোনার সাজ-পোশাক, সোনার মুকুট আর সোনার জুতো জোড়া সে চায়। শুধু এই কারণেই আমি আপনার পিছু ধাওয়া করে এসেছি। যেন তেন প্রকারে এই সামানগুলো আমাকে জোগাড় করতেই হবে।

বৃদ্ধ ভ্রুকুটি করে, জোগাড় করতেই হবে? তার মানে তুমি কী বলতে চাও, আমি দান-সত্র খুলে বসে আছি! যে যা চাইবে, তাই আমি দিয়ে দেবো তাকে?

আলী বলে, না, না তা আমি ভাবিনি। এমন অমূল্য ধন কেউ কাউকে প্রাণে ধরে বিলিয়ে দিতে পারে না। সে জন্য আমি তৈরি হয়ে এসেছি।

—তৈরি মানে? চুরি করবে?

চুরি না করতে পারলে ডাকাতিই করবো।

বুড়োটা ফোকলা মুখে বিকট করে হাসলো। তারপর যাদু টেবিলের দিকে এগিয়ে বললো, মরার যদি সাধ জাগে, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারো। আর যদি আমার কথা শোনো, তাহলে বলি, এসব বদ ফিকির ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। তা না হলে, এর আগে যেসব মস্তানরা হাত বাড়াতে এসেছিলো, তাদের যা দশা হয়েছিলো, তোমারও তাই হবে। আমি যদি গুনে পাই দেখি, তোমার মউৎ আমারই হাতে লেখা আছে, তবে আর একটা মুহূর্ত দেরি করবো না। এখুনি তোমার গর্দান মুণ্ডু আলাদা করে দেবো।

বুড়োর এই বস্তাপচা তম্বি শুনে আলী ক্রোধে জ্বলে ওঠে। ক্ষিপ্র হাতে সে তলোয়ার খুলে যাদুকরের বুকে বসিয়ে দিতে উদ্যত হয়। দারুণ দীপ্ত রোষে গর্জে ওঠে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে তোমার মেয়ের ঐ সামানগুলো যদি দিয়ে না দাও তবে শেষ করে দেবো তোমাকে।

বুড়ো দু পা পিছিয়ে গিয়ে দু'হাত জোড় করে এমন ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়ায়, যেন মনে

হয়, এক্ষুনি সে নতি স্বীকার করে আলীর ইচ্ছা পূরণ করবে। কিন্তু সে তার ছল মাত্র। পর মুহূর্তেই সে চিৎকার করে ওঠে, যে হাতে তুমি আমাকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছো, সেই ডান হাত তোমার অবশ পাথর হয়ে যাক।

সঙ্গে সঙ্গে আলীর হাত থেকে তলোয়ারখানা খসে পড়ে। হাতখানা যেমন উদ্যত ছিলো তেমনি অনড় থেকে যায়। আলী তক্ষুনি বাঁ হাত দিয়ে কুড়িয়ে নেয় তলোয়ারখানা। কিন্তু বুড়ো আবার বলে ওঠে, তোমার বাঁ হাতখানাও ঐ রকম হোক।

তৎক্ষণাৎ তার বাঁ হাত থেকেও তলোয়ারখানা নিচে পরে যায়। হাতখানা যেমন ওঠানো ছিলো তেমনি ওঠানোই থাকে। আলী ক্রোধে ফেটে পড়ে। প্রচণ্ড জোরে সে তার পেটের ওপরে এক লাথি বসিয়ে দেয়। ছিটকে পড়ে যায় বুড়ো, কিন্তু পলকের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করে বলে, তোমার ডান পাখনাও পাথর হয়ে যাক।

এরপর অসহায় আলী শুধুমাত্র বাঁ পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

এই সময়ে শাহরাজাদ দেখলো ভোর হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো বাষট্টিতম রজনী।

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলী তার অবশ অঙ্গগুলোকে সচল করার অনেক ব্যর্থ প্রয়াস করে। বুড়ো বলে, এবার? এবার কোথায় যাবে চাঁদ? এখনও কী আমার মেয়ের সামানপত্র হরণ করার সাধ জাগছে প্রাণে?

আলী বলে, এখন আমি নিরুপায়। কিন্তু তবু আশা কী করে ছাড়বো? তা হলে তো জাইনাবকে পাওয়ার আশাও ত্যাগ করতে হবে আমাকে। সে আমি পারবো না। জাইনাব ছাড়া আমার জীবনের অন্য কোনও কামনা নাই। তাকে আমি চাই-ই। আর সেই কারণেই আপনার মেয়ের জিনিসগুলোও আমাকে পেতে হবে।

বুড়ো শয়তানটার মুখে এক বদমাইশের হাসি ফুটে ওঠে, অতি উত্তম কথা। তা হলে তুমি তো আমার মেয়ের জিনিসগুলো না নিয়ে এখান থেকে যাবে না। কিন্তু বলি, নেবে কী করে। মাথায় করে মোট বয়ে নিয়ে যাবে? আহা-হা সে কী হয়। কাইরোর মালিক, কুলির কাজ করবে, সে কি হয়? তার চাইতে এসো, তোমাকে একটা গাধা বানিয়ে দিই। তখন দিব্যি পিঠে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে ওগুলো। লোকে দেখে কেউ আর ঠাট্টা-তামাশা করবে না।

এই বলে উঠে গিয়ে একটা ছোট্ট পাত্রে করে মন্ত্র-পড়া জল নিয়ে এসে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় কর কি সব আওড়ালো সে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা গর্দভের আকার ধারণ করলাম।

বুড়োর মুখে হাসি আর ধরে না, বলে এইতো দিব্যি সুন্দর চেহারা হয়েছে তোমার! কুলোর মতো কান, কি সুন্দর লেজ, আর মুখের সুরৎই বা কেমন চমৎকার হয়েছে। নিজের চেহারা তো নিজে দেখতে পাচ্ছো না, আহা যেন কোন্ সুলতান বাদশাহর পুত্র! রূপের জেল্লায় যেন ঘর ভরে গেলো।

আলীর অন্তর আক্রোশে খাক হতে থাকে। কিন্তু কী করবে, মুখের ভাষা নাই, কিছুই বলতে পারে না সে।

যাদুকর ওকে নিচে নামিয়ে এনে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে

কাঠকয়লা দিয়ে তার চারপাশে এক বৃত্ত এঁকে দেয়। অর্থাৎ এই বৃত্তের বাইরে সে পালাতে পারবে না!

ঐ উন্মুক্ত আকাশের নিচে অনাহারে অনিদ্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারাটা রাত কেটে যায় তার। অনেক কসরৎ করেও ঐ দাগের বাইরে পা বাড়াতে পারলো না সে।

সকালে যথারীতি দোকানে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বুড়ো আজারিয়াহ নিচে নেমে আলীর পিঠে চেপে বসে চাবুক মেরে বলে, চল, বাজারে চল। আজ তোকে বেচে দেবো। যাক্, আজকের মতো আমার বুড়ো খচ্চরটার তো একটু বিশ্রাম হলো। নে, জলদি চল।

আলী আর কী করবে, বুড়োটাকে পিঠে করে পথে নেমে পড়ে। এদিকে নিমেষের মধ্যে প্রাসাদটা হাওয়ায় মিশে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দোকানের সামনে যে জায়গায় খচ্চরটাকে বেঁধে রাখতো জহুরী, আলীকেও সেই জায়গায় বেঁধে রাখলো। সারাদিন ধরে ঠাঠা করা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলতে থাকলো সে। দানাপানি বলতে শুকনো কিছু ছোলা তাকে খেতে দিয়েছিলো বুড়োটা। কাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, সেই অবস্থায় ঐ শুকনো ছোলাই সে গব গব করে খেলো খানিকটা। যেমন করেই হোক, বেঁচে থাকতে হবে তাকে এবং জাইনাবের মাতুলের দাবী পুরণ করে জাইনাবকে পেতেই হবে।

বুড়োটা সারাদিন ধরে নিক্তিতে সোনা ওজন করে থলেয় ভরতে থাকে। আলীর মনে হয় শয়তানটাকে এক গুঁতো মেরে শেষ করে দেয়। কিন্তু নাগালের বাইরে বসে আছে সে। আলী মাঝে মাঝে বিকট চিৎকার করে ওঠে। আশে-পাশের দোকানদার পথচারীরা চকিত হয়ে তাকায়। আলী জলের চাড়িতে নাক ডুবিয়ে জল টেনে নিয়ে ফরফর করে জহুরীর গায়ে ছিটিয়ে দেয়।

আজারিয়াহ দাঁত কড়মড় করে বলে, দাঁড়াও, তোমাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করছি।

একটু পরে তার দোকানে একটা ইহুদী ছেলে এসে বলে, জহুরী সাহেব, বড় বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে। ব্যবসায় আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। এখন বিবি-বাচ্চাদের মুখে দানাপানি দেবো কী করে, তাই ভাবছি। এই নিন, আমার বিবির বাজুবন্ধ, এ দু'টো রেখে আমাকে কিছু টাকা দিন, আমি একটা গাধা কিনে পানির ভিস্তি বইয়ে বাড়ি বাড়ি পানি বেচবো।

বুড়ো জহুরী বলে, তোমাকে এই গাধাটা আমি দিতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত, এর পিঠে পেল্লায় বোঝা চাপাতে হবে। গাধাটা বড্ড বেয়াড়া, একেবারে খল, কিছুতেই নড়তে চায় না। ওকে বেধড়ক পিটে পিটে মোট বওয়াতে হবে। যদি রাজী থাক, আমি তোমাকে বিনি পয়সায় দিয়ে দিতে পারি।

ইহুদী ছেলেটা উৎসাহিত হয়ে বলে, সে আপনি কিছু ভাববেন না, জহুরী সাহেব। এমন পিটানী লাগাবো,ওর বাপ ঠাকুরদার নাম ভুলিয়ে দেবো আমি।

আলীকে সঙ্গে করে সে বাড়ি নিয়ে যায়। বিবিকে বলে, গাধাটাকে নিয়ে এলাম। কাল থেকে ওকে পানির ভিস্তি বহাবো। আমি কিছু সামানপত্র কিনতে বাজারে যাচ্ছি। তুমি একে কিছু দানাপানি খেতে দাও।

ইহুদীর বিবি কিছু ছোলা এনে আলীকে খেতে দিতে ওর সামনে এগিয়ে আসে। আলী প্রচণ্ড জোরে নাক ঝেড়ে মাথা দিয়ে একটা গুঁতো মেরে মাটিতে চিৎপাট করে ফেলে দেয় ওকে। তারপর বুকের নিচে চেপে ধরে তার গাধাড়ে লম্বা জিভটা দিয়ে বৌটার নরম গাল চাটতে থাকে। পড়ে যাওয়ার সময় বৌটার কাপড়-চোপড় অসংবৃত হয়ে গিয়েছিলো। গাধার কামোত্তেজনা দেখে সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। পাড়া কাঁপিয়ে চিৎকার করতে থাকে।

তার আর্তনাদে পড়শীরা ছুটে এসে গাধারূপী আলীকে ঘা-কতক লাগিয়ে সরিয়ে দেয়।

একটু পরে স্বামী ফিরে আসতেই রাগে ফেটে পড়ে বৌটা। তোমার মতো শয়তান বে-আক্কেলে মরদে আমার দরকার নাই। সারা বাগদাদে এই মেয়ে-খেকো গাধা ছাড়া আর গাধা খুঁজে পেলে না তুমি?

স্বামীটা কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, কেন, কী হয়েছে, কী করেছে গাধাটা? লাথ-ফাৎ চালিয়েছে নাকি?

—আরে না, ওসব হলে তো কথা ছিলো না। আসলে গাধাটা ভীষণ কামুক। আমাকে দেখামাত্র এক গুঁতো মেরে মাটিতে ফেলে দিলো। আমি তো চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেছি। কাপড়-চোপড় সরে গেছে, এক রকম উদোম বললেই হয়। গাধাটা করলো কি জান, আমার বুকের সঙ্গে বুক ঠেকিয়ে ওর ওই খরখরে জিভ দিয়ে আমার এই গাল আর ঠোঁট চাটতে লাগলো। আমি প্রাণপণে ওটার চেষ্টা করছি। ভয়ে শিটকে গেছি তখন। পরণের বেশ-বাস ঠিক নাই, কাউকে ডাকতেও পারছি না। কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, গাধাটা আমাকে শেষ না করে ছাড়বে না। আমাকে সে ফেঁড়ে ফেলবেই। এবং তার বিক্রম ঠেকাবার বা সহ্য করার শক্তি আমার নাই। তাই শরমের মাথা খেয়ে নিরুপায় হয়ে চিৎকার করে পাড়ার লোককে জড়ো করতে বাধ্য হলাম। সময় মতো ওরা এসে গাধাটার লালচ থেকে আমাকে না বাঁচালে এতক্ষণে আমি শেষ হয়ে যেতাম। আমাকে ফেঁড়ে ফেলে দিত সে। এখন তুমি এর বিহিত কর। হয় গাধাটাকে তাড়াও, নয়তো আমি তোমাকে তালাক দেবো। আর এক দণ্ড দেরি করবো না আমি।

ইহুদী যুবক বললো, আমার দরকার নাই এমন গাধার। যার গাধা তাকে ফেরত দিয়ে আসছি।

আলীকে মারতে মারতে সে ইহুদী জহুরীর দোকানে নিয়ে এসে বলে, আপনার গাধা আপনি ফেরত নিন, সাহেব। এমন বেয়াড়া জানোয়ার দিয়ে আমার কাজ চলবে না।

তারপর সে জহুরীকে গাধার কাণ্ডকারখানা সব খুলে বলে চলে গেলো। জহুরী আলীকে বললো, কীহে, সুন্দরী মেয়েছেলে দেখে লোভ সামলাতে পারোনি? আচ্ছা চলো, আজ তোমাকে অন্য দাওয়াই দেবো।

দোকানের কাজ-কাম সমাধা করে গাধার পিঠে সামানপত্র চাপিয়ে প্রাসাদে ফিরে যায় জহুরী।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

.

চারশো তেষট্টিতম রজনীতে আবার গল্প শুরু করে সে ঃ

আলীকে প্রাসাদের একটা ঘরে এনে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে আবার তাকে আগের আকৃতিতে ফিরিয়ে আনে।

—এবার বলো, তোমার কিছু শিক্ষা দীক্ষা হলো? এখনও কী সেই গোঁ ধরেই বসে আছো? না, মতটত কিছু পালটেছো?

আলী বলে, মত আমার একটাই! জান থাকতে তা পালটাবো না।

বুড়োটার চোখ জ্বলে ওঠে, হুঁ, ভাঙ্গবে, তবু মচকাবে না দেখছি।

আলী বুড়োটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাক করতেই সে পলকের মধ্যে মন্ত্রবলে তাকে একটা ভাল্লুকে রূপান্তরিত করে ফেলে।

গলায় একটা লোহার শিকল বেঁধে সারারাত প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে দাঁড় করিয়ে রেখে

দেয় আলীকে। সকাল বেলায় টানতে টানতে তাকে দোকানে নিয়ে যায় বুড়ো। সারাদিন ধরে টা টা করা রোদের মধ্যে দোকানের সামনে একটা খুঁটিতে বেঁধে রাখে। কত লোক আসে যায়, কত বেচা কেনা দেখে সে। কিন্তু কাউকেই কোনও কথা বলতে পারে না। জানাতে পারে না তার মনের বাসনা। বুড়ো যাদুকর তাকে বোবা করে রেখেছে।

একটি লোক আলীকে দেখে বুড়ো জহুরীটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, আপনার এই ভল্লুকটা বিক্রি করবেন? আমার বিবি খুব অসুস্থ। তাকে হেকিম দেখিয়েছি। তিনি বলেছেন, ভল্লুকের মাংস খাওয়াতে হবে আর ভল্লুকের চর্বি মাখাতে হবে তাকে। এই ভল্লুকটা পেলে আমার কাজ চলে যাবে।

যাদুকর বলে, আজই তুমি একে জবাই করতে চাও? তবে দিতে পারি।

লোকটা বললো, হ্যাঁ, আজই। আমার বিবির জন্যে সারা শহরে হন্যে হয়ে খুঁজছি। কিন্তু মনের মতো একটাও পেলাম না। আপনার ভল্লুকটা আমার খুব মনে ধরেছে।

জহুরী বললো, উত্তম কথা। নিয়ে যাও, আমি বিনি পয়সাতেই তোমাকে দিয়ে দিলাম।

আলীকে বাড়ি নিয়ে গেলো লোকটি। চাকরকে পাঠালো একটা কষাইকে আনার জন্য। কষাই এসে তার ছুরি শান দিতে দিতে বললো, ভল্লুকটা বেশ তাগড়াই, ভালো গোস্ত হবে।

মৃত্যুর মুখোমুখি হলে মানুষ তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য শরীরে দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চার করতে পারে। আলীও নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রচণ্ড বিক্রমে কষাইকে এক ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে চলে গেলো। একটানা ছুটতে ছুটতে অবশেষে সে যাদুকরের প্রাসাদে এসে হাজির হয়।

বুড়ো যাদুকর ভল্লুককে ফিরে আসতে দেখে বললো, ফিরে যখন এসেছো, আর একবার বাঁচার সুযোগ আমি তোমাকে দেবো। কিন্তু এখনও তুমি যদি একগুঁয়ে হয়েই বসে থাক, আমার কিছু করার নাই।

এই বলে সে আবার মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে আলীকে মানুষের চেহারায় ফিরিয়ে আনে। এবার সে তার কন্যা কামরকে ডাকে। যাদুকর-কন্যা আলীর অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এমন সুন্দর সুঠাম চেহারার নওজোয়ান সে জীবনে দেখেনি কখনও। আলীর সামনে এসে বলে, আচ্ছা সাহেব, সত্যি করে বলো তো, তুমি শুধু আমার সাজ-পোশাকই চাও—আমাকে চাও না?

আলী বলে, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো, আমি তোমার সাজ-পোশাকই চাই—তা শুধু আমার জাইনাবের জন্য। ওগুলো না দিতে পারলে তাকে যে আমি শাদী করতে পারবো না।

ক্ষোভে অপমানে কামর-এর মুখ কালো হয়ে যায়। বুড়ো আজারিয়াহ হুঙ্কার ছাড়ে, দেখলি মা, দেখলি? কত দেমাক দেখলি? এতোতেও ওর এক রতি শিক্ষা হলো না।

এই বলে সে আবার আলীর গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে বলে, কুকুর হয়ে যা। বলার সঙ্গে সঙ্গে আলী কুকুরের রূপ ধারণ করে। বুড়োটা ওর মুখে থুথু ছিটিয়ে এক গোত্তা মেরে রাস্তায় বের করে দেয়, যা, পথে পথে ঘোর।

আলী কুকুর হয়ে বাগদাদের এক প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চরে বেড়ায়। কিন্তু অন্য কুকুরের তাড়া ছাড়া কোনও খাদ্যবস্তুই সে সংগ্রহ করতে পারে না। খিদের জ্বালায় পেট জ্বলতে থাকে। শেষে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একটা দোকানের সামনে এসে ধুঁকতে ধুঁকতে এলিয়ে পড়ে। তার এই অবস্থা দেখে দোকানীর মনে করুণার উদ্রেক হয়। সে তাকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চৌষট্টিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সওদাগরের কন্যা কুকুররূপী আলীকে দেখা মাত্র নাকাব দিয়ে মুখ ঢেকে সামনে থেকে আড়ালে সরে গিয়ে বলে, আব্বাজান, এ তুমি কাকে ধরে নিয়ে এসেছো অন্দরমহলে?

সদাশয় বৃদ্ধ সওদাগর নিরীহ সরল মানুষ। কন্যার কথা কিছুই বুঝতে পারে না।

—তুই কার কথা বলছিস্ মা? আমার সঙ্গে তো অন্য কোনও পরপুরুষ আসেনি।

মেয়ে বলে, তুমি বুঝতে পারনি, আব্বাজান। যাকে তুমি কুকুর ভেবে অন্দরে এনেছো, আসলে যে এক নওজোয়ান পুরুষ। তার নাম চাঁদ আলী। কাইরোর বাসিন্দা। আজ নসীবের ফেরে পড়ে এই হাল হয়েছে। যাদুকর আজারিয়াহ তাকে কুকুর বানিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সওদাগরের বিশ্বাস হয় না। সে আলীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কী, যা বলছে আমার মেয়ে, সব ঠিক?

আলীর মুখে ভাষা নাই। কিন্তু বুঝতে পারে সবই। মাথা হেলিয়ে সে জানায়—সব সত্যি।

—ইহা আল্লাহ, সওদাগর চিৎকার করে উঠে, এখন উপায়?

—উপায় আছে, আব্বাজান। আমি ওকে আবার মানুষের রূপে ফিরিয়ে আনতে পারি।

সওদাগর অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকায়, তুমি? তুমি ওকে মানুষ বানিয়ে দিতে পারো?

পারি, আব্বাজান। যদি সে আমাকে শাদী করবে কথা দেয়, এক্ষুনি আমি ওকে ওর আগের চেহারায় ফিরিয়ে দিতে পারি।

হায় আল্লাহ, ওসব হিসেব নিকেষের কথা পরে হবে মা, যদি পারো, আগে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করে মানুষের চেহারায় ফিরিয়ে আনো ওকে। তারপর শাদীর প্রস্তাব দেবো আমি। নিশ্চয়ই সে অকৃতজ্ঞ হবে না।

সওদাগর-কন্যা তখন একটি পাত্রে খানিকটা জল এনে আলীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে বিড়বিড় করে মন্তর আওড়ায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলী আবার তার আগের রূপ যৌবন চেহারা সব ফিরে পায়।

সওদাগর অবাক হয়ে আলীকে দেখতে থাকে। এমন চাঁদের মতো সুন্দর ছেলেটাকে ঐ বুড়ো আজারিয়াহ একটা কুকুর বানিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিলো?

সওদাগরের ক্রীতদাসী নিগ্রো মেয়েটা ছুটে আসে; এ তোমার কী রকম ব্যাপার, ছোট মালকিন? তোমার সঙ্গে আমার ওয়াদা কী ছিলো?

এই নিগ্রো ষোড়শী মেয়েটি সওদাগর-কন্যারই সমবয়সী। বাড়ির কেনা দাসী হলেও সখী-সহচরীও বটে। আগে সে যাদুকর আজারিয়াহর বাড়িতে কাজ করতো। সেই সময় কায়দা করে সে বুড়োর পাঁজিপুঁথি চুরি করে পড়ে পড়ে এই যাদুবিদ্যার কৌশল রপ্ত করেছিলো। সওদাগরের বাড়িতে আসার পর তার মেয়ের সঙ্গে বেশ ভাব জমে যায় তার। তার অধিত বিদ্যার সবটাই সে শিখিয়ে পড়িয়ে দেয় তাকে। কিন্তু সে শেখানোয় একটা শর্ত ছিলো। ওরা দু'জনে কসম খেয়ে হলফ করেছিলো, জীবনে তারা কখনও কেউ কাউকে ছেড়ে থাকবে না। এবং সেই কারণে দু'জনেই একজন পুরুষকে শাদী করবে। কিন্তু আজ সওদাগর-কন্যা আলীকে শাদী করার প্রস্তাব দেবার সময় নিগ্রো সহচরীর কথা উল্লেখ করেনি বলে সে আহত হয়ে ক্ষোভ জানায়।—এ তোমার কেমনতর বিচার ছোটা মালকিন, কথা ছিলো যাকে শাদী করবো, দু'জনে এক সঙ্গে করবো?

আলী পুরোপুরি মানুষের আকৃতি ফিরে পেয়ে বলে, আমি তোমাদের দু'জনকেই শাদী করবো। তোমাদের দয়াতেই আমি আমার আগের জীবন ফিরে পেলাম।

এমন সময় দরজা ঠেলে জহুরী যাদুকরের মেয়ে কামর প্রবেশ করে সেখানে। তার হাতে একখানা সোনার রেকাবী। তাতে সাজানো তার সোনার পোশাক, সোনার মুকুট এবং সোনার জুতো জোড়া। সে বলে, এই নাও, তোমার ভালোবাসা জাইনাবের দেন-মোহর দিয়ে যেতে এসেছি আমি। সত্যিই জাইনাবের সৌভাগ্য দেখে হিংসে হয়। তার জন্যে তুমি যে অমানুষিক লাঞ্ছনাকষ্ট সয়েছো, ভালোবাসার ইতিহাসে তার কোনও নজির নাই। জাইনাবকে পেয়ে তোমার জীবন মধুময় হোক, তাতেই আমি সুখী হবো।

চাঁদ আলী বলে, জাইনাব আমার জীবনের স্বপ্ন। তাকে আমি নিশ্চয়ই চাই। সেই সঙ্গে তোমাদেরও দূরে রাখতে পারবো না। তোমরা এই তিনজন আমার জীবনে আবার নতুন করে ফুল ফুটিয়ে দিলে। কামর, তোমার এই মহান ত্যাগের কাহিনীও সোনার জলে লেখা থাকবে। জানি, প্রথম দর্শনেই তুমি আমাকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছো। আমার কষ্টে তুমি যন্ত্রণা ভোগ করেছো। আমার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য আজ তুমি নিজে হাতে করে নিয়ে এসেছো তোমার সবচেয়ে প্রিয় মহামূল্যবান সাজ-পোশাক। সে পোশাক আমি আমার প্রিয়তমা জাইনাবকে পরাবো, সে তুমি ভালো করেই জানো। সব জেনে শুনেও, তুমি যে এইসব আমার হাতে তুলে দিতে এসেছো এর বদলে তোমাকে কী শূন্য হাতে ফেরাবো?

—আমি কোনও প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি, আলী? শুধু তুমি সুখী হবে বলে—

আলী বলে, আজ তুমি যে সামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেক ওপরে উঠে এসেছো, কামর। তাই আমি তোমাকে শাদী করবো। এরা দু'জন আমার প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তুমি হবে আমার তৃতীয় বিবি।

—আর জাইনাব?

কামর জানতে চায়। আলী বলে, সে আমার চতুর্থ এবং শেষ বিবি। তারপরে আর আমার জীবনে কিছু নাই। তা হলে, আজকের মতো ছুটি দাও; আমি এই সাজ-পোশাক নিয়ে যাই জাইনাবের কাছে। তাকে দিয়ে আসি।

রাস্তায় বেরিয়ে আলী একটা বেঁটেখাটো মেঠাইওলার দেখা পায়! সে হালওয়া আর পেস্তার বরফি বিক্রি করে বেড়াচ্ছিল। আলী ভাবে, জাইনাবের কাছে কিছু মিষ্টি নিয়ে যাবে। মেঠাইওলাকে সে ডাকে, এই—শুনছো, এদিকে এসো, নামাও, দেখি কী মেঠাই আছে তোমার ডালায়।

লোকটা তাড়াতাড়ি কাছে এসে ডালা নামায়, আমার মেঠাই সারা বাগদাদের সেরা, সাহেব। একবার মুখ দিয়ে দেখুন না!

লোকটার হাত থেকে একটুকরো হালওয়া নিয়ে আলী মুখে পোরে। এগাল-ওগাল করতেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে থাকে। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। মাথাটা ধরে সে মাটিতে বসে পড়ে। তারপর মুহূর্তের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

এই বেঁটেখাঁটো মেঠাইওলাটি জাইনাবের বড় বোনের আটাশে ছেলে মহম্মদ। আলীকে ফাঁদে ফেলার জন্যই সে আফিং মেশানো মেঠাই নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

আলী পথের মাটিতে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ার পর মহম্মদ সেই সোনার সাজ-পোশাকগুলো বগলদাবা করে চোঁ দৌড় দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু হাসান তার ধনুর্ধরদের নিয়ে সেই সময় ঐ পথ দিয়ে ফিরছিলো। ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদকে পাকড়াও করে ফেলে। চড়-চাপড় লাগাতেই সে কবুল করে, হ্যাঁ

সামানগুলো চাঁদ আলীরই বটে। সে তাকে প্রতারণা করে আফিং মেশানো মণ্ডা খাইয়ে সে-গুলো নিয়ে সটকে পড়ার ফিকিরে ছিলো।

অচৈতন্য আলীকে হাসান তার বাড়িতে নিয়ে আসে। আফিং-এর ঘোর কাটানোর দাওয়াই দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। আলী চোখ খুলেই চিৎকার করে ওঠে, আমার জাইনাবের সাজ-পোশাক কোথায়?

হাসান হাসে, আছে, আছে। তোমার এতো কষ্টের সংগ্রহ করা জিনিস আর একটু হলেই লোপাট হয়ে যাচ্ছিল। সময় মতো আমার নজরে আসতে রক্ষা পেয়েছে, এই নাও।

চাঁদ আলী তার নিদারুণ অভিজ্ঞতার হৃদয়-বিদারক কাহিনী শোনালো হাসানকে। সব শুনে হাসান বলে, সাবাস, একেবারে কামাল করে দিয়েছো। কামরকে যখন শাদী করছো, তখন তো তুমি বুড়ো আজারিয়াহর দোকান-পাট প্রাসাদ সব বিষয় সম্পত্তির ষোল আনা মালিক হচ্ছো। তা হলে শাদীর উৎসবটা ঐ যাদুকরের প্রাসাদেই হবে, কী বলো?

আলী হাসে, তাতে আর বাধা কী? যাই হোক, এখন আমি জাইনাবের মামা সেই পাজি শয়তান জুরেকের কাছে এই সাজ-পোশাক নিয়ে যাবো। মনে হয়, এবার আর সে 'না' করতে পারবে না। শাদীর পর জাইনাবের সেই বোনপোটাকে একটু টিট করে দিতে হবে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁয়ষট্টিতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

হাসান জুরেককে খবর পাঠিয়েছিলো, আমরা আপনার বায়না মতো দেনমোহর সঙ্গে নিয়ে চিড়িয়াখানার বাসগৃহ ডিলাইলাহ এবং জাইনাবের কাছে যাচ্ছি। আপনি মেহেরবানী করে সেখানে আসুন।

আলীকে সঙ্গে নিয়ে হাসান সেই সাজ-পোশাকের রেকাবীখানা বয়ে নিয়ে চলে।

জাইনাব আর ডিলাইলাহ তখন পায়রাদের দানা খাওয়াচ্ছিল। জুরেক বসেছিলো এক পাশে। হাসান সাজ-পোশাকের ডালাখানা তার সামনে নামিয়ে বললো, দেখুন জনাব, আপনি যা যা চেয়েছিলেন, সব ঠিক ঠিক আছে কিনা, দেখে নিন। এবার তো আপনার অমত হবে না! এর পরেও যদি আপনি অন্য ছুতো তোলেন, তাহলে কিন্তু ইজ্জতের লড়াই বেধে যাবে আপনার সঙ্গে।

জুরেক হাসলো, আমি লোকটা একটু কড়া ধাঁচের, সবাই জানে। কিন্তু তা বলে কথার খেলাপ করবো কেন? খুব খুশি হয়েছি আমরা। আর কোনও কিছু দাবী দাওয়া নাই। জাইনাবও খুশি হয়ে শাদীতে মত দিচ্ছে।

পরদিন সকালে চাঁদ আলী জহুরী আজারিয়াহর প্রাসাদ অধিকার করে বসে। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় কাজীকে ডাকা হয়। আহমদ তার চল্লিশজন অনুচরদের সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যায়। পর পর চারটি শাদী-নামা তৈরি করে কাজী। ডিলাইলাহর কন্যা জাইনাব, আজারিয়াহ-তনয়া কামর, সদাগর-নন্দিনী এবং তার নিগ্রো সহচরী এই চারজনের সঙ্গে আলীর শাদীপর্ব সমাধা হয়!

প্রথম রজনীতে বাসরশয্যায় এলো জাইনাব। আলী বুঝলো; সত্যিই সে এতোদিন অপাপবিদ্ধ কুমারীই ছিলো। তার পরদিন থেকে প্রতিদিন এক এক বিবির সঙ্গে সহবাস করে সে খুশি হলো। তার চার বিবির সকলেই খুব চমৎকার।

এরপর পুরো, এক মাস ধরে খানাপিনার মহোৎসব চলতে থাকে। অতিথি মেহেমান অভ্যাগতরা খানাপিনা, নাচগান বাজনা হৈ-হল্লা করে সারা প্রাসাদ মাতিয়ে রাখলো।

হাসান দরবার থেকে ফিরে এসে আলীকে বললো, চাঁদ একটা শুভ সংবাদ আছে। খলিফার চোখ পড়েছে তোমার ওপর। তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন তাঁর কাছে।

আহমদ আর হাসানের সঙ্গে আলী দরবারে এসে খলিফাকে কুর্ণিশ জানিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। খলিফা আলীর রূপ দেখে মুগ্ধ হন।

প্রহরীদের একজন রুমালে ডাকা একখানা রেকাবী হাতে করে সুলতানের সামনে এসে দাঁড়ায়। খলিফার ইশারাতে রুমালখানা তুলে নেয় সে। রেকাবীর ওপরে একটি কাটা মুণ্ডু। খলিফা হেসে আলীকে জিজ্ঞেস করে, দেখো তো, চিনতে পারো কিনা—কার মাথা?

—আলী বলে, খুব পারি, ধর্মাবতার। এ সেই শয়তান জহুরী যাদুকর আজারিয়াহর কাল্লা।

খলিফা বলেন, লোকটার অত্যাচারে বাগদাদের মানুষ অহর্নিশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। এই তার সমুচিত পুরস্কার—

আলী বলে, ধর্মাবতার যোগ্য সাজাই বিধান করেছেন। আর কিছুকাল ওকে বাঁচিয়ে রাখলে তামাম শহরটাকেই সে জ্বালিয়ে দিত।

এরপর আলী তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলো খলিফার সামনে। খলিফা শুনে একদিকে যেমন বিস্মিত হলেন আর এক দিকে তেমনি মুগ্ধও হলেন আলীর দুঃসাহসিক অভিযান আর অসীম সাহস দেখে। তৎক্ষণাৎ তিনি আলীকে আহমদ হাসানের সম মর্যাদার পদে বহাল করলেন।

শাহরাজাদ থামলো।

সুলতান শাহরিয়ার জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা শাহরাজাদ এ কাহিনী কী সত্যি সত্যিই ঘটেছিলো? না, নেহাতই বানানো কিস্‌সা—।

শাহরাজাদ বলে, আমি যা বললাম, তার একবর্ণও বানানো নয়, জাঁহাপনা। সবই সত্যি ঘটনা। কিন্তু এরপর যে কাহিনীটা শোনাবো সেটা আরও চমক জাগানো, সত্যি ঘটনা। ধীবর যুদর অথবা আশ্চর্য যাদু-থলের কাহিনী শুনুন ঃ

উমর নামে এক সওদাগর ছিলো। তার তিন পুত্র। বড়টির নাম সালিম, মেজোটি সলিম আর ছোটছেলের নাম যুদর। সওদাগর তিন ছেলেকেই সমান আদর-যত্নে লালন-পালন করে বড় করলো। কিন্তু বড় দুই ভাই ছোটর প্রতি দুর্ব্যবহার করতো নিয়ত। সওদাগর বুঝলেন, তার মৃত্যুর পরও ছোটছেলের প্রতি অসদাচরণ করবে তারা। তাই সে কাজী এবং পরিবারের সকলকে ডেকে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললো, ভাই-এ ভাই-এ সদ্ভাব নাই। সুতরাং আমার মৃত্যুর পর ছোটকে পথে বসাবে বড় দুই ভাই। সেই কারণে আজই আমি আমার বিষয় সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিতে চাই।

উমরের নির্দেশে তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি সমান চার-ভাগে ভাগ করে দিলেন কাজী। এক

এক ভাগ পেলো এক এক পুত্র। বাকী একভাগ নিজের দখলে রাখলো সওদাগর। বললো, আমার মনে হয়, এবার আর কোন ঝগড়া বিবাদ বাধবে না। আমার মৃত্যুর পর আমার ভাগের সম্পত্তির মালিক হবে আমার বিধবা বিবি। শেষ বয়সে যাতে ছেলেদের হাত-তোলা হয়ে না থাকতে হয় তাকে, সেই কারণেই এই ব্যবস্থা করে গেলাম।

আত্মীয়-পরিজন সকলেই সাধুবাদ জানিয়ে বললো, খুব পাকা কাজ করে গেলো সওদাগর। এতে সকলেই সুখে শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সওদাগরের মৃত্যুর পর নানা ছলছুতো করে বড় দুই ভাই যুদরের বিষয়-সম্পত্তি বে-দখল করে নিলো।

যুদর পাড়া-প্রতিবেশিদের স্মরণাপন্ন হলো। তারা এসে মিটমাট করার অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। সালিশের কোনও কথাই বড় দু'ভাই গ্রাহ্য করলো না। তারা বললো, ছোটর জন্যই আমাদের এই দুর্দশা। এতো বড় সম্পত্তি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। দোকানপাট বিক্রি করে দিতে হয়েছে। এখন আমরা খাবো কী? সুতরাং ঐ সম্পত্তিরও ভাগ চাই আমরা।

প্রতিবেশিরা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো, দেখ, এসব ফালতু যুক্তি আইনের ধোপে টিকবে না। তোমার বাবা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কানুনমাফিক তিনি কাজী এবং সাক্ষী-সাবুদ ডেকে সম্পত্তি ন্যায্যমতো ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে গেছেন। আদালতে সেই দলিলই গ্রাহ্য হবে। এখন তোমরা বড় হয়েছো, বাপের বাক্য যদি অমান্য করতে চাও, আমাদের কিছু বলার নাই। তবে এটাও ঠিক, আমাদের পাঁচজনের কথা অগ্রাহ্য করে কোর্ট-কাছারী করলে, ফয়দা হবে না কারো।

এতেও বড় দুই ভাই-এর বোধোদয় হলো না। বাধ্য হয়েই যুদরকে আদালতে যেতে হলো। বিষয়-সম্পত্তির মামলা বড় জটিল ব্যাপার। অতি সহজে এর নিষ্পত্তি হতে পারে না। আর মামলা একবার রুজু করলে পিছনে হটাও সম্ভব না। আদালতে দাঁড়ানো মানেই উকিল মোক্তারকে জেবে পয়সা গুঁজে দেওয়া। এইভাবে কলসীর জল গড়াতে গড়াতে একদিন তা শেষ হতে বাধ্য। এছাড়া মামলা-মোকদ্দমার নেশা মদের নেশার চেয়েও মারাত্মক। মামলায় জেতার জেল মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দেয়।

উমর-সন্তানদেরও তাই হলো। মামলার খরচ জোগাতে জোগাতে এক এক করে সব বিষয়-সম্পত্তিই নিঃশেষ হয়ে গেলো সকলের। শেষ পর্যন্ত কেউই আর টিকে থাকতে পারলো না। মামলাটা খারিজ হয়ে গেলো।

এই সময়ে ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ছেষট্টিতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

তিন ভাই-এর এমন দুর্দশা-দিনান্তে একখানা রুটি আর একটুকরো পেঁয়াজ জোগাড় করতে পারে না তারা। বড় দুই ভাই এবার মা-এর বিষয়টুকু কেড়ে-কুড়ে নিয়ে উধাও হলো। মা বেচারী কাঁদতে কাঁদতে ছোটছেলে যুদরের কাছে এসে সাহায্য চায়। বড় দুই ছেলের নামে বার বার অভিসম্পাত দিতে থাকে।

যুদর বলে, অমন করে ওদের শাপ-শাপান্ত করো না, মা। হাজার হলেও ওরা তো তোমার পেটের সন্তান। উপরে আল্লাহ আছেন, তিনিই বিচার বিহিত করবেন। ও নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না। তোমার এই ছোটছেলে যুদর তো এখনও জিন্দা আছে মা। আমি যদি এক বেলা খেতে পাই, তুমিও পাবে! আর-খঞ্জ অথর্ব তো নই। গায়ে তাগদ আছে, জোয়ান মরদ ছেলে, দুনিয়ার হাজারো মানুষ খেটে খাচ্ছে, আর আমি পারবো না? তবে এও ঠিক, মায়ের সম্পত্তি ছেনতাই করে ওরা পেট ভরাবে, তাও আমি সইবো না। লাঠালাঠি আমি পছন্দ করি না, কিন্তু তা বলে, অন্যায়, অধর্মও আমি বরদাস্ত করবো না। যা হয় হবে, আজই আমি আবার মামলা ঠুকে দেবো ওদের নামে।

মা বাধা দিয়ে বললো, অমন কথাটি মুখে আনিসনি, বাবা। একবার মামলা করে তো দেখলি, কী হলো। নিজেরা পথের ভিখিরি হয়ে উকিল মোক্তারদের পেট মোটা করালি। যা গেছে তা যাক, আর কখনও আদালতের ত্রি-সীমানা মাড়াস না—এই আমার উপদেশ বাবা। ওতে আখেরে কারো লাভ হয় না। ওপরে তিনি আছেন, শেষ-বিচারের দিন কেউ

কিছু গোপন করতে পারবে না। কড়ায়-গণ্ডায় সব হিসেব নিকেষ নেবেন তিনি। তিনিই বিচার করবেন—সাজা দেবেন।

যুদর একখানা মাছধরা জাল কিনে আনলো। নীল নদের জলে মাছ ধরে বাজারে বেচতে লাগলো। প্রতিদিন সে বুলক পুলের ওপরে দাঁড়িয়ে নদীর জলে জাল ফেলে। কোনও দিন, নসীবে থাকলে, মোটামুটি কিছু মেলে, আবার কোনও দিন হয়তো বা শুধু চুনো পুঁটি পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। যুদর-এর মনে কোনও ক্ষোভ নাই। একদিন সে শহরের এক বিত্তবান পরিবারের সন্তান ছিলো, সে কথা ভেবে আজ সে বৃথা অনুতাপ করে না। কী ছিলো, কী রাখতে পারলে কী হতে পারতো, সেই-সব অলীক চিন্তায় সে একমুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চায় না। অবস্থা এবং সময়ের ফেরে আজ সে যেখানে দাঁড়িয়েছে তাকেই সে হাসিমুখে আলিঙ্গন করে নিয়েছে।

প্রত্যেক দিনই হয়তো সমান রোজগার হয় না—তবে কেনও দিন দশ, কোনও দিন কুড়ি, আবার কোনও দিন ত্রিশ-চল্লিশটা তামার পয়সা সে ঘরে আনতে পারে। দুধে-ভাতে না হলেও মোটামুটি খেয়ে পরে তাদের দু'জনের দিন চলে যায়।

মা-এর সর্বস্ব অপহরণ করেও তার দু-ভাই বেশি দিন রাখতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আবার তারা দীন-ভিখারি হয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকে।

মায়ের প্রাণ মোমের পাথরে গড়া। স্নেহের উত্তাপে গলেগলে সারা হতে কতক্ষণ! অভুক্ত উপবাসী, রিক্ত-বস্ত্র, নগ্নপ্রায় সন্তানকে দেখে কোন্ মা-ই বা পাষাণ হয়ে থাকতে পারে? যুদরের অলক্ষ্যে সে খিড়কীর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। সূর্য পাটে বসে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। অশরীরী প্রেতাত্মার মতো সালিম সলিম দুই ভাই মাটির সরা হাতে করে এসে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছে মা কিছু রুটি আর মচ্ছী ঢেলে দিয়ে বলে, যা যা, এখানে আর দাঁড়াস নে, পালা। ছোট এসে দেখলে আমাকে বকাবকি করবে।

এইভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় দুই ভাই চুপিসারে খিড়কির দরজায় এসে মায়ের দেওয়া রুটি—তরকারী নিয়ে চলে যায়। একদিন কিন্তু যুদর দেখে ফেলে। সাধারণত: এই সময় সে বাড়ি ফেরে না। কিন্তু সে-দিন কী একটা কারণে সে বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার মা দুই ভাই কে খেতে দিচ্ছে। ছোট ছেলে দেখে ফেলেছে জানতে পেরে মা ভয়ে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে থাকে। যুদর কিন্তু হাসিমুখে মা আর ভাইদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কী ব্যাপার বড় ভাই, তোমরা এই অন্ধকারে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? এসো, ভেতরে এসো। কতকাল তোমাদের দেখিনি। এইভাবে ছোট ভাইকে ভুলে থাকতে আছে? আমি অনেক খোঁজ করেছি তোমাদের। কিন্তু কোনও হদিস করতে পারিনি। কেমন আছ, কোথায় থাক কিছুই জানি না।

সালিম সলিম বলে, কী করে আর তোমার সামনে এসে দাঁড়াই, বলো? যে অন্যায় করেছি আমরা, তা কী অত সহজেই তুমি ভুলতে পারো? কী বলবো ভাই, সবই শয়তানের কারসাজি। তা না হলে, তোমার মতো ভাই-এর সঙ্গে আমরা ঝগড়া-বিবাদ করি? আজ আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি—কী দুর্ব্যবহারই না করেছি তোমার সঙ্গে। এখন এতো বড় দুনিয়াতে তুমি আর মা ছাড়া আমাদের আপনজন বলতে কেউ নাই, যুদর।

মা বলে, একমাত্র খোদা-তালার ওপর ভরসা রাখ, বাবা। তিনিই সব বিপদ কাটিয়ে দেবেন। আবার সুদিন ফিরে আসবে।

যুদর বললো, পথে পথে কোথায় ঘুরবে, আমার কাছেই থাক তোমরা। আমাদের যদি কিছু জোটে, তোমাদেরও জুটবে।

এইভাবে সেদিন সন্ধ্যায় ভাই-এ ভাই-এ আবার মিলন ঘটলো।

পরদিন সকালে উঠে তিন ভাই একসঙ্গে বসে নাস্তা-পানি করলো। তারপর যুদর জাল কাঁধে করে নীলের দিকে রওনা হলো আর সালিম সলিম বেড়াতে বেরুলো। দুপুরবেলায় ফিরে এসে তারা দু'জনে মা-এর সঙ্গে বসে আহারাদি সেরে আবার বেরিয়ে গেলো। সন্ধ্যায় ফিরে এলো যুদর। সারাদিন মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সব্জী মাংস সওদা করে ঘরে এলো সে।

এইভাবে একটা মাস কেটে যায়। যুদর সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে পয়সা রোজগার করে নিয়ে আসে। আর দুই ভাই খায় দায়, আর গুলতানি করে ঘুরে বেড়ায়।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সাতষট্টিতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

একদিন নদীতে জাল ফেলে ফেলে সারাদিনে একটি পুঁটি মাছও তুলতে পারলো না। পরদিনও সেই একই ব্যাপার ঘটলো। এই কারণে তার পরদিন সে জায়গা বদল করে নদীর অন্যত্র জাল ফেলতে লাগলো। কিন্তু এমনই বরাত সারাদিন ধরে চেষ্টা করেও একটা ছোটখাটো মাছও সে তুলতে পারলো না। পরদিন সে আবার স্থান পরিবর্তন করে। কিন্তু নসীব যখন সাধ দেয় না তখন কিছুতেই কিছু হয় না। এক এক করে অনেকগুলো জায়গায় জাল ফেলেও সে কিছু সংগ্রহ করতে পারলো না।

তবেকী পানিতে আর মাছ নাই? যুদর শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তা হলে কী উপায় হবে? ঘরে যা জমানো ছিলো সব শেষ হয়ে গেছে। আজ কিছু না নিয়ে যেতে পারলে উপোস দিতে হবে! সে নিজে না হয় দু-একটা দিন না খেয়ে কাটাতে পারবে । যুদর ভাবে, কিন্তু তার মা—তার দুই ভাই? তাদের অভুক্ত রাখবে কী করে?

চলতে চলতে এক সময় সে রুটির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রতিদিন সে ফেরার পথে এই দোকান থেকে রুটি কিনে বাড়ি ফেরে। কিন্তু আজ তার কাছে একটা পয়সা নাই। কী করে কিনবে রুটি!

যুদর দোকানের এক পুরানো খদ্দের। প্রত্যেক দিন সে জাল কাঁধে করে সোজা দোকানে ঢুকে রুটি কেনে। কিন্তু আজ, দোকানী ভাবে, সে ঐ ভাবে সতৃষ্ণ-নয়নে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছে কেন?

—যুদর ভাই, কী হলো? আজ বাইরে দাঁড়িয়ে যে? রুটি নেবে না?

যুদর কোন জবাব দিতে পারে না। দোকানী বলে, বুঝেছি, আজ জালে কিছু ধরা পড়েনি, এই তো? তা, এতো সঙ্কোচ কেন, ভাই। এসো, ভেতরে এসো, যা দরকার নিয়ে যাও। কাল মাছ উঠলে দাম দিয়ে যেও।

যুদর বলে, আমাকে দশ পয়সার রুটি দিন। কাল জালে মাছ উঠলে দাম দেবো।

— আরে, তার জন্য অত ভাবছো, কেন? কাল না হয়, পরশু দেবে। না হয় আরও দুদিন পরে দেবে। মাছ তো একদিন উঠবেই।

দোকানী ওকে রুটি এনে দেয়। যুদর কেমন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।—আপনি বরং আমার এই জালখানা বাঁধা রাখুন—

—পাগল ছেলের কথা শোনো, জালখানা এখানে রেখে দিলে তুমি মাছ ধরবে কী দিয়ে? যাও, বাড়ি যাও, খেয়ে দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাও গে। কাল সকালে তো আবার বেরুতে হবে।

যুদর স্বস্তি পায়। সে রাতটাও কোনোরকমে কেটে যায় । কিন্তু পরদিনও সে

একটা মাছ তুলতে পারে না। সেদিনও রুটিওলা ওকে ধারে রুটি দেয়। বলে, যুদর ভাই আমার, কোনও শরম করো না। যা দরকার আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও। জানি, মানুষের সব দিন সমান যায় না। তা বলে মুষড়ে পড়লে তো চলবে না। বরং মনে আরও সাহস সঞ্চয় করতে হবে। খারাপ সময়ের মোকাবিলা করাই আদর্শ কর্ম।

যুদর বলে , আল্লাহ আপনার মঙ্গল করবেন। দেখি, কাল আবার জায়গা বদল করে জাল ফেলবো।

কিন্তু তার পরদিনও যুদর কোনও মাছ ধরতে পারে না। সেদিনও সে রুটিওলার কাছ থেকে কিছু রুটি এবং দশটা নগদ পয়সা ধার করে নিয়ে যায়। ভাবে, পরদিন নিশ্চয়ই সে মোটা মাছ পাবে। তা হলে প্রথমে সে দোকানীর ধার মিটিয়ে দেবে। মানুষটা বড় ভালো। তার সহৃদয়তা কখনও সে ভুলতে পারবে না! কিন্তু হায় রে পোড়া কপাল, সারাদিন চষে বেড়িয়েও সে দশ পয়সার মাছ ধরতে পারলো না। সে দিন সে আর দোকানের সামনে না দাঁড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে থাকে। দোকানী ছুটে এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

—এই তোমার ব্যবহার? পয়সা দেওয়ার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছো?

যুদর কী বলবে, ভেবে পায় না।

—উঁ হুঁ, একটিও কথা নয় যুদর, এই ধর, রুটি নাও। আর এই নাও দশটা পয়সা। শুধু রুটি তো খাওয়া যাবে না: কিছু সব্জী কিনে নিয়ে যাও। খেয়ে দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাও গে। শরীরটাকে তো ঠিক রাখতে হবে। তার পর কালকের ব্যাপার কাল দেখা যাবে। আমার যতটা সাধ্য আছে আমি তোমাকে দিয়ে যাবো। তোমার যখন সুবিধে হবে আমাকে ফেরত দিও। কোনও লজ্জা করো না, বুঝলে?

পরদিনও সে শুন্য হাতে ফিরে এসে দোকানীর কাছ থেকে রুটি আর পয়সা কর্জ করে বাড়ি আসে। এইভাবে আরও সাতটা দিন সে দেনা করেই কাটায়। রোজইজাল নিয়ে নদীতে যায়, কিন্তু একটা খলসে চাঁদাও জালে ওঠে না। ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে সে। এভাবে কতদিন চালাবে সে? না না না—মাছ তাকে ধরতেই হবে। এই নীল নদ তাকে আর কিছু দেবে না। সে একেবারে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তা নিক, তা বলে সে তো আর হাল ছেড়ে বসে থাকতে পারে না। নীল যদি নির্দয়ভাবে তাকে ফেরায়ও তবে সে অন্য কোথাও বা অন্য কোনওখানে গিয়ে জাল ফেলবে, মাছ তাকে তুলতেই হবে।

পরদিন সকালে সে জাল নিয়ে কারুণ হ্রদে যায়। এই হ্রদটা কাইরো থেকে বেশি দূরে নয়। সবে জলে জাল ফেলতে যাবে, এখন সময় সে দেখতে পেলো, এক মুর একটি সুসজ্জিত খচ্চরে চেপে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। নিজেও সেজেছে মূল্যবান সাজ-পোশাকে। মুর তাকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়, কী গো উমরের পো যুদর, কেমন আছ?

—এই—কেটে যাচ্ছে, হাজী সাহেব?

হাজী সাহেব আরও কাছে এসে বলে, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম উমরের' পো। তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে, বাবা! যুদর বলে, কী দরকার বলুন, চাচা। আমি তো আপনারই বান্দা। আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনও কাজ হয়, এখুনি করে দেবো।

হাজী সাহেব প্রথমে কোরাণ শরীফের কয়েকটা বয়েৎ আবৃত্তি করলো। তারপর জীনের হাওদায় ঝুলানো একটা থলে থেকে একগাছি রেশমী সুতা বের করে বললো, শোনও উমরের পো যুদর, এই রেশমী রশিটা দিয়ে তুমি আমার হাত দু'টো পিছমোড়া করে বাঁধো। তারপর ঐ সাগরের পানিতে আমাকে ফেলে দাও। যদি প্রথমে আমার হাত ভেসে ওঠে, আমাকে তুমি জাল ফেলে ওপরে তুলে আনবে। আর যদি দেখ, আমার পা দু'খানা জলের

ওপরে ভেসে উঠেছে বুঝবে, আমি মারা গেছি। তখন তুমি আমার এই থলেটা আর খচ্চরটা নিয়ে বাজারে যাবে। সেখানে ইহুদী সামাইয়াহর কাছে খচ্চরটাকে একশো দিনারে বেচে দেবে। খুব গোপন রাখবে এসব কথা। কাউকে বলবে না কিন্তু।

এই সময় ভোর হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো আটষট্টিতম রজনী।

আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

মুরের সেই কথামতো যুদর সুতোটা দিয়ে তাকে পিছমোড়া দিয়ে হাত দু'খানাকে শক্ত করে বাঁধে। তারপর কাঁধে তুলে হ্রদের জলে ফেলে দেয় তাকে।

কিছুক্ষণ পরে দু'খানা পা ভেসে ওঠে জলের ওপর। যুদর বুঝলো হাজী সাহেবের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। যুদর আর অপেক্ষা না করে খচ্চরের পিঠে চেপে বসে।

বাজারে ঢুকে সেই ইহুদী সামাইয়াহকে খুঁজে বের করে সে। লোকটা জুল-জুল করে খচ্চরটার দিকে তাকায়।

—হুম, তা হলে খতমই হয়ে গেলো—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

ইহুদী সহওদাগর যুদরকে খচ্চরের মূল্য বাবদ একশো দিনার দিয়ে বললো, ব্যাপারটা গোপন রেখ, কাউকে বলো না যেন।

যুদর সব আগে রুটিওলার কাছে ছুটে আসে। একটা গোটা দিনার তার হাতে দিয়ে বলে, এই নিন আপনার ধারটা কেটে নিন। আর যা থাকে আমাকে রুটি দিন।

দোকানী হিসেবপত্র করে বললো, আরও দুদিন রুটি দিলে তবে দিনারটা পুরো হবে।

এরপর যুদর কসাই ও সব্জীওলার কাছে গিয়ে তাদের দেনা পরিশোধ করে মাংস আর কাঁচা তরকারী সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই যুদরের কানে এলো তার দুই ভাই খাবারের জন্যে মাকে নানারকম কটু কথা শোনাচ্ছে। ছোট ভাই-এর হাতে খাবার-দাবার দেখে তারা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিলো রুটির ঠোঙাটা।

পরদিন আবার জাল কাঁধে করে যুদর কারুণ হ্রদে যায়। জলে জাল ফেলতে যাবে, এমন সময় আর এক মুর একটা খচ্চরে চেপে তার সামনে এসে হাজির হয়।

—হ্যাঁ গো, উমরের পো যুদর, গতকাল কী এই সময় এখানে আমার মতো আর একজন মুর এসেছিলো? জান কিছু তুমি?

যুদর ভাবলো, লোকটা তার কাছ থেকে ধোঁকা দিয়ে কথা বের করে নিতে চায়। কিন্তু মুর সাহেব্ তাকে বারণ করে গেছে—কাউকে কিছু বলবে না।

—জী না, কই কেউ আসেনি তো—

—কেন মিথ্যে বলছো, উমরের পো যুদর। আমি জানি, সে কাল এখানে এসেছিলো। সে তো আমার বড় ভাই। তার কথা মতো তুমি তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে এই দরিয়ায় ফেলে দিলে। তারপর পা দু'টো ভেসে উঠলে তার কথামতো খচ্চরটাকে বাজারের ইহুদী সওদাগর সামাইয়াহর কাছে একশো দিনারে বেচে দিয়ে চলে গেছ তুমি। আমার কাছে লুকাচ্ছো কেন? আমি সবই জানি।

—তা এতোই যদি জানেন, আমাকে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?

মুরটা বলে, না, মানে—আমি তোমার কাছ থেকে এই কাজটুকুই চাই। আমার বড় ভাই-এর মতো আমাকেও বেঁধে তুমি পানিতে ফেলে দাও। যদি আমার পা ভেসে ওঠে, আমার খচ্চরটা নিয়ে গিয়ে ইহুদীটার কাছে একশো দিনারে বেচে তুমি বক্শিশ নিও।

যুদর মুর-এর হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বেঁধে হ্রদের জলে ফেলে দিয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকলো। একটুক্ষণের মধ্যেই দু'খানা পা উঠলো জলের ওপর।

—ইয়া আল্লাহ, লোকটা খতম হয়ে গেলো। বা, বেশ মজা তো? নিত্যি যদি এমনি একটা মক্কেল জোটে মন্দ হয় না।

ইহুদী সওদাগরটা আবার যুদরকে খচ্চরে চেপে আসতে দেখে আফসোস করে ওঠে, আর একটাও গেলো! লোভ যে মানুষকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়—

কথা আর শেষ করে না, ঝকঝকে একশোটা স্বর্ণমুদ্রা গুণে যুদরের হাতে দেয় সে।

যুদর পুরো টাকাটা এনে মা-এর হাতে তুলে দেয়। মা বুঝতে পারে না, এতো সোনা তার ধীবর ছেলে পেলো কোথায়? ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে খোকা, এসব পেলি কোথায়? আমার ডর লাগছে, বাবা।

যুদর বলে, ভয়ের কোনও ব্যাপার নাই, মা। তোমার ছেলে যুদর কাউকে ঠকিয়ে একটা পয়সা ঘরে আনবে না।

এরপর সব ব্যাপারটা খুলে বললো সে মা-এর কাছে। মা শঙ্কিত হয়ে বলে, কী জানি, আমার বুক কাঁপছে, বাবা। কাল থেকে আর ঐ কারুণ সায়রে তোমার যাওয়ার দরকার নাই। এই মুর জাতটাকে আমার বড় ভয়।

—কিন্তু মা, যুদর বলে, ওদের কথামতোই আমি ওদের জলে ফেলে দিয়েছি। আমার দোষটা কোথায়? এমন একটা লাভের কারবার কেউ সাধ করে বন্ধ করে? ফি দিনে যেখানে নগদ একশোটা সোনার মোহর রোজগার হচ্ছে, সেই কাজ তুমি আমাকে বন্ধ করতে বলছো, মা? যাই-ই বল, আমি কিন্তু রোজই কারুণ সায়রে যাবো। এমন আশা কেউ ছাড়তে পারে?

পরদিন যথাসময়ে কারুণের তীরে গিয়ে বসে। সেদিনও আর এক মুর এসে হাজির হয়। দারুণ জমকালো তার সাজ-পোশাক, বাহারী জীন লাগামে সাজিয়েছে খচ্চরটাকে। যুদর অবাক হয়ে দেখলো, জীনের দুপাশে দু'টো কাঁচের কলসী ঝুলছে। লোকটা কাছে এসে সেই একই ভাবে শুভেচ্ছা জানায়।

—হ্যাঁ গো উমরের পো যুদর, কেমন আছো?

—এই, কেটে যাচ্ছে, আর কী।

যুদর অবাক হয়, এই লোকগুলো সকলেই তার নাম ধাম জানলো কী করে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো ঊনসত্তরতম রজনী।

আবার সে বলতে থাকে ঃ

—এর আগে আর কোনও মুর এসেছিলো এখানে? আগন্তুক প্রশ্ন করে।

যুদর বলে, দু'জন।

—কোথায় গেলো তারা?

যুদর বলে, আমি তাদের বেঁধে এই সায়রের জলে ফেলে দিয়েছি। তারা দু'জনেই অক্কা পেয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, আপনিও এক পথের পথিক। তাহলে আর দেরি কেন, আসুন।

বৃদ্ধ মুর হাসে, অবোধ বেচারা, তুমি কি জানো না, প্রত্যেক মানুষেরই ভাগ্যলিপি আগে থেকে লেখা থাকে তার কপালে?

এই বলে সে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে একগাছি রেশমী সূতো তুলে দেয় যুদরের হাতে। বলে, চটপট কাজ হাসিল কর, আমার আর তর সইছে না।

যুদর বলে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, হাত আমার রপ্ত হয়ে গেছে। এক্ষুণি আপনাকে আচ্ছা করে কষে বেঁধে ডুবিয়ে দিচ্ছি—যাতে আর আপনি জিন্দা ভেসে উঠতে না পারেন।

মুর বলে, সাবাস, এই না হলে তুমি উমরের সন্তান যুদর।

যুদর ওকে খুব মজবুত করে বেঁধে সায়রের জলে ফেলে দেয়। অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, কখন পা দু'খানা ভেসে উঠবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, পা-এর বদলে ভেসে উঠলো দু'খানা হাত। লোকটা খাবি খেতে খেতে চিৎকার করতে থাকলো, জলদি জাল ফেলে আমাকে টেনে তোলো। না হলে আমি সাঁতার জানি না, মরে যাবো।

যুদর ক্ষিপ্রহাতে জালখানা বৃত্তাকারে ছড়িয়ে তার মাথার ওপরে ফেললো। কিছুক্ষণের মধ্যে টেনে তুললো তাকে সাগরের তীরে এবং অবাক হয়ে সে দেখলো, লোকটার দু'হাতে দু'টো প্রবাল বর্ণের রঙিন মাছ। বৃদ্ধ মাছ দু'টো শক্ত মুঠিতে ধরে উঠে দাঁড়ালো। খচ্চরের জিনে ঝোলানো সেই কাঁচের কলসী দু'টোতে মাছ দু'টো পুরে যুদরকে সে জড়িয়ে ধরে এন্তার চুমু খেয়ে আদর করতে থাকলো।

—আজ তোমার জন্যেই আমি জানে বেঁচেছি। তুমি সাহায্য না করলে এ মাছ আমি কিছুতেই ধরতে পারতাম না, যুদর।

যুদর বললো, সত্যিই যদি আমি আপনার কোনও কাজে লেগেছি মনে করেন তবে মেহেরবানী করে এই হেঁয়ালীটা আমাকে একটু খুলে বলুন। সে-ই আমার ইনাম পাওয়া হবে।

বৃদ্ধ বলতে থাকে ঃ তোমার ধারণা ঠিকই। গত দুদিন যে দু'জন এই সায়রে প্রাণ হারিয়েছে, ওরা দু'জনই আমার বড় ভাই। প্রথম জনের নাম আবদ অল সামাদ। আর ঐ বাজারের যে ইহুদী সওদাগর সেজে তোমার কাছ থেকে একশো দিনার দিয়ে খচ্চরটা কিনেছে—ও আমার চতুর্থ ভাই, সাচ্চা মুসলমান। ওর আসল নাম আবদ্ অল রহিম। আমাদের বাবা, আবদ অল ওয়াদুদ, একজন ক্ষমতাবান যাদুকর ছিলেন। নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিলো তাঁর। তিনিই আমাদের চার ভাইকে যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিলেন। এছাড়াও আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক মন্তরতন্তর এবং গুপ্তধন আবিষ্কারের সূত্র পাঠ করতে শিখেছিলাম। এই সব অলৌকিক বিদ্যা এমনভাবেই আমরা রপ্ত করতে পেরেছিলাম যে, জিন মারিদ এবং আফ্রিদিরাও আমাদের ইশারায় উঠ বোস করে।

পরিণত বয়সে বাবা একদিন দেহ রাখলেন। তিনি যে বিশাল বিষয় সম্পত্তি এবং অমূল্য ধনরত্ন রেখে গিয়েছিলেন তা এক কথায় অপরিমেয়। আমরা বলতে পারবো না—টাকার অঙ্কে তা কত হতে পারে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, বাবার একখানা হাতে লেখা কিতাব ছিলো। সেই ভীষণ ভারি কিতাবকানা একদিকে আর অন্যদিকে সমান ওজনের হীরে চাপালে সেই হীরের যা দাম হবে তাতে ঐ কিতাবের দামের হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র হতে পারে। তবেই বোঝ, ব্যাপারখানা কী।

এ হেন সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে কলহ-কাজিয়া বাধাই স্বাভাবিক। আমরা চার ভাই তাঁর রেখে যাওয়া ধন-রত্নাদি, আপোষে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করে নিতে পারলাম। কিন্তু মুশকিল হলো বাবার মহামূল্য কিতাবগুলোর স্বত্ব নিয়ে। কে কোন্‌খানা নেবে, সেই নিয়ে ঝগড়া বিবাদ বাধলো। আগেই বলেছি, বাবার সবচেয়ে মূল্যবান কিতাবখানা—'এল্ড' নিয়ে বিবাদ চরমে উঠলো। কেউ ছাড়তে চায় না কারো অধিকার।

এমন সময় একদিন আমাদের বাড়ীতে এলেন এক সদাশয় বৃদ্ধ। এঁর কাছ থেকে বাবা সবকিছু শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেই পীরসদৃশ বৃদ্ধের নাম অল-কাহিন অল-অবতান। তিনি সেই মহামূল্য কিতাব 'এল্ড' হাতে নিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য করে বাণী দিলেন ঃ বৎস, তোমরা আমার প্রাণাধিক পুত্রসম শিষ্যের আদরের দুলাল। বিশেষ কারো প্রতি পক্ষপাত

দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমি ফরমান দিচ্ছি—যে অল শমরদলের গুপ্তধন আবিষ্কার করে তার সেই অলৌকিক গোলক, কাজললতা, তলোয়ার এবং সেই মোহর আঁকা আংটিটা নিয়ে আসতে পারবে সে-ই এই কিতাবের মালিক হওয়ার যোগ্য হতে পারবে। এই সব জিনিসগুলোর অলৌকিক যাদু ক্ষমতা আছে। সেই আংটিটা রক্ষা করছে আর এক জিন। তার নাম বজ্রদানব। এই আংটি যদি কেউ ধারণ করতে পারে তবে সে সলতানিয়তের সুলতান না হয়েও দণ্ড-মুণ্ডে বিধাতার ক্ষমতা অর্জন করবে। সুলতানের সব ক্ষমতাই সে করায়ত্ত করতে পারবে। তার হুকুম তামাম দুনিয়া তামিল করবে। আর ঐ তলোয়ার যার হাতে থাকে সে আর কাকে ডরায়? এক বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ঐ একখানা তলোয়ারে সে কেটে কুচি কুচি করে দিতে পারবে। আর ঐ গোলকটা থাকবে যার দখলে সে ঘরে বসে সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে এক মুহূর্তে। যে দেশের যে জায়গা দেখার ইচ্ছা হবে গোলকের সেই বিন্দুতে আঙ্গুল রাখার সঙ্গে সঙ্গে গোলকটা বনবন করে ঘুরতে থাকবে এবং তখুনি তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে সেই দেশের গ্রামগঞ্জ পথঘাট নদী-নালা পশুপক্ষী মানুষ জন, সব। যদি এই গোলকাধিপতি পৃথিবীর কোন দেশ পর্যবেক্ষণ করতে করতে বুঝতে পারেন, কোথাও ঘোর অন্যায় অবিচার এবং পাপে পূর্ণ হয়ে গেছে তখন তিনি সূর্যের রশ্মি আকর্ষণ করে সেই দেশকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারেন। আর ঐ কাজললতার কাজল যদি কেউ চোখে লাগান তবে পৃথিবীর তাবৎ লুকানো গুপ্ত ধনাগার তাঁর সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। এই কিতাব 'এল্ড' যদি পেতে চাও তোমরা, তবে এই পরম আশ্চর্য ঐশ্বর্য ভাণ্ডার আবিষ্কার করে এই জিনিসগুলো বের করে আনতে হবে। এখন দেখ চেষ্টা করে—কে আনতে পারো।

তখন আমরা চার ভাই-ই সমস্বরে বললাম, আমরা আপনার শর্তে রাজি আছি, পীর সাহেব। কিন্তু আমরা তো কেউই শমরদলের সেই অতুল ঐশ্বর্য ভাণ্ডার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সত্তরতম রজনী। আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

তখন সেই জ্ঞান-বৃদ্ধ পীর কাহিনী বললেন ঃ

সুলতান লাল শাহর দুই পুত্রের অধিকারে আছে এই শমরদল। তাদের দু'জনকে পরাজিত না করতে পারলে সেই ঐশ্বর্য ভাণ্ডার অধিকার করা সম্ভব নয়। তোমাদের পিতা অনেক চেষ্টা করেছিলো সুলতানের পুত্র দুটিকে কব্জায় আনার। শঙ্কিত হয়ে কিন্তু পূর্বাহ্নেই সংবাদ পেয়ে ও আত্মরক্ষার জন্য তারা কারুণ সায়রে ঝাঁপ দিয়ে প্রবাল মাছের রূপ ধরে আত্মগোপন করে রইলো। তোমার পিতা আর ঝামেলার মধ্যে যেতে চাইলো না। তখন আমি গুণে পড়ে দেখলাম, এই অবস্থায় শমরদলের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার তখন আর আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। বেশ কিছুকাল পরে কাইরোর যুদর নামে এক যুবকের সাহায্যেই শুধু এই সম্পদ উদ্ধার হতে পারবে। এই যুদর সওদাগর উমরের পুত্র। জাত-ব্যবসা তার মাছ ধরা নয়, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকে এই ব্যবসায়ই গ্রহণ করতে হবে এবং নিরুপায় হয়ে একদিন তাকে আসতেও হবে এই কারুণের উপকূলে। কবে সে আসবে তার প্রতীক্ষায় দিন গুণতে হবে। তার আগমনেই শুধু ঐ সায়রের মধ্যে নিক্ষেপ করাতে হবে নিজের দেহটাকে। পানির তলায় যাওয়া মাত্র তার বন্ধন মুক্ত হবে। সে তখন সন্ধান করে বেড়াবে শুধুমাত্র দুটি প্রবাল মাছ—সেই সুলতানের দুই পুত্রকে। যদি তার বরাত ভালো হয়, যদি সে ধরতে পারে তাদের, তবেই তার হাত দু'খানা ভেসে উঠবে উপরে। তখন ঐ উমর-সন্তান যুদর জাল ফেলে তাকে কূলে তুলে আনবে। আর যে তা পারবে না, অর্থাৎ সেই প্রবাল মাছ দু'টো ধরতে পারবে না, তার

আর বাঁচবার কোন আশা থাকবে না। কারুণের পাণিতে তার সলিল সমাধি ঘটবে। মরার পর তার পা দু'খানা ভেসে উঠবে শুধু।

আমরা বড় তিনজন বললাম, ঠিক আছে মরতেও আমরা রাজি আছি। আমরা যাবো সেই কারুণ সায়রে। দেখবো, সেই প্রবাল মৎস্যরূপী শাহজাহাদের পারি কিনা ধরতে? যায় যাবে প্রাণ, যাক। মরতে তো একদিন হবেই।

কিন্তু আমাদের ছোটভাই, আবদ অল রহিম এই দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে রাজি হলো না এবং শুধু এই কারণেই আমরা তাকে ইহুদী সওদাগর বলে ক্ষ্যাপাতে লাগলাম। সেই থেকে লোকে জানে, সে ইহুদী সওদাগর। কিন্তু আসলে তার মতো সাচ্চা মুসলমান পাওয়া ভার।

আমাদের ওয়াদা ছিলো, যদি কেউ কারুণের পানিতে প্রাণ হারায় তবে তার খচ্চর আর থলেটা যুদর নিয়ে যাবে ছোট ভাই-এর কাছে। সে তাকে প্রতিবারে একশো দিনার ইনাম দিয়ে খচ্চর আর থলেটা কিনে নেবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে, তার কোন্ কোন্ ভাই-এর ইন্তেকাল হলো।

তুমি তো জানো যুদর, এর আগে আমার দুই ভাই-এর বরাতে কী জুটেছে। এই মাছ দু'টো ধরতে গিয়ে তারা জীবন বিসর্জন দিয়ে গেছে এখানে। একমাত্র আমিই আজ তোমার সহায়তায় এই শাহজাদাদের কব্জাগত করতে পেরেছি। আমিও এদের সঙ্গে লড়াই-এ প্রায় কাবু হয়ে পড়েছিলাম। নেহাত বরাত ভালো, তাই ওদের হাতের মুঠোয় পুরে ফেলতে পেরেছি। এই দুই শাহজাদা অনন্ত শক্তির অধিকারী দুই আফ্রিদি দৈত্য। আজ তাদের আমি এই কাঁচের কলসীতে পুরে ফেলেছি। আজ এদের ধরার ফলে সেই শমরদলের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার আবিষ্কারের প্রথম পর্বটি আমার সমাধা হলো মাত্র। সেই পীর কাহিনের ঠিকুজীর নির্দেশ অনুসারে তোমার উপস্থিতি একান্তভাবে দরকার। তুমি কী আমার সঙ্গে সেই ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের লক্ষ্যস্থান মারঘ্রিবে যেতে পারবে? ফেজ এবং মিকনাস থেকে জায়গাটা খুব বেশি দূরে নয়। সঙ্গে থাকলে আমি সহজেই সেই পথ খুঁজে পাবো। এর জন্য যা চাও আমি তোমাকে দেবো এবং সারা জীবন আমি তোমার দোস্ত হয়ে থাকবো। অভিযান শেষ হলে আবার তুমি তোমার ঘরে আপনজনের কাছে ফিরে যেতে পারবে।

যুদর বললো, শুনুন সাহেব, আমি প্রথমে আমার মা এবং ভাইদের কাছে বলবো সব। তারা যদি অমত না করে, আপনার সঙ্গে যেতে আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু তাদের কথা অমান্য করে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া, আমি সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ, আমি তাদের ফেলে চলে গেলে খাবে কী তারা?

মুর বললো, এ তোমার কুড়েমির কথা। টাকা পয়সাই যদি সমস্যা হয়, তা আমি এক হাজার দিনার দিচ্ছি তোমাকে। যাও, দিয়ে এসো তাদের। আমাদের ফিরতে মাস চারেক সময় লাগবে। এক হাজার দিনারে চার মাস চালাতে পারবে না তারা?

মুর-এর প্রস্তাব শুনে যুদর হাঁ হয়ে যায়। লোকটা বলে কী? এক হা—জা—র দিনার দেবে সে? বলে, তা হলে টাকাটা দিন, আমি আমার মা-এর হাতে দিয়ে চার মাসের ছুটি নিয়ে চলে আসি। টাকা পেলে তারা কেউ আমাকে আটকাবে না।

মুর তাকে এক সহস্র মুদ্রা দিলো।

যুদর দিনারের থলেটা মা-এর হাতে তুলে দিয়ে বললো, মা, এতে এক হাজার দিনার আছে। সংসার খরচের টাকা। আমি মারঘ্রিবের এক অধিবাসীর সঙ্গে চার মাসের জন্য এক অভিযানে বেরুচ্ছি। এই খরচাপাতি রইলো, কোনও চিন্তা ভাবনা করো না। আমি আবার যথাসময়ে ফিরে আসবো।

মা কেঁদে আকুল হলো, সে কি কথা বাবা। এমন দূরদেশে গেলে কেউ ফিরে আসতে পারে?

—কোনও ভয় নেই মা। যার সঙ্গে যাচ্ছি, সব পথঘাট তার ভালো করে চেনা। কিচ্ছু ভেবো না, তোমার ছেলে আবার তোমার কোলে ফিরে আসবে।

মা বললো, যা ভালো বুঝিস বাবা, কর। আমি আর কী বলবো? তবে বিদেশ বিভূঁই, একটু দেখে শুনে থাকিস। আল্লাহ মেহেরবান, তোর ভালো করবেন তিনি।

যুদর ফিরে আসতে মুর জিজ্ঞেস করে, কী, মায়ের মত পেলে?

—পেয়েছি। মা আমাকে দোয়া করেছে, আমাদের কোনও বিপদ হবে না।

আর কালবিলম্ব না করে মুর খচ্চরে চেপে তার পিছনে বসিয়ে নিলো যুদরকে। তারপর সেই খাড়া দুপুর থেকে শুরু করে সূর্য পাটে বসা অবধি আকাশ পথে উড়ে চলতে থাকলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো একাত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বায়ুবেগে চলতে চলতে যুদর ক্ষুধার্ত বোধ করে। কিন্তু ভেবে আতঙ্কিত হয়, তাদের সঙ্গে খাদ্যবস্তু বলতে কিছুই নাই। মুরকে বলে, আমার মনে হয় সঙ্গে খাবার দাবার আনতে আপনি ভুলে গেছেন, জনাব!

মুর বলে, কেন, খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?

—তা পেয়েছে।

—কী খাবে বলো?

—কী আর বলবো, থলেয় তো দেখছি খানাপিনা কিছুই নাই!

—আরে, কী খাবে তাই বলো না? খিদে যখন পেয়েছে, খেতে তো হবে!

—যা হোক কিছু একটা হলেই হতো—

—তবু বলো না, রসনা কী চাইছে?

যুদর বলে, একটু রুটি আর পানি হলেই চলে।

বৃদ্ধ মুর হাসে, সে তো নেহাতই সাদা-মাঠা—শুধু পেট ভরাবার জন্যে দরকার হয়। ও সব নয়, তোমার সব চাইতে কী খেতে ভালো লাগে, তাই বলো।

যুদর বললো, খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে, এখন যা পাওয়া যাবে তাই অমৃত মনে হবে।

বৃদ্ধ বললো, তন্দুরী মুরগী চলবে?

যুদর চোখ বড় বড় করে, চলবে মানে? তার চাইতে আর কী ভালো হতে পারে?

—কেন, মধুর বিরিয়ানী সঙ্গে হলে ভালো হয় না?

—চমৎকার হয়।

—আর যদি পাখীর মগজ এবং বিলাতী বেগুনের টক-ঝাল পাও?

—তোফা—!

—তুমি কী ধনেপাতা আর শালুক ডাঁটা দিয়ে সূর্যমুখী ফুলের শুখা চচ্চড়ি খেতে ভালোবাসো?

—খুব!

—ভেড়ার মগজের ঝাল?

—জিভে পানি আসছে, জনাব।

—বার্লির পকোড়া? আঙ্গুরপাতা ভাজা? পিঠে-পুলি ইত্যাদি নানা রকম মেঠাই মণ্ডা?

—হেই বাপ! এতোসব খাবার এক সঙ্গে?

বৃদ্ধ বলে, হ্যাঁ এক সঙ্গেই দেবো। আরও কিছু চাও?

যুদর ভাবে, লোকটা বদ্ধ পাগল! তা না হলে এই পরবাসে এসে এইসব খানাপিনার কথা তোলে কেউ? না আছে হাঁড়ি-পাতিল, না আছে রসুই-এর সাজসরঞ্জাম, অথচ আহার্য বস্তুর ফিরিস্তি শোনাচ্ছে হাজারো কিসিমের। সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কখনও এইসব আজগুবি কথাবার্তা বলতে পারে? যুদর বলে, এই খিদের সময় আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন, সাহেব? আপনার খানাপিনার ফর্দ শুনে আমার জিভে জল এসে গেছে। যা বললেন, তার একটা খাবারও কী আপনি এখানে যোগাড় করতে পারবেন?

বৃদ্ধ বলে, আমি তো তাই চাইছিলাম, যুদর। ভালো ভালো খানাপিনার ছবি চোখের সামনে ভেসে না উঠলে ক্ষুধার উদ্রেক হবে কেন? তা এখন মনে হচ্ছে খিদেটা বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে, কেমন? আচ্ছা এই ধর, থলেটা। হাত ঢুকিয়ে এক এক করে বের করো সব থালাগুলো। যা যা খেতে চেয়েছিলে, দেখবে, এক একখানা থালায় ভর্তি করে সাজানো আছে সব। খাবারগুলো আগে বের করো। তারপর রসিয়ে রসিয়ে খাওয়া যাবে 'খন।

বিস্ময়ে বিমূঢ় যুদর থলে থেকে খাবারের থালাগুলো এক এক করে বের করে। সব হাতে-গরম! খুসবুতে মদির হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস।

—নাও, শুরু করো।

যুদর চিৎকার দিয়ে ওঠে, এ সব কী, জনাব? আমার মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে না জানিয়ে এগুলো আগে থেকেই বানিয়ে এনেছিলেন?

বৃদ্ধ বলে, না গো উমরের পো যুদর, না। আসলে এই থলেটাই অলৌকিক যাদুমন্ত্রপুত। এ সবই তার কল্যাণে। এই যে খানাপিনা যা বের করেছ, এক আফ্রিদি আমার হুকুম তামিল করে এনে দিয়েছে। এ তো সামান্য, তুমি যদি দুনিয়ার নানান দেশের হাজারো জাতের খানাপিনার ফরমাইশ করতে, তাও নিমেষে এনে দিত সে। এখনি যদি বলো হাজার রকমের সিরিয়ার, হাজার রকমের মিশরের, হাজার রকমের হিন্দুস্তানের এবং হাজার রকমের চীনা খাবার তুমি খেতে চাও, এক পলকে সব সে এনে হাজির করে দেবে এখানে।

দু'জনে মিলে বেশ তৃপ্তি করে, পেট পুরে আহার করলো। কিন্তু অত সব খাবার দু'জনে নিঃশেষ করবে কী করে? যতটা পারলো খেলো, বাকীটা ফেলে দিয়ে সোনার থালাগুলে থলেটার মধ্যে ভরে রাখলো বৃদ্ধ। তারপর থলেটার আর একদিক থেকে একটা জল ভর্তি সোনার বদনা বের করে আকণ্ঠ পান করলো। তারপর হাত মুখ ধুয়ে বদনাটাকে থলেয় ভরে আবার তারা খচ্চরটার পিঠে চেপে বসে, আকাশ-পথে বায়ুবেগে ছুটে চলতে থাকলো।

বৃদ্ধ এক সময় জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা—বলতে পার যুদর, কাইরো থেকে আমরা কত দূরে এসে পড়েছি?

যুদর বলে, খোদা জানেন, আমি বলতে পারবো না।

—এই দু ঘণ্টায়, বৃদ্ধ মুর বলে, আমরা প্রায় এক মাসের পথ পার হয়ে এসেছি। একমাত্র আফ্রিদি জিন ছাড়া এই বেগে আর কেউই চলতে পারে না। এইভাবে পুরো একটা দিন আমরা চলতে থাকলে এক বছরের যাত্রাপথ অতিক্রম করবো।

দিনের পর দিন ওরা আকাশ-পথে উড়ে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে খানাপিনার জন্য বিরতি দিতে হয়। যুদরের রসনা মতো নানা উপাচারের আহার্য পাওয়া যেতে থাকে সেই আশ্চর্য থলেয়। এইভাবে পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি চলার পর মারঘ্রিবে এসে পৌঁছয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেজ আর মিকনাস শহরে অবতরণ করে ওরা।

শহরের পথে চলতে চলতে যুদর বুঝতে পারে, বৃদ্ধ মুরকে সেখানকার অনেকেই

চেনে। জনে জনে কাছে এসে মুরকে কুশল অভিনন্দন জানাতে থাকে। অবশেষে এক সময়ে ওরা এক বিশাল প্রাসাদের সামনে এসে থামে। দরজায় কড়া নাড়তে খুলে যায়। হরিণ-নয়না

পরমাসুন্দরী এক তরুণী হাসিভরা মুখে এসে দরজা ধরে দাঁড়ায়। স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বলে, কী আমার সৌভাগ্য, আসুন, ভিতরে আসুন।

—রহমা মা, —বৃদ্ধ সস্নেহে বলে, বড় ঘরখানা খুলে দাও, আমাদের জন্যে।

রহমা তাড়াতাড়ি মাঝের বড় ঘরখানা খোলার জন্য ছুটে যায়। তার ভারি নিতম্বের উথাল-পাথাল যুদরের বুকে চাঞ্চল্য জাগায়। ভাবে, এ মেয়ে তো যে সে মেয়ে নয়, নিশ্চয়ই কোনও শাহজাদী-টাহজাদী হবে।

থলেটা নামিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ খচ্চরটাকে বললো, এখন তুমি যাও। আবার যখন ডাকবো, এসো।

সঙ্গে সঙ্গে ধরণী দ্বিধা হয়ে গেলো এবং খচ্চরটা মাটির নিচে চলে যেতে আবার জোড়া লেগে গেলো মাটির ফাটল। যুদর হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

—এ কী তাজ্জব কাণ্ড!

বৃদ্ধ বলে অবাক হওয়ার কিছু নাই, যুদর। তোমাকে তো আগেই বলেছি সে আসলে কোনও খচ্চর নয়—জিনিয়াহ দানবী।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো বাহাত্তর রজনী। আবার সে বলতে থাকে ঃ

বৃদ্ধের সঙ্গে যুদর এসে বসে একটা প্রকাণ্ড কামরায়। সারা ঘরটা মূল্যবান জিনিসপত্রে সাজানো গোছানো। চোখ ঝলসে যায়।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে যুদরের হাতে একটা মোড়ক তুলে দেয়। বলে, এতে সাজ-পোশাক আছে। আপনার ঐ পোশাক ছেড়ে এটা পরে নিন।

যুদর অবাক হয়ে যায়। অন্তত পক্ষে হাজার দিনার দাম হবে সেই সাজ-পোশাকের। যুদর যখন পরে দাঁড়ালো, মনে হতে লাগলো, না জানি কোন্ দেশের সে বাদশাজাদা।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ মুর অলৌকিক থলে থেকে এক এক করে অনেক রকম খাবারের থালা বের করে টেবিলে সাজিয়েছে।

—আর দেরি নয় যুদর, এসো, খাবে এসো। অবশ্য জানি না এসব খানা তোমার মুখে রুচবে কিনা। আমার নিজের ইচ্ছেমতো এগুলো আনিয়েছি। তোমার যদি ভালো না লাগে বলো, আবার ফরমাইশ মতো আনিয়ে দিচ্ছি।

যুদর বলে, এ আপনি কী বলছেন, জনাব। আমার মুখে সব খানাই ভালো লাগে। আপনার পছন্দ আমারও পছন্দ। চিরকালই আমি পেটুক মানুষ। খাবার দেখলেই লোভ হয়। ভালমন্দ বাছ-বিচার করতে জানি না। সব খাবারই আমার দারুণ ভালো লাগে। যা পাই পরিতৃপ্তি করে খাই।

কুড়িটা দিন বৃদ্ধের আদর আপ্যায়নে কাটালো যুদর। প্রতিদিন এ-বেলা ও-বেলা সে নতুন নতুন পোশাক বদলায়। আর খানাপিনা—তার তো তুলনাই নাই। যা প্রাণ চায়, তাই সে খায়। শুধু একবার মুখ ফুটে উচ্চারণ করলেই হলো।

একুশ দিনের দিন সকালে বৃদ্ধ এলো তার কাছে। তখন যুদর অলস নিদ্রায় আচ্ছন্ন

ছিলো। সে ডাকে, এই যে উমরের পো, যুদর, ওঠ, ওঠ। চল এবার আমাদের কাজে নামতে হবে। আজই শমরদলের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের পথ খুঁজে পাওয়ার উপযুক্ত দিন।

দু'জনে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে শহরের সীমানা প্রাচীরের পিছনে এসে দাঁড়ালো। যুদর দেখলো, দুটি খচ্চর এবং দু'জন নিগ্রো ক্রীতদাস এসে হাজির হলো সেখানে। দু'জনে খচ্চর দু'টোয় চেপে বসতে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকলো জানোয়ার দু'টো। আর পিছনে পিছনে আসতে থাকলো সেই নিগ্রো-নফররা।

ঠিক দুপুরে এসে পৌঁছলো একটা নদীর উপকূলে। খচ্চর থেকে নামলো ওরা। বৃদ্ধ ইশারা করতে নিগ্রো দু'টো জানোয়ার দু'টোকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এবং একটু পরেই আবার ফিরে এলো তাঁবু খাটানোর সাজসরঞ্জাম কাঁধে নিয়ে। চটপট একটা সুন্দর তাঁবু খাটিয়ে ফেললো। তাঁবুর ভিতরে গালিচা বিছিয়ে আসন পেতে দিলো। আর এক পার্শে বসিয়ে দিলো সেই কাঁচের কলসী দু'টো। প্রবাল বর্ণের মাছ দু'টো তার মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। এরপর নিগ্রো দু'টো অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে গেলো।

খানাপিনা শেষ হলে বৃদ্ধ মুর কাঁচের কলসী দু'টোকে একটা ছোট টুলের উপরে স্থাপন করে অস্ফুট মন্ত্র আওড়াতে থাকলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলসীর মাছ দু'টো ছটফট করে কঁকিয়ে উঠলো, আমরা এখানে আছি, যাদু-সম্রাট। দোহাই আপনার,আমাদের হত্যা করবেন না। আমরা আপনার দাসানুদাস—ক্ষমাপ্রার্থী।

কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রপাঠ থামালো না। একটুক্ষণের মধ্যেই খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেলো কলসী দু'টো। আর সঙ্গে সঙ্গে মাছ দু'টো দুই শাহজাদার রূপ ধরে যুক্ত করে দাঁড়িয়ে পড়লো তার সামনে।

—আপনি সর্বশক্তিমান যাদুকর, আমাদের প্রাণে মারবেন না, এই ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে।

বৃদ্ধ গর্জে উঠলো, চোপরাও, একটা কথা বলবে না। আমি তোমাদের টুঁটি টিপে মেরে ফেলে দেবো। আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবো একেবারে। হুম—বাঁচতে পারো, রেহাই দিতে পারি, যদি শমরদলের পথ বাৎলে দাও। তা না হলে, ঐ যা বললাম— একেবারে গলা টিপে মেরে ফেলে দেবো। জ্বলন্ত অঙ্গারে ফেলে ভস্ম করে দেবো।

শাহজাদা- দ্বয় ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

—আপনি নির্দয় হবেন না; প্রভু। আমরা আপনার সব কথাই শুনবো। আপনি যা জানতে চান, বলে দেবো। কিন্তু যাদুসম্রাট, আপনাকে পথ বলে দিলেও তো আপনি শমরদলের শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না। একমাত্র যুদর নামে এক জেলেই সেখানে যেতে পারবে। তা-ও যে-কোন যুদর হলে হবে না। কাইরোর সওদাগর উমরের পুত্র যুদর হওয়া চাই। তাকে নিয়ে না আসলে তো আপনি ঐ অলৌকিক ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবেন না।

বৃদ্ধ বলে, আমি তা জানি। আর জানি বলেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তোমাদের সামনের দিকে তাকাও। দেখ, উমরের পুত্র যুদর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শাহজাদা-দ্বয় যুদরকে দেখে প্রসন্ন মুখে বললো, তা হলে তো আপনি প্রায় বাজিমাৎ করেই ফেলেছেন! এবার আমাদের ওপর সদয় হোন, যাদুসম্রাট। আমাদের মুক্তি দিন।

বৃদ্ধ তাদের বললো, ঠিক আছে, যেতে পারো।

দুই ভাই তখন নদীর জলে তলিয়ে গেলো।

একটি ধূপদানীর ভিতরে দুটি রক্তরাগমণি রেখে তার উপর কিছু কাঠকয়লা চাপিয়ে দিলো বৃদ্ধ। তারপর জোরে জোরে ফুঁ দিতে থাকলো। একটুক্ষণের মধ্যেই

কয়লাগুলো গনগনে আগুন হয়ে উঠলো। খানিকটা ধুনোর গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে যেতে লাগলো ওপরের দিকে। বৃদ্ধ বললো, যুদর শোনো। ধূপের ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে। এবার আমি সাধনায় বসবো। তার আগে তোমাকে যা বলার বলে নিতে চাই। কারণ আমার মন্ত্রসাধন সময়ে কোনও কথাবার্তা বলা চলবে না। কোনও কারণে যদি আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই, তোমাকে কী কী করতে হবে, সেই কথাগুলো আগেই শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি। মন দিয়ে শোনো, কাজের সময় এক চুল এদিক ওদিক করা চলবে না। তাতে প্রান-সংশয় ঘটে যেতে পারে।

যুদর বলে, আমি প্রস্তুত জনাব।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তিয়াত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বৃদ্ধ বলতে থাকে ঃ আমি যখন এই ধূপের ধোঁয়ায় মন্ত্রপাঠ করতে থাকবো তখন, ঐ নদীর পানি আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসতে থাকবে। এই ভাবে, দেখবে, কিছুক্ষণের মধ্যে সারা নদীটা শুকিয়ে ধূ-ধূ করে চর হয়ে যাবে। তুমি তখন এই ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে একেবারে নিচে নেমে যাবে। নেমেই দেখতে পাবে, নদীর পাড়ের নিচে এক বিশাল সিংহ দরজা। ও রকম দরজা একমাত্র সুলতান বাদশাহদের প্রাসাদ ফটকেই দেখা যায়। সে যাক, ঐ বদ্ধ দরজার পাল্লায় দেখবে ইয়া বড় বড় দু'খানা সোনার বলয়ের মতো কড়া। তুমি তার একটা ধরে একবার নাড়বে। আওয়াজ উঠবে, কিন্তু কেউ খুলবে না। একটু পরে আর একবার নাড়া দেবে কড়াটায়। সেবারও কেউ সাড়া দেবে না! এরপর আরও একবার নাড়া দেবে কড়াটা। এইবার দরজাটা খুলে যাবে। ভয় পেয়ো না, তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে এক জল্লাদের মতো প্রহরী। হাতে ধরা খোলা তলোয়ার। হুঙ্কার ছেড়ে বলবে, 'কে তুমি?' তুমি তখন নির্ভয়ে বলবে, 'আমি উমরের পুত্র যুদর।' সে বিকটভাবে মুখ ব্যাদন করে বলবে, তুমি যদি যথার্থই যুদর হও তবে গর্দান বাড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি তোমার ধড় মুণ্ড আলাদা করে ফেলবো।' যুদর, খুব সাবধান, প্রহরীর হুঙ্কারে একটুও ভয় করো না বা পালাবার কোনও চেষ্টা করো না, অথবা তাকে আক্রমণ করারও কোন প্যাঁচ কষতে যেও না। যেমনটি সে বলবে, তেমনি ভাবে সুবোধ বালকের মতো গর্দানটা বাড়িয়ে দেবে তার তলোয়ারের সামনে। লোকটা তোমার ঘাড় তাক করে কোপ বসাতে যাবে, ঠিকই। কিন্তু তার আগে সে নিজেই ধরাশায়ী হয়ে পড়ে যাবে তোমার পায়ের তলায়। তারপর দেখবে, সে অক্কা পেয়েছে। তোমার কোন চোট লাগেনি। কিন্তু তুমি যদি তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করো, সে তোমাকে নির্ঘাৎ কোতল করে ফেলবে।

এইভাবে প্রথম দরজার ফাঁড়া কাটাবার পর তুমি এগিয়ে যাবে দ্বিতীয় দরজার দিকে। সে দরজাও দেখবে, বন্ধ। যথারীতি কড়া নাড়লে দরজা খুলে দাঁড়াবে এক ঘোড়সওয়ার সেনাপতি। তার হাতে থাকবে একখানা বর্শা। সে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, ' কে তুমি ?' তুমি বলবে, 'আমি কাইরোর সওদাগর উমরের পুত্র যুদর।' সে বলবে, ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, এই বর্শা তোমার বুকে বসাবো আমি। তুমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সেখানে। এক চুল নড়বে না। লোকটা বর্শাখানা ছুঁড়ে তোমার কলিজা বিদ্ধ করতে উদ্যত হবে। কিন্তু পারবে না। তার আগে নিজেই সে পড়ে যাবে ঘোড়া থেকে, একেবারে তোমার পায়ের তলায়। তারপর দেখবে, সেও বেঁচে নাই। এরপর তুমি তৃতীয় দরজার সামনে গিয়ে কড়া নাড়বে। দরজা খুলেই রুখে দাঁড়াবে তীরন্দাজ। হাতে তার উদ্যত তীর ধনুক। কোনও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই সে তোমাকে তাক করে তীর ছুঁড়বে। কিন্তু পারবে না। নিজেই পড়ে যাবে তোমার পায়ের তলায়।

দেখবে, তারও ইন্তেকাল হয়ে গেছে। একটা কথা মনে রাখবে, কোন -কিছুতেই ভয় পাবে না। পালাবার চেষ্টা করবে না বা বাধা দিতে যাবে না। তা যদি কর, তুমিই মরবে।

এরপর চতুর্থ দরজার কাছে গেলেই দেখবে, এক ভয়ঙ্কর সিংহ গর্জন করছে। মনে হবে,

তখুনি বুঝি তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু না, সে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসবে তোমার সামনে। তুমি কিন্তু যেমনটি দাঁড়িয়েছিলে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকবে। তোমার সামনে এসে সিংহটা প্রকাণ্ড হাঁ বাড়িয়ে তোমার মাথাটা মুখের মধ্যে পুরে ফেলতে চাইবে। তখন তুমি বুকে সাহস বেঁধে সিংহটার হাঁ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে তোমার ডান হাতখানা। দেখবে সে স্তব্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে যাবে তোমার পায়ের কাছে। তোমার গায়ে আঁচড়টি বসাতে পারবে না সে।

পঞ্চম দরজাটি খুলে দেবে দৈত্যের মতো আবলুস কালো এক নিগ্রো। ভাঁটার মতো জ্বলতে থাকবে তার গোলাকৃতি চোখ দু'টো। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে তোমাকে প্রশ্ন করবে, 'কে তুমি?' তুমি ওর ঐ হম্বি-তম্বিতে একটুও ভয় পেয়ো না। শান্তভাবে বলবে, 'আমি ধীবর যুদর। আমার বাবা কাইরোর সওদাগর ছিলেন, তার নাম উমর।' তখন নিগ্রোটা বলবে, 'তুমি যদি সত্যিই সেই যুদর হও তবে যাও ঐ ষষ্ঠ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াও।'

এই ষষ্ঠ দরজায় এসে বোধহয় তুমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না। একমাত্র খোদাতালার নাম জপ করতে থাকবে। দরজাটা আরও অনেক বড়। পাল্লা খুলে যেতেই দেখবে, দুটি ড্রাগন বিকট হাঁ করে তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। ঐ ভয়াল-ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে স্বভাবতঃই সংজ্ঞা হারাবার কথা। কিন্তু আল্লাহর দোয়াতে তোমার সে-রকম কিছু হবে না। ওরা দুটিতে দু-পাশ থেকে তোমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে। যেই তারা থাবা বাড়াবে তোমার দিকে; তুমি বুকে সাহস এনে দু'হাতে দুটির দু'খানা পা চেপে ধরবে। ভাবছো শাল বট উপড়ে ফেলার শক্তি যাদের থাবায়, তাদের হাত ধরে কী ফায়দা হবে? হবে হবে, ওতেই কাজ হবে। কাজ তো এই মন্ত্রে হবে, তুমি তো উপলক্ষ্য মাত্র। যাই হোক, তোমার হাতের ছোঁয়া পাওয়ামাত্র তারা গগন-বিদারী আর্তনাদ করে তোমার পায়ের কাছে ভেঙ্গে পড়বে। আর উঠবে না। তুমি দেখবে, তোমার দেহে কোনও আঘাত লাগেনি।

এরপর আরও একটি দরজার গণ্ডী তোমাকে পেরুতে হবে। এটি সপ্তম এবং শেষ দরজা। এই বন্ধ দরজার সামনে এসে কড়া নাড়ালেই বেরিয়ে আসবে এক হাস্যময়ী মাতৃমূর্তি। পক্কিত কেশ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়েছে দেহ। সে তোমাকে ছলনায় ভোলাবার বহুবিধ চেষ্টা করবে, 'সে কি রে বেটা, আমকে চিনতে পারছিস না? আমি যে তোর গর্ভধারিণী মা? আয় বাবা, আমার কাছে আয়। আমি যে চোখে ভালো দেখতে পাই না রে, আয় আমার কাছে আয়, কত কাল পরে এলি, একবার নয়ন ভরে দেখি!' তুমি কিন্তু তার কথায় ভুলে কাছে যেও না। তা হলে তোমার এ জন্মের সাধ সে ঘুচিয়ে দেবে। নিজেকে শক্ত করে কঠিন কণ্ঠে বলবে, 'দাঁড়াও, আর এক পা এদিকে এগোবে না। শোনো, তোমার সাজ-পোশাক খুলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়াও আমার সামনে।' ডাইনিটা তখন তোমাকে বলবে, সে কী বাবা, আমি তোমার মা, আমাকে উলঙ্গ হতে বলছো তুমি? আমি তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছি, বুকের দুধ খাইয়ে লালন করেছি। তারই কী এই পুরস্কার, বাবা? তুমি আমাকে বিবস্ত্রা হতে বলছো? ধরিত্রী যে রসাতলে যাবে—

'— তা যাক, তুমি ন্যাংটো হবে কি না আমি জানতে চাই। এই মূহূর্তে এক্ষুণি যদি না তোমার কাপড়-চোপড় খুলে ফেলো আমি তোমাকে সংহার করবো।'

এই বলে পাশের দেওয়ালে ঝুলানো অসংখ্য তলোয়ারের একখানা খুলে হাতে নেবে তুমি। তখনও সে তোমার দুর্বল জায়গায় আঘাত করার চেষ্টা করবে, করুণা চাইবে। কিন্তু তুমি টলবে না। তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে তাকে ভয় দেখাতে থাকলে একটা একটা করে সে জামা-কাপড় খুলতে থাকবে। কিন্তু সবটা খুলবে না। আবার সে তোমার দয়া ভিক্ষা করবে। কিন্তু তুমি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। কেটে টুকরো টুকরো করার হুমকী দেখাবে। এর পর সে নিরুপায় হয়ে এক এক করে শেষ পোশাকটিও পরিত্যাগ করবে। কিন্তু আশ্চর্য হবে, সেই ডাইনীটার দেহের কোনও অস্তিত্ব দেখতে পাবে না তুমি। পলকে সে অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে যাবে।

আর কোনও বাধা নাই। এবার তোমার সামনে ঐশ্বর্যের সমুদ্র। কত কী নেবে তুমি? কত কী নিতে পারো তুমি? এতো ঐশ্বর্য কখনও দেখিনি কেহ। তাল তাল সোনা, তাল তাল রুপা। হীরে জহরতের স্তূপ চারপাশে। তুমি কিন্তু কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। সোজা চলে যাবে ভিতরের ঘরে। সে ঘরে এক সোনার মসনদে শুয়ে আছেন যাদুসম্রাট অল শমরদল। ঘুমে আচ্ছন্ন, তার মাথায় এক রত্নমুকুট। মুকুটের শীর্ষে একটি মাণিক জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। সেই আলোতে আলোময় হয়ে আছে সারা ঘর। লোকে বলে, সাত সম্রাটের ধন এক মাণিক। সেই মাণিক আছে অল শমরদলের মাথার মুকুটে। এতো বিরাট মাণিক্য আর দুটি নাই দুনিয়ায়। আসলে এই মাণিকটিই আশ্চর্য গোলক। শমরদলের কোমরে আছে সেই তলোয়ার,আর এক হাতের আঙ্গুলে পরা আছে আংটিটা এবং গলায় তক্তি করে ঝোলানো আছে সেই কাজললতাখানা।

এই চারটি পরমাশ্চর্য সম্পদ তোমাকে সংগ্রহ করে আনতে হবে সেখান থেকে। আমি যা বললাম, আশা করি মন দিয়ে শুনেছো। দেখো, কোথাও যেন চালে ভুল করো না। একটু এদিক-ওদিক হলে কিন্তু তোমাকে চিরকালের মতো হারাবো আমি।

বৃদ্ধ মূর বললো,—হয়তো তোমার কোথায়ও বুঝতে ভুল চুক হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং মন দিয়ে শুনে নাও, আরও একবার বলছি তোমার কাছে।

বৃদ্ধ তোতা-পাখীর মতো করে শিখিয়ে পড়িলে দিলো যুদরকে।

এই সময় ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো চুয়ারত্তম রজনী।

আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

যুদর বলে, সবাই বুঝলাম। কিন্তু আপনি যা বললেন, সেই সব ভয়ঙ্কর ব্যাপার সহ্য করা কী মানুষের পক্ষে সম্ভব?

বৃদ্ধ বলে, আমি তো বলছি, তোমার কোনও ভয় নাই। যা যা বললাম, ঠিক ঠিক মতো করতে পারলে, তোমার একগাছি চুলও কেউ ছিঁড়তে পারবে না। দ্বার-রক্ষী হয়ে যারা তোমার সামনে দাঁড়াবে, আসলে তো তারা সকলেই ভূতপ্রেত-অপছায়া মাত্র। সে তো আমি এখান থেকে মন্ত্রবলেই শায়েস্তা করবো। মোট কথা, তোমার ভয় পাওয়ার কিছুই নাই। বরং তাদের সামনে অত্যন্ত সহজ সাধারণ ভাবে দাঁড়াবে।

যুদর বলে, ঠিক আছে, একমাত্র আল্লাহই ভরসা।

ধূপদানীতে আবার নতুন করে ধূপের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলো মূর । গলগল করে

ধোঁয়া উঠতে লাগলো ওপরে। বৃদ্ধ মন্ত্র-সাধনায় বসলো। যুদর লক্ষ্য করে নদীর জল ধীরে ধীরে কমছে। শেষে এক সময় একেবারেই শুকিয়ে চড়া পড়ে গেলো। বৃদ্ধের নির্দেশ মতো সে নদীর নিচে নেমে দেখতে পেলো সেই বিশাল সিংহ-দরজা। বার বার তিনবার কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, কে তুমি?

—আমি কাইরোর সওদাগর উমরের পুত্র যুদর।

সশব্দে দরজাটা খুলে গেলো। সামনে দাঁড়িয়ে এক জাঁদরেল প্রহরী। হাতে তার শাণিত তলোয়ার। বললো, তুমি যদি সত্যিই যুদর হও, তোমার গর্দান পেতে দাও আমার তলোয়ারের নিচে। আমি তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করবো।

যুদর বৃদ্ধের কথা স্মরণ করে গর্দান বাড়িয়ে দিলো তার সামনে। কিন্তু কোপ সে বসাতে পারলো না। নিজেই লুটিয়ে পড়লো যুদর পায়ের তলায়।

এরপর দ্বিতীয় দরজা। সেখানেও যথারীতি মূরের নির্দেশমতো, ঘোড়সওয়ারকে ধরাশায়ী করে।

এইভাবে এক এক করে ছয়টি দরজার সংকট কাটিয়ে সে সপ্তম এবং শেষ দরজার সামনে গিয়ে সেই ডাইনী বুড়ির মুখোমুখী হয়। যুদর ভাবে বুড়িটা অবিকল দেখতে তার মা-এর মতো। তার চেহারা, চলা বলা সব— সব তার মতো। কিন্তু সে জানে, এ মায়া। আসলে ওটা একটা ডাইনীর প্রেতছায়া। কোনও সশরীরী মানুষই না সে। গর্জে উঠলো যুদর,এই শোনো এক পা নড়বে না। তোমার সাজ-পোশাক সব খুলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াও।

—সে কি বাবা, ছেলে হয়ে মাকে এই কথা বলে কেউ? আমি দশ মাস গর্ভে ধরেছি, বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি। লেখাপড়া শিখিয়েছি—এই কী তার পুরস্কার ,বাবা!

ও-সব কোনও কথা শুনতে চাই না। সব কাপড় চোপড় খুলবে কী বলো? না হলে, এই যে দেখছো তলোয়ার, একেবারে দু'খানা করে ফেলবো।

ডাইনীটা বলে, খুলছি বাবা, খুলছি। মাকে যদি বেইজ্জত করতেই চাও, করো।

খানিকটা অঙ্গবাস খোলার পর আবার সে চুপ করে দাঁড়ায়।

যুদর আবার হুঙ্কার তোলে, কী হলো, কথা কানে ঢুকছে না? তা হলে বাঁচার সাধ নাই, মনে হচ্ছে!

— না বাবা, না। অমন করে ভয় দেখিও না। এক্ষুনি খুলছি।

আবার দু-একখানা খুলে ফেলে দেয়। আবার দাঁড়িয়ে পড়ে।

—না, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না দেখছি, খোলো বলছি। নইলে এক ঘায়ে দেবো শেষ করে।

যুদর তলোয়ারখানা সাঁই করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে বুড়িটার নাকের ডগার ওপর দিয়ে। ভয়ে শিউরে ওঠে সে। ও বাবা গো, মরে যাবো গো? অমন করে নাকের ডগায় তলোয়ার নাচিয়ো না, বাবা। আমি খুলছি। এখুনি সব খুলে ন্যাংটা হয়ে দাঁড়াচ্ছি তোমার সামনে। ছেলে হয়ে যদি মায়ের বস্ত্রহরণ করতে চাও, করো। ছিঃ ছিঃ কি ঘেন্নার কথা, দুনিয়াটা রসাতলে গেলো—

প্রায় সবই সে খুলে ফেলেছে। মাত্র শেষ অন্তর্বাসটি রয়ে গেছে। বুড়িটা করুণ মিনতি করে বলে, দোহাই বাপ, মাকে এইভাবে বে-ইজ্জৎ করো না। এর চাইতে আমার যে গলায় দড়ি দেওয়া ভালো ছিলো।

যুদরের সব তালগোল পাকিয়ে যায়। ভুলে যায় সে মুরের সতর্কবাণী। কেবল তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি মাত্র অশ্রু-সজল মুখ—তার মায়ের মুখ। সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, থাক, আর দরকার নাই।

সঙ্গে সঙ্গে ডাইনীর অট্টহাসিতে সারা কক্ষ ফেটে পড়ে, এই—কে আছিস, বেহদ্দটাকে বেধড়ক পিটিয়ে এখান থেকে বের করে দে।

ডাইনীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো, চারদিক থেকে অজস্র ধারায় কিল চড় লাথি বর্ষণ হতে লাগলো যুদরের ওপর। কে যে তাকে মারছে কিছুই বুঝতে পারে না। কারণ সকলেই অদৃশ্য-লোক থেকে হাত পা চালাচ্ছিল। মারের চোটে যুদরের হাড় মাস আলাদা হবার দাখিল হলো প্রায়। কোনও রকমে সে পিছু হটতে হটতে এক সময়ে প্রথম দরজা পার হয়ে নদীর চরে এসে দাঁড়াতে পারে।

বৃদ্ধ মূর মন্ত্রবলেই বুঝতে পেরেছিলো, সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। নদীর নিচে ছুটে এসে সে যুদরকে ওপরে নিয়ে যায়।

যুদর বলে, পারলাম না, জনাব। মায়ের বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই আর বলতে পারলাম না, খুলে ফেল তোমার ঐ শেষ অন্তর্বাসটুকু। আমি জানি, আমি ভুল করেছি। আমি জানি, সে আমার মা নয়—ডাইনী। তবু—তবু আমি পারলাম না। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেলো। বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় আমার মায়ের সেই রোদনভরা অশ্রু-সজল মুখখানাই বার বার দেখতে থাকলাম। আমাকে মাফ করে দিন, জনাব। আমি আপনার সব ভেস্তে দিয়েছি—

বৃদ্ধ সান্ত্বনা দেয় যুদরকে। আমি বুঝেছি, কোথায় তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলে। সে যাক, যা হবার তা হয়েছে। ও-নিয়ে এখন আর ভেবে কিছু লাভ নাই। আবার একটা গোটা সাল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক এক বছর পর এইদিনে, এই তিথি-নক্ষত্রে আবার আমরা এখানে আসবো। সেদিন পর্যন্ত তোমার দেশে ফেরা হবে না। আমার কাছেই থাকবে তুমি। চলো, আজ আর এখানে ফালতু বসে থেকে কাজ নাই। ঘরে ফেরা যাক।

সেই মুহূর্তে আবার সেই নিগ্রো নফর দু'টো হাজির হলো সেখানে। বৃদ্ধের ইশারায় ওরা তাঁবুটা গুটিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এবং কিছুক্ষণ পরে খচ্চর বসলো। নিগ্রো দু'টো পিছন পিছন চলতে থাকলো।

ফেজ শহরের সেই প্রাসাদ-তুল্য ইমারতে নানা সুখ-বিলাসের মধ্য দিয়ে গোটা একটা বছর কাটিয়ে দিলো যুদর।

আবার ফিরে এলো সেই তিথি-নক্ষত্র ফিরে এলো সেইদিন। মুর বললো, আজ আমাদের যেতে হবে।

সেই শহর-প্রাচীরের পাশে আসতেই নিগ্রো নফর দু'টো খচ্চর সঙ্গে করে এলো। যুদর আর বৃদ্ধ খচ্চরে চেপে নদীর কিনারে এসে দাঁড়ায়। নিগ্রোরা খচ্চর দু'টো নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে তারা তাঁবুর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। তাঁবু খাটানো হয়। মুর ধূপদানীতে ধুনো ছড়িয়ে দিতে দিতে যুদরকে বলে, সব ঠিক ঠিক মনে আছে তো? এবার আর ঐ রকম ভুল করবে না আশা করি।

যুদর বলে, ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়।

রাত্রি শেষ হয়। শাহারাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁচাত্তরতম রজনীতে আবার গল্প শুরু করে সে ঃ

তবু বৃদ্ধ বলে, ভুলেও কখন মনে করবে না, ঐ ডাইনী বুড়িটা তোমার গর্ভধারিণী মা। সবই তার ছলনা মাত্র। মোট-কথা, তার ছলা-কলাতে তুমি কোনও মতেই ভুলবে না। প্রথমবার তুমি প্রাণে বেঁচে এসেছো। কিন্তু এবার যদি সেই ভুল করো, সশরীরে আর ফিরে আসতে পারবে না, আমার কাছে। তবে, তোমার প্রেতাত্মার সঙ্গে আমার মোলাকাত হতে পারবে।

যুদর বলে, এতো কাণ্ডের পর আবার যদি আমি ভুল করি তবে তো আমাকে জ্যান্ত পুড়য়ে মারা দরকার।

ধুপদানীতে ধূনো দিতে গলগল করে ধোঁয়া নির্গত হতে থাকে। বৃদ্ধ মন্ত্রপাঠ করে চলে। নদীর জল শুকিয়ে শুকিয়ে এক সময় ধূ ধূ চর জেগে ওঠে। যুদর নিচে নেমে যায়। সেই রুদ্ধ দ্বারে কড়া নাড়ে। বার বার—তিন বার। ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে, কে?

—আমি উমর সন্তান যুদর।

দরজা খুলে যায়। শাণিত তরোয়াল বাগিয়ে প্রহরী হুকুম করে, গর্দান বাড়াও।

যুদর নিঃশঙ্ক চিত্তে মাথা পেতে দেয়। লুটিয়ে পড়ে প্রহরী। এইভাবে এক এক করে ছয়টি দরজা অতিক্রম করে সপ্তম এবং শেষ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই ছলনাময়ী পেতনী মায়ের রূপ ধরে যুদরের সামনে এসে দাঁড়ায়। যুদর কিন্তু নির্মম নিষ্করুণ কণ্ঠে বলে, তোমার সব সাজ-পোশাক খুলে আমার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াও।

ডাইনীটা নানা বাহানা করে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। মা-ছেলের সম্পর্ক টেনে এনে যুদরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কিন্তু গত বছরের সে-কথা যুদর ভোলেনি। সেই হাড়-চুর করা কিল চড় ঘুসি লাথির ব্যথা এখনও সে কল্পনায় অনুভব করতে পারে। ডাইনীটা সাজ-পোশাক খুলতে খুলতে শেষ অন্তর্বাস-এ এসে থেমে যায়। ক্ষুদর খিস্তি খেউড় করে হুঙ্কার ছাড়ে, এই হারামজাদী, খোল শীগগির। নইলে, এই দ্যাখ তলোয়ার, একেবারে সোজা ঢুকিয়ে দেবো—

ডাইনী শেষ বাসটুকু ছেড়ে ফেলে। কিন্তু কি আশ্চর্য, যুদর আর ডাইনিটাকে দেখতে পায় না। পলকে সে উবে গেছে!

ব্যস, আর কোনও বাধা নাই। যুদর এবার বড় কামরায় ঢুকে পড়ে। এই প্রকাণ্ড ঘরখানা সোনার ইটে ঠাসা। কিন্তু সেদিকে দৃকপাত করে না যুদর। খানিকটা এগোতে আর একটা ঘরের দরজা। পর্দা ঝুলছিলো । যুদর ঢুকে পড়ে। ঘরের এক পাশে একটি সোনার সিংহাসন। সেই সিংহাসনে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে যাদুসম্রাট অল-শমরদল। তার মাথায় নানা রত্নখচিত এক সুবর্ণমুকুট। মুকুটের শীর্ষে সেই আশ্চর্য গোলক। আসলে সেটা একটা মাণিক। শমরদলের ডান হাতের আঙ্গুলে পরা ছিলো একটি মোহারাঙ্কিত অঙ্গুরীয়। সিংহাসনের মাথার কাছে রাখা আছে একখানা তলোয়ার। আর শমরদলের কণ্ঠে ঝোলানো ছিলো একখানা তক্তি। আসলে এই তক্তিখানাই কাজললতা।

যুদর প্রথমে তলোয়ারখানা কোমরে বাঁধলো। তারপর শমরদলের আঙ্গুল থেকে আংটিটা খুলে দিয়ে নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখলো। এবং সব শেষে সে মুকুট থেকে তুলে নিলো সেই আশ্চর্য গোলকটি।

তখন চারদিক থেকে জয়ধ্বনি হতে লাগলো, সাবাস যুদর, তুমিই কামাল করে দিলে!

নানারকম বিজয়-বাদ্য বাজতে লাগলো চারদিকে। যুদর ধীর পায়ে চলতে চলতে এক সময় নদীর চরে উঠে দাঁড়ালো। বৃদ্ধ মুর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। যুদরকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে, তা হলে পেরেছো, সত্যিই আসতে পেরেছো যুদর?

সেই অমূল্য রত্ন-সম্পদগুলো দু'হাতে চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে সে, আমার এতোকালের স্বপ্ন আজ সফল হলো। দু ফোঁটা অশ্রু ঝড়ে পড়ে তার দু'গাল বেয়ে।

—চলো চলো, আর এখানে দেরি করে কী লাভ? চলো এবার প্রাসাদে যাই।

আবার সেই নিগ্রোরা আসে। তাঁবুর পাট গোটানো হয়। দু'টো খচ্চর আসে। তার পিঠে চেপে যুদর আর বৃদ্ধ মুর প্রাসাদে ফিরে আসে।

সে রাত্রে তারা দু'জনে মিলে প্রাণভরে খানাপিনা করে। এতোকালের স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছে বৃদ্ধ মুর আবদ অল সামাদ। এ আনন্দ সে রাখবে কোথায়। যুদরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, তোমার জন্যেই আমার এতোকালের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। বলো বাবা, যুদর, কী চাও তুমি। আজ তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। তুমি যা চাইবে, তাই দেবো। দিতে পারবো। কারণ আজ আমি ত্রিভুবন বিজয়ের ক্ষমতা ধরি। বল, কী চাও?

যুদর বলে, আপনার ঐ মজার থলেটার ওপর আমার ভারি লোভ। যদি মেহেরবানী করে ওটা আমাকে দেন—

বৃদ্ধ হাসে, বোকা ছেলে, সামান্য এই থলেটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাও?

—সামান্য কেন বলছেন, জনাব? এমন কল্পতরুর মতো থলে—যা খেতে চাইবো তাই পাবো। এর চাইতে আর বেশি কি প্রয়োজন থাকতে পারে? পেট পুরে জিভের সাধ মিটিয়ে খানা-পিনা খেতে পেলে আমার আর কিছু চাই না।

'মুর বলে, কিন্তু খেতে পাওয়াই তো সব নয়, যুদর। খাওয়া ছাড়াও মানুষের আরও অনেক কিছুর দরকার হয়। তোমাকে এই যাদু-থলের সঙ্গে আরও একটা থলে দিচ্ছি। এটা অবশ্য অলৌকিক না। তবে মণিমুক্তা হীরে-জহরত ভরা। সারা জীবন ধরে দু'হাতে খরচাপাতি করেও ফুরাতে পারবে না। তুমি এক কাজ করো। কাইরোতে ফিরে গিয়ে একটা দোকান নিয়ে বসো।দেখবে শহরের সেরা সওদাগর হতে পারবে। তাছাড়া এই খাবারের যাদু থলে তো রইলোই। যখন যা খেতে ইচ্ছে করবে ব্যাগটা হাতে ধরে শুধু মনে মনে বলবে, শোনো থলের নফর, এখন আমি এই খানাপিনা চাই। তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে থলের মধ্যে এসে যাবে সেইসব খাবার ভর্তি থালাগুলো। একটা কথা, খানাপিনা শেষ হয়ে গেলে সোনার থালাগুলো আবার থলের মধ্যে পুরে দিতে হবে। থলের নফর জিনিয়াহকে যদি তুমি একদিনে হাজার রকমের দুষ্প্রাপ্য খানাপিনারও ফরমাশ করো, সঙ্গে সঙ্গে সে এনে হাজির করবে সব।

আবদ অল-সামাদ শূন্যের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ডাকতেই সেই নিগ্রো দু'টোর একটা এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে নিয়ে এলো একটা খচ্চর। বৃদ্ধ মুর যুদরকে খচ্চরে চাপিয়ে দিলো। সঙ্গে দিলো সেই হীরে জহরৎ আর যাদু-থলে দু'টো। বললো, তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে এই নিগ্রো। এই খচ্চরটা এক জিনিয়াহ। যেমন ভাবে আমরা এসেছিলাম তেমনি বায়ুবেগে উড়ে যাবে সে। কাইরোতে একেবারে তোমার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবে। তুমি নেমেই দেখতে পাবে এই নিগ্রোকে। এর হাতে আবার এই খচ্চরটাকে ফেরত পাঠাবে আমার কাছে। যাও, আল্লাহর কাছে দোহা মাঙছি, তিনি যেন সারা জীবন তোমাকে সুখে রাখুন। কতকাল পরে দেশে ফিরছো, তোমার মা পথ চেয়ে বসে আছেন। তোমাকে পেয়ে আবার হাসি গানে ভরে উঠবে তাঁর সংসার।

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি উড়ে চলার পর যুদর কাইরোয় ফিরে আসে। মনে তার কত, আনন্দ, কতদিন পরে মাকে দেখতে পাবে সে?

বাড়ির দরজায় ঢুকেত গিয়েই চমকে ওঠে। একী ব্যাপার? তার মায়ের পরণে শতছিন্ন একখানি মাত্র বস্ত্র। কোনও রকমে সে লজ্জা নিবারণ করতে পেরেছে মাত্র। অনাহারে অনিদ্রায় তার চেহারার জৌলুস ধুয়ে মুছে গেছে। কেঁদে কেঁদে চোখের কালে কত কালি পড়েছে!

—মা, মাগো, একি তোমার চেহারা হয়েছে, মা? যেন মনে হচ্ছে—কতকাল তুমি অনাহারে আছো?

—খুব মিথ্যে নয়, বাবা। রোজদিন তো পেটে দানাপানি পড়ে না। দয়া করে যেদিন লোকে দেয়, সেদিন খাই। অন্যদিন উপোস।

—উপোস! সে কি! আমি যে অনেক টাকা তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম, মা। একশো একশো করে দুবারে দুশো, তারপর এক হাজার—এই বারোশো দিনার তোমার কাছে সংসার খরচের জন্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। রেখে ঢেকে খেলে এ টাকায় মাত্র এক বছর কেন মা, বহুকাল চলার কথা?

মা বললো তোর সব কথাই ঠিক, বাবা। অত পয়সা থাকতে আজ আমাকে সানকী হাতে করে দোরে দোরে ফিরতে হবে কেন? কিন্তু নসীবে লেখা থাকলে খণ্ডাবে কে? তুই চলে যাওয়ার পরই তোর ভাই দু'টো আমার কাছ থেকে টাকা পয়সাগুলো কেড়ে নিয়ে পথে বের করে দিলো। তারপর কী করলো জানি না দুদিনেই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আবার এসে আমার ঘাড়ে চাপলো! সারাদিন আমি ভিক্ষে করে যা পাই, মায়ের প্রাণ, ওদের না দিয়ে তো মুখে দিতে পারি না।

যুদর বলে, তোমার সব দুঃখের আজ থেকে ইতি হয়ে গেলো মা। দেখ তোমার জন্যে কী নিয়ে এসেছি। কত ধন-দৌলত, কত খানাপিনা। আচ্ছা মা তোমার তো আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি? এখন কী খেতে চাও, বলো তো?

—গরীবের আবার বাছ-বিচার কী, বাবা। যা পাবো তাই খাবো।

—উঁ হুঁ, গরীব কী বলছো, আমি এখন বিরাট বড়লোক। বলো তুমি কী খেতে চাও। এক্ষুণি খাওয়াবো তোমাকে।

মা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকায়।

—তা তুই কী খেতে দিতে পারবি, বাবা? এতোকাল পরে এলি, দু'খানা থলে হাতে করে। তার আবার একটা খালি। অন্যটায় তো কই খানাপিনা কিছু দেখছি না।

—আছে আছে। তুমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। এখন বল, কী খেতে চাও?

—কী আবার চাইবো। তুই বাপু বাজে খরচ করিস নে। বাজার থেকে রুটি আর একটু পনির নিয়ে আয়। সবাই মিলে খাবো।

যুদর বলে, তুমি কী যে বলো মা, 'শুকনো রুটি আর পনিরই খাবে শুধু। কেন, মধুর বিরিয়ানী, মাংসের কোপ্তা, ভেড়ার কাবাব, মোরগ মসাল্লাম, পেস্তার বরফি, আফগানী হালওয়া, মধু—এসব তোমার পছন্দ নয়?

ছেলের মুখে এই সব দুষ্প্রাপ্য খানাপিনার ফিরিস্তি শুনে মা ভাবে, হয় ছেলে তার সঙ্গে তামাশা করছে, নয়তো মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। আতঙ্কিত হয়ে সে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, যুদর এসব কী পাগলের মতো প্রলাপ বকছিস বাবা? তুই খোয়াব দেখছিস, না পাগল হয়ে পড়লি? এতো সব বাদশাহী খানাপিনার ফর্দ দিচ্ছিস। বলি, তাদের একটাও কী আমরা চোখে দেখেছি কখনও?

—দেখনি! কিন্তু আজ থেকে দেখবে এবং এখনি দেখবে। এই মুহূর্তে যেসব খানার নাম করলাম, তার সব তোমার সামনে হাজির করছি, মা। তোমার ছেলে কী তোমার সঙ্গে

হাসি মজাক করতে পারে? ঐ খালি থলেটা আমাকে একবার দাও তো—

মা ছেলের হাতে যাদু থলেটা তুলে দিলে যুদর থলিটার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে এক এক করে থালা ভর্তি সব খাবারগুলো বের করে মেজেতে কাপড়ের ওপর রাখে। সুগন্ধে ভরে ওঠে ঘর। মা হাঁ হয়ে দেখতে থাকে।

—হ্যাঁ বাবা, দেখে তো মনে হয়েছিলো, থলেটা খালি! তা এতো সব খাবার দাবার ছিলো ওর মধ্যে।

যুদর বলে, ছিলো না। কিন্তু এখনই এলো। দেখছো না, ধোঁয়া উঠছে। বাস ছাড়ছে। সদ্য রান্না করা। হাত দিয়ে দেখ, কী গরম?

মা বেচারা ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়।

—বলিস কী বাবা, এ যে ভূতুড়ে কাণ্ড। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কী ব্যাপার বলতো, বাবা?

যুদর বলে, এই আশ্চর্য যাদু-থলেটা আমাকে সেই বৃদ্ধ মুর দিয়েছে মা। এর অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা। খানাপিনা বলতে যা বোঝায়—সব পাওয়া যাবে এই থলেয়। শুধু নামটা মনে করে থলেয় হাত ঢোকাতে হবে। ব্যস, আর কোনও ঝামেলা নাই। পলকের মধ্যে তোমার হাতে এসে যাবে গরমাগরম সেই সব খাবার ভর্তি থালা। তা সে হাজার কিসিমেরই হোক না কেন। সব এসে হাজির হবে এক পলকে। তবে একটা কথা, খানাপিনা শেষ হয়ে গেলে এই সোনার থালাগুলো আবার ভেতরে পুরে দিতে হবে। সুতরাং বুঝতে পারছো মা, সারা জীবনে আমদের আর খানাপিনার জন্যে কোনও চিন্তাভাবনা করতে হবে না।

মা জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ বাবা ক'জন মানুষের খানাপিনা পাওয়া যাবে?

—কত জনের দরকার মা? তোমার ছেলেদের শাদী দাও। হাজারো মেহেমানকে নেমন্তন্ন করো। দেখো, কোনও অসুবিধা হবে না। তাদের সবাইকে পেট পুরে খাইয়ে দেব আমি। তোমার যাকে খুশি ডেকে যত খুশি খাওয়াতে পারো, মা। কিন্তু একটা কথা, এই আজব থলের কথাটা কারো কাছে ফাঁস করো না। মুর সাহেব বার বার বারণ করে দিয়েছেন। এর গোপন রহস্য কাউকে জানাবে না কোনও দিন।

—তুই কী পাগল হয়েছিস বাবা, এসব কথা কাউকে বলতে আছে?

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সাতাত্তরতম রজনীতে আবার সে শুরু বলতে করে ঃ

এমন সময় সলিম সালিম দুই ভাইয়ে সদর দরজায় পা দিয়েই হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে ঘরে আসে।

—মা বড় খিদে পেয়ে গেছে, শিগগির খেতে দাও—

কিন্তু মুখের কথা আর শেষ হয় না। নানারকম সুগন্ধী খাবারের থালায় সারা ঘর ভর্তি দেখে ওরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দরজায় মুখেই দাঁড়িয়ে পড়ে। খাবারের থালাগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকে। জীভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বলে, হেই বাপ, এসব কী? অঃ, ছোট এনেছে বুঝি!

তিন ভাই আর মা মিলে রসনার তৃপ্তি করে খেলো সে রাতে। তার পরদিনও ঐ রকম বাহারী বাদশাহী খানাপিনায় সাজানো হলো কাপড়। সকলে বেশ তৃপ্তি করে খেলো। তারপর দিনও একই ব্যাপার। সলিম সালিম অবাক হয়ে। রোজ রোজ এমন দামী দামী খানাপিনা খাওয়াচ্ছে তার ভাই যুদর। নিশ্চয়ই সে বিদেশ থেকে অনেক মাল-কড়ি নিয়ে এসেছে।

কয়েক দিন বিশ্রাম নেবার পর যুদর বাজারে যায়। এবার একটা দোকান-পাটের সন্ধান করতে হবে। বৃদ্ধ মুরের উপদেশ সে স্মরণ করে। সঙ্গে যা হীরে জহরৎ আছে তার অল্প কিছু দিয়েই একটা লাগসই দোকান সে কিনতে পারবে। ভালো করে সাজিয়ে গুজিয়ে বসতে পারলে অচিরেই শহরের সেরা সওদাগর হতে পারবে সে।

যুদর-এর অনুপস্থিতির সুযোগে সলিম সালিম মাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মা, যখন আমরা যা খেতে চাই, তুমি ও-ঘরে ঢুকেই তা নিয়ে আস কী করে? এতো সব খাবার বানাও কখন?

—ও মা, বানাতে যাবো কেন?

—তবে?

কেন জানিস না, যুদর দু'টো থলে এনেছে বিদেশ থেকে। তার একটা হীরে জহরতে ভর্তি। আর একটা খালি। কিন্তু খালি হলে কী হবে। থলেটা যাদুমন্ত্র করা। তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে যে খাবারই চাওয়া যাবে সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে। তা না হলে এতো হরেক রকমের গরম গরম খানাপিনা খাচ্ছিস কী করে?

সলিম সালিম গোপনে যুক্তি করে! সলিম বলে, একটা ফন্দী বের করতে হবে।

সালিম জিজ্ঞেস করে, কী রকম ফন্দী?

—মায়ের কাছ থেকে ঐ থলে লোপাট করতে হবে?

—কিন্তু যুদর জানতে পারলে—?

—জানতে যাতে না পারে তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

—কী ব্যবস্থা?

—সুয়েজ বন্দরের কাপ্তান আমার চেনা। চলো, তার কাছে যাই। যুদরকে যদি সুয়েজে নিয়ে গিয়ে কাপ্তানের কাছে বিক্রি করে দিই, সে লুফে নেবে। ওরা জাহাজের দাঁড় টানবার লোক খুঁজছে। কিন্তু সমুদ্রের নোকরীতে কেহ যেতে চায় না।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহারাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটাত্তরতম রজনী। আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সালিম বলে, কিন্তু কী করে যুদরকে সেখানে নিয়ে যাবে?

সলিম বলে, আমরা নিয়ে যাবো কেন? কাপ্তানকে আমাদের বাড়িতে রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করবো। বলবো, 'আপনি দু'জন পালোয়ান খালাসীকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। তারপর কী করে কী করতে হয় তুমি দেখে নিও।

দুই ভাই সুয়েজে এসে কাপ্তানের সঙ্গে দেখা করে। সালিম বলে, আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

কাপ্তান বলে, বেশ, বলো।

সলিম বলে, এ আমার ভাই। আরও একটি অপগণ্ড ভাই আছে আমাদের। বাবা মারা যাওয়ার সময় সকলকে সমান ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বিশাল সম্পত্তি। কিন্তু আমাদের ঐ ছোট ভাইটি তার অংশের সবকিছু দু'দিনেই উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আমাদের ঘাড়ে ভর করেছে। প্রথম সে আমাদের নামে নানা রকম মিথ্যা কথা রটাতে থাকলো। পাড়া-প্রতিবেশিদের কাছে কাঁদুনি গাইতে লাগলো, আমরা নাকি তাকে ফাঁকি দিয়েছি। তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছি। কিছু খারাপ পড়শী তাকে বদবুদ্ধি দিলো।

তাদের কথায় নেচে আমাদের দুই ভাইয়ের নামে সে মামলা দায়ের করলো। অনেক দিন ধরে চললো সে মামলা। কাজী ব্যাটা ঘুষ খেয়ে আমাদের যথা সর্বস্ব জরিমানা করলো। এতেও কিন্তু আমার ভাইটি ক্ষান্ত হলো না। পরপর আর দুটি মামলা রুজু করলো আমাদের নামে। সে মামলা দুটি অবশ্য ধোপে টেকেনি। কিন্তু তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি আমরা। আমাদের ঘাড়েই খাবে এবং আমাদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র আঁটবে—এখন এই তার একমাত্র কাজ। এরকম কাল সাপ নিয়ে কতদিন বাস করা যায়, বলুন। তাই আমরা আপনার দ্বারস্থ হয়েছি আজ। একমাত্র আপনিই আমাদের বাঁচাতে পারেন।

কাপ্তান বলে, কিন্তু আমি তোমাদের বাঁচাতে পারবো কী করে?

সালিম বলে, যুদরকে আমরা আপনার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছি। আপনি ওকে এনে জাহাজে দাঁড়টানার কাজে লাগান।

কাপ্তান বললো, তা মন্দ বলনি। এ রকম দুষ্ট গরুকে দাঁড়ে বসিয়ে দিলে শায়েস্তা হবে। কিন্তু ওকে নিয়ে আসবে কী করে?

—সে ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। আজ রাত আপনি দু'জন তাগড়াই খালাসীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসুন। সেখানে আপনার জন্যে খানাপিনার বন্দোবস্ত করবো আমরা। আপনি আমাদের মহামান্য মেহেমান হয়ে আজকের রাতটা আমাদের বাড়িতেই কাটাবেন। তারপর রাত গভীর হলে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, ওকে বেঁধে আপনার লোকরা নিয়ে চলে আসবে।

কাপ্তান বললো, কিন্তু তাকে কাঁধে তুলতে গেলেই তো ঘুম ভেঙ্গে যাবে তার। তখন তো চেঁচামেচি চিৎকার করবে!

—না তো করবে না। আমি সে ব্যবস্থা করেছি। তার খাবারের সঙ্গে কিছু ঘুমের দাওয়াই মিশিয়ে দেবো। তা হলে সে আর জাগবে না।

কাপ্তান হাসলো, বাঃ, বেড়ে বুদ্ধি তো তোমার। ঠিক আছে, খানাপিনা ঠিক রেখ। আজ রাতেই যাবো। আচ্ছা-কি দাম নেবে বলো? চল্লিশ দিনার?

সলিম বললো, খুবই কম হলো। তবু আপনার কথাই মেনে নিলাম। কারণ, আমরাও তো আপদ বিদায় করে নিষ্কৃতি পাবো। তা হলে ঐ কথাই রইলো। আজ সন্ধ্যাবেলা আমরা আপনার জন্যে বড় মসজিদের পাশে অপেক্ষা করবো।

কাপ্তান বললো, ঠিক আছে।

দুই ভাই তখন বাড়িতে ফিরে এসে দুপুর বেলায় খেতে বসে নানা খোস গল্প করতে থাকে। এক সময় সলিম বলে, যুদর, আজ তোমাকে না জিজ্ঞেস করেই একটা কাণ্ড করে এসেছি।

যুদর অবাক হয়ে তাকায়, কী ব্যাপার?

—না না, ভয় পাওয়ার মতো কিছু না। আমার এক পেয়ারের দোস্ত প্রায়ই আমাদের দু'জনকে তার বাড়িতে ডেকে ভুরি ভোজ করায়। বেশ বড় লোক সে। পয়সা আছে—দেদার খরচা করে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে খানাপিনা করে। কিন্তু আমরা তার বদলা দিতে পারি না। তা এখন যখন তোমার দৌলতে আমাদের অভাব বলতে কিছু নাই, তাই ভাবলাম বন্ধুটিকে ডেকে ভালো মন্দ কিছু খাওয়াই। সেই ভেবে আজ সকালে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। ইচ্ছে ছিলো ওকে একাই আসতে বলবো আজ রাতে। আমাদের সঙ্গে খাবে। কিন্তু ঐ সময় ওর ঘরে ওর দুই ভাই বসেছিলো। বাধ্য হয়ে ওদেরও বলতে হলো। ভাবছি কাজটা বোধহয় ভালো করি নি। আগে অন্তত তোমার মতামত নেওয়া উচিত ছিলো। নানা কাজের মানুষ তুমি, হয়তো আজ রাতে তেমার সময় সুবিধে নাও থাকতে পারে।

যুদর বলে, তাতে কী হয়েছে। আমি থাকি না থাকি তাতে কী তোমাদের মেহেমানদের খানা-পিনার কিছু অসুবিধে হবে? মাকে বললেই সে সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। যা যা খাওয়াতে চাও, সব গরম গরম পাবে। আর তা ছাড়া আমি তো থাকবোই।

সন্ধ্যা বেলায় দুই ভাই বড় মসজিদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। একটু পরে কাপ্তান তার দুই সাগরেদকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলো।

নানা উপাচারে খানাপিনা শেষ হলো। আশ্চর্য যাদু-থলের কল্যাণে প্রায় চল্লিশ রকম বাদশাহী খাবার-দাবার এনে দিলো ওদের মা। সলিম কায়দা করে যুদরের অলক্ষ্যে তার খাবারের মধ্যে এক ডেলা আফিং মিশিয়ে দিলো।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই যুদর ঘুমে টলে পড়ে। রাত গভীরতর হলে দুই ভাই যুদরকে একটা কালো কাপড়ের থলেয় ভরে কাপ্তানের চাকরদের কাঁধে তুলে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমন্ত যুদরকে নীদর ঘাটে বাঁধা ছোট একটা নৌকায় নিয়ে গিয়ে ফেলে। তারপর সোজা সুয়েজে চলে যায়।

কাপ্তানের ডেরায় যুদর মুলত বন্দী হয়ে থাকে। তার পায়ে বেড়ি পড়িয়ে জাহাজের দাঁর টানার কাজে লাগানো হয়। এইভাবে কপালের ফেরে বহু ধনসম্পত্তির মালিক হয়েও যুদর আজ এক নগণ্য ক্রীতদাস হয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হলো।

রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ঊনআশিতম রজনী। আবার গল্প শুরু হয় ঃ

সকাল বেলায় সলিম এবং সালিম ঘুম থেকে উঠে ওদের মায়ের কাছে গিয়ে বললো, মা যুদর কী জেগেছে?

মা বলে, না বাবা আমি কোনও সাড়া পাইনি। বোধ হয় এখনও ঘুমিয়েই আছে। যা ডাক। আমি নাস্তা পানি দিচ্ছি। এক সঙ্গে বসে খা তোরা।

দুই ভাই পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে বলে, কই মা, ঘরে তো যুদর নাই।

মা বলেন, কিন্তু আমি অনেক ভোরেই জেগে গেছি। কই, তার ওঠার তো কোনও আওয়াজ পাইনি। এতো ভোরে সে গেলো কোথায়?

সলিম বলে, আমার মনে হয়, সে ঐ কাপ্তানের সঙ্গে বন্দরে চলে গেছে। ওর কথাবার্তায় বুঝতে পারছিলাম, সাগর অভিযানের খুব সখ। হয়তো জাহাজে চেপে সাগর পাড়ি দেবে। সাগরপারের কোন দ্বীপে নাকি অঢেল ধনরত্ন আছে। হয়তো সেই রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধান করতে বেরিয়ে গেছে সে।

মা বললো, হতেও পারে। আমাকে বললে আমি রাজি হবো না, এই আশঙ্কাতেই কিছু না বলে চলে গেছে।

সলিম বলে, সে জন্য কোনও চিন্তা ভাবনা করো না, মা। যুদর ধনদৌলতের বরাত নিয়ে জন্মেছে। তুমি দেখে নিয়ো, আবার সে অনেক পয়সা কড়ি নিয়ে দেশে ফিরবে।

কিন্তু মায়ের প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

সলিম চিৎকার করে ওঠে, শোনো মা, যুদর-এর জন্য তোমার দরদ খুব বেশি। কিন্তু আমরাও তোমার পেটের সন্তান। আমাদের জন্যে তো তোমার চোখে এক ফোঁটা পানি ঝরতে দেখিনি কোনও দিন? তুমি মা হয়ে আমাদের সঙ্গে সৎ মায়ের মতো ব্যবহার করো। আমাদের সুখ-দুঃখের কথা একবারও ভাবো না। কিন্তু কেন? শুধু সে-ই কী তোমার সন্তান? আমরা নই?

মা কাঁদতে কাঁদতে বলে, নিশ্চয়ই, তোমরাও আমার পেটের সন্তান। কিন্তু আজ

আমার ভাবতে কষ্ট হয়, তোমাদের মতো অপদার্থ শঠ শয়তান কুলাঙ্গার ছেলেদের আমি কী করে জঠরে ধরেছিলাম। তোমাদের বাপজান মারা যাওয়ার পর থেকে একটা দিনের তরে আমাকে শান্তিতে কাটাতে দাওনি। বাপের রেখে যাওয়া বিষয়-আশয় দুদিনে ফুঁকে দিয়ে তোমার ছোট ভাই আর আমার ভাগের বিষয়টুকুও আত্মসাৎ করেছ। একটা দিন রোজগার-পাতির ধান্দায় বেরুলে না। হয় আমার না হয় তোমার ভাই-এর ঘাড়ে চেপে রইলে। আমি বুড়ো হয়েছি, আমি তোমাদের গর্ভধারিণী মা, তোমাদের কী উচিত না—আমার ভরণপোষণ করা? সে চুলোয় যাক, নিজেদের খাওয়া-পরা জোগাড় করার যোগ্যতাও তো তোমাদের নাই। বড় ভাই হয়ে এইভাবে ছোট ভাই-এর ঘাড়ে বসে বসে খেতে তোমাদের শরম লাগে না?

এরপর সলিম সালিম বুড়ো মাকে বেদম প্রহার করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে যুদরের থলে দু'টো ঘরের বাইরে নিয়ে আসে।

—এ সবই আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। আমাদের ফাঁকি দিয়ে তুমি ছোট ছেলের জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলে!

মা বলে, আল্লা কসম, যুদর বিদেশ থেকে রোজগার করে এনেছে। ও জিনিসে তোরা হাত দিসনি।

—তুমি চুপ কর। ছোট ছেলের হয়ে আর তোমাকে দালালি করতে হবে না। এ-সব আমাদের বাবার বিষয়। হকের জিনিস। আমরা ছাড়বো না!

মা কাতরভাবে কাকুতি মিনতি করতে থাকে, না না, শোন, ওই থলে দু'টো যুদরকে দিয়েছে এক বৃদ্ধ মুর। তোদের বাবা এসব কিছু রেখে যায়নি—

—মিথ্যে কথা। তুমি একটা ডাহা মিথ্যুক। এগুলো আমরা দু'ভাই ভাগ করে নেবো।

মায়ের কোনও কথায় ওরা কর্ণপাত করে না। নিজেরা ভাগ-বাঁটোয়ারায় মশগুল হয়ে পড়ে।

ধন-রত্নাদি ভাগ করতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। কিন্তু গোলমাল বাধলো আসল বস্তুটি নিয়ে। দু'জনেই দাবী করে বলে ঐ অলৌকিক যাদু-থলেটা। সালিম বলে, আমিই সব ফন্দী ফিকির বের করেছি যুদরকে সরাবার। সুতরাং থলেটা আমারই প্রাপ্য।

কিন্তু সলিম বলে, সে কি করে হয়? আমার সাহায্য ছাড়া তোমার প্যাঁচ-পয়জার কাজে লাগাতে পারতে? ওটা আমার চাই-ই চাই।

সালিম চিৎকার করে পাড়া মাথায় তোলে।

—ছাড়বে না মানে? ছাড়তে হবে তোমাকে। তা না হলে তোমার সব শয়তানীর কেচ্ছা আমি ফাঁস করে দেবো সকলের কাছে।

—কী, কী ফাঁস করে দিবি শুনি? ভেবেছিস, বলে দিয়ে শুধু আমাকেই ফাঁসাতে পারবি? তোকে ধোয়া তুলসী পাতা বলে ছেড়ে দেবে লোকে? মরি তো তোকে সঙ্গে নিয়ে মরবো।

সালিম হুঙ্কার ছাড়ে, সে-ভি আচ্ছা। ফাঁসী যেতে রাজি আছি। কিন্তু তোর গুণের কীর্তি আমি বলবো সবাইকে।

সালিম, বলে, সে তুই যাকে খুশি, যা ইচ্ছে বলতে পারিস। এই থলে আমি ছাড়বো না।

সালিম একটা ডাণ্ডা তুলে নিয়ে রুখে আসে, ছাড়বি না মানে; তোর বাপ' ছাড়বে—

সলিম বেগতিক দেখলো। সালিম তার মাথায় হয়তো বসিয়ে দেবে। 'মা গো' 'বাবা গো' বলে চিৎকার করতে করতে দু'টো থলেই বগলদাবা করে সে ছুটতে থাকে।

সালিমের মাথাতে তখন খুন চেপে গেছে। সে-ও পিছনে পিছনে তাড়া করে চলে। দুই ভাই-এর কেলেঙ্কারী কাণ্ডাকারখানা দেখার জন্য পটাপট বাড়ির দরজা জানালা খুলে মেয়েরা নাকাব সরিয়ে মজা অনুভব করতে থাকে। রাস্তায় লোক জমায়েৎ হয়ে যায়। এমন সময় সুলতানের দরবারে যাচ্ছিল কোতোয়াল। ব্যাপারটা তার নজরে পড়ায় সিপাইদের হুকুম করে, পাকড়াও করে নিয়ে এসো ওদের।

দরবারে হাজির করা হয় দুই ভাইকে। সুলতান সামস অল দুলহা দেখলো, একটা থলে বোঝাই হীরে জহরৎ। সে ভেবে অবাক হয়, এতো অমূল্য ধন-রত্ন এরা কোথায় পেলো? তার কোষাগারেও তো এ সম্পদ নাই!

—কোত্থেকে চুরি করেছিস?

—ধর্মাবতার, এ সব চুরির জিনিস নয়।

সুলতান গর্জে ওঠে, সাফ সাফ সত্যি কথা বল, কোথায় এবং কার ঘরে সিঁদ কেটেছিস।

—বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, এসব আমার ছোট ভাই যুদর...

—চোপ রও, সুলতান হুঙ্কার ছাড়ে। আবার ছোট ভাই-এর ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে। কোতোয়াল, এদের দু'টিকে অন্ধকার ফাটকে কয়েদ করে রেখে দাও। যতদিন না সত্যি কথা কবুল করে ততদিন ওরা ঐ আঁধিরা ঘরেই বন্দী থাকবে।

উজিরকে বললো সে, এদের মাকে দিন-গুজরান-এর মতো একটা মাসোহারা পাঠিয়ে দিও।

এবার যুদরের কাহিনী শুনুন।

সুয়েজ বন্দরের কাপ্তান যুদরকে খাটিয়ে খাটিয়ে ফর্দা-ফাঁই করে দিতে লাগলো। যুদর আর কী করবে। অদৃষ্টের ফের—অস্বীকার করবে কী করে সে? যতদিন কপালে দুর্ভোগ লেখা আছে, ভোগ করতেই হবে।

এইভাবে সাগরে পাড়ি দিতে দিতে এক পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে যুদরদের জাহাজখানা খান খান হয়ে যায়। সঙ্গী সাথীরা কে কোথায় তলিয়ে গেলো, কে তার হদিশ রাখে। যুদর কোনও রকমে পাহাড়ের শিলাখণ্ড আঁকড়ে ধরে প্রাণ রক্ষা পরতে পারে। অনেক কষ্টে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে সে তীরের সমতলভূমিতে পা রাখে। অচেনা অজানা দুর্গম মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে অবশেষে এক আরব তীর্থ-যাত্রীদের তাঁবুতে এসে উপস্থিত হয়। যাত্রীদলের প্রধান জিদ্দার এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর। যুদরের জাহাজ ডুবির নিদারুণ কাহিনী শুনে করুণা-পরবশ হয়ে তাকে একটা নোকরী দিতে রাজী হয় সে।

—তুমি কি আমাদের সঙ্গে জিদ্দায় যেতে রাজি আছ? তাহলে তোমাকে কাজে বহাল করতে পারি।

যুদর সম্মতি জানায়। সওদাগর যুদরকে সাজ-পোশাক দেয়। বলে, আমরা মক্কায় হজে যাচ্ছি! তুমি আমাদের ফাই-ফরমাস খাটবে। হজ শেষ করে আমরা জিদ্দায় ফিরে যাবো। তোমাকেও নিয়ে যাবো সঙ্গে করে।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আশিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

একদিন তারা মক্কায় এলো। যুদর নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। কাবাহ প্রদক্ষিণ

করার জন্য পুণ্যার্থীরা মিছিল করে অগ্রসর হতে থাকে। যুদরও ওদের সামিল হয়। এইভাবে কাবাহ-কে সাতবার প্রদক্ষিণ করার সময় হঠাৎ সেই বৃদ্ধ যাদুকর মুরের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার!

—আরে যুদর না? এই বয়সে তুমি এখানে? হজে এসেছো?

চোখের জল ফেলতে ফেলতে যুদর তার দুঃখের কাহিনী বলে বৃদ্ধকে।

বৃদ্ধ আবাদ অল সামাদ তাকে তার নিজের ডেরায় নিয়ে যায়। মূল্যবান সাজ-পোষাক পরায়। ভালোভাবে খানাপিনা খাওয়ায়।

—তোমার দুঃখের দিন ফুরিয়ে এসেছে, যুদর। আমি গুনে পড়ে দেখলাম, এবার তোমার সুখের দিন আসছে। সে সুখের তুলনা নাই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর কেউ তোমার পথে বাধা হতে পারবে না।

যুদর জিজ্ঞেস করে, আমার ভাইরা কেমন আছে, জনাব?

বৃদ্ধ বলে, তোমার ভাই-অন্ত প্রাণ। কিন্তু সেই শয়তান ভাইদের জন্যেই আজ তোমার এই হাল। তারা তোমার থলে দু'টো নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিলো। সেই সময় সুলতানের দরবারে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সুলতান থলে দু'টো কেড়ে নিয়ে ওদের অন্ধকার ফাটকে কয়েদ করে রেখেছে।

—আর আমার মা?

—তাকে সুলতান অনুগ্রহ করে সামান্য কিছু মাসোহারা দিচ্ছে। সে যাক, ও-নিয়ে এখন চিন্তা করো না। মক্কায় এসেছো, তীর্থ ধর্ম কর। যত দিন না ধর্ম-কর্মের পাঠ শেষ হয় ততদিন তুমি আমার সঙ্গেই থাক। তারপর আমি আমার দেশে ফিরে যাবো। তোমাকেও পাঠিয়ে দেব কাইরোয়।

যুদর বলে, আমাকে একবার আমার মনিবের সঙ্গে দেখা করে আসতে দিন, জনাব। তিনিই এই বিপদের দিনে আমাকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে এসেছি। এখন যদি নোকরী ছেড়ে দিয়ে আমি দেশে ফিরতে চাই, তবু তো তাঁর অনুমতি দরকার।

—আলবাত দরকার। তুমি এক্ষুণি যাও তোমার মনিবের কাছে। তাঁকে গিয়ে বলো, তোমার আপন-জনের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে গেছে এখানে। সে তোমাকে স্বদেশে পৌঁছে দেবে।

যুদর জিদ্দার সওদাগরকে গিয়ে বলে, আপনার উপকার আমি ভুলবো না। কিন্তু আমি দেশে ফিরে যাবার একটা উপায় করতে পেরেছি। আপনি যদি মেহেরবানি করে আমাকে খালাস করে দেন—

—এতো বহুৎ আনন্দের কথা, বেটা। নিজের দেশে ফিরতে পারবে, তার চাইতে ভালো আর কী হতে পারে! আমি খুশি মনে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি চলে যাও। এই নাও কুড়িটা দিনার। তোমার মজুরীর পাওনা। এটা নিয়ে দায়মুক্ত করে যাও।

যুদর দিনারগুলো হাত পেতে নিয়ে বলে, আপনার সব পাওনা-গণ্ডা আমি বুঝে পেলাম। আর কোনও দাবি দাওয়া রইলো না আমার।

মুর-এর বাসগৃহের পথে আসার সময় এক অতি দিন দীন-দরিদ্র ভিখারীর হাতে ঐ কুড়িটা দিনার দান করে দিলো যুদর।

এরপর তীর্থমেলার দিনগুলো আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে একদিন ঘরে ফেরার দিন সমাগত হলো। বৃদ্ধ মুর তার হাতের সেই মন্ত্রসিদ্ধ যাদু আংটিটি যুদরের আঙ্গুলে

পরিয়ে দিয়ে বললো, আজ থেকে এটার মালিক তুমি। এই অলৌকিক আংটির দৌলতে তুমি ইচ্ছা করলে বিশ্ব বিজয় করতে পারো। এই মোহরটায় হাত রেখে ঘষামাত্র এক জিন এসে দাঁড়াবে তোমার সামনে। তার নাম বজ্রদানব, সে তোমাকে সেলাম করে বলবে, 'বান্দা হাজির, মালিক। হুকুম করুন কী করতে হবে? তখন তুমি যদি তাকে হুকুম কর, 'এখনই—এই মুহূর্তে তুমি এক নতুন শহর গড়ে তোলো।' দেখবে পলকে সে তৈরি করে দিয়েছে এক মনোহর শহর-সভ্যতা। কিংবা যদি বলো, 'আমি চাই অমুক সুলতানের সলতানিয়ৎ ধ্বংস করে দাও।' মুহূর্তে সে ধূলায় মিশিয়ে দেবে সেই সলতানিয়ৎ। শত্রুকে পরাভূত করার এমন অস্ত্র আর দুটি হয় না।

যুদর বৃদ্ধ মুরকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিয়ে আংটির মোহরে হাতের তালু ঘষে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রদানব এসে সেলাম করে দাঁড়ায়, বান্দা হাজির মালিক, হুকুম করুন,কী করতে হবে।

যুদর বলে, আমাকে আমার স্বদেশ কাইরোয় নিয়ে চলো।

বজ্রদানব মাথা নুইয়ে বলে, আজই আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি, মালিক।

এই বলে সে যুদরকে তার পিঠে তুলে নিয়ে উল্কার বেগে আকাশ পথে ছুটে চলে কাইরোর দিকে। দুপুর বেলায় যাত্রা শুরু হয়েছিলো। এবং মাঝ রাত্রে যুদরকে সে তার বাড়ির ছাদে নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ছেলেকে আবার ফিরে পেয়ে মা-এর সে কি আকুল কান্না। কীভাবে বড় ছেলেরা তাকে প্রহার করে বেঁধে রেখে তার থলে দু'টো লোপাট করে পালাচ্ছিল, এবং সুলতানের রোষে পড়ে আজ কয়েদখানায় কী দারুণ দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে তাদের—সব বিস্তারিত ভাবে খুলে বললো যুদরকে।

মা ছেলেকে বুকে চেপে অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে। যুদর বলে, চোখের পানি মুছে ফেলো, মা। এইবার দেখ আমার কেরামতি।

হাতের আংটি ঘষতেই বজ্রদানব এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো, বান্দা হাজির মালিক, হুকুম করুন।

—বজ্রদানব, আমার দুই ভাইকে কয়েদ করে রেখেছে এখানকার সুলতান। এক্ষুণি তাদের এখানে নিয়ে এসো।

—জো হুকুম, মালিক।

পলকের মধ্যে সে সলিম-সালিমকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো যুদরের সামনে।

দুই ভাই কারাগারের অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর দিন গুনছিলো। হঠাৎ বজ্রদানব তাদের পিঠে তুলে নিয়ে পাতাল প্রদেশ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই তারা ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষে যুদর এবং মাকে দেখতে পেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়।

যুদর বলে, তোমরা এতোদিন মাকে ছেড়ে কোথায় ছিলে ভাই? এভাবে বুড়ো মাকে কষ্ট দিতে হয়?

ভয়ে দুঃখে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায় ওরা। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। এমন যে তাদের ভাই—তার সঙ্গে তারা কি দুর্ব্যাবহারই না করেছে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো একাশিতম রজনী। আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

দু-ভাই অনুতপ্ত হয়ে কাঁদতে থাকে। যুদর সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কেঁদো না ভাই,

শয়তান তোমাদের ওপর ভর করেছিলো। তা না হলে জাহাজের কাপ্তানের কাছে আমাকে বেচে দেওয়ার দুর্মতি হবে কেন তোমাদের? যাই হোক, যা হবার তা হয়েছে, কেঁদো না। আমি মহামতি জোসেফের কাহিনী স্মরণ করে আমার নিজের দুঃখ কষ্ট কিছু হালকা করতে পেরেছি। জোসেফকেও একদিন তার ভাইরা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলো। তোমরা আমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছ তার অনেক বেশী খারাপ আচরণ তারা করেছিলো জোসেফের সঙ্গে। তারা তাঁকে এক ঊষর মরুভূমির মধ্যে ফেলে রেখে গিয়েছিলো। আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙো। তিনিই তোমাদের সব গোস্তাকি মাফ করে দেবেন। আজ থেকে তোমরা আমার শুধু সহোদর ভাই নও, পরম প্রিয় বন্ধুও হলে। তোমাদের কোনও ভয় নাই। আমার কাছে নির্ভয়ে থাকো। এই দেখো, আমার হাতে এক অলৌকিক যাদু আংটি আছে। এরই জোরে আজ সুলতানের কারাগার থেকে তোমাদের উদ্ধার করে এনেছি। এর অলৌকিক ক্ষমতায় তামাম দুনিয়া আমার হাতের মুঠোয় আনতে পারি। সুতরাং অন্য কাউকে পরোয়া করার দরকার নাই। কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারবে না আমাদের।

দুই ভাই আকুল হয়ে যুদরকে জড়িয়ে ধরে বলে, যা করেছি, তা করেছি। সব অপরাধ ক্ষমা করো ভাই। এরপর যদি কখনও আবার সে-রকম কোনও ব্যবহার করি তুমি আমাদের কঠোর শাস্তি দিও।

যুদর বলে, ওসব কথা থাক, এখন বলো তো ঐ সুলতান তোমাদের কী ধরনের সাজা দিয়েছে।

সুলতান থলে দু'টো কেড়ে নিয়ে কী অমানুষিক প্রহার করে কীভাবে তাদের এক দোজকখানায় কয়েদ করে রেখে দিয়েছিলো তার মর্মন্তুদ কাহিনী যুদরকে শোনালো তারা।

যুদর হাতের আংটি ঘষতেই বজ্রদানব এসে দাঁড়ালো।

—সুলতানের কোষাগার থেকে আমার থলে দু'টো উদ্ধার করে নিয়ে এসো। আর সেই সঙ্গে কোষাগারের সব ধনরত্নও সাফ করে নিয়ে আসবে।

—জো হুকুম, মালিক।

বজ্রদানব অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং মুহূর্তের মধ্যে যুদরের থলে দু'টো নিয়ে এসে বললো, এই নিন মালিক।

শুধু মাত্র যাদু-থলেটা নিজের কাছে রেখে হীরে জহরতের থলেটা এবং সুলতানের কোষাগারের সোনা-দানা টাকা-পয়সা সব মায়ের হেপাজতে রেখে দিলো যুদর। তারপর বজ্রদানবকে বললো, আজ রাতের মধ্যে আমার জন্য একখানা বিশাল প্রাসাদ বানিয়ে দাও। প্রাসাদের বাইরেটা সোনা দিয়ে বাঁধানো থাকবে। ভেতরে ঢুকলে মনে হবে বেহেস্ত। সারা দুনিয়ার সেরা হওয়া চাই।

বজ্রদানব বললো, আজ রাতেই আমি বানিয়ে দিচ্ছি। কাল সকালে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন মালিক, কেমন হলো। এমন প্রাসাদ বানিয়ে দেবো তামাম দুনিয়ায় তার জুড়ি খুঁজে পাবেন না।

—আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পারো।

বজ্রদানব অদৃশ্য হয়ে গেলো। যুদর তার দুই ভাই এবং মাকে নিয়ে নানা রকম সুগন্ধী মুখরোচক খানাপিনা খেয়ে শুয়ে পড়লো।

সকাল বেলায় বজ্রদানব এসে বললো, আপনার প্রাসাদ তৈরি, মালিক। আপনি চলুন দেখবেন।

যুদর দুই ভাই এবং মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। এমন আনিন্দ্য-সুন্দর শিল্প-সৌন্দর্য কোন বাসগৃহের হতে পারে, সে কল্পনাও করেনি। অথচ এই চমৎকার প্রাসাদটির জন্য তার এক পয়সাও খরচ হয়নি।

মা জিজ্ঞেস করলো, বাবা, এখন থেকে তুই এখানেই থাকবি?

যুদর বলে, শুধু আমি কেন, তোমরা সকলেই বাস করবে এখানে।

বজ্রদানবকে ডেকে সে বললো, চল্লিশজন সুন্দর সুঠামদেহী বান্দা, আর চল্লিশটি নিগ্রো আর সুন্দরী বাঁদী চাই, চল্লিশটি খোজাও আমার লাগবে।

সঙ্গে সঙ্গে বজ্রদানব অদৃহ্য হয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এলো ঐ সব দাস-দাসীদের সঙ্গে নিয়ে। এক এক করে প্রত্যেকটিকে পরীক্ষা করে দেখলো যুদর। সবগুলোই বড় চমৎকার।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো বিরাশিতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

যুদর বললো, এই দাসী ও বাঁদীদের জন্য সুন্দর সুন্দর সাজপোশাক এনে দাও এবং আমার দুই ভাই, মা ও আমার জন্য নিয়ে এস এর চেয়ে জমকালো বাদশাহী সাজপোশাক।

বজ্রদানব মুহূর্তের মধ্যেই এনে হাজির করলো যথা-নির্দেশিত পোশাক-আশাক। যুদর শাহেনশাহর সাজে সেজেগুজে সোনার মসনদে গিয়ে বসলো।

সকাল বেলায় সুলতানের খাজাঞ্চি কিছু অর্থ বের করবার জন্য কোষাগার খুলতেই ভয়ে শিউরে ওঠে, একী সর্বনাশ কাণ্ড! সুলতানের ধনাগারে একটা কানাকড়িও নাই?

সুলতান সমীপে ছুটে গিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে জানালো, ধর্মাবতার, আজ রাতে ধনাগারের সব সম্পদ চুরি হয়ে গেছে।

সুলতান গর্জে ওঠে, পাজি শয়তান, তোমাকে কোষাগারের ভার দিয়েছি, এই কথা শোনার জন্য? এতো কড়া পাহারা, চুরি কী করে সম্ভব?

খাজাঞ্চী বলে, আমি এইসব ভূতুরে কাণ্ডের কিছুই বুঝতে পারছি না, হুজুর। খাজাঞ্চিখানার দরজা যেমন বন্ধ করেছিলাম তেমনি বন্ধ ছিলো। আমি ভালো করে দেখেছি, কোনও সিঁদ-ফিঁদ কাটেনি কেউ। কিন্তু আশ্চর্য, ঘরে একটা ফুটোও নাই।

—আমি তোমার গর্দান নেব। এসব, তাহলে, তোমার নিজেরই কাজ। যুদরের ঐ দুই থলে? সে দু'টোও গেছে?

খাজাঞ্চী মাথা নত করে বলে, হ্যাঁ জাঁহাপনা। সেগুলোও নাই।

সুলতান ক্রোধে আরক্ত হয়ে বলে, চল, আমি নিজের চোখে দেখবো।

ধনাগারে প্রবেশ করে তিনি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন সব। না, বাইরের কোনও লোক ভিতরে ঢোকেনি, ঢোকা সম্ভবও না। তবে? তবে কী করে সব উধাও হয়ে গেলো রাতারাতি? কার ঘাড়ে দু'টো মাথা, এতোবড় দুঃসাহসের কর্ম করবে? ভেবে কোনও কূল-কিনারা করতে পারে না সে।

দরবারের উজির, দেওয়ান, আমির আমাত্য সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে শিউরে ওঠে। একী সর্বনাশ? সারা দরবার-মহলে কবরের নীরবতা নেমে আসে। কারো মুখে কোনও কথা নাই-চোখে কেবল আতঙ্ক, আর অনন্ত জিজ্ঞাসা।

এই সময় কারাগার-রক্ষী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়, জাঁহাপনা আমি সারারাত অতন্দ্র প্রহরায় ছিলাম। কারাগারের লৌহকপাট অটুট অক্ষুন্নই আছে। কিন্তু সলিম সালিমকে

পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সব দরজা জানালা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, কোথাও একটা ফুটোও নাই। অথচ ওরা পালিয়েছে।

সুলতান হুঙ্কার ছাড়ে, অপদার্থ! আমি সব্বাইকে আজ শূলে চড়াবো।

কারাগার-রক্ষী বললো, জাঁহাপনা অভয় দেন তো একটা কথা বলি!

—ভণিতা ছাড়ো, যা বলার তাড়াতাড়ি বলো।

রক্ষী বলে, আমি দরবারে আসার সময় দেখলাম, বড় ময়দানের ফাঁকা মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদ—

ঐ নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও সকলের মুখে অবিশ্বাসের মুচকি হাসি ফুটে ওঠে।

সুলতান বলে, সারারাত ধরে গাঁজা-ভাঙ্গ টেনেছ, দেখছি—

—না জাঁহাপনা। অবিশ্বাসের কথাই বটে, একটা রাতের মধ্যে অত বড় পেল্লাই প্রাসাদ কেউ বানাতে পারে এ কথা তো নিজের চোখে না দেখলে মানা যায় না। তাই বান্দার আর্জি, ধর্মাবতার, আপনি নিজে একবার দেখে আসুন। তারপর আমার কথা মিথ্যে হলে যা খুশি সাজা দেবেন।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। উজিরকে উদ্দেশ্য করে সুলতান বলে, যাও তো, একবার সরজমিনে দেখে এসো,ব্যাপারখানা কী!

কিছুক্ষণ পরে উজির এসে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, জাঁহাপনা। এমন অলৌকিক প্রাসাদ কোনও সুলতান বাদশাহর পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। শুনলাম এক উমরের পুত্র যুদর বানিয়েছে এই হর্ম্যমালা। কত লক্ষ কোটি মুদ্রা ব্যয় করলে এবং কত শতসহস্র মিস্ত্রি মজুর কত বছর ধরে কাজ করলে এই সুরম্য ইমারত বানানো সম্ভব তা হিসেব করা যায় না। কিন্তু জাঁহাপনা, শুনে অবাক হবেন, এই সবই সংঘটিত হয়েছে মাত্র একটি রাতের মধ্যে। গতকাল বিকেলেও আমি ঐ ময়দানের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছি। কোথাও কিচ্ছু ছিলো না, হঠাৎ এখন দেখলাম, প্রায় সারা ময়দান জুড়ে দাঁড়ায়ে এক বিশাল প্রাসাদ! একি ভুতুড়ে কাণ্ড, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, জাঁহাপনা ।

সুলতান চিন্তিত মুখে বললো, একই রাতে তিন তিনটি বিস্ময়কর কাণ্ড! খাজাঞ্চীখানা সাফ, কারাগারের কয়েদী হাওয়া আর ফাঁকা মাঠে এই ইমারত—এ সবগুলো কী বিচ্ছিন্ন ব্যাপার উজির?

উজির বললো, আমিও সেই কথাই ভাবছি। এইসব আজগুবি কাণ্ডকারখানার মধ্যে নিশ্চয়ই এক যোগসূত্র আছে। শুনেছি, উমরের পুত্র বিদেশ সফর করে গতকাল ফিরে এসেছে। আমার মনে হয় এসবই তার কারসাজী।

সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়ে,কী এতো বড় দুঃসাহস। উজির, তুমি এক্ষুণি চল্লিশজনের এক সিপাইবাহিনী পাঠাও। ধরে নিয়ে আসুক ওকে। আমি সদর রাস্তায় ফাঁসীতে ঝুলাবো শয়তানকে।

সুলতানের আদেশে শহরের কোতোয়াল তার বিশাল সিপাইবাহিনী নিয়ে দরবারে এসে হাজির হলো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো তিরাশিতম রজনী।

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

উত্তেজিত সুলতানকে উজির শান্ত হওয়ার পরামর্শ দেয়। মহামান্য ধর্মাবতার,

আপনি রাগ প্রশমিত করে ভালোভাবে ব্যাপারটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। যে মানুষ এক রাতে এতো বড় ইমারত বানাতে পারে, সে নিশ্চয়ই তুচ্ছ সাধারণ শক্তির অধিকারী নয়। তার প্রতি আপনি কঠোর আচরণ প্রদর্শন করবেন না। আমার মনে হয়, তাতে কোনও সুরাহা হবে না।

—তুমি কী বলতে চাও, উজির?

উজির বলে, আপনি এখন ক্রুদ্ধ উত্তেজিত। প্রথমে নিজেকে শান্ত করুন। তারপর আপনা থেকেই সব বুঝতে পারবেন। যুদর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। কী সে ক্ষমতা, প্রথমে সেটা জানা দরকার।

সুলতান বলে, ওসব ভেল্কি-বাজি দেখিয়ে আমার কাছে কোনও সুবিধে হবে না উজির। এক্ষুণি তাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে ওর সব ফেরেব-বাজী খতম করে দেব!

উজির দেখলো, সুলতান ক্রোধে দিশাহারা, এখন কোনও ভালো পরামর্শ তার কানে ঢুকবে না। তাই সে তাকে একটু অন্যভাবে মোচড় দেওয়ার মতলব আঁটলো।

—জাঁহাপনা, আমার একটা কথা শুনবেন?

—বলো। তোমার কথা শুনে শুনেই তো আজ আমার এই হাল। তবুও বলো দেখি, শুনি।

—শত্রুর শক্তির পরিমাণ না জেনে তাকে নিধন করার চেষ্টা করতে নাই। তাতে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি। এ হচ্ছে সমর-নীতি। একথা আপনি মানেন তো?

—আলবাত। কিন্তু আমার নগণ্য এক প্রজা কী আমার সমকক্ষ শত্রু হতে পারে?

উজির বলে, আপাত-ভাবে যা আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে তাকে আর নগণ্য প্রজামাত্র বলা বোধহয় সঙ্গত হবে না জাঁহাপনা। নিশ্চয়ই সে কোনও অপার্থিব ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। কী সে ক্ষমতা—সেইটেই আপনাকে যাচাই করে দেখতে হবে। সেই কারণে আমার ইচ্ছা, আপনি তাকে সম্মানীয় অতিথির মর্যাদা দেবেন, এক ছলনায় আপনার প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে পাঠান। সে আসুক। তাকে পর্যবেক্ষণ করুন। তারপর যদি বোঝা যায়, সে আপনার তাঁবে থাকতে চাইবে না, আর কোনও দ্বিধা না করে সেই ভোজসভাতেই তাকে সাবাড় করে দেবেন। শত্রুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের কব্জায় আনতে হয় প্রথমে। তা না হলে তাকে জব্দ করবেন কী করে?

উজিরের কথাগুলো সুলতানের মনে ধরে, হুঁ, মগজে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি এখনও কিছু আছে দেখছি। তা মন্দ বলনি। ঠিক আছে, তুমি আমার বিচক্ষণ আমির উথমানকে দৌত্য করতে পাঠাও তার কাছে। আজ রাতে আমার প্রাসাদে এক খানাপিনার আয়োজন করো, সেই ভোজসভায় আমি মোলাকাত করবো যুদরের সঙ্গে। কিন্তু উজির, আমির উথমানকে একা পাঠাবে না। সঙ্গে অন্ততঃ পঞ্চাশজন সিপাই-সান্ত্রী দেবে। দরকার হলে, ও আমার অমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে, সে যাতে ওকে বলপ্রয়োগ করে ধরে আনতে পারে, সেজন্য তার সঙ্গে যথেষ্ট সশস্ত্র প্রহরী থাকা দরকার। যে ভাবেই হোক, যুদরকে ধরে আনতেই হবে।

সুলতানের এই আমিরটি সব সময় নিজেকে একজন বিচক্ষণ—বুদ্ধিমান মানুষ বলে জাহির করতো। আসলে সে একটা গবেট। মাথা মোটা লোক।

যুদরের প্রাসাদে এসে সে দেখে, প্রধান ফটকের সামনে বসে আছে এক বিকটাকৃতির প্রহরী। উথমান তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মালিককে একবার ডাকে। তার সঙ্গে আমার দরকার আছে।

কিন্তু প্রহরী কোনও সাড়া দেয় না। এবার সে চিৎকার করে ওঠে, কী, কথা কানে যাচ্ছে না? তোমাদের মালিক কোথায়?

—তিনি প্রাসাদের ভিতরে আছেন।

প্রহরী নির্বিকারভাবে বসে থাকে। উথমান সুলতানের আমির, তাকে গ্রাহ্য করছে না প্রহরীটা। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, তোমাকে না বলছি, তোমার মালিককে ডাকো, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই?

প্রহরী সে কথায়ও কর্ণপাত করলো না। মুখ ফিরিয়েই বসে রইলো। উথমান এবার আর প্রহরীর বেয়াদপি সহ্য করতে পারে না। হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে সে তেড়ে যায়।

—এতো বড় স্পর্ধা তোর, আমার কথা কানেই তুলছিস না?

এই প্রহরী স্বয়ং বজ্রদানব। সাধারণ এক খোজা সেজে সে সদর পাহারা দিচ্ছিল। উথমানের হম্বিতম্বি দেখে সে এবার উঠে দাঁড়ায়। হাতের ডাণ্ডাটা উঁচিয়ে ধরে আমিরের প্রহারোদ্যত লাঠিটাকে প্রতিহত করে। এর পর উথমান মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে বজ্রদানব তাকে ডাণ্ডা দিয়ে প্রহার করে মাটিতে শুইয়ে দেয়।

এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আমিরের পঞ্চাশজন সিপাই তলোয়ার বের করে তেড়ে আসে।

বজ্রদানব গর্জে ওঠে, তবে রে, তলোয়ার খুলেছ? দাড়াও মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি।

পলকের মধ্যে প্রলয়-কাণ্ড ঘটে গেলো। বজ্রদানব যাদু-বলে সিপাইদের ধরাশায়ী করে দিলো। পটাপট পঞ্চাশখানা তলোয়ার এসে পঞ্চাশজনের পেটের মধ্যে গেঁথে গেলো। বিষম আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো সকলে। রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগলো সেখানে।

এই সংবাদ যখন সুলতানের কাছে পৌঁছলো, নিদারুর ক্রোধে ফেটে পড়লো সে। উজিরকে হুকুম করলো, এক্ষুণি একশো সিপাই পাঠাও!

সুলতানের নির্দেশে তৎক্ষণাৎ একশো সিপাই-এর এক সশস্ত্র-বাহিনী পাঠানো হলো। কিন্তু বজ্রদানবের দাপটে তারাও নিমেষে ধরাশায়ী হয়ে পড়লো।

সুলতানের হুকুমে আরও দুশো সিপাই গেলো। কিন্তু বজ্রদানবের কাছে এসব নেহাতই তুচ্ছ ব্যাপার। এক লহমাতে সে দুশো সিপাইকেই নিধন করে ফেলে।

এরপর সুলতান ক্ষেপে উঠলো। উজিরকে বললো, পাঁচশো সেনা নিয়ে তুমি আক্রমণ কর ঐ প্রাসাদ। ধূলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে আসবে।

উজির বললো, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু জাঁহাপনা আমার কোনও সিপাই-সেনার দরকার নাই। আমি একাই খালি হাতে যাবো তার কাছে।

সুলতান অবাক হয়, একা খালি হাতে যাবে তুমি। কী সাহসে?

উজির বলে, অস্ত্র-সজ্জায় যেখানে কাজ হয় না। সেখানে এছাড়া আর কী উপায়, জাঁহাপনা?

উজির একদরবেশের সাজ-পোশাক করে রিক্তহস্তে এসে উপস্থিত হলো যুদরের প্রাসাদে। খোজাপ্রহরী-বেশী বজ্রদানবের সামনে গিয়ে বিনয়াবনত হয়ে বললো, সালাম জনাব।

বজ্রদানব উত্তর করে, বলুন নরবর।

নরবর? উজির অবাক হয়ে তাকায় বজ্রদানবের দিকে। উজিরকে সে 'নরবর' সম্বোধন করলো কেন; তবে প্রহরীর ছদ্মবেশে সে কোন দৈত্যদানব? মানুষ নয়? ভয়ে আতঙ্কে সে শিউরে উঠলো। তার হাত পা ঠক-ঠক করে কাঁপতে থাকলো।

—আমাদের মালিক—যুদর সাহেব কি ভিতরে আছেন?

বজ্রদানব বলে, জী হ্যাঁ। প্রাসাদেই আছেন।

উজির বলে, মেহেরবানী করে আমাকে একবার ভিতরে নিয়ে চলুন। আমি তাঁর সঙ্গে একবার মোলাকাত করতে চাই। আমাদের সুলতান সামস অল দুলাহ আজ রাতে তাঁর সম্মানে এক ভোজ-সভার আয়োজন করেছেন। সুলতানের হয়ে আমি ওঁকে নেমন্তন্ন জানাতে এসেছি। যদি উনি অনুগ্রহ করে আজকের সন্ধ্যাটা আমাদের সুলতানের সঙ্গে কাটান, তিনি ধন্য হবেন।

বজ্রদানব বললো, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি মালিককে খবর দিচ্ছি।

এই সময় রাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে যায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চুরাশিতম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

উজিরকে বাইরে বসিয়ে রেখে বজ্রদানব প্রাসাদের অন্দরে প্রবেশ করে যুদরকে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, মালিক, সুলতান প্রথমে এক উদ্ধত আমিরকে পাঠিয়েছিলো। আমি তাকে প্রহার করেছি। এতে তার পঞ্চাশ জন সিপাই আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে আমি তাদের খতম করি। এর পর সুলতান একশো সিপাই-এর একটা বাহিনী পাঠিয়েছিলো আমাকে তথা আপনাকে শায়েস্তা করতে। কিন্তু তাদেরও আমি কোতল করে ফেলি। তারপর সে দুশো সেনার এক বাহিনী পাঠায়। তারাও আমার হাতে নিধন হয়! এর পর এখন সুলতানের উজির এসেছে। তার সঙ্গে কোনও-সৈন্য-সামন্ত নাই। একাই এসেছে সে। সুলতান আপনার সঙ্গে ভেট করতে চায়। আজ রাতে আপনার সম্মানে সে এক ভোজসভার আয়োজন করেছে। সুলতানের তরফ থেকে তারই আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে এই উজির। এখন আপনি যা বলবেন, আমি সেই মতো করবো।

যুদর মণিমাণিক্য-খচিত এক স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন ছিলো। তার পায়ের তলায় ছিলো এক দুষ্প্রাপ্য গালিচা। মাথার ওপর হাজারো মোমের ঝাড়বাতি। বাঁদীরা চামর দোলাচ্ছিল। একটি ফুটন্ত গোলাপের বাস আঘ্রাণ করতে করতে সে বললো, উজিরকে নিয়ে এসো।

বাদশাহী কেতায় কুর্নিশ জানিয়ে এসে দাঁড়ালো উজির।

—মহামান্য মালিক, আপনার দোস্ত আমাদের সুলতান আজ রাত তাঁর প্রাসাদে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনি যদি মেহেরবানী করে যান, তিনি কৃতার্থ হবেন।

যুদর বলে, তিনি যখন আমার দোস্ত, তাহলে তো আর কোনও কথাই নাই। আপনি গিয়ে তাঁকে আবার শুভেচ্ছা জানান। বলুন, আমার দরজা সুলতানের জন্য সর্বদা খোলা আছে। আজ রাতের ভোজ-সভার আয়োজন আমিই করবো আমার এই প্রাসাদে। তিনি যদি আসেন, ধন্য হবো আমি।

আংটিটা ঘষতেই বজ্রদানব এসে দাঁড়ায়। যুদর বলে, উজির সাহেবকে বাদশাহী সাজ-পোষাক উপহার দাও।

পলকের মধ্যে বজ্রদানব এক জমকালো সাজ-পোষাক এনে উজিরের হাতে তুলে দেয়। যুদর বলে, আপনি পরুন। সুলতানের কাছে গিয়ে এখানে যা দেখে গেলেন, তাঁকে বলবেন।

উজির সেই মহামূল্যবান সাজ-পোশাক পরে যুদরের সামনে দাঁড়ায়। এমন পোশাক সে এই প্রথম চোখে দেখলো।

প্রাসাদে ফিরে এসে সুলতানকে উজির বলে, জাঁহাপনা, যুদর আপনাকেই নিমন্ত্রণ করেছে। আজ রাতে সে আপনাকে ভোজসভায় আপ্যায়ন করবে।

সুলতান বলে, ঠিক আছে, আমার এক সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে আজ যাবো তার ভোজসভায়।

বজ্রদানব যুদরকে সংবাদ দিলো, মালিক, সুলতান তার লোক-লস্কর, সিপাই সেনাপতি সঙ্গে করে আজ আপনার ভোজসভায় আসছে!

যুদর বলে, ঠিক আছে। তুমিও তোমার লোকজনকে এনে আমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাও। দেখেই যাতে সুলতানের হৃদকম্প ধরে যায়—সেইভাবে জাঁদরেল পালোয়ানদের নিয়ে এসে ভরে ফেলো।

সুলতান ফটকে প্রবেশ করতেই দেখতে পায়, দুইদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক শ' যোদ্ধা। একই বেশে, একই অস্ত্রে সুসজ্জিত সকলে! ভয়ে বুক শুকিয়ে যায় তার।

যুদর সিংহাসনে বসে তন্ময় হয়ে কী যেন চিন্তা করছিলো। সুলতান তাকে সালাম জানালো। কিন্তু তখনও সে একমনে কী যেন ভাবছেই। সুলতানের উপস্থিতি সে গ্রাহ্যই করলো না। একবার তাকে বসতেও বললো না সে। সুলতান ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো—অনেকক্ষণ। দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকালো সে। এই অবস্থায় কী করা উচিত। কীই বা করতে পারে সে কিছুই বোধগম্য হলো না।

অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে যুদর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্নবাণ ছুঁড়লো।

—দুটি নির্দোষ যুবকের ওপর নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে হাজতের অন্ধকার-কক্ষে রুদ্ধ করে রেখে কী আপনি খুব বীরপুরুষের কাজ করেছিলেন? অন্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিজের ধনাগার ভরানোই বুঝি আপনার একমাত্র পেশা?

সুলতান করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, না জেনে যা অপরাধ করেছি তার জন্য আমি অনুতপ্ত, মালিক। আপনি নিজগুণে ক্ষমা করে নিন। আমার অহঙ্কার এবং লোভই আমাকে এই খারাপ কাজ করেছিলো। আপনি মহানুভব, আমি ক্ষমাপ্রার্থী এক অপরাধী। তা দুনিয়াতে অপরাধ আছে বলেই তো ক্ষমার এতো কদর।

এইভাবে নানা সার-গর্ভ বক্তৃতা দিয়ে যুদরকে সে খুশি করার চেষ্টা করে।

যুদর বলে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আসুন, আমার পাশে বসুন।

এরপর যুদর তার দুই ভাইকে ডেকে বলে, এবার খানাপিনার ব্যবস্থা কর। এখানকার সুলতান আজ আমাদের অতিথি। এঁকে প্রসন্ন করাই এখন একমাত্র কাজ। দেখো, ব্যবস্থার যেন কোনও ত্রুটি না হয়। ভালো ভালো খাবার দাবার-এর আয়োজন কর। যেন কোনও নিন্দা না হয়।

দুই ভাই নিজ হাতে কাপড় বিছিয়ে দিলো। যাদু-থলের দৌলতে নানা রকম দুষ্প্রাপ্য খানাপিনায় সুলতানকে পরিতৃপ্ত করলো যুদর। সুলতান খুশি হয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলো!

সেদিন ফিরে গেলো, কিন্তু পরদিন আবার এলো। তারপর দিনও। প্রতিদিনই যুদর সুলতানকে নতুন নতুন কায়দায় আদর অভ্যর্থনা জানাতে থাকলো! এক খানা সে দুদিন খেতে দেয় না তাকে। এক সাজ-পোশাক দ্বিতীয় দিন পরে না কেউ। প্রতিদিনই সুলতান যুদরের প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখে, সারা প্রাসাদটা আগাগোড়া নতুন সাজে সাজানো হয়েছে। গতকালের সাজ-সরঞ্জাম, গালিচা পর্দা আসবাব আবরণ আজ দেখা যায় না। আজকের গুলো আবার অদৃশ্য হয়ে যায় আগামীকাল। যুদরের সহৃদয় প্রীতি ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারে না সুলতান। প্রতিদিন সে নিয়ম করে আসতে থাকে তার প্রাসাদে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে সুলতান উজিরকে বললো, যুদর যেভাবে দোস্তি করছে; শঙ্কা হয়, কোন দিন না সে আমাকে হত্যা করে আমার মসনদ অধিকার করে বসে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো পঁচাশিতম রজনী। আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

উজির বলে, আপনার আশঙ্কা অমূলক জাঁহাপনা। কারণ যুদর এমন সম্পদের মালিক যার কাছে আপনার এই সলতানিয়ৎ নিতান্তই নগণ্য। আপনার মসনদের ওপর তার কোনও লোভ হতে পারে না। তার মতো বিত্ত ও ক্ষমতাবান মানুষ তামাম দুনিয়ায় কেউ নাই। সে আপনার সম্পদে কোনও লোভ দেখাবে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও আপনার মনে যদি ঐ আশঙ্কাই বাসা বেঁধে থাকে, তা হলে বলবো, আপনি তাকে অন্য ফাঁদে বেঁধে ফেলুন।

—কী রকম?

উজির বলে, আপনার একমাত্র কন্যা আসিয়াহ আপনার মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারিণী। যুদরকে আপনি জামাতা করে নিন। আসিয়াহর সঙ্গে শাদী হলে সে আপনার প্রাণাধিক পুত্রসম আপনজন হবে। সুতরাং মনেও আর কোনও ডর থাকবে না।

সুলতান নতুন আলোর রোশনাই দেখতে পায়, বলে, কিন্তু কী ভাবে প্রস্তাবটা উত্থাপন করা যায়?

উজির বললো, আজ রাতে আপনিই যুদরকে আপনার প্রাসাদে আমন্ত্রণ করুন এবং সেই ভোজ-সভাতে আসিয়াহকে উপস্থিত রাখুন। তারপর, আসিয়াহ মা-এর যা রূপ-যৌবন, আপনাকে আর মুখ ফুটে কোনও প্রস্তাব দিতে হবে না। সব আপসে সমাধা হয়ে যাবে, দেখবেন। আপনার কন্যা আপনার এবং যুদরের বিশাল বৈভবের একমাত্র মালিক হতে পারবে।

সেইদিন রাতেই যুদরকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনলো সুলতান। ভোজ-সভায় আসিয়াহকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় যুদর। উজিরকে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটি তো অসাধারণ সুন্দরী, উজির সাহেব। কার মেয়ে?

উজির বলে, আপনার দোস্ত-সুলতানের মেয়ে।

যুদর বলে, আমি ওকে শাদী করতে চাই। আপনি সুলতানকে আমার হয়ে প্রস্তাব করুন। তিনি যা দেনমোহর চান, আমি দেব।

উজির সুলতানকে বললো, জাঁহাপনা, আপনার কন্যা আসিয়াহকে শাদী করতে চাইছেন যুদর সাহেব। আপনি যা দেনমোহর চান, তিনি দেবেন।

সুলতান বললো, এতো আমার পরম সৌভাগ্য। আর দেনমোহর? ও নিয়ে আমার কোন দাবি-দাওয়া নাই। আমি জানি, যুদর সাহেব স্বেচ্ছায় যা দেবেন, আমার আকাঙ্ক্ষার চাইতে তা অনেক বেশি। তিনি যে মেহেরবানী করে আমার কন্যাকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তাতেই আমি ধন্য।

সেইদিনই কাজীকে ডাকা হলো। বিরাট জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে যুদর-এর সঙ্গে আসিয়াহর শাদী সমাধা হয়ে গেলো।

এর পর বহুদিন ধরে যুদর আসিয়াহকে নিয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিলো। অবশেষে একদিন সুলতান দেহ রাখলো। উজির আমির প্রজাবৃন্দরা যুদরকে সুলতান হতে অনুরোধ জানালো। যুদর প্রথমে রাজি হয়নি। পরে অবশ্য সকলের অনুরোধ এড়াতে না পেরে মসনদে বসলো।

সুলতান হয়েই প্রথমে সে মৃত সুলতান সামস অল দুলাহর সমাধির ওপর বিরাট একটা মসজিদ বানালো। এই কবর এবং মসজিদটি বুনদাকানিয়াহ অঞ্চলে স্থাপন করা হয়েছিলো। পরে এই অঞ্চলটি জুনারিয়াহ নামে পরিচিত হয়।

যুদর তার দুই ভাই সলিম ও সালিমকে দুই উজির পদে বহাল করেছিলো।

এইভাবে পুরো একটা বছর কেটে গেলো। কিন্তু তার বেশি নয়।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ছিয়াশিতম রজনীতে আবার গল্প বলতে শুরু করে ঃ

একদিন সালিমকে সলিম বলে, এইভাবে ছোট ভাই-এর গোলামী আর কতকাল করবে?

সালিম বলে, কিন্তু যুদরের হাতে যতক্ষণ ঐ আংটি আছে—ওকে তো কিছুতেই কাবু করা যাবে না। তুমিই একটা ফন্দি-ফিকির বের করতে পারো। কারণ আমার চাইতে বদবুদ্ধি তোমার অনেক বেশি।

সলিম বললো, শোনো, আগেই বলে নিচ্ছি। আমি যুদরকে হত্যা করে ওর হাতের আংটি আর ওই যাদু-থলে কব্জাগত করবো। কিন্তু একটা কথা, আমি হবো সুলতান, আর তুমি হবে আমার প্রধান উজির? কী রাজী? অবশ্য ঐ আংটি আর যাদু-থলে, তোমার যখন প্রয়োজন হবে, ব্যবহার করতে পারবে। তুমি।

সালিম বললো, আমি রাজি।

সেইদিন রাতেই সলিম খাবারের মধ্যে জহর মিশিয়ে দিয়ে যুদরবে হত্যা করে সেই আংটি আর যাদু-থলেটা হাতিয়ে নিলো।

আংটিটা ঘষতেই বজ্রদানব এসে দাঁড়ালো সলিমের সামনে।

—বান্দা হাজির হুজুর, হুকুম করুন, কী করতে হবে।

—আমার ভাই সালিমকে হত্যা কর। এক্ষুনি।

বজ্রদানব হুকুমের বান্দা। শমরদলের ঐ আংটি যার হাতে থাকবে তার আদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বাধ্য। তা সে-কাজ ভালোই হোক বা খারাপই হোক। তৎক্ষণাৎ সে সালিমকে গলা টিপে হত্যা করলো।

তারপর সলিম বজ্রদানবকে বললো, যুদর আর সালিমের শবদেহ দুটি প্রধান সেনাপতির হাতে দিয়ে বলো, এদের দু'জনেরই ইন্তেকাল হয়েছে। যথাবিহিত সামরিক মর্যাদায় এদের সমাধিস্থ করতে হবে।

সেই সময় প্রধান সেনাপতি তার দলবল নিয়ে এক ভোজ-সভায় আমোদ-আহ্লাদ করছিলো। আফ্রিদি দানব যুদর আর সালিমের নিষ্প্রাণ দেহ দুটি এনে তার সামনে রাখতেই সে হায় হায় করে উঠলো। মুহূর্তে খানা-পিনা নাচ-গান হৈ-হল্লা সব স্তব্ধ হয়ে গেলো। সেনা অধ্যক্ষ ক্রোধে ফেটে পড়লো, কে, কে এই নৃশংস কাজ করলো?

—আমি, হঠাৎ নাটকীয়ভাবে সলিম প্রবেশ করলো সেখানে, আমি হত্যা করেছি, আমার এই দুই ভাইকে। পথের কাঁটা সরিয়েছি। এখন কানুন মতো আমিই মসনদের একমাত্র দাবিদার এবং মালিক। আমাকে তোমরা যদি নির্বিবাদে সুলতান বলে মেনে নাও তা হলে কোনই গোল থাকে না। আর তা যদি না কর, তবে আমাকেও আমার পথ দেখতে হবে। এই যে দেখছো যুদরের হাতের আংটি—এটা এখন আমার হাতে! সুতরাং বুঝতেই পারছো, পৃথিবী পদানত করার ক্ষমতাও আমার মুঠির মধ্যে।

প্রধান সেনাপতি বুঝলো, কোনও উপায় নাই। প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ মানেই মৃত্যু। বললো, আমরা আপনাকে সুলতান বলে মেনে নিচ্ছি, জাঁহাপনা।

সলিম বললো, আজ রাতেই আম যুদরের বিধবা পত্নী আসিয়াহকে শাদী করবো। তার আয়োজন কর।

আমিররা বললো, একশোবার, আপনি তাকে শাদী করতে পারেন। কিন্তু বিধিমতো আপনাকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হয়।

—গুলি মারো, তোমাদের বিধি-প্রথায়। আমি আজই শাদী করবো তাকে।

সেই রাতেই আসিয়াহকে শাদী করলো সলিম। রাত্রি গভীর হতে না হতে সে আসিয়াহর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। শাদীর প্রথম রাতে সে তার এতোকালের প্রলুব্ধ কাম চরিতার্থ করবে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো সাতাশিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বিধবা আসিয়াহ নতুন শাদীর সাজ পরে সলিমকে স্বাগত জানায়। দরজা বন্ধ করেই সলিম আসিয়াহকে অলিঙ্গন তথা চুম্বন করতে উদ্যত হয়। আসিয়াহ বলে, আহা, অত তাড়া কিসের! আমি তো সারা জীবনের মতো তোমার বাঁদী হয়ে গেলাম। আর আজকের রাতটাও অনেক বাকী। এসে, বসো, আমি তোমায় শরাব ঢেলে দিচ্ছি, খাও, মৌজ কর। তা না হলে জমবে কেন?

সলিম ভাবে, তাইতো। আসিয়াহ ঠিকই বলেছে। তাড়াহুড়ার কী আছে। সে তো এখন থেকে চিরজীবনের মতো তার হারেমের বেগম।

পালঙ্কের এক পাশে গিয়ে বসে সে। পেয়ালায় পূর্ণ করা ছিলো শরাব। আসিয়াহ অপূর্ব লাস্যময়ী ভঙ্গীতে পেয়ালাটা এগিয়ে দেয় সলিমের সামনে। এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলে সলিম।

ব্যস! মুহূর্তে মধ্যেই ঢলে পড়ে তার দেহ। সোনার বর্ণ মুখখানা জহরে নীল হয়ে যায়।

আসিয়াহ দরজা খুলে খোজাকে বলে, আমির সেনাপতিদের ডাকো।

তাদের সকলের সামনে আসিয়াহ সেই আংটিটা হাতুড়ির ঘায়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে এবং থলেটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে বলে, যত পাপ যত অশান্তির মূলে ছিলো এরা। আমি সব শেষ করে দিলাম। এবার আপনারা মসনদের নতুন সুলতানের সন্ধান করুন...

শাহরাজাদ থামলো! কারো মুখে কোন কথা নাই। একটু পরে শাহরাজাদ বললো, এই হলো যুদর, তার ভাই, সেই থলে আর আংটির কাহিনী। এর পর আপনাকে অন্য কাহিনী শোনাবো, জাঁহাপনা।

দুনিয়াজাদ আনন্দে জড়িয়ে ধরে দিদিকে, কী চমৎকার কাহিনী দিদি আর কী মিষ্টি করেই না তুমি বলতে পার?

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

শুনুন জাঁহাপনা, এবার আপনাকে আবু কাইর আর আবু শাইর-এর মজাদার কাহিনী শোনাচ্ছি ঃ

এক সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে আবু কাইর নামে এক রজক আর আবু-শাইর নামে এক নাপিত বাস করতো। দু'জনেরই শহরে দোকান ছিলো।

আবু কাইর-এর মতো পাজি বদমাইশ আর দুটি ছিলো না। চোখে মুখে সে মিথ্যে কথা বলতো। তার মতো অসৎ শঠ প্রবঞ্চক সে শহরে আর কেউ ছিলো না। তার কুখ্যাতি ও

কুকীর্তির নানা কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরতো। লোকটা নানা ছল চাতুরী করে লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করতো। কেউ তার কাছে জামা কাপড় রং করতে এলে ধোঁকা দিয়ে পুরো টাকা আগাম নিয়ে নিত সে। বলতো, বাজারে রং পাওয়া যাচ্ছে না। চড়া দামে নগদে রং কিনতে হবে। লোকে বিশ্বাস করে অগ্রিম দিয়ে যেত। কিন্তু আবু কাইর সেই টাকা দিয়ে ভালো ভালো খানা-পিনা এনে স্ফূর্তি করে খেত। কিন্তু খদ্দেরকে মাল তৈরি করে দিত না। আগাম টাকাটাই আত্মসাৎ করে ক্ষান্ত হতো না, তাদের জামা কাপড়ও বেচে দিত। এইভাবে হাজার হাজার লোককে সে ঠকাতো। বেচারা খদ্দেররা দিনের পর দিন ফিরে যেত। রোজই লোকটা নতুন নতুন ছল করে তাদের ধোঁকা দিয়ে ফেরাতো। কাউকে বলতো, 'আমার বিবির বড় বিমার, কদিন কাজে একদম হাত দিতে পারেনি। কিছু মনে করবেন না, দিন দুই পরে আসবেন।' দুদিন বাদে এসে তারা আবার এক নতুন কথা শুনে। 'আর বলবেন না, গতকাল থেকে এমনভাবে পেট ছেড়ে দিয়েছে যে, উঠে দাঁড়াতে পারছি না। কথা দিচ্ছি, দিন কয়েকের মধ্যেই আপনার পোশাক রং করে দেব।' খদ্দের ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যায়। মুখে কিছু বলতে পারে না। মানুষের শরীর খারাপ হতেই পারে। কিন্তু তারা তো জানে না যে, পোশাক অনেক আগেই সে বেমালুম বেচে দিয়েছে।

এইভাবে দিনের পর দিন প্রতিটি নিরীহ খদ্দেরকে নানা ছল ছুতোয় ঘোরাতে থাকে। কিন্তু এমনভাবে বেশিদিন চললো না। একদিন একজন ফেটে পড়লো, সাফ সাফ সত্যি কথা বলো, আমার কামিজ কোথায়? দিনের পর দিন তুমি আমাকে নানা ছলে ঘোরাচ্ছো। আজ আমি তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না। আগে বের কর আমার কামিজ আর টাকা। তা না হলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, আমি দেখিয়ে দেবো।

আবু কাইর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো, আপনি বিশ্বাস করুন মালিক, সত্যি কথাটা বলবো বলবো করে কিছুতেই আপনার কাছে বলতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন দেখছি, না বলে আর উপায় নাই।

খদ্দেরটি গর্জে ওঠে, ওসব ভণিতা রেখে কি বলতে চাও, বলো।

ধোপাটা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, আমি আপনার কামিজটা রং করে দোকানের বাইরে মেলে দিয়েছিলাম। এমন সুন্দর রং হয়েছিলো, আপনাকে কি বলবো, কিন্তু সবই আমার নসীব—বিকাল বেলায় তুলতে গিয়ে দেখি, চুরি গেছে। শুধু আপনারটাই না, ঐ সঙ্গে আরও দু'জনের সাজ-পোশাক ছিলো—সবই নিয়ে চম্পট দিয়েছে ব্যাটা। এখন আমি কী করি? কী করে আপনাদের বোঝাই। এতে আমার কোনও হাত ছিলো না। আর এসব বললেই বা আপনারা শুনবেন কেন বলুন। আপনারা আমার খদ্দের, উচিত মূল্য দিয়ে কাজ করাবেন। ক্ষয় ক্ষতি হলে আপনারা মানবেন কেন?

খদ্দেরটি বলে, কিন্তু তোমার দোকানের সামনে থেকে চুরি যাবে কি করে? কার এতো বড় সাহস? তোমার নাকের ডগা থেকে চুরি করে হাওয়া হবে?

—আর বলবেন না সাহেব, আমার পাশেই একটা মহা চোরের ডেরা।

—কে সে?

আর বলবেন না মালিক, এই যে ছুঁচো নাপিতটা—ঐ ব্যাটাই আমার সর্বনাশ করছে। একটু বেসামাল হয়েছি কি রক্ষা নাই। ব্যাটা ওৎ পেতেই থাকে—লোকটা এমন অসৎ ছিঁচকে চোর—একবার যদি বাছাধনকে হাতে-নাতে ধরতে পারি, জন্মের সাধ ঘুচিয়ে দেব।

খদ্দেরটির সব রাগ জল হয়ে যায়। আহা, বেচারা গরীব মানুষ, এতো দামী সাজ-পোশাকের খেসারত সে দেবে কি করে? আর কাজীর কাছে মামলা করেই বা ফয়দা কী? ওর দোকানে কী আছে? কী ক্রোক করে নেওয়া যাবে? শুধু-শুধু খাটুনিই সার হবে। সুতরাং মাল

আদায়ের আশা ছেড়ে দিয়ে শুকনো সান্ত্বনা দিয়ে সে চলে যায়, দুঃখ করো না দোকানী। পাপের শাস্তি আল্লাহ দেবেন। তোমার ক্ষতিপূরণ তুমি একদিন সুদে আসলে পাবে।

লোক ঠকানোর ব্যবসা আর কত দিন চলে। এইভাবে একদিন তার সব খদ্দের সরে পড়ে। শহরে তার ভীষণ বদনাম, কেউ আর তার ছায়া মাড়ায় না।

রোজগারপাতি একেবারে বন্ধ, দিন আর চলে না। প্রতিবেশি সদাশয় নাপিত দেখলো লোকটা না খেতে পেয়ে মারা যাবে। একদিন সে আবু কাইরকে বললো, দেখ ভাই, দেখতে পাচ্ছি, তোমার ব্যবসা একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। এখন খাবে কী? এক কাজ কর, যতদিন না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পার, আমার বাসাতেই খানা-পিনা কর। তারপর যখন সুদিন আসবে, আবার পসার জমবে।

আবু শাইর-এর বদান্যতায় কোনও রকমে জীবন ধারণ করতে থাকে আবু কাইর। কিন্তু নাপিতের ব্যবসাও তেমন কিছু চলে না। তার ওপরে বয়স হয়েছে, তেমন খাটতেও পারে না। দিনকে দিন রুজি-রোজগার কমতেই থাকে। অথচ খরচ বেড়ে গেছে। ঘাড়ের ওপর ধোপার সংসার। নিজে যা খায়, তাদেরও তা খাওয়াতে হয়।

একদিন আবু কাইর বললো, দেখ বন্ধু, আমি বুঝতে পারছি তোমার রোজগার কমে আসছে। এই বাজারে তোমার নিজের সংসার চালিয়ে আমার সংসারের ভার বয়ে চলা বড় শক্ত। আমি বলি কি, চলো আমরা বিদেশে যাই। নতুন কোনও শহরে। হয়তো আল্লাহ মুখ তুলে চাইবেন। আমরা আবার নতুন করে দোকান-পাট সাজাবো। এখানকার দোকান তুমি বেচে দাও। চলো, ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ি।

আবু কাইর বলে, তা কথাটা মন্দ বলনি, ভাই। এ পোড়া শহরে আমাদের আর কিছু হবে না। তাই চলো, অন্য দেশেই চলে যাই।

আবু শাইর দোকান বিক্রি করে দিয়ে বিদেশ যাত্রার তোড়জোড় করতে থাকে। আবু কাইর বলে, কোরাণ ছুঁয়ে হলফ করছি, আজ থেকে তুমি আমার ভাই। আমরা যা লাভ করবো দু'জনে সমান ভাগ করে নেব। তা সে যদি একা আমর খাটুনিতেও রোজগার হয় তারও সমান ভাগ তোমাকে দেব, কেমন?

আবু শাইর বলে, এর চাইতে ভালো কথা আর কি হতে পারে, ভাই।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো অষ্টাশিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

জাহাজ ছাড়ার দিন দুই বন্ধুতে বন্দরে এসে আল্লাহর নাম করে জাহাজে চেপে বসে। সঙ্গে সামানপত্র বিশেষ কিছুই নাই। এমন কি রাহাখরচ বা খানাপিনা কিছুই সঙ্গে নিতে পারেনি তারা। পাবেই বা কোথায়। দোকানটা বিক্রি করে যা কিছু সামান্য পেয়েছিলো তার থেকে বিবি বাচ্চাদের খাওয়া পরার জন্য কিছু দিয়ে এসেছে। বাকী টাকায় জাহাজের ভাড়া মেটাতে হয়েছে!

কিন্তু নসীব সাধ দিলো। জাহাজের কাপ্তান, খালাসী, যাত্রী ও সওদাগরদের চুল দাড়ি কেটে খানাপিনার পয়সা রোজগার হতে লাগলো। আবু শাইর ছাড়া জাহাজে অন্য কোনও নাপিত ছিলো না। তাই, সাদরেই তাকে দিয়ে তারা ক্ষৌর-কর্ম করায় এবং হিসেবের তুলনায় কিছু বেশি পয়সা দেয়। আবু শাইর বলে, পয়সার আমাদের তেমন প্রয়োজন নাই, আপনারা যদি আমাদের দু'জনের খানাপিনার ব্যবস্থা করে দেন তা-ই যথেষ্ট হবে।

যাত্রীদের কেউ রুটি কেউ মাখন কেউ মধু কেউ বা একটু মাংস দেয়। যারা খানাপিনা কিছুই দিতে পারে না তাদের কাছ থেকে পয়সা নেয় আবু শাইর।

এইভাবে সে কয়েকদিনের মধ্যেই সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে! স্বয়ং কাপ্তান একদিন ডেকে বললো, তোমার তো খুব সুখ্যাতি শুনছি। খুব সুন্দর করে নাকি কামাতে পার। তা আমার মাথাটা একবার কামিয়ে দাও তো দেখি।

খুব যত্ন করে আবু শাইর কাপ্তানের মাথা কামিয়ে দেয়। ক্ষুর চালাতে চালাতে সে তার এবং আবু কাইর-এর দুর্ভাগ্যের কাহিনী খুলে বলে।

—স্বদেশে আর খেতে পরতে পেলাম না সাহেব, তাই বিদেশে চলেছি ভাগ্য অন্বেষণে।

আবু শাইর-এর ব্যবহারে খুশী হয় কাপ্তান। বলে, আজ থেকে তোমার দোস্তকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আমার কামরায় যেও। যতদিন না তোমাদের এই জাহাজ যাত্রা শেষ হয় প্রতিদিন আমার সঙ্গে খানপিনা করবে তোমরা, কেমন?

আবু শাইর এতোটা আশা করেনি। কাপ্তানের বদান্যতায় সে গদগদ হয়ে বলে, আপনার এ ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না, সাহেব।

—তার দরকার নাই। তোমরা বিপদে পড়েছ, সাধ্যমতো সাহায্য করা আমার কর্তব্য।

আবু শাইর কাজ-কাম শেষ করে ফিরে এসে দেখে, আবু কাইর নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। সারাদিন কাজ করে আজ তার অনেক রোজগার হয়েছে। রুটি, মাখন, মধু, মাংস, সব্জী এনেছে অনেক।

আবু কাইরকে জাগাতেই সে লাফিয়ে ওঠে, ওরে বাস, এতো খাবার? কোথায় পেলে?

—লোকে ভালোবেসে দিয়েছে। আবুকাইর আর কোনও কথা বলে না। গোগ্রাসে মুখে পুরতে থাকে। আবু শাইর যে সারাদিন খেটেখুটে এসেছে, তার সঙ্গে বসে ভাগাভাগি করে খাওয়া দরকার, সেই সৌজন্যবোধটুকু তার নাই।

আবু শাইর বলে, ধীরে বন্ধু, ধীরে। একদিনেই সব খেয়ে ফেললে কাল কী খাবে?

—কেন, কাল কি কাজে বেরুনে না?

—বেরুবো না কেন, কিন্তু যদি রোজগার না হয়। ভবিষ্যতের জন্য তো কিছু সঞ্চয় করে রাখা দরকার। কিছুই তো বলা যায় না। তা ছাড়া আরও একটা খবর আছে।

—কী?

কাপ্তান সাহেব আমাকে খুব সুনজরে দেখেছেন। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর কামরায় তোমার আমার নেমন্তন্ন। সেখানেই পেট পুরে খেতে পারবো। সুতরাং এগুলো এখন না খেয়ে ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখাই বোধহয় ভালো।

আবু কাইর মাংসের একটা টুকরো মুখে পুরতে পুরতে বলে, সমুদ্রের এই নোনা হাওয়ায় আমার শরীরটা ভালো নাই। গা হাত পা ব্যথা ব্যথা করছে। আমি আর কাপ্তানের কামরায় যাবে না। তুমি একাই গিয়ে খানাপিনা করে এসো। যদি পার, ভালোমন্দ খানিকটা আমার জন্যে নিয়ে এসো।

আবু শাইর বললো, সে তুমি ভেবো না, ভালো জিনিস তোমাকে না খাইয়ে আমার মুখে রুচবে না।

আবু শাইর-এর সারদিনের সংগৃহীত সমস্ত খানাপিনা একাই সাবাড় করে দিলো আবু কাইর। একটা ক্ষুধার্ত রাক্ষস! যেন কতকাল খেতে পায়নি।

এই সময় কাপ্তানের লোক এসে বললো, খানা তৈরি, কাপ্তান আপনাদের খেতে ডাকছেন।

আবু শাইর আবু কাইরকে বললো, কী যাবে না?

—তুমিই যাও ভাই, আমার শরীরটা বেজায় খারাপ। সমুদ্রের শয়তানটা আমার ওপর ভর করেছে। উফ কী ব্যথা, সারা শরীরটা টনটন করছে। এক পাও নড়ার শক্তি নাই আমার।

সুতরাং আবু শাইর একাই গেলো কাপ্তানের কামরায়। লম্বা একটা মেজের উপর সাদা কাপড় বিছানো হয়েছে। তার উপরে নানা ধরনের বাদশাহী খানা থরে থরে সাজানো। প্রায় গোটা কুড়ি রেকাবী ভর্তি মুখরোচক খানা! কাপ্তান মেজের মাঝখানে বসে আবু শাইর এবং তার আরও দু-চারজন মেহেমানের প্রতীক্ষায় বসে আছে।

নাপিতকে একা দেখে কাপ্তান প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার, তোমার দোস্ত কোথায়? সে এলো না?

—জী না। তার বিমার হয়েছে। সমুদ্রের জল হাওয়া সবারই তো ধাতে সয় না। বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। তবে দু'একদিনেই সেরে যাবে মনে হয়।

কাপ্তান বললো, ঠিক আছে, এই এখানে আমার পাশে এসে বস। একখানা বড় দেখে থালা নাও। যা যা পছন্দ, যত খুশি তুলে নাও। কোনও সঙ্কোচ করো না। খাবার লোক বেশি নাই। কিন্তু কম করে হলে জনা-দশেকের খানা সাজানো আছে। পেট ভরে খাবে কিন্তু। বুঝলে?

আবু শাইর ঘাড় নেড়ে জানায়, সে যতটা পারে খাবে।

প্রাণ ভরে তৃপ্তি করে খেলো সে। কাপ্তান একখানা বড় থালা টেনে নিয়ে নিজে হাতে নানারকম খানায় ভর্তি করে আবু শাইর-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, তোমার বন্ধুর জন্যে নিয়ে যাও। বেচারা, বিমারে কষ্ট পাচ্ছে।

আবু শাইর ফিরে এসে দেখে, আবু কাইর-এর পেটটা ফুলে যেন জয়ঢাক। ঘন ঘন ঢেকুর তুলছে। লোভে পড়ে খেয়েছিলো। এখন তার ঠেলা সামলাতে পারছে না।

—তোমাকে পই পই করে বারণ করলাম, ঐ সব বাজে জিনিস খেয়ে শরীর খারাপ করো না। তা আমার কথা তো কানে তুললে না! এখন দেখ, কত সুন্দর জিভে জল আসা খানা নিয়ে এসেছি। তখন কম করে খেলে এখন কত রসিয়ে রসিয়ে খেতে পারতে—

আবু কাইর-এর লোভী চোখ দু'টো ধক ধক করে জ্বলতে থাকে।

—আরে রাখ রাখ, আমার সামনে রাখ দেখি। আঃ, কী বাহারী-খানা গো! এ কি না খেয়ে থাকা যায়?

আবু শাইর আঁৎকে ওঠে, অ্যাঁ, বলো কী? এ অবস্থায় আবার তোমার গলায় নামবে?

—খুব নামবে। তুমি দেখই না, কেমন করে সাবাড় করে দিই। আহ, এমন সুন্দর শাহী কাবাব, কোর্মা, কালিয়া চাঁপ, তন্দুরী,—একি কালকের জন্যে ফেলে রাখা যায়! কাল যদি না-ই বাঁচি।

আবু শাইর-এর হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে রেকাবীখানা কেড়ে নিয়ে দু'হাত চালিয়ে মুখে পুরতে থাকে সে। নেকড়ের মতো লোভী লোলুপ তার চোখের দৃষ্টি। সিংহের মতো ক্ষিপ্রতায় সে হাত মুখ চালাতে থাকে। পলকের মধ্যে পুরো থালাটাই সাবাড় করে ফেলে। দু হাত দিয়ে থালাখানা মুখের সামনে তুলে ধরে জিভ দিয়ে চেটেপুটে ফর্সা করে আবু শাইর-এর হাতে ফেরত দিয়ে বলে, বেড়ে খেলাম।

আবু শাইর হতবাক। একটা লোক এতো খেতে পারে? ভয় হয়, লোভে পড়ে খেলে বটে, কিন্তু বাঁচবে তো?

আবু শাইর-এর আশঙ্কা বৃথা। দিব্যি আরামে মোষের মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগলো আবু কাইর। সারা রাত ধরে তার নাসিকা গর্জন আর সমুদ্রের ভয়াল তর্জন মিলে-মিশে একাকার হয়ে যেতে থাকলো।

পরদিন সকালে উঠে আবার আবু শাইর জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে। কারো মাথা কামায়, কারো গোঁফ ছাঁটে। এইভাবে সারাদিন কাজ-কাম করার পর কাপ্তানের কামরায় হাজির হয়। আবু কাইর তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সমানে নাসিকা গর্জন করে চলেছে।

কাপ্তান সাহেব তাকে আদর আপ্যায়ন করে খানাপিনা করায়।

এইভাবে সপ্তাহ তিন কেটে গেলো। জাহাজ এসে ভিড়লো এক নাম-না-জানা বন্দরে। আবু কাইর আর আবু শাইর তীরে নামে। বন্দরের পাশেই শহর। ওরা একটা কম দামী সরাইখানায় একখানা ঘর ভাড়া করে নিলো। আবু কাইর কিন্তু তখন দরিয়া-বিমারে শয্যাশায়ী। সে আবু শাইর-এর মাদুরের এক পাশে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে।

আবু শাইর তার ক্ষুর কাঁচি সঙ্গে নিয়ে একটা জনবহুল রাস্তার চৌমাথার এক পাশে একটু জায়গা করে বসে পড়ে। প্রথমে একটা কুলি পরে গাধার সহিস, ভিস্তিওলা, ফলওলা, ফেরিওলা প্রভৃতি গরীব খদ্দেরগুলো জুটতে থাকে। তার কামাবার কায়দা দেখে পথচারীরা থমকে দাঁড়ায়। আপনা থেকে বাহবা শব্দ বেরিয়ে আসে, বাঃ চমৎকার হাত তো লোকটার!

আস্তে আস্তে পয়সাওলা লোকগুলিও পাছায় ইট নিয়ে আবু শাইর-এর সামনে কামাতে বসে পড়ে।

দিনের অলো শেষ হয়ে গেলে আবু শাইর সেদিনের মতো ক্ষুর কাঁচি জড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ে এবং ঘরে ফেরার পথে খানাপিনা কিনে নিয়ে যায়। বন্ধুবর আবু কাইর তখনও শয্যাশায়ী। নাসিকা গর্জনে কামরা কাঁপিয়ে তুলছে। আবু শাইর ওর নাকের কাছে মাংসের কালিয়াটা ধরতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসলো সে।

—বাঃ বেড়ে গন্ধ তো!

আবু কাইর জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে। লোলুপ চোখে খাবারের ভাঁড়ের দিকে তাকায়।

দু'জনে মিলে ভাগ করে খানাপিনা করে। বলাবাহুল্য আবু কাইরই বেশী খায়।

এইভাবে প্রতিদিন কাজে বেরিয়ে যায় আবু শাইর আর কুঁড়েটা পড়ে পড়ে ঘুমায়। জিজ্ঞেস করলে বলে, উঃ, সারা গায়ে কী দর্দ। এপাশ-ওপাশ করতে পারি না।

এমনি করে চল্লিশটা দিন কেটে গেলো। সারাদিন খেটে খুটে ভালো মন্দ খানাপিনা নিয়ে আসে আবু শাইর আর তার ভাগ বসায় কুঁড়ের বাদশা ধোপাটা। আবু শাইর দু-একবার বলার চেষ্টা করেছে, ঘরের মধ্যে এইভাবে আবদ্ধ না থেকে শহরটা ঘুরে ফিরে একবার দেখে এস না। কি সুন্দর সব দোকান-পাট রাস্তা-ঘাট, ফুলের বাগিচা, ফোয়ারা—চোখ জুড়িয়ে যাবে।

আবু কাইর হঠাৎ কঁকিয়ে ওঠে, উ-হু-হু, গেলাম—

আবু শাইর ভীত চকিত হয়ে ওঠে কী, কী হলো?

—পায়ের রগে টান ধরেছে, একটু মালিশ করে দাও।

আবু কাইর কাতরাতে থাকে। সরল প্রাণ নাপিত বুঝতে পারে না ওর বাহানা। কাছে এসে পা-খানা ডলে দিতে থাকে।

—আহা-হা থাক থাক, তুমি আর ওঠা বসা করো না। শুয়েই থাক। পা দু'খানা টান করে রাখ। আমার আবার দেরি হয়ে গেলো, চলি। খানা ঢাকা আছে ওপাশে, দুপুরবেলায় উঠে খেয়ে নিও।

আবু কাইর বলে আচ্ছা। তুমি কিচ্ছু ভেব না, অসুখটা সারলেই আমি কাজে লেগে যাবো। তারপর দু'জনে মিলে রোজগার করে চটপট অনেক টাকা বানিয়ে ফেলবো।

আবু শাইর তখনও দরজার চৌকাঠ পার হয়নি, আবু কাইর নাক ডাকাতে আরম্ভ করে।

দিনের পর দিন টাটা রোদ্দুরে খেটে খেটে একদিন আবু শাইর অসুখে পড়লো।

কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো, কী করে আর কাজে বেরোয়। সরাইখানার মালিককে ডেকে বললো, আমার তবিয়ৎ বহুৎ খারাপ-হয়ে পড়েছে। কাজে বেরুতে পারছিনা। যদি মেহেরবানী করে দিন দুই ভাইটাকে খেতে দেন, বড় উপকার হয়। আমি ভালো হয়ে আপনার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেব।

আবু শাইর-এর কথামতো আবু কাইরকে দুদিনের মতো খানাপিনা পাঠিয়ে দিলো সে। কিন্তু আবু শাইর ইতিমধ্যে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। জ্বরের ঘোরে সে ভুল বকতে আরম্ভ করে। কিন্তু অপদার্থ ধোপাটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। একবার ফিরেও তাকায় না তার দিকে। ক্ষিদের জ্বালায় তার পেট জ্বলছে, সরাইখানার মালিক আর খানা দেবে না, ঘরেও কিছু নাই, আবু কাইর ছটফট করতে থাকে, কী খাবে সে? আঁতিপাতি করে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। কিন্তু না, কোথাও কিচ্ছু নাই। হঠাৎ একটা ছোট বটুয়া খুঁজে পেলো সে। প্রতিদিন কিছু কিছু দিরহাম বাঁচিয়ে আবু শাইর এই বটুয়াটায় কিছু পয়সা জমিয়েছিলো! আবু কাইর বটুয়াটা ট্যাঁকে গুঁজে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ে। সেই সময় সরাইখানার মালিকও সে-দিকে ছিলো না। সকলের অলক্ষ্যে সে শহরের পথে হন হন করে হেঁটে চলে। কিছু দূর যেতেই একটা হালুইকরের দোকান দেখতে পায়। আর কোনও দিকে না তাকিয়ে সে দোকানে ঢুকে পড়ে! দোকানীকে বলে, খুব জলদি রুটি আর হালওয়া দাও। বড্ড খিদে পেয়েছে।

পেটপুরে খেয়ে দেয়ে দাম চুকিয়ে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে!

চারশো ঊননব্বইতম রাতে আবার সে শুরু করে ঃ

বাজারে গিয়ে আবু কাইর সুন্দর দেখে জামা কাপড় কিনে পরে নিলো। রাস্তায় নেমে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে গজেন্দ্র-গমনে চলতে থাকে। একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হয়, রাস্তায় যত মানুষ চলা-ফেরা করছে তাদের সকলের সাজ-পোশাক মাত্র দুটি রঙে সীমাবদ্ধ। সাদা আর নীল। এর বাইরে অন্য কোনও রঙ তার চোখে পড়ে না।

আবু কাইর এক রজকের দোকানে ঢোকে। দোকানী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কী চাই জনাব।

আবু কাইর পকেট থেকে একখানা সাদা রুমাল বের করে বলে আমি এটা রঙ করাতে চাই! কত লাগবে?

দোকানী বলে, কুড়ি দিবহাম।

আবু কাইর-এর চোখ কপালে, ওঠে, কুড়ি দিরহাম? কেন?

—কেন কী, কুড়ি দিরহামই বাঁধা দর। বিশ্বাস না হয় আর পাঁচটা দোকান যাচাই করে দেখুন!

—কিন্তু আমাদের দেশে তো এই রুমালখানা রং করতে আধ দিরহাম লাগে?

দোকানী নির্লিপ্তভাবে বলে তাহলে আপনার দেশে গিয়েই করাবেন। আমরা ওর কমে করতে পারবো না।

আবু কাইর বলে, ঠিক আছে, তাই দেবো। আমাকে লাল রঙ করে দেবেন।

দোকানী অবাক হয়ে তাকায়, লাল?

—হ্যাঁ, লাল রঙই আমার পছন্দ!

—আপনার পছন্দমতো কাজ হবে না, সাহেব!

—মানে?

—মানে আবার কী? নীল ছাড়া অন্য কোনও রং করা যাবে না।

এবার আবু কাইর অবাক হয়, কেন? কেন করা করা যাবে না?

—এ দেশে নীল আর সফেদ এই দু'টো রঙই হয়। আপনি পথে ঘাটে লক্ষ্য করেননি? কোনও মানুষের সাজ-পোশাকে অন্য কোনও রঙ দেখেছেন?

—না, তা অবশ্য দেখি নি। কিন্তু কেন অন্য রং করা যাবে না?

এখানে—এই শহরে আমরা চল্লিশ ঘর রঙের কারিগর আছি। বংশানুক্রমে এই আমাদের জাতব্যবসা। বাবা একমাত্র ছেলেকে শিখিয়ে যায়। সেজন্য অন্য কোনও লোক এখন পর্যন্ত এ ব্যবসাতে নাক গলাতে পারেনি। আমরা শুধু জানি, নীল রঙ করতে। অন্য কোনও রঙের কাজ আমাদের বাপঠাকুর্দাও জানতো না, আমরাও জানি না।

আবু কাইর বললো, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি। আমি বিদেশী, আলেকজান্দ্রিয়াতে আমার ঘর। এখানে ভাগ্যান্বেষণে এসেছি। আমারও জাতব্যবসা এই কাপড় রঙ করা। আমি চল্লিশ রকম রঙের কাজ জানি। আমাকে যদি আপনার সঙ্গে নেন তবে সব কাজ আপনাকে আমি শিখিয়ে দেবো। তখন দেখবেন, আপনার দোকোনে কী ভিড় জমে যায়।

দোকানী সন্দিগ্ধভাবে আবু কাইর-এর দিকে তাকায়। বলে, আমার ওসব ঝমেলার দরকার নাই। এই বেশ আছি।

আবু কাইর বলে, বেশ, আমাকে একটা চাকরীতেই বহাল করুন কোনও অংশ চাই না। আমি আপনাকে সব শিখিয়ে দেবো।

দোকানী বললো, সে হয় না। আমরা কোনও বিদেশীকে চাকরী দিতে পারি না। আমাদের রজক-সভার অনুমতি ছাড়া কোনও কাজ আমরা করি না। আমাদের সভাপতির নির্দেশ আছে, কোনও বিদেশীর সঙ্গে কারবার করবে না তাদের কাউকে কর্মচারী রাখবে না।

আবু কাইর হতাশ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আর একটা কাপড় রঙ করার দোকানে ঢোকে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে দোকানীটাও ঐ একই কথা বলে তাকে ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে সে যতগুলো দোকোনেই গেলো, সবাই একই কথা বলে, না, কোনও বিদেশীকে তারা দোকানে ঢোকাবে না। এরপর সে গেলো রজক-সভার সভাপতির কাছে। লোকটি বয়সে প্রবীণ। ব্যবহারও বেশ ভালো। কিন্তু তারও সেই এক কথা, আমাদের বাপঠাকুর্দার নির্দেশ আছে, সাহেব। হাত পা আমাদের বাঁধা, কোনও বিদেশীকে আমাদের দোকানে জায়গা দিতে পারি না!

অবশেষে আবু কাইর মরীয়া হয়ে সেখানকার সুলতানের দরবারে গিয়ে হাজির হয়। আবু কাইর বিদেশী, সুলতান তাকে সাদর স্বাগত জানায়। যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে সে বলে, জাঁহাপনা, আমি আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী। হুজুরের দরবারে একটা আর্জি পেশ করতে চাই।

সুলতান বলে, বেশ বলো, কী বলতে চাও?

—জাঁহাপনা, জাতে আমি রজক। কাপড় রঙ করে রোজগার করি। নিজের দেশে ব্যবসা চললো না; তাই ঘুরতে ঘুরতে আপনার শহরে এসেছি। উদ্দেশ্য গায়ে গতরে খেটে দুবেলার রুটি সংগ্রহ করবো। কিন্তু আপনার শহরে, চল্লিশটি রজকের দোকান আছে, প্রতিটি দোকানে আমি ঘুরেছি! কেউ আমাকে কাজ দিলো না। আমার একমাত্র অপরাধ, আমি বিদেশী। কিন্তু আমাকে কাজে নিলে তারা লাভবান হতো, হুজুর।

সুলতান প্রশ্ন করে, কেন? লাভবান হতো কেন?

—আপনার শহরের প্রতি মানুষ এমনকি স্বয়ং সুলতান পর্যন্ত দেখছি দুটি রঙের

সাজ-পোশাক পরেন। সাদা আর নীল। দোকানীদের কাছ থেকে জানলাম, নীল ছাড়া তারা নাকি অন্য কোনও রঙের কাজ জানে না।

সুলতান বাধা দিয়ে বলে, তা তারা অন্যায়টা কী বলেছে? সত্যিই তো, নীল ছাড়া অন্য রঙে সাজ-পোশাক রাঙানো যাবে কী করে?

—হুজুর যদি অভয় দেন তো বলি, আমি লাল, নীল, হলুদ, জাফরান, গোলাপী, বেগুনী, সবুজ প্রভৃতি চল্লিশটা রঙের কাজ জানি। একেবারে পাকা রঙ। আপনি যে রঙ বলবেন। সেই রঙে কাপড় রঙিয়ে দিতে পারি। কাপড় ছিঁড়ে যাবে, কিন্তু রঙ জ্বলজ্বল করবে।

সুলতান হতবাক, কয়েক মুহূর্ত তার মুখে কথা জোগায় না। সারা দরবার অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আবু কাইর-এর মুখের দিকে। লোকটা বলে কী। মাথাটাথা খারাপ? পাগল নয় তো?

সুলতান বলে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু তুমি বিদেশী, তাই তোমাকে অসম্মান করে একেবারে নস্যাৎ করে দিচ্ছি না। বেশ তুমি কী চাও, বলো, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখ, বিদেশী, যদি তোমার কথা ঠিক হয় তবে তোমাকে আমি মাথায় করে রাখবো। আর যদি ধোঁকাবাজী কর, তোমার গর্দান যাবে।

আবু কাইর কুর্নিশ জানিয়ে বলে, তাই হবে জাঁহাপনা। আপনি আমাকে শহরের যে-কোনও রাস্তার ওপরে একখানা দোকান ঘর-এর ব্যবস্থা করে দিন। আর চাই কয়েকজন লোক, কিছু কাপড় আর রঙ তৈরি করার খরচা।

সুলতানের হুকুমে সেইদিনই শহরের চৌমাথার কাছে একখানা বিরাট দোকান ঘর ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো তাকে। যে কজন লোক দরকার সব পেয়ে গেলো সে।

আবু কাইর লোকজনদের কাজে লাগিয়ে দোকানটাকে পরিপাটি করে সাজালো। সুলতান বললো, এই নাও, এক হাজার দিনার, এটা রাখ। যতদিন না কাজ শুরু হয়, তোমার হাত খরচা হিসাবে দিলাম। তোমার থাকার জন্য একখানা বাড়ি আমি সাজিয়ে গুজিয়ে দিতে বলেছি। এখন থেকে সেই বাড়িতেই থাকবে তুমি। চাকর নফর যা দরকার তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে উজির—আমার বলা আছে। তোমাকে অন্য কোনও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না। শুধু কাজ নিয়ে মেতে থাকবে। কাজ শেষ হলে খানাপিনা আর ফূর্তি করবে।

দু-একদিনের মধ্যেই আনুসঙ্গিক সব কাজ সমাধা হয়ে গেলো। ঝকঝকে করে সাজানো হলো দোকান। সুলতান বললো, এবার তাহলে কাজ শুরু করে দাও। কিন্তু পয়সা না হলে কী করেই বা শুরু করবে? এই নাও, পাঁচ হাজার দিনার। এ দিয়ে রঙ, মসলাপত্র সব কিনে নাও। আমি পাঁচশো গজ কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি—খুব ভালো করে বাহারী রঙ করে দেবে, বুঝলে?

আবু কাইর এতো টাকা এক সঙ্গে জীবনে দেখেনি। মোহরের থলেটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বিনয়ে গদগদ হয়ে বলে, সে আবার বলতে, হুজুর! এমন রঙ করে দেবো, দেখে লোকে ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে।

—লোকে যাক, কিন্তু আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো না তে, হে?

—কী যে বলেন, হুজুর। আমি তো আপনার কথা বলিনি।

সুলতান চলে গেলে আবু কাইর মোহরের থলে থেকে একটা মোহর বের করে থলেটা ভালো করে কোমরে জড়িয়ে বাঁধে। মনে মনে বলে, সুলতানটা কী আহম্মক। এক দিনার লাগবে না রঙ কিনতো—পাঁচ হাজার দিয়ে গেলো! বড় মানুষের পয়সা—যত ঠকিয়ে নেওয়া যায় ততই লাভ।

পরের দিনই সুলতান পাঁচশো গজ সাদা রেশমী কাপড় পাঠিয়ে দেয়। আবু কাইর নানা ধরনের সুন্দর রঙে রাঙিয়ে দোকানের সামনে ঝুলিয়ে দেয় কাপড়গুলো। পথের

লোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, এমন আজব চীজ তারা জীবনে কখনও দেখেনি। কাপড়ের এতো রঙ কী করে করা সম্ভব, ভাবতে পারে না তারা। এখানকার মানুষ জন্ম থেকে দেখে আসছে মাত্র দুটি রঙ। সাদা আর নীল। হরেক রকম রঙের বাহার দেখে তাজ্জব বনে যায় শহরবাসী। অতি রক্ষণশীল বয়বৃদ্ধরা আশঙ্কা প্রকাশ করে, শেষ বিচারের দিন আসতে আর বাকী নাই। দুনিয়া এবার ধ্বংস হয়ে যাবে। তা না হলে এই সব ভূতুড়ে আজগুবি কাণ্ডকারখানা শুরু হচ্ছে কেন?

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা কিন্তু বুড়োদের এই সব নাক-উঁচু কথায় আমল দেয় না। তারা বলে, দিন বদলাচ্ছে, মানুষের রুচি ও প্রয়োজন পালটাচ্ছে। নতুন নতুন কত কি আবিষ্কার হচ্ছে। এও একটা আবিষ্কার। তাতে দুনিয়া রসাতলে যাবে কেন?

সবচেয়ে খুশি হয় সুলতান নিজে। চল্লিশ রকমের রঙে রঙিয়েছে সে কাপড়গুলো। কোনওটা বেদানার দানার মতো, কোনওটা বা কমলা। আবার কোনওটা পাকা ন্যাসপাতির মতো। কোনওটার রঙ চাঁপার কলির মতো। কোনওটা বা পারিজাত অথবা গোলাপ-সদৃশ। আকাশের নীল, সমুদ্রের গভীর নীল, কচি কলাপাতা, তাল পাতা, জাম আর জামরুল, জাফরান, দারুচিনি, কালোজিরে, পেস্তা, আখরোট বাদাম প্রভৃতি যত রঙ ভাবা যায়, সব রঙেই সে রাঙিয়েছে।

গর্বে বুক ফুলে ওঠে সুলতানের। এ আবিষ্কার যেন তার নিজেরই। অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সে কাপড়গুলো। উজিরকে বলে, কাপড়গুলো প্রাসাদে নিয়ে চলো। বেগমদের পরতে দাও। আর আবু কাইরকে আরও এক হাজার গজ কাপড় পাঠিয়ে দাও আজই।

কয়েকদিনের মধ্যে সে কাপড়গুলোও রঙ করে দিলো আবু কাইর। সুলতান খুশি হয়ে দশ হাজার দিনার ইনাম দিলো তাকে। সারা শহরে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেলো। উজির আমির ওমরাহেরা কাপড় পাঠাতে লাগলো। আবু কাইর চড়া দর হাঁকে। কিন্তু দামের কথা তখন আর কে চিন্তা করে। কিছুদিনের মধ্যেই আবু কাইর শহরের সেরা ধনী ব্যক্তি হয়ে উঠলো। মোহরের যেন শিলাবৃষ্টি হতে লাগলো তার দোকানে। এতো টাকা সে রাখবে কোথায়?

শহরের অন্য সব রজকরা মাথায় হাত দিয়ে বসে। তাদের দোকানে লোক ঢোকে না। শেষে একদিন রজক-সমিতির সেই বৃদ্ধ সভাপতি সদলে আবু কাইর-এর কাছে ক্ষমা চাইতে আসে।

—আমরা আপনাকে চিনতে পারিনি, সাহেব। আমাদের গোস্তাকি মাফ করে দিন। আমরা আপনার একান্ত অনুগত হয়ে আপনার অধীনে নোকরি করতে চাই। আমাদের কাজ দিয়ে বাঁচান। না হলে, বাল-বাচ্ছা নিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাবো।

কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করার বান্দা আবু কাইর নয়। বললো, এখন কেন এসেছ? কত কাকুতি-মিনতি করেছিলাম, তখন তো আমার কথা শোনওনি তোমরা। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। এখন কেন এসেছ হাত জোড় করতে? ওসবে আমার হৃদয় গলবে না। আমার দ্বারা কিছু হবে না। মানে মানে কেটে পড়।

এই সময় রাত্র প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো বিরানব্বইতম রজনী।

আবার সে শুরু করে ঃ

আবু শাইর-এর যা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিলো সবই চুরি করে পালালো আবু কাইর। তখন আবু শাইর জ্বরে চৈতন্য। তিন দিন তিন রাত্রি একইভাবে পড়ে রইলো সে। দেখার

কেউ নাই, কে দেবে দাওয়াই, কে দেবে এক বিন্দু পানি! সরাইখানার মালিক অতটা খেয়াল করেনি, কিন্তু তিন দিনের মধ্যে কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। দেখে অবাক হয়ে আবু শাইর জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে, অথচ আবু কাইর পাশে নাই। ঘরের ভিতরে ঢুকে সে আবু শাইর-এর পাশে এসে বসে।

—কী হয়েছে শেখ, তোমার সাথী কোথায়?

আবু শাইর-এর গলা দিয়ে আধা-স্পষ্ট একটা আওয়াজ বের হয়, খোদা জানেন। আজ একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে। জানি না, কতকাল ধরে আমি এই ভাবে এখানে পড়ে আছি। বলতে পারবো না, আমার সঙ্গীটি কোথায় গেছে। জ্ঞান হওয়ার পর আমি আর তাকে দেখিনি এখানে। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু পানি দেবেন, ভাইসাব? ওই যে ওখানে আমার যন্ত্র-পাতির থলেটা দেখছেন—ওর মধ্যে আমার জমানো কিছু পয়সা আছে। যদি মেহেরবানী করে ওর থেকে পয়সা বের করে আমার জন্যে কিছু পথ্যের ব্যবস্থা করে দেন, খুব উপকার হয়।

সরাইখানার মালিক যন্ত্রপাতির থলেটা নিয়ে এসে আবু শাইর-এর সামনে মেলে ধরে। আঁতি-পাতি করে খুঁজেও কোনও পয়সার বটুয়া পাওয়া যায় না।

—কই গো শেখ, এর মধ্যে তো কিছু নাই।

—নাই?

অত জ্বরের ঘোরেও আবু শাইর চঞ্চল হয়ে ওঠে, নাই কী? ওর মধ্যে যে আমার যথা-সর্বস্ব ছিলো?

সরাইখানার মালিক থলেটা উপুড় করে সব যন্ত্রপাতি মেজেয় ঢেলে দেয়, কই দেখ তোমার ক্ষুর কাঁচি-টাচি ছাড়া তো কিছুই নাই!

আবু শাইর হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলে। —সে নিয়ে ভেগেছে। আমাকে পথে বসিয়ে গেছে। ইয়া আল্লা, এ কী হলো, এখন এই বিদেশ-বিভূঁই-এ বেঘোরে মারা যাবো যে।

সরাইখানার মালিক বললো, আমি থাকতে তোমার কোনও ভয় নাই, শেখ। বিনা চিকিৎসায় বা না খেতে পেয়ে তুমি মারা যাবে না। আমার সাধ্যমতো আমি করবো। কিছু ভেবো না। তোমার কষ্টের পয়সা চুরি করে কেউ সুখী হবে না। যাক, চোখের পানি মুছে ফেলো। আমি তোমার জন্য বার্লি তৈরি করে আনছি। মনে রেখ, আজ থেকে তুমি আমার সেবা-যত্নে থাকবে।তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।

একটু পরে সে এক বাটি বার্লি আর মুরগীর ঝোল নিয়ে এসে বললো, নাও, খেয়ে নাও তো। অসুখ সারাতে গেলে দেহের মনের জোর থাকা দরকার। খানাপিনা না করলে দেহের তাগদ হবে কী করে? নাও ওঠ।

নিজের হাতে ধরে খুব যত্ন করে সে খাওয়ালো তাকে। তারপর ভালোভাবে শুইয়ে গায়ে চাদর চাপা দিতে দিতে বললো, আমি মাঝে মাঝেই এসে দেখে যাবো। তবুও যদি কখনও দরকার হয়, কোনও দ্বিধা না করে আমাকে ডাক দেবে, বুঝলে? আমি তো তোমার পাশেই আছি। হেকিমের কাছে যাচ্ছি, যা দাওয়াই পত্র তিনি দেন আমি তোমাকে খাইয়ে যাবো খন।

একটানা দুটি মাস সরাইখানার মালিকের অক্লান্ত সেবা-যত্নে সুস্থ হয়ে ওঠে আবু শাইর। খরচাপাতির কোনও কার্পণ্য করে না সে।

আবু শাইর-এর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, আপনার এ ঋণ অমি পয়সা দিয়ে কখনও শোধ করতে পারবো না। আপনি আমার পুনর্জন্ম দিয়েছেন। তবে যতদিন বাঁচবো

আপনার এই সেবা এই যত্ন এই আদর কোনওদিন ভুলবো না আমি। আজ আমার কিছু নাই। কিন্তু আল্লাহ যদি কখনও দিন দেয় আপনাকে আমার মনে থাকবে। অবশ্য পয়সা-কড়ি আপনার অনেক আছে ও সব কথা তুলে আপনার এই ভালোবাসাকে ছোট করতে চাই না।

সরাইখানার মালিক বলে, একমাত্র খোদাতালাকেই ধন্যবাদ জানাও শেখ। তিনিই তোমাকে আরোগ্য করে তুলেছেন। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমি অন্তরে তাঁর নির্দেশ পেয়েছিলাম বলেই তোমার দেখাশুনা করেছি। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

আবু শাইর-এর চোখ জলে ভরে আসে। দুনিয়াটা শুধুই ঠগে ভরা নয়। ভালো মানুষও দু-চারটে আছে।

আরও কয়েকদিন পরে বেশ সুস্থ হয়ে উঠলে আবু শাইর ক্ষুর কাঁচি জড়িয়ে আবার বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ে। রোজগারের ধান্দা দেখতে হবে। ঘুরতে ঘুরতে সে এক জায়গায় বহু লোকের জটলা দেখে সেইদিকে এগিয়ে যায়। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। আবু কাইর-এর দোকানের সামনে শহরের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। হরেক রকম রঙের কাপড় দেখার কৌতূহলে ছুটে আসছে মানুষ। কাপড়ে এতো বাহারী রঙ তারা এতোকাল ভাবতে পারেনি।

আবু শাইর-এর শরীর দুর্বল। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতে পারে না। একজনকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, এতো জমায়েত কেন? কী হয়েছে এখানে?

লোকটা অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে।—সে কি, সারা শহর তোলপাড় করে ফেলেছে এই পরদেশী, কোনও খবর রাখ না কিছু?

আবু শাইর বলে, না ভাই, আমি বহুৎদিন বিমার ছিলাম। কিছুই জানি না।

লোকটা বলে, আরে সব ব্যাটাকে কানা করে দিয়েছে। আবু কাইর নামে আলেকজান্দ্রিয়ার এক রজক এসে এখানে দোকান খুলেছে। তার হরেক রকম রঙের বাহার দেখে লোকে লোকারণ্য। অন্য সব রজকের দোকান সাহারা হয়ে গেছে। একটা মাছি ঢোকে না এখন। আহা লোকটা যাদু জানে, তা না হলে কে কবে শুনেছে, নীল ছাড়া অবার রঙ হয়! আর ঐ দেখ, কত মজাদার রঙের কাপড় সব ঝুলছে। লোকে এই কাপড় ফেলে ঐ বস্তাপচা নীল রঙের কাপড় পরবে আর?

আবু শাইর দেখলো দোকানের সামনে নানা রঙের অসংখ্য কাপড় ঝুলান। আনন্দে উল্লাসে নেচে উঠলো তার মন। এখানে তাহলে আবু কাইর জোর ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। পয়সার থলেটা চুরি করে আবু কাইর তাহলে একটা কাজের কাজই করেছে। মুহূর্তের মধ্যে তার মন থেকে সব রাগ সব ক্ষোভ মুছে গেলো। যাক, আল্লাহ এতোদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। এবার তাদের দুঃখ দুর্দশার অবসান হবে।

আবু শাইর কোন রকমে ভিড় ঠেলে ঠেলে দোকানের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দোকানের ভিতরে একটা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বসেছিলো আবু- কাইর। তার পিছনে দাঁড়িয়ে চারজন আজ্ঞাবহ হাবসী ক্রীতদাস চামর দোলাচ্ছে। দোকানের ভিতরে জনা-দশেক কর্মচারী কাপড় রঙ করাতে ব্যস্ত।

আবু শাইর দু পা এগিয়ে যায় সামনে। আবু কাইর কিন্তু তখন আরাম-কেদারায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে চামরের হাওয়া খাচ্ছিল। আবু শাইর ভাবে, এ অবস্থায় ওর তন্দ্রা কাটানো বোধহয় ঠিক হবে না। এখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করা যাক। যখন সে চোখ খুলবে, নজর পড়লেই সে অবাক হয়ে যাবে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো চুরানব্বইতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

হঠাৎ আবু কাইর সজাগ হয়ে দরজার দিকে তাকায়। ক্রোধে জ্বলে ওঠে তার চোখ। চোর বদমাইশ কোথাকার, এখানে এসে আমার দোকানে হানা দিয়েছ! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। এই লোকটাকে পাকড়াও। ব্যাটা মহাচোর।

আবু কাইর-এর হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাবসী নফরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে আবু শাইর-এর ওপর। দমাদ্দম কিল চড় ঘুষি চালাতে থাকে! ধোপাটা উঠে দাঁড়িয়ে একটা ছড়ি হাতে তেড়ে আসে, তোর এতো বড় সাহস দিন-দুপুরে এসেছিস আমার দোকানে চুরি করতে। মেরে ছাল চামড়া খুলে নেব।

সপাং সপাং করে বেতের চাবুক কষাতে থাকে সে। কয়েক পলকের মধ্যেই যন্ত্রণায় নীল বর্ণ হয়ে যায় শাইর-এর দেহখানা। সবে এতোবড় অসুখ থেকে উঠেছে। গায়ে জুতসই বল হয়নি, তার উপর এই পাশবিক অত্যাচার। জোয়ান মর্দই সহ্য করতে পারে না, সে তো বয়সের ভারেই নুয়ে পড়েছে, তার এই রুগ্ন বার্ধক্য জর্জর দেহে এই আঘাত সে সইবে কি করে? আবু শাইর-এর অসাড় অচৈতন্য দেহখানা লুটিয়ে পড়ে গেলো।

আবু কাইর হাঁপাতে হাঁপাতে ছড়িখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ফের যদি কখনও তোকে এ-মুখো আসতে দেখি, সুলতানকে বলে জন্মের মতো হাজতে ঢুকিয়ে দেবো ঠগ জোচ্চোর কোথাকার।

তারপর হাবসীদের বললো, লোকটাকে রাস্তার ওপরে ফেলে দিয়ে আয়। আর ককখনো ব্যাটাকে এই মহল্লায় ঢুকতে দিবি না।

সন্ধ্যার দিকে জ্ঞান ফিরে আসে আবু শাইর-এর। কোনও রকমে ব্যথা জর্জর দেহখানা টেনে নিয়ে সরাইখানায় ফিরে আসে। ছেঁড়া মাদুরের উপর শুয়ে সারা রাত ধরে কাতরায়।

সকাল বেলা অনেকটা সুস্থ বোধ করে আবু শাইর, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। অনেক দিন বাদে আজ সে হামামে গোসল করবে। একজন পথচারীকে জিজ্ঞোস করে এখানকার হামামটা কোন দিকে, ভাই?

—হামাম? হামাম আবার কী?

লোকটা অবাক হয়ে আবু শাইরকে প্রশ্ন করে।

আবু শাইর বলে, কেন হামাম জান না? যেখানে সাধারণ মানুষে গোসল করে। আমাদের দেশে প্রতি মহল্লায় সরকার থেকে হামাম ঘর বানিয়ে দেয়। যাতে সাধারণ মানুষে অল্প পয়সায় গোসল করতে পারে।

লোকটা বললো, গোসল করার জন্যে দরিয়ায় দাও। যত খুশি প্রাণ ভরে ডুব দিয়ে গোসল কর। হামাম আবার কী? আমরা সবাই তো দরিয়ার পানিতেই গোসল করি।

—কিন্তু দরিয়ার পানি তো নোনা। মিঠা পানি না হলে গোসল করা যায়?

লোকটা অবোধের মতো বলে, কি জানি হামাম বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ। আমি তো বাপের জন্মে হামাম বলে কিছু শুনিনি। আমাদের যখন ইচ্ছে হয় আমরা দরিয়ায় যাই।

আবু শাইর এই প্রথম বুঝতে পারলো এদেশের লোক গোসলের বিলাসিতা বোঝে না। তারা ঠাণ্ডা পানি গরম পানি দিয়ে গোসল করার মজা কখনও অনুভব করেনি।

আবু সুলতানের দরবারে যায়। বিদেশী একজন দর্শন-প্রার্থী শুনে সুলতান তাকে ডেকে পাঠান। আবু শাইর সুলতানের সামনে এসে যথাবিহিত কুর্নিশ করে বিনম্র ভঙ্গীতে হাত জোড় করে দাঁড়ায়।

—সুলতান মহানুভব, আমি এক বিদেশী। সুলতানের দরবারে আমি এক আর্জি নিয়ে এসেছি।

—সুলতান বলে, বেশ বলো তোমার আর্জি।

আবু শাইর বলে, জাতে অমি নরসুন্দর। হামামের সব কাজ জানি। যদিও আমাদের দেশে একটা হামামে পানি গরম করার এবং গোসল করানোর লোক আলাদা আলাদা, কিন্তু আমি একাই সমস্ত কাজ জানি। জাঁহাপনা যদি অনুমতি করেন আমি একটা হামাম ঘরের দায়িত্ব নিতে পারি।

সুলতান অবাক হয়। অবাক হয় উজির আমির সকলেই। এমন তাজ্জব কথা শুনেছে নাকি কেউ। হামাম ঘর—গোসলখানা—সে আবার কী বস্তু?

সুলতান বলে, তোমার কথা বুঝলাম না পরদেশী। হামাম কাকে বলে?

আবু শাইর বলে, সে আমি বুঝতে পারছি, জাঁহাপনা। আপনি হামাম ঘর কখনও দেখেননি। সেখানে গোসল করার যে কী আনন্দ আপনার দেশের মানুষ তা জানে না। আজ সকালে আমি হামামে গোসল করবো বলে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ আমার কথা বুঝতেই পারালো না। তখন জানলাম আপনার দেশে হামাম বলে কিছু নাই। আপনার এতো বড় সুন্দর এই শহর, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ব্যবস্থারই ত্রুটি রাখেননি আপনি, অথচ অবাক লাগে, কোনও হামাম নাই। পথশ্রান্ত মানুষ একটু জিরিয়ে নেবে, তারপর গা হাত পা ঘষে মেজে সাফ করে ঠাণ্ডা গরম পানি দিয়ে গোসল করে, শরীরটা ঝরঝরে চাঙ্গা করে তুলবে তার কোনও ব্যবস্থা নাই। হামাম ঘর সব সভ্যদেশের শহরের শোভা। যে শহরের হামাম ঘর যত সুন্দর আমরা সে-শহরের তত প্রশংসা করি। একটা শহরের হামাম ঘরে ঢুকলেই সে শহরের মানুষের পরিচ্ছন্নতা রুচি প্রকৃতির পরিচয় পাই। এক কথায় বলতে গেলে, আধুনিক মানুষের জীবনে হামামই বেহেস্ত। সারাদিনের খরতাপে দগ্ধ হয়ে দুদণ্ডের শান্তি এনে দিতে পারে শুধু হামামই।

সুলতান বলে কিন্তু তোমার কথায় তো কিছু ঠাওর করতে পারছি না পরদেশী। কি এমন চীজ যাকে তুমি বেহেস্তের সঙ্গে তুলনা করছ ?

আবু শাইর বোঝাতে থাকে, জাঁহাপনা, হামাম ঘর কী ভাবে বানাতে হয় বলছি শুনুন ঃ একখানা বড় ইমারত—বিশেষভাবে হামামের জন্যেই তৈরি করা হয়। তাতে থাকবে বিশ্রাম করার বড় জায়গা। গোসলের পর সাজ-পোশাক প্রসাধনের ঘর। আর থাকবে খানা-পিনার কামরা। মোট কথা একটা মানুষ তেতে পুড়ে সেখানে ঢুকে আগে খানিকটা বিশ্রাম করে নিজেকে ঠাণ্ডা করে নেবে। তারপর গোসল সেরে সাজ-পোশাক পালটে প্রসাধন করে অল্প কিছু হালকা সরবৎ পানি খেয়ে ঝরঝরে তাজা হয়ে বেরুতে পারবে। হামামে গোসল করাবার লোক ভাড়া পাওয়া যায়। তাদের কাজ সাবান ছোবড়া দিয়ে খদ্দেরের সারা শরীরের ময়লা সাফ করে দেওয়া। তারপর সুগন্ধী পানি ঢেলে গোসল করিয়ে দেয় তারা। মেয়েদের জন্য মেয়ে এবং মর্দদের জন্য পুরুষ মানুষ ভাড়া পাওয়া যায়। হামামের বিশ্রামাগারে নাপিত বসে থাকে। যদি কেউ চুলদাড়ি কামাতে চায় কামিয়ে দেবে সে! তার জন্যে সামান্যই দক্ষিণা দিতে হয়। আপনি যদি আগ্রহ দেখান আমি আপনাকে আরও নিখুঁতভাবে সব বুঝিয়ে দিতে পারি, জাঁহাপনা।

সুলতান মুগ্ধ বিস্ময়ে আবু শাইর-এর কথা শুনছিলো এতক্ষণ।

—বড় আজব ব্যাপার। ঠিক আছে আমি রাজি। আজ থেকেই তুমি কাজে লেগে যাও পরদেশী! তোমার যা যা দরকার, আমি উজিরকে বলে দিচ্ছি, সব তোমাকে জোগান দেবে সে।

আবু শাইর বলে, আপনার রাজমিস্ত্রিকে ডাকুন। আগে আমি হামামের জন্য কি ভাবে ইমারত বানাতে হবে 'তাকে বুঝিয়ে দেব।'

সেইদিনই সুলতানের হুকুমে রাজমিস্ত্রীরা হাজির হলো। আবু শাইর হামামের নক্সা এঁকে তাদের বুঝিয়ে দিলো—কী ভাবে কী ধরনের ইমারত বানাতে হবে।

সুলতান আবু শাইর-এর থাকার জন্য একখানা বড় বাড়ি কয়েকজন চাকর নফর দাসী, দামী দামী আসবাব পত্র, সুন্দর সুন্দর খচ্চর গাধা ঘোড়া, বাহারী সাজ-পোশাক আর প্রচুর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে দিলো।

হামামঘরের জন্য শহরের ঠিক মাঝখানে এক জায়গা নির্বাচন করা হলো। সেখানে বানানো হবে আবু শাইর-এর নক্সা মত একখানা ইমারত।

দিনরাত খেটে মিস্ত্রীরা কয়েক দিনের মধ্যে একখানা বিশাল ইমারত বানিয়ে দিলো। আবু শাইর নিজের পছন্দ মতো আসবাবপত্রে সুন্দর করে সাজালো সেই হামামঘর।

সাজানো-গোছানো শেষ হলে সুলতানের কাছে গিয়ে সে বললো, জাঁহাপনা আপনার হামাম তৈরি হয়ে গেছে। মেহেরবানী করে আপনি একবার পায়ের ধুলো দেবেন, চলুন।

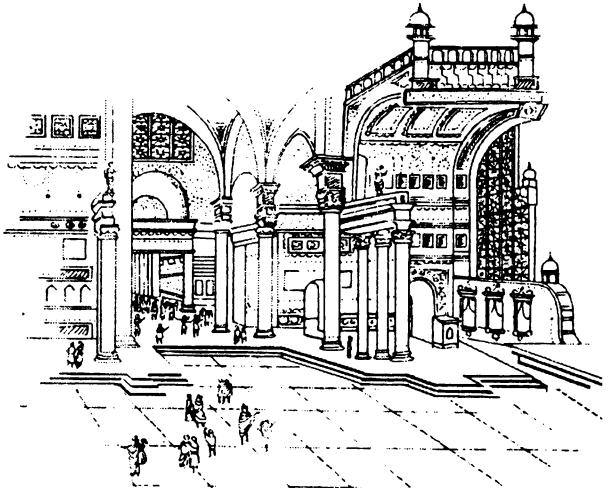

সুলতান হামামে এসে খুশিতে উপচে পড়ে। এমন চমৎকার বস্তু যে মানুষ কল্পনা করতে পারে ভাবতে পারে না সে। ঘরের ভিতরে পা দিতেই এক অপরূপ প্রশান্তিতে ভরে যায় মন-প্রাণ। সত্যিই, আরামের জায়গা।

আবু শাইর বললো, সবই হয়ে গেছে, এখন আমার কিছু কর্মচারী চাই, হুজুর।

সুলতান বললো কী কী ধরনের কর্মচারী চাও, বলো। আজই আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—জনা কুড়ি তাগড়াই হাবসী ছোকরা চাই—এরা ডলাই-মলাই করে গায়ের ময়লা সাফ করবে। কী করে করতে হবে আমি তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেব।

—এ আর বেশি কথা কী। আমার প্রাসাদ থেকে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। আর কী চাই বলো?

—আর বিশেষ কিছু না, কিছু দামী সুগন্ধী আতর, গোলাপ নির্যাস, কিছু তুরস্কের তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি।

সুলতান বললো, ও সব তোমার পছন্দ মতো বাজার থেকে কিনে নেবে। এই রাখো দশ হাজার দিনার—হবে তো ঃ

—এতো কী হবে, জাঁহাপনা!

—যা লাগে লাগবে, বাকীটা তোমার বকশিশ।

আবু শাইর কুর্নিশ জানায়, জাঁহাপনার অসীম দয়া।

সুলতান বললো একটা ভালো দিনক্ষণ দেখে শুভ উদ্বোধন করো। আমি হবো তোমার প্রথম খদ্দের, কী, রাজি?

আবু শাইর বিনয়াবনত হয়ে বলে, আমি দিনক্ষণ দেখে আপনাকে জানাবো, হুজুর।

সারা শহরে লোকের মুখে মুখে একই কথা উচ্চারিত হতে থাকে, এক পরদেশী আজব জিনিস বানিয়েছে—গোসলখানা। স্বয়ং সুলতান সেখানে আসবেন গোসল করতে। দলে দলে মানুষ এসে জড়ো হতে লাগলো হামাম ঘরের সামনে। বিশাল পেল্লাই ইমারত। আগাগোড়া শ্বেত পাথরে তৈরি। নানা কারুকার্য করা। বাইরে থেকে দেখেই চোখ জুড়িয়ে যায়। ভিতরে না জানি কী আছে। সুলতান আজ গোসল করবেন এখানে। তারপর জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে এই হামাম। তখন সাধারণ মানুষ ঢুকতে পারবে ভিতরে।

সকালে উঠেই আবু শাইর উনুনে চাপিয়েছে পানি। গরম পানি ঠাণ্ডাপানি দুই-ই লাগে গোসলের সময়। সদর ফটকে শানাই বসানো হয়েছে। মালিকে বলা ছিলো, নানা রকম বাহারী ফুলে সাজিয়ে দিয়ে গেছে সারা হামামঘর।

উজির আমির বয়স্যদের নিয়ে সুলতান এলো গোসল করতে। সামনে পিছনে সেনাপতিরা ভিড় সরাতে ব্যস্ত। সুলতান সদর ফটকে পা দিয়েই চমকে ওঠে।

—আঃ, কী মজাদার খুশবু।

যুঁই ফুলের সৌরভে মদির হয়ে গেছে চারদিক। আবু শাইর কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আজ জাঁহাপনার গোসলের পানিতে যুঁই-এর আতর মেশানো হয়েছে।

অন্দরে গোসলঘরে জলের ফোয়ারায় আতর দেওয়া হয়েছে। তার সুবাসে সারা বাড়ি ভরপুর! সুলতানকে সাদর অভ্যর্থনা করে বিশ্রামাগারে নিয়ে যায় আবু শাইর। দেওয়ালের চারপাশে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা নগ্ন নিরাবরণ নারী-পুরুষের জলকেলি এবং রতিরঙ্গের দৃশ্যবলী। ঘরের ঠিক মাঝখানে বিরাট শ্বেত পাথরের গোলাকৃতি মেজ। সেই মেজ-এর উপরে ডাবর-সদৃশ একটা কারুকার্য-খচিত রূপোর ফুলদানিতে এক ঝাড় নানা বর্ণের সুন্দর ফুল। ঘরের চারপাশে আরাম-কেদারা, কুর্শি, পালঙ্ক।

সুলতানকে পালঙ্কে বসিয়ে নিরাবরণ করলো আবু শাইর। দু'খানা বড় বড় তোয়ালে দিয়ে সারা শরীর মুড়ে দিলো তার। বললো, এবার মেহেরবানী করে গোসল ঘরে চলুন, জাঁহাপনা।

সুবোধ বালকের মতো সুলতান আবু শাইরকে অনুসরণ করে পাশের কামরায় চলে যায়। ধবধবে সাদা মসৃণ শ্বেত পাথরের মেজেয় শুইয়ে দেয় সুলতানকে। তারপর দুটি ছোকরা বান্দার সাহায্যে আবু শাইর সুলতানের সারাদেহ পানি সাবান আর ছোবড়া দিয়ে আচ্ছা করে সাফ করে। বহুকালের সঞ্চিত ক্লেদ ঘষা মাজায় সাফ হয়ে যায়। ঠাণ্ডা-গরম পানি মিশিয়ে সুলতানকে নিজে হাতে গোসল করায় আবু শাইর।

স্নান পর্ব শেষ করে নতুন সাজ-পোশাক পরে যখন সরবতের টেবিলে এসে বসে মনে হয় তার দেহের ওজন বুঝি শূন্য হয়ে গেছে। ইচ্ছে হয়, ডানা মেলে দুর নীল নভে উড়ে চলে যায়। স্নানের যে এতো অপার আনন্দ, এর আগে কখনও অনুভব করেনি সুলতান। খুশিতে ভরে যায় দেহ মন প্রাণ। আবু শাইর আজ তাকে নতুন জীবনের স্বাদ এনে দিয়েছে। এর বিনিময়ে কী মূল্য তাকে দেবে সে? আবু শাইর এক গেলাস পেস্তার সরবত এনে সামনে ধরে। আঃ কী সুন্দর সুবাস। সরবতে চুমুক দিয়ে সুলতান বলে, আজ যে সুখ বিলাসের সন্ধান তুমি দিলে আবু শাইর তা আমার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। এখন বলো, কী ইনাম তুমি চাও।

আবু শাইর মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও কথা বলে না।

—না না, চুপ করে থাকলে হবে না, আবু শাইর, বলো তুমি কী চাও।

আবু শাইর মৃদু কণ্ঠে বলে, আমার কিছুই চাইবার নাই, জাঁহাপনা। হুজুরের ভালো লেগেছে, এ-ই আমার সব চাইতে বড় পুরস্কার।

শুধু সুলতান নয়, উজির আমির বয়স্য—সকলেই অবাক হয়ে তাকায় আবু শাইর-এর দিকে। লোকটা বলে কী? স্বয়ং সুলতান তাকে দিতে চাইছেন। যা মুখ ফুটে চাইবে তাই সে পেতে পারে। এক মুহূর্তে সে লক্ষপতি হতে পারে। অথচ বলে কিনা—চাইবার কিছুই নাই!

সুলতান বলে, এ তুমি কি বলছো, আবু শাইর! তুমি যদি আমার কাছে কিছু চাইতে, তা সে যত মূল্যের হোক, আমি দিতাম। কিন্তু কিছুই না চেয়ে তুমি আমাকে অনেক বেশি দেনার অঙ্গীকারে বেঁধে ফেললে। তোমার মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মানুষ আমি খুব বেশি দেখিনি। যাক, তুমি যখন দেশে ফিরে যাবে সেই সময় তোমাকে আমি আমার সাধ্যমতো ইনাম দেবো—খুশি হয়ে নিয়ে যেও, কেমন?

আবু শাইর বলে, সুলতান মহানুভব, এর চাইতে ভালো আর কী হতে পারে, জাঁহাপনা।

সুলতান বলে, আচ্ছা আবু শাইর তোমার হামামে যারা গোসল করতে আসবে তাদের কাছ থেকে কী নেবে তুমি।

—জাঁহাপনা, যদিও এই আমার রুজি-রোজগারের পথ, তবুও ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষকে দু-দণ্ডের শান্তি দেওয়াই এর আসল উদ্দেশ্য। লোক খুশি হয়ে যে যা আমাকে দিয়ে যাবে তাই আমি মাথা পেতে নেবো হুজুর। আমার কোনও দাবি নাই।

সপারিষদ সুলতান আর একবার চমকে ওঠে। সত্যিই লোকটা অসাধারণ। উজির বলে, আচ্ছা ধর লোকে যদি এসে গোসলাদি সেরে পয়সা না দিয়েই চলে যায়—

আবু শাইর মুচকি হাসে, বেশ কাল আপনি আসবেন, আপনাকে দিয়েই তার পরীক্ষা হয়ে যাবে।

সুলতান সহ পারিষদরা সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। সুলতান বলে, কী উজির, তোমার থোতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে তো আবু শাইর। আমার সারা সলতানিয়তে তোমার চেয়ে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান আর কেউ নাই বলে তুমি আমার পরমর্শদাতা—উজির। কিন্তু আজ তুমি সামান্য এক নাপিতের কাছে হেরে গেলে?

উজির বলে, আমার চাইতে যে বিচক্ষণ—তার কাছে নতি স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জা নাই, জাঁহাপনা।

সুলতান হাসতে হাসতে বলে, এরজন্যে দশ হাজার দিনার জরিমানা হলো তোমার। টাকাটা পাবে আবু শাইর। আর যাবে আমার খাজাঞ্জিখানা থেকে। খাজাঞ্জিকে হুকুম দিয়ে দিও।

সবাই আমোদে হাসতে থাকে।

পর পর তিনদিন সাধারণের জন্য বিনামূল্যে হামামের দরজা উন্মুক্ত করে দিলো আবু শাইর। লোকে আসুক, দেখুক—হামাম ঘর কী বস্তু। তারপর তারাই পাঁচজনের মধ্যে প্রচার করবে এর গুণগান।

আবু শাইর-এর এই চালে কয়েকদিনের মধ্যেই সারা শহরের সমস্ত মানুষ জেনে গেলো হামামের মহিমা। যারা গোসল করে গেলো, তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আত্মীয়-স্বজন ইয়ার-বন্ধুদের পাঠাতে থাকলো। ফলে, প্রতিদিন সকাল থেকেই হামামের সামনে বিরাট ভিড় জমতে লাগলো। আবু শাইর বললো, সবাই সমান সুযোগ পাবেন। আপনারা মেহেরবানী করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান।

বাঁধাধরা পয়সা দেবার কোনও ব্যাপার না থাকায় যার যা খুশি ইনাম দিয়ে যেতে

লাগলো। এতে গরীব লোকরা যেমন অল্প পয়সায় আরাম আনন্দ পেতে থাকলো, বড়লোকরা তেমনি খুশি হয়ে আবু-শাইর-এর ঝুলি ভরে দিয়ে যেতে লাগলো। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আবু শাইর শহরের এক সেরা ধনী হয়ে উঠলো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

চারশো ছিয়ানব্বইতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

শহরের উজির আমির সম্ভ্রান্ত সওদাগররা সকলেই হামামের নিয়মিত খদ্দের। তারা যতবারই গোসল করতে আসে আবু শাইরকে একশোটা সোনার মোহর একটি ফর্সা এবং একটি হাবসী বান্দা উপহার দিয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে একটি করে বাঁদীও দিয়ে যায় তারা। কয়েক দিনের মধ্যে আবু শাইর পেলো চল্লিশটা ফর্সা, চল্লিশটা হাবসী বান্দা আর চল্লিশটা বাঁদী। এছাড়া সুলতান তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা, দশটা ফর্সা ছোকরা, দশটা হাবসী ছোকরা বান্দা, আর দশটা চাঁদের মতো সুন্দরী বাঁদী পাঠালো।

আবু শাইর সুলতানের কাছে গিয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আপনি মেহেরবান শাহেনশাহ। আপনার অসীম কৃপায় আজ আমার অনেক হয়েছে। কিন্তু জাঁহাপনা, আমি এই বান্দা আর বাঁদীর বাহিনী নিয়ে কী করবো! গরীব মানুষ, খেটে খাই, এতোগুলো লোককে বসে বসে খাওয়ানোর সামর্থ্য নাই আমার। সামর্থ্য থাকলেও প্রয়োজন নাই। আমি তো আর লড়াই করতে যাবো না করো সঙ্গে! আপনি ওদের ফেরত নিয়ে নিন, এই আমার আর্জি।

সুলতান বললো, এ সবই তো সম্পত্তি। যার ঘরে যত দাসদাসী বান্দা নফর থাকে, তাকেই আমরা তত বিত্তবান মনে করি। তোমার কাছে যদি এসব বোঝা বলে মনে হয়, কিছু চিন্তা করো না, যখন তুমি দেশে ফিরে যাবে, আমাকে সব দিয়ে যেও। আমি ন্যায্য দামে কিনে নেবো ওদের।

আবু শাইর বলে, দামের কোনও কথা ওঠে না, জাঁহাপনা। আমি ওদের আপনার প্রাসাদে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার ওসব ঝামেলা সহ্য করার অভ্যাস নাই।

সুলতান হাসলেন, তা ঠিক। তুমি সদাশয় নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চাও। বেশ ওদের পাঠিয়ে দাও। আমি প্রত্যেকটির জন্য একশো দিনার দাম দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

আবু শাইর স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি হুজুর।

সুলতান খাজাঞ্চীকে ডেকে বলে দিলো, একশো দিনার হিসাবে একশো পঞ্চাশটা বান্দা বাঁদীর দাম দিয়ে দাও আবু শাইরকে।

আবু শাইর দু'হাতে পয়সা লুঠতে থাকলো। এতো পয়সা সে কী করবে? মোহরগুলো বস্তাবন্দী করে একটা ঘরে পরপর সাজিয়ে রাখতে লাগলো। কিছুকালের মধ্যে এতো বস্তা জমে উঠলো যে, ঘরে আর রাখার জায়গা হয় না।

হামামের প্রবেশ দ্বারের এক পাশে বিরাট একটা বাক্স। গোসল শেষে যে যা ইচ্ছা করে সেই বাক্সে ফেলে দিয়ে চলে যায়। আবু শাইর রাত্রি বেলায়, হামামের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো, বাক্সটা খুলে দেখে, দিরহামে একেবারে ভর্তি। এইভাবে প্রতিদিন পয়সার পাহাড় জমতেই থাকে। আবু শাইর ভেবে পায় না, এতো অর্থ নিয়ে সে কী করবে?

সুলতান, বেগম, উজির আমিররা নিয়ম করে প্রতিসপ্তাহে একদিন হামাম ঘরে আসে। প্রতিবারই মোটা দক্ষিণা পায় আবু শাইর।

এতো অর্থ, এতো বাদশাহী খাতির, কিন্তু আবু শাইর-এর কোনও অহঙ্কার নাই। আগেও যেমন ছিলো, এখনও সে তেমনি সদাশয় পরোপকারী। চালে-চলনে, পোশাকে-আশাকে এমনকি খানা-পিনাতেও সে অনাড়ম্বর একেবারে সাদাসিধে মানুষ। কোথাও কোনও

পরিবর্তন হয়নি। অভুক্ত মানুষ দেখলে এখনও তাঁর মন কাঁদে। পরের উপকারে আসতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে সে। এখনও সে আগের মতোই গল্পবাজ, আড্ডা-প্রিয়, সদা উচ্ছল প্রাণবন্ত মানুষ। তার এই দিল দরিয়া ব্যবহারের জন্য একবার সে কী ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিলো সে কাহিনী পরে শোনাচ্ছি। শুধু এইটুকু এখন শুনে রাখুন, একদিন এক জাহাজোর কাপ্তান এসেছিলো তার হামামে। ঘটনা চক্রে তার কাছে কোনও পয়সা কড়ি ছিলো না। আবু শাইর তাকে, কোনও রকম পয়সার তোয়াক্কা না করে, খুব যত্ন করে ঘষে মেজে গোসল করিয়ে দিয়েছিলো। কাপ্তান খুব খুশি হয়ে চলে গিয়েছিলো সেদিন। বলে গিয়েছিলো, আল্লাহ যদি কখনও সুযোগ করে দেয়, আমি তোমার এই সদ্ব্যবহারের প্রতিদান দেবো, শেখ। সারা জীবন আমি তোমাকে মনে রাখবো।

আপনারা এর পরের কাহিনী পরে শুনবেন। এখন পরম বন্ধু আবু কাইর-এর কথা শুনুন:

সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে হামামের প্রশংসা। আবু কাইর একদিন এলো গোসল করতে। শহরের সব বিত্তবানরাই গোসল করে যায়। তারা কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে, হামামে সে গোসল করেছে কিনা। আবু কাইর সময় পাই নি, পরে যাবো' বলে বলে এড়িয়ে আসছিলো। কিন্তু আর চুপ করে থাকা যায় না। যায় যাবে শ'খানেক দিনার, তবু তাকে হামামে যেতেই হবে। নইলে সমাজে ইজ্জৎ থাকে না। তাই আজ এসেছে সে গোসল করতে।

পরনে জমকালো বাদশাহী সাজ। বাহারী জীন লাগামে খচ্চরটাকে সাজিয়ে তার পিঠে চেপে এসেছে আবু কাইর। সামনে পিছনে বান্দাদের এক বাহিনী। সারা পথ তারা সেলাম ঠুকতে ঠুকতে আবু কাইরকে তোয়াজ করতে করতে নিয়ে এসেছে।

হামামের দরজার সামনে পৌঁছতেই এক সুন্দর সুবাস ভেসে আসে তার নাকে। চন্দনের গন্ধ। আবু কাইর লক্ষ্য করে, দলে দলে লোক ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। কিন্তু কোনও হুড়োহুড়ি বিশৃঙ্খলা নাই। একজনের পাশে এসে আর একজন বসে অপেক্ষা করছে। একের পর এক সবাই গোসল করার সুযোগ পাবে। গরীব বড়লোক কোনও ভেদাভেদ নাই। সকলের সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ।

বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করতেই আবু কাইর দেখতে পেলো, একধারে একটা কুর্শিতে বসে আছে তার পুরনো দোস্ত আবু শাইর। মুখে তার সহজাত মিস্টি হাসি। আবু কাইর বিশ্বাস করতে পারে না, এই সেই আবু শাইর। রোগা হাড় জির জিরে চেহারা ছিলো তার, কিন্তু এখন সে দিব্যি নাদুস নুদুস হয়ে উঠেছে। আপেলের মতো সুন্দর গালে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু দেহের চেকনাই-এ খোলতাই হয়ে গেছে তার রূপ।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলো তারপর দারুণ উচ্ছ্বাসের ভান করে সে এগিয়ে এলো আবু শাইর-এর দিকে।

—আরে—আরে—তুমি? আবু শাইর—? এখনও বেঁচে আছো? আচ্ছা লোক যাহোক, তোমার এই অপদার্থ বন্ধুটি বেঁচে রইলো কি মরে গেলো, একবার খোঁজও নিলে না। একেইবলে আজব দুনিয়া—না? তুমি হয়তো বলবে, এতো বড় শহর, কোথায় আমার খোঁজ করবে? কিন্তু সে কথা কি ঠিক? সারা শহরের প্রতিটি মানুষ আজ আবু কাইর-এর নাম জানে। আমি এখন সুলতানের রজক। এ দেশে রঙের বন্যা এনে দিয়েছি। এখানকার মানুষ আগে সাদা আর নীল ছাড়া অন্য কোনও রঙের ব্যবহার জানতো না। কিন্তু আমি তাদের নানা রঙে রাঙিয়ে তুলেছি। তারাও আমাকে মাথায় করে রেখেছে। আজ শুধু আমার পয়সাই হয়নি, নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তিতে আজ আমার জুড়ি নাই। কোনও উৎসব অনুষ্ঠান আমাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। সুলতানের দরবারে একমাত্র আমারই অবাধ গতি। আমি যখন তখন তার সঙ্গে

দেখা করতে পারি। কেউ কোনও টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। এমন কি স্বয়ং উজিরও আমার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপে। আমার ইচ্ছায় সুলতানকে দিয়ে করতে না পারি এমন কোনও কাজ নাই।

আমার যখন সুদিন ফিরলো, বিশ্বাস কর দোস্ত, সব আগে তোমার কথাই আমার মনে হয়েছিলো। চার দিকে চর পাঠালাম। সারা শহরের গলিঘুচি, সরাইখানা মুসাফিরখানা-সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে তারা। কিন্তু কেউই তোমার কোনও সন্ধান দিতে পারে নি।

আবু শাইর হাসে, অবিশ্বাসের হাসি। বলে, কিন্তু বন্ধু আমি তো তোমার দোকানের দরজায় গিয়েছিলাম। সেদিন তুমি আমাকে যে ভাবে আদর অভ্যর্থনা করেছিলে, তা তো ভুলবার নয়।

—কী যা তা বলছো, দোস্ত। তুমি আমার দোকানে কবে গিয়েছিলে?

সে খুব বেশি দিনের কথা নয়। এই হামাম ঘর তৈরি হওয়ার কিছুদিন আগে। দুটি মাস আমি বিমারে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ঐ সরাইখানার মালিক না থাকলে মরেই যেতাম। তোমার ঠিকানা পেতেও বেগ পেতে হলো না। কিন্তু ঠিকানা না পেলেই বুঝি ভালো হতো—

আবু শাইর-এর চোখ জলে ভরে আসে। —সেদিন সবে আমি পথ্য করেছি। গায়ে এক ফোঁটা বল নাই, কোনও রকমে পথে পা ফেলে চলতে পারি, সেই রোগ-জর্জর অবস্থায় সেদিন তুমি আমাকে চুরির অপবাদ দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলে আবু কাইর। কী, ভুলে গেছ?

আবু কাইর যেন আকাশ থেকে পড়ে।—কীর যা তা বলছো ভাই?

—যা তা নয় আবু কাইর, বুকে বড় ব্যথা নিয়ে বলছি এসব কথা। সেদিন তুমি আমার ওপর তোমার হাবসী বান্দা লেলিয়ে দিয়েছিলে বন্ধু!

—অসম্ভব। তুমি আমার দোকানে গেছ, আর আমি চিনতে পারবো না?

—কেন চিনতে পারবে না ভাই? তুমি আমাকে, অসুখে যত ক্ষীণ কৃশকায়ই হয়ে থাকি, দেখামাত্র চিনেছিলে।

—বিশ্বাস করো, আবু কাইর মিথ্যা অনুতাপের ভান করে বলতে থাকে, আমি চিনতে পারিনি। কত চোর ছ্যাঁচোড় দোকানের সামনে থেকে কাপড়-চোপড় চুরি করে সরে পড়ে তুমি জান না। সেই কারণে আমার লোকজনকে বলা আছে, ভিখিরি টিখিরি জাতের কোনও লোককে দোকানের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না। ওরাই বেশি চোর হয়। তা তোমার তো তখন খুব দৈন্যদশা। হয়তো ওরা ভুলটুল করে থাকবে। তুমি কিছু মনে করো না, ভাই।

আবু শাইর কঠিন কণ্ঠে বলে, না, ভুল কেউ করেনি। তোমার বান্দারাও করেনি তুমিও করোনি। তুমি জেনে শুনেই তোমার লোককে হুকুম দিয়েছিলে আমার ওপর চড়াও হতে। তোমার আশঙ্কা হয়েছিলো, আমি তোমার লাভের ব্যবসায় ভাগ বসাতে চাইবো। তাই সেই মুহূর্তেই পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে বেতের চাবুক নিয়ে ছুটে এসেছিলে তুমি। এই দ্যাখো, এখনও কোন দাগই মিলায়নি, কি নির্মমভাবে তুমি আমাকে সেদিন প্রহার করেছিলে, ভাই। কী করে হাত উঠেছিলো তোমার?

আবু কাইর একমুহূর্ত কোনও কথা বলতে পারে না। দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে, ইস এতোবড় ভুল আমি করেছি, দোস্ত। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কী করে—

আবু শাইর-এর বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না, লোকটা এখনও তাকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে।

—যাক ভাই , ওসব কথা। যা গেছে তা গেছে। ওনিয়ে আর আমার কোনও ক্ষোভ নাই। হ্যাঁ চলো, গোসল করবে তো?

আবু কাইরকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায় আবু শাইর।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চারশো আটানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আবু কাইর জিজ্ঞেস করে তোমার এই ভাগ্য পরিবর্তন কবে হলো? কী ভাবে হলো?

আবু শাইর বলে, আল্লাহ যখন যাকে দেয়, ছপ্পর ফুঁড়েই দেয়। কোনও কারণ থাকে না তার।

এরপর সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী খুলে বললো তাকে। আবু কাইর মনের জ্বালা চেপে মুখে খুশির বন্যা ভাসিয়ে বলে, সুলতান যে তোমার উপর সদয় হয়েছেন এতে আমার চেয়ে আর কেউই এতো খুশি হতে পারবে না দোস্ত। আমি সুলতানকে তোমার গুণের কথা শোনাবো। বলবো, তুমি আমার শুধু স্বদেশবাসীই নয়, একেবারে জীগরী দোস্ত। দেখো, তাতে তিনি তোমাকে আরও সুনজরে দেখবেন।

আবু শাইর বলে, আমি কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ওপরেই ভরসা রাখি, ভাই। আজ আমার যা কিছু ধন-দৌলত, সে সবই তাঁর কৃপায়। আমি বিশ্বাস করি, তিনি কেড়ে নিতে চাইলে, স্বয়ং বাদশাহও আমাকে সুখে রাখতে পারবেন না। আর তিনি যদি দরাজ হাতে আমাকে দিতে চান, সাধ্য নাই কারো আমার সুখ সম্পদ কেড়ে নিতে পারে। সুতরাং ওসব কথা থাক। সবই নসীবের লেখা। কেউ তা এড়াতে পারবে না।

আবু কাইরকে নিরাবরণ করে তোয়ালে জড়িয়ে সে গোসলখানায় নিয়ে যায়। নিজে হাতে তাকে সাবান ছোবড়া দিয়ে ঘষেমেজে সাফ করে গোসল করায়। তারপর প্রসাধন কামরায় নিয়ে এসে সাজ-পোশাক পরিয়ে দামী সরবৎ খেতে দেয়।

সাধারণ মানুষ দেখলো সুলতানের পেয়ারের রজককে হামামের মালিক স্বয়ং তোয়াজ করে গোসল করাচ্ছে। একমাত্র সুলতান ছাড়া, দ্বিতীয় কোনও মানুষকে সে নিজে হাতে কখনও গোসল করায় না।

আবু কাইর যাবার সময় আবু শাইরকে একটা মোহরের তোড়া দিতে যায়। আবু শাইর গ্রহণ করে না, তোমার একটুও লজ্জা হলো না আবু কাইর। তোমার আমার সম্পর্ক কি পয়সার? সামান্য এই পয়সা দিয়ে আমাদের বন্ধুত্বে ইতি করতে চাও?

—না ভাই তা কেন চাইবো। তোমার আমার বন্ধুত্ব চির-জীবনের। যাক ওসব কথা, তোমার হামামের সব ব্যবস্থাই চমৎকার। শুধু একটি খুঁৎ চোখে পড়লো।

—কী বলো?

—তোমার খদ্দেরদের চুল দাড়ি কামাবার সময় নরম কাই লাগিয়ে নাও না কেন? তাতে যেমন মোলায়েম করে কামানো যায়, তেমনি আরও আরাম পেতে পারে মানুষ। আমি তোমাকে এই কাই তৈরি করার কায়দা-কানুন সব বলে দিতে পারি।

—বাঃ চমৎকার বলেছো তো। আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু এদেশে শখের জিনিস বড় একটা পাওয়া যায় না। তা বানাবার মাল-মসলা আর কায়দা যদি বাৎলে দাও; আমি বানিয়ে নেবো!

আবু কাইর বলে, তুমি বাজার থেকে হলদে রঙের শেঁকো বিষ আর কড়া চুন কিনে আনবে। একটু তেলের সঙ্গে এই দু'টো খুব ভালো করে মেড়ে নেবে। তারপর দেবে খানিকটা আতর। তাহলে বদ গন্ধটা কেটে যাবে। তৈরি হয়ে গেলে মাটির ভাঁড়ে ভরে রাখবে। এসব বিশেষ ধরনের প্রসাধন সাধারণ মানুষের জন্য নয়, যখন সুলতান আসবেন গোসল করতে শুধু তারই মুখে মাথায় মাখিয়ে কামাবে। দেখবে, তিনি কত খুশি হন। তোমাকে একেবারে মাথায় করে রাখবেন।

আবু শাইর একখানা কাগজে সব লিখে রাখলো, আমি আজই তৈরি করে রাখছি। সুলতান প্রত্যেক জুম্মাবারে আমার হামামে আসেন চুল দাড়ি কামিয়ে গোসল করতে।

আবু কাইর আর দাঁড়ালো না। হামাম থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলো সুলতানের দরবারে।

—কী সংবাদ রজক-প্রবর? এসো, এসো—

সুলতান স্বাগত জানায় আবু কাইরকে। আবু কাইর বলে জাঁহাপনা বড়ই দুঃসংবাদ।

—সে কী? কী ব্যাপার?

—আপনার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

সুলতান এবং দরবারের সকলে এক সঙ্গে আঁৎকে ওঠে, সে কী?

আবু কাইর মুখে কপট গাম্ভীর্য টেনে বলে, হ্যাঁ, হুজুর, আমার খবর মিথ্যা নয়। আপনাকে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, ভুলেও আর কখনও আপনি ঐ হামামে গোসল করতে যাবেন না।

—কেন? কেন?

—আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছে। আপনার দেহে শেঁকো বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে আপনাকে খতম করবে আবু শাইর। ঐ মারাত্মক বিষ কড়া চুন দিয়ে সে কাই তৈরি করে রেখেছে। আপনি গেলেই আপনার মাথায় মুখে মাখিয়ে চুল দাড়ি কামিয়ে দেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন আপনার মুখ মাথা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। সে আপনাকে বলবে, ঐ মারাত্মক কাই আপনার তলপেটের নিচে লাগাতে। ওটা লাগালে ক্ষুর কাঁচির দরকার হয় না। এমনিতেই চুল খুলে সাফ হয়ে যাবে। আপনি হুজুর, ঐ শয়তানের কারসাজীতে ভুলবেন না। যেখানে লাগবে পুড়ে দগদগে ঘা হয়ে যাবে।

সুলতান তাজ্জব হয়ে যায় আবু কাইর-এর কথা শুনে।

—কিন্তু আমাকে সে মারবে কেন, কী ফায়দা?

—লোকটা আসলে খ্রীস্টান সম্রাটের গুপ্তচর। ছদ্মবেশ ধরে এসেছে এখানে, আপনাকে মারতে পারলে সে অনেক ইনাম পাবে তাদের কাছ থেকে।

সুলতান ঘাড় নাড়েন, হুঁ। বুঝলাম। দুনিয়াতে মানুষ চেনা ভার। কে যে কী উদ্দেশ্য নিয়ে চলা ফেরা করে—বোঝা দায়।

আবু কাইর চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা দেখিয়ে বলে, এই খবর শোনা ইস্তক আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে জাঁহাপনা। আমি সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। যদি আপনি আজই চলে যান হামামে—

সুলতান দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় এখনই বুঝি কে যেন তার সারা অঙ্গে বিষ ঢেলে দিয়েছে।

—ঠিক আছে, এসব নিয়ে আর বেশি আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখন সবাই চুপচাপ থাক, আমি উজিরকে নিয়ে আজই হামামে যাবো। দেখবো কী ব্যাপার?

উজিরকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান হামামে আসে। আবু শাইর পুলকিত হয়। দু'জনকে নিয়ে পাশের ঘরে যায়। প্রথমে সুলতান এবং পরে উজিরের সারা দেহ দলাই মলাই করতে থাকে।

এক সময় আবু শাইর বলে, জাঁহাপনা, চুল সাফ করার আমি এক রকম কাই তৈরি করেছি। ওতে আর ক্ষুরের দরকার হয় না। শুধু লাগিয়ে দিলেই হলো। ব্যাস্, সব চুল পলকে উঠে সাফ হয়ে যাবে।

সুলতান গম্ভীরভাবে বলে, আগে উজিরের তলপেটে লাগাও দেখি। ওর তো সারা শরীরে ভালুকের মতো লোম।

মাটির ভাঁড় থেকে খানিকটা কাই নিয়ে আবু শাইর উজিরের তলপেটে লাগিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে উজির। সুলতান বুঝতে পারে, আবু কাইর মিথ্যে বলেনি, মারাত্মক বিষই বটে। গর্জে ওঠে সুলতান। সঙ্গে সঙ্গে হামামের হাবসী ক্রীতদাসেরা এসে হাজির হয়।

—এই খুনীটাকে বাঁধো।

আবু শাইরকে পিঠমোড়া করে বেঁধে প্রাসাদে নিয়ে আসা হয়। সুলতান বন্দরের কাপ্তানকে ডেকে বলে, এই বিশ্বাসঘাতকটাকে একটা চুনের বস্তায় পুরে দরিয়ার জলে ছুঁড়ে দাও। আমি আমার প্রাসাদের জানালা দিয়ে স্বচক্ষে দেখতে চাই, লোকটা, কেমন করে ডুবে মরে।

কাপ্তান কুর্নিশ জানিয়ে বললো, জো হুকুম জাঁহাপনা।

আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে একদিন আবু শাইর তার হামামে এক কাপ্তানকে বিনা মূল্যে খুব আদর যত্ন করে গোসল করিয়েছিলো। এই কাপ্তানই সেই ব্যক্তি।

কাপ্তান প্রহরীদের বললো, বন্দীকে আমার বন্দরে নিয়ে এসো।

বন্দর থেকে সুলতানের প্রাসাদ বেশি দূরের পথ নয়। কাপ্তান একখান ছোট্ট ডিঙিতে আবু শাইরকে তুলে দাঁড় বাইতে বাইতে অদূরে একটা ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে ভেড়ে।

—আমাকে চিনতে পারে শেখ?

কাপ্তান প্রশ্ন করে! আবু শাইর এতক্ষণ তার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করেনি। নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভেবে ভেবেই সে সারা। কাপ্তানের কথায় চোখ মেলে তাকাল সে। তাই তো, সেই কাপ্তানই, বটে, একে সে একদিন গোসল করিয়েছিলো।

কাপ্তান বললে, তোমার সেদিনের ব্যবহার আমি কোনও দিন ভুলতে পারবো না শেখ। তোমার মতো সদাশয় মানুষ, এই জঘন্য কাজ কী করে করতে পারলো?

আবু শাইর-এর চোখে জল আসে।—বিশ্বাস করুন, কাপ্তান সাহেব, আমার মধ্যে কোনও ঘোর প্যাঁচ নাই। আমি সরল সাদা-সিধে মানুষ—সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করি, আপন করে নিতে চাই। আমরা বন্ধু আবু কাইর চুল কামাবার কাঁই একটা বানাবার মতলব দিয়ে গিয়েছিলো। তার কথামতো মালমশলা কিনে এনে বানালাম সেই কাঁই। তখন কি জানি, বন্ধু আমার প্রাণনাশের ফাঁদ ধরিয়ে দিয়ে গেলো আমার হাতে।

কাপ্তান বললো, অধর্মের জয় কোনও দিনই হয় না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো, তোমার কাজের সুফল তুমি পাবেই, শেখ। সুলতান এখন ক্রুদ্ধ। তাকে কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা। সময় আসতে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। দিন কয়েক তুমি এই দ্বীপেই থাকো। তারপর আমি তোমার বিধি-ব্যবস্থা করে দেবো। এবার আমি যাচ্ছি, সুলতান তোমাকে দরিয়ার পানিতে ডুবিয়ে মারার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখবেন বলে তাঁর প্রাসাদের বাতায়ন-পাশে বসে আছেন।

আবু শাইর বলে, কিন্তু আমি তো রইলাম এখানে! কী ভাবে তাঁকে দেখাবেন।

কাপ্তান হাসে, এই যে বস্তাখানা দেখছো, তোমাকে এতে ভরে পানিতে ফেলে দেবার কথা ছিলো। এই বস্তায় আমি বালি আর পাথরের চাঁই ভরে নিচ্ছি। ডিঙি বেয়ে প্রাসাদের সামনে গিয়ে সুলতানের চোখের সামনে ঝুপ করে ফেলে দেবো—বুঝতেও পারবেন না তিনি।

আবু শাইর-এর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। —আমার জন্যে আপনি এতো ঝক্কি নেবেন—যদি কোনওক্রমে ধরা পড়ে যান!

কাপ্তান বলে, যদি ধরা পড়ে যাই? যাই যাবো। তবু এই ভেবে মরতে পারবো এক সহৃদয় নিরপরাধ মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রাণ দিচ্ছি।

দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আবু শাইর-এর দু-গাল বেয়ে।

একটুক্ষণ পরেই কাপ্তান ডিঙি বেয়ে প্রাসাদের পিছনে এসে হাজির হয়। বাতায়নে বসে আছে সুলতান—পাশে পারিষদরা। কাপ্তান বালি আর পাথর ভর্তি বস্তাটা গড়াতে গড়াতে ডিঙির ধারে নিয়ে আসে। সুলতান জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ইশারা করতেই সে ঠেলে ফেলে দেয় সমুদ্রের জলে।

সুলতান হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে দেখে তার অনামিকা থেকে মহামূল্যবান আংটিটা খসে পড়ে গেছে দরিয়ার অগাধ জলে। এই আংটিটা ছিলো দৈবশক্তি সম্পন্ন। সুলতান এবং তাবৎ প্রজাদেরও বিশ্বাস সুলতান ঐ আংটির বলেই বলীয়ান। যতক্ষণ তাঁর কাছে ঐ অলৌকিক আংটি থাকবে ততক্ষণ দেশের বা বিদেশের কোনও শত্রু তাঁর কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। প্রজারা একান্ত বশংবদ হয়ে থাকবে।

সুলতান দিশাহারা হয়ে পড়ে। এ কী হলো? এখন সে কী করবে। একথা জানাজানি হয়ে গেলে তার প্রজারা আর পরোয়া করবে না তাকে। সারা সলতানিয়াতে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। ক্ষমতালোভী উজির সেনাপতিরা তাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করে বসতে পারে। সুতরাং কাউকে কিচ্ছু না বলাই সঙ্গত মনে করলো সে। কিন্তু মনে মনে দুর্বল, অসহায় বোধ করতে থাকলো। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যেতে লাগলো। সমুদ্রের পানি শোষণ করা তো সম্ভব নয়, সুতরাং তার সমস্ত শক্তির উৎস সে-আংটিও আর উদ্ধার হবে না কোনও দিন। সুলতান বিষণ্ন বদনে শয্যাকক্ষে প্রবেশ করলো। সকলে ভাবলো, হাজার হলেও সুলতানের দয়ার শরীর, আবু শাইরকে প্রাণদণ্ড দিয়ে অন্তরে আঘাত পেয়েছেন খুব।

সেই জন-মানব শূন্য নির্জন দ্বীপে আবু শাইর একা একা দিন কাটাতে থাকে। কাপ্তান তাকে কিছু খাবার-দাবার আর একখানা মাছ ধরার জাল দিয়ে গিয়েছিলো। সারাদিন সে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়ায়। কখনও ইচ্ছে হলে জাল ফেলে। ছোট বড় কত না জানা মাছ ওঠে। আবু শাইর নিজের খাবার মতো রেখে বাকীগুলো জলে ছেড়ে দেয়। কী হবে শুধু শুধু মাছগুলোকে মেরে।

সেদিনও সে খেলাচ্ছলেই জাল ফেলেছিলো। কিন্তু টেনে আর তুলতে পারে না। পেল্লায় ভারি। কোনও রকমে কিনারে ওঠাতে দেখলো, বিরাট একটা মাছ জালে জড়িয়ে পড়েছে। অনেক দিন এতো বড় মাছ সে চোখে দেখেনি। আবু শাইর ভাবলো, আজ আর অন্য কিছু না, এই মাছেরই ফলার করবে সে। ছুরি দিয়ে কেটে ফেলতেই পেটের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে কী যেন ঝক-মক করে উঠলো। আবু শাইর কৌতূহলী হয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে, পাথর বসানো একটা আংটি। নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেও সে কিছু বুঝতে পারলো না, পাথরটা কী? যাই হোক ডান হাতের মাঝের আঙ্গুলে পরে নিলো সে। ভাবলো কাপ্তান এলে তাকে দেখাবে, হয়তো সে চিনলেও চিনতে পারে!

কিছুক্ষণ বাদে বন্দর থেকে একখানা ডিঙি ভাসিয়ে কাপ্তানের দুই অনুচর এসে হাজির হলো আবু শাইর-এর কাছে।

আবু শাইর জিজ্ঞেস করে, কাকে চাই?

ছেলে দুটি বলে, আমাদের কাপ্তান সাহেব সেই সক্কালবেলা বেরিয়ে গেছেন! এখন পর্যন্ত ফেরেননি। তিনি আমাদের মাছ ধরতে বলে গেছেন। রোজ সুলতানের প্রাসাদে মাছ পাঠাতে হয় কিনা। কিন্তু আজ কী বরাত, সারা সকাল ধরে জাল ফেলে একটা মাছ তুলতে পারলাম না। এখন কী হবে। মাছ না পাঠাতে পারলে গর্দান যাবে যে—

আবু শাইর বললো, অনেক সকালে কাপ্তান সাহেব একবার এদিকে এসেছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকেননি। তারপর এইদিকে চলে গেছেন।

আবু শাইর ডান হাতটা ছেলে দু'টোর মাথার ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে নির্দেশ

করে দেখায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে এক তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেলো। হাতটা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দু'টোর ধড় থেকে মাথা দু'টো উড়ে গেলো, আর ধড় দু'খানা পাক খেয়ে গড়িয়ে পড়লো নিচে।

আবু শাইর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এ কি হলো? কী করে হলো—কিছুই অনুমান করতে পারে না সে। মনে হলো, তাকে ঘিরে ধরেছে বুঝি এক ঝাঁক জীন। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। নিজেকে আর সে ধরে রাখতে পারলো না। লুটিয়ে পড়ে গেলো বালির ওপর। তারপর আর কিছু মনে নাই।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। কাপ্তান তার অনুচরদের খুঁজতে খুঁজতে সেই দ্বীপে এসে ডিঙ্গি ভেড়ায়। কিন্তু একি কাণ্ড, ছেলে দু'টো ছিন্নমুণ্ডু অবস্থায় ছিটকে পড়ে আছে। আর আবু শাইর বালির ওপরে অসাড়ে নিদ্রামগ্ন। তার হাতের আংটিটার দ্যুতি এসে বিঁধলো কাপ্তানের চোখে। সর্বনাশ এই আংটি তো সুলতানের। অলৌকিক ক্ষমতায় ছেলে দু'টোর জীবনান্ত ঘটেছে।

এমন সময় আবু শাইর আড়ামোড়া ভেঙ্গে পাশ ফেরে। কাপ্তান চমকে ওঠে। আবু শাইর যদি ঘুম ভেঙ্গে উঠে তার দিকে কোন ভাবে হাত বাড়ায়, তা হলে তারও দশা ঐ ছোকরা দু'টোর মতোই হবে। সে চিৎকার করে ওঠে, আবু-শাইর—তোমার ডান হাতটা গুটিয়ে রাখো, আমার দিকে বাড়িও না, ভাই। তা হলে নির্ঘাৎ আমার মৃত্যু হবে।

আবু শাইর ধড়মড় করে উঠে বসে। ডান হাতখানা পিছনের দিকে করে রাখে। প্রশ্ন করে, কিন্তু কেন কী ব্যাপার, কাপ্তান সাহেব?

—তার আগে বলো, তোমার হাতের ঐ আংটি তুমি পেলে কোথায়? ওটা সুলতানের হাতের অলোকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন দৈব আংটি। ঐ আংটির দৌলতেই তিনি অসীম শক্তিধর। কিন্তু যেভাবেই হোক, ঐ আংটি তাঁর হাতছাড়া হয়েছে। সুতরাং এখন তিনি আমার মতোই সাধারণ একজন মানুষ মাত্র। তিনি যে বলে বলীয়ান ছিলেন সে শক্তি আজ তোমার করায়ত্ত! তুমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেকটি মানুষকে তোমার গোলাম বানিয়ে রাখতো পারে। এমন কি সুলতানকেও। যদি তিনি বেগড়বাই করার চেষ্টা করেন, তোমার এক ইশারাতে তাঁরও মুণ্ডু উড়ে যেতে পারবে। আবু শাইর তোমাকে বলেছিলাম না, সৎপথে থাকলে আল্লাহ তার সহায় হন। চলো, এখানে আত্ম-গোপন করে থাকার আর কোনও প্রয়োজন নাই। চলো, সুলতানের সামনেই যাবো। দেখবে, তিনি তোমার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। না হলে, তার প্রাণ যাবে।

আবু শাইরকে সঙ্গে নিয়ে কাপ্তান সোজা সুলতানের দরবারে চলে আসে। সুলতান তখন উজির. আমির পারিষদ পরিবৃত হয়ে দরবারের কাজে ব্যাপৃত ছিলো। কাপ্তানের সঙ্গে আবু শাইরকে সশরীরে দেখে সুলতান আঁৎকে ওঠে।

—এ্যাঁ; ভূত নাকি?

দরবারের উজির আমির সকলেই অবাক হয়ে আবু শাইরকে দেখতে থাকে। তাইতো, লোকটাকে জলজ্যান্ত দরিয়ার মধ্যে বস্তা-বন্দী করে ফেলে দেওয়া হলো, সে আবার উঠে এলো কী করে? যাদুমন্ত্র জানে নাকি?

সুলতান গর্জে ওঠে, কাপ্তান তুমি বিশ্বাসঘাতক। আমাকে ধোঁকা দিয়েছ, এর কী সাজা তোমার জানা নাই।

—খুব জানা আছে, হুজুর। সুলতানের হুকুম তামিল না করলে গর্দান যায়, কিন্তু গর্দান নেবার তো ক্ষমতা এখন আপনার নাই।

—কী এতো বড় স্পর্ধা।

—অপরাধ নেবেন না, হুজুর। আপনি যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যার বলে আপনার প্রজারা পদানত ছিলো, সে দৈব অঙ্গুরীয় আপনার হাতে আর নাই। ওটা দেখুন, আবু শাইর-এর হাতে।

সুলতান চমকে ওঠে। অজ্ঞাতসারে ডান হাতখানা আড়াল করতে চায়। তার চোখে মুখে সে-এক মৃত্যুর বিহ্বলতা। মুহূর্তের মধ্যে সারা মুখে বড় বড় স্বেদবিন্দু জমে ওঠে। উজির আমিররা এতক্ষণে নজর করলো, সত্যিই সুলতানের অনামিকা রিক্ত। আবু শাইর-এর ডান হাতের দিকে তারা তাকিয়ে দেখতে পেলো, সুলতানের সেই দৈব আংটি জ্বলজ্বল করছে।

সুলতান সিঁটকে যায়। ভাবে তার মৌৎ সামনে হাজির। এক মুহূর্তের মধ্যে তার মুণ্ডু উড়ে যাবে। হঠাৎ সে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আবু শাইরকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমার সঙ্গে যে আচরণ আমি করেছি তার প্রতিশোধ তুমি নেবে বলেই এসেছ। কিন্তু আমি তোমার কাছে প্রাণ-ভিক্ষা চাইছি, আবু শাইর। আমাকে প্রাণে মেরো না। তার বদলে আমি ছেড়ে দিচ্ছি এই মসনদ। তুমি আমার সারা সলতানিয়তের সুলতান হও। শুধু আমার আর্জি, প্রাণে মেরো না আমাকে।

আবু শাইর সেই নিস্তব্ধ দরবার কক্ষের অপর প্রান্তে কাপ্তানের পাশে এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়েছিলো। এবার সে ধীর পদক্ষেপে সুলতানের পাশে এসে দাঁড়ালো। সকলকে চমকিত করে সুলতানের হাতে সে খুলে দিলো সেই আংটি।

—তখত-এর গৌরব আমার প্রয়োজন নাই। সলতানিয়তের লোভে আমি লুব্ধ নই। এই নিন আপনার অলৌকিক অঙ্গুরীয়। আমি অতি সাদাসিধে সাধারণ মানুষ—এই অমিত বিক্রমের অধিকারী আমি হতে চাই না। এ আংটি আমি পেয়েছি একটি মাছের পেটে। কাপ্তান আমাকে বললেন, আংটিটা আপনার। তাই ফেরত দিতে এসেছি। কোনও শর্ত নয় শুধু একটি মাত্র প্রার্থনা আমার, এই কাপ্তান সাহেব আপনার হুকুম অমান্য করে আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, তাকে আপনি কোনও সাজা দেবেন না। আরও একটা কথা, আপনি আমার প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন আমার অপরাধের সূত্র অনুধাবন না করেই। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি আসল অপরাধীকে সনাক্ত করুন। আমার সব কথা শুনলে আপনার কাছে সব পানির মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সুলতান দু-হাতে জড়িয়ে ধরে আবু শাইরকে। দু-চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা।

—আমি সব বুঝেছি আবু শাইর। কোনও এক দুষ্ট-চক্রান্তের শিকার হয়েছিলে তুমি। তোমার মতো সরলপ্রাণ সদাশয় মানুষকে প্রতারণা করতে তো বেশি কসরত করতে হয় না। তুমি সবাইকেই বুক ভরে ভালোবাসা দিতে পারো, বিশ্বাস করতে পারে। আমারই দোষ, আমিই তোমাকে চিনতে পারিনি এতোদিন। আমি ন্যায় বিচার না করে তোমাকে অন্যায়ভাবে সাজা দিয়েছিলাম। কিছু মনে রেখ না, আবু শাইর। আমার হঠকারীতার জন্য আমি অনুতপ্ত। কিন্তু এখন আমার কাছে বলো তো, কে তোমাকে পরামর্শ দিয়েছিলো সেই বিষাক্ত কাই তৈরি করার?

আবু শাইর বলে, সে আমারই স্বদেশবাসী—আবু কাইর। কাইটা যে ঐ রকম মানুষ খুন করা মারাত্মক বস্তু হতে পারে, আপনি বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, আমি জানতাম না।

—আমি সবই এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আবু শাইর। ঐশ্বর্য দেখে আপনজনই সব চাইতে বেশি ঈর্ষাকাতর হয়। আবু কাইর আমাকে এসে বলেছিলো, তুর্কি খ্রীষ্টানদের গুপ্তচর। আমাকে হত্যা করার জন্যেই তারা তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সে নিজেই যে এই শয়তানীর পাণ্ডা তা আমি খতিয়ে দেখিনি তখন।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো একতম রজনীতে আবার বলতে শুরু করে ঃ

আবু শাইর মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে, উফ, লোকটা কী মিথ্যাবাদী শয়তান? আমার জীবনে আমি কখনও কোনও খ্রীষ্টানদেশে যাইনি। আর বলে কি না, আমি তাদের গুপ্তচর। জানেন জাঁহাপনা, এই লোকটাকে আমি দিনের পর দিন মাসের পর মাস খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।

—তাই বলো! এতক্ষণ আমি আসল সূত্রটা ধরতে পারছিলাম না। তুমি তার উপকার না করলে সে তোমার এতো বড় অনিষ্ট কী ক'রে করে?

এর পর আবু শাইর আবু কাইরকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে এখানো আসা, সরাইখানায় ওঠা এবং তাকে জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে তার সঞ্চিত অর্থ নিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া এবং তার দোকানে তাকে অমানুষিক প্রহার করা ইত্যাদি সমস্ত কাহিনী খুলে বললো সুলতানকে।

—আপনি আরও প্রমাণ পাবেন হুজুর, সেই সরাইখানার মালিককে একবার ডেকে পাঠান।

সুলতানের হুকুমে তখনই সরাইখানার মালিককে হাজির করা হলো সেখানে। সে বললো, লোকটা কাফের জাঁহাপনা। আমি দেখেছি দিনের পর দিন সে কুঁড়ের বাদশার মতো ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতো, আর এই আবু শাইর সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে খানাপিনা নিয়ে এসে তাকে খাওয়াতো। তার পুরস্কার সে কী ভাবে দিয়েছিলো শুনুন ঃ আবু শাইর যখন অসুখে পড়লো, বেদম জ্বরে সে যখন অচৈতন্য, তখন তার যা কিছু জমানো পয়সা কড়ি ছিলো সব হাতিয়ে নিয়ে একদিন সে হাওয়া হয়ে গেলো। এর মাস দুই পর আবু শাইর অসুখ থেকে উঠে খুঁজতে খুঁজতে আবু কাইর-এর দোকানে গিয়ে ঢোকে। তাকে দেখামাত্র লোকটা হাবসী বান্দাদের দিয়ে মারায়। তাতেও সে সন্তুষ্ট হয় না, বেতের চাবুক দিয়ে মেরে সারা অঙ্গ চৌচির করে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে যায় বেচারাকে।

সুলতান থামিয়ে দিলো, থাক, আমার সব জানা হয়ে গেছে। এবার দেখ, ওকে কী ভাবে শায়েস্তা করি আমি। এই —কে আছিস, শয়তান ধোপাটাকে পিছ-মোড়া করে বেঁধে নিয়ে আয় আমার সামনে।

সুলতানের আদেশে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলো পেয়াদারা। আবু কাইর তখন তার পালঙ্ক-শয্যায় শুয়ে সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিলো। তার একমাত্র পথের কাঁটা আবু শাইরকে সে চির-জীবনের মতো সরিয়ে দিতে পেরেছে। এখন আর তাপেপক পায় কে!

পেয়াদাগুলো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে তার ঘরে। আবু কাইর তম্বি করে তাড়া করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওরা সে-সুযোগ দিলো না তাকে। রশি দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে ফেললো। আবু কাইর হাতপা ছুঁড়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু হাবসী পেয়াদার বিরানব্বই সিক্কার গোটাকয়েক ঘুষিতেই বাছাধন কঁকিয়ে থেমে গেলো। জামা পাতলুন ছিঁড়ে খুঁড়ে প্রায় আধা উলঙ্গ করে ফেললো তাকে। টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো সুলতানের সামনে।

আবু শাইর তখন বসেছিলো সুলতানের ডান পাশে। সরাইখানার মালিক দাঁড়িয়েছিলো একদিকে। নজর পড়তেই আবু কাইর-এর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দাখিল। আর রক্ষা নাই। সব চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে। এবার নির্ঘাত মৃত্যু। প্রতারণা, বিশ্বাস-ঘাতকতার সাজা এবার তাকে পেতেই হবে।

সুলতান গর্জে ওঠে, তোমার দোস্তকে চিনতে পারছো আবু কাইর? একে তুমি বেত্রাঘাত করেছিলে? এর সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করেছিলে? হাবসী-বান্দাদের দিয়ে পিটিয়েছিলে? এবং একে ফাঁসীর কয়েদী বানাবার চক্রান্ত করেছিলে? ঠিক কিনা? চুপ করে থেকো

না, চটপট জবাব দাও। তুমি চক্রান্ত করলে কী হবে, আল্লাহ যার সহায় আছেন, তার অনিষ্ট কেউ করতে পারে না। তোমার এর চরম প্রতারণার সাজা কী হতে পারে জান? মৃত্যু।

দরবারের সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুলতান জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কী বলো?

সকলে হাত উঠিয়ে জানালো সুলতানের বিচার ন্যায়সঙ্গত।

এরপর সুলতান পেয়াদাদের হুকুম দিলো, লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে সারা শহর ঘোরাবে। তারপর খারের বস্তায় ভরে ওকে দরিয়ার পানিতে ছুঁড়ে দেবে।

দরবারের সকলে সুলতানের বিচারের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। আবু শাইর বলে, জাঁহাপনা, আমি ওকে ক্ষমা করে দিলাম, ওর সম্বন্ধে সব অভিযোগ আমি তুলে নিচ্ছি।

—কিন্তু আমি ভুলে যেতে পারছি না, আবু শাইর। সে শুধু তোমাকে নয় আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সে সাজা তাকে পেতেই হবে।

পেয়াদাদের হুকুম দিলো, যাও নিয়ে যাও।

সুলতানের যথা নির্দেশ মতো আবু কাইরের কোমরে দড়ি বেঁধে সারা শহরে বার-কয়েক ঘোরালো তারা। হাজার হাজার আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যক্ষ করলো, একদিন যার দাপটে সারা শহরবাসীরা থরথর করে কাঁপতো আজ তার কী হাল! একেই বলে নসীবের খেলা।

শহর ঘোরানো শেষ হলে পেয়াদারা আবু কাইরকে একটা চুনের বস্তায় পুরে দরিয়ায় পানিতে ডুবিয়ে দিলো।

সেইদিন পূর্ণ দরবার কক্ষে সুলতান আবু শাইর-এর দু'হাত ধরে বললো আবু শাইর, তোমার কাছে নিজেকে বড় ঋণী এবং অতি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। তোমার যা প্রাণ চায়, চাও আমার কাছে। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। যা চাইবে—তাই দিয়ে আমি ধন্য হবো। চাও, আবু শাইর, যা তোমার ইচ্ছা, চাও আমার কাছে। তোমাকে দু'হাত ভরে দিয়ে আমি নিজের দীনতা কমাতে চাই।

আবু শাইর-এর মুখে অমায়িক হাসি, আমার কিছুই চাই না, জাঁহাপনা। আপনার দৌলতে এই শহরে এসে অনেক অর্থ আমি উপার্জন করেছি। আর বেশি কিছু চাই না। শুধু আমার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিন আপনি। অনেকদিন আমার আপনজনদের দেখিনি। মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সুলতান বললো, তোমার বুদ্ধি বিচক্ষণতার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে তুমি আমার প্রধান উজির হতে পারে। আমার ইচ্ছা, তুমি উজিরের মর্যাদা নিয়ে আমার কাছেই থাক।

আবু শাইর বললো, আপনার আদেশ মাথায় রাখলাম। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিন, জাঁহাপনা। মন আমার দেশে পড়ে রয়েছে, এখন কোনও কাজেই মন বসবে না। আপনি আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। তা হলেই আমি খুব আনন্দ পাবো।

সুলতানের নির্দেশে একখানা জাহাজে দামী দামী সাজ-পোশাক, আসবাবপত্র, সামানপত্র এবং সোনা-দানায় ভর্তি করা হলো। বেছে বেছে সুন্দর সুন্দর দাস দাসী, বান্দা-বাঁদী তুলে দেওয়া হলো সেই জাহাজে। সুলতান বললো, এগুলো আমার উপহার!

আবু শাইরও এনে তুললো তার সঞ্চিত মোহরের বস্তাগুলো। যথাসময়ে জাহাজ ছেড়ে দিলো আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে।

শাহরাজাদ থামলো।

এই হলো আবু কাইর ও আবু শাইর-এর কাহিনী। এরপর আপনাকে শোনাবো আর এক চমকপ্রদ কিস্‌সা। দুই আবদাল্লার এই উপকথা আপনার নেহাত মন্দ লাগবে না।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

কোনও এক সময়ে আবদাল্লা নামে এক জেলে বাস করতো। ন'টি সন্তানের জনক সে। কিন্তু অত্যন্ত গরীব। দিন আনে, দিন খায়—এই রকম দশা। রোজ সকালে সে জাল কাঁধে করে সমুদ্রের পাড়ে যায়। সারাদিন জাল ফেলে। যেদিন বরাতে থাকে মোটামুটি মাছ ওঠে। আর যেদিন নসীব সাধ দেয় না—সেদিন হরিমটর।

লোকটা খানিকটা বেপরোয়া। যেদিন চুনোপুঁটি ধরে, সেদিন সে কোন রকমে পেট ভরানোর মতো রুটি সবজী নিয়ে ঘরে ফেরে। কিন্তু যেদিন রাঘব বোয়াল রুই কাতলা তুলতে পারে সেদিন আর তাকে পায় কে? ভালো ভালো দামী দামী খানাপিনা সাজ-পোশাক কিনে নিয়ে যায়। সব পয়সা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নাই। বিবি হয়তো কখনও বলতে গেছে, ঘরে বাল-বাচ্চা আছে একটু রেখে-ঢেকে খরচ কর। মানুষের সবদিন তো সমান যায় না।

আবদাল্লা সে-সব কথায় কর্ণপাতই করে না, কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। তা বলে আজ কষ্ট করে থাকবো কেন? আর তাছাড়া, জীবন দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

এইভাবে দিন কাটে।

একদিন সকালে আবদাল্লা-বিবি দশম পুত্রের জন্ম দান করলো। আপনারা জেনে রাখুন, আল্লাহর অশেষ করুণায় এর আগের নটিও পুত্রসন্তান।

ঘরে একটা দানাও ছিলো না সেদিন। তবুও আবদাল্লা-গৃহিণী হাস্যমুখে বললো, হ্যাঁগা, নবজাতকের মুখে তো একটু দুধ-মধু দিতে হবে। যাও; জাল নিয়ে বেরোও! আজ দেখো, তোমাকে দু'হাতে ভরে দেবেন তিনি।

আবদাল্লা বলে, আগের নটার বেলাতেও তো সেই আশাই ছিলো, বিবিজান। কিন্তু সবাই হা-ঘরে বরাত নিয়ে জন্মেছে। যাক, যাই দেখি সমুদ্রের ধারে। যদি কিছু জোটে। জান বিবিজান, আমি সব সময়ই আশাবাদী। তবে আশা আমার পূরণ হয় না এই যা-ফারাক—

আবদাল্লা আর দেরি করে না। জালখানা কাঁধে তুলে হন হন করে হেঁটে চলে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছয়তম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু করে সে ঃ

নবজাতকের নাম করে জাল ফেলে আবদাল্লা।

—আল্লাহ তুমি তাকে পাঠিয়েছে। তার জীবন যেন আমার মতো দুঃখের না হয়। তাকে দুধে ভাতে রেখ, এই দোয়া মাঙ্গি।

তারপর ধীরে ধীরে জালখানা টেনে তোলে। কিন্তু হায় রে কপাল, একগাদা মাটি,শামুক আর ঝিনুকের খোলা ছাড়া কিছুই ওঠে না।

আবদাল্লা দুঃখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।

—হায় খোদা, এই কী তোমার বিচার হলো। যাকে পাঠালে তার আহারের কোনও ব্যবস্থা করলে না? কিন্তু এতো হতে পারে না—কখনই হতে পারে না। তাকে কী অনাহারে রাখার জন্য পাঠিয়েছ তুমি?

জালখানা কাঁধে তুলে সে সমুদ্র-সৈকতের অন্য প্রান্তে চলে যায়। আর একবার জাল ফেলে জলে। এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে জালখানা গুটিয়ে তুলতে থাকে! অবশেষে সে ওপরে তুলে দেখলো, একটা গাধা জল খেয়ে পেট ডাঁই করে মরে আছে। আবদাল্লার গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। কোন রকমে ছাড়িয়ে গাধাটাকে ফেলে দিয়ে জালখানা গুটিয়ে সে অন্য দিকে ছোটে। সমুদ্রপাড়ের আর এক দিকে। মনে মনে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে। একমাত্র

আল্লার করুণা ছাড়া কিছুতেই কিছু হয় না। এতো মন্দভাগ্য তার হলো কী করে? এ নির্ঘাৎ তার অপয়া বিবির দোষে। তা না হলে আজকের মতো এমন খারাপ দিন তার আর কখনও আসেনি। এইভাবে যদি প্রতিবারেই মাছের বদলে আবর্জনা উঠতে থাকে তবে এ কারবার বন্ধ করে অন্য ধান্দা দেখতে হবে তাকে। অনেক দিন ধরে সে তার বিবিকে বলছিলো, মাছ ধরার কাজে কোনও নাফা নাই, অন্য কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু বজ্জাত মাগীটার জন্যেই সে এই বে-ফয়দার কাজটা ছাড়তে পারছে না। তার সেই এক কথা, কাজ কোনওটাই খারাপ নয়। আল্লার ওপর ভরসা রেখে চলো, দেখো একদিন না একদিন তিনি মুখ তুলে চাইবেন। কিন্তু এই কী মুখ তুলে চাওয়ার নমুনা?

হতাশায় ক্ষুব্ধ হয়ে সে অনেকক্ষণ সমুদ্র পাড়ে বসে রইলো। আর জাল ফেলেই বা কী হবে। হয়তো আবার কোনও নিষিদ্ধ জন্তু জানোয়ারের গলিত দেহ উঠে আসবে। বেলা পড়ে আসে। আবদাল্লা আর একবার জাল ফেলে জলে। মনে মনে ভাবে এই শেষ। যদি কিছু না ওঠে আর সে এমুখো হবে না কোনও দিন।

—আল্লাহ তোমার প্রাণে যদি এক বিন্দুও মায়া-মমতা থাকে তবে আমার সদ্যজাত সন্তানের মুখে একটু দুধ মধুর ব্যবস্থা করে দাও। আমি না হয় পাতক, অনেক দোষ করেছি, কিন্তু সে তো নিষ্পাপ শিশু। তার কী অপরাধ? সে কেন অভুক্ত থাকবে? তাকে তুমি খেতে দাও—বাঁচাও। আমার বিশ্বাস, সে যখন বড় হবে তোমার নাম গান করবে। আহা শিশুটার কচি মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে এসেছি আমি। সে বড় ভালো ছেলে হবে। সাচ্চা মুসলমান হবে। শুধু তার মুখ চেয়ে অন্তত একটা মাছও আমার জালে দাও, খোদা। সে অন্তত বাঁচুক। আমার রুটিওলার কাছে অনেক ধার জমে গেছে। একটা ছোটখাটো মাছও যেন তাকে দিতে পারি আজ। তার কাছ থেকে রুটি নেব। কিছু নগদ পয়সাও ধার নেব। আহা, আহা, লোকটা বড় ভালো। সেধে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয় আমার সংসারের হাল। মুখ ফুটে বলতে না পারলেও সে সব বুঝতে পারে। রুটি তো দেয়ই, উপরন্তু কিছু নগদ পয়সাও গুঁজে দেয় হাতে। এমন মানুষ আজকের দিনে ক'টা মেলে!

এই সব বলার পর আস্তে আস্তে জালখানা সে টেনে তুলতে থাকে। এবার যেন আরো বেশি ভারি মনে হয়। মনে শঙ্কা জাগে, আবার হয়তো কোনও বাজে মাল জালে জড়িয়েছে। অবশেষে অনেক কষ্টে টেনে তুলতে পারে সে।

আবদাল্লা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, জালের ভিতরে জড়িয়ে আছে একটা মানুষ। হ্যাঁ মানুষই তো। তার হাত পা, নাক মুখ চোখ সবই মনুষ্যাকৃতির। শুধু তার নিম্নাঙ্গটি মাছের মতো! মনে হয়, একটা লম্বা লেজ।

আবদাল্লার বুঝতে কষ্ট হয় না, সেই আজব বস্তুটি আসলে কোন জিন বা আফ্রিদি। হয়তো বহুকাল তামার জালায় বন্দী হয়ে ছিলো। হয়তো সে মহামতি সুলেমান দাউসের কোনও বিদ্রোহী নফর। অপরাধের সাজা দিয়ে এই দরিয়ায় কয়েদ করে রেখেছিলেন তিনি। তারপর কোনও ক্রমে সে সেই জালার মোহর ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছে!

আতঙ্কিত আবদাল্লা সমুদ্রকূল ধরে ছুটে পালাতে থাকে।

—ওরে বাবা রে গেলাম রে, ও বাবা আফ্রিদি, ও বাবা সুলেমানের নফর, আমাকে মেরো না। দয়া কর।

—অরো এদিকে শোনো, ফিরে তাকাও, ও ধীবর ভায়া শোনো, এদিকে এস, তোমার কোনও ভয় নাই। আমি জিন আফ্রিদি বা বাঘ ভালুক—কিছুই না। তোমারই মতো এক মানুষ।

মৎস্যরূপী মানুষটা আবদাল্লাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু আবদাল্লা তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। মৎস্য-মানুষ আবার বলতে থাকে, আমি যদি সত্যিই কোন জিন অফ্রিদি হতাম, তুমি কী আমাকে এই সামান্য জালে আটকে রাখতে পারতে। এতক্ষণে তোমার ঘাড় মটকে ধরতাম না? কোনও ভয় নাই। কাছে এস। এলে তোমার লাভই হবে—এসো।

আবদাল্লা থমকে দাঁড়াল। ভাবে, তাতো ঠিকই। আসলে যদি সে কোনও দৈত্যদানবই হবে, ঐ তুচ্ছ জালের ঘেরোয় সে আবদ্ধ থাকে? এতক্ষণে এসে তার ঘাড় মটকে দিত না?

পায়ে পায়ে আবার সে ফিরে আসে জালের কাছে।

—সত্যিই তুমি কোনও জিন দৈত্য নও?

কোন রকমে আবদাল্লা এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারে। রাত্রির অন্ধকার কেটে যেতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো সাততম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

জালের মানুষ বলে, তোমাকে তো বললাম, না, আমি কোনও দৈত্য-দানব নই। দেখছো না, অমি তোমারই মতো এক মানুষ। তোমারও যেমন হাত আছে মুখ আছে বুক আছে পেট আছে আমারও দ্যাখো সবই আছে, শুধু ফারাক—তোমার দু'খানা পা আছে, আর আমার আছে এই ল্যাজ! তুমি ডাঙ্গায় চলো দু'টো পা দিয়ে, আর আমি জলে চলি এই ল্যাজ নাড়িয়ে। আমি কোনও অভিশপ্ত প্রাণী নই। আমাকে কেউ জলে ফেলেও দেয়নি। আমরা জলের মানুষ। জলেই আমদের ঘর ও বাড়ি। শুধু আমি নই গো, আমার মতো হাজার হাজার জলপুত্র, জলকন্যা আছে এই দরিয়ার নিচে। তোমরা যেমন হাজার হাজার নরনারী বাস কর গ্রামে গঞ্জে শহরে, তেমনি আমরাও বসবাস করি জলের তলায়। আর তাছাড়া, আমার কথা-বার্তা শুনেও কী তুমি বুঝতে পারছো না, আমিও তোমার মতো রক্ত মাংসে গড়া এক মানুষ?

আবদাল্লা আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। মনে হচ্ছে তুমি কোনও জিন অফ্রিদি নও।

—তা হলে আর দেরি কেন, এবার জাল থেকে আমাকে বাইরে বের কর? তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আজ থেকে তুমি আমার দোস্ত হলে। সেই রকম আমিও হলাম তোমার দোস্ত।

আবদাল্লা জাল থেকে ওকে বাইরে বের করে দেয়। জলপুত্র বেরিয়ে এসে আবদাল্লাকে সেলাম জানায়। খোদা মেহেরবান, তুমিও যেমন ইসলামে বিশ্বাসী আমিও তেমনি সাচ্চা মুসলমান। আজ থেকে আমরা দু'জনে দোস্ত হয়ে গেলাম। আমার যতটা সাধ্য আমি তোমার উপকার করবো। আর তোমার যতটা ক্ষমতা তুমি আমার জন্য করবে—কী, রাজি?

আবদাল্লা বলে, বেশ তো। আমাকে কী কী করতে হবে, বলো।

জল পুত্র বলে, তুমি রোজ আমার জন্যে নিয়ে আসবে তোমাদের মাটির ফলমূল—আঙ্গুর, ডুমুর, তরমুজ, ক্ষীরা, শশা, আনার, বেদানা, জলপাই, কলা, খেজুর ইত্যাদি। আর তার বিনিময়ে আমি দেব তোমাকে পানির তলার ফল-ফলারী। যেমন—হীরে মুক্তো, চুনীপান্না, চন্দ্রকান্ত মণি ইত্যাদি গ্রহ-রত্নাদি। তুমি যে-ঝুড়ি করে আমার জন্যে ফলমুল আনবে, সেই ঝুড়ি ভরেই আমি তোমাকে হীরে মুক্তো দেবো। কী? রাজী তো?

আবদাল্লা শুনে তো থ। বলে কী সে? আনন্দে নেচে ওঠে তার মন। বলে, রাজি মনে? একশোবার রাজি। আমি পা বাড়িয়েই রইলাম।

জলপুত্র বলে, তা হলে এস আমরা আল্লাহর নামে হলফ করি। কেউ আমরা কখনও আমাদের এই শর্তের খেলাপ করবো না।

দু'জনে মিলে উচ্চ কণ্ঠে কোরানশরীফের প্রথম পরিচ্ছেদ আবৃত্তি করে মৌখিক চুক্তির শর্তাবলী স্বীকার করে নেয়। আবদাল্লা জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

—আবদাল্লা, তোমার?

—আমারও নাম আবদাল্লা।

উল্লাসে ফেটে পড়ে দরিয়া আবদাল্লা, বাঃ চমৎকার। তাহলে আজ থেকে হবে মিট্টি আবদাল্লা, আর আমাকে ডাকবে দরিয়া আবদাল্লা বলে, কেমন?

—তাই হবে।

দরিয়া আবদাল্লা বলে আল্লাহর কুদরতে আমাদের শুধু নামেই মিল নাই, অন্তরের দিক থেকেও আমরা এক। তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ভাই। তুমি আমার দোস্ত, আমি তোমার দোস্ত। এস, হাতে হাত মেলাও।

অতি অল্প সময়ে দু'জনের মধ্যে গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। দরিয়া আবদাল্লা বলে, এখানে এক পলক দাঁড়াও, আমি যাবো আর আসবো। তোমার জন্যে এক ঝুড়ি হীরে চুনী পান্না নিয়ে আসি। কাল ঐ ঝুড়ি করেই আমার জন্যে ফলমুল নিয়ে আসবে।

এই বলে দরিয়া আবদাল্লা সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে গেলো। মিট্টি আবদাল্লা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো পুতুলের মতো।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপর আবার সে উঠে এলো জল থেকে। মাথায় একটা ঝুড়ি। মিট্টি আবদাল্লা বিস্ফারিত বিস্ময়ে দেখলো, সত্যিই—ঝুড়িটা হীরে চুনী পান্না মুক্তোয় ভরা। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে তার। দরিয়া আবদাল্লা বলে, নাও ধর, মাথায় তুলে ঘরে যাও। কাল যখন আসবে মনে থাকে যেন, ঝুড়িভর্তি ফল আনবে।

মিট্টি আবদাল্লা বলে, সে আর বলতে—

হন হন করে পা চালিয়ে সে বাড়ির পথ ধরে। পথেই রুটিওয়ালার দোকান। মিট্টি আবদাল্লা ভাবে, লোকটার দেনা কোনও দিনই শোধ করতে পারি না। আজ শোধ করে দেবো।

রুটিওলার দোকানের সামনে এসে আবদাল্লা বলে হ্যাঁ গো, দোকানী, আমার হিসেবটা একটু দেখ তো।

রুটিওলা বলে, অত হিসেব নিকেশের কী আছে। যা এনেছ, দিয়ে যাও। রুটি যা দরকার, নিয়ে যাও। তুমি কী হাতে কিছু পেলে শোধ করে দেবে না?

—সত্যিই আজ হাতে হয়েছে, শেখ। তোমার কেন, সব দায়-দেনা আমি শোধ, করে দিতে পারবো। অসময়ে তুমি আমার যা উপকার করেছ, দোস্ত, পয়সা কড়ি দিয়ে সে ঋণ পরিশোধও করা যায় না। সে চেষ্টাও আমি করবো না। তবে আজ যখন আল্লাহ দু'হাত ভরে দিয়েছে—তোমাকে খানিকটা তার ভাগ না দিলে আমি নিজেই শান্তি পাবো না। এই নাও—

এই বলে আবদাল্লা এক মুঠি হীরে জহরৎ তুলে দেয় দোকানীর হাতে। মহামূল্য রত্নরাজি দেখে শেখ সাহেবের চোখ কপালে ওঠে।

—ইয়া আল্লাহ একী ব্যাপার? তুমি তো কামাল করেছ, দোস্ত?

দোকানী এক ঝুড়ি পাউরুটি নিজের মাথায় তুলে বলে, চলো চলো, আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার ছেলেটা দেখছি খুব পয়মন্ত। মনে হচ্ছে সুলতান বাদশাহর বরাত নিয়ে জন্মেছে।

আবদাল্লা বিবিকে সব ঘটনা আদ্যোপান্ত খুলে বললো।

—এই নাও হীরে জহরতগুলো সাবধানে তুলে রাখ। আর একটা কথা, কাউকে কিছু বলবে না। বুঝলে?

আবদাল্লা-গৃহিণী খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে, পাগল নাকি। এসব কথা বলতে আছে কাউকে? আমি তো কাউকেই বলবো না। তুমি যেন আবার বলে বেড়িও না বাজারে।

আবদাল্লা বলে না না বিবিজান, একমাত্র আমার ঐ রুটিওলা দোস্ত ছাড়া কাউকেই বলিনি। বলবোও না।

পরদিন সকালে আবদাল্লা সমুদ্র উপকূলে যায়। নানারকম সুন্দর সুন্দর মিষ্টি ফলের ঝুড়ি মাথায় করে হাজির হয় সেখানে। বালির ওপর ঝুড়িটা নামিয়ে হাতে তুড়ি বাজিয়ে ডাকে, ও ভাই দরিয়া আবদাল্লা, কই, উঠে এসো, দেখ, কী মজার সব ফল এনেছি তোমার জন্য।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব আসে, এই তো আমি এলাম বলে।

একটু পরেই দরিয়া আবদাল্লা ওপরে উঠে আসে। উভয়ে সালাম-শুভেচ্ছা বিনিময় করার পর মিট্টি আবদাল্লা ফলের ঝুড়িটা দেখিয়ে বলে, তোমার জন্যে এনেছি। দেখ তো, পছন্দ হয় কিনা।

দরিয়া আবদাল্লা উল্লসিত হয়ে ওঠে, ইয়া আল্লাহ, কী তোফা—

এরপর সে তাকে সমুদ্র উপকূলে অপেক্ষা করতে বলে ঝুড়িটা নিয়ে জলের তলায় তলিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ওপরে উঠে আসে। এবার ঝুড়িটাতে ফল নাই, তবে মণি মুক্তোয় ঠাসা ছিলো।

এর পর যথারীতি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দু'জনেই দু'জনের ঘরের পথ ধরে।

আবদাল্লা আবার রুটিওলা বন্ধুর দোকানে এসে থামে। তার মাথায় সেই জহরতের ঝুড়ি।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো নয়তম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

—ওদোকানী ভাই, একবার এদিকে এসো, দেখ কে এসেছে?

রুটিওলা ছুটে আসে। বলো, তোমাকে আর কষ্ট করে রুটি বইতে হবে না দোস্ত। আজ আমি বাদাম পেস্তা আকরোট কিসমিস চিনি মধু দিয়ে চল্লিশখানা পিঠে বানিয়ে তোমার বাড়িতে দিয়ে এসেছি। খেয়ে বলবে—কেমন হয়েছিলো।

আবদাল্লা ঝুড়ি থেকে তিনখানা বড় বড় জহরত বের করে বলে, এটা রাখ।

রুটিওলার মুখে কথা সরে না। বোবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আবদাল্লার মুখের দিকে। আবদাল্লা বলে, অবাক হয়ে দেখছ কী? খুশি হয়ে তোমাকে দিলাম, নাও। আমি আর দেরি করবো না বাজারে যেতে হবে জহুরীর কাছে!

বাজারের সবচেয়ে সেরা জহুরীর দোকানে এসে আবদাল্লা দোকানীকে কয়েকটা হীরে চুনী পান্না দেখায়।

—এগুলোর কী দাম হতে পারে দেখুন তো, জনাব?

বৃদ্ধ জহুরী সন্দিগ্ধ চোখে আবদাল্লার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখে।

—কতগুলো আছে?

আবদাল্লা বলে এগুলো তো নমুনা দেখাবার জন্যে এনেছি। বাড়িতে পুরো দুই ঝুড়ি আছে।

—কোথায় তোমার বাড়ি?

—খোদা মেহেরবান, বাড়িঘর বলতে যা বোঝায় তা আমার নাই, জনাব। ঐ মাছের বাজারের পাশে একটা বস্তির ঘরে বাস করি আমরা।

আবদাল্লার এই কথা শুনে জহুরী তার কর্মচারীদের বলে,—লোকটাকে পাকড়াও কর। চুরির মাল পাওয়া গেছে ওর কাছে। বেগম সাহেবার যে সব জড়োয়া গহনাপত্র চুরি গিয়েছিলো সেইগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে এর কাছে। লোকটা চোর।

জহুরীর লোকজন আবদাল্লাকে পাকড়াও করে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে। একজন বলে, এই লোকটাই তো গত মাসে হাসান সাহেবের দোকানে ডাকাতি করে পালিয়েছিলো।

আর একজন বলে, তাই বলি, ইদানিং এতো বাড়িতে চুরি হচ্ছে কী করে?

সকলেই এক একটা রোমাঞ্চকর চুরি ডাকাতির গল্প ফেঁদে বসে। আবদাল্লা একটাও কথা বলে না। চুপচাপ সব শোনে।

দোকানের কর্মচারীরা মারতে মারতে আবদাল্লাকে নিয়ে যায় সুলতানের কাছে। জহুরী নানা রং চড়িয়ে নালিশ করে।

—লোকটা মহাচোর। বেগম সাহেবার গহনাপত্র সব এ-ই চুরি করেছে, জাঁহাপনা।

খবর পেয়ে বাজারের অন্যান্য জহুরীরাও ছুটে আসে সুলতানের দরবারে। তাদের মুখেও একই কথা।

এই লোকটাই যত চুরি ডাকাতির নাটের গুরু। বেগম সাহেবার যে হারটা হারিয়ে গিয়েছিলো, এই হীরে জহরতগুলো তা থেকেই খুলে এনেছে ব্যাটা।

জহরতগুলো খোজার হাতে দিয়ে সুলতান বললেন, বেগম সাহেবার কাছে নিয়ে যা। তাকে দেখা তো—এগুলো তার কিনা!

বেগম সাহেবা হীরে জহরতগুলো হাতে নিয়ে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে ঃ বাঃ চমৎকার তো? কোথায় পেলি?

খোজাটা বলে, জাঁহাপনা জানতে চাইছেন, আপনার যে গলার হারটা চুরি গেছে, দেখুন তো জহরতগুলো তার কিনা।

বেগম সাহেবা বলে, না না, সে তো আমি খুঁজে পেয়েছি। আমার বাক্সের তলায় পড়ে গিয়েছিলো। আর তা ছাড়া, এতো দামী জিনিস কোথায় পাবো? এ বস্তু তো তামাম দুনিয়া খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তুই সুলতানকে গিয়ে বলো,আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি যেন আমার মেয়ের জন্য এগুলো কিনে নেন। আমি তাকে একটা সাতনরী হার গড়িয়ে দেব।

খোজা গিয়ে সুলতানকে বললো, জাঁহাপনা, জহরতগুলো খুব পছন্দ হয়েছে বেগম সাহেবার। কিন্তু এগুলোর একটাও তাঁর নয়। তাঁর যে হারটা চুরি হয়ে গিয়েছিলো মনে করেছিলেন, আসলে তা চুরি যায়নি। ঘরেই ছিলো।

খোজার কথা শুনে সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়লেন, জহুরীদের তিরস্কার করে বললেন, তোমাদের কোনও কাণ্ডজ্ঞান নাই। একটা নিরীহ গোবেচারা মানুষ-তাকে চোর ডাকাত বলে ধরে এনেছ আমার কাছে? আল্লাহ তোমাদের এই গোস্তাকি মাফ করবেন কখনও?

জহুরীটা তখনও সুলতানকে বোঝাতে চায়, আপনি ভেবে দেখুন জাঁহাপনা, লোকটা সামান্য একটা জেলে। সে এই মহামূল্যবান জহরত পেলো কোথায়? তাও আবার একটা দু'টো নয়, বলে কিনা ওর বাড়িতে আরও দুই ঝুড়ি আছে। একটা হাঘরে লোকের পক্ষে এইসব মহামূল্য সম্পদ সৎভাবে রোজগার করা কী সম্ভব হুজুর?

সুলতান আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, কেন সম্ভব নয়। আল্লাহ কখন কাকে কী ভাবে দেন কেউ বলতে পারে? সত্যিকার সৎ মানুষই তাঁর কৃপায় একদিনে রাতারাতি অতুল

ঐশ্বর্যের মালিক হতে পারে। তোমরা লোভী, ঈর্ষাকাতর শকুনী। তাই অন্যের ঐশ্বর্যে কাতর হয়ে তার সর্বনাশ চিন্তা করছ। কিন্তু আমার সলতানিয়তে ধনী নির্ধন সব প্রজাই আমার চোখে সমান। তুমি শাহবানদার বলে ভেব না তোমাকে আমি বিশেষ কোনও সুনজরে দেখবো, আর এই গরীব বেচারা—যেহেতু সে তোমাদের মতো অসৎ গলাকাটা ব্যবসা করে পরস্ব অপহরণ করতে পারে না সেই কারণে তার ওপর নির্দয় হবো।

তোমরা আজ বিত্তবান—তাই সমাজের মাথায় পা রেখে যা খুশি তাই করে যাচ্ছো। এই অসহায় লোকটাকে আজ মারধোর করতে করতে এখানে নিয়ে এসেছ। কিন্তু কেন? কী তার অপরাধ? সে কিছু বিত্তের মালিক হয়েছে বলে? এতো তোমাদের ঈর্ষা! তোমরা কেউই চাও না, আর কেউ তোমাদের সমকক্ষ হোক। তাই বুঝি আজ একে চোর ডাকাতের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমার দরবারে এনে হাজির করেছিলে। ভেবেছিলে, তোমরা শহরের সম্ভ্রান্ত কেতাদুরস্ত সওদাগর। তোমাদের কথা আমি অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়ে এই নিরপরাধ লোকটিকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাবো। বাঃ, চমৎকার তোমাদের ফন্দী! কিন্তু একবারও কী ভেবেছিলে শাহবানদার, আমাকে ধোঁকা দিতে পারলেও আখেরে আল্লাহর কাছে ফাঁকিবাজী টিকবে না? শেষ বিচারের দিন সব কড়ায়গণ্ডায় তিনি বিচার করে দেবেন। তখন? তখন তোমারাই বা পালাবে কোথায়; আর আমিই বা আমার ভুলের, অজ্ঞতার কী জবাবদিহি করতে পারবো?

এই সময় প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো দশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু করে সে ঃ

এইবার সুলতান আবদাল্লাকে উদ্দেশ করে বলে, তুমি গরীব বেচারা, আল্লাহ তোমার ওপর সদয় হয়ে কিছু দিয়েছেন, বুঝতে পারছি। আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, তোমার কোও ভয় নাই। এবার নির্ভয়ে বলো তো এই মহামূল্য হীরে জহরত তুমি পেলে কেমন করে? এগুলো দেখে আমি বুঝতে পারছি, এ সব জিনিস কোন সুলতান বাদশাহদের কোষাগারেও দুর্লভ।

আবদাল্লা বলে, জাঁহাপনা, এই ধরনের হীরে জহরতের দু'টো ভর্তি ঝুড়ি আছে আমার বাসায়। আমার এক দোস্ত, নাম দরিয়া আবদাল্লা—সে আমাকে দিয়েছে এগুলো।

এরপর আবদাল্লা সমুদ্র উপকূলের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনালো সুলতানকে এবং বললো, আমি তার সঙ্গে কোরাণশরীফ হলফ করে এক শর্ত করেছি—প্রতিদিন সকালে আমি তাকে এক ঝুড়ি ফল দেব, আর তার বিনিময়ে সে দেবে আমাকে এক ঝুড়ি এই সব হীরে জহরত।

সুলতান শুনে প্রীত হয়ে বললেন, তুমি আল্লাহর নিষ্ঠাবান ভক্ত। তারই পুরস্কার তুমি পাচ্ছ। কিন্তু একটা কথা, ধন সংগ্রহ করা আর সেই ধন রক্ষা করতে পারা এক কথা নয়। তোমার ধনরত্ন রক্ষা করার সব ভার আমি নিলাম।

যতদিন তুমি বাঁচবে আমি তার যথাযোগ্য পাহারার ব্যবস্থা করবো। এমনি কি তোমার মৃত্যুর পরও নিরাপদ থাকবে তোমার সম্পদ। তবে তোমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা কী করবে আমি বলতে পারি না এবং সে নিয়ে আমি কোনও বাধাও দিতে পারবো না তাদের। তবে তুমি যদি চাও আমার কন্যার সঙ্গে তোমার শাদী দিতে পারি। সবে সে বিয়ের বয়সে পা দিয়েছে এবং আমার কন্যাকে যদি তুমি শাদী কর তবে আমার মৃত্যুর পর তুমিই আমার মসনদে বসবে। সুলতান হবে। এখন তোমাকে আমি আমার উজির করে রাখবো, কথা দিচ্ছি।

আবদাল্লা সম্মতি জানায়। সুলতান তার নফরদের ডেকে বলে, আবদাল্লাকে হামামে নিয়ে যাও।

চাকররা ওকে হামামে নিয়ে গিয়ে ভালো করে সাবান ও খোসা দিয়ে ঘষে মেজে সাফ করে গোসল করায়। তারপর মহা মূল্যবান সাজ-পোশাকে সাজিয়ে সুলতানের সামনে হাজির করে।

সুলতান বলেন, এখন থেকে তুমি আমার উজির হলে। কী কী তোমার দপ্তর থাকবে, আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

আবদাল্লা বলে, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।

সুলতান বললেন, আমি তোমার বাড়িতে দামী দামী নফর পেয়াদা পাহারা পাঠিয়েছি। তারা তোমার বিবি সন্তান এবং হীরে জহরতগুলো এখানে নিয়ে আসবে, আমার প্রাসাদেই থাকবে তারা।

সেইদিনই সুলতান তার কন্যার সঙ্গে আবদাল্লার শাদী দিয়ে দেন। উৎসবের সমারোহে প্রাসাদ ও প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। সারা শহরের পথঘাট বাজার আলোর মালায় ঝলমল করতে থাকে। আজ প্রাসাদের দ্বার সকলের জন্য অবারিত উন্মুক্ত। খানাপিনা নাচ-গান হাসি-হল্লায় মেতে ওঠে, আমির, ইতর সকলে। সুলতানের সেনা-বাহিনীও নতুন সাজ-পোশাক পরে উৎসবে যোগ দিতে আসে।

আবদাল্লার জীবনে সেদিন এক পরম লগ্ন এলো। শাহাজাদী তার বেগম হয়ে অঙ্কশায়িনী হলো। এমন সৌভাগ্য কজনে কল্পনা করতে পারে?

প্রতিদিনের অভ্যাস মতো সেদিনও অতি প্রত্যুষে সুলতান শয্যা ছেড়ে উঠেছেন। জানলার ধারে বসে আল্লাহর নাম গান করছেন। এমন সময় নজরে পড়লো, তার জামাতা উজির আবদাল্লা একটি ফলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে সদর পেরিয়ে চলে যাচ্ছে? সুলতান ডাকলেন, কী ব্যাপার জামাই বাবা, এ সব কী, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো এগারো তম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

—আমার দোস্ত দরিয়া আবদাল্লার জন্যে ফল নিয়ে যাচ্ছি।

সুলতান বলেন, কিন্তু তা বলে এতো ভোরে? এ সময় তো প্রাসাদ থেকে কেউ বাইরে বেরোয় না! আর তাছাড়া, তুমি আমার জামাতা, সামান্য একটা কুলির মতো মাথায় মোট বয়ে নিয়ে যাবে, তাই বা কী করে হয়?

আবদাল্লা বলে, আপনি যথার্থই বলেছেন, জাঁহাপনা। কিন্তু আমার কথাটা একবার ভাবুন। আমার কথার খেলাপ হোক, আমার দোস্তের কাছে আমি মিথ্যেবাদী হই—এটাও তো আপনার কাম্য নয়, জাঁহাপনা। আজ এই যে আমার বিত্ত, এই যে আমার খ্যাতি সম্মান, এই সবেরই তো মূলে সে। তাকে কী করে ভুলবো বলুন?

সুলতান বললেন, ঠিক, ঠিক বলেছ। যাও বাবা, তাড়াতাড়ি যাও তার কাছে। ওয়াদা আগে পূরণ করতে হবে। জীবনে জবানের দাম না দিতে পারলে আর কিছুই থাকে না।

আবদাল্লা ফলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে হন হন করে হেঁটে চলে। কোনও কোনও পথচারী তাকে চিনতে পেরে অন্যজনকে বলে, ঐ দ্যাখ সুলতানের জামাই চলেছে সমুদ্রের উপকূলে।

অনেকেই সে-কথা বিশ্বাস করে না। ভাবে এমন গাঁজাখোরী কথা-বার্তা কেউ শুনেছে কখনও। বাদশাহর জামাই মোট বয়ে বেড়াবে কোন দুঃখে?

কেউ বা ভাবে, লোকটা ফলওলা। তাকে ডাকে, ফলওলা, তোমার আনার কত করে দেবে?

আবদাল্লা রাগ করে না। বরং আরও বিনীত হয়ে বলে, জী, এ ফল বিক্রীর না। আমার দোস্তের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।

এইভাবে সে একসময় সমুদ্র-সৈকতে এসে হাজির হয়। তার ডাকে সাড়া দিয়ে দরিয়া আবদাল্লা উঠে আসে। যথাবিহিত কুশল বিনিময়ের পর ফলের ঝুড়িটা নিয়ে জলের তলায় তলিয়ে যায় সে। ফিরে আসে আবার, নানা বর্ণের অমূল্য রত্নাভরণ ভরে নিয়ে। ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে আবদাল্লা আবার ফিরে আসতে থাকে। পথে সেই রুটিওলার দোকান। সেখানে সে দাঁড়ায়। দোকানটা সেদিন বন্ধ দেখে পাশের দোকানীকে জিজ্ঞেস করে, হাঁ গো, বলতে পারো, এই রুটিওলা দোকান খোলেনি কেন?

কিন্তু কোনও সঠিক উত্তর দিতে পারে না সে। তখন আবদাল্লা জানলা বেয়ে উঠে ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে দোকানের ভিতরটা দেখে নেবার চেষ্টা করে। দোকানী গুটিসুটি মেরে বিছানায় পড়ে আছে। আবদাল্লা ডাকে, দোস্ত—দোস্ত শুনছো?

দোকানী ধড়মড় করে উঠে বসে। সারা চোখে মুখে তার আতঙ্ক।

—সে কী? এখনও তুমি জিন্দা আছে? আমি তো শুনেছিলাম তোমার ফাঁসী হয়ে গেছে! হাটে বাজারের মানুষ সেইরকম আলোচনা করছিলো।

আবদাল্লা বলে, সব বলছি। আগে দরজাটা খোলো। কোনও ভয় নাই। আমি মরিনি এবং তোমারও কোন ক্ষতি করতে পারবে না কেউ?

রুটিওলা দরজা খুলে দেয়। আবদাল্লা সব বৃত্তান্ত খুলে বলে তাকে। বাজারের জহুরীগুলো তাকে শেষ করারই প্যাঁচ কষেছিলো। কিন্তু সুলতান ধর্মাত্মা। তিনি সব বুঝে তাদেরই তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার ওপর সদয় হয়ে সুলতান তাঁর কন্যার সঙ্গে আমার শাদী দিয়ে আমাকে জামাতা তথা উজির করেছেন। এখন আমি প্রাসাদের এক হারেমে মা এবং বেগমকে নিয়ে বসবাস করার অধিকার পেয়েছি।

আবদাল্লা এক নিশ্বাসে বলে গেলো কথাগুলো। একটু থামলো। তারপর আবার বলতে থাকলো, দোস্ত, আমার আশার অতিরিক্ত আমি পেয়ে গেছি। এতো দৌলতে আমার কি বা প্রয়োজন। তাই আজ তোমাকে এই ঝুড়ির সব হীরে জহরতগুলো দিয়ে যেতে এসেছি। তুমি নিয়ে আমাকে ধন্য কর।

রুটিওলা বেচারার মুখে কথা যোগায় না। হতবাক হয়ে সে আবদাল্লার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আবদাল্লা শূন্য ঝুড়ি নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসে। সুলতান হেসে বলেন, আজ দেখছি তোমার দরিয়া দোস্ত তোমার সঙ্গে ধোঁকাবাজী করলো!

আবদাল্লা বলে, না জাঁহাপনা, সেও তার ওয়াদা পূরণ করেছে। বরঞ্চ গত-কালের চেয়ে আরও বাহারী মাল সে দিয়েছে।

—তবে তোমার ঝুড়ি খালি কেন?

—আজকের সবটাই আমার এক রুটিওলা দোস্তকে দান করে এলাম। লোকটি বড় ভাল। আমার অসময়ের বন্ধু। যখন অভাবের তাড়নায় খেতে পেতাম না, লোকের কাছে ধার চেয়ে মুখ-ঝামটা খেতাম, সেই সময় আমার এই বন্ধু দিনের পর দিন রুটি এবং নগদ পয়সা ধার দিয়ে আমার বাল-বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলো। সেই অসময়ের উপকার আমি ভুলবো কি করে? শুধু পয়সা-কড়ি বা ধন-দৌলত দিয়ে সে ঋণ শোধ করা যায় না। তাই আজ আমি যৎসামান্য তার হাতে দিয়ে এলাম। সে আমার অসময়ের বন্ধু। আজ আমার সুখের দিনে তাকে ভুলবো কি করে?

সুলতান বললেন, তোমার কথা শুনে খুবই প্রীত হলাম বাবা। তা ঐ রুটিওলার নাম কী।

তার নাম তন্দুরী আবদাল্লা।

সুলতান হাসলেন, বাঃ চমৎকার যোগাযোগ তো! তোমার নাম মিট্টি আবদাল্লা, তোমার এক দোস্তের নাম দরিয়া আবদাল্লা, আর এক দোস্তের নাম তন্দুরী আবদাল্লা এবং আমার নাম তো জানো, সুলতান আবদাল্লা। সকলেই আমরা আল্লার পেয়ারের নোকর। সকলেই আমরা সমান তাঁর চোখে। ধর্মে বিশ্বাসে সততায় আমরা সকলেই এক। তোমার এই তন্দুরী আবদাল্লা বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। তোমার মতো তাকেও আমি এক উজির বানাতে চাই।

মিট্টি আবদাল্লা তার বন্ধু রুটিওলা আবদাল্লাকে ডেকে আনে সুলতানের কাছে। সুলতান তার সঙ্গে কথা বলে খুব খুশি হন। বলেন, আজ থেকে তোমাকে আমার বাঁ-পাশের উজির করে নিলাম। আমার জামাতা থাকবে আমার ডান পাশে।

আবদাল্লা আজ সুলতান জামাতা—উজির। অতুল ঐশ্বর্যের মালিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিনের জন্য ভুল হয় না। দরিয়া দোস্ত-এর সঙ্গে দেখা করতে যায় যে প্রতিদিন সকালে।, নিজের মাথায় বয়ে নিয়ে যায় নানারকম মরশুমী ফলমুল এবং প্রতিদিনই সে ফিরে আসে ঝুড়ি ভর্তি হীরে জহরত নিয়ে। এইভাবে বরোমাসে একটা দিনও সে বিরতি দেয় না। বছরের একটা সময়ে কোনও তাজা ফল পাওয়া যায় না। তখনও সে শুকনো ফল যা মিলতো তাই বয়ে নিয়ে যেত তার বন্ধুর জন্য। এইভাবে পুরো একটা বছর কেটে গেলো।

একদিন প্রত্যুষে যথারীতি সমুদ্র-সৈকতে বসে দুই বন্ধু আলাপ সালাপ করছিলো।

এই সময় প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে রইলো।

পাঁচশো বারোতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মিট্টি আবদাল্লা জিজ্ঞেস করছিলো, আচ্ছা দোস্ত, তোমাদের দেশটা কেমন? খুব সুন্দর?

দরিয়া আবদাল্লা বলে, তুমি যদি দেখতে চাও আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, যাবে? যদি যাও দেখবে, আমাদের দেশের মানুষজন ভালো। সবাই তোমাকে কত আদর যত্ন করবে।

মিট্টি আবদাল্লা বলে, কিন্তু দোস্ত, তোমরা পানিতে জন্মেছ, পানির নিচেই মানুষ হয়েছ। সেই কারণে জলের মধ্যে অবাধ গতিতে চলা-ফেরা করতে পারো। কিন্তু তা বলে আমরা তো মাটির মানুষ—আমরা পারবো কেন? যাই হোক, তুমি আমাকে পানির দেশে নিয়ে যেতে পারবে? আমার কোনও অসুবিধে হবে না?

দরিয়া আবদাল্লা বলে, তা হবে। ডাঙ্গায়ও আমার বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। হাঁসফাঁস করি। গায়ের চামড়ায় হাওয়া লেগে শুকিয়ে যায়। টান ধরে। মনে হয় সারা শরীরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মনে হয় এই বুঝি হাওয়ার দাপটে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবো।

মিট্টি আবদাল্লা হেসে বলে, আমাদেরও ঠিক ওই রকম হয়। পানির মধ্যে হাওয়া কম। অথচ আমরা দমভরে অনেক বেশি হাওয়া টানি আর ছাড়ি। ডাঙাতে আমাদের জন্ম। এবং এখানকার আবহাওয়া আমাদের ধাত সওয়া হয়ে গেছে। পানির নিচে একটুক্ষণ থাকলেই আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। দেহে অনাবশ্যক পানি ঢুকে কাহিল করে তোলে! এবং জোর করে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের প্রাণসংশয় ঘটতে পারে।

দরিয়া আবদাল্লা বলে, তুমি যদি রাজি থাক আমি তোমার সারা গায়ে এমন একটা মালিশ মাখিয়ে দেব, যার ফলে, আর কোনও অসুবিধাই হবে না। চাই কি, বাকী জীবনটাও

যদি পানির তলায় আমাদের সঙ্গে কাটাও, কোনও ক্ষতি হবে না তোমার। যেমন খুশি চলা-ফেরা করতে পারবে। খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো—যা প্রাণ চায় করতে পারবে।

—তা যদি হয়, তা হলে তোমার সঙ্গে পানির তলায় যেতে আমার বাধা কী? ঠিক আছে, নিয়ে এস সেই মালিশ। দেখি একবার চেষ্টা করে।

ফলের ঝুড়িটা তুলে নিয়ে জলপুত্র সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে যায়। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার ওপরে উঠে আসে। হাতে একটা পাত্র। তার মধ্যে গাওয়া ঘি-এর মতো খানিকটা তৈলাক্ত পদার্থ! হলদে রং। চমৎকার গন্ধ।

মিট্টি আবদাল্লা একটুখানি আঙ্গুলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী দিয়ে তৈরি জিনিসটা?

দরিয়া আবদাল্লা বলে, এটা দানদান মাছের তেল। দানদান হলো সমুদ্রের সব মাছের সেরা! এক একটা মাছ বিরাট আকারের হয়। মাছের বাদশাহ বলতে পার। হাতির মতো আকৃতি প্রকৃতি।

—সর্বনাশ! এতো বড় মাছটা কী খেয়ে বেঁচে থাকে?

—ছোটোখাটো মাছই তার খাদ্য। তুমি তো জান, সবলের ভক্ষ্য দুর্বল।

মিট্টি আবদাল্লা বলে, হাঁ, তা জানি। কিন্তু একটা কথা, তুমি যেখানে থাক সেখানে কী অনেক দানদান মাছ ঘোরাফেরা করে? তা হলে দোস্ত আমি তোমার সঙ্গে যাবো না।

দরিয়া আবদাল্লা হেসে বলে, ভয় নাই বন্ধু, ভয় নাই। দানদানরা ভয়ঙ্কর মারাত্মক ঠিক, কিন্তু ওরা মানুষের গন্ধ পেলে ত্রিসীমানায় থাকে না। তার কারণ মানুষের রক্তমাংসে যে জহর আছে তা তাদের পেটে গেলে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

মিট্টি আবদাল্লা বলে, আমাকে মুখে পোরার পরে তো বুঝবে আমার রক্ত-মাংসে ওর মরণ বিষ আছে। আমাকে যদি সে গিলেই ফেরে তারপরে সে দানদান বেঁচে থাকলো কী মারা গেলো, আমার কী যায় আসে। আমি তো তার আগেই খতম হয়ে যাবো।

দরিয়া আবদাল্লা অভয় দিয়ে বলে, না না, ওসব ভয় করার কেনও ব্যাপার নাই। দূর থেকে ওরা মানুষের গায়ের গন্ধ পাওয়া মাত্র সেখান থেকে হাওয়া হয়ে যায়। সুতরাং তুমি নির্ভয়ে আমার আমার সঙ্গে যেতে পার।

মিট্টি আবদাল্লা খানিকটা ভরসা পায়। বলে, একমাত্র খোদা আর তোমার ওপর নির্ভর করে আমি তোমাদের দেশে যাবো।

এই বলে সে তার সাজপোশাক খুলে একটা বালির গর্তের মধ্যে পুরে মাটি চাপা দিলো। উদ্দেশ্য কোনও মানুষের নজরে পড়বে না।

জলের তলা থেকে উঠে এসে আবার এই সাজপোশাক পরে সে প্রাসাদে ফিরবে।

—তা হলে চলো, দোস্ত, আমি তৈরি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো তেরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

দানদান মাছের তেল ওর সারা গায়ে মাখিয়ে দেয় দরিয়া। তারপর মিট্টি আবদাল্লাকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে যায়। নামতে নামতে ওরা এক সময় একেবারে তলদেশে এসে হাজির হয়। এইবার দরিয়া মিট্টির চোখের পট্টি খুলে দেয়।

—চোখ মেলে দেখ, দোস্ত, আমাদের দেশে পৌঁছে গেছি আমরা।

মিট্টি আবদাল্লা দেখলো, তার শরীরে কোন আঘাত লাগেনি অথবা কোনও জড়তাও অনুভব করছে না সে। ওপরে বিশাল জলরাশির চাপ। কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস নিতে বা

ছাড়তে কোনও রকম অসুবিধে হচ্ছে না তার। বরং বলতে গেলে, নিজেকে অনেক হাল্কা বোধ হচ্ছে।

আমরা যেমন মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে উপরে তাকালে দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ দেখি তেমনি সমুদ্রের নিচে দাঁড়িয়ে ওপরের বিস্তৃত জলরাশিকে এক সমুদ্র দিক-চক্রবাল বলে মনে হতে থাকে। চারপাশে অসংখ্য লতাপাতা গাছপালার অপূর্ব সমারোহ। অদূরে একটি ছোট পর্বতমালা চোখে পড়ে। পাহাড়ের কোথাও কোথাও সুন্দর সবুজ উপত্যকার মনোরম শোভা দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। আবদাল্লা দেখলো, একপাশে একটা বিস্তীর্ণ রক্তমুখী প্রবাল বন। তার মাঝে মাঝে সাদা এবং গোলাপী প্রবালও দেখা যাচ্ছিল। প্রবালের গাছগুলোর বহু বিস্তৃত ডালপালা নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক দিকে একটা হীরের পাহাড়। পাহাড়ের তলায় একটা গুহা। গুহার মুখ পদ্মরাগমণির একখানা বড় চাঁই দিয়ে ঢাকা। সেই পাহাড়ের মাথায় হাজার হাজার নানা বর্ণের ঝিনুক। আলোর রশ্মি পড়ে সেই ঝিনুকগুলো ঝলমল করছিলো।

মাথার ওপর দিয়ে আবদাল্লা ওপরে তাকিয়ে দেখে, নানা রঙের মাছ চলা-ফেরা করে বেড়াচ্ছে। তাদের কেউ ফুলের মতো, কেউ ফলের মতো, আবার কেউ বা পাখীর আকারের। আবার অনেকগুলো মাছ দেখতে নানা ধরনের জন্তু-জানোয়ারের মথো। যেমন গরু, মোষ, হরিণ, খরগোস, কুকুর। আবার কেউ বা দেখতে অবিকল মনুষ্যাকৃতির।

আবদাল্লা চলতে চলতে হীরে জহরতের পাহাড়ে উঠে আসে। মণি-মুক্তার দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যায় আর কি! কোথাও বা চুনী কোথাও হীরে কোথাও পান্না, আবার কোথাও বা মুক্তোর পাহাড়।

মিট্টি আবদাল্লা তখনও তার দোস্ত দরিয়ার হাত ধরে চলছিলো। চলতে চলতে সে অবাক হয়ে দেখলো, একটা পান্নার পাহাড়কে কেটে ছোট ছোট গুহার মতো ডেরা বানানো হয়েছে।

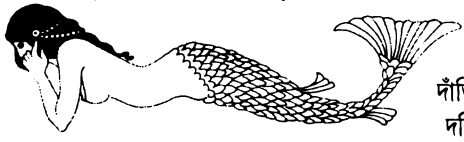

আর সেই প্রতিটি গুহার মুখে এক একটি পরমাসুন্দরী ষোড়শী কন্যা দাঁড়িয়ে আছে।

দরিয়াকে সে জিজ্ঞেস করে, এই মেয়েগুলো কারা? দেখে মনে হচ্ছে, এরা একা। শাদী নিকা এখনও হয় নি।

—তুমি ঠিক ধরেছ। ওরা সবাই কুমারী—সমুদ্র কন্যা। আর ঐ যে পান্না পাহাড়ের গুহাগুলো দেখছো—ওই ওদের থাকবার ঘর। যতদিন না কোনও পুরুষ এসে পছন্দ করে তাদের নিয়ে যায় ততদিন ওখানেই ওরা বাস করবে। সেই রকম একজন পুরুষের প্রতীক্ষাতেই ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকে—যতদিন না তেমন কেউ আসে।

এই শহরের অন্যদিকে আছে জন-বসতি। সেখানে মানুষ স্ত্রী-পুত্র কন্যা নিয়ে ঘর সংসার করে। কিন্তু মেয়েরা যখনই শাদী-যোগ্যা হায় তখনই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই পর্বতগুহায়। এই সময়টা এদের পতি সাধানার কাল। আত্মীয় পরিজন ছেড়ে এসে কায়-মনো-ঝাক্যে শুধু মনের মানুষের চিন্তা করে এখানে।

দুই বন্ধু হাত ধরা-ধরি করে সামনে এগিয়ে চলে। মিট্টি আবদাল্লা দেখতে পায় অনেক লোকজন নারী-পুরুষ বালবাচ্চা এবং তাদের ঘরবাড়ি। কিন্তু দোকান পাট বা হাট-বাজার কিছুই নজরে পড়ে না। মিট্টি আবদাল্লা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দোস্ত, তোমরা সওদাপাতি কর কোথায়? কই, কোনও দোকান পাট তো দেখছি না।

দরিয়া বলে, না নেই। ও সবের দরকার হয় না আমাদের। প্রয়োজনের তুলনায়

জিনিসপত্র এখানে অনেক বেশি। তাই বেচা-কেনার কোনও দরকার হয় না। যা যা দরকার হাত বাড়ালেই পায়—মাঙনায়। সুতরাং হাট-বাজারে কী হবে? ঐ যে দেখছো, ছোট ছোট অসংখ্যা মাছ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, এগুলোই আমাদের আহার্য। খিদে পেলেই ধরে ধরে খাই। আর মনের আনন্দে গান গাই। অভাব অভিযোগ বলতে কিছু নাই এখানে।

আবদাল্লা বললো, তোমরা, কেউই সাজ-পোশাক পর না? সবাই এরকম উদোম উলঙ্গ হয়ে থাক কেন? শরম লাগে না?

—শরম? সে আবার কী বস্তু? আর সাজ-পোশাক আমাদের কাছে বাহুল্য মনে হয়। আল্লা আমাদের যাকে যে ভাবে গড়েছেন তা কাপড়-চোপড় জড়িয়ে ঢেকে রাখতে যাব কেন? ওসব আমরা পছন্দ করি না। তাই এখানে সাজ-পোশাক বলতে কী বোঝায় তা জানে না কেউ।

আবদাল্লা জানতে চায়, আচ্ছা তোমাদের শাদীর ব্যাপারটা কী ভাবে হয়?

—এখানে নানা জাতের মানুষের বাস। খ্রীস্টান, ইহুদী, পারসী, মুসলমান সব জাতের লোকই থাকে এই শহরে। বিধর্মীরা শাদী নিকার ধার ধারে না। কোনও একটা মেয়েকে কোনও একটা ছেলের মনে ধরলেই তারা একসঙ্গে সহবাস করতে থাকে। এই ভাবে কিছুকাল কাটার পর ছেলে বা মেয়ে কারো যদি অনিচ্ছা জন্মে, তবে আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তখন ছেলেটি খুঁজে বেড়ায় অন্য একটি মেয়ে। সেই রকম মেয়েটিও অন্য এক পুরুষের সন্ধান করতে থাকে। তবে এ সবই বিধর্মীদের ব্যাভিচার। সাচ্চা মুসলমানরা কিন্তু পবিত্র কোরাণের নির্দেশ মতোই শাদী নিকা করে।

দরিয়া আবদাল্লা বলে, আর একটু জোরে চলো দোস্ত, আমাদের নিজেদের মুলুকের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। দেখবে সে কী বাহারী জমকালো শহর। চোখ জুড়িয়ে যাবে। মন ভরে যাবে। আর দেখবেই বা কত! দু'চার দিন বা দু'চার বছর ঘুরে দেখে তো তার কিছুই দেখা সম্ভব না। এক হাজার বছর ধরে যদি দেখ তবে দেশটার দেখার মতো সুন্দর সুন্দর জিনিসের শতাংশের এক অংশ দেখা সম্ভব হতে পারে। এবং তা থেকে এর সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা করাও সম্ভব না।

মিট্টি আবদাল্লা বললে, বড্ড খিদে পেয়েছে দোস্ত। কিন্তু আমি তো তোমাদের মতো ঐ কাঁচা মাছ খেতে পারবো না।

দরিয়া আবদাল্লা অবাক হয়, সে কি? তবে তোমরা খাও কী করে?

—অলিভ তেলে ভেজে নিই। অথবা লঙ্কা পেয়াজ রসুন ইত্যাদি মসলা দিয়ে ঝোল-ঝাল বানাই। অবশ্য অলিভ তেল ছাড়া বিনের তেলেও রান্না করি আমরা।

দরিয়া আবদাল্লা হো হো করে হেসে ওঠে, তবেই বোঝ, এই সমুদ্রের তলায় আমরা অলিভ বা বিনের তেল পাবো কোথায়? আর এই জলের ভিতর আগুনই বা জ্বালাবো কী করে?

—তা বটে। যাইহোক, চলো, তোমাদের শহরের ভিতরে নিয়ে চলো।

ভোর হয়ে আসছিলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চৌদ্দতম রজনী আবার গল্প শুরু হয় ঃ

দরিয়া আবদাল্লা এবার মিট্টিকে সঙ্গে নিয়ে এক নতুন দেশে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে একটা পাহাড়ের তলায় ছোট বড় অনেক গুহা। এই সব গুহাতে বাস করে এরা। যার যে রকম সংসার সেই ভাবে বেছে নিয়েছে গুহার আকার। কারো সংসার ছোট। সে থাকে ছোট্ট গুহায়। কারো আবার আল্লার দোয়ায় অনেক বালবাচ্চা। সে বেছে নিয়েছে বড় সড় গোছের একটা। দরিয়া এই রকম একটা গুহার সামনে এসে থামে।

—এই হোল আমার আস্তানা। এখানেই আমি থাকি। এস, ভেতরে এসে।

দুই বন্ধু গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ পরে। দরিয়া ডাকে, কই গো, মা জননী, একবার এদিকে দেখবে এস, কে এসেছে।

দরিয়ার বড় কন্যা এগিয়ে আসে। গুলাবী প্রবালের মতো গায়ের রং। এলায়িত সেনালী চুল। সুডোল স্তনভার। সুন্দর পেটখানা। পাতলা ছিপ-ছিপে শরীরের গড়ন। আর বিশাল কাজল কালো ওর চোখ দুটি। কিন্তু হায়, এমন সুঠাম সুন্দর সুতনুকার ভারী নিতম্ব নাই। নাই দু'খানা পা। তার বদলে এক দীর্ঘায়ত লেজ শোভা পাচ্ছে তার নিম্নাঙ্গে।

পরদেশী মেহেমানকে দেখে সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে মিট্টি আবদাল্লাকে আপাদমস্তক গভীর কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে থাকে। তারপর এক সময় হি-হি করে হেসে ওঠে, আব্বাজান এর লেজ নাই কেন? এ কেমন জীব?

দরিয়া বলে, ইনি আমার দোস্ত, মা। জলের ওপরে মাটির দেশে থাকেন। আমি যে রোজ তোমার জন্য ঝুড়িভর্তি ফল নিয়ে আসি, সে-সব ফলমূল ইনিই আমাকে দেন। খুব সাচ্চা আদমী। অমন ভয় করছ কেন? কাছে এস, এঁর সঙ্গে কথা বলো। ইনি যে আমাদের মাননীয় মেহেমান, মা।

মেয়েটি কাছে আসে। মিষ্টি গলায় বলে, বসুন। আমাদের দেশে এসে আপনার কেমন লাগছে?

আবদাল্লা জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় সেখানে এলো দরিয়ার বিবি। কোলে কাঁধে দুটি বাচ্চা। ওদের হাতে দু'টো মাছ। কামড়ে কামড়ে খাচ্ছিল। আবদাল্লার মনে হলো, আমাদের দেশের বাচ্চারা ঠিক এই ভাবে শশা পেয়ারা খায়।

মিট্টি আবদাল্লাকে দেখে হাঁ হয়ে যান দরিয়ার বিবি। বাচ্চা দু'টোকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—খোদা হাফেজ, তাজ্জব কাণ্ড! এ যে দেখি ল্যাজ নাই গো। ল্যাজ ছাড়া কী করে চলা ফেরা করেন ইনি? কী কাণ্ড—

বৌটা আবদাল্লার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। সব চেয়ে রোমাঞ্চকর মনে হয় ওর কাছে আবদাল্লার নিম্নাঙ্গ। এমন সুন্দর জিনিস সত্যিই হয় না আল্লাহর

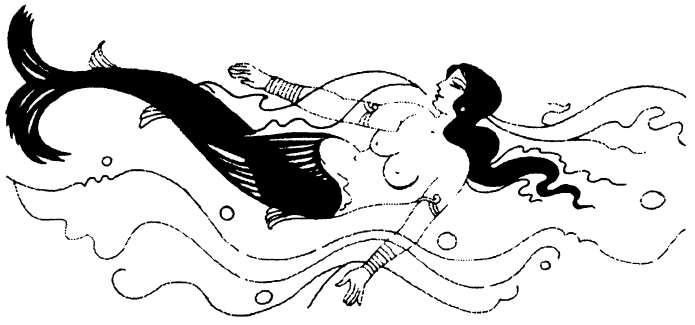

কী অপরূপ সৃষ্টি প্রথমে কেমন ভয় ভয় লাগে, কিন্তু একটু পরে জড়তা কেটে যায়। বৌটা হাতের আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে অনুভব করে আবদাল্লার সারা শরীর, মাঝে মাঝে সে ফিক ফিক করে হেসে ওঠে, সবই সুন্দর, চমৎকার। কিন্তু ল্যাজ নাই—এ কেমন ব্যাপার?

এই পা উরু পাছা জঙ্ঘা ও কটিওলা লেজবিহীন জীবটিকে দেখে দেখে বিস্ময়

আর কাটে না তার। মিট্টি আবদাল্লার কিন্তু এই সব আদৌ ভালো লাগে না। একটু রাগত স্বরেই সে অনুযোগ করে, দোস্ত, তোমার বিবি-বাচ্চাদের উপহাস কুড়াতেই কি এসেছি এখানে? আমকে দেখে ওরা অত হাসাহাসি করছে কেন?

—ক্ষমা কর ভাই, সত্যিই আমি লজ্জিত। ওদের ঐ সব পাগলামীতে কান দিও না তুমি। আসলে মেয়ে-মানুষ আর বাচ্চাদের জ্ঞান-বুদ্ধি একটু তরল হয়।

এই বলে ছোট দু'টোকে ধমক দেয় দরিয়া, এ্যাই, কী হচ্ছে, চুপ কর।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। ভীত চকিত চোখে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। দরিয়া আবার বলে, ওদের আচরণে আহত হয়ে না ভাই। জন্মাবধি ওরা লেজ ছাড়া কোনও মানুষ চোখে দেখেনি। সুতরাং তোমার এই পা কোমর পাছা ওদের কাছে আজব বস্তু বলেই তা মনে হবে। তোমরা চিড়িয়াখানায় গেলে যে কৌতূহল নিয়ে নানা জাতের বহুবিচিত্র জন্তুজানোয়ার দেখো, তোমাকে দেখেও ওদের চোখে সেই বিস্ময় ফুটে উঠেছে। ওরা অবোধ অবলা শিশু। এতে যে তোমার মনে কোনও আঘাত অভিমান হতে পারে সে দিকটা চিন্তা করার মতো বুদ্ধি ওদের নাই। সেই ভেবেই ওদের ক্ষমা এবং অবজ্ঞা কর।

ওরা যখন এইসব কথাবার্তা বলছিলো সেই সময় ইয়া লম্বা তাগড়াই দশটি সমুদ্রমানব এসে দাঁড়ালো সেখানে।

—শোনো আবদাল্লা, সুলতান শুনেছেন, তুমি এক ল্যাজহীন মাটির মানুষকে এনে ঢুকিয়েছ তোমার ঘরে! কথাটা কী সত্যি?

—মিথ্যে হবে কেন? বিলকুল সত্যি। এবং এই দেখ সে লোক। আমার দোস্ত—আমার মেহেমান। আমাদের দেশ দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম। এখুনি আবার সমুদ্রকূলে তুলে দিতে যাচ্ছি।

—না; তা তুমি পারো না। সুলতানের হুকুম, এই স্থলদেশীকে তার সামনে হাজির করতে হবে। সুলতান পরীক্ষা করে দেখবেন, আসলে এর শরীরের গঠন-প্রকৃতি কেমন। এবং কী বস্তুতে গড়া। সুলতান খবর পেয়েছেন, এর সামনেটা এক রকম এবং পিছনটাও নাকি আর এক রকম? শরীরে নাকি এমন সব কল-কব্জা বসানো আছে; যা কোনও মানুষের হয় না। তিনি একে দেখার জন্যে দারুণ কৌতূহল নিয়ে বসে আছেন। এক্ষুণি যেতে হবে।

দরিয়া দোস্তের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে দু'হাত জোড় করে বলে, আমাকে ক্ষমা কর ভাই। আমাদের মহামান্য সুলতানের আদেশ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আমার নাই। তিনি যখন তোমাকে দেখতে চেয়েছেন, নিয়ে যেতেই হবে তাঁর সামনে।

মিট্টি আবদাল্লা বলে, আমার কেমন ভয় ভয় করছে, দোস্ত। হাজার হলেও সুলতান তো। খেয়ালী মানুষ, যদি মেজাজ মর্জি ভালো থাকে, কথা নাই। কিন্তু যদি প্রথম দর্শনেই তাঁর খারাপ লাগে তবে আমার গর্দান থাকবে তো?

দরিয়া বলে, তোমার কোন ভয় নাই, ভাই। আমি তো তোমার সঙ্গে থাকবো। যদি কোনও বিপদ ঘটে, আমি বাঁচাবো তোমাকে।

আবদাল্লা বলে, সবই খোদা ভরসা। তিনি যদি রাখেন তবেই বাঁচবো। ঠিক আছে, চলো তাঁর দরবারে।

আবদাল্লাকে দেখা মাত্র উৎসুক আর আনন্দে হেসে গড়িয়ে পড়ে সুলতান। হাসির হুল্লোড়ে সিংহাসনটা জলের তলায় তলিয়ে যায় বার বার।

—ইয়া আল্লাহ, এ যে দেখছি, ল্যাজ হীন মানুষ! কী হে, কী ব্যাপার? তোমার ল্যাজ নাই কেন? চলাফেরা কর কী করে?

আবদাল্লা বলে, আমি জানি না। পা দিয়েই আমরা চলি। আমাদের দেশের কোন মানুষেরই লেজ নাই। সকলেরই আমার মতো পা আছে।

সুলতান জিজ্ঞেস করে, তোমাদের পিছনের ওই ভারী বস্তুটি কী?

আবদাল্লা বলে, কেউ বলে পাছা, কেউ গলে নিতম্ব।

—কী কাজে দরকার হয়?

—বাঃ, পাছা না থাকলে বসবো কী করে? অবশ্য এই পাছা মেয়েদের অঙ্গ শোভাও বটে। ভারী নিতম্বগুওলা মেয়েদের কদর বেশি।

—আর তোমাদের ঐ সামনের বস্তুটি কী? কী কাজেই বা লাগে?

আবদাল্লা সলজ্জ কণ্ঠে বলে, এটা পুরুসাঙ্গ-লিঙ্গ। মানুষের জীবনের এ বস্তু একাধিক কাজে দরকার হয়। কিন্তু মহামান্য সুলতানের সামনে সে-সব কথা আমি বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি। তবে এইটুকু জেনে রাখুন জাঁহাপনা, মানব-সভ্যতার মূলসূত্র এই লিঙ্গ। এর দ্বারা আমরা বংশ বৃদ্ধি করে টিকে আছি।

আবদাল্লার কথা শুনে সুলতান এবং দরবার-শুদ্ধ সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।

আবদাল্লা হতচকিত মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পনেরোতম রজনী আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সুলতান প্রীত হয়ে মিট্টি আবদাল্লাকে বলে, শোনো ল্যাজহীন, তোমার পাছাটা দেখে আমি বড় খুশি হয়েছি। তোমাকে আমি পুরস্কার দিতে চাই। বলো, কী তোমার বাসনা—কী নিতে চাও?

আবদাল্লা বলে, জাঁহাপনা, দুটি বস্তু আমার কাম্য। প্রথমত, আমি ফিরে যেতে চাই আমার দেশে এবং যাওয়ার সময় নিয়ে যেতে চাই কিছু জহরত।

দরিয়া আবদাল্লা বলে, জাঁহাপনা, আমার বন্ধুটি এখানে আসার পর থেকে কিছুই আহার করে নি! -আমাদের প্রিয় খাদ্য কাঁচা মাছ ওরা খেতে পারে না। সেই কারণে ওকে এখুনি সমুদ্রের ওপরে ফিরিয়ে দিয়ে আসা দরকার।

সুলতান বললো, ঠিক আছে। যতটা চায় হীরে জহরত দিয়ে ওকে ওপরে রেখে এসো।

সুলতানের লোকজন নানা বর্ণের বহুবিচিত্র অমূল্য মণিমাণিক্য এনে হাজির করলো তখুনি।

সুলতান বলে, যত পার, নিয়ে যাও। কিন্তু নেবে কিসে?

দরিয়া আবদাল্লা সেই ফলের ঝুড়িটা নিয়ে এসে এক ঝুড়ি বোঝাই করে নিলো সেই হীরে চুনি পান্না মুক্তো, মণি ইত্যাদি। তারপরে মিট্টিকে সঙ্গে করে সোঁ সোঁ করে অনন্ত জলরাশি ভেদ করে ওপরে উঠে এলো।

সমুদ্রসৈকতে তুলে দিয়ে দরিয়া আবদাল্লা বললো, তা হলে এবার আমি চলি ভাই।

বালির ওপরে বসে রইলো আবদাল্লা। একটানা অনেক পথ সাঁতার কেটে ওঠার পর হাঁফ ধরে গেছে তার। বেশ কিছুক্ষণ পৃথিবীর মুক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তারপর জহরতের ঝুড়িটা মাথায় তুলে শহরের পথে হেঁটে চললো।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, এবং দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো দেখে সুলতান চিন্তিত হলেন। হয়তো জামাতার কোনও বিপদ ঘটে থাকতে পারে। তন্দুরী উজিরকে বললেন তিনি, এতো দেরি তো তার কোনও দিন হয় না, উজির। আমার লোকজন সঙ্গে নিয়ে তুমি সমুদ্রের ধারটা দেখে এস তো।

—জো হুকুম, জাঁহাপনা।

জনা কয়েক নফর চাকর সঙ্গে নিয়ে তন্দুরী আবদাল্লা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে দেখা হয়ে গেলো মিট্টি আবদাল্লার সঙ্গে।

—কী ব্যাপার দোস্ত! আজ এতো দেরি? আমরা তো ভাবনায় মরি।

জহরতের ঝুড়ি একটা নফরের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে মিট্টি বলে, আর বলো কেন, আমার দোস্ত আজ নিয়ে গিয়েছিলো তার ঘরবাড়ি শহর মুলুক দেখাতে।

—সে কী পানির তলায়? গেলে কেমন করে? দম বন্ধ হয়ে গেলো না?

আবদাল্লা বলে, না। সব বলবো, চলো আগে প্রাসাদে যাই।

প্রাসাদে পৌঁছে সুলতান এবং অন্যান্যদের সামনে তার সমুদ্র তলদেশের সেই বিচিত্র অভিযানের কাহিনী সবিস্তারে শোনালো সে। এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

যদিও মুগ্ধ বিস্ময়ে সব শুনলেন সুলতান, কিন্তু বার বার মাথা নেড়ে বললেন, কাজটা তুমি আদৌ ভালো কর নি, বেটা। পানির তলায় মানুষ যায় কখনও? ভবিষ্যতে আর ককখনো যাবে না। —এই আমার ইচ্ছা। এরপর থেকে, তুমি আমার জামাতা এবং মান্যবর উজির হয়ে ঝুড়ি মাথায় করে নগণ্য এক কুলিমজুরের মতো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে, তাও আমি চাই না। ধন-দৌলতের প্রয়োজন আছে মানি, কিন্তু সব আগে মান ইজ্জত। এখন আর তোমার ঐ কাজ সাজে না। পাঁচজন পাঁচরকম কথা বলছে তোমাকে নিয়ে। সবই আমার কানে আসে। যাইহোক, ধন-দৌলত অনেক হয়ে গেছে, আর তোমার সমুদ্র-সৈকতে যাওয়ার কোনও দরকার নাই।

সুলতানের আদেশ অমান্য করতে পারলো না আবদাল্লা। সেই তার শেষ। আর কোনও দিন সে সমুদ্র উপকূলে যায় নি তার দোস্ত দরিয়ার সঙ্গে দেখা করতে।

জানি না, দরিয়া এতো ক্ষুব্ধ হয়েছিলো কি না, ভেবেছিলো কি না—মাটির মানুষেরা কী সবাই এইভাবে কসম খাওয়া কথার খেলাপ করে?

শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে সুলতান শাহরিয়ার-এর দিকে তাকায়।

—বাঃ বেড়ে মজার কিসসা শোনালে শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ বলে, এবার শুনুন, পীতাম্বর যুবকের কাহিনী।

সে বলতে থাকে ঃ

একদিন রাত্রে খলিফা হারুন অল রসিদ তার উজির জাফর, উজির অল ফজল, আবু ইশাক, কবি আবু নবাস এবং দেহরক্ষী মাসরুর হাবিলদার আহমদকে সঙ্গে নিয়ে সওদাগরের ছদ্মবেশে প্রাসাদ ছেড়ে পথে বের হলেন। খলিফা অনিদ্রা রোগে ভুগছেন। সারাদিন কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েও রাতে তাঁর ঘুম আসে না। উজির জাফরের পরামর্শেই তিনি টাইগ্রিসের দিকে চললেন, জাফর বলেছিলো, মনের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নৌকাবিহার বড় চমৎকার।

টাইগ্রীসের উপকূলে এসে ওঁরা একখানা নৌকা ভাড়া করে চেপে বসেন। রাত্রিকালে টাইগ্রিসের শোভা বড়ই মনোহর। মাথার ওপর চাঁদ ঝুলছিলো, মৃদুমন্দ সমীরণ বইছিলো। দূরে মাঝিরা দেহাতী গান ধরেছিলো। নৌকা চলতে থাকে।

এক সময় নদী-তীরবর্তী এক প্রাসাদোপম ইমারতের কাছে এসে পড়েন ওঁরা। খলিফা কান পেতে শোনেন, ঐ বাড়িটার ভেতর থেকে এক সুমধুর সঙ্গীত ভেসে আসছে। জাফরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শুনতে পাচ্ছ?

জাফর বলে, বড় মিঠে গলা, জাঁহাপনা। এমন গান কখনও শুনিনি!

খলিফা বলে নৌকা ভেড়াও। দেখতে হবে কে গাইছে। এমন ভাল গান দূর থেকে শুনে কী আশ মেটে। যে ভাবেই হোক অন্দরে ঢুকতে হবে।

রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ষোলতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

—জাফর, খলিফা বলেন, আমরা পরদেশী মুসাফির—এই বলে গৃহস্বামীর আতিথ্য নিতে হবে। বাড়ির ভিতরে না ঢুকতে পারলে এমন মধুর সঙ্গীত ভালো করে উপভোগ করা যাবে না।

নৌকা থামলে ওরা সকলে নেমে বাড়িটার দরজার সামনে দাঁড়ালেন। কড়া নাড়তেই এক খোজা প্রহরী এসে দরজা খুলে দিলো।

—কাকে চান, জনাব?

জাফর বলে, আমরা পরদেশী মুসাফির। আজকের রাতের মতো মাথা গোজার একটু আস্তানা চাই।

—আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি খবর দিচ্ছি।

খোজাটা অদৃশ্য হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামী এসে দাঁড়ালো দরজার সামনে।

—আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক, জনাব। আমার কী পরম সৌভাগ্য, আমার বাড়িতে পায়ের ধুলে দিতে এসেছেন আপনারা। এ ঘর-দোর আপনাদের নিজেদের মনে করে ভিতরে আসুন জনাব।

এক প্রশস্ত কক্ষ। সেখানে নিয়ে গিয়ে গৃহস্বামী যুক্তকরে বললো, মেহেরবানী করে আসন নিন।

ঘরখানা অতি মুল্যাবান আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো। দেওয়াল ও ছাদে শিল্পীর তুলিতে আঁকা নানা ছাঁদের সুন্দর সুন্দর কারুকার্য। ঘরের ঠিক মাঝখানে স্ফটিকের চৌবাচ্চার মধ্যে বসানো একটা জলের ফোয়ারা। বিরাম-বিহীন ধারা বর্ষণ করে চলেছে। এবং তারই ফলে সারা ঘরটায় সুখদায়ক শীতলতা ছড়িয়ে পড়েছে।

গৃহস্বামী সবিনয়ে বললো, আপনাদের কে কী মর্যাদার মানুষ আমি জানি না। তাই, সকলকেই আমি সমান সম্মান দেখাচ্ছি। ঘরে অনেক প্রকারের আসন কুর্শি কেদারা আছে। আপনারা যে যেখানে বসতে ইচ্ছা করেন বসুন।

এরপর সে ঘরের অপর প্রান্তে চোখ রাখলো। সেখানে একশোটি সোনার কুর্শিতে একশোটি সুন্দরী তরুণী আসীন ছিলো। হাতের ইশারা করতেই ওরা এক এক করে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। এবং দ্বিতীয় সঙ্কেত করতে নফররা কারুকার্য করা একখানা কাপড় বিছিয়ে দিলো পাশের মেজ-এ। তারপর এক এক করে সুগন্ধী খানাপিনা এনে সাজিয়ে দিলো।

গৃহস্বামীর অনুরোধে ওরা সকলে বসে আহার করলো। মুখ-হাত ধোয়া শেষ হলে এবার গৃহস্বামী বললো, আপনারা আজ রাতে আমার ঘরে মহামান্য অতিথি। অনুগ্রহ করে বলুন, কী ভাবে আপনাদের তুষ্ট করতে পারি। আপনাদের যা অভিরুচি ফরমাইশ করুন; আমি পূরণ করার কৌশিস করবো।

জাফর বলে, আমরা যখন নদীর ঘাটে নৌকা ভেড়ালাম তখন এক সুন্দর সঙ্গীতের রেশ আমাদের কানে ভেসে আসছিলো। এবং আপনার এই ইমারত থেকেই আসছিলো বুঝতে পারলাম। যদি কোনও অসুবিধা না থাকে তবে ঐ গান আমাদের একবার শোনান, জনাব।

গৃহস্বামী বললেন, অনেক ধন্যবাদ। এখুনি শোনাচ্ছি আপনাদের।

পাশের একটি নফরকে বললো তোমার মালকিনকে গিয়ে বলো, মেহেমানরা তাঁর গান শুনতে চাইছেন।

ঘরের শেষ প্রান্তে দামী পর্দা টাঙানো ছিলো। তার ওপার থেকে গৃহস্বামীর বিবি উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানালো। একটু পরে সে গাইতে শুরু করলো। কী সে অপূর্ব গান। যেমন কথা তেমনি তার সুরেলা কণ্ঠ। সারা ঘরময় কান্নার বেদনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

খালিফা মুগ্ধ হয়ে আবু ইশাককে বলেন, ইয়া আল্লাহ, এমন গান আমি কখনও শুনিনি, ইশাক।

তারপর গৃহস্বামীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, মনে হয় গায়িকা তার প্রিয়তমের বিরহে একেবারে মুহ্যমান হয়ে গেছেন। গানের ভাষা ও সুরে তারই করুণ বেদনা ঝরে ঝড়ছে।

গৃহস্বামী বললেন, জী না সাহেব, আপনার এ অনুমান ঠিক না, তবে আপনজন—তার মা এবং বাবার বিয়োগের ব্যথা তাকে মথিত করে ফেলেছে। যখনই তাদের কথা মনে পড়ে সে এই ধরনের করুণ সুরের গান গায়।

খালিফা এই প্রথম গৃহস্বামীর দিকে ভালো করে তাকালেন। বয়সে সে যুবক। সুন্দর চেহারা। কিন্তু সারা মুখে এক বিষাদের ছাপ। যেন মনে হয়, দেহের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ। পীতাভ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সারা মুখ। যুবককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা বিদেশী, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারের কোনও কথা জানতে চাওয়া বোধহয় সঙ্গত হবে না, তবু বলছি, যদি আপত্তি না থাকে তবে বলুন, মুখের যে এই পীতাভ ফ্যাকাশে রং একি আপনার জন্মগত, না অন্য কোনও কারণে হয়েছে।

যুবক বললো, না, বলতে কোনও বাধা নেই। সে এক বড় বিচিত্র কাহিনী। আপনাদের যদি শোনার ধৈর্য থাকে, আমি শোনাতে পারি।

—আমরা সবাই উন্মুখ হয়ে আছি। আপনি বলুন।

এই সময় রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সতেরোতম রজনী।

আবার গল্প শুরু করে সে ঃ

—তাহলে শুনুন মালিক, আমার মাতৃভূমি উমান মুলুকে এক সময়ে আমার বাবা উমান শহরের নামজাদা সওদাগর ছিলেন। জাহাজের ব্যবসা ছিলো তাঁর। নানা দেশের বন্দরে বন্দরে ভাড়া খেটে ঘুরে বেড়াতো সেগুলো। ত্রিশখানা জাহাজ। এর বাৎসরিক আয় ছিলো প্রায় তিরিশ হাজার দিনার।

বাবা খুব শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। সে-কারণে আমাকেও তিনি যথেষ্টই পড়াশুনা শিখিয়েছিলেন। জীবনের শেষ সময়ে বাবা আমাকে কিছু মুল্যবান উপদেশ দিয়ে যান। আমি শ্রদ্ধাভরে সেগুলো শুনেছিলাম সেদিন। এরপর আল্লাহ তাঁকে কোলে টেনে নিলেন।

বাবার মৃত্যুর পর আমি ইয়ার দোস্ত পরিবৃত হয়ে (তখন আমার অনেক টাকা কড়ি সুতরাং তাঁবেদারদের অভাব ছিলো না) একদিন বসে আছি এমন সময় অসময়ের ফলভর্তি একটা ঝুড়ি নিয়ে এসে হাজির হলো জাহাজের এক কাপ্তান। ফলগলো সত্যিই খুব সুন্দর এবং দুষ্প্রাপ্যও বটে। আমি ওকে একশো দিনার বকশিশ দিলাম। ইয়ার বন্ধুদের মধ্যে ফলগুলো বিলিয়ে দিতে দিতে কাপ্তানকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথা থেকে এনেছ এই অকালের ফলগুলো। এখন তো আমাদের দেশে এসব পাওয়া যায় না।

কাপ্তান বলে, আমি সদ্য বসরাহ এবং বাগদাদ থেকে ফিরছি। ওখানকার বাজার থেকে সংগ্রহ করেছি। সাধারণ মানুষ এ ফল খেতে পারে না। সুলতান বাদশাহদের জন্য বিক্রি হয়।

আমার বন্ধু-বান্ধবরা বসরাহ আর বাগদাদের গুণগানে মুখর হয়ে উঠলো। সেখানকার মানুষ, তাদের আচার ব্যবহার, সভ্যতা ভদ্রতা নাকি অপরূপ। এক একজন এক-একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এমন সব সুন্দর সুন্দর কাহিনী শোনাতে থাকলো যে আমি বড়ই চমৎকৃত হলাম। আমার মনে দেশ ভ্রমণের বাসনা জেগে উঠলো। বিশেষ করে বসরাহ এবং বাগদাদ আমাকে দেখতেই হবে।

আমি আমার বিষয়-সম্পত্তি প্রায় জলের দরেই বেচে দিলাম। যত দাসী বাঁদী ছিলো তাও বেচলাম। একখানা মাত্র জাহাজ রেখে বাকীগুলো বেচে হাজার হাজার দিনার হাতে পেলাম। বেচলাম না শুধু আমার হীরে জহরত এবং সোনাদানাগুলো। তারপর দিনক্ষণ দেখে আমার সেই একমাত্র জাহাজখানায় চেপে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে পড়লাম।

আল্লাহ সহায় ছিলেন। পথে কোনও বিপদ হলো না। কয়েকদিন পরে নিরাপদে এসে পৌঁছলাম বসরাহর বন্দরে। সেখান থেকে একখানা ছোট নৌকা করে চলে এলাম বাগদাদে।

আমার বন্ধুদের মুখে শুনেছিলাম বাগদাদের কারখ্ অঞ্চলে বিত্তশালীরা বাস করে। সেখানে একখানা বিরাট বাড়ি ভাড়া করে নিলাম। আমার বাড়িটা ছিলো ঠিক জাফরান পথের ওপর।

সেদিন জুম্মাবার ছিলো। আমি সদ্য শহরে এসেছি। শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখছি। বেড়াতে বেড়াতে এক সময় আমি টাইগ্রিসের উপকূলে এসে পড়লাম। সেখানে দেখি, একখানা বিরাট বাড়ির বাইরের বারান্দায় অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলে এক পলিত-কেশ বৃদ্ধকে ঘিরে বসে আছে। আরও কাছে যেতে বুঝলাম তিনি কিস্‌সা শোনাচ্ছেন ছেলেদের। পরে জেনেছিলাম এই বৃদ্ধের নাম তাহির ইবন অল আলা। ছোটদের বন্ধু নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ছোট ছোট ছেলেদের তিনি খুব পেয়ার করেন। মজার মজার কাহিনী শোনান। নানারকম ফলমুল, মেঠাই-মণ্ডা খেতে দেন।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আঠারোতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি বৃদ্ধের কথাবার্তা শুনতে থাকলাম! বড় মজার মানুষ। তার গল্প বলার কায়দা ভারি অদ্ভুত। শুনতে শুনতে সব কিছু ভুলে যেতে হয়। সেই মুহূর্তে মনে হলো, আমার বাগদাদে আসা সার্থক হয়েছে।

বারান্দার ওপরে উঠে গিয়ে বৃদ্ধকে সালাম জানাতে তিনি আমাকে বসতে বললেন, সবিনয়ে বললাম, জনাব আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। আজ রাতটা যদি আপনার এখানেই কাটাই—

তিনি খুশি হয়ে বললেন, এতো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। বেশ তো থাকুন। খানাপিনা করুন। আমার এখানে অনেক রকম সুন্দর সুন্দর বাঁদী আছে। দশ বিশ পঞ্চাশ এমন কি একশো দিনারের মেয়েও আছে। আপনার যাকে পছন্দ সঙ্গী করে নিতে পারেন।

আমি বললাম, আমাকে একটা দশ দিনারের বাঁদী দিন। এই নিন একমাসের টাকা আগাম তিনশো দিনার।

বৃদ্ধের হাতে দিনারগুলো তুলে দিতে তিনি নিক্তি দিয়ে ওজন করে একটি ছেলেকে বললেন, সাহেবকে হামামে নিয়ে যাও। খুব ভালো করে গোসল করাও।

ঘষে মেজে গোসল করে আসার পর বৃদ্ধ আমাকে সঙ্গে করে একটা ঘরে নিয়ে গেলো। সেখানে একটি মেয়ে বসেছিলো। বৃদ্ধ তাদের সামনে আমাকে দেখিয়ে বললো, এই তোমার নতুন মেহেমান রেখে গেলাম।

তিনি চলে গেলেন। ভালো করে দেখলাম, মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। ওর লাবণ্য-লাস্য আমকে মুগ্ধ করলো।

সে আমাকে বসতে বললো। আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। একটা মেজেয় সাজানো ছিলো নানারকম সুন্দর সুন্দর খানাপিনা।

দু'জনে মিলে আহারপর্ব সমাধা করলাম। তারপর সে আমাকে শরাবের পেয়ালা পূর্ণ করে দিলো। সেই রাতে সুরা এবং নারী-সুধা পান করলাম আকণ্ঠ। মেয়েটি কায়দা-কানুন জানে, আমাকে অমৃতের সায়রে ভাসিয়ে রাখলো সারাটা রাত।

শুধু সেই একটা রাত্রিই নয় পর পর তিরিশটা রাত্রির সহচরী, শয্যা-সঙ্গিনী হয়ে আমাকে অনেক আনন্দ উজাড় করে দিলো সে। সুখের সময়গুলো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। একটা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেলো বুঝতেই পারলাম না। মনে হলো শুধুমাত্র একটা রাতই অতিবাহিত করেছি আমি।

ঠিক তিরিশটা রাত্রি কাটার পর একটি চাকর এসে আমাকে হামামে নিয়ে গেলো। গোসলাদি করার পর সে নিয়ে এলো আমাকে সেই বৃদ্ধের কাছে।

আমি বললাম, মালিক বড় আনন্দ পেয়েছি একটা মাস। এবার আপনি আমাকে কুড়ি দিনারের একটা মেয়ে দিন।

বৃদ্ধ হাত বাড়ালেন। আমি এক মাসের ভাড়া ছ'শ দিনার তার হাতে তুলে দিলাম। যথারীতি নিক্তিতে ওজন করলেন তিনি।

তিনি অন্য একটা ছেলেকে বললেন, যাও সাহেবকে নিয়ে যাও।

অন্য একটা ঘরে এসে দাঁড়ালাম। ঘরের মাঝখানে দুগ্ধ-ফেননিভ পালঙ্ক-শয্যা। তার চারপাশে চারটি দাসী দণ্ডায়মান। আমাকে বসতে বলে তারা পাশের ঘরে চলে গেলো। একটু পরে দেখলাম, এক খ্রীস্টান সুন্দরী এসে দাঁড়ালো আমার পাশে। আগের মেয়েটির চেয়ে অনেক সুন্দর দেখতে। সাজ-পোশাকের বাহারও অনেক বেশি তার। সে আমার একখানা হাত ধরে পালঙ্কে বসালো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো উনিশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

সে আমাকে সোহাগ জানিয়ে বললো, সাহেবের এমন সুন্দর রূপ, তা এই ভাড়া করা মেয়ের দরকার হলো কেন? তোমাকে দেখে যে-কোনও মেয়েরই তো জিভে জল আসার কথা! যাই হোক, খানাপিনা তৈরি, চলো খেয়ে নিই আগে।

দু'জনে তৃপ্তি করে খেলাম। খাবারের শেষে সুরা-সাধনা চলতে থাকলো। রাত বাড়ে। নেশাও বাড়তে থাকে। রক্ত নেচে ওঠে। আমরা শুয়ে শুয়ে অমৃতলোকে পাড়ি জমাই।

ভালো লাগে। বড় ভালো লাগে। অবশ্য এজন্য মেয়েটিই দায়ী। কী করে ভালো লাগাতে হয় সে বিদ্যা তার বেশ ভালো রকমই জানা আছে।

সারাটা মাস কেটে গেলো। আমি অনেক পেলাম। কিন্তু মনে হতে লাগলো, আরও চাই, আরও। আমার ক্ষুধার বুঝি শেষ নাই।

যথারীতি আবার চাকরটা এসে আমাকে হামামে নিয়ে গেলো, হামাম থেকে আবার সেই বৃদ্ধের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আমি বললাম, অনেক আনন্দ পেয়েছি। আমার ইচ্ছা, বাকী জীবনটা আমি আপনার আনন্দ-গৃহেই কাটিয়ে দিই।

বৃদ্ধ বললেন উত্তম কথা। আজ রাতে আমাদের এই বাড়িতে এক সুন্দর উৎসব অনুষ্ঠান হবে। আপনি আমাদের মহামান্য অতিথি। আপনাকে এই উৎসবে যোগ দিতে অনুরোধ করছি। সন্ধ্যাবেলায় আপনি এসে সোজা-ছাদের ওপরে চলে যাবেন। সেখানেই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

সেদিন ছাদের ওপরটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছিলো। ছাদের মাঝখানটায় একখানা মখমলের পর্দা খাটিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত করা হয়েছে। পর্দার ওপারে, দেখলাম এক তরুণ আর এক তরুণী গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে শায়িত।

পাতলা পর্দার বাধা থাকলেও মেয়েটির অসাধারণ রূপ-লাবণ্য আন্দাজ করতে অসুবিধা হলো না। এমন আলোক-সামান্যা রূপবতী নারী আমি জীবনে দেখিনি কখনও। বুকের মধ্যে কামনার আগুন দাড় দাউ করে উঠলো। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। গত একটা মাস যে মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়েছিলাম তার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, ছাদের ওপরে যাকে দেখে এলাম, সে কে?

মেয়েটি মুচকী হেসে বলে, কেন, খুব বুঝি মনে ধরেছে? তা তো ধরবেই। তার মতো খুবসুরত মেয়ে তো তামাম আরবে নাই। সে-ই আমাদের মধ্যমণি। তার রূপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কত সুলতান ও বাদশাহর ছেলে। তুমিও কী হাত বাড়াবে নাকি?

আমি বলি, ক্ষতি কী?

—না বিশেষ আর কী ক্ষতি। মাত্র পাঁচশো দিনার—এক রাতের ভাড়া।

মেয়েটি মুখ টিপে হাসে, ভালো করেই টোপ গিলেছ দেখছি। যাক কাল সন্ধ্যায় মালকড়ি নিয়ে এসো। সে তোমার বাঁদী হবে বৈকি।

পরদিন শাহজাদাদের জমকালো সাজ-পোশাকে সেজেগুজে এসে দাঁড়ালাম বৃদ্ধের সামনে। দিনারের একটা থলে বাড়িয়ে দিলাম তার হাতে।

—পনের হাজার আছে। এক মাসের ভাড়া।

বৃদ্ধ ওজন করে দেখে নিলো। তারপর একটি ছোকরাকে বললো, সাহেবকে নিয়ে যা।

ছেলেটি আমাকে একখানা প্রশস্ত কামরায় নিয়ে এসে বললো, আপনি এখানে বসুন।

ছেলেটি বেরিয়ে যেতে পাশের ঘর থেকে দু'জন বাঁদী এসে আমাকে বললো, মেহেরবানী করে আমাদের সঙ্গে আসুন।

পাশের ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম। এমন মূল্যবান গালিচা পর্দা, আসবাবপত্র আমি জীবনে কখনও দেখিনি। আর কী সুন্দর করে সব সাজানো গোছানো! দেওয়ালে দেওয়ালে নামী শিল্পীর আঁকা নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী। জীবন সার্থক হয়ে গেলো আমার।

ঘরের এক পাশে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিলো সে। তার মাথা এবং পায়ের কাছে বাঁদীরা চামর দোলাচ্ছিল। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি তাকে, তার রূপ-যৌবন, লাস্যকে।

—আসুন আসুন, মালিক। আপনার পথ চেয়েই বসে আছি আমি।

যেন কেউ সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে উঠলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলাম, মেয়েটি দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে আহ্বান করছে।

—আসুন, বাঁদী আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত মালিক।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো কুড়িতম রজনী । আবার সে বলতে থাকে ঃ

তার রূপের বর্ণনা দেব, সে ভাষা আমার নাই। তবে এইটুকু শুনে রাখুন, বেহেস্তের ডানাকাটা হুরী পরী সে। রূপবতী সুন্দরী নারী আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এ মেয়ের সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। কবিরা হয়তো তাকে নিয়ে অনেক কাব্যগাথা রচনা করতে পারতেন, কিন্তু আমি এক সাধারণ মানুষ, সে ভাষা কোথায় পাবো। তবু বলবো, দুনিয়ার সেরা শিল্পীরও সাধ্য নাই তার মতো সুন্দরীর ছবি আঁকতে পারে।

সেই রাতে আমাকে সে অনেক সুমধুর গান শোনালো। সে গানের মিঠে সুর আজও আমার কানে বাজে। হৃদয়ের রক্তে, রন্ধ্রে অনুরণন তোলে।

শরাবের নেশায় পাগল হলাম, কিম্বা তার রূপের নেশায়, ঠিক বলতে পারবো না। তবে সে নেশার ঘোর আমার সারাটা মাস আর কাটলো না।

মাসান্তে আমার ডাক পড়লো। বৃদ্ধের সামনে নিয়ে গেলো নফর। আমি বললাম, আমার সব কিছু পাওয়া হয় নি, শেখসাহেব। আমি আরও কিছুকাল কাটাতে চাই তাকে নিয়ে।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, এ তো বড় শুভ সংবাদ। তা টাকাটা আগাম যে চাই মালিক।

আমি লজ্জিত হয়ে বলি, একশো বার। এক্ষুণি আমি বাসায় গিয়ে নিয়ে এসে দিচ্ছি আপনাকে।

আরও পনের হাজার দিনার এনে দিলাম বৃদ্ধের হাতে। একটা মাস পরে আবার নফর এসে দাঁড়ায়। আমি তখন আরও বেশি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

আবার বৃদ্ধকে এনে দিলাম পনের হাজার দিনার। আর এক মাসের ভাড়া।

এইভাবে মাসের পর মাস চলে গেলো। সেই সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেলো আমার সমস্ত সঞ্চিত ধন। উমান থেকে যা কিছু এনেছিলাম সব শেষ হয়ে গেলো একদিন।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো একুশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

আমি কপর্দক শূন্য হয়ে চোখের পানি ফেলতে থাকি। আমাকে কাঁদতে দেখে মেয়েটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, মালিক, তোমার চোখে পানি কেন? কী হয়েছে?

আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। দু হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠি, আমার আর কিছু নাই, সোনা। সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি পথের ভিখারি। পয়সা নাই সে জন্য আমার এক বিন্দু দুঃখ নাই মণি। শুধু এই ভেবে সারা হচ্ছি, তোমার সঙ্গ ছেড়ে আমাকে সরে যেতে হবে। তোমাকে না দেখে, আমি বাঁচবো কী করে?

মেয়েটি বলে, এর আগে একটা খদ্দেরেরও পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিলো। আমাকে নিয়ে সে অনেকদিন কাটাবার পর তারও বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি সব শেষ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমার বাবা বড় ভালো মানুষ। তিনি বিনি পয়সায় আরও তিনটে দিন কাটাতে দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। তোমাকেও তিনি নিশ্চয় সেই কথাই বলবেন। কিন্তু প্রিয়তম, তুমি যেমন আমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না, আমিও তেমনি তোমার অদর্শন সইতে পারবো

না। যে-ভাবেই হোক আমি একটা ফিকির বের করবো। যাতে তুমি আমি একসঙ্গেই সারাজীবন কাটাতে পারি তার একটা ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। যাক, ও নিয়ে তুমি কোনও দুর্ভাবনা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। দরকার হলে আমার নিজের ভবিষ্যৎ আমিই নির্ধারণ করবো। বাবার কিছু বলার নাই, আমি বড় হয়েছি এখন। আমার স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরার অধিকার আছে। তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। আমি তোমাকে পাঁচশো দিনার দিচ্ছি। এটা নিয়ে গিয়ে তুমি বাবাকে দিয়ে বলো, এখন থেকে রোজকার পয়সা রোজ দেবে। তাতেও তিনি 'না' করবেন না। আজ তুমি যে টাকাটা বাবার হাতে দিয়ে আসবে সেই টাকাটা তিনি আমাকে দেবেন। আগামীকাল আবার সেই টাকাটা নিয়ে গিয়ে বাবাকে দিও। এইভাবে চলতে থাকলে বাবা বুঝতে পারবেন না। তোমারও আর থাকার কোনও অসুবিধা ঘটবে না।

মেয়েটির এই আশ্চর্য ফন্দীতে একটা বছর ওকে নিয়ে দিব্যি আনন্দে কাটালাম। কিন্তু নসীবে সুখ চিরকাল থাকে না কারো। মেয়েটি একদিন রাগের মাথায় তার দাসীকে একটা থাপ্পড় মেরে বসলো। আর সেই হলো আমার কাল। জব্দ করার জন্য সে বৃদ্ধের কাছে গিয়ে আসল কথা সব ফাঁস করে দিলো।

মেয়ের বাবা তো ক্ষেপে আগুন। তিনি শুধু মারতেই বাকী রাখলেন। ঠগ জোচ্চোর প্রতারক নানারকম বিশেষণে ভূষিত করলেন আমাকে।

—আপনার মতো এই রকম জালিয়াত ঠগ আমি কম দেখেছি। আমার নিয়ম আছে পয়সা ফুরিয়ে গেলে তিনটি দিন আমি তাকে বিনি পয়সায় থাকতে দিই।

কিন্তু আপনি আমাকে ধোঁকা দিয়ে মেয়ের সঙ্গে সাট করে গোটা একটা বছর কাটিয়েছেন। আর নয়, এবার মানে মানে কেটে পড়ুন। আমার এখানে কোনও জায়গা হবে না। শুধু এখানে কেন, এই বাগদাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে আপনাকে, এবং আজই। নইলে আপনার লাস টাইগ্রিসে ভাসবে কাল।

বৃদ্ধ আমার দিকে দশটা চাঁদীর দিরহাম ছুঁড়ে দিলো। এই নিন রাহাখরচ। আধঘণ্টার মধ্যে বাগদাদের সীমানা ছেড়ে চলে যান।

উমানের সওদাগর-সম্রাটের পুত্র আমি। একদিন কয়েক লক্ষ দিনারের মালিক ছিলাম। আর আজ পথের ভিখারী। কী খাব কোথায় যাব কিছুই জানি না।.

হাঁটতে হাঁটতে একদিন বসরাহ এসে পৌঁছলাম। খিদেয় পেট জ্বলছিলো। অথচ ট্যাঁকে কানা-কড়ি নাই। চেয়ে-চিন্তে কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা, সেই আশায় বাজারের দিকে চলেছি, হঠাৎ চমকে উঠলাম। পিছন থেকে কে যেন আমার কাঁধে হাত রেখেছে। ফিরে দেখি আমার দেশ উমানের এক সওদাগর। বাবার দোকানের কর্মচারী ছিলো এক সময়। এখন নিজেই ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ পয়সা করেছে।

—আরে, মালিক আপনি এখানে?

—আর মালিক। কে যে কখন বাদশাহ আর কে যে কখন ফকির হয় কে বলতে পারে।

আমার এই ধরনের দার্শনিক কথার মর্ম উদ্ধার করতে পারলো না সে। বললো, কেন, কী হয়েছে?

আমি তখন আমার সব আনন্দ-দুঃখের কাহিনী খুলে বললাম তাকে।

—আমারর যা ছিলো সবই তুলে দিয়েছি ওই বুড়োর হাতে। সে যে কী পরিমাণ অর্থ নিশ্চয়ই তুমি আন্দাজ করতে পার। ত্রিশখানা জাহাজ বিক্রির টাকা। তাছাড়াও আমার বাড়ি-ঘর জমি-জমা দোকান-পাট বেচেও পেয়েছিলাম অনেক। এর সঙ্গে ছিলো বাবার শখের সম্পত্তি—হীরে জহরত সোনা-দানা। সেও প্রচুর। সব মিলে কয়েক লক্ষ

দিনার। এর একটা পয়সাও আমি অন্য দিকে খরচ করিনি। সবই দিয়েছি ঐ বুড়োকে। তার বিনিময়ে সে আমাকে তার মেয়ের সঙ্গে কাটাতে দিয়েছ কিছুকাল। আজ যখন আমি নিঃশেষ, রিক্ত, তখন সে আমাকে বের করে দিয়েছে। একটা পয়সা নাই যে রুটি সবজী সংগ্রহ করি।

বলতে বলতে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিলো। সে বললো, দুঃখ করে কোনও ফল হবে না মালিক। নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। না ঠেকলে মানুষ শেখে না। তবে অনেক সময় এই শিক্ষালাভের জন্য এতো মূল্য দিতে হয় যে আর টিকে থাকাই দায় হয়। যাক, সামনে চলতে হবে। নতুন করে বাঁচার ধান্দা করতে হবে। যতদিন না সময় সুযোগ হয় আপনি আমার গদিতেই থাকুন। বসরাহর বন্দরে আমি ভূষি-মালের কারবার করি। সারাদিনের কেনা বেচার হিসেবপত্র রাখবেন। তার বদলে খানাপিনা এবং নগদেও কিছু ধরে দেব। আপনি আমার মালিকের সন্তান। অবস্থার ফেরে পড়েছেন। তাই বলে মনে করবেন না আপনাকে কর্মচারী করে রাখতে চাই। আপনি আমার দোকানটা দেখা-শুনা করবেন। তার সম্মান দক্ষিণা হিসাবে সামান্য কিছু দেবো আমি।

মনে সাহস এবং আশা ফিরে পেলাম। যাক, দুনিয়াতে সব মানুষই তবে অকৃতজ্ঞ নয়। এখনও কিছু হৃদয়বান পরোপকারী লোক আছে।

বসরাহর বন্দর বাজারে বছরখানেক কাটে। ইতিমধ্যে শ'খানেক দিনার জমিয়ে ফেলেছি। ভাবলাম, আর এইভাবে বসে বসে সময় নষ্ট করবো না। এই একশো দিনার সম্বল করেই ব্যবসা শুরু করবো।

একদিন বাগদাদের জাহাজে চেপে বসলাম।

জাহাজের পাটাতনে বসে দূর দিগন্ত বিস্তৃত অশান্ত জলরাশির দিকে তাপলকভাবে তাকিয়ে থাকি। জাহাজ চলেছে, যাত্রীর কোলাহল, খালাসীদের ব্যস্ততা সারেঙের হাঁক —কিছুই কানে প্রবেশ করে না। আমি শুধু একা একা বসে অতীতের পাতা ওলটাই। স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাই।

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি পাটাতনের এক পাশে কয়েকজন সওদাগর ঘিরে ধরেছে আর এক সওদাগরকে। সে একটা পোঁটলা খুলে মেলে ধরেছে তাদের সামনে। মুহূর্তে আমার চোখ ঝলসে গেলো। একসঙ্গে এতো চুনী-পান্না মুক্তো প্রবাল, নাগরাজ মণি প্রভৃতি মূল্যবান রত্ন কখনও দেখিনি।

ওদের কথাবার্তা এবং কলকোলাহল থেকে বুঝলাম, সওদাগর সাহেব নানা দেশে ঘুরে স্বদেশে ফিরছেন। অনেক হীরে জহরত বিক্রী করেছেন। শেষে এইটুকু আর বেচা হয় নি। তাই সবাইকে বলছেন, যার দরকার এগুলো নিয়ে নিন, খুব সস্তা দরে দিয়ে দেবো।

কিন্তু মওকা বুঝে সওদাগররা তেমন বড় একটা আগ্রহ দেখাচ্ছিল না। তারা দাঁও খুঁজছিলো। নিশ্চয়ই সে নামবার আগে প্রায় মাটির দরে দিয়ে যাবে।

হয়তো দিতও তাই। কারণ অনেকদিন ঘর ছাড়া। আজ প্রথম পরবাস থেকে নিজের শহরে পা রাখবে সে। ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেও অনেক। লাভের অঙ্কটা নেহাত মন্দ আসে নি। এখন এই সামান্য কটা মাল নিয়ে আর ঝুলে থাকার ইচ্ছে নয় তার। জাহাজ থেকে নামার আগে হাত সাফ করতে চায় সে।

হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়লো সওদাগর সাহেবের। বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে পরিচয় হাতড়াতে লাগলাম।

—আপনি এখানে?

আমি তখনও তাঁকে ঠিক চিনতে পারছি না বুঝে তিনি বললেন, আপনার বাবা উমানের সওদাগরদের বাদশাহ ছিলেন, মালিক। আমি আপনার বাবার কাছে অনেক হীরে জহরত বিক্রী করে এসেছি। বহুত খানদানী বড়া আদমী ছিলেন আপনার বাবা। শুনলাম, তিনি গত হয়েছেন। তা আপনি এখন কোথায় ব্যবসা করেন, মালিক?

আমি বললাম, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু করি না।

—করবারই বা কী দরকার। বাবা যা রেখে গেছেন তা সাতপুরুষে বসে খেলেও ফুরোবে না। এগুলো দেখলেন হুজুর? পছন্দ হয়?

আমি বলি, পছন্দ হলেই বা কী করবো, বলুন। এই দুনিয়াতে আমি এখন মাত্র একশো দিনারের মালিক। তার বেশি এক আধলাও আমার নেই।

সওদাগর অবাক হন। বলেন, সে কি কর্তা? অতবড় বিশাল সম্পত্তি, নষ্ট হলো কিসে?

আমি বললাম, সে অনেক দুঃখ লজ্জার কাহিনী। এতো লোকের সামনে বলি কী করে। আর বলেই বা কী হবে। যা গেছে তা গেছে। ফিরে আসবে না কোনও দিন এবং ও নিয়ে দুঃখও করি না। এখন আমি মাত্র একশোটা দিনার সম্বল করে অনির্দিষ্ট পথে চলেছি। যদি বরাতে কিছু থাকে হবে। না হলে—না হলে আর ভাবি না, যা হয় হবে।

সওদাগর আমার কথায় অভিভূত হয়ে বললেন, এক কালে আপনার বাবার পয়সা বহু লোকে খেয়েছে। আমিও যে তার ভাগ পাইনি তা নয়। যখনই গেছি তার কাছে—শূন্য হাতে ফিরিনি। শৌখিন মানুষ ছিলেন তিনি। ভালো হীরে জহরত মূল্যবান রত্ন কিছু নিয়ে গেলে লুফে নিতেন। দরদাম একদম পছন্দ করতেন না। মুখ ফুটে চাইতে পারলেই হতো। সেই দামই মঞ্জুর করতেন তিনি। তাই বলছিলাম, এক সময়ে আপনাদের অনেক খেয়েছি আজ না হয় আপনার এই অসময়ে তার কিছু ফেরতই দিলাম। আপনি এগুলো নিন মালিক! যদি বরাতে থাকে, যদি তেমন তেমন মক্কেলের দেখা পান এতেই আপনার অনেক হবে।

আমি বললাম, কিন্তু আমি দাম না দিয়ে নেব না। এবং ও-সব জিনিসের দাম আমার কাছে নাই।

সওদাগর নাছোড়াবান্দা। বললেন, ঠিক আছে আপনি ঐ একশো দিনারই দিন আমাকে। ঐ দামেই আপনাকে বেচবো আমি।

তবু আমার মনে হতে লাগলো তিনি আমাকে যেন কৃপা করতে চাইছেন। আমি রাজি হবো কি হবো না ভাবছি। তিনি পুঁটলিটা বেঁধে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, নিন ধরুন। ভাববেন না, আপনাকে আমি দান করে দিলুম। বাজারে দরদাম করে বেচলে হাজারখানেক লাভ করতে পারবেন। সে আর এমন কী। একশো দিনারে মাল কিনে হাজার দিনার কী নাফা হতে পারে না!

আমার দ্বন্দ্ব ঘুঁচে গেলো। তাই তো, ব্যবসাতে এরকম মওকা কখনও আসে বইকি। এবং সে সময়ে হাতগুটিয়ে বসে থাকে নাকি কেউ?

সওদাগরের হাতে আমার পুঁজিটা তুলে দিয়ে রত্নের পুঁটলিটা নিয়ে নিলাম।

এই সময়ে ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তেইশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সেই থেকে আমার ভাগ্যের বিবর্তন শুরু হলো। বাগদাদে এসে আমির অমাত্যদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে অনেক গুলো মাল বিক্রি করতে পারলাম। হাতে কিছু পয়সা হলো।

তখন একটা দোকান ভাড়া করে কেনা-বেচার ব্যবসা শুরু করে দিলাম। দিনের শেষে লাভও থাকলো কিছু কিছু।

আমার রত্নগুলোর মধ্যে অদ্ভুত ধরনের একটা বস্তু ছিলো। সমুদ্রের কোনও ঝিনুক-টিনুক জাতীয় কিছু একটা হবে। দেখতে লাল টুকটুকে। ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় দু'টো চোখ এবং ফড়িং -এর মতো দু'খানা ঠ্যাং আছে তার। যাইহোক, বাজারের অনেককেই দেখালাম। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারলো না। এবং দামও দিতে চাইলো না কিছু। ভেবেছিলাম এক দুই দিনারও যদি পাওয়া যায় বেচে দেব। কিন্তু পনেরো দিরহামের বেশি দাম দিতে চাইলো না কেউ। আমি আর ও নিয়ে সময় নষ্ট করলাম না। দোকানের একটা তাকে ফেলে রাখলাম। থাক, যদি কখনও কারো দরকারে লাগে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে।

একদিন দোকান খুলে আছি, এক পরদেশী এসে ঢুকলো। আমি তাকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, বসুন, মালিক। কী চান বলুন? কী দেব?

আগন্তুক তাক-এ রাখা সেই অদ্ভুত বস্তুটার দিকে তাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, ইয়া আল্লাহ, এতোদিনে পেলাম—

অনেক দিনের অনাদরে অযত্নে পড়ে থাকার জন্য ওটার ওপর ধুলো বালি জমে গিয়েছিলো। লোকটি হাতে তুলে নিয়ে ধুলো ঝেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। আমি ঈষৎ বিরক্ত বোধ করছিলাম। এই সাত সকালে কোথায় ভাবলাম একটা মক্কেল এলো, তা না, যত সব ঝুট ঝামেলা—

লোকটা বললো, কত নেবেন এটা।

আমি বললাম, কত দিতে পারেন?

—কুড়ি দিনার।

একেবারে কু-ড়ি দিনার। আমি ভাবলাম লোকটা রসিকতা করতে ঢুকেছে। রাগ হলো, কিন্তু আমি দোকান খুলে বসেছি। খদ্দেরের সঙ্গে রাগারাগি করা কেতা বিরুদ্ধ। মনের রাগ মনে চেপে নির্লিপ্ত ঠাণ্ডাগলায় বললাম, আপনি আসতে পারেন।

সে কিন্তু অন্যরকম ভাবলো, দামের অঙ্কটা শুনে হয়তো গোসা হয়েছে আমার। তাই আমাকে তোয়াজ করে বললো, আহা রাগ করছেন কেন? আমি খদ্দের, আমার যা ইচ্ছে দাম বলতে পারি। আপনার পোষায় দেবেন, না হলে দেবেন না। এর মধ্যে রাগারাগির কী থাকতে পারে। ঠিক আছে পঞ্চাশ নিন।

এবার নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম। লোকটার তামাশা করার ঢং দেখে রী রী করে জ্বলে উঠলো আমার শরীর। কিন্তু কথা উঠলে রাগের মাথায় কি বলতে কি বলে ফেলবো, তার চাইতে গুম মেরে বসে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলাম। এক-খানা হিসেবের খাতা টেনে নিয়ে সেই দিকে মনোনিবেশ করতে চাইলাম। ভাবলাম এইভাবে ওকে দোকান থেকে বিদায় করবো। কিন্তু তা হলো না! দুম করে সে বললো, একহাজার দিনার, দেবেন?

এবার আমি ওর মুখের দিকে কটমট করে তাকালাম। ইচ্ছে হলো একটা ঘুঁষি মেরে ওর মুখের আদলটা বিগড়ে দিই। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার খাতার দিকে মনোসংযোগ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। লোকটা একটু বেহুদা!

—আহা, আমার কথাটা একটু শুনুন। কী চান বলুন, দুহাজার, তিন হাজার, চার হাজার?

আর একটাও কথা বলার প্রবৃত্তি হলো না আমার। সে এক তরফা বকেই চললো, দশ পনেরো—বিশ হাজার?

একটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, কী ব্যাপার? আপনার মতলব কী? বিক্রি করতে চান, না চান না। সাফ সাফ বলে দিন।

তার চেঁচামেচিতে ততক্ষণে রাস্তার অনেক পথচারী দোকানে উঠে এসে ভিড় জমিয়েছে।

—কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

লোকটা বলে দেখুন, আমি এই জিনিসটা কিনতে চাই। তা নিজে থেকেও উনি দাম বলবেন না। আমি দর দিচ্ছি তাও হ্যাঁ না কোনও জবাব দেবেন না।

একজন বললো, সে কি গো দোকানী, খদ্দেরের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করে নাকি!

আমি দারুণ অস্বস্তিতে পড়লাম। একটা তুচ্ছ কারণে এতো লোক জমায়েত হয়ে গেছে। লোকটা তো মহাশয়তান। আমি বেশ রাগত স্বরেই বললাম। কী ব্যাপার, আপনি সত্যিই কিনতে চান, না মস্করা করছেন?

লোকটাও ঠিক তেমনি ভাবে জবাব দেয়, আপনি সত্যিই বিক্রী করতে চান, না, মস্করা করছেন?

—নিশ্চয়ই বিক্রী করতে চাই।

—তাহলে আমার শেষ কথা শুনুন, আমি এর জন্য ত্রিশ হাজার দিনার দিতে পারি। যদি মনে করে লেনদেন শেষ করে দিতে পারেন।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। চিৎকার করে উপস্থিত লোকদের সাক্ষী মানলাম, আপনারা শুনছেন, শুনছেন তো সব? আমি কিন্তু এক্ষুণি মেনে নেব ওঁর কথা! তখন পিছটান দিলে শুনবো না।

—আমিও শুনবো না। একবার যদি মেনে নেন আমার দাম। দিতে হবে ঐ দামে।

—আলবাৎ দেব। ফেলুন কড়ি।

—ত্রিশ হাজার?

—হ্যাঁ, ত্রিশ হাজারই দেব।

তখন লোকটি উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে বললো, আপনারা সাক্ষী। উনি আমাকে এই জিনিসটা ত্রিশ হাজার দিনারে বিক্রী করছেন। আমি এক্ষুণি দাম মিটিয়ে দিচ্ছি!

এ বলে সে একটা বস্তা এনে আমার সামনে রাখলো।

লেনদেন চুকে গেলো। সেই অদ্ভুত বস্তুটা জেবে ভরলো সে। আমি ত্রিশ হাজার দিনার বাক্সে তুললাম। লোকজন বিদায় নিলো। দোকানের ভিড় পরিষ্কার হয়ে গেলো। কিন্তু লোকটি গেলো না। আমার পাশে এসে বসলো। তারপর করুণা প্রদর্শন করে বললো, আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে। রাগের মাথায় এমন একটা অমূল্য জিনিস এই নামমাত্র দামে বেচে দিলেন? বুঝতে পারছি, আপনি একেবারে অজ্ঞ। জহুরীর ব্যবসাই ফেঁদেছেন! কিন্তু আসল জহরত চিনতে পারেন না।

—মানে?

—মানে আর কিছুই নাই। হাতের মুঠোয় সাতরাজার ধন এসেছিলো। কিন্তু চিনতে পারলেন না? ছাইএর দামে বেচে দিলেন?

—ছাই-এর দামে?

—হ্যাঁ, ছাই-এর দামে। এর দাম মাত্র ত্রিশ হাজার নয়। ত্রিশ লক্ষেও এ বস্তু সংগ্রহ করা যায় না।

সেই মুহূর্তে আমার মাথাটা ঘুরে গেলো। কী ভাবে আমি প্রতারিত হয়েছি ভাবতে গিয়ে অজ্ঞান অচৈন্য হয়ে পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলাম আমার সারা মুখের রক্ত দেহে নেমে গিয়ে পাণ্ডুর বর্ণ হয়ে গেছে। সেই থেকে আমার এই অবস্থা। অনেক চিকিৎসাপত্র করেও মুখের স্বাভাবিক অবস্থা আর ফিরিয়ে আনতে পারিনি।

যাইহোক অনেক্ষণ পর ধাতস্ত হয়ে লোকটিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা বলুন তো, বস্তুটা কী। কী কাজেই বা লাগে? কেনই বা এর এতো দাম?

সে বললো, ভারত-সম্রাটের এক পরমাসুন্দরী কন্যা আছে। সারা দুনিয়ায় তার রূপের খ্যাতি। লোকে বলে, তার সমতুল্য রূপবতী নাকি আর দুটি নাই। কিন্তু সেই কন্যা এক দুরারোগ্য মাথার যন্ত্রণায় ভুগছে। নানা দেশের অনেক হেকিম বদ্যি তার চিকিৎসা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু সুফল হয়নি।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চব্বিশতম রজনী ঃ

আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

ভারত-সম্রাটের আমি এক পারিষদ। একদিন তাঁকে বললাম, আপনার কন্যার এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে পারেন এমন ধন্বন্তরী মহাপুরুষের আমি সন্ধান পেয়েছি, সম্রাট।

—কে সে?

ব্যবিলনে বাস করেন এক সিদ্ধপুরুষ। তার নাম সাদ আলী। তিনি নাকি কঠিন অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন। তবে সে অনেক খরচের ব্যাপার।

আমার কথা শুনে সম্রাট হাসলেন। কন্যা আমার প্রাণ-প্রতিমা। তার নিরাময়ের বিনিময়ে সাম্রাজ্যও দিয়ে দিতে পারি। যাও তুমি তাঁর কাছে। যত অর্থ প্রয়োজন নিয়ে যাও। কন্যা সুস্থ হয়ে উঠবে, তার চেয়ে বড় কিছু নাই আমার কাছে।

আমি ব্যাবিলনে গিয়ে পীর সাদ আলীর সঙ্গে দেখা করলাম। সম্রাট নন্দিনীর অসুখের বিস্তারিত বিবরণ শোনালাম তাকে। তিনি বললেন, সাত মাস ধরে আমি বিচার বিবেচনা করবো। তারপর দেব বিধান।

সাতমাস ধরে তিনি গুনে পড়ে দেখলেন। তারপর বললেন, সমুদ্রে এক দুষ্প্রাপ্য শঙ্খ এই রোগের একমাত্র রক্ষাকচ। একটা ছোট লাল টুকটুকে বস্তু আমাকে দেখালেন! তার দুটি চোখ। ফড়িং-এর মতো দু'খানা ঠ্যাং। অনেকটা সমুদ্রের ফেনার মতো অদ্ভুত বস্তু। তিনি বললেন, সারা দুনিয়ায় কয়েকটিমাত্র আছে। পয়সা কড়ি দিয়ে এর দাম মেটানো যায় না। যাইহোক, তুমি আমাকে এক কোটি দিনার দিও।

দাম শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। যাইহোক, সম্রাটের হুকুম যত টাকা লাগে দেব, যদি মেয়ের রোগ সারে।

সাদ আলী সেই শাঁখটাকে আমার হাতে দিয়ে বললেন, মেয়ে গলায় হারের মতো ঝুলিয়ে রাখবে। দেখবে আর কোনও রোগ নাই। কিন্তু সাবধান গলা থেকে খুলবে না। তা হলে আবার আক্রমণ করবে।

কী আশ্চর্য, একটা কবচ করে হারের মতো পরার দিন থেকে সম্রাট-কন্যার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেলো। যে মেয়েকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হতো, সেই মেয়ে আবার হাসি গানে মুখর হয়ে উঠলো। সম্রাট নিশ্চিন্ত হলেন। প্রজারাও খুশি হলো।

কিন্তু সে-সুখ আর বেশিদিন সইলো না সম্রাটের। রাজকন্যা একদিন সখী-সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে কলহাস্যে মুখর হয়ে নৌকা-বিহারে বেরুলেন! সে-ই তার কাল হলো। আনন্দের হুটোপুটিতে কখন যে গলা থেকে রক্ষাকবচের হারটা নদীর জলে পড়ে গেলো কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। কিন্তু একটু পরেই মাথাটা যখন

টনটন করে উঠলো তখন গলার দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠলেন তিনি। সেই থেকে রাজকন্যা আবার নিদারুণ মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। সম্রাট আমাকে ব্যাবিলনে পাঠালেন, আর একটা রক্ষকবচ কেনার জন্য। কিন্তু ব্যাবিলনে এসে শুনলাম, সাদ আলী দেহ রেখেছেন। চোখে অন্ধকার দেখলাম। সম্রাট বললেন, দিকে দিকে লোক পাঠাও। পৃথিবীর যে প্রান্তে পাওয়া যায় সংগ্রহ করে নিয়ে এস সেই রক্তবর্ণ রক্ষাকবচ। যত অর্থ প্রয়োজন হয়, দেব আমি।

আমরা দশজন অমাত্য পৃথিবীর দশ দিকে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছিলমা। আজ আপনার দোকানে এসে, একমাত্র তাঁর ইচ্ছায়ই, সেই হারা-নিধি অমূল্য-বস্তুর সন্ধান পেলাম। তার পরের ঘটনা তো আপনার জানা।

আমাকে আফশোশের হুতাশনে দগ্ধ করে রেখে সে বিদায় নিলো। ব্যবসা-বাণিজ্যে আর মন বসলো না। দোকানপাট বেচে দিয়ে আমি আবার গেলাম আমার প্রিয়ার সন্ধানে।

টাইগ্রিসের উপকূলের সেই প্রাসাদোপম ইমারত। কিন্তু একি তার জরাজীর্ণ দশা! চুনবালি খসে খসে পড়ছে। জানলার শার্সির কাঁচ ভাঙ্গা। কার্নিশে আগাছারা আড্ডা জমিয়েছে। কতকাল ঝাড়ু পড়েনি। ধুলোবালিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সারা বাড়িটা।

দরজার একটি চাকরকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম। কী ব্যাপার এমন দশা হলো কী করে?

ছেলেটি বললো, সেই রমরমা আর নাই। সব শেষ হয়ে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করি, সেই বৃদ্ধ? তার মেয়েরা?

—উমানের এক সওদাগর-পুত্র—আবু অল হাসান তার নাম। তার সঙ্গে আমাদের মালিকের মেয়ের পেয়ার হয়েছিলো। কিন্তু বাড়ির মালিক মেয়ের বাবা জানতে পেরে তাকে তাড়িয়ে দেন। এতো অধর্ম সইবে কেন, হাসান সাহেব তার সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা এনেছিলেন। আমাদের মালিক সেগুলো হাতিয়ে নিয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। সেই থেকে বৃদ্ধের বরাত খারাপ হয়ে গেলো। সে সময় সারা বাড়িটায় কত মেয়ে ছিল। কত খদ্দের আসতো। সারা বাড়িটা গমগম করতো দিনরাত। কিন্তু হাসান সাহেব যাওয়ার পর মালিক-কন্যা শয্যা নিলেন। কাজ কাম একেবারে বন্ধ করে দিলেন। সারা দিন-রাত ঘরের দরজা বন্ধ করে শুধু কাঁদেন—আর কাঁদেন। না আছে খাওয়া না আছে নাওয়া। দিনকে দিন অমন ননীর শরীর শুকিয়ে যেতে লাগলো। বৃদ্ধ বাবা মেয়েকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন মা, মনে কোনও দুঃখ রেখ না। এখানে কোনও মানুষই চিরদিন থাকবে বলে আসে না। ওরা আসে মরশুমী ফুলের মধু আহরণ করতে। ভালবাসতে আসে না কেউ।' কিন্তু বৃদ্ধের এই সান্ত্বনায় কোনও কাজ হলো না। দরজা তিনি খুললেন না।

তিনিই ছিলের সারা বাড়ির শতেক মেয়ের সেরা—মধ্যমণি। তার মতো সুন্দরী তামাম বাগদাদে ছিলো না কেউ। আজও নাই। কত বড় বড় আমির সওদাগর আসতো। কিন্তু তারা যখন শুনলো মালিকের মেয়ে আর কোনও খদ্দের ঘরে ঢোকাবে না তখন ভিড় কমতে থাকলো। সারা বাগদাদে এই বাড়িটা সেরা ফুর্তির জায়গা বলে দেশ-বিদেশের লোকে জানতো। দুনিয়ার নানা দেশ থেকে কত ধনী সওদাগর আসতো এখানে। কিন্তু নাম একবার খারাপ হয়ে গেলে ব্যবসা রাখা দায় হয়।

মেয়ের অবস্থা দেখে মালিক তাহির সাহেব চিন্তিত হলেন। দেশ বিদেশে লোক পাঠালেন হাসান সাহেবের সন্ধানে। কিন্তু কি করে তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে? দীন দরিদ্র অবস্থায় তিনি হয়তো অখ্যাত অজ্ঞাত কোন জায়গায় পড়ে আছেন।

শেষে, বৃদ্ধ তাহির সাহেব ব্যবসা-পাতি গুটিয়ে নিলেন। বাড়ি ভর্তি মেয়ে ছিলো। সবাইকে তিনি ছেড়ে দিলেন। সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করতে লাগলো। একদিন

মাইফেল মজলিশে সরগরম থাকতো যে বাড়ি, আজ সেটা পড়ো ভূতুড়ে হয়ে পড়ে আছে। একটা মানুষ আসে না আজ।

আমি জিজ্ঞেস করি, মালিক তাহির সাহেব গেলেন কোথায়?

—তিনি আর এ বাড়িতে থাকেন না। দেহ জরাজীর্ণ হয়েছে। মেয়ের দুঃখে তিনি নেতিয়ে পড়েছেন। এখন শহরের ভিতরে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে আছেন।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পঁচিশতম রজনী ঃ

আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

আমি বললাম, যাও তোমার মালিককে খবর দাও। বল, হাসান সাহেব ফিরে এসেছেন। তিনি তাঁর বাড়িতে অপেক্ষা করছেন।

আমার কথা শুনে ছেলেটি একবার আমার আপাদমস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ করে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, আপনি সাহেব? দাঁড়ান, আমি আসছি।

প্রায় ছুটতে ছুটতে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এলো শেখ তাহিরকে সঙ্গে নিয়ে।

বৃদ্ধের দেহের সেই জৌলুস আর নাই। চোখের কোলে কালি পড়েছে। গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। মনে হলো, এই দু'বছরে বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে তাঁর।

আমাকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়কে কাঁদতে থাকলেন তিনি।

—কোথায় ছিলে বাবা? তোমার জন্যে মেয়েটা আমার কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেছে। তোমার টাকা পয়সা—যা আমার কাছে গচ্ছিত আছে সব ফেরত নিয়ে আমাকে ঋণ মুক্ত কর।

এই বলে একটা মোহর ভর্তি বস্তা এনে আমার সামনে রাখলেন তিনি।

—এতে এক লক্ষ দিনার আছে। এ সবই তোমার টাকা। নিয়ে আমাকে ভার মুক্ত কর। আজ দু'টো বছর মেয়েটা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তুমি ওকে বাঁচাও বাবা, এই আমার একমাত্র ভিক্ষে তোমার কাছে।

আপনারা বিশ্বাস করুন জনাব, আমাকে দেখা মাত্র আমার প্রেয়সী আনন্দে মূর্ছা গেলো। দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা। সে অশ্রু আনন্দের।

সেই রাতেই তাহির সাহেব কাজী এবং সাক্ষী সাবুদ ডেকে এনে আমাদের শাদী দিয়ে দিলেন। সেই থেকে তাহির সাহেবের প্রাণাধিক কন্যা আমার আদরের বিবি হলো। আমার এতো দিনের বাসনা পূর্ণ হলো। তাকে নিয়ে পরমানন্দে ঘর করছি আমি। আজ আমার মনে আর কোনও খেদ নাই। ওর ভালোবাসায় ভরে আছি কানায় কানায়! দশটা বছর কেটে গেছে। আমরা ভালোবাসার ফলে পেয়েছি একটি পুত্র সন্তান। চাঁদের মতো ফুটফুটে, ওর মায়ের মতোই খুবসুরত। একটু অপেক্ষা করুন, তাকে আপনাদের সামনে হাজির করছি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছাব্বিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এই বলে সেই পাণ্ডুবর্ণ যুবক অন্দরে চলে গেলো। একটু পরে বছর দশেকের একটি সুন্দর ছেলেকে সঙ্গে করে এনে বললো, এই হচ্ছে আমাদের একমাত্র সন্তান। মেহমানদের আদাব জানাও বেটা।

খালিফা দেখলেন ছেলেটি সত্যিই অপূর্ব সুন্দর। যেমন চেহারা তেমনি আদব-কায়দা। মন ভরে গেলো।

এরপর ওঁরা বিদায় নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

পরদিন সকালে খালিফা বললেন, জাফর, একবার আবু অল হাসানকে হাজির কর। এবং সারা বছর ধরে বাগদাদ বসরাহ এবং খুরাসন থেকে যত ভেট নজরানা পেয়েছি সেগুলো সব এই দরবার-কক্ষে আমার সামনে নিয়ে এসে রাখ।

জাফরের ইশারায় মাসরুর সেই উপহার উপঢৌকন সামগ্রী এনে দরবার-কক্ষের মাঝখানে স্তূপাকার করে রাখালা। হীরে চুনী পান্না প্রবাল ও মুক্তের সে কি এলাহী ব্যাপার! চোখ ঝলসে যায় আর কী! একখানা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হলো জহরতগুলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে মাসরুর সঙ্গে করে নিয়ে এলো সেই পাণ্ডু বর্ণ যুবক আবু অল হাসানকে। যথাবিহিত কুর্নিশ কেতা জানিয়ে অল হাসান অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে। খলিফা স্মিত হেসে প্রশ্ন করলেন। গতকাল রাতে তোমার হাবেলীতে যে ক'জন মুসাফির সওদাগর মেহমান হয়েছিলো, জান তারা কে?

—না জাঁহাপনা। তাঁরা আমার মহামান্য অতিথি। তাঁদের সৎকার করাই আমার ধর্ম। কুলশীল জানার তো কোনও অধিকার নাই আমার।

—চমৎকার।

ইশারা করতে মাসরুর চাদরের ঢাকাটা খুলে দিলো। খলিফা বললেন, চেয়ে দেখ তো যুবক। এখানে যে সব ধনরত্ন পালা দেওয়া আছে তার মোটমূল্য তোমার সেই দৈবরত্নের সমান হবে কিনা? কোন রত্নের কথা বলছি বুঝতে পারছো? যেটা তুমি না বুঝে মাত্র ত্রিশ হাজার দিনারে বেচে দিয়েছিলে?

আবু অল হাসান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে খলিফার দিকে তাকিয়ে—

—আ-প-নি?

—হ্যাঁ, আমিই। কাল রাতে আমি—আব্বাস বংশের পঞ্চম ধারক খলিফা হারুন অল-রসিদ, আমার উজির জাফর এবং সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তোমার আতিথ্য নিয়েছিলাম। তোমার সেবায় বড় প্রীত হয়েছি। তোমার মহব্বতের বিরহ বেদনা মধুর কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এবং দুঃখ অনুভব করেছি ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য। যে অমূল্য রত্ন তোমার হাতে এসেছিলো, তোমার অজ্ঞতার দোষে, তার উচিত মূল্য তুমি লাভ করতে পারনি। এতে আমিও বিশেষ দুঃখ বোধ করেছি। এই যে ধন রত্ন দেখছো এখানে, এ সবই তোমার জন্য। একটা ভুলের জন্য, অজ্ঞতার জন্য যে ক্ষতি তোমার হয়েছে, আমি তো পুরণ করতে চাই। দেখ তো এগুলোর দাম তোমার সেই দৈবরত্নের দামের সমান হবে কিনা!

অল হাসান বলে, অনেক বেশিই হবে, জাঁহাপনা।

—তা হোক। এসব তোমার। আমি দিলাম, নিয়ে যাও।

আবু অল হাসান ভাবতে পারে না, কী কথা সে শুনলো। এতো বিপুল পরিমাণ অর্থ কেউ কাউকে দান করতে পারে। হোন না তিনি সুলতান বাদশাহ! দৌলতের মায়া কার নাই। সারা শরীরের মধ্যে কী এক অভূতপূর্ব শিহরণ খেলে যেতে থাকে। অল হাসান মাথা চেপে সেই দরবার-কক্ষেই বসে পড়ে। তারপর আর কোনও চৈতন্য থাকে না।

অনেকক্ষণ পর যখন সম্বিত ফিরে এলো তখন খালিফা জাফর এবং আমির অমাত্যরা অবাক হয়ে দেখলেন; যুবকের মুখের পাণ্ডুবর্ণ আর নাই। গালে রক্তের গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে। কল্পনাতীত প্রাপ্তির আনন্দে তার দেহের তন্ত্রীতে আবার বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেছে। এবং তারই ফলে মুখের ধমনীতে আবার রক্ত-প্রবাহ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মাসরুর একখানা আর্শী এনে ধরলো হাসানের সামনে। অনেক দিন পরে নিজের চেহারার

পূর্ব রূপ ফিরে পেয়ে আনন্দে নেচে ওঠে তার মন। এ-সবই আল্লাহর বরপুত্র খলিফার অপার মহিমা।

খলিফা চিৎকার করে ওঠেন, সবই সেই দয়াময়ের দোয়ায় হলো হাসান। আমার কোনও কেরামতি নাই। যাক, এবার এগুলো সঙ্গে নিয়ে ঘরে যাও। সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাও গে।

—জাঁহাপনা, এই হচ্ছে সেই পীত যুবক হাসানের কাহিনীর। এর পরে শোনাবো আপনাকে আনারকলি এবং বদর বাসিমের কিস্‌সা।

এবং শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

অনেক অনেক দিন আগে আজম মুলুকের খুরাসন শহরে শাহরিমান নামে এক বাদশাহ বাস করতেন। তাঁর হারামে শতাধিক সুন্দরী বাঁদী রক্ষিতা ছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের কারুরই গর্ভে কোনও সন্তানাদি হয়নি।

বিশাল সলতানিয়ত, কে তার উত্তরাধিকারী হবে, তাঁর অবর্তমানে কে বসবে মসনদে, এই নিয়ে তিনি সদাই চিন্তিত এবং বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকতেন। নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য নানা শাস্ত্রের গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে তত্ত্ব আলোচনায় দিন কাটাতেন।

এমনি এক দিনে, যখন তিনি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ধর্ম আলোচনায় ব্যাপৃত, সেই সময়ে দ্বার রক্ষী এসে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, জাঁহাপনা, বিদেশী এক সওদাগর এসেছেন সঙ্গে এক পরমাসুন্দরী বাঁদী নিয়ে। আপনার দর্শন-প্রার্থী তিনি।

সুলতান বললেন, নিয়ে এসো তাকে।

সওদাগরের সঙ্গে মেয়েটি এসে দাঁড়ালো। তার রূপের ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো দরবার মহল। পাতলা ফিনফিনে বোরখার আড়ালে তার দেহের প্রতিটি ভাঁজ প্রতিটি খাঁজ স্বচ্ছ পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। অমন অনিন্দ্য রূপ-যৌবন কোনও নারীর হতে পারে ভাবা যায় না। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিটোল নিখুঁত সুন্দর। সুলতান বললেন, কত নেবে বণিক?

সওদাগর বিনয়ের অবতার বললো, জাঁহাপনা আমি একে প্রথম পালকের কাছ থেকেই কিনেছি। এখনও অপাপবিদ্ধ—কুমারী। তিনি দাম নিয়েছিলেন তিন হাজার দিনার। এরপর নানা দেশের নানা হাটে বাজারে ঘুরেছি। তাতেও আমার হাজার তিনেক খরচ হয়েছে। এখন শাহেনশাহর সামনে হাজির করেছি। যদি জাঁহাপনার মনে ধরে তবেই আমি ধন্য হবো। ইনাম কিছু আশা করি না।

সওদাগরের ব্যবহারে প্রীত হলেন সুলতান। উজিরকে বললেন, ওকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং এক প্রস্থ মূল্যাবান সাজপোশাক বকশিশ দিয়ে দাও।

সওদাগর দশ হাজার দিনার ও শৌখিন সাজ বগলদাবা করে সুলতানের শতায়ু কামনা করতে করতে বিদায় হলো।

সুলতান খোজা সর্দারকে বললেন, যা একে হারেমে নিয়ে যা। দাসী বাঁদীদের বল, হামামে নিয়ে গিয়ে খুব ভালো করে ঘষে মেজে যেন গোসল করায়। অনেক দূর দেশ থেকে এসেছে। পথের ক্লান্তি জমে উঠেছে অঙ্গে। সব যেন সাফা করে দেয় তারা।

খোজা সর্দার মেয়েটিকে অন্দরমহলে নিয়ে চলে যায়। সারাদিন ধরে দরবারের কাজকর্ম সামাধা করে সুলতান নিজের কক্ষে আসেন। মেয়েটিকে গোসলাদি

করিয়ে মূল্যবান নতুন সাজ-পোশাকে সাজিয়ে দাসী বাঁদীরা সুলতানের ঘরে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলো।

ঘরে ঢুকে তিনি মেয়েটিকে কাছে ডাকেন, কই, এ দিকে এসোতো সুন্দরী। নাকাব খোলো তো একবার, দেখে জীবন সার্থক করি।

কিন্তু কি আশ্চর্য, যাঁর এক ইশারাতে সারা সলতানিয়ত থরথর কম্পমান, সেই অমিত বিক্রম এবং অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতিকে সামনে দেখে সে একবার উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম কুর্নিশ জানালো না!

সুলতান শাহরিমান-এর মুখ কালো হয়ে গেলো। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, বেয়াদপ! যারা মানুষ করেছে, দেখছি আদবকেতা কিছুই শেখায়নি!

—তোমার নাম কী?

কিন্তু কোনও উত্তর দিলো না মেয়েটি। তবে কী বোবা বধির? সুলতান এবার ওর সামনে সরে আসেন। নিজের হাতে নাকাব সরিয়ে দেন। সে চোখের দৃষ্টিতে কোনো চাঞ্চল্য নাই। স্থির, ঠাণ্ডা। ভাবলেশ হীন। নিথর ও নিস্পন্দ।

—কে তুমি?

কোনও জবাব নাই! শান্ত নির্বিকার নির্বাক হয়ে বসে থাকে সে। সুলতান দু'হাতে টেনে নেয় ওকে। বুকের মধ্যে পেষণ করে জাগ্রত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। সাপের মতো ঠাণ্ডা। শরীর। কোনও উত্তাপ-উত্তেজনা নাই।

এবার তিনি ক্ষুব্ধ বিরক্ত বোধ করেন। কিন্তু মেয়েটির অপার রূপ-লাবণ্য তাঁকে আবার প্রসন্ন করে তোলে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতাশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

সে দিনের মতো তিনি আর মেয়েটিকে কোনও প্রশ্ন করেন না।

পরদিন উৎসবের আয়োজন করা হয়। খানাপিনা গান-বাজনায় মেতে ওঠে প্রাসাদের মানুষজন। কিন্তু মেয়েটির কোনও বিকার নাই।

উৎসবের শেষে সবাই বিদায় নিলে সুলতান নিজের কক্ষে ফিরে আসেন। মেয়েটিকেও নিয়ে আসা হয় তার ঘরে।

সুলতান ওকে দু'হাতে তুলে শুইয়ে দেন পালঙ্ক শয্যায়। এক এক করে দেহের আবরণ খুলে ফেলতে থাকেন তিনি। পরপর সাতটা পোশাক খোলার পর একটি মাত্র পাতলা রেশমী শেমিজ অবশিষ্ট থাকে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ান তিনি। তারপর সেটিও খুলে নেন। এমন নিভাঁজ নিখুঁত দেহবল্লরী তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেননি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে কামনার আগুন।

কিন্তু মেয়েটি অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। ওর দেহে কোনও চাঞ্চল্য জাগে না। সে রাতে সুলতান আকণ্ঠ পান করেন ওর দেহ সুধা। মনের সব ক্ষোভ রাগ উবে যায়। আনন্দে নেচে ওঠে হৃদয় মন।

এইভাবে রাতের পর রাত ওকে শয্যাসঙ্গিনী করে মেতে থাকেন তিনি। হারেমের অন্য সব মেয়েদের কথা একেবারে ভুলে থাকেন।

একটা বছর কেটে যায়। মেয়েটিকে দিয়ে সুলতানের কাম-বাসনা চরিতার্থ হয় কিন্তু একটা কথাও তিনি আদায় করতে পারেন না তার কাছ থেকে। সুলতান বুঝতে

পারেন না, কেন সে কথা বলে না। রাতের পর রাত কত আদর সোহাগ করে কতভাবে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

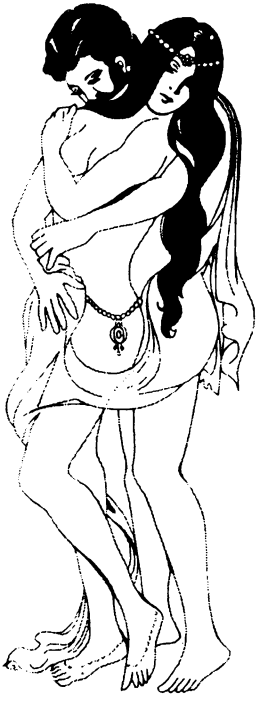

—তুমি আমার দেহের ক্ষুধা তৃপ্ত করেছ, তোমাকে পেয়ে আমার সব দৈন্য ভুলে গেছি, শোনও চোখের মণি, একবার কথা বলো। আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি কী বুঝতে পার না? বিশ্বাস কর না আমাকে? তোমার জন্য আমার সব বেগম বাঁদীদের বরবাদ করে দিয়েছি? তোমাকে পেয়ে আমি দরবারের কাজেও তেমন মন দিই না—প্রজাদের ওপর অবিচার করি। সে কী তুমি জান না? তোমার জন্য আমি আমার সব কিছু ঐশ্বর্য বিসর্জন দিতে পারি—একথা কি বিশ্বাস কর? কথা বলো সোনা, একটিবার কথা বলো। আর যদি তুমি নাই বলতে পার কথা—যদি বোবাই হও তাতেও আমি ক্ষুব্ধ হবো না। তুমি ইশারাতেও বোঝাও তোমার মনের ভাষা। তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালো লাগা না লাগা বুঝতে দাও আমাকে। আল্লা তোমাকে আলোক-সামান্য রূপযৌবন দিয়েছেন। আর মুখে ভাষা দেননি সে কি বিশ্বাস করা যায়? তিনি কী এতোই নির্মম হতে পারেন?

সুলতানের এতো অনুরোধ উপরোধও সে নির্বাক হয়ে বসে থাকে। সুলতান বলেন, ঠিক আছে, কথা না হয় নাই বললে, তুমি আমাকে এক পুত্র উপহার দাও। আমার বয়স বাড়িয়ে বিকেল হতে চললো। এতো বড় সলতানিয়ত। এই বিপুল বৈভব—মসনদ, কে সব ভোগ করবে। তুমি আমাকে দয়া কর, একটি পুত্র সন্তান দাও। আর ক'দিন বাঁচবো জানি না। কিন্তু যদি এই সান্ত্বনা নিয়েও মরতে পারি, তোমার গর্ভে আমার সন্তান আছে, সে সুলতান হয়ে আমার মসনদে বসবে, আমার বংশ রক্ষা করবে, আমার বেহেস্তে লাভ হবে।

হঠাৎ মেয়েটি মাথা তুলে তাকাল। এতোদিন পরে ওর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটেছে। বললো ঃ

পাঁচশো ঊনত্রিশতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

—মহানুভব সুলতান, আপনার আর্জি আল্লা পূরণ করেছেন। আমার গর্ভে আপনার সন্তান এসেছে। জানি না সে ছেলে কি মেয়ে—তিনিই একমাত্র বলতে পারেন। আমার প্রতিজ্ঞা ছিলো, যতদিন না আমি আপনার সন্তান ধারণ করি আপনার সঙ্গে বাক্যালাপ করবো না।

এতোদিন পরে ওর মুখে কথা ফুটছে দেখে সুলতানের আনন্দ আর ধরে না। সে যে কী আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ কার সম্ভব নয়। হৃদয়াবেগে তিনি কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না। ওর কুসুমদল কোমল দেহলতাখানি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর সোহাগ চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিতে থাকেন।

—এতোদিন আল্লাহ মুখ তুলে চেয়েছেন। তোমার মুখের ভাষা শুনতে পেয়েছি। আজ আমার কী আনন্দের দিন, তোমার গর্ভে আমার সন্তান। আমার ভবিষ্যৎ বংশধর, মসনদের উত্তরাধিকারী!

দরবারে গিয়ে সবাইকে জানালেন তিনি। এতোদিন পরে ঘর আলো করতে আসছে তার সন্তান। উজির আনন্দ কর, আনন্দ কর। যে যা চায় দাও। আমার আর কোনও দুঃখ নাই, আর কোন বাসনা নাই।

সুলতানের নির্দেশে অকাতরে দানধ্যান করা হতে লাগলো। দীন-দরিদ্ররা আহার্য বস্ত্র বকশিশ নিয়ে দোয়া মাঙতে মাঙতে চলে গেলো। সারা প্রাসাদ শহর সলতানিয়ত সুলতানের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলো। প্রজারা আশ্বস্ত হলো—তাদের ভাবি সুলতান তবে আসছে।

দরবারের কাজ সেরে সুলতান আবার ফিরে আসে নিজের কক্ষে। প্রাণাধিকাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে।

—আচ্ছা নয়নতারা, বলো দেখি, কেন এতোদিন আমাকে এতো কষ্ট দিয়েছ? কেন কথা বলোনি?

সে বলে, জাঁহাপনা আমি যখন এখানে আসি তখন আমার কী পরিচয়? আর অধিকারই বা কতটুকু। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে প্রাসাদে ঠাঁই দিলেন, তাতেই বা কী গেলো এলো? আমি তো জানতাম আপনার কাছে আমার কানা-কড়িও দাম থাকবে না, যদি না আমি আপনাকে সন্তান উপহার দিতে পারি! শুনা ছিলো, আপনার শতাধিক বেগম-বাঁদী যা পারেনি—আমিই বা তা পারবো, কী ভরসা! তাই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম। আমি জানতাম, যদি ব্যর্থকাম হই, যদি আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করতে না পারি, তবে হারেমের অন্য বাঁদী বেগমদের যা বরাতে জুটেছে আমার ভাগ্যেও তাই মিলবে। এঁটো কলাপাতার মতো পরিত্যাগ করে প্রাসাদের এক কোণে রেখে দেবেন। হয়তো বৎসরান্তেও একবার খোঁজ নেবার ফুরসত হবে না আপনার। সেই দুঃখ সইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম আমি। দু'দিনের আদর ভালোবাসা সোহাগ খেয়ে লালসা বেড়ে গেলে পরে আরও বেশি কষ্ট পাবো এই আশঙ্কাতেই নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম।

সুলতান অবাক হয়ে বললেন, শুধু এইমাত্র কারণ? কিন্তু না, আমার মনে হয় তোমার মনে অন্য কোনও ব্যথা-বেদনা আছে। আসল কারণ সেইটেই।

সে বলে, আমি আজ চার বৎসর মা ভাই আত্মীয় পরিজনদের ছেড়ে চলে এসেছি। তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে না। আমার জন্মভূমি থেকে সাত সমুদ্র পার হয়ে আজ আমি কত দূরে চলে এসেছি। জানি না, আমার মা ভাইরা কে কেমন আছে।

সুলতান বলেন, এইজন্যেই তোমার মন খারাপ করে? এইজন্যে এতোদিন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলোনি? তা সে তোমার মা ভাই যত দূরেই থাক, আমি কি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাতে পারি না কয়েকদিনের জন্য?

সে বলে, আমার নাম গুলনার। আমাদের মাতৃভাষায় একথার অর্থ— বেদনার ফুল—আনারকলি। আমার জন্ম সাগরে। আমার বাবা ছিলেন সমুদ্রের শাহ। মা-এর নাম লোকাস্ত। এবং এক ভাই আছে, তার নাম সালির। ছোট্টবেলা থেকেই আমার প্রতিজ্ঞা ছিলো, সমুদ্রে আমি থাকবো না। জলের ওপরে মাটির দেশে যাবো—এই আমার একমাত্র স্বপ্ন। সেখানকার প্রথম চেনা পুরুষ হবে আমার ভালোবাসার সঙ্গী। সে আমাকে রক্ষা করবে। ভরণ-পোষণ করবে। তার বদলে আমি তাকে উজাড় করে দেব আমার দেহ-মন-প্রাণ ভালোবাসা—যাকে তোমাদের ভাষায় বলে মহব্বত।

একদিন রাতে মা ভাই যখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সেই সময় আমি চুপিসারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। উত্তাল জলরাশি ঠেলে শোঁ শোঁ করে উঠে আসলাম ওপরে। সাঁতার কেটে এসে পৌঁছলাম সমুদ্র উপকূলে। তখন গভীর রাত। মাথার ওপরে পূর্ণিমার চাঁদ। আলোর অমৃত ঝরে পড়ছিলো। দক্ষিণা বাতাসে ঘুম এসে গেলো চোখে।

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক হত-কুৎসিত লোক। প্রায় দৈত্যের মতো। লোমশ হাতের থাবা বাড়িয়ে আমাকে তুলে নিলো সে কাঁধের ওপর। আমি অনেক হাত পা ছুঁড়লাম। দাপাদাপি করলাম। কিন্তু ওর কবল ছাড়া পেলাম না।

এক জঙ্গলের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে নামালো সে। জোর করে শুইয়ে দিলো চিৎ করে। তারপর পাশবিক ক্ষুধা মেটাবার জন্য জোর জবরদস্তি করতে থাকলো। কিন্তু আমি প্রাণপণে ওর মুখে এমন একটা ঘুষি মারলাম, লোকটা আর্তনাদ করে ছিটকে পড়লো দূরে। সেই ফাঁকে আম উঠে দে দৌড়। সে আমার পিছু ধাওয়া করেছিলো, কিন্তু ধরতে পারেনি।

দৌড়ে আর কোথায় পালাবো, এক সওদাগরের খপ্পরে গিয়ে পড়লাম। সে আমাকে বাঁদী হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে দিলো এই সওদাগরের কাছে। এবং তার কাছ থেকেই আপনি আমাকে কিনেছেন। লোকটা খুব সৎ এবং নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিলো। তা না হলে, আমার মতো একটি কচি ডাগর মেয়েকে নিয়ে সে পুরো তিনটি বছর এদেশে সেদেশে ঘুরে বেড়িয়েছে— একদিনের তরে গায়ে হাত ঠেকায়নি!

এই আমার জীবনের কাহিনী।

এখানে আসার পর প্রথম আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। সদাই মনে হতো, এই জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি সমুদ্রের জলে। ডুব দিয়ে চলে যাই আমার দেশে মা ভাই-এর কাছে, কিন্তু পারিনি। পরে যখন বুঝতে পারলাম আপনি মানুষটা নেহাত খারাপ নন তখন আর সে ঝোঁক ছিলো না। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিলো, গোড়াতেই বেশি ঢলাঢলি করবো না। কারণ সুলতান বাদশাহদের খামখেয়ালীর অনেক কাহিনী আমার শোনা ছিলো। আজ তারা যাকে মাথার মণি করে রাখে কাল তাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়! সেই কারণে আমি আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইনি। জানতাম, আমার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন না হলে আপনার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরোতে দেরি হবে না। এতোদিনে যখন বুঝতে পারলাম, আমি সন্তান-সম্ভবা তখন মনে ভরসা পেলাম— তা হলে আপনি আর আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না। এখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি, আপনার হারেমের ঐ শতাধিক বেগম বাঁদীদের কাউকে আপনি আর ভালোবাসবেন না। কিন্তু আমি বুঝি আর আমার মা ভাইকে দেখতে পাবো না। আমার শোকে কেঁদে কেঁদে তারা সারা হয়ে যাচ্ছে। এমন দেশ, সেখানে লোকজন পাঠিয়েও কোনও খবর দেবার উপায় নাই। আর তা ছাড়া আমি যদি নিজেও যাই, তারা আমার কথা আদৌ বিশ্বাস করবে না। আমি যে এখন আর সামান্যা কেউ নই—পারস্য এবং খুরাসনের শাহেন শাহর একমাত্র পেয়ারের বাঁদী, সে কথা তারা আজগুবি গল্প বলে উড়িয়ে দেবে।

এই সময়ে রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ত্রিশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

আনারকলির কাহিনী শুনে সুলতান শাহরিমান মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে।

—কী অদ্ভুত সুন্দর কাহিনী শোনালে, আমায়! কিন্তু যে কারণেই হোক তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও কখনও, আমি আর এক মূহূর্তও বাঁচবো না —নির্ঘাৎ মরে যাবো। তুমি বললে, তোমার জন্ম সমুদ্রের নীচে। তোমার বাবা ছিলো সমুদ্রের সুলতান। তোমার মা লোকন্ত আর তোমার ভাই সালিহ। ওরা এখনও সমুদ্রের তলাতেই বসবাস করে। সবই বড় অদ্ভুত শোনাচ্ছে আমার কাছে। সত্যিই কোন মানুষ সমুদ্রের নিচে থাকতে পারে কিনা,

আছে কিনা আমার কোনও ধারণা নাই। শুধু বুড়ো-বুড়িদের কাছে ছোটবেলায় কিছু গল্প কাহিনী শুনেছিলাম। কিন্তু সে তো সবই বানানো কিস্‌সা। সত্যিই যে কিছু তেমন সব নরনারী পানির নিচে থাকতে পারে বিশ্বাস করিনি। আজ তোমার মুখে শুনে আর অবিশ্বাস করতে পারছি না, আমি। উপরন্তু তোমাদের জাত ধর্ম আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার কৌতুহল হচ্ছে। আচ্ছা, একজন মানুষ ঐ পানির নিচে চলা-ফেরা করতে পারে কী করে? দম আটকে মরে যায় না? বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো!

আনারকলি বলে, আমি যা জানি, সব আপনাকে বলবো, জাঁহপনা। সুলেমান ইবন দাউদের অশেষ করুণায় আমরা সমুদ্রের নিচে সুখে সচ্ছন্দে বসবাস করি। আপনারা যেমন এই মাটির পৃথিবীতে বাস করেন তেমনিভাবে। জলই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের বস্তু। আপনারা যেমন নাক দিয়ে হাওয়া টানেন ছাড়েন, আমরা তেমনি জল টানি আর ছাড়ি। জলই আমাদের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। জলে আমাদের দেহ নরম এবং সতেজ থাকে। আমাদের দেহের আচ্ছাদন জলে কখনও ভেজে না। এই যে আমার চোখের মণি দেখছেন, জলের তলায় সে জ্বলে। অনেক দূরে দিগন্তে চলে যেতে পারে এই চোখের দৃষ্টি। সমুদ্রের গভীর তলদেশে থেকেও আমরা স্বচ্ছ পরিস্কার দেখতে পাই চাঁদনি তারার রোশনাই। পৃথিবীর সব মুলুক এক সঙ্গে জুড়লে আমাদের জল মুলুকের চার ভাগের এক ভাগ হবে। কী বিরাট বিশাল, তা কল্পনা করা যায় না। আমাদের সমুদ্র সাতটি মুলুকে বিভক্ত। তার এক একটা প্রায় আধখানা পৃথিবী। লক্ষলক্ষ কোটি কোটি মানুষ, জন্তু জানোয়ার এবং মাছের বাস এই সব সমুদ্রে। এর নিচে বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান ধনরত্ন সঞ্চিত আছে। আমরা যে শহরে বাস করি সেখানকার ঘর বাড়ি দেখলে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন। স্ফটিকের তৈরি নানারকম কারুকার্য করা সব বাড়িঘর। লাড্ডুর মত বড় বড় মুক্ত, প্রবাল, চুনী, পান্না পদ্মরাগমণি, সোনা-চাঁদীর পাহাড় চারপাশে। কেউ হাত দিয়ে ছোঁয় না। ওসবে কার কী প্রয়োজন? কিন্তু, কিন্তু এখানে—তোমাদের এই মাটির দেশে সেই সব এক একটা জিনিষের কী দাম?

আমরা ইচ্ছামত সাঁতার কেটে যেখানে খুশি, যত দূরে খুশী চলে যেতে পারি। তাই গাধা ঘোড়া বা পাল্কী রথের কোনও প্রয়োজন হয় না। তোমাদের এখানে অবশ্য ঐগুলোই পথ চলার সেরা অবলম্বন। তবে ওসব আমাদের দেশেও আছে । আস্তাবলে রেখে দেয় লোকে। উৎসব অনুষ্ঠানের সময় কেউ হয়তো শখ শৌখিনতা করে এক-আধটুক চাপে। যাই হোক, একদিনে আপনাকে কত আর বলবো। আমি তো আপনার সারা জীবনের সঙ্গিনী, পরে আবার অনেক মজার মজার কথা শোনাবো।

—তবে একটা কথা, আনার আবার বলে, আমাদের দেশের এবং আপনাদের দেশের প্রসূতি পরিচর্যার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক আছে। আমাদের শরীরটা যেভাবে তৈরি আপনাদের এখানকার মেয়েদের শরীর ঠিক সেইভাবে তৈরি নয়। সেই কারণে এখানকার ধাইরা হদিশই করতে পারবে না আমাদের পেটে বাচ্চা কীভাবে থাকে, কখন সে প্রসব করবে, এবং নবজাতককে কী-ভাবে রাখলে, পরিচর্যা করলে সে সুস্থ থাকবে। এই সব ভেবে আমার বড় ভয় করছে জাঁহাপনা, আমার পেটে আপনার যে বাচ্চা আছে তার জন্মকালে ধাইদের দোষে তার না কোনও অনিষ্ট হয়! কারণ এখানকার ধাইরা তো এখানকার মতো করে আমাকে প্রসব করাবার চেষ্টা করবে। তাতে ফল খারাপ হওয়ার আশঙ্কাই বেশি!

সুলতান আঁৎকে উঠলেন, বলো কী? সর্বনাশ হবে যে!

—তাই তো বলছি, জাঁহাপনা, আপনি আমার মা ভাইদের খবর পাঠান। তারা আমার কাছে থাকলে আর কোনও ভয় থাকবে না। আমার মা সব জানে। সে সব নিখুঁত

বন্দোবস্ত করতে পারবে। আমাদের বাচ্চার নিরাপদের কথা ভেবেই তাদের খবর দেওয়া দরকার।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো একত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সব শুনে সুলতান বললেন, কিন্তু তোমার মা ভাই-এর এখানে কী করে নিয়ে আসা যায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, আনার। আমার লোকজন তো পানির তলায় যেতে পারবে না।

আনারকলি বলে, তার দরকার নাই, জাঁহাপনা। আপনি যদি বলেন আমি তাদের এখানে এনে হাজির করে দিতে পারি।

—তুমি পার? কী করে?

—আপনি পাশের ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকুন, তা হলেই দেখতে পাবেন কী করে আমি তাদের নিয়ে আসি এখানে!

আনারকলি ওর বুকের মধ্যে থেকে দু'টুকরো ছোট ছোট চন্দন কাঠের টুকরো বের করে একটা সোনার পাত্রে রেখে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে গল গল করে ধোঁয়া নির্গত হতে থাকে। আনার বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়ায়। আর তক্ষুনি, দেখা গেলো, সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। তারপর মুহূর্ত মধ্যে প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা তুফান শুরু হয়ে যায়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। সেই তরঙ্গতুঙ্গে ভেসে ওঠে এক সুন্দর সুপুরষ যুবক। তার এক হাতে একটি ফুল। এবং তার ওপরেই ভাসে এক পলিত-কেশ বৃদ্ধা নারী। সুলতানের বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেই বৃদ্ধা আনারের মা লোকস্ত। আর ঐ যুবক তার ভাই সালিহ। এরপর আরও পাঁচটি সুদর্শনা মেয়ে ভেসে ওঠে জলের ওপর। এরা সকলে ভাসতে ভাসতে প্রাসাদ-সমীপের উপকূল দিয়ে এগিয়ে আসে। তারপর কূলে উঠে ওরা প্রাসাদের জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। এবং এক এক করে লাফিয়ে লাফিয়ে আনারের ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়।

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আনার-এর মা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে, অমাদের ছেড়ে তুই এতোদিন কী করে ছিলি মা। আমরা ভাবলাম তুই আর বেঁচে নাই। কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছি এতোকাল।

—আমার দোষ স্বীকার করছি মা। না বলে কয়ে ঐ ভাবে ঘর ছেড়ে চলে আসা আমার উচিত হয়নি! কিন্তু নিয়তির লিখন কে খণ্ডাতে পারে, বলো। যাইহোক, দেরিতে হলেও আবার তো আমরা এক জায়গায় হতে পেরেছি। এ আনন্দই বা রাখবো কোথায়?

তারপর আনার তার বিচিত্র অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করলো তাদের কাছে।

—এখন আমি বাদশাহ শাহরিমানের পেয়ারের বেগম। আমর গর্ভে তার একমাত্র সন্তান। এই বিশাল সলতানিয়তের একমাত্র মালিক। এই সন্তানের প্রসব যাতে নিরাপদে হয় সেই জন্যেই আমি তোমাকে স্মরণ করেছি, মা। তুমি ছাড়া আমাদের রীতি-নীতি এরা তো কেউ জানে না।

আনার-এর মা বলে, বাছা তোমাকে এই মাটির দেশে দেখে আমি তা আঁতকে উঠেছিলাম। না জানি কত দুঃখে কষ্টে তোমার দিন কাটছে। ভেবেছিলাম স্বদেশে

ফিরে যাওয়ার জন্যেই বুঝি আমাদের ডাকছো। কিন্তু এখন এই অবস্থা স্বচক্ষে দেখে বুঝতে পারছি, তুমি খুব সুখে আনন্দে আছে।

আনার বললো, আজ আমার মতো ভাগ্যবতী সুখী মেয়ে আর কে আছে, মা!

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বত্রিশতম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

পাশের ঘর থেকে সবই শুনছিলেন সুলতান। তার প্রিয়তমা আনার আজ মা ভাইকে ফিরে পেয়ে খুশির বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, তার মুখে হাসি ফুটেছে। সুলতান পুলকিত হয়।

আনারকলি দাসী বাঁদীদের ডেকে খানাপিনা সাজাতে বলে। নানারকম বাদশাহী খাবার-দাবার এনে টেবিলে সাজিয়ে দেয় তারা। মা বলে, সে কি, আমরা এলাম যাঁর ঘরে তিনি কোথায়? তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো না, খাবো কি? যা মা, তাঁকে ডাক, আমরা তাঁকে দেখি আলাপ করি, তারপর খাবো।

আনারকলি একটু গলা চড়িয়ে সুলতানকে ডাকে, জাঁহাপনা, শুনতে পাচ্ছেন? আমার মা ভাই এসেছে। তারা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে।

সুলতান পাশের ঘর থেকে এসে আনারের মা ভাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানালেন, আমি বড় খুশি হয়েছি আপনারা এসেছেন।

সালিহ বললো, আমার আদরের ভগ্নী আনার, মনে ভয় ছিলো সে বুঝি সুখে নাই, সুলতান বাদশাদের হিংস্র কামনার স্বীকার হয়ে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু আনারের মুখে সব শুনলাম, আপনি তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। এ আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা। অবশ্য সবই নিয়তির খেলা। যার ভাগ্যে যা লিখেছেন তিনি, তাই তো হবে। তা না হলে, আমার বোন আনার সমুদ্রের কন্যা, অতল সমুদ্রের প্রত্যন্ত প্রদেশে আমাদের বাস। সেখান থেকে উঠে সে কী করে আপনার সন্তানের জননী হচ্ছে?

সুলতান বললেন, এ তুমি যথার্থই বলেছ, শালা সাহেব। নিয়তির লেখা কেউ এড়াতে পারে না। যাক, এবার খানাপিনা কর।

সেদিন থেকে ওরা সকলে প্রাসাদেই অবস্থান করতে থাকলো। যথাসময়ে আনারকলি তার মা লোকান্তের হাতে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলো। চাঁদের মতো সুন্দর ছেলে। যেমন রং, তেমনি চেহারা। সুলতানের যে কী আনন্দ, কী করে তা বলবো। সে ভাষা আমার নাই। সাত দিন পরে শুদ্ধাচার করে ছেলেকে সুলতানের কোলে তুলে দিলো আনারকলি। নবজাতকের নাম রাখলেন তিনি বদর বাসিম। অর্থাৎ চাঁদের হাসি।

এই সময় রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তেত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

সুলতানের হাত থেকে সালিহ,—আনারকলির ভাই, ছেলেকে হাতে নিয়ে আদর সোহাগ করতে থাকে। নানা ভাবে নাচাতে নাচাতে সে ঘরময় নেচে বেড়ায়। হঠাৎ সুলতানকে হতবাক করে দিয়ে সালিহ ছেলেকে হাতে ধরে জানালা দিয়ে লাফিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতলে তলিয়ে যায়। সুলতান অসহায়ভাবে আর্তনাদ করে ওঠেন। তাঁর সারা চোখে মুখে সে কি আতঙ্ক, ভয়! একটু পরে নিদারুণ হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন তিনি।

আনারকলি হাসে। আপনি শান্ত হোন, জাঁহাপনা, ভয়ের কোনও কারণ নাই। ছেলের কোনো অনিষ্ট হবে না। বহাল তবিয়তে আবার তারা ফিরে আসবে।

কিন্তু সে কথায় সুলতান আশ্বস্ত হতে পারেন না। তাঁর সারা চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে, এখন আমি কী করি, কী হবে, ওরে বাবা, এ কী হলো?

আনার সুলতানকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে, আপনি উতলা হবেন না জাঁহপানা, এটা তো মানেন, আমি তার মা, দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছি। আপনার চাইতে দরদ আমার অনেক বেশি। সেই মা হয়ে আমি বলছি, হতাশার কোনও কারণ নেই। আপনার সন্তান যেমনটি ছিলো তেমনি সুস্থ অবস্থায় আবার ফিরে আসবে। আপনি শান্ত হোন।

সুলতান বুঝলেন সবই। আনারকলি তার গর্ভাধারিণী মা। সে যখন এতো নিশ্চিত, নিশ্চয়ই আশাঙ্কার কোনও কারণ থাকতে পারে না। তবু অশান্ত পিতার মন কিছুতে প্রবোধ মানতে চায় না। অপলক চোখে তিনি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ভেসে ওঠে সালিহ। তার হাতে বদর বাসিম। সুলতান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

কি আশ্চর্য, সুলতান ছেলেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন, একেবারে মায়ের বুকের শিশুর মতো ঝকমক করছে এক ফোঁটা পানিও গায়ে লাগেনি।

সালিহ বলে, আমি ভেবেছিলাম আপনি ভীষণ ভয় পেয়ে যাবেন। কিন্তু ভয়ের কিছু নাই। ওর শরীরের অর্ধেক রক্ত আমার ভগ্নী আনারের। সেই সূত্রে সে জলচরের সব যোগ্যতার হকদার। পরমপিতা সুলেমানের আশীর্বাদ নিয়ে সে জন্মেছে। জল তার সহায় হবে জীবনভোর, কোনও অনিষ্ট করবে না। আমি ওকে কাজল পরাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। জন্মের সাতদিন পরে আমাদের প্রত্যেক শিশুকে আমরা পরিয়ে দিই। এর ফলে সারাজীবন ধরে সে জলের মধ্যে সব কিছু স্বচ্ছ পরিষ্কার দেখতে পায়। জলের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে এর কখনও কিছু অসুবিধে হবে না। এমন কি জলে চলবে, জলে শোবে অথচ একবিন্দু জল লাগবে না গায়ে। এ হচ্ছে আমাদের জন্মগত ব্যাপার। সুলেমানের আশীর্বাদ।

সালিহ বদর বাসিমকে আনারকলির কোলে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ট্যাঁকে ঝোলানো থলেটা খুলে সুলতানের হাতে দেয়।

—ভাগ্নের মুখ দেখার নজরানা!

কার্পেটের ওপর থলেটা উপুড় করে ঢেলে দেন সুলতান। বিস্ময়ে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। পায়রার ডিমের মতো বড় বড় হীরে, এক বিঘৎ মাপের পান্না, মটরদানার মতো মুক্তো, অদ্ভুত লাল রঙের প্রবাল, এবং অজস্র মাপের মূল্যবান গ্রহরত্ন। সারা ঘরখানা আলোয় আলোয় ঝকমক করে উঠলো।

সুলতান ভেবে পান না, সালিহকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবেন। আনারকলিকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার ভাই-এর এই অভাবনীয় উপহার দেখে আমার তো আক্কেল-গুড়ুম হয়ে গেছে, আনার। এর এক একটা রত্ন আমার সারা মুলুকের সম্বৎসরের আয়ের সমান।

আনারকলি বলে, সে যাই হোক, আপনার যোগ্য উপহার আমরা দিতে পারি না, জাঁহাপনা। যা-ই দিই না কেন, আপনার ঋণ শোধ হবে না কোনও দিন। আমরা সবাই মিলে হাজার বছর ধরে আপনার বাঁদী গোলাম হয়ে থাকলেও আপনার দেনা শোধ দিতে পারবো না।

সালিহকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে সুলতান বললেন, এই খানে আমার প্রাসাদে তোমরা আরও চল্লিশ দিন থাকো—এই আমার ইচ্ছা, ভাই।

সুলতানের অনুরোধে আরও চল্লিশটা দিন কাটিয়ে দেশে ফিরে যাবার উদ্যোগ করলো ওরা। সুলতান বললেন, ক'টা দিন বড়ই আনন্দে কাটলো। সালিহ, তোমাকে কিছু

দিতে চাই আমি, কী নেবে, বলো?

সালিহ বললো, যে আদর ও আতিথেয়তা পেলাম, তার তুলনা নাই। এর বেশি কী আর কামনা করতে পারে মানুষ। ধন দৌলতের তো কোনও মূল্য নাই আমাদের কাছে। আমরা চাই ভালোবাসা—প্রেম ও শুভেচ্ছা। এবং তা আপনার কাছ থেকে পর্যাপ্তই পেয়েছি আমরা। মন ভরে গেছে। এখন অনুমতি করুন, স্বদেশে ফিরে যাই। জল ছেড়ে আমরা অনেকদিন হাওয়ার মধ্যে আছি। স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা শুভ নয়। বেশিদিন ডাঙায় থাকলে অসুখ বিসুখ করতে পারে। এখন আমরা বিদায় নিচ্ছি। পরে আবার আসবো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো চৌত্রিশতম রজনী ঃ

আবার কাহিনী শুরু হলো ঃ

সালিহ বলতে থাকে, ভাগ্নেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, মন বড়ই বিষণ্ন হয়ে উঠছে। কিন্তু উপায়ই বা কী? যাই হোক, মাঝে মাঝে এসে মামুকে দেখে যাবো।

সুলতান বলেন, না আর তোমাদের আটকে রাখবো না। এখন ফিরে যাও। কিন্তু যখনই সময়-সুযোগ হবে, চলে এস। তোমাদের মজার দেশটা দেখার বড় ইচ্ছে। কিন্তু পানি আমি ভীষণ ভয় করি।

আনারকলি বাচ্চা বদর বাসিম এবং সুলতানকে নিয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া দেখতে থাকলো।

এবার আমরা বদর বাসিমের কথায় আসি।

আনারকলি আয়া—ধাইদের বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের কোলে ছেলেকে ছেড়ে না দিয়ে নিজের বুকের দুধই খাইয়ে লালন করতে থাকলো। এইভাবে চার বছর কাটে। দামাল শিশু দিনে দিনে সিংহ-শাবকের মতো বেড়ে ওঠে।

বাসিমের বয়স যখন পনের হলো, তার রূপের বাহার আরও ফেটে পড়তে লাগলো। পড়াশুনা, খেলাধুলা, নাওয়া-খাওয়া, ঘুমনো—সব তার ঘড়ির কাঁটায় চলে। কোনও অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খলা নাই। দিনে দিনে বিকশিত হতে থাকে ওর যৌবনের গোলাপ-কুঁড়ি।

সুলতান বৃদ্ধ হয়েছেন। দেহ অথর্ব হয়ে পড়ছে। বুঝতে পারছেন, সময় সমাগত। আর বেশি দেরি নাই—এবার যেতে হবে। সুলতান ভেবে আনন্দ পান তাঁর একমাত্র সন্তান বাসিম রূপে, গুণে, শৌর্যে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

একদিন উজির আমির অমাত্য আমলা ইয়ার বক্সী,পাত্র-মিত্র পারিষদ এবং সেনাপতিদের সমক্ষে বাসিমের মাথায় বাদশাহী শিরোপা মুকুট পরিয়ে দিলেন সুলতান। নিজে হাতে ধরে তাঁর মসনদে বসিয়ে দিলেন পুত্রকে।

—আজ থেকে তুমি এই সলতানিয়তের সুলতান। আমি চাই যে, এই পবিত্র মসনদের মর্যাদা তুমি জীবন দিয়েও রক্ষা করবে। এই ধর, ন্যায় দণ্ড, শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন। এসবই বাদশাহর ধর্ম।

সুলতান বাসিমের কপালে চুম্বন এঁকে দিলেন। এইভাবে অভিষেক হলো তার।

বদর বাসিম তখ্‌তে বসে প্রথমে উজির আমিরদের নিয়ে সভা করলো।

—সবলের আক্রোশ থেকে দুর্বলকে এবং ধনীর শোষণ থেকে গরীব-দুঃখীকে রক্ষা করাই আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে।

নতুন সুলতানের মুখে এই সাম্যের বাণী শুনে বৃদ্ধ শাহরিমান ও উজির-আমির সকলেই মুগ্ধ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

এরপর শাহরিমান সুখে অবসর যাপন করতে থাকলেন। আর বাসিম বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রজাপালন করেতে লাগলো।

এক বৎসর পরে আল্লার নামগান করতে করতে একদিন শাহরিমান দেহ রাখলেন।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো পঁয়ত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আনারকলি এবং বাসিম এক মাস ধরে শোক পালন করলো। শাহরিমানের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সালিহ এলো সমুদ্রতল থেকে। এই সতেরো বছরে আরও অনেক বার এসে সে দেখে গেছে তারা বোন আর ভাগ্নেকে। বাসিমের কাছে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলো সে।

—তাঁর মরার সময় আমি কাছে থাকতে পারলাম না, বাবা। এ দুঃখ আমার যাবে না। যাক, বাবা-মা কারো চিরকাল বেঁচে থাকে না। শোক করো না মামু। ভালোভাবে শাসন কাজ চালাও। তোমার প্রজারা তোমার পুত্রসম। তাদের সুখ-সুবিধে দেখাই তোমার একমাত্র কাজ।

ভাই-বোনে বাসিমের শাদী নিয়ে আলোচনা হয়। সালিহ বলে, বাসিম, বড় হয়েছে—সতেরোয় পা দিলো, এবার তো ওর একটা শাদীর ব্যবস্থা করতে হয়, বোন।

আনারকলি বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম, দাদা। ভালো মেয়ে কোথায় পাওয়া যায় দেখ। একমাত্র সলতে, সময় মতো শাদী দিয়ে বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

সালিহ বলে, আমার মতে, সমুদ্রের শাহজাদীদের কারো সঙ্গে ওর শাদী দেওয়া উচিত।

আনারকলি বলে আমারও তাই ইচ্ছে। ভেবে দেখতো কোন সুলতান বাদশাহর সুদর্শনা সুলক্ষণা সুন্দরী কন্যা আছে!

সালিহ এক এক করে নাম করতে থাকে। কিন্তু আনারকলির কাউকেই মনে ধরে না।

—না, এরা কেউই বাসিমের যোগ্য হবে না। ওর যা বাড়ন্ত গড়ন—যা রূপ, শিক্ষাদীক্ষা, তার উপযুক্ত এরা কেউ না।

সালিহ বলে, মনে পড়েছে, আনার। সুলতান সামানদালের এক পরমাসুন্দরী কন্যা আছে—তার নাম জানারা।

আনার বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে। আমি যখন চলে আসি তখনও ওর বয়স ছিলো বছরখানেক। ফুটফুটে সুন্দর চাঁদের মতো মেয়ে—একেবারে ডানাকাটা পরীর মতো। এই মেয়েই আমার ছেলের যোগ্য হবে। তুমি ওর বাবার সঙ্গে কথা বলো, দাদা।

দুই ভাইবোনে যখন এই সব কথাবার্তা হচ্ছিল বাসিম শুয়ে শুয়ে ঘুমের ভান করে সব শুনছিলো। জানারার রূপের বর্ণনা শুনে সে মনে মনে শিহরিত হয়ে ওঠে।

সালিহ বলে, কিন্তু বোন, কাজ অত সহজ হবে বলে তো মনে হয় না। জানরার বাবা বড় একরোখা গোঁয়ার। এর আগে অনেক সুলতান বাদশাহর প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন কি কয়েকজন শাহজাদাকে ঠেঙিয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে। আবার শুনেছি, কাউকে মারতে মারতে শহরের বাইরে বের করে দিয়েছে। জানি না, আমাদের প্রস্তাব সে কী ভাবে নেবে। এই কারণে আমার সন্দেহ হয়, ব্যাপারটা হয়তো শুভকর হবে না।

আনারকলি বলে হুঁ, কাজটা খুব হিসেব করে ও সাবধানে এগোতে হবে। ঝোপ বুঝে কোপ মারা ছাড়া আর পথ নাই। তাছাড়া করতে গেলে দয়ে মজতে হতে পারে! যাক, এ নিয়ে ভেবে চিন্তে পরে আবার আলোচনা করা যাবে।

এই সময়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে বাসিম জেগে ওঠে। ভাবখানা এতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিলো। এই মাত্র জাগলো। বিছানা ছেড়ে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে। কিন্তু অন্তরে দগ্ধ হতে থাকলো। জানারা তার বুকে ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়েছে। এখন কিসে তার নির্বাপিত হবে?

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাঁইত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বাসিম ভাবে, তার হৃদয়ের এই আকুলতা মা ও মামার কাছে গোপন রাখবে। সারা রাত ধরে নানা রঙের স্বপ্নের জাল বুনে চলে। চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসে না।

ভোর না হতেই সে শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে। মামার ঘরে গিয়ে সালিহকে ডেকে তোলে, মামা, ওঠ, চলো তোমার সঙ্গে আজ সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবো। সারারাত ঘুম হয়নি। মাথাটা ধরে আছে। খোলা হাওয়ায় বেড়ালে হয়তো একটু ভালো লাগবে।

সালিহ বলে, বেশ তো চলো, মামু। সকাল বেলায় সমুদ্রের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো।

সমুদ্রের উপকূলে এসে ওরা একটা উঁচু টিলার ওপরে বসে। সামনে শান্ত গভীর সমুদ্রের ঘন নীল জল। মাথার ওপরে নির্মেঘ আকাশ। এক সময় বাসিম বলে, মামা আপনাদের কথাবার্তার সবই আমি শুনেছি। সুলতান সামানদালের কন্যা জানারাকে দেখার জন্য মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সালিহ বুঝলো ভাগ্নের হৃদয়ে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। বললো, কিন্তু তাকে পাওয়া তো খুব সহজ কাজ হবে না, মামু।

—কিন্তু মামা, যে ভাবেই হোক জানারাকে পেতেই হবে। তার কথা শোনার পর থেকে আমার বুকের মধ্যে তার অসন পাতা হয়ে গেছে। আমি তাকে না পেলে মরে যাবো। আপনাকে ব্যবস্থা একটা করে দিতেই হবে। তাকে ছাড়া অন্য কোনও নারীকে আমি হৃদয়ে স্থান দিতে পারবো না।

সালিহ বলে, তা হলে মামু, চলো তোমার মা-এরা কাছে যাই। তাকে বলি, সুলতান সামানদলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য আমরা সমুদ্রের নিচে যেতে চাই। সে যদি যাবার অনুমতি দেয় তবে তোমাকে নিয়ে আমি সামানদলের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

বাসিম বাধা দিয়ে বলে, মাকে এসব বলে তার অনুমতি আদায় করতে যাওয়া বৃথা। আমি তার একমাত্র সন্তান। এক পলক চোখের আড়াল করতে চাইবে না, কিছুতেই আমাকে যেতে দিতে রাজি হবে না। তার চেয়ে আমি বলি কি তাকে না বলেই, চলো আমরা চলে যাই। হয়তো মা খানিকটা কষ্ট পাবে, কিন্তু আমি ফিরে এলেই আবার মুখে হাসি ফুটবে তার। আর তা ছাড়া মা-এর আশঙ্কা, সুলতান সামানদাল ভীষণ নিষ্ঠুর, সে আমাদের সঙ্গে হয়তো খারাপ ব্যাবহার করবে! মা বলবে, নিজের সলতানিয়ত ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না। কারণ মসনদ অরক্ষিত থাকলে শত্রুর মনে লোভ জাগবে। আমি আমার মাকে ভালো করে জানি, সে এই সব অজুহাত দেখিয়ে আমার যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেবে। তার চেয়ে, মাকে কিছু বলার দরকার নাই, চলো আমরা একবার সামানদালের সঙ্গে মোলাকাত করে আসি। দেখি তার কী মতামত।

সালিহ বললো, তোমার যখন এতোই ইচ্ছা, চলো যাই একবার ঘুরে আসি।

এই বলে সে তার হাতের একটা আংটি খুলে বাসিমের হাতে দিয়ে বললো, এটা

পরে নাও। রক্ষাকবচ, হাতে থাকলে জলের নিচে তোমার কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

এরপর টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সালিহ আল্লা হো আকবর বলে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিলো। মামার দেখাদেখি ভাগ্নেও ঠিক একইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। নিমেষে তলিয়ে গেলো দু'জনে। একেবারে সমুদ্রের গভীর তলদেশে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আটত্রিশতম রজনী। আবার সে শুরু করে ঃ

সালিহর ইচ্ছা প্রথমে সে তার ভাগ্নেকে তাদের নিজের প্রাসাদে নিয়ে যায়। তার মা লোকস্ত নাতিকে দেখে পুলকিত হবেন।

সুতরাং সে বাসিমকে সঙ্গে নিয়ে মা-এর কাছে উপস্থিত হলো। লোকস্ত বাসিমকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বুকে জড়িয়ে ধরে আদর সোহাগ করতে থাকে।

—তোমার মা কেমন আছে, ভাই?

—ভালো আছে, দাদীমা।

লোকস্ত বলে, আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। কতকাল পরে আবার তোমাকে দেখতে পেলাম। আনারকে আনতে পারলে না ভাই, তাকে একবার দেখতাম।

বাসিম বললো, মা আপনাকে শুভেচ্ছা আর সালাম জানিয়েছে দাদীমা।

আপনারা বুঝতে পারছেন, এখানে বাসিম মিথ্যে কথা বললো। আসার সময় সে তো তার মা-এর সঙ্গে দেখা করেই আসেনি।

সালিহ বললো, তোমার নাতি সামানদালের কন্যা জানারাকে শাদী করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে এসেছি সামানদালের সঙ্গে এই শাদীর ব্যাপার নিয়ে এক প্রস্তাব দেব বলে।

ছেলের কথা শুনে লোকস্ত ভীষণ রেগে উঠলেন, তোর তো সবই জানা আছে বাবা। সামানদাল ভীষণ জেদী একরোখা এবং ভয়ঙ্কর লোক। কত সুলতান বাদশাহকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, কত শাহজাদাদের মেরে হাড়-গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে, সেকি তুই জানিস না? এসব জেনে শুনে ওর কাছে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসলে মাটির মানুষের কাছে আমাদের মান ইজ্জত কী বাড়বে সালিহ।

—কিন্তু মা আমাদের ছেলেই বা কম কিসে? হতে পারে তার মেয়ে জানারা সুন্দরী, কিন্তু আমাদের বাসিম তারও অধিক সুন্দর সুপুরুষ। হতে পারে তারা বিত্তশালী কিন্তু আমাদের ছেলে তার চেয়েও ধনী সুলতান।

লোকস্ত দেখলো, ছেলেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। তার মা বললো, যেতে হয়ত তুই এক যা। আমি বাসিমকে সঙ্গে দেব না। কোনও কারণে সে যদি অপমান অবজ্ঞা করে সে আমি সইতে পারবো না।

সালিহ দুই বস্তা উপহার সামগ্রী চাকরদের মাথায় চাপিয়ে সামানদালের প্রাসাদের দিকে চললো।

এই সময়ে ভোর হতে থাকে। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ঊনচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু করে সে ঃ

সামানদালের প্রাসাদে এসে সে সুলতানের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। এবং প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। সালিহ দরবারে প্রবেশ করে।

একখানা পান্নার সিংহাসনে বসেছিলো সামানদাল। সালিহ তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উপহারের বস্তা দু'খানা তার সামনে রাখে। সুলতানও তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাশে বসতে বলে।

—সু-স্বাগতম শাহজাদা সালিহ। কী খবর, এস, এস, এখানে বসো আমার পাশে। অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হলো। আচ্ছা, বলো কেন এসেছ আজ, দেখি কিছু করতে পারি কিনা তোমার জন্য?

নিশ্চয়ই আপনি করতে পারবেন, জাঁহাপনা। আজ আমি যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। দুনিয়াতে একমাত্র আপনিই তা পূরণ করতে পারেন।

সামানদাল অধৈর্য হয়ে ওঠে, আহা, ভূমিকা রেখে চটপট বলেই ফেল, না!

সালিহ বলে, আপনার প্রাণাধিক কন্যার সঙ্গে আমার ভাগ্নে সুলতান বদর বাসিমের শাদীর প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আমি। পারস্য এবং খুরসানের পরলোকগত সুলতান শাহরিমানের একমাত্র সন্তান সে—বর্তমানে সুলতান।

সালিহর প্রস্তাব শুনে সামানদাল হো-হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

আমি ভেবেছিলাম, তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, কিন্তু এখন দেখছি, নাঃ, আমি ভুল করেছি। তা না হলে এই ধরনের অদ্ভুত আজগুবি একটা প্রস্তাব তুমি রাখতে পার আমার কাছে।

—কেন, প্রস্তাবটা আজব হলো কী করে। আমার ভাগ্নে বাসিম আপনার কন্যার অযোগ্য কোন দিক দিয়ে। রূপে? গুণে? ঐশ্বর্যে? আমি বলবো, আপনার কন্যার যা গুণ আছে বাসিমের গুণ তার চেয়ে অনেক বেশি। আর ঐশ্বর্য তার এতো আছে— আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

সালিহর এই সব কথা শুনে সামানদাল ক্রোধে ফেটে পড়ে।

—কী, এতো বড় স্পর্ধা! আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান? এই কে—আছিস, কুত্তার বাচ্চাকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দে তো।

একদল ষণ্ডামার্কা পেয়াদা তাকে পাকড়াও করার জন্য ছুটে আসে। কিন্তু সালিহ আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় তাদের সকলকে পাশ কাটিয়ে প্রাসাদের বাইরে ছিটকে আসতে পারে।

বাইরে এসেই সে চমকে যায়। তার মা লোকন্ত সন্তানের বিপদ আশঙ্কায় এক হাজার অশ্বারোহী সেনা পাঠিয়েছে তাকে রক্ষা করার জন্য। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত তারা।

সেনাপতি জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে শাহাজাদা। আপনি এতো ভীত চকিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন কেন?

সালিহ বলে, সামানদাল আমাকে কুৎসিততম গালমন্দ দিয়েছে। তার লোকজনদের লেলিয়ে দিয়েছে আমার ওপর। আমাকে তারা মারবে।

সেনাপতি তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলো, দরবারে ঢুকে সুলতানকে আক্রমণ কর।

তৎক্ষণাৎ সৈন্যরা লাফ দিয়ে নেমে অসি উন্মুক্ত করে রে রে করে ঢুকে পড়লো দরবার মহলে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চল্লিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

সামানদাল দেখলো, এক উন্মুক্ত সৈন্যদল তার প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। এক মুহূর্ত সে স্তব্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু তারপর চিৎকার করে উঠলো, আমার বীর যোদ্ধা সৈন্যরা, শত্রু হানা দিয়েছে, বীর বিক্রমে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়। কচুকাটা করে শুইয়ে দাও এদের।

এই মুহূর্তে আমি দেখতে চাই, শয়তানদের মুণ্ডু গড়াগড়ি যাবে আমার পায়ের তলায়।

সামানাদালের সৈন্যরাও তেড়ে এলো। দুই দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগলো। কিন্তু সালিহর সৈন্যবাহিনী অমিত বিক্রমশালী। এক পা পিছনে হটাতে পারলো না। তাদের অসির আঘাতে সামানদালের সৈন্যরা লুটিয়ে পড়তে থাকলো। এইভাবে অনেকক্ষণ লড়াই চলার পর দেখা গেলো, সামানদালের সব সৈন্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। অগণিত মৃতদেহ লুটিয়ে পড়েছে সারা দরবার মহলে। রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে।

সামানদাল শঙ্কিত হলো। এবার বুঝি তার প্রাণ যায়। সিংহাসন ছেড়ে সে পালিয়ে অন্দরমহলে যেতে চায়। কিন্তু সালিহ লাফিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ায়। তলোয়ার উঁচিয়ে ধরে বলে, খবরদার, এক পা নড়বে না। যদি পালাবার চেষ্টা কর শয়তান, এই যে দেখছো, শাণিত তলোয়ার, তোমার মুণ্ডু লুটিয়ে পড়বে এখুনি।

সামানদাল হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে। সালিহর সৈন্যারা পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেলে তাকে।

সামানদাল সালিহর হাতে বন্দী থাকে। আমরা এখন তার কন্যা জানারার কথা বলি।

প্রাসাদের সৈন্যবাহিনী শত্রুর হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত,ভুলুণ্ঠিত হয়েছে এবং বাবা সামানদাল বন্দী, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র জানারা তার এক নিত্য সহচরী বাঁদী সিরৎলিকে সঙ্গে করে খিড়কীর দরজা দিয়ে পালিয়ে অজানার পথে বেরিয়ে পড়লো।

পথঘাট কিছুই জানা নাই। প্রাণ-ভয়ে দিশাহারা হয়ে কোথায় যে সে ছুটে চললো কিছুই বুঝতে পারে না। প্রাসাদের বাইরে সে কখনও আসেনি।

চলতে চলতে এক জনবসতি-শুন্য গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করে সে একটা ঝাঁকড়া গাছের ওপরে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইলো।

কিন্তু নিয়তির এমনি খেলা যে লোকস্তের প্রাসাদ এই বনভূমির অতি সন্নিকটে।

দুইজন অশ্বারোহী সৈন্য ছুটতে ছুটতে এসে লোকাস্তকে সংবাদ দিলো। শাহজাদা সালিহকে সুলতান সামানদাল অপমান করেছিলো। তাকে প্রহার দেবারও হুকুম দিয়েছিলো সে। কিন্তু তা তারা পারেনি। ইতিমধ্যে আমরা, এক সহস্র সেনা সেখানে পৌঁছে যাই। এখন দুই দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না বেগমসাহেবা, এ যুদ্ধে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

বদর বাসিম আতঙ্কিত হলো। সর্বনাশ! এখন উপায়? শুধু একমাত্র তারই কারণে এই যুদ্ধ। মামা যদি মারা যায়? তা হলে? তা হলে সে দাদীমা লোকস্তের চোখের বিষ হবে। সব দোষ তার ঘাড়েই চাপবে। বলবে, তোমার খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়েই আমার ছেলেটা প্রাণ হারালো! না না, না, আর ভাবতে পারে না বাসিম।

সকলের অলক্ষ্যে সে প্রাসাদ ছেড়ে বনের দিকে ছুটে চলে। কোথাও পালাতে হবে। আত্মগোপন করতে হবে। না হলে পুত্রহারা মায়ের রোষানলে পড়ে সে ছারখার হয়ে যেতে পারে।

নিয়তিই তাকে সেই ঝাঁকড়া গাছের নিচে এনে দাঁড় করালো। আপনারা জানেন, এই গাছের ডালে বসে আছে সামানদাল কন্যা জানারা। সেও প্রাণভয়ে এখানে এসে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলো।

গাছের ডালে উঠে বসতে যাবে, হঠাৎ বাসিমের নজরে পড়ে এক পরমাসুন্দরী কন্যা একটা ডালের ওপরে বসে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। এমন রুপবতী নারী কখনও দেখেনি সে।

—কে তুমি? কেনই-বা এখানে এই গাছে বসে আছ, সুন্দরী?

—আমি জানারা, আমার বাবা সুলতান সামানদাল। সালিহ তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আমাদের প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। আমাদের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত খতম হয়ে গেছে। আমার বাবা এখন শাহাজাদা সালিহর হাতে বন্দী। আমার তল্লাশে তার সৈন্যারা এতক্ষণে সারা প্রাসাদ তোলপাড় করছে। আমি অনেক আগেই প্রাসাদ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু তুমি কে?

—আমার নাম বদর বাসিম, সালিহর ভাগ্নে। পারস্য এবং খুরাসনের সুলতান। আমার বাবা ছিলেন সেখানকার সুলতান। আমার মা আনারকলি, —বেগমসাহেবা লোকস্তের কন্যা। মামার মুখে তোমার রূপের অনেক কথা শুনেছি। আমারই ইচ্ছায় তিনি গিয়েছিলেন তোমার বাবার কাছে। শাদীর প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু তোমার বাবা শুনেছি আমার মামাকে প্রহার করতে উদ্যত হয়। আত্মরক্ষার জন্যই তিনি সৈন্য ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তোমার বাবা উদ্ধত, অবিনয়ী। তার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই এই মর্মান্তিক কাণ্ড সংঘটিত হলো। মামার প্রস্তাবে সে যদি রাজি নাও হতো এমন কোনও অপরাধ ছিলো না। কিন্তু পেয়াদা সিপাই দিয়ে মারধোর করানো কি সহ্য করা সম্ভব!

জানারা বলে, আমার বাবা ভীষণ বদরাগী, একরোখা মানুষ। তা না হলে, তোমার মতো এমন সুন্দর সুপুরুষ পাত্রকে তাঁর পছন্দ হয় না? তোমাকে জামাই করতে পারলে, যে-কোনও সুলতান বাদশাহ নিজেকে ধন্য মনে করবে। কিন্তু আমার বাবা নিজের ভালো, আমার ভালো কিছুই বুঝতে চাননি। তাঁর দম্ভেই তিনি মারা গেলেন। আপনার মামার হাতে আজ তিনি বন্দী। কে জানে, তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন কিনা। না করাই স্বাভাবিক। নিজেকে রক্ষা না করতে পারলে তো এতক্ষণে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়তো আমার বাবার পায়ের নিচে। এখন তাঁর অনুকম্পার ওপরই সব নির্ভর করছে।

জানারা নিচে নেমে এলো। বাসিম তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে, তুমি আমার কল্পলোকের মানসী প্রিয়া। শয়নে স্বপ্নে, নিদ্রা জাগরণে শুধু তোমারই ধ্যান করেছি আমি। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচতে পারবো না—এই কারণেই সুদূর মাটির দেশ থেকে নেমে এসেছি এই গহিন সমুদ্রে। বলো, তুমি আমার হবে?

চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেয় জানারার অধর কপোল, বুক। গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে পিষ্ট করে ফেলতে চায় ওর ফুলের মতো কোমল তনুলতা। বাসিম অনুভব করতে পারে, জানারার সুডৌল স্তন-যুগল মর্দনের আনন্দে যেন আর্তনাদ করে উঠছে।

বাসিম উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ক্ষিপ্রহাতে সে জানারার কটিবন্ধ খোলার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু পারে না। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মেরে বাসিমকে ঠেলে ফেলে দেয় জানারা। মুখে থুথু ছিটিয়ে ফুঁসে ওঠে, অসভ্য জানোয়র, কামনার কীট, এই তোর ব্যবহার? এই তোর ভালোবাসা? নারী-মাংসের পাশবিক ক্ষুধা তোর শিরায় শিরায়। তুই আমাকে ভালোবাসিস? মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা? তোর অপকর্মের সাজা কেমন করে দিতে হয়, একবার দ্যাখ। শোনও মাটির দেশের জন্তু, আমার সঙ্গে যে ব্যবহার তুমি করলো তার দণ্ড হিসাবে তোমাকে আমি এই মুহূর্তে না-পাখি না-পশু এক অদ্ভুত ধরনের জীবে পরিণত করলাম।

কি আশ্চর্য, জানারার মুখের অভিশাপ শেষ হতে না হতে বদর বাসিম একটা বিরাটাকৃতির শাদা উটপাখির আকার ধারণ করলো।

জানারা তার সহচরী বাঁদীকে বললে, এই কামুক জানোয়ারটাকে আমি এমন একটা জীব বানালাম সে কোনও দলেই ঠাঁই পাবে না। পাখীরা বলবে, 'তুমি উড়তে পার না, ডানা থাকলে কী হবে, আমরা তোমাকে দলে নেব না। আর জানোয়াররা বলবে, তোমার তো দু'খানা পা। তুমি আবার জানোয়ার হতে চাও কোন মুখে, দূর হও।' সিরৎলি, এটাকে নিয়ে চলে যা ঐ মরুভূমির মধ্যে। বেঁধে রেখে আয়, না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরুক লোচ্চাটা। নারী-মাংস খুবলাতে আসার মজাটা একবার বুঝুক।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বিয়াল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

জানারা বললো, তুমি ভুল জায়গায় খাপ খুলতে গিয়েছিলে মিট্টির সুলতান। জানারা ভালোবাসার দাসী হতে পারে কিন্তু কারো পাশবিক কামনার শিকার হবে না! সিরৎলি যাও, নিয়ে যাও তাকে ঐ উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে, ওকে বেঁধে রেখে এস। গলা শুকিয়ে না খেয়ে মরুক, ওটা!

সিরৎলি বাসিমকে তাড়াতে তাড়াতে মরুভূমির দিকে নিয়ে চলে। বাসিম-এর চোখে জল আসে। চলতে চলতে কখনও সে দাঁড়িয়ে পড়লে সিরৎলির ডাণ্ডা এসে পড়ে ওর পিঠে। বেদনায় কঁকিয়ে ওঠে সে। আবার চলতে থাকে। কিন্তু হাজার হলেও সুলতানের দুলাল। দৌড় ঝাঁপের অভ্যাস নাই কোনকালে, অমন তাড়া সহ্য করবে কি করে। আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ে। সিরৎলির দিকে করুণভাবে তাকায়।

সিরৎলির মায়া হয়। আহা কী সুন্দর শাহজাদা। না হয় একটু বাড়া-বাড়িই করেছিলো, তাই বলে এই হাল করতে আছে। সে ভাবে, ঐ খাঁ খাঁ মুরভূমির মধ্যে বেঁধে রেখে এলে নির্ঘাৎ মারা যাবে। না, তা সে করতে পারবে না। একটা সোনার চাঁদ ছেলেকে এইভাবে হত্যা করার পাপের ভাগী সে হতে পারবে না। অন্য কোথাও, অন্য কোনও স্থানে রেখে দিয়ে যাবে। যেখানে অন্ততঃ প্রাণে মারা যাবে না। তারপর ওর যা বরাতে লেখা আছে তাই হবে। চাই কি শাহজাদী জানারার রাগ পড়ে গেলে তারও মনে অনুতাপ অনুশোচনা হতে পারে। তখন হয়তো সে-ই তাকে উল্টে চাপ দিয়ে দুষবে, 'আমি না হয় রাগের মাথায় তাকে মেরে ফেলতেই বলেছিলাম, তাই বলে তুমি ঠাণ্ডা মাথার মানুষ হয়ে অমন সুন্দর এক শাহজাদাকে হত্যার মুখে রেখে এলে?'

নবাব বাদশাহর বাড়িতে নোকরী করে করে তার তিন কাল গেছে। এদের খামখেয়ালীপনা দেখে দেখে নাড়ি-নক্ষত্র সব তার চেনা হয়ে গেছে। একই কথা মেজাজ মর্জি বুঝে চলতে পারলে ইনাম মেলে। আবার সেই কথারই দোষ ধরে, অন্য সময় হয়তো বা কারো গর্দান যায়।

সিরৎলি উটপাখী রূপী বাসিমকে তাড়িয়ে নিয়ে এক শ্যামল বন-প্রান্তরের দিকে চলে যায়। অদূরে এক স্বচ্ছ-সলিলা নদী প্রবাহিতা। গাছে গাছে পাকা পাকা ফল। সে ভাবলো, এইখানে শাহজাদাকে রেখে গেলে গাছের ফল আর নদীর জল খেয়ে সে অন্ততঃ জীবন ধারণ করতে পারবে।

সালিহ সামানদালকে বন্দী করে তারই প্রাসাদের এক কক্ষে কয়েদ করে রাখে। এবং মসনদে আরোহণ করে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করে দেয়। সারাটা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে শাহজাদী জানারার সন্ধান পায় না।

সালিহ বুঝতে পারে বিপদের আশঙ্কা বুঝে পূর্বাহ্নেই সে কেটে পড়েছে। মা-এর কাছে ফিরে আসে সে। লোকস্ত ছেলেকে ফিরে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে। কেঁদে আকুল হয়।

—এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে, বাবা।

—কেন কী, আবার কী হয়েছে মা?

সালিহ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

লোকস্ত বলে, বাসিমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই অচেনা-অজানা বিদেশ-বিভূঁই-এ কোথায় গেলো সে, আর কেনই বা না বলে ক'য়ে চলে গেলো, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি নফর চাকরদের খুঁজতে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা ফিরে এসে বললো, ধারে কাছে কোথাও সে নাই। বহু দূরে অন্য কোথাও গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে হয়তো বা।

সালিহ চারদিকে লোকজন পাঠালো। সারা শহর গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরে এলো তারা। না, কোথাও সন্ধান পাওয়া গেলো না বাসিমের। অবশেষে সে শ্বেত শহরে দূত পাঠালো আনারকলির কাছে। গভীর দুঃখ-বেদনা জানিয়ে এক পত্র লিখলো সে, 'বাসিম কোথায় উধাও হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও তার সন্ধান করতে পারিনি।'

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে আনারকলি এসে উপস্থিত হলো। মা লোকস্ত ভাই সালিহ গভীর শোকে মুহ্যমান। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে তাদের।

সালিহ চোখের জল ফেলতে ফেলতে সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলো।

—আমি এখন সামানদালের মসনদ অধিকার করে সুলতান হয়ে বসেছি। সারা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শাহাজাদী জানারাকেও পাওয়া যায় নি। প্রাসাদ কেন, সমগ্র দেশেও তাকে দেখে নি কেউ। বদর বাসিমের সন্ধানে এখনও আমার বিশাল বাহিনী দেশের সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আনারকলির চোখের সামনে আঁধার নেমে এলো। পুত্রহারা মা-এর গগনভেদী আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠলো। প্রাসাদ ছাপিয়ে পড়লো বুক ভাঙ্গা কান্নার ঢেউ।

মা লোকস্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দেয়, খোদা এতো নিষ্ঠুর হবেন না, মা। বাসিম আমার ফুলের মতো নিষ্পাপ নির্মল। তার কোনও ক্ষতি হতে পারে না। তুই দেখিস, বাসিম আবার ফিরে আসবে।

আনারকলি বলে, মা আমি তো আর এখানে পড়ে থাকতে পারবো না। চার দিকে শত্রুর অভাব নাই। মসনদ অরক্ষিত আছে, আমি যাচ্ছি। বাসিমের খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে দূত পাঠাবে আমার কাছে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তেতাল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এবার চলুন আমরা সেই সবুজ বনানীর নদী উপকূলে যাই। সেখানে সিরৎলি বদর বাসিমকে কীভাবে রেখে গেছে—একবার দেখে আসি।

উটপাখি-রূপী বাসিম যখন দেখলো, দাসীটা তাকে নদীর ধারে ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো, কান্নায় ভেসে যেতে লাগলো তার দু'চোখ। পাখা আছে তবু উড়ে পালাবার ক্ষমতা নাই। বিশাল দেহটা নিয়ে দুপায়ে গুটি গুটি হেঁটে আর কতদূর যাওয়া যায়? এবং যাবেই বা কোথায়। সবই অচেনা-অজানা। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা করে দেখে নিলো সে। খিদের তেষ্টাও পেয়েছিলো বেশ। চারপাশে অনেক ছোট ছোট ঝাঁকড়া গাছ। এবং

সেই সব গাছের নাম না জানা হাজার হাজার পাকা ফল। বাসিম যতটা পারলো খেলো। তারপর নদীর ঘাটে গিয়ে প্রাণভরে জল পান করলো। তারপর খুঁজে পেতে একটা বিশাল প্রাচীন বটের কোটরে আশ্রয় নিলো। জায়গাটা সে মন্দ বের করেনি। বিশ্রাম করার পক্ষে উপযুক্ত।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এলো। বাসিম বৃক্ষ-কোটরে ঘুমিয়ে পড়লো। সকাল বেলায় ঘুম ভেঙ্গে যে চমকে ওঠে। এক শিকারী জালে আবদ্ধ করেছে তাকে।

শিকারীর মুখে বিজয়ের হাসি।

—যাক, আজ একটা ভালো দাঁও পাওয়া গেছে। বাজারে নিয়ে গেলে চড়া দামে বিকাবে। শিকারী তার কাঁধে তুলে নিলো উটপাখী-রূপী বাসিমকে। স্বগতভাবে বলতে বলতে পথ চলে, এতোকাল এতো পাখি ধরেছি, কিন্তু এ রকম অদ্ভুত নতুন পাখি তো কখনও পাইনি। দামটা যাচাই করে দেখতে হবে। নিশ্চয়ই কোনও সাধারণ পাখি নয়। হয়তো অনেক দাম হবে। হাটে বাজারে কোনও সাধারণ লোকের কাছে বেচে দিলে দামও বেশি পাওয়া যাবে না, এবং এর মর্ম বোঝার চেষ্টা না করে কেটে ফেলবে হয়তো। তার চাইতে সুলতান বাদশাহের কাছে হাজির করলে মোটা বকশিশ মিলতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে সে এক সুলতানের প্রাসাদে পৌছালো। পাখিটার অদ্ভুত আকার এবং ঠোঁট চোখ পালক দেখে সুলতান মোটা ইনামের বিনিময়ে পাখিটা কিনে নিয়ে একটা সোনার খাঁচায় ভরে রাখলো। একটা পাত্রে করে খেতে দিলো কিছু ভুট্টা আর ডালের দানা। কিন্তু কিছুই স্পর্শ করলো না সে। সুলতান ভাবলো, এ পাখি এসব বুঝি খায় না। তারপর কিছু মাংস এবং ফল এনে দিলো। এবার কিন্তু পাখিটা সাগ্রহে খেতে থাকলো।

সুলতান আনন্দে নেচে ওঠে। খোজাকে ডেকে বলে, ওরে যা যা, শিগ্গির বেগমসাহেবাকে খবর দে, কী অদ্ভুত একটা পাখি কিনেছি আজ। পাখিটা ডালের দানা ছোঁয় না। অথচ মাংস ফল পেলে গবগব করে খায়।

খোজাটা ছুটে যায় হারেমে। একটু পরে বেগমসাহেবা আসে। কিন্তু পাখিটা দেখামাত্র সে নাকাব দিয়ে মুখ ঢেকে থামের আড়ালে দাঁড়ালো। সুলতান বুঝতে পারে না, কী ব্যাপার? বেগমের পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হলো? এতো শরম কীসের? এখানে তো বাইরের কোনও পুরুষ নাই!

বেগম বলে, এই পাখিটা আসলে পাখি নয়। এক শাহজাদা। খুব সুন্দর দেখতে। ওর নাম বদর বাসিম। সুলতান শাহরিমানের পুত্র। ওর মা আনারকলি। শাহজাদী জানারার অভিশাপে ওর এই উটপাখির দশা হয়েছে।

সুলতান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, জানারা অভিশাপ দিলো কেন?

—তার কারণ, এই বদর বাসিমের মামা সালিহ জানারার বাবা সামানদালকে বন্দী করে মসনদ দখল করে নিয়েছে।

সুলতান চিৎকার করে ওঠে, আল্লাহ ঐ শাহাজাদী জানারাকে সমুচিত সাজা দেবেন। কী কী ঘটেছে, সব আমাকে খুলে বলো, বেগম।

সুলতান-বেগম অসাধারণ যাদু বিদ্যাধরী। আগাগোড়া সব কাহিনী খুলে বললো সে। সুলতান সব শুনে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে উঠপাখির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী, সব সত্যি।

পাখিটা ঠোঁট নেড়ে, পাখা ঝটপট করে জানালো সবই ঠিক।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চুয়াল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সুলতান বলে, বেগমসাহেবা, তুমি ওকে শাপমুক্ত করে দাও। আবার সে মানুষ হয়ে উঠুক।

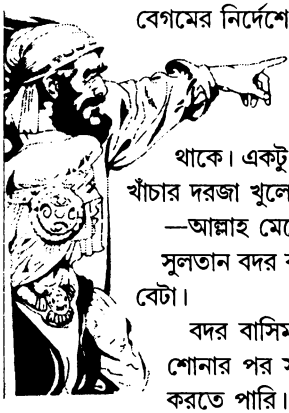

বেগমের নির্দেশে খোজা এক পেয়ালা জল এনে দেয়। বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র আওড়ে কয়েকবারে জলটুকু পাখিটার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে আবার কী সব বলতে থাকে।

নিমেষের মধ্যে উটপাখিটা মানুষের আকার ধারণ করতে থাকে। একটু পরে সে এক সুন্দর সুপুরুষ শাহজাদার চেহারা ফিরে পায়। খাঁচার দরজা খুলে সে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

—আল্লাহ মেহেরবান।

সুলতান বদর বাসিমকে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার সব কাহিনী শুনতে চাই, বেটা।

বদর বাসিম তার জীবনের সব কাহিনী সবিস্তারে খুলে বললো তাকে। শোনার পর সুলতান বললো, এখন বলো, বাবা, তোমার জন্যে কী আমি করতে পারি।

বদর বলে, সব আগে আমি আমার সলতানিয়তে ফিরে যেতে চাই! অনেক দিন দেশ ছাড়া। মসনদ খালি পড়ে আছে। চারদিকে শত্রুর অভাব নাই। না জানি এতোদিনে কী ঘটেছে। দারুণ উৎকণ্ঠায় মা দিন কাটাচ্ছেন। আমাকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মুখে হাসি ফুটবে না।

সুলতান বললো, আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।

খুব সুন্দর দেখে একখানা ময়ূরপঙ্খী নৌকা বানিয়ে অনেক খাবার দাবার এবং সোনাদানা হীরে জহরতে বোঝাই করে বাসিমকে চাপিয়ে বিদায় দিলো সে।

বাসিমের বড় আশা ছিলো সে দেশে ফিরতে পারবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ভাগ্য যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে না গিয়ে উপায় কী?

পাঁচ দিন চলার পর হঠাৎ সমুদ্রে তুফান উঠলো! ঝড়ের তোড়ে নৌকাখানা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেলো। মাঝি মাল্লারা কে কোথায় তলিয়ে গেলো কেউ জানে না। বাসিমের যখন সম্বিত ফিরে এলো, দেখলো, সে শুয়ে আছে এক পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্র উপকূলে! আশে-পাশে তাকিয়ে দেখলো, কোনও জনমানব নাই। একটু পরে দেখা গেলো গরু, গাধা, ঘোড়া, খচ্চর মোষের একটা দল এগিয়ে আসছে। বাসিমের ভয় হলো। ওরা যদি আক্রমণ করে, প্রাণে আর বাঁচবে না সে। ভয়ে আতঙ্কে সে ছুটতে থাকে। জানোয়ারগুলোও তাড়া করে নিয়ে চলে। এইভাবে দৌড়তে দৌড়তে এক সময় এক শহরেয় ভিতরে প্রবেশ করে। সামনেই একটা দাওয়াখানা। উপায়ান্তর না দেখে সে ঐ ওষুধের দোকানেই ঢুকে পড়ে।

দোকানের মালিক এক পলিত-কেশ বৃদ্ধ। বাসিম তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছিলো। আর্তকণ্ঠে মিনতি জানালো সে, মেহেরবাণী করে বাঁচান আমাকে। এক দল জন্তুজানোয়ার তাড়া করেছে আমাকে। উফ্ কী সাংঘাতিক ব্যাপার। এতো জন্তুজানোয়ার এলো কোথা থেকে এ শহরে?

বৃদ্ধ বললো, তোমার কোনও ভয় নাই, বেটা। তুমি স্থির হয়ে বসো এখানে। তারপর চলো আমার বাসায়। খানাপিনা কর। তখন তোমাকে বলবো সব কাহিনী।

দোকানের পিছন দিকে বৃদ্ধের বাড়ি। বাসিমকে নিয়ে এসে সে শোবার ঘরে বসলো। নফর খানা সাজিয়ে দিয়ে গেলো। খেতে বসে বৃদ্ধ বাসিমকে বলতে থাকে, এই

শহরের নাম যাদুপুরী। এখানকার শাসক এক যাদুকরী—বেগম সালমানখ। তার যাদুবিদ্যার কৌশল জগৎবিখ্যাত। আসলে সে এক দানবী! নারীমূর্তি ধরে আছে এখানে। দারুণ কামুক।

দুনিয়ার এমন কোনও বীর্যবান পুরুষ নাই, যে ওর কামক্ষুধা মেটাতে পারে। এই দ্বীপে যারা আসে তাদের মধ্য থেকে সুন্দর সুন্দর সেরা জোয়ানদের সে পাকড়াও করে আনে। যতক্ষণ তাদের ক্ষমতা থাকে ততক্ষণ ধরে তাকে নিয়ে কামসম্ভোগ করে। তারপর নির্বীর্য হয়ে পড়লে মন্ত্র পড়ে জানোয়ার বানিয়ে ফেলে। এবং নিজেও সেই জাতের মাদী জানোয়ারের রূপ ধরে পাল খেতে থাকে। এইভাবে জানোয়ারও যখন তাগদহীন হয়ে পড়ে তখন আবার সে নারীমূর্তি ধারণ করে। কিন্তু জানোয়ারকে তবে মানুষের চেহারা ফিরিয়ে দেয় না। তুমি যাদের তাড়া খেয়ে আমার দোকানে ঢুকেছিলে সেই জানোয়ারগুলো আসলে কেউ জানোয়ার নয়। সকলেই পরদেশী মুসাফির! ঐ শয়তানীর খপ্পরে পড়ে আজ তাদের এই দশা। ওরা চেয়েছিলো, তুমি যাতে এই শহরে না ঢোকো। সেইজন্যে তাড়া করে সমুদ্রেই পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু তুমি বুঝতে পারনি। ভয় পেয়ে সাপের গর্তের মধ্যেই ঢুকে পড়েছ। তোমার রূপ অসাধারণ। যৌবন অটুট তাগড়াই আছে। এই শয়তানী যাদুকরীটা তোমাকে দেখলে তার জিভে পানি ঝরবে। কিন্তু সাবধান কোনভাবেই তার কব্জায় পড়ো না। একেবারে ছোবড়া করে ফেলে দেবে।

অবশ্য আমিও একজন যাদুকর। এমন বিদ্যা জানি, ওই আলমানখকে সাতঘাটের পানি খাইয়ে দিতে পারি। কিন্তু নিজের যাদুক্ষমতা আমি কাজে লাগাই না. আমি সাচ্চা মুসলমান, নিত্য কোরান পাঠ করি। আল্লাহর নির্দেশ আছে অসৎ কাজে যাতে এই সব যাদুবিদ্যার ব্যবহার না হয়। সুতরাং সে রকম অনাচার আমি কিছু করতে পারি না। তা না হলে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম ঐ যাদুকরীকে।

বৃদ্ধের কথা শেষ, হতে না হতে সুবেশা সুন্দরী প্রায় এক হাজার মেয়ের একটা বাহিনী এসে বাড়ির দরজার সামনে দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এবং তার মাঝখান দিয়ে একটা আরবী তেজি ঘোড়ায় চেপে এসে দাঁড়ালো সেই বেগম আলমানাখ তার পরণে চোখ ধাঁধানো জমকালো বাদশাহী সাজ-পোশাক।

বাড়ির ভিতর ঢুকে সে বৃদ্ধকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানালো।

সদর-পেরিয়ে ছোট একখানা বসার ঘর। তার পাশেই বৃদ্ধের শোবার ঘর। একখানা কুর্শিতে বসে পড়ে আলমানাখ আড়চোখে বাসিমকে নিরীক্ষণ করতে থাকে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছেচল্লিতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

একটু পরে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করে, আবদ অল রহমান সাহেব, এই খুবসুরত ছেলেটি কে?

বৃদ্ধ জবাব দেয়, আমার ভাইপো। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

—ভারি চমৎকার দেখতে আপনার ভাতিজা। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে যায়। যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা রাতের জন্যে ওকে আমি আমার প্রাসাদে নিয়ে

যেতে চাই। আপনি বিশ্বাস করুন, কোনও রকম খারাপ কাজ করবো না। শুধু নয়ন ভরে দেখবো ওর মনোহর রূপ। এক সঙ্গে বসে গল্পসল্প করবো, খানাপিনা, গান বাজনা করবো। ব্যস, এর বেশি আর কিছু করবো না। আপনি নিশ্চিন্তে একটা রাতের জন্যে আমার হাতে ছেড়ে দিন। সত্যি বলছি, আর কোনও কিছু করবো না। ছেলেটিকে দেখেই বড় ভালো লেগেছে। ওকে একটু প্রাণভরে দেখবো, এই আর কি!

আবদ অল রহমান বলে, দেখুন, আপনার হাতে ছেড়ে দিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমার ভাইপোর ওপর কোনও যাদুবিদ্যা খাটাবার চেষ্টা করবেন না। তা হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। কারণ আপনাকে তো চিনতে আমার বাকী নাই!

—আরে না, না, আমি আপনাকে যখন কথা দিয়ে যাচ্ছি, ওসব খারাপ কিছু করবো না। এই নিন, আপনার সেলামী রইলো। ওকে দিন, আমি যাই।

এক হাজার মোহরের একটা থলে বৃদ্ধের সামনে রেখে বাসিমকে ঘোড়ায় চাপিয়ে সে প্রাসাদে ফিরে এলো।

প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করে বাসিম স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এমন অসাধারণ কারুকর্ম কোথাও সে দেখেনি। দরজা জানলাগুলো সব সোনার তৈরি। ঘরে ঢুকেই সে বাসিমকে নিয়ে পালঙ্ক-শয্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু না, আসুরিক কোনও কায়দা নয়, বেশ সোহাগ করেই ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলতে থাকে বাসিমকে। বাসিমের সমস্ত সত্তা ক্রমশঃ হারিয়ে যেতে থাকে আল-মানাখের সোহাগ শৃঙ্গারের যাদুতে। মেয়েটি কামকলায় ওস্তাদ। কী ভাবে মরুভূমিতেও ফুল ফোটাতে হয় সে কায়দা তার জানা।

বাসিম বৃদ্ধের কাছ থেকে পূর্বাহ্নেই সব জেনে নিয়ে ছিলো। সেই কারণে নিজেকে সে কঠিন করে বেঁধে রাখার প্রাণপণ কসরৎ যে করে নি তা নয়, কিন্তু মেয়েটির আশ্চর্য রতিরঙ্গ ভঙ্গী এবং রীরংসা জাগাবার ছলা-কলার কাছে কোথায় সে-সব খড়কুটোর মতো ভেসে গেলো।

আনন্দ যেমন সে লুটতে জানে, আনন্দ তেমনি সে দিতেও জানে। সে দেওয়ার কোনও কার্পণ্য নাই। দু'হাত ভরে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া। দেহ প্রাণ মন ভরে গিয়ে উপচে উপচে পড়তে থাকলো।

বাসিম ভেবে পায় না, এতো আসন, এতো ব্যসন, বিহার সে শিখলো কোথায়? যে কোন হীন বীর্য পুরুষও এই রতিসঙ্গ লাভ করলে সিংহের মতো তড়পে উঠবে।

পরদিন বাসিম নিজেই নড়লো না। তারপর দিনও সে আল মানাখের দেহপাশেই আবদ্ধ রয়ে গেলো। মেয়েটি অবশ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো। মুখ টিপে হেসে ঠোনা মেরে বলেছিলো, কী গো নাগর, এখনও তোমার আশ মিটলো না! আর কত মধু খাবে। এবার যাও তোমার বুড়ো চাচার দোকানে। তোমাকে না পেয়ে সে যে মূর্ছা যাবে।

—তা যাক, আমি তোমার কাছেই থাকবো—চিরকাল।

—চিরকাল? হা হা হা—চিরকাল? আহা, পুরুষদের কী আমার চিনতে বাকী আছে? একটা মেয়েতে কী তাদের চিরকাল চলে! দিনকয়েক পরেই আমাকে এঁটো কলাপাতার মতো ছুঁড়ে দিয়ে অন্য মেয়ের ওড়না পাজামা খুলতে ছুটবে। আমি তোমাদের চিনি না?

—বিশ্বাস করো, যে রসের স্বাদ তুমি আমাকে দিয়েছ, জীবনে এর আগে কেউ দেয় নি। আমার বিশ্বাস এ বিদ্যার এতো কলা অন্য কোনও মেয়ের জানাও নাই। তাই আমি তোমার কাছেই থাকবো চিরকাল। কোথাও যাবো না।

—দেখা যাক।

মেয়েটি মুচকি হেসে আবার সুরত রঙ্গে মেতে উঠলো।

এইভাবে চল্লিশটা দিন, চল্লিশটা রাত মধুর আনন্দে কেটে যায়। বাসিম ভাবে এবার সে একটু অভিনয় দেখাবে আল মানাখকে। সন্ধ্যাকালে যথারীতি মেয়েটি কাছে এসে আদর সোহাগ আরম্ভ করে। কিন্তু বাসিম অনীহা দেখিয়ে বলে, আজ শরীরটা ভালো নাই গো, আজকের রাতটা রেহাই দাও।

আল মানাখ ঠোঁটের কোণে হাসে, শরীরের আর কী দোষ, বলো। একনাগাড়ে কতদিন আর পারবে? ঠিক আছে, বিশ্বাস কর আর বিরক্ত করবো না তোমাকে।

বাসিম ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে।

রাত গভীর হলে মেয়েটি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের এক পাশ থেকে একটা পাত্রে খানিকটা বার্লি নিয়ে আসে। জল দিয়ে গুলে কাই করে তার মধ্যে আর একটা গুঁড়ো পদার্থ খানিকটা মিশিয়ে ঢেকে রাখে। তারপর আবার বাসিমের পাশে এসে শুয়ে পড়ে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে বাসিম সোজা সেই বৃদ্ধের দোকানে আসে। সব ব্যাপার খুলে বলে তাকে। বৃদ্ধ বলে, শয়তানী আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? ওর মরার পাখা গজিয়েছে। তোমাকে আমি একখানা পিঠে দিচ্ছি। এ-খানা নিয়ে যাও। ওখানে গিয়ে দেখবে, শয়তানীটা নাস্তা সাজিয়ে বসে আছে। এবং সেই নাস্তা-খাবারের মধ্যে এই রকম একখানা পিঠে দেখতে পাবে। ওই পিঠেখানা কিছুতেই খাবে না। ওর মধ্যে ওষুধ মিশিয়ে রেখেছে সে। খেলেই কিন্তু তুমি একটা গাধা হয়ে যাবে। এই পিঠেখানা কৌশল করে ওকে খাওয়াতে পারবে তো? তা হলেই বাজিমাৎ হয়ে যাবে। তোমাকে গাধা বানাতে গিয়ে সে নিজেই গাধা হয়ে যাবে। তখন তুমি ওর পিঠে চেপে সোজা চলে আসবে আমার দোকানে। তারপর যা করার আমি করবো।

বাসিম প্রাসাদে ফিরে এসে দেখে সামনের ফুলবাগিচার মধ্যে একটা টেবিলে খানাপিনা সাজিয়ে বসে আছে আল মানাখ। বাসিমকে দেখে সে বলে, কী ব্যাপার, কোথায় গিয়েছিলে এতো সকালে?

বাসিম বলে, অনেক দিন চাচার সঙ্গে দেখাতে করতে পারি নি। ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ভাবলাম, একবার দেখা করে আসি। তা চাচা পেট পুরে নাস্তা খাইয়ে দিয়েছেন। কী চমৎকার পিঠে বানাতে পারেন তিনি। আমি তো অনেকগুলো খেলাম। চাচা তোমার জন্যও একখানা দিলেন, খেয়ে দেখ।

বাসিম পিঠেখানা আল মানাখের হাতে তুলে দেয়। আল মানাখ বলে আমিও বানিয়েছি ; আমারটা একবার খেয়ে দেখ দেখি, তোমার চাচার চেয়ে খারাপ হয়েছে কিনা।

নাস্তার রেকাবী থেকে একখানা পিঠে তুলে দেয় সে বাসিমের হাতে। বাসিমের বুঝতে অসুবিধে হয় না ওর কারসাজী। পিঠেখানার একটুকরো ভেঙ্গে নিয়ে মুখে পোরার ছল করে কামিজের মধ্যে ফেলে দেয়। মিছি মিছি করে এগাল ওগাল করে চিবুতে থাকে। আল মানাখও একটুকরো ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দেয়। এগাল ওগাল করে খেয়ে সে জলের গেলাস তুলে নিয়ে এক আঁজলা জল বাসিমের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বলতে থাকে, ওরে হাঁদা, কি খেয়েছিস, জানিস না, এইবার তুই গাধা হয়ে যা।

কিন্তু বাসিমের আকৃতির কোনও পরিবর্তন হলো না। আল মানাখ শিউরে ওঠে। তবে—তবে কী আমার যাদুবিদ্যা মিথ্যা হয়ে গেলো?

—হ্যাঁরে, বিশ্বাসঘাতক শয়তানী, মিথ্যেই হয়ে গেছে তোর ভেল্কিবাজী। এইবার দেখ আমার যাদুবিদ্যার ক্ষমতা।

এই বলে সে এক আঁজলা জল ছিটিয়ে দিলো ওর গায়ে।

—আমাকে গাধা বানাতে গিয়েছিলি? এবার তুই নিজে গাধা হয়ে যা।

সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরী গাধা হয়ে গেলো। এবং বাসিমও ওর পিঠে চেপে সোজা চলে এলো বৃদ্ধের ওষুধের দোকানে।

আবদ অল রহমান গাধারূপী আল মানাখকে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়ে। এইবার বিশ্বাসঘাতিনী, তোকে আমি কি শিক্ষা দিই এইবার দেখ।

এই বলে সে আল মানাখের মুখের ওপর একটা লাথি মারে। বাসিমকে বলে, বাবা, তোমাকে আর আটকাবো না। তুমি দেশে ফিরে যাও। তোমার মা দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। আমি আগে তোমার পৌঁছবার ব্যবস্থা করছি। তারপর ঐ সব হতভাগ্য পরদেশী মুসাফিরগুলোকে আবার মানুষের রূপে ফিরিয়ে আনবো।

বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তেই সামনে এসে দাঁড়ালো এক আফ্রিদি জিন। অল রহমান বললে, এই শাহজাদাকে নিয়ে শ্বেতশহরে তার প্রাসাদে পৌঁছে দাও।

জিন তার পিঠে তুলে নিলো বাসিমকে। তারপর ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গেলো। তীরবেগে ছুটে চললো সে শ্বেতশহরের দিকে। একদিন এক রাত্রি ছুটে চলার পরে এসে পৌঁছয় শ্বেতশহরের প্রাসাদ-চূড়ায়। সেখানে সে বাসিমকে নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই সময়ে ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আটচল্লিশতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বাসিম সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসে। দুঃখী মায়ের মুখে হাসি ফোটে। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর সোহাগ করতে থাকে। দু'চোখে ভরে ওঠে অশ্রু।

বাসিম দেখলো লোকস্ত এবং সালিহও এসেছে তার মা-এর কাছে। তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনালো সকলকে। তারপর মা-এর দিকে তাকিয়ে বললো, মা, জানারাকে শাদী করার ইচ্ছা আমি ত্যাগ করতে পারি নি। তোমরা যে ভাবে পার তার ব্যবস্থা করো।

সালিহ বললো, সে আর এমন কী কঠিন কাজ মামু। জানারার বাবা সামানদাল আমার হাতে বন্দী হয়েছে। ওকে আমি তারই প্রাসাদের এক অন্ধকার কয়েদখানায় আটক করে রেখেছি। এখুনি নিয়ে আসছি এখানে।

তুড়ি বাজাতেই এক প্রহরী এসে দাঁড়ালো। সালিহ বললো, যাও পাতালপুরী থেকে সামানদালকে নিয়ে এসো এখানে।

প্রহরী বিদায় নিলো। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শৃঙ্খলিত সামানদালকে এনে দাঁড় করালো সে সালিহর সামনে।

সালিহ বললো, কী কেমন আছেন শাহেনশাহ!

—কেন আমাকে বিদ্রূপ করছো, সালিহ। তুমি আমার মসনদ অধিকার করে নিয়েছ, আমি তো এখন আর সুলতান নই, তোমার বন্দী মাত্র।

সালিহ বলে, আপনার সলতানিয়ত দখল করে ভোগ করার কোনও বাসনা নাই আমার। আপনার মসনদ আপনাকেই ফিরিয়ে দেবো। কিন্তু একটা শর্তে।

সামানদাল জানতে চায়, কী শর্ত?

—আপনার কন্যা জানারাকে শাদী করতে চায় আমার এই ভাগ্নে বাসিম। আপনি একে এর আগে স্বচক্ষে দেখেন নি। ভালো করে দেখুন তো, আপনার মেয়ের চাইতে কোনো অংশে এ খাটো কিনা?

সামানদাল বলে, চমৎকার ছেলে। এমন জামাই পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। আমি এখুনি রাজি। কিন্তু জানারাকে আনতে তো লোক পাঠাতে হবে। আমার প্রাসাদে সে নাই। তবে এটা ঠিক, ধারে কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

সালিহ প্রহরীকে ডেকে বললো, জলদি যাও। যে ভাবে পার, সুলতান সামানদালের কন্যা জানারাকে খুঁজে পেতে এনে হাজির করো এখানে।

প্রহরী চলে গেলো। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে এলো জানারাকে সঙ্গে নিয়ে। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলো সামানদাল। আদর সোহাগ করে বললো, মা-জননী, এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি হচ্ছেন বেগম লোকস্ত, এ হচ্ছে তাঁর ছেলে সালিহ, আমাকে বন্দী করেছে ; আর এ তার ভগ্নী আনারকলি—এখানকার সুলতান বদর বাসিমের মা। এবং এই হচ্ছে সেই—

বাধা দিয়ে জানারা বললো, জানি বাবা, ইনি হচ্ছেন মহামান্য সুলতান বদরু বাসিম। এঁর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হয়েছে।

সামানদাল বললো, মা, আমি এদের জবান দিয়েছি—বাসিমের সঙ্গে তোমার শাদী দেবো। আমি জানি তুমি আমার ভীষণ অনুগত। আমার কথার খেলাপ হবে তেমন কাজ করবে না কখনও। বাসিম তোমার যোগ্যপাত্র হতে পারবে। রূপে গুণে শৌর্যে, বীর্যে ওর তুলনা নাই, আমার তো মনে হয় তোমরা দু'জনে দু'জনের যোগ্য।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো উনপঞ্চাশতম রজনীতে আবার সে কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

জানারা সলজ্জভাবে মাথা নিচু করে। বিনয় কণ্ঠে বলে, আব্বাজান, আপনার কথা আমার কাছে হাদিশের বাণী। আপনি যখন ভালো বুঝেছেন, নিশ্চয়ই এ শাদী আমার পক্ষে শুভকর হবে। আমার কোনও দ্বিধা নাই। আপনি ব্যবস্থা করুন, আব্বাজান। আমি রাজি।

জানারার সম্মতি শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের সকলে আনন্দ ধ্বনি করে ওঠে। তড়িৎ প্রবাহের মতো পলকে ছড়িয়ে পড়ে এই শুভ সংবাদ।

সন্ধ্যাকালে কাজী এবং সাক্ষী-সাবুদ এলো। শাদীনামা তৈরি করলো তারা। দারুণ জাঁকজমকের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেলো জানারা-বাসিমের শাদী পর্ব।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে সুলতান শাহরিয়ারের দিকে তাকায়। শাহরিয়ার বলে, ভারি সুন্দর তোমার কিস্‌সা, শাহরাজাদ। মন ভরে যায়। তোমার এই গল্প থেকে অনেক অজানা জিনিস জানলাম। অবশ্য দরিয়া আবদাল্লার কাহিনীও বহুৎ মজাদার ছিলো। পানির নিচে যে কী অদ্ভুত সুন্দর দেশ আছে তা তো আগে জানতাম না। আচ্ছা, শাহরাজাদ, শয়তান বদমাইশের গল্প শোনবে দু একটা?

শাহরাজাদা বলে, নিশ্চয়ই শোনাবো।

এবং শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

কাইরোর সুবাদার আমির মহম্মদ এই কাহিনীটি বলেছিলেন ঃ

মিশরের উত্তরাঞ্চলে সফর করার কালে এক রাতে আমি এক জিলার সেরা চাষী—ফাল্লার অতিথি হয়েছিলাম। বয়সে তিনি প্রাচীন। এবং গাঢ় তামার মতো তাঁর গায়ের বর্ণ। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, তার ছেলেমেয়েরা সকলে ধবধবে ফর্সা। চিবুকে গোলাপী আভা। চোখ নীল এবং চুল হালকা নরম।

ফাল্লা সাহেব আমাকে স্বাগত জানালেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনার গায়ের রং তামাটে, কিন্তু আপনার ছেলেমেয়েরা তো সব চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর?

তিনি সহাস্যে বললেন, ওদের মা ফ্রাঙ্ক দেশের মেয়ে। আমি তাকে এক যুদ্ধ বন্দিনী হিসেবে কিনেছিলাম। হিতিনের যুদ্ধে সালা অল দিন খ্রীস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করে পরাজিত করেছিলেন। সেই থেকে জেরুজাস খ্রীস্টান আক্রমণ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে।

এসব অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন আমি সবে যৌবনে পা দিয়েছি।

আমি বললাম, যদি মেহেরবানী করে শোনান সে কাহিনী—

—নিশ্চয়ই শোনাবো। সেই খ্রীস্টানদের সঙ্গে আমার দুঃসাহসিক অভিযান বড়ই আশ্চর্যজনক।

আপনি হয়তো জানেন, আমি একজন শন-চাষী। এটা আমাদের বংশগত ব্যবসা। আমার বাবা, আমার বাবার বাবা, সকলেই এই কাজ করে গেছেন। আমি উত্তরাধিকার সূত্রে এই কাজ করি। ফাল্লা আমাদের পৈতৃক উপাধি।

এক বছর কপাল জোরে অনেক ভালো আবাদ হয়েছিলো। শনের গাছগুলোর এমনই বাড়-বাড়ন্ত চেহারা হয়েছিলো যে প্রায় পাঁচশো দিনারের ফসল ঘরে তুলতে পারলাম। কিন্তু বাজারে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। আড়ৎদাররা এমন দাম বলে যাতে বিক্রি করলে নাফা দূরে থাক, লোকসান হয়ে যায়। তারা বললো, তোমার শন নিয়ে সিরিয়ার একরে যাও। সেখানে গেলে ভালো দাম পেতে পার। ওদের কথায় আমি একর শহরে গেলাম।

এক সময় এই একর শহর ফ্রাঙ্কদের দখলে ছিলো। যাই হোক, সেখানে যাওয়াতে মোটামুটি ভালোই বাণিজ্য হলো। মালের অর্ধেকটা দালালদের ছয় মাসের বাকীতে দিলাম। আর বাকী অর্ধেকটা খুচরো খদ্দেরের কাছে বেচে বেশ মোটা লাভ বানালাম।

একদিন আমার দোকানে এক খ্রীষ্টান ফ্রাঙ্ক তরুণী এলো। আমাদের মেয়েদের মতো ওরা বোরখা-টোরখা পরে না। লাজ-শরমের বালাই নাই, শরীরের আধখানাই খোলামেলা।

মেয়েটি সুদর্শনা, সুন্দরী এবং ধবধবে ফর্সা। প্রথম দর্শনেই আমার খুব ভালো লেগে গেলো। যতক্ষণ সে আমার দোকানে বসেছিলো, আমি শন ওজন করা এবং দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম ওর দেহ-সৌষ্ঠব, মুখশ্রী, আয়ত চোখ। আজ বলতে লজ্জা নাই, ন্যায্য যা দাম হয় তার চেয়ে অনেক কম দামই নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে। দোকান থেকে বেরিয়ে সে চলে যায়। আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি—যতদূর চোখ যায়।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

•

পাঁচশো বাহান্নতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু করে সে ঃ

এর কয়কেদিন পরে আবার সে এলো। এবার আমি তাকে আরও সস্তা দরে মাল বেচলাম। মেয়েটি কিন্তু আদৌ দর-দাম করে না। আমি হিসেব করে যা বলি তাই সে দিয়ে চলে যায়।

এরপর আরও একবার এলো সে। বুঝতে পারলাম, আমি যে ওকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখি সে ব্যাপারটা ওর চোখ এড়ায়নি। এবার সে একা আসেনি। এক বৃদ্ধা রমণীকে নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

এই বুড়িটা আমার দিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে কী যেন তল্লাস করে দেখতে থাকলো।

এরপর আরও কয়েকবার মেয়েটি এসেছে, আমার দোকানে। বলা-বাহুল্য উদ্দেশ্য—শন কেনা। কিন্তু প্রতিবারই ঐ বুড়ি মেয়েছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

দিনে দিনে মেয়েটির প্রতি আমি গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়ি। বুকের মধ্যে হু হু করে পুড়ে যেতে থাকে।

একদিন বুড়িটাকে একান্তে ডেকে বললাম, মেয়েটির সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিতে পার? আমি তোমাকে খুশি করে দেবো।

বুড়িটা বলে, দেবো। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমি তুমি আর সে ছাড়া কাক-পক্ষীটি জানবে না এই গুপ্তমিলনের কথা।

আমি বললাম, আমার তরফ থেকে কোনও বেইমানী হবে না, কথা দিচ্ছি।

বুড়ি বললো, ঠিক আছে দিনক্ষণ ঠাঁই সব জানাবো তোমাকে। যথাসময়ে যথাস্থানে সঙ্গে কিছু পয়সা-কড়ি নিয়ে হাজির থেক, কেমন?

আমি বলি, আমি তৈরি আছি, তুমি ব্যবস্থাপত্র করো। পয়সা কড়ি আমার কাছে তুচ্ছ। আমি চাই ওর ভালোবাসা। তারজন্য যত টাকা লাগে আমি দু-হাতে খরচ করবো। আচ্ছা বুড়ি মা, তোমাকে কী দিতে হবে, বলো। তোমারটা আগাম দিয়ে দিই।

সে বলে, ও নিয়ে বিশেষ ভাবনার কারণ নাই, বাছা। সে হবে খন।

—না না, সে হয় না। এই নাও ধর, পঞ্চাশটা দিনার রাখ এখন।

আমি প্রায় জোর করেই ওর হাতে গুঁজে দিই টাকাটা। বুড়ি আমার কানে কানে ফিসফিস করে বললো, তুমি একটু দাঁড়াও বাবা, আমি ওকে জিজ্ঞেস করে এসে বলছি।

বুড়িটা সুন্দরীর কাছে গিয়ে কী সব আলোচনা করলো, বলতে পারবো না। একটু পরে সে ফিরে এসে বললো, ওর কোন জানা জায়গা কোথাও নাই। একেবারে আনকোরা কুমারী মেয়ে। এ সবের মর্ম সে এখনও বোঝে না। তা বাবা তোমার বাড়িতেই ব্যবস্থা করো না কেন? সন্ধ্যাবেলায় দিয়ে যাবো ওকে, আর সকালবেলায় নিয়ে যাবো। আমার মনে হয়, সে-ই ভালো হবে।

আমি বললাম, তা হতে পারে। আমি তো একলাই থাকি, কোনও অসুবিধে হবে না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সে আসবে—সেই রকমই ঠিক হলো। আমি সকাল সকাল দোকান-পাট বন্ধ করে মাংসের অনেক রকম দামি-দামি খানা, তন্দুরী, ফল, মিষ্টি এবং শরাব, গোলাপ জল নিয়ে বাসায় পৌঁছলাম। সব সাজিয়ে গুছিয়ে অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকলাম।

যথাসময়েই সে এলো।

তখন গ্রীষ্মকাল। আমি ছাদের ওপরে ফরাস পেতেছিলাম। ওকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে গেলাম। পাশাপাশি বসলাম। দু'জনে মিলে খানাপিনা করলাম। তারপর সুরার পেয়ালা পূর্ণ করে নিলাম আমরা।

আমার বাসাটা একেবারে সমুদ্র উপকূলে। সেদিন ছিলো শুক্লপক্ষের শেষের দিকের এক তিথি। চাঁদের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা ছাদে। সমুদ্রের জলে এক অপূর্ব যাদু লেগেছিলো সেদিন। সেই মনোহর দৃশ্য আজও আমার চোখে ছবির মতো ভেসে ওঠে।

আমার মনের মধ্যে কী যেন তোলপাড় শুরু হয়। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, এই সুন্দর ধরণীতে আমি যেন এক অসুন্দর, অসুর। তা না হলে, আমি আল্লাহর দোয়াতে এই দুনিয়ায় এসেছি, তাকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, অথচ তার বাণী আমি বিস্মৃত হয়ে এক বিধর্মী খ্রীস্টান কন্যাকে অঙ্কশায়িনী করার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছি। ছিঃ ছিঃ, ধিক আমাকে।

যদিও আমরা দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে পড়েছিলাম তবু নিজেকে সংযত করে একটু সরে গিয়ে বললাম, এই চাঁদিনী রাত, মৃদুমন্দ হাওয়া, সমুদ্রের শোভা, শরাবের গুলাবী নেশা এবং তোমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য—এর বেশি আর কী কাম্য হতে পারে প্রিয়া। নাই বা হলো আমাদের দেহ-মিলন, আজকের মধুযামিনী এমনি মধুর হয়েই কাটুক না।

মেয়েটি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। আমার হৃদয়ের অনুভূতি ও হয়তো বুঝতে পারে না। আমার মতো একটি জোয়ান পুরুষের নিরালা সঙ্গ পাওয়ার পর তার মনের সুপ্ত নারী-সত্তা ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল। সে আমি বুঝতে পারছিলাম। ক্রমশঃ সে উচ্ছল এবং প্রগলভ হয়ে উঠছিলো। আমার গায়ে হাত রাখছিলো। আমার মাথার চুলের মধ্যে বিলি কেটে আদর করতে করতে ওর মুখখানা অস্বাভাবিকভাবে নামিয়ে নিয়ে আসছিলো আমার মুখের ওপর।

আমি ওকে আলতোভাবে সরিয়ে দিয়ে বললাম, আজ থাক সোনা। অন্য দিন হবে। আজ শুধু তোমাকে, চাঁদকে আর এই সমুদ্রকে নয়ন ভরে দেখি, কেমন?

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে সরে যায়।

সে রাতে আমি আর সে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়েছিলাম বটে কিন্তু কেউ কারো কাছে ঘেঁষে আসিনি বা অঙ্গ স্পর্শ করিনি।

খুব সকালে ফ্রাঙ্ক-সুন্দরী ঘুম থেকে উঠে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। আমি আমার দোকানে এসে বসলাম।

ঠিক দুপুরবেলায় মেয়েটি আমার দোকানের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেলো। দেখলাম, ওর চোখের দৃষ্টিতে সাপিনীর ক্রোধ। এবার আমি আর নিজেকে সহজ সংযত করে রাখতে পারলাম না। মেয়েটির সারা চোখে মুখে অতৃপ্ত কামনা ক্ষুধা। আমাকে দেখে ফুঁসতে থাকে। তখন ওকে আরও অনেক অনেক বেশী সুন্দরী মনে হতে লাগলো। আমার সমস্ত দেহমন ওর সঙ্গ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কাল রাতে হঠাৎ তুমি এতো উদাস বিবাগী পীর মুসাফিরের মতো হয়ে গেলে কেন? তুমি না কাইরোর ফাল্লা। ভোগ-বিলাস কামনা-বাসনা নিয়েই তোমাদের জীবন কেটেছে এতোকাল। আজ হঠাৎ সাধু সন্ত বনে গেলে কী করে? তুমি প্রাসাদের খোজা নও। যৌবন-মদে মত্ত এক নওজোয়ান তুমি।

তবে শুধু শুধু নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবে কেন?

মেয়েটিকে আর একবার কাছে পেতে হবে। তাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। নিজেরও কাম-ক্ষুধা মেটাতে হবে। এই রকমের একটা চিন্তা-ভাবনা ঘুরতে থাকলো মাথার মধ্যে। আমি ছুটে বাইরে গেলাম। বুড়িটাকে সঙ্গে করে মেয়েটি ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে।

বুড়িকে একপাশে ডেকে বললাম, হ্যাঁগো, বুড়িমা, আর একটা রাত ওর সঙ্গে কাটাবার ব্যবস্থা করে দাও।

বুড়ি বললো, তা দেখি চেষ্টা করে। কিন্তু সে কী রাজি হবে?

আমি বুড়ির হাতে একশোটা দিনার গুঁজে দিয়ে বললাম। রাজী তাকে করাতেই হবে। অন্ততঃ আর একটা রাতের জন্য।

বুড়ির চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেলো। বললো, ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যাতেই নিয়ে যাবো।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় এলো মেয়েটি। কিন্তু কী আশ্চর্য, সে রাতেও চাঁদনী রাতের ঐ কাব্যগন্ধময় মনোহর শোভা দেখে চিত্ত বিগলিত হয়ে গেলো। দেহ মন থেকে উদগ্র কামনা উধাও হয়ে গেলো। আমি পারলাম না। সেদিনও পারলাম না তাকে কাছে টেনে নিতে। পারলাম না ভোগ করতে তার দেহ-সুধা।

সে রাত্রিও কেটে গেলো নিরামিষ ভাবে।

মেয়েটি, বুঝতে পারলাম, আমার এই রকম অদ্ভুত আচরণে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলো না। নীরবে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

পরদিন আবার সে যখন আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল আবার তাকে দেখে আমার বুকের মধ্যে কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আশ্চর্য!

সে কিন্তু আমার দিকে বিষ-দৃষ্টিতে তাকালো। মনে হতে লাগলো, এখনি বুঝি পঞ্চশরে দগ্ধ করে দেবে আমাকে।

মেয়েটি আমার সামনে এগিয়ে ভুরু কুঁচকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বললো, প্রভূ খ্রীষ্টের নামে বলছি, ওগো মুসলমানের সন্তান, এই কী তোমাদের ধর্মের শিক্ষা? একটি নবযৌবন-উদ্ভিন্না কুমারী মেয়েকে পাশে শুইয়ে তসবীর জপ করো তোমরা? আর কখনও ভেবো না, আমার দেখা পাবে।

নিরুপায় হয়ে আমি বুড়ির শরণাপন্ন হলাম। সেও দাঁও বুঝে কোপ বসালো। বললো, এবার পাঁচশোর কমে হবে না বাছা।

বুড়ি আর দাঁড়ালো না। মেয়েটিকে নিয়ে হন হন করে চলে গেলো।

আমার বুকে তখন কামনার আগুন ধকধক করে জ্বলছে। যে ভাবে হোক ওকে ভোগ করতে হবে, এই আমার তখন একমাত্র চিন্তা। পাঁচশো দিনার আমার কাছে অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও টাকা পয়সার কথা চিন্তা না করে একটা থলেয় পাঁচশোটা দিনার ভরে ছুটে যাবো বুড়ির কাছে, হঠাৎ এমন সময়...

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো শাহরাজাদ।

পাঁচশো তিপান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

আমি শুনতে পেলাম, সুলতানের আমির সনদ ঘোষণা করে চলেছে, শোনও মুসলমান ভাই সব, যারা আমাদের শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন—অবিলম্বে তাদের দোকান-পাট গুটিয়ে ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ ব্যাপারে মাত্র এক সপ্তাহের সময় মঞ্জুর করা হচ্ছে।

আমার সব কামনা বাসনা মাথায় উঠলো। তড়িঘড়ি মাল যা ঘরে ছিলো সব বেচে সাবাড় করতে লাগলাম। দালালদের বললাম, আমার পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে দাও তোমরা, আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।

টাকা পয়সা যা আদায়, বিক্রি হলো তা দিয়ে নানারকম জিনিষপত্র সওদা করলাম। আমাদের দেশে সেগুলো বেচে লাভ হবে।

সাতদিনের মাথায় একর শহর ত্যাগ করে দেশের পথে রওনা হলাম। মন ভারাক্রান্ত ছিলো, কারণ আমার একমাত্র কামনা—সেই খ্রীস্টান মেয়েটির সঙ্গে সহবাস আর হলো না।

প্রথমে আমি দামাসকাসে এলাম। সেখানকার বাজারে বেশ ভালো মুনাফায় অনেক জিনিষপত্র বেচলাম। এতো মোটা লাভ আমি আশা করিনি। কিন্তু যুদ্ধের দামামা বাজছে। অন্য দেশ থেকে মালপত্রের আমদানি ছিলো কম। সেই কারণে আমার মাল আশাতীত চড়া দামে বিকিয়ে গেলো। অবশ্য সবই খোদার দোয়া। তা না হলে যে কাজেই হাত দিই, সোনা ফলে কেন?

সে সময় একটা জব্বর ব্যবসায়ে নেমে পড়লাম। মোটা লাভ। যুদ্ধে যে সব খ্রীস্টানরা বন্দী হতো, তাদের নিলামে তুলে বিক্রী করে দিত সরকার। আমি এই নিলাম ডাকতে শুরু করলাম। নতুন জাতের ব্যবসা। অনেকেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে থাকলো। কিন্তু আমি বেপরোয়া হয়ে উঠেছি তখন। লাভ হোক, লোকসান হোক, ছাড়বো না।

লোকসান দূরে থাক, লাভের অঙ্কের কোনও সীমা সংখ্যা রইলো না। এক একটা চালান পানির দরে কিনি। আর তার এক একজন বন্দীকে বিক্রি করে কেনা দামের দশগুণ উঠে আসে। যুদ্ধের ভয়ে অনেক বড় মহাজন শহর ছেড়ে পালিয়ে গণ্ডগ্রামে চলে গিয়েছিলো। আমার পক্ষে সুবিধে হলো সেই। কারবারে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে তবে যা খুশি দাম হেঁকে মাল বেচা সম্ভব। আমারও হলো তাই। আমি সর্বেসর্বা। আমার ওপরে টেক্কা দিয়ে নিলাম ডাকার মতো মক্কেল মহাজন তখন সারা দামাসকাসে কেউ ছিলো না।

এইভাবে পুরো তিনটি বছর দু'হাতে কামিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে আমার মনে সেই খ্রীষ্টান মেয়েটির স্মৃতি অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছিলো।

আমাদের সুলতানের বিক্রমের কাছে খ্রিস্টান ফ্রাঙ্করা দাঁড়াতে পারলো না। ফ্রাঙ্ক-কবলিত জেরুজালেম এবং সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল অধিকার করে নিলেন। ফ্রাঙ্করা প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে সুলতান বাহিনীর হাতে বন্দী হতে লাগলো। আর যত বন্দী আসে, ততই আমার পোয়া বারো, জলের দামে কিনে সোনার দামে বেচা।

একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটলো। একটি সুন্দরী বাঁদী সংগ্রহ করে সুলতানকে ভেট দিতে তার তাঁবুতে গিয়েছি। বাঁদীটিকে সুলতানের বেশ পছন্দ হয়ে গেলো। খুশি হয়ে তিনি আমাকে একশো দিনার বকশিশ দিতে বললেন তার উজিরকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই লড়াই ক্ষেত্রের খাজাঞ্চীখানায় সেদিন একশোটি দিনারও পুরো ছিলো না। প্রতিদিন যুদ্ধের খরচ এলাহী। প্রাসাদ থেকে রোজই টাকা আসে। রোজই সব খরচ হয়ে যায়। যাই হোক, উজির বললেন, তহবিলে মাত্র নব্বইটা দিনার আছে।

সুলতান বিচলিত বোধ করলেন, ঠিক আছে, ঐ নব্বইটা দিনারই দিয়ে দাও একে। আর আমার যুদ্ধবন্দীদের খোঁয়াড়ে নিয়ে যাও।

সুলতান আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, ঐ বাকী দশ দিনারের জন্য যে কোনও একটি বাঁদী পছন্দ করে, নিয়ে যাও তুমি।

এসবের কোনও প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু সুলতানের জবান থেকে বেরিয়েছে, আমাকে একশো দিনার দিতে হবে। সে কথার খেলাপ হবে কী করে?

প্রহরী আমাকে বন্দী করে খোঁয়াড়ে নিয়ে গেলো। খোঁয়াড়টা দুইভাগে বিভক্ত। একদিকে মেয়ে আর একদিকে পুরুষদের আটক করে রাখা হয়েছে। আমাকে সে নিয়ে গেলো মেয়েদের খোঁয়াড়ে। হাজারখানেক বন্দিনী—আমি ঘুরে ঘুরে দেখছি, হঠাৎ নজর পড়লো, সেই ফ্রাঙ্ক-সুন্দরীর ওপর। ওর সঙ্গে আমি দুটি অ-সহবাস রাত্রি কাটিয়েছিলাম একদা। খুব চেনা মুখ, প্রথম দর্শনেই চিনতে পারলাম। বুকের মধ্যে পুরোনো ক্ষতটা টনটন করে উঠলো।

একর শহর ছেড়ে চলে আসার পর সে এক খ্রীস্টান সেনাপতির অঙ্কশায়িনী হয়েছিলো।

ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে প্রহরীকে বললাম, এই মেয়েটিকে আমি নেব।

মেয়েটির নাম ড্যামজেল। ওকে সঙ্গে নিয়ে আমার তাঁবুতে ফিরে এলাম।

—আমাকে চিনতে পার?

ড্যামজেল ঘাড় নাড়ে, না। আমি চিনতে পারছি না।

—কেন মনে পড়ছে না, তুমি আমার দোকানে যেতে সওদা করতে। তোমার সঙ্গে এক বুড়ি থাকতো। এক শহরের সমুদ্র উপকূলের এক ভাড়াবাড়িতে আমি থাকতাম। পরপর দুটি রাত্রি তুমি আমাকে সঙ্গ-সুখ দিয়েছিলে,

মনে নাই? অত কাছে নিভৃতে পেয়েও আমি কিন্তু তোমার কুমারীত্ব নষ্ট করিনি সেদিন। এবং সেই কারণেই বোধ হয় তুমি আমার ওপর ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলে। তবে বিশ্বাস কর, তৃতীয় রাতেও তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে আসতাম আমি। আমার ইচ্ছে ছিলো, সেই রাতে আমি তোমার দেহ-সম্ভোগ করবো। তোমার বুড়ি আমার কাছে পাঁচশো দিনার সেলামী চেয়েছিলো। দেবার জন্যে তৈরিও হয়েছিলাম। কিন্তু নসীব খারাপ, সেইদিনই সরকারের হুকুম জারী হলো, বিদেশী মুসলমান সওদাগরদের ব্যবসা গুটিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং মনের খেদ মনেই রয়ে গেলো। আর তোমার সঙ্গে মিলতে পারলাম না। সেদিন একটা রাতের জন্য পাঁচশো দিনারও দিতে তৈরি ছিলাম, কিন্তু কপাল দোষে পাইনি। আজ কিন্তু সামান্য দশটা দিনারের বিনিময়ে তোমাকে চিরকালের মতো লাভ করেছি, ড্যামজেল! এখন থেকে তুমি আমার।

ড্যামজেল মাথা নিচু করে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললো, সেদিন আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তুমি আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছ তোমার বাসায় আর কেনই বা নিজে অভুক্ত থেকে আমাকে উপবাসী রেখে বিদায় করে দিচ্ছ—ঠিক বুঝতে পারিনি তখন। আমি রুষ্ট হয়েছিলাম তোমার ওপর, কিন্তু পরে বুঝেছি। ইসলামের নির্দেশ তোমাকে ঐ ব্যভিচার করতে দেয়নি। সেই থেকে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আমার ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়েছে। এখন আমি মনে-প্রাণে পয়গম্বর মহম্মদের বাণীই গ্রহণ করে নিয়েছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কোনও মহান্ শক্তির অস্তিত্ব নাই।

খোদা কসম, সেই রাতেও আমি তাকে শয্যা সঙ্গিনী করতে পারলাম না। কারণ সে তখনও আমার কেনা বাঁদী। বিধিমতে আগে তাকে মুক্ত করতে হবে। তারপর ইসলাম-ধর্মমতে আমি শাদী করতে পারবো তাকে।

এরপর কাজী ও সাক্ষী-সাবুদ ডেকে ড্যামজেলকে আমি শাদী করেছিলাম। আমার ঔরসে সে গর্ভবতী হলো। আমরা দামাসকাসে পাকাপাকি বসবাস করতে থাকলাম।

আমাদের শাদীর বেশ কিছুকাল পরে একদিন ফ্রাঙ্কের সম্রাটের দূত এলো আমদের সুলতান সালা-অল-দিনের দরবারে। যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। কতকগুলো শর্তে সন্ধি হয়েছিলো দুই পক্ষের। সেই সূত্রেই দূত এসেছিলো। উদ্দেশ্য যুদ্ধবন্দী বিনিময় চুক্তি হবে।

আলোচনায় সাব্যস্ত হলো, ফ্রাঙ্কের সমস্ত নারী-পুরুষ বন্দীদের ফেরত দেওয়া হবে। অবশ্য ফ্রাঙ্ক-সম্রাটও সমস্ত মুসলমান বন্দীদের ওয়াপস করে দেবে।

সুলতানের সেনাপতি একখানা ফর্দ দিলো। যাবতীয় বন্দীদের নাম-ধাম পরিচয় ছিলো সেই ফর্দে। দূত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকলো সব। কিছুক্ষণ পরে সে বললো, কিন্তু এই ফর্দে তো একটি রমণীর নাম নাই। সে রমণী আমাদের এক সেনাপতির সহধর্মিণী। তাকে তো চাই।

সুলতান প্রহরীদের বললেন, দেখ, সে কোথায় গেলো। খুঁজে-পেতে নিয়ে এসো তাকে।

প্রহরীরা খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে আমার গৃহে এসে তার সন্ধান পেলো। সুলতানকে সব ব্যাপারটা জানিয়ে আবার যখন তারা আমার কাছে ফিরে এলো, আমি ততক্ষণে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছি। আমার বিবি অবাক হয়ে আমার পিঠে হাত রাখে, কী, হয়েছে কী? তোমার চোখে পানি কেন?

আমি সব বললাম তাকে।

—সুলতানের পেয়াদা এসেছে। তোমাকে নিয়ে যাবে তারা।

ড্যামজেল বললো, পেয়াদাদের যেতে বলো, তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো দরবারে। তারপর সুলতানকে যা বলতে হয়, আমি বলবো।

বোরখা পরিয়ে ওকে নিয়ে গেলাম সুলতানের দরবারে। সুলতানের এক পাশে বসেছিলো ফ্রাঙ্ক-সম্রাটের দূত।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চুয়ান্নতম রজনী ঃ আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

আমি কুর্নিশ করে দাঁড়ালাম।

—এই সেই নারী, জাঁহাপনা!

সুলতান আমার বিবির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী বলার আছে? এই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তুমি কী তোমার স্বদেশে ফিরে যেতে চাও? না, যেমন আছ তেমনি তোমার স্বামীর সঙ্গে এখানে ঘর করতে চাও?

—আমি আমার স্বামীর সঙ্গেই থাকতে চাই, জাঁহাপনা। তাঁর সন্তান আমার গর্ভে আছে। এবং আমি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাকে বিধিসম্মত ভাবে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি। এখন আমি আর খ্রীষ্টান নই আর সেখানে আমার ফিরে যাওয়ারও কোন অভিপ্রায় নাই।

সুলতান সালা-অল-দিন ফ্রাঙ্ক-রাষ্ট্রদূতকে উদ্দেশ করে বললেন, তা হলে সবই শুনলেন। এখন আপনি যদি মনে করেন, ওর সঙ্গে বাক্যালাপ করে দেখতে পারেন।

সুলতান যেভাবে প্রশ্ন করলেন, ঠিক সেইভাবে ফ্রাঙ্ক-রাষ্ট্রদূত, আমার বিবিকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি তোমার বর্তমান মুসলমান স্বামীর কাছেই থাকতে চাও? না, তোমার খ্রীস্টান স্বামীর কাছে আবার ফিরে যাবে?

—আমি এই মিশরীয়কে ছেড়ে কোথাও যাবো না। এখন আমি আর খ্রীস্টান নই। ইসলাম ধর্মমতে দীক্ষা নিয়েছি।

রাষ্ট্রদূত গর্জে উঠলেন, ঠিক আছে। আমার যা জানার, জানা হয়ে গেছে। এবার তুমি যেতে পার।

বিবিকে নিয়ে আমি দরবার থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে যাচ্ছি, এমন সময় রাষ্ট্রদূত আমাকে ডাকলো, একর শহরে যে বুড়িটার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিলো, সে তোমার বিবির মা। এই মোড়কটা তোমাকে দেবার জন্য পাঠিয়েছে আমার হাতে।

আমি হাত পেতে সেই মোড়কটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। খুলে দেখি, ড্যামজেলের পুরনো ব্যবহৃত কিছু সাজ-পোশাক। আর একখানি রুমালের এক কোনায় পঞ্চাশ এবং অপর কোনায় একশোটা দিনার বাঁধা।

আমার কাছে সব ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে গেলো। তার কন্যার প্রতি আমি যে মর্যাদা দেখিয়েছিলাম এবং এখনও যে মর্যাদা তাকে দিয়েছি তারই কৃতজ্ঞতা এবং আশীর্বাদই জানিয়েছে সে।

এরপর দামাসকাস ছেড়ে আমরা মিশরে চলে এলাম। তারপর কতকাল কেটে গেছে। ড্যামজেল এক এক করে আমার ঔরসের অনেকগুলো সন্তানের জননী হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে তারা সকলেই আমার বিবির রং পেয়েছে।

এই আমার জীবনের কাহিনী, খোদা হাফেজ।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে। সুলতান শাহরিয়ার মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে, ফাল্লার মতো ভাগ্যবান সুখী মানুষ কম আছে, শাহরাজাদ!

কিন্তু তার চেয়েও সুখী এবং ভাগ্যবান লোকের কাহিনী আপনাকে শোনাবো।

—কী কাহিনী?

এক জেলে খলিফা, এক সামুদ্রিক বাঁদর আর এক খলিফার কাহিনী শুনুন তাহলে ঃ

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

কোনও এক সময়ে বাগদাদে খলিফা নামে এক জেলে বাস করতো। এমনই তার দীন-হীন অবস্থা যে, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও শুধুমাত্র নিজের উদরান্নের সংস্থান করতে পারতো না। এই কারণে সে ভয়ে শাদী নিকা কিছুই করার দুঃসাহস করেনি। একজনেরই রুটি জোগাড় হয় না, সেখানে বিবি বাল-বাচ্চাদের মুখে সে খাবার দেবে কোথা থেকে! তার মতো দুঃস্থ অসহায় অবস্থা তার পড়শীদের কারুরই ছিলো না।

ফিদিন সাত-সকালে সকলের আগে জাল কাঁধে করে সে নদীতে যায়। সকলের চেয়ে বেশিবার জাল ফেলে। কিন্তু এমনই বরাত, সকলের চেয়ে কম মাছ সে তুলতে পারে।

এই রকম একদিন, নদীতে দশ দশবার জাল ফেলেও একটা চুনো-পুঁটি তুলতে পারলো না। রাগে দুঃখে হতাশায় নদীর উপকূলে বসে পড়ে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকলো সে।

—হায় আল্লাহ, একবার অভাগার দিকে মুখ তুলে তাকাও। তুমি ছাড়া যে এ-জগতে আর কোনও ভরসাই নাই আমার। তুমি তো তোমার সৃষ্ট সব প্রাণীকে আহার যোগাও। তবে আমার ওপর এতো নির্দয় হবে কেন?

এইভাবে অনেকক্ষণ হা হুতাশ করার পর আবার সে বুকে ভরসা নিয়ে জাল ফেললো। একটুক্ষণ পরে জাল গোটাতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলো। দারুণ ভার বোধ হচ্ছিল। ভাবলো, এতোদিনে আল্লাহ বোধহয় মুখ তুলে তাকিয়েছেন! বেশ তাগদ খাটিয়েই জালখানা ওপরে তুলতে পারলো সে।

খলিফা অবাক হয়ে দেখলো, না কোনও মাছ নয়, একটা কানা খোঁড়া বাঁদর উঠে এসেছে মাত্র।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো পঞ্চান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

খলিফা কপাল চাপড়াতে থাকে, এই কী তোমার বিচার হলো মালিক! মাছের বদলে একটা কানা-খোঁড়া বাঁদর বরাদ্দ করে পাঠালে আমার জন্য?

একখানা রশি দিয়ে বাঁদরটাকে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে বেধড়ক প্রহার করতে লাগলো সে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে সে বলে ওঠে, আমাকে মেরো না জেলের পো, আমাকে এমন করে মেরো না। তুমি আমার কথা শোনো, আর একবার জাল ফেলো। দেখবে, আল্লাহ তোমার আজকের রুটির ব্যবস্থা করে দেবেন।

এক চক্ষু খঞ্জ সেই বাঁদরের কথায় জেলে আবার জাল ফেলে জলে।

এবারে জালটা আরও বেশি ভারি বোধ হয়। অনেক কষ্টে সেবারও জালখানা ওপরে তোলে সে। আর কী আশ্চর্য, এবারও আর একটা বাঁদর। কিন্তু এ বাঁদরটা খোঁড়াও না, কানাও না। দেখতে খুবই সুন্দর। কাজল কালো টানাটানা চোখ, সুন্দর থ্যাবড়া নাক, দাঁতগুলো ঝকঝকে, সাদা মুক্তোর মতো। ওর গায়ে ছিলো লাল সাদা ডুরি কাটা একটা কুর্তা। হাতে ছিলো সোনার বালা। কানে ছিলো দুল। এবং পায়ে ছিলো সোনার ঘুঙুর। বেশ সুন্দর করে হাসছিলো সে। এবং আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো জেলেকে।

খলিফা দাঁতে দাঁত চেপে স্বগতভাবে বলে, আজ দেখছি বাঁদরেরই দিন।

আল্লাহ কী পানির সব মাছকেই এই রকম সব বাঁদর বানিয়ে রেখেছেন?

এ বাঁদরটাকেও সে আগের মতো রশি দিয়ে গাছের গুঁড়িতে বেঁধে প্রথম বাঁদরটাকে তেড়ে বললো, ওরে শয়তান, তোর কথাতেই আমি আবার জাল ফেললাম। তা মাছের বদলে আর একটা বাঁদর? এবার তোকে মারতে মারতে মেরেই ফেলবো।

প্রথম বাঁদরটা বলে, আচ্ছা আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। তুমি ঐ বাঁদরটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখ না, ও কী বলে? আমার মনে হয়, আমাকে পেটালে তোমার পেট ভরবে না, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বললে আখেরে তোমার ভালোই হবে।

প্রথমটাকে ছেড়ে দিয়ে সে দ্বিতীয়টার কাছে এসে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় বাঁদরটা সহাস্যে স্বাগত জানায় জেলেকে।

খলিফা ওকে ধমক দেয়, এতো হি হি করে হাসার কী আছে? থামো। বলো, কী বলতে চাও?

দ্বিতীয় বাঁদর বলে, আমাকে তুমি চেন, খলিফা?

—না, জানি না। কিন্তু আমার কথার যদি জবাব না দাও, এই চাবুক তোমাকে সব জানিয়ে দেবে।

বাঁদর বলে, আহা অত গোসা করছো কেন? অমন কড়া কড়া কথা বলে কী ফয়দা? তার চেয়ে এসো আমার কাছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, অনেক লাভবান হতে পারবে।

খলিফা চাবুকটা ফেলে দিয়ে বলে, বেশ বলো। আমি তোমার সব কথাই শুনতে চাই।

বাঁদরটা বলে, এর আগে আমি এক ইহুদীর কাছে ছিলাম। এখনও সে-ই আমার মনিব। লোকটা সুদে টাকা খাটায়। তার কাছে থাকার সময়ে তার ব্যবসার খুব বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিলো। প্রতিদিন সে আমার মুখ দেখে দোকান খুলতো। এবং আমার মুখ দেখেই আবার দোকান বন্ধ করতো। লোকে বলে, বাঁদরের মুখ দেখলে নাকি অযাত্রা—অশুভ হয়। কিন্তু আমার মনিবের তো ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ভালোভাবেই চলছে। যাই হোক, তোমার নসীবটা একবার পরীক্ষা করে দেখ, আমাকে দিয়ে তোমার বরাত কিছু খোলে কিনা।

—এক কাজ করো, বাঁদরটা বলতে থাকে। আমাকে জালে জড়িয়ে তুমি আর একবার জাল ফেল জলে। দেখ কী ওঠে।

জেলে বললো, বেশ তাই করছি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো ছাপান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

বাঁদরটা যেভাবে বললো, খলিফা সেইভাবে জাল ফেলে।

এবার তার ভাগ্যে একটা বিরাট মাছ ওঠে। তার গায়ের রং রূপোলী । চোখ দু'টো ঠিক যেন দু'টো সোনার মোহর।

বাঁদরটা বলে, দেখলে তো আমি কেমন পয়া? যাই হোক, একটা বড়সড় ঝুড়ি নিয়ে এসো। নিচে কিছু পাতা বিছিয়ে মাছটা ভরে নিয়ে বাগদাদ শহরে যাও। আমার কথা যদি বিশ্বাস না করো তবে যাওয়ার আগে আমাদের দু'জনকে বেঁধে রেখে যাও এই গাছের গুঁড়িতে। পথে যেতে যেতে যদি কোনও লোক জিজ্ঞেস করে কী মাছ পেয়েছ আজ, কোনও জবাব দেবে না।

সোজা চলে যাবে স্যাকরা বাজারে। সেখানে জহুরী সাদার দোকান আছে।

লোকটা ইহুদী—সুদখোর। স্যাকরা বণিক-সভার শাহবানদার সে। তাকে বলবে, আপনার নাম করে জাল ফেলেছিলাম। আল্লাহ আমাকে এই মাছটা দিয়েছেন। তুমি যখন ঝুড়ি থেকে বের করে মাছটা তাকে দেখাবে, সে জিজ্ঞেস করবে 'আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখিয়েছ এ মাছ?' তুমি বলবে, খোদা কসম, কাউকেই দেখাইনি। তখন সে দাম হিসাবে তোমাকে একটা দিনার দিতে যাবে। তাও নেবে না। এইভাবে সে দাম বাড়াতে বাড়াতে যদি বলে, 'মাছটাকে সোনা দিয়ে ওজন করে দিচ্ছি' তাও নেবে না তুমি। তখন সে জিজ্ঞেস করবে 'তাহলে কী নেবে?' তখন তুমি বলবে, 'পয়সা-কড়ি কিছুই চাই না, মালিক। কয়েকটা কথার বিনিময়ে আপনাকে দিতে পারি এই মাছটা।' সে বলবে, 'কী কথা?' তখন তুমি বলবে 'আপনি উঠে দাঁড়িয়ে বলুন, আপনারা সবাই সাক্ষী, আমি আমার বাঁদরটা এই জেলে খলিফার বাঁদরের সঙ্গে বদল করে নিলাম।'

ব্যস, এই তোমার মাছের উপযুক্ত দাম হবে। এরপর আমি তোমার সম্পত্তি হয়ে যাবো। এবং আমার কপালেই তোমার কপাল ফিরে যাবে। প্রতিদিন তুমি জাল ফেলে যা মাছ পাবে, বিক্রি করে একশো দিনার সংগ্রহ করতে পারবে। এবং দেখবে, দিনে দিনে তুমি ধনী হবে এবং ঐ ইহুদী গরীব হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে এমন একদিন আসবে, তখন তুমি হবে বাজারের সেরা বণিক, আর সে কপর্দকহীন হয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবে।

বাঁদরটা বললো, যা বললাম, ভালো করে খেয়াল রেখ, তাহলে তোমার সৌভাগ্য কেউ নিতে পারবে না।

জেলে বললো, ঠিক আছে, তোমার কথামতোই কাজ করবো। কিন্তু এখন এই কানা-খোঁড়া বাঁদরটাকে কী করবো? ছেড়ে দেব?

দ্বিতীয় বাঁদর বলে ঠিক আছে, আমাদের দু'জনকেই তুমি ছেড়ে দিয়ে যাও। আমরা এই জলেই থাকবো।

খলিফা ওদের দু'জনকে খুলে দিতেই ওরা জলে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মাছটাকে ভালো করে ধুয়ে ঝুড়িতে ভরে মাথায় তুলে বাজারের পথে গান গাইতে গাইতে চলে সে।

পথে অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়। সবাই চেনা জানা। তারা সকলেই জানে, লোকটা একেবারে অপয়া। সারাদিনে একটা ভালো মাছ ধরতে পারে না। কেউ কেউ রসিকতা করে জিজ্ঞেস করে, কী গো, জেলের পো, আজ দেখি প্রাণে বসন্ত জেগেছে! তা রুই-টুই কিছু তুলেছ বলে মনে হচ্ছে?

কিন্তু খলিফা কোনও জবাব দেয় না। গান গাইতে গাইতে সে সোজা চলে আসে ইহুদী জহুরীর দোকানে।

জহুরী বসেছিলো নফর চাকর পরিবৃত হয়ে বাদশাহী কেতায়। পরনে তার মহামূল্যবান সাজ-পোশাক। যে আসনটায় বসেছিলো তা দেখতে প্রায় তখত-এর মতো—অত্যন্ত দামী, বাহারী। দেখে মনে হয় যেন কোথাকার নবাব বাদশাহ।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

খলিফাকে দেখে স্বাগত জানালো ইহুদী, আরে এসো এসো, কী ব্যাপার! কী মাছ পেয়েছ আজ? রাতে স্বপন দেখেছি, বিরাট একটা মাছ ধরে আনা হয়েছে বাড়িতে।

খলিফা বলে, আজ সকালে আপনার নাম করে জাল ফেলেছিলাম। তা জালে আল্লাহর দোয়ায় উঠেছে একটা পেল্লাই মাছ। এই দেখুন।

ইহুদী দেখে খুশি হয়ে বলে, বাঃ তোফা। এই নাও, দামটা রাখ।

একটা দিনার দিতে যায় সে।

কিন্তু খলিফা বলে, না মালিক ওতে হবে না।

—আচ্ছা এই নাও দু দিনার।

—না ওতে হবে না?

—তিন দিনার?

—না।

—দশ?

—না, ওতেও দিতে পারবো না।

—আচ্ছা, বাবা তুমি কী চাও? সোনা দিয়ে মেপে দেব?

জেলে বলে, মাফ করবেন জনাব, টাকা-পয়সার বিনিময়ে এ মাছ আমি বিক্রি করতে পারবো না।

ইহুদী জহুরী অবাক হয়ে বলে, তবে? কী চাও তুমি?

—জী, আমাকে একটা কথা দিতে হবে?

—কী কথা বলো?

জেলে বলে, আপনার যে বাঁদরটা আছে, ঐ বাঁদরটা আমি নেব। তার বদলে অবশ্য আমার একটা বাঁদর আপনাকে দেব। আপনি রাজি থাকেন তো বলুন?

—বড় অদ্ভুত প্রস্তাব! ঠিক আছে তাই হবে।

খলিফা বলে, না, ওভাবে বললে হবে না। আপনার দোকানের এইসব খদ্দের কর্মচারী এদের সামনে হলফ করে বলুন যে, আমার বাঁদরটার সঙ্গে আপনার বাঁদরটা বদলা-বদলী করে নেবেন।

ইহুদী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এই যে, শোনো ভাইসব, আমি এই জেলে খলিফাকে কথা দিচ্ছি, আজ থেকে ওর বাঁদরের সঙ্গে আমার বাঁদরটা বদল করে নেব।

জেলে সঙ্গে সঙ্গে মাছটা ইহুদীর দোকানে নামিয়ে দিয়ে খালি ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে আবার নদীর ধারে ফিরে আসে। মনে মনে ভাবে বাঁদরটাকে সব কথা বলা দরকার। জাল ফেলে সে। ভাবে নিশ্চয় সে উঠে আসবে। জালটা ভারিও বোধ হতে থাকে। টেনে তুলতে বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, জালে বাঁদরটা উঠে আসেনি, তার বদলে উঠেছে অজস্র ভালো ভালো মাছ। সারা জালটা রূপোর মতো ঝকঝক করতে থাকে।

নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল একটা মেয়ে। জেলের কাছে এগিয়ে এসে একটা মাছ দরদাম করে এক দিনার দিয়ে কিনে নেয়। একটু পরে আরও কয়েকজন পথচারী দাঁড়িয়ে পড়ে। তারাও কিনে নেয় খানিকটা। এইভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে বেজায় ভিড় জমে যায় সেখানে। সবাই তাজা মাছের সন্ধানে এসেছিলো। ভালো দামেই সব মাছগুলো অল্পক্ষণের মধ্যে বিকিয়ে যায়। খলিফা গুণে দেখলো, ঠিক একশো দিনার হয়েছে।

মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে আসে খলিফা। বহুকাল পরে আজ তার খুশির সীমা নাই। একটা নয় দু'টো নয় একশোটা সোনার দিনারের মালিক সে। এইভাবে প্রতিদিন জাল ফেলে সে একশো দিনার পাবে। ওরে বাপস্! সে কত টাকা হয়ে যাবে ? অত টাকা সে রাখবে কোথায়?

খলিফা আকাশ-কুসুম কল্পনা করতে থাকে ঃ এইভাবে আমি অনেক বড় লোক হয়ে যাবো একদিন। বিরাট ইমারত, দাস-দাসী খ্যাতি মান সব হবে আমার। কত লোক আমার কাছে আসবে সাহায্যের জন্য! আমি অবশ্য কাউকেই ফেরাবো না। আহা, লোকে অভাবে পড়েই না হাত পাতে। যার যা দরকার সবাইকে খুশি করে দেব।

সবচেয়ে মজার হবে, স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ আসবেন আমার কাছে টাকা ধার করতে। তিনি এসে বলবেন, খলিফা সাহেব, খলিফা সাহেব, বাড়ি আছ?

—আমি উত্তর দেব, কে?

তিনি আমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলবেন, আমি খলিফা হারুন অল রসিদ। বড় টানাটানির মধ্যে চলছে, তা আমাকে একশোটা দিনার ধার দিতে পার, খলিফা সাহেব?

আমি তখন গম্ভীর চালে বলবো, একশো দিনার? অত টাকা কোথায় পাবো জাঁহাপনা? আমি গরীব-সরীব মানুষ, দিন আনি, দিন খাই। একসঙ্গে একশো দিনার চোখেই দেখিনি। আপনাকে কে বলেছে, আমার কাছে টাকা আছে?

খলিফা বিশ্বাস করবেন না আমার কথা। তিনি সব খোঁজখবর নিয়েই আমার কাছে আসবেন। কত টাকা আমার জমেছে এবং কোন্ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি, সবই তাঁর জানা, সুতরাং হাবিলদার আহমেদকে বলবেন, গ্রেপ্তার করো একে। আহমেদ আমাকে ন্যাংটো করে পেটাতে শুরু করবে। যতক্ষণ না একশো দিনার বের করে দিই ততক্ষণ সে আমাকে মারতেই থাকবে। অবশেষে টাকা বের করে দিতেই হবে।

এই রকম ঝুট ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় বের করতে হবে। জেলে শুয়ে শুয়ে ভাবে। শেষে সে ঠিক করে, না, পাড়াপড়শী কাউকে সে জানাবে না কী তার রোজগার হচ্ছে। জামাকাপড় সাজ-পোশাক এবং খানাপিনা কিছুই পালটাবে না সে। যেমন আগে ছিলো ঠিক তেমনি থাকবে। না, অন্যের দুঃখে বিগলিত হয়ে দয়া সে দেখাবে না কাউকে। দেবে না একটা পয়সাও। তাতে লোকে সন্দেহ করবে। ভাববে, অনেক পয়সা না থাকলে কেউ দানখয়রাত করতে পারে? পরের উপকার করতে গিয়ে নিজের বাঁশ হয়ে যাবে। কী দরকার অমন উট্‌কো দরদ দেখিয়ে? লোকে হাতে পেয়ে উপকারটুকুও নেবে, আবার চোখও টাটাবে। এইভাবে পাঁচ কান হতে হতে একদিন সুলতানের কানে যেতে আর কতক্ষণ। আর খলিফার রোষে পড়লে কারো রক্ষে আছে? সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে হবে। সুতরাং একটিও কথা না। নিজেকে ঠিক তেমনি দীন-ভিখারী সাজিয়েই রাখবে সে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ঊনষাটতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

অনেক বুদ্ধি খরচ করে সে একটা অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলো। গাঁজাখোরদের মতো আজগুবি এক ফিকির বলা যায়।

রাত যখন গভীর হয়ে এলো, খলিফা নিজেকে বিবস্ত্র করে দেওয়ালে টাঙানো চাবুকখানা পেড়ে নিলো। সপাং সপাং করে নিজের শরীরে বসাতে থাকলো চাবুকের ঘা। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে সে, ওরে বাবা রে, গেলাম রে, ম'লাম রে। দোহাই হুজুর আর মারবেন না, মরে যাবো।

এরপর সে নিজেই নিজেকে তড়পে ওঠে। বলো শীগ্‌গির, বল, কোথায় টাকা রেখেছিস্?

আবার সপাং সপাং করে আঘাত করে নিজেকে। আবার সে আর্তনাদ করে, দোহাই জাঁহাপনা আমাকে ছেড়ে দিন, বলছি, বলছি আমি।

—বল, কোথায় রেখেছিস্ টাকা?

আবার নিজেই বলে, দিচ্ছি, হুজুর দিচ্ছি বের করে।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে খলিফার আর্ত চিৎকারে পড়শীদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। হুড়পাড় করে সবাই বাইরে বেরিয়ে আসে।

—কী ব্যাপার! খলিফার ঘরে ডাকাত পড়লো নাকি?

আর একজন বলে, ঘরে ওর দু'টো পয়সা নাই, চোর ডাকাতে নেবে কী?

অন্য একজন বলে, কিন্তু সে হুঁশ কী ওদের আছে? লোকটা দু'বেলা দু'খানা রুটি জোগাড় করতে পারে না। তাকে মারধোর করলেই কী টাকা বের করে দিতে পারবে।

ওদিকে আরও জোরে আর্তনাদ ওঠে। ও বাবা গো, ম'লাম। আমায় ছেড়ে দিন, হুজুর আমি সব বলছি।

পড়শীরা আলোচনা করলো! আর তো চুপ করে থাকা উচিত হবে না। চলো সকলে মিলে দেখি।

কেউ লাঠি, কেউ বর্শা, কেউ সড়কী নিয়ে এসে দাঁড়ালো খলিফার দরজায়। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তখন ওরা দেওয়াল বেয়ে ছাদের ওপরে ওঠে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে।

তাজ্জব কাণ্ড! সবাই দেখে অবাক হয়। ঘরে দ্বিতীয় কোনও মানুষ নাই। খলিফা একা—এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ। একখানা চাবুক দিয়ে নিজেই পেটাচ্ছে নিজের শরীর।

—কী ব্যাপার? তোমার কান্নাকাটি চিৎকারে পাড়ার লোক সব জেগে ওঠে। আমরা তো মনে করেছিলাম, তোমার ঘরে ডাকাত পড়েছে! সেই থেকে ভয়ে আমরা কাঁপছি। কিন্তু এসব কী কাণ্ড?

ওদের কথার জবাব না দিয়ে খলিফা উল্টো তম্বি করে, তোমরা কী চাও? এই রাত দুপুরে কেন এসেছ আমাকে বিরক্ত করতে? না হয় আমি নিঃস্ব, তা বলে নিজের দেহটারও কি আমি মালিক নই? দু চারটে গোত্তা মেরে এই বেয়াড়া শরীরটা শায়েস্তা করারও কী কোনও অধিকার নাই আমার? আমাকে একটু নিশ্চিন্তে থাকতে দাও। তোমরা এখন ভালো ছেলের মতো বিদেয় হও তো! তোমাদেরও উচিত মাঝে মাঝে আমার মতো এই রকম দেহচর্চা করা, বুঝলে?

এরপর আর পড়শীদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার সে যথারীতি চাবুক চালিয়ে যেতে লাগলো নিজের শরীরে।

খলিফার এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে পড়শীরা তো সবাই হেসে খুন। আর কিছু না বলে তারা বিদায় নিলো।

খলিফা চিন্তা করতে থাকে, ব্যাটারা এর মধ্যে সন্ধান পেয়ে গেছে, আমার কাছে একশো দিনার আছে। সেইটেই হাতাতে ওরা এসেছিলো। হুঁ হুঁ বাবা, আমিও কম সেয়ানা নই। সেটি হচ্ছে না। এই বসে রইলাম গ্যাট হয়ে। সারারাত ঘুমাবো না। দেখি কে চুরি করে নিয়ে যায়।

সারাটা রাত বিনিদ্রভাবে কাটালো খলিফা। সকালে নদীতে যাবে। কিন্তু সমস্যা হলো দিনারগুলো কোথায় রেখে যাবে। ভাবলো, যদি ঘরে রেখে যাই ব্যাটারা নির্ঘাৎ লোপাট করে দেবে। সুতরাং ঘরে রেখে যাবে না সে। কিন্তু কোমরে পেটিতে বেঁধে চলাও নিরাপদ নয়। সবাই জানে পেটিতে টাকাপয়সা ছাড়া কিছু থাকে না। আর এই বাগদাদ শহরে

ছিনতাই দলের অভাব নাই। পথে পা বাড়ালেই গাঁটকাটারা পিছনে লাগবে। অনেক ভেবে-চিন্তে অবশেষে সে একটা অভিনব উপায় আবিষ্কার করলো। পুরানো কুর্তা ছিঁড়ে একটা থলে বানালো। দিনারগুলো থলেয় ভরে গলায় ঝুলিয়ে জাল কাঁধে করে সে নদীর দিকে রওনা হলো।

আগের দিনের সেই জায়গায় এসে জালটাকে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছত্রাকার করে জলের মধ্যে ফেললো সে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপর্যয় ঘটে গেলো। জাল ফেলার সময় সারা দেহে প্রচণ্ড ঝাঁকানি লাগে। এবং সেই ঝাঁকানির দোলায় ছিট্‌কে বেরিয়ে যায় থলেটা। একবারে মাঝ নদীতে পড়ে তলিয়ে যায়।

খলিফাও ক্ষিপ্রহাতে জামাকাপড় খুলে ফেলে বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। অনেকক্ষণ ধরে আঁতিপাতি করে খোঁজে। কিন্তু জলের কোন্ অতলতলে স্রোতের টানে ভেসে চলে যায় তা কিছুই হদিশ করতে পারে না। অবশেষে হতাশ অবসন্ন দেহে ওপরে উঠে আসে। কিন্তু অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস, জামাকাপড়গুলো কে চুরি করে পালিয়েছে।

—ইয়া আল্লাহ! এই কী তোমার বিচার? শয়তান চোর আমার এই ছেঁড়া সাজপোশাকের লোভও সামলাতে পারলো না?

খলিফা একটি প্রচলিত প্রবাদ আওড়ায় ঃ মক্কায় পৌঁছলে কি হবে, উটের সহিসরা কখনও হাজী হতে পারে না।

সেই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ষাটতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বেচারা খলিফা আর কী করে ; জালখানা জড়িয়ে নিলো সারা শরীরে। ঝুড়িটা তুলে নিলো মাথায়, ছড়িটা নিলো হাতে—তারপর ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে নদীর ধার দিয়ে চলতে থাকলো।

খলিফা জেলের কথা এখন থাক। এবার খলিফা হারুন অল রসিদের কথা শুনুন। বর্তমান কাহিনীর সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

এই সময়ে বাদদাদ শহরে ইবন অল কিরনাস নামে এক জহুরী ছিলো। সুলতানের দরবারে তার গতিবিধি ছিলো অবাধ। এক কথায় শহরের সম্ভ্রান্তদের সে অন্যতম,—সুলতানের নেক-নজর ছিলো তার ওপর। শহরের যে-কোনও বড় কেনা বেচা—তা সে সাজপোশাক, অলঙ্কার বা বাঁদী গোলামের কেনা-বেচাই হোক না কেন, ইবন অল-কিরনাসকে বাদ দিয়ে কিছুই হতে পারতো না।

একদা ইবন অল কিরনাস সাহেব তার দোকানে বসেছিলো। এমন সময় একটা দালাল নিয়ে এলো একটি বাঁদীকে। মেয়েটি এ শহরে নবাগতা। পরমাসুন্দরী বললেও তার রূপের মাধুর্যকে খাটো করা হয়। মোটকথা, তার মতো নিখুঁত নিভাঁজ কুমারী কন্যা এতাবৎ কালে তামাম আরবে কোথাও কেউ দেখেনি।

দালাল বললো, শুধু রূপই নয় মালিক, গুণগুলোও পরখ করে নিন। গান, বাজনা, নাচ-এ সে পটীয়সী। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানেও সে সুপণ্ডিত।

অল কিরনাস আর কোন দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার দিনার দামে মেয়েটিকে সওদা করে নিলো। ওর জমকালো বাহারী সাজপোশাক বাবদ খরচ করলো আরও এক হাজার দিনার।

সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে গেলো সে খলিফার দরবারে। সে রাতটা খলিফার সঙ্গেই

কাটালো মেয়েটি। এর ফলে অল রসিদ মেয়েটির অনন্য-সাধারণ গুণাবলীর পরিচয় জানতে পারলেন। মুগ্ধ হলেন তিনি। মেয়েটির নাম মেরিজান। খাস আরবের কন্যা। কোনও দোআঁশলা নয়। সকালবেলায় খুশি হয়ে তিনি অল-কিরনাসকে দশ হাজার দিনার পাঠিয়ে দিলেন।

এই নতুন বাঁদীটির রূপেগুণে মুগ্ধ হয়ে খলিফা অন্য সব বাঁদীদের ভুলে গিয়ে ওকে নিয়েই

মেতে রইলেন বেশ কিছুদিন। আপনারা শুনে অবাক হবেন, মেয়েটার মোহে অন্ধ হয়ে খলিফা তার প্রিয়তমা বেগম জুবেদাকে স্মরণ করেন না অনেকদিন। জুবেদা তো শুধু তাঁর বেগম নয়, চাচার মেয়ে নিজের বোন। তাকেও ভুলে রইলেন তিনি। দরবারের কাজ ডকে উঠলো। সারাটা মাসে একমাত্র জুম্মাবারে নামাজের সময়টুকু ছাড়া আর তাঁকে কেউ অন্য কোথাও দেখতে পেত না। সারা দিনরাত মেরিজানকে নিয়ে পড়ে থাকেন।

সারা সলতানিয়তের আমির ওমরাহরা চিন্তিত হলো। সুলতান যদি দরবারের কাজ দূরে ঠেলে এইভাবে দিনের পর দিন সামান্য একটি নারীকে নিয়ে বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাতে থাকেন তবে তো দেশ জাহান্নামে যাবে। সকলে মিলে উজির জাফর অল বারমাকীর কাছে দরবার করলো তারা, আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, এর একটা ব্যবস্থা করুন। আমাদের তো মনে হয় সুলতানকে ঐ মেয়েটা গুণ করেছে। এখন তিনি ব্যাধিগ্রস্ত। আপনাকেই এর প্রতিকার করতে হবে।

জাফর বলে, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, উপযুক্ত দাওয়াই দিয়ে তাঁর এ রোগ আমি সারাবো।

এই জন্যে জাফর শুক্রবার-এর প্রতীক্ষায় বসে রইলো। যথাসময়ে জুম্মাবারে সে আগে থেকেই হাজির থাকলো বড় মসজিদে। সেখানে সুলতান নামাজ পড়তে আসবেন। সেই সময় সে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারবে।

যথাসময়ে সুলতান এলেন। নামাজাদির পর উজির জাফর কথা পাড়লো। নানা বিষয়ের কথা। প্রথমে দেশের হালচাল। তার পরে ভালোবাসার মোহ এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নিয়ে গভীর তত্ত্বকথার অবতারণা করলো উজির জাফর।

সুলতান বললেন, জাফর আমি নেহাত ছেলেমানুষ বা নিরেট নই। সব আমি বুঝি। এর পরিণাম যে সুখাবহ হতে পারে না, তা আমি জানি, কিন্তু কি করবো জাফর, হাত-পা আমার বাঁধা, কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারছি না। সব দোষ আমার। আমি সবই বুঝতে পারি। কিন্তু ভালোবাসার মোহের জালে জড়িয়ে পড়েছি।

জাফর বলে, ধর্মাবতার, মেরিজান এখন আপনার দখলে। আপনার হুকুমের বাঁদী সে। অন্যান্য আর পাঁচটা বাঁদীর মতো সেও আপনার একটি কেনা বাঁদী মাত্র। আমি আপনাকে এই মোহমুদ্গারের একটা উপায় বাতলে দিতে পারি। ওকে ছেড়ে আপনি মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে পড়ুন। শিকার করুন, মাছ ধরুন। ফাঁদ ছাড়াও আরও অনেক রকম ফাঁদ আছে। সেই ফাঁদে আপনি পা বাড়ান। এতে আপনার ভালো হবে। আপনার সলতানিয়ত রক্ষা পাবে। আপনার প্রজারা আপনার জন্য দারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে।

—তুমি ঠিক বলেছ, জাফর। বাইরেই কোথাও যাওয়া যাক। তুমি ব্যবস্থা করো। আমি আজই যাবো। এবং এক্ষুনি।

জাফর এবং খলিফা খচ্চরে চেপে সোজা শহর-সীমায় এসে পৌঁছলো। সারা দিন ধরে ওঁরা দু'জনে প্রচণ্ড খরতাপের মধ্যে এদিক ওদিক বিচরণ করতে থাকেন। এইভাবে পেয়াদা প্রহরীদের পিছনে ফেলে এক সময় তাঁরা দৃষ্টি পথের অগোচরে উধাও হয়ে যান।

চলতে চলতে খলিফা পিপাসার্ত বোধ করেন।

—জাফর, তেষ্টা পেয়েছে যে—

ধারে কাছে কোনও জনবসতি নাই। জাফর লক্ষ্য করলো অনেক দূরে একটা ছোট্ট পাহাড়ের টিলায় কী যেন একটি বস্তু নড়াচড়া করছে।

সুলতান জিজ্ঞেস করেন, ওখানে কী আছে জাফর?

—আসলে, আমার মনে হচ্ছে, ওগুলো মানুষজন কিছু না। ওখানে শশার ক্ষেত কিংবা ফলের বাগান আছে। অর্থাৎ ধারে কাছে পানিও আছে। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি দেখে আসছি।

সুলতান বললেন, তোমার খচ্চরের চেয়ে আমারটা অনেক তাগড়াই আর দ্রুতগামী। তুমি বরঞ্চ এখানে দাঁড়াও, আমি ঘুরে আসছি।

সুলতান আর কোনও জবাবের প্রত্যাশা না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললেন। এবং নিমেষের মধ্যে পৌঁছে গেলেন সেই পাহাড়ের পাদদেশে। সেই উলঙ্গ জেলে সারা অঙ্গ জালে আবৃত করে ধুলোকাদা মেখে কিম্ভূত কিমাকার সেজে পাগলের মত ধেই ধেই করে নাচছিলো সেখানে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। মনে হয় কোনও এক দৈত্যদানব সে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো একষট্টিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

অল রসিদ জেলের সামনে দাঁড়িয়ে স্মিত হেসে স্বাগত জানালো।

—আচ্ছা ভাইসাব, আমাকে একটু খাবার পানি দিতে পারো?

খলিফা জেলে বাজখাই গলায় খেঁকিয়ে ওঠে, তুমি কী উন্মাদ না অন্ধ? পাহাড়ের নিচ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, দেখতে পাচ্ছো না?

হারুন অল নদীর ঘাটে নেমে আঁজলা ভরে টাইগ্রিসের জল পান করে। খচ্চরটাকে খাওয়ায়। তারপর খলিফা জেলের কাছে ফিরে গিয়ে বলো, এখানে কী করছো? এবং কী করো তুমি? পেশা কী?

খলিফা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তোমার আগেরটার চেয়ে এটা আরও আহাম্মকের মতো প্রশ্ন। তাই নয় কী? আমার কাঁধের মালপত্র দেখে কী বুঝতে পারছো না, আমার কী পেশা?

—হুঁম, দেখে তো সবাই বলবে তুমি জেলে। মাছ ধরাই তোমার কাজ। কিন্তু তোমার কুর্তা কামিজ পাতলুন গেলো কোথায়?

এই কথা শুনে জেলের প্রত্যয় হয়, আর কেউ নয়, এই ব্যাটাই সেই চোর। তার জামাকাপড় চুরি করে এখন মজা দেখতে এসেছে। ভাবামাত্র সে ছুটে এসে সুলতানের খচ্চরের লাগাম চেপে ধরে, আমার জামাকাপড় কোথায়, শীগ্গির বের করো। আমাকে ন্যাংটো করে তামাশা দেখতে এসেছ? শিগ্‌গির ফেরত দাও আমার সাজপোশাক। তা না হলে তোমার খুপরী খুলে নেব, শয়তান কাঁহিকা।

—খোদা কসম, হারুন বলেন, আমি তোমার জামাকাপড়ের বিন্দুবিসর্গ জানি না। বুঝতেই পারছি না, কী তুমি বলতে চাইছো, কী করেই বা পরনের বাস চুরি যেতে পারে। আমার মগজে ঢুকছে না, জেলের পো!

সুলতান হারুন অল রসিদের গাল দু'টো বেলুনের মতো ফোলানো। মুখের হাঁ-খানা খুব ছোট্ট—ঠিক সানাইবাদকদের মতো। জেলে খলিফা সুলতানের মুখের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করে ভাবলো, নির্ঘাৎ লোকটা সানাইবাজিয়ে।

—ওহে সানাইবাদক, সুবোধ ছেলের মতো আমার জামাকাপড়গুলো বের করে দাও দেখি। তা না হলে এই যে দেখছো ডাণ্ডা, এটা তোমার পিঠে ভাঙ্গবো।

হারুন আঁৎকে ওঠার ভান করেন, হায় বাপস্, ওর একটা বাড়ি খেলে আমার দফা-রফা হয়ে যাবে। দোহাই বাবা রক্ষা করো, আমি তোমাকে আমার সাজ-পোশাক দু-একটা খুলে দিচ্ছি, পরো। কিন্তু তোমার ঐ ডাণ্ডাটা নিচে নামাও। ওটা দেখলেই আমার কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছে।

সুলতান তাঁর বাহারী সাটিনের পোশাকটা খুলে খলিফা জেলের হাতে দিলেন।

—এইটে নিয়ে আমাকে রেহাই দাও বাবা। সত্যি বলছি, আমি তোমার জিনিস চুরি করিনি।

জেলে বিজ্ঞের হাসি হাসে, আমাকে তুমি অতই বোকা হাঁদা পেয়েছ নাকি। আমার পোশাকের দাম তোমার এটার দশগুণ হবে। ভুজুংভাজুং দিয়ে যা তা একটা গছিয়ে দিলেই অমনি আমি গলে যাবো, ভেবেছ? তোমার এই বিদঘুটে আঁকি-বুকি-কাটা কুর্তার ক'-পয়সা দাম হবে, শুনি? আমারটার কী দাম ছিলো জান?

—তোমার কথা একশোবার সত্যি, ভাইসাব। কিন্তু আপাততঃ এটা পরে তোমার অঙ্গ-শোভা একটু ঢাক। তোমার মহামূল্যবান পোশাকটার সন্ধান করে দেখছি।

খলিফা জেলে সেই সুলতানের আজানুলম্বিত শেরোয়ানীটা গায়ে চাপায়। কিন্তু বেঁটে খাটো, মানুষটার পক্ষে পোশাকটা বেশিমাত্রায় বড় হয়ে যায়। মাটিতে ঘষা লেগে ছিঁড়ে যাবে আশঙ্কায় মাছের ঝুড়ি থেকে ছুরিখানা বের করে নিচের অংশটুকু কেটে ফেলে। সেই কাটা অংশটুকু পাকিয়ে সে পাগড়ী বানিয়ে মাথায় পরে। এবার শেরোয়ানীটা ওর হাঁটু অবধি নেমে থাকে। তা থাক ওর বেশি নিচে নামাতে সে চায় না।

জেলে বলে, আচ্ছা সানাইবাদক, সানাই বাজিয়ে মাসে কত টাকা রোজগার করো?

খলিফা হারুন বিন্দুমাত্র হাসি মজাক না করে বেশ গম্ভীর ভারিক্কি চালে বলেন, তা ধর, দশ দিনার।

জেলে সমবেদনা জানায়, আহা গরীব বেচারা, তা কী করবে বলো। তিনি যার ভাগ্যে যা লিখেছেন তার বেশি তো কেউ পাবে না। আমার কথাই বলি, দশটা দিনার আমি তুড়ি মেরে এক পলকে রোজগার করতে পারি। একবার মাত্র জাল ফেলবো ব্যস্ আর দেখতে হবে না, মাছে মাছে ছয়লাপ হয়ে যাবে আমার জাল।

হারুন বলেন, জাল ফেললেই মাছ উঠবে জানলে কী করে? কোনও কোনও বার নাও তো উঠতে পারে?

—না তা হতে পারে না। এই জলের তলায় আমার একটা বাঁদর আছে। সেই আমার হয়ে দেখা শুনা করে। জাল ফেলামাত্র ভালো ভালো মাছদের তাড়িয়ে এনে সে জালের মধ্যে ঢোকায়।

জেলে খলিফা একবার সুলতানের চোখের দিকে তাকায়, কী খুব লোভ হচ্ছে তো? তা করবে এই ব্যবসা? ভাবনার কিচ্ছু নাই। সব আমি হাতে কলমে শিখিয়ে দেব তোমায়। সারাদিন তুমি আমার সাগরেদ হয়ে কাজ করে যাবে। আমি তোমাকে পাঁচ দিনার দিনরোজ দেবো, কী, রাজি? না, না ঘাবড়াবার কিচ্ছু নাই। ভেবো না, ঐ পাঁচ দিনারের চাকাতেই বাঁধা হয়ে গেলো জীবন। যখন ধীরে ধীরে ভালো কাজ শিখতে পারবে মাইনে আরও

বাড়িয়ে দেবো। তুমি হয়তো ভয় পাচ্ছো তোমার সানাই-দলের সর্দার যদি বাধ সাধে। তাহলে আমার এই ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে দেব। তা ছাড়া আমার বিরাশী সিক্কা ওজনের একটা ঘুষি যখন খাবে, বুঝবে বাছাধন কেমন মজা।

সুলতান বলেন, ঠিক, আমি তোমার শর্তে রাজি।

—তা হলে খচ্চর থেকে নামো। এখুনি তালিম নিতে শুরু করো। করবেই যখন ঠিক করেছ, দেরি করে লাভ কী?

সুলতান আমতা আমতা করে নেমে পড়ে, না, হ্যাঁ, মানে, তাতো বটেই।

জেলে বলে, এই যে জালখানা দেখছো, ঠিক এর গোড়াটা শক্ত মুঠিতে পাকড়াও করে ধরো। তারপর জালটাকে মাথার ওপর দিয়ে এইভাবে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দেবে পানিতে। গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে।

সুলতান যথাসাধ্য চেষ্টা করে জালখানা জলে ফেলতে পারেন। একটু পরে ধীরে ধীরে টেনে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু দারুন ভারি। টেনে আর পারেন না। তখন দু'জনে মিলে ওপরে তুলে আনলো জালখানা। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেলে খলিফা চিৎকার করে গালিগালাজ দিতে থাকে, ওহে ক্যাওড়ার সানাই-এর পো, ইটপাটকেল ঢুকে যদি জাল আমার ছেঁড়ে তাহলে তোমাকে আস্ত রাখবো না। খেসারত হিসাবে তোমার খচ্চরটাকে বাজেয়াপ্ত করে নেব।

ভাগ্য ভাল হারুনের জালে ইটপাটকেলের বদলে সুন্দর সুন্দর মাছ উঠলো অনেকগুলো। কিন্তু তাতে জেলের মুখে হাসি দেখা গেলো না। আবার খিস্তি খেউড় করে সুলতানকে তামিল দিতে লাগলো। নাও অত আহ্লাদে আটখানা হতে হবে না। এখন মন দিয়ে কাজ কাম করো—তা না হলে মেরে তোমার ঐ বাঁদরের মতো হত কুৎসিত মুখখানার আদলই পাল্টে দেব।

ভোর হয়ে আসছে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বাষট্টিতম রজনী ঃ আবার গল্প শুরু হয় ঃ

—শোনো জেলে খলিফা হুকুম করে, তোমার খচ্চরটায় চেপে সোজা বাজারে চলে যাও। সেখান থেকে বেশ ভালো দেখে দু'খানা বড়সড় ঝুড়ি কিনে আনবে। তা না হলে এতো মাছ একটা ঝুড়িতে ধরবে না। তুমি যাও, আমি মাছগুলো পাহারা দিই। অন্য কোন দিকে তাকাবে না, ঝুড়ি কিনেই চলে আসবে। দাঁড়ি-পাল্লা বাটখারা সব আমার কাছে আছে। বাজারে যাবো, মাছ দাঁড়িতে তুলবো আর পয়সা গুনে থলেয় ভরবো। ব্যস, অন্য কাজ নাই। খুব সাবধান, দেরি করো না, তাহলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।

—ঠিক আছে মালিক, যা বললেন তাই হবে।

এই বলে খচ্চরের পিঠে চেপে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে যেতে হো হো করে হাসতে থাকেন সুলতান।

সুলতানকে খোশ মেজাতে আসতে দেখে উজির জাফর বলে, মনে হচ্ছে ওখানে খুব চমৎকার একখানা বাগান পেয়ে অনেকটা সময় জিরিয়ে এলেন, জাঁহাপনা?

খলিফা হারুন অল রসিদ তখনও প্রাণখোলা হাসি হেসেই চলেছেন। জাফর বলে, মনে হচ্ছে, আপনি নতুন ভাবে খুশি হবার পথ খুঁজে পেয়েছেন। কী ব্যাপার, পানি খেতে আপনার এতো দেরি হলো কেন?

খলিফা হেসে বলেন, সে বড় মজার ব্যাপার। এমন নির্মল আনন্দ বহুদিন আমি পাইনি, জাফর। বড় ভালো কেটেছে সময়টুকু।

তিনি জেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া ইত্যাদির কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগলেন।

সব শুনে জাফর বললো, যাক শুনে আসবস্ত হলাম। আপনার গায়ের লাল শেরোয়ানী না দেখে আমার তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিলো আর কী? এতক্ষণে বুঝলাম, না মারাত্মক কিছু না। আপনি যদি অনুমতি করেন তবে জেলের কাছ থেকে আপনার মহামূল্যবান কুর্তাটা আমি কিনে নিয়ে আসতে পারি।

সুলতান আরও উচ্চস্বরে হো হো করে হেসে ওঠেন।

তুমি কী ভাবছো এখনও সেটা আগের মতো মূল্যবানই আছে? ওটার তিন ভাগের একভাগ কেটে সে তার পাগড়ী বানিয়ে দফা শেষ করে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, মাছ ধরার শখ আমি ষোলআনা মিটিয়ে নিয়েছি। ঐ রকম আসুরিক ব্যায়াম-চর্চার আর দরকার নাই আমার। এবং প্রথম বারে যা তুলতে পেরেছি, কে জানে, সারাজীবন ধরে জাল ফেললেও হয়তো আর তেমনটি হবে না। এক খেপেই বাজিমাত করে দিয়েছি। এতো মাছ উঠেছে, রাখবার মতো পাত্র নাই। তাই আমার সদাশয় মনিব বাজার থেকে দু'টো বড় গোছের ঝুড়ি কেনার জন্য পাঠিয়েছে।

জাফর বলে, জাঁহাপনা কী মনে করেন, তাঁর মহামান্য মালিককে একটু মার দিয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার?

—না না, মোটেই না। বরং আমাকে পাহারা দেবার জন্য তোমার সাঙ্গপাঙ্গরা যারা আশে-পাশেই ঘুর ঘুর করছে তাদের সব্বাইকে বলে দাও। এক একটা মাছ, এক এক দিনার দামে জেলের কাছ থেকে কিনে আনুক তারা।

জাফর তখন সমস্ত সিপাই পেয়াদাদের ডেকে বললো, তোমরা সবাই এক এক করে নদীর ধারে যাও। এবং সুলতানের জন্য মাছ নিয়ে এসো।

তক্ষুনি সকলে জাফরের নির্দেশ মতো পাহাড়ের পাদদেশে টাইগ্রিস নদীর উপকূলের দিকে ধাবিত হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা চড়ুই-এর ঝাঁকের মতো ঘিরে ধরলো সেই জেলেকে।

—এ্যাই ব্যাটা জেলে, কী মাছ ধরেছিস দেখি, দে?

জেলে বলে, ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর? মাছ নেবে—পয়সা এনেছ?

—চোপ বাঁদর, সুলতান মাছ খাবে, এই তোর বাপের ভাগ্যি, আবার পয়সা কী র‍্যা?

এই বলে সবাই মিলে কেড়ে কুড়ে নিলো ওর মাছগুলো। জেলে প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। একটু পরেই দু'চার ঘা খাওয়ার পর মালুম হতে লাগলো, নাঃ, লোকগুলো নেহাত ফালতু আদমি নয়। লড়াইএর কায়দা কসরত ওরা খুব ভালো করেই জানে। তা না হলে, তার মতো পালোয়ানের হাত থেকে মাছ কেড়ে কেউ পার পেয়ে যেত?

কোন রকম দু'হাতে দু'টো মাছ শক্ত করে ধরে সে নদীর জলে ঝাঁপ দিলো। এক ডুবে অনেকটা ভেতরে চলে গিয়ে ভেসে উঠে মাছ দু'টো ওপরের দিক করে দেখাতে দেখাতে সাফাই গাইতে থাকে, এই দেখো, সব নিতে পারনি তোমরা। আমি দু'টো নিয়ে এসেছি। দাঁড়াও, সবুর করো, আমার সানাই-এর পোঁ ফিরে আসুক, তারপর সে তোমাদের মজাটা টের পাইয়ে দেবে·'খন।'

সবাই জেলের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখছিলো। সেই ফাঁকে সব মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে নদীর জলে পড়ে পালিয়ে গেলো। প্রহরীরা দেখলো, একটা মাছও নাই। তখন এক নিগ্রো নফর চিৎকার করে জেলেকে ওপরে উঠে আসতে বলে। তার আশা ঐ মাছ দু'টোও অন্তত সে নিয়ে যাবে সুলতানের কাছে।

—ও জেলের পো, ওপরে উঠে এসো ভাই।

জেলে ক্ষেপে ওঠে, বিদেয় হ, বানচোৎরা।

এই গালাগালে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিগ্রোটা। হাতের বর্শা উঁচিয়ে ধরে, এখনও বলছি, উঠে আসবে তো এসো, নইলে এই বর্শার ফলা তোমার দাবনায় গেঁথে যাবে।

জেলে খলিফা আঁৎকে উঠে, ওরে হতভাগা পাজি ছুঁচো, এটা ছুঁড়িস্ নে বাবা, তাহলে আর বাঁচবো না। এই নে, দিচ্ছি তোকে এই মাছ দু'টো। মাছের চেয়ে আমার জানের দাম অনেক বেশি।

সাঁতার কেটে সে উপকূলের দিকে এগিয়ে এসে মাছ দু'টো নিগ্রোটার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয়।

নিগ্রোটা মাছ দু'টোকে একখানা বাহারী রুমালে বেঁধে কুর্তার জেবে হাত ঢোকায়।

—নাঃ, তোমার নসীবই খারাপ জেলের পো, একটা দিরহামও নাই। যাই হোক কাল সকালে যদি প্রাসাদে গিয়ে আমাকে, মানে নিগ্রো খোজা সাঁদালকে খোঁজ করো, ভালো ইনাম পাবে।

জেলে খলিফা আর একটি বাক্যও উচ্চারণ করে না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে নিগ্রোটাকে। আর মনে মনে মুণ্ডুপাত করে তার।

নিগ্রোটা চলে গেলে জল থেকে উঠে বাজারের পথ ধরে চলতে থাকে সে।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তেষট্টিতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

খলিফা জেলেকে দেখে রাস্তার লোক ঘিরে ধরে। তার দেহে অন্ততঃ হাজার দিনারের মহামূল্যবান এক জলসিক্ত শেরোয়ানী। সবাই অবাক হয়ে দেখে আর ভাবে, এই গরীব জেলেটা এ পোশাক পেলো কোথায়?

সুলতানের দর্জির দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দর্জি হতবুদ্ধি হয়ে তাকায় খলিফার দিকে। হারুন অল রসিদের এ পোশাক তার নিজের হাতের তৈরি। কিন্তু এই জেলেটা তা পেলো কী করে?

—হ্যাঁ গো, এই পোশাকটা তুমি পেলে কোথায়?

খলিফা খিস্তি করে ওঠে, তাতে তোমার কী হে শালা? তুমি কে নটবর, জবাবদিহি করতে হবে? তা যদি জানার ইচ্ছে হয় তো শুনে রাখ, এটা নজরানা দিয়েছে আমার সাগরেদ। তাকে আমি মাছ ধরার ব্যবসায় তালিম দিয়েছি। আমার জামা-কাপড় সে ব্যাটা চুরি করেছিলো। যদি না দিত এটা, আমি তার হাত কেটে-ফেলে দিতাম।

দর্জি বুঝলো কোনও ভাবে সুলতানের সঙ্গে এই জেলের যোগাযোগ হয়েছিলো। এবং তিনি তার সহজাত মজা তামাশার ঝোঁকেই এই কাণ্ড করেছেন। তাই সে বলে, ও, বুঝেছি। ঠিক আছে, তোমার কাজে যাও।

এরপর নিজের ঘরে ফিরে আসে জেলে।

আমরা জানি, সুলতান কিছু মুক্ত বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে জাফরকে সঙ্গে নিয়ে শহর ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে বেড়াতে বেরিয়েছিলো। এবং জেলে খলিফার সাহচর্যে এসে প্রচুর নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছিলেন। এতোদিনের মনের জড়তা কাটিয়ে আবার সজীব কর্মমুখর হওয়ার উৎসাহ প্রেরণা সঞ্চয় করে এসেছিলেন। এর ফলে মেরিজানের মোহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিলো। এই বাঁদীটা একটা দুষ্ট গ্রহের মতো তার জীবনটাকে গ্রাস করে বসেছিলো এই একটা মাস। দরবারের কাজকর্ম যেমন সিকেয় উঠেছিলো,

তেমনি চাচার মেয়ে বেগম জুবেদাও বিষাদে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলো। নাওয়া-খাওয়া সে প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলো বলা যায়। এর অবশ্য একটাই কারণ, মেয়েদের স্বভাব-সুলভ হিংসা। তার স্বামীকে নিয়ে অন্য মেয়ে ফস্টিনস্টি করবে, গুণ-তুক করে বশে রাখবে, তা কোনও বেগম-বিবিই সহ্য করতে পারে না।

বেগমসাহেবা মওকা খুঁজছিলো এতোদিন। এই শয়তানী বাঁদীটাকে একবার কব্জায় পেলে ওর জন্মের সাধ শেষ করে দেবে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সেই সুযোগ গতকাল সে পেয়েছিলো। এবং তার সদ্ব্যবহার করতেও কসুর করেনি জুবেদা বেগম।

যখন সে শুনলো, সুলতান জাফরকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ বিহারে বেরিয়েছেন তখন বাঁদীটাকে নিমন্ত্রণের নাম করে তার কামরায় ডেকে পাঠালো। খোজাকে বললো, যা তাকে গিয়ে বল, অনেকদিন সে প্রাসাদে এসেছে, অথচ আমি সুলতানের খাস বেগম, আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি। তাই আজ দুপুরে তার সম্মানে আমি একটা ভোজসভার আয়োজন করেছি। সে যেন অতি অবশ্য এক্ষুনি চলে আসে আমার কামরায়। শুনেছি সে নাচে-গানে বাজনায় চৌকস। সুলতান তো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে যদি এসে আমাকে দু-একটা গান বাজনা শোনায়, খুব খুশি হবো।

খোজা বেগমের দূত হয়ে গেলো মেরিজানের কামরায়। আদাব-কুর্নিশ জানিয়ে বললো, মালকিন, গোস্তাকি মাফ করবেন। আমি এসেছি খলিফা হারুন অল রসিদের চাচা কাসিমের কন্যা এবং সুলতানের একমাত্র খাস বেগম জুবেদা সাহেবার কাছ থেকে। আপনি হারেমে এসেছেন এক মাস হলো। এ যাবত তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয়নি। সুলতানের মুখে আপনার নানা গুণ-কীর্তন শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। আজ দুপুরে শুধুমাত্র আপনারই সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করেছেন তিনি। তাঁর একান্ত অনুরোধ, আপনি যদি আমার সঙ্গে তাঁর কামরায় গিয়ে খানাপিনায় সঙ্গ দেন এবং আপনার দু-একটা মধুর সঙ্গীত শোনান তবে কৃতার্থ হবেন তিনি।

মেরিজান বলে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন, যাবো না? চলো, আমি তৈরি।

বীণ হাতে করে সে উঠে দাঁড়ায়। খোজাটা এগিয়ে এসে হাত পেতে বলে, মেহেরবানী করে যন্ত্রটা আমার হাতে দিন মালকিন।

জুবেদা, তার নিজস্ব দরবার-মহলে এই ভোজসভার ব্যবস্থা করেছিলো। মেরিজান প্রবেশ করে প্রথমে সোনার তখতে আসীন বেগম জুবেদাকে আভূমি আনত হয়ে দীর্ঘ কুর্নিশ জানালো। তারপর উপস্থিত অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে থাকলো।

অনেকটা দূরে স্বর্ণসিংহাসনে বসে ফিন-ফিনে পাতলা রেশমী বোরখার জাফরীকাটা নাকাবের মধ্য দিয়ে এক দৃষ্টে মেরিজানকে নিরীক্ষণ করতে থাকলো বেগম জুবেদা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চৌষট্টিতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সত্যিই মেয়েটি অসাধারণ রূপসী বটে। যেমন টানাটানা চোখ, তেমনি ভ্রু, তেমনি ছোট ললাট। গায়ের রং দুধে-আলতায়। কী সুন্দর অধর—একেবারে পাকা আঙ্গুরের

মতো টসটসে। গালে গুলাবী আভা। ছোট অথচ উন্নত নাকের একপাশে কালো একটা তিল সারা মুখটাকে আরও বেশি সুন্দর করে তুলেছে। জুবেদা মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। মেয়েটির মরালের মত গ্রীবা। কচি ডালিমের মতো সুডৌল সুগঠিত দুটি স্তন, ক্ষীণ কটি, ভারি নিতম্ব—যতই দেখে জুবেদার বুকে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু মুখে মধু ঢেলে বলে, আহা, অত শরম কীসের ভাই। এখানে আমরা সবাই সুলতানের পেয়ারের বাঁদী বেগম। সহজ হয়ে দিলখোলা মেজাজে হাসি মজাক করো সকলের সঙ্গে, তবে তো আসর জমবে!

মেরিজান মাথা নুইয়ে বলে, তাই হবে, বেগমসাহেবা।

—অত কায়দা কেতা দেখাচ্ছো কেন, ভাই। বললাম না সবাই আমরা এক। তুমি বাঁদী আমি না হয় বেগম। নাম আলাদা হলেও সুলতানের চোখে সকলেই আমরা সমান। সবাই আমরা একই বৃন্তের ফুল। আজ অনেক দিন বাদে সকলে যখন এক জায়গায় মিলিত হয়েছি, তখন আজ আর কারো মনে কোন জড়তা সঙ্কোচ রেখ না, ভাই. খাও, পিও, নাচো, হাসো, গাও।

একটু থামলো জুবেদা বেগম, তারপর জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মেরিজান, সুলতানের মুখে শুনেছি—তোমার নাকি ভারি সুন্দর মিষ্টি গলা। কী ভাই, শোনাবে দু' একটা গান?

মেরিজান জুবেদার এই রকম সুন্দর সহজ-সাধারণ আচরণ প্রত্যাশা করেনি। সে ভেবেছিলো, সুলতানের পেয়ারের খাস বেগম—দেমাকেই মাটিতে পা পড়বে না। কিন্তু সে-সব ধারণা সব ভুল হয়ে গেলো তার। কত সুন্দর সহজ ভাবে নিমেষে মানুষকে আপন করে নিতে পারে সে। উৎফুল্ল হয়ে জবাব দেয়, নিশ্চয়ই শোনাবো। আপনি শুনতে চাইছেন, শোনাবো না? ভালো মন্দ জানি না—শুনে ভালো লাগে বাহবা দেবেন। আর যদি ভালো না লাগাতে পারি—সে তো আমার দোষ।

মেরিজান গান ধরে। সুললিত মধুর কণ্ঠ। সুরের মূর্ছনায় মোহিত হয়ে যায় সকলে। এক এক করে চৌদ্দখানা গান গায় সে। জুবেদা ভাবে, নাঃ, যা শুনেছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি গুণবতী সে। তার গলায় কী এক যাদু আছে, গান শুনতে শুনতে অন্য জগতে উধাও হয়ে যেতহয়।

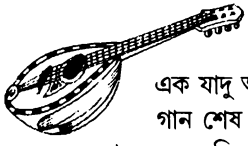

গান শেষ হলে, অপূর্ব ছন্দ-তালে নাচতে থাকে মেরিজান। এমন মনোহর নাচ অনেক দিন দেখেনি জুবেদা। ঈর্ষায় অন্তর জ্বলে ওঠে।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পঁয়ষট্টিতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

নাচ শেষ হতে হাততালি দিয়ে প্রশংসা জানায় জুবেদা।

—চমৎকার! বড় সুন্দর তোমার নাচগান, মেরিজান। খুব আনন্দ পেলাম, ভাই। আচ্ছা এবার এসো, আমরা খানাপিনায় বসি।

বিরাট টেবিলে নানা রকমের সুগন্ধী মুখরোচক শাহী খানাপিনার এলাহী ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

জুবেদা নিজের হাতে মেরিজানের সামনে খাবারের রেকাবীগুলো সাজিয়ে দেয়। বলে, নাও ভাই, শরম করো না। পেটভরে খেয়ে নাও।

মেরিজান বলে, আপনারা?

—আমরাও তোমার সঙ্গেই বসছি। আমাদের দিচ্ছে দাসী বাঁদীরা। তুমি আমার ঘরে আজ প্রথম এলে, তাই নিজের হাতেই তোমাকে দিলাম—তা না হলে নিন্দে হবে যে, ভাই।

সবেমাত্র একগ্রাস মুখে পুরেছে, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে ওঠে মেরিজানের। জলের গেলাসের দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু গেলাস আর হাতে ওঠাতে পারে না। মাথাটা ঢলে পড়ে ঘাড়ের ওপর।

বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না আপনাদের যে, ঈর্ষান্বিতা জুবেদা মেরিজানের খাবারে মারাত্মক আফিং-এর ডেলা মিশিয়ে রেখেছিলো। এবং এ তারই অবশ্যম্ভাবী এই ফল।

পলকের মধ্যে মেরিজানের দেহ লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপর। কপট উৎকণ্ঠা দেখিয়ে ছুটে আসে, জুবেদা।

—এ কি! কী হলো? মেরিজান? মেরিজান? কী হলো ভাই? কথা বলো?

কিন্তু কে কথা বলবে? তখন সে আফিঙের আরকে জারিত হয়ে গেছে। জুবেদা খোজাকে বললো, আর দেরি করিস নে। শীগ্‌গির নিয়ে যা আমার ঘরে। আমি যাচ্ছি এক্ষুনি।

জুবেদা তার মহলের একটি গুপ্ত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখলো—মেরিজানকে। কিছুক্ষণ পরে ঘোষণা করে দিলো,খাবার টেবিলে গলায় মাংসের টুকরো আটকে দম বন্ধ হয়ে মেরিজান মারা গেছে।

অল্প সময়ের মধ্যে জুবেদার অনুচররা প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগিচায় একটা শ্বেতপাথরের তাজিয়া বানিয়ে ফেললো।

খলিফা বাইরের ভ্রমণ-সফর শেষ করে প্রাসাদে ফিরে এসে প্রথমে খোজার কাছে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়া বাঁদীর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, জুবেদা পূর্বাহ্নেই খোজাকে ভয় দেখিয়ে রেখেছিলো, খবরদার, সুলতান যদি এর বিন্দু বিসর্গ জানতে পারেন, তোর ধরে মুণ্ডু আর রাখবো না। খোজা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, ধর্মাবতার, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আপনি চলে যাওয়ার পর তিনি খেতে বসেছিলেন। কিন্তু কপালের লেখা, মুখের মাংস গলায় আটকে দম বন্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন। হাকিম বদ্যি ডাকবার পর্যন্ত ফুরসত দিলেন না তিনি। শোকের সমুদ্রে আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে [illegible] গেলেন। পরম ভাগ্যবতী নারী। না হলে এমন মৃত্যু কারো হয় না, জাঁহাপনা।

জাঁহাপনার তখন ঐ সব তত্ত্বকথা শোনার মতো অবস্থা নয়। সে পাগলের মতো ছুটে গেলো প্রাসাদে। মেরিজানের কামরায়। সেখানে তার সাজপোশাক, সেতার বেহালা সরোদ, ঘুঙুর, নূপুর মল সবই যেমন ছিলো ঠিক আছে। শুধু সে নাই। প্রায় উন্মাদের মতো সারা প্রাসাদ দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন তিনি। এক সময় বাগিচার অভ্যন্তরে নকল তাজিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখের জল আর কিছুতেই বাঁধ মানে না। এক অসহায় শিশুর মতো কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি।

ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটানোর পর নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলেন সুলতান। বাঁদী বেগম ইয়ার দোস্ত উজির আমির সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন।

জুবেদা দেখলো, তার সব ফিকিরই খেটে গেছে। তখন সে একটা বড় গোছের সাজপোশাকের বাক্সে মেরিজানের হতচৈতন্য দেহটা ভরে ডালা বন্ধ করে দু'জন একান্ত অনুরক্ত খোজার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বললো, যা বাজারে নিয়ে যা। যাকে প্রথম খদ্দের পাবি, যে দামে হোক, বেচে দিবি। বলবি, ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই অবস্থাতেই নিতে হবে।

এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাই।

পরদিন সকালে জেলে খলিফার ঘুম ভাঙ্গে। প্রথমেই মনে পড়ে, সেই আবলুস কালো নিগ্রোটার কথা। সে বলেছিলো, মাছ দু'টোর দাম দেবে। সুলতানের প্রাসাদে গিয়ে

তার নাম সাঁদাল বলে খোঁজ করলেই হবে। কিন্তু সে যদি তার কথা না রাখে, খলিফা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তা হলে ঐ গব্দামুখোর থ্যাবড়া নাক আমি ঘুষি মেরে ফাটিয়ে দিয়ে আসবো।

প্রাসাদের সদর ফটকের সামনে এসে এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মেরে সাঁদালকে খুঁজতে চেষ্টা করে জেলে খলিফা। ফটকের পাহারায় ছিলো যে প্রহরী তড়পে তেড়ে আসে সে, এ্যাই—কুত্তাকা বাচ্চা, ইধার কেয়া কাম, ভাগো হিয়াসে।

ফটকের ওপাশে সঙ্গী সাথী পরিবৃত হয়ে কাছেই বসেছিলো সাঁদাল। প্রহরীর তর্জনে সে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে, কী ব্যাপার। হঠাৎ খলিফাকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে বলে, আরে এসো, এসো ভাইসাব, তোমার জন্যেই বসে আছি।

জেলে গম্ভীরভাবে বলে, তা তো থাকতেই হবে। আমার মাছের দামটা—

সাঁদাল ব্যস্ত হয়ে ওঠে, আরে কী আশ্চর্য, দাম তো নিশ্চয়ই পাবে। সঙ্গে আরও কিছু বকশিশও পাবে। দাঁড়াও দাঁড়াও, এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি তোমার দামটা।

এই বলে খোজাটা কুর্তার জেবে হাত ঢোকায়। ঠিক তক্ষুনি উজির জাফর, সাঁদাল-সাঁদাল বলে চিৎকার করে ডেকে ওঠে।

সাঁদাল জেলের দিকে তাকায়, এক পলক, ঐ-উজির ডাকছেন। শুনে আসি আগে। যাবো আর আসবো। এসেই তোমার দাম মিটিয়ে দিচ্ছি আমি। ততক্ষণে—এই টুলটায় বসো তুমি।

সাঁদাল ছুটতে ছুটতে দরবারে ঢুকে যায়। জেলে খলিফা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহারাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছেষট্টিতম রজনী ঃ আবার সে বলতে থাকে ঃ

খোজা নফর চাকর প্রহরীরা ঘিরে থাকে জেলে খলিফাকে। তারা জানে সুলতানের পছন্দ মতো এই জেলের মাছই এসেছে তাঁর প্রাসাদে। সুতরাং সে তো আর যে-সে মেকদারের মানুষ হতে পারে না। তাই খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে তার সান্নিধ্যে থাকতে পেরে প্রাসাদপুত্ররা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে থাকে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। সাঁদাল সেই চলে গেছে—আর ফেরার নাম নাই। খলিফা জেলে প্রথমে অধৈর্য, পরে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। লোকটা ধাপ্পাবাজ নয় তো? হয়তো এই হুট করে কেটে পড়া—এও তার একটা বাহানা। কিন্তু সে-ও জেলের পো, খলিফা। তার সঙ্গে ঐ সব গাঁড়চালাকী চলবে না। মেরে লাস নামিয়ে রেখে যাবে। খলিফা হাঁক ছাড়লো—হেই, সাঁদাল—

কিন্তু কোনও জবাব পেলো না। সাঁদাল তখন জাফরের সঙ্গে জরুরী কথা বলতে ব্যস্ত ব্যাপৃত ছিলো। জেলে খলিফা আবার একটু গলা চড়া গলায় ডাকে, এই যে—কদম্বপিয়ারী, কই, কোথায় গেলে, একবার এদিকে এসো তো নটবর। আমার যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেলো, বাপজান! আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে যাও, আমি বিদেয় হই।

জাফরের সামনে দাঁড়িয়ে সাঁদাল জেলের ঐ সুমধুর সম্ভাষণ শুনে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু সাড়া না দিয়ে বরং আরও তৎপর হয়ে ওঠে কথাবার্তায়। ভাবখানা এই—কিছুই তার কানে যায়নি।

কিন্তু জেলের পো খলিফা তো ছাড়বার পাত্র নয়। এবার সে দরবার-মহলের আরও কাছে সরে আসে। খ্যানখ্যানে গলায় সাদর সম্ভাষণ জানাতে থাকে, ওহে মিথ্যুক জাসু, একবার দয়া করে গতরটা বাইরে বের করে আনো। বলি, লোক ঠকানোর এই ধাঁন্দা কতকাল ধরে চালাচ্ছো। ট্যাঁকে নাই ফুটো পয়সা, বাদশাহী চাল আছে ষোল আনা। বলে কিনা—যাওয়া মাত্র পেয়ে যাবে দাম।' ওরে আমার দেনেওলা আমির রে! এখনও বলছি, এই

গরীবের পয়সা কটা মেরে তুমি সুলতান বনবে না। মেহেরবানী করে আমার ন্যায্য পাওনাটা দিয়ে দাও।

এইবার উজির জাফর কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পায়। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। খোজাকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, লোকটা কে? কী সব বলছে সে? কে তাকে ঠকিয়েছে?

নিগ্রো খোজাটা বলে, ঐ লোকটাকে আপনি চেনেন না, হুজুর?

জাফর বলে, যাকে জীবনে কখনও দেখিনি, তাকে চিনবো কী করে?

খোজা বলে, কিন্তু মালিক, এই জেলের কাছ থেকেই তো আপনি আমাদের মাছ আনতে বলেছিলেন! শেষ পর্যন্ত দু'টো মাছ নিয়েও এসেছিলাম। তবে তার দাম দেওয়া যায়নি। কারণ আমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছুই ছিলো না তখন। আমি ওকে এখানে এসে দাম নিয়ে যেতে বলেছিলাম। তাই সে এসেছে। দামও মিটিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি তলব করলেন, তাই আর দেওয়া হয়নি। বলে এলাম, ফিরে এসে দিচ্ছি। তা, লোকটা এতো ইতর, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে যা তা বলে গালমন্দ দিয়ে যাচ্ছে।

জাফর মুচকি হেসে বলে, আহা-হা ধীরে। খলিফা হারুন অল রসিদের মহামান্য গুরু—ওস্তাদ সে। তার নামে ঐ ধরনের অশালীন মন্তব্য করছো? তোমার তো বড় কম দুঃসাহস নয় খোজা সর্দার! স্বয়ং সুলতান যাকে সেলাম করে কথা বলেন, তার সঙ্গে এই ব্যবহার? না-না-না, এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। মুখ সামলে, খুব সমীহ করে কথা বলবে তার সঙ্গে।

—ওকে কিছুতেই যেতে দিও না, জাফর নির্দেশ দেয়, আমাদের কী পরম সৌভাগ্য এই দুঃসময়ে সে নিজেই এসে হাজির হয়েছে। তুমি তো জান, গতকাল প্রিয়তমা বাঁদী মেরিজান মারা যাওয়ার খবর শোনার পর থেকে সুলতান ঘরে দোর দিয়েছেন। ইয়ার বন্ধু, বিবি বাঁদী, আমির আমলা কারো সঙ্গেই দেখা করছেন না। শোকে তিনি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন, এই অবস্থায় আমাদের কোনও কথাই তিনি কানে তুলবেন না। একমাত্র এই জেলের পো-ই অসাধ্য সাধন করতে পারবে। ওর সঙ্গে সুলতানের অন্য একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ওকে দেখামাত্র তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারেন। তুমি যাও, ওকে একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করো। আমি খলিফার ঘরের সামনে যাই। দেখি, হাওয়া কী রকম!

সাঁদাল বললো, একাজ আপনার পক্ষেই সম্ভব, হুজুর।

উজির গেলো প্রাসাদের অন্দরে খলিফা হারুনের ঘরের সামনে আর সাঁদাল এলো প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে খলিফা জেলের কাছে।

—হুম্ এতক্ষণে তা হলে ফিরে এলে চাঁদু।

সাঁদাল দ্বাররক্ষীকে ইশারা করে বলে, লোকটাকে আটক করো।

খলিফা খেঁকিয়ে ওঠে, উঁ, আটক করো! যেন ওর লাখ পঞ্চাশ চুরি করেছি আমি! আটক করো! আগে আমার কড়ি ফেলো, তারপর ওসব আটক করো— ফাটক করো, শোনাবে। কারো গাঁটকাটা পয়সা নয়—এ হকের পাওনা। সিধে ফেলে তারপর কথা বলো। ওসব বুজরুকি আমি শুনতে চাই না।

খলিফা জেলেকে দ্বাররক্ষী যে কী সমাদরে রাখলো, সে কথা পরে বলবো। এখন চলুন যাই, প্রাসাদের অন্দরমহলে।

জাফর পা টিপে টিপে সুলতানের ঘরের সামনে এসে জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করে, শোকে মুহ্যমান খলিফা পালঙ্ক-শয্যায় এলিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

জাফর খুব মৃদু গলায় বলে, খোদা হাফেজ! সবই তাঁর অপার লীলা ধর্মাবতার। তাঁর ওপরে আর কারো কিছু জারিজুরি খাটে না। নসীবে যা লিখে রেখেছেন তিনি, মেনে তা নিতেই হবে। খোদা—আপনার মঙ্গল করুন, জাঁহাপনা।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতষট্টিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালো সুলতান। চোখে তার বিষদৃষ্টি।

—খোদা তোমার মঙ্গল করুন, জাফর। কিন্তু বেয়াদপ, কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে। কেন আমার হুকুম অমান্য করে বিরক্ত করতে এসেছ? সুলতানের ফরমান কী তোমার জানা নাই? কেন এসেছ এখানে?

জাফর বলে, ধর্মাবতার আপনার হুকুম না মেনে এখানে আসা আমার অন্যায় হয়েছে, আমি জানি। এবং সে জন্য যে আপনি আমাকে সমুচিত সাজা দিতেও কসুর করবেন না—তাও জানি। এ সত্ত্বেও কিন্তু আমি এলাম। কারণ, না এসে পারলাম না। আপনার গতকালের শিক্ষাগুরু—সেই জেলে খলিফা আজ সকালে প্রাসাদে এসেছে। আপনার সম্বন্ধে তার অনেক নালিশ আছে। আমি তার খানিকটা নিজের কানে শুনে এসেছি। সে বলছিলো,—'খোদা মেহেরবান আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, মানুষ এতো অধম এবং অকৃতজ্ঞ হয় কী করে। সে আমার কাছে নাড়া বাঁধলো। ওস্তাদ বলে স্বীকার করে নিলো। আমি তাকে আমার মাছ ধরা বিদ্যা শেখালাম। প্রথম খেপেই সে কামাল করে দিলো। কিন্তু হলে হবে কী, সব রসাতলে গেলো। গোচোনা হয়ে গেলো। শিক্ষাগুরুর ইজ্জৎ করতে শেখে না যে, সে যত গুণবানই হোক ওস্তাদের অভিশম্পাতে আখেরে কোনও আয় উন্নতি করতে পারে না। আগে গুরু খুশি রাখতে হবে। গুরু রুষ্ট হলে সব ভ্রষ্ট হয়। আমি ওকে বললাম যাও দু'খানা ঝুড়ি কিনে নিয়ে এসো। তা সেই যে হাওয়া হলো, আর ফিরলো না? এইভাবেই কী গুরুদক্ষিণা দিতে হয়?

জেলের এই কথা শুনে আমারও বেশ খারাপ লেগেছে। সত্যিই, ওস্তাদ বলে কথা—ও নিয়ে এমন ঠাট্টা রসিকতা আদৌ করা উচিত নয় আপনার। সত্যিই যদি আপনি তার কাছে শিক্ষানবীশি করতে চান করুন। আমাদের কিচ্ছু বলার নাই। আর যদি মনে করেন না, আর ওসব শিখে-টিখে কোনও লাভ নাই। তাও তাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিন ঃ না ওস্তাদ কাল পর্যন্ত যা হয়ে গেছে তা হয়েছে। তারপর আর আমাদের কোন শর্ত চুক্তি রইলো না। এখন তুমি অন্য সাগরেদ তলাশ করতে পার।

কালকের পরে এই প্রথম খলিফার চোখে জল থাকা সত্বেও মুখে হাসি ফুটলো। একটু পরে তিনি অনেক পিছনের কথা স্মরণ করে হো হো করে উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন। হঠাৎ তার বুক থেকে ভারি পাথরের বোঝা সরে গেলো। নিজেকে মনে হতে লাগলো, উচ্ছল প্রাণবন্ত ডানামেলা এক পায়রা। বললেন, একটা সত্যি কথা বলতো জাফর, সত্যিই কী সে এখন প্রাসাদে?

—খোদার কসম, জাফর দিব্যি করে বলে, সে এখন সশরীরে এই প্রাসাদেই হাজির আছে।

—খোদা হাফেজ, আজ আমি তাকে সব পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেব। আল্লাহ যদি তাকে এইভাবে পাঠিয়ে থাকেন যে, তার আচার-আচরণের দণ্ড-সাজা আমাকে দিয়ে দেওয়াবেন তিনি তবে তাই হোক। আর যদি তিনি ভেবে থাকেন সে আমার ইনাম এবং মর্যাদা পাবার অধিকারী, সে ভী আচ্ছা। জাফর একখানা কাগজ দাও আমাকে।

তৎক্ষণাৎ কাগজ এলো। কাগজখানা চল্লিশটা টুকরো করলেন তিনি। প্রথম কুড়িখানা জাফরের হাতে দিয়ে বললেন, এক থেকে একহাজার দিনারের যে কোনও অঙ্ক এই কুড়িখানা কাগজের যে কোনওটায় লেখ। এবং সেই সঙ্গে আমার দরবার বা দপ্তরের যে কোনও পদ, তা সে খলিফা আমির উজিরই হোক বা নফর চাকরই হোক—উল্লেখ করো।

উজির আজ্ঞা মতো কুড়িখানা কাগজে কুড়িটা পদের নাম এবং নিজের ইচ্ছে মত এক থেকে এক হাজারের নানারকম সংখ্যা লিখে রাখে। এরপর বাকী কুড়ি খানা কাগজ দিয়ে সুলতান বলেন, এই কুড়িখানা কাগজে সাধারণ প্রহার থেকে শুরু করে মৃতুদণ্ড পর্যন্ত কুড়িটা সাজার উল্লেখ করো।

জাফর তাও লেখে। এবং সুলতানের নির্দেশমতো কাগজের টুকরোগুলো একই রকমের ভাঁজ করে একখানা গামলার মধ্যে রেখে গামলাটা খলিফার দিকে এগিয়ে দেয়।

খলিফা ইস্টনাম জপ করতে থাকেন।

—আমি আমার চৌদ্দ পুরুষের হলফ করেছি, এই গামলা থেকে ঐ জেলে খলিফা যে কাগজখানা প্রথমে টানবে, তার বিধান আমি অক্ষরে অক্ষরে মানবো। তা সে যদি 'খলিফার' কাগজটাই তুলতে পারে, আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবো তখত্। আর যদি সে শূল, ফাঁসী বা ঐ রকম কোনও নিষ্করুণ সাজার কাগজ একখানা তুলে ধরে, তবে সে রেহাই পাবে না। সে সাজা তাকে নিতেই হবে—মৃত্যুদণ্ড হলেও। মুকুবের কোনও প্রশ্ন নাই। কারণ আমি পিতৃপুরুষের নামে হলফ করেছি। এ সাজা বা পুরস্কার রদ করার ক্ষমতা আমার হাতে রইলো না।

জাফরকে বললেন তিনি, নিয়ে এসো তাকে এখানে।

উজির শঙ্কিত হলো, সাধারণতঃ দেখা গেছে, গরীব দুঃখীদের নসীবে ভালো কিছু ওঠে না। হয়ত নিরীহ বেচারা মৃত্যুদণ্ডের কাগজই একখানা টেনে বসবে। তখন তার এই অকারণ মৃত্যুর জন্য সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দোষী মনে করতে পারবে না। খলিফা হলফ করেছেন। সুতরাং তখন তাঁর কাছে আর্জি জানিয়ে কোনও সুরাহা হবে না। ইয়া আল্লাহ, একি সঙ্কটে ফেললে আমাকে। এখন কী করে সেই ভাগ্যহত মানুষটাকে এখানে হাজির করবো আমি।

জাফর প্রাসাদের বাইরে এসে জেলেকে দেখতে পেয়ে প্রাসাদের অন্দরে নিয়ে আসতে চায় তাকে। কিন্তু জেলে কিছুতেই রাজি নয়। সে চেঁচামেচি চিৎকার জুড়ে দেয় হায় খোদা, এই ভোঁদড় নিগ্রোটার কথায় ভুলে কেন আমি এসেছিলাম এখানে। একি দশা হলো আমার।

মাটিতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে তার-স্বরে চিৎকার এবং খিস্তি খেউর করতে থাকে। কিন্তু সুলতানের হুকুম, নিয়ে যেতেই হবে, জাফর খোঁজা সাঁদালকে হুকুম করে, টেনে হিঁচড়ে যে ভাবে হোক, নিয়ে যেতে হবে খলিফার সামনে।

সাঁদাল হিড় হিড় করে টানতে টানতে এনে হাজির করে প্রাসাদের বাইরের ঘরে। সাঁদাল বলে, খুব হুঁশিয়ার খলিফা, এখনও বলছি, ভালো মানুষের মতো গিয়ে সুলতানের সামনে দাঁড়াও। তা না হলে হয়তো এক্ষুনি তোমার গর্দান নেবার হুকুম আসবে।

ভয় পেয়ে খলিফা উঠে দাঁড়ায়। সামনে দরজায় ভারি পর্দা সরিয়ে সাঁদাল তাকে খলিফার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। হারুন অল তখন তখত্-এ বসেছিলেন। তার দুইপাশে দাঁড়িয়েছিলো কয়েকজন সম্ভ্রান্ত আমির ওমরাহ।

খলিফা ঘরে ঢুকেই থমকে যায়। এ সে কী দেখছে? খুব ভালো করে সুলতানের চেহারাখানা নিরীক্ষণ করে হি হি করে হেসে উঠলো সে।

—অ, সানাই-এর পো তুমি এখান বাদশাহ সেজে! বহুত আচ্ছা। তুমি কী ভেবেছিলে গতকাল নদীর ধারে ঐ ভাবে আমাকে একা ফেলে রেখে, ধোঁকা দিয়ে কেটে পড়ে খুব

বাহাদুরের কাজ করেছিলে? আমি তোমাকে আমার বিদ্যা শিখিয়ে দিলাম। তার পুরস্কার কী এই বেইমানী? তোমাকে দু'টো ঝুড়ি আনতে পাঠালাম, তুমি আর ফিরলে না? আমাকে না তুমি ওস্তাদ বলে মেনে নিয়েছিলে? এই কী তোমার গুরুদক্ষিণা? একপাল খোজা শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে নাজেহাল করে ছাড়লো। তোমার ধরা সব মাছগুলো খোয়ালাম। অন্ততঃ একশোটা দিনার পাওয়া যেত বিক্রি করে। এখন তো দেখছি, এ সবই তোমার কারসাজী! কাল যাদের ওখানে দেখেছিলাম, যারা আমার মাছগুলো সব কেড়ে-কুড়ে নিয়েছিলো, মনে হচ্ছে, তারা সবাই এখানে তোমার আশেপাশে আছে! সে যাক, এখন বলো দেখি সানাই-এর পো, তোমার এই বন্দীদশাটা কী করে হলো? এইভাবে তোমাকে কয়েদ করে রেখেছে কে?

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আটষট্টিতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সুলতান হাসলেন। সোনার গামলাটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা ধর খলিফা। এর থেকে একটিমাত্র কাগজের মোড়ক তুলে নাও।

কিন্তু খলিফা সুলতানের কথায় আমল না দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, হায় বাপ্, এ কি কাণ্ড! সানাই ছেড়ে কী জ্যোতিষ ধরলে নাকি? গতকাল তো জেলে হতে চেয়েছিলে, আজ হয়েছ জ্যোতিষী! বাঃ বেড়ে! তবে একটা কথা জেনে রাখ সানাই-এর পো, যত বেশি রকমের ব্যবসা ধরবে, লাভের অঙ্ক কিন্তু ততই কমতে থাকবে। ধর যদি—

বাধা দিয়ে জাফর বলে, থাক আর জ্ঞান দিতে হবে না। এবার একখানা মোড়ক তোলো দেখি।

জাফর ওকে তখত্এর দিকে ঠেলে এগিয়ে দিলো। গামলার কাছে দাঁড় করিয়ে একটা হাত টেনে নিয়ে জোর করে ঢুকিয়ে দিলো তার মধ্যে।

জেলে খলিফা মুঠি করে একগাদা কাগজের মোড়ক তুলে ধরলো।

জাফর প্রায় ধমকের সুরে বললো, তোমাকে না বলা হলো, মাত্র একখানা মোড়ক তুলবে। রাখ, রেখে দাও আবার, মাত্র একখানা তোল।

এবার সে একখানা মোড়কই উঠিয়ে আনলো। মোড়কটা খুলে সে সুলতানের হাতে দেয়, এই নাও সানাই-এর পো, দ্যাখ, কী উঠেছে আমার নসীবে। ঠিক ঠিক বাতাবে, কিছু লুকাবে না কিন্তু।

সুলতান কাগজখানা দেখে গম্ভীর মুখে জাফরের হাতে দেয়। জাফরের মুখখানা আরও কালো হয়ে যায়। লেখা ছিলো ঃ একশোটা চাবুকের ঘা।

তৎক্ষণাৎ মাসরুরকে ডাকা হলো। এবং সপাং সপাং করে একশো চাবুকের আঘাত পড়লো খলিফার পিঠে। কিন্তু ওর তাতে ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেলো না। যেন তেমন কিছুই হয় নি।

জাফর এবার আর্জি জানায়, আমার মনে হয়, এই গরীব বেচারাকে আর একটা সুযোগ দেওয়া দরকার। ধর্মাবতার যদি আজ্ঞা করেন, তবে খলিফা আর একবার মোড়ক তুলে ভাগ্য চাই করতে পারে। আহা, অনেক মার খেয়েছে সে।

—তুমি তো বড় বেহুদা হে জাফর, সুলতান কী তার কথার খেলাপ করবে? হয়তো এবার সে ফাঁসীর কাগজখানাই তুলে বসতে পারে, ওর মৃত্যু দেখবারই কী বাসনা হয়েছে তোমার?

জাফর বলে, শোভান আল্লাহ, এর চাইতে ফাঁসীর কাগজ তোলাই বুঝি ভালো ছিলো ধর্মাবতার।

—তাই নাকি? ঠিক আছে, তোমার কথাই থাক। তোলো দেখি হে আর একবার।

কিন্তু খলিফা বেঁকে বসলো, খোদা তোমাদের দুধে-ভাতে রাখুন। অত ভালোয় আমার কাজ নাই। চাই না আমি আমির বাদশাহ হতে, মাথায় থাক তোমার এই জ্যোতিষ খেলা। শোনো সানাই-এর পো আর ও কাজটি হচ্ছে না আমাকে দিয়ে।

জাফর বলে, আমি বলছি, তোমার বরাত খুলবে। ভালো করে নেড়ে-চেড়ে আর একখানি তোলো।

খলিফা নিমরাজি হয়ে গামলার মধ্যে হাত ঢোকায়। একখানা মোড়ক তুলে জাফরের হাতে এগিয়ে দেয়। জাফর খুলে দেখে চুপ করে যায়।

—কী, কী হলো? চুপ করে গেলে কেন, উজির? বলো, কী লেখা আছে?

কাগজখানা সুলতানের হাতে তুলে দিতে দিতে সে বলে, কিছুই লেখা নাই, জাঁহাপনা, একেবারে সাদা।

তোমাকে বলেছিলাম না, ওর কপালে ভালো কিছু নাই। যাক, এবার বিদায় করে দাও।

জাফর বললো, এটা তো ঠিক যাচাই হলো না, ধর্মাবতার।

—ঠিক আছে, আর একবার তুলতে বলো, কিন্তু মনে থাকে যেন, এই-ই শেষ বার।

সে-বারে সে যে কাগজখানা তুললো তাতে লেখাছিলো—এক দিনার।

খলিফা জেলে শাপ-শাপান্ত করে, নিপাত যাও, সানাই-এর পো। একশো ঘা চাবুকের বদলে দিচ্ছ মাত্র একটা দিনার! এর প্রতিফল তুমি পাবে আল্লাহর দরবারে—শেষ বিচারের দিন।

সুলতান অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। জাফর আর এই [illegible]না-দায়ক পরিহাস সহ্য করতে পারছিলো না। খলিফাকে সে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে চলে গেলো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো ঊনসত্তরতম রজনী ঃ আবার সে বলতে থাকে ঃ

সেই হতভাগ্য জেলে যখন মনের দুঃখে প্রাসাদের সদর ফটক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছিল, তখন দূর থেকে ছুটে এসে নিগ্রো খোজা সাঁদাল ও পথরোধ করে দাঁড়ালো, ভাগ না দিয়ে পালাচ্ছো যে বড়!

কীসের ভাগ?

—বাঃ, সুলতানের ঘরে দিয়ে এলাম। ইনাম বকশিশ যা পেয়েছ হিস্‌সা মতো তার আদ্দেক ভাগ দেবে না আমাকে? এটা তো আমার হক মতো ন্যায্য পাওনা।

খলিফা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে, হকের পাওনা? তা নেবে, নাও। আমি যে একশো ঘা চাবুক খেয়েছি—তার আদ্দেক নেবে? নিতে পারবে? আর এই নাও একটা দিনার নগদ পেয়েছি। এটার আর আদ্দেক না, পুরোটাই তুমি নাও।

এই বলে দিনারটা খোজা সাঁদালের মুখে ছুঁড়ে মারলো সে। তারপর হন হন করে ছুটতে থাকলো। মুদ্রাটা কুড়িয়ে নিয়ে খোজা সাঁদাল দৌড়ে এসে খলিফার হাতে একটা থলে গুঁজে দেয়।

আরে, পালাচ্ছো কোথায়? তোমার মাছের দাম নেবে না? এই নাও, একশো দিনার আছে। আর এই নাও তোমার সেই এক দিনার।

এতক্ষণে খলিফার মুখে হাসি ফোটে। লোকটাকে যত খারাপ সে ভেবেছিলো আসলে ততটা খারাপ নয়। তা না হলে মাত্র দু'টো মাছের দাম একশো দিনার কেউ দেয়?

বুকের মধ্যে দিনারের থলেটা লুকিয়ে সে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে চলতে থাকে।

বাঁদী-বাজারের পাশ কাটিয়ে বাড়ি পৌঁছতে হয়। খলিফা দেখলো, দুটি লোক একটা লম্বা বাক্স সামনে করে বিচিত্র ভঙ্গীতে হাঁক ডাক করছে, এই যে বণিক সওদাগর সাহেবরা—দেখে যান, কম দামে ভালো সওদা ঘরে নিয়ে যান।

খলিফা থমকে দাঁড়ায়। কম দামে ভালো সওদা। পায়ে পায়ে সে ওদের কাছে আসে। জিজ্ঞেস করে, কী গো, কী আছে তোমাদের বাক্সে?

একজন বলে, বেগম জুবেদা নিলামে পাঠিয়েছেন। যা আছে তা বাক্সেই আছে। আগে থেকে কিছু দেখা যাবে না, বলা যাবে না। যদি ইচ্ছা করেন নিলাম ডাকতে পারেন। হারেমের মাল—বহুত সস্তায় বিকিয়ে যাবে। কে নেবেন আসুন।

অনেকেই ভিড় করে আসে। একজন দর দেয়—কুড়ি দিনার। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে—পঞ্চাশ। অন্য এক ব্যক্তি হাঁকে—একশো দিনার।

লোক দু'টো তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে—এই যে মাত্র একশো দিনারে হারেমের মাল নিলাম হয়ে যাচ্ছে—মাত্র একশো দিনার। আর কেউ আছেন? একশো একশো—

—একশো এক দিনার।

খলিফা দর দেয়। এরপর আর কেউ মুখ খোলে না। সুতরাং একশো এক দিনারেই ডাক শেষ হয়। খলিফা একশো এক দিনার গুণে দিয়ে বাক্সটা কাঁধে তুলে বাড়ির পথে রওনা হয়।

মনে মনে ভাবে স্বয়ং জুবেদার হারেমের সম্পত্তি। নিশ্চয়ই ভালো ভালো সাজ-পোশাক আছে। সুলতানের হারেমে সামান, পুরোনো হলেও অনেক দাম হবে। মনে মনে আকাশ-কুসুম রচনা করতে করতে এক সময় বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছয়।

মাছের বাজারের পিছনে তার বাস। এক বিরাট পড়ো বাড়ি। অসংখ্য ঘর। এক একটা অধিকার করে আছে এক একটি জেলে পরিবার। সরকারী সম্পত্তি। কেউই ভাড়া দিয়ে থাকে না সেখানে। অবশ্য দেবার সঙ্গতিও কারো নাই। সবাই দিন আনে দিন খায়। তবে খলিফার মতো দৈন্যদশা কারো নয়। লোকটা নেশা ভাঙ্গ কিছু করে না, শাদী নিকাও করেনি। সুতরাং বিবি বাল-বাচ্চা বা অন্য কোনও ঘাড়ে বসে খানেওলা লোকও কেউ নাই। তার পরিবার বলতে সে মাত্র একা। তবু তার রোজ দিন খাবার জোটে না। ঘরে একটা দানা বা ফুটো পয়সা সে জমিয়ে রাখতে পারে না কখনও। যেদিন বরাতে জোটে সেদিন সে খায়, অন্যদিন নিরম্বু উপবাস।

দরজার সামনে বিরাট দশাসই একটা বাক্স নামাতেই পড়শীদের অনেকেই এসে ভিড় জমায়।

—কি গো খলিফা, এ জিনিস কোত্থেকে নিয়ে এলে?

খলিফা বলে, কিনে এনেছি।

এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। চোখে মুখে দুর্বোধ্য আতঙ্ক বিস্ময় ফুটে ওঠে। এতো বড় একটা বাহারী বাক্স—ভিতরে কী আছে কে জানে? এই বাক্সটারই তো অনেক দাম হবে? এক দিরহাম যার ঘরে থাকে না, দিন ভিখিরির হাল যার, সে কি করে এ মাল কিনে আনবে? ধীরে ধীরে সকলের চোখে মুখে অবিশ্বাসের প্রশ্ন জেগে ওঠে, তা হ্যাঁ গো খলিফা, কত দামে কিনলে? পয়সা পেলে কোথায়?

—দাম? তা দাম নেহাত মন্দ না—একশো এক দিনার।

—একশো—এ—ক—দি—না—র? বলো কি? এতো টাকা কোথায় পেলে তুমি?

তখন খলিফা গতকালের এবং সে দিনের সমস্ত ঘটনা টিকা-টিপ্পনি সহকারে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করলো তাদের কাছে।

—জানো তোমরা, সেই সানাই-এর পোটা এমন অকৃতজ্ঞ, নরাধম আমাকে বাগে পেয়ে একশোটা চাবুক মারিয়ে একটা মাত্র দিনার ছাড়লো? আবার ওর সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলে কিনা, লোকটা স্বয়ং নাকি খলিফা হারুন অল রসিদ, যতো সব গাঁজা। তবে হ্যাঁ, জাতেহাবশী হলে কী হবে, নিগ্রোটা লোক ভালো। মাত্র দু'টো মাছ সে নিয়েছিলো। তার দাম হিসাবে পুরো একশোটা দিনার আমার হাতে দিলো! আরে, সেই টাকার গরমেই তো মাথাটা বিগড়ে গেলো। তা না হলে বাক্সের ভিতরে কী মাল আছে জানি না শুনি না—অমনি দুম করে পুরো পয়সাটাই বাজী ধরে বসলাম?

পড়শীরা তার এই অসম্ভব গাঁজাখুরী বানানো গপ্পো কেউই বিশ্বাস করে না। তাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়—এ নির্ঘাৎ চুরির মাল। প্রাসাদের হারেম থেকে চুরি করে আনা হয়েছে। দারুণ আতঙ্কে ভয়ে তারা কেঁপে ওঠে। এখুনি সারা মহল্লাটা খানাতল্লাসী করতে আসবে সুলতানের সিপাই সামন্তরা। পাড়া সুদ্ধু সবাইকে বেঁধে নিয়ে যাবে দরবারে। তারপর একের অপরাধে অন্যের ফাঁসী—এ আর নতুন কথা কী?

—ওরে বাবা রে, কী হবে রে, বলে সকলে যে যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

খলিফা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওদের ভীত-চকিত ত্রস্ত পায়ে ছুটে চলার দিকে।

—যাঃ বাবা! এ কী হলো? সব যে কেটে পড়লো? এখন এই পেল্লাই বাক্সটা আমি ঘরে ঢোকাই কী করে?

যাই হোক, অনেক কায়দা কসরত করে অপরিসর দরজার চৌকাঠ গলিয়ে কোনও ক্রমে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসতে পারলো সে।

এতক্ষণে খলিফা বুঝতে পারে, বাক্সটা বিরাট বড়। কারণ তার ছোট্ট ঘরটার আধখানাই সে জুড়ে নিয়েছে। খলিফার মুখে হাসি ফোটে, তা মন্দ হলো না। খাট পালঙ্কের কাজ দেবে। সটান টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে সে বাক্সটার ওপর। দেখে নেয়, আরামসে শোয়া যাবে কিনা। নাঃ, একেবারে মানুষের মাপের প্রমাণ আকারের বাক্স। আনন্দে নেচে ওঠে সে। সত্যি সত্যিই সে শুয়ে পড়ে বাক্সটার ওপর।

শুয়ে শুয়ে ভাবে, না জানি ভিতরে কী আছে। নবাব বাদশাহের খেয়াল খুশির কারবার। হয়তো এমন কোনও চিজ রয়ে গেছে, যা দিয়ে তার মতো একজন গরীব জেলের সারা জিন্দগীই মহা সুখে কেটে যেতে পারে।

এই সব ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম ভাঙ্গলো, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। সারা ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ তার কানে আসে একটা কঁকানীর আওয়াজ। চমকে ওঠে খলিফা। কী রে বাবা, ভূত প্রেত নাকি! ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। হাতড়াতে হাড়তাতে চিরাগটা খুঁজে পায়। জ্বালায়।

নাঃ, ঘরে তো কেউ নাই। কিন্তু আবার সেই অদ্ভুত আওয়াজ। এবার সে বুঝতে পারে শব্দটা ঐ বাক্সের ভিতর থেকেই আসছে। ডালাটা খুলতে যায়। কিন্তু তালা দিয়ে বন্ধ করা।

একটুক্ষণ কী যেন ভাবে সে। তারপর একখানা ডাণ্ডা এনে ডালাটার ভিতর ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই মট করে খুলে যায়।

ডালাখানা তুলতেই চমকে ওঠে সে। এ কী? কী যেন নড়াচড়া করছে? মূল্যবান সাজ-পোশাক পরা পরমাসুন্দরী একটি নারী-মূর্তি। খলিফা ভয়ে শিউরে উঠে। এ নির্ঘাৎ কোন হুর-পরী বা জিন!

ছুটে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে, কই গো, কে আছ, তোমরা বেরিয়ে এসো, আমার ঘরে জিন ঢুকেছে।

তার চেঁচামেচিতে পড়শীদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। বিরক্ত হয়ে কেউ কেউ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, কী, এতো রাতে আরম্ভ করেছ কী? একটু ঘুমাতে দেবে না?

আল্লাহ কসম, তোমরা একবারটি আমার ঘরে এসে দ্যাখো, জিন এসেছে।

এবার তারা ক্রোধে ফেটে পড়ে, গাঁজা-ভাঙ্গ চড়িয়েছ বুঝি? যাও, ঘরে যাও। যতো সব ঝুট ঝামেলা—

খলিফা হতাশ হয়ে ফিরে আসে। ততক্ষণে বাক্সের মধ্যে উঠে বসেছে মেরিজান। খলিফাকে দেখে সে আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এ আমি কোথায়?

খলিফা অবাক চোখে দেখতে থাকে, একেবারে ডানা-কাটা পরী। এমন রূপ সে জীবনে কখনও দেখেনি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, কে তুমি, মালকিন?

এই সময়ে ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বাহাত্তরতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

তখনও মেরিজানের নেশার ঘোর সবটা কাটেনি। জোর করে চোখের পাতা খোলার চেষ্টা করে বলে, আমার যুঁই চামেলীরা কোথায়?

এরা দু'জন মেরিজানের নিত্য সহচরী দাসী।

খলিফা বিস্মিত হয়ে তাকায়, এখানে যুঁই চামেলী কোথায় পাবো? অনেক দিন আগে কয়েকটা হেনা এনেছিলাম। তা এতোদিনে শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছে বোধ হয়।

খলিফার এতস্বিধ বাক্য কানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সব ঘোর কেটে যায় মেরিজানের। বড় বড় চোখ মেলে সে তাকায়। খলিফার আবির্ভাব সে আন্দাজ করতে পারে না। ঘরের দৈন্যদশা অবলোকন করে বেশ বুঝতে পারে, এ তার সেই প্রাসাদ-হারেম কক্ষ নয়। যে ভাবেই হোক, অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে এসে পড়েছে সে।

—আমি কোথায়? তুমি কে?

খলিফার কানে যেন মধু ঢেলে দিলো কেউ। কী মিষ্টি গলার আওয়াজ। একেবারে গানের মতো। সুলতানের উদ্যানে একটা ঝরনা আছে। খলিফা একদিন ঐ ঝরনার পানি খেতে গিয়েছিলো। এখনও সে ঐ কলকল শব্দ শুনতে পায় মাঝে মাঝে। ভারি মিঠে লেগেছিলো সেই ঝরনার আওয়াজ। আজ, অনেকদিন পরে, আবার সেই ঝরনার গান শুনতে পেলো সে এই রূপসীর কণ্ঠে। সামান্য দুটি কথা—'আমি কোথায়, কে তুমি।' কিন্তু এই সামান্য প্রশ্নই অসামান্য সঙ্গীত হয়ে ভেসে আসে তার কানে। বড় মধুর মনে হয়। ভালো লাগে।

—আমি এক অতি সাধারণ জেলে—নাম খলিফা। এই আমার দৌলতখানা। এখানেই আমি অবস্থান করি। আর ঐশ্বর্য বলতে আমার যা যা আছে তা তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ সব। এ ছাড়া অন্য কোনও কিছু বৈভব আমার নাই। সংসারে আমি একা। আমার খানাপিনায় ভাগ বসাবার দ্বিতীয় ছিলো না কেউ—আজ তুমি এলে।

—তা হলে আমি আর প্রাসাদে নাই?

—বিলকুল না। তুমি এখন আমার 'প্রাসাদে' এসে গেছ। এবং একান্ত ভাবেই আমার, তবে—

—অর্থাৎ—

—অর্থাৎ তোমাকে আমি বাঁদী-বাজার থেকে নিলামে কিনে এনেছি, আমার শেষ

সম্বল নগদ একশো এক দিনারে। এখন তুমিই আমার একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তবে সত্যি কথা বলছি শোনো। কেনার সময়, বাক্সের ডালা খোলার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না, ভিতরে তুমি আছ! নিলামের শর্ত ছিলো—'যো হ্যায়—সো হ্যায়' তাই—সওদা দেখার প্রশ্ন ওঠে না।

মেরিজান হাসে, সে হাসিতে মুক্তো ঝরে। কাজল-কালো টানা টানা আয়ত চোখ মেলে তাকায়, তুমি আমাকে না দেখেই কিনে নিয়ে এলে?

—তুমি যে আছো, তা তো জানতাম না। আসলে আদৌ কিছু আছে কি না—তাও ভাবিনি তখন। শুধু মনে করেছিলাম, বেগম জুবেদার হারেমের মাল যখন, তখন খুঁজে পেতে দেখলে, এবং বরাতে থাকলে হয়তো মণি-মুক্তো কিছু মিললেও মিলতে পারে।

এবার মেরিজান সব কিছু ইয়াদ করতে পারে। সব স্বচ্ছ মনে পড়ে ওর। জুবেদার মহলে সে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলো। সেই গান, সেই নাচ, সেই খানা খেতে বসা—

ব্যস্! তারপর তো আর কিছু মনে করতে পারে না সে। কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না, বয়সের ভারে প্রায় বিগত-যৌবনা, এক কালের পরমাসুন্দরী, বেগম জুবেদা তার রূপগুণের ঈর্ষায় কাতর হয়ে খাবারে ঘুমের দাওয়াই মিশিয়ে দিয়ে এইভাবে পার করে দিয়েছে তাকে।

খলিফার কথায় সব পর্দা সরে গেলো মন থেকে। মুচকি হেসে সে জানতে চাইলো, তা পেলে কিছু তেমন মণিরত্ন?

খলিফা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কাব্য করে বলে ফেলে, হয়তো তারও বেশি পেয়েছি—

এই ভাবে টুকিটাকি কথাবার্তা, হাল্কা কিছু রসিকতার মধ্য দিয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে দেয় ওরা।

ভোরে মেরিজান বলে, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে, খলিফা। তোমার ঘরে তো কিছু নাই। কি করা যায়, বলো তো?

—তুমি কিচ্ছু ভেবো না, একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি।

বাইরে এসে হাঁক পাড়তে থাকে, এই যে শুনছো, জিনের খিদে পেয়েছে, একটু খাবার কিছু দেবে, ভাই?

একটা জানলা খুলে যায়। আধখানা আধপোড়া রুটি, আর একটা শশা ছুঁড়ে দিয়ে আবার জানলাটা দড়াম আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে যায়।

রুটির টুকরো আর শশাটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে সে। বলে, এই নাও খাও।

মেরিজান বলে, কিন্তু শুকনো রুটি গলায় আটকে যাবে যে। একটু পানি নিয়ে এসো।

খালি কুঁজোটা তুলে নিয়ে আবার সে বাইরে চলে যায়। এবং একই ভাবে ডেকে হেঁকে লোক জাগিয়ে একজনের কাছ থেকে নিয়ে আসে খানিকটা পানীয় জল।

মেরিজান খুব পরিতৃপ্তি সহকারে সেই পোড়া রুটি আর শশাটা উদরস্থ করলো।

—আর কিছু চাই, মালকিন?

খলিফা ওকে তুষ্ট করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কিন্তু মেরিজান বলে, বহুৎ সুক্রিয়া। আমার জন্য অনেক তকলিফ্ তোমাকে পোয়াতে হলো। এখন আর কিছু চাই না।

খলিফা বললো, তা হলে, মালকিন এবার আপনার কাহিনীটা একটু শোনান। কেন এবং কীভাবে আপনি এই বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে বাঁদী-বাজারে বিক্রী হতে এলেন?

মেরিজান মধুর করে হাসতে জানে। সে হাসির বানে অনেক পাখি বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়তে পারে। খলিফাও কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—জুবেদা, মেরিজান বলতে থাকে, সুলতানের চাচার মেয়ে, পেয়ারের বেগম, বিকেল-বয়েসী জুবেদাই আমার এই দশা বানিয়েছে। হিংসায় সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলো। নেহাত বরাত জোর আমার, বুকে ছুরিফুরি বসিয়ে একেবারে খতম করে দেয়নি!

আমার মনে হয়, সে-ই আমাকে বাক্সে ভরে বাজারে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলো। এবার এর আসল কারণ শোনো। সুলতান যে-কোন কারণেই হোক, আমাকে ভীষণ পেয়ার করেন। একদণ্ড চোখের আড়াল করতে চান না—এই ছিলো তার আক্রোশ। তবে খোদা মেহেরবান, তাঁর ইচ্ছাতেই আজ তোমার কাছে এসেছি আমি। তুমি আমার সঙ্গে আচার ব্যবহারও খুব ভালো করছো। এসব কথা ধর্মাবতার অবশ্যই জানবেন। এবং তার যোগ্য পুরস্কার তুমি পাবে।

খলিফা বললো, কিন্তু এই কী সেই হারুন অল রসিদ যাকে আমি মাছ-ধরা শিখিয়েছিলাম? প্রাসাদের ভিতরে সে একটা ইয়া বিরাট বড় পিজঁরা পোলের মতো কুর্শিতে বসে থাকে?

মেরিজান বলে, ঠিক। ঠিক বলেছ।

খলিফা বলে, তা—যাই বলো না কেন, লোকটা মোটেই সুবিধের না। সানাই-এর পোঁ ধরে ধরে গাল দু'খানা টোপাকুলের মতো ফুলিয়ে ফেলেছে। একেবারে ডাহা মিথ্যুক, ঠগবাজ পাজি শয়তান। এতো বড় বদমাইশ, আমার পরণের কাপড় চুরি করলো, তারপর একশোটা চাবুক মেরে একটা দিনার ধরিয়ে দিলো হাতে! এরপর একদিন যদি পথে-ঘাটে পাই বাছাধনকে—

মেরিজান ঠোঁটে তর্জনী রেখে চোখের ইশারায় চুপ করতে বলে, ওসব কথা থাক, জানতো দেওয়ালেরও কান আছে। অন্যে কী খারাপ আচরণ করলো, না ভালো ব্যবহার করলো, সে সব নিয়ে দুঃখ করতে নাই। নিজে ভালো হও। লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, দিল্‌টাকে সাফা রাখো। তোমার আচার ব্যবহারেই তোমার পরিচয়। শিক্ষা-দীক্ষা সবই পণ্ড হয়ে যায়, যদি না তুমি নম্র বিনয়ী এবং মধুরভাষী হতে পার। সমাজের ওপর তলায় আসন পেতে গেলে আগে তোমাকে কথা বলতে শিখতে হবে। তা না হলে তোমার কোন জ্ঞান বা বিদ্যাবুদ্ধি কোনও কাজে আসবে না।

ভোর হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তিয়াত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে আরম্ভ করে ঃ

মেরিজানের কথাগুলো খলিফার মরগে গিয়ে বিঁধে। এতোকাল পরে তার চোখের সামনে থেকে অজ্ঞতার এক কালো পর্দা সরে যায়। অভ্যাস-লব্ধ কটু-ভাষা, এবং সহজলভ্য নিষ্ঠুর আচার আচরণ পরিহার করে সদা মধুরভাষী হওয়ার এবং সহজাত সুকুমার বৃত্তিগুলো জাগ্রত করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।

খলিফাকে আদর্শ মানুষ হতে গেলে কী কী আচার আচরণ প্রদর্শন করতে হবে এবং কী কী বিধি নিয়ম মেনে চলতে হবে তার বিস্তারিত উপদেশবাণী শোনায় মেরিজান।

খলিফা বলে, এতোদিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলাম। আজ তুমি আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে দিলে। কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো, জানি না। তোমার প্রতিটি উপদেশ আমি যথাসাধ্য মেনে চলবো। এখন বলো, কী আমাকে করতে হবে।

মেরিজান বলে, কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু একটুকরো কাগজ আর দোয়াত কলম নিয়ে এসো।

খলিফা প্রতিবেশিদের একজনের কাছ থেকে কাগজ ও কলম এনে দেয় মেরিজানকে।

মেরিজান ছোট্ট একখানা চিঠি লিখলো জহুরী ইবন কিরনাসের নামে। অতি সংক্ষেপে জানালো তার ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী। পরিশেষে লিখলো, এখন সে এই জেলে খলিফার ঘরে আছে। বাঁদী-বাজার থেকে একশো এক দিনার দিয়ে তাকে কিনে এনেছে সে।

চিঠিখানা ভাঁজ করে খলিফার হাতে দিয়ে সে বললো, সোজা চলে যাও স্যাকরা পট্টিতে—জহুরী ইবন কিরনাসের দোকানে। চিঠিখানা তার হাতে দেবে। সে যা বলে শুনবে। কিন্তু একটা কথা, আচার ব্যবহার কথায় বার্তায় কোনও রকম অসভ্যতা যেন প্রকাশ না পায়।

খলিফা বললো, আপনার উপদেশ আমার মনে আছে, মালকিন।

দ্রুত পায়ে চলে যায় সে স্যাকরা পট্টিতে কিরনাসের দোকানে। মাথা নুইয়ে তাকে আদাব জানিয়ে চিঠিটা তার হাতে তুলে দেয়। কিরনাস মাতা নত করে না। ঠোঁট নেড়ে আদাব জানায়। ভাঁজ করা চিঠিখানা না খুলে আলতোভাবে দু'আঙ্গুল ধরে একপাশে রেখে দেয়। ভাবে, কারো কাছ থেকে কোনও প্রশংসাপত্র লিখিয়ে এনেছে। এও এক জাতের ভিখিরিদের ভিক্ষে আদায় করার ফিকির। কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করে বলে, একটা আধলা দিরহাম দিয়ে দে একে।

খলিফা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে আরও বিনয় বিগলিত হয়ে বলে, কিছু গোস্তাকি নেবেন না জনাব, আপনার কাছে কোনও দান ভিক্ষের জন্যে আসিনি আমি। মেহেরবানী করে ঐ চিঠিখানা যদি একবার পড়েন, আমি ধন্য হবো। তারপর আপনি যা বলবেন এ বান্দা তাই করতে প্রস্তুত আছে, মালিক।

কিরনাস একটু অবাক হয়। চিঠিখানা খুলে পড়তে শুরু করে। এবং একটু পরেই আনন্দে নেচে ওঠে ওর চোখ। চিঠিখানা বার বার ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুমু খেতে থাকে সে। খলিফাকে আদর করে পাশে বসায়, কোথায় থাকো, তুমি ভাই, বাসা কোথায়?

খলিফা মৃদুকণ্ঠে তার বাসগৃহের ঠিকানা জানায়। কিরনাসের আনন্দ আর ধরে না। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে থাকে। দোকানের দু'জন কর্মচারীকে বলে, একে এক্ষুনি মোসেসের কাছে নিয়ে যাও। বলো, আমি বলছি, তহবিল থেকে যেন এক হাজার দিনার এর হাতে দেয় সে। তারপর আবার আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসো এই মেহেমানকে।

একটুক্ষণ পরে নগদ এক হাজার দিনার সঙ্গে করে আবার সে ফিরে এলো কিরনাসের দোকানে। কিন্তু এ কী এলাহি কাণ্ড! দুটি সুসজ্জিত খচ্চর—সোনার জিন লাগাম লাগানো। তার একটায় চেপে বসেছে জহুরী কিরনাস। আর একটা সওয়ারের অপেক্ষা করছে। এ পাশে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ ভাবে শ'খানেক নফর চাকর দাসদাসী। খলিফা ফিরে আসতেই খুব ঘরোয়া সুরে আদর করে কিরনাস বলে, চটপট, জলদি চেপে বসতো, দোস্ত।

খলিফা বলে, কিন্তু আমি তো কখনও খচ্চরে চাপিনি জনাব। ও আমি পারবো না। আমি বরং হেঁটেই যাচ্ছি।

—আরে না, না, সে হয় নাকি? এতোকাল চাপোনি তো কী হয়েছে? আজ চাপবে। আচ্ছা দাঁড়াও। কী করে চাপতে হবে, আমি তোমাকে তালিম দিয়ে দিচ্ছি।

কিরনাস নেমে এসে খলিফাকে দু'হাতে তুলে খচ্চরটার পিঠে বসিয়ে দেয়।

কিন্তু অনভ্যাসের কপাল চচ্চড় করে, খচ্চরটা বেগড় বাই করতেই লাগাম ছেড়ে দিয়ে সে লেজে মোচড় দেয়। আর যাবে কোথায়, এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে, টাল সামলাতে পারে না খলিফা। এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হতে পারে, তাই ঘটলো। খলিফা ছিটকে পড়ে গেলো রাস্তায়। খচ্চরটা ছুটেই চললো।

কিন্তু এই সঙ্গেই সব দুর্ভাগ্যের ইতি হয়ে গেলো খলিফার জীবনে। এর পরের অধ্যায়গুলো খুবই সুন্দর, সুখকর এবং আনন্দদায়ক।

এই সময়ে ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চুয়াত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

কিরনাস তার নফরদের বলে, সাহেবকে উঠিয়ে হামামে নিয়ে যাও। খুব ভালো করে ঘষেমেজে গোসল করাবে। তারপর আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে। আমি সেখানে অপেক্ষা করছি।

চাকররা খলিফাকে নিয়ে শহরের এক সম্ভ্রান্ত হামামে গেলো। আর কিরনাস চললো খলিফার বাসায়—মেরিজানকে নিয়ে আসতে।

চাকর দু'টো হামামের ইজারাদারকে বুঝিয়ে বললো, একেবারে শাহজাদার মতো বানিয়ে দিতে হবে। আপনি সাহেবকে গোসল করান, আমরা ওঁর জন্য সাজপোশাক সওদা করে নিয়ে আসি ততক্ষণ।

গোসলাদি শেষ করে হামাম থেকে বেরিয়ে যখন রাস্তায় নামলো খলিফা, তখন কে বলবে সে শাহজাদা নয়। ওকে দেখার জন্য পথচারীরা দাঁড়িয়ে পড়তে থাকলো। এমন বাহারী বাদশাহী সাজ-পোশাকে সেজেছে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে কিরনাসের ইমারতে এসে পৌঁছয় ওরা। মেরিজানকে নিয়ে কিরনাস অবশ্য তার আগেই এসে গিয়েছিলো সেখানে।

বিরাট একটা প্রশস্ত কামরা। তার মাঝখানে একটা 'দিবানে' বসেছিলো মেরিজান। ওর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো শতাধিক দাসী বাঁদীরা।

খলিফা প্রবেশ করতেই সকলে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো। অতি সহজেই খলিফাও প্রত্যাভিবাদন জানায়। একেবারে বাদশাহী কেতায়।

খলিফার অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। সোজা সে মেরিজানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মৃদু হেসে আভূমি আনত হয়ে অভিবাদন জানায় তাকে। মেরিজান উঠে দাঁড়িয়ে হাতে ধরে তাকে নিজের পাশে বসায়। শরবতের দুটি পেয়ালা তুলে নিয়ে খলিফার হাতে দেয় একটা, এবং নিজে একটা নেয়। দু'জনে খুব ধীরে ধীরে পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকে।

খলিফা বিনম্র কণ্ঠে বলে, এই গৃহের আতিথেয়তা আমার বহুকাল স্মরণে থাকবে।

মেরিজান বলে, তোমার এই সংযত আচরণও এ বাড়ির কেউ ভুলতে পারবে না, খলিফা। এবার তোমাকে সুলতানের সামনে দাঁড়াতে হবে। তার আগে আমি তোমাকে দু-একটা উপদেশ দিতে চাই। যখন তুমি সুলতানের দর্শন প্রার্থনা করবে এবং তা মঞ্জুর হবে, তখন দরবারে প্রবেশ করে যথাবিহিত কুর্নিশাদি জানিয়ে তাকে সবিনয়ে বলবে, 'ধর্মাবতার, আপনার কী স্মরণে আছে, এই বান্দা একদিন আপনাকে জাল ফেলার কৌশল শিখিয়েছিলো? ' তিনি তৎক্ষণাৎ তা স্বীকার করবেন। তখন তুমি বলবে, আপনি কী আজ রাতে এই অধমের পর্ণকুটীরে একবার মহামান্য মেহমান রূপে পায়ের ধুলো দিতে পারেন না?' ব্যস্ আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। দেখবে, তিনি অবশ্য আসবেন তোমার ঘরে।

খলিফা প্রায় শতাধিক নফর-চাকর পরিবেষ্টিত হয়ে তখুনি সুলতানের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়। খোজা সর্দার সাঁদাল তাকে চিনতে পেরে এগিয়ে আসে, কী ব্যাপার?

—সাঁদালজী, সুলতানের সঙ্গে মোলাকাত করতে চাই। এই তার ভেট সহস্র মুদ্রা। তাকে গিয়ে মেহেরবানী করে বলো, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

সাঁদাল কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে সে খলিফার জমকালো বাদশাহী

সাজপোশাকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে কিছুক্ষণ। তারপর দরবারে ঢুকে সুলতানকে বলতে থাকে, ধর্মাবতার, ব্যাপার কী হয়েছে, আমি বলতে পারবো না। তবে দেখে মনে হলো, সেই জেলে খলিফা হয়তো বা হালে সুলতান হয়েছে। তার সাজপোশাক এবং সঙ্গের নফর-চাকর পেয়াদা পাহারা দেখে অন্ততঃ তাই মনে হয়। আর এই নিন আপনাকে তিনি সহস্র দিনার ভেট পাঠিয়েছেন।

সুলতান গম্ভীর ভাবে বললেন, নিয়ে এসো তাকে।

খলিফা দরবারে ঢুকেই আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো।

—খোদা আপনার মঙ্গল করুন, জাঁহাপনা। আপনি ত্রিভুবনের পিতা ইসলামীদের রক্ষক। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন। আপনার সলতানিয়ৎ-এর প্রজারা সসম্মানে বসবাস করতে থাকুন। দুনিয়ার মহামতিদের নামের ওপরে আপনার নাম উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাক চিরকাল।

সুলতান সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন খলিফার এই আশ্চর্য পরিবর্তন।

—একটা কথার জবাব দেবে খলিফা, এই চমৎকার পোশাকটা তুমি পেলে কোথায়?

—আমার প্রাসাদেই ছিলো, জাঁহাপনা।

—আচ্ছা—তা হলে এখন তুমি প্রাসাদের মালিক?

—হ্যাঁ হুজুর। এখনও পর্ণকুটীরই বলতে পারেন। তবে আজ রাতে যদি মেহেরবানী করে আপনি পায়ের ধুলো দেন, তবে তা প্রাসাদই হয়ে যেতে পারে। আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ জানাতেই এসেছি, জাঁহাপনা। আজ আপনি আমার মহামান্য মেহমান হবেন, এই আশা করবো!

—মেহমান? তোমার?

হারুন অল রসিদ মৃদু হাসলেন, তুমি কি শুধু একা আমাকেই চাইছো? না—আমার সঙ্গে যারা যেতে চায় তারাও যাবে?

খলিফা বলে, সকলকেই আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, জাঁহাপনা। আপনার প্রাসাদ এবং দরবারের সকলেই যদি যান, আমি আরও খুশি হবো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পঁচাত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

হারুন জাফরকে ইশারা করতে সে খলিফার সামনে এগিয়ে এসে বললো, আজ রাতে আমরা তোমার অতিথি হলাম—ধর্মাবতারের এই অভিপ্রায়।

এরপর আবার যথাবিহিত কুর্নিশাদি সেরে খলিফা জাফরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে গেলো। সুলতান অনেকক্ষণ ধরেই ব্যাপারটা অনুধাবন করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কিছুই ঠাওর করতে পারলেন না। পরিশেষে জাফরকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা জাফর, বলতে পার, এই খলিফা জেলেটা গতকাল কী রকম সব হাঁদা বোকার মতো কাণ্ডকারখানা দেখিয়ে আমাদের হাসিয়ে মাতিয়ে গেলো, সেই লোকটাই একটা রাতে এতো আমূল বদলে গেলো কী করে? তুমি দেখলে তো ওর আদব-কায়দা কেতা। কেমন মোলায়েম মার্জিত ভাষা! হঠাৎ রাতারাতি এ-সব সে রপ্ত করলো কী করে! মানব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানা আছে, তাতে তো এতো তাড়াতাড়ি এসব গুণের অধিকারী হওয়া যায় না। এরজন্য আজন্মের না হলেও বহুকালের শিক্ষাদীক্ষা অভ্যাস দরকার হয়। তাছাড়া এতো অর্থই বা সে পেলো কোথায়? বড় তাজ্জব কাণ্ড!

জাফর বলে, সবই তাঁর ইচ্ছা। কখন যে তিনি কাকে কী ভাবে চালান—তাঁর মহিমা বোঝা বড় ভার!

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে জাফর, মাসরুর এবং প্রাসাদের আরও দু'জন প্রিয়-পাত্রকে সঙ্গে নিয়ে খচ্চরে চেপে বসলেন সুলতান। জেলে-খলিফার বাড়ির ঠিকানা ধরে যেতে যেতে বিশাল এক প্রাসাদোপম ইমারতের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা। ফটক থেকে প্রাসাদের দরজা অবধি বেশ কিছুটা পথ গালিচা ঢাকা। ঘরের সারা মেঝেটা নানা কারুকাজ করা অতি মূল্যবান পারস্য-গালিচায় মোড়া। দরজা জানলায় বাহারী অথচ নয়নাভিরাম পর্দা খাটানো।

সুলতান দেখলেন, দরজার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে খলিফা জেলে।

—আসতে আজ্ঞা হোক, জাঁহাপনা।

ঘরের ভিতরটায় প্রবেশ করে চোখ জুড়িয়ে যায়। লোক দেখানো জাঁকজমকের চেয়ে সারা ঘরময় ছড়িয়েছিলো এক রুচিরা হাতের যাদুস্পর্শ, খুব যে একটা অসম্ভব দামী দুষ্প্রাপ্য আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো গোছানো তা নয়। পরন্তু বলা যায়, অতি নগণ্য একটা সাধারণ খেলনাও জায়গা মতো রাখার গুণে ঘরের আদলই গেছে বদলে।

মোট কথা মনোহর নয়—মনোরম পরিবেশ। মার্জিত রুচি সর্বত্র। সব মিলে এক ছন্দবদ্ধ কাব্যের রূপ ধারণ করে আছে ঘরখানা।

ঠিক মাঝখানে সোনা দিয়ে মোড়া হাতীর দাঁতের চৌকো একখানা তখত্। সুলতানকে সসম্মানে সেই মসনদে বসালো খলিফা জেলে। জাফর বসলো ওর এক পাশে। মাসরুর এবং অন্য দু'জন দাঁড়িয়ে রইলো অদূরে।

নফর চাকররা খানাপিনা এনে থরে থরে সাজিয়ে দিলো। মুরগী, হাঁস, ভেড়া এবং নানারকম পাখীর মাংসের হরেক রকম পদ। সুগন্ধে আমোদিত হয়ে উঠলো সারা ঘর। সুসজ্জিতা বাঁদীরা শরাবের পাত্র পূর্ণ করে দিতে থাকলো।

সুলতান বিস্ময়ে হতবাক। তিনি তখনও ভাবতে পারছিলেন না, এ কী সত্য? জাফরকে জিজ্ঞেস করলেন, জাফর, আমার আল্লার কসম খেয়ে বলছি, এতো সুন্দর ব্যবস্থা আগে কখনও দেখিনি। এতোটুকু উৎকট বাড়াবাড়ি নাই, সব যেন নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন—মন-প্রাণ ভরে গেছে আমার। আমি যা কল্পনা করেছিলাম, এ দেখছি তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুন্দর।

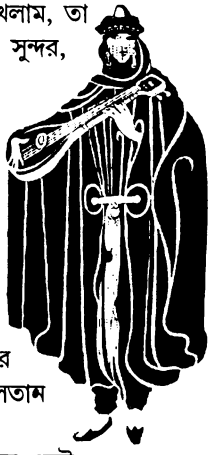

জাফর বলে, ধর্মাবতার, কে বলতে পারে এখন পর্যন্ত যা দেখলাম, তা আসলে কিছুই দেখা নয়। এরপরে যা দেখাবে, তা হয়তো আরও সুন্দর, আরও চমৎকার—

এই সময় জেলে খলিফা এসে কুর্ণিশ জানিয়ে বললে, মহামান্য ধর্মাবতার যদি আজ্ঞা করেন, তবে তার এক বাঁদীকে এখানে গান গাইবার জন্য হাজির করতে পারি। তামাম বাগদাদের সেরা গাইয়ে সে—

—আর্জি মঞ্জুর।

সুলতান সম্মতি জানালেন। মেরিজান বোরখায় সারা অঙ্গ জড়িয়ে সামনের মঞ্চে এসে বসলো। খলিফা হারুন অল রসিদ তেমন নজর করলেন না—করলেও অবশ্য ধরতে পারতেন না। কিন্তু গানের সুললিত কণ্ঠ যখন সারা ঘরে অনুরণন তুলতে থাকলো তখন সুলতান ছটফট করে উঠলেন।

—এ কি? এ কার কণ্ঠ? না না না, সে কী করে হয়? তবে কী হুবহু একই কণ্ঠ দু'জনের হতে পারে?

সুলতানের সারা মুখ বিবর্ণ পাংশু বর্ণ হয়ে যায়। কপালে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। তারপর—তারপর আর কিছুই তিনি মনে করতে পারেন না। ঢলে পড়ে যান।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছিয়াত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

হঠাৎ সুলতান মূর্ছিত হয়ে পড়ায় ঘর সুদ্ধু সকলে তাকে ঘিরে ধরে। সকলের মুখে চোখে দারুণ আতঙ্ক ভয়। কিন্তু মেরিজান নির্বিকার। সে জানে, এর আসল কারণ কী? খলিফাকে বলে, সবাইকে বাইরে যেতে বলো তো। কোন ভয় নাই। সব ঠিক হয়ে যাবে এখুনি।

সকলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। শুধু রইলো মেরিজান, জেলে খলিফা আর অচৈতন্য সুলতান। ক্ষিপ্র হাতে বোরখা এবং ইজার টেনে খুলে দেয় মেরিজান। শুধু পরনে থাকে এক নয়ন-সুখকর সাজ-পোশাক। এই পোশাকটা সুলতানের বড় প্রিয় ছিলো। প্রাসাদে সে বেশির ভাগ সময়ই পরে থাকতো।

অল রসিদের গা-ঘেঁষে বসে পড়ে সে। চোখে মুখে গোলাপ জলের ঝাপটা দেয়। এবং হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকে।

একটু পরে চোখ মেলে তাকালেন খলিফা। সামনে মেরিজানকে দেখামাত্র আবার মূর্ছা গেলেন। মেরিজান এবার অল রসিদকে জড়িয়ে ধরে আদর সোহাগ চুম্বন করতে করতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

সুলতানের আচ্ছন্ন ভাব'তখনও কাটে না। তিনি কঁকিয়ে ওঠেন, তবে কী এই শেষ বিচারের দিন? মৃতেরা কী সবাই উঠে এসেছে আজ? না আমি খোয়াব দেখছি?

মেরিজান আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে, না না না, ও কথা আপনি কী বলছেন জাঁহাপনা! এই তো আমি বেঁচে আছি, রক্ত-মাংসের দেহ নিয়েই বেঁচে আছি, ধর্মাবতার। শেষ বিচারের দিনও না, খোয়াবও না। আমি আপনার পেয়ারের মেরিজান—তাকিয়ে দেখুন, হুজুর, আমি সশরীরে বেঁচে আছি। আমাকে কেউ কবর দেয়নি, মরিনি আমি। আমি মারা গেছি—আমাকে কবর দেওয়া হয়েছে সবই মিথ্যা। আপনাকে ওরা ধোঁকা দিয়েছিলো, ধর্মাবতার। আজ আমি জানে বেঁচে আবার আপনাকে ফিরে পেয়েছি, তার জন্য একমাত্র দায়ী এই খলিফা, আর কেউ নয়।

অল রসিদ হাসলেন, কাঁদলেন, চোখের জল মুছলেন এবং সব শেষে আবার হাসতে থাকলেন। তারপর সব কথা ফুরিয়ে গেলে গভীর আশ্লেষে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মেরিজানকে। চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করে দিলেন অধর কপোল রুক্ষ।

এইভাবে অনেক অনেকক্ষণ একে অন্যের মধ্যে হারিয়ে রইলো। এক সময় জেলে খলিফা উঠে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারী দিয়ে বলে ধর্মাবতার, রাত অনেক গভীর হয়ে আসছে। এবার বোধহয় আর এভাবে এখানে পড়ে থাকা সঙ্গত হবে না।

সুলতান সহাস্যে মুখ তুলে বললেন, তোমরা অধৈর্য হয়ে পড়লে নাকি। ঠিক আছে, ওদের ডাকো। শোনো খলিফা, আমার জন্য যা তুমি করেছ, সে ঋণ শোধ করা যায় না। আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, তুমি আমার একটা অঞ্চলের সুবাদার হয়ে চিরকাল আমার পাশে পাশে বন্ধুর মতো শুভানুধ্যায়ী হয়ে থাক—এই আমার ইচ্ছা।

—বান্দা কী কখনও মনিবের আজ্ঞা অমান্য করতে পারে, ধর্মাবতার! আমি রাজি।

—শুধু তুমি আমার সুবাদারই হবে না খলিফা, তুমি হবে আমার প্রাণাধিকা মেরিজানের মালঞ্চের নতুন মালাকর। আমি তোমার হাতেই সঁপে দিতে চাই একে। আমি

বিশ্বাস করি, তোমরা দু'জনেই সুখী হবে। চিন্তার কোন কারণ নাই, মেরিজানের ভরণ-পোষণের জন্য মাসে দশহাজার দিনার বরাদ্দ করে দেব আমি। এ ছাড়া তার সাজ-পোশাক, অলঙ্কার বাসস্থান দাস দাসী এবং নানা বিলাসের সামগ্রী যৌতুক দেব তাকে। প্রতিদিনই তোমাদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হবে। এবং প্রাসাদের উৎসব অনুষ্ঠানে সাদরে ডেকে নিয়ে যাবো। এক সঙ্গে খানাপিনা গান-বাজনা আমোদ আহ্লাদ করবো।

খলিফা আভূমি আনত হয়ে সুলতানকে কুর্নিশ জানায়।

এরপর বহুকাল সে মেরিজানকে জীবন-সঙ্গিনী করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করেছিলো।

শাহরাজাদ ক্ষণকালের জন্য থামে। এ গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু, জাঁহাপনা, তাই বলে ভাববেন না, এর চেয়ে ভালো গল্প আপনাকে শোনাতে পারবো না।

শাহরিয়ার বলে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র আমার সংশয় নাই, শাহরাজাদ। এর পর তুমি কী কিস্‌সা বলতে চাও? নাম বল। নিশ্চয়ই সেটা এই জেলে খলিফার কাহিনীর চেয়েও মজাদার হবে।

শাহরাজাদ বলে, আমার পরের গল্পের নাম.....

শাহরাজাদ বলে ঃ আমার গল্পের নাম বসরাহর হাসানের দুঃসাহসিক অভিযান।

অনেককাল আগে পারস্য ও খুরাসনের বাদশাহ ছিলেন কিনদামির। সমগ্র ভারত চীন ও সিন্ধের সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ছিলেন তিনি। তাঁর মতো দুঃসাহসিক, যোদ্ধা, দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার, এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসি-যোদ্ধা আর কেউ ছিলো না। ভ্রমণ, শিকার এবং লড়াই-এ তার আসক্তি ছিলো অপরিসীম। এছাড়া আলোচনা, বিতর্ক এবং রঙ্গ রসিকতাতেও সবিশেষ পটু ছিলেন তিনি।

উৎসব অনুষ্ঠানে কবি দার্শনিক এবং কথকদের আমন্ত্রণ জানাতেন। তাদের কাব্য কাহিনী এবং সারগর্ভ আলোচনা শুনতেন। যদি কখনও কোনও বিদেশী মুসাফির তার আশ্রয়ে আসতো, প্রভূত সমাদরে তাকে আপ্যায়ন করতেন। তাঁর জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতেন। এবং প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর সভার বেতনভুক কবি এবং কথকদের তিনি উজিরের সমান মর্যাদায় আসন দিতেন। এই কারণে তাঁর প্রাসাদ দেশের সেরা বিদ্বজ্জনদের সমাবেশে এক মহাতীর্থ হয়ে উঠেছিলো। বহু লুপ্ত প্রায় গল্পগাথা কাব্য-দর্শন তার প্রচেষ্টায় আবার নতুন করে বেঁচে উঠতে পেরেছিলো।

আপনি শুনে হয়তো অবাক হবেন জাঁহাপনা, তাঁর স্মৃতিশক্তি এতোই প্রখর ছিলো যে, একবার তিনি যে গল্প-গাথা শুনতেন তা আর কোনও দিনই বিস্মৃত হতেন না। এই রকম শোনা বহু ভারতীয় আরবী এবং পারসী উপকথার প্রতিটি ছত্র তিনি নির্ভুলভাবে পরিবেশন করতে পারতেন। বহু কবির কাব্য অনর্গল মুখস্থ আবৃত্তি করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না তাঁর।

এইভাবে দিনে দিনে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। নতুন কিছুই আর বাকী ছিলো না শোনার। যিনি তাঁকে যা শোনাতে আসতেন তা পূর্বাহ্নেই জানা বলে আর শোনার কোনও দরকার হতো না তাঁর। এই কারণে দুঃখ পরিতাপের অন্ত ছিলো না বাদশাহ কিনদামিরের। কি করে কার গল্প কিস্‌সা শুনে তিনি অবসর বিনোদন করবেন সেই চিন্তায় তাঁকে দহন করতো সর্বদা।

একদিন এই রকম এক যন্ত্রণা-কাতর মুহূর্তে বাদশাহ কিনদামির তাঁর ব্যক্তিগত খোজাকে বললেন, যা তো, আবু আলীকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।

আবু আলী বাদশাহর খুবই প্রিয়পাত্র। তার সমকক্ষ কথক সে-সময়ে আর

দ্বিতীয় ছিলো না কেউ! এমন গল্প সে ফাঁদতে পারতো যা শুনতে শুনতে শ্রোতারা আহার নিদ্রা ভুলে যেত। একটা কিস্‌সাই একনাগাড়ে এক সাল ধরে বলে যেত সে। কোথাও কোনোও ছেদ-যতি পড়তো না। শুনতে শুনতে কেউ হাই তুলতো না, কেউ বলতে পারতো না—গল্পটা কোনও জায়গায় ঝিমিয়ে আসছে বা শুনতে আর তেমন জমজমাট মনে হচ্ছে না।

সেই আবু আলীও আজ বাদশাহর কাছে দেউলে হয়ে গেছে। তার সমুদ্রগর্ভ গল্পের অগাধ সম্ভার সব আত্মসাৎ করে নিয়েছেন তিনি। নতুন গল্প তেমন আর বানাতে পারে না আজকাল। তবু বাদশাহ আবু আলীকে অশ্রদ্ধা করেন না। ভাঁড়ারের সবখানি উজাড় করে দিয়েছে সে। এবং তার পরিমাণও পর্বত প্রমাণ। এতোবড় গুণী লোককে সমাদর না করে কী পারা যায়?

বৃদ্ধ আবু আলী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়।

—এই যে এসো এসো। এককালে কত গল্প কিস্‌সা শুনিয়েছ, আজ একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলে! তা সত্ত্বেও তোমাকেই আজ ডেকে পাঠিয়েছি। নতুন একটা কিস্‌সা শোনাতেই হবে। কী, পারবে না? আমি যে অনেকদিন উপবাসী, আলী। আজকাল কেউ আর নতুন কোনও কাহিনী শোনাতে পারে না। যারা আসে, তারা সবাই পুরোনো কাহিনীই সম্বল করে আসে। সবই যে আমার শোনা। দেশে গল্পের এতো দুর্ভিক্ষ হয়ে গেলো কেন, আলী? আমার যে একা একা সময় আর কাটে না। তাই বলছি, নতুন কোনও গল্প যদি শোনাতে পার, আমি তোমাকে একটা জায়গীর দেব, অনেক বাগ-বাগিচা গোলাবাড়ি চাষাবাদের নিষ্কর, জমিজমা দেব। কিন্তু একটা শর্ত—এমন গল্প বলবে যা আমার অজানা এবং অসাধারণ। যদি তোমার কাহিনী শুনে আমি মুগ্ধ হই, কথা দিচ্ছি, তোমাকে আমার প্রধান উজিরে বহাল করবো। এবং তুমি আমার ডান পাশে বসবে। এবং তোমার খেয়াল খুশি মতো হুকুমত চালাবে। পুরো ক্ষমতা দেওয়া হবে তোমাকে। আর যদি বলো, না, পারবে না শোনাতে তেমন কাহিনী, তবে আর এখানে পড়ে থেকে কী করবে? তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিবি বালবাচ্চাদের কাছে দেশে ফিরে যাও। বাকী জীবনটা শাক-রুটি খেয়ে কাটিয়ে দাও গে।

বাদশাহর প্রস্তাব শুনে আবু আলী দিশাহারা হয়ে পড়ে।

—শাহেন শাহর আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু জাঁহাপনা এই অজ্ঞ-অধম আপনার একটু দাক্ষিণ্য প্রার্থনা করছে! আমি কিস্‌সা আপনাকে শোনাবো ঠিকই, তবে তার জন্য একটা বছর সময় ভিক্ষা করছি। এক বৎসর পরেও যদি আমি কাহিনী শুরু করতে না পারি, তবে বাদশাহ যে ফরমান দিয়েছেন, আমি তা মেনে নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবো।

বাদশাহ বলেন, পুরো একটা বছর—বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে না? কে বলতে পারে কোন্ মানুষ আরও একটা সাল বেঁচে বর্তে থাকবেই? যাই হোক, তোমার গল্প আমার বড় প্রিয়। সেই কারণে একটা বছরই সময় তোমাকে দিলাম। তবে একটা শর্ত—এই সময়কালের মধ্যে তুমি তোমার গৃহ-ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে পারবে না।

আলু আলী বাদশাহকে কুর্নিশ জানিয়ে ঘরে ফিরে গেলো।

একা একা বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো সে। তারপর তার প্রিয়পাত্র পাঁচটি তরুণ ম্যামলুককে ডেকে বললো, বড় বিপদে পড়েছি, বাবা সকল। বাদশাহ হুকুম করেছেন, নতুন গল্প শোনাতে হবে। এবং অপূর্ব অসাধারণ হওয়া চাই। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে নতুন গল্প কোথায় পাবো আমি! তাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, এই বুড়ো মনিবকে যদি বাঁচাতে চাও তবে তোমাদের একটু তখলিফ্ সইতে হবে।

আমি তোমাদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার দিনার সঙ্গে দিচ্ছি। পাঁচদিকে পাঁচজন বেরিয়ে পড়। পৃথিবীর নানা দেশ তোমরা পরিভ্রমণ করবে। নানা জাতের ধর্মের মানুষের সঙ্গে

মিশবে। তাদের কাছ থেকে গল্প কিস্‌সা শুনবে। এরমধ্যে বসরাহর হাসান-এর দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী যদি কেউ শোনাতে পারে, তাকে খুশি করে, পয়সা কড়ি যা চায় দিয়ে, তার কাছ থেকে সেই কাহিনী শুনে একটা খাতায় লিখে আনবে। আমি নিজে জানি না সে কাহিনী। এবং আমার বিশ্বাস খুরাসন পারস্যের কোনও কথকই তা জানে না। দুনিয়ার সব কিস্‌সাই তাকে আমি শুনিয়েছি শুধু মাত্র এই একটা গল্পই বাদশাহ কিনদামিরের না জানা। এ কাহিনী যদি তাঁকে শোনাতে পারি, আমার মান-ইজ্জত সব বাঁচবে। আমি বাদশাহর জায়গীর জমা পাবো, উজির হয়ে তার হুকুমত চালাবো। আর তা যদি তোমরা কেউ সংগ্রহ করে না আনতে পারো—আমার নকরী যাবে। শূন্য হাতে স্বদেশে ফিরে যেতে হবে। এখন সবই তোমাদের হাতে। তোমরা যদি চেষ্টা করো, যদি ঐ হাসানের লুপ্ত কাহিনী উদ্ধার করে আনতে পারো তবেই তোমাদের মনিবের মুখ রক্ষা হয়।

আবু আলী তার পাঁচজন কর্মচারী, কে কোন্ দেশে যাবে তাও বলে দিলো। প্রথম জনকে বললো, 'সে যাবে ভারত এবং সিন্ধে'। দ্বিতীয় জন যাবে পারস্য, চীন এবং তার আশে পাশের দেশ। তৃতীয় যাবে, খুরাসন এবং তার সংলগ্ন রাষ্ট্রগুলি। চতুর্থ যাবে মাঘরীবের পূর্ব পশ্চিম এবং পঞ্চম জন যাবে সমগ্র মিশর এবং সিরিয়া।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতাত্তরতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

দিনক্ষণ দেখে একদা পাঁচজনকে পাঁচদিকে রওনা করে দিলো আবু আলী।

এর এগার মাস পরে চারজন ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এসে জানালো, তারা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু তন্ন তন্ন করে তলাশ করেও এমন কোনও মানুষের সন্ধান করতে পারেনি যে তাদের সেই হাসানের কাহিনী শোনাতে পারে।

আবু আলী বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। চিন্তায় ভাবনায় বার্ধ্যক্য নেমে আসে দেহে মনে। প্রায় হতাশ হয়ে শুধু আল্লাহর নাম জপ করতে থাকে। এখন একমাত্র ভরসা তিনি। তাঁর দয়া না হলে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

সবাই শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। শুধু মুবারকই ফেরেনি।

তামাম মিশর এবং সিরিয়ার প্রায় বেশির ভাগ অঞ্চলই সে ঘুরেছে। কিন্তু হাসানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী জানে—তেমন কোনও ব্যক্তিরই সন্ধান পায়নি। তবু সে আশা ছাড়েনি। অক্লান্তভাবে ঘুরে চলেছে।

কাইরোর জগৎ বিখ্যাত কথকদের সঙ্গেও সে দেখা করেছিলো। তারা তাকে আরও অনেক মজার মজার কাহিনী শোনাতে চেয়েছিলো। কিন্তু আবু হাসানের দুঃসাহসিক অভিযান তাদের সকলেরই অজানা। তাই প্রায় ব্যর্থ মনোরথ হয়েই সে স্বদেশে ফেরার উদ্যোগ করছিলো। কারণ সময় আসন্ন। এক বছর পূর্ণ হতে আর বেশি দেরি নাই। তার মধ্যে মালিককে কৈফিয়ৎ দাখিল করতে হবে।

কাইরো ছেড়ে মুবারক দামাসকাসে আসে। মনে তখনও আশা—যদি কেউ শোনাতে পারে।

দামাসকাস বড় সুন্দর শহর। তার পথ ঘাট, হাট বাজার, প্রাসাদ ইমারত চোখ মেলে দেখার মতো। তাছাড়া চমৎকার জলহাওয়া। প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

এক পড়ন্ত বিকেলে শহরের অভ্যন্তরে এসে পৌঁছয় সে। একটা সরাইখানার সন্ধানে এপথে ওপথে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। বড় বড় দোকান-পাট, ফিরিওলা, গাধা,

খচ্চর, ভিস্তিওলা, ছেলে-ছোকরাদের হুটোপুটি এইসব দেখতে দেখতে এগিয়ে চলছিলো, এমন সময় কে যেন পিছন থেকে কাঁধে হাত রাখলো। মুবারক চমকে ওঠে। এই অজানা অচেনা বিদেশ বিভূঁই—এখানে কে তার কাঁধে হাত রাখবে! মুখ ফেরাতে এক হাসিখুশি যুবককে দেখতে পেলো।

—তুমি তো মুসাফির? তা এই ভর সন্ধ্যাবেলা কোথায় চলেছ?

মুবারক বলে, হ্যাঁ ঠিক ধরেছ, আমি পরদেশী। এখানে একটা আস্তানা খুজতে বেরিয়েছি। আপাতত রাতটা কাটাতে হবে।

—তারপর? তারপর কোথায় যাবে?

মুবারক বলে, কোথায় আর যাবো। পথে পথেই ঘুরবো। জনে জনে জিজ্ঞেস করবো, কেউ যদি শোনাতে পারে হাসানের কাহিনী?

—হাসানের কাহিনী? সে কে? কোথায় থাকে?

মুবারক হাসে, এ হাসান বসরাহর হাসান। অনেক অনেক কাল আগে তার ইন্তেকাল হয়েছে। তিনি ছিলেন দুঃসাহসিক মানুষ। তাঁর জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিলো। সে-সব কাহিনী এখন প্রায় হারিয়েই গেছে। আমি বহু দেশ ঘুরে এলাম, কিন্তু কেউই বলতে পারলো না। তাই হতাশ হয়ে দেশে ফিরে চলেছি। যাবার পথে দামাসকাস পড়লো—জগৎ বিখ্যাত প্রাচীনতম শহর, ভাবলাম একবার দেখে নয়ন সার্থক করে যাই।

যুবক বললো, তুমি কী জান এখানে দুনিয়ার সেরা কথক শেখ ইশাক থাকেন।

—শুনেছিলাম।

—চলো, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। ঐ যে দলে দলে মানুষ প্রায় ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে—দেখছো, ওরা সবাই চলেছে শেখ ইশাকের কিস্‌সা শুনতে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি কাহিনী বলতে শুরু করেন। যারা আগে ভাগে গিয়ে জায়গা দখল করে বসতে পারে তারা ভাগ্যবান—পুরো কাহিনীটা শুনতে পায়। আর যারা দেরি করে তাদের মাঝখান থেকেই শুনতে হয়। চলো একটু পা চালিয়ে চলো, এখনও হয়তো বসার জায়গা পাবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বলতে শুরু করবেন।

একটা প্রকাণ্ড বড় মহলের মত ঘর। তার ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু মঞ্চে বসে কিস্‌সা বলে চলেছেন শেখ ইশাক—পৃথিবীর নামজাদা কথক। প্রতিদিন নানা দেশ থেকে শত সহস্র মানুষ আসে তার কিস্‌সা শুনতে।

ইতিমধ্যেই প্রচুর জনসমাগম হয়ে গিয়েছিলো। মুবারক এবং ঐ যুবক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে এক পাশে জায়গা করে বসে পড়লো।

পলিতকেশ সদাপ্রফুল্ল সেই কথক বৃদ্ধকে ঘিরে প্রথম সারিতে বসেছে শহরের সম্ভ্রান্ত আমির ও সওদাগররা। তাদের পিছনে পিছনে বসেছে সুধী গুণী এবং ইতর সাধারণ মানুষ।

যুবক বললো, এ কাহিনীটা শেখ সাহেব কয়েকদিন আগে শুরু করেছেন। এখন তিনি এ গল্প প্রায় শেষ করে এনেছেন। এরপরে নতুন কিস্‌সা শুরু হবে আজ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দারুণ উত্তেজনা এবং হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে কাহিনীটা শেষ করে শেখ ইশাক।

এক এক করে শ্রোতারা বিদায় নিয়ে চলে যায়। কিন্তু মুবারক দাঁড়িয়ে থাকে। ইশাক ইশারা করতে তার সামনে এসে সালাম জানায়।

—মালিক, আমি পরদেশী। আপনাকে দু একটা কথা বলতে চাই।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আটাত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

বৃদ্ধ ইশাক বলে, ওকথা বলতে নাই বেটা, আমরা সকলেই পরদেশী। তাঁর ঠিকানা ছেড়ে দুদিনের তরে এসেছি। আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাবো।

মুবারক বলে, আমার স্বদেশ খুরাসান। আমার ওস্তাদ আবু আলী, হয় তো তার নাম শুনে থাকবেন, খুব নামজাদা কথক। তিনিই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এই তাঁর নজরানা—একহাজার দিনার। মেহেরবানী করে আপনি গ্রহণ করুন, তিনি ধন্য হবেন।

আমার ওস্তাদের বিশ্বাস বর্তমানে জীবিত তাবৎ সেরা কথকদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। আপনার তুল্য কাহিনীকার সারা দুনিয়ায় আর দুটি নাই।

ইশাক বললো, হ্যাঁ, আমি তাঁর অনেক খ্যাতি ও প্রশংসা শুনেছি। তিনি আজ আরব দুনিয়ায় সুপরিচিত। ঠিক আছে তার উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করলাম। এখন বলো, কী তোমার অভিপ্রায়? আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো।

মুবারকের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

—আল্লাহ আপনার নাম যশ খ্যাতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখুন মালিক। আবু আলী, আমার ওস্তাদ নতুন এক কাহিনী চেয়ে পাঠিয়েচেন আপনার কাছে। আমাদের সুলতান শুনতে চেয়েছেন। দুনিয়ার সব কিস্‌সাই তাঁর শোনা হয়ে গেছে। একমাত্র বসরাহার হাসানের বিচিত্র অভিযানের কাহিনী ছাড়া। আমি তারই প্রত্যাশায় আপনার কাছে এসেছি। যদি আপনি জেনে থাকেন সে কাহিনী আমাকে মেহেরবানী করে শোনান—এই আমার একমাত্র বাসনা।

বৃদ্ধ ইশাক হাসে, তুমি যথাস্থানেই এসে পড়েছ বাছা। আমি ছাড়া আর কেউই জানে না সে কাহিনী। ঠিক আছে, আমি তোমাকে খুশি করে দেব। তোমার মালিক, আবু আলী যথার্থই ভেবেছেন, হাসানের কাহিনীর মতো অমন চমৎকার কিস্‌সা আজ পর্যন্ত কেউ কখনও শুনেছে বলে আমার জানা নাই। অতি শৈশবে আমি এক লোলচর্ম পীর ফকিরের মুখ থেকে শুনেছিলাম এই কাহিনী, সেই পীর সাহেবও নাকি শুনেছিলেন অন্য এক সদাশয় বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছে। তাঁরা আজ আর কেউ ইহজগতে নাই।

তোমার মালিকের অনুরোধে, শুধু শোনার মতো করেই বলবো না, তুমি যাতে নিখুঁতভাবে তার প্রতিটি ছত্র লিপিবদ্ধ করে করে নিতে পারো সেদিকেও আমি লক্ষ্য রাখবো। কিন্তু একটা শর্ত আছে, বেটা।

মুবারক বলে, আপনি আদেশ করুন মালিক, আপনার শর্তের প্রতিটি অক্ষর আমি যথাযথ পালন করবো।

—বহুত আচ্ছা, বেটা। কারণ এ কাহিনী সকলের জন্য নয়। তোমাকে কথা দিতে হবে পাঁচ রকম লোকের কাছে এ কাহিনী তোমরা শোনাতে পারবে না। অজ্ঞ এবং উগ্ররা এর মর্ম বুঝবে না। এ কাহিনী ভণ্ডরা শুনলে রাগান্বিত হবে। মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা ক্ষীণবুদ্ধি বা নির্বোধ হয়—তারাও এ বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। বোকা হাঁদাদেরও ঠিক একই কারণে শোনাবে না। এবং পরিশেষে বিধর্মীদের কখনই শোনাবে না। এ কাহিনীর সার, যা অমূল্য সম্পদ, তারা মেনে নিতে পারবে না।

মুবারক বলে, উপরে আল্লাহ সাক্ষী আর নিচে আপনি, মালিক, আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

বৃদ্ধ ইশাক খাতা এবং দোয়াত কলম দিলো মুবারককে।

—নাও শুরু করো। প্রথমে 'হাসানের বিচিত্র অভিযানের দুঃসাহসিক কাহিনী' এক শিরোনাম লেখ।

একটানা সাত দিন সাত রাত্রি ধরে লিখে চললো মুবারক। লেখা শেষ হলে আগাগোড়া সবটা আবার সে পড়ে শোনালো বৃদ্ধ ইশাককে। মাঝে মাঝে ইশাক সাহেব একটু আধটু পরিবর্তন পরিমার্জন করে দিলো।

এতো দিনে মুবারকের মুখে এক দুর্গ জয়ের আনন্দ ফুটে ওঠে। ইশাক-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশের পথে রওনা হয়।

বৎসর পূর্তির আর মাত্র দশ দিন বাকী। প্রাসাদের সদর ফটকে আবু আলীর নামের ফলক আঁটা হবে। দেশের আপামর সবাই জানবে আলু আলী বাদশাহকে নতুন এক কাহিনী শোনাবে। কী বেইজ্জতের কথা হবে। আবু আলী কী কাহিনী শোনাবে বাদশাহকে। কী নতুন কাহিনী তার জানা আছে? সবই তো তার শোনা। একমাত্র শেষ ভরসা ছিলো মুবারক। কিন্তু সে-ও ফিরলো না। আর শূন্য হাতে ফিরেই বা কী হবে? তাতে তো মান বাঁচবে না।

বৃদ্ধ যখন একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে, ঠিক সেই সময় মাত্র দশ দিন আগে এসে পৌঁছলো মুবারক। আনন্দ উল্লাসে মাতিয়ে তুললো আবু আলীর বাসগৃহ।

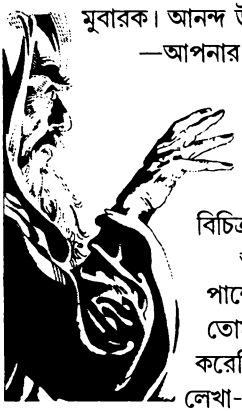

—আপনার আশীর্বাদে আমি পেয়েছি মালিক, এই নিন।

খাতাখানা আলীর হাতে তুলে দেয় মুবারক। বৃদ্ধের চোখ থেকে দু-ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে।

খাতাখানার প্রথম পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়লো আবু আলীর, বেশ বড় বড় হরফে লেখা আছে ঃ বসরাহর হাসানের বহু বিচিত্র অভিযানের দুঃসাহসিক কাহিনী।

আবু আলী বুকে জড়িয়ে ধরে ম্যামলুক মুবারককে। তারপর ডান পাশে বসায়। মাথায় হাত রেখে বলে, অতি শৈশবে বাজার থেকে তোমাকে কিনে এনে আমি নিজের সন্তানের মতো লালন পালন করেছি বাবা। বান্দা বলে মুর্খ করে রাখিনি। আমার সাধ্যমতো লেখা-পড়া তোমাকে শিখিয়েছি। আজ আমি বড় খুশি হয়েছি তোমার কাজ দেখে। আর কেনা গোলাম করে তোমাকে আটকে রাখবো না, বাবা। যাও আজ থেকে তুমি মুক্ত। তোমার গোলামী জীবন শেষ হয়ে গেলো। এবার নিজের ইচ্ছামতো যেখানে খুশি চলে যাও। যা প্রাণ চায় করো, কেউ তোমাকে আর বাধা দেবে না। আজ থেকে আমি আর তোমার মালিক নই, বেটা। এখন তোমার নিজের মালিক তুমি নিজে। আর ওপরে যিনি আছেন তিনি তো মালিকের মালিক।

—আমি তোমাকে দশটা আরবী টাট্টু ঘোড়া, পাঁচটা মাদী ঘোড়া, দশটা উট্, দশটা খচ্চর, তিনটি নিগ্রো এবং দুটি খুদে বান্দা উপহার দিচ্ছি—এ তোমার কাঁজের যোগ্য পুরস্কার, তুমি নাও।

নয় দিন নয় রাত্রি ধরে বৃদ্ধ আলী, মুবারকের হাতের লেখা সেই খাতাখানা আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেললো।

দশ দিনের দিন সকালে হামামে গিয়ে গোসল করলেন তিনি। নতুন সাজ-পোশাক পরলেন। তারপর পাণ্ডুলিপিখানা একটি ছোট সোনার বাক্সে বন্দী করে হাজির হলেন বাদশাহ কিনদামিরের দরবারে।

বাদশাহ কিনদামির আবু আলীর প্রতীক্ষাতেই অধীর আগ্রহে বসেছিলেন মসনদে। উজির আমির ওমরাহ আমলায় পরিপূর্ণ দরবার-কক্ষ।

আলু আলী কুর্ণিশ জানায়। বাদশাহ উৎফুল্ল হয়ে স্বাগত জানায়, এসো এসো আবু আলী, তোমার পথ চেয়েই বসে আছি আমরা।

সোনার বাক্সটা মসনদের সামনে রেখে আবু আলী বললো, এই আমার সেই কাহিনী। আজ ওয়াদার শেষ দিন। আপনি যদি হুকুম করেন আমি পড়ে শোনাতে পারি।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো ঊনআশিতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

বাদশাহ বললেন, তুমি তোমার কথা রেখেছ, আমি খুব প্রীত হয়েছি। যাই হোক, এখন কিস্‌সাটা শোনাও। দেখি কেমন লিখেছ।

একটানা সাত দিন ধরে পড়ে শোনালো আবু আলী। বাদশাহ এবং দরবারের সকলে আহার নিদ্রা ভুলে রুদ্ধশ্বাসে শুনলেন সেই হাসানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার দুঃসাহসিক কাহিনী। বাদশাহ মুগ্ধ, বিস্মিত এবং চমৎকৃত হলেন। আবু আলী প্রধান উজিরের পদে বহাল হয়ে বাদশাহর ডানপাশে অলঙ্কৃত হয়ে বসলো। জায়গীর জমি-জমা বাগ-বাগান, দাস-দাসী, ঘোড়া, খচ্চর—নানা উপহার উপঢৌকনে ভূষিত করলেন তাকে।

শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা, এই হাসানের কাহিনীর পাণ্ডুলিপির একখানা নকল আমার সংগ্রহে আছে। অনেকবার এই চমৎকার কাহিনী আমি পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। এখন সেই কাহিনীই আপনাকে শোনাবো ঃ

অনেক অনেক দিন আগে বসরাহ শহরে এক প্রিয়দর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত, বিচক্ষণ এবং সাহসী যুবক বাস করতো। তার নাম—হাসান। বৃদ্ধ বাবা মা-এর বড় আদরের দুলাল ছিলো সে। কারণ হাসান তাদের শেষ বয়সের সন্তান।

বাবা মার যাওয়ার পর প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলো, এবং নানা রকম ভোগ-বিলাসে ডুবে অল্পকালের মধ্যে সব নিঃশেষও করে দিয়েছিলো সে।

ছেলের দীনদশা দেখে মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে। সে নিজের পাওয়া অংশের সম্পত্তি বিক্রি করে ছেলেকে একখানা স্যাকরার দোকান করে দিলো।

হাসান বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি। তার মতো সুঠাম সুন্দর সুপুরুষ বড় একটা চোখে পড়ে না। দোকান খুলে বসার সঙ্গে সঙ্গে পথচারীরা ভিড় করে দাঁড়ায়। এমন খুব-সুরত চাঁদের মতো ছেলে তারা কেউ দেখেনি কখনও।

দু দিনেই দোকান জম-জমাট হয়ে উঠলো। ছেলে মেয়ে বুড়ো, বণিক সওদাগর আমির—সবাই এসে ভিড় জমাতে থাকলো। সওদা করাটা গৌণ, আসল উদ্দেশ্য হাসানকে প্রাণ ভরে দেখা।

একদিন হাসান তার দোকানে বসেছিলো, এমন সময় সাদা দাড়িওলা এক পারসী এসে দাঁড়ালো। তার মাথায় বিরাট এক পাগড়ী। আর হাতে একখানা কোরান।

—খোদা হাফেজ, এ তো দেখছি সুন্দর এক স্বর্ণকার।

দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে হাসানকে শুভেচ্ছা জানায় সে। হাসানও প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে ওকে বসতে অনুরোধ জানায়।

পারসী আসন গ্রহণ করে স্মিত হেসে বলে, বেটা, তোমার সুরত এবং আদব কায়দা বড়ই সুন্দর। আমার নিজের কোনও সন্তানাদি নাই। তোমাকে আমি যদি দত্তক নিতে ইচ্ছা করি তো তুমি কি রাজি হবে? সারা জীবন ধরে যে বিদ্যা আমি শিখেছি, তা আমার মরার সঙ্গে সঙ্গেই মুছে যাবে—এ ব্যথা আমি সইতে পারছি না। সেই কারণেই আমি তোমাকে দত্তক

নিতে চাই। শিখেয়ে যেতে চাই আমার গুপ্ত মন্ত্র। দিয়ে যেতে চাই আমার সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ—ধনদৌলত—সব।

হাসান এক কথায় রাজি হয়ে যায়।

—আপনি কখন আমাকে গ্রহণ করতে চান, চাচা? আমি রাজি।

—আগামীকাল। আজ আমি উঠি তাহলে?

পারসী সাহেব উঠে দাঁড়ায়। হাসানের মাথায় হাত রেখে সে আশীর্বাদ জানায়। তারপর আর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে চলে যায়।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো আশিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

হাসান ভীষণ চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরে এসে মাকে সব কথা বলে।

মা আঁৎকে ওঠে, এ তুই কী বলছিস হাসান? পারসীরা কী কখনও সৎ হয়? ওদের কী জন্মের ঠিক আছে?

—কিন্তু মা, ঐ সদাশয় পারসী সাহেবটি বেজন্মা নয়। ওর সঙ্গে কথা বললে, ওর চেহারা চরিত্র দেখলে তুমি বুঝতে পারতে। ওর মাথার পাগড়ী সাদা মুসলিনের। সাচ্চা মুসলমান পীর ছাড়া এ পাগড়ী কেউ পরে?

মা বাধা দিয়ে বলে, ভুল করো না বাবা, আমি জানি এই পারসীরা ভীষণ ঠগ জোচ্চোর হয়। ওদের শিক্ষা-দীক্ষা সবই বদ কাজের উদ্দেশ্যে, জীবনে ভালো চিন্তা তারা কখনও করে না। নিজের ভাইকে কী করে পথে বসাতে হবে সেই চিন্তাই তাদের আসল।

হাসান হো হো করে হেসে ওঠে, মা, আমরা গরীব। গরীব বললে ঠিক বলা হলো না, আমরা দীন দরিদ্র। তাই কারো ভালো আমরা সহ্য করতে পারি না। আমি তো বাজি রেখে বলতে পারি, সারা বসরাহয় একটা লোকও নাই, যে ঐ পারসী সাহেবের মতো উদার মহৎ। একটা লোকের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় না? লোকটা সৎ কী শঠ? ঐ পারসী সাহেবকে দেখলেই তোমার মনে হবে—কোন পীর-টির কেউ হবে হয়তো। লোকের নামে নিন্দা করার আগে তাকে একবার ভালো করে যাচাই করা উচিত মা। মিছিমিছি কারো নামে দোষ দিতে নাই।

মা দেখলো ছেলেকে বোঝানো যাবে না। সে আর কথা বাড়লো না।

পরদিন সকালে যথারীতি দোকান খুলে বসে আছে হাসান। একটু পরে সেই পারসী এলো। হাসান সাদর অভ্যর্থনা করে তাকে বসতে দিলো। পারসী প্রশ্ন করলো, আচ্ছা তুমি কী শাদী করেছ?

হাসান বলে, জী না। তবে আমার মা ভীষণ পীড়াপীড়ি করেন রোজই।

পারসী বলে, অতি উত্তম। তুমি যদি শাদী নিকা কিছু করতে তবে আমার বিদ্যা তোমাকে শেখাতাম না। কারণ তুমি গোপন রাখতে পারতে না তোমার বিবির কাছে। আচ্ছা, তোমার দোকানে কোনও তামার জিনিস আছে?

—জী হ্যাঁ। তামার রেকাবী আছে, চলবে?

একখানা তামার রেকাবী এনে দিলো হাসান। সে বললো, চমৎকার, এতেই হবে। তোমার হাপরটা জ্বালাও। এই রেকাবীখানা পোড়াও। তারপর কাটারী দিয়ে কুটি কুটি করে কেটে ফেল।

পারসীর কথামতো হাসান রেকাবীখানাকে পুড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললো।

—আচ্ছা, এবার তোমার ধাতু গলানো পাত্রে টুকরোগুলো রেখে গলিয়ে ফেলো।

হাসানের কাছে এসব কাজ শক্ত নয়। যথা নির্দেশ মতো তামার টুকরোগুলোকে সে গলিয়ে ফেললো।

পারসী হাপরের কাছে এগিয়ে এসে তার হাতের বইখানা খুলে বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়লো। তারপর হঠাৎ গলা চড়িয়ে সে হক্ বক্ মক্ বলে চিৎকার করে ওপরের দিকে দৃষ্টিপাত করলো। তারপর আবার খাটো গলায় বলতে থাকলো, আ যা—! আ যা—সুরজ কা রোশনি—আ—যা!

এরপর আবার সে হুঙ্কার ছাড়লো। ওরে শয়তানের বেহদ্দ, ধাতুর বাচ্চা—আসবি কিনা বল, না হলে পিটিয়ে খাল খিঁচে নেব। অক্ বক্ মক্। ওরে শয়তানের জাসু তামা, সোনা-হ। না হবি- তো আমার হাতে মরবি।

এরপর পাগড়ীর ভাঁজ থেকে একটা ছোট কাগজের পুরিয়া বের করে খুললো সে। হলুদ আর জাফরান মেশানো রঙের একটু গুঁড়ো। গলিত তামার মধ্যে ঢেলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে তরল ধাতুটি জমে একটা শক্ত বাঁট হয়ে গেলো। হাসান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখলো—একখানা সোনার বাঁট।

তবু মনে সন্দেহ থেকেই যায়। তাই হাসান পরীক্ষা করার জন্য কষ্টি পাথরখানা নিয়ে আসে।

না, কোনও সন্দেহ নাই, একেবারে খাঁটি সোনা। কোনও খাদ নাই।

পারসী বললো, জলদি বাজারে গিয়ে বেচে টাকা নিয়ে এসো। টাকাটা দোকানে রাখবে না। বাড়িতে নিয়ে যেও, বুঝলে?

হাসান তাড়াতাড়ি বাজারে চলে যায়। দু-হাজার দিনারে বিক্রি করে টাকা নিয়ে ফিরে আসি।

তখুনি বাড়ি ফিরে হাসান মার হাতে টাকাটা তুলে দেয়। ছেলে রোজগার করে এনেছে। মা খুশি হয়ে সিন্দুকে তুলে রাখে। হাসান হাসতে হাসতে বলে, কিন্তু কী করে টাকাটা পেলাম তা তো জিজ্ঞেস করলে না, মা?

—কেন ব্যবসা করছিস, লাভ হবে না।

—তা বলে একদিনে এতো নাফা?

মা বুঝতে পারে না, তবে কোথায় পেলি?

তখন সে সব ঘটনা খুলে বলে। মা শুনে আঁৎকে ওঠে, সর্বনাশ এ তুই কী করেছিস। কোন্ জালিয়াতের পাল্লায় পড়েছিস, বাবা। এবার যে ফাটকে যেতে হবে।

—কেন, ফাটকে যেতে হবে কেন? আমি তো কাউকে ঠকাইনি—খাঁটি সোনা দিয়ে ন্যায্য দাম নিয়েছি। সোনা যে নিখাদ খাঁটি তা আমিও যাচাই করে দেখেছি, যে কিনেছে সেও যাচাই করে দেখেছে। এতে ভয় পাওয়ার কী আছে। তোমার যত্তোসব আজগুবি চিন্তা।

মা বলে, তুই চিনিস না ঐ জালিয়াত পারসীগুলোকে। ওরা পারে না এমন কাজ নাই। গুন তুক করে ভেল্কি দেখিয়ে 'না' কে 'হাঁ' করে দিতে পারে। তুই যাকে সোনা বলে বেচে এসেছিস্ বাবা, আসলে তা সোনা নয়। হতে পারে না। কালই দেখবি তা পিতল বা তামা হয়ে গেছে। ওরা তুক তাক জানে, কিছুক্ষণের জন্য যে-কোনও ধাতুকে সোনার মতো করে দিতে পারে। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। আবার সে নিজের ধাতুর গুণে ফিরে আসে।

হাসান বলে, আমি তো এই বিদ্যাই শিখবো, তাঁর কাছে! আজ প্রথমে তিনি আমাকে মৌলিক ধাতু থেকে সোনা বানাবার কায়দা শিখিয়েছেন।

মা কী বলবে বা বলতে চায়, সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে রসুইখানায় ঢুকে পিতলের হামান-দিস্তাখানা তুলে নিয়ে সোজা দোকানে ফিরে আসে হাসান। এই হামান-দিস্তায় তার মা পেঁয়াজ রসুন থেঁতো করে। লঙ্কা মরিচের গুঁড়ো-মসলা বানায়।

হামান-দিস্তাখানা দোকানের মেঝেয় রেখে হাপরটা জ্বালাতে যায়। পারসী দোকানেই বসেছিলো। হাসানের কাণ্ড দেখে সে হাসে।

—এটা কী হবে?

হাসান উৎসাহিত হয়ে বলে, খাঁটি পিতলের। অনেকটা ভারি আছে। সোনা বানাবো। কত ওজন হবে?

পারসী বলে, কিন্তু এ বিদ্যা তো দিনে মাত্র একবারই খাটানো চলে। বেশি লোভ করলে কোনও লাভ হবে না। আজকের যা পাওনা পেয়ে গেছ, আবার কাল বানাতে পারবে।

হাসান চুপসে যায়, কিন্তু আমি আপনার বিদ্যার গুপ্ত রহস্যটা জানতে চাই, মালিক।

—তুমি একটা বদ্ধ পাগল। যথাসময়ে সব শিখতে পারবে। এতে ধৈর্যই বড় কথা। অসংযম বিদ্যার সুফল নষ্ট করে।

হাসান মাথা নাড়ে, তা ঠিক, সব কিছুরই নির্দিষ্ট সময় আছে। তাড়াহুড়ো করলে সমূলে বিনাশ হতে পারে।

পারসী বলে যদি তুমি সত্যিই শিখতে অভিলাষ কর, তোমার সব যন্ত্রপাতি বেঁধে-ছেঁদে চলো আমার বাসায়। সেখানে গোপনে শেখাবো তোমাকে। এখানে এই বাজারের মধ্যে কী এসব কাজ হয়?

হাসান বলে, তা হলে তাই চলুন। সত্যিই তো এ সাধনার বস্তু। এতো হট্টগোলের মধ্যে সম্ভব হবে কী করে?

যন্ত্রপাতি সব বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে দোকান বন্ধ করে পারসীর সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়ে হাসান। কিন্তু কিছুদূর এগোতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মা-এর কথাগুলো বার বার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে।

পারসী কাছে এসে মাথায় হাত রাখে, কী মনে দ্বিধা আছে? না, মন যতক্ষণ না সাফা হচ্ছে ততক্ষণ কোনও কাজে পা বাড়াবে না। ঠিক আছে, যেতে হবে না আমার বাসায়। চলো, আজ তোমার বাসাতেই যাবো। সেখানেই শুরু হবে তোমার শিক্ষানবিশী।

—সেই ভালো। মা নিজের চোখে দেখলে মনে ভরসা পাবেন।

হাসান পারসীকে নিয়ে তার নিজের বাসার দিকে চললো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে!

পাঁচশো একাশিতম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

বাসায় পৌঁছে হাসান পারসীকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ভিতরে চলে যায়।

—মা, মাগো, উনি এসেছেন। আজ রাতে আমাদের বাসায় মেহমান হবেন। আমরা একসঙ্গে খানাপিনা করবো।

মা বলে, বাড়িতে যা শাক-রুটি আছে, তাই খাবে, চিন্তার কী? আমাদের শাস্ত্রে নুন আর রুটির মতো পবিত্র জিনিস আর কিছু নাই। কিন্তু ঐ নাস্তিক সূর্যের উপাসক পারসীরা এর মর্ম বোঝে না। যাই হোক, একবার যখন আমার ঘরে সে এসেছে, তাকে যেতে বলবো

না—যেতে দেবোও না। কিন্তু ঐ জালিয়াত ঠগ জোচ্চোরটা যতক্ষণ থাকবে আমি এ বাড়িতে থাকবো না। তোমাদের খানা-পিনা যা দরকার সব আমি বানিয়ে দিয়ে পড়শীদের কারো বাড়িতে রাত কাটাতে যাবো। তারপর কাল চলে গেলে, সারা বাড়িটা আগে ভালো করে ধোয়া পোঁছা করে তবে এখানে নুন রুটি খাবো আমি।

পাঁচরকম তরকারী রুটি নুন জল সব সাজিয়ে রেখে হাসানের মা পাশের বাড়িতে শুতে চলে যায়।

হাসান এবং পারসী দু'জনে বসে খানাপিনা শেষ করে। পারসী বলে, হাসান, আজ তোমার নুন খেলাম, এ ঋণ পরিশোধ করা যায় না। তোমাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছি। শুধু সেই কারণেই আমার অর্জিত বিদ্যার গুপ্তরহস্য তোমাকে শেখাতে চাই।

এই বলে সে একটি কাগজের পুরিয়া বের করে পাগড়ীর ভাঁজ থেকে। ভাঁজ খুলে সেই জাফরান হলুদ বর্ণের গুঁড়োটা দেখিয়ে বলে এর মাত্র এক টিপ পরিমাণ গুঁড়োতে পাঁচ সের পিতলকে সোনা করে ফেলতে পার। এই অমোঘ বস্তুটি এক হাজার সহজলভ্য এবং এক হাজার দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়ার মূল থেকে তৈরী করা হয়। বহু পরিশ্রম-সাধ্য! কী কী প্রক্রিয়ায় করা যায় তার বিস্তারিত বিবরণ তোমাকে পরে বলবো একদিন। এখন এটা তোমার কাছে রেখে দাও। কিন্তু সাবধান, খুলে রেখ না, এর মধ্যে একটা গন্ধ আছে সেটা উবে যেতে পারে।

স্বাভাবিক কৌতূহলের খেয়ালেই পুরিয়াটা নাকের কাছে ধরে গন্ধের প্রকৃতি আঘ্রাণ করে দেখতে যায় হাসান। ঠিক এইটেই চেয়েছিলো পারসী। হাসানের অচৈতন্য দেহটা লুটিয়ে পড়ে। পারসী আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।—বাজীমাৎ। হাসান, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি ক'টা বছর ফন্দী ফিকির করছিলাম। শেষে আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। এবার আর আমার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছ না তুমি।

ঘরের এক পাশ থেকে একটা বাক্স টেনে নিয়ে ডালা তুলে ভিতরের জামা-কাপড়গুলো বের করে ছুঁড়ে দেয়। হাসানের অচৈতন্য দেহটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বাক্সের মধ্যে ভরে। একটা কুলিকে ডেকে এনে বাক্সটা তার মাথায় চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সোজা সমুদ্রের তীর। সেখানে তার একখানা জাহাজ ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলো। পারসী বাক্সটা নিয়ে উঠতেই জাহাজটা ছেড়ে দিলো।

জাহাজ চলতে থাকুক, এবার আমরা হাসানের মা-এর কথায় আসি।

সকালবেলায় হাসানের মা বাড়িতে ঢুকেই ডুকরে কেঁদে ওঠে। সে যা আশঙ্কা করেছিলো, তাই ঘটেছে। দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরের মধ্যে যে বাক্সটা ছিলো তা নাই। বাক্সের সাজপোশাকগুলো মেঝের ওপর ছত্রাকারে ছড়ানো। হাসান নাই, পারসীটাও নাই।

ছেলের শোকে মা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। কপাল চাপড়ায়। বুক চাপড়ায়। চুল ছেঁড়ে।

—হায় রে আমার চোখের মণি, হায় রে আমার সোনা, কোথায় গেলি, বাবা। কী করে তোকে ফিরে পাবো।

পাড়া-পড়শীরা ছুটে আসে। সমবেদনা জানায়। অনেকেই এদিক ওদিক খোঁজ করতে ছুটে। কিন্তু হাসানকে কোথায় পাবে তারা। সে ততক্ষণে এক সমুদ্রগামী জাহাজের খোলে অচৈতন্য অবস্থায় বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে।

শোকাতুরা মা হাসানের আশায় কোনও রকমে জীবন ধারণ করতে থাকে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো বিরাশিতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পারসীটা মহা ধুরন্ধর ধড়িবাজ এক যাদুকর। লোকটার নাম বাহুরাম। অগ্নির উপাসক। প্রতি বছর সে মুসলমানদের ঘর থেকে একটি করে সুঠাম সুদর্শন যুবককে চুরি নিয়ে আসে। তার বিকৃত কামনার ভোগ্য হিসাবে ব্যবহার করে। একটা বিখ্যাত প্রবাদ আছে ঃ সে নিজে কুকুর তার মা বাবাও কুকুর। তার বাবার বাবাও তো কুকুর। এবং যে পথ ধরে সে চলে সে পথে তো একমাত্র কুকুররা চলে। সুতরাং সে যে পুরোপুরি একটা কুকুর সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী?

জাহাজ ছাড়ার পর প্রতিদিন একবার ক'রে সে নিচের খোলে যায়। বাক্সের ডালা তুলে দেখে, হাসানের চৈতন্য ফিরেছে কিনা। কয়েকদিন পরে আস্তে আস্তে সে জ্ঞান ফিরে পেতে থাকে। পারসী খানাপিনা নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেয়। তারপর ডালা বন্ধ করে ওপরে চলে আসে। এইভাবে যাত্রাপথ একদিন শেষ হয়ে আসে। জাহাজ এসে ভিড়ে এক উপকূলে। বাক্সটা নিয়ে বাহুরাম তীরে নামে। জাহাজটা আবার দরিয়ার মাঝখানে ভেসে গিয়ে চলতে থাকে।

বাহুরাম বাক্সের ডালাটা তোলে। হাসানের আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে দেয় মন্ত্রবলে। এবার সে চোখ মেলে তাকায়। উঠে বসে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সামনে সমুদ্র। পায়ের নিচে পাথরের নুড়ির সমুদ্র-সৈকত। নুড়িগুলো কত বিচিত্র বর্ণের। কোনটা লাল, কোনটা সবুজ, কোনটা সাদা, আবার কেউ বা নীল।

হাসানের বুঝতে কষ্ট হয় না, সে আর নিজ দেশের সমুদ্র-সৈকতে দাঁড়িয়ে নাই। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে দেখে, তার পিছনের দিকে একটা পাহাড়ের টিলার ওপর বসে আছে ঐ পারসী। একটা চোখ বন্ধ করে তাকে ট্যারার মতো দেখছে। এবার সে পরিষ্কার বুঝতে পারে, এই শয়তানটিরই এই কাণ্ড। মায়ের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ হয়। আগেই সে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু হাসান নিজেই তা উপেক্ষা করেছে।

পারসীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে।

—এ সবের মানে কী? আপনি না আমার নুন খেয়েছেন?

বাহুরাম হো হো করে হেসে ওঠে।

—আমরা তো অগ্নির উপাসক। তোমাদের নুন-ফুনের ধার ধারি না। এযাবৎ আমি ন'শো নিরানব্বইটি মুসলমান ছেলের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছি। আগুন সাক্ষী রেখে বলতে পারি, তোমার মতো এমন সুন্দর তাদের কেউই ছিলো না। তুমিই আমার এক হাজার সংখ্যা পূরণ করবে। ভাবিনি, এতো সহজে তুমি আমার খপ্পরে ধরা দেবে। কিন্তু সূর্যের অপরা মহিমা, এখন তুমি আমার কব্জায়। এবং দেখ, কী ভাবে কতখানি আমি তোমার সঙ্গে ভালোবাসা করি। প্রথমে তুমি তোমার ধর্মমত ত্যাগ করে আমার ধর্মমত মাথা পেতে নাও।

এই কথা শোনামাত্র হাসান তড়িৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ায়, কী? কী বললেন? আবার বলুন তো শুনি? শয়তান!

পারসী বলে, আরে না না, আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। যাক, পরীক্ষায় তুমি পাশ করে গেছ। এবং প্রমাণ করতে পেরেছ ধর্মে তোমার অটুট মতি আছে। তুমি পরমপিতা আল্লাহর একনিষ্ঠ সেবক।

—আমি তোমাকে এই পাহাড়-সন্নিহিত নির্জন সমুদ্র উপকূলে কেন নিয়ে এসেছি, জান? প্রকৃত শিক্ষা এই রকম নির্জন স্থানেই সম্ভব হতে পারে। ঐ যে পাহাড়ের চূড়া দেখছো, ওখানে আমাদের উঠতে হবে। ঐখানেই আছে প্রকৃত সঞ্জীবনী সুধা—যা এই বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য একান্ত অপরিহার্য। ঐ পর্বতের শিখরে শয়ন করে এই বিদ্যার সাধনা করতে হবে তোমাকে। তবেই সিদ্ধিলাভ হবে। নচেৎ নয়। যদি তুমি স্বেচ্ছায় ওখানে যাও খুব সুখের কথা।

অফুরন্ত আনন্দ আহরণ করতে পারবে। আর যদি যেতে না চাও, তবে আমাকে বলপ্রয়োগ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে তুমি যেখানে একদিন নিদ্রিত ছিলে সেখানেই রেখে দেবো আবার। এবার বলো, কী করতে চাও? আমরা ঐ পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে অনেক গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করতে পারবো। সেগুলো আমাদের এই বিদ্যায় একান্তভাবে প্রয়োজন। ওগুলো আনতে পারলে তোমাকে শেখানোর কাজ আরও দ্রুততর হতে পারবে।

হাসান সরাসরি 'না' করতে পারলো না। লোকটা মহা শয়তান, বদমাইস ধড়িবাজ। মা-এর উপদেশগুলো আবার মনে ভেসে ওঠে। জলে দু-চোখ ভরে ওঠে।

—কেঁদো না, হাসান। খুব শীগ্‌গিরই প্রমাণ পাবে আমার উপদেশ কত মূল্যবান।

হাসান ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু কী করে আমি ওখানে উঠবো? অত উঁচু পাহাড়।

—তোমাকে কোনও কষ্ট করতে হবে না, হাসান। আমি যাদুমন্ত্র দিয়ে তোমাকে ওপরে উঠিয়ে দেব। পাখীর মতো ডানা মেলে উঠে যাবো আমরা।

আলখাল্লার ভিতর থেকে একটা ছোট্ট তামার পাত্র বের করলো পারসীটা। পাত্রটার গায়ে উৎকীর্ণ করে লেখা কতকগুলো শব্দ—ঠিক যেন দৈববাণীর মতো।

পাত্রটার মুখ মোরগের একটুকরো চামড়া দিয়ে ঢাকা। ঠিক যেন ছোট্ট একটা দামামা। আঙ্গুলের টোকা দিয়ে টঙ্কার তোলে সে। এবং তৎক্ষণাৎ ধূলির ঝড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় চারদিক। এবং মিশ-মিশে কালো একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সামনে। ঘোড়াটার দু'খানা পাখা নড়তে থাকে।

পারসী ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসে এবং হাসানকে উঠিয়ে নেবার জন্য হাত বাড়ায়। পারসীর হাতে ভর করে হাসান ওপরে উঠে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে পক্ষীরাজ উড়ে চলে আকাশে। পলকের মধ্যে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে ওদের নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শয়তানের দুষ্ট চাহনি পারসীর চোখে। গগন-বিদারী শব্দ করে সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, এবার—হাসান, তুমি আমার পুরো কব্জায়। তোমাকে রক্ষা করে এমন প্রাণী কেউ জন্মায়নি দুনিয়ায়। এবার আমার কামনা-বাসনা চরিতার্থ কর। এখন তো মানবে, একমাত্র অগ্নি ছাড়া কোনও শক্তি নাই।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তিরাশিতম রজনী ঃ আবার সে শুরু করে ঃ

হাসান চিৎকার করে ওঠে, আল্লা হো আকবর! আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নাই। মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। ওরে শয়তান বেল্লিক, তুই আমার শক্তি জানিস না, আমি এক সাচ্চা মুসলমান, তাঁর কৃপাতেই তোকে আমি খতম করে ফেলবো।

এই বলে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাদুকরের হাত থেকে সেই দামামাটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে পর্বত-শিখরের এক ধারে ঠেলে নিয়ে যায়। এবং প্রাণপণ শক্তিতে এক লাথি বসিয়ে দেয় ওর নাভিস্থলে। টাল সামলাতে না পেরে পারসীর দেহটা ছিটকে চলে যায় শূন্যে। এরপর ঘুরপাক খেতে খেতে শয়তানের দেহটা গিয়ে আছড়ে পড়ে নিচে সমুদ্র-সৈকতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়।

এইভাবে ঐ বিকৃত-কাম জালিয়াত যাদুকরের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

হাসান উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

অনেকক্ষণ সেই পাহাড় চূড়ায় বসে থাকার পর নিজেকে সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে পারে। হাসানের হাতে ছিলো সেই ছোট্ট দামামাটা। মোরগের চামড়া দিয়ে ছাওয়া। সে জানে, বস্তুটা যাদু-মন্ত্রপুত। কিন্তু কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, কিছুই বুঝতে পারে

না। হাসান সে চেষ্টাও করে না। কী করতে কী হয়ে যাবে কে জানে। এই ভেবে দামামাটাকে সে কোমরে ঝুলিয়ে নেয়।

এবার নিচে নামবার উপায় দেখতে হয়। হাসান নিচে তাকায়, মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে ওর। পাহাড়টা এতো উঁচু যে নিচে বড় বড় গাছ-পালাগুলো খুবই ছোট চারার মতো দেখাচ্ছে। মাথার ওপরে হাত বাড়ালেই পেঁজাতুলোর মেঘ।

এই রকম অত্যুচ্চ পাহাড়ের শিখর থেকে অবরোহণ অসম্ভব কাজ। হাসান দেখতে পায় পাহাড়ের একপ্রান্তে অনেক দূরে একটি আগুনের শিখা। জনমানবের চিহ্ন নাই, এখানে আগুন কে জ্বালায়? হাসান ভাবে, তবে কী কেউ আছে ওখানে? কোনও মানুষ?

অতি সন্তর্পণে দেখে-শুনে পা ফেলে হাসান। বিপদ-সঙ্কুল গিরি পর্বত। পথ নাই। তবু নিদারুণ কৌতূহলে ধীরে ধীরে ঐ অগ্নি-শিখাকে লক্ষ্য করে সামনে এগিয়ে চলতে থাকে।

বেশ কিছুটা এগোবার পর হাসান বেশ বুঝতে পারে, আসলে ওটা কোনও আগুনের শিখা নয়, বিশাল স্বর্ণ-প্রাসাদের শিখরে একটি বিরাট গোলাকৃতি গম্বুজ। সূর্যের কিরণে ঐ রকম লেলিহান অগ্নিশিখা বলে ভ্রম হচ্ছে। চার পাশের চারটি সোনার থাম ওকে রক্ষা করে আছে।

ঐ গম্বুজটা লক্ষ্য করে সে চলতে থাকে। কাছে মনে হলেও আসলে অনেক অনেক দূরে। হাসান ভাবতে ভাবতে হেঁটে চলে, হয়তো ঐ প্রাসাদে জিন দৈত্যরা বসবাস করে। যাই হোক, সুলতান বাদশাহ অথবা আফ্রিদি জিন যে-ই থাক সেখানে, আমি যাবোই। হাসান মনে মনে সঙ্কল্প করে। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, খানাপিনার তো একটা সন্ধান দেখতে হবে। আমি প্রাসাদের দ্বাররক্ষীকে বলবো, আমাকে একটুকরো রুটি আর একটু পানি দাও, আমি খাবো। বড় খিদে তেষ্টা পেয়েছে। দেখি, সে কী বলে? যদি ওর প্রাণে দয়ামায়া কিছু থাকে। যদি সে রক্তমাংসের মানুষ হয়, হয়তো দয়া-ধম্মো করে প্রাসাদের এক কোণে একটু মাথা গোঁজার মতো ঠাঁইও দিয়ে দিতে পারে।

হাসান বুকে সাহস সঞ্চয় করে প্রাসাদের সামনে এগোতে থাকে। তবে যা হয় হবে, নসীবে যা লেখা আছে তার বাইরে কিছুই হবে না। সুতরাং ও নিয়ে বৃথা মাথা ঘামিয়ে, ভীত শঙ্কিত হয়ে কী ফায়দা? বরং বেপরোয়া হওয়াই ভালো। তাতে মনের সাহস বাড়ে, দেহে অনেক বেশি শক্তি সঞ্চার হয়।

হাসান প্রাসাদের সিংহদরজায় এসে দাঁড়ায়। একখানা প্রকাণ্ড পান্না পাথরের চাঁই কেটে বানানো হয়েছে এই সুন্দর সিংহদরজাটি।

ফটকে কোনও প্রহরী নাই। হাসান প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় নজরে পড়লো, ফোটা ফুলের মতো সুন্দর দুটি কুমারী কন্যা একটি শ্বেত পাথরের মঞ্চে বসে খুব মনোযোগ সহকারে দাবা খেলছে। এমনই নিবিষ্ট মনে খেলায় মগ্ন ছিলো যে, হাসানের প্রবেশ এবং উপস্থিতি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না ওরা। কিন্তু একটু পরে ছোটটি মুখ তুলে তাকায়। হঠাৎ বাইরের আগন্তুক দেখে অবাক হয়।

বড় মেয়েটিকে সজাগ করে দিয়ে বলে, ঐ দ্যাখ, কী সুন্দর একটি ছেলে! মনে হচ্ছে, সেই বদমাইস বাহূরামের শিকার। কিন্তু কী করে সে ওই শয়তানের হাত থেকে পালাতে পেরেছে, বুঝতে পারছি না।

অন্য মেয়েটি ফিরে তাকায়। হাসানের নিটোল স্বাস্থ্য, নিখুঁত রূপলাবণ্য অপলক মুগ্ধ-নয়নে দেখতে থাকে সে। প্রতি বছরই তো বাহুরাম একটি করে মুসলমানের ছেলেকে চুরি করে নিয়ে আসে এই পাহাড়ে। তার বিকৃত কামনা চরিতার্থ করে। কিন্তু তারা কেউই এর মতো এতো সুন্দর সুপুরুষ ছিলো না।

হাসান ছোট মেয়েটির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। আকুল হয়ে বলে তুমি যা ভেবেছ, আমি তাই, সুন্দরী। শয়তান বাহুরাম আমাকে এনেছিলো এই পাহাড়ে তার বিকৃত কাম-ক্ষুধা মেটাতে। কিন্তু আমার সাহস এবং বিক্রমের কাছে সে হেরে গেছে। তাকে আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি নিচে একেবারে সমুদ্রের উপকূলে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে অক্কা পেয়েছে।

ছোট মেয়েটি বিস্ময়ে চমকে ওঠে, বলো কী? কী সাংঘাতিক কাজ করতে পেরেছ? কত শত ফুলের মতো ছেলেকে ধরে নিয়ে এসে লোকটা শেষ করে দিয়েছে। তুমি তো বাহাদুর পুরুষ, ওই রকম একটা ধূর্ত ধড়িবাজ শয়তানকে খতম করেছ?

মেয়েটি ওর দিদির দিকে তাকিয়ে বলে, দিদি, আজ থেকে একে আমি ভাই বলে মেনে নিলাম।

হাত ধরে হাসানকে সে তুলে ধরে, চলো, আমাদের সঙ্গে থাকবে তুমি। আমরা যা খাব, তাই তুমি খাবে।

হাসানকে সে হামামে নিয়ে যায়। ভালো করে স্নান করায়। বাহারী সাজ-পোশাক পরতে দেয়। তারপর খাবার ঘরে নিয়ে এসে বসায়। তিনজনে মিলে খানাপিনা করে। ছোট বোন জিজ্ঞেস করে, তোমার কী নাম, ভাই?

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চুরাশিতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

—আমার নাম হাসান। আল্লাহর ইচ্ছায় আজ তোমাদের এখানে এসে পৌঁছেছি।

এরপর হাসান তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করে। কী করে বাহুরাম তাকে ধোঁকা দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলো, সেই সব বৃত্তান্ত আগাগোড়া খুলে বললো ওদের।

মেয়ে দুটি ক্রোধে আরক্তবর্ণ হয়ে বলে, ঐ কুত্তার বাচ্চাটাকে পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুমি খুব ভালো কাজ করেছ, ভাই। তা না হলে দোজকের পোকাটা আরও কত শত নিরীহ ছেলের সর্বনাশ করতো কে জানে!

বড় বোন ছোটকে উদ্দেশ্য করে বলে, গুলাবী, তোর ভাইটিকে আমাদের জীবনের কাহিনীটা বল, তাহলে সে বুঝতে পারবে আমরা কে, কেন এখানে আছি।

তখন গুলাবী বলতে শুরু করে ঃ

শোন ভাইসাব, আমরা সম্রাট-নন্দিনী। আমার-নাম গুলাবী, আর দিদির নাম জামিলা। আরও পাঁচটি বোন আছে আমাদের। তারা অবশ্য—আমাদের চেয়েও সুন্দরী। এখন ওরা শিকারে গেছে, তবে তাড়াতাড়িই ফিরবে। আমাদের যে সকলের বড় তার নাম শুকতারা, তার ছোটর নাম সন্ধ্যামণি, তার ছোট—চুনী, পরেরটার নাম পান্না আর সব ছোট—পাপিয়া।

আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান। কিন্তু আমাদের মা ভিন্ন ভিন্ন। আমি আর জামিলা সহোদরা। আমাদের বাবা জিনদের সম্রাট। তিনি ভীষণ উদ্ধত, অহঙ্কারী, অত্যাচারী। সেই কারণে কেউই আমাদের বিয়ে করতে সাহস করেনি, বা রাজী হয়নি। বাবার ধারণা তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যাদের পাণিগ্রহণ করার যোগ্যতা সারা দুনিয়ায় কারো নাই। তাঁর এক পণ, কারও তিনি বিয়ে দেবেন না। এই কারণে তাঁর মন্ত্রীকে বলেছিলেন, 'দুনিয়ার মধ্যে

এমন এক গুপ্তস্থানের সন্ধান করো, যেখানে আমার মেয়েদের নিরাপদে রাখা যাবে। এবং কোনও জিন আফ্রিদি কখনও সন্ধান করতে পারবে না।' 'আমাদের একমাত্র বিশ্বাস, ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করার জন্য। পয়গম্বরের পবিত্র বাণী—কোনও নারীই কুমারীত্ব নিয়ে বাঁচে না। সুতরাং সম্রাট যদি তাঁর কন্যাদের চিরকুমারী করেই রাখেন, তা কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হবে। এবং কন্যাদের জীবন গভীর দুঃখের মধ্যে কাটবে।' কিন্তু আমাদের বাবার সেই এক গোঁ। তিনি বললেন, বিবাহিত দেখার আগে ওদের আমি মরা-মুখ দেখবো। এই মুহূর্তে এখনি যদি তুমি ওদের লুকিয়ে রাখার মতো কোনও গুপ্ত-গৃহের ব্যবস্থা না করতে পারো, তোমার গর্দান নেব আমি। উজির তখন নিরুপায় হয়ে বললো, সম্রাট যদি এমনই ধনুভাঙ্গা পণ করেন তবে আমি নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করছি। মেঘমালা পর্বতে এক স্বর্ণ-প্রাসাদ আছে। জনমানবের অগম্য সেই স্থান। দুর্গের মতো সুরক্ষিত। বহু প্রাচীন কালে সম্রাট সুলেমানের বিদ্রোহী সেনাপতিরা এই দুর্গম পর্বত-শিখরে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের পুনর্বাসনের জন্য এক মনোহর সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলো। সেই থেকে সে প্রাসাদ জন-মানবশূন্য পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। বড় মনোরম পরিবেশে তৈরি করা হয়েছিলো প্রাসাদটি। চমৎকার জল-হাওয়া, একেবারে চির-বসন্ত। যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, লতাগুল্ম গাছপালার নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী। হাজারো রকম ফুল ফলের সে কী সীমাহীন সমারোহ। কোথাও নিরন্তর নির্ঝর ঝরনা নিরবধিকাল ধরে ঝরে চলেছে। কোথাও পাহাড়ের ছোট নদী এঁকে বেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে দূর-দূরান্তরের কোনও এক দুর্গম গুহার অন্ধকারে। সে-নদী, জল, সে-ঝরনার জল বরফের মত শীতল, মধুর মতো মধুর।'

বাবা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না। তাঁর দুই বিশ্বস্ত অনুচর জিন ও মরিদস্‌কে দিয়ে এই প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের। আমাদের পৌঁছে দিয়েই ওরা আবার ফিরে গেলো বাবার সাম্রাজ্যে।

সেই থেকে আমরা এখানে আছি। উজিরের প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমাদের এই প্রাসাদ-পরিবেশ বড়ই সুন্দর। চারদিকে ফুলে ফলে ভরা। ঝরনা আর ছোট নদীর ছড়াছড়ি। এখানকার আকাশে-বাতাসে ফুলের সুবাস। পাখিদের গান শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। আবার ওদের কল-কাকলীতে জেগে উঠি। এখানে মানুষের কোলাহল, বিদ্বেষ বিভেদের হলাহল নাই। আছে ফুলে ফুলে মধু, পাখির কুজন, আর ঝরনার কলতান। এখানে শীতের কাঁপুনি নাই। এখানে গ্রীষ্মের দাবদাহ সহ্য করতে হয় না। এখানে চিরকাল বসন্ত জাগ্রত, সামনেই সরোবর। সারাদিন হাঁসেরা খেলা করে। এই পাহাড়ের নাম মেঘমালা। আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। বিশ্ব সংসার আঁধার হয়ে যায়। তখন, ময়ূরেরা পেখম মেলে, সে দৃশ্য তুমি দুনিয়ার আর কোথায় দেখতে পাবে? আর ঐ যে দেখছো, কত নাম না জানা হরেক রঙের পাখি—আমরা ভাবি, লাল নীল গোলাপী, প্রবাল, মুক্তো, চুনী পান্নার মতো এতো হাজারো রকম সুন্দর সুন্দর রঙ ওরা পেলো কোথায়। দিনের পর দিন বছরের পর বছর দেখেও পুরনো হয় না ওরা—মনে হয় একেবারে আনকোরা নতুন।

আমরা বেশ আছি। সুখে আছি এখানে। ঈশ্বরের কাছে একটাই আমাদের প্রার্থনা ছিলো, তাও আজ পূরণ করে দিলেন তিনি। আমরা চেয়েছিলাম অন্ততঃ একজন পুরুষ সঙ্গী। তা তিনি আমাদের আশার অতিরিক্ত দিয়েছেন। তোমার মতো অলোক-সামান্য সুপুরুষ—সঙ্গী হিসাবে এতোটা আশা করি না আমরা।

কিছুক্ষণ পর অন্য পাঁচ বোনেরা এসে গেলো। গুলাবী এক এক করে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলো, আজ থেকে হাসান আমাদের ভাইজান, বুঝলে?

সকলে হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে, আমরা সাত বোন আর, তুমি আমাদের মাথার মণি একটিমাত্র ভাই।

হাসানের আর কোনও দুঃখ থাকে না। এক অবর্ণনীয় আনন্দে ভরে ওঠে মন। আর কী আশ্চর্য, এতোগুলো ভরা-যৌবনের কন্যা তাকে ঘিরে আছে, অথচ মনের নিভৃত কোণেও এতোটুকু যৌবন-চঞ্চলতা অনুভব করে না সে।

ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পঁচাশিতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

হেসে খেলে নেচে গেয়ে বেড়িয়ে শিকার করে বড় সুন্দরভাবে দিনগুলো কেটে যেতে থাকে। হাসান এক নতুন জীবনের, নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছে। জীবনের সুধাপাত্র কানায়-কানায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। কোনও অভাব-অভিযোগ দুঃখ সন্তাপের লেশ মাত্র নাই আর। এখানে এসে যে আনন্দ, যে সুখ, সে শান্তি সে পেয়েছে—কামনা-বাসনা-কলুষিত মাটির পৃথিবীতে তা কল্পনাও করা যায় না।

হাসান তার দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা বলে। মেয়েরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শোনে। সেই রকম মেয়েরাও তাদের নিজের দেশের, নিজের জাতের জিন আফ্রিদিদের বিচিত্র কাহিনী শোনায়। হাসান শুনতে শুনতে অবাক হয়, মজা পায়। আবার ভয়ে শিউরেও ওঠে কখনও।

সব মেয়েরাই তাকে খুব ভালোবাসে। আদর যত্ন করে। বিশেষতঃ ছোটটি গুলাবী হাসানকে আরও বেশি আপন করে নিতে চায়।

একদিন ওরা দল বেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছিলো। এ-বনে ও-বনে অনেক ঘুরলো, শিকার করলো। তারপর এক সরোবরের ধারে পা ছড়িয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশাপাশি বসে নানা গল্পে মশ্‌গুল হয়ে উঠলো।

হঠাৎ একসময় ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জনের মতো তাণ্ডব নিনাদ শুনতে পেয়ে সকলে সামনের দিকে ভয়ার্থ চোখে তাকায়! ধূলি-ধূম্রজালে ঢেকে আসতে থাকে সারা আকাশ। নিমেষের মধ্যে কালো অন্ধকার নেমে আসে। গুলাবী ভয়ে আর্তনাদ করে হাসান-এর হাত ধরে টেনে তোলে, শিগ্গির ওঠ, আর এক পলক এখানে নয়।

প্রায় একরকম জোর করেই হাসানকে টেনে হিঁচড়ে সে নিয়ে আসে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের ফুল-বাগিচায়। একটা ঝাউ-এর ঝোপের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে বলে, চুপ! কোনও সাড়া শব্দ করবে না। নড়বে না চড়বে না একটুও। এখুনি সম্রাট জিনিস্থানের বিশাল জিন সৈন্যবাহিনী এখানে এসে নামবে। এই ধূলিধূম্রজাল তারই ইঙ্গিত। প্রতি বছর আমাদের দেশে বাবার প্রাসাদে এক বিরাট উৎসব হয়। সে উৎসবে দেশ-বিদেশের অনেক জিন আফ্রিদি রাজারা আমন্ত্রিত হয়ে আসে। বাবা বছরে ঐ একটিবার আমাদের নিয়ে যান সেখানে। কিন্তু পাছে আমরা কোনও পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত হই, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে আমাদের নিয়ে যান। উৎসব শেষ হলে আবার আমরা ফিরে আসবো। কিন্তু ভাইজান, এই ক'টা দিন তোমাকে একা একা কাটাতে হবে। এইভাবে এখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তোমাকে ফেলে যেতে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে আমাদের। কিন্তু কী করবো বলো। সম্রাটের আদেশ—না গিয়ে উপায় নাই।

বিদায়বেলায় মেয়েরা চোখের জল ফেলতে থাকে। ছোট বোন একটা চাবির গোছা হাসানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, সব ঘরের তালার চাবি আছে এতে। ইচ্ছে হলে যে-কোনও ঘর খুলতে পার। কিন্তু সাবধান, ঐ যে দেখছো পাশের ঐ ঘরটা—ভুলেও কখনও ওদিকে যেও না। ও -ঘর খোলার চেষ্টা করো না, ভাইজান। তোমাকে ভালো করে বোঝাবার

জন্য ও-ঘরের এই চাবিটায় দেখ, একটা মার্কা করে রেখেছি। এই চাবিতে খোলা যাবে ও-ঘরের তালা। কিন্তু ভাইটি আমার, ওদিকে পা মাড়িও না।

—অন্য আর সব ঘরে যেও। খানাপিনা অঢেল আছে। ইচ্ছে মতো খেও। ক'টা দিন একটু কষ্ট করে কাটাও। আমরা শিগ্গিরই ফিরে আসবো, কেমন?

হাসান হাত পেতে চাবির গোছাটা নেয়। ঘাড় নেড়ে বলে, আমি তোমাদের ফেরার পথ চেয়েই বসে রইলাম, বোন। আমার কোনও কষ্ট হবে না। আর হলেও, আবার তোমাদের ফিরে পাবো সেই আশাতেই সব সইতে পারবো।

নীরব নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিঃসঙ্গ জীবন কাটতে থাকে হাসানের। দুঃখ বেদনায় টনটন করে ওঠে হৃদয়। কবে ওরা ফিরবে, আবার কবে হাসি কল-গানে মুখর হয়ে উঠবে তার জীবন, সেই ভেবে ভেবে সময় আর তার কাটতে চায় না।

সারাটা দিন সে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায় পাখির গান শোনে, ফুলের শোভা দেখে, ঝরনার সঙ্গে খেলা করে। কিন্তু রাত আর ফুরায় না। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ায়। কত রকম বাহারী-বাহারী খানাপিনা। হাসানের মুখে রোচে না।

চোখে ঘুম আসে না। একা একা পালঙ্ক-শয্যায় শুয়ে ছটফট করে হাসান। নাঃ, আর ভালো লাগে না। মনের মধ্যে একটা নিষিদ্ধ বাসনা কুরে কুরে খায়। হাসান ভাবে, ঐ ঘরে ঢুকতে বারণ করে গেছে কেন গুলাবী? কী আছে ও-ঘরে? বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। পায়ে পায়ে সেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। চাবিটা নিচে নাড়া-চাড়া করে। খুব ইচ্ছে হয়, খুলতে। কিন্তু গুলাবীর সেই কাতর অনুনয় মনে পড়ে। ওর কাজল-কালো চোখের মিনতি সে ভুলবে কী করে? নাঃ, না না, সে খুলবে না। কাজ নাই খুলে। বারণ যখন করে গেছে, কী হবে তার কথা অমান্য করে, দ্রুত পায়ে আবার ফিরে আসে শোবার গরে। সটান শুয়ে পড়ে শয্যায়। মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে ওই অহেতুক কৌতূহল।

কিন্তু যা করতে বারণ করা হয়, যা না দেখতে বলা হয় এবং যা শুনতে দেওয়া হয় না—তার প্রতি মানুষের সহজাত অদম্য কৌতূহল অনেক বেশি। হাসান আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। কী আছে ঐ ঘরে—তাকে দেখতেই হবে। কেন বারণ করে গেছে গুলাবী? হাসানের কোনও বিপদ হবে বলে? তা হোক, মরার বাড়া তো বিপদ নাই। যদি জানও কবুল করতে হয় তাও সে করবে। কিন্তু দেখবে, ঐ ঘরে কী আছে? কেন ঢুকতে নিষেধ করে গেছে সে?

এবার সে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ঐ দরজার দিকে এগোয়। চাবি দিয়ে খুলে ফেলে কুলুপ।

ভিতরে ঢুকে কিছুই দেখতে পায় না প্রথমে। সব যেন কেমন কালো অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে সব। ঘরে আসবাব বলতে কিছু নাই। না আছে একখানা কুর্শি কেদারা, না আছে খাট পালঙ্ক। গালিচা পর্দা কিছুই চোখে পড়ে না। অবশেষে এক প্রান্তে দেওয়ালে দাঁড় করানো একখানা কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়িটা যেখানে ছাদে গিয়ে ঠেকেছে সেই জায়গাটায় মানুষ গলার মতো একটা ফোকর। হাসান বাতিটা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু না, নিচে থেকে কিছু দেখা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে ওঠে। ফোকরটা দিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে দেয়।

মাথার ওপরে উন্মুক্ত আকাশ। নিচে সমতল ভূমি, ফুটফুটে চাঁদের আলোয় ভরে গেছে দশ-দিগন্ত। সামনে বিশাল ফুলের বাগিচা। কত নাম না জানা বাহারী ফুল—চাঁদের আলোয় হাসছে। যতদূর চোখ যায়—শুধু প্রকৃতির অপার সুন্দর সাজে বনরাজি নীলা।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো ছিয়াশিতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

অদূরে একটা সরোবর। কানায় কানায় ভর্তি স্বচ্ছ নীল নিস্পন্দ জলরাশি। যেন মনে হয়, ঘুমে গলে গেছে। পুকুরের পাশে নানা জাতের বিরাট বিরাট গাছপালা। মৃদু-মন্দ সমীরণে পাতার মর্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। বাদাম গাছের মাথায় চাঁদের আলো বরফের আস্তরণ ফেলেছে। অদূরে কোনও তরুশাখায় রাতজাগা পাখি একই আওয়াজের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। পুকুরের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একখানা প্রাসাদ। প্রাসাদের ভেতর থেকে পুকুরের ঘাট পর্যন্ত নেমে এসেছে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি। ঘাটের দু'পাশে সারি সারি স্ফটিকের থাম। সিঁড়ির ধাপগুলো প্রবাল আর পান্না দিয়ে তৈরি। এবং ধারগুলো সোনা দিয়ে বাঁধানো। ওপরে পাতা একখানা চন্দন কাঠের সিংহাসন। সিংহাসনের মাথায় সোনার রাজছত্র। ঘাটের প্রবেশ দ্বারের ওপরে এক আঙ্গুর কুঞ্জ। তার লতাপাতা সবই সোনার। আঙ্গুরগুলো মুক্তোর। সারা চত্বরটা চাঁদী আর সোনার জরিতে বোনা এক পর্দা দিয়ে ঘেরা। এমন সুন্দর বস্তু ধরায় কেউ কল্পনা করতেও পারে না।

হাসান হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। এক অজানা আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করে ওঠে।

এক ঝাঁক পাখি উড়তে উড়তে পুকুরের পাড়ে এসে বসে। বিরাট বিরাট সব দেখতে। সংখ্যায় মোট দশটি। সাদা ডানাগুলো ঘাসের ওপর ঘসতে ঘসতে ঘাটের কাছে আসে। ওদের মধ্যে যে বয়সে প্রবীণ সে ঐ সিংহাসনে উঠে বসে।

পাখিগুলো প্রবল বেগে পাখা ঝাপটাতে থাকে। এবং একটু পরে পাখার খোলসের ভেতর থেকে দশটি পরমাসুন্দরী বিবসনা তরুণী হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসে। মেয়েগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গী করে সাঁতার কাটতে থাকে।

এক সময় সাঁতার ও স্নান শেষ করে ঘাটে উঠে আসে। ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি সিংহাসনে গিয়ে বসে। দীর্ঘায়িত কেশদাম ছাড়া তার দেহে আবরণ বলতে অন্য কোনও বসন ছিলো না।

হাসান বিচলিত বোধ করে। দেহে রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখন সে বুঝতে পারছে, গুলাবী কেন তাকে এই দরজা খুলতে নিষেধ করেছিলো।

মেয়েটি আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি। ওর দেহের কোথাও কোন খুঁত নাই। নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া এক নিভাঁজ নিখাদ শিল্পকর্ম। সে সম্পূর্ণ নিরাবরণ। তার গভীর কাজল-কালো চোখেও কীসের যাদু! হাসান আর স্থির থাকতে পারে না। ওর অধর কপোল, পীনোন্নত স্তন, ক্ষীণ কটি, ভারি নিতম্ব, পাথর কুঁদা জঙ্ঘা, উরু—সব মিলে সে-কি এক অপরূপ ছন্দ।

সম্রাজ্ঞীর মতো ভঙ্গী করে সে পা ছড়িয়ে কনুই-এ ভর দিয়ে অর্ধশায়িত হয়ে থাকে। ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে ।

পাঁচশো সাতাশিতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সম্রাজ্ঞীর সঙ্গী-সাথীরা এক গোছা সোনার জরি ঝালর এনে ওর কাঁধের ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেহের নিম্নাঙ্গ কিছুটা আচ্ছাদিত করে দেয়। মাথায় পরিয়ে দেয় নানা রত্ন খচিত একটা স্বর্ণমুকুট। কোমরে জড়িয়ে দেয় একখানা সুক্ষ্ম কাজ করা সুবর্ণ পেটিকা। এইবার সে আরও মোহিনী রূপ ধারণ করে।

হাসান এতক্ষণ একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো। এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না সে। এগিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে।

এমন সময় শুনতে পায় হাসান, মেয়েদের মধ্যে একজন বলে, রাজকুমারী, ভোর হয়ে আসছে। এবার আমাদের যেতে হবে। দূর দেশের পথ, এই সময় না বেরুলে সকাল হয়ে যাবে!

আবার ওরা পালকের পাখাগুলো পরে নিয়ে দূর নীল আকাশে উঠে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওরা দৃষ্টির ওপারে চলে যাওয়ার পরও হাসান ঊর্ধ্বাকাশের দিকে এক ভাবে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। যদি কোনও ভাবে আবার নজরে আসে। কিন্তু নীল আকাশ আর পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। হাসানের হৃদয় বিদারিত হতে থাকে। বহু সুন্দরী মেয়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য সে পেয়েছে। কিন্তু কেউ তাকে এইভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। বুকের মধ্যে কী এক দুঃসহ অনুভূতি। কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। সাতটি পরমাসুন্দরী কন্যা তার হৃদয়ের যে বস্তুতে সাড়া দিতে পারে নি, এই মেয়েটি অনায়াসে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তা চুরি করে পালালো কী উপায়ে?

নিজের ঘরে ফিরে আসে হাসান। সারাদিন ধরে নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে ঐ রাজকন্যার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে সে।

আবার রাত্রি নামে। সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আবার সে ওপরে উঠে আসে। এক ঠায় দাঁড়িয়ে পুকুরের ঘাটের দিকে তাকিয়ে রাতের প্রহর গুণতে থাকে।

কিন্তু সে রাতে তারা আর আসে না। আসে না তার পরের রাতেও। তারপর এক এক করে অনেক রাত আসে যায়। কিন্তু তারা আর আসে না। হাসান আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। সারা দিনে রাতে তার একই ধ্যান জ্ঞান। দারুণ অসহ্য প্রেমানলে জ্বলতে থাকে সে। এর চেয়ে মৃত্যুও যে অনেক ভালো ছিলো।

এইভাবে হাসানের যখন মৃতকল্প দশা, তখন একদিন সেই সপ্ত কন্যারা ফিরে এলো। বাইরের সাজপোশাক না খুলেই ছোট মেয়ে গুলাবী ছুটে এলো হাসানের ঘরে। দেখতে পেলো সে, হাসান বিবর্ণ হয়ে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে প্রায়। চোখ দু'টো আধ বোজা। অঝোর ভাবে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

গুলাবী হাসানকে দু'হাতে টেনে তোলার চেষ্টা করে, ভাইজান, কী হয়েছে? তোমার জন্যে ভাবনার আমার অন্ত ছিলো না। না জানি, কেমন আছ তুমি? শেষে, যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হলো? যাই হোক, কী হয়েছে খুলে বলো দেখি। আমি সব ঠিক করে দেব, বলো ভাইটি।

হাসান শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কোনও কথা বলতে পারে না। গুলাবীও কাঁদতে থাকে। বার বার বলে, আমাকে তোমার দুঃখের কারণটা বলো, ভাই। দেখ, আমি তার কিনারা কিছু করে দিতে পারি কি না।

অনেকক্ষণ পরে হাসান বলতে পারে, আমি সাধ করে মরেছি। দোষ আমার। তুমি কী করে বাঁচাবে, বোন? যাক যে ভুল আমি করেছি, তার চারা নাই। এবার আমাকে নীরবে মরতে দাও।

গুলাবী এবার আর্তনাদ করে ওঠে, এসব কী অলুক্ষণে কথা মুখে আনছ ভাই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেব। তা যদি না পারি, তোমার আগে তোমার এই বোনটিই দেহ রাখবে—এই বলে দিলাম।

হাসান বলে, শোনো বোন, আজ দশটা দিন আমি মুখে একটা দানা তুলতে পারিনি। রাতে ঘুমোইনি।

এরপর সমস্ত ঘটনা গুলাবীকে বলে।

ভোর হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো অষ্টাশিতম রজনী ঃ আবার সে বলতে থাকে ঃ

রাগ করবে কী—হাসানের বিরহ-বেদনার কাহিনী শুনে অনুকম্পা জাগে গুলাবীর। হাসানকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, নিজেকে শান্ত করো ভাইজান। চোখের পানি মুছে ফেলো। আমি ভরসা দিচ্ছি, তোমার কল্পলোকের মানসীকে আমি এনে দেব তোমার হাতে। জানি না সে মেয়ে কে? কী তার রুচি প্রকৃতি পরিচয়! তবু তুমি যখন চাইছ, আমি আমার জীবন তুচ্ছ করেও এ-কাজ করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কিন্তু একটা কথা—এ ব্যাপারটা আমার অন্য সব বোনদের কাছে গোপন রাখতে হবে। ওরা যদি শোনে, বারণ করা সত্ত্বেও তুমি ঐ দরজা খুলে বাইরে গিয়েছিলে, তা হলে বিশ্রী ব্যাপার হবে। তার চেয়ে কোনও কথা বলার দরকার নাই। ওরা জানতে পারলে আমাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবে। ওরা যদি তোমাকে ঐ নিষিদ্ধ দরজার কথা জিজ্ঞেস করে বলবে, ওর ধারে কাছে যাওনি।' যদি জানতে চায়, 'তবে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কেন?' বলবে, 'তোমরা চলে যাওয়ার পর থেকে এই দশা হয়েছে।'

হাসান বলে, বাঃ চমৎকার। ঠিক আছে, আমি ঐ রকমই বলবো ওদের।

হাসান অনেকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এর প্রধান কারণ, গুলাবী ভরসা দিয়েছে, তার মানসীকে পাইয়ে দেবে। এবং অন্য কারণ, নিষেধ সত্ত্বেও ওই দরজা খোলায় সে রাগ করেনি। হাসান বলে, আমাকে কিছু খেতে দাও, বোন।

গুলাবী ওর দিদির কাছে যায়। বলে, হাসান আজ দশ দিন অসুস্থ ছিলো। খানাপিনা কিছুই করেনি। এখন সে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। খিদেও পেয়েছে। চলো, ওকে কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থা করি, বেচারা আমাদের অদর্শনে কাতর হয়ে পড়েছিলো। স্বদেশ স্বজন ছেড়ে এখানে একা একা পড়ে থেকে সে কাহিল হয়ে পড়েছে। চলো, যাই, আমরা ওকে একটু সঙ্গ দিয়ে আবার হাসি আনন্দে মাতিয়ে রাখি।

মেয়েরা নানারকম খানাপিনা এনে টেবিলে সাজায়। হাসানকে সঙ্গে নিয়ে হৈ হল্লা করে খায়। কেউ গায়, কেউ নাচে—আবার জমজমাট হয়ে ওঠে স্বর্ণপ্রাসাদ। অল্প সময়ের মধ্যে হাসান আবার হাসিখুশি প্রাণবন্ত হয়।

দু একদিন পরে মেয়েরা শিকারে যায়। যায় না শুধু গুলাবী। সে বলে, হাসানের কাছে একজন থাকা দরকার। তোমরা যাও, আমি ওকে দেখবো।

গুলাবী হাসানকে সঙ্গে করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে। পুকুর পাড়ের ঘাটের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে হাসানকে প্রশ্ন করে,ত এখন বলো তো ভাইজান, তোমার মানসী ঘাটের কোন্ জায়গায় বসেছিলো সে রাতে?

হাসান বলে, ঐ যে ঐ চন্দনকাঠের সিংহাসন দেখছো—ঐ সিংহাসনে সে বসেছিলো—সাম্রাজ্ঞীর মতো ভঙ্গী করে।

গুলাবী শিউরে ওঠে, বলো কী! ও যে এক জিন-সম্রাটের কন্যা! সারা পৃথিবীর চার ভাগের একভাগ তার দখলে। আমার বাবাও অনেক বড় সম্রাট। কিন্তু সে তো আরও অনেক বড়। এক সময় আমার বাবা তার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তুমি যে চাঁদে হাত বাড়িয়েছ, ভাই?

গুলাবী বলতে থাকে ঃ ওর বাবার এক দল নারী সাগরেদ আছে। ওরা প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা—সেনাপতি। ওদের এক-একজনের অধীনে পাঁচ হাজার করে নারী-সেনার এক একটা বিশাল বাহিনী আছে।

জিন সম্রাটের সাতটি কন্যা। এইটিই সবচেয়ে ছোট। এবং পরমাসুন্দরী। ওর নাম রোশনি। প্রতি পক্ষের প্রথমায় ওর বাবার দরবারের উজির আমিরদের কন্যাদের সহচরী করে সে এ সরোবরে সাঁতার কাটতে আসে। ঐ যে পালকের ডানাগুলো ওরা খুলে যখন জলে

ঝাঁপ দেবে সেই সময় টুক করে রোশনির ডানা দু'খানার খোলসটা সরিয়ে ফেলতে হবে তোমাকে। এই ডানার খোলস যাদুমন্ত্রপুতঃ। পরে নিলে তবেই আকাশে ওড়া যায়, নচেৎ নয়।

চুরি করে এই গাছের আড়ালে তুমি ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর জলকেলী শেষ করে সে যখন ওপরে উঠে দেখবে ডানা নাই—তখনই মজাটা জমবে ভালো। তোমাকে আর কিছু কসরত করতে হবে না। আপসে আপসে তোমার কব্জায় এসে যাবে। কিনতু খুব সাবধান, অনেক ছলাকলা করে সে তোমাকে ভোলাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু মেয়েমানুষের ছলচাতুরীতে ভুলে একবার যদি তাকে ফেরত দিয়ে দাও তার ডানার খোলস, তবে সব রসাতলে যাবে। তুমি তো মরবেই, সেই সঙ্গে আমরাও বাঁচবো না। ওর বাবার আক্রোশে আমার বাবার সাম্রাজ্যও ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। ওর কোনও মিঠে কথা কানে তুলবে না। বরং সব সময় কড়া তাঁবে রাখবে। যাতে সে তোমাকে ভয় পায়, এবং বাধ্য থাকে। তারপর যা ঘটে ঘটবে।

ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো ঊননব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

হাসান খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে। গুলাবীর হাতে সে ঠোঁট স্পর্শ করে চুম্বন করে। বলে, তোমার মাথা আছে বলতে হয়। এক চালেই বাজিমাৎ হয়ে যাবে, বোন।

গুলাবী বলে, আহা আগে থেকেই অত আশা করতে নাই। শেষে ভরাডুবি হলে দুঃখটা বেশি করে বাজে,বুঝলে।

এরপর ওরা আবার নিচে নেমে আসে।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রতিপদের চাঁদ ওঠার দিন। হাসান সন্ধ্যা হতে না হতেই পুকুরের পাশে ঘাটে এসে উঁচু মঞ্চের পিছনে এসে লুকিয়ে পড়ে। রাত বাড়ে। এক সময় ঐ দশটি পাখি এসে নামে পুকুরের পাড়ে। ওরা ডানার খোলসগুলো ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই মওকায় হাসানও রোশনির খোলস সরিয়ে নিয়ে যায় এক গুপ্ত স্থানে। নিজেও লুকিয়ে থাকে একটা গাছের আড়ালে।

জলকেলী শেষ করে সকলে ঘাটে উঠে আসে। কিন্তু রোশনি আর তার নিজের ডানা-খোলস খুঁজে পায় না। আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠে সে। কপাল চাপড়াতে থাকে, চুল ছিঁড়তে থাকে। দারুণ হতাশায় সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

অন্য মেয়েরা এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে ওঠে। যে যার নিজের নিজের ডানাগুলো চটপট পরে নিয়ে আকাশ পথে উঠে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের রাজকুমারী অসহায় অবস্থায় পড়ে রইলো সেখানে—সেদিকে কেউই কোনও ভ্রূক্ষেপ করে না। ওরা বুঝেছে, বাইরের কোনও অজানা শত্রু ওদের পিছনে লেগেছে। প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারলে বাঁচা দায় হবে।

রোশনি সহচরীদের এই অশোভন স্বার্থপর আচরণে ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে ফুঁসতে থাকে, ঠিক আছে, এর প্রতিফল তোদের পেতে হবে একদিন।

হাসান আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বিবসনা সুন্দরীর দিকে সে ধাবিত হয়। মেয়েটি ছুটে পালিয়ে যায় পুকুরের অপর পাড়ে। ওর চোখে মুখে সে কী নিদারুণ ভয় আর লজ্জা। হাসান চিৎকার করে বলে, শোনো পিয়ারী আমাকে ভয় করার কিছু নাই। কাছে এসো, আমি তোমার কোনও ক্ষতি করবো না।

কিন্তু সে কথা সে কানে তোলে না। কোনও রকমে দু'হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকার

ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে ছুটে চলে। হাওয়ার দাপটে ওর লম্বা চুলের রাশি পতাকার মতো পতপত করে উড়তে থাকে। হাসান পিছনে পিছনে দৌড়তে দৌড়তে এক সময় রোশনির চুলের গোছা মুঠি করে ধরে ফেলে, আহা পালাচ্ছ কেন? আমি কী বাঘ, না ভালুক যে খেয়ে ফেলবো?

মেয়েটি হাত পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করে নিজেকে ছাড়াবার কায়দা কসরৎ চালায়। কিন্তু হাসানের বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে আর বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। টানতে টানতে এনে তার নিজের ঘরে তালা বন্ধ করে ফেলে। তারপর ছুটে যায় গুলাবীর কাছে। এমন শুভ সংবাদ আগে তো তাকেই জানাতে হবে।

গুলাবী হাসানের কামরায় এসে দেখে, মেয়েটি নিদারুণ দুঃখে হতাশায় কপাল বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কান্নাকাটি করছে। সে ওর পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বলে, আপনি মহারানী। আমাদের ঘরে যখন একবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এখানে থাকুন ঘর আলো করে—এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

রোশনির ভুরু নেচে ওঠে, ওঃ, তুমি গুলাবী! তা হলে এইসব ফন্দী তোমারই! তাই বলি, মাটির মানুষ এখানে আসবে কী করে? এতক্ষণে বুঝলাম তোমারই সব ষড়যন্ত্র। তোমার বাবা যাঁর গোলামী করেছে সেই জিন-সম্রাটের কন্যা আমি। আর আমাকে কিনা তুমি একটা মানুষের বাচ্চার যৌন-কামনার শিকার বানাবার জন্য ফাঁদ পেতেছিলে? ঠিক আছ—দেখা যাবে। তুমি তো জান গুলাবী, আমার বাবার কী বিক্রম। তামাম দুনিয়ার তাবৎ জিন সম্রাট তার অনুদাস মাত্র। সেই বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বাঁধবার সাধ হয়েছে তোমার? তুমি কী জান না, আমার বাবার এক ইশারায় লাখো লাখো সৈন্য গগনমণ্ডল ছেয়ে ফেলতে পারে। তুমি এক জিন-সম্রাটের কন্যা হয়ে একটা মানুষের সন্তানকে আশ্রয় দিয়েছ? একথা শুনলে আমাদের সমাজে তোমার বা তোমার বাবার কী দশা হবে একবার ভেবেছ? তার উপর আমার সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা—কি ভেবেছ, অত সহজেই আমি ভুলে যাব? তোমার সহায়তা ছাড়া, কোনও মানুষের পক্ষে কী সম্ভব ছিলো আমার জলকেলীর সরোবরের পথ সন্ধান করা?

গুলাবী গলায় মধু ঢেলে রোশনির মন ভোলাবার চেষ্টা করে, রাজকুমারী, আপনার পিতা আমার পিতার মালিক। সুতরাং তিনি আমার মালিকের মালিক। আপনি তার কন্যা। আপনার মতো রূপসী নারী তামাম জিন দুনিয়ায় দুটি নাই। জলকেলীর সময় এই অবোধ যুবক আপনার অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বিধাতা পুরুষ কার ভাগ্যে কী লিখে রেখেছেন আগে থেকে কেউ আমরা তা বলতে পারি না। তা না হলে দুনিয়াতে এতো নারী থাকতে সে মাটির দেশের মানুষ হয়ে আপনার মতো এক জিন-পরীর প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়বে কেন? নিশ্চয়ই, বুঝতে হবে, এর পিছনে অদৃশ্য ঈশ্বরের কোনও হাত আছে। আপনি একটু গভীরভাবে ভাবার চেষ্টা করুন রাজকুমারী। ঈশ্বরের অভিপ্রায় না থাকলে এই ধরনের অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছুতেই ঘটতে পারতো না।

—ভালোবাসার অপরাধ সর্বদা মার্জনীয়। সে দিক থেকে এই যুবকের গোস্তাকি আপনি মাফ করতে পারেন। আমি হলফ করে বলতে পারি, শুধু চোখের নেশা নয়, এর মহব্বৎ সাচ্চা সোনা। আপনাকে সে দিল-ক্যা-প্যার করেই রাখতে চায়। আপনি প্রসন্ন হোন। এর ভালোবাসা গ্রহণ করে দেখুন, সেখানে কোনও খাদ নাই। আপনারও ভালো লাগবে একে। আপনিও প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতে পারবেন। আপনি শুনে অবাক হবেন রাজকুমারী এক পক্ষ আগে আপনাকে প্রথম দেখার পর থেকে এই পনের দিন সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আপনার বিরহে কাতর হয়ে শয্যা নিয়েছিলো। আপনাকে না পেলে এর জীবন ব্যর্থ হয়ে

যাবে। এবং বিরহ জ্বালাতেই মৃত্যু হবে।

গুলবী আরও সবিস্তারে হাসানের হৃদয় যন্ত্রণার বিষাদ করুণ চিত্র তুলে ধরে রোশনির সামনে। এবং বলে, আপনারা দশ জন ছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই পরমাসুন্দরী। কিন্তু ভেবে দেখুন, রাজকুমারী, এ কিন্তু কোনও নারীর দিকে কোনও নজর করেনি। এর একমাত্র কাম্য আপনি আর আপনার মহব্বত।

রোশনি বুঝতে পারে, যুবকের উদ্দেশ্য অসৎ নয়। এতক্ষণে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো নব্বইতম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

জমকালো সাজ-পোশাকে সাজিয়ে রোশনিকে খানাপিনা এনে দেয় গুলাবী। অনেক আদর-আপ্যায়ন তোয়াজ করতে থাকে সারাক্ষণ। রোশনি-সুন্দরী খুশি হয়ে ওঠে, আমিও ভাবছি গুলাবী, এই বোধহয় করুণাময়ের ইচ্ছা ছিলো! তা না হলে আমার স্বদেশে, বাবা আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে এই দূর প্রবাসে এসেই বা এমন কঠিন পরীক্ষার সামনা-সামনি হব কেন? এখন নসীবের কাছে নতি স্বীকার ছাড়া গতি কী?

গুলাবী হাসানের কাছে গিয়ে বলে, এবার যাও, এই উপযুক্ত সময়। ওর মনটা বেশ নরম হয়ে আছে। প্রথমে ঘরে ঢুকেই ওর পা দু'খানা জড়িয়ে ধরবে। তারপর ওর হাত এবং কপালে চুমু খাবে। এর আগে পর্যন্ত একটি বাক্য উচ্চারণ করবে না, মনে থাকে যেন।

হাসান ঘরে এসে কাঁপতে থাকে। রোশনি এগিয়ে আসে কাছে। অপলক নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সে হাসানকে। হাসান বড় রূপবান যুবক। খুশিতে ভরে ওঠে ওর মন। নিচে বসে পড়ে রোশনির পা দু'খানা চেপে ধরে হাসান। চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেয়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম হাতে এবং পরে ওর চোখে কপালে এবং পরিশেষে অধরে অধর রাখে।

তুমি সুন্দর—সবচেয়ে সুন্দর, রূপের রানী—আমার দিল-ক্যা-প্যার। আমার আনন্দ, আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান—চোখের মণি রোশনি—! আমার ওপর একটুখানি সদয় হও, সোনা। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি। আমার এই জীবন-যৌবন—সব বিলিয়ে দিতে চাই তোমার পায়ে। শুধু একটু খানি ভালোবাসো। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো—আমি তোমার বান্দা হয়ে থাকতে চাই, রোশনি তুমি একটুখানি সদয় হও। আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না, ভালোবাসতে চাই, প্যার করতে চাই। শাদী করতে চাই তোমাকে।

আমি তোমাকে আমার স্বদেশ বাগদাদে নিয়ে যাবো। সেখানে তুমি আমার বেগম হয়ে থাকবে। দাস দাসী খোজা নফর চাকর তোমার সেবা-যত্ন করবে। তোমার জেল্লায় ঘর ভরে উঠবে আমার। বাগদাদ বলতে শান্তির শহর বোঝায়। সেখানকার বাসিন্দা কলহ-বিবাদ জানে না। দেখবে, সেখানকার মানুষজন কত ভালো, কত ধার্মিক। আমার মা আছে, তার মতো ভালো মানুষ আজকালকার দিনে দেখা যায় না। দেখো, সে তোমায় পেটের সন্তানের মতোই আদর সোহাগ করবে। ভালোবাসায় ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে তোমার হৃদয়। কত সুন্দর সুন্দর খানা বানিয়ে খাওয়াবে, তোমাকে পেয়ে যে কী খুশি হবে!—কারণ আমি তার একমাত্র সন্তান, আর তুমি আমার পেয়ারের বিবি। আমার মায়ের হাতের রান্না একবার যে খেয়েছে, সে আর ভুলতে পারেনি কোনও দিন। তামাম বাগদাদের মধ্যে তার তুল্য ভালো খানা আর কেউই বানাতে পারে না।

একটানা এতো সব কথা বলে হাসান থামে। ভাবে, রোশনি কিছু বলবে। কিন্তু একটাও কথা বলে না সে!

এই সময় হঠাৎ সদর দরজায় করাঘাত হয়। হাসান দরজা খোলার জন্য বাইরে আসে। মেয়েরা শিকার থেকে ফিরেছে। হাসানকে দেখে ওরা কলমুখর হয়ে ওঠে। অনেকগুলো হরিণ খরগোস, বুনো মোষ, শেয়াল এবং আরো অনেক রকমের পশু শিকার করে এনেছে তারা। এবং সেই আনন্দেই সকলে মশগুল। হাসান ভয় করছিলো, রোশনিকে ওরা দেখে ফেলবে। কিন্তু তখন কে কী ভাবে কোন্ জানোয়ারটাকে ঘায়েল করেছিলো, তারই ফিরিস্তি শোনাতে ব্যস্ত। অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য ছিলো না। মেয়েরা বলে, হাসান ভাই, একটু হাত লাগিয়ে ধরতো, বাব্বা জানোয়ারগুলো কি পেল্লাই ভারি।

অন্য দিন হাসান ওদের হৈ-হুল্লোড়ে নিজেকে সামিল করে দেয়। শিকার সামগ্রী দেখে আনন্দে নেচে ওঠে। কিন্তু আজ যেন হাসান তেমন প্রাণ খুলে হাসতে পারছে না। বারবার ওর নিজের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক ভাব। ব্যাপারটা বড় বোনের নজর এড়ায় না। হাসানকে একটু টিপ্পনি কেটেই বলে, কী হলো ভাইজান, মনে হচ্ছে, আজকের শিকার তোমার পছন্দ হয়নি? তা আর কোনও বড় শিকার ধরেছ নাকি।

হাসান ভীষণ বিচলিত বোধ করে। তবে কী বড়দিদি সব জেনে ফেলেছে? মাথা তুলে আর তাকাতে পারে না সে। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়! বড় বোন আবার বলে, না কি দেশের জন্য মন খারাপ করছে। মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। শরম করো না ভাইটি, খুলে বলো তোমার মনের কথা। তা না হলে আমরা জানবো কেমন করে?

হাসান তবু কোনও কথা বলতে পারে না। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময় গুলাবী ছুটে আসে সেখানে। হাসতে হাসতে বলে, ভাইজান আজ একটা সুন্দর চিড়িয়া ধরেছে, দিদি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে পাখিটা কিছুতেই পোষ মানছে না। তোমরা যদি চেষ্টা-চরিত্র করে তাকে একটু বশে আনতে পারো দিদি, ভাই-এর আমার মুখে হাসি ফুটবে।

মেয়েরা হো হো করে হেসে ওঠে। বড় বোন বলে, এটা কী একটা সমস্যা হলো? না না, একটা সামান্য চিড়িয়ার জন্য ও বেচারী অমন মনমরা হবে কেন? নিশ্চয়ই অন্য কিছু হয়েছে।

—কারণ, হাসান ঐ পাখিটাকে পেয়ার করে ফেলেছে। আর সে কী পেয়ার দিদি! যদি একবার দেখতে—

হাসান তখনও আরক্ত হয়ে নত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

বড় বোন এবার বোধহয় কিছু আন্দাজ করতে পারে।

—তা হলে খুব বড় রামপাখি বল?

—তা আমাদের মতই আকরে হবে আর কি।

গুলাবী মুখ টিপে হাসে। হাসতে হাসতেই বলে, হলেও মনুষ্য সন্তান তো! বুদ্ধিতে একটু খাটো! তাই আমরা যখন দেশে গিয়েছিলাম, তখন হাসানকে বারবার করে বারণ করে গিয়েছিলাম, ঐ নিষিদ্ধ দরজাটা খুলো না। কিন্তু খাটো বুদ্ধির মানুষগুলোর অহেতুক কৌতূহল একটু বেশি হয়। আমার বারণ অমান্য করে আমাদের আদরের ভাইজান এক রাতে ঐ দরজা খুলে ওপরে চলে গিয়েছিলো। এবং ভাগ্যক্রমে সে রাত ছিলো প্রতিপদের। তোমরা তো জান দিদি, প্রত্যেক প্রতিপদ তিথিতে সম্রাট জিনিস্থানে মেয়েরা সরোবরে জলকেলী করতে আসে! হাসান ঐ সম্রাট-নন্দিনীকে দেখে মূর্ছা যায়। তারপর থেকে সে আর শয্যাত্যাগ করে দাঁড়াতে পারেনি—এমনই শরীরের হাল হয়েছিলো।

—যাই হোক, অনেক প্যাঁচ-পয়জার করে সেই রাজকুমারী রোশনিকে সে ঘরে এনে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু কিছুতেই তাকে পোষ মানাতে পারছে না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো একানব্বইতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

গুলাবীর কথা শুনে মেয়েরা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, তাই নাকি, ভাইজান? তা একবার দেখাও তোমার সে আজব চিড়িয়া? দেখি সে কতবড় রূপসী।

হাসান ওদের সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। সাত বোন এক সঙ্গে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ করে রাজকুমারী রোশনিকে। বড় বোন এগিয়ে এসে বলে, আপনার আগমনে এই স্বর্ণ-প্রাসাদ আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে, রাজ-নন্দিনী। আমাদের ভাই হাসান, রূপে-গুণে সেরা ছেলে। এতো ভালো ছেলে আজকের দিনে হয় না। আমি হলফ করে বলতে পারি, হাসানকে স্বামী হিসেবে পেয়ে আপনার জীবন মধুর হয়ে উঠবে। আপনি রাজা হয়ে যান। হাসান ভাইজানের সঙ্গে আপনার শাদী দিয়ে দিই আমরা। এই প্রাসাদে চিরকাল ঘর আলো করে থাকুন।

মেয়েরা রোশনির জবাবের প্রত্যাশায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রোশনি না বলে 'হ্যাঁ', না বলে 'না'। গুলাবী রোশনীর একখানা হাত টেনে নিয়ে হাসানের হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বলে, ব্যস, হয়ে গেলো। দু'হাত এক করে দিয়েছি আমরা—এবার তোমরা বোঝাপড়া করে নাও, কেমন?

হাসানের আনন্দ আর ধরে না। গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে সে ঃ

যখন তুমি খেলা কর জলে,
খেলার ছলে হারিয়ে যাও তলে,
তখন আমি চমকে উঠে বলি,
কোথায় আমার স্বর্ণচাঁপার কলি?
হঠাৎ আবার ভেসে ওঠো জলে,
রুষ্ট হই, কপট কোপানলে।
তখন তুমি মধুর করে হাসো,
শুধাও যেন—এতোই ভালোবাসো?

মেয়েরা আনন্দে চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে ওঠে, হৈ—হৈ—

হাসিতে গড়িয়ে পড়ে ওরা। হাসির হুল্লোড়ে এ ওর গায়ে ঢলাঢলি করে অনেকক্ষণ।

—এবার বলুন রাজকুমারী , আমাদের ভাইটি কেমন? কী সুন্দর করে মহব্বতের ছড়া বেঁধে দিলো এক লহমায়, আপনি পারবেন?

—তা হলে তোমাদের ভাইটি কবিয়াল, দেখছি।

এই প্রথম রোশনির মুখে বোল ফোটে। গুলাবী বলে, হ্যাঁ, আলবাৎ কবি। মুখে মুখে সে এই রকম মহব্বতের হাজারো কবিতা বানিয়ে শুনিয়ে দিতে পারে আপনাকে।

এবার রোশনি কোমল দৃষ্টি মেলে হাসানের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসে। চোখের ইশারায় হাসানকে কাছে ডাকে।

এরপর হাসানের দুই বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ হয় রোশনি। মেয়েরা খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। পর পর চল্লিশটা দিবস রজনী হাসান আর রোশনি পালঙ্ক-শয্যায় পড়ে থাকে। এমন মধুময় মুহূর্ত হাসান জীবনে কখনও উপভোগ

করেনি। প্রাণ মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। রোশনি তাকে কোনও ভাবেই বঞ্চিত করেনি। দু হাতে সব উজাড় করে দিয়েছে।

কিন্তু একচল্লিশ দিনের শেষ রাতে হাসান স্বপ্নে তার মাকে দেখে। পুত্র শোকে কেঁদে কেঁদে তার মা প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। হাসানের তাজিয়া বানিয়ে সারা দিনরাত সে তার সামনে বসে চোখের জল ফেলে।

স্বপ্ন দেখতে দেখতেই হাসান আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে, মা, মা গো, মা—

হঠাৎ এই অস্বাভাবিক আওয়াজে চমকে ওঠে মেয়েরা। দ্রুত পায়ে ছুটে আসে হাসানের ঘরের দিকে। গুলাবী রোশনিকে জিজ্ঞেস করে, কী কী হয়েছে হাসানের?

রোশনি বলে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে স্বপ্নে কিছু দেখে থাকবে।

গুলাবী হাসানকে জাগিয়ে তোলে, ভাইজান? ভাইজান, কী হয়েছে তোমার? অমন চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

হাসান বিছানায় উঠে বসে। তখনও ওর চোখে জল টলমল করছে। স্বপ্নের কাহিনীটা বললো সে।

গুলাবী এবং অন্য মেয়েরাও কাঁদতে থাকে, তোমাকে আর এখানে আটকে রাখা ঠিক হবে না, ভাইজান। তুমি এবার দেশে যাও। কিন্তু কথা দাও, ফি বছর একবার করে এসে তোমার এই বোনদের সঙ্গে দেখা করে যাবে?

হাসান বলে, একশোবার। যেখানেই যাই, যত দূরেই থাকি বোন, তোমাদের এই আদর আর এতো ভালোবাসা ভুলবো কেমন করে? মন আমার পড়ে থাকবে এখানেই।

কিন্তু হাসান যাবে কী ভাবে! হঠাৎ তার মনে পড়ে, বাহুরামের সেই ছোট্ট যাদু দামামাটা আছে তার কাছে। তবে সে বস্তুটি কী করে ব্যবহার করতে হয় তা তো সে জানে না! গুলাবী শুনে বললো, আমি জানি। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সেই ছোট্ট দামামাটা মোরগের চামড়ার ছাউনিতে ঢাকা। গুলাবী অদ্ভুত কায়দা করে দুটি আঙ্গুল রেখে টোকা মারে। আর তখুনি সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে পিলপিল করে গাধা, ভেড়া, খচ্চর, ঘোড়া, মোষ, উট প্রভৃতি নানা জাতের জন্তু-জানোয়ার এসে স্বর্ণ-প্রাসাদের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। গুলাবী তার থেকে কয়েকটা উট এবং খচ্চর বেছে নিয়ে বাকীগুলোকে বিদায় করে দেয়।

নানারকম সাজ-পোশাক, রত্ন আভরণ এবং মনোহারী উপহার সামগ্রী বেঁধে-ছেঁদে জানোয়ারগুলোর পিঠে চাপিয়ে দেয় মেয়েরা।

বিদায় বেলায় সাত বোন চোখের জলে ভাসে। বিশেষ করে গুলাবীর বেশি করে বাজে। কারণ, এতোদিন সেই সবেচেয়ে বেশি করে হাসানকে কাছে কাছে রেখেছিলো। তার খানাপিনা সুখ-সুবিধা দেখা-শোনার ভার ছিলো তারই ওপর।

দীর্ঘ পথ, কিন্তু বিশেষ কোন দুর্ভোগ পোয়াতে হলো না। কয়েকদিন চলার পর হাসান রোশনিকে সঙ্গে করে বসরায় এসে পৌঁছয়।

মা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। ছেলের আগমন প্রথমে সে বুঝতে পারে না। হাসান আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরে, মা, মাগো চেয়ে দেখ, আমি—হাসান, তোমার ছেলে আবার ফিরে এসেছে তোমার কোলে।

হাসানকে যে আবার ফিরে পাবে সে আশা করেনি তার মা। তার ধারণা জন্মেছিলো, হাসান আর বেঁচে নাই। তাই বাড়ির আঙ্গিনায় হাসানের নামে একটা তাজিয়া বানিয়ে সে তার সামনে বসে দিনরাত কান্নাকাটি করতো।

হাসান বলে, মা আমি বেঁচে আছি। এই দেখ, শাদীও করেছি। এই তোমার পুত্র-বধূ।

মা রোশনিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তুমি যে-ই হও মা, তুমি আমার বড় আদরের। যখন এসেছ, ঘর আলো করে থাক, মা।

হাসানের বাড়িটা ছোট-খাটো। কোনও প্রাসাদ ইমারত নয়। ঘরদোর অতি সাধারণ। রোশনি সম্রাট-নন্দিনী—সে অবাক হয়। এই ছোট বাড়িতে মানুষেরা বাস করে কী করে?

বসরাহর বড় বাজার থেকে সবচেয়ে দামি দামি সাজ-পোশাক কিনে আনে হাসান। রোশনিকে ডেকে বলে, দেখ তো, কেমন মানবে তোমায়?

সে-সব অতি সাধারণ, একেবারেই জোলো বলে মনে হয় রোশনির কাছে। এমন সাজ-পোশাক সে কেন, তাদের দাসী বাঁদীরাও কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু হাসান বা তার মা মনে দুঃখ পেতে পারে, তাই মুখে বলে মন্দ কী! এতেই চলবে।

হাসানের মা সব বুঝতে পারে। বলে, এখানকার হাট-বাজারে বাহারী সওদা পাওয়া শক্ত, মা। ওসব পেতে গেলে বাদদাদে যেতে হবে।

রোশনি বলে কী দরকার মা। এই বেশ হয়েছে। এতেই চলে যা। খলিফা হারুন অল রসিদের শহর। উজির আমির সওদাগরদের বাস। বড় লোকের জায়গা, শখের সামানের অভাব নাই সেখানে। ওখানে গিয়ে খুব বড় দেখে একখানা বাড়ি কিনে বৌমাকে নিয়ে ওখানেই তুই বাস কর গে। নতুন অচেনা জায়গা। গোড়া থেকেই যদি আমিরি চালে চলতে শুরু করিস, কারো মনে কোনও সন্দেহ হবে না। কারণ কত দেশ থেকে কত বড়লোক সেখানে যায়। লাখ লাখ টাকা খরচ করে। কেউ সে দিকে তাকিয়েও দেখে না। কিন্তু এখানে এই ছোট্ট বসরাহতে আমাকে তোকে তো সবাই চেনে জানে। এতো কাল আমাদের কী অবস্থা ছিলো কারো অজানা নাই। আজ যদি তুই এখানে হঠাৎ তিনমহলা বাড়ি হাঁকিয়ে বসিস, গণ্ডা কয়েক দাসী-বাঁদী কিনিস, লোকের চোখ টাটাবে না? ভাববে, এতো পয়সা কোথায় পেলো ওরা? এমনিতেই ঐ শয়তান পারসীটার সঙ্গে তোর অত মাখামাখি মেলামেশার জন্য অনেক কথা উঠেছিলো। লোকটা যে জালিয়াত—মন্তর তন্তর দিয়ে তামা-পিতলকে সোনা বানিয়ে বাজারের লোককে ঠকায়, সে খবর তারা পেয়েছিলো। এখন তুই ফিরে এসেছিস। বিদেশ থেকে অঢেল সোনাদানা হীরে জহরৎ নিয়ে এসেছিস। সে খবরও লোককে জানানো যাবে না। যা ঘরদোরের হাল চুরি ডাকাতি হয়ে যাবে। এবং যদি আমিরি চালে চলতে থাকিস, তখন এখানকার লোক রটাবে সোনা জাল করে পয়সা বানাচ্ছিস। তার অনেক বিপদ আছে, বাবা। একবার যদি খলিফা হারুন অল রসিদের কানে যায়—একেবারে গর্দান নিয়ে নেবে আমাদের সকলের। তার চেয়ে ওসব ঝুঁকির মধ্যে গিয়ে কাজ নাই। তুই বাগদাদে চলে যা। গোড়া থেকেই বড়লোকি চালে চলতে থাকলে কারো আর নজরে পড়বে না।

হাসান বললো, তুমি ঠিকই বলেছ, মা। এখানে থাকলে ভয়ে ভয়ে গরীবের মতোই দিন কাটাতে হবে। কিন্তু তার তো কোনও দরকার নাই। আমি যে ধনদৌলত সঙ্গে এনেছি ; সাতপুরুষ বসে খেলেও তা ফুরাবে না। ঠিক আছে এখানকার পাট আমি একেবারেই তুলে দিচ্ছি মা। তুমিই বা এখানে পড়ে থাকবে কী কারণে? আমি বাড়িঘর সব বেচে দিয়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়েই বাগদাদে যাবো।

কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ি এবং বাড়ির যাবতীয় সামানপত্র সব বেচে দিলো হাসান। প্রতিবেশিরা অনেকে দুঃখ করল, আহা, সাত পুরুষের ভিটে, বেচে দিলে?

হাসান বলে, ভিটে তো খাওয়াবে না, চাচা। বাঁচতে গেলে পয়সা চাই। সে-পয়সা রোজগার করতে হলে ভালো বাণিজ্য করা দরকার। আমি বাগদাদে গিয়ে সওদাগরি ব্যবসা করবো।

এই সময়ে ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো তিরানব্বইতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

সামানপত্র বাঁধা ছাঁদা করে নিয়ে হাসান সেই ছোট্ট দামামাটায় টোকা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একপাল জন্তু জানোয়ার এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মধ্য থেকে কয়েকটা উট বাছাই করে নিয়ে বাকীগুলোকে বিদায় করে দেয় সে। এবং বাক্সপ্যাটরা চাপিয়ে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে যায়।

বাগদাদ শহরের পাশে টাইগ্রিসের উপকূলে এসে এক লক্ষ দিনার দিয়ে একখানা সুরম্য অট্টালিকা কেনে। এই প্রাসাদখানা এক উজিরের ছিলো।

বাজার থেকে অনেকগুলো দাসী বাঁদী নফর চাকর খোজা কিনে নিয়ে আসে হাসান। আর নিয়ে আসে দুষ্প্রাপ্য দামী কাঠের খাট পালঙ্ক কুর্শি কেদারা মেজ। সুক্ষ্ম কাজকরা পর্দা কিনে এনে টাঙিয়ে দেয় জানালা-দরজায়। পারস্যের শৌখিন গালিচা এনে পাতে মেঝেয়। এবং আরও নানা রকম সুন্দর সুন্দর শখের জিনিস এনে ঘরদোর সাজায়। এইভাবে দিন কয়েকের মধ্যে প্রাসাদখানা ঝকমক করে ওঠে।

রোশনি আর মাকে নিয়ে হাসান পরম সুখ বিলাসের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। প্রতিদিন নতুন নতুন স্বাদের সুন্দর সুন্দর খানা তৈরি করে তার মা। রোশনি নিজহাতে হাসানকে খাবার সাজিয়ে দেয়। নাচ গান বাজনায় মাতিয়ে রাখে স্বামীকে।

রোশনি গর্ভবতী হয়, এবং ন'মাস বাদে ফুটফুটে সুন্দর দুটি জমজ পুত্রের জন্ম দেয়। হাসান ওদের একটির নাম রাখে নাসির এবং আর একটির মনসুর।

একটা বছর কেটে গেলো। হাসানের মনে পড়ে সেই সপ্তকন্যার কথা। ওরা বলেছিলো, বছর শেষে একবার করে এসে বেড়িয়ে যাবে।

একমাত্র ইরাকেই মেলে সেই রকম কিছু বিশেষ উপহার সামগ্রী সংগ্রহ করে আনে হাসান। মেয়েদের জন্যে নিয়ে যাবে সে। কিন্তু হাসানের আশঙ্কা হয়, মা হয়তো যেতে দিতে চাইবে না। কিন্তু মা বাধা দেয় না, বলে যারা তোমার জন্য এতো করেছে, যাবে বই কি সেখানে। তবে বেশি দেরি করো না, বাবা। জানতো মায়ের প্রাণ কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না।

হাসান বলে তুমি কিচ্ছু ভেব না মা, আমি বেশি দেরি করবো না। তুমি রইলে, রোশনি, নাসির, মনসুর এরা রইলো—আমি কি বেশিদিন না দেখে থাকতে পারি।

হাসান গলাটা খাটো করে বলে, একটা কথা মা—তোমার ঘরের খাটের তলায় একটা পাখীর ডানার খোলস আছে ; খুব হুঁশিয়ার থেকো, ঐ খোলসটা যেন কিছুতেই রোশনির হাতে না পড়ে। ওর উড়ে বেড়ানোর নেশাটা এখন কেটে গেছে। কিন্তু ঐ খোলসটা দেখলেই আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আর একবার যদি সে আকাশে উড়তে পায় তখন কী হবে কে বলতে পারে। হয়তো সে চিরকালের মতো আমাদের ছেড়ে ওর বাবার কাছে পালিয়ে যাবে। ওই খোলসটা তোমার বুকের কলিজা—এই জ্ঞান করে ওটাকে আগলে রাখবে, মা। আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।

হাসান আরও সতর্কবাণী শোনায় মাকে, তুমি নিজে হাতে রোশনির খানাপিনা এনে দিও মা। নফর চাকরদের ওপর ছেড়ে দিও না। কারণ ওরা কেউই ওর মেজাজ-মর্জি জানে না। কোন্ জিনিসটা ওর পছন্দ কোন্টা অপছন্দ, আমি আর তুমি ছাড়া তো কেউ জানে না, মা। রোশনিকে তুমি বাড়ির বাইরে এক পা যেতে দেবে না কোথাও। ও যেন জানালা দিয়ে পথের দিকে মুখ না বাড়ায়, ছাদে না যায়। সব সময় চোখে চোখে রাখবে ওকে।

একবার যদি সে আমাকে ছেড়ে চলে যায় মা, আমি আর বাঁচবো না। রোশনি আমার জান, আমার কলিজা! এই কথাটা তুমি মনে রেখো, মা।

মা হেসে বলে, তুই কী আমাকে এতোই বোকা হাঁদা মনে করিস নাকি, বাবা। আমি সব বুঝি, সব আঁচ করতে পারি। তোর বৌ আমাদের ঘরে বেগমের তোয়াজে থাকলে কী হবে, ওর মন পড়ে থাকে আশমানে। ওর বাবা মার দেশে। তুই দেখিস্ না, নিজের গর্ভের সন্তান নাসির মনসুর—হীরের টুকরো, চাঁদের মতো ছেলে, সেই ছেলের ওপরই বা ওর মায়ের দরদ কতটুকু। তবে আমিও সেয়ানা মেয়ে। আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালানো সম্ভব নয়। তুই কিচ্ছু ভাবিস নি বাবা, যা ঘুরে আয় মেয়েদের সঙ্গে দেখা করে। এসে দেখবি তোর রোশনি যেমনটি ছিলো তেমনি আছে আমার কাছে। ওর আদর যত্নের কোনও ত্রুটি রাখিনি এতোদিন, এখনও কোন অনাদর করবো না। তুই যা ওদের দেখে আয়। তবে বেশি দেরি করিস নে, বাবা।

মা-পোয়ের এই নিভৃত আলাপ কিন্তু আড়ালে থেকে রোশনি সবই শুনে ফেলে।

দিনক্ষণ দেখে হাসান মায়ের কাছে বিদায় নেয়। রোশনি নাসির এবং মনসুরকে আদর সোহাগ করে। রোশনিকে বলে, খুব সাবধানে থেক। মায়ের কথার অবাধ্য হয়ো না। আমি খুব শিগগিরই ফিরে আসবো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো চুরানব্বইতম রজনী আবার গল্প শুরু হয় ঃ

দামামায় টোকা দিতেই অনেক জন্তু-জানোয়ার এসে হাজির হয়। হাসান এক পক্ষীরাজ ঘোড়াকে রেখে বাকী সবগুলোকে চলে যেতে বলে।

শেষ বারের মতো সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পক্ষীরাজের পিঠে চেপে বসে হাসান। এবং পলকের মধ্যে সে উড়ে চলে আসে স্বর্ণপ্রাসাদে।

সাত বোন আনন্দে নেচে ওঠে। সারা প্রাসাদ আলোর মালায় সাজায়। রাশি রাশি ফুল এনে ভরে ফেলে ঘরদোর। সুন্দর সুন্দর খাবার তৈরি করে। সারা প্রাসাদময় সে কি উৎসব আনন্দের ঘটা।

সাত বোন, বিশেষ করে গুলাবী যে কী খুশি হলো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নাচগান হৈ হল্লা, শিকার ভ্রমণ সাঁতারে মেতে উঠলো সকলে। প্রাণের ভাই হাসান সব কিছুতে তাদের সঙ্গী সহচর হয়ে রসের ভিয়েন জোগাতে থাকলো।

আচ্ছা, ওরা ওদিকে হেসে খেলে আনন্দে দিন কাটাক, আমরা চলুন আবার ফিরে যাই বাগদাদে—হাসানের প্রাসাদে।

হাসান চলে যাওয়ার পর দুদিন শাশুড়িকে ছেড়ে এক পাও নড়লো না রোশনি। কিন্তু তৃতীয় দিন ভোরে উঠে সে হাসানের মাকে বললো, মা আজ কতকাল গোসল করিনি। বাচ্চা দু'টো তো দুধ মাখিয়ে বুকখানা চটচটে করে ফেলেছে। গা ঘিন ঘিন করছে, আমি হামাম থেকে গোসল সেরে আসি।

মা বললো, হায় আমার কপাল, এ শহর তো আমার কাছে একেবারেই অচেনা, মা। এর পথ ঘাট বাজার হাট কিছুই জানি না। এখান থেকে কত দূরে হামাম, কোন্ পথেই বা যাওয়া যায়, কিছুই জানি না। এ অবস্থায় কী করে হামামে যাবে তুমি। তার চেয়ে আর কটাদিন কষ্ট করে কাটাও। হাসান শিগ্গির এসে পড়বে। ছেলে এসে তোমাকে গোসল করিয়ে নিয়ে আসবে। আর তোমার যদি নিতান্তই খারাপ লাগতে থাকে তাহলে ঘরেই আমি খানিকটা পানি গরম করে দিচ্ছি। তাই দিয়ে গা হাত পা ভালো করে মুছে ফেলো, দেখবে—আরাম

পাবে। গোসলের সব সাজ-সরঞ্জামই আমার ঘরে আছে। দিন কয়েক আগে হাসান একটা আলেপ্পোর সুগন্ধী আতরের শিশি এনে রেখেছে। পানির মধ্যে খানিকটা মিশিয়ে দিলে ফুরফুর করে খুশবু ছাড়বে। মনটা খুশ্ হয়ে উঠবে।

রোশনি কিন্তু তার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারে না! ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে থাকে, মা একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না। শহরের পথ-ঘাট অচেনা-অজানা এ অজুহাত অচল। আমি নাজুক নাবালিকা নই যে, পথে বেরুলে হারিয়ে যাবো। আপনার একটা কেনা বাঁদিকেও যদি এই ধরনের বাধা দিতেন তবে আমি বলতে পারি, সেও তা মানতো না। বাঁদী-বাজারে তাকে বিক্রি করে দিয়ে আসার জন্য জুলুম করতো। আপনি আমাকে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করেন। তা না হলে বাড়ির বাইরে যেতে দিতে আপনার আপত্তি হতো না। কিন্তু একথাও জেনে রাখুন মা, কোনও নারী যদি মনে করে সে পালাবে বা নষ্ট হবে তাকে আপনি শিকলে বেঁধে রেখেও আটকাতে পারবেন না। আপনি আমার সতীত্বে কটাক্ষ করেছেন। এ অবস্থায় এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না, মা। এখন আমার মৃত্যু ছাড়া পথ নাই।

এই বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে রোশনি। মা দেখলো রোশনি তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এই রাগের মাথায় মানুষ করতে পারে না এমন কাজ নাই। কী জানি, হয়তো সে জহর খেয়েই জীবন শেষ করে দেবে! ভয়ে শিউরে ওঠে সে।

—তুমি যখন এতোই গোঁসা করছ মা, তবে চলো যাই তোমাকে হামামে গোসল করিয়ে নিয়ে আসি। হাসান বলেছিলো, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাকে যেন বাড়ির বাইরে যেতে না দিই। কিন্তু আমি তার কথা রাখতে পারলাম না। চলো তেল সাবান আতর সঙ্গে নাও, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো হামামে।

রোশনিকে বাগদাদের এক সম্ভ্রান্ত হামামে নিয়ে যায় হাসানের মা। কিন্তু না নিয়ে গেলেই ভালো হতো, আরও একটু পাষাণ প্রাণ হয়ে রোশনির সব কথা হজম করে চুপচাপ কটাদিন কাটালে কী ক্ষতি ছিলো? কিন্তু নিয়তিকে কে এড়াতে পারে? যা হবার তা তো হবেই।

হামামে পৌঁছতেই রোশনির অসাধারণ রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করে গোসলের জন্য অপেক্ষমান মেয়েরা চমকে ওঠে। এতো রূপ কোনও মানুষের হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই কোনও হুরী-পরী।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো পচানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

কেউ আর চোখ ফেরাতে পারে না। তারপর সাজপোশাক ছেড়ে যখন রোশনি বিবস্ত্রা হয় তখন তারা ওর নগ্ন দেহবল্লরীর অপার লাবণ্য এবং নিভাঁজ নিখুঁত অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখে আরও বেশি অবাক হয়ে যায়। একেবারে নিপুণ কারিগরের হাতে গড়া অপূর্ব এক শিল্পমূর্তি।

অন্য মেয়েরা, যারা গোসল করার জন্যে গিয়েছিলো, সকলেই গোসল-টোসল ভুলে গিয়ে রোশনিকে দেখতে থাকে। এতো রূপ সে কোথায় পেলো? দুনিয়ার বহু রূপসী নারীর দেহ-বর্ণনা ওরা শুনেছে কিন্তু এ মেয়ে তো তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। কোনও শিল্পীর সাধ্য নাই এ রূপ তুলিতে আঁকে। কোনও কবির কল্পনা এর ধারে কাছেও পৌঁছন সম্ভব নয়।

মুহূর্তের মধ্যে রোশনির রূপের খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে! দলে দলে মেয়েরা হামামে এসে ভিড় জমাতে থাকে। কেউ গোসল করতে আসে না—আসে রোশনিকে দেখে নয়ন সার্থক করতে। এই সব মেয়েদের মধ্যে বেগম জুবেদার এক চরও ছিলো। মেয়েটির নাম তুহ্ফা। ভীষণ চালাক এবং অপরূপ সুন্দরী।

গোসল শেষ করে সাজপোশাক পরে রোশনি বাড়ি ফেরার জন্য শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামে। যতক্ষণ সে ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নগ্ন দেহ মর্দন করতে করতে স্নান করছিলো ততক্ষণ একভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো তুহ্‌ফা।

রোশনির সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলার ছল করে সে। কিন্তু রোশনি কোনও আমল দেয় না। নিজের মনে পথে নামে। তুহ্‌ফা কিন্তু চিনে-জোঁক। সে ওদের পিছু ছাড়ে না। হাঁটতে হাঁটতে হাসানের বাড়ির দরজায় এসে পড়ে। রোশনি আর তার শাশুড়ি ভিতরে ঢুকে যায়। খোজা দরজা বন্ধ করতে যাবে, এমন সময় তুহ্‌ফা খোজাকে বলে, আমিও যাবো ভেতরে। তোমার মালকিনের সঙ্গে আমার কথা আছে।

—আরে ভাগ্।

খোজাটা খিঁচিয়ে ওঠে, যা পালা এখান থেকে, মালকিনের সঙ্গে কথা আছে! কথা আছে তো সারাটা পথ মুখে কুলুপ এঁটে ছিলে কেন। বলতে পারলে না?

তুহ্‌ফা বলে, আহা ছাড়োই না গো, আমি শুধু এই গুলাবটা তার হাতে দেব, তার পরেই বেরিয়ে আসবো।

খোজাটা এবার খেউড় করে, গুলাব তোর ইয়েয় ঢুকিয়ে দেব। যা ভাগ্, পালা। তা না হলে চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় নামিয়ে দেব।

তুহ্‌ফা সাপিনীর মতো ফুঁসে ওঠে, কী, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! দাঁড়া তোর দেমাক আমি দুমড়ে দিচ্ছি।

এই বলে দুমদাম পা ফেলে তুহ্‌ফা রাস্তায় নামে।

—আরে যা যা, তোর মতো কত ছেনাল দেখলাম আমি। তুই এসেছিস এখানে খাপ খুলতে।

ক্রুদ্ধ তুহ্‌ফা প্রাসাদে ফিরে আসে। মুখ ভার করে বসে থাকে জুবেদার সামনে। বেগম জুবেদা বুঝতে পারে আজ কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। তা না হলে সদা-চঞ্চল তুখোড় তুহ্‌ফা ঐভাবে মন-মরা হয়ে বসে থাকার পাত্রী নয়।

—হ্যাঁরে তুহ্‌ফা, অমন মুখ ভার করে বসে আছিস কেন, কী হয়েছে? এ দিকে আয় তো শুনি।

তুহ্‌ফা কোনও কথা বলে না। ধীরে ধীরে জুবেদার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—কী হয়েছে? কোথায় গিয়েছিলি এতক্ষণ?

—হামামে।

—তা সেখানে তোকে কেউ কিছু বলেছে?

—না।

—তবে?

—মালকিন, আজ হামামে গোসল করতে এসেছিলো একটি মেয়ে। তেমন রূপবতী নারী আমি জীবনে দেখি নি। আমি কেন, আপনারা কেউই দেখেন নি। ধরার মানুষ এতো সুন্দর হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই ডানাকাটা হুরী-পরী!

—বলিস কী?

জুবেদা জানে, তুহ্‌ফা নিজে দেখতে সুন্দরী বলে ও সহসা কোনও মেয়েকেই সুন্দরী বলে স্বীকার করতে চায় না। অথচ ওর মুখে অন্য মেয়ের রূপের প্রশংসা!

—মেয়েটার কী নাম?

—তাতো বলতে পারবো না, তবে শুনলাম বসরাহর এক সওদাগর হাসানের বিবি সে। ওদের বাড়িটা আমি দেখে এসেছি।

—কোথায়?

টাইগ্রিসের ধারে একটা বিরাট প্রাসাদ আছে। তার একটা ফটক এধারে আর একটা ফটক নদীর সামনে।

জুবেদা দেহরক্ষী মাসরুরকে ডেকে পাঠায়। সে এলে জুবেদা তাকে বলে, টাইগ্রিসের ধারে একটা প্রাসাদ আছে জানিস?

—জী হ্যাঁ।

সেই প্রাসাদের এধারে একটা ফটক আর নদীর দিকে আরেকটা। ওই প্রাসাদের মালিক বসরাহর এক সওদাগর হাসান। তার বিবিকে আমার কাছে নিয়ে এসো একবার।

মাসরুর হাসানের প্রাসাদে যেতেই দ্বাররক্ষী খোজা সেলাম ঠুকে সরে দাঁড়ায়,

—বান্দাকে হুকুম করুন মালিক।

মাসরুর বলে, হাসানের মা কোথায়?

খোজা ওকে ভেতরে নিয়ে যায়। হাসানের মা ভয়ে কেঁপে ওঠে। খলিফার দেহরক্ষী মাসরুরকে সে চেনে। মাসুরুর বলে, আমি পয়গম্বর মহম্মদের চাচা আব্বাসের ষষ্ঠ পুরুষ খলিফা হারুন অল রসিদের চাচা কাসিমের কন্যা এবং খলিফার খাস পেয়ারের বেগম জুবেদার আজ্ঞাবহ নফর মাসরুর। তিনি আপনার পুত্রবধূকে নিয়ে যেতে হুকুম করেছেন। তাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এখুনি।

হাসানের মা এবার আর্তনাদ করে ওঠে, আমরা এখানে বিদেশী বণিক। আমার একমাত্র ছেলে, সে-ই বাড়ির কর্তা, এখন বাড়ি নাই। দূরদেশে বাণিজ্যে গেছে। বিদেশ যাওয়ার আগে সে আমাকে বার বার বারণ করে গেছে, ঘরের বিবিকে যেন বাইরে না বের করি। এমন কি আমিও যেন তাকে নিয়ে বাইরে না যাই. তা সে যে কারণেই হোক। আমার ডর লাগছে, সে যদি বাড়ির বাইরে যায় তাহলে তার ঐ রূপ-যৌবন অনর্থ ঘটাবে। আর কোনও কারণে যদি অঘটন কিছু ঘটে যায়, ছেলে আমার আত্মঘাতী হবে। এই কারণেই আপনার কাছে আমার আর্জি মাসরুরজী, আমার এই অসহায় অবস্থা বিবেচনা করে আপনি আমার ওপর একটু করুণা করুন। হাসান না আসা পর্যন্ত এই কটা দিন সবুর করে থাকুন। ও আসুক, তারপর যতবার খুশি নিয়ে যাবেন ওর বিবিকে। আমি একটুও আপত্তি করবো না।

মাসরুর বলে, আপনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না মালকিন, আপনার পুত্র বধূর কোনও তখলিফ হবে না। আমাদের বেগমসাহেবা শুধুমাত্র একবার দেখতে চেয়েছেন তাকে। কারণ, তিনি শুনেছেন, তার মতো পরমাসুন্দরী কন্যা তামাম দুনিয়ায় আর দুটি নাই। সেইটাই পরখ করে দেখবেন তিনি নিজের চোখে। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। এমনও তো হয়, তাক লাগাবার জন্য অহেতুক বাড়িয়ে বলে অনেকে। বেগমসাহেবা এর আগেও আমাকে অনেক মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম করেছেন। এবং আমি তা তামিলও করেছি। তিনি কারো না কারো মুখ থেকে সেই সব মেয়েদের রূপগুণে অনেক রংদার বর্ণনা শুনেছিলেন এবং আমাকে হুকুম করেছিলেন তাদের হাজির করতে। আপনার পুত্র-বধূকেও তিনি ঐ সব মেয়েদের মতোই স্বচক্ষে যাচাই করে দেখে নিতে চান মাত্র। আপনি নির্ভয়ে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন ওকে। আমি কথা দিচ্ছি, যথাসময়ে আবার আমিই ফিরিয়ে দিয়ে যাবো তাকে। তার কোনও অনিষ্ট হবে না, হতে পারে না। আমি খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবো, দিয়ে যাবো।

হাসানের মা দেখলো মাসরুরকে আর বেশি কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা। সে বাদশাহী হুকুমের তাঁবেদার। বেগম জুবেদা যখন নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে, কিছুতেই ছাড়বে না সে।

অন্দরে গিয়ে রোশনিকে বলে, মা, বেগম জুবেদা তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। এখনি যেতে হবে। ভালো করে সেজে-গুজে নাও। আমি নাসির ও মনসুরকে সাজিয়ে দিচ্ছি। ওদের দু'টোকে নিয়ে মাসরুরের সঙ্গে তুমি প্রাসাদে চলে যাও। আচ্ছা চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

আগে আগে পথচারীদের 'হট যাও হট যাও' করতে করতে মাসরুর চলো। দুই নাতিকে কোলে করে নিয়ে তার পিছনে পিছনে চলে হাসানের মা। এবং মোটা কাপড়ের বোরখায় আপাদ-মস্তক আবৃত করে রোশনি চলে সব পিছনে।

খলিফার প্রাসাদে পৌঁছে মাসরুর ওদের নিয়ে আসে বেগম জুবেদার খাস-মহলে। বেগমসাহেবা তখন তার তখতে আরাম করছিলো। রোশনির কোলে শিশু-সন্তান দুটিকে তুলে দিয়ে হাসানের মা আভূমি আনত হয়ে বেগম সাহেবাকে কুর্নিশ জানায়। জুবেদা হাত বাড়িয়ে তাকে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে। রোশনিকে কাছে ডাকে, এদিকে কাছে এসো বাছা। শরম করার কি আছে, এখানে তো কোনও পরপুরুষ নাই। বোরখা নাকাব খুলে ফেলো।

তুহ্‌ফাকে সে ইশারা করতে সে এসে রোশনির বোরখা খুলে সরিয়ে নেয়। রোশনির রূপের আলোয় জুবেদার মহল ঝলমল করে ওঠে। জুবেদা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রোশনির মুখের দিকে। তুহ্‌ফা বাড়িয়ে বলেনি কিছু। সত্যি, এমন অলৌকিক রূপলাবণ্য সে আগে দেখেনি কখনও। বিধাতা পুরুষ কী ভাবে এমন নিখুঁত সুন্দর নারী সৃষ্টি করেছিলেন সেই কথাই ভাবতে থাকে জুবেদা।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো সাতানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

অনেকক্ষণ পরে জুবেদা নিজেকে ধাতস্থ করতে পারে। তখত ছেড়ে উঠে এসে সে রোশনির গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে, চুমু খায়, সোহাগ জানায়। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তখতে নিজের পাশে বসায়। গলায় পরিয়ে দেয় নিজের গলার সাতনরী মুক্তোর মালাখানা। এই হারটা এক সময় অল রসিদ পরিয়ে দিয়েছিলেন জুবেদাকে।

—তুমি আমার সারা মুলুকের গৌরব। আমার ছোট্ট বাঁদীটা তোমার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে একটা জায়গায় মস্ত ভুল করেছে, রোশনি। তোমার এ রূপ তো কোনও ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়, বাছা। আচ্ছা এবার বলো নাচ গান কিছু জান তুমি? নিশ্চয়ই জান। তোমার মতো রূপবতী কন্যার সব গুণই থাকা সম্ভব।

রোশনি বলে, বিশ্বাস করুন , বেগমসাহেবা, আমি ও-সব কিছুই জানি না। না গান, না নাচ। সাধারণতঃ মেয়েরা যে সবগুলোর অধিকারী হয় তার কিছুই আমার জানা নাই। শুধু একটা জিনিস খুব ভালো জানি, আসমানে পাখীর মতো উড়ে বেড়াতে পারি।

—বাঃ এ তো ভারি অদ্ভুত।

জুবেদা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকায় রোশনির দিকে। বলে, শুনেছি জিন-পরীরা ডানামেলে শূন্যে উড়ে বেড়ায়। তা তুমি ডানা ছাড়া

উড়বে কী করে? ডানা ছাড়া নয় বেগমসাহেবা, ডানা আমার আছে। কিন্তু এখন আমার কাছে নাই. আমার শাশুড়ির হেপাজতে আছে। আপনি যদি দেখতে ইচ্ছা করেন, তবে এঁকে বলুন, তিনি যদি আমার ডানার খোলসটা এনে দেন আমি আপনাকে আমার আকাশে ভেসে বেড়ানোর খেলা দেখাতে পারি।

জুবেদা বৃদ্ধার দিকে তাকায়, বুড়িমা, ঐ পালকের খোলসটা একবার এনে দাও তো ওকে। আমি ওর আকাশে ওড়া দেখবো।

বৃদ্ধা শিউরে ওঠে, এইবার সব গেলো! মনে মনে ভাবে সে। একবার মুক্ত আকাশে উড়লে ও কী আর এই ইট-পাথরের শহরে ফিরে আসবে? ইয়া আল্লা, একি মুসকিলে ফেললে আমাকে। এখন আমি কী করি। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলে, বাছা আমার আপনাকে দেখে ঘাবড়ে গেছে। কী যে আবোল তাবোল সব বকতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি না। ভাবছি, ওর মাথাটাই বুঝি খারাপ হয়ে গেলো। কোনও মানুষ কী কখনও ডানা পাখা পরে উড়তে পারে, না ডানা পাখা কারো থাকে?

কিন্তু রোশনি বাধা দিয়ে বলে, আমি আপনার নামে কসম খেয়ে বলছি বেগমসাহেবা, আমার পাখার খোলসটা আমাদের প্রাসাদেরই কোনও স্থানে লুকানো আছে।

জুবেদা এক জোড়া মণি-রত্ন খচিত মহামূল্যবান বালা তুলে দেয় হাসানের মার হাতে। প্রায় ঘুষ বলা যায়।

—আর দেরি করো না, বুড়ি মা, শিগ্গির যাও। খুঁজেপেতে নিয়ে এসো ঐ খোলসটা। আমরা তোমার ছেলের বিবির মজার খেলা দেখবো। তারপর আবার তোমাকে ফেরত দিয়ে দেবো এক্ষুনি। যাও, আর দেরি করো না।

কিন্তু হাসানের মা কিছুতেই কবুল করে না। বলে, আপনি বিশ্বাস করুন বেগমসাহেবা, সে জিনিস আদৌ আছে কিনা, বা থাকলে কোথায় আছে—আমার জানা নাই।

জুবেদা মাসরুরকে ডাকে।

মাসরুর হাসানের বাড়ি চলে যাও। সারা প্রাসাদ তন্ন করে তলাসী করে দেখ একটা পাখীর ডানার খোলস কোথাও আছে কিনা। খুঁজে পেলে আমার কাছে নিয়ে এসো।

মাসরুর ছুটলো হাসানের প্রাসাদে। অবশ্য যাবার আগে হাসানের মা-এর কাছ থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে যেতে ভুললো না সে।

সারা প্রাসাদ ঢুঁড়ে সে বের করলো সেই খোলসখানা। হাসানের মায়ের পালঙ্কের তলায় একটা বাক্সের মধ্যে লুকানো ছিলো।

জুবেদা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে সেই শশাঙ্কশুভ্র পাখীর পালকের খোলস-খানা নেড়ে চেড়ে দেখলো। ভিতরে কোনও অলৌকিক যন্ত্রপাতি কিছু নাই। নেহাতই বাহারী একখানা মুখোশ জাতীয় খেলনা মাত্র।

দেখা শেষ হলে সে রোশনির হাতে দিয়ে বললো, নাও এবার দেখাও দেখি তোমার ভেল্কিবাজী। আমার তো বাপু এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না—

রোশনি খোলসখানা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করে। নাঃ, অবিকল সেই রকম আছে। যেমনটি সে খুলে রেখেছিলো পুকুরপাড়ে, ঠিক সেই রকম।

চোখের পলকে পরে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। পাখা দু'খানা আলতোভাবে নাড়তে নাড়তে মেঝে থেকে অল্প উঁচুতে হাওয়ায় ভর করে চারপাশে ঘেরা হারেমের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি কয়েকেবার ঘুরে বেড়ায়। তারপর ছোঁ-মেরে ছেলে দুটিকে তুলে নেয় দুই হাতে। আবার সে ঘুরতে থাকে-এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি।

জুবেদা হতবাক হয়ে এই অভাবনীয় আশ্চর্য কাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে থাকে। নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। ভাবে, স্বপ্ন দেখছে না তো। কিন্তু স্বপ্ন তো অনেকে মিলে দেখা যায় না।

রোশনি বলে, এই দেখুন বেগমসাহেবা, ছেলে কোলে নিয়ে কেমনভাবে আমি উড়ে বেড়াচ্ছি। উড়তে উড়তেই ওদের আদর সোহাগ করছি, মাই দিচ্ছি কেমন দেখুন।

একটুক্ষণ পরে আরও খানিকটা ওপরে ছাদ বরাবর উঠে যায় রোশনি। সবাই মাথার ওপরের দিক করে একভাবে তাকিয়ে দেখতে থাকে রোশনির খেলা। হঠাৎ সে অনেক ওপরের খোলা জানালা দিয়ে গলে প্রাসাদের বাইরে চলে যেতে যেতে বলে, বিদায় বেগমসাহেবা, আমি চললাম—চির বিদায়।

হাসানের মাকে বলে, মা আপনার ছেলেকে বলবেন যদি ইচ্ছা হয় ওয়াক ওয়াক দ্বীপে আমার সঙ্গে সে দেখা করতে পারবে।

—রোশনি—রোশনি, শোনো ফিরে এসো!

একটানা চিৎকার করতে থাকে জুবেদা। একি হলো, মেয়েটা ধোঁকা দিয়ে কেটে পড়লো! তবে তো হাসানের মার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। হায় হায়, একি হলো—একি করলাম আমি? এখন এই বুড়ি আর ছেলের কী দশা হবে। না না, আর ভাবতে পারে না সে।

—হাসানের মা, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নাই আমার। আমি তোমার কাছে চির-কালের মতো অপরাধী হয়ে গেলাম। ছি ছি ছি, একী করলাম? আজ থেকে তোমার জীবনে যে নিদারুণ বিয়োগ ব্যথা নেমে এলো, তা আর কী করে সারাবো আমি। আমার খেয়াল-খুশি মেটাতে গিয়ে তোমাদের সর্বনাশ করলাম। এ পাপ আমি রাখবো কোথায় বুড়ি মা?

হাসানের মার কানে এ সব কথা কিছুই ঢুকলো না। রোশনি জানলার মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই সে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছিলো। অনেকক্ষণ পর যখন সে সম্বিত ফিরে পেলো, দেখলো রোশনি নাই, তার দুই নাতিও নাই।

রোশনি যে সুযোগ পেলেই পালাবে তা সে কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলো। কিন্তু কোনও ভাবেই সে সুযোগ করতে পারছিলো না। আজ জুবেদা বেগমের হঠকারিতায় সব পণ্ড হয়ে গেলো। এমন বেইমান মেয়েটি, যাবার সময় দুধের বাছা—তার আদরের ধন নাসির আর মনসুরকেও তুলে নিয়ে চলে গেলো? হাসান—তার একমাত্র সন্তান, এই শোকতাপ কী করে সহ্য করবে সে। রোশনির শোকে তো সে সারা হয়ে যাবেই, সেই সঙ্গে পুত্রশোকও কী কম দহন করবে তাকে?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পাঁচশো আটানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

জুবেদা বলে, হাসানের মা, তুমি আমাকে আগে বললে না কেন, তোমার ছেলে একটা জিন-পরীকে শাদী করে নিয়ে এসেছে? তাহলে আমি তাকে এভাবে পালাবার সুযোগ দিতাম না। আমি বুঝতে পারিনি আগে ওর এই মতলব ছিলো, তাহলে এই ঘটনা কিছুতেই ঘটতো না।

হাসানের মা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, দোষ কারো নয় বেগমসাহেবা, দোষ আমার নসীবের। ভাগ্যে যা লেখা আছে তা এড়াবো কী করে? যাক, এখন আমি শুধু ভাবছি, হাসান ফিরে এলে এই দুঃসংবাদে তাকে জানাবো কী করে?

মনের দুঃখে ঘরে ফিরে যায় হাসানের মা। বাড়ির অঙ্গিনায় তিনটি তাজিয়া বানিয়ে তার সামনে বসে সারা দিনরাত চোখের জল ফেলতে থাকে।

হাসান সপ্তকন্যাদের সঙ্গে তিনটি সুখের মাস অতিবাহিত করে একদিন বাগদাদে ফিরে আসে। আসার সময় মেয়েরা দশটি উটের পিঠে সোনাদানা হীরে জহরত বোঝাই করে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়।

বাড়িতে এসেই সে প্রথমে রোশনি এবং পরে পুত্র দুটির সন্ধান করে। কিন্তু কাউকেই দেখতে না পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে রোরুদ্যমানা মাকে জিজ্ঞেস করে, মা আমার রোশনি কোথায়?

মা এ কথার কী জবাব দেবে। হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে, বাবা আমাদের কপাল ভেঙ্গেছে, রোশনি ছেলে দুটোকে নিয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে।

হাসান উন্মাদের মতো মায়ের ঘরে ছুটে যায়। খাটের তলায় বাক্সটা খোলা পড়ে আছে। খোলসটা নাই, এবার সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। দেওয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে। ঘরের এক কোণে একখানা তলোয়ার রাখা ছিলো, সে-খানা তুলে নিয়ে ছুটে আসে আঙ্গিনায়।

—মা এ জীবন আমি আর রাখবো না।

মা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, অমন কাজটি করিসনে বাছা। তুই আমার বুকের কলিজা, একমাত্র দুলাল। এইভবে আত্মঘাতী হলে আমি তো আর একদণ্ড বাঁচবো না। বাবা, সোনা আমার , মাথাটা ঠাণ্ডা কর। চলো, ঘরে চলো। সব আশাই গেছে, তবু তার মধ্যে একটুখানি ভরসা সে দিয়ে গেছে, বাবা! উড়ে চলে যাবার সময় সে একটি মাত্র কথা বলে গেছে, হাসান যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গেলে দেখা হবে।

রজনী প্রভাত হয়ে আসে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁচশো নিরানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এই নিদারুণ দুঃখের মুহূর্তে হাসান যেন একটু আশার আলো দেখতে পায়।

—মা, আমি যাবো সেই ওয়াক ওয়াক দ্বীপে। কোথায় সে দ্বীপ আমি জানি না, তবু আমি যাবো। নাম শুনে মনে হচ্ছে, দ্বীপ-এ শুধু পাখীরাই থাকে। হয়তো বহু দুরদেশে সিন্ধু কিংবা চীন, পারস্য বা ভারতের কোনও দুরধিগম্য সমুদ্রের ওপারে। তা হোক, যেখানেই হোক, যত দূরেই হোক, আমি যাবো। পথের নিশানা আমি জানি না। কিন্তু নিশানা আমি পাবো। আমার সাতবোনরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে এই দ্বীপের ঠিকানা। আমি আর দেরি করবো না, মা। এখনি মেঘমালা পাহাড়ে আবার চলে যাবো। মেয়েদের কাছ থেকে ওয়াক ওয়াক দ্বীপের ঠিকানা জেনে নিয়ে আমাকে যেতে হবে রোশনির সন্ধানে। রোশনি ছাড়া আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব। রোশনি বিহীন এ জীবন আমার কাছে একেবারে অর্থহীন।

হাসান সেইদিনই মেঘমালা পাহাড়ে আবার ফিরে আসে। মেয়েরা তো হাসানকে দেখে অবাক। আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে সকলে। কিন্তু হাসানের মুখে সেই দুঃসংবাদ শুনে সবাই চুপসে যায়। সবারই মুখ কালো হয়ে ওঠে। চোখে জল আসে। গুলাবী এগিয়ে এসে হাসানের কাঁধে হাত রাখে, নিজেকে শক্ত করো, ভাইজান। জীবনে সুখ যেমন আছে দুঃখেরও সীমা নাই। সবই সইবার শক্তিও তিনি দিয়েছেন। নিজেকে হারিয়ে দিও না। সময়ে সবই সয়ে যায়, ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় একটা মারাত্মক ভুল করে বসলে, তা আর শুধরানো যায় না। সে ক্ষতি অপূরণীয়ই থেকে যায়।

হাসান অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে বলে, কিন্তু বোন, এ ব্যথা আমি

সইবো কী করে? না না, সে আমি পারবো না। হয় রোশনিকে তোমরা ফিরিয়ে পাওয়ার উপায় বলে দাও, নয়তো এ জীবন আমি রাখবো না। রোশনি যাওয়ার সময় বলে গেছে, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গেলে তার সঙ্গে দেখা হবে। আমি জানি না, সে দ্বীপ কোথায়? কোন পথে যেতে হয়? কতই বা দূর। যাই হোক পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক, আমি সেখানে যেতে চাই। তোমরা কী জান বোন, সেই ওয়াক ওয়াক দ্বীপের ঠিকানা?

গুলাবী বলে জানবো না কেন? সবই জানি। কিন্তু ঐ দ্বীপে তুমি যাবে কী করে ভাইজান? ওর চেয়ে তুমি যদি বলো বেহেস্ত যাবে, আমরা তোমাকে এক্ষুনি যেতে বলবো। কিন্তু ওয়াক ওয়াক দ্বীপ—সে তো মানুষের অসাধ্য!

গুলাবীর কথা শুনে হাসানের মনে যে ক্ষীণ আলোটুকু টিমটিম করে জ্বলছিলো, তাও মিলিয়ে যায়।

গুলাবী হাসানকে আদর সোহাগ করে ভোলাবার চেষ্টা করে। মন খারাপ করো না, ভাইজান। তুমি না পুরুষমানুষ, একটু শক্ত হও। ধৈর্য ধর। প্রবাদ আছে জানো তো-ধৈর্যই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা—ধৈর্য ধরে শান্ত ধীর ভাবে এগোতে পারলে একদিন লক্ষ্যে পৌঁছন সম্ভব।' সুতরাং এই দারুণ দুঃখের দিনে ধৈর্য ধরে মাথা ঠিক রাখ। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার বিবি বাচ্চাদের ফেরত পাওয়ার জন্য আমি আমার প্রাণ পণ করবো। এবং আশা করি, তোমার মুখে আবার হাসি ফোটাতে পারবো। কী দুর্ভাগ্য! তোমাকে আমি বার বার বলেছিলাম, অশুভের শেষ রাখতে নাই। তখনই যদি আমার কথামতো ঐ খোলসটাকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারতে তাহলে আজ এতো দুঃখ পেতে হত না। যাক, নসীবে যা আছে, কে আর এড়াবে বলো। এখন চেষ্টা করতে হবে যাতে এই দুঃখ বেদনার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। এই কথা বলার পর গুলাবী তার দিদিদের মিনতি করে, তোমরা সকলে মিলে যদি হাসানকে না বাঁচাও, সেই দুর্গম ওয়াক ওয়াক দ্বীপে তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না করো তবে ভাইজান আমার প্রাণে বাঁচবে না, দিদি।

মেয়েরা ভরসা দেয়, ঠিক আছে বোন, আমরা সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করবো, কথা দিচ্ছি।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শোতম রজনীতে আবার গল্প শুর হয় ঃ

মেয়েদের এক চাচা আছে তিনি প্রতি বছর একবার করে এই মেঘমালা প্রাসাদে এসে ভাইঝিদের দেখে যান। সবাইকেই খুব পেয়ার করেন। কিন্তু তার মধ্যে বড় বোনকে একটু বিশেষ নেক-নজরে দেখেন তিনি।

এই চাচার নাম আবদ অল কাদ্দুস। গতবারে তিনি যখন এসেছিলেন তখন বড় ভাইঝিকে একটি আতরের বাক্স উপহার দিয়ে যান তিনি। বলেছিলেন, এই আতর-এর অল্প একটুখানি তুলোয় মাখিয়ে যদি আগুনে ধরিয়ে দাও তবে তোমার ঈপ্সিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারবে।

গুলাঝী বললো, বড়দি তোমার সেই আতর একটুখানি দেবে?

বড়বোন বলে, ওমা সে কি কথা, দেব না কেন? যা, আমার ঘরে আছে, নিয়ে আয়।

গুলাবী অতরের বাক্সটা নিয়ে এসে একটুকরো তুলোয় কয়েক ফোঁটা মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক সুগন্ধে ভরে ওঠে। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা তুষার-শুভ্র হাতীর পিঠে চেপে আকাশ পথ থেকে নেমে আসেন চাচা আবদ্ অল কাদ্দুস।

—এই যে মা সকল, আমি হাজির, বলো কী চাই?

বড়বোন চাচার পায়ে হাত রেখে বলে, কেন, শুধু দেখার জন্য আমরা স্মরণ করতে পারি না আপনাকে? সেই এক সাল আগে এসেছিলেন আপনি। এতোকাল দেখিনি, মন খারাপ করছিলো, তাই আতরে আগুন দিয়েছি, চাচা।

চাচা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। মৃদু হাসলেন।

—সে কথা ঠিক, বেটা। বছর ঘুরে এলো অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। আমিও ভাবছিলাম, দু একদিনেই আসবো। তা সে যাই হোক, এখন আসল ব্যাপারটা কী বলো তো, মা জননী? কেন ডেকে পাঠিয়েছ, এই বুড়ো ছেলেকে?

বড়বোন বলে, ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন চাচা, আপনি যখন জানতে চাইছেন, বলছি।

এরপর হাসানের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতা, রোশনির সঙ্গে তার শাদী এবং সন্তান দুটি সহ রোশনির পলায়নের বিস্তারিত কাহিনী চাচাকে সে খুলে বলে।

—এখন চাচাজী, আমাদের এই ভাইটি রোশনির তালাশে ওয়াক ওয়াক দ্বীপে যেতে চায়। আমরা জানি, আপনি বলে দিতে পারেন তার নিশানা।

শেখ আবদ্ অল কাদ্দুস গম্ভীর হয়ে মাথা নিচু করে মুখে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে কী সব আঁকিবুকি কাটলেন। এবং বার বার ঘাড় আন্দোলিত করে অস্ফুট স্বরে স্বগত ভাবে 'না না' শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন।

—না, বেটা কোনও উপায় নাই। ওয়াক ওয়াক দ্বীপে পাঁচ হাজার কুমারী জিন-কন্যাদের বাস। এবং তারা সকলে সম্রাট জিনিস্থানের নারী-সেনা। তোমাদের ভাইটিকে বলো, বৃথা শোক করে নিজেকে ধ্বংস না করে সে যেন এই দুরাশা মন থেকে মুছে ফেলে। কোনও জনপ্রাণী এই দুর্গম দ্বীপে কখনও পৌঁছতে পারবে না। এই অবাস্তব অসম্ভব চেষ্টা করে কোন ফয়দা নাই।

গুলাবী অসহায় ভাবে শেষ চেষ্টা করে, কিন্তু চাচাজী, আমাদের ভাইটিকে একথা বলে শান্ত করা যাবে না। আপনি ওকে আরও বিশদভাবে একটু বুঝিয়ে বলুন!

চাচা এবার হাসানের দিকে তাকায়। হাসান ওঁর পায়ে হাত রাখে। হাসানকে আদর জানিয়ে চাচা বলেন, বেটা, বৃথা শোক করে নিজেকে শেষ করো না। শান্ত মাথায় ভাবো। শোক নিয়ে চিরকাল কেউ বসে থাকে না। সময়ে একদিন সে সয়ে যায়ই। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত অনেকে টিকে থাকতে পারে না। আমি বয়সে প্রবীণ, অনেক দুঃখ তাপ সকলের জীবনে যেমন আসে আমার জীবনেও এসেছিলো। কিন্তু তাদের জন্য দগ্ধ হয়ে যদি নিজেকে নষ্ট করে ফেলতাম তবে আর আজ তোমার সামনে বসে এই উপদেশ দিতে পারতাম না। শুধু একটা কথা মনে রেখ বাবা, নিজের ব্যথাটাই সবচেয়ে বড় করে দেখ না। তোমার চেয়ে আরও বেশি ব্যথিত মানুষ এই দুনিয়ায় আছে। তাদের কথা ভেবে নিজের দুঃখটা ঈষৎ হাল্কা করার চেষ্ট করো।

চাচা বলতে থাকেন, যত চেষ্টা করো কোনও ভাবেই তুমি সেই ওয়াক ওয়াক দ্বীপে পৌঁছতে পারবে না। এবং সে চেষ্টাও কোরো না। তার ফল শুভ হবে না। এমন কি যদি ডানাওলা জিন আফ্রিদিদের এক বিশাল বাহিনীরও সাহায্য পাও; তবুও আমি বলছি, ওখানে যেতে পারবে না তুমি। এই ওয়াক ওয়াক দ্বীপ তোমার শ্বশুর জিনিস্থান-সম্রাটের অত্যন্ত সুরক্ষিত অঞ্চল। এখান থেকে ওয়াক ওয়াকের দুরত্বটা একবার শোনো ঃ সাতটা দুস্তর সমুদ্র পার হতে হবে। তারপর সাতটা মহাদেশ, এবং সাতটা অত্যুচ্চ গিরি পর্বতমালা অতিক্রম করে যেতে হবে সেই দ্বীপে। পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে—তার ওপারে মহাশূন্য ছাড়া আর কিছু নাই। আমি মনে করি না, তুমি এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র প্রান্তর গিরি পর্বত পার হয়ে সেখানে পৌঁছতে পারবে কখনও। যদিও পারও, তবু ওয়াক ওয়াক দ্বীপের সুরক্ষা ভেদ করতে পারবে না কিছুতেই। তাই বলছি, বাবা ঐ দুরাশা ত্যাগ করে তোমার বোনদের সঙ্গে হেসে খেলে এখানেই দিন কাটাও।

হাসানের মুখ ফ্যাকাশে রক্তশূন্য হয়ে যায়! এবং মুহূর্ত মধ্যেই এক বিকট আর্তনাদ তুলে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। মেয়েরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সাজপোশাক ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে।

হাসানের যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তখন দেখে, গুলাবীর কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে আছে। আর অন্য মেয়েরা গোল হয়ে ঘিরে কেউ হাওয়া করছে, কেউ বা চোখে মুখে গোলাপ জলের ঝাপটা দিচ্ছে।

চাচা আবদ অল কাদ্দুসের করুণা হয়। মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা শান্ত হও মা, এই সময়ে শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যদি নিজেরাই ভেঙ্গে পড় তা হলে ওর কী দশা হবে?

এই বলে তিনি হাসানের কাছে এগিয়ে আসেন। মাথায় হাত রেখে বলেন, চুপ কর বেটা, চুপ কর। তুমি পুরুষমানুষ, তোমার চোখে পানি শোভা পায় না। ওঠ, আমার সঙ্গে এসো। দেখি কি করা যায়।

প্রায় জোর করেই তিনি হাসানকে উঠিয়ে নিয়ে হাতীর পিঠে চেপে বসেন।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো একতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মেয়েরা হাসিমুখে বিদায় জানালো। ওদের মনে আশা জেগেছে, চাচা যখন একবার ভরসা দিয়েছেন নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা তিনি করবেন।

হাতীটার কানে কী যেন ফিসফিস করে বললেন চাচা। আর সঙ্গে সঙ্গে শোঁ শোঁ করে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যেতে লাগলো সে। তারপর মহাশূন্যে উঠে গিয়ে এক পলকের জন্য নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে এবং পর মুহূর্তেই উল্কার গতিতে ছুটে চলতে থাকলো।

একটানা তিনি দিন তিন রাত্রি চলার পর অনেক সমুদ্র গিরি নদী প্রান্তর পার হয়ে চলে এলো তারা পৃথিবীর অপর প্রান্তে অদ্ভুত অজানা এক বিচিত্র দেশে। চাচা বললেন, এই তিন দিনে আমরা যে পথ পার হয়ে এলাম তা সাধারণ মানুষের কত দিনের পথ, জান?

হাসান বলে, অনুমান করতে পারবো না, চাচা।

সাত বছর ধরে যদি চলতে থাকো, তবেই এখানে এসে পৌঁছতে পারো। সেই পথ আমরা এলাম মাত্র তিন দিনে।

একটা গাঢ় নীলবর্ণের পাহাড়ের চূড়ায় এসে থামলো হাতীটা। এই পাহাড়ের উপত্যকায় একটি বিশাল গুহা দেখতে পেলো হাসান। গুহার মুখে একখানা লোহার দরজা। দরাজর রঙও গাঢ় নীল। ভেতর থেকে বন্ধ। বৃদ্ধ গিয়ে টোকা দিতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো একটা নিগ্রো। তার হাতে ধরা ছিলো একখানা নীলবর্ণের ঢাল এবং তলোয়ার। কোনও কিছু ভাববার বা বলার সুযোগ না দিয়ে দারুণ ক্ষিপ্রহাতে নিগ্রোটার হাত থেকে তিনি ছিনিয়ে নিলেন তলোয়ারখানা। নিগ্রোটা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। হাসানকে নিয়ে চাচা ভিতরে ঢুকে গেলেন। নিগ্রোটা দরজা বন্ধ করে দিলো।

ওরা তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যেতে থাকে। আশে পাশে স্বচ্ছ নীল পাহাড়ের দেওয়াল। তার ভিতর দিয়ে নীল আলো এসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো সিঁড়ির পথ।

এইভাবে নিচে নামতে নামতে এক সময়ে ওরা দুটি বিরাট ফটকের সামনে এসে হাজির হয়। ফটকের দরজা ভারি সোনার পাতে গড়া। এর একখানা দরজা খুলে ফেললেন

আবদ অল কাদ্দুস। এবং ভিতরে ঢুকে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যেতে যেতে হাসানকে উদ্দেশ করে বলে গেলেন, যেমন দাঁড়িয়ে আছ, তেমনি দাঁড়িয়ে থাক, একদম নড়াচড়া করবে না। আমি ফিরে আসছি।

প্রায় এক ঘন্টা পরে একটি নীল রঙের ঘোড়ায় লাগাম ধরে ফিরে এলেন তিনি। বললেন, উঠে বসো।

এরপর অন্য ফটকের দরজা খুলে ফেললেন। হাসান তাকিয়ে দেখে, দূর নীল দিগন্ত বিস্তৃত এক শস্য শ্যামল প্রান্তর। কোথায় যে তার শেষ, কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়।

বৃদ্ধ সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, বেটা,প্রস্তুত থেকো, যে কোনও মুহূর্তে প্রাণ সংশয় বিপদ ঘটে যেতে পারে। আর যদি মনে করো, এখনও সময় আছে, তোমার সাত বোনের কাছে ফিরে যেতে পারো।

হাসান বলে, যাই ঘটুক, মৌৎ যদি আসে আসুক—আমি ফিরবো না, চাচা।

বৃদ্ধ বললেন, বাবা বাড়িতে তোমার বুড়ো মা আছেন, এই বয়সে পুত্রশোকে কেঁদে ভাসাবেন তিনি—সেটা কী সন্তান হয়ে তোমার ভাবা উচিত নয়? আমি বলি কি, এই মৃত্যুর গুহায় না ঢুকে তার চেয়ে মা-এর ছেলে মা-এর কোলে ফিরে যাও। তোমাকে পেয়ে আবার তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠবে। কী বলো?

হাসানের সেই এক কথা, আমার বিবি বাচ্চাদের না নিয়ে আর তার কাছে ফিরে যাবো না, চাচা।

আবদ অল কাদ্দুস আর বেশি বোঝাবার চেষ্টা করলেন না। একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই খৎখানা সঙ্গে রাখ।

ঘন নীল কালিতে চিঠিখানার ওপরে নাম লেখা ছিলো ঃ 'সেখ-এর গুরু সেখ আলী আমাদের পরম শিক্ষাগুরু সদাশয় মহামতি পালক-পিতা'—

চাচা বললেন, তা হলে ঠিক আছে, হাসান, এবার আমার ফেরার পালা। তোমাকে একাই যেতে হবে। আল্লাহর নাম করতে করতে এগিয়ে যাও। তারপর নসীবে যা আছে, হবে। তোমাকে কিচ্ছু নিশানা বাতলাতে হবে না, এই ঘোড়া যেদিকে যেখানে নিয়ে যায় সেইদিকেই যাবে তুমি। চলতে চলতে এক সময় এক কালো পাহাড়ের সামনে গিয়ে হাজির হবে। সেই পাহাড়ের চূড়াটাও দেখতে ভীষণ কালো। পাদদেশে দেখবে একটা গুহা। ঘোড়া থেকে নেমে পড়বে। এবং জিন লাগামশুদ্ধ একে ঢুকিয়ে দেবে ঐ গুহার অভ্যন্তরে। তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে বাইরে—গুহার মুখে। একটুক্ষণ পরে একজন মিশমিশে কালো মানুষ এসে দাঁড়াবেন তোমার সামনে। তিনি দেখতে যেমন আবলুস-কালো; তাঁর সাজপোশাকও তেমনি কাঠ কয়লার মতো ম্যাটমেটে কালো। অঙ্গের অন্যান্য আবরণ-আভরণ সবই কালো। শুধু তাঁর আজানুলম্বিত দাড়িগুলো দেখবে শাঁখের মতো সাদা। তাঁর হাতে চুম্বন করবে তুমি। এবং ওর পোশাকের একপ্রান্তে মাথা ঠেকাবে একবার। এরপর এই চিঠিখানা তুলে দেবে তাঁর হাতে। তোমার সম্বন্ধে এতে সুপারিশ করা আছে। এই কৃষ্ণকায় বৃদ্ধই সেই সদাশয় মহামতি পালকপিতা। আমার ওস্তাদ—শিরোমণি। মনে রেখ, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তোমার সকল ইচ্ছা পূরণ করে দিতে পারেন। সেই কারণে তাঁকে খুশি করে তাঁর প্রিয়ভাজন হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে তোমাকে। তিনি যা যা বলেন, গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শুনবে এবং সেইভাবে চলবে। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন।

আবদ অল কদ্দুস বিদায় নিয়ে চলে গেলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসান বুঝতে পারলো, ঘোড়াটা একবার গা-ঝাড়া দিয়ে শোঁ-শোঁ করে ওপরে উঠে তারপর তীরগতিতে ছুটে চলতে থাকলো।

দশদিন ধরে ঘোড়ার লাগাম ধরে রইলো হাসান। উল্কার মতো একটানা ছুটে চলেছে সে। কোথায় কতদূরে এবং কোন পথে সে চলেছে, জানে না, জানতে চায়ও না। কারণ, চাচা গেছেন, ঘোড়াকে চালাতে হবে না। শুধু লাগাম ধরে বসে থাকবে। যেখানে যাবার সেখানেই ও যাবে।

অবশেষে সেই কৃষ্ণ পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামে ঘোড়াটা। হাসান দেখলো পাহাড়ের শিখরে ঘোরতর কৃষ্ণকালো অন্ধকার। একদিকে একটা গুহা। তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। জিন লাগামসহ ঘোড়াটাকে গুহার মধ্যে ঢুঁকিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলো । চাচার বর্ণিত সেই কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন। তাঁর তুলোর মতো সাদা দাড়িগুলো জানু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো দুইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এই বৃদ্ধই সদাশয় মহামতি পালক-পিতা শেখ আলী—পয়গম্বর সুলেমানের বিবি বিলকিসের পুত্র। হাসান নতজানু হয়ে বৃদ্ধের হাতে চুম্বন করে। তারপর ওঁর পোশাকের এক প্রান্তে মাথায় ঠেকায়, এবং চিঠিখানা হাতে তুলে দেয়। বৃদ্ধ নীরবে চিঠিখানা গ্রহণ করে গুহার অভ্যন্তরে চলে যান।

হাসান আশায় আশায় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। শেষে প্রায় হতাশ হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ আর ফেরেন না। আরও অনেক সময় কেটে যায়। আবার তিনি ফিরে এলেন। এবার তাঁর সারা অঙ্গের আবরণ আভরণ সব সাদা।

তাঁকে অনুসরণ করে ভিতরে আসতে ইশারা করলেন হাসানকে।

গুহার অভ্যন্তরে চার দেওয়ালে ঘেরা বিরাট একখানা কামরায় এসে দাঁড়ালো হাসান। সেই ঘরের চার কোণে বলেছিলো চারজন বৃদ্ধ। ওদের সকলেই একই রকম কালো পোশাক পরিহিত। প্রত্যেকের সামনেই স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপি এবং একটি করে ধূমায়িত সুবর্ণ ধূপদানী। ধূপের সুগন্ধে সারা ঘর ভরপুর হয়ে উঠেছিলো। ওদের সামনে আরও সাতজন শিষ্য বসে বসে তুলট কাগজে কী যেন লিখে চলেছিলো এক মনে।

পালক-পিতা যখন ঘরে ঢুকলেন, ওরা সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানালো তাঁকে। চার কোণের সেই চার বৃদ্ধ ব্যক্তিও উঠে এসে ঘরের মাঝখানে রক্ষিত আসনে পালক-পিতার পাশে বসলো। সকলে যে যার আসন গ্রহণ করার পর শেখ আলী হাসানকে বললো, এবার তোমার যা বলার, বলো।

হাসান কী বলবে, যতবারই শুরু করতে যায়, চোখে জল ভরে আসে। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একটুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিতে পারে সে। জীবনের আগাগেড়া সমস্ত ঘটনাই সবিস্তারে মেলে ধরে ওঁদের সামনে। কী ভাবে পারসী জালিয়াতটা তাকে বিভ্রান্ত এবং মেঘমালা পর্বত শিখরে নিয়ে যায়, কী ভাবে তার ওপর সে পাশবিক অত্যাচার করে বিকৃত কামনা চরিতার্থ করতে উদ্যত হয়, আত্মরক্ষার জন্য কি ভাবে তাকে পাহাড় চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে হাসান হত্যা করে, তারপর সপ্তকন্যার সঙ্গে পরিচয়, রোশনির সঙ্গে তার শাদী, সন্তান লাভ এবং তার পলায়ন, পরিশেষে তাকে উদ্ধারের নিমিত্ত শেখ আবদ অল কাদ্দুসের সঙ্গে এই অভিযানে আসা—সব আগাগোড়া খুলে বলে সে।

সকলে অবাক হয়ে শুনলো। এবং হাসান থামতে ওরা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো,

বেগম বিলকিসের যোগ্য সন্তান, আমাদের বিচারে এই যুবক দয়ার যোগ্য। কারণ, সে একদিকে স্বামী, এবং অপর দিকে পিতা হিসাবে নিদারুণ দুঃখ শোক ভোগ করছে। আমাদের উচিত ওর বিবি এবং বাচ্চাদের সন্ধান করে ওর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া।

প্রাজ্ঞ শেখ আলী বললেন, তোমরা বিশেষ বিজ্ঞ, কিন্তু একটা কথা কি জান, এই কাজটা যত সহজে বললে তত সহজে সমাধা করা কিন্তু সম্ভব হবে না। দুস্তর বাধা, বিস্তর বিপদ কাটাতে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই জান, ওই ওয়াক ওয়াক দ্বীপে যাওয়া এবং সেখান থেকে কার্য সমাধা করে ফিরে আসা কত কঠিন কাজ। সবচেয়ে শক্ত সম্রাটের ঐ দুর্ধর্ষ পাঁচ হাজারী উড়ন্ত সৈন্য-বাহিনী। ওরা দিনরাত অতন্দ্র পাহারা দিচ্ছে সম্রাট এবং তাঁর কন্যাদের। এ হেন অবস্থায় তোমরা কী করে আশা করতে পার, রোশনির সঙ্গে হাসানের দেখা হওয়া সম্ভব হতে পারে!

শিষ্যরা বললো, আপনি যথার্থই বলেছেন, পিতা। কিন্তু আপনি তো জানেন, এই যুবককে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আমাদেরই এক ধর্মভাই—আবদ অল কাদ্দুস। শুধু এই কারণেই আমরা এই দায়িত্ব এড়াতে পারি না কোনও মতে।

হাসান পালক-পিতার পা জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

—আপনিই একমাত্র পারেন, আমার বিবি বাচ্চাদের ফিরিয়ে দিতে।

পালক-পিতা বিচলিত হয়ে ওঠেন। হাসানকে দু'হাতে তুলে ধরে বললেন, জীবনে আমি অনেক দেখেছি জেনেছি। কিন্তু এর মতো একজনকেও দেখিনি। বিবি বাচ্চাদের জন্য এই মহব্বত, তাদের উদ্ধারের জন্য মরাণাপন্ন বিপদ নিশ্চিত জেনেও এইভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করতে পারে, এ আমি ভাবতে পারি না। যাই হোক, পথ অতি বন্ধুর, তবু আমি কথা দিচ্ছি, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

এর পর শেখ আলী প্রায় এক ঘণ্টা মৌন হয়ে রইলো। শিষ্যরাও তারা অনুগামী হলো। সারা ঘরময় বিরাজ করতে থাকলো এক নিঃসীম নীরবতা।

এক সময় মৌন ভঙ্গ করে পালক-পিতা বললেন, প্রথমে আমি সম্ভাব্য বিপদ কাটাবার জন্য একটা জিনিস দিচ্ছি। তাঁর দীর্ঘ দাড়ির গোছা থেকে সবচেয়ে লম্বা একগাছি চুল ছিঁড়ে হাসানের হাতে দিয়ে বললেন, যখন বুঝবে মরণাপন্ন বিপদ, বাঁচার আর কোনও আশাই নাই, তখন এই চুল থেকে একটুখানি বের করে আগুন ধরিয়ে দেবে। তাহলেই তৎক্ষণাৎ আমি তোমার সামনে উপস্থিত হবো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে!

ছয়শো তিনতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

বৃদ্ধ ওপরের গম্বুজ-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। হাতে তুড়ি বাজিয়ে কাকে যেন এত্তেলা দিলেন। এক আফ্রিদি এসে হাজির হলো সঙ্গে সঙ্গে। শেখ আলী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী আফ্রিদি?

—আমি দানাস ইবন ফাকতাস—আপনার দাসানুদাস, পরম-পিতা।

দানবের কানে কানে ফিস ফিস করে কী যেন বললেন তিনি। তারপর হাসানের

দিকে মুখ ফিরিয়ে সকলকে শোনাবার মতো স্বরে বললেন, এই আফ্রিদির পিঠে চেপে বসো বেটা। এ তোমাকে আসমানের অনেক ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। খুব শক্ত করে ধরে থাকবে এর গলা। এ তোমাকে নামিয়ে দেবে শ্বেত কর্পূর দ্বীপে। সেখানে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে এ আবার ফিরে আসবে। কারণ তার ওপরে আর যাওয়ার এক্তিয়ার নাই এর। এরপর তোমাকে একা একা পার হতে হবে সেই কর্পূর দ্বীপের প্রান্তরভূমি। ওই দ্বীপ অতিক্রম করে সামনে আর একটা দ্বীপ দেখতে পাবে। তারই নাম ওয়াক ওয়াক দ্বীপ। তারপর আল্লাহ তোমাকে দেখবেন।

হাসান বৃদ্ধ শেখ আলী এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে বিদায় নিয়ে আফ্রিদি দানাস-এর কাঁধে চেপে বসলো।

মুহূর্ত মধ্যে মহাশূন্যে উঠে গেলো আফ্রিদি। তারপর বায়ুবেগে ধাবিত হতে থাকলো সেই শ্বেত কর্পূর দ্বীপের দিকে।

যথাসময়ে দানাস নামিয়ে দিলো হাসানকে। তারপর বললো, এই সেই কর্পূর দ্বীপ, এর ওধারে আমার যাওয়ার উপায় নাই। আপনি একাই যান। আমি চললাম।

সামনে চকচকে রূপোলী প্রান্তর। হাসান এগিয়ে চলে। চলতে চলতে এক সময় অনেক দূরে একটা তাঁবু দেখতে পায়। হাঁটতে হাঁটতে তার কাছে চলে আসে। না তাঁবু নয়, ঘাসের শয্যায় শুয়ে পড়ে আছে এক বিশাল বিকট দৈত্য। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে হাসান। দৈত্যটার নিদ্রাভঙ্গ হয়। ক্রোধে আরক্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়ায়! তারপর মেঘ-নিনাদের মতো গর্জন করে ওঠেন। সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজে হাসান চৈতন্য-লুপ্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যায়। দৈত্যটা আলতোভাবে এক হাত দিয়ে ওর দেহটাকে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নেয়, আবার সে ছুঁড়ে দেয়, আবার লুফে নেয়। এইভাবে বার কয়েক লোফালুফির পর সে দু আঙ্গুলে ওর ঘাড়টা চেপে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে।

হাসানের পায়ের তলায় মাটি নাই। শূন্যে ঝুলেই হাত পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করতে থাকে, ওরে বাবা রে, গেলাম রে, ওগো কে আছ, বাঁচাও। ও বাবা, দৈত্য মহারাজ দোহাই তোমার—তোমাকে গড় করি বাবা, আমাকে মেহেরবানী করে ছোড়ে দাও।

হাসানের এই কাকুতি মিনতি শুনে দৈত্যটার মুখে হাসি ফোটে, আরে এ তো বৃহৎ আচ্ছা গানেবালা চিড়িয়া। ভারি সুন্দর মিঠে তো এর বোল। সম্রাটের কাছে নিয়ে গেলে অনেক ইনাম মিলবে। ঠিক আছে তাই নিয়ে যাবো!

হাসানকে আলগোছে হাতের তালুর ওপর বসিয়ে দৈত্যটা আধ ক্রোশ লম্বা লম্বা পা ফেলে বন-বাদাড় ভেঙ্গে এগিয়ে চলে। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূরে এক পাহাড়ের গুহায় চলে আসে। এই ওর সম্রাটের ডেরা-দরবার। এক শিলাখণ্ডকে মসনদ বানিয়ে তার উপর বসেছিলো দৈত্য-সম্রাট। চারপাশে ঘিরে বসেছিলো, ওর সাঙ্গ-পাঙ্গরা। প্রায় পঞ্চাশজন হবে। প্রত্যেকেই এক একজন ভয়ঙ্কর-দর্শন দানব। দৈর্ঘ প্রস্থ উচ্চতা সবদিকেই সমান—প্রায় পঞ্চাশ হাত হবে।

এই দেখুন মহারাজ, আমি আপনার জন্য এক আজব চিড়িয়া ধরে এনেছি। ভারি সুন্দর গান গাইতে পারে। গলার আওয়াজ বড় মিঠে।

দৈত্যটা হাসানের নাকে টোকা দিতে দিতে বলে, গাও মেরে বুলবুল। গাও।

দৈত্যের ভাষা হাসান কী করে বুঝবে। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। ভাবে এবার তার ইত্তেকাল এসে গেছে। ওরা ওকে মেরে খেয়ে ফেলবে। আকুল হয়ে সে কেঁদে ওঠে, কে আছ গো। রক্ষা কর, রক্ষা কর। ও বাবা গো ম'লাম গো—বাঁচাও গো—

ইনিয়ে বিনিয়ে সে কাঁদতে থাকে। এবং তাতেই কাজ হয়। সম্রাট হাসানের করুণ কান্নার অর্থ বুঝতে পারে না। কিন্তু ওর কণ্ঠের আওয়াজ বড় মধুর মনে হয় তার।

খোদা হাফেজ, খুব মজাদার—চমৎকার চিড়িয়া তো! কোথায় পেলে? যাও এক্ষুণি আমার মেয়েকে দিয়ে এসো। মেয়ের খুব ভালো লাগবে। একটা খাঁচায় ভরে ওর ঘরের সামনে ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে এসো। এর গান আর গলার কিচির-মিচির আওয়াজ শুনে মেয়েটা ভারি আনন্দ পাবে।

এই সময় ভোর হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো চারতম রজনী। আবার সে বলতে থাকে ঃ

দৈত্যটা একটা খাঁচায় পুরলো হাসানকে। খাঁচার মধ্যে বসিয়ে দিলো দু'টো চাড়ি। একটায় জল, অন্যটায় দানা! আর দু'খানা দোলনা। ভাবলো, চিড়িয়াটা নেচে নেচে গাইবে আর এ দোলনা থেকে লাফিয়ে ও দোলনায় গিয়ে বসবে। তারপর খাঁচাটাকে রাজকুমারীর পালঙ্কের শীর্ষে একটা আংটায় ঝুলিয়ে রেখে চলে গেলো।

হাসানকে দেখে রাজকুমারীর আর আনন্দ ধরে না। নানাভাবে ওর সঙ্গে সে নিজের ভাষায় কথা বলে মনের অভিব্যক্তি বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু হাসান তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে না। তবে এটা বুঝতে অসুবিধা হলো না, মেয়েটা তাকে কোন কষ্ট দিতে চায় না। বরং হাবভাবে মনে হয়, আদর সোহাগই করতে চায় সে।

হাসান হাত পা নেড়ে মুখে অদ্ভুত আওয়াজ তুলে মনের ভাব বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু রাজকুমারী ভাবলো সে গান গাইছে। ওর গলার মিষ্টি স্বরে মুগ্ধ হয় সে।

হাসানকে তার এতোই ভালো লাগে যে, কোনও সময়ই তার কাছ ছাড়া হতে চায় না। সারাদিন সারারাত ধরে ওর সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় বক বক করে চলো, আদর সোহাগ ও তর্জন করে! হাসানেরও মন্দ লাগে না। সে-ও চোখের ভাষায় হাতের ঈশারায় তাকে মনের কথা বোঝাবার চেষ্টা করে। বিচিত্র সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক আবোল তাবোল বকে। রাজকুমারীর কানে সে-সব আওয়াজ গান হয়ে বাজে।

হাসান কখনও কখনও উত্তেজিত বোধ করে। আকারে ইঙ্গিতে তার সঙ্গম সহবাস অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। এসব কথা বোঝার জন্য কোনও ভাষার প্রয়োজন হয় না। রাজকুমারীও সঙ্গসুখ পেতে উন্মুখ। কিন্তু বুঝতে পারে না, ঐ চড়ুই-এর মতো ছোট্টো একটা চিড়িয়াকে দিয়ে কী ভাবে রতিসুখ পাবে।

একদিন রাজকুমারী খাঁচা থেকে হাসানকে বাইরে বের করে। সাজপোশাক খুলে ফেলে স্নান করাতে যায়। হঠাৎ সে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে হাসানের নিরাবরণ নগ্ন দেহের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে। একি! এ তো পুরুষদের মতোই পুরুষাঙ্গ। শুধু আকারে অত্যন্ত ছোট একটা ধানি লঙ্কার মতো। ইয়া আল্লাহ, কোনও পাখীর এরকম হয় তাতো কখনও দেখিনি। এবার সে হাসানের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে দেখতে থাকে। বাঃ একি, সবই তো পুরুষের মতো। এ তো বহুৎ আজব চিড়িয়া। হাসানের নগ্ন দেহখানা সে বাঁ হাতের তালুর ওপর বসিয়ে নেয়। হাসান একটি ছোট্ট চড়ুই-এর মতো ওর হাতের মধ্যে ছটফট করতে থাকে। রাজকুমারী লক্ষ্য করে, ধানি লঙ্কাটা ধীরে ধীরে ফুলে ঢপের আকার ধারণ করে।

এ কেমন পাখী? পাখীর মতো গান গায় বটে কিন্তু আর সবই তো এর আমাদের দানবদের মতো? রাজকুমারী ভাবে।

হাসানের অনাবৃত দেহে হাত বুলাতে থাকে সে। স্বভাবতই হাসান উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রাজকুমারীর বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। সে-ও রিরংসায় কাতর হয়।

রাজকুমারীর খুব একটা মন্দ লাগে না। যদিও চড়ুই-এর মতো একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। আরও খানিক সময় থাকতে পারলে হয়তো আরও ভালো লাগতে পারতো।

সেই থেকে হাসান রাজকুমারীর পোষা মোরগ হয়ে গেলো। যখন তখন সে হাসানকে বের করে আদর করে, সোহাগ করে, চুমু খায়, এবং সারা গায়ে হাত বুলায়! হাসান উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে। কিন্তু রাক্ষস-কন্যা এক পলকেই ওকে অসাড় অবশ করে ফেলে!

এই রকম মজার খেলা চলতে থাকে বেশ কিছুদিন। হাসানের মন্দ লাগে না। কিন্তু ওর আসল উদ্দেশ্যের কথা এক নিমেষের জন্য বিস্মৃত হতে পারে না। তার বিবি রোশনি, তার পুত্র নাসির আর মনসুরকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু এখানে এই রাক্ষসপুরীতে খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে রাজকুমারীর চোখে চোখে থাকলে তার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে কী উপায়ে? তাকে যেতে হবে ওয়াক ওয়াক দ্বীপে। জিনিস্থান সম্রাটের সুরক্ষা থেকে লোপাট করে আনতে হবে ওদের।

হাসানের সঙ্গে সেই আশ্চর্য দামামা আর শেখ আলীর একগাছি চুল আছে। বিপদের দিনে কাজে লাগানো যেতে পারতো। হাসানের পোশাক পাল্টাবার সময় রাক্ষস-রাজকন্যার সে দুটো বস্তু ঐ কুর্তার জেব থেকে বের করে রাখা সম্ভব হয়নি। তা হলে সে সন্দেহ করতে পারতো। ঐ পোশাকের মধ্যেই সেগুলি রয়ে গেছে। পোশাক এখন রাজকুমারীর হেপাজতে। অনেক বার সে ঐ দামামা আর চুলের গাছিটা রাজকুমারীর কাছে ইশারা ইঙ্গিত করে ফেরত চেয়েছে। রাজকুমারী প্রতিবারই ভুল ভেবেছে—চিড়িয়া গরম হয়েছে। প্রতিবারই সে হাসানকে ঐ ভাবে ঠাণ্ডা করেছে। এখন সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, কী ভাবে কথাটা ওকে বোঝানো যায়, কী ভাবে আবার ফেরত পাওয়া যায় ও দু'টো অমূল্য সম্পদ।

একদিন রাতে রাজকুমারী হাসানকে খাঁচা থেকে বের করে তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আদর সোহাগ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। এই মওকায় হাসান আস্তে আস্তে উঠে তার পরিত্যক্ত পোশাকের ভেতর থেকে সেই দামামাটা আর শেখ আলীর দেওয়া চুলের গাছিটা বের করে এক গাছি চুলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো পাঁচতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

সঙ্গে সঙ্গে গুহাগহ্বর কেঁপে ওঠে, পালক-পিতা আবির্ভূত হন। তার সর্বাঙ্গে কালো সাজপোশাক।

—কী চাও বেটা?

হাসান নতজানু হয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করে বলে, দোহাই আপনার, জোরে কথা বলবেন না। ও জেগে যাবে এবং আমাকে ঐ খাঁচায় ভরে ফেলবে।

শেখ ওকে হাতে তুলে নিয়ে অলৌকিক ক্ষমতা-বলে গুহার বাইরে পাহাড়ের ওপরে চলে যায়। তারপর জানতে চান, কী ঘটেছে। তখন হাসান তার শ্বেত কর্পূর দ্বীপের এই বন্দীদশার কাহিনী ব্যক্ত করে তাঁকে।

শেখ আলী হাসানের ব্যভিচার-প্রক্রিয়া শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। বলেন, তোমার যদি এই অনাচার করার ইচ্ছা থাকে তবে বাকী চুলগুলো তুমি আমাকে ফেরত দিয়ে দাও। তারপর তোমার যা প্রাণ চায় করতে পারো আমার কিছু বলার নাই। তবে জেনে রাখ, আমার দ্বারা আর কোনও সাহায্য পাবে না তুমি। তোমার নিজের হিম্মতে যদি কুলায় তুমি ওয়াক ওয়াক দ্বীপ থেকে বিবি বাচ্চাদের উদ্ধার করে দেশে নিয়ে যেও। আমার সাহায্য চেও না—পাবে

না। আর যদি আমার ওপর তোমার ভরসা থাকে তবে এই সব ব্যভিচার তোমাকে ছাড়তে হবে। আমি তোমার বিবি বাচ্চাদের উদ্ধার করে দেব।

হাসান কেঁদে ফেলে, আপনি আমাকে মাফ করুন, প্রভু আমার বিবি বাচ্চাদের ফেরত নিয়ে যাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। আমার কাছে, এই দেখুন। একটা আশ্চর্য দামামা আছে, এর সাহায্যে আমি পরীর দেশে উড়ে যেতে পারি।

শেখ আলী বললেন, আমি চিনতে পেরেছি। এটা বাহুরামের কাছে ছিলো। সেও আমার এক শিষ্য—অগ্নি উপাসক ছিলো। সে-ই একমাত্র যে আল্লাহতে বিশ্বাস রাখতে পারেনি। কিন্তু এ দামামা ওয়াক ওয়াক দ্বীপে কোনও কাজে আসবে না। কারণ জিনিস্থান-সম্রাট তার এলাকার সব যাদু অকেজো করে রেখেছে। একমাত্র তার নিজের যাদুই সেখানে কাজ করতে পারে।

হাসান বলে, পয়গম্বরের বাণী ঃ যার দশ সাল বেঁচে থাকার ওয়াদা ন'বছরের মাথায় তার ইন্তেকাল হয় না। যদি আমার নসীবে লেখা থাকে ঐ অজ্ঞাত দেশে প্রাণ যাবে। সেইজন্যে আপনার কাছে আমার আর্জি, আপনি আমাকে সঠিক পথ বলে দিন প্রভু। আমি তার থেকে বিচ্যুত হব না।

তখন পালক-পিতা হাসানকে বললো চোখ বন্ধ কর।

হাসান চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—চোখ খোলো।

হাসান চোখ মেলে তাকালো। কিন্তু কী আশ্চর্য, সামনে দাঁড়িয়েছিলো পালক-পিতা। নিমেষে তিনি অদৃশ্য হয়েছেন। আরও আশ্চর্য হলো হাসান এখন সে আর শ্বেত কর্পূর দ্বীপের রাক্ষসদের প্রাসাদ পাহাড়ের চূড়ায় নাই। সে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা অজানা এক দ্বীপের সমুদ্রের বেলাভূমিতে। যে দিকে নজর যায়, সারা সমুদ্র সৈকত ব্যাপী লক্ষ্ লক্ষ হাজার হাজার বহু বিচিত্র রঙের হীরে জহরত ছড়ানো।

কিন্তু সে দিকে বা নিজের দিকে নজর দেওয়ার পলকমাত্র সময় পেলো না হাসান। হাজার হাজার সাদা পাখীর ঝাঁক নেমে এলো তার মাথার ওপর। কী বিরাট বিরাট সে-সব পাখী। এক একটা প্রায় মানুষের মতো দেখতে। সারা আকাশে ছেয়ে গেলো তারা, সূর্য ঢাকা পড়ে গেলো তাদের পাখার আড়ালে। চার দিকে নেমে এলো ঘন কালো অন্ধকার।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা হাসানের চারপাশে নেমে এসে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ওয়াক ওয়াক আওয়াজ তুলে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকলো।

হাসান বুঝলো, এই সেই ওয়াক ওয়াক দ্বীপ—সেই নিষিদ্ধ দেশ। পাখী গুলো তাড়া করে হাসানকে সমুদ্রে নামাতে চায়। কিন্তু হাসান দৌড়ে কাছেই একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলো। ঘরটার মধ্যে একটা যুৎসই জায়গা খুঁজে বসতে যাবে, এমন সময় পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো। চারদিক থেকে গুম গুম আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো।

এমন সময় ধুলোর ঝড় উঠলো। অন্ধকার হয়ে গেলো দশদিক। সেই অন্ধকারের মধ্যে হাজার সৈন্যের ঢাল-তলোয়ার ঝিলিক মেরে উঠলো।

এরাই আমাজন সেনা! সম্রাটের নারী-সৈন্য-বাহিনী। সকলেই সোনার ঘোড়ায় চেপে এসেছে। হাসানকে কুঁড়েঘরের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা লাগাম টেনে ঘোড়াগুলোকে পিছনের দিকে হঠাতে থাকে। তখন ওরা পিছনের পা ছুঁড়ে বালির পাহাড় তুলে মেয়েগুলোকে ঢেকে ফেলে। কিন্তু হাওয়ার দাপটে মুহূর্তে ধূলো বালি সরে সরে যায়। হাসান দেখলো, মেয়েগুলোর মুখ একেবারে চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর।

ভোর হয়ে এলো! শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো ছয়তম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা চওড়া একটি মেয়ে ঘোড়া থেকে নেমে হাসানের দিকে এগিয়ে এলো। তার ইশারায় সব মেয়েই নিচে নেমে সার হয়ে দাঁড়ালো। ওরা সবাই ফুলের মতো সুন্দর।

লম্বা জাঁদরেল মেয়েটির মুখ সেনাপতির শিরস্ত্রাণ বর্মে ঢাকা ছিলো। হাসানের বুঝতে অসুবিধে হয় না, সে-ই এই নারী সেনা-বাহিনীর প্রধান। কাছে আসতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে ওর পা দু'খানা চেপে ধরলো, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমি পরদেশী মুসাফির। ভাগ্যের তাড়নায় এখানে এসে পড়েছি। আপনি আমাকে বাঁচান। যদি আমার দুঃখের কাহিনী শোনেন আপনার করুণা হবে। এমনি হতভাগ্য আমি, বিবি বাচ্চাদের খুইয়ে আজ দেশে দেশে ঘুরছি।

মেয়েটির কী মনে হলো। সে তার মুখের বর্ম সরিয়ে নিলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসান ওর কুৎসিত কদাকার চেহারা দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠে কয়েক কদম পিছিয়ে গেলো। এমন ভয়ঙ্কর বীভৎস কারো চেহারা হতে পারে, সে ভাবতে পারে না। নাকটা ব্যাঙির মতো, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, চোখ দু'টো কয়লার গুলের মতো গোল গোল। আকর্ণ বিস্তৃত মুখের হা, নিচের ঠোঁটটা অস্বাভাবিক রকমের ঝুলে পড়েছে। হাসান আর সহ্য করতে পারে না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে।

বৃদ্ধা সেনাপতি ভাবলো মনুষ্য-সন্তানরা হয়তো মুখ ঢেকে সম্মানীয়দের সম্মান দেখায়। হাসানের ব্যবহারে সে প্রীত হলো।

শোনো ছেলে, ভয় নাই, আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, কোনও সাজা দেব না। বরং তোমার যাতে কোনও বিপদ না হয় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। এখন নির্ভয়ে বলো তো, কে তুমি, কেনই বা এসেছ এই নিষিদ্ধ দেশে। আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ এখানে আসার দুঃসাহস করেনি। তুমি জান না, এই ওয়াক ওয়াক সপ্তদ্বীপমালা, জীন-সম্রাট জিনিস্তানের সপ্তকন্যাদের সুরক্ষিত সাতটি রাজ্য। সম্রাটের কড়া নির্দেশ আছে, কোন বিদেশী—সে মানুষই হোক আর জীন আফ্রিদিই হোক, এই সাতটি দ্বীপের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারবে না। যদি কেউ তার আদেশ লঙ্ঘন করে ঢোকার চেষ্টা করে, তবে কঠোর সাজা পেতে হবে তাকে। তা তুমি কী এসব কিছু জানতে না। আর তা ছাড়া ঐ সব দুর্গম গিরি পর্বত কান্তার মরুপ্রান্তর এবং সাগর দরিয়া পার হয়ে এমন দূর দেশে পৌঁছতেই বা পারলে কী করে? এবং কী উদ্দেশ্যেই বা এসেছ এখানে?

হাসান বলে, আপনি যদি ধৈর্য ধরে আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শোনেন আমি নিশ্চয় শোনাবো, মা। তবে সে কাহিনী একটু দীর্ঘ, কিছু সময় লাগবে।

নারী-সেনাপতি ইশারা করতে তার গোটা বাহিনীটা নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেলো। বৃদ্ধা সস্নেহে বললো, চলো ঐ পাহাড়ের টিলাটায় গিয়ে বসি। তার পর শুনবো তোমার কাহিনী।

হাসান তার কাহিনী বলে।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করে তোমার বিবি বাচ্চাদের কী নাম।

—আমার দুই ছেলের নাম নাসির আর মনসুর। আর বিবির আসল নাম কী—বলতে পারবো না। তবে আমাকে সে তার নাম বলেছিলো রোশনি।

এই বলে হাসান ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

বৃদ্ধা সান্ত্বনা দিতে দিতে বলে, কেঁদো না বাছা, তোমার এই দুঃখের কাহিনী শুনে

বড় ব্যথিত হলাম। কোনও মা-ই কী সন্তানের চোখে পানি দেখতে চায়? কেঁদো না, চুপ কর। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার বিবি বাচ্চাদের সন্ধান করার জন্য জান প্রাণ চেষ্টা করবো। এখন সন্দেহ হচ্ছে আমার নারী-সেনাদের কেউ হয়তো তোমার বিবি হতে পারে। কারণ এই দ্বীপে ওরা ছাড়া তো কোনও মেয়ে নাই। যাই হোক, কাল তোমাকে ওদের সবাইকে বিবস্ত্রা করে দেখাবো। তুমি ভালো করে দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে তোমার বিবিকে।

হাসান কৃতার্থ হয়ে বলে, আলবাৎ চিনতে পারবো মা। তার চেহারা কী ভোলবার?

পরদিন বৃদ্ধা সেনাপতির বিশাল সৈন্য-বাহিনীর মেয়েরা এসে হাজির হয়। সবাই সাজ-পোষাক খুলে বিবস্ত্রা হয়ে দাঁড়ায়। হাসানকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধা প্রতিটি মেয়ের সামনে দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে চলে।

হাসান বলে, এরা সকলেই পরমাসুন্দরী সন্দেহ নাই। কিন্তু মা, এর মধ্যে আমার বিবি নাই।

বৃদ্ধা চিন্তিত হয়, তবে? তবে তো মনে হয়, সে এ দ্বীপের মেয়ে নয়।

হাসান বলে, কিন্তু উড়ে চলে যাবার আগে সে আমার মাকে বলেছিলো, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গেলে আবার তার সঙ্গে দেখা হতে পারে।

বৃদ্ধা বললো, এ ছাড়া আর মাত্র সাতটি কন্যা আছে এই সপ্তদ্বীপে। কিন্তু তারা তো সম্রাট-নন্দিনী। কেমন দেখতে ছিলো তোমার বিবি, তার রূপের কিছু বর্ণনা শোনাতে পার?

হাসান বলে, সে-রূপ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, মা, অমন অলোকসামান্যা সুন্দরী আমাদের মনুষ্য-জগতে দুটি নাই। তার চোখ নাক মুখ স্তন কটি জঙ্ঘা একেবারে নিখাদ নিখুঁত। নিপুণ ভাস্করের হাতে গড়া এক অপরূপ সৃষ্টি!

বৃদ্ধা কিছু অনুমান করতে পারে না। এখানকার সেনাবাহিনীর মেয়েরাও তো সকলে অসামান্যা সুন্দরী, অবশ্য রাজকুমারীরা আরও অনেক বেশী সুন্দরী, সে কথা ঠিক। কিন্তু রাজকুমারীদের যদি কেউ হয়, বৃদ্ধা শিউরে ওঠে, তা হলে তো সর্বনাশ। এবং তা ছাড়া কীই বা হতে পারে। আবার এই সমগ্র সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যখন সে নাই তখন তো বাকী থাকে মাত্র ঐ সাতজন রাজকুমারী। এ ছাড়া তো অন্য কোনও নারী এখানে নাই।

বৃদ্ধা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে, হাসান তোমার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, তোমার বিবি সম্রাটের সাত মেয়ের কোনও এক মেয়ে। তা যদি হয়, সে দুরাশা তুমি ত্যাগ কর, বাবা। চাঁদে হাত বাড়াতে যেও না। এ খবর সম্রাটের কানে গেলে এইখানেই তোমাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবেন তিনি। সম্রাটের এই দুর্ভেদ্য সুরক্ষা থেকে তাঁর কন্যাকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে—সে আশা করো না। তার চেয়ে তুমি আমার কথা শোনো, আমার সেনাদের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ বলো, আমি সানন্দে তাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। এর জন্যে সম্রাট বা তাঁর কন্যাদের কারো অনুমতির প্রয়োজন হবে না। কারণ সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর আমিই সর্বপ্রধান কর্ত্রী। আমার হুকুমে ওরা প্রাণ দেবে, প্রাণ নেবে।

হাসান বলে, আপনার এই বদান্যতার কথা আমি ভুলবো না। কিন্তু আমি যৌবন কামে উন্মত্ত হয়ে কোনও নারী মাংসের সন্ধানে এখানে আসিনি মা। আমি আমার পেয়ারের বিবি বাচ্চাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি। এবং আমার বিশ্বাস, আল্লাহ যখন এতো দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়ে এখানে আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন তখন শেষরক্ষাও তিনি করবেন। তা না হলে এই নিষিদ্ধ দ্বীপে এসে আপনার মতো এমন দয়াবতী মাকেই বা পাবো কেন? সবই তাঁর ইচ্ছা। আমার মন বলছে, আপনি—আপনিই আমাকে সন্ধান করে দিতে পারবেন আমার বিবি বাচ্চার।

বৃদ্ধা প্রশংসায় বিগলিত হয়ে গেলো।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো আটতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

—বাবা, আমি তোমার মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছি। বিবি বাচ্চারা তোমার কাছে বড় আদরের। তাদের অদর্শন তুমি সইতে পারছো না। যাই হোক, খুব বড় রকমের ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে আমি এই দ্বীপের রানী আমাদের সম্রাটের বড় কন্যার দরবারে নিয়ে যাচ্ছি। জানি না সে আমাকে কী বলবে।

হাসানকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধা সেনাপতি দরবারে আসে। হাসানকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে সে রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। দরবারে প্রবেশ করে রাজকুমারীকে যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে দাঁড়ায়।

রাজকুমারীর নাম নূর অল হুদা। এই বৃদ্ধাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে সে। তার কারণ জন্মের পর থেকে সে তাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। বুকের দুধ খাইয়েছে। সে তার ধাত্রী।

নূর অল হুদা বৃদ্ধাকে দেখে খুব খুশি হয়। বলে, এই যে ধাই মা, মনে হচ্ছে, সুখবর আছে?

—সুখবর কিনা জানি না, বেটা, তবে তোমার কাছে এক আর্জি নিয়ে এসেছি। আজ একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। একটি চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর নওজোয়ান ছেলে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? এবং কেনই বা এসেছ? তার জবাবে ছেলেটি বড় করুণ কাহিনী শোনালো আমাকে। তার বিবি একজিন-কন্যা। তার সঙ্গে ছেলেটির শাদী হয়েছিলো। এবং দুটি সন্তানের জন্মও দিয়েছিলো সে। একদিন সে ছেলে দুটিকে তুলে নিয়ে আবার আকাশে উড়ে উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু যাবার সময় সে এই দ্বীপের নাম বলেছে।—যদি দেখা করতে চাও, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে গেলে আমার সন্ধান পাবে। আমি আমার সৈন্যবাহিনীর সব মেয়েদের দেখিয়েছি তাকে। কিন্তু তাদের কেউ ওর বিবি নয়। যা বর্ণনা দেয় তাতে মনে হয়, তোমাদের সাত বোনের একজন হয়তো হতে পারে। আমি ওকে সঙ্গে করে এনেছি। যদি তুমি দেখতে চাও, দরবারের ভিতরে নিয়ে আসতে পারি ওকে।

বৃদ্ধার কথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়ে নূর অল হুদা।

—তুমি একটা হতচ্ছাড়া মেয়েছেলে। এতোবড় সাহস তোমার, একটা মানুষের বাচ্চাকে ঢুকতে দিয়েছ আমাদের এই পবিত্র দ্বীপে? কী লজ্জার কথা? ছি ছি! তুমি কী চাও, তোমার মুণ্ডুটা আমি ছিঁড়ে খাই?

বৃদ্ধা ভয়ে কাঁপতে থাকলো। হাত জোড় করে সে রাজকুমারীর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লো। নূর অল হুদা তখনও বলে চলেছে, তুমি কী আমার রাগ জান না? আমি তো বুঝতে পারছি না, এসব শোনার পর এখনও কেন তোমাকে জিন্দা রেখেছি। তুমি আমাদের সেনাপতি, এই দ্বীপ পাহারা দেবার ভার দেওয়া আছে তোমার ওপর। তার কী এই নমুনা? আমি তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো। আমাকে চেন না! থাক, সে সব পরে হবে, এখন ওকে হাজির করো আমার সামনে। দেখি, কতবড় তার দুঃসাহস, আমাদের এই পবিত্র দ্বীপে পা রেখেছে সে!

বৃদ্ধা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এসে হাসানকে নিয়ে আবার দরবারে প্রবেশ করে।

নূর অল হুদা বোরখায় সারা দেহ আবৃত করে সিংহাসনে বসেছিলো। আভূমি আনত হয়ে হাসান কুর্নিশ জানালো তাকে। নূর অল হুদা বৃদ্ধাকে ইশারা করতে সে হাসানকে বললো, আমাদের মহামান্যা রাজকুমারী তোমাকে প্রশ্ন করছেন, তোমার নাম কী, স্বদেশ এবং তোমার বিবি বাচ্চাদেরই বা কী নাম?

হাসান বলে, আমার নাম হাসান, আমার জন্মভূমি বসরাহ। আমার বিবির নাম জানি না; দুইপুত্রের নাম নাসির আর মনসুর।

—তোমার বিবি তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে কেন?

হাসান বলে, খোদা কসম, আমি তা জানি না।

—কোথা থেকে চলে গেছে?

—বাগদাদের খলিফা অল রসিদের প্রাসাদ থেকে সে উড়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময় সে আমার মাকে বলে গেছে, 'আপনাদের ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু আকাশ আমাকে ডাক দিয়েছে—যেতেই হবে। বিদায় বেলায় দুঃখ রয়ে গেলো। আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। যদি সে দেখা করতে চায়, ওয়াক ওয়াক দ্বীপে যেতে বলবেন ওকে।' এই বলে সে আমার বাচ্চা দু'টোকে তুলে নিয়ে আকাশ পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি সে-সময় দেশে ছিলাম না। ফিরে এসে সব শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হয়ে গেলো আমার সামনে।

এবার নূর ঘাড় নাড়তে নাড়তে নিজেই কথা বললো, হুম, তোমার বিবি যদি তোমাকে দেখা না দিতে মনস্থ করতো, তা হলে তোমার মাকে তার ঠিকানা জানিয়ে আসতো না কিছুতেই। আবার অন্য কথাও ভাববার আছে, সে যদি সত্যিই ভালোবাসতো তাহলে তোমাকে ছেড়ে পালাবেই বা কেন?

হাসান সঙ্গে সঙ্গে হলফ করে বললো, আপনি বিশ্বাস করুন রাজকুমারী, খোদা কসম, আমার বিবি আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসতো—আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এখনও সে ভালোবাসা অটুট আছে তার। শুধু উন্মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াবার নেশা ওকে ঘর ছাড়া করেছে। আমারই ভুল হয়েছিলো, আমি ওকে অবিশ্বাস করে ওর ডানার খোলসটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। তাই শাদীর পর আর কোনও দিন সে আকাশে ভেসে বেড়াতে পারেনি। আমার মনে হয়, গোড়া থেকে ওকে পুরো স্বাধীনতা দিলে ওর আকাশে ওড়ার শখ মেটালে, ঐ ভাবে সে চলে যেত না।

একটু থেমে হাসান বললো, আমার জীবনের দুঃখের কাহিনী সব শুনলেন, এখন যদি মেহেরবানী করে আমার বিবি বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, চিরকাল আপনার বান্দা হয়ে থাকবো, রাজকুমারী। আশা করি আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না।

নূর অল হুদা 'হাঁ না' কোনও কথা বললো না। পুরো একটা ঘণ্টা মুখ গুঁজে আপন মনে ভাবতে থাকলো, তারপর এক সময় মাথা উঁচু করে বললো, এতক্ষণ কী ভাবে তোমাকে সমুচিত সাজা দেওয়া যায়, তা-ই চিন্তা করছিলাম। কিন্তু এখনও ভেবে উঠতে পারলাম না ঠিক মতো।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো দশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

বৃদ্ধা আতঙ্কিত হয়ে নূর-এর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। রাজকুমারী, মা, তোমাকে আমি নিজের কন্যার মতো করে লালন পালন করেছি। আমার স্তন খেয়ে তুমি মানুষ হয়েছ। সেই জোরে তোমার কাছে আজ এই যুবকের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি, বেটা। তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও। কত দূর দেশ থেকে সে এসেছে। কত দুস্তর বাধা বিপত্তি মাথায় নিয়ে সাত সমুদ্র, সাতটা পাহাড় পর্বত ও সাতটা মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে তবে পৌঁছতে পেরেছে এখানে। এবং তা কীসের জন্য? বিবি আর বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলে। দুনিয়ার ইতিহাসে এই

মহব্বতের নজির নাই, রাজকুমারী। একে তুমি কঠোর দণ্ড দিও না, এই আমার প্রার্থনা। বরং ক্ষমা করে এই মূর্ত ভালোবাসার প্রতীককে সৌজন্য দেখাও। তবে তোমার মহত্ত্ব বাড়বে। ছেলেটির সঙ্গে সহজ হয়ে, একটু দরদ ঢেলে, প্রাণ খুলে আলাপ-সালাপ করে দেখ, তোমার প্রাণে দয়া হবে।

নূর অল হুদা নিজের বোরখা খুলে হাসানের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে হাসান নূরকে দেখে আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বৃদ্ধা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধাতস্থ করার চেষ্টা করে। একটু পরে সে চোখ মেলে তাকায়। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ কী হলো বাছা।

হাসান বলে, ইয়া আল্লাহ, এ আমি কী দেখলাম? এ যে বিলকুল আমার বিবির মতো দেখতে। একটা মুগের দু'খানা ডালের একখানা! অবিকল তার মতো!

রাজকুমারী হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে।

—এ তো দেখছি আস্ত একটা উন্মাদ। আজন্ম আমি কুমারী, আমাকে সে তার বিবি বলে ঠাওরালো? আমি কিনা তার দুই ছেলের মা? আচ্ছা বলো শুনি, কেন আমাকে দেখে তোমার বিবি বলে মনে হলো?

হাসান বলে, আমার বিবির মতো পরমাসুন্দরী নারী ত্রিভুবনে কোথাও নাই, এই আমার এতোদিনের বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু আপনাকে দেখে সব আমার গোলমাল হয়ে গেলো। সেই মুখ, সেই নাক, কপোল অধর সব-সব হুবহু তারই মতো। এতোটুকু তফাত নাই। শুধু ভালো করে লক্ষ্য করলে ধরা যায়, তার চোখের সঙ্গে আপনার চোখের সামান্য ফারাক আছে। আর ধরা যায় আপনার কণ্ঠস্বর শুনে। আপনার কথাও গান হয়ে বেরিয়ে আসে, কিন্তু দু'জনের স্বরে কিছু পার্থক্য আছে।

'রাজকুমারী বুঝলো এ যুবক অন্য কোনও নারীতে আসক্ত হবার পাত্র নয়। কিন্তু দেখা অবধি কী এক অজানা আকর্ষণ অনুভব করছে সে। এরই নাম কী ভালোবাসা?

যাই হোক, কে সেই নারী—যার সন্ধানে সে নিজের জীবন তুচ্ছ করে এই নিদারুণ ঝুঁকির মধ্যে পা বাড়িয়েছে? তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। এবং এই দ্বীপেই যখন সে আছে, নিশ্চয়ই তার অন্য ছয় বোনদেরই একজন কেউ হবে! কিন্তু কে? আমি এদের দু'জনকেই শায়েস্তা করবো।

বৃদ্ধাকে সে বলে, ধাইমা এক্ষুণি তুমি আমার ছয় বোনকে নিমন্ত্রণ করে এসো। গত দুই বছর তাদের কারো সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ওদের বলবে, কাল আমার প্রাসাদে আনন্দ উৎসব হবে। ওরা যেন সবাই চলে আসে। কিন্তু খবরদার, এই ছেলেটির কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলবে না কিছু।

রাজকুমারীর মনের কথা আর জানবে কী করে, হুকুম তামিল করতে তক্ষুনি সে বেরিয়ে পড়লো অন্য ছয় দ্বীপে। প্রত্যেক দ্বীপের রানী হচ্ছে এক এক বোন।

পর পর পাঁচটি দ্বীপে গিয়ে পাঁচ বোনকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে সব শেষে ছোট বোনের দ্বীপে গেলো সে। জিন-সম্রাট এই ছোট কন্যার প্রাসাদেই শেষ জীবন অতিবাহিত করছে। বৃদ্ধার মুখে বড়দিদির আমন্ত্রণ পেয়ে ছোট কন্যা নাচতে নাচতে ছুটে যায় বাবার কাছে।

—বাবা, বড়দি ডেকে পাঠিয়েছেন। কাল তাঁর প্রাসাদে খানাপিনা, নাচ-গান হবে। সব বোনেরা—আমরা এক জায়গায় মিলবো আজ দু বছর বাদে। আমাকে যেতে দেবে তো, বাবা?

সম্রাট ছোট কন্যার কথা শুনে হঠাৎ কেমন বিচলিত বোধ করে, না মা, না, মানে—না, হ্যাঁ—মা না না।

ছোট মেয়ে সম্রাটের এই ধরনের ভাবভঙ্গী দেখে ঘাবড়ে যায়, সে কী বাবা, অমন করছো কেন তুমি। অনেক দিন বাদে নিজের বড় দিদির সঙ্গে দেখা করতে যাবো—তাতে তোমার এতো আপত্তি হচ্ছে কেন?

এতক্ষণে সম্রাট গুছিয়ে বলতে পারেন কথাটা।

—কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, মা। এবং সেই থেকে আমি ভীষণ ভয়ে ভয়ে আছি। কেন জানি না, মনে হচ্ছে, তোমাকে বুঝি আমি আবার হারাবো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো এগারতম রজনী ঃ

আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

সম্রাট বলতে থাকে, স্বপ্নে দেখেছি, আমার গুপ্তধনাগারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। লক্ষ লক্ষ হীরে জহরত, মণিমুক্তা নেড়ে চেড়ে দেখছি। হঠাৎ আমার নজর পড়লো সাতখানা অত্যাশ্চর্য মণিরত্নের দিকে। তার মধ্যে সব চেয়ে যেখানা ছোট, সেখানা আমার কাছে আরও বেশি সুন্দর মনে হলো। আমি ঐ রত্নখানা হাতে করে প্রাসাদে উঠে এলাম। এর পর দেখলাম, হঠাৎ একটা বাজপাখী উড়ে এসে আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেলো ঐ রত্নখানা। আমি চিৎকার করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। বাকী রাতটা শুধু পায়চারী করে কাটালাম। সকালবেলায় গণৎকারদের ডেকে পাঠিয়ে আমার স্বপ্নের কথা বললাম ওদের। ওরা আমাকে ব্যাখ্যা করে বললো, মহানুভব সম্রাট ঐ সাতখানা রত্ন আপনার সাতটি কন্যা। আর ছোট রত্নখানা—সে আপনার কনিষ্ঠা কন্যা।

আমাদের আশঙ্কা, কোনও এক দৈব-দুর্বিপাকে আপনি আপনার এই ছোট কন্যাকে হারাতে পারেন।

সেই থেকে আমি দারুণ উদ্বেগের মধ্যে আছি। তোমার দিদি অনেক দিন পরে তোমাকে ডেকেছে, যাওয়া খুবই সঙ্গত, কিন্তু এ অবস্থায় তোমাকে কাছ-ছাড়া করতে কিছুতেই প্রাণ চাইছে না, মা।

সব শুনে ছোট মেয়ে হো হো করে হাসে, তুমি আমাকে সকলের থেকে বেশি ভালোবাসো, সেইজন্যেই তোমার মনে এতো ভয়, বাবা। তা না হলে খোয়াব কী কখনও সত্যি হয়? আর ঐ গণৎকারদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা তো গালভরা বাণী দিতে পারলেই মোটা ইনাম পায়। তোমার আশঙ্কা করার কোনও কারণ নাই বাবা। আম নিজে যেতে রাজি না হলে কেউ আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো জান বাবা, এর আগে আমার বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে বিপদে পড়ে কিছুকালের জন্য আটকে পড়েছিলাম। কিন্তু আমাকে ওরা চিরকালের মতো বেঁধে রাখতে পেরেছিলো? সুঁযোগ বুঝে একদিন তো আবার তোমার কাছে ফিরে এলাম বাবা। সুতরাং ওসব দুর্ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলো। আমি কোথাও চলে যাবো না। কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমাকে কথা দিচ্ছি বাবা মাসখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে আসবো তোমার কাছে। হাজার হলেও সহোদরা দিদি, সে ডেকেছে, না গেলে চলে?

সম্রাট তবু যেন প্রাণ, খুলে বলতে পারে না, আচ্ছা যা।

ছোট কন্যা-আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এই আমাদের কাহিনীর নায়িকা রোশনি—বাবাকে আদর করতে করতে বলে, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছো,

বাবা। তোমার এই ওয়াক ওয়াক দ্বীপে এতো সহস্র সৈন্য দিনরাত শ্যেন দৃষ্টি মেলে পাহারা দিচ্ছে। বাইরের একটা মশাও এ দ্বীপে ঢুকতে পারবে না। তা ছাড়া সাত সমুদ্র, সাত পাহাড়, সাত মরুপ্রান্তর, শ্বেত সূর্যের দ্বীপ ডিঙিয়ে তবে ওয়াক ওয়াক দ্বীপ। এতো বাধা কাটিয়ে এখানে এসে পৌঁছবে, এমন হিম্মত কার আছে? বাবা, আর মুখ ভার করে থেকো না, সব দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে একবার প্রাণ খুলে হেসে আমাকে বিদায় দাও তো!

শেষের কথাগুলি সম্রাটের খুব মনে ধরলো। তাই তো! তার দেশের যা সুরক্ষা, তা ভেদ করে বাইরের কোন প্রাণীর এখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেলো। বললো, যা মা, দেখে শুনে যা। তোর সঙ্গে আমি কড়া পাহাড়া দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি। জানিস তো তোকে ছাড়া আমি দিন কাটাতে পারি না।

এর পর এক হাজার নারী-সেনার এক বাহিনীর প্রহরায় রোশনি বড় দিদির প্রাসাদে এসে পৌঁছয়।

পৌঁছয় আরও পাঁচ বোন। কিন্তু আনন্দ উৎসবের কোনও আভাস দেখতে পেলো না কেউ।

নূর অল হুদা খবর পাঠালো, তোমরা বিশ্রাম করো, সবাই। যথাসময়ে আমি ডেকে পাঠাবো।

দরবারে নূর অল হুদা সিংহাসনে উপবিষ্ট। আর তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসান। কোরবানীর খাসীর মতো তার অবস্থা। চারপাশ ঘিরে এক পাল অসিধারিণী উন্মুক্ত খড়্গ উঁচিয়ে আছে। রাজকুমারী প্রথমে তার চেয়ে ছোট যে বোন—তাকে ডেকে পাঠালো।

—দেখ, ভালো করে তাকিয়ে দেখ, যুবক। এ-ই কী তোমার বিবি?

হাসানকে প্রশ্ন করে নূর। কিন্তু হাসান বলে, এঁরও রূপের কোনও তুলনা নাই, রাজকুমারী। দেখতেও অনেকটা আমার বিবিরই মতো, কিন্তু না, ইনি নন।

নূর অল হুদা ইশারা করতে তার ভগ্নী দরবার ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

আর একজন আসে। হাসান বলে, সত্যিই অপরূপ সুন্দরী। একেবারে নিখুঁত। কিন্তু নসীব খারাপ, ইনিও আমার বিবি নন।

এর পর তৃতীয় জন এলো। সেও নয়। চতুর্থ এলো। সেও নয়। এলো পঞ্চম সহোদরা। নূর জিজ্ঞেস করে, দেখ ভালো করে, দেখ, এ নিশ্চয়ই তোমার বিবি?

হাসান অবাক হয়। এতো মিল কী করে সম্ভব। হুবহু একই রকম দেখতে। একেবারে রোশনি। কিন্তু না, এ রোশনি নয়। হাসান ঘাড় নাড়ে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে, না না এ-ও নয়। এরা সবাই সুন্দর, সবাই দেখতে আমার বিবির মতো। আশ্চর্য ভেল্কী বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। কিন্তু এদের কেউই আমার বিবি নয়।

নূর অল হুদার বুঝতে আর বাকী থাকে না, তা হলে রোশনি—তার সর্ব কনিষ্ঠ ভগ্নী ছাড়া আর কেউ নয়। ইশারা করতে প্রহরী রোশনিকে দরবারে নিয়ে আসে। হাসান মুখ তুলে তাকায়। আর তখুনি অস্ফুট আর্তনাদ তুলে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। নূর-এর ঠোঁটের কোণে হিংসার হাসি ঝিলিক মেরে ওঠে। হুম, তা হলে ছোটর এই কাণ্ড। ঠিক আছে, দাঁড়াও মজা আমি দেখাচ্ছি। এই কে আছিস, এই ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যা এখান থেকে। সমুদ্রের পানিতে ফেলে দিয়ে আসবি, যা নিয়ে যা।

দুটি নারী-জল্লাদ হাসানের অচৈতন্য দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যায়। সমুদ্র-সৈকতে

এসে হাসানের হত-চৈতন্য অসাড় দেহটাকে শুইয়ে দেয় বালির ওপর—একেবারে জলের ধারে। ভাবে এক সময় সাগরের ঢেউ এসে ওকে টেনে নিয়ে যাবে অকুল দরিয়ায়। তারপর এই চাঁদের মতো সুন্দর নওজোয়ানের নসীবে যা লেখা আছে, তাই হবে।

এদিকে নূর ক্রোধান্বিত হয়ে রোশনিকে বলে, তুই আমাদের পবিত্র জিন-বংশের কলঙ্ক। জিনিস্থান-সম্রাট যার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতে পারে না, তিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা। একটা সামান্য নর সন্তানের সঙ্গে ঢলাঢলি করে তুই তাকে দেহ বিলিয়ে দিয়েছিস। ছি ছি, লজ্জায় মাথা কাটা যায়। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোকে আমি এই মুহূর্তেই খতম করে ফেলি। কিন্তু না, বাবা এখন জীবিত। তার হুকুম ছাড়া কোনও কাজ আমি করি না। এখনি তাঁর কাছে আমি তোমার গুণের কথা জানিয়ে খবর পাঠাচ্ছি। তিনি যা জবাব পাঠান—সেইভাবে তোমার ব্যবস্থা করা হবে। এ্যাই, একে পাতালের অন্ধকার কারাগারে নিয়ে যা। খুব শক্ত করে থামের সঙ্গে বেঁধে রাখবি।

এর পর নূর বৃদ্ধা সেনাপতির দিকে তাকায়।

—আর তুমি? তোমার কী শাস্তি বিধান দেব, বলো তো; ধাই মা? তুমি আমাকে লালন পালন করেছ, বুকের স্তন খাইয়ে মানুষ করেছ। তোমার ওপর কিছু কৃতজ্ঞতা আমার থাকা উচিত। কিন্তু ধাইমা, ব্যক্তি-স্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্র অনেক বড়। তার স্বার্থ সকলের ওপরে। সেখানে আমি কোনও দাক্ষিণ্য দেখাতে পারি না। তুমি আমার প্রধান সেনাবাহিনীর প্রধান। তোমার হাতে রাষ্ট্রের সুরক্ষার ভার দেওয়া ছিলো। সেই, মহান কর্তব্য থেকে তুমি বিচ্যুত হয়েছ। এর সাজা তোমাকে পেতেই হবে। তুমি আমার মাতৃতুল্য, কিন্তু তুমি এখন দেশ-দ্রোহী। এখন আমি চিন্তিত বিচলিত! কী করবো কিছুই ঠিক করতে পারছি না। দেশ-দ্রোহের সাজা প্রাণদণ্ড, কিন্তু তোমাকে আমি নিজে হাতে সে দণ্ড দেব কি করে, মা?

নূর অল হুদা এক মুহূর্ত স্থির অপলক হয়ে কী যেন ভাবে। তারপর বলে, নাঃ, আমি হাতে রাখবো না তোমার বিচার। বাবাকেই সব জানাচ্ছি। তিনি যা হুকুম করে, তাই হবে। এখনি আমি দূত পাঠাচ্ছি বাবার কাছে। তাঁর জবাব না আসা পর্যন্ত এই দরবারে এইভাবে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, এই আমর আদেশ।

এই বলে নূর দরবার কক্ষ ত্যাগ করে অন্য বোনেদের সঙ্গে মিলিত হতে যায়।

এদিকে সমুদ্রবেলায় বালির শয্যায় শুয়েছিলো হাসান। এক সময় তার জ্ঞান ফিরে আসে। দুদিন আগে হঠাৎ এই সমুদ্র-সৈকতেই সে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো হঠাৎ সেই শেখ আলীর মন্ত্রবলে। আজ সে সেখানেই শুয়ে আছে, আশ্চর্য!

সামনে দিগন্ত-প্রসারী দুস্তর জলরাশি, আর এপাশে সেই গিরি পাহাড় শ্রেণী। ওপরে স্বচ্ছ নীল আকাশ। বড় মনোহর দৃশ্য। কিন্তু হাসানের কিছুই ভালো লাগে না। কোথায় তার নয়নের মণি রোশনি। এক পলকের জন্য তাকে সে দেখেছে। তারপর আর কিছু মনে নাই।

হাসান বুঝতে পারে রাজকুমারী নূর অল হুদার হুকুমে তার প্রহরীরা এখানে এই বালুকাবেলায় ফেলে গেছে তাকে। তা যাক, কিন্তু রোশনি—তার বিবিকে কী অবস্থায় রেখেছে সে। অথবা এতক্ষণে ক্রোধে অন্ধ হয়ে সে তার প্রাণ সংহার করেছে! না না, ও-কথা হাসান ভাবতে পারে না—ভাবতে চায় না।

একটা চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ কানে আসে হাসানের। তাকিয়ে দেখে দুটি ছোট্ট মেয়ে—নারী-সেনা হবে-প্রচণ্ডভাবে মারামারি করতে করতে তার দিকে ধেয়ে আসছে। হাসান উঠে দাঁড়ায়। ছুটে গিয়ে মেয়ে দুটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করে, কী ব্যাপার, তোমরা এমন মারামারি করছো কেন?

একটি ছোট্ট মাথার টুপি নিয়ে ওদের মধ্যে বচসা এবং সেই নিয়ে মারামারি শুরু হয়েছে। একটি মেয়ে বলে, টুপীটা আমার, অন্য জন বলে না আমার, আমি দেব না।

হাসান হাসে। তুচ্ছ একটা মাথার টুপি, এই নিয়ে এমন তুলকালাম কাণ্ড। আচ্ছা শোনো, আমি তোমাদের বিবাদ মিটিয়ে দিচ্ছি।

মেয়ে দুটি সাগ্রহে বলে, বেশ তাই দিন। আমরা আপনার রায়ই মেনে নেব।

হাসান বলে আমি একটা ঢিল ছুঁড়ে দিচ্ছি আসমানের দিকে। তোমরা ছুটে যাবে। যে আগে নিয়ে আসতে পারবে ঐ ঢিলটা, এ টুপি তারই প্রাপ্য, কেমন রাজি। —রাজি-রাজি।

দু'জনেই একসঙ্গে বলে ওঠে। হাসান বলে, তা হলে টুপিটা আমার কাছে জিম্মা রাখ।

একটি মেয়ের হাতে ছিলো টুপিটা। সে নির্দ্বিধায় তুলে দেয় হাসানের হাতে। হাসান একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে পাঠিয়ে দেয় অনেক ওপরে। আর তখনি চিলের মতো ডানা মেলে ওরা উড়ে যায় আকাশে। ঐ ঢিলটার পিছনে। হাসান হাসতে হাসতে টুপিটা মাথায় পরে নেয়,স্বগতভাবে বলে, যতো সব পাগল।

একটুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে ওরা। হাসান দেখে ওদের একজনের হাতে সেই পাথর টুকরোখানা। সে চিৎকার করে ডাকে, কই গো, কোথায় গেলে এই যে আমি ঢিলটা ধরেছি।

হাসান হাসতে হাসতে বলে,এই তো আমি।

হাসান অবাক হয়, সে কি! ওদের একেবারে নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে আছে সে—ওরা দেখতে পাচ্ছে না। আবার সে সাড়া দেয়, এই তো আমি।

মেয়ে দু'টো দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। এবার হাসানের মনে খটকা লাগে। তবে তো এ কোনও সাধারণ টুপি নয়। নিশ্চয়ই যাদু মন্ত্রঃপুত। মাথায় পরলে আর তাকে কেউ দেখতে পায় না।

মেয়েরা তারস্বরে ডাকতে থাকে ওকে। হাসান কিন্তু আর কোনও সাড়া দেয় না। হন হন করে হেঁটে চলে আসে নূর অল হুদার দরবারে। সেখানে তখন নূর ছিলো না। দরবারকক্ষ প্রায় শূন্য। শুধু একপাশে মুহ্যমান সেই বৃদ্ধা মাথায় হাত রেখে চোখের জল ফেলছিলো।

হাসান ওর কাছে গিয়ে ডাকে, আপনি কাঁদছেন কেন মা।

বৃদ্ধা মুখ তুলে তাকায়। কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না। ভাবে, হয়তো তার মতিভ্রম ঘটেছে।

হাসান আবার বলে, রোশনি কোথায় মা, তাকে তো দেখছি না?

এবার আর ভুল হয় না তার। এতো সেই হাসানের কণ্ঠ স্বর। কিন্তু কোথায় সে? দরবারে তো অন্য কোনও প্রাণী নাই। অবাক হয়ে সে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। হাসান বুঝতে পারে বৃদ্ধা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। টুপিটা সে মাথার থেকে খুলে নেয়।

হঠাৎ হাসানকে দেখে চমকে ওঠে সে, তুমি? তুমি কী করে এখানে এলে বাবা? তোমাকে তো ওরা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এসেছে।

হাসান বলে, সে কথা পরে বলবো। এখন বলুন রোশনি কোথায়—জিন্দা আছে তো সে?

—এখনও আছে। তবে আর বেশিক্ষণ বোধ হয় থাকবে না।

—কেন?

নূর ওর বাবাকে খৎ লিখে দূত পাঠিয়েছে। জবাব এলেই রোশনি আর আমাকে খতম করে ফেলবে সে।

—আপনাকেও? কিন্তু কেন, মা?

—দেশদ্রোহিতার অপরাধ। আমি তার সেনাবাহিনীর প্রধান, আমি তোমাকে

আশ্রয় দিয়েছি এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম স্বার্থ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করেছি —এই অপরাধ। ও-কথা থাক, আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। মরতে আমার বাধা নাই। কিন্তু দুধের বাছা রোশনি, ওকে বাঁচাতে হবে বাবা। কিন্তু কী করে বাঁচাতে পারবে ওকে। সে তো এখন পাতালের কয়েদখানায় বন্দিনী হয়ে আছে!

হাসান আকুল হয়ে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাও অদৃশ্য হয়ে যায়। দরবারের প্রহরীরা আতঙ্কিত হয়ে একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে, আরে সেনাপতি গেলো কোথায়?

হাসান বুঝতে পারে, এ টুপি যার মাথায় থাকবে সে-ই শুধু অদৃশ্য হয়ে যাবে তা নয়, সে যাকে ধরবে, ছোঁবে—তাকেও কেউ দেখতে পাবে না।

হাসান বলে, মা, আপনি আমাকে ধরে থাকুন, তা হলে আপনাকেও কেউ দেখতে পাবে না। তারপর চলুন ঐ কয়েদখানায়, রোশনিকে উদ্ধার করতে হবে।

বৃদ্ধা পাতালের কয়েদখানায় নিয়ে আসে। সেখানে রোশনিকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো চৌদ্দতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

হাসান ভাবে, এই অবস্থায় রোশনিকে যদি দেখা দেয় তবে হয়তো এখুনি মুর্ছা যাবে সে। ক্ষিপ্র হাতে হাসান ওর বাঁধন খুলে দেয়। প্রথমে রোশনি কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকে। পরে হাসান ওর মাথার টুপি খুলে ফেলতে পরিষ্কার বুঝতে পারে এই অন্ধকার কয়েদখানা থেকে তাকে উদ্ধার করতে এসেছে তার স্বামী। হাসানের বুকে মাথা রেখে সে কাঁদতে থাকে।

হাসান বলে, এখন কান্নার সময় নয় রোশনি। চলো, এখান থেকে পালাতে হবে। টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়। রোশনিকে কাঁধে তুলে এবং বৃদ্ধাকে হাতে ধরে কয়েদখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

হাসান বলে, আমি তোমাকে বাগদাদে নিয়ে যেতে এসেছি রোশনি, যাবে তো?

রোশনি বলে, দেরি হলেও বুঝতে পেরেছি, হাসান। শাদীর পর মেয়েদের একমাত্র ভরসাস্থল তার স্বামীর আশ্রয়। এখানে যদি ফেলে রেখে যাও, আমার নিজের লোকরাই আমাকে কোতল করে ফেলবে। ওদের ধারণা, তোমাকে শাদী করে তোমার ঔরসে বাচ্চা পয়দা করে আমি পতিতা হয়েছি। জিন-সম্রাটের বংশে চুনকালি দিয়েছি, সুতরাং এই ওয়াক ওয়াক দ্বীপ-এ আমার থাকা আর নিরাপদ নয়। চলো, এই মুহূর্তে আমি তোমার সঙ্গে জাহান্নামেও যেতে রাজি আছি।

হাসান বলে জাহান্নামে কেন বলছো, তুমি আর আমি বাগদাদে ফিরে গিয়ে নতুন বেহেস্ত রচনা করবো। তার আগে একবার তোমার নিজের প্রাসাদে যেতে হবে। সেখান থেকে আমাদের চোখের মণি নাসির ও মনসুরকে তুলে নিতে হবে।

রোশনি স্বামী আর বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে আসে। তিনখানা ডানার খোলস সংগ্রহ করে আনে সে। আর নিয়ে আসে নাসির ও মনসুরকে।

—নাও এই ডানাগুলো পরে নাও।

রোশনি নিজেও একখানা পরে। ছেলে দু'টোকে কোলে নেয় বৃদ্ধা। এবং মুহূর্তে

মধ্যে মহাশূন্যে মেঘের ওপারে নিঃসীম নীল আকাশে উঠে যায় ওরা। তারপর উল্কার গতিতে ছুটে চলে বাগদাদের দিকে।

মাত্র একটি রাত। হাজার হাজার যোজন পথ একটি মাত্র রাতের মধ্যে পার হয়ে ঠিক ভোরবেলায় টাইগ্রিস উপকূলে এসে হাসানের বাড়ির ছাদের ওপর এসে নামে সকলে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো পনেরোতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু করে সে ঃ

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে হাসান দরজায় কড়া নাড়ে। তখনও রাতের অন্ধকার কাটেনি। হাসানের মা অসাড় হয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছিলো। ছেলের শোকে কেঁদে কেঁদে সে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। সারা দিন রাতে চোখের দু পাতা এক করতে পারে না। প্রতিটি রাতের প্রতিটি প্রহর ঘন্টা সে কান পেতে শোনে।

আত্মীয় পরিজন কেউই বড় একটা খোঁজ খবর রাখে না। হঠাৎ এই ভোরে কে আবার কড়া নাড়ে। হাসানের মা মেঝের ওপর শুয়ে থেকেই সাড়া দেয়, কে? কে কড়া নাড়ে?

—আমি মা, হাসান, তোমার ছেলে। দরজা-খুলে দেখ, কাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

হাসানের মা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। তার হারানিধি হাসান আবার ফিরে এসেছে? কোনরকমে সে উঠে দাঁড়ায়। দরজায় হুড়কোখানা খোলে তারপর সত্যি সত্যিই হাসানকে দেখতে পেয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে টলে পড়তে যায়। কিন্তু হাসান দু'হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মাকে। মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে, মা—মাগো তাকিয়ে দেখ, আমি ফিরে এসেছি। আর, এই তোমার রোশনি এই দেখ তোমার দাদুভাইরা, এদের বুকে নাও।

অনেকক্ষণ পর মা সম্বিত ফিরে পায়। রোশনি তার পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে বলে সব আমার দোষে হয়েছে মা। আমি ঘাট স্বীকার করছি। আর কখনো এমনটি হবে না। আপনি দেখবেন, কত ভালো মেয়ে হয়ে আমি ঘরে থাকবো। আকাশ আমাকে ডাক দিয়েছিলো, ত আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। আপনাদের এতো আদর ভালোবাসা তুচ্ছ করে চ গিয়েছিলাম। কিন্তু মা, সে মোহ আমার কেটে গেছে। আমি আর কোথাও যাব না। এই আম ঘর, এই আমার সংসার, এই-ই আমার ইহকাল পরকাল-সব।

এরপর হাসান তার মাকে সামনে বসিয়ে সেই দুঃসাহসিক অভিযানের আদ্যোপান্ত কাহি শোনালে.। তার পুনরাবৃত্তির কোনও প্রয়োজন নাই এখানে।

তখন থেকে হাসান তার মা বিবি-বাচ্চাদের এবং মাতৃপ্রতিম সেই বৃদ্ধাকে নিয়ে সু স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে থাকলো। বৎসরান্তে একবার করে সে তার সাত বোনের সঙ্গে দে সাক্ষাৎ করতে যেত। যাবার সময় রোশনিকে বুকে জড়িয়ে চুমু খেয়ে আদর সোহাগ করা করতে কানে কানে বলে যেত, আবার পালিয়ে যাবে না তো?

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ সুলতান শারিয়ারের মুখের দিকে তাকায়। সুলতান এতক্ষ গল্পের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে বসেছিলো। গল্প শেষ হতে সে আত্মস্থ হয়।

—শুনতে শুনতে হতবাক হয়ে যেতে হয় শাহরাজাদ। সত্যিই এমন দুঃসাহসিক অভিযানে কাহিনী অনেক কাল শুনিনি। এমন তোমার শ্বাসরোধ করা গল্প যে, শুনতে আমার দরবারে কাজ কাম লাটে ওঠার দাখিল হয়েছে।

দুনিয়াজাদ বলে, কী চমৎকার কিসসা দিদি। তবে এ তোমার ভারি অন্যায়, গুলাবীর সঙ্গে হাসানের আর একটা শাদী দিলে কী এমন ক্ষতি হতো?

শাহরাজাদ হাসে, পাগলী কোথাকার।

তারপর সুলতানের দিকে তাকিয়ে বলে রাত আর বেশি বাকী নাই। এখন নতুন কিসসা শুরু করলে আপনার ঘুম ভাঙ্গতে দেরি হয়ে যাবে, জাঁহাপনা। এমনিতেই তো আমাকে দোষারোপ করছেন, আমার জন্যেই নাকি আপনার দরবারের জরুরী কাজ কাম নষ্ট হচ্ছে।

সুলতান শারিয়ার বলে, তা হোক, তবু তোমর কিসসা শুনে মেজাজ তো খুশ থাকে। ঠিক আছে, আজ আর, নতুন কাহিনী নয়, এখনও রাতের অন্ধকার কাটেনি। এসো আমরা একটু 'ভালোবাসা' করে ঘুমিয়ে পড়ি।

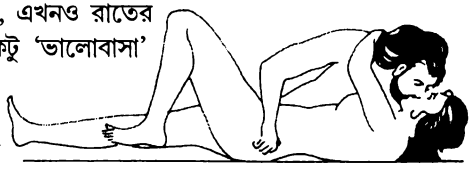

তারপর দুনিয়াজাদের দিকে চোখ পাকিয়ে সুলতান শাহরিয়ার কপট তম্বি করেন, দুনিয়া, তুম ইধার মৎ দেখো, আঁখ বন্ধ করকে শো যাও।

এর পর ওরা এক সময় সব কাজ সাঙ্গ করে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন ছয়শো ষোলোতম রজনী ঃ

শাহরাজাদ এবার নতুন গল্প শুরু করবে ঃ

শাহরাজাদ বলে জাঁহাপনা এবার একটা মজাদার কাহিনী শুনুন!

কোনও এক শহরে এক যুবক সওদাগর বাস করতো। ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে প্রায়ই তাকে বিদেশে যেতে হতো। সওদাগরের এক বিবি ছিলো মেয়েটি নষ্ট চরিত্রের। ভীষণ কামুক।

সওদাগর যখন বিদেশে যেত বিবি কাম-কাতর হয়ে সুন্দর সুপুরুষ ছোকরা খুঁজে বেড়াতো।

একবার সওদাগর বিদেশে গেলে বিবিটা ঐ রকম একটি তরুণকে সন্ধান করে বাড়িতে নিয়ে আসে। সারা দিন রাত তার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ রতি রঙ্গ করে কাটাতে থাকে।

একদিন ঐ ছেলেটি এক বিকৃত-কাম শেখের পাল্লায় পড়ে। বৃদ্ধের প্রস্তাবে ছেলেটি ক্ষেপে যায়। এবং কিল চড় লাথি ঘুষি মেরে তাকে ঘায়েল করে ফেলে। বুড়োটা কোতোয়ালের কাছে নালিশ করে। কোতোয়াল ছেলেটিকে ধরে এনে ফাটকে ভরে রাখে।

সওদাগর-বিবি খবর পায়, তার নাগর কয়েদ হয়েছে। রাগে সে ফুঁসে ওঠে। সটান চলে আসে কোতোয়ালীতে।

কোতোয়াল তখন তার দপ্তরে কাজে ব্যস্ত ছিলো। সওদাগর-বিবিকে দেখে সে লোলুপ হয়ে ওঠে। মেয়েটির দেহে ঢলঢলে ভরা যৌবন। রিরংসার আগুন জ্বলে ওঠে শরীরে। জিজ্ঞেস করে, কী চাই তোমার?

সওদাগর-বিবি সালাম জানিয়ে বলে, কোতোয়াল সাহেব, আপনার ফাটকে আমার ভাই আটক হয়ে আছে। একটা বুড়ো শেখ ওর নামে মিথ্যা নালিশ করেছে আপনার কাছে। ও কিছু দোষ করেনি। মেহেরবানী করে আপনি ওকে ছেড়ে দিন। আমার বাড়ির সে-ই একমাত্র কর্তাব্যক্তি। ওকে যদি আপনি কয়েদ করে রাখেন আমার সংসার অচল হয়ে যাবে।

কোতোয়াল বললো, ঠিক আছে তোমার ভাই যাতে ছাড়া পায়, আমি দেখব। আমি এখন অন্য কাজে খুব ব্যস্ত। তুমি আমার হারেমে অপেক্ষা কর। এদিকের কাজ কাম শেষ করে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করছি।

সওদাগর-বিবি ভাবলো, বুড়োটার প্রাণে বসন্ত জেগেছে। কিন্তু সে-ও জাঁহাবাজ মেয়ে। তাকে কাবু করা অত সহজ নয়। মুখে বললো, কোতোয়াল সাহেব, আপনার হারেমে এসব হবে না। আপনি যদি দয়া করে আমার বাড়িতে আসেন, আমি নির্ভয়ে সব খুলে বলতে পারি আপনাকে।

—বেশ তো, কোথায় তোমার বাড়ি?

মেয়েটি বলে, চাঁদনী বাজারের পিছনে একটাই লাল রঙের বাড়ি আছে। ওইটেই এই বাঁদীর বাড়ি। ঠিক সূর্য ডোবার সময় যদি আসেন খুব ভালো হয়।

কোতোয়াল গম্ভীর হয়ে বলে, ঠিক আছে, তুমি থেকো। আমি ঐ সময়ই যাবো তোমার বাড়ি।

সওদাগর-বিবি কোতোয়ালী থেকে বেরিয়ে সোজা চলে আসে কাজীর বাড়ি। মেয়েটিকে দেখামাত্র কাজীর কামনা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এমন আপেলের মতো গাল, রতিদগ্ধ অধর, উদ্ধত বক্ষ, ভারি নিতম্ব কাজীর বুকে তুফান তোলে। বৃদ্ধ প্রশ্ন করে, কী চাই তোমার? কেউ তোমার ওপর জোর-জুলুম করেছে কিছু?

সওদাগর-বিবি বলে, জী না, আমার ওপরে আবার কে জুলুম করবে। আমি এসেছি আমার নিরপরাধ ভাই-এর খালাসের জন্য।

—খালাস? কেন কী হয়েছে, সে কী কয়েদ হয়েছে নাকি?

—জী হাঁ, কোতোয়াল তাকে অন্যায় করে ফাটকে ভরে রেখেছে। একটা বুড়ো শেখ আমার ভাই-এর নামে মিথ্যে করে নালিশ করেছিলো। কয়েকটা মিথ্যে সাক্ষী জোগাড় করে এনেছিলো। কোতোয়াল দু-তরফের সব কথা না শুনেই তাকে বেড়ি পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

কাজী বলে, তোমার সব কথা শোনা দরকার। তুমি এখন আমার হারেমে যাও। তারপর দেখি, এদিকের কাজ কাম সেরে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবো। তবে নিশ্চিন্ত থেক তোমার ভাইকে আমি খালাস করে দেব।

সওদাগর-বিবি বুড়ো কাজীর মতলব বুঝতে পারে। বলে, দেখুন কাজী সাহেব, আপনার হারেমের মেয়েরা আমার অচেনা। সেখানে আমি ঠিক সহজ হতে পারব না। তার চেয়ে আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার বাড়িতে আসেন খুব ভালো হয়।

—কোথায় তোমার বড়ি?

সওদাগর-বিবি বলে, এই কাছেই চাঁদনীচকে।

বাড়ির ঠিকানা নির্দেশ করে সে বলে, সূর্য ডোবার একটু পরে আপনি আসুন, আমি আপনার জন্যে তৈরি থাকবো।

এই বলে সে আমার সেখানে দাঁড়ায় না। চলে আসে উজিরের প্রসাদে। উজির সাহেব তখন তার সাঙ্গ পাঙ্গদের নিয়ে মশগুল ছিলো। সওদাগর-বিবির কাম-জর্জর মূর্তি দেখে সে মোহিত হয়ে পড়ে।

—তোমার কী চাই?

সওদাগর-বিবি বলে, হুজুর কোতোয়াল আমার ভাইকে অন্যায় করে আটকে রেখেছে। সে আমার সংসারের একমাত্র সহায়। তাকে আপনি মুক্ত করে দিন,এই আমার আর্জি।

উজির ভারিক্কি চালে বলে, এইসব কোতোয়ালগুলোকে আমি শুলে দেব। তা তুমি কিচ্ছু ভেব না, তোমার ভাইকে আমি খালাস করে দেব। এখন এক কাজ করো, আমার অন্দরমহলে গিয়ে অপেক্ষা করো। এদিকের কাজকাম সেরে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি।

সওদাগর-বিবি বলে, আমি অতি সাধারণ মানুষ, আপনাদের হারেমে আমার যেতে শরম করছে। তার চেয়ে আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার গরীবখানায় একবার পায়ের ধুলো দেন, ধন্য হবো।

এর পর সে তার বাড়ির ঠিকানাপত্র জানিয়ে বলে সূর্য ডোবার ঘন্টাখানেক পরে আপানার জন্য আমি পথ চেয়ে বসে থাকবো, হুজুর।

উজির বলে, আচ্ছা দেখি, যাবো।

এর পর সে চলে আসে সুলতানের কাছে। সুলতান তার রূপের আগুনে জ্বলে ওঠেন। সাধারণ ঘরে এমন সুন্দরী যুবতী মেয়ে!

—কী বাছা, কেন এসেছ? কেউ তোমার ওপর অত্যাচার করেছে?

—না জাঁহাপনা, সে-সব কিছু নয়। আমার সংসারের একমাত্র সহায় আমার ভাই। সে এখন ফাটকে।

—ফাটকে? কেন?

—আপনার কোতোয়াল তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে আটক করে রেখেছে। আপনি আমার মা-বাপ—তাকে যদি ছেড়ে দেবার হুকুম না দেন তো অনাহারে মরে যাবো আমি।

এই বলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সুলতান বলেন, আহা-হা, কেঁদো না, আমি সব সুরাহা করে দিচ্ছি। আগে মামলাটা আমাকে শুনতে হবে। তার জন্য কিছু সময় দরকার। তবে আমার কাছে ন্যায্য বিচার পাবে। অন্যায় আমি বরদাস্ত করতে পারি না। তুমি এখন আমার হারেমে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি সব খোঁজখবর নিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি একটু পরে।

সওদাগর বিবি বলে, জাঁহাপনা আমি অতি সাধারণ মেয়ে, সুলতানের হারেমে প্রবেশ করার স্পর্ধা আমার নাই। আপনি যদি মেহেরবানী করে এই গরীবের কুঁড়েঘরে একবার আসেন চিরজীবন আমার কাছে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুলতান মনে মনে ভাবেন, সেই ভালো। বলেন, ঠিক আছে, তোমার ঠিকানাপত্র রেখে যাও, আমি যাবো। হ্যাঁ, কখন গেলে তোমার সুবিধে হবে?

সওদাগর-বিবি বলে, আমার ঘরের কর্তা সূর্য ডোবার ঘন্টাখানেক বাদে বাইরে যায়। আপনি তার পরে যে-কোনও সময় আসুন, জাঁহাপনা। বাঁদী প্রস্তুত থাকবে।

সুলতানের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সে এক ছুতোরের দোকানে আসে। ছুতোরটা ইয়া মোটকা। গোল গোল চোখ দু'টো ওর উদ্ধত বুকের ওপর গেঁথে রেখে জ্বল জ্বল করে তাকায়, আর জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে।

—হ্যাঁ গো দোকানী,আজ সন্ধেবেলায় আমার রসুই ঘরের হাঁড়ি পাতিল থালাবাসন রাখার একটা বেশ বড়সড় আলমারী দরকার। বানিয়ে দিতে পারবে?

লোকটা বলে, অত তাড়াতাড়ি অত বড় একটা আলমারী কী বানানো যায়, মালকিন। তা আমার দোকানে একটা তৈরি আছে, দেখুন যদি পছন্দ হয়।

সওদাগর-বিবি বলে না ও-সব জিনিস চলবে না। আমার আলমারী প্রমাণ সাইজের হওয়া চাই। ভিতরে পাঁচখানা তাক থাকবে। এবং প্রত্যেকটা তাকের জন্য আলাদা কুলুপ থাকা চাই। দাম যা লাগে আমি দেব। চাই কি আগামও নিয়ে নিতে পার। কিন্তু সূর্য ডোবার আগে আমার চাই।

আগাম দাম পাওয়া যাবে শুনে ছুতোর উৎসাহিত হয়ে বলে, ঠিক আছে, বেকেলেই পেয়ে যাবেন। তা মাপটাপগুলো কী হবে, একবার কথা বলা দরকার। অন্য

খদ্দের-পাতির ভিড় হবে, আপনি বরং আমার দোকানের পিছনের দিকের ঐ খুপরিতে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

—হাতুড়ি বাটালি চালিয়ে চালিয়ে তোমার মাথাটা দেখছি একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে ছুতোর। দেখছো না আমার এই জমকালো সাজ-পোশাক, তোমার ঐ ময়লা নোংরা খুপরিতে বসবো কোথায়। তার চেয়ে তুমি আমার বাড়িতে চলে এসো। একটু রাত করে। তারপর সারারাত ধরে তোমাকে নিয়ে মাফ-জোকের হিসেব করবো খন। তবে হ্যাঁ আলমারীটা কিন্তু আজ বিকেলেই চাই। এবং তার মধ্যে পাঁচটা তাক থাকবে। এবং প্রত্যেকটা তাকের আলাদা আলাদা তালা থাকবে।

ছুতোর বলে, সে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মালকিন। আপনার ফরমাশ মতো বানিয়ে বিকেলের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব লোক দিয়ে।

সওদাগর-বিবি বলে, শুধু আলমারী পাঠিয়ে দিলেই চলবে না ছুতোর, তোমাকে নিয়ে আজ সারারাত ধরে মাফজোকের হিসেব করবো, মনে থাকে যেন। ঠিক রাত দশটায় যাবে আমার বাড়িতে। একটু কাগজ দোয়াত কলম দাও, ঠিকানাটা লিখে রেখে যাই—নইলে তুমি আবার ভুলে যেতে পার।

সূর্য ডোবার অনেক আগে দোকানের মুটেরা মাথায় করে নিয়ে এলো সেই আলমারী। সওদাগর-বিবি লোকগুলোকে বড় ঘরের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দিতে বললো।

তাকগুলো সব গুণে দেখলো সে। হ্যাঁ, পাঁচটাই আছে। তাকগুলো ভালো করে আর পরীক্ষা করে দেখার অবকাশ হলো না; দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।

দরজা খুলে সওদাগর বিবি কোতোয়ালকে স্বাগত জানায়, আইয়ে—আইয়ে জনাব, বইঠিয়ে। মেঝের ওপরে বিরাট গালিচা পাতা হয়েছে। তার ওপর কাপড় পেতে নানা রকম উপাদেয় খানাপিনা শরাব থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে সওদাগর-বিবি।

কোতোয়াল তো দেখে মহা খুশি। শরাবের পেয়ালা পূর্ণ করে দেয় মেয়েটি। কোতোয়াল মৌজ করে চুমুক দেয় পেয়ালায়। নেশা একটু ধরতেই দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে যায় সওদাগর-বিবিকে। কিন্তু মেয়েটি ভীষণ সেয়ানা, কায়দা করে পাশ কাটিয়ে সরে যায়।

—আহা, অত তাড়া কিসের, ছটফট করছেন কেন? আপনার ঐ সাজ-পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে যে। আমি আপনাকে পরার জন্য ছোটোখাটো পোশাক এনে দিচ্ছি। ওটা পরুন। তারপর সারারাত ধরে যত ইচ্ছে ফূর্তি করুন।

একটা লাল ডুরে কাটা ফতুয়া আর একটা আঁটোসাঁটো ল্যাঙোট এনে সে কোতোয়ালের হাতে দেয়।

—নিন, পরে ফেলুন। যখনকার যে-সাজ, তা না পরলে চলবে কেন।

কোতোয়াল ভাবে—মেয়েটা খানদানি বেবুশ্যা। কায়দাকেতায় একেবারে দুরস্ত। নিজের পোশাকটা খুলে ফেলে সে ঐ লাল ডুরোকাটা ফতুয়া আর ল্যাঙোট পরে পালোয়ান সেজে ফরাসে এসে বসে।

সবে আর এক পেয়ালা ভরে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়েছে, এমন সময় জোরে জোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ আসে।

মেয়েটার চোখে মুখে কপট আতঙ্ক ফুটে ওঠে, সর্বনাশ। এ সময়ে তো তার ফেরার কথা নয়—

কোতোয়াল দাঁড়িয়ে পড়ে তিড়িং তিড়িং ঘরে লাফাতে থাকে, কে? কে? কে এসেছে?

মেয়েটি ভয়ার্ত কণ্ঠে কঁকিয়ে ওঠে, আমার স্বামী—

—তা হলে কী হবে? এখন উপায়?

মেয়েটি ঝটপট আলমারীটার নিচের তাক খুলে বলে, আর দেরি করবেন না, আসুন, এই তাকটায় গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ুন। আমি বন্ধ করে দেব।

কোতোয়াল আর একটি কথা বলে না, তাকটার মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে কুলুপ এঁটে দেয়।

এদিকে কাজী সাহেব ঘন ঘন কড়া নেড়েই চলছিলো। মেয়েটা দরজা খুলে মাথা নুইয়ে সালাম জানায়, আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।

খানাপিনার এলাহী ব্যবস্থা দেখে কাজী খুব পুলকিত হয়। মেয়েটি সুরার পেয়ালা পূর্ণ করে কাজীর সামনে রাখে। অল্পক্ষণের মধ্যে ফুরফুরে গুলাবী নেশায় চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে আসে কাজীর। ঈষৎ জড়ানো কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, কোন কুত্তার বাচ্চা কোতোয়াল তোমার ভাইকে আটক করে রেখেছে,আমি তাকে দেখে নেব। নাও, এখন কাগজ কলম নিয়ে এসো তো দেখি, আমি বেকসুর খালাসের ফরমান লিখে দিচ্ছি। এটা দেখালেই ওকে তক্ষুনি ছেড়ে দেবে।

মেয়েটি দোয়াত কলম আর কাগজ এনে দেয়। কাজী ফাটকের হাবিলদারকে হুকুমনামা লিখে দেয়। তারপর হাত বাড়ায় মেয়েটির দিকে, এবার তাহলে আমার বুকে এসো, মেরিজান।

মেয়েটি দাঁতে দাঁত চেপে স্বগতভাবে বলে, দাঁড়াও বুড়ো তোমার জান আজ আমি বের করে দিচ্ছি। মুখে মধু ঢেলে তেরছা নজর হেনে বলে, আহা, বয়স হলে মানুষের আর ধৈর্য-টৈর্য থাকে না। আমি কি এই সাঁঝ রাতেই ফুরিয়ে যাচ্ছি নাকি। দাঁড়ান, আগে আপনাকে সাজ পোশাক পরাই—তার পরে তো সুরত রঙ্গ জমবে।

কাজী অবাক হয়, সাজ-পোশাক? কেন, আমি তো বেড়ে সাজ-পোশাক পরে আছি—

কথাগুলো এবার বেশ জড়ানো। মেয়েটি বলে, ওসব আমিরি পোশাক এখানে চলে না জনাব। যেখানকার যা, তাই করতে হয়। এই নিন আপনার ফতুয়া আর ল্যাঙোট, পরে পালোয়ান সাজুন। না হলে লড়বেন কী করে?

সবুজ রঙের ডুরেকাটা ফতুয়া আর ল্যাঙোট। নেশায় বুঁদ হয়ে ঢুলঢুল চোখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে দেখতে থাকে।

—বাঃ, বহুৎ চমৎকার দেখতো তো? তা এ পোশাক না পরলে বুঝি এখানে কাজ কাম করা যায় না?

মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়োকে বক দেখায়, না কাজী সাহেব, আমাদের কাছে এলে এই পোশাকই পরতে হয়। এতোটা বয়স হলো, কেন কখনও মহল্লায় কারো ঘরে কী রাত কাটাননি কখনও? জানেন না সব কেতা-কানুন?

ওই মদের নেশাতেও বুড়ো কাজী দু-কানে আঙ্গুল গুঁজে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে—তোবা তোবা! ওসব কথা শোনাও পাপ।

এর পর সে নিজের সাজ-পোশাক খুলে ফেলে ঐ ফতুয়া আর ল্যাঙোটটা পরে নেয়।

এই সময় অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে কড়া নাড়ার আওয়াজ ওঠে। মুহূর্তে কাজী সাহেব সজাগ স্বাভাবিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি রেখে তাকায়, কে কে এসেছে? কড়া নাড়ছে, না?

মেয়েটিও ভীত চকিত ভাব দেখায়, সর্বনাশ হয়েছে। এতো আমার স্বামীর কড়া নাড়ার শব্দ। কিন্তু এসময়ে তো তার আসার কথা নয়?

কাজী লাফিয়ে ওঠে, ওরে বাব্বা, এখন কী উপায় হবে।

মেয়েটি ওকে শান্ত করে, ধৈর্য ধরুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো আঠারতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলমারীর দ্বিতীয় তাকটা খুলে বলে চটপট এটার ভিতরে ঢুকে হাত পা গুটিয়ে কোনরকমে শুয়ে পড়ুন।

কাজীকে তালা বন্ধ করে সে তৃতীয় অতিথি উজিরকে স্বাগত জানাতে দরজার কাছে যায়।

—আসুন হুজুর, আমার কী পরম সৌভাগ্যের দিন আজ। আসুন, আসন গ্রহণ করে ধন্য করুন আমাকে।

—বাঃ, এতো দেখছি বহুৎ খানদানী ব্যাপার। তা কতদিন ধরে এ কারবার?

—হুজুরের কী আমাকে দেখে খুব বয়স্কা বলে মনে হচ্ছে?

উজির নিজের ভুল বুঝতে পারে, আরে না না, আমি সে-সব ইঙ্গিত করিনি, কিছু মনে করো না। তুমি তো একেবারে ডাগর ডাঁসা। গুলাবের কুঁড়ি। তোমাকে বয়স্কা বলবে কে?

সওদাগর-বিবি পেয়ালা ভরে উজিরের মুখে তুলে ধরে, নিন, এক চুমুক দিন, হুজুর।

উজির ওর পেয়ালা শুদ্ধ নরম হাতখানা মুঠি করে চেপে ধরে, তা চুমুকটা কোথায় দেব—পেয়ালায়, না পানিতে।

বুড়ো উজির রসিক আছে বটে। মেয়েটি বলে, আমাকে পান করে কী সুরাপানের নেশা মিটবে হুজুরের।

উজির শরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে, সুরায় কতটুকু নেশা, কতক্ষণই বা থাকে। কিন্তু তোমার নেশায় মাতাল হতে পারলে জীবনটা সুধায় সুধায় ভরে যেত, মেরি দিল!

মেয়েটি নীল রঙের ডুরে কাটা ফতুয়া আর ল্যাঙোট এনে বলে, নিন, হুজুর আপনার সাজ-পোশাক ছেড়ে এটা পরে নিন। আমাদের ঘরে এলে এই পোশাকই পরতে হয়—রেওয়াজ।

ফতুয়া আর ল্যাঙোটটা পরে সবে উজির সাহেব সওদাগর বিবিকে জড়িয়ে ধরতে যাবে এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দে চমকে দু-পা পিছিয়ে যায়, কে?

মেয়েটি বলে, বুঝতে পারছি না—এ সময় তো আমার স্বামীর ফেরার কথা নয়।

—তোমার স্বামী? সর্বনাশ, তবে উপায়?

—দাঁড়ান, আমি ব্যবস্থা করছি।

আলমারিটার তৃতীয় তাকটা সে খোলে, মেহেরবানী করে এর মধ্যে আপনি ঢুকে পড়ুন। বেশিক্ষণ থাকতে হবে না। এখুনি ওকে আমি বাজারে পাঠিয়ে দেব একটা সওদা কিনে আনার ছুতোয়।

উজির মুখ কাচুমাচু করে, এর মধ্যে আমার এই দশাসই শরীরটা ঢুকবে?

—খুব ঢুকবে। হাত পা গুটিয়ে একটু কষ্ট করে শুয়ে পড়ুন। আর দেরি করবেন না হুজুর, ওদিকে শুনছেন তো কেমন কড়া নাড়ছে সে।

উজিরকে তালা বন্ধ করে সে সুলতানকে বরণ করতে যায়। দরজা খুলেই আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায়।

—আসতে আজ্ঞা হোক, জাঁহাপনা। আমি ভাগ্যবতী নারী। ধন্য হলাম।

সুলতান ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন। মেয়েটি বলে, গরীবখানায় যখন এলেনই, একবার অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন, জাঁহাপনা।

সুলতান বলেন, আহা-হা অত ব্যস্ত হবার কী আছে। বসছি। এসেছি যখন নিশ্চয়ই বসবো, খাবো, পান মৌজ করবো। আর শোনো, এটা প্রাসাদ দরবার নয়। এখানে শুধু তুমি আর আমি আছি। অত জাঁহাপনা টাঁহাপনা, কেতা কুর্নিশ করার দরকার নাই। তা হলে মজাটাই মাটি হয়ে যাবে, বুঝলে?

—বুঝেছি, জাঁহাপ...প...

হো হো হেসে ওঠেন সুলতান। হেসে ওঠে মেয়েটিও—খিল খিল করে। সেই হাসির ঝরনায় ঝরে ঝরে পড়তে থাকে আনন্দের মুক্তো।

মেয়েটি বলে, আপনি এতো সহজ সাধারণ, ভাবতে পারিনি, বড় ভালো লাগছে।

—আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে, সুন্দরী—

—খু-উ-ব।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো কুড়িতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মদের পেয়ালা পূর্ণ করে দেয় মেয়েটি। সুলতান একচুমুকে শূন্য করে দেন। আবার সে ঢেলে দেয়, আবার শূন্য হয়। এইভাবে এক এক করে অনেক পেয়ালা উজাড় করে দেন সুলতান।

মেয়েটি তখন একটা হলুদ রঙের ডুরেকাটা ফতুয়া আর ল্যাঙোট এনে পরতে দেয় সুলতানকে। বলে, এই নিন, এটা পরুন, পরতে হয় এখানে।

সুলতান বলেন, বাঃ, বেড়ে বাহারী তো। ঠিক আছে এইটে পরেই তোমার সঙ্গে আজ মধুযামিনী যাপন করা যাবে, কেমন?

নেশার ঘোরে টলে টলে পড়তে যায় সুলতান। কিন্তু কোনও রকমে সামলে নিয়ে পোশাকটা পরতে পারেন।

এই সময় দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা যায়! সুলতান চমকে ওঠেন। কে?

মেয়েটি না বোঝার ভান করে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আমার স্বামী তো এইমাত্র বাইরে গেলেন। এর মধ্যে এতো সকাল সকাল তো তার ফেরার কথা নয়। কিন্তু এ কড়া-নাড়ার আওয়াজ তো তারই।

সুলতানের নেশা জল হয়ে যায় নিমেষে।

—এখন তাহলে কী হবে?

—আপনি ভাববেন না, আমি একটা উপায় বের করছি।

আলমারীর চতুর্থ তাকটা সে খোলে।

এই তাকটায় উঠে কোনও রকমে গুটি শুটি মেরে শুয়ে পড়ুন, জাঁহাপনা। তাড়াতাড়ি করুন আর দেরি করবেন না।

সুলতানকে তালা বন্ধ করে সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ছুতোর দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে।

—বাঃ চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন তো মালকিন।

মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কিন্তু তোমার কী আক্কেল, বলতো?

—কেন, কী হলো?

—এই কী তোমার তাক বানানো হয়েছে, একখানা থালা-বাসন ঢোকাতে পারছি না।

আলমারীর কাছে গিয়ে ওপরের তাকের পাল্লাটা খুলে ফেলে সে। ছুতোরটা

বলে, এতো বড় তাক, আমার মতো এই মোটকা শরীরটাও আস্ত ঢুকিয়ে দিতে পারি, আর সামান্য থালাবাসন ঢুকবে না বলছেন?

মেয়েটি মুচকি হাসে, কী বললে, তোমার এই নাদুস-নুদুস দেহটা ওর মধ্যে এঁটে যাবে? নাঃ, হাতুড়ি বাটালি পিটে পিটে তোমার মাথাটা একেবারে নিরেট হয়ে গেছে। এক ফোঁটা মগজে যদি থেকে থাকে, আচ্ছা ঢুকে দেখাও দেখি, কেমন করে আঁটাতে পারো তোমার এই নধর বপুটা।

নিরেট ছুতোর হাঁদার মতো উঠে বলে এই দ্যাখো।

অনায়াসেই সে ওপরের তাকে ঢুকে পড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কুলুপ এঁটে দেয়।

আর এক মুহূর্ত দেরি করে না সওদাগর-বিবি। কোতোয়ালের কয়েদখানায় চলে যায়। কাজীর চিঠিখানা দেখাতেই সঙ্গে সঙ্গে তার নাগরকে খালাস করে দেয় তারা।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো একুশতম রজনী। আবার গল্প শুরু হয় ঃ

নাগরকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি আবার ফিরে আসে তার নিজের ঘরে। কীভাবে ঐ পাঁচজন কামুককে আলমারীর ভিতরে পুরে ওদের মনোবাঞ্ছা পুরণ করেছে, তার মজাদার কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে শোনাতে লাগলো তার নাগরকে।

—এই সব মাথা মোটা মানুষগুলো এমনই হাঁদা, কামের তাড়নায় একেবারে ভাদ্দর মাসের কুত্তার মতো ক্ষেপে উঠেছিলো। এখন দেখ, বাছাধনরা কেমন লেজ গুটিয়ে সব শুয়ে আছে আলমারীটার মধ্যে।

ঘর ফাটিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে ওরা।

তারপর মৌজ করে খানা, পিনা রতিরঙ্গ করে দু'জনে। সারারাত ধরে ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে নানারকম ব্যসন বিহারে মত্ত হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে মেয়েটি ঘরের সব ভারি ভারি আসবাবাপত্রগুলো বিক্রি করে দেয়। এবং দামী দামী বসন আভরণগুলো একটা প্যাঁটরায় বোঝাই করে ঐ সুলতানের মুলুক ছেড়ে অন্য এক সুলতানের মুলুকে রওনা হয়ে যায়।

আলমারীটা কিন্তু ঐ শূন্য ঘরের মধ্যেই একলা দাঁড়িয়ে থাকে। আর তার ভিতরে পাঁচটি প্রাণী পচা গরমে সিদ্ধ হয়ে প্রায় আধমরা অবস্থায় পড়ে থাকে।

দুই দিন দুই রাত্রি কাটার পর সওদাগর ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু তার বিবি বা ঘরের সামানপত্র কিছুই দেখতে না পেয়ে অবাক হয়। ভাবে, নিশ্চয়ই ডাকাতরা জিনিসপত্রের সঙ্গে তার বিবিকে লুঠ করে নিয়ে গেছে।

এমন সময় সওদাগর আলমারীর ভেতর থেকে একটা গোঙানীর আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে। ওরে বাবা, এ আবার কী ভূতুড়ে কাণ্ড! হাঁক ডাক করে সে পাড়া-প্রতিবেশিদের সবাইকে জড় করে ফেলে।

—কী ব্যাপার? কী হয়েছে সওদাগর সাহেব?

সওদাগর ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে, কোনও রকমে বলতে পারে, জিন—জিন ঢুকেছে আমার ঘরে।

—কোথায়?

সে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ঐ আলমারীটার ভেতর থেকে মানুষের গোঙানীর মতো আওয়াজ আসছে।

সকলে কান পেতে শুনলো, ঠিকই ভেতরে যেন অনেকগুলো লোক কাতরাচ্ছে।

পড়শীরা পরামর্শ দিলো, এক কাজ করো, আগুন লাগিয়ে দাও। পুড়ে সাফ হয়ে যাবে—তা সে জিন আফ্রিদি যাই থাক।

এইবার উজির চিৎকার করে ওঠে, শোনো ভাই সব, আমরা কেউ জিন দৈত্য নই, কোনও ভয় নাই। পাল্লাগুলো খুলে দাও। আমরা সকলেই মানুষ। দোহাই আমাদের পুড়িয়ে মেরো না।

এর পরের ঘটনা কী—সবিস্তারে বলার কোনও প্রয়োজন আছে জাঁহাপনা? কোতোয়াল, কাজী, উজির, সুলতান, ছুতোর সবাই লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারে না কারো দিকে।

সওদাগর যুবকটি সুলতান উজিরের এই দশা দেখে নিজেও বিশেষ লজ্জিত হয়। পড়শীদের সবাইকে বিদায় করে দিয়ে সকলকে নিজের নিজের পোশাক এনে দেয় সে।

এরপর সুলতান সওদাগর-যুবককে তার দরবারের সহকারী উজিরের পদে বহাল করেছিলেন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো বাইশতম রজনী ঃ

পরদিন শাহরাজাদ নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

খলিফা হারুন অল রসিদের সময় বাগদাদ শহরে আবু অল হাসান নামে খামখেয়ালী প্রকৃতির একগুঁয়ে এক যুবক বাস করতো। এতটা বয়স হলো? শাদী নিকা করার দিকে তার কোনও খেয়াল নাই। পাড়া- পড়শীদের সঙ্গে ক্বচিৎ মেলা-মেশা করে। সারাটা দিন একা একা সে ঘরের মধ্যে বসে বসে কাটায়। এবং বিকেল হতেই শহরের প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে বড়ো রাস্তার ওপর যে সাঁকোটা আছে সেই সাঁকোর ওপরে গিয়ে বসে। সারাটা বিকেল সন্ধ্যা ওখানেই বসে বসে পথচারীদের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করে। নতুন কোনও মুসাফির বাগদাদ শহরে ঢুকতে যাচ্ছে বুঝতে পারলেই সে সেধে তার সঙ্গে আলাপ করতো। এবং বলতো, আজকের রাতটা যদি মেহেরবানী করে আমার ঘরে মেহমান হন—কৃতার্থ হবো আমি।

তার প্রস্তাবে অনেকেই হয়তো রাজি হতো না, কিন্তু একজন না একজন হতোই। আর এই একজনকেই তার দরকার প্রতি রাতের জন্য। এবং সারা রাত ধরে অতিথির আপ্যায়নে তিলমাত্র ত্রুটি করতো না সে। নানারকম উপাদেয় খানা, ভালো ভালো দামী মদ এবং তার ঘরোয়া মেজাজের সান্নিধ্য পেয়ে সকলেই মুগ্ধ হতো। কিন্তু সকাল না হতেই সে সেই গত রাতের মহামান্য অতিথিকে এক কথায় বিদায় করে দিত।

—দেখুন কিছু মনে করবেন না। আমি কোনও মেহেমানকেই এক রাতের বেশি সময় আপ্যায়ন করি না। এবার আপনি শহরের কোনোও সরাইখানায় চলে যান।

গতকাল রাতে যাকে বাদশাহী কেতায় সম্মান দেখিয়েছে তাকেই সকাল বেলায় এইভাবে বিদায় করে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না সে। লোকে বলে, ছেলেটার মাথার ছিট আছে।

এমন ঘটনাও হামেশাই ঘটে, সারারাত মহা সম্মানে রাখার পর যখন কোনও মুসাফির সরাইখানায় চলে যায় এবং ঘটনাক্রমে যদি পথে-ঘাটে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তবে আবু অল হাসান মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। চিনেও তাকে চিনতে পারে না—চিনতে চায় না।

তার এই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণের কোনও সদর্থ করতে পারতো না কেউ।

এইভাবে দিন কাটছিলো। প্রতিদিন সে শহর-প্রত্যন্তে সেই সাঁকোর ওপর গিয়ে বসে। প্রতি রাতেই কোনও না কোনও মুসাফিরকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এবং যথারীতি সারারাত ধরে তার সেবা পরিচর্যা করে পরদিন সকালে বিদায় করে দেয়।

একদিন আবু অল হাসান ঘটনাক্রমে খলিফা হারুন অল রসিদকে মুসাফির ভ্রমে ঘরে নিয়ে আসে।

খলিফা মাঝে মাঝে শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে যেতেন তাঁর সালতানিয়তের হাল-চাল প্রত্যক্ষ করতে। সেদিন তিনি সেই রকম এক সফর শেষ করে সন্ধ্যাবেলা শহরে ফিরছিলেন। আপনারা জানেন, খলিফা যখন গোপনে বাইরে বেরুতেন, তিনি কোনও না কোনও ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতেন। যাতে তাঁকে অন্য কেউ চিনতে না পারে। কারণ, মনে করতেন, সাধারণ মানুষ খলিফাকে সশরীরে সামনে দেখলে সমীহ শ্রদ্ধা ভক্তি ভয় করে তাদের আসল অভাব অভিযোগের কথা গোপন রাখবে।

সেদিন খলিফা মশুলের এক সওদাগরের ছদ্মবেশে সেজে শহর সন্নিহিত গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করে সন্ধ্যায় প্রাসাদে ফিরে আসছিলেন। প্রবেশ দ্বারের মুখে সেই সাঁকো পার হতে গিয়ে তিনি আবু অল হাসানের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

আবু অল হাসান নিজেই হাত জোড় করে সামনে এসে দাঁড়ায়, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে মশুল থেকে আসছেন?

খলিফা মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বলেন, ঠিকই ধরেছ। কিন্তু কেন, কী চাই তোমার?

—আপনি কী শহরেই কাটাবেন আজকের রাতটা?

—সে তো অবশ্যই।

—এখানেই কী আপনার নিজের কোনও বাড়ি-ঘর বা আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে, না সরাইখানায় উঠবেন বলে মনে করেছেন।

যুবকের এবম্বিধ অদ্ভুত প্রশ্নবাণে খলিফা কিছু বিরক্ত বোধ করেন। আবার কৌতূহলও জাগে। এত সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে কেন? ছেলেটির কী মতলব? উদ্দেশ্য যত খারাপই হোক, খলিফা কখনও কাউকে দেখে ভয় পান না, বা বিচলিত হন না। এমন অনেক কাহিনী আপনাদের শোনা আছে অবশ্যই, এইভাবে ছদ্মবেশে বেড়াতে বেড়াতে অনেক সময় তিনি প্রাণ সংশয় বিপদের গুহায় ঢুকে পড়েছেন। তারপর নিজের বুদ্ধির কৌশলে এবং আল্লাহর অপার করুণায় অবশেষে প্রাণে রক্ষা পেয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন।

এই যুবক কোনও ঠগ প্রতারক নয় তো? কী এর উদ্দেশ্য? এত হাঁড়ির খবরই বা জানার আগ্রহ কেন? যাই হোক, ওতে তাঁর কিছু যায় আসে না। খলিফা বলে, না—মানে নিজের বাড়ি-ঘর আমার মশুলে। এখানে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে মাঝে মাঝে আসতে হয়। চেনা দু-একটা সরাইখানা আছে, সেখানেই উঠি। দু-একদিন থাকি, কাজকাম সমাধা করে আবার দেশে ফিরে যাই। কিন্তু এতো কথা জানতে চাইছ কেন, বাবা?

আবু অল হাসান বিনয় বিগলিত কণ্ঠে করজোড়ে মিনতি জানায়, যদি মেহেরবানী করে একটা রাতের জন্য এই গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দেন, ধন্য হবো আমি! এ বান্দা আজকের রাতটা আপনাকে সেবা করতে চান।

বড়ো অদ্ভুত মনে হয়। আজকালকার দিনে এই বয়সের ছেলের মনে এত ধর্মভাব বড়ো একটা দেখা যায় না। খলিফা সানন্দে সম্মত হয়ে যায়।

—ঠিক আছে, চলো, তোমার দৌলতখানাতেই যাওয়া যাক। এই বিদেশে তোমার মতো একজন সঙ্গী পেয়ে রাতটা আমার কাটবে ভালো।

আবু অল হাসানের মা চমৎকার চমৎকার মুখরোচক খানা পাকাতে পারেন। সে রাতেও সে অতিথির জন্য অনেক নতুন নতুন খাবার তৈরি করলো। মোরগ মোসাল্লাম, ভেড়ার মাংসের কাবাব। হাঁসের দোপিঁয়াজি, পায়রার মাংসের ঝোল প্রভৃতি। খুব পরিতৃপ্তি করে

আহারপর্ব সমাধা করলেন খলিফা।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো চব্বিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মুখ হাত ধুয়ে এসে বসতে, হাসানের মা আঙুর বেদানা আপেল প্রভৃতি নানারকম ফলের রেকাবী এনে সাজিয়ে দেয়। দুজনে মিলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন।

এর পর দামি পেয়ালায় দুষ্প্রাপ্য মদ ঢেলে খলিফার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনি তো জানেন, মদ কখনও একা একা খেয়ে মজা পাওয়া যায় না। আপনাকে সঙ্গদান করার জন্যেও অন্ততঃ আমাকে এক পেয়ালা খেতে হবে, জনাব। শুধু একটি রাতের জন্য। মদ পেটে না পড়লে মানুষের ওপরের ভদ্রতা সৌজন্যের কঠিন আবরণটা সরিয়ে আসল চেহারা চরিত্র খুলে মেলে ধরা যায় না। আর তা যদি না পারা যায় জীবনে আনন্দের সন্ধানও সে পায় না কখনও।

খলিফা ভাবলেন, ছেলেটির পেটের কথা জানতে হলে ওর দোসর হতে হবে। মদ পেটে না পড়লে মনের লুকানো কথা টেনে বের করা যাবে না। শুধু এই কারণেই খলিফা বললেন, দাও খাবো।

ধীরে ধীরে সরাবের ফুরফুরে নেশা জমে ওঠে। খলিফা বললেন, আচ্ছা আবু অল হাসান, আমরা একসঙ্গে বসে নুন রুটি খেলাম, তাহলে আমি তোমার দোস্ত তা স্বীকার করতো?

হাসান বলে, আলবাত, আজ রাতে আপনি আমার মহামান্য অতিথি বন্ধু—পরমাত্মীয়।

—তা হলে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

—একশোবার, আমি আপনার গোলাম, জনাব। যা হুকুম করবেন, আমি জান কবুল করে তা করতে বাধ্য।

—আরে না না, ওসব কিছু করতে হবে না। তুমি আমার একটা ছোট্ট কথার জবাব দাও তো। তুমি বললে প্রত্যেক রাতে আমার মতো একজন মুসাফিরকে তুমি অতিথি করে ডেকে এনে প্রভূত আদর যত্ন সম্মান করো। এবং তা যে সত্যি সত্যিই করো তার প্রমাণ তো আমি নিজেই পেলাম। হয়তো শুনলে স্তাবকের মতো মনে হতে পারে আমাকে, তবু নির্দ্বিধায় বলছি, এত সৌজন্য, এত আদর আপ্যায়ন, এমন প্রাণ ঢালা দরদ, মিষ্টি ব্যবহার কখনও আমি পাইনি কোথাও। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন এইসব? কী কারণে? তোমার যা বয়স তাতে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য যে করো, তা তো ভাবতে পারছি না। নিশ্চয়ই এর পিছনে অবাক করার মতো কাহিনী আছে। আর সেই কাহিনীটাই আমি শুনতে চাই। যদি আপত্তি না থাকে, বল হাসান।

হাসান বলে, কাহিনী একটা অবশ্যই আছে। তবে অবাক করার মতো নয়। বলতে পারেন—শিক্ষামূলক।

আপনি তো শুনেছেন আমার নাম আবু অল হাসান। আমার বাবা এই শহরের এক বিত্তবান বণিক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি যথেষ্ট ধন-দৌলত রেখে গিয়েছিলেন আমার জন্যে। আমার বাবা স্বপ্রতিষ্ঠিত সওদাগর ছিলেন। জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করে উত্তরকালে অনেক ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এই কারণে খুব ছোটো থেকে কড়া শাসন এবং দারুণ কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যে আমাকে মানুষ করে তুলেছিলেন তিনি। বাবার জীবদ্দশায় ভোগ-বিলাস বলতে কী বোঝায় আদৌ তার স্বাদ পাইনি। বিলাস-ব্যসন তাঁর চোখে বিষ ছিলো। তা বলে তিনি যে আমাকে খেতে পরতে দিতেন না, তা নয়। প্রয়োজনের সবটাই মেটাতেন, কিন্তু ভোগ-লালসার বস্তু থেকে শত হাত সরিয়ে রাখতেন আমাকে।

এই অতৃপ্ত বাসনা অস্বাভাবিকভাবে চরিতার্থ করে, ছোটোবেলা থেকে বঞ্চিত হওয়ার শোধ তুলেছিলাম। কিন্তু সে প্রতিশোধ আমার নিজের ওপরেই নেওয়া হয়েছিলো, তখন বুঝিনি, পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম।

বাবা মারা যাওয়ার স্বল্পকালের মধ্যে আমার সমস্ত সম্পত্তিকে দুই রূপে রূপান্তরিত করে ফেললাম। কিছু সোনাদানা হীরে জহরৎ এবং বাকীটা নগদ মোহরে। হীরে চুনী পান্না এবং আভরণ অলঙ্কারাদি সযত্নে বাক্সবন্দী করে, নগদ টাকাটা হাতে নিয়ে ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে করে দু'হাতে দেদার ওড়াতে লাগলাম। দিনকে দিন খরচের বহরটা এমনই বাড়তে থাকলো যেন মনে হলো, কোন্ আমির বাদশাহর ছেলে আমি। আর এ তো জানেন, পয়সা ওড়াতে চাইলে বন্ধু সাগরেদ অঢেল জুটে যায়।

এইভাবে একটা বছর দারুণ সুখ-সম্ভোগের মধ্যে দিয়ে কাটলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে আবিষ্কার করলাম আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। হাতে আর দু'টো পয়সাও নাই। এবং দেখলাম এক সময়ের দিবারাত্রের বন্ধুরাও হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেছে। পথে ঘাটে দেখা হলেও মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

কারো কাছে কিছু ধার চাইলে একটা পয়সা কেউ দেয় না। সেই থেকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, না যথেষ্ট হয়েছে, আর কোনও বন্ধু-বান্ধব নয়, কোনও আত্মীয়-স্বজন কারো সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবো না। একমাত্র অচেনা অজানা বিদেশী মুসাফির ছাড়া কাউকেই আমি ঘরে আশ্রয় দেব না, মনস্থ করলাম।

এরপর আর একটা শিক্ষালাভ করলাম। কোনও মানুষের সঙ্গে, তা সে বিদেশী মুসাফিরই হোক—বেশি মাখামাখি সম্পর্ক গড়ে তুলবো না। যে মুসাফিরকে ঘরে আনবো, তাকেও মাত্র একদিনের জন্য আশ্রয় দেব। কারণ তার বেশি সময় কোনও বিদেশীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা করার অনেক বিপদ আছে। এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, সখ্যের নিষ্ঠুর বন্ধন-জীবনে সব সুখ-শান্তি ধূলিসাৎ করে দেয়। এই কারণে আপনাকেও আমি কাল সকালে আর আমার বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারবো না। এমন কী এর পরে পথে-ঘাটেও যদি আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি আর চিনতে পারবো না।

খলিফা অবাক হয়ে বললেন, তোমার এই অদ্ভুত আচরণ আমার কাছে বড়ো চমৎকার মনে হচ্ছে। তোমার মতো এই ধরনের একরোখা ছিটিয়াল মানুষ সত্যিই আমি আর দুটি দেখিনি।

যাই হোক, খলিফা বলতে থাকেন, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আশা করি তোমার সোনাদানা হীরে জহরতগুলো আলাদা করে যা সরিয়ে রেখেছিলে, সেগুলো ইয়ার-দোস্তদের থাবা থেকে বাঁচাতে পেরেছ। এখন প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয়ে নতুন স্বাদের সন্ধান পেয়েছ। কিন্তু তুমি যে বললে, আগামীকাল সকালেই তোমার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, সে কথা শুনে আমি বড়ো ব্যথিত হলাম, হাসান। আমি যে তোমার এই সৌজন্যের জন্য কিছু প্রতিদান দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি যে বলছো, কাল সকালে বিদায় নেবার পর তুমি আর আমাকে চিনতেই চাইবে না। তা হলে কথাটা আজ এই রাতেই হয়ে যাক। এক কাজ করো, আমার অনেক আছে, যা তোমার প্রাণ চায়, আমার কাছে চেয়ে নাও তুমি। আমি অত্যন্ত খুশি মনে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করবো। মনে কোনো দ্বিধা ক'রো না, হাসান। তোমার যা অভীপ্সা অসঙ্কোচে আমার কাছে বলো, আমি তা পূরণ করবো। আল্লাহর দোয়ায় আমি অনেক পয়সার মালিক, ভোগ করার তেমন কেউ নেই, তোমাকে যদি তার খানিকটা দিতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করবো, হাসান।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো পঁচিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

আবু অল হাসানের কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেলো না। ধীর শান্ত গলায় সে বললো, আজ রাতে আপনার সাহচর্য পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, জনাব। এর চেয়ে বেশি কি আর ধনদৌলত মেলে? আপনি হৃদয়বান ব্যক্তি। আল্লাহর দোয়াতে আপনার আছেও অনেক। এবং খুশি-মনেই আমাকে কিছু দান করতে চান—তাও বুঝলাম। কিন্তু জনাব, আমি সবিনয়ে আমার অক্ষমতা জানাচ্ছি। আমার যা অল্প স্বল্প আছে, তা নিয়েই মাথা নিচু করে থাকতে চাই। আপনার দাক্ষিণ্য আমার প্রয়োজন হবে না, জনাব।

খলিফা বললেন, খোদার নাম নিয়ে বলছি, তুমি আমার একটা কথা রাখ, ফিরিয়ে দিয়ো না। তা হলে মনে বড়ো দুঃখ পাবো। আর তোমার ঘর থেকে তোমার মেহমান অপ্রসন্ন মনে বিদায় নিক্, এটা কী তুমিও চাও?

হাসান দেখলো, মুসাফিরকে নিরস্ত করা যাবে না। ঘরের মেহমান অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে—এও তো হতে পারে না। এতদিন এত পরদেশী এসেছে তার ঘরে, প্রত্যেকেই আদর আপ্যায়নে যথেষ্ট আনন্দিত হয়ে খুশি মনে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু আজ এই বিদেশী বণিক তাকে বড়ো অসহায় অবস্থায় ফেলেছে। প্রতিজ্ঞা করেছিলো, কারো কাছে সে হাত পাতবে না, কারো অনুগ্রহ সে নেবে না। কিন্তু ঘরে মুসাফির মেহমান এলে তাকে প্রাণ দিয়েও খুশি রাখতে হয়—এ-ও তো হাদিসের কথা।

মাথা গুঁজে একভাবে অনেকক্ষণ বসে রইলো সে। কি যেন চিন্তা করলো। তারপর একসময় বললো, একটা জিনিসই আমার চাইবার আছে, কিন্তু সে কথা শুনলে আপনি হয়তো আমাকে পাগল ভাববেন। যদি কথা দেন, সব শোনার পর ভুল বুঝবেন না। তবেই সে কথা বলতে পারি আপনাকে।

খলিফা হাসেন, এ তো তুমি বড়ো অদ্ভুত কথা বললে? কথা কী, তা না শুনে কী কোনও মন্তব্য কেউ করতে পারে। আগে বল শুনি। তারপর দেখা যাবে। তা ছাড়া তোমার সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে খারাপ ধারণা পোষণ করবো কেন? আমি একজন বিত্তশালী বণিক। তোমার অর্থের চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা অবশ্যই আমার আছে। সেদিক থেকে অসঙ্কোচে তোমার বক্তব্য রাখতে পার। কথা দিচ্ছি কোনও অসুবিধে হবে না।

হাসান বললো, আমার সমস্যার সুরাহা একমাত্র স্বয়ং খলিফাই করতে পারেন। আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন, যদি কোনও উপায়ে একটা দিনের জন্য খলিফা হারুন অল রসিদকে আমার এই গরীবখানায় আপনি নিয়ে আসতে পারেন তা হলে চিরকাল আপনার ওপর কৃতজ্ঞ থাকবো।

একটুক্ষণ চিন্তা করে খলিফা বললেন, খলিফা যদি একদিনের জন্য তোমার গৃহে আতিথ্য নেন, তবে তাঁকে নিয়ে কী করবে তুমি?

হাসান বলে, আপনি মুসাফির, আমাদের এই শহরের হালচাল সম্বন্ধে কতটুকু ওয়াকিবহাল, জানি না। তবে শুনন, এই বাগদাদ শহরটা ভাড়াটে বাড়ির শহর। হাজার হাজার মানুষ জীবিকার অন্বেষণে এখানে এসে মাথা গুঁজেছে। এখান বাড়িওলা শেখগুলো ভাড়াটেদের সঙ্গে কী রকম যে দুর্ব্যবহার করে তার তিক্ত ভুক্তভোগী আমি নিজে একজন। এক অসভ্য জংলী জানোয়ার জুটেছে আমার কপালে। লোকটার কুৎসিত কদাচার দেখে আমার সন্দেহ হয়, আদৌ সে মনুষ্য সন্তান নয়। মনে হয়, গাধা আর ঘোড়ার পালে ওর জন্ম হয়েছিলো। সারাদিন রাত ধরে কী অসভ্য খিস্তি খেউড় যে সে চালায় —মনে হবে একটা পায়খানার ঝাঁঝরি। অনর্গল

পূতিগন্ধময় নোংরা গালিগালাজ তার মুখে ঝরেই চলেছে। কোনও সময় একটা ভলো কথা কানে আসে না। লোকটাকে দেখেও মনে হয় একটা জানোয়ার। মোষের মতো বিশাল লোমশ বপু। হায়নার মতো হাঁ। কুলোর মতো দুখানা কান লটপট করে। যখন সে কথা বলে, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, কার সাধ্যি। থোকা থোকা থুথুর ছিটে এসে লাগে গায়ে। মুখখানা দেখতে একেবারে ঠিক বুড়ি বাঁদরীর পাছার মতো। দাঁতগুলো একটাও নাই। সারাটা দেহ যত রাজ্যের বিদঘুটে চর্মরোগে ছেয়ে গেছে তার। লোকটা রাক্ষসের মতো এককাঁড়ি খাবে আর হাসবে।

এই জন্তুটার দুটি সাগরেদ আছে। তারাও দুজনে দুই রত্ন। সব রকমের জাল জুয়াচুরি, বদমাইশি, লোচ্চামি তাদের নিত্যকর্ম পদ্ধতির একটা অঙ্গ। দুনিয়াতে এমন কোনও পাপকর্ম নাই—যা তারা করে না। হঠাৎ দুম করে এমন সব মিথ্যা আজগুবি খবর রটিয়ে দিয়ে প্রতিবেশীদের অহেতুক আতঙ্কিত করে তোলে যে, তা আর কহতব্য নয়। সাদাসিধে নিরীহ ভালোমানুষ দেখলে আর তার রক্ষা নাই। যেন তেন প্রকারে তার অনিষ্ট কিছু করবেই। এই হচ্ছে ওদের শিক্ষাদীক্ষা রুচি-প্রকৃতির নমুনা।

ওদের একজন ভৃত্য—বয়সের গাছ পাথর নাই, কিন্তু অদ্যাবধি গোঁফদাড়ি গজায়নি—একেবারে খোজা-মাকুন্দ। লোকটার কী খরখরে বাজখাই গলা! গাধার ডাকও কানে সওয়া যায়, কিন্তু উফ্, ওই ভোঁদড়ের সুমধুর বাণী আমি আর বরদাস্ত করতে পারি না। খুব সকালে সবাই যখন শেষ ঘুমের সুখাবহ খোয়াড়ীতে আচ্ছন্ন, সেই সময় লোকটা সারা মহল্লার নিথর নিস্তব্ধতা খান খান করে হ্রেষারবে চিৎকার তুলে মেথর মুদ্দোফরাসদের সঙ্গে বচসা আরম্ভ করে দেয়। আমার তখন এমনও মনে হয়, হাতের কাছে পেলে বোধহয় আমি ওকে খুনই করে ফেলবো। এই নেড়ি কুত্তার বাচ্চাটা মুখে বড়ো ফট্টাই মারে, সে নাকি সাচ্চা আরব সন্তান। আমি বিশ্বাস করি না। লোকটা ডাইনে বাঁয়ে মিথ্যে কথা বলে। ওর চৌদ্দ পুরুষের কেউ কখনও আরবের বাসিন্দা বা মুসলমান ছিলো না। আসলে ও বেজম্মা বিধর্মী ম্লেচ্ছ—খ্রীস্টান। ওর আসল কারবার হলো হারেমের খোজাদের হাত করে তাদের মালকিনদের কাছে উঠতি বয়সের ছেলে ছোকরা জোগান দেওয়া। এই রকম দালালী করে কিছু রোজগার-পাতি হলে এক পলকেই জুয়া খেলে তা উড়িয়ে দেয়।

আর এক মক্কেল—একটা ভাঁড়। ভোঁদড়ের মতো চেহারা। হোঁদলের মতো কুতকুতে চোখ। থপ থপ করে পা ফেলে হাঁটে। ওর কাজ কেবল বদখদ বাজে রসিকতা—কাতুকুতু দিয়ে লোক হাসানো। আর বস্তা পচা সস্তা যৌন সুড়সুড়ির কেচ্ছা বলে বিগত-যৌবন বুড়ো হাবড়াদের খানিকটা চাগিয়ে তোলা। ও যখন খুব হাল্কা-চালে এইসব ন্যক্কারজনক কথাবার্তা বলে বাজারের লোক জড়ো করে আমার মনে হয় লোকটার ঐ তেল-চকচকে টাকটার ওপর একটা মাটির হাঁড়ি ফাটিয়ে দিই।

যদি আমি কখনো ধর্মাবতারের সঙ্গে দেখা করতে পারি এবং তিনি যদি সদয় হয়ে আমাকে কোনও বর প্রার্থনা করতে হুকুম করেন, তবে আপনাকে আমি কসম খেয়ে বলছি, ধন-দৌলত কিছুই চাইবো না তাঁর কাছে। শুধু বলবো, আপনি এই কুত্তার বাচ্চাগুলোর হাত থেকে আমাকে বাঁচান, আর কিছু আমার বাসনা নাই। আপনার বিচারে যার যা সাজা প্রাপ্য সেই সাজা দিয়ে ওদের বুঝিয়ে দিন, এ শহর শেরিফ আদমীর শহর, বেতমিজ বদমাইশ বেল্লিকদের এখানে জায়গা নাই। আমি বলবো, জাঁহাপনা, আপনি ওদের কেটে কুচি কুচি করে নর্দমায় ফেলে দিন। এ না হলে আমাদের পাড়ায় শান্তি আসবে না।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো সাতাশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সব শুনে খলিফা বলেন, তা হলে তুমি বলতে চাইছো, এইসব অবাঞ্ছিত দুষ্ট লোকদের সমাজে বসবাস করার কোনও অধিকার নাই! কার এরা নিরীহ সৎ মানুষের চিত্ত কলুষিত করে। তোমার নালিশ অতি ন্যায়সঙ্গত। এবং খলিফা এইসব অনাচার সমাজ থেকে দূর করার জন্যই বদ্ধপরিকর। এই কারণেই তিনি মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের ঘন সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করেন। তোমার এই অভিপ্রায় যদি জানতে পারেন, আমার মনে হয় একদিনের জন্য তিনি তোমার আতিথ্য নিতে গররাজি হবেন না। আমি জানি এই ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তিনি সঞ্চয় করতে চান।

হাসান হো হো করে হেসে ওঠে, না না তার দরকার নাই। সত্যি সত্যিই গুরুগম্ভীরভাবে এসব কথা আপনাকে আমি বলিনি। হাল্কাভাবে সময় কাটানোর জন্য এমনি বললাম। আপনি আবার কাউকে যেন বলবেন না। খলিফার কানে গেলে আমাকে তিনি পাগলা-গারদে ভরে রাখবেন হয়তো। আপনি তো নামজাদা সওদাগর, প্রাসাদের আমির উজিরদের সঙ্গেও আপনার পেয়ার দোস্তি থাকা অসম্ভব নয়। দোহাই আপনার, মদের খেয়ালেও তাদের কাছে আমার এসব অলীক উচ্ছ্বাসের কোনও কথা বলবেন না যেন।

খলিফা বলেন, কথা দিচ্ছি, আমার মুখ থেকে কেউ কিছু শুনতে পাবে না। কিন্তু খলিফা স্বয়ং নিজেই যদি সন্ধান করতে করতে তোমার কাছে চলে আসেন একদিন, তখন?

হো হো করে হেসে ওঠে হাসান। হেসে ওঠেন খলিফাও। তারপর সুরাপাত্র পূর্ণ করে হাসান। খলিফা এক চুমুকে নিঃশেষ করে নামিয়ে রাখেন। হাসানও অতিথির তালে তাল রেখে চলে। এইভাবে একের পর এক মদের পেয়ালা উজাড় করে দিতে থাকে দুজনে।

নেশায় বুঁদ হয়ে আসছিলো হাসানের চোখ। খলিফা বললেন, এবার তুমি রাখ, আমি ভরে দিচ্ছি পেয়ালা।

খলিফা এগিয়ে আসেন। শরাব ঢালার সময় হাসানের পেয়ালায় টুক করে এক ডেলা আফিঙ ফেলে দেন তিনি। হাসানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, কামনা করি আরো মধুর হোক আমাদের এই মৌতাত।

হাসান বলে, অনেক হয়েছে, এরপর আর চড়ালে, আমার ভয় হয়, কাল সকালে সময় মতো জেগে উঠে আপনাকে বিদায় জানাতে পারবো না। কিন্তু আপনি মহামান্য অতিথি, আপনাকে প্রত্যাখ্যান করি সাধ্য কী, দিন।

খলিফা বলেন, কিচ্ছু হবে না। আমি তোমাকে জাগিয়ে দেব।

আবু অল হাসান সে পেয়ালাও নিঃশেষ করে রেখে দেয়।

একটুক্ষণের মধ্যেই ওষুধের ক্রিয়া কাজ করতে শুরু করে। হাসানের দেহটা ঢলে পড়ে যায়। খলিফা হেসে ওঠেন।

বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিলো মাসরুর তার দেহরক্ষী এবং অন্য নফররা। জানলা দিয়ে ইশারা জানাতেই তারা এসে হাসানের অসাড় দেহটা কাঁধে তুলে নেয়। খলিফা বলেন, আমার পিছনে পিছনে এস তোমরা।

বাড়ি থেকে পথে নেমে খলিফা মাসুরকে বললেন, এই বাড়িটা ভালো করে লক্ষ্য করো, পরে যখন বলবো আবার আসতে হতে পারে।

মাসরুর বললো, ঠিক আছে জাঁহাপনা ভুল হবে না।

পথে বেরিয়ে আসার অনেক পরে খলিফার খেয়াল হয়, দরজাটা হাট করে খোলা পড়ে রইলো, বন্ধ করা হয়নি।

প্রাসাদের পিছন দিকের গুপ্তদ্বার দিয়ে হাসানকে অন্দরে নিয়ে আসেন খলিফা। তাঁর নিজের ঘরের পালঙ্ক-শয্যায় শুইয়ে দিতে বলেন। তারপর নফরদের হুকুম করেন, ওর সাজ-পোশাক খুলে নিয়ে আমার রাতের পোশাক পরিয়ে দাও।

এরপর প্রাসাদের সব নফর চাকর খোজা দাসী বাঁদী প্রহরী সকলকে ডেকে তিনি বললেন, তোমরা সবাই খেয়াল করে শোনো, কাল সকালে এই যুবকের যখন ঘুম ভাঙবে, তখন ওকে খলিফা জ্ঞানে শ্রদ্ধা সম্মান জানাবে। মনে রেখ, আমার জন্য যা যা তোমরা করো, ঠিক সেই সবই করবে এর জন্য। মনে করবে, এই তোমাদের সুলতান খলিফা হারুন অল রসিদ। কোনও ভাবেই সে যেন বুঝতে না পারে—এটা তামাশা।

কাল সকালে তোমরা সকলে এই কামরার সামনে হাজির থাকবে! রোজ যেমন থাক। সে যা হুকুম করবে সঙ্গে সঙ্গে তামিল করবে। তা সে যত অসঙ্গতই হোক না কেন? মাথা পেতে মেনে নেবে সব। আমাকে যে ভাবে কুর্নিশ করো, সম্বোধন জানাও, ঠিক সেইভাবে সেই কায়দায় একেও কুর্নিশ কেতা জানাবে। যদি আমার এই হুকুমের কেউ অবাধ্য হও, তা সে আমার পুত্র হলেও রেহাই দেব না। এর একমাত্র সাজা—প্রাণদণ্ড এবং তাই তোমাদের ভাগ্যে জুটবে।

সমবেত সকলে মাথা নত করে জো হুকুম জাঁহাপনা বলে দাঁড়িয়ে রইলো।

খলিফা এবার উজিরকে বললেন, জাফর, আমার দরবারের সব আমির, সেনাপতি ও পারিষদদের আজ রাতেই খবর পাঠিয়ে দাও। কাল সকালে তারা যেন এই যুবক হাসানকে খলিফার মর্যাদায় মসনদে বরণ করে নেয়। সে যা হুকুম করবে তাই তোমাদের মাথা পেতে নিতে হবে। যা যা দিতে বলে অকাতরে দান করে দেবে। তাতে যদি আমার সলতানিয়তের সমগ্র ধনভাণ্ডারও উজাড় হয়, সে ভি আচ্ছা। যদি কারো গর্দান নিতে চায় সঙ্গে সঙ্গে তা তামিল করবে। মনে রেখ আগামীকাল সেই তোমাদের সুলতান। তার ওপরে কথা বলার এক্তিয়ার কারো থাকবে না। এমন কি আমারও না। কোনও কিছুর জন্যেই আমার অনুমতি প্রার্থনা করার কোনও দরকার নাই। তার হুকুমই শেষ কথা। জাফর, যা বললাম তার যেন এদিক ওদিক না হয়।

মাসরুরকে বললেন, শোনো, কাল সকালে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে আমার ঘরে যাবি। হাসান জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহী কেতায় তাকে কুর্নিশ জানিয়ে তার হুকুমের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবি। মনে থাকে যেন প্রতিদিন সকালে আমাকে যা যা বলিস ওকেই বলবি সে সব কথা। এবং তার জবাবে সে যা বলবে ঘাড় হেঁট করে তা শুনবি। খবরদার, একটুও এদিক ওদিক হয় না যেন।

মাসরুর কুর্নিশ জানিয়ে বললো, জো হুকুম, জাঁহাপনা।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো আটাশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

পরদিন সকালে মাসরুর প্রথমে খলিফাকে জাগায় তারপর চলে আসে খলিফার শোবার ঘরে। সেখানে হাসান তখনও নিদ্রামগ্ন।

খলিফা এসে বসলেন একটা পর্দার আড়ালে। সেখান থেকে পালঙ্ক-শায়িত হাসানকে তিনি পরিষ্কার দেখতে থাকলেন। অথচ হাসান বা ঘরের অন্য কেউ তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।

জাফর এবং মাসরুর এসে হাসানের শয্যাপার্শ্বে করজোড়ে দাঁড়ায়। তাদের পরিধানে সাজ-পোশাক। ঘরের চার পাশে এসে অবনত মস্তকে দাঁড়ালো প্রাসাদের

নফর-চাকর বান্দা খোজা দাসী বাঁদী প্রভৃতি। কারো মুখে কোনও কথা নাই। সারা প্রাসাদটায় নেমে এলো গভীর নিস্তব্ধতা। খলিফার ঘুম থেকে ওঠার আগে রোজ যেমন হয়।

একটু পরে একটি বাঁদী খানিকটা ভিনিগার তুলোয় ভিজিয়ে এনে হাসানের নাকে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ঘোরেই সে হেঁচে ওঠে। এক—দুই—তিন বার। এতে আফিঙের ঘোরটা কেটে যায়।

এরপর গোলাপজলের পাত্র এনে মেয়েটি হাসানের চোখমুখ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলো।

এইবার হাসান চোখ মেলে। কিন্তু সে পলকের জন্য মাত্র। আবার সে চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে শোয়। ঘুম তার ভেঙ্গে গেছে, নেশা তার কেটে গেছে। কিন্তু একি দেখলো সে? বাদশাহী পালঙ্ক-শয্যা, অগণিত দাসদাসী নফর চাকর—এসব কী? সে কী স্বপ্ন দেখছে? কিন্তু না, স্বপ্নই বা হবে কেন? সে তো জেগেই রয়েছে।

আবার সে চোখ খোলে। কী আশ্চর্য, এরা সব তার ঘরে এলো কী করে? আর এ ঘর তো তার নয়। এত বড়ো কামরায় তো সে কোনও দিন বাস করেনি। আর এমন জাঁকজমক, বাহারী আসবাবপত্র তার ঘরে আসবেই বা কোত্থেকে?

ধীরে ধীরে আবার সে চোখের পাতা বন্ধ করে, আবার খোলে। না, সেই একই দৃশ্য।

তার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে শহরের সব বিখ্যাত আমির উজির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তবে কী সে জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে? হতেও পারে। কাল সেই মশুলের সওদাগরটার সঙ্গে অনেক রাত অবধি সে অনেক মদ গিলেছে। হয়তো এই খোয়াব, তারই কুফল।

জাফর আভূমি আনত হয়ে তিনবার কুর্ণিশ জানায়।

—বান্দা হাজির, ধর্মাবতার। শয্যা ত্যাগ করে উঠতে আজ্ঞা হোক, জাঁহাপনা। আপনার নামাজের সময় হয়ে গেছে।

দু হাত দিয়ে চোখ দু'টো কচলায় হাসান। কী ব্যাপার? এ সব কী? ঘরের এদিক থেকে ওদিক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়।

—না, আমি তো স্বপ্ন দেখছি না! তবে কী করে রাতারাতি খলিফা হয়ে গেলাম। আর কে-ই বা আমাকে নিয়ে এলো এখানে?

না না, আর ভাবতে পারে হাসান। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে সে।

কিন্তু কী একটা অদৃশ্য শক্তি হনন করতে থাকে। চোখ বন্ধ করেও পড়ে'থাকতে পারো না।

জাফর দ্বিতীয় বার আবেদন জানায়, ধর্মাবতার, আপনার সকাল বেলার নামাজের সময় বয়ে যায়। মেহেরবানী করে শয্যা ত্যাগ করতে আজ্ঞা হোক, জাঁহাপনা! আজ এতকাল আপনি তো কখনও নামাজ নষ্ট করেননি। কৃপা করে উঠুন।

এই সময় জাফর ইশারা করতে নটীরা নানারকম তারের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ভৈরবীর তান তুলতে থাকলো।

আর হাসান ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, ঘরের এক প্রান্তে একটা মঞ্চের ওপরে বসেছে অনেকগুলো নটী নর্তকী। তাদের কারো হতে বীণা, কারো হতে সেতার, আবার কারো বা হাতে সরোদ। হাতের যাদুতে সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করে চলেছে তারা।

হাসান ভাবে, সে তো শোবার সময় এদের কাউকে দেখিনি। তবে এই একটা রাতের ব্যবধানে এমন পরিবর্তন, এত সব কাণ্ডকারখানা ঘটে গেলো কী প্রকারে? ভাবতে থাকে সে। কিন্তু কোনও কূল কিনারা খুঁজে পায় না।

এবার সে উঠে বসলো। হাত দিয়ে বালিশ বাজু পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। না, সবই তো শক্ত শক্ত মনে হচ্ছে। পরিষ্কার সে অনুভব করতে পারছে। স্বপ্ন হলে কী অনুভব করা যায়? বলতে পারবে না সে।

দুনিয়াতে এর চেয়ে তাজ্জব কাণ্ড আর কী হতে পারে? তার নাম আবু অল হাসান। তার বাবা ছিলো সওদাগর। অনেক ধন রত্ন রেখে গিয়েছিলেন তিনি। সেগুলো না উড়িয়ে জমিয়ে রাখলেও এই রকম বাদশাহী খাট-পালঙ্ক গালিচা পর্দা, নফর চাকর, দাসী বাঁদী, নটী নর্তকীর বিলাস প্রাচুর্যে দিন কাটাবার স্বপ্নও সে দেখতে পারতো না। সেই সব অসম্ভব অদ্ভুত কাণ্ড তো আজ সে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছে।

এই সময় বাজনা থেমে গেলো। মাসরুর এগিয়ে এসে তিনবার আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, ধর্মাবতার নামাজের বেলা বয়ে যায়। দরবারে যাবার সময় আগত হয়ে এলো। শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করতে আজ্ঞা হোক।

আবু আল হাসান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে মাসরুরের দিকে তাকায়। লোকটা বলে কী! তাকে দরবারে গিয়ে মসনদে বসতে হবে?

ক্রোধে ফেটে পড়তে চায় হাসান।

—আমি জাঁহাপনার বান্দা মাসরুর। আর আপনি পয়গম্বর মহম্মদের চাচা আব্বাসের পঞ্চমতম পুরুষ মহামান্য ধর্মাবতার খলিফা হারুণ অল রসিদ।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো ত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

—তুমি একটা দোজকের পোকা—খানকির বাচ্চা।

মাসরুর মাথা নুইয়ে বলে, শাহেনশাহ যথার্থই বলেছেন। নিজেকে আমি গর্বিত মনে করছি। আমার মনে হয়, জাঁহাপনার কাল রাত্রে সুনিদ্রা হয়নি। কিছু দুঃস্বপ্ন দেখে থাকবেন, সেই কারণে তিনি আমার প্রতি কুপিত হয়ে উঠেছেন। যাই হোক, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে সুস্থ করে তুলুন।

আবু অল হাসান আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আবার শয্যায় ঢলে পড়ে। দু'হাতে মুখ ঢেকে পা দু'টো ছুঁড়ে দাপাদাপি করতে থাকে। পর্দার আড়ালে হারুন অল রসিদ আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। তাঁর হাসির শব্দে সবাই চকিত হয়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কায় রুমাল দিয়ে তিনি মুখ চাপা দিয়ে ধরেন।

আবু হাসান নিজের মনেই হো হো করে হাসতে থাকে। খলিফা হারুন অল রসিদ হা হা হা, সে নাকি স্বয়ং খলিফা! কী সব আজগুবী কাণ্ড! আবার সে তড়াক করে শয্যার উপর

উঠে বসে। সামনে দাঁড়িয়েছিলো একটা ছোট্ট নিগ্রো বাঁদী. তার দিকে তাকিয়ে বলে, এ্যাই, এদিকে আয়। বলতো, আমি কে?

মেয়েটি ভীত চকিত হয়ে কাছে আসে, বলে, আপনি তো আমাদের খলিফা হারুন অল রসিদ।

—চোপ রও! হারুন অল রসিদ—মিথ্যুক কোথাকার।

এরপর আর একটা ফর্সা বাঁদীর দিকে বাঁ হাতের তর্জনটা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলে, এ্যাই, আমার এই আঙ্গুলটা কামড়ে দে তো!

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে হাসানের আঙ্গুলটা কামড়ে ধরে।

—উঃ উঃ, ছাড় ছাড়—

হাসান হাতটা টেনে নেয়। না, স্বপ্ন হলে ব্যথা লাগবে কেন? এ তো স্বপ্ন নয়! মেয়েটিকে সে প্রশ্ন করে। আমাকে তুমি চেন? বল তো আমি কে?

মেয়েটি নির্বিকার ভাবে বলে, আপনি আমাদের মহানুভব সুলতান খলিফা হারুন অল রসিদ।

হাসান আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। হো হো হো। হাসান, তুমি তা হলে দেখেছ, সত্যিই খলিফা বনে গেছ। এরা যে সবাই এক কথা বলছে, তুমি নাকি বাগদাদের সুলতান খলিফা হারুন অল রসিদ!

এই সময় প্রধান খোজা তিনবার কুর্নিশ জানিয়ে বললো, ধর্মাবতার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিরর্থক। তবু বলছি, দরবারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এবার তো ধর্মাবতারকে মসনদে বসতে হবে। দরবারের আমির অমাত্যরা অধীর আগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

হাসান এক লাফ দিয়ে পালঙ্ক ছেড়ে নিচে নেমে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে একনজর নফর ছুটে আসে খলিফার হীরে মুক্তোয় চুমকি-বসানো সোনার জরিতে মোড়া টুকটুকে লাল চটি জোড়া নিয়ে। হাসানের পায়ের তলায় বসে পড়ে জুতো জোড়া বাড়িয়ে ধরে।

এমন অতি মূল্যবান শাহী জুতো সে চোখে দেখেনি কখনও। নির্বিবাদে পা দুখানা গলিয়ে দেয় সে চটির মধ্যে।

প্রধান খোজার কাঁধে ভর দিয়ে হাসান হামামে গিয়ে ঢোকে।

কিছুক্ষণ পরে হাসান ফিরে এসে দেখে, হারেমের সমস্ত বাঁদীরা দুই সরি হয়ে অবনত মস্তকে কুর্নিস জানাবার ভঙ্গী করে কোমর নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এইখানে রাত্রির সাজপোশাক খুলে ফেলে হাসানকে দরবারের বাদশাহী সাজে সজ্জিত করা হয়।

হাসান এবার সন্দেহাকুল হয়ে ভাবে, না, তা হলে সত্যিই হাসান নই। এই তো আমি স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ। তবে বোধ হয় কাল রাতের স্বপ্নটাই আমাকে ভাবিয়েছিলো, আমি এক তুচ্ছ বেকার বণিক সন্তান আবু অল হাসান! আরে ছোঃ যত সব আজগুবী খোয়াব। না না, আমি হাসান হতে যাবো কেন, আমি তো খলিফা। এই তো আমার উজির, এই তো আমার প্রাসাদ। এই তো আমার বেগম-বাঁদীরা। না, আমি আর ওসব হাসান ফাসানের কথা চিন্তা করে মাথা খারাপ করবো না। আমার ওসব বাজে কথা চিন্তা করার মতো সময় কোথায়? আমি খলিফা, ওরা আমাকে এখুনি দরবারে নিয়ে যাবে। মসনদে বসাবে। আমি বিচার করবো, হুকুম ফরমানি জারি করবো। আমার কথায় সবাই ওঠ বোস করবে।

দরবারে চলো, কদম বাড়াও।

হাসানের কণ্ঠে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। স্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ। কোনও দ্বিধা জড়তার লেশমাত্র নাই।

দারুন জাঁকজমক করে দরবারে নিয়ে এসে হাসানকে মসনদে বসানো হয়।

হাসান দেখলো সারা দরবারকক্ষ আমির উজির সেনাপতি সভাসদ পারিষদ বয়স্যে পরিপূর্ণ। সকলেই শ্রদ্ধাবনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো। নিয়ম হচ্ছে যতক্ষণ না খলিফা সকলকে আসন গ্রহণ করতে বলেন, ততক্ষণ কেউই বসতে পারে না। দাঁড়িয়েই থাকতে হয়। হাসান তা বুঝতে পারে না। সুতরাং কেউই আর আসন গ্রহণ করতে পারে না। উজির ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে, ধর্মাবতার যদি অনুমতি করেন, আমরা আপনার চরণতলে বসতে পারি।

হাসান ইশারা করে। সবাই যে যার আসনে বসে পড়ে।

দরবারের অধিকাংশই তার অচেনা মুখ। শুধু উজির জাফর এবং কবি আবু নবাস, অল ইজলী, অল রাক্কাসী, ইবদান, অল সাকার, উমর অল টারতিস, আবু ইশাক ও জাদিমকে সে চেনে। নানা সভা-সমিতিতে অনেকবার সে দেখেছে তাদের।

জাফর একখানা বড়ো কাগজের লম্বা ফর্দ বাড়িয়ে দেয় হাসানের দিকে। সেদিন দরবারে কার কী আর্জি আছে, কোন মামলার বিচার-রায় দিতে হবে এবং কোন কোন ফরমান হুকুম জারি করতে হবে তারই লম্বা ফিরিস্তি।

এরপর জাফর প্রজাদের অভাব অভিযোগের দরখাস্তগুলো সভাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়তে থাকে। পর্দার পিছনে খলিফা বসেছিলেন তামাশা উপভোগ করার জন্য। তিনি সব শুনতে থাকেন। এবং উজিরকে ইশারা করে তার 'হ্যাঁ' 'না' বক্তব্য জানিয়ে দিতে থাকেন।

হাসান কিন্তু এই সবের কিছুই বুঝতে পারে না। উজির নিজের মনে সব দলিল দস্তাবেজ হুকুম ফরমানের কাগজপত্র পাঠ শেষ করে। এর কোনটায় হাঁ বলতে হবে, কোনটা না করতে হবে হাসান বুঝবে কী করে? উজিরকে সে বলে, ওসব দেখার বা শোনার আমার সময় নাই। এখন থাক। পরে হবে। এখন হাবিলদার আহমদকে হাজির কর।

তৎক্ষণাৎ শহরের সিপাই অধিকর্তা আহমদ এসে তিনবার কুর্নিশ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। হাসান বললো, দশজন সিপাই সঙ্গে নিয়ে এক্ষুনি তুমি মোস্তাফা পট্টির রমজান শেখ আর তার দুই সাগরেদকে পাকড়াও কর। এই তিনটি লোকই বেতমিজ বদমাইশ। শুধু লোক ঠকানো, ধাপ্পাবাজি, অন্যের মেয়েছেলের দিকে নজর দেওয়া, আর নিরীহ মানুষকে অহেতুক শশব্যস্ত করাই এদের পেশা। এরা সমাজের কীট। এদের ধরে আচ্ছা করে রশি দিয়ে বাঁধবে। তারপর গাধার পিছনে বেঁধে সারা মহল্লা ঘোরাবে। জনে জনে ডেকে বলবে, খলিফার হুকুমে শয়তানদের সাজা দেওয়া হচ্ছে। এরপর চৌমাথার মোড়ে নিয়ে এসে প্রকাশ্য দিবালোক সহস্র জনতার সামনে ওদের প্রত্যেককে চারশো ঘা করে চাবুক লাগাবে।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো বত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

তারপর লোহার ডাণ্ডা গরম করে ঐ শেখটার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। এই মুখ দিয়ে অশ্রাব্য ভাষায় লোককে গালিগালাজ করে সব সময়। এরপর ওর লাশটা কুত্তাদের মুখে ছুঁড়ে দেবে। তারপর ঐ শাগরেদ দু'টোকে ধরে ওই পাড়ার এক পড়শী আবু অল হাসানের খাটা-পায়খানার হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দেবে।

আহমদ ফৌজি কায়দায় মাথায় ডান হাতখানা তুলে ধরে, পরে আর একবার কুর্নিশ জানিয়ে দরবারকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলো।

পর্দার আড়ালে বসে খলিফা হাসানের কার্যবিধি সবই প্রত্যক্ষ করছিলেন। তার এই ধরনের শাহচিত হুকুমনামা শুনে বিশেষ প্রীত হলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরে আহমদ ফিরে এলো। হাসান জিজ্ঞেস করে, আমার হুকুম তামিল করেছ?

আহমদ বলে, ধর্মাবতার মহানুভব এই তার প্রমাণ।

একখানা কাগজ সে উজিরের দিকে বাড়িয়ে দেয়। উজির পড়ে শোনালো, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা স্বাক্ষর করে দিয়েছে—তাদের চোখের সামনে খলিফার এই হুকুম তামিল করেছে পুলিশের সর্বাধিনায়ক হাবিলদার আহমদ।

হাসান উল্লসিত হয়ে ওঠে, অতি উত্তম। আমি খুব খুশি হয়েছি তোমার কাজে।

হাসান এবার প্রধান খাজাঞ্চীকে উদ্দেশ করে বলে, এক হাজার দিনার একটা থলেয় ভরে চাঁদনীচকের আবু অল হাসানের মার হাতে দিয়ে এস। হাবিলদার আহমদকে জিজ্ঞেস করলে সে হাসানের ঠিকানা বলে দিতে পারবে। থলেটা সাহেবের মাকে দিয়ে বলবে, আমাদের ধর্মাবতার খলিফা এই এক হাজার দিনার আপনাকে পাঠিয়েছে। আরও বেশি টাকা পাঠাবার ইচ্ছা ছিলো তাঁর। কিন্তু রাজা কোষে বেশি অর্থ নাই। তাই এই দিনারগুলোই আজকের মতো রাখুন, পরে আবার পাঠাবেন তিনি।

প্রধান খাজাঞ্চা দরবার থেকে বেরিয়ে একটা থলেয় এক হাজার দিনার ভরে হাসানের মা-এর কাছে চলে যায়।

হাসান উজিরকে জানালো, আজকের মতো দরবার শেষ। উজির সেকথা আমির অমাত্যদের জানিয়ে দিতে তারা সকলে খলিফাকে যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে দরবারকক্ষ ছেড়ে চলে গেলো।

হাসান উজির এবং মাসরুরের কাঁধে ভর দিয়ে মসনদ থেকে নীচে নামে। তারপর ওরা হাসানকে নিয়ে হারেমে চলে আসে। সেখানে সেদিনের দুপুরের খানাপিনার আয়োজন করা হয়েছিলো। মেয়েরা সকলে এসে হাসানের পাশে বসে।

সুন্দরী মেয়েরা সুমধুর তালে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। হাসান ভাবতে থাকে, সে যে সত্যি সত্যিই খলিফা হারুন অল রসিদ সে বিষয়ে তার মনে আর কোনও সংশয়, দ্বিধা নাই। এই তো সে শুনতে পাচ্ছে মেয়েদের বাজনা, ফুল শুঁকে সে গন্ধ আঘ্রাণ করতে পারছে, দিব্যি পায়ে হেঁটে চলে বেড়াতে পারছে। সে কথা বলছে, হুকুম করছে, তামিল হচ্ছে। একটু আগেই সে তিনজনের প্রাণদণ্ড দিয়ে এসেছে। সবাই তাকে খলিফা বলে মান্য করছে। সুতরাং সে তো আর স্বপ্ন দেখছে না। সে নিশ্চয়ই খলিফা।

ভোর হয়ে আসছে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো চৌত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বিশাল একখানা টেবিলে থরে থরে নানা স্বাদের বাদশাহী খানা সাজানো হয়েছে। কোনওটায় মাংসের কাবাব, কোন রেকাবীতে মোরগ মোসাল্লাম, কোনটায় আফগানী কোর্মা, আবার কোন রেকাবীতে পায়রার ঝোল। তন্দুরী রুটি প্রভৃতি। এছাড়া অনেক রকমের সব্জীর তরকারী।

গতকাল রাত-এর পর হাসান কিছু খায়নি। বেশ চনমনে খিদেও পেয়েছে তার। তাই বেশ উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো খাওয়ার জন্য।

হাসান নানা ব্যঞ্জন সহকারে খানাপিনা করে। তার সামনে পিছনে পাশে দাঁড়িয়ে সাতটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে চামর দুলিয়ে হাওয়া করতে থাকে। হাসানের কেমন অস্বস্তি লাগে। এসব তো আর অভ্যেস নাই কোনও কালে।

শেষ গ্রাস মুখে নেবার সময় পর্যন্ত প্রতিটি মেয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

খাওয়া দেখে। হাসান ঘেমে ওঠে। তার খাওয়া কেউ দেখছে, এটা ভেবেই তার খিদের অর্ধেকটা উবে যায়। কিন্তু কি করবে, উপায় নাই। সে খলিফা হারুন অল রসিদ, তাকে তো প্রাসাদ হারেমের রীতিনীতি কেতা, মেনে চলতে হবে।

মেয়েদের ডেকে প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞেস করে হাসান, কী নাম তোমাদের? একজন বলে তার নাম চুমকী। আর একজন বলে শোভা। আর একজনের নাম গুলাবী। অন্য একজনের নাম আনার। আর একটির নাম পলা। এবং বাকী দুজনের নাম চুনী ও পান্না।

—বাঃ, চমৎকার নাম তো তোমাদের।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে খোজা গরম জলের গামলা নিয়ে আসে। মেয়েরা হাসানের হাত মুখ ধুইয়ে সুগন্ধ তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেয়। তারপর হাত ধরে আর এক কামরায় নিয়ে চলে। দরজায় খোজা প্রহরী ছিলো। সে শশব্যস্ত হয়ে পর্দা গুটিয়ে ধরে।

হাসানকে পালঙ্কে বসিয়ে খোজার জিম্মায় রেখে মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশের একটা দরজা দিয়ে পরপর অন্য সাতটি পরমাসুন্দরী মেয়ে সাতখানা ফলের বারকোষ হাতে নিয়ে প্রবেশ করে। এই সাতটি মেয়ে আগের সাতটির চেয়ে আরও বেশি সুন্দরী।

হাসান ওদের পাশে বসায়। এবং নিজের হাতে করে প্রত্যেককে নানারকম ফল খেতে দেয়। কাউকে দেয় আঙুর, কাউকে তরমুজ, কাউকে বা কলা—এইভাবে এক একজনকে এক এক রকমের ফল তুলে দেয় সে।

সে নিজে প্রত্যেক ফল একটু একটু করে আস্বাদ করে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো ছত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

এরপর ঐ সপ্তকন্যা হাসানকে হাতে ধরে পাশের কামরায় নিয়ে যায়। সে ঘরেও পালঙ্ক-শয্যায় বসিয়ে খোজার হেপাজতে দিয়ে ওরা বিদায় নেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য সাতটি মেয়ে। তাদের প্রত্যেকের হাতে সোনার থালা। আর থালা ভর্তি এক এক রকমের মিষ্টি। পেস্তার বরফি, আলেপ্পের মণ্ডা, মশুলের জমানো খেজুর-ক্ষীর, আর বসরাহর হালওয়া প্রভৃতি। হাসান এই বস্তুগুলো খেতে ভালোবাসে না। অল্প একটু মুখে দিয়ে বলে, তোমরা খাও, আমি দেখি।

এবার মেয়েরা হাসানকে নিয়ে যায় পানঘরে। যথারীতি খোজার কাছে জমা দিয়ে দেয় তারা। এবং প্রায় সঙ্গেই সাতটি সুন্দর মেয়ে নানারকম মদের পাত্র মাথায় নিয়ে সঙ্গীতের তালে তালে (পর্দার আড়াল থেকে যে সব মেয়েরা সমধুর সুরে গান গাইছিলো তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছিল না।) নাচতে নাচতে পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে।

হাসানের চোখ নেচে ওঠে। বাঃ, তোফা। এতক্ষণ তো সে এই কথাই ভাবছিলো।

মেয়েরা এক এক জনের পাত্র থেকে এক এক পেয়ালা ভরে হাসানের অধরে ধরে। এক এক চুমুকে হাসান নিঃশেষ করতে থাকে। এইভাবে ছ'জনের হাত থেকে ছ'পেয়ালা মদ সে উদরস্থ করে। ধীরে ধীরে নেশাটা বেশ জমে ওঠে। এইবার সপ্তম কন্যার দেবার পালা। মদ ঢালার সময় সে কায়দা করে আফিঙের একটি ডেলা পেয়ালার মধ্যে ঢেলে দেয়। উজির জাফর মেয়েটিকে আফিং বড়িটা দিয়ে বলেছিলো, খলিফার শরাবের শেষ পেয়ালায়, তাঁর অলক্ষ্যে এই ডেলাটা মিশিয়ে দিয়ে তাঁর মুখে ধরবে।

পলকের মধ্যেই হাসান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে শয্যায় এলিয়ে পড়ে। খলিফা হারুন অল রসিদ মাসরুর আজ জাফরকে পাশে নিয়ে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে এই সব দেখছিলেন। এবার তিনি হো হো করে হাসতে হাসতে পর্দা ঠেলে পালঙ্ক-শয্যার পাশে দাঁড়াল।

হাসানের দেহটা তখন অসাড় অচৈতন্য। খলিফা মাসরুরকে বলেন, ওর গা থেকে আমার সাজ-পোশাক সব খুলে ওর নিজের গুলো পরিয়ে দে।

মাসরুর বাদশাহী সাজ খুলে হাসানকে তার নিজের সাজ-পোশাক পরিয়ে দেয়। খলিফা বলেন, এবং যে দরজা দিয়ে ঢুকিয়েছিলি প্রাসাদের সেই গুপ্তদরজা দিয়ে আবার একে বাইরে নিয়ে যা। যে বাড়ি থেকে এনেছিলি সেই বাড়ির সেই ঘরে এর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে আসবি। সাবধান, কেউ যেন টের না পায়, বুঝলি?

মাসরুর মাথা নেড়ে বলে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না জাঁহাপনা। কাক পক্ষীটিও জানতে পারবে না।

খলিফা বলেন, উফ, সকাল থেকে হাসতে হাসতে আমার পেটে ব্যথা ধরে গেছে। হাসান যদি আর বেশিক্ষণ এখানে থাকে, আমি হাসতে হাসতেই মারা পড়বো।

খলিফার নির্দেশমতো মাসরুর হাসানকে নিয়ে চাঁদনীচকে ওর বাড়িতে চলে যায়। তারপর সেই ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়ে।

পরদিন সকালে হাসানের ঘুম ভাঙ্গে না। বেলা যখন দুপুর গড়িয়ে গেলো সেই সময় সে চোখ মেলে। কিন্তু কেমন সব গোলমাল মনে হয়। মাথাটায় ঝাঁকুনি নিয়ে ঘুমের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করে।

—কোথায়, মেয়েরা সব, কোথায় গেলে, এদিকে এস।

হাসানের কণ্ঠে হুকুমের সুর। কিন্তু কেউ আসে না; কেউ কোনও সাড়া দেয় না। হাসান এবার কিছু উত্তেজিত কণ্ঠে ডাক দেয়, মেয়েরা সব কোথায় গেলে, আমি জেগে উঠেছি, দেখতে পাচ্ছ না? এদিকে এস।

কিন্তু কে আসবে? কে সাড়া দেবে?

এবার হাসান ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে ওঠে, এ্যাই জাফর—জাফর? এ্যাই—কুত্তার বাচ্চা? মাসরুর—খানকির ছেলে, কোথায় গেলি সব। দাঁড়া, আজ তোদের সব্বাইকে শূলে চড়াবো। এত বড়ো আস্পদ্দা, আমি কখন থেকে ডাকছি, তা নবাবজাদাদের সাড়া দেবার নাম নাই।

ক্রোধে আরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তার পরই ভ্যাবাচেকা খেয়ে আবার সে বসে পড়ে খাটের ওপর। বিস্ময় বিস্ফারিত বড়ো বড়ো চোখ মেলে সে ঘরের এপ্রান্ত ওপ্রান্ত দেখতে থাকে। এ কোন্ ঘর? এ তো তার প্রাসাদের শয়নকক্ষ নয়! কিছুই বুঝতে পারে না হাসান। এ কোথায় সে বসে আছে। এ তো একটা এঁদো স্যাঁতসেঁতে চুনবালীখসা ঘর। এখানে সে এলো কী করে। সে স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ। সে কেন এই দীন ভিখারীর ঘরে বসে থাকবে? কে তাকে নিয়ে এলো এখানে? কার ঘাড়ে দু'টো মাথা আছে—এই কাণ্ড করেছে। এবার সে আরও জোরে বাড়ি ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে, জা-ফ-র। তবু জাফর সাড়া দেয় না! ছুটে আসে তার বৃদ্ধা মা।

—কী বাবা, কী হয়েছে? খারাপ স্বপ্ন-টপ্ন কিছু দেখেছিস নাকি?

হাসান সন্দেহের চোখে তাকায়, কে তুমি?

—সে কি বাবা, এখনও কী স্বপ্ন দেখছিস জেগে জেগে?

—স্বপ্ন আমি দেখছি, না তুমি দেখছো বুড়ি। জানো কার সামনে দাঁড়িয়ে কাকে কী কথা বলছো? আমি স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ পয়গম্বর মহম্মদের চাচা আব্বাসের

পঞ্চম পুরুষ। খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে কী আদব কেতায় কথা বলতে হয়, তাও জান না?

মা আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে, সে কি বাবা, তুই যে আমার একমাত্র চোখের মণি, আমি তোর মা।

—তুমি মাই হও আর যেই হও—আমি তো এই মুলুকের সুলতান। আমার সামনে যখন দাঁড়াবে, সবাই যেমন সালাম কুর্নিশ করে, তুমিও তেমনি করবে। সবাই যেমন আমাকে ধর্মাবতার বলে সম্বোধন করে, তোমাকেও তাই করতে হবে। এই-ই নিয়ম। মা হয়েছ বলে তুমি খলিফার তখতের অপমান করতে পার না। জান, আমার এক আঙ্গুলের ইশারায় কী কাণ্ড ঘটতে পারে? এই তো কালই ঐ শয়তান শেখটা আর তার দুই সাগরেদকে এক হুকুমে খতম করে দিয়েছি। হুঁ হুঁ বাবা, আমি কি যে সে লোক নাকি। এই তো খাজাঞ্চাকে হুকুম করা মাত্র তোমাকে সে এক হাজার দিনারের একটা থলে দিয়ে গেছে। কী, দেয়নি?

হাসানের মা বলে, হ্যাঁ, কাল দুপুরে প্রাসাদ থেকে একজন এসে আমাকে একটা মোহরের তোড়া দিয়ে বললো, খলিফা এই এক হাজার দিনার পাঠিয়েছেন আপনাকে। আজ ধনাগারে বেশি অর্থ নাই, তাই এইটাই রাখুন আজকের মতো। পরে আবার পাঠিয়ে দেবেন তিনি।

হাসান ভারিক্কি চালে মাথা নাড়ে, তবেই বোঝ, আমার কী ক্ষমতা। আরে হবে না কেন, আমি যে স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ—সমগ্র ইরাক খুরাসনের প্রবল প্রতাপান্বিত মহামান্য সুলতান। আমার কথায় বাঘে গরুতে একঘাটে পানি খায়। আর এ তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

হাসানের মা বুঝতে পারে, ছেলের মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে, ও বাবা গো, আমার একি হলো গো? আমার একমাত্র বুকের কলিজাকে কে কি গুণ তুক্ করেছে গো? হায় হায়, এখন আমার উপায় কী হবে? কী করে সারাবো আমি? কে সারিয়ে দেবে আমার বাছাকে।

—এ্যাই বুড়ি চুপ কর। মাথা আমার খারাপ হয়নি, হয়েছে তোমার। তা না হলে, খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে এই রকম বেয়াদপি করে বে-শরম বাত বলতে পার? দূর হও—দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

হাসানের মা এবার ডুকরে কেঁদে ওঠে, এসব কী বলছিস, বাবা। কে তোকে কী খাইয়েছে বল? সেই মশুলের সওদাগরটাকে যখন অত রাত অবধি অত গলাগলি করছিলি তখনই আমার ভয় লাগছিলো। মশুলের লোকগুলো ভালো হয় না। ওরা অনেক রকম ঝাড়ফুঁক, গুনতুক করতে জানে। জড়ি বড়ি খাইয়ে ভালো মানুষকে পাগল করে দিতে পারে।

—থামো। পাগল করে দিতে পারে—

হাসান খেঁকিয়ে ওঠে ওর মাকে, আমি শাহেন শাহ খলিফা হারুন অল রসিদ। আমাকে সে পাগল করে দেবে? সারা মশুল আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেব না?

—ও বাবা গো, মা গো, এ আমার কী হলো গো? কে আমার এই সব্বোনাশ করে গেলো গো। হায় হায় হায়—আমার একমাত্র চোখের মণি—তাকে পাগল করে দিলো কে?

হাসান চিৎকার করে ডাকে, জাফর জাফর? মাসরুর, মাসরুর? এই বেয়াদপ বুড়িটাকে প্রাসাদ থেকে বাইরে বের করে দাও।

কিন্তু জাফর বা মাসরুর কেউ-ই আসে না। হাসানের মা মুখে মধু ঢেলে বলে, জাফর মাসরুর আসবে কোত্থেকে, বাবা। আর এটা কী খলিফার প্রাসাদ। তাকিয়ে দেখ না, আমাদের সেই ঝরঝরে পুরনো বাড়ি—চুন বালী খসা ঘর। তুই কী এখনও বুঝতে পারছিস না, খারাপ স্বপ্ন টপ্প দেখে এই রকম ভুল বকছিস। নে, চোখে মুখে পানি দে। একটু শরবত খা। দেখ সব ভুল ভেঙ্গে যাবে। দাঁড়া, আমি নিয়ে আসি।

মা বেরিয়ে যায়। হাসান বসে বসে ভাবতে থাকে, তবে কী সে সত্যিই স্বপ্ন দেখছিলো সারারাত ধরে? তবে কি সে আবু অল হাসান? খলিফা নয়? হয়তো মা-র কথাই ঠিক। আগাগোড়াটাই স্বপ্ন?

মা ফিরে এসে হাসানের চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দেয়। এক গেলাস শরবত তুলে দেয় ওর হাতে। এক চুমুকে শরবতটুকু নিঃশেষ করে হাসান বলে, মা, তুমি ঠিকই বলেছ, আমি অল হাসান। এই তো আমার সেই চির চেনা ঘর। কাল রাতে আমি বোধহয় স্বপ্নই দেখেছিলাম।

মা-এর মুখে হাসি ফোটে। যাক, ছেলে তবে পাগল হয়ে যায়নি।

—তোকে আমি তো বললাম, বাবা, অনেক সময় নানারকম আজগুবি স্বপ্ন দেখে সকালবেলায় কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। তুই একটু সুস্থ হয়ে বোস, আমি তোর জন্যে নাস্তা বানিয়ে নিয়ে আসি।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে রসুইখানায় যাবার উদ্যোগ করতেই হাসান আবার চিৎকার করে ওঠে, এ্যাই শয়তানী, শিগ্গির করে বলো, কে আমাকে প্রাসাদ থেকে এখানে রেখে গেছে। আমার দরবার, আমার তখত্ আমার হারেম—কোথায় গেলো? কে কারসাজী করে আমাকে সরিয়ে এনেছে এখানে? বল, শিগ্গির করে বল। নইলে মেরে শেষ করে দেব তোকে।

হাসান তেড়ে আসে মা-এর কাছে। চেপে ধরে তার চুলের মুঠি, এখনও বল, এসব কার ষড়যন্ত্র?

মা বলতে চায়, বাবা, শান্ত হয়ে বোস, কেন এরকম করছিস। আমি তোর গর্ভধারিণী মা। দশমাস দশদিন পেটে ধরেছি, বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি। এই কী তার পুরস্কার? তুই কী করে খলিফা হতে পারবি, বাবা। তুই তো আমার ছেলে—হাসান।

—হাসান! ওরে শয়তান বুড়ি, আমি হাসান? জানিস না, আমার হুকুমে সারা সলতানিয়ত কাঁপে।

এই বলে সে এক ধাক্কা মেরে মাকে মেঝেতে ফেলে দেয়। বৃদ্ধা হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। পুত্রস্নেহে অন্ধ মা চোখের জল মুছতে মুছতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে নাস্তা বানিয়ে আবার ফিরে আসে সে হাসানের ঘরে। হাসান তখন গুম মেরে বসে বসে কী সব ভাবছিলো। ছেলের পাশে এসে হাত রাখে মা। বলে, নে বাবা, খেয়ে নে। তারপর যা, একটু খোলা হাওয়া থেকে ঘুরে আয়। দেখবি, ভালো লাগবে।

হাসান কোনও কথা বলে না। খেতে শুরু করে। মা বলে, জানিস বাবা, কাল হাবিলদার আহমদ এসেছিলো, আমাদের মহল্লায়। পাশের ঐ শয়তান শেখটা আর তার দুই সাগরেদকে ধরে গাধার পিঠে চড়িয়ে সারা মহল্লাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালো। আর ঢ্যাঁড়া পিটে লোকজনদের জানাতে লাগলো এই যে চাঁদনীচকের বাসিন্দারা, শোনো, এই বদমাইশ শেখ আর তার এই দুই বেল্লিক ল্যাঙবোটকে এবার চাবুক মারা হবে। যারা দেখতে চাও, চৌমাথায় জড়ো হও। কাতারে কাতারে ছেলে বুড়োরা জড়ো হলো সেখানে। আমি তো ঘরে বসে জানালার পর্দা সরিয়েই দেখতে পেলাম। ওঃ, কী মারটাই মারলো! এক এক জনকে চারশো ঘা চাবুক। তা অত মার কী আর শরীরের সয়? তখনই প্রায় দলা পাকিয়ে গেছে। তার উপর একটা লোহার শিক তাঁতিয়ে এনে শেখটার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো আহমদ। আর সঙ্গে সঙ্গে সব খতম। শেখের লাশটা নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলো ঐ নর্দমায় পানিভরা ডোবাটার মধ্যে। আর ওর সাগরেদ দু'টোকে এনে ফেলে দিলো আমাদের খাটা পায়খানার ময়লার হাঁড়ির মধ্যে। ঠিক হয়েছে, উচিত সাজা দিয়েছেন ধর্মাবতার। পাড়াটার হাড় জুড়িয়েছে।

হাসান অনেকটা সামলে নিয়েছিলো। কিন্তু মা-র এই কথা শোনার পর আবার তার

ধারণা বদ্ধমূল হলো, সে নির্ঘাৎ খলিফা হারুন অল রসিদ। কারণ আহমেদকে সে-ই তো এই হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছিলো। আবার সে চিৎকার করে ওঠে, সেই ধর্মাবতারটি কে—জান? এই শর্মা। আমি—আমিই সেই খলিফা হারুন অল রসিদ—আমার সেই পূর্বপুরুষ আব্বাস—পয়গম্বর হম্মদের আপন চাচা। আমার হুকুমেই আহমদ ওদের তিনজনকে খতম করেছে। আর তুই শয়তানী কিনা বলছিস, আমি হাসান? এত বড়ো স্পর্ধা তোর, স্বয়ং খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে এন্তার মিথ্যে কথা বলা? জানিস, এর সাজা কী? মৃত্যু—মৃত্যুদণ্ড। জল্লাদকে দিয়ে নয়, আজ তোকে আমি নিজের হাতে খুন করবো।

এই বলে ঘরের কোণে রাখা একখানা ছড়ি তুলে নিয়ে সে ছুটে আসে মা-এর দিকে। ঠাই ঠাই করে বসিয়ে দেয় কয়েক ঘা। বৃদ্ধা আর্তনাদ করে ওঠে, ও বাবা গো, মা গো, মেরে ফেললো গো, তোমরা কে কোথায় আছ, বাঁচাও—বাঁচাও!

হাসানের মা-এর চেঁচামেচি চিৎকারে পাড়াপড়শীরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে।

—কী ব্যাপার, কী হয়েছে? একি! হাসান, বুড়ো মাকে ধরে মারছো? ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা!

ওদের একজন ছুটে গিয়ে হাসানের হাতের উদ্যত ছড়িটা কেড়ে নেয়, তোমার মতো অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেকে আঁতুড়ঘরে জহর দিয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিলো। গর্ভধারিণী জননী, তার গায়ে তুমি হাত তোলো? এত বড়ো তোমার স্পর্ধা। সাপের পাঁচ পা দেখেছ? জান না, আমরা পাড়ায় আছি—মেরে একেবারে হাড় মাস আলাদা করে দেব।

হাসান ক্রুদ্ধ নয়নে পড়শীদের দিকে তাকায়, তোমরা কে?

—আমরা? আমরা কে জান না বেশরম। আমরা তোমার মউত। মা-এর গায়ে হাত তোলার মজা এবার টের পাবে। আমরা কে এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি। মোড়লের বাড়িতে আজ সভা ডাকা হচ্ছে। সেখানে তোমার বিচার হবে। আমরা কেউ আর তোমার সঙ্গে বসবাস করবো না। তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে এ দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে তোমাকে। তোমার ছিটিয়ালি এত কাল আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু মা-এর গায়ে হাত দিয়েছ যখন, তখন আর রেয়াত করবো না।

হাসান খুব শান্ত গলায় ভারিক্কি চালে বলে, কার সামনে দাঁড়িয়ে বেয়াদপ বেশরমের মতো এইসব আলতু ফালতু বকে যাচ্ছো, জান? চেন আমি কে?

—খুব চিনি। চিনবো না কেন, তুমি হচ্ছো—টিকিখরা ছিটিয়াল আবু অল হাসান।

—না।

সিংহের মতো গর্জে ওঠে হাসান, আমি খলিফা হারুন অল রসিদ, তামাম আরব দুনিয়ার একচ্ছত্র শাহেন শাহ। আমার পূর্বপুরুষ আব্বাস—পয়গম্বর মহম্মদের নিজের চাচা। তোমাদের এইসব বেতমিজ বদমাইশির সাজা কী ভাবে দিতে হয় তা একটু পরেই দেখবে। সবগুলোর মুখ আমি চিনে রাখলাম। দরবারে গিয়েই আহমদকে হুকুম দেবো। সে তোমাদের সবাইকে ধরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে আমার প্রাসাদের সদর ফটকের সামনে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেবে।

এবার প্রতিবেশীরা একেবারে চুপ হয়ে যায়। হাসানের মা-এর দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, মাথাটা দেখছি একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম রাগের মাথায় আপনাকে মারধোর করছে। কিন্তু তা তো নয়। এ তো বদ্ধ উন্মাদের কাণ্ড। তা, কবে থেকে এরকম হলো?

মা ওদের সকলকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, দিব্যি আমার ভালো ছেলে, রোজ যেমন সন্ধ্যেবেলা মুসাফির মেহমান সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরে, পরশুদিনও সেইরকম একজনকে সে নিয়ে এসেছিলো। লোকটা মশুলের এক সওদাগর। তার

সঙ্গে অনেক রাত অবধি খানাপিনা গল্প গুজব করলো। তারপর সকালবেলায় আমি ঘরে গিয়ে দেখি, দুজনের কেউই নাই। মুসাফির তো সকাল হলে চলে যাবে, সেই রকমই ওয়াদা করে মেহমানকে ঘরে আনা হয়, কিন্তু হাসান কোথায় গেলো? আমি ভাবলাম, লোকটাকে হয়তো কোনও সরাইখানায় পৌঁছে দিতে গেছে। অথবা, ভীষণ খেয়ালী ছেলে তো, কোথায় হয়তো একা একাই টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওসব নিয়ে আমি বেশ চিন্তাভাবনা করি না। কারণ, হাসানের ধাত আমার চেনা। কখন যে ওর কী খেয়াল চেপে ওঠে, কেউ বলতে পারে না। যাই হোক, সন্ধ্যাবেলায় ওর এই ঘরে এসে দেখি, বাছা আমার অকাতরে ঘুমোচ্ছে। এমন কিন্তু সাধারণতঃ হয় না। সকাল দুপুর যেখানে থাকুক, সন্ধ্যাবেলায় সে চাঙ্গা হয়ে একজন পরদেশীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

আমি ভাবলাম, হয়তো সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে শরীরটা ওর ভালো নাই। তাই ঘুমে এলিয়ে পড়েছে। আমি আর ডাকলাম না। আজ সকালেও দুবার দেখে গেছি—একেবারে অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমি আর ঘুম ভাঙ্গালাম না। কিন্তু ভাঙ্গালেই বুঝি ভালো ছিলো।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পর ওর ঘুম ভেঙ্গেছে। আর তার পর থেকেই এইসব আলতু ফালতু বকে যাচ্ছে। আমি যতই বলি তুই স্বপ্ন দেখেছিস। ওসব সত্যি না, সত্যি হতেপারে না, ততই সে ক্ষেপে আগুন হয়ে ওঠে। দোষের মধ্যে, আমি ওকে বোঝাতে গিয়েছিলাম, তুই আমার ছেলে আবু অল হাসান—খলিফা নোস। ব্যস, আর যাই কোথা, লাঠি নিয়ে তেড়ে এসে ঠাই ঠাই করে বসিয়ে দিলো আমার পিঠে! এখন আমার কী উপায় হবে—কী করবো?

প্রতিবেশীরা বলে, কাঁদবেন না, কেঁদে কী করবেন। নসিবে যা লেখা আছে তা তো খণ্ডানো যায় না, হাসানের মা। কিন্তু ছেলে আপনার বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। ওকে ঘরে রাখা নিরাপদ নয়। কখন হয়তো আপনাকে ছুরিই বসিয়ে দেবে, বলা তো যায় না কিছু! তাই বলছি, আর দেরি করবেন না, এক্ষুনি ওকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিন। সেখানে অনেক হেকিমবদ্যি আছে। তারা দাওয়াইপত্র দিয়ে সারিয়ে তুলতেও পারতে পারে। সারুক না সারুক, খুন জখমের ভয়তো থাকবে না, এবং চিকিৎসাও হবে। এখানে ঘরে থাকলে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা ছাড়া উপায় নাই। আর তাতে লাভ কী? চিকিৎসা পত্র তো কিছু হবে না।

মা কাঁদতে কাঁদতে বল লো, তোমরা যা ভালো বোঝ, করো।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো চল্লিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

তখন প্রতিবেশীরা হাসানের হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলে পাগলা-গারদের দিকে। মজা দেখার জন্য রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। কেউ বা এসে দু'চারটে গোত্তা মারে, পাগল না হাতী! হাড়ে হাড়ে বজ্জাৎ—মাকে ধরে মারা হয়েছে? যাও এখন পাগলা-গারদে—ষাঁড়ের চামড়ার ফেটি দিয়ে ফাটিয়ে দেবে পিঠের খাল।

পাগলা-গারদের হেকিম হাসানকে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, মাকে মেরেছিস কেন?

হাসান চুপ করে থাকে।

—চুপ করে থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না, বল্ কেন মেরেছিস?

হেকিম ইশারা করতেই একজন নিগ্রো এগিয়ে আসে ষাঁড়ের চামড়ার ফেটি হাতে নিয়ে। সপাং সপাং করে কয়েক ঘা বসিয়ে দেয় হাসানের পিঠে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে সে।

—বল, কেন মেরেছিস? তোমার পাগলামী আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

আবার কয়েক ঘা এসে পড়ে ওর পিঠে। এবার আর হাসান দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। লুটিয়ে পড়ে যায় মাটিতে। গোঁ গোঁ করে গোঁঙাতে থাকে। কিন্তু নিগ্রোটা এলোপাতাড়ি

পিটিয়েই চলতে থাকে। সারা শরীর ফেটে দর দর করে রক্ত ঝরে। হেকিম বলে, যা এবার গারদে ভরে রাখ, পরে আবার চড়ানো যাবে।

অন্ধকার কয়েকখানার মধ্যে হাতে পায়ে বেড়ি পরানো অবস্থায় পড়ে থাকে মৃতপ্রায় হাসানের দেহটা। তিন দিন তিন রাত্রি আর চৈতন্য ফিরে আসে না। চার দিনের দিন সে চোখ মেলে তাকায়। সারা শরীর ব্যথায় টন টন করছে উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নাই।

প্রহরী এসে টানতে টানতে হাসানকে বাইরে নিয়ে আসে।

—চলো, তোমার মা এসেছে দেখা করতে!

ছেলের শরীরের হাল দেখে মা আর চোখের জল চাপতে পারে না। একি দশা হয়েছে বাবা, তোর?

হাসানও কাঁদে।

—মা, আমারই ভুল হয়েছিলো। স্বপ্নকেই আমি সত্যি বলে ভ্রম করেছিলাম। ঝোঁকের মাথায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে তোমাকে আঘাত করে অপরাধ করেছি। তুমি ক্ষমা করো, মা। এই দোজক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে চলো আমাকে। এখানে থাকলে ওরা আমাকে মারতে মারতেই মেরে ফেলে দেবে। আমি তো পাগল নই মা, তবে কেন, এখানে আমাকে রেখে যাবে? এখানে থাকবো না, হেকিমকে বলে আমার ছুটি করিয়ে বাড়ি নিয়ে চলো। কথা দিচ্ছি, আর কখনও তোমাকে কটু কথা বলবো না। তোমার অবাধ্য হবো না। তুমি আমাকে ঘরে নিয়ে চলো।

হাসানের মায়ের মুখে হাসি ফোটে। আনন্দে সে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বুকে।

আল্লাহর দোয়াতেই তুই ভালো হয়ে গেছিস বাবা। চলো, বাড়ি চলো।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো একচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মা বললো, যা ঘটে গেছে ও-নিয়ে আর চিন্তা ভাবনা করিস নে, বাবা। আমার মনে হয় মণ্ডলের ঐ সওদাগরটাই যত নাটের গুরু। ওর সঙ্গেই শয়তান এসেছিলো সে রাতে। সেই শয়তানটাই ভর করেছিলো তোর ঘাড়ে। যাই হোক, আল্লাহর করুণা, খুব বেশি মারাত্মক ক্ষতি সে করে যেতে পারেনি।

হাসান বলে, তুমি ঠিকই বলেছ মা, শয়তানই ভর করেছিলো আমার ওপর। যাই হোক, তুমি পাগলা-গারদের হেকিমকে বলো, সে যেন আমাকে ছেড়ে দেয়।

হাসানের মা হেকিম সাহেবকে কাছে গিয়ে বললো, আমার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই, হেকিম সাহেব। আপনি ওকে ছেড়ে দিন।

হেকিম বললো, এটা তো ছেলেখেলা করার জায়গা না। নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় নিয়ে যেতে পার।

কিন্তু পরে আবার যদি এখানে রাখার জন্য কান্নাকাটি করো, তখন কিন্তু আমি আর জায়গা দেব না।

হাসানের মা বলে, তার দরকার হবে না, হেকিম সাহেব। ছেলে আমার ভালো হয়ে গেছে।

—বাঃ, তুমিই তো হেকিম হয়ে গেছ, দেখছি! তা হলে আর আমার দরকার কী? ঠিক আছে, নিয়ে যাও, আমি আর রাখবো না ওকে।

মা-এর হাত ধরে কোনও রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে বাড়ি ফিরে আসতে পারে। সারা শরীর ব্যথায় টন টন করছিলো।

মা গরম জল করে হাসানের মারের ক্ষতস্থানে সেঁক দিয়ে মলম লাগিয়ে দেয়। প্রায় একমাস ধরে ওষুধপত্র লাগাতে লাগাতে ঘা-গুলো একদিন শুকিয়ে ওঠে। কিন্তু সেই ষাঁড়ের চামড়ার ফেটির মারের কালসিটে পড়া দাগগুলো আর মিললো না।

এই এক মাসের মধ্যে হাসান বাড়ির বাইরে বেরুতে পারেনি। সুতরাং মুসাফির মেহেমানও কেউ আসেনি ঘরে। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনও কালেই সে মেশে না, তাই একা একা দিন আর তার কাটতে চায় না। মা বললো, যা না, সাঁকোটার ওপর গিয়ে বোস, নিশ্চয়ই আল্লাহ আজ রাতের জন্য কাউকে জুটিয়ে দেবেন।

একমাস পরে আবার এই প্রথম শহর প্রত্যন্তের সেই সাঁকোটার উপর এসে বসে হাসান। সারাদিন শহরের কাজ সেরে সবাই এখন যে যার ঘরে ফিরে যেতে ব্যস্ত। শহরমুখী মানুষ খুবই কম। যারা আসে তাদের বেশির ভাগই এই বাগদাদ শহরের বাসিন্দা। ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে হয়তো গ্রামে গঞ্জে গিয়েছিলো। দিনান্তে তারাই আবার ফিরে আসছে শহরে নিজের ডেরায়। তবে বিদেশী মুসাফির যে একেবারেই আসে না তা নয়। অনেকে হয়তো আরও দূর দেশের যাত্রী। পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা নেমে আসছে দেখে শহরে ঢুকে রাতের জন্য কোনও সরাইখানায় রাত কাটায়। আবার সকাল হলে বেরিয়ে পড়ে। এদেরই একজনকে হাসান তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সে-রাতের মতো সে-ই হয় তার মেহমান—সাথী, তার কথা বলার মানুষ।

বিকেল থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে হাসান। কিন্তু নাঃ, একটি পরদেশী মুসাফিরকেও সে পায় না। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেতে থাকে।

এমন সময় সে দেখলো, সেই মশুলের সওদাগরটা আবার আসছে। হাসান পাশের শস্যক্ষেত্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। লোকটার সঙ্গে সে আর বাক্যালাপ করতে চায় না। তার জীবনের এই নিদারুণ বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ এই সওদাগরটা।

কিন্তু সওদাগর-ছদ্মবেশী খলিফা হাসানকে পাশ কাটিয়ে যান না। তিনি আগে থেকে খোঁজ খবর নিয়ে হাসানের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যই এই পথে এসেছেন আজ।

—ও আবু অল হাসান ভাই।

খলিফা পাশে দাঁড়িয়ে হাসানকে সজাগ করতে চান। কিন্তু যে জেগে ঘুমাচ্ছে তাকে সজাগ করবে কে? হাসান কোনও সাড়াও দেয় না, মুখও ফেরায় না। এবার খলিফা ওর কাঁধে হাত রেখে ঈষৎ চাপ দিয়ে আবার ডাকেন, হাসান ভাইসাব?

হাসান ঝটকা মেরে কাঁধ থেকে খলিফার হাতখানা সরিয়ে দেয়। কিন্তু মুখে কথা বলে না বা ঘাড় ফেরায় না।

—এ কী রকম ব্যবহার হাসান ভাই, সে দিন রাতে এত গল্প কথা হলো। এত আদর যত্ন করলে আর এই ক'টা দিনের মধ্যেই সব ভুলে গেলে? একেবারে চিনতেই পারছো না?

হাসান মুখ না ফিরিয়েই বলে, চিনতে পারবো না কেন? খুব পাচ্ছি। হাড়ে হাড়ে পাচ্ছি। কিন্তু চিনতে আমি চাই না আপনাকে। আপনি যান।

—না, যাবো না, খলিফা হাসতে হাসতে বলেন, আজ রাতে আর একবার তোমার বাড়িতে আমি মেহমান হবো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

হাসান ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, আপনার মতো বেহুদা মানুষের সঙ্গে আমার কোনও কথা থাকতে পারে না। আপনি আমাকে ক্ষান্তি দিন। পথ দেখুন।

খলিফা বলেন, কিন্তু তাতো হবে না, হাসান ভাই। আজকের রাতটা আমি তোমার বাড়িতেই কাটাবো।

—জুলুম নাকি?

—হ্যাঁ, জুলুমই। তবে মহব্বতের জুলুম। একটা রাতের আলাপেই তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

—ভালোবেসে ফেলেছেন? এই তার নমুনা?

হাসান কামিজ তুলে তার পিঠের কালসিটে দাগগুলো দেখায় খলিফাকে।

—ইস্, আহ-হা, এমন দশা কে করেছে তোমার?

—কে করেছে? বলতে লজ্জা করছে না আপনার? সেদিন আপনি শয়তানকে সঙ্গে করে আমার বাসায় ঢুকেছিলেন। সেই শয়তান আমার ঘাড়ে ভর করে বসেছিলো। আর তারই জন্যে পাড়ার লোকে আমাকে পাগল ঠাওরে পাগলা-গারদে ভরে দিয়ে এসেছিলো। এবং সেদিন পাগলা-গারদের জল্লাদ ষাঁড়ের চামড়ার ফেটি দিয়ে আমার পিঠের খাল খিঁচে নিয়েছিলো—এ সেই দাগ। আবার আপনি যেতে চাইছেন আমার বাড়ি! না না, দোহাই আপনার, আপনি আজ অন্য কোথাও যান। আপনি গেলে আবার শয়তান আমার ঘাড়ে ভর করবে। আবার সেই পাগলা-গারদ, আবার সেই ষাঁড়ের চামড়ার চাবুকের ঘা —উফ্, না না, সে আমি ভাবতেও পারবো না। দোহাই আপনার, আপনি চলে যান। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারবো না।

খলিফা হাসানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, আমার জন্য তোমার এত তখলিফ হয়েছে—ভাবতে পারছি না, হাসান ভাই। যাই হোক, আমি তোমার যত দুঃখ তাপেরই কারণ হয়ে থাকি, আর একবার আমাকে নিয়ে চলো তোমার বাড়িতে। যে ক্ষতি সেদিন আমি করেছি তোমার, একটিবার আমাকে সুযোগ দাও, আমি তার খানিকটা পূরণ করে দেব।

হাসান বলে, ক্ষতিপূরণ কী দিয়ে করবেন? এ ক্ষতিপূরণের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আমার নসিবে যা লেখা ছিলো, তাই ঘটেছে। এ নিয়ে আপনার কাছে আমার কোনও নালিশ নাই। শুধু এই অনুরোধ, আপনি আর আমার বাসায় যাবেন না। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

—এ সব তো রাগের কথা, ভাইসাব, না না, তুমি যদি রাগ করে থাক, তবে যে আমার দোজকেও জায়গা হবে না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার একটা সুযোগ দাও। আমি কথা দিচ্ছি, এরপর আর কোনও দিন তোমাকে বিরক্ত করবো না। শুধু আজকের রাতটা নিয়ে চলো। তোমার পুরো কাহিনীটিও শুনবো। এবং আমার দ্বারা যা করা সম্ভব, তাও করবো।

খলিফা হাসানকে বুকের মধ্যেই জড়িয়ে ধরে থাকে।

—আগে বলো, হ্যাঁ, নিয়ে যাবো। তবেই ছাড়বো, নইলে ছাড়বো না।

হাসানের মনটা ঈষৎ নরম হয়। না করতে পারে না। বলে, ঠিক আছে, চলুন। বাসায় গিয়ে আপনাকে বলবো সেই অদ্ভুত কাহিনী।

বাড়িতে আসার পর কিন্তু হাসান একেবারে অন্য মানুষে হয়ে গেলো। আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখলো না। নানারকমের খানা একসঙ্গে বসে খেলোঁ দুজনে। তারপর নিজে হাতে শরাবের পাত্র পূর্ণ করে খলিফার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, এবার আমার সেই কাহিনী শুনুন।

এই সময় রাত্রি ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো তেতাল্লিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

হাসানের মুখ থেকে সব শোনার পর খলিফা বড়ো ব্যথিত হয়ে বলেন, সবই আমার দোষে ঘটেছে ভাইসাব। সেদিন যাবার সময় দরজাটা আমি বন্ধ করে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম। সেই ফাঁকে শয়তানটা ঢুকে পড়েছিলো তোমার ঘরে। যাক, যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে তো দুঃখ করে লাভ নাই। তবে আমি নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে করছি। কী করে এর খেসারত দেওয়া যায় তাই ভাবছি।

হাসান বলে ও-নিয়ে আপনি ভাববেন না। আর খেসারতের কথা তুলছেন কেন? পয়সা কড়ি দিয়ে এর ক্ষতি পূরণ করা যায়? এখন ওসব ভুলে যান তো, ভালো করে মৌজ করুন।

খলিফা জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, হাসান স্বপ্নের মধ্যে খলিফার প্রাসাদে যে মেয়েগুলোকে দেখেছিলে তার মধ্যে সব চেয়ে কোন্‌টি তোমার মনে ধরেছিলো? মানে কাকে দেখে তোমার খুব ভালো লেগেছিলো?

হাসান একটুক্ষণ চিন্তা করে বললো, চুমকী।

খলিফা আর কিছু বললেন না।

হাসানই বললো, মেয়েটির কী রূপ, কী যৌবন, আর কী সুন্দর মিষ্টি করে হাসতে জানে। এখনও ওর সেই হাসি হাসি মুখখানা আমার চোখের সামনে ভাসছে। এতটা বয়স হলো, শাদী করিনি কেন জানেন? কোনও মেয়েকেই বিবি করার যোগ্য মনে হয়নি। মায়ের অনুরোধ এড়াতে না পেরে অনেক মেয়েকেই দেখেছি, কিন্তু কেউই মনের ওপর ছাপ ফেলতে পারেনি।

কিন্তু চুমকীকে দেখা মাত্র আমি মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হলে কী হবে, সে তো অলীক স্বপ্ন মাত্র। তবে এও ঠিক শাদী যদি করতে হয় তবে ঐ মেয়েকেই। জানি না পাবো কিনা, কখনও যদি চুমকীর মতো কোনও মেয়ের দেখা পাই জীবনে, তবে যত টাকাই দেনমোহর দিতে হোক, দিয়ে তাকে আমার বিবি করে আনবো।

পেয়ালা যত নিঃশেষ হয় নেশাও ততো জমতে থাকে। এবং সেই সঙ্গে গাম্ভীর্যের মুখোশও খুলে পড়ে যায়। হৃদয়ের কামনা বাসনার একান্ত গোপন কথাও অবলীলাক্রমে বলতে থাকে হাসান।

—মনে যে বড়ো সাধ ছিলো, চুমকীকে নিয়ে ঘর বাঁধবো। সে হবে আমার মালিনী, আর আমি হবো তার মালঞ্চের মালাকার। কত সুন্দর সুখের হতে পারতো, ভাবুন তো?

খলিফা ঘাড় নাড়েন, তা ঠিক। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার গরমিল আছে বলেই মানুষ অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে উল্কার মতো ছুটে চলে।

নেশায় হাসানের চোখ ছোটো হয়ে আসে। কথা জড়িয়ে যেতে থাকে। এই উপযুক্ত সময়। হাসানের শরাবের পেয়ালায় এক ডেলা আফিঙ ফেলে দেন খলিফা!

পেয়ালাটা এক চুমুকে শেষ করে দেয় হাসান। এর কিছুক্ষণের মধ্যে সে অসাড় হয়ে নেতিয়ে পড়ে যায় গালিচায়।

খলিফার নফররা ইশারার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলো বাড়ির পাশে। দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে হাসানকে কাঁধে তুলে তারা রাস্তায় নেমে পড়ে। এবার খলিফা বেরুবার আগে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দেন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো চুয়াল্লিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ঠিক আগের দিনের মতো হাসানের সাজ-পোশাক খুলে নিয়ে খলিফার নৈশবাস পরানো হয়। তারপর খলিফার নিজস্ব কামরায় পালঙ্ক-শয্যায় শুইয়ে দেয় নফররা।

খলিফা এর আগের দিন প্রাসাদের সকলকে ডেকে ডেকে যে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন আবার সেই নির্দেশ দেন।

—খবরদার, কোনও ভাবেই যেন সে বুঝতে না পারে, সে খলিফা নয়।

জাফর এবং মাসুরুরকেও যথাযোগ্য তালিম দেন তিনি।

—সকাল হতেই তোরা সব হাসানের পালঙ্কের পাশে গিয়ে দাঁড়াবি। তার ঘুম

ভাঙ্গলেই যথাযোগ্য সম্মান মর্যাদায় তাকে সালাম কুর্নিশ করবি। মোটকথা মনে করবি, সেই তোদের খলিফা।

পরদিন ভোরে মাসরুর খলিফাকে জাগিয়ে দিয়েই হাসানের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার অনেক আগে থেকেই সে-ঘরে হাজির ছিলো প্রাসাদের মেয়েরা। বিশেষ করে যে মেয়েগুলো খানাপিনা করিয়েছিলো সেই মেয়েগুলো দাঁড়িয়েছিলো হাসানের একেবারে চোখের সামনে। চোখ খুলতেই যাতে হাসান ওদের সকলকে এক জায়গায় দেখতে পায়। এদের সবার পুরোভাগে দাঁড় করানো হয়েছিলো চুমকীকে।

ওপাশে মঞ্চের ওপর নানারকম তারের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছে আরও একদল সুন্দরী মেয়ে। চুমকী একটা রুমালে খানিকটা ভিনিগার ভিজিয়ে হাসানের নাকে ধরে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসান তিনবার হেঁচে ওঠে। সেই সঙ্গে তার আফিঙের নেশাটা কেটে জল হয়ে যায়।

এবং তখুনি, মেয়েরা বাজনা বাজাতে শুরু করে। বাজনার সুমধুর আওয়াজে খলিফার ঘুম ভাঙ্গানো হয়—প্রতিদিন।

হাসান চোখ মেলে তাকায়। এবং খলিফার শয়নকক্ষের সেই জাঁকজমক প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কে একবার চিৎকার করেই সে থেমে যায়।

সেই সোনার পালঙ্ক, সেই মখমলের শয্যা, সেই আটাশটি সুন্দরী কন্যা, সেই নর্তকী নটীরা—অবিকল সব আবার তার দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠে।

সারা ঘরময় এক অসহনীয় নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। হাসান শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভাবতে ভাবতে শিউরে ওঠে। সর্বনাশ। আবার তাকে পাগলা গারদে ভরবে। আবার সেই নিগ্রো জহ্লাদের চামড়ার চাবুকের কশাঘাত।

—উফ্, না না না, এ হবে না। আমাকে মুক্তি দাও, বাঁচাও বাঁচাও।

তার চিৎকার—আর্তনাদ প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকে।

—ওরে শয়তান, মশুলের সওদাগর, তোর ছলনায় আবার আমি ভুললাম? একবারেও শিক্ষা হলো না আমার? হায় হায়, একি সর্বনাশ হলো। আমি তার কী ক্ষতি করেছিলাম? আল্লাহ যেন মশুলের সব সওদাগরকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। সারা মশুল একদিন ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়ে যেন, আল্লাহ তোমার দরবারে এই আমার একমাত্র আর্জি।

হাসান পরপর অনেক বার চোখ দু'টো খুললো এবং বন্ধ করলো। কিন্তু না, সে স্বপ্ন দেখছে না বা ঘুমিয়েও নাই। আবার সে চিৎকার করে ওঠে, ওহে হাসান, আবার ঘুমিয়ে পড়—সে ঘুম যেন তোমার আর না ভাঙ্গে। শয়তানটা তোমার ঘাড়ে ভর করে আছে। সে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তুমি ঘুমিয়েই থাক।

এই বলে সে আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শোয়।

খলিফা পর্দার আড়ালে বসে হাসানের এই হা-হুতাশ দেখতে থাকলেন।

বেচারা আবু অল হাসান কিন্তু আদৌ ঘুমাতে পারে না। চুমকী ওর শয্যার এক পাশে বসে মধুর করে ডাকে, ধর্মাবতার, নামাজের সময় হয়ে এলো, এবার উঠতে আজ্ঞা হোক।

হাসান মুখের ঢাকা না খুলেই আবার চেঁচিয়ে ওঠে, আল্লাহ এর সাজা দেবেন, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা শয়তানীরা।

কিন্তু চুমকী নিরস্ত হয় না। বলতে থাকে, জাঁহাপনা বোধ করি গত রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে

থাকবেন। আমি তো শয়তান নই, ধর্মাবতার। আমার নাম চুমকী। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে তুলুন, এই প্রার্থনা করি। আমাকে তো আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন জাঁহাপনা, আমি সেই চুমকী।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো পঁয়তাল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

আবু অল হাসান হাতের ঢাকা সরিয়ে চোখ মেলে তাকায়। তার সামনে চুমকী—হ্যাঁ সেই চুমকীই তো বসে আছে। আর ওরা যারা ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তারাও সকলে তার চেনা। শোভা, চুনী পান্না, আরও অনেকে।

হাসান দুহাত দিয়ে চোখ দু'টো, রগড়ায়, কে বাবা, তোমরা? আর আমিই বা কে?

মেয়েগুলো সমস্বরে তাদের নিজের নাম উচ্চারণ করে। তারপর এক সঙ্গে সবাই বলে, আপনি আমাদের প্রভু—ধর্মাবতার খলিফা হারুন অল রসিদ, তামাম আরব দুনিয়ার মালিক।

কী বললে? আমি সেই ছিটিয়াল আবু অল হাসান নই?

মেয়েরা এক সঙ্গে বলে ওঠে, আমাদের ধর্মাবতারের ওপর দুষ্ট শয়তান ভর করেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, সে খতম হোক। আপনি আবু অল হাসান নন—আমাদের পরম পিতা।

হাসান বলে, ঠিক আছে, একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। এই চুমকী—তুমি তো চুমকী? এগিয়ে এগিয়ে এসে আমার এই কানটা কামড়ে ধর দেখি।

চুমকী হাসানের কানের কাছে মুখ এনে এ্যইসা জোরে এক কামড় বসিয়ে দেয় যে, হাসান যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠে বলে, আঃ ছাড় ছাড়। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি, আমি তোমাদের ধর্মাবতার খলিফা হারুন অল রসিদ।

এই সময়ে বাদ্যযন্ত্রে নাচের বোল বেজে ওঠে। এবং মেয়েরা রক্ত নাচানো গান গাইতে শুরু করে।

হাসান আর সহ্য করতে পারে না। সেই মখমলের কুসুমাদপি কোমল শয্যায় তার দেহটা পালঙ্কের এ পাশ থেকে ও পাশ অবধি গড়াগড়ি খেতে থাকে। এমন ভাবে সে হাত পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করে যে, মাথার টুপীটা ছিটকে গিয়ে মেঝের গালিচার ওপর পড়ে। এরপর হাসান তার অঙ্গের মহামূল্যবান সাজপোশাক ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে।

হঠাৎ সে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তখন, বলতে গেলে, সে একেবারে উলঙ্গ। পাগলের মতো ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে গালিচার ওপর। সামনে যে আটাশটি পরমাসুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়েছিলো তারা হাসানের প্রায় উলঙ্গ শরীরটা না দেখার ভান করে পায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আড়-চোখে দেখতে থাকে। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই আবু অল হাসানের। এলো পাতাড়ী নেচে চলে। এবং হো হো হা হা হি হি করে হাসির বন্যায় হাবুডুবু খায়।

খলিফা আর পর্দার আড়ালে চুপ করে থাকতে পারেন না। হাসতে হাসতে তাঁর পেটে খিল ধরে যাওয়ার দাখিল। পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি।

—আবু অল হাসান, আমার ভাই, তুমি আমার মরা মুখ দেখতে চাও। এই তোমার সামনে হাজির হয়েছি আমি মশুলের সওদাগর। এবার এস, তোমার প্রতিশোধ যা নেবার আছে নাও, আমি সানন্দে মাথা পেতে দিচ্ছি।

মুহূর্তের মধ্যে হাসানের তাণ্ডব নৃত্য বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েরা নিজেদের গুটিয়ে নেয় একপাশে। সারা ঘরে নেমে আসে গভীর নিস্তব্ধতা। হাসান ঘাড় ফিরিয়ে খলিফাকে

দেখে চিনতে পারে—এই তো সেই মশুলের সওদাগরটা। সঙ্গে সঙ্গে গত রাতের সব ঘটনা তার চোখের সামনে ছবির মতো ফুটে ওঠে। হাসান গর্জে ওঠে, হুম্, তা হলে এসব তোমারই কারসাজী। এতক্ষণে বুঝলাম। দাঁড়াও, হাতে যখন একবার পেয়েছি, কী করে শিক্ষা দিতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি। বার বার ঘুঘু তুমি ধান খেয়ে যাও, এবার—এবার কোথায় যাবে?

খলিফা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন।

—তুমি আমার চির-জীবনের সাথী—আমার ভাই—আবু আল হাসান। আমার পবিত্র পূর্বপুরুষদের নামে কসম খেয়ে বলছি, তোমার মনের সব কামনা বাসনা, সাধ আহ্লাদ আমি পূরণ করবো। আমার খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য তোমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। ভাই বলে যখন বুকে টেনে নিয়েছি, আশা করি সেসব তুমি অতীতের মিথ্যা দুঃস্বপ্ন বলে ভুলে যাবে ভাই। আজ থেকে তুমি আমার পরিবারের পরমাত্মীয় হয়ে এই প্রাসাদেই থাকবে, হাসান।

এই বলে খলিফা হাসানকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন।

খলিফার নির্দেশে মেয়েরা নতুন জমকালো সাজ-পোশাক এনে হাসানকে পরালো। খলিফা বললেন, বাঃ সুন্দর মানিয়েছে। আচ্ছা এখন বলো, হাসান, কি তোমার অভিপ্রায়। কী পেলে তুমি খুশি হও। আমি তোমাকে সব উজাড় করে দিতে প্রস্তুত ভাই। বল। কোনও দ্বিধা সঙ্কোচ করো না।

হাসান আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ করে বলে, আমি সারাজীবন জাঁহাপনার ছায়ানুগামী এক বান্দা হয়ে থাকতে চাই, ধর্মাবতার।

হাসানের রুচি প্রকৃতি সাধারণ থেকে অনেক উঁচু পর্দায় বাঁধা। খলিফা মুগ্ধ হয়ে বললেন, এই ধরনের নিঃস্বার্থ মহব্বত দোস্তী আমার খুব পছন্দ, হাসান। আজ থেকে তুমি যে শুধু আমার ভাই এবং এক গেলাসের ইয়ার হলে তাই নয়, প্রাসাদের যত্রতত্র, যখন তখন তোমার অবাধ গতিবিধি রইলো। এর জন্য আর কোনও অনুমতির প্রয়োজন হবে না। রাত দু'টোতেও যদি তুমি আমার হারেমের কোনও কামরায় ঢুকতে চাও তাতেও কেউ বাধা দেবে না। দরবার চলাকালেও দরবার-মহলে তুমি ইচ্ছে করলেই ঢুকতে বা বেরুতে পারবে। তার জন্যও কোনও অনুমতির দরকার হবে না। আমার চাচার মেয়ে—আমার পেয়ারের খাস বেগম জুবেদার মহলে অন্য কারো প্রবেশ অধিকার নাই। কিন্তু তাকেও আমি জানিয়ে দেব, এখন থেকে তার মহলে আমি যখন থাকবো, অবাধে তুমি সেখানে যেতে পারবে, এবং তার সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতে পারবে। তোমার সামনে সে বোরখা পরে পর্দানশিন হয়ে চলবে না।

শুধু এই নয়, হাসানের বসবাসের জন্য সুন্দর সাজানো গোছানো প্রাসাদের একটি নিভৃত মহল নির্দিষ্ট করে দিলেন খলিফা। এবং তার অবসর ভাতার প্রথম কিস্তি বাবদ দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা বরাদ্দ করে দিয়ে বললেন, তুমি আমার প্রাসাদে থাকবে আমার সমান মর্যাদায়। সুতরাং আহার বিহার বিন্যাস ব্যসন—কোনও ব্যাপারেই যাতে তোমার কোনও রকম অভাব অসুবিধা না ঘটে, সে সব দেখার দায় আমার রইলো।

এরপর খলিফা দরবারে যাওয়ার উদ্যোগ করতে থাকলেন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো সাতচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আবু অল হাসান মা-র কাছে ছুটে যায়।

—মা, মা, মাগো, আজ তোমাকে কী মজার কথা শোনাবো!

হাসানের আনন্দ আজ ধরে না।

মা অবাক হয়। ভাবে, এ আবার ছেলের কী খেয়াল। হাসান বলতে থাকে, জান মা, যাকে আমরা মশুলের সওদাগর ভেবেছিলাম, আসলে তিনি স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ। সওদাগরের ছদ্মবেশে আমার ঘরে এসেছিলেন। তিনিই আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই হুকুমে প্রাসাদের তাবৎ নারী পুরুষ আমাকে খলিফা বলে সালাম কুর্ণিশ করেছিলো। উজির জাফর আর মাসরুর আমাকে দরবারে নিয়ে গিয়ে মহামান্য ধর্মাবতারের মসনদে খলিফার মর্যাদায় বসিয়ে শাসনদণ্ড হাতে তুলে দিয়েছিলো সেদিন। তোমরা আমাকে সবাই মিলে পাগল বলে পাগলা গারদে দিয়ে এলে। কিন্তু দেখ আমি তো একটাও মিথ্যে বলিনি, মা। খলিফার খেয়াল হয়েছিলো তাই তিনি আমাকে একদিন কা সুলতান বানিয়ে আড়ালে থেকে মজা লুটেছেন। যাই হোক, পাগলা-গারদে আমার মারধোর খাওয়ার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও আহত হয়েছেন। তবে দুঃখ করো না মা—দুঃখের দিন আমাদের শেষ হয়ে গেছে। এবার সুলতানের অনুগ্রহে আমরা দারুণ আনন্দ বিলাসের মধ্যে দিন কাটাবো—সে ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন। আমার জন্য তিনি প্রাসাদের একটা মহল বন্দোবস্ত করেছেন। আজ থেকে আমি প্রাসাদেই থাকবো। তুমি কোন চিন্তা করো না মা, প্রত্যেকদিন এসে তোমাকে আমি দেখে যাবো এখানে।

এই বলে মার কাছে বিদায় নিয়ে হাসান আবার প্রাসাদে ফিরে আসে।

হাসানের প্রতি খলিফার এই বদান্যতা এবং বন্ধুত্বের সমাচার স্বল্প সময়ের মধ্যে সারা সলতানিয়তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। এমন কি আশে পাশের মুলুকেও এই মজাদার মুখরোচক কাহিনী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরতে থাকলো।

এর পর খলিফার সহৃদয় সাহচর্য এবং নির্মল হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়ে হাসানের দিনগুলি মধুর হয়ে উঠতে থাকে। খলিফা আর তাকে নিয়ে উগ্র রসিকতায় মাতেন না কখনও। বলতে গেলে, হাসানই তখন তাঁর দিবারাত্রের একমাত্র সঙ্গী হয়ে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। জুবেদার মহলে, সেখানে খলিফার কোনও ইয়ার দোস্ত কারুরই প্রবেশ অধিকার নাই, হাসানকে সঙ্গে নিয়ে খলিফা সেখানে নির্বিবাদে ঢুকে পড়েন। জুবেদাও আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখে না।

জুবেদা খেয়াল করে, এই হাসান ছেলেটি যখনই খলিফার সঙ্গে এ মহলে আসে, তার একান্ত অনুচর চুমকীবাঁদীর দিকেই সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সর্বক্ষণ। আর চুমকীও এত চঞ্চল ছটফটে মেয়ে—ঠায় বসে থাকে, এক পা নড়ে না। জুবেদার ভুরু কুঁচকে ওঠে, ব্যাপারটা কী, একবার দেখতে হয়।

একদিন জুবেদা খলিফাকে একান্তে পেয়ে বলে, ধর্মাবতার, একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেছেন? আমার মনে হয়, চুমকী আর হাসান প্রেমে পড়েছে। আচ্ছা, ওদের দুটির শাদী দিয়ে দিলে হয় না।

খলিফা বলেন, অসম্ভব কিছুই না। চুমকী পরমাসুন্দরী ডাগর মেয়ে। আর হাসান সেও তো সুঠামসুন্দর স্বাস্থ্যবান নওজোয়ান। মহব্বত হতেই পারে—স্বাভাবিক। এবং আমার বিবেচনায়, এ শাদী দোষেরও কিছু হবে না। কিছুদিন ধরে আমি তোমাকে কথাটা বলবো বলবো করছিলাম, কিন্তু ঠিক মতো সময় পরিবেশ পাচ্ছিলাম না। যাক, আজ কথাটা তুলে ভালোই করেছ। আমার মনে হয়, আর দেরি না করে শুভ কাজ শীঘ্র সমাধা করাই শ্রেয়ঃ।

জুবেদা বললো, সে

তো একশো বার। কিন্তু চুমকীকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি। আপনিও হাসানের মতামতটা একবার যাচাই করে দেখে নিন! যদিও জানি, ওরা পা বাড়িয়েই আছে, তবু এ কর্তব্য করা আমাদের উচিত।

খলিফা বলেন, বাঃ, চমৎকার বলেছ তো, চাচার মেয়ে।

তখুনি চুমকী আর হাসানকে ডাকা হলো সেখানে। জুবেদা চুমকীকে জিজ্ঞেস করে, কীরে, হাসানকে তোর পছন্দ? শাদী করবি ওকে?

মুহূর্তে চুমকীর মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে। লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারে না। একটু পরে সে জুবেদার পা দুখানা জড়িয়ে ধরে।

জুবেদার হাসতে হাসতে বলেন, ধর্মাবতার আমার চুমকী রাজি। এবার আপনি আপনার হাসানকে জিজ্ঞেস করুন।

আবু হাসান বলে, ধর্মাবতার আপনার মহানুভবতার সায়রে আমি নিয়ত অমৃত সুধা পান করছি। কিন্তু এই পরমাসুন্দরী কন্যাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করে ঘরে নিয়ে যাওয়ার আগে, আমাদের মাহামান্য মালকিন বেগমসাহেবা অনুমতি করলে আমি তাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।

জুবেদা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করেন, প্রশ্নটা কি শুনি।

—আমি জানতে চাই, আমার রুচি প্রকৃতির সঙ্গে তার মিল হবে কিনা। আমার বলতে কোনও দ্বিধা নাই, মদ আমার বড়ো প্রিয়, মদে আমি আসক্ত। মাংস খেতে আমি ভীষণ ভালোবাসি। সুমধুর সঙ্গীত এবং কাব্যালোচনা করে পরমানন্দে দিন কাটাতে চাই। যদি চুমকীও এসব পছন্দ করে এবং সহধর্মিনী হয়ে এই বিলাস ব্যসনের সমান ভাগীদার হতে পারে, তবে তাকে গ্রহণ করতে আমার কোনও অমত নাই। কিন্তু এসব যদি সে পছন্দ না করে তবে, আমার এক কথা, সারাজীবন আমি চিরকুমার হয়েই কাটাবো।

জুবেদা খিলখিল করে হেসে চুমকীর দিকে তাকান, কী রে, রাজি? দেখ পারবি তো সামাল দিতে?

চুমকী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

খলিফা তখনি কাজী আর সাক্ষীদের ডেকে পাঠালেন। শাদীনামা লিখে দিলো কাজী। সাক্ষীরা সইসাবুদ করে দিয়ে বিদায় নিলো।

এরপর একমাস ধরে প্রাসাদে আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে যেতে থাকলো। নাচ গান হৈ-হল্লায় মেতে উঠলো প্রাসাদ-পুরবাসীরা। খানা-পিনার মহোৎসব চলতে থাকলো নিত্য। সরাবের নেশায় মৌজ করে গাথা কাব্য সঙ্গীতে মশগুল হয়ে রইলো চুমকী আর হাসান। দু'হাতে দেদার খরচা করে ইয়ার বন্ধুদের তুষ্ট করতে লাগলো ওরা। প্রতিদিন পোলাও বিরিয়ানী মোরগ মোসাল্লাম, কাবাব কোর্মা কোপ্তা প্রভৃতি নানাবিধ দামী দামী খানা এবং মেঠাইমণ্ডা এবং দুষ্প্রাপ্য ফলমূল দিয়ে অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করে চললো।

এইভাবে একদিন ওরা দেখলো, সব সঞ্চিত বিলাস সামগ্রী এবং অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেছে। এদিকে খলিফাও হুকুমতের কাজে নানা ব্যস্ততার মধ্যে থাকার দরুন যথাসময়ে ভাতাও পাঠাতে ভুলে গেছেন।

এইভাবে একসময় ওরা এমন এক দীন দশায় উপনীত হলো, যেদিন ওরা আর পাওনাদারদের সামান্যতম পাওনার টাকাও মেটাতে পারে না।

চুমকী বা হাসান কেউই লজ্জায় জুবেদা অথবা খলিফার কাছে তাদের অভাবের কথা জানাতে পারে না।

হাসান বলে, আমরা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে সব পয়সা-কড়ি দু'হাতে উড়িয়ে

দিলাম। এটা কিন্তু মোটেই উচিত কাজ হয়নি চুমকী। এখন কোনও ক্রমেই পয়সার জন্য আমি খলিফার কাছে হাত পাততে পারবো না। এবং তুমি যে জুবেদা বেগমের কাছে বলবে, তাও আমি পছন্দ করতে পারছি না।

চুমকী বলে, কিন্তু এইভাবে কতদিন চলবে? খলিফা ভীষণ খেয়ালী মানুষ। তাছাড়া এখন তিনি দরবারে জটিল কাজে ফেঁসে আছেন। এ অবস্থায় ভাতার টাকা কবে দেবার হুকুম তিনি দেবেন, কে জানে।

হাসান বলে, আমার মাথায় একটা ফন্দী এসেছে।

—কী ফন্দী।

হাসান বলে, তোমাকে খানিকটা সাহায্য করতে হবে।

—একশো বার করবো, কিন্তু কারো কাছে কর্জ বা ভিক্ষে করতে বলো না। ওটি পারবো না।

—তোমার কী করে মনে হলো চুমকী, তোমাকে আমি অত ছোটো হীন কাজে পাঠাবো। এই সমস্যা কাটাবার একটা সুন্দর মতলব আমি এঁটেছি।

—কী মতলব, বলো না গো।

চুমকী বায়না ধরে।

হাসান বলে, আমরা মরে যাবো।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো-আটচল্লিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চুমকী ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, মরে যাবো? মানে? না, না, খোদা কসম, আমি মরতে-টরতে পারবো না। সে তুমি মরতে হয়, একাই মরগে। ওরে বাবা, না না, আমি মরতে পারবো না। আমি কিছুতেই মরতে পারবো না।

হাসান রাগ করে না। বরং মৃদু হাসতে হাসতে বলে, সারাদিন আমি চিরকুমার থাকতে চেয়েছিলাম কেন, জান? রুচি প্রকৃতি এবং বুদ্ধিতে সমতুল না হলে কোনও মেয়েকে আমি জীবন-সঙ্গিনী করবো না, এই ছিলো আমার পণ। তা তুমি যখন জানালে, আমার সঙ্গে সব দিক থেকেই তোমার মিল হবে, তখনই আমি এ শাদীতে সায় দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের সঙ্গে তোমার বিশেষ কোনও ফারাক নাই। আমার পুরো কথাটা না শুনেই তুমি লাফাতে ঝাঁপাতে শুরু করলে; এ কী ব্যাপার? তোমার কী করে ধারণা হলো, আমরা এই একটা অতি নগণ্য কারণে মৃত্যু বরণ করবো। গোড়াতেই তো বলেছিলাম, সমস্যাটার সুরাহা করার জন্য একটা ফন্দী এঁটেছি. কী সে ফন্দী, তা আগে ভালো করে শোনো! তা না, তার আগেই তুমি তোমার রায় দিয়ে দিলে? আরে, আমি কী তোমাকে সত্যি সত্যিই মরতে বলতে পারি? মরার ঢং করতে হবে। বুঝলে, মরার অভিনয় করে পড়ে থাকতে হবে। ব্যস, আর দেখতে হবে না, তা হলেই দেখবে মোহরে ভরে যাবে ঘর।

চুমকী ভুরু কুঁচকায়। কিছুতেই সে আঁচ করতে পারে না। বলে, কী করে?

হাসান গম্ভীর হয়ে বলে, খুব ভালো করে মন দিয়ে শোনো। আমি মরে পড়ে থাকবো। তুমি একখানা কালো কাপড় দিয়ে আমার সারা শরীর ঢেকে দেবে। এবং ঘরের ঠিক মাঝখানে আমাকে শুইয়ে রাখবে। আমার মুখ ঢাকা দেবে আমার মাথার টুপী দিয়ে। মনে থাকে যেন, মৃতদেহের পা পবিত্র কাবাহর দিকে করে রাখতে হয়। এর পর তুমি তোমার ঢং-এ মরণ-কাঁদা কাঁদতে কাঁদতে কপাল বুক চাপড়াবে, মাথার চুল, অঙ্গের সাজ-পোশাক ছিঁড়তে উদ্যত হবে। তাই বলে সত্যি সত্যিই কিন্তু ছিঁড়ো না তোমার চুল।

তোমার কান্নাকাটির আওয়াজে সবাই ছুটে এসে সমবেদনা জানাবে। এবং তারাই জুবেদা বেগমকে খবর দেবে। তুমিও একটুক্ষণের মধ্যেই কাঁদতে কাঁদতে পাগলিনীর মতো ছুটে যাবে তার কাছে। জুবেদাকে দেখেই তুমি আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে তার পায়ের ওপর—ব্যস, তার পরেই মূর্ছা।

মনে থাকে যেন, যতক্ষণ না তোমার চোখ মুখ গোলাপ জলের ঝাপটা মেরে ধুইয়ে দিচ্ছে ততক্ষণ দাঁত-কপাটি খুলবে না কিছুতেই।

অনেকক্ষণ পরে তুমি যখন একটু সুস্থ হবে সেই সময় জুবেদা বেগম তোমাকে সমবেদনা সান্ত্বনা দিয়ে বলবেন, শোক করো না। মানুষ চিরকাল তো বেঁচে থাকে না। কবে কার দিন ফুরাবে, কে বলতে পারে।

এর পর দেখবে, আমাদের ঘরে টাকার পাহাড় জমে উঠবে!

চুমকী বলে, বাঃ চমৎকার! তা সত্যিই তো, মানুষের মৃত্যুর কথা কিছুতেই বলা যায় না। যে-কোনো কারণেই যে-কোনও মানুষের যখন তখন মৃত্যু হতে পারে। ঠিক আছে। তুমি তা হলে মর, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

চুমকী হাসানকে ন্যাংটো করে কার্পেটের ওপর শোয়ালো। পা দুখানা যাতে মক্কার দিকে থাকে তাও লক্ষ্য রাখলো। মুখখানা ঢেকে দিলো মাথার টুপি দিয়ে।

তারপর কপাল বুক চাপড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সারা প্রাসাদে রটে গেলো হাসান মারা গেছে। চুমকী চুল উস্কোখুস্কো করে আলু-থালু বেশে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো জুবেদার কাছে। জুবেদা তাকে বুকে জড়িয়ে অনেক আদর, করে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন।

কিন্তু চুমকীর কান্না থামে না, আমার আর বেঁচে থাকার সাধ নেই মালকিন, এ জীবন আমি আর রাখবো না।

—ছিঃ, ওকথা বলতে নাই। স্বামী কারো চিরকাল থাকে না। তোমার এই ভরা যৌবন, জীবনের কোনও স্বাদ আহ্লাদই পূরণ হয়নি, এখনই মরবে কেন?

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করে না চুমকী। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদে আর কপাল বুক চাপড়ায়।

চুমকীর দুঃখে হারেমের সব মেয়েরই চোখ জলে ভরে যায়। বেগম জুবেদা তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দশ হাজার দিনারের একটা তোড়া চুমকীর হাতে দিয়ে বলে, যাও, স্বামীর শেষ কাজটুকু ভালো করে সমাধা কর গে। তার আত্মার যেন মঙ্গল হয়।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো ঊনপঞ্চাশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে।

মোহরের থলেটা বগলদাবা করে চুমকী ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাসানকে টেনে তোলে, এই ওঠ ওঠ, বাজিমাত করে দিয়ে এসেছি, এই দ্যাখো।

হাসান থলেটা বুকে জড়িয়ে আনন্দের চোটে চিৎকার করে উঠতে যায় সঙ্গে সঙ্গে চুমকী ওর মুখে পাত পা চাপা দিয়ে বলে, চুপ। এক্কেবারে কোন আওয়াজ তুলবে না। ওরা জানতে পারলে সব মাটি হয়ে যাবে।

হাসান চুমকীকে একটা চুমু খেয়ে বলে, কে বলে তোমার বুদ্ধি কম। এই তো দিব্যি মাথাটা খুলে গেছে, দেখছি।

মোহরগুলো মেঝের ওপর ঢেলে স্তূপাকারে করে ফেলে হাসান। আজ তার কী আনন্দ। উফ্ কত টাকা! কী মজা ফূর্তিই না করা যাবে!

এই বলে কোমরে আর থুতনিতে হাত রেখে পাছা দুলিয়ে মেয়েমানুষের মতো নাচতে থাকে হাসান। হাসির তোড় আর চেপে রাখতে পারে না চুমকী। মুখের মধ্যে রুমাল গুঁজে দেয়। গাল দু'টো টুকটুকে রাঙা হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে।

হাসান কিন্তু একটানা নাচতেই থাকে। চুমকী বলে, তুমি একটা কী! লজ্জা শরমের বালাই নাই?

হাসান অবাক হয়, কেন? লজ্জা শরম হবে কেন?

একখানা মোহর তুলে চুমকী হাসানের নিবিবন্ধ তাক করে ছুঁড়ে মারে, বে-শরম কাহিকা।

হাসান সশব্দে হেসে ওঠে, অ, এই কথা। তা ঘরে তো তুমি ছাড়া আর কেউ নাই, বিবিজান।

—তা হোক। তুমি ইজার পর।

এই কথায় হাসান ভীষণ উত্তেজিত বোধ করে। ছুটে গিয়ে সে চুমকীর পলকা দেহখানা দু'হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে ধরে গভীর আশ্লেষে এক দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দেয় ওর পাকা আঙুরের মতো টসটসে অধরে। চুমকীও দু'হাতে জড়িয়ে ধরে থাকে হাসানের গলাটা।

হাসান অনেক অনেকক্ষণ ধরে আদর সোহাগ করতে থাকে চুমকীকে। চুমকীও এলিয়ে পড়ে থাকার পাত্রী নয়। সে যেমন নিতে জানে, তেমনি দিতে জানে উজাড় করে। হাসান এক সময় বলে, কিন্তু প্রিয়তমা, এখানেই তো খেলার ইতি নয়। এবার তোমার পালা। তোমাকে মরতে হবে।

চুমকী বীরাঙ্গনার মতো দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কী দেখাও ভয়। ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়?

চুমকীর মুখে হাত চাপা দেয় হাসান, আস্তে। শুনতে পাবে।

চুমকী জিভ কাটে। হাসান বলে, শোনো,তুমি জুবেদার কাছ থেকে যেমন দশ হাজার দিনার বাগিয়ে আনলে আমিও তেমনি, দেখে নিও, খলিফাকে বোকা বানিয়ে কেমন মালকড়ি বের করে নিয়ে আসি। খলিফা ভাবেন, তিনিই সবচেয়ে চালাক এ দুনিয়ার। কিন্তু দেখো, চালাকেরও বাবা আছে, তা আমি ধর্মাবতারকে এবার দেখিয়ে দিচ্ছি।

হাসান বলে, আচ্ছা আর আদর সোহাগ নিয়ে থাকলে চলবে না। তুমি এখন মর।

চুমকীকে একইভাবে বিবস্ত্রা করে হাসান ওকে ঘরের ঠিক মাঝখানে মক্কার দিকে পা করে শুইয়ে কালো একখানা কাপড়ে ঢেকে দিলো। বললো, খুব সাবধানে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে, ছাড়বে। যেন কেউ বুঝতে না পারে, বুঝলে?

মাথার টুপি খুলে ফেলে হাসান। চুল উস্কো খুস্কো করে। চোখে পেঁয়াজের রস লাগায়। গভীর দুঃখে কপাল বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সে ছুটে যায় খলিফার হারুন অল রসিদের দরবারে। খলিফা তখন উজির, জাফর, আমির, অমাত্য এবং সভাসদদের নিয়ে দরবারে বসে হুকুমতের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

হাসানকে ঐভাবে ঢুকতে দেখে খলিফা আশঙ্কিত হয়ে মসনদ ছেড়ে ছুটে আসেন ওর কাছে।

—কী? কী হয়েছে হাসান? তোমার চেহারা এমন দেখছি কেন? কী হয়েছে, বল। তোমার চোখে পানি কেন?

কিন্তু হাসান খলিফার কথার জবাব দিতে পারে না। এবার সে চিৎকার করে কেঁদে আছাড় খেয়ে পড়ে খলিফার পায়ের উপর।

—চুমকী—আমার পেয়ারের চুমকী, কোথায় গেলে তুমি—

খলিফা কিছুই আঁচ করতে পারেন না, কী হয়েছে হাসান? চুমকী কোথায় গেছে? সে প্রাসাদে নাই?

—আছে।। আমার ঘরেই সে শুয়ে আছে। কিন্তু—কিন্তু—

আর বলতে পারে না হাসান। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে ওর কণ্ঠ।

খলিফা বুঝলেন, চুমকী দেহ রেখেছে। রুমালে চোখ মুছলেন তিনি।

—ওঠ ভাই, শোক করে কী করবে? খোদা যাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন, তার জন্যে শোক করতে নাই। নিজেকে শক্ত করো হাসান। তার আত্মার কল্যাণ কামনা কর। চুমকী আমাদের সবচেয়ে আদরের বাঁদী ছিলো। তাই তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সুখে থাকবে সে। এর চেয়ে বেশি সুখ আর কোথায় পাবে সে?

খলিফা আবার চোখের জল মুছলেন রুমালে। জাফর এবং অন্যান্য আমির অমাত্যরাও চোখ মুছলো। খলিফা খাজাঞ্চীকে বললো, হাসানকে দশ হাজার দিনার দিয়ে দাও।

হাসানের দিকে তাকিয়ে বললেন, চুমকীর শেষ কাজ খুব ভালো করে সমাধা ক'রো ভাই। আমরা বড় ভালোবাসতাম ওকে।

হাসান মোহরের থলে হাতে করে ঘরে ফিরে এসে চুমকীকে ডেকে তোলে। ওঠ ওঠ, শিগ্গির ওঠ। দেখো শুধু তুমিই না, আমিও খলিফাকে বোকা বানিয়ে কী মাল নিয়ে এসেছি।

থলেটা উপুড় করে ফেলে দিলো মেঝেয়। মোহরে মোহরে পাহাড় জমে উঠলো।

হাসান চুমকীকে আদর সোহাগ করতে করতে বলে, তা তো হলো, কিন্তু এর পরের ব্যাপারটা ভেবে দেখেছো? জুবেদা বেগম আর খলিফা দুজনে যখন জানবেন, আমরা তাদের ধোঁকা দিয়ে টাকা নিয়ে এনেছি, তখন অবস্থাটাই বা কী দাঁড়াবে একবার চিন্তা করো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো পঞ্চাশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সেদিন খলিফা দরবারের কাজ কাম সংক্ষিপ্ত করে মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে জুবেদার কাছে চলে এলেন। চুমকীর শোকে তাঁর হৃদয় মথিত হচ্ছিল। তাই তিনি জুবেদার কাছে এলেন নিজেকে শান্ত করতে এবং জুবেদাকে সান্ত্বনা দিতে। বেগমসাহেবার ঘরে ঢুকতেই তিনি দেখলেন, জুবেদা অঝোর নয়নে জল ফেলছে। আর হারেমের বাঁদীরা তাকে ঘিরে বসে আছে। কেউ বা তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

বড়োই করুণ দৃশ্য!

খলিফা জুবেদার শয্যাপাশে এসে দাঁড়াল।

—চাচার মেয়ে, চুমকী তোমার কী যে আদরের ছিলো তা তো আমি জানি। তার ইন্তেকালে তোমার চেয়ে আর বেশি করে কার বাজবে বলো?

জুবেদা সবে হাসানের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে খলিফাকে সান্ত্বনা জানাতে যাবেন,

সেই মুহূর্তে খলিফার মুখে একি কথা শুনলেন তিনি। নিজের কানকেই তিনি বিশ্বাস করতে পারে না।

জুবেদা বলেন, চুমকী দীর্ঘজীবি হোক, ধর্মাবতার। আমি চোখের পানি ফেলছি, আপনার দুঃখে। হাসান আপনার প্রাণের বন্ধু, ভাতৃপ্রতিম ছিলো। ওর মতো ভালো ছেলে বড়ো একটা দেখি না। তার শোকে আপনি বড়োই কাতর হয়েছেন, বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করবেন বলুন, মানুষের আয়ু সদাই টলমল করে। কখন যে কে টুপ করে ঝরে পড়বে, কেউ বলতে পারে না।

এই নিদারুণ এক শোকাবহ মুহূর্তেও জুবেদা কেন রঙ্গ তামাশায় মশগুল হয়ে আছে, খলিফা কিছুই বুঝতে পারেন না। তবে কী বেগমসাহেবা এখনও হাসানের মৃত্যু সংবাদ জানে না? এত দুঃখেও খলিফা বেদনার হাসি হাসেন। মাসরুরকে ডেকে বলেন, মাসরুর, তোর মালকিনকে একবার বুঝিয়ে বল, কী ঘটেছে। আমার মনে হচ্ছে ওর মেজাজটা ঠিক নাই, তাই চুমকীর মৃত্যুর সঙ্গে হাসানের মৃত্যু মিলিয়ে ফেলেছে। আমি এলাম তাকে সান্ত্বনা জানাতে। আর সে কিনা আমাকে একটা আজগুবি মিথ্যে খবর শুনিয়ে দুঃখ দিতে চাইছে। তুই নিজের চোখেই সব দেখেছিস? হাসান আমার কাছে কী ভাবে এলো, এবং কী দুঃসংবাদ দিয়ে গেলো, তোর মালকিনকে খুলে বল সব ঘটনা। আমার মনে হয় এরপর আর সে আমাদের বোকা বানাতে চেষ্টা করবে না।

মাসরুর তখন জুবেদাকে উদ্দেশ্য করে বলে, বেগমসাহেবা, ধর্মাবতার যথার্থই কথা বলেছেন। আজ সকালে আবু হাসান কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে এলো। তার রুক্ষ্ম চুল, বেশবাশ ছিন্নভিন্ন, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়ে গিয়েছিলো। কাঁদতে কাঁদতে তিনি ধর্মাবতারের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। খাবারের বিষক্রিয়ায় গত রাতে তার বিবি চুমকী দেহ রেখেছেন। তার দুঃখে ধর্মাবতার তো ব্যথিত হলেনই, দরবারের কেউই অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

এরপর ধর্মাবতার তার বিবির সৎকারের জন্য দশ হাজার দিনার দিয়ে দিতে বললেন খাজাঞ্চীকে।

মাসরুরের এই কথাতে কোনও ফল হলো না। বরং জুবেদা ভাবলেন খলিফার রঙ্গ রসিকতা করার হাজার ছলের এ-ও একটা ছল মাত্র। সুতরাং মাসরুরের বক্তব্যের একটি বর্ণও তিনি বিশ্বাস করলেন না। ভাবলেন, সবটাই খলিফার শেখানো বুলি।

জুবেদা ক্ষুব্ধ স্বরে নালিশ জানাল, আজকের দিনেও কি আপনি এই রকম রসিকতাগুলো মেহেরবানি করে বন্ধ রাখতে পারেন না, জাঁহাপনা! আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তবে আমার কোষাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, হাসানের সৎকারের জন্য সে কত টাকা বের করে চুমকীর হাতে দিয়েছে। আমার মনে হয়, এখানে বসে এই রকম হৃদয়হীন নির্মম রঙ্গ রসিকতায় না মেতে আপনার প্রাণের বন্ধুর মৃতদেহের পাশে উপস্থিত থেকে তার শেষকৃত্য সম্পাদন করানোর কাজে ব্যাপৃত থাকলে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করা হতো।

খলিফা এবার ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন, এসব কী যা তা বলছো, চাচার মেয়ে? খোদা হাফেজ, আমার ...আমার...আমার মনে হচ্ছে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বলছি—চুমকী মারা গেছে কাল রাতে। এর মধ্যে যুক্তি তর্কের আর কোনও অবকাশ নাই। এক্ষুনি হাতে নাতে তা প্রমাণ করে দিচ্ছি।

খলিফা সেখানেই 'দিবানের' ওপর বসে পড়ে মাসরুরকে বললেন, যা এক্ষুনি আবু অল হাসানের কামরায় যা। নিজের চোখে দেখে আয়, যদিও তার কোনও দরকার নাই। দুজনের কে মারা গেছে?

মাসরুর চলে গেলে খলিফা জুবেদাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এক্ষুনি প্রমাণ হয়ে

যাবে, কার কথা ঠিক। কিন্তু তুমি তোমার সেই বরাবরের গোঁ-টা ছাড়তে পারলে না। আমি নিশ্চিত জানি, তুমি ডাহা ভুল করেছ। এখনও যদি চাও আমি তোমার সঙ্গে বাজী লড়তে পারি।

—ঠিক আছে, বাজীই রইলো, জুবেদা কঠিন কণ্ঠে বলে, আমি যদি হারি তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় তসবির মহলটা চিরকালের মতো দিয়ে দেব আপনাকে।

খলিফা বললো, প্রাণাধিক প্রিয় 'রঙমহল' প্রাসাদটি বাজি ধরলাম আমি। যদি আমি হারি, যা একেবারেই অসম্ভব, তবে তোমাকে বিনাশর্তে চিরকালের মতো ঐ রঙমহলের মালিকানা লিখে দিয়ে দেবো। এবং এটা তো মানো যে, তোমার ঐ তসবির-মহলের চেয়ে অনেক বেশি দামি আমার ঐ রঙমহল।

জুবেদা বেশ বিরক্ত ভাবেই বললো, থাক থাক ধর্মাবতার, এ নিয়ে আর আপনার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করতে চাইনে। তসবির-মহলের প্রকৃত মূল্য এবং মর্ম যাঁরা বোঝেন, তাঁদের কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, কী তার দাম এবং নাম। আপনার সামনে যারা বলে, আপনার রঙমহলই সবার সেরা—সব চেয়ে দামী, তারাই আবার আপনার আড়ালে গিয়ে অন্য জায়গায় আমার তসবিরমহলের গুণগান করে। বলে, এর চেয়ে মূল্যবান বস্তু তামাম দুনিয়ায় কিছু নাই। আপনি যদি প্রমাণ চান, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। তা হলে আসুন আমরা পবিত্র 'ফতিয়াহ' পাঠ করে শপথ নিই।

খলিফা বললে, ঠিক আছে, এই তো কোরান সামনেই আছে, এস তাহলে পাঠ করি।

এরপর দুজনেই কোরান পাঠ করে শপথ করেন। তারপর মাসরুরের আশায় বসে থাকেন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো একান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আবু অল হাসান জানলা দিয়ে দেখতে পেল মাসরুর আসছে। বুঝতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না, কেন তার এই আগমন? চুমকীকে বললো, বিবিজান, বিপদ আসন্ন। মাসরুর আসছে। আমার মনে হচ্ছে, বেগম আর খলিফার মধ্যে তর্ক বেধেছে—আমাদের 'মৃত্যু' নিয়ে। আগে আমি খলিফাকেই জেতাবো। সুতরাং আর দেরি নয়, যাও, মক্কার দিকে পা করে মড়ার মতো শুয়ে থাকো। আমি কালো কাপড়ে তোমাকে ঢেকে দিচ্ছি।

চুমকীর 'শব'দেহে কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে মাথার টুপী খুলে ফেলে হাসান। চোখে পেঁয়াজ ঘষে নেয়। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

মাসরুর ঘরে ঢুকে চুমকীর মৃতদেহ দেখে মাথার টুপী খুলে হাতে নিয়ে শোকাহত হাসানের পাশে এগিয়ে যায়।

—সবই তাঁর ইচ্ছা মালিক। তার জিনিস তিনি ফেরত নিয়ে গেলেন। এ নিয়ে শোক করে আমরা কী করতে পারি। এখন একমাত্র তাঁকেই ভরসা করে সান্ত্বনা লাভ করুন, এ ছাড়া কী বা বলতে পারি আমরা। যাক্ শেষ কাজ করুন, আমি চলি।

মাসরুর দ্রুত পায়ে জুবেদার মহলে ফিরে আসে।

—কী সংবাদ মাসরুর?

জুবেদা উন্মুখ হয়ে জিজ্ঞেস করে।

মাসরুর কুর্নিশ জানিয়ে বলে, বেগমসাহেবা, অপরাধ নেবেন না, ধর্মাবতারের কথাই ঠিক। গতকাল রাতে হাসানের বিবি চুমকী মালকিনই মারা গেছেন।

খলিফার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিজয় গর্বের হাসি হেসে বলেন, কী, হলো তো?

এবার? এবার তো তোমার তসবির মহল হাতছাড়া হয়ে গেলো, চাচার মেয়ে। তাহলে আর দেরি কেন, পেশকারকে ডেকে আমার নামে দানপত্রটা লিখে দাও।

জুবেদা ক্রোধে ফেটে পড়েন, এই মিথ্যুকটার কথায় কী বিশ্বাস? আপনার মনোরঞ্জনের জন্য ও পারে না এমন কোনও কাজ দুনিয়ায় নাই। আমি ওকে বিশ্বাস করি না। এরপর থেকে ওকে আর আমার হারেমেই ঢুকতে দেব না, শয়তান কোথাকার! একেবারে চোখে মুখে মিথ্যার খই ফোটায়! যা ভাগ, আমার সামনে থেকে।

এই বলে জুবেদা তাঁর পায়ের চটি ছুঁড়ে মারলেন মাসরুরের দিকে।

মাসরুর থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে যায়। বেগমসাহেবা এখন আগুন হয়েছেন। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক এ সময় আর কোনও কথা বোঝাতে যাওয়া নিরাপদ হবে না।

জুবেদা উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, ধর্মাবতার, আপনার তাঁবেদার ঐ মাসরুরের কোনও কথা আমি বিশ্বাস করলাম না। এখন আমি আমার কোনও বাঁদীকে পাঠাচ্ছি। সে-ও যদি দেখে এসে একই কথা বলে, তবে আপনি যা বলবেন, আমি মেনে নেব।

খলিফা দেখলেন জুবেদা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানিয়ে বললেন, তাই হোক। তোমার লোককেই পাঠাও।

জুবেদা তার একান্ত অনুরক্ত এক বৃদ্ধা ধাইকে ডেকে বললো, যাও তো ধাইমা, তুমি নিজের চোখে দেখে এস, হাসান, না চুমকী-কে মারা গেছে কাল রাতে।

বৃদ্ধা চলে গেলো।

আবু হাসান আশঙ্কা করেই অপেক্ষা করছিলো। এর পরে আবার নিশ্চয়ই কেউ আসবে তদন্ত করতে। বৃদ্ধাকে আসতে দেখে সে চুমকীকে বললো, বিবিজান, সাবধান। দূত আসছে। এবার আমি মরলাম।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো বাহান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

হাসান ঝটপট ঘরের মাঝখানে মক্কার দিকে পা করে শুয়ে পড়লো। চুমকী হাসানের মুখে টুপীটা রেখে দেহটা একখানা কালো কাপড়ে ঢেকে দিলো। নিজের চুলগুলো পাগলীর মতো এলোমেলো করে কপাল বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলো।

বৃদ্ধা ধাই ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। তারপর চুমকীর পাশে এসে দাঁড়ায়, কেঁদ না মা, কেঁদ না। কেঁদে আর কী করবে? হাসান আজ তোমাকে ছেড়ে চলে গেলো, তোমার এই কচি বয়েস, এখন বিধবা জীবন কাটাবে কী করে, মা?

এরপর বৃদ্ধা ফিরে যাবার উদ্যোগ করে বলে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, মা। বেগম জুবেদাকে খবর দিতে হবে। কি কাণ্ড বলো! ঐ মাসরুর মিথ্যুকটা এখান থেকে গিয়ে বলেছে, সে নাকি নিজের চোখে দেখে গেছে তুমি মরে গেছ।

চুমকী বলে, মাসরুর বোধহয় খুব মিথ্যে বলেনি, ধাইমা। কারণ কাঁদতে কাঁদতে মাঝে মাঝেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছি। হয়তো মাসরুর যখন এসেছিলো আমি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়েছিলাম।

এই বলে চুমকী আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। বৃদ্ধা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, চুমু খায়, সান্ত্বনা দেয়। দুঃখ করো না, মা। নসীবে যা আছে তা এড়াবে কী করে?

এরপর আর দাঁড়ালো না সে।

বৃদ্ধা এক এক করে সব ঘটনার বিবরণ দিলো। এবং সে যে চুমকীর দুঃখে বিশেষ কাতর হয়ে পড়েছে—সে কথাও জানালো বেগম জুবেদা এবং খলিফার সামনে।

এবার জুবেদা খলিফার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকান, কী তোমার সেই সত্যবাদী সাগরেদ মাসরুরটা গেলো কোথায়? ডাকো তাকে। জবাব দিক এর। হাড়ে হাড়ে শয়তান, কুত্তার বাচ্চা!

খলিফা মাসরুরকে ডাকলেন।

—কী রে হতভাগা, এত বড়ো মিথ্যে কথা বললি কেন? কী ব্যাপার? তোর জন্য আমিও মিথ্যেবাদী হয়ে গেলাম বেগম জুবেদার কাছে।

জুবেদা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে, ধাইমা, এই কুত্তার বাচ্চাটাকে বলো তো, কী তুমি দেখে এসেছো?

বৃদ্ধা যা দেখে এসেছে, তার বিবরণ আবার শোনালো তাকে।

মাসরুর তো রেগে কাঁই। জুবেদা বা খলিফা যে সামনে আছেন, সে কথা সে বিস্মৃত হয়ে চিৎকার করে ওঠে, ফোকলামুখী বুড়ি, এত বড়ো ডাহা মিথ্যে কথাটা বলতে তোমার একটুও মুখে বাধলো না। তুমি কী বলতে চাও, সেই হতভাগী চুমকীর লাশটা আমি স্বচক্ষে দেখে আসিনি?

বৃদ্ধার চোখে এবার আগুন জ্বলে ওঠে। মনে হলো, তখুনি বুঝি ভস্ম করে দেবে মাসরুরকে।

—তোমার মতো মিথ্যেবাদী ত্রিভুবনে দুটি নাই। ফাঁসীতে ঝোলালেও যোগ্য সাজা হয় না, টুকরো টুকরো কেটে তোমার মাংস কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো উচিত।

—চুপ কর ডাইনী বুড়ি। ঐ সব গাঁজাখুরী গল্প তোমার লাজুক মেয়েদের গিয়ে শোনাও গে!

মাসরুরের এই ঔদ্ধত্যে জুবেদা নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে খলিফাকে বললেন, আপনার এই মিথ্যের জাহাজ সাগরেদটিকে শায়েস্তা করুন। ধর্মাবতার, তা না হলে আমি হত্যে দেবো।

খলিফা বললেন, খোদা হাফেজ, মাসরুরু একা মিথ্যেবাদী হতে যাবে কেন? তা হলে আমিও মিথ্যুক। তোমার ধাইও মিথ্যুক। এবং তুমিও মিথ্যেবাদী।

এরপর আর একটিও কথা বললেন না খলিফা। মাথা নীচু করে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর এক সময় মাথা তুলে বললেন, ব্যাপারটা জটিল বলে মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে অন্য কারো ওপর আর ভরসা করা যায় না। চলো, আমরা দুজনে গিয়ে নিজের চোখে যাচাই করে দেখে আসি।

জুবেদা বললো, সেই ভালো, চলুন আমরাই দেখে আসি।

খলিফা এবং জুবেদা, মাসরুর, বৃদ্ধা ধাই ও হারেমের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে করে আবু অল হাসানের বাসার দিকে এগিয়ে চলেন।

আবু অল হাসান আগেই ভেবে রেখেছিলো, ব্যাপারটা অত সহজে মিটবে না। আরও গুরুতর কিছুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলো সে।

সুলতান এবং জুবেদার বিশাল বাহিনী তাদের কামরার দিকে ধাবমান দেখে চুমকী হাসানকে বলে, কতবার আর চালাকী করে পার পাবে, সোনা এবার? এবার কী করবে? ঐ ওঁরা দুজনেই আসছেন।

হাসান কিন্তু হাসে। বলে, এসো, এবার আমরা দুজনেই মরবো।

খলিফা এবং জুবেদা দুজনে হাসানের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। পাশাপাশি দুটি মৃতদেহ দেখে দুজনেই শিউরে ওঠেন। অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনও কথা সরে না।

এমন সময় আর একটি কাণ্ড ঘটে। এই নিদারুণ মর্মান্তিক শোকাবহ দৃশ্য দেখে বেগম জুবেদা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। মূর্ছিত হয়ে তাঁর এক বাঁদীর কাঁধে ঢলে পড়েন। অন্য মেয়েরা তাঁর মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পান জুবেদা। হায় হায় করতে করতে বলেন, চুমকী, তোমার মহব্বতের নজির নাই। স্বামীর শোক সইতে না পেরে সতীসাধ্বী চুমকী আমার, দেহত্যাগ করেছে। ও আমাকে তখনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলো, হাসান ছাড়া আমার জীবনে বাঁচার আর কোনও মানে নাই, বেগম সাহেবা। আমি আর বাঁচতে চাই না। তা মুখে যা বললো, কাজেও তাই করলো চুমকী? ইয়া আল্লাহ! এ তোমার কী নিষ্ঠুর লীলা!

খলিফা বাধা দিয়ে বলেন, তুমি ভুল করছো, চাচার মেয়ে। শোকে তাপে দগ্ধ হয়ে চুমকী মরেনি, মরেছে আমার পেয়ারের দোস্ত হাসান। চুমকীকে সে জান দিয়ে ভালোবাসতো। নিজের জীবন দিয়ে সেই কথাই সে আজ প্রমাণ করে গেলো। আল্লাহ ওর আত্মার মঙ্গল করুন। বেগমসাহেবা, তুমি ভাবছো, মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলে বলেই লোকে তোমার কথা বিশ্বাস করবে? বলবে, তোমার কথাই ঠিক?

জুবেদা বলে, না। আপনার একটা মিথ্যের জাসু নফর আছে বলেই আপনার সব মিথ্যে কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করবে তারা!

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো তিপ্পান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

—কিন্তু আবু অল হাসানের চাকররা সব গেলো কোথায়? জুবেদা জানতে চাইলেন।

—ওদের ডাকুন, ওরাই বলতে পারবে—আসল ঘটনা। কে আগে মরেছে, কে পরে মরেছে, ওরা ছাড়া আর জানার উপায় কী?

তুমি ঠিক বলেছ, চাচার মেয়ে, খলিফা চেঁচিয়ে বলেন, কই, কে আছ, কে বলতে পারবে, কে আগে মরেছে। আর কে বা শোকে কাতর হয়ে পরে মারা গেছে? যে বলতে পারবে তাকে আমি এখুনি নগদ দশ হাজার দিনার বখশিশ দেব।

ঘরের অভ্যন্তর থেকে এক অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো, আমাকে দিন ঐ দশ হাজার। আমি বলে দেব সত্যি ঘটনা। আমি, ধর্মাবতার, আমি আবু অল হাসান চুমকীর শোকে কাতর হয়ে মরে গিয়েছিলাম।

এই কথা শোনামাত্র জুবেদা এবং তার মেয়েরা ভয়ে আর্তনাদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে। কিন্তু খলিফা বুঝতে পারেন এ সবই হাসানের অভিনব চাতুরী। অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন তিনি।

—হো হো, হা হা, হি হি, ওরে বাবা, ও , হাসান ভাই, আমি যে হাসতে হাসতে মরে যাবো। একি মজাদার রঙ্গ তুমি বানিয়েছ। ওঃ হো হো, আর পারি না হাসতে। ওরে বাবারে!

হাসতে হাসতে খলিফার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। এতক্ষণে জুবেদা বুঝতে পারেন, আসলে পুরো ব্যাপারটাই তামাশা। ভয় আতঙ্ক কেটে যায়। হাসান এবং চুমকী উঠে দাঁড়ায়। তাদের এই অভিনব ফন্দীর কাহিনী সব খুলে বলে খলিফার পায়ে লুটিয়ে পড়ে হাসান। আর চুমকী জড়িয়ে ধরে জুবেদার পা।

খলিফা প্রসন্ন চিত্তে মার্জনা করে হাসানকে। জুবেদাও হাসতে হাসতে চুমকীকে বলেন, ভীষণ দুষ্টুমী করেছ। যাও, এবারের মতো মাফ করে দিলাম।

খলিফা খুশি হয়ে হাসানকে দশ হাজার এবং চুমকীকে দশ হাজার দিনার বখশিশ দিলেন। এবং জাফরকে বলে দিলেন, জাফর, আমার হয়তো সব সময় খেয়াল থাকে না। তুমি প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে এদের ভাতার টাকাটা পৌঁছে দিও হাসানের ঘরে।

এর পর ওরা দুজনে সেই প্রাসাদ পরিবেশে সুখ বিলাসের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছিলো সারাটা জীবন।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ সুলতান শাহরিয়ারের দিকে তাকায়। শাহরিয়ার বলে, এর পর প্রেমের একটা ছোট কিস্‌সা শোনাও শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ বলে, তা হলে জাইন মাওয়াসিফের মহম্মতের কিস্‌সা শুনুন।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

অনেক কাল আগের কাহিনী।

এ কাহিনীর নায়ক এক সুঠাম সুন্দর প্রিয়দর্শন যুবক। তার নাম আনিস। উত্তরাধিকার সূত্রে সে ধনবান্ দয়ালু নম্র স্বভাব শিক্ষিত, মার্জিত রুচি এবং সদ্বংশ জাত। তার মতো সদা-প্রফুল্ল নওজোয়ান সে সময়ে বিরল ছিলো। দুনিয়ার কোনও কিছুর মধ্যেই সে অসুন্দর কিছু খুঁজে পেত না। যা দেখতো, যা শুনতো সবই তার কাছে অপরূপ মনে হতো। সঙ্গীত, কাব্য, সুগন্ধী প্রসাধন, নারীসঙ্গ, ইয়ার দোস্ত, হৈ-হল্লা, আনন্দ সবই তার কাছে খুব ভালো লাগতো। সবুজ ঘাস, কাশবন, জলকল্লোল—সবই তাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করতো।

এইভাবে দিন কাটছিলো।

একদিন সে এক বাগানে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় একা একা শুয়ে নিদ্রামগ্ন ছিলো। এমন সময় সে স্বপ্নের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলো চারটি সুন্দর রঙিন চিড়িয়া এবং একটি ঘুঘুর সঙ্গে সে খেলায় মেতেছে। ওদের সবাইকে নিয়ে খুব আদর সোহাগ করছে সে। কখনও বা বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। হঠাৎ সে দেখলো, একটা কালো কাক ছোঁ মেরে নেমে এসে তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে ঘুঘুটার ঘাড়টা খামচা ধরে শোঁ করে শূন্যে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গেলো। ঘটনাটা পলকের মধ্যে এমনই আচমকাভাবে ঘটে গেলো যে, আনিস ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো শুধু। কিছুই করতে পারলো না—করার কিছু সাধ্যও ছিলো না।

দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে ঘুম ভাঙ্গে ওর। সেই বাগানের মধ্যে গাছের তলায় বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে থাকলো। কিন্তু স্বপ্নের কোনও যুক্তিবহ অর্থোদ্ধার করতে পারলো না। কিন্তু কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণা তখন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, —মানে তাকে জানতেই হবে।

গ্রামের পথ ধরে অনেক দূরে চলে গেলো। কিন্তু এমন কাউকেই পেলো না, যে ওকে স্বপ্নের অর্থ বলে দিতে পারে। হতাশ মনে ঘরে ফিরে আসছিলো, এমন সময় সুন্দর একখানি চকমিলান বাড়ির সামনে পৌঁছতে নারী-কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত ভেসে এলো ওর কানে।

সকালের নির্মেঘ নীল আকাশের গায়ে
পাখীরা ডানা মেলে উড়ে চলে দিক দিগন্তে,
আর গলা ছেড়ে গান গায় ভালোবাসার।
কিন্তু আমি পারি না।
আমি এক বান্দিনী নারী।
কেমন করে সূর্য ওঠে,
কেমন করেই বা পাটে বসে সে,
আর কেমন করে কুঁড়িরা ফুল হয়ে ফুটে,
সে তো আমার আর দেখা হলো না।

গান তো নয় বেদনার ফুল ঝরে ঝরে পড়তে থাকে যেন। গানের করুণ মূর্ছনায় আনিসের কোমল হৃদয় বিদারিত হতে থাকে। সে ভাবে, জীবন তো মধুর সুন্দর। সেখানে এত বেদনা এত দুঃখ সন্তাপ কী করে আসে? কেন আসে?

কে এমন দুঃখের গান গায়—দেখার জন্য আনিস বাড়িটার আধ খোলা দরজার চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়ায়। ভিতরে যতটা দৃষ্টি যায়, দেখতে পায় প্রাসাদতুল্য বাড়িটার সামনে বিশাল এক ফুলবাগিচা। তার ভেতরে কত না বহু বিচিত্র রঙের সুগন্ধী সব ফুলের গাছ। মালীর নিপুণ হাতে ঝকঝক করে সাজানো গোছানো। কত রকমের পাখী! আর কী তাদের কিচির মিচির কাকলি।

এই অপরূপ মনোহর দৃশ্যাবলী দেখে নয়ন সার্থক করার লোভ সংবরণ করতে পারে না আনিস। পায়ে পায়ে সে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে।

ওধারে একটি আঙ্গিনা। সেখানে এক দঙ্গল মেয়ে হুটোপুটি করে খেলায় মত্ত। বাগিচার মাঝে একটি সরু পথের ওপর তিনটি খিলান গাঁথা তোরণ। তারই আড়াল হওয়ায় মেয়েরা ওকে দেখতে পায় না।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো পঞ্চান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

প্রথম তোরণের সামনে এসে দাঁড়াতে আনিস দেখলো, সিঁদুর রঙে লেখা আছে ঃ

আমাদের ঘরের দরজা এতই ছোট,
সে দ্বার দিয়ে দুঃখ এবং কালস্রোত-এর
বিশাল বপু ঐরাবত গলতে পারে না;
কিন্তু মহব্বত এবং আনন্দ
ঝরণার মতো উচ্ছল তরল—
তাদের পথ রুদ্ধ হবে না কখনও।

এর পর দ্বিতীয়তোরণের সামনে আসে সে। তার ওপরে সোনার জলে লেখা আছে ঃ

যতদিন পাখীরা এই প্রস্ফুটিত কুসুম্যোদ্যানে
ফুলের আঘ্রাণ নিতে আসবে,
যতদিন বন্ধুত্ব সুবাস ছড়াবে প্রতি ঘরে ঘরে,
এবং ফুলেরা দল মেলে ফুটবে,
আর নিজের রূপেই দগ্ধ হয়ে ঝরে পড়বে একদিন;
যতদিন বসন্ত ফিরে ফিরে আসবে,
চারদিকে জেগে উঠবে সবুজ সুন্দর ঘাসের সমারোহ,
যতদিন এই বৃক্ষ তরুলতা গুল্ম জন্মাবে আর মরবে,
ততদিন আমার এই সুখের নীড় খুশির আনন্দে দুলবে হাওয়ায়।

এরপর তৃতীয় তোরণের সামনে এসে দেখলো, খিলানের মাথায় সবুজ রঙে লেখা আছে ঃ

আমার এ গৃহের
নয়নাভিরাম প্রতিটি বিলাস-কক্ষের
মাথার ওপর থেকে সময় ও সূর্য সরে সরে যায় নিয়ত।
কিন্তু ভালোবাসার ছায়া
ইঁদুরের মতো লুকিয়ে থাকে
এর নিরালা নিভৃত কোণে;
সূর্য বা সময় কেউই সন্ধান পায় না তার।

তৃতীয় তোরণ পার হয়ে পথের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায় আনিস। বাগিচার তল থেকে একটা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে গৃহের অভ্যন্তরে।

পায়ে পায়ে উঠে আসে সে। সামনেই একখানা প্রশস্ত ঘর। মখমলের গালিচায় পাতা একখানা আসনে বসে আছে চৌদ্দ পনের বছরের এক তরুণী। তাকে ঘিরে চারজন সহচরী গা হাত পা টিপে দিচ্ছে। তরুণী সতনুকা, পরমাসুন্দরী। চাঁদের আলোর মতো ধবধবে ফর্সা তার গায়ের রঙ। ক্ষীণ কটি, তন্বী। কাজল কালো টানা টানা চোখ। শিল্পীর তুলিতে আঁকা তার ভুরু।

আনিস অবনত মস্তকে অভিবাদন জানায়। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে, সুপ্রভাত, শাহজাদী।

কিন্তু মেয়েটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, এই নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করার দুঃসাহস তোমার কী করে হলো?

আনিস বলে, এ জন্যে আমার কোনও দোষ নাই, মালকিন। দোষ আপনার নিজের, অথবা আপনার ঐ বাগিচার। দরজাটা আধখোলা ছিলো। বাইরে দাঁড়িয়ে আমি যুঁই, চামেলী গুলাব-এর বাহার দেখে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারি নি। ফুল আর পাখীদের সঙ্গে মিতালী করার জন্য প্রাণ আমার আকুলি বিকুলি করে ওঠে।

মেয়েটি খিলখিল করে হাসে, কী তোমার নাম?

—আপনার বান্দা—আনিস।

—বাঃ সুন্দর। তোমার কথায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি, আনিস। এস আমার পাশে বস।

আনিস আসন গ্রহণ করে। মেয়েটি বলে, একটু চিত্ত-বিনোদন করতে চাই। তুমি দাবা জানো?

আনিস ঘাড় নেড়ে জানায়, সে জানে।

তখন মেয়েটি তার সখীদের খেলা ছক-ঘুঁটি আনতে বলে।

আবলুস কাঠ আর হাতীর দাঁত দিয়ে তৈরি ছক। চারধারটা কারুকার্য করা সোনার পাতে মোড়া ঘুঁটিগুলো লাল আর সফেদ। লালগুলো পলার আর সাদাগুলো স্ফটিক পাথরের তৈরি।

—লাল না সফেদ—কোন্‌টা নেবে তুমি?

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে। আনিস বলে, খোদা হাফেজ আমি সাদাই নেব। লাল মানেই রঙচঙে—ওটা আপনাকেই মানায়।

—তা মন্দ বলনি।

মেয়েটি বড়েগুলো বসাতে থাকে ঘরে ঘরে।

খেলা শুরু হয়।

কিন্তু আনিসের খেলার চেয়ে খেলোয়াড়ের মোহিনীর রূপের দিকেই নজর বেশি। মেয়েটির চাঁপার কলির মতো নিটোল মোলায়েম আঙ্গুলগুলোর সঙ্গে ওর আঙ্গুলের ঠোকাঠুকি হয়। সারা শরীরে শিহরণ খেলে যায়। আনিস চিৎকার করে ওঠে। এরকম আঙুলের সঙ্গে আমি লড়বো কী করে।

কিন্তু মেয়েটি বলে এবার তোমার বাদশাহকে সামলাও। তুমি গেলে—শিয়রে সংক্রান্তি বুঝে আনিস খেলায় মনসংযোগ করে।

মেয়েটি বলে, নাঃ, এমনি এমনি জমছে না। এস আমরা একশো দিনার বাজি ধরি। তা হলে খেলায় মন বসবে।

—স্বচ্ছন্দে, আনিস বলে, আমার কোনও আপত্তি নাই। ঠিক আছে, রইলো বাজি—একশো দিনার।

আমাদের নায়িকার নাম জাইন মুস্তয়ামিফ। এবারে সে ঘুঁটি সাজিয়ে এঁটে সেঁটে বসলো। বাজি জিততে হবে। প্রথম কয়েকটি এমন চাল দিলো আনিস, যা সামলাতে জাইন হিমসিম খেয়ে যায়। হঠাৎ সে তার পাতলা রেশমের বোরখাখানা খুলে পাশে রেখে দেয়।

এবার আনিসের সব তালগোল পাকিয়ে যায়। নিজের ঘুঁটি ছেড়ে সে লাল ঘুঁটি

তুলেই চাল দিতে উদ্যত হয়। জাইন হা হা করে ওঠে, ও কি, ও কি করছো, ও যে আমার ঘুঁটি আনিস।

মাখনের মতো নরম একখানা হাত দিয়ে আনিসের পুরুষ কঠিন হাতের মণিবন্ধ চেপে ধরে জাইন। আনিস সরিয়ে নেয় না হাত। খুলতে চায় না ওর কোমল হাতের কঠিন বাঁধন। শুধু গভীর আয়ত চোখ মেলে জাইনের দিকে তাকায়। সে চোখের দৃষ্টিতে কী এক অব্যক্ত ভাষা মুখর হতে চায়। চোখে চোখে দৃষ্টি বিনিময় হতেই জাইন সচকিত হয়ে হাতখানা সরিয়ে নেয়।

—এইভাবে আমার ঘুঁটি নিয়ে তুমি চাল দেবে নাকি?

আনিস বলে, আমার আর তোমার বলে কী আছে। ঠিক আছে, আর ছেলে খেলা নয়, এ বাজির লড়াই, জান দিয়ে লড়তে হবে, আচ্ছা এই দিলাম আমার চাল, এবার এসো-ও-ও, মানে আসুন।

জলতরঙ্গের ধ্বনি তুলে খিল খিল করে হেসে ওঠে জাইন, আপসে যা মুখে আসে তাকেই স্বাগত জানাও আনিস! ওসব আপনি-টাপনি থাক।

বাজির খেলা হলেও আনিস-এর চোখ মন ঘুঁটিতে বসে না! সর্বক্ষণ সে জাইনের রূপ-সুধা পান করে কাটায়। তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হবার তাই হলো। পরপর পাঁচটা খেলায় শোচনীয় পরাজয়। গুণে গুণে পাঁচশোটি দিনার তুলে দিলো সে জাইনের হাতে! অতি প্রসন্ন মনে।

জাইন মুচকী হেসে বলে, আহা এত টাকা হেরেছ বলে গোসা করছো কেন, আরও হয়ে যাক কয়েক হাত—

—না। আমার কাছে আর পয়সা নাই। যা সঙ্গে ছিলো, সব হেরেছি।

—কেন সঙ্গে নগদ না থাকলে বুঝি বাজি লড়া যায় না? আসলে বল তুমি ভয় পাচ্ছ।

আনিস বলে, খোদা কসম, নিশ্চয়ই না। খেলাতে হার-জিত আছেই। ও -নিয়ে আমার কোনও চিন্তা নাই।

—তাহলে উঠছো কোথায়? বোস।

জাইন ওকে হাতে ধরে আবার বসিয়ে দেয়। বলে, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে খেলবে। দাবা ছেলে-খেলার জিনিস নয়। ঘুঁটি ছেড়ে আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে কী হবে? আমার মুখে তো আর ঘুঁটির চাল লেখা নাই। খেলার সময় ওসব দিকে মন গেলে তো চলবে না। আর হ্যাঁ, এবার থেকে বাজি অঙ্ক একহাজার করা হলো। কী রাজি?

আনিস বলে, রাজি। বাজিতে আমি ভয় পাই না।

জাইনার বলে, বাড়ানো হলো—এই কারণে যে, মনটা একটু ছকের দিকে বসবে।

কিন্তু আনিস-এর চোখ দাবার ছকে নিবদ্ধ থাকে না। সারাক্ষণ সে জাইনের রূপ সায়রে সুধা পান করতে থাকে। ফলে এক এক করে টাকা পয়সা ধনদৌলত যা কিছু সঞ্চিত ছিলো সব হেরে হেরে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু আনিস তবু নিরস্ত হয় না। জমি-জমা দোকান-পাট বাড়িঘর সব স্থাবর সম্পত্তিও হেরে ফতুর হয়ে যায়।

জাইন বলে আর একটা দান খেলবো, এই দানে যে হারবে, তাকে তার অধিকারের সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি খোয়াতে হবে।

আনিস বলে, আমার তাতে কিসের ভয়? সবই তো তোমার কাছে হেরে গেছি, এর পরে আর নেবে কী?

জাইন বলে, আমিও তো হারতে পারি? তাহলে তোমার হারা সম্পত্তির সঙ্গে আমার মালিকানার সম্পত্তিও সব তোমার হতে পারবে।

আনিস বলে, কিন্তু আমি যে তোমাকে হারতে দেব না, জাইন।

জাইনের মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে, তুমি একটা আস্ত আহাম্মক। যাও, চলে যাও আর কখ্খনো এস না আমার এই বাগানবাড়িতে। তোমার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখতে চাই না আমি। যা তুমি হেরেছ, আমি সব ফেরত দিয়ে দিলাম তোমাকে। যাও, বিদায় হও।

আনিস কিন্তু ওঠে না। করজোড়ে মিনতি করে বলে, তুমি আমার ওপর এমন নির্দয় হয়ো না, জাইন। আমার ধন দৌলত বিষয় আশয় সব কিছু হেরেছি—তার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই। সব আমি হাসিমুখে লিখে দিচ্ছি তোমাকে। কিন্তু দোহাই তোমায় আমাকে চলে যেতে বলো না। তোমাকে না দেখতে পেলে আমি বাঁচবো না। যদি চাও, আমাকে কঠোরতম সাজা দিতে পার! কিন্তু তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়ো না, শুধু এইটুকু দয়া করো।

জাইন বিরক্ত হয়ে ওঠে, ঠিক আছে, ফেরত যখন নেবে না তখন কাজীকে ডাক! দলিল বানিয়ে দাও আমার নামে।

আনিস কাজী এবং সাক্ষীদের ডেকে এনে তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি এবং নগদ ধনদৌলত সব জাইনের নামে দানপত্র করে দিলো।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো ছাপান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

জাইন মুচকি হেসে বলে, তাহলে আনিস তোমার সঙ্গে সব কাজ খতম। এবার পথ দেখ তুমি। এরপর তোমাকে আর চিনি না। চিনবো না।

আনিস করুণ চোখে তাকায়, আমার সব কামনা বাসনা অতৃপ্ত অপূর্ণ রেখেই আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও, শাহজাদী?

—আমারও ইচ্ছে, তোমাকে নিয়ে সুখ সম্ভোগ করি। কিন্তু খালি হাতে তো মজা লুটা যায় না, আনিস। ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর!

আনিস বলে, বেশ, আজ্ঞা কর, কী দিতে হবে?

জাইন বলে, আমার জন্যে চার বোতল খাঁটি আতর চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং চারটি সুসজ্জিত খচ্চর নিয়ে এস আগে। তারপর তোমার সব বাসনা পূর্ণ করবো আমি।

আনিস বলে, ঠিক আছে, তাই হবে।

—কিন্তু পাবে কোথা থেকে। দেবে কী করে? তোমার বলতে তো আর কানাকড়িও নাই। সব সম্পত্তি এখন আমার।

— সে নিয়ে তুমি ভেবো না। আল্লাহ আমাকে জুটিয়ে দেবেন। বিষয়আশয় সবই খুইয়েছি তোমার কাছে, ঠিক। কিন্তু আমার শুভানুধ্যায়ী ইয়ার বন্ধুরা তো আছে। তাদের কাছে ধার করবো।

—ধার করবে? ঠিক আছে, ধার করেই নিয়ে এসো। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে রইলাম।

আনিস পথে নেমে পড়ে। জাইন তার অন্যতম সহচরী হুবুবকে ডেকে বলে, যা তো, সাহেবের পিছনে পিছনে ধাওয়া কর। যেন বুঝতে না পারে। দ্যাখ, কার কার কাছে সে যায়। তারা কে কী বলে শোনো। তারপর সবাই যখন এক এক করে ওকে শূন্য হাতে ফেরাবে তখন তার সামনে দেখা দিয়ে বলবি, 'আনিস সাহেব, আমার মালকিন এক্ষুনি একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। এনে ঐ অতিথি মেহমানদের বড়ো ঘরটায় বসাবি ওকে। তারপর আমাকে খবর দিবি। এর পর যা বরাতে থাকে, হবে।

হুবুব অভিবাদন জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে অনুসরণ করে চলতে

থাকে আনিসকে। জাইন হামামে গিয়ে গোসল সেরে নিলো। জমকালো বাহারী সাজে সাজিয়ে দিলো ওর সহচরীরা। আতর ছিটিয়ে দিলো সারা গায়ে। নানারকম মূল্যবান রত্নাভরণ পরিয়ে দিলো ওর কানে গলায় হাতে পায়ে।

ইতিমধ্যে হুবুব আনিসকে অনুসরণ করতে বুঝতে পারে ওর কোনও বন্ধুই ওকে কিছু দিলো না। আনিস ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কী করবে ভাবছে, এমন সময় হুবুব ওর সামনে দেখা দিয়ে বলে, আনিস সাহেব, আমাদের মালকিন জাইন মওয়াসিফ আপনার সঙ্গে এখনি একবার মোলাকাত করতে চান। মেহেরবানী করে চলুন।

আনিসকে সঙ্গে নিয়ে হুবুব ফিরে এসে বড় ঘরে প্রবেশ করে দেখে শাহজাদীর সাজে সজ্জিত হয়ে জাইন একটা উঁচু আসনে বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। জাইনকে দেখেই চমকে ওঠে আনিস। এ কোনও মানবী না বেহেস্তের ডানা কাটা হুরী। দয়িতের মন ভরেছে, বুঝতে পেরে জাইন অন্তরে রোমাঞ্চ অনুভব করে। ধীর পায়ে উঠে আসে সে আনিসের পাশে। ওর একখানা হাত ধরে। তারপর পাশের একখানা লম্বা অনুচ্চ 'দিবানে' নিয়ে গিয়ে বসায়। এবং নিজেও পাশে বসে।

সহচরীরা নানারকম খানাপিনা এনে সাজিয়ে দেয়। দুজনে পরিতৃপ্তি সহকারে আহারাদি শেষ করে। মুখ হাত ধোওয়ার পর ওরা এক পেয়ালায় দুজনে মদ্যপান করতে থাকে। জাইন একসময় বলে, এক টেবিলে বসে যখন একসঙ্গে নুন-রুটি খেলাম, তখন আজ থেকে তুমি আমার মেহমান হয়ে গেলে, আনিস। সুতরাং আমি তোমার কণামাত্র বস্তু গ্রহণ করতে পারবো না। তা তোমার পছন্দ হোক আর নাই হোক। তুমি যা লিখে পড়ে দিয়েছ তার সব তোমাকে ফেরত দিয়ে দিলাম।

জাইন-এর বদান্যতায় আনিস অধীর আনন্দে জাইনের পা জড়িয়ে ধরে। জাইন ওকে দু'হাতে তুলে ধরে, ছিঃ ছিঃ একি! তুমি না পুরুষ মানুষ! মেয়েমানুষের পায়ে ধরছো! আমার ব্যবহারে সত্যিই যদি তুমি খুশি হও, আমাকে আমার যোগ্য মর্যাদা দিতে চাও, তবে আমার পায়ে কেন, চলো আমার পালঙ্কে, আমাকে নিয়ে লুটিয়ে পড়বে সেখানে। আমি দেখতে চাই সত্যিই তুমি এক সেরা দাবাড়ে। এবার কিন্তু কিস্তিমাত তোমাকেই করতে হবে, আনিস।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো আটান্নতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

আনিস আসতে হাসতে বলে, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব, জাইন, আমার সফেদ বাদশাহ তোমার সব লালবাহিনীকে কী ভাবে ঘায়েল করে ফেলে।

জাইনকে একহাতে জড়িয়ে ধরে সে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

দরজায় দাঁড়িয়েছিলো হুবুব। সাদর অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যায় সে দু'জনকে।

এরপর শুরু হয় আবার নতুন দাবা খেলা! আনিসের সফেদ বাদশাহ বীরবিক্রমে লালবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে ছত্রখান করে ফেলে। প্রথম দানে জাইন হারে। কিন্তু সদর্পে বলে, এবার তোমার সফেদ শাহকে আমি কয়েদ করবো আনিস, সাবধান।

কিন্তু আনিসের সফেদ বাদশাহকে ফাঁদে ফেলে, লালবাহিনীর কী সাধ্য। সেবারেও কিস্তিমাত। এইভাবে বার বার পাঁচবার জাইনের লালসেনা বিধ্বস্ত হয় সফেদ শাহর

হাতে। লালসেনাদের সারা অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, ব্যথা-বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। না না আনিস, তোমার পায়ে ধরি, আর না। আমি হার মানছি। তোমারই জিত হয়েছে। বাব্‌বা তোমার সফেদ বাদশাহর কী তাগদ! প্রাণ যায় যায় আর কী?

দুজনে গভীর আবেশে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। কতক্ষণ কে জানে। এক সময়ে জাইন উঠে বসে। আনিসকে জাগিয়ে তোলে। বলে, তোমার দেহ ক্লান্ত অবসন্ন, জানি। তবু ওঠ, মৌজ মৌতাত করা যাক। গান আবৃত্তি চলুক, তাহলে আবার নতুন করে লড়ার তাগিদ হবে।

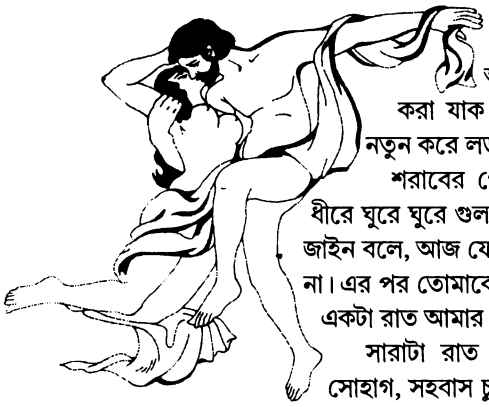

শরাবের পেয়ালা পূর্ণ করে নেয় দুজনে। ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে গুলাবী নেশায় মদির হয়ে ওঠে মন প্রাণ। জাইন বলে, আজ যে সুখ দিলে আনিস, জীবনে তা ভুলবো না। এর পর তোমাকে ছাড়া—একটা দিন আমি বাঁচবো না। একটা রাত আমার কাটবে না।

সারাটা রাত ধরে ওরা পরস্পরে অনেক আদর সোহাগ, সহবাস চুম্বন করে কাটালো। পরদিনও তেমনি আহার বিহার বাসন রাগ অনুরাগ সুরত রঙ্গে কেটে গেলো। তারও পরদিন একই আনন্দে কাটলো। এইভাবে পুরো একটা মাস সুখ-সম্ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে ওরা ভেসে চলতে থাকে।

জাইন বিবাহিতা। ওর স্বামী তখন বিদেশে ছিলো। একদিন স্বামীর কাছ থেকে একখানি পত্র পেলো। বিদেশের বাণিজ্য শেষ করে সে শীঘ্রই ঘরে ফিরে আসছে।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে জাইন, আনিস, এখন কী উপায় হবে। তোমাকে ছাড়া তো আমি প্রাণে বাঁচবো না, সোনা। কিন্তু আমার স্বামী একটা নরখাদক বাঘ। সে যদি জানতে পারে, আমি তোমাকে নাগর করে রতিসুখে মেতে আছি, আমাকে তোমাকে এক কোপে দুখণ্ড করে ফেলবে। লোকটা ভীষণ হিংসুটে এবং সাংঘাতিক। দুনিয়াতে সে কোনও নারীকেই বিশ্বাস করে না। তার চোখে সব মেয়েই চরিত্রহীনা—পরপুরুষে আসক্তা। এই অবস্থায় এ বাড়িতে তোমার প্রবেশ অধিকার কী করে বজায় থাকে, সে কথা ভেবে আমি সারা হচ্ছি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে জাইন মনে মনে মতলব ভাঁজতে থাকে। তারপর এক সময় বলে, আনিস, পথ একটা পেয়েছি।

আনিস জিজ্ঞেস করে, কী?

—তুমি আতর হিং মসলার বণিক হয়ে ফিরি করতে আসবে আমার স্বামীর দোকানে। তারপর সব আমি ব্যবস্থা করবো। কিন্তু খেয়াল রেখ, আমার স্বামী যে ভাবেই তোমাকে জেরা-জুলুম করুক, তুমি কিন্তু দু'রকম কথা বলো না তার কাছে। তা হলে সব গুবলেট হয়ে যাবে।

আনিস বলে, তবে তো এখন থেকেই আমাকে ঐ ব্যবসার তালিম নিতে হয়।

জাইন বলে, বেশক। আজ থেকেই তুমি খোঁজ-খবর নাও। কোন্‌টার কী নাম, কোন্‌টার কি দর দাম। কোথাকার মাল। ব্যবসার সব খুঁটিনাটি জেনে এস।

এইভাবে আনিসের সঙ্গে সাট করে জাইন যুক্তি আঁটতে থাকে—কীভাবে তার স্বামীকে ঠকানো যায়।

জাইন-এর স্বামী ঘরে ফিরে এসে বিবির পাংশুবর্ণ চেহারা দেখে শিউরে ওঠে, একি হাল হয়েছে, বিবিজান? তোমার কী অসুখ-বিসুখ করেছিলো? সারা শরীর হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে!

এ-সব জাইন-এর চাতুরী। জাফরান-এর জল গায়ে মাখলে চেহারাটা রুগ্ন পাণ্ডুর মনে হয়। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকেই আমি বিমারে পড়েছিলাম। ভয়ে মরি, কবে তুমি দেশে ফিরবে। সেদিন তোমার খৎখানা পেয়ে তবু ধড়ে প্রাণ এসেছে। আমাকে যে এমন ফ্যাকাশে দেখছো, সে কিন্তু আমার অসুখের জন্য না। তোমার অদর্শনই আমাকে এমন পাণ্ডুর করে ফেলেছে। শুধু ভেবে মরেছি, বিদেশ বিভূঁই—একা মানুষ, না জানি কখন কী বিপদ-আপদ ঘটে। কিছু একটা হলে খবরও যে পাবো, তারও কোনও উপায় নাই। তাই বলছি, ওগো, এর পর যখন বিদেশে যাবে, আর কখনও একা একা যেও না বাপু, আমার বড্ড ভয় করে। সঙ্গে কেউ থাকলে সময়ে অসময়ে সে তো একটা খবর-টবরও দিতে পারে।

সওদাগর স্বামী বিবির এই দরদ দেখে খুবই প্রসন্ন হয়। তুমি ঠিকই বলেছ, বিবিজান। এর পর থেকে তোমার কথা ছাড়া আর এক পাও চলবো না। যাক, আমি তো ভালোয় ভালোয় বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছি। আর তো তোমার দুর্ভাবনার কোনও কারণ নাই। এবার তুমি হাসি গানে মেতে ওঠ। শরীরটাকে সুস্থ করে তোলো।

এই বলে সে জাইনকে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। এই সওদাগর জাতে ইহুদী , এবং তার বিবিজানও এক ইহুদী কন্যা। হিং-আতরের নয়া সওদাগর আনিস ইহুদী সওদাগরের দোকানের সামনেই ঘুর ঘুর করছিলো। জাইন-স্বামী দোকানে আসতেই তার সঙ্গে সে আলাপ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তোলে আনিস। ইহুদী দর-দাম জিজ্ঞেস করে। বাজার থেকে সস্তা দরেই সে মাল দিতে রাজি দেখে এক কথাতেই সওদা করে নেয় সে। এবং আনিসের সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ওর নিয়মিত খরিদ্দার হয়ে যায়। এর কয়েকদিন পরে ইহুদী আনিসকে প্রস্তাব দেয়, তুমি আমার ব্যবসার অংশীদার হয়ে যাও। তাতে তোমারও সুবিধে হবে আমারও ব্যবসা বাড়বে।

আনিস বলে; আমি রাজি। কী টাকা দিতে হবে আমাকে?

ইহুদী বলে, বেশি না, হাজার দশেক নিয়ে এস, তাহলেই হবে।

আনিসের পক্ষে এ এমন কিছু নয়। পরদিনই সে টাকা নিয়ে হাজির হয়। দু'জন নামজাদা সওদাগরকে সাক্ষী রেখে চুক্তির দলিল তৈরি করে দেন ইহুদী।

সেদিন রাতে সে আনিসকে সঙ্গে নিয়ে আসে তার নিজের বাসায়।

—আজ থেকে তুমি আমার ব্যবসার নতুন অংশীদার হলে, আনিস। চলো আজ রাতে আমার বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন। একসঙ্গে বসে খানাপিনা করবো আমরা।

আনিস এইটাই চাইছিলো। সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করে দুজনে ইহুদীর বাড়িতে এসে পৌঁছয়। আনিসকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ইহুদীটা অন্দরে চলে যায়। জাইনকে বলে, একটা সুন্দর ছেলেকে আজ থেকে আমার ব্যবসার অংশীদার করে নিলাম জাইন। কারণ বয়স হয়েছে, এখন আর একা একা খাটতে পারি না অত।

জাইন বলে, খুব ভালো করেছ। তা লোকটা কেমন?

—আমার তো খুব ভালো লেগেছে। খুব শান্তশিষ্ট নম্র বড়ো বংশের ছেলে, মালকড়িও অনেক আছে। তুমি আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আজ রাতে ও আমাদের সঙ্গে খানাপিনা করবে। সেই সুযোগে তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয়ে যাবে।

জাইন চোখ কপালে তুলে বলে, এ তোমার কী রকম কথা, আমি তোমার ঘরের বিবি, আমাকে পরপুরুষের সামনে বেরুতে হবে?

—আহা, বুঝছো না কেন, এখন থেকে সে আর বাইরের লোক থাকছে না। সে আমার ব্যবসার সমান অংশীদার। তুমি আমার জীবনের অংশীদার, আর ও আমার ব্যবসার। তা হলে সে বাইরের মানুষ থাকে কী করে? আর তা ছাড়া বিরাট বড়লোক, অনেক পয়সার মালিক, ওকে হাতে রাখতে পারলে আখেরে ভালো হবে।

জাইন কপট রাগত স্বরে বলে, তা যাই বল বাপু, পরপুরুষের সামনে আমি ঘরের বিবি বেরুবো—এ আমার ভালো ঠেকছে না।

ইহুদীটা বলে, তুমি দেখছি, সাচ্চা মুসলমানের মেয়ের মতো কথা বলছো। ওরা ঘরের মেয়েদের বাক্সে পুরে রাখে। ভাবে, বাইরে বেরুতে দিলেই বিবিজান হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা তো আর মুসলমান নই। পয়গম্বর মুসা তো কোথাও বলেনি, ইহুদী মেয়েরা পর্দানশিন হয়ে ঘরে খাঁচার পাখীর মতো বন্দী হয়ে থাকবে? মানুষের সঙ্গে সহজ সরল ভাবে মিশবে, আলাপ করবে। দোস্তী বন্ধুত্ব করবে, এইতো স্বাভাবিক।

জাইন বলে, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলে আমাদের সুবিধে হবে, আমি করবো।

সেদিন রাতে নানা উপচারে আহার পর্ব সমাধা হলো। মাথা গুঁজে আনিস খানাপিনা সারলো। ইহুদী বলে, তুমি তো আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে গেলে আনিস, অত শরম করছো কেন? জাইন আমার বিবি—সেও আমার অংশীদার। সুতরাং ওর সঙ্গে একটু প্রাণ খুলে কথাটথা বলো, আলাপ পরিচয় কর!

আনিস কিন্তু বহুত সেয়ানা। আড়চোখেও একবার তাকিয়ে দেখে না জাইনকে। একেবারে লাজুক নিরীহ গোবেচারা মানুষ—যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। ইহুদী যদিও মুখে বলেছিলো, জাইনের সঙ্গে আলাপ-সালাপ কর, তবুও মনে মনে আনিসের এই সলজ্জ-বিনম্র মুখ স্বভাবতই তাকে মুগ্ধ করেছিলো।

পরদিন রাতেও ইহুদী আনিসকে সঙ্গে নিয়ে আসে। আবার তিন জনে একত্রে বসে আহারাদি করে। জাইনের স্বামী ভাবে, এইভাবে নিত্য একসঙ্গে ওঠা বসা এবং খানা পিনা করতে করতে আনিসের লাজুক ভাব এবং জড়তা একদিন কেটে যাবে। তখন সে তাদের এক অন্তরঙ্গ শুভানুধ্যায়ী হয়ে উঠবে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছয়শো ষাটতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে

ইহুদীর কথাই ঠিক, কয়েকদিনের মধ্যেই আনিস ওদের পরিবারের এক পোষমানা পাখী হয়ে ওঠে। সওদাগর ভাবে, ছেলেটার স্বভাব চরিত্র সাচ্চা—নিরাপদ। জাইন-এর কাছে ছেড়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে বাইরে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ইহুদীটা বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে পা রাখা মাত্র পাখী তার নিজের মূর্তি ধরে। জাইনকে আদর সোহাগ করে। হাসি তামাশা, নাচ গানে মেতে ওঠে।

এরপর একদিন ইহুদীটা ঘরে ফিরে এসে জাইন আর আনিসের মাখামাখি দেখে বিস্মিত এবং সন্দিগ্ধ হয়। এই কয়দিনের মধ্যে আনিস একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। কথায় কথায় সে জাইনকে নিয়ে হাসি মস্করা করে। জাইনও কারণে অকারণে আনিসের সঙ্গে কলকল করে কথা বলে। একেবারে বেহায়া বেশরম বাজারের মেয়েমানুষের মতো।

আনিসের স্বভাবের যে সলজ্জ-ভাব সে প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলো তার বিন্দুমাত্র আর অবশিষ্ট নাই। তার অনুজ-প্রতিম শ্রদ্ধা সমীহ সব কোথায় উবে গেছে। বরং এখন তার আচার আচরণে একটা অস্বাভাবিক ঔদ্ধত্য এবং বেপরোয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই প্রকট হয়ে উঠেছে। এত তাড়াতাড়ি এত পরিবর্তন কী করে সম্ভব? সওদাগর সন্দেহাকুল হয়ে ভাবে, নিশ্চয়ই এর পিছনে জাইন-এর কোনও ছলনা কাজ করছে।

রোজই সে তাকে-তাকে থাকে। হাতেনাতে ধরবে—এই তার বাসনা। কিন্তু সুযোগ আর মেলে না। অবশেষে একদিন সে ফাঁদ পাতলো।

সেদিন খুব সকাল সকাল আনিসকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এলো। আগে থেকেই জাইনকে বলে রেখেছিলো, কোতায়ালকে নিমন্ত্রণ করেছে, আজ রাতে সে ওদের সঙ্গে খানাপিনা করবে।

ইহুদী বাড়ি ফিরে দেখে, জাইন নানাবিধ ব্যঞ্জন বানিয়ে রেখেছে।

—বাঃ, খাসা সব খানা পাকিয়েছ তো, বিবিজান।

—বানাবো না? আজ ঘরে কোতোয়াল সাহেব আসবে বলেছো, তার আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হলে চলবে কেন?

ইহুদী বলে তা ঠিক। আচ্ছা, তোমরা বসে গল্প কর, আমি কোতায়াল সাহেবকে সঙ্গে করে ডেকে নিয়ে আসি।

জাইন বলে, কখন ফিরবে বলো, সেইভাবে টেবিলে কাপড় পাতা হবে। খানাপিনা সাজানো হবে।

—তা ধর ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।

ইহুদী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে নয়। ফুল-বাগিচার ওপাশ দিয়ে ছাতের ওপরে ওঠার একটা সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার ঘরে যায় সে। সেখান থেকে জাইনাবের শোবার ঘর পালঙ্ক শয্যা পরিষ্কার নজর করা যায়।

চিলেকোঠার ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

একটুক্ষণের মধ্যে খেলা শুরু হয়ে যায়। জাইন জড়িয়ে ধরে আনিসকে। টানতে টানতে নিয়ে যায় পালঙ্ক-শয্যায়। বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আনিসের দেহের ওপর। তারপর চুষে কামড়ে ছিঁড়ে এক-সা করে দিতে থাকে আনিসকে। আনিসও কম বাহাদুর নয়। ইহুদী ভাবে—জোয়ান লেড়কীকে তাঁবে রাখতে গেলে তার এই ভাঁটা পড়া যৌবনে সম্ভব না। আনিসের মতো উদ্দাম পৌরুষ থাকা দরকার।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে বুকে। মাথায় খুন চেপে যায়। কিন্তু নাঃ, এখনই নয়। ইহুদী ভাবে, ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। যথাসময়ে এর ব্যবস্থা করা যাবে।

সওদাগরের ফেরার সময় হয়ে এসেছে দেখে জাইন নিজের বেশবাস সংবৃত করে পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। আনিসকে বলে, ভালো করে ইজার পাতলুন পরে নাও, মুখপোড়াটা এখুনি আবার এসে পড়বে।

ইহুদী হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে, না জাইনার নসীব খারাপ। কোতোয়াল সাহেব একটা খুনের তদন্ত করতে শহরের বাইরে গেছেন। ফিরতে অনেক দেরি হবে। আজ আর আশা নাই। সুতরাং এস, আমরাই ভালো মন্দ যা বানিয়েছ উদরস্থ করি।

খানাপিনা শেষ হলে আনিস যথারীতি বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ি চলে যায়। ইহুদী

জাইনকে সঙ্গে নিয়ে পালঙ্কে এসে শুয়ে পড়ে। জাইন এগিয়ে এসে স্বামীকে আদরের ভান দেখায়।

—তোমাকে আজ এত মনমরা দেখছি, কেন গো? আমি তখন থেকে লক্ষ্য করছি, তুমি কী যেন ভাবছো, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছো। কেন, কিছু হয়েছে নাকি?

কোমর থেকে একখানা চিঠি বের করে ইহুদী। বলে, আমার এক দালাল লিখেছে অনেকদূর দেশ থেকে। আর একদিনও দেরী করা সম্ভব না। এখনি রওনা হতে হবে। না হলে ব্যবসার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

খুশিতে নেচে ওঠে জাইন-এর মন, কিন্তু মুখে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ করে না, বরং দুঃখে কাতর হয়ে বলে, কিন্তু তোমার এই শরীর স্বাস্থ্য, অত দূর দেশে যাবে তুমি, আমি তো ভাবতেই পারছি না গো, কী করে থাকবো। আচ্ছা, কতদিন লাগবে? কবে ফিরবে?

—তা ধর, তিন থেকে চার বছর। তিন বছরের আগে ফেরা সম্ভব হবে না। তবে চার বছরের বেশিও থাকবো না।

জাইন কত সহজে চোখে জল আনতে পারে। টসটস করে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে ওর গাল বেয়ে।

—অতদিন আমি একা একা থাকবো কি করে? না না, সে আমি পারবো না, গো।

ইহুদী শান্ত কণ্ঠে বলে, আমি সেই কথাই ভেবেছি জাইন। তোমাকে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া উচিত হবে না। অল্প দিনের ব্যাপার নয়। তা ছাড়া আমার শরীর স্বাস্থ্যও তেমন সুবিধের নয়। কখন কী অসুখ-বিসুখ করে বলা তো যায় না। সে অবস্থায় তুমি কাছে না থাকলে আমারও ভালো লাগবে না। আমি ঠিক করেছি, তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবো।

—এ্যাঁ।

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে জাইন। নিজের অন্তরের অভিব্যক্তি আচমকা আসে মুখ দিয়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ঘুরিয়ে নেয়।

—এ্যাঁ! কী মজা হবে বলো তো? এতদিনে আমার মনের সাধ মিটবে। তোমার কাছে থাকবো, কত নতুন নতুন দেশ দেখবো—এ আমার অনেক দিনের স্বপ্ন। তা কবে রওনা হবে, গো?

ইহুদী বলে, না আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়তে হবে। আজ খুব ভোরে উঠে তুমি সব বাঁধা-ছাঁদা করে নেবে। দশটা উটের ব্যবস্থা করে এসেছি। উট নিয়ে সহিসরা খুব সকালেই হাজির হয়ে যাবে। আমার মনে হয় আমাদের দামী দামী সব সামানপত্রই ধরে যাবে দশটা উটে, কী বলো?

জাইন-এর তখন মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। স্বামীর কথার কী জবাব দেবে?

ইহুদী বলে, কি গো, কী ভাবছো?

জাইন ধাতস্থ হয়ে নিতে পারে। বলে, না, মানে—মানে কী মজা হবে বলতো? কত নতুন নতুন দেশ দেখবো—

ইহুদী ছোট্ট করে জবাব দেয়, তা বটে।

সূর্য ওঠার আগেই মালপত্র সব বোঝাই হয়ে যায় উটের পিঠে। সহিস তাড়া লাগায়, তাড়াতাড়ি করুন মালিক, বেলা বেড়ে গেলে খরায় চলতে বড় কষ্ট পেতে হবে যে।

একটা বড় উটের পিঠে ডুলি বসানো হয়। সামনে ইহুদী, মাঝখানে জাইন ও পিছনে তার চার সহচরী হাবুব, খুতুব, সুকুর এবং রুকুর বসে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো বাষট্টিতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

চলে যাওয়ার আগে সকলের অলক্ষ্যে সদর দরজার মাথায় লিখে রেখে যায় জাইন ঃ

তুমি আজ কত দূরে, সখা,
তবু তোমার বুকের ধকধকে তুফানের উত্তাপ
আমি অনুভব করতে পারি আমার কলিজায়।
আল্লাহ কসম, কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না,
যায় যদি বিশ্ব রেণু রেণু হয়ে যায়,
তবু তুমি আর আমি
একসাথে র'বো দুইজনে।

পরদিন সকালে আনিস দোকানে আসে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ইহুদীকে আসতে না দেখে চিন্তিত হয়। কি জানি কোনও অসুখ বিসুখ করলো নাকি, সন্ধ্যা হতে না হতে তাড়াতাড়ি সে জাইনের বাড়িতে চলে আসে। সদর দরজায় ঢুকতে গিয়েই হোঁচোট খায়। দরজার ওপরে জাইনের সেই কবিতাটা পড়ে বুঝতে আর অসুবিধা হয় না, তার চোখের মণি বুকের কলিজা আর এ বাড়িতে নেই।

তাড়াতাড়ি সে অন্দরে প্রবেশ করে। সব ঘর শূন্য হাহাকার করছে। কেউ কোথাও নাই। পাড়া-পড়শীদের কাছে ছুটে যায় আনিস। তাদের কাছ থেকে জানতে পারে, সওদাগর তার বিবিকে নিয়ে বহু দূরদেশে রওনা হয়ে গেছে। কয়েক বছরের মধ্যে ফেরার কোনও সম্ভাবনা নাই।

শোকে মুহ্যমান আনিস ফুলবাগিচায় বসে বসে চোখের জল ফেলতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘাসের শয্যাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে সে জাইনকে আপন করে পায়। জাইন ওকে আদর করে চুমু খেয়ে সান্ত্বনা দেয়। কেঁদ না সোনা, কেঁদ না। আমাদের এই বিচ্ছেদ চিরকালের নয়। আবার আমরা মিলবো, হাসবো নাচবো গাইবো—ভালোবাসা করবো।

আনিসের ঘুম ভেঙ্গে যায়। আবার সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আহার নিদ্রা সব টুটে যায়। একমাত্র জাইন তার ধ্যান জ্ঞান—আর কিছুই তার ভালো লাগে না।

একটানা এক মাস পথ চলার পর ইহুদী সহিসদের বলে, সামনেই একটা বন্দর শহর আসছে। শহরে ঢোকার মুখে তাঁবু ফেলতে হবে। এখানে দু-এক-দিন জিরিয়ে আবার যাত্রা করা যাবে।

শহরের প্রত্যন্তে সমুদ্র উপকূলের এক নির্জন পরিবেশে তাঁবু ফেলা হলো।

জাইন-এর চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করায় ইহুদীটা।—এ্যাই খানকি, শিগ্গির জামা-কাপড় খোল, খুলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়া।

জাইন ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। কী করবে কিছুই বুঝতে পারে না। ইহুদী আবার গর্জে ওঠে, কী কথা কানে যাচ্ছে না। দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি। সে নিজেই জাইনের পরনের জমকালো সাজ-পোশাকটা ফড় ফড় করে ছিঁড়ে ফেঁড়ে ন্যাংটো করে ফেলে। তারপর একখানা লম্বা লকলকে বেতের চাবুক এনে সপাং সপাং করে চাবকাতে থাকে জাইনের পিঠে পাছায় বুকে। দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ে। জাইনের ফুলের মতো নরম দেহখানা রক্তে মাখামখি হয়ে তালগোল পাকিয়ে পড়ে যায় নিচে। চাবুকখানা ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে যায় ইহুদীটা।

শহরের প্রবেশ মুখেই এক কামারশালায় গিয়ে বলে, আমার বিবির হাতে পায়ে লোহার হাল লাগিয়ে দিতে হবে।

—কামার অবাক হয়, লোহার হাল মানুষের জন্য? সে আবার কী? কেন?

ইহুদী বলে, বাঁদীটা বজ্জাত মাগী, চরিত্রহীন খানকি। পরপুরুষ নিয়ে কেলি করে। আমরা ইহুদী, আমাদের শাস্ত্রমতে চরিত্রহীনা মেয়েদের এইটেই উচিত সাজা।

কামারটা ইহুদীর সঙ্গে তাঁবুতে আসে। জাইন তখন রক্তাক্ত দেহে কাতরাচ্ছিল। ইহুদীর এই নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তুমি একটা জানোয়ার, এইরকম একটা ফুলের মতো মেয়ে, তাকে চাবুকের ঘয়ে আধমরা করে ফেলেছো। এত বড় স্পর্ধা! দাঁড়াও আমি তোমাকে মজাটা দেখাচ্ছি।

কামারটি ছুটে গিয়ে কোতোয়ালকে খবর দেয়, হুজুর আপনি দেখে আসুন, ঐ সমুদ্রের ধারে একটা তাঁবুর ভেতরে পরীর মতো পরমাসুন্দরী একটা মেয়েকে প্রায় খুন করে রেখে দিয়েছে একটা ইহুদী শয়তান।

কোতোয়াল সিপাইদের হুকুম করে, জলদী যাও, ঐ ইহুদী, তার সুন্দরী বাঁদী আর অন্যান্য যারা আছে তাদের সব্বাইকে ধরে বেঁধে নিয়ে এস এখানে।

কিছুক্ষণেই মধ্যেই সিপাইরা এসে ওদের ধরে নিয়ে গেলো কোতোয়ালের কাছে। জাইন-এর চেহারা দেখে কোতোয়াল তো হতবাক। ভাবতে পারে না—এমন রূপ এমন যৌবন কোনও মেয়ের হয় নাকি!

তোমার নাম কি বাছা? জাইন বলে,

আপনার বাঁদীর নাম জাইন, হুজুর।

—আর এই কদাকার জানোয়ারটা কে?

—'একটা ইহুদী, হুজুর। লোকটা আমার মা বাবার হেপাজত থেকে ছিনিয়ে এনেছে আমাকে। সর্বক্ষণ নিষ্ঠুর অত্যাচার করে আমার ওপর। নানারকম উৎপীড়ন চালায়, বলে ইসলাম ছাড়বি কিনা বল, না হলে চাবকে ছাল খুলে নেব।' কিন্তু আমার বাপ ঠাকুরদার স্বধর্ম, কী করে ত্যাগ করি, হুজুর? আমি রাজি হইনি। আর এই কারণেই সে আমার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে চলেছে।

এই বলে সে সলজ্জভাবে দেহের ওপরের কিছু অংশ অনাবৃত করে দেখায়। কোতোয়াল শিউরে উঠে। থাক থাক আমি বুঝতে পেরেছি।

জাইন বলে, হুজুর, আপনি এই কামার-ভাইকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এই ঘাটের মড়াটা তার কাছে কী প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলো। আমার হাতে পায়ে লোহার হাল গেঁথে দিতে চেয়েছিলো সে। আল্লাহ মেহেরবান, কামার-ভাই রাজি হননি ওর এই নৃশংস প্রস্তাবে। তা না হলে এতক্ষণ আমার কী দশা হতো একবার ভাবুন হুজুর।

জাইন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, আপনি আমার এই সখীদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, ওরা আপনাকে বলবে, আমি সাচ্চা মুসলমানের মেয়ে। আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে আমি মানি না। আমাদের পয়গম্বর মহম্মদ।

কোতোয়াল মেয়েদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী, সত্যি?

সবাই এক সঙ্গে জবাব দেয়, হ্যাঁ হুজুর, সত্যি।

তখন কোতোয়াল রোষ-কশায়িত চোখে ইহুদীর দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে, মনে হতে লাগলো, কোতোয়ালের রোষানলে বুঝি ভস্ম হয়ে যাবে ইহুদীটা।

—ওরে শয়তান, শঠ, আল্লাহর দূষমন এবার তোর মোউৎ সামনে। তার আগে জবাব দে, কেন এই মেয়েটিকে তার মা বাবার হেপাজত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিস? কেন

তার উপর এই রকম উৎপীড়ন চালিয়েছিস এতকাল? কেন তাকে ইসলামের পবিত্র পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করেছিলি, কেন তাকে তোদের ঐ ভয়ঙ্কর ম্লেচ্ছ বিধর্মের পথে টেনে নিয়ে যাবার জন্য প্রলোভন দেখিয়েছিস? কেন? কেন? জবাব দে।

ইহুদী বলে, মালিক, আমি আমাদের পবিত্র পয়গম্বর মুসা জ্যাকব এবং আবন-এর কসম খেয়ে বলছি, এই মেয়ে আমার ধর্মপত্নী।

কিন্তু কোতোয়াল সে কথা কর্ণপাত না করে গর্জে ওঠে, চোপ রও বেয়াদপ। এ্যাই—চাবুক লাগা শয়তানটাকে।

সিপাইরা ধাক্কা মেরে ইহুদীটাকে নিচে ফেলে দিয়ে এলোপাতাড়ি চাবুক চালাতে থাকে। একশোটা পায়ে, একশোটা পাছায় এবং একশো চাবুক ওর পিঠে মারা হয়।

কিন্তু তখনও লোকটা কাতরাতে কাতরাতে বলতে থাকে, ও আমার শাদী করা বিবি ধর্মপত্নী?

—ধর্মপত্নী? ধর্ম বলে তোদের কিছু আছে? ধর্মপত্নী! এই—যদি না স্বীকার করে ওর হাত আর পা কেটে ফেলে দে।

আতঙ্কে শিউরে ওঠে ইহুদী। তাকিয়ে দেখে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক উদ্যত-খড়্গ জহ্লাদ!

—না না, বাবা, কেটো না। কেটো না আমাকে। করছি—স্বীকার করছি—স্বীকার না করলে যখন রেহাই পাওয়া যাবে না তখন স্বীকার করছি ঃ এ আমার শাদী করা বিবি নয়। আমি এর মা-বাবার হেপাজত থেকে ছেনতাই করে এনে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার জন্য এর ওপর অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন করেছি এতকাল।

—হুম্, এই তো বাপের সুপুত্তুরের মতো কথা। সোজা আঙ্গুলে ঘি কিছুতেই উঠতে চায় না। এ্যাই—জানোয়ারটাকে কয়েদখানায় ছুঁড়ে দে। যা, ওখানে থাকগে—জিন্দগীভর। দেখগে, কী মজা! বিধর্মী ম্লেচ্ছ ইহুদীদের আমরা এই সাজাই দিই। আল্লাহর এই নির্দেশ। আমরা আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে স্বীকার করি না। আমাদের পয়গম্বর মহম্মদ।

জাইন কোতোয়ালকে সালাম জানিয়ে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসে। সেইদিনই সে সহিসদের বলে, তাঁবু গুটিয়ে বেঁধে ছেঁদে নাও আমি দেশে ফিরে যাবো।

তিন দিন চলার পর জাইন সদলবলে এক খ্রিস্টান পাদরীর গির্জার মঠের কাছে এসে পৌঁছায়। এই গীর্জা-মঠে জনার চল্লিশ পাদরী অবস্থান করে। এদের প্রধানের নাম দানিস!

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। সহিসরা জানালো এদিকটার পথ বড় দুর্গম। চোর ডাকাত এবং হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভীষণ উপদ্রব। যদি রাতের মতো কোথাও আশ্রয় নেওয়া যায়, ভালো হয়।

জাইন ভাবছিলো, কী করবে। এমন সময় ঐ গীর্জার মঠের সদরে দণ্ডারমান এক বৃদ্ধ পাদরীর আহ্বান কানে এলো। এই বিগত-যৌবন লোলচর্ম বৃদ্ধই পাদরী-পিতা দানিস। দেহ অপরাগ হলে কী হবে, অল্প বয়েসী ডবকা মেয়ে ছেলে দেখলে এখনও সে খলবল করে ওঠে। চোখে মুখে ফুটে ওঠে নোংরা বিকৃত কামনার লালসা। সারাদিন সে ফটকের পাশে একখানা কুর্শি পেতে বসে থাকে—পথের দিকে চেয়ে। উটের পিঠে চেপে যাত্রীরা যাতায়াত করে। বৃদ্ধ লোলুপ দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সহিস সর্দার বললো, মালকিন, খ্রীস্টান পাদরী সাহেব ডাকছেন! বলছেন রাতের বেলা এ পথে চলা নিরাপদ নয়। তাঁর গির্জেতে রাতটা কাটাতে বলছেন তিনি! মালকিন, ওরা তো খ্রীস্টান।

জাইন বলে, হোক খ্রীস্টান। আমরা তো শুধু রাতটা থাকবো। ওদের খাবো না,

ছোঁবো না। তাতে আর কী ক্ষতি হবে। চলো, উনি যখন ডাকছেন এখানেই থাকা যাক রাতের মতো।

সহিসরা মঠের প্রাঙ্গণে উটবাহিনীকে প্রবেশ করালো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো পঁয়ষট্টিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে।

বৃদ্ধ পাদরী-পিতা বিকৃত কামনার ফাঁদে ছটফট করতে থাকে। জাইনকে সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। তার রূপ-যৌবন পাগল করে তুলেছে তাকে। অবশেষে আর স্থির থাকতে না পেরে, সে তার এক চেলাকে দূত করে পাঠালো জাইন-এর কাছে। কিন্তু লোকটা জাইন-এর সামনে এসে আর কথা বলতে পারে না—তো তো করতে থাকে। জাইন তো হেসেই খুন। আসল ব্যাপার সে আগেই আঁচ করতে পেরেছিলো।

পাদরীটা কিছু না বলতে পেরে বৃদ্ধের কাছে ফিরে যায়। বৃদ্ধ আর একজনকে পাঠায়—জাইনকে রাজি করাতে। কিন্তু সেও জাইন-এর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। জাইন তাকে অট্টহাসিতে বিদায় জানায়। এইভাবে এক এক করে চল্লিশজন পাদরীই ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউই প্রস্তাবটা পাড়তে পারে না। অবশেষে কাম-কাতর বৃদ্ধ নিজেই এসে দাঁড়ায় জাইনের দরজায়। জাইন স্বাগত জানায় তাকে, এই যে আসুন, আসুন ঠাকুর্দা, আসুন! তা নাতনীকে না দেখে বুঝি ঘুম আসছিলো না।

বৃদ্ধা থতমত খেয়ে বলে, না মানে, হ্যাঁ, মানে—মানে—

খিল খিল করে হাসে জাইন, বুঝেছি, বুঝেছি। আমার বিরহ আর সইতে পারছেন না, এই তো? তা আজকের রাতটা একটু কষ্ট করে কাটান, কাল আপনার বাসনা পূরণ করে দেব, ঠাকুর্দা। পথের অনেক ধকল গেছে। আমার শরীরটা তেমন যুৎসই নাই। এ অবস্থায় তো মজা পাবেন না। সেইজন্যেই বলছি, কাল সকালে আসবেন, আমি আপনার বাঁদী হয়ে থাকবো। আজ তা হলে আসুন।

হুবুব এবং অন্যান্য সখীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলো জাইন, দ্যাখ—আমার মনে হচ্ছে, ঐ পালের গোদা বুড়ো পাদরীটা সারারাত ঘুমাবে না। আবার এসে আমাদের দরজা ধাক্কাবে। ঐ ইতরটার সামনে দাঁড়াতে আমার গা ঘিন ঘিন করছে। তার চেয়ে মরি-বাঁচি চলো, এখনি এই রাতেই, আবার রওনা হয়ে পড়ি।

সহচরীরাও সায় দিলো, সেই ভালো, ঐ নখ-দাঁত হীন ভালুকটার থাবায় না গিয়ে বরং পথের হিংস্র জানোয়ারদের হাতে প্রাণ খোয়ানো অনেক ভালো।

সেই রাতেই ওরা গীর্জা-মঠ ছেড়ে সকলের অজ্ঞাতসারে আবার পথে বেরিয়ে পড়ে!

আল্লাহর অপার করুণা, একদিন ওরা নিরাপদেই স্বদেশে পৌঁছে যায়। ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে হামামে গিয়ে ঘষে মেজে ভালো করে গোসল করে জাইন। হুবুবকে বলে, যা, আনিসকে ডেকে নিয়ে যায়।

এ পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত।

আনিস জাইনের শোকে না খেয়ে না ঘুমিয়ে কেঁদে নিজেকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছিলো। হুবুরকে দেখে সে অবাক হয়ে লাফিয়ে ওঠে, তোমার মালকিন?

হুবুব বলে, মালকিন ভালো আছেন। আজই আমরা ফিরে এসেছি। আপনি চলুন।

—তার স্বামী?

—সে নাই। কোতোয়াল তাকে কয়েদ করেছে—জীবন ভোর।

এরপর আনিস হাতে বেহেস্তে পায়। দৌড়ে নয়, বলা যায়—অপূর্ব ছন্দ তুলে নাচতে নাচতে এসে সে হাজির হয় জাইন-এর ঘরে।

জাইন তখন শাহজাদীর মতো জমকালো সাজ-পোশাক আর দামী রত্নাভরণে সেজেগুজে সামনে খানা সাজিয়ে বসেছিলো। আনিসকে দেখা মাত্র সে ছুটে গিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

—ইয়া আল্লাহ, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার!

আনিস হাসে, ও কিছু নয় দেখো, আবার দুদিনেই আগের মতো ঠিক হয়ে যাবো। মোক্ষম দাওয়াই যখন পেয়ে গেছি, তখন আর ওসব নিয়ে চিন্তা ক'রো না। এখন বল্ কেমন ছিলে? তোমার স্বামীর খবর কী—

—সে খতম হয়ে গেছে।

জাইন আগাগোড়া সব খুলে বললো।

—এবার আমাদের পথের কাঁটা দূর হয়েছে আনিস। এখন আর কেউ আমাদের ভালোবাসায় বাস সাধতে আসবে না। আমি তোমাকে শাদী করবো—এবং আজই রাতে।

সেদিন সন্ধ্যায় কাজী এবং সাক্ষীদের ডাকা হলো। শাদীনামা তৈরি করে সই-সাবুদ করে দিয়ে গেলো তারা।

এর পরের দৃশ্য বাসরঘর। সেখানে আর আজ যাবো না। গল্প এখানেই খতম।

শাহরাজাদ থামতেই দুনিয়াজাদ উঠে এসে গলা জড়িয়ে ধরে, কি সুন্দর কিস্‌সা দিদি, আর কী মিঠে করেই না তুমি বলতে জান।

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা যদি অনুমতি করেন এর পর তোমাদের সেই 'কড়ের বাদশাহ' কিস্‌সা শোনাতে পারি।

সুলতান শাহরিয়ার বলে, স্বচ্ছন্দে। তাছাড়া গল্পটা আমার অজানা।

একদিন খলিফা হারুন অল রসিদ তার উজির আমির অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে দরবারে কর্ম-নিরত ছিলেন। এমন সময় মহামূল্যবান মণি-রত্ন খচিত একটি সোনার কারুকার্য করা রক্তবর্ণের রত্নমুকুট হাতে নিয়ে হারেমের একটি ছোট্ট খোজা এসে দাঁড়ালো।

খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, কী সংবাদ , কে পাঠালো?

খুদে খোজাটা কুর্নিশ জানিয়ে বললো, ধর্মাবতার জুবেদা বেগমসাহেবা এটা পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে। এই মুকুটের মাথায় একটা খালি জায়গা দেখছেন—এখানে বসানো ছিলো এক অমূল্য রত্ন। আকারে এত বড় রত্ন সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, রত্নটি খোয়া গেছে। কিন্তু কী ভাবে গেছে তা খোঁজখবর করেও হদিশ পাওয়া যায়নি। বেগমসাহেবা এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য শহরের তাবৎ জহুরীদের দোকানে খোঁজ করেছেন। কিন্তু তেমনটি পাওয়া যায়নি। তাই শেষে নিরুপায় হয়ে তিনি এটি আপনার কাছে পাঠালেন। আপনি যদি চেষ্টা করে এর জুড়ি কোনও মণি-রত্ন সংগ্রহ করে বসিয়ে দিতে পারেন, তিনি খুব খুশি হবেন।

খলিফা বললেন, সর্বনাশ, জুবেদার ঘরে চুরি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

উজির-আমির ওমরাহদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, তোমরা মুকুটটা ভালোর করে পরীক্ষা করে দেখে যাও। দেখ, যদি তোমাদের কারো ঘরে থেকে থাকে এর জুড়ি কোনও রত্ন, তবে যে দামেই হোক আমি কিনে নিতে চাই।

আমির ওমরাহরা নিজেদের প্রাসাদে গিয়ে অনেক খুঁজে-পেতে দেখলো। কিন্তু না, কারো প্রাসাদেই ঐ ধরনের কোনও রত্নের সন্ধান পাওয়া গেলো না।

খলিফা উজিরকে বললেন, শহরের সব ধনী সওদাগরদের বাড়ি তল্লাশ করে দেখ, যদি মেলানো যায়।

কিন্তু না, উজিরের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো। অত দামী এবং অত বড় রত্ন কারো কাছেই পাওয়া গেলো না।

খলিফা চিন্তিত, ঈষৎ বিরক্ত হলেন, আমি তামাম দুনিয়ার মালিক, আর আমার বেগমের সামান্য এই সাধ পূরণ করতে পারবো না আমি?

এমন সময় এক বণিক এসে বললো, ধর্মাবতার, এই রকম একখানা মহামূল্য রত্ন বসরাহর এক যুবকের কাছে আছে।

খলিফা জিজ্ঞেস করেন, তার নাম?

—তার নাম কুড়ের বাদশা আবু মহম্মদ। লোকে তাকে শুধু কুড়ের বাদশা বলেই জানে। তবে অন্য কারো কাছে সে বিক্রী করবে না সে রত্ন। একমাত্র মহামান্য ধর্মাবতার চেষ্টা করলেই তা পেতে পারেন।

তখুনি খলিফা উজিরকে বললেন, তাহলে আর বিলম্ব নয়, জাফর। তুমি বসরাহর সুবাদারকে চিঠি পাঠাও। যে ভাবেই হোক, ঐ রত্নটি আমার চাই।

এই সময় প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো সাতষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বসরাহর সুবাদার জুবাইদি। জাফর তাকে চিঠি লিখে মাসরুরের হাতে পাঠিয়ে দিলো।

আবু মহম্মদের প্রাসাদে পৌঁছে মাসরুর দ্বাররক্ষীকে বললো, তোমার মালিককে খবর দাও, বাগদাদ থেকে খলিফার দূত এসেছে। এখনি তাকে বাগদাদে যেতে হবে। খলিফা তাকে তলব করেছেন।

দ্বাররক্ষী অন্দরে চলে গেলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলা যায়, স্বয়ং আবু মহম্মদ বাইরে বেরিয়ে এসে সালাম জানিয়ে স্বাগত অভ্যর্থনা করলো, মহামান্য ধর্মাবতারের দূত, আপনি মেহেরবানী করে এক পলকের জন্য ভেতরে এসে ধন্য করুন।

মাসরুর বলে, না না, সে সম্ভব নয়। আর এক মুহূর্ত দেরি করতে পারবো না, ধর্মাবতার আপনাকে তলব করেছেন! এখুনি যেতে হবে। তৈরি হয়ে নিন।

আবু মহম্মদ বিনয়াবনত হয়ে বলে, শাহেনশাহর আদেশ আমার শিরোধার্য। আমি এখুনি রওনা হবো। কিন্তু তার জন্যে তো কিছু গোছগাছ করে নিতে হবে আমাকে। সেইটুকু সময় আপনি আমার এই গরীবখানায় একটু পায়ের ধুলো দিন।

মাসরুর আর না করতে পারে না। সদলে অন্দরে প্রবেশ করে। বৈঠকখানায় ঢুকেই মাসরুরের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। একি কাণ্ড! এত জাঁকজমক, এমন মহামূল্যবান পর্দা গালিচা, আসবাবপত্র সে তার খলিফার প্রাসাদেও দেখেনি কখনও। চারদিকে সুন্দর সুন্দর শৌখিন জিনিসপত্র ছবির মতো করে সাজানো গোছানো। টেবিলের ওপর রাখা ছিলো দুষ্প্রাপ্য অমূল্য মণিরত্নের হার এবং অন্যান্য রত্নাভরণ।

আবু মহম্মদ বললো, আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যদি কিছু মনে না করেন হামামে চলুন। গোসলাদি করে শরীরটাকে একটু ঝরঝরে করে নিন।

মাসরুর ভাবে, কথাটা মন্দ বলেনি। সারা পথের ধুলোবালিতে গা-হাত-পা কিচ কিচ করছে। একটু গোসল করে নিলে মন্দ হয় না।

হামামে ঢুকে মাসরুরের তাক লেগে যায়। হামাম না বেহেস্ত, ঠিক বুঝতে পারে না সে। স্বপ্নেও এ দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। সব মিলে সুললিত কাব্যের মতো মনে হয় তার কাছে।

হামাম থেকে ফিরে মাসুরুর দেখে, একখানা বড় টেবিলে খানাপিনা সাজানো হয়েছে। অসংখ্য অগণিত রেকাবী ভর্তি জানা-অজানা নানারকমের নানা স্বাদের খানা।

আবু মহম্মদ হাত জোড় করে বলে, মেহেরবানী করে যদি কিছু গ্রহণ করেন, আনন্দিত হবো।

মাসরুর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে করে পেটপুরে খেলো।

এরপর পাঁচটি কিশোর পাঁচখানা সোনার থালায় করে নিয়ে এলো পাঁচটি মোহরের তোড়া। প্রতিটি এক হাজারের। আবু মহম্মদ বলে, আমার এই সামান্য উপহার গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন, ধর্মাবতারের বান্দা।

এছাড়াও সূক্ষ্ম কারুকার্য করা নানা রত্নখচিত একটি সাজ-পোশাক তুলে দিলো সে মাসরুরের হাতে।

—গরীবের এই সামান্য দানটুকু প্রত্যাখ্যান করবেন না, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

মাসরুর খুব খুশি মনে নিলো।

এর পর ওরা বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করে।

খলিফা সাদরে কাছে বসালেন আবু মহম্মদকে। বললেন, আমি শুনেছি, তামাম আরব দুনিয়ার আমির বাদশাহের কাছে যে রত্ন-মণি-মাণিক্য নাই, তা তোমার কাছে আছে।

মহম্মদ সবিনয়ে বলে, ধর্মাবতার ঠিকই শুনেছেন। যদিও আপনার দূত আমাকে কোনও আভাষ দেয়নি তবু আমি বুঝেছিলাম, কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হয়তো আপনি কোনও দুষ্প্রাপ্য রত্নের সন্ধান করছেন। কিন্তু আমার কাছে যে সব অমূল্য মণিরত্ন আছে, পয়সার বিনিময়ে তা আমি কোনও জহুরী বা ব্যবসাদারের কাছে বিক্রি করি না। তবে জাঁহাপনার যদি কোনও কাজে লাগে, সাগ্রহে আমি দিয়ে যাবো। এই কারণে, আমি নিজে থেকেই দুটি বাক্স করে কিছু মণিরত্ন নিয়ে এসেছি আপনার জন্য। আপনার পছন্দ মতো বেছে নিয়ে আমাকে ধন্য করুন ধর্মাবতার।

এই বলে আবু মহম্মদ একটি থলে থেকে সোনার একটি বাক্স বার করে তার ডালা খুলে ধরলো।

খলিফা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, হীরে চুনী, পান্না মুক্তো, রক্তরাগমণি, পদ্মরাগমণি প্রভৃতি নানারকম বহু বিচিত্র বর্ণের মণি-মাণিক্য ঝকমক করছে। আবু মহম্মদ বললো, ধর্মাবতার এগুলোর আকার এবং প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করুন। এবং আপনার সংগ্রহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন সুলতান বাদশাহদের সংগৃহীত রত্নাবলীর সঙ্গে এর ফারাক কোথায়। আমি বাজি রেখে বলতে পারি জাঁহাপনা, এই বাক্সে যা দেখছেন তার সমতুল্য আর একটিও কোথাও খুঁজে পাবেন না। এবং সবিনয়ে বলছি, এ সবই আপনার জন্য এনেছি, গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

আবু মহম্মদ এর পর একটি বাক্স বের করে। সে বাক্সের ডালা তুলতেই দেখা গেলো, একটি সোনার গাছ। তার কাণ্ড শাখা সব সোনার। পাতাগুলো পান্নার আর ফলগুলো সব হীরে রক্তরাগমণি নীলকান্তমণি বৈদুর্যমণি প্রভৃতি নানা অমূল্য রত্নের তৈরি। গাছের শাখায় অনেক পাখি। সবই সোনার। ঠোঁট এবং চোখগুলোয় রত্ন বসানো।

খলিফা এবং তাঁর পরিষদরা হাঁ হয়ে দেখতে থাকেন। এমন অদ্ভুত বস্তু তারা কেউ

কখনও দেখেনি। আবু মহম্মদ বললো, ধর্মাবতার খুবই অবাক হচ্ছেন, মনে হচ্ছে। কিন্তু আরও অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার আছে।

এই বলে সে বাক্সটার মধ্যে হাত রেখে গাছটিকে মৃদু নাড়া দিতেই পাখিগুলো গান গেয়ে শিস দিয়ে নাচতে থাকলো। নাচতে নাচতে তারা এ ডাল থেকে সে ডাল, সে ডাল থেকে আবার অন্য ডালে হুটোপুটি করতে থাকলো।

খলিফা মন্ত্রমুগ্ধের মতো হতবাক হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। সভাসদরাও বিস্ময়ে স্তব্ধ। সারা দরবারকক্ষে নেমে আসে গভীর নিস্তব্ধতা। বাস্তবে ভাবা দূরে থাক, এযাবৎ কেউ কখনও এ বস্তু স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

খলিফা বললেন আচ্ছা আহম্মদ, তোমার সম্বন্ধে যা খোঁজখবর সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে তো পৈতৃক সূত্রে এসব তুমি পাওনি। তোমার বাবা বসরাহর এক হামামের অতি সাধারণ ভিস্তিওলা ছিলো মাত্র। সে যা রোজগার করতে পারে তাতে পরিবার প্রতিপালন করে তেমন কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তোমার বাবার বাবাও নিতান্তই সাধারণ গরীব-সরীব মানুষ ছিলো। সুতরাং এই অমূল্য সম্পদ বংশগতভাবে তুমি পাওনি, এ আমি সুনিশ্চিত। এরপর আরও মজার কথা, সারা বসরাহতে তুমি কুড়ের বাদশাহ নামে বিখ্যাত। ওখানকার মানুষ তোমাকে কখনও পথে ঘাটে বেরোতে বা কোন কাজ কাম কি ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও ধান্দা করতে দেখেনি কখনও। এমতাবস্থায় এই বিশাল ধনরত্নের মালিক তুমি হলে কী করে?

আবু মহম্মদ বলে, আপনার সব জানাই সত্যি, ধর্মাবতার। আমরা বংশানুক্রমে ভীষণ গরীব ছিলাম। আমার বাবা হামামে জল দেবার কাজ করে যে সামান্য পয়সা রোজগার করতো তাতে দুবেলায় নুন-রুটির সংস্থানও হতো না সব দিন। আমার বাবা যখন মারা যায় সে সময় আমি নিতান্তই শিশু। পেটের দায়ে মা অন্য বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে আমাকে প্রতিপালন করতো।

জন্মাবধি আমি কুড়ে। সারা দিন-রাত শুয়ে শুয়ে কাটাই। এমনকি মা আমাকে খাইয়ে না দিলে উঠে বসে খানাপিনা করারও কোনও স্পৃহা হতো না আমার। এমনও দিন গেছে, আমি হয়তো বাড়ির দাওয়ায় শুয়ে আছি। বেলা বেড়েছে, সুর্যের খরতাপ আমার গায়ে লেগে দগ্ধ করছে। সামান্য একটু পাশ ফিরে শুতে পারলে সূর্য-তাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার এমন কোনও শক্তি বা ইচ্ছা নাই যাতে একটু পাশ ফিরে শুতে পারি।

এই রকম আরও অনেক কাহিনী আপনাকে শোনাতে পারি, ধর্মাবতার। এবং সে সব অবিশ্বাস্য কুড়েমির কাহিনী শুনে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন। সে কথা থাক। মোটের পর, আমার মতো কুড়ে অকর্মা বোধ করি সারা দুনিয়ায় দুটি ছিলো না।

অন্যের বাড়িতে কাজ সেরে একদিন দুপুরে ফিরে এসে মা আমাকে বললেন বাবা মহম্মদ, ও -পাড়ার মুজাফ্‌ফর শেখ আজ বাণিজ্যে যাচ্ছে। শুনলাম, চীন দেশে যাবে। অনেক লোক অনেক কিছু আনার জন্য পয়সা কড়ি দিচ্ছে। তা আমার কাছে মাত্র পাঁচটা দিরহাম আছে। তুই শেখ সাহেবকে এই দিরহাম কটা দিয়ে বলে আয় বাবা, সে যেন চীন দেশ থেকে যা হোক কিছু একটা জিনিস কিনে আনে আমাদের জন্য। আল্লাহ যদি দেন তা থেকেই দু পয়সা নাফা হতে পারবে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তুমি কী যে বলো মা, এখন আমার দারুণ ঘুম পেয়েছে। ফিরে শুতে পারছি না, তা আবার মুজাফ্‌ফর শেখের বাড়ি যাবো, না, না, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

মা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললো, না করিস নে বাবা, শুনেছি, চীন দেশ থেকে যারাই ফিরেছে বিরাট বড় লোক হয়ে গেছে। কে জানে, আমাদের বরাত খুলে যেতে পারে।

আমি বললাম, তোমার যেমন কথা, ঐ সামান্য পাঁচটা দিরহামের সওদায় তুমি কী এমন হাতী ঘোড়া লাভ করতে পারবে। বাণিজ্য করতে হলে মূলধন দরকার, বুঝলে? ওসব

ফালতু আকাশ-কুসুম আশার চিন্তা মাথা থেকে সরাও তো মা। যাও, এখন আর বিরক্ত করো না। আমাকে শান্তিতে একটু ঘুমাতে দাও।

মা এবার কড়া হলেন। দেখ আবু, পরের বাড়িতে এইভাবে ঝি-গিরি আর করতে পারি না। বয়স হয়েছে, সোমত্ত ছেলে, একটা রোজগার-পাতির ধান্দা দেখ। এইভাবে তোমাকে আর আমি শুইয়ে শুইয়ে খাওয়াতে পারবো না।

আমি প্রমাদ গুণলাম। মা যদি সত্যি সত্যিই আমাকে খেতে না দেয়, আমি অনাহারে উপোস করে মরবো। কারণ, কাজ করা অনেক দূরের কথা, পাশ ফিরে আমি নড়তে পারি না। ভয়ে ভয়ে বললাম, তা কতদূর—কোথায় যেতে হবে?

মা হাসিতে ঝলমল করে উঠলো, এই কাছেই, বাবা। শেখ সাহেব জাহাজে মালপত্র তুলছে—একটু পরেই ছেড়ে চলে যাবে। এই তো সামান্য পথ—বাজারের পাশেই বন্দর।

আমি বললাম, তাহলে আমার হাতখানা একবার ধরে তুলে বসাও, দেখি।

মা আমার শরীরটাকে খাটের ওপর বসিয়ে দিলো। বললো, চলো, বাবা চলো।

আমি বললাম, আরে, বলছি তো যাবো। কিন্তু আমার চটি জোড়া কোথায়?

—এই তো পায়ের নিচেই রয়েছে। নে পরে নে।

—বাঃ রে, আমি পরতে পারি নাকি। তুমি আমাকে পরিয়ে দেবে তো!

মা নিজে হাতে আমার চটি জোড়া ঢুকিয়ে দিয়ে বললো, তাড়াতাড়ি চলো। শেখ সাহেব জাহাজ ছেড়ে চলে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে।

আমি বললাম, হুঁ, কী আমার লাখ-পঞ্চাশের সওদার ওয়াদা। তা আবার মাটি হয়ে যাবে।

মা এবার ক্ষুব্ধ হন, দেখ মহম্মদ, না হয় আমরা গরীব, তা বলে কোনও আশাই ছোটো নয় রে। আল্লাহ যদি এই পাঁচ দিরহামের বদলে আমাকে সাত দিরহামও ফিরিয়ে দেন—আমার মন ভরে যাবে।

আমি বললাম, তা তো হলো, এখন মাটিতে পা রাখবো কী করে?

মা বললো, আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়া, বাবা। আমি তোকে ধরে নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছি।

বন্দরের পথে যেতে যেতে অনেকে আমায় দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, কী ব্যাপার আবু মহম্মদ তুমি?

আমি বলি, আর বলো কেন, পাগল মা-এর আব্দার এড়াতে পারলাম না।

বন্দরে এসে দেখলাম, সব ঠিকঠাক। জাহাজ ছাড়বো ছাড়বো করছে। মুজাফফর শেখকে ঘিরে পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবরা শেষ বিদায় জানাতে ব্যস্ত। আমাকে দেখে শেখ সাহেব বললো, আরে, মহম্মদ না! কত কাল তোমাকে দেখিনি বাবা। তা কী খবর বলো।

আমি সেই পাঁচটা দিরহাম ওর হাতে দিয়ে বললাম, আপনি চীন দেশে যাচ্ছেন মা আপনাকে এই দিরহাম ক'টা দিয়ে বলেছে, আপনার পছন্দ মতো যাহোক কিছু একটা জিনিস নিয়ে আসবেন আমাদের জন্য। অবশ্য আপনার যদি কোনও অসুবিধা না হয়।

শেখ মুজাফফর বললো, অসুবিধা হলেও তা করবো, বাবা। তোমার বাবা আমার অন্তরঙ্গ দোস্ত ছিলেন। তার মতো সাচ্চা মানুষ বড়ো একটা হয় না। যাই হোক, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমার পছন্দ মতোই নিয়ে আসবো একটা জিনিস।

জাহাজ ছেড়ে চলে গেলো।

এর পরের কাহিনী বড় মজার। মুজাফফর সাহেব তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সারা চীন দেশ ঘুরে নানারকম

ব্যবসা-বাণিজ্য করে অনেক লাভের টাকা থলেয় ভরে আবার একদিন জাহাজে উঠে বসলো। জাহাজ চলতে থাকলো বসরাহর দিকে।

হঠাৎ মুজাফফ্‌র সাহেবের খেয়াল হলো, আমার জন্যে কিছু কেনা হয়নি। রুমালের খুঁটে সেই পাঁচটা দিরহাম যেমন বাঁধা ছিলো, তেমনি বাঁধা পড়ে আছে। শেখ সাহেব কপাল চাপড়াতে লাগলেন, ইয়া আল্লাহ! একী করলাম! আমার এত কালের প্রাণের দোস্ত—তার ছেলে বৌকে আমি কথা দিয়ে এসেছি। সেই কথার খেলাপ হয়ে যাবে। না না, সে হয় না। তোমরা জাহাজ ফেরাও। আমি আবার চীনের বন্দরে নামবো। মহম্মদের জন্যে সওদা আমাকে করতেই হবে।

সঙ্গীরা অনেক বোঝালো, পাঁচটা তো মোটে দিরহাম, ওতে কী বা সওদা হবে, আর তা থেকে নাফাই বা কী হতে পারবে? এর জন্যে আপনি আবার এতটা পথ ফেরত যাবেন? কতদিন আমরা দেশ ছাড়া, মন আকুল হয়ে উঠেছে। এই সময় আরও দেরি হয়ে যাবে না?

শেখ বললেন, কিন্তু কী করা যাবে। আমি ওয়াদা করে এসেছি তাদের কাছে। তোমরা কী চাও, আমি মিথ্যেবাদী হই?

একজন বলে, মিথ্যেবাদী হওয়ার কথা উঠছে কেন? সে তো দিরহাম কটা দিয়েছিলো, কিছু সওদা করে আনতে। এবং সে সওদা বসরাহয় বিক্রি করে দু পয়সা নাফা করতে। তা আমরা যদি ঐ পাঁচ দিরহামের বদলে ওকে পুরো পাঁচটা দিনারই দিয়ে দিই—তাতেও কি সে খুশি হবে না? আপনি কি বলতে চান শেখ সাহেব, পাঁচটা দিরহাম খাটিয়ে সে পাঁচ দিনার নাফা করতে পারবে কখনও?

শেখ বললেন, তা হয়তো পারবে না। কিন্তু আমি তো মিথ্যেবাদী হয়ে থাকবো। সওদা কিছু না করেই যদি তাকে লাভের পয়সা হিসাবে পাঁচটা মোহর গুণে দিই তবে কী ইনসাফের দিক থেকে তা ঠিক হবে?

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো আটষট্টিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এ কথার পর আর কেউ কথা বলতে পারে না। আবার জাহাজ ফিরে চলে চীন-বন্দরের দিকে।

কয়েকদিন পরে চীনের বন্দরে জাহাজখানা আবার গিয়ে ভিড়লো। শেখ মুজাফ্‌ফর বললো, তোমরা সকলে জাহাজেই অপেক্ষা করো। আমি সওদাটা সেরে আসি।

জাহাজ থেকে সবে শেখ সাহেব মাটিতে পা দিয়েছে ঠিক সেই সময় এক থুর থুরে বুড়ি একটা বুড়ো হ্যাংলা বাঁদরকে পেটাতে পেটাতে নিয়ে এলো তার কাছে।

—হ্যাঁ-গা পরদেশি, কিনবে এই বাঁদরটা? একেবারে জলের দামে দিয়ে দেব?

বুড়িটার প্রস্তাব শুনে মুজাফ্‌ফর একটুক্ষণ চিন্তা করে বলে, কিন্তু মাত্র পাঁচটা দিরহামের সওদা আমার বাকী। আর সব হয়ে গেছে। তা পাঁচ দিরহামে দেবে কী তোমার এই বাঁদর?

বুড়িটা গদ গদ হয়ে বলে, খুব দেব, খুব দেব। তা পাঁচ দিরহামই আমার লাভ। এই নাও বাঁদর।

ব্যস, আর বেশি দূরে যেতে হলো না। শেখ মুজাফ্‌ফর বাঁদরটাকে নিয়ে জাহাজে এসে উঠলো।

আবার জাহাজের মুখ ফেরানো হলো। এবারে আর কোথাও থামা নয়। সোজা বসরাহ।

কিন্তু এক জায়গায় এসে অল্পক্ষণের জন্যেও থামতে হলো।

একটা ছোট্ট দ্বীপ। চার পাশে সমুদ্র। সেই দ্বীপের কিনারে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে জাল ফেলছিলো। এক সময়ে সে একবার মাছের সঙ্গে একটা মুখ বাঁধা থলে তুললো।

থলেটার মুখ খুলে মাটির ওপরে উপুড় করে ঢালতেই দেখা গেলো রাশি রাশি হরেক রকমের সব পাথর।

বাঁদরটা সব লক্ষ্য করলো। তারপরে আকারে ইঙ্গিতে কী যেন বোঝাতে চাইলো শেখ সাহেবকে। শেখ সাহেব ইঙ্গিত ইশারায় বলতে চাইলো—সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তখন বাঁদরটা বিরাট একটা লাফ দিয়ে পড়লো সমুদ্রের জলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেলো নিচে।

শেখ ভাবলো, বাঁদরটার মাথায় ছিট আছে। না হলে এই গহিন দরিয়ায় ঝাঁপ দেয় কখনও?

কিন্তু একটু পরেই সে উঠে এলো। হাতে একটা মুখ-বাঁধা থলে। বাঁধন খুলে থলেটা উপুড় করে দিলো। তাজ্জব ব্যাপার! নানারকম হীরে জহরতের একটা স্তূপ জমে উঠলো।

বাঁদরটা আবার ঝাঁপ দিলো জলে। আবার সে তুলে আনলো আর একটা থলে। সে থলেও হীরে চুনী পান্না মুক্তো এবং অমূল্য সব মণি-মাণিক্যে ভরা।

এইভাবে সে পর পর অনেকবার ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেকগুলো থলে তুলে নিয়ে আসে।

বসরাহর বন্দরে জাহাজ ভিড়লো। সারা শহরের লোক ভেঙ্গে পড়লো। চীন থেকে কি বাণিজ্য করে নিয়ে এসেছে শেখ মুজাফ্‌ফর। দেখার জন্য দলে দলে মানুষ এসে ভীড় করতে লাগলো বন্দরে।

কিন্তু আমি গেলাম না। মা বললো, খবর পেলাম, শেখ সাহেবের জাহাজ ভিড়েছে। তা যা না বাবা। তার সঙ্গে দেখা করে আয়। দেখ গে, আমাদের জন্য কী সওদা সে এনেছে।

আমি বললাম, তোমার আর ধৈর্য মানছে না, মা। দিয়েছো তো ভারি পাঁচটা দিরহাম। তাতে কী এমন হাতী ঘোড়া আনবে সে? ঠিক আছে, নিজের কাজে যাও। যদি কিছু এনে থাকে, বহুত শেরিফ আদমী সে, নিশ্চয়ই তোমার ঘরেই পৌঁছে দেবে।

মা মুখ বেজার করে বক বক করতে চলে যায়। একেবারে কুড়ের বাদশা—

একটু পরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। সর্বনাশ, মা বাড়িতে নাই। এখন কী উপায়? দরজা খুলে দেবে কে? আমি তো উঠতে পারবো না।

আরও জোরে জোরে নাড়তে থাকে কড়া। বাইরে থেকে কে যেন বেশ গলা চড়িয়েই হাঁকছে, কই গো, আবু আহম্মদ, শিগ্গির দরজা খোল, আমি মুজাফ্‌ফর—তোমার চাচা। দেখ, তোমার জন্য কী এনেছি।

আমি কান পেতে উন্মুখ হয়ে শুনি! আরে চাচা মুজাফ্‌ফরের গলা না? হঠাৎ আমার জড়তা কেটে যায়। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াই। প্রায় ছুটে গিয়েই দরজা খুলে দিই।

চাচা মুখ ভরা হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকলো, তা তোমরা সব ভালো আছ বাবা?

—ভালোই আছি চাচা। আপনি কেমন ছিলেন?

—ভালো—খুব ভালো। তা শোনো, তোমার জন্যে এই বাঁদরটা এনেছি। পাঁচ দিরহাম দাম নিয়েছে।

মেজাজটা কেমন খিঁচড়ে গেলো আমার। শেষ পর্যন্ত একটা বাঁদর! নিজেদের খেতে জোটে না—তার মধ্যে আর এক ভাগীদার? মনে মনে মা-এর উপর ভীষণ চটে উঠি।

এমন সময় জাহাজের খালাসীরা কতকগুলো মাল বোঝাই বস্তা এনে রাখলো আমার ঘরের সামনে। মুজফ্‌ফর সাহেব আমার নির্বোধ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এসবও তোমার?

—আমার? তবে যে আপনি বললেন চাচা, বাঁদরটার দামই পাঁচ দিরহাম লেগেছে?

—হ্যাঁ বাবা, তা তো বলেছি। এবং সত্যিই পাঁচ দিরহাম দাম নিয়েছে ওর আগের মালকিন সেই চীনা বুড়িটা।

আমি আরও অবাক হই, তবে এই বস্তার মালগুলো কিনলেন কী দিয়ে?

—ওগুলো তো কিনিনি, বাবা!

—তবে?

—ওগুলো এই বাঁদর রোজগার করেছে বাবা।

—রোজগার করেছে? ঐ বাঁদরটা?

আমার আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

তখন মুজাফ্‌ফর চাচা সব বৃত্তান্ত আমাকে খুলে বললো।

—এ সবই তোমার হকের ধন। নাও ভালো করে যত্ন করে তুলে রাখ। জীবনে সৎপথে থেকে তোমার বাবা অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে গেছে। তোমার মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে তোমাকে পালন করছে। অথচ কত লোক লোক ঠকিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে।

তবে এও ঠিক বাবা, সৎপথে অবিচল থাকা বড়ো কঠিন, কিন্তু কষ্ট করে চলতে পারলে আল্লাহ তার ইনাম দেন।

আমাদের দিন ফিরে গেলো।

সামান্য দুএকখানা জহরত বিক্রি করে আমি প্রভূত অর্থ পেলাম। সেই অর্থে বসরাহর সম্ভ্রান্ত এলাকায় একখানা প্রাসাদ এবং অন্যান্য আসবাবপত্র কিনলাম। আমার প্রাসাদে যাঁরা পায়ের ধুলো দেন, তাঁরা সবাই অবাক হয়ে যান। অত দুষ্প্রাপ্য পর্দা গালিচা আসবাব এবং বিলাসের সামগ্রী নাকি কোনও সুলতান বাদশাহর প্রাসাদেও নাই। তবে বিশ্বাস করুন ধর্মাবতার, সে সব সংগ্রহ করতে এই ধরনের একটি দুটি মাত্র মণি-রত্ন আমাকে বিক্রি করতে হয়েছিলো। তারপর থেকে ঠিক করেছি আর একটিও বেচবো না। সারা দুনিয়ার জহুরী বণিকরা আমার প্রাসাদে নিত্য ধর্ণা দেয়। এক একটা রত্নের জন্য এমন এমন সব দামের লোভ দেখায়—যে-কোনও লোকই প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের নগদ অর্থের কোনও প্রয়োজন নাই। যারা আসে, এক কথায় তাদের বিদায় করে দিই—না বিক্রি করবো না। কিন্তু ধর্মাবতার, আপনি আমাদের মালিক। আপনি যদি এগুলো গ্রহণ করেন, আমি ধন্য হবো। তবে সবিনয়ে বলছি, কোনও মূল্যের বিনিময়ে আমি এর একটিও বিক্রি করবো না। মেহেরবানী করে আমাকে কোনও ইনাম দিতে চাইবেন না।

খলিফা বললেন, বেশ, তাই হবে। কিন্তু সেই বাঁদরটা কোথায়, সে এখন তোমার কাছে আছে?

—না ধর্মাবতার। তাহলে বাকীটুকুও বলি শুনুন। মুজাফ্‌ফর চাচা বাঁদরটা আমার হাতে দিয়ে বলে গিয়েছিলো, বেটা, এই জানোয়ারটা বড় পয়মন্ত—কোনও অনাদর বা অত্যাচার করো না একে।

আমি বললাম, আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে মানবো চাচা। আমারও মনে হয়েছে, এ সাধারণ কোনও বাঁদর নয়।

পরের বাড়ির কাজ সেরে মা ফিরে এলে জড়িয়ে ধরে বললাম, মা, তুমি দিন রাত আমাকে কত গঞ্জনা দিয়েছো—কেন কাজ-কর্ম করি না, কেন কুড়ের বাদশা হয়ে শুয়ে শুয়ে দিন কাটাই। কিন্তু আমি তোমাকে কী কথা বলতাম, মা? বলতাম, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। তবে একনিষ্ঠ মন নিয়ে সেই আল্লাহর ওপর ভরসা রেখেই চলতে হবে। তা দেখ, আমার কথা তো ফলে গেলো?

মা বললো, তুই ঠিক কথাই বলিছিলি বাবা, সত্যিই আল্লাহ যাকে দেন ছপ্পর ফুঁড়েই দেন। তা না হলে এই জিনিস আমরা পাই কখনও?

যাই হোক, দারুণ ভোগ-বিলাসের মধ্যে দিন কাটতে লাগলো। বাঁদরটাকে আমি

একটা সোনার সিংহাসনে বসিয়ে রাখি। তার চার পাশে চারজন বাঁদী সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে তার হুকুম তামিল করার জন্য।

আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, ধর্মাবতার, এই বাঁদরটা আসার পর থেকে আমার সব কুড়েমি এক নিমেষে কেটে গিয়েছিলো। নতুন কর্মোদ্যমে মেতে উঠলাম আমি। বসরাহর বাজারে দোকান কিনলাম। বাগ-বাগিচা জমিজমা যেখানে যা ভালো কিছু পেলাম সব এক এক করে কিনে নিতে থাকলাম। এখন আমি ব্যস্তবাগীশ মানুষ। এত কাজের চাপ, নাওয়া-খাওয়ার সময় পাই না প্রায়।

যাই হোক, বাঁদরটার প্রতি আমার প্রখর দৃষ্টি ছিলো সদা সর্বদা। যেখানেই যাই, ওকে সঙ্গ ছাড়া করি না। আমি যা খাই ওকেও তাই খেতে দিই। এইভাবে দারুণ সখ্য গড়ে উঠেছিলো ওর সঙ্গে। যদিও মুখে কথা বলতে পারতো না, কিন্তু কাগজ কলম দিলে সে তার মনের কথা লিখে জানাতে পারতো।

একদিন আমরা দুজনে প্রাসাদে বসে আছি, এমন সময় বাঁদরটা আমাকে ইশারায় জানালো কাগজ কলম দিতে। আমি কাগজ কলম ও দোয়াত এনে দিলাম। সে লিখলো, 'আবু মহম্মদ, বাজার থেকে একটা সফেদ রঙের মোরগ কিনে এনে দাও আমাকে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গেলাম। কী আশ্চর্য, সারা বাজার ঢুঁড়ে একটি মাত্রই সাদা মোরগ পেলাম। যে দাম চাইলো, সেই দামেই কিনে নিয়ে এলাম। ঐ সময় বাঁদরটা আমার ফুলবাগিচার মধ্যে বসেছিলো। দেখলাম ওর থাবায় ধরা একটা সাপ।

আমার হাত থেকে মোরগটা নিয়ে সে সাপের সামনে ছেড়ে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে গেলো তুমুল লড়াই। সে যে কী লড়াই, কেমন করে বোঝাই আপনাকে। সাপটা চেষ্টা করলো লেজটা জড়িয়ে মোরগটাকে আছড়ে মেরে ফেলতে আর মোরগটা চেষ্টা করতে লাগলো ওর গলাটা খামচে ধরতে। শেষ পর্যন্ত মোরগেরই জিত হলো। এক সময় সাপের গলাটা খামচে ধরে ঘায়েল করে ফেললো সে।

সাপটা মরে গেলো। কিন্তু মোরগরা সাপ খায় না।

এরপর বাঁদরটা মোরগটাকে দু'হাতে ধরে ডানা দুখানা ছিঁড়ে ফেললো। পালকগুলো একটা একটা করে বাগানের চারপাশে পুঁতে দিলো। এবং মোরগের ছাল ছাড়ানো দেহটা বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত খুঁড়ে কবর দিয়ে রাখলো।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো একাত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে

এরপর বাঁদরটা বিরাট এক চিৎকার তুলে লাফ দিয়ে ওপরে ওঠে গিয়ে আকাশ পথে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর কখনও ফিরে আসেনি।

কিন্তু বাঁদরটা শূন্যপথে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগানের চারপাশে পুঁতে রাখা সেই পালকগুলোর প্রত্যেকটি এক একটা এই রকম সোনার ডালপালাওলা গাছ হয়ে গেলো। তাদের পাতাগুলো এই রকম পান্নার এবং ফলগুলো সব একই রকমই হীরে-মুক্তো মণি মাণিক্যের।

বাগানের মাঝখানে যেখানে মোরগের দেহটা কবর দেওয়া হয়েছিলো, সেখানে গজিয়ে উঠলো এক বিশাল মহীরুহ। এবং তারও কাণ্ড ডালপালা সোনার। পাতা পান্নার। ফলগুলো এইরকম হীরে জহরতের। কিন্তু সে তো অনেক বড়ো বৃক্ষ। সামান্য বাক্সে ভরে আনা সম্ভব নয়। ধর্মাবতার যদি ইচ্ছা করেন, ওটাও আপনাকে দিতে পারি আমি।

খলিফা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলেন। জাফরকে বললেন, জাফর এ কাহিনী আগামী দিনের মানুষের জন্য সোনার অক্ষরে লিখে রাখা দরকার।

জাফর বললো, ধর্মাবতারের যেরূপ অভিরুচি।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামে। সুলতান শারিয়ার বললো, এ কাহিনীর সার কথা বড়ো সুন্দর।

শাহরাজাদ বললো, এর পর আপনাকে নওজোয়ান নূর এবং এক লড়াকু মেয়ের কিস্‌সা শোনাই ঃ

কোন এক সময়ে মিশরে এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বাস করতো। সে সময়ে তার মতো বিত্তবান আর কেউই ছিলো না। এই সওদাগররের নাম শের।

প্রথম যৌবনে সে নানা দেশ ঘুরেছিলো। নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সমুদ্র অভিযান করেছিলো। কত বিপদ-সঙ্কুল মুহূর্ত জীবনে এসেছে, কত ঝড় বয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সে-সবই অতীত স্মৃতি মাত্র আজ।

এখন বয়সের ভার নুব্জ হয়েছে দেহ। চুল দাড়ি সব হাঁসের পালকের মত শুভ্র হয়ে গেছে। যৌবনের উদ্দামতা আজ শান্ত স্থির। সেদিন যে স্বাস্থ্য যৌবন উদ্দীপনা ছিলো আজ তার কিছুই নাই।

কিন্তু একটা জিনিস আছে। অর্থ! অতুল বৈভবের সে মালিক আজ। সে দিন প্রথম যৌবনে, এই অর্থের কণামাত্র তার আয়ত্তে ছিলো না।

সারাটা যৌবন অর্থের অন্বেষণেই কেটে গেছে। ভোগের ফুরসত মেলেনি। কিন্তু আজ অফুরন্ত অবকাশ। এবং অকল্পনীয় ঐশ্বর্যের সে মালিক। কিন্তু হায়! যৌবন, যে কখন চুপিসারে বিদায় নিয়েছে। ভোগের বাসনাটুকু শুধু জেগে আছে মনে, সাধ কিছু নাই।

এই অগণিত দাস দাসী বাঁদী খোজা নফর এবং অপরিমিত ধন-দৌলত সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহর অপার করুণা—একটি মাত্র পুত্র সন্তান তিনি তাঁকে দিয়েছেন।

ছেলেটির বয়স এখন সবে চৌদ্দ। দেখতে চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর। শের সন্তানের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে মাঝে মাঝে। সারা জীবনের অতৃপ্ত বাসনার সমস্ত জ্বালা নিমেষে জল হয়ে যায়।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো বাহাত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

একদিন বাবার দোকানে বসেছিলো নূর। এমন সময় তার কয়েকজন ইয়ার দোস্ত এসে বললো, চলো, এক মজার জায়গায় বেড়িয়ে নিয়ে আসি তোমাকে।

নূর বলে, কোথায়?

—আরে, চলই না ইয়ার। না গেলে বুঝবে কী করে?

নূর তবু জানতে চায়, জানতো ভাই, বাবাকে না বলে কোথাও যেতে পারি না। কোথায় যাবো, কত দেরি হবে, সব বললে তবে মত পাওয়া যাবে।

ছেলেদের মধ্যে সবগুলোই নূর-এর চেয়ে বয়সে বড়। এবং বেশ বোঝা যায়, চৌকস সেয়ানা হয়ে উঠেছে সকলেই। ওদের একজন বললো, আমাদের একটা বাগানবাড়ি আছে জান তো? সেই বাগানবাড়িতে আজ একটা মাইফেল বসবে সন্ধ্যেবেলা। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

—মাইফেল? সে আবার কী?

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে নূর। সবে সে কিছুদিন হলো বাড়ির বাইরে বেরুবার ছাড়পত্র পেয়েছে। তাও দোকান পর্যন্ত, মাত্র দু এক ঘণ্টার জন্য। সুতরাং বাইরের জগতের বহু বিচিত্র রসের সন্ধান সে কী করে রাখবে?

একজন বলে হৈ হৈ। মাইফেল জান না? তাহলে আর জীবনে জানলে কী? চলো চল কী জিনিস, তা মুখে বলে তো বোঝানো যাবে না? নিজের চোখে দেখতে হবে। দেখে মজা লুটতে হবে! তবে মোদ্দা কথা জেনে রাখ, একটা গান-বাজনার আসর বসবে। খানাপিনা হবে—এই আর কি?

নূর উৎসাহিত হয়। এই কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে সব তরুণেরাই সহজাত কৌতূহল অদম্য হয়ে ওঠে। নূর বললো, তোমরা দাঁড়াও, আমি আব্বাজানের মত করিয়ে আসি।

ওরা যখন দল বেঁধে সেই বাগানবাড়ির ফটকে এসে দাঁড়ালো তখন সূর্য পাটে বসি বসি করছে। আমরা যাকে বলি গোধুলি লগ্ন বা কনেদেখা আলো।

বাগানের মালী এক সদাশয় বৃদ্ধ মানুষ। ওদের সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো ভেতরে। সবুজ ঘাসের শয্যায় এলিয়ে আয়াস করে বসলো সকলে। বড় মনোরম পরিবেশ। যে দিকে চোখ যায়—শুধু সবুজের মেলা। গাছে গাছে ফুল ফল পাখী।

মালী এসে বলে, বাতি জ্বালানো হয়েছে মালিক, আপনারা রঙমহলে গিয়ে বসুন।

ওরা সকলে পাশের হাবেলীতে প্রবেশ করে।

একখানা প্রশস্ত কক্ষ। দামী পর্দা গালিচায় মোড়া ঘরের দেয়ালে টাঙানো নামজাদা শিল্পীর রতিবিলাসের নানাবিধ আসন প্রক্রিয়ার রক্ত-নাচানো যৌনচিত্রাবলী। নূর এসব কখনও চোখে দেখেনি।

একটু ক্ষণের মধ্যেই নফররা খানা সাজাতে থাকলো। হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতি পাখি জাতীয় মাংসের ঝোল, মসাল্লাম, ভেড়া, দুমবা খাসীর মাংসের কাবাব কোর্মা কোপ্তা। তন্দুরী রুটি, বিরিয়ানী এবং নানাবিধ মেঠাই মোণ্ডা ও ফল।

খুব পরিতৃপ্তি করে আহার পর্ব শেষ করে ওরা। এর পর শরাবের পাত্রপেয়ালা এনে বসিয়ে দেয় নফররা।

নূর অবাক হয়! শরাব।

একজন হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ শরাব—মৌজ করে পান করার বস্তু।

নূর বলে, না, ওসব আমি খাবো না।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে, আরে অত ভয় পাচ্ছো কেন, জহর নয়—অমৃত। একবার চুমুক দিয়েই দেখ। খাঁটি আঙ্গুরের রস।

—আঙ্গুরের রস? তবে যে বলছো, সরাব?

—ও সব মন্দ লোকে বলে। এর প্রতিটি ফোঁটা আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি। নাও, খেলেই বুঝতে পারবে। খারাপ লাগে খেও না।

সবাই এক সঙ্গে মদের পেয়ালা মুখে তুলে ধরে। নূর তখনও সংশয়াচ্ছন্ন। তুলবে কী তুলবে না ভাবছে। এমন সময় একজন হাতে করে তুলে ওর অধরে ধরে।

নূর একটা চুমুক দেয়। স্বাদটা নেহাত মন্দ নয়। এরপর সে নিজে হাতেই ধরে পেয়ালাটা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো চুয়াত্তরতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়ঃ

ধীরে ধীরে নেশাটা জমে ওঠে। সারা দেহের মধ্যে রক্তস্রোত দ্রুততর হয়। এ

অনুভূতি নূরের জীবনে এই প্রথম। মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করতে থাকে। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। এই অপরূপ সুখানুভূতিতে সবকিছুই সুন্দর হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে। দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে এতক্ষণ সে সহজভাবে তাকাতে পারছিলো না। এবার কিন্তু আর কোন লজ্জা-সঙ্কোচ হয় না—সোজাসুজি দৃষ্টি মেলে সব ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গিলতে থাকে নূর। এবং দেখতে বেশ ভালোও লাগে। এতক্ষণ যা দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল, সুরার ইন্দ্রজালে সবই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

বন্ধুরা বলে, কী হে দোস্ত, কবি হয়ে উঠলে নাকি?

এক ইয়ারের তীর্যক বাক্যবাণে সম্বিত ফিরে পায় নূর।

—না—মানে, ছবিগুলো দেখছিলাম—খুব সুন্দর।

বন্ধুরা হো হো করে হেসে ওঠে।

একজন বলে, ওসব ছবি-টবি দেখে কী হবে, চাঁদ? দুধের সাধ কী ঘোলে মেটে। দাঁড়াও, আসল ক্ষীর তোমাকে খাওয়াচ্ছি।

নূর এ কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। দেখাদেখি বোকার মতো ওদের হাসির তরঙ্গে গা ঢেলে দেয়।

এর পর আর কোনও বাধা থাকে না। পেয়ালার পর পেয়ালা নিঃশেষ হয়ে যায়। নূরের তখন মদে চুর চুর অবস্থা। চোখ ঢুল ঢুলু। গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে।

সবাই মিলে নূরকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেয়, এই নূর, এখনি ঢলে পড়লে চলবে কেন, দোস্ত। আসল চিজই তো আস্বাদ করলে না? চোখ মেল—তাকাও?

নূর চোখ না খুলেই বিজড়িত কণ্ঠে বলে, এর চেয়েও আর কি চিজ থাকতে পারে, ইয়ার?

—পারে পারে। একবার চোখ মেলে দেখ না?

নূর কোনও রকমে মাথা তুলে চোখ তুলে তাকায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তড়িতাহতের মতো চমকে ওঠে। এক ভাবে তাকিয়ে থাকে। পলক পড়ে না।

একটি পরমাসুন্দরী নব-যৌবন উদ্ভিগ্না যুবতী নারী! স্বর্ণচাঁপার মতো গায়ের রঙ। কাজল কালো টানা টানা চোখ। গুলাবের পাপড়ির মতো গাল। আর অধর? সে তো এক চিত্ত-চঞ্চলকারী অপরূপ মায়াময় যাদু।

নূর অবাক হয়ে দেখতে থাকে। এত সুন্দর মেয়ে সে তো আগে কখনও দেখেনি।

এই সময় ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো ছিয়াত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মেয়েটির মুখে এক দুর্বোধ্য মধুর হাসি। নূরের গা ঘেঁষে সে বসে পড়ে। ঐ নেশার ঘোরেও সহজাত সম্ভ্রম বোধ তখনও তার একেবারে বিনষ্ট হয়নি। ফারাক রেখে একটু সরে যেতে চায় সে। মেয়েটি ডান বাহু দিয়ে ওর গলাটা বেষ্টন করে কাছে টেনে ধরে, উঁহু, দেব না সরতে। কেন আমি কী বাঘিনী? খেয়ে ফেলবো।

নূর অনুভব করে, ওর বাঁ হাতের বাহুতে মেয়েটির নিটোল স্তনের নিষ্পেষন হয়ে চলেছে। সম্পূর্ণ এক অজানা শিহরণে শিহরিত হয়ে ওঠে সে। সরে যেতে গিয়েও আর সরে যেতে পারে না। পরন্তু মেয়েটিরই বুকের কাছে খানিকটা সরে আসে সে।

এর পর এক সময় নূর দেখলো ঘরে অন্য সব ইয়ার বন্ধুরা আর কেউ নাই। কোন ফাঁকে কখন যে তারা সটকে পড়েছে নূর বুঝতে পারেনি।

চোখে মুখে এক ভয় ভাব ফুটে উঠে। মেয়েটি খিলখিল করে হাসে।

—কী ভয় করছে বুঝি, খোকা?

—না না ভয় করবে কেন? কিন্তু মানে—ওরা সব গেলো কোথায়?

—ওমা, তুমি কী অসভ্য গো, অতগুলো ইয়ার দোস্তের সামনে তুমি আমাকে বে-আব্রু করবে? তোমার শরম করবে না?

নূর এ কথার অর্থ বুঝতে পারলো না সেই মুহূর্তে। কিন্তু বুঝলো একটু পরেই। মেয়েটি এক এক করে তার অঙ্গবাস খুলে খুলে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে।

এইভাবে সে একসময় শুধুমাত্র একটি ফিনফিনে গোলাপী সেমিজ পরে দাঁড়ায়। এক মুহূর্ত। তীর্যক দৃষ্টি হেনে তাকায় নূরের চোখে চোখ রেখে, কী কেমন লাগছে?

মুখে ওর মধুর হাসি। নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। তারপর ঝুপ করে বসে পড়ে নূরের কোলের ওপর। এক হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেয় নূর-এর অধরের নিচে।

—কই, দাও?

নূর দুঃসাহসী হতে পারে না। মেয়েটিই কামড়ে ধরে নূরের টসটসে পাকা আঙ্গুরের মতো অধর।

সেই প্রথম বুঝতে পারে নূর, রক্তের স্বাদ নোনতা। বাঘ নাকি এই দূরন্ত স্বাদের নেশাতেই মানুষের মাংস খাওয়ার জন্য মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে।

মেয়েটি বলে, তুমি কী হাঁদা গো, শেমিজটাও কী আমি খুলবো নাকি।

নূর এই প্রথম শিখছে। এ ধমক শুনতে যেন আরও মধুর লাগে।

বাড়ি ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে গেলো। নূরের মা সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। নূর এই প্রথম রাত করে বাড়ি ফিরলো। মা বললো, কী রে নূর, তোর এত দেরি হলো কেন, বাবা।

নূর কোনও কথা বলতে পারে না। নেশায় সে তখন টলছে। মা চমকে ওঠে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, একি, তুই মদ খেয়েছিস?

নূর তবু কোনও কথা বলে না। মা-এর কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কোনও রকমে টাল সামলাতে সামলাতে ঘরে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো সাতাত্তরতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হলো ঃ

মা ভেবে আকুল হয়। নূরের বাবা যদি জানতে পারে, কেলেঙ্কারী কাণ্ড হবে। হলোও তাই।

অনেক রাতে নূরের বাবা ছেলের ঘরে আসে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারে, নূর মদ্যপান করে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে জ্বলে ওঠে।

আমার বাড়িতে এত অনাচার। ঘুমন্ত নূরের চুলের মুঠি ধরে সে তুলে ধরে, এ্যাই-ওঠ, বেতমিজ। তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার বাড়িতে মদ খেয়ে ঢুকেছিস।

নূরকে বেধড়ক প্রহার করতে থাকে সে। কিন্তু একতরফা মার খাওয়ার ছেলে সে নয়। তার ওপর মদের নেশায় চুর হয়েছিলো। বাবাকেও সে দু ঘা বসিয়ে দেয়। বৃদ্ধ বাবা জোয়ান ছেলের গোত্তা সহ্য করতে পারবে কেন? ঘুষি খেয়ে সে ছিটকে পড়ে যায়। নূর বাঘের মতো

হিংস্র হয়ে ওঠে। একখানা ডাণ্ডা তুলে সে বাবার দিকে ধেয়ে আসে। প্রাণভয়ে শের ছুটে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তিন কসম খেয়ে বলে, তোর মতো ছেলে থাকার চেয়ে না থাকা ঢের ভালো। আমি তোকে ত্যজ্যপুত্র করলাম। যে হাতে আমাকে মারলি সেই হাত কেটে নিয়ে তোকে যদি কাল সকালে বাড়ি থেকে না তাড়াই, আমি এক বাপের পুত্র নই।

মা হা-হা করে ছুটে আসে, এ তুমি কী কথা বললে নূরের বাপ। না না, ও কথা তুমি ফিরিয়ে নাও।

শের সিংহের মতো গর্জে ওঠে, আমার এক কথা, কাল ওকে আমি তাড়াবোই।

মা ভাবলেন, কাল সকালে একটা অঘটন ঘটবে। খুব ভোরে সে নূরকে ডেকে তোলে। বলে, তোর আর এ বাড়িতে থাকা হবে না, বাবা। তোর বাবা ক্ষেপে উঠেছে। এই নে, আমার কাছে এগারো শো দিনার ছিলো—তোকে দিলাম। এটা নিয়ে তুই আলেকজান্দ্রিয়াতে চলে যা। পয়সা ফুরিয়ে গেলে আমার কাছে লোক পাঠাবি। আবার দেব। যা বাবা, আর দেরি করিসনে। হয়তো এখুনি তোর বাবা জেগে উঠবে।

নূর আর দেরি করলো না। মায়ের দেওয়া দিনারগুলো কোমরে বেঁধে সে নীল-এর ঘাটে গিয়ে নৌকায় চেপে বসলো।

আলেকজান্দ্রিয়া দুনিয়ার সেরা শহর। নতুন জায়গায় এসে নূর-এর মন ভরে যায়। যে দিকে তাকায় ঝকঝকে তকতকে—সুন্দর সাজানো গোছানো—একেবারে ছবির মতো।

শহরটাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। এক সময় সে বাঁদীবাজারে এসে হাজির হয়। দালালরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে জটলা করছে। বণিক সওদাগরেরা এসে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। একটু পরেই নীলামের ডাক শুরু হবে।

নূর লক্ষ্য করে, একটা খচ্চরে চেপে এক বৃদ্ধ এবং তার পিছনে এক পঞ্চদশী তরুণী এগিয়ে আসছে হাটের দিকে। মেয়েটির স্বচ্ছ বোরখার তলায় তার দেহের রূপ-লাবণ্য পরিষ্কার নজরে পড়ে। নূর-এর মনে হলো সেই বাগান বাড়ির মেয়েটির চেয়েও এ মেয়েটি আরও সুন্দরী—লাস্যময়ী।

বৃদ্ধকে দেখে দালালরা ছুটে আসে। বণিকরা উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকে। একটা উঁচু বেদির ওপর মেয়েটিকে দাঁড় করানো হয়। একজন দালাল তার পাশে দাঁড়িয়ে নীলাম শুরু করে।

—ইয়ে আসলি হীরা—বিকনে কে লিয়ে আয়া।

একজন দাম বললো, নয়শো দিনার।

আর একজন দর দেয়, নয়শো পঁচিশ।

কিন্তু বণিক-সভার শাহবানদার বলে, আমার দাম সাড়ে ন'শো রইলো।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ করে যায়। বণিক সভার বৃদ্ধ সভাপতি যখন হাত বাড়িয়েছে তখন আর ওদিকে হাত বাড়াতে কেউ সাহস করে না। দালাল হাঁকে সাড়ে ন'শো—খালি সাড়ে ন'শো দিনার, পানিকা দাম। আউর কোই শেরিফ আদমী হ্যায়।

কিন্তু শাহবানদারের সঙ্গে লড়বে, কার হিম্মৎ আছে?

দালাল নীলাম শেষ করতে উদ্যত হয়, সাড়ে ন'শো এক, সাড়ে ন'শো দুই। কিন্তু সকলে নিরুত্তর। এক দালাল প্রথানুযায়ী বাঁদীকে জিজ্ঞেস করে এই শাহবানদারের ঘরে যেতে তুমি রাজি আছ মেয়ে?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলে, ঐ বুড়োর এত শখ কেন? ও তো আজ বাদে কাল কবরে যাবে। আমাকে নিয়ে গিয়ে কী করবে সে। ওর দাড়িতে কী মেহেন্দি মাখিয়ে দেবার জন্যে আমাকে নিয়ে যেতে চায়? না, আমি রাজি নই।

দালাল বলে, ডাক বাতিল। আবার ডাক শুরু হবে। কে আছেন এগিয়ে আসুন।

অন্য একজন বুড়ো উঠে দাঁড়ায়। লোকটার চোখ কোটরে বসে গেছে, নাকটা সারস পাখীর ঠোঁটের মতো। মুখে একটাও দাঁত নাই। সারা শরীরে এক ছটাক মাংস নাই—হাড্ডিসার।

দালাল বলে, দেখ, এর ঘরে যেতে চাও?

মেয়েটি বলে, ঐ শকুনটা কী আমার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে? তারও তো উপায় নাই। দাঁত কই ওর? একটাও তো দেখছি না। বুড়োগুলোর শখ কেন? না, আমি যাবো না ওর ঘরে।

তারপর আর একজন উঠে দাঁড়ালো। লোকটা অপেক্ষাকৃত শক্ত সমর্থ কিন্তু দোষের মধ্যে ওর আজানুলম্বিত দাড়ি।

মেয়েটি বলে, বাঃ দাড়িটা বেশ মজার। একেবারে ছাগলের ল্যাজের মতো। মালিক বৃদ্ধকে বলে, না সাহেব আমার দ্বারা হলো না—এ হাটে হবে না। আপনি অন্য হাটে চেষ্টা করুন। আপনার বাঁদীর অনেক রকম ফিরিস্তি।

বৃদ্ধ হতাশ হয়ে মেয়েটিকে নিয়ে খচ্চরে চাপতে যায়। নূর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে ওকে। সত্যিই সুন্দরী সে। এমন সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে ঐ বুড়ো হাবড়াগুলো কী করতে চেয়েছিলো?

মেয়েটি বৃদ্ধের পিছনে পিছনে যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকিয়ে নূরকে দেখে। তারপর বৃদ্ধকে বলে, আমার মনে হয় ঐ ছেলেটি আমাকে অপছন্দ করবে না।

বৃদ্ধ বলে, তা হলে সে ডাকলো না কেন? খোলা বাজারের নীলাম ডাকতে তো বাধা ছিলো না?

মেয়েটি বলে জানি না, তবে আমার মনে হচ্ছে, আমাকে দেখে ওর পছন্দ হয়েছে।

—কিন্তু সেধে তো তার কাছে যাওয়া যায় না। তাহলে দর পাওয়া যাবে না।

মেয়েটি বলে, ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।

পায়ে পায়ে সে এগিয়ে আসে নূরের কাছে।

—কী? আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

নূর বলে, পছন্দ নয় মানে? তোমার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে আমি দেখিনি কোথাও।

—তবে নীলাম ডাকলে না কেন? তুমি ডাকলে আমি রাজি হয়ে যেতাম।

নূর বলে, আমি পরদেশী মিশরে আমার বাড়ি। তুমি যদি আমাদের শহরে নীলামে উঠতে, বাড়ি ঘর বাঁধা দিয়েও তোমাকে আমি কিনে নিয়ে যেতাম। কিন্তু এই বিদেশে তোমাকে আমি রাখবো কোথায়? খাওয়াবোই বা কী? আমার কাছে সাকুল্যে হাজারখানেক দিনার আছে।

মেয়েটি বলে, ঠিক আছে, ঐ হাজার দিনারই তুমি দর দাও। আমি তোমার হয়ে যাচ্ছি।

নূর কোমর থেকে হাজার দিনারের তোড়াটা খুলে পারসীটার হাতে তুলে দেয়।

কাজী আর সাক্ষীরা চুক্তিপত্র লিখে সই করে দেয়। মেয়েটি বলে এক হাজার দিনারের বদলে এই নওজোয়ানের কাছে স্বেচ্ছায় আমি যেতে রাজি হলাম।

উপস্থিত জনতা সাধু সাধু করে ওঠে, আল্লাহ ওদের দু'জনকে দুজনের জন্য পয়দা করেছিলেন। খুব চমৎকার হলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

ছয়শো ঊনআশিতম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে শহরের একটা বড়ো সরাইখানায় এসে ওঠে নূর। একখানা ঘর ভাড়া করে। বলে, কী করবো, আমার কাছে পয়সা কড়ি নাই। তোমাকে একটু কষ্ট

করেই থাকতে হবে। যদি আমার স্বদেশ কাইরো হতো, তবে তোমাকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তুলতাম। কিন্তু আমি পরদেশ তাই জাঁকজমক কিছুই করা গেলো না।

মেয়েটি বলে, সে জন্যে তুমি অত মন খারাপ করছো কেন? আমার হাতের এই আংটিটা নিয়ে যাও। বাজারে বিক্রি করে কিছু ভালো খাবারদাবার আর একটু সরাব নিয়ে এস। আজ রাতটা আমরা ভালো করে খানাপিনা মৌজ মৌতাত করে কাটাবো। নাই বা হলো তোমার প্রাসাদ, এই সরাইখানাই আমাদের আজ মধুযামিনীর বাসর হয়ে উঠবে।

নূর আংটিটা নিয়ে বাজারে যায়। মোরগ মোসাল্লাম কাবাব কালিয়া কোর্মা বিরিয়ানী হালওয়া প্রভৃতি কিছু মুখরোচক খাবার এবং দামি খানিকটা মদ কিনে আনে। আর কেনে কিছু ফল ফুল এবং সুগন্ধী আতর গোলাপজল।

মেয়েটি ঘরটাকে পরিপাটি করে সাজিয়ে টেবিলে কাপড় বিছিয়ে বসেছিলো। খুব তৃপ্তি করে ওরা খেলো। তারপর একটা পেয়ালায় সরাব নিয়ে দুজনে চুমুক দিতে থাকলো।

আয়োজন অতি সামান্য, কিন্তু তাতে কোনও দুঃখ নাই। দুজনেই খুশির মেজাজে টৈটম্বুর হয়ে উঠতে পারলো।

সে রাতে মেয়েটি আর নূর অনেক আদর সোহাগ চুম্বনে দুজনে দু'জনকে ভরে দিলো। সারারাত ধরে নানা আসনে ওরা ভালোবাসা করলো।

নূর এক সময় বললো, তোমার নামটা কিন্তু এখনও জানি না, বিবিজান। কোথায় তোমার দেশ, কেনই বা এই হাটে বিকাতে এলে, বলবে না?

মেয়েটি হাসে, বলবো, নিশ্চয়ই বলবো। আমার নাম মিরিয়াম। কনস্টাইটাইনের এক বিক্রমশালী সম্রাট আমার জন্মদাতা পিতা। ছোট থেকেই তিনি আমাকে পড়াশুনা, নাচ গান, সেলাইবোনা, শিল্পকর্ম প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছেন। নিজের প্রশংসা নিজের মুখে শোভা পায় না, তবু বলছি, আমার মতো সূচের সুক্ষ্ম কারুকাজ খুব কম মেয়েই জানে। পাতলা রেশমীর কাপড়ে আমি বাহারী নক্সা তুলতে পারি। খুব দামী গালিচা পর্দা বানাতে পারি। সোনালী রূপোলী জরির কাজে আমার জুড়ি নাই। এ সবই আত্ম-প্রশংসা, কিন্তু বিশ্বাস করো, একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

বাবা আমাকে অসূর্যম্পশ্যা করে অন্তঃপুরেই আটক রেখেছিলেন। তা সত্ত্বেও আমার রূপের খ্যাতি নানা দেশে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। অনেক সম্রাট বাদশাহর ছেলেরা আমাকে শাদী করার জন্য বাবার কাছে প্রস্তাব রেখেছিলো। কিন্তু বাবা আমাকে কাছ ছাড়া করতে চায় না, তাই সবাইকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আমার আরও অনেক ভাই ছিলো, কিন্তু কন্যা বলতে আমি বাবার একমাত্র আদরের দুলালী। আমার ভাইদের চেয়েও আমাকেই তিনি বেশি ভালোবাসতেন।

একসময় আমার কঠিন অসুখ করে। বাবা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন, আমি যদি সেরে উঠি, তিনি আমাকে আমাদের সবচেয়ে বড় গীর্জামঠে তীর্থ করতে নিয়ে যাবেন।

বাবার এই আকুল আবেদন বুঝি ঈশ্বর শুনেছিলেন। তিনি আমাকে সুস্থ করে তুললেন। মানত রক্ষার জন্য বাবা আমার ধাইমাকে সঙ্গে দিয়ে সাগর পারের সেই গীর্জামঠে তীর্থ করতে পাঠালেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, মুসলমান জলদস্যুরা আমাদের জাহাজে হানা দিয়ে নির্মমভাবে খুন জখম লুটতরাজ করলো। ওদের ঐ গগনভেদী গর্জনে এবং উদ্যত অসির তর্জনে

আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ি। তারপর যখন জ্ঞান ফিরলো দেখলাম আমি এক ডাকাত দলের হাতে বন্দী। আমার মতো আরও অনেক সুন্দরী মেয়েকে ওরা এক খোঁয়াড়ে পুরে রেখেছিলো। পরে শুনলাম, বাঁদী-হাটে আমাদের বিক্রি করা হবে। এর কয়েকদিন পরে ওরা আমাদের মিশরের বাজারে এনে বেচে দিয়ে গেলো। ঐ বাজার থেকে এই বুড়ো পারসী বণিকটি আমাকে সওদা করে এনেছিলো। মুসলমান ডাকাতগুলো কিন্তু আমাদের কারুরই অঙ্গ স্পর্শ করেনি। শুনেছিলাম এটা ওদের পবিত্র ব্যবসা বলে মনে করে। জীবিকার বেশাতি নিয়ে ওরা ব্যভিচার করে না কখনও। আর ঐ পারসী বুড়োটা ধ্বজভঙ্গের রুগী। ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্যে কুলায়নি। এই পারসী লোকটির কিছুদিন আগে, বিমার হয়েছিলো। আমি আমার সাধ্যমতো সেবা যত্ন করে ওকে সারিয়ে তুলি। তারই কৃতজ্ঞতায় সে আমাকে বলেছিলো, তোমার জন্যে আমি সেরে উঠলাম। খুব খুশি হয়েছি। বলো তুমি কী চাও?

আমি বললাম, চাই না কিছুই। আপনি আমাকে আমার পছন্দমতো খদ্দেরের কাছে বেচে দেবেন—এই একমাত্র ইচ্ছা। আমি কোনও বুড়ো হাবড়ার ঘরে যেতে চাই না।

পারসী বললো, বেশ, তাই হবে। সেইজন্যেই দেখেছো, আমি যখন বাঁদী হাটে তিন বুড়োকে নাকচ করলাম, পারসী কিন্তু একটুও গোসা করেনি।

নূর বললো, হ্যাঁ, তা আমি নজর করেছি।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশোতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

পরদিন থেকে মিরিয়ামের ইসলামের পাঠ গ্রহণ শুরু হয়। মিরিয়াম বলে আমি খ্রীষ্টান-পরিবারে জন্মেছি। কিন্তু এখন আমি তোমার সহধর্মিণী। তোমার কর্মই আমার কর্ম, তোমার ধর্মই আমার ধর্ম। কিন্তু আমি তো ইসলাম সম্বন্ধে কিছুই জানি না নূর, তুমি আমাকে সব শেখাও।

নূর বলে, ইসলাম খুব সহজ ধর্ম। কোনও ঘোর প্যাঁচ কিছু নাই। আজ হোক, কাল হোক, সারা দুনিয়ার মানুষ এর মহত্ত্ব একদিন উপলব্ধি করতে পারবেই। আজ যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে, ভবিষ্যতে ইসলামের আনুগত্যে এসে তারা আলোর মুখ দেখতে পাবে—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যদি তুমি ম্লেচ্ছ খ্রীস্টান ধর্মের অক্টোপাশ থেকে মুক্তি পেতে চাও, আমি তোমাকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করবো। তবে তার আগে তোমাকে মেনে নিতে হবে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। শুধু এই বিশ্বাস যদি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পার তাহলেই তুমি সাচ্চা মুসলমান হতে পারবে।

তৎক্ষণাৎ সম্রাট-কন্যা মিরিয়াম দুহাত জোড় করে উচ্চারণ করলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বর আমি মানি না—বিশ্বাস করি না। আল্লাহই একমাত্র সর্বশক্তিমান। মহম্মদ তাঁর পয়গম্বর।

নূর আনন্দে জড়িয়ে ধরে মিরিয়ামকে, মিরিয়াম, এই মুহূর্ত থেকে তুমি মুসলমান হয়ে গেলে।

এর পর ওরা গোসলাদি সেরে খানাপিনা করলো। নূর যতই বেশি করে দেখছে মিশছে, ততই সে অবাক হচ্ছে মিরিয়ামের আচার আচরণ জ্ঞান বুদ্ধি শিক্ষা দীক্ষা রুচি প্রকৃতি দেখে।

সেদিন ছিলো জুম্মাবার। নূর বললো চলো, আজ আমরা মসজিদে গিয়ে নামাজ করবো।

মিরিয়াম খুশিতে নেচে ওঠে। এই প্রথম সে মসজিদ দেখবে।

এদিকে কনস্টানটাইন সম্রাট খবর পেলেন তাঁর প্রাণাধিক কন্যাকে মুসলমানরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদল পাঠালেন।

—যেখান থেকে পার, যেমন করে পার আমার মিরিয়ামকে উদ্ধার করে আনা চাই-ই।

কিন্তু যারা সন্ধানে গেলো একদিন তারা শূন্য হাতেই ফিরে এলো সম্রাটের কাছে।

—নাঃ, কোথাও সন্ধান পাওয়া গেলো না, মহামান্য সম্রাট।

সম্রাটের গুপ্তচর বাহিনীর বড়কর্তা বললো, আমি গোপনে গোপনে তলাশ করার ব্যবস্থা করছি। লোক-জানাজানি হয়ে গেলে শয়তানরা তাকে লুকিয়ে রাখবে।

চৌকস সেয়ানা অথচ খুব ছোট্ট বেঁটে খাটো একটি বৃদ্ধা তার বুদ্ধি এবং কৌশলের জন্য গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানের খুব প্রিয়পাত্রী ছিলো। বড়সাহেব তাকেই নির্বাচন করলো মিরিয়ামকে খুঁজে বের করার কাজে। ঠিক করা হলো এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির গুপ্তচরটাকে মুসলমান মুলুকে পাঠানো হবে।

সম্রাট তাকে বললেন, যদি তুমি কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসতে পার, মেয়ে, তবে আমি তোমাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেব। কিন্তু যদি না পার, তবে তোমাকে সাপের ইঁদারায় ফেলে দেওয়া হবে, মনে থাকে যেন।

বুড়ি মাথা নুইয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে বলে, তাই হবে মহামান্য সম্রাট, আপনার কন্যা রাজকুমারী মিরিয়ামকে যদি আমি ফিরিয়ে আনতে না পারি, তাতে যে সাজা আমাকে দেবেন, মাথা পেতে নেব।

বুড়িটা এক চোখে ফেটি বাঁধলো, পায়ে কাপড় জড়ালো। তারপর জনাকয়েক সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নানা দেশের নানা শহর বন্দর ঘুরতে ঘুরতে একদিন আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে হাজির হলো।

আলেকজান্দ্রিয়ার পমপি মিনার বিশ্ববিখ্যাত। একদিকে এটা যেমন মুসলমানদের তীর্থস্থান, আর একদিকে এক মনোহর পরিবেশ এবং মিনার সৌধের অপরূপ কারুকলা দেশ-বিদেশের মুসাফিরদের কাছে এক উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

মিরিয়াম বিকাল বেলায় প্রায় প্রতিদিন পবিত্র পমপি মিনারের পাদদেশে এসে মুক্ত বায়ু সেবন করে। সেদিনও সে একা একাই বসে প্রকৃতির মনোরম শোভা প্রত্যক্ষ করে পুলকিত হচ্ছিলো, এমন সময় সেই গুপ্তচর বুড়ি ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে মিরিয়ামের দেখা পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।

বুড়িটা কাছে এগিয়ে গিয়ে রাজকুমারীকে অভিবাদন জানিয়ে তার হাতে চুম্বন করে।

হঠাৎ এক অপরিচিত নারী খ্রীষ্ট-কেতায় তাকে অভিবাদন এবং চুম্বন করায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মিরিয়াম।

—কে তুমি ম্লেচ্ছ, শয়তান, কুত্তার বাচ্চা। জান না, এ আমাদের পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে তোমাকে কে ঢুকতে দিয়েছে? বেরিয়ে যাও বলছি।

বুড়িটা কিন্তু রাগ করে না। আরও বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, আপনি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন না রাজকুমারী! আপনার পিতা আপনার অদর্শনে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। আপনার মাতা কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী। এ অবস্থায় আপনি যদি আপনার পিতার কাছে ফিরে না যান, হয়তো ঈশ্বর জানেন, কী ঘটবে।

মিরিয়াম ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, যা ঘটে ঘটুক, আমি যাবো না। এখন এই আমার দেশ, এই আমার স্বজন-ভূমি। আমি ইসলামে দীক্ষা নিয়েছি। এখন আমার একমাত্র বিশ্বাস ইসলামই সত্য, আর সব মিথ্যা। আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি না আমরা। তুমি ফিরে যাও। সম্রাটকে গিয়ে বলো, আমি খুব সুখে আছি। এবং ইসলামে দীক্ষা নিয়েছি। খ্রীষ্ট সাম্রাজ্যে আর ফিরে যাবো না।

—কিন্তু ফিরে যে আপনাকে যেতেই হবে, রাজকুমারী। খালি হাতে ফিরে যেতে পারবো না আমি। ওয়াদা আছে, আপনাকে নিয়ে তবে দেশে ফিরতে পারবো। তা না হলে আমাকে সাপের ছোবলে মরতে হবে। কিন্তু একবার যখন আপনার সন্ধান পেয়েছি—কেন আর প্রাণটা খোয়াবো। আপনাকে না নিয়ে আমি ফিরবো না। এখনও মিনতি করছি, আমার কথা শুনুন, দেশে ফিরে চলুন।

মিরিয়াম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ওরে কুত্তার বাচ্চা, আমার সামনে থেকে যাবি কিনা বল, না হলে এখুনি চিৎকার করে লোক জড়ো করবো। কেটে টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

মিরিয়াম চিৎকার করতে যাবে, এমন সময় বুড়ির ইশারায় তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা এসে তাকে ঘিরে ধরে। খবরদার, একটুও শব্দ করবে না। তা হলে এই যে দেখছো ঝকঝকে ছুরি, একেবারে আমূল বসিয়ে দেব বুকে।

হঠাৎ এসবের জন্য প্রস্তুত ছিলো না মিরিয়াম। হতচকিত হয়ে পড়ে সে। সেই ফাঁকে সাঙ্গ-পাঙ্গরা মিরিয়ামের মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে হন হন গতিতে বন্দরের দিকে ছুটে চলে।

জাহাজ প্রস্তুত ছিলো। মিরিয়ামকে তোলামাত্র নোঙর তুলে ছেড়ে দিলো কাপ্তান। জাহাজ ভেসে চললো কনসতানতাইন-এর দিকে।

নূর সরাইখানায় মিরিয়ামের ফেরার পথ চেয়ে বসেছিলো। প্রতিদিন বিকেলে সে বেড়াতে যায় পমপি মিনারে। এবং ফিরে আসে সন্ধ্যার আগেই। কিন্তু আজ এত দেরি হচ্ছে কেন? অন্ধকার নেমে এলে তো পমপিতে কাউকে থাকতে দেয় না? তবে?

মাথায় দুশ্চিন্তা নিয়ে সে সরাইখানা ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। একে ওকে জিজ্ঞেস করে। একজন বলে,জনাকয়েক লোক একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে জাহাজঘাটের দিকে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

অজানা আশঙ্কায় নূর-এর বুক কেঁপে ওঠে। ছুটতে ছুটতে বন্দরে আসে। খবর পায় এটা খ্রীষ্টান জাহাজ এইমাত্র ছেড়ে চলে গেলো। কতকগুলো লোক একটা মেয়েছেলেকে জোর-জবরদস্তি করে জাহাজে তুলেই ছেড়ে দিয়েছে। কেন, কী হয়েছে?

নূর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, বিধর্মী ম্লেচ্ছরা আমার বিবিকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

—ওই মেয়েটি তোমার বিবি?

—জী হ্যাঁ। জাহাজটা কোথায় যাবে বলেছে কিছু?

—না। তবে জাহাজের নিশান পতাকা দেখে তো আমার চিনতে কোনও অসুবিধে হয় না—ওটা কনসতানতাইনের জাহাজ।

—সর্বনাশ। ওরা তবে নির্ঘাৎ আমার বিবিকে নিয়েই পালিয়েছে।

কান্নায় ভেঙে পড়ে নূর। লোকটি বলে, আহা কেঁদ না, বাছা! আমি তোমার বিবিকে উদ্ধার করে দেব। ঐ দেখছো, দাঁড়িয়ে আছে আমার জাহাজ—ওই জাহাজের কাপ্তান আমি। আমার সঙ্গে একশোজন সাচ্চা মুসলমান কর্মচারী আছে। ইসলাম বিপন্ন, সুতরাং আর তো মুখ বুজে সহ্য করা যায় না। চলো, আমার জাহাজে ওঠ। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি ধাওয়া করবো ওদের। ব্যাটারা পালাবে কোথায়? ধরবোই।

কাপ্তান তার একশোজন দাঁড়ি-মাল্লাদের বললো, খুব জোরসে চালাবে। সামনের ঐ কুত্তার বাচ্চাদের ধরতেই হবে।

নূরকে নিয়ে সে জাহাজ ছেড়ে দিলো। কিন্তু দিনের পর দিন তাড়া করে চলার

পরও কনসতানতাইন-সম্রাটের জাহাজখানা আর কিছুতেই ধরতে পারে না। নূর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। কাপ্তান ওকে ভরসা দেয়, ঘাবড়াবার কিছু নাই। সমুদ্রে না পারি ডাঙ্গাতেও ধরবো। আমরা একশোজন আছি। সাচ্চা মুসলমানের সন্তান। আমাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে না কাফেররা।

একান্ন দিন পরে জাহাজ ভিড়লো কনসতানতাইনের বন্দরে। কিন্তু তীরে নামার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের সৈন্যবাহিনী ঘিরে ফেললো ওদের। নূরসহ বন্দী হলো সবাই।

সম্রাট ওদের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

এই ঘটনার আগের দিন মিরিয়ামকে এনে সম্রাটের হাতে তুলে দিয়েছে সেই গুপ্তচর।

মেয়েকে ফিরে পেয়ে সম্রাটের সে কি আনন্দ! সারা প্রাসাদ, সারা শহর আলোর মালায় সাজানো হয়েছিলো। শহরের পথে পথে বসানো হয়েছিলো বিজয়তোরণ। আজ দেশবাসীর মহা আনন্দের দিন। অনেক দিন পরে সম্রাট প্রাণ খুলে হেসেছেন। তাই প্রজারাও বিশেষ পুলকিত।

মহারাণী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মা, তোকে ঐ যবনরা কিছু করেনি তো।

মায়ের কথায় মিরিয়াম হাসে, তুমি কী যেন বল মা। মুসলমানরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো কী শুধু মুখ দেখার জন্য? তুমি কী জান না, ইসলামে কোনও পরিণত-বয়স্কা নারী কুমারী থাকে না। মাসিক-ধর্ম শুরু হওয়ার পর মুসলমান মেয়েরা কুমারী থাকলে পাপ হয়। সুতরাং আমি ইসলামে দীক্ষা নেবার পর কী করে কুমারী থাকতে পারি, বলো?

মা কেঁদে আকুল হয়, ও কী কথা বলছিস খুকী, আমরা তো খ্রীষ্টান।

—তোমরা তো নিশ্চয়ই খ্রীষ্টান মা। যতদিন তোমাদের কাছে ছিলাম, আমি খ্রীষ্টানই ছিলাম। কিন্তু এখন আমি মুসলমান।

মহারাণী শিউরে ওঠেন, চুপ কর মা, ওকথা বলতে নাই। কেউ শুনতে পেলে কেলেঙ্কারী হবে।

কিন্তু মা গোপন করতে চাইলেও এত বড় সত্যি কথাটা গোপন রইলো না। সারা শহরে, দেশের প্রজাদের কানে কানে রটে গেলো। সম্রাট-নন্দিনীকে মুসলমানরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তার সর্বনাশ করে দিয়েছে। যবনরা রাজকুমারীকে জোর করে মুসলমান-ধর্মের কলমা পড়িয়ে সহবাস সঙ্গম করেছে।

কথাটা সম্রাটও শুনলেন। মন্ত্রী যুক্তি দিলো, আপনি বড় গীর্জার পাদরীমাতার সঙ্গে পরামর্শ করুন, ধর্মাবতার। তিনি আপনাকে নিশ্চয়ই বিধান বলে দিতে পারেন।

পাদরী-মাতা সব শুনে বললেন, হুঁ, বিধর্মীরা রাজকুমারীর সতীত্ব অপহরণ করেছে। ঠিক আছে, আমি ওকে পুনরায় খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা দেব। তবে একটি কাজ করতে হবে।

সম্রাট করজোড়ে বললেন, আজ্ঞা করুন মাতা।

—দীক্ষার পূর্বে কন্য মিরিয়ামকে একশোটি মুসলমানের রক্তে স্নান করিয়ে ওর সব অতীত পাপ ধুয়ে ফেলতে হবে।

সম্রাট বললো, সদ্য শতাধিক যবন বন্দী হয়েছে আমার সেনা-বাহিনীর হাতে। তারা আমার কারাগারেই আছে। আপনি আজ্ঞা করলে আজই আমি শত-যবনের রক্ত সংগ্রহ করতে পারি।

পাদরী-মাতার ইচ্ছায় এবং সম্রাটের আদেশে নূর-সহ জাহাজের একশো খালাসী কর্মচারীদের হাজির করা হলো। সম্রাটের পাশে বসেছিলেন বৃদ্ধা পাদরী-মাতা। ঘাতক সকল বন্দীদের সারি বন্দী করে দাঁড় করালো। হাতে শাণিত তলোয়ার। সম্রাটের সামনে একটা হাড়িকাঠ। তার নিচে পাতা ছিলো একটা বিরাট গামলা। তিনি হুকুম দেওয়া মাত্র এক এক জনকে ধরে এনে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে সাবাড় করতে থাকলো। এইভাবে গামলাটা রক্তে

পূর্ণ হতে থাকে। এক এক করে একশোটা নরবলি সংঘটিত হওয়ার পর একশো একতম কয়েদী নূরকে দাঁড় করানো হয় হাড়ি কাঠের সামনে।

পাদরীমাতা সম্রাটকে বললো, সম্রাট, একশোটি যবনের রক্ত ধরা হয়ে গেছে। রাজকুমারীর শুদ্ধি-স্নানের জন্য এই রক্তই যথেষ্ট। আর প্রয়োজন নাই। এই যুবকটিকে আমি আমার গীর্জার প্রহরী হিসাবে নিযুক্ত করতে চাই।

সম্রাট বললেন, তাই তো, আমি অতটা খেয়াল করিনি। ঠিক আছে, আপনার যদি অভিরুচি হয় তবে নিয়ে যান ওকে। আমার কোনও আপত্তি নাই।

রাজকুমারীকে নতুন করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার পর পাদরী-মাতা প্রিয়দর্শন নূরকে সঙ্গে নিয়ে গীর্জায় ফিরে আসে।

নূর বুঝতে পারে না। কেনই বা তাকে হাড়িকাঠে হত্যা করা হলো না, কেনই বা তাকে মুসলমান জেনেও গীর্জায় নিয়ে আসা হলো।

পাদরী-মাতা বললো, শোনো যুবক, তোমার রূপ-যৌবন এবং ভাগ্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

নূর বলে, আমার রূপ আছে—অনেকেই বলে। যৌবন যে আছে তা আমিও অনুভব করতে পারি। কিন্তু ভাগ্য? আমি যে ভাগ্যবান—সে কথা আমার অতি বড় আপনজনও বলবে না। কিন্তু আপনি আপনাকে ভাগ্যবান দেখলেন কী ভাবে? সত্যিই যদি আমার সৌভাগ্য হবে, তবে কী আজ আমার চোখের মণি, বুকের কলিজাকে হারাতে হয়? এবং তারই সন্ধানে এসে সম্রাটের রোষানলে পড়ে অন্ধকার কারায় পচে পচে মরতে হয়?

পাদরী মাতা বলে, জানি না কে তোমার চোখের মণি, বুকের কলিজা এবং কী করেই বা তাকে হারিয়েছ, তাও আমার অজানা। কিন্তু তুমি যে সম্রাটের কারাগারে একশো একতম মুসলমান বন্দী হতে পেরেছ সেই জন্যেই বলছি, তুমি পরম ভাগ্যবান। তা না হলে এতক্ষণে তোমার কাটা মুণ্ডু গড়াগড়ি যেত।

নূর বুঝতে পারে না। বলে, কারণ?

—কারণ, সম্রাট-নন্দিনীকে মুসলমানরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো। তাকে এখন উদ্ধার করে আনা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানেরা তার ধর্ম এবং সতীত্ব দুইই কেড়ে নিয়েছিলো। তাই আবার নতুন করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য আমি তাকে শত যবনের রক্তে স্নান করিয়ে পবিত্র হতে বিধান দিয়েছিলাম। সেই জন্যেই আজ একশোটি মুসলমানকে কেটে তাদের রক্ত সংগ্রহ করা হলো। আমি আশ্চর্য হলাম। তুমি ঐ একশোজনের একজন হলে না। তাই আমার মনে হলো, তুমি পরম ভাগ্যবান। তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। এখন বলতো বেটা, তুমি কে! আর কেনই বা সম্রাটের কয়েদখানায় তুমি বন্দী হয়েছো? তোমাকে দেখে তো মনে হয় না, কোনও অপরাধ তুমি করতে পার?

নূর বলে, আপনি মহামান্য মাতা, আমার সব দুঃখের কাহিনী বলতে কোনও বাধা নেই। সম্রাট-নন্দিনী মিরিয়ামকে তার স্বইচ্ছায় আমি শাদী করেছি। সে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছে। কিন্তু সেজন্য তার ওপর কোনও বল প্রয়োগ করা হয়নি, বিশ্বাস করুন। সে নিজে থেকেই মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। সম্রাটের গুপ্তচর আমার বিবিকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে এখানে, তাকে উদ্ধার করতেই আমি এখানে এসে সম্রাটের সেনার হাতে বন্দী হয়েছি। সে ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে চাই না। তাই আজ যদি ঘাতকের ঘায়ে মারা যেতাম, সেই বুঝি আমার ভালো হতো।

নূরের গাল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

পাদরী-মাতা বিচলিত হয়ে পড়েন।

—আমি বুঝতে পারি, তোমার কী মর্মবেদনা। ভালোবাসা কোনও জাতি ধর্ম মানে না। মিরিয়াম যে তোমাকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলো, সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। যাই হোক, আজ রাতে মিরিয়াম গীর্জায় বাতি জ্বালাতে আসবে। সে-সময় তার সঙ্গে আমি তোমার দেখা করিয়ে দেব। দেখ, যদি এখনও সে তোমার প্রতি আসক্ত থাকে তবে আমি আর তাকে জোর করে এখানে আটকে রাখার পক্ষপাতী নই। নদীকে সহজ ভাবেই তার স্রোতে বয়ে যেতে দিতে হয়।

পাদরী-মাতা বলে, শোনো তোমাকে আমি এখানে এনেছি গীর্জার প্রহরী করবো বলে। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য তা নয়। আমি তোমাকে পাদরীর বেশবাস এনে দিচ্ছি। তুমি এই মুসলমানী পোশাক ছেড়ে ফেলে ওগুলো পরে নাও। তাতে তোমার সুবিধে হবে।

সন্ধ্যাবেলায় মিরিয়াম আসে। গীর্জার বেদীতে মোমবাতি জ্বালিয়ে চলে যেতে পা বাড়ায়। পথরোধ করে দাঁড়ায় নূর। সামান্য এক পাদরীর দুঃসাহস দেখে অবাক হয় মিরিয়াম। ক্রোধান্বিত হয়ে সে পাদরীর মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে। অনেক কটু কথা বলবে ভেবেছিলো, কিন্তু সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কিছুই বলতে পারে না। শুধু বলে পথ ছাড়ুন।

নূর হাসে। মিরিয়াম অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, এই হাসি তো তার চেনা। তা কী করে হয়? পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয় সে। নূর হাত বাড়ায়, পথ যখন রুখে দাঁড়িয়েছি, যেতে যদি হয়ই দলে যাও—পাশ কাটিয়ে যেও না মিরিয়াম?

—সে কি নূর, তুমি—?

মুহূর্তে বিশ্ব-সংসার সব তালগোল পাকিয়ে যায়। তারপর আর কিছুই মনে থাকে না। যখন সম্বিত ফিরে পায়, দেখে, নূরের কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে।

পাদরী-মাতা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব প্রত্যক্ষ করছিলো। এবার কাছে এসে বললো, আমি সব বুঝতে পারলাম, নূর। তুমি এক বর্ণও বাড়িয়ে বলনি। এ অবস্থায় মিরিয়ামকে যদি জোর করে খ্রীষ্টান বানিয়ে আটকে রাখা হয়, যীশু আমাদের ক্ষমা করবেন না। তাই ঠিক করেছি, আমি তোমাদের সাহায্য করবো। মিরিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে তুমি আজই রাতে এদেশে থেকে পালিয়ে যাও। না হলে হয়তো সবই হারাতে হবে।

মিরিয়াম বলে, কিন্তু সম্রাটের এই কড়া পাহারা ভেদ করে নূর আমাকে নিয়ে পালাবে কি করে?

পাদরী মাতা বলে, আমি সে ব্যবস্থা করে দেব। আমার এক ভক্ত অনুচর সম্রাটের নৌবাহিনীর একজন কাপ্তান। আমি তাকে বলে রাখছি, কাল খুব ভোরে তোমরা বন্দরে যাবে। কাপ্তান তার জাহাজে তোমাদের তুলে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে দেবে। কিন্তু খেয়াল রেখো, সে নিজে থেকেই তোমাদের নাম ধরে ডাকবে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো তিনতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পাদরী-মাতাকে অভিবাদন জানিয়ে মিরিয়াম প্রাসাদে চলে যায়। নূর রয়ে যায় গীর্জাতেই। পাদরী-মাতা তাকে পাথেয় হিসাবে কিছু খাবারদাবার এবং প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা এনে দেয়। বলে, এগুলো সঙ্গে রাখ, অনেক দিনের পথ। প্রয়োজন হবে। এই ঘরেই তুমি শোবে। খুব ভোরে তোমাকে আমি ডেকে ফটকের বাইরে বের করে দেব।

গীর্জার সদর ফটক থেকে জাহাজঘাট খুবই কাছে। পাদরী-মাতা নূরকে ফটক পার করে দেয়। নূর বন্দরে এসে দেখে, একখানা ছোট্ট জাহাজ ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

জাহাজের পাটাতনে দশজন খালাসী এবং কাপ্তান। মনে হয় নূরেরই প্রতীক্ষা করছিলো তারা। কাছে যেতেই কাপ্তান জিজ্ঞেস করে তোমার নাম?

—আমার নাম নূর।

—উঠে এসো।

খালাসীদের হুকুম দিলো কাপ্তান, নোঙর তোলো।

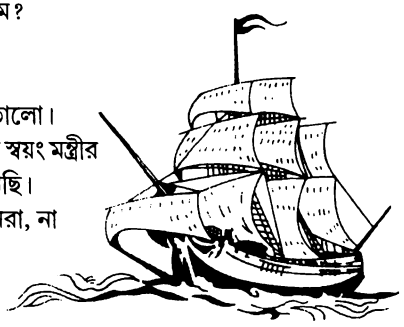

খালাসীরা অনেকেই বিস্ময়াহত। এ জাহাজে স্বয়ং মন্ত্রীর যাবার কথা ছিলো। কিন্তু এতো এক পাদরী দেখছি।

কাপ্তান গর্জে ওঠে, জাহাজের কাপ্তান তোমরা, না আমি?

একজন সামনে এসে প্রতিবাদ জানাতে যায়, কিন্তু আপনিই বলেছিলেন, জাহাজ ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হও, এখুনি মন্ত্রীমশাই আসছেন। তিনি মিশরের উদ্দেশে রওনা হবেন। আমাদের রাজকুমারীকে যেসব মুসলমান দস্যুরা অপহরণ করেছিল—তাদের মোকাবিলা করতে যাবেন তিনি।

কাপ্তান তরবারি উন্মুক্ত করে বলে, জাহাজের শৃঙ্খলাভঙ্গ করার অপরাধে এই তোমার সাজা।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই খালাসীটার মুণ্ডু পাটাতনে লুটিয়ে পড়ে। এতে বাকী নয়জন ক্রুদ্ধ হয়ে কাপ্তানকে ঘায়েল করার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু কাপ্তানের তরবারি এক এক কোপে এক এক জন পাটাতনশায়ী হয়ে পড়ে।

এর পর সে নিজেই নোঙর তুলে জাহাজ ছেড়ে দেয়। হাওয়ার গতি ছিলো পালের অনুকূলে। ক্ষুদে জাহাজখানা তরতর করে বয়ে চলতে থাকে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে।

নূর তখন থর থর করে কাঁপছিলো। একসঙ্গে এতগুলো খালাসীকে কেটে ফেলেও কিন্তু কাপ্তান সাহেবের মুখে কোনও উত্তেজনা অস্থিরতা নাই। ব্যাপারটা যেন কিছুই না—এই রকম ভাবখানা।

নূর ভয়ে ভয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বলে না। কী জানি লোকটার কী মতলব! হয়তো মাঝ দরিয়ায় ছুঁড়েই ফেলে দেবে তাকে। কিংবা ঐ তলোয়ারের এক ঘায়ে—না না, সে কথা ভাবতে পারে না নূর, ভাবতে চায় না।

তবে সে একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছে, কাপ্তানের কোনও সৎ উদ্দেশ্য নাই। তা না হলে, সে রাজকুমারী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই জাহাজখানা ছেড়ে দিলো কেন? সম্রাটের গুপ্তচর নয় তো? মিরিয়ামের সঙ্গে যখন তার যে গোপন পরামর্শ হয়—জাহাজঘাটায় যাবে খুব ভোরে, ওখানে জাহাজ প্রস্তুত থাকবে—সে কথা কী সম্রাটের কানে পৌঁছে দিয়েছিলো কেউ? হতে পারে। হয়তো ঐ বুড়ি পাদরী-মাতারই এই কারসাজী।

—এই যে পাদরী সাহেব, অমন মন-মরা হয়ে বসে বসে কী ভাবছো ওখানে? এদিকে আমার কাছে এস। একটু গল্প সল্প করি।

কাপ্তানের গলায় যেন কেমন ব্যঙ্গের সুর। নূর ঢোক গিলে বলে, না, মানে এমনিই পানির শোভা দেখছি।

—সে তো এখানে বসেও দেখতে পারবে পাদরী সাহেব। এস, এখানে এস।

নূর আর না করতে পারে না। কে জানে হয়তো এখুনি হুট করে রেগে উঠে গলাটা কুচ করে নামিয়ে দেবে।

নূর ওর কাছে গিয়ে বসে। কাপ্তান বলে, আমরা কোথায় যাচ্ছি জানো?

—না। তবে যাওয়ার কথা ছিলো আলেকজান্দ্রিয়া। এখন আপনার মর্জি যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যেতে হবে।

—কেন, তোমার মনে কোনও সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

—না, মানে—রাজকুমারী মিরিয়ামের আসার কথা ছিলো। সে কথা কি আপনি জানতেন না?

—কেন জানবো না? তার হুকুমেই তো তোমাকে নিয়ে চলেছি।

নূর বলে, কিন্তু তার আসা পর্যন্ত তো অপেক্ষা করলেন না? এ জাহাজে আমার সঙ্গে তারও তো যাওয়ার কথা ছিলো।

কাপ্তান চোখ পাকিয়ে ওঠে, কথা ছিলো? রাজন্যাকে চুরি করে পালাবে ভেবেছিলে? জান, তুমি কোথায়, আর কার সাম্রাজ্যে দাঁড়িয়ে এইসব ষড়যন্ত্র এঁটেছিলে? সম্রাটের লাজুক কন্যাকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার মতলব করেছিলে?

—মোটেও না। আমি কাউকে ভাগাবার জন্য কোনও ফন্দী ফিকির করিনি। রাজকুমারী মিরিয়াম আমার শাদী করা বিবি। সম্রাটই ছল করে আমার বিবিকে চুরি করে এনেছে। আমি তাকে উদ্ধার করতে এসেছিলাম।

কাপ্তান বলে, কিন্তু রাজকুমারী তো তার ভুল বুঝতে পেরে আবার খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে।

—মিথ্যে কথা। জোর করে তাকে খ্রীষ্টান করা হয়েছে। আমি জানি, ওতে কেউ খ্রীষ্টান হয় না। কারণ পয়গম্বর যীশু বলেছেন, কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে খ্রীষ্টান করা পাপ।

কাপ্তান বলে, তা হলে এখন কী করবে? রাজকুমারী তো ধোঁকা দিয়ে তোমাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছে।

নূর বললো, আমি মিরিয়াম ছাড়া জীবন ধারণ করবো না। আপনার পায়ে পড়ি, কাপ্তান সাহেব, আলেকজান্দ্রিয়ায় আমি একা ফিরে যাবো না। আপনি আমাকে কনসতানতাইনের বন্দরেই ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। সেখানে আমি সম্রাটের বন্দী হয়েই প্রাণ হারাতে চাই। তবু মিরিয়াম-বিহীন জীবন আমি রাখবো না।

কাপ্তান হাসে, সামান্য একটা ম্লেচ্ছ নারীর জন্য তুমি প্রাণ দেবে? তুমি না সাচ্চা মুসলমানের সন্তান?

নূর প্রতিবাদ করে, মিরিয়াম সামান্যা নারী নয়। এবং সে বিধর্মীও নয় কাপ্তান সাহেব। সে আমার সহধর্মিণী। দোহাই আপনার, জাহাজ ফেরান। আমাকে কনসতানতাইনে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। না হলে, এই দরিয়ার পানিতেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেব।

উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে নূর। সে আর ধরে রাখতে পারে না নিজেকে। সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেবার জন্য ঝুঁকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তান ওকে ধরে ফেলে। জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে।

কিন্তু এ কি! নূর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ মেলে কাপ্তানের মুখের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে দেখতে থাকে। কাপ্তান খিল খিল করে হেসে ওঠে। কী আশ্চর্য, হঠাৎ কাপ্তানের গলার আওয়াজ মধুর হয়ে গানের মতো বেজে ওঠে।

—মিরিয়াম তুমি?

কাপ্তান নকল দাড়ি গোঁফ টেনে খুলে ফেলে দেয়। মাথার পাগড়ী নামিয়ে রাখে।

সেই মিরিয়াম—তার চোখের মণি বুকের কলিজা। খিল খিল করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে সে। নূরের গালে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে বলে, খুব যাতনা দিয়েছি, না, সোনা?

নূর-এর মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে, তামাশারও একটা সীমা থাকা দরকার, মিরিয়াম। তুমি

কী জান না, আমার মনের অবস্থা কী। আমি যদি এই দরিয়াতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মঘাতী হতাম—

—আমি হতে দিলে তো?

এবারে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে নূরের অধরে ধীর্ঘ চুম্বন করে মিরিয়াম।

নূর জিজ্ঞেস করে, কিন্তু পাদরী-মাতা তো আমাকে বলেছিলেন, তাঁর এক শিষ্য কাপ্তান একখানা ছোট জাহাজ নিয়ে বন্দরে অপেক্ষা করবে? তুমি কী করে এলে এই বেশে।

মিরিয়াম বলে, এ সবই পাদরী-মাতার দৌলতেই সম্ভব হয়েছে, নূর। তাকে আমার শতকোটি সালাম। তিনি সাহায্য না করলে আমার বাবার শ্যেন দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে এভাবে পালানো একেবারেই সম্ভব ছিলো না।

বাবাকে বলে তিনিই আমাকে গত রাতে গীর্জায় নিয়ে এসেছিলেন। প্রভু যীশুর কাছে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সারা রাত ধরে আমাকে দীপ জ্বালাতে এবং উপাসনা করতে হবে—এই রকম বলে তিনি আমাকে প্রাসাদ থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

মিরিয়াম বলতে থাকে ঃ এই জাহাজের আসল কাপ্তান সত্যিই পাদরী-মাতার একান্ত অনুরক্ত শিষ্য। এখন সে ঐ গীর্জারই একটা ঘরে আত্মগোপন করে আছে। আমাকে তার সাজ-পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন মাতা। এবং এই যে গোঁফ দাড়ি দেখছো—এও তিনি লাগিয়ে দিয়েছিলেন আমার মুখে। এমন নিখুঁতভাবে ছদ্মবেশে সাজিয়ে দিয়েছিলেন যে, খালাসীরা দেখে নকল কাপ্তান বলে চিনতে পারেনি কেউ। তুমি ভাবছো, এমন অসি-বিদ্যা এবং জাহাজ চালাবার কৌশল আমি শিখলাম কোথায়? আমাদের রাজবংশের নিয়ম, প্রত্যেক সম্রাট-সন্তান—তা সে পুত্রই হোক, বা কন্যাই হোক, প্রত্যেককে যুদ্ধ বিদ্যায় বিশারদ হতে হবে। আমাদের সমুদ্র সন্নিহিত সাম্রাজ্য; সেই কারণে নৌবিদ্যাতেও দক্ষ হতে হয়। এজন্য খুব ছোট থেকে আমার ভাইদের সঙ্গে আমিও যুদ্ধবিদ্যা শিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। ভাগ্যে বাধ্য হয়েছিলাম—তা না হলে আজ কী করে তোমাকে ফিরে পেতাম বলো?

নূর মিরিয়ামের বুকে মাথা গুঁজে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো পাঁচতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মিরিয়াম বললো, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর অপার করুণায় আমরা আবার মিলিত হতে পেরেছি নূর। আর কেউ আমাদের ছাড়াছাড়ি করতে পারবে না।

সমুদ্র যাত্রা দীর্ঘ একান্ন দিনের পথ। একটি ছোট্ট জাহাজের পাটাতনে গা এলিয়ে শুয়ে বসে মধুর ভাবে দিবস-রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকে। ওপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, আর নিচে নীল জলধি। তার ওপর দিয়ে হাওয়ার টানে ভেসে চলেছে ছোট জাহাজখানা। নূর আর মিরিয়াম ছাড়া সে দুনিয়ায় তৃতীয় কোনও প্রাণী নাই। দিনের বেলায় বিবস্ত্র হয়ে দুজনে জাহাজের পাটাতনে পাশাপাশি শুয়ে রৌদ্র-স্নাত হয়। আর রাত্রি বেলায় শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় দুজনে দুজনের বুকের ওমে উত্তাপ আহরণ করে।

নাচ গান আদর সোহাগ চুম্বন এবং সহবাসে প্রতিটি মুহূর্ত মধুরতর হতে থাকে।

এইভাবে একদিন ওরা আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে এসে জাহাজ ভেড়াতে পারে। নূর বলে, তুমি যে তীরে নামবে, কিন্তু বোরখা কোথায়?

মিরিয়াম বলে, তাই তো, বোরখা না পরে নামবোই বা কী করে?

নূর বললো, ঠিক আছে, এখন তোমাকে নামতে হবে না। তুমি জাহাজেই অপেক্ষা কর। আমি বাজার থেকে তোমার জন্যে বোরখা আর নাগরা চটি কিনে নিয়ে আসি।

মিরিয়াম বলে, কিন্তু বেশি দেরি করো না, সোনা। আমার একা একা থাকতে মন চায় না।

নূর আদর করে ছোট্ট একটা চুমু এঁকে দিয়ে মিরিয়ামের গালে, আর ভয় কী! আমি যাবো আর আসবো। তুমি একটুখানি একা একা থাক।

নূর নেমে বাজারের উদ্দেশ্যে চলে যায়।

এদিকে কনসতানতাইন সম্রাটের প্রাসাদৈ হৈ চৈ ওঠে। গতকাল রাতে মিরিয়াম গীর্জায় উপাসানা করতে গেছে, সকালেই তার ফেরার কথা, কিন্তু সকাল গড়িয়ে যায়, এখনও মিরিয়াম ফিরে আসেনি।

গীর্জায় লোক পাঠালেন সম্রাট। কিন্তু পাদরী-মাতা বললো, সে তো অনেক সকালে—খুব ভোরেই ফিরে গেছে।

সম্রাট চিন্তিত হয়ে চারিদিকে চর পাঠালেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই খবর পাওয়া গেলো ঃ রাজকুমারী নূরকে নিয়ে একখানা জাহাজে উঠে পালিয়েছে।

সম্রাট তার সেনাপতিদের ডেকে বললেন, যাও, এক্ষুনি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ধাওয়া কর ওদের। জীবিত অথবা মৃত মিরিয়ামকে আমি ফেরত চাই।

তৎক্ষণাৎ রণতরী ছুটে চললো সমুদ্রের বুক চিরে। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে আসার আগে পর্যন্ত কোনও জাহাজের সন্ধান করতে পারলো না।

সম্রাটের রণতরীর কাপ্তান আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে ঢুকতেই দেখতে পেলো, তাদেরই ছোট একখানা জাহাজ বন্দরে নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে।

পলকের মধ্যে ওরা মিরিয়ামকে জাহাজে তুলে নিয়ে আবার কনসতানতাইনের অভিমুখে যাত্রা করলো।

সম্রাট ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে মিরিয়ামকে বললেন, এর শাস্তি কী জান? কেন পালিয়েছিলে? ভেবেছিলে, পালিয়ে তুমি আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে? তোমার মতো নষ্ট-চরিত্রা ব্যভিচারিণীর স্থান নাই আমার প্রাসাদে। মৃত্যুই তোমার সাজা। এবং সেই শাস্তিই আমি তোমাকে দেব।

মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজই একে প্রকাশ্য রাজপথে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দিন। আর আমাদের প্রজাদের জানিয়ে দিন, সম্রাটের আদেশে তার প্রাণাধিক কন্যার ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। যারা স্বচক্ষে দেখতে চায়, দেখে যাক।

সম্রাটের এই মন্ত্রী অশীতিপর বিরূপ দর্শন এক বৃদ্ধ। তার গায়ের চামড়া লাল, চোখ কোটরে বসে গেছে, মাথা ভরা টাক। একটাও দাঁত নাই। নাকটা ব্যাঙের মতো। প্রথম দর্শনে যে কেউ শিউরে উঠবে।

এই মন্ত্রীমহোদয় বললো, মহামান্য সম্রাট, আমার একটি নিবেদন আছে।

—বলুন।

সম্রাট মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। মন্ত্রী বললো, রাজকুমারীকে আপনি ফাঁসি দেবেন না। বরং তার চেয়েও কঠিন সাজা দিন ওকে।

—মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে বড় সাজা আর কী হতে পারে, মন্ত্রিবর?

—হতে পারে। আপনি ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। আমার মতো এক কদাকার কুৎসতি লোলচর্ম বৃদ্ধকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিতে হবে—এই যন্ত্রণা মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও ভয়াবহ। ফাঁসির দড়িতে লটকে দিলে ওর এক পলকের জন্য কষ্ট হবে মাত্র। তারপর

সব শেষ। কিন্তু এতে সে তিল তিল করে দগ্ধ হয়ে মরবে। আমার মনে হয় রাজকুমারী সম্রাটের আনুগত্য উপেক্ষা এবং খ্রীষ্টধর্মের অমর্যাদা করে যে পাপের ভাগী হয়েছে, এই হবে তার যোগ্যতম দণ্ড।

সম্রাট বললেন, উত্তম। তাই হোক, আপনি ওকে বিয়ে করুন। আপনি একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান। এই ভ্রষ্টা ব্যভিচারিণীকে নিয়ে আপনি কী করবেন? তা ছাড়া ওকে চোখে চোখে আগলে রাখা কী আপনার পক্ষে সম্ভব হবে? যে মেয়ে একবার বাঁধন ছিঁড়েছে, তাকে শিকলে বেঁধে রাখলেও আটকে রাখা যায় না।

মন্ত্রিবর বলে, সেজন্য আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, মহামান্য সম্রাট। আমার স্ত্রীকে কী করে বশে রাখতে হয়, সে ওষুধ আমার জানা আছে।

সম্রাট বলেন, কিন্তু কাজটা খুব সহজ-সাধ্য হবে না, মন্ত্রীমশাই। যাই হোক, আপনার কথায় আমি আজ ওকে ফাঁসিতে ঝুলালাম না। বিশ্বাস করে আপনার হেপাজতে দিচ্ছি। কিন্তু যে কারণেই হোক, বা যেভাবেই হোক, ছলচাতুরী করে সে যদি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে যায়, তবে এর সমুচিত শাস্তি আপনাকে মাথা পেতে নিতে হবে। তখন আপনি মন্ত্রী বলে আমি আপনাকে রেয়াত করবো না। এই শর্তে যদি রাজী থাকেন, তবেই ওকে বিয়ে করতে পারেন। নচেৎ বিরত হোন।

বৃদ্ধ মন্ত্রী বলে, আমি মহামান্য সম্রাটের সতর্কবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছি। আপনি আশঙ্কা করবেন না। আমি এমন কিছু অপরাধ করবো না যাতে প্রাণটা খোয়া যায় আমার।

সারা প্রাসাদে ও শহরে মহা ধুম পড়ে গেলো। রাজকুমারীর বিয়ে হবে। খানাপিনা দান-ধ্যান-এর জন্য প্রাসাদ দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। দেশ-বিদেশ থেকে গণ্যমান্য রাজা মহারাজা নানারকম উপহার উপঢৌকন পাঠাতে লাগলো।

এবং এক শুভক্ষণ দেখে গীর্জার পাদরী-মাতা বিয়ের শপথ বাক্য পাঠ করালো বৃদ্ধ উজিরকে।

এদিকে নূর বোরখা আর এক জোড়া চটি কিনে নিয়ে বন্দরে এসে দেখে মিরিয়াম নাই। কপাল বুক চাপড়াতে থাকলো সে। তার কান্নায় ছুটে এলো আশেপাশের লোকজন। সকলেই নূরের দুঃখে সমবেদনা জানাতে থাকলো। কেউ বলে, বিবিকে এইভাবে একা ফেলে কেউ বাজারে যায়! কী দরকার ছিলো বাপু, ছেড়ে যাবার?

নূর বলে, উপায় ছিলো না। জাহাজে আমরা দুজনে ছিলাম। বোরখার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এখন এই বন্দরে বোরখা ছাড়া মেয়েছেলে নামে কী করে?

নূর যে সরাইখানায় থাকে সেই সরাইখানারই এক বৃদ্ধ শেখ নূরের কাছে এসে কাঁধে হাত রাখলো, চোখের জল ফেলে আর কী করবে, বেটা। বিধর্মীদের কাণ্ডই ঐ রকম। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, চল এখন সরাইখানায় ফিরে যাই।

রোরুদ্যমান নূরকে প্রায় জোর করেই সে সরাইখানায় নিয়ে আসে। ওকে পাশে বসিয়ে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, দেখ বাবা, নারী শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের বস্তু। ভালোবাসাই বলো, আর প্রেম মহব্বতই বলো, ওগুলো মেয়েদের কাছে কিছু নয়। ওরা রূপ-যৌবনের যাদুকরী—দেহ এবং কাম সর্বস্ব। সুতরাং শোক ক'রো না। আজ তোমার মনে হচ্ছে, কনসতানতাইন সম্রাটের কন্যা ছাড়া তুমি প্রাণে বাঁচবে না। কিন্তু দু'দিন সবুর কর, দেখবে সব সয়ে গেছে। তখন দেখবে, এই ফুল লতা পাতা পাখী—সব আবার ভালো লাগছে। তখন দেখবে, তুমি আবার কথায় মুখর হয়েছ, হাসছ গাইছ। তখন দেখবে, অন্য আর এক

রূপসী নারী তোমার মন কেড়ে নিচ্ছে। এই-ই হয়—এই-ই নিয়ম। সুতরাং শোক ক'রো না। শান্ত হও।

নূর কিন্তু সে কথায় আদৌ সান্ত্বনা পায় না। বলে, না চাচা, আমি আমার বিবি মিরিয়ামকে ছাড়া এ জীবন রাখবো না। ওকে আমি চাই-ই।

শেখ বলে, কিন্তু কনসতানতাইনের বিক্রম এবং ইসলাম-বিদ্বেষ কী তোমার জানা নেই বাবা! ঐ ম্লেচ্ছ বিধর্মী খ্রীষ্টান সম্রাটের সারা মুলুকে একটাও তুমি মুসলমান খুঁজে পাবে? না, নাই—সারা দেশে একটা মুসলমান সে রাখেনি। অথচ ছিলো—হাজার হাজার ইসলামে বিশ্বাসী মুসলমানের বাস ছিলো তার সাম্রাজ্যে। সম্রাট তাদের সবাইকে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টান হতে হুকুম করেছিলো। কিন্তু একটা মুসলমান তার হুমকীতে মাথা নত করেনি। এবং এই কারণে—ঐ বিধর্মী ম্লেচ্ছটা আমাদের প্রতিটি ভাইবোনদের শূলে চাপিয়ে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয়, কারণে অকারণে কতবার সে ইসলাম রাষ্ট্রগুলোর ওপর সৈন্যদল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এবং লুঠতরাজ হত্যা করে আবার সরে পড়েছে।

নূর বাধা দিয়ে বলে, কিন্তু এবার তো আমরা মুসলমানরাই তার কন্যাকে অপহরণ করে বাঁদী-হাটে বেচে দিয়েছিলাম, চাচা।

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলেন, তা-হতে পারে। এবং সে যে খুব একটা অপরাধ, তাও আমি মনে করি না বাবা। খোঁজ নিয়ে দেখ, যারা সম্রাট-নন্দিনীকে অপহরণ করে বাঁদী-বাজারে বেচে দিয়েছিলো, তাদের কী সর্বনাশ করে গেছে সম্রাটের সেনারা? নিশ্চয়ই কোনো সাংঘাতিক ক্ষতি অনিষ্ট তাদের হয়েছে। না হলে শুধু শুধু তারা রাজকুমারীকে হরণ করতো না। খোঁজ নিলে হয়তো শুনবে, সম্রাটের নৃশংস অত্যাচারে তাদের বিবি বাচ্চারা নিহত হয়েছে—অথবা সৈন্যরা মজা দেখার জন্য গভীর রাতে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

বৃদ্ধের এই রক্ত-নাচানো বক্তৃতা শুনতে হাজারো লোক জড়ো হয় সেখানে।

শেখ আবার বলতে থাকে ঃ যা বলেছিলাম, তুমি সামান্য এক মুসলমান সন্তান। সম্রাটের সৈন্যবল অসীম। এবং তার হিংস্রতা-নিষ্ঠুরতারও তুলনা নাই। সে ক্ষেত্রে তোমার বিবিকে কীভাবে তুমি উদ্ধার করে আনবে, বাবা। একবার তো একশো জনকে সঙ্গে নিয়ে গেলে। সবাইকে হাড়িকাঠে ফেলে সে কোতল করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয়ে আওয়াজ ওঠে, আল্লাহ হো আকবর। আমরা ওতে ভয় খাই না। ইসলাম যেখানে বিপন্ন আমরা জানকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। চলো, নওজোয়ান, আমরা তোমার সঙ্গে যাবো।

প্রায় শ'খানেক মুসলমান রাজি হয়ে গেলো। তখনই একখানা জাহাজ ঠিক করে নূরকে সঙ্গে নিয়ে চেপে বসলো তারা।

একটানা একান্ন দিন পরে জাহাজ এসে ভিড়লো কনসতানতাইনের বন্দরে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই নূর-রা সকলেই বন্দী হলো সম্রাটের সেনাবাহিনীর হাতে।

প্রাসাদের সামনে সবাইকে সারবন্দী করে দাঁড় করানো হলো। সম্রাট হুকুম দিলেন, শূলে চড়াও।

এক এক করে সবাইকে শূলে গেঁথে হত্যা করা হলো। সব শেষে আনা হলো নূরকে। সম্রাট দেখে বিস্মিত হলেন, এ কি! এই যুবককে সেবার তো আমি পাদরী মাতার অনুরোধে রেহাই দিয়ে গীর্জার প্রহরী করে পাঠিয়েছিলাম। সেখান থেকে পালিয়ে আবার আমার জালে ধরা পড়েছে। যীশুর কী অপার মহিমা! ঠিক আছে, এবার একে দু'দুবার শুলে গেঁথে বধ করতে হবে।

এই সময় সেই বৃদ্ধ উজির বললো, মহামান্য সম্রাট আমার প্রাসাদের দ্বাররক্ষীর

জন্য তিনজন যবনকে নিযুক্ত করবো বলে আমি পণ করেছি। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে তিনটি যবনকে আমার হাতে দিন।

সম্রাট বললেন, আপনার প্রতিজ্ঞা আমি কী করে জানবো, মন্ত্রীমশাই। আগে যদি বলতেন তিন কেন, তিরিশটা দিতে পারতাম। কিন্তু এখন তো সব খতম হয়ে গেছে। বাকী রয়েছে মাত্র এই একটি, তা যদি চান, এটিকে নিয়ে যেতে পারেন।

নূরকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী তার নিজের প্রাসাদে আসে। তার ধারণা তিনটি যবনের রক্ত দিয়ে দরজার চৌকাঠ ধুয়ে দিলে আর কোন অশুভ শক্তি ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। যাই হোক, তিনটিকে যখন একসঙ্গে সংগ্রহ করা গেলো না, তখন বাকী দুটির জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। আবার নিশ্চয়ই মুসলমানরা সম্রাট-সেনার হাতে বন্দী হবে। তখন আর দুটি চেয়ে নিয়ে একসঙ্গে তিনটিকে বলি দিতে হবে। ততদিন এইটিকে জিইয়ে রাখতে হবে।

কিন্তু কোথায় রাখা যায় এই ম্লেচ্ছ অপবিত্র জীবটিকে। প্রাসাদের কোনো কক্ষে রাখলে সে কক্ষ অপবিত্র হবে!

ভেবে ভেবে সে স্থির করলো, ঘোড়ার আস্তাবলে ওকে হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে ফেলে রাখবে।

সম্রাটের একটি আস্তাবলে দুটি জগৎ বিখ্যাত আরবী ঘোড়া ছিলো। একটির নাম সাবিক, আর একটির নাম লাহিক। সাবিকের গায়ের রঙ পায়রার মতো সাদা, আর লাহিক ঘোরতর কৃষ্ণ বর্ণের। তাবৎ মুসলমান এবং খ্রীষ্টান মুলুকে এই সাবিক-লাহিকের দারুণ প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিলো। সে সময়ে ওদের সমকক্ষ দূরন্ত দুর্বার এবং নানা যুদ্ধ-কৌশলে ওস্তাদ ঘোড়া আর একটিও ছিলো না কোনও দেশে।

নূরকে সঙ্গে নিয়ে আস্তাবলে আসে উজির। বলে, আপাততঃ এইখানেই তোমাকে থাকতে হবে। যতদিন না তোমার মতো আর দুই বিধর্মী যবনকে সংগ্রহ করতে পারি, ততদিন এই আস্তাবল তোমার বেহেস্ত। এখানে বসে ঈশ্বরের উপাসনা কর। তারপর যথাসময়ে তিনজনকে এক সঙ্গে বলি দিয়ে তোমাদের পাপ মুক্ত করবো।

উজির ভেবেছিলো, আতঙ্কে আঁৎকে উঠবে সে। কিন্তু একি। ছেলেটা মিটি-মিটি হাসছে।

অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করে, কী, আমার কথার মানে বুঝতে পারনি? তোমাদের কোতল করা হবে—যথাসময়ে!

—জী হ্যাঁ, তা খুব বুঝেছি।

—তবে হাসছো কেন?

নূর বলে আপনার আস্তাবলের হেকিম বেচারী কিছুই জানে না। না হলে, এই রকম সেরা জাতি ঘোড়াটার চোখে পিচুটি পড়েছে, দেখছেন সে সারাতে পারছে না? চোখটা তো কানা হয়ে যাবে।

উজির শিউরে ওঠে, বলো কী? কানা হয়ে যাবে? তামাম দুনিয়ায় এ ঘোড়ার জুড়ি নাই, জান?

—জানবো না কেন, সেইজন্যেই তো বলছি, ভালো করে চিকিৎসা করান, তা না হলে পস্তাবেন। এমন অমূল্য জানোয়ার পয়সা ছড়ালেও তো জোগাড় করতে পারবেন না।

উজির বলে হেকিমটাকে তো আমি রোজই ধমকাচ্ছি। কিন্তু সে বলে, কালই সেরে যাবে। কিন্তু, তুমি ঠিকই বলেছ, আসলে ও রোগই ধরতে পারেনি। ওর কোনও দাওয়াই-ই কাজে লাগছে না।

এ রোগের দাওয়াই সবাই জানে না। আমি সারিয়ে দিতে পারি আপনার ঘোড়ার অসুখ। কিন্তু তার বদলে আপনি আমাকে কী দেবেন?

উজির আশান্বিত হয়ে প্রশ্ন করে, পার তুমি সারাতে? তুমি কী হেকিম?

তারপর বলে, যদি সারাতে পার, সম্রাটের সমস্ত আস্তাবলের বড়কর্তা করে দেব তোমাকে। আর দেব যেখানে খুশি চলা-ফেরার অবাধ স্বাধীনতা।

—আমি রাজি। আপনি এক কাজ করুন মন্ত্রীমশাই। আমাকে খানিকটা রসুন, চুন, মোম এবং বাছুরের যকৃত এনে দিন। আমি ওষুধ বানিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি, কালই সেরে যাবে অসুখ। তার আগে আমার হাতে পায়ের কড়াগুলো খুলে মুক্ত করে দিন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো সাততম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

পরদিন সকালে উজির এসে বললো, কই চোখের বাঁধনটা খোল, দেখি তোমার ওষুধে কী কাজ হয়েছে?

নূর খুলে দেখালো। ঘোড়াটার চোখ হরিণের মত ডাঁসা এবং স্বচ্ছ হয়ে গেছে। পিচুটির লেশ মাত্র নাই।

মন্ত্রী তারিফ করে নূরের পিঠ চাপড়ায়, বাঃ বহুত, ধন্বন্তরী হেকিম তো তুমি। শিখলে কোথায়?

আসলে নূর হেকিমীর কিছুই জানে না। ওদের বাড়িতে একটা ঘোড়ার একবার এই অসুখ হয়েছিলো। তখন পাড়ায় এক হাতুড়ে এই ওষুধটা বানিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিলো এবং একদিনেই সেরে গিয়েছিলো ঘোড়াটার চোখ। ওষুধটা কী ভাবে, কী কী দিয়ে বানিয়ে দিয়েছিলো সে, নূরের পরিষ্কার মনে ছিলো সব। এছাড়া অন্য কোনও কেরামতি তার নাই। নূর বললো, জী, আমি তো এই বিদ্যাই শিখেছি।

উজির খুব খুশি হয়। বলে, আজ থেকে সব আস্তাবলের কর্তা নিযুক্ত করা হলো তোমাকে। তোমার হুকুমে সব সহিসরা ওঠা বসা করবে। যখন খুশি, যে-কোনও জানোয়ারকে পরীক্ষা করতে পারবে, দাওয়াই দিতে পারবে। কোনও জানোয়ারকে বাইরে নিয়ে যেতে হলে তোমার ছাড়পত্র লাগবে। এ ছাড়া যে-কোনও জানোয়ার নিয়ে তুমি যত্র তত্র অবাধভাবে চলা-ফেরা করতে পারবে।

মিরিয়াম উজিরের ঘরে বন্দীদশায় দিন কাটায়। দিন রাত সে চোখের জল ফেলতে থাকে। বুড়ো উজিরটা নানাভাবে ওর মনোরঞ্জন করতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু মিরিয়াম তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

এই সময় এক দরদী সহচরী মিরিয়ামকে জানালো, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে একখানা জাহাজে করে শ' খানেক মুসলমান এসে নেমেছিলো বন্দরে। সম্রাট তাদের একজনকে বাদে সবাইকে শূলে দিয়েছে।

মিরিয়াম শিউরে ওঠে, বলিস কী?

বাঁদীটা বলে, হ্যাঁ মালকিন, নূর নামে এক খুবসুরত নওজোয়ান শুধু রেহাই পেয়েছে।

মিরিয়াম মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে, তুই ঠিক জানিস?

—হ্যাঁ মালকিন, সেই নূর সাহেব তো এখন সম্রাটের আস্তাবলের বড় সাহেব হয়েছেন?

—তুই তাকে দেখেছিস?

—দেখবো না কেন? কী সুন্দর দেখতে মালকিন—যেন রাজপুত্তুর।

মিরিয়াম বলে, আমার একটা কাজ করতে পারবি?

—কেন পারবো না?

—তাকে একবার এই জানলার ধারে বাগানে নিয়ে আসতে পারবি?

বাঁদীটা বলে, এ আর এমন শক্ত কী? আমি এখুনি খবর দিচ্ছি তাকে।

মিরিয়াম ওর হাত চেপে ধরে, কিন্তু সাবধান, কেউ যেন টের না পায়?

মেয়েটি বলে, বুঝতে পেরেছি মালকিন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ জানতে পারবে না।

পরদিন সকালে মিরিয়াম জানলার ধারে বসে বাগানের দিকে তাকিয়েছিলো। এই সময় নূর এসে এ-গাছ ও-গাছ থেকে দু একটা ফুল তোলার অছিলায় জানলার দিকে তাকায়।

মিরিয়াম-এর সারা শরীরে শিহরণ খেলে যায়। তাড়াতাড়ি সে কাগজ কলম নিয়ে একটা চিরকুট লেখে ঃ

সোনা, তোমার আশাতেই দিন গুণছি। আজ সন্ধ্যায় শহরের শেষ প্রান্তের সুলতান ফটকের সামনে দু'টো ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করো। বাঁদী হাজির হবে—মিরিয়াম।

একখানা রেশমী রুমালের খুঁটে বেঁধে বাগিচার ভেতরে ছুঁড়ে দেয় মিরিয়াম। নূর পায়ে পায়ে এগিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে রুমালখানা তুলে নিয়ে চলে যায়। একটু পরে আবার ফিরে এসে ইশারা করে জানিয়ে যায়—ঠিক আছে।

বিকেল বেলায় সহিসদের ডেকে বলে সাবিক আর লাহিকের পিঠে জিন লাগাম চাপিয়ে বাইরে বের কর।

অনেক দিন বাদে সাবিক লাহিককে বাইরে বের করে জিন লাগাম পরানো হচ্ছে দেখে উজির নূরকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, কী তোমার জানোয়াররা কেমন আছে? আজ যে বড় সাজগোজ দেখছি। কোথাও যাওয়া হবে নাকি।

নূর বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, অনেক দিন এরা বাইরে বেরোয় না। এভাবে একটানা আস্তাবলে বন্দী করে রাখলে পায়ে বাত ধরে যাবে। তাই ঠিক করেছি আজ থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ওদের একটু দৌড় ঝাঁপ করাবো। তাতে শরীর ঠিক থাকবে।

উজির বলে, বাঃ চমৎকার, তাই তো দিনের পর দিন ওদের একভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলে জরা চেপে বসবে। আমাদের আগের হেকিমটার মাথায় গোবর পোকা ছিলো। ব্যাটাচ্ছেলে সারাদিন শুধু ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুতো। এতগুলো জানোয়ার কেউ মরলো কি বাঁচলো—খোঁজই রাখতো না সে।

উজির চলে গেলো। নূর ঘোড়ার পিঠে চাপলো না। ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো সুলতান-ফটকের দিকে।

সন্ধ্যা হতে না হতে উজির এসে মিরিয়ামের পাশে বসে। অনেক মিঠে মিঠে বাত শোনায়। আদর সোহাগ করতে যায়। অন্যদিন মিরিয়াম কোনও পাত্তা দেয় না। কিন্তু সেদিন সে নিজে থেকেই বুড়োটার গা ঘেঁষে বসে। নাকিসুরে অনেক আব্দারের কথা বলে। বুড়ো বিগলিত হয়ে যায়।

মিরিয়াম বলে, আজ দুপুরে ভালো করে খানা খেতে পারিনি। বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। খেতে দিতে বলো না গো?

উজির বলে, খিদে পেয়েছে, তা এতক্ষণ বলনি কেন? এ্যাই—কে আছিস—খানা সাজিয়ে দে।

অন্যদিন উজির তাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করেও খাওয়াতে পারে না, কিন্তু আজ সে খাবার টেবিলে নিজেই প্রধান ভূমিকা নেয়।

—আহা, ঐ পায়রার দো-পিঁয়াজিটা তুমি একদম খেলে না। ওটা এই বয়সে একটু বেশি করে খাওয়া দরকার। ওতে বীর্য বাড়ে। নাও, আর একটা টুকরো খেয়ে নাও। গায়ে তাগদ বাড়াতে হবে না?

একটুকরো পায়রার মাংস দু'আঙ্গুলে ধরে আলতো করে বুড়োর মুখে গুঁজে দেয় মিরিয়াম।

মিরিয়াম যে তাকে আপন করে নিতে পেরেছে এই ভেবে উজির আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

তা হলে কাল থেকে পায়রার মাংস বেশি করে দিতে বলবো, কী বলো? ওটা খেলে শরীর খুব গরম হয় না?

মিরিয়াম বলে, হ্যাঁ, কিন্তু আস্তে আস্তে সইয়ে নিতে হবে তো? এক দিনেই এক বাটি খেলে হজম করতে পারবে না।

—তা যা বলেছো। ধীরে ধীরে যৌবনকে ফেরাতে হবে। তা—তুমি যখন আমার হৃদয়ের রাণী হয়ে এসেছ—তোমার ছোঁয়াতেই যৌবন আমার ফিরে আসবে।

—থাক। অত আর মন ভুলিয়ে কথা বলতে হবে না। এমনিতেই আমি তোমার বাঁদী হয়ে থাকবো চিরকাল। নাও, এই বাচ্চা মুরগীর এই সুরুয়াটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলতো! এটাও তোমাকে নিয়ম করে ওষুধের মতো খেতে হবে, বুঝলে? মেয়েমানুষের মান রাখতে গেলে এই সুরুয়াই কিন্তু আসল দাওয়াই। দু'বেলা দু'বাটি যদি খাও, দেহে মনে ফূর্তি জাগবে। শরীর চনমন করে উঠবে।

এই সব বক্তৃতার ফাঁকে কায়দা করে এক ডেলা মরোক্কার অ ফিঙ মিশিয়ে দিলো সে মুরগীর ঝোলে। বাটিটা বুড়োর মুখে তুলে ধরে বলে, নাও এক চুমুকে খে য়ে ফেলো। আজ প্রথম তোমার সঙ্গে আমার লড়াই হবে। দেখবো তোমার বুড়ো হাড়ে কেমন ভেল্কি দেখাতে পার?

বুড়ো দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, আমি আর পারছি না মিরিয়াম। আজ সাতদিন আমাদের শাদী হয়েছে, এই সাতদিনের মধ্যে একটা দিনের তরে আমার আদর সোহাগ পাওনি তুমি।

মিরিয়াম বলে, আহা, কী যে বলো, পুরোনো ঘা-টা শুকাতে সময় লাগবে না? আজ তো আমি পুরো সেরে উঠেছি। দেখো, আজ কত আদর সোহাগ খাবো তোমার। আচ্ছা এখন চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলতো সুরুয়াটা। তারপর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো। শাদী আমাদের যেদিনই হোক, আজই তো হবে প্রথম বাসর রাত্রি—কী বলো?

উজির ঝোলটা চুমুক দিয়ে খেয়ে শুধু বলতে পারে, তা যা বলেছো—

ব্যস, এর পরই সে ঢলে পড়ে গালিচায়।

আগে থেকেই সব গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিকঠাক করে রেখেছিলো মিরিয়াম। দু'টো থলেয় ভরে নিয়েছিলো উজিরের সঞ্চিত সব মূল্যবান ধনরত্নগুলো। থলে দু'টো আর একখানা শাণিত তলোয়ার বেঁধে নিলো সে কোমরে। তারপর একখানা মোটা কাপড়ের কালো বোরখা দিয়ে ঢেকে নিলো সারা শরীর। জানরার চৌকাঠে রশি বেঁধে নিচে ঝুলে পড়লো মিরিয়াম। তারপর অতি সহজ স্বাভাবিক অথচ দ্রুতগতিতে হেঁটে চললো সুলতানী ফটকের দিকে।

নূর ঘোড়া দু'টো সঙ্গে নিয়ে মিরিয়ামেরই প্রতীক্ষা করছিলো। মিরিয়াম এসে লাফিয়ে উঠে বসে লাহিকের পিঠে। বলে, জলদি ওঠ সাবিকের পিঠে। জোর কদমে আমার পিছনে পিছনে ছুটে এস। আমি ছুটলাম।

তীরবেগে দুই ঘোড়া ছুটে চলে গ্রাম গঞ্জ মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে সারারাত ধরে।

সকাল বেলা ওরা প্রায় হাজার যোজন পথ পার হয়ে শস্য-শ্যামল প্রান্ত সীমায় এক স্রোতস্বিনী নদীর কিনারে এসে থামে।

মিরিয়াম আর নূর নেমে পড়ে। ঘোড়া দু'টো মাঠে চরতে ছেড়ে দেয়। নিজেরা নদীতে নেমে হাত মুখ ধুয়ে রুজু করে নামাজ সারে। গাছের ফল পেড়ে আনে নুর। দুজনে তৃপ্তি করে খায়। তারপর নদীর জল পান করে নদীর ধারে ঘাসের শয্যায় গা এলিয়ে দেয়।

—বাব্বা, সারাটা রাত কী দুরন্ত বেগে ছুটেছি।

নূর জিজ্ঞেস করে, আমরা কতদূর এসেছি মিরিয়াম?

—অনেক দূর। আমার বাবার সাম্রাজ্যের একেবারে শেষপ্রান্তে বলতে পার। এখন আর ওরা আমাদের পাত্তা করতে পারবে না। সারারাত ঘুমটুম তো হয়নি। এস, একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আবার চলবো।

অনেক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। দুজনেই অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল গড়িয়ে দুপুর আসে। দুপুরও বিকেল হতে চায়। কিন্তু ওদের আর ঘুম ভাঙ্গে না।

হঠাৎ হাজার হাজার অশ্বক্ষুর ধ্বনিতে চমকে ওঠে বসে মিরিয়াম। নূরকে নাড়া দিয়ে জগিয়ে তোলে, এই—শিগ্গির উঠে বস।

—ও কীসের শব্দ, মিরিয়াম? চারদিক এমন ধূলোর ঝড়ের মতো আঁধার হচ্ছে।

মিরিয়াম গম্ভীর হয়ে বলে, হুঁ, হাজার দশেক হবে?

—দশ হাজার? তা হলে কী হবে, মিরিয়াম?

—তুমি পিছনে সরে থাক। আমি একাই লড়বো। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা কোনও পাপ করিনি নূর। হার হবে না।

নূর শঙ্কিত হয়ে বলে, তা বলে তুমি ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একা কী করে লড়বে, মিরিয়াম।

—ধৈর্য ধর নুর। দেখ আমি কী করি।

সকালে যখন যথাসময়ে উজির দরবারে এলো না, সম্রাট খোঁজ করতে পাঠালেন তাঁর প্রাসাদে। অবিলম্বে দূত এসে জানালো, উজির অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। রাজকুমারী ঘরে নাই।

সম্রাট ক্ষিপ্ত সিংহের মতো ছুটে এলেন উজিরের প্রাসাদে। উজিরটা তখন গালিচার ওপরে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলো। সম্রাট গর্জে উঠলেন, এই কুত্তার বাচ্চা, মিরিয়াম কোথায়?

উজিরের একখানা হাত ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকানি দিলেন তিনি, কিন্তু কোনও সাড়া নাই। জানলার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, কয়েকটা গরাদ ভাঙ্গা। একখানা দড়ি নেমে গেছে নিচে। বুঝতে অসুবিধা হলো না, এই দড়ি বেয়েই সে নেমে গেছে। আস্তাবলের সহিসরা এসে খবর দিলো; কাল সন্ধ্যায় নূর সাহেব সাবিক আর লাহিককে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে বেরিয়েছিলো, কিন্তু আর ফিরে আসেনি।

এবার তিনি নিশ্চিত হলেন, ঐ ছোকরাটার সঙ্গেই সে পালিয়েছে। সম্রাটের মাথায় খুন চেপে গেলো, তরবারীর এক কোপে উজিরের ধড় মুণ্ডু আলাদা করে দিলেন তিনি।

তারপর সেনাপতিদের তিনজনকে ডেকে এনে হুকুম করলেন। আর এক তিল দেরি নয়, তোমাদের তিনজনের পুরোবাহিনী নিয়ে সুলতান-ফটক দিয়ে বেরিয়ে পড়। বায়ুবেগে ছুটে চলতে হবে। যেভাবেই হোক, মিরিয়ামকে জ্যান্ত অথবা মৃত অবস্থায় আমার চাই-ই।

তৎক্ষণাৎ তিন সেনাপতির নয় হাজার অশ্বারোহীর তিনটি বিশাল সৈন্যবাহিনী আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নগর প্রান্তর ধূলি ও ধূম্রজালে আচ্ছন্ন করে উল্কার বেগে ছুটে চললো। সম্রাট স্বয়ং প্রধান সেনাপতি হয়ে তাদের পুরোভাগে ছুটতে থাকলেন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো নয়তম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

লাফিয়ে ওঠে লাহিকের পিঠে চেপে বসে মিরিয়াম। নূরকে বলে, সাবিকে চেপে তুমি অনেকটা পিছনে সরে থাকো। আমি সম্মুখ সমরে লড়বো।

এই বলে সম্রাটের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দিকে ঘোড়া ছুটালো।

দূর থেকে সম্রাটের দেখতে ভুল হলো না, উদ্যত তরবারি হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে মিরিয়াম। সম্রাট ভাবলেন, মেয়েটা কী বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। তা না হলে আত্মসমর্পণ না করে একি তার স্পর্ধা! নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি। সম্রাট তার সেনাপতিদের হুকুম দিলেন, সৈন্যবাহিনীর গতি স্তব্ধ কর। আমি একাই যাবো তার সামনে।

কন্যার মুখোমুখি এসে তিনি গর্জে ওঠেন, তোমার কী মাথার বিকৃতি ঘটেছে মিরিয়াম। খ্রীষ্টান সম্রাটের এই বিশাল বাহিনীর সামনে তুমি তরবারি উঁচিয়ে ছুটে আসছো? এখন তোমার সামনে একটাই পথ খোলা আছে তা আমার কাছে করুণা ভিক্ষা করা। না হলে মৃত্যু তোমার অবধারিত। কেউ রোধ করতে পারবে না।

মিরিয়াম বলে, আমি পিছনের দিকে তাকাতে জানি না, বাবা। যা ঘটে সামনাসামনিই ঘটুক। আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন। এবং এও ঠিক, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এবং মহম্মদ তাঁর পয়গম্বর। যদিও আমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তবুও আমি আমার ধর্ম এবং ভালোবাসা থেকে বিচ্যুত হতে পারি না।

এই বলে সে ঘোড়ার লাগামে ঝাঁকি দিয়ে আরও কয়েক কদম সামনে এগিয়ে যায়। হাতের তলোয়ার রৌদ্রকিরণে ঝকমক করে ওঠে।

লাহিকের পাছায় আদর করে দুটি চাপড় মারে মিরিয়াম। এবং তৎক্ষণাৎ লাহিক চিঁহিঁহিঁ আওয়াজ তুলে তীরবেগে ছুটে যায় সেনাবাহিনীর এক প্রান্তে। বাঁই বাঁই করে কয়েকবার ঘুরে আসে মিরিয়ামের তরবারী। এবং প্রায় জনা কুড়ি অশ্বারোহী লুটিয়ে পড়ে যায় নিচে। এবং সঙ্গে সঙ্গে লাহিক কয়েক কদম পিছিয়ে আবার ছুটে যায় ডানদিকের অশ্ববাহিনীর সামনে। মিরিয়ামের একটা মারও কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। ঝুপ ঝুপ করে সব খসে পড়ে যেতে থাকে।

সম্রাট আকাশ ফাটিয়ে ডাকলেন বারটাউট।

বারটাউট সম্রাটের সেনাপতিদের প্রধান। তার অসীম শৌর্য-বীর্যের নানা কাহিনী দেশ বিদেশের মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তার অমিত বিক্রমে ও দুর্জয় দুঃসাহস সর্বজন-বিদিত।

বারটাউট একটি সুন্দর তেজি ঘোড়ায় চেপেছে আজ। তার সারা চোখে দীপ্ত বিজয়ের হাসি। সম্রাটের সামনের এসে সে অভিবাদন জানায়।—মহামান্য সম্রাট, বারটাউট হাজির, হুকুম করুন অধীশ্বর।

সম্রাট বললেন, বারটাউট, আজ এক ক্ষিপ্ত নারীর সঙ্গে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তোমার মতো দুর্জয় বীর সেনাপতির পক্ষে হয়তো এটা অসম্মানজনক। কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই উন্মাদিনী আমার শতাধিক সৈন্য ধরাশায়ী করে ফেলেছে। এবং এও তো ঠিক, আমার প্রতিটি সৈন্য দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা এক একজন শত সৈন্যের প্রাণ সংহার করেছে। কিন্তু আজ একি হলো! ঐ একটি তরুণীর তরবারির সামনে তারা কেউ এক পলকও টিকে থাকতে পারলো না?

তাই আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছি, বারটাউট। এইভাবে যদি আমার বুকের বল সৈন্যরা অসহায় পতঙ্গের মতো মৃত্যুবরণ করতে থাকে, তবে কি উপায় হবে? আমার মনে হয়,

এখনি তাকে হত্যা করে আশঙ্কা নির্মূল করা দরকার। সামান্য একটা বিদ্রোহিনীকে দমন করার জন্য তোমাকে ডাকতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু এখন সমূহ বিপদকাল। এ সময় ওসব চিন্তার সময় নাই।

বারটাউট অভিবাদন জানিয়ে বললো, যথা আজ্ঞা সম্রাট। তারপর সে হুঙ্কার ছেড়ে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো মিরিয়ামের ওপর, মনো হলো আমাদের সকল বিশ্বাস, সকল অহঙ্কার বুঝি সে নিমেষে ধূলিসাৎ করে দেবে। তার সেই বিকট আওয়াজে গগনমণ্ডল বিদারিত হয়ে যেতে থাকলো।

তারপর শুরু হলো প্রচণ্ড অসিযুদ্ধ। একদিকে মিরিয়াম, অপর দিকে বারটাউট। যেন দুই সিংহে সিংহে লড়াই।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলতে থাকলো সে যুদ্ধ। ক্ষণে ক্ষণে তরবারির আঘাতে আঘাতে আগুনের ফুলকি ছুটে বেরুতে লাগলো। কিন্তু কেউই কাউকে পরাস্ত করতে পারে না।

অবশেষে একসময় বারটাউটের হাতের ধমনী শিথিল হয়ে আসে, বুঝতে পারে ডানহাতে সে আর অসি ধরে রাখতে পারবে না। তাই হাত বদল করে বাঁ হাতে নিয়ে নেয় অসিখানা। আর ডানহাত দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষেপ করে একখানা বর্শা। কিন্তু মিরিয়াম আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় তরবারির আঘাতেই সে বর্শা মাটিতে ফেলে দেয়। বারটাউড চমকে ওঠে, সর্বনাশ তার বর্শার অব্যর্থ নিশানা এবং বিদ্যুতের গতিবেগ রোধ করবার সাধ্য তো কোনও যোদ্ধারই নাই! কিন্তু একি হলো! আহত সিংহের মতো গর্জে উঠে আর একখানা বর্শা টেনে নেয় সে। এইবার তোমার মৌৎ কে রক্ষা করবে? কিন্তু সে বর্শাও পাশে ফেলে দেয় মিরিয়াম। এইবার আরও একখানা। কিন্তু মিরিয়ামের বেগ পেতে হয় না। অনায়াসে তার চারখানা বর্শা মাটিতে ফেলে দিতে পারে সে।

বারটাউট উন্মত্ত হয়ে ওঠে। লজ্জায় তার চোখ মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। সামান্য এক নারীর সঙ্গে সে যুঝতে পারছে না? ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার কথা! আবার সে অসিখানা ডানহাতে ফিরিয়ে নেয়। এবং শত সিংহের বিক্রমে গর্জে ওঠে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই তরবারিই ছুঁড়ে দেয় মিরিয়ামের দিকে। বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসে তা মিরিয়ামের বুকের কাছে। সে অসির গতি যদি রোধ করতে না পারতো তবে এক পলকে মিরিয়ামের দেহ শত টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তো চারপাশে। কিন্তু আল্লাহর অপার করুণায় সে গতিও রুদ্ধ হলো। মিরিয়ামের এক আঘাতে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেলো বারটাউটের সেই বিজয়ী তরবারি।

এরপর মিরিয়াম ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে বারটাউটের চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তুলে প্রচণ্ড শক্তিতে আছাড় মেরে নিচে ফেলে দিয়ে বললো, এই তুমি বিশ্ববন্দিত যোদ্ধা—বীর? তরবারির মর্যাদা জান না? থু।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

•

সাতশো দশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুর করে ঃ

বারটাউট মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত চোখে একবার মিরিয়ামকে দেখে নেয়। ভাবে, এইবার বুঝি তার ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে গেঁথে দেব

অসিখানা। কিন্তু মিরিয়াম হাসে, ভয় নাই তুমি নিরস্ত্র, তোমাকে আঘাত করবো না। কিন্তু একটা কথা পালাবার চেষ্টা করো না। তার পরিণাম ভালো হবে না। শুনেছিলাম, তুমি নাকি দুনিয়ার সেরা যোদ্ধা। কিন্তু এই কী মহারথী প্রথা? বর্শার বদলাই একমাত্র বর্শা হতে পারে। আর যুদ্ধক্ষেত্রে অসি ছুঁড়ে আঘাত করে কে? সে কী মহারথী, না মরকট?

বারটাউটের মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো। তাই সে দিশাহারা হয়ে প্রাণ ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করে। মিরিয়ামের চোখে আগুনের ফুলকি জ্বলে ওঠে, কাপুরুষ—গিদধড়। এই তোমার যোগ্য পুরস্কার।

ঘোড়াকে এক কদমও সে আগে বাড়ায় না। যেখানে দাঁড়িয়েছিলো, সেইখানে দাঁড়িয়ে হাতের অসিখানা প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে মারে। লক্ষ্য অবর্থ্য। তরবারিখানা চক্রের মতো ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে বারটাউটের মুণ্ডুটা নামিয়ে দেয় মাটিতে।

চারদিকে ছিটিয়ে পড়েছিলো অগণিত তরবারি। তারই একখানা তুলে নিয়ে মিরিয়াম এবার ছুটে যায় খাস বাহিনীর দিকে।

সম্রাট দেখলেন, তাঁর প্রধান সেনাপতির বুকের পাঁজর বারটাউট ধরাশায়ী হয়েছে। এবার তিনি দ্বিতীয় সেনাপতি বারতাসকে আহ্বান করলেন। বারতাস বারটাউটের ছোট ভাই, এরও শৌর্য্যখ্যাতি অসীম। বীর যোদ্ধা হিসাবে তারও সমকক্ষ খুব বেশি কেউ নাই।

বারতাস এসে অভিবাদন জানাতে সম্রাট বললেন, তোমার দাদা তো প্রাণ হারালো, দেখছি আমার দারুণ দুঃসময়। ঐ নারীকে পরাস্ত না করতে পারলে তো মান থাকে না বারতাস। তুমি পারবে?

বারতাস বলে, পারা না পারা সে সম্মুখে সমরে ফয়সলা হবে, সম্রাট। কিন্তু তা বলে বারতাস কখনও লড়তে ভয় পায় না। আমি প্রস্তুত।

—তা হলে যাও। ঝাঁপিয়ে পড়। তোমার দাদার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

বারতাস তলোয়ার বাগিয়ে রে রে করে ছুটে আসে মিরিয়ামের দিকে। কিন্তু মিরিয়াম অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বারতাসের প্রথম আঘাত-এর লক্ষ্য ছিলো মিরিয়ামের শির। কিন্তু সে আশা তার ব্যর্থ হয়। অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় পলকের মধ্যে সে আঘাত প্রতিহত করে মিরিয়াম। এর পর অসিতে অসিতে যুদ্ধ শুরু হয়। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুত চমকে চমকে ওঠে। আশ্চর্য, মিরিয়াম যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে তরবারির যাদু দেখতে থাকে। বারতাস তাকে কাবু করার জন্য তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধ করে চলে। মাঝে মাঝে সিংহনিনাদ করে ওঠে সে এইবার—এইবার তোর ইন্তেকাল এসে গেছে। ওরে বিধর্মী যবন, তোর আল্লাহর নাম জপ কর।

মিরিয়াম কোনও জবাব দেয় না। নির্বিকার চিত্তে তরবারির খেলায় মেতে ওঠে সে। বারতাস বুঝতে পারে, এ মেয়ে তো সাধারণ মেয়ে নয়। না হলে, তার অসির তাণ্ডবের সামনে এতক্ষণ টিকে থাকার সাধ্য কী করে হয় তার?

বারতাসের আরও কয়েকটা মোক্ষম মার যখন তাচ্ছিল্যভাবে প্রতিহত করে মিরিয়াম, তখন সম্রাটের সেনাবাহিনীর বীরা যোদ্ধারা উদ্‌গ্রীব হয়ে আরও কয়েক কদম এগিয়ে আসে। কে এই বীরাঙ্গনা, দেখার খুব কৌতূহল হয় তাদের। বুঝতে আর দেরি হয় না। শুধু বারতাস যথেষ্ট নয়। তাকে রুখতে গেলে গোটা সেনাবাহিনীর শক্তিই কাজে লাগাতে হবে।

বারতাস এবার বর্শা ছুঁড়ে মারে। তীক্ষ্ণ-তীর সমতার গতি। সে বেগও লক্ষ্য কাটাবার দক্ষতা একমাত্র মিরিয়ামেরই ছিলো! ওরা তো কখনও কেউ জানতো না, এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে ত্রিভুবন বিজয়ের আশীর্বাদ লাভ করেছে সে তার গুরুর কাছ থেকে। আশৈশব

আকৈশোরের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে যে সিদ্ধিলাভ সে করেছিলো, আজ যুদ্ধক্ষেত্রে তারই মূর্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করছে এরা সকলে।

বারতাস আর একখানা বর্শা নিক্ষেপ করে মিরিয়ামের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করে। এখানা সে বাঁ হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলে। এবং সেই হাত দিয়েই তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে মারে বারতাসের নাভিস্থল লক্ষ্য করে। অব্যর্থ আঘাত। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিশাল এক দানবের মতো বিকট চিৎকার তুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বারতাস। যেন একটা মিনারের শীর্ষদেশ ধ্বসে পড়লো ঊর্ধ্বাকাশ থেকে।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো এগারতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মিরিয়াম এবার লাহিককে ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। দৃপ্তকণ্ঠে গর্জে ওঠে, কোথায় খ্রীস্টানের বীরপুরুষরা, এদিকে সামনে এগিয়ে এস, তোমাদের সুরতগুলো দেখি। কোথায় আমার বুড়ো-হাবড়া সাধের স্বামী—পিছনে লুকিয়ে রইলে কেন? একবার সামনে এসে দাঁড়াও। তোমরা কী সবাই সামান্য এক দুর্বল নারীর ভয়ে ভীতা হয়ে পুচ্ছ গুটিয়ে পলায়নোদ্যোগ করছো? ছিঃ, ছিঃ, মরি, একি লজ্জা!

সম্রাট হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। তৃতীয় সেনাপতি তরুণ যোদ্ধা ফাসিয়ানকে আহ্বান করলেন তিনি।

—ফাসিয়ান, তুমিই শেষ ভরসা, তবে এও জানি, তোমার তরবারি দোর্দণ্ড। সবাই প্রাণভয়ে পালাবার পথ খুঁজে পায় না। আমি আশা করবো, তোমার এই প্রদীপ্ত যৌবনের বিদ্যুৎ ঝলকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারবে ঐ উদ্ধত নারীর দুঃসাহস আর দম্ভ। যাও সিংহের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড় তার ওপর। আমি তার ছিন্নমুণ্ড দেখতে চাই তোমার তরবারির ডগায়।

ফাসিয়ান যথারীতি অভিবাদন করে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে মিরিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার সারা চোখে মুখে প্রতিহিংসার আগুন ধকধক করছে। কিন্তু মিরিয়ামের অসির স্পষ্ট মার ঠেকাতে না পেরে লাগাম টেনে কয়েক কদম সে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তবে সে মুহূর্তমাত্র। ফাসিয়ান ছুটে এসে প্রচণ্ড এক আঘাত হানে মিরিয়ামের শির লক্ষ্য করে। ফাসিয়ানের সতীর্থরা ভাবে, এইবার বুঝি সব খতম হয়ে গেলো। ফাসিয়ানের এ প্যাঁচ কাটিয়ে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা হবে না রাজকন্যার। কিন্তু ওদের ধারণা ভ্রান্ত। মিরিয়াম এমন তাক করে ফাসিয়ানের তরবারিতে আঘাত করলো যে ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। এবার ফাসিয়ান ভয়ার্ত কণ্ঠে পিছনে যোদ্ধাদের ডাকে, তোমরা কে আছ, ছুটে এসে রক্ষা কর, হত্যা কর এই নারীকে। প্রাণভয়ে সে পালাবার চেষ্টা করতেই মিরিয়ামের তরবারি আমূল বিদ্ধ হয়ে যায় তার পিঠের ভিতরে। আর্তনাদ করে সে ছিটকে পড়ে যায়।

সিংহের আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে মৃগদল যেমন প্রাণপণে ছুটে পালায় তাদের তিন মহারথীর এই বিস্ময়কর পতনে সমগ্র সৈন্যবাহিনী সেইভাবে ভীত চকিত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নে তৎপর হয়ে ওঠে। সম্রাটের কোনও আবেদন, নিবেদন, আদেশ-নির্দেশ হুঙ্কার আর গ্রাহ্য করে না তারা। পলায়মান সমগ্র সৈন্যদলের মধ্যে পলকে ছড়িয়ে যায়, ওরে বাবা, পালাও। এ মেয়ে, মেয়ে নয়। নিশ্চয়ই স্বর্গে দনুজদলনী কোন এক দেবী মূর্তি। সৈন্যদলের বিভাগীয় সহ-সেনাপতিরা দেশদ্রোহীতার ভয় দেখায়। স্থির হও, কেউ এক পা পিছু হটবে না। আমরা লড়বো।

শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও লড়বো। কিন্তু পিছু হটবো না। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করলে রাজদ্রোহের দণ্ড পেতে হবে তাকে, সুতরাং সাবধান।

কিন্তু কেউ পরোয়া করে না জাঁদরেলদের এই সতর্কবাণী। যে যেদিকে পারে ছত্রখান হয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করে। এর যা অবশ্যম্ভাবী ফল ঘটা সম্ভব, তা-ই ঘটতে থাকে। জাঁদরেলদের সঙ্গে সাধারণ সৈনিকদের সম্মুখ সমর শুরু হয়ে যায়। নিজেরাই কাটাকাটি করে এক এক করে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

মিরিয়াম এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করলো। তরবারির এক এক কোপে এক একজন জাঁদরেলকে ভূপাতিত করতে থাকলো সে। কেউ-ই তার সামনে পলকের বেশি সময় টিকে থাকতে পারলো না। বিদ্রোহীরা, সৈন্যরা অনেকেই নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বা অশ্ব ছুটিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিলো। কিন্তু যারা মিরিয়ামকে প্রতিহত করার সাধ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো তারা আর কেউ জীবিত রইলো না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই যুদ্ধে ইতি হয়ে গেলো। বিশাল প্রান্তরের বুকে নেমে এলো গভীর নিস্তব্ধতা আর রাত্রির কালো যবনিকা।

এইবার সে নদীর কিনারে ছুটে এসে নূরকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন এঁকে দেয়।

—শুধু তোমার ভালোবাসার জোরে আর আল্লাহর দোয়ায় আমি এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছি, সোনা। আমার গুরুর আশীর্বাদ আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। তিনি আজ কোথায় জানি না, যেখানেই থাকুন, হাজার সেলাম জানাই তাঁর চরণে।

সে রাতে সেই নদী তীরের তৃণশয্যায় সুখ-সহবাস করলো দুজনে। এবং পরদিন সকালে ওঠে দামাসকাসের পথে রওনা হয়ে গেলো।

এদিকে পরাজিত সম্রাট ক্রোধানলে জ্বলতে জ্বলতে সিংহের থাবা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া নেকড়ের মতো গা ঢাকা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়েন। প্রাসাদে ফিরে এসে অমাত্য পারিষদ এবং গীর্জার পাদরী-পিতা-মাতাদের ডেকে এক সভা করলেন। আমার কুলের কলঙ্কিনী কন্যা মিরিয়াম আমার তিন প্রধান স্তম্ভ বারটাউট, বারতাস এবং ফাসিয়ানকে হত্যা করেছে। এ বড়ই শোকের বিষয়।

সভায় সকলে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে মৌন হয়ে লোকান্তরিত সেনাপতিদের আত্মার শান্তি কামনা করে। তারপর সম্রাট আবার বলতে থাকেন। এরা তিনজন ছিলো আমার বুকের এক একখানা অস্থি। আজ আমি আর আপনাদের সেই প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট নই। সৈন্যবল আমার সীমিত হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও আমি কিছুতেই অনুধাবন করতে পারছি না, এ অলৌকিক কাণ্ড কী করে সংঘটিত করতে পারলো।

জাঁদরেল একজন দাঁড়িয়ে বললো, মহামান্য সম্রাট যদি অনুমতি করেন, আমি একটা কথা বলবো।

—বলো, বলো?

রাজকুমারী মিরিয়াম ধর্মচ্যুত হয়ে সে অসুর শক্তির উপাসনা করে শয়তানের বর লাভ করেছে। সেই কারণেই আমরা তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারিনি।

গীর্জার পাদরীও সে কথায় সায় দিয়ে বলে, হুম্! তাই সত্য বলে মনে হয় আমাদের। কোনও অশুভ শক্তির সহায়তা ছাড়া এই দুঃসাহস কারো হতে পারে না। বিধর্মী ম্লেচ্ছ মুসলমানরা অনেক তুকতাক গুণগান জানে শুনেছি। এবং তার ফলে এমন সব যাদু বা ভেল্কি তারা দেখাতে পারে যা সাধারণ বিচার-বুদ্ধির বাইরে। কিন্তু এ সবই ধ্বংসাত্মক। কোনও শুভ কাজে, সে-সব যাদুবিদ্যা কোনও সুফল দেয় না, বা পৃথিবীর মঙ্গলে আসে না।

আমরা খ্রীষ্টান। যীশু আমাদের সহায় আছেন। সুতরাং কোনও অশুভ শক্তিই আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না। আপনি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন সম্রাট। সময়ের সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকুন, দেখবেন জয় আপনার সুনিশ্চিত।

সম্রাট, মহামান্য প্রধান পাদরী-পিতার এই বাণী শিরোধার্য করে বলেন, কিন্তু পরম পিতা, আপনার বাক্য কী করে ফলবতী হতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না। কারণ এই যুদ্ধে আপনাকে এই মাত্র জানালাম আমার সৈন্যবল সীমিত হয়ে গেছে। আমি যে তিন বীর-যোদ্ধাকে আজ হারিয়েছি, কোনও মূল্যের বিনিময়েই তাদের সমকক্ষ অন্য কোনও যোদ্ধা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করে তাদের এখানে বন্দী করে আনতে পারবো, সে আশাও দুরাশা।

পাদরী-পিতা বললো না। সে পথ নয়। যেখানে দেহবল কাজে আসে না, সেখানে প্রয়োজন বুদ্ধির কৌশল। ছলে বলে কৌশলে কাজ হাসিল করতে হবে আপনাকে।

—কী ছল, কি বলো, কী কৌশল পিতা?

—আপনি খলিফা হারুন অল রসিদের কাছে দূত পাঠান। শুনেছি, লোকটা নাকি ভণ্ড-তপস্বী। তবে যাই হোক, বাইরের ভড়ংটা ষোল আনা বজায় রেখে চলে সে। মুখে অন্ততঃ অনেক বড় বড় ভালো ভালো বুলি আওড়ায়—প্রজাদের ধোঁকা ধাপ্পা দিয়ে দিব্যি অনাচার ব্যভিচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই খলিফাটাকে টোপ দিতে হবে।

সম্রাট বলেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না পিতা। টোপ মানে? সে আরবের শাহেনশাহ, কোন ধন-দৌলতের লোভ দেখিয়ে তো তাকে ভোলানো যাবে না।

পাদরী সাহেব বলে, না ওসব নয়। ওসব তো আনুষঙ্গিক। উপহারের অছিলা করে কিছু পাঠাতেই হবে। কিন্তু আসল টোপ অন্য। আপনি ওকে একখানা চিঠিতে লিখে পাঠান, আপনার কন্যা উদ্ধত অবিনয়ী অবাধ্য হয়ে প্রাসাদ থেকে পালিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সে এখন মিশরে এক যুবকের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত আছে। খলিফা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি যেন তাকে কনসতানতাইনে পাঠিয়ে সখ্য-বন্ধন সুদৃঢ় করেন।

সম্রাট বাধা দিয়ে বলেন, কিন্তু খলিফা হারুন অল রসিদ কেন মাথা ঘামাতে যাবেন। তার সঙ্গে তো আমার আগের কোনও দোস্তি নাই।

পাদরী-পিতা বলে, আসল টোপটার কথাই বলছি। এর পর লিখে দিন, তিনি যদি আপনার এই উপকারটুকু করেন, তবে আপনি আপনার এই খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যে মুসলমানদের সুবিধার জন্য একটি সুবিশাল মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। এবং সে মসজিদটি তাঁরই পরিকল্পনা মতো তাঁরই নির্দিষ্ট স্থানে নির্মিত হবে।

সভাস্থ সকলে সাধু সাধু করে ওঠে। এ একেবারে মোক্ষম অস্ত্র। বিধর্মী খলিফা এক ঢিলেই কুপোকাত হয়ে যাবে। আর আমরাও বাজীমাত করে ফেলবো।

সম্রাট তখনই সে সভাস্থলে বসেই খলিফাকে এক পত্র লিখলেন।

মহামান্য ধর্মাবতার, সমগ্র আরব দুনিয়ার একচ্ছত্রাধিপতি আব্বাসের পঞ্চম পুরুষ খলিফা হারুন অল রসিদ।

অত্র পত্রে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার সঙ্গে সখা-বন্ধন আরও নিবিড় আরও ঘনিষ্ঠ করতে আগ্রহী আমি। যদিও আপনি ইসলামের ধারক, তবু আপনার মহিমা ও সৎ গুণে আমি বিশেষ বিমুগ্ধ।

আমার কন্যা মিরিয়াম, আমার ভাগ্যদোষে, আজ অবাধ্য অবিনয়ী উদ্ধত এবং ব্যভিচারিণী। প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেছে সে। খবর পেয়েছি, এখন সে মিশরের এক

সওদাগর-পুত্রের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত আছে। আপনি ধর্মপ্রাণ মুসলমান, আপনার সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান কন্যার এই কদাচার কখনও বরদাস্ত করবেন না, এই আমি আশা করি। পবিত্র মুসলমান ভূমি তার পদস্পর্শে কলুষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, আমাকে সহৃদয় বন্ধু বলে গ্রহণ করে আমার ঐ কলঙ্কিনী কন্যাকে এই উজিরের হাতে প্রত্যর্পণ করে আপনার নিগূঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে চিরকালের মতো আবদ্ধ করে রাখবেন আমাকে।

আপনার সঙ্গে আমার এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্প্রীতির ব্যবহার চিরস্মরণীয় করে রাখতে চাই আমার এবং আমার প্রজাসাধারণের অন্তরে। প্রীতির নির্দশন স্বরূপ আপনার পরিকল্পনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী আমি আমার সাম্রাজ্যে মুসলমান প্রজাসাধারণের হিতার্থে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করে দেব। এর ফলে ইসলাম-ধর্মীরা তাদের ঈশ্বরের উপাসনার এবং স্বজাতি মিলনের এক পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র পেতে পারবেন। আপনার সম্মতি পেলেই আমার কারিগররা এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করে মসজিদের নক্সা ইত্যাদির কাজ পাকা করে আনতে পারে।

পরিশেষে লিখি, আমার কন্যাকে উদ্ধার করে যদি আপনি সরাসরি এখানে পাঠিয়ে দেন, তবে আরও ভালো হয়। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার লোকজনের হাতে আমার উপহার উপঢৌকনের যৎসামান্য উপচারও পাঠাতে পারবো। আপনার হারেমের জন্য আমি দশটি গ্রীক-সুন্দরী বাঁদী সংগ্রহ করে রেখেছি। এ ছাড়া দাস দাসী নফর চাকরও অনেক থাকবে তাদের সঙ্গে। এই পরমা সুন্দরী বাঁদীদের দেহাভরণ অঙ্গ সাজ-সজ্জার জমকালো পোশাকাদির মূল্যও কিঞ্চিদধি দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা হতে পারবে। অবশ্য মূল্য দিয়ে উপহারের মান বিচার করা সম্ভব নয়। আপনি যদি আমাকে এক দিনার মূল্যের কোন ভালোবাসার উপহার নির্দশন পাঠান—তা হবে আমার মুকুট-মণির সমতুল্য।

আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। নিবেদন ইতি—

আপনাদের একান্ত বশংবদ—
সিজার
কনসতানতাইনের সম্রাট

লেখা শেষ করে চিঠিখানা পড়ে শোনালেন সম্রাট। পাদরী-পিতা বললেন, দারুণ হয়েছে। ঐ মাথা-মোটা মুসলমান সুলতানটা এ টোপ গপ্ করে গিলবে, দেখে নেবেন। আপনার কন্যাকে যখন ওর লোকজনরা নিয়ে এসে নামবে—এই বন্দরে সঙ্গে সঙ্গে ঐ যবনদের শূলে চাপিয়ে খতম করে দেবেন। কারণ শত্রুর শেষ রাখতে নেই। ওরা হচ্ছে সর্বনাশার ঝাড়। আধ মরা করে ফেলে রেখে দিলেও ওরা আবার বেঁচে উঠে সর্বনাশ করবে। ওদের প্রাণ বড় শক্ত। লোহার ডাণ্ডায় পিটলেও ব্যাটারা মরে না। একমাত্র শাস্তি ওদের শূলে গেঁথে মারা।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো বারতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চিঠিখানা মোহর করে নতুন উজিরের হাতে দিয়ে সম্রাট বললেন, তুমি আমার দূত হয়ে বাগদাদে খলিফা হারুন অল রসিদের দরবারে যাবে। ভালো করে শোনো, তিনবার কুর্নিশ করবে তাকে। কুর্নিশ কী করে করতে হয় জান? যদি না জেনে থাক—মুসলমানী আদব কায়দা যারা জানে তাদের কারো কাছ থেকে জেনে নিও। মোট কথা সম্মান জানানোর ভড়ংটা যেন ঠিক থাকে। তারপর আমার চিঠিখানা তুলে দেবে তার হাতে। বলবে, আপনি যদি অনুমতি করেন; ধর্মাবতার—তবে কিছুদিন আমি এখানেই অবস্থান করি। রাজকুমারীকে যদি আমার

সঙ্গেই দিয়ে দেন তবে আমিই তাকে নিয়ে যেতে পারি। খলিফা যদি বলে, থাকুন, আমি তার সন্ধান করে দেখছি—তবে ঐখানেই তুমি থেকে যাবে। সেক্ষেত্রে একজন দূতকে পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়ে দেবে। আর যদি বলে, না, তার প্রয়োজন নাই, খোঁজখবর করে তাকে আমিই পাঠাবো আমার লোকজন দিয়ে, তা হলে আর অপেক্ষা করবে না সেখানে। সটান চলে আসবে।

সম্রাটের মন্ত্রী এসে হাজির হলো বাগদাদে খলিফার দরবারে। যথাবিহিত কুর্নিশাদি করে সে বললো, আমি এসেছি কনসতানতাইন সম্রাটের দূত হয়ে। মহামান্য ধর্মাবতারকে আমাদের সম্রাট একখানি পত্র প্রেরণ করেছেন।

উজির জাফর চিঠিখানা পড়ে শোনালো হারু অল রসিদকে। খলিফা বললেন, ঠিক আছে, আপনি আমার প্রাসাদে অবস্থান করুন। আমি আমার সারা মুলুকের সর্বত্র চর পাঠাচ্ছি। সম্রাট-নন্দিনীকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখান থেকেই এনে এখানে হাজির করা হবে।

উজিরমশাই বিশেষ পুলকিত হয়ে ওঠে।

—শাহেনশাহর অসীম করুণা।

খলিফা জাফরকে বললেন, জাফর মেহমানের আদর-যত্নে যেন কোনও ত্রুটি না হয়, দেখো। আর আজই সমস্ত শহর গঞ্জে চর পাঠাও। কনসতানতাইন সম্রাট-কন্যা মিরিয়ামকে যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে আমার কাছে হাজির করতে নির্দেশ দেবে।

উজির জাফর জো হুকুম জাঁহাপনা, বলে মন্ত্রীবরকে নিয়ে অতিথিশালার দিকে পা বাড়ালো।

এদিকে মিরিয়াম তার ভালোবাসার পাত্র নূরকে নিয়ে দামাস্কাসের মনোরম পরিবেশে হেসে খেলে বেরিয়ে মজাসে দিন কাটাচ্ছিলো। হঠাৎ একদিন সুলতানের পেয়াদা এসে ধরে নিয়ে গেলো তাদের। কোতোয়াল জিজ্ঞেস করে তোমার নাম ধাম কী?

নূর এবং মিরিয়াম গোড়া থেকে তাদের নাম ভাঁড়ায়নি। তার প্রয়োজনও বোধ করেনি। কারণ এখন তো তারা খ্রীষ্টান অধিকার থেকে মুসলমান সুলতান খলিফা হারুন অল রসিদের মুলুকে এসে বসবাস করছে।

নূর বললো, আমার নাম নূর আর আমার বিবির নাম মিরিয়াম।

—মিরিয়াম? মানে কনসতানতাইন-সম্রাটের কন্যা?

—জী হ্যাঁ।

ঠিক আছে। খলিফা হারুন অল রসিদের হুকুমে তোমরা এখন তাঁর বন্দী। আজ তোমাদের বাগদাদে পাঠানো হবে।

অজানা আশঙ্কায় দুলে ওঠে নূর।—এ আবার নতুন কী ফ্যাসাদ হলো? আবার কী কয়েদ হতে হবে? ইয়া আল্লাহ, এই কী তোমার বিচার! ধরণীর এক কোণে আপন মনে আমরা দুজনে সুন্দরভাবে জীবন কাটাবো—তাও তুমি হতে দিলে না?

মিরিয়াম ওকে সান্ত্বনা দেয়, দুঃখের দিনে বিচলিত হতে নাই, নূর! আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। তিনিই ঠিক পথে নিয়ে যাবেন আমাদের।

যথাসময়ে খলিফার দরবারে হাজির করা হলো ওদের। মিরিয়াম ও নূর দুজনে আভূমি আনত হয়ে খলিফাকে কুর্নিশ করে অবনত মস্তকে দাঁড়ায়।

দামাসকাসের সুবাদারের প্রধান সচিব বলে, ধর্মাবতার এই সেই মিরিয়াম, যাকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা আপনি পাঠিয়েছিলেন সুবাদার সাহেবের কাছে। আর এ হচ্ছে নূর—কাইরোর এক সম্ভ্রান্ত সওদাগরপুত্র। এরই সঙ্গে মিরিয়াম বসবাস করছিলো ওখানে।

খলিফা দৃষ্টিপাত করলেন। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু বিধর্মী ম্লেচ্ছ খ্রীষ্টান বলে মনেই হয় না।

—তা হলে তুমিই সেই মিরিয়াম—কনসতানতাইন সম্রাট-নন্দিনী?

খলিফার কণ্ঠস্বরে কিছুটা বুঝি বিদ্রূপের সুর। মিরিয়াম মাথাটা আরও খানিকটা অবনত করে বলে, ধর্মাবতারের বাঁদী হাজির জাঁহাপনা। আপনি আমাদের পয়গম্বর মহম্মদের চাচা আব্বাসের পঞ্চম পুরুষ—ইসলামের রক্ষাকর্তা। আমরা আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য।

এই স্তুতিবাক্যে খলিফা মুগ্ধ হলেন। এবার তিনি নূরের দিকে দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করেন, আর তুমি বুঝি নূর—মিশরের সেই সওদাগরপুত্র?

নূর মাথা নুইয়ে বলে, আপনার বান্দার নাম নূর ধর্মাবতার এবং আমার বাবা কাইরোর এক সওদাগর।

হঠাৎ খলিফা গর্জে ওঠে বেতমিজ বেশরম, তুমি মুসলমানের সন্তান হয়ে এক ম্লেচ্ছ বিধর্মী খ্রীষ্টান কন্যার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ? তুমি জান ইসলামের বিধানে এর কী সাজা?

নূর আরও বিনীত হয়ে বলে, জানি ধর্মাবতার। কিন্তু আমি বা আমরা ইসলামের কোনও বিধান লঙ্ঘন করিনি। আপনি যদি আমাকে বলার সুযোগ দেন আমি আমাদের আগাগোড়া কাহিনী কোনও রকম বিকৃত না করে আপনার সামনে উপস্থাপন করতে পারি।

—বেশ বলো।

খলিফা আদেশ করলেন। তখন নূর তাদের সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে শোনালো। এখানে আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই!

সব শুনে খলিফা মিরিয়ামকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার বাবা একজন দূতকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। তিনি আমাকে একখানা চিঠিও দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন, আমি যদি তোমাকে ফেরত পাঠাই তবে তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি তাঁর দেশে মুসলমানদের নামাজের জন্য একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করে দেবেন। এবং সে মসজিদের পরিকল্পনার ভার আমাকে নিতে হবে। এখন এ বিষয়ে তোমার কী বক্তব্য?

এই কথা শোনামাত্র মিরিয়াম ফণিনীর মতো মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকলো, ধর্মাবতার আপনি আল্লাহর বরপুত্র—ইসলামের ধারক। পয়গম্বরের বাণীর যাতে কোনও অসম্মান অপমান বা অমর্যাদা না ঘটে সেই পবিত্র কর্তব্য আপনার ওপরে ন্যস্ত আছে। আমি এখন সাচ্চা মুসলমানী। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। মহম্মদ আমাদের পয়গম্বর। এখন আপনি বলুন, কোন নীতিতে আপনি আমাকে বিধর্মী নাস্তিকের হাতে তুলে দিয়ে আমার ধর্ম ইজ্জত মান সব নষ্ট করতে অভিলাষী। যারা মনে করে তাদের মানব সুত যীশুও আমাদের আল্লাহর সমতুল্য, এবং যারা মূর্তিপূজা এবং ক্রুশকে ভক্তি করে, সেই ম্লেচ্ছ নাস্তিক বিধর্মী খ্রীষ্টানদের হাতে আমাকে তুলে দেবার অপরাধে আপনাকে আমি আল্লাহর দরবারে অভিযুক্ত করবো? এখানে তার বিচার হবার হয়তো কোনও সুযোগ নাই, কিন্তু আপনি জানবেন আপনার বিচার হবে শেষ বিচারের দিন তার দরবারে।

মিরিয়ামের এই দৃপ্তবাণী শুনে খলিফা বিচলিত হয়ে ওঠেন, দু চোখ জলে ভরে যায়।

—কে তুমি কন্যা, তুমি আমার জ্ঞানের চোখ খুলে দিলে? তুমি যথার্থই বলেছ, কোনও সাচ্চা মুসলমানকে আমি বিধর্মী নাস্তিকের হাতে তুলে দিতে পারি না। আমি আল্লাহর তল্পিবাহক দাসানুদাস—ইসলামের রক্ষক। আমাকে এই মহা-পাতকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন কন্যা। তোমার এই সৎ-সাহস এবং স্পষ্টবাদীতার জন্য

আমি তোমাকে তোমার অভিরুচি মতো ইনাম দিতে চাই। তাতে যদি তুমি আমার সমগ্র মুলুকের অর্ধেকও চেয়ে বসো, সানন্দে দেব তোমাকে।

সুলতান বললো, মনের সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়তা কাটিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ভাবো, তারপর বলো, আর একটা কথা আমাকে বলতো মিরিয়াম, তুমি রাজার দুলালী। তোমার বংশমর্যাদা, আভিজাত্য অহঙ্কার এবং আত্মমর্যাদাবোধ সাধারণ মানুষ থেকে অনেকটা ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে, কোনও এক সময়ে ঝোঁকের মাথায় ভালো লাগলেও লাগতে পারে, নূরের মতো এক অতি সাধারণ সওদাগর-তনয়কে জীবন-সঙ্গী করে কী সুখী হতে পারবে?

মিরিয়াম বলে, আমার খেয়াল ও ঝোঁকের কথা বাদ দিন, ধর্মাবতার। আমি যদি তাকে আর নাও চাই সে কী আমাকে ছাড়বে? আর ছাড়বেই বা কেন? সে তো আমাকে উচিত মূল্য দিয়ে বাঁদী-বাজার থেকে সওদা করে নিয়েছে? এখন আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাই তো শেষ কথা নয়। আর তা ছাড়া, আপনাকে একান্তে বলি, আমি নূরকে প্রাণাধিক ভালোবাসি। সে আমার জন্যে কী ভাবে দু'দুবার নিজের জীবন তুচ্ছ করতে পেরেছিলো—সে দিকটা একবার ভাবুন? আজ আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে এই যে কথা বলছি, এবং আমার ধর্মবিশ্বাসে অটল থাকতে পেরেছি—সে তো শুধু এই নূরেরই কল্যাণে। না হলে এতদিনে আমাকে কনসতানতাইন সম্রাটের সেই ঘাটের মড়া বুড়ো উজিরটার অঙ্কশায়িনী হয়ে স্বধর্ম ভ্রষ্ট হতে হতো।

খলিফা প্রীত হলেন। আর এক মুহূর্তও তিনি অপেক্ষা করতে চাইলেন না। বললেন, কাজী সাক্ষীদের ডাকো, এখনি এই দরবারকক্ষেই আমি এদের শাদী দিয়ে দেব। শুভ কাজে বিলম্ব করতে নাই।

এরপর সম্রাটের মন্ত্রী-দূতকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, সব তো নিজের কানেই শুনলেন। এই অবস্থায় আমি তো আপনার প্রভুর কাছে ফেরত পাঠাতে পারছি না তাকে। রাজকুমারী এখন মনে-প্রাণে মুসলমান। ইসলাম তাঁর একমাত্র ধর্ম। আমি তো কোনও মুসলমানকে বিধর্মীর হাতে তুলে দিতে পারি না। ইসলামে তা মহাপাপের কাজ। আমি আল্লাহর তল্পিবাহক—ইসলামের রক্ষক হয়ে আমি নিজেই কী করে এই অনাচার করতে পারি। আপনি যা শুনলেন এখানে, সম্রাটের কাছে গিয়ে সব খুলে বলুন। হাত পা আমার বাঁধা, কিছুই করার নাই এ ব্যাপারে। আর আমি যদি আজ মহাপাতক হয়ে মিরিয়ামকে আপনার সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিই তবে ইহজগতে আমিই হয়তো খলিফা বলে কোনও সাজা পাবো না, কিন্তু সেই শেষ বিচারের দিন, সে দিন? সে দিন তো খলিফা হারুন অল রসিদ আর ওরা নূর মিরিয়াম বলে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। সে দিন আমাকে কে রক্ষা করবে? আপনি বরং তাঁর কাছে গিয়ে আমার অক্ষমতার কথা জানান।

এই সময় সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চৌদ্দতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সম্রাটের দূত যখন পরিষ্কার বুঝতে পারলো, মিরিয়ামকে তিনি ফেরত পাঠাবেন না, তখন অস্বাভাবিক অভব্য ক্রোধে ফেটে পড়লো সে। সে সম্রাটের সামান্য এক মন্ত্রী, আর তার সামনে তামাম আরব দুনিয়ার অধিপতি আব্বাসের পঞ্চম পুরুষ ইসলামের রক্ষক ধর্মাবতার খলিফা হারুন অল রসিদ মসনদে আসীন, সে কথা সে বেমালুম ভুলে গেলো।

—যীশুর নামে শপথ করে বলছি, হাজার বার সে ইসলামে দীক্ষা নিতে পারে, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, কিন্তু তাকে তার বাবার কাছে ফিরে যেতেই হবে। তাতে যদি আপনি বাধা দেন, তবে ইউফ্রিট থেকে ইয়ামান পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত আপনার যে রাজ্যপাট, আমাদের সেনাবাহিনীর দোর্দণ্ড প্রতাপে আপনাকে তা খোয়াতে হবে।

খলিফা গর্জে ওঠেন, কী এতবড় স্পর্ধা! এই কুত্তার বাচ্চা খ্রীষ্টানটা আমাকে শাসাচ্ছে? এখুনি ওর মুণ্ডুটা কেটে আমার প্রাসাদ-ফটকের সামনে ঝুলিয়ে দাও। আর ওর দেহটা ক্রুশে গেঁথে নর্দমায় ফেলে দিয়ে এস। ঘোষণা করে দিও, খলিফার হুকুমে দূতকে এই সাজা দেওয়া হয়েছে।

সারা সভাস্থল ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলো। সেই নীরবতা ভঙ্গ করে মিরিয়াম কথা বলে, মহামান্য ধর্মাবতারের পবিত্র তরবারি এই কুত্তার রক্তে কলুষিত করবেন না জাঁহাপনা। আমি নিজের হাতে ওর সমুচিত সাজা দিচ্ছি। এই বলে মিরিয়াম ছুটে এসে মন্ত্রীটার কোমর থেকে তারই অসি খুলে নিয়ে প্রচণ্ড এক কোপে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আর ওর ধড়টা পা দিয়ে লাথি মারতে মারতে দরবারের বাইরে ফেলে দিয়ে এলো।

এই তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হয়ে খলিফা তাঁর নিজের মুকুট পরিয়ে দিলেন মিরিয়ামের মাথায়। এবং নূরকে ভূষিত করলেন এক মহামূল্যবান বাদশাহী সাজ-পোশাকে।

এক বিশাল উট-বাহিনীর পিঠে নানা অমূল্য উপহার উপঢৌকন সামগ্রী বোঝাই করে মিরিয়াম ও নূরকে তাদের স্বদেশ কাইরোয় পাঠিয়ে দিলেন খলিফা।

এইভাবে নূর মিরিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে অনেক দিন বাদে আবার ফিরে এলো তার বাবার কাছে। বহুদিন পুত্রের অদর্শনে বাবা সব রাগ রোষ ভুলে গিয়েছিলো। আবার সে ছেলে এবং তার বৌকে ফিরে পেয়ে আপন করে বুকে টেনে নিলো।

নূরের প্রত্যাবর্তন ও শাদী উপলক্ষে কাইরোর সম্ভ্রান্ত বণিক ও আত্মীয় ইয়ার বন্ধুদের ভোজ-সভায় আমন্ত্রণ জানালো ওর বাবা। নূরের বিবি মিরিয়ামকে দেখে পঞ্চমুখে প্রশংসা করে গেলো সবাই।

এরপর দীর্ঘকাল তারা একত্রে সুখে স্বচ্ছন্দে হেসে গেয়ে নেচে এবং আদর সোহাগ সহবাস করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছিলো।

গল্প শেষ হলো। শাহরিয়ার বললো, তোমার এই লড়াকু মেয়ের কিস্‌সাটা খুব মজার লেগেছে, শাহরাজাদ। যাই হোক, আমার মনে হয়, তোমার গল্পের থলি প্রায় খালি হয়ে এসেছে, কী বলো? এবার তো তাহলে আমার সেই প্রতিজ্ঞা তোমার মুণ্ডচ্ছেদ—পালন করতে হয়—?

শাহরাজাদ ভাবে, আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা বোধ হয় সঙ্গত নয়। মৃদু কণ্ঠে বললো, এই দুঃসাহসিক লড়াই-এর কাহিনীর পর আরও চমৎকার দু একটা কাহিনী আপনাকে শোনাবো, জাঁহাপনা।

শাহরিয়ার বলে, তাই নাকি, আরও গল্প আছে তোমার ঝুলিতে? আচ্ছা, কি কিস্‌সা শোনাবে বলো?

শাহরাজাদ বলে, খুব বড় গল্প আরম্ভ করার আগে একটা ছোট কাহিনী শুনুন জাঁহাপনা।

সে বলতে শুরু করে ঃ

কোন এক সময়ে বসরাহর এক দরাজ-দিলো উদার স্বভাবের এক সুলতান বাস করতেন। তার নাম সুলতান জাইন। বয়সে সে নবীন নওজোয়ান। স্বভাবতই সমবয়সী ইয়ার বন্ধু এবং স্তাবকের অভাব ছিলো না।

অন্যের দুঃখ কষ্ট দেখলে তিনি সইতে পারতেন না। কারণে অকারণে অকাতরে

মুক্তহস্তে দানধ্যান করতেন। তাঁর মত সদাশয় বন্ধুবৎসল মহৎ উদার সুলতান খুব কমই দেখা যেত।

এত সব সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বড্ড বেপরোয়া এবং কিছু খামখেয়ালীও ছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং আপনজনেরা এর সুযোগ নিতে কসুর করতো না। নানা ছল ছুতোয় তারা এসে হাত পাততো। এবং সুলতানের সামনে কেউ হাত পেতে ব্যর্থ-মনোরথে হয়ে ফিরে যায় না, সে কথাও তারা খুব ভালো করেই জানতো।

এইভাবে তারা একদিন সুলতানের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার শূন্য করে ফেললো। ইয়ার বন্ধুরা নিত্য নতুন বাঁদী মেয়েমানুষের সন্ধান আনতে লাগলো, আর সুলতান তাদের পিছনে লক্ষ লক্ষ দিনার ওড়াতে থাকলো। এভাবে চলতে থাকলে কুবেরের ভাঁড়ারও একদিন নিঃশেষ হতে পারে, জাইন তো কোন ছার। বসরাহর একটা ছোট অঞ্চলের সুবাদার মাত্র। বাৎসরিক আয়ের একটা মোটা অঙ্ক ফি বছর বাগদাদে খলিফার কাছে নজরানা পাঠাতে হয় তাকে।

একদিন উজির এসে কুর্নিশ করে বললো, জাঁহাপনা, বড়ই দুঃসংবাদ, কোষাগারে কোনও অর্থ নাই। এমন সঙ্কট অবস্থা কখনও ঘটেনি। কাল কী হবে, তার কোনও সংস্থান নাই। এখন কী উপায় হবে জাঁহাপনা?

সুলতান জাইন ভাবিত হলেন। তাই তো, তাঁরই খামখেয়ালীর জন্য সব ধন নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন প্রাসাদ দরবারের কর্মচারীদের বেতন এবং আহারাদির সংস্থান হবে কী করে?

ভেবে কোন কূলকিনারা পান না তিনি। এখন মৃত্যু ছাড়া আর সম্মানজনক কোনও পথই খোলা নাই। তার হারেমের সব প্রিয় বাঁদীদেরই বিদায় করে দিতে হবে। বিদায় দিতে হবে খোজা নফর চাকর সবাইকে। শূন্য প্রাসাদে একা একা বসে কী সে হাহাকার করে মরবে? না ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পথে নামবে?

প্রবাদ আছে ঃ দারিদ্র্যের চেয়ে কবর অনেক শ্রেয়।

এই কথা স্মরণ করে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছদ্মবেশ ধারণ করে পথে বেরিয়ে পড়েন। হঠাৎ খেয়াল হয়, বাবা মৃত্যুর পূর্বে কিছু উপদেশবাণী রেখে ছিলেন তাঁর জন্য। কিন্তু কী সেই উপদেশ? কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর মনে করতে পারেন তিনি।

বৃদ্ধ পিতা সন্তানের প্রতি উপদেশ রেখে গিয়েছিলেন ঃ যত সুখ-সম্ভোগ আর বিলাস-ব্যসনেই দিন কাটাতে থাক না কেন বাবা, সবার ওপর একটা কথা অন্তরে গেঁথে রাখবে। তাহলো সুদিন কারো চিরকাল থাকে না। সৌভাগ্যের একটা বিবর্তন ঘটতে পারে। এই কারণে আমি আমার মহাফেজখানায় এমন এক সম্পদ লুকিয়ে রেখে গেলাম, যা তোমার দুঃসময়ে সকল দুর্ভাগ্য ও দুঃখ কষ্টের লাঘব করতে পারবে।

সুলতান জাইন বাবার এই উপদেশ বাণী এতদিন বিস্মৃত হয়েছিলেন। আজ এই মুহূর্তে সে-কথা মনে পড়ায় তিনি দ্রুত পায়ে প্রাসাদে ফিরে এসে মহাফেজখানায় প্রবেশ করলেন।

চারপাশে থরে থরে সাজানো কত কলা-কথার পাণ্ডুলিপি, কত মূল্যবান উপদেশাবলীর মহামূল্য গ্রন্থরাজি। সব তন্নতন্ন করে খুঁজে পেতে দেখলেন তিনি। কিন্তু না, কোথাও একটুকরো সোনা রূপাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। শুধু কাগজের ওপরে কালির আঁচড়ে লেখা হাজার হাজার কাব্য, গাঁথা কিস্‌সা কাহিনী; সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান কোরান প্রভৃতি।

এছাড়া আরও আছে কত মূল্যবান দলিল পাট্টা, কবুলিয়ৎ নানা খতিয়ান পর্চা রসিদ ইত্যাদি।

সবই তিনি আঁতিপাঁতি করে খুঁজলেন। কিন্তু নাঃ, কোথাও কিছু হদিশ করতে পারলেন না।

তবু কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না সুলতান জাইন। তার বদ্ধমূল ধারণা, বাবা ভাবাবেগের মানুষ ছিলেন না। হঠাৎ খেয়ালের বশে কোনও বাজে কথা বলে যাননি। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু রেখে গেছেন।

প্রায় উন্মাদের মতো হাতড়াতে থাকেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখে উৎসাহিত হতে পারেন না। হতাশায় খাঁ-খাঁ করে ওঠে মন।

হঠাৎ তার চোখ পড়ে, একটা ছোট্ট বাক্স। তালাবন্ধ। এর মধ্যে আর তেমন কী ঐশ্বর্য আঁটতে পারে? তবু সে নেহাতই কৌতূহলের বশে কুলুপটা ভেঙ্গে ফেলে। বাক্সটার মধ্যে কোনও রত্নমণি কিছুই নাই। ছিলো একখণ্ড কাগজ মাত্র। সুলতান জাইন চিরকুটটা মেলে ধরেন। একখানা শাবল নিয়ে প্রাসাদের পশ্চিম প্রান্তে চলে যাও। সেখানে একখানা ছোট্ট নহবতখানা আছে। সেই নহবতখানার মেঝের ঠিক মাঝখানে একখানা বৃত্তাকার শ্বেত পাথর আছে। ঐ পাথরখানা তুলে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকবে। তারপর আল্লাহ ভরসা।

জাইন কাগজখানা হাতে নিয়ে ভাবেন, এদ্বারা বাবা তাকে কী বোঝাতে চেয়েছেন? মনে হয়, তিনি প্রকারান্তরে উপদেশ দিয়েছেন, কঠোর পরিশ্রম কর। কোনও অভাব হবে না। ভিক্ষার চেয়ে মোট বওয়াও অনেক ভালো।

যাই হোক, পিতৃ আদেশ শিরোধার্য। জাইন ভাবলেন, তিনি জায়গা মত শাবল চালিয়ে দেখবেন, কী হয়।

ফুলবাগিচা থেকে একখানা সাবল নিয়ে নহবতখানায় প্রবেশ করেন সুলতান। ঘরের ঠিক মাঝখানে একখানা বৃত্তাকার শ্বেত পাথরও দেখতে পান তিনি।

রাত্রি অবসান হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

ছোট দুনিয়াজাদ গালিচা থেকে উঠে এসে বলে, তোমার গল্প বলার কী মিষ্টি কায়দা দিদি। শাহরাজাদ বলে, আগে যে সব কাহিনী শুনেছো এটা তার থেকে কিছু আলাদা, বোন। একটু ধৈর্য ধরে শোনো, তবেই বুঝতে পারবে।

সাতশো একুশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

নহবতখানা ছোট্ট ঘর। সব দরজা জানালা বহুকাল ধরে বন্ধ প্রায়ান্ধকার বলা যায়। একটা চিরাগবাতি নিয়ে আসেন জাইন।

সাবলখানা দিয়ে চাড় দিতেই পাথরখানা উঠে আসে। তারপর মাটি। খানিকটা গর্ত খুঁড়তেই খং খং করে ফাঁপা আওয়াজ ওঠে।

মাটি সরাতেই চোখে পড়ে, একখানা পাথরের চাঁই। অনেক কষ্ট করে পাথরখানা টেনে তুলতে চোখে পড়ে, একখানা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। আলো আর সাবলখানা হাতে নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকেন।

নিচে নেমে যেতে চোখে পড়ে, একখানা সুন্দর প্রশস্ত কক্ষ। চারদিকের দেওয়াল চীনা স্ফটিক পাথরে নির্মিত। মাথার ওপরের ছাতটা নীল রঙের। নানা কারুকার্য করা। ঘরের একপাশে পর পর চারখানা লম্বা লম্বা টেবিল। সেই টেবিলে সাজানো দশটি সোনার জালা। তার গায়ে কী সব বিচিত্র কারুকার্য। চোখ জুড়িয়ে যায়।

জাইন ভেবে পান না, জালাগুলোয় কী আছে। জালার আকৃতি না হলেও প্রকৃতি দেখে মনে হয়, ওগুলো দামী মদের পাত্র সব। তাই যদি হয় ক্ষতি কী? প্রাণ ভরে পান করা যাবে তো। এই ভেবে তিনি কাছে এগিয়ে আসেন। একখানা টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে একটা

জালার ঢাকনা খুলে ফেলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, জালাটা সোনার গুঁড়োতে কানায় কানায় ভরা! জাইন হাত ঢুকিয়ে দেন জালার ভিতরে। সারা হাতটায় সোনার গুঁড়োয় মাখামাখি হয়ে যায়। এরপর আর একটা জালার ঢাকনা খুলে ফেলেন। সেটায় মোহর ভরা। এইভাবে তিনি প্রতিটি জালার মুখ খুলে ধরেন। প্রতিটিই হয় সোনার গুঁড়ো, নয় সোনার মোহরে পরিপূর্ণ।

জাইন শিহরিত হয়ে ওঠেন। আনন্দে নেচে ওঠে তার সর্বাঙ্গ। মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠেন। একটা জালা টেনে মাথায় তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু সোনার গুঁড়োর খানিকটা তাঁর মাথায় ঘাড়ে পিঠে মুখে বুকে ছড়িয়ে পড়ে যায়। মুহূর্তে জাইনের সর্বাঙ্গ সোনার বর্ণ ধারণ করে।

ঘরের পাশে এক মনোরম হামাম। সেই হামামের ফোয়ারায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি গোসল করে গায়ের স্বর্ণরেণু ধুয়ে ফেলেন। গোসল করতে করতে নিজের খেয়ালেই তিনি বলতে থাকেন, জাইন, তুমি তো ভিক্ষার পাত্র হাতে ধরতে গিয়েছিলে? এত ঐশ্বর্য নিয়ে এখন কী করবে?

জাইন ভাবেন, প্রাণ খুলে মানুষকে দান করার বুঝি এই পুরষ্কার। একদিন যখন ছিলো, যে যা চেয়েছে, উজাড় করে দিয়েছেন, এ তারই সুফল। একটা কথা আল্লাহ তাকে বুঝিয়ে দিলেন, যে প্রাণ খুলে দান করতে চায়, তার সামগ্রীর কোনও অভাব হয় না।

জাইন সব হাঁড়িগুলো মেঝের ওপর উপুড় করে ঢালতে থাকে। আর দেখে অবাক হতে থাকেন, কত সোনা এবং সোনার মোহর। সারা মেঝেটায় সোনার পাহাড় জমে ওঠে।

জাইন নাবালক শিশুর মতো স্বর্ণস্তূপের সামনে বসে পড়ে দুহাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে খেলা করতে থাকেন। কখনও বা মোহরগুলো আর সোনার গুঁড়োগুলো আঁজলা ভরে তুলে মাথার ওপর দিয়ে সারা অঙ্গে গড়িয়ে দেন। ভারি মজা লাগে। এত অর্থ নিয়ে তিনি কী করবেন, কীই বা এর মূল্য।

জাইন কী করবেন ঠিক বুঝতে পারেন না। সেই নির্জন কক্ষে কুবেরের ধন সামনে নিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েন। সোনার গুঁড়োর মধ্যে গড়াগড়ি খান। মোহরের বিছানা করে শুয়ে পড়েন। নাঃ, এ শয্যা তো তেমন সুখাবহ কোমল কুসুমাস্তীর্ণ নয়? এমন স্বর্ণশয্যায় শুয়ে পিঠে তার ব্যথা লাগে কেন?

আবার তার সর্বাঙ্গ সোনায় সোনায় সোনালী বর্ণ হয়ে ওঠে। দেওয়ালের আয়নায় নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। একটা সোনার তৈরি পুতুল হয়ে গেছেন তিনি।

জাইন নিজের মনেই ভাবেন আর হো হো করে হাসেন। এই সন্ধ্যাবেলাতেই তিনি দৈন্যের লজ্জা ঢাকবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে জীবন শেষ করে দেবেন বলে পথে বেরিয়েছিলেন, আর এখন কতই বা রাত্রি হবে—তার মধ্যে তিনি বোধ হয় তামাম দুনিয়ার সেরা ধনবানদের একজন হয়ে উঠেছেন। আল্লাহর কী মহিমা।

জাইন ভেবে পান না, তার বাবা জনাকীর্ণ প্রাসাদের এই কক্ষতলে কী করে এমন সুন্দর একখানি হর্ম্যকক্ষ বানাতে পেরেছিলেন? নিশ্চয়ই তিনি সকলের অলক্ষ্যেই করেছিলেন এ কাজ। এই যে জালা জালা মোহর আর সোনার গুঁড়ো এ সবই বা তিনি লোকচক্ষুর অগোচর করে এখানে এসে জমা করতে পেরেছিলেন কী করে?

ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। এত ঐশ্বর্যই বা তিনি সংগ্রহ করলেন কী করে। তাঁর সলতানিয়তের যা আয় তা থেকে তো এ সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব নয়।

এইসব নানারকম ভাবছিলেন এবং মোহর আর সোনার গুঁড়োগুলো নিয়ে আপন

মনে খেলা করে চলেছিলেন জাইন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো ছোট্ট একটি কৌটো। সোনার তৈরি; খুব কারুকার্য করা।

এই রকম একটা ক্ষুদ্র কৌটো এখানে কেন? কী এমন ধন-রত্নই বা থাকতে পারে এর ভিতরে। একটু এদিক ওদিক চাপ দিতে দিতে কৌটোটা খুলে ফেললেন জাইন। না, কোনও মণি-রত্ন কিছু নয়, একটুকরো কাগজ এবং একটা চাবি মাত্র।

কাগজখানায় ঘরের নক্সা আঁকা ছিলো। জাইন একটু মিলিয়ে দেখে বুঝতে পারেন, এই মহলেরই পুরো নক্সা করা আছে ঐ কাগজে।

জাইন ভাবে, চাবিটা যখন এত সযত্নে রাখা আছে, মনে হয় এই ঘরের আশেপাশে আরও কোনও ঘর আছে।

নক্সাটা মিলিয়ে মিলিয়ে তিনি দেওয়ালের এক ধারে কী যেন সন্ধান করতে থাকেন। এবং পেয়েও যান একটা চিহ্ন। হাত দিয়ে একটু নাড়া চাড়া করতেই দেওয়ালের ঐ জায়গা থেকে খুলে আসে ছোট্ট একখানা স্ফটিক পাথর। জাইন দেখতে পান চাবি লাগানোর মতো একটা ছোট্ট ফুটো। চাবিটা ঢুকিয়ে এদিক ওদিক দু একবার ঘোরাতেই হঠাৎ দেওয়ালটা একদিকে সরে ফাঁক হয়ে যায়।

ওপাশে আর একখানা ঘর। এবং আরও আরও সুন্দর দেখতে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো বাইশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সারা ঘরখানা পান্না রঙে রঙ করা, এবং সোনার জলে নানারকম নক্সার কাজ করা ছিলো। মাথার ওপরের বৃত্তাকার গোলকে ছয়টি পরমাসুন্দরী মেয়ে। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক সোনার সিংহাসনে সমাসীন। কিন্তু তারা কেউ জীয়ন্ত নয়—এক এক খণ্ড হীরে কেটে এক একটি গড়া।

জাইন হতবাক হয়ে ভাবেন, ইয়া আল্লাহ তাঁর বাবা এত সম্পদের মালিক হয়েছিলেন কী করে? এ দৌলত তো উপার্জন করা সম্ভব নয় কোনও মানুষের পক্ষে।

জাইন ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারেন, আরও একটা সিংহাসন সেখানে রয়েছে। কিন্তু সেটায় কোনও পুতুল নাই। খালিই পড়ে আছে মনে হলো তাঁর। কিন্তু একটু ওপরে উঠে দেখতে পেলেন , না, একেবারে শূন্য সিংহাসন নয়। একখণ্ড রেশমীর কাপড় রাখা আছে তার ওপর। জাইন কাপড়খানা নামিয়ে নিয়ে আসেন। কাপড়টায় সোনার অক্ষরে লেখা ঃ

'বাবা, এই হীরক-কন্যাদের সংগ্রহ করতে আমাকে বহু দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করতে

হয়েছে। এই পুতুলগুলো প্রত্যেকটিই এক একটা হীরে কেটে বসানো। তুমি ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে কী নিপুণ শিল্পীর হাতে এগুলো গড়া। প্রতিটি মেয়ে যেন প্রাণবন্ত বেহেস্তের হুরীর মতো পরমাসুন্দরী। কিন্তু তাই বলে ভেব না এদের চেয়ে আরও বেশি সুন্দরী কোনও নারী হতে পারে না। পারে। এখানে ছ জনকে দেখছো, কিন্তু সপ্তম কন্যার সিংহাসন শূন্যই পড়ে আছে, সে নাই। সে এখানে নাই, কিন্তু আছে। আছে সে মিশরে—কাইরোয়। সেখানে যদি যাও, আমার এক অতি বৃদ্ধ নফর মুবারকের খোঁজ করো তুমি। সেখানকার প্রায় প্রতিটি মানুষই তাকে চেনে। সেই তোমাকে বলে দিতে পারবে—এই সপ্তম কন্যার সন্ধান। নিজের চোখে যদি কখনও সে কন্যার অলোকসামান্য রূপ প্রত্যক্ষ করতে পার, তবে বুঝবে সে এই ছয় কন্যার চেয়েও কত বেশি সুন্দরী রমণী। যদি পার তাকে সংগ্রহ করে এনে এই শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে দিও, জাইন। এই আমার শেষ বাসনা। আল্লাহ তোমায় রক্ষা করুন।'

জাইন ঠিক করেন, তিনি কাইরোয় যাবেন। এবং কালই। সপ্তম কন্যাকে দেখতেই হবে।

জাইন আর অপেক্ষা করেন না সেখানে। একটা বাক্সে করে কিছু মোহর ভরে নিয়ে যথানিয়মে তালা চাবি বন্ধ করে ওপরে উঠে এসে আবার ঘরের মেঝেয় পাথরখানা বসিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে আসেন।

পরদিন সকালে তিনি উজির আমির এবং সভাসদদের ডেকে বললেন, আমি অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি। কিছুদিন একটু বাইরে বেড়িয়ে আসবো ভেবেছি। আমার প্রধান উজিরকে হুকুমতের পুরো দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা তার আনুগত্য নিয়ে আপন আপন কর্তব্য করবেন, আশা করি।

প্রধান উজির বুঝতে পারলো, সুলতানের মনোকষ্টের কারণ কী?

—জাঁহাপনা কোথায় যাবেন মনস্থ করেছেন?

বৃদ্ধ উজির কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করে। জাইন বলেন, কায়রো। কাইরোর মনোহর প্রাকৃতিক শোভা মনের সব দুঃখ যন্ত্রণা লাঘব করে দিতে পারে। আপনি আমার যাবার ব্যবস্থা করুন উজির সাহেব। বিশেষ কোনও আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, বাছাই করা দু'চার জন নফর চাকর সঙ্গে দিলেই চলবে।

উজির জো হুকুম—বলে কুর্ণিশ করে সুলতানের কাইরো সফরের উদ্যোগ আয়োজন করতে প্রাসাদের ভিতরে চলে যায়।

যথাসময়ে কাইরোয় পৌঁছে জাইন এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা শেখ সাহেব, মুবারক নামে এক বৃদ্ধ, শুনেছি এখানকার প্রায় সব মানুষই তাকে এক ডাকে চেনে, কোথায় থাকে বলতে পারেন।

লোকটি জাইনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলে, তুমি বুঝি মুসাফির?

—জী হ্যাঁ।

—শাহ বাদশার মুবারক সাহেবের প্রাসাদ কে না চেনে? তিনি এখন বলতে গেলে কাইরোর মালিক। তার মতো বিত্তবান এ শহরে আর কেউই নাই। এমন কি —এখানকার সুলতানও ধন-দৌলতে তার সমকক্ষ নন। তুমি এক কাজ কর, বাবা, এই পথ দিয়ে সোজা চলে যাও। যেতে যেতে দেখবে পথটা ডাইনে বেঁকে গেছে। সেইখানে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে তার বিশাল প্রাসাদ।

জাইন বিনীত হয়ে বলে, বহুত সুক্রিয়া।

যথা-নির্দেশিত স্থানে এসে প্রাসাদখানার আকার এবং কারুকার্য দেখে অবাক হয়ে যান। বাবার কথাগুলো মনে পড়ে, মুবারক তাঁর একজন সামান্য নফর ছিলো। আজ সে এই বিশাল প্রাসাদের মালিক! ভাবতে অবাক লাগে।

বিরাট একখানা বসার ঘর। দেওয়ালে দেওয়ালে নানা প্রাচীন কারু-শিল্পের নির্দশন। মেঝেয় দামি গালিচা পাতা। ঘরের আসবাবপত্রও অনেক খানদানী আভিজাত্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে, এক নজরেই বোঝা যায়।

ঘরের ভিতরে একটা মখমলের আসন পাতা উঁচু বেদীতে বসে আছেন শুভ্র শ্মশ্রু পলিতকেশ এক সদাশয় বৃদ্ধ। সারা মুখে চোখে তার নির্লিপ্ত প্রশান্তি।

জাইনকে দরজায় দেখে স্বাগত জানান তিনি।

—আসুন ভিতরে আসুন, মনে হচ্ছে আপনি পরদেশী মুসাফির, মেহেরবান করে আসন গ্রহণ করুন।

অতি অমায়িক ব্যবহার। জাইন কোনও কথা বলতে পারেন না। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে একটা জায়গায় বসে পড়েন।

বৃদ্ধ এবার সবিনয়ে জানতে চান, সাহেবের আগমনের উদ্দেশ্য?

জাইন বলেন, আমি মুবারকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

একটি অল্পবয়সী নওজোয়ানের মুখে তার অলঙ্কার-বর্জিত শুধু নামটা শুনে একটু বা আহত হয় সে। কিন্তু মুখের ভাবে তা প্রকাশ পায় না। কায়রোর প্রতিটি মানুষ তাকে দারুণ শ্রদ্ধা সম্মান করে। শুধু মুবারক বলে, ডাকার মতো লোক এখন আর কাইরোয় কেউ বেঁচে নাই। বৃদ্ধ ঈষৎ হেসে বলে, আমিই মুবারক। বলুন কী চাই আপনার?

জাইন বলে, আমার নাম জাইন, বসরাহ থেকে আসছি। আমি সেখানকার বর্তমান সুলতান। আমার বাবা গত হয়েছেন—

আরও কী সব বলতে যাচ্ছিলেন জাইনের কিন্তু বলা হলো না। বৃদ্ধ মুবারক তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন নিজের আসন ছেড়ে। এক মুহূর্ত। জাইনের সামনে ছুটে এসে জাইনের পায়ের পরে লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে ওঠে মালিক—

ঘরে বসেছিলো শহরের সম্ভ্রান্ত সব সওদাগররা। তারা তো বিস্ময়ে বিমূঢ়! জাইনও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। দু'হাতে মুবারককে টেনে তোলে, আহা এ কি করছেন আপনি?

মুবারকের চোখে জল।

—আপনার বাবা গত হয়েছেন। কিন্তু পুণ্যবান মানুষের কখনও মৃত্যু হয় না। আপনি আমার মালিক। আপনার বাবা আমার মালিকের মালিক। আজ এতকাল পরে এই শেষ বয়সে মালিকে-নফরে আবার মিলন হলো। আজ আমার এ গরীবখানা পবিত্র পূর্ণতীর্থ হয়ে গেলো, জাঁহাপনা!

মুবারকের এই কথায় ঘরের উপস্থিত সকলেই সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো জাইনকে। তারপর নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলো সকলে।

মুবারক বলে, এখন হুকুম করুন, জাঁহাপনা।

হুকুম নয়, 'জাঁহাপনা'ও আর নয়—বন্ধু বলে কাছে টেনে নিন। আমি আপনার কাছে এসেছি সপ্তম হীরক-কন্যাকে দেখবো বলে। বাবার লেখা থেকে জানতে পারলাম, আপনিই তার হদিশ জানাতে পারবেন!

—ঠিকই জেনেছেন, মালিক। আমি একদিন আপনাদের যে নফর ছিলাম আজও ঠিক সেই নফর মুবারকই আছি। এই যা ধন-দৌলত প্রাসাদ ইমারত দেখছেন, এ সবই আপনার, মালিক।

একটু থেমে আবার সে বলতে থাকে। হীরক-কন্যার সন্ধানে আপনাকে আমি নিয়ে যাবো অবশ্যই। তার আগে এখানে দু'একদিন জিরিয়ে নিন। শরীর মন দুই-ই চাঙ্গা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আপনার সম্মানে আমি এক ভোজসভার আয়োজন করবো ঠিক করেছি।

আমার আমন্ত্রণে শহরের তাবড় তাবড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সবাই আসবেন আপনাকে সম্বর্ধনা জানাতে। তাদের সকলের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় করাবো, এই আমার ইচ্ছা। আপনি মালিক, বান্দার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন জাঁহাপনা।

রজনী শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো তেইশতম রজনী ঃ

আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

জাইন বলে, একথা সত্য, আপনি আমার বাবার কেনা গোলাম ছিলেন। জানি না আপনি যখন বসরাহ ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনি আপনাকে মুক্তিনামা দিয়েছিলেন কিনা। তবে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি এখনও আমার বান্দা হয়েই আটক আছেন। মুক্ত হননি। যাই হোক, আজ আমি আপনাকে আমাদের সব গোলামী থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিনাশর্তে মুক্ত করে দিলাম।

একটু থেমে জাইন বলেন, আমি বসরাহ থেকে এতটা পথ এসেছি, পথশ্রমে ক্লান্ত—অবশ্যই। কিন্তু সপ্তম হীরক-কন্যাকে দেখার জন্য মন আমার ছটফট করছে। তাই আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণের আড়ম্বর এখন থাক। আপনি আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

মুবারক বুঝলো, মালিক বিশেষ উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করাই সঙ্গত। বললো, ঠিক আছে, মালিক কালই রওনা হবো আমরা। কিন্তু একটা কথা কী ভেবেছেন মালিক, পথে যে সব বাধা-বিপত্তি আসবে তা কাটাতে হবে। সপ্তম হীরক-কন্যা এখন ত্রিভুজ দ্বীপের এক বৃদ্ধের হেপাজতে আছে। বড় দুর্ভেদ্য দুর্গম পথ; দুস্তর বাধা অতিক্রম করতে হবে। যারা ঘাঁৎ ঘোঁৎ জানে না, তারা কিছুতেই এই ত্রিভুজ দ্বীপের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারে না। যে দু একজন এই বিপদ বাধা কাটিয়ে সেখানে পৌঁছোতে পেরেছিলো আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন। সেইজন্যই জানি, কত মারাত্মক কত বিপদ-সঙ্কুল এর যাত্রাপথ।

জাইন বলে, সে যাই হোক, আমি সবকিছুর জন্য তৈরি। আপনি আর ভয় দেখাবেন না, চলুন বেরিয়ে পড়ি। আমার বুকে দুর্জয় সাহস আছে, মৃত্যুকে আমি ডরাই না।

মুবারক তার নফরদের বললো, সব বাঁধা-ছাঁদা করে ফেলো, কালই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

পরদিন খুব ভোরে মুখে হাত ধুয়ে রুজু নামাজ সেরে ওরা পথে বেরিয়ে পড়লো।

দিনের পর দিন তারা কত নদী মরুপ্রান্তর পার হয়ে চলে। পার হয় কত সবুজ শস্য ক্ষেত, গিরি পর্বতমালা, কী করে তার পরিমাপ করা যাবে। চলতে চলতে রাত্রি নেমে আসে। রাত্রি শেষ হলে আবার ওঠে দিনের সূর্য। আবার সূর্যও এক সময় ঢলে পড়ে। কিন্তু জাইন আর মুবারক ক্লান্তিবিহীন চলতেই থাকে। যখন একেবারেই আর শরীর সইতে পারে না তখন খানিকটা জিরিয়ে নেয়। খানাপিনা সারে। তারপর আবার শুরু হয় পথ চলা।

এইভাবে ওরা একদিন সমুদ্র উপকূলে এসে একখানা নৌকায় চেপে আবার চলতে থাকে। চারদিকে জল, শুধু জল। জাইন কিছুই নিশানা বুঝতে পারে না।

এক সময় মুবারক বলে, এই সামনেই ত্রিভুজ দ্বীপ দেখতে পাবেন এবার।

সত্যিই একটু পরে দেখা গেলো একটা দ্বীপ। গাছপালা, তরুলতা গুল্মে ভরা সুন্দর সবুজের হাট।

নৌকাখানা কুলে ভিড়িয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধলো মুবারক। তারপর জাইনকে বললো, আপনি এখানে নৌকাতেই থাকুন, আমি আসছি।

জাইন বললেন, না, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।

মুবারক হাসে, আমি আগে পথঘাট দেখে আসতে চেয়েছিলাম। পরে তো আপনাকে নিয়ে যাবোই। না হলে, সেই হীরক-কন্যাকে দেখবেন কী করে আপনি। তা এখন যদি যেতে চান চলুন, তবে বড়ই বিপদসঙ্কুল পথ—তাই বলছিলাম আগে আমি দেখে আসি।

জাইন বলেন, তা হোক। বিপদে আমি ভয় করি না।

চলতে চলতে বৃদ্ধ বলে, সে তো একশোবার মালিক। আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন কেউ তাকে মারতে পারে না। আবার কথা আছে খোদার মার, দুনিয়ার বার। তিনি যদি মারেন, কেউ বাঁচাতেও পারবে না। সুতরাং ভয় আতঙ্ক সব মিছে। যা ঘটবার তা ঘটবেই। আমরা নিমিত্ত মাত্র।

চলতে চলতে একসময় বৃদ্ধ আবার বলে, আমরা কিন্তু এবার হীরক-কন্যার সেই নিষিদ্ধ এলাকার দোরগড়ায় এসে পড়েছি প্রায়। বুকে সাহস সঞ্চয় করুন মালিক, এবার আমাদের ভেতরে ঢুকতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা রিক্তহস্ত। আমাদের কাছে আত্মরক্ষারও কোন অস্ত্র নাই কিছু।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর ওরা একটা পাহাড় দেখতে পায়। উচ্চতায় পাহাড়টা নেহাত খাটো নয়। মুবারক বলে, ঐ চূড়ায় উঠতে হবে আমাদের।

জাইন বলে, কিন্তু আমাদের তো ডানা নাই, মুবারক। ওপরে যাবো কী করে। হাঁটা পথ বলতে তো কিছু দেখছি না!

মুবারক বলে, আমাদের ওড়ারও দরকার নাই, ওঠারও দরকার নাই।

এই বলে সে কুর্তার জেব থেকে একখানা ছোট্ট পুরোনো কিতাব বের করে। একেবারে জরাজীর্ণ। পাতাগুলো ঝুর-ঝুর হয়ে গেছে। মৃদুমন্দ হাওয়াতেই খসে যেতে পারে। কোথাও কোথাও উই-এ কেটেছে।

বৃদ্ধ ওই বইখানার পাতা খুলে একটা জায়গা পড়তে থাকলো। জাইন বুঝতে পারলেন, কয়েকটি ছত্রের একটি কবিতা সে পাঠ করে চলেছে। কিন্তু তার ভাষা বা উচ্চারণ কিছুই বোধগম্য হবে না তার।

মুবারক নিবিষ্ট মনে কবিতা অথবা মন্ত্রের ছত্রগুলো বিড় বিড় করে আওড়াতে আওড়াতে পাহাড়ের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত, আকাশ থেকে সমতল পর্যন্ত সব দিক নিরীক্ষণ করতে থাকলো।

হঠাৎ দেখা গেলো পাহাড়টা সমান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। প্রথমে ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা ফাটল দেখা দিলো। তারপর সেই ফাটল ক্রমশঃ একটি সরু পথের সৃষ্টি করলো, অংশ দুটির মধ্যে।

কোন রকমে একটি মাত্র মানুষ প্রবেশ করতে পারে সে পথ দিয়ে।

মুবারক আগে এবং তার পরে পিছনে পিছনে প্রবেশ করলেন জাইন। একটানা এক ঘণ্টা ধরে ওরা হেঁটে চললো সেই দুর্গম পথ বেয়ে। অবশেষে এক সময় পাহাড় পথ অতিক্রম করে ওপারে বের হতে পারলো। কি আশ্চর্য, বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ফাটলটা আবার জোড়া লেগে গেলো। একটা সরু চুলের মতো দাগও আর চোখে পড়লো না।

সামনেই এক বিশাল হ্রদ। হ্রদ না বলে সমুদ্র বলাই সঙ্গত। তার ওপারে বহুদূরে এক সবুজ গাছপালার বন-জঙ্গল চোখে পড়ে। হ্রদের প্রাকৃতিক শোভা বড় সুন্দর। নীচে নীল নিথর স্বচ্ছ জলরাশি। মাথার ওপরেও নীল আকাশ—নির্মেঘ। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে।

জাইনকে পাশে নিয়ে মুবারক জলের ধারে পা ছড়িয়ে বসলো। ওপারে আঙ্গুল

দিয়ে দেখিয়ে বললো, ঐ যে দেখছেন, ওপারের যে গাছগুলো শস্যশ্যামল প্রান্ত, ঐখানে আমাদের যেতে হবে মালিক।

জাইন-এর চোখে জিজ্ঞাসা, কিন্তু ওপারে আমরা যাবো কী করে?

মুবারক বলে, ও-নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না, জনাব। এখুনি একখানা ছোট নৌকো এসে আমাদের নিয়ে যাবে। ঐ সুন্দর স্বপ্নের দেশে কোনও কিছুরই অভাব নাই। শুধু আপনার কাছে একটা আর্জি জাঁহাপনা, যা কিছু দেখবেন, সহজভাবে দেখবেন। কোনও কিছু দেখে বিচলিত বা অবাক হবেন না যেন। আর একটা কথা, ভয় পেয়ে ভুলেও কখনও ফিরে যাওয়ার নামটি মুখে আনবেন না। তা সে যদি ঐ নৌকোর মাঝি আমাদের কোনও বিপদের মধ্যে নিয়ে যায় তবুও না। ধৈর্য ধরে মুখ বুজে সব সয়ে যাবেন। আপনি ভয় পেয়েছেন—এটা বুঝতে পারলে খুব খারাপ হবে। যতই বেকায়দায় সে ফেলুক, কোনও কথা বলবেন না। যদি বলেন, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে পানির নিচে ডুবিয়ে দেবে সে।

জাইন বলে, এই আমি মুখে কুলুপ এঁটে দিলাম। আর একটি কথাও বেরুবে না। আপনার কথাবার্তা শুনে বেশ রোমাঞ্চ লাগছে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চব্বিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ওরা যখন এই সব আলোচনায় রত সেই সময় একখানা ডিঙি নৌকো এসে ভিড়লো ওদের সামনে। জাইন অবাক হয়ে ভাবেন কি আশ্চর্য, সে তো এতক্ষণ সামনে তাকিয়েছিলো! যতদূর দৃষ্টি যায়, কই, কোথাও তো কোনও নৌকো-টৌকার আভাষ সে বুঝতে পারেনি এতক্ষণ। তবে হঠাৎ এই ডিঙিখানার আবির্ভাব ঘটলো কী করে? আকাশ থেকে নেমে আসলো, না জলের তলা থেকে উঠে আসলো, কিছুই বুঝতে পারেন না জাইন।

ডিঙিখানা আগা গোড়া রক্তচন্দন-কাঠে তৈরি। দড়ি কাছিগুলো রেশমের। সুন্দর সুগন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত হয়ে উঠলো।

ডিঙির মাঝিটার নিম্নাঙ্গ দেখতে মানুষের মতো। কিন্তু তার মাথাটা হাতীর। কান দুখানা বিরাট বিরাট কুলোর মতো লটরপটর করছিলো।

ডিঙিখানা একেবারে কূলে এসে ভিড়লো না। তার থেকে কয়েক হাত দূরে রেখে এক লাফ দিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালো। তারপর দু'জনকে দু'হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে আবার এক লাফে ডিঙিতে গিয়ে উঠলো।

জাইন আর মুবারককে ডিঙির খোলের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে সে গলুই-এর ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বিরাট বিরাট কান দুখানা টানটান করে মেলে ধরে। একেবারে পালের মতো করে।

শোঁ শোঁ করে হাওয়া বইছিলো। মঝিটার কানের পালে হাওয়া লাগতে নৌকোখানা তর তর করে চলতে থাকলো।

অল্পক্ষণের মধ্যে সেই দ্বীপ নিকটবর্তী হয়ে এলো। তখন মঝিটা আবার ওদের দু'জনকে দু হাতে তুলে এক লাফ দিয়ে দ্বীপের কূলে নামিয়ে দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলো।

জাইনকে হাতে ধরে মুবারক দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। সুন্দর একটি সান-বাঁধানো পথ দিয়ে ওরা হেঁটে চলে। পথের দুপাশে আমরা যেমন পাথরের খোয়া দিয়ে আল করে দিই, সেই রকমই আল করা ছিলো পাথরের নুড়ি দিয়ে। কিন্তু সে নুড়িগুলো কোনও সাধারণ পাথর নয়। বহু বর্ণের চূর্ণী পান্না পলা মুক্তো সব। জাইন ভাবতে পারেন না, কত লক্ষ কোটি দিনার

তার মূল্য হতে পারে। আশ্চর্য, এতটা পথ তাঁরা হাঁটলেন, অথচ কোথাও একটি জন-প্রাণীর সাড়া পেলেন না।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময়ে এক বিশাল প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা। মুবারক বললো, এই সেই প্রাসাদ। এর মধ্যেই থাকে ঐ বৃদ্ধ।

জাইন বলে, কিন্তু এর তো দরজা কপাট সব ভিতর থেকে বন্ধ। কোনও পাহারা পেয়াদাও দেখছি না?

মুবারক বলে, তার কোনও দরকারও নাই।

—তবে ভিতরে ঢুকবেন কী করে, খবরই বা দেবেন কী করে?

মুবারক বলে, খবর-টবর কিচ্ছু দিতে হবে না, যা করতে হবে আমি করছি।

জাইন দেখলেন, আগাগোড়া প্রাসাদটা একখানা মাত্র পান্নার পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। কোথাও জোড়া-টোড়া কিছু নাই। এত বড় পান্না পাথর কোথা থেকেই বা জোগাড় করেছে, আর কী করেই বা এখানেই এনে বসিয়েছে, কিছু বোধমগম্য হয় না তাঁর। প্রাসাদের চারপাশ ঘিরে দুর্গ পরিখা। বাইরের কোনও অবাঞ্ছিত কেউ যাতে প্রাসাদ-সান্নিধ্যে যেতে না পারে তার জন্যই এই কড়া ব্যবস্থা। পরিখার এপাশের পাড়ে সারবন্দী করে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ বসানো। যার ফলে বাইরে থেকে ঠিকমত নজর না করতে পারলে বোঝারই উপায় নাই, ভিতরে অত বিরাট একখানা প্রাসাদ সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

প্রাসাদের সব দরজাই রুদ্ধ। তার মধ্যে সবচেয়ে যে দরজাটা বড়, তার চৌকাঠ থেকে শুরু করে পাল্লা সব আগাগোড়া সোনার তৈরি। দূর থেকে দেখে মনে হয়, পাল্লা দু'খানা কুমীরের চামড়ায় গড়া।

মুবারক তার কামিজের তলা থেকে চারখানা রেশমী ফিতে বের করে দু'খানা জাইনের হাতে দেয়, আর দু'খানা নিজে রাখে। তারপর একখানা ফিতে সে নিজের কোমরে এবং একখানা পিছনে বাঁধে। জাইনকে বলে, ঠিক আমি যেমনটি করে বাঁধলাম, আপনিও দেখে এই রকম করে বাঁধুন, মালিক।

মুবারকের অনুকরণ করে জাইনও তার নিজের কোমরে বাঁধে একখানা, অন্য খানা ঝুলিয়ে দেয় পিছনে।

এরপর মুবারক তার কামিজের তলা থেকে নমাজে বসার উপযোগী দু'খানা বড় আকারের রেশমী কাপড় বের করে মাটিতে পাশাপাশি পাতে। একটার ওপরে সে নিজে বসে। জাইনকে বলে, আপনিও বসুন আমার মতো করে।

মুবারক আতরের শিশি বের করে জাইন এবং নিজের গায়ে ছড়িয়ে দেয়। ভুর ভুর করে সুবাস ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আর একটা শিশি থেকে গোলাপ জল বের করে বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করতে করতে চারপাশে ছড়াতে থাকে।

মুবারক বলে, ব্যস। এবার আমি বৃদ্ধকে আহ্বান করবো! জানি না সে কী মূর্তি ধরে দেখা দেবে। যে ভাবেই আসুক, যে মূর্তিতেই দেখা দিক, আগেই বলেছি, বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করবেন না বা আঁৎকে উঠবেন না। তা হলে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

জাইন বলে আমার মনে আছে।

মুবারক বলে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, সে যেন কূপিত না হয়ে আসে। আমাদের আগমন যদি অবাঞ্ছিত মনে করে, তবে বিকট বীভৎস এক দৈত্য দানবের রূপ ধরে দেখা দেবে। এবং তার সেই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাই আরও একবার সাবধান করে দিচ্ছি মালিক, কিছুতেই ভয় পাবেন না। আর যদি খুশ-মেজাজে

থাকে সে, তবে আর কথা নাই, এক সদাশয় মিষ্টভাষী বৃদ্ধের মূর্তিতে আবির্ভূত হবে। কিন্তু একটা কথা, যে রূপ ধরেই সে আসুক, আপনি তাকে শ্রদ্ধা সম্মান জানাবেন বেশ ভালো করে। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলবেন, 'আপনি মহা শক্তিধর—সম্রাটের সম্রাট। আমরা আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে আপনার সাম্রাজ্যে হাজির হয়েছি। আপনি আমাদের রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা জানাই, আমি আপনার একান্ত অনুগত এক ভৃত্য। অধমের নাম জাইন—বসরাহর বর্তমান সুলতান। আমার বাবা মহামান্য সম্রাটের অনুগ্রহে ছয় ছয় বার এখানে এসে ছয়টি হীরকের পুতুল পেয়েছিলেন। আমি এসেছি আমার বাবারই নির্দেশে। তিনি আজ ইহলোকে নাই। কিন্তু আমাকে আদেশ করে গেছেন, এখানে এসে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে। তাঁর জীবদ্দশাতে সপ্তম হীরক-কন্যাটি তিনি আর আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করে যেতে পারেননি। তাই আমার ওপরে দায়িত্ব আরোপ করে গেছেন, আমি যেন আপনার কাছে এসে সেই সপ্তম হীরক-কন্যাটি প্রার্থনা করি। আমি আমার প্রস্তাব রাখলাম। এখন আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে প্রদান করেন, তবে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তবে একথাও ঠিক, আপনি যদি আমাকে নাও দেন, ঐ সপ্তম কন্যা, তবু আমার পিতৃদেবের মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি অম্লান এবং অবিচল থাকবে আপনার প্রতি। কোনও দিন তা বিন্দুমাত্র নষ্ট হবে না।' এর পর বৃদ্ধ যদি জিজ্ঞেস করে, 'ঐ সপ্তম হীরক-কন্যা নিয়ে তুমি কী করবে, তখন আপনি বললেন, 'আপনার অনুগ্রহে দৌলতের কোনও অভাব নাই আমার। এ শুধু পিতৃ আজ্ঞা পালন। তিনি বলে গেছেন, তাঁর গুপ্তধনাগারে সাতটি কন্যার জন্য সাতটি সোনার সিংহাসন আছে। তার মধ্যে ছয়টিতে ছয় কন্যা অধিষ্ঠিত, কিন্তু সপ্তম আসনটি শূন্য পড়ে আছে। ওটি নিয়ে গিয়ে ওখানে বসাতে পারলে ষোলকলা পূর্ণ হয়।'

এর পর মুবারক জপ তপ, মন্ত্রপাঠ এবং অনেক রকম তুকতাক এবং নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে ডাকাডাকি করতে থাকে। এমন সময় চারদিক আঁধার হয়ে আসে। সূর্য ঢাকা পড়ে যায়। ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনীভূত হতে হতে এমন অবস্থা হয়, জাইন আর মুবারক কেউ কাউকে দেখতে পায় না। হঠাৎ সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার চিরে এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকায়। এবং তখনি গগন-মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

জাইন দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক পলিত-কেশ বৃদ্ধ। মুখে তার মধুর হাসি। প্রশ্ন করলেন, কে তুমি বাবা?

—মহামান্য ত্রিলোকেশ্বর, আমি আপনার বান্দা জাইন, বর্তমানে বসরাহর সুলতান।

তখন মুবারক যা যা শিখিয়েছিলো, হুবহু সেইসব কথাগুলো বলে গেলেন জাইন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো পঁচিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সব শুনে বৃদ্ধ প্রীত হয়ে বললো, তোমরা এই দুর্গম দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছ, সেজন্য খুব খুশি হয়েছি বাবা। কিন্তু সপ্তম হীরক কন্যাটি পাওয়ার পথে একটি কঠিন অন্তরায় আছে। তোমার বাবাকে আমি পর পর ছয়টি শর্ত পালনের জন্য ছয়টি হীরক কন্যা দান করেছিলাম। সপ্তমটিও তাকেই দেবার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু আমার শেষের শর্তটি সে পূরণ করতে পারেনি। অবশ্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি সে করেনি। তার মৃত্যুর পর তার যোগ্য সন্তান তুমি এসেছো, ঐ সপ্তমটিকে নিতে। অবশ্যই আমি দেব—দিতেও চাই। তার কারণ, ওরা একসঙ্গে সাতজন ছিলো, তার মধ্যে ছ'টি এখন তোমার ধনাগারে, আর এই সপ্তম বেচারী একা

একা পড়ে হাহাকার করছে। তাই ঠিক করেছি, দিতে হলে তোমার কাছেই দেব। কিন্তু সেই শর্তটি তোমাকে পূরণ করতে হবে যে, বেটা!

জাইন এক পলকও চিন্তা না করে বলে, আপনার যে-কোনও শর্তে আমি রাজি আছি, ত্রিভুবন অধিপতি। আদেশ করুন।

বৃদ্ধ হাসে, কিন্তু বাবা, তুমি কী পারবে তা পূরণ করতে?

—অবশ্যই পারবো। আপনি হুকুম করুন। ওই সপ্তম কন্যার বিনিময়ে আপনি যদি আমার গোটা সলতানিয়তটাও চান, আমার কোনও দুঃখ থাকবে না—দিয়ে দেব আপনাকে। আপনার গুপ্ত ধনাগারে অগাধ ঐশ্বর্য আছে, যদি চান, তাও সব দিতে পারি। বলুন, কী চান?

বৃদ্ধ হো হো করে হাসে, না, না, ওসবে আমার কোনও প্রয়োজন নাই।

—না, না, সে তুমি পারবে না। তোমার পিতা বহু বৎসর চেষ্টা করেছিলো। সে-ও পারেনি।

—বাবা পারেননি বলে ছেলে পারবে না, তা তো হয় না। আপনি বলুন, দেখি, পারি কিনা। একি কোনও অপার্থিব বস্তু, সম্রাট?

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বলে, না। তুমি সাধারণ এক মনুষ্য সন্তান। তোমার কাছে অলৌকিক বা অপার্থিব বস্তু চাইবো কেন? এ বস্তু অত্যন্ত পার্থিব। কিন্তু মেলানো ভার।

জাইন বলে, পৃথিবীর যে-প্রান্তেই পাওয়া যাক, আর যত দুর্গমই হোক সে পথ, আমি এনে দেব আপনাকে, আপনি মেহেরবানী করে আজ্ঞা করুন।

বৃদ্ধ বলে, আমি একটি পরমাসুন্দরী পঞ্চদশী প্রকৃত কুমারী কন্যা চাই।

জাইন ভাবতে পারেনি, এত সাধারণ বস্তু তার কাম্য। বলেন, এ আপনি কী বললেন, সম্রাট। আমার হারেমেই অন্ততঃ বিশটা পঞ্চদশী পরমাসুন্দরী কুমারী পালিতা হচ্ছে। এখনও ওরা আমার ভোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। আপনি আদেশ করুন, তাদের সবাইকে আপনার সামনে হাজির করছি। তাদের মধ্যে এমন অলোক-সামান্য সুন্দরীও আছে, তামাম দুনিয়ায় যার জুড়ি মেলা ভার।

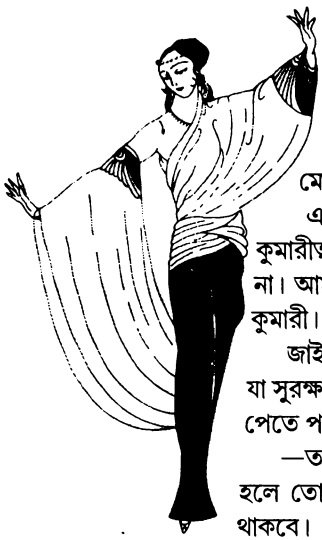

এবার বৃদ্ধ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তুমি অবোধ শিশু। কুমারীত্ব কাকে বলে তাই জানো না। আমি শুধু রূপবতী নারী চাই না। আমার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে, সে হবে অপাপ-বিদ্ধ কুমারী।

জাইন বলে, তাই দেব আপনাকে। আমি জানি আমার হারেমের যা সুরক্ষা, তাতে কোন বাঁদী বেগম ব্যভিচার করার কোনও সুযোগ পেতে পারে না।

—তা সত্ত্বেও আমি বলছি, তারা কেউই প্রকৃত কুমারী নয়। তা হলে তোমাকে খুলেই বলি, প্রকৃত কুমারী কন্যার সতীচ্ছদ অটুট থাকবে। কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, যাদের তুমি অসূর্যস্পশ্যা করে অন্দরে পুরে রেখেছ, তারাও কেউ পূত-পবিত্র নাই।

জাইন বলে, ঠিক আছে, আমি তাদের এনে হাজির করছি। আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন, তারা কুমারী কিনা।

—এখানে এনে পরীক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নাই। তুমি নিজেও পরীক্ষা করে দেখতে পার। তাতেই হবে।

জাইন বলে, কিন্তু পিতা, সহবাস ছাড়া পরীক্ষার তো দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। এবং সহবাস করে পরীক্ষা সমাধা করতে গেলে তারপর তো সে আর কুমারী থাকবে না!

—তুমি যথার্থই বলেছ। সহবাসের পর প্রকৃত কুমারীরও আর কুমারীত্ব বজায় থাকে না।

জাইন বলে, তা হলে? আপনার সন্দেহ মোচন হবে কী করে? আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আপনাকে আমি শতাধিক কুমারী কন্যা এনে দিতে পারি! এখানে আপনি নিজে তাদের সঙ্গে সহবাস করতে করতে জানতে পারবেন, কোন্‌টি প্রকৃত কুমারী। তাকেই আপনি গ্রহণ করে বাকীগুলোকে ফেরত দিয়ে দেবেন?

—কিন্তু বৎস, তোমার এ প্রস্তাব একেবারেই অবাস্তব।

—কেন?

—কারণ, একশো কেন, একশো হাজার পঞ্চদশীর মধ্যেও একটি প্রকৃত কুমারী পাওয়া সম্ভব নয়। তুমি কত মেয়ে জোগাড় করতে পার? যদি পারও তাদের প্রত্যেককে ঐ পদ্ধতিতে পরীক্ষা তো একেবারেই অসম্ভব।

জাইন নিরুৎসাহ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, আপনি বলছেন, একশো হাজারেও একটি প্রকৃত কুমারী মেয়ে পাওয়া শক্ত?

বৃদ্ধ বলে, বুঝেছি, তোমার মনে সন্দেহ জমছে। ঠিক আছে, তোমাকে পরীক্ষার এক নতুন উপায় বাৎলে দিচ্ছি। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি।

বৃদ্ধ প্রাসাদের ভিতরে চলে গেলো।

একটু পরে সে ফিরে এলো একখানা আয়না হাতে করে।

—এই যে দেখছো, আর্শিখানা—এই আর্শির সামনে কোনও কুমারী মেয়েকে দাঁড় করালে তার নিরাবরণ দেহখানা দেখতে পাবে। শুধু তাই নয়, সে মেয়ে যদি পাপবিদ্ধ হয়ে কুমারীত্ব খুইয়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাও ধরা পড়বে এই আয়নায়।

জাইন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কীভাবে?

—আয়নার কাঁচখানা আস্তে আস্তে ঘোলাটে হয়ে যাবে। তখন আর কিছুই দেখা যাবে না।

—আশ্চর্য তো!

—হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে। এ কষ্টিপাথর আর দুটি কোথাও খুঁজে পাবে না। এটা তোমাকে দিলাম। সযত্নে রক্ষা করবে। সাবধান, যদি ভেঙ্গে বা হারিয়ে যায়, তোমার দারুণ দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসবে।

জাইন হাত পেতে নিলো আয়নাখানা। বৃদ্ধ আবার বলে, তোমার যাকে যাকে মনে হবে পঞ্চদশী পরমাসুন্দরী এবং প্রকৃত কুমারী, কেবল তাদেরই পরীক্ষা করে দেখবে। অহেতুক ব্যবহার বিধেয় নয়। তারপর যদি কখনও সন্ধান পাও তেমন মেয়ের এবং তাকে যদি সংগ্রহ করে আনতে পার এখানে, তবেই আমি তোমাকে দেব ঐ সপ্তম হীরক কন্যা। এবং আমি স্বয়ং তোমার প্রাসাদের গুপ্ত ধনাগারে পৌঁছে দিয়ে আসবো। তার কারণ, এই সব মহামূল্যবান সামগ্রী উটের পিঠে নিয়ে এত বিপদ-সঙ্কুল দূরদেশ পাড়ি দিয়ে নিরাপদে ঘরেতুলতে পারবে না। পথের মধ্যে অনেক চোর ডাকাত দুর্বৃত্ত ওৎ পেতে থাকে। সুযোগ পেলেই তারা ডাকাতি ছিনতাই করে কেড়ে নিতে পারে, এই আশঙ্কায় ঐ ছ'টি হীরক পুতুল আমি তোমার বাবার হাতেও দিইনি। আমি নিজে তোমাদের প্রাসাদে গিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। আর এই সপ্তম পুতুলটি পৃথিবীর পরমাশ্চর্য বস্তু। ঐ রকম হাজারটি পুতুলের চেয়েও এর দাম অনেক বেশি। সুতরাং এ বস্তুর কেউ সন্ধান পেলে আর রক্ষা থাকবে না। তাই আমি নিজেই তোমার প্রাসাদে দিয়ে আসবো। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। তার আগে আমার ওয়াদা পূরণ কর, তবে তো সে প্রশ্ন উঠবে।

জাইন আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ করে বলে, আপনি আশীর্বাদ করুন সম্রাট, আমি যেন কৃতকার্য হই। ইরান, ইরাক, পারস্য—তামাম আরবের, দরকার হলে প্রতিটি সুন্দরী পঞ্চদশীকে আমরা পরীক্ষা করে দেখবো। এবং যদি ইপ্সিত বস্তুর সন্ধান করতে পারি, তারপর যে মূল্যেই পারি, কিনে এনে আপনার চরণে নিবেদন করবো।

বৃদ্ধ ডানহাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে বলে, তোমাদের জয় হোক।

আবার চারদিক ঘন ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। আবার বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। জাইন দেখলেন, গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এবং কী আশ্চর্য, বৃদ্ধ অদৃশ্য হয়ে গেছে কখন।

মুবারক বললো, আপাততঃ পর্ব শেষ। চলুন মালিক, এবার দেশে ফিরে যেতে হবে। তারপর শুরু হবে আমাদের দ্বিতীয় পর্বের কাজ।

আবার ওরা হাঁটতে হাঁটতে সেই হ্রদের তীরে আসে। একটু পরে নৌকাখানা এসে ওপারে পার করে দেয়। সেই পাহাড়। মন্ত্রবলে পাহাড়ও দ্বিখণ্ডিত হয়ে পথ করে দেয়! তারপর সমুদ্রের কূলে অপেক্ষমান সেই নৌকায় চড়ে এপারে এসে আবার দীর্ঘ যাত্রা শেষে একদিন কাইরোয় এসে পৌঁছোয়।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ছাব্বিশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

মুবারকের একান্ত অনুরোধে জাইন কয়েকটা দিন তার প্রাসাদে বিলাস বিশ্রামের মধ্যে কাটাতে রাজি হলেন।

জাইন ভাবে, না। যতটা ভয় পেয়েছিলাম ততটা কিছু ঘটেনি। ত্রিভূজ দ্বীপের বৃদ্ধটি লোক খুব ভালো। ঐ রকম একটা অমূল্য সম্পদ—সপ্তম হীরক-কন্যা সে সামান্য এক মর্তের কুমারী-কন্যার বদলে দিতে রাজী হয়ে গেলো। এ তো হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরা। তার কী ধারণা সারা দুনিয়ায় একটিও কুমারী কন্যা নাই?

অবসর বিনোদনের মধ্যে এক সময় জাইন মুবারককে বলেন, এবার তাহলে আমরা বাগদাদেই যাত্রা করি? সেখানে আখচার পরমাসুন্দরী কন্যা পাওয়া যায়। এবং খুঁজে-পেতে দেখলে, তার মধ্যে কী একটা কুমারী কন্যা মিলবে না? বাগদাদে গেলে, অনেক সুন্দরী মেয়ের মধ্যে পছন্দসই কুমারীদের বেছে বেছে পরীক্ষা করে দেখতে পারবো।

মুবারক বাধা দিয়ে বলে, কেন আপনি অত ভাবনা করছেন, মালিক? কাইরোই বা কী কম যায়! মিশরের মেয়েরা জগৎ-বিখ্যাত। তা ছাড়া এখানে দুনিয়ার সব দেশ থেকেই সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে আসা হয়। আমার বিশ্বাস অন্য কোথাও যাওয়ার দরকারই হবে না। এখানেই পেয়ে যাবেন।

জাইন বলে, বেশ, পেলে তো ভালোই হয়। নানাদেশের ঘোরাঘুরির হয়রানি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

মুবারক বলে, আসল মেয়ে আমি খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিচ্ছি মালিক।

—কী ভাবে খুঁজবেন?

—আমি একটি বুড়িকে জানি, তার কাজই এই। ভালো ভালো মেয়েদের ভালো ভালো পাত্র জুটিয়ে দেওয়া।

জাইন জিজ্ঞেস করে, কী ভাবে সে এত সব মেয়েদের সন্ধান রাখে?

—সন্ধান কি সে বাড়ি বাড়ি খোঁজ করে রাখতে যায়? সন্ধান তার কাছে আপ্‌সে আসে। দু তরফ থেকেই—ছেলে এবং মেয়ে।

—অর্থাৎ।

—ধরুন আপনার যেমন একটি পঞ্চদশী পরমাসুন্দরী কন্যা দরকার—আপনি তাকে আপনার নাম ঠিকানা জানিয়ে বলে এলেন, তেমনি কোনও পরমাসুন্দরী পঞ্চদশীর বাবা-মাও তো উপযুক্ত পাত্র খুঁজছে। তারাও তার কাছে নাম ঠিকানা জানিয়ে তার চাহিদা জানিয়ে আসছে। বুড়ি শুধু ঘটকের কাজ করছে। মেয়ের চেহারা চরিত্র বয়স আপনাকে জানিয়ে আপনার চেহারা চরিত্র বয়স এবং ধনদৌলত এর খবর নিয়ে তাদের জানিয়ে আসছে। তারপর আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে শাদী-নিকা হতে আর কতক্ষণ।

জাইন বলে, বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা তো। এতে তো বুড়ির দু তরফা লাভ, তাই না?

মুবারক বলে, আলবত। এই ভাবে অনেক অনাথ মেয়েছেলে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে।

জাইন বলে, ঠিক আছে, আপনি তাহলে, সেইরকম কাউকেই ডাকুন।

মুবারক বলে, ঠিক আছে আজই তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আপনার সামনেই তাকে বলবো, সারা মিশরের সেরা সুন্দরী চাই, আমাদের এই বসরাহর সুলতান জাইন শাদী করবেন। তোমার যা দালালী তার চাইতে কিছু বেশিই পাবে। অবশ্য যদি পছন্দ হয়। বাঁদী-বাজারেরমেয়ে হলেও আপত্তি নাই, তবে হ্যাঁ, বড়িয়া খুব সুরত হওয়া চাই। বয়স পনের হতে হবে। অবশ্যই অন্যের হাত ফেরা মেয়ে চলবে না। একেবারে গোলাপ-কুঁড়ি হওয়া চাই।

আমার মনে হয়, বুড়ি প্রাণ দিয়ে খাটবে। সুলতান বাদশাহ বলে কথা! সে তো বুঝতে পারবে, সুলতানের মনে ধরলে তার সারা-জীবনের মতো একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

জাইন বলে, আপনার ফিকির খুবই ভালো মনে হয়, ভালো কাজ হবে। কিন্তু একটি কথা—বাঁদী-বাজারে মেয়ে পছন্দ হলে, না হয়, দাম দিয়ে কিনে নিলেন কিন্তু পছন্দ যদি কোনও খানদানী ঘরের মেয়েকে করি, সেক্ষেত্রে কী উপায় হবে। সেখানে তো শুধু পাত্রপক্ষই সব নয়। মেয়ের মতামতই সব আগে দরকার! তারপরে তার মা বাবা আছে। তাদের যদি একজন রাজি না হয়, তবে তো সব ভেস্তে যাবে।

মুবারক বলে, সে ব্যাপার, আমি থাকতে, সারা মিশরে কোথায়ও ঘটবে না। প্রথমে আপনাকে দেখবে—যে সে পরিচয় তো নয়। একেবারে সুলতান! দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারপর আমার প্রতাপ প্রতিপত্তি আছে। সারা মিশরে এমন কোনও সম্ভ্রান্ত আমির বাদশা-সওদাগর বা অন্য কোনও খানদানী পরিবার নাই, যারা আমাকে খাতির সম্মান করে না। ওসব আপনি আদৌ চিন্তা করবেন না, মালিক। মেয়ে যদি পছন্দ হয়, হাতে আমাদের আসবেই।

মুবারক আরও বলে, আর একটা কথা, হুজুর, যদি দেখেন একেবারে ডানা কাটা পরী মিলছে না, যা পাওয়া যাচ্ছে—মোটামুটি সেরা, সে মেয়েকেও হাত ছাড়া করবেন না। শাদী করে নেবেন। সারা মিশরে বাছাই করে, ধরুন, পাঁচটা সুন্দরী মেয়ে মনে ধরলো। কাউকেই হাত ছাড়া করবেন না, মালিক। সবগুলোকেই শাদী করে রেখে দেবেন।

এরপর আমরা দামাসকাসে যাবো। সেখানকার সেরা মেয়েগুলোকে শাদী করে নেবেন। ঠিক একভাবে বাছাই করে। তারপর যাবো আমরা বসরাহ এবং বাগদাদে। একই কায়দায় ছাকনী করে সেরা মেয়েদের বাছাই করে তারপর সবগুলো এক জায়গায় এনে তাদের মধ্যে থেকে সবার সেরা সুন্দরী ঠিক করা যাবে। আমার মনে হয়, এইভাবে যদি আমরা এগোই, কাজটা

অনেক সহজ হতে পারবে। আমার তো মনে হয়, অল্প সময়ের মধ্যে এখানেই আমরা ডানাকাটা পরী পেয়ে যাবো।

জাইন বলে, শুধু ডানা-কাটা পরী পেলে তো হবে না, মুবারক ভাই। সব আগে তাকে প্রকৃত কুমারী হতে হবে।

মুবারক বলে, সে তো একশোবার। প্রথম বাছাই-এর সময় সব আগে তো আমরা আয়না দিয়ে তার কুমারীত্বই পরীক্ষা করবো। সে পরীক্ষা পাশ করলে তবে তো রূপ-যৌবনের কথা উঠবে।

জাইন বললে, আপনার পরিকল্পনা অভিনব। এখন দেখা যাক, কতদূর কী হয়। আপনি আগে সেই বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠাবেন। সে কী রকম মেয়ের সন্ধান দিতে পারে দেখা যাক।

কিছুক্ষণ পরেই এক বৃদ্ধা এলো। দূতয়ালী করাই তার একমাত্র কাজ। মুবারক বললো, কি গো বুড়ি মা, তেমন কোন বেহেস্তের ডানা-কাটা পরী-টরির কোনও সন্ধান আছে?

বুড়ি ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বলে, তা আর নাই? খুব আছে। কত চাই?

—দু চারটে দেখাও দেখি। তবে হ্যাঁ, বয়স পনেরোর বেশি হলে চলবে না এবং হাতফেরা মেয়ে চলবে না। তোমার দালালী এবং বখশিশের কথা চিন্তা করো না। পছন্দ হলে অনেক পাবে। যা আশা করতে পার না, তাও পাবে।

বুড়ি বললো, আজই দেখাবো গোটা-পাঁচেক।

মুবারক বলে, বেশ, দেখাও।

বুড়িটা বলে, আমি কোনও হেঁজি-পেঁজি মেয়ে নিয়ে কারবার করি না, মালিক। সবই খানদানী ঘরের খুবসুরত কন্যা। মহামান্য সুলতানের পছন্দ না হয়েই পারবে না। একেবারে আসমান থেকে ধরায় নেমে এসেছে—ফুটফুটে চাঁদ। ওদের যখন নিয়ে আসবো, আপনারা দেখে তাজ্জব বনে যাবেন। ভাববেন, কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে নিই। আচ্ছা, এখন আমি চলি, সন্ধ্যের আগেই সবাইকে নিয়ে হাজির হবো।

সন্ধ্যে হতে না হতেই সে গুটি-পাঁচ মেয়েকে নিয়ে এলো।

—এই নিন, এনে দিলাম। উল্টেপাল্টে দেখে নিন। হলফ করে বলতে পারি, এ মেয়েদের কেউই এর আগে কোনও পুরুষের ছায়া মাড়ায়নি। একেবারে আনকোরা—পবিত্র কুমারী। আর নষ্ট হবেই বা কী করে বলুন? বড় বড় আমিরের হারেমের মেয়ে এরা। সেখানে তো খাজা নফরের চোখে ফাঁকি দিয়ে কোনও আস্ত পুরুষ দূরে থাক, দুধের বালকও ঢুকতে পায় না।

মুবারক বুড়ির এবং মেয়েদের অলক্ষ্যে আয়নাখানা এমনভাবে কায়দা করে ঘরের এক পাশে স্থাপন করে—যেখান থেকে মুবারক এবং জাইন ছাড়া অন্য কারুই চোখে পড়া সম্ভব নয়।

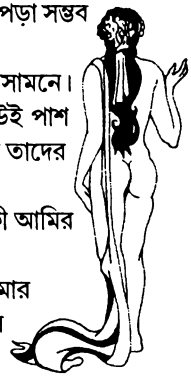

এক এক করে এক একটি মেয়েকে এনে দাঁড় করানো হয় ওদের সামনে। মেয়েগুলোর সকলেই সত্যিই পরমাসুন্দরী কিন্তু আয়নার পরীক্ষায় কেউই পাশ করতে পারলো না। প্রত্যেকটি মেয়ের ছায়া পড়তেই দেখা যেতে লাগলো তাদের নগ্ন দেহবল্লরী। এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাচখানা ঝাপসা হয়ে গেলো।

মুবারক আফশোশ করে ওঠে, শোভন আল্লাহ, একি কাণ্ড! এই-ই কী আমির বাদশাহর হারেম?

মুবারক আর আসল কথা ফাঁস করলো না। শুধু বললো, বুড়ি মা, তোমার মেয়েরা সবাই ভালো, কিন্তু আমাদের সুলতান একটু অন্য ধাঁচের মেয়ে চাইছেন। সুতরাং তোমার মেয়েদের তুমি ফেরত নিয়ে যাও।

বুড়ি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললো, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি মহামান্য সুলতান অনেক উঁচুদরের সমঝদার। আমি এর পর কাল নিয়ে আসবো আরও সুন্দরী কন্যা—বিদেশী কন্যা।

মুবারক অবাক হয়, বিদেশী কন্যা!

বুড়ি বলে, হ্যাঁ, আমার খোঁজে সুদানী, বাদাবী, আরবী, মরোক্কো আর আবসিনিয়া প্রভৃতি অনেক জাতের, অনেক দেশের মেয়ে—পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে।

মুবারক বলে, ঠিক আছে, নিয়ে এসো দেখবো?

বুড়ি বিদায় নিতে, জাইন বলে, এই যদি নমুনা হয়, তবে কোথায় পাওয়া যাবে সেই মেয়ে? আমি তো ভীষণ চিন্তায় পড়লাম।

মুবারক বলে, আজ পাওয়া গেলো না বলে কাল পাওয়া যাবে না, তেমন নাও হতে পারে জাঁহাপনা।

জাইন, প্রায় হতাশ হয়ে বলে, দেখুন।

পরদিনও একই ফল দেখা গেলো। বুড়ি যাদের নিয়ে এলো, খেতে তাদের প্রায় সকলেই পরমাসুন্দরী, কিন্তু আয়নার পরীক্ষায় দেখা গেলো , কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। অতএব বাতিল।

বুড়ি হতাশ হয়। বসরাহর সুলতান মস্ত বড় মক্কেল, আশা করেছিলো, ভালো দাঁও মারবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই ফক্কা হয়ে গেলো।

এর পর নিরাশ হয়ে জাইন আর মুবারক সিরিয়ার পথে যাত্রা করেন। মুবারক শুনেছিলো, সেখানে কিছু অসাধারণ রূপবতী কন্যা আছে এক সওদাগরের হেপাজতে। মেয়ে কেনা-বেচাই তার ব্যবসা। কিন্তু সাধারণ বাঁদী নিয়ে সে কারবার করে না। নবাব বাদশাহর রক্ষিতাদের পরিত্যক্ত কন্যা আতুড় থেকেই কিনে নিয়ে এসে লালন পালন করে। তারপর যখন ডাগর ডাঁসা হয়ে ওঠে, মোটা দরে বেচে দেয়।

দামাসকাসে এসে একখানা সুন্দর চকমিলান বাড়ি ভাড়া করে মুবারক, সারা শহরে রটিয়ে দিলো, বসরাহর মহামান্য সুলতান অবসর বিনোদনের জন্য এখানে এসেছেন। তবে মনের মতো সুন্দরী মেয়ে পেলে তিনি হারেমের বাঁদী বেগম করেও নিয়ে যেতে পারেন।

এই খবর রটে যাওয়া মাত্র নানা দিক থেকে নানা মেয়ের সন্ধান আসতে লাগলো। দামাসকাস পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর, (এই তথ্য ভুল। যতদূর মনেহয়, ভারতের কাশীই সবচেয়ে প্রাচীন) নানা দেশের নানা জাতের বাহারী সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়। তার মধ্যে সুন্দরী নারীই প্রধান। বহু দূর থেকে সুলতান বাদশাহর দালালরা এখানকার বাঁদী-বাজারে আসে মেয়ে সংগ্রহ করতে। দুর্দ্ধর্ষ বাদাবী দস্যুরা ডাকাতি রাহাজানী করে যে সব সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আসে, তারও ভীষণ চাহিদা।

মুবারক সব রকমই দেখতে লাগলো। কিন্তু না, কোনও মেয়েই ধোপে টেঁকে না। দেখতে অনেক পরীর মতো মেয়ে তারা পায়, কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড় করানো মাত্র সব বাতিল হয়ে যায়।

জাইন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, ইয়া আল্লাহ, শেষ পর্যন্ত কী সেই ত্রিভুজ দ্বীপের বৃদ্ধের কথাই ঠিক হবে? সারা দেশে কী একটাও সতী নারী নাই? এমন ব্যভিচার ঢুকে গেছে আমাদের শোবার ঘরে?

মুবারক বললো, তা হলে এবার চলুন বসরাহতেই যাই। অন্য কোথাও না থাক, আপনার নিজের হারেমের মেয়েরা তো অসতী হতে পারবে না! আমি তো জানি, আপনার বাবা—আমার মালিক, কড়া মানুষ ছিলেন। এমনভাবে হারেমগুলো তৈরি যে, বাইরের মাছি পর্যন্ত ঢুকতে পারে না সেখানে।

—কিন্তু মুবারক ভাই, জাইন বলে, যতই দেখছি আমার চোখের পর্দা সরে যাচ্ছে।

আমরা তো অনেক আমির বাদশাহর মেয়েও দেখলাম, আপনার কী ধারণা, তাদের হারেমগুলো সবই অরক্ষিত? আসল কথা, খারাপ হতে চাইলে, তাকে সিন্দুকে ভরে রাখলেও খারাপ সে হবেই। আপনি বলছেন বসরাহয় যেতে। আপনার ধারণা আমার হারেমের মেয়েরা একদম সাচ্চা আছে। আপনার কথা মানাই উচিত। কারণ আমার বাবা এবং আমি যে ভাবে হারেমগুলো বানিয়েছি, তাতে একটা সূচও গলে ভিতরে যেতে পারে না আমি জানি। কিন্তু আমার মনে দারুণ ভয় ঢুকেছে, মুবারক ভাই। সেই কারণেই আমি বসরাহ যেতে চাইছি না।

মুবারক অবাক হয়, ভয়? ভয় কেন, জাঁহাপনা? ভয় কাকে?

জাইন বলে, আরে না না —সে সব ভয় নয়। ভয় আমার নিজেকে। আপনি তো জানেন, মুবারক ভাই, আমার বাবা ভীষণ গোঁড়া মানুষ ছিলেন। সেই কারণে তিনি বাছাই করে কোলের বাচ্চাকে কিনে নিয়ে আসতেন। এবং হারেমে লালন পালন করতেন ধাই পরিচারিকা দিয়ে। তারপর সে যখন ডাগর হয়ে উঠতো তখন তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করতেন। প্রতি বছরই তিনি নতুন নতুন শিশুকন্যাদের কিনে আনতেন এবং প্রতি বছরই নতুন নতুন আনকোরা মেয়ের সঙ্গে সহবাস করতেন। বাবার মৃত্যুর পরও আমার হারেমের এই সুন্দর ব্যবস্থাটি চালু আছে। এখনও নিয়ম করে শিশুকন্যা কিনে আনা হয়। এবং নিয়ম করে কিশোরী কন্যার নথ খোলা হয়।

কিন্তু সব দেখে শুনে আমার আর কোনও ভরসা হচ্ছে না। ধরুন যদি বসরাহয় যাই, এবং হারেমের একেবারে আনকোরা কুঁড়ি যাদের নথ এখনও আমি খুলিনি, তাদের পরীক্ষা করে যদি দেখি আয়না ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে—তাহলে? তাহলে তো আমার মাথায় খুন চেপে যাবে। জানি না, রাগের মাথায় হয়তো তামাম হারেমের দরজা পাট বন্ধ করে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দেব। না না—মুবারক ভাই, ঐ ভয়ঙ্কর সত্যকে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চাই না। তার চেয়ে ওরা যেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে কাটাক। আমি অন্ততঃ এই সান্ত্বনা নিয়ে কাটাতে পারবো যে, আমার মেয়েরা সতীই আছে। ঐ নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি আমি দাঁড়াতে পারব না। তার চেয়ে চলুন, আমরা সোজা বাগদাদেই চলে যাই। শহরও বড়, খানাদানী লোকের বাসও বেশী। সুতরাং খুব-সুরত মেয়েও অনেক মিলবে। তারপর বরাতে যদি থাকে, আসলি চীজ হয়তো পেলেও পেয়ে যেতে পারি।

জাইন-এর কথাবার্তায় আর তেমন কোনও উৎসাহ উদ্দীপনার আমেজ নাই। তাঁর সারা জীবনের বিশ্বাস ধুলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, সাচ্চা মুসলমান মেয়েরা কখনও অসতী হয় না। আর তাদের এই যে পর্দা বোরখা এবং হারেমের কঠিন কড়া প্রহরার ব্যবস্থা—তামাম দুনিয়ার মধ্যে সেরা। এখানকার মেয়েরা খ্রীষ্টানদের মতো বেহায়া অসতী হতেই পারে না। কিন্তু এই আয়নাটা হাতে আসার পর থেকে তাঁর সে-সব বিশ্বাস একেবারে মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে। কত শত মেয়েকে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু হায়, একটি মেয়েও অক্ষত পাওয়া গেলো না!

বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। জাইন বললে, মুবারক ভাই, আর কাল-বিলম্ব না করে চলুন, আমরা আজই বাগদাদে রওনা হয়ে যাই।

মুবারক সেইদিনই বাগদাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো আটাশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়ঃ

আল্লাহর কৃপায় কয়েকদিনের মধ্যে ওঁরা বাগদাদে এসে উপস্থিত হলেন। দামাস্কাসের মতো বাগদাদেও একখানা সুন্দর সাজানো গোছানো ইমারত ভাড়া করা হলো।

টাইগ্রিসের উপকূলে একখানা বাগান বাড়ি। একদিকে স্রোতস্বিনী নদী প্রবাহিতা এবং অপর দিকে প্রকৃতির অপূর্ব শ্যামল শোভা। বড় মনোরম পরিবেশ।

মুবারক প্রচার করে দিলো, বসরাহর পরম দয়ালু সুলতান এসেছেন দীন-দুঃখীদের দান ধ্যান করতে।

প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি অগণিত দীন ভিখারী এসে সুলতানের খয়রাতি নিতে হাজির হয়।

ওদের বাসার কাছেই এক গরীব ইমামের বাসা। লোকটা নিজে দরিদ্র। বোধ হয় সে কারণেই, ধনীর ঐশ্বর্যে খুব ঈর্ষাকাতর ছিলো। বড় লোকেদের এই সব দান খয়রাতি দু' চোখে দেখতে পারতো না সে। মনে প্রাণে সে সবদিক থেকে দীন এবং ভীষণ কৃপণ। জাইনের এই ঢালাও দানসত্রের ব্যাপারটা সে আদৌ সহ্য করতে পারে না।

মসজিদে নামাজ শেষে উপস্থিত ধর্মানুরাগীদের সে অনেক ভালো ভালো উপদেশের বাণী ছাড়ে নিয়ত। একদিন ইমাম সাহেব বললো, দেখ ভাইসাহেবরা, আমার বাড়ির পাশে জানি না কোন এক পরদেশী আমির এসে উঠেছে, সারাদিন ধরে শুধু লোকজনদের টাকা পয়সাই বিলিয়ে যাচ্ছে—দেদার। আচ্ছা বলতে পার, এই পয়সা সে পাচ্ছে কোথায়? আমার তো মনে হয়, কোনও ডাকাতের সর্দার পালিয়ে এসে পীর সেজে দান খয়রাতি করছে। ব্যাপারটা পরখ করে দেখা দরকার। তোমরা সকলে একটু সজাগ থাকবে। কদাচ তার ঐ খয়রাতির অর্থ গ্রহণ করবে না। শুধু তাই নয়, ধর্মের পীঠস্থান এই বাগদাদ শহরের বুকে বসে অসাধু চোর ডাকাত বদমাইশ যা খুশি তাই অনাচার চালিয়ে যাবে, তা তো হতে পারে না। পূর্বাহ্নেই ব্যাপারটা ধর্মাবতারের কর্ণগোচর করা সমীচীন মনে করি। তা না হলে পরে, কোনও গণ্ডগোল হলে আমাদের আর জবাবদিহি করার মুখ থাকবে না। খলিফা আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলবেন, তোমার বাড়ির সামনে, তোমার নাকের ডগা দিয়ে এই ঘটনা ঘটে গেলো—নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিল নাকি?

তখন আমি কী বলবো? সুতরাং আর দেরি না করে সমস্ত ব্যাপারটা খলিফার গোচরে আনা দরকার। তারপর তিনি যা ভালো বোঝেন, করবেন, আমাদের আর কোন ঝুঁকি থাকবে না।

ইমাম আবু বকর-এর কথা শুনে উপস্থিত সকলে সমস্বরে জানালো, ইমাম সাহেব যথার্থ উপদেশই দিয়েছেন। এই রকম একটা গুরুতর ব্যাপার অবশ্যই খলিফাকে জানানো দরকার।

সেই সভাতেই সাব্যস্ত হলো, তারা সকলে মিলে খলিফার দরবারে গিয়ে ঐ পরদেশীদের সন্দেহজনক কার্যবিধি সম্পর্কে নালিশ জানাবে।

এ-সব কথা মুবারকের কানে পৌঁছতে বেশি দেরি হলো না। জাইনকে সে বললো, মালিক, এই ইমাম আবু বকর লোকটা ভীষণ ঈর্ষাকাতর। সে তার দলবল নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। খলিফা হারুন অল রসিদের কাছে আমাদের নামে নাকি মিথ্যে লাগানি ভাঙ্গানি করতে যাবে।

জাইন বললে, এসব লোকের মুখ বন্ধ করার একটা সহজ উপায় আছে। আপনি শ'পাঁচেক দিনারের তোড়া নিয়ে ওর বাড়িতে যান। তাহলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় মুবারক পাঁচশো দিনারের একটা তোড়া হাতে করে ইমাম আবু বকর-এর বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়লো।

ইমাম দরজা খুলে মুবারককে দেখে না চেনার ভান করে বলে, কী চাই? কোত্থেকে আসছেন?

মুবারক যথাবিহিত সালাম শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, আমার নাম মুবারক, আমার মালিক বসরাহর আমির জাইন এখন আপনার বাড়ির পাশে ঐ প্রাসাদে অবস্থান করছেন। খুব ধার্মিক মানুষ। সব সময় ধর্ম-কর্ম নিয়েই দিন কাটান। তিনি জেনেছেন, আপনি এখানকার

মসজিদের ইমাম সাহেব। তাই কুণ্ঠিত চিত্তে এই পাঁচশো দিনারের একটা তোড়া আপনার চরণে নিবেদন করার জন্য আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি মেহেরবানী করে গ্রহণ করেন, তিনি কৃতার্থ হবেন। আপনার মতো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি সহবত করতে সদাই ব্যাকুল।

আবু বকর্ দিনারের থলেটা হাতে নিয়ে ওজনটা অনুভব করে বোঝার চেষ্টা করে। তা শ'পাঁচেক হতে পারে।

এতক্ষণে ইমাম সাহেবের খেয়াল হয়, দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে মুবারককে।

—আরে কী কাণ্ড, এই রকম বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলবেন নাকি! আসুন, ভেতরে এসে বসুন, মেহেরবানী করে।

হঠাৎ আতিথেয়তার ধূম পড়ে যায়। মুবারক ভিতরে গিয়ে বসে। চাকর এসে সরবতের গেলাস রেখে যায়। ইমাম বলে, নিন, একটু খেয়ে নিন।

সরবতের গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে মুবারক বলে, আমার মালিকের সঙ্গে মোলাকাত হলে আপনি বুঝবেন, তিনি কত ধর্মপ্রাণ উদার মহৎ মানুষ, গরীবের দুঃখে সদা তার প্রাণ কাঁদে। আর ধার্মিক মানুষের সন্ধান পেলে তো আর কথাই নাই। নাওয়া খাওয়া ভুলে তার কাছে ছুটে যান উপদেশ বাণী শুনতে। আজকেও তিনি নিজেই আসতে চাইছিলেন, আমিই বললাম, আমি আগে তার কাছে যাই। অনেক কাজের মানুষ। তার সময় সুযোগ বুঝে আপনাকে নিয়ে যাবো।

ইমাম বলে, তাতে কী? নিয়ে এলেই পারতেন? এর পরে যখন খুশি নিয়ে আসবেন তাঁকে। মহামান্য আমিরের জন্য আমার গরীবখানা সব সময়ই খোলা আছে।

মুবারক বলে, ইমাম সাহেব কী আমাদের সুলতানের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন?

ইমাম বলে, কেন, একথা বলছেন কেন?

—না, মানে এই পাড়াপড়শীরা বলাবলি করছিলো আর কি?

—ও হো হো, বুঝেছি—বুঝেছি, দুষ্টলোকে লাগিয়েছে। বলেছে বুঝি যে, খলিফার কাছে আমরা খবর দেব? মানে—সে-সব কিছু না। আসল কথা কি জানেন, বাগদাদে এসেছেন, আপনারা মহামান্য ব্যক্তি, আপনাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটাও খলিফার দেখা কর্তব্য। তাই ভেবেছিলাম, তাকে একবার জানাবো। কিন্তু এখন তো আর তার দরকার নাই। আপনার মুখ থেকেই তো সব শুনলাম। ওসব নিয়ে আপনারা কোনও ভাবনা করবেন না।

মুবারক বললো, তাহলে কালই আমরা আবার ইমাম সাহেবের কাছে আসছি?

—নিশ্চয়ই। যখন খুশি আসবেন। মহামান্য আমির যদি মেহেরবানী করে আমার দরজায় পায়ের ধূলো দেয় কৃতার্থ হবো।

মুবারক চলে গেলো!

পরদিন আবু বকর মসজিদে অন্য বক্তৃতা দিলো।

—ভাই সাহেবরা, গতকাল আমি তোমাদের বলেছিলাম, ঐ পরদেশীরা হয়তো কোনও ডাকাতের দলের সর্দার হতে পারে। কিন্তু কালই আমি ভালো করে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ওরা খুব শেরীফ মানুষ। বসরাহর সুলতান। অনেক ধন-দৌলত সঙ্গে এনেছেন। দু'হাতে বিলিয়ে দান-ধ্যান করে পুণ্য অর্জন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। ছিঃ ছিঃ, না জেনেশুনে এই রকম ধর্মপ্রাণ মানুষের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে আমি খুব অন্যায় করেছি। যাক, কাল যা বলেছিলাম, আপনারা ভুলে যান।

মসজিদের সামনেই দাঁড়িয়েছিলো মুবারক। ইমাম আবু বকর বেরিয়ে আসতেই সে সালাম জানিয়ে বললো, আমার মালিক আপনার দর্শনপ্রার্থী। মেহেরবানী করে বাড়ি

ফেরার পথে একবার যদি আমাদের প্রাসাদে পায়ের ধুলো দেন—খুব আনন্দিত হবেন তিনি। আপনার দক্ষিণা বাবদ আর একটা তোড়া তিনি আলাদা করে রেখেছেন।

তোড়ার কথা শুনে ইমামের চোখ চক্‌চক্ করে ওঠে। তা বেশ তো, চলুন না। দেখাটা করেই যাই।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ঊনত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ইমাম প্রাসাদে প্রবেশ করে জাইনকে কুর্নিশ করে। জাইনও যথারীতি প্রত্যভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করতে বলেন।

খানাপিনা সাজানো হয়। জাইন বলেন, মেহেরবানী করে কিছু গ্রহণ করুন।

তিনজনেই খেতে বসে। ধীরে ধীরে আলাপ-সালাপ জমে ওঠে।

ইমাম জিজ্ঞেস করে, মহামান্য আমির কী আমাদের শহরে কিছুকাল অবস্থান করবেন?

জাইন বলে, হ্যাঁ মানে আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি এখানে। যতদিন না কাজ সমাধা করতে পারছি ততদিন তো থাকতেই হবে।

ইমাম বলে, আপনার উদ্দেশ্যটা কী জানতে পারি? যদি আমাকে দিয়ে কোনও কাজ হয় আপনার, সানন্দে আমি করে দিতে পারি।

জাইন বলে, আমার উদ্দেশ্য একটাই—শাদী করা। আপনি হয়তো বলবেন, আমি সুলতান, এ আর এমন কঠিন কী কাজ! হাত বাড়ালেই হাজারো মেয়ে পেতে পারি! তা পারি। এবং পরমাসুন্দরী মেয়েও পেতে পারি অনেক। কিন্তু আমার ইচ্ছা একটু অন্যরূপ।

ইমাম ঠিক বুঝতে পারে না, কী রকম?

জাইন জানান, আমি যাকে শাদী করবো নিশ্চয়ই সে পরমাসুন্দরী হবে। তার বয়স হবে পনের। এবং সব থেকে প্রথম কথা—প্রকৃত কুমারী হতে হবে তাকে। আচ্ছা এমন কোনও মেয়ের সন্ধান দিতে পারেন? আমি সারা মিশর-সিরিয়ার প্রতিটি শহর ঘুরে এসেছি। কিন্তু এই তিনটি গুণের সমন্বয় কোন কন্যার ভেতরে পাইনি। তাই বড় আশা নিয়ে এই বাগদাদে এসেছি। জানি না, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে কিনা।

ইমাম বলে, হ্যাঁ। এ রকম মেয়ে পাওয়া খুবই শক্ত। হয়তো আপনি বুড়িগুলোকে ঘটকালীর জন্য বাড়িতে বাড়িতে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু আমার ধারণা তাতে কোনও সুবিধে হবে না। ঐ মেয়েছেলেগুলো যে-সব পাত্রীর সন্ধান দেবে তারা কেউই আনকোরা হবে না। তবে আমি আপনাকে একটি মেয়ের হদিশ দিতে পারি। যদি আপনি অনুমতি করেন, তাকে দেখাবার ব্যবস্থাও করতে পারি।

মুবারক বলে, ইমাম সাহেব, আপনি কী সে মেয়ের সতীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ? কিন্তু কী করেই-বা নিঃসন্দেহ আপনি হতে পারবেন? আপনি কী করে বুঝবেন, সে মেয়ের সতীচ্ছদ এখনও অটুট অক্ষত আছে? তা যদি না থাকে, অসূর্যম্পশ্যা হয়ে আজন্ম হারেমে বন্দী থাকলেও, প্রকৃত কুমারী থাকতে পারে না সে।

ইমাম বলে, না আমি তাকে চোখে দেখিনি কখনও। আমি কেন, সারা বাগদাদের কোনও মানুষই তাকে দেখেনি। জন্মের পর থেকে সে হারেমের বাইরে আসেনি কখনও। এবং যে-ঘরের মেয়ে সে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, কোনও রকম অসৎ প্রবৃত্তি তার মনে জাগতে পারে না। আমার এই কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, আমি হলফ করছি, আমার এই ডান হাতখানা আমি কেটে ফেলবো। এখন আপনারা যদি গা-জোয়ারী করে বলেন, না সে কুমারী নয়—সে

এঁড়ে তর্কের মধ্যে আমি যাবো না। একথা তো ঠিক, শাদীর প্রথম রাত ছাড়া কুমারীত্বের পরীক্ষা করা সম্ভব না। আমার কথায় ভরসা করে আপনাকে শাদী করতে হবে। তারপর শাদীর পরদিন সকালে আমাকে বলবেন, তখন যদি বলেন, মেয়ে কুমারী ছিলো না। আমি আমার এই হাত তখুনি কেটে ফেলবো।

আশ্চর্য আয়নার কথা তো কাউকে বলা যাবে না, জাইন মনে মনে ভাবেন, খুব সহজ ভাবেই তো পরীক্ষা করে নিতে পারবো। ঠিক আছে আগে সে দেখাক না। ইমামকে বলেন, আপনার কথা একশোবার খাঁটি। শাদীর প্রথম রাত ছাড়া সত্যিই তাকে কী করে পরীক্ষা করা যাবে? যাই হোক, আপনি একবার দেখাবার ব্যবস্থা করুন পাত্রীকে। যদি তার রূপ দেখে পছন্দ হয়ে যায় তখন আপনার সঙ্গে বাজি লড়া যাবে। আমিও বাজি ধরছি, যদি সে মেয়ে সত্যিই প্রকৃত কুমারী হয়, দশ হাজার দিনারের একটি তোড়া আপনাকে ইনাম দেব। অবশ্য ইমাম সাহেব, আমি বাজিতে হারতেই চাই। কারণ বাজি জেতার চেয়ে একটি কুমারী-কন্যা পাওয়ার দিকেই আমার নজর বেশি।

ইমাম বললো, ঠিক আছে আজই সন্ধ্যায় পাত্রীকে দেখাচ্ছি। তা হলে এখন আমি উঠি?

বাগদাদের প্রধান ইমামের একটি পরমাসুন্দরী পঞ্চদশী কন্যা আছে। মেয়েটি রূপে-গুণে অতুলনীয়া। স্বভাবতই ইমাম-বাড়ির খানদান বহুজনবিদিত। সে বংশের ছেলেমেয়ে জন্মাবধি নম্র বিনয়ী এবং মিষ্টভাষী হয়। তাদের আদব-কায়দা আচার ব্যবহার আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। প্রধান ইমাম সাহেব নিষ্ঠাবান আল্লাহর উপাসক। তার মতো সত্যভাষী ধর্মাত্মা বাগদাদে আর দুটি নাই। এই সব সদ্‌গুণের অধিকারী তার সন্তানরাও।

ইমাম আবু বকর্-এর সঙ্গে প্রধান ইমামের খুব ভাব ছিলো। প্রায়ই সে বলতো, আবু মেয়েটা লায়েক হয়ে উঠলো, এবার তো একটা পাত্র-টাত্র দেখতে হবে। কিন্তু কে আমার মেয়েকে শাদী করবে? আমরা তো পয়সাওলা মানুষ নই।

আবু বকর্ বলেছিলো, আমি কোশিস্ করবো, মালিক। তবে মা জননীকে যে সে ফালতু লোকের হাতে দিলে হবে না। ও যে শাহজাদার বেগম হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছে।

প্রধান ইমাম বলে যোগ্যতা থাকলেই তো হবে না আবু, ভাগ্য থাকা দরকার। নসীবে যা লেখা আছে, তার বাইরে তো কিছু হবে না।

আবু বকর্ সোজা প্রধান সাহেবের বাড়িতে চলে আসে। এই অসময়ে আবু বকরকে তার বাড়িতে আসতে দেখে ইমাম সাহেব একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী খবর আবু, কোনও দুঃসংবাদ আছে নাকি?

—জী না, মালিক। আজ শুভ সংবাদ এনেছি। মা জননীর জন্য একটি বহুত খানদানি আমির পাত্র দেখে এসেছি। আপনার মেয়ের রূপ-গুণের কথা শুনে তিনি পাত্রী দেখতে চেয়েছেন। আমার তো মনে হয়, মাকে দেখে সুলতানের অপছন্দ হবে না।

—তা কোথাকার সুলতান?

—বসরাহর। নাম জাইন। খুব সুন্দর নওজোয়ান যুবক। শুধু ধনদৌলত আছে, তা নয়, সৎ, আদর্শ চরিত্রের মানুষ তিনি। ধর্মে মতি আছে খুব। মানাবে ভালো। আপনি যা দেন-মোহর চাইবেন দিতে তার কোনও অসুবিধে হবে না। সুলতান জানিয়েছেন, মেয়েকে তিনি একটিবার স্বচক্ষে দেখবেন। তা তাকে অসভ্য সাজ-পোশাক পরে দাঁড়াতে হবে না, খুব মার্জিত রুচির ইজার বোরখা পরে সে দাঁড়াবে। আপনি যদি মত করেন আজই দেখাতে পারি তাকে।

প্রধান ইমাম সাহেব ভাবতে থাকেন, তার খানদানের মেয়ে কখনও পর পুরুষের সামনে দাঁড়ায়নি। শাদীর আগে কেউ দেখতেও চায়নি। কিন্তু আজ অন্য প্রশ্ন। এ পাত্র সাধারণ

মানুষ নন—স্বয়ং সুলতান। সুতরাং তার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্নই বড় কথা। যাই হোক, অনেক ভেবে চিন্তে অবশেষে ইমাম সাহেব মত দিলেন, ঠিক আছে, আমার আপত্তি নাই। দেখাও তাকে।

বিবিকে ডেকে তিনি বললেন, আবু বকর একটি সুপাত্রের সন্ধান এনেছে, স্বয়ং সুলতান। এমন পাত্র হাতছাড়া করা যায় না। তুমি লতিফাকে নিয়ে আবু বকর-এর সঙ্গে চলে যাও, পাত্রর প্রাসাদে দেখিয়ে এসো তাকে। পছন্দ হলে মেয়েটা বেগম হয়ে সুখে কাটাবে। জানি না ওর নসীবে কী লিখেছেন তিনি।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

প্রথম দর্শনেই অভিভূত হয়ে পড়ে জাইন। রূপে সে হুরী, সেকথা খুব বড় নয়। চেষ্টা চরিত্র করলে অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে কিছু পাওয়া যায়। ইদানীং দেখলেনও অনেক, কিন্তু সারা মুখে চোখে এমন নিষ্পাপ নির্মল অভিব্যক্তি অন্য কোনও মেয়ের মধ্যে এ যাবৎ তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেননি।

যাই হোক, মুবারক আগে থেকেই আয়নাটা যথাস্থানে আড়াল করে বসিয়ে রেখেছিলো এক জায়গায়। মেয়েটিকে যেখানে দাঁড় করানো হবে সেখান থেকে আয়নায় তার পুরো দেহের ছবি প্রতিবিম্বিত হতে পারবে—অথচ তারা দুজনে ছাড়া ঘরে অন্য কেউ দেখতে পাবে না।

লতিফা ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। জাইন দেখেন, মেয়েটির বোরখা ইজার সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। অপূর্ব নিখুঁত দেহবল্লরী। নিখাদ নিভাঁজ। এমন সুচারু দেহ সৌন্দর্য জাইন কখনও কোনও বাঁদী বেগমের দেহে দেখেনি।

বেশ অনেকক্ষণ আড়চোখে আয়নার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে জাইন। কিন্তু আয়না তো ঝাপসা হয়ে ওঠে না। একি অবিশ্বাস্য কাণ্ড! স্থানকাল পাত্র ভুলে গিয়ে আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে ওঠে জাইন, মুবারক ভাই। বাজীমাৎ—

অর্থাৎ আসল মেয়ে পাওয়া গেছে। একেবারে নিখাদ প্রকৃত সুন্দরী। সুতরাং সেই রাতেই যথারীতি শাদী করলেন জাইন। লতিফা জাইন-এর বেগম হয়ে গেলো।

পরদিন সকালে মুবারক প্রধান ইমামকে বললেন, মহামান্য সুলতান স্বদেশে ফেরার জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন। আজই আমরা রওনা হতে চাই।

—শাদীর পর মেয়ে শ্বশুরের ঘরেই যাবে।

ইমাম সাহেব ম্লান হাসলেন।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সেইদিনই মুবারক ও জাইন লতিফাকে সঙ্গে নিয়ে আবার ত্রিভুজ দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো। এবং অনেক দিনের দুর্গম যাত্রাপথ অতিক্রম করে অবশেষে এসে পৌঁছলো সেই বৃদ্ধের প্রাসাদ সম্মুখে।

বৃদ্ধ পরীক্ষা করে দেখে বললেন, ঠিক আছে তোমার ওয়াদা পূরণ করেছ। আমার ওয়াদাও পূরণ অবশ্যই করবো। যাও, নিজের দেশে প্রাসাদে ফিরে যাও। আমি শূন্যপথে তোমাদের অনেক আগেই পৌঁছে দেব সপ্তম হীরক কন্যাকে।

মুবারক ও জাইন বিদায় নিয়ে চলে যায়। লতিফা কাঁদতে থাকে। এইভাবে তাকে নির্বাসন দেবার জন্যই কী সুলতান তাকে শাদী করেছিলো সেদিন।

বসরাহর প্রাসাদ।

অনেকদিন একটানা পথ চলার পর একদিন জাইন পৌঁছে গেলেন নিজের প্রাসাদে। পৌঁছে দ্রুত পায়ে তিনি গুপ্ত ধনাগারে নেমে যান। বৃদ্ধ বলেছিলো, সপ্তম হীরক-কন্যাকে ছয় পুতুলের পাশে রেখে যাবে।

কিন্তু এ কী! দরজা খুলতেই দেখলেন জাইন, বৃদ্ধের পাশে লতিফা। হাসতে হাসতে বৃদ্ধ বললো, এই সেই সপ্তম হীরক-কন্যা, জাইন। হাজার হীরক কন্যার চেয়েও পরম মূল্যবান রত্ন। একে জীবন-সঙ্গিনী করে তুমি সুখী হও এই আশীর্বাদ করে আমি বিদায় নিচ্ছি।

অনেক কাল আগের কথা।

চীনদেশের এক শহরে এক দরিদ্র দর্জি বাস করতো। শহরটার সঠিক নাম আমার মনে নাই। যাই হোক, সেই দর্জির একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিলো। আদর করে বাবা মা, তার নাম রেখেছিলো আলা অল-দিন। ছেলেটি কিন্তু মা বাবার ইচ্ছে মতো মানুষ হলো না। লেখাপড়ার ধার দিয়েও সে গেলো না। হরেক রকম বদমাইশি বুদ্ধি সব সময় তার মাথায় ঘোরাফেরা করতো। এইভাবে, খারাপ ছেলেদের কুসংসর্গে পড়ে খুব ছোটতেই সে বয়ে গেলো।

যখন ওর বছর দশেক বয়স, আলা অল-দিনের বাবা সার বুঝে নিলো, ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে না। মনে বড় আশা করেছিলো, ছেলেকে অন্য কোনও মর্যাদার কাজে শিক্ষানবীশি করাবে। কিন্তু তার চাল-চলন দেখে সে-আশা পরিত্যাগ করলো। ছেলেকে কাছে ডেকে বললো, শোনও বাবা আলা, তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান, তোমার ওপরে অনেক আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমার কোনও আশাই পূর্ণ করতে পারবে না তুমি। যাই হোক, বয়স বাড়ছে, কবে আছি, কবে নাই, তুমি এখন আমার দোকানেই বসো। অন্ততঃ দর্জির কাজটাও শেখ। খদ্দেরপাতি যা আছে, দেখেশুনে চললে, তোমার আর তোমার মা-এর কোনও অভাব হবে না।

পরদিন থেকে আলা অল-দিনের বাবা ছেলেকে সঙ্গে করে দোকানে যেতে থাকলো। কীভাবে সাজ-পোশাক তৈরি করতে হয় তার তালিম দিতে শুরু করলো।

কিন্তু আলা অল-দিনের ডাংগুলি খেলার স্বভাব, সুস্থির হয়ে বসে সূক্ষ্ম সুচীকর্ম তার পোষাবে কেন? ফাঁক পেলেই সে দোকান ফেলে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। বাবা কিছুতেই তাকে বশে আনতে পারে না। অনেক বকুনি ধমকানি শাসানি প্রহার কিছুই তাকে দোকানমুখি করতে পারলো না। বাবা হয়তো কোনও খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত—ব্যস, সেই সুযোগে বাছাধন টুক করে কেটে পড়েছে। তারপর সারাদিন আর তার টিকি দেখা গেলো না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও ছেলেকে বাধ্য করে কাজে মন বসাতে পারলো না সে। দিনকে দিন সে মার্কামারা ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে মস্তানি গুলতানি করতে করতে একেবারে চোস্ত রংবাজ বনে গেলো প্রায়।

বাবা মনের দুঃখে সব আশাই ছেড়ে দিলো। ছেলের দুঃখে এবং বয়সের ভারে একদিন সে শয্যা নিলো। তারপর কিছুকাল রোগ-ভোগের পর একেবারে পরপারে চলে গেলো।

বিধবা মা দেখলো, স্বামী চলে গেছে, ছেলে অপদার্থ, সুতরাং দোকান-পাট রেখে আর কী হবে। তাই যা পেলো সেই দামেই বেচে দিলো।

আলাদিনের মা সেলাই-বোনায় বেশ দক্ষ ছিলো। বাজার থেকে পশম কিনে এনে

জামা বুনে সে দোকানে দোকানে বিক্রি করে যা লাভ পেত সেই পয়সা দিয়ে ছেলের ও তার নিজের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করতে পারতো কোনরকমে।

আলাদিনকে সে একমাত্র খাওয়া আর শোওয়ার সময় ছাড়া আর কখনও কাছে পেত না। সারাদিন পাড়ার সমবয়সী বাউণ্ডুলে ছেলেদের সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়াতো সে। মা বিরক্ত হয়ে অনেক সময় ভাবতো, ছেলেকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু মায়ের প্রাণ, তা আর পারে না।

এইভাবে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ইয়ারকি মেরে আলাদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মা চোখের জল ফেলে আর পশমের জামা বুনে রুটির পয়সা রোজগার করে।

আলাদিনের বয়স যখন পনের তখন তার দেহে যৌবনের জোয়ার আসতে শুরু করে। দেখতে সে সুন্দরই ছিলো, প্রথম যৌবনের ছোঁয়া লাগতে আরও সুন্দর মনে হতে লাগলো। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে যখন সে ঘুরে বেড়াত, সব ছেলে ছাপিয়ে তার রূপের লাবণ্যই সকলের চোখ ঝলসে দিত। যেমন তার বড় বড় টানা টানা চোখ তেমনই তার নাক মুখ গাল। আর গায়ের রং স্বর্ণচাঁপাকেও হার মানায়।

একদিন বাজারের পাশের একটা খোলা মাঠে তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সে খেলায় মেতেছিলো, এমন সময় এক দরবেশ ফকির এসে উপস্থিত হলো। লোকটি মূর, মরোক্কোবাসী। আলাদিনকে দেখে সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখতে থাকে। বাঃ, অপূর্ব সুন্দর তো ছেলেটি!

এখানে বলে রাখি এই দরবেশটি আসলে এক যাদুকর। জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ পটু। লোকের মুখ দেখে তার ভাগ্য, বর্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে।

আলাদিনকে দেখতে দেখতে সে ভাবে, হ্যাঁ, এইরকম একটি ছেলেরই সে সন্ধান করছিলো এতদিন। এরই অন্বেষণে সে মরোক্কো ছেড়ে সুন্দর এই চীন দেশ পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে এসেছে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো বত্রিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয় ঃ

দরবেশ ছেলেদের একজনকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বেটা ঐ খুব সুরত লেড়কাটা কে বলতে পারো?

—ওঃ, ঐ আলাদিনের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলতো বাবা, ও কে?

ছেলেটি বলে, ও তো রাঙা মূলো। ওর বাবা দর্জি ছিলো। কিন্তু ছেলের নাম রেখেছে আলা অল-দিন—যেন সুলতান বাদশাহজাদা।

—তা বাবা, যা ওর রূপ, শাহজাদা হবারই যোগ্য—

ছেলেটি ঠোঁট উল্টে বলতে বলতে চলে যায়, রূপ না হাতি। আর রাঙা মূলোর মতো রূপ থাকলেই শাহজাদা হওয়া যায়?

দরবেশ এবার আলাদিনকে ডাকে। আলাদিন অবাক হয়, এ আবার কে? চিনতে পারে না? পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায়।

—তোমার নাম তো আলা অল-দিন?

আলাদিন আরও অবাক হয়, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কী করে মালিক?

দরবেশ বলে তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছি বাবা, তোমার আব্বাজান আমার বড় ভাই ছিলো। আচ্ছা তোমাদের দর্জির দোকানটা আছে এখনও?

আলাদিন বলে, না। মা বেচে শেষ করে দিয়েছে।

—কেন, বেচল কেন?

—বা রে, বাবা মারা গেলো, আমি তো দর্জির কাজ শেখার সময়ই পেলাম না। এ অবস্থায় দোকান-পাট দেখে কে? তাই মা বেচে দিয়ে এখন পশমের জামা বোনে বাড়িতে বসে।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো দরবেশ। আলাদিন বিমূঢ় হয়ে পড়ে। বলে, একি! আপনি কাঁদছেন?

—কাঁদবো না? আমার মায়ের পেটের ভাই তোমার বাবা মারা গেছে—আর বলছো, আমি কাঁদবো না? ও হো হো এ আমি কী করলাম, আল্লাহ। নিজের স্বার্থ নিয়েই মেতে থাকলাম সারাটা জীবন? সহোদর ভাই বাঁচলো কি মরলো তার একবার খবর নেবার ফুরসত করতে পারলাম না? যাক, এই বোধ হয় দয়াময় খোদার অভিপ্রায় ছিলো। তা না হলে মরার আগে শেষবারের মতো এক পলক চোখের দেখাও কী তিনি দেখাতে পারতেন না?

দরবেশ চোখের জল মুছে আলাদিনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, আজ বড় ভাই নেই, কিন্তু তোমাকে রেখে গেছে সে। তোমার মধ্যে তাকে আমি খুঁজে পাবো, বেটা, তুমিই আমার দুঃখ শোক ঘুচিয়ে দিতে পারবে।

এই বলে সে আলাদিনের কপাল গাল চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিতে লাগলো।

—আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ বাবা, তোমাকে পেয়েছি। এই শোক তাপে তুমিই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। তুমিই তোমার বাবার অভাব পূরণ করতে পারবে—পুত্রবান পিতার কখনও মৃত্যু হয় না।

মূর দরবেশ তার ট্যাক থেকে দশটা সোনার মোহর বের করে আলাদিনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, এটা তোমার মাকে দিও, বাবা।

আলাদিনের চোখ চকচক করে ওঠে। দরবেশ বলে, তোমরা থাক কোথায়?

আলাদিন বলে, এই কাছেই। আসুন আমার সঙ্গে, বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

দরবেশের হাত ধরে সে পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। অদূরে অবস্থিত একটা ছোট্ট কোঠাবাড়ি দেখিয়ে বলে, ঐ যে দেখছেন লালরঙের বড় বাড়িটার পাশে একটা ছোট্ট একতলা বাড়ি—ওখানেই আমরা থাকি।

দরবেশ বলে, ঠিক আছে, আজ আর যাবো না। কাল গিয়ে তোমার মা-এর সঙ্গে আলাপ করে আসব, কেমন? তুমি এই দিনার দশটা তোমার মা-এর হাতে দিয়ে বলবে, তোমার চাচা এসেছে বিদেশ থেকে। তাকে আমার সালাম আর শুভেচ্ছা জানাবে, বুঝলে বাবা?

আলাদিন বলে, জী বুঝেছি। আমি এখুনি গিয়ে মাকে বলছি, কাল আপনি অতি অবশ্য আসবেন।

মূর বলে, নিশ্চয়ই আসবো। সকালেই আসবো। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কাল সকালে। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, কেমন? বড় ভাই-এর সঙ্গে দেখা হলো না কিন্তু তার কবরটা তো দেখতে পাবো? জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যে ঘরে শুয়ে, যে দাওয়ায় বসে কেটেছে তার, সে জায়গাগুলো তো দেখতে পাবো চোখে। আচ্ছা বাবা, আজ আর নয়, আজ আমি চলি, কাল আবার দেখা হবে।

আলাদিন দরবেশের হাতে চুম্বন রেখে ছুটে যায় মা-এর কাছে। মা ছেলেকে অসময়ে ঘরে ফিরতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়, কী রে, শরীর টরীর খারাপ করেছে নাকি? এখনও খানার সময় হতে ঘন্টাখানেক বাকী?

আলাদিন ওসব কথা গ্রাহ্য করে না। খুশিতে আজ ডগমগ। চকচকে দশ দশটা সোনার মহর তার কোমরে।

—না মা, শরীর ভালোই আছে। তোমাকে একটা সুখবর দিতে ছুটে এলাম।

—সুখবর? কীসের সুখবর?

মা অবাক হয়ে তাকায় আলাদিনের মুখের দিকে। ভবঘুরে বাউণ্ডুলে অপদার্থ ছেলে আলাদিন—সে দেবে সুখবর? সন্দেহ অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফুটে ওঠে ওর চোখে।

—হ্যাঁ, মা খুব শুভসংবাদ। আমার এক চাচা পরবাস থেকে ফিরে এসেছেন। আজ আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। জান মা, কী নজর, আমাকেই দেখে বললেন, তুমি আলা অল-দিন না? আমি তো অবাক! জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে চিনলেন কী করে? উনি বললেন, তোমার বাবার সঙ্গে হুবহু তোমার চেহারার মিল আছে। তারপর কত কথা হলো। আমাদের দর্জির দোকান আছে কিনা, তুমি কেমন আছ—এইসব।

মা অবাক হয়, আমার কথাও জিজ্ঞেস করলেন?

—হ্যাঁ মা, খুব ভালো লোক, একেবারে পীর ফকীরের মতো কথাবার্তা, বেশবাস—সব। কাল তোমার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন তিনি।

আলাদিনের মা বলে, কিন্তু বাবা, তোর বাবার কাছে তো তোর এই চাচার কোনও কথা শুনিনি কখনও। তোর এক চাচা ছিলো সে তো অনেক আগে—তুই যখন পাঁচ-ছ বছরের খোকা, সেই সময় মারা গেছে।

আলাদিন বললো, এ চাচা অনেক অনেক দিন আগে দেশান্তরী হয়েছিলো। তারপর নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এই সবে ফিরেছেন।

মা ভাবলেন হতেও পারে। অনেক কাল আগের কথা। হয়তো পুরোনো শোকের আগুনটা আর উস্কে দিতে চায়নি ওর স্বামী! ভেবেছে সে তো আর বেঁচে বর্তে নাই। কী হবে সে সব শোক দুঃখের কথা তুলে?

—ঠিক আছে বাবা, কাল তাকে নিয়ে আয়। হাজার হলেও চাচা—রক্তের সম্বন্ধ।

পরদিন সকাল হতেই আলাদিন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। সাধারণতঃ এত সকাল তার কাছে মাঝ রাত্রির। সকাল দশটার আগে সে কোনও দিন শয্যাত্যাগ করে না। কিন্তু আজ যে তাকে চাচাকে আনতে যেতে হবে। চটপট তৈরি হয়ে নিলো সে। বিছানার তলা থেকে সেই দশটা মোহর আবার কোমরে বেঁধে নিলো। টাকাগুলো সে মাকে দেয়নি। এবং সে সম্বন্ধে বলেওনি কোনও কথা।

প্রায় ছুটতে ছুটতে সে বাজারের পাশের সেই খেলার মাঠে এসে দাঁড়ায়। দরবেশ তখনও আসেনি। অধীর আগ্রহে সে অপেক্ষা করতে থাকে। ভাবে, হয়তো তারই আসতে দেরি হয়েছে, চাচা দেখে দেখে ফিরে গেছেন। কিন্তু না, একটু পরেই দেখা গেলো, দরবেশ আসছে।

—এই যে বেটা, আলা অল-দিন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ? আমার কী আসতে দেরি হয়ে গেলো?

আলাদিন আমতা আমতা করে বলে, না, মানে—ভাবলাম আপনি যদি আগে এসে পড়েন, একা একা দাঁড়িয়ে থাকবেন, তাই—আমিই একটু আগে এসে দাঁড়ালাম।

দরবেশ বলে, তা বেশ করেছ, এই নাও দিনার দু'টো ধর, এ দু'টো মাকে দিয়ে

বলো, আমি আজ তোমাদের সঙ্গে খানাপিনা করবো। অল্প-স্বল্প যা হোক কিছু বাজারটাজার করে নিতে বলো। আমি দুপুরে নামাজ সেরে তোমাদের বাসায় যাবো। আর হ্যাঁ, আর একবার তোমার বাসাটা ভালো করে চিনিয়ে দাও তো বাবা। কাল যদিও দেখে নিয়েছি, তবু গোলমাল না হয়ে যায়।

আলাদিন আবার দূর থেকে বাসাটা দেখিয়ে দিলো মুরকে। তারপর বিদায় নিয়ে মা-র কাছে চলে এলো এক এক ছুটে। দিনার দু'টো হাতে গুঁজে দিয়ে বললো চাচা তোমাকে দিতে বললেন, বাজার করে খানাপিনা পাকাও, তিনি নামাজ সেরে খেতে আসবেন।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো তেত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

দিনার দু'টো হাতে পেয়ে ছেলের কথা আর অবিশ্বাস করতে পারে না মা। আলাদিনের অনেক ফন্দী ফিকিরের সঙ্গে সে পরিচিত। নানা মতলব ভেঁজে কতবার যে তাকে ধোঁকা দিয়ে কত পয়সা বের করে নিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই। কাল থেকে সে শুধু ভাবছিলো, এও বোধহয় আলাদিনের নতুন এক চাল। কিছু পয়সা আদায় করার ছল। কিন্তু নগদ দু'টো স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে তার ভাবনাটা ঘুরে গেলো। না, তাহলে সত্যিই হয়তো তার চাচা ফিরে এসেছেন।

যাই হোক, তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে ভালোমন্দ কিছু মাংস সবজী মিঠাই ফল ইত্যাদি কিনে নিয়ে ফিরে এলো সে। খুব যত্ন করে খানাপিনা তৈরি করলো।

দুপুর গড়িয়ে যায় যায়। মা বললো, দেখ রে আমার মনে হচ্ছে তোর চাচা বাড়ি চিনতে পারছে না। একটু বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়া না!

আলাদিন বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছে এমন সময় সদরের কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা গেলো। আলাদিনের চোখে খুশির ঝিলিক খেলে যায়, বলে, ঐ মা, উনি এসেছেন।

ছুটে গিয়ে সে দরজা খুলেতই দেখলো, বৃদ্ধ দরবেশ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। তার পিছনে একটা কুলি। তার মাথায় একটা ঝুড়ি—ফলমূল মেঠাই মণ্ডায় ভর্তি।

কুলিটা ভিতরে ঢুকে ঘরের দাওয়ায় ঝুড়িটা নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো। আলাদিন মূরকে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

আলাদিনের মা বোরখা পরে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সালাম জানালো। বৃদ্ধও মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানালো তাকে।

—খোদা হাফেজ, তাঁর অপার করুণায় আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারলাম, বড় ভাই-এর বিবি। কিন্তু মনে বড় খেদ রয়ে গেলো। আর ক'টা দিন আগে আসতে পারলে তার সঙ্গে একটিবার দেখা হতো।

শেষের দিকের কথাগুলো বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে এলো। কামিজের হাতাটা দিয়ে চোখ মুছলো মূর। আলাদিনের মাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর দুজনেই আবার নিজেদের সামলে নিতেও পারলো। মূর জিজ্ঞাসা করে, বড় ভাই কোথায় বসতো, কোথায় শুতো? এইসব নানা হৃদয়-স্পর্শী তথ্য সে জানতে থাকে।

আলাদিনের মা-র আর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না, সে তার স্বামীর সহোদর ভাই। বলে, আল্লাহর চরণে যে আশ্রয় নিয়েছে তার জন্যে আমরা শোক করি কেন ভাইজান। আসুন, সবাই মিলে তাঁর কাছে আমরা মোনাজাত করি।

মূর বলে, তুমি বড় ভালো কথা শোনালে বড় ভাই-এর বৌ! বড় ভালো কথা

শোনালে। সব বুঝি, কিন্তু আমরা সবাই মায়াবদ্ধ জীব, বুঝেও অবুঝের মতো শোক তাপ করে তার আত্মার অকল্যাণ ডেকে আনি। আচ্ছা থাক ওসব কথা, এখন বলো দেখি, আলা-দিন কী করছে। রোজগার পাতি যা করতে পারছে তাতে সংসার ঠিক চলছে তো?

আলাদিনের মা এ কথার কী জবাব দেবে? কী করে বলবে ছেলে একটা অপদার্থ বাউণ্ডুলে? কী করে বলবে, অত বড় ছেলে এক পয়সা রোজগার করে না, তার মা-র ঘাড়ে বসে খায়? আর কী করেই বা বলবে যে পশমের জামা বুনে তার দিন চলে?

—না না, চুপ করে থেক না বড় ভাই-এর বৌ। ওর বাবার অবর্তমানে আমি চাচা—আমিই তার দেখা-শোনা করার একমাত্র লোক। আমার কাছে লজ্জাশরম করার তো কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না। বলো, সে এখন ব্যবসাপত্র কী করছে?

আলাদিনের মা এবার বলে কিছুই করে না আলাদিন। সারাদিন ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। খাবার সময় হলে বাড়ি ফেরে।

মূর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, খুবই অন্যায়। কই, আলা অল-দিন, এদিকে আমার সামনে এসে দাঁড়াও।

আলাদিন চোরের মতো জড়ো-সড়ো হয়ে একপাশে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়।

—কী, কাজ কাম করতে মন চায় না, এই তো?

আলাদিন কোনও জবাব দেয় না—দিতে পারে না। চোখও তুলতে পারে না মাটি থেকে।

মূর এবার ওকে আদর করে পাশে ডাকে, কিন্তু কাজ করতে মন চায় না কেন? মনের মতো কাজ পাওনি বলে তো? ধর যদি তোমাকে বাজারে একটা বেশ বড় সড় রেশমী কাপড়ের দোকান করে দিই—চালাবে?

আলাদিনের চোখ নেচে ওঠে। বলে, হ্যাঁ।

এর পর খানাপিনা সাজিয়ে দেয় আলাদিনের মা। খেতে খেতে মূর বলে, সে অনেক দিন—প্রায় তিরিশ বছর আগে ভাগ্য অন্বেষণে আমি পরবাসী হই। সিন্ধু, হিন্দুস্তান প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে মিশরে চলে যাই। সেখানে বছর দশেক কাটাবার পর মরোক্কোতে গিয়ে পাকাপাকি ভাবে আজ বিশ বছর ব্যবসা করছিলাম। টাকা পয়সা অনেকই রোজগার করলাম, কিন্তু বড় ভাই-এর বৌ, সত্যি কথা বলতে কি মনে শান্তি পেলাম না। যতই বয়স বাড়তে থাকলো দেশের জন্য মন বড় অশান্ত হয়ে উঠলো। তখন কি জানি ভাই আমাকে ডাকছে, তা হলে সব কাজ ফেলে তখুনি চলে আসতাম। আজ যাই কাল যাই করতে করতে এত দেরি হয়ে গেলো যে ভাইকে আর চোখের দেখাটা দেখতে পেলাম না। রক্তের এমনই টান সেই সুদূর মরোক্কোতে বসেও আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, ভাই আমাকে ডাকছে। সেই এলামও—দু'দিন আগে যদি পৌঁছোতে পারতাম—

মূর আর কথা শেষ করতে পারে না। কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে!

আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে আলাদিনের মা। এবার মূরই তাকে সান্ত্বনা দেয়, কেঁদ না, কেঁদ না বড় ভাই-এর বৌ। যে গেছে সে তো গেছেই, যে আছে তাকে বুকে ধরেই তো বাঁচতে হবে। আলাদিন তোমার জীবনের একমাত্র চিরাগ। সেই তোমার জীবন আলোময় করে রাখবে।

আলাদিনের মা দুঃখ করে বলে, সে আশায় আমার ছাই পড়েছে। ছেলে কী আর মায়ের দুঃখ বোঝে। সে তার ইয়ার বন্ধুদের নিয়েই মত্ত থাকে। এখনও গতরে বল আছে, চোখে দৃষ্টি আছে, তাই দু'টো খেতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন অথর্ব হয়ে পড়বো, চোখে ছানি পড়বে, তখন? তখন আমার কী গতি হবে সেই কথা ভেবেই আঁৎকে উঠি। আরও ভয় লাগে আলাদিনের

জন্য। এখন ও বুঝতে পারছে না। দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাওয়ার সময় হলে খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটিবার ভেবে দেখে না, এই খানাপিনা জুটছে কী করে।

মূর বলে, যা হয়ে গেছে তা গেছে। আমি যখন এসে পড়েছি, আর কোন ভাবনা করতে হবে না তোমাদের। আলাদিনকে আমি বাজারে একখানা মস্ত বড় কাপড়ের দোকান করে দেব। গা-গতরে কিছুই খাটতে হবে না ওকে, লোকজন অনেক থাকবে, তারাই সব করবে। আলাদিন শুধু তহবিল নিয়ে বসবে। টাকা পয়সার হিসেবটুকু বুঝে নিতে হবে। কী পারবে না, আলা অল-দিন?

আলাদিন বলে, খুব পারবো।

মূর বললো, তা হলে কালই চলো বাজারে। আগে তোমাকে দোকানের মালিকের মতো সাজ-পোশাকে সেজে এক সওদাগর পুত্র বনতে হবে। জানতো আগে চাই দর্শনধারী—পরে গুণ বিচারী? সেজে-গুজে শাহজাদার মতো গদিতে বসবে। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তোমাকে দেখেই খদ্দেরা মুগ্ধ হয়ে দোকানে ঢুকে পড়বে। যে ব্যবসার যে ভড়ং, তা তো বজায় রাখতেই হবে।

আলাদিনের আনন্দ আর ধরে না। এবং সে বাহারী সাজ পোশাক পরে সওদাগর হবে!

মূর বলে, এবার আমি উঠি। তা হলে ঐ কথাই রইলো। কাল আমি সকালে আসছি। তোমাকে নিয়ে বাজারে বেরুবো।

মূর চলে গেলো। আলাদিনের মা ভাবলো, সাক্ষাৎ আল্লাহর দূত! না হলে তাদের দীন হীন এই দারিদ্র্য দশায় এ রকম পরমাত্মীয় কেউ এসে সব দায় মাথা পেতে নিতে চায়? স্বামীর ছোট ভাই-এর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে মন।

পরদিন সকালে আবার কড়া নড়ে ওঠে। আলাদিনের মা-ই দরজা খুলে দেয়।

—এস ভাইজান ভেতরে এসে বসো।

—না ভাবী, এখন আর বসবো না, কই আলাদিন কোথায়? ওকে পাঠিয়ে দাও। কাল বলে গিয়েছিলাম না বাজারে যেতে হবে? আজ ওর সাজপোশাক কিনে দেব—খুব বাহারী। দেখবে যে ছেলে ঘরে থাকে না, দোকানে বসতে চায় না, সে কেমন সংসারী হয়ে ওঠে, কেমন পাক্কা সওদাগর বনে যায়! আসলে ওর যাতে ভালো লাগে, সেই পথেই ওকে নিয়ে যেতে হবে। নাও, আর দেরি করবো না, ওকে পাঠিয়ে দাও। আমি বাইরেই দাঁড়াচ্ছি।

আলাদিনের মা বলে, হয়তো সাহেব এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে, দেখি যাই ডেকে তুলি গে—

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো পঁয়ত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বাজারের বড় বড় দোকান ঘুরে ঘুরে ওরা সাজ-পোশাক পছন্দ করতে থাকে। বৃদ্ধ বলে, লজ্জাশরম করো না, বাবা। যেটা খুশি বেছে নাও, দামের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

বাঁশবনে ডোম কানা, তবু যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একটা পোশাক পছন্দ করতে পারলো সে। দোকানদার বললো, আপনার ভাইপোর পছন্দ আছে বলতে হয় জনাব। এর চাইতে ভালো পোশাক আমার কেন, সারা বাজারের কোনও দোকানে পাবেন না আপনি।

মূর হাসে, নজরটা উঁচু না হলে বড় কাজ করবে কী করে?

ডোরাকাটা রেশমী শেরওয়ানী, সাদা পাগড়ীর মধ্যে মধ্যে সোনার জরির কাজ। কাশ্মীরের কোমর-বন্ধ। টকটকে লাল চামড়ার জুতো।

দোকানী যা দাম চাইলো, এক পয়সা দরাদরি না করে পুরো টাকা বের করে দিলো বৃদ্ধ। তারপর পোশাকের মোড়কটা আলাদিনের হাতে দিয়ে বললো, চলো বাবা, এবার আমরা হামামে যাবো। খুব আচ্ছাসে ঘষে মেজে গোসল করিয়ে নতুন সাজে সাজাবো তোমাকে।

হামামে ঢুকে মূর নিজে হাতে আলাদিনকে খোসা সাবান দিয়ে ডলাই-মলাই করে ঠাণ্ডা গরম জল মিশিয়ে গোসল করালো। আলাদিন এক নতুন নওজোয়ান যুবক হয়ে বেরিয়ে এলো।

গোসলের পর নাস্তা। হামামেই তার ব্যবস্থা থাকে। দুজনে তৃপ্তি করে খানাপিনা সারলো। বৃদ্ধ বললো নাও, এবার ঐ পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়। ওখানে আয়না প্রসাধন সব আছে। খুব পরিপাটি করে ইচ্ছেমত কাজল সুর্মা আতর লাগিয়ে এসো।

এমন বাদশাহী হামাম আলাদিন জীবনে দেখেনি। সেজে-গুজে যখন বেরিয়ে এলো তখন কে বলবে সে শাহজাদা নয়? যেমন চাঁদের মতো রূপ তেমনি জমকালো সাজপোশাক। প্রথম দর্শনেই মনে হয় যেন কোন সুলতান বাদশাহর পুত্র। আলাদিন এসে বৃদ্ধের কর চুম্বন করে। সে-ও তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে।

—এই তোমার যাত্রাপথের শুরু হলো, বেটা। এবার আসল কাজে নামতে হবে। চলো, বাজারের দিকে যাই, কোথায় তুমি দোকান খুলতে চাও আমাকে দেখিয়ে দাও। আমি সেখানেই তোমার দোকান খুলে দেব।

দোকানের জায়গা পছন্দ করার পর বৃদ্ধ বললো, এবার চলো একটু শহরটা ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যাক। লোকে তোমাকে দেখুক। তুমি যে একজন যে সে লোকের ভাইপো নও সেটা তারা জানুক।

আলাদিনকে সঙ্গে নিয়ে সে অনেক বাগান অনেক মসজিদ ঘুরে ঘুরে অবশেষে এক সরাইখানায় এসে হাজির হয়। এই সরাইখানাতেই বৃদ্ধ মূর আস্তানা গেড়েছে।

—এখানেই আমি উঠেছি। চলো, আমার ঘরে চলো।

বিরাট একখানা প্রশস্ত ঘর। বেশ সাজানো গোছানো। লম্বা লম্বা টেবিলে কাপড় বিছিয়ে নানারকম খানাপিনা সাজানো হয়েছে। বৃদ্ধ বললো, তোমার সঙ্গে নামজাদা সব সওদাগরদের আলাপ করিয়ে দেব বলে আজ এই ভোজসভার ব্যবস্থা করেছি। বসো, এখুনি সবাই এসে পড়বে।

কিছুক্ষণেই মধ্যেই এক এক করে শহরের সম্ভ্রান্ত সওদাগররা এসে উপস্থিত হলো। বৃদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাদিনের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলো। তারপর আরম্ভ হলো খাওয়া-দাওয়া।

এত সব সুন্দর সুন্দর খাবার-দাবার আলাদিন খায়নি কোনও দিন। খুব তৃপ্তি করে খেলো সে।

আসর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সন্ধ্যা উৎরে গেলো। বাসায় ফিরে আসতে মা ছেলেকে দেখে আর চিনতে পারে না। অমন বাদশাহী সাজ পোশাকে সজ্জিত আলাদিন আর সে আলাদিন নাই। একেবারে অন্য মানুষ বনে গেছে। বৃদ্ধকে কী বলে যে ধন্যবান জানাবে বুঝতে পারে না।

—ভাইজান, আমাদের বড়দুঃসময়ে তুমি আল্লাহর আশীর্বাদ হয়ে নেমে এসেছো। তা না হলে এ-সব তো আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিলো। খোদা, তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন।

বৃদ্ধ বলে, আরে—এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছ কেন, ভাবী। এ তো আমার কর্তব্য। আলাদিন আমার ভাইপো। তার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। তুচ্ছ ধন্যবাদ দিয়ে সে-সম্পর্ক খাটো করো না, বড় ভাই-এর বৌ। আলাদিনের বাবার অভাব আমিই তো মেটাবো। আজ বড় ভাই বেঁচে থাকলে যা-করতো আমিও তাই করতে চাই।

আলাদিনের মায়ের দুগাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। খোদা মেহেরবান, ভাইজান। তা না হলে, এ সময়ে তোমার মতো একটা নির্ভর-যোগ্য বটের ছায়া আমি পাবো কী

করে? এখন থেকে আলাদিনকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম। ছেলেটা একেবারে অমানুষ হয়ে যাচ্ছিল, এবার হয়তো তোমার শাসন শিক্ষায় ও সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে।

—হয়তো কেন ভাবীজী, নিশ্চয়ই পারবে। কালক্রমে দেখবে, তোমার ছেলে সারা দেশের মধ্যে সেরা হয়ে উঠবে। তোমার আশংকা করার কোনও হেতু নাই। যে সৎ বংশে ওর জন্ম সে বংশের ছেলেরা কখনও অসৎ উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে না। তা ছাড়া আলাদিন ছেলে তো খারাপ নয়। খুব শান্ত নম্র বিনয়ী। ওকে বাউণ্ডুলে বলো কী করে?

মা হাসে, চাচাকে দেখে এখন ভয়ে সাধু সেজেছে।

বৃদ্ধ জোর দিয়ে বলে, আর সে অসাধু হওয়ার সুযোগ পাবে না। কাল জুম্মাবার। দোকানপাট সব বন্ধ। পরশুই ওকে দোকানে বসিয়ে দেব। আর অসৎ সঙ্গে মিশতেই পারবে না। কাল ওকে নিয়ে যাবো শহর ছাড়িয়ে ঐ পাহাড়ের পাশে এক বাগানবাড়িতে। সেখানে শহরের নামজাদা সব সওদাগররা যাবে আমোদ প্রমোদ করতে। ওদের সঙ্গে আলাদিনের ভাব-সাব রাখা দরকার। বড় ব্যবসা করতে গেলে বড় মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে হয়। না হলে ব্যবসায় নাম ডাক হবে কী করে? আচ্ছা এখন আমি চলি। কাল এসে নিয়ে যাবো।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ছত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সারা রাত ধরে আলাদিনের চোখে আর ঘুম আসে না। জেগে জেগে নানারকম আকাশ-কুসুম রচনা করতে থাকে। সে ব্যবসা করবে। মস্ত বড়ো সওদাগর হবে—অনেক টাকা হবে তার। অনেক ধন দৌলত। তখন কী আর সে এই জরাজীর্ণ পড়ো বাড়িতে পড়ে থাকবে। সুলতানের উজিরের প্রাসাদের মতো একখানা পেল্লাই প্রাসাদ বানাবে। কত লোক লস্কর। কত নফর চাকর, দাসী বাদীতে গম গম করবে সারা প্রাসাদ। সে হবে তার একমাত্র মালিক। তার ইশারাতে কত লোক ওঠ্ বোস করবে।

আলাদিন আর ভাবতে পারে না। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। নিশুতি রাত। চারদিক নিস্তব্ধ-নিরন্ধ অন্ধকার। ঘরের মধ্যে চিরাগের সলতেটা নিষ্প্রভ হয়ে ধুঁকছে। আলাদিন আলোটা জোরালো করে দেয়। আলনায় ঝোলানো পোশাকটায় সে নেড়ে চেড়ে দেখে। ঝুঁকে পড়ে নাক দিয়ে নতুন সাজের গন্ধ আঘ্রাণ করতে থাকে। হামামের সেই আতরের খুসবু তখনও সুবাস ছড়াচ্ছিল সারা পোশাকটায়।

এইভাবে এক সময় সকাল হয়ে আসে। আলাদিন হাত মুখ ধুয়ে সাজপোশাক পরে অধীর আগ্রহে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। সময় যেন আর কাটতে চায় না। অস্থিরভাবে পায়চারী করে এদিক ওদিক।

আজ যেন চাচা একটু দেরি করছেন? কিন্তু দেরি করার মানুষ তো তিনি নন? কিংবা সে-ই অনেক সকাল সকাল উঠে পড়েছে।

যাই হোক, একটু পরেই বৃদ্ধ মূর এসে পড়লো। আলাদিনের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেলো। কেন জানি না, তার কেবলই মনে আশঙ্কা হচ্ছিলো আজ যদি চাচা না আসেন? তা হলে বেড়াতে যাওয়াটা মাঠে মারা যাবে।

কিন্তু না, আলাদিনের আশঙ্কা অমূলক, একটু বাদেই বৃদ্ধ মূর এসে হাজির হলো। আলাদিন ছুটে গিয়ে ওর কর চুম্বন করে বললো, আমি ভাবলাম, চাচা, আপনি বোধ হয় এলেন না।

বৃদ্ধ হাসে। আলাদিনের পিঠ চাপড়ায়। বলে, খুব অধৈর্য হয়ে উঠেছ বুঝি! চলো, আর দেরি নয়, এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। অনেক দূর যেতে হবে।

আলাদিন পা বাড়িয়েই ছিলো। বলে, চলুন।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা শহর প্রান্তে এসে পড়ে। তারপর বিস্তীর্ণ শস্য-শ্যামল প্রান্তর। তাও এক সময় অতিক্রম করে গাছপালা ঘেরা এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। কত সব সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ি বাগ-বাগিচা পেরিয়ে আরও সামনে এগিয়ে চলে।

আলাদিন ক্লান্ত বোধ করে। বলে, চাচা, কত পথ পার হয়ে এলাম। আর কত দূর যেতে হবে। সামনে তো ঐ পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখছি না? আমি আর চলতে পারছি না, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ মূর একটা ঝোলা থেকে অনেক ফল এবং পিঠে বের করে আলাদিনের হাতে দেয়।

—নাও খেয়ে নাও। আর বেশি দূরে নয়, ঐ তো কাছেই এসে পড়েছি। পৌঁছলে দেখবে কী মজার জায়গা? সারা দুনিয়ায় তার জুড়ি নাই।

এইভাবে নানা আশার কথায় ভুলিয়ে আলাদিনকে পাহাড়-সন্নিহিত সেই মরু-প্রান্তরও পার করে নিয়ে যায় মূর।

অবশেষে ওরা এসে পৌঁছয় পাহাড়ের পাদদেশে এক সুন্দর উপত্যকায়। একটা পাথরের চাঁইকে আসন করে ওরা পাশাপাশি বসে। মূর আলাদিনের কাঁধে হাত রাখে। বলে, নাও, এবার একটু বিশ্রাম করে নাও এখানে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, না? আচ্ছা ঘুমিয়ে পড়। তারপর আমি তোমাকে এক অলৌকিক মজার জিনিস দেখবো। সে জিনিস, সারা দুনিয়ার কেউ তোমাকে দেখাতে পারবে না। এবং আমার বিশ্বাস পৃথিবীর কোনও মানুষই কোনও কালে দেখেনি তা। যখন তুমি দেখবে, সারাদিনের এই যে এত পথশ্রম সব সার্থক হবে তখন। আর, এখন হয়তো আমার ওপর কিছুটা বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ হয়েছ, তাও কেটে যাবে তৎক্ষণাৎ। প্রথম যে-দিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো সে-দিন যেমন আমাকে ভালো লেগেছিলো তোমার, আজ তার চেয়েও বেশি ভালো মনে হবে। যাক্ আর কথা নয়, এবার একটু জিরিয়ে নাও। পা দু'খানা ছড়িয়ে দিয়ে আমার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আলাদিন চোখ খুলে অবাক হয়ে দেখে তার চোখের সামনে বিস্তীর্ণ এক লতাগুল্মের ঝোপ জঙ্গল। মূর বলে, ওঠ, উঠে পড়। যাও, ঐ জঙ্গল থেকে এক আঁটি শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে নিয়ে এসো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাদিন এক বোঝা শুকনো ডাল-পালা এনে হাজির করে। বৃদ্ধ বলে, বাঃ, চমৎকার। এবার আমার পিছনে এসে দাঁড়াও।

আলাদিন আজ্ঞাবহর মতো মূর-এর পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। মূর তার কোমর থেকে একটা চকমকির বাক্স বের করে কাঠের পালায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। শুকনো কাঠ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এবার বৃদ্ধ একটা ছোট্ট কচ্ছপের খোলের বাক্স বের করে। তার ভেতর থেকে খানিকটা ধূপের গুঁড়ো বের করে মন্ত্র পড়ে জ্বলন্ত অঙ্গারে ছড়িয়ে দেয়। গল গল করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে থাকে ঊর্ধ্বাকাশে। বৃদ্ধ বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ে চলে। ধীরে ধীরে গগন-মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। আলাদিন বুঝতে পারে, সারা পাহাড়টা দুলছে। হঠাৎ বিরাট এক শব্দ করে পাহাড়ের এক ধারটা বিদীর্ণ হয়ে যায়। আলাদিন লক্ষ্য করলো, অদূরে আট-দশ হাত ব্যাসের এক ইঁদারার মত গর্ত হয়ে গেছে। বৃদ্ধ ওর হাত ধরে বললো, এসো, দেখবে এসো।

গর্তটা খুব একটা গভীর নয়—আট দশ হাত হবে। মূর বললো, তাকিয়ে দেখ, গর্তটার নিচে একখানা শ্বেত-পাথরের চাঁই। দেখতে পাচ্ছো?

আলাদিন বললো, হ্যাঁ পাচ্ছি।

—আর কী দেখছো?

—পাথরটার মাঝখানে দু'খানা পিতলের কড়া।

বৃদ্ধ বললো, নিচে নেমে পড়। এই কড়া দু'খানা ধরে পাথরটাকে টেনে তুলতে হবে।

আলাদিন শিউরে ওঠে, ওরে বাবা ,ওই পেল্লাই পাথর আমি টেনে তুলতে পারি নাকি? ও আমি পারবো না।

—আমি বলছি পারবে। নামো, নেমে পড়।

আলাদিন ভয়ে কাঁপতে থাকে। না না, আমি পারবো না। আপনি সুদ্ধু নামুন। দুজনে মিলে চেষ্টা করি তবে হয়তো ওঠানো যেতেও পারে।

বৃদ্ধ বিরক্ত হয়ে বলে, কথার অবাধ্য হ'য়ো না আলাদিন। আমাকে দিয়ে হ'লে তোমাকে সঙ্গে আনতাম না। আমার কথা শোনো, নেমে কড়াটা ধরে টান দিয়ে দেখ, পাখির পালকের মতো হাল্কা মনে হবে। তোমাকে কোনও জোরই খাটাতে হবে না।

বৃদ্ধ বলতে থাকে, যা বলছি খুব মন দিয়ে শোনো। ঐ পাথরের নিচে এক অতুল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার আছে। আল্লাহ তোমার জন্যেই তা বরাদ্দ করে রেখেছেন। তোমার কপালের লিখন আমি পড়ে দেখেছি। যদিও আমার অসীম ক্ষমতা ইচ্ছ করলে পলকে প্রলয় ঘটিয়ে দিতে পারি, তবু ঐ পিতলের কড়া দু'টো স্পর্শ করার কোনও এক্তিয়ার আমার নাই। একমাত্র তুমি ছাড়া ঐ পাতালপুরীতে অন্য কেউই প্রবেশ করতে পারবে না। শুধু তুমিই ঐ গুপ্ত ধন আবিষ্কারের একমাত্র হকদার। এখন কী ভাবে কী করতে হবে তাই তোমাকে বাতলে দিচ্ছি। হ্যাঁ শোনো, যা পাওয়া যাবে তা আধাআধি বখরা করে নেব আমরা।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো আটত্রিশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

এতক্ষণে আলাদিন-এর মন থেকে সব ভয় মুছে যায়। বলে, আমি রাজি। বলুন চাচা, কী কী করতে হবে আমাকে। আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

—এই তো শেরকা মাফিক কথা।

বৃদ্ধ বুকে জড়িয়ে ধরলো আলাদিনকে। গা মাথায় আদর করতে করতে বললো, তুমি আমার প্রাণাধিক পুত্রের চেয়েও প্রিয় বাবা। এ-দুনিয়ায় আমার বলতে আর কেউই নাই। তুমিই আমার সব। আমার যা বিষয়-আশয় কালে তুমিই পাবে। শুধু তোমার ভালোর জন্য ঐ সুদূর মরোক্কো থেকে এসেছি আমি। আচ্ছা আর দেরি নয়, এবার নামো। ঐ কড়া দু'টো ধরে টেনে তোল পাথরখানা!

আলাদিন লাফ দিয়ে নিচে নামলো। বৃদ্ধ বললো, তোমার বাপ ঠাকুর্দার নাম নিয়ে এবার কড়ায় হাত লাগাও, দেখবে পেঁজা তুলোর মতো হাল্কা হয়ে উঠে আসবে।

আলাদিন কড়া দু'টো দু'হাতে চেপে ধরে বললো, আমি আলীর নাতি, মুসতাফার ছেলে আলাদিন—

এই বলে টানতেই পাথরের সেই প্রকাণ্ড চাঁইখানা আলগা হয়ে হাতের সঙ্গে উঠে এলো। আলাদিন চাঁইখানা একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখলো।

নিচে একটা গুহা। উঁকি দিয়ে দেখলো, সিঁড়ি নেমে গেছে। বারোটা ধাপের নিচে একখানা বিরাট দরজা। রুদ্ধ দরজার পাল্লা দু'খানা তামার পাতে গড়া। অসংখ্য বল্টু আঁটা। বৃদ্ধ নির্দেশ করে, নিচে নেমে যাও। দরজাটা আপনা আপনি খুলে যাবে। দরজা দিয়ে ঢুকলে

দেখতে পাবে একখানা বিরাট ঘর। ঘরখানা তিনটি দরজা দিয়ে তিনখানা কামরায় বিভক্ত করা আছে। প্রথম কামরায় দেখতে পাবে বিরাট বিরাট চারটি তামার জ্বালা। সেগুলো তরল সোনায় ভরা। পাশের কামরায় দেখবে ঐ রকম চারটি রূপোর জ্বালা। তার মধ্যে আছে সোনার গুঁড়ো। আর শেষ কামরায় দেখবে চারটি সোনার জ্বালা। তার মধ্যে আছে সোনার মোহর। তুমি কিন্তু এসব কিছুই লক্ষ্য করবে না। সাবধান, ভুলেও ঐ জ্বালার গায়ে হাত ঠেকাবে না। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে যাবে তোমার সর্বাঙ্গ।

তৃতীয় কামরার শেষে আর একটা দরজা পাবে। সেই দরজা দিয়ে এগোলে এক মনোরম বাগিচার মধ্যে গিয়ে পড়বে তুমি। চারদিকে কত রকমের ফুল আর ফল। দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু ওসব দিকে নজর করার মতো সময় নাই, আরও খানিকটা এগুলে দেখবে একটা থামে লাগানো আছে একখানা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরে উঠে যাবে। দেখবে, একটা ছাদের আঙ্গিনা। ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে দুটি থামের মাঝখানের ফাঁকে একটা কুলুঙ্গি। ঐ কুলুঙ্গির ওপরে একটা পিতলের পিলসুজ। তার মাথায় একটা চিরাগ জ্বলছে। এগিয়ে যাবে, ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দেবে। তারপর চিরাগটাকে হাতে তুলে নিয়ে ছাদের ওপর উপুড় করে সব তেলটুকু ঢেলে দিয়ে তোমার কামিজের তলায় লুকিয়ে আবার নিচে নেমে আসবে। তোমার এই মূল্যবান কামিজ কুর্তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করো না। কারণ চিরাগের তেলে কোনও দাগ লাগবে না! ও তেল সাধারণ কোনও তেল না।

এরপর আর কোথাও দাঁড়াবে না। যে পথে যাবে ঠিক সেই পথ ধরেই আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। তবে ঘাবড়ে যেও না। মুখের হাব ভাব দেখে যেন বোঝা না যায় যে চিরাগ-বাতি চুরি করে পালাচ্ছো। এমন সহজ সাধারণ ভাবে চলবে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। বড় জোর দেখে মনে হতে পারে বাগানে বেড়াতে এসেছে তুমি।

চিরাগটা যদি একবার এনে আমার হাতে দিতে পারো, আলাদিন, তখন আর কে পায় আমাদের। তামাম দুনিয়ার সেরা ধনী হতে পারবো আমরা। তার আর জুড়ি পাওয়া যাবে না কোথাও!

মূর তার নিজের আঙ্গুল থেকে একটা আংটি খুলে আলাদিনকে ছুঁড়ে দিলো, এটা পরে নাও। এই আংটি মন্ত্রপূত, কাছে থাকলে কোনও বিপদ হয় না। শয়তান নজর দিয়ে কোনও কাজ নষ্ট করে দিতে পারে না। তাছাড়া বুকে সাহসও অনেক বেড়ে যাবে, দেখো। এখন ভালোয় ভালোয় কাজ সমাধা করে ফিরে এসো। তারপর দেখবে আমরা কত বড় লোক হয়ে গেছি। শোনও আলাদিন, তোমার ঐ শেরোয়ানীটা গুটিয়ে কোমরে গুঁজে নাও। দেখবে সাবধান, কোনক্রমেই যেন ঐ জালাগুলোর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়ে যায়। তা হলে তুমিও খতম হয়ে যাবে, আর চিরাগ-বাতি লাভের আশাতেও ছাই পড়বে।

আলাদিন নিচে নেমে গেলো। কুর্তার ঝুল কোমরে গুঁজে নিলো। দরজার সামনে দাঁড়াতেই পাল্লা দু'খানা সরে গেলো। আলাদিন ঘরে প্রবেশ করলো। চাচার কথা মতো কোনও দিকেই সে দৃষ্টিপাত করলো না। এক এক করে তিনখানা ঘরই পার হয়ে বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। সামনেই সেই সিঁড়ি। সোজা উপরে উঠে গেলো আলাদিন। ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো কুলুঙ্গির ভিতরে জ্বলন্ত চিরাগ-বাতিটা!

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদা গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো ঊনচল্লিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

একটা পিতলের পিলসুজ কুলুঙ্গির মাথার ওপর বসানো। কাছে গিয়ে ফুঁ দিয়ে

নিভিয়ে দিলো আলাদিন। তারপর বাতিটা হাতে নিয়ে সব তেলটুকু নিঙড়ে ফেলে দিয়ে কামিজের তলায় লুকিয়ে নিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করছে। কিন্তু নিজেকে সহজ শান্ত রাখতে হবে, চাচা বলে দিয়েছেন। তাই সে নির্বিকার হওয়ার ভান করে বাগানের এদিকে ওদিক তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে থাকলো।

ফলের ভারে গাছগুলোর ডাল মাটিতে নুইয়ে পড়েছে। আর সে যে কত বিচিত্র রকমের বাহারী সব ফল! আলাদিন এমন ফল কখনও দেখিনি। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো। কোনওটা বা কর্পূরের মতো সফেদ। কোনওটা মোমের মতো সাদা। আবার কেউ বেদানার মতো টুকটুকে লাল। কোনওটা কমলা রঙের। কোনওটা হাল্কা সবুজ, কোনওটা গাঢ় সবুজ, কোনওটা হলুদ, —বেগুনি, নীল। এত রং। সব রং-এর নামই সে জানে না।

আলাদিন বুঝতে পারেনি, ঐ সাদা ফলগুলো সব হীরে, মুক্তো, আর চন্দ্রকান্তমণি। লালগুলো পলা। সবুজ সব পান্না। নীলগুলো নীলকান্তমণি। হলুদগুলো পোখরাজ। মোটকথা ফলগুলোর সবই কোনও না কোনও মহামূল্য রক্তমণি।

আলাদিন অনেক আশা নিয়ে একটা ফল হাতে ধরে ছিঁড়ে নেয়। কিন্তু একি! এতো খাওয়ার ফল নয়। পাথরের মতো শক্ত যে। আলাদিন ভাবলো আসলে এগুলো নানারকম রঙিন কাঁচের খেলনা। হতাশায় ছেয়ে গেলো মন। যাই হোক, মাকে দেখাবে বলে যতটা পারলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে কামিজের পকেটে কোমরের বন্ধনীতে ভরে নিলো সে।

আবার সেই তিন কামরার জ্বালাগুলোর স্পর্শ বাঁচিয়ে অতি সন্তর্পণে পার হয়ে আসে আলাদিন। বারখানা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই দেখে পাথরের চাঁইটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ। তার চোখ দু'টো ভাঁটার মতো জ্বলছে। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, এনেছো? আমার চিরাগ? কই দাও।

আলাদিন হাসতে হাসতে বলে, এনেছি চাচা। দিচ্ছি। চলুন ওপরে উঠি, তারপর এই কাঁচের খেলনাগুলো সব নামাই তারপর বের করে দিচ্ছি।

মুরের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, না এখনই—এখনই দাও।

—বাঃ রে, দেখছেন না, আমার সারা কামিজ কুর্তা ভরে আমি এই কাঁচের ফলগুলো নিয়ে এসেছি। এগুলো নামাতে দিন, তাড়াহুড়ো করলে সব ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে না? এগুলো ঠিক মতো নামিয়ে রাখি, তারপর আপনার চিরাগ বাতি বের করে দিচ্ছি। সে তো একেবারে আমার পেটের সঙ্গে গোঁজা আছে। এক্কেবারে তলায় চাপা পড়ে আছে।

মূরের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোয়, হুম্ বুঝেছি, আমার সঙ্গে চালাকী শুরু

করেছো। ভেবেছো, আমি কিছু বুঝি না? ওসব কোনও কথা শুনতে চাই না, দেবে কিনা, বলো। তা না হলে এখুনি মজা টের পাইয়ে দেব; কুত্তার বাচ্চা বের কর বলছি।

আলাদিন বুঝতে পারে না হঠাৎ চাচা কেন এত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বলে, কিন্তু আমাকে বের করতে দেবেন তো, চাচা!

—চাচা! কে তোর চৌদ্দপুরুষের চাচা রে শয়তান। ভেবেছ, আমাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি পালাবে! সেটি হচ্ছে না।

এই বলে মূর আচমকা দুই থাপ্পড় বসিয়ে দিলো আলাদিনের গালে। আলাদিন টাল সামলাতে না পেরে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে গেলো।

সিঁড়ির নিচে পড়ে সে ভাবলো, এখন ওপরে ওঠা ঠিক হবে না। চাচার রাগ খানিকটা প্রশমিত হলে তারপর ওঠা যাবে।

এদিকে বুড়ো হা-হুতাশ করে চুল দাড়ি ছিঁড়তে থাকলো। এই গুহায় নামার এক্তিয়ার নাই তার। তার কাছে নিষিদ্ধ এলাকা। তাই সে আলাদিনের পিছু ধাওয়া করতে পারলো না। ওপরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে লাগলো।

ওরে শয়তানের বাচ্চা, ভেবেছিস পালিয়ে বাঁচবি। দাঁড়া তোকে এমন শিক্ষা দেব, জীবনে ভুলতে পারবি না।

লাফ দিয়ে সে ওপরে উঠে এসে কাঠের পাঁজায় আগুন জ্বালিয়ে ধূপের গুঁড়ো ছড়িয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়টা আবার দুলে উঠে ফাটলটা বন্ধ হয়ে গর্তের মুখ জোড়া লেগে গেলো।

আপনারা আগেই শুনেছেন, এই বুড়ো মূরটা আসলে আলাদিনের কেউ না। মরোক্কোর সে এক কুখ্যাত জাদুকর।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চল্লিশতম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে ঃ

ছোটোবেলা থেকে সে যাদুবিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষালাভ করে অনেক অলৌকিক কায়দা কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছিলো। গণনায় সে জানতে পেরেছিলো এই পাহাড়ের নিচে এক আশ্চর্য যাদু চিরাগ আছে। সেই চিরাগ হস্তগত করতে পারলে, দুনিয়ার তাবৎ ধন-সম্পদের সে মালিক হতে পারবে।

গণনায় জানতে পাওয়ার পরই সে মরোক্কো ছেড়ে সুদূর এই চীন দেশে পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁচেছিলো। এবং গণনায় এও পরিষ্কার জানতে পেরেছিলো, মুসতাফার পুত্র আলাদিনের নামেই সে চিরাগ বরাদ্দ করে রেখেছেন আল্লাহ। কিন্তু খোদার এই লিখন সে ভণ্ডুল করে আলাদিনকে দিয়েই চিরাগবাতি নিজের কব্জায় আনতে চেয়েছিলো। কাজটা নির্বিঘ্নে সমাধাও হয়ে এসেছিলো। আলাদিন চিরাগটা এনেছিলো। কিন্তু ওর নিজেরই ভয় হলো, ওপরে উঠে যদি সে চিরাগটা না দেয়। যদি বলে, আমি কষ্ট করে এনেছি, তোমাকে দেব কেন? তাই তো সে ওকে দু'টো থাপ্পড় মেরে কেড়ে নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু আলাদিন যে নিচে গড়িয়ে পড়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি। গুহার নিচে নামার তার এক্তিয়ার নাই। আল্লাহর নির্দেশে এটা তার কাছে নিষিদ্ধ এলাকা। তাই সে তাকে চিরকালের মতো সমাধিস্থ করে রেখে দিলো। এখন সেই গুহার মধ্যে অনাহারে শুকিয়ে শুকিয়ে মরুক।

মূর ঠিক করলো সে আর এদেশে থাকবে না, তার স্বদেশ অফ্রিকাতেই সে ফিরে চললো।

এখানকার মতো যাদুকর মূরের কথা মুলতুবী রাখছি। যথাসময়ে আবার আমরা তার কথায় ফিরে আসবো।

আলাদিন গুহার নিচে বসে যখন ভাবছিলো চাচা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার রাগ কিছুটা প্রশমিত হলে সে উপরে উঠে যাবে, সেই সময় বুঝতে পারলো গুহাটা দুলছে। ভয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করলো। কিন্তু গুহার মুখে পাথরের চাঁইখানা চাপা দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো। প্রাণপণ শক্তিতে নড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু একতিলও নড়াতে পারলো না। চিৎকার করে সে ডাকতে থাকলো, চাচা, আমাকে উপরে উঠতে দিন। এই নিন আপনার চিরাগবাতি।

কিন্তু কে শুনবে তার আর্ত-আহ্বান? মূর তখন সেখান থেকে বহু দূরে চলে গেছে। আলাদিন বুঝতে পেরেছিলো, লোকটা আসলে তার চাচা নয়। হতে পারে না। কারণ কোনও চাচা তার ভাইপোকে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি গালাজ করে না। নিশ্চয়ই সে কোন শয়তান যাদুকর। তাকে দিয়ে কার্য সিদ্ধি করে নিতে চেয়েছিলো।

এখন সে কী করবে? কী করে এই পাতালপুরীর কয়েদখানা থেকে উদ্ধার পাবে, কিছুই ভাবতে পারে না। বাগানের দিকে যেতে চায় কিন্তু সে দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ধাক্কা-ধাক্কি করেও খুলতে পারলো না। তাই নিরুপায় হয়ে আবার ফিরে এসে গুহার সিঁড়ির মুখে বসে বসে কাঁদতে লাগলো।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এই গুহার মধ্যেই সে তিলে তিলে শুকিয়ে মরবে। আর সে তার মা'র কাছে ফিরে যেতে পারবে না। ফিরে যেতে পারবে না তার আত্মীয় বন্ধুদের মাঝে। একবিন্দু জল একটুকরো রুটির অভাবে তাকে—প্রাণ দিতে হবে। অথচ তার ধারে কাছে কত সোনা। এখানে তার কানা কড়িও দাম নাই।

আসন্ন মৃত্যুর ভয়াল ছায়া তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মরতে তাকে হবে।—ইয়া আল্লাহ এ কী করলে তুমি? কী এমন পাপ করেছিলাম, যার সাজা এইভাবে আমাকে পেতে হবে?

আলাদিন পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ বড় অকরুণ। তার এতো কাকুতি-মিনতি তিনি কর্ণপাত করলেন না।

তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নিশ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। আলাদিন হাতের তালু দিয়ে বুক গলা ঘষে কষ্টাটা কিছু লাঘব করতে চায়। হঠাৎ তার হাতের আংটির সঙ্গে বুকে ঘষা লাগতেই এক কাণ্ড ঘটে গেলো।

বিশাল আকারের এক আবলুস কালো আফ্রিদি দৈত্য এসে দাঁড়ালো আলাদিনের সামনে।

—আমি স্থল জল এবং অন্তরীক্ষের অধিপতি, আমার অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু আমি ঐ আংটির দাস। এখন আংটিটা আপনার হাতে—তাই আমি আপনার আজ্ঞাবহ। বলুন মালিক, কী চান আপনি?

অন্য সময় হলে দৈত্যের এই বিকটাকৃতি দেখে আলাদিন মুর্ছা যেত, কিন্তু এখন সে মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। সে ধরেই নিয়েছে, আজ হোক, কাল হোক তাকে মরতেই হবে। সুতরাং আফ্রিদিকে দেখে সে ভাববে কেন?

—এই মুহূর্তে আমি এই গুহার নির্বাসন থেকে মুক্ত হয়ে মাটির উপরে যেতে চাই।

আফ্রিদি বললো, এখুনি আপনার হুকুম তামিল করছি, মালিক।

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো, আলাদিন দেখলো, দৈত্যটার মাথার ওপর থেকে পাথর সরে গেলো। এবং তৎক্ষণাৎ আলাদিনকে তুলে নিয়ে সে উপরে চলে এলো। ঠিক যেখানে মুর যাদুকর কাঠের ধুনী জ্বালিয়েছিলো সেখানে বসিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

আলাদিনের সে কী আনন্দ! প্রাণভরে সে নিশ্বাস টানলো। ওপরে তাকিয়ে দেখলো, লক্ষ-কোটি তারকা-খচিত সুন্দর নীল আকাশ। মৃদুমন্দ সমীরণ বইছিলো। আলাদিন বাঁচার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো।

পাহাড় থেকে বাড়ির পথ অনেকটা। কিন্তু তখন সে খিদে-তৃষ্ণা ভুলে ছুটে চললো বাড়ির দিকে। যখন বাড়ির দোরগড়ায় পৌঁছলে, তখন রাত অনেক। মা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছেলের আগমন প্রতীক্ষা করছিলো। আলাদিনকে ঐভাবে ফিরতে দেখে আকুল হয়ে ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলো সে।

—এতো রাত হলো কেন রে? আমি ভয়ে মরি, তোর কী মায়ের কথা একটুও মনে ছিলো না বাবা!

আলাদিনের তখন কথা বলার অবস্থা নাই, শুধু বলতে পারলো, মা, পানি—

তাড়াতাড়ি এক বদনা জল এনে ছেলের মুখে ধরে মা। আলাদিন ঢক ঢক করে প্রায় পুরো বদনাটাই নিঃশেষ করে দেয়। তারপর নেতিয়ে শুয়ে পড়ে দরজার পাশেই।

মা গায়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে। সেই মুহূর্তে ছেলেকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আলাদিন চোখ খোলে, মা, বড্ড খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।

ঘরে যা ছিলো এনে দেয় সে। আলাদিন আর ধৈর্য রাখতে পারে না। গোগ্রাসে খেতে থাকে। মা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করে, সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, বাবা?

আলাদিন কোন রকমে মুখের খাবার গিলে নিয়ে বলে, সেই সকালে দু-একটা ফল খেয়েছিলাম। তারপর আর জোটেনি কিছু।

মা বললো, বুঝেছি, খুব খিদে পেয়েছে। তা অত তাড়াহুড়ো করছিস কেন? ধীরে-সুস্থে খা। অমনভাবে খেলে, গলায় আটকে মরবি যে?

আলাদিন বলে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। আগে পেট ভরে খেতে দাও।

—কেন, তোর চাচা খেতে দেয়নি কিছু?

—চাচা? কে চাচা? লোকটা একটা ধাপ্পাবাজ শয়তান যাদুকর। ও জাতে মূর, কোন কালেও আমার চাচা না।

মা আঁৎকে ওঠে, ওমা বলিস কী? তবে যে সে বলেছিলো তোর বাবার মায়ের পেটের ভাই। তিরিশ বছর আগে দেশ থেকে বিবাগী হয়ে গিয়েছিলো?

—সব ধাপ্পা মা, সব ধাপ্পা। আমাকে দিয়ে কাজ হাসিল করার জন্যে সে ঐরকম বাহানা করে আমাদের ঘরে ঢুকেছিলো।

মা অবাক হয়ে বলে, কাজ হাসিল করার জন্য? তা তোকে দিয়ে তার কোন উপকার হবে? কী এমন কাজ করে দিতে পারিস তুই।

আলাদিন তখন সব কথা মাকে খুলে বলে। কীভাবে সে তাকে পাহাড়ের উপত্যকায় নিয়ে গিয়েছিলো, কীভাবে মন্ত্রবলে সে পাহাড় বিদীর্ণ করে ফেলেছিলো এবং কেমন করে আলাদিন তার কথামতো সেই চিরাগবাতিটা আনতে পেরেছিলো—সব কাহিনী সবিস্তারে সে মাকে খুলে বললো।

মা তো শুনে থ। এমন সব ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা যে হতে পারে বিশ্বাসই হতে চায় না তার। বলে, সামান্য একটা চিরাগবাতির জন্য তোকে ঐ পাতাল-পুরীতে নামিয়ে দিয়েছিলো লোকটা? কই, কোথায় সে চিরাগবাতি?

আলাদিন এবার বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে-ঢুকিয়ে ঐসব হীরে চুনি পান্না মুক্তোর ফলগুলো এক এক করে বের করতে থাকে।

মা অবাক হয়ে বলে এগুলো কী? এতো দেখছি সব খেলনার জিনিস! তোর চিরাগ কই?

আলাদিন বলে, সবুর কর সব বের করি, তারপর ওটাও বের করবো। একেবারে পেটের নিচে পড়ে আছে।

একটা ছোট্ট তামার চিরাগবাতি। মা দেখে বলে ওমা, এর জন্য এতো কাণ্ড। দাম তো এক আধলাই হবে!

আলাদিন ঘাড় নেড়ে বলে, আমারও তো তাই ধারণা মা। কিন্তু বুঝলাম না, লোকটা এই তুচ্ছ একটা জিনিসের জন্য কেন আমাকে ঐ গুহার মধ্যে পাঠিয়েছিলো? আর কেনই বা সে আমাকে ঐভাবে পাথর চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলো, তাই বুঝতে পারছি না আমি। অথচ দেখ, আমার জন্য আমাদের সংসারের জন্য কত পয়সাই না সে খরচাপাতি করলো? জানি না এই তামার চিরাগটা দিয়ে তার কী উপকার হতো?

মা বলে, ওসব যাদুকররা ঐরকম হয়। শুনেছি, অল্প বয়সী ছেলেদের ওপর ওদের খুব নজর। তুকতাক করার জন্যে নাকি উঠতি বয়সের ছোকরার দরকার হয়। যাক বাবা, জান নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পেরেছিস, সেই তোর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি। নে, এখন ঘুমিয়ে পড়।

পরদিন সকালে আলাদিন বললো, মা খেতে দাও।

মা-এর মুখ কালো হয়ে গেলো। ঘরে যা ছিলো কাল রাতেই তো সব শেষ হয়ে গেছে!বললো বাবা আর তো কিছু নাই। দাঁড়া দেখি মহাজনের কাছ থেকে কিছু ধার-কর্জ পাই কিনা। পেলে কিছু কিনে নিয়ে আসবো।

আলাদিন বললো, মা ঐ চিরাগটা বেচলে একটা আধলা দিরহামও তো মিলতে পারে। ওটা সঙ্গে নিয়ে যাও না, ধার যদি না পাও,তবে খালি হাতে ফিরতে হবে না। বিক্রি করে যা-পাও তাই দিয়ে যাহোক কিছু একটা আনতে পারবে!

মা-বলে, ভালো কথা বলেছিস বাপ। ওটা সঙ্গেই নিয়ে যাই। অমন চিরাগ ঘরে রেখে কী ফয়দা হবে। তার চেয়ে বেচে দিলে আধ দিরহাম তো মিলতে পারে! কই দে দেখি চিরাগ টা!

আলাদিন ঘর থেকে চিরাগবাতিটা এনে দেয় মা-এর হাতে। বলে, এক কাজ কর মা, খানিকটা ছাই দিয়ে মেজে ঘষে সাফ করে নাও। তামার জিনিস মাজলে একটু চক চক করবে। খদ্দেরের নজরে ধরলে হয়তো পুরো এক টা দিরহামই পেয়ে যেতে পারো।

মা বলে, তা মন্দ বলিসনি আলা।

রসুইখানায় গিয়ে আলাদিনের মা উনুনের ছাই নিয়ে চিরাগটা মাজতে বসে যায়। একটা ঘষা দিতেই বিরাট এক আফ্রিদি দৈত্য এসে হাজির হয় সামনে। আলাদিনের মা তো সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে বিকট এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝেয়?

আলাদিন ছুটে এসে রান্নাঘরের মাঝখানে দণ্ডায়মান আফ্রিদিকে দেখে আঁৎকে ওঠে, কিন্তু মূর্ছা যায় না। কাল রাতে পাহাড়ের গুহায় সে এই রকমই আর একটা আরও কুৎসিত আফ্রিদির মুখোমুখি হয়েছিলো। তাই ভয় অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে।

আলাদিনের আর বুঝতে কষ্ট হলো না, ঐ চিরাগের অলৌকিক ক্ষমতায় এই

আফ্রিদিব আবির্ভাব ঘটেছে। তাড়াতাড়ি সে চিরাগবাতিটা হাতে তুলে নিয়ে আফ্রিদিকে প্রশ্ন করে, তুমি কে?

আফ্রিদি বিশাল বুকটা সামনের দিকে নুইয়ে অভিবাদনের ভঙ্গী করে বলে, আমি জল স্থল অন্তরীক্ষের অধীশ্বর। কিন্তু আমার ঈশ্বর ঐ চিরাগবাতি। সে এখন আপনার হাতের মুঠোয়। সুতরাং আমি আপনার দাসানুদাস, আজ্ঞা করুন প্রভু, কী করতে হবে?

আলাদিন বললো, কিছু খাবার-দাবার নিয়ে এসো।

পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলো দৈত্যটা। কিন্তু তা পলকের জন্যই। আবার তাকে দেখা গেলো এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার বিরাট একখানা রূপোর বারকোস। তার ওপর বারখানা সোনার থালায় সাজানো নানারকম সুগন্ধী সব খানাপিনা। বারকোসখানা মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মা তখনও মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলো। আলাদিন চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে চোখ মেলে তাকালো সে। তখনও তার ভয়, দৈত্যটা বুঝি ধারে-কাছেই রয়ে গেছে। এদিক ওদিক ভালো করে সে দেখতে লাগলো।

আলাদিন হাসতে হাসতে বলে, নাও ওঠ। তুমি ভয় করছো, দৈত্যটা তোমার গলা টিপে ধরবে? না না, ওসব কিছু সে করবে না। ওঠ, এখন সে চলে গেছে।

মা উঠে বসে। ঘরের মেঝেয় বিরাট একটা রূপোর বারকোসে সাজানো নানারকম খানাপিনা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এ সব কী? কে আনলো আলাদিন?

—আবার কে? ঐ আফ্রিদি দৈত্য, যাকে দেখে তুমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। সে দেখ কত সুন্দর সুন্দর খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য? নাও, এসো খেতে বসি। বেশ গরম আছে, দেখছো না কেমন ধোঁয়া ছাড়ছে।

মা-এ পো-এ খুব রসিয়ে রসিয়ে খায়। কতকাল এসব খানাপিনা চোখে দেখিনি তারা। অন্যের বাড়ি শাদী নিকায় নিমন্ত্রণ হলে তবে এরকম দু-একটা পদ হয়তো বরাতে জোটে। না হলে গাঁটের কড়ি খরচ করে কেউ এমন বাহারী খাবার বানায় না।

মা বলে, এতো খাবার তো তিন বেলা খেয়েও শেষ করতে পারবো না আমরা। আর এমন দামী খানাপিনা ফেলে দিতেও মায়া লাগে। তার চেয়ে আর্ধেকটা কালকের জন্যে তুলে রেখে দিই, কী বলিস?

আলাদিন বলে, তাই দাও। আচ্ছা মা, এই থালাগুলো দেখছো, কেমন সোনার মতো চক চক করছে।

মা বললো, পিতলের বাসন যত্ন করে ঘষা মাজা করে রাখলে সোনার মতই মনে হয়, বাবা।

সেই কালিয়া, কোর্মা কাবাব, বিরিয়ানী, তন্দুরী প্রভৃতি উপাদেয় খাবারগুলো ওরা দু'দিন ধরে ভুরিভোজ করে খেলো। তৃতীয় দিন সকালে আবার যে কে সেই অবস্থা। ঘুরে ফুটো পয়সা নাই। আলাদিন বলে, আবার আফ্রিদিকে ডাকি মা? আবার সে খাবার-দাবার দিয়ে যাবে।

মা শিউরে ওঠে, না না, বাবা, ও সবের দরকার নাই। ওই সব জীন দৈত্য আমি সহ্য করতে পারবো না। আমাদের পয়গম্বর মহম্মদ (আল্লাহ তাকে অমর করুন) এসব একদম

পছন্দ করতেন না। আফ্রিদি দৈত্য বা অলৌকিক যাদু ভেল্কী থেকে তিনি শত হাত দূরে থাকতে বলেছেন। কারণ ওগুলো শয়তানের আধার। তুই বরং এই সব রেখে অন্য কোনও ধান্দা দেখ বাবা, কিছু রোজগারপাতি করার চেষ্টা কর।

একখানা থালা কামিজের তলায় পেটে গুঁজে আলাদিন বাজারে চলে আসে। ওপাশে একটা বিধর্মী ইহুদীর দোকান। লোকটার তেজারতি কারবার। ওর দোকানেই ঢুকে পড়ে সে। লোকটাকে দেখতে ঠিক রক্ত-চোষা কাঁকনাসের মতো। একেবারে হাড্ডিসার চেহারা। চোখ দু'টো কোটরে-বসা শকুনের মতো লোলুপ।

—আইয়ে আইয়ে বইঠিয়ে, জনাব। বলুন, কী উপকারে লাগতে পারি আপনার?

আলাদিন সঙ্কুচিতভাবে থালাটা বের করে ইহুদীর হাতে দেয়। ইহুদীটা থালাটার দিকে দৃষ্টিপাত করেই আলাদিনের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করতে থাকে। চোরাই মাল কিনা বুঝতে পারে না। কষ্টিপাথর থালায় ঘষে সোনার মান যাচাই করে বলে, কত হলে দেবে?

আলাদিন কী বলবে, কী দাম হতে পারে, ও বুঝবে কী করে? বলে, আপনিই তো ভালো বুঝবেন, দরাদরির কি আছে। যা উচিত দাম হয়, দিন।

অনেক ইতঃস্তত করার পর ইহুদীটা একটা সোনার দিনার তুলে দেয় আলাদিনের হাতে। আসলে থালাটার দাম কম করে হলেও দুশো দিনার হবে। কিন্তু লোকটা বুঝতে পেরেছে, ছেলেটা এর আসল কিমৎ জানে না।

পুরো একটা দিনার হাতে পেয়ে আলাদিনের চোখ চকচক করে ওঠে। দিনারটাকে মুঠি করে চেপে ধরে ইহুদীটাকে আদাব জানিয়ে সে রাস্তায় নেমে হন হন করে হেঁটে বাজারের অন্য প্রান্তে চলে যায়। ইহুদী স্যাকরাটা 'চুক চুক' করে পস্তাতে পস্তাতে কপাল চাপড়ায়।

—ইস্, আধ দিনার দিলেই চলতো, কেন একটা গোটা দিনার দিতে গেলাম—

দিনারটা ভাঙ্গিয়ে আলাদিন কিছু খানাপিনা কিনে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বলে, জান মা বাজারের ঐ ইহুদীটা কত ভালো, থালাখানা নিয়ে সে পুরো একটা দিনারই দিয়ে দিলো! এই নাও বাকী টাকা।

মা হেসে বললো, তুমি কচি ছেলে। দেখতেও তো শাহজাদার মতো—তাই বুড়ো তোকে ভালোবেসে বেশি পয়সা দিয়েছে।

দিনারটা ফুরিয়ে গেলে কয়েকদিন পরে আর একখানা থালা পেটে গুঁজে গায়ে চাদর জড়িয়ে আলাদিন আবার সেই ইহুদীর দোকানে আসে। ইহুদী জুল জুল চোখে আলাদিনের চাদর ঢাকা পেটের দিকে তাকায়, আজ কী আছে, জনাব?

আলাদিন থালাখানা বের করে দেয়। বুড়োটা আবার একটা দিনার বের করে দেয়। ভাবে, গত দিনই চালে ভুল হয়ে গেছে, আজ আর একই মালের জন্য কম দেওয়া যাবে না।

এইভাবে কয়েকদিন বাদে বাদে এক একখানা করে থালা এক এক দিনারের বিনিময়ে ইহুদীটার দোকানে বেচে দেয় আলাদিন। সেই পয়সায় চলে যায় বেশ কিছুদিন।

কিন্তু বেশ কিছুদিন একদা শেষ হয়ে আসে। গৃহে আহার্যের অভাব দেখা যায়। মা-এর মুখ শুকিয়ে যায়। আলাদিন বলে, ঐ চাঁদীর বারকোসটাও বেচে দিয়ে আসি মা। কী হবে ও জিনিস ঘরে রেখে? পেটে খিদে রেখে ঘরে সোনা রূপা জমা করে রেখে কী ফয়দা?

মা, বলে জিনিসটা বড় বাহারী। তা খেদ করে আর কী হবে, যা নিয়ে যা। দেখ, কী পাওয়া যায়।

ইহুদী পুরো দু'টো সোনার মোহর দিলো আলাদিনকে। বললো, আমার কাছে এলে

ন্যায্য দাম পাবেন, জনাব। অন্য দোকানে যাচাই করার আগে আমার কাছে একবার আসবেন, মোসেস-আরন-এর নামে কসম খেয়ে বলছি ঠকবেন না।

আলাদিন বলে, সেইজন্যেই তো সোজা আপনার কাছেই আসি। আচ্ছা, আজ চলি।

শেষ সম্বল দুটি মোহরও কয়েকদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। আলাদিন মাকে বলে, মা তোমার ভয় ডর একটু কমাও তো, না খেয়ে তো মরা যাবে না, আমি আবার ঐ আফ্রিদিকে ডাকছি একবার। না হলে চলবে কী করে?

মা বললো, ঠিক আছে, আমি একটু পাশের বাড়িতে বেড়িয়ে আসি। তুমি যা ভালো বুঝিস, কর।

মা চলে গেলে আলাদিন চিরাগবাতিটা বের করে একটা ঘষা দিতেই আবার সেই আফ্রিদিটা এসে সালাম ঠুকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—আমি জল স্থল অন্তরীক্ষের অধীশ্বর। কিন্তু আমার ঈশ্বর ঐ চিরাগ। সে এখন আপনার কব্জায়। সুতরাং আমি আপনার দাসানুদাস, আজ্ঞা করুন প্রভু।

আলাদিন বলে, আরও কিছু খানাপিনা নিয়ে এসো।

পলকের মধ্যে আবার সে ঠিক আগের মতো একখানা চাঁদীর বারকোস এনে নামায়। তার উপরে বারখানা সোনার থালায় সুগন্ধী সব মন-মাতানো খাবার দাবার।

দু'দিন ধরে খুব চব্য চোষ্য করে খেলো ওরা। তার পরদিন আলাদিন আবার একখানা থালা জামার তলায় পেটে গুঁজে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ে।

ইহুদীটার দোকানে যাবার পথে এক মুসলমান বৃদ্ধের স্যাকরার দোকান পড়ে। এই সদাশয় বৃদ্ধ কিছুকাল ধরেই লক্ষ্য করছিলো, কয়েকদিন পর পর ছেলেটা কামিজের তলায় কি যেন একটা নিয়ে ইহুদীর দোকানে ঢোকে। ইহুদীটা যে মস্ত ফাঁকিবাজ—লোক ঠকাতে ওস্তাদ সে কথা সবাই জানে। বৃদ্ধ ভাবে, অবোধ সরল ছেলেটাকে না জানি শয়তানটা কী ভাবে ঠকাচ্ছে। দোকানের সামনে আসতে বৃদ্ধ আলাদিনকে ডাকে, শোনো বাবা, শোনো।

আলাদিন দ্বিধাভরে দোকানে উঠে আসে। বৃদ্ধ বলে, প্রায়ই দেখি, তুমি ঐ বিধর্মী ইহুদীটার দোকানে যাও। লোকটা ভালো না, কী ব্যাপার, কেন যাও সেখানে?

আলাদিন বলে, সংসারের অবস্থা আগে ভালো ছিলো আমাদের। এখন অভাব অনটনে পড়েছি। তাই কিছু থালাবাটি বিক্রি করে খেতে হচ্ছে।

বৃদ্ধ বলে, কই দেখি, কী এনেছো আজ?

আলাদিন থালাখানা বের করে বৃদ্ধের হাতে দেয়। এক নজরেই বৃদ্ধ বুঝতে পারে একেবারে নিখাদ খাঁটি সোনার তৈরি। জিজ্ঞেস করে এরকম কতগুলো আছে তোমাদের ঘরে।

—বারখানা। আরও বারখানা ছিলো, ঐ ইহুদীকে বেচে দিয়েছি। কী দাম দেবেন এটার।

বৃদ্ধ বলে, তুমি যেই হও, আমি কোনও ঠকাবার ব্যবসা করি না, বাবা। দাঁড়াও ওজন করে দেখি, যা ন্যায্য দাম হয় তাই পাবে।

নিক্তিতে ওজন করে হিসেব কষে সে দাম বলে, দুশো দিনার পেতে পার।

আলাদিন আকাশ থেকে পড়ে। দুশো দি-না-র?

—হ্যাঁ দুশো দিনার। অন্য পাঁচটা দোকানে যাচাই করে দেখতে পার। যদি কেউ বেশি দিতে চায় তবু তাকে দিও না। আমার কাছে এসো, আমিও দেব তোমাকে সেই দাম।

আলাদিন বলে, অন্য দোকানে যাওয়ার কোনও দরকার নাই আমার। এখন বুঝতে পারছি, ইহুদীটা আমাকে কি ঠকান ঠকিয়েছে।

—কত করে দিয়েছিলো এই এক একটা থালার জন্য?

—মাত্র এক দিনার।

বৃদ্ধ চমকে ওঠে, এক দিনার? বলো কী? এ যে গলাকাটা ব্যাপার। লোকটাকে ফাঁসী দেওয়া দরকার। কিন্তু কী করবে বলো, সাক্ষী প্রমাণ তো কিছু নাই, তা না হলে ওকে জেলে ভরে দেওয়া যেত।

আলাদিন বলে, যাক, যা-গেছে তা-যাক। ও নিয়ে আর ঝুট ঝামেলা বাড়াতে চাই না। এখন থেকে আপনার কাছে ছাড়া আর কোথাও যাবো না।

এর পর থেকে সেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দোকানে সব থালাগুলো বেচে দিয়ে অনেক টাকা ঘরে তোলে আলাদিন। বহুকল পরে নিজেদের দৈন্যদশা কাটিয়ে বেশ পয়সাকড়ির মালিক হয়ে ওঠে।

বৃদ্ধ দোকানীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলাদিনের বেশ ভাব জমে ওঠে। কথায় কথায় বৃদ্ধ বলে, এছাড়া আর কিছু নাই তোমাদের বাড়িতে?

আলাদিন বলে দামী জিনিস বলতে আর বিশেষ কিছু নাই। তবে কতগুলো শৌখিন ঘর সাজানো—জিনিস কিছু আছে। তবে সে-গুলো সবই কাঁচের, পাথরের। আপনার দোকানে তার কিই বা কদর হবে।

বৃদ্ধ বলে, ঠিক আছে, কাল একটা নিয়ে এসো তো, দেখবো, কেমন শখের জিনিস?

পরদিন সে একটা আনার নিয়ে বৃদ্ধের দোকানে আসে। বৃদ্ধ সমঝদার জহুরী। হাতে ধরেই বুঝতে পারে, এ বস্তু সাত বাদশাহর ধন-মালিক। বলে, বাবা, একটা কথা বলবো?

—এ-রকম ঘর সাজানো কাঁচ-পাথর এ-গুলো আছে তোমার বাড়িতে?

আলাদিন বলে, ঠিক গুনিনি, তা কমসে কম শ'খানেক হবে।

বৃদ্ধের চোখ ছানা-বড়ার মতো গোল গোল হয়ে ওঠে, এক-শো?

আলাদিন বলে, ঐ রকমই হবে? কিন্তু কেন?

বৃদ্ধ বললো, শোনো বাবা, আমি অধর্ম করিনি জীবনে, আজও করবো না। তাই বলছি, এ জিনিস তুমি আর কাউকে দেখাবে না বা বলবে না তোমার কাছে আছে এ সব?

আলাদিন বুঝতে পারে না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, কেন?

বৃদ্ধ বলে, আমার এই দোকানে খুব কম করে হলেও কয়েক লক্ষ দিনারের সম্পত্তি আছে। আমার বাড়ি ঘর জমি জমা এবং অন্য বিষয় আসয় বেচলেও দশ বিশ লাখ হয়তা পাওয়া যাবে। কিন্তু সব দিয়েও তোমার এই একটা কাঁচের ফলের দাম মেটানো যাবে না, বাবা। এবং সে চেষ্টাও আমি করবো না। শুধু আমি কেন এই শহরের সব সওদাগরের তামাম সম্পত্তি ধনদৌলত একত্র করলেও এর একটার দাম হবে না। তাই বা বলি কেন, আমাদের যে সুলতান, তার যে এই বিশাল সলতানিয়ত—এই রকম সাত সাতটা সলতানিয়তের যা মূল্য, তোমার এই আনারটার মূল্য তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। সুতরাং এমন অমূল্য রত্ন যখন যে-কোনও কারণেই হোক, তোমার নসীবে জুটেছে এগুলো হাতছাড়া করো না। যত্ন করে বাক্সে তুলে রেখে দিও।

আলাদিন বৃদ্ধের কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই অনুধাবন করতে পারলো না। যাই হোক, বুঝলো জিনিসগুলো শখের হলেও বাজারে হামেশা মেলে না। কোনও শৌখিন মানুষের দেখা পেলে হয়তো মোটামুটি ভালো দামে বিকতেও পারে। তবে এটা সার বুঝতে পেরেছে, এই সদাশয় বৃদ্ধ এ বস্তুর বেসাতি করে না। যাই হোক সৎ পরমর্শই দিয়েছে। হাটে বাজারে অন্য কোনও দোকানে নিয়ে গেলে ওকে ঠকিয়ে নামমাত্র মূল্য ধরিয়ে সবগুলো হাতি নিয়ে নেবে।

বাড়িতে ফিরে এসে আলাদিন কাঁচ-পাথরের ফলগুলো একটা প্যাটরায় পুরে খাটের তলায় ফেলে রাখে।

এর পর আর ও-নিয়ে মাথা ঘামায় না আলাদিন। খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়। বৃদ্ধের দোকানে বসে গল্প স্বল্প করে।

এইভাবে দিন কাটছিলো। একদিন বৃদ্ধের দোকানে বসে খোস-গল্পে মশগুল ছিলো আলাদিন, এমন সময় সুলতানের পেয়াদা বরকন্দাজরা ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে ফরমাস জারি করতে করতে রাস্তা সাফ করে করে এগোচ্ছিল।

—শোনও শহরবাসীরা, সুলতানের কন্যা শাহজাদী বদর অল বুদুর আজ হামামে গোসল করতে যাবেন। সেইজন্যে সুলতানের হুকুম, যে যেখানে আছ, দোকান-পাট বন্ধ করে এ রাস্তা থেকে সরে পড়ো, না হলে গর্দান যাবে।

হুঁড়মুড় করে ঝপ ঝপ করে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেলো নিমেষে। বৃদ্ধ আলাদিনকে বললো, পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। এখনই শাহজাদী পথে বেরুবেন। তার সামনে পিছনে কয়েক শো নিগ্রো খোলা তলোয়ার বাগিয়ে ধরে হাঁটবে। যদি কাউকে পথের এধারে ওধারে দেখে তারা, তবে আর রক্ষে নাই। একেবারে কচু-কাটা করে ফেলবে। তাই আর এক পলক দেরি করো না, বাবা! কি জানি কিছুই বলা যায় না, কার নসীবে কী লেখা আছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে আলাদিন বাড়ি ফিরে যায় না। শুনেছিলো, সুলতান কন্যা বদুর অল বুদুর নাকি বেহেস্তের ডানা-কাটা পরী। সুলতাদের হারেমে ঢুকে তাকে তো দেখার দুঃসাহস হবে না কারো, তবে আজ যখন হাতের কাছে সুযোগ একটা মিলেই গেছে, এ সুযোগ হেলায় হারাবে না আলাদিন। না হয় নিগ্রো খোজাদের হাতে তার মাথাটা উড়ে যাবে। তা যাক, বুদুর সুন্দরীকে সে দেখবেই।

ছুটে চলে যায় ঐ খানদানী হামামে। দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকে ঘাপটি মেরে।

একটু পরে সদলবলে শাহজাদীর ডুলি এসে দাঁড়ায় হামামের সামনে। সশস্ত্র নিগ্রোর খোজারা দুই ধারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়! ডুলি থেকে নামে শাহজাদী। হামামের ভিতরে ঢুকে সে বোরখার নাকাব খুলে ফেলে।

আলাদিনের বুকের মধ্যে ধক করে জ্বলে ওঠে এক ঝলক আগুন। একি দেখছে সে। এতদিন ধরে এই না-দেখা সুন্দরীর অনেক সুন্দর মুখচ্ছবি সে মনের মুকুরে এঁকেছিলো, কিন্তু আজ বাস্তবে যা প্রত্যক্ষ করলো, তার তুলনা কোথায়! মানুষের কল্পনা এখানে পৌঁছতে পারে না।

শাহজাদী হামামের ভিতরে ঢুকে যায়। সকলের অলক্ষে টুক করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আলাদিন। তারপর সোজা চলে আসে বাড়িতে।

আলাদিনের সমস্ত হৃদয়ে তুফান ওঠে। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে কাতরাতে কাতরাতে বিছানায় ঢলে পড়ে।

ছেলের অস্ফুট গোঙানি শুনে মা ছুটে আসে ঘরে। আলাদিন তখন বিছানায় এপাশ থেকে ওপা গড়াগড়ি খাচ্ছিল। মা ভাবে, ছেলের বুঝি বিমার হয়েছে। গায়ে হাত রেখে বলে, কী হয়েছে বাবা, এমন করছিস কেন? কোথাও চোটফোট লেগেছে?

আলাদিন খাটের বাজুর সঙ্গে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলে, না না ওসব কিছু হয়নি।

—তবে? তবে এমন ছটফট করছিস কেন?

—সে তুমি বুঝবে না মা, এখন এখান থেকে যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

মা আর কথা বাড়ায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রাত্রে এসে জিজ্ঞেস করে, ওঠ বাবা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়। দেখবি কাল সকালে সব দর্দ সেরে গেছে।

আলাদিন বলে, তুমি খেয়ে নাও মা, আমি খাবো না।

—সে কি! তুই না খেলে আমি খাব কি করে, বাবা?

—বাঃ, আমার তবিয়ত ভালো না থাকলেও আমাকে খেতে হবে। তুমি যাও আমার মাথা ধরেছে, আমি খাব না।

মা বলে মাথা ধরার ভালো গোলি আছে আমার কাছে। এক গেলাস পানির সঙ্গে খেয়ে নে, এখুনি ছেড়ে যাবে।

আলাদিন এবার ঝাঁকিয়ে ওঠে, ওসব দাওয়াই ফাওয়াই-এ আমার কিছু হবে না, মা। তুমি আর কথা বাড়িও না। এখন যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।

মা চলে যায়। আলাদিন সারারাত ধরে বিছানায় পড়ে ছটফট করে। একি অসহ্য যন্ত্রণা, কেন এমন হলো তার? বুদুর এর রূপে কী যাদু ছিলো, যা তার সকল প্রাণ-মন মথিত করে ফেললো?

পরদিনও আলাদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। মা অনেক সাধাসাধি করে কিন্তু কিছুই ফল হয় না। আলাদিনের বুকের জ্বালা কিছুতেই প্রশমিত হয় না।

মা ভাবে, ছেলের কঠিন কোনও অসুখ করেছে। বলে, শহরে শুনেছি এক নামজাদা হাকিম এসেছে। আমি ভাবছি, তাকে ডেকে এনে দেখাবো তোকে। তা সে যে টাকাই লাগুক।

আলাদিন চিৎকার করে ওঠে, না। ওসব ক'রো না, মা। তাতে কোনও লাভ হবে না। আমার কোনও অসুখ বিসুখ করেনি।

— তবে তুই আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিস কেন, বল বাবা? তোর কী হয়েছে?

আলাদিন তখন মাকে সব কথা বলে। বুদুরের রূপে সে দিশাহরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। অন্য কোনও হাকিম কবিরাজের ওষুধে কিছু উপকার হবে না। বুদুর তার বুকের সবটুকু অধিকার করে বসে আছে। সেখানে অন্য কোনও মেয়ের কোনও জায়গা হবে না কোনওদিন।

মা কপাল চাপড়াতে থাকে, একি সব্বনেশে কথা বলছিস বাবা। এ যে অসম্ভব ব্যাপার। সুলতান বাদশাহ বলে কথা—তাদের দিকে নজর দিলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চলে!

একথা যদি ঘুনাক্ষরেও সুলতানের কানে যায়, একেবারে মায়ে-বেটার দুজনেরই গর্দান যাবে। ওসব আকাশকুসুম চিন্তাভাবনা তুই মন থেকে ঝেড়ে ফেলো বাবা। আমরা সাধারণ মানুষ, সাধারণ ভাবেই বেঁচে-বর্তে থাকতে চাই। চাঁদে হাত বাড়িয়ে কোনও লাভ আছে?

আলাদিন মা-এর এই উপদেশ কর্ণপাত করে না। বলে, তুমি য়তই আমাকে বোঝাতে চাও মা, মন আমার বুঝবে না। হয় বুদুরকে পাবো, নয় জান খতম করে দেব, এই আমার পণ।

মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু কী করে এই অসম্ভব সম্ভব হতে পারবে, একবার ভেবে দেখ, বাবা। শুনেছি, শাহজাদী বুদুরের রূপের কথায় সারা দুনিয়ার শাহজাদারা লক্ষ-কোটি টাকার সাম্রাজ্য বিলিয়ে দিতে চায় তার পায়ে। আর আমরা এক সামান্য দরিদ্র মানুষ—কী করে তাদের চালের সঙ্গে টেক্কা দিতে সাহস করবো?

আলাদিন বলে, টেক্কা আমাকে দিতেই হবে মা। সারা দুনিয়ার শাহজাদাদের ঘরে যা নাই আমাদের ঘরে সেই বস্তু আছে। পয়সা দিয়ে তার দাম হয় না। তবে এও জানি সুলতান বা তার কন্যার হাতে সে জিনিস পড়লে তার কদর হবে।

মা, অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কী সে জিনিস?

আলাদিন বলে, ঐ যে কাঁচের ফলগুলো দেখেছিলে—পাহাড়ের গুহা থেকে

এনেছিলাম, ওগুলো আমি বাজারের ঐ বৃদ্ধ জহুরীকে একবার দেখিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, সুলতান বাদশাহ ছাড়া এ বস্তুর কদর কেউ বুঝবে না—এর ন্যায্য দামও কেউ দিতে পারবে না। ঐকাঁচের ফলগুলো তুমি নিয়ে সুলতানের দরবারে যাও মা। তাকে উপহার দিয়ে এসো গে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো সাতচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

মা বলে, কই কোথায় রেখেছিস, বাবা?

আলাদিন বলে, রসুইখানায় একটা ঝোলায় করে টাঙানো আছে।

মা তাড়াতাড়ি ছুটে যায় রান্নাঘরে। ঝোলাটা নিয়ে আসে।

আলাদিন বলে, একখানা চিনেমাটির পিরিচ নিয়ে এসো বড় দেখে।

সেই হীরে জহরতের ফলগুলো পিরিচে সাজিয়ে দেয় আলাদিন। বলে, গায়ে একখানা শাল জড়িয়ে তার নিচে এই পিরিচখানা ঢেকে নিয়ে যাও। সুলতানকে এগুলো ভেট দিয়ে আমার মনের বাসনা জানাবে তাঁকে। দেখবে, তিনি খুশি মনে রাজি হয়ে যাবেন।

মা বলে, আমার কিন্তু কেমন ভয় ভয় করছে, বাবা। সুলতান বাদশাহ বলে কথা, তাদের দরবারে তো কখনও যাইনি। সাহস করে পারবো তো যেতে?

আলাদিন বলে, সাহস তোমাকে করতেই হবে, মা। তা না হলে আমি প্রাণে বাঁচবো না। একদিকে তোমার ছেলের জীবন, অন্যদিকে তোমার লজ্জা ভয় সঙ্কোচ—আমাকে যদি বাঁচাতে চাও মা, সাহস করে তোমাকে দাঁড়াতেই হবে সুলতানের সামনে।

মা বলে, অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আনিসনে বাবা। এ দুনিয়ায় তোর চাইতে বড় আমার কাছে কিচ্ছু নাই। তোর জন্যে আমি ফাঁসীতেও ঝুলতে রাজি আছি।

আলাদিন বলে না, তোমাকে ফাঁসীতে ঝোলাবে কেন? তোমার প্রস্তাবে তিনি রাজি না হলে ফিরিয়ে দিতে পারেন, সাজা দেবেন কেন?

—কী জানি বাবা, সুলতান বাদশাহর খেয়াল, হুকুম জারি করে দিলেই হলো। তা হোক, তোর জন্যে আমি জান কবুলও করতে পারি। ও জন্যে আমি ভয় করবো না, যাবো তার কাছে, বলবো আমার প্রস্তাব। নিতে হয় নেবেন, না হয় নেবেন না। আমাকে যদি সাজা দেন তার জন্যে আমি চিন্তা করি না, কিন্তু প্রস্তাব শুনে সুলতান যদি ক্ষেপে তোকে কোনও সাজা দেয়— সে আমি সইবো কী করে, বাবা?

আলাদিন বলে, তা হোক, বুদুরকে না পেলে এ-জীবন আমি এমনিতেও রাখবো না, না হয় সুলতানের রোষেই মরবো। যাই হোক, তুমি যাও, মা। আমায় বিশ্বাস কর এই ভেট তাঁর সামনে ধরলে তিনি তোমার ওপর প্রসন্নই হবেন।

মা গায়ে শাল জড়িয়ে তার তলায় ফলের পিরিচখানা ঢেকে নিয়ে দরবারে এসে এক কোণে দাঁড়ালো। তখন সুলতান মসনদে বসে হুকুমতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সারা দরবার-কক্ষ উজির আমির এবং বিচার প্রার্থীদের ভিড়ে পরিপূর্ণ। উজির এক এক করে নাম ডাকতে থাকে। সুলতান তাদের আর্জি শোনেন। তারপর ফরমাস দিতে থাকেন। এইভাবে ধীরে ধীরে দরবারটার ভীড় হাল্কা হতে থাকে। এক সময় সুলতান তাঁর কাজ-কাম সমাধা করে মসনদ ছেড়ে নেমে প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে যায়। আলাদিনের মা কিন্তু সাহস করে সামনে এগিয়ে যেতে পারে ন। বলতে পারে না। বলতে পারে না তার আগমনের উদ্দেশ্যে। দরবার যখন একেবারে ফাঁকা হয়ে যায় তখন সে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসে বাড়িতে।

আলাদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। মাকে ফিরতে দেখে বড় আশা নিয়ে সে ছুটে আসে। কিন্তু মা ছেলেকে কোনও সুখবর দিতে পারে না। বলে, সবই আমার দোষ বাবা, পারলাম না—কিছুতেই পারলাম না বলতে। কে যেন আমার গলাটা চেপে ধরলো। বিশ্বাস কর বাবা অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস হলো না।

আলাদিন হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো। ছেলেকে আশ্বাস দিয়ে মা বলে, তুই ঘাবড়াসনে বাবা। আজ পারিনি, কিন্তু দেখে নিস, কাল ঠিক পারবো। কাল আমি সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবোই।

পরদিন যথাসময়ে আবার সেই ফলের পিরিচ শালের তলায় ঢেকে আবার দরবারে হাজির হয়। কিন্তু সেদিনও সেই একই অবস্থা—অনেক চেষ্টা করেও জড়তা কাটাতে পারে না আলাদিনের মা। একে-একে দরবারের সব কাজ সমাধা করে সুলতান প্রাসাদে ফিরে চলে যান। আলাদিনের মা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

সে দিনও বাড়ি ফিরে সে আলাদিনকে কোনও আশার বাণী শোনাতে পারে না। তবে ভরসা দেয়, হাল সে কিছুতেই ছাড়বে না। আবার যাবে আগামী কাল।

পরের দিনও এক দশা। বোবার মতো দরবারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে ব্যর্থ মনে ফিরে আসে।

এইভাবে অনেক দিন কাটার পর একদিন সুলতান উজিরকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ঐ যে ওপাশে একটা মেয়েকে দেখো, আমি লক্ষ্য করছি, প্রতিদিন সে দরবারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঐ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমার মনে হয় সে কিছু বলতে চায়।

উজির বললো, কিন্তু জাঁহাপনা কত সাধারণ মানুষ আপনার দরবারে আসে—তাদের নিজের নিজের আর্জি পেশ করে। ওর যদি বলারই কিছু থাকবে, ঐ ভাবে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকবে কেন। নিয়ম মতো দরখাস্ত পেশ করতে পারে। সময় মতো তার শুনানিও উঠতে পারে।

সুলতান বলে, তোমার কথা আমি বুঝলাম সবই। কিন্তু সব মানুষই তো সমান বিচক্ষণ নয়। হয়তো কোন কারণে সে সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করছে না। যাই হোক ওকে আমার কাছে আসতে বলো, আমি ওকে জিজ্ঞেস করবো।

তৎক্ষণাৎ উজিরের ইশারায় পেয়াদা এসে আলাদিনের মাকে বললো, আপনি মসনদের সামনে হাজির হোন, সুলতান আপনাকে জেরা করবেন।

আলাদিনের মা-এর বুকে কাঁপুনি ধরে! কোনও রকমে টলতে টলতে সে সুলতানের সামনে এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়।

সুলতান প্রশ্ন করেন, কে তুমি?

—আমি জাঁহাপনার একান্ত অনুগত এক দাসী, ধর্মাবতার আমার স্বামী এই শহরের এক সামান্য দর্জি ছিলো। অনেক দিন তার এন্তেকাল হয়েছে। এখন আমার একমাত্র সন্তান আলাদিন—তাকে নিয়ে কোনও রকমে দিন গুজরান করছি।

সুলতান বলেন, বেশ কিন্তু এখানে এই দরবারে তোমার কী আর্জি। আমি লক্ষ্য করছি, রোজই তুমি আস। ঐ এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। কী ব্যাপার, তোমার যদি কোনও কিছু বলারই আছে, তা বলো না কেন?

আলাদিনের মা বলে, ভয়ে জাঁহাপনা।

—ভয়ে? কিসের ভয়ে? আমার সলতানিয়তের কোনও প্রজা আমার সামনে ভয়-সঙ্কোচ করে কোনও কথা গোপন করবে না এই-ই আমি চাই। তোমার কোনও ভয় নাই, নির্ভয়ে বলো, আমি তোমার অর্জি শুনতে চাই। কী তোমার অভাব, অথবা অভিযোগের নালিশ? কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করেছে বা কারো কাছে প্রতারিত হয়েছ?

—না জাঁহাপনা, কোন অভাবের আর্জি পেশ করতে আমি আসিনি। আর তাছাড়া মহামান্য শাহেন শাহর সুশাসনে আমি বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছি। আমার প্রতিবেশিরা প্রত্যেকেই সহৃদয়, মহানুভব, কোনও নালিশ অভিযোগ আমার নাই।

সুলতান অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, তবে? তবে কেন নিত্য এই দরবারে এসে দাঁড়িয়ে থাকো।

আলাদিনের মা বলে, আমার নিবেদনটা একটু অন্য রকম। এবং তা দরবারের এই সব লোকজনের মধ্যে বলাও সঙ্গত মনে করি না। ধর্মাবতার যদি একান্তে আমার কথা বলার অনুমতি দেন তবে খুব ভালো হয়।

সুলতান কিছুই বুঝতে পারেন না। উজিরের দিকে তাকালেন তিনি। উজির বললো, আজকের দরবারে কাজ সবই শেষ হয়ে গেছে জাঁহাপনা, আপনি যদি অনুমতি করেন। আমরা দরবার ত্যাগ করে চলে যাই।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে সবাইকে যেতে বলো। কিন্তু তুমি যেও না।

উজিরের ইশারায় দরবার-কক্ষ নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেলো। তখন সুলতান বললেন, এবার তোমার কী বলার আছে, বলো?

আলাদিনের মা একটু সামনে এগিয়ে আসে। কিন্তু মুখে কোনও কথা বলতে পারে না। কে যেন তার গলাটা চেপে ধরে থাকে। বুকের স্পন্দন আরও দ্রুততর হয়ে ওঠে।

উজির বলে, কই, তোমার কী বলার আছে বল জাঁহাপনার সামনে!

সুলতানও বলেন, নির্ভয়ে বলো। তোমার কথা নিভৃতে শুনবো বলে আমি দরবারের সকলকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। বলো।

আলাদিনের মা তবু কথাটা যেন বলতে পারে না। সুলতান এবার একটু রাগত স্বরেই বলে, এভাবে সময় নষ্ট করো না, যা বলার আছে চটপট বলে ফেলো।

এবার আলাদিনের মা মরিয়া হয়ে বলে, মহামান্য ধর্মাবতার আমার গুস্তাফী মাফ করবেন। আমি সামান্য এক দর্জির বিধবা পত্নী। আমার একমাত্র ছেলে আলাদিন। দেখতে শুনতে চমৎকার। কিন্তু পয়সা না থাকলে এ-দুনিয়ায় রূপের কী দাম? কোনরকমে দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন সংস্থান হয়তো হয়, কিন্তু তার বেশি নয়।

সুলতান অধৈর্য হয়ে ওঠেন, আহা, সে তো বুঝলাম, এখন আসল কথাটা কী ঝটপট বলে ফেলো তো, বাপু। আমার আর নষ্ট করার মতো সময় নাই।

আলাদিনের মা বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, সে কথা শুনে আপনি কুপিত হবেন না। আপনি দীন-দুনিয়ার মালিক, আপনার অসীম ক্ষমতা, আপনি ক্রুদ্ধ হলে—

—আহা, অত ভনিতা করছো কেন, যা বলার সোজাসুজিই বলো না—আমি তো বলেছি, আমার দরবারে যার যা অভিরুচি আর্জি জানাতে পারে। তার জন্য আমি রুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হই না।

আলাদিনের মা বলে, জাঁহাপনা, আমার নির্বোধ পুত্র আলাদিন আপনার দাসানুদাস নফর, সে একদিন শাহজাদী বদর অল বুদুরকে স্বচক্ষে দেখেছে।

উজির প্রশ্ন করলো, কী উপায়ে?

—শাহজাদী কিছুদিন আগে গোসল কেলীর জন্য হামামে গিয়েছিলেন। সেই সময় জাঁহাপনার কড়া পাহারা সত্ত্বেও আলাদিন হামামে ঢুকে পড়তে পেরেছিলো।

সুলতান এবং উজির দুজনেই বিস্মিত হয়ে বললেন, আশ্চর্য!

আলাদিনের মা বলতে থাকে, ঐ হামামে পরমাসুন্দরী শাহজাদীর রূপের ছটা দেখে বাছা আমার মজে যায়। সেই থেকে সে প্রেমানলে দগ্ধ হচ্ছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। তার এক কথা শাহজদী বুদুরকে না পেলে জীবন রাখবে না। আমি তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছি, জাঁহাপনা, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে নাই, কিন্তু ছেলের আমার ধনুর্ভাঙ্গা পণ, হয় সে বুদুরকে শাদী করবে নয় সে জান দেবে। এখন আপনিই বিচার করুন, ধর্মাবতার। এ-কথা শোনার পর কোন্ পাষাণী মা চুপ করে ঘরে থাকতে পারে? আলাদিন আমার একমাত্র সন্তান, ঈদের চাঁদ। তাকে যদি হারাই—এ বিশ্ব-সংসারে আমার আর কী থাকবে? তাই একেবারে অসম্ভব জেনেও এই অবাস্তব প্রস্তাব নিয়ে আপনার দরবারে আমি নিত্য আসি। এবং শত চেষ্টা করেও যখন আপনার সামনে তা পেশ করতে পারি না তখন বুকের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ব্যর্থ হয়ে আবার ঘরে ফিরে যাই। লোকে শুনলে, আমাকে ও আমার ছেলে আলাদিন দু'জনকেই বদ্ধ পাগল বলবে জানি। তবু, সব জেনে-শুনেও, কেন আপনার কাছে এই প্রস্তাব আজ রাখছি তা তো সন্তানের পিতা হয়ে আপনি নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছেন, জাঁহাপনা!

সুলতান গম্ভীর ভাবে বললেন, অবশ্যই পারছি। তুমি ছেলের মা। আমি মেয়ের বাবা। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার যে অপত্য স্নেহ মায়া মমতা মহব্বত, তার তুলনা কোথায়? না, আমি তোমাকে উন্মাদ বলবো না। পুত্রের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য, তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য, তুমি অসাধ্য সাধন করতে পার, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো তোমার আমার মধ্যে কোনও সমতা নাই। সুতরাং এ প্রস্তাব তো আমি গ্রহণ করতে পারি না। আমার কন্যা শাহজাদী—আজন্ম ঐশ্বর্য-বিলাসের মধ্যে লালিতা। তোমার পুত্র সাধারণ এক গরীব দর্জির সন্তান। এই বিরাট ফারাক পূরণ করার তো কোনও পথ নাই। আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে আমরা মানুষকে মানুষের ধন-দৌলতের মাপ কাঠিতে বিচার করি। অন্য কোনও গুণাবলী কোনও কাজে আসে না। এক্ষেত্রে আমার কন্যা বুদুরের পাণি গ্রহণ করতে গেলে তার যোগ্য ইনাম চাই। এবং আমি বুঝতে পারছি, সে দৌলত তোমাদের নাই। সুতরাং তোমার ছেলের মন থেকে এ দুরাশা মুছে ফেলার পরামর্শ দাও গে।

আলাদিনের মা-এর চোখ জলে ভরে আসে। শালের তলা থেকে চিনা মাটির থালাখানা বের করে সুলতানের সামনে রাখে সে।

—আমার পুত্র আলাদিন, শাহেন শাহকে তার নজরানা পাঠিয়েছে, জাঁহাপনা।

মণি-মাণিক্যের দ্যুতিতে সমগ্র দরবার-কক্ষ ঝলমল করে ওঠে। সুলতান দু'হাতে মুখ ঢেকে মসনদের পিছনে হেলে পড়েন।

—এ কী! এসব কি?

উজির থালা থেকে একটা ফল হাতে তুলে নেয়। দেখতে দেখতে ওর চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, অপূর্ব।

সুলতানের হাতে তুলে দেয় সে ফলটা, দেখুন, জাঁহাপনা, আপনি তো জগৎ-বিখ্যাত

জহুরী, একমাত্র আপনিই এর আসল কদর বুঝবেন। ওফ্, আমি ভাবতে পারছি না; এ ধন কোথায় পেলো সে।

সুলতান পরীক্ষা করে বললেন, সারা দুনিয়ার কোনও নবাব বাদশাহদের কারো ঘরে এ বস্তু নাই। এই সামান্য দর্জির বিবি এসব পেলো কোথায়? এর একটার উচিত দাম আমার ধনাগারে নাই। এতোগুলো তুমি কোথায় পেলে, দর্জির বিবি?

আমার ছেলে আলাদিন একবার পরদেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলো। সেখান থেকে সে নিয়ে এসেছে। সুলতান মহানুভব, আপনি যদি আমার ছেলের এই সামান্য ভেট গ্রহণ করেন সে ধন্য হবে, জাঁহাপনা।

সুলতান উজিরের দিকে তাকালেন, তা হলে উজির, এর পর তো আর এই বিধবাকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না। বুদুরকে পাওয়ার যোগ্যতার মূল্য তো সে সংগ্রহ করে এনেছে। এখন না বলা যাবে কী করে?

উজির বলে, কিন্তু জাঁহাপনা আপনার সঙ্গে অনেক আগেই আমার কথা হয়ে আছে, আপনি বলেছিলেন, বিশেষ যোগ্যতর পাত্র না পাওয়া গেলে শাহজাদী বুদুরকে আপনি আমার পুত্রের সঙ্গেই শাদী দেবেন।

সুলতান বলেন, সে কথা আমি বিস্মৃত হইনি, উজির। এখনও বলছি, আমার যোগ্য ইনাম তুমি সংগ্রহ কর, তোমার ছেলের সঙ্গেই বুদুরের শাদী দেব। এর জন্য আমি তোমাকে তিন মাস সময় দিলাম। এই তিন মাসের মধ্যে তোমাকে এর চেয়ে আরও মূল্যবান দান-সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে।

উজির বললো, তাই হবে জাঁহাপনা। যেভাবেই পারি, আমি এর চেয়ে আরও অমূল্য রত্নমাণিক্য আপনাকে এনে দেব।

সুলতান এবার আলাদিনের মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরে যাও, দর্জি-ঘরণী। তোমার পুত্র আলাদিনের সঙ্গেই বুদুরের শাদী হবে, এ একরকম নিশ্চিত রইলো। শুধু আমার সত্য রক্ষার জন্য উজিরকে আমি তিন মাসের সময় দিলাম। আমি জানি, আমার উজির কেন, দুনিয়ার কোনও সম্রাট বাদশাহর পক্ষেও—এই মণি-মাণিক্যের অধিক কোনও বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ধরে নিতে পার, সে তোমারই পুত্রবধূ হবে, শুধু তিনটি মাস সময় আমি উজিরকে দিলাম। এই তিন মাস পরে আর কোনও—বাধা থাকবে না। বুদুরকে আমি তোমার ছেলের হাতেই তুলে দেব।

আলাদিনের মা—সুলতানকে কুর্ণিশ জানিয়ে ঘরে ফিরে এলো। আলাদিন অধীর হয়ে পায়চারী করছিলো। অন্যদিন মা তাড়াতাড়ি ফিরে আসে দরবার থেকে। কিন্তু আজ তার অনেক বেশি দেরি হচ্ছে। তবে কি, কোনও অঘটন ঘটলো?

—বেটা আলাদিন, মা আনন্দে ছুটে এসে আলাদিনকে জড়িয়ে ধরে, আজ আমার এতো চেষ্টার সুফল পেয়েছি।

আলাদিন বুঝতে পারে খবর, শুভ সন্দহ নাই। বলে, কী মা? কী হয়েছে, বলো।

আলাদিনের মা বলে, তোর ঐ কাঁচের খেলনাগুলো দিতেই সুলতান গলে গেলেন। বললেন, শাহজাদী বুদুরকে তোর সঙ্গেই শাদী দেবেন তিনি। কিন্তু তিন মাস বাদে এই শাদী হবে। এখনই হ'তো, কিন্তু ঐ মুখপোড়া উজিরটা বাগড়া দিলো।

—বাগড়া দিলো কেন?

—তার নিজের বাঁদরমুখো বামন হাঁদা একটি ছেলে আছে। শাহজাদী বুদুরের

সঙ্গে শাদী দেবার জন্য সে সুলতানের কাছে বায়না ধরেছে। সুলতান ওকে তিন মাস সময় দিলেন, বললেন, এর মধ্যে আমাদের চেয়ে আরও দামী দেন-মোহর দিতে হবে, তা না হলে এ শাদী তোর সঙ্গেই দিয়ে দেবেন তিনি। কিন্তু এখন আমার ভয় লাগছে, বাবা, ঐ বাঁদরমুখো উজিরটা যদি আরও বেশি ধনদৌলত জোগাড় করে?

আলাদিন হাসে, তুমি একটা আস্ত পাগল, না। যে-বস্তু সুলতানের হাতে তুলে দিয়ে এসেছো, তামাম দুনিয়া ঢুঁড়লেও তার নখের যুগ্যি একটা জিনিস জোগাড় করতে পারবে না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ঊনপঞ্চাশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলাদিন আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরে, মা, মাগো, এতদিনে তুমি আমার স্বপ্ন সফল করতে পেরেছো। শাহজাদী বুদুর এখন আমার। তাকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। যে রত্ন আমি ভেট দিয়েছি, সুলতানকে তার সমান দূরে থাক, হাজার ভাগের এক ভাগও দেওয়ার সাধ্য নাই কারো। সুতরাং বুদুর আমার।

আলাদিনের মা—ছেলেকে আদর করে বলে, এখন ভালোয় ভালোয় শুভ কাজটা মিটে গেলে হয়। ঐ কু-নজরে উজিরটাকে দেখে আমার ভালো ঠেকল না বাবা। না জানি ছুঁচোটা কি শয়তানী করে বাগড়া দেয়?

আলাদিন বলে, তুমি রাখতো মা, উজিরের কী ক্ষমতা, সে আমার একগাছি চুলও ছিঁড়তে পারবে না। তুমি দেখে নিও, ও ব্যাটার নাকের ডগা দিয়ে শাহজাদীকে আমি শাদী করে ঘরে নিয়ে আসবো।

পুরো তিনটি মাস অপেক্ষা করতে হবে আলাদিনকে। মা-এ পো-এ দুজনে মিলে পল পল করে সময় গুণতে থাকে। এইভাবে এক এক করে দুটি মাস কেটে যায়। আলাদিন আশায় আনন্দে নেচে ওঠে। আর মাত্র একটা মাস। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মাকে ডেকে আলাদিন বলে, মা শাদীর তো আর মাত্র একটা মাস বাকী। তুমি এবার ধীরে ধীরে কেনাকাটা শুরু কর। সওদাপত্র তো কম লাগবে না, শাহজাদীর সঙ্গে শাদী, জাঁকজমকের ঘাটতি হলে তো চলবে না, মা।

মা বলে, আমি সেই কথাই ভাবছিলাম, বাবা। আজই বাজারে যাচ্ছি।

আলাদিনের মা বাজারে ঢুকেই তাজ্জব বনে যায়। সারা বাজারের প্রতিটি দোকান ঝলমল করছে। নানারকম বাহারী সাজপোশাক এবং শৌখিন জিনিসের চমকে চোখ ঝলসে যায় আর কি!

একটা বড় দোকানে ঢুকে পড়ে আলাদিনের মা! সোনার জরির কাজ করা কয়েকটি মূল্যবান সাজ-পোশাক ঝোলানো ছিলো দোকানের সামনে। তার একটার দাম জিজ্ঞেস করে সে।

—কত দাম এটার?

দোকানী অবাক হয়ে আলাদিনের মা-এর দিকে তাকায়। বলে, তোমার কী দেমাক খারাপ হয়েছে নাকি গো, জান না আজ বাজারের যত দোকানে যত বাহারী সাজ-পোশাক বা শখের সামান যা ঝোলানো হয়েছে সব বিক্রি হয়ে গেছে।

—বিক্রি হয়ে গেছে? বিক্রি হয়ে গেছে তো দোকানে রাখছো কেন? সে তো ঘরে নিয়ে গেলেই পারে।

দোকানী বলে, তোমার সাহস তো বড় কম নয় মেয়ে, কার সম্বন্ধে কী কথা বলছো, তা জান? স্বয়ং শাহজাদী বুদুরের শাদীর সাজ-পোশাক এসব—যা দেখছো, সব। জান না,

আজ রাতে উজিরের ছেলের সঙ্গে শাহজাদী বুদুরের শাদী হবে? উজির নিতে এসে এইসব সাজ-পোশাক পছন্দ করে গেছে। এখুনি তার লোক-লস্কর আসবে। উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে চলে যাবে।

আলাদিনের মা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাড়াতাড়ি ছুটে যায় আর একটা দোকানে। সে দোকানদারও একই কথা বলে। এর পর সে প্রায় উন্মাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে ঘরে ফিরে আসে। মাকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে দেখে, আলাদিন অবাক হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কী হলো মা, কী হয়েছে, শুধু হাতে ফিরে এলে যে? সওদা করলে না কিছু?

মা বলে, আমার মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে, আগে একটু পানি দে, সব বলছি।

আলাদিন ছুটে গিয়ে এক গেলাস জল এনে মা-এর মুখে ধরে। ঢক ঢক করে জলটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করে মা বলে, বাবা, আমাদের কপাল ভেঙ্গেছে।

—মানে, আলাদিন কিছুই আঁচ করতে পারে না, কী বলছো মা, কপাল ভেঙ্গেছে কেন?

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আমি বাজারে গিয়ে শুনে এলাম ঐ বাঁদরমুখো মুখপোড়া উজিরটার ছেলের সঙ্গে শাহজাদী বুদুরের শাদী হচ্ছে আজ রাতে।

আলাদিন বলে, না মা সে কী করে হয়, কেউ তোমার সঙ্গে মস্করা করেছে।

—না বাবা, না; আমি জনে জনে জিজ্ঞেস করেছি। সবারই মুখে এক কথা। পথে ঘাটের মানুষ এই শাদীর কথায় মেতে উঠেছে, আমি নিজে কানে শুনে এসেছি। তাছাড়া সারা বাজারের সব সেরা সাজ-পোশাক আর শখের বাহারী জিনিস তামাম কিনে নিয়েছে ঐ উজিরটা।

আলাদিনের চোখ জ্বলে ওঠে, বেইমান—

আলাদিনের মা বলে, বেইমান বলে বেইমান, সুলতান নিজ মুখে আমাকে কথা দিলো, 'শাহজাদী বুদুরের সঙ্গে তোমার ছেলের শাদী হবে।' তা এই কী ইমানদারের বাক্যি? সর্বনাশ হবে ছারখার হয়ে যাবে সব।

আলাদিন মাকে শান্ত করার চেষ্টা করে, মা, তুমি মেজাজ খারাপ ক'রো না। কী করে এই মিথ্যের মোকাবিলা করতে হয় তা আমার জানা আছে। তবে এও তোমাকে বলে রাখলাম মা, ঐ শয়তান উজির যদি স্বপ্ন দেখে থাকে তার গুণধর পুত্রের অঙ্কশায়িনী করাবে শাহজাদী বুদুরকে, সে গুড়ে বালি। আমার হাতে এমন অস্ত্র আছে যাতে বাছাধনের সব সাধ ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। যাও মা তুমি আর মন খারাপ ক'রো না। ভালো করে খানা পাকাও। আমার বড় খিদে পেয়েছে।

মা সুলতান আর উজিরের মুণ্ডুপাত করতে করতে রসুইখানার দিকে চলে যায়। আলাদিন ঘরের দরজা বন্দ করে ঝোলা থেকে চিরগটা বের করে। আলতো করে একটু ঘষা দিতেই সেই আফ্রিদি দৈত্য এসে হাজি হয়। আভূমি আনত হয়ে আলাদিনকে সে কুর্নিশ করে। বলে, আমি ত্রিভুবনের মালিক। আমার অসীম ক্ষমতার কাছে সবই পদানত। শুধুমাত্র এই যাদু চিরাগই আমার একমাত্র ঈশ্বর। এঁর নির্দেশ আমার শিরোধার্য, এখন আপনি যখন এই চিরাগের মালিক, সেই কারণে আমি আপনার দাসানুদাস। গোলামকে হুকুম করুন মালিক। আপনার আজ্ঞা পালন করতে আমি প্রস্তুত।

আলাদিন বললো, শোনো, চিরাগ-দাস তোমাকে একটা কথা বলি। এবারে কিন্তু

আমার খানাপিনার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠাইনি। ব্যাপারটা বেশ জটিল এবং তোমাকেই তার সুরাহা করতে হবে। সুলতান আমার কাছে মণিরত্নের উপঢৌকন গ্রহণ করেছে। এবং কথা দিয়েছিলো, তার কন্যা শাহজাদী বুদুরকে আমার সঙ্গে শাদী দেবে। কথা ছিলো তিন মাস পরে আমাদের শাদী হবে। কিন্তু দু মাস পার হতে না হতেই সুলতান তার বাগদানের সব কথা ভুলে গেছে, অথবা মনে রেখেও আমার সঙ্গে বেইমানী করতে চলেছে। খবর পেলাম সে তার মেয়েকে উজিরের ছেলের সঙ্গে শাদী দিচ্ছে আজ রাতে। কিন্তু এ শাদী আইন-সিদ্ধ নয়। যেন তেন প্রকারে উজিরের ছেলের হাত থেকে শাহজাদীর সতীত্ব রক্ষা করতে হবে। আমার একান্তভাবে অধিকার আছে শাহজাদী বুদুরকে ভোগ করার। সুতরাং অন্য কারো থাবা আমি বরদাস্ত করবো না। এবং এই কারণেই আমাকে সাহায্য করার জন্য আজ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

আফ্রিদি বললো, আমাকে এতো সব কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন কেন মালিক। আমি আপনার আজ্ঞাবহ দাসমাত্র। আপনি হুকুম করুন, বান্দা তামিল করতে প্রস্তুত।

আলাদিন বলে, ঠিক আছে, তবে শোনো, আজ সন্ধ্যায় যখন শাহজাদী বুদুরকে উজিরের ছেলের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সবাই চলে যাবে সেই সময় তুমি তাকে-তাকেই আশে পাশে থাকবে, সাবধান উজিরের ছেলেটা যেন ওর গায়ে হাত ঠেকাতে না পারে। তুমি তাদের চোখে ঘুম ঢেলে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে তখুনি। তারপর দু'জনকেই নিয়ে চলে আসবে এখানে আমার এই ঘরে। আর তারপরের ব্যাপার আমি বুঝবো। হ্যাঁ, আনার সময় পালঙ্কশয্যা সমেত নিয়ে আসবে ওদের, বুঝলে?

আফ্রিদি মাথা নুইয়ে বলে, জো-হুকুম, মালিক।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো একান্নতম রজনীতে আবার কাহিনী বলতে শুরু করে সে ঃ

সুলতান শাহজাদী বুদুরকে উজির-পুত্রের সঙ্গে কেন শাদী দিতে সম্মত হলেন সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করা দরকার।

সেদিন আলাদিনের মা দরবার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সুলতান উজিরকে বললেন, শাদীর যৌতুক হিসেবে আলাদিন যে মণিরত্ন পাঠিয়েছে তার মূল্য অর্থ দিয়ে যাচাই করা সম্ভব নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে শাহজাদীকে আলাদিনের হাতে তুলে না দিয়ে উপায় নাই উজির। আমি তিন মাস সময় অবশ্য রেখেছি কিন্তু আমার মনে হয় সারা আরব দুনিয়ার কোনও সুলতান শাহজাদাই আলাদিনের উপঢৌকনকে টেক্কা দিতে পারবে না। সুতরাং একরকম ধরেই রাখ, শাহজাদী বুদুর আলাদিনের বেগম হবে।

উজির বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, শাহজাদীকে শাদী করার পক্ষে একমাত্র যৌতুক উপঢৌকনই কী সব? ঘর বর কিছুই দেখার প্রয়োজন নাই? ছেলে দেখতে কেমন—কালো বোবা হাঁদা কিংবা অন্ধ-খঞ্জ কিনা তাও তো একবার স্বচক্ষে দেখা দরকার।

সুলতান বললেন, একশোবার। তিন মাস সময় কি আমি শুধু শুধু পিছিয়ে দিলাম নাকি? সবই তো খোঁজ খবর নিতে হবে? এবং তা তোমাকেই নিতে হবে। আজ থেকেই আলাদিনের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা কর উজির। কী করে সে, কোথায় থাকে, কী তার খানদানী সব আমার জানা দরকার।

উজির বলে, ওসব নিয়ে আপনি একটুও চিন্তা করবেন না হুজুর। কাক পক্ষীও টের পাবে না। আমি আজই চর নিযুক্ত করছি। তারা আমাকে আলাদিনের সব গোপন সংবাদ এনে দেবে নিত্য।

উজির কয়েকদিন পরে সুলতানকে বললো, জাঁহাপনা, আলাদিন বাণিজ্য করতে বিদেশ গেছে। মাসখানেক বাদে ফিরবে কথা আছে।

মাসখানেক পরে উজির আবার সুলতানকে বললো, জাঁহাপনা, খবর এসেছে ভারত সাগরের কূলে আলাদিনদের জাহাজ ডুবে গেছে। জাহাজের মাত্র একজন যাত্রী রক্ষা পেয়ে দেশে ফিরে এসেছে। তার বিবরণে জানতে পারলাম, জাহাজের আর কেউই প্রাণে রক্ষা পায়নি।

সুলতান বললেন, আহা হা, বেচারী! ভাগ্যে বুদুরের শাদীটা দিয়ে দিই নি তখন। তাহলে মেয়েটা আমার পাথারে পড়তো। তা এক কাজ করো উজির। তুমি বরং আর একটু ভালো করে খোঁজ খবর করো। হয়তো আল্লাহর কৃপায় সে বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

উজির বলে, যে লোক ফিরে এসে খবর দিয়েছে, তার কথা অবিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ নাই। তা সত্ত্বেও আপনি যখন বলছেন, আমি খোঁজখবর নিতে লোক পাঠাচ্ছি। তবে মৃত্যু সংবাদ সচরাচর মিথ্যে হয় না, জাঁহাপনা।

এর কিছুদিন পরে উজির সুলতানকে জানালো, জাঁহাপনা আমার দূতরা ফিরে এসেছে। তারা খবর নিয়ে জেনেছে, সত্যিই সে-জাহাজের একটিমাত্র মানুষ ছাড়া দ্বিতীয় কেউ প্রাণে রক্ষা পায়নি।

সুলতান অনেক আফশোশ করলেন। তারপর বললেন, সবই নিয়তির লেখা। কেউই তার বাইরে যেতে পারে না উজির। যাই হোক, আর তো অপেক্ষা করা যায় না, এবার শাহজাদীর শাদীর ব্যবস্থা করতে হয়।

উজির করজোড়ে আর্জি পেশ করে, সুলতান মহানুভব, আপনি এক সময় আমার পুত্রকে জামাতা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। যদি অধমের আর্জি মঞ্জুর করেন তবে আমার ছেলেটার একটা গতি হয়।

সুলতান বললেন, উত্তম, তাই হবে। আমি আর দেরি করতে চাই না। দু একদিনেই শাদীর সব ব্যবস্থা করে ফেলো।

উজিরের চালে বিভ্রান্ত হয়ে বুদুরের শাদীতে সায় দিলেন তিনি। পরদিন থেকেই শাদীর সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। সারা শহরে রটে গেলো সেই বার্তা। দোকান পাট-এ নানারকম বাহারী রংদার সাজ-পোশাক এবং উপহার উপঢৌকনের সামান ঝলমল করে উঠলো। উজিরের ঢালাও হুকুম, বাজারের সেরা সেরা সব জিনিস তার ছেলের শাদীর জন্যে চাই। অন্য কাউকে তা বিক্রি করা চলবে না। দোকানীরাও মওকা বুঝে দামী দামী সাজ-পোশাক আর সামানপত্র আমদানী করে দোকান ভরে ফেললো। এবং তিন-চারগুণ দামে তা উজিরের কাছে বিক্রি করে মোটা মুনাফা ঘরে তুলতে লাগলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো বাহান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলাদিন মাকে তার ফন্দী ফিকিরের কোনও আভাষ দিলো না। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। খানাপিনা শেষ করে মা ঘরে শুতে চলে গেলো। আর আলাদিন নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে আফ্রিদির আগমন প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণতে থাকলো।

এদিকে সুলতানের প্রাসাদে শাদীর উৎসব সমারোহ চলছে তখন। একে একে অভ্যাগত আমন্ত্রিতরা বিদায় নিচ্ছে। শাহজাদী বুদুরকে যথারীতি উজির-পুত্রের সঙ্গে এক ঘরে শোয়ানোর ব্যবস্থা করা হলো। প্রথা অনুযায়ী পাত্র পাত্রী উভয়ে নগ্ন হয়ে ফুলশয্যায়

রাত্রি যাপন করবে। সেইভাবে শাহজাদী বুদুরকে বিবস্ত্রা করে উজির-পুত্রের ঘরে পালঙ্কে বসিয়ে

দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে হারামের মেয়েরা।

উজির-নন্দন উলঙ্গ হয়ে পালঙ্কে শুয়ে এতক্ষণ শাহজাদীর প্রতীক্ষায় অধীর হয়েছিলো, এবার তাকে কাছে পেয়েই জড়িয়ে জাপটে ধরতে এগিয়ে যায়। কিন্তু পলকে তাজ্জব কাণ্ড ঘরে গেলো। পালঙ্কটা মেঝে ছেড়ে শূন্যে উড়ে যেতে লাগলো। আতঙ্কে দু'জনেরই অবস্থা কাহিল। প্রায় হত-চৈতন্য বলা যায়। প্রাণপণে বিছানায় মুখ ঢেকে পড়ে রইলো ওরা। পালঙ্কটা নিমেষে খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আকাশপথে উড়ে চললো। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আলাদিনের ঘরের মেঝেয় এসে নেমে পড়লো।

এ সবই আফ্রিদির ঐন্দ্রজালিক কারসাজি। অদৃশ্য দৈত্য এবার স্বরূপ ধারণ করে আলাদিনকে আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, হুকুম তামিল করেছি হুজুর। এবার আর কী করতে হবে আজ্ঞা করুন, বান্দা প্রস্তুত।

আলাদিন বললো, এই মেয়েছেলের দালালটাকে পায়খানার হাঁড়ির মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিয়ে আজকের মতো তুমি বিদায় নাও। কাল খুব ভোরে—রাতের আঁধার না কাটতেই আবার এসে হাজির হবে আমার সামনে। তখন যা বলার বলবো।

—জো হুকুম জাঁহাপনা।

এই বলে সে উজিরের ছেলেকে এক হাতে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে পায়খানা ঘরে চলে গেলো।

আলাদিন দেখলো মখমলের শয্যায় শাহজাদী বুদুরের নগ্ন দেহখানা এলিয়ে পড়ে আছে। সারা চোখে মুখে তার আতঙ্ক। আলাদিন বললো, শাহজাদী শঙ্কা করার কোনও কারণ নাই। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করবো না। আমাকে বিশ্বাস কর, যদিও তুমি আর আমি এই ঘরে একা, তবু কথা দিচ্ছি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করবো না আমি।

আলাদিনের এই কথায় শাহজাদী বুদুর তেমন কোনও ভরসা পায় না। সন্দেহাকুল চোখে সে আলাদিনের দিকে তাকায়।

আলাদিন বলে, আমাকে নির্ভর করতে পারো শাহজাদী, তোমার কোনও অসম্মান আমি করবো না। তোমার বাবার প্রাসাদে যেমন নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলে, এখানেও ঠিক তেমনি নির্ভয় নিরাপদ তুমি। আমি শুধু ঐ জন্তুটার থাবা থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্যই এখানে নিয়ে এসেছি। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। উজিরের ঐ ছেলেটা একটা গবেট হাঁদা। শুধু সে

নারী-মাংস খুবলে খেতে জানে, আর কোনও যোগ্যতাই তার নাই। আমি জানি না, তোমার বাবা আমার সঙ্গে শাদী দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েও কেন ঐ বেল্লিকটার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়েছেন। কিন্তু শুনে রাখ শাহজাদী আমার জান থাকতে তা হতে দেব না। তুমি আমার বাগদত্তা। আইনতঃ তোমাকে শাদী করার একমাত্র অধিকার আমারই আছে। এবং সে শাদী হবেও। তাই আমি চাই না—আমার ভাবী বিবির দেহ কেউ স্পর্শ করুক। এমন কি আমিও বিধি সম্মত শাদী করার আগে তোমার দেহ গ্রহণ করবো না।

শাহজাদী বুদুর তার বাবার বাগদানের কোনও কথাই জানত না। তাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে শুধু কাঁদতে থাকলো, আলাদিনের কোন কথার জবাব দিলো না।

আলাদিন ওকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করলো: একখানা শাল ছুঁড়ে দিয়ে বললো, আমি থাকবো এ পাশে। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়, তোমার কোনও অনিষ্ট করবে না কেউ।

আলাদিন এক মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলো, কিন্তু শাহজাদীর চোখে আর ঘুম এলো না। সারারাত সে অজানা আতঙ্কে শিহরিত হতে থাকলো। অবশ্য তার সদ্য বিবাহিত স্বামী উজির পুত্রের জন্য তার বিন্দুমাত্র চিন্তা ছিলো না। শাদীর সময় থেকে ওকে দেখা ইস্তক বুদুরের সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে উঠতে চাইছিলো। এমন কদাকার কুৎসিত, বেঁটে হাঁদা বাঁদরমুখো একটা লোক তার স্বামী হবে, ভাবতে পারেনি সে।

পরদিন প্রত্যুষে চিরাগের আফ্রিদি আবার এসে হাজির হলো। আলাদিন তখনও নিদ্রামগ্ন। আফ্রিদি একটা অদ্ভুত আওয়াজ করতে আলাদিনের ঘুম ছুটে যায়। শাহজাদী জেগেই ছিলো, কিন্তু হঠাৎ সেই শব্দে আতঙ্কিত হয়ে সে ধড়মড় করে শয্যার উপর উঠে বসে কাঁপতে লাগলো। ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি চোখ বুলিয়ে কাউকেই দেখতে পেলো না। অথচ সে নির্ঘাত জানে, এই ঘরের মধ্যেই কেউ সেই বিকট বিদঘুটে আওয়াজটা তুলেছে।

আলাদিন কিন্তু পরিস্কার আফ্রিদিকে দেখতে পাচ্ছিল। বিছানা ছেড়ে সে আফ্রিদিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলো। সেখানে ফিস ফিস করে সে আফ্রিদিকে কী সব বললো, বুদুর শুনতে পেলো না।

একটু পরে আফ্রিদি পায়খানা থেকে উজির-পুত্রকে শূন্যে ঝুলিয়ে এনে নামালো বুদুরের পাশে—পালঙ্ক-শয্যায়। পায়খানার নোংরা জলে তার সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত—ভেজা। ভয়ে অথবা হিমে বোঝা গেলো না, সর্বাঙ্গ ওর ঠক ঠক করে কাঁপছিলো।

এরপর পালঙ্কটা আবার শূন্যে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আকাশ-পথে বায়ুবেগে সুলতানের প্রাসাদের দিকে ধাবমান হলো।

পলকের মধ্যেই আবার সুলতান- প্রাসাদের যথা-নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে এনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো আফ্রিদি। বুদুর এবং উজির পুত্র বোবা বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলো পালঙ্কটা আবার তাদের নিজেদের কামরাতেই ফিরে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরে বুদুরের বাবা মা মেয়েকে দেখতে এলেন। বুদুর আকুল হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মা মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে সোহাগ করে বলে, কী বাছা, কী হয়েছে। শাদীর প্রথম রাতে ভয় পেয়েছিস? তা ভয় পাবার কী আছে বাছা? ওরকম প্রথম প্রথম দু-একটা রাত কেমন কেমন মনে হবে। তারপর দেখবি, আপসে আপ সব সহজ

হয়ে গেছে। মা মেয়ের কানে কানে ফিস ফিস করে বলে, খুব কী ব্যথা পেয়েছিস মা? রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেছে?

বুদুর মাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে, না মা ওসব কিছু না।

—তবে? তবে কী হয়েছে,মা? তোর স্বামী কী তোর সঙ্গে কাজ কাম ঠিক ঠিক করেনি?

একথার কোন জবাব দেয় না বুদুর । সুলতান জামাতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু উজির-পুত্র মাথা নিচু করে বসে থাকে। কোনও কথা বলতে পারে না। সুলতান এবং বেগম দুজনেই আবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকেন। উজির-পুত্র শয্যা ছেড়ে নেমে সুড় সুড় করে হামামে গিয়ে ঢোকে। গত রাতের পায়খানার নর্দমার নোংরা জলে তার সর্বাঙ্গ ক্লেদাক্ত হয়েছিলো। হামামে ঢুকেই সে গামলা-গামলা জল ঢেলে ময়লা কাদা ধুয়ে সাফ করার কসরৎ করতে থাকে। মনে মনে ভাবে গত রাতের ঐ লজ্জার কাহিনী সে বলবে কী করে লোককে।

বুদুরও নীরবে চোখের জলে গাল ভাসিয়ে দিতে থাকে। মা-বাবার হাজার প্রশ্নের একটাও সে জবাব দেয় না—দিতে পারে না। গত রাতের ঐ অবিশ্বাস্য অলৌকিক লজ্জাকর কাহিনী কী করে শোনাবে সে তাদের। আর শুনলেই কী তাঁরা সে কথা বিশ্বাস করবেন?

মেয়ের অঝোর নয়নে কান্নায় মা কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই প্রশ্ন করেন, সব মেয়েরই শাদীর প্রথম রাত অদ্ভুত লাগে। কারো সুখের মনে হয় আবার কেউ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কিন্তু এ সবই তো সাময়িক মা। দু'টো রাত কাটাতে পারলেই সব গা সওয়া হয়ে যাবে। তখন আজ যার কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছিস দেখবি তখন তার জন্যেই প্রাণে আকুলি বিকুলি করবে। এখন কান্না থামা, বেটা। লজ্জা করিস নে, সত্যি করে বলতো, জামাই তোর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করেছে?

তবু বুদুর চুপ করে থাকে। মা অধৈর্য হয়ে বলেন, কী, কথার জবাব দিবি না? যা বাবা, এতো ঢং করছিস কেন? আমিও তো এক সময় শাদীর ক'নে হয়েছিলাম না, হইনি? কিন্তু তোর মতো এতো সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড করিনি বাছা! তোর বাবা আর আমি এই সাত সকালে ছুটে এসেছি তোর খবর নিতে। তাঁরও তো মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা তোর উচিত!

বুদুর দেখলো মা বাবা উভয়েই বিশেষ চিন্তিত এবং আহত, অপমানিত হয়েছেন। সুতরাং আর চুপ করে থাকা সঙ্গত হবে না।

—মা, তোমার কী করে ভাবলে তোমাদের উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি এতোটুকু কম আছে? আমি এতোক্ষণ চুপ করে আছি, শুধু লজ্জায়। কী করে তোমাদের বলবো সে-সব কথা, তাই ভেবে পাচ্ছি না, মা। কী যে ঘটে গেছে গত রাতে, আমি নিজেই তা এখনও বুঝতে পারছি না। একেবারে আজগুবি অবিশ্বাস্য ভুতুড়ে কাণ্ড!

এরপর অনেক-সময় ধরে নানাভাবে বর্ণনা করে মা বাবাকে গত রাত্রের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনালো সে। তার স্বামী পাশে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে পালঙ্কটা কী ভাবে ওপরে ওঠে জানালা দিয়ে বেরিয়ে আকাশপথে উড়তে উড়তে এক অজানা বাড়ির একটা ঘরে গিয়ে নেমেছিলো এবং সে ঘরের এক সুন্দর যুবক তার পাশে সারারাত শুয়ে ঘুমিয়েছিলো, অথচ তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। সেই সব ঘটনা সে মা-বাবার সামনে বিবৃত করলো।

তখনও বুদুরের আতঙ্ক কাটেনি। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, মা, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কী ভাকে কোন্ অদৃশ্য শক্তি আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো সেখানে। আবার সকাল হওয়ার আগেই আমাদের পালঙ্কটা আবার উড়তে উড়তে ফিরে এলো এই বাসর-কক্ষে। আমি এখনও ভাবতে পারছি না মা, শাদীর প্রথম রাতে এমন একটা অলক্ষুণে কাণ্ড কেন ঘটলো।

সুলতান এবং বেগম পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করেন। ওদের আর বুঝতে বাকী থাকে না, অনভ্যস্ত সহবাসের আতঙ্কে মেয়ে সারারাত ধরে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। মা বললেন, বেটা,

ওসব মন থেকে মুছে ফেলো। শাদীর প্রথম রাতে অনেক মেয়েরই ওরকম হয়ে থাকে। যাই হোক আমাদের কাছে যা বললে তা আর অন্য কাউকে ব'লো না। এসব কথা শুনলে লোকে তোমাকে পাগল ঠাওরাবে। যাক ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। মন থেকে ওসব বাজে দুঃস্বপ্নের কথা মুছে ফেলো। হাসি গানে মেতে থাকো। তুমি আমাদের একমাত্র কন্যা। তোমার শাদীর জন্য দেশ-বিদেশ থেকে কত গণ্যমান্য মেহেমানরা এসেছে। সারাদেশের মানুষ কত আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। চল্লিশ দিন ধরে চলবে এই উৎসব। এখন এই সব অলক্ষুণে দুঃস্বপ্নের কথা কারো কানে গেলে সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। তাই বলছি মা, কেউ যেন না জানতে পারে এসব কথা।

সুলতান এবং বেগম মেয়েকে নানারকম উপদেশ বাক্য শুনিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হামাম থেকে গোসল করে উজির-পুত্র আবার ঘরে ফিরে আসছিলো, সুলতান তাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বেটা, কাল রাতটা তোমাদের কেমন কাটলো?

উজির-পুত্র বোকার মত ফিক্ ফিক্ করে হেসে বললো, কেন বলুন তো, আপনার মেয়ে আমার নামে কিছু খারাপ বলেছে নাকি?

সুলতান বলে, না, খারাপ বলবে কেন? কিন্তু মনে হলো সাধারণ ভাবে যেমনটা কাটা উচিত তা কাটেনি। কী ব্যাপার বলতো? শাহজাদী কী তোমার এই কুরূপ দেখে মুখ ফিরিয়েছিলো?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো তিপ্পান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

উজির-পুত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলে, না না, ওসব তো কিছুই হয়নি। সাধারণভাবে যা ঘটা সম্ভব সবই আমাদের ঘটেছে।

জামাই-এর কথা শুনে সুলতান এবং বেগমের ধারণা বদ্ধমূল হলো, মেয়ে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। সুলতান বললো, মনে হচ্ছে, শাহজাদী শরীরে অস্বাভাবিক ব্যথা পেয়েছে। বাবা, একটা কথা মনে রেখ, তোমার বিবির শরীর বড় পলকা ফুলের মতো নরম। ওকে একটু সাবধানে ব্যবহার করো।

জামাইকে উপদেশবাণী দিয়ে সুলতান বেগমকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

আলাদিন সারাদিন ধরে মনে কল্পনা করতে লাগলো, শাহজাদী বুদুর আর তার সদ্য শাদী করা স্বামীটিকে নিয়ে সুলতান-প্রাসাদে কী সব কাণ্ডকারখানা ঘটতে পারে!

সন্ধ্যার পরে খানা-পিনা শেষ করে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলো আলাদিন। চিরাগটা বের করে আলতোভাবে একবার ঘষতেই আবার এসে হাজির হলো সেই আফ্রিদি। আলাদিন বললে, সুলতানের প্রাসাদে যাও অপেক্ষা কর, যখন শাহজাদী এসে আবার পালঙ্ক-শয্যায় শোবে আবার ওদের নিয়ে এসো এখানে।

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেলো। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই পালঙ্ক-শয্যা সমেত শাহজাদী আর স্বামীটাকে নিয়ে এসে হাজির করলো আলাদিনের সামনে। তারপর উজির-পুত্রকে তুলে নিয়ে চলে গেলো পায়খানার ঘরে।

সে রাতেও আলাদিন রোরুদ্যমানা শাহজাদীকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তোমার কোনও ভয় নাই। এখানে তোমার মান ইজ্জত সব নিরাপদ। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও, কেউ তোমাকে স্পর্শ করবে না।

শয্যার মাঝখানে আবার রাখা হলো একখানা মারাত্মক ধারালো অস্ত্র। তার এক পাশে শাহজাদী অন্য পাশে আলাদিন শুয়ে রাত্রি অতিবাহিত করলো। পরদিন সকাল

হওয়ার আগেই আবার সেই আফ্রিদি এসে পালঙ্কসমেত ওদের দু'জনকে রেখে এলো প্রাসাদের বাসর-কক্ষে।

সুলতান সারারাত কন্যর চিন্তায় দু-চোখের পাতা এক করতে পারেননি। সকাল হতে না হতে তিনি একাই চলে এলেন শাহজাদীর বাসরঘরে। বেগমকে সঙ্গে আনলেন না,কারণ বেগম অল্পতেই অধৈর্য হয়ে ওঠেন। মেয়েকে কটূ কথা বলতে দ্বিধা করেন না।

সুলতানের আগমন সংবাদ পাওয়ামাত্র উজির- পুত্র শয্যাত্যাগ করে খিড়কীর দরজা দিয়ে হামামে পালিয়ে যায়।

সুলতান ঘরে প্রবেশ করলেন। মেয়ের কাছে এসে কপালে চুমু দিয়ে বললেন, আজকের রাতটা নিশ্চয়ই তোমার ঐরকম বাজে দুঃস্বপ্নে কাটেনি মা! মনে কোনও দ্বিধা সংকোচ ক'রো না। কেমন কেটেছে তোমাদের বাসর রাত বলতো, মা?

শাহজাদী বুদুর বাবার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না। তাঁর হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো।

সুলতান ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু শাহজাদী তার হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদছিলো বলে সুলতানের সেই রোষ কষায়িত মূর্তি প্রত্যক্ষ করতে পারলো না। সুলতানের গলার স্বরে সে চমকে উঠলো।

—সাফ সাফ জলদি জবাব দাও। আসল কথা কী? না হলে আমি তোমার গর্দান নেব, বেয়াদপ লেড়কী কোথাকার!

বুদুর বাবার এই হুঙ্কারে কান্না-বিজড়িত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কণ্ঠে বলতে পারলো আব্বাজান, রাগ করো না, আমাকে দয়া কর। কেন জানি না, আজ রাতেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। একথা শুনলে আম্মা আমাকে আস্ত রাখবে না জানি, কিন্তু আব্বাজান, তুমি আমার অসহায় অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে চেষ্টা করবে। এ কী দুর্বিপাকে পড়লাম আমি, কী অপরাধ করেছি, কেন এভাবে আল্লাহ আমাকে সাজা দিচ্ছেন। এর চেয়ে যে মরাও অনেক ভালো। আব্বাজান আমি তোমাকে বলছি আজ রাতেও যদি ফের একই ঘটনা ঘটে, তবে আর এ জীবন আমি রাখবো না। কাল সকালে আমাকে তোমরা আর জ্যান্ত দেখতে পাবে না।

এই সময় ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো চুয়ান্নতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু করে সে ঃ

কন্যার কথায় সুলতানের হৃদয় বিগলিত হয়। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন তিনি।

—সত্যি করে বলতো মা, কী কী ঘটনা তুমি প্রত্যক্ষ করেছ বলো, তোমার কোনও ভয় নাই। এখানে তোমার মা আসেননি। ভয়ের কোনও কারণ নাই, আমাকে সব খুলে বলো দেখি।

বুদুর বাবার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে সব সবিস্তারে খুলে বললো তাকে।

—তোমার যদি বিশ্বাস নাহয় আব্বাজান, উজির-পুত্রকে তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ। তাহলেই বুঝতে পারবে, আমি কতটা কি সত্যি বললাম।

সুলতানের চোখ জলে ভরে ওঠে। প্রায় চিৎকার করে বলতে থাকেন, এ সবই আমার গলতি মা, আমিই তোমাকে হাত পা বেঁধে দরিয়ায় ফেলে দিয়েছি। এমন একটা অকাল-কুষ্মাণ্ডর হাতে তোমাকে সঁপে দিলাম—তোমাকে রক্ষা করার কোনও ক্ষমতাই সে বুড়বাকটার নাই, বেশ বুঝতে পারছি। আমার কত আশা কত স্বপ্ন ছিলো। তুমি আমার আদরের

দুলালী—সুখে থাকবে, তোমার মুখে হাসি দেখবো, এই ছিলো আমার একমাত্র বাসনা। কিন্তু বিধি বাম হলেন, আমি দেখছি তোমার কাছে এ জীবন বিষবৎ মনে হচ্ছে, মৃত্যুর আতঙ্ক তোমাকে ঘিরে ধরেছে—এর চেয়ে দুঃখের বেদনার আর কী হতে পারে, মা? আমি ঐ অপদার্থ আহম্মকটার বাবাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তার কাছে আমি কৈফিয়ৎ তলব করবো, কেন তার ছেলে আমার মেয়ের জীবনটাকে এমনি ভাবে তছনছ করে দিচ্ছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, সহজে আমি ওদের বাপ বেটাকে রেহাই দেব না। এর পরে আর একটা দিনও যাতে এসব ঘটনা না ঘটে তার ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

সুলতান বুদুরদের বাসরকক্ষ ছেড়ে নিজের দরবারে ফিরে গেলেন। ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছিলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন,—এই বিশ্রী ব্যাপারের ইতি তিনি ঘটাবেনই।

প্রধান উজিরকে ডেকে পাঠালেন সুলতান। উজির হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়লেন, তোমার ঐ গুণধর পুত্রটি কোথায়? হাজির কর তাকে। গত দুই রাতে কী সব ঘটনা ঘটছে, সে তোমাকে বলেছে কিছু?

উজির করজোড়ে বললো, আপনার এই ক্রোধের টান আমি অনুধাবন করতে পারছি না জাঁহাপনা। না, ছেলে আমাকে কিছুই বলেনি। যদি অনুমতি করেন, আমি এখনি গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি।

সুলতান বললেন, হ্যাঁ,তাই যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস করে উল্লুটাকে।

উজির দরবার থেকে বেরিয়ে ছুটে যায় ছেলের সন্ধানে। উজির-পুত্র তখন গোসলাদি শেষ করে সবে হামাম থেকে বেরিয়েছে, উজির তাকে দেখতে পেয়েই রাগে ফেটে পড়ে, এই কুত্তার বাচ্চা, কুত্তা, বল কী হয়েছে গত দুই রাতে। কৈফিয়ৎ দে, কেন আমাকে সত্যি কথা সঙ্গে সঙ্গে জানাসনি, পিঠের চামড়া আজ আমি খুলে নেব, বদমাইশ।

উজির-দুলাল মাথা হেঁট করে বলে, আমি বলবো বলবো ভেবেছিলাম, আব্বাজান। কিন্তু লজ্জায় সে-কথা বলতে পারিনি আপনার কাছে।

—লজ্জা? কীসের লজ্জা? কী— কী ব্যাপারটা ঘটেছে শুনি?

উজির-তনয় গত দুই রাতের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো তার কাছে। সব শুনে উজিরের মুখ কালো হয়ে যায়।

—ছিঃ ছিঃ, এসব শোনার আগে তোমার মরা মুখ কেন আমি দেখলাম না? কেন , একগাছি দড়িও কী তোমার জোটেনি? কড়িকাঠে ঝুলে পড়ে জান খতম করে দিতে পারনি, বে-শরম?

উজির-পুত্র অধোবদন হয়েই বলে, সত্যিই আব্বাজান, এর চেয়ে মৃত্যুই আমার কাছে অনেক ভালো। এমন শাদীতে আমার দরকার নাই। অমন পরমাসুন্দরী শাহজাদী আমার চাই না আব্বাজান। আমি ঠিক করেছি, ওকে আমি তিনতালাক বয়ান তালাক দেব—আজই। আপনি সুলতানকে বলে দিন, আজ থেকে শাদী-নামা নাকচ হয়ে গেলো। আমি বাদশাহ বনতে চাই না, আব্বাজান। ধনদৌলত, সলতানিয়ত হুকুমত আর শাহজাদীতে আমার লোভ নাই। সব শখ আমার মিটে গেছে। আমি আপনার সাধারণ উজির সন্তান হয়েই একটু শান্তিতে বাস করতে চাই। সারা জীবন আমি অকৃতদার হয়ে একা একা নিজের ঘরে কাটাবো, তবু ঐ সব প্রাণান্তকর ঝামেলার মধ্যে আমি আর মাথা গলাবো না, আব্বাজান। পায়খানার নর্দমার মধ্যে রাত্রিবাস—উফ্, সে কী দুঃসহ যন্ত্রণা। ওসব আমি আর ভাবতে পারছি না, এর এখনই একটা বিহিত করুন আপনি।

ছেলের কথায় উজির মুষড়ে পড়ে। তার কত উচ্চাশা ছিলো—সে একদিন এই বিশাল সলতানিয়তের একচ্ছত্র অধিপতি হবে। তার হুকুমেই চলবে সব। কিন্তু মুখপোড়া বাঁদর ছেলেটা এসব কী বলছে? সব সাধ যে তার ভেস্তে গেলো।

—আমি বুঝতে পারছি, অশেষ ক্লেশ তোমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা কী ভেবে দেখেছ, এর ফলে কতটা তুমি হারাবে? তার চেয়ে আমি বলি কি, ধৈর্য ধরে আর একটা রাত দেখো। কথা দিচ্ছি, আমি তোমার জন্যে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করবো, তোমার কোনও ভয় নাই, কেউ স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে।

—আপনি যত খুশি পাহারার ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু আমি আর ঐ অপয়া বাসরঘরে ঢুকবো না, আব্বাজান।

উজির বিষণ্ণ মনে ফিরে আসে দরবারে। সুলতান জিজ্ঞেস করে, এবার তোমার কী বলার আছে বলো উজির?

উজির মাথা হেঁট করে বলে, শাহজাদী যা বলেছেন, তা সবই সত্য, জাঁহাপনা। কিন্তু সে-জন্য আমার ছেলের কোনও দোষ নাই। যাই হোক, শাহজাদী বুদুরকে এই ভীতি থেকে অব্যহতি দেবার জন্যেই আমার পুত্র তাকে তালাক দিতে চায়।

—চমৎকার। আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। এ শাদী সুখের হতে পারবে না। সুতরাং তালাকই শ্রেয়ঃ। পাত্র যদি তোমার পুত্র না হতো উজির, তবে আমি তাকে তলোয়ারের এক কোপেই খতম করে দিতাম। যাক, আপদ চুকে গেলো, তুমি আজই আবার সারা দেশে ঘোষণা করে দাও, শাহজাদীর শাদী নাকচ হয়ে গেছে। আর এও জানিয়ে দাও সবাইকে, যদিও উজির-পুত্রের সঙ্গে তার শাদী হয়েছিলো তবু এখনও সে অপাপবিদ্ধ কুমারী। তার সতীত্ব অটুট আছে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ বলা থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো পঞ্চান্নতম রজনীঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলাদিন ঘরে বসেই জানতে পারলো, শাহজাদীর শাদী নাকচ হয়ে গেছে। আনন্দে সে নেচে উঠলো। আশ্চর্য যাদু চিরাগের দৈত্যের উদ্দেশ্যে সে দু হাত তুলে আশীর্বাদ জানাতে থাকলো। এতো সহজে এমন চমৎকার ভাবে কাজ সমাধা হয়ে গেলো—আফ্রিদি ছাড়া কী সম্ভব হতে পারতো!

সুলতানের কথামতো তিন মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সে চুপচাপ অপেক্ষা করলো। তারপর আলাদিন মাকে বললো, মা এবার তুমি সুলতানের কাছে যাও। গিয়ে বলো, 'আপনার কথামতো আমি তিন মাস অপেক্ষা করেছি। এখন আপনি আপনার সত্য রক্ষা করুন।'

আলাদিনের মা দরবারে আসতেই সুলতান তাকে চিনতে পারেন। উজিরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। উজির তখন কম্পমান। সুলতানকে বললো, জাঁহাপনা, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সেই জাহাজ ডুবিতে আল্লাহর অশেষ কৃপায় আলাদিন প্রাণে রক্ষা পেয়ে দেশে ফিরে এসেছে সম্প্রতি। কথাটা আমি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, জাঁহাপনা। আমার গোস্তাকি মাফ করুন।

সুলতান বললেন, আল্লাহই আমাকে সত্যভ্রষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন, উজির। আজ যদি তোমার ছেলে শাহজাদীকে তালাক দিয়ে মুক্ত না করতো তবে আমি তো মহাপাতক হতাম। আজ তো সে শাহজাদীকে দাবী করতেই এসেছে আমার কাছে। আমি ভাবতে পারছি না, বয়ান তালাক না হয়ে গেলে কী কেলেঙ্কারী কাণ্ডটাই না হতো আজ। খোদা মেহেরবান। তিনি আমার সত্য রক্ষা করেছেন। আমি যে বাগদান করেছিলাম উজির! উফ্, ভাবতে পারছি না—কী সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে পারতো। যাই হোক, এখন আল্লাহর দোয়ায় আমার সত্য রক্ষা হবে!

উজির তখন ঈর্ষায় জ্বলছিলো! শাহজাদীর শাদী বাগড়া দিয়ে ভণ্ডুল করার শেষ চেষ্টা করলো সে, জাঁহাপনা, আপনি আমাকে হুকুম করেছিলেন পাত্রের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সব তথ্য সংগ্রহ করেছি। আলাদিনের বাবা এই শহরের একপ্রান্তে একটি ছোট্ট দর্জির দোকানে কাজ করে প্রায় অর্ধাহারে দিন কাটাতো। মরার সময় সে একটা কানাকড়িও রেখে যেতে পারেনি বিবি-বাচ্চার জন্য। এখন জাঁহাপনা নিজেই বিবেচনা করে দেখুন, এই দীন-দরিদ্র দর্জির সন্তানের সঙ্গে শাহজাদীর শাদী দেওয়া সঙ্গত হবে কিনা! আমার তো একদম বিশ্বাস হয় না, সে সৎভাবে জীবন-যাপন করে।

সুলতান বলেন, কিন্তু এখন সে তো আর গরীব নাই উজির। যে-সব রত্নমাণিক সে যৌতুক পাঠিয়েছিলো, তা দেখার পর নিশ্চয়ই তোমার মনে কোনও সংশয় নাই।

—আমিও সেই কথাই বলছি, জাঁহাপনা। এই সামান্য কিছুকাল আগেও যার ঘরে দু'বেলা উনুন জ্বলতো না, সে সৎভাবে এই সম্পদ রোজগার করলো কী করে?

সুলতান হাসেন, তুমি একটা আস্ত আহাম্মক। যে সব রত্নমণি-মাণিক্য সে আমাকে ভেট পাঠিয়েছে তা কেউ রোজগার করে কখনই সঞ্চয় করতে পারে না, উজির। একটা জীবনে দূরে থাক, সাতপুরুষ ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যে ফুলে ফেঁপে উঠলেও এ ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব না। একমাত্র খোদাতালার অসীম কৃপা ছাড়া এসব বস্তু কারও করায়ত্ত হতে পারে না। তার নিজের নসীবেই হোক বা তার পূর্ব-পুরুষদের সুকৃতির ফলেই হোক, একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই সে এই দুর্লভ সম্পদের মালিক হতে পেরেছে। কিভাবে কেমন করে সে হতে পেরেছে সে সব তথ্য আমার জানবার প্রয়োজন নাই। এটুকু বুঝতে পেরেছি, সে পরম ভাগ্যবান পুরুষ হয়ে ধরায় জন্মেছে। সুতরাং শাহজাদী বুদুর তারই ভোগের পাত্রী হওয়া উচিত বলে মনে করি আমি।

উজির দেখলো আর কোনও মতেই সুলতানকে নিরস্ত করা যাবে না। তবু শেষবারের মতো আর একটা বাণ ছুঁড়লো সে।

মহামান্য সুলতানকে এই অধমের নিবেদন, সবই ঠিক আছে, তা আলাদিনের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার পরীক্ষা করার জন্য আর একদফা যৌতুক চেয়ে পাঠানো দরকার মনে করি আমি। অবশ্য জাঁহাপনা যদি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন আমার কিছু বলার নাই।

সুলতান স্মিত হাসলেন, উত্তম। তাহলে পাত্রের মাকে সেই বায়নাই শুনিয়ে দাও উজির। ঠিক আছে ওর মাকে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে বলো আমিই বলছি তাকে।

সুলতানের হুকুম মতো আলাদিনের মা তাঁর সামনে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালো। সুলতান বললেন, আমি তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছি মেয়ে। আমি আমার হলফ-এর কথা ভুলিনি, মনে আছে। তোমার পুত্রের সঙ্গেই শাহজাদীর শাদী হবে সন্দেহ নাই। এবার তাহলে দেনমোহরের কথায় আসা যাক, কী বলো? একথা তো সারা দুনিয়ার মানুষ জানে, শাহজাদী বুদুরের রূপের জোড়া নাই কোথাও। সুতরাং যোগ্য পাত্রীর যোগ্য দেনমোহর তো দিতে হবে।

—জাঁহাপনা যথার্থ বলেছেন। উপযুক্ত দেনমোহর ছাড়া তো শাদী সুসম্পন্ন হতে পারে না। আপনি আজ্ঞা করুন, হুজুর। আপনার অভিলাষ পূরণ করবো।

সুলতান বললো, সাবাস! তবে শোনও আমার কন্যা যা চায় তার ফিরিস্তি শোনাচ্ছি, তিন মাস আগে যে রত্নমণিগুলো আমাকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলো তোমার পুত্র, সেই রকম চল্লিশখানা সোনার থালায় ভর্তি ঐ ধরনের মণিমাণিক্যের ফল সাজিয়ে নিয়ে আসবে চল্লিশজন সুবেশা সুন্দরী বাঁদী। আর এই বাঁদীদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আসবে চল্লিশজন নিগ্রো নফর। তারা কালো হলেও দেখতে

সকলেই সুন্দর এবং তাগড়াই জোয়ান যুবক হওয়া চাই। তারা সবাই বাদশাহী কেতা অনুসারে যথাযোগ্য সুন্দর সুন্দর সাজে সুসজ্জিত হয়ে আসবে আমার প্রাসাদে। ব্যস, এর বেশি আর আমার কিছু চাইবার নাই, পাত্রের মা। অবশ্য তোমার ছেলে এর আগে আমাকে যা পাঠিয়েছে তার একটা মণি-মাণিক্যের মূল্য অনেক। কোনও সুলতান বাদশাহ ঐ সব রত্ন-মাণিক্যের একটাও সংগ্রহ করে আনতে পারবে না আমি জানি। তাই এ আমার দাবি নয়, অভিলাষ। যদি তোমার পুত্র পূরণ করতে পারে, আমি খুব খুশি হবো।

আলাদিনের মা সুলতানের বায়না শুনে শিউরে উঠলো। সর্বনাশ, এই রকম অসম্ভব দাবি কেউ পূরণ করতে পারে নাকি! এতো শাহজাদীকে না দেবার ছল। মুখে হ্যাঁ না কোন শব্দ উচ্চারণ না করে সে নীরবে দরবার ছেড়ে ঘরে ফিরে যায়। কাঁদতে কাঁদতে সে ছেলেকে বলে, আমি আগেই বলেছিলাম। বাবা, ওসব সুলতান বাদশাহদের সংস্রবে যেতে নাই। তুই শাহজাদী বুদুরের আশা ছাড়। কিন্তু আমার কথা শুনলি না তখন, এখন ঠেলা বোঝ।

আলাদিন উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন মা, আবার কী বাগড়া হলো?

আলাদিনের মা তখন ইনিয়ে বিনিয়ে লোভী শকুনি সুলতানের লালসার কাহিনী শোনালো ছেলেকে।

—বাবা তখন যদি ঐ সোনার থালাগুলো না বেচে লুকিয়ে রাখতিস তবে আবার না হয় সেই পাহাড় গুহায় ঢুকে ঐরকম কিছু কাঁচের ফল সংগ্রহ ক'রে আনতিস। কিন্তু সে-সব কাঁচ পাথরের ফল জোগাড় হলেও চল্লিশখানা সোনার থালা কোথায় পাবি, বাবা। আর সোনার থালাও যদি যোগাড় হয়, ঐ চল্লিশটা সুন্দরী বাঁদী আর চল্লিশটা নিগ্রো নফর তুই কোথায় পাবি? জানিস বেটা সুলতানটা হয়তো অত খারাপ নয়, কিন্তু বাঁদরমুখো ঐ পাজি উজিরটাই যত নষ্টের গোড়া। যত সব কুবুদ্ধি, ঐ লোকটাই জোগাচ্ছে তাকে। সে চায় না এ শাদী হোক। কারণটা অতি সোজা—এতো বড় হুকুমত আর অমন সুন্দরী শাহজাদী তার হাতছাড়া হয়ে গেছে—এ শোক কী সে ভুলতে পারে? আমি স্বচক্ষে দেখলাম, ঐ শয়তান উজিরটা সুলতানের কানে কানে ফুসমন্তর দিচ্ছিল।

আলাদিন হাসে। তোমাকে কালো মুখ করে ঢুকতে দেখে আমার তো আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিলো মা। ভাবলাম আবার বুঝি সব কেঁচে গেছে। কিন্তু এখন ধড়ে প্রাণ এলো, যাক বাঁচালে তুমি।

—ধরে প্রাণ এলো? বলিস কী বাবা? সুলতানের যা বায়নাক্কা তাতে কী তুই শাহজাদীকে ঘরে আনতে পারবি কখনও?

—আলবাৎ পারবো মা। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তুমি জান না, আমার হাতে কী মোক্ষম অস্ত্র আছে। পয়সা-কড়ির সমস্যা আমার কাছে কোনও সমস্যাই নয়। এক লহমায় আমি সুলতানের সব চাহিদা পূরণ করে দেব! তুমি নিশ্চিত হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাও গে, মা।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ছাপ্পান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলাদিনের মা দ্বিধা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আলাদিন এতো জোর দিয়ে ও সব কথা কী করে বলতে পারে বুঝতে পারলো না সে। খানা পাকাবার জন্য বাজারে সওদা করতে চলে যায় সে।

আলাদিন দরজা বন্ধ করে চিরাগটা বের করে মৃদু ঘষা দিতেই সেই আফ্রিদিটা আবার এসে হাজির হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বলে আমি ত্রিভুবনের মালিক, আমার ওপরে আর কেউ

নাই। কিন্তু আমার মালিক ঐ চিরাগ। এখন তা আপনার হাতে, সুতরাং আপনিই আমার একমাত্র মালিক। আজ্ঞা করুন, হুজুর, কী করতে হবে আমাকে?

আলাদিন বলে, শোনও আফ্রিদি, সুলতান তার কন্যা বুদুরকে আমার সঙ্গে শাদী দিতে রাজি হয়েছে। আর তার বদলে আমাকে চল্লিশটা সোনার থালায় ভর্তি করে মণি-মাণিক্য পাঠাতে হবে। আর সেই থালাগুলো প্রাসাদে বয়ে নিয়ে যাবে চল্লিশজন সুবেশা সুন্দরী বাঁদী। তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে চল্লিশটি সুদর্শন সুঠামদেহী নওজোয়ান নিগ্রো নফর। এ সবই তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে, পারবে তো?

আফ্রিদি বিকট মুখব্যাদন করে হাসলো, কী যে বলেন মালিক; এ আবার একটা কাজ নাকি! আমি এক পলকেই আপনার কাছে সব হাজির করে দিচ্ছি।

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চল্লিশজন সুন্দরী বাঁদী আর চল্লিশজন নওজোয়ান নিগ্রো নফরকে এনে হাজির করলো আলাদিনের বাড়ির সামনে। বাঁদীগুলোর প্রত্যেকের মাথায় একখানা করে বিরাট বড় সোনার থালা। আর সেই সব থালায় থরে থরে সাজানো মণি-মাণিক্যের নানা রকম ফল। আলাদিন এর আগে সুলতানকে যা ভেট পাঠিয়েছিলো তার চাইতেও আকারে এগুলো অনেক বড়।

আলাদিন ইশারা করতে আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেলো। আলাদিনের মা বাজার থেকে ফিরে এসে ছেলের শান্তভাব দেখে তাজ্জব বনে যায়। এই এক দণ্ডের মধ্যে আলাদিন এতোগুলো নফর বাঁদীই বা জোগাড় করলো কী করে? আর ঐ সব হীরে চুনি পান্না মণি-মাণিক্য ভর্তি সোনার থালাগুলোই বা কোথায় পেলো সে!

আলাদিন হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

—কী মা, কী দেখছো? খুব অবাক হচ্ছো, ছেলের কাণ্ড দেখে, তাই না? এ আমার এমন কী, তোমার ছেলে আরও অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে মা।

আলাদিন মায়ের হাত থেকে বাজারের থলেটা নিজের হাতে নিয়ে বলে, মা তুমি আর দেরি করো না। এদের নিয়ে এখুনি প্রাসাদে রওনা হয়ে যাও। সুলতানের পায়ের সামনে থালাগুলো নিবেদন করে বলো, জাঁহাপনার সব ফরমাশ এনে হাজির করেছি, এবার শাদীর আজ্ঞা করুন।

আলাদিনের মা চল্লিশজন বাঁদী আর চল্লিশজন নিগ্রো নফরকে সঙ্গে নিয়ে সুলতানের প্রাসাদাভিমুখে রওনা হলো।

এক একজন সুবর্ণ-থালা-বাহক বাঁদী তার সামনে দশ হাত এবং পিছনে দশ হাত দূরে দূরে এক একজন নিগ্রো নফর। সকলেই জমকালো সাজে সজ্জিত। সেই আশিজনের বিশাল বাহিনী নিয়ে আলাদিনের মা প্রাসাদ-ফটকে এসে হাজির হলো এক সময়।

সান্ত্রীরা ছুটে গিয়ে সুলতানকে খবর দিলো, আলাদিনের মা শাদীর দেনমোহর নিয়ে এসেছে, জাঁহাপনার সঙ্গে মোলাকাত করতে। সুলতানের নির্দেশে তাকে বর করে দরবারে নিয়ে আসতে গেলো উজির।

সুলতান সেদিনের মতো দরবারের কাজ মুলতুবী করে সভা ভঙ্গ করে সকলকে বিদায় দিয়ে নতুন অভ্যাগতদের জন্য দরবারকক্ষ মুক্ত করে রাখলেন।

এক এক করে চল্লিশজন সুসজ্জিত নিগ্রো নফর এবং চল্লিশজন সুবেশা সুন্দরী বাঁদী দরবারে প্রবেশ করলো। মেয়েরা সুলতানের মসনদের সামনে সোনার থালাগুলো এক এক করে নামিয়ে রেখে এক পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সকলে। আর এক পাশে দাঁড়ালো নিগ্রো-নফরগুলো। মা এসে দাঁড়ালো ঠিক মাঝখানে। যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আপনার ওয়াদা মতো সবকিছু এনে হাজির করেছি, জাঁহাপনা। এবার আপনি সন্তুষ্ট মনে শাদীর সম্মতি দিলে বাঁদী কৃতার্থ হবে।

সুলতান অভাবনীয় দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি একবার সুবর্ণ থালায় সজ্জিত মণি-মাণিক্যের রত্নফলগুলোর দিকে আর একবার সুন্দরী বাঁদীদের দিকে এবং সুঠামদেহী নিগ্রো নফরদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নয়ন ভরে দেখতে থাকলেন। এই সময়ে আলাদিনের মা যে তাঁকে কুর্নিশাদি জানিয়ে তার আর্জি পেশ করেছে সে দিকে আর একদম খেয়াল নাই। সুলতানকে নীরব থাকতে দেখে আলাদিনের মা প্রমাদ গুণলেন, হায় আল্লাহ, জাঁহাপনার বুঝি পছন্দ হয়নি এ সব।

—আমার গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, কোথায় আমার ত্রুটি হয়েছে জানলে তার বিহিত করতে পারি। মনে হচ্ছে, শাহেনশাহ খুশি হতে পারেননি।

আলাদিনের মা-এর এই কথায় সুলতান সম্বিত ফিরে পান। উজিরের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তাজ্জব ব্যাপার। এই সব দৌলতের কাছে আমার কোষাগারের ধনরত্ন তো তুচ্ছ উজির!

উজির মাথা নাড়লেন, জাঁহাপনা যথার্থই বলেছেন।

সুলতান বললেন, এমন অতুল ঐশ্বর্যের যে মালিক সে হবে আমার জামাতা—এ কি আমার কম সৌভাগ্যের কথা উজির?

—হুজুর যথার্থই বলেছেন।

সুলতান বললেন, আমার কন্যা শাহজাদী বুদুরের রূপের খ্যাতি জগৎজোড়া সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলে এতো বিপুল ধনরত্নের মালিক যে তার স্বামী হবে তাও তো আমি কল্পনা করতে পারিনি, উজির?

—মহানুভব শাহেনশাহ যথার্থই বলেছেন। তবে যদি অভয় দেন একটা কথা বলি, আমাদের শাহজাদী বুদুরের রূপের মূল্য এ-সব ধন-দৌলত দিয়ে মাপা যাবে না, জাঁহাপনা।

সুলতান বুঝলেন, উজির তাকে তোষামদ করতে চাইছে। হেসে বললেন তিনি, না না, উজির ওসব কথা বলে তুমি আমাকে খুশি করতে পারবে না। যে সম্পদ আজ আলাদিন পাঠিয়েছে এখানে তামাম দুনিয়ার সব কিছুর বদলেও তার দাম শোধ হয় না। বুদুর আমার চোখের মণি, আদরের ধন, জগতের সেরা সুন্দরী, কিন্তু, বাবা হয়েও বলছি, এতো দাম তার হতে পারে না। যাই হোক, এরপরে তুমি আর বলতে পার না, উজির, আমি আমার কন্যাকে হাত পা বেঁধে দরিয়ায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।

উজির মুখ কাচুমাচু করে বলে, না, তা অবশ্য নয়—

সুলতান এবার দরবারের অন্যান্য আমির অমাত্যদের দিকে তাকালেন। তারা সবাই সমস্বরে প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো।

—এমন সুপাত্র আর দুটি পাওয়া যাবে না, জাঁহাপনা। আমাদের মনে হয়, মহামান্য আলাদিনই শাহজাদী বুদুরের একমাত্র যোগ্য পাত্র।

সকলে উঠে দাঁড়িয়ে আভূমি আনত হয়ে তিনবার কুর্নিশ জানালো সুলতানকে। অর্থাৎ তারা সকলে সর্বান্তঃকরণে সম্মতি দিলো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো আটান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সুলতান এবার আলাদিনের মা-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার পুত্র আলাদিনের অতুল সম্পদ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু বুদুরকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে পেতে গেলে টাকাটাই তো একমাত্র ব্যাপার নয়, এখন বল তোমার পুত্র আর কী কী গুণের অধিকারী?

আলাদিনের মা বললো, ছেলে আমার রূপবান, অবশ্য লোকে বলে। আমি মা, মা-এর চোখে সব সন্তানই অপরূপ, সুতরাং আমার মতামত আপনাকে শোনাবো না, জাঁহাপনা। আমার চোখে ছেলে বড় দুবলা; কিন্তু অপরে বলে আলাদিনের মত সুন্দর স্বাস্থ্যবান নওজোয়ান নাকি এ শহরে খুব বেশি নাই।

—ব্যস ব্যস, সুলতান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, আর বলতে হবে না। রূপ আছে, যৌবন আছে, দৌলত আছে এর চেয়ে বেশি তো আর কী চাই? এ-ই বুদুরের একমাত্র যোগ্য বর। আমি আর একদিনও দেরি করতে চাই না পাত্রের মা। আজ থেকেই তাকে আমি আমার বাদশাহী খানদানীর এক শরিক করে নিতে চাই। এই মুহূর্ত থেকে আমি আমার পুত্রাধিক স্নেহে বুকে টেনে নিতে চাই। পবিত্র গ্রন্থ সাক্ষী রেখে তার সঙ্গে আমার কন্যার শাদী দেব আজ সন্ধ্যায়। এই আমার পাকা কথা।

আলাদিনের মা দরবার থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে আসে। আলাদিন অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসেছিলো। না জানি আবার কোন বাগড়া আসে। মাকে ছুটে আসতে দেখে আলাদিন বুঝতে পারে, সংবাদ শুভ।

আলাদিন বলে, কী সংবাদ এনেছ, মা?

মা বলে, সুলতান পাকা কথা দিয়েছেন। আজই শাদী হবে।

আলাদিনের আনন্দ আর ধরে না। এতদিনে তার মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। মা বলে, সবই আল্লাহর অসীম কৃপাতে সম্ভব হতে চলেছে, বাবা। তাঁর করুণা ছাড়া এ-অসম্ভব কী করে সম্ভব হতে পারে? নে আর দেরি করিস নে, তৈরি হয়ে নে। সন্ধ্যের আগেই রওনা হতে হবে।

আলাদিন নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে প্রদীপটা বের করে আলতোভাবে ঘষে। এবং তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হয় সেই আফ্রিদি। আলাদিন বলে, শোনো চিরাগের বান্দা, আমি আগে গোসল করবো, তারপর জমকালো শাহজাদার সাজপোশাকে সাজবো। এমন বাহারী মূল্যবান পোশাক আমার জন্যে আনবে যা দুনিয়ার আর কেউ যেন যোগাড় করতে না পারে। লোকে দেখে যাতে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমার দিকে। খুব কম করে হলে লক্ষ কোটি দিনার তার দাম হওয়া চাই।

আফ্রিদি কুর্ণিশ জানিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বসে বললো, আপনি আমার পিঠে চেপে বসুন, মালিক। আমি আপনাকে হামামে নিয়ে যাব।

আলাদিন চেপে বসলে আফ্রিদি তাকে নিয়ে আকাশ পথে উড়তে উড়তে এক সুরম্য হামামে নিয়ে এসে হাজির হলো। এমন চোখ ঝলসানো হামাম কোনও সুলতান বাদশাহও চোখে দেখেনি কখনও। আগাগোড়া ইমারতটা স্ফটিকে নির্মিত। প্রবাল, পোখরাজ, পান্না, মতি দিয়ে নানারকম কারুকার্য করা। একটা বিশাল ফুলবাগিচার মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের নিচে এই হামাম। বাগিচার মাঝখানে একটি বিরাট জলের ফোয়ারা—অবিরত ধারা বহন করে চলেছে। তাকে ঘিরে প্রশস্ত এক জলধারা—প্রায় পুকুরের মতো। স্বচ্ছ নির্মল নীল জল—নিথর। মনে হয় এখানে কেউ কখনও অবস্থান করেনি এর আগে। আলাদিন এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারলো, ধারে কাছে কোনও লোকালয় নাই। শুধু পাখির কূজন ছাড়া জন-মানবের কোনও সাড়া নাই।

অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কেটে স্নান করলো আলাদিন। আফ্রিদি সাজ-পোশাক নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো পুকুরের পাড়ে। আলাদিন জল থেকে উঠে এসে ঐ সাজ-পোশাকে শাহজাদার মতো করে সাজলো।

এরপর আফ্রিদি আবার তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে নামায়। আলাদিন বলে, এর পর তোমাকে কী করতে হবে জান, বান্দা?

আফ্রিদি বলে, হুকুম করুন, মালিক।

আলাদিন বলে, আমার জন্যে একটা চমৎকার তাজি ঘোড়া নিয়ে এসো। সব চেয়ে সেরা হওয়া চাই। সেই সঙ্গে আটচল্লিশটা সুঠাম সুন্দর নওজোয়ান বান্দা নিয়ে আসবে। ওরা আমার ঘোড়ার দুই পাশে এবং সামনে পিছনে বারজন করে সারিবদ্ধভাবে প্রহরী হয়ে চলবে। এছাড়া আরও বারটি সুবেশা সুন্দরী বাঁদী চাই আমার মা-এর জন্য। মাকে বৃত্তাকারে ঘিরে সুলতানের প্রাসাদে নিয়ে যাবে তারা। আরও একটা কথা, আমার আটচল্লিশজন দেহরক্ষী প্রত্যেকের গলায় একটা করে পাঁচ হাজার দিনার ভর্তি বটুয়া ঝোলানো থাকবে। প্রয়োজন হলে যাতে আমি সেই অর্থ দু'হাতে খরচ করতে পারি। বৎস, এখন এই পর্যন্ত। তুমি এসো।

রাত্রির অন্ধকার সরে যেতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো ঊনষাটতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলাদিনের কথা শেষ হতে না হতেই আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। পর মুহূর্তেই সে একটা আরবী তাজি ঘোড়া, আটচল্লিশটা বান্দা, বারটি সুন্দরী বাঁদী এবং অন্যান্য যে-সব জিনিসপত্র আলাদিন ফরমাস করেছিলো—সব যথাযথ এনে হাজির করলো। এবং সব কিছুই বড় চমৎকার। আলাদিন যেমন যেমন চেয়েছিলো তার চেয়েও সুন্দর।

আলাদিন বললো, ঠিক আছে, এখন তুমি যাও। আবার যখন দরকার হবে ডাকবো।

আফ্রিদি অভিবাদন জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আলাদিন ঘোড়ায় চেপে বসলো। বান্দারা সারিবদ্ধভাবে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। মা সেজেগুজে বাইরে আসতে বাঁদীরা তাকে বৃত্তাকারে ঘিরে নিলো।

এইবার আলাদিন শহর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লো। রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে শত সহস্র মানুষ জমায়েৎ হতে লাগলো। সুলতানের হবু জামাতা আলাদিনকে দেখার কৌতূহলে পর্দানসীন মেয়েরাও জানালার পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে রইলো পথের দিকে।

মহা সমারোহে পথ পরিক্রমা শেষ করে এক সময় মিছিল প্রাসাদ ফটকে এসে হাজির হলো।

সুলতান আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন আলাদিন সদলে প্রাসাদ অভিমুখে আসছে। যথাযোগ্য সমাদরে হবু জামাতাকে বরণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। সুলতান স্বয়ং প্রাসাদ প্রাঙ্গণের ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলাদিনকে অভ্যর্থনা করার তদারক করছিলেন।

উজির হাতে ধরে আলাদিনকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করলো। আলাদিন এগিয়ে গিয়ে সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে যথাবিহিত কুর্নিশ জানালো। আলাদিনের সুন্দর চেহারা এবং তার মূল্যবান সাজ-পোশাক দেখে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমির অমাত্য সেনাপতিদের হর্ষধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে নানারকম বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠলো এক অপূর্ব ছন্দলহরী তুলে!

সুলতান আলাদিনকে এক হাতে বেষ্টন করে ধীর পদক্ষেপে দরবার কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, খোদা হাফেজ, বাবা, আল্লাহর অভিপ্রায় কেউ এড়াতে পারে না। শাহজাদী বুদুরের সঙ্গে তোমার মিলন বিধাতার লিখন, তাই শেষ পর্যন্ত তা ঘটতে চলেছে। অনেক আগেই এ শাদী হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক যা হয়ে গেছে ও নিয়ে এখন সে জন্য আমি দুঃখিত বাবা। যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, ও নিয়ে এখন আমার খেদ নাই। সব ভালো যার শেষ ভালো।

এরপর চতুর্থ খণ্ডে

৪
সহস্র এক আরব্য রজনী

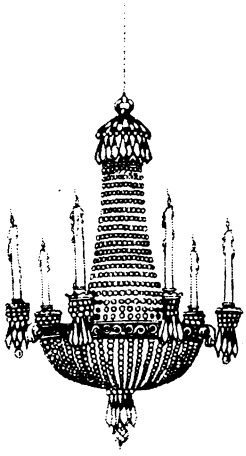

সহস্র এক আরব্য রজনী

কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

মৌসুমী প্রকাশনী ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯

ডঃ জে. সি. মারদ্রুস

সহস্র এক আরব রজনী

অসংক্ষেপিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ

চতুর্থ খণ্ড

ভাষান্তর : ক্ষিতীশ সরকার

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সত্য চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ
১লা অক্টোবর, ১৯৮২

পরিমার্জিত শোভন সংস্করণ
জুন, ২০১১

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯
কম্পোজ
বর্ণায়ন
৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
মুদ্রক
পপুলার এন্টারপ্রাইজ
৩৫এ/৩ বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, কল-৬৭

দাম : ২০০ টাকা

আলাদিন বললো, ফল পাকবার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। সময় না হলে তা ভোগের যোগ্য হয় না, জাঁহাপনা।

আলাদিনের এই চমৎকার সারবান কথায় মুগ্ধ হন সুলতান।

—আজ আমি ধন্য আলাদিন, তোমার মত যোগ্য পাত্র কার না কাম্য। দুনিয়ার যে-কোনও সুলতান বাদশাহ তোমাকে জামাতা করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো।

দরবারে নিজের তখ্‌তের একপাশে বসিয়ে আলাদিনের সঙ্গে নানারকম সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ আলোচনায় মেতে উঠলেন সুলতান।

এর পর খানা-পিনার আয়োজন করা হয়। দরবারের আমির অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে সুলতান এবং আলাদিন আহারাদি সমাধা করেন। এই ভোজসভার প্রধান পরিবেশক ছিলো সেই বাঁদরমুখো বুড়ো প্রধান উজির। সে নিজে হাতে সুলতান এবং আলাদিনের খানাপিনা পরিবেশন করলো।

আহার উৎসব শেষ হলে সুলতান কাজী এবং সাক্ষীদের ডেকে পাঠালেন। তার এসে শাদী-নামা বানিয়ে সইসাবুদ করে দিয়ে বিদায় নিলো।

সুলতান আলাদিনকে বললো, বাবা, আজ রাতে তুমি কি বাসরঘরে বুদুরকে নিয়ে সহবাস করবে?

আলাদিন বলে, জাঁহাপনা, যে শুভ মুহূর্তটির জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি এতো কাল, সেই সৌভাগ্য আমি হাতের মুঠোয় পেয়ে আর ক্ষণকাল বিলম্ব করতে চাই না। শাহজাদী বুদুরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমার হৃদয়মন আকুল হয়ে উঠেছে। আমি তাকে একান্ত করে পেতে চাই জাঁহাপনা। প্রাসাদের ওই কল-কোলাহল আমাদের ভালোবাসার অন্তরায় হয়ে উঠবে। তাই আমি আপনার এই প্রাসাদকক্ষে আমার বিবিকে নিয়ে সহবাস করতে ইচ্ছা করি না।

সুলতান বললেন, বেশ তো তুমি যদি জনসমারোহ পছন্দ না করো তবে তোমার জন্য আমি আমার প্রমোদ বিরাহের নিরালা নির্জন প্রাসাদকক্ষই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সেখানে প্রকৃতির অপরূপ শোভা তোমাদের মুগ্ধ করবে। বাইরের কোনও অবাঞ্ছিত মানুষ বিরক্ত করতে যাবে না।

—না, জাঁহাপনা। শাহজাদী বুদুর আমার প্রাণের স্পর্শমণি। তাকে আপনার জলসাঘরে নিয়ে তুলতে চাই না। সে ফুলের মতো পবিত্র নির্মল। বহু বাঁদীর নূপুর নিক্কণে যে প্রাসাদের পাথরের মেঝে কলঙ্কিত হয়ে আছে শাহজাদী বুদুর সে ঘরে পা রাখবে না।

সুলতান আহত হলেন, ঈষৎ; কিন্তু আনন্দিত হলেন ততোধিক। কী অপরূপ মান ইজ্জৎ বোধ! বুদুর তার প্রাণাধিক কন্যা। প্রমোদ-বিহারের রঙমহলে তাকে নিয়ে যাওয়া যে অসঙ্গত এ চৈতন্য তিনি আলাদিনের কাছ থেকেই পেলেন। জামাতার বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা ও আত্মসম্মানবোধে সুলতান বিমোহিত হয়ে গেলেন।

—তা হলে তুমিই অভিপ্রায় ব্যক্ত কর বেটা, তোমাদের মধুযামিনী কোথায় হতে পারে। যেখানে বলবে সেখানেই আমি ব্যবস্থা করে দেব।

আলাদিন বললো, এই প্রাসাদের এ পাশে যে বিশাল ফাঁকা মাঠটা পড়ে আছে ঐ মাঠে আমি একখানা নতুন প্রাসাদ বানাতে চাই, জাঁহাপনা। সেই নতুন প্রাসাদে আমি আমর বিবিকে নিয়ে বসবাস করতে চাই। এখন আপনার অনুমতি পেলেই আমি কাজে হাত দিতে পারি।

—এ অতি উত্তম কথা। তুমি আমার শুধু জামাতা নয়। পুত্রসম প্রাণাধিক প্রিয়। তোমার যেখানে খুশি যেমন খুশি, প্রাসাদ ইমারত বানাও, এর জন্য আমার কোনও অনুমতির প্রয়োজন নাই, বাবা। তোমরা দুজনে বেহেস্তের সুখে সম্পদে দিন কাটাবে—এই তো আমি

আশা করবো। তার জন্য যা যা দরকার আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তাহলে আর দেরি করো না বাবা, চটপট প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করে দাও। বলা তো যায় না, বুড়ো হয়েছি, কবে আছি কবে নাই, যাবার আগে তোমরা ঐ প্রাসাদে বসবাস করছো—পুত্র পরিবার নিয়ে ধন সম্পদ সুখ বিলাসের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছ—দেখে মরতে চাই।

আলাদিন বললো, এবার আমাকে অনুমতি করুন, জাঁহাপনা, আমি আমার বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি।

আলাদিন নিজের বাড়িতে ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে চিরাগটা বের করে আলতোভাবে ঘষতেই আফ্রিদি দৈত্য এসে হাজির হলো।

আলাদিন বললো, তোমার এতাবৎ সব কাজে আমি খুব খুশি হয়েছি, বান্দা। কিন্তু এবারে তোমাকে আরও অনেক কঠিন কাজের ভার দেব।

আফ্রিদি অভিবাদন জানিয়ে ঘোৎ ঘোৎ করে নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ তুলে বললো, হুকুম করুন, মালিক, কঠিন বলে কোনও কাজ আমার কাছে নাই।

আলাদিন বললো, জানি। সেইজন্যেই ভরসা করে তোমাকে ডেকেছি। শোনো, সুলতানের প্রাসাদের পাশে যে ফাঁকা মাঠটা আছে সেখানে আমি এক অনিন্দ্যসুন্দর হর্ম্যপ্রাসাদ বানাতে চাই। সারা দুনিয়ায় তার তুল্য ইমারত কোথাও কেউ কখনও দেখেনি এবং ভবিষ্যতেও দেখবে না—এমনি হওয়া চাই, পারবে তো?

আফ্রিদি আকর্ণ বিস্তৃত দাঁত বের করে হাসলো, কী যে বলেন, কত্তা, এ আবার একটা কঠিন কাম নাকি। আগাগোড়া প্রাসাদটা আমি পান্নার পাথর দিয়ে বানিয়ে দেব। তার ভিতরে বাইরে হীরে, চুনী, মুক্তো, নীলা, চন্দ্রকান্তমণি, পলা, পোখরাজ—নানারকম মণি-মাণিক্য দিয়ে কারুকাজ করা হবে। এখন বলুন, এ জিনিস আপনি পছন্দ করেন কিনা?

আলাদিন অবাক হয়ে বলে, আগাগোড়া প্রাসাদটা পান্নার পাথর দিয়ে গড়া হবে? কিন্তু সে তো পাহাড়প্রমাণ পান্না লাগবে, বান্দা!

—তা লাগুক। সে আমি ব্যবস্থা করবো। আপনি ওসব নিয়ে আদৌ চিন্তা-ভাবনা করবেন না মালিক। শুধু হুকুম করুন, আপনার কী পছন্দ।

আলাদিন বলে, ঠিক আছে, আমি আর ভাবতে পারছি না, তুমি যা ভালো বোঝ, তাই কর। শুধু খেয়াল রাখবে, দেখা মাত্র লোকে যেন বাহবা দিয়ে বলে, এমনটি আর হয় না। আর একটা কথা, প্রাসাদের মাথার উপরে ঠিক মাঝখানে একটা বিশাল গম্বুজ বসানো থাকবে। এই গম্বুজটাকে কয়েকটা সোনা আর চাঁদীর থাম মাথায় করে ধরে রাখবে। আর গম্বুজটা হবে স্বচ্ছ স্ফটিকের। সূর্যের কিরণ পড়লে গগণমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এছাড়া সারা প্রাসাদের চারপাশে যেন নিরানব্বইটা জানলা থাকে। এই সব জানলাগুলোর কার্নিশ প্রবাল পাথরের তৈরি হবে। এবং হীরে মতি ও মূল্যবান মণি-মাণিক্যে খচিত থাকবে এর পাল্লা আর চৌকাঠগুলো। আর হ্যাঁ, ভুলে যেও না, প্রাসাদের সামনে এক অনুপম বাগিচা থাকবে। তার মাঝখানটা ঝর্ণা, ফোয়ারা, পানির চৌবাচ্চা এবং বিলাসের নানা উপকরণে সুসজ্জিত হবে।

আফ্রিদি মাথা নুইয়ে বলে, যথা আজ্ঞা মালিক। আর কিছু অভিপ্রায় আছে?

—ওঃ, হ্যাঁ, শোনো, প্রাসাদের তলায় মাটির নিচে একটা গুপ্তঘর থাকবে। এটি হবে আমার কোষাগার। এই ঘরে মূল্যবান মণি-মাণিক্য, ধনরত্ন এবং সোনা-দানায় ঠাসা থাকবে। এছাড়া রসুইখানা, আস্তাবল এবং দাসদাসী নফর চাকরদের থাকার জন্য আস্তানা। সেগুলো সম্বন্ধে তোমাকে আর পরামর্শ দেবার কিছু নাই। যেমন ভালো বুঝবে তেমনি করে বসাবে। ব্যস এখন এই পর্যন্ত। এবার যাও; সব ঠিকঠাক বানিয়ে তবে আমার কাছে ফিরে আসবে।

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

পরদিন ভোর হতে না হতেই আবার সে আলাদিনের কামরার শয্যাপাশে এসে দাঁড়ালো। আলাদিন তখনও নিদ্রামগ্ন। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক দিয়ে অদ্ভুত ধরনের সেই আওয়াজ বের করতেই আলাদিনের ঘুম ছুটে যায়। আফ্রিদি কুর্নিশ জানিয়ে বললে, মালিক আপনার আজ্ঞামত সব তৈরি। মেহেরবানী করে আপনি গিয়ে একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।

আলাদিন বললো, বেশ, চলো যাই দেখে আসি।

আফ্রিদির পিঠে উঠে বসতে সে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেলো সুলতানের প্রাসাদের পাশের খালি ময়দানে নব নির্মিত ইমারতের সামনে। প্রথম দর্শনেই আলাদিন খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, বাঃ চমৎকার। এতো আমি যা কল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক সুন্দর বান্দা!

—মেহেরবানী করে ভিতরে চলুন মালিক।

ভিতরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় আলাদিন। একি ব্যাপার! মর্তলোকে না বেহেস্তে এসে দাঁড়িয়েছে সে? আলাদিন বলে, আমি কিন্তু এতোটা ভাবিনি। তুমি যা বানিয়েছো, সত্যিই তার তুলনা নাই।

খুটিয়ে খুটিয়ে সব ঘুরে দেখতে থাকে আলাদিন। যেখানে যে বস্তুটি থাকলে দেখতে বাহারী হয় তাই বসানো হয়েছে। মাটির নিচের ঘরটা দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। অমন হীরা মণি-মাণিক্যের দ্যুতি কী কেউ খোলা চোখে সহ্য করতে পারে?

আলাদিন বললো, তোমাকে বহুত বাহবা দিচ্ছি নফর। কিন্তু একটা জিনিস করতে বাকী রয়ে গেছে। অবশ্য তোমার কোনও দোষ নাই। আমিই বলতে ভুলে গেছি।

আফ্রিদি সাগ্রহে জানতে চায়! কী করতে হবে, মালিক?

—সুলতানের প্রাসাদ আর আমার প্রাসাদের মাথার ওপর দিয়ে একখানা গালিচা পাতা থাকবে, শাহজাদী বুদুর তার ইচ্ছামত এ প্রাসাদ থেকে ও প্রাসাদে যাতে খালি পায়ে যাতায়াত করতে পারেন তার জন্য এটা দরকার।

আফ্রিদি বলে, এতো আলবৎ দরকার, মালিক। তিনি তো আর মাটিতে পা রেখে এ প্রসাদ-ওপ্রসাদ করতে পারেন না। সেইজন্যে আপনি না বললেও আমি নিজে থেকেই দুই প্রাসাদের মাথার ওপর দিয়ে একখানা গালিচা বীথি তৈরি করে দিয়েছি।

আলাদিন খুব খুসি হলো আফ্রিদির কথা শুনে। কিন্তু অবাক হলো তখুনি!

—কই, কোথায় তোমার গালিচা বীথি, বান্দা? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

আফ্রিদি হাসে, আছে, আপনি প্রাসাদের ওপরে চলুন দেখতে পাবেন।

উপরে উঠে আসতে আলাদিনের ভ্রম ঘুচলো। একখান হাল্কা মেঘরঙের মখমলের গালিচা ও প্রাসাদ থেকে ও প্রাসাদের ছাদ পর্যন্ত বিছান আছে। বলে না দিলে মনে হতে পারে একখণ্ড মেঘ ভেসে রয়েছে মাত্র।

—নিখুঁত সুন্দর, আলাদিন আনন্দে নেচে ওঠে, এমন অপূর্ব সুন্দর কখনও দেখিনি কেউ। সত্যিই তোমার কাজ তারিফ করার মতো বান্দা! আমি খুব খুশি হয়েছি! চলো, দেখা আমার শেষ হয়েছে, এবার আমাকে আবার ঘরে পৌঁছে দাও।

আফ্রিদি আলাদিনকে নিয়ে উড়ে চলে গেলো তার ঘরে।

এদিকে সুলতান-প্রাসাদে তখন বিস্ময়ের বান ডেকেছে। প্রাসাদের প্রহরী কর্মচারী নফর চাকররা সকালবেলায় ঘুম থেকে চোখ খুলেই দেখে পাশের খোলা ময়দানে এক সুরম্য প্রাসাদ, তার বর্ণাঢ্যে চোখ ঝলসে যায়। মাথার ওপরের স্ফটিকের গম্বুজটায় তখন সূর্যকিরণ

পড়ে জ্বলন্ত এক সূর্যগোলকে পরিণত হয়েছে। সবাই মিলে ছুটে গেলো উজিরের কাছে। উজির অবিশ্বাস নিয়ে বাইরে এসে তাজ্জব বনে যায়। দ্রুত পায়ে সে ছুটে যায় সুলতান-সকাশে।

—জাঁহাপনা আপনার জামাতা আলাদিন এক কুশলী যাদুকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুলতান উজিরের একস্বিধ উক্তিতে অসম্মানিত বোধ করেন।

—কেন? কী দেখলে তার?

—আপনি বাইরে বেরিয়ে দেখুন জাঁহাপনা, এক রাতের মধ্যে প্রাসাদের প্রান্তে সে এক বিশাল ইমারত বানিয়ে ফেলেছে। এতো কোনও মানুষের সাধ্যে সম্ভব হতে পারে না, হুজুর।

—কেন হতে পারে না, উজির! ওসবই তোমাদের ঈর্ষার কথা। যে মানুষ পৃথিবীর দুষ্প্রাপ্য মণি-মাণিক্যের মালিক, যার ধন-দৌলতের কোন সীমা পরিসীমা নাই, সে শুধু বিত্তবানই নয়, অসীম ক্ষমতাবানও বটে। তার ধনবল যেমন অপার জনবলও তেমনি অপর্যাপ্ত থাকতে পারে। সুতরাং তার মতো মানুষের পক্ষে রাতারাতি একখানা ইমারত বানানো কী অসম্ভব ব্যাপার হতে পারে?

উজির বুঝলো, সুলতান স্নেহবন্ধ হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় তাঁকে অন্যরূপে বোঝাতে গেলে বিপত্তি ঘটতে পারে। তাই সে আর দ্বিরুক্তি না করে চুপ করে গেলো।

এ প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই থাক এখানে। এখন আমরা আবার আলাদিনের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো একষট্টিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ঘরে ফিরে এসে আলাদিন মা-এর কাছে গিয়ে বললো, মা তৈরি হয়ে নাও। একটু পরেই আমরা প্রাসাদে যাবো। তোমার বাঁদীদেরও তৈরি হয়ে নিতে বলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে আলাদিন নিজেও সেজেগুজে ঘোড়ায় চেপে বসলো। বেরিয়ে এলো বারজনে সারিবৃত হয়ে। আলাদিন মাকে উদ্দেশ্য করে বললো, মা আমি আমার মত নফরদের সঙ্গে নিয়ে চললাম। তুমি তোমার মতো বাঁদীদের নিয়ে প্রাসাদে চলে এসো।

আলাদিন শহর পরিক্রমা করতে করতে এগোতে থাকে। কিন্তু আলাদিনের মা সোজা পথে অনেক আগেই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে হাজি হলো।

সুলতান নিজে এসে সাদর অভ্যর্থনা করলো জামাইএর মাকে। খোজাদের হুকুম করলো, যা এঁকে শাহজাদীর কাছে নিয়ে যা।

—যান, ওদের সঙ্গে যান, ছেলের বৌকে একবার দেখুন।

শাহজাদী বুদুর শাশুড়ীকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে সালাম জানিয়ে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ফরাসে বসালো। দাসী বাঁদীরা নানারকম সরবৎ গোলাপজল মিঠাই মণ্ডা ইত্যাদি নিয়ে এসে সামনে সাজিয়ে দিলো। শাহজাদী অনুরোধ জানায়, একটু কিছু খান, মা।

মা-এর মন ভরে যায়। আহা, কী মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বর। অপলক চোখে সে তাকিয়ে তাকিয়ে বুদুরকে দেখতে থাকে। বিধাতা পুরুষ এমন নিখুঁত করে গড়েছেন কী করে তাকে—সেই কথা সে ভেবে পায় না।

বুদুরের রূপে মোহিত হয়ে গিয়েছিলো আলাদিনের মা। এমন সময় তার কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় বলে, হ্যাঁ, খাবো মা। তুমিও খাবে তো?

বুদুর বলে, বেশ, খাবো। আপনি খান, আমিও নিচ্ছি।

একটু পরে সখিরা বুদুরকে সাজাতে বসে। তার চুল বেঁধে দিলো এক অপূর্ব ছাঁদে। মুখে মাখিয়ে দিলো মসৃণ প্রসাধন। দেহে পরালো নানারকম মূল্যবান আভরণ অলঙ্কার! জমকালো সাজ-পোশাক পরে যখন সে উঠে দাঁড়ালো, আলাদিনের মা ভাবতে থাকলো, মাটির দেশে এ মেয়ের জন্ম হলো কী করে?

সন্ধ্যা সমাগত। এবার পাত্রী তার জন্য নির্মিত নতুন প্রাসাদে যাবে। সেখানেই যাপন করবে তারা মধুযামিনী। আলাদিন তার নিজের প্রাসাদের ছাদে গালিচা-বীথির পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো তার প্রাণাধিকা বুদুরের জন্য।

শাহজাদী এক এক করে মা বাবার কাছে বিদায় নিলো। তার সঙ্গে চলেছে শতাধিক দাসী বাঁদী খোজা নফর। বাজিয়েরা অপূর্ব তালে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করলো। সুরের মুর্ছনায় প্রাসাদ-পরিবেশ মুখরিত হয়ে উঠলো। শাহজাদী ধীর পায়ে গালিচা-বীথি অতিক্রম করে নতুন প্রাসাদে চলে এলো। আলাদিন স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়েছিলো, এগিয়ে এসে সে বুদুরের হাত ধরে প্রাসাদের বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। সে ঘরে অন্য কোনও লোকের ভিড় নাই। শুধু আলাদিন তার মা আর বুদুর।

নানা উপাচারে খানাপিনা সাজানো হয়েছিলো। বিশাল টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো সোনার থালায় নানা দেশের নানারকম মুখরোচক আহার্য।

আলাদিনের মা বুদুরকে বলে, এসো মা, আমরা খানাপিনা শেষ করে নিই।

খেতে বসে বুদুর মুখে গ্রাস তুলতে ভুলে যায়। হাঁ করে সে দেখতে থাকে প্রাসাদের অপরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য। সে প্রাসাদ পরিবেশে মানুষ। দুনিয়ার সেরা সেরা শিল্পকর্ম সে দেখেছে, কিন্তু এমন অসাধারণ বস্তু কখনও প্রত্যক্ষ করেনি জীবনে।

—এসব কী করে, কারা বানিয়েছে, মা?

মা এ কথার কী জবাব দেবে। আলাদিন বলে, কেন ভালো হয়নি?

—ভালো? একে যদি সামান্য ভালো বলো, তা হলে এতকাল আমরা যা দেখেছি জেনেছি সে সবকে তো কুৎসিত বলতে হয়। আমি বলছি, এই যে শিল্পকর্ম ছড়িয়ে আছে সারা প্রাসাদের প্রতিটি দেওয়ালে চাতালে, আবসাবপত্রে, এমন শিল্পীরা কী দুনিয়ায় আছে?

আলাদিন হাসে, কেন থাকবে না। না থাকলে এসব হলোই বা কী করে?

বুদুর তন্ময় হয়ে ঘাড় নাড়ে, তবু সে খাবারের থালায় চোখ নামাতে পারে না। অপলকভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখতে থাকে।

আলাদিনের মা মোটা বুদ্ধির মানুষ, প্রাসাদটা দেখতে বড় বাহারী হয়েছে, এ কথা সেও তারিফ করেছে। কিন্তু শিল্পীর সূক্ষ্ম কাজ বোঝার মতো অমন সংবেদশীল মন তার নয়—সে ওসব বুঝবে কী করে? কিন্তু বুদুরের যে শিক্ষা-দীক্ষা আছে। সে বুঝতে পারে, সুচারু শিল্পকর্ম দেখে সে রসাপ্লুত হতে পারে।

বুদুর দেখে খুশি হতে পেরেছে জেনে আলাদিনের মনে আনন্দ আর ধরে না। খেতে খেতে বুদুর তারিফ করে, আজ এমন এক পরিবেশের মধ্যে আমি এসে পড়লাম, এমনটা শুনেছি ইস্কান্দার বা সুলেমানের সময়েই নাকি সম্ভব হতো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো বাষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

খানাপিনা শেষ হলো। সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। রাত্রির মাদকতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বড় ঘরে এক দল সুবেশ সুন্দরী বাঁদী এসে দাঁড়ালো। সকলের হাতে বাদ্যযন্ত্র।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নাচ গানের আসর জমে ওঠে। আলাদিন বুদুরকে হাতে ধরে বাসরকক্ষে নিয়ে আসে। এক এক করে ওর দেহের সকল বেশবাস সে খুলে এক পাশে রেখে দেয়। শাদীর প্রথম রাতে এই রীতিই প্রচলিত।

এর পর যা ঘটতে পারে তাই ঘটেছিলো। সে সব খুঁটিনাটি বিবরণের কোন প্রয়োজন নাই।

রাত্রি শেষ হলো, সকালে শাহজাদী বুদুরের বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়। আলাদিন সেজেগুজে আস্তাবলে গিয়ে একটি তাজি ঘোড়া বেছে নিয়ে চেপে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলো। আলাদিনকে পেয়ে সুলতান খুশিতে উপচে পড়লেন।

আশা করি তোমাদের প্রথম মিলন রাত্রি সুখের হয়েছে বেটা? বুদুর কেমন আছে?

আলাদিন বলে, ভালো, খুবই ভালো কেটেছে, জাঁহাপনা। বুদুর এখন সুখ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমি আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আজ আপনি আপনার উজির আমির অমাত্যদের নিয়ে আমার প্রাসাদে পায়ের ধুলো দিলে আমি ধন্য হবো।

সুলতান বললেন, এ তো বড় আনন্দের কথা, বাবা। চলো, আমি এখুনি যাবো তোমার প্রাসাদে।

সুলতান আলাদিনকে সঙ্গে করে উজির আমির অমাত্য সমভিব্যাহারে তখনি জামাই-এর প্রাসাদ পরিদর্শন করতে বেরুলেন।

দূর থেকে দেখে প্রাসাদের ভিতরের অসাধারণ কারুকর্ম আন্দাজ করতে পারেননি সুলতান। যতই দেখতে থাকেন ততই মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। এমন জাঁকজমক বিলাসবহুল প্রাসাদ তিনি কল্পনাতেও ভাবতে পারেননি কখনও। কোন্ দক্ষ কারিগর বানিয়েছে এসব, সেই কথা ভেবেই তিনি অবাক হন। জানালাগুলো এক এক করে গুণে দেখলো, মোট নিরানব্বইটি, প্রতিটি জানালা সুন্দর করে সাজানো—তাদের চারপাশ ঘিরে সে কি অপরূপ চারুকলার নিদর্শন! শুধুমাত্র একটি জানালার কাজ অসম্পূর্ণ।

আলাদিন সুলতানকে সঙ্গে করে বুদুরের বাসরকক্ষে নিয়ে গেলো। মেয়ের মাথায় হাত রেখে সুলতান আদর করে বললেন, ভালো আছিস, মা? দুঃস্বপ্ন কিছু দেখিসনি তো?

বুদুর সলজ্জ হাসি হেসে অস্ফুট স্বরে বলে, না বাবা। ভালোই ঘুমিয়েছি।

সুলতান বুঝলেন, কন্যা সুখ-সম্ভোগে মধুযামিনী যাপন করেছে। আলাদিনকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করেছ, বাবা। আশীর্বাদ করি, চিরজীবন সুখে থাক।

এরপর কন্যা জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে আহার করলেন সুলতান। আফ্রিদির দৌলতে নানাবিধ মুখরোচক খানা-পিনায় আপ্যায়ন করলো আলাদিন। সুলতান সে-সব অসাধারণ খাবার-দাবার জীবনে কখনও চোখে দেখেননি। কী তার সুবাস, কী তার জিভে জল আসা আস্বাদ!

রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো তেষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

খানা-পিনা শেষ হলে আলাদিন বললো, আমার প্রাসাদ দেখে আপনার কেমন লাগলো, জাঁহাপনা।

সুলতান বলল, এক কথায় অপূর্ব—অসাধারণ। তামাম দুনিয়ায় এর কোনও জুড়ি নাই। শুধু একটি জানালার কারুকাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে দেখছি। যাই হোক, আমি আমাব জহুরীদের ডেকে কাজটুকু সমাধা করে দিচ্ছি।

এই বলে তিনি উজিরকে বললেন কারিগর আর জহুরীদের শমন পাঠাও। এখুনি—এখানে আসতে বলো।

সুলতানের হুকুমে তৎক্ষণাৎ শহরের সেরা জহুরী এবং কারিগররা এসে হাজির হলো সেখানে। সুলতান বললেন, ঐ দেখছো একটি জানালা—এটার কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

জহুরীরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। অন্য সব জানালায় যে ধরনের হীরে জহরত বসানো আছে তার সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করতে হবে। অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে তারা অবনত মস্তকে এসে দাঁড়ালো সুলতানের সামনে!

—গোস্তাকি মাফ করবেন, জাঁহাপনা, পাশের সব জানালায় যে ধরনের কাজ রয়েছে, তা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সারা দেশ খুঁজেও ঐ একটা জানালার একশো ভাগের এক ভাগ পরিমাণ হীরে জহরত সংগ্রহ করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। কোনও অর্থের বিনিময়েই ঐ সব একটা মণিরত্ন সংগ্রহ করা যাবে না।

সুলতান উজিরকে বললেন, তুমি আমার কোষাগারে যাও। সেখানে যা কিছু মূল্যবান ধনরত্ন আছে নিয়ে এসো এখানে! জহুরীদের দেখাও সে-সব দিয়ে তারা জানালাটার কাজ সমাধা করে দিতে পারে কিনা।

—জো হুকুম, জাঁহাপনা!

উজির সুলতানের ধনাগারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলো। সুলতান কিছুটা আহত কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তার এই সলতানিয়তের জহুরীদের কাছে এতোটা ধনরত্ন পাওয়া গেলো না—এই সব ধনরত্নের সমান।

আলাদিন সুলতানের অবস্থা বুঝতে পেরে ব্যাপারটাকে সহজ করে তোলার জন্য গান-বাজনার আয়োজন করে। মনে আশা, সঙ্গীতের মূর্ছনায় হয়তো বা তিনি একটু সহজ হতে পারেন।

ফল যে হলো না-তা নয়। সুলতান কিছুক্ষণের জন্য গানের জগতে তন্ময় হয়ে পড়লেন। কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র। উজির ফিরে আসতেই তিনি আবার সেইদিকে মনোযোগ দিলেন, কই দেখি কী সব এনেছ?

জহুরী সামনেই দাঁড়িয়েছিলো। সুলতান বললেন, দেখ তো এসব দিয়ে কাজটা নিখুঁতভাবে অন্য জানালার কাজের সঙ্গে মিলিয়ে, করা যাবে কিনা!

জহুরীরা পরীক্ষা করে দেখে বললো, এখানে যা আছে তার আটগুণ জহরত লাগবে, জাঁহাপনা। এবং আপনি যদি পুরো জহরত সংগ্রহ করে দিতে পারেন তা হলে আমার কারিগররা—তিন মাসের মধ্যে সেগুলি বসিয়ে অন্য জানালার প্রায় অনুরূপ কাজ—কিছুই বলা যায় না, তুলে দিতে পারবে আশা করি। অবশ্য হাতের কাজ কিছুই বলা যায় না, দু-চারদিন বেশিও লাগতে পারে।

লজ্জায় সুলতানের মুখমণ্ডল বেগুনী বর্ণ হয়ে গেলো। সারা প্রাসাদটা এক রাতের মধ্যে বানিয়েছে আলাদিন। এই একটি মাত্র জানালার কারুকাজ সমাধা করতে শহরের সেরা কারিগররা বলছে তিন মাস সময় লাগবে? অপারগতার দুঃসহ জ্বালায় জ্বলতে থাকেন তিনি। ছিঃ ছিঃ, এ লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়?

আলাদিন মজা দেখছিলো। এবার অবশ্যই তার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় সুলতান পেয়েছেন, বুঝতে পারলো সে। আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠলো মন, বললো, যাক ওসব হীরে জহরতের দরকার হবে না। ওগুলো যেখানে ছিলো সেখানেই রেখে আসুন উজির সাহেব, জানালার বাকী কাজটুকু আমি এখুনি সমাধা করে নিচ্ছি।

সুলতানের দিকে তাকিয়ে আলাদিন বিনম্র বিগলিত হয়ে বলে, মহামান্য শাহেনশাহ আমার অপরাধ নেবেন না, যে মণিমাণিক্য আপনাকে আমি ভেট দিয়েছি সেগুলো দিয়ে আমার প্রাসাদের জানালার কারুকাজ করা আপনার পক্ষে শোভন সঙ্গত হবে না, জাঁহাপনা। এভাবে আমার দেওয়া জিনিস আমাকে ওআপস করে দিলে আমি আহত হবো। ওগুলো যেমন আপনার প্রাসাদে ছিলো তেমনিই সেখানে থাক। আমি নিজেই এ জানালার কাজ সম্পূর্ণ করে নিচ্ছি। আপনি, মেহেরবানী করে, একটুক্ষণ আপনার কন্যার কক্ষে বিশ্রাম করুন। আমি এখুনি কাজটুকু শেষ করে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

সুলতানকে সঙ্গে করে বুদুরের কামরায় নিয়ে যায় আলাদিন।

—আপনি এখানে বসে কন্যার সঙ্গে কথা বলুন, আমি এখুনি আসছি।

আলাদিন ফিরে এসে চিরাগটা নিয়ে ঘষতেই আফ্রিদি এসে হাজির হলো। আলাদিন বললো, বান্দা, ঐ জানালাটার কারুকাজ বাকী রয়ে গেছে। ওটা অন্য জানালার মতো করে দাও এখুনি!

আলাদিনের মুখের কথা শেষ হতে না হতে আফ্রিদি এক অত্যাশ্চর্য দক্ষতায় পলকের মধ্যে জানালাটকে অন্য জানালার মতো নিখুঁত সুন্দর করে হীরে জহরত বসিয়ে সাজিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আলাদিন সুলতানকে বুদুরের ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এসে বললো, দেখুন, দেখুন তো জাঁহাপনা, কাজটা অন্য জানালাগুলোর মতো নিখুঁত হয়েছে কিনা।

সুলতান ধাঁধায় পড়লেন। তিনি অনেক চেষ্টা করেও ওই নিরানব্বইটি জানালার মধ্য থেকে সেই জানালাটিকে আর খুঁজে বের করতে পারলেন না। আগের এবং সদ্য তৈরি জিনিস চোখে দেখলেই ধরা যায়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সুলতান সদ্য নির্মিত জানালাটাকে চিহ্নিত করতে পারলেন না।

আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না, আলাদিন, কোন্‌টার কাজ তুমি সমাধা করলে?

আলাদিন হাসতে থাকে। আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, এইটে।

সুলতান লজ্জিত হলেন। বললেন, তোমাকে যতই আমি দেখছি, ততই বেশি অবাক হচ্ছি বাবা। এতো গুণের অধিকারী কী করে হলে তুমি?

রাত্রি অবসান হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো!

সাতশো চৌষট্টিতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়ঃ

সুলতান উজিরকে ডেকে পাঠালেন। একটু পরে সে কুর্নিশ জানাতে তাকে বললেন তিনি, তাকিয়ে দেখ উজির—জানালাটার দিকে তাকিয়ে দেখ।

উজির এদিকে ওদিক সবগুলো জানালার ওপর চোখ বুলাতে থাকে কিন্তু সেই অসমাপ্ত জানালাটিকে আর দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, সে জানালাটা কোথায় গেলো, ধর্মাবতার?

সুলতান হেসে বলেন, ঐ তো, দেখতো পাচ্ছো না? আলাদিন এক লহমায় কেমন সুন্দর করে কারুকাজ করে ফেলেছে।

উজির আগেই বুঝেছিলো আলাদিন এক কুশলী যাদুকর ছাড়া কিছু নয়। এবার তার ধারণা আরও বদ্ধমূল হলো। বুঝতে বাকী রইলো না ছেলেটি শুধু যাদুকরই নয়, জাল ধনরত্ন বানাতেও ওস্তাদ। কিন্তু এসব কথা সুলতানকে শোনালে হিতে বিপরীত হবে। সুতরাং সে মনেব কথা মনেই চেপে শুধু বলতে পারলো, খোদা হাফেজ, তার অপার লীলা বোঝা বড় ভার।

সেদিন থেকে প্রতি সন্ধ্যায় সুলতান আলাদিনের প্রাসাদে এসে কন্যা জামাতার সঙ্গে অবসর বিনোদন করতে থাকেন। প্রতিদিনই নতুন নতুন বাহারী জিনিসের আমদানী দেখে মুগ্ধ হয়ে যান তিনি।

অপরিমিত সুখ বিলাসের মধ্যে কাল কাটাতে থাকলেও আলাদিন কিন্তু তার শৈশবের দারিদ্র্য দুর্দশার বীভৎস চিত্র কিছুতেই ভুলতে পারে না। সে বুঝতে পারে, এই শহরেরই সর্বত্র কত নিরন্ন অসহায় পরিবার এক টুকরো রুটির জন্যে অসহ্য ক্ষুধা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। ভাবতে ভাবতে এক-এক সময় সে অন্য জগতে হারিয়ে যায়। সেই সুরম্য অট্টালিকার বিলাসমহলে তার দেহটা পড়ে থাকলেও মন কিন্তু উধাও হয়ে যায় সর্বহারাদের পাশে। এবং শুধু এই কারণে প্রায় রোজই সে তার নফরদের হাতে দিনারের তোড়া দিয়ে বলে, যা পথে-ঘাটে যাদের দেখবি দারুণ দুর্দশা—তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আসবি এগুলো।

এইভাবে দরিদ্রদের মধ্যে দু'হাতে অর্থ বিলিয়ে খানিকটা তৃপ্তি বোধ করে সে। অভাব অনটনের দুঃখ অনেক। কিন্তু প্রাচুর্যের যন্ত্রণাও বড় কম নয়। আলাদিন অহরহ দগ্ধ হতে থাকে। দেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষের সঙ্গে তার এতো বৈভব-বৈষম্য সে বুঝি আর সহ্য করতে পারে না।

আলাদিনের নির্দেশে তার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রতিদিন হাজার হাজার দীন ভিখারীকে পাত পেড়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হলো। আলাদিনের এই সহৃদয় বদান্যতা সারা শহরের আপামর মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগলো না। চারদিকে ধন্য ধন্য রব উঠতে থাকলো। এমন দয়ালু দাতা জামাই পেয়েছেন সুলতান। সবাই দুহাত তুলে আলাদিন বুদুরের নামে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে। ওরা যেন শতায়ু-সুখী হয়।

এবার আমরা সেই মূর যাদুকর বুড়োটার দিকে চোখ ফেরাচ্ছি ঃ

লোকটা সেই পর্বত গুহায় আলাদিনকে আটক করে স্বদেশে মরোক্কোয় প্রস্থান করলো। আলাদিন তখন খিদে তেষ্টায় প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় সেই পাহাড় তলদেশের অন্ধকূপ গুহায় মৃত্যুর মুহূর্ত গুণতে থাকে। বুড়োটা খুব ভালো করেই জানতো, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে আলাদিন। একটি অবোধ অসহায় শিশুকে ঐ ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ছুঁড়ে দিয়ে সে সচ্ছন্দে স্বগৃহে ফিরে আসতে পারলো। তার নিষ্ঠুর কসাই প্রাণে এতোটুকু মমতা সে কখনও পালন করেনি জীবনে। আলাদিনের জীবন-মৃত্যু নিয়ে আদৌ চিন্তিত বা বিচলিত বোধ করেনি। তার মনে তখন হাহাকার উঠেছে—যাদুচিরাগটি কব্জায় না পাওয়ার শোকে।

দিন যায়। মূরের মনের খেদ আর মেটে না। ইস্, হাতের মুঠোয় পেয়েও সে হারিয়েছে। আর একটু হলেই সে আলাদিনের কাছ থেকে চিরাগটা ছিনিয়ে নিতে পারতো। সে চেয়েছিলো গুহার নিচে থাকতে থাকতে আলাদিনের কাছ থেকে চিরাগটা ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে পাথর-বন্দী করে মেরে ফেলবে। সেইজন্যে সে তাকে দু একটা চড়-চাপড় দিয়ে একটু ভয় দেখিয়ে বাতিটা হাতের মুঠোয় করতে চেয়েছিলো। কিন্তু ফল বিপরীত দাঁড়িয়ে গেলো। কে জানে মার খেয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে একেবারে নিচে গুহাগৃহের দরজার চৌকাঠে গিয়ে পড়ে যাবে। সিঁড়ির নিচে নামার তো তার এক্তিয়ার নাই। এবং এও বুঝতে পেরেছিলো, আলাদিন একবার ওপরে উঠতে পারলে আর তাকে পাত্তা দিত না। কারণ চিরাগ সম্বন্ধে তার মাত্রাধিক আগ্রহ দেখে সে সন্দেহ করেছিলো নিতান্তই তার মধ্যে কোনও রহস্য জড়িয়ে আছে। তা না হলে কালি-ঝুলি মাখা একটা তামার প্রদীপ নিয়ে এতো ঝামেলা করছে কেন সে।

বুড়ো যাদুকর তার নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেরই কপাল চাপড়ায়। কিন্তু চিরকালের মতো চিরাগটা পাওয়ার আশা অন্তর্হিত হওয়া সত্ত্বেও তার শোক আর সে কাটাতে পারে না কিছুতেই।

বেশ কিছুদিন পরে বুড়ো মূর তার যাদুদণ্ড আর বালীর ঝুলিটা নামিয়ে নিয়ে টেবিলে বসে। বালীগুলো টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে দণ্ডটা দিয়ে মন্তর-তন্তর আওড়াতে আওড়াতে আঁকিবুকি কাটতে থাকে। উদ্দেশ্য, আলাদিন কী ভাবে সেই পর্বত-গুহায় প্রাণ ত্যাগ করেছে, এবং যাদুচিরাগটাই বা এখন কোথায় পড়ে আছে তা নিরূপণ করা।

বার বার আঁকিবুকি কেটে কেটে সে হুঙ্কার ছাড়তে থাকে, বল, জলদি করে বল লাঠি, আলাদিন কবে মরেছে আর চিরাগটাই বা কোথায় পড়ে আছে?

কিন্তু লাঠিখানা বার বার ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে থাকে। যাদুকরের কথার কোনও জবাব দিতে পারে না।

মূরের মনে সন্দেহের কালো ছায়া নেমে আসে। তবে কী গণনায় ভুল হচ্ছে। তবে কী আলাদিন এখনও জীবিত?

যাদুদণ্ড ইঙ্গিতে সব পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলো, আলাদিন মরেনি। সে এখন বহাল তবিয়তে, চীন সুলতানের কন্যাকে শাদী করে, সুখ-বিলাসের মধ্যে কাল কাটাচ্ছে। আর যাদু-চিরাগ? সে তো তারই দখলে আছে এখন। তার দৌলতে এখন সে সুলতানের প্রাসাদের পাশে পেল্লাই একখানা চমৎকার চোখ ঝলসানো প্রাসাদ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সে এখন সুলতান-জামাতা। শুধু তাই নয়, তার দান-ধ্যানে দেশের মানুষ তাকে মহাজন বলে সম্মান করে।সে আর এখন দীন ভিখারী আলাদিন নয়। তাকে এখন আমির আলাদিন বলে লোকে। সে এখন দীনদয়াল আলাদিন। লোকে তাকে অনাথের নাথ অগতির গতি একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে মনে করে। সে সবই তার এখন ঐ চিরাগের কল্যাণে।

হুম বুঝলাম, শয়তান বদমাইশটা আমারই অস্ত্রে আমাকে ঘায়েল করেছে। আমার হকের ধন আমাকে ফাঁকি দিয়ে বাদশাহী সুখ-বিলাসে সে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি শয়তানের শয়তান—মূর যাদুকর। তুমি কত সেয়ানা হয়েছ আলাদিন, আমিও তা দেখবো। তোমাকে আমি কী করে খতম করি একবার দেখ।

আর ক্ষণমাত্র মরোক্কোয় অপেক্ষা না করে সে চীনের উদ্দেশে পথে বেরিয়ে পড়লো। মন্ত্রবলেই তার বাহুতে বোধহয় ডানা গজিয়েছিলো, তা না হলে মরোক্কো থেকে চীন তো কম দূরের পথ নয়, সে এতো তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছলই বা কী করে?

আলাদিনের সুরম্য প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে তার বুকের জ্বালা আরও বেড়ে যায়। ভাবে, এই প্রাসাদ ঐশ্বর্য সুখ-বিলাস উপকরণাদি সবই তার হকের সম্পত্তি। আলাদিন শয়তান বেল্লিকটা তাকে ঠকিয়ে আজ সে তার ভুয়ো মালিক হয়েছে। এর উপযুক্ত সাজা তাকে দেবই দেব আমি।

শহরের একপ্রান্তে একটা সরাইখানায় উঠেছে সে। সেদিনের মতো সরাইখানা ফিরে গিয়ে মাথায় ফন্দী আটতে লাগলো—কী ভাবে শয়তানটাকে শায়েস্তা করা যায়। কিন্তু অনেক ভেবেও কোনও মতলবই সে আঁটতে পারলো না। পরদিন আবার গেলো সে আলাদিনের প্রাসাদের সামনে। কিন্তু অতবড় প্রাসাদে তার কোন্ কামরায় আলাদিন থাকে এবং সে কামরার কোথায় কোন্ বাক্সে তোরঙ্গে চিরাগটিকে সে লুকিয়ে রাখে তাই বা কে বলে দেবে তাকে। আর বললেই বা কী? ঐ প্রাসাদের কড়া প্রহরা ভেদ করে অন্দরেই বা প্রবেশ করতে পারবে কে?

সেদিনও সে ব্যর্থ মন নিয়ে সরাইখানায় ফিরে আসে। যাদুদণ্ড আর বালীর ঝোলাটা বের করে টেবিলের ওপরে বালীগুলো ছড়িয়ে দেয়। কাঠিকে দিয়ে আঁকি-বুকি কাটতে কাটতে মন্ত্র আওড়ায়। দণ্ডকে প্রশ্ন করে, বল বেটা, আলাদিন কোথায় কোন্ ঘরে শুয়ে থাকে। এখন সে কোথায়? চিরাগটা কী তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে না? না, প্রাসাদেই কোথাও লুকিয়ে রাখে?

বালীর লিখন পড়ে বুড়ো শয়তানটার চোখ নেচে ওঠে। আকর্ণ বিস্তৃত দাঁত বের করে বিকটভাবে হাসতে থাকে—হা হা হা। এবার বাছাধন, যাবে কোথায়?

আলাদিন সেদিন শিকারে চলে গেছে। যাবার সময় সে চিরাগটা দেরাজে তালা বন্ধ করে যেতে ভুলে গেছে। টেবিলের ওপর রেখেই খেয়ালের ঝোঁকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

আলাদিন প্রায়ই সদলবলে শিকারে যায়। বুদুরকেও সে সঙ্গে নিতে চেয়েছে প্রতিবার। কিন্তু শান্ত নিরীহ প্রকৃতির বুদুর শিকারে কোনও মজা পায় না। তাই সে প্রাসাদেই থেকে যায়। প্রতিবারই। আলাদিন অবশ্য দিন সাতেকের বেশি দেরি করে না। এই ক'টা দিন স্বামী-চিন্তায় বিভোর থাকে সে। দিন কাটাতে তার খুব একটা খারাপও লাগে না। সব সময় যে কাছে কাছে থাকে সে যদি কখনও-সখনও চোখের আড়াল হয় তবে আরও মধুর বলে মনে হয় তাকে।

মুর যাদুকর গণনায় বুঝতে পেরেছিলো, আলাদিন শিকারে গেছে। ফিরতে দিনকয়েক দেরী হবে। এবং চিরাগটা সে তার শোবার ঘরের টেবিলেই রেখে গেছে ভুল করে।

এই মওকা। শয়তানটা প্রায় ছুটতে ছুটতে বাজারে যায়। চিরাগের দোকানে ঢুকে বলে বশে ঝকঝকে সুন্দর সুন্দর তামার চিরাগ দাও এক কুড়ি।

দোকানি তাকে নানা আকারের নানা বাহারের চিরাগ দেখায়। বুড়োটা বলে, ঠিক আছে সবগুলোই আমার এই ঝুলিতে ভরে দাও। কত দাম?

দোকানির সঙ্গে সে আর দাম নিয়ে দরাদরি করে না। যা সে চায় তাই গুণে দিয়ে রাস্তায় নেমে হন হন করে হাঁটতে থাকে আলাদিনের প্রাসাদের দিকে। আর মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়ে, চিরাগ চা-ই, চি-রা-গ নেবে গো? নতুন চিরাগের বদলে পুরানো দিলে বদল হবে—

পাড়ার ছেলেরা বুড়োর অদ্ভুত ধরনের সুর করে হাঁক ডাকে মজা পেয়ে তার পেছনে লাগে। পাগল পাগল বলে ক্ষেপায়। কিন্তু ধূর্ত যাদুকর বালকদের নেবে গো, চি-রা-গ-পুরানো চিরাগের বদলা নতুন চিরাগ মিলবে—চিরাগ নেবে, চিরাগ চা-ই—

শাহজাদী শূন্য প্রাসাদের বাতায়ন-পাশে বসে বাইরের পথচারীদের যাওয়া আসা লক্ষ্য করছিলো। এমন সময় একটা জগঝম্পের আলখাল্লা পরা একটা কোথাকার কুৎসিত লোলচর্ম বুড়ো ফিরিওয়ালার পিছনে পিছনে এক দঙ্গল ছেলে-ছোকরাকে হুটোপুটি করতে দেখে বুদুরের অন্তরের কিশোর প্রাণ নেচে ওঠে। বড় মজা পায়।

লোকটার কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কাঁধে একটা বিরাট ঝোলা। একহাতে একখানা ত্রিভঙ্গাকৃতির যষ্ঠি, অন্য হাতে একটি ঝকমকে তামার নতুন চিরাগবাতি। সুর করে হাঁক ছাড়ে, চি-রা-গ নেবে গো—চিরাগ—। পুরানো চিরাগ বদল করে নতুন চিরাগ দেবো।

বুদুরের পাশে সখীরাও খিল খিল করে হাসে। মজা পায়, ওমা লোকটা বলে কী? পুরানো চিরাগ বদল করে নতুন চিরাগ দেবে?

বুদুর বলে, ঐ জন্যেই তো ছেলেগুলো ওর পেছনে লেগেছে। লোকটার বোধ হয় সত্যিই মাথা খারাপ, না হলে নতুন জিনিস দিয়ে কেউ পুরানো জিনিস দিতে চায়।

একজন সহচরী বলে, ওঃ, তাই বুঝি ছেলেগুলো পাগল পাগল বলে বুড়োটাকে ক্ষেপাচ্ছে!

আর একজন পরিচারিকা বলে, আমাদের মালিকের ঘরের টেবিলে একটা কালিঝুলিমাখা পুরানো চিরাগ দেখেছি আজ। তা শাহজাদী, ওটাকে পালটে নিলে কেমন হয়?

বুদুর বলে, তাই নাকি? তোমাদের মালিকের টেবিলে আছে? কই, নিয়ে আয় দেখি।

মেয়েটি ছুটে গিয়ে চিরাগটা নিয়ে আসে। বুদুর হাতে নিতে চায় না। দূর দূর, ওদিকে রাখ, আমার পোশাকে তেলকালি লেগে যাবে। উফ্ কী নোংরা! যা ওটাকে খোজার হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দে বুড়োটার কাছে! এই রকম একটা জবরজং পুরানো চিরাগের বদলে যদি একটা নতুন পাওয়া যায়—ক্ষতি কী?

মেয়েটি এক খোজার হাতে দিয়ে বুড়োর কাছে পাঠায়। খোজাটা বাম হাতের দুটি আঙ্গুল দিয়ে আলগোছে ধরে বাতিটাকে নিয়ে যেতে যেতে বলে যত্তো সব বিদঘুটে কাণ্ড!

এই রকম একটা পোড়-খাওয়া পুরানো নোংরা পিদিমের বদলে একটা আস্ত আনকোরা বাতি দেবে নাকি সে। সব বুজরুকি! খালি খালি হয়রানি করছো তোমরা, দেখো, লোকটার অন্য ধান্দা আছে। বাতিটা হাতিয়ে নিয়ে তখন নতুন বায়না ধরবে। বলবে সঙ্গে কিছু নগদ ছাড়ো, না হলে নতুন মাল পাওয়া যায় নাকি?

পরিচারিকাটি বলে, তোমার অত বকবক করার কী আছে, যা হুকুম করছি তামিল কর।

খোজা পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, কী? কী বললে? তুমি আমায় হুকুম করছ? তুমি কি আমার মালকিন নাকি? এই রইলো তোমার চিরাগ। ওরে আমায় হুকুমদার রে! তুইও যেমন এক বাঁদী আমিও তেমনি বান্দা। আমাকে তুই হুকুম করিস কিসের জোরে রে।

মেয়েটি সুযোগ পেলেই এই খোজাটিকে চটায়। বেশ মজা পায়। মুখে ভীষণ গাম্ভীর্য টেনে বলে, দেখ নফর, বাতি ওঠা, যা বলছি শোনো, তা না হলে তোর আজ গর্দান নেব।

—কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? তুই আমার গর্দান নেবার কে? আমি পারবো না—

—কী, পারবি না? তবে শাহজাদীকে গিয়ে বলি, নফর আপনার হুকুম তামিল করতে চাইছে না—

খোজাটা মুহূর্তে কেঁচোর মতো গুটিয়ে যায়, অ, তাই বলো। স্বয়ং শাহজাদীর হুকুম। তা এতক্ষণ ন্যাকরা করছিলি কেন রে মুখপুড়ি।

এই বলে সে ছো মেরে চিরাগটা তুলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বুড়োটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—এটার বদলে দেবে একটা?

বুড়োটা হতবাক হয়ে জুল জুল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে যাদুচিরাগটা। হ্যাঁ, সেই চিরাগ—তার সারাজীবনের স্বপ্নের ধন। অবশেষে এতদিন পরে তার হাতের নাগালের মধ্যে এসেছে। কি এক অপূর্ব শিহরণে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। তখনও তার মনে পাওয়া না পাওয়ার সংশয় দুলছে। যদি এইমাত্র লোকটা বলে, না থাক তোমার চিরাগটা পছন্দসই মনে হচ্ছে না, নেব না। অথবা, আলাদিন যদি ধূমকেতুর মতো এই মুহূর্তে এসে হাজির হয় এখানে। যদি কোনও কারণে তার শিকার অভিযান বাতিল করে প্রাসাদে ফিরে আসে? ওরে সর্বনাশ তা হলে তো সে ধনে-প্রাণে মারা যাবে! চিলের মতো ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নেয় সে চিরাগ। খোজাটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যাপারটা কী কিছুই অনুধাবন করতে পারে না। লোকটা কী একটা ঠগ? এইভাবে লুব্ধ করে লোকের জিনিসপত্র ঘর থেকে বের করে আনিয়ে ছেনতাই করে? কিন্তু না, তা নয়। পরমুহূর্তেই সে তার ভুল বুঝতে পারলো। বুড়োটা তার ঝোলা থেকে আরও ঝকঝকে একটা চিরাগ বের করে খোজার হাতে গুঁজে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে রাস্তার বাঁকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। ছেলেগুলো আর তাকে ধাওয়া করে সুবিধে করতে পারে না। বুদুর আর তার সহচরীরা এই দৃশ্য দেখে হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে।

একটানা ছুটতে ছুটতে যাদুকর বুড়োটা সোজা চলে আসে তার সরাইখানার ঘরে। যাদুচিরাগটাকে বের করে ঘষতেই সেই আফ্রিদি দৈত্যটা এসে হাজির হয় সামনে। বলে, আমি ত্রিভুবনের অধিপতি। আমার তুল্য শক্তিধর আর কেউ নাই। একমাত্র আপনার হাতের

এই চিরাগ ছাড়া কেউ আমার প্রভু নয়। এই চিরাগ এখন আপনার কব্জায়। সুতরাং এখন আপনিই আমার একমাত্র মালিক, হুকুম করুন, হুজুর কী করতে হবে। বান্দা প্রস্তুত।

যাদুকর বললো, ওরে বাবা, অত বকিসনে, সব আমি জানি! নে এখন চটপট যা বলি করে ফেলো দেখি!

—আজ্ঞা করুন, মালিক।

—শোন বান্দা, এর আগে তোর মালিক ছিলো আলাদিন।

—যথার্থ বলেছেন, হুজুর।

—তার হুকুমে এক বিশাল প্রাসাদ এনে বসিয়ে দিয়েছিস সুলতানের প্রাসাদের পাশে।

—বিলকুল সাচ্ বাত্।

—এখন আমার হুকুম, ঐ প্রাসাদটা যেমন আছে ঠিক তেমনি ভাবে আলতো করে তুলে নিয়ে গিয়ে আমার স্বদেশ মরোক্কোর এক নির্জন বনাঞ্চলে স্থাপন করে রেখে আয়। তারপর আমাকেও নিয়ে যাবি সেখানে।

—জো হুকুম মালিক, আমি এখুনি করে দিচ্ছি। বুড়োটা বলে, তা কতক্ষণ সময় লাগবে তোর?

আপনার চোখ দু'টো একবার বন্ধ করে আবার খুলতে যতটুকু সময় লাগবে তার চেয়ে বেশি সময় লাগবে না, হুজুর।

—ঠিক আছে।

এক পলকের মধ্যে ফিরে এসে আফ্রিদি জানালো, আপনার হুকুম তামিল করেছি মালিক। এবার আমার পিঠে চেপে বসুন। আপনাকে এখুনি পৌঁছে দিচ্ছি সে প্রাসাদে।

আফ্রিদি হামাগুড়ি দিয়ে বসতে যাদুকরটা তার পিঠে চেপে বসলো এবং পলকের মধ্যে সে তাকে নিয়ে গিয়ে মরক্কোর এক নির্জন জঙ্গলের এক প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাসাদ প্রাঙ্গণে নামিয়ে দিলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ছেষট্টিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পরদিন সকালে সুলতান কন্যার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বুদুরের প্রাসাদে আসেন। কিন্তু কী আশ্চর্য প্রাসাদ কোথায়? এ তো তার সেই ফাঁকা ময়দান। ঠিক আগে যেমনটি ছিলো তেমনি খালি পড়ে আছে। কে বলবে গতকাল সন্ধ্যাতেও এক বিশাল গগনচুম্বী ইমারত মাথা তুলে সদর্পে দাঁড়িয়েছিলো।

সুলতান নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারে না। দু'হাতে তিনি চোখ রগড়াতে থাকেন। কিন্তু না, এ তাঁর ভ্রম নয়। সত্যিই সেখানে প্রাসাদ বলে কিছু নাই। ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন তিনি। সর্বনাশ, তার বুকের কলিজা নয়নের মণি বুদুর। সে কোথায় গেলো? তার কী হলো?

এবারে আর তার বুঝতে বাকী থাকে ন, সবই সেই শয়তান যাদুকর আলাদিনের ভেল্কী। সুলতান ছুটে ফিরে আসেন তাঁর নিজের প্রাসাদে। ছাদের ওপরে উঠে আবার ভালো করে দেখতে থাকেন। কিন্তু না, তার দেখার কোনও ভুল নয়। পাশে ময়দান, সেখানে প্রাসাদ বলে কিছুই নাই। কখনও যে ছিলো তারও কোনও চিহ্নমাত্র নাই।

কন্যার শোকে পাগল-প্রায় সুলতান নিজের চুল দাড়ি ছিঁড়তে থাকেন, ইয়া আল্লাহ, এ কী করলে তুমি? কী এমন পাপ আমি করেছিলাম, আমার একমাত্র চোখের মণি মেয়েকে তুমি কেড়ে নিলে?

একটি ছোট শিশুর মতো তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। উজির এসে পাশে দাঁড়ায়। সুলতান এবার হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠেন, আমার সর্বনাশ হয়েছে উজির। আলাদিন শয়তানটা সত্যিই একটা যাদুকর ছিলো। সে আমাকে ধোকা দিয়ে শাহজাদীকে শাদী করে উধাও হয়েছে।

উজির মনে মনে হাসে। মুখে বলে, আল্লাহর অপার লীলা। তিনি যা করবেন তা তো কেউ এড়াতে পারবে না, জাঁহাপনা। কিন্তু আমি তো শুনেছি আলাদিন দলবল নিয়ে শিকারে গেছে!

সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়েন, এখুনি সেপাই পেয়াদা পাঠাও। যেখানে পাও তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসো আমার সামনে। আমি তার গর্দান চাই।

উজির এবার সাহস করে বলতে পারে, জাঁহাপনাকে আমি অনেক আগেই সতর্ক করে বলেছিলাম, ছেলেটি এক ধূর্ত ঠগ যাদুকর। কিন্তু সেদিন ধর্মাবতার পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন।

একথার কোনও জবাব দিতে পারেন না সুলতান। মাথা নিচু করে ঘাড় নেড়ে উজিরের কথায় সায় জানান শুধু।

উজির বলে, ঠিক আছে আমি এখুনি সিপাই সান্ত্রী পাঠাচ্ছি। যদি সে সত্যিই শিকারে গিয়ে থাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে!

সাতশো সাতষট্টিতম রজনী ঃ

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

উজিরের আদেশে সিপাই সর্দার শ'খানেক সিপাই নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় শহর ছেড়ে। বেশি দূর তাদের যেতে হয় না। শহর ছাড়িয়ে একটা প্রান্তর, সেটা পার হলে এক গভীর জঙ্গল। এই জঙ্গলেই তাঁবু খাঁটিয়ে শিকার করতে আসে আলাদিন।

সিপাই সর্দার আলাদিনের সামনে পৌঁছে যথা মর্যাদায় কুর্নিশাদি জানিয়ে সুলতানের ফরমাস জানায়।

—আপনি আমার গোস্তাকি মাফ করবেন, মালিক। আপনার বদান্যতা দেশের কোনও মানুষই ভুলবে না কোনও দিন। আপনি ধনী দরিদ্র সকলের প্রাণের দোস্ত। আপনার মতো দরদী বন্ধু এ জগতে হয় না। কিন্তু আমরা সুলতানের নফর, হুকুমের দাস। তাঁর আদেশ অমান্য করার শক্তি আমাদের নাই।

আলাদিন হাসে, বেশ তো কী তাঁর আদেশ বলো, শুনি।

সর্দার ইতস্ততঃ করে, সে আদেশ কী করে আপনাকে শোনাবো, মালিক। সে যে মুখে আনতেও জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়।

—বুঝতে পারছি, তোমরা বড়ই বিব্রত বোধ করছ। কিন্তু তার কোনও প্রয়োজন নাই। দ্বিধাহীন চিত্তে অসঙ্কোচে বলো, কী তাঁর হুকুম। সুলতানের আদেশ তোমাদের যেমন আমারও তেমনি শিরোধার্য। আর কুণ্ঠিত হয়ো না বন্ধু, বলো, কী তাঁর আদেশ।

সিপাই সর্দার কোনও রকমে বলতে পারে, কী কারণে জানি না, সুলতান আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাঁর হুকুম, আপনাকে, কোমরে দড়ি বেঁধে, টানতে টানতে তাঁর সামনে হাজির করতে হবে। আপনি মহামান্য আমির, সুলতানের জামাতা—এ কী কাজ আমাদেব ঘাড়ে তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন, বলুন মালিক। এখন আমি কী করি।

আলাদিন বলে, কী আবার করবে? সুলতানের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই প্রভুভক্ত নফরের একমাত্র কাজ—তাই তোমরা করবে। এসো আমার কোমরে দড়ি বাঁধ, আমি প্রস্তুত।

আলাদিন তার ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। সিপাইরা তার কোমরে দড়ি বেঁধে প্রাসাদে এনে হাজির করলো। আসার পথে আলাদিনের এই বন্দীদশা দেখে শহরবাসীরা আহত হলো সবাই, চোখের জল ফেললো অনেকে। কিন্তু সুলতানের হুকুম, মুখে কেউ কোনও প্রতিবাদ করতে সাহস করলো না। কী কারণে জামাতার এই সাজা, জানবার জন্য সারা শহর ভেঙ্গে পড়লো প্রাসাদের চারপাশে। লোকে লোকারণ্য। কেউ কিছু বলতে পারে না, সুলতান জামাতার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন।

সেপাইরা আলাদিনকে টানতে টানতে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বাইরে তখন উত্তাল জনসমুদ্র। একটা চাপা গর্জন, বেশ বুঝতে পারা যায়, জনতা রোষে ফেটে পড়তে চাইছে।

আলাদিন প্রাসাদের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেও একটি মানুষও প্রাসাদের সামনে থেকে নড়ে না। বরং ক্রমশঃ ভিড় বাড়তে থাকে।

ধীরে ধীরে জনতা সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা জিগির তোলে, দীন-দয়াল মালিক, আলাদিনের মুক্তি চাই। সাচ্চা হীরা আলাদিনকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

সুলতান রাগে ফুঁসছিলেন। আলাদিনকে দেখামাত্র তিনি কোনও রকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই হুকুম দিলেন, কোতল কর। আর একমুহূর্ত আমি এই শয়তান ঠগের মুখ দর্শন করতে চাই না।

জল্লাদ দোতলার ছাদে নিয়ে গেলো আলাদিনকে। কারণ জনতা তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বাগানের বাইরে ছাদের ওপরে নিয়ে গিয়ে আলাদিনকে সে হাঁটু গেড়ে বসতে বললো। আলাদিন এতোটুকু বিচলিত নয়। সে জানে সে কোনও অপরাধ করেনি, বিনা দোষে যদি তাকে মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নিতে হয় সে নেবে। তারপর পাপের ফল দণ্ডদাতা ভোগ করবে—এও সুনিশ্চিত।

হাঁটু গেড়ে বসে সে ঘাতকের খাড়ার আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়। জল্লাদ তার চোখে কাল কাপড় বেঁধে দিয়ে খাঁড়া উঁচিয়ে ধরে। কিন্তু নিচে থেকে হাজার হাজার কণ্ঠে এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, বন্ধ কর, রুখ যাও।

ঘাতক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার সে খাড়া বাগিয়ে ধরে। কারণ সুলতানের হুকুম তাকে তামিল করতেই হবে। নিচে থেকে জনতা মারমুখী হয়ে ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে ঘাতককে লক্ষ্য করে, মালিক আলাদিনের গর্দান নিলে রক্তের নদী বয়ে যাবে। বন্ধ কর, খাড়া পেলে দাও ঘাতক।

আবার জল্লাদ উদ্যত খাড়া নামিয়ে নিয়ে সুলতানের দিকে তাকায়। সুলতান তখনও তার গোঁ-তে অটল, হুকুম তামিল কর, বেতমিজ।

এবার মারমুখী জনতাকে আর বাগে রাখতে পারলো না সিপাই পেয়াদারা।

সুলতান প্রমাদ গণলেন। এ জনতার রোষ শান্ত হবার নয়। জল্লাদকে তিনি নিরস্ত হতে হুকুম দিলেন, ঠিক আছে, শহরবাসীর অনুরোধে, এ যাত্রায় আমি ওর প্রাণভিক্ষা দিলাম।

এবার জনতা শান্ত হলো খানিকটা।

সুলতানের সামনে আলাদিনকে হাজির করা হলো। তিনি বললেন, জনতার দাবীতে তুমি এবারের মতো প্রাণে রক্ষা পেলে। কিন্তু আমার আদরের দুলালী বুদুরকে যদি ফিরিয়ে না দাও আমি তোমাকে রেয়াৎ করবো না।

আলাদিন বুঝতে পারে না, বুদুরকে ফিরিয়ে দেবার প্রশ্ন উঠছে কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, শাহজাদী বেগম হলেও সে আপনারই কন্যা আছে। আপনি যেমন নিত্য দু'বেলা তাকে দেখতে যান তেমনি যাবেন। আপনার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে কী করবেন? আর কেনই বা নেবেন? আমার কী গোস্তাকি, জাঁহাপনা?

সুলতান বলে, কেন, তুমি কিছুই কি জান না?

—না, হুজুর।

সুলতান বলেন, ওপাশের জানলার পর্দা সরিয়ে দেখ, তোমার প্রাসাদ কোথায় গেলো?

আলাদিন দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। সত্যিই সেই আফ্রিদির তৈরি করা প্রাসাদটার কোনও চিহ্নমাত্র নাই। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারে, এ সেই মরক্কো যাদুকরটার শয়তানী। সে ছাড়া এ অঘটন আর কেউ ঘটাতে পারে না।

সুলতান বললেন, শোনো আলাদিন, তোমার প্রাসাদ-টাসাদ চুলোয় যাক। আমার মেয়েকে তুমি ফেরত এনে দাও। তা না হলে এ যাত্রা তোমার গর্দান বাঁচলেও আখেরে তোমাকে আমি ছাড়বো না।

আলাদিন বলে, জাঁহাপনা, কেউই কার ভাগ্য এড়াতে পারে না। সুতরাং এও আমি জানি আমার নসীবে যা লেখা আছে তা কখনই খণ্ডন করতে পারবো না। আর মৃত্যুর কথা বলছেন? ও ভয়ে আমি ভীত নই কখনোই। তবে শাহজাদী বুদুর যেমন আপনার প্রাণাধিকা কন্যা আমারও তেমনি বুকের কলিজা। তাকে ছাড়া আমিও প্রাণে বাঁচতে পারবো না। যেভাবেই হোক, তার সন্ধান আমাকে করতেই হবে।

সুলতান বলেন, ওসব ছেঁদো কথা রাখ। আমি তোমাকে চল্লিশ দিন সময় দিলাম। তার মধ্যে শাহজাদীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তুমি—এই আমার হুকুম। তা না হলে পৃথিবীর যে প্রান্তেই তুমি পালিয়ে থাক, আমার প্রহরীরা তোমাকে পাকড়াও করে আনবেই।

আলাদিন বললো, আমি জ্ঞানত কোনও পাপ করিনি। জানি না, কার চক্রান্তে অথবা কোন্ অভিশাপে এমন দুর্ভাগ্য আমার ঘটেছে, যাই হোক, আমি পথে বেরুচ্ছি। বুদুরকে যদি ফিরিয়ে আনতে না পারি, তবে এ জীবন আমি রাখবো না।

আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করে তখুনি আলাদিন নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে।

সারাদিন ধরে একটানা পথ চলে চলে এক সময় যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন কোনও গাছতলায় বসে একটু জিরিয়ে নেয়। নদীর জল আর গাছের ফল খেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটায়। তারপর আবার চলতে শুরু করে। কত গ্রাম গঞ্জ শহরে পৌঁছয়। সেখানে জনে জনে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কেউ একটা বুড়ো যাদুকরকে দেখেছ? সে আমার বিবিকে নিয়ে পালিয়েছে।

কেউই আলাদিনকে কোনও আলোর নিশানা বলতে পারে না। এই ভাবে দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হতে থাকে। হতাশায় সে ভেঙ্গে পড়ে। যাদুকর মহাধূর্ত। সে যে কোথায় নিয়ে চলে গেছে বুদুরকে—কেউ কী তার হদিশ বলতে পারবে? শুধু এইভাবে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ালে কী কোনও ফয়দা হবে?

একদিন এক বিশাল বিস্তৃত নদীর সামনে এসে আলাদিনের গতি রুদ্ধ হয়ে গেলো। ওপারে যাওয়ার কোনও যানবাহন নাই। অথচ নদী পেরোতে না পারলে সামনে চলার পথও নাই। কূলে বসে বসে সে ভাবতে থাকে, এ পোড়া জীবন রেখে আর কী লাভ? বুদুরকেই যদি সে না ফিরে পেলো, কী হবে এ জীবনে বেঁচে থেকে?

সামনে স্রোতস্বিনীর কালো জল। সে তাকে হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে। আর কেন আলাদিন, তোমার ইহজগতের লীলা সাঙ্গ হয়েছে, এবার আমার কোলে এসে দেহ রক্ষা কর।

আলাদিন আর স্থির থাকতে পারে না। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে গগনবিদারী চিৎকার করে ওঠে, আল্লাহ, এই কী তোমার বিচার? কী এমন পাপ আমি করেছি তোমার দরবারে—যার সাজা এইভাবে আমাকে দিলে খোদা?

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আলাদিন। সেই নদী উপকূলে ঘাসের শয্যায় গড়াগড়ি যায় তার

সুকুমার সুন্দর দেহখানা। হাত পা ছুঁড়ে দাপাদাপি করতে থাকে। মাথার চুল ছিঁড়ে, জামা কাপড় ফালা ফালা করে ফেলে। প্রায় উন্মাদের দশা! দু হাতের তালু দিয়ে থুতনি গাল ঘষতে থাকে।

হঠাৎ এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেলো। আলাদিনের ডান হাতের তর্জনীতে সেই যাদুকরের দেওয়া আংটিটা পরা ছিলো। পাহাড়-গুহার নিচে নামার আগে শয়তান বুড়োটা এই আংটিটা আলাদিনকে পরিয়ে দিয়ে বলেছিলো, যদি কখনও চরম বিপদ ঘনিয়ে আসে তবে এই আংটি ঘষবে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এক দৈত্য এসে দাঁড়াবে তোমার সামনে। তাকে যা করতে বলবে, সে করে দেবে।

এই আংটির দৌলতে একদিন সে সেই পাহাড়ের মৃত্যু-গুহার ফাঁদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছিলো। আজ এতদিন আংটিটা তার হাতেই আছে। কিন্তু সে-কথা সে একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলো। আজ গালের সঙ্গে হাতের তালু ঘষতে ঘষতে আংটিটাও ঘর্ষিত হয়েছিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অভাবনীয় ঘটনাটি ঘটে গেলো। দৈত্য-প্রবর আবির্ভূত হলো তার সম্মুখে। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আমি আংটির গোলাম। আমার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি এখন আংটির মালিক। সেই কারণে আমার প্রভু। হুকুম করুন মালিক, কী করতে হবে, বান্দা প্রস্তুত।

আলাদিনের চোখ আশার আনন্দে নেচে উঠলো, শোনও বান্দা, আমি সেই মরক্কোর বুড়ো যাদুকরের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছি। পাহাড় গুহা থেকে আশ্চর্য যাদু-চিরাগ উদ্ধার করে এনেছিলাম আমি। সেই চিরাগের বান্দা আফ্রিদি দৈত্য আমার নফর ছিলো। তাকে দিয়ে আমি এক সুরম্য প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলাম। চীন সুলতানের কন্যা শাহজাদী বুদুরকে শাদী করে পরমান্দে বসবাস করছিলাম সেখানে। কিন্তু আমার অসতর্কতার দোষেই ঐ শয়তানটা আমার চিরাগটা হাতিয়ে নিয়েছে। এবং তারই ফলে সে আমার বিবিকে সুদ্ধ প্রাসাদটা তুলে নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে, আমি কিছুই হদিস করতে পারছি না। এখন তুমিই একমাত্র ভরসা। আমার বিবি আর প্রাসাদটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো, এই আমি চাই।

আলাদিনের কথা শুনে আফ্রিদি দৈত্য মাথা নিচু করে বললো, আপনার সব হুকুম আমি তামিল করতে পারি, কিন্তু এই হুকুম আপনি করবেন না মালিক। একাজ আমি করতে পারবো না।

আলাদিন অবাক হয়ে বলে, কেন? তুমি যে বললে, কোনও কাজই তোমার অসাধ্য নয়?

দৈত্য বললো, মর্ত্যলোকের কোনও কাজই আমার অসাধ্য নয়, কিন্তু চিরাগের মালিক আফ্রিদি দৈত্য আমার ওস্তাদ। তার কোনও কাজ আমি ভুণ্ডুল করতে পারি না।

দৈত্যের কথা শুনে আলাদিনের মন আবার হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। তবে, তবে কী উপায় হবে? প্রাসাদটা যদি সে না নিয়ে আসতে পারে তবে আর শাহজাদী বুদুরকে উদ্ধার করা যাবে কী করে?

দৈত্যটা বললো, আপনি যদি হুকুম করেন, আমি আপনাকে আপনার ঐ প্রাসাদের সামনে পৌঁছে দিতে পারি। তারপর যদি পারেন, আপনি উপায় করে নেবেন।

আলাদিন এবার একটু আশার আলো দেখতে পায়। বলে, ঠিক আছে, তাই কর। সেই প্রাসাদের সামনেই আমাকে পৌঁছে দাও।

দৈত্য ওকে পিঠে তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উড়ে এসে মরোক্কোর সেই নির্জন জঙ্গল প্রান্তরে রক্ষিত প্রাসাদের পশ্চাৎ দিকে নামিয়ে দিলো।

আলাদিন দেখামাত্র চিনতে পারে, এই তার প্রাসাদ। বুঝতে অসুবিধে হলো না কোন্ জানালাটা তার নিজের, এবং কোন্ জানালাটা শাহজাদী বুদুরের শয়ন-কক্ষের! একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে অধীর হয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো বুদুরের কামরার

দিকে। কিন্তু অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলো জানালায় কারো ছায়াও দেখতে পেলো না আলাদিন। তবে কী, শয়তান যাদুকরটা বুদুরকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়েছে? অতি সন্তর্পণে সে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে। এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখে নেয়, কেউ কোথাও তাকে লক্ষ্য করছে না। অন্য কোনও লোকের দৃষ্টিতে পড়লে আশাঙ্কার কিছু নাই, কিন্তু ঐ বদমাইশটার নজরে পড়লে নসীবে অনেক দুঃখ আছে। কিন্তু চারিদিক নিথর নিস্পন্দ। জনমানবের কোনও সাড়া শব্দ পায় না সে। মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ মলয় বাতাসে আন্দোলিত তরুশাখার পত্র মর্মর শোনা যায়।

আলাদিন দুঃসহ আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে জানালার দিকে। ভেড়ার মগজ রসুইখানায় পাকাবার জন্য পাঠিয়ে এক ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন অস্থির প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে, এ তেমনি এক প্রতীক্ষা।

যাদুকরটা প্রাসাদসুদ্ধ বুদুরকে এখানে নিয়ে আসার পর থেকে শাহজাদী আলাদিনের শোকে দুঃখে কাতর হয়ে শয্যা গ্রহণ করেছে। সে আর পালঙ্ক ছেড়ে ওঠে না, খায় না ঘুমায় না। তার একমাত্র চিন্তা কী করে আবার সে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবে। আশঙ্কায় তার বুক কাঁপে, শয়তান বুড়োটা প্রতিদিনই একবার করে তার ঘরে আসে। অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে মন ভেজাবার চেষ্টা করে। বুদুর বুড়োটার দিকে ফিরেও তাকায় না। ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়! কিন্তু এও বুঝতে পারে, বদমাইশটা তাকে সহজে নিস্তার দেবে না। এখন সে মুখে মধু ঢেলে কথা বললেও কিছুদিন বাদেই তার আসল চেহারা মেলে ধরবে সে। তার পাশবিক অত্যাচারের লোলুপতা থেকে কী করে সে নিজেকে রক্ষা করবে ভাবতে পারে না।

সূর্য ঢলে পড়ে। একটু পরেই রাত্রির কালো অন্ধকার নেমে আসে। এখনও জানালায় এসে দাঁড়ালো না শাহজাদী। তবে কী সে এ ঘরে নাই? আংটিটা ঘষতেই আবার এসে দাঁড়ালো দৈত্যটা। আলাদিন বললো, আমি তো সারাদিন শাহজাদীর ঘরের জানালায় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু সে তো জানালার ধারে কাছে এলো না। এখন খোঁজ নিয়ে বলো, সে কোথায়? এই প্রাসাদে কী নাই?

দৈত্যটা পলকে অদৃশ হয়ে পলকেই আবার ফিরে এসে বললো, না হুজুর, তিনি এই ঘরেই শুয়ে আছেন। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন। শয্যা ছেড়ে বড় একটা ওঠেন না।

আলাদিন বললো, তুমি এক কাজ কর। এক খোজা নফরের বেশে তাকে গিয়ে গেলো, সে যেন একবার জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়।

—জো হুকুম, মালিক!

দৈত্য অদৃশ্য হয়ে গেলো। এক নফরের রূপ ধরে সে শাহজাদীর কামরায় ঢুকে বললো, শাহজাদী, একবার মেহেরবানী করে জানালার পাশে এসে দাঁড়ান, দেখুন বাগানে কী সুন্দর সব ফুল ফুটে আছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাহজাদী উঠে এসে জানালার পাশে দাঁড়ায়। এবং আলাদিনকে দেখতে পেয়ে এক অব্যক্ত আনন্দে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। ওঃ, তুমি সোনামণি, তুমি এসেছ?

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ঊনসত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

—এদিকে আরও আরও কাছে জানালার সামনে এসে দাঁড়াও সোনা, কোনও ডর নাই, ছুঁচোটা এখন প্রাসাদে নাই। কোথায় কার সর্বনাশ করতে বেরিয়েছে। সেই রাতে খানা-পিনার আগে ফিরবে না। আলাদিন জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বুদুর হাত বাড়িয়ে

আলাদিনের চিবুক অধর স্পর্শ করে। আদর জানায়। বলে, আমি আল্লাহর কাছে অহরহ মোনাজাত করছি, জানতাম আমার মিনতি তিনি ঠেলতে পারবেন না। কিন্তু আজই যে তোমার দেখো পাবো তাও ভাবতে পারিনি।

বুদুরের ইশারায় নফর প্রাসাদের ফটক উন্মুক্ত করে দিলো, শাহজাদী বললো, আর দেরি না করে চটপট ভিতরে চলে এসো।

আলাদিন ঘরে আসতেই বুদুর দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বামীর বুকে ঢলে পড়ে। কান্নায় সে ভাসিয়ে দেয় ওর বুক। আলাদিন ওকে সান্তনা দিতে থাকে, কেঁদ না মেরিজান, আমি যখন একবার এসে পড়েছি, ঐ শয়তান যাদুকরটাকে আমি একবার দেখে নেব। তুমি কিচ্ছু ভেব না। এখন বলো, তোমার ঘরে লুকাবার জায়গা আছে কোথাও?

বুদুর বলে, খুব আছে। ঐ যে দেখছো, মেহগনি কাঠের পেল্লাই আলমারীটা—ওটায় আমার সাজ-পোশাক থাকে। ওর মধ্যে দিব্যি তুমি শুয়ে ঘুমিয়ে কাটাতে পারবে।

আলাদিন বলে, আরে না ঘুমাবার দরকার নাই, আজ রাতেই কেল্লা ফতে করে তোমাকে নিয়ে আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। আচ্ছা হ্যাঁ, যাদু-চিরাগের কথা বুড়ো তোমাকে বলেছে কিছু? ওটা কোথায় আছে জান?

বুদুর বলে, হ্যাঁ, বলেছে, ঐ চিরাগের যাদুতেই নাকি তুমি এই প্রাসাদ বানিয়েছিলে। আমার পোড়াকপাল, ঐ শয়তানটার ধোঁকায় ভুলে তোমার ঐ চিরাগটা আমি লোকটার কাছে পালটি করে নতুন একটা চিরাগ নিয়েছিলাম। তখন কী জানতাম ও চিরাগবাতি আলো জ্বালাবার নয়। ওর মধ্যে এমন যাদু আছে, যা দিয়ে তামাম বিশ্ব-সংসার পায়ের তলায় রাখা যায়? আমি বুঝবো কী করে? আমাকে তো তুমি বলনি কোনও দিন। বুড়োটা আমাকে সব বলেছে। এও বলেছে, ঐ চিরাগের মায়াবলে দুনিয়ার সব সুখ বিলাস সে আমার পায়ে এনে নিবেদন করতে পারে। শুধু একবার তার কথায় রাজি হলেই হলো। শয়তানটা কত রকম লোভ দেখায় জান? বলে, চাও তো যে কোনও দেশের শাহেনশাহর বেগমকে এনে তোমার বাঁদী করে রাখতে পারি।'

আলাদিন হাসে, তা মিথ্যে বলেনি। ও এমনই চিরাগ, ওর যাদুতে অসাধ্য সাধন করা যায়। সে তো তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো। এই যে ইমারত এর একটা জানালার কারুকার্য সাত সুলতানের ধন-সম্পত্তির চাইতেও অনেক বেশি দামি। এ সব কী কোনও মর্ত্যলোকের মানুষের চেষ্টায় সংগ্রহ হতে পারে? থাক ওসব কথা। এখন বলো দেখি, ঐ চিরাগটা কোথায়? বুড়োটা কী কোথাও লুকিয়ে রেখে যায়, না সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে?

বুদুর বলে, আমিও অনেক কোসিস করেছি, হাতাবার, কিন্তু বুড়োটা মহা ধূর্ত ধড়িবাজ। ও বস্তু সে নিজের কাছ-ছাড়া করে না। কামিজের তলায় তলপেটে গুঁজে রাখে, সব সময়। দরজা বন্ধ করে রাতে ঘুমায়! কিন্তু তখনও ওটা ওর তলপেটেই গোঁজা থাকে।

আলাদিন বলে, ঠিক আছে, কুছ পরোয়া নাই। তোমাকে আজ খানিকটা ঢং করে অভিনয় করতে হবে।

—কী রকম?

—লোকটা রাতে ফিরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তো?

—ও বাবা, তা আর আসবে না। রোজই তো ও মনে বড় আশা নিয়ে আমার ঘরে আসে। নানা প্রলোভনে ভুলিয়ে আমাকে শয্যা-সঙ্গিনী করতে চায়। কিন্তু আমি যখন ওর দিকে বিষনজর হেনে বলি, জানে যদি বাঁচতে চাও, আমার ঘর ছেড়ে সিধে বেরিয়ে যাও,

তখন আর একটি কথা বলতে পারে না। ভীতু পেঁচার মতো পালিয়ে যায়।

আলাদিন বলে, বহুত আচ্ছা। কিন্তু আজ তোমাকে অন্য চালে চলতে হবে। চুল টুল বেঁধে, প্রসাধন প্রলেপ লাগিয়ে খুব দামী দামী গহনা পরে এবং জমকালো সাজ-পোশাক পরে একেবারে কামাতুরা পটের বিবিটি সেজে বসে থাকবে। লোকটা ঘরে ঢোকা মাত্র উঠে গিয়ে ওর হাত ধরে পালঙ্কে এনে বসাবে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে, তোমার মত বদলেছে। মনে আর কোনও খেদ নাই। এখন তার অঙ্কশায়িনী হতে তোমার আর কোনও বাধা নাই।

বুদুর আলাদিনের মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরে, কী যে আজে বাজে অলুক্ষণে কথা সব বল তার ঠিক নাই।

—আহা-হা, এতো ঘাবড়াচ্ছো কেন, আগে পুরোটা শোনো, তারপর যা বলার বলবে।

—বেশ বলো কিন্তু বাপু, তোমাকে আগেই বলে রাখছি, ওই শয়তানটাকে নিয়ে আমি শুতে পারবো না। তুমি হয়তো মতলব এঁটেছো, বুড়োটা ঘুমিয়ে পড়লে, ওর তলপেট থেকে চিরাগটা বের করে নিতে পারবো। কিন্তু অত সহজ ভেবো না। বুড়োর ঘুম খুব পাতলা! খুট করে ছোট্ট একটা আওয়াজ শুনলে শুয়ে শুয়েই সে গোঙায়—এ্যাই কে র‍্যা?

আলাদিন বলে, তুমি আমাকে অত মাঠো ভাবলে কী করে, সোনা। বুড়ো-হাবড়াদের নিদ খুব পাতলা হয়, আমি জানি। ও পাশে যাবো না আমি। বুড়োটাকে এমন দাওয়াই দিতে হবে যাতে আর ইহজীবনে ওর ঘুম না ভাঙে।

—বিষ?

বুদুরের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। আলাদিন বলে, হ্যাঁ বিষ।

—কিন্তু এখানে কোথায় পাবে বিষ। একেবারে জনমানব শূন্য জঙ্গল জায়গা। দু'চার দশ দিনের পথ হাঁটলেও কোনও গ্রাম গঞ্জ বা দোকান-পাট মিলবে না। বিষ কোথায় পাবে?

আলাদিন বলে, তুমি সেজে-গুজে তৈরি হও। সে ব্যবস্থা আমি করবো। শুধু কায়দা করে খাবারের সময় সরবত বা মদের পেয়ালায় মিশিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

বুদুর গোসল করতে হামামে ঢোকে। আলাদিন হাতের আংটি ঘষে। দৈত্য এসে হাজির হয়। আলাদিন হুকুম করে, জহর ঠোঁটে লাগানো মাত্র ঢলে পড়বে এমন জহর চাই খানিকটা। এখুনি।

দৈত্য অদৃশ্য হয়ে যায়। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার আবির্ভূত হয়ে আলাদিনের হাতে একটা পুরিয়া তুলে দিয়ে বলে, এর মধ্যে যে বিষ আছে তাতে লক্ষ্য মানুষকে মারার পক্ষে যথেষ্ট।

হামাম থেকে ফিরে এলে আলাদিন বিষের পুরিয়াটা বুদুরের হাতে দিয়ে বলে, খুব সাবধান, ভুলেও কখনও না ধুয়ে হাত মুখে লাগাবে না। এর এক কণামাত্র বিষ বুড়োকে মারার পক্ষে যথেষ্ট। কায়দা করে যাদুকরটার পেয়ালায় মিশিয়ে দিতে হবে খানিকটা। কিন্তু কী করে দেবে? লোকটা যদি তোমার হাতে কিছু একটা আছে বুঝতে পেরে সন্দেহ করে?

বুদুর বলে, সে ভাবে হাতে আমি ধরবো না। তুমি বলছো, এতো মারাত্মক বিষ। কণামাত্র জিভে ঠেকলে অক্কা পাবে। তাহলে পুরিয়াটা খুলে, আমার ডান হাতের তর্জনীর ডগায় খানিকটা মাখিয়ে নিই। সরবতই খাক আর সরারই খাক, সে পেয়ালায় আঙ্গুলটা আলতো করে ডুবিয়ে দিতে অসুবিধে হবে না আমার।

আলাদিন বলে, আর, ধরো যদি বুড়োটা বলে, তবিয়ত ভালো নাই, আজ কিছু খাবো না—তখন?

বুদুর বলে, তাতেও ঘাবড়াবার কিছু নাই। আমি নিজে থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে সোহাগের ঢং করবো। তাতে তো চনমন করে উঠবে বাঁদরটা! আমার মুখের কাছে এগিয়ে

আনতে যাবে ওর ঠোঁট, ঝুলে-পড়া তোবড়ানো ফোকলা বদনখানা। তখনি আমি চোখের বান হেনে ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলবো, আহা অত তাড়া কিসের, সারা রাতই পড়ে আছে, মালিক। আমি তো তোমারই—। ব্যস কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

আলাদিন বুদুরকে বুকে টেনে উল্লাসে ফেটে পড়ে, সাবাস্।

যথাসময়ে বুড়ো যাদুকর প্রাসাদে ফিরে আসে। খবর পেয়ে বুদুর আলাদিনকে তার সাজ-পোশাকের আলমারীতে ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখে। পরে আশ্চর্য কুশলতায় বুড়ো এবং বুদুর দুজনে এক সঙ্গে খানাপিনার টেবিলে গিয়ে বসে। এর একটু পরে সরবতের পেয়ালায় চুমুক দিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বুড়োটা।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে আলমারী খুলে আলাদিনকে বাইরে বের করে বুদুর।

—খতম হয়ে গেছে।

আলাদিন বুড়োর কাছে গিয়ে কামিজের তলায় হাত ঢুকিয়ে তলপেট থেকে চিরাগটা বের করে নেয়। অল্প একটু ঘষতেই চিরাগ-দৈত্য আফ্রিদি এসে হাজির হয়ে সালাম ঠুকে বলে, ত্রিভুবনের অধিপতি আমি, আমার অসাধ্য কিছুই নাই। একমাত্র এই চিরাগ ছাড়া আমি কারো দাসত্ব করি না। চিরাগ এখন আপনার হাতে। সুতরাং আপনিই আমার একমাত্র প্রভু। এখন আদেশ করুন, মালিক, কী করতে হবে।

আলাদিন বলে, শোনো চিরাগের বান্দা। প্রাসাদ যেমন আছে তেমনি অবস্থায় আলতোভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে আগে যেখানে ছিলো সেখানে বসিয়ে দাও। দেখো, আমাদের বিশেষ করে শাহজাদী বুদুরের যেন কোনও ঝাঁকানী না লাগে।

জো হুকুম, বলে আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেলো। পরক্ষণেই আলাদিন বুঝতে পারলো, গোটা প্রাসাদটা মহা শূন্যে উঠে যাচ্ছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলো তার স্বদেশে চীনের সেই সুলতান-প্রাসাদের পাশে এসে গেছে তারা।

তখন নিশুতি রাত। কেউ কিছু টের পেলো না। কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই সুলতান তাঁর শয়নকক্ষের জানালা দিয়ে দেখলেন, আলাদিনের সেই প্রাসাদটা আগে যেখানে যেমনটি ছিলো ঠিক সেখানে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন না। অভূতপূর্ব বিস্ময়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের বাদশাহী কায়দা কেতা ভুলে রাত্রিবাস পরেই খালি পায়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সুলতানকে স্বাগত জানাতে আলাদিন সদরে বেরিয়ে এলো।

—একি আপনি এভাবে না এসে শমন পাঠালেই তো পারতেন, জাঁহাপনা। বান্দা হাজির হতো।

সুলতান তখন কন্যা সন্দর্শনে উন্মুখ, আলাদিনের কোনও কথাই তাঁর কানে ঢুকলো না বোধ হয়। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, শাহজাদী বুদুর কোথায়?

আলাদিন বলে, আপনি ভিতরে আসুন। সে এখনও ঘুমুচ্ছে। আমি ডেকে দিচ্ছি, ভিতরে আসুন আপনি।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো একাত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

কন্যাকে ফিরে পেয়ে সুলতান আনন্দে কেঁদে ফেলেন। বুদুর বলে, আব্বাজান তোমার একি চেহারা হয়েছে?

সুলতান কন্যাকে আদর করতে করতে বলেন, তোর শোকে জানে যে বেঁচে আছি এই ঢের মা। তুই আমার একমাত্র সন্তান, চোখের মণি, তোর অদর্শন কী আমি সইতে পারি? কী হয়েছিলো তোর, কী করে কে তোকে এই প্রাসাদ সুদ্ধ কোথায় নিয়ে গিয়েছিলো আমি তো ভাবতেই পারছি না, মা।

বুদুর তখন সেই শয়তান মূর যাদুকরের সব কাহিনী সুলতানকে খুলে বললো।

—জান আব্বাজান, আমি তো দিন রাত কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিলাম, বুড়ো শয়তানটা বুঝি আর আমাকে আস্ত রাখবে না। কিন্তু ওপরে আল্লাহ আছেন, এতো পাপ অনাচার তিনি সহ্য করবেন কেন? তাই দেখ, তার সমুচিত সাজা সে পেলো।

সুলতান বুঝতে পারলেন, আলাদিন নির্দোষ। জামাইকে বুকে টেনে নিয়ে তিনি আদর করে বললেন, সন্তান-স্নেহে অন্ধ হয়ে সবকিছু না জেনে তোমাকে অনেক কষ্ট লাঞ্ছনা দিয়েছি বাবা। কিছু মনে রেখ না। তুমি তো জান বাবা, আমি আমার সলতানিয়ত খোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু আমার প্রাণাধিক বুদুরের কেশাগ্র ছুঁতে দিতে দেবো না কোনও শয়তানকে।

আলাদিন বলে, আমি আপনার সে-সময়ে মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলাম আব্বাজান। যাক, যা হয়ে গেছে তা আর মনে পুষে রেখে লাভ নাই। আপনার কন্যাকে ফিরে পেয়ে আবার আপনি আনন্দ-মুখর হতে পেরেছেন এই আমার পরম ভাগ্য।

আলাদিন তার নফরদের বললো, ঐ বুড়ো মূরটার লাশটা নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আয়। শিয়াল শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক-এর দেহের মাংস। সেই হবে তার যোগ্য পুরস্কার।

সুলতানের প্রাসাদে ও সারা শহরে উৎসবের বাদ্যি বেজে উঠলো। সুলতান ঘোষণা করলেন, শাহজাদীর ফিরে আসার আনন্দে ফাটকের কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হলো। যে যেখানে আছ, আনন্দ কর, নাচো গাও, পিও জিও। দলে দলে হাজার হাজার মানুষজন এসে প্রাসাদে পাত পেড়ে পরিতৃপ্তি করে খেয়ে যেতে লাগলো। সুলতান কোষাগার উন্মুক্ত করে দিলেন। দু'হাতে ধররত্ন বিতরণ করা হতে লাগলো।

এরপর আলাদিন বুদুরকে নিয়ে অপর্যাপ্ত সুখ-সম্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে।

দিনে দিনে মাস অতিক্রান্ত হয়। মাসে মাসে বছরও ঘুরে আসে। কিন্তু বুদুর সেই পরম সংবাদটি আর শোনাতে পারে না কাউকে। বিবাহিত জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল সন্তান। সেই সন্তানের আগমন-বার্তা এসে পৌঁছলো না দেখে সুলতান বেগম এবং অপরাপর আত্মীয়-পরিজন সকলেই উদ্বিগ্ন হলেন। তবে কি শাহজাদী বুদুর বন্ধ্যা? একটি সন্তানও এলো না তার গর্ভে।

বুদুর বিষণ্ণ বদনে একা একা বসে ভাবে। একটি সন্তানই যদি কোলে না এলো তবে এ জীবনে কীসের সুখ, কীসের আনন্দ?

চেনা জানা যে যা বলে পালন করতে কসুর করে না বুদুর। কত জলপড়া ঝাড় ফুঁক টোটকা তো করা হলো, কিন্তু ফল নৈব নৈব চ।

আলাদিন স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়, অত ভাবো কেন, সোনা, আমরা কী এখনই বুড়ো হয়ে গেছি। অঢেল যৌবন তো পড়ে রয়েছে! আজ হয়নি, কাল হবে। ও নিয়ে অত মন খারাপ করতে নাই। আমরা কোনো পাপ করিনি, দেখো, আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন।

কিন্তু আলাদিনের এই সান্ত্বনা বাক্যে বুদুরের খাঁ খাঁ করা শূন্য হৃদয় পূর্ণ হতে পারে

না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস কোন রকমে চেপে বলতে পারে না না, ওসব আমি ভাবি না। তুমি আছ আমি আছি আমার আর ভাবাটা কী? তুমিই তো আমার সকল চিন্ত জুড়ে রয়েছ, সোনা।

একটু থেমে আলাদিনের বুকে মাথা রেখে বুদুর বলে, একটা কথা বলবো, জান?

আলাদিন অবাক হয়। এমন কী কথা, যার জন্য বুদুর এতো দ্বিধা সঙ্কোচে ভণিতা করছে!

—কী ব্যাপার, অমন কিন্তু কিন্তু করছো কেন, চটপট বলেই ফেলো না?

বুদুর বলে, শহরে এক গুণী সন্ত বৃদ্ধা এসেছেন। শুনলাম তিনি নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। যে-সব মেয়েদের সন্তান হয় না, তাকে দর্শন করলেই নাকি গর্ভবতী হয়। তুমি এ সবে মত দেবে কিনা জানি না, তবে একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়।

আলাদিন হো হো করে হেসে ওঠে, ও, তাই বলো। তা—আমার অমত হবে কেন। বেশ তাকে এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি।

চারজন খোজা নফরকে ডেকে পাঠিয়ে দিলো সে বৃদ্ধাকে নিয়ে আসার জন্য।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সন্ত বৃদ্ধা আলাদিনের প্রাসাদে এসে পৌঁছলো। সর্বাঙ্গ মোটা কাপড়ের বোরখায় ঢাকা। গলায় দোদুল্যমান আজানুলম্বিত বহু বিচিত্র এক মালা। সারা অঙ্গে নানারকম পাথর, ধাতুর চাকতি, পশুপাখির হাড্ডি এবং অনেক রকমের গাছের মূল ইত্যাদি দিয়ে বানানো এক ভয়ঙ্কর বস্তু। হাতে একখানা আঁকাবাঁকা লাঠি। এক হাতে একটা পিতলের ধূপদানী।

খোজারা ওকে হারেমে শাহজাদী বুদুরের সামনে হাজির করলো। বৃদ্ধা আশীর্বাদের ভঙ্গী করে বুদুরকে দোয়া জানালো। বুদুর ওকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে বললো, শুনেছি, আপনি সাক্ষাৎ আল্লাহর পয়গম্বর। আপনার অসাধ্য নাকি কিছুই নাই। আপনি যখন মেহেরবানী করে আমার গরীবখানায় চরণ ধুলো দিয়েছেন তবে একটুখানি করুণা করে আমার ক্ষুদ্র একটি মনস্কামনা পূর্ণ করুন, এই আমার ইচ্ছা।

বৃদ্ধা বলে, আমি বুঝেছি বেটা, তোমার মনের বাসনা আমি জ্ঞাত হয়েছি। ঠিক আছে, যা বলছি মন দিয়ে শোনো। যদি ঠিক ঠিক করতে পার, তবে নির্ঘাৎ পুত্রলাভ হবে তোমার।

বুদুর চমকে ওঠে, পুত্র লাভ! আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ।

—বলুন মা, যত দুঃসাধ্যই হোক, আমি তা করবোই।

বোরখাবেশি সন্ত বলে, বলবো, অবশ্যই বলবো, মা। কিন্তু সে বস্তু কী তুমি সংগ্রহ করতে পারবে?

বুদুরের আর বাঁধ মানে না। বৃদ্ধার পায়ের কাছে সে হাঁটু গেড়ে বসে পা-দু'টো চেপে বলে, খুব পারবো, আপনি আদেশ করে দেখুন। আমার স্বামী আলাদিন, এ দুনিয়ার অসাধ্য কাজ তার কিছুই নাই।

সন্ত বলে, ঠিক আছে তাকে বলো, সে যেন একটি রকপাখির ডিম সংগ্রহ করে এনে তোমার শোবার ঘরের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখে। বাস আর কিছুই করতে হবে না। দশমাস দশদিন পরে দেখবে, তুমি পুত্রবতী হয়েছো। এই রকপাখির ডিম কোথায় পাওয়া যায় তাও তোমাকে বলে দিচ্ছি। ককেসাস পর্বতমালার নাম শুনেছ তো, সেই পর্বতের অত্যুচ্চ শিখরে রকরা ডিম পাড়ে। সেখান থেকে সে-ডিম বহন করে নামিয়ে আনা সহজ কর্ম নয়।

বুদুর বলে, ও-নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না, আমার স্বামীর কাছে কোনও কাজই কঠিন নয়। অনায়াসে সে এনে দিতে পারবে। এ ছাড়া আর যদি কোনও আজ্ঞা থাকে করুন, মা, আমি পুত্রলাভের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

বৃদ্ধা বলে, মা আর কিছুর প্রয়োজন নাই। সন্তান লাভের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। এই ডিমটার গুণে তোমার মাতৃত্বের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে জেগে উঠবে। এখন সে মরার মতো

অসাড় হয়ে আছে তোমার দেহের ভিতর। ঠিক আছে বেটা, আজ তাহলে আমি আসি। আমার জন্যে আরও অনেকে এসে অপেক্ষা করছে হয়তো। সকলের দুঃখের লাঘব করাই তো আমার এক মস্ত ধর্ম।

বুদুর নানা ধনরত্নে বৃদ্ধার ঝুলি পূর্ণ করে দিলো। প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বললো, দেখি, যদি সময় পাই, কাল আর একবার আসবো তোমার কাছে। আজ রাতে আল্লাহর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হবে। তখন তোমার কথা বলবো তাঁকে। যদি তিনি প্রসন্ন হয়ে কোনও বাণী দেন আমি তোমাকে জানিয়ে যাব, মা।

বৃদ্ধা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদিন বুদুরের কক্ষে প্রবেশ করে।

—কী, কী বলে গেলেন উনি?

বুদুর বিষণ্ণ মনে বলে, সে প্রায় অসাধ্য ব্যাপার।

—আরে বলই না, আমি আলাদিন, ত্রিভুবনে অসাধ্য বলে কোন কিছু নাই আমার কাছে। বলো তো পুরো হিমালয় পাহাড়টিকে তুলে অন্য কোথাও বসিয়ে দিতে পারি। এর চেয়ে বড়ো কঠিন কী কাজ থাকতে পারে।

বুদুরের মুখে হাসি ফোটে, না অত বড় কাজ নয়, তবে খুব সহজও নয়। ককেসাস পাহাড়ের মাথায় রকপাখিরা ডিম পাড়ে। সেই ডিম একটা আমার চাই।

—কেন কী হবে তা দিয়ে।

—সন্ত বলে গেলো আমার শোবার ঘরের মাঝখানে একটা রকপাখির ডিম ঝুলিয়ে রাখলে আমি পুত্র-সন্তানের মা হবো।

—বহুত আচ্ছা, আলাদিন বলে, এ আর কী কঠিন কাজ। দাঁড়াও এখুনি আফ্রিদি দৈত্যকে ফরমাশ করছি, চোখের পলকে সে এনে হাজির করবে। তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো তিয়াত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

এই বলে আলাদিন বুদুরকে ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যায়! চিরাগবাতিটা হাতে নিয়ে আলতোভাবে ঘষতেই আফ্রিদি এসে হাজির হয়। যথাবিহিত কুর্নিশ করে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আলাদিন আফ্রিদিকে বলে, জান বান্দা আজ এক কাণ্ড করেছে আমার বিবি। এতকাল আমাদের শাদী হয়েছে। কিন্তু বালবাচ্চা কিছু হয় নি বলে শাহজাদীর খুব মন খারাপ। তাই সে আজ এক বৃদ্ধা সন্তের সঙ্গে দেখা করবে বলে আমার কাছে বায়না ধরেছিলো। আমি সেই ফকির সন্তকে প্রাসাদে এনে তার সামনে হাজির করেছিলাম। সে ফরমাশ করে গেছে আমাদের শোবার ঘরের মাঝখানে একটি রকপাকির ডিম ঝুলিয়ে রাখতে হবে। সে ডিম নাকি ককেসাস পর্বত-শিখরে পাওয়া যায়। তা বাপু, একটু কষ্ট করে একটা ডিম এনে দাও তুমি।

আলাদিনের মুখের কথা শেষ হতে না হতে বিকট এক আর্তনাদ করে ওঠে আফ্রিদি দৈত্য। আলাদিন চোখ তুলে তার ভয়াল ভয়ঙ্কর মুখাকৃতি দেখে শিউরে ওঠে। দু'হাতে ঢেকে ফেলে নিজের মুখ। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না দৈত্যটা এতকাল বাদে আজ হঠাৎ এমন চণ্ডাল মূর্তি ধারণ করলো কেন। উফ! কী ভীষণ তার মুখব্যাদন। জ্বলন্ত ভাটার মতো তার

গোলাকৃতি চোখ দু'টো দেখে হৃদপিণ্ডের কাঁপুনি ধরে গেছে আলাদিনের। সাহস করে আর তাকাতে পারে না। হাতে মুখখানা ঢেকে রেখেই ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, কী হলো চিরাগের বান্দা, এতো গোসা হলো কেন তোমার? আমি কী তোমাকে মন্দ বলেছি কিছু?

—এ কি কথা বলেছেন, মালিক! এর চেয়ে খারাপ কথা আর কী হতে পারে বলুন। আপনি আমাকে দু'চার ঘা মারতে চাইতেন, পিঠ পেতে দিতাম, কিন্তু এ কি সাংঘাতিক কথা আপনি বললেন। নেহাত আপনার সঙ্গে আমার এতদিনে অনেকটা মায়া-মমতা গড়ে উঠেছে। অন্য মালিকদের মতো আপনি কখনও মুখ গোমড়া করে ফাই-ফরমাশ করেন না। আমি বান্দা, নফর। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সব সময়ই আমি বড়ো ভালো ব্যবহার পেয়েছি। সেই কারণে আপনার সম্বন্ধে আমার একটা দুর্বলতাও জন্মে উঠেছে। তাই আপনি রক্ষা পেয়ে গেলেন আজ। তা না হলে যে কথা আপনি উচ্চারণ করেছেন, তা শোনার পর আপনাকে টুটি টিপে আমি মেরে ফেলতাম।

আলাদিন আতঙ্কিত হয়ে বলে, কিন্তু বিশ্বাস কর বান্দা, এখনও আমি বুঝতে পারছি না, আমি খারাপ কী বলেছি।

আফ্রিদি খানিকটা শান্ত হয়ে বলে, তবে শুনুন মালিক, বুঝতে পারছি, সজ্ঞানে আপনি ও কথাটা বলেননি। সেই বৃদ্ধাটা আপনার অনিষ্ট করার জন্য আপনার বিবিকে ওই সর্বনাশা কুপরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলো। আপনি হয়তো জানেন না, আমাদের—জীন দৈত্যদের সবার উপাস্য ঈশ্বর হচ্ছে পরমপিতা রক।

এই বলে আফ্রিদি দুই কাঁধে, কর্ণমূলে এবং নাকে হাত রেখে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললো, আপনার হাতে যে চিরাগ সে আমার প্রভু, মালিক। কিন্তু রক আমাদের সমগ্র জীন দৈত্যকুলের ঈশ্বর। তার চেয়ে বড়ো আর কেউ নাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং তার ডিম আপনি আমাকে চুরি করে আনতে বলে কী সাংঘাতিক গর্হিত কাজ করেছেন, একবার ভেবে দেখুন।

আলাদিন বলে, বিশ্বাস কর বান্দা, তোমাদের ঈশ্বরকে একবিন্দু খাটো করার অভিপ্রায় নিয়ে একথা আমি বলিনি।

আফ্রিদি বলে, আমি বুঝতে পেরেছি মালিক, আপনি এক দুষ্ট দুরাচারের পাল্লায় পড়েছেন। আপনার বা আপনার বিবির কোন গুনাহ নাই, মালিক।

আলাদিন বলে, আচ্ছা বান্দা বলো দেখি, ওই বৃদ্ধার অন্তরে এমন অনিষ্ট করার প্রবৃত্তি হলো কেন? আমি তো তার কোনও ক্ষতি করিনি।

—কে বললো আপনি তার ক্ষতি করেন নি, মালিক! তার বড় ভাই সেই বুড়ো যাদুকর মুরকে আপনারা বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেছেন। এ তারই প্রতিহিংসা। বৃদ্ধা সন্তের বেশে যে এসেছিলো আসলে সে কোন নারী নয়। সেই মুর যাদুকরের সহোদর ভাই। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সে এ শহরে এসেছে। নিজের কোনও বিদ্যা জানা নেই, যা দিয়ে সে আপনাকে ঘায়েল করতে পারে। তাই চক্রান্ত করে কলা-কৌশলে আমার হাতে আপনাকে নিধন করাতে চেয়েছিলো। কারণ সে জানতো, রকপাখীর ডিমের কথা শোনামাত্র আমি আর পলকমাত্র অপেক্ষা করবো না। আপনার ঘাড় মটকে দেব। কিন্তু লোকটার চাল ঠিকমতো খাটলো না। আমি সব বুঝতে পারলাম। তবে এও ঠিক অন্য সব মালিকের মতো আপনি যদি চিরাগ ঘষেই শুধুমাত্র বলতেন, 'একটা রকপাখির ডিম নিয়ে এসো' তাহলে মৃত্যু আপনার অবধারিত ছিলো। কিন্তু, আমি প্রতিক্ষেত্রেই দেখেছি, আমাকে দিয়ে কোনও একটা কাজ করাবার জন্য আপনি বিস্তারিত ভূমিকা করে কার্য কারণ খুলে বলেন। এতে অবশ্য আমি অনেক সময় মনে মনে ঈষৎ বিরক্তি বোধ করেছি,

কিন্তু আজ শুধু সেই কারণেই আপনার প্রাণ রক্ষা হয়ে গেলো, মালিক। না হলে আপনার লাসটা পড়ে থাকতো এই মেঝেয়।

আলাদিন কেঁপে ওঠে। যাক, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।

আফ্রিদি বলে, আমাদের শাস্ত্রের একটা উপদেশ আছে, ধাড়ি কুত্তার চেয়ে ছোট কুত্তাগুলো আরও বেশি পাজি হয়। বুড়ো মুর যাদুকরের চেয়ে তার এই ছোটো ভাইটা আরও মারাত্মক শয়তান। সে আপনাকে নিধন করতে ক্ষেপে উঠেছে। একটু সাবধানে থাকবেন, মালিক। এই আমার নিবেদন। যাই হোক, আমি আপনাকে সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখবো, আপনার কোনও চিন্তা নাই।

এই বলে আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বুদুরের কাছে ফিরে এলো আলাদিন। বললো, শোনো, মণি, আমি নিজে কানে ঐ বৃদ্ধার কথা শুনতে চাই। কী ভাবে কী করতে হবে, নিজে কানে শোনার পর আমি তোমাকে ঐ রকপাখির ডিম আনিয়ে দেব।

বুদুর বলে বেশ তো, কাল সকালেই সে আবার আসবে এখানে। তুমি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানে সব শুনে নিও।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চুয়াত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পরদিন সকালে মুর যাদুকরের কনিষ্ঠ সহোদর বৃদ্ধা সন্তের ছদ্মবেশে আবার এসে হাজির হয় আলাদিনের প্রাসাদে। খোজারা সমাদর করে নিয়ে যায় তাকে শাহজাদী বুদুরের কক্ষে।

আলাদিন আগে থেকেই পর্দার আড়ালে অপেক্ষমান ছিলো। তার এক হাতে দড়ির ফাঁস, অন্য হাতে রজত শুভ্র চকচকে ধারালো তলোয়ার। ছদ্মবেশী বুদুরের সামনে এসে দাঁড়াতেই আলাদিন পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষিপ্র হাতে দড়ির ফাঁস পরিয়ে দেয় তার গলায়।

বুদুর হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে, একি! একি করছো তুমি? কিন্তু আলাদিন ততক্ষণে তলোয়ারের এক কোপে লোকটার ধর মুণ্ডু আলাদা করে ফেলেছে।

বুদুরের চোখে ক্রোধের বহ্নি, একি করলে তুমি? এ যে মহাপাতকের কাজ হলো। এ পাপ আমরা রাখবো কোথায়?

আলাদিন হাসতে হাসতে বললে, এই লোকটার আসল পরিচয় তুমি কিছুই জান না, সোনা। এই দেখ—

আলাদিন তলোয়ারের ডগা দিয়ে বোরখাখানা চিরে ফালা ফালা করে সরিয়ে দিলো!

বুদুর তো হাঁ হয়ে গেছে। এমন অবাক কাণ্ড কেউ ভাবতে পারে?

আলাদিন বলে, লোকটা যে আসলে কোনও বৃদ্ধা সন্ত ফকির নয়, সে তো দেখতে পাচ্ছো! এর প্রকৃত পরিচয় কী জান? ঐ ঘাটের মড়া শয়তান যাদুকর মুরটার এ ছোট ভাই। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সে এ শহরে এসে আস্তানা গেড়েছিলো। ওর একটাই মতলব ছিলো, আমাকে এবং তোমাকে নিহত করা। কাজ প্রায় হাসিল করেও ফেলেছিলো, কিন্তু উপরে আল্লাহ অসীম করুণাময়। তাঁর দরবারে আমাদের কোনও অপরাধ নাই। তাই সোনা, তিনি আমাদের রক্ষা করেছেন।

বুদুর তখনও থর থর করে কাঁপছে। আলাদিনকে জড়িয়ে ধরে সে বলে আমি তো বুঝতে পারিনি, কিন্তু তুমি কী করে জানতে পারলে লোকটার এই অভিসন্ধি।

আলাদিন বললো, আমার চিরাগের বান্দা আফ্রিদি দৈত্যই আমাকে সব বলেছে, মণি। সেই আমাকে জানিয়েছে লোকটা মূর যাদুকরের সহোদর ভাই। প্রতিহিংসার আগুনে সে জ্বলছে। আমায় মারার ফন্দী এঁটে সে এ প্রাসাদে বৃদ্ধা ফকিরের ছদ্মবেশে প্রবেশ করেছিলো।

তারপর আলাদিন আফ্রিদি দৈত্যের সব বৃত্তান্ত খুলে বললো বুদুরকে। বুদুর বললো, দৈত্যটা খুবই ভালো, তাই আমরা রক্ষা পেলাম, না?

আলাদিন বলে, সবই খোদাতালার খিদমদ। তিনি রাখলে কী কেউ মারতে পারে?

এরপর আলাদিন আর বুদুর জীবনের ইন্তেকাল পর্যন্ত প্রেমের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে বহু বৎসর অতিবাহিত করে গিয়েছিলো এবং এও জেনে আপনারা খুশি হবেন, শাহজাদী বুদুর আদৌ বন্ধ্যা নারী ছিলো না। একাধিক সন্তানের আদর্শ জননী হওয়ার পরম সৌভাগ্য তার জীবনেও ঘটেছিলো।

শাহরাজাদ বললো, এই হলো আলাদিন এবং তার আশ্চর্য যাদুচিরাগের কাহিনী।

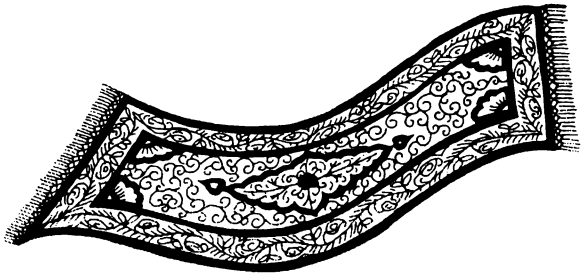

সুলতান শারিয়ার বললো, খুব সুন্দর, বড় চমৎকার। এমন কাহিনী বহুকাল মনে থাকবে।

শাহরাজাদ বলে, এবার যদি জাঁহাপনা অনুমতি করেন তবে কামর আর হালিমাহর কাহিনী শোনাতে পারি।

—বেশ তো, শোনাও।

শাহরাজাদ হাসে, তার আগে ছোট্ট একটা হিতোপদেশের গল্প শোনাই আগে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এই ধরনের শিক্ষামূলক অনেক কাহিনী রেখে গেছেন। আমাদের জন্য। আজ তারই একটা শোনাচ্ছি আপনাকে।

সুলতান শারিয়ার বলে, আচ্ছা তাই শোনাও দেখি কেমন উপদেশের কথা। শাহরাজাদ, আমি ভেবে পাই না, তুমি একনাগাড়ে এতদিন ধরে একটার পর একটা এইরকম মজাদার কিস্‌সা কি করে বলে যেতে পারছো!

শাহরাজাদ বলে, মহানুভব শাহেনশাহর অপার করুণা। ওয়াদা মতো প্রতিটি রাতে তো আমি আপনাকে কাহিনী শোনাতে পারিনি। কখনও মন মেজাজ ভালো লাগেনি বলে বাদ দিয়েছি, আবার কখনও অসুখ-বিসুখ হওয়াতেও ছেদ পড়েছে। একবার তো একটানা বিশদিন বিমারে পড়েছিলাম। আপনাকে কিস্‌সা শোনাতে পারিনি। কিন্তু আমার ওপর আপনার অশেষ দয়া, —আপনি আমাকে ক্ষমার চোখে দেখেছেন।

শারিয়ার হাসে, তুমি কী আমাকে শুধুমাত্র হৃদয়হীন পাষণ্ড বলেই মনে কর শাহরাজাদ। রক্ত মাংসে গড়া মানুষের শরীর। অসুখ-বিসুখ হবেই। তাছাড়া তুমি তো একটা কলের পুতুল নও, দম দিলেই চলতে থাকবে। আর সকলের মতো তোমারও ইচ্ছে অনিচ্ছে ভালো লাগা

না-লাগা বলে একটা ব্যাপার থাকতেই পারে। আমি কী এতোই অমানুষ, সেটুকুও বুঝতে পারবো না?

কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে যায় শাহরাজাদের। একটুক্ষণ পরে সে গল্প শুরু করে ঃ

কোন এক সময় এক সুন্দর সুপুরষ বিদ্যোৎসাহী তরুণ নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অতি অল্প বয়সেই পরম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলো। যেখানে যা ভালো বইপত্তর পেত সংগ্রহ করে পড়তো সে। জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির সন্ধান পেলেই সে ছুটে যেত তাদের কাছে। যদি কিছু জ্ঞান আহরণ করা যায়। এইভাবে দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞানভাণ্ডার উজার করে নিতে থাকলো সে। তবু তার তৃষ্ণা মেটে না। দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে চলে—নতুন কোনও বিদ্যা যদি সে শিখতে পারে এই আশায়!

একদা চলতে চলতে এক ফকির দরবেশের সাহচর্য পায় সে। যুবক তাকে আঁকড়ে ধরে, আপনি আমাকে কিছু জ্ঞান দান করে যান পীরসাহেব।

দরবেশ ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, বেটা, তোমার সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম, এই বয়সে তুমি যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছ আমি সারাজীবন ঘুরে ঘুরে এই বৃদ্ধবয়সে তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারিনি। তোমাকে জ্ঞান দান আমার বিদ্যায় কুলাবে না। বরং আমি তোমাকে এক দিব্যজ্ঞানীর কাছে পাঠাচ্ছি সেখানে যাও, তিনি তোমাকে দিব্যজ্ঞান দিতে পারবেন।

যুবক কৃতজ্ঞচিত্তে সেই জ্ঞানী মহাজনের ঠিকানা নিয়ে রওনা হলো। কুড়ি দিন একটানা পথ চলার পথ এক গণ্ডগ্রামে এসে পৌঁছলো। সেই গ্রামে বাস করেন সেই দিব্যজ্ঞানী, এক কর্মকার।

যুবক দেখলো, একটা ছোটোখাটো কামারশালা। এক পলিতকশে বৃদ্ধ নিজের হাতে হাপর টেনে লৌহশলাকা গরম করছে। যুবককে দেখে বৃদ্ধ কর্মকার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কী বাবা, কী দরকারে এসেছ।

যুবক তার পদধূলি মাথায় নিয়ে বললো, আমি আপনার কাছে এসেছি জ্ঞানলাভের জন্য। অনেক পথ হেঁটে বহু দূরদেশ থেকে আসছি। শুনেছি সারা দুনিয়ার মধ্যে এখন আপনিই একমাত্র প্রাজ্ঞব্যক্তি।

বৃদ্ধ হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, জ্ঞান-সমুদ্রের এক আজলা পানিও কী আমরা গ্রহণ করতে পারি বাবা। যাই হোক কাছে এসো। এখানে বস। আমার যা জানা আছে অবশ্যই তোমাকে তা শেখাবো, কিন্তু তার জন্য ধৈর্য ধরতে হবে, হাঁক-পাক করলে হবে না।

যুবক বলে, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য।

বৃদ্ধ বললেন, তা হলে আজ থেকে পাঠ শুরু হয়ে যাক। এই নাও ধরো এই হাপরের দড়িখানা। বুড়ো হয়েছি, একনাগাড়ে কতকাল ধরে দড়ি টেনে হাওয়া করে লোহা গরম করে আসছি। এবার তুমি এসে গেছো, ভালোই হোল। আমি হাতুড়ি পিটে যন্ত্রপাতি বানাবো, আর তুমি হাপর টেনে আমার কাজের একটু সাহায্য করবে!

যুবক বলে, এভাবে আপনার কোনও কাজে লাগতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি।

প্রতিদিন কামারশালা খোলে বৃদ্ধ। হাপর জ্বালানো হয়। যুবক সারাদিন ধরে হাপর টানে আর বৃদ্ধ নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করতে থাকেন! কত রকম খদ্দের আসে। কত

লোকের কত রকম ফরমাশ। বৃদ্ধ যত্ন সহকারে সব শোনে। বায়না নেয়। এবং সেই মত কাজ সমাধা করে যথাসময়ে খদ্দের বিদায় করেন।

একদিন দু'দিন করে একটা সপ্তাহ কেটে গেলো। বৃদ্ধ কোনও জ্ঞানের কথা বলে না। যুবক ভাবে, সময় হলে তিনি নিজে থেকেই বলবেন। সুতরাং পুনরায় তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না।

কিন্তু দিনে দিনে মাস অতিক্রান্ত হতে চললো, বৃদ্ধ তার নিজের কামারশালার কাজকর্মে ডুবে থাকেন। সারাদিন অন্য কোনও কথাবার্তা বলার ফুরসতই নাই! যুবক লক্ষ্য করে, এই বয়সেও বৃদ্ধ কী অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। এক মুহূর্ত কাজে গাফিলতি নাই। সারাদিন ধরে হাতে কাজ করে চলেছেন এবং সেই সঙ্গে মুখে কথা বলে যাচ্ছেন খদ্দেরদের সঙ্গে। কোনও বিরাম নাই।

এইভাবে মাসে মাসে বছর পার হয়ে গেলো। যুবক বুঝতে পারলো, বৃদ্ধ ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন না। কিন্তু কেন? অনেক ভেবেও কোনও কারণ অনুসন্ধান করতে পারে না সে। যাই হোক, যুবক নিজে থেকে তার শিক্ষালাভের কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করতে সাহস করে না। বৃদ্ধ যদি অপ্রসন্ন হন, যদি তিনি বিমুখ হয়ে বলেন, না বাপু আমার দ্বারা হবে না, তুমি অন্য পথ দেখ।

এক এক করে পুরো পাঁচটা বছর কেটে গেলো। তবু বৃদ্ধ মুখ খোলেন না। তার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেন না ওর কাছে। এবার কিন্তু যুবক ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করে না। অসীম ধৈর্য নিয়ে সেই পরমক্ষণটির প্রতীক্ষা করতে থাকে।

এইভাবে আরও পাঁচটা বছর চলে গেলো। যুবক তখন সব কিছু ভুলে বৃদ্ধের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। সে জানে সময় হলে আপনা থেকেই তিনি তাকে দিব্যজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করবেন।

বৃদ্ধ একদিন বললেন, আচ্ছা বাবা একটানা দশটা বছর তুমি একই ভাবে হাপর টেনে যাচ্ছো, তোমার বিরক্তি লাগে না?

যুবক বললো, এখন আমি সে সবের অনেক ওপরে চলে গেছি, বাবা। প্রথম প্রথম যে একেবারে সে-রকম হয়নি তা নয়, কিন্তু এখন আর হয় না?

বৃদ্ধ বলেন, আমার কাছে কিছু শিখবে বলে এসেছিলে! এতকাল ধরে তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে শুধু হাপরের দড়ি টানালাম। দিব্যজ্ঞান তো কিছু দিতে পারলাম না, বেটা।

যুবক বলে, প্রথমে বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে আমার সম্যক্ জ্ঞানলাভ হয়েছে বাবা, দিব্যজ্ঞান লাভ করতে গেলে, অসীম ধৈর্যের অধিকারী হতে হবে। জগতে ধৈর্যশীল ব্যক্তিরাই প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারে। এতকাল পরে এই পরম সত্যটি আমি আপনার সাহচর্য থেকে লাভ করতে পেরে ধন্য হয়েছি।

বৃদ্ধ আশীর্বাদ করে বললেন, যাও বাবা গৃহে ফিরে যাও। যে ধৈর্য তিতিক্ষার পরিচয় তুমি রেখে গেলে আমার কাছে, সারা দুনিয়ায় তার নজির মেলা ভার। আমি বিশ্বাস করি, তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছ।

যুবক বৃদ্ধের পদধূলি মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে গেলো।

শাহরাজাদ থামলো। সুলতান শাহরিয়ার বলে, অপূর্ব! খুব ভালো লাগলো শাহরাজাদ। এবার তাহলে তোমার সেই কমার আর হালিমাহর কিস্‌সা শুরু কর, শোনা যাক।

শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা ভাবছি, তার আগে অন্য আর একটা কাহিনী আপনাকে শোনাবো।

শারিয়ার বলে, কী কাহিনী?

গুলাব সুন্দরী ফারিজাদ-এর কিস্‌সা বলছি শুনুন্ জাঁহাপনা। খুব সুন্দর নির্মল মনোগ্রাহী এক কাহিনী।

সুলতান বলে, বেশ তাই বলো, শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। তখন পারস্যের সুলতান খসরু শাহ।

অবশ্য আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন, জাঁহাপনা শাহেনশাহ খসরু শাহ কেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ বাদশাহ ছিলেন। একদিকে যেমন কুসুমাদপি কোমল ছিলো তাঁর হৃদয়, অন্যদিকে বজ্রের চেয়েও কঠিন এবং দীপ্যমান ছিলেন তিনি। লোকে বলে, তাঁর ইঙ্গিতে বাঘে ছাগলে একঘাটে পানি খেত।

সে যাই হোক, তাঁর জীবনের বহু বিখ্যাত-কাহিনী আজ লোকের মুখে মুখে ফেরে, আজ আমি তাঁরই সময়ের একটি সত্য ঘটনা আপনাকে বলছি।

সুলতান প্রায় প্রতিরাতেই বিদেশী বণিকের ছদ্মবেশে শহর পরিক্রমায় বেরুতেন। উদ্দেশ্য—তাঁর প্রজারা কে কেমন ভাবে দিন গুজরান করছে, প্রত্যক্ষ করা।

এক রাতে তিনি তাঁর উজিরকে সঙ্গে নিয়ে শহরের প্রান্তে অতি দিন দরিদ্র এক পল্লীতে প্রবেশ করলেন। সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দারাই অভাবের তাড়নায় জর্জরিত।

একটা গলির মুখে পুরানো বস্তিবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই গুটিকয়েক মেয়ের বাক্যালাপ শুনে থমকে দাঁড়ালেন সুলতান। দরমার বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখলেন ঘরের মধ্যে তিনটি মেয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে আড্ডা জমিয়েছে। মনে হয় ওরা তিন বোন। বড় দুটির শাদীর বয়স পার হয়ে গেছে। ছোটোটি অপেক্ষাকৃত কচি এবং সুন্দরী। বেশ বোঝা যায় দারিদ্র্যের চাপেই ওদের বাবা-মা মেয়েদের শাদী দিতে পারেনি।

বড় জন বলছিলো, আমি যদি কখনও শাদী করি তবে কাকে করবো জানিস?

অন্য দু'জন কৌতূহলী হয়ে তাকায়। বড়টি বলে, সুলতানের যে হালুইকর আছে—তাকে আমি শাদী করবো। ওঃ, কী মজা হবে, যত খুশি মিঠাই মণ্ডা আর বাদশাহী হালওয়া খাবো রোজ। জানিস ভাই, শাহী হালওয়া খেতে আমার ভারি ভালো লাগে। তা হালুইকরকে শাদী করলে তো আর হালওয়ার কোনও অভাব থাকবে না। যত প্রাণ চায় খাবো। কিন্তু তোদের জন্য মন কেমন করবে। আমি খাবো আর ভাববো, আহা তোরা একটু খেতে পেলি না। আমি কিন্তু আমার স্বামীকে বলবো তোদের জন্য একটু পাঠাতে। কিন্তু সে কি রাজি হবে? যাক, সে পরে দেখা যাবে।

মেজটি বলে, না ভাই আমার ওসব মিঠাই-মণ্ডার লোভ নাই। আমি যদি শাদী করি তো করবো সুলতানের খাস বাবুর্চিকে। সে কতরকম কোর্মা কোপ্তা কালিয়া পোলাও বানায় রোজ। উফ্, ভাবতেই জিভে পানি এসে যাচ্ছে। কী মজাসে খাবো রোজ। মাংস খেতে আমার কী যে ভালো লাগে দিদি। তোরা ভাবিস নে, আমার স্বামীকে বলে তোদের জন্যেও মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেব একটু আধটু।

বড় দুজনের কথা শেষ হলো। কিন্তু ছোট তখনও নীরব। বড় বোন ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে, কি রে ছোট, তুমি যে বড় চুপটি করে আছিস্? তোর কী ইচ্ছে-টিচ্ছে বলে কিছু নাই? বল না, ভাই, শুনি।

ছোট তবু কথা বলে না। ও এখনও বড়দিদির মতো প্রগলভ হয়ে উঠতে পারেনি। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে। মেজ বলে, ঘাবড়াস নে বোন, আমাদের শাদী হয়ে গেলে তোরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। খুব সুন্দর দেখে একটা পাত্র দেখে শাদী দিয়ে দেব তোর।

প্রাসাদেরই কোনও আমলা-টামলা কাউকে দেখে গছিয়ে দেব তোকে। তাহলে তিন বোন কাছাকাছি থাকতে পারবো, কী বলিস?

ছোট যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়। এমনিতেই সে বেশ সুন্দরী, তার ওপর লজ্জারক্ত মুখখানা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। এবার সে মৃদু অথচ বেশ প্রত্যয় নিয়ে মধুর কণ্ঠে বলে, শোনও দিদি, আমার ইচ্ছা শাদী যদি করতেই হয় তবে কোনও আমলা অমাত্য নয়, খোদ মালিককেই করবো।

দুই বোন ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে, মানে?

—মানে—আমি স্বয়ং সুলতানকেই স্বামী হিসেবে পেতে চাই।

বড় দু'বোন হো হো করে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, ওরে বাব্বা, দেখি অল্পে মন ওঠে না।

ছোট বলে, সত্যিই দিদি অল্পে আমার মন ভরবে না। আমি বাদশাহর বেগম হবো, আমার ছেলেমেয়েরা চাঁদের মতো সুন্দর হবে। আমার মেয়ের রূপ দেখে দেশ-বিদেশের সুলতান বাদশাহরা পাগল হয়ে ছুটে আসবে। আমার আদরের দুলালীর কান্নায় পান্না ঝরবে, হাসলে মুক্তো পড়বে।

সুলতান খসরু শাহ এবং তার উজির দাঁড়িয়ে সব শুনলেন। তার পর অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সরে পড়লেন যাতে ওরা কেউ টের না পায়।

পরদিন সকালে সুলতান উজিরকে বললেন, ঐ মেয়ে তিনটিকে দরবারে হাজির কর।

কোরবানীর খাসির মতো এসে দাঁড়ালো তিন বোন। ভয়ে ওরা কাঁপছিলো। না জানি কোন অপরাধে সুলতান তাদের তলব করেছেন। হয়তো ফাঁসীর দড়িতেই লটকে দেবেন তিনি। নানারকম অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভীত-চকিত হয়ে দরবারের এক পাশে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা।

সুলতান খসরু তখতে বসে গম্ভীর গলায় বড় জনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কী, তোমার কী মনের বাসনা? কী হলে তুমি সুখী হবে?

মেয়েটি ভেবে পায় না, এ কথার কী জবাব সে দেবে। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। সুলতান বলে, কী বলতে পারলে না তো? তা হলে আমিই বলি তোমার মনের কথা। তুমি আমার হালুইকরকে শাদী করতে পেলে জীবনে খুব সুখে থাকবে, তাই না?

মেয়েটি অবাক হয়, সুলতান সর্বজ্ঞ, না হলে তার মনের কথা তিনি জানলেন কী করে! মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না, ঘাড় নেড়ে সে জানায়—হ্যাঁ।

এবার সুলতান মেজকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমার কী বাসনা? আমার খাস বাবুর্চিকে শাদী করবে? খুব ভালো-মন্দ খানা-পিনা খেতে পাবে রোজ না? বেশ তাই হবে। তোমাদের দুজনের ইচ্ছেমতো হালুইকর আর বাবুর্চির সঙ্গেই তোমাদের দুজনের শাদী দিয়ে দেব।

এরপর সুলতান মসনদ থেকে নেমে এসে অধোবদনা ছোটকে হাতে ধরে নিজের পাশে বসালো।

—এখন থেকে তোমার আসন আমার এই পাশে। তুমি আমার খাস বেগম হবে আজ। কেমন, রাজি তো?

সেইদিনই যথানিয়মে কাজী এবং সাক্ষীদের ডেকে তিন বোনের শাদীর পর্ব সমাধা হয়ে যায়।

ছোটর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা বড় দুই বোন আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। ইস্, কী ভুলই না ওরা করেছে। কেন মরতে হালুইকর আর বাবুর্চির সঙ্গে শাদী করার ইচ্ছা মনে এসেছিলো। ছোটটা কী ভাগ্যবতী, যেই মুখ দিয়ে বের করলো, সুলতানকে শাদী করবে, অমনি তার কপালে স্বয়ং সুলতান খসরুই জুটে গেলো। হায় হয়, এ কী নিজের সর্বনাশ নিজেই করলো ওরা।

যত দিন যায় ততই ঈর্ষার আগুন বুকে ধক ধক করে জ্বলতে থাকে দুই বোনের। কিন্তু মুখে মধু ঢেলে কথাবার্তা বলে ছোট বোনের সঙ্গে। ছোট বোন বড়দের মনের এই কুটিলতা বুঝতে পারে না।

ন'মাস পরে ছোট বোন একটা চাঁদের মতো ফুটফুটে পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলো। স্বভাবতই বড় দুই বোন ছোট বোনের পরিচর্যা করতে এগিয়ে এসেছেন। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি যখন অচৈতন্য সেই ফাঁকে তার পুত্র-সন্তানটিকে ওরা সরিয়ে ফেলে তার জায়গায় একটা কুকুরের মরা বাচ্চা এনে রেখে দিলো।

জ্ঞান ফিরে ছোট তার দুর্ভাগ্য দেখে ভেঙ্গে পড়লো। সুলতান ক্ষোভে দুঃখে দরজা বন্ধ করলেন।

বড় দুই বোন একটা বাক্সের ডালায় বসিয়ে সদ্যজাত পুত্রটিকে খালের জলে ভাসিয়ে দিলো। বাক্সটা ভাসতে ভাসতে গিয়ে ভিড়ল সুলতানের বাগানের পাশে।

এক সদাশয় বৃদ্ধ মালী ঐ বাগানের পরিচর্যা করে। হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটি সদ্যজাত শিশু ভেসে এসে ভিড়েছে বাগিচার ধারে। ছেলেটিকে বুকে তুলে সে বাসায় যায়। মালী-বিবি চিরকালের বন্ধ্যা। শাদীর পর কতকাল কেটে গেছে, অনেক দোয়া মানত করেও একটি সন্তান পেটে ধরতে পারেনি সে। শিশুটিকে পেয়ে সে যেন হাতে চাঁদ পেলো। ভাবলো আল্লাহর করুণাতেই সে পুত্রবতী হতে পারলো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো পঁচাত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পর বৎসর সুলতানের বেগম আর এক পুত্রের জন্ম দিলো। এ সন্তানটি আগের পুত্রের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু বড় বোনদের চক্রান্তে সেবার সে পুত্র প্রসবের গৌরব থেকে বঞ্চিত হলো। ওর দিদিরা কায়দা করে ছেলেটিকে সরিয়ে ফেলে তার জায়গায় একটা বেড়ালের মরা বাচ্চাকে রেখে দিলো।

প্রসূতির প্রাণ হাহাকার করে ওঠে। সুলতান ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

সেবারও বড় দুই বোন সদ্যজাতকে একটি বাক্সের ডালায় বসিয়ে খালের জলে ভাসিয়ে দেয়। এবং একই ভাবে ভাসতে ভাসতে গিয়ে বাগানের ধারে ভেড়ে, বৃদ্ধ মালী দেখতে পেয়ে বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যায়। বড় ভাই-এর পাশে পাশে ছোট ভাইও মালী এবং মালী বৌ-এর অশেষ আদর-যত্নে মানুষ হতে থাকে।

এর পরের বছর সুলতান-বেগম তৃতীয় সন্তান প্রসব করে। এবারেরটি কন্যা। কী তার রূপ, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেন বেহেস্তের ডানাকাটা পরী! দুই বোনের চক্রান্তে সে সন্তানও কোলে পায় না মা। এবার ওরা মেয়েটিকে সরিয়ে নিয়ে একটা মরা ইঁদুর বাচ্চাকে রেখে দেয় সেখানে।

এ আঘাত সুলতান আর সহ্য করতে পারে না। পর পর তিনবার এ ধরনের অশুভ ঘটনার মূল কারণ হিসাবে বেগমকে দায়ী করেন তিনি। তার ধারণা হয় বেগম নিশ্চয়ই শাপগ্রস্তা কোনও শয়তানী। প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো তার।

বেগম সুলতানের কাছে মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা করলো। হাজার হলেও হারেমের বেগম, সুলতান বিচলিত হলেন তার প্রার্থনায়। যাই হোক, প্রাণে সংহার না করে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন তিনি।

একই ভাবে কন্যাটিকেও খালের জলে ভাসিয়ে দিলো দুই বোন। এবং সৌভাগ্যক্রমে সেই বৃদ্ধ মালীর নজরে পড়ায় তাকেও সে ঘরে নিয়ে গিয়ে পরম আদরে লালন পালন করতে লাগলো।

দুই বোন গোপন এই সব কাজ করতে পেরে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করলো।

সময় বয়ে চলে। ছোট বোনের তিন সন্তান মালীর ঘরে বড় হতে থাকে। ওদের নাম রাখা হয় ফরিদ ফারুজ এবং ফরিজাদ। ফরিজাদ দেখতে পরীর মতো সুন্দরী। তার চুলের বর্ণ সোনালী। কান্নায় তার পান্না ঝরে, আর হাসলে পরে মুক্তো পড়ে মুখ দিয়ে। যে দেখে সেই বলে এমন সুন্দর মেয়ে মানুষের ঘরে জন্মায় না।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন ভাইবোন লেখাপড়ায় চৌকস হয়ে ওঠে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা যাবতীয় পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করে ফেলে। শুধু লেখা পড়া নয়, আচারে ব্যবহারেও তাদের তুলনা রইলো না।

এইভাবে ওরা যখন বেশ বড় সড় হয়ে উঠলো, মালী -বৌ একদিন দেহ রাখলো। বিবির শোকে মালী কাতর হয়ে পড়লো। সুলতান দেখলেন, বৃদ্ধ মালী বয়সের ভারে এবং শোকে তাপে অথর্ব হয়ে পড়েছে। তিনি তাকে অবসর নিতে বললেন। মালীর নামে তিনি জায়গীর লিখে দিলেন। বললেন, সারা জীবন তো আমার সেবা করেছ, এবার আর তোমাকে খেটে খেতে হবে না। আমি তোমার ভরণ-পোষণের জন্য পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিলাম।

এর কিছুকাল পরে মালীও দেহ রক্ষা করলো।

তিন ভাইবোন বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। সুলতানের মৌরসীপাট্টার আয় থেকে তাদের বেশ ভালোভাবেই দিন কাটতে থাকে।

দুই ভাই প্রায়ই শিকার সন্ধানে বাইরে যায়। বোনটি ঘরে থাকে। ওদের বাড়ির লাগোয়া একটি সুন্দর বাগান। একদিন ফরিজাদ একা একা বাগানের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় তার দাসী এসে খবর দিলো বাগানের ফটকে এক বৃদ্ধা এসে দাঁড়িয়েছেন। ফরিজাত এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এসে একটি গাছের তলায় বসালো। কেন জানি না, বৃদ্ধাকে দেখামাত্র ফরিজাদের মনে হলো মহিলাটি বড় সুন্দর পবিত্র। একটা থালায় করে কিছু ফল কেটে এনে তার সামনে রেখে বললো, মেহেরবানী করে একটু কিছু খান।

বৃদ্ধা ফরিজাদের ব্যবহারে বড়ই মুগ্ধ হয়ে বললো, মা তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হলো।

ফরিজাদ জিজ্ঞেস করে, আপনি কে মা? কেনই বা এমনভাবে পথে বেরিয়েছেন।

বৃদ্ধা বললে, মা, আমি আল্লাহর এক নগণ্য সেবিকা। সারা জীবন ধরে তাঁরই নাম গান করে আমার দিন কাটছে। পথে পথে ঘুরে বেড়াই। যে আদর করে ডাকে তারই কাছে যাই। আজ তুমি ভালোবেসে ডাকলে তাই এলাম। আবার কোথায় চলে যাবো জানি না। তোমার এই বাগানটা দেখে বড় ভালো লাগলো। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না মা। বাগানে সবই আছে কিন্তু তিনটি জিনিসের অভাব দেখছি।

ফরিজাদ জিজ্ঞেস করে, কী সে তিনটি বস্তু, মা?

বৃদ্ধা বললো, বলছি মা, বলছি।

এরপর সে অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলো। তারপর বললো, তোমার বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর পাখী আছে। কিন্তু ওরা এক সঙ্গে সুমধুর তানে গান করে না। আর এই যে সব তরুবর এদের শাখা মলয় বাতাসে আন্দোলিত হলে এক সঙ্গীতের মূর্ছনা ভেসে আসতে পারে, কিন্তু আসছে না। তৃতীয়ত ঐ যে ঝর্ণা বয়ে চলেছে ওখানে ঐ ঝর্নাও তো গান গেয়ে উঠতে

পারে। কিন্তু তোমার ঝর্না গেয়ে ওঠে না কেন? শোনো মা, এই তিনটি জিনিস যদি তোমার বাগিচায় থাকতো তা হলে একেবারে বেহেস্ত হয়ে উঠতো জায়গাটা।

ফরিজাদ বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন, মা। কিন্তু এমন অপার্থিব বস্তু আমি কোথায় পাবো? আপনি কী তার সন্ধান জানাতে পারেন, কোথায় কোন দেশে গেলে এসব পাওয়া যেতে পারে?

বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে বলে, তোমাকে আমি নিশানা বলে দিচ্ছি, যদি সেখানে কাউকে পাঠাতে পারো সে দেখে আসতে পারবে সেই নন্দন কানন। এখান থেকে বিশ দিনের পথ। সোজা চলে যেতে হবে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে। সেখানে প্রথম যে মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এখানে এমন কোন উপবন আছে যেখানে পাখিরা কথা বলে, গান গায়। তরুশাখা মধুর সুরের মূর্ছনা তোলে এবং ঝর্ণা কলতান করে? সেই মুসাফীর পরদেশী পথ বাতলে দেবে। সেই মতো গেলে পৌঁছে যাবে সেই সুন্দর উপবনে। আচ্ছা মা, তোমার আদর যত্ন এবং সুন্দর ব্যবহারে আমি বিশেষ প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছি। এবার আমি চলি। খোদা হাফেজ।

বৃদ্ধা আশীর্বাদ করতে করতে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

ফরিজাদ এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধার কথা শুনছিলো। সে চলে যেতে তার সম্যক চৈতন্য ফিরে এলো। মনে মনে আফশোশ করতে লাগলো, বৃদ্ধার কাছে আরও ভালো করে পথের নিশানাটা জেনে নিলে ভালো হতো। কিন্তু তখন আর তার কোনও উপায় রইলো না। দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেছে সে। ব্যথ্যায় বুকটা টন টন করে ওঠে ফরিজাদের। দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

শিকার শেষে দুই ভাই ফিরে দেখে বোন ফরিজাদ সেখানে নাই। বেশ অবাক হয় ওরা। এ সময় তো সে ঘরেই থাকে। বাইরে বাগানে আসে। ছোট ভাই ফারুজ বলে ঐ দেখ বড় ভাই গাছের তলায় কত পান্না। তাহলে তো বোন খুব কান্নাকাটি করেছে।

দু'ভাই চিন্তিত হয়ে বাগানের এদিক ওদিক অনুসন্ধান করতে করতে এক জায়গায় এসে দেখে ফরিজাদ অঝোর নয়নে কাঁদছে। দুই ভাই আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে কী এমন ব্যাপার ঘটেছে যার জন্যে তাদের আদরের বোনের চোখে জল।

ফরিজাদ করুণভাবে হাসে। বলে কেন কাঁদছি জানতে চাইছ দাদা? সে আমি বলতে পারবো না!

—কেন? কী এমন কথা যে বলতে পারবে না, বোন? কেউ তোমার মনে আঘাত করে গেছে?

ফরিজাদ বলে, না না, সে সব কিছু নয়।

—তবে? তবে কেন তোমার চোখে পানি বোন? বলো, আমাদের কাছে কোনও কথা গোপন করোনা বোন। তোমার মুখে হাসি না দেখলে আমরা স্থির থাকতে পারি না।

ফরিজাদ বলে, এই বাগানটা আমার একদম পছন্দ নয়, দাদা। এখানকার পাখিরা কথা বলতে পারে না, গান গাইতে পারে না। গাছগুলো সব বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকে, আর ঝর্না সেই বা এমন নীরব কেন?

ফরিজাদ কী বলতে চায় কিছুই অনুধাবন করতে পারে না ভাইরা। তখন সে সেই বৃদ্ধার আগমন এবং তার কথোপকথন বৃত্তান্ত সব দাদাদের খুলে বললো।

বোনের কথা শুনে ভাইরা বেশ অবাক হয়। বড় ভাই আশ্বাস দিয়ে বলে, তুমি কিচ্ছু ভেব না বোন, আমি তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করবো। তোমার জন্য দুর্লঙ্ঘ্য কাফ

পর্বত-শিখরেও আমরা উঠে যেতে পারি। এ তো সামান্য বিশদিনের পথ। আমি অনায়াসেই এনে দিতে পারবো তোমাকে এসব। আমাকে শুধুপথের নিশানাটা ভালো করে বলে দাও।

ফরিজাদ বললো, আমি যেটুকু শুনেছিলাম বললাম, দাদা। এর বেশি কিছু আর জানি না। কিন্তু এ নিয়ে তোমরা এতো চিন্তা করছো কেন? ঐ অজানা দেশে যাওয়ার কোন দরকার নাই।

বড় ভাই ফরিদ বলে, ও নিয়ে তুমি কোনও দুর্ভাবনা করো না বোন। আমার চমৎকার এক ঘোড়া আছে। সে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ভারত সীমান্তে। আমার কোনও কষ্ট হবে না। আমি একাই যাবো, ফারুজকে সঙ্গে নেব না। সে তোমার কাছে থাকবে।

ফরিজাদ দাদাকে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু ফরিদ বলে সে যাবেই। এবং এ যাত্রায় আর কারো সঙ্গে যাবার প্রয়োজন হবে না। বোনকে অভয় দিয়ে বলে, আমার জন্যে একটুও ভাবিস না বহিন, আমার কোনও বিপদ হবে না! এই নে এই ছুরিখানা রাখ। যদি কখনও দেখিস এর ফলায় মরচে ধরছে, বুঝবি, আমার কোনও বিপদ ঘটেছে বা কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছি আমি। কিন্তু যদি দেখিস ছুরির গায়ে লাল লাল রক্তের মতো দাগ লেগেছে—বুঝবি আমার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। এবং সে রকম কোনও চিহ্ন দেখতে পেলে, তোদের দু'জনকেই বলে যাচ্ছি, আল্লাহর কাছে আমার নামে মোনাজাত করিস!

ফরিদ ছুরিখানা বোনের হাতে তুলে দিলো।

একটানা কুড়ি দিন ঘোড়া ছুটিয়ে চলার পর ভারত সীমান্তের পর্বতমালার পাদদেশে এক শস্য-শ্যামল প্রান্তরে এসে পৌঁছল ফরিদ।

কিছুদূর এগোতে এক বটবৃক্ষের নিচে এক বৃদ্ধ সাধুকে দেখে সে এগিয়ে এলো। ঘোড়া থেকে নেমে ফরিদ সাধুকে প্রণতি জানিয়ে বললো, আমি দূর দেশ থেকে আসছি, বাবা সাহেব।

সাধু হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে কী যেন বলে, সে বুঝতে পারে না। আবার বলে, সন্ত বাবা, আমি অনেক দূর দেশ পারস্য মুলুক থেকে আসছি। শুনেছি এখানে এমন উপবন আছে যেখানে পাখিরা কথা বলে গান গায়, গাছপালা এবং নদী ঝর্নাও নাকি সঙ্গীত-মুখর হয়ে থাকে সর্বদা, আপনি কী বলতে পারেন, কোন পথে গেলে সেই শ্রুতিসুখকর নয়নাভিরাম জগতে আমি পৌঁছতে পারবো?

সাধু মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, সে বলতে পারে। কিন্তু মুখে কোনও কথা উচ্চারণ করলো না।

ফরিদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি মুখ ফুটে কথা বলছেন না কেন, ফকির সাহেব? আপনি যদি বলতে না পারেন, শুধু শুধু এখানে আমাকে দেরি করিয়ে দেবেন না। আমাকে যেভাবেই হোক সেই অপরূপ অলৌকিক উপবনে পৌঁছতেই হবে।

এবার ফকির বেশ পরিষ্কার বোধগম্য ভাষায় বললো, অধৈর্য হয়ো না বেটা, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। এতক্ষণ বলতে দ্বিধা করছিলাম, কারণ তোমার মতো এমন সুন্দর একটি নওজোয়ান ছেলের সেই বিপদ-সঙ্কুল দুর্লঙ্ঘ্য গিরি-শিখরে ওঠা কি সঙ্গত হবে! বড় দুর্গম ভয়ঙ্কর সে পথ।

ফরিদ বলে, তা হোক, যেতে আমাকে হবেই। আপনি আমাকে নিশানা বলে দিন। আল্লাহ আমার দেহে যথেষ্ট শক্তি এবং মনে অপরিমিত সাহস দিয়েছেন। আমি কিছুতেই ভয় করি না।

—কিন্তু বেটা, অদৃশ্য দানবের সঙ্গে যুঝবে কী করে? তুমি তো তাকে চোখে দেখতে পাবে না। আর সেই সব ভূতপ্রেতদের সংখ্যা হাজার হাজার।

—তা হোক, আপনি আমাকে পথ বলে দিন, আমি যাব। কোনও বাধাই আমার কাছে বাধা নয়। কোনও বিপদই আমি গ্রাহ্য করি না।

সাধু বললো, বেশ আমার বারণ যখন শুনবে না, তখন যাও। পথ আমি বাৎলে দিচ্ছি।

এই বলে সে তার কাঁধের ঝুলি থেকে একটা লালরঙের মসৃণ ও গোলাকৃতি কঠিন বস্তু বের করে সজোরে নিক্ষেপ করলো! গোলাকার ডেলাটা অনেকটা দূরে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে বাঁই বাঁই করে ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় গিয়ে আটকে গেলো! সাধু আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে বললো, ঐ—ঐ জায়গাটায় চলে যাও। ওখান থেকে সোজা উঠে যাবে পাহাড়ের চূড়ায়।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো সাতাত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

খুব সাবধান, সাধু বলতে থাকে, পাহাড়টা একেবারে খাড়াই। তবে দু'পাশে ধরার মতো পাথরের চাঁই আছে অনেক। ওগুলো ধরে ধরে খুব সন্তর্পণে ওপরে উঠতে হবে। মাঝে মাঝেই নানারকম বিকট আওয়াজ শুনতে পাবে। ভেবো না, সেগুলো হাওয়ার দাপটের শব্দ, সবই ঐ সব অদৃশ্য ভূতপ্রেতের ভয় দেখানো আওয়াজ। ওসবে যদি ভয় পাও, তবে ওঠার পথেই তোমাকে খতম করে দেবে ওরা। তুমি ওদের হুমকীতে ভয় পেও না একটুও। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে খুব সাবধানে ওপরে উঠতে থাকবে। এইভাবে সব বাধাবিপত্তি এবং ভয়-ভীতি কাটিয়ে যদি ওপরে উঠতে পারো, দেখবে পাহাড়ের চূড়ায় একটা বিরাট খোলা জায়গায় অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি। ওরা একে অন্যের সঙ্গে দিব্যি কথা বলছে, গান গাইছে। তুমি অনায়াসে ঐ পাখিদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। ওরা তোমার কথার উত্তর দেবে। তুমি ওদের জিজ্ঞেস করবে, সেই গাছপালা ঝর্নাধারা কোথায়—যারা গানের মূর্ছনা তুলতে পারে? তখন পাখিরা তোমাকে নিশানা বলে দেবে। তারপর খোদা তোমার সঙ্গে আছেন।

যথা-নির্দেশিত স্থান থেকে পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠার কালে প্রথম দিকে তেমন কোনও অসুবিধা মনে হলো না ফরিদের। কোনও ভয়ঙ্কর কিছুও শ্রুতিগোচর হলো না। শুধু মাঝে মাঝে মনুষ্যাকৃতির বড় বড় কালো পাথরের চাঁই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ঝুলছিল। সেই পাথরগুলো ধরে ধরে সে উপরে উঠে যেতে লাগলো। ফরিদ বুঝতে পারলো, তার পূর্বসূরীরা অনেকে এই পথ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে শয়তানের ভীতিতে ভয় পেয়ে পাথর হয়ে জমে গেছে।

আরও খানিকটা উঠতে এক বিকট কান-ফাটা গগন-বিদারী শব্দ ভেসে এলো। ফরিদ বিচলিত হলো না একটুও। ফরিদ বেশ বুঝতে পারলো, এ আর্তনাদ কোনও মানুষের হতে পারে না। সব শয়তানের কারসাজী। তা হোক, ভয় সে পাবে না কিছুতেই। হঠাৎ কে যেন প্রশ্ন করলো, কী চাও তুমি? কেন উপরে ওঠার দুঃসাহস করছো। এখনও বলছি ভালোয় ভালোয় নেমে যাও। নইলে আর সকলের যা দশা হয়েছে দেখতে পাচ্ছো—তোমারও তাই হবে।

এমন কর্কশ কণ্ঠ কী করে মানুষের হতে পারে! আর মানুষ হলে কী সে তাকে দেখতে পাবে না? ফরিদ অবিচল নির্বিকার। শয়তানের শাসানি সে শুনেও শুনলো না। যেমন উপরে উঠছিলো তেমনি উঠতে থাকলো।

আবার কানে এলো, লোকটাকে টুটি টিপে মেরে ফেলো, ওকে রুখে দাও, মেরে ফেলো, রুখে দাও, মেরে—

অগণিত হাজার হাজার কণ্ঠের আক্রোশ ভেঙ্গে পড়তে লাগলো চারদিক থেকে। আবার কেউ কেউ হুঙ্কার ছাড়তে লাগলো, লোকটাকে ছুঁড়ে টেনে দাও নিচে। ছাতু হয়ে যাক।

কিন্তু আবার যেন কে অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বললো, আহা মেরো না, মেরো না, ছুঁড়ে দিও না, দেখছো না কেমন সুন্দর দেখতে—

কে যেন বললো, তুমি খুবসুরত, এসো এসো, আমাদের সঙ্গে এসো।

মনে হলো খিল খিল করে হেসে উঠলো কারা। কিন্তু ফরিদ কিছুই গ্রাহ্যে আনলো না! সোজা ওপরে উঠতে লাগলো। মনে তার অদম্য সাহস। কোনও দিকে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চাইলো না, কে বা কারা তার আশে পাশে বা পিছনে ঘিরে ধরছে কিনা।

যতই সে উপরে যেতে থাকলো দানবের চিৎকার কোলাহল শাসানী হুঙ্কার ক্রমশই বাড়তে লাগলো। ফরিদ বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলো, ভূত-প্রেতের আগুনের হল্কার মতো প্রশ্বাস তার গায়ে লাগছে। কখনও বা চেঁচামেচি চিৎকার ক্ষীয়মান হয়ে মিলিয়ে যায়। মনে হয় ওরা ওকে ছেড়ে অনেক অনেক দূরে চলে গেছে। আবার কখনও বা মনে হয় ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রাক্ষসগুলো! চিৎকার গর্জনে কানের পর্দা ফেটে যায় আর কি?

বৃদ্ধ ফকির বলে দিয়েছিলো চারপাশে বা পিছনে যাই ঘটুক, তুমি কখনও ঘাড় ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করবে না। এতক্ষণ সে সাধুর কথা স্মরণ রেখে কোনও কিছুতেই বিভ্রান্ত না হওয়ার সংকল্প নিয়ে শান্ত সবল পদক্ষেপে উপরে উঠে আসছিলো। কিন্তু ঠিক তার পিছনে কে যেন কার মাথায় গদাম করে একখানা লাঠি বসিয়ে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্তচিৎকার দিয়ে সে হাজার হাজার হাত নিচে পড়ে গেলো। এরপর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না ফরিদ। ঘাড় ফিরিয়ে এসে দেখতে চাইলো ঘটনাটা কী। এবং সেই তার প্রথম পদস্খলন। সঙ্কল্পচ্যুতি। এবং সেই তার চরম বিপর্যয়!

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো অদৃশ্য শয়তানরা। অর্থাৎ অবশেষে তাদের ফাঁদে পা দিয়েছে বাছাধন! তৎক্ষণাৎ ফরিদের দেহখানা একখণ্ড কালো পাথরে রূপান্তরিত হয়ে পাহাড়ের গায়ে লট্‌কে রইলো। সেই সঙ্গে পাহাড়ের পাদদেশে ফরিদের পেয়ারের তাজি ঘোড়াটাও নিশ্চল পাথরের চাঁই হয়ে গেলো। এবং ঐ গোলাকৃতি লাল শক্ত বস্তুটি গড়গড় করে গড়াতে গড়াতে ফিরে চলে গেলো সেই বৃদ্ধ ফকিরের সামনে।

শাহজাদী ফরিজাদ প্রতিদিন দাদার দেওয়া ছুরিখানা পরীক্ষা করে দেখে। সে দিনে সকালে উঠে ছুরির গায়ে রক্তের ছিটে দেখে তার বুক কেঁপে উঠলো। তা হলে তাদের বুকের কলিজা চোখের মণি বড় ভাই আর ইহজগতে বেঁচে নাই! আর সে ভাবতে পারে না। অস্ফুট একে আর্তনাদ করে ঢলে পড়লো।

ফারুজ ছুটে এসে দেখে একপাশে বোন ফরিজা অন্যপাশে ছুরিখানা লুটিয়ে পড়ে আছে। বোনের মূর্ছিত দেহখানা তুলে ধরে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে প্রকৃতিস্থ করার প্রয়াস করতে থাকে ফারুজ। একটু পরে জ্ঞান ফিরে এলো। মেজ ভাইকে সামনে দেখে কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়লো, বড় ভাই আর বেঁচে নাই, দাদা। হায় হায়, কেন আমি তাকে যেতে দিলাম। আমার শখের বায়না মেটাতে গিয়ে দাদা আমার প্রাণ খোয়ালো। ও ফরিদ ভাই, কোথায় গেলে তুমি। এ আমি কী করলাম। কেন তাকে যেতে দিলাম, দাদা?

ফরিজাদ নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে, কপাল বুক চাপড়ায়। নিজেকেই নিজে গালি-গালাজ করে, ওরে মুখপুড়ি, শয়তানী, তুই তো অমন সুন্দর ভাইটাকে হত্যা করলি? এ পাপের শাস্তি তোর কী হবে?

বোনকে নানাভাবে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফারুজ। সে-ও দাদার শোকে

মুহ্যমান। কিন্তু এ অবস্থায় আদরের দুলালী বোনকে সামলাতে না পারলে সে হয়তো আত্মঘাতী হতে পারে। এই আশঙ্কায় ফারুজ বোনকে আঁকড়ে ধরে সোহাগ আদর দিয়ে ভ্রাতৃশোক ভোলাবার প্রয়াস করে।

—অমন করে কান্নাকাটি করে কী হবে, বহিন, নসীবে যার যা লেখা আছে তা তো কেউ খণ্ডাতে পারে না। তা না হলে, বলো, কোথায় পারস্য আর কোথায় ভারত, সহস্র যোজন পথ। সেই পথ পাড়ি দিয়ে সে মোউৎকে বরণ করতে যাবে কেন? একবার শান্ত হয়ে ভেবে দেখ, নিয়তির এই-ই নির্দেশ ছিলো। তা না হলে এমনটা হতে পারত না। যাই হোক, আমি তো আর এখানে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না, বহিন! আর কালবিলম্ব না করে এখুনি আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। দেখতে হবে দাদার কী হয়েছে। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো তোমার কাছে।

ফরিজাদ আর্তনাদ করে ওঠে, না না, সর্বনেশে দেশে তোমার গিয়ে কাজ নাই। একবার এক ভাইকে হারিয়েছি, আর আমি আর এক ভাইকে ঐ বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারবো না।

ফারুজ হেসে ফরিজাদ-এর মাথায় হাত বুলায়।—পাগলী, আমার কোনও বিপদ আপদ হবে না, দেখে নিস। আমি যাচ্ছি, তুই বহিন, একটু সাবধানে থাকিস।

এই বলে ফারুজ বোনের হাতে একটা মুক্তোর মালা তুলে দিয়ে বলে, এই মুক্তোগুলোয় যদি কালো চিহ্ন দেখতে পাস তবে বুঝবি, দাদার যা দশা হয়েছে আমারও তাই ঘটেছে। তবে আমার বিশ্বাস, তেমন কিছু হবে না।

বিশ দিন একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে চলার পর ফারুজও এসে পৌঁছয় সেই বৃদ্ধ ফকিরের সামনে। ফকির তাকে অনেক চেষ্টা করে ঐ পাহাড়ে ওঠা থেকে বিরত হওয়ার জন্য। কিন্তু ফারুজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে যাবেই। তাই অবশেষে সে ঝুলি থেকে সেই গোলাকৃতি মসৃণ বস্তুটি বের করে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, ঐ ওখান থেকে পাহাড় চূড়ায় উঠে যাও। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না, পিছন ফিরে তাকাবে না কখনও। তা সে যাই ঘটুক।

ফারুজ বৃদ্ধের উপদেশ শিরোধার্য করে নির্ভয় চিত্তে পাহাড়-শীর্ষে আরোহণ করার জন্য উপরে উঠতে থাকে। দানব শয়তানের হুঙ্কার, চিৎকার তর্জন গর্জন উপেক্ষা করে সে প্রায় শীর্ষদেশে পৌঁছে গেছে, এমন সময় সে শুনতে পেলো দাদা ফরিদের কণ্ঠস্বর, ভাইজান আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছিস? আমি যে পাহাড়-গহ্বরে আটকে পড়ে আছি ভাই, একবার আমাকে একটু ধর।

ফারুজের সব কেমন গোলমাল হয়ে গেলো। সে বুঝতেই পারলো না, এও সেই সব শয়তানদের এক অভিনব ছল। দাদাকে উদ্ধার করার জন্য পিছন ফিরে তাকাতেই পলকে সে কঠিন কালো প্রস্তরখণ্ডে পরিবর্তিত হয়ে ঝুলতে থাকলো।

ফরিজাদ রোজ সকালে উঠে মুক্তোর মালাটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে। সে দিন সকালে মালাটা হাতে নিয়েই সে ডুকরে কেঁদে উঠলো।—হায় হায় একি হলো, এ কি করলাম আমি? দু-দুটি ভাইকে মেরে ফেললাম?

মুক্তোর মালাটা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। ফরিজাদ বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হা-হুতাশ করতে থাকে। তারই দোষে তারা প্রাণ হারালো। সে এমনই সর্বনাশী, এমনই পাপীয়সী?

ফরিজাদ মন স্থির করে, সেও যাবে ভাইদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাতে যদি মোউৎ আসে তা আসুক। ক্ষতি কী? কী হবে এই শোকাহত বিষাদাচ্ছন্ন জীবনে বেঁচে থেকে। তার চেয়ে মৃত্যু যদি তাকে কোলে টেনে নেয়, সেই হবে তার পরম শান্তি।

পুরুষের ছদ্মবেশে সেজে তাগড়াই একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে ফরিজাদ। বিশ

দিনের দিন সে-ও এসে পৌঁছয় সেই বৃদ্ধ ফকিরের আস্তানায়। ফরিজাদ সন্তকে সালাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করে, ফকির সাহেব, এদিকে দু'জন খুবসুরত নওজোয়ান ছেলেকে দেখেছেন এর আগে? তারা এসেছিলো সেই উপবনের সন্ধানে—যেখানে বনের পাখি কথা বলে, গান গায়, তরুশাখা এবং ঝর্ণাধারা সঙ্গীতে মুখর হয়ে থাকে, দেখেছেন কী তাদের?

বৃদ্ধ বললো, তুমিই তো সেই সুন্দরী ফরিজাদ? হ্যাঁ, আমি ওদের দু'জনকেই দেখেছি। ওরা আমার কাছে সেই আশ্চর্য উপবনের নিশানা জানতে চেয়েছিলো। আমি ওদের বারণ করেছিলাম, কিন্তু আমার কথা ওরা শোনেনি। তাই পথের নিশানা আমি বাতলে দিয়েছিলাম। তারপর, এর আগে আরও অনেকের ভাগ্যে যা ঘটেছিলো, তাদের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে। আমি জানতাম, আমার উপদেশ ঠিক ঠিক জেনে শেষ পর্যন্ত কেউ চলতে পারবে না। তাই সকলকেই আমি বারণ করেছিলাম। কিন্তু সকলেরই এক গোঁ। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, যা হবার তাই হয়েছে।

ফরিজাদ ভাবে, এই বৃদ্ধ ফকির তার নাম কী করে জানলো? তবে কী সে অন্তর্যামী ত্রিকালজ্ঞ পয়গম্বর?

ফকির বললো, আমি জানি তুমিও সেই আশ্চর্য উপবনে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারছো না। সেখানে পাখিরা কথা বলে, বৃক্ষ-তরুলতা এবং ঝর্না নদী গান গায়—সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার লোভ কী সামলানো যায়? তবু বলবো, আমার যদি কথা শোনো, ঐ দুর্গম গিরিশৃঙ্গে ওঠার পরিকল্পনা তুমি ত্যাগ কর ফরিজাদ? একাগ্র চিত্তে আমার উপদেশ মনে রেখে নিতে না পারলে তুমিও তোমার দাদাদের মতোই কালো পাথরের একখণ্ড চাঁই-এ পরিণত হবে।

ফরিজাদ বলে, না বাবা সাহেব, আশ্চর্য উপবনের যাদু দেখার কোনও বাসনা আমার নাই। কিন্তু আমার দুই দাদা যেখান থেকে ফিরে আসেনি সেখানে আমাকে যেতেই হবে। আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই তাদের কী হয়েছে? আপনি আমাকে মেহেরবানী করে পথটা একবার বলে দিন, বাবা?

ফকির বললো, ঠিক আছে শাহজাদী ফরিজাদ নিজের চোখেই যখন দেখতে চাও তোমার দাদাদের হাল, যাও, পথ আমিও পথ বাতলে দিচ্ছি।

এই বলে ঝুলি থেকে সেই লাল গোলাকৃতি বস্তুটি দূরে নিক্ষেপ করে দিলো বৃদ্ধ! বললো, ঐ দেখ, ওটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে পাহাড়ের তলায় একটা জায়গায় থেমে গেলো। তুমি চলে যাও সেখানে। ওখান থেকে পাহাড়ে ওঠার একটা দুর্গম পথ পাবে। ঐ পথ বেয়ে খাড়াই উঠে যেতে হবে সোজা ওপরে। আশে পাশে আঁকড়ে ধরার মতো কতকগুলো কালো পাথরের ঝুলন্ত চাঁই দেখতে পাবে। আসলে ওগুলো কিন্তু পাথর নয়। তোমার পূর্বসূরীরা শিখরে ওঠার আশা নিয়ে উঠতে গিয়ে ভয়ে আতঙ্কে পাথর হয়ে জমে গেছে। যাই হোক, ওগুলো ধরে ধরে তোমাকে এগোতে হবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ মা, ঐ পাহাড়ের চারপাশে ঘিরে রয়েছে হাজার হাজার ভূত-প্রেত ডাকিনী-যোগিনী। ওরা তোমাকে ভয় দেখাবে। নানারকম হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ডাকে তোমার কানে তালা ধরিয়ে দেবে। ভয়ে তোমার বুক কেঁপে উঠবে। কিন্তু সাবধান, কিছুতেই ভীত হয়ো না। সামনে ছাড়া অন্য কোনও দিকে দৃকপাত করার চেষ্টা করো না। তাহলে তোমারও দশা তোমার ভাইদের মতোই হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ তার ঝুলি থেকে খানিকটা তুলো বের করে ফরিজার হাতে দিয়ে বললো, ভালো করে দু কানে গুঁজে নাও। তাহলে ঐ সব বিকট আওয়াজ তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

ফরিজাদ তুলোটুকু হাত পেতে নিয়ে দু কানে গুঁজে ফরিদকে সালাম জানিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলো।

তুলো গুঁজা থাকার দরুন ভূত-প্রেতদের নানারকম বিকট আওয়াজ তার কর্ণকুহরে তেমন একটা পৌঁছতে পারলো না। তাই অনেক কষ্টে এক সময় সে পাহাড়-শিখরে উঠে আসতেও পারলো।

যে দিকে সে তাকায়, বড় সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করে। একটু এগোতেই চোখে পড়ে একটা বিশাল পাখির খাঁচা, তার মধ্যে হাজার হাজার নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর সব পাখি কল কল করে কথা বলছে পরস্পর। কাছে যেতেই একটা বুলবুল এগিয়ে এসে ফরিজাদকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, এখানে এলে কী করে?

ফরিজাদ বললো সব। বুলবুল শুনে বলে, খুব ভালো করেছ, ঠিক আছে, এখানে যখন এসে পড়েছ তখন ঘুরে ঘুরে সব দেখবে তো?

ফরিজাদ বলে, শুনেছি এখানে গাছেরা গান গায়?

বুলবুল বলে, ওমা, গাইবে না কেন? তোমাদের দেশে বুঝি গায় না? চলো তোমাকে ঐ বনের কাছে নিয়ে যাই, ওখানে দেখবে কি সুন্দর সব গাছপালা। আর সোনালী জলের কি চমৎকার ঝর্ণা। সবাই গান গাইছে।

বুলবুল ফরিদজাদকে সঙ্গে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখায়। ফরিজাদ বলে, খুবই ভালো ভাই, কিন্তু মনে আমার সুখ নাই। এতো আনন্দের মুলুকে এসেও খুশিতে নাচতে পারছি না।

বুলবুল অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কেন ভাই?

ফরিজাদ বলে, আমার দুই দাদা এই উপবনে আসতে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে কালো পাথর হয়ে আটকে আছে।

বুলবুল বলে, ও এই কথা। ও জন্যে আবার দুঃখ করছ কেন? এই ঝর্নার জল খানিকটা নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে ছিটিয়ে দাও ওদের গায়ে। দেখবে এখুনি ওরা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে আবার কথা ক'য়ে উঠবে।

বুলবুলের কথামতো ঝর্নার জল নিয়ে গিয়ে পাহড়ের গা বেয়ে নিচে ঢেলে দিলো ফরিজাদ। আর কী আশ্চর্য, ফরিদ এবং ফারুজ দু'জনেরই তরতর করে উপরে উঠে এলো তখুনি। শুধু ওর দুই দাদাই নয় এতকাল ধরে যে সব দুঃসাহসী নওজোয়ান এই পর্বতারোহণ করতে এসে শয়তানের পাল্লায় পড়ে কৃষ্ণপাথরে রূপান্তরিত হয়েছিলো তারা সকলেই সজীব হয়ে উঠলো।

এরপর ওরা তিন ভাইবোন বুলবুলকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসে ওদের প্রস্তরীভূত ঘোড়াগুলোকে জীবন্ত করে তুললো।

ফরিজাদ বললো, চলো দাদা, আগে ঐ সন্তের কাছে গিয়ে তাকে সালাম জানাই। কারণ তাঁর দয়াতেই আজ তোমাদের ফিরে পেলাম আমি।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, সেই গাছতলায় এসে দেখা গেলো, বৃদ্ধ ফকির আর সেখানে নাই। আস্তানা গুটিয়ে কোথায় সে চলে গেছে। ফরিজাদ বুলবুলকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার বুলবুল, ফকির সাহেব কোথায় চলে গেলেন?

বুলবুল ঈষৎ রাগতভাবেই বলে, এ তোমার অযথা কৌতূহল শাহজাদী। তোমাকে তিনি কী শিক্ষা দিয়ে গেছেন, মনে নাই? অহেতুক অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে নাই। তোমার চারপাশে হাজারো রকম ঘটনা ঘটতেই পারে। সব ব্যাপারে তুমি কেন নাক গলাবে। তোমার নিজের কাজ তুমি ভালো করে সমাধা করবে, এই তার নির্দেশ। সেই কারণেই তিনি তোমার দু কানে তুলো গুঁজতে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, বুঝতে পারনি? ফরিজাদ লজ্জিত বোধ করে। হ্যাঁ, তাই তো, তার নিজের যাতে কোনও প্রয়োজন নাই সে ব্যাপারে অযথা আগ্রহ প্রকাশ করা

উচিত হয়নি। বৃদ্ধ ফকির হয়তো তাদের পথ চেয়েই সেখানে অপেক্ষা করছিলো। তার কর্তব্য কর্ম শেষ হয়ে যাওয়াতে সে প্রস্থান করেছে। সুতরাং ও নিয়ে সে কেন চিন্তা করছে?

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ঊনআশিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এরপর বুলবুলকে সঙ্গে নিয়ে তিন ভাইবোন নিজের দেশ পারস্যে ফিরে আসে।

আবার দুই ভাই শিকারে যায়। ফরিজাদ বুলবুলকে নিয়ে ঘরে থাকে। এখন সে তার দিবারাত্রির সঙ্গী। দু'জনে কত কথা বলে, গান গায়।

একদিন শিকার শেষে ঘরে ফিরে আসছিলো ফরিদ আর ফারুজ। পথের মধ্যে দেখা হয়ে গেলো সুলতান খসরুর সঙ্গে। পুত্রদ্বয়ের আলোক-সামান্য রূপে আকৃষ্ট হয়ে সুলতান থমকে দাঁড়ালেন। এমন চাঁদের মতো সুন্দর ছেলে দুটি কার?

ফরিদ আর ফারুজ কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায়।

সুলতান সস্নেহে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমরা, বাবা?

—আমরা জাঁহাপনার বান্দা মৃত মালীপুত্র।

—ও, তোমরাই সেই দুই ছেলে? শুনেছিলাম, তোমাদের এক ভগ্নি আছে?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা, সে আমাদের ছোট। ঘরেই আছে সে।

সুলতান বলে, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হলো, বাবা। চলো তোমাদের ঘরে যাওয়া যাক। বোনটিকেও দেখে আসি।

ফরিদ বলে, এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা।

ফারুজকে সে ফিস ফিস করে বলে, তুই ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ি চলে যা। ফরিজাদকে খবর দে, সুলতান আসছেন। তাঁর আদর আপ্যায়নের যেন ব্যবস্থা করে সে।

ফারুজ এসে বোনকে বললো, জানিস বোন, পথে সুলতানের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, তোমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবো, ফরিজাদের সঙ্গে আলাপ করবো। ওরা এখুনি এসে পড়বেন। তুই একটু খানাপিনার ব্যবস্থা কর।

ফারুজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ফরিজাদ সমস্যায় পড়লো, সুলতান বাদশাহ বলে কথা। তাঁকে আদর অভ্যর্থনা করার কতটুকুই বা সাধ্য আছে তাদের?

বুলবুল বলে, এ নিয়ে ভাবছো কেন? তোমাদের সুলতান শশা খেতে খুব ভালোবাসে। এক কাজ কর একখানা মুক্তো দিয়ে শশার বিরিয়ানী বানিয়ে রাখ। সুলতান খুব তৃপ্তি করে খাবেন।

পাখিটার আজগুবি কথা শুনে ফরিজাদ ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। বলে, এ তুমি কী বলছো? মুক্তোর বিরিয়ানী? মুক্তো কী আবার খাওয়া যায় নাকি? বলো, চালের বিরিয়ানী?

বুলবুল বলে, না না, চালের নয়, মুক্তো দিয়েই শশার বিরিয়ানী বানাও। সুলতান খুব তৃপ্তি করে খাবেন। আর অন্য কিছু খানা-পিনাও দরকার হবে না।

ফরিজাদ যদিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না তবু তার প্রিয় সঙ্গী বুলবুলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করলো না। কারণ সে জানতো, বুলবুল যা বলে তা ভেবে-চিন্তেই বলে। কখনও সে ফালতু কথা বলবে না।

সুলতান খসরু বাড়িতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা সোচ্চার হয়ে ওঠে, এই যে সুলতান খসরু, আসুন আসুন—আসতে আজ্ঞা হোক। আমরা আপনার আগমনেরই প্রতীক্ষায় বসে আছি এতো কাল।

ফরিজাদ এই প্রথম বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে সুলতানের সামনে এসে যথাবিহিত কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

সুলতান বলেন, বাঃ, চমৎকার! তোমরা আমার বহুকালের অনুরক্ত ভৃত্য মালীর সন্তান। আমার বড় আদরের! আজ তোমাদের বাবা বেঁচে থাকলে আরও অনন্দের হতো। যাই হোক, বাবা-মা তো আর চিরকাল কারও বেঁচে থাকে না। আল্লাহ তাকে কোলে নিয়েছেন, এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে। সব পিতা বেঁচে থাকে তার সন্তানের মধ্যে।

খাবারের টেবিলে কাপড় বিছানো হলো। ফরিজাদ শসা দিয়ে বানানো একটিমাত্র মুক্তোর বিরিয়ানীর থালা এনে রাখলো সেখানে। তারপর সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি আমাদের গরীবখানায় এসেছেন। বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা করতে পারিনি। এই সামন্য একটু বিরিয়ানী বানিয়েছি। যদি মেহেরবানী করে আহার করেন।

ভারী মিষ্টি কণ্ঠস্বর ফরিজাদ-এর। এবং আরও মিষ্টি করে বলতে জানে সে। সুলতান খসরু মুগ্ধ হয়ে যান। বলেন, বাঃ, মাইজী নিজে হাতে বানিয়েছে, খাবো না? পেট ভরে পরিতৃপ্তি করে খাবো। তাছাড়া দেখছি আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার শসা দিয়ে বানিয়েছ? ওঃ, জিভে আমার জল এসে যাচ্ছে এখুনি।

সুলতান হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে এসে বসে। শশা ভাজার টুকরোগুলোর দিকে লোলুপ চোখে তাকায়। কিন্তু একি! এ তো চালের বিরিয়ানী নয়। এক থালা মুক্তো—তার সঙ্গে শশা ভাজা? খসরু ভাবে, এ নিশ্চয়ই নতুন ধরনের এক খানা। নিশ্চয়ই শশা ভাজার সঙ্গে খেতে চালের বিরিয়ানীর চেয়েও সুস্বাদু লাগবে।

এই যখন ভাবছে সুলতান, সেই সময় বুলবুল পাখিটা বেশ জোরে জোরে বলে ওঠে, অমন করে ভাবছেন কী সুলতান খসরু। নিন খান। কী, একথালা মুক্তো দেখে ঘাবড়ে গেলেন?. ভাবছেন এ আবার কেমনতর খানা? তাহলে অনেক বছর পিছনে চলে যান একবার। মনে আছে সুলতান খসরু, কোন এক সন্ধ্যায় আপনি বণিকের ছদ্মবেশে শহর পরিক্রমা করতে করতে এক দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করেছিলেন? মনে পড়ে সে দিনের কথা? ভালো করে ইয়াদ করে দেখুন তো, একটি বস্তিবাড়ির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে-বাড়ির তিনটি অবিবাহিত কন্যার নানারকম জল্পনা-কল্পনার কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনেছিলেন কিনা। মনে পড়ে—ঐ তিন কন্যার সর্বকনিষ্ঠা বলেছিলো, শাদী যদি করতেই হয়, খোদ সুলতানকেই করবো? মনে পড়ে? ভাবুন, ভেবে দেখুন, আরও সে বলেছিলো কিনা—আমাদের মিলনে যে সন্তানের জন্ম হবে তারা হবে চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর। আরও সে বলেছিলো একটি মেয়ে হবে। তার মাথার চুল হবে সোনার মতো সোনালী। কান্নাতে তার পান্না ঝরবে, আর হাসলে পড়বে রাশি রাশি মুক্তো। এ সেই কন্যার মুখ-নিঃসৃত মুক্তো।

সুলতান খসরুর কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমে উঠছে ততক্ষণে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব তার মনে পড়ছে!

বুলবুল ফরিজাদকে উদ্দেশ্য করে বললো, ফরিজাদ, বোরখা খুলে পিতার সামনে দাঁড়াও। তোমার পিতা তোমাকে দেখুন। তোমার মাথার সোনালী চুল দেখলে তাঁর সব সংশয় ঘুচে যাবে।

ফরিজাদ বোরখা খুলে ফেলে সুলতানকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে ওঠে, বাবা,—তুমি আমাদের বাবা! বলো, বাবা, বুলবুল যা বলছে তা ঠিক?

বুলবুল এবার চটে ওঠে, বুলবুল কখনও মিথ্যে বলে না ফরিজাদ। তোমার পিতাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সেই রাতের পর পরদিন তোমার মা আর দুই মাসীকে তিনি

দরবারে ডেকে এনেছিলেন কিনা। এবং সেইদিনই তিন বোনের ইচ্ছামত পাত্রের সঙ্গে তাদের শাদী হয়ে গিয়েছিলো কিনা?

সুলতান মাথা নাড়েন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ঠিক। কিন্তু আমার বেগম তো তিনবারে তিনটি জন্তু-জানায়োরের বাচ্চা পয়দা করেছিলো।

—ঝুট! সব মিথ্যে কথা। বড় দুই বোন, ছোট বোনের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা হয়ে এই চক্রান্ত করেছিলো! সুলতান তাদের শয়তানীর কথায় বিশ্বাস করে নিরপরাধ বেগম সাহেবাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন—

সুলতান খসরু আর্তনাদ করে ওঠেন, আমি সব—সব বুঝতে পারছি এখন। সব পানির মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু—কিন্তু বেটা, ও পাপ আমি রাখবো কোথায়? তোমাদের জননী নিষ্পাপ ফুলের মতো পবিত্র এক মেয়ে। তাকে আমি কারাগারে দোজক যন্ত্রণা দিয়েছি এতকাল। এই গুনাহ কী খোদাতালা ক্ষমা করবেন?

ফরিজাদ বলে, কিন্তু বাবা, এতে তো আপনার দোষ সামান্যই। সাজা যদি পেতে হয় আমাদের মাসীদেরই পাওয়া উচিত! কারণ তারাই আপনাকে ধোঁকা দিয়েছিলো।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত।

সুলতান বেগমকে কারাগার থেকে মুক্ত করে হারেমে নিয়ে এলেন। সে ছেলেমেয়েদের ফিরে পেয়ে সুখের সাগরে ভাসতে থাকলো। আর সেসই বড় দুই বোন? তাদের যে-সাজা যোগ্য ছিলো, তাই মাথা পেতে নিতে হলো তাদের।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ থামে। দুনিয়াজাদ এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিলো, এবার সে দিদিকে জড়িয়ে ধরে বলে, যেমন সুন্দর তোমার কিস্‌সা তেমনি মিষ্টি তোমার বলার ঢং, দিদি।

—ঠিক। বিলকুল ঠিক বলেছে দুনিয়াজাদ। বহুৎ মিঠা তোমার বলার কায়দা, শাহরাজাদ। আহার নিদ্রা ভুলে রুদ্ধশ্বাসে শুনতে হয়!

শাহরাজাদ বলে, এবার জাঁহাপনা, আপনাকে সেই কামর আর হালিমাহর কিস্‌সা শোনাবো। তবে আজ তো রাত খতম হয়ে এলো। আজ আর নয়, আসুন আমরা শুয়ে পড়ি। কাল থেকে শুরু করা যাবে, কেমন?

সুলতান শাহরিয়ার শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে নিতে বলে, সেই ভালো, শাহরাজাদ আজ এখানেই গল্পের ইতি হোক। এসো ঘুমের আগে আমরা একটু ভালোবাসা করি, কী বলো?

শাহরাজাদ সুলতানের বুকের তলায় হারিয়ে যেতে যেতে বলে, এই দুনিয়া ওদিকে ফিরে শো—মুখপুড়ি!

সাতশো আশিতম রজনী ঃ

শাহরাজাদ নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

কোনও এক সময়ে এক শহরে আবদ অল রহমান নামে এক ধনী সওদাগর বাস করতো। আল্লাহর কৃপায় সে একটি পরম রূপবান পুত্র এবং পরমাসুন্দরী এক কন্যা লাভ করেছিলো।

সওদাগর পুত্র-কন্যার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওদের দু'জনকে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে লালন-পালন করতে থাকে। একটিমাত্র বিশ্বাসী বৃদ্ধ নফর ওদের দু'জনকে দেখাশুনা করতো। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে ওরা বড় হতে থাকে।

এইভাবে চৌদ্দটা বছর কেটে গেছে। ছেলের দেহে যৌবনের ছোঁয়া লাগতে শুরু

করেছে। একদিন সওদাগর-গৃহিণী স্বামীকে একান্তে ডেকে বললো, বলি ছেলের বয়স কত হলো খেয়াল আছে?

সওদাগর বলে, থাকবে না কেন, এইতো চৌদ্দ চলছে।

—তবে ছেলে কি এখনও সেই কচি খোকাটি আছে নাকি ভাবছ? তার বিয়ে শাদী দিতে হবে না? তাকে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে শুনে নিতে হবে না। ঐভাবে অন্ধকার ঘরে ওদের বন্দী করে কী ফয়দা ওঠাবে শুনি?

—আহা বিবিজান, সওদাগর স্ত্রীর উষ্মা শান্ত করতে বলে, তুমি বুঝছ না কেন, কামর তো আর বাচ্চা ছেলের মত সাধারণ রূপলাবণ্য নিয়ে জন্মায়নি। ওর দিকে তাকালে যে ভয় করে আমার। অমন সর্বনাশা রূপ তো বাপু আমি আমার জীবনে কোথাও দেখিনি। আল্লাহর একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত। একটামাত্র আমার পুত্র-সন্তান, সুলতান বাদশাহর ঘরে জন্মায়নি, গায়ে গতরে খেটে খেতে হবে। সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে মিশতে হবে না। এমন ঘরে এতো রূপবান পুত্রের কী দরকার ছিলো বিবিজান?

—ওমা, একি কথা, সওদাগর-গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তুমি বাপ হয়ে একি কথা মুখে আনছো গো? ছেলেমেয়ে দেখতে সুন্দর হবে, এ তো বাবা মায়ের চির-জীবনের সাধনা। কোথায় খুশিতে ডগমগ হবে, তা না আল্লাহর উপর দোষারোপ করছো?

সওদাগর বলে, তুমি আমার আসল কথাটাই বুঝলে না, বিবিজান। ছেলেমেয়ে খুবসুরত হবে না, তা তো বলিনি। সব বাবা-মাই চায় তাদের সন্তানরা সুদর্শন সুন্দর হোক। কিন্তু তা বলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ঘরে আসমানের চাঁদ—একি শোভা পায়, বলো, না এর ঝামেলাই সহ্য করা যায়?

—ঝামেলা? ছেলেমেয়েকে তুমি ঝামেলা মনে কর?

—এ্যাই দ্যাখো, আমি বলতে চাইছি এক আর তুমি বুঝছো আর এক। কী মুশকিল বলতো।

—থাক থাক, অত বোকা বুঝিয়ে আর কাজ নেই। সে যাকগে, এখন যা বলছি মন দিয়ে শোনো।

—বলো।

—বলি আখেরের কথা তো কিছু ভাবতে হবে?

—আলবত ভাবতে হবে।

—তাহলে ছেলেকে ঘরের মধ্যে কয়েদ করে রাখছ কেন? তাকে দোকানে বসাতে হবে না। তোমার বয়স হয়েছে। আল্লাহ করুন তুমি শ' সাল বেঁচে থাক! কিন্তু মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যের কথা কিছুই বলা যায় না। আমিও আগে যেতে পারি, তুমিও পার। ধর যদি অসময়ে তেমন কিছু একটা বিপদই ঘটে যায় তখন ছেলেমেয়ে দু'টো কি পথে বসবে?

সওদাগর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, কেন, পথে বসবে কেন? জান, বাজারে আমার কত বড় দোকান, এতো আমার খদ্দেরপাতি। দেখে শুনে খেলে সাত পুরুষের কোনও ভাবনা থাকবে না।

—দেখে শুনে খেলে—তা দেখাশোনাটা কে করবে শুনি। ছেলেকে তো ঘরে পুরে রেখেছ। ধর আজ বাদে কাল তুমি ইন্তেকাল করলে। তখন হঠাৎ যদি একটা ফুটফুটে ছেলে গিয়ে গদীতে গিয়ে বসে বলে, এ দোকানের আমিই মালিক। লোকে শুনবে? তারা মুখ টিপে হাসবে না? বলবে না, কই সওদাগর সাহেবের কোনও লেড়কা আছে বলে তো আমরা কখনও শুনিনি? তোমার ছেলেকে যদি দোকানে তারা ঢুকতে না দেয় তখন আমি কি কাছারীআদালত করতে যাবো? সংসারে বাঁচতে গেলে সমাজ ছাড়া বাঁচা যায় না। তাদের সকলের মতামত অগ্রাহ্য করেও টিকতে পারা যায় না। তাই আগে থেকেই সাবধান হতে হয়।

সওদাগর অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করে, তা—এখন কী করতে বলো আমায়।

—কী আবার বলবো, ছেলেটাকে এখন থেকে সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যাও। গদীতে বসিয়ে রাখ তাকে। পাঁচজনে দেখুক, জানুক এ তোমারই ঔরসজাত সন্তান। তারপর আস্তে আস্তে দোকানদারীও শিখে নেবে সে। খদ্দেরদের সঙ্গেও জানপছান হবে।

সওদাগর অনেকক্ষণ ধরে গৃহিণীর কথাগুলো অনুধাবন করে দেখলো। হুম, নাঃ, অন্যায় কিছু বলেনি কামরের মা। আজ যদি সে হঠাৎ মারা যায় তখন ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠতে পারে। পাড়া-পড়শী বা সমব্যবসায়ীরা কামরকে হঠাৎ দেখে তার ঔরসজাত সন্তান বলে স্বীকার নাও করতে পারে। হয়তো এমনও ভাবতে পারে, স্ত্রীর অন্য কোনও ভালোবাসার ছেলে! ছিঃ ছিঃ, সে কি লজ্জার ব্যাপার হবে।

—কই গো শুনছো, সওদাগর বিবিকে ডেকে বলে, ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক। ছেলেকে পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করানো দরকার। তা আর দেরি কেন, আজ থেকেই নিয়ে যাবো। ওকে খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে তৈরি করে দাও।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো একাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ছেলের হাত ধরে সওদাগর দোকানের পথে রওনা হয়। কিন্তু মুহূর্তেই বিপদ ঘনিয়ে আসে। পঙ্গপালের মতো পথচারিরা এসে ছেঁকে ধরে কামরকে। সকলের চোখে-মুখে দারুণ বিস্ময়। এমন আসমানের চাঁদ মাটিতে নেমে এলো কী করে? কেউ হাত ধরে টানে। কেউ গাল টিপে আদর করে। কেউ বা চুমু খেয়ে যায়।

সওদাগর প্রাণপণে ভিড় ঠেলতে থাকে। ভয় হয় ভীড়ের চাপেই বুঝি তার ছেলেটা মারা যাবে। সে চিৎকার করে ওঠে, কী করছো তোমরা, সরে যাও। ছেলেটা মরে যাবে যে।

কিন্তু সে কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। মুহূর্তের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। আজব বস্তু দেখার কৌতূহলে দলে দলে ছুটে আসতে থাকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

সওদাগর ছেলেকে নিয়ে কোনক্রমে ছুটতে ছুটতে এসে দোকানে ওঠে। ছেলেকে পাঠিয়ে দেয় দোকানের পিছনের দিকে। কিন্তু জনতা তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার মানুষ দোকানের সামনে এসে হুড়োহুড়ি করতে থাকে।

এই সময় ভিড় ঠেলে এক পলিতকেশ বৃদ্ধ দরবেশ এসে ঢুকলো দোকানে। সওদাগর সসম্ভ্রমে স্বাগত জানালো ফকিরকে।

—কোথায় তোমার লেড়কা?

সওদাগর বললো—ওই ওপাশে বসে আছে। এদিকে রাখলে বাজারের মানুষ ওকে ছিঁড়ে খাবে। তাই লোকের চোখের আড়ালে বসিয়ে রেখেছি।

দরবেশ কামরের পাশে গিয়ে বসে। দোকানের বাইরে জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ওই লোকটাকে বাইরে বের করে দিন। বুড়ো দরবেশগুলো ছেলে খাওয়ার যম।

সওদাগর চিন্তিত হয়ে ওঠে। সত্যিই এই সব ঘাটের মড়া ফকিরগুলো সাধারণতঃ ভীষণ বদ হয়। ছোট ছোট খুবসুরত ছেলেদের ওপর ওদের ভীষণ লোভ। সওদাগর দিশাহারা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কী করে সে ছেলেকে উদ্ধার করবে?

—ফকির সাহেব, এবার তাহলে আসুন, আমার দোকান বন্ধ করে ঘরে যাবো।

সওদাগর নিরুপায় হয়ে দোকান বন্ধ করে পালাবার সিদ্ধান্ত পাকা করে। কিন্তু দরবেশ ওঠার নাম করে না। সওদাগর ভাবে, লোকটা পয়সা-কড়ি না নিয়ে নড়বে না। একটা মোহর তোড়া ওর সামনে রেখে বলে, আজকের মতো ক্ষান্তি দিন। আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যাবো।

গৃহিণীর ওপর আক্রোশে মনে মনে সে গজরাতে থাকে, আজ আগে বাড়ি যাই, তারপর তারই একদিন কী আমারই একদিন, দেখে নেব। উফ্, ছেলেকে দোকানদারী শেখাতে হবে। এখন শেখাও দেখি দোকানদারী। কাল থেকে মা-বেটাকে দোকানে পাঠাবো। দেখবে, কত ধানে কত চাল।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় সওদাগর আবদ অল রহমান। দরবেশ টাকার তোড়াটা স্পর্শ করে না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সওদাগর ছেলের হাত ধরে হন হন করে বাড়ির পথে রওনা হয়। কিন্তু দরবেশটা ওদের পিছু ছাড়ে না। সে ততোধিক লম্বা লম্বা পা ফেলে রহমানের পাশে এসে চলতে চলতে বলে, আজকের রাতটা আমি তোমার বাড়িতে মেহমান হতে চাই সওদাগর।

লোকটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে রহমানের। এখন কী উপায় হবে। হাদিসের নির্দেশ আছে কোনও মুসাফীর যদি মেহমান হয়ে আসে তাকে ফিরিয়ে দিলে মহাপাতক হতে হবে। ইসলামের নির্দেশ অমান্য করবে কী করে সে? কিন্তু লোকটার মতলব ভালো নয়, ওকে বাড়িতে আশ্রয়ই বা দেবে কী করে সে?

একবার যখন সে নিজের মুখে বলেছে তার ঘরে মেহেমান হবে তখন কিছুতেই তাকে না করতে পারবে না রহমান। কিন্তু তা বলে লোকটাকে সারারাত সে আশ্রয় দেবে না তার ঘরে। সকাল সকাল খাইয়ে ওকে বিদেয় করে দেবে সে। কিন্তু লোকটা যদি বদ মতলব নিয়ে আমার ছেলের দিকে নজর দেয় তবে মেহমান বলে আর রেয়াত করবো না ওকে। আস্ত কবর দেব আমার বাগানে। তারপর ফৌজকে যেতে হয় যাবো, কুছ পরোয়া নাই।

লোকটার ভড়ং আছে আঠারো আনা। বাড়িতে পৌঁছেই সে নামাজের ব্যবস্থা করতে বলে রহমানকে। মেহমানের যাতে অনাদর না হয় সে দিকে সওদাগর সচেতন। মাদুর পেতে দিলো। রুজু করার পানি এনে দিলো। দরবেশটা নামাজাদি শেষ করে কোরাণ পাঠ করতে থাকলো। সওদাগর ভাবে, নিয়মমতো অনেকেই কোরাণের কিছু অংশ পাঠ করে রেখে দেয়। কিন্তু অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, লোকটা কোরাণ থেকে আর চোখ ফেরায় না। পাতার পর পাতা সে পাঠ করতে থাকে। সওদাগর নিরুপায়। রাত গভীর হয়ে আসে। কিন্তু ফকিরকে বলতে পারে না পাঠ শেষ করুন, খানা-পিনা সেরে নিন, আপনাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু লোকটা থামতে জানে না বোধ হয়। রহমান ছটফট করতে থাকে। ঘরছেড়ে ভিতের চলে যায়।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে অতিথিকে একা ফেলে অন্যকাজে মন দিতে নাই। তাই সে কামরকে বলে, যা তো বাবা, ফকির সাহেবের পাশে গিয়ে বসে কোরাণ পাঠ শোন। ধর্ম কথা কানে গেলেও পুণ্য হবে।

কামর বলে, কিন্তু আব্বাজান লোকটা দোকানে হাত লাগিয়ে আমার গাল টিপে দিয়েছিলো।

রহমান হাসে, বুড়ো মানুষ, একটু আদর করেছে, তাতে দোষ কী। যা কাছে গিয়ে বোস। যদি একটু আধটু আদর টাদর করে, উঠে আসবেনা যেন। হাজার হলেও মেহেমান তো, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।

ছেলেকে দরবেশের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে কিন্তু রহমান নিশ্চিন্ত হতে পারে না। দোতলার একটা ঘরের জানলার পাশে গিয়ে বসে সে। সেখান থেকে দরবেশকে পুরো নজর করা যায়। কিন্তু দরবেশ তাকে দেখতে পাবে না।

কামর আসে। দরবেশের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটার চোখ ছলছল করে ওঠে।

—এসো এসো, কাছে এসো, বেটা। এখানে আমার কোলে এসে বোস।

আহা গলায় যেন মধু ঢালা। কামরকে এতক্ষণ না দেখতে পেয়ে মনে মনে সে যে হা হুতাশ করছিলো তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কামর তার কোলে অবশ্য বসেনা, কিন্তু বেশি দূরত্ব না রেখে প্রায় গা ঘেঁষেই বসে পড়ে।

দরবেশ বলে, বসো বেটা ভালো করে বসো। কোরাণ পাঠ করি, মন দিয়ে শোন।

দরবেশ এক মনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে থাকে। ভাবাবেগে অশ্রুধারা নামে তার দু'গাল বেয়ে। দোতলার ওপর থেকে রহমান এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অবাক হয়। মিথ্যাই সে তাকে সন্দেহ করে ছিলো। আসলে সে তো এক ধর্মপ্রাণ।

তাড়াতাড়ি সে নিচে নেমে আসে। দরবেশের সামনে হাত জোড় করে বলে আমার গোস্তাকি মাফ করবেন ফকির সাহেব। আপনার চোখে জল কেন? আমার আদর যত্নে কী কোনও দোষ হয়েছে।

দরবেশ স্মিত হেসে বলে, না বাবা সে সব কিছু নয়।

—তবে?

—কেন বাবা আমার পুরোনো ক্ষত খুচিয়ে আবার ঘা করে দিতে চাইছো?

রহমান বলে, আমি আপনাকে জোর করছিনা, বাবা সাহেব। যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে আমাকে শোনাতে পারেন। শুনতে বড় কৌতূহল হচ্ছে আমার। বৃদ্ধ বললো, বেশ তাহলে বলছি, শোনো।

আমি এক কপর্দক-শূন্য দরিদ্র দরবেশ। এ সংসারে নিজের বলতে কোনও ধন-সম্পদই আমার নাই। আল্লাহর আশীর্বাদই আমার একমাত্র পাথেয়। তাই সঙ্গে করে দেশে দেশে পথে-পথে ঘুরি।

এমনি ভাবে চলতে চলতে একবার এক জুম্বাবারের সকালে বসরাহ শহরে পৌঁছলাম। বাজারে ঢুকে দেখি কোথাও কোনও জনপ্রাণী নাই। অথচ প্রতিটি দোকানপাট খোলা। নানারকম জিনিসপত্রে ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো গোছানো। অবাক কাণ্ড, আতিপাতি করে তলাশ করেও না কোনও খদ্দের, না কোনও দোকানী—কারও দেখা পেলাম না। চারদিকে যেন কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। ভাবতে লাগলাম, দোকানপাট যেভাবে পসরা সাজানো—তাতে মনে হয় এইমাত্র সবাই ছিলো, কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মুহূর্তে সকলে উধাও হয়ে গেছে।

খিদেয় আমার পেট জ্বলছিলো। সামনেই দেখলাম এক হালুইকরের দোকান। থরে থরে মিঠাই মণ্ডা সাজানো। মনে হলো, এইমাত্র বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। দোকানে ঢুকে যতটা প্রাণ চায় খেলাম। পাশেই একখানা কাফিখানা। সেখানে ঢুকে নানারকম কাবাব, কোরমা, বিরিয়ানী, কালিয়া যা ইচ্ছে হলো পেট পুরে খেয়ে নিলাম। সত্যি, বিশ্বাস কর, অমন মুখরোচক সুগন্ধী খানা আমি তার আগে কখনও আস্বাদ করিনি। এরপর আমি এলাম এক শরবতের দোকানে। এক পেয়ালা খুসবুওয়ালা পেস্তার শরবত খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে থাকলাম।

শরবত খেয়ে দোকান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটছি। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠতে থাকলাম। এতো বড় শহর, কোথাও কোনও জনপ্রাণী নাই—যেন এক বিরাট কবরখানার মধ্যে দিয়ে চলেছি।

•

হঠাৎ এক বাজনার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম! তবে কী কেউ বা কারা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। নানারকম বাদ্যযন্ত্রের লহরা কানে স্পষ্টতর হতে থাকলো। কিন্তু বেশ

বুঝতে পারলাম, এ সঙ্গীত কোনও শুভ সংকেত নয়। নিশ্চয়ই কোনও শয়তানের কাজ। আমি একটা গুদোমের পালাকরা বস্তার আড়ালে লুকিয়ে রাস্তার দিকে চোখ মেলে রাখলাম। সেখান থেকে পথচারীদের আমি সবই প্রত্যক্ষ করতে পারবো কিন্তু ওরা শত চেষ্টা করলেও আমাকে দেখবে না কেউ।

একটু পরেই বুঝতে পারলাম বাদ্যযন্ত্রীদের সঙ্গে একটা মিছিল আসছে। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলাম পথের দিকে।

পরীর মতো সুন্দরী চল্লিশটি মেয়ে পথের দুধার দিয়ে দুই সারি বেঁধে চলেছে। তাদের রূপের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু এহ বাহ্য। এদের পিছনে একটা খচ্চরের পিঠে আসীন এক অলোকসামান্যা পরমাসুন্দরীকে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেলো। পথে প্রবাসে ঘুরে ঘুরেই আমার দিন কাটে। জীবনে অনেক ভালো অনেক খারাপ অনেক সুন্দর অনেক অসুন্দর আমি দেখেছি। কিন্তু বিশ্বাস কর বাবা, সে দিন যাকে দেখেছিলাম তার জুড়ি দেখিনি কোথাও? কোনও মেয়ে যে অমন রূপসী হতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। আমার মুখে এমন কোনও ভাষা নাই যে তার রূপের বর্ণনা দিতে পারি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিছিল পার হয়ে গেলো, আমি বস্তার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, যে দোকানপাট একটু আগেও জনশূন্য খাঁ-খাঁ করছিলো তা আবার মুহূর্তেই দোকানী আর খদ্দেরে সরগম হয়ে উঠেছে। একজনকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা ভাই, কাকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে গেলো ওরা? আমার প্রশ্ন শুনে লোকটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আপাদমস্তক এক সন্দেহের চোখে একবার দেখে নিয়ে ভীতচকিত হয়ে সরে গেলো, কোনও জবাব দিলো না। আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু সেও ভূত দেখার মত ভয় পেয়ে ছুটে পালালো। এরপর যাকেই জিজ্ঞেস করি কেউ আমার কথার জবাব না দিয়ে সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে কেটে পড়ে। শেষে এক নাপিতকে পাড়কাও করলাম, ও নাপিত ভাই, ব্যাপার কী বলতে পার, কে গেলো মিছিল করে?

আমার কথা শুনে নাপিত কানে আঙ্গুল দিলো। ফিস ফিস করে বললো, ওসব কথা জিজ্ঞেস করতেও নাই, জবাব দিতেও নাই। মনে হচ্ছে আপনি পরদেশী, এখানে আর আপনার একদণ্ডও থাকা উচিত নয় মুসাফির। আপনি এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান! এর বেশি আর কিছু জানতে চাইবেন না, বলতে পারবো না। জানে যদি বাঁচতে চান, এখুনি শহর ছেড়ে পালান। ভাগ্যে আপনি মিছিল আসার আগে বুদ্ধি করে আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলেন, না হলে আপনার কাটা মুণ্ডু এখানে গড়াগড়ি যেত। আমরা সদা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকি। একটু আগের দোকান-পাটের অবস্থা দেখে টের পেয়েছেন আশা করি। কখন যে কার ভাগ্যে কী ঘটতে পারে, কেউ জানি না আমরা।

নাপিতের কথা শুনে বুঝলাম ও-শহরে আমার মতো ভাব-ভোলা মানুষের আর এক দণ্ডও অবস্থান করা উচিত নয়। তাই সেই মুহূর্তেই শহর ছেড়ে প্রান্তরের পথে বেরিয়ে পড়লাম। চলতে চলতে অবশেষে আজ এসে পৌঁচেছি তোমাদের এই শহরে। এসেই দেখলাম তোমার এই পুত্রকে। আহা, চোখ জুড়িয়ে যায়। তখন থেকে আমার শুধু একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছে, এ ছেলের একমাত্র জুটি ঐ বসরাহ-সুন্দরী! বসরাহতে তাকে দেখার পর থেকে শুধু এই কথাই ভেবেছি, এমন তুলনাহীন সুন্দরীর যোগ্য বর কোথায় মিলবে? তা আল্লাহ যখন তাকে

পয়দা করেছেন, তার উপযুক্ত জুটিও যে বানাবেন তাতে আর সন্দেহ কী? তোমার পুত্রকে দেখে বুঝলাম এ পাত্র একমাত্র তারই যোগ্য হতে পারবে। এখন খোদার কী অভিপ্রায় জানি না, তবে এরা একসঙ্গে মিললে সোনায় সোহাগা হবে।

দরবেশ তার কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো, ব্যস, আজ এই পর্যন্ত। এবার আমি বিদায় নিচ্ছি, সওদাগর। তোমার আতিথেয়তা আমার মনে থাকবে। আমি আশা করবো তোমার পুত্র বসরাহ-কন্যাকে শাদী করে সুখ-সম্ভোগে বসবাস করুক।

এরপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে সেই রাতের অন্ধকারেই পথে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তরুণ কামর সারাটা রাত বিনিদ্রভাবে কাটালো। বৃদ্ধ দরবেশ তার মনে নতুন রঙ ধরিয়ে দিয়ে গেলো। কল্পনার তুলি দিয়ে মনে মনে সে সেই বসরাহ- কন্যার ছবি আঁকার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই তার অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যের মূর্তিটি প্রতিভাত করতে পারে না।

পরদিন সকালে উঠে সে মা-এর কাছে গিয়ে বায়না ধরে, মা আমি আজই বসরাহ পথে রওনা হবো। আমার সামান-পত্র গুছিয়ে দাও। ঐ বসরাহ-কন্যাকে না পেলে এ জিন্দগী বরবাদ হয়ে যাবে আমার।

মা কান্নাকাটি জুড়ে দিলো। স্বামী আবদ অল রহমানকে ডেকে বললো, শোনো তোমার ছেলের কথা। সে গোঁ ধরেছে, বসরাহয় যাবে। সেই মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে সে শাদী করবে না।

রহমান ছেলেকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো। বিদেশ বিভূঁই জায়গা। জানা নাই, চেনা নাই, আন্দাজে কোথায় যাবি, বাবা?

কিন্তু কামর তার মত বদলাতে রাজি নয়। সে যখন ভেবেছে, যাবেই। তাতে যা ঘটে ঘটুক। সে বললো, আমি যাবই। এতে যদি তোমরা বাধা দাও, আমার মরা মুখ দেখবে।

মা-বাবা দুজনেই শিউরে ওঠে, ওকি কথা! অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আনতে নাই বাবা।

রহমান সব দোষ তার বিবির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে, তুমিই যত নষ্টের গোড়া। তোমার বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে আজই ছেলেটাকে খোয়াতে বসেছি।

দুঃখে হতাশায় সে ভেঙ্গে পড়ে, আবদ অল রহমান, নিজেকে বড় বুদ্ধিমান ভেবেছিলো! অতি সাবধানে ছেলেকে সিন্দুকে পুরে আগলে রাখতে চেয়েছিলো। ঠিক হলো, এই তোমার উচিত পুরস্কার পাওনা ছিলো।

যার নসীবে যা লেখা থাকে কেউই খণ্ডন করতে পারে না। কামর-এর মা স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, এ নিয়ে আর হা-হুতাশ করে কী করবে বলো। যা ঘটবার তা ঘটবেই। তুমি আমি হাজার কোসিস করেও ঠেকাতে পারবো না।

ছেলের যাত্রার গোছগাছ করে দিলো মা। একটা বটুয়াতে ভর্তি করলো হীরে চুনী পান্না! ছেলের হাতে দিয়ে বললো, ভালো করে সঙ্গে রাখিস। বিপদ আপদের সহায়!

রহমান ছেলেকে নব্বই হাজার দিনার রাহাখরচ দিলো। এবং তার পুরোনো নফরদের দু'জনকে সঙ্গে দিয়ে বললো, এরা দু'জন আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং প্রিয় বান্দা, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, দেখাশুনা করবে। এদের পরামর্শ অমান্য করো না। কারণ, নফর হলেও, এরা তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—জ্ঞান বৃদ্ধ।

উটের পিঠে রসদ এবং অন্যান্য সামানপত্র চাপিয়ে সেইদিনই কামর ইরাকের পথে রওনা হয়ে গেলো। এবং কিছুদিন পরে নিরাপদেই বসরাহতে এসে পৌঁছলো।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো তিরাশিতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

সেদিনও ছিলো জুম্মাবার। কামর শহরে প্রবেশ করেই দরবেশের কথার সত্যতা বুঝতে পারে। কী আশ্চর্য, পথঘাট জনশূন্য, দোকানপাট খোলা! থরে-থরে সামানপত্র সাজানো। কিন্তু কোনও দোকানে দোকানীও নাই, খদ্দেরও নাই। যেদিকে তাকায় খাঁ খাঁ করছে। নিজের পায়ের শব্দেই সে চমকে ওঠে।

খিদে পেয়েছিলো ভীষণ। একটা দোকানে ঢুকে পেটপুরে খেয়ে নিলো কামর। কিন্তু দাম মেটাবে কাকে? কেউ তো দোকানে নাই। যাই হোক, বাইরে বেরিয়ে আসতেই দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ বাদ্য-সঙ্গীত শুনতে পেয়ে সে দরবেশের কথা স্মরণ করে একটা গুদোমের পালাকরা বস্তার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

একটু পরেই মিছিল বাজারের পথের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলো। কামর উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলো পথের দিকে।

চল্লিশটি সুবেশা অপ্সরীর মতো সুন্দরী রমণী-পরিবৃতা হয়ে এক নবযৌবন-উদ্ভিন্না সুকুমারী ভ্রমণে বা বিহারে বেরিয়েছে। দরবেশ তার লাবণ্যের অসামান্যতা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি, শুধু বলেছিলো দুনিয়ার সর্বত্র সে ঘুরেছে সারা জীবনভোর, কিন্তু অমন রূপ সে কখনও দেখেনি। কামর ভাবলো, ফকির সাহেব সত্যিই বলেছিলো—এ রূপের জুটি মেলা ভার।

রুদ্ধশ্বাসে অপলক দৃষ্টিতে তরুণীর রূপসমুদ্রে অবগাহন করতে থাকে কামর। এতদিনের পথ-শ্রম, মা-বাবার মনে দুঃখ দিয়ে চলে আসা—সব আজ তার কাছে সার্থক হয়ে উঠলো এই মুহূর্তে। মনে মনে নিজেকে সহস্র ধন্যবাদ জানাতে থাকে সে,—ধন্য কামর, তুমি আজ সত্যই ধন্য হয়ে গেলে। আজ দুচোখ ভরে যে রূপ তুমি দর্শন করলে, তারপর তোমার যদি মৃত্যুও আসে কোনও খেদ থাকবে না।

মিছিল অদৃশ্য হয়ে গেলে কামর বাইরে এসে দেখে পথঘাট হাটবাজার জনসমাকীর্ণ। দোকানী দোকানে বসেছে, খদ্দের দরদাম করে কেনা কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কী আশ্চর্য, এদের মুখ দেখে বুঝবারই জো নাই, একটু আগেই তারা আতঙ্কে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো।

কামর একটা দোকানে ঢুকে খুব জমকালো একটা সাজ-পোশাক কিনে বাজার সন্নিহিত হামামে গিয়ে খুব ভালো করে ঘষে মেজে সাফ করে অনেক জল ঢেলে স্নান করে শাহজাদার মতো সাজে সেজে-গুজে পথে বেরিয়ে এলো। অদূরেই সেই নাপিতের দোকান। লোকটা তখন একজনের মাথায় ক্ষুর ধরেছে। প্রায় আধখানা মাথা সাফ করে এনেছে, এমন সময় কামরকে ঐ বেশে তার দোকানে ঢুকতে দেখে হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা সেলাম ঠুকে স্বাগত জানায়। কামর ওর হাতে একটা মোহরের তোড়া গুঁজে দিয়ে বলে, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। তা এখানে তো তোমার খদ্দেররা রয়েছে, একটু বাইরে আসবে?

নাপিত তোড়ার ওজনটা অনুভব করে বুঝতে পারে মালকড়ি নেহাত কম নাই। বিচলিত হয়ে বলে, কী যে বলেন হুজুর, আপনি হুকুম করলে আমি জাহান্নামেও যেতে পারি।

দু'জনে দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে একটু নিরালা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। কামর বলে, শুনেছি প্রতি জুম্মাবার সকালে এই পথ দিয়ে একটা মিছিল যায়। এবং যে-কোনও কারণেই হোক, সেই সময়টায় পথঘাট, হাটে বাজারে কোন জনপ্রাণী থাকে না। কিন্তু কেন? কার ভয়ে? আমি এই শহরে নবাগত। আড়ালে লুকিয়ে ঐ মিছিলের সুন্দরীকে আজ আমি দেখেছি। এক কথায় বলতে গেলে, চোখে আমার ধাঁধাঁ লেগে গেছে। এমন রূপ কখনও দেখিনি। তা বলতে পার, এই ডানাকাটা পরীটি কে?

নাপিত গম্ভীর হয়ে গেলো। কী যেন ভাবলো এক মুহূর্ত। তারপর বললো, আমি ঠিক জানি না, মালিক। তবে এইটুকু বুঝেছি, শুক্রবার সকালে ঐ মিছিল পার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ দোকান পাটে বসতে বা কেনাকাটায় বেরুতে সাহস করে না।

—এর কারণ কী? ভয়টা কোথায়?

নাপিত কাচুমাচু মুখে বলে, আজ্ঞে এর বেশি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, আমি জানি না, বলতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, আমার বিবি সব জানে। তাকে জিজ্ঞেস করলে এবং সে যদি রাজি হয় সব আপনাকে বলতে পারবে। আপনি একটুক্ষণ এখানে দাঁড়ান, হুজুর, আমি আমার বিবিকে জিজ্ঞেস করে আসি। সে যদি রাজি হয়, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো আমার বাড়িতে।

এই বলে নর-সুন্দরটি তার দোকানের আধ ন্যাড়া খদ্দেরটির কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে তোড়াটা নাচাতে নাচাতে বাড়ির পথে ছুটে যায়।

বিবির হাতে মোহারগুলো তুলে দিয়ে বলে, বহুত বড়িয়া এক মালদার সওদাগরকে পাকড়াও করেছি। এক্ষুনি তাকে নিয়ে আসছি তোমার কাছে, বরাতে থাকলে আরও কিছু মিলতে পারে বিবিজান। আচ্ছা আমি যাচ্ছি। ওকে নিয়ে আসছি তোমার কাছে, কেমন?

ছুটতে ছুটতে সে কামরের কাছে এসে বলে, বিবিজান আপনাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে—আর ভাবনা নাই, আপনি আসুন, মালিক।

নাপিতের সঙ্গে কামর ওর বাড়িতে এসে পৌঁছয়। নাপিত-গৃহিণী বয়সের ভারে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে বেশ। কামরকে যে অতিথির অধিক আদর আপ্যায়ন করে বসালো, দামী খুসবুওলা শরবত এনে খেতে দিলো এবং পরম স্নেহময়ীর মতো কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো।

এই সুদূর প্রবাসে এসে এমন একজন মাতৃসমা মমতাময়ীর দেখা পেয়ে কামর উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। নাপিত-গৃহিণী কামরকে নানারকম খানা-পিনা এনে খেতে দেয়। মুখে মধু ঢেলে বলে, কী আর খেতে দেব বাবা, গরীব-সরীব মানুষ। ঘরে যা ছিলো দিলাম, জানি না তোমার মুখে রুচবে কিনা।

কামর লজ্জিত বোধ করে, কী যে বল মা, ভালোবেসে দিলে খুদ-কুঁড়োও অমৃত মনে হয়।

খানা-পিনা শেষ হলে, কামর জেব থেকে এক মুঠো মোহর বের করে নাপিত-বৌ-এর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, এটা ছেলের ভালোবাসার দান, নাও মা। তোমার আদর-যত্নের দাম এই তুচ্ছ টাকা পয়সা দিয়ে হতে পারে না! কিন্তু আমি এখানে পরদেশী, এর বেশি তো আর কিছুই দিতে পারবো না, মা।

মোহরগুলো ওড়নার খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে নাপিত-বৌ বলে, অমন করে বলো না বাছা, আমাদের এই গরীবখানায় তোমার বড় কষ্টই হবে।

—ও-নিয়ে তুমি একদম ভাববে না, মা। আমাকে না ঘরের ছেলে বলে মনে করেছ? তবে অমন পরপর ভাবছো কেন? নিজের ছেলের মতো করে ভাবো, দেখবে আর খুঁত খুঁত

করবে না মন। যাই হোক মা জননী, আমি যে উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছি, এবার সে সম্বন্ধে কিছু শোনাবে?

নাপিত-বৌ বলে, আলবৎ, একশোবার শোনাবো, বেটা। তবে শোনো ঃ

আমাদের এই বসরাহর সুলতান একদিন ভারতের সম্রাট-এর কাছ থেকে একটা ইয়া বড় মুক্তো উপহার পেলেন। আমরা তো দেখিনি, শুনেছি, অত বড় মুক্তো নাকি হয় না! একেবারে ছোটোখাটো একটা সূর্যের মতো। সব সময় তার গা থেকে আলোর রোশনাই ঠিকরে বেরোয়।

সুলতান বাজারের জহুরীদের ডেকে মুক্তোটা দেখিয়ে বললেন, আমার ইচ্ছে এটা গলায় পরে থাকি! কিন্তু মুক্তোটা তো আনকোরা। সুতো পরানোর কোনও ফুটো নাই। তোমরা খুব সাবধানে এটায় সুতো পরাবার মতো সূক্ষ্ম একটা ফুটো করে দাও।

জহুরীরা এক এক করে সকেলেই সেই পরমাশ্চর্য মুক্তোটা নেড়ে চেড়ে দেখে বিষণ্ণ বদনে সুলতানের হাতে ফেরত দিয়ে বললো, এ বস্তু জীবনে আমরা এই প্রথম দেখলাম। হাজার হাজার মুক্তো আমরা কেনাবেচা করেছি, করছি, কিন্তু এমন অসাধারণ রত্ন কখনও চোখে পড়েনি, জাঁহাপনা। জানি না এর কত মূল্য। অথবা কোনও অর্থের বিনিময়ে আদৌ এ বস্তু কেনা যায় কিনা—তাও আমাদের অজানা। সেই কারণে এই অমূল্য রত্নে যন্ত্র চালিয়ে ফুটো করার দুঃসাহস আমাদের কারো নাই। যদি কোনও কারণে টুটে যায় তা হলে? তা হলে কী দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে পারবো আমরা? না না, হুজুর, আমরা অপারগ, এ মুক্তোয় আমরা বিঁদ করতে পারবো না।

সুলতান হতাশ হয়ে বললেন, সে কি কথা? তোমরা সব আরব দুনিয়ার তুখোড় সব জহুরী। তোমরা যদি না পার কে পারবে? আমার যে বড় শখ, মুক্তোটা কারে ঝুলিয়ে গলায় পরবো। আমার বুকের ওপর জ্বলন্ত সূর্যের গোলার মতো দুলবে সারাদিন। লোকে অবাক হয়ে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে—আমার এই শখটা মিটবে না?

জহুরীদের একজন বললো, এই শহরে উবেদ নামে এক বৃদ্ধ কারিগর আছে। জাঁহাপনা যদি তাকে তলব করেন, আমাদের মনে হয় সে একাজ করে দিতে পারবে।

সুলতান আশান্বিত হয়ে বললেন, বেশ তো তাকে ডাকো।

সুলতানের হুকুমে তখনই বৃদ্ধ উবেদকে হাজির করা হলো। সুলতান বললেন, দেখ এই মুক্তোটা। এটা ফুটো করে দিতে হবে। আমি গলায় ধারণ করবো? কিন্তু সাবধান, কোনও ক্রমেই যেন চোট না খায়। যদি আমার ইচ্ছা পূরণ করতে পার তবে তোমার মনঃস্কামনাও আমি পূরণ করবো—তা সে যাই হোক।

বৃদ্ধ উবেদ মুক্তোটা হাতে নিয়ে নিরীক্ষণ করলো কিছুক্ষণ। তারপর কোমর থেকে একটা তুরপুণ বের করে আশ্চর্য দক্ষতায় পলকের মধ্যেই এপার ওপার করে দিলো! সুলতানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, দেখুন জাঁহাপনা, আপনার রত্নের গায়ে কোনও চোট লেগেছে কিনা!

সুলতান দেখলেন একটা সূক্ষ্ম সুতো পরাবার মতো নিখুঁত একটি ছিদ্র হয়ে গেছে অথচ মুক্তোর গায়ে কোথাও আঘাত লাগেনি।

—সাবাস্, চমৎকার হয়েছে। এবার তোমার পালা। বল বৃদ্ধ, কী চাও তুমি? যা চাইবে আমার ওয়াদা মত আমি পূরণ করবো। বলো, নির্ভয়ে বলো তোমার মনের বাসনা।

বৃদ্ধ উবেদ বলে, জাঁহাপনা বয়সের ভারে বৃদ্ধ হয়েছি আমি। এবং বুদ্ধিসুদ্ধিও আমার বরবরই কিছু কম। ঘরে আমার রূপসী বিদুষী তরুণী বিবি আছে। দেখতে যেমন সে ডানাকাটা পরী, গুণেও তেমনি সে সেরা। তার বুদ্ধির কাছে অনেকেই হার মানে। তার মতামত ছাড়া কোনও কাজই করি না আমি। জাঁহাপনা যদি অনুমতি দেন, আমি বিবিজানের কাছ থেকে জেনে আসি।

সুলতান বললো, বেশ তো, চটপট যাও, জেনে এসো। কথা যখন দিয়েছি ওয়াদা আমি পূরণ করতে চাই।

বৃদ্ধ উবেদ ঘরে ফিরে এসে সুলতানের অভিপ্রায়ের কথা বলে বিবিকে।

উবেদ-বৌ আনন্দে নেচে ওঠে, উফ্ কী মজা! এতদিনে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে।

উবেদ বলে, হবে মানে? যা চাইবে তাই পাবে, বিবিজান। যত টাকা পয়সা, সোনাদানা-যা চাইবে তাই পাবে। একবার মুখ দিয়ে বের করতে পারলেই হবে। বিবিজান, আমার ভাবতে কী রকম গা শিরশির করছে। আর আমাদের এই রকম দীন ভিখারির মতো দিন কাটাতে হবে না। কাল থেকেই আমরা আমির ওমরাহ বনে যেতে পারবো। শুধু একবার বেশ বুদ্ধি করে ভেবে চিন্তে বলো কী চাইতে হবে! আমি মুখ দিয়ে বের করা মাত্র সুলতান বলবেন, 'আর্জি মঞ্জুর।' ব্যস, আর দেখতে হবে না—আমরা রাতারাতি বড় লোক হয়ে যাবো। যাই হোক, আর দেরি করো না বিবিজান, চটপট বলো কী চাইতে হবে। আমাকে আবার এখুনি দরবারে ফিরে যেতে হবে, এখুনি।

উবেদ-বৌ বলে, ভাববার কিছু নাই গো, অনেক আগেই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, জীবনে যদি তেমন কোনও সুযোগ আসে তবে আমার একটা সাধ মেটাবো প্রাণ ভরে।

—কী সাধ গো, বলো না?

—বলছি বলছি। বলবো বলেই তো ছটফট করছি তখন থেকে। ভালো করে শোনো, সুলতানকে গিয়ে বলবে, জাঁহাপনা, আমার বাসনাটা নিতান্তই সামান্য। টাকাকড়ি বলতে কিছু চাই না আমি। শুধু আপনি অনুমতি করুন, প্রতি জুম্বাবার সকালে আমার বিবি শহর পরিক্রমায় বেরুবে নামাজের দুঘন্টা পূর্বে। সেই সময় শহরবাসীরা কেউ ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে পারবে না। যদি কেউ পথে বা হাটে বাজারের কোথাও থেকে থাকে তবে মিছিলের বাদ্য-সঙ্গীত শোনামাত্র যে যার কাছের মসজিদে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে থাকবে। কিন্তু একটা কথা, দোকানপাট নিত্য যেমন খোলা থাকে তেমনি খোলামেলাই পড়ে থাকবে। কিন্তু কোনও দোকানে কোনও খদ্দের বা দোকানী থাকতে পারবে না সে সময়। সবাইকে ছুটে গিয়ে কাছের মসজিদে আশ্রয় নিতে হবে। যদি কারো মাথা দেখা যায় তবে আমার স্ত্রীর প্রহরীদের উদ্যত খড়্গ তার মুণ্ডুচ্ছেদ করে ফেলবে তৎক্ষণাৎ। এজন্য জাঁহাপনার কাছে আমি বা আমার বিবি নরহত্যার দায়ে সোপর্দ হবো না।

এক নিশ্বাসে এতোগুলো কথা বলে উবেদ-বৌ থামলো। বৃদ্ধ উবেদ তো থ'। এ আবার কী বদখদ চাওয়া হলো?

দুনিয়াতে এতো জিনিস থাকতে এইরকম ফালতু চাওয়া কী কেউ চায়?

বৃদ্ধ মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে, হায় হায়, কেন সে মেয়েমানুষের বুদ্ধি নিয়ে কাজ করবে ভেবেছিলো।

যাই হোক, বৃদ্ধেরা তরুণী ভার্যাকে চটাতে সাহস করে না। তাই উবেদও মনের দুঃখ মনে চেপে সুলতানের দরবারে ফিরে আসে।

সুলতান উবেদের মনোবাঞ্ছা শুনে প্রীত হয়ে বলেন, বহুত আচ্ছা, আজই আমি ঢ্যাঁড়া পিটে ফরমান জারি করে দিতে বলছি, প্রতি জুম্বাবারে নিত্য যেমন হাটবাজার, দোকানপাট খোলা থাকে তেমনি খোলা থাকবে। কিন্তু নামাজের দু ঘন্টা আগে থেকে ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে পারবে না কেউ। যারা হাটে-বাজারে বা পথে-ঘাটে রয়ে যাবে তারা কাছাকাছি মসজিদে গিয়ে মাথা লুকাবে। যদি কারো শির দেখা যায় প্রহরীর তলোয়ারের ঘায়ে কোতল করে দেবে।

সেই থেকে প্রতি শুক্রবার উবেদ-বেগম শহরে পথ-বিহারে বের হয়। সে সময় কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে—পথে-ঘাটে বের হতে পারে! এই নিয়ম চলে আসছে সেইদিন থেকে। জানি না আর কতকাল এভাবে শহরবাসীরা জুম্বাবারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাবে।

নাপিত-বৌ থামলো। তারপর একটু মৃদু হেসে কামরের দিকে তাকিয়ে বললো, কিন্তু বেটা, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমার এই কিস্‌সা শুনে তোমার পেট ভরলো না! যতক্ষণ না নিজের চোখে উবেদ-বেগমকে একবার দেখতে পাচ্ছো স্থির থাকতে পারবে না!

—আপনি ঠিকই ধরেছেন, মা। শুধু তাকে দেখার জন্যে তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আমি আমার স্বদেশ ছেড়ে এতো দূরদেশে এসেছি। ঘরে আমার মা বাবা চোখের পানি ফেলছেন। কিন্তু তাও উপেক্ষা করে চলে এসেছি এখানে—তার সঙ্গে দেখা করবো বলে।

নাপিত-বৌ বলে, ঠিক আছে, সব আমি ব্যবস্থা করে দেব। এখন বলতো বাবা, সঙ্গে কী পয়সাকড়ি এনেছ?

কামর বলে হীরে মুক্তো, চূণী পান্না এই চার রকমের জহরত কিছু আছে সঙ্গে। আর আছে কয়েকটা থলিতে হাজার আশী দিনার।

নাপিত-বৌ বলে, চমৎকার। তা হলে ওঠো। চলো আমার সঙ্গে। বাজারে যেতে হবে। ওখানে জহুরী উবেদের একটা দোকান আছে, আগে ওখানেই যাবো আমরা। এখন শুধু তোমার জহরতের থলেটা সঙ্গে নাও। তারপর আমি যা যা শিখিয়ে দেব সেই সেই মতো কাজ করবে।

একটা কথা, বড় কিছু করতে গেলে অসীম ধৈর্যের দরকার। আমার এই উপদেশটুকু মনে রাখলে আখেরে তোমার লাভ হবে। তবে কার্য উদ্ধার হয়ে গেলে এই গরীব মাকে ভুলে যেও না, বেটা। আমার স্বামী বড় দরিদ্র। সারাদিন খেটে সে দু'বেলা রুটি সংগ্রহ করে। তুমি যদি দয়া করে খুশি মনে তাকে দু'টো পয়সা দিয়ে যাও—আল্লাহ তোমার ভালো করবেন।

কামর বলে, ও-নিয়ে আপনি ভাববেন না, মা। আপনাদের এই উপকার আমি ভুলবো না।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চুরাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

শহরের এক প্রান্তে উবেদের স্যাকরার দোকান। জনাকয়েক কারিগর নিয়ে সে কাজ করে। অলঙ্কার নির্মাণে উবেদের নাম শহরজোড়া। তাই কাজেরও অভাব হয় না। নানারকম মানুষের নানারকম বায়না। উবেদ সকলের কাজই যত্নসহকারে করে দেয়—সবচেয়ে কম মজুরীতে।

কামর এসে দোকানে উঠতেই উবেদ আদর অভ্যর্থনা করে বসতে দেয়। কামরের রূপ আর জমকালো সাজপোশাক দেখে ভাবে, নিশ্চয়ই কোনও আমির বাদশাহর সন্তান।

জহরতের থলে থেকে ছোট্ট একখণ্ড হীরে বের করে উবেদের হাতে দেয় কামর। বলে, আমার ইচ্ছে একটা আংটিতে বসিয়ে দিন আপনি। এ শহরের সবাই এক বাক্যে আপনার নামই করলো, তাই অন্য সব দোকান ফেলে আপনার কাছেই এলাম।

উবেদ হীরেটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলে, কী ধরনের আংটির ওপর বসাতে হবে, মালিক? নক্সা দেখাবো?

কামর বলে, না না, ওসব দেখাবার কোনও দরকার নাই। আমি খবর নিয়েছি, আপনি শুধু সেরা জহুরীই নন—উঁচুমানের শিল্পীও। সুতরাং ওটা আপনার মনমতো একটা আংটির ওপর বসিয়ে দেবেন। বিশ্বাস করি, তা দেখে আপনার পছন্দ তারিফ করবে সকলে। ও হ্যাঁ, এই নিন সামান্য কিছু অগ্রিম রাখুন। পুরো মজুরী নেবার সময় দেবো।

এই বলে অন্য একটা থলে থেকে এক মুঠো মোহর বের করে উবেদের হাতে দিলো কামর। এবং দোকানের কর্মরত কর্মচারীদেরর প্রত্যেককে বকশিশ করলো একটা করে মোহর দিয়ে।

ইতিমধ্যে কামরকে দেখার জন্য কিছু ইতর মানুষের ভিড় হয়ে গেছে। কামর আর এক মুঠো স্বর্ণমুদ্রা বের করে ওদের প্রত্যেককে একটা একটা করে দান করলো। তারপর বিস্ময় বিমুগ্ধ উবেদকে আর কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কোনও সুযোগ না দিয়ে দোকান ছেড়ে পথে নামতে নামতে বললো, তা হলে আজ আসি শেখ সাহেব। কাল নিতে আসবো?

উবেদ বিস্ময়ে বিগলিত হয়ে যুক্ত করে বলে, আপনার মাল মজুত থাকবে মালিক। আপনার যখন খুশি এসে নিয়ে যাবেন।

উবেদ সব কাজ ফেলে নিজে হাতে একটা আংটি তৈরি করতে লেগে গেলো। দক্ষ কারিগরের নিপুণ হাতের যাদুতে সন্ধ্যার আগেই এক মনোহর কারুকার্য করা অদ্ভুত সুন্দর এক আংটি তৈরি হয়ে গেলো। অনেকদিন পর এতো সুন্দর একটি কাজ ওঠাতে পেরে খুশিতে ভরে ওঠে উবেদের মন। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের সৃষ্টি নিরীক্ষণ করতে থাকে সে! অনেক যত্ন নিয়ে করেও এমন মনের মতো কাজ সব সময় হয় না। আংটিটা দেখতে দেখতে নতুন এক সৃষ্টির গর্বে গর্বিত হয়ে ওঠে সে। এমন একটা অসামান্য কীর্তি তার প্রিয়তমা তরুণী ভার্যাকে না দেখিয়ে কী সে থাকতে পারে! তাই দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় আংটিটা সঙ্গে নিতে ভোলে না।

ঘরে ফিরে আংটিটা বিবির হাতে দিয়ে বলে, দেখতো কেমন হয়েছে? আমি নিজে হাতে বানিয়েছি। বাজি রেখে বলতে পারি, সারা দুনিয়ায় এমন কোনও স্যাকরা নাই যে এর জুড়ি একটা বানিয়ে দিতে পারে। হুঁ হুঁ বাবা, আমার নাম উবেদ!

সত্যিই আংটিটার গঠনরীতি, কারুকার্য এবং হীরেটাকে বসানোর দক্ষতা এক কথায় অপূর্ব। উবেদ-বিবি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে আংটিটার দিকে। আংটির কাজ না, হীরে কোন্‌টা বেশি তাকে মোহিত করে ঠিক বুঝতে পারে না।

—এমন দামী জহরত দিয়ে এই শখের আংটি বানায় যে সে মানুষটি কেমন?

উবেদ বলে, ওঃ, তাকে যদি তুমি দেখতে বিবিজান, ভিরমি খেয়ে পড়ে যেতে।

—ওমা সে কি কথা, ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবো কেন?

—কেন জানি না, তবে তার রূপের জেল্লা দেখলে তোমার চোখে ধাঁধা লেগে যেত। এই হীরেটা দেখছ, এদিক ওদিক ঘোরালে কেমন দ্যুতি ছাড়ে? আর তাকে ঘোরাতে ফিরাতে লাগে না। যে পাশ থেকেই তাকে দেখবে —এই রকম হাজার হীরের দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে দেখবে। চোখ না ধাঁধিয়ে পারে? আহা কী তার রূপ? কী করে বর্ণনা দিয়ে তোমাকে বোঝাবো, বিবিজান। মোটকথা আমি বুড়ো হয়ে মরতে বসেছি, তাকে দেখে আমারই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো। অমন চোখ, অমন গাল, নাক, অধর আমি দেখিনি কারো। নাঃ, কোনও আমির বাদশাহর প্রাসাদেও নজরে পড়েনি।

উবেদ-ভার্যা বৃদ্ধ স্বামীর কথাগুলো যেন গিলছিলো। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলো, উমর কত?

—তা তোমার মতই চোদ্দ-পনের হবে। কিন্তু কী বাড়ন্ত গড়ন। দেখলে মনে হয়, এক তাগড়াই নওজোয়ান।

উবেদ-বিবির যৌবন গলতে থাকে। কামনার বহ্নি জেগে ওঠে। শাদীর পর থেকে বৃদ্ধ উবেদ তাকে এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। মানুষটা বুড়ো হয়েছে। দেহের তাগদ কমে এসেছে। এখন কী সে এই নতুন যৌবনের জোয়ারের সামনে দাঁড়াতে সাহস পায়! কিন্তু তিলে তিলে সে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে। রঙে রসে এখন যে পাকা ফলের মতো টইচম্বুর।

উবেদ-ভার্যা আর কোনও প্রশ্ন করে না। কি জানি মানুষটা যদি কোনও সন্দেহ করে। যদি ভাবে তার বিবি পরপুরুষে আসক্ত হয়ে পড়েছে?

আংটিটা সে একটা আঙ্গুলে পরে নেয়।

—বাঃ, দেখ, কেমন সুন্দর মানিয়েছে? মনে হচ্ছে যেন আমার জন্যেই গড়েছ?

মেয়েটার চোখ আনন্দে নেচে ওঠে।

উবেদ বলে, সব হুরীদের আঙ্গুল একই রকম হয়। আচ্ছা, কাল সকালে মালিক যখন আসবে তখন তাকে জিজ্ঞেস করবো। সে যদি বিক্রি করতে চায় তোমার জন্যে কিনে নেব। তোমার যখন এতো পছন্দ, দেখবো সে রাজি হয় কি না।

কামর ফিরে আসে নাপিতের বাড়িতে। একশোটা দিনার নাপিত-বৌ-এর হাতে দিয়ে বলে, প্রথম দফার কাজ ঠিক ঠিক মতই করে এসেছি—যেমনটি বলেছিলে। এই নাও এই টাকাটা রাখ, মা। তাহলে এর পর আমাকে কী কী করতে হবে?

নাপিত-বৌ বলে, কাল সকালে যেমন উবেদের দোকানে যাবে, আংটিটা দেখে বলবে, তৈরি খুব সুন্দর হয়েছে, কিন্তু আমার হাতের তুলনায় দেখতে একটু ছোট হয়েছে। যাই হোক, এটা আপনি রেখে দিন, শেখ সাহেব। বরং আর একটা হীরে দিচ্ছি, এটা দিয়ে একটু বড় করে অন্য একটা বানিয়ে দিন। আর এটা আপনাকে আমি উপহার দিলাম।' এই বলে তোমার থলে থেকে একটু বড় গোছের একটা হীরে বের করে ওর হাতে দেবে, দেখবে যাদুমন্ত্রের মতো কাজ দেবে।

পরদিন সকালে কামর উবেদের দোকানে পৌঁছলে উবেদ তাকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে আংটিটা বের করে হাতে দেয়। কামর নেড়ে নেড়ে দেখে প্রশংসায় গদগদ হয়ে বলে, আপনার হাতের যাদুতে অসাধারণ হয়ে উঠেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শেখ সাহেব আমার হাতের তুলনায় হীরেটা একটু ছোট হয়ে গেছে। তা হোক, এটা আপনি রেখে দিন, আপনাকে খুশি মনে উপহার দিলাম। আপনি বরং আমাকে আর একটু বড় হীরে দিয়ে একটা বানিয়ে দিন।

এই বলে থলে থেকে অপেক্ষাকৃত একটা বড় হীরে বের করে সে উবেদের হাতে দেয়। সেই সঙ্গে ষাটটি স্বর্ণমুদ্রাও গুঁজে দিয়ে বলে, আপনার কারুকার্যের ইনাম দেবার ধৃষ্টতা আমার নাই, শেখ সাহেব। এটা আমি আপনাকে শরবত খেতে দিলাম। আচ্ছা চলি, কাল সকালে আবার আসবো।

দোকান ছেড়ে বেরুবার সময় সামনে জমায়েত হওয়া দীন ভিখারীদের মধ্যে মুঠো মুঠো দিনার ছড়িয়ে দিয়ে চলে যায় কামর।

বৃদ্ধ জহুরী হতবাক হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবতে পারে না, মানুষ এমন দিল-দরিয়া কী করে হতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফিরে আংটিটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, নাও বিবিজান তোমার জন্যেই বোধ হয় গড়েছিলাম। তাই বোধ হয় তার পছন্দ হলো না।

—পছন্দ হলো না? এমন সুন্দর জিনিসটা মনে ধরলো না তার?

—আরে একি তোমার আমার পছন্দ? না জানি সে কোন আমির বাদশাহের ছেলে। দেখে শুনে বললো,'হাতের কাজ তোমার খুব সুন্দর শেখ, তবে আকারে কিছু ছোট হয়েছে। সে দোষ তোমার নয়, আমিই হীরেটা ছোট দেখে দিয়েছিলাম। যাই হোক, হারেমের মেয়েদের হাতে মানাবে ভালো, এট তুমি বাড়ি নিয়ে যাও। তাই মনে হচ্ছে, নিজের অজান্তে আমি তোমার হাতের মাপেই বানিয়েছিলাম, বিবিজান। আর খোদার কী মর্জি, তোমার নসীবেই জুটে গেলো! নাও, তোমার পছন্দের জিনিস তোমার কাছেই এসে গেলো।

উবেদ-বিবি বলে, ওমা সে কি কথা, তা হলে তিনি কী পরবেন? এতো শখের জিনিস!

—সেজন্যে ভেব না বিবিজান। আর একটা হীরে আমার হাতে দিয়ে সে বললো, শেখ সাহেব, এটা দিয়ে আর একটা গড়িয়ে দিন আমাকে, আশা করি সেটা আরও সুন্দর হবে।

মেয়েটির অন্তর আকূল হয়ে ওঠে কামরকে দেখার জন্য। কিন্তু মুখে সে আকুলতা প্রকাশ করা সম্ভব না। বৃদ্ধ সন্দেহ করতে পারে। শুধু সে বললো, বানিয়েছ নাকি? কই দেখি কেমন হয়েছে?

বৃদ্ধ বলে, বানাবো না মানে? অমন খদ্দের ক'টা মেলে? আমি নিজে হাতেই এটাও তৈরি করেছি, এই দেখ!

আংটিটা হাতে নিয়ে উবেদ-বিবির চোখ নেচে ওঠে।

—বাঃ, অপূর্ব। আরও সুন্দর হয়েছে।

হাতের আঙ্গুলে পরে নিয়ে বলে, দেখ, দেখ, কেমন সুন্দর মানিয়েছে!

বৃদ্ধ জহুরী বলে, সুন্দর জিনিস সুন্দর হাতেই তো মানায়। আচ্ছা দেখা যাক, যদি তোমার নসীবে থাকে, তবে এটাও হয়তো তোমার হাতেই ফিরে আসবে।

কামর ফিরে এসে নাপিত-বৌকে বিবরণ জানায়। একটা দিনারের তোড়া হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, এরপর কী করতে হবে মা?

নাপিত-বৌ বলে, কাল সকালে জহুরীকে বলবে, এ আংটিটা আবার বেজায় বড় হয়ে গেলো। সে যাক গে, আপনি আমাকে আর একটা গড়িয়ে দিন। এবার তুমি আরও দামী হীরে দেবে ওর হাতে।

পরদিন সকালে কামর আবার উবেদের দোকানে যায়। আংটিটা দেখে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, দারুণ হয়েছে। কিন্তু আমারই ভুল হয়েছে শেখ সাহেব। এতো বড় হীরেটা আমার হাতে মানাবে না। আপনি বরং আর একটা বানিয়ে দিন। আমি মাঝামাঝি আকারের একটা হীরে দিচ্ছি আপনাকে।

এই বলে অন্য একটা হীরে এবং একশোটা স্বর্ণ মুদ্রা তার হাতে দিয়ে বলবে, এটা আপনার জলপানি। আর ঐ আংটিটা আপনার হারেমের কোনও বাঁদীকে উপহার দিলাম আমি।

যথারীতি সেদিনও সে মুক্ত-হস্তে মুদ্রা ছড়াতে ছড়াতে দোকান ছেড়ে নাপিত-বৌ-এর কাছে ফিরে আসে।

এইভাবে সে নাপিত-বৌ-এর প্রতিটি পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে থাকে। প্রতিদিনই সে উবেদের কাছে গিয়ে নতুন আংটির বরাত দিয়ে আগের আংটিটা নাকচ করে উপঢৌকন দিয়ে আসে। আর বোকা বৃদ্ধ জহুরী এক এক করে সবগুলো নিয়ে গিয়ে তরুণী ভার্যার হাতে দিয়ে একটু মন পাওয়ার চেষ্টা করে।

কিন্তু সুন্দরী তার বুড়ো স্বামীকে জ্ঞান দিয়ে বলে, আহা তুমি কী মানুষ বলতো! এমন যে লোক, নিত্য তোমার বিবির জন্যে একটা করে জহরতের আংটি উপহার পাঠাচ্ছে তাকে একবার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খানাপিনা করতেও বলতে পারছো না?

বৃদ্ধ বলে, ও হো হো, তাইতো, ও কথা তো একদম মনে হয়নি, বিবিজান! আমি না হয় একটু মাটো, কিন্তু তুমি তো অনেক বুদ্ধি ধর; তুমিও তো আমাকে হুকুম করনি চাচার মেয়ে? ইস্, কী ভুলটাই না হয়ে গেছে!

উবেদ-বিবি বলে, যাক যা হবার তা হয়েছে। কাল তাকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসো। আমি খুব আদর আপ্যায়ন করে তোমার সব ভুল শুধরে দেব।

পরদিন সকালে যথারীতি কামর এসে উপস্থিত হয় উবেদের দোকানে। আংটিটা

দেখে বলে, নাঃ, আপনার হাতের কাজের প্রশংসা না করে উপায় নাই কিন্তু এই পাথরটা আমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না। আপনি বরং এটা আপনার বাঁদীদের কাউকে দিয়ে দিন।

এই বলে কামর আর একটা মূল্যবান পাথর এবং এক তোড়া মোহর জহুরীর হাতে দিয়ে বলে, আজ তাহলে আমি আসি?

উবেদ হাত জোর করে বলে, আপনি বহুত খান-দানী বংশের সন্তান। আমাদের গরীবখানায় আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে কুণ্ঠা বোধ করছি। কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন তবে মেহেরবানী করে একবার আমার বাসায় পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ করুন মালিক।

কামর বললো, এ তো খুব আনন্দের কথা। বেশ তো, আপনি দোকানপাট বন্ধ করে যখন বাড়ি ফিরবেন, আমাকে আমার সরাইখানা থেকে ডেকে নিয়ে যাবেন দয়া করে। আমি প্রস্তুত থাকবো।

এই বলে সে তার সরাইখানার ঠিকানাটা বৃদ্ধকে দিয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো পঁচাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সেদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ জহুরী সরাইখানা থেকে কামরকে ডেকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছায়।

খানা-পিনা তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। দু'জনে মিলে তৃপ্তি করে খানা-পিনা সেরে নিলো। উবেদ বিবি নিজে হাতে নানারকম আহার্য বস্তু প্রস্তুত করেছিলো। কোর্মা, কালিয়া, কাবাব, মোরগ মোসাল্লাম, বিরিয়ানী, হালওয়া, পেস্তার বরফী শরবত—আরও অনেক কিছু।

খাবারের শেষে শরবত-এ চুমুক দিতে ঘুমে ঢলে পড়লো দু'জন।

এ কাণ্ড উবেদ-বিবির। আগে থেকেই সে ফন্দী এঁটেছিলো, তাই শরবতের পেয়ালায় ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলো খানিকটা। এবং তার অব্যর্থ ফল হাতে হাতেই ফলে গেলো।

বিরাট ফরাসের এক পাশে বৃদ্ধ অন্য পাশে নওজোয়ান কামর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলো। আর এদিকে রিরংসা-দংশিতা সেই তরুণী বেশবাস ছুঁড়ে ফেলে কাম-চঞ্চলার মতো ছুটে এসে কামরের দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাতাড়ি অবলেহন করতে থাকলো। সে সময় সেই রতি-তাড়িত নারীর কাম-কটাক্ষ দেখলে যে-কোন পৌরুষের পতন ঘটতে পারতো নিমেষে।

এরপর, আল্লাহ জানেন, সে রাতে সে-মেয়ে কামরের নিদ্রা-বিগলিত দেহখানা নিয়ে কী খেলায় মেতেছিলো।

সারারাত ধরে সে কামরের দেহের সঙ্গে লীন হয়ে সেঁটে ছিলো। কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই তার গনগনে গরম দেহখানা উঠিয়ে নিয়ে অন্দরে পালিয়ে গেলো। যাবার আগে সে আঙ্গুলে কাজল লাগিয়ে কামরের বুকে পর পর চারটি কাল ছাপ এঁকে দিয়েছিলো।

হারেমে ফিরে গিয়ে হালিমা ওর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহচরীকে প্রহরী করে বাইরের ঘরে পাঠায়। এই মেয়েটি সারারাত ধরে উদ্যত

খাঁড়া হাতে দরজায় প্রহরারত ছিলো। হালিমা বললো, যা ওদের নাকে ঘুম ছাড়ার ওষুধটা গিয়ে ধর গে, তা না হলে সারাদিনেও ঘুম ভাঙ্গবে না ওদের।

নাকে ওষুধের ঝাঁজ ঢুকতেই গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে পড়ে উবেদ।

—ইস্ একি কাণ্ড, একেবারে যে সকাল হয়ে গেছে। নামাজের সময় বয়ে যায় দেখে ধরমড় করে উঠে দাঁড়ায়।

কামরও বুঝতে পারে না, কি করে সারাটা রাত সে একভাবে অসাড়ে ঘুমিয়ে কাটাতে পারলো। এমন বেয়াড়া ঘুম তো কখনও ছিলো না তার। ঘুমের পর এমন অবসাদ তো সে জীবনে কখনও অনুভব করেনি। কে যেন সারা শরীরে ব্যথা ছড়িয়ে রেখে গেছে।

রজু করার সময় ঠোঁটে জল লাগতেই ছ্যান ছ্যান করে জ্বলে উঠলো। ঠোঁট দু'খানা ফেটে চৌচির, ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। ব্যথায় টনটন করছে। গালে হাত দিয়ে বুঝতে পারলো মাঝে মাঝে কেটে ছড়ে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে।

কামর ভেবে পায় না, এমনটা কী করে হলো। ভালোমানুষ সারা গায়ের কোথাও কোনও ব্যথা দরদ ছিলো না, কিন্তু এই একটা রাতের মধ্যে এ সব অসম্ভব ব্যাপার কী করে ঘটতে পারলো?

জহুরী দেখে বললো, ও কিছু নয়, ঘরে মশার বাড়াবাড়ি হয়েছে। ওগুলো মশার কামড় দাগ আর কিছুই না। ঘুমোনের আগে মশারী না টাঙানো বোকামী হয়েছে।

কামর বলে, কিন্তু আপনার মুখে তো এ রকম কোনও দংশন দেখতে পাচ্ছি না?

বৃদ্ধ হেসে বলে, মশারা রসিক। ওরা বেছে বেছে সুন্দর মুখেরই সন্ধান করে। এই বুড়োর কোঁচকানো ঝুলে পড়া চামড়া ওদের পছন্দ হবে কেন?

এরপর দু'জনে নমাজ সেরে নাস্তা সেরে নেয়। তারপর উবেদ চলে যায় দোকানে, আর কামর ফিরে আসে নাপিত-বৌ-এর কাছে।

কামরকে লক্ষ্য করে নাপিত-বৌ হাসতে হাসতে বলে, না না, আমাকে আর মুখে কিছু বলতে হবে না, বেটা। আমি তোমার মুখের চেহারা দেখেই সব বুঝে নিয়েছি।

কামর বলে, না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। সারারাত খুব মশায় কেটেছে।

নাপিত-বৌ এবার হো হো করে হেসে ওঠে, খালি মশার কামড়? আর কিছু দেখতে-পাওনি শরীরে?

কামর বলে, হ্যা মা পেয়েছি। এই দেখুন আমার বুকে কালো কালি মাখা আঙ্গুলের চারটে ছাপ, কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমার বুকে এই টিপসই লাগলো কী ভাবে?

নাপিত-বৌ ভালোভাবে পরীক্ষা করে বললো, তুমি খুব সরল সোজা মানুষ, বাবা। ঘোর প্যাঁচ কিছুই মাথায় ঢোকে না তোমার। তা না হলে কোন্‌টা মশার কামড়, আর কোন্‌টা চুম্বনের দংশন, চিনতে পার না? ঐ আঙ্গুলের চারটে টিপ কেন দিয়েছে সে, জান? সে তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে দাসখত সই করে দিয়েছে। এখন সে একমাত্র তোমার। এবার তোমার কর্তব্য তুমি ঠিক কর, বাবা। আমার বিশ্বাস ঐ জহুরী আবার তোমাকে নিমন্ত্রণ জানাবে। কিন্তু কাজ হাসিল হলে এই মা-বেটিকে ভুলে যেও না যেন।

কামর বলে, না মা, আপনার উপকার আমার মনে থাকবে।

এরপর কামর বিদায় নিয়ে সরাইখানায় ফিরে যায়।

হালিমা স্বামীকে বেশ কড়া সুরেই প্রশ্ন করে, কালকের রাতটা কেমন কাটালে তোমরা। বাড়িতে একজন মেহমানকে নিয়ে এসে কী রকম ব্যবহারটা করলে তার সঙ্গে?

বৃদ্ধ জহুরী বলে, ব্যবহার তো কিছু খারাপ করিনি, বিবিজান।—তবে কী জান,

বেচারা সারারাত মশার কামড় খেয়েছে। একটা মশারী খাটিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো।

—আজ রাতে যদি তাকে আবার নিয়ে আস, ঐ ভাবে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো না আগেই। নিজে কষ্ট করেও অতিথির সৎকার করতে হয়।

বৃদ্ধ বলে, সেই ভালো, ছেলেটাকে একটু আদর যত্ন করা হয়নি। কী ঘুম যে পেয়েছিলো কাল, কিছুই করতে পারিনি! দেখি আজ যদি তাকে নিয়ে আসতে পারি, আদর যত্নের ত্রুটি রাখবো না।

কামর দোকানে এলে বৃদ্ধ আবার তাকে আমন্ত্রণ জানায়।

কাল রাতে যা ঘুম পেয়েছিলো, কোনও আনন্দই করা যায়নি! আজ যদি আর একবার পায়ের ধুলো দেন—

কামরও এই আমন্ত্রণের আশাই করে এসেছিলো। সহজেই সম্মত হয় সে।

সে রাতেও একই কায়দায় শরবতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দু'জনকে শয্যাশায়ী করে ফেলে হালিমা। তারপর উদগ্র কামনার বহ্নি জ্বালিয়ে বিবসনা হয়ে ছুটে এসে কামরের যৌবন-জাগ্রত দেহের সঙ্গে বিলীন হয়ে সারাটা রাত সুরতরঙ্গে মেতে ওঠে।

পরদিন সকালেও একই ধরনের ব্যথা বেদনা অনুভব করে সে, অধরে গালে সারা দেহে। কিন্তু বৃদ্ধকে সে সম্বন্ধে কিছু বুঝতে দেয় না।

জহুরী জিজ্ঞেস করে, আজকের রাতটা কেমন কেটেছে, মালিক?

কামর বলে, খুব ভালো। আজ আর মশা-টশা কামড়ায়নি দেখছি।

সেদিন সে নাপিত-বৌ-এর কাছে ফিরে বলে, আজকেও একই রকম কেটেছে। সারা অঙ্গ ব্যথায় টনটন করছে। আর এই দেখুন আমার দেহে কে যেন এই চাকুখানা ঢুকিয়ে রেখে গেছে। আমি বুঝতে পারছি না—এর কী অর্থ?

নাপিত-বৌ বলে, খুব সাবধান বেটা, মেয়েটা ভীষণ চটে গেছে। ও জানতে চেয়েছে। আজ রাতেও যদি ঐভাবে অসাড় হয়ে পড়ে থাক তবে তোমাকে সে খুন করে ফেলবে। মেয়েরা যখন কামের তাড়নায় দিশাহারা হয়ে পড়ে তখন তারা বাঘিনীর মতো হিংস্র হয়ে ওঠে। একা একা ভোগে পরিতৃপ্ত হয় না। তাই তোমাকে সে জাগ্রত পেতে চায়।

কামর অসহায়ভাবে বলে, কিন্তু আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলে কী করে আমি জেগে থাকবো। আমি তো আর ইচ্ছে করে অসাড় হয়ে পড়ে থাকি না। কাল রাতে তো আমি জেগে থাকার অনেক কোসিস করেছিলাম কিন্তু শরবতটা খাবার পর আর চোখের পাতা টেনে তুলতে পারলাম না কিছুতেই।

নাপিত-বৌ যুক্তি দেয়, আজ রাতে বেটা, খানা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন তোমাদের সামনে শরবতের পেয়ালা এনে রাখবে, তুমি কায়দা করে শরবতের পেয়ালা ওঠাতে গিয়ে ফেলে দেবে। কিন্তু লক্ষ্য রেখ, ততক্ষণে বুড়োটা যাতে তার পেয়ালাটা চুমুক দিয়ে খালি করে ফেলে। তাহলে মজাটা চলবে ভালো। দেখবে, জহুরী ঘুমে ঢলে পড়বে তখুনি। কিন্তু তোমার চোখে আর ঘুম আসবে না। তারপর কী করতে হবে, নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।

আনন্দে নাপিত-বৌ-এর হাতে চুম্বন করে কামর।

—চমৎকার! আজ রাতে আমি বাজি মাত করে দেব।

সে রাতেও বৃদ্ধ উবেদ কামরকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে তার বাড়িতে। যথারীতি নানা উপচারে আহারাদি শেষ হয়ে গেলো। একটা রেকাবীতে দু'পেয়ালা শরবত সাজিয়ে এনে সামনে রাখে পরিচারিকা। বৃদ্ধ এবং কামর দু'জনে একসঙ্গেই পেয়ালা দু'টো হাতে তুলে নেয়। কিন্তু কামর মুখে ঠেকাতে একটু বিলম্ব করে। ইতিমধ্যে বৃদ্ধের পেয়ালা নিঃশেষ হয়ে যায়।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কামরের হাত কেঁপে পেয়ালাটা নিচে পড়ে যায়।

বৃদ্ধ শুধু চুকচুক করে ওঠে, ইস্ পড়ে গেলো—

আর কোনও কথা সরে না তার, ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসে তার সকল সত্তা। ফরাশের একপাশে ঢলে পড়ে সে।

পরিচারিকা হারেমে ফিরে গিয়ে জানায়, সে শরবত দিয়ে এসেছে ওদের। এবং ওরা দু'জনেই অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হালিমা রাগে জ্বলতে থাকে। মূর্খটা তার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে আজও শরবতটুকু গিলেছে? ফুঁসতে ফুঁসতে হাতে একখানা ছুরি নিয়ে সে ছুটে আসে।

তখন ফরাশের দুপাশে জহুরী আর কামর অসাড় হয়ে পড়েছিলো। হালিমা ছুরিকা হাতে কোমরের ওপর চেপে বসে শাণিত ছুরিটা কামরের বুকে বসিয়ে দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু কামর খপ করে হাতখানা চেপে ধরে হো হো করে হেসে উঠে হালিমাকে হত-চকিত করে দেয়।

—ওরে দুষ্টু, এই তোমার ঘুম? আমার সঙ্গে তামাশা করছিলে এতক্ষণ? কে, কে তোমাকে এসব শিখিয়ে দিয়েছে, শুনি।

কামর এবার হালিমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। অধরে অধর রেখে বলে, এক বৃদ্ধা নাপিত-বৌ! সেই আমাকে তোমার টিপ-ছাপ আর ঐ চাকুর অর্থ বলে দিয়েছে।

—ভারি চালাক মেয়েমানুষ তো! সে তোমাকে লায়েক করে তুলেছে, দেখছি! কিন্তু যাদু, আমাকে তো তুমি জান না, আজ সারারাত ধরে তোমাকে আমি উল্টে পাল্টে যাচাই করে দেখে নেব,—সে বুড়ি তোমাকে তালিম দিয়ে কতখানি পাকা পোক্ত করে পাঠিয়েছে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো ছিয়াশিতম রজনীতে

আবার গল্প শুরু হয় ঃ

উত্তাল উদ্দাম এক ছন্দতরঙ্গে ভাসতে ভাসতে সমুদ্র-স্নান করতে থাকে ওরা। সারারাত ধরে। এক সময় হালিমা বলে, বুকের কল্‌জে ছিঁড়ে দিতে পারি কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারবো না, মেরে জান! এ অমৃত আমি দু'চারদিন বা দু'চার মাস বা বছরের জন্য খেতে চাই না। সারা জিন্দগীভর তোমার যৌবন-সুধা পান করবো আমি। এই আমার পণ। ঐ অপদার্থ নপুংসক বুড়োটার বাঁদী হয়ে আর থাকবো না। চলো, আমি তোমার দেশে যাবো। তোমাকে ছাড়া একদণ্ড আমার চলবে না, মালিক। এখন যা বলি শোনো। আমাদের এই বাড়ির ধারে-কাছে একখানা বাড়ি ভাড়া করে সরাইখানা ছেড়ে চলে এসো তুমি। বুড়োটা যদি আবার তোমাকে নেমন্তন্ন করে বলবে, পর পর তিনি দিনই যথেষ্ট। তার পর আর ভালো দেখায় না।

কামর কসম খেয়ে বললো, তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মানবো, সোনা।

এরপর আবার ওরা সুরত-রঙ্গে মেতে ওঠে।

এইভাবে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। হালিমা হারেমে ফিরে যায়।

পরদিন সকালে উঠে কামর নাপিত-বৌ-এর কাছে চলে যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় উবেদ আবার কামরকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু কামর রাজি হয় না। বলে, আমি ঐ সরাইখানা ছেড়ে আপনাদের পাড়ায় একখানা বাড়ি ভাড়া করবো ঠিক করেছি।

বৃদ্ধ জহুরী বোকাসোকা মানুষ। উৎসাহিত আনন্দে কামরের অভিপ্রায়কে স্বাগত জানিয়ে বললো, চমৎকার হবে। তা আমার বাড়ির লাগোয়া বাড়িটাই বাড়া আছে। আপনি যদি অনুমতি করেন আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

কামর বলে, বেশ তো, তাই করে দিন, ভালোই হবে। কাছাকাছি পাশাপাশি থাকা যাবে।

সেইদিনই বৃদ্ধ পাশের বাড়িটা ভাড়া নিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিলো কামরের জন্য।

প্রতিদিন সকালে জহুরী দোকানে চলে গেলে হালিমা খিড়কীর পথ দিয়ে কামরের ঘরে এসে প্রবেশ করে। সারাটা সকাল ওরা গল্প করে, দাবা খেলে, রঙ্গ তামাশা করে। এবং আদর সোহাগ চুম্বনে মেতে ওঠে।

হালিমা ফন্দী আঁটে। কী করে বুড়ো জহুরীর হাত থেকে মুক্ত হওয়া যায় তারই উপায় উদ্ভাবন করতে থাকে। কামরকে বলে, শোনো মালিক, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

কামর হালিমাকে বুকের কাছে টানতে টানতে বলে, বলো কী করতে হবে? পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দিতে হবে?

হালিমা হাসির ঝরনা হয়ে নিজের উদ্ধত বুকে হাত রেখে বলে, হ্যাঁ, এই পাহাড় থেকে।

কামর উন্মত্ত হয়ে ওঠে। হালিমা ওকে শান্ত হতে বলে, আহা, আমি তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছি না। একটু ধৈর্য ধর, আগে একটা কাজের কথা বলে নিই।

এই বলে সে বুকের মধ্যে থেকে একখানা ছোট ভোজালী বের করে কামরের হাতে দিয়ে বলে, দেখছো, কী সুন্দর! এর বাঁটখানা বুড়োটা নিজে হাতে বানিয়েছে!

কামর নেড়ে চেড়ে দেখলো ছুরিখানা। সত্যিই খুব সুন্দর। সোনার বাঁটের সূক্ষ্ম কারুকর্ম একমাত্র উবেদের হাতেই সম্ভব।

হালিমা বললো, এই ছুরিখানা নিয়ে তুমি বুড়োর দোকানে যাও। ওকে দেখিয়ে বলো, এটা তুমি বাজারে একটা লোকের কাছ থেকে কিনেছ একশ' দিনারে। ওকে জিজ্ঞেস করবে, জিনিসের তুলনায় দামটা ঠিক হয়েছে কিনা। বুড়ো যাই বলুক, ছুরিখানা নিয়ে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে এখুনি।

কামর বললো, আমি এখুনি যাচ্ছি।

ছুরিখানা উবেদের হাতে দিয়ে কামর বললো, দেখুন তো শেখ সাহেব, ঠকে গেলাম কিনা। একশো দিনার নিয়েছে।

উবেদ চমকে ওঠে, কার কাছ থেকে কিনলেন?

—এই বাজারেরই একপাশে এক ফিরিওলা বসেছিলো নানারকম বাহারী জিনিসপত্র নিয়ে। ছুরিখানার বাঁটের কাজ দেখে আমার খুব পছন্দ হয়ে গেলো।

উবেদ গম্ভীর হয়ে গেলো। ছুরিখানা কামরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, না, ঠকেন নি। এর অনেক দাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে উবেদ বাড়িতে ফিরে এসে ক্রোধান্বিত হয়ে প্রশ্ন করে বিবিকে, আমার ভোজালীখানা কোথায়?

হালিমা ইচ্ছে করেই জবাব দেয় না। বৃদ্ধ ফেটে পড়ে, কী চুপ করে রইলে কেন? কোথায় আমার ভোজালী?

হালিমা বলে, কী ব্যাপার হঠাৎ অমন রণমূর্তি ধরে এই অসময়ে ঘরে ফিরে এলে কেন?

বৃদ্ধ এবার চিৎকার করে ওঠে, ওসব কথা পরে হবে, আগে আমার কথার জবাব দাও। বলো কোথায় আমার ভোজালী?

হালিমা কিন্তু শান্ত সহজ কণ্ঠে বলে, কেন? আমার কাছেই থাকে, আমার কাছেই আছে!

—কই, বের কর দেখি?

হালিমা বলে, না। এখন তুমি যে কারণেই হোক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছ আমার ওপর। এ

সময় অমন মারাত্মক অস্ত্র তোমার হাতে তুলে দিতে পারি না আমি। তবে নিশ্চিন্ত থাক, সে জিনিস ঘরেই আছে। এবং আমার বাক্সেই আছে।

দাঁতে দাঁত চেপে কটমট করে ওঠে জহুরী। বলে, না, নাই।

হালিমা ভুরু কোচকায়, মানে? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? আমি কী মিথ্যে বলছি তোমার কাছে?

—জানি না। এখুনি আমি দেখতে চাই আমার ছুরি।

—বেশ দেখ।

অভিমানে আহত হয়ে কাঁদ কাঁদ ধরা গলায় হালিমা বলে, জানকে আমি পরোয়া করি না। বুকে বসিয়ে দিতে চাও দেবে। দাঁড়াও, এখুনি আমি বাক্স খুলে বের করে দিচ্ছি তোমার ছুরি।

বাক্সের ডালা তুলে ভোজালীখানা বের করে বৃদ্ধের হাতে তুলে দিতে চায় হালিমা, নাও ধর। এই বুক পেতে দিলাম, শেষ করে দাও এ আপদ। এতো সন্দেহ, অবিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। স্বামী যদি বৌকে বিশ্বাসই না করতে পারলো, কি দরকার সে পোড়া জীবনে!

বেচারা উবেদ! অনুতাপে লজ্জায় মরমে মরে যেতে থাকলো।

—আমাকে মাফ করে দাও, চাচার মেয়ে। আমার ঘাড়ে শয়তান ভর করেছিলো। না হলে তোমার মতো সতী-সাধ্বীকে সন্দেহ করি!

পরদিন সকালে এক বাঁদীর সাজে সেজেগুজে কামরের ঘরে আসে হালিমা।

—দেখ তো মালিক, বিকাবো কিনা বাজারে?

কামর অবাক অথচ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে হালিমার যৌবন-মদমত্তা মোহিনী সাজগোজের দিকে।

—লুফে নেবে গো, লুফে নেবে? কোন্ বাদশার প্রাসাদে যাবার শখ হয়েছে, শুনি?

হামিলা কামরকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয়, আহা-হা, ধরো না, ধরো না আমাকে। প্রসাধন প্রলেপ সব মুছে যাবে। আচ্ছা, আর দেরি নয়। চলো, আমাকে নিয়ে জহুরীর দোকানে চলো। বুড়োকে বলবে, বাঁদী হাট থেকে হাজার দিনারে কিনেছ আমাকে।

বৃদ্ধ উবেদ নিবিষ্ট মনে একটা সূক্ষ্ম কারুকর্মে ডুবেছিলো। কামর আর হালিমার আগমন সে বুঝতে পারেনি প্রথমে। কামর সাড়া দিতে সে সম্বিত ফিরে পেয়ে চোখ তুলে তাকায়। লজ্জিত হয়ে বলে, গোস্তাকি মাফ করবেন মালিক, খেয়াল করতে পারিনি।

কামর বলে, বাঁদীহাটে গিয়েছিলাম। এই বাঁদীটাকে পছন্দ হয়ে গেলো। হাজার দিনার দাম। তা পছন্দ যখন হলো, নিয়েই ছিলাম। দেখুন তো শেখ সাহেব, আপনার শিল্পীর চোখ, ঠকে গেলাম কিনা।

হালিমার মুখের নাকাব খুলে ধরে কামর। বৃদ্ধ তাকিয়েই দু'হাতে চোখ ঢেকে আর্তনাদ করে ওঠে। ব্যস্ তারপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে উবেদ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসে। চোখে মুখে তার দারুণ উৎকণ্ঠা আশঙ্কা।

হালিমা তখন একটা আটপৌরে শেমিজ পরে আয়নার সামনে বসে এলায়িত কেশে তেল দিচ্ছিল আর গুনগুন করে মনের আনন্দে গান করছিলো।

•

উবেদ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে হালিমার নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত সুন্দর মুখাবয়বের দিকে। এই ঘরোয়া পরিবেশে—প্রসাধন-প্রাক্কালে হালিমার চেহারা তার অনেক দিনের চেনা। একটু আগে তার দোকানে কী সে এই হালিমাকেই বাঁদীর মোহিনী বেশে দেখেছিলো? না না,

অসম্ভব! হালিমা তার ঘরের বিবি। অমন বাঁদীর সাজে সাজবে কেন সে? আর বাঁদীহাটেই বা যাবে কী করে?

কিন্তু তার চোখ কী এতোই ভুল করেছিলো? উবেদ আর ভাবতে পারে না।

হালিমা স্বামীর কাছে এগিয়ে এসে সোহাগ জোড়ানো স্বরে বলে, আহা, তোমার মুখ চোখ অমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন গো, শরীর খারাপ হয়নি তো!

—না হালিমা, ওসব কিছু নয়। আমি বড় ধাঁধায় পড়েছি।

—সে কি, আবার কী ধাঁধা?

বৃদ্ধ ক্লান্ত স্বরে বলে, আজ সকালে কামর সাহেব বাঁদীহাট থেকে একটা বাঁদী কিনে আমার দোকানে আমাকে দেখাতে গিয়েছিলো। কিন্তু কী বলব বিবিজান, মেয়েটির মুখের দিকে তাকাতেই আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেলো। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না হালিমা, সে মেয়ে তুমি নও।

—কী যে যা তা বলো, তোমার মাথার ঠিক নাই। দিনে দিনে সন্দেহ তোমার বাড়ছেই। আমি তোমার শাদী করা বিবি। আমাকে যদি এইভাবে পদে পদে সন্দেহ কর, কী দরকার এই মিথ্যে বন্ধনে?

—না বিবিজান, সন্দেহের কথা নয়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। ভুল হবে কী করে।

হালিমা বলে, এক রকম দেখতে দু'জন কী হয় না?

—তা হতে পারে। কিন্তু তা বলে কি নিজের বিবিকে চিনতে ভুল হয় কারো?

হালিমা বলে, তোমার বুড়ো বয়সে বাহাত্তরে ধরেছে। যাক, কামর সাহেব-এর বাসা তো আর সাত যোজন দূরে নয়। একবার যাও না, দেখেই এসো না আর একবার। তাহলেই বুঝবে, সে মেয়ে তোমার হালিমা বিবিজান কি না?

উবেদ যেন সমাধান খুঁজে পেয়ে গেছে।

—ঠিক, ঠিক বলেছ, বিবিজান, সত্যিই তোমার বুদ্ধি আছে। তারিফ করতে হয়। আমি এখুনি যাচ্ছি কামর সাহেবের বাসায়।

হালিমা বলে, যাবে নিশ্চয়ই যাবে। ঘরে যখন ফিরেই এলে এই অসময়ে আমি আনারের হালওয়া বানিয়েছি। একটুখানি বসো, জিরিয়ে নাও। আমি নাস্তাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেয়ে দেয়ে যাও কামার সাহেবের বাসায়।

উবেদ তার নিজের ঘরে ফিরে আসে। হালিমা পরিচারিকার হাতে হালওয়ার রেকাবীখানা পাঠিয়ে দিয়ে চটপট অন্যরকম সাজ-পোশাক পরে খিড়কীর পথ দিয়ে কামরের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে।

একটুক্ষণ পরে উবেদ আসে কামরের বাসায়। কামর সাদরে বসতে বলে। একটু পরে হালিমা দু'পেয়ালা সুগন্ধী শরবত এনে দু'জনের সামনে রেখে মাথা নুইয়ে যুক্তকরে উবেদকে সালাম করে।

উবেদ কিন্তু এবার আর মূর্ছা যায় না। নিজের ভুল বুঝতে পারে। খুশি মনে আবার দোকানে ফিরে যায়।

উবেদ বেরিয়ে যেতেই হালিমা কামরের কাছে এগিয়ে এসে বললো, আচ্ছা বলতো, বুড়োটা কী? ও কী বুঝতে পারছে না, ওর প্রাণাধিকা হালিমা আর ওর সম্পত্তি হয়ে এখানে পড়ে থাকতে চায় না? আমি উট ঠিক করে রেখেছি। চলো আজই এক্ষুণি এখান থেকে পালিয়ে যাই।

সেইদিন ওরা দু'জনে বসরাহ ছেড়ে কাইরোর পথে রওনা হয়। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই নিরাপদে এসে পৌঁছয়।

ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা বাবা আনন্দে কেঁদে ফেলে। আবদ অল রহমান জিজ্ঞেস করে, একি শাহজাদী নাকি, বেটা?

কামর বলে, না। তবে ঐ ফকির সাহেব যার কথা বলেছিলেন, এ সেই মেয়ে। আমি একে শাদী করবো বাবা।

কামর তার মা বাবাকে বসরাহ সফরের সব বৃত্তান্ত খুলে বললো। বাবা শুনে আতঙ্কে শিউরে ওঠে, এ তুই কী করেছিস, কামর। কাকে ধরে এনেছিস আমার খানদানে। একে আমি ছেলের বিবি করে ঘরে তুলবো? কী আছে এর বংশ-পরিচয়? নাম-গোত্রহীন একটি রাস্তার মেয়েছেলেকে আমি পুত্রবধূ করে বরণ করে নেব? যে নষ্ট-চরিত্রের মেয়ে তার নির্দোষ স্বামীকে পরিত্যাগ করে তোর হাত ধরে পালিয়ে এসেছে, তাকে বিশ্বাস কী? দু'দিন বাদে তোকেও কলা দেখিয়ে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে যাবে না, তার কী প্রমাণ? এসব বেলেল্লায়ানা আমি একদম পছন্দ করি না। তুই একে ছেড়ে দে, বাবা। আমি তোর সঙ্গে অনেক বড় ঘরের পরমাসুন্দরী মেয়ের সঙ্গে শাদী দিয়ে দিচ্ছি। আমার ইয়ার-বন্ধুদের ঘরে অনেক ভালো মেয়ে আছে। তারা আমাকে নিত্য খোসামদ করছে। তুই আমার কথা শোন, এসব বাজে নেশায় মেতে থাকিস না।

কামর বলে, কিন্তু বাবা, আমি তো তোমাদের মত নিয়েই বসরাহয় গিয়েছিলাম। যাই হোক, তোমাদের যখন ইচ্ছা নয়, আমি হালিমাকে শাদী করতে চাই না। তোমরাই মেয়ে পছন্দ কর। আমি তাকেই শাদী করবো।

এরপরে হালিমাকে আবদ অল রহমান তার বাড়ির কাছেই একটা গুদামঘরে কয়েদ করে রেখে দেয়।

অনেক দেখেশুনে কাইরোর কাজীর পরমাসুন্দরী এক মেয়ের সঙ্গে কামরের শাদী দিয়ে দেওয়া হলো। চল্লিশ দিন ধরে আনন্দে উৎসবে মেতে রইলো রহমান-পরিবার। রহমান একমাত্র ছেলের শাদীতে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করলো না। চল্লিশ দিন ধরে খানা-পিনা নাচগান দান-ধ্যান সমানে চলতে থাকলো। অবারিত দ্বার। ঢালাও আমন্ত্রণ। যার ইচ্ছা পেটপুরে খেয়ে যেতে পারে। কেউ বাধা দেবে না।

কামর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সকলের খাওয়া দাওয়া তদারক করছিলো। হঠাৎ তার চোখে পড়লো, ছিন্নবসন দীন দরিদ্র এক কৃশকায় বৃদ্ধের দিকে। চিনতে অসুবিধে হলো না, এই সেই বৃদ্ধ জহুরী উবেদ।

বাবার কাছে ছুটে গিয়ে সে খবর দেয়, সেই জহুরী উবেদ এসেছে, বাবা। মেহমানদের সঙ্গে বসে আছে।

রহমান দ্রুতপায়ে বাইরে এসে খাবার ঘরে ঢোকে। বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে আলাপ পরিচয় করে।

—আপনার এমন হাল হয়েছে কেন, শেখ সাহেব? এরকম দীন দশার কী কারণ?

উবেদ বলে, যাদের আপনজন মনে করেছিলাম, তারা যখন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো তখন ঘৃণায় আমি বসরাহ ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ি! কিন্তু নসীব খারাপ, পথে আরব-দস্যুদের হাতে পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে আজ নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমার সারা জীবনের যা কিছু সঞ্চিত সম্পদ ছিলো সব তারা লুটে নিয়ে গেছে। শুধু আল্লাহর অসীম কৃপায় রক্ষা পেয়ে গেছি কোনক্রমে।

রহমান ওকে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসলাদি করিয়ে নতুন সাজ-পোশাক পরতে দিলো!

—আপনি আমার মহামান্য মেহমান। কোনও দ্বিধা সঙ্কোচ করবেন না, শেখ

সাহেব। অকপটে প্রাণের কথা জানাতে পারেন আমাকে। সত্য কথা বলতে কোনও ইতস্ততঃ করবেন না। আমি সব জানি। আপনার বিবি হালিমা এখন আমার হেপাজতে নিরাপদেই আছে। কোনও চিন্তা করবেন না। এখন একটু কিছু খানা-পিনা সেরে নিন। আমি ভাবছিলাম, দু'চার দিনের মধ্যেই আপনার বিবিকে আপনার কাছে বসরাহয় পাঠিয়ে দেব। তা আপনি যখন স্বয়ং এসে গেছেন তখন আর তার দরকার হবে না। হালিমাকে আপনার হাতে তুলে দেব। আমার ধারণা, আপনি তার সন্ধানেই এই দূর দেশে পাড়ি জমিয়েছেন! আপনর এতো দুঃখ ক্লেশের একমাত্র কারণ আপনার এই বিবি। সব কাহিনীই আমি শুনেছি কিন্তু কিছু মনে করবেন না শেখ সাহেব এর জন্যে পুরো দোষ তার একারই! আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি তাকে। তারপর ইচ্ছে করলে তাকে আপনি মার্জনা করে ঘরে নিয়ে যেতে পারেন। অথবা তার প্রাপ্য সাজারও ব্যবস্থা করতে পারেন। সবই আপনার মর্জির ওপর নির্ভর করবে। যাক সে-সব পরে হবে, এখন আগে কিছু একটু মুখে দিয়ে নিন। মনে হচ্ছে, অনেক দিন ভালো করে খাওয়া-দাওয়া হয়নি আপনার।

বৃদ্ধকে মেহমানের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে খানা-পিনা করতে বসে দু'জনে। খেতে খেতে রহমান একসময় বলে, একটা নারী যখন কোনও পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে থাকে তখন সে পুরুষের পক্ষে তার ফাঁদ এড়িয়ে পালিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমার ছেলে কামর, একেবারে অজ্ঞ অনভিজ্ঞ ছিলো কাম-কলায়। কিন্তু আপনার বিবি হালিমা তাকে নিজে হাতে ধরে ধরে সব শিখিয়ে পোক্ত করে তুলেছে! আমি ভেবে পাই না, যে নারী তার স্বামীর সঙ্গে শঠতা করে তারই নাকের ডগায় পরপুরুষ নিয়ে রতিরঙ্গে মত্ত হতে পারে, সে বিবি ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কী ফায়দা হবে আপনার? কামনা বাসনা মানব-দেহে সহজাত। আল্লাহরই দান। কিন্তু তা যদি বিপথগামী হয় তবে তা দিয়ে সংসারের কী কল্যাণ হতে পারে?

জহুরী বিষণ্ণভাবে বলে, আপনি যথার্থই বলেছেন, ভাইসব। আপনার ছেলের কোন দোষ দেখি না আমি। সব দোষ আমার বিবির। কই, কোথায় সে?

কামর-এর বাবা বললো, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। কাছেই একটা বাড়িতে তাকে আটকে রেখেছি আমি।

রহমান বৃদ্ধকে সঙ্গে করে সেই বাড়িটায় নিয়ে গিয়ে তালা খুলে দিয়ে বলে, ভিতরে যান, এই ঘরেই সে আছে।

জহুরীকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে হালিমা। সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে এক পা এক পা করে পিছু হটতে থাকে সে। কিন্তু জহুরীর দুটি হাতের থাবা ওর গলাটা টিপে ধরে।

—ওরে শয়তানী বেবুশ্যা খানকি মাগী, এই তোর পুরস্কার—

রাত্রির অন্ধকার কেটে যায়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো সাতাশিতম রজনীতে আবার সে শুরু করে ঃ

যদিও ছেলে কামর-এর দোষ ততটা ছিলো না, তবু আবদ অল রহমান অনুতাপের আগুনে পুড়তে থাকে। বৃদ্ধ জহুরী বেচারা কারো ক্ষতি করেনি জীবনে, অথচ এইভাবে তার জিন্দগীটা বরবাদ হয়ে গেলো কেন?

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামলো। সুলতান শারিয়ার বললো, এইভাবেই বিশ্বাসঘাতিনীরা সাজা পায়, শাহরাজাদ। সংসারে যেসব মেয়ে ভ্রষ্ট-চরিত্রের হয় তাদের সকলের দশাই হালিমার মতো হয়। শাহরাজাদ, হয়তো তুমি আমার কথায় ক্ষুব্ধ হলে, কিন্তু মনে করে দেখ, কী ক্রোধের কারণে প্রতিদিন একটি করে মেয়েকে শাদী করে পরদিন সকালে হত্যা করার হলফ

নিয়েছি আমি! আমিও নারীর কাছ থেকে পেয়েছি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। এবং সেই কারণেই আমার এতো ক্রোধ—এমন প্রতিজ্ঞা। জান বলতে আজ বুকে বাজে, যেদিন আমার প্রাণাধিকা বেগমকে দেখলাম, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে আমার পবিত্র প্রেমকে কলুষিত করে ফেলেছে সেইদিনই আমি তাকে এবং তার হারেমের সব সাগরেদ দাসী বাঁদীদের কোতল করেছি।

সুলতান শারিয়ারের দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এলো।

শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে শারিয়ার নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এই দ্যাখ, আমি কী সব বলে তোমাদের গল্পের মেজাজটাই মাটি করে দিলাম। যাক, এবার নতুন কিস্‌সা শুরু কর, শাহরাজাদ!

এক সময়ে কাইরোয় একটি সাংঘাতিক চতুর রমণী বাস করতো। চোখের পলকে এমন ভেল্কী সে লাগিয়ে দিতে পারতো যার তুলনা মেলা ভার।

একজন ইসলামী চারটি মেয়েকে শাদী করে ধর্ম রক্ষা করতে পারে। কিন্তু কে কবে শুনেছে, একটি নারী একাধিক স্বামী-সহবাসে ভোগবাসনা তৃপ্ত করেছে?

আমাদের এ কাহিনীর নায়িকা সেই জাতের এক মেয়ে। একই সঙ্গে দুটি পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে সে দু'জনকেই তুষ্ট করতো।

এদের একজনের নাম হারাম। লোকটা চোর। সারারাত ধরে পরস্ব অপহরণ করাই তার একমাত্র পেশা। সুতরাং রাতে সে বাড়ি থাকতো না। লোকের ঘরে সিঁদ কাটতে কাটতে তার সারারাত কাবার হয়ে যেত। সকালবেলায় বাড়ি ফিরে বৌকে নিয়ে শুয়ে পড়তো সে। সারাদিন সহবাস নিদ্রায় কাটিয়ে আবার সন্ধ্যায় নিজের ধান্দায় বেরিয়ে যেত।

অন্যজন পকেটমার। সুতরাং তার কার্যকলাপ ছিলো প্রকাশ্য দিবালোকে। হাটে বাজারে, জনসমাগমে তার ছিলো গতিবিধি। দারুণ দক্ষতায় হাত-সাফাই করে অন্যের পয়সা-কড়ি হাতিয়ে নিতে ভারি ওস্তাদ ছিলো সে। সারাটা দিন ধরে সে শিকার-সন্ধানে টো টো করে ঘুরে বেড়াতো, আর ফিরে আসতো সন্ধ্যাকালে। কারণ তখন তো আর পথে ঘাটে মানুষ চলে না। খানা-পিনা সেরে সে 'পরমা সতী স্বাধ্বী' বৌকে নিয়ে শুয়ে পড়তো।

এইভাবে দিন কাটতে থাকে। দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বছরও অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

একদিন চোরটা বৌকে সোহাগ করতে করতে বলে, এখানে কোতায়ালের বড় উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। লোকটা ভীষণ কড়া। মনে হচ্ছে, এ শহরে আর চুরির ব্যবসা চালানো যাবে না। সিপাইগুলো আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে পারে না আজকাল। বড্ড মুশকিলে পড়েছি। রাতের পর রাত চলে যাচ্ছে। আমদানি হচ্ছে না বিশেষ কিছুই। তাই ভাবছি বিবি, দু একদিনের মধ্যে অন্য কোনও শহরে চলে যেতে হবে কাজের ধান্দায়।

সন্ধ্যায় পকেটমার আকিল শূন্য হাতে ফিরে এলো। চতুরা বৌ জিজ্ঞেস করে, কি গো, এমন মনমরা হয়ে পড়ে রইলে কেন? কী হয়েছে?

বৌকে বুকে জড়িয়ে আকিল বলে, না এ শহরে আর এ ব্যবসা চলবে না, খানকীর ছেলে এই নতুন কোতোয়ালটার জ্বালায় কিছুই সুবিধে করতে পারছি না। সিপাইরা সব সময় পিছনে পিছনে লেগেই থাকে। ভাবছি, অন্য কোনও শহরে চলে যাব। এভাবে রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে থাকলে খাব কী?

দুষ্টা রমণী পকেটমারের বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, বিদেশে চলে গেলে তোমাকে ছেড়ে একা একা কী করে থাকবো আমি?

আকিল সান্ত্বনা দিতে দিতে বলে, আহা আমি কি চিরকালের মতো যাচ্ছি নাকি। কিছু মোটামুটি মালকড়ি বানাতে পারলেই আবার চলে আসবো। তাহলে আর দেরি করে লাভ নাই। কাল রাতেই আমি রওনা হয়ে যাবো। তুমি আমার জামাকাপড় আর কিছু পথের খানা বেঁধে-ছেঁদে ঠিক করে রেখ, কেমন?

পরদিন সকালে হারাম এসে বলে, খোঁচড় পিছনে লেগেছে। শালারা বোধ হয় আমাকে শ্বশুর ঘরে না পাঠিয়ে ছাড়বে না। তবে আমারও নাম হারাম। কেমন করে চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি। বিবিজান, তুমি আমার জিনিসপত্র বাঁদা-ছাঁদা করে দাও। হ্যাঁ সঙ্গে কিছু খানা আর রেস্ত দিও। আজ বিকেলেই আমি এ শহরের বুকে লাথি মেরে রওনা হবো।

ছলনাময়ী কেঁদে ভাসিয় দেয়, আমার কী হবে গো? তোমাকে ছাড়া একটা দুপুর আমি ঘুমাতে পারি না, কেমন করে আমি বাঁচবো?

হারাম একটু কড়া ধাঁচের লোক, আঃ। শুভকাজে যাওয়ার সময় প্যান প্যান করে বাধা দিও না তো! আমি মরে যাচ্ছি—না, চিরকালের মতো ছেড়ে যাচ্ছি? ভয় নাই, তোমার স্বামী তোমারই থাকবে। তা সে বেহেস্তের ডানাকাটা হুরী এসে দাঁড়ালেও এ বান্দা মুখ তুলে তাকাবে না তার দিকে।

মেয়েটা লাস্যময় কটাক্ষ করে, সত্যি বলছ? তোমাদের পুরুষ মানুষকে বাপু বিশ্বাস নাই। আর তোমাদেরই বা কী দোষ দেব বলো। আজকাল দুষ্টু মেয়ে-মানুষগুলোই যত বেহায়া। একটা শক্ত সমর্থ খুবসুরত মরদ দেখতে পেলে আর কথা নাই! কী ভাবে তাকে নষ্ট করতে হয় তার সব ছলাকলাই তাদের মুখস্ত।

হারাম বলে, যাও যাও, এখন নিজের কাজে যাও তো। তুমি কি ভাব, তুমি ছাড়া দুনিয়ার আর সব মেয়েছেলেই বদ?

সারাদিন ধরে অনেকবার রতি-বিহার করে সন্ধ্যার আগেই হারামকে রওনা করে দেয় মেয়েটা। আর সন্ধ্যার পরে আসে আকিল। তাকেও খাইয়ে-দাইয়ে, বার-কয়েক সহবাস শেষে শেষ রাতের দিকে বের করে দেয় বাড়ি থেকে।

নিয়তি অলক্ষ্যে হাসছিলো।

সারাদিন পথ চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক ছোট্ট শহরের উপান্তে এসে সেখানকার একমাত্র সরাইখানায় আশ্রয় নেবার জন্য ঢুকে পড়ে আকিল। সরাইখানাটি ছোট্ট। একটি মাত্র ঘর। কোন রকমে একটা রাতের মতো মুসাফির পথিকরা এখানে রাত্রি বাস সেরে চলে যায়।

পকেটমার আকিল দেখলো, যাত্রী বলতে তখন পর্যন্ত আর মাত্র একজন এসে উঠেছে তার আগে। বিদেশে মানুষ বেশি মিশুকে হয়ে ওঠে। কথায় কথায় আলাপ পরিচয় হয় দু'জনের। আকিল জিজ্ঞেস করে, ভাই সাহেব দেখছি গা এলিয়ে পড়ে আছেন, খুব ক্লান্ত বুঝি?

লোকটি ঈষৎ হালকা হাসি টেনে বলে, ক্লান্ত হবো না? সেই কাইরো থেকে একটানা হেঁটে আসছি। পা দু'খানা টনটন করছে! উফ্!

আকিল বলে, আমারও সেই দশা। আমিও কাইরো থেকেই হেঁটে আসছি। যাক ভালোই হলো, আল্লাহ বহুত মেহেরবান, তা না হলে এই নির্জন অন্ধকার রাতটা একা একাই কাটাতে হতো। জানেন তো পয়গম্বর বলেছেন, পথের সব চেয়ে বড় সম্বল হচ্ছে সঙ্গী। যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় আনন্দ হলো। আসুন ভাইসাব হাতে হাতে মেলাই। আজ আমাদের যে দোস্তী এখানে তৈরি হলো, তা যেন জীবনের কোনও অবস্থাতেই নষ্ট না হয়।

দু'জনে হাতে হাত রাখলো। আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো।

আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন, অন্যজন হারাম। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ তারা এই পান্থশালায় এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

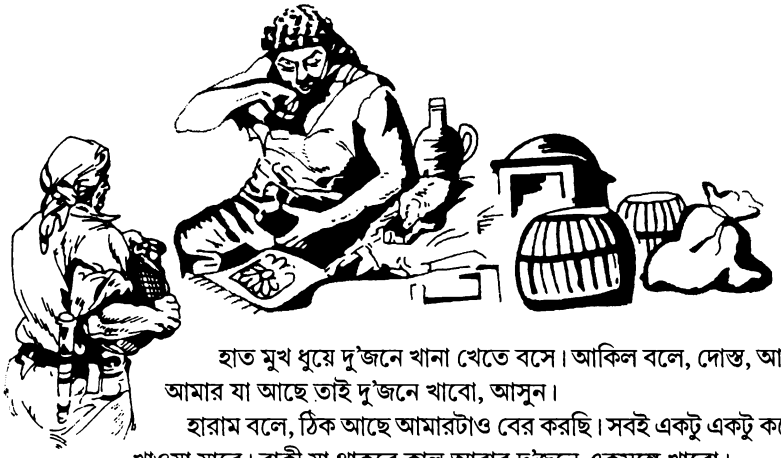

হাত মুখ ধুয়ে দু'জনে খানা খেতে বসে। আকিল বলে, দোস্ত, আজ আমার যা আছে তাই দু'জনে খাবো, আসুন।

হারাম বলে, ঠিক আছে আমারটাও বের করছি। সবই একটু একটু করে খাওয়া যাবে। বাকী যা থাকবে কাল আবার দু'জনে একসঙ্গে খাবো।

আকিল তার প্যাঁটরা থেকে চাপাটি, সবজী, চাট্‌নী প্রভৃতি যা যা বের করে, হারামও ঠিক ঠিক সেই সব খাবারই বের করে তার ঝুলি থেকে। দু'জনেই অবাক হয়ে দু'জনের মুখের দিকে তাকায়। তারপর হেসে ফেলে।

—আশ্চর্য ব্যাপার তো! ভাবলাম আপনার খানা আর আমার খানা হরেক কিসিমের হবে। তা না, আপনিও যা যা এনেছেন আমিও দেখছি সেই সবই এনেছি।

এই বলে হারাম একটা ছোট পুঁটলীতে বাঁধা একটা নাস্তার কৌটো বের করে। তার মধ্যে ছিলো ভেড়ার টেংরীর ঝোল। ওরা এ খাবারটাকে 'পায়া' বলে।

আর কী আশ্চর্য, আকিলও একটা কৌটো খুলে ঠিক অবিকল ঐ রকম ভেড়ার পায়া বের করে।

এবার দু'জনেরই বিস্ময় চরমে ওঠে।

—আল্লাহ আকবর, একি কাণ্ড! আচ্ছা আপনি এসব খানা কোত্থেকে এনেছেন?

আকিল জিজ্ঞেস করে। হারাম বলে, আমার বিবি বানিয়ে দিয়েছে সব। কিন্তু আপনারগুলো?

আকিল বলে, আমার খানাও তো আমার বিবি বানিয়ে দিয়েছে?

—কোথায় থাকেন আপনি?

আকিল বলে, কাইরোর 'বিজয় দরজার' কাছে!

হারাম অবাক হয়ে বলে, আমিও তো ওখানেই থাকি!

এরপর দুই নচ্ছার এক এক করে দু'জনের খুটিনাটি সব পরিচয় জেনে নেয়। দু'জনেই বুঝতে পারে নষ্ট মেয়েছেলেটা তাদের কী আশ্চর্য কুশলতায় প্রতারণা করে এসেছে এতো কাল।

দু'জনেই ক্রোধে ফেটে পড়ে, আমরা দু'জনেই এতদিন একটা মেয়ের কাছে বোকা বনেছি, দোস্ত। এর উচিত সাজা তাকে দিতে হবে।

হারাম বলে, মাথা গরম করবেন না, ভাইসাব। চলুন ঘরে ফিরে যাই। আগে কৈফিয়ত তলব করে দেখি, সে কী বলতে চায়।

দু'জনে একসঙ্গে এসে দাঁড়ালো তাদের বাড়ির দরজায়। মেয়েটি ভাবতে পারেনি,

এইভাবে তার দুই স্বামী একজোট হয়ে তাকে আক্রমণ করবে কোনও দিন। বাঁচবার আর কোনও পথ নাই দেখে ছলনাময়ী হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে দু'জনের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

—আমি অবলা নারী, না বুঝে লোভে পড়ে তোমাদের দু'জনকেই শাদী করে ফেলেছিলাম। বিশ্বাস কর, তোমাদের কাউকে ঠকাবার কোনও মতলব ছিলো না আমার। এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা করে দাও, সোনারা!

হারাম এবং আকিল দু'জনেই মেয়েটিকে সত্যি সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিলো। তাই তার কান্নায় বিগলিত হয়ে দু'জনেই তাকে ক্ষমা করলো।

মেয়েটি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওরা বললো, দেখ বিবিজান, এতদিন যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু সব জানাজানি হওয়ার পর তো আর এ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে আমরা দু'জনেই তোমার স্বামী হয়ে থাকতে পারি না। যে-কোনও একজনকে বেছে নিতে হবে তোমাকে। এবং এখুনি।

ধূর্ত শয়তানীটা ভাবে, দেহের তাগদ দু'জনেরই জব্বর। একজনকে খুশি করলে আর একজনের মাথায় খুন চেপে যাবে। এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যে মৃত্যু—তা সে সহজেই অনুমান করতে পারে।

অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটিকে নীরব থাকতে দেখে দু'জনেরই ধৈর্যচুতি ঘটে। হারাম চিৎকার করে ওঠে, কী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? মুখ খোল। একজনকে বেছে নিতে হবে তোমাকে। এবং এখুনি। ঝটপট সাফসাফ বলে দাও। আমাদের অত সময় নাই।

মেয়েটি চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, এ বড় কঠিন সমস্যা, একমাত্র খোদা ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। এখন আমি কী বলি বলো তো। তোমাদের দু'জনই আমার বড় ভালোবাসার ধন। কাকে ছেড়ে কাকে নিতে চাইবো আমি?

—ওসব আমরা জানি না, দু'জনের একজনকে বাছাই করে নিতে হবে তোমাকে। এবং তার জন্যে আর বেশি সময় দিতে পারবো না আমরা।

মেয়েটি বলে, এতো দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে বোঝার বস্তু নয়। কী করে ঠিক করবো, কার দিকে আমার মন বেশি ঝুঁকতে চায়?

—ওসব ফালতু কথা আমরা শুনতে চাই না। সাফসাফ বাতাও—আভি।

মেয়েটি এবার চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। না না, আমি পারবো না। আমার মহব্বতের চোখে তোমরা দু'জনেই সমান। তিল মাত্র ফারাক করতে পারছি না কাউকে। এখন তোমাদের মধ্যে গুণে বুদ্ধিতে কে বড় বলতে পারবো না। একমাত্র সেইভাবেই হয়তো দু'জনকে আলাদা করা সম্ভব হতে পারে। আমার মনে হয়, তোমরা তোমাদের নিজের নিজের কেরামতি দেখাও আমাকে। যার বুদ্ধি বেশি হবে তাকেই আমি ধরে রাখবো। কী, আমার কথা তোমাদের পছন্দ হয়?

—চমৎকার।

দু'জনেই একসঙ্গে লাফিয়ে ওঠে। তা হলে আজ থেকেই পাট শুরু করা যাক। যে বেশি বুদ্ধি খাটিয়ে চুরি বিদ্যার পরীক্ষায় পাশ করবে তাকেই সে গ্রহণ করবে। কিন্তু কে আগে শুরু করবে? তাও ঠিক হলো। ভাগ্য পরীক্ষা করে। আকিল প্রথম সুযোগ পেলো।

সুতরাং হারামকে সঙ্গে নিয়ে আকিল বাজারে আসে। এক ইহুদী সুদখোর স্যাকরাকে দেখিয়ে বলে, এই লোকটাকে ভালো করে চিনে রাখ। দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে এই বুড়োটা টাকা ধার দিয়ে সোনাদানা বন্ধক নিয়ে বেড়ায়। ওর কাঁধে যে ঝোলাটা দেখছো—ওটা ভর্তি আছে সোনার মোহর আর অলঙ্কারে। তুমি দেখ, ওটা আমি কেমন করে ছিনিয়ে নিই কুত্তার বাচ্চাটার কাছ থেকে।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ইহুদীটা হাতে একটা চিরাগ বাতি নিয়ে পথ চলছিলো! আকিল ঝড়ের বেগে তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ইহুদীকে ঈষৎ ধাক্কা মেরে তার হাতের বাতিটা ফেলে দিয়ে কাঁধের ঝুলিটাকে লোপাট করে অন্ধকার গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পড়ে পলকের মধ্যে। ইহুদীটার চিৎকার চেঁচামেচিতে আশে-পাশের মানুষজন ছুটে আসে। কিন্তু আকিল ততক্ষণে পগারপার। মাঝখান থেকে নিরীহ এক গো-বেচারাকে সামনে দেখতে পেয়ে ইহুদীটা তাকেই চোর ঠাউরে দেখিয়ে দিতেই জনতার বেধড়ক প্রহারে আধমরা হয়ে গেলো সে।

আকিল হাসতে হাসতে হারামের কাছে ফিরে এসে বাহাদুর গর্বে বুক ফুলিয়ে বলে, কেমন দেখলে, দোস্ত?

এমন চমৎকার হাত সাফাই, তারিফ না করে উপায় কী? হারাম বলে, একদম যাদুকা খেল দেখিয়ে দিলে বন্ধু! বহুৎ সুক্রিয়া।

আকিল বললো, আরে দাঁড়াও দোস্ত আসল খেলা এখনও শুরু হয়নি।

—কী রকম?

হারাম অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। আকিল বলে, ইহুদীর এই থলেটা হজম করা কী অত সোজা ভেবেছ নাকি। ব্যাটাচ্ছেলে এখনি কোতায়ালীতে এজাহার দেবে না? তারপর সিপাই সান্ত্রীরা সারা শহর তোলপাড় করে খুঁজতে থাকবে। তখন? তখন আমি এসব রাখবো কোথায়, শুনি?

হারাম বলে, হুঁ, কথাটা তে ভাববার মতো। ও ব্যাটা জাতে ইহুদী। অন্যের রক্ত চুষে খায়। জান থাকতে ওর একটা কানাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা শক্ত। তা কী করবে?

আকিল বলে, দাঁড়াও খুলে দেখি আগে, কী কী মাল আছে ভেতরে।

একটা ঝোপের আড়ালে এসে ঝোলাটা খুলে উপুড় করে দিলো আকিল। এক গাদা সোনার মোহর। নেড়ে চেড়ে দেখলো, মোহর ছাড়া অন্য কোনও বস্তু নাই। দশটা মোহর তুলে নিয়ে সে হারামের হাতে দিয়ে বলে এগুলো ট্যাকে গুঁজে রাখ তো!

তারপর নিজের হাতের আকিল নাম খোদাই করা একটা তামার আংটি খুলে ঐ মোহর গুলোর সঙ্গে থলেয় পুরে যেমনটি বাঁধা ছিলো সেই ভাবে বেঁধে আকিল বললো চলো, ইহুদীটার পিছনে ধাওয়া করে লোকটাকে ধরতে হবে।

হারাম কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। বলে, কেন? ওর পিছনে যেও না। দেখলে তো তোমাকে ধরে ফেলবে?

আকিল বলে, আরে, এসো না। খেলাটা কেমন জমে দেখ।

ইহুদীটা তখনও বাজার ছেড়ে বেশি দূর যায়নি, হন হন করে ওকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে থলেটা ওর কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিয়ে পলকে উধাও হয়ে গেলো আকিল।

হারানো ধন ফিরে পেয়ে ইহুদীর সে কি আনন্দ। কে ছেনতাই করেছিলো, কে ফেরত দিয়ে গেলো সে দিকে ওর কোনও কৌতূহল নাই তখন। শুধু ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে বার বার কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকলো সে।

সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় সামনে থেকে এসে ইহুদীর কামিজ চেপে ধরলো আকিল, হু হু বাবা, আমার থলে চুরি করে হাওয়া হবে ভেবেছিলে? দাঁড়াও বিধর্মী শয়তান, তোমার শয়তানী আমি আজ শেষ করে দেব।

ইহুদী তো অবাক। কী বলবে কিছুই ভেবে পায় না প্রথমে।

—এ তুমি কি বলছো বাবা, মানুষ চিনতে ভুল করেছ মনে হচ্ছে।

—ভুল করেছি তোমার মতো শকুনিকে চিনতে কারো ভুল হয় না আরুনের

বাচ্চা। ন্যাকামী করা তোমার আমি ভুলিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে প্রত্যেক দিন তুমি এই শহরের কত মানুষের সর্বনাশ করো ইজরায়েল সন্তান? কাঁধের ওপর দেখছি জলজ্যান্ত আমার থলেটা, আবার বলছো, মানুষ চিনতে ভুল করেছি আমি। তোমার বাঁদর-মুখ মনে রাখার কোনও প্রয়োজন নাই আমার। আমি আমার থলেটা তো চিনতে পারছি। চলো, কাজীর কাছে চলো, আমি নিজে হাতে তোমাকে সাজা দিতে চাই না। যা করার আইন মোতাবেক তিনিই করবেন।

কাজীর কথা শুনে ইহুদীর প্রাণ তুড়ুক করতে শুরু করে। বে-আইনি সুদেখাটানো টাকা, সরকারের দপ্তরে জমা পড়লে আর কী তা উদ্ধার করা যাবে? তার অনেক রকম কাকুতি-মিনতি করতে থাকে লোকটা।

দোহাই বাবা, কাজী কোতয়ালে টেন না, বিশ্বাস কর, আমার পয়গম্বর, আব্রাহাম, আইজাক, জ্যাকব এর নামে শপথ করে বলছি, এ থলে আমার। তুমি ভুল করেছ।

—ভুল করেছি! ওরে শয়তান সুদখোর, চোর, আমি ভুল করেছি। তুমি এই ভাবে সাধু সাজবার চেষ্টা করে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ? চল্—আর কোনও ওজর শুনতে চাই না তোর। চুরি করার সাজা তোকে আজ পেতেই হবে।

আকিলের চেঁচামেচি চিৎকার হুঙ্কারে আমার পাশের দোকান-বাড়ি থেকে অনেক ছেলে ছোকরা বয়স্ক বৃদ্ধ সবাই ছুটে এলো।

—কী, কী হয়েছে?

আকিল বলে এই বিধর্মী শয়তান চোরটা আমার থলেটা চুরি করে পালাচ্ছিল। ছুটতে ছুটতে এসে আমি ধরেছি। ওকে কাজীর কাছে নিয়ে যাবো, কিন্তু ব্যাটা যাবে না কিছুতেই। তা আমি কী ছাড়বো নাকি?

একে ইহুদী তায় চোর, সুতরাং জনতা রোষে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ব্যাটাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দাও।

এদিক-ওদিক থেকে দু'চারটে চড়-চাপড়ও পড়তে থাকে। আকিল বলে, ভাই সব, আমরা সাচ্চা মুসলমান, অন্য ধর্মের কাউকে প্রহার করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে না। তার চেয়ে কাজীর কাছে নিয়ে চলুন লোকটাকে। আইনে যা সাজা পাওয়ার তাই সে পাবে।

আকিলের বিজ্ঞজনোচিত বক্তৃতায় সকলেই অনুধাবন করলো উচিত অনুচিত যে কারণেই হোক কোনও ইহুদীর গায়ে হাত ওঠালে ইহুদী মুসলমানে সংঘাত বেধে যেতে পারে।

ইহুদীটাকে প্রায় জোর করেই কাজীর কাঠগড়ায় হাজির করা হলো।

কাজী প্রশ্ন করলো, কী ব্যাপার, কী হয়েছে? এই বৃদ্ধ ইহুদীকে ধরে এনেছো কেন তোমরা?

আকিল বলে, ধর্মাবতার, লোকটা চোর। এই দেখুন এর কাঁধে আমার থলেটা! ওটা চুরি করে পালাচ্ছিল, আমি দৌড়ে এসে পাকড়াও করেছি। আপনি এর বিচার করুন।

ইহুদী বলে, এসব মিথ্যে কথা, মালিক, এ থলে আমার। এতে আমার পয়সা কড়ি আছে।

কাজী প্রশ্ন করে, কত টাকা আছে তোমার থলেয়?

—জী হুজুর পাঁচশো সোনার মোহর নিয়ে আমি আমার এক মহাজনের কাছে যাচ্ছিলাম—

—মিথ্যে কথা, হুজুর। বিলকুল বানানো কথা। লোকটা শুধু চোরই না—অসৎ মিথ্যুক। ডাহা মিথ্যে কথা বলছে সে।

কাজী বললো, ঠিক আছে তুমি তো বলছো থলেটা তোমার?

—কোনও সন্দেহ নাই, ধর্মাবতার।

—তা হলে তুমিও বলো, থলেয় কী কী জিনিস আছে?

আকিল তিন মাত্র না ভেবে বলে, সোনার মোহরই, তবে পাঁচশো নয়, চারশো নব্বুইটি স্বর্ণমুদ্রা আছে ওতে। এছাড়া আমার আর একটি মূল্যবান জিনিসও আছে ওর মধ্যে।

কাজী এবং ইহুদী আকিলের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। আকিল বলে, আমার নাম লেখা একটা তামার আংটিও থাকার কথা থলেয়। এই আংটিটার আর্থিক মূল্য কিছুই নয় কিন্তু আমার কাছে ওটা কোনও কারণে অমূল্য বস্তু। জানি না চোরটা থলে থেকে ওটা সরিয়ে ফেলেছে কিনা।

ইহুদী বলে, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, একেবারে আষাঢ়ে গপ্পো—

কাজী গম্ভীর হয়ে ইহুদীকে বলে, থলেটা খুলে সব বের কর, দেখি।

সামনের টেবিলের উপর থলেটা উজাড় করে ঢালা হলো। চকচকে মোহরগুলের মধ্যে তামার আংটিটাও বর্ণভেদেই পৃথক হয়ে নজরে পড়লো সকলের। মোহরগুলো গুণে দেখা গেলো চারশো নব্বই—আকিলের কথাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো। কাজী রায় দিলো, মোহর সুদ্ধ থলেটা আকিলকে দিয়ে দাও আর চোর ইহুদীটাকে পঁচিশ ঘা বেত লাগাও।

মোহরের থলেটা নাচাতে নাচাতে হারামের সঙ্গে আকিল পথে বেরিয়ে আসে। হারাম বলে, বহুৎ বড়িয়া ওস্তাদ কা খেল দেখালে দোস্ত। জবাব নাই।

আকিল বলে, আমার কাজই বুদ্ধির খেলা। এভাবে কত লোককে বোকা বানিয়ে অকূলে ভাসিয়েছি তার ঠিক নাই। যাই হোক, এবার দোস্ত তোমার কেরামতি দেখতে হয়! হাজার হলেও তুমি জাতে সিঁদেল চোর। বুকের পাটা দশ হাত না হলে অন্যের ঘরে ঢোকা যায়?

হারাম মুচকি হাসে। বলে, চলো আজ, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা সুলতানের প্রাসাদের পিছনে এসে পড়ে। হারাম বলে দাঁড়াও একটু। আমি একখানা রশি নিয়ে আসি।

আকিলকে দাঁড় করিয়ে রেখে ক্ষণকালের জন্য হারাম অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর এক বাণ্ডিল রশি এনে বলে, আমরা প্রাসাদের ওপরে উঠে যাবো। আমি একাই যেতাম কিন্তু মজাটা দেখাবার জন্য তোমাকেও সঙ্গে নিতে হবে। এসো, আমার পিছনে পিছনে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসো। কোনও ডর নাই।

ভয়ে আকিলের হাত পা কাঁপতে থাকে। কিন্তু অদম্য কৌতূহল এড়াতে না পেরে হারামের পিছনে পিছনে সেও দড়ি বেয়ে প্রাসাদের ছাদে উঠে যায়। তারপর হারামকে অনুসরণ করে করে কখনও নিচে নেমে কখনও ডাইনে ঘুরে কখনও বাঁয়ে চলে এক সময় ওরা একটা দামী পরদা ঝোলানো ঘরের সামনে এসে থামে।

পরদাটা ফাঁক করে হারাম দেখে নেয় ঘরের মাঝখানে একটা সোনার পালঙ্কে এলিয়ে পড়ে আছে সুলতান। আর তার পায়ের কাছে ঢুলুঢুলু চোখে বসে একটি কিশোর নফর পা টিপছে আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।

হারাম বললো, দোস্ত তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে দেখ। আমি ভিতরে ঢুকছি।

আকিলের বুক ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। সর্বনাশ যদি জেগে ওঠে সুলতান?

হারাম পা টিপে টিপে ছেলেটির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। নিদ্রাচ্ছন্ন কিশোর তখন যন্ত্রচালিতের মতো সুলতানের পায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। একখানা রুমাল দিয়ে ছেলেটার মুখ বেঁধে ফেলে হারাম। তারপর পিছমোড়া করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়ালের একধারে ফেলে রাখে।

এরপর হারাম ছেলেটার জায়গায় বসে সুলতানের পা টিপতে আরম্ভ করে। সুলতানও নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। তবু পায়ের ওপর কড়া হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘুমজড়িত কণ্ঠেই বলে, কীরে অত জোরে জোরে টিপতে আরম্ভ করলি কেন?

হারাম বাচ্চাদের মতো গলা নকল করে বলে, জাঁহাপনা, একটা কিস্‌সা শোনাবো?

সুলতান চোখ না খুলে আধো আধো ঘুমের ঘোরেই বলে, বেশ তো, বলো না।

হারাম বলতে থাকে ঃ

এক শহরে দুই বন্ধু বাস করতো। ওদের একজনের নাম হারাম আর একজনের নাম আকিল। হারাম-এর ব্যবসা চুরি করা। আর আকিল হাত সাফাই করে পকেট মেরে লোক ঠকিয়ে খায়।

এরপরে আকিল কী করে এক ইহুদীর থলে হাত সাফাই করে হাতিয়ে নিয়ে তার মধ্যে নিজের হাতের তামার আংটি রেখে দিয়ে কাজীর কাছে প্রমাণ করেছিলো, থলেটার প্রকৃত মালিক আকিল—ঐ ইহুদী নয়, তা বললো। এরপর হারাম তার কেরামতি দেখাবার জন্য দোস্ত আকিলকে প্রাসাদের পাঁচিল টপকে ভিতরে নিয়ে এলো। তার উদ্দেশ্য সুলতানের প্রাসাদে ঢুকে সে তাকে কিস্‌সা শোনাবে। এবং এমনি তার বুদ্ধি আর সাহস, করলোও সে তাই। সুলতান তার পালঙ্কে শুয়ে এলিয়ে পড়ে আছেন, আর তার পায়ের কাছে বসে পা টিপছে এক ঘুম-কাতর ছোকরা নফর। তাকে কায়দা করে সরিয়ে দিয়ে সে সুলতানের পায়ের কাছে বসে ছেলেটির গলা নকল করে সুলতানকে কিস্‌সা শুনিয়ে দোস্তকে অবাক করে দিলো। এখন বলুন তো জাঁহাপনা, ওদের দুই বন্ধুর মধ্যে কে বড়?

সুলতান ঘুম জড়ানো স্বরেই বললো, কেন? ঐ হারাম? কাজিকে না হয় ফাঁকি দেওয়া সম্ভব, কিন্তু সুলতানকে ফাঁকি দেবার হিম্মৎ কার হতে পারে?

এরপর হারাম বন্ধুকে সঙ্গে করে প্রাসাদের বাইরে নেমে আসে।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে সুলতান দেখলো, তার পেয়ারের ছোকরা বান্দা মুখ বাঁধা অবস্থায় দেওয়ালের পাশে পড়ে রয়েছে। বাঁধন খুলে দিলে সে গতরাত্রের স্বচক্ষে দেখা সব কাহিনী শোনালো সুলতানকে। সুলতান অবাক হলেন, সে কি রে, আমি তো ভেবেছিলাম, তুই আমাকে কিস্‌সা শোনাচ্ছিস। বহুৎ তাজ্জব কি বাত—

দরবারে এসে সুলতান উজিরকে বললো, সারা শহরে ঢ্যাঁড়া পিটে জানিয়ে দাও সবাইকে, হারাম নামে কে আছে সে এসে নির্ভয়ে আমার সঙ্গে দেখা করুক। আমার প্রাসাদের সুরক্ষা ভেদ করে কাল রাতে সে আমার ঘরে ঢুকেছিলো। কি সাহস, ভাব একবার, আমি ইনাম দিতে চাই। ওকে একবার সামনে হাজির হতে বলো।

সেইদিনই হারাম সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। সুলতান ওর বুদ্ধি এবং সাহসের প্রশংসা করে বললো, আমি খুব খুশি হয়েছি। আজ থেকে তোমাকে আমার সার সলতানিয়তের কোতোয়ালদের সর্দার পদে বহাল করলাম।

সুচতুরা আকিলকে বোঝালো, বুদ্ধি এবং সাহসের জোরে হারাম আজ অনেক বড় হয়ে গেছে। সুতরাং শর্তমতো হারামই আমাকে পাওয়ার অধিকারী। তুমি কিছু মনে দুঃখ রেখ না সোনা, যদিও আমি তার ঘরের বিবি হয়ে যাচ্ছি কিন্তু মনে-প্রাণে তোমাকেও আমি ভালোবাসি—ভালোবাসবো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ বললো, গল্পও শেষ হলো রাতও ফুরিয়ে গেলো। আজ এখানেই শেষ। কাল আবার নতুন কিস্‌সা শুরু করা যাবে।

সাতশো অষ্টাশিতম রজনী ঃ

শাহরাজাদ নতুন কাহিনী শুরু করে ঃ

মিশরের সুলতান খলিফা মহম্মদ ইবন থাইলুন জ্ঞানে গরিমায় মহত্ত্বে যেন সেরা ছিলেন তেমনি ছিলেন তিনি একজন যোগ্য সুশাসক। কিন্তু তাঁর পরলোকগত পিতা ছিলো তার ঠিক উল্টো। শিক্ষা-দীক্ষার সে ধার ধারতো না, প্রজাদের ওপর নিপীড়ন করে প্রদেয় রাজস্বের তিন চার গুণ আদায় করাই ছিলো তার একমাত্র কাজ। দীন হতে দীনতম কোনও মানুষও তার ক্ষুদ্রতম সঞ্চয় আগলে রাখতে পারতো না সুলতানের কোপদৃষ্টি থেকে।

কিন্তু মহম্মদের প্রকৃতি ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রজাদের দুঃখে তাঁর হৃদয় আকুল হয়ে উঠতো। তিনি ছদ্মবেশে প্রজাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাদের অবস্থার হালচাল জেনে নিয়ে তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা করতেন।

সুলতান মহম্মদের শুধু মনে প্রশ্ন জাগতো তার সলতানিয়তে প্রজাদের মধ্যে এতো আর্থিক বৈষম্য কেন? কেন একদল লোক বিলাস ব্যসনে অলস জীবন যাপন করবে? আর কেনই বা বাকী সব মানুষ সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ক্ষুধার অন্ন সংস্থান করবে?

একদিন তিনি তাঁর দরবারের তাবৎ গণ্যমান্য আমলা ও পাত্র-মিত্র পারিষদদের হাজির হতে বললেন তাঁর সামনে।

সকলে এসে সমবেত হলো। সারা দরবার-কক্ষ সেদিন পরিপূর্ণ। সুলতান সকলকে আহ্বান করেছেন। সুতরাং একজনও গর-হাজির থাকেনি সেদিন।

সুলতান মহম্মদ বললেন, আপনাদের মধ্যে আমার উচ্চতম পদের উজিররাও যেমন আছেন তেমনি আছে আমার প্রাসাদের দ্বাররক্ষীরাও। আজ আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই। আমার কর্মচারীরা যে যে-রকম মাইনে পায় তাতে তাদের প্রত্যেকের কীভাবে সংসার-যাত্র নির্বাহ হতে পারে তা আমি দেখতে চাই। যদি দেখি, কেউ তার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অর্থ গ্রহণ করে তবে আমি তা কমিয়ে দেব নির্ঘাৎ। কিন্তু যদি দেখি, যারা কম মাইনে পেয়ে অতি কষ্টে সংসার চালায় তাদের আমি মাইনের অঙ্ক বাড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করবো না।

সুলতানের নির্দেশ মতো প্রথমে এসে দাঁড়ালো তার চল্লিশ জন উজির। সকলেরই সাজ-পোশাক বাদশাহী। নানারকম স্বর্ণালঙ্কর-খচিত পোশাক আশাক-এ ঝকমক করছে তারা। এর পরের সারিতে এসে দাঁড়ায় বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদাররা। তাদেরও জাঁকজমক দেখার মতো। এরপর সেনাবাহিনীর প্রধানরা এলো। তারপর এলো কাজীরা।

সকলেই এক এক করে হাঁটুগেড়ে বসে কুর্ণিশ জানায় সুলতানকে। সুলতান সকলেরই সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করেন। কাউকে হয়তো কোনও প্রশ্ন করেন, আবার কাউকে কিছুই বলেন না।

এইভাবে সুলতানের সব দপ্তরে সমস্ত কর্মচারীদের সালাম কুর্ণিশ জানানো হয়ে গেলে, সব শেষে সুলতানের হারেমের দুই বল্লমধারী খোজা নফর এসে দাঁড়ালো। যদিও ওরা দু'জনেই অলস এবং দেখতে বেশ নাদুস-নুদুস, তবু চোখে মুখে যেন কি এক বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছিলো দু'জনেরই। স্বয়ং সুলতান ডেকেছেন, সকলেই কেমন সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে হাজিরা দিয়েছে কিন্তু ওদের সাজ-পোশাক দেখলে মনে হয় কতকাল ধরে যেন মেঝেয় গড়াগড়ি খেয়েছে! ওরা দু'জনেই একসঙ্গে সুলতান মহম্মদের সামনে দাঁড়িয়ে আভূমি আনত হয়ে ক্ষুব্ধ ধরা গলায় বলতে থাকলো, আপনি দীনদুনিয়ার মালিক জাঁহাপনা, আপনার দয়াতেই বান্দারা কোনও রকমে বেঁচে আছে। কিন্তু আপনার পিতার আমলে আমরা কি সুখেই না ছিলাম। তিনি গত হওয়ার পর থেকে আমাদের কপাল পুড়তে আরম্ভ করেছে। এখন আমাদের এমন হাল হয়েছে,

যা মাহিনা পাই তা দিয়ে দু'বেলার উদর-পূর্তি হয় না। পরনের বেশবাসের দশা দেখছেন, জাঁহাপনা। এমন সঙ্গতি নাই একখণ্ড চাদর কিনে গায়ে দিই। সারাটা শীতকাল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাই। কিন্তু কি করবো, কাকেই বা জানাবো আমাদের এ দুঃখের করুণ কথা। কেই বা শুনতে চাইবে। তবে আমাদের ভয় হয় কি জানেন, জাঁহাপনা, এইভাবে অনাহারে কাটাতে কাটাতে হয়তো বা কোনদিন এই রোগা টিঙটিঙ শরীরটা ধুপ করে পড়ে শেষ হয়ে যাবে। যাই হোক খোদাতালা আমাদের সুলতানের সুখ-সমৃদ্ধি এবং দীর্ঘ জীবন দান করুন, এই প্রার্থনা করি।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সুলতান মহম্মদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই দুই দ্বাররক্ষী সত্যিই ভীষণ দুস্থ। এমন কোনও ইনাম পায় না যা দিয়ে ওরা একটু ভালোভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। প্রাসাদের ভিতরে ওদের কাজ, সুতরাং বাইরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ নাই এবং সেই কারণেই অন্যের কাছ থেকে বখ্‌শিশাদি পাওয়ায় বিশেষ কোনও সুযোগ পায় না এরা।

মহম্মদ আশ্বাস দিলেন, আমি তোমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা অবগত হলাম। আমার হুকুমতে এই বৈষম্য আমাকে সত্যিই ব্যথা দিয়েছে। যাই হোক, এর পর থেকে তোমরা যাতে একটু ভালোভাবে কাটাতে পার, সেজন্য প্রতি বছরে দু'শো দিনার করে ইনাম পাবে।

সুলতানের এই ন্যায় বিচারে গদগদ হয়ে দ্বাররক্ষীদ্বয় বার বার তিনবার সালাম কুর্ণিশ জানিয়ে সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। সভায় সমাগত কর্মচারীবৃন্দ সুলতানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করার পর সবাই যখন সভাকক্ষ ছেড়ে গমনোদ্যোগ করছে এমন সময় এক অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন সুলতান। লোকটি, যে কারণেই হোক, এতক্ষণ তাঁর দৃষ্টিগোচরে আসেনি। সুলতান তাঁর সন্নিকটে আসতে ইশারা করলেন।

বৃদ্ধ গুটি গুটি সুলতানের দিকে এগিয়ে এসে যুক্ত করে নিবেদন করে, আপনি আমাদের ভাগ্যবিধাতা, মহামান্য শাহেনশাহ। এই বৃদ্ধ বান্দা আপনার বিশেষ কোনও দপ্তরে নিযুক্ত নাই। সেই কারণে হুকুমৎ বিধি অনুসারে আমার নির্দিষ্ট কোনও পদও নাই। তবে আপনার অবগতির জন্য জানাই, মহামান্য সুলতানের মৃত পিতার আমি এক নগণ্য অনুরক্ত নফর ছিলাম। তিনি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত একটি ছোটো কৌটো আমার হেপাজতে রাখতেন। শাহেনশাহ জীবিত থাকতে তাঁর প্রয়োজন মতো কৌটোটা আমি তাঁকে বের করে দিতাম। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে আবার তিনি সেটা আমার হাতেই ফিরিয়ে দিতেন। এইভাবে বহুকাল কেটে গেলো, আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো থাকি ঐ কৌটোটা নিয়ে। হঠাৎ তিনি একদিন ইন্তেকাল করলেন। এখন আমি সমস্যায় পড়লাম সেই কৌটোটা নিয়ে। নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের বস্তু। অন্য কারো হাতে তুলে দেবার নির্দেশও দেননি তিনি। সুতরাং আজও সেটা আমি যখের ধনের মতো আগলে রয়েছি। আমি জানি না তার মধ্যে কী জিনিস আছে।

আজ আপনাদের গোলামী করতে করতে আশীটা বছর কেটে গেছে। মুখ ফুটে কোনও দিন কোনও কথা বলতে হয়নি। কারণ মহামান্য শাহেনশাহর পিতা জীবিত থাকতে আমার কোনও অভাবই তিনি রাখতেন না। না চাইতেই দু'হাত ভরে পেতাম। কিন্তু তিনি গত হওয়ার পর আমাকে বড় একটা কেউ নজর দেয় না। মাস গেলে দশটি স্বর্ণমুদ্রা বরাদ্দ আছে তাই নিয়ে ঘরে যাই। সংসারে অনেক খানেওয়ালা বাল-বাচ্চা, এই সামান্য বেতনে আমি আর দিন গুজরান করতে পারছি না, জাঁহাপনা। ভেবেছিলাম, যত অভাবই থাক, যত কষ্টই হোক, নিজের দুঃখের কাহিনী নিজ মুখে আর শোনাবো না কাউকে। খোদা ওপরে আছেন, আর মর্তে আল্লাহর প্রতিভূ আপনি আছেন, কোনও না কোনও দিন আপনারা আমার দিকে মুখ তুলে চাইবেন। বহুদিন প্রতীক্ষা করার পর আজ আপনার সামনে এসে দাঁড়াবার সুযোগ মিলেছিলো। মনে বড়

আশা করে এসেছিলাম, জাঁহাপনা, এই অধমের দিকে একবার নজর পড়লে শাহেনশাকে আর মুখ ফুটে কিছু বলতে হবে না।

সুলতান মহম্মদ অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু এই সামান্য একটা কাজের জন্য হুকুমতের এতোটা ব্যয়-বরাদ্দ কে করেছে। এ তো চলতে পারে না। কী এমন সে কৌটো? তার রক্ষার জন্য এতো টাকা খরচ করতে হচ্ছে? কী আছে তার মধ্যে?

বৃদ্ধ বললো, খোদা কসম, আমি বলতে পারবো না। গত চল্লিশ বছর ধরে বাদশাহর হুকুম মতো আমি সেটা আগলে ধরে রেখেছি।

মহম্মদ বললেন, এক্ষুণি নিয়ে এসো, আমি দেখবো।

বৃদ্ধ দরবার ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এবং একটু পরেই একটি ছোট্ট সোনার কৌটো নিয়ে ফিরে আসে। সুলতান ইশারা করতে ঢাকনাটা সে খুলে ধরে।

সুলতান দেখলেন, কৌটোর ভিতরে ছোট্ট এক ডেলা রাঙামাটি আর একটুকরা পাতলা ছাগচর্ম রক্ষিত আছে।

চামড়ার টুকরোটায় বেশ পরিষ্কার বড় বড় হরফে কী যেন লেখা আছে। সুলতান হাতে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বহু ভাষায় পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তার এক বর্ণ উদ্ধার করতে পারলেন না তিনি। উজির আমির পাত্র-মিত্র সভাকবি কেউই তার পাঠোদ্ধার করতে পারলো না।

সুলতান বললেন, মিশর এবং সিরিয়ার, পারস্য এবং ভারতের জ্ঞানীগুণীদের ডাকো। হয়তো তাঁদের কেউ পড়ে দিতে পারবেন।

সুলতানের আমন্ত্রণে অনেক পণ্ডিতরাই এলো কিন্তু কেউই পাঠোদ্ধার করতে পারলো না। সুলতান দেশে-বিদেশে প্রচার করে দিলেন, যদি কেউ এই চর্মপত্র পাঠ করে দিতে পারে তবে তাকে অঢেল ইনাম দেওয়া হবে। অথবা কেউ যদি তেমন কোনও ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারে তাকেও প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই ঘোষণার দিন কয়েক পরে একদিন এক সাদাপাগড়ী পরে এক বৃদ্ধ এসে হাজির হলো সুলতানের সামনে। যথাবিহিত কুর্ণিশ জানিয়ে সে বললো, আল্লাহ আমাদের পালনকর্তাকে দীর্ঘায়ু করনু, আমি আপনার পিতা শাহনেশাহ থাইলুনের এক অধম বান্দা। তাঁর জীবিত কাল পযর্ন্ত আমি তাঁর সেবা করে গেছি। আমিই জানি ঐ কৌটোয় রক্ষিত চর্মপত্রটির ইতিহাস। ঐ চর্মপত্র একমাত্র একজনই পাঠ করতে পারেন। তিনি তার মালিক। অল আসারের পুত্র শেখ হাসান আবদাল্লাহ তাঁর নাম। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আপনার পিতা তাকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। জানি না, আজও সে জীবিত আছে কিনা?

সুলতান মহম্মদ প্রশ্ন করলেন, কেন তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিলো?

বৃদ্ধ বললো, কারণ আপনার পিতা অনেক জোর-জুলুম অত্যাচার করেও তাকে দিয়ে ঐ পত্রের পাঠ উদ্ধার করাতে পারেনি। লোকটির কাছ থেকে ঐ পত্রখানা তিনি জোর করে কেড়ে নিয়েছিলেন।

সুলতান তখুনি প্রহরী-সর্দারকে হুকুম করলেন, যাও সব কয়েদখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজে-পেতে দেখ, শেখ হাসান আবদাল্লাহ নামে কেউ কোথাও আছে কিনা, পেলে সঙ্গে করে নিয়ে এসো আমার কাছে।

খোদাই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। প্রহরী-সর্দার শেখ হাসান আবদাল্লাকে কয়েদখানার বাইরে এনে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসলাদি করিয়ে নতুন সাজ-পোশাকে সাজিয়ে সুলতান সমীপে হাজির করলো।

সুলতান দেখলেন, এক অশীতিপর লোলচর্ম বৃদ্ধ। তার চোখেমুখে বহু লাঞ্ছনা

অত্যাচারের ছাপ। সুলতান সশ্রদ্ধভাবে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন তাকে। তখতে তারই পাশে সসম্মানে বসালেন। তারপর বললেন, শেখ সাহেব, আমার বাবা যে ভুল, যে অন্যায় করে গেছেন, তার জন্য আমি মর্মাহত। এমন কোনও বস্তু আমি জোর করে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই না যা আমার সম্পত্তি নয়। তা সে যদি তামাম দুনিয়ার সমগ্র ধনভাণ্ডারের চাবিও হয়, তবুও।

হাসান আবদাল্লার দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। দু'হাত ওপরে তুলে আকুল হয়ে বলতে থাকে, খোদা, তুমি আছ, তুমিই একমাত্র সত্য এই দুনিয়ায়, তা না হলে শত্রুর অন্ধকার কারাগারে তিলে তিলে পচে শেষ হচ্ছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই ভাবতাম তোমার কথা। ইন্তেকাল সব দুঃখ বেদনার অবসান ঘটাতে পারে, আমি তোমার কাছে দিবস রজনী সেই প্রার্থনাই জানিয়েছিলাম এতকাল। কিন্তু তখন কী জানতাম আমার শত্রুর পুত্রই আমাকে মুক্ত করে আবার সূর্যের আলো দেখাবে একদিন। এখন ভাবছি সবই তোমার অপার লীলা।

তারপর সুলতানের দিকে চোখ ফিরিয়ে সে বললো, জাঁহাপনা, একদিন যার জন্য অনেক রক্তপাত ঘটে গেছে, অসহ্য অত্যাচার সয়েছি এবং নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আমার মুখ থেকে একটি শব্দ বের করতে পারেনি, আজ তা আমি স্বেচ্ছায় আনন্দচিত্তে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। যে সহৃদয়তার পরিচয় আপনি দিয়েছেন আমার কাছে তার মূল্য অসীম। আপনার পিতা সেদিন আমাকে মেরেধরে ভয় দেখিয়ে কবুল করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি অন্যায় এবং অত্যাচারের কাছে মাথা নোয়াতে শিখিনি। এবং সেই কারণেই জীবনকেও পণ করতে হয়েছিলো। কিন্তু আপনার প্রেম প্রীতি ও সহৃদয়তা আমাকে অভিভূত করেছে। আমার বিশ্বাস প্রেম দিয়ে দুঃসাধ্য সাধন করা যায়। আজ আপনাকে আমি খুশি মনে ঐ চর্মপত্র পাঠ করে দিচ্ছি। এই একটি মাত্র দলিল সঙ্গে করে আমি একদিন মানুষের অগম্য সাদ্দাত ইবন আদাতের শহর ছেড়ে চলে আসতে পেরেছিলাম। আজ পর্যন্ত সে শহরে কোনও জনমানব যেতে পারেনি।

সুলতান বৃদ্ধের হাতে চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন, আপনি আমার পিতৃসম, যদি কিছু মনে না করেন এই চর্মপত্রের পাণ্ডুলিপি এবং ঐ আজব শহর সম্বন্ধে যা জানেন বলুন, আমার খুব শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বৃদ্ধ বললো, সে এক বিরাট কাহিনী, মালিক। যাই হোক বলছি শুনুন ঃ

আমার বাবা কাইরোর একটা সম্ভ্রান্ত সওদাগর ছিলেন। ধন-সম্পদ ছিলো যেমন প্রচুর, তেমনি ছিলেন তিনি সর্বজন-সম্মানিত ব্যক্তি।

আমি তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান। আমার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। সেই সময়ের সেরা পণ্ডিতদের নিয়োগ করেছিলেন আমার বিদ্যালাভের জন্য।

আমার যখন মাত্র কুড়ি বৎসর বয়স সেই সময়েই বিদ্বজ্জনের মধ্যে আমার পাণ্ডিত্য নিয়ে বেশ চাঞ্চল্যকর আলোচনা হতে লাগলো। ফলে, অচিরেই আমি দেশ বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে উঠলাম। প্রাচীন পুঁথি পাঠে আমার মতো দক্ষ মানুষ সে-সময়ে আর দু'টি ছিলো না।

দিনক্ষণ দেখে বাবা আমাকে এক পরমাসুন্দরী চতুর্দশীর সঙ্গে শাদী দিলেন। আমার বিবি শুধু দেখতেই রূপসী ছিলো না, লেখাপড়াতেও ছিলো বেশ বুদ্ধিমতী। শাদীর পর সুখ-সম্ভোগের মধ্যে পুরো দশটা বছর আমরা একত্রেই কাটিয়েছিলাম।

কিন্তু নিয়তিকে কে এড়াতে পারে?

বাবা মারা গেলেন। সেই সঙ্গে সৌভাগ্যও বিদায় নিলো। ব্যবসা বাণিজ্যে দারুণ লোকসান হতে লাগলো। মহাজনদের কাছে ঋণ জমে পাহাড় হয়ে উঠলো। এমন সময় মরার ওপর খাঁড়ার ঘা-আমার প্রাসাদোপম বিরাট ইমারত আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

বিপদ কখনও একা আসে না। আমার শেষ সম্বল একটিমাত্র জাহাজ— তাও সমুদ্রঝঞ্ঝায় তলিয়ে গেলো একদিন।

আমি কপর্দকশূন্য পথের ভিখিরি হয়ে গেলাম। আমি ভবঘুরের মতো দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকলাম। এতো দুঃখে, বিপদেও কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ করেছি নিত্য। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিলো, যে দেশেই যাই, মসজিদে সময় মতো নমাজ পড়া। মসজিদে গেলে অনেক সাধু মানুষের দেখা মেলে। তাঁরা অনেক জ্ঞানের কথা, অনেক ধর্মোপদেশের কথা বলেন। আমার সে-সব শুনতে বড় ভালো লাগতো। ঐ নিঃসম্বল জীবনে তাঁরাই ছিলো আমার প্রকৃত আপনজন, বন্ধু।

এইভাবে ভাগ্য অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে অবশেষে একদিন শূন্য হাতে ঘরে ফিরে আসি। আমার বৃদ্ধ বিধবা জননী ও ক্ষুধাক্লিষ্ট সন্তান ও বিবির মুখের দিকে আর তাকাতে পারি না। এমনই আমার দুর্ভাগ্য নিজের মা বৌ বাচ্চাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না? এ হেন তুচ্ছ জীবন রেখে কী লাভ?

একদিন, কোনও উপায়েই আর কিছু সংগ্রহ করতে পারলাম না। আমার বিবি তার অঙ্গের শেষ বস্ত্রটুকু খুলে আমার হাতে দিয়ে বললো, যাও, এটা বেচে যাহোক কিছু এনে দাও। বাচ্চাটার মুখের দিকে আমি আর চাইতে পারছি না।

মনের ক্ষোভ মনেই চেপে পোশাকটা নিয়ে বাজারে গেলাম। সেখানে দোকানে দোকানে ঘুরে বিক্রির চেষ্টা করছি, এমন সময় খয়েরী রঙের উটের পিঠে এক বাদাবীকে দেখতে পেলাম।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো উননব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আমাকে দেখতে পেয়ে সে লাগাম টেনে উটটাকে থামালো। তারপর নিচে নেমে খুব বিনয়াবনত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মালিক, আপনি কী বলতে পারেন, অল আসারের পুত্র হাসান আবদাল্লার বাড়িটা কোন্ দিকে?

এক পরদেশীর মুখে একথা শুনে আমি আমার দৈন্যদশার কারণেই কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। হয়তো এই বিপদকালে আল্লাহই ওকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে আশীর্বাদ হিসাবে, কিন্তু তবু আমি নিজেকে উন্মুক্ত করে ধরতে পারলাম না ওর কাছে।

আপনি আরব-শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জনাব, এই কাইরো শহরে ও রকম নামের কোনও মানুষ তো কেউ বাস করে না।

আমি আর ওর সামনে দাঁড়াতে পারছিলাম না। কথা কয়টি বলেই পিছন ফিরে হন হন করে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু বাদাবী ছুটে এসে আমার হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরলো, খোদা হাফেজ, আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো, আপনিই শেখ হাসান আবদাল্লা কিনা? আপনার বাবাই তো অল আসার? আমি বুঝতে পেরেছি কেন আপনি নিজের পরিচয় গোপন করতে চাইছেন। বাড়িতে মেহমান এলে তাকে কী করে সমাদর করবেন এই আশঙ্কাতেই আমাকে এড়াতে চাইছেন, তাই না?

ওর কথায় আমি আর অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। আমি কাতর অনুনয় করে বললাম, আমাকে দয়া করে মাফ করুন, আমাকে ভুলে যান।

কিন্তু সে কথায় সে কান দিলো না। আমাকে অনেক আদর সোহাগ করে চুম্বন করতে লাগলো।

—কেন, ভাইসাব এতো দ্বিধা কেন? সব দিন মানুষের সমান যায় না। ধর, আমি যদি তোমার সহোদর বড় ভাই হতাম? পারতে কী মুখ ফিরিয়ে নিতে?

এর পর আর কথা চলে না। আমি ওকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এলাম। উটের পিঠে চাপলো না, আমার পাশে পাশে সে হেঁটেই এলো। সারাটা পথ আসতে আসতে শুধু একটা চিন্তাই আমাকে দংশন করতে থাকলো—মুসাফির মেহমানের সামনে ধরার মতো কোনও সম্বলই তো আমার নাই।

ঘরে ফিরে বিবিকে বললাম সব কথা। —জান বিবিজান, মনে হচ্ছে আল্লাহ স্বয়ং পাঠিয়েছে এঁকে। আর আমাদের দুঃখ কষ্ট থাকবে না, দেখে নিও।

আমার বিবি বললো, কিন্তু সে তো হলো, এখন কী খেতে দেব মেহেমানকে। হাদিসে আছে ঘরে অতিথি এলে পুত্র-কন্যাদের খানাপিনাও তার প্রাপ্য! তুমি দেরি করো না। ছুটে বাজারে যাও। যে দামেই পারো পোশাকটা বেচে কিছু সওদা করে নিয়ে এসো। অতিথি সৎকার শেষে যদি কিছু বাঁচে তবে আমাদের ভোগে লাগবে।

আমি বললাম, কিন্তু এখন বাড়ি থেকে বাইরে বেরুবো কি করে? বৈঠক খানায় ওকে বসিয়েছি। বেরুতে গেলে ওর সামনে দিয়ে বেরুতে হবে। তা কি তিনি হতে দেবেন? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করবেন, তোমার কামিজের তলায় কী নিয়ে যাচ্ছ ভাই, দেখি? তখন আমি কী বলবো ওকে?

বিবি বললেন, কিন্তু তা বলে অতিথিকে অভুক্ত রেখে চক্ষুলজ্জা নিয়ে ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না গো।

মহা সঙ্কটে পড়লাম। কিন্তু কিই বা উপায়, বাইরে বেরুতে গিয়েই বাদাবী ভাই-এর জেরার মুখে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—দেখি ভাইসাব দেখি, কামিজের তলায় ওটা কী?

আমি থতমত খেয়ে বলি, কই না তো, কিছু না।

—খোদা মেহেরমান, আমার কাছে গোপন করো না ভাই। বলো কী নিয়ে যাচ্ছ—এবং কেন?

আমি পোশাকটা বের করে দেখালাম ওকে। বললাম, আমার বিবির বড় শখের জিনিস। এবং এটাই শেষ সম্বল আমাদের। এতদিন আঁকড়ে ধরেছিলাম। কিন্তু আজ আর কোনও উপায় নাই। তাই বাজারে বেচতে যাচ্ছি।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তুমি না আমাকে বড় ভাই বলে ঘরে এনেছ? একজন মেহমানের পরিচর্যার জন্য তুমি বিবির এই শখের জিনিসটা বিক্রি করতে যাচ্ছ? এই নাও, দশটা দিনার। যাও, যা প্রাণ চায় কিনেকেটে নিয়ে এসো। আমরা সবাই মিলে আজ ফলার খাবো।

সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে দিনারগুলো আমার হাতে গুঁজে দিলো। আমি না করতে পারলাম না।

সেই শুরু হলো। প্রতিদিন বাদাবী আমাকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বাজার করে আনতে বলে। আমিও নানারকম চর্ব্য-চোষ্য জাতীয় খানাপিনা কিনে মহাস্ফূর্তিতে দিন কাটাতে লাগলাম।

এইভাবে পনেরোটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। ষোল দিনের দিন বাদাবী সর্দার আমাকে বললো, আচ্ছা হাসান আবদাল্লাহ, তুমি কি নিজেকে বিক্রি করতে চাও?

আমি পরিহাস মনে করে তৎক্ষণাৎ জবাব দিই, বান্দা তো আপনার কাছে বিক্রি হয়ে আছে মালিক।

বাদাবী এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, কী দাম দিলে নিজেকে বিক্রি করবে তুমি?

আমি তখনও লঘুভাবে নিচ্ছি ও-কথাগুলো। বললাম একখানা কোরাণ আর এক হাজার দিনার—এই তো যথেষ্ট এতেই আমার চলবে।

—আমি তোমাকে দেড় হাজার দিনার দেব, আবদাল্লাহ, তুমি রাজী?

হঠাৎ কেমন খটকা লাগলো বাদাবীর কথায়। নাঃ, ও তো তামাশা মজাক ফজাক করে বলছে না এসব। সত্যি সত্যি ব্যবসাদারী চালে দরাদরি করছে। আমি তখন নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে গেছি। ওকে এক রকম কথাই দিয়ে দিয়েছি, হাজার দিনার পেলেই আমি ওর হয়ে যাবো। তার বদলে সে বদান্যতা দেখিয়ে বলেছে দেড় হাজার দেবে। আমি ভাবলাম, বাদাবী মন্দ প্রস্তাব করেনি। বৌ বাচ্চার মুখের দিকে আর তাকানো যায় না। টাকাটা পেলে এরা দু'টো খেয়ে বাঁচবে। আর আমার জীবন? ও নিয়ে আমার কোনও মায়া মমতা নাই। যদি কেউ ফাঁসী দেবার জন্যেও কিনে নিতে চায় আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু সংসারে আমিই, তো সবই নই। আমার বিবি আছে মা আছেন। তাদেরও অনুমতি দরকার। বললাম আমি একবার বিবিকে জিজ্ঞেস করে দেখি। আমার নিজের দিক থেকে বিন্দুমাত্র অমত নাই। আমাকে একটু সময় দিন, মালিক।

—বেশ তো, ভেবে চিন্তে আলাপ আলোচনা করেই আমাকে বলো। এতো তাড়াহুড়োর কী আছে?

এই বলে আমাকে ছেড়ে সে তার নিজের কাজে বেরিয়ে পড়লো।

তারপর শুনুন, জাঁহাপনা, আমার মা বৌকে সব কথা বলতে তারা কেঁদে কপাল চাপড়াতে থাকলো।

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, দেখ, তোমরা অবুঝ হয়ো না। যে নিদারুণ দুঃখের দিন দেখেছ এর আগে, এই বাদাবী আসার পর তা কেটে গেছে, বলা যায়। এবং আমার ধারণা, তার প্রস্তাব মেনে নিলে তোমরা সকলে খেয়ে পরে বাঁচবে? এ ছাড়া এখন যদি তার কথা না শুনি সে হয়তো রেগে গিয়ে বলবে, এতদিন তোমার খাওয়ার জন্য যে টাকা দিয়েছি তা ফেরত দিয়ে দাও। তখন আমি কোথা থেকে সে ঋণ শোধ করবো?

আমার বিবি এবং মা শঙ্কিত হলো। তাইতো শয়তান বাদাবীটা যদি টাকার দাবি তোলে তাহলে কী উপায় হবে?

মুখে আর না বলতে পারলো না ওরা। বিকেলে বাদাবী ফিরে এলে আমি বললাম, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি।

বাদাবী তখুনি পনেরোশো দিনার গুণে আমাকে দিলো।

—পয়গম্বরের কাছে প্রার্থনা জানাও, আবদাল্লাহ তোমার ওপর যেন সদয় থাকেন। তাহলে ভাইজান, এখন থেকে তুমি আমার কেনা সম্পত্তি হলে? তোমার আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। আমার কাছে সুখেই থাকবে। স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হবে না কিছুমাত্র। আমি শুধু তোমাকে আমার সুদূর যাত্রাপথের এক বন্ধু সহচর করে রাখবো। জানতো পয়গম্বর বলেছেন ঃ বিদেশ ভ্রমণ কালে সঙ্গীই সবচেয়ে বড় পাথেয়।

আমি প্রফুল্ল মনে সেই পনেরশো দিনারের তোড়াটা নিয়ে মা এবং বিবির কাছে গেলাম। তারা তখন অঝোরে কাঁদছিলো। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম ওদের, বাদাবী আমাকে তার আপনজন করেই রাখবে, তোমরা কোনও দুশ্চিন্তা করো না আমার জন্য।

কিন্তু সে-কথায় কী প্রিয়জনকে ভোলানো যায়?

—না না, ঐ রক্তমাখা টাকা আমরা ছোঁবো না। তার চেয়ে না খেয়ে মরবো সে-ও ভালো।

আমি বললাম, তোমরা যা ভয় করছো, তা হবে না। বাদাবী খুব সুন্দর মানুষ। আমাকে কেনার তেমন বিশেষ প্রয়োজন ছিলো না তার। শুধু তোমরা কষ্ট পাবে জেনেই সে অনুগ্রহ করে এটা করলো।

আপনজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাদাবীর সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

বাদাবী-সর্দার প্রথমে আমাকে বাজারে নিয়ে গেলো। সেখান থেকে তাজা তাগড়াই দেখে একটা উট কিনলো আমার জন্য। তারপর সাজ-পোশাক খাবার-দাবার অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় নানারকম সামানপত্র কিনে চাপিয়ে দিলো তার পিঠে। আমি উঠে বসলাম আমার উটে আর বাদাবী তার নিজেরটায়।

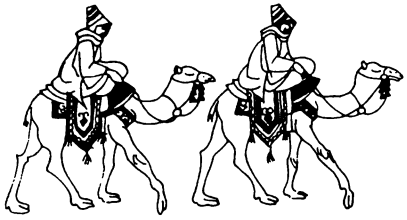

তারপর যাত্রা শুরু হলো।

মরুভূমির তপ্ত বালুকারাশির মধ্য দিয়ে একটানা দশ দিন চলতে থাকলাম। সে এক দুঃসাহসিক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। জীবনে এমন অভিজ্ঞতার স্বাদ এই প্রথম পেলাম।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো নব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এগার দিনের দিন আমরা এসে পৌঁছলাম এক শস্য-শ্যামল প্রান্তরে। আনন্দে নেচে ওঠে মন।

সবুজ ক্ষেত পার হয়ে এক বিস্তীর্ণ রুপালী মাঠ। মাঠের মাঝ-বরাবর একটি গ্রেনাইট পাথরের উঁচু পাহাড়ের চূড়াটা দেখে মনে হয় এক তাম্রবর্ণ বিশাল বপু যুবক শীর্ষাসন করে আছে। তার বিস্তৃত ডান হাতের মুঠোয় ধরা পাঁচটা বিরাট চাবি। প্রথম চাবিটা সোনার, দ্বিতীয়টা রূপার, তৃতীয়টা তামার, চতুর্থটা লোহার এবং পঞ্চমটা সীসের তৈরি। সবগুলোই দেখতে বড় অদ্ভুত ধরনের।

এই চাবিগুলো এক একটা নিয়তির প্রতীক। সোনাটা দুঃখের, রূপারটা কষ্টের, তামারটা মোউৎ-এর, লোহারটা যশের এবং সীসারটা সুখের এবং জ্ঞানের।

কিন্তু এতো সবের আমি কিছুই জানতাম না। এবং সেই কারণেই আমার জীবনে নেমে এসেছিলো গভীর দুঃখ বেদনা।

মিনারের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম আমরা। বাদাবী তার উটের পিঠ থেকে নেমে পড়লো। দেখাদেখি আমিও নামতে যাচ্ছিলাম এমন সময় দেখি, বাদাবী ধনুকে তীর জুড়ে মিনার শীর্ষের সেই ঊর্ধ্বচরণ যুবকের দিকে তাক করছে। বাঁ হাতে ধনুকটাকে বাগিয়ে ধরে তীরসুদ্ধ ছিলাটাকে বুকের কাছে টেনে এনে নিশানা করে ছুঁড়ে দিলো তীর। কিন্তু তীর ছোঁড়ার অভ্যাস বা তেমন দক্ষতা ছিলো না বলে বোধ হয় তাম্রমূর্তিকে আঘাত করতে পারলো না সে তীর। অনেকটা দূর দিয়ে চলে গেলো। আশাহত বাদাবী আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, এবার তোমার পরীক্ষা নাও, ধর, দেখি কেমন তোমার নিশানা। ঐ চাবিগুলোকে তাক করবে।

তীর ধনুকটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলো সে। ধনুকটা বড় সুন্দর। দক্ষ ভারতীয় কারিগরদের হাতে তৈরি।

প্রথম বাণেই আমি তাম্র-যুবকের হাত থেকে সোনার চাবিটা ফেলে দিলাম নিচে। ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে বাদাবীর হাতে দিতে গেলাম। কিন্তু সে নিতে চাইলো না, বললো, এটা তোমার কাছে রাখ, আমার চাই না। তুমি তো দেখছি চৌকস তীরন্দাজ—এটা তোমার দক্ষতার পুরস্কার।

সুতরাং স্বর্ণ চাবিটা আমার কোমরে গুঁজে রাখলাম। হায় তখন কী জানি সে চাবি দুঃখ-লোকের দরজা খুলে দেবে আমার জীবনে!

পরের বারে রুপার চাবিটাকে নামিয়ে আনলাম। কিন্তু বাদাবী সেটাও আমাকে দিয়ে

দিলো। যথারীতি ওটাকেও ট্যাকে গুঁজলাম আমি। এ চাবিটা কষ্টের পাথারে ডুবিয়ে দেবে আমাকে। কিন্তু সে-কথা তখন জানবো কী করে?

পরের দুই তীরে লোহা আর সীসার চাটি দু'টো পেড়ে আনলাম। এর প্রথমটা যশখ্যাতির এবং দ্বিতীয় সুখসমৃদ্ধি ও জ্ঞান গরিমার প্রতীক। বাদাবী আনন্দে নেচে উঠে দু'টোই নিজে নিয়ে নিলো। এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুম্বন করে বললো, খোদা তোমার মঙ্গল করুন। আচ্ছা যাও, এবার তুমি মুক্ত। আর তুমি আমার বান্দা নও।

আমি তার বদান্যতায় অভিভূত হয়ে গেলাম। লোকটা কত মহৎ কত উদার। এতো পয়সা দিয়ে আমাকে কিনেছিলো, এই সামান্য কাজের বিনিময়ে সে আমাকে মুক্ত করে দিলো! কৃতজ্ঞতায় মাথা অবনত হয়ে এলো। কোমর থেকে চাবি দু'টো বের করে বললাম, এ দু'টো আপনার। আপনি রাখুন।

বাদাবী আমাকে আদর সোহাগ করে বললো, না, ও দু'টো আমি তোমাকে দিলাম, ভাইজান।

আরও একটা চাবি তখন মিনার-শীর্ষের তাম্রযুবকের হাতে ধরা আছে, সুতরাং ওটাকেও নামিয়ে আনবো এই আমার ইচ্ছা। ধনুকে তীর জুড়ে সবে নিশানা ঠিক করতে পেরেছি, আর একটু হলেই তীরটা হাত থেকে বেরিয়ে যায় আর কি, এমন সময় বাদাবী ছুটে এসে ধনুক সুদ্ধ আমার হাতটা সজোরে নামিয়ে নিম্নমুখী করে দিয়ে প্রায় ভর্ৎসনা করেই বললো, আঃ, কি করছো! যে দুঃখ কষ্ট নিয়েছ তাই বয়ে বেড়াও—আবার ওটার দিকে নজর কেন?

তার এই অপ্রত্যাশিত ঊষ্মায় আমি সেই মুহূর্তে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। তীরটা জ্যাতে আর ধরে রাখতে পারলাম না। কিন্তু ধনুক নিম্নমুখী ছিলো, তাই তীরখানা আমার একখানা পায়ের পাতা ভেদ করে মাটিতে গেঁথে গেলো।

সে কি রক্তারক্তি কাণ্ড। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে গেলাম আমি। বাদামী অবশ্য তীরখানা পা থেকে ছাড়িয়ে ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে উটের ওপরে চাপিয়ে দিলো।

সেই শুরু হলো আমার দুর্ভাগ্যের দিন।

একটানা তিন দিন তিন রাত্রি ধরে মরুপ্রান্তর ভেঙ্গে চলেছি। পায়ের অসহ্য ব্যথায় প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি আমি। বাদাবী আমাকে মাঝে মাঝে সাহস দিয়েছে। কষ্টকে সইবার জন্য মন শক্ত করতে হয়। কিন্তু এই দুঃসহ যন্ত্রণা কী করে মুখ বুজে হজম করা সম্ভব?

খিদেয় পেট জ্বলছিলো। বাদাবী বললো, সামনেই একটা নদী পাবো। নদীর পাড়ে একটা বাগান আছে। হয়তো বরাতে থাকলে কিছু ফলটল মিলতে পারে।

অচেনা সব গাছ। ফলগুলোও সব অজানা। লাল রঙের। দেখতে বড় সুন্দর। তখন খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, পায়ের ব্যথা তুচ্ছ করে প্রায় বাঁদরের মতো লাফিয়ে একটা গাছের ওপরে উঠে গেলাম। ওঃ, যত সব টুকটুকে পাকা ফল। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে ফেলতে লাগলাম। তারপর নেমে এসে একটা ফল মুখে নিয়ে সবে কামড় বসিয়েছি হঠাৎ আমার ব্রহ্মতালু ঘুরে গেলো। কে যেন আমার চোয়ালে তুরপুন বিঁধে দিতে থাকলো। আমি আর হাঁ করে ফলটাকে মুখ থেকে বের করে ফেলতে পারি না। চিৎকার দেব তারও উপায় নাই। গোটা ফলটা আমার মুখ অবরোধ করে আছে। হাত পা ছুঁড়ে গোঁ গোঁ করতে করতে আছড়ে পড়ে গেলাম। আমরা অবস্থা আঁচ করতে না পেরে বাদাবী কাছে ছুটে আসে। চোয়ালের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফলটাকে বের করে ফেলে দেয়।

গাছতলায় যে ফলগুলো পড়েছিলো সেগুলো

কুড়িয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে বাদাবী বুঝতে পারে, ফলগুলোর গা ছোট ছোট সোঁয়া পোকায় ঢাকা। আমি খিদের জ্বালায় ওসব দিকে নজর করার খেয়াল করিনি। এই বিষাক্ত পোকাগুলোর বিষ-যন্ত্রণা তিন দিনের আগে উপশম হয় না। সারা মুখ ফুলে ঢোল হয়ে যাবে।

বাদাবীর কথা শুনে যন্ত্রণা আমার আরও বেড়ে গেলো। এই বিছে কামড়ের জ্বালা তিনদিন ধরে সহ্য করতে হবে! ওরে বাবা, এর চেয়ে যে মৃত্যু অনেক ভালো ছিলো।

ধীরে ধীরে আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়লো। যন্ত্রণায় আমি প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলাম সেই গাছতলায়। বাদাবী আমাকে পরিত্যাগ করেনি। সে আমার পাশেই রইলো। চারদিনের দিন সকালে অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। ফোলা এবং ব্যথা অনেকটা কমে এসেছে।

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। বাদাবী বললো, যাও না, ওদিকে নদী আছে, জল খেয়ে এসো।

আমি নদীর দিকে ছুটলাম। রুপার মতো ঝকঝকে পানি। যতটা পারলাম প্রাণভরে খেয়ে ফিরে এলাম।

বাদাবী বললো, চলো যাত্রা করা যাক। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেছে বোধ হয়। কিন্তু এখানকার কোনও ফল মুখে তোলা ঠিক হবে না। তার চেয়ে চলো, সামনে এগোই। একটা পাহাড় পাবো। তার নিচে অনেক গাছগাছালি আছে। সেখানে কিছু মিললেও মিলতে পারে।

আবার উটের পিঠে চাপলাম দু'জনে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই পেটে বেশ ব্যথা অনুভব করতে থাকলাম। যত এগোই ব্যথাটা বাড়তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সারা পেট জুড়ে অসহ্য ব্যথায় ছটফট করতে লাগলাম। প্রাণ যায় যায়—এমন অবস্থা।

বাদাবী বললো, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তার নাম জপ কর, কমে যাবে।

পাহাড়ের পাদদেশে এসে একটা সুন্দর উপবনে থামলাম আমরা। সামনে নানা জাতের নাম না জানা গাছপালা। বাদাবী সামনে এগিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্য থেকে একটা বাঁশের কোড়া জাতীয় একটা জিনিস কেটে নিয়ে এলো। ওপরের খোসা ছাড়াতে ভেতরে বেশ শাঁসালো বস্তু দেখা গেলো। বাদাবী বললো, খাও, পেটও ভরবে, তেষ্টাও যাবে!

খেয়ে দেখলাম—বেশ মিষ্টি। পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সারারাত সুখ-নিদ্রায় কাটলো।

সকালবেলায় শরীর মন বেশ ঝরঝরে বোধ হলো। বাদাবী বললো, কী, এখন বেশ ভালো লাগছে তো? আচ্ছা এবার তোমায় একটা কাজ করতে বলবো। ঐ যে পাহাড়ের চূড়াটা দেখছো ওখানে উঠে যেতে হবে। এখন সূর্য ওঠার দেরি আছে। চূড়ায় উঠে তুমি সূর্যোদয়-এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। কিন্তু সাবধান আরোহণের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ো না যেন। সূর্যের লাল আভা যখন দেখতে পাবে তখন পূর্বদিকে মুখ করে নমাজ পড়তে বসবে। তারপর নমাজ শেষ হয়ে গেলে নিচে নেমে আসবে। মনে থাকবে তো?

শরীরের ওপর দিয়ে ক'দিন অনেক ধকল গেছে, তবু বাদাবী আমার পরম হিতৈষী, তার কথা ঠেলতে পারলাম না। পায়ে তখনও বেশ ব্যথা ছিলো, তা সত্ত্বেও কোনও রকমে ওপরে উঠে গেলাম।

পাহাড়ের উপরিভাগ একেবারে ন্যাড়া। কোথাও আড়াল করে দাঁড়াবার উপায় নাই। অথচ প্রচণ্ড দমকা হাওয়ার দাপট ক্ষণেক্ষণেই আমাকে টালমাটাল করে ফেলছিলো। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না, হাওয়ার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সেই উন্মুক্ত পর্বত-শিখরে সটান শুয়ে পড়লাম আমি। দেহ অবসাদগ্রস্ত ছিলো, স্বভাবতই সঙ্গে সঙ্গে ঘুম জড়িয়ে ধরলো আমার চোখে।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো তাকিয়ে দেখলাম, সূর্য সবে উঠেছে। আমি দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য , কে যেন আমার পা দু'খানা জোর করে চেপে ধরে রেখেছে, কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, লক্ষ্য করলাম, আমার ঠ্যাং দু'খানা ফুলে কলা গাছের মতো হয়ে গেছে। পেটের দশাও তাই। মনে হচ্ছিল আমার পেটের মধ্যে কে যেন একটা আধমণি তরমুজ পুরে দিয়েছে। ফুলে ফেঁপে ঢবঢব করছে। ঘাড় কাঁধ কেমন যেন সিঁটকে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এদিক-ওদিক নড়াতে-চড়াতে পারছিলাম না।

এতৎসত্ত্বেও আমি বুকে বল সঞ্চয় করে অমানুষিক কায়দা কসরত করতে করতে এক সময় উঠে দাঁড়াতে পারলাম। আমার কেবলই আশঙ্কা হচ্ছিল, সময় মতো নামতে না পারলে বাদাবী হয়তো বা আমাকে ছেড়েই চলে যাবে।

ঐ অবস্থাতেও পূবদিকে মুখ ফিরিয়ে নমাজ সারলাম। অবাক হলাম আমার নমাজ শেষ হতে না হতেই সারা আকাশ ঘন তমসায় আবৃত হয়ে গেলো।

আমি আর অপেক্ষা না করে পাহাড়ের ধাপে ধাপে পা রেখে অতি সন্তর্পণে নিচে নামতে থাকলাম। পা দু'খানা দানবের মতো বিশাল দশমনি ওজনের বলে মনে হচ্ছিল। নিজের পা নিজেই টেনে ওঠাতে পারি না—এমনি আমার অবস্থা।

এভাবে ভারসাম্য রেখে কতক্ষণ আর ঠিক থাকা যায়, একবার একটু বেকায়দায় পা পড়তেই হড়কে গেলাম। ব্যস, তারপর গড়াতে গড়াতে পপাত ধরণীতলে। বলা বাহুল্য আমার কোনও চৈতন্য ছিলো না তখন। দেহের পোশাক-আশাক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে উড়ে গেছে। সারা অঙ্গে সহস্র ক্ষতে রক্তাক্ত। কী করে যে প্রাণে বাঁচলাম, তা আমার জীবনদাতা বাদাবী মালিকই জানে, আমি বলতে পারবো না।

কয়েকদিন পরে বাদাবীর পরিচর্যায় কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলাম। সে আমাকে ভরসার বাণী শোনাতে লাগলো।

—অনেক বরাত করে এসেছ, ভাই, তা না হলে ঐ রকম পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়ার পর কেউ বাঁচতে পারে না। যাক, ফাঁড়া ছিলো কেটে গেছে, এবার তোমার ভাগ্যের চাকা অন্যপথে ঘুরবে আল্লাহকে ডাকো, তাঁর ওপর ভরসা রাখো। বুকে সাহস আনো। এরপর আমাদের এক নতুন সন্ধানে পা বাড়াতে হবে। জীবনের অনেকগুলো বছর আমি তার অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনে হচ্ছে, এবার তার পথের নিশানা আমি পেয়ে গেছি। খোদা হাফেজ, চলো তার নাম করে ঝাঁপিয়ে পড়ি, বরাত যখন খুলেছে, আল্লাহ নিশ্চয় পাইয়ে দেবেনই।

এরপর কোমর থেকে তরবারী বের করে সামনে পুঁতে দিয়ে সে বললো, এই—এইখানে খুঁড়তে হবে। এখানেই পাওয়া যাবে সেই গুপ্তধনের সন্ধান। এসো, এসো, আর দেরি করো না ভাইজান, হাত লাগাও। ঘায়ের ব্যথা-বেদনা সব ভুলে যাও এখন। তুমি আন্দাজ করতে পারবে না, যে বস্তুর সন্ধানে আমি হন্যে হয়ে দেশে দেশে ফিরছি, তার সন্ধান পেলে, বেহেস্ত কোন্ ছার, সুখ-সম্ভোগ আর ঐশ্বর্য-সম্ভারের সীমা পরিসীমা থাকবে না আমাদের।

কিন্তু ওর ঐ দারুণ উৎসাহ-ব্যঞ্জক কথাবার্তাতেও আমাকে বিন্দুমাত্র চাঙ্গা করতে পারলো না। দেহে শক্তি বলতে এক ফোঁটা কিছু নাই। সারা অঙ্গে ব্যথা, ক্ষতয় জ্বর-জ্বর। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি উঠে বসতে পর্যন্ত পারলাম না।

এবার বাদাবী বেশ রাগতভাবেই বললো, শোনো হাসান আবদাল্লা, তোমাকে যা বলছি তা শুনছো না। তার ফলে তোমাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। আমি বলেছিলাম, সাবধান, পাহাড়ের মাথায় উঠে ঘুমিয়ে পড়ো না কখনও, সর্বনাশ হবে। আমার বারণ

সত্ত্বেও তুমি সে কাজই করলে। ফলে, এখন দেখছো, এ কী দুর্ভোগে ভুগতে হচ্ছে। ঐ পাহাড়ে শয়তানের বাতাস লেগেছে তোমার হাড়ে। শরীরের সব খুন জহর করে দিয়ে গেছে সে।

বেশ ক্রোধের সঙ্গেই সে বলে গেলো কথাগুলো। কিন্তু তখন আমি দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে কাঁপছি দেখে কিছুটা শান্ত হয়ে বললো, ভেবো না, আমি তোমার ওপর খুব রেগে গেছি। আমি তোমাকে আমার সব রকম চেষ্টা দিয়ে সারিয়ে তুলবো।

এই বলে সে তার কোমর থেকে একখানা তীক্ষ্ণ ফলার ছুরি বের করে আমার সারা দেহের নানা জায়গায় ফুটিয়ে দিয়ে শরীরের বিষাক্ত পানি বের করে ফেলতে লাগলো।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে অনেক পানি বের করার পর শরীরটা কিছুটা হাল্কা বোধ হতে থাকলো। বাদাবীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে বসতে পারলাম এক সময়।

এরপর দু'জনে মিলে বাদাবীর নির্দেশিত জায়গায় গর্ত খুঁড়তে লেগে গেলাম। অনেক মাটি তোলার পর গর্তটা বেশ বড় এবং গভীর হয়ে গেলো। এক সময় দেখলাম, একটা পাথরের গম্বুজ মতো কি একটা বেরিয়ে আসছে। উৎসাহ বেড়ে গেলো অনেক। শরীরের ব্যথা-বিষ আর তেমন অনুভব করতে পারলাম না তখন। ক্ষিপ্রহাতে মাটি কেটে গম্বুজটাকে পরিষ্কার করতে থাকলাম।

বাদাবী গম্বুজটা দু'হাতে ধরে টানাটানি করতে করতে ওপরের ঢাকনাটা খুলে বেরিয়ে এলো।

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, অসংখ্য ছোট বড় মানুষের কঙ্কাল আর তার ওপর ছাগলের চামড়ায় লেখা একখানা ঐ পাণ্ডুলিপি, যেটা আপনি এখন হাতে ধরে আছেন।

আমার মালিক ছোঁ মেরে এই চর্মপত্রখানা তুলে নিলো তার হাতে। উত্তেজনা, এবং কী এক অজানা শঙ্কায় ঠকঠক করে সে কাঁপছিলো তখন। যদিও পাণ্ডুলিপির ভাষাটা দুর্বোধ্য, তবু চোখের সামনে মেলে ধরে পাঠোদ্ধারের জন্য ছটফট করতে থাকলো।

অনেকক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থাকার পর এক সময় সে জয়োল্লাসে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলে বললো, পেয়েছি—পেয়েছি আবদাল্লাহ, এতদিনের স্বপ্ন আমার সার্থক হয়েছে। সেই অমর্তলোকের নিশানা আমি খুঁজে পেয়েছি এতকাল পরে। আবদাল্লাহ, আনন্দ কর, নাচো গাও—আর কোনও ভাবনা নাই। আবার আমরা সঠিক পথ ধরে যেতে পারবো সেই স্বপ্নপুরীতে। আজ পর্যন্ত কোন মানুষ সাদ্দাতের ঐ মিনারের দেশে যেতে পারেনি। কিন্তু আমাদের যেতে বিশেষ কোনও অসুবিধে হবে না। ঐ মিনারপুরীতে পৌঁছতে পারলেই আমরা সেই লাল গন্ধকের কৌটোটা উদ্ধার করে আনতে পারবো।

আমি বললাম ঐ লাল গন্ধক দিয়ে কী হবে?

—কী হবে? পাগল—তুমি কিছুই জান না। তামাম দুনিয়ার সব ধনরত্ন করায়ত্ব করার বীজমন্ত্র আছে ঐ গন্ধকে।

আমার শরীর আর চলছিলো না। তা ছাড়া পথের বিপদে আমার বড় ভয়। বললাম, আমাকে মেহেরবানী করে ছেড়ে দিন, মালিক। যদি ও আপনার সৌভাগ্যে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি, তবু বলছি ঐসব ধন-সম্পদে আমার কোনও লোভ নাই। আমি মা বৌ-বাচ্চাদের কাছে ফিরে গিয়ে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে চাই। আপনি আমাকে রেহাই দিন।

বাদাবী আমার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকালো।

—বেচারা! এতো যে দুঃখ-কষ্ট সয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অতটা পথ এলাম সে কি শুধু আমার একার লাভের জন্য?

আমি বিনীতভাবে বলি, তা আমি জানি, মালিক। কিন্তু আমার কপালে অত ঐশ্বর্যর অত সুখ সইবে না। কারণ, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এক এক যাত্রায় আমাদের দু'জনের দু'রকম ফল হচ্ছে। আমি যা করতে যাচ্ছি তাই আমার কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দুঃখ-যন্ত্রণার সীমা

থাকছে না। কিন্তু আপনার বেলায় তো তা ঘটছে না। তাই বুঝতে পেরেছি, ওসব ঐশ্বর্য সম্পদ আমার জন্যে বরাদ্দ করে রাখেননি তিনি।

আমার এসব দুঃখ বিলাপে কর্ণপাত করলো না বাদাবী। তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে সামনের ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলো এবং অনেকগুলো সেই বাঁশের কোড়া জাতীয় খাবার বস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে এসে বললো, নাও, আর দেরি নয়, ওঠ, চেপে বস।

সে তার নিজের উটে এবং আমি আমার উটে চেপে বসলাম। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে সোজা পশ্চিম দিকে চলতে থাকলাম আমরা। একটানা তিন দিন তিন রাত্রি চলার পর এক নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। এই নদী গলিত পারদ-প্রবাহিনী। ওপারে পার হওয়ার একটি সরু সেতু আছে। সেতুটি স্বচ্ছ স্ফটিকে নির্মিত। কিন্তু উপরিভাগ পিচ্ছিল, পা রাখামাত্র হড়কে নিচে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

আমার মালিক কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ালো না। উট থেকে নামলো। আমাকেও নামতে বললো। বাদাবী একটা ঝোলা থেকে দু'জোড়া পশমের জুতো বের করে এক জোড়া আমাকে দিয়ে বললো, আমি যেমন করে পরছি দেখে দেখে তেমনি করে পরে নাও।

জুতো পরার পর বাদাবী আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললো, একদম আমাকে ছাড়বে না। শক্ত করে ধরে খুব সন্তর্পণে দেখে-শুনে পা ফেলবে।

আল্লাহর মর্জিতে পায়ে পায়ে পার হয়ে গেলাম সেই মরণ-সেতুটি।

কয়েক ঘণ্টা সামনের দিকে পথ চলার পর এক কৃষ্ণ উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম আমরা।

দু'পাশে গগনচুম্বী পাহাড়, মাঝখান দিয়ে পথ। পাহাড়ের গায়ে গজিয়েছে বিশাল বিশাল পাইন বৃক্ষ। তার ছায়া-ঘন কালো কুটীল অন্ধকার নেমে এসেছে সারা পর্বতপথে। এদিক-ওদিক নজর পড়তেই আমার পীলে চমকে উঠলো। সেই সব গাছের ডালে জড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর সব পাহাড়ী সাপ। ওদের হাঁ-তে গোটা একটা হাতী ঢুকে যেতে পারে। ভয়ে শিঁউরে উঠে আমি দৌড়ে এগিয়ে পালাতে যাই। কিন্তু পালিয়ে যাবো কোথায়? পাহাড়ের পথ আর ফুরায় না। এবং সারা পথব্যাপীই এই একই ভয়াবহ দৃশ্য।

আমি চোখ ঢেকে পথের ওপরে বসে পড়লাম। কান্নায় কণ্ঠ বুঁজে এলো, ইয়া আল্লাহ, এ কোথায় দোজকের দরজায় নিয়ে এলে তুমি! এর চেয়ে অনাহারে প্রাণত্যাগ করাও যে ভালো ছিলো আমার।

বাদাবীর পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে কাতর কাকুতি করে বললাম, আপনি আমার বিবি বাচ্চাদের জানে বাঁচিয়েছেন। সে কৃতজ্ঞতা কখনও ভোলার নয়। কিন্তু একি করলেন আপনি? এমন ভয়ঙ্কর দেশে কেন নিয়ে এলেন আমাকে? এর চেয়ে এক কোপে কাল্লাটা কেটে নামিয়ে দিলে তো পারতেন মালিক? হায় আল্লাহ, কেন আপনার কাছ থেকে অনুগ্রহ নিতে গিয়েছিলাম আমি? না হয় খেয়ে না খেয়ে কোনও রকমে দারিদ্র্য-যন্ত্রণাতেই দিন কাটাতাম। তবু তো আপন জনের কাছে আপন দেশেই মরতে পারতাম! কেন আপনি আমাকে সুখের লোভ দেখালেন?

বাদামী একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আমাকে থামিয়ে দিলো, আঃ থাম। ধৈর্য ধর, বুকে সাহস সঞ্চয় কর নওজোয়ান। তুমি না পুরুষমানুষ! ভয় নাই, কেউ তোমাকে সংহার করতে পারবে না। আমরা আবার কাইরো ফিরে যাবোই। এই প্রত্যয় মনে থাকা চাই। কেউ আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। আর যখন আমরা দেশে ফিরবো তখন আর আমাদের কোনও দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা কিচ্ছু থাকবে না। বদলে পাবো অতুল ঐশ্বর্য সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিলাস।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো বিরানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এই বলে বাদাবী মালিক আমার পাশে বসে পড়ে সেই চর্মপত্রখানা বের করে নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করতে থাকলো। তার একাগ্রতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আশেপাশে ঐ সর্পভয় তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। মনে হলো, সে যেন তার নিজ গৃহের নিভৃত শয়নকক্ষে নিঃশঙ্ক চিত্তে বসে রয়েছে। আমি কিন্তু ভয়ে মরি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাণ্ডুলিপি পাঠ করার পর বাদাবী মুখ তুলে বললো। হাসান আবদাল্লা ঝটপট এই জায়গাটা থেকে সরে পড়তে চাও?

—আলবাৎ—একশোবার চাই। আপনি বিশ্বাস করুন, মালিক, অর্থ বা সুখে আমার প্রয়োজন নাই। আমাকে দুঃখ তাপের মধ্যেও আমি আমার বাচ্চা বৌ-এর সঙ্গে দিন কাটাতে চাই। আপনি আমাকে কষ্ট দেবেন না মালিক। আপনি যদি বলেন, আমি আগাগোড়া কোরাণ কণ্ঠস্থ আওড়াতে পারি আপনার কাছে। আপনি যদি হুকুম করেন, আল্লাহর সব পবিত্র বাণী আপনাকে শোনাতে পারি এখনি। যদি বলেন, আপনার পূণ্যার্থে দশ বছর ধরে মক্কা মদিনাতে মোনাজাত করতে পারি আমি। এ ছাড়াও আপনি আরও যা যা ফরমাশ করবেন সবই আমি হাসিমুখে তামিল করে যাবো, কিন্তু একবার আমাকে দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিন।

বাদাবী আমার দিকে স্নেহকোমল দৃষ্টিতে তাকালো একবার।

—না হাসান আবদাল্লাহ, অত বড় বড় কঠিন কাজ তোমাকে করতে হবে না আমার জন্য। এর পরের পথটুকু অত্যন্ত সুগম। কিন্তু তার আগে আর একটি কাজ করত হবে তোমাকে।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, কী কাজ?

বাদাবী তীর-ধনুকটা এগিয়ে দিয়ে বলে, সামনে এগোলে অনেক সাপের মধ্যে একটা বিরাট বড় কৃষ্ণফণার সাপ দেখতে পাবে। ঐ সাপটাকে তীর-বিদ্ধ করে মারতে তোমার মতো বিচক্ষণ তীরন্দাজের এমন কিছুই বেগ পেতে হবে না! সাপটাকে মেরে তার কাল্লা আর কলিজা কেটে নিয়ে আসবে আমার কাছে। ব্যস, এরপর আর তোমার কোনও কাজ নাই।

—ইয়া আল্লাহ। এই কী একটা সোজা কাজের বায়না হলো। না না, আমি পারবো না, কিছুতেই পারবো না ঐ বিষধর কালনাগিনী মারতে। কেন, অতই যদি সহজ মনে করেন, নিজে মেরে আনুন না? আমি মরে গেলেও পারবো না।

বাদাবী আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, হাসান আবদাল্লাহ সব কথা কী ভুলে গেলে ভাই? মনে করে দেখ, তোমার বৌ ছেলের মুখে যে খানা জুটছে তা কী জন্য?

আমি কেঁচোর মতো কুঁকড়ে গেলাম। কান্নায় ভরে এলো দু'চোখে জল। তীর-ধনুকটা নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

অতি সহজেই দেখা মিললো সেই কালনাগিনীর। তার বিশাল উদ্যত ফণা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লাম। একটা ড্রাগনের মতো দাপাদাপি করতে করতে একটু পরে সে নেতিয়ে পড়ে গেলো। কোমর থেকে ছোরা বের করে ওর কাল্লা আর পেট চিরে কলিজাটা কেটে এনে বাদাবীর সামনে রেখে বললাম, এই নিন।

বাদাবী খুব তারিফ করলো আমার কাজের। বললে, তুমি ছাড়া এ কাজ আর কে করতে পারতো এতো সহজে? আচ্ছা এবার একটু আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে দাও।

আশপাশ থেকে গাছের ডালপালা কুড়িয়ে এনে পালা দিলাম। বাদাবী একখণ্ড হীরে বের করে সূর্যকিরণে মেলে ধরতে কিছুক্ষণের মধ্যে শুকনো ডালপাতায় আগুন জ্বলে উঠলো। তখন সে ঝুলি থেকে একটি ছোট্ট লোহার হাঁড়ি এবং পলার পাথরের সরু একটা চোঙ্গা বের করে বললো, এই যে পলার চোঙ্গাটা দেখছো আবদাল্লা, জান, এর মধ্যে কী আছে।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, কী করে জানবো, আপনি তো বলেননি কখনও।

বাদাবী বললো, এর মধ্যে ফিনিক্স পক্ষীর খুন আছে।

চোঙ্গার মুখের ছিপিটা খুলে লোহার হাঁড়িটার মধ্যে রক্তটুকু ঢেলে দিলো সে। তারপর গনগনে আগুনের উপর বসিয়ে দিলো হাঁড়িটাকে। এরপর সেই সাপের কাল্লা আর কলিজা দু'টোও ছেড়ে দিলো হাঁড়িটার মধ্যে। তারপর আপনার হাতের এই চর্মপত্রখানা মেলে ধরে সে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াতে থাকলো।

একটুক্ষণ পরে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমাকে বললো, আমার ঘাড়ে কাঁধে খুব ভালো করে এই হাড়ির পাঁচনটা মালিশ করে দাও তো।

মালিশ করতে করতে আমি লক্ষ্য করলাম ওর কাধের মাংসল জায়গা দু'টো আস্তে আস্তে থলথলে নরম হয়ে আসছে। এরপর দেখা গেলো দু'পাশ থেকে দু'খানা ডানা বেরিয়ে পড়ছে। ক্রমশঃ ডানা দু'খানা বেশ বড়সড় হয়ে গেলো একেবারে ঈগল পাখীর মতো।

এবার বাদাবী পাখা দু'খানা আস্তে আস্তে নাড়তে নাড়তে ওপরে ওড়ার চেষ্টা করতে থাকে। আমি দেখলাম বাদাবী আকাশে উড়বে উড়বে তাক করছে। ওর কামিজের খুঁট খুব শক্ত করে চেপে ধরে রইলাম। বাদাবী ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পলকের মধ্যে শূন্যলোকে উঠে গিয়ে বায়ুবেগে আকাশপথে উড়ে চললো। আমিও চললাম ঝুলতে ঝুলতে।

জানি না, জাঁহাপনা, ঐ ভাবে কতক্ষণ আমরা আকাশপথে উড়ে চলেছিলাম। তবে এক সময় বুঝতে পারলাম, সেই কৃষ্ণ পর্বতমালা পিছনে ফেলে আমরা এক বিশাল বিস্তৃত সুবর্ণ প্রান্তর-শীর্ষে এসে গেছি। এই মাঠের চারপাশটা স্বচ্ছ নীল রঙের স্ফটিকের দেওয়ালে ঘেরা। মাঠের বালুকারাশি সুবর্ণধূলী। আর ছোটো ছোট নুড়িগুলো সব নানা রকমের হীরে জহরৎ।

এই প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে বাগান ঘেরা এক প্রাসাদ-নগরী। চারপাশে অজস্র সারি সারি মিনার।

বাদাবী বললো, এই সেই মিনার দেশ—সাদ্দাতের শহর।

পাখা দু'খানা ঈষৎ গুটিয়ে নিতেই শোঁ শোঁ করে নিচের দিকে নামতে থাকলাম আমরা।

ধীরে ধীরে ডানা দু'টো গুটাতে গুটাতে এক সময় শরীরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো, এবং তখুনি আমরা নিচে নেমে পড়লাম।

প্রাসাদ-নগরীর চারপাশ সোনার দেওয়ালে ঘেরা। প্রবেশদ্বার একটাই। পরপর সাতটা ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

ভিতরে একটা বিরাট ফুলবাগিচা। দুইপাশে দুই ফোয়ারা। অবিরল ধারায় পানি ঝরছে। মাঝখানে একটি মঞ্চ। সেই মঞ্চের উপরে একটি সোনার মসনদ। কিন্তু সে মসনদে কোন সুলতান বাদশাহ নেই কেউ। আছে শুধু একটি ছোট সোনার কৌটো—যেটা এখন আপনার হাতে আছে, জাঁহাপনা।

বাদাবী কৌটোটা তুলে নিয়ে খুললো। ভিতরে লাল রঙের খানিকটা গুঁড়ো।

সে চিৎকার করে উঠলো, দেখ দেখ, হাসান আবদাল্লাহ, এই সেই লাল গন্ধক—কি না।

আমি বললাম, কী একটা বাজে জিনিস নিয়ে অমন হৈ হৈ করছেন, মালিক। ওসব ফেলে দিয়ে এদিকে দেখুন, কত বড় বড় সব হীরে জহরত। এগুলো বরং পুটলি বেঁধে নিই, আসুন। আমি তো বাবা, যতটা পেরেছি পকেট ভর্তি করে নিয়েছি।

বাদাবী বলে, আরে, ওসব তুচ্ছ, ওসব রাখ। এই এক বিন্দু গুঁড়োতে ওরকম হাজার হাজার হীরে জহরত বানানো যাবে। আর, সাবধান এখানকার কোনও মণিমুক্তো সঙ্গে নেবার চেষ্টা করো না। তাহলে বাইরে পা দেবার আগেই নির্ঘাৎ মৃত্যু হবে তোমার।

তাড়াতাড়ি সে ছুটে এসে আমার পকেট থেকে সব হীরে জহরতগুলো বের করে ফেলে দিলো। কোমর-টোমর ভালো করে তলাশ করে দেখে নিলো। তারপর বললো চলো, আমাদের কাজ খতম। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবো না আমরা।

হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে সাতটা ফটক পার হয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। কিন্তু এ কি! সামনে বিশাল বিস্তীর্ণ স্বর্ণ-প্রান্তর এবং অসংখ্য মিনার দেখে গিয়েছিলাম—সে সব কোথায় উধাও হয়ে গেলো? তাকিয়ে দেখলাম, সেই পারদনদীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা।

সেই স্ফটিক-সেতু পার হলাম দু'জনে। আমাদের উট দু'টো যেন আমাদের জন্যেই পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিলো। দুটির পিঠে দু'জনে চেপে বসলাম। বাদাবী বললো, ব্যস, আর কোথাও নয়, সোজা মিশরে যাবো আমরা।

দু'হাত তুলে আল্লাহকে সালাম জানালাম।

আমার কোমরে তখনও সেই চাবী দুটি গোঁজা ছিলো, জানতাম না ওরাই আমাকে দুর্ভাগ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বার বার।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো তিরানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

অনেক দুঃখ দুর্বিপাক কাটিয়ে রুগ্নদেহে অবসন্ন মনে অবশেষে একদিন কাইরো এসে পৌঁছলাম। মনে আশার আলো ফুটলো। কতকাল পরে আবার আমার আপনজনের সঙ্গে মিলিত হবো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। ঘরে ফিরে কোনও জনপ্রাণীর সাড়া না পেয়ে শঙ্কিত হলাম। পড়শিরা জানালো, আমি চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই এক মহামারি রোগে পরিবারের সকলেই ইন্তেকাল করেছে।

আমি শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়লাম। হায় হায়, একি আমার ভাগ্য! যাদের মুখে অন্ন জোগাবার জন্য এতো দুঃখ কষ্ট সহ্য করলাম তারাই আমাকে ছেড়ে চলে গেলো?

বাদাবী আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, দেখ, চিরকাল কেউ বেঁচে থাকতে আসেনি এ সংসারে। সবাইকেই একদিন তাঁর চরণে আশ্রয় নিতে হবে। কেউ দু'দিন আগে কেউ দু'দিন পরে যাবে তাঁর কাছে। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আবার আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং এ নিয়ে শোক করতে নাই। যে আগে যেতে পারে, সেই বেশি ভাগ্যবান।

বাদাবী আমাকে হাতে ধরে অন্যত্র নিয়ে গেলো।

নীলনদের তীরে এক প্রাসোদোপম মনোহর ইমারত কেনা হলো একটি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকলো বাদাবী। আমার মনের দুঃখ লাঘব করার জন্য বাদাবী তার সম্পদের অর্ধেক আমাকে বাটোয়ারা করে দিলো। এবং কীভাবে ঐ গন্ধক গুঁড়োর সাহায্যে সীসাকে সোনায় রূপান্তরিত করা যায় তার কৌশলশিখিয়ে দিলো। সে প্রায় রোজই মণ মণ সীসা নিয়ে এসে সোনা করে তার অর্ধেক আমাকে ভাগ করে দিতে লাগলো। সে ভেবেছিলো, এইভাবে ধনসম্পদের মোহে আমি প্রিয়জন বিয়োগ-ব্যথা ভুলে আবার হাসি-গানে মেতে উঠবো। কিন্তু আমি তা পারলাম না। অর্থ আমাকে শোক তাপ ভুলাতে পারলো না।

আমার মালিক বাদাবী বিলাস-ব্যসনের মধ্যে বিলিয়ে দিলো নিজেকে। প্রতিদিন নানারকম বাদশাহী খানা-পিনা নাচ-গান আমোদ-প্রমোদের সমারোহ চলতে থাকলো। বাঁদীহাটের পরমাসুন্দরী বাঁদীতে ভরে উঠলো সারা প্রাসাদ। তাদের নূপুর -নিক্কণে অনুরণিত হতে লাগলো প্রাসাদের প্রতিটি মহল। স্বভাবতই ইয়ার-বক্সীদের ঘাটতি ছিলো না। অনেক

রথী-মহারথী আমির শাহজাদারাও মাইফেল করতে আসতে লাগলো নিয়মিত।

বাদাবী বড় দিলদরিয়া মানুষ। দান-ধ্যানে মুক্ত হস্ত। কেউ যদি কোনও সুন্দরী বাঁদীর গান বা নাচে মুগ্ধ হয়ে তারিফ করতো সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে তার হাতে তুলে দিয়ে বলতো, যদি মেহেরবানী করে আমার এই সামান্য দান গ্রহণ করেন, ধন্য হবো।

আমি কিন্তু ওর ঐ জলসা-ঘরে যাইনি কখনও। শোকের পাথরে আমি কুল খুঁজে পাই না, নিভৃতে নিজের ঘরে বসে বসে আত্মবিলাপ করে দিন কাটাই।

একদিন সে আমার ঘরে এলো। সঙ্গে একটি পরমাসুন্দরী লাজুক তরুণী। বাদাবী সুরার মৌজে মশগুল হয়েছিলো। খুশীর বন্যায় সে ভাসছিলো। আমার খুব কাছে এসে সে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো। মেয়েটিকে টেনে নিয়ে বসালো তার উরুর ওপর। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, হাসান আবদাল্লাহ, তুমি তো আমাকে কখনও গান গাইতে শোননি, না? আজ আমি তোমাকে গান শোনাবো একটা।

আমাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে সে উদাত্তকণ্ঠে গাইতে শুরু করলো ঃ

আজ রাতে সুরার নেশায় মাতাল আমি
তুমিও বন্ধু সঙ্গী হতে পারতে
কমলানেবুর, গাছগুলো আকাশের সব বাতাস
কী পান করে নিঃশেষ করে ফেলেছে?
আমাকে আর এক পেয়ালা পূর্ণ করে দেবে, বন্ধু?
আমার হৃদয়ে তুফান উঠেছে
দেখ দেখ, কত গোলাপের কুঁড়ি লুটিয়ে পড়েছে পায়ে!
যদিও তোমরা সবাই উলঙ্গ—সুন্দর
তবু ঐ যে এক ফালি ঈদের চাঁদ
তার তুলনা কোথায়?

গান শেষ করে বৃদ্ধ বাদাবী মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে আমার শয্যার একপাশে শুয়ে পড়লো। আমি ভাবলাম এবার সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

কিন্তু মেয়েটি মুহূর্তের মধ্যে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। তার চোখেমুখে সে কি নিদারুণ আতঙ্ক!

আমি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, কী? কী হলো? উঠে পড়ছো কেন?

মেয়েটির ইশারাতে বুঝতে পারলাম, আমার এতদিনের সঙ্গী মালিক বাদাবী বন্ধু চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে।

প্রাণপাখী দেহ ছেড়ে উড়ে গেছে, কিন্তু বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মিষ্টি মধুর একটু নরম হাসি তখনও লেগে রয়েছে ওর অধরে।

নিজের হাতে আতর-জলে ওর দেহখানা ধুইয়ে দিলাম আমি। শেষকৃত্যের সমারোহে কোনও ত্রুটি রাখিনি। একটি কর্মবীর সুখ-সমৃদ্ধ জীবনের অবসান হয়ে গেলো।

অনেক দান ধ্যান করলাম। হাজার হাজার ধনী দরিদ্র মানুষকে পরমাদরে আপ্যায়ন করে খাওয়ালাম। এইভাবে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ছিলো আমার মনিবের প্রতি শেষ কর্তব্য করলাম আমি।

মনিবের সব সম্পত্তির তখন আমি একমাত্র উত্তরাধিকারী। আপনার হাতের এই ছোট সোনার বাক্সটা খুলে দেখলাম। লাল গন্ধকের গুঁড়োয় ভর্তি ছিলো কৌটোটা। কিন্তু দু'হাতে অঢেল খরচ করতে করতে তার অনেকখানিই শেষ হয়ে গেছে। বাকী যেটুকু ছিলো তা এখনও

তেমনি আছে ঐ বাক্সে। আমি কিছু খরচ করিনি। কোনও প্রয়োজনই হয়নি। কারণ অর্থে আমার লোভ বা প্রয়োজন ছিলো না তখন। যাই হোক, এখন যেটুকু গন্ধকগুঁড়ো কৌটোটায় আছে তা আপনার সলতানিয়তের তামাম ঐশ্বর্যের চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান, জাঁহাপনা। সেই প্রথম আমি চর্মপত্রটি মেলে ধরলাম। বাদাবী আমাকে পাণ্ডুলিপি পাঠ করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছিলো। তাই পড়তে কোন অসুবিধা হলো না। পাণ্ডুলিপি পাঠ করে বুঝতে পারলাম আমি এতকাল ধরে সোনা আর রুপোর যে চাবি দু'টো অতি সযত্নে কোমরে গুঁজে রেখেছি তাই আমার যত দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ। সঙ্গে সঙ্গে চাবি দু'টোকে বের করে আগুনে পুড়িয়ে দিলাম।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো চুরানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চাবি দু'টো যখন আগুনে পুড়ছে ঠিক তখনই খলিফার পেয়াদা এসে দরজায় কড়া নাড়লো। দরজা খুলতেই তারা আমাকে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে গেলো সুলতানের সামনে।

সুলতান থাইলুন, আপনার পিতা, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আমি খবর পেয়েছি নকল সোনার কারবার চালাচ্ছো তুমি। এক্ষুণি আমার সামনে সব কায়দাকানুন খুলে বলো, না হলে কঠোর সাজা পেতে হবে।

আমি বলতে অস্বীকার করায় তিনি আমাকে বেদম প্রহার করালেন। কিন্তু আমি মুখ খুললাম না। তখন তিনি আমার হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তন্ন তন্ন করে এই কৌটোটা হস্তগত করে আমার প্রাসাদটা ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না তিনি।

কয়েদখানায় ছুঁড়ে দিয়েও ক্ষান্ত হলেন না তিনি। প্রতিদিন নিয়ম করে আমার ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চালাতে থাকলেন। তাঁর আশা ছিলো, অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন না একদিন আমি ঐ গুপ্ত রহস্য বলতে বাধ্য হবো। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি। কারণ আমার জেদ ছিলো, অন্যায় জুলুমের কাছে মাথা হেঁট করবো না আমি।

কিন্তু আজ চল্লিশ বছর পরে আমি এক অন্য মানুষ হয়ে গেছি। আজ আমার কোনও অহঙ্কারই নাই, জেদ নাই, লোভ মোহ উচ্চাশা কিছুই নাই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর পদাশ্রয়। তিনিই একমাত্র ভরসা। কী হবে আমার ঐশ্বর্যে, তাই আপনাকে আমি এই কৌটোর সব রহস্য অকপটে খুলে বলে দিলাম। আপনি সুলতান, আপনার অর্থের প্রয়োজন আছে। ওটা গ্রহণ করে আমাকে ভারমুক্ত করুন, জাঁহাপনা!

সুলতান মহম্মদ তখত থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ হাসান আবদাল্লাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

—খোদা হাফেজ, আপনার মতো সদাশয় মানুষ এতো শাস্তি কেন ভোগ করলো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই বিধাতার বিচার?

এরপর সুলতান মহম্মদ হাসান আবদাল্লাকে তার দরবারের প্রধান উজিরের পদে বহাল করে তার সুচিন্তিত পরামর্শ নিয়ে বহুকাল সৎভাবে হুকুমত পরিচালনা করেছিলো।

ঐ গন্ধক গুঁড়োর সাহায্যে শত শত মণ সীসা সোনায় পরিণত করেছিলো সুলতান। কিন্তু নিজের ভোগের জন্য সে সোনার একটা কণা কখনও ব্যবহার করেনি। তাবৎ মূল্যে

বিশাল এক মসজিদ বানিয়েছিলো সে। আজও মিশরের সেই সেরা মসজিদ সুলতান মহম্মদ ইবন থাইলুনের মসজিদ নামে জগদ্বিখ্যাত। শোনা যায় মসজিদটি বানাতে সাতহাজার মানুষের সাত বছর লেগেছিলো। আর অর্থ ব্যয় হয়েছিলো—সাড়ে সতের হাজার মণ স্বর্ণমুদ্রা।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ থামলো। সুলতান শারিয়ার বললো, বুঝলাম বিধিলিপি কেউ খণ্ডন করতে পারে না। তোমার কিস্‌সাটা শুনে মনটা বড় দুঃখে কাতর হয়ে গেলো, শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ জানতে চায়, কার কিস্‌সা শোনাবে, শাহরাজাদ বলে সুলতানের বয়স্য মজিদ অল দিন আবু তাহির মহম্মদের হাস্য-মধুর একটি কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

এক সময়ে কাইরো শহরে আবুকাশেম নামে এক অর্থগৃধ্ন উনুনী বাস করতো। আল্লাহ তাকে অনেক দিয়েছিলেন। বিষয় সম্পত্তি পয়সা কড়ির প্রাচুর্য ছিলো যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও লোকটির ধন-লিপ্সা আর কমে না। পয়সা বাঁচাবার সে কি প্রাণান্তকর প্রয়াস ছিলো তার। লোকে তাকে চশমখোর হাড়কঞ্জুস বলতো।

ওর সাজ-পোশাক দেখে পথের দীনতম ভিখিরি ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। আলখাল্লার মতো শত সহস্র তালিতাপ্তি দেওয়া একখানাই চোগাচাপকান বারোমাস তার অঙ্গে শোভা পেত। ঐ মহামূল্য অঙ্গবাস ছাড়া আবু কাশেমের আলাদা কোনও অস্তিত্ব কেউ কল্পনা করতে পারতো না। অনেকে তামাশা করে বলতো, আবু কাশেম মারা গেলে পর ঐ পোশাকটাকে যাদুঘরে রেখে দেওযা হবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের দেখার জন্য। কাশেমের মাথার তেল-চিটচিটে শতছিন্ন পাগড়ীটা ছিলো আরও বাহারী। এমন তার সুবাস— আতঙ্কে কেউ তার ধারে কাছে ঘেঁষতো না। সেই খুশবু একবার আঘ্রাণ করলে অন্নপ্রাশনের আহার্য আবার প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। কাশেমের চোগাচাপকান আর পাগড়ীর প্রকৃত বর্ণ কিরূপ ছিলো তা নিয়ে বহু চিন্তাবিদের বহুবিধ সারগর্ভ গবেষণা ছিলো। কারণ সৃষ্টির আগে থেকে, ঐ বেশবাস ওর অঙ্গে ওঠার পর আর কখনও জল স্পর্শ করেনি। সুতরাং কালে আর তেলে (জলে নয় কিন্তু) প্রকৃত বর্ণ কবে যে বিলীন হয়ে গেছে আজ আর তা কেউ স্মরণ করতে পারে না।

জুতোর অবস্থা ছিলো আরও মজাদার। এমন আজব জুতো কোনও কালে কেউ দেখেনি। সেলাইএ সেলাইএ জর্জরিত তার সারা অঙ্গ। আর সূচ বেঁধানোর কোনও জায়গা নাই। সবচেয়ে দেখার মতো ছিলো জুতোর চারপাশের দাঁত বের করা কাঁটাগুলো। ছোট বড় নানারকম কাঁটায় কণ্টকিত ছিলো। হঠাৎ কেউ দেখলে আঁৎকে উঠবে। কারণ কাঁটাগুলো মেসিন গানের মতো চারপাশে মোতায়েন করা হয়েছে বলে প্রতিভাত হবে। ভালো করে লক্ষ্য করলে অবাক হয়ে ভাবতে হবে, যে অসাধারণ দক্ষতায় রিপু-কর্ম করা হয়েছে, এবং তার ফলে জুতোর আসল চেহারা যেভাবে পরিবর্তিত হয়ে এক অভিনব নতুন আকৃতি লাভ করেছে কোনও সুনিপুণ মুচি এক যুগ কসরত করেও হুবহু ঐ রকম আর এক জোড়া বানিয়ে দিতে পারবে না। মোট কথা ওর জুতো জোড়াটার হাল নাল, কাঁটা সেলাই, ও জোড়াতালির এক জগঝম্প সংস্করণ বলা চলে। ওজনে এবং আয়তনে তার জুড়ি পাওয়া যাবে না। ভাবা যায় না, ঐ রকম আধমণি ওজনের একহাত লম্বা একজোড়া জুতো পায়ে নিয়ে সে অবাধে চলা-ফেরা করতো কী ভাবে! কিন্তু যারা কাশেমকে দেখেছে তারা ওর কেরামতি দেখে তারিফ না করে পারেনি। কাশেম জুতো পরে সারা শহর বার দশেক চষে ফেলতো রোজ। কোনও অসুবিধেই হতো না ওর। কাশেমের জুতো জোড়াটা তৎকালে কাইরোর কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলো। যদি কারও স্বভাব-চরিত্রকে জাঁদরেল বলে বোঝাতে চাইতো, লোকে বলতো; মানুষটা যেন কাশেমের চপ্পলের মতো বাজখাঁই। যদি কোনও মাদ্রাসার মৌলভীর গোমড়া মুখের বর্ণনা দিতে যেত, বলতো, লোকটার

মুখের দিকে তাকানো যায় না—যেন কাশেমের চপ্পল। কুলিরা একটু ভারি মোট বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতো, বাবা, এতো মোট না, কাশেমের চপ্পল। যদি কোনও লোক অভ্যাস দোষে কখনও নেমন্তন্ন বাড়িতে একটু বেশি মাত্রায় ভোজন করে পেটটা ডাঁই করতো, যারা পেট রোগা স্বল্পহারী তারা ঈর্ষাকাতর হয়ে চুকলি কাটতো, দেখ দেখ, লোকটা লোভে পরে খেয়ে পেটটা কেমন কাশেমের চপ্পলের মতো জয়ঢাক করে ফেলেছে। সত্যিকথা বলতে কি, সাধারণ মানুষ কারণে অকারণে কাশেমের জুতোর প্রসঙ্গ টেনে আনতো।

ব্যবসায় একদিন কাশেমের মোটামুটি মালকড়ি নাফা হলো। কাশেম ভাবলো, আজ সে পয়সা খরচা করে হামামে গোসল করে ভালোমন্দ কিছু একটা খানা-পিনা করবে। কাশেমের কুষ্ঠিতে এ ধরনের কথা লেখা নাই। কিন্তু কেন জানি না, বহুকাল পরে তার শখ হলো।

দোকানপাট বন্ধ করে জুতো জোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে সে হামামের দিকে ছুটলো। আজকাল সব সময় জুতো জোড়া সে পায়ে না দিয়ে বেশির ভাগ সময় কাঁধে ঝুলিয়েই চলা-ফেরা করতো। ওর ধারণা এতে পায়ে চোট লাগলেও জুতো জোড়াটায় তাপ্পি কম লাগাতে হবে।

হামামে পৌঁছে দোরগড়ায় জুতোটাকে সাজিয়ে রেখে সে ভিতরে ঢুকলো গোসল করতে। বছরখানেক জল স্পর্শ করেনি সে। সুতরাং কয়েক পর্দা ময়লা চিটেগুড়ের মতো লেপটে গিয়েছে সারা অঙ্গে। ডলাই মলাইকাররা মোটা বুরুশ দিয়ে ঘষে ঘষেও তা আর সাফ করতে পারে না। প্রায় ঘণ্টা ছ'য়েক ধরে কায়দা কসরত করে কোনও রকমে তারা খানিকটা সাফ করে গোসল করিয়ে ছেড়ে দিলো। স্নান সমাপন করে কাশেম বাইরে এসে দেখে, তার জুতো জোড়াটা উধাও। কে বা কারা চুরি করে পালিয়েছে। কিন্তু চোর ব্যাটা রসিক আছে। কাশেমের জুতোর দিকে নজর অনেকেরই ছিলো, কাশেম জানতো। দাঁও পেলে যে তারা কসুর করবে না, তাও সে আশঙ্কা করেছিলো। তবে তার জুতোর বদলে অন্য এক জোড়া বাহারী নতুন জুতো রেখে যাবে তারা, ভাবতে পারেনি। কাশেম দেখলো, তার জোড়াটা নাই, কিন্তু তার জায়গায় হালকা হলুদ রঙের সুন্দর একজোড়া চপ্পল তারা রেখে গেছে ওর জন্য। কাশেম অবলীলাক্রমে ঐ জুতোয় পা গলিয়ে দেখলো বেশ মাপে মাপে হয়ে গেলো। ভেবে অবাক হলো, চোরটা কখন কীভাবে তার পায়ের মাপটাও চুরি করে নিয়েছিলো। তা না হলে এমন ঠিক মাপের জুতো সে কিনবে কি করে তার জন্য? কাশেম ভাবে, যাক ভালোই হলো। জুতোটা একটু পুরোনো হয়ে গিয়েছিলো। অনেক দিন ধরেই পালটাবো পালটাবো করছিলাম। তা চোর ব্যাটাই তার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলো।

কাশেম আর দাঁড়ালো না। হারেম থেকে বেরিয়ে হন হন করে বাড়ির পথে রওনা হলো।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। কাশেম বেরুবার কিছুক্ষণ আগে কাজী সাহেব হারেমে ঢুকেছেন গোসল করতে। কাশেম যে চপ্পল পরে মনের আনন্দে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেলো আসলে তা ঐ কাজী সাহেবেরই জুতো।

তা হলে কাশেমের সেই মার্কামারা জুতোটা গেলো কোথায়? দ্বাররক্ষী অনেকক্ষণ ধরে কাশেমের বদখদ চপ্পলটাকে সদর দরজার সামনে পড়ে থাকতে দেখে ছড়ির ডগা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে দরজার পাল্লার আড়াল করে রেখে দিয়েছিলো। কারণ, খদ্দেররা ঐ ধরনের একটা নোংরা বীভৎস বস্তু দেখে নাক সিটকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছিলো। দারোয়ানের মনে হয়েছিলো এমন অবাঞ্ছিত জিনিস সদর দরজায় শোভা পেতে থাকলে হামামের সম্ভ্রান্ত খদ্দেররা সব পালিয়ে যেতে পারে। ভেবেছিলো, কাশেম যখন গোসল সেরে বাইরে বেরুবে তখন সে বের করে দেবে তাকে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা আর ঘটেনি। কাশেমের স্নান করতে সময় লেগেছে অনেক। এর মধ্যে ফটকের দারোয়ান বদল হওয়ার সময় হয়েছে। আগের দারোয়ান

বাড়ি চলে গেছে। দরজায় দাঁড়িয়েছে নতুন লোক। এবং আগের দারোয়ান ঘরে ফেরার আকুলতায় কাশেমের জুতোর কথাটা বেমালুম ভুলে গেছে।

বিপত্তি বাধলো এখানেই।

কাজী সাহেব গোসল সেরে হামাম থেকে বেরিয়ে দেখেন তাঁর চপ্পল নাই। সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদা বরকন্দাজরা তটস্থ হয়ে খোজাখুঁজি শুরু করলো। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে কাশেমের সেই জগৎ বিখ্যাত জাঁদরেল জুতো জোড়া দরজার আড়াল থেকে টেনে বের করলো তারা। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো সেটা কাশেমের সম্পত্তি।

কাজীর হুকুমে তখুনি কাশেমকে পাকড়াও করে আনা হলো তার সামনে। জুতো জোড়া কাঁধে ঝুলিয়ে কোরবানীর খাসীর মতো এসে দাঁড়ালো সে। কাজী সাহেব জুতো জোড়া কেড়ে নিয়ে কাশেমকে ফটকে পাঠালো। সেখানে অবশ্য কাশেম কয়েদখানার সেপাইদের হাতে আদর অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি পায়নি।

সারা দেহ ব্যথায় জরজর। দিনকয়েক ফাটক খেটে ছাড়া পাওয়ার পর, ঘরে ফিরে এসে ক্ষোভে দুঃখে সব আগে সে তার ঐতিহাসিক অপয়া জুতো জোড়াটা নীলের জলে বিসর্জন দিয়ে এলো।

এর কয়েকদিন পরে। এক জেলে নীলে মাছ ধরছিলো। একবার জাল গুটাতে গিয়ে বেশ ভার ভার মনে হলো তার। ভাবলো, ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন হয়েছে, হয়তো বড় সড় গোছের মাছ জড়িয়ে গছে তার জালে। অনেক সন্তর্পণে এবং বেশ কায়দা কসরত করে জালখানাকে তীরে তুলে আনলো সে। —আ —আ —হ, জেলে চিৎকার করে ওঠে, তার জালের সুতো ছিঁড়ে-খুড়ে একশা হয়ে গেছে।

কাশেমের জুতো জোড়া জালে জড়িয়ে এই সর্বনাশ করেছে। গরীব বেচারা জেলে। তার জীবিকার একমাত্র হাতিয়ার জালখানার দশা দেখে সে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো, এখন আমি কি করে খাবো?

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জেলে কাশেমের দোকানে আসে। জুতো জোড়াটা দোকানের মধ্যে জোরসে ছুঁড়ে মারে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাজানো বড় বড় কাচের জারে লেগে কয়েকটা ওষুধ ভর্তি জার ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। নানা বর্ণের ওষুধের ঢল নামে ঘরের মেঝেয়। জেলে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, আমার মুখের অন্ন নষ্ট করলে এই শাস্তিই পেতে হয়, বুঝলে কাশেম সাহেব? দেখ, আমার জালের অবস্থাখানা দেখ। তোমার ঐ জুতোর কাঁটা আমার রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে আজ।

কাশেমের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ে। তার এতো টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেলো এই অপয়া জুতো জোড়ার জন্যে। দাঁত মুখ খিচিয়ে ওঠে সে জুতোটার দিকে তাকায়। যেন এখুনি বুঝি আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে ওটাকে। কিন্তু অমন উপাদেয় বস্তু কী করেই বা গলাধঃকরণ করে!

ঠিক করলো মাটির তালায় পুঁতে রাখবে সে। যাতে ভবিষ্যতে আর ওটাকে নিয়ে নতুন ঝামেলায় জড়াতে না হয়। সুতরাং সে সামনের বাগানের মধ্যে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে জুতো জোড়াকে রেখে কবর দিয়ে দিলো।

কাঁশেমের এক প্রতিবেশির সঙ্গে ওর বেশ অসদ্ভাব ছিলো। লোকটিও তাকে তাকে ছিলো। কাশেমকে বাগানে গর্ত খুঁড়তে দেখে সে কোতায়ালীতে ছুটে গিয়ে খবর দিয়ে এলো যে, আবু কাশেম সরকারকে ফাঁকি দিয়ে অনেক টাকাকড়ি রোজাগার করে। এবং বাগানের মধ্যে সেগুলো সে পুঁতে রাখে।

কোতোয়াল অবিশ্বাস করতে পারে না। এমন ঘটনা তো প্রায়ই ঘটছে। সরকারের

নজর থেকে আড়াল রাখার জন্য অনেক বে-আইনি সম্পদ অনেকেই এইভাবে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে সে পেয়াদা পাঠিয়ে কাশেমকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো তার সামনে। কাশেম যতই বলে, জী না, টাকা পয়সা কিছু না, ওটা আমার পায়ের ছেঁড়া জুতো জোড়া। কিন্তু ঘুষখোর কোতোয়াল ওসব কথায় বিশ্বাস করে না। মোটামুটি টাকা ঘুষ দিয়ে তবে সে ছাড়া পায়।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সাতশো পঁচানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

নিদারুণ হতাশা দুঃখ ক্ষোভে ঘরে ফিরে এসে যত অনিষ্টের মূল ঐ জুতো জোড়াটা হাতে নিয়ে সে কয়েক ক্রোশ দূরে গিয়ে একটা নালার জলে ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু এমনি মন্দ কপাল, স্রোতের টানে গড়াতে গড়াতে গিয়ে আটকে যায় এক জল-সেচ কলের চাকায়। সঙ্গে সঙ্গে কলটা অচল হয়ে থেমে যায়। মালিক ছুটে এসে দেখে আবু কাশেমের সেই ছেঁড়া চপ্পলটা তার কলের চাকার দাঁতের মধ্যে ঢুকে পড়ে অনেক গুলো দাঁত ভেঙে দিয়েছে।

কলের মালিক কাশিমের নামে মামলা দায়ের করে দিলো। বিচারে ক্ষতি পূরণ বাবদ শুধু অনেক টাকা গচ্চাই দিতে হলো না, সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ করতে হলো তাকে বেশ কিছুকাল। অবশ্য ফাটকের কর্তাকে মোটামুটি ঘুষ খাইয়ে কয়েকদিন পরেই সে বাড়ি ফিরে আসতে পেরেছিলো।

মনের দুঃখে, টাকার শোকে মুহ্যমান হয়ে কিছুদিন ঘরেই বসে কাটায়। জুতো জোড়াটা বাড়ির পিছন দিকে ছাতের কার্ণিশের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে—যাতে আর ঐ সর্বনাশা বস্তুটিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে না হয়।

কাশেমের বাড়ির পিছনেই আর একটা বাড়ি। ও বাড়ির বাঘা কুকুরটা ঝুলন্ত জুতো জোড়াকে করায়ত্ত করার জন্য ও-বাড়ির দোতলা থেকে এ্যাইসা জোরে এক লাফ দিলো যে, একেবারে এসে পড়লো এ বাড়ির ছাতের মাঝখানে। কাশেম তখন ছাতে বসে বৈকালিক শোভা উপভোগ করছিলো। কুকুরটা লাফিয়ে এসে আর পড়ার জায়গা পেলো না। পড়রি তো পড় একেবারে আবু কাশেমের গায়ের উপর! কুকুরটার ধারালো থাবা বৃদ্ধ কাশেমের চোয়ালের খানিকটা মাংস খুবলে নিয়ে গেলো। উফ্, সেকি রক্তারক্তি কাণ্ড। পাড়ার লোকরা ধরাধরি করে হাসপাতলে নিয়ে গেলো তাকে। দিন দুই বাদে মাথা মুখ গলা পেঁচিয়ে পেল্লাই এক পাগড়ী সমান পটি বেঁধে ঘরে ফিরে এলো সে। হেকিম বদ্যি হাসপাতালের খরচ বাবদ এক গাদা টাকা বেরিয়ে গেলো। ক্ষতের চেয়ে খরচের ব্যথাটাই বেশি করে কাতর করে ফেললো কাশেমকে।

তার এই শেষ বিপর্যয়ে মাথা আর ঠিক রাখতে পারলো না কাশেম। জুতো জেড়াটি নিয়ে ছুটে গেলো সে কাজীর কাছে। সাশ্রুনয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমার এই জুতো জোড়াটা আমার সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হুজুর। এর জন্যে আমার যা গচ্চা গেছে তাতে আমি আজ সর্বস্বান্ত! এখন ঘরে আর ফুটো পয়সা নাই। ভিক্ষে করে ছাড়া পোড়া রুটির জোগাড় করতে পারবো না। এটাকে যতই ছাড়াতে চাইছি কিছুতেই ছাড়ছে না আমাকে। তাই আজ আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। এটা আমি আপনার হেপাজতেই রেখে যাচ্ছি হুজুর। এরপর থেকে এই জুতোর জন্য কারো কোন ক্ষয় ক্ষতি হলে আমি আর দায়ী হবো না, এই আমি বলে গেলাম।

এই বলে কাশেম সেই প্রকাশ্য আদালতের মেঝেয় তার এতোকালের সঙ্গী জুতো জোড়াটাকে বয়ান তালাক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

কাজী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন।

একটুক্ষণ পরে শাহরাজাদ আবার একটা নতুন কিস্‌সা বলতে শুরু করে ঃ

এক শহরে এক জেলে বাস করতো। লোকটির জাত-ব্যবসা ছিলো মাছধরা। কিন্তু সর্বজনের কাছে সে পরিচিত ছিলো চরসখোর হিসেবে।

সারা দিনে রাতে মাত্র তিনবার সে চরস সেবন করতো। খুব সকালে কাজে বেরোবার আগে, বাসি পেটে একবার। একবার ভর দুপুর বেলায় এবং আর একবার সূর্য পাটে বসার সময় খেত সে। এর বেশি সে একবারও খেয়ে পয়সার অপচয় করতো না কখনও।

সে বলতো, এটা তার নেশা নয়। সারা দিন গাধার মতো খাটার ক্ষমতা জোগায় এই চরস। শরীরে যেমন তাগদ জোগায়। মনও স্ফূর্তিতে থাকে। কাজে কখনও কুঁড়েমি লাগে না। এমন কি কোনও কোনও দিন সে ভূতের মতোও খেটে প্রচুর মাছ ধরে আনে।

কখনও-সখনও সন্ধ্যাবেলায় মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে খেতো। তারপর টিমটিমে একটা ফুপি জ্বালিয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে বসে বসে ঝিমাতো। আর বিড় বিড় করে আপন খেয়ালে কি যেন সব আওড়াতো।

এই রকম এক সন্ধ্যার কথা শুনুন ঃ সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে খানিকটা মাত্রা চড়িয়ে সে চরস সেবন করে চোখ বুঁজে দাওয়ায় বসে কল্পনার ইন্দ্রজাল বুনে চলেছিলো। কিছুক্ষণ পর একবার নয়ন মেলে তাকিয়ে দেখে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে আঙ্গিনা ভরে গেছে। জেলের প্রাণে বসন্ত জেগে ওঠে। পায়ে পায়ে সে রাস্তায় নেমে আসে। নিশুতি-নির্জন রাত। কোথাও কোনও জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। শুধু চাঁদের আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে সর্বত্র।

জেলের মনে খুশির বন্যা উপছে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সে তার নিত্য সঙ্গী নীলের ধারে এসে উপস্থিত হয়।

মাথার ওপর পূর্ণচাঁদের মেলা। নীলে নিথর জল। ঘাটে ঘাটে মাঝিমাল্লারা নৌকা নোঙর করে নিদ্রামগ্ন। নদীর পাড়ে নদী এবং প্রকৃতির অপরূপ মনোহর শোভায় অভিভূত হয়ে পড়ে সে! হঠাৎ তার নজর চলে যায় নদীর অতলে। স্বচ্ছ জলে চাঁদের ছায়া পড়েছিলো। জেলে অবাক হয়ে ভাবে, হায় বাপ্, আসমানের চাঁদ নদীর জলে নেমে মাছের সঙ্গে খেলায় মেতেছে? এ মওকা তো ছাড়া যায় না। চাঁদমামাকে এবার কব্জায় পেয়েছি, পালাবে কোথায়?

প্রায় ছুটতে ছুটতে সে ঘরে ফিরে এসে জালটা কাঁধে তুলে নিয়ে আবার নীলের পথে ছুটে যায়।

মনে আশঙ্কা ছিলো, হয়তো ফিরে গিয়ে দেখবে চাঁদমামা চলে গেছে! কিন্তু না; তখনও সে তেমনি মধুর হাসি ছড়িয়ে জলের তলাতেই দুলছে। সেই নীল নির্জন গভীর নিশুতি রাতে কাঁধ থেকে জালটা নামিয়ে হাতে বাগিয়ে ধরে সহজাত দক্ষতায় বৃত্তাকারে ছড়িয়ে ফেলে। মনে আশা, চাঁদকে সে জালের ঘায়ে জড়িয়ে ফেলবে! কিন্তু একটু পরে গুটিয়ে তোলার পর সে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।

জালটা কাঁধে তুলে আবার সে বাড়ির পথ ধরে।

কিছু দূর আসার পর রাস্তার পাশের নালার জলে আবার সে চাঁদটা দেখতে পেয়ে নেচে ওঠে, ওরে মামা, তুমি হালা এইখানে পালিয়ে এয়েছো। দাঁড়াও দেখছি।

খুব সন্তর্পণে আবার সে জালটাকে ছড়িয়ে ফেলে নালাটার উপর। দুটি কুকুর শুয়েছিলো নালার ধারে। হঠাৎ জালে ঢাকা পড়ে তাদের নিদ্রা ছুটে যায়। জাল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য হুড়পাড় করতে থাকে তারা। জেলে ভাবে মোটা মাছ বেঁধেছে। খুব কায়দা কসরত করে সে জালটাকে গুটাবার চেষ্টা করে কিন্তু জাঁদরেল কুকুর দু'টোর দাপটের কাছে সে টিকে থাকতে পারবে কেন। ওরা ওকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় নালার জলে। জেলে নাকানি চোকানি খেতে থাকে।

—কই গো, কে আছ, সাচ্চা মুসমলান, বাঁচাও, বাঁচাও!

তার চেঁচামেচি চিৎকারে আশেপাশে বাড়ির প্রহরীরা ছুটে আসে! চরসখোরের কাণ্ড দেখে হেসে লুটোপুটি খেতে থাকে।

ওদের তামাসা দেখে জেলের হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়।

—তোমরা তো বড় বেল্লিক বদমাইশ হে, এইভাবে শয়তান আমাকে বেকায়দায় ফেলে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে, আর তোমরা মুসলমানের বাচ্চা হয়ে কিনা দাঁত বের করে হাসছো? তোমরা কী এক বাপের জন্মা?

জেলের কথায় প্রহরীরা ক্ষেপে ওঠে। লোকটা জাতে মাতাল হলেও গালিগালাজ-এর বেলায় তো বেশ টনটনে আছে।

—দাঁড়াও, তোমার ওষুধের ব্যবস্থা করছি।

জেলেকে ধরে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে টানতে টানতে কাজীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো ওরা।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

সাতশো আটানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আল্লাহর কী মহিমা, কাজী সাহেবও চরস-এ বুঁদু হয়ে ঝিমচ্ছিল তখন। ঐ নেশার ঝোঁকেও তিনি বুঝতে পারলেন, প্রহরীরা যাকে ধরে এনেছে সে তারই মতো এক চরসখোর।

জেলেকে রেখে প্রহরীদের বিদায় করে দিলেন তিনি। তারপর নফরদের বললেন, এ্যাই, মেহমানের খানাপিনা এবং শোবার ব্যবস্থা করে দে। দেখিস, যেন কোনও অসুবিধে না হয় ওর।

খুব চর্ব্য চোষ্য করে খেয়ে দেয়ে গরম বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো জেলে এবং এক ঘুমে বাকী রাত এবং পরের দিনটাও কাবার হয়ে গেলো।

সন্ধ্যাবেলায় কাজীর চাকর এসে ডেকে তুললো জেলেকে।

—সাহেব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, মালিক।

কাজীর সামনে দাঁড়াতেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন জেলেকে।

—তুমি আমার বুকের কলিজা, আমার ভাই, এসো, মৌতাতে বসা যাক।

দুই চরসখোর বসে চরস খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চাকর এসে খবর দিলো রাতের খানা দেওয়া হয়েছে টেবিলে।

কাজী সাহেব জেলের হাত ধরে টেনে তোলেন, চলো ভাইসাব, খানা-পিনা সেরে দিই।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আবার ওরা দু'জনে মুখোমুখি বসলো। আরও খানিকটা চরস গলাধঃকরণ করে নেশাটাকে রঙদার করে দিতে চাইলো।

এরপরেই শুরু হলো আসল মজা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাত্রাতিরিক্ত মাদকের ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেলো।

কাজী সাহেব এক এক করে সব সাজ-পোশাক খুলে ফেললেন। জেলেও দেখাদেখি ন্যাংটো হয়ে দাঁড়ালো। তারপর শুরু হলো ওদের উদ্দাম নৃত্য। শুধু নাচ নয়, অপূর্ব সঙ্গীত-লহরীতেও আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললো দু'জনে। ভাগ্যে ধারে কাছে গাধারা কেউ ছিলো না।

রাত তখন নেহাত কম নয়। নাচের তাণ্ডব চলেছে অন্দরে। কিন্তু পথচারীরাও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সব।

সুলতান এবং তার উজির নৈশ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ওঁরা কাজীর বাড়ির সামনে এসে পড়েন। ওদের পরনে বণিকের ছদ্মবেশ। উজিরকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান ভেজানো দরজা ঠেলে উঁকি দিয়ে দেখলেন, কাজী সাহেব এবং অন্য একটি লোক একেবারে উলঙ্গ হয়ে নানা ঢং-এ নেচে চলেছে এবং রসভ-কণ্ঠের লহরা তুলছে।

সুলতান এবং উজির ভিতরে ঢুকতে কাজী সাহেবরা নৃত্যগীত বন্ধ করে এগিয়ে এলো সামনে।

—আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক। আমার কী সেই ভাগ্য, অধমের গরীবখানায় আপনাদের পায়ের ধুলো পড়লো।

কাজী সাহেব বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত না হয়ে এগিয়ে এসে সুলতানকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

সুলতান আসন গ্রহণ করলে, কাজী সাহেব জেলেকে নিয়ে আবার রসকলি নৃত্য-সঙ্গীতে উদ্দাম হয়ে উঠলেন।

কাজী সাহেবের দেহের বর্ণ সোনার মতো। কিন্তু তাঁর সঙ্গীটি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের। সুলতান উজিরের কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, দেখছো, আমাদের কাজীর গায়ের রঙটাই শুধু ফর্সা, কিন্তু আসল বস্তুটি তার সাথীর তুলনায় ধানি লঙ্কা!

—কী? কানে কানে গুজুর গুজুর করছো কী তোমরা? জেলেটা প্রায় ক্ষেপে উঠলো, জান, আমি কে? এই শহরকা সুলতান। চুপ্‌সে বসে নাচ দেখ আমাদের। কোনও রকম গুজ গুজ ফুস ফুস করবে না, বুঝলে? এ আমার হুকুম। যদি এরপরে ফের এই রকম বেয়াদপি করতে দেখি, তবে তোমাদের দু'জনারই গর্দান নেব আমি। মনে থাকে যেন, আমি হচ্ছি সুলতান, আর আমার এই সঙ্গীটি হচ্ছে আমার উজির। তামাম দুনিয়াটা আমার হাতের মুঠোয়। জালাখানা গুটাবো আর সব খলবল করে উঠে এসে লুটিয়ে পড়বে আমার পায়ের ওপর। হুঁহুঁ বাবা, যে সে কথা নয়, আমি হচ্ছি আরব দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি। আমার হুকুমে বাঘে ছাগলে একঘাটে পানি খায়।

সুলতান এবং উজির বুঝলেন, ওঁরা দুই চরসখোরের সামনে এসে পড়েছেন। উজির জিজ্ঞেস করলো, তা মহামান্য সুলতান, কতদিন হলো এখানকার সুলতান হয়েছেন। এর আগে যিনি মসনদে ছিলেন, তিনি গেলেন কোথায়?

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তৎক্ষণাৎ জেলে জবাব দেয়, তাকে আমি বিদায় করে দিয়েছি।

—আপনি বিদায় দিলেন আর তিনি চলে গেলেন?

—সঙ্গে সঙ্গে। এক তিল দেরি করলেন না। যেই আমি বললাম, এবার তোমার দিন ফুরিয়ে গেছে, তুমি কেটে পড়, অমনি সে আভূমি আনত হয়ে আমাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, আমি তো আপনারই জন্যে পথ চেয়ে এই মসনদ আগলে বসে রয়েছি, জাঁহাপনা। আপনার মসনদ আপনি নিন। আমাকে রেহাই দিন এই গুরুদায়িত্ব থেকে। বাদশাহীতে আমার কোনও মোহ লিপ্সা নাই। এতোবড় হুকুমতের গুরুদায়িত্ব আমার ঘাড়ে পর্বতপ্রমাণ ভারি বোঝা হয়ে আছে এতো কাল। এতো দায়িত্ব আমি আর পালন করতে পারছি না।

সুলতান আর হাসি চাপতে পারেন না। কিন্তু ওদের সামনে প্রাণ খুলে হাসার উপায় নাই। গর্দান যাবে। সুতরাং উজিরকে ইশারা করে টুক করে রাস্তায় নেমে পড়েন তিনি।

গল্পটা এখানেই শেষ নয়। পরদিন সকালে সুলতান কাজী সাহেব এবং তার অনুচরটাকে তলব করলেন।

কাজী এবং জেলে এসে হাজির হলো দরবারে। সুলতান কাজীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

কাজী সাহেব, আপনি আমার আদালতের বিচারক। মহামাননীয় ব্যক্তি। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায়, এই বিধান আমরা চাই আপনার কাছে। কিন্তু একটা কথা বলি, নিশুতি রাতে পাড়া-প্রতিবেশী এবং পথচারীদের কানের তালা ফাটানো সঙ্গীত শুনিয়ে শান্তি ভঙ্গ করার বিধান আপনার কোন্ আইনে আছে? নিজের বাড়ির অন্দরে চরস খেয়ে সঙ্গী সাথী নিয়ে উদ্দাম হয়ে নাচন-কোদন করাই কি আপনার মতো প্রাজ্ঞ বিচারপতির সাজে?

কাজী সাহেব বুঝতে পারেন গতরাতের ছদ্মবেশী বণিকদ্বয় স্বয়ং সুলতান এবং তাঁর উজির ছাড়া কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে সুলতানের মসনদের সামনে।

—দোহাই হুজুর, আমার গোস্তাকি মাফ করুন। না জেনে আমি আপনার যথাযোগ্য সম্মান করতে পারিনি। তখন চরসের নেশায় কি বলতে কি বলেছি আপনাকে, এখন আমার কিছুই মনে নাই। আপনি বিশ্বাস করুন, জাঁহাপনা। যা-ই বলে থাকি, আমি বলিনি, বলেছে আমার নেশা—চরস। সেই কথা ভেবে অধমকে রেহাই করে দিন এবারের মতো।

জেলেটার নেশা তখনও কাটেনি। চোখ দু'টো চেষ্টা করেও খুলে রাখতে পারছে না সে।

কিন্তু কাজীর কথায় সে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, আরে, অত কাচুমাচু করার কী আছে? আমরা কী চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি। ইচ্ছে হয়েছে নেশা করেছি।

তারপর সুলতানকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে আপনি এখানে আপনার প্রাসাদে সুলতান হয়ে তখতে বসে আছেন। খুব ভালো। কিন্তু আমিই বা কম কিসে আপনার তুলনায়? কাল রাতে আমাদের প্রাসাদে আমরা সুলতান উজির ছিলাম। সেখানে আপনারা তো আমার প্রজার সমান।

সুলতান মজা পান।

—তোমার কথা একশোবার খাঁটি। আমি আমার তখতে, তুমি তোমার ডেরায় সুলতান। তাহলে এসো দোস্ত, আমরা দু'জনেই সুলতান হয়ে এক সঙ্গে বসবাস করি।

জেলে গম্ভীরভাবে বলে, আপনার প্রস্তাব আমি বিবেচনা করে দেখতে পারি। কিন্তু তার আগে আমার উজিরকে সব গুনাহ থেকে রেহাই দিতে হবে।

সুলতান হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক আছে, তোমার সম্মানে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

এরপর আর একটা কাহিনী শুরু করে শাহরাজাদ।

কোনও এক সময়ে মিশরের এক তহশীলদার বাস করতো। কর আদায় উপলক্ষে সারা বছরের বেশির ভাগ সময়ই তাকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হতো।

তহশীলদারের ঘরে ছিলো যুবতী বৌ। স্বামীর অবর্তমানে বৌটার নিঃসঙ্গ রাত আর ফুরায় না। উদ্দাম যৌবন কেঁদে কেঁদে সারা হয়। কিন্তু তহশীলদারটার বয়সে ভাটা পড়েছিলো। তার উপর হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যেদিন সে ঘরে ফিরে আসে সেদিন আর শরীরটাকে ধরে

রাখতে পারেনা। খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শোয়া মাত্র নাক ডাকাতে থাকতো। বৌটা দেহের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে ক্ষেপে উঠলো। কিছুদিনের মধ্যেই সে এক নওজোয়ান খুবসুরত নাগর জুটিয়ে নিলো।

ছেলেটির গায়ে তাগদ অনেক। বৌটা যখন ডাকতো তখনই এসে তার মনঃস্কামনা পূর্ণ করে যেত। মেয়েটির দেহমন খুশিতে ডগোমগো হয়ে ওঠে। কারণে অকারণে ছেলেটিকে সে নানারকম সাজ-পোশাক কিনে দেয়, নগদ অর্থও মুঠি মুঠি গুঁজে দেয় জামার পকেটে।

এই ভাবে দুটি নর -নারী অবৈধ সুখ -সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে বেশ কয়েকটা বছর পার করে দিলো।

একদিন তহশীলদার ঘরে ফিরে এসে তার পর দিনই বৌকে বললো, আমার খচ্চরকে দানা-পানি খাইয়ে দাও। আর আমাকেও কিছু একটা খানা-পিনা দাও, এখুনি বেরুতে হবে।

বৌটা মনের আনন্দে চটপট স্বামীকে বিদায় করার জন্য কাজে লেগে গেলো। খচ্চরকে দানা-পানি খাইয়ে তার পিঠে জীন লাগাম চাপিয়ে দিলো। কিন্তু তহশীলদারকে খেতে দিতে গিয়ে দেখে রুটি চাপাটি কিছু নাই ঘরে। নিগ্রো দাসীটাকে বললো, এই, চট করে দু'খানা রুটির মতো খানিকটা গম পিষে দে তো, তোর মালিক খেয়ে এখুনি কাজে বেরুবে।

তহশীলদার বললো, এখন গম পিষে রুটি বানাতে বানাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার দরকার নাই, আমি বরং বাজার থেকে দু'খানা তন্দুরী রুটি কিনে নিয়ে আসছি।

এই বলে সে দ্রুতপায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারের পথে চলে গেলো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো একতম রজনী ঃ আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বৌটা তার স্বামীর বাজার থেকে ফেরার অপেক্ষায় দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়েছিলো। দূর থেকে ওর নাগর ছেলেটা মেয়েটিকে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভাবলো, তহশীলদারটা বোধ হয় কাজে বেরিয়ে গেছে, তাই বৌটা দরজা ধরে তারই প্রতীক্ষা করছে।

ছেলেটি বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েটিকে বললো, আমার এখুনি তিনশো দিরহাম দরকার।

মেয়েটি বলে, কিন্তু আজ তো আমার হাতে কিছু নাই, গো।

ছেলেটি বলে, তোমাদের তো একটা খচ্চর আছে দেখছি। ওটা আমাকে দাও। আমি বিক্রি করে নেব। টাকাটা আমাকে আজ জোগাড় করতে হবে।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! আমার স্বামী ফিরে এসে যদি দেখে খচ্চরটা নাই, আমাকে আস্ত রাখবে সে?

কিন্তু ছেলেটি নাছোড়বান্দা। তার আব্দার এড়াতে পারে না প্রেমিকা। খচ্চরটা নিয়ে চলে যায় ছেলেটি।

কিছুক্ষণ পরে তহশীলদার রুটি কিনে ফিরে আসে। আস্তাবলে ঢুকে রুটি ক'খানা ঝোলার মধ্যে পুরে নিতে যায়। কিন্তু এ কি! খচ্চরটা গেলো কোথায়? জীন লাগাম সব পড়ে আছে অথচ খচ্চরটা নাই! সে ছুটে আসে বৌ-এর কাছে। কী ব্যাপার খচ্চরটা কোথায়?

বৌটা শান্ত গলায় বললো, তুমি বাজারে যাওয়ার একটু পরেই খচ্চরটা মানুষের রূপ ধরে আমাকে বললে, আমাকে যাদু করে খচ্চর বানিয়ে রাখা হয়েছিলো। আসলে আমি সুলতানের কাজী। এখন আমি দরবারে চললাম। এই বলে সে গটগট করে বেরিয়ে গেলো।

তহশীলদার রাগে ফেটে পড়লো, তুমি আমার সঙ্গে মসকরা করছো?

—বারে মসকরা করতে যাবো কেন? যা ঘটেছে তাই বললাম। তোমার সঙ্গে ছলচাতুরী করে আমার কি ফয়দা হবে? তোমাকে বলতে আমি সাহস করিনি, খচ্চরটা সত্যিই মাঝে মাঝে মানুষের মতো কথা বলতো আমার সঙ্গে। আমি তো শরমে মরি। তাড়াতাড়ি বোরখায় মুখ ঢেকে আস্তবল থেকে পালিয়ে আসতাম। কিন্তু আজ একেবারে তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেলো। আমি ঘরে দাওয়ায় বসে কাজ করছি হঠাৎ দেখি আস্তাবল থেকে এক সদাশয় বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়ালেন। আমি ছুটে ঘরের মধ্যে পালাতে গেলাম। তিনি আমাকে মা বলে ডাকলেন। বললেন, মা, আমাকে শরম করার কিছু নাই। আমি তোমার বাপের মতো। কপাল দোষে এতদিন খচ্চর হয়ে ছিলাম। আজ আমার মুক্তি হয়েছে। আমি সুলতানের কাজী। এখন তাঁর দরবারেই ফিরে যাচ্ছি।

তহশীলদার চোখ কপালে তুলে বলে, ইয়া আল্লাহ, এমন আজব কাহিনী তো জীবনে কখনো শুনিনি। কিন্তু খচ্চর ছাড়া এখন আমি কাজে বেরুবো কী করে? আজ আমাকে কত গ্রামে যেতে হবে কর আদায় করতে! কী করে যাবো বলতো?

বৌটা পরামর্শ দেয়, তুমি এক কাজ কর। এক আঁটি বিচালী নিয়ে দরবারে গিয়ে কাজীকে দূর থেকে দেখাতে থাক। তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন। খচ্চর ছাড়া তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে। তখন তিনি দরবার ছেড়ে তোমার সঙ্গে চলে আসবেন।

তহশীলদারের খুব পছন্দ হলো বৌ-এর কথাগুলো। তখুনি একগোছা বিচালি নিয়ে দরবারে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলো।

বৌটা বললো, একটা কথা কিন্তু মনে রেখ, খুব সাবধান, কাজী আর খচ্চর একই ধাঁচের জানোয়ার। ওরা ভীষণ বদলা দেবার ফিকিরে থাকে। এতকাল তুমি ওঁর উপর যে-সব অত্যাচার করেছ, সে-সব কিন্তু তিনি একটুও ভুলে যাননি। মওকা পেলে তোমার ওপর শোধ তুলতে কসুর করবেন না তিনি।

বৌ-এর শেষ উপদেশটুকু মাথায় রেখে অতি সন্তর্পণে সে কাজীর আদালতে প্রবেশ করে। কাজী সাহেব তখন তাঁর আসনে বসে মামলার কাজ পরিচালনা করছিলেন। বিরাট কক্ষের একেবারে পিছনে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো তহশীলদার। হাতে এক আটি বিচালি, মাঝে মাঝে কাজী সাহেবের দিকে একটু উঁচু করে তুলে ধরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে থাকলো।

ব্যাপারটা কাজীর নজর এড়ালো না। ইশারা করে ডাকলেন তিনি, এদিকে এগিয়ে এসো আমার সামনে।

কিন্তু তহশীলদার সেখান থেকে এগিয়ে না গিয়ে কাজী সাহেবকে ইশারা করে ডাকলো, আপনিই আসুন আমার কাছে।

কাজী সাহেব তহশীলদারকে চিনেছিলেন। সে যে সরকারের এক তহশীলদার তা তিনি জানতেন। ভাবলেন নিশ্চয়ই কোনও গোপন কাজকর্মের জন্য কোতোয়াল তাকে পাঠিয়েছে এখানে। তাই, সেদিনের মতো আদালতের সব কাজ মুলতুবী রেখে সকলকে বিদায় করে দিলেন তিনি। তারপর তহশীলদারের কাছে এসে বললেন, কী ব্যাপার, কী হয়েছে? খুব কি জরুরী কিছু?

তহশীলদার সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে বিচালির গোছাটা কাজীর সামনে ধরে জিভ আর তালুর সাহায্যে পশু পোষ মানানোর মতো অদ্ভুত এক আওয়াজ তুলে তাঁকে পায়ে পায়ে আদালতের বাইরে ডেকে আনতে প্রলুব্ধ করতে লাগলো।

কাজী সাহেব ব্যাপারটা অনুধাবন করতে না পেরে তহশীলদারকে অনুসরণ করতে করতে আদালতের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তখন তহশীলদার তাঁর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলে, খোদা হাফেজ, সত্যিই আমি আপনার ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা শুনে মর্মাহত হলাম। আপনি ভাববেন না, শুধু শুধু আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি এখানে। আজ আমাকে অনেক গুলো গাঁয়ে যেতে হবে আদায় করতে। সেজন্য আদালতের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। তার আগেই আপানাকে ডাকতে হলো। যাই হোক, আর দেরি করা চলে না, নিন এবার আপনি আবার খচ্চরের রুপ ধরুন, আমি আপনার পিঠে চেপে এখুনি রওনা হবো।

কাজী সাহেব আতঙ্কে শিউরে ওঠেন, এ কি অদ্ভুত কথা!

তহশীলদার বেশ বিনীতভাবে বললো, না না, আর ওসব ভয় করবেন না। একবার যখন জেনেছি আপনি আসলে জানোয়ার নন, তখন কী আর আপনার পাছায় চাবুকের ঘা মারতে পারি? আমি জানি, আমাদের—মানুষের পাছাগুলো কী থলথলে নরম! চাবুকের আঘাত পেলে বড় ব্যথা লাগে। আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনার কোনও ভয় নাই। চাবুক ছড়ি আমি হাতেই নেব না। যাক, আর দেরি করবেন না, এমনিতেই অনেক বেলা হয়ে গেছে। নিন চলুন। কথা দিচ্ছি, রোজ রাতে যা দানা-পানি দিই আজ থেকে তার দু'গুন বরাদ্দ করে দেব।

কাজী সাহেব বুঝলেন, পাগলা গারদ থেকে কোনও ভাবে এই রুগীটা পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ছে। ভয়ে তাঁর চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। এক পা এক পা করে পিছু হটতে হটতে আদালতকক্ষের দরজা পেরিয়েই তিনি এজলাসের দিকে দৌড়ে পালাতে গেলেন। কিন্তু তহশীলদারও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও তাকে ধাওয়া করে ছুটে এলো। কাজী সাহেব প্রমাদ গুণলেন। ঘরের সব লোককে তিনি ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। সেই শুন্য কক্ষে তহশীলদারের কবল থকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনও পথ নাই। কাজী সাহেব খুব করুণ কণ্ঠে বললেন, বুঝতে পারছি, আপনার খচ্চরটা খোয়া গেছে। এবং একটা খচ্চর না হলে আপনার কাজ-কর্মও সব অচল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এক কাজ করুন, এই নিন তিনশো দিরহাম আপনাকে দিচ্ছি আমি। এ দিয়ে বাজার থেকে সেরা জাতের একটা খচ্চর কিনতে পারবেন অনায়াসেই। নিন ধরুন, টাকাটা নিয়ে আমাকে রেহাই দিন।

এই বলে ট্যাক থেকে তিনশো দিরহামের একটা তোড়া তহশীলদারের হাতে গুঁজে দিয়ে কাজী সাহেব আর কোন দিকে দৃকপাত না করে আদালত কক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে চোঁচা দৌড় দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান।

তহশীলদার ভাবে, কাজী সাহেব লোকলজ্জা এড়াতে তিনশো দিরহামের এই তোড়াটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে পালালেন। তা যাক, ভালোই হলো, তিনশো দিরহামে ওর চাইতে তাজা তাগড়াই খচ্চর কিনতে পারবে সে।

তহশীলদার বাজারে গিয়ে একটা একটা করে অনেকগুলো খচ্চর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে থাকে। কিন্তু মনমতো পছন্দ হয় না একটাও। একটা দালাল বললো, কত দামের মধ্যে খুঁজছেন শেখ?

—পছন্দ হলে তিনশো দিরহাম পর্যন্ত দিতে পারি।

লোকটি লোলুপ উৎসাহে বলে, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি ভালো মাল এনে দেখাচ্ছি আপনাকে।

পাশের একটা কামরা থেকে একটা বেশ তাগড়াই খচ্চর বের করে নিয়ে এসে সে ওর সামনে দাঁড় করিয়ে বললো, দেখুন, চলবে?

ততক্ষণে তহশীলদারের চোখ কপালে উঠেছে, একি, এ যে তারই সেই খচ্চরটা। যেখানে যা যা খুঁত ছিলো সব হুবহু ঠিক আছে। তহশীলদার খচ্চরটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো একটু, তারপর দালালটাকে বললো, না হে, এ রকম জানোয়ার চলবে না আমার। সত্যিকারের জানোয়ার চাই আমার।

লোকটা দাঁত-মুখ খিচিয়ে ওঠে, সত্যিকারের জানোয়ার মানে? এটা কি তবে মিথ্যেকারের জানোয়ার নাকি? কী বলতে চান আপনি। সওদা করতে এসেছেন না মসকরা করতে এসেছেন এখানে?

তহশীলদার বলে, না মসকরা করবো কেন? তবে যে কারণেই হোক, এটা আমি কিনবো না। অন্য কিছু আছে।

—বেশ তো পছন্দ না হয় অন্য খচ্চর দেখাচ্ছি।

তিনশো দিরহাম দিয়ে আর একটা খচ্চর পছন্দ করে সে কিনে বাড়ি ফিরে আসে। বলা বাহুল্য, আগাগোড়া কাহিনী সবিস্তারে বৌকে শোনালো সে।

এইভাবে চতুরা নষ্ট নারীর বুদ্ধির কৌশলে সবদিকই রক্ষা পেলো। মেয়েটি তার নাগরকে নিয়ে রসের সায়রে কেলি করে দিন কাটাতে থাকলো। তহশীলদার একটা নতুন তাগড়াই খচ্চর ফিরে পেলো এবং কাজী সাহেব মিথ্যা কেলেঙ্কারীর হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন। অবশ্য তার জন্যে তিনশো দিরহাম গচ্চা দিতে হলো তাঁকে। তা যাক, আদালতের ফি বাড়িয়ে দিয়ে তিনি তা উসুল করে নেবেন সুদে আসলে।

এই সময় রাত্রি শেষ হলে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো দুইতম রজনী ঃ

এবার সে আর একটা নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

এক অত্যন্ত গরীব দম্পতি সারাদিন ধরে শহরের পথে পথে ভুট্টার খই বিক্রি করে বেড়াতো। ওদের পরমাসুন্দরী একটি কন্যা ছিলো।

শহরের কাজী একদিন মেয়েটির মা বাবার কাছে তার পাণি প্রার্থনা করলো। কাজী সাহেব পাত্র হিসাবে ফেলনা বলা চলে না। বয়সটাই একটুখানি যা বেশি—তা বেশিই বা বলা যায় কি করে, আশী বছরে কি আর কেউ শাদী নিকা করে না? তবে চেহারাটা তেমন খুবসুরত নয়। আড়ালে কু-লোকে বাঁদর হনুমান বলে। কিন্তু দেখতে তাদের মতো হলে আসলে তো আর বাঁদর বেবুন নয় সে। তা ছাড়া পুরুষ মানুষের আবার রূপ-জৌলুসের কী দরকার। পয়সা কড়ি কেমন আছে, কেমন কামায় সেই কথাই তো আসল। সে দিক থেকে কাজী সাহেবের জুড়ি নাই। ঘুষের টাকায় ফেঁপে ফেঁপে সে কলাগাছ হয়ে গেছে। বাড়ি ঘর-দোর, ধন-দৌলতের কোনও অভাব নাই। মেয়ের বাবা বললো, আমি রাজি।

সেইদিনই কাজীর সঙ্গে শাদী হয়ে গেলো মেয়েটির।

কাজী সাহেব তার বার্ধক্য এবং চেহারার দৈন্য ঢাকতে প্রতিদিন নতুন নতুন নানারকম

উপহার উপঢৌকনে ভরে দিতে লাগলো তার নব-পরিণীতা তরুণী বেগমকে। কিন্তু যত মন-ভোলানো বাহারী রংদার বস্তুই উপহার দিক সে, একটি সোমত্ত ভরা-যৌবনের নারীকে তুষ্ট করার মত আসলি-উপহার দিতে অপারগ হলে কোন্ মেয়ে ক্ষমা করতে পারে তার স্বামীকে? স্বভাবতই ঐ সব ফালতু উপহার উপঢৌকনে তার মন ভরে না। কিন্তু কীই বা করতে পারে সে। অসহায় অবলা এক নারী, তাই, নীরবে মুখ বুজে সহ্য করে সব। নিষ্কাম নিস্তেজ জড় পদার্থের মতো সারাদিন রাত বিছানায় পড়ে থাকে।

কাজী সাহেব কোসিসের কোনও ত্রুটি রাখে না। ঘড়ি ঘড়ি এসে বেগম সাহেবার খোঁজ খবর নিয়ে যায়। মোলায়েম করে মন-ভোলানো অনেক রকম রস-কথা বলে চাঙ্গা করার প্রয়াস করে। কিন্তু শুধু কথায় কী আর চিড়ে ভেজে, সুপ্তকাম-তরুণী-ভার্যা ফিরেও তাকায় না নপুংসক কাজীর দিকে।

কাজী সাহেব তার দপ্তরের কাজের চাপের দরুণ এক খুবসুরত নওজোয়ান পেশকার বহাল করলো। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর এ আদব-কায়দাও তেমনি। খুব নম্র, বিনয়ী, মৃদুভাষী।

কাজী সাহেব কাজের অছিলায় ছেলেটিকে অন্দরে পাঠায় মাঝে মাঝে। বেগম সাহেবার খোঁজ-খবর দেখা-শোনা করতে বলে। ছেলেটি একান্ত অনুগত কর্মচারীর মতো যথাযথ আদেশ পালন করে চলে।

এইভাবে কিছুদিনের মধ্যে দুই তরুণ-তরুণীর মধ্যে লজ্জা-শরমের ব্যবধান ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে সেখানে এক নতুন সম্পর্কের সেতু গড়ে ওঠে। তার নাম মহব্বত।

কাজী সাহেব অভিজ্ঞ মানুষ। সবই সে অনুমান করতে পারে। একটি জোয়ান ছেলে আর যুবতী মেয়ে একত্রে হলে কী কী ঘটতে পারে, তা তার অজানা নয়। কিন্তু কিছুই যেন সে আঁচ করতে পারে না এই রকম অজ্ঞ নির্বোধের ভান করে থাকে।

ক্রমশঃ প্রেমের প্রথম পর্ব শেষ হলে একদিন কাজী-বেগম দু'হাত বাড়িয়ে পেশকার ছেলেটিকে বুকে টেনে নেয়। তার এতদিনের সুপ্ত কামনা লেলিহান বহ্নিশিখা হয়ে ছেলেটির জাগ্রত যৌবনকে গ্রাস করে ফেলতে চায়। সে আহ্বানে ছেলেটিই বা সাড়া না দিয়ে পারে কি করে? হাজার হাজার টাকার সাজ-পোশাক গহনা অলঙ্কারে কাজী সাহেব যা দিতে পারেনি, সে বস্তু কানায়-কানায় ভরে দেয় তাকে ঐ ছেলেটি।

বেগমের মুখে হাসি দেখে কাজী সাহেব খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে।

প্রেমের বড় বিচিত্র গতি। মেয়েটি ওর জানালায় রুমাল ঝুলিয়ে রাখতো। সাদা আর লাল রঙের দু'খানা রুমাল ঝুলাতো সে। যখন সাদা রুমাল ঝুলতো বুঝতে হবে কাজী সাহেব বাড়িতে নাই। আর যখন লাল রঙের রুমাল ঝুলতো বুঝতে হবে, এখন নয়, এখন এসো না, কাজী সাহেব ঘরেই আছে। এইভাবে প্রেমিকা নারী তার দয়িতকে বুঝিয়ে দিত, কখন আসতে হবে এবং কখন আসতে হবে না।

এইভাবে কাজীর চোখে ধুলো দিয়ে ওদের মহব্বত মিলন যথারীতি চলছিলো। কিন্তু চিরদিন চললো না।

একদিন বিকেলে কাজী সাহেব কাজে বেরুলেন। বললেন, বড় লোকের বাড়িতে শাদী আছে। রাতে আর ফিরতে পারবো না, বিবিজান।

বিবিজান তো আনন্দে নেচে উঠলো। ঘর-দোরে গোলাপ জল ছিটালো। কুসুম-সজ্জায় শয্যা রচনা করলো। তারপর জানলায় একখানা সাদা রুমাল মেলে দিয়ে পালঙ্কে শুয়ে প্রিয়-মিলনের সুখ-স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো।

একটু পরেই দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দে ধরমড় করে উঠে বসে সে।

এ তো তার প্রেমিকের মৃদু করাঘাত নয়। দরজা খুলতে দেখলো, বৃদ্ধ কাজী সাহেব এক খোঁজা নফরের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁপাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ধরাধরি করে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয় মেয়েটি।

—কি গো, শরীরটা খারাপ হয়েছে নাকি?

কাজী সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, বেশ ভালোই ছিলাম। হঠাৎ কেমন মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। কোনও রকমে শাদীনামা লিখে দিয়েই আমি চলে এলাম।

—তা বেশ করেছ, মেয়েটি বলে, তুমি শোও, আমি তোমার সারা গাটা গোলাপ জল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছি। দেখবে আরামে ঘুম এসে যাবে।

কাজী সাহেবকে পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে তার দেহ থেকে এক এক করে সব সাজ-পোশাক খুলে একেবারে বিবস্ত্র করে সে। তারপর গোলাপ জল ছিটিয়ে সারা শরীরটা ভালো করে মুছিয়ে, চাদর দিয়ে ঢেকে বলে, এবার দেখবে, এখুনি ঘুম আসবে। আর ঘুম ঠিকমতো হলে কাল সকালে শরীরও ঝরঝরে হয়ে যাবে।

এই প্রথম কাজী সাহেব তার বেগমের কাছ থেকে এমন দরদ ঢালা ব্যবহার পেলো। মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

বুড়ো কাজীর গায়ের দুর্গন্ধে বমি আসছিলো মেয়েটির। তোয়ালে আর সাবান নিয়ে সে হামামে গিয়ে ঢুকলো।

ইত্যবসরে পেশকার নাগরটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে জানলার দিকে লক্ষ্য করে বুঝলো, কাজী সাহেব ঘরে ফিরবে না, আজকের রাত তাদের মধুযামিনী হবে। যথারীতি সে জলের পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে সুন্দরীর জানলা টপকে ঘরের ভিতরে এসে নামে।

ঘরের এক কোণে একটা মৃদু আলোর চিরাগ টিমটিম করে জ্বলছিলো। প্রায়ান্ধকার। তবে এটুকু বেশ বোঝা যায়, পালঙ্কের চাদর মুড়ি দেয়ে সে ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে। প্রথমে দু-একবার সোহাগ সম্বোধন করে ডাকলো সে। কিন্তু তাতেও পালঙ্ক থেকে কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে বেশ জোরেই শব্দ করে হেসে উঠলো।

—হুম, একেবারে ঘুমে গলে গিয়েছ দেখছি। তা দেখি, কেমন কতখানি ঘুমে কাতর করেছে, আমার নয়নতারাকে।

চাদরের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয় ছেলেটি।

—ওরে, বাবা, একেবারে তৈরি হয়ে আছ যে দেখছি বিবি সাহেব? অন্য দিন সাজ-পোশাক টেনে টেনে আমাকে খুলতে হয়, তা আজ দেখছি নিজে হাতেই সে কাজটি সমাধা করে রেখেছ, তোফা!

দুষ্টুমি করে সে শায়িতের দু'পায়ের মাঝখানে হাত রাখে। উদ্দেশ্য রাগমোচনের আগে খানিকটা সোহাগ-শৃঙ্গারে কামোত্তেজিত করে তোলা। কিন্তু থলথলে কী একটা অদ্ভুত বস্তুর স্পর্শে আঁৎকে উঠে সে তড়িতাহতের মতো হাতটা টেনে বের করে নেয়।

হাতটা গুটিয়ে নিতে পারলেও দেহটাকে সরিয়ে নিতে পারলো না ছেলেটি। ততক্ষণে কাজী সাহেবের দুই বাহু তাকে জাপটে ধরে ফেলেছে।

ছেলেটি শিউরে ওঠে। সর্বনাশ, কাজী সাহেব। নিমেষে তার দেহের বিপুল শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু বলহীন বৃদ্ধরা ক্রোধে উত্তেজিত হলে ক্ষণকালের জন্যও আসুরিক শক্তির আধার হয়ে ওঠে।

পেশকার ছেলেটি তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলো। বৃদ্ধ কাজী তাকে অতি সহজেই পাশের একটা খালি কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরে দালা এবং তালা বন্ধ করে দেয়। এই

বাক্সটায় দিনের বেলায় শয্যার কাঁথা-তোষকগুলো ভরে রাখা হয়। আকারে বেশ বড়সড়। সুতরাং তার মধ্যে একটা জোয়ান মানুষ অক্লেশে শুয়ে থাকতে পারে।

কাজী সাহেব হুঙ্কার ছাড়লো। নফর চাকররা তটস্থ হয়ে ছুটে এলো।

—তোদের বেগম সাহেবা কোথায়?

—কি হুজুর, তিনি হামামে গেছেন।

কাজী সাহেব গজরাতে থাকে, ঠিক আছে, সে আসুক তার সামনে আমি ডালা খুলবো। যদি সে বলে, লোকটাকে সে চেনে না তা হলে, নিজে হাতে আমি তাকে এই তলোয়ার দিয়ে দু'খানা করে ফেলবো। আর যদি বলে সে তার নাগর, তাহলে, এই দু'হাতের থাবায় দু'জনের গলা টিপে এক সঙ্গে দু'জনকে শেষ করে ফেলবো। আমি স্বয়ং কাজী। এই আমার বিচার।

কাজীর বাড়ির এক বৃদ্ধা দাসী হামামে গিয়ে কাজী -বেগমকে খবরটা জানিয়ে দেয়। সর্বনাশ হয়েছে বেগম - সাহেবা, পেশকার সাহেব ঘরে ঢুকতেই কাজী সাহেব তাকে ধরে বিছানার বাক্সে বন্দী করে ফেলেছে, এখন কী হবে?

মেয়েটি ঠোঁটে দাঁত চেপে ধরে, ইস্, একেবারেই মনে ছিলো না। জানলার সাদা রুমালখানা সরাতে ভুলে গেছি। একটা কাজ কর, বুড়িমা, যেভাবেই হোক কাজী সাহেবকে কিছুক্ষনের জন্য ও-ঘর থেকে সরাতে হবে।

বুড়ি বলে, আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে। কিন্তু কী করে খাওয়াবেন তাকে?

ঠিক আছে একটা বড়ি আর এক গেলাস পানি নিয়ে গিয়ে রাখ আমার ঘরে আমি যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে কাজী-বেগম ঘরে ঢুকেই আঁৎকে ওঠে, হায় বাপ, তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছ? হেকিম সাহেব বলে গেলেন একদম নড়া চড়া করা চলবে না। শোও, শোও বলছি আগে।

কাজী সাহেব একটু নরম হয়ে বলে, কিন্তু আমার কথাটা আগে শোনো। মানে—মানে—

—আর মানে মানে করতে হবে না। এই শরীরে বেশি কথাবার্ত্তা বলাও বারণ। তোমার সব কথা কাল শুনবো আমি। এখন এই দাওয়াই- এর গোলিটা খেয়ে শুয়ে পড়।

কাজী সাহেব প্রসন্ন হয়। বলে, আহা আবার হেকিম সাহেবকে ডাকতে গেলে কেন? শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিলো, তুমি যত্ন করে গোলাপ নির্যাস দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছো, তাতেই আমি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।

—তা হলেও সাবধানের মার নাই। হেকিম সাহেবও বললেন ভয়ের মতো তেমন কিছু নয়, তবে দু-একদিন বিছানাতেই পড়ে থাকতে হবে, কোনও কাজ কামে বেরুতে পারবে না। শুধু সুবোধ ছেলের মতো আমি যা যা বলবো তাই মেনে চলবে, কেমন?

তারপর জলের গেলাস আর ঐ ঘুমের বড়িটা হাতে তুলে নিয়ে কাজীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নাও, টুক করে গিলে ফেলো তো—

কাজী সাহেব বড়িটা খেয়ে বলে, শোনো, খুব গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেছে একটু আগে।

মেয়েটি বলে, তোমার শরীর স্বাস্থ্যের চেয়ে গুরুতর ব্যাপার, এখন অন্ততঃ আমার কাছে আর কিছু থাকতে পারে না। তুমি যা খুশি বলতে চাও,কাল সকালে বলো শুনবো।

কাজী সাহেব বাধা দিয়ে বলে, কাল সকালে শুনলে চলবে না বিবিজান। এখনই শোনো, না হলে লোকটা মরে যাবে।

—যে মরে মরুক। তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না। চুপচাপ শুয়ে পড়, আর একটি কথা বলবে না।

কথা অবশ্য আর বলার কোনও ক্ষমতা হলো না কাজীর। ঘুমে ঢলে পড়লো সে তখুনি।

মেয়েটি খাট থেকে নেমে বাক্সটার দিকে ছুটে যায়। ডালাটা খুলে ধরে। ছেলেটি ঘেমে নেয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে ওকে বাইরে বেরুতে সাহায্য করে। কাজীকে দেখে সে ভয়ে সিটকে যায়।

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলে, ভয় নাই, ও এখন কাটা সৈনিক। এসো আমরা আজ নিচে মেঝেয় মাদুর পেতেই মধুযামিনী যাপন করবো।

শেষ রাতে মেয়েটি ছেলেটিকে জাগিয়ে তোলে, এ্যাই— ওঠ ওঠ। তোমাকে যেতে হবে। সকাল হতে আর দেরি নাই। তার আগে চলো আস্তাবলে যাই। একটা কাজ করতে হবে।

ওরা দু'জনে আস্তাবলে এসে একটা গাধাকে টানতে টানতে নিয়ে আসে শোবার ঘরে। মেয়েটি বলে, এসো দু'জনে মিলে ধরাধরি করে গাধাটাকে বাক্সটার মধ্যে পুরে ফেলি।

গাধাটাকে বাক্সে ভরে ডালা বন্ধ করে দেয় মেয়েটি। ছেলেটিকে বলে, এবার তুমি কেটে পড়। আমি বুড়োর পাশে শুয়ে পড়ছি।

সকালে ঘুম থেকে জেগেই কাজী মেয়েটিকে ঠেলা দেয়, এই ওঠো, ওঠো তো।

মেয়েটি বিরক্ত হওয়ার ভান করে পাশ ফিরে শোয়, কেন, কী হলো, এতো ভোরে ডাকছো কেন?

—ডাকছি তোমার বিচার হবে,ওঠ।

মেয়েটি এবার চোখ বড় বড় করে তাকায়, কিসের বিচার?

—এখনি বুঝতে পারবে। আমি পাড়ার পাঁচজন সাক্ষী ডাকতে পাঠিয়েছি। তারা এখনি এসে পড়বে। তখনই বুঝবে কিসের বিচার।

একটু পরে পাড়ার কয়েকজন বয়স্ক মানী ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। কাজী-সাহেব তাদের উদ্দেশ্য করে বলে, আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি একটা গুরত্বপূর্ণ ব্যাপারে সাক্ষী হওয়ার জন্য।

এই বলে কাজী সাহেব উঠে গিয়ে বাক্সের ডালাটা তুলে ধরে। আর সঙ্গে সঙ্গে গাধাটা মাথা তুলে মুখ বাড়িয়ে দেয়। কাজী সাহেব রাগে চিৎকার করে ওঠে, এই মাগী, কোথায় সে বল, না হলে গলা টিপে তোকে শেষ করে দেব আজ।

দু'হাতে থাবা মেলে সে মেয়েটির গলাটা টিপে ধরতে এগিয়ে আসতে থাকে।

মেয়েটি আর্তনাদ করে ঘর থেকে ছুটে পালায়, ওরে বাবারে, মেরে ফেললো আমাকে। বাঁচাও—বাঁচাও।

সাক্ষীরা ব্যাপারটা কিছু আঁচ করতে পারে না। উন্মত্ত কাজী সাহেবকে জাপটে ধরে একজন।

মেয়েটি ঘরের বাইরে থেকে বলে, ওকে আপনারা দড়ি দিয়ে বাঁধুন। কাল রাত থেকেই মাথাটা বিগড়ে গেছে।

শাহরাজাদ বললো, এরপর আর একটা কিস্‌সা শোনাচ্ছি ঃ

কোনও এক সময়ে এক দুর্জয়-সাহস সুলতান প্রতাপের সঙ্গে সব প্রাজা পালন করতেন। সুলতানের তিন পুত্র। বড়টির নাম আলী, মেজটির নাম হাসান এবং ছোট ছেলের নাম ছিলো হুসেন। তিন পুত্রই দেখতে ছিলো খুব সুন্দর। সুলতানের এক সম্পর্কে বোনের হাতে তাদের লালন পালনের ভার দেওয়া হয়েছিলো।

ছেলেরা প্রাসাদের মনোরম পরিবেশে বড় হতে থাকে। তাদের তিন ভাই-এর সঙ্গে মা-বাপ-মরা অনাথ এক মাসতুতো বোনও মানুষ হচ্ছিল। এই মেয়েটির নাম নূর অল-নিহার। অপরূপ সুন্দরী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। ওর হরিণীর মতো কাজল-কালো টানাটানা চোখের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

চার ভাই-বোন এক সঙ্গে খায় দায়, খেলাধুলা করে এবং একই সঙ্গে ঘুমোয়। সুলতান ভেবেছিলেন, নূর বড় হলে পাশের কোনও সুলতান বাদশাহর পুত্রের সঙ্গে শাদী দিয়ে দেবেন। কিন্তু মেয়েটির দেহে যখন প্রথম যৌবন উন্মেষ ঘটলো তখন তাকে পরদা নসীন করে রাখার জন্য পুত্রদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, তাঁর তিন পুত্রই নূরের প্রতি সমান ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। সুলতান ভাবলেন, এ অবস্থায় যে কোনও দুই পুত্রকে বঞ্চিত করে একজনের হাতে যদি নূরকে তুলে দেন তবে ভাইএ ভাইএ বিবাদ বেঁধে যাবে। আবার যদি ওদের বাদ দিয়ে অন্য কোনও দেশের শাহজাদাদের কারও সঙ্গে শাদী দিয়ে দেন তাহলেও অশান্তি বাড়বে। সুতরাং কী ভাবে এ সমস্যার মোকাবিলা করা যায় কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

তিন ছেলেকেই সুলতান ডেকে পাঠালেন।

—শোনও বাবা, তোমরা সবাই আমার চোখে সমান। কারও ওপর কোনও পক্ষপাত আমি করতে পারি না। অথচ তোমাদের তিন জনের সঙ্গেই তো নূরের সাদী দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে। তোমাদের ভাইদের যাতে সদ্ভাব বজায় থাকে সে ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

সুলতান বললেন, শোনও, আমি একটা উপায় উদ্ভাবন করেছি। তোমরা তিন ভাই নিজের নিজের পছন্দ মতো তিন দেশে যাত্রা কর। আমি দেখতে চাই তোমরা নিজেদের হিম্মতে কে কতটা অবাক করার মতো কী করে আসতে পার। যার কাজে আমি সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ হবো সেই পাবে নূরকে। কী, তোমরা রাজী?

ছেলেরা বাবার প্রস্তাবে একবাক্যে সম্মতি জানালে সুলতান বললেন, তাহলে যাত্রার আয়োজন কর। কার কী টাকা পয়সা প্রয়োজন বলো, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খাজাঞ্চীখানা থেকে বস্তা বস্তা সোনা বের করা হলো। এবং যার যতটা ইচ্ছা, প্রত্যেক ছেলে সেগুলো সঙ্গে নিলো।

দিনক্ষণ দেখে একই সময়ে ওরা বণিকের ছদ্মবেশে রওনা হয়ে গেলো। যাওয়ার সময় সুলতানকে বলে গেলো, এক বছর পরে আবার ঠিক এই দিনে ওরা সকলে প্রাসাদে ফিরে আসবে।

শহর ছেড়ে বড় সড়ক ধরে ওরা তিন ভাই এক সঙ্গে চলতে চলতে এক সময় অন্য এক শহর প্রান্তের এক সরাইখানায় এসে উপস্থিত হয়। এখান থেকে সড়কটা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে তিন দিকে চলে গেছে। ঠিক হলো, এবার ওরা তিনজনে তিন দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিলো, সে রাতটা ওরা তিন ভাই সরাইখানাতেই আশ্রয় নিলো। রাতের খাবার খেতে বসে তিনজনে পরামর্শ করলো, সফর শেষে এক বছর পরে ঠিক এই দিনে ওরা প্রথমে এই সরাইখানেতে এসেই মিলিত হবে। তারপর তিন ভাই এক সঙ্গে প্রাসাদে ফিরবে। যদি কেউ আগে এসে পৌঁছয় তবে সে অন্য ভাইদের জন্য এখানে অপেক্ষা করবে।

পরদিন খুব ভোরে যাত্রার পূর্বে তিন ভাই পরস্পরে শুভ কামনা জানিয়ে বিদায় আলিঙ্গন বিনিময় করে যে যার পথে রওনা হয়ে গেলো।

এক টানা তিন মাস ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক দুর্গম গিরি প্রান্তর অতিক্রম করার পর বড় ছেলে আলী একদিন ভারতের সমুদ্র উপকূলের বিশানগড় সাম্রাজ্যে এসে উপস্থিত

হলো। শহরের সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত সরাইখানার একটি বিরাট সুসজ্জিত কামরা ভাড়া করে নিলো সে।

অনেক দিনের পথের ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন হলে এসেছিলো। সেদিন সারাটা দিন পড়ে পড়ে ঘুমালো আলী। এবং সন্ধ্যার একটু আগে সেজে গুজে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লো।

শহরের ঠিক মাঝখানে একটা বেশ সাজানো গোছানো বাগিচা তার মাঝখানে বিরাট একটা জলের ফোয়ারা। তার চারপাশটা শ্বেত পাথরে বাঁধানো। বাগানের মধ্যে নানা রকম বাহারী ফুলের সমারোহ। চোখ জুড়িয়ে যায়।

চার পাশে নানারকম দোকান পাট। হরেক কিসিমের ভারতীয় পণ্যের মেলা। যা দেখে তাই বড় সুন্দর মনে হয় আলীর। দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে হরেক জিনিসের দাম জেনে নিতে থাকে সে।

আলী বিদেশী এ শহরে নবাগত, তার সাজ পোশাক, চাল চলন দেখে সবাই বুঝতে পারে তা। এক দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেশ ভাবই জমে ওঠে। দোকানী বলে, যদি কিছু মনে না করেন তবে চলুন, আমার গরীবখানায় একটু পায়ের ধুলো দেবেন আজ।

এ আমন্ত্রণ এড়াতে পারে না আলী। নতুন দেশে এসেছে, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ সালাপ জমাতেই হবে। তাই সাগ্রহে রাজি হয়ে যায়।

দোকান বন্ধ করে আলীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে আসে দোকানী। আপ্যায়ন করে বাইরের ঘরে বসিয়ে সে অন্দরে চলে যায়।

আলী জানালার পাশে বসে পথচারীদের যাওয়া আসা দেখতে থাকে।

একটু পরে একখানা ছোট্ট গালিচা হাতে করে একটা লোক হাঁকতে হাঁকতে এগিয়ে চলেছে, গালিচা নেবে গা—বহুৎ আজব গালিচা! একদম জলের দরে বিকিয়ে যাচ্ছে। মাত্র তিরিশ হাজার মোহরে দিয়ে দেব।

আলী হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে লোকটার দিকে। বলে কী? নামাজ পড়ার যোগ্য ছোট্ট একখানা গালিচার দাম তিরিশ হাজার? লোকটার কী মাথা-টাথার কিছু গোলমাল আছে? লোকটা আরও কাছে ওর জানালার সামনে আসতে আলী ওকে ডাকে, এই শোনো, দেখি তোমার গালিচাখানা। এতো দাম হাঁকছ কেন?

লোকটা নির্বিকার ভাবে বলে, এতো দাম কোথায়, কত্তা। আমার মালিক বলে দিয়েছে, চল্লিশের কমে বিক্রি করবি না, তা রাত হয়ে যাচ্ছে, হাত খালি করে ঘরে ফিরতে নাই, তাই তিরিশ হাজারেই ছেড়ে দেব ঠিক করেছি—একেবারে জলের দাম।

আলী পরীক্ষা করে দেখলো। অতি সাধারণ একখানা গালিচা। ভেবে পেলো না, এইটুকু একখানা সাধারণ গালিচার এতো দর কেন হাঁকছে লোকটা? পারস্যের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা একশোখানা ঘরজোড়া গালিচার তো তিরিশ হাজার টাকা দাম নয়!

—নিশ্চয়ই তোমার গালিচার অন্য কোনও মাহাত্ম্য আছে মনে হচ্ছে। তা না হলে এতো দাম চাইছো কেন?

লোকটি এবার আলীর দিকে চোখ তুলে ভালো করে তাকালো, হ্যাঁ সাহেব আপনি ঠিকই ধরেছেন। এ গালিচা মন্ত্রঃপূত। এর ওপর বসে আপনি যেখানে যাওয়ার বাসনা করবেন সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাবে। তা সে হিমালয়ের চূড়াতেই হোক বা ভারত মহাসাগরের মাঝখানেই হোক। সাগর প্রান্তর গিরি নদী কোনও বাধাই এর কাছে বাধা নয়। চোখের পলকে যেখানে খুশি চলে যেতে পারবেন।

আলী বলে, তোমার কথা যদি ঠিক হয়, যদি প্রমাণ পাই তোমার গালিচা ঐ রকম

অলৌকিক গুণধর, তবে তিরিশ কেন চল্লিশ হাজারই দেব তোমাকে। এ ছাড়া দালালী হিসাবে আর এক হাজার বেশি দেব তোমাকে! আগে তোমার কারিকুরি দেখাও দেখি—

লোকটির চোখে কেমন অবিশ্বাসের প্রশ্ন, কোথায়, আগে একচল্লিশ হাজার মোহর আমাকে দেখান, তা হলে এখুনি ভেল্কীবাজি দেখিয়ে দেব আপনাকে।

আলী বলে, টাকা আমার ডেরায় আছে। এই শহরের সব চেয়ে সেরা যে সরাইখানা—সেখানে আমি একখানা ঘর ভাড়া করে উঠেছি। সওদা হয়ে গেলে আমার সঙ্গে যেও হাতে হাতে টাকা দেব, মাল নেব।

লোকটি এবার উৎসাহিত হয়ে বলে, সরাইখানার পথ তো এখান থেকে নেহাত কম নয়। তা পায়ে হেঁটে গিয়ে কী লাভ, আসুন এই গালিচায় এসে বসুন আমার পাশে, এক পলকে পৌঁছে

যাবো আপনার ঘরে। গালিচায় বসে আপনি মনে মনে স্মরণ করবেন একবার, কোথায় যাবেন। ব্যস আর কিছু করতে হবে না, সোজা পৌঁছে দেবে পলকে।

হলোও তাই। গালিচায় বসে চোখ বন্ধ করে মনে মনে একবার মাত্র ভেবেছে, এখন ঘরে ফিরতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে দেখলো, সেই সুরম্য সরাইখানায় তার নিজের কক্ষে এসে পড়েছে সে।

তাজ্জব ব্যাপার! আলী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নফরকে বললো, একে একচল্লিশ হাজার মোহর দিয়ে দে।

আলী ভাবে সার্থক তার ভারতে আসা। অতি অল্পকালের মধ্যেই এমন এক আজব বস্তু সংগ্রহ করতে পেরেছে যা তার অন্য দুই ভাই কখনোও করতে পারবে না। যে দেশেই যাক, আর যত চেষ্টাই করুক, এমন অলৌকিক যাদুকরী জিনিস ওরা পাবে কোথায়? সুতরাং কেল্লা ফতে—নূর অল-নিহার তারই বুকে মাথা রাখবে। বাবা বিচক্ষণ সুলতান, বিচারে তিনি পক্ষপাতিত্ব করবেন না। আর ন্যায় বিচার হলে তাকে টেক্কা দিতে পারবে না অন্য কোনও ভাই।

কিন্তু সমস্যা হলো—বছরের সবে তিনটি মাস অতিক্রান্ত। কথা আছে, এক বৎসর পরে ওরা তিন ভাই সেই সরাইখানায় মিলিত হবে, তারপর এক সঙ্গে হাজির হবে সুলতানের সামনে। এখন এই দীর্ঘ সময় কোথায় কাটাবে সে।

পরদিন থেকে সে শহরের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলো। সারা শহরব্যাপী হিন্দুদের কত মজার মজার মন্দির। আর সেই সব মন্দিরে কত বিচিত্র রকমের সব মূর্তি। কোনওটা পিতলের কোনওটা তামার আবার কোনওটা বা সোনার তৈরি। সকাল সন্ধ্যায় ঘণ্টা-ধ্বনি হয়, নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজে, হাজার হাজার ভক্ত নর-নারীর সমাগম হয়। পুরোহিত সকলকে আশীর্বাদ করে, প্রসাদ হয়, ভক্তরা যে যা পারে প্রণামী দিয়ে চলে যায়।

আলী অবাক হয়ে দেখে সব। পুরোহিতগুলো বেতন পায় না। ভক্তদের প্রণামীর দাক্ষিণ্যে তাদের জীবিকা চলে।

হিন্দুদের বারমাসে তের পার্বণ। উৎসব অনুষ্ঠান লেগেই আছে। মাঝে মাঝেই

মেলা বসে। দূর দুরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে। আসে সওদাগররা। কত রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস কেনা বেচা হয়।

এইভাবে দেখতে দেখতে প্রায় বছরটা ফুরিয়ে আসে। আলী ভাবে এবার দেশে ফিরতে হবে। নফরটাকে সব গোছগাছ করে নিতে বলে। তারপর একদিন গালিচাখানা পেতে ওকে পাশে বসিয়ে দেশের সেই সরাইখানায় যাবার ইচ্ছা করে মনে মনে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ তিন মাসের দুর্গম পথ পলকে পার হয়ে এসে পৌঁছয় ওরা ঐ সরাইখানার সামনে।

বছর পুরতে আর ক'দিন বাকী। আলী ঠিক করে এ'কটা দিন সে সরাইখানাতেই অপেক্ষা করবে ওর ভাইদের জন্য।

আলী-ওরা ভাইদের জন্য বসে থাক ওখানে, আমরা এবার মেজভাই শাহজাদা হাসানের কথা বলি।

চলতে চলতে হাসান পারস্যের এক শহরে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানকার সেরা সরাইখানাতে একখানা ঘর ভাড়া করে মালপত্র এবং নফরটাকে সেখানে রেখে হাসান বেরুলো শহর পরিক্রমায়। কত রকম সুন্দর সুন্দর শৌখিন জিনিসের কত সব দোকান। দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়।

হাসানের রূপে এবং ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে এক সওদাগর তাকে পাশে বসিয়ে খাতির যত্ন করতে থাকে। এমন সময় হাসান লক্ষ্য করলো এক অশীতিপর সদাশয় বৃদ্ধ হাতে একটা ছোট্ট হাতীর দাঁতের চোঙ্গা নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে এগিয়ে আসছে, একেবারে পানির দামে বিকিয়ে গেলো—মাত্র তিরিশ হাজার দিনারে দিয়ে দেব। পয়সা দিয়েও এ বস্তু বাজারে কিনতে পাবেন না কেউ। একেবারে মাটির দাম—মাত্র তিরিশ হাজার।

হাসান অবাক হয়ে সওদাগরকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা শেখ সাহেব বৃদ্ধটি এসব কী আবল তাবল বকছে! লোকটি পাগল নয় তো!

দোকানী বলে, না না মালিক খুব সাচ্চা আদমী। আমরা বহুকাল দেখছি, কাউকে এক পয়সা ঠকায় না। ভুলেও মিথ্যে কথা বলে না কখনও। দামী দামী শখের জিনিসের দালালী করে খায়। ওর হাতে যে জিনিসটা দেখছেন ওটা ও কিনে আনেনি। কোনও সুলতান আমির ঘরের জিনিস বিক্রি করতে পাঠিয়েছে। বিক্রি হলে ও কিছু দালালী পাবে মাত্র।

হাসান বৃদ্ধকে কাছে ডাকে, আপনার ঐ হাতীর দাঁতের ছোট্ট চোঙাটির কী যাদু আছে, যে তিনিশ হাজার দিনার দাম চাইছেন?

বৃদ্ধ হাসে, ঠকিয়ে একটা ফুটো পয়সা নেব না মালিক। লক্ষ দিনার দিলে বাজারে মিলবে না এ-জিনিস। আমার মনিবও চল্লিশ হাজারের কমে বেচতে বারণ করেছে। কিন্তু সারা শহরটা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেলাম, একটা শৌখিন মালদার মানুষ দেখতে পেলাম না।

—তা বস্তুটির অলৌকিক কী গুণ আছে শুনি?

চোঙাটি হাসানের হাতে দিয়ে সে বলে এতে একটা চোখ রেখে আপনি যা দেখতে বাসনা করবেন তাই দেখতে পাবেন, দেখুন না—

হাসান কৌতুক বোধ করে। অবিশ্বাস্য মনে হয় বৃদ্ধের কথা। চোখে ধরে সে নূর অল-নিহারকে দেখার বাসনা করে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রাসাদের হারেমের সুরম্য হামামে বহু সখী-পরিবৃতা হয়ে বিবসনা নূরকে জলকেলী রত দেখতে পেয়ে রোমাঞ্চিত এবং বিস্মিত হয়ে ওঠে সে। এও কি সম্ভব? এমন অপার্থিব বস্তুও পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় এদেশে? হাসান বলে, আমার সরাইখানায় চলুন, এখুনি আপনার দাম মিটিয়ে দিচ্ছি। তিরিশ হাজার নয় চল্লিশ হাজারই পাবেন আপনি। এবং আপনার দালালী হিসেবে আরও এক হাজার বেশি দেব।

হাসান ভাবে, এমন এক আজব জিনিস সে হাতে পেয়েছে—তাকে আর হারায় কে? তার ভাইরা দেখলে হাঁ হয়ে যাবে না?

হাসানেরও একই সমস্যা হলো। বছর শেষের অনেক বাকী। কিন্তু তার আগে দেশে ফেরাও যাবে না। তাই পারস্যেরই নানা দর্শনীয় জায়গা দেখে সে দিন কাটাতে লাগলো।

তারপর বছরের শেষের দিকে সময় হিসেব করে একদিন সে ঐ সরাইখানায় এসে হাজির হলো।

আপনারা সবাই জানেন তার আগে বড় ভাই আলী সেখানে পৌঁছে গিয়েছে।

এবার ছোটজন হুসেনের কথায় আসি।

চলতে চলতে হুসেন এসে পৌঁছল সমরখন্দে—জাঁহাপনার ছোট ভাই শাহজামান এখন যেখানে সুলতান হয়ে আছে।

যথারীতি সেও শহরের এক সম্ভ্রান্ত সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছিলো।

একদিন শহর দেখতে পথে বেরিয়েছে হুসেন, এক ফেরিওয়ালার হাতে তরমুজ সদৃশ বিরাট আকৃতির একটি আপেল দেখে সে কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস করলো, এতো বড় আপেল তো কখনও দেখিনি গো? এটা কোন দেশের মাটিতে ফলে?

লোকটি হেসে বললো, না মালিক এ ফল গাছে ধরেনি। এক বিজ্ঞানী যাদুকরের তৈরি।

—কত দাম?

—মাত্র তিরিশ হাজার দিনার পেলে দিয়ে দেব। আমার মালিক চল্লিশ হাজারের কমে বেচতে বারণ করেছে। কিন্তু সারা শহর ঘুরে একজন সমঝদার মানুষ পেলাম না। তাই ঠিক করেছি, তিরিশ হাজারেই দিয়ে দেব।

হুসেন বলে, তুমি কী মস্করা করছো আমার সঙ্গে? একটা ফলের দাম তিরিশ হাজার দিনার?

মস্করা কেন করবো, জনাব! আপনি এর আজব গুণের কথা জানেন না, তাই অবাক হচ্ছেন। এ আপেল খাওয়ার জন্য নয়, এর গন্ধ শুঁকলে দিল খুশ হয়ে যায়, দুরারোগ্য বিমারী সেরে যায়।

হুসেন পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। নাকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আপেলটায় আঘ্রাণ করতেই দেহের সকল অবসাদ কেটে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে ওঠে সে।

লোকটি বলে, কী অবাক হয়ে গেলেন? দাঁড়ান এখনও আসল প্রমাণ আপনাকে দিইনি।

একটা লোক কুষ্ঠরুগীকে পিঠে বেঁধে নিয়ে আসছিলো। লোকটি আপেলটা ঐ পঙ্গু কুষ্ঠরুগীর নাকে নিয়ে গিয়ে ধরতেই রুগীটা চটপট করে ঝোলা থেকে লাফিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়লো। হুসেন দেখলো, ওর দেহে আর কোনও ক্ষত বা দাগ কিছুই নাই। দিব্যি সুস্থ তাগড়াই একটি জোয়ান মানুষ।

হুসেনের মন আনন্দে নেচে উঠলো। এমন অলৌকিক বস্তু যদি তার হাতে থাকে তবে তাদের ভাইদের সে ডরাবে কেন? তারা যত চেষ্টাই করুক, এর চেয়ে আজব জিনিস আর কী জোগাড় করতে পারে।

লোকটিকে সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে একচল্লিশ হাজার দিনার গুণে দিয়ে আপেলটা সে কিনে নেয়।

বছরের বাকী সময়টা সমরখন্দে নানা জায়গা সফর করে যথাসময়ে একদিন সে সেই সরাইখানায় এসে বড় দুই ভাই-এর সঙ্গে মিলিত হয়।

একটা বছর পরে আবার একত্রিত হতে পেরে সকলেই খুব খুশি হয়ে আনন্দে আলিঙ্গন করে।

খানা-পিনা শেষ হলে বড় ভাই বলে, এবার আমরা কে কি সংগ্রহ করে এনেছি—এসো দেখাই।

আলী তার আশ্চর্য গালিচা বের করে বলে, এর সাহায্যে পলকের মধ্যে পৃথিবীর অপর প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। এসো আমরা তিন ভাই এর উপর চেপে বসি। তারপর দেখবে কোথায় নিয়ে যাবো তোমাদের।

পলকের মধ্যে দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পারের এক দেশে নিয়ে গেলো আলী। এবং পর মুহূর্তেই আবার সরাইখানায় ফিরে এলো তিনজন।

মেজ ভাই বের করলো সেই হাতীর দাঁতের চোঙাটা। বললো, জিনিসটা দেখতে অতি সাধারণ, কিন্তু এতে চোখ রেখে দুনিয়ার যা কিছু দেখতে চাইবে দেখতে পাবে। এই মুহূর্তে আমাদের বোন নূর কী করছে, দাঁড়াও, দেখে আমি বলে দিচ্ছি।

এই বলে হাসান চোঙাটা ধরেই ডুকরে কেঁদে উঠলো।

দুই ভাই বুঝতে না পেরে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কী? কী দেখলে?

হাসান বলে, আর কী হবে এসবে? নূর মৃত্যুশয্যায়। বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। তার চারপাশে হারেমের মেয়েরা ঘিরে আছে। তাদের সকলের চোখে মুখে কী নিদারুণ হতাশা। আমরা পৌঁছবার আগেই নূর হয়তো ইন্তেকাল করবে।

হাসান-এর হাত থেকে চোঙটা নিয়ে আলী চোখে লাগিয়ে হাসানের কথার সত্যতা যাচাই করতে যায়।

—না না, আর তো দেরি করা যায় না, চলো, এখুনি প্রাসাদে পৌঁছে যাই। এসো আমার গালিচায় বস তোমরা।

ঘোড়াগুলো সঙ্গে দিয়ে নফরদের রওনা করে দিয়ে তিনভাই গালিচায় চেপে তক্ষুনি প্রাসাদের হারেমে এসে পৌঁছায়। নূর বিছানার সঙ্গে লীন হয়ে গেছে। বাহ্যজ্ঞান সব লোপ পেয়ে গেছে। তা না হলে আজন্মের সাথী তিন ভাইকে সামনে দেখেও চিনতে পারে না? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

হুসেন আপেলটা নাকের কাছে ধরতেই নূর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। এক বছর বাদে তিনভাইকে এক সঙ্গে দেখে খুশিতে ডগমগো হয়ে বলে, বিদেশে সবাই ভালো ছিলে ভাইজান?

—আমরা ভালোই ছিলাম। কিন্তু তোমাকে এমন বিমার দেখে আমরা তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। যাক, এখন কেমন লাগছে?

নূর বলে, খুব ভালো, আমি তো আগের চেয়েও সুস্থ হয়ে গেছি। এখন আমার একটু অসুখ নাই, ভাইজান।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো দশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

তিন ভাই সুলতানের কাছে এসে তাদের নিজ নিজ সংগৃহীত পরমাশ্চর্য বস্তুর অলৌকিক গুণাবলী প্রদর্শন করলো। সুলতান হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনটি জিনিসই তিন দিক থেকে অনন্য সাধারণ। কোনও ভাবে কাউকে খাটো করে দেখতে পারি না আমি। সুতরাং এখন নতুন এক সমস্যার মধ্যে পড়লাম আমি। এ অবস্থায় তোমাদের কোন ভাই-এর হাতে নূরকে সঁপে দিতে পারি আমি? যাই হোক, আর একটা পরীক্ষা তোমাদের দিতে হবে। কাল সকালে পোলো মাঠে হাজির হবে তোমরা। তিন ভাইকেই তীর ছুঁড়তে হবে। যার তীর সবেচেয়ে বেশি দূর যাবে, সেই পাবে নূরকে।

পরদিন সকালে যথাসময়ে তিন ভাই হাজির হলো পোলো মাঠে। আলী এবং

হাসানের চেয়ে হুসেন অনেক বেশি দূর পাঠিয়ে দিলো তার তীর। সুলতান এবার একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাক, এবারে একটা ফয়সালা হয়ে গেলো। তোমাদের দু'জনের মনে কোনও খেদ থাকার কারণ নাই, হাসানই নূরকে লাভ করার যোগ্যতম পাত্র। আর দেরি করতে চাই না, আজই আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি, হাসানের সঙ্গে নূর-এর শাদী হবে।

দুঃখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো আলী। প্রকাশ্যে সে জানিয়ে দিলো সুলতানকে, মসনদে তার লোভ নাই এতোটুকু। ভোগ-বিলাস থেকে বিরত হয়ে সে দরবেশের বেশে পথে বেরিয়ে পড়লো।

ছোট ভাই হুসেন কিন্তু মনের দুঃখে বিবাগী হতে পারলো না। ওর মনে একটা সংশয়-এর কুণ্ডলী পাকাতে থাকলো। বড় ভাই আলীর তীর বেশি দূরে যেতে পারিনি। কিন্তু হুসেনের তীর দৃষ্টির অগোচরে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু সুলতান হাসানের তীর আরও বেশি দূরে গেছে বলে রায় দিলেন।

হুসেন ঠিক করলো তীরখানা খুঁজে বের করবেই। পোলো মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ। হুসেন তীরখানা খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর চলে গেলো। কিন্তু না কোথাও দেখতে পেলো না। অবশেষে সে মরিয়া হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। কিন্তু না, কোথাও দেখতে পেলো না সে তীর। হুসেন অবাক হয়ে ভাবে, কোথায় যাবে, আর কত দূরই বা যেতে পারে? আরও খানিকটা ওপরে উঠতে একটা পার্বত্য পথের নিশানা পেয়ে সেইদিকে চলতে থাকলো সে। চলতে চলতে একটি বিশাল বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। এই দরজার পাল্লায় গেঁথে গেছে তীরখানা। আশ্চর্য! পোলো মাঠ থেকে এতো দূরে এ তীর এলো কী করে!

যাই হোক, দরজা থেকে টান দিয়ে তীরখানা সে খুলে নিলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজাখানা খুলে গেলো ওর মুখের সামনে।

এক অলোক সামান্যা সুন্দরী বেরিয়ে এলো বাইরে। তার সঙ্গে এক দঙ্গল সহচরী। তরুণীর বিলাসবহুল বেশবাস এবং রূপের জেল্লা দেখে হুসেনের বুঝতে অসুবিধে হয় না, এ মেয়ে সাধারণ কেউ নয়, নিশ্চয়ই কোনও শাহজাদী হবে।

হুসেন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি প্রশ্ন করে, কী দেখছো, শাহজাদা হুসেন?

হুসেন! তার নাম সে জানলো কী করে?

—আপনি কে? আমি বুঝতে পারছি না, আমার নাম কী করে জানলেন আপনি?

মেয়েটি বললো, উঁহু, এখানে বাইরে দাঁড়িয়ে কোনও কথা নয়, আগে ভেতরে চলো, তারপর তোমার সব কথার জবাব দেবো।

হাত ধরে শাহজাদী হুসেনকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলো। কক্ষের জাঁকজমকে চোখ ঝলসে যায়। একটা শৌখিন মখমলের গদীতে ওরা দু'জনে পাশাপাশি বসলো। মেয়েটি বললো, তোমার প্রতীক্ষাতেই এতকাল এখানে বসেছিলাম। আমি জিন-সম্রাটের কন্যা। তোমার সঙ্গেই আমার ভাগ্য বাঁধা হয়ে আছে। আমারই অলৌকিক ক্ষমতায় তীরখানা আমার দরজায় এনে রেখেছিলাম। জানি, তুমি ঐ তীরের সন্ধান করতে করতে আমার এখানে আসবেই। আমার হিসেব কিন্তু নির্ভুল। দ্যাখো, সত্যিই তুমি এলে। আমারই যাদুবলে বিশানগড়ে গালিচা, সিরাজে হাতীর দাঁতের চোঙা এবং সমরখন্দে ঐ আপেল সংগ্রহ করতে পেরেছিলে তোমরা।

তোমাদের বোন নূর অল-নাহারকে পাওয়ার জন্য তোমরা পাগল হয়েছিলে। তোমার বড় ভাই আলী তো মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে ফকির দরবেশ হয়ে গেলো। এখন তুমি কি করবে? ঐ তীরখানা বুকে গেঁথে আত্মহত্যা করবে কী?

জিন-সম্রাট-কন্যা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। বলে, দ্যাখো, আমার দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে দ্যাখো, হুসেন। আমি কী তোমার ভগ্নীর চেয়ে কিছু কম সুন্দরী? কী, আমাকে তোমার পছন্দ হয় না? তুমি যদি অমত না কর, আমি তোমাকে শাদী করতে চাই, হুসেন। করবে আমাকে শাদী?

মেয়েটির এই আচমকা প্রশ্নের কী জবাব দেবে হুসেন? সত্যি সে তুলনাবিহীন পরমাসুন্দরী। নূর অল-নাহার-এর রূপের খ্যাতি দেশ-জোড়া। কিন্তু এর কাছে তার রূপ ম্লান হয়ে যায়। হুসেন বললো, কিন্তু তোমার মা বাবার মত হবে কেন? তুমি জিন-সম্রাট-নন্দিনী, আবার আমি মানব-সন্তান, এ শাদীতে সম্মত হবে কেন তারা?

আবার সুন্দর করে হাসল মেয়েটি, ওসব নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। মা বাবা কেউ নয়। আমি নিজেই আমার মালিক। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাই সব। এখন তোমার মত কী, তাই বলো।

হুসেন বলে তোমাকে পেলে আমি ধন্য হবো।

মেয়েটি আবার হাসে, কেন, তোমার ভগ্নী নূরের জন্য মন খারাপ করবে না?

—না। সে এখন আমার জীবনে মৃত। আর তা ছাড়া রূপে গুণে কোনও দিক থেকে সে তোমার সমকক্ষ হতে পারে না। তুমি বিশ্বাস কর, তোমাকে পেলে আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

মেয়েটি এবার হুসেনকে দু'হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর আশ্লেষে চুম্বন করে।

—এই আমাদের শাদী হয়ে গেলো। এখন থেকে তুমি আমার স্বামী, আর আমি তোমার সহধর্মিণী। আচ্ছা, চলো, এবার পাশের ঘরে যাই। খানা-পিনা সাজিয়েছে ওরা, খেয়ে দেয়ে শুতে যাবো আমরা।

পাশের ঘরটায় হাজারো রকমের খাবার-দাবার সাজানো ছিলো টেবিলে। দু'জনে পরিতৃপ্তি করে আহার পর্ব শেষ করে পাশের আর একখানা ঘরে এলো। জিন-কন্যার শোবার ঘর। এমন সুন্দর করে সাজানো-গোছানো স্বপ্নপুরীর মতো বাসরঘর হুসেন কল্পনাও করতে পারেনি এর আগে।

সাকী মদ ঢেলে দিলো সোনার পেয়ালায়। একটা পেয়ালা তুলে হুসেনের ঠোঁটে ধরলে জিনিয়াহ। বললো, চুমুক দাও।

হুসেনের সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেলো। এমন অনাস্বাদিত আনন্দ সে এই প্রথম অনুভব করলো।

সুখের সায়রে ভাসতে ভাসতে দুটা মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো। একদিন হুসেন বললো, অনেক দিন প্রাসাদ ছেড়ে এসেছি। বাবা বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসা দরকার।

জিনিয়াহ বললো, তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে বাঁচবো কি করে? না, না, একটা দিন, একটা পলও তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারবো না আমি।

হুসেন জিনিয়াহকে আদর করে চুমু খেয়ে বললে, আমি চিরকালের জন্য তোমারই গোলাম হয়ে গেছি সোনা। আমিই কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো? শুধু বাবার সঙ্গে একবার দেখা করেই আবার ফিরে আসবো তোমার কাছে। কিন্তু তুমি না বললে তো আমি যেতে পারবো না।

জিনিয়াহ বললো, বেশ, মাত্র তিন দিনের জন্য তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি। আমার সশস্ত্র প্রহরীরা তোমার সঙ্গে যাবে। যদি কোনও বিপদ আপদ ঘটে, ওরা তোমাকে রক্ষা করবে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো বারতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

আর একটা কথা, ভুলে কখনও তোমার বাবা বা অন্য কাউকে বোলো না, তুমি একটি জিন-কন্যাকে শাদী করেছ। এবং আমার এই প্রাসাদের ঠিকানাও যেন তারা কেউ জানতে না পারে। শুধু তোমার বাবাকে বলবে, ভাববার কোনও কারণই নাই, তুমি খুব সুখ সম্ভোগের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছো।

জিনিয়াহ হুসেনের নিরাপত্তার জন্য কুড়িজন সশস্ত্র ঘোড়-সোয়ার সৈন্য সঙ্গে দিয়ে রওনা করে দিলো।

বেশি দূরের পথ নয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই হুসেন সদলবলে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো। অনেকদিন পরে পুত্রকে ফিরে পেয়ে সুলতান আনন্দে কেঁদে ফেললেন। পুরবাসীরা উৎফুল্ল, কলমুখর হয়ে উঠলো। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাশ্রুনয়নে সুলতান বললেন, আবার যে তোকে ফিরে পাবো, ভাবতে পারিনি, বাবা। ভেবেছিলাম মনের দুঃখে তুই বুঝি আত্মঘাতী হয়েছিস।

হুসেন বললে, আপনি যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তা মিথ্যে না, আব্বাজান। ভালোবাসার শেকড় তো এক পলকে উপড়ে ফেলা যায় না। নূরকে হারানোর দুঃখ কি সহজে ভোলা সম্ভব? যাক, সে এখন আমার বড় ভাই-এর বেগম, তার সম্বন্ধে কোনও কামনা বাসনা পোষণ করা পাপ। আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এই ক'মাসে নূরকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পেরেছি, বাবা।

সুলতান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কী করে পারলে বাবা?

হুসেন বলে, এর বেশি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, আব্বাজান, বলতে পারবো না। বারণ আছে। আর জেনে রাখুন, আমি খুব সুখে আছি। আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর বেশি কিছু আর আমার চাইবার নাই।

সুলতান বললেন, শুনে খুব সুখী হলাম বাবা। কোনও পিতাই তার সন্তানের সুখ-সমৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই জানতে চায় না। আমি চাই, যে ক'টা দিন বাঁচি, তুমি আমার পাশেই থাক। কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে তুমি পারবে না।

হুসেন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, আব্বাজান। আমি মাঝে মাঝে এসে আপনাকে দেখে যাব। আপনার যখন দেখতে ইচ্ছে হবে তক্ষুনি এসে যাব আমি।

সুলতান ম্লান হাসলেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি করে জানতে পারবে তুমি। কোথায় কত দূর দেশে থাক তুমি তার তো কোন ঠিকানা দিতে চাও না তুমি। প্রয়োজন হলে কী করেই বা খবর দেব তোমাকে?

হুসেন বলে, আমি কসম খেয়ে এসেছি, ঠিকানা আপনাকে আমি দিতে পারছি না, আব্বাজান। তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি, প্রায়ই আমি এসে আপনাকে দেখে যাবো। মাসে অন্তত একবার আসবই।

তিন দিন তিন রাত্রি কাটানোর পর চতুর্থ দিনে খুব ভোরে আবার সে সদলবলে প্রাসাদ ছেড়ে পাহাড় উপত্যায় জিনিয়াহর কাছে ফিরে এলো হুসেন। বলা বাহুল্য, তারই পথ চেয়ে বসেছিলো জিনিয়াহ। হুসেনকে পেয়ে খুশির বন্যায় ভেসে গেলো সে। হাসি নাচে গানে মুখর হয়ে উঠলো জিনিয়াহর প্রাসাদ। অমন অমর্ত্যলোকের আনন্দ হুসেন জীবনে কখনও উপভোগ করেনি।

এই আনন্দধারায় একটি মাস কেটে গেলো। হুসেন মনে করলো, বাবাকে সে কথা

দিয়ে এসেছে মাসান্তে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। দলবল নিয়ে সে রওনা হলো সুলতানের প্রাসাদ অভিমুখে।

এদিকে এই মাসখানেকের মধ্যে সুলতানের পার্শ্বচররা নিয়ত তাঁর কানে কুমন্ত্রণা দিতে কসুর করেনি।

—শাহজাদা হুসেনের জাঁকজমকের বহরটা লক্ষ্য করেছেন জাঁহাপনা? যে সাজ-পোষাক সে পরে এসেছিলো, তেমন মহামূল্য বস্তু সারা আরব দুনিয়ার কোনও সুলতান বাদশাহর প্রাসাদে নাই। আর তা ছাড়া, আপনি তার পরমারাধ্য পিতা। কোথায় অবস্থান করছে, ঠিকানা জানাতে সে অস্বীকার করলো কেন? মনে হচ্ছে এর পিছনে কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে।

আর একজন পারিষদ বললে, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন, জাঁহাপনা? শাহজাদার দেহরক্ষী ঐ সৈন্যগুলো কেমন ঝকঝকে থাকে! ওদের জমকালো পোশাক-আশাকে এতোটুকু ধুলোবালি লাগেনি। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি সদ্য সেজেগুজে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এ থেকে বুঝতে কি অসুবিধে হয় যে শাহজাদা আমাদের শহর থেকে খুব বেশি দূরে কোথাও থাকে না।

উজির ঘাড় নেড়ে সায় দিলো এ কথায়, হুঁ, ঠিক, ঠিক বলেছ। এই শহরেরই আশেপাশে কোনও গোপন ডেরায় সে আস্তানা গেড়েছে। মনে হচ্ছে, উদ্দেশ্য মহৎ নয়, জাঁহাপনা।

সুলতান ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, কী কী বলতে চাও তোমরা?

উজির বললো, শাহজাদার আড়ম্বর এবং ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো, সে প্রাচুর্যের মধ্যে বেশ বাদশাহী মেজাজেই দিন কাটাচ্ছে। এবং এও পরিষ্কার, এ শহর থেকে সে খুব বেশি দূরেও থাকে না। আমার ধারণা গোপনে গোপনে সে শক্তি সঞ্চয় করছে। এবং এখন সে জাঁহাপনার একান্ত অনুরক্ত থাকলেও খুব শিগ্গিরই একদিন তার নিজের স্বরূপ দেখাতে দ্বিধা করবে না।

সুলতান টেবিলে ঘুষি মেরে চিৎকার করে ওঠে,—খামোকা এসব কথার মানে কী?

উজির বিনীতভাবে বলে, অর্থ একটাই জাঁহাপনা। এবং তা অত্যন্ত স্বচ্ছ। সময় এবং সুযোগ বুঝে সে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে।

—অসম্ভব। আমার হুসেনকে আমি চিনি। এসব তোমাদের মনগড়া আশঙ্কা।

উজির বলে, আপনার কথাই সত্যি হোক, ধর্মাবতার, আমাদের আশঙ্কা যেন মিথ্যাই হয়। কিন্তু একটা কথা আপনি ভেবে দেখুন, জাঁহাপনা, শাহজাদি নূর অল-নাহার তার নয়নের মণি ছিলো। আপনি তার বাড়াভাতে ছাই দিয়েছেন। আপনার বিচার যত সূক্ষ্মই হোক, শাহজাদা হুসেন কিন্তু তা উদার চিত্তে মেনে নিতে পারেনি। তা হলে সে ঐ ভাবে প্রাসাদ থেকে অন্তর্ধান হয়ে যেত না। এই ক'মাস বাদে আবার সে ফিরে এসেছিলো আপনার কাছে, তা কিন্তু শুধু পিতৃভক্তি বা ভালোবাসার টানেই নয়, তার পিছনে অন্য একটা সুপরিকল্পিত গূঢ় উদ্দেশ্য ছিলো।

—গূঢ় উদ্দেশ্য?

সুলতান বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে উজিরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

—হ্যাঁ, জাঁহাপনা, গভীর এক কূট উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসেছিলো আপানর কাছে। তাকে দেখা মাত্রই আপনার কি মনে হয়নি, অন্তত অর্থবলে সে আপনার চেয়ে অনেক বলীয়ান? তার সাজ-পোশাকে যে মহামূল্য মণিরত্নাদি বসানো ছিলো তার কিমত আপনার সমগ্র সলতানিয়তের চাইতেও বেশি!

সুলতান গম্ভীরভাবে বললেন, দেখেছি। হ্যাঁ, সে কথা একশোবার ঠিক। কিন্তু তাতে

আমি ঈর্ষান্বিত হব কেন। বরং এ তো আমার গৌরবের কথা!

উজির বলে, আপনি বড় উদার মহৎ সরল প্রাণ। কিন্তু হুকুমমত চালাতে গেলে বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সে তার ঐশ্বর্য দেখাতে এসেছিলো। এবং একথা তো আপনি মানেন, পয়সা যার হাতে পৃথিবী তার পায়ে।

সুলতান, বললো, এ তো সবাই জানে। মানবো না কেন?

উজির বলে, তাহলে বুঝুন, পয়সা দিয়ে সে শৌর্য বীর্য বিক্রম সবই কিনতে পারে। সুতরাং আজ না থাকলেও কালক্রমে সে আপনার চেয়ে অনেক বলশালীও হতে পারে। এবং তখন যদি সে আপনাকে মসনদ থেকে নামিয়ে কারারুদ্ধ করে তাতে কী অবাক হবেন?

—না না না, সে কখনও হতে পারে না। হুসেন—আমার হুসেন কখনও অমন কাফের হতে পারে না উজির।

—কিন্তু জাঁহাপনা, এই-ই ইতিহাস। যুগে যুগে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে আসছে—

—না না। ওসব বলে আমার সব গোলমাল করে দিও না তোমরা। হুসেন কখনও অমনটি হতে পারবে না।

উজির কুর্ণিশ জানিয়ে বলে, গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা, সুলতান মহনুভব, আমরা অধম হীনমন্য মানুষ, কী বলতে কী বলে আপনার দুঃখের কারণ হলাম—এজন্য গভীর অনুতপ্ত বোধ করছি।

সুলতান উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন, জানি না, কী বিশ্বাস করা উচিত আর কী বিশ্বাস করা উচিত নয়। যাই হোক, তোমাদের এই পরামর্শের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আমি সজাগ থাকবো এ ব্যাপারে।

সুলতান সেদিনের মতো তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীদের বিদায় করে দিলেন।

শাহজাদা হুসেন সুলতানের কাছে এসে ভক্তিভরে প্রণামাদি জানিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করলো, আব্বাজান, আপনার শরীর ভালো ছিলো তো এক মাস?

সুলতান ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুই যেদিন থেকে ভালো আছিস শুনেছি, সেদিন থেকে আমি খুব ভালো আছি বাবা।

ছেলেকে কাছে পেয়ে তাঁর মনে সকল সংশয় অন্তর্হিত হয়ে গেলো নিমেষে। হুসেনের অপাপ-বিদ্ধ মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, ওরা মিথ্যেই সন্দেহ করেছে, না না, শিশুর মতো সরল এই হুসেন কখনও নৃশংস নির্মম হতে পারে না। মিথ্যে, মিথ্যে ওদের সব সন্দেহ।

পরদিন সকালে কিন্তু সুলতান শহরের এক নামকরা যাদুকরী বৃদ্ধাকে ডেকে এনে বললেন, দেখ বুড়ি, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। লোকে বলছে, আমার ছেলে হুসেন নাকি এই শহরের আশেপাশে কোনও গোপন ডেরায় বাস করে। সে তার ঠিকানা বলেনি আমাকে। তোমাকে এই কাজটি গোপনে করে দিতে হবে। কাল সকালে হুসেন প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবে। তুমি ঐ সময় তাকে অনুসরণ করে পিছনে পিছনে যাবে।

বুড়ি বললো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা, সব নাড়ি নক্ষত্র আমি জেনে এসে বলবো আপনাকে।

মাসখানেক বাদে হুসেন আবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে জিনিয়াহর প্রাসাদ ছেড়ে সদলবলে বেরিয়ে পড়লো। একটু এগোতেই দেখতে পেলো এক অশীতিপর বৃদ্ধা জরাগ্রস্ত রুগীর মতো এক প্রস্তরখণ্ডের ওপর শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। হুসেন এগিয়ে এসে ডাকলো, কে গো, এখানে শুয়ে কে?

—আমি মালিক, আমি এক অথর্ব, জ্বরে ব্যথায় আর চলতে না পেরে এখানেই পড়ে আছি কাল থেকে।

হুসেন জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবে তুমি?

যাবো তো শহরে। কিন্তু আমার যা শরীরের হাল, তাতে এক পা চলার সাধ্যি নাই। উঃ বাবাগো, ম'লাম!

হুসেন রক্ষীদের বললো, বুড়িকে প্রাসাদে নিয়ে চলো। মনে হচ্ছে, কঠিন অসুখ করেছে। দাওয়াই পত্র না খেলে হয়তো আর বাঁচবে না।

দু'জন রক্ষী বুড়িকে তুলে ধরাধরি করে পাহাড়-প্রাসাদে নিয়ে আসে। হুসেনকে ফিরে আসতে দেখে জিনিয়াহ ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, ফিরে এলে যে?

হুসেন বলে, এই বৃদ্ধা পাহাড়ের নিচে একটা পাথরের চাঁইয়ের উপর শুয়ে কাতরাচ্ছিল, মনে হচ্ছে ভারি অসুখ করেছে। ওকে একটু সেবা যত্ন করে সুস্থ করতে হবে।

বৃদ্ধার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলো জিনিয়াহ। তারপর হুসেনকে উদ্দেশ্য করে বললো, তোমার দয়ার শরীর, অন্যের দুঃখ কষ্ট দেখলে তুমি আর ঠিক থাকতে পার না! যাই হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, ওর কোনও রকম অযত্ন হবে না। মনে রেখো আমার নিজের অসুখ করলে যে ভাবে সেবা যত্ন হতো, তার চেয়ে কম করা হবে না ওর জন্য! তবে শোনো, কে এই বৃদ্ধা, কী কী তার পরিচয়, কী উদ্দেশ্যেই বা ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং কেই বা পাঠিয়েছে, সব আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে যে চক্রান্তই হোক, আমার ওপর ভরসা রেখ, কেউ তোমার এক কণা অনিষ্ট করতে পারবে না। আমি মন্ত্রবলে আগে থেকেই সব জানতে পারি। কার কি মনের অভিসন্ধি সব আমি জানি। সে জন্যে তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও আমার পাকা করা আছে। তুমি নির্ভয়ে বাবাকে দেখতে যাও। কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না।

যাদুকরী বুড়িকে একটা পালঙ্কে শুইয়ে দিলো জিনিয়াহর সহচরীরা। একজন এক গেলাস জল এনে বুড়ির সামনে ধরে বললো, এই পানিটুকু খেয়ে নাও তো, সব বিমার এখুনি সেরে যাবে। সিংহ-ঝরনার পানি। এ পানি খেলে সব রোগ সেরে যায়।

বুড়ি জলটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে শুয়ে রইলো। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে অবাক হয়ে বললো, বাঃ চমৎকার দাওয়াই তো। শরীরটা একেবারে ঝরঝরে চাঙ্গা হয়ে উঠলো। নিজে নিজেই সে পালঙ্ক ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো। পরিচারিকাদের বললো, তোমাদের মালকিনের কাছে নিয়ে চলো আমাকে, তাকে আমার সুক্রিয়া জানাবো।

একটার পর একটা নয়ন-মনোহর কক্ষ পেরিয়ে সে এক বিশাল মহলে এসে দাঁড়ালো। দরবার মহল। ঠিক মাঝখানে এক সোনার সিংহাসনে বসেছিলো জিনিয়াহ! বুড়ি আভূমি অবনত হয়ে কুর্নিশ জানালো জিনিয়াহকে।

—আপনার কৃপায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি।

জিনিয়াহ বললো, আপনার যতদিন খুশি এ প্রাসাদে অবস্থান করুন। আমার মেয়েরা আপনার সেবা যত্ন করবে।

বুড়ি বললো, না মালকিন, আমি বেশ সেরে গেছি, এখন আমার ঘরে ফিরে যেতে চাই।

জিনিয়াহ বললো, বেশ আপনার যা অভিরুচি।

প্রাসাদের সবগুলি কক্ষের জাঁকজমক এবং আড়ম্বর দেখে সে হতবাক হয়ে গেলো। এতো ঐশ্বর্য কোথা হতে এলো এখানে?

শহরে ফিরে এসে সুলতানকে সবিস্তারে সব জানালো সে। উজির আমিররা বললো, জাঁহাপনা, আমরা যা আশঙ্কা করেছিলাম, তা তো মিথ্যে নয়! আপনি আর সাপ নিয়ে

খেলবেন না। এবার শাহজাদাকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন। না হলে সেই আপনাকে কারারুদ্ধ করবে।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে আমি এক্ষুনি হুসেনকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হুসেন এসে দাঁড়ালো। সুলতান বললেন, বেটা তোমার গরীব বাবার চেয়ে তুমি বিত্তে এবং বীর্যে অনেক বেশি বড় হয়েছ, এ আমার গর্বের কথা। আমি তোমার কাছে সামান্য একটা জিনিস উপহার চাইছি। লড়াই ক্ষেত্রে বাস করার মতো ভালো তাঁবু নাই আমার। তুমি যদি আমাকে একটা তাঁবু এনে দাও খুব খুশি হবো।

হুসেন বললো, এ এমন বেশি কি কথা আব্বাজান, আমি আজই এনে দিচ্ছি।

জিনিয়াহর প্রাসাদে ফিরে এসে হুসেন স্ত্রীকে বললো, বাবা আমার কাছে একটা তাঁবু চেয়েছেন।

জিনিয়াহ শুনে অবাক হলো, সে কি, এতো বস্তু থাকতে সামান্য একটা তাঁবু চাইলেন তিনি? যাই হোক, এক্ষুনি আমি ভাঁড়ার থেকে আনিয়ে দিচ্ছি।

খাজাঞ্চীকে ডেকে সে হুকুম করলো, সাইবাহকে বলো, সে যেন একটা বিরাট বড় দেখে তাঁবু নিয়ে আসে এখানে। তাবুটা যেন খুব বড় হয়, যাতে গোটা একটা সেনাবাহিনী ঘুমোতে পারে।

একটু পরে সাইবাহ এসে হাজির হলো। লোকটার চেহারা বড় অদ্ভুত। লম্বায় সে বড় জোর এক হাত; কিন্তু লোকটার গোঁফজোড়া ইয়া বড়-তার দেহের চেয়েও বিরাট। তার এক কাঁধে একখানা গদা সদৃশ লোহার ডাণ্ডা। অন্য কাঁধে গুটানো একখানা তাঁবু। খুব ছোট্ট একটা পুটলির মতো।

জিনিয়াহ ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললো, এইটুকু একটা তাঁবু এনেছ? আমি তো বলেছিলাম অনেক বড় দেখে আনতে।

সাইবাহ কুর্নিশ জানিয়ে সবিনয়ে বললো, জী, বহুত বড়ই এনেছি।

এই বলে সে তাঁবুখানা ভাঁজ খুলে দেখালো, গোটা একটা সৈন্যবাহিনী দিব্যি শুয়ে বসে কাটাতে পারে তার ভিতর।

জিনিয়াহ খুশি হয়ে বললো, বাঃ বেশ এনেছ! এখন ওটা নিয়ে তুমি আমার স্বামীর সঙ্গে তার বাবার প্রাসাদে যাও। সুলতানকে ভেট দিয়ে এসো।

সাইবাহ বললো, জো হুকুম মালকিন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো চৌদ্দতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সাইবাহকে সঙ্গে নিয়ে হুসেন সুলতানের দরবারকক্ষে প্রবেশ করে। সুলতান তখন উজির আমির পরিবৃত হয়ে মসনদে আসীন ছিলেন! হুসেন বললো, আপনার তাঁবু এনেছি জাঁহাপনা, আপনি মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন।

সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে হুসেনকে কাছে ডেকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে বললেন, আমার বয়স হয়েছে বাবা, এখন আমি মক্কায় গিয়ে আল্লাহর নাম গান করবো। এখন থেকে তোমাকেই আমি সুলতান করলাম। তুমি আদর্শ শাসক হয়ে প্রজা পালন কর।

সেইদিন থেকে হুসেন সুলতান হয়ে দেশ শাসন করতে লাগলো।

শাহরাজাদ নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

খলিফা হারুন অল রসিদের পৌত্র অল মুতাবাকিল তস্য পৌত্র মুতাসিব বিল্লাহ

অতিশয় বিনয়ী নম্র এবং প্রিয়দর্শন সুলতান ছিলেন। রূপে গুণে শৌর্যে কি বীর্যে বিক্রমে তার তুল্য নরপতি বড় একটা দেখা যায় না। কবি হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিলো দেশ জোড়া।

তাঁর দরবারে আটজন পরশ্রীকাতর উজির ছিলো। তারাই হুকুমতের কাজকর্ম দেখাশোনা করতো। তাঁর সুবিশাল সলতানিয়ত বিস্তৃত ছিলো একদিকে শ্যাম মরুভূমি সীমা থেকে শুরু করে মূর অধ্যুষিত অঞ্চল এবং অন্যদিকে খুরাসন পর্বতমালা থেকে ভারত ও আফগানিস্তানের পশ্চিম সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত।

খলিফা মুসতাবিদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো আহমদ ইবন হামদুন। একদিন দুটি যুটি প্রাসাদ উদ্যানের এক শ্বেত পাথর নির্মিত চবুতরার উপর বসে সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ আলাপ আলোচনায় মগ্ন হয়েছিলো। বয়সে দু'জনে নবীন নওজোয়ান। চোখে ওদের নানারকম রঙিন স্বপ্ন। কল্পনার ডানায় ভর করে দূর দিগন্তে ভেসে চলে ওরা। একজন বলে, আমরা যদি পাখীদের মতো সত্যই ওই নীল নভমণ্ডলে উড়ে বেড়াতে পারতাম। তা হলে কি ভালোই না হতো বলো? অন্যজন বলে, দেখ, দুনিয়ার মানুষ কত কাজে সদা ব্যস্ত। এই যে প্রকৃতির অপরূপ শোভা—এদিকে নজর দেবার ফুরসুতই নাই কারো। তা না হলে এমন সুন্দর কুসুম সুরভিত বাগিচার ধারে কাছে একটি মানুষও পা বাড়ায় না! কাজ—শুধু কাজ জীবনে সব। জীবনকে মধুর করে তুলতে হলে খাওয়া পরা ছাড়াও তো আরও অনেক কিছু চাই বন্ধু।

মুসতাবিদ আর হামদুন বণিকের ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে ঐ বাগানের মধ্যে তরুণদ্বয়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের এইসব কথাবার্তা শুনছিলেন। মুসতাবিদ অবাক হয়ে ভাবলেন, এতো অল্প বয়সে এরা এতো সুন্দর সুন্দর ভাব-দর্শনের কথা সব বলতে পারছে কি করে? আমি দেশের সুলতান খলিফা, লোকে আমাকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলে জানে, কিন্তু এই শেষ বয়সেও এসব দর্শনের ভাবনা তো আমাকে কখনও আন্দোলিত করেনি। মুসতাবিদ বুঝতে পারেন না কে এই তরুণ দুটি। এমন সুন্দর উদ্যান-তার সংলগ্ন প্রাসাদোপম বাড়ি! হামদুনকে তিনি বললেন, দোস্ত আমারই শহরে এই সুরম্য অট্টালিকা, নয়ন-মনোহর এই বাগিচা—এর মালিক কে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু জান?

হামদুন বলে, না, আমিও কিছু বলতে পারবো না ধর্মাবতার, তবে ছেলে দু'টিকে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই জানা যাবে।

হামদুন এগিয়ে গিয়ে ছেলে দু'টির সামনে দাঁড়িয়ে বলে, আমরা পরদেশী বণিক। তোমাদের মালিককে একবার খবর দাও, আজ রাতে আমরা তার মেহেমান হতে ইচ্ছুক।

ছেলে দু'টি খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে বললো, মেহেরবানী করে যদি আমাদের সঙ্গে আসেন আপনারা।

ছেলে দু'টিকে অনুসরণ করে খলিফা ও হামদুন প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। একটি সুসজ্জিত বিরাট কক্ষ। দুনিয়ার সেরা সেরা জিনিসপত্রে ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো-গোছানো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গৃহস্বামী এসে অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। সাজে-পোশাকে আদব-কায়দায় চেহারা-চরিত্রে বিশেষ একটা খানদানি ছাপ সুস্পষ্ট। ঘরে ঢুকেই সে সালাম সাবুদ জানিয়ে বিনয়াবনত হয়ে বাদশাহী কেতায় বললো, অনেক পুণ্যের ফলে আজ আপনাদের দর্শন পেলাম জনাব। আপনাদের পদধূলিতে এ গরীবখানা তীর্থভূমি হয়ে গেলো। এখন হুকুম করুন মালিক, কি ভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি।

ঘরের এক পাশের সারা দেওয়াল জুড়ে একখানা স্ফটিকের আয়না। আর সেই আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে প্রাসাদ-সংলগ্ন ফুলবাগিচার প্রায় পুরো দৃশ্য। বাগিচার ঠিক

মাঝখানে একটি নিরন্তর নির্ঝর ঝর্ণা ঝরে পড়ছে। মুসতাবিদ মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে থাকলেন সেই অপরূপ শোভা। মনে হতে লাগলো ঘরের মধ্যে যেন একটি ফুলের বাগান আর একটি ঝর্ণা অনর্গল জলধারা সিঞ্চন করে চলেছে। মন-প্রাণ এক অপূর্ব পুলকে নেচে উঠতে চায়। খলিফা মনে মনে তারিফ করে, গৃহস্বামীর বাহারী রুচি আছে বলতে হয়। অর্থ অবশ্যই ব্যয়িত হয়েছে, কিন্তু শুধু পয়সা খরচ করলেই এ বস্তু বানানো যায় না। তার জন্যে চাই সূক্ষ্ম রুচিবোধ। মুসতাবিদ ভাবেন, আমি তো সুলতান, ইচ্ছা করলেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারি কিন্তু এমন সুন্দর পরিকল্পনা তো আমার মাথায় আসেনি কখনও।

বাগিচায় নানা রঙের নানা সুবাসের কত রকমের কুসুম। কেউ বা সব দল মেলে ধরেছে। কেউ বা আধো আধো লজ্জায় ফুটিফুটি করেও ফুটে শেষ হতে পারছে না। আবার কতকগুলো নেহাতই কলি-কুঁড়ি।

এ ছাড়াও আরও চারটি প্রস্ফুটিত কুসুম দল মেলে পাশাপাশি বিকশিত হয়ে আছে। তাদেরই অপরূপ শোভায় সুবাসে সারা বাগিচায় খুশির বান ডেকেছে।

এরা চারজনেই রূপসী যুবতী। সে রূপের বর্ণনা এখানে বাহুল্য। শুধু মনে মনে কল্পনা করে নিন, জাঁহাপনা, ওরাও চারটি সদ্য ফোটা ফুল।

গৃহস্বামী নিজের পরিচয় দেয়, আমার নাম আবু অল হাসান আলী ইবন আহমদ, খুরাসনে আমাদের আদি বাস।

খলিফা বললেন, এবার তাহলে আমার পরিচয় শোনো, আমি স্বয়ং খলিফা মুসতাবিদ।

এই কথা শুনে গৃহস্বামী থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। আভূমি আনত হয়ে সে খলিফাকে কুর্ণিশ করলো।

—যদি কোনও অন্যায় করে থাকি, যদি কোনও অসম্মান করে থাকি, শাহেনশাহ মহানুভব, গোলামের গোস্তাকি মাফ করবেন, জাঁহাপনা।

খলিফা মৃদু হেসে বললেন, অমন সঙ্কুচিত হওয়ার কোনও কারণ নাই। তোমার ব্যবহারে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি। শুধু একটা কথা, তোমার গৃহের এই যে সব বৈভব এবং তোমার অঙ্গের এই যে সাজ-পোশাক দেখছি, এ সবই কিন্তু আমার ঠাকুর্দা মুতাবাকিল আলা আল্লাহর। ব্যাপারটা কি,খুলে বলতে পার আমাকে? এসব ছাড়াও কী তোমার কাছে আমার পূর্বপুরুষদের আরও অনেক ব্যবহার্য সংবাদপত্র আছে? এখানে এসব জিনিস দেখে আমি তাজ্জব বনে গেছি। যাই হোক, সমস্ত ঘটনাটা আমার জানা দরকার। আশা করি কোনও কিছু লুকো-ছাপা করবে না। তার পরিনাম ভালো হবে না।

খলিফার হুমকিতে গৃহস্বামী মৃদু হাসলো মাত্র।

—আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন, জাঁহাপনা। সত্য অন্তরের ভূষণ, বাইরের সজ্জাটার নাম আন্তরিকতা, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে অবস্থান করুন, আমি আপনাকে সত্য ভাষণই শোনাব।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো ষোলতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

একটা কুর্শিতে বসে আবু হাসান বলতে শুরু করলো ঃ শুনুন, জাঁহাপনা, আমি কোনও শাহজাদা নই বা আমার পিতৃদেবও কোনও সুলতানের পুত্র ছিলেন না। কোনও ভাবেই আমার ধমনীতে শাহ-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সংঘটিত হয়েছিলো, সেই বিচিত্র কাহিনীই বলছি। এই ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র এবং আমার

অঙ্গের সাজ- পোশাক দেখে আপনি স্বভাবতই সংশয়চ্ছন্ন এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমার বলা শেষ হলে আপনার মনে আর কোনও খেদই অবশিষ্ট থাকবে না।

এরপর এক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলো আবু হাসান। হয়ত বা পুরোনো স্মৃতি মনে মনে একবার ঝালাই করে নিতে চাইলো।

যদিও আমির বাদশাহর বংশে জন্ম নয় তবু ধনে মানে আমার বাবাও কারো থেকে খাটো ছিলেন না। এক সময়ে এই বাগদাদ শহরে সম্ভ্রান্ত সওদাগর হিসাবে যথেষ্টই তার নাম ডাক ছিলো। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু এই শহরের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। আরব পারস্যের নানা দেশে তার বাণিজ্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই শহরের প্রায় প্রতিটি বাজারে আমার বাবার নানারকম কারবারের অনেকগুলো দোকান ছিলো। কোনটা কাপড়ের,কোনটা ওষুধের, আবার কোনওটা বা পরদেশী মুসাফীরদের জন্য শখের সামানের। প্রত্যেকটি দোকানের দেখা-শোনার জন্য একটি করে সুদক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন তিনি।

প্রত্যেক দোকানের পিছন দিকে একটি করে বিলাসকক্ষ নির্মাণ করেছিলেন বাবা।

দুপুরের দাব-দাহে বাগদাদ যখন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে সেই সময় আমার বাবা সেই বিলাসকক্ষে সুশীতল পাখার বাতাসে আরামে নিদ্রা যেতেন।

আমি বাবার একমাত্র সন্তান—বড় আদরের ধন। সুতরাং কোনও ব্যাপারেই আমার ওপর কখনও বাধা-নিষেধ আরোপ করেননি তিনি। আমার লেখাপড়া, খেলা-ধূলা, সাজ-পোশাক, আহার বিহার, কোনও বিষয়েই তাঁর কোনওরূপ কার্পণ্য ছিলো না।

একদিন বৃদ্ধবয়সে বাবা দেহ রাখলেন। আমি তাঁর বিপুল বিত্তের একমাত্র মালিক হলাম। বাবাকে যা যা করতে দেখেছি, আমিও হুবহু তাঁরই পথ অনুসরণ করে যথাবিহিত দোকান-পাটের দেখা শোনা করে বহাল তবিয়তে দিন কাটাতে লাগলাম।

এই সময় আমার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা স্বভাবতই অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকলো। কিন্তু তাতে কি, আমার যা রোজগার তাতে ভালোমন্দ খেয়ে-দেয়ে আর কত ফুরানো যায়!

আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই অনেকবার বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করেছে কিন্তু আমি তাদের সে-সব প্রস্তাব সযত্নে পরিহার করে পাশ কাটিয়ে যেতে পেরেছি।

বন্ধুরা একে একে হতাশ হয়ে কেটে পড়লো। আমি প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম। কিন্তু তাতেও আমার কোনও অসুবিধা হয়নি।

কিন্তু কোনও মানুষের জীবনই সহজ-সরল পথে চিরকাল চলে না। তেমনি আমার জীবনেও একদিন জটিলতার সৃষ্টি হলো। চোদ্দ বছরের একটি মাত্র মেয়ে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেলো।

একদিন আমার এক দোকানে বসে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে লঘুরসের আলাপ-সালাপ করছি, এমন সময় একটি কিশোরী এসে দাঁড়ালো সেখানে। মেয়েটি জাতে জিপসী। নাচগান করে পয়সা রোজগার করাই তার পেশা। আমার সামনে লাস্যময়ী ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বিলোল কটাক্ষ হানলো। বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, সেই মুহূর্তে আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেলো। অমন সর্বনাশা যৌবনবতী মেয়ে আমি আর দেখিনি। ওর চোখে কি যাদু ছিলো বলতে পারবো না। মুহূর্তেই আমি সম্মোহিত হয়ে গেলাম।

মেয়েটি আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্নবাণ ছুঁড়লো, এটা কি আবু অল হাসান সাহেবের দোকান?

কথাগুলো গান হয়ে আমার কানে বাজলো। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এটা আপনার বান্দারই দোকান'।

মেয়েটি দোকানের ভিতরে এসে শাহজাদীর কেতায় একখানা কুর্শিতে উপবেশন করলো। সারা শরীরে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করলাম আমি। মেয়েটি দ্বিধা-সঙ্কোচহীন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, কোথায় সে?

আমি তখন উত্তেজনায় কাঁপছি, মুখ দিয়ে কথা সরতে চায় না। কোনও রকমে বলতে পারলাম, আমিই হাসান।

—ও, আচ্ছা আপনার লোককে বলুন সে যেন আমাকে তিনশো দিনার গুণে একটা থলেয় ভরে দেয়।

আমি যন্ত্রচালিতের মত আমার তহবিলদারকে বললাম, তিনশো দিনার ওজন করে এক তোড়ায় বেঁধে দাও।

আমার নির্দেশমতো তহবিলদার দিনারের তোড়াটা মেয়েটির সামনে রাখতেই সে প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পলকের মধ্যে দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেলো।

তহবিলদার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কার নামে খরচ লিখবো, মালিক?

আমি তখনও তন্ময় হয়ে মেয়েটির চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে তারই কথা ভাবছিলাম, কর্মচারীর কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললাম, এ্যাঁ। কার নামে লিখবে? তা ক্রার নামে লিখবে আমি কি করে বলবো?

—কেন, ঐ কন্যাটির নাম জানেন না আপনি?

—নাম? না, না-তো!

—তবে? তবে অতগুলো টাকা ওকে দিতে বললেন কেন, মালিক? আমি বললাম, ও যে চাইলো।

—বাঃ, এ কি কথা, চাইলো বলেই আপনি দিয়ে দেবেন? দাঁড়ান আমি দেখছি।

এই বলে সে দোকান থেকে বেরিয়ে ছুটে চলে গেলো মেয়েটির দিকে। কিন্তু একটুক্ষণ পরে একহাতে বাঁ চোখটা চেপে ধরে কাতরাতে কাতরাতে ফিরে এসে বললো, আমি মেয়েটির সামনে গিয়ে রুখে দাঁড়াতেই ও আমার এই চোখের ওপর বেমক্কা একটা ঘুষি বসিয়ে দিলো। আমি চোখে আঁধার দেখে মাটিতে পড়েছিলাম, সেই ফাঁকে সে হাওয়া হয়ে গেলো। উফ্, হাতের কী জোর! যেন কামারের হাতুড়ি। মনে হচ্ছে, চোখটা আমার খতম হয়ে গেছে।

পরদিন আবার এলো সে। যথারীতি আবার শাহজাদীর মতো দোকানে ঢুকে একখানা কুর্শিতে বসে পড়ে বললো, গতকাল একটা ছোট্ট থলেয় কিছু দিনার দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কি আপনি কাতর হয়ে পড়েছেন?

আমি বললাম, না না, কে বললো আপনাকে? মোটেই না। এ দোকান তো আপনারই জন্য। আপনাকে কিছু দিতে পেরে আমি ধন্য হয়েছি, বলুন আর কি চাই?

মেয়েটি সহজভাবেই বললো, তা'হলে আপনার লোককে বলুন, সে যেন আমাকে আজ পাঁচশো দিনার দেয়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি তহবিলদারকে নির্দেশ দিলাম। এবং স্বল্পক্ষণের মধ্যে সে পাঁচশো দিনারের থলেটা নিয়ে উধাও হয়ে গেলো।

সারাদিন রাত আমি অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকলাম। এ কি জাদুকরীর পাল্লায় পড়লাম আমি এভাবে চলতে থাকলে খুব শিগ্গিরই তো ফতুর হয়ে যাবো।

পরদিন সকালে বিষণ্ণ মনে দোকানে বসে মেয়েটির সম্মোহনের কথাই ভাবছি, এমন সময় আবার সে এসে বসলো আমার সামনে। এবার সে মুখে একটি কথাও উচ্চারণ করলো না! সামান্য একটু হাসলো মাত্র। তারপর চোখের ইশারা করে তাকে রাখা একটা মখমলের

বটুয়া চাইলো। আমিও নির্বোধের মতো মূল্যবান জড়োয়া অলঙ্কার ভর্তি বটুয়া এনে তার হাতে তুলে দিলাম। একটি কথাও সে বললো না। বটুয়াটা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো সতেরোতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মুহূর্তে আমি আত্মস্থ হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে ধাওয়া করলাম মেয়েটিকে।

মেয়েটিকে যখন দেখতে পেলাম তখন সে টাইগ্রিসের কূলে গিয়ে পৌঁচেছে। তার কাছে পৌঁছবার আগেই সে ঘাটে অপেক্ষমান ছোট্ট একখানা ডিঙিতে চেপে দাঁড় টানতে টানতে নদীর কিনারা ছেড়ে দূরে চলে গেলো। তীরে দাঁড়িয়ে আমি দেখতে থাকলাম। ডিঙিখানা বেয়ে সে অন্য একটা ঘাটে ভিড়লো। সেই ঘাটের পাশে আপনার ঠাকুর্দার একখানা বিলাসমহল ছিলো। মেয়েটি ডিঙি থেকে নেমে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লো সেই বাড়িটার ভিতরে।

ব্যাপারটা কি কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে চিন্তিত বিষণ্ন হয়ে বাড়ি ফিরে এসে আমার মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। মা শিউরে উঠলেন, তুই ঠিক দেখেছিস বাবা, মেয়েটি খলিফার রঙমহলে গিয়ে ঢুকলো?

—ঠিক দেখবো না কেন মা?

—তা হলে বাবা, ওদিকে আর ভুলেও নজর দিসনি। সুলতান বাদশাহর ব্যাপারে সাধারণ মানুষের থাকতে নাই। ওতে অনেক বিপদ বাড়ে। আমি দশ মাস পেটে ধরেছি, বুকে করে মানুষ করেছি, এই বুড়ো বয়সে তোকে হারাবার দুঃখ আমাকে দিসনি, বাবা। আমার কথা শোনো।

আমি মাকে আদর করে বললাম, বৃথা আশঙ্কা করো না, মা। আমার নসীবে যা লেখা আছে তা কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। যা ঘটার ঘটবেই। আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

পরদিন সকালে স্যাকরাপট্টিতে আমার গহনার দোকানে বসে আছি, আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো আমার দাওয়াখানার প্রধান কর্মচারী। বয়সে প্রবীণ, দক্ষ লোক, আমার বাবার খুব প্রিয়পাত্র ছিলো সে। তোমাকে এমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছ কেন? তোমার পিতাজী চলে যাওয়ার পর অনেক ঝড় ঝঞ্ঝাই গেছে কিন্তু তোমাকে তো এমনটা কখনও দেখিনি।

আমি বললাম, না-চাচা শরীর আমার ভালোই আছে, তবে দু-একটা ঘটনায় একটু বিচলিত হয়ে পড়েছি।

—কি রকম?

—দু-তিন দিন হলো একটা ছোট্ট মেয়ে আমাকে বড় বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এর পর পর কয়দিনের সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম।

—হুঁ, চিন্তাই বটে। যাক, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। এক দর্জির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। সুলতানের দরবারের উজির আমিরদের সে পোশাক বানায়। তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব আমি। তুমি যদি তাকে কিছু কাজ-টাজ দাও তাহলে সে তোমার উপকারে আসতে পারে।

এরপর সে আমাকে ঐ দর্জির কাছে নিয়ে গেলো। প্রথম আলাপেই বুঝলাম লোকটি বেশ সদাশয়। আমার কামিজের একটা পকেট ছিঁড়ে গিয়েছিলো, ভাব জমাবার জন্যেই বললাম, জেবটা একটু ঠিক করে দিন তো।

তখুনি সে সুন্দর করে জামাটা রিপু করে দিলো। আমি খুশি হওয়ার ছল করে দশটা দিনার গুঁজে দিলাম তার হাতে। লোকটা একটু বোকা-সোকা ধরনের। চোখ বড় বড় করে

আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, ওটা আপনি রাখুন। আপনার কাজ আমার খুব পছন্দ হয়েছে, শেখ।

দর্জি বললো, আপনার সাজ-পোশাক দেখে তো বনেদী বণিক-সওদাগর বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ব্যবহারটা আসলে তাদের মত নয়, মালিক।

কথাটার নিগূঢ় অর্থ বুঝতে না পেরে আমি বললাম, মানে?

সে বললো, দশ রিহামের কাজ না পেলে এক দিরহাম হাত দিয়ে গলে না কোনও সওদাগরের, আপনি ফালতু ফালতু দশটা দিনার খয়রাতি করে দিলেন আমাকে? এতো আমির বাদশাহ ছাড়া আর কেউই দেয় না। অবশ্য আরও একজন দেয়, কিন্তু সাহেব, আপনি কি প্রেমে পড়েছেন সদ্য?

আমি লজ্জা পেলাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন, শেখ। প্রথম দর্শনেই আমি মূর্ছা গেছি।

দর্জি মুচকি হেসে বলে, খরগোশ, না হরিণী।

—সে হরিণী-নয়না।

—তা হলে তো পোয়া-বারো। হরিণী শিকারের ওস্তাদী আমার বহুৎ আচ্ছা-তরা জানা আছে, মালিক, ঘাবড়াবেন না কিছু। কি নাম তার?

—খোদা জানেন। আর চেষ্টা করলে আপনি জানতে পারবেন।

—ঠিক আছে, কোই বাত নাই, কি রকম দেখতে, বলুন।

আমার সাধ্যমতো তার রূপ-যৌবনের বর্ণনা দিলাম।

আমার কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠলো, ইয়া আল্লাহ, এ তো মুক্তাবানু! খলিফার জলসা-ঘরে বাঁশী বাজায়। আমার কাছে তো তার খুদে খোজা নফরটা হামেশাই আসে।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই একটা সুন্দর ফুটফুটে ছোকরা এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। ঝুলন্ত একটা ছোট্ট কামিজ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটার কত দাম নেবে শেখ আলী? চটপট বলো, আমার দাঁড়াবার সময় নাই, দেরি হলে আবার মুক্তাবানু বকুনি লাগাবে।

জামাটা খুলে নিয়ে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললাম, এই নাও, তোমাকে উপহার দিলাম এটা। আমি দাম দিয়ে দেব।

ছেলেটি মিষ্টি করে হাসলো। হঠাৎ ওর হাসির ঝিলিক আর কটাক্ষ দেখে আমার মুক্তাবানুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অদ্ভুত মিল তো। তফাতের মধ্যে সে মেয়ে আর এ ছেলে।

—নিশ্চয়ই আপনি খুরাসনের আবু অল হাসান ইবন আহমদ।

ছেলেটি আমাকে চিনলো কি করে? অবাক হলাম। এবং প্রীত হলাম ছেলেটির ওপর। আমার হাতের একটা আংটি খুলে পরিয়ে দিলাম ওর আঙ্গুলে।

—তুমি তো ঠিকই চিনেছ, খোকা। কিন্তু কে তোমাকে বললো আমার নাম, কার কাছ থেকে শুনেছ?

—বাঃ, চিনবো না কেন, আমার মালকিন তো সারা দিন-রাতে হাজার বার আপনার কথা বলে। তার মুখ থেকে আপনার চেহারা চরিত্রের নিখুঁত বর্ণনা শুনে শুনে আমার সব মুখস্থ হয়ে গেছে। আমি কি কচি খোকাটি আছি নাকি এখনও, বুঝতে পারি না, সে আবু অল হাসান আলীকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছে? তবে মালিক, আপনিও যদি আমার মালকিনকে ভালোবেসে থাকেন তবে খোদা কসম, আমার দিক থেকে যা করা দরকার তো আমি করবো।

আমি ওকে বললাম, তোমার মালকিনকে দেখার পর থেকে আমি ভালোবাসার আগুনে জ্বলছি। জানি না, তাকে না পেলে আমি জানে বাঁচবো কিনা।

ছেলেটি বললো, তা হলে ঠিক আছে, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো আঠারোতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

কিছুক্ষণ বাদে ছেলেটি ফিরে এলো। তার হাতে একটা মোড়ক। বললো, এর মধ্যে খলিফা মুতাবাকিল আলা আল্লাহর সান্ধ্য পোশাক আছে। আর আছে এক শিশি আতর। খলিফা ঐ রঙমহলে আসেন এই পোশাক পরে। রঙমহলের দোরগড়ায় এই আতর ঢেলে দিলেই দরজা খুলে যায়। আপনি আজ সন্ধ্যায় সেজে-গুজে আসুন, তারপর যা যা করতে হয় আমি করবো।

ছেলেটি আর দাঁড়ালো না। মোড়কটা আমার হাতে দিয়ে চলে গেলো।

আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। কিন্তু নতুন অভিজ্ঞতার আকর্ষণও এড়াতে পারলাম না।

সন্ধ্যার পর সেজে-গুজে রঙমহলে চলে এলাম। জলসাঘর ছাড়িয়ে ওদিকে অন্দরমহল—হারেম। দুরু দুরু কম্পিত বুকে পায়ে পায়ে আমি এগিয়ে গেলাম।

হারেমের রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আতর ঢেলে দিলাম চৌকাঠে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো। ভিতরে ঢুকবো কি ঢুকবো না, এই সংশয়ে দুলছি, এমন সময় মচমচ পায়ের শব্দে চমকে পিছনে তাকিয়ে আত্মা শুকিয়ে গেলো। সর্বনাশ, স্বয়ং খলিফা মুতাবাকিল আলা আল্লাহ। তার দুইপাশে জনাকয়েক তাগড়াই দেহরক্ষী। তাদের সকলের হাতেই চিরাগ-বাতি। কি করবো, কি করা উচিত কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। পালাবারও পথ নাই। পিছনে সদলবলে সুলতান এগিয়ে আসছেন। সামনে হারেমের মহল। উপায়ান্তর না দেখে হারেমের ভিতরেই ঢুকে পড়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে লাগলাম। এ ঘর ছেড়ে ও ঘর ছেড়ে অন্য এক ঘর। কিন্তু কোথায় লুকাবো কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

অবশেষে আর একটা ঘরে ঢুকে পড়লাম। একটি প্রায় বিবস্ত্রা পরমাসুন্দরী মেয়ে আমাকে আচমকা দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পালঙ্কের শয্যায় নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি কি করবো কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। মেয়েটি মৃদু কণ্ঠে বললো, আপনি তো আবু অল হাসান আলী। মুক্তাবানু আমার বোন, আপনি বসুন, কোনও ভয় নাই। এ ঘরে কেউ আসবে না। আমার বোন আপনাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু আপনার মনোভাব এখনও তার অজানা।

আমি বললাম, আমাকে বিশ্বাস করুন, এখন আমার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান আপনার ভগ্নী। সে ছাড়া আমি আর অন্য কোনও মেয়েকে ভাবতে পারি না।

মেয়েটি হাতে তুড়ি বাজাতেই সেই ছোট্ট ছেলেটি এসে দাঁড়ালো।

—শোন্, এখানে মুক্তাবানুকে নিয়ে আয়, বল্ পিস্তাবানু ডাকছে। যা, জলদি ডেকে নিয়ে আয়।

একটুক্ষণ পরে নীলরঙের রেশমী বোরখা পরে একটি মেয়ে এলো। রাতের অস্পষ্ট আলোতেও বুঝতে অসুবিধে হলো না—সে এসেছে। আপনাকে বোঝাতে পারবো না তখন আমার কি অবস্থা। ভয়-উত্তেজনা মিশ্রিত সে এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ। মুখে কোনও কথা বলতে পারলাম না। সেও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো আমার সামনে। কোনও কথা বললো না।

তারপর একসময় আমার বাহুর আকর্ষণে অথবা তারই স্বেচ্ছা-সম্পর্কে, দেখলাম সে আমার বুকের মধ্যে হারিয়ে গেছে। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে ওর অধরে এঁকে দিলাম গভীর একটি চুম্বন। ওঃ সে কি মধুর, কি করে বোঝাই আপনাকে। মনে হলো শতবর্ষ পরমায়ু বেড়ে গেলো আমার।

জানি না ঐভাবে একাত্ম হয়ে কতক্ষণ আমরা ছিলাম সেখানে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো ঊনিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে আমরা যখন প্রেমালাপে মত্ত সেই সময় খলিফার আগমন সংবাদ পেয়ে আমি ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম। খলিফা আজ ঠিক করেছেন পিস্তাবানুর ঘরে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাকে একটা বিরাট বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে ফেললো।

আমি বাক্সের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শুনলাম, আপনার নানাজী বলছেন, এই যে মুক্তাবানু, তুমি যে এ সময়ে তোমার দিদির ঘরে? কই তোমাকে তো এ ক'দিন রঙমহলে দেখিনি! কোথায় গিয়েছিলে? সারা মহল তোমার গুঞ্জরণে মুখর হয়ে থাকে। অথচ ক'দিন একটা কলিও শুনিনি। যাক, আজ যখন সামনে পেয়েই গেছি, আমাকে একটা গান শোনাও দেখি।

মুক্তাবানু জানতো, সুলতান তার বোন পিস্তাবানুকেই ভালোবাসেন। মুক্তার কাছে তিনি শুধু গান শুনতেই ভালোবাসেন।

মুক্তার গান শুনে মুগ্ধ হলেন খলিফা। তারিফ করে বললেন, সত্যিই, কি গানে কি বাজনায় তোমার জুড়ি নাই, মুক্তো। আমি খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে আমি ইমাম দিতে চাই, বলো তুমি কি চাও? যা চাইবে তাই দেব, এমন কি আমার সলতানিয়তের অর্ধেকটাও চাইতে পার, দিয়ে দেব হাসিমুখে।

—খোদা ধর্মাবতারকে চিরজীবী করুন, আমার আর কোনও বাসনাই নাই জাঁহাপনা, আপনি আমাকে আর আমার বোন পিস্তাকে মেহেরবানী করে পায়ে ঠাঁই দেবেন, তা হলেই ধন্য হবো।

—সে তো ঠিক আছে। এ ছাড়া অন্য কিছু চাও—যা খুশি।

—জাঁহাপনার যদি এতোই ইচ্ছা তবে বলছি, তিনি যেন আমাকে খালাস দিয়ে দেন। আর সেই সঙ্গে এই মহলের যাবতীয় পোশাক-আশাক আসবাবপত্র যা আছে সেগলোও আমি নিতে চাই।

—তাই হলো, আজ থেকে এ সব তোমার। আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। তোমার যেখানে খুশি তুমি চলে যেতে পার। অথবা থাকতেও পার এখানে।

এরপর খলিফা আর সে-ঘরে অপেক্ষা করলেন না।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। পরদিন সকালে খোজাদের ডেকে রঙমহলের তামাম জিনিসপত্র সব এক এক করে বের করে নিয়ে এলাম আমার এই বাড়িতে। ঐ যে ওপাশে দেওয়ালের ধারে লম্বা বাক্সটা দেখছেন, ঐ কাঠের বাক্সটায় ওরা আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলো সেদিন।

সেইদিনই আমি মুক্তোকে শাদী করে আমার বিবি বানালাম।

এই হচ্ছে, জাঁহাপনা আমার কাহিনী। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনার নানাজীর এই সমস্ত বাদশাহী আসবাবপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম কি করে আমার ঘরে এলো? আপনাকে যা বললাম, তার একবর্ণও মিথ্যে নয়, খোদা কসম।

খলিফা মসতাবিদ বললেন, তোমার কথায় খুব প্রীত হয়েছি হাসান আলী। আমাকে এক-টুকরো কাগজ আর দোয়াত কলম দাও। আমি তোমাকে কিছু উপহার দেব।

কাগজ কলম আনা হলে খলিফা হামদুনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ফিরমানকে হুকুমনামা লিখে দাও, আজ থেকে হাসান আলী যতকাল জীবিত থাকবে, তার সব কর মুকুব করে দেওয়া হলো।

হামদুন লিখে খলিফার সামনে ধরতে তিনি দস্তখত করে দিলেন। এবং বললেন, এখন থেকে তুমি আমার দরবারের অন্যতম আমীর হলে হাসান আলী। এর ফলে প্রায় রোজই তোমার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটবে। দিনে দিনে আমরা আরও নিকট সৌহার্দ্যে পৌঁছতে পারবো।

সেই থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আবু অল হাসান আলী আর খলিফার মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ ঘটেনি।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ চুপ করলো। কিন্তু প্রভাত হতে তখনও দেরি ছিলো। একটুক্ষণ পরে সে বললো, আর একটা কিস্‌সা শুরু করছি, জাঁহাপনা। এবার সুলতান মামুদের কাহিনী শুনুন ঃ

মিশরের জ্ঞানী-গুণী এবং বিচক্ষণ সুলতান হিসাবে সুলতান মামুদের নাম বিশ্ববিখ্যাত ছিলো।

বিশাল সলতানিয়ত এবং অপর্যাপ্ত ধন-গৌরবের মালিক হয়েও কিন্তু সুলতান বড় দুঃখী বড় নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। প্রায় বেশির ভাগ সময়ই তিনি প্রাসাদের একান্ত নিরালা নিভৃত কক্ষে বিষাদ-বিষণ্ণ জীবন যাপন করতেন। আল্লাহ তাকে অফুরন্ত ঐশ্বর্য দিয়েছিলেন, এবং দিয়েছিলেন ভোগ করার মতো সুন্দর সুস্থ স্বাস্থ্য যৌবন-দীপ্ত কামনা-বাসনা। তার শৌর্য বীর্য খ্যাতি প্রতিপত্তির কোনও অভাব ছিলো না। মিশর তখন দুনিয়ার সেরা শহর, তার প্রাকৃতিক শোভা নয়নাভিরাম। আর নারীসঙ্গ? তার তো কোনই অভাব ছিলো না। নীলের জলের মতো সুন্দরী নারীর সমুদ্রে তিনি সাঁতার কেটে অবগাহন করতে পারতেন ইচ্ছা করলেই।

কিন্তু এসবই তাঁর কাছে তুচ্ছ বিষাদময় এবং সাহারা তুল্য ছিলো। দরবারের কাজকর্ম শেষ হতে না হতে তিনি প্রাসাদে গিয়ে প্রবেশ করতেন। তারপর সারা দিনে-রাতে তাঁর আর সাক্ষাৎ পেত না কেউ। অবশ্য কি যে তাঁর দুঃখ, কি যে তাঁর ব্যথা, সে কথা সারা দেশের একটি মানুষও জানতো না। সুলতান মামুদ নিজেই কি তা জানতেন?

একদিন তিনি নিজের নিভৃত কক্ষে বিষণ্ণ বদনে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর প্রধান উজির এসে সভয়ে বললো, জাঁহাপনা, পশ্চিম সীমান্ত দেশ থেকে প্রবীণ প্রাজ্ঞ অলৌকিক গুণধর এক ব্যক্তি এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য। শুনেছি তিনি নাকি আল্লাহর আশীর্বাদ-ধন্য এক ধন্বন্তরী হাকিম। কোনও কঠিন রোগই নাকি তাঁর কাছে দুরারোগ্য নয়। তাঁর দাওয়াই নাকি যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। জাঁহাপনা যদি অনুমতি করেন তবে তাঁকে আপনার সামনে হাজির করতে পারি।

সুলতান মামুদ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। উজির উৎফুল্ল হয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো।

রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো কুড়িতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

প্রায় শতবর্ষের এক বৃদ্ধকে সঙ্গে করে উজির এসে দাঁড়ালো। চুল দাড়ি সব তুলোর মত শুভ্র। চোখ দু'টি কোটরাগত, কিন্তু দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত।

বৃদ্ধ কুর্নিশ জানালো না। বিচিত্র এক কণ্ঠস্বরে বললো, খোদা তোমার মঙ্গল করুন সুলতান মামুদ। আমার ভাই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, আমি তারই দোয়া বয়ে নিয়ে এসেছি তোমার জন্য।

বৃদ্ধ সুলতানের হাত ধরে তাকে একটা বন্ধ জানালার পাশে নিয়ে গেলো। বললো, জানালাটা খুলে ফেলো।

সুলতান মন্ত্রমুগ্ধের মতো জানালাটা খুলে দিলেন।

বৃদ্ধ বললো, সামনে তাকিয়ে দেখ!

অদূরে একটা পাহাড়। তার মাথার ওপর থেকে একদল সৈন্য তরতর করে নিচে আসছে। দেখতে পেলেন সুলতান। সকলের হাতেই উন্মুক্ত তরোয়াল। তিনি বুঝতে পারলেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ বিশাল সৈন্যদল তার শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ইয়া আল্লাহ, আর বাঁচবার কোনও পথ নাই, আমার মোউৎ এসে গেছে।

বৃদ্ধ ক্ষিপ্রহাতে জানালা রুদ্ধ করে দিলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার খুলে ফেললো। সুলতান দেখলেন সেনাবাহিনী অদৃশ্য হয়ে গেছে। পাহাড়টা জনমানবশূন্য অনড় জড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র।

এবার বৃদ্ধ ওঁকে আর একটা জানালার পাশে নিয়ে গেলো। সে জানালা খুলতে দেখা যায় তার বিরাট শহরটা। বৃদ্ধের নির্দেশে তিনি জানালার কপাট খুলে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। শহরের চার শতাধিক মসজিদ, অসংখ্য প্রাসাদ ইমারত সব দাও দাও করে জ্বলছে। ধোঁয়ার কালো কুণ্ডলী গগনমণ্ডল ঢেকে ফেলেছে। দামাল হাওয়ায় আগুনের লেলিহান শিখা উল্কার বেগে প্রাসাদের দিকে তেড়ে আসছে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রচণ্ড দাবদাহে তাঁর প্রসাদ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। হতাশায় শঙ্কায় ভেঙ্গে পড়লেন সুলতান। ভাবতে লাগলেন, তাঁর এমন সুন্দর শহর প্রাসাদ সব পুড়ে ছাই হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পাশের মরুভূমির সঙ্গে ওর আর কোনই ফারাক থাকবে না।

বৃদ্ধ জানালাটা বন্ধ করে আবার খুলে দিলো। কি আশ্চর্য, সব আগুনের শিখা কোথায় মিলিয়ে গেছে। শহরটা যেমন ছিলো তেমনি আছে পূর্ববৎ।

বৃদ্ধ এবার টানতে টানতে তৃতীয় জানালার পাশে নিয়ে গেলো সুলতানকে। এ জানালা খুললে নীল নদের মনোহর শোভা চোখে পড়ে।

জানালা খুলতে মামুদ শিউরে উঠলেন, সর্বনাশ নদীর বাঁধ ভেঙ্গে দুর্বার গতিতে জলস্রোত তেড়ে আসছে শহরের দিকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের তোড়ে তাঁর সুন্দর সাজানো শহরটা ভেসে যাবে। ঐ উত্তাল জলরাশি ঝাঁপিয়ে পড়লে শহরবাসীরা বাড়ির ছাদে উঠেও প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না। নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন তিনি।

বৃদ্ধ জানালাটা ভেজিয়ে দিয়েই আবার খুলে ধরলেন, এই দ্যাখো, কিচ্ছু নাই। নদীর বাঁধ যেমনটি ছিলো তেমনি অটুট আছে।

সুলতান বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ এবার তাঁকে চতুর্থ জানালাটির পাশে নিয়ে গিয়ে বলে, খোলো।

সুলতান মামুদ পাল্লা খুলে ধরেন। তখন তিনি নতুন আশঙ্কার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। কিন্তু জানালা খুলতেই চোখ জুড়িয়ে গেলো। সামনে বিস্তীর্ণ শস্য-শ্যামল প্রান্তর। রাখাল বাঁশী বাজিয়ে পশুচারণে চলেছে। গাছে গাছে কত ফুল-ফলের সমারোহ। নির্মেঘ নীল আকাশে দল বেঁধে উড়ে চলেছে পাখীরা। মাথার ওপরের আকাশটা গোলু হয়ে নিচে নেমে এসে দূর চক্রবালে মিশে গেছে।

সুলতান মামুদ ভাবতে পারেন না, তিনি জেগে, না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন? কিংবা এই বৃদ্ধ শেখ তাঁকে যাদু করেছে! নাকি তিনি পাগল হয়ে গেছেন।

বৃদ্ধ এবারে তাঁকে পাশে ছোট্ট ফোয়ারাটার কাছে এনে দাঁড় করালো। বললো ঐ চৌবাচ্চাটার নিচে তাকিয়ে দেখ।

মাথা ঝুঁকিয়ে নিচের দিকে তাকাতেই তিনি বুঝতে পারলেন, বৃদ্ধ তাঁকে চৌবাচ্চার জলে চেপে ধরেছে।

পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলেন, বিরাট একটা সমুদ্রের পাশে একটা পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। নিচে একখানা জাহাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে জলের তলায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। পাহাড়ের অন্য প্রান্তে কতকগুলো গুণ্ডাগোছের লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে খিক খিক করে হাসছে।

ক্রোধে ফেটে পড়লেন সুলতান। বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, তুমি একটা আস্ত শয়তান। আমাকে সমুদ্রে এনে জাহাজ ডুবি করে মজা দেখছ। তোমার শয়তানী আমি ঘুচিয়ে দেব। জান, আমি সুলতান মামুদ, ভালো চাও তো এখনও বলছি, ভাগো।

সুলতানের ক্রোধ এবং চিৎকারে লোকগুলো আরও মজা পেলো। হো হো করে এক সঙ্গে হেসে উঠলো সকলে।

লোকগুলো কি ভীষণ দেখতে! হাসলে তার মুখমণ্ডল আকর্ণ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। হাঁ-গুলো সব এক একটা গুহার মতো। ওদের যে সর্দার, সে লোকটা এগিয়ে এসে সুলতানের মাথার মুকুট আর গায়ের কামিজ কুর্তা ছিনিয়ে নিয়ে নিলো। তারপর সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে নীল ডোরা-কাটা মোটা সুতীর একটা পোশাক পরিয়ে দিলো তাকে। পায়ে পরতে দিলো হলদে রঙের এক জোড়া বাজখাঁই চপ্পল। বললো, চলো আমাদের দেশে নিয়ে যাব, সেখানে আমাদের মতো গায়ে গতরে খেটে খেতে হতে তোমাকে।

মামুদ আপত্তি জানিয়ে বলেন, কিন্তু আমি তো কাজ-কাম কিছু করতে পারি না।

ওদের একজন বললো, বেশ তো কাজ করতে না পার, গাধার মতো মোট বইবে। গাধা হতে তো আর কোনও বুদ্ধির দরকার হয় না!

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো একুশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

লোকগুলো আসলে চোর-গুণ্ডা নয় কেউ। একদল খেটে-খাওয়া চাষী মানুষ। দিনের শেষে মাঠের কাজ-কাম শেষ করে তারা জাহাজ ডুবি দেখতে এসেছিলো।

চাষের হাল, কোদাল গাঁইতি প্রভৃতি নানারকম ভারি ভারি সাজ-সরঞ্জাম সব সুলতান মামুদের মাথায় চাপিয়ে দিলো ওরা। বোঝার ভারে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে এসে পৌঁছলো ওদের আস্তানায়। ওরা ওকে শুকনো রুটি আর নুন লঙ্কা খেতে দিলো। খিদের মুখে তাই বেশ তৃপ্তি করে খেয়ে ফেললেন সুলতান।

পরদিন সকালে ওরা তাকে পুরোপুরি একটা গর্দভই বানিয়ে ফেললো। হাত দু'খানা মাটিতে গেড়ে সোয়ার নেবার ঢংএ পিঠ পেতে দাঁড় করালো তাকে। জিন লাগাম এনে চাপিয়ে দেওয়া হলো। তারপর ওঠাতে লাগলো নানারকম যন্ত্রপাতি, বোঝা বোঁচ্‌কা। সুলতান আর নড়তে পারে না। কিন্তু কে যেন তার কান মলে দিয়ে বললো, 'ওহে বুড়ো খোকা, গতরটা এবার একটু নাড়াও। তোমার জন্যে তো আর আমরা এখানে বসে থাকবো না।' পাছার ওপরে সপাং করে কে যেন দু ঘা বসিয়ে দিলো, কথা কানে যাচ্ছে না, বুঝি!

অগত্যা শরীরে না সইলেও মারের চোটে পা চলতে থাকলো।

এইভাবে দিনের পর দিন সুলতান মামুদকে দিয়ে মোট বওয়াতে লাগলো। দিনে-দিনে মাসে-মাসে বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো।

এখন আর তাঁকে ওরা মাঠে নিয়ে যায় না। কলুর ঘানিতে জুড়ে দিয়ে তেল তৈরি করে। দিন-রাত ধরে একই বৃত্তপথে তিনি নীরবে নিঃশব্দে ঘানি টেনে চলেন।

পাঁচ বছর পার হয়ে গেলো। একদিন হঠাৎ ঘানির জোয়াল ভেঙ্গে পড়ে গেলো। সেই মওকায় সুলতান সকলের অলক্ষ্যে ঘানিঘর থেকে বেরিয়ে গা ঢাকা দিয়ে কেটে পড়লেন।

চলতে চলতে অজানা অচেনা শহরে এসে উপনীত হলেন মামুদ। কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো তাঁর। পরদেশী মুসাফির দেখে এক দোকানের সদাশয় বৃদ্ধ মালিক ওঁকে তার বাসায় নিয়ে গেলো সঙ্গে করে। বৃদ্ধ বললো, আমাদের শহর তোমার কেমন লাগলো, বেটা।

—খুব ভালো, বেশ চমৎকার সাজানো গোছানো।

বৃদ্ধ বলে, তোমার মতো নওজোয়ান ছেলেদের এখানে খুব কদর। থাকবে এখানে?

আমার কোনও আপত্তি নাই। শুধু দয়া করে কাঁচা বীনগুলো খেতে দেবেন না। ওতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

—কাঁচা বীন? সে কি! সে সব তো গাধা ঘোড়ার খাদ্য।

—বিশ্বাস করুন, পুরো পাঁচটা বছর আমাকে ঐ অখাদ্যই খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছে।

বৃদ্ধ বলে, না না, তোমার জন্য নিত্য নানারকম মাংসের কাবাব কালিয়ার ব্যবস্থা থাকবে। বীন কেন খেতে যাবে তুমি? তোমার যা যা খেতে প্রাণ চাইবে তাই পাবে। আমাদের শহরে তোমার মতো জোয়ান ছেলেদের জন্য খানাপিনার অভাব নাই।

সুলতান মামুদ বললেন, ঠিক আছে, আমি এই শহরেই থাকবো। কী কাজ করতে হবে আমাকে।

কাল সকালে তোমাকে আমাদের শহরের হামাম বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দেব। ঐ হামামে যতগুলো মেয়ে ঢুকতে যাবে তাদের প্রত্যেককে একের পর এক প্রশ্ন করবে, 'তোমার কী শাদী হয়েছে? প্রথম যে মেয়েটি বলবে না, আমি এখনও কুমারী, তারই স্বামী হয়ে যাবে তুমি। সেই মেয়ের সঙ্গেই তোমার ধর্মমতে শাদী হয়ে যাবে। এই হচ্ছে এ দেশের আইন। কিন্তু সাবধান, সতর্ক থেক, যতগুলো মেয়ে হামামে ঢুকতে যাবে পর পর সব মেয়েকে একই প্রশ্ন করবে। কাউকে বাদ দিতে পারবে না। প্রথম যে মেয়ে বলবে সে কুমারী সেই হবে তোমার স্ত্রী। ব্যস, তার পরে আর কোনও মেয়েকে কোনও প্রশ্ন করবে না। খেয়াল রেখ, পরপর যে মেয়েগুলো আসবে যতক্ষণ না কুমারী মেয়ের সন্ধান পাচ্ছ, কেউ যেন না বাদ পড়ে! তাহলে মহা বিপত্তি ঘটবে। এ-ও আমাদের দেশের আইনের এক কড়া অনুশাসন।

পরদিন সকালে সুলতানকে একটা হামামের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ দোকানে চলে গেলো।

প্রথম মেয়েটি এক কিশোরী। বয়স বড়জোর তের হবে। বেশ সুন্দরী। সুলতানের বুক দুরু দুরু করতে থাকে। মেয়েটিকে পেলে জীবন ভরে যাবে। এক পা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, মালকিন, আপনি কি কুমারী?

—না। আমার শাদী হয়ে গেছে।

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব আসে। তারপর আর এক একটি কথা না বলে সে হন হন করে হামামে ঢুকে যায়।

পরের জন এক হত কুৎসিত-দর্শনা বৃদ্ধা। মামুদ শিউরে উঠলেন। কিন্তু উপায় নাই, প্রশ্ন করতেই হবে।

—আপনি কি বিবাহিতা?

—হ্যাঁ।

যাক বাঁচা গেলো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মামুদ।

বুড়িটা চলে যাওয়ার পর আর একজনের আবির্ভাব হলো। বিরাট দশাসই চেহারা। সারা অঙ্গ দামী সাজ-পোশাক আর জড়োয়া অলঙ্কারে মোড়া এক মেদবহুল মুটকী। এর চেয়ে ঐ বুড়িটাও বুঝি দেখতে অনেক ভালো ছিলো।

—আপনি কি বিবাহিতা?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন মামুদ। মেয়েটি আকর্ণ বিস্তৃত দন্তরাজি বিকশিত করে হেসে বললো, তুমি আমার চোখের মণি, তোমার পথ চেয়েই তো বয়সটা বিকেল হয়ে গেছে সোনা, সেই এলে, আর ক'টা বছর আগে আসতে পারলে না? যাক, শেষ পর্যন্ত তোমার দেখা পেলাম, এই আমার ভাগ্য।

মেয়েটি মামুদের কাঁধে হাত রাখতে এগিয়ে আসে। কিন্তু মামুদ এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, আহা-হা, আমার গায়ে হাত দিও না, দেখছো না, আমি একটি গাধা। এই দেখ কলুর ঘানি টেনে টেনে কাঁধে আমার কড়া পড়ে গেছে। তুমি অমন খুবসুরৎ জেনানা, আমার মতো একটা গাধাকে শাদী করে জিন্দিগীটা বরবাদ করে দেবে কেন, চাচী?

কিন্তু চাচী সে কথায় কর্ণপাত করলো না। হুমড়ি খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে জাপটে ধরলো মামুদকে! তারপর চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুললো সে। মামুদ ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, আহা-হা, আস্তে-আস্তে, আমার ঠোঁটফোট ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেলো যে। বিশ্বাস কর, আসলে আমি মানুষের বাচ্চা নই, গাধা—কলুর ঘানি টানা একটা গাধা। এই দ্যাখো, আমার ঘাড়ে কি রকম জোয়ালের কড়া? আঃ, ছাড় ছাড়, লাগছে—মরে যাবো যে—

প্রায় অমানুষিক জোর করে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি ফোয়ারার চৌবাচ্চা থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালেন।

সুলতান মামুদ অবাক হয়ে দেখলেন, তিনি তাঁর নিজের প্রাসাদের মাঝখানে ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে উজির আর হারেমের সুন্দরীরা। ওদের সকলের হাতে আতর, তেল, তোয়ালে, সাবান, শরবত ইত্যাদি। আর দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ ফকির।

বৃদ্ধ আশীর্বাদের ভঙ্গী করে হাত তুলে বললো, খোদা তোমার মঙ্গল করবেন, মামুদ। সব দুঃখ হতাশা কেটে যাবে তোমার মন থেকে!

এর পরই পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলো বৃদ্ধ। কেউ আর তাকে দেখতে পেলো না। আশ্চর্য!

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে শারিয়ারের দিকে তাকালো। সুলতান বলে, চমৎকার কিস্‌সা শাহরাজাদ। এ থেকে আমার অনেক শিক্ষা লাভ হলো।

শাহরাজাদ বললো, এরপর আর একটা কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

সে বলতে শুরু করে ঃ

আপনারা সবাই জানেন খলিফা হারুন অল রসিদের সদগুণের অবধি ছিলো না। তাঁর মতো ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, উদার মহৎ নরপতি আর কেউই ছিলো না। কিন্তু একটা

জায়াগয় তাঁর একটু খামতি ছিলো। তাঁর মনে একটা বিষয়ে দারুণ অহমিকা ছিলো। এবং প্রকাশ্যে সেকথা সবাইকে শোনাতেও তিনি কসুর করতেন না। তিনি বললেন, তাঁর মতো মুক্তহস্তে দান-ধ্যান করতে আর কেউই পারে না।

একদিন তিনি তাঁর নিজের কক্ষে অবসর-বিনোদন করছেন, এমন সময় প্রধান উজির জাফর এসে কুর্ণিশ জানালো তাঁকে। তারপর জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনাতে থাকলো ঃ

ধর্মাবতার, আপনি আমাদের মাথার মণি, জগতের আলো। এই বান্দার গোস্তাকি মাফ করবেন, জাঁহাপনা, আজ সে আপনার কাছে গলা চড়িয়ে দু-চারটে বাক্য শোনাবে।

একজন ধর্মবিশ্বাসীর প্রধান গুণ হবে সে আল্লাহর পায়ে নিজের কায়-মন-প্রাণ সমর্পণ করে দেবে। এবং সেই আত্ম-নিবেদনই রীতি-সম্মত গৌরব। দুনিয়ার যা কিছু বৈভব, এই যে প্রকৃতির অপরূপ দান, আর মানব আত্মার যে মহৎ উপাদান—এসবই সেই পরমপিতার অকৃপণ আশীর্বাদে সম্ভব হচ্ছে। এ জন্যে কোনও মানুষই আত্মম্ভরিতা করতে পারে না। তার যতটুকু বড়াই বা অহঙ্কার—তার জন্য একমাত্র আল্লাহই দায়ী। একটি বৃক্ষ কি তার ফল-সম্ভারের জন্য অহঙ্কার করে? কিংবা সগার কি বলে, দেখ দেখ, কি বিপুল জালরাশি আর রত্নমণির মালিক আমি? আকাশ কি কখনও অহঙ্কার করে বলে, আমার মতো উঁচু কি তোমরা কেউ হত পার? না। সত্যিকারের যে বড়, মহৎ—সে কখনও বড়াই করে লোকের কাছে জাহির করে না। তাই বলছিলাম, ধর্মাবতার আপনার বলতে যা কিছু আছে—সব পরার্থে বিলিয়ে দিন। দরিদ্র জন-সাধারণ আল্লাহর পরম প্রিয়ভাজন। তাদের মধ্যে আপনার সম্পদ বিভক্ত হয়ে গেলে, তাঁর চরণে উৎসর্গীকৃত হবে, মনে করবেন।

আচ্ছা ধর্মাবতার, একটা কথা কি বান্দাকে বলবেন, এই যে বিশাল সলতানিয়ত বিপুল অর্থভাণ্ডার, আর অগণিত অট্টালিকা ইমারত প্রাসাদের যে বাহ্যাড়ম্বর, এ-সবের কি আপনি একাই মালিক? একাই সব করছেন, সেইজন্যই কি আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন এসব?

বসরাহ শহরে আবু অল কাসেম নামে এক বিরাট বিত্তশালী সওদাগর আছে। তার বিপুল ঐশ্বর্যের পরিমাপ সে নিজেও করতে পারে না। লোকে বলে তার বিত্ত-বৈভব যে-কোনও বড় সুলতান বাদশাহর চেয়েও বেশি। তবে শুধু এই কারণেই তার দেশজোড়া অত নাম-খ্যাতি হয়নি। তার মতো দরাজ দিল এবং মুক্তহস্ত সারা আরব দুনিয়ায় কারো নাই। এমনকি স্বয়ং ধর্মাবতারও তার তুল্য দানশীল নন।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো বাইশতম রজনী

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

জাফরের এবম্বিধ বক্তৃতা শুনতে শুনতে খলিফা হারুন অল রসিদের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠে।

—কুত্তাকা বাচ্চা! এতো বড় স্পর্ধা তোমার, আমার মুখের সামনে এই রকম বেয়াদপি করার দুঃসাহস কর! তুমি কি ভুলে গেছ, এই ধরনের মিথ্যাচার মানে অবধারিত মৃত্যু।

জাফর বলে, খোদ কসম, জাঁহাপনা, এক বর্ণও মিথ্যা বলিনি আমি। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তবে বসরাহতে কাউকে পাঠিয়ে আপনি খবর নিন। আমি তার কথাই মেনে নেব। এর আগে আমি যখন একবার বসরাহতে গিয়েছিলাম তখন ঐ আবু কাসেমের বাড়িতেই অতিথি হয়ে উঠেছিলাম। যা বললাম, সে-সব আমার নিজের চোখে দেখা। অন্যের মুখের ঝাল খাইনি। তাকে জানার পর মুক্ত কণ্ঠে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তার মতো উদার এবং দানে মুক্তহস্ত মানুষ আজকের দুনিয়ায় আর দু'টি নাই।

জাফরের কথায় খলিফা উত্তেজিত হয়ে প্রহরীকে হুকুম করলো, এই বেয়দপকে গ্রেপ্তার কর।

প্রহরীরা জাফরকে হাতকড়া পরাবার জন্য এগিয়ে এলো। খলিফা আর সেখানে থাকলেন না, ঘর ছেড়ে জুবেদার মহলের দিকে চলে গেলেন।

খলিফার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখে বেগম জুবেদা অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই কোনও খারাপ কিছু ঘটে গেছে।

খলিফা কোনও কথা না বলে গুম হয়ে বসে পড়লেন একটা আরামকেদারায়।

জুবেদা জানতেন এ অবস্থায় খলিফাকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে নাই! এক গেলাস সুগন্ধি সরবৎ এনে খলিফার সামনে ধরলেন তিনি।

—নিন, খেয়ে নিন ধর্মাবতার। শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। জীবনের দু'টি রং আছে। একটি সফেদ সুন্দর, অন্যটি কালো, অন্ধকার। আপনাকে আমি সদা সর্বদাই হাসি-খুশিই দেখতে চাই, জাঁহাপনা।

খলিফা বাধা দিয়ে বলেন, কিন্তু আজ আমার খুব খারাপ দিন, বেগম। ঐ বেতামিজ বারসাফী জাফর আমার মন মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। ওর এতো বড় সাহস, আমার কাজের সমালোচনা করে?

বেগম জুবেদাকে তিনি সব কথা খুলে বললেন। জুবেদা বুঝতে পারলেন, জাফর বড় বেকায়দার কাজ করেছে। এর পরিণাম যে কি হতে পারে ভাবতে পারেন না তিনি। এ অবস্থায় খলিফাকে শান্ত করতে গেলে খোলাখুলি জাফরকে সমর্থন করতে যাওয়া বিপদজনক। অথচ তাকে বাঁচাতে গেলে তার পক্ষ না নিলেও চলবে না। তাই তিনি কায়দা করে বললেন, বসরাহতে একটা দূত পাঠিয়ে খবরটা যাচাই করে নিলে কেমন হয়, জাঁহাপনা? যতদিন না দূত ফিরে আসে ততদিন পর্যন্ত জাফরের সাজা দেওয়াটা না হয় মুলতুবিই রাখলেন। তবে এও জানি, সাজা সে এড়াতে পারবে না কোনও মতে।

জুবেদার কথায় খলিফা অনেকটা শান্ত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, এ ব্যাপারে অন্য কোনও লোকজন পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। জাফর আমার দরবারের পুরোনো লোক। ওর বাবা, তার বাবা সকলেই আমাদের বংশের সেবা করে এসেছে। তাই এ ব্যাপারে অন্য কোনও লোকের ওপর তদন্ত করতে দিয়ে আমি স্বস্তি পাবো না। সুতরাং আমি নিজেই যাবো বসরাহয়। আবু কাসেমের সঙ্গে মোলাকাত করে নিজেই বিচার করবো। যদি বুঝি জাফর তার সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলেছে, রেহাই নাই, ওকে ফাঁসীতে ঝোলাবো।

জুবেদা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, একা যাওয়া ঠিক হবে না! কিন্তু খলিফা সে-কথায় কর্ণপাত না করে তখুনি এক বণিকের ছদ্মবেশ ধরে বসরাহর পথে বেরিয়ে পড়লেন।

আল্লাহর দোয়ায় যথাসময়ে নিরাপদে বসরাহয় পৌঁছে গেলেন তিনি। সেখানকার বড় সরাইখানায় একখানা ঘর ভাড়া করে উঠলেন। রাতে খানাপিনা সেরে নেবার আগে তার ঘরের খানসামাকে জিজ্ঞেস করলেন খলিফা, আচ্ছা বাপু বলতে পার, এই শহরে নাকি আবু নামে এক যুবক আছে। তার দান-ধ্যানের নাকি তুলনা হয় না?

বৃদ্ধ খানসামা দু'হাত তুলে আল্লাহর নাম স্মরণ করে বললো, খোদা তাঁকে চিরজীবী করে রাখুন। সত্যি কথা বলতে কি, তার তুল্য মানুষ এ দুনিয়ায় দু'টি নাই, জনাব। এই শহরে এমন একজনকেও পাবেন না যে তার নাম শুনে কপালে হাত না রাখবে। আমার যদি শতমুখ থাকতো তবে একসঙ্গে সব মুখ দিয়ে একই কথা বেরিয়ে আসতো, তার মতো মানুষ দু'টি জন্মাবে না দেশে। তাঁর গুণগান করে আমরা নিজেরাই ধন্য হই। তাকে ধন্য করার স্পর্ধা কারো নাই।

পরদিন সকালে খলিফা সরাইখানা থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে হাঁটতে

থাকলেন। দোকানপাট তখনও খোলেনি, নানা পথ ধরে হেঁটে হেঁটে গোটা শহরটাকে দেখতে লাগলেন।

তারপর এক সময় বাজারে জনসমাগম হতে লাগলো। এক এক করে সব দোকানই খুলে গেলো। এক দোকানের মালিককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, এ শহরে আবু কাসেমের প্রাসাদটা কোন দিকে বলতে পারেন?

দোকানী একটু কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে তাকালো। মনে হচ্ছে, আপনি পরদেশী! অনেক দূর দেশ থেকে আসছেন? এখানে আবু কাসেমের প্রাসাদ একটা দুধের বাচ্চাও দেখিয়ে দিতে পারে।

খলিফা স্বীকার করলেন তিনি বিদেশী। তখন দোকানী তার ছোকরা কর্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে বললো, এর সঙ্গে যান, আপনাকে দেখিয়ে দেবে।

আবু কাসেমের প্রাসাদটা দাঁড়িয়ে দেখার মতো বটে! দামী দামী নানা বর্ণের মার্বেল পাথরে আগাগোড়া প্রাসাদটা তৈরী। প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এক দঙ্গল খুদে পল্টন লড়াই-এর মহড়া খেলায় মত্ত হয়েছিলো। সুলতানের উপস্থিতিতে ওরা রণে ভঙ্গ দিয়ে কাছে এগিয়ে এলো। খলিফা বললেন, এ বাড়ির মালিকের সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছি। একবার ডেকে দাও তাঁকে।

ছেলেদের একজন ছুটে ভিতরে ঢুকে গেলো। এবং প্রায় তখুনি আবু কাসেম বাইরে বেরিয়ে এসে মুসাফির মেহেমানকে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটা মখমলের দিবানে বসালো। একটু পরে সাকীরা শরবৎ, খাবারের পেয়ালা পাত্র সাজিয়ে সোনার রেকাবীগুলো রাখলো তার সামনের মেজ-এ। বারটি চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দরী বাঁদী। সকলেই কুসুমাদপি পেলব-কোমল পঞ্চদর্শী।

খলিফা হারুণ অল রসিদ শরবতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তারিফ করলেন, বাঃ চমৎকার, এমন জিনিস তো আগে কখনও খাইনি?

এরপর নানা উপচারে আহারাদি সমাধা করলেন তিনি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন, প্রতিটি খাবারই বড় সুস্বাদু, মুখরোচক।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে গান-বাজনার আসর বসলো। খলিফা বুঝলেন আবু কাসেম সমঝদার মানুষ। প্রকৃত গুণী গাইয়ে বাজিয়েদের সে সংগ্রহ করে রেখেছে।

একটি পরমাসুন্দরী কিশোরী কন্যার গান শুনে খলিফা মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে যখন মনোনিবেশ করেছেন, সেই ফাঁকে আবু কাসেম অন্দরে চলে গেলো। একটু পরে ছোট্ট একটা গাছ হাতে নিয়ে আবার ফিরে এলো। গাছের গুঁড়িটা রূপোর, পাতাগুলো পান্নার, আর ফলগুলো সব পলার তৈরি। গাছটাকে সামনে বসিয়ে দিতে খলিফা দেখলেন গাছের মাথার উপরে একটা ময়ূর পেখম মেলে বসে আছে। ময়ূরটা সোনার। ময়ূরটার মাথায় মিশ-মিশে কালো রঙের একটা লাঠি দিয়ে মৃদু ঠোকা দিতেই সে পাখা দু'টো ঝাপটাতে লাগলো, পুচ্ছটা উচ্চে তুলে নাচতে থাকলো। একটু পরে সে লাট্টুর মতো বন বন করে ঘুরতে আরম্ভ করলো। এতো জোরে যে ময়ূরটাকে আর দেখা গেলো না কিছুক্ষণ। সারা ঘর চন্দনের সুবাসে ভরপুর হয়ে উঠলো।

হারুণ অল রসিদ হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন সেই অবিশ্বাস্য আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ।

ইয়া আল্লাহ, এমন বস্তুও দুনিয়াতে থাকতে পারে। এ যে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না?

আবু কাসেম ময়ূর-সুদ্ধ গাছটাকে নিয়ে ভিতরে চলে গেলো। খলিফা ভাবলেন, এ কি রকম ব্যবহার আবু কাসেমের? তার কি মনে হয়েছে ওর ঐ গাছ আর পাখীটা চেয়ে নেব আমি? তবে যে জাফর বড়াই করে বলেছিলো, তার মতো দাতা আর সারা দুনিয়ায় কেউ নাই? আর যদি চাই-ই, তবে কি দিতে তার বুকে বাজবে?

একটু পরে একটি ছোট্ট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো আবু কাসেম। একমাত্র সূর্যকিরণের সঙ্গেই ছেলেটির রূপের জেল্লার তুলনা চলে। সোনার জরির কাজ করা তার মুল্যবান সাজ-পোশাকে অসংখ্য বড় বড় মনিমুক্তো বসানো ছিলো, ছেলেটির হাতে একটা পলার তৈরী পেয়ালা। সে পেয়ালাটি সোনালী মদে পরিপূর্ণ। প্রায় আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে মদের পেয়ালাটা খলিফার সামনে বাড়িয়ে ধরলো সে। ছেলেটির উপহার প্রসন্ন মনে হাত পেতে নিলেন তিনি। এবং এক চুমুকে সবটুকু সরাব নিঃশেষ করে শূন্য পেয়ালাটা ছেলেটির হাতে ফেরত দিতে গিয়েই থমকে গেলেন। একি ! পেয়ালাটা সঙ্গে সঙ্গেই আবার পূর্ণ হয়ে গেছে! আর এক চুমুকে মদটুকু খেয়ে নিয়ে আবার তিনি ফেরত দিতে যান, কিন্তু এবারও একই দৃশ্য। পেয়ালাটা পূর্ববৎ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। একি! এ যে ভুতুড়ে কাণ্ড!

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো তেইশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

খলিফা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, এ অদ্ভুত কাণ্ড কী করে সম্ভব হতে পারে।

আবু কাসেম বিনীত ভাবে বলে, সত্যিই, অবাক হওয়ার মতো কিছু নাই, মালিক। এক প্রবীণ দার্শনিক এটা বানিয়েছেন। দুনিয়ার মধ্যে সেরা পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। এমন কোনও গুপ্তবিদ্যা ছিলো না যা তাঁর অজানা।

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সে দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। খলিফা ক্রুদ্ধ হলেন, কি বেয়াদপ, আদব-কায়দার সাধারণ নিয়ম-কানুনগুলো পর্যন্ত সে জানে না, বর্বর কোথাকার। এমনভাবে ছেলেটাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলো যেন আমি কেড়েকুড়ে নেব সব। এক এক করে যত সব অবাক অদ্ভুত বস্তু এনে হাজির করছে, আর কিছুক্ষন ভেল্কিবাজী দেখিয়েই আবার অন্দরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসছে? যখনই সে বুঝতে পারছে আমি বেশ মজা পেয়েছি তখনই সে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটা। একে এককথায় কি বলা যায়? কুৎসিত—অসৎ! দাঁড়াও জাফর, তোমার মউৎ-এর আর বেশি দেরি নাই। বাগদাদে ফিরে গিয়েই আমি তোমার ব্যবস্থা করছি।

কিছুক্ষণ বাদে আবু হোসেন আবার ফিরে এলো। এবার তার সঙ্গে একটি কিশোরী মেয়ে। খুব ফর্সা এবং পরীর মতো পরমাসুন্দরী। তার সাজ-পোশাক এক গাদা হীরে বসানো। কিন্তু হীরেয় কি হবে, তার তন্বীদেহের রূপের ছ'টা আরও বেশি চমক লাগার মতো। সেই মুহূর্তে হারুণ সব বিস্মৃত হলেন, এমন কি সেই গাছ, ময়ূর, পেয়ালা কিছুই তার মনে ঠাঁই পেলো না। মেয়েটি তার সামনে বসে বাঁশীতে সুমধুর তান তুলে একনাগাড়ে চব্বিশটা রাগ-রাগিনী বাজিয়ে শোনালো। মুগ্ধ খলিফা আবু কাসেমকে বাহবা দিয়ে বললেন, সত্যিই সাহেব, তোমার সংগ্রহ বড় অসাধারণ, হিংসে করার মতো।

এই কথা শোনামাত্র আবু কাশেম আর দাঁড়ালো না সেখানে, মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

এবারে খলিফা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নাঃ, এ জিনিস আর বরদাস্ত করা যায় না।

আবু কাসেম ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, মনের রাগ মনে

চেপে তিনি যথাসাধ্য সৌজন্য-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আবু কাসেম, তোমার আতিথেয়তায় প্রীত হয়েছি। কিন্তু আর বেশি সময় তোমাকে বিব্রত করতে চাই না, এবার আমি চলি—

আবু কাসেম কিন্তু একবারও তাঁকে আরও কিছু সময় থেকে যাবার জন্য অনুরোধ জানালো না। বরং বিদায়ের শুভেচ্ছা জানানোর ঢং এ মাথাটা নুইয়ে সালাম জানিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে দিতে এলো তাঁকে।

সরাইখানায় ফিরে আসতে আসতে খলিফা ভাবলেন, লোকটা হাড়-কিপ্পন। ঘর ভরা দৌলত থাকলে কি হয়, চড়ুই পাখীর মতো দিল। এর প্রশংসায় আমার উজির সাহেব পঞ্চমুখ। দাঁড়াও ব্যাটাকে আমি মজাখানা দেখাবো—বাগদাদে ফিরে গিয়ে।

কিন্তু খলিফাকে আরও বেশি অবাক করে দিলো আর একটি ঘটনা। সরাইখানায় তার ঘরের দরজার সামনে দু'টি কৃষ ক্রীতদাসের সঙ্গে সেই ছোট্ট পেয়ালা হাতে ছেলেটি এবং সেই বাঁশী হাতে কিশোরীটি আর চাকর দু'টির হাতে সেই গাছটি আর ময়ুর। খলিফা সামনে আসতেই সুন্দরী কিশোরীটি একটুকরো চিঠি বাড়িয়ে দিলো খলিফার দিকে।

খোদা ভরসা। আপনার বান্দা এই সামান্য উপহারগুলো পাঠাচ্ছে আপনাকে। আমার গরীবখানায় আপনার স্বল্পক্ষণের আতিথ্য সারাজীবন আমার স্মৃতি-পটে আঁকা থাকবে। এই তুচ্ছ কয়টি বস্তু আপনাকে মুগ্ধ করেছিলো দেখে এগুলো আপনাকেই উপহার পাঠালাম। গ্রহণ করে ধন্য করবেন এ অধমকে।"

চিঠিখানা পড়ে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেন না খলিফা। স্বপ্ন দেখছেন না তো তিনি? এ কি সেই আবু কাসেমের লেখা খৎ? একজন সামান্য যুবকের পক্ষে এতো সব অমূল্য বস্তু সংগ্রহ করাই বা সম্ভব হলো কি করে? আর তার চেয়ে বড় কথা, যে জিনিস কোনও অর্থের বিনিময়েই কিনতে পাওয়া যায় না তা অবলীলাক্রমে দান করে দিতে পারে কে? এমন দাতা তো ত্রিভুনে কোথাও আছে বলে শুনিনি।

খলিফার আর ঘরে প্রবেশ করা হলো না, সেইখানেই দানসামগ্রী সব ঐ অবস্থাতেই ফেলে রেখে তিনি আবার ছুটলেন আবু কাসেমের প্রাসাদের দিকে। কী ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হলে এই অমূল্য সম্পদ তুচ্ছজ্ঞানে দিয়ে দিতে পারে অন্যকে? সেই তথ্যটি আজ তাঁকে জানতেই হবে।

দ্রুতপায়ে আবু কাসেমের প্রাসাদে আবার ফিরে এসে খলিফা কাসেমকে বললো, আমার দোষ যদি কিছু ঘটে থাকে, তবে নিজগুণে তুমি ক্ষমা কর সাহেব। আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি। হয়তো আমার আচার আচরণে কোন অসৌজন্য দেখিয়ে থাকতে পারি। আশা করি সে ত্রুটি মনে রাখবে না। আমি আবার ফিরে আসতে বাধ্য হলাম, একটি কারণে। এইভাবে তুমি যদি দু'হাতে বিলাতে থাক তোমার বিত্ত বৈভব তবে বাদশাহর ভাঁড়ারও একদিন ফুরিয়ে যাবে যে। তোমার এই দানপত্র না কমালে তো একদিন তুমি ফতুর হয়ে যাবে! হয়তো তোমার সম্পদের পরিমাণ অনেক, কিন্তু তা বলে তো অফুরান নয়।

—এই যদি আপনার ফিরে আসার কারণ হয়ে থাকে তবে আপনি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যেতে পারেন আপনার ঘরে। প্রতিদিন আমি আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি, আমার ইহজগতের ঋণ যেন আমি পরিশোধ করে যেতে পারি। যখনই আমার দরজায় কোনও মেহেমান আসে তাকে দু'সহাত ভরে দিতে পেরে আমি ধন্য হই। সত্যি কথা বলতে কি, খোদা আমাকে অফুরন্ত ধন-সম্পদই দিয়েছেন। দু'হাতে বিলিয়েও তা শেষ করা যাবে না কোনদিন। আপনাকে সব খুলে বললে আপনি হয়তো আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। সে কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ সন্দেহ নাই। তা হলে মেহেরবানী করে একটু বসুন এখানে, আপনাকে শোনাই সে কাহিনী।

খলিফা আসন গ্রহণ করলেন। আবু কাসেম বলতে শুরু করলো ঃ

আমার বাবা আবদ অল আজিজ কাইরোর খুব নামজাদা জহুরী ছিলো এক সময়ে। আমার বাবার বাবা এবং তার বাবাও বংশানুক্রমে মিশরের আনুকূল্য লাভ করে অনেক ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন। যদিও কাইরোতেই সারাজীবন কেটেছে তাদের তবু জন্মভূমি বসরাহকে তাঁরা কখনই ভোলেননি। বাদশাহর কাছ থেকে পাওয়া সব ধন-সম্পদই তাঁরা বসরাহয় নিয়ে এসে জমা করেছিলেন।

আমার বাবা একটি মাত্র কন্যাকেই শাদী করে জীবন কাটিয়ে গেছেন। এবং আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। সুতরাং বাবা যখন ইন্তেকাল করলেন, আমি একাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির পুরো মালিক হলাম।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো চব্বিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

আমার ভীষণ খরচের হাত ছিলো বরাবরই। তাই ঐ বিপুল ঐশ্বর্য নিঃশেষ করতে দু'বছরও সময় লাগলো না আমার। আল্লাহর দোয়াতে যা হাতে এসেছিলো আবার তারই ইচ্ছায় তিনি তা ফিরিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিলেন আমাকে। এরজন্য মনে আমার অনুতাপ হয়নি কখনও।

বাড়ি ঘর-দোর সব বিক্রি করে দিয়ে একদিন বসরাহ ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়লাম আল্লাহর নাম করে। কেমন করে জানি না, এক সওদাগরের দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়েছিলাম আমি। প্রথমে মশুল এবং পরে দামাসকাসে গেলাম আমরা। তারপর দুস্তর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে মক্কার পরে কাইরো শহরে গিয়ে পৌঁছলাম একদিন। এই কাইরোয় আমরা কিছুকাল অবস্থান করবো, ঠিক হলো।

কাইরোর সুন্দর সুন্দর দালান কোঠা আর অসংখ্য ছোটবড় মসজিদ দেখে পুলকে নেচে উঠলো আমার মন। বাবার কথা মনে হলো, তিনি এবং তাঁর পিতৃপুরুষরা এই শহরেই কাটিয়ে গেছেন চিরটাকাল। কান্নায় চোখ ফেটে পানি গড়িয়ে পড়লো, এই শহরে আমার বাপ-ঠাকুরদাদারা কি নবাবী চালে কাটিয়ে গেছেন, আর আমি তাদের বংশধর হয়ে দীন ভিখিরির মতো হাজির হয়েছি এখানে।

নীলনদের তীরে বসে নদীর শোভা দেখছিলাম। আমার পাশেই সুলতানের বিলাসমহল ঝকমক করছিলো। মুগ্ধ নয়নে প্রাসাদের কারুকার্য লক্ষ্য করছি হঠাৎ একটা বাতায়নের পর্দা সরিয়ে একটি পরমাসুন্দরী মুখ বাড়িয়ে দিলো। আমার চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠলো। কিন্তু কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। মেয়েটি জানালা থেকে সরে গেলো। ওপরের দিকে তাকিয়ে সারাটা বিকেল শেষ হয়ে গেলো, মনে আশা আর একবার হয়তো সে জানলার সামনে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু না, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে থাকলো, মেয়েটি আর দর্শন দিলো না।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে সরাইখানায় ফিরে আসতে হলো। সারাটা রাত সেই মুখচ্ছবি বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

সকাল হতে না হতেই আবার আমি নদীর ধারে এসে প্রাসাদের পাশে বসে উন্মুখ, ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসে থাকি। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে একটি বারের জন্য জানলার পর্দা সরিয়ে সে এসে দাঁড়ালো না। আমি কিন্তু হাল ছেড়ে দিলাম না। তৃতীয়দিন বিকেলে জানলার পর্দা সরে গেলো। সেই মুখখানি আবার দেখতে পেলাম। আমার সারা শরীরে সে যে কি এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ খেলে গেলো, বোঝাতে পারবো না আপনাকে। কেন জানি না সেই মুহূর্তে হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকটা গলা চড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, শোনো সুন্দরী,

আমি এ শহরে নবাগত মুসাফির। তোমার রূপে আমি মুগ্ধ। এতো পথ হেঁটে এই দূরদেশে আসা সার্থক হয়ে গেলো তোমাকে দেখে।

আমি থামলাম। ভাবলাম মেয়েটি কিছু বলবে। কিন্তু ওর মুখে-চোখে দারুণ একটা ভয়ের ছাপ লক্ষ্য করে দমে গেলাম। একটু পরে সে খুব আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিস করে আমাকে বুঝিলে দিলো, এখন তুমি পালাও এখান থেকে। ঠিক মাঝরাতে এসো।

জানলাটা বন্ধ হয়ে গেলো। আনন্দে নেচে উঠলো আমার হৃদয়। কি ঘটতে পারে কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করে সেইদিন মাঝরাতে এসে হাজির হলাম আবার সেখানে। দেখলাম, জানলাটা থেকে একটা রেশমী দড়ি ঝুলছে। দড়িটা ধরে প্রাণপণ কসরতে একসময় জানালায় উঠে আসতে পারলাম আমি। ঘরের ভিতরে একখানা চাঁদী পালঙ্কে শুয়েছিলো সে। তার রূপের বর্ণনা দিতে পারবো না, তবে একথা বলতে পারি, ওধরনের সুন্দরী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না।

এরপরে সহজভাবেই যা ঘটা সম্ভব ছিলো তাই সংঘটিত হয়েছিলো সে রাতে। আমরা দু'জনে গভীর আশ্লেষে একাত্ম হয়ে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু থাক সেসব কথা, প্রেমোপাখ্যান বিবৃত করার প্রয়োজন নাই এখানে। সে রাতে মেয়েটি তার দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছিলো আমাকে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলো, আমি সুলতানের বেগম লুবিবাহ। এই বিলাসমহলে আজ আমি নির্বাসিতা। সুলতানের অন্যান্য বেগমরা শত্রুতা করে এই সর্বনাশ করেছে আমার। সুলতান আমাকে বিষনজরে দেখেন এখন। অথচ একদিন আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র নয়নতারা। আজ আমি বড় একা নিঃসঙ্গ। এই নিঝুম পুরীতে আজ আমি বন্দিনী। অথচ একদিন কি না আমার ছিলো।

আজ আমি বড় একা—অসহায়। মাঝে-মাঝে জানলায় দাঁড়িয়ে নীলের শোভা দেখে দেখে দিন কাটাই। একটা সঙ্গী সাথী নাই আমার, যার সঙ্গে দু'টো মনের কথা বলতে পারি। এখন কাউকে কাছে পাই না যাকে আমার দেহ-প্রাণ-মন উজার করে দিতে পারি। বহুকাল পরে নদীর তীরে তোমাকে দেখে মনে বড় আশা হলো। তোমার সুঠাম সুন্দর যৌবন আমাকে চঞ্চল করে তুলেছিলো, তাইতো তোমাকে আসতে বলেছিলাম আজ রাতে। তুমি এলে, অনেকদিনের অতৃপ্ত কামনা শান্ত করে দিয়েছ তুমি! কিন্তু আজকের রাতই কি শেষ সুখের রাত হবে গো? আর তুমি আসবে না আমার কাছে?

আমি বলতে পারলাম, চিরকাল—যতদিন বাঁচবো তোমাকে নিয়েই বাঁচতে চাই আমি।

ঠিক এই সময় কে যেন দরজায় প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারতে লাগলো। বেগম লুবিবাহ শিউরে উঠলো, সর্বনাশ, এতো সুলতানের করাঘাত। এখন উপায়?

জানালার কাছে গিয়ে দেখি রেশমী দড়িটা কেটে দেওয়া হয়েছে! ভয়ে আমি পালঙ্কের নিচে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু বিশজন কাফ্রি খোজার হাত থেকে পালঙ্কের তলায় পালিয়ে নিস্তার পাওয়া যায়? ওরা আমাকে টেনে বের করে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো নীলের জলে। শুধু আমাকেই নয়, আমার প্রাণাধিকা লুবিবাহকেও ওরা রেহাই দিলো না। তাকেও ছুঁড়ে দিলো আমারই পাশে।

সাঁতার জানা ছিলো, তাই নীলের স্রোতে হারিয়ে গেলাম না। কোনরকমে সাঁতার কাটতে কাটতে এক সময় অপর পারে গিয়ে তীরে উঠতে পারলাম। কিন্তু সে যে কোথায় তলিয়ে গেলো তার আর কোনও হদিস পেলাম না।

এর পর কাইরোয় থাকার বাসনা ত্যাগ কের বাগদাদে চলে গেলাম আমি। আমার কোমরের তোড়ায় তখন গুটিকয়েক মাত্র দিনার অবশিষ্ট ছিলো। সেই ক'টা টাকা দিয়ে একটা বারকোষ ভর্তি করে মেঠাই মণ্ডা কিনে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে ফিরি করে বেড়াতে লাগলাম। আমার গলায় খুব মিষ্টি সুর ছিলো। এবং এই কারণেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে খদ্দেরদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। প্রতিদিন বারকোষ ভরে মেঠাই নিয়ে পথে বেরুই। কিন্তু দিনান্তে একটিও পড়ে থাকে না। এইভাবে দিনে দিনে যা লাভ হয় তার সামান্যই খরচ হয় খানাপিনা করতে। বাকীটা জমতে থাকে।

একদিন পথে পথে ঘুরতে এক দোকানের বৃদ্ধ মালিক আমাকে ডাকলেন। শেখ সাহেব কিছু মিঠাই কিনবেন। বারকোষখানা নামালাম তাঁর দোকানে। বৃদ্ধ আমার নাম ধাম জিজ্ঞেস করায় আমি কিঞ্চিৎ বিব্রত বা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললাম, অতীতের স্মৃতিটা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করতে চাইনে শেখ সাহেব। সে বড় মর্মান্তিক মনে হয় আমার কাছে।

বৃদ্ধ আমাকে আর ঘাঁটালো না। দশটা দিনার হাতে গুঁজে দিলো সামান্য মিঠাইএর জন্য। এটা দয়ার দান বুঝতে পেরেও, না করতে পারলাম না। বৃদ্ধকে খুশি করার জন্যই নিলাম।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো পঁচিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পরদিন আবার আমি ঐ বৃদ্ধের দোকানে গেলাম। সেদিনও তিনি সামান্য খানিকটা মিঠাই কিনলেন। তারপর আবার সেই একই প্রশ্ন করলেন, কি আমার নাম, কোথায় আমার দেশ।

সেদিন আর আমি তাঁকে বিমুখ করলাম না। আমার সব কাহিনী তাঁকে খুলে বললাম। বৃদ্ধ শুনে সাশ্রুনয়নে বললেন, বেটা তোমার বাবা আবদ অল আজিজ আমার প্রাণের দোস্ত ছিলো। তার ছেলে হয়ে আজ তুমি পথে পথে ফিরি করে বেড়াচ্ছ? বাবা একটা কথা বলবো, আমি সারাজীবন অপুত্রক। তোমার বাবা আমার পরম বন্ধু ছিলেন, সেই অধিকারে তোমাকে আমি দত্তক গ্রহণ করতে চাই। আজ থেকে তুমি আমার ছেলে হলে।

পরদিনই তিনি দোকানপাঠ বন্ধ করে আমাকে নিয়ে বসরাহয় রওনা হলেন। বসরাহতেই তাঁর আদি বাসগৃহ ছিলো।

বসরাহয় এসে আমি বৃদ্ধের প্রাসাদে দারুণ আদর যত্নে দিন কাটাতে লাগলাম। বৃদ্ধ আমাকে বললেন, বাবা, বয়স হয়েছে। এবার যাবার সময় হলো। আমার মৃত্যুর পর আমার যা-কিছু বিষয়-আশয় সব তোমার হবে।

এরপরও তিনি বছরখানেক জীবিত ছিলেন। মৃত্যু-শয্যায় তিনি আমাকে কাছে ডেকে বললেন, বাবা, যে সম্পদ আমি রেখে গেলাম তোমার জন্য তা দুনিয়ার তাবৎ সুলতান বাদশাহর কোষাগারেও নাই। এ আমাদের বংশানুক্রমে সঞ্চিত ঐশ্বর্য। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা জমিয়ে গেছেন এসব। আমিও যতটা পেরেছি বাড়িয়েছি। আমার নানাজী মৃত্যুকালে আমার বাবাকে যে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন আমার বাবাও মৃত্যুশয্যায় আমাকে ডেকে সেই উপদেশই রেখে গেছেন। আমিও তোমাকে সেই কথাই কানে কানে বলে যাচ্ছি বেটা, প্রাণ খুলে মুক্ত হাতে দান ধ্যান করবে, তোমার ঐশ্বর্য কখনও ফুরাবে না। আর একটা কথা, সব অবস্থাতেই নিজেকে সুখী মনে করবে। আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন।

এই ছিলো তাঁর শেষ কয়টি কথা। এবং সেই নির্দেশই আমি যথাযথ পালন করে চলেছি। আমাকে যারা গোড়া থেকে জানতো তারা ভেবেছিলো, বাবা দাদার ঐ বিশাল ঐশ্বর্য

যখন আমার হাতে পড়ে উড়ে গেছে, এ বিষয় সম্পত্তির মেয়াদও বেশি ছিলো না। কিন্তু দু'হাতে বিলিয়ে আজও একই রকম ঐশ্বর্যবান রয়ে গেছি দেখে তারা একটু যেন দমে গেছে।

আমার দান ধ্যানের বহর দেখে সরকারের শহর অধিকর্তাদেরও চোখ টাটাতে লাগলো। একদিন বড় কোতোয়াল সাহেব এলেন আমার প্রাসাদে। বেশ খানিকটা খোঁচা দিয়েই তিনি বললেন, আবু কাসেম সাহেব, চোখ কান তো আমাদেরও খোলা আছে, সবই দেখতে শুনতে পাচ্ছি। তা অত নবাবী চালে দু'হাতে ধন দৌলত বিলিয়ে দিয়ে কতদিন চলবে? দিন দিন যা মাঙ্গি-গণ্ডার বাজার হচ্ছে তাতে লোকে দু'বেলা দু'খানা রুটি জোগাড় করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তোমার এইরকম দান খয়রাতি কি শোভা পাচ্ছে, মালিক? এই দেখ না, আমি সরকারের উঁচু পদে বহাল থেকেও সংসার চালাতে পারছি না ঠিকমতো। রুটির দাম বেড়ে গেছে, এদিকে গাইগরুটা দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে, কি যে করি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, ঠিক আছে দিনে রুটি আর দুধের বাবদ কত খরচ হয় আপনার?

সে বললো, দিনে দিনারের বেশি না। কিন্তু এই দশটা দিনারও আমি জোগাড় করতে পারছি না।

আমি বললাম, আপনাকে আপাতত একশো দিনার দিচ্ছি। মাস শেষ হলে আবার আসবেন, আমি আপনাকে আবার দেব।

লোকটি গদগদ হয়ে হাতে চুমু দিতে এলো। কিন্তু আমি তাকে নিরস্ত করে বললাম, আমি যা দিচ্ছি সবই আল্লাহর জিনিস, এরজন্য আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার কিছু নাই।

এর কয়েকদিন পরে বসরাহর সুবেদার সাহেব আমাকে তলব করলেন। আমি হাজির হতেই তিনি আমায় খুব খাতির যত্ন করে বসতে দিলেন। এবং বললেন, এই শহরের কিছু লোক বলছে, তোমার কাছে বিপুল ধন-সম্পত্তি আছে। এবং তুমি তা বেপরোয়া ভাবে অপাত্রে দান করে যাচ্ছ।

সুবেদারের মতলব বুঝতে আমার দেরি হলো না। বললাম, আপনি যা শুনেছেন তা অনেকখানিই সত্যি। তবে অপাত্রে দান করছি কিনা বলতে পারবো না। মোট কথা আমার কাছে যারা চাইতে আসেন আমি তাদের ফেরাতে পারি না।

সুবেদার বললেন, এই শহরে প্রায় দু'হাজার অত্যন্ত দরিদ্র ধার্মিক মানুষ আছে। তারা সৎভাবে আল্লাহর নাম গান করে। কিন্তু দু'বেলার আহার জোটাতে পারে না। তুমি যদি প্রতিদিন দু'হাজার দিনার করে আমার হাতে দাও আমি ঐ সব ধর্মপ্রাণদের মধ্যে বিতরণ করতে পারি।

বুঝতে পারলাম গরীব মানুষদের নাম করে সুবেদার নিজের পকেট ভরতে চায়। বললাম, ঠিক আছে তাই হবে। প্রত্যেক দিন আমি আপনাকে দু' হাজার দিনার পাঠিয়ে দেব।

বলা বাহুল্য সুবেদার সাহেব এখন আমার প্রসংশায় পঞ্চমুখ।

খলিফা হারুন অল রসিদ আবু কাসেমের পাঠানো উপহারগুলো সঙ্গে নিয়ে বাগদাদে ফিরে এলেন। জাফরকে ডেকে এনে বললেন, জাফর তোমার কথা বিশ্বাস না করে আমি তোমার উপর অবিচার করেছি। আবু কাসেম সম্বন্ধে তুমি যা বলেছিলে, আমি নিজে যাচাই করে এসেছি, আসলে সে তার চাইতে আরও অনেক বড়। তার ব্যবহারে আমি বিশেষ প্রীত হয়েছি। আমি তাকে পুরস্কৃত করতে চাই। কিন্তু সে তো আমার চেয়েও অনেক ঐশ্বর্যবান, ধন-দৌলতের উপহার নিয়ে সে কি করবে?

জাফর বললো, অর্থের প্রয়োজন জীবনে সীমিত, জাঁহাপনা। কিন্তু সম্মান, প্রভাব- প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা লাভের বাসনা অনন্ত। আমার মনে হয় আবু কাসেমকে যদি আপনি বসরাহর সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করেন সেই হবে তার যোগ্যতম পুরস্কার।

খলিফা বললেন, যথার্থ বলেছ তুমি। আর কালবিলম্ব না করে তার অভিষেকের আয়োজন কর।

কয়েকদিনের মধ্যেই বাগদাদ শহরে মহা সমারোহে দারুণ জাঁকজমকের মধ্যে আবু কাসেমকে বসরাহর সুলতান পদে বহাল করে নিলেন খলিফা। নানা প্রকারের উপহার উপঢৌকনের মধ্যে সবচেয়ে সেরা একটি সুন্দরী বাঁদী তুলে দিলেন তিনি কাসেমের হাতে। কাসেম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো, একি পরম সৌভাগ্য তার! একদিন নীলের অতল জলে যে হারিয়ে গিয়েছিলো সেই বেগম লুবিবাহ আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

লুবিবাহকে একটি জেলে উদ্ধার করে বাগদাদের বাঁদীবাজারে বিক্রি করে দিয়েছিলো। এবং ঘটনাক্রমে সে খলিফার হারেমে এসে অবস্থান করছিলো।

লুবিবাহকে ফিরে পেয়ে আবু কাসেমের জীবন কানায় কানায় ভরে ওঠে। এতো অর্থ, এতো সম্মান মর্যাদা এতো প্রেম ভালোবাসা ক'জনের ভাগ্যে মেলে?

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ চুপ করে বসে রইলো। দুনিয়াজাদ উঠে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, কি সুন্দর তোমার কিস্‌সা দিদি, আর কেমন মিষ্টি করেই না তুমি বলতে পার।

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা, যদি অনুমতি করেন তবে আজ রাত থেকে আর একটা কাহিনী শুরু করতে পারি।

শারিয়ার বললো, আমি তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করে তোমার কিস্‌সা শোনার জন্যেই বসে আছি, শাহরাজাদ। নাও শুরু কর।

শাহরাজাদ বলে, এবারে যে কাহিনী বলতে শুরু করছি, তার নাম বাদশাহী জারজ।

আরবের কোনও এক শহরে তিন বন্ধু বাস করতো। ওরা তিনজনেই কুলজী বিদ্যা বিশারদ। কারুরই কোনও চালচুলো ছিলো না। বাস করতো একটা সস্তার সরাইখানায়। সারাদিন লোক ঠকিয়ে যা সংগ্রহ করে আনতো তাই তারা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিত। রোজগারের যৎসামান্যই আহার ও বিহার এবং বেশবাসে খরচ করতো, বেশির ভাগই উড়িয়ে দিত গাঁজা ভাঙ্গ চরস খেয়ে।

সারাদিন পয়সার ধান্ধায় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যেবেলায় তিন বন্ধু ফিরে আসতো সরাইখানায়। সেখানে বসতো মৌতাতের আসর। রাত যত বাড়তো নেশাও তত চড়তে থাকতো, আর সেই সময় সবাই মনের দরজা খুলে দিত দিলদরিয়া মেজাজে।

একদিন রাতে চরসের মাত্রাটা একটু বেশি মাত্রা চড়িয়ে ছিলো ওরা। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হাতে হাতে ফলে গিয়েছিলো। প্রথমে হাসি-মস্করা, পরে তা থেকে তর্ক বিতর্ক, এবং শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে পর্যবসিত হয়েছিলো তাদের সেদিনকার সান্ধ্যসভা। বেদম নেশায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তিন বন্ধু বন্যজন্তুর মতো হিংস্র হয়ে এ ওকে তাড়া করতে করতে এক সময় সুলতানের প্রাসাদসংলগ্ন ফুলবাগিচার ভিতরে ঢুকে পড়েছিলো।

সে সময়ে সুলতান নৈশ-বিহারে বেরিয়েছিলেন। তিন বেয়দপ বদমাইশের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে সঙ্গের প্রহরীদের হুকুম করলেন, ওদের ধরে আজ ফাটকে রেখে দাও, কাল সকালে আমার দরবারে হাজির করবে।

পরদিন দরবার শুরু হতে ঐ তিন কুলজী বিদ্যাদিগগজকে হাজির করা হলো সুলতানের সামনে। ওদের দেখেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন, পাজি বদমাশ, কে তোমরা? এতো বড় দুঃসাহস তোমাদের, নেশায় মাতাল হয়ে আমার প্রাসাদের পাশে এসে মাতলামি আরম্ভ করেছিলে?

—আপনি মহানুভব সম্রাট, আমরা কোনও অসৎ লোক নই, আমাদের তিনজনেরই একই পেশা-কুলজী বিদ্যাবিশারদ আমরা।

—কুলজী বিদ্যাবিশারদ? সে কি রকম?

—জী, কুলজী বিদ্যা মানে, কোনও বস্তু বা প্রাণীর উৎপত্তি বা জন্মবৃত্তান্ত সব বলে দিতে পারি আমরা।

সুলতান ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না ব্যাপারটা, বললেন, যথা।

চরসখোরদের একজন এগিয়ে এসে বললো, আমি গ্রহরত্ন বিশারদ। হীরে চুনী পান্না বা অন্য যে-কোনও মণিরত্ন রাখুন আমার সামনে, আমি চোখ বন্ধ করে শুধুমাত্র বাঁ হাতের কড়েআঙ্গুল স্পর্শ করে তার গুণাগুণ ঠিকুজী কুষ্ঠি সব বিচার করে বলে দেব।

সুলতান বললেন, তোমার কথা যদি ঠিক হয় তবে যথাযোগ্যই ইনাম পাবে, কিন্তু যদি মিথ্যে বলো তবে গর্দান যাবে, মনে থাকে যেন?

—তাই হবে জাঁহাপনা।

দ্বিতীয় জন এগিয়ে এসে বললো, আমি পশুদের বংশ কুলজী বিশারদ। আপনি আমার সামনে একটা ঘোড়া এনে দাঁড় করান, আমি তার গতি, মা বাবা চৌদ্দপুরুষের সব খবর বলে দেব।

—আর যদি তা ঠিক না হয়?

—তবে জাঁহাপনার যা অভিরুচি সাজা দেবেন আমাকে।

তৃতীয় জনকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন্ বিদ্যায় বিশারদ।

—আমি, জাঁহাপনা, মানুষের জন্ম কুলজী সব বলতে পারি।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, তোমাদের তিনজনের কথাই শুনলাম। যথাসময়ে আমি যাচাই করে দেখবো। কিন্তু পরীক্ষায় যদি দেখি তোমরা ধোঁকা দিয়েছ আমাকে, তা হলে রক্ষা থাকবে না। ফাঁসীতে ঝুলাবো।

এর কয়েকদিন পরে পাশের এক বন্ধুদেশের কাছ থেকে নানারকম উপহার ভেট-এর মধ্যে একটি বিরাট বড় আকারের হীরে পেলেন। সুলতান প্রথম জনকে ডেকে বললেন, এই যে হীরেটা দেখছ, এটা পরীক্ষা করে বলতে হবে আসল অথবা নকল।

হীরেটা হাতে তুলে দিতে গেলেন সুলতান। কিন্তু সে হাতে না নিয়ে বললো, আপনি মেহেরবানী করে টেবিলের ওপরে রাখুন, আমি শুধু আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা একবার স্পর্শ করবো মাত্র।

দুই চোখ বন্ধ করে সে অতি আলগোছে কনিষ্ঠা দিয়ে ছুঁয়েই তড়িতাহতের মত হাতখানা টেনে নিয়ে কাতরাতে কাতরাতে বললো, ওফ, পুড়ে গেল—পুড়ে গেলো।

সুলতান চমকে উঠলেন, কী, কি হলো?

—জাঁহাপনা, একদম ঝুটা মাল। একেবারে কাঁচ।

সুলতান রোষে ফেটে পড়লেন, কী এতো বড় কথা! আমার দোস্ত শাহেন শাহ আমাকে উপহার পাঠিয়েছেন, ঝুটা জিনিস? এই, কে আছিস্, এই লোকটার গর্দান নিয়ে নে।

ঘাতক এগিয়ে এসে তাকে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে টানতে টানতে হাড়িকাঠের কাছে নিয়ে গেলো।

উজির দেখলেন, সুলতানের হুকুমে এখুনি ছেলেটির প্রাণনাশ হয়ে যাবে। তার কথার সত্যাসত্য যাচাই হলো না।

—জাঁহাপনা, আমার একটা নিবেদন আছে।

—বল।

—এই যুবক বলেছে হীরেটা ঝুটা। কিন্তু ওর কথাই যে মিথ্যে তার কি প্রমাণ আছে? আপনি কি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছেন, সে মিথ্যে বলেছে?

সুলতান আমতা আমতা করে বলতে থাকেন, তা বটে, কিন্তু এটা বুঝছো না কেন, এ জিনিসটা এসেছে আমার বন্ধুর কাছ থেকে। জেনে শুনে তিনি আমাকে নকল জিনিস পাঠাবেন, তা কি হতে পারে?

উজির বললো, জেনে শুনে তিনি নকল জিনিস পাঠাবেন না, এ কথা আমি একশোবার মানি, কিন্তু যার কাছ থেকে কিনেছেন বা পেয়েছেন সে তো তাকে ঠকাতে পারে। আর জহরত চেনার মতো বিদ্যে যে তার থাকবেই তা আপনি কি করে আশা করেন, জাঁহাপনা?

—হুম্, তুমি ঠিকই বলেছ উজির। আমি তো ওদিকটা তেমন ভেবে দেখিনি। যাই হোক, হীরেটা কি করে পরীক্ষা করা যায় বলতো?

উজির বললো, ঠিকমতো জানতে গেলে হীরেটার মায়া আপনাকে ত্যাগ করতে হবে জাঁহাপনা।

—কেন?

—না ভাঙ্গলে এর আসল গুণাগুণ যথার্থভাবে নির্ণয় করা শক্ত। হীরেটাকে দ্বিখণ্ডিত করে হাতে ধরলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। যদি টুকরোগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তবে নকল। আসল হীরেয় যত আঘাত ঘর্ষণই করুন তা কখনও গরম হবে না।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, ভেঙ্গেই ফেলো। একটা হীরের চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

উজির বললো, আমারও তাই মনে হয় জাঁহাপনা, নির্দোষকে নিহত করে পাপের দায় ঘাড়ে না নেওয়াই ধর্মাবতারের কাজ।

সুলতান ঘাতককে বললেন, এই হীরেটাকে এক কোপে দু'খানা করে ফেলো দেখি।

তরবারীর এক ঘায়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলো হীরেটা। উজির হাতে নিয়ে সুলতানের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, ছেলেটি ঠিকই বলেছে, জাঁহাপনা দেখেন কি গরম হয়ে উঠেছে—

সুলতান অবাক হয়ে তাকালেন ছেলেটির দিকে, এসো, আমার কাছে এসো বৎস। আচ্ছা, সত্যি করে বলতো, কোন্ যাদুবলে এই অলৌকিক জ্ঞান তুমি আয়ত্ত করেছ।

ছেলেটি বললো, আমার এই আঙ্গুলটার এক অদ্ভুত স্পর্শশক্তি আছে ছোঁয়ালেই আমি বুঝতে পারি।

সুলতান খুশী হয়ে উজিরকে নির্দেশ দিলেন, আজ থেকে এর বাদশাহী মর্যাদায় খানা-পিনার ব্যবস্থা করবে।

কয়েকদিন পরে সুলতান একটি চমৎকার বাদামী রঙের আরবী ঘোড়া কিনলেন। এবার ডাক পড়লো দ্বিতীয় যুবকের।

সুলতান বললেন, ভালো করে তাকিয়ে দেখ, এই ঘোড়াটার বংশ পরিচয় তোমাকে বলতে হবে। যদি পার ঠিক ঠিক বাতলাও, না হলে, আলতু ফালতু কিছু বলবে না। তা হলে কিন্তু গর্দান যাবে।

ছেলেটি ঘোড়াটার দিকে এক নজর তাকিয়ে বললো, আমার দেখা হয়ে গেছে, জাঁহাপনা।

—কি দেখলে?

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো আটাশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

ছেলেটি বলে ঃ জাঁহাপনা, ঘোড়াটা সত্যিই বড় চমৎকার জানোয়ার। এর অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং তাগদ-এর তুলনা মেলা ভার। সারা আরবে খুঁজলেও এর জুড়ি পাওয়া যাবে না, এ কথা আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলবো। রূপে গুণে একে ঘোড়ার বাদশা বললেও অত্যুক্তি হবে না, তবে সামান্য একটু দোষ আছে এই আর কি।

এতক্ষণ প্রশংসা শুনে খুব খুশি হয়ে উঠছিলেন সুলতান। কিন্তু সামান্য একটু দোষের কথা শুনে তিনি অকস্মাৎ ক্ষেপে উঠে বললেন, তুমি একটা জোচ্চোর, শয়তান, বেল্লিক। একটা সাচ্চা, সবচেয়ে সেরা তেজি ঘোড়ার মধ্যে খুঁত ধরছো! আমি তোমার গর্দান নেব।

উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন সুলতান। উজির বোঝালো, ছেলেটা যা বলছে হয়তো তা মিথ্যে হতে পারে। কিন্তু যথার্থ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি উচিত হবে জাঁহাপনা?

—হুম, উজিরের কথায় চুপসে গেলেন তিনি, বললেন, ঠিক আছে, কি দোষ তুমি দেখলে, খুলে বলো আমার কাছে।

ছেলেটি বলে, বাবার দিক থেকে ঘোড়াটা সাচ্চা আরবী বংশের। কিন্তু ওর মা ম্লেচ্ছ। এর পরের টুকু আমি আর বলতে চাই না, জাঁহাপনা।

সুলতান গর্জে ওঠেন, আলবাৎ তোমাকে বলতে হবে, এবং এক্ষুনি। তা না হলে ঐ যে ঘাতকের তলোয়ার দেখছ, তোমার গর্দানে বসে যাবে।

—ওরে বাবা, না না, আমি বলছি। জাঁহাপনা, এর মা সিন্ধুঘোটকের ঔরসজাত এক মাদী ঘোড়া।

সুলতান ক্রোধে আরক্ত হয়ে ঘামতে থাকলেন, উজির এক্ষুনি সহিস-সর্দারকে ডাক।

সহিস-সর্দার আসতে তিনি জানতে চাইলেন। এই ঘোড়াটা কোথা থেকে কেনা হয়েছে, সে লোকটাকে ধরে নিয়ে এসো এক্ষুনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে লোককে নিয়ে হাজির হলো সহিস-সর্দার। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, এ ঘোড়াটা তুমি কোথায় পেয়েছিলে?

লোকটি কাঁপতে কাঁপতে বলে, ভালো জাতের ঘোড়ার বাচ্চা পয়দা করিয়ে বিক্রি করাই আমার ব্যবসা জাঁহাপনা।

—তাহলে সাফ সাফ বাতাও, এর বাবা কে আর মা-ই বা কে?

লোকটি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, জাঁহাপনা, এর বাবা সম্পর্কে আমি বড় মুখ করে বলতে পারি আরবের সেরা এক তাজির ঔরসে জন্ম হয়েছে। কিন্তু এর মা সাচ্চা তাজি নয়।

—সাচ্চা তাজি নয়?

সুলতান গর্জে ওঠেন। লোকটি বিনীত হয়ে কড়জোড়ে বলে, না, হুজুর, সিন্ধুঘোটকের ওরসজাত এক মাদী ঘোড়া। সাধারণত এই সব মাদীগুলো জারজ হলেও আসল আরবী মাদীর চাইতে ঢের বেশি তাগড়াই হয়। এবং সেই কারণেই তার এই বাচ্চাও এমন জব্বর দেখতে হয়েছে। দো-তরফা আসল হাতের আরবী ঘোড়া কখনই এরকম দর্শনধারী, টগবগ

হবে না। আরব সাগরের কিনারে ঘোড়া ব্যবসায়ীরা তাঁবু খাঁটিয়ে মাদী ঘোড়া বেঁধে রাখে জায়গায় জায়গায়। দরিয়া থেকে সিন্ধুঘোটকরা মাদী ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেয়ে ওপরে উঠে এসে উপগত হয়ে আবার দরিয়ার পানিতে পালিয়ে যায়। তখন ব্যবসায়ীরা ঘোড়াগুলোকে নিয়ে দেশে ফিরে আসে। যথাসময়ে তাদের বাচ্চা হয়। এবং সেই সব টাট্টু বাচ্চা চড়া দামে বাজারে বেচে দেয় তারা। আর মাদী বাচ্চাগুলোকে পালন করে সাচ্চা তাজি ঘোড়ার সঙ্গে পাল খাওয়ায়। এদের গর্ভজাত বাচ্চাগুলোর বাজার দর অনেক বেশি। আসল তাজি ঘোড়ার তিন চারগুণ দাম পাওয়া যায়।

সুলতান মুগ্ধ হয়ে যুবককে বললেন, তোমার বিচার নিখুঁত। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, কি করে তুমি বুঝতে পারলে যে ঘোড়াটি জারজ?

ছেলেটি হাসলো, সে কথা বুঝানো শক্ত। তবে জেনে রাখুন জাঁহাপনা, এই-ই আমার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান, এই চর্চ্চা করেই আমি খাই।

সুলতান উজিরকে বললেন, এর জন্যেও থাকা খাওয়ার এলাহী ব্যবস্থা করবে আজ থেকে। এমন গুণীজনের সমাদরে যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

এরপর সুলতান ভাবলেন এবার তৃতীয় জনের বিদ্যা যাচাই করে দেখতে হবে। একদিন তাকে ডেকে বললেন, ওহে বাপু, তুমি যা বলেছিলে মনে আছে তো?

ছেলেটি সবিনয়ে বলে, সে-কথা ভুলবো কি করে, জাঁহাপনা। ওটাই তো আমার একমাত্র পেশা।

—ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে।

সুলতান ওকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে গেলেন হারেমে। সাধারণতঃ কেন, কোনও কারণেই বাইরের কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই হারেমে। একমাত্র হাকিমরা প্রয়োজন হলে সুলতানের সঙ্গে যেতে পারেন। তবু কোনও বেগম বাঁদীর মুখদর্শন করতে পারবেন না তারা। পর্দার আড়াল থেকে রোগের বিবরণ শুনে দাওয়াই পত্রের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সুলতান আজ সব নিয়ম বিধি তছনছ করে ছেলেটিকে নিয়ে একেবারে হারেমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

সুলতানের সর্বাধিক প্রিয়তমা বাঁদীর ঘরে এসে দাঁড়ালেন। অসময়ে সুলতানকে দেখে খোজা নফর দাসী বাঁদীরা সবাই তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সুলতান-প্রিয়া আভূমি আনত হয়ে কুর্ণিশ জানিয়ে আসন গ্রহণের আর্জি রাখলো। সুলতান সেদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বললো, তুমি যদি চাও, আমি ওকে বোরখা খুলে দাঁড়াতে বলতে পারি, ভালো করে পরীক্ষা করে দেখ একে।

ছেলেটি বলে, না তার দরকার হবে না। আমার যা দেখার দেখা হয়ে গেছে জাঁহাপনা।

—তাহলে চলো বাইরে যাই। এখানে কোন কথা হবে না।

দরবারে ফিরে এসে সবাইকে সভা ত্যাগ করে চলে যেতে নির্দেশ করলেন সুলতান। শুধু উজিরকে বললেন, তুমি থাক এখানে।

সকলে প্রস্থান করলে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, আচ্ছা বিশারদ, এবার তোমার যা বলার বলতে পার আমাকে। আমি আমার বাঁদীর জন্ম কুলজী জানতে চাই।

ছেলেটি মাথা নিচু করে বলে, এমন নিখুঁত সুন্দরী আমি কখনও দেখিনি জাঁহাপনা। কিন্তু আপনি আমাকে ওঁর জন্মবৃত্তান্ত বলতে হুকুম করবেন না।

সুলতান গর্জে ওঠেন, এই সব বুজরুকি শোনার জন্যে তোমাকে ডাকিনি আমি। এখুনি তোমাকে বলতে হবে। এবং তার মধ্যে যদি কোনও মিথ্যাচার থাকে তবে তোমার গর্দান নেব আমি।

ছেলেটি বলে, আমি যা বলবো তা আপনার শুনতে ভালো লাগবে না জাঁহাপনা।

—তা হোক, তুমি বলো।

এই মেয়ের বাবা সৎবংশ সম্ভূত। কিন্তু এর মা বারবনিতার গর্ভজাত ছিলো।

সুলতান চঞ্চল হয়ে উঠলেন। উজিরকে বললেন, বাঁদীর বাবাকে হাজির কর।

একটু পরে এক বৃদ্ধ এসে কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়ালো। সুলতান প্রশ্ন করলেন, তোমার মেয়ের প্রকৃত পরিচয় কী?

বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, আমার বংশমর্যাদা খানদানী সম্বন্ধে আপনাকে যা বলেছি তার মধ্যে এতোটুকু মিথ্যে নাই।

সুলতান অধৈর্য হয়ে বলেন, তা আমি শুনেছি। সে সম্বন্ধে জানতে চাই না। তোমার বিবি, যার গর্ভে তোমার কন্যা হয়েছে, তার বংশ কুলজী কিছু জান।

বৃদ্ধ ক্ষণকালের জন্য নীরব হয়ে রইলো। সুলতান হুঙ্কার ছাড়লেন, চুপ করে থাকলে চলবে না। সাফ সাফ সত্যি কথা বলো, তা না হলে জ্যান্ত কবর দেব তোমাকে।

—জাঁহাপনা, একসময়ে আমি মক্কায় যাচ্ছিলাম হজ করতে। দুস্তর মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলেছি। পথের মাঝখানে একদল মজরোওরালী মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলো। তারাও মক্কায় চলেছিলো। পথের মাঝখানে মুসাফিরদের মনোরঞ্জন করাই তাদের পেশা। একদিন সন্ধ্যায় একটি মরুদ্যানে আমরা তাঁবু গেড়ে রাত্রিটা কাটাবো স্থির করলাম। যাত্রীরা যে যার মতো তাঁবু ফেলে খানা-পিনা গান-বাজনা নিয়ে মেতে উঠলো। ঐ মেয়েগুলো তাঁবুতে যাত্রীদের চিত্তবিনোদন করতে থাকলো।

এমন সময় ঝড় উঠলো। বালীর ঝড়ে চারদিক উত্তাল হয়ে উঠলো। সেই নিদারুণ মরুঝঞ্ঝাবাত্যায় কে যে কোথায় ছিটকে চলে গেলাম কিছুই ঠাওর হলো না।

শেষ রাতে ঝড় থামলো। আমি পড়েছিলাম বালীর উপর মুখগুঁজে। সকাল হতে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সঙ্গী সাথী বা তাঁবুগুলোর কোনও চিহ্নমাত্র নাই। ঝড়ের তোড়ে কে যে কোথায় ভেসে গেছে তা আর হদিশ করতে পারলাম না। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলাম একটা গাছের গুঁড়ির কোটরের মধ্যে গুঁটিসুটি মেরে বসে আছে একটি ফুটফুটে কচি বালিকা। নেহাতই শিশু। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? তোমার মা বাবাই বা কোথায়?

সে আমার কথার জবাব দিতে পারলো না। পরে বুঝেছিলাম, কথা বোঁঝার মতো বয়স এবং বুদ্ধি তখনও তার হয়নি। সেই শিশুকে সঙ্গে নিয়ে আমি দেশে ফিরে আসি। আমার বাড়িতে আর পাঁচটা বালবাচ্চাদের সঙ্গে হেসে খেলে যে মানুষ হতে থাকে।

এইভাবে দিন কাটছিলো। একদিন তার দেহে কিশোরীর উন্মেষ লক্ষ্য করলাম। এবং স্বভাবতই তার মনমোহিনী রূপ-যৌবনে আমি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিধি-সম্মতভাবে শাদী করে আমার বিবি বানিয়েছিলাম। জাঁহাপনার বাঁদী তারই প্রথম ফল। ধর্মাবতার বিচার করুন, আমার কি অপরাধ।

সুলতান বললেন, যাক আমি শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।

সুলতান উজিরকে বললেন, একে খুব আদর যত্ন করে রাখবে।

সুলতানের অবাক লাগলো, কি করে এরা তিনজন এমন অসম্ভব বিদ্যা অর্জন করতে পেরেছে! পরদিন তিনি তৃতীয় ছেলেটিকে ডেকে বললো, এবার তোমাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য জানাতে হবে।

ছেলেটি বললো, অবশ্যই বলবো, কিন্তু আমাকে অভয় দিতে হবে, জাঁহাপনা। অপ্রিয় সত্য বললে, আপনি কুপিত হয়ে আমাকে সাজা দেবেন না, কথা দিন।

সুলতান বললো, তোমার কথা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে সাজার বদলে ইনাম পাবে অনেক, তুমি নির্ভয়ে বলো।

ছেলেটি বললো, তা হলে দরবারের সবাইকে চলে যেতে হুকুম করুন। এ কথা শুধু মাত্র আপনাকেই বলতে চাই আমি।

সুলতানের নির্দেশে উজিরসহ সকলে দরবার কক্ষ ছেড়ে বাইরে চলে গেলো।

ছেলেটি তখন সুলতানের কানে কানে ফিস ফিস করে বললো, জাঁহাপনা, আপনি একটি জারজ সন্তান।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো তিরিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

ছেলেটির কথা কানে যেতেই সুলতানের শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে আসে। কে যেন তাঁর টুটিটা চেপে ধরলো সেই মুহূর্তে। বেশ কিছুক্ষণ তিনি মুখে কোনও আওয়াজ বের করতে পারলেন না। সারা শরীর ঘেমে ভিজে গেলো। নিঃশ্বাস দ্রুততর হতে থাকলো।

এক সময়ে তিনি নিজেকে সামলে নিতে পারলেন। বললেন, কিন্তু তোমার এ-কথার প্রমাণ কী?

ছেলেটি বললো, এখনও তো আপনার বৃদ্ধামাতা জীবিত আছেন। মেহেরবানী করে তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন। তিনি যদি সত্যিই আপনাকে স্নেহ করেন, আমার মনে হয়, কোনও কথা গোপন করবেন না।

—ঠিক বলেছ, তখুনি সুলতান তলোয়ার বাগিয়ে ধরে হারেমের দিকে ছুটলেন। আজ আমাকে এর একটা ফয়সালা করতে হবে।

ছেলেকে চণ্ডমূর্তিতে এসে দাঁড়াতে দেখে মায়ের প্রাণ কেঁপে ওঠে। কী হয়েছে বেটা, হঠাৎ তলোয়ার হাতে করে ছুটে এলে কেন?

সুলতান দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, সত্যি করে বলো, আমার বাবা কে? মিথ্যা বলার চেষ্টা করবে না মা, তাতে আখেরে তোমার ভালো হবে না। কিন্তু সত্যি কথা যদি খুলে বলো, তবে আমি তোমাকে রেহাই দিতে পারি।

বৃদ্ধা কেঁদে ফেললো, তুই আমাকে জানের ভয় দেখাস নি, বাবা। বাঁচার কোনও সাধ নাই আমার। তবে প্রশ্ন যখন করেছিস, সত্যি কথাই বলবো আজ। তবে শোন্ ঃ

তোর বাবা আমাকে যখন বেগম করে এই হারেমে এনেছিলো, তখন আমার ভরা

যৌবন! খুব হৈ-হল্লা, আনন্দস্ফূর্তির মধ্যে দিন কাটতে লাগলো। আমার রূপের মোহে তোর বাবা প্রায় সব সময়ই আমার ঘরে পড়ে থাকতো। কিন্তু একটা বছর কেটে গেলেও আমার গর্ভে কোনও সন্তান এলো না। আমার শাশুড়ি তোর ঠাকুমা চিন্তিত হলো। আমি তাকে বোঝালাম, আমার চেষ্টার কোনও কসুর নাই। আরও একটা বছর কেটে গেলো। তোর বাবার সঙ্গে প্রতি রাতেই আমার সহবাস হতো। কিন্তু দু' বছরের মাথায় এসেও বুঝতে পারলাম আমি সন্তান-সম্ভবা হতে পারিনি।

আমার শাশুড়ি আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। আমাকে বাঁজা বন্ধ্যা বলে দূর ছাই, দূর ছাই করতে লাগলো। আমারও মনে কেমন খটকা লাগলো! হয়তো শাশুড়ির কথাই ঠিক!

কিছুদিনের মধ্যে হারেমে নতুন বেগম এলো। পরমাসুন্দরী ডাগর যুবতী ছিলো সে-ও। আমার কপাল পুড়লো। তোর বাবা দিন-রাত সেই নতুন বেগমকে নিয়ে পড়ে থাকে। ভুলেও আমার মহলে আসে না।

কিন্তু একটা বছর কেটে যাওয়ার পর শাশুড়ি তার ওপরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। এর কয়েম মাস বাদে আরও এক সুন্দরী বেগম এসেছিলো এই হারেমে। শাশুড়ির বড় আশা ছিলো, এই ছোট বেগম বংশ রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু পুরো দু'টি বছর হয়ে গেলো, সে অন্তঃসত্ত্বা হতে পারলো না।

এবার আমি নিঃসংশয় হলাম, দোষ আমাদের কারো নয়, অক্ষমতা তোর বাবার। তার মরা বীর্যে সন্তান পয়দা হতে পারবে না। একথা জানার পর আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। সর্বনাশ! এতো বড় সলতানিয়ত—যদি তার কোনও উত্তরাধিকার না থাকে—সব ছারখার হয়ে যাবে যে! সেইদিনই আমি ঠিক করলাম, যেভাবেই হোক বংশ রক্ষা করতে হবে। মসনদ যাতে অন্য লোকের হাতে চলে না যায়, তারজন্যে আমার নিজের সতীত্ব আমি বিসর্জন দেব।

হারেমে পরপুরুষের প্রবেশ অধিকার নাই। খোজা নফর আর দাসী বাঁদীরাই হারেমের সব কাজ দেখাশুনা করে। ভাবতে লাগলাম, কী ভাবে একটা জোয়ান মরদ জোগাড় করা যায়।

ইচ্ছে থাকলে উপায় একটা হয়ই। একদিন কায়দা করে হারেমের বাবুর্চিকে মহলে ডেকে আনলাম। লোকটার শরীর স্বাস্থ্য ছিলো পাথরে কুঁদা। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তাকে দিয়ে। সুতরাং সেইদিনই আমি তার সঙ্গে সঙ্গম করলাম। যাতে লোক জানাজানির কোনও আশঙ্কা না থাকে সেজন্য সেই রাতেই তাকে আমি নিজে হাতে খুন করে মাটি খুঁড়ে গোর দিয়েছিলাম। আমার একান্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন সহচরী ছাড়া এব্যাপারটা আর কেউই জানতে পারেনি আজ পর্যন্ত। তুমি বিশ্বাস কর বাবা, এভাবে তোমার বাবার বংশ রক্ষা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিলো না আমার সামনে।

সুলতান একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। চোখের জল মুছতে মুছতে দরবার কক্ষে ফিরে এলেন। ছেলেটি তখনও সেখানে একাই বসেছিলো। সুলতান এসে সিংহাসনে না বসে তার সামনে একটা কুর্শিতে বসে পড়ে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন।

এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেছে, এক সময় সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, কি করে এই বিদ্যা তুমি আয়ত্ত করেছ, বেটা।

ছেলেটি বলে, ভাষায় ব্যক্ত করে তা বোঝানো সম্ভব নয়, জাঁহাপনা। এটা অনুভব করার জিনিস। আমিও জানি না, কি করে বলতে পারি। আপনা থেকেই আমার মনে এসে যায় সব।

সুলতান তার বাদশাহী অঙ্গবাস খুলে ফেলে দিলেন। ছেলেটিকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে বললেন, এ তখতে আমার কোনও অধিকার নাই—লোভও নাই। এ ভার আমি আর

বইতে পারবো না। তাই আজ থেকে তোমাকেই সুলতান পদে অভিষিক্ত করে ফকিরের বেশে আমি এ শহর পরিত্যাগ করে অন্য কোনও দূর অজ্ঞাত দেশে চলে যাচ্ছি।

সেইদিনই উজির ও আমির ওমরাহ এবং দরবারের অন্যসব সভ্যসদদের ডেকে সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, আজ থেকে এই কুলজীবিদ্যা-বিশারদ যুবকই তোমাদের সুলতান হচ্ছে। আমি আশা করবো, একে যথাযোগ্য সম্মান মর্যাদা দেখাবে তোমরা।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুনিয়াজাদ দিনে দিনে রূপে রসে টইটম্বুর হয়ে উঠছে। আগে সে বাচ্চাদের মজাদার কিস্‌সা শুনতেই বেশি ভালোবাসতো। কিন্তু এখন তার দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে, মনে বসন্তের রং ধরেছে, এখন সে বড়দের কাহিনী শুনতেই আগ্রহী হয়ে উঠছে। দিদির গলা জড়িয়ে ধরে সে বললো, তারপর কি হলো দিদি। সেই জারজ সুলতান মসনদ ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন?

সুলতান শারিয়ার এবার মুখ খুললো, তাহলে একথা তো জান শাহরাজাদ। আমি প্রত্যেক রাতে একটি করে মেয়েকে শাদী করে ভোরবেলায় তাকে আবার কেন মেরে ফেলতাম। আসলে মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করবে যে সেই ঠকবে। বলো, ঠিক বলছি কিনা?

শাহরাজাদ বলে, সত্যি মিথ্যা আপনার কাছে, জাঁহাপনা। আমি গল্প শোনাবো ওয়াদা করেছি, নিছক গল্পই শোনাচ্ছি আপনাকে। বিচারের ভার আপনার। তবে মেহেরবানী করে কালকের রাত পর্যন্ত যদি বাঁচিয়ে রাখেন, তবে এ গল্পের শেষটুকু শোনাতে পারবো আপনাকে।

আটশো একত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

তৃতীয় কুলজীবিদ্যা-বিশারদকে মসনদে বসিয়ে নিজেকে ফকির দরবেশের বেশে সাজিয়ে সুলতান নিরুদ্দেশের পথে রওনা হলেন।

বেশ কয়েকদিন পরে একদিন তিনি কাইরো শহরে এসে পৌঁছলেন। কাইরো তখন দুনিয়ার এক সেরা শহর। সেখানকার সুলতান মাহমুদ তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুজন! মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি তার প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছলেন।

সুলতান মাহমুদ তাকে চিনতে পারলেন না। সুলতান যদি ফকিরের বেশ ধারণ করে কেইবা তাঁকে চিনতে পারে?

সুলতান মাহমুদ দরবেশকে খুব খাতির যত্ন করে বসালেন। সাধুজনের সঙ্গ তার বড় প্রিয় ছিলো। মাহমুদ বললেন, আপনাদের মতো আল্লাহর পীরদের দেখা পেলে আমি ধন্য হই ফকিরসাহেব। আপনি যদি মনে কোনও দ্বিধা না রেখে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জানান কৃতার্থ হবো আমি।

ফকিরবেশি সুলতান বললেন, আপনার অমায়িক আদর অভ্যর্থনায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি আপনার কাছে। আমি ফকির মানুষ বিষয়-আসয়েরও কোনও বাসনা নাই।

সুলতান মাহমুদ বললেন, তাহলে আপনার সংসার ত্যাগের কাহিনীই শোনান আমাকে। ঘরবাড়ি আপনজন পরিত্যাগ করে কেনই বা এই ফকির দরবেশ হয়ে দেশে দেশে ঘুরছেন। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, আপনি এখন দরবারের কর্তব্য সমাধা করুন। পরে নিভৃত আলাপের সময় আমার কাহিনী শোনাবো আপনাকে।

সুলতানের কাহিনী শুনে মাহমুদের প্রাণ মথিত হলো। দু'হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। বললেন, আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এতকাল। কিন্তু পাশাপাশি দেশের সুলতান হিসাবে আমরা বহুকালের বন্ধু। আজ থেকে আমাদের সে বন্ধুত্ব আরও পাকা মজবুত হলো। আপনি আমার প্রাসাদে আমারই সমমর্যাদায় সুলতানের মতো বসবাস করতে থাকুন। আজ থেকে আপনি শুধু আমার বন্ধুই নন, আমার অগ্রজপ্রতিম বড় ভাইও বটে। আমার জীবনেও অনেক চমকপ্রদ ঘটনা আছে। আপনাকে সময়ান্তরে শোনাবো সে-সব।

একদিন সুলতান মাহমুদ তাঁর জীবনের এক কাহিনী শোনাতে লাগলেন ঃ

আমার এ কাহিনী, আপনার থেকে একেবারেই আলাদা ধরনের দোস্ত। আপনি জন্মাবধি বাদশাহী পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। কালক্রমে সুলতান হয়ে মসনদে বসে প্রজাপালন করেছেন। আর আমার কাহিনী ঠিক তার উল্টো। প্রথমে আমি দরবেশ দিয়ে জীবন শুরু করি! পরে ঘটনাচক্রে আমি আজ এই মসনদের অধিকারী সুলতান হয়েছি।

আমার বাবা অত্যন্ত দীনদরিদ্র মানুষ ছিলেন। পথে পথে পানি দেওয়া কাজ করে অতি কায়ক্লেশে কোনরকমে দু'বেলার রুটির সংস্থান করতে পারতেন তিনি। আমি যখন বড় হলাম তখন আমার পিঠেও তিনি একটা ছাগলের চামড়ার ইয়া বড় এক মশক চাপিয়ে দিয়ে বললেন, যাও পানি ভরে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে দোকানে দোকানে পানি ফিরি করে বেড়াও। খোদা মেহেরবান নিশ্চয়ই তিনি তোমার রুটির ব্যবস্থা করে দেবেন।

কিন্তু বাবার মতো তাগদ ছিলো না আমার। ছোটবেলা থেকেই আমি খুব দুব্‌লা শীর্ণকায় ছিলাম। অতবড় মশক ভর্তি পানি, বাবা অবলীলায় বয়ে বেড়ালেও, আমি কিন্তু বইতে পারতাম না। কয়েক পা চলতেই হাঁপিয়ে পড়তাম।

শেষে ঠিক করলাম কায়িক পরিশ্রমের কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি ফকির দরবেশ হয়ে আল্লাহর নামগান গেয়ে বেড়াবো। অনুগ্রহ করে যে যা দেয় তা দিয়েই কোনও রকমে জীবন ধারণ করবো।

একটা ভিক্ষাপাত্র সম্বল করে দোরে দোরে মেগে বেড়াই এবং চলতে চলতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লে এক মসজিদে প্রবেশ করে আল্লাহর পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে শুয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। সারাদিন ধরে সামান্য যা কিছু সংগ্রহ হয় তা দিয়ে রাত্রে একবার মাত্র আহার করি। যে-দিন কিছু জোগাড় করতে না পারি দু আঁজলা পানি খেয়েই পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

মাঝে মাঝেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতাম কোনও মসজিদের এক প্রত্যন্তে। কেউ দয়াপরবশ হয়ে একটা দিরহাম দিয়ে গেলে তাই দিয়ে দু'একখানা রুটি কিনে খেতাম।

শুকনো রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে জিভ একেবারেই ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো। আশায় আশায় থাকতাম, যদি কোনও পয়সাওলা মানুষ একটু দয়া দেখিয়ে গোটাকয়েক দিরহাম ছুঁড়ে দিয়ে যায় তবে ভালোমন্দ কিছু খেয়ে পরিতৃপ্ত হবো। তেমন ঘটনা যে আদপেই ঘটতো না তা নয়, মাঝে মাঝে মোটামুটি ইনামও জুটে যেত কপালে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো বত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

একদিন কিছু পয়সা হাতে পেয়েই বাজারের দিকে ছুটে চললাম অনেক দিন বাদে বেশ রসনা তৃপ্ত করে ভালোমন্দ কিছু খাবো পেটভরে। বাজারে এসে পৌঁছতে দেখলাম লোকে লোকারণ্য। একটা বাঁদরকে ঘিরে কয়েক শো মানুষ মজা দেখতে হুড়পাড় লাগিয়েছে।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে বুঝতে পারলাম বাঁদরটাকে দিয়ে নানারকম মজাদার

তামাশা দেখিয়ে ওর মালিকটা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। উদ্দেশ্য বাঁদরটাকে সে বিক্রি করতে চায়।

আমার হাতে তখন পাঁচটা চকচকে দিরহাম। ভালোমন্দ খাব বলে বাজারে এসেছি। সেই মুহূর্তে আমি ঠিক করলাম লোকটা যদি পাঁচ দিরহামে রাজি হয় তবে বাঁদরটা আমি কিনে নেব তার কাছ থেকে।

দর কষাকষি করতে শেষ পর্যন্ত সে ঐ পয়সাতেই বাঁদরটাকে দিয়ে দিলো আমাকে। বাঁদরটা সঙ্গে নিয়ে আমি মসজিদে ফিরে এলাম। কিন্তু আমার বা তার কারুরই জায়গা হলো না সেখানে। অগত্যা আমার পরিত্যক্ত ভাঙ্গাচোরা বাড়িটাতে এসেই আবার আস্তানা গাড়তে হলো।

রাতটা কোনও রকমে কাটালাম, কিন্তু ক্ষুধা বড় পীড়া দিতে লাগলো। বাঁদরটাকে নিয়ে তামাশা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করবো ধান্দা করেছিলাম। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, সেই মুহূর্তে মনে হলো পয়সাগুলো দিয়ে খাবার-দাবার না কিনে ঐ বাঁদর কেনাটা যুক্তিযুক্ত হয়নি।

আমি যখন এই সব ভেবে পস্তাচ্ছি, সেই সময় লক্ষ্য করলাম, বাঁদরটা গা-ঝাড়া দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বন্য জানোয়ার হয়ে গেলো। এবং আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে পলকের মধ্যে সে আশ্চর্য সুন্দর এক নওজোয়ান যুবকে রূপান্তরিত হলো।

অমন খুবসুরত ছেলে আমি খুব কমই দেখেছি। অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললে, মাহমুদ সাহেব, শেষ কপর্দক দিয়ে আপনি আমাকে কিনেছেন , এখন এমন অবস্থা, আমাদের আহারাদির কোনও সংস্থান নাই আপনার।

আমি বললাম, খোদা হাফেজ, তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু তুমি কে? কোথায় তোমার দেশ? এবং কেনই বা আমার কাছে এলে এইভাবে?

ছেলেটি বললো, অধৈর্য হবেন না, এক সঙ্গে অত প্রশ্ন করবেন না? ঘাবড়ে যাবো। তার চেয়ে এই দিনারটা ধরুন এটা দিয়ে আপাততঃ কিছু খাবার-দাবার সংগ্রহ করে আনুন। আগে খানাপিনা করা যাক। তারপর সব কথার জবাব দেব আপনাকে।

আমি আর কোনও বাক্য ব্যয় না করে দিনারটা হাতে নিয়ে বাজারে চলে গেলাম। যত রকম মুখরোচক খানাপিনা পাওয়া গেলো সবই কিনলাম। ফিরে এসে দু'জনে বসে প্রাণভরে তৃপ্তি করে খেলাম সব। দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকার জন্যই বোধহয় আহারের পর নিদ্রায় চোখ বুঁজে আসতে লাগলো। মেঝের ওপর একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম দু'জনে।

কিন্তু ঘুম ভাঙ্গতেই আবার অবাক হলাম আমি । কি আশ্চর্য, এতক্ষণ যে সুদর্শন যুবকটির সঙ্গে আহার নিদ্রা সারলাম সে আবার যথাপূর্ব সেই বাঁদর হয়ে গেছে।

একটু পরে বাঁদরটারও ঘুম ভাঙ্গালো। এবং অদ্ভুত কায়দায় গা ঝাড়া দিতেই আবার সে সেই সুন্দর সুঠামদেহী যুবকে রূপান্তরিত হয়ে গেলো।

—মামুদ সাহেব, সে বললো, আমাকে যখন পেয়ে গেছেন, আপনার আর কোনও দুঃখ দুর্দশা থাকবে না। আপনি ইচ্ছে করলেই অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হতে পারবেন । যাই হোক, প্রথমে এই পড়ো বস্তির আস্তানা ছেড়ে শহরের এক সম্ভ্রান্ত এলাকায় একটি প্রাসাদোপম ইমারত ভাড়া করতে হবে। আর আপনার ঐ ফকির দরবেশের সাজ-পোশাক ফেলে দিয়ে শাহজাদার সাজে সাজতে হবে। যান আগে হামাম থেকে গোসল সেরে আসুন। আমি আপনার সাজ-পোশাক আনছি।

স্নানাদি সেরে ডেরায় ফিরে দেখি এলাহী ব্যাপার। ছেলেটি আমার জন্য বাজারের সবচেয়ে মূল্যবান সেরা একটি পোশাক নিয়ে এসেছে। সে বললো, নিন চটপট সেজে নিন তো।

আমি তার হুকুম তালিম করলাম। ছেলেটি বললো, বাঃ, চমৎকার লাগছে।

একেবারে শাহজাদা। মিশরের সুলতানের দু'টি কন্যা ছাড়া কোনও পুত্র-সন্তান নাই। আপনি তার কাছে গিয়ে সালাম কুর্ণিশ জানান। তিনি যখন আপনার অভিপ্রায় জানাতে চাইবেন , তখন তাঁর হাতে এই ভেটের বাক্সটা তুলে দেবেন।

আপনার উপহার সামগ্রী দেখে সুলতান মুগ্ধ হবেন সন্দেহ নাই। কারণ খুব কম সুলতান বাদশাহর ঘরেই আছে এ বস্তু। তিনি আপনাকে তার পরমাসুন্দরী কন্যাকে গ্রহণ করতে অ নুরোধ জানাবেন। তখন আপনি কি বলবেন তাকে?

আমি বললাম, এ তো খুব আনন্দের কথা। আমি রাজি হয়ে যাব।

আমি আর দেরি না করে তখুনি সুলতানের প্রাসাদে চলে গেলাম। খোজা এবং প্রহরীরা আমার জমকালো সাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলো। আমি যখন বললাম, মহামান্য সুলতানের জন্য কিছু ভেট এনেছি, তখন তারা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে দরবার-কক্ষে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো। যথাবিহিত কুর্ণিশ সালাম জানিয়ে সুলতানের সামনে বাক্সটি স্থাপন করলাম আমি।

সুলতান মহানুভব, আর এই ক্ষুদ্র সেলামীটুকু গ্রহণ করে বান্দাকে কৃতার্থ করুন, জাঁহাপনা।

সুলতান তাঁর উজিরকে বললেন, বাক্সটা খোলো দেখি।

উজির বাক্সটির ডালা উন্মুক্ত করে সুলতানের সামনে ধরলো। তিনি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, অমূল্য মণিরত্নরাজি-খচিত এক দুর্লভ অলঙ্কার।

—বাঃ, চমৎকার! এবার বলো তোমার কি অভিপ্রায়? আমি তোমার মনঃস্কামনা পূর্ণ করবো।

আমি বিস্ময়ানত হয়ে প্রার্থনা জানালাম, মুক্তহস্ত শাহেনশাহর জগৎ জোড়া খ্যাতি, কিন্তু এ অধমের আকাঙ্ক্ষা বেশি।

সুলতান বললেন যাই হোক, অসঙ্কোচে বলো, আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবো।

আমি বললাম, শাহেনশাহর পরমাসুন্দরী প্রথমা কন্যার পাণিপ্রার্থী আমি।

সুলতান এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তিনি ছোট্ট করে বললেন, বেশ, তাই পাবে।

তারপর প্রধান উজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই শাহজাদার দাবি সম্পর্কে তোমার কি অভিমত, উজির! আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি নাই। ওর মুখের মধ্যে পরম সৌভাগ্যের ছবি দেখতে পেয়েছি। আমি।

উজির বললো, তা বটে, পাত্র হিসাবে অযোগ্য সে নয়, জাঁহাপনা। তবে জামাতা বলে কথা, আরও একটু ভেবে-চিন্তে দেখলে হয় না?

—কোন দিক থেকে ভাবার কথা বলছো?

—তার যোগ্যতার আরও কিছু নমুনা জানা দরকার। আপনি এক কাজ করুন জাঁহাপনা, ধনাগারের সমস্ত মণি-রত্নের মধ্যে সব থেকে যেটি সেরা সেটা দেখিয়ে ওঁকে বলুন, কন্যার দেনমোহর হিসাবে তার সমতুল্য একটি মূল্যবান রত্ন আপনার চাই। যদি তিনি তা এনে দিতে পারেন, নিঃসংশয়েই বলতে পারা যাবে, ইনিই আমাদের শাহজাদীর যোগ্যতম পাত্র।

উজিরের কথা শুনে আমার হৃদ্‌কম্প শুরু হয়ে গেলো। সুলতানের হুকুমে

কোষাগার থেকে সবচেয়ে বড় একটি হীরকখণ্ড এনে স্থাপন করলেন তাঁর সামনে। সুলতান আমাকে আরও কাছে ডেকে বললেন, ভালো করে দেখ এই হীরেটি। শাহজাদীর শাদীর দেনমোহর হিসেবে এর তুল্য একটি হীরে আমি তোমার কাছ থেকে আশা করছি। যদি তুমি এনে দিতে পার, কথা দিচ্ছি, শাহজাদীকে তোমার হাতে সঁপে দেব তখুনি।

হীরেটাকে হাতে নিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। তারপর আগামীকাল আসবো বলে, দরবার ছেড়ে চলে এলাম আমার ডেরায়।

বাঁদরটা স্মিতমুখে জিজ্ঞেস করলো, কী, খবর শুভ?

আমি বিষণ্ণ মুখে বলতে পারলাম, নাঃ, কোনও আশা নাই। সুলতান দেনমোহর হিসাবে ইয়া বড় একটা হীরে চান। ও বস্তু মিলবে কোথায়?

বাঁদর বললো, ঘাবড়াবার কিছু নাই, হতাশ হবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। এমন জিনিস এনে দেব, সুলতানের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে। আজ রাত হয়ে গেছে, এখন আর বাইরে বেরুবো না। কাল আমি আপনাকে একটা কেন দশটা বড় বড় হীরে এনে দেব।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো তেত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

পরদিন সকালে বাঁদর যুবকের রূপ ধরে সুলতানের বাগিচায় গিয়ে প্রবেশ করলো। এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে পায়রার ডিমের মত প্রকাণ্ড আকারের দশটা হীরে তুলে দিলো আমার হাতে।

—দেখুন তো মালিক, সুলতানের হীরেটা এতো বড় ছিলো?

ঝলমলে হীরেগুলো দেখে আমি নেচে উঠলাম, না না, এগুলোর চেয়ে সেটা অনেক অনেক ছোট ছিলো।

দরবারে এসে যথাবিহিত কুর্ণিশাদি জানিয়ে বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে আমি বললাম, জাঁহাপনা দুনিয়ার মালিক, আমি অতি দীন—আমার এই সামান্য প্রণামী গ্রহণ করে ধন্য করুন, বন্দেগী।

ছোট একটি মীনাকরা কৌটো তার সামনে রাখলাম। সুলতান্ উজিরকে ইশারা করতে সে কৌটোটা খুলে ধরলো তাঁর সামনে।

সুলতান বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর উজিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এবার-এখন কী করণীয় উজির?

উজির বললো, আর কোনও সংশয় নাই জাঁহাপনা। সত্যিই উনি বহুত বড় ঘরের সন্তান। আপনি শাদীতে সম্মত হোন। শাহজাদী ওঁরই প্রাপ্য।

তৎক্ষণাৎ কাজী এবং সাক্ষীসাবুদদের ডাকা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে শাদীনামা তৈরি করে আমার হাতে তুলে দিলো তারা। আমি তো লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাইনি জীবনে তাই আমার পরম সুহৃদ বাঁদর-যুবককে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। শাদীনামাটা তার হাতে দিয়ে বললাম, কি লেখা আছে পড়ে শোনাও।

আমার হয়ে সে শাদীনামার বয়ান উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করে সভাকে শুনিয়ে দিলো। তারপর গলা খাটো করে আমার কানে কানে বললো, একটা কথা দিতে হবে।

আমি বললাম, দরকার হলে জান দিতে পারি।

সে বললো, আমি না বলা পর্যন্ত শাদীর পর কয়দিন আপনি শাহজাদীর সঙ্গে সঙ্গম করবেন না।

আমি বললাম, বেশ, তাই হবে।

যথা আড়ম্বরে শাদীপর্ব শেষ হলো। বাসরঘরে শাহজাদীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম। নানা গল্প-গুজবের মধ্যে আমাদের শাদীর প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেলো। বাঁদর-যুবকের কথামতো তার সঙ্গে সহবাস করলাম না। এর পরে আরও দু'টি রাত্রি নির্জলা উপবাসেই কাটালাম।

প্রতিদিন সকালে শাহজাদীর মা বেগমসাহেবা এসে কন্যার খবরাখবর নিয়ে যান। কন্যার দেহ অক্ষত রয়েছে দেখে তিনি প্রসন্ন হতে পারেন না। চতুর্থ দিন সকালে এসেও যখন তিনি কন্যার মুখে শুনলেন, সেরাতেও তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়নি তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন।

—হায় হায়, একি সর্বনাশ হলো আমার মেয়ের! এখন পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাব কি করে আমি?

বেগমসাহেবা সুলতানকে জানালেন মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা। ক্রোধে ফেটে পড়লেন সুলতান, কী, এইভাবে আমার মেয়ের জীবনটাকে বরবাদ করে দেবে সে? এ সব আমি বরদাস্ত করবো না, বেগমসাহেবা। আজকের রাতটা শুধু দেখব, আজও যদি সে আমার মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম না করে তবে ওর মুণ্ডু কেটে ঝুলিয়ে দেব এই প্রাসাদের সিংহদরজায়।

সুলতানের এই হুঁশিয়ারী শাহজাদীকে জানিয়ে গেলেন বেগমসাহেবা। এবং তার কাছ থেকে যথাসময়ে আমি জানতে পেয়ে শিউরে উঠলাম। ছুটে গেলাম বাঁদর-যুবকের কাছে, এখন উপায়? আজ রাতে যদি শাহজাদীর সঙ্গে সহবাস না করি আমার গর্দান যাবে যে?

বাঁদর যুবক হাসলো, ঠিক আছে, কোনও ভয় নাই। এখন যা করতে হবে আমি বাৎলে দিচ্ছি। আপনি আপনার বেগমের কাছে যান। গিয়ে তাকে বলুন, শাহজাদী তোমার ডান হাতের বাজুবন্ধটা আমাকে দিতে হবে। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ তিনি তোমাকে ওটা দিয়ে দেবেন। ঐ বাজুবন্ধটা এনে আমাকে দিয়ে আপনি আপনার বেগমের সঙ্গে যত পারেন সঙ্গম সহবাস করবেন। আর আমার কোনও বাধা-নিষেধ থাকবে না।

রাত্রে আহারাদি শেষ হয়ে গেলে শাহজাদীর সখী সহচরীরা বিদায় নিলো। এবার আমরা শুতে যাব। শাহজাদীকে নিভৃতে পেয়ে বললাম, শাদীর পর চারটে কুমারী রাত কাটিয়েছি আমরা। নিশ্চয়ই তুমি আমার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে আছ! কিন্তু কথা দিচ্ছি আজ আমরা আনন্দের সাগরে ভেসে বেড়াব। কী, রাজি?

শাহজাদী আরক্তিম হয়ে উঠলো। মুখে কিছু বলতে পারলো না, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

এবার আমি বললাম, তোমার কাছে সামান্য একটা জিনিস চাই।

শাহজাদী কথার অর্থ বোঝার জন্য আমার মুখের দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো। আমি বললাম, তোমার ডান হাতের ঐ বাজুবন্ধটা আমাকে দাও।

কোনও কথা না বলে তখুনি সে বাজুবন্ধটা খুলে আমার হাতে তুলে দিলো। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

বাজুবন্ধটা নিয়ে সোজা চলে এলাম বাঁদর-যুবকের কাছে, এই যে সেই বাজুবন্ধ।

বাজুবন্ধটা দেখে ওর চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করে নেচে উঠলো, ঠিক আছে, এবার আপনি আপনার বেগমের ঘরে চলে যেতে পারেন।

সে রাতে আমরা সত্যিকারের মধুযামিনী যাপন করেছিলাম। সারারাত ধরে আমরা দু'জনে দু'জনের মধ্যে হারিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

রতিরঙ্গ শেষ করে এক সময়ে পালঙ্কের দুপাশে দু'জনে ঢলে পড়েছিলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বলতে পারবো না; কিন্তু এক সময় বুঝতে পারলাম, কে যেন আমার দেহ থেকে শাহজাদার সাজ-পোশাক খুলে নিয়ে আবার সেই দীন ভিখারী ফকির দরবেশের শতছিন্ন আলখাল্লা পরিয়ে রেখেছে। ঘরের স্তিমিত আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। না, আমার কোনও ভুল হয় নি, সত্যিই আমি আর শাহজাদা মামুদের শাহী সাজ-পোশাকে সজ্জিত নেই। কে যেন আমাকে ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তখন। সত্যিই কি স্বচক্ষে দেখছি! না, এখন এসব স্বপ্নের ঘোর? কী এক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি। অবশেষে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না। রাত তখনও শেষ হতে কিছু বাকী ছিলো, আমি আর থাকতে না পেরে, শাহজাদীকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পথে নেমে পড়লাম।

তখন আমি উদ্ভ্রান্ত দিশাহারা। কোথায় চলেছি, কেন চলেছি কিছুই জানি না। এলোপাতাড়ি চলতে চলতে এক সময় এক মূর যাদুকরের বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ মূর একটা টুলে বসেছিলো। আমাকে কাছে ডেকে বললো, কি ব্যাপার, এই সাত সকালে কোথায় চলেছ?

আমি তাকে আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী খুলে বললাম, ঐ সুদর্শন বাঁদর যুবকটি আসলে কোনও মানব-সন্তান নয়। ও হচ্ছে জীন। সুলতানের জ্যেষ্ঠ কন্যার ওপর লোভ ছিলো অনেক দিন ধরে। কিন্তু কিছুতেই কায়দা করতে পারছিলো না। তার কারণ, শাহজাদীর ডান হাতে একটা মন্ত্রঃপুত বাজুবন্ধ ছিলো। সেই পবিত্র কবজের দরুণ সে তার কাছে ঘেঁষতে পারছিলো না। তোমাকে দিয়ে অতি সুকৌশলে ঐ বাজুবন্ধটা সরিয়ে ফেলতে পেরেছে। এখন তার পোয়াবার। শাহজাদীকে কব্জায় পাওয়ার পক্ষে আর কোনও অন্তরায় রইলো না। তোমাকে দিয়ে তার উদ্দেশ্য হাসিল করার পর আবার তোমাকে দীন ভিখারী সাজিয়ে প্রাসাদ থেকে বের করে দিয়েছে। এখন সে শাহজাদীকে মনের সুখে ভোগ করবে।

যাই হোক, আমি আশা করি ঐ শয়তান জীনটাকে শায়েস্তা করতে পারবো। ঐ আফ্রিদিটা আমাদের পরমপিতা সুলেমানের বিদ্রোহী বান্দাদের একজনের বংশধর। ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব।

এই বলে সে একখণ্ড বহু বিচিত্র আঁকিবুকি কাটা তুলোট কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললো, এটা ধর। ভালো করে মন দিয়ে শোনো, তোমাকে যা করতে বলছি, ঠিক ঠিক সেইমতো কাজটা সমাধা করে আসবে। সোজা এই পথ ধরে উত্তর মুখে চলে যাও। যেতে যেতে এক সময় দেখবে একদল ফৌজ নিয়ে এক ফৌজদার চলেছে। তুমি তাকে সালাম করে এই কাগজখানা তার হাতে তুলে দেবে। তারপর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে তোমার যা প্রাণ চায় আমাকে দিয়ে যেও।

বৃদ্ধকে সেলাম জানিয়ে তাঁর নির্দেশ মতো হেঁটে চললাম সোজা উত্তর দিকে। সারাদিন সারারাত ধরে হেঁটে চললাম। পরের দিনও চলতে থাকলাম। আরও একটা দিন একটা রাত কেটে গেলো। পথ চলা আর শেষ হয় না আমার। কত গ্রাম প্রান্তর পার হয়ে গেলাম।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় এক বিশাল বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে এসে উপনীত হলাম। রাত্রের মতো কোথায় দেহ রাখবো ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়লো একখণ্ড মরূদ্যান। ঠিক করলাম ঐ গাছের তলাতেই শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দেব।

কাছে যেতে বুঝতে পারলাম, যাকে দূর থেকে সুন্দর মরূদ্যান বলে মনে হয়েছিলো আসলে তা কাশ আর উলুখাগড়ার এক ঘন বনবাদাড়। যাই হোক, উপায় নাই, ওখানেই একটু জায়গা সাফ করে বসলাম। নানা জাতের রাতচরা পাখীদের বিচিত্র আওয়াজে কানে তালা ধরে গেলো। মাঝে মাঝে দু-একটা পাখী এমন বিদঘুটে শব্দ করতে লাগলো যেন মনে হয় মানুষ

কিংবা দৈত্যরা মারামারি বা দাপাদাপি করছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেলো। নির্ঘাৎ প্রাণটা এবার বেঘোরে যাবে। যাই হোক, আল্লাহ ভরসা করে চুপচাপ বসে রইলাম।

একটুক্ষণ পরে দেখি হাজার হাজার বাতির আলো আমার দিকেই ছুটে আসছে। আমি প্রমাদ গণলাম। হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো। এবার মউৎ সামনে এসে গেছে।

ক্রমশঃ আলোগুলো আমার সামনে এসে আরও ঘেঁষাঘেষি হয়ে গেলো। সেই হাজার বাতির আলোকে তখন আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, এক সিংহাসন অধিরূঢ় সুলতান আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ভয়ে হিম হয়ে গেছে রক্ত। পা দু'খানা ঠকঠক করে নড়ছে। সুলতান হাত বাড়িয়ে বললো, আমার সেই বৃদ্ধ মূর বন্ধুর কাগজখানা কোথায়?

আমি এবার খানিকটা ভরসা পেলাম। কাগজখানা তার হাতে তুলে দিতেই সে চটপট পড়ে নিয়ে তার সেনাপতিদের একজনকে হুকুম করলো, শোনো আতবাস, তুমি এক্ষুনি কাইরোয় চলে যাও। ঐ শয়তান জীনটাকে শিকলে বেঁধে আমার সামনে এনে হাজির কর।

এর প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেই বাঁদর যুবকটিকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় এনে দাঁড় করালো সুলতানের সামনে। সুলতান কঠিন কণ্ঠে বললো, কেন এই মনুষ্য-সন্তানটির সঙ্গে প্রতারণা করেছ তুমি? বলো, কৈফিয়ত দাও? কেন তুমি তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ? কেন? কী জবাব তোমার দেবার আছে এ সম্বন্ধে?

উদ্ধত জীনটি কিন্তু সুলতানের ধমকানিতে বিচলিত হলো না এতোটুকু। বললো, আমার হকের ধন আমি যেন তেন প্রকারেণ কব্জাগত করেছি। মনে করি না, তাতে কোনও অন্যায় হয়েছে আমার।

সুলতান বললো, ওসব কথা পরে শুনবো, আগে ঐ বাজুবন্ধটা একে ফিরিয়ে দাও তো।

বাঁদর যুবক বললো, আমি দেব না। ঐ শাহজাদীকে পাওয়ার জন্য আমি কত কষ্ট স্বীকার করেছি কতকাল ধরে। আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দেব না বাজুবন্ধ। কারও ক্ষমতা নাই এটা ছিনিয়ে নেয় আমার কাছ থেকে।

এই বলে কোমর থেকে বাজুবন্ধটা বের করে গপ করে মুখে পুরে গিলে ফেললো।

কিন্তু সুলতানও ছাড়বার পাত্র নয়। বাঁদর যুবককে সে এক হাতে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিলো। পাক খেতে খেতে সে পড়লো মাটিতে। আবার তাকে ছুঁড়ে দিলো, আবার সে আছাড় খেয়ে পড়লো মাটিতে। এইভাবে কয়েকটা আছাড় দিতেই হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে অসাড় নিষ্প্রাণ হয়ে এলিয়ে পড়ে রইলো। আর উঠলো না। তখন সুলতান অদৃশ্য সেনাদের একজনকে বললো, ওর গলাটা চিরে বাজুবন্ধটা বের কর।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো চৌত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

তারপর শুনুন ভাইসাহেব, ঐ বাজুবন্ধটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েই পলকের মধ্যে সেই সুলতান আর তার অদৃশ্য সৈন্যসামন্তরা কোথায় যে মিলিয়ে গেলো, আর দেখতে পেলাম না। এবং তখুনি সেই রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে বেশ বুঝতে পারলাম, আমি আবার সেই শাহজাদার সাজ-পোশাকে সজ্জিত হয়ে গেছি। কি আশ্চর্য কাণ্ড! আরও অবাক হলাম, কোন্ যাদুবলে আমি আবার ফিরে এসেছি আমারই প্রিয়ার পালঙ্কশয্যায়। হাত বাড়িয়ে দেখলাম, রতিসুখ অবসাদে অসাড়ে নিদ্রামগ্ন হয়ে আছে সে। খুব সন্তর্পণে সযত্নে বাজুবন্ধটা পরিয়ে দিলাম ওর ডান হাতে। কিন্তু সে জেগে উঠে আনন্দে জড়িয়ে ধরলো আমাকে।

পরদিন সকালে বেগমসাহেবা এবং সুলতানের মুখে হাসি ফুটলো। তাঁদের প্রাণাধিক কন্যার কুমারীত্ব নষ্ট করেছি শুনে আমাকে অনেক আদর সোহাগ জানালেন।

এরপর আমরা প্রেম ভালোবাসার সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে অনেক বছর কাটিয়ে দিলাম। তারপর একদিন আমার শ্বশুর দেহ রাখলেন। মৃত্যুর আগে আমাকে তিনি মসনদে বসিয়ে সুলতান করে গেলেন। সেই থেকে আমি কাইরোর সুলতান হয়েছি, ভাইসাব। সবই আল্লাহর দোয়া।

সুলতান মামুদ তাঁর কাহিনী শেষ করলেন। দরবেশ সুলতান মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিলেন এতক্ষণ। বললেন, সত্যিই বিধাতা যার কপালে যা লিখে দিয়েছেন তা কেউ খণ্ডন করতে পারে না।

সুলতান মামুদের সৌহার্দ্য ও আতিথ্যে মুগ্ধ হয়ে কাইরোতেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন দরবেশ সুলতান।

শাহরাজাদ বললো, এরপর তিনটি পাগলের কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

একদিন প্রহরীরা তিনজনকে ধরে এনে হাজির করলো সুলতান মামুদের সামনে। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে?

তিনজনেই বললো, তারা কেউ পাগল নয়। প্রহরীরা ভুল করে তাদের পাকড়াও করেছে।

সুলতান বললেন, বেশ তোমাদের কাহিনী শোনাও দেখি।

একজন এগিয়ে এসে কুর্ণিশ করে বলতে শুরু করলো ঃ

—জাঁহাপনা, আমি একজন রেশমী কাপড়ের সওদাগর। আমার বাবা, তার বাবাও এই ব্যবসা করতেন। হিন্দুস্থান থেকে সুন্দর সুন্দর কাশ্মীরি রেশমের পোশাক-আশাক এনে এখানকার আমির বাদশাহদের কাছে বেশ চড়া দামে বিক্রি করাই আমার একমাত্র নেশা। এতে বেশ মোটা লাভ থাকে।

একদিন দোকান খুলে বসে আছি আমি, এক সময় এক বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে এক খানদানি ঘরের সুন্দরী এলেন। ভালো ভালো দামী যা কাপড়-চোপড় আছে দেখাতে বললেন।

একখানা কাপড় বের করে দেখাতেই তার পছন্দ হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলেন কত দাম।

শাঁসালো মক্কেল পেয়েছি, দামটা চড়িয়েই বললাম, পাঁচশো দিনার।

মেয়েটি কোনও দরদাম করলো না। বৃদ্ধাকে নির্দেশ করতে সে পাঁচশো দিনার গুণে দিয়ে দিলো। আসলে কাপড়খানার নাম দেড়শো দিনার। মফতে সাড়ে তিনশো দিনার বাড়তি মুনাফা হয়ে গেলো।

পরদিন আবার এলো সুন্দরী। আর একখানা কাপড় দেখাতেই পছন্দ করে পাঁচশো দিনার গুণে দিয়ে নিয়ে গেলো।

এরপর এক নাগাড়ে পর পর পনেরদিন সে আমার দোকানে এসেছিলো। এবং প্রতিদিন একটি করে কাপড় পাঁচশো টাকা গুণে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। প্রতিটা কাপড়েই মোটা লাভ করে আমি ফুলে উঠেছি।

কিন্তু ষোল দিনের দিন মেয়েটি এসে একখানা কাপড় পছন্দ করার পর দাম দিতে গিয়ে দেখলো, দিনারের থলেটা আনতেই সে ভুলে গেছে। লজ্জিত হয়ে বললো, ইস টাকাই আনতে ভুলে গেছি। থাম, আজ আর নেব না। কাল নিয়ে যাব।

আমি বললাম, আহা, তাতে কি হয়েছে, নিয়ে যান। এর পরে যখন সুবিধে হয় দিয়ে যাবেন। আর যদি ভুলে যান আরও খুশি হবো।

মেয়েটি বললো, না তা হয় না। ধারে আমি নেব না। কাল নগদ পয়সা দিয়ে নিয়ে যাবো।

আমি দেখলাম এর আগে পনেরখানা কাপড়ে যা বাড়তি মুনাফা করেছি তাতে

এ-রকম দু'চারখানা কাপড় বিনে পয়সায় দিলেও আমার কোন লোকসান নাই। তাই সৌজন্যের বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো দু'জনের মধ্যে। নগদ না দিয়ে সে কিছুতেই নেবে না। আর আমিও তাকে না গছিয়ে ছাড়বো না। শেষে একটা রফা হলো। মেয়েটি বললো, নিতে পারি, একটা শর্তে। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন আমার গরীবখানায়। আমি দাম দেব আপনাকে। নিয়ে চলে আসবেন।

আমি হাসলাম, আপনার দৌলতখানায় নিয়ে যেতে চান, পা বাড়িয়েই আছি। হাজার বার যাবো। কিন্তু মহাজনের মতো পাওনা পয়সা আদায় করতে নয়।

মেয়েটি হাসলো, বেশ তো মেহেমান হয়ে চলুন। আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়লে ধন্য হবো আমি।

আর দ্বিধা না করে দোকান বন্ধ করে ওর পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চললাম আমি। এক সময় এটা গলির মুখে এসে মেয়েটি একখানা বড়সড় রুমাল বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো, যদি কিছু মনে না করেন, চোখ দু'টো বেঁধে এই বৃদ্ধার হাত ধরে আসুন একটুখানি পথ।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন কী ব্যাপার?

মেয়েটি বললো, ও কিছু না, এই গলিটার দু'পাশের বাড়ির জানালায় অনেকগুলো খুবসুরত লেড়কী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদের যাওয়া আসা দেখে। তাদের কাউকে যদি আপনার নজরে ধরে যায় সেই ভয়েই বাঁধতে বলছি।

হো হো করে হেঁসে উঠলাম, ও, এই কথা। তা বেশ, শক্ত করেই বাঁধছি।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো পঁয়ত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

কয়েক পা চলার পরই একটা বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছালাম আমরা। মেয়েটি কড়া নাড়লো। কে যেন দরজা খুলে দিলো। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। বৃদ্ধা আমার চোখের পটি খুলে দিলো। আমি বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, এক সুরম্য প্রাসাদের ঝলমলে মহলে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। জীবনে কখনও ঐ রকম ঘরদোর প্রত্যক্ষ করিনি। গল্প কাহিনীতে অনেক সুলতান বাদশাহ্‌র নয়নাভিরাম প্রাসাদকক্ষের বর্ণনা শুনেছি, কিন্তু সেদিন নিজের চোখে যা দেখলাম তা আমার কল্পনা-রসজারিত সেই সব মানস-প্রাসাদের বিলাস-বাসনাকে হার মানিয়ে দিলো।

বৃদ্ধা আমাকে একটি ছোট ঘরে বসিয়ে অন্দরে চলে গেলো। সে ঘরের খোলা দরজা দিয়ে পাশের বিশাল কক্ষের চোখ বাঁধানো বাহার দেখে মোহিত হয়ে গেলাম আমি।

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ঐ ঘরের এক কোণে অবহেলা ভরে স্তূপীকৃত করে ফেলে রেখেছে আমার কাছ থেকে কেনা রেশমী কাপড়গুলো। অত দামী দামী দুষ্প্রাপ্য কাপড়গুলোর দশা দেখে বুকের মধ্যে টনটন করতে লাগলো। আহা, এর একখানা কাপড় পেলে মেয়েরা কত যত্ন করে আলমারীতে তুলে রাখে। আর এতোগুলো মূল্যবান কাপড় এমন অযত্ন করে দলা পাকিয়ে ফেলে রেখেছে ওখানে?

করুণ চোখে কাপড়গুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় দু'টি মেয়ে পানির গামলা হাতে করে ঢুকলো ওঘরে। ঐ রেশমী কাপড়গুলো গামলার পানিতে চুবিয়ে চুপড়ি করে স্ফটিকের তৈরি ঘরের মেঝেটার জল মুছে ঝকঝকে তকতকে করতে থাকলো।

সত্যিই এ দৃশ্য অসহ্য। মানুষের পয়সা থাকলেই কি তা এইভাবে অপব্যবহার করতে হয়? কাপড়গুলো ওরা ফালা ফলা করে ফেঁড়ে ফেলে ন্যাতা বানিয়ে ফেললো!

ধোয়া মোঁছা হয়ে গেলে মেঝেয় মূল্যবান গালিচা এনে পেতে দিলো ওরা। তারপর

এক এক করে কেদারা কুর্শি, পালঙ্ক আসনে নিখুঁত এবং চমৎকার করে সাজিয়ে ফেললো কিছুক্ষণের মধ্যে।

এরপর সেই বৃদ্ধা এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেলো ওই ঝকঝকে সাজানো গোছানো ঘরখানায়।

আমি ভাবলাম, এবার আর রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই এরা আমাকে মেরে ফেলবে। এখন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।

কিন্তু সেই সুন্দরী আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে এগিয়ে এলো আমার সামনে। মুখে হাসি, চোখে লাস্য। হাতে ধরে নিজের পাশে রাখলো আমাকে। আমি নিরুপায়, প্রতিবাদ করবো, সাধ্য কি! সুবোধ বালকের মতো বিনা প্রতিবাদে বসে পড়লাম তার গা ঘেঁষে।

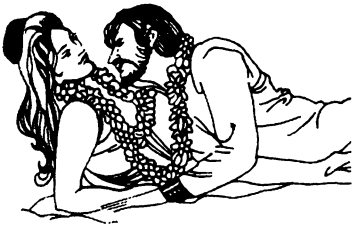

মেয়েটি মধুর করে হেসে আমার কানে কানে বললো, কী, আমাকে দেখে পছন্দ হচ্ছে না? আমি যদি তোমাকে সারা জীবনের মতো স্বামী করে পেতে চাই, পাবো না?

আমি বললাম, কিন্তু মালকিন, আমার মতো সাধারণ এক সওদাগর আপনার যোগ্য হবে কি করে? আমি যদি সুখ-স্বপ্নও দেখি—তবু তো আপানর নফর বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য ছাড়া অন্য কিছুই কল্পনা করতে পারবো না।

সুন্দরী বললো, না, না, তোমার ওসব এড়িয়ে যাওয়ার কথা আমি শুনতে চাই না। আমাকে কথা দাও তুমি রাজি কিনা। ভেবো না, কোনও ঝোঁকের মাথায় এসব কথা বলছি। আমার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চায়, আমি তোমাকে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছি, মেরি জান!

ভেবে পেলাম না দুনিয়াতে এতো সুন্দর সুন্দর নওজোয়ান থাকতে আমাকে সে এতো পছন্দ করলো কি দেখে! তবে এও ঠিক, ভালোবাসা এমনই বস্তু যা কখনও যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না।

মেয়েটি আমাকে নীরব থাকতে দেখে বললো, চুপ করে থেক না। কথা দাও, আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমার মত পেলে এক্ষুনি আমি কাজীকে ডেকে পাঠাবো। আজই হবে আমাদের প্রথম মিলন উৎসব।

আমি না করতে পারলাম না। এবং সেই রাতেই আমাদের শাদী হলে গেলো। এ এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড বটে।

পরপর কুড়িটি সুখ-সঙ্গমের বিনিদ্র রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। বৃদ্ধা মায়ের জন্য চিন্তিত হলাম আমি। বিবিকে বললাম, দেখ, বেশ কিছুদিন বাড়ি ছাড়া, আমার বুড়ো মা বেচারা বোধহয় কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। তাছাড়া দোকানপাটও বন্ধ আছে—ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে উঠবে যে।

সে বললো, ঠিক আছে। প্রত্যেক দিন দোকানে যাবে, মাকে দেখে আসবে। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে একটা রাতও কাটাতে পারবো না আমি। রুমালে চোখ বেঁধে দেবো, আমার বুড়ি বাঁদীর সঙ্গে যাবে, আবার তার সঙ্গেই ফিরে আসতে হবে।

প্রতিদিন সকালে চোখ বেঁধে বুড়ির হাত ধরে প্রাসাদের বাইরে বের হই। গলি পার হয়ে বড় রাস্তার মুখে এসে সে আমার বাঁধন খুলে দিয়ে বলে, আমি আর তোমার সঙ্গে যাবো না বেটা। এইখানেই বসে থাকি, সারাদিন শেষে সব কাজ সেরে যখন ফিরে আসবে আবার চোখ বেঁধে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে যাব।

এইভাবে তিনটি মাস কেটে গেলো। আমার প্রতি এক বিন্দু আকর্ষণ কমলো না আমার বিবির। বরং আদর যত্ন সোহাগ চুম্বনের মাত্রাটা যেন দিন দিন বেড়েই চললো।

একদিন বাড়ির এক নিগ্রো দাসীকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মেয়ে, একটা কথা বলতে পার? তোমাদের মালকিন একজন পরমাসুন্দরী পয়সাওলা ঘরের মেয়ে। কিন্তু আমার মধ্যে সে এমন কি অসাধারণ বস্তুর সন্ধান পেয়েছে যার জন্যে এতো ভালোবাসা এতো দরদ দেখায়, এমন আড়াল করে আগলে রাখার চেষ্টা করে?

মেয়েটি জিব কেটে দু'কানে হাত রাখলো। সর্বনাশ, এ সব কি বলছেন মালিক? মালকিন জানতে পারলে আমার গর্দান যাবে।

আমি বললাম, কথা দিচ্ছি, তুমি আর আমি ছাড়া তৃতীয় কোন মানুষ জানবে না, বলো।

দেখলাম নিগ্রো মেয়েটি আতঙ্কে সিটিয়ে যাচ্ছে। ফিস ফিস্ করে বললো, সে অনেক কথা। এখনে দাঁড়িয়ে টুক করে বলা যাবে না। এখন যান, যদি কখনও তেমন সময় সুযোগ পাই, বলবো আপনাকে। বৃহৎ কেচ্ছা আছে ভিতরে, অনেক সময় লাগবে!

মেয়েটি আর দাঁড়ালো না আমার সামনে। আমিও চলে এলাম নিজের ঘরে।

এর কয়েকদিন পরে দোকানে বসে আছি—এক সময় দেখলাম, রংদার সাজ-পোশাক পরা এক ষোড়শী আমার দোকানের সামনে এলো। অবাক হলাম, মেয়েটি নির্লজ্জের মতো আমার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে অতি মন্থর পায়ে পার হয়ে গেলো। একটু পরে দেখলাম মেয়েটি আবার ফিরে আসছে আমার দোকানের দিকেই। ভাবলাম কোনও খদ্দের হবে, উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাতে সে দোকানের ভিতরে এসে বসলো। ওর হাতে একটা ছোট থলে।

মেয়েটি থলে থেকে একটা ছোট্ট সোনার মোরগ বের করে বললো, এর চোখ দু'টো হীরের। খুব সখের জিনিস! কিন্তু দায়ে পড়ে বেচতে এসেছিলাম। তা এসব বাহারী জিনিসের সমঝদার আদমী আজকাল আর নাই। কেউ দরই দিতে চাইলো না। আপনাকে দেখে বড় বংশের ছেলে বলে মনে হলো, তাই ভাবলাম আপনি হয়তো দিলেও দিতে পারেন।

খেলনাটা নেড়ে চেড়ে দেখলাম। সত্যিই ব্যবহারিক কোনও মূল্য নাই, তবে ঘর সাজাবার জন্য বড়লোক এবং সৌখিন ব্যক্তিরা নিলেও নিতে পারে। আমার বিবির ভালো লাগতে পারে ভেবে বললাম, একশোটা দিনার আমি দিতে পারি। যদি রাজি থাকেন দিয়ে যেতে পারেন।

মেয়েটি চোখ কপালে তুলে বললো, একি বলছেন, আমির সাহেব! হাজার দিনার যার দাম মাত্র একশো দিনারে তা কিনতে চাইছেন?

—আমি জানি এর দাম এক হাজারেরও বেশি। কিন্তু আদপে আমার প্রয়োজন নাই এ জিনিসে। নেহাত আপনি দায়ে ঠেকেছেন, তাই একশোটা দিনার দিতে পারি। না হলে অন্য কোথাও দেখুন, যদি কারো নজরে ধরে যায় বেশি দাম পেলেও পেতে পারবেন।

মেয়েটি কিন্তু নড়লো না। বললো, বাজারের সব মক্কেলকেই যাচাই করে করে দেখে এলাম। কিন্তু ভোঁতা। সবাই ফোঁকো কাপ্তেন। কারো শখ নাই রুচি নাই। সে যাক আপনি আর কিছু দিতে পারেন কিনা, দেখুন।

আমি বললাম, না, একশোটা দিনারই দিতে পারি।

মেয়েটি কি যেন একটু ভাবলো, তারপর বললে, বেশ ওতেই রাজি, তবে আর একটা ছোট্ট জিনিস চাই। পয়সার জিনিস নয়।

—কী?

—আপনার এই টুকটুকে গালে ছোট্ট একটা চুমু এঁকে দিতে চাই।

অদ্ভুত প্রস্তাব তো! কেমন যেন রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগলাম। অমন রূপসী তরুণীর চুম্বন—সে তো আমারই বাড়তি লাভ! বললাম, বেশ আমি রাজি।

মেয়েটি তখন গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মুখের নাকাব তুলে আমার বাঁ গালের ওপর অধর রাখলো। কিন্তু একি! মেয়েটি অমনভাবে দাঁত দিয়ে আমার গালের চামড়া কামড়ে ধরেছে কেন?

নিজেকে ছাড়িয়ে দেবার জন্য একটু জোর দিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমার গাল বেয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে।

মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে হাসতে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলো দোকান থেকে। যাবার সময় সে কিন্তু আমার দেওয়া দিনারের থলেটাও নিয়ে গেলো না।

সোনার মোরগটা হাতে নিয়ে ভাবলাম, এর দাম একটি সুন্দরী নারীর দাঁতের দংশন!

ঘরে ফিরে এসে বিবির হাতে মোরগটা তুলে দিতে গিয়ে হোঁচট খেলাম।

—থাক আর ঢং দেখাতে হবে না।

—হঠাৎ এতো রাগ কেন, মনি? তোমার জন্যে আশা নিয়ে কিনে আনলাম।

এবার সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো, কিনে আনলে? কী দাম দিয়ে? সুন্দরী নারীকে চুম্বন বিলিয়ে? বেতমিজ বেল্লিক কোথাকার?

প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলে সে আমার বাঁ গালের ক্ষতটার ওপর। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। তারপর পড়ে গেলাম মেঝেয়। আর মনে নাই।

অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলো। স্ফটিকের মেঝের ওপর তখনও আমি পড়ে আছি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখলাম, সামনে একটা কুর্শিতে বসে আছে আমার বিবি। ইশারা করতেই চারটি মেয়ে ধরাধরি করে একটি মেয়ের লাস এনে রাখলো আমার পাশে। আঁৎকে উঠলাম আমি। দোকানে যে মেয়েটি আমার গালে দংশন করে এসেছিলো সেই মেয়েটি। ছোরার আঘাতে আঘাতে সারা দেহ ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত। অমন সুন্দর লাবণ্যময়ীর একি বীভৎস চেহারা?

আবার আমি সংজ্ঞা হারালাম। তারপর থেকে মাথাটা আমার বিগড়ে গেছে। নিজেকে আর কিছুতেই সাহস করতে পারি না। যখনই ঐ মেয়েটির ক্ষত-বিক্ষত চেহারা ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে, তখনই কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। আর মাথা ঠিক রাখতে পারি না, আবোল তাবোল বকি, অকারণে অন্যকে আঘাত করি, কিংবা কোনও রকম অশোভন আচরণে মত্ত হয়ে উঠি।

সুতরাং বুঝতে পারছেন, জাঁহাপনা, আসলে আমি দুষ্ট লোক নই। নেহাতই নসীবের ফেরে এই রকম হয়ে গেছি। তাই আমার আর্জি জাঁহাপনা, এ বান্দার জানটা আপনি রক্ষা করুন।

সুলতান মামুদ উজিরকে বললেন, বড় তাজ্জব কি বাত উজির! কী ব্যাপার বলতো? এই রমণীটি কে? কেনই বা এই সওদাগর বেচারাকে সে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আদর সোহাগ করেছিলো, আর কেনই বা আবার তাকে কুকুর বেড়ালের মতো মারধোর করে পথে নামিয়ে দিয়েছে—একেবারে পাগল বানিয়ে? চলো, ওকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধান করতে হবে। আসল ঘটনা আমাকে জানতেই হবে।

উজির বললো, তা হলে আপাতত বাকী দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া যাক, জাঁহাপনা। আমার মনে হয় একে সঙ্গে নিয়ে সেই গলিটার মুখে গেলে হদিশ একটা মিলে যাবে।

সুলতান এবং উজিরকে সঙ্গে নিয়ে সওদাগর যুবক এক সময় সেই গলির মুখে এসে দাঁড়ালো, এই সেই গলি, জাঁহাপনা, এখানেই আমার চোখে ফেটি বাঁধা হতো। তাই এর পরের নিশানা আর বলতে পারবো না আমি।

সুলতান বললেন, এ গলির ভিতরে প্রাসাদতুল্য একটিমাত্র ইমারতই আছে। এবং সেখানে তো আগের সুলতানের একটি বিধবা বৃদ্ধা বেগম তার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে বসবাস করে! তাহলে কি ঐ শাহজাদীই এই সওদাগরকে শাদী করেছিলো।

উজির বললো, অসম্ভব নয়।

সুলতান বললেন, চলো এগোন যাক।

কয়েক পা আসার পর একটি দরজায় কড়া নাড়লেন সুলতান মামুদ। একটি খোজা নফর এসে দরজা খুললো। সুলতানকে দেখেই সে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে ছুটে অন্দরমহলে চলে গেলো খবর দিতে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো সাঁইত্রিশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দরী হারেম থেকে বেরিয়ে এসে সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে সাদর অভ্যর্থন করে অন্দরে নিয়ে গেলো।

আপনারা হয়তো এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন কে এই সুন্দরী। সুলতান মামুদ—সুলতানের বড় মেয়েকে শাদী করেছিলেন। এটি তাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনী।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। সুলতান মামুদ তাঁর শ্যালিকাকে বোঝালেন, ঘর-সংসার করতে গেলে ছোটখাট অসঙ্গতি কিছু ঘটেই থাকে তার জন্যে কেউ শাদী করা স্বামীকে পরিত্যাগ করে না। আমি কথা দিচ্ছি, এরপর তোমার স্বামী অন্য কোনও মেয়েকে চুমু খাওয়ার জন্য গাল পেতে দেবে না। ওকে তুমি গ্রহণ করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার কর। আমি ভায়রাকে আমার দরবারের আমির করে নিলাম আজ থেকে!

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামলো একটু, তারপর বললো, যদি অনুমতি করেন তবে এবার বাকী দুই পাগলের কাহিনীও শোনাতে পারি, জাঁহাপনা।

সুলতান শাহরিয়ার বললেন, বেশ তো, শোনার জন্যই তো আমি রাত জেগে বসে আছি শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ দ্বিতীয় পাগলের জবানীতে কাহিনী শুরু করে ঃ

আমিও এক সওদাগর! আমার বাবাও সওদাগর ছিলেন। এই শহরেই স্যাকরা বাজারে আমার দোকান। সব রকম অলঙ্কারই বিক্রি করি আমি। বিশেষ করে আমার দোকানের বাহারী বাজুবন্ধের খ্যাতি শহরের সকলেই জানেন।

ছোটবেলা থেকেই আমি ভীষণ লাজুক প্রকৃতির ধর্মপ্রাণ ছেলে। নরনারীরর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি না কখনও। আমার স্বভাব চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে শাদীর জন্য কত কন্যার মায়েরা আমার মাকে ধরাধরি করতে আসতো। কিন্তু একেবারে উঠতি বয়স, মা রাজী হতেন না। ছেলে আর একটু বড় হোক তারপর শাদীর কথা ভাবা যাবে।

আমারও ভি শাদী নিকা সম্বন্ধে তেমন কোনও আগ্রহ ছিলো না। আমার নিত্যসঙ্গী কোরাণ নিয়েই সময় কেটে যেত বেশ সুন্দরভাবে।

একদিন আমার দোকানে একটি বেঁটে মুটকী নিগ্রো তরুণী এলো। হাতে তার একখানি খৎ। বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমার মালকিন দিয়েছেন মেহেরবানী করে পড়ে জবাব লিখে দিন।

খুলে দেখলাম, একখানি রগরগে প্রেমপত্র। প্রেমপত্র না বলে কামপত্র বলাই সঙ্গত। প্রতিটি ছত্র কুৎসিত কামনার বিকৃতির ছবি। গা জ্বলে গেলো। দাঁত কড়মড় করতে করতে চিঠিখানি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে পায়ের তলায় পিষে দিলাম।

নিগ্রো মেয়েটির চোখে মুখে তখন বিস্ময় আতঙ্ক। ওর কান ধরে হিড় হিড় করে দরজার কাছে নিয়ে পাছায় একটা লাথি মেরে দোকানের বাইরে বের করে দিলাম।

নির্লজ্জ বেহায়া বেয়াদপ বেশরম মাগী, দূর হ, আমার দোকান থেকে। ফের যদি এ মুখো কখনও হো'স, মেরে বদন বিগড়ে দেব। যা, তোর ঐ খানকী মালকিনকে গিয়ে বলগে, বেশ্যাবৃত্তি করার সাধ জাগে যদি তবে পট্টিতে গিয়ে ঘর ভাড়া নিক। অনেক মক্কেল জুটবে। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে গেলে বিপদ হবে।

আমার দৃপ্ত চরিত্রের দার্ঢ্য দেখে আশেপাশের সকেলেই ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

এ ঘটনা যখন ঘটে তখন বয়স আমার মাত্র ষোল, এর অনেক পরে বুঝেছিলাম সে দিনের সেই আদর্শ চরিত্রের অহঙ্কার কতই না অসার ছিলো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনটাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেলাম। তখন জানতে পারলাম চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে এতদিন যা করে এসেছি আসলে তার কোনও মানে হয় না।

আমি যুবক। যৌবনের মধুর স্বাদ আমাকে পাগল করেছে। এ বস্তু কৈশোরে কি করে অনুভব করা যাবে? আজ আমি ভালোবাসার আলোয় উদ্ভাসিত হতে পেরেছি। কিন্তু তখন কৈশোর কালে অবোধের মতো তাকে পায়ে দলে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

যৌবনের মধুপ আমাকে জানিয়ে দিলো, এবার সময় হয়েছে, শাদী কর। আল্লার ইচ্ছায় শাদীও আমি করেছিলাম।

একদিন বিকেলে গোটা পাঁচ-ছয় ফর্সা বাঁদী নফরানী এসে ঢুকলো আমার দোকানে। তাদের সঙ্গে একটি পরমাসুন্দরী ষোড়শী মালকিন। ভাব-সাব দেখে মনে হলো যেন এক শাহজাদী। বেশ গুরুগম্ভীর চালে আমাকে জিজ্ঞেস করলো সে, আপনার দোকানে ভালো গহনাপত্র কিছু আছে?

আমি বললাম, যা আছে দেখাতে পারি, যদি আপনার পছন্দ হয়—

সে বললো, আমাকে এক জোড়া তাগা দেখান তো?

বেশ ভারি ওজনের সূক্ষ্ম কারুকার্য করা এক জোড়া তাগা বের করে দিলাম। আমার দোকানের সবচেয়ে দামী অলঙ্কার।

মেয়েটি বললো, হাতে হবে কিনা একবার পরিয়ে দেখান। বাঁদীরা এসে বোরখা তুলে শাহজাদীর দু'খানা হাত-এর আস্তিন গুটিয়ে বাহুমূলে সরিয়ে দিলো। তাগা পরাবো কি, আমি ঐ হাতের নিখুঁত গড়ন এবং পেলব কোমলতা দেখে হতবাক হয়ে গেছি তখন। কোনও মানুষের হাত যে এমন সুন্দর ছাঁচে ঢালা হতে পারে ভাবতে পারিনি।

আমার ভারি ওজনের তাগাটা ও হাতে আদৌ মানায় না। লজ্জিত হয়ে বললাম, মাফ করবেন শাহজাদী ও হাতের যোগ্য তাগা আমার দোকানেই নাই।

তখন সে বললো, ঠিক আছে, পায়ের একজোড়া মল দিন। বলা বাহুল্য আমার দোকানের সেরা জিনিসই বের করলাম। বাঁদীরা শাহজাদীর গোড়ালি থেকে শালোয়ার-এর হেমটা হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়ে ধরলো, নিন, পরিয়ে দিন?

আমি লজ্জিত হলাম এবারও। বললাম, ঐ হুরীর মতো সুন্দর পায়ে এ মল মানাবে না।

মেয়েটি বললো, ঠিক আছে আমার গলার একটি নেকলেস আর বুকের মাপের একটা সাতনরী দিন।

মেয়েরা এগিয়ে বললো, দাঁড়ান আগে মাপ নেবেন তো, তা না হলে বুঝবেন কি করে কোন্‌টা জুৎসই হবে?

এই বলে বাঁদীরা শাহজাদীর অঙ্গবাস এক এক করে খুলে ফেলতে লাগলো।

সব খোলা শেষ হয়ে গেছে, বাকী রয়েছে মাত্র পাতলা একটা রেশমী শেমিজ।

আমি ঘামতে থাকলাম। দু'টি সুন্দর সুগঠিত স্তন উদ্ধত ভঙ্গীতে এগিয়ে এলো আমার বুকের কাছে। শাহজাদীর চোখে লাস্য, অধরে দুর্বোধ্য হাসি। শেমিজটা নিজেই খুলে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, কই, হাত দু'খানা দিয়ে মুঠি করে ধরে মাপটা নিন ভালো করে?

আমার তখন বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বললাম, থাক থাক, আমি আন্দাজেই মাপ নিতে পারবো, আপনি ঢাকুন।

—কেন, ঢাকবো কেন? আমি কি সত্যিই এতো কুৎসিত, কুরূপা!

আমি প্রতিবাদ করে বলি, কুৎসিত? আপনার মতো সুন্দরী বেহেস্তর পরীরাও নয়, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

তবে যে আমার বুড়ো বাবা আমাকে দিনরাত, কানি, বাঁদরমুখী, লেংড়ী, কুঁজি বলে গালাগাল করে। বলে, তোর মতো মত কুৎসিত মেয়েকে শাদী দিতে আমার জান শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা বলুন না সাহেব, সত্যিই কি আমার শাদী নিকা কিছু হবে না?

আমি অবাক হয়ে বলি, সে কি? আপনার মতো সুন্দরী কন্যা সারা দেশে, কটা আছে? মুখ ফুটে চাইলে আপনি অনেক সুলতান বাদশাহর ছেলেকে পাবেন।

মেয়েটি বললো, না না, আপনার চোখে রং ধরেছে, তাই এসব কথা বানিয়ে বানিয়ে শোনাচ্ছেন আমাকে। আমার বাবা—শেখ ইসমাইল কত চেষ্টা করছে, কিন্তু সুলতান বাদশাহ দূরে থাক একটা বণিক সওদাগর পাত্রও জোটাতে পারছে না।

আমি বললাম, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

মেয়েটি অসঙ্কোচে বললো, তাহলে আপনিই রাজি হয়ে যান না। আমার একটা হিল্লে হয়ে যায় তা হলে।

—আমি? আমাকে শাদী করবেন আপনি? আমি তো সামান্য একজন স্যাকরা। আপনার মতো সুন্দরী পত্নী আমি আশা করবো কি করে।

—আহা, ওসব রাজি না হওয়ার বাহানা।

আমি বললাম, আমি রাজি।

মেয়েটি বললো, তা হলে আমার বাবার কাছে গিয়ে প্রস্তাব পেশ করুন। বলবেন, আপনার একমাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থী আমি। তার সম্বন্ধে আমার সবকিছুই জানা হয়ে গেছে।

বাবা তবু আমার গুণের কথা শোনাতে ছাড়বেন না আপনাকে। বলবেন, আমার মেয়ের মতো কালো কুৎসিত মেয়ে আরবে দু'টি নাই। আপনি তখন বলবেন, আমি তা জানি, এবং সব জেনেশুনেই শাদী করতে চাইছি। বাবা তবু আপনাকে নিরুৎসাহ করার জন্য বলবেন, তার তো একটা চোখ কানা, লাঠিতে ভর দিয়ে লেংড়িয়ে চলে, কোমরে বাত, পিঠে ইয়া বড় কুঁজ, চিৎ হয়ে শুতে পারে না। যত রকম অঙ্গহানি ঘটতে পারে মানুষের দেহে তার সব রকম ফিরিস্তি তিনি শুনিয়ে দেবেন আপনাকে। তাঁর আসল মতলব আপনাকে নিরুৎসাহ করে ফিরিয়ে দেওয়া।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এতে তার কি ফয়দা হবে। এভাবে পাত্রদের ফেরাতে থাকলে তো কোনও দিন আপনার শাদী দিতে পারবেন না। তিনি।

—আমার তো শাদী দিতে চান না তিনি। আমি তাঁর ভীষণ আদরের দুলালী। এক পলক চোখের আড়াল করতে পারেন না! অথচ মেয়ে ডাগর হয়েছে, শাদী দিতে না চাইলে সমাজে নিন্দে হবে। তাই তিনি এই পথ বেছে নিয়েছেন।

আমি বললাম, কিন্তু ও চালে তো এ ভবি ভুলবে না, মালকিন! যেভাবে উনি

আমাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করুন আমি শুধু বলবো, আমি সব জানি, সব খোঁজখবর নিয়েই এসেছি। আপনি শাদীর আয়োজন করুন, আপনার এই কন্যাকেই শাদী করবো আমি।

—বহুত আচ্ছা, মেয়েটির চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেলো। তা হলে শুভ কাজে আর দেরি করবেন না, আমি ঠিকানা বাৎলে দিচ্ছি, আজই আপনি আমার বাবা শেখ ইসমাইলের বাড়িতে চলে যান।

মেয়েটি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চলে যেতে আমি দোকানপাট বন্ধ করে শেখ ইসমাইলের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

বাড়িটা বেশ বড়সড়। খানদানি কিনা জানি না, তবে বেশ পয়সাওলা লোকের ইমারত বলে মনে হলো।

দরজায় নিগ্রো নফর ছিলো, তাকে বলতেই সে আমাকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলো। দেখলাম, গালিচার ওপর বসে এক অশিতিপর পলিতকেশ বৃদ্ধ কোরান পাঠ করছেন। বয়সের ভারে দেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। একটা চোখ কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত। বুঝলাম, যে-কোন কারণেই হোক চোখটা হারিয়েছেন তিনি।

সালাম আদান প্রদানের পর তিনি আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আপনার একমাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে এসেছি আমি। যদি আমাকে অপছন্দ না হয় তবে তাকে শাদী করতে পারি।

বৃদ্ধ বললেন, আমার দিক থেকে আপত্তির কোনও প্রশ্ন ওঠে না। মেয়েকে আমি পার করতে পারলে উদ্ধার পাই। কিন্তু তেমন উদারচেতা পাত্র কোথায় পাব বাবা—সে সব জেনে-শুনে আমার ঐ কুরূপ কুৎসিত, কানা-কুব্জি লেংড়ি, বামন জরাগ্রস্ত মেয়েকে শাদী করবে?

আমি জানতাম শেখ সাহেব কন্যার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন। ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম, আপনি যা যা বলবেন সব আমার জানা, শেখজী। সব জেনে-শুনেই আপনার কন্যাকে শাদী করতে এসেছি আমি। এখন আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর সব নির্ভর করছে।

বৃদ্ধ অবাক হলেন। দেখলাম, একটু পরে তাঁর দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বুঝলাম, এবার নিশ্চিতভাবে মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে হবে জেনে তিনি আর শোক সামলাতে পারছেন না। এবং মুখ ফুটে বলেও ফেললেন, ঠিক আছে বাবা, শাদী আমি দেবো। কিন্তু এই বৃদ্ধের একটি আর্জি আছে, বাবা।

আমি বিব্রত বোধ করলাম, আহা এমনভাবে বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আর্জি কেন, আদেশ করুন, কী করতে হবে।

শেখ ইসমাইল বললো, শাদীর পর, যতদিন না সে সুস্থ হয়ে চলা ফেরা করতে পারে ততদিন আমার এই বাড়িতেই তোমরা বসবাস করবে। আমি কথা দিচ্ছি, জামাই হিসাবে কোনও অনাদর হবে না আমার কাছে।

আমি বললাম, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব!

বৃদ্ধ শেখ সেই রাতেই কাজী ডেকে শাদীনামা লেখালেন। যথাসময়ে শাদীর আচার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলো।

এবার আমার মধুযামিনী শুরু হবে। মনে অনেক রঙিন কল্পনা। কি ভাবে প্রিয়তমাকে আদর-সোহাগ চুম্বন সহবাস করবো, তারই মহড়া দিয়েছি সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যে।

কিন্তু সব ধূলিসাৎ হয়ে গেলো এক নিমেষে। বাসরঘরে ঢুকে পাত্রীকে দেখে আমি মাথাঘুরে পড়ে গেলাম। শেখ ইসমাইল এতোটুকু মিথ্যে বলেননি। বরঞ্চ নিজের কন্যা বলেই বোধহয়, তার কুরূপের যথার্থ বর্ণনা দিতে পারেননি।

কি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে যে কেটেছিলো রাত্রিটা তা বোঝাতে পারবো না। মনে হতে লাগলো, আমি বুঝি বা পাগল হযে যাব।

খুব সকালে উঠে দোকানে চলে এলাম। দোকান খুলে গুম মেরে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছি এমন সময় আমার একদল ইয়ারদোস্ত এসে মজাক মস্করা করতে শুরু করলো।

—কী হে দোস্ত, এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজটা সারলে? তা বেশ, শাদী করেছ ভালোই করেছ, এখন মিঠাই-মণ্ডা, খাওয়াও দেখি।

ওদের নানারকম কাঁচা রসিকতায় মনটা আরও বিষিয়ে উঠলো। কিন্তু কি করবো, নিরুপায়, নীরবে সব সহ্য করে যেতে হলো। নাছোড়বান্দা বন্ধুদের মিষ্টিমুখও করাতে হলো।

দুপুর গড়িয়ে গেলো।

একসময়ে সখী বাঁদী পরিবৃত হয়ে আবার এসে উপস্থিত হলো সেই সুন্দরী শাহজাদী। চোখে-মুখে তার হাসির ঝিলিক খেলে যাচ্ছিল।

—কী সাহেব, সোহাগ-রাত কাটলো কেমন?

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো একচল্লিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

আমি চিৎকার করে উঠলাম, আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করবেন, শয়তানী কোথাকার! তোমার মতো বাজারের বেবুশ্যার পাল্লায় পড়ে আজ আমার জানটাই বরবাদ হয়ে গেলো। তবে এও বলে দিচ্ছি, অহেতুক একটা নিরীহ লোকের অনিষ্ট করে তোমার দোজকেও ঠাঁই হবে না।

—অহেতুক কোনও লোকের অনিষ্ট করা আমার পেশা নয় সাহেব। তবে জেনে রাখুন একদিন আমার মহব্বতকে আপনি অবজ্ঞা করেছিলেন, আমার প্রেমপত্র ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আমারই নিগ্রো বাঁদীর সামনে পায়ে দলে ছিলেন, এ তারই প্রতিশোধ।

মেয়েটির চোখে আগুনের ঝলকানী দেখলাম। নিমেষে সব ব্যাপারটা পানির মতো স্বচ্ছ হয়ে গেলো আমার সামনে। ওর পাছাটা জড়িয়ে ধরলাম আমি, না জেনে যে অন্যায় করেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি, শাহজাদী। তুমি আমাকে ঘৃণা করে চলে যেও না।

আমার কথায় সে নরম হলো। বললো, তোমাকে খানিকটা শিক্ষা দেবার সাধ হয়েছিলো আমার। এবং তা আমি যথার্থ ভাবেই মিটিয়ে নিয়েছি। এবার আর কোনও রাগ নাই। বেশ, তুমি যদি রাজি থাক, তবে যাও, ঐ শেখ ইসমাইল-এর বাড়ি গিয়ে তোমার নব-পরিণীতাকে বয়ান তালাক দিয়ে এসো। দেনমোহর যা লাগে আমি দেব। তারপর সন্ধ্যাবেলায় আমার নফর এসে তোমাকে নিয়ে যাবে আমার প্রাসাদে।

তার কথামতো বিশ হাজার দিনার দেনমোহর গুণাগার দিয়ে তখুনি শেখ ইসমাইলের কন্যাকে তালাক দিয়ে এলাম আমি।

সেই রাতেই শাহজাদীর সঙ্গে শাদী হলো আমার!

এরপর পুরো একটা মাস সোহাগ সম্ভোগের মধ্যে কাটিয়ে দিলাম আমরা। কিন্তু আমার বিবি ভীষণ কাম-কাতর। দিনে দিনে বুঝতে পারলাম আমার সঙ্গম-ক্ষমতা সীমিত হয়ে আসছে। এতে সে ক্ষুব্ধ হতে লাগলো। শেষে একদিন যখন শরীর খারাপের অজুহাতে আমি তার সঙ্গে সহবাসের অক্ষমতা জানালাম সে আমাকে বেদম প্রহার করে অজ্ঞান করে ফেললো। যখন জ্ঞান ফিরলো দেখলাম, আমি পাগলা গারদে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে আছি।

এই হচ্ছে আমার কাহিনী, জাঁহাপনা।

সুলতান মামুদ বললেন, তোমার বিবির প্রাসাদ চিনে যেতে পারবে।

দ্বিতীয় পাগল বললো, হ্যাঁ, পারবো, জাঁহাপনা।

তখন সুলতানের ইশারায় তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করা হলো। সুলতানকে সঙ্গে নিয়ে সে তার বিবির প্রাসাদে এসে হাজির হলো। শাহজাদী সুলতানকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালো।

সুলতান মামুদ বললেন, তুমি হচ্ছো আমার এক শ্যালিকা। আর এ হচ্ছে আমার ভায়রা। দাম্পত্য-জীবনের অনেক গরমিল মানিয়ে চলতে হয়। নিজের স্বামীকে কি কেউ একটা তুচ্ছ কারণে পরিত্যাগ করে। তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার কর এই আমি চাই। আজ থেকে আমার এই ভায়রাটিকে দরবারের অন্যতম আমীর করে নিলাম।

শাহজাদী কুর্নিশ জানিয়ে বললো, আপনার আদেশ শিরোধার্য জাঁহাপনা। এরপর থেকে আপনার ভায়রার প্রতি আর কোনও খারাপ আচরণ করবো না কথা দিচ্ছি।

সুলতান বললো, যাক তুমি আমার বুক থেকে একটা ভারি বোঝা নামিয়ে দিলে।

শাহরাজাদ থামলো। শারিয়ার বললো, এরপর আর একজনের কাহিনীটা শোনাবে না?

শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা—হুকুম করলেই শোনাতে পারি।

এরপর শাহরাজাদ তৃতীয় পাগলের ইতিবৃত্তান্ত বলতে শুরু করে ঃ

তৃতীয় পাগল তার কাহিনী বলতে শুরু করলো ঃ

আমি যখন খুব ছোট, সেই সময় আমার বাবা-মা মারা যায়। নিতান্তই গরীব ছিলো আমার বাবা। সুতরাং অন্যের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে বড় হতে লাগলাম আমি।

লেখা-পড়া শেখা হলো না। দয়া করে তারা যা খেতে-পরতে দিত তাই খেয়ে-পরে কোনও রকমে পরগাছার মতো বাড়তে থাকলাম। এইভাবে বারোটা বছর কেটে গেলো।

একদিন একটা পড়োবাড়ির ভিতরে ঢুকে চড়ুইপাখী তাড়া করতে করতে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধকে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। এরকম একটা জনমানব-বর্জিত নির্জন পুরীতে কোনও মানুষ বাস করতে পারে, ভাবতে পারলাম না। মনে হলো, নিশ্চয়ই ওটা কোনও দৈত্য হবে। ভয়ে পালাবার জন্যে ছুট দিতে গিয়ে বাধা পেলাম।

—এই খোকা, শোনো শোনো, ভয় কি? এদিকে এসো। আমি কি বাঘ ভালুক নাকি? তোমাকে খেয়ে ফেলবো?

ছুটে পালাতে গিয়েও বৃদ্ধের কথায় থমকে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ আবার ডাকলো, কাছে এসো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো তেতাল্লিশতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

বৃদ্ধ কাছে ডেকে বললো, আমাকে ভয় করছ কেন অত। দেখছ না, আমি একজন বুড়ো ফকির মানুষ। ভাবছ, কোন জীন দৈত্য কিনা? না না, ওসব কিছু নই। তোমারও কোনও ভয় নাই। আমার কাছে এসো।

আমি ভরসা পেয়ে এগিয়ে গেলাম। বৃদ্ধ বলতে থাকলো, বুড়ো হয়েছি, বাবা। আজ বাদে কাল মরে যাবো। কিন্তু মুখে একটু পানি দেবার মতো আপনজন কেউ নাই আমার। তুমি আমার কাছে থাকবে বেটা। তোমাকে আমি নিজের ছেলে বলে বুকে টেনে নেব। তোমাকে আমি আমার বিদ্যা শিখিয়ে যাবো। আমি যা জানি সব তোমাকে দিয়ে যাবো।

বৃদ্ধের স্নেহ আদরে আমার মাতৃ-পিতৃহারা হৃদয় বিগলিত হয়ে গেলো। সেই থেকে আমি ঐ পড়োবাড়িতে ওর আশ্রয়ে রয়ে গেলাম।

একদিন বৃদ্ধ আমাকে ভিক্ষে করে কিছু আহার্য সংগ্রহের জন্য মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বললো। যারা নামাজ পড়তে আসে তারা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য দীন-দুঃখীদের দু' চার দিরহাম দান-খয়রাত করে থাকে।

সেদিন মসজিদের সামনে ভীষণ ভীড়। লোকে লোকারণ্য। সুলতানের সিপাই সান্ত্রীরা জনতার ভীড় সরাতে ব্যস্ত। আমি উৎসুক হয়ে নিগ্রো খোজার ধমক উপেক্ষা করে আরও খানিকটা গিয়ে ফটকের একপাশে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো এক অপ্সরী তুল্যা সুলতান কন্যা। তার রূপের বর্ণনা কি দেব, জাঁহাপনা! আমার চোখে ঝলসে গেলো সেই মুহূর্তে। উফ্, সে কি রূপের জেল্লা! সমস্ত হৃদয়মন উদ্বেল হয়ে উঠলো আমার। কেন জানি না, এই বয়সেই আমার দেহে কামনার বহ্নি জ্বলে উঠলো ওকে দেখে। ভাবলাম, বৃথাই আমার জীবন। দুনিয়াতে ভোগ করার এমন সব বস্তু আমাদের একেবারে নাগালের বাইরে।

বিষণ্ণ মনে ফিরে এলাম পড়োবাড়িতে। কেন জানি না, কিছুই আমার ভালো লাগছিলো না। বুকের মধ্যে কেমন হু হু করতে লাগলো।

আমার অবস্থা আঁচ করে বৃদ্ধ আমাকে কাছে ডেকে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলো, কি বেটা কি হয়েছে? অমন মন-মরা হয়ে শুয়ে পড়লে কেন?

আমি বললাম, না, কিছু না।

বৃদ্ধ কিন্তু সে কথায় তুষ্ট হলো না, তুমি আমার কাছে কিছু গোপন করো না, বাছা। আমি সব জানতে পারি।

এবার আমি কেঁদে ফেললাম। সব কথা তাকে খুলে বললাম।

—এর পর শাহজাদীকে না পেলে আমি আর বাঁচবো না; বাপজান। কেন বলতে পারবো না, আমার দেহমন অসাড় হয়ে আসছে তাকে দেখার পর থেকে।

বৃদ্ধ আমাকে নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলো, ওরা আমির বাদশা, আর আমরা ফকির দরবেশ। ওদের দিকে নজর রাখতে নাই বাবা। তাতে কখনও শুভ হয় না। ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। দু'টো আলাদা জাত। একসঙ্গে মিল খায় না কোনও দিন। আমরা যেমন দীন দরিদ্র—তেমনি সামান্যয় সন্তুষ্ট থাকতে হয় আমাদের।

আমি বললাম, তা কেন হবে? আমিও তো মানুষ?

—কিন্তু গরীব যে! ওরা সুলতান বাদশাহ—আমির আদমী, প্রচুর আছে ওদের। তাই ওদের সঙ্গে আমাদের খাপ খেতে পারে না। তুমি নিজেকে সংযত কর বাবা। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার স্বপ্ন দেখো না।

আমি গোঁ ধরে রইলাম, না, বাপজান। আপনার কথা মানতে পারছি না। প্রাণ যায় যাক, আমার একমাত্র পণ ঐ শাহজাদীর সঙ্গে অন্তত একটিবার আমি মিলিত হবো।

বৃদ্ধ প্রমাদ গুণলো। ছেলে নাছোড়বান্দা, তাই সে আমাকে তুষ্ট করার জন্যই বললো, আমি একটি তুক জানি। সুর্মা আছে আমার কাছে। ওটা চোখে লাগালে তোমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। সোজা তুমি প্রাসাদের হারেমে ঢুকে যেতে পারবে। তোমার দেহমন আকুল হয়ে উঠেছে শাহজাদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। তাই এ সুর্মা মাত্র একবারের জন্য তোমাকে আমি পরিয়ে দেব। কিন্তু কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর বেটা। আমার ইন্তেকালের দিন এগিয়ে এসেছে। সামনের জুম্বাবার আমি দেহ রাখবো। এই পোড়োবাড়িরই একপ্রান্তে আমাকে সমাহিত করবে তুমি। তারপর এই সুর্মা চোখে লাগিয়ে শাহজাদীর ঘরে চলে যেও। তবে খেয়াল রেখ, যে রাতে যাবে সেই রাতেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে আবার রাতের অন্ধকারেই বেরিয়ে চলে আসবে, কেমন?

আমি বললাম, তাই হবে বাপজান।

এর পর শুক্রবার দিন সকালে বৃদ্ধ-তার কথামতো দেহ-রক্ষা করলো। আমিও আমার ওয়াদা মতো ঐ ভাঙ্গা বাড়িরই একপ্রান্তে তাকে সমাহিত করলাম।

সেইদিনই সন্ধ্যার পরে সেই সুর্মা চোখে লাগিয়ে পথে বের হলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। চলতে চলতে এক সময় প্রাসাদের প্রধান ফটকে এসে হাজির হলাম। প্রহরী তখন চরস খেয়ে বুঁদ হয়ে ঝিমোচ্ছিল। তার কাছে ঘেঁষে আমি ওর ঘাড়ের নিচে সুড়সুড়ি দিলাম। লোকটা বিরক্ত হয়ে চোখ মেলে তাকালো। একবার আশে-পাশে দেখে নেবার চেষ্টা করলো, কেউ আছে কিনা। কাউকে দেখতে না পেয়ে, একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে উঠলো, অদৃশ্য মশাদের উদ্দেশে, তেরি—

আমার তখন সে কি আনন্দ! সোজা হারেমে ঢুকে পড়লাম। বাইরে সে কি কড়া প্রহরা। কিন্তু তখন আর কাকে পরোয়া করি? কেউ তো আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারছে না।

সোনার পালঙ্কে মখমল-শয্যায় শায়িত ছিলো সে। একটি মাত্র ফিন ফিনে পাতলা শেমিজ ছাড়া পরনে কোনও অঙ্গবাস ছিলো না ওর। খুব ভালো করে নজর না করলে সে-শেমিজও চোখে পড়বে না কারো।

কি সুন্দর ওর নগ্ন নির্জন দেহখানি। যেন একখানি বেহালা। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম ওর পীনোন্নত ছোট ছোট স্তন দু'টির দিকে। অজান্তেই কখন আমার হাত দু'খানা ওর বুকে রেখেছিলাম বুঝতে পারিনি। চৈতন্য ফিরে পেলাম, শাহজাদীর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় টুক করে হাত দু'খানা সরিয়ে নিলাম আমি। একবার মাত্র সে চোখ মেলে তাকিয়ে বন্ধ করে নিলো। আবার একটু পরেই ঘুমে এলিয়ে পড়লো আবার।

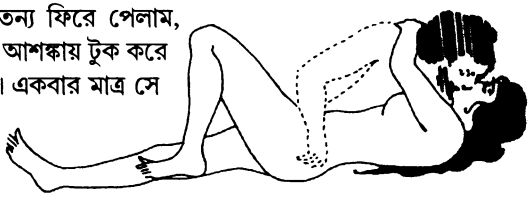

এবার আমি অতি সন্তর্পণে পালঙ্কের উপরে উঠে পড়লাম। আলতোভাবে শাহজাদীর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন বুঝলাম সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে তখন—

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি শাহজাদীর পাশে শুয়ে আছি আমি। ভেবেছিলাম, বেশ খানিকটা অন্ধকার থাকতে সকলের অজান্তে প্রাসাদ থেকে কেটে পড়বো। কিন্তু তা আর হলো না।

দরজা ঠেলে শাহজাদীর সহচরীরা ভিতরে ঢুকলো। আমি পালঙ্ক ছেড়ে নিচে নেমে ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শাহজাদীকে ঘুম ভাঙ্গাতে এসে প্রধান পরিচারিকা আঁৎকে উঠলো।

—সর্বনাশ! একি কাণ্ড! শাহজাদীর জঙ্ঘায় রক্তের দাগ! সঙ্গে সঙ্গে হারেমের বুড়ি সর্দারণীকে ডাকা হলো। সে পরীক্ষা করে বললো, শাহজাদীর সতীচ্ছেদ হয়ে গেছে। এই হারেমে এ কাণ্ড ঘটলো কি করে? এখানে পরপুরুষ এলো কোথা থেকে?

শাহজাদীকে জাগানো হলো। সে-ও বললো, কি জানি, রাতের অন্ধকারে ঘুমের ঘোরেই আমি বুঝতে পারছিলাম, কে যেন আমার শরীরের ওপরে চেপে বসেছে। ছাড়াবারও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি।

ভয়ে বুক দুরু দুরু করতে লাগলো সহচরীদের। এখন যদি সুলতান জানতে পারেন, গর্দান যাবে তাদের।

একজন বাঁদী শাহজাদীর খাবারের থালাটা এনে মেলে ধরলো। কাল রাতে শাহজাদীর জন্যে খানা-পিনা এনে রেখেছিলাম। কিন্তু শাহজাদীর তবিয়ত ভালো ছিলো না বলে তিনি কিছু খেলেন না। থালাখানা টেবিলের ওপরে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। এখন দেখছি, সবই খেয়ে গেছে কে! বুড়ি বললো এ নির্ঘাৎ কোনও জীন দৈত্যের কাণ্ড। তা ছাড়া কার সাধ্য এই দুর্ভেদ্য

হারেমে ঢুকতে পারবে। তবে বাছাধন, মনে হচ্ছে, এখন পালাতে পারেনি। এই ঘরেরই কোনও খানে লুকিয়ে আছে। তোমরা এক কাজ কর, উটের গোবর-ঘুঁটে এখানে ডাই কর এই ঘরের মাঝখানে। তারপর আমি সব ব্যবস্থা করছি।

সর্দারণীর আদেশে কয়েক ঝুড়ি উটের গোবর-ঘুঁটে এনে স্তূপীকৃত করা হলো ঘরের মেঝে। বুড়িটা নুড়ো জ্বেলে দিলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সারাঘর ভরে গেলো। বুড়ি বললো, দরজা জানলা সব বন্ধ করে শাহজাদীকে সঙ্গে নিয়ে তোমরা সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। তারপর আমি যখন ডাকবো তখন আসবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ার গমকে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো আমার। চোখ দু'টো জ্বলতে লাগলো। আমি দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে ডলতে লাগলাম চোখের পাতা।

এবং এরপর যা অবশ্যম্ভাবী ফল হতে পারে তাই হলো। আমার হাতের ডলায় চোখের সুর্মা গেলো মুছে। আর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেলো আমার তুক। আমি দৃশ্যমান হয়ে পড়লাম।

বুড়ি আমাকে দেখতে পেয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো, কে আছ, শিগ্গির ছুটে এসো, জীন ধরা পড়েছে।

হুড়পাড় করে একপাল নিগ্রো খোজা খাড়া উঁচিয়ে ঢুকে পড়লো ঘরে। তখন আমার অবস্থাটা কি হতে পারে আশা করি আঁচ করতে পারছেন, জাঁহাপনা।

নিগ্রো নফরগুলো আমাকে জাপটে ধরলো।

—কে তুমি? সত্যি করে বলো? না হলে এখুনি কোতল করে ফেলবো।

আমি বললাম, আমাকে মেরো না। নেহাত ঘটনাচক্রে আজ আমি তোমাদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমাকে যদি জানে মারো, তবে এও বলে রাখছি, আমার ভাই জীন-সম্রাট তোমাদের বংশ নির্বংশ করে দেবে।

দেখলাম আমার এই মিথ্যে শাসানীতে ওরা একটু থতমত খেয়ে গেলো। বুড়ি বললো, ঠিক আছে, ওকে জানে মারার দরকার নাই। তবে মারিস্থানে কয়েদ করে রেখে দাও আপাততঃ। পরে বিচার করা যাবে।

তৃতীয় পাগল তার কাহিনী শেষ করে সুলতান মামুদের দিকে করুণভাবে তাকালো। আমার গোস্তাকি মাফ করুন, জাঁহাপনা। কামনার বশে যে অপরাধ আমি করেছি তার জন্য আমি অনুতপ্ত।

সুলতান ওকে শৃঙ্খল মুক্ত করার আদেশ করলেন।

—তুমি যার সঙ্গে সহবাস করেছ, সে আমার সবচেয়ে ছোট্ট শ্যালিকা। যাই হোক্ তোমার দ্বারা যখন তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়েছে তখন তোমাকে শাদী করতে হবে ওকে। এই আমার হুকুম।

—জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য।

সুলতান মামুদ বললেন, আজ থেকে তুমিও হবে আমার দরবারের এক মহামান্য আমির। কি, ঠিক আছে?

—সুলতানের যা অভিরুচি—

শাহরাজাদ বললো, তিন পাগলের কাহিনী এখানেই ইতি। এরপর আপনাকে নতুন কিস্‌সা শোনাবো জাঁহাপনা, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

অনেক অনেক দিন আগে পারস্যের কোনও এক শহরে কাসিম ও আলিবাবা নামে দুই ভাই বাস করতো।

ওদের বাবা নেহাতই এক সাধারণ গৃহস্থ মানুষ ছিলো। সে যখন মারা গেলো, দুইভাগে সামান্যই পেলো ওরা পিতৃসম্পদ!

কিছুদিন পরে দুই ভাই-ই একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লো। দিনান্তে দু'খানা রুটির সংস্থানও আর রইলো না।

বড় ভাই কাসিম এক ছোকরা পাগলা বুড়োর নেকনজরে পড়ে গেলো। তার দৌরাত্ম্য সহ্য করে দাঁত মুখ কামড়ে সে পড়ে রইলো বুড়োর লেজুড় ধরে। বুড়োটা কাসিমকে সত্যিই ভালোবাসতো। তাই, তার নিজের বলবীর্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যখন বুঝতে পারলো সবই ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেছে তখন সে সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে কাসিমকে শাদী দিয়ে দিলো। মেয়েটির সঙ্গে সে নগদ বেশ কিছু অর্থ এবং বাজারে একখানা সওদাগরী দোকানেরও মালিক হয়ে গেলো। এইভাবে সে দারিদ্র্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো একদিন।

আলিবাবা একটু ভিন্ন ধাঁচের ছেলে। সে সৎভাবে খেটে খেতে চায়। তাই সে বনে বনে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে আহার্য সংগ্রহ করতে লাগলো।

আলিবাবার কোনও বাবুগিরি ছিলো না। খুব মিতব্যয়ী ছেলে সে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে যা রোজগার করে তার নামমাত্র খানা-পিনায় খরচ করে বাকীটা সে সযত্নে জমিয়ে রাখে।

কিছুদিন বাদে আলিবাবা তার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটি গাধা কিনলো। কিছুদিন পরে একটি এবং তারও কিছুদিন পরে আরও একটি গাধার মালিক হলো সে।

প্রতিদিন গাধা তিনটিকে সঙ্গে নিয়ে সে বনে যায়। তাদের পিঠে চাপিয়ে বেশ মোটা মোটা কাঠ লকড়ি নিয়ে শহরে ফিরে আসে।

তিন তিনটি গাধার মালিক হওয়ার পর কাঠুরেদের মধ্যে ভীষণ আদর ইজ্জত বেড়ে গেলো আলিবাবার। এক সতীর্থ কাঠুরে তার কন্যাকে শাদী করার জন্য প্রস্তাব পেশ করলো আলিবাবার কাছে। বললো, দেনমোহর হিসেবে ঐ গাধা তিনটে শাদীনামায় লিখে দিলেই যথেষ্ট হবে।

বাবা বিশেষ গরীব, শাদীর সময় মেয়েকে কিছুই দিতে পারলো না কাঠুরে। যাক্, ও নিয়ে ভেবে কি লাভ। আল্লাহর মেহেরবানী থাকলে গরীবের বড় লোক হতে আর কতটুকু সময় লাগে?

শাদীর কয়েক বছরের মধ্যে আলিবাবার বেশ কয়েকটি ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাকাচ্চা হলো। আনন্দে ভরে উঠলো ওদের সংসার। নাই বা থাকলো প্রাচুর্য, যা জুটছে, তাই যদি খুশি চিত্তে ভোগ করতে পারা যায় তার চাইতে বেশি আনন্দ আর কোথায় মিলবে?

একদিন আলিবাবা যথা নিয়মমতো বনে ঢুকে গাধা তিনটিকে চরতে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো কাঠের সন্ধানে। ঘুরতে ফিরতে এক সময় গভীর গহনে ঢুকে পড়লো। অবশ্য সেখান থেকেও সে বেশ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল গাধাগুলোর সুললিত কণ্ঠস্বর।

কিন্তু একটুক্ষণ পরে গর্দভ রব ছাপিয়ে অশ্বখুরধ্বনি শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো আলিবাবা। এই বনাঞ্চলে এমন অশ্ববাহিনীর আগমন ঘটতে পারে কি উদ্দেশ্যে? আলিবাবা আঁচ করতে পারে না। ভয়ে শিউরে উঠলো সে। নিশ্চয়ই কোনও দুর্ধর্ষ দস্যুদল অথবা ফৌজবাহিনী হতে পারে।

তাড়াতাড়ি একটা ঝাঁকড়া গাছের গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো সে। একটার শাখা-ডালে বসে নিজেকে পাতার আড়ালে ঢেকে, নিচের বনপ্রবেশ নিরীক্ষণ করতে লাগল।

একটু পরে দেখলো, একদল ডাকাত এসে থামলো তার গাছের নিচে। টুপটাপ করে নেমে পড়লে তারা গাছতলার তৃণ-ঘন সবুজ শয্যায়।

লোকগুলোর চেহারা দেখলে পিলে চমকে ওঠে। উফ্, কি তাদের দৈত্যসদৃশ আকৃতি। চোখগুলো যেন সব জ্বলন্ত ভাঁটা। সকলের দাড়িই দু'ভাগ করে দু গালের দিকে পাকানো, মুখের চোয়াল কঠিন। ভয়াল ভয়ঙ্কর ওদের চাহনি। মনে হয়, অনেক চুরি ডাকাতি

রাহাজানি নরহত্যার ফেরারী আসামী এরা। ওদের যে সর্দার তার মুখের দিতে তাকাতে পারে না আলিবাবা। অমন কুৎসিত কদাকার বীভৎস মানুষ কখনও কল্পনা করতে পারেনি সে।

জীনে ঝোলানো গোটাকয়েক থলে খুলে আনলো তারা। এক গোছা যবের শুকনো রুটি। গোগ্রাসে সবাই খেতে লাগলো সেগুলো। গাছের ওপর থেকে আলিবাবা গুণে দেখলো ওরা মোট চল্লিশজন।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো বাহান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

খানাপিনা শেষ করে চল্লিশ চোর ঘোড়ার পিঠ থেকে বাক্স প্যাঁটরাগুলো নিজের নিজের মাথায় তুলে গভীর জঙ্গল ভেঙ্গে এগোতে লাগলো বনের মধ্যে। আলিবাবা গাছের শাখায় বসে দেখতে থাকলো ডাকাতগুলোর ক্রিয়াকাণ্ড। সেই পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে থামলো তারা। সবাই সামানপত্র নামিয়ে সার হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। চোর সর্দার পাহাড়ের দিকে মুখ করে চিৎকার করে উঠলো, 'চিচিং ফাঁক'।

এবং তখুনি দেখা গেলো পাহাড়ের তলদেশ থেকে মাটি দু' ভাগ হয়ে সরে গেলো খানিকটা। সর্দারের নির্দেশে এক এক করে সব সাগরেদরা সামানপত্র তুলে নিয়ে ফাটলের গর্তে ঢুকে গেল! সব শেষে নামলো সর্দার। আবার আওয়াজ উঠলো 'চিচিং বন্‌ধ্'।

আর কি আশ্চর্য, আলিবাবা প্রত্যক্ষ করলো ফাটল বন্ধ হয়ে জোড়া লেগে গেলো পলকের মধ্যে।

আলিবাবা ভাবলো, যাক বাবা, ওরা তাকে লক্ষ্য করেনি, এই যা রক্ষে!

একই ভাবে গাছের ডালে বসে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

অনেকক্ষণ পরে প্রচণ্ড শব্দ কানে এলো। আলিবাবা দেখলো, পাহাড়ের তলার ঐ জায়গাটা আবার দু'ভাগ হয়ে গেছে। এবং এক এক করে ঐ চল্লিশ জন চোর তাদের খালি বাক্স প্যাঁটরাগুলো নিয়ে আবার ওপরে উঠে আসছে।

সকলে উঠে আসার পর সর্দার গুণে দেখলো, ঊনচল্লিশ জনই উঠে এসেছে কিনা। তারপর সে আবার হাঁক ছাড়লো, 'চিচিং বন্‌ধ্'।

তৎক্ষণাৎ ফাটলের মুখ জোড়া লেগে গেলো।

ডাকাতগুলো আবার আলিবাবার গাছের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেলো ওর। যদি কোন রকমে ওরা আলিবাবার অবস্থিতি টের পায় তবে আর রক্ষা রাখবে না, একেবারে কোতল করে দেবে।

কিন্তু না লোকগুলো এসে ওদের ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে আবার বন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলো।

প্রাণে ভয়, অথচ অদম্য কৌতূহল মনে। আলিবাবা সেই মুহূর্তে ভুলে গেলো ওর তিনটি গাধার কথা, ভুলে গেলো ওর বিবি-বাল-বাচ্চাদেরও। গাছ থেকে নেমে সে উঁকি ঝুঁকি মেরে এদিক ওদিক খুব ভালো করে দেখে নিলো। নাঃ, কেউ কোথাও নাই। ডাকাতগুলো এতক্ষণে বন পেরিয়ে শহরের সীমায় পৌঁছে গেছে হয়তো বা।

পায়ে পায়ে সে জঙ্গল ভেঙ্গে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু কি আশ্চর্য, কোথাও তো ফাঁটলের রেখামাত্র দেখতে পেলো না আলিবাবা। কিন্তু সে নির্ঘাৎ জানে, স্বচক্ষে দেখেছে, ঠিক এইখানেই চোরগুলো এসে দাঁড়িয়েছিলো। এবং এখানেই একটা গর্তে নেমে গিয়েছিলো তারা।

তবে কি পুরো ব্যাপারটাই ভেল্কি! তবে কি 'চিচিং ফাঁক' কথাটার মধ্যেই যাদুটা লুকিয়ে আছে? সেই মুহূর্তে আলিবাবা সব শঙ্কা ভয় ঝেড়ে ফেলে চিৎকার করে উঠলো, 'চিচিং ফাঁক'।

দুটি মাত্র শব্দ। কিন্তু তারই কি আশ্চর্য যাদু, সঙ্গে সঙ্গে সামনের মাটি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেলো। আলিবাবা দেখলো, বিরাট একটা গুহার মুখ ! উন্মুক্ত হয়ে গেছে ওর সামনে। কিন্তু ভিতরটা মিশমিশে কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

ভয়ে কেঁপে উঠলো আলিবাবা। দৌঁড়ে পালাবে কিনা ভাবলো। কিন্তু ভাগ্যই তাকে আটকে রাখলো সেখানে।

সাহস করে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো।

একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। নিচে একটা প্রকাণ্ড ঘর। ঘরের দেওয়ালগুলো পাথর কুঁদা। কে বা কারা পাহাড়ের কঠিন শিলা কেটে বানিয়েছে।

আল্লাহর নাম স্মরণ করে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো। ওপরের ছাদটাও এবড়ো খেবড়ো পাথরের।

ঘরের ঠিক মাঝখানে রাশি রাশি সামানপত্র পালা দেওয়া ছিলো। গাঁট গাঁট দামী রেশমী কাপড়, কতকগুলো বাক্সে চাঁদীর চাঁই ভর্তি, কতকগুলোয় সোনার দিনার। এছাড়া আরও কতশত দামী দামী সাজপোশাক, অলঙ্কার, নানাবিধ শখের সামগ্রী এবং খাবার-দাবার।

আলিবাবা দেখতে পেলো ঘরের এক কোণে দেওয়াল ঘেঁষে স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে হাজার হাজার জড়োয়া গহনা, মূল্যবান মণিমাণিক্য ইত্যাদি।

এক কথায় সারা ঘরময়ই ঐশ্বর্যের মেলা। পা ফেলতে গিয়ে পায়ে জড়িয়ে যায় দামী দামী হার, পায়ের মল, মাথার টায়রা, আরও কত কি! আলিবাবা ভেবে পায় না, কত সহস্র লক্ষ টাকার মূল্যবান সামগ্রী বৃত্তাকারে পড়ে রয়েছে ঘরময়। এ সব ওরা পেলো কোথা থেকে? সবই চুরি ডাকাতির ধন? ভাবতেও গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। এ সব সংগ্রহ করতে কত শত সহস্র নিরীহ মানুষকেই না খুন জখম করেছে তারা। তা না হলে এই বিপুল ঐশ্বর্য, যা কোনও সুলতান বাদশাহর ভাণ্ডারেও দুর্লভ, ওরা পাবে কোথায়?

আলিবাবা ভাবে, মাত্র চল্লিশ জন দস্যু সারাজীবন ধরে ডাকাতি রাহাজানি করে এই পর্বত প্রমাণ সম্পদ সংগ্রহ করবে কি করে? অসম্ভব, এ ধনভাণ্ডার দু'এক পুরুষের সংগ্রহে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যুগ যুগ ধরে বহু পুরুষ ধরে এসব জমা করা হয়েছে এখানে। মনে হয় ঐ ডাকাতগুলো ব্যাবিলনের সেই কুখ্যাত দস্যুদেরই বংশধর।

গুহা অভ্যন্তরে ঐ অনন্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডারের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে সেইক্ষণে আলিবাবার মনে হলো, যে ধনের সন্ধান সে পেয়েছে তা বোধহয় সম্রাট সুলেমান বা আলেকজাণ্ডারও চোখে দেখেননি কখনও!

আলিবাবা ভাবলো, তার সত্য নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং পরিবারের পরিজনদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং আল্লাই তাকে এই অপ্রতুল ইনাম-এর দরজা

খুলে দিয়েছেন। এ সম্পদ আহরণের ইতিহাস অবশ্যই রক্তে রাঙা। কিন্তু যে-শয়তান দস্যুরা ভোগ করবে বলে নির্বিচারে নরহত্যা করে ধনরত্ন ছিনিয়ে আনে তা তাদের মতো পাপাচারীদের ভোগবিলাসে আসে না কখনও। আলিবাবা এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, পাপীদের ভোগ করার কোনও অধিকার রাখেননি আল্লা। দুনিয়ার তামাম সুখসম্পদ পুণ্যাত্মদের জন্যই বরাদ্দ করে রেখেছেন তিনি। সুতরাং এ সব আমার। আমার বিবি-বাল-বাচ্চাদের সুখের জন্যই এ ধনরত্ন এখানে জমা হয়ে আছে।

একটা খাবার ভর্তি থলে মেঝেয় উপুড় করে ঢেলে দিয়ে সোনার দিনারে ভরে নিলো আলিবাবা। চাঁদী-টাঁদীর দিকে সে নজর দিলো না। কারণ এক বস্তা সোনার দিনার বয়ে নিয়ে যাওয়াই কষ্টকর, অন্য কিছু নেবে কি করে?

বস্তাটা কাঁধে তুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে আলিবাবা। গুহার মুখের ধাপে নামিয়ে রেখে আবার নিচে নেমে যায়। আরও একটা বস্তা খালি করে সোনার মোহর এবং হীরে মণিমাণিক্য বোঝাই করে। এইভাবে এক এক করে অনেকগুলি বস্তা সে মহামূল্যবান ধনরত্নে বোঝাই করে সিঁড়ির ওপরের ধাপে নিয়ে আসে। আলিবাবা ভাবে, আর না, তিনটে গাধা এর বেশি ভার বইতে পারবে না। আজ এই পর্যন্ত থাক। পরে আবার আসা যাবে।

এর পর সে হাঁক ছাড়ে 'চিচিং ফাঁক'।

আর সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখটা খুলে যায়।

আলিবাবা ওর গাধা তিনটাকে নিয়ে আসে। বস্তাগুলো সমান ভাগ করে চাপিয়ে দেয় ওদের পিঠে। তারপর, 'চিচিং বন্‌ধ্' বলতেই গুহার মুখ নিখুঁতভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর গাধা তিনটেকে নানারকম শ্রুতি-সুখকর আদর সোহাগের সম্বোধন করে তাড়াতে তাড়াতে শহরে ফিরে আসে সে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো তিপ্পান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বাড়ির সামনে এসে আলিবাবা দেখলো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কেন জানি না, আপনা থেকেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'চিচিং ফাঁক'। আর তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেলো। গাধাগুলোকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলো আলিবাবা। পিছন ফিরে বললো, 'চিচিং বন্‌ধ'। এবং তখনি বন্ধ হয়ে গেলো দরজাটা।

আলিবাবার বিবি গাধার সুমধুর আওয়াজ শুনে ঘরের বাইরে এসে তাজ্জব বনে গেলো।

হায় আল্লা, সদর তো নিজে হাতে বন্ধ করেছিলাম আমি, তুমি ঢুকলে কি করে গো?

আলিবাবা বিবির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললো, এই বস্তাগুলো আল্লাহর দেওয়া ইনাম, বিবিজান। একটু হাত লাগাও, এগুলোকে ঘরে তুলি।

আলিবাবার বিবি বস্তায় হাত দিয়েই বুঝতে পারে, টাকায় ভর্তি। সব যে সোনার মোহর ভাবতে পারে না সে। মনে করে হয়তো বা তামার চাকতি হবে। ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে! তবে কি তার স্বামী কোনও ডাকাত দলের সামিল হয়েছে? সর্বনাশ!

—একি করেছ গো, শেষ পর্যন্ত চোর ডাকাতের দলে নাম লিখিয়েছ? কেন মোটা ভাত মোটা কাপড় কি আমাদের জুটছিলো না? না, গতরে তোমার ঘুন ধরেছে! হায় আল্লাহ, এ কি করলে তুমি, আমার দুধের বাচ্ছারা এবার না খেতে পেয়ে মরবে যে? এতো পাপ কি সইবে ভেবেছ, কতকাল তুমি সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে কাটাতে পারবে?

আলিবাবার বিবি কপাল চাপড়তে থাকে। আলিবাবা রাগে দাঁত কড়মড় করে ওঠে, চুপ কর শয়তান মাগী, কী আবোল তাবোল বকবক করছিস?

—এমন অলক্ষুণে জিনিসপত্র ঘরে আনলে কেন তুমি? এতো পাপ কি সইবে? আমার বালবাচ্চাদের অমঙ্গল হবে যে গো—না না, আমার কথা শোনো, আবার এগুলোকে গাধার পিঠে চাপিয়ে তুমি বাড়ির বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসো। আমি তোমার দু'টি পায়ে ধরছি চাচার পো, আমার মিনতিটুকু রাখ।

আলিবাবা আর ধৈর্য রাখতে পারে না, ইয়া আল্লা, এ কি নির্বোধ মেয়েছেলের হাতে পড়েছি আমি। আচ্ছা, তোমার কি ধারণা, এই বস্তাগুলো আমি চুরি করে এনেছি? এমন জঘন্য নীচ ধারণা তোমার জন্মালো কি করে বিবিজান? তবে জেনে রাখ, তেমন কোনও অধঃপতন আমার ঘটেনি। আজ সকালে বনে কাঠ কাটতে গিয়ে এগুলো পেয়ে গেছি আমি। নাও ধর, এগুলো ঘরে তুলি আগে, তারপর তোমাকে সব বৃত্তান্ত খুলে বলছি।

ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর বিছিয়ে বস্তাগুলো সব ঢেলে দিলো আলিবাবা। তারপর সেই মোহরের টিলার মাথায় উঠে বসে গর্বে বুক ফুলিয়ে ঐ রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের কাহিনী সবিস্তারে শোনালো তার বিবিকে।

সব শোনার পর বিবির মন থেকে ভয়ের কুয়াশা কেটে গেলো। খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো সে।

ওঃ কত টাকা! কত সোনা! মোহর! উফ্, আমরা আর গরীব থাকবো না, না গো? খু—ব, খুব, বড়লোক হয়ে যাবো তাই না? খোদা মেহেরবান, দেখ, সৎপথে খেটে রোজগার করে খেলে আল্লাহ এমনি ভাবে দু'হাত ভরে দেন একদিন। কিন্তু আমি ভাবছি, এতো টাকা পয়সা ঐ শয়তানরা কত মানুষজনকে জখম করেই না জমিয়েছিলো! তা অত পাপের সম্পত্তি কি ভোগে লাগে?

আলিবাবার বিবি একটা একটা করে মোহরগুলো গুনতে বসে যায়। আলিবাবা হাসে, দূর পাগলী, ও কি করছো? ঐভাবে সারাদিন রাত ধরে গুনেও তুমি শেষ করতে পারবে না। রাখ, ওসবের দরকার নাই। এখানে ঘরের মেঝেয় এভাবে ফেলে রাখলে তো চলবে না। এক কাজ কর রসুইঘরের মেঝেয় একটা বড় করে গর্ত কর। ওখানে পুঁতে রাখবো সব। চটপট কর, তা না হলে বলা যায় না হুট করে হয়তো পড়শীদের কেউ এসে পড়তে পারে। তা হলেই পাঁচ কান হতে হতে কোতোয়ালের কাছে চালান হয়ে যাবে খবর।

কিন্তু আলিবাবার বৌ সে কথায় তেমন কোনও গুরুত্ব দিলো না। তার দারুণ কৌতূহল, সে জানতে চায়, কত টাকার সে মালিক হয়েছে আজ।

ঠিক আছে, গুনতে না পারি ওজন করে দেখে নিই? তুমি একটু দাঁড়াও, পাশের বাড়ি থেকে একটা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসি আমি। তুমি ততক্ষণে গর্তটা খুঁড়তে থাক, তোমার খোঁড়া শেষ হতে হতে আমি মেপে শেষ করে দেব। রোজ রোজ তো আর গর্ত খুঁড়ে তোলা যাবে না, ছেলেমেয়েদের জন্যে কি সম্পত্তি কতটা রেখে দিলাম তার হিসেব তো একটা জানা থাকা চাই!

যদিও ব্যাপারটা নিরর্থক, তবু বিশেষ প্রতিবাদ করলো না আলিবাবা। বললো, ঠিক আছে! ছুটে যাও, নিয়ে এসে চটপট ওজন করে ফেলো, আমি গর্তটা খুঁড়ে ফেলছি তাড়াতাড়ি। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার, কাউকে কিছু বলবে না, কাকপক্ষীটি টের পায় না যেন।

আলিবাবার বৌ সোজা কাসিমের বাড়িতে যায়। কারণ ওর বাড়িটাই ওদের লাগোয়া। কাসিমের বৌটা কুৎসিত কদাকার। যেমন দেখতে তেমন রুচি প্রকৃতিতে। ভুলে সে কখনও আলিবাবার বাড়ির দিকে পা মাড়ায় না। তার প্রধান কারণ, আলিবাবা গরীব, যদি কখনও কিছু চেয়ে বসে!

আলিবাবার বিবি সেধেই আলাপ জমাতে যায়। কিন্তু কাসিম-গৃহিণী তেমন পাত্তা দেয় না। ভাবে, হয়তো বা কিছু চাইতে এসেছে।

—তোমাদের দাঁড়িপাল্লাটা একটু দেবে দিদি? এখুনি দিয়ে যাবো।

কাসিমের বৌ দাঁড়িপাল্লার কথা শুনে কৌতূহল হয়ে মুখ তোলে, অবাক হয়, সে জানে আলিবাবা ভীষণ গরীব, দিন আনে দিন খায়। আজ হঠাৎ দাঁড়িপাল্লার কি দরকার পড়লো তার!

—কি এমন সুলতান বাহশাহর ধন ঘরে এনেছে রে তোর সোয়ামী, যে দাঁড়িপাল্লার দরকার হলো? তা ছোট পাল্লাটা নিবি না বড়টা দেব?

কাসিম-বিবি বাজিয়ে দেখে নিতে চায়, আলিবাবা কি পরিমাণ মালপত্তর ঘরে এনেছে।

—ছোটটা হলেই চলবে দিদি।

কাসিমের বৌ রসুইখানায় ঢোকে পাল্লাটা বের করার জন্য। মেয়েটা শয়তানের ধাড়ি। প্যাঁচে প্যাঁচে বদবুদ্ধি। একটুখানি আটারডেলা দাঁড়ির পাল্লায় এঁটে দিলো সে। উদ্দেশ্য আলিবাবা যে দানা শস্য ওজন করবে তার দু'চারটে পাল্লায় আটকে থেকে যাবে। এবং তা দেখে সে জানতে পারবে কি বস্তুর সে ওজন করেছিলো, অথবা আদৌ করেনি কিছু।

—এই নে ভাই। ওপরের মই-এ তোলা ছিলো, তাই পাড়তে একটু দেরি হয়ে গেলো।

আলিবাবার বিবি পাল্লাটা এনে চটপট মাপতে লেগে গেলো। এক একটা পাল্লা মাপা হয় আর এক একটা কাঠকয়লার দাগ কাটে সে মেঝেয়। এইভাবে অনেক তাড়াহুড়ো করে মাপা সত্ত্বেও সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়। আলিবাবার গৃহিণী ভাবতে পারেনি ওজন করতে এতো সময় লাগবে। কাসিম-বৌকে সে বলে এসেছিলো একটু পরেই ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ইস্, বৌটা কি ভাবছে তার সম্বন্ধে।

যাই হোক, ওজন শেষে রসুইখানার গর্তে বোঝাই করে মাটি চাপা দিয়ে দিলো দু'জনে। তারপর পাল্লাটা তুলে নিয়ে ছুটে গেলো সে কাসিমের বাড়িতে।

—এই যে দিদি। বড্ড দেরি হয়ে গেলো। কিছু মনে করো না যেন।

আলিবাবার বিবি ঘরে ফিরে এলো, কিন্তু সে বুঝতেই পারলো না কাসিমের বৌ-এর কারসাজির ফাঁদে সে পা দিয়েছে। পাল্লায় লেপে দেওয়া আটার সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে গেছে একটি সুবর্ণমুদ্রা।

আলিবাবার বিবি ফিরে গেলে কাসিমের ধূর্ত বৌটা পাল্লাটা মেলে ধরে দেখলো, না, গম নয়, যব নয়, ভুট্টাও নয়, আটার সঙ্গে সেঁটে একটি সোনার মোহর ঝলমল করছে।

ঈর্ষা আর পরশ্রীকাতরতার আগুন দপ করে জ্বলে উঠলো তার বুকের পাঁজরায়।

—সোনার মোহর! এতো টাকার মালিক সে, গুনে শেষ করতে পারবে না, পাল্লা দিয়ে ওজন করতে হয়? ওরে বাবা,—আমার কি হবে রে—

কাসিমের বৌ-এর মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। হা-হুতাশে পুড়ে যেতে থাকে কলিজাটা। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যায় চোখ মুখ। অনর্গল অভিসম্পাত নিসৃত হতে থাকে মুখ দিয়ে, খোদা, একমাত্র তুমিই এর বিহিত করতে পার। ঐ ছাঁটা বেহুদাটা এতো সোনা পেলো কোথায়? ওর সব যেন উচ্ছন্নে উড়ে পুড়ে যায়, আল্লাহ। তাহলে পীরের দরবারে সিন্নি দিয়ে আসবো আমি।

সারা বাড়িময় দাপাদাপি করতে লাগলো সে। প্রায় উন্মাদিনীর মতো অবস্থা।

কাসিম সন্ধ্যার অনেক পরে দোকানপাট বন্ধ করে বাড়ি ফেরে। ততক্ষণ পর্যন্ত

ধৈর্য-ধরে সে বসে থাকতে পারবে না। তাই তখুনি সে দোকানে চাকর পাঠালো, শিগ্গির যা ডেকে নিয়ে আয় তোর মনিবকে। বলো গে আমার শরীর খারাপ।

কাসিম অসময়ে দোকানপাট বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে। তাকে দেখা মাত্র কাসিমবিবির ক্রোধ, ক্ষোভ, আক্রোশ শতগুণ হয়ে শিলাবৃষ্টির মতো বর্ষিত হতে থাকে।

বিবি কেন এতো উত্তপ্ত কিছুই আঁচ করতে পারে না কাসিম। কাছে এগিয়ে এসে গলায় খুব দরদ ঢেলে জিজ্ঞেস করতে যায়, কী, কি হয়েছে জান, তোমাকে এতো উত্তেজিত দেখছি কেন?

—থাক, অত আর শুকনো সোহাগ জানাতে হবে না। বলি চোখ কানের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছ নাকি?

—কেন, কী হয়েছে কী?

—আমার মাথা হয়েছে। এই দ্যাখো, কী হয়েছে।

এই বলে সোনার মোহরটা সে কাসিমের নাকের ডগায় ছুঁড়ে মারলো।

—দেখ, চোখ মেলে চেয়ে দেখ। তোমার গুণধর ভাইটির বাড়ি থেকে খয়রাতি এসেছে আমার ঘরে। তুমি তো একখানা দোকানের মালিক হয়ে গরবে মাটিতে পা রাখ না। তোমার অহঙ্কার, তোমার মতো রোজগার আর করতে পারে না কেউ। কিন্তু ভুল, ভুল, সব তোমার মিথ্যে অহঙ্কার। তোমার ভাই-এর মাত্র তিনটে গাধা। জ্বালানীর লকড়ি বেচে খায়। তার ঘরে আজ টাকা রাখার জায়গা নাই। এতো টাকা হাতে গুনতে পারে না—আমার কাছ থেকে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে গিয়ে ওজন করে দেখতে হয়! আর তুমি? তুমি একটা অপদার্থ। আমার বাপের তৈরি করা একটা দোকান হাতে পেয়েও সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মোটা পয়সা ঘরে আনতে পার না?

কাসিম ভেবে পায় না একথার কি জবাব দেবে সে। কিন্তু জাঁহাবাজ বৌ ছাড়বার পাত্রী নয়। হিংস্র বাঘিনীর মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তার স্বামীর ওপর।

—না, চুপ করে মুখ বুজে সহ্য করা চলবে না। যাও, তোমার ভাই রত্নটিকে গিয়ে জেরা কর, কোথায় পেলো সে এতো মোহর! কী তার সূত্র, আমি জানতে চাই। সে না তোমার ভাই?

বিবির যুক্তিতর্কে কাসিম বুঝতে পারলো যে-কোনভাবেই হোক তার ভাই আলিবাবা নিজের ভাগ্য বিবর্তন ঘটিয়েছে। ভাই-এর সৌভাগ্যের কথা শুনে সেও কিন্তু খুশি হতে পারলো না। হিংসায় কাতর হয়ে পড়লো সে।

একটু পরে প্রকৃত ব্যাপারটা কি জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে সে আলিবাবার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো চুয়ান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলিবাবা তখন কোদালটা সাফ করছিলো। কোনও রকম সভ্যতা-ভব্যতার বালাই না দেখিয়ে রাগে গরগর করতে করতে কাসিম বলে, কি রে গাধার বাপ্ কী, ব্যাপার কী? আমার সঙ্গে তুই বড়লোকী দেখাতে যাস কোন সাহসে? তোর না হয় পয়সা-কড়ি হয়েছে, তা বলে দাঁড়ির পাল্লায় মোহর গুঁজে দিয়ে নবাবী চাল মারবি? এতো বড় আস্পদ্দা তোর?

আলিবাবা হকচকিয়ে যায়। ভয়ে বুক দুরু দুরু করে ওঠে। সে জানে কাসিম আর তার বিবি কি লোভী আর ধূর্ত।

—খোদা কসম, তুমি কি বলছো, বড়ভাই, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। একটু খোলসা করে বলবে, ব্যাপারটা কী? তুমি আমার সহোদর ভাই, রক্তের সম্পর্ক আছে তোমার

সঙ্গে। কিন্তু আজ কতকাল একটিবার আমাদের খোঁজ খবর নিতে আস না। আজ হঠাৎ এসেই এইভাবে রাগারাগি করছো কেন বড় ভাই। ঠিক আছে, কী জানতে চাও বলো, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কাছে কিছু গোপন করবো না।

—আলিবাবা, গর্জে ওঠে কাসিম, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। তুমি কিচ্ছু জান না বলে ন্যাকাটি সাজলে তো আমি শুনবো না। আমি জানি, কি তুমি লুকাতে চেষ্টা করছো আমার কাছে।

এই বলে সে আলিবাবার নাকের ডগার সামনে সেই মোহরটা মেলে ধরে বললো, দেখো, চিনতে পারছো? এরকম চিজ কতগুলো বাক্সে ভরেছ? চোর কাঁহিকা—। তুই আমাদের বংশের কলঙ্ক, কুলাঙ্গার।

আলিবাবা কি বলবে কিছুই ভেবে পায় না। তার বিবির হঠকারিতার জন্যই এই অপকর্মটি হয়ে গেছে।

—বড় ভাই, সব খোদার মেহেরবানী। তিনি দিলে ঘরে রাখার ঠাঁই হয় না। আর কেড়ে নিলে বাদশাহর ভাণ্ডারও শূন্য হয়ে যায়।

এরপর সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী খুলে বললো কাসিমকে। শুধু সেই চিচিং ফাঁক-এর মাহাত্ম্যটুকু গোপন রাখলো।

—তুমি আমার সহোদর ভাই, তোমার সঙ্গে আমার লুকোছাপা কিছু থাকতে পারে না, দাদা। আমি যা পেয়েছি, যা ঘরে এনে তুলেছি তাতে আমার যেমন অধিকার তোমারও তেমনি সমান অধিকার আছে। তুমি এসো, ঘরের ভিতরে এসো দাদা, সমান আধাআধি বখরা করে নিয়ে যাও। আমি তোমাকে খুশি মনে দিয়ে দিচ্ছি।

কাসিম কিন্তু ভীষণ লোভী, সে আলিবাবার প্রস্তাবে সম্মত হলো না। বললো, না, না, ওসবে আমার দরকার নাই। তুই বল, সেই গুহার মধ্যে কি উপায়ে আমি ঢুকতে পারি। তোকে আর কিছু করতে হবে না। আমার যা দরকার আমি নিজেই নিয়ে আসবো ওখান থেকে। কিন্তু হুঁশিয়ার, আমাকে ভুল পথের নিশানা বলে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করবি না। তা হলে জানে খতম করে দেব একেবারে। সোজা গিয়ে কোতোয়ালীতে এজাহার দিয়ে আসবো তোর নামে। তুই একটা মহাচোর। চুরির মাল তোর ঘরে খুঁজে পেলে তোর কি অবস্থা হবে একবার ভাব।

আলিবাবা সম্যক্ বুঝতে পারলো, কাসিমের অসাধ্য কিছুই নাই। চুরির দায়ে সে তাকে অতি সহজেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। এবং তা যদি ঘটে, তবে তার বৌ-বাল-বাচ্চাদের কি হাল হবে ভাবতেও তার বুক কেঁপে ওঠে।

আলিবাবা আর দ্বিধা না করে ঐ গুহা অভ্যন্তরে প্রবেশের চাবিকাঠি সেই চিচিং ফাঁক এবং চিচিং বন্ধ যাদুমন্ত্র দু'টি কাসিমকে বলে দিলো।

কাসিম আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করলো না সেখানে। রাতারাতি কোটিপতি কুবের বনে যাবার খোয়াবে তখন সে মশগুল। আলিবাবার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে হন হন করে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলো।

পরদিন সকাল হতে না হতে কাসিম দশটা খচ্চরের পিঠে কুড়িটা খালি জালা ঝুলিয়ে সেই জঙ্গল প্রান্তে এসে হাজির হলো। আলিবাবার পথ-নির্দেশ মতো এগোতে এগোতে এক সময় সেই পাহাড় পাদদেশের নির্দিষ্ট স্থানটিও খুঁজে পেলো সে।

কাসিমের সর্বাঙ্গ এক অভূতপূর্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের সামনে এসে পড়েছে সে। এবং এই কুবের সম্পদ সবই তার হবে। সে হবে জগতের সবচেয়ে সেরা ধনী মানুষ। উফ্ ভাবতেও সারা শরীর শির শির করে ওঠে।

আলিবাবার বর্ণনামতো গুহামুখে চিহ্নটিও সে আবিষ্কার করতে পারলো। কাসিম আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে বলে উঠলো-চিচিং ফাঁক।

আর কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে, পাহাড় পাদদেশের মাটিতে ফাটল ধরলো। ক্রমশ সে ফাটল বিস্তৃত হতে হতে একটি গর্তর মতো হয়ে গেলো।

কাসিম ঝুঁকে পড়ে দেখতে পেলো, একটা পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। আলিবাবা যেমনটি বর্ণনা করেছিলো হুবহু একই রকম সব মিলে গেলো। কাসিম আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। তড়বড় করে নেমে গেলো নিচে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফাটলটা জোড়া লেগে গুহার প্রবেশ পথ রুদ্ধ হয়ে গেলো। তা যাক, কাসিম ভাবে, খোলার যাদুও তো তার জানাই আছে, ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ নাই। এখন দেখতে হবে কোথায় কী কী

ধনদৌলত জড়ো করা আছে চারদিকে। এবং কী ভাবে সেগুলোকে বস্তাবন্দী করে ওপরে উঠানো যাবে, তারই ফন্দি ফিকির ভাঁজতে থাকলো সে।

গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্র মণি-মাণিক্যের জেল্লায় চোখে ধাঁধাঁ ধরে গেলো কাসিমের। দুনিয়াতে এতো ধনদৌলত থাকতে পারে সে কল্পনাও করতে পারেনি।

একের পর এক বস্তা বোঝাই করতে থাকলো কাসিম। শুধু সোনার মোহর, আর দামী দামী রত্ন মণি ছাড়া অন্য কিছু সে নিলো না। কতই বা নিতে পারবে সে। মাত্র দশটা খচ্চর সঙ্গে এনেছে, ওরা কত ভারই বা বইতে পারবে।

বস্তাগুলো ভরে এক এক করে টেনে এনে সিঁড়ির তলায় রাখলো কাসিম। এবার গুহার মুখ খুলে বাইরে বেরুবার পালা। কিন্তু সেই যে কী ফাঁক—দূর ছাই কিছুতেই তো মনে পড়ছে না! সর্বনাশ!

অনেক চেষ্টা করেও চিচিং শব্দটা সে কিছুতেই মনে করতে পারে না।

মুহূর্তে কাসিমের মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ভয়ে গলা কাঠ হয়ে আসে। জোরে সে চিৎকার করে ওঠে, সীম ফাঁক—

কিন্তু দরজা একটুও ফাঁক হয় না।

কাসিম আবার গর্জন করে, লাউ ফাঁক, শসা ফাঁক, ক্ষীরা ফাঁক।

কিন্তু দরজা ফাঁক হয় না। কাসিম ঘামতে শুরু করে। ভয়ে শিউরে ওঠে সে। দাঁত মুখ খিঁচে সে প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করতে থাকে সে চিচিং শব্দটি। কিন্তু দুনিয়ার যত রাজ্যের বস্তুর নাম মনে আসে শুধু ঐ চিচিং ছাড়া।

অসহায় ভাবে সে দু'হাতে কপাল চাপড়াতে থাকে। ইহা আল্লাহ, একি হলো আমার, একটু আগেও যা মুখের ডগায় ছিলো এখন দারুণ প্রয়োজনে সে কথা মনে পড়ছে না কেন? কেন?

পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটতে থাকে সে। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয় না।

হতাশায় চোখে অন্ধকার নেমে আসে। দেহ অবসাদগ্রস্ত হয়। নেতিয়ে পড়ে যায় সে

পাথরের মেঝেয়। ক্লান্তিতে শরীর অসাড় হয়ে যায়। চোখে তন্দ্রা নামে।

কিন্তু সে স্বল্পকালের জন্য। আবার সে উঠে দাঁড়ায়। স্মৃতির সঙ্গে মনের লড়াই চলে অনেকক্ষণ ধরে। কত শব্দ মনে পড়ে। কত ফলের নাম, কত শস্যের নাম, কত সব্জীর নাম, কিন্তু আসল বস্তুটির নাম আর মুখে আসে না।

কাসিম বুঝতে পারে, এ আল্লাহরই কারসাজি। তিনি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যই তার স্মৃতি থেকে শব্দটিকে লোপাট করে নিয়ে গেছেন। তার অত্যধিক লোভ লোলুপতার জন্য এ সাজার বিধান করেছেন খোদা।

ইয়া আল্লাহ, আমাকে মার্জনা কর প্রভু, আমি আর লোভ করবো না কখনও। আমাকে এই সোনার কয়েদখানা থেকে মুক্তি দাও তুমি। আমি কথা দিচ্ছি, কসম খাচ্ছি, এই সোনাদানা মণি রত্ন কিছুই আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না। আমাকে বিশ্বাস কর খোদা, আমি তোমাকে মিথ্যে ধাপ্পা দিচ্ছি না। সত্যিই আমি আর কোনও সম্পদে লোভ করবো না। একটি বার—শুধু একবারের জন্য আমাকে ক্ষমা কর, মুক্তি দাও।

কিন্তু কাসিমের খোদা সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। গুহামুখ উন্মুক্ত হলো না।

এরপর কাসিম-এর অবস্থা উন্মাদের মতো হয়ে উঠলো। বড় বড় হীরে জহরত গুলো মুঠি ভরে নিয়ে পাথরের দেওয়ালে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে থাকলো।

কিন্তু তাই বা কতক্ষণ! অবসাদে এলিয়ে পড়ে দেহ। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসে চোখ। সেই এবড়ো খেবড়ো পাথরের মেঝের ওপরেই অসাড়ে পড়ে ঘুমাতে থাকে সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে, হঠাৎ কারা যেন গুহামুখ খুলে দিয়েছে। এক ঝলক সূর্যালোক এসে পড়েছে তার মুখে। ওঃ কি আরাম! এই অন্ধ কারার মধ্যে একি মুক্তির আশ্বাস! কিন্তু ও কাদের পায়ের শব্দ! মনে হয়, একদল জাঁদরেল মানুষ সশব্দে নিচের দিকে নেমে আসছে!

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো পঞ্চান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে তেতে পুড়ে এসে হাজির হলো চল্লিশ চোর। পাহাড়ের পাদদেশে, ঠিক গুহামুখের পাশে। অদূরে দশটা খচ্চর বাঁধা দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো ওরা। এই নির্জন বন-প্রান্তরে এই জানোয়ারগুলোকে এখানে নিয়ে এলো কে? তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে এদিকে ওদিকে তন্ন তন্ন করে তল্লাস করতে থাকলো সকলে। কিন্তু কোথাও কোনও মানুষের সাড়া পাওয়া গেলো না। সর্দারটি বললো, সর্বনাশ! আমাদের ডেরার সন্ধান পেয়ে গেছে কেউ।

অন্য একজন বললো, কিন্তু সন্ধান পেলেই বা কী? ঢুকবার চাবিকাঠি জানবে কি করে।

সর্দার বলে, লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের পিছু ধাওয়া করে সবই দেখে শুনে জেনে নিয়েছে। যাক আর দেরি না, এবার তোমরা সব তলোয়ার বাগিয়ে নিচে নেমে পড়। চিচিং—ফাঁক।

গুহার মুখ খুলে গেলো। এবং শাণিত অস্ত্র কাঁধে চেপে এক এক করে সবাই নিচে নেমে গেলো।

সিঁড়ির মুখে বস্তা বস্তা মোহর আর হীরে জহরত দেখে বুঝতে আর বাকী রইলো না চোরের ওপর বাটপাড়ি করার জন্য কেউ প্রবেশ করেছে ভিতরে।

গর্জে উঠলো সর্দার, দুশমন কো খতম করো।

সর্দারের সিংহ-গর্জনে কাসিমের ঘুম ছুটে যায়। স্বপ্ন টুটে যায়। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে সে। কিন্তু উঠে আর দাঁড়াতে পারে না। সর্দারের এক ঘায়ে ধরমুণ্ডু আলাদা হয়ে যায়।

শয়তান, চোট্টা কাঁহিকা।

যদিও একবার মাত্র আর্তনাদ করেই কাসিম স্তব্ধ হয়ে পড়ে গেলো তবু ক্রুদ্ধ সর্দার নিরস্ত হলো না, নিষ্প্রাণ ধরটার ওপর কোপের উপর কোপ বসিয়ে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলতে থাকলো কাসিমের দেহটাকে। তারপর সাগরেদদের হুকুম করলো, ইসকা লাসকো বাহারমে ফেক দে।

এইভাবে কাসিমের মৃতদেহটা ছয় টুকরো আকারে একটা বস্তাবন্দী অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়ে গুহা মুখের কাছেই পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে রইলো। এই তার পরিণতি!

কাসিমকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার চোররা গুহাভ্যন্তরে গিয়ে বস্তাগুলো খালি করে আবার যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে গোল হয়ে বসে মতলব আঁটতে থাকে।

কিন্তু অনেক জল্পনা কল্পনা করেও কেউই কোনও সূত্র উদ্ভাবন করতে পারে না। কে এই লোকটা, কী করেই বা সে তাদের অনুসরণ করে গুহার দরজা খোলার গুপ্ত মন্ত্র জেনে নিয়েছিলো কিছুই অনুমান করতে পারে না কেউ। সর্দার বললো, এই জঙ্গলের পরে ফাঁকা মাঠ। মাঠ পার হলে শহর। এ ছাড়া এদিকে কোনও জনবসতি নাই। আমার ধারণা ব্যাটা ঐ শহরেরই কোনও অঞ্চলে বসবাস করতো, নিশ্চয়ই সেখানে তার বৌ-ছেলে মেয়ে বা অন্য আত্মীয়স্বজন আছে। তারা চিন্তিত হয়ে বসে আছে তার জন্য। এখন আমাদের কাজ তাদের খুঁজে বের করা।

সর্দারের একথায় সকলে বলে উঠলো, অত বড় শহর কত শত সহস্র মানুষের বাস। কত জনপথ, অলিগলি—ইয়ত্তা আছে। তার মধ্যে কে বা কারা আপনজনের প্রতীক্ষায় ম্রিয়মাণ হয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, কি করে আন্দাজ করা যাবে!

অন্য একজন বললো, আর তাছাড়া শয়তানকে তো খতমই করে ফেলা হয়েছে। এখন আর খোঁজাখুজি করে কী ফয়দা?

সর্দার একথায় সায় দেয়, তা ঠিক, যে ব্যাটা আমাদের এই গুপ্ত গুহার সন্ধান পেয়েছিলো তাকে তো সাবাড় করেই দিয়েছি।

সুতরাং এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তার কিছু নাই। তবে এখন থেকে আরও সাবধানে সতর্ক হয়ে গুহার দরজা খুলতে হবে।

এরপর সকলে গুহা থেকে বেরিয়ে চিচিং বন্ধ বলে দরজা বন্ধ করে আবার নতুন ধান্ধায় বেরিয়ে পড়লো। যাবার আগে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিরীহ খচ্চরগুলোকে নৃশংসভাবে হত্যা করে যেতে কসুর করলো না ওরা।

কাসিমের মৃত্যুর জন্য তার শয়তান বৌটাই একমাত্র দায়ী! সে যদি ঐ মোহরটা দেখিয়ে তার স্বামীকে প্রলুব্ধ না করতো তা হলে এইভাবে প্রাণ হারাতে হতো না তাকে।

কাসিমের বৌ নানারকম মুখরোচক খানা পাকিয়ে স্বামীর পথ চেয়ে বসে রইলো। তার চোখে লোভ লকলক করছিলো। সারাক্ষণ সে একটা কথাই ভাবছিলো—স্বামী দশ দশটা খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে জালা জালা সোনাদানা নিয়ে আসছে। উফ্, কী আনন্দ। অত সোনা সে রাখবে কোথায়? কী ভাবে রাখবে?

এই সব রঙিন চিন্তায় চিন্তায় দিনটা শেষ হয়ে যায় এক সময়। রাতের কালো ঘনিয়ে আসতে থাকে! এবার বৌটা চিন্তিত হয়ে ওঠে। এই অন্ধকারে ঐ জঙ্গলে তো জনমানুষ থাকতে পারে না! হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের আড্ডা হয় সেখানে। বেশি রাত করে ফিরতে গেলে বাঘ-ভাল্লুকের মুখে পড়বে না তো মানুষটা!

কথাটা মাথায় আসতেই শিউরে ওঠে সে। তাড়াতাড়ি ছুটে যায় আলিবাবার বাড়িতে। আলিবাবা তখন দাওয়ায় বসে কুঠারে শান দিচ্ছিল।

— শোনও ছোট শেখ, রাত এক প্রহর উৎরে গেলো, কিন্তু তোমার বড় ভাই এখনও

ফিরলো না। কী ব্যাপার বলতো! বড় চিন্তা লাগছে মনে। আলিবাবা বলে, ও এখনও ফেরে নাই বুঝি! তা চিন্তার কিছু নাই বিবিজান, অমন ধনদৌলত নিয়ে দিনের আলোয় ফেরার অনেক ঝুঁকি আছে। লোক জানাজানি হয়ে গেলে সরকারের কানে চলে যেতে পারে খবরটা। বড় ভাই আমার এদিকে দারুণ হুঁশিয়ার আদমী। এই সব সাতপাঁচ ভেবেই বোধহয় একটু বেশি রাত করে রওনা দেবে সে।

আলিবাবার কথায় যুক্তি ছিলো, খানিকটা আশ্বস্ত হতে পারে বৌটা। আলিবাবা বলে, তা এখানেই বসো না একটু। আমার মনে হয় এখুনি এসে পড়বে।

রাত আরও বাড়তে থাকলো, কিন্তু কাসিম ফিরলো না। বৌটা আবার অধৈর্য উৎকণ্ঠিতা হয়ে আলিবাবাকে জিজ্ঞেস করে, এখনও কী তুমি মনে করছো এই নিশুতি রাতে সে ফিরে আসবে?

আলিবাবা বললো, না বিবিজান আজ আর তার ফেরার কোনও আশা নাই। আমার মনে হচ্ছে মালপত্র বস্তাবন্দী করতেই তার সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। জঙ্গলটা জব্বর, সাপ খোপ তো আছেই, মানুষ-খেকো জন্তু-জানোয়ারদেরও অভাব নাই। তাই বোধহয় সে গুহা থেকে বের হয়নি রাতের মতো। ঠিক করেছে কাল সাত-সক্কালে কাকপক্ষী জাগার আগেই সবার অলক্ষ্যে সে ঘরে এসে পৌঁছাবে। তুমি কোনও দুশ্চিন্তা করো না বৌ, কাল সকালেই বড় ভাই ফিরে আসবে। তুমি মিলিয়ে নিও আমার কথা।

কিন্তু আলিবাবার ধারণা সত্য হলো না। পরদিন অনেক বেলা হলো, তবু কাসিম ফিরে এলো না দেখে আলিবাবাও চিন্তিত হয়ে পড়লো।

—নাঃ, আর তো চুপচাপ ঘরে বসে থাকা যায় না বৌ, আমি একবার দেখে আসি, কী হলো তার।

খচ্চর তিনটাকে সঙ্গে করে জঙ্গলের পথে রওনা হয়ে যায়।

পাহাড়ের কাছে এসে কাসিমের দশটা খচ্চরের বিচ্ছিন্ন দেহ আর রক্তের ঢল দেখে সে আঁতকে ওঠে। সর্বনাশ তবে তো তার ভাই আর জীবিত নাই। নিশ্চয়ই ডাকাতদের হাতে ধরা পড়ে তার জান শেষ হয়েছে। ভীত কম্পিত কণ্ঠে সে কোন রকমে উচ্চারণ করতে পারে চিচিং ফাঁক।

সঙ্গে সঙ্গে গুহার মুখ উন্মুক্ত হয়ে যায়। তর তর করে নিচে নেমে যায় আলিবাবা। সিঁড়ির নিচেই চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আলিবাবার বুঝতে অসুবিধা হয় না ডাকাতরা কাসিমকে কেটে ফেলেছে। কিন্তু সারা গুহা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার লাশের সন্ধান পায় না সে। বিষাদে মুহ্যমান হয়ে উপরে উঠে আসে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে অদূরে একটা রক্তমাখা বস্তা দেখতে পেয়ে সেইদিকে এগিয়ে যায়।

বস্তাটার মুখ খুলতেই সে শিউরে ওঠে। ডাকাতরা তার দাদাকে টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তায় পুরে ফেলে রেখে গেছে।

চটপট সে বস্তাটাকে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়।

আলিবাবার কেনা বাঁদী মরজানা বয়সে তরুণী শক্ত সামর্থ্য দেহ-বল্লরী শাণিত তলোয়ারের মতো। বাড়ির দরজায় পৌঁছেই আলিবাবা মরজানাকে ডাকে।

মনিবের সাড়া পেয়ে ছুটে আসে মরজানা! আলিবাবা বলে, বস্তাটায় একটু হাত লাগা তো, মা।

দু'জনে ধরাধরি করে কাসিমের খণ্ডিত দেহভর্তি বস্তাটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তোলে। বুদ্ধিমতী মরজানা পলকে বুঝে নেয় ব্যাপারটা কী?

আলিবাবা বলে, মা জননী আমি জানি তোর অনেক বুদ্ধি। এখন যে-বিপদ সামনে

তাকে সামলাবার মতো মগজ আমার নাই। তুই মা একটা উপায় বাৎলা, যাতে সব দিক রক্ষা হয় ঠিকমতো।

মরজানা বলে, আপনি, কিছু চিন্তা করবেন না আব্বাজান, সব আমি সামাল দিয়ে দেব।

আলিবাবা বলে, দাদার দেহটাকে কবর দিতে হবে তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এই টুকরো টুকরো করা লাস দেখলে পাড়াপড়শীরা আঁৎকে উঠে হাট বসিয়ে দেবে বাড়িতে।

মরজানা বলে, আপনি কি পাগল হয়েছেন, আব্বাজান, এই অবস্থায় গোর দেওয়া যায় তাকে? আমি সেই ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি, ভালো মুচি ডেকে এমন নিখুঁতভাবে সেলাই করিয়ে নেব যা দেখলে আপনিই তাজ্জব বনে যাবেন, সেলাই-এর জোড়া খুঁজে পাবেন না।

কাসিমের বৌ খণ্ডিত দেহ স্বামীকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠতে চায়। মরজানা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, একদম কাঁদবেন না এখন চাচী, সর্বনাশ হয়ে যাবে। দাঁড়ান আগে আমি বিধি-ব্যবস্থা করি তারপর যত পারেন কাঁদবেন খ'ন।

কাসিমের বৌ ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পেরে চুপ হয়ে যায়। মরজানা দ্রুত পায়ে পাড়ার হাকিমের দাওয়াখানায় চলে আসে।

—হাকিম সাহেব আমার চাচার বহুত বিমার, বুকে কফ জমেছে, দরদ আছে ভাত বন্ধ হয়ে গেছে, জলদি দাওয়াই দিন মেহেরবানী করে।

হাকিম আরও অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে এক শিশি ওষুধ দিলো, মরজানাকে। বললো, বিমার বড় খারাপ বেটি, আজ রাতটা যদি টিকে তবে আশা আছে, খানিকটা। যাই হোক কেমন থাকে কাল সকালে আমাকে জানিয়ে যেও।

পরদিন সকালে মরজানা কাঁদতে কাঁদতে দাওয়াখানায় ঢুকে বলে, না হাকিম সাহেব কোনও উপকার হলো না। রুগী আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। আপনি আরও ভালো দাওয়াই দিন।

হাকিম বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, দাওয়াইতে আর কোনও কাজ হবে না মা। এবার খোদার নাম জপ করতে বলো গে।

রাত্রি শেষ হলে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো ছাপ্পান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মরজানা ঘরে ফিরে এসে কাসিমের বৌকে বলে, চাচী নাও, এবার মরা কান্না কাঁদতে শুরু কর।

এই বলে সে নিজেও কাঁদতে বসে গেলো।

মরার খবর বাতাসের আগে যায়। মুহূর্তে পাড়াপড়শীরা সবাই জেনে গেলো আলিবাবার বড় ভাই কাসিম মাত্র দু'দিনের বিমারে ইন্তেকাল করেছে।

মরজানা ভাবলো একটা পর্ব তো চুকলো; কিন্তু এখন আসল কাজটাই বাকী। হন হন করে সে ছুটলো শহর প্রান্তের সুদক্ষ কারিগর এক মুচির বাড়িতে। লোকটার হাতের কাজ বড় চমৎকার। এর আগে সে ওর দোকান থেকে জুতো বানিয়ে এনেছে—যেমন গড়ন তেমনি সুক্ষ্ম সেলাই।

মুচি তখন তার দোকানে বসে জুতো তৈরি করছিলো। মরজানা মুখে মধু ঢেলে বলে, শেখ মুসতফা, আজ তোমাকে আমার বড় দরকার। আমার বাড়িতে গিয়ে একটা খুব দরকারী কাজ করে দিয়ে আসতে হবে। তবে হ্যাঁ, তার জন্য আমি তোমাকে পুষিয়ে দেব।

এই বলে সে গোটা একটা মোহর বাড়িয়ে দেয় মুচির দিকে। সোনার মোহরটা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারে না মুচি বেচারা! সারা মাস ধরে খাটলে দু'টো মোহর রোজগার হয় না আর একদিনের একটা কাজের ইনাম আস্ত একটা মোহর। ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকে মরজানার মুখের দিকে, রসিকতা কিনা বুঝতে পারে না, তাই হাত পেতে নিতেও

ভরসা হয় না তার। মরজানা বুঝতে পেরে মোহরটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, নাও আর দেরি করা চলবে না—এখুনি যেতে হবে। এটা তোমার কাজের আগাম দিলাম। কাজ শেষ করে দিলে পুরো মজুরী পাবে।

মেয়েটা বলে কী? একটা কাজের জন্য এই মোহর ছাড়া আরও পারিশ্রমিক দেবে সে? কী এমন কাজ?

মরজানা বলে, কাজটা কিন্তু খুব গোপনীয়। কসম খেয়ে বলতে হবে শেখ এ জিন্দগীতে কাউকে সে কথা বলতে পারবে না কখনও। এবং এই কারণেই তোমার যা যোগ্য মজুরী তার অনেক বেশি তোমাকে দেব।

মুচি দু'কানের লতি টিপে ধরে বলে, তোবা তোবা, আপনি বারণ করছেন সে কথা কি কাউকে বলতে পারি কখনও। এই কসম খাচ্ছি, যদি কাউকে বলি জিভ আমার খসে পড়বে।

মরজানা বলে, তা হলেও বিশ্বাস নেই বাপু, তুমি এক কাজ কর। এই ফেটিখানা দিয়ে চোখ দু'টো বেঁধে নাও। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, আবার সঙ্গে করে দিয়ে যাবো এখানে। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি চাই না তুমি আমার বাড়ির ঠিকানা জেনে রাখ।

মুচি ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক আছে, তাই ভালো হবে চাঁদবানু। কি দরকার ঠিকানা পত্র মনে রেখে। হয়তো কে জানে কখন মনের খেয়ালে ফস করে বলে ফেলব। তার চেয়ে এই-ই ভালো, আমার ইচ্ছে থাকলেও কাউকে বলতে পারবো না।

মরাজানা বলে, তাহলে এসো আর দেরি করো না। আমি নিজে হাতে তোমার চোখ দু'টো ভালো করে বেঁধে দিই।

মুচি মাথাটা এগিয়ে দিলো। মরজানা সঙ্গে করে একখানা কালো রঙের বড় রেশমী রুমাল এনেছিলো। তাই দিয়ে সে মুচির চোখ দু'টো বেঁধে সঙ্গে করে রাস্তায় বেরুলো।

এ গলি সে গলি করে অনেক গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক সময় সে মুচিকে নিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছলো।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে মরজানা মুচির চোখের পটি খুলে দেয়। বলে, এই দেখ, একটা লাশের ছ'খানা টুকরো। এমন নিখুঁত হাতে নিখুঁতভাবে সেলাই করতে হবে যাতে তুমি নিজেই পরে জোড়া খুঁজে না পাও, বুঝলে? আমি তোমার হাতের কাজ জানি। সারা দেশের মধ্যে তোমার মতো খলিফা চর্মকার আর দু'টি নাই! নাও, আর দেরি করো না, কাজ শুরু কর। আর হ্যাঁ, এই দিনার দু'টো রাখ। কাজ দেখে খুশি হলে আরও বকশিশ দেব।

মুচি কম্পিত হাতে মোহর দু'টো মুঠোয় ধরে ট্যাকে গোঁজে। তারপর কাজে মন দেয়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাসিমের দেহের টুকরোগুলো সুন্দরভাবে জোড়া লাগিয়ে দেয় মুচিটা। মরজানা খুশি হয়ে বলে, বাঃ চমৎকার হাত তোমার শেখ। এই নাও ধর তোমার বকশিশ।

মুচি তাকিয়ে দেখলো, আর দু'টি স্বর্ণমুদ্রা তার হাতের তালুতে এসে পড়েছে।

আবার যথারীতি চোখে কালো রেশমী রুমালের ফেটি বেঁধে এ গলি সে গলি ঘুরিয়ে মুচিকে তার বাড়িতে ফেরত দিয়ে এলো মরজানা।

এরপর শোক মিছিলের পর্ব। পাড়াপড়শিরা কাসিমের মরদেহ গোরস্তানে বয়ে নিয়ে চললো। তাদের পিছনে পিছনে মরজানা তার চাচার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে সারা হতে থাকলো।

এইভাবে যথানিয়মে কাসিমের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেলো।

এদিকে মাসখানেকের পরে চল্লিশ চোর চুরি ডাকাতির পাট শেষ করে নিজেদের ডেরায় ফিরে এলো একদিন। কিন্তু কি আশ্চর্য, পাহাড়ের পাদদেশে এসে তারা কাসিমের লাশের টুকরো ভর্তি বস্তাটাকে যথাস্থানে খুঁজে পেলো না।

এবার সর্দার হুঙ্কার ছাড়ে, হুম্, দুশমনেরা দেখছি শেষ হয়নি। আমরা যাকে খতম করেছি, সে যে একা নয় এখন তো তোমরা তার প্রমাণ পেলে? তা হলে? পিছনে শত্রু রেখে আমরা কি করে নিশ্চিত থাকতে পারি বলো?

সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো, খুঁজে কের করতেই হবে। শত্রুর লেশ রাখতে নাই। যে ভাবেই হোক তাকে খুঁজে বের করবোই।

সর্দার বললো, শোনো, এই পাশের শহরেরই বাসিন্দা তারা। তাদের বাড়ির ঠিকানা আমার চাই। সবংশে নিধন করতে হবে ওদের সকলকে। তা না হলে আমাদের ধন-দৌলত কিছুই রক্ষা করা যাবে না এখানে। এমনকি জানেও বেঁচে থাকতে পারবো না। সুতরাং আজ থেকে জান প্রাণ লড়িয়ে দিতে হবে তাদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বের করার জন্য। আচ্ছা এবার কে আগে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও বলো। তাকে আজই ছদ্মবেশে শহরে ঢুকে পড়তে হবে। তার মনে থাকে যেন, ভুল খবর এনে আমাকে ফালতু হয়রানি করবে না কিছুতেই। তাহলে আমি গর্দান নেব, বলো, কে যাবে?

সর্দারের এই শর্ত মেনে নিয়ে চোরদলের একজন এগিয়ে এসে বলে, আমি যাব। আমিই খুঁজে বার করবো তাকে, সর্দার।

দরবেশ-বেশি চোরটা সারা শহরের নানা বসতবাড়ি দোকানপাট ঘুরতে ঘুরতে কয়েকদিন পরে সেই মুস্তাফা মুচির দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার এক হাতে ভিক্ষাপাত্র, অন্য হাতে ধূপদানী।

মুচি তখন নিবিষ্ট মনে এক জোড়া জুতো সেলাই করছিলো। দরবেশ চোর চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার নিপুণ হাতের কারুকার্য দেখতে থাকে।

এক সময় মুচি মুখ তুলে দরবেশকে দেখে স্বাগত জানায়। দরবেশ চোর বাহবা দিয়ে বলে, বাঃ এই বয়সেও তোমার হাতের কাজ তো বড় সূক্ষ্ম দেখছি!

মুস্তাফার অহঙ্কার জেগে ওঠে, তা ফকির সাহেব, খোদার মেহেরবানীতে এখনও একবারেই সূচে সুতো পরাতে পারি। হাতের কাজ বলছেন? তা একটা মানুষকে ছ'টুকরো করে কেটে দিন, আমি এমন নিপুণভাবে সেলাই করে জোড়া দিয়ে দেব যে হাজার খুঁজেও আপনি তার জোড়া ধরতে পারবেন না।

দরবেশ চোর সূত্র-সন্ধানের সম্ভাবনায় পুলকিত হয়ে ওঠে। বলে, হুঁ তোমার হাতের কাজের নমুনা দেখেই বুঝতে পারছি। বহুত গুণী কারিগর তুমি। তবে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া লাগাতে পার কিনা তা অবশ্য জানি না।

মুস্তাফা বাধা দিয়ে বলে, এতো আর আন্দাজে বলছি না, দরবেশ সাহেব। নিজে হাতে করে দেখেছি আমি। জোড়া লাগাবার পর আমি নিজেই তাজ্জব হয়ে গেছি নিজের কাজ দেখে। খোদা কসম, বিশ্বাস করুন, শত চেষ্টা করেও আমার নিজের হাতের সেলাই-এর জোড় আমি ধরতে পারিনি।

দরবেশ অবাক হওয়ার ভান করে বলে, একটা মানুষের ছ' খণ্ড দেহ সেলাই দিয়ে জোড়া দিয়েছ? কোথায়? কবে?

মুস্তাফা বলে, বানিয়ে বলছি না ফকির সাহেব। এই মাসখানেক আগে এক জানানা

এসেছিলো আমার দোকানে। আমার চোখ দু'টো রুমাল দিয়ে বেঁধে বোরখা পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তার বাসায়। সেখানে গিয়ে দেখি একটা লোককে ছ'টুকরো করে কাটা হয়েছে। মেয়েটি আমার হাতে ঝকঝকে মোহর গুঁজে দিলো গোটাকতক। বললো, সূক্ষ্মভাবে সেলাই করে জুড়ে দিতে হবে। কাজ ভালো হলে বকশিশ পাবে।

আমিও দেখিয়ে দিলাম আমার কেরামতি! এমন কাজ করে দিলাম, দেখে খুব তারিফ করলো সে। আমাকে আরও কয়েকটা মোহর দিয়ে আবার চোখ বেঁধে পৌঁছে দিলো এখানে।

দরবেশ চোর ন্যাকার মতো প্রশ্ন করে, তা তোমাদের এ দেশের বুঝি এই রকমই প্রথা? কোনও লোক মারা গেলে তাকে ছ'টুকরো করে কেটে তারপর সেলাই দিয়ে জুড়ে গোর দিতে হয়?

মুস্তাফা হো হো করে হেসে ওঠে, আরে না না, দরবেশজী, ও রকম উদ্‌ভট প্রথা কেন থাকবে? ব্যাপারটা যে কী তা আজ পর্যন্ত আমি ঠাওর করতে পারিনি। কেই বা সে লোক? কেনই বা তাকে ছ'টুকরো করে কাটা হয়েছিলো, কেই বা কেটেছিলো—কিছু জানি না আমি। জানবার কোনও উপায়ও ছিলো না। আমার সঙ্গে শুধু কাজের সম্পর্ক ছিলো ওর। আমার আশার অতিরিক্ত পয়সা দিয়েছে সে, যেমনটি কাজ করতে বলেছে, করে দিয়েছি। এর বেশি কিছু জানবার চেষ্টাও করিনি, জানতেও পারিনি। তা আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কী ফয়দা, বলুন?

দরবেশ চোর বলে, তা বটে, কিন্তু মুস্তাফাজী, আমার কিন্তু বড় কৌতূহল জাগছে। এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী করে ঘটতে পারে। আচ্ছা, এক কাজ করতে পার? আমাকে নিয়ে যেতে পার ঐ বাসাটায়?

—এই দেখুন, বললাম না, রুমালে কষে বেঁধে দিলো আমার চোখ দু'টো তারপর বোরখায় সারা অঙ্গ ঢেকে নিয়ে গিয়েছিলো সে সঙ্গে করে। কী করে বলবো আপনাকে, কোথায় কোন বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি?

দরবেশ চোর বলে, ঠিক আছে। আমিও তোমার চোখ বেঁধে দিচ্ছি। তারপর তুমি হাতড়াতে হাতড়াতে চলো আমার সঙ্গে। মনে করার চেষ্টা কর, কত দূর সোজা গিয়ে কোনদিকে বাঁক নিয়েছিলে। তারপর আবার কতটা চলার পর কোনদিকে ঘুরেছিলে। আমার মনে হয়, ঠিক মতো ইয়াদ করলে বাড়িটা তুমি খুঁজে বের করতে পারবে।

মুস্তাফা বলে, হু', ঠিকই বলেছেন পীরসাহেব। যাদের চোখ নাই—অন্ধ, তারা তো আন্দাজেই হাতড়ে হাতড়ে সারা শহর দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। চোখে দেখতে না পেলেও তারা মন দিয়ে দেখে।

দরবেশ চোর উৎসাহ দিয়ে বলে, ঠিক বলেছ, চোখে না দেখলেও অনুভবে দেখে তারা। তুমিও পারবে—নিশ্চয়ই পারবে। তা আমার এ খেয়াল মেটাতে তোমাকে খেসারত দিতে হবে কেন? অনেকটা সময় তোমার কাজের ক্ষতি হবে। সেইজন্যে এই নাও, ধর, এই মোহরটি রাখ।

একটা চকচকে সোনার মোহর গুঁজে দিলো সে মুচির হাতে। মুচির চোখ নেচে ওঠে, দরবেশকে আপ্যায়ন করে বসায়, বলে, আপনি এক পলক বসুন, পীরসাহেব। আমি দোকানটা বন্ধ করে আপনাকে নিয়ে বেরুচ্ছি এখুনি।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

•

আটশো সাতান্নতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চোর দরবেশ মুচির চোখ রুমালে বেঁধে দেয়। মুচি অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলে। এপথ সেপথ ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে চোরকে সঙ্গে নিয়ে এক

বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, এই-এই সেই মকান।

চোর দরবেশ মুচির চোখের বাঁধন খুলে দেয়। তারপর একখণ্ড চকখড়ি দিয়ে দরজার গায়ে একটি চিহ্ন এঁকে দেয়। মুচির হাতে দু'টো দিনার গুঁজে দিয়ে বলে, এই নাও তোমার বকশিশ। এখন থেকে আমাদের যা জুতো লাগবে সব তোমার দোকান থেকে কিনবো, বুঝলে?

মুচি গদগদ হয়ে বলে, সেলাম সাহেব, আচ্ছা তা হলে আমি চলি!

চোর ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে চলে যায়। সর্দারকে সব বলে।

মরজানা দোকানের সওদা কিনতে বাড়ির বাইরে বেরুতেই দেখতে পায় দরজার গায়ে সেই সাদা খড়িমাটির চিহ্ন। সন্দিগ্ধভাবে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ভেবে পায় না, কে এবং কেন এই অদ্ভুত ধরনের চিহ্নটি এঁকে দিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই কোনও দুরভিসন্ধি আছে এর পিছনে।

মরজানা এক টুকরো সাদা চক এনে পাড়ার সবকটি বাড়ির দরজায় অবিকল ঐ একই ধরনের চিহ্ন এঁকে দেয়।

পরদিন সকালে ঐ চল্লিশ চোর দু'জন দু'জন করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু প্রতিটি বাড়ির দরজায় একই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখে গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে থাকে তারা। ক্রোধে ফেটে পড়ে সর্দার। যে চোরটাকে সন্ধান করতে পাঠিয়েছিলো তার ওপর ভীষণ ক্ষেপে ওঠে।

—ব্যাটা ধাপ্পাবাজ, শয়তান, আমার সঙ্গে ইয়ারকি! দাঁড়াও ডেরায় ফিরে গিয়ে তোমার মজা দেখাচ্ছি আমি।

বলাবাহুল্য, জঙ্গলে ফিরে গিয়ে সর্দারের তরবারির এক কোপে গুপ্তচর লোকটার প্রাণান্ত ঘটেছিলো।

সর্দার এবার আর একজনকে পাঠালো সেই মুচির কাছে। সে-ও যথারীতি মুচির চোখ বেঁধে তার পিছনে পিছনে এসে হাজির হলো আলিবাবার বাড়ির সামনে। মুচির চোখের বাঁধন খুলে যথাবিহিত ইনাম বকশিশ দিয়ে গুপ্তচরটি একখণ্ড নীল রঙের খড়িমাটির সাহায্যে দরজার গায়ে নতুন ধরনের এক সংকেত চিহ্ন এঁকে দিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেলো।

পরদিন সকালে চোরগুলো দুই-দুইজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আবার শহরাভ্যন্তরে এসে পৌঁছয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেদিনও তারা প্রতিটি বাড়ির দরজায় একই চিহ্ন অঙ্কিত দেখে বিভ্রান্ত এবং ক্রোধান্বিত হয়ে জঙ্গলে ফিরে গিয়ে গুপ্তচরের প্রাণ সংহার করলো।

চোর সর্দার এবার আর অন্য কাউকেই ভরসা করতে না পেরে নিজেই দরবেশের ছদ্মবেশে মুচির দোকানে এসে হাজির হয়। একই ভাবে মুচি তাকেও আলিবাবার বাড়ির দরজায় নিয়ে যায়। সর্দার তাকে বকশিশ দিয়ে বিদায় করে। তারপর একখণ্ড লাল চকখড়ি দিয়ে দরজার গায়ে মোহর এঁকে দিয়ে জঙ্গলে ফিরে যায়।

সর্দার বুঝেছিলো শুধু খড়িমাটির চিহ্ন এঁকে গেলেই যথেষ্ট হবে না। কারণ নিশ্চয়ই কেউ আড়াল থেকে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রত্যেক বাড়ির দরজায় একই চিহ্ন এঁকে রাখে। তাই সে যাবার আগে আলিবাবার বাড়িটার আশেপাশের বাড়িঘর, গাছপালা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাদি মনে গেঁথে নিয়ে চলে যায়।

গুহার ডেরায় ফিরে এসে সে সাঙ্গপাঙ্গদের বলে, এবার আর চোখে ধাঁধা দিতে পারবে না আমার। এমন চিহ্ন মনে এঁকে দিয়ে এসেছি যা কক্‌খনো ভুল হবার নয়। যাক, এবার তোমরা এক কাজ কর। বাজার থেকে আটত্রিশটা বড় বড় মাটির জালা কিনে নিয়ে এসো। বেশ চওড়া মুখ আর পেট মোটাওলা হওয়া চাই। একটায় শুধু জলপাই তেল ভরতে হবে। আর বাকীগুলো খালি থাকবে, যাও, জলদি বেরিয়ে পড় তোমরা।

সর্দারের হুকুমে চোররা সকলে ঘোড়ায় চেপে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্দারের নির্দেশমত একটি জালায় জলপাই তেল ভর্তি করে এবং বাকী সাঁইত্রিশটা শূন্যাবস্থায় কিনে ফিরে এলো।

সর্দার বললো, প্রত্যেক ঘোড়ার দুই পাঁজরে দু'টি জালা ঝোলাতে হবে। তার আগে তোমরা সকলে সাজপোশাক খুলে ফেলে একেবারে উদোম হও। শুধু মাথায় থাকবে পাগড়ী আর পিঠে ঝুলবে নাগরা।

সর্দারের হুকুম শিরোধার্য, তৎক্ষণাৎ সকলে বিবস্ত্র হয়ে দাঁড়ালো। সর্দার বললো, প্রথমে একজন এসো, এই তেলের জালাটা এক পাশে থাকবে, আর এক পাশে আরেকটি জালার ভিতরে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে বসতে হবে একজনকে। তা হলে দু' পাশের ভার সমান হবে। বাকী তোমরা ছত্রিশজন ছত্রিশটা জালার মধ্যে ঐ একই ভাবে গুটিসুটি মেরে বসে পড়। তার আগে রশি দিয়ে জোড়া জোড়া জালার গলা বেঁধে এক একটা ঘোড়ার পিঠের দুপাশে ঝুলিয়ে দাও।

সর্দারের কথামতো চোরগুলো প্রথমে প্রত্যেকটি ঘোড়ার দুই পাঁজরে দু'টি শূন্য জালা ঝুলিয়ে দিলো। তারপর এক একটিতে এক একজন ঢুকে পড়লো।

প্রতিটি জালার মুখে হাল্কা করে নারকেলের ছোবড়া গুঁজে তালপাতার ঢাকা দিয়ে এমন ভাবে বেঁধে দিলো, যাতে ওদের শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে ফেলতে খুব একটা অসুবিধা না ঘটে। তারপর সে প্রতিটি জালার গায়ে একখানা ভোজালী এবং একখানা ডাণ্ডা বেঁধে দিয়ে তৈল সহযোগে নানা বিচিত্র ধরনের আঁকিবুকি এঁকে দিলো।

এরপর সে ঘোড়াগুলোকে শহরের পথে চালিয়ে নিয়ে চললো।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আলিবাবার বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো সর্দার। সে সময় আলিবাবা তার ফটকের দোরগড়ায় আয়াস করে বসে জিরোচ্ছিল।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থাপিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো আটান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চোর সর্দার বিনয়ের অবতার হয়ে আলিবাবাকে সালাম সওগাত করে বলে, আমি এক সামান্য তেল ব্যবসায়ী, মালিক। এ শহর আমার একেবারে অচেনা, এই প্রথম এসেছি। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে, এখন কোথায় রাতটা কাটাই সেই সমস্যায় পড়েছি। যদি কিছু মনে না করেন এ বান্দা আজকের রাতটা আপনার আশ্রয়েই কাটাতে চায়। আপনার বাড়ির আঙ্গিনাটাও বেশ বড়সড়। আমার ঘোড়াগুলোও আরামে থাকতে পারবে।

আলিবাবা সদাশয় মানুষ, তখুনি সে বিনীত হয়ে বললো, আপনি পরদেশী, মুসাফির, আমার ঘরে অতিথি হতে চান, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! আপনার কুণ্ঠিত হওয়ার কোনও কারণ নাই, মেহেরবানী করে অন্দরে আসুন। এ ঘর আপনার নিজের ঘর মনে করুন, আমি ধন্য হবো।

সর্দারের হাত ধরে সে বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসে।

—মরজানা, ও মরজানা, দেখ কে এসেছে আমাদের ঘরে।

মরজানা ছুটে আসে। আলিবাবা বলে, মুসাফির মেহেমান। খুব আদর যত্ন করবে। দেখো যেন কোনও ত্রুটি না হয়। ঘোড়াগুলোকে ভিতরে নিয়ে এসো। তেলের জালাগুলো সব সাবধানে নামিয়ে রাখ এক পাশে। আর ঘোড়াগুলোকে জাবনা দাও।

সকলে মিলে ধরাধরি করে মাটির জালাগুলোকে অতি সন্তর্পণে নামিয়ে চত্বরের একপাশে সারবন্দি করে বসানো হলো। ঘোড়াগুলোকে যব আর ছোলা খেতে দিলো মরজানা। আলিবাবা মহামান্য অতিথিকে নিয়ে আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে রইলো।

বাড়ির বড় শোবার ঘরটায় চোর সর্দারের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হলো। নানারকম ভুরিভোজে পরিতৃপ্ত করে চোর সর্দারকে শয্যা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে আলিবাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান মালিক, এ ঘর আপনার নিজের ঘর বলে মনে করবেন।

সর্দার বলে, ও নিয়ে আপনি ভাবনা করবেন না শেখ সাহেব। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। শুধু রাতের বেলায় পায়খানা প্রস্রাব পেলে কোথায় যাবো, জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিয়ে যান।

আলিবাবা সর্দারকে আঙ্গিনার একপাশে এসে পায়খানাটা দেখিয়ে বলে, দরকার হলে এখানে চলে আসবেন, মালিক।

সর্দার দেখলো, পায়খানার পাশেই জালাগুলো রাখা হয়েছে। বললো, বহুত আচ্ছা, আর কোনও অসুবিধে হবে না। এবার আপনি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন শেখ সাহেব।

আলিবাবা চলে গেলে চোর সর্দার জালাগুলোর কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বলে, শোনো সাঙ্গাতরা, আমি যখন জালার গায়ে ছোট একটা ঢিল ছুঁড়ে আওয়াজ করবো তৎক্ষণাৎ তোমরা তড়িঘড়ি জালা থেকে বেরিয়ে আমার ঘরের দিকে ছুটে আসবে। বুঝতে হবে তখনি শুরু হবে খতমের পালা।

আর ক্ষণমাত্র সেখানে না দাঁড়িয়ে ঘরে ফিরে এলো সর্দার। মরজানা তখন একটা স্বল্পালোকের চিরাগ বাতি এনে ঘরের এক প্রান্তে রেখে সর্দারকে শুভরাত্রি জানিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলো।

মরজানা লক্ষ্য করে তেল-সওদাগর পালঙ্কে শোয়ামাত্র নাক ডাকাতে শুরু করেছে!

মরজানার তখনও অনেক কাজ বাকী। রসুইখানায় ঢুকে সে বাসনপত্র ধোয়ামোছা করতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে মরজানার চিরাগের তেল ফুরিয়ে আসে। আলোটা নিভু-নিভু হয়। কিন্তু তখনও সব কাজ তার শেষ হয়নি। সন্ধ্যাবেলায় দোকানে যাবে ভেবেছিলো, কিন্তু ঘরে অতিথি এসে পড়ায় আর তেল কিনে আনা হয়ে ওঠেনি।

নিভন্ত চিরাগ হাতে সে আলিবাবার ঘরে আসে, এখন কী হবে মালিক, ঘরে এক ফোঁটা তেল নাই। সন্ধ্যাবেলায় দোকানে যাওয়ার ফুরসত পাইনি।

আলিবাবা হাসতে হাসতে বলে, দূর বোকা মেয়ে। ঘরে তেল নাই কি বলিস, জলজ্যান্ত আটত্রিশটা তেলের জালা বসানো আছে আঙ্গিনায়। তোর আর কতটুকু তেল লাগবে? এখন যা, রাত হয়েছে, শুয়ে পড়গে। কাজ কাম যা বাকী আছে কাল সকালে সারলেই হবে।

মরজানা আলিবাবাকে আর বিরক্ত না করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পাশের বড় ঘরটায় তখন মহামান্য মেহেমান সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে নাসিকা গর্জন করে চলেছে। মরজানা আঙ্গিনায় নেমে আসে জালাগুলোর কাছে। একটুখানি তেল সে চিরাগে ভরে নেবে। কিন্তু একটা জালার মুখের ঢাকা খুলতে তেলের বদলে নারকেলের ছোবড়া দেখে ভড়কে যায়। যাই হোক

ছোবড়াগুলে টেনে তুলতেই আরও অবাক হয়ে যায়। ঘাড় মুখ গুঁজে ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা দামড়া লোক। ভয়ে শিউরে ওঠে মরজানা। সর্বনাশ, একি! তাড়াতাড়ি সে জালার মুখটা ঢাকা দিয়ে পাশের আর একটা জালার কাছে যায়।

এক-এক করে সাঁইত্রিশটা জালা পরীক্ষা করে একই বস্তু প্রত্যক্ষ করে তাজ্জব বনে যায়। এ যে একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র তা আর বুঝতে বাকী থাকে না তার।

শেষের জালাটিতে তেলের সন্ধান পেয়ে আনন্দে নেচে ওঠে ওর চোখ। রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে খানিকটা কাঠ ভরে দিয়ে কাপড় সিদ্ধ করার বিরাট কড়াটা চাপিয়ে দেয়। তারপর তেলের জালাটা টেনে এনে কড়াতে সবটা তেল ঢেলে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে কড়া আগুনের জ্বালে টগবগ করে ফুটে ওঠে কড়ার তেল। আস্তাবল থেকে একটা বালতি আর মগ নিয়ে আসে মরজানা। সেই ফুটন্ত তেল বালতি ভরে নিয়ে জালার কাছে আসে সে।

প্রথম জালাটার ঢাকনা খুলে ছোবড়া তুলে চোরটার মাথায় একটা গাঁট্টা মারতেই লোকটা ক্যাঁক করে আওয়াজ তুলে ওপরের দিকে মুখ বাড়ায়। এবং তৎক্ষণাৎ মরজানা তার মুখের হাঁর ভিতরে ঢেলে দেয় এক মগ ফুটন্ত তেল। লোকটা অদ্ভুত এক আর্তনাদ তুলে স্তব্ধ হয়ে যায় মুহূর্তে।

মরজানা আর একটা জালার কাছে এগিয়ে যায়।

এইভাবে এক এক করে সাঁইত্রিশটা জালার জঠরে তৈলদগ্ধ হয়ে সাঁইত্রিশ জনেরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়।

এর পরের ঘটনার জন্য মরজানা রসুইখানায় ফিরে এসে অপেক্ষা করতে থাকে।

বেশ কিছু পরে, তখন মাঝ রাত হবে, মহামান্য অতিথি সাহেবের নাক ডাকার আওয়াজ থেমে যায়। মরজানা বুঝতে পারে সর্দারজীর ঘুম ভেঙ্গেছে। এবার তার খেলাটা শুরু হবে।

এক মুঠো পাথরের নুড়ি সঙ্গে এনেছিলো সর্দার। এক এক করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে থাকে জালাগুলো লক্ষ্য করে। লক্ষ্য অব্যর্থ, সবগুলো জালার গায়েই টঙ্কার তোলে। কিন্তু সর্দার অবাক হয়, তার সাঙ্গাতরা কেউই মাথা তুলে দাঁড়ায় না। বিশ্রী ভাষায় সে গালাগাল দিয়ে ওঠে, শালা হারামীকা বাচ্চা, সব ঘুমে লটকে পড়েছে। দাঁড়া মজাটা আমি দেখাচ্ছি।

মরজানা রুদ্ধশ্বাসে দেখতে থাকে, সর্দারটি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে জালাগুলোর কাছে আসে। কিন্তু পোড়া তেল আর কাঁচা মাংস ঝলসানোর বিশ্রী গন্ধে নাকটা কুঁচকে ওঠে।

ধীরে ধীরে সে একটা জালার মুখের ঢাকনা খুলেই আঁৎকে ওঠে, সর্বনাশ, তার সব ফন্দী ফিকির ফাঁস হয়ে গেছে! এ যে তার জালার তেলেই তার সঙ্গীসাথীদের সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে এরা।

কয়েকটা জালার মুখ খুলে একই দৃশ্য দেখতে পেলো আর এক তিল সে দাঁড়ালো না। ঝটপট সদর খুলে চোঁচা দৌড় দিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সেই নিশুতি নিঃশব্দ রাতের অন্ধকারে মরজানা একা একা হেসে লুটোপুটি হতে থাকলো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো ঊনষাটতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

মরজানা বুঝেছিলো আপাতত রাতের মতো বিপদ কেটে গেছে। তাই সে রাতে সে আর আলিবাবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে খবরটা জানাবার দরকার মনে করে না।

খুব সকালে আলিবাবার ঘুম ভাঙ্গে। দরজা খুলে সে বাইরে এসে দেখে মরাজানা ঘরের কাজ সারছে।

—কী রে মরজানা, এই সাত সকালে উঠে পড়ে কাজে লেগেছিস। মরজানা মুখে কোনও কথা না বলে ইশারায় জালাগুলোর কাছে আসতে বলে আলিবাবাকে।

—আপনি নিজে হাতে এই জালাগুলোর ঢাকা খুলে দেখুন মালিক, কাল রাতে কাকে আপনি মেহেমান বলে আপ্যায়ন করে ঘরে তুলেছিলেন।

তাবৎ দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে আলিবাবা। মরজানার উপস্থিত বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার কথা ভেবে অবাক হয়ে যায় সে।

—মরজানা, তুমি যা করেছ তার কোনও জবাব নাই। আজ থেকে আমার এই সংসারের সব দায়-দায়িত্ব তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হচ্ছি। আমি জানি, তুমি যেভাবে চালাতে পারবে তা আর কেউই পারবে না।

আবদাল্লার সহযোগিতায় সেইদিনই ঐ সাঁইত্রিশ চোরের লাশ সমাধিস্থ করলো আলিবাবা। বাড়ির পাশেই একটা বাগান, সেই বাগানের মাঝখানে পেল্লাই বড় একটা গর্ত খুঁড়ে সবগুলো মড়াকে একসঙ্গে গণসমাধি দেওয়া হলো।

আলিবাবার বড় ছেলে এখন কাসিমের দোকানে বসে। একদিন বাবাকে বললো, আমি তো দোকান-পাটের কিছুই জানতাম না আব্বাজান, আমাদের বাজারের হুসেনসাহেব আমাকে হাতে ধরে ধরে সব শিখিয়ে পড়িয়ে লায়েক করে তুলেছেন। এতো ভালো মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। দিন দিনই তার কাছে বড্ড বেশি ঋণী হয়ে যাচ্ছি। প্রায়ই সে আমাকে তার সঙ্গে খানা-পিনা করতে ডাকে। আমি না বলতেও পারি না। কিন্তু বড় লজ্জা করে। কারণ আমি তো তাকে কোনও দিন খানা-পিনায় ডাকতে পারি না! আব্বাজান, আমার মনে হয়, ওকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো দরকার।

আলিবাবা বলে, একশোবার দরকার। বেটা, তুমি আগে বলোনি কেন, এমন সদাশয় লোকের পায়ের ধুলো পড়লেও বাড়ি পবিত্র হয়। না না, আর দেরি করো না, কালই আমি ভোজের আয়োজন করছি, তুমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। কাল জুম্মাবার, শুভদিন তোমাদের দোকানপাটও বন্ধ থাকবে, বিশ্রামের দিন, —সেই ভালো হবে। তাকে আমার তরফ থেকে নিমন্ত্রণ জানাবে। তাতে যদি সে লজ্জা বা বিনয় করে কোও অজুহাত দেখাতে চেষ্টা করে তুমি তার কোনও ওজর শুনবে না, ধরে নিয়ে আসবে।

সুতরাং পরদিন সকালে আলিবাবার পুত্র হুসেনকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলো। আলিবাবা সাদর অভ্যর্থনা জানালো নতুন সওদাগরকে। হুসেনের বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, মুখে চাপ দাড়ি। আলিবাবা আলাপ করে বড় প্রীত হলো।

হুসেন বিনয়াবনত হয়ে বলে, আপনার আদর অভ্যর্থনায় আমি আহ্লাদিত হয়েছি, মালিক। কিন্তু খানা-পিনা থাক ও সবে আমার আবার অনেক বাছ-বিচার, থাক ওসব, এই যে আলাপ পরিচয় হলো, এর তো কোনও তুলনা নাই।

আলিবাবা অবাক হয়ে বলে, খানা-পিনায় যদি বাছ-বিচার থাকে, বেশ তো সে সব জিনিস বাদ দিয়েই না হয় খাবে। কি কি খেতে মানা বলো, আমি সেই মতোই ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আমার গরীবখানায় যখন পায়ের ধুলো দিয়েছ, শুধু মুখে যেতে দেব না, বাবা।

হুশেন বলে, আমার মানত আছে বাড়ির বাইরে যদি কোথাও মাংসাদি খাই নুন দিয়ে খাব না।

—বেশ তো এ আর বেশি কথা কী! নুন ছাড়াই তোমার জন্যে খানা পাকাতে বলছি। কোনও অসুবিধে হবে না।

আলিবাবা ছুটে রসুই ঘরে গিয়ে মরজানাকে বলে, আজকের খাবারে কোনওরকম নুন দিও না মরজানা। মেহেমান নুন খাবে না।

কথাটা শুনে মরজানার কেমন খটকা লাগলো। এ কেমন কথা। খাবারে নুন খাবে না কেন সে?

সন্ধ্যায় খাবার সাজানো হলো টেবিলে। আমন্ত্রিত অতিথি হুসেনকে পাশে নিয়ে খেতে বসলো আলিবাবা আর তার পুত্র। মরজানাই পরিপাটি করে পরিবেশন করলো সকলকে। মরজানা বেশ বুঝতে পারলো, সওদাগরটি বয়সে প্রবীণ হলে কী হবে, ক্ষণেক্ষণেই সে মরজানার রূপ-যৌবন দেখে চঞ্চল হয়ে উঠছে।

খানাপিনা শেষ হয়ে গেলো। তিনজনে বসে তখন খোশ গল্প করছিলো। এমন সময় অপরূপ নর্তকীর সাজে সজ্জিত হয়ে মরজানা প্রবেশ করলো ঘরে। শুধু হুসেন নয়, আলিবাবা এবং তার পুত্রও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো মরজানার সাজ-সজ্জার বাহার দেখে। সূর্মা কাজলে এঁকেছে চোখ, পরণে দামী রেশমী শালোয়ার, কোমরে সোনার কোমরবন্ধ, একপাশে সোনার খাপে ঝোলানো একখানা ছোট্ট ভোজালী। গায়ে জমকালো কামিজ। তার ওপরে নানা মণিমুক্তো খচিত একটি খাটো জ্যাকেট। মাথায় সুন্দর একটি কাজ করা টুপী। এক কথায় বুকে আগুন ধরানো রূপ।

মরজানার পিছনে তরুণ আবদাল্লা—তার হাতে নাচের বাদ্যযন্ত্র। হাতের যাদুতে সে অপূর্ব এক নৃত্যতাল বাজাতে শুরু করেছে। সে তালে তাল মেলাতে চাইবে না এমন বেরসিক কেবা আছে! আপনা থেকেই সে ছন্দে হৃদয় নেচে ওঠে—পা তাল ঠুকতে শুরু করে।

মরজানা প্রথমে আলিবাবার সামনে এসে কুর্নিশ করে শ্রদ্ধা জানালো। তারপরই পাখীর মতো ফুড়ুৎ করে চলে গেলো ঘরের অপর প্রান্তে।

শুরু হলো নাচ। অপূর্ব তাল-মান-লয় জ্ঞান তার। একেবারে নিখুঁত। তিনজনের সকলের মুখের ভাষা গেছে হারিয়ে। অপলক চোখে তারা মরজানার অপূরপ নৃত্যকলা দেখে মুগ্ধ হতে থাকে।

একটানা কতক্ষণ নাচতে পারে মরজানা? মেয়েটির সারা অঙ্গের প্রতিটি মাংসপেশী নাচতে থাকে। নাচতে থাকে সেই ঘরের প্রতিটি ধূলিকণা, বাতাস।

কত রকম নৃত্যই যে সে দেখাতে থাকলো তার সীমা সংখ্যা নাই। কখনও সে ইহুদীদের নাচ নাচে, কখনও জিপসী নাচ ধরে, আবার কখনও গ্রীক, কখনও পারসী, কখনও বা ইথিওপিয়ার গ্রাম্য নাচে মেতে ওঠে।

তিন দর্শক যখন নিজেদের সত্তা ভুলে গিয়ে মরজানার তালে তাল মিশিয়ে দিয়েছে সেই সময় মরজানা ভোজালী নৃত্য শুরু করে। ছোরা হাতে সে নাচতে নাচতে ছুটে আসে দর্শকদের সামনে। আবার পলকে ঘরের অপর প্রান্তে ছিটকে পালিয়ে যায়। পরমুহূর্তেই সে বুকে তুফান তোলা ছন্দে নাচতে নাচতে আবার ফিরে আসে ওদের সামনে। ছোরাটা বাগিয়ে ধরে আলিবাবার পুত্রের বুকে। মনে হলো, এই বুঝি বসিয়ে দেবে সে। কিন্তু না তক্ষুণি সে পলকে পালিয়ে চলে যায় অপর প্রান্তে।

পলে পলে উত্তেজনা, আশঙ্কা, শিহরণ—সব মিলে মরজানা এমন এক রোমাঞ্চকর নৃত্যকলা রচনা করে চলেছে যা মনপ্রাণ উত্তাল করে তোলে।

ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো ছোরা হাতে ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে আসে মরজানা। এমনভাবে ছোরাটা সে বাগিয়ে ধরে আসে যে, মনে হয় এই বুঝি কারো বুকে বসিয়ে দেবে সে। কিন্তু ওদের

সামনে এসেই মরজানা ভোজালীটা মুহূর্তের মধ্যে নিজের বুকেই বাগিয়ে ধরে। মরজানার দেহটা ময়ূরীর পেখমের পিছন দিকে বেঁকে নুইয়ে পড়তে থাকে। ডান হাতের মুঠিতে ধরা ছোরাটা তখনও তার নিজের বুকেই তাক করা।

আলিবাবা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সর্বনাশ, যদি কোনও কারণে মরজানার পা ফসকে যায় তবে ছুরিটা আমূল বসে যাবে তার বুকের মধ্যে। একি সর্বনেশে নাচরে বাবা! দম বন্ধ হয়ে আসে।

মরজানার চোখের ইশারায় আবদাল্লাহ পেয়ালার পাত্র মেলে ধরে দর্শকদের সামনে। আলিবাবা ভাবে মরজানা বকশিশ না পেলে এই আত্মহত্যার নাচ থামাবে না। তাই সে জেব থেকে একটা মোহর বের করে আবদাল্লাহর পাত্রে ছুঁড়ে দেয়। বাবার দেখাদেখি ছেলেও একটি স্বর্ণমুদ্রা বকশিশ দেয়। মহামান্য অতিথি হুসেন সাহেবই বা হাত গুটিয়ে বসে থাকে কি করে। সেও কোমর থেকে তোড়া খুলে তার মধ্যে হাত ঢোকায়। এবং সেই মওকায় মরজানা ঝাঁপিয়ে পড়ে হুসেনের ওপর। কোনও রকম সুযোগ না দিয়েই সে ভোজালীখানা আমূল বসিয়ে দেয় সে হুসেনের কলিজায়। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গগনভেদী আর্তনাদ তুলে হুসেন গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়।

আলিবাবা এবং তার পুত্র দু'জনেই শিউরে ওঠে? একি সাংঘাতিক কাণ্ড? মরজানার কী মাথা খারাপ হয়ে গেলো?

—না মালিক, মরজানা শান্ত সহজ কণ্ঠে বলে, মাথা আমার ঠিক আছে। আপনারা যাকে মহামান্য অতিথি মনে করে ঘরে এনেছিলেন আসলে সে কোনও সওদাগর নয়—ঐ শয়তান ডাকু সর্দার। এর আগে সে এসেছিলো তেল ব্যবসায়ী হয়ে।

আলিবাবা অবাক হয়ে বলে, কিন্তু তার তো দাড়িগোঁফ ছিলো না কিছু?

—এ দাড়িগোঁফও এর নিজের নয় মালিক, পরচুলা। এই দেখুন আমি টেনে খুলে দিচ্ছি, এবার নিশ্চয়ই চিনতে অসুবিধে হবে না?

পিতাপুত্র উভয়েই বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগলো সেই তেল-ব্যবসায়ীই বটে!

কৃতজ্ঞতায় রুদ্ধ হয়ে এলো আলিবাবার কণ্ঠ।

—বেটি, তুমি দু' দুবার আমাদের গোটা পরিবারের জান বাঁচিয়েছ। তোমার বুদ্ধি বিচক্ষণতার তুলনা হয় না। আমি চাই তুমি আমার সংসারের মণি হয়ে চিরকাল এই সংসারেই বাস কর। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। তুমি আর আমার কেন বাঁদী রইলে না। এবার তুমি স্বাধীন। আমার প্রস্তাব আমার ছেলেকে শাদী করে তুমি যদি আমার ঘর আলো করো, মা জননী, আমি খুব সুখী হবো।

মরজানা লজ্জায় মাথা অবনত করে বলে, আপনাকে সুখী করা ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোনও চিন্তা নাই, আব্বাজান।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো ষাটতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আলিবাবার পুত্রের সঙ্গে মরজানার শাদী হয়ে যাওয়ার পরে অনেকদিন মরজানা আলিবাবাকে সেই পর্বত গুহায় যেতে দেয়নি। তার কারণ চল্লিশ চোরের বাকি দু'জন হয়তো তখনও ঐ গুহাভ্যন্তরেই রয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওরা কি করে ভাববে সে দু'জনকে চোরসর্দারই নিজের হাতে হত্যা করেছিলো।

এইভাবে পুরো একটা বছর কেটে গেছে। আলিবাবা ছেলেকে সঙ্গে করে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায় আর ঘরে থাকে মরজানা।

একদিন আলিবাবা বায়না ধরলো, ঢের দিন চলে গেছে মা জননী, আমার মনে হয় ওদের আর কেউ বেঁচে বর্তে নেই দুনিয়ায়। তাহলে কি আমাদের রেয়াৎ করতো সহজে। এবার তুমি অনুমতি দাও, আমি একবার গুহায় গিয়ে ধনরত্নগুলো ঘরে এনে তুলি?

মরজানা বলে, ঠিক আছে আব্বাজান, কাল সকালে আপনাদের সঙ্গে আমিও যাবো ঐ গুহা দেখতে।

পরদিন তিনজনে অতি সন্তর্পণে গুহা সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। মরজানা সূক্ষ্ম বুদ্ধি-সম্পন্না মেয়ে। সে দেখলো, গুহার দিকে যাওয়ার পথটা লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে সমাকীর্ণ হয়ে গেছে। ভালো করে লক্ষ্য করে বোঝা যায় এ পথে বহুদিন কোনও জন-মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। চোর দু'টো যদি সত্যিই জীয়ন্ত থাকতো তবে নানা কারণেই তারা বাইরে আসতে বাধ্য হতো। এবং তাদের যাওয়া আসার একটা ছাপ অবশ্যই আঁকা থাকতো এখানে। মরজানা বললো, চলুন আব্বাজান, গুহার ভিতরে ঢোকা যাক। আমি নিশ্চিত, এখন আর এখানে কেউ যাতায়াত করে না। আমরা নির্ভয়ে ঢুকতে পারি এখন।

আলিবাবার মনে তখনও ভয়ের কালো মেঘ দানা বেঁধে ছিলো। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সে হাঁক ছাড়ে 'চিচিং ফাঁক'!

সঙ্গে সঙ্গে গুহামুখ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

তিনজনেই নিচে নেমে যায়। আলিবাবা দেখে যেমনটি সে দেখে গিয়েছিলো ঠিক তেমন রয়েছে সবকিছু। কেউ কিচ্ছু সরিয়ে নিয়ে যায়নি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব মণিরত্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওরা তিনজনে সবচেয়ে মূল্যবানগুলো তিনটি বস্তায় ভরে নিয়ে বাড়ি চলে এলো।

এরপরে আর তারা কখনও ঐ রত্নগুহায় যায়নি। যাওয়ার দরকারও হয়নি। যে ধনরত্ন তারা নিয়ে এসেছিলো সেদিন তারই কল্যাণে সারা মুলুকে তাদের মতো ধনী মানুষ আর কেউ ছিলো না। আলিবাবা বলতো, এই আমাদের অফুরান, আর বেশি সম্পদে কাজ নাই। আল্লাহর কৃপা থাকলে কোনও কিছুরই অভাব হয় না। তিনি হাত গুটিয়ে নিলে সোনামুঠিও ধুলো হয়ে যায়।

মহানুভব শাহেনশাহ, এই আমার কিস্সা। জানি না কেমন লাগলো আপনার।

শাহরাজাদ থামলো। সুলতান শাহরিয়ার বলেন, সত্যিই বড় চমৎকার তোমার কাহিনী শাহরাজাদ, তুলনা হয় না। আজকের দিনে মরজানার মতো বুদ্ধিমতী বিচক্ষণা নারী চোখে পড়ে না। কিন্তু আমি নিত্য নতুন নারী-সম্ভোগ করে তার শিরচ্ছেদ করি। এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে হয়তো কোনওদিন তেমন এক মেয়ে আমার সামনে এসে এর সমুচিত্ জবাব দিয়ে যাবে।

শাহরাজাদ দেখলো। সুলতান কিছু বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাই সে নতুন কাহিনী শুরু করতে দ্বিধা করতে লাগলো।

কিন্তু পরক্ষণেই সুলতান নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললেন, তাহলে নতুন কিস্সা শুরু কর, শাহরাজাদ, রাত এখন অনেক বাকী।

একদিন জাফর আর মাসরুরকে সঙ্গে করে খলিফা হারুণ অল রসিদ টাইগ্রীসের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বেড়াতে বেড়াতে এক সময় তিনি একটা সেতুর ওপরে এসে দেখলেন এক অন্ধ পদ্মাসন হয়ে বসে ভিক্ষে মেগে চলেছে। সুলতান হাত বাড়িয়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিলো তার ভিক্ষাপাত্রে। অন্ধটি সঙ্গে সঙ্গে দাতার হাতখানা চেপে ধরে, আপনার এই দান-এর যোগ্য প্রতিদান আপনি পাবেন মালিক। আল্লাহ আপনাকে সবচেয়ে সেরা বস্তু দান করবেন। আমার একটা অনুরোধ আছে, আপনাকে রক্ষা করতে হবে।

খলিফা ঈষৎ বিরক্তই হলেন। বলেন, বেশ তো কী অনুরোধ, বলো শুনি।

—আমাকে যারা দান করেন তাদের হাতের একটা ঘুষি না পেলে আমি কিছুই গ্রহণ করতে পারি না। তাই আপনাকেও আমার অনুরোধ, যদি দিতেই চান তবে আমার মুখে একটা ঘুষি লাগিয়ে দিন।

খলিফা অবাক হন, সে কি কথা, তুমি অন্ধ আতুর মানুষ। আমি দয়াপরবশ হয়ে তোমাকে সাধ্যমতো কিছু দান করবো, তা ঘুষি দিতে যাবো কেন?

—তা যদি না-দিতে পারেন মালিক, আপনার দান আপনি ফিরিয়ে নিন। আমার শপথ আছে, নিতে পারবো না।

বৃদ্ধ অন্ধটার একগুঁয়েমী দেখে খলিফা বেশ বিরক্তই বোধ করেন। কিন্তু লোকটা দান গ্রহণ করবে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে তার কানের গোড়ায় ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে রেহাই পান।

একটু দূরে গিয়ে জাফরকে বলেন খলিফা, ইয়া আল্লাহ একি আজব মানুষ। নিশ্চয়ই ওর জীবনে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছিলো, যার জন্যে এই ধরনের এক অদ্ভুত শপথ নিতে হয়েছিলো। যাও লোকটার কাছে গিয়ে বলে এসো আগামীকাল দুপুরে তাকে খলিফার দরবারে হাজির হতে হবে।

জাফর ফিরে এলে আবার খলিফা হাঁটতে থাকেন। কিছু দূরে গিয়ে আর এক ভিক্ষুকের দেখা পান। লোকটি খঞ্জ! মুখের এক পাশ কাটা। সেও ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে ধরলো। খলিফা সহজভাবে একটি দিনার দিলেন তার পাত্রে। স্বর্ণমুদ্রা দেখে লোকটির চোখ দু'টো চকচক করে ওঠে, ওরে বাবা, গোটা একটা মোহর? যখন মাদ্রাসার মৌলভী ছিলাম তখনও এক সঙ্গে একটা গোটা মোহর চোখে দেখিনি কখনও।

—লোকটা বলে কি, হারুণ অল রসিদ বিস্ময়াহত হয়ে বলেন, একটা মাদ্রাসার মৌলভীর এই দীন ভিখারীর দশা হলো কি করে? জাফর, লোকটা কি সত্যিই বলছে? সে কি কোনওকালে শিক্ষক ছিলো তোমার মনে হয়? যাই হোক মনে হচ্ছে, এরও জীবনের ঘটনাস্রোত সোজা পথে বয়ে চলেনি। তা না হলে আজ সে ভিক্ষে করে খাবে কেন? তুমি একেও কাল দুপুরে আমার দরবারে হাজির করবে! জাফর বলে, জো হুকুম, জাঁহাপনা।

এরপরে ওরা তিনজনে আরও খানিকটা এগোতে অন্যতম ভিখারীর উচ্ছ্বসিত আশীর্বাণী শুনতে পেলেন। সুলতান দেখলেন, এক বৃদ্ধ সওদাগর বেশ মুঠিভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দান করছে ভিক্ষুকটিকে এবং তাতে সে দিশাহারা হয়ে কি ভাবে তাকে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। খলিফা লক্ষ্য করলেন, বৃদ্ধ সত্যই বেশ মোটা অঙ্কের মুদ্রা দরাজহাতে দান করেছে তার পাত্রে। খলিফা অবাক হলেন এই ভেবে, একজন সাধারণ নাগরিক যা দান করতে পারে তিনি নিজে সুলতান হয়েও তা পারেন না। জাফরকে বললেন তিনি, শোনো সাহেবকে কাল দুপুরে খলিফার দরবারে হাজির হতে বলো।

আরও একটু এগোতে খলিফা দেখলেন রাস্তার দু' পাশের মানুষজন সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাচ্ছে, আর এক অশ্বারোহী সেনাপতি হাঁক ছাড়ছে। এই, খবরদার, পথ ছেড়ে দাঁড়াও। চীন-সম্রাটের রাজকুমারীর স্বামী আসছেন! হট যাও, তফাত যাও, মহামান্য চীন-সম্রাটের জামাতা হিন্দুস্তানের সম্রাট আসছেন এই পথে। দেখা গেলো একটি প্রিয়দর্শন যুবক রাজবেশে সুসজ্জিত হয়ে অশ্বারোহী সেনাপতিটির পিছনে পিছনে এগিয়ে আসছে।

খলিফা জাফরকে বললেন, আমার শহরে এমন মেহেমান এসেছেন। নিশ্চয়ই আলাপ-পরিচয় করা দরকার। জাফর, তুমি ঐ মিছিলের পিছনে পিছনে ধাওয়া কর। দেখ, তারা কোথায় গিয়ে ওঠে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই আমার এই শহরেই কোথাও

রাত্রিবাস করবে। তুমি কাল দুপুরে আমার দরবারে তাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবে। আমি আর মাসরুর প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি। এদের খোঁজ খবর নিয়ে তুমিও ফিরে এসে জানাও আমাকে। এদের খবরা-খবর জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবো আমি।

আরও খানিকটা এগোতে খলিফা দেখলেন, এক যুবক একটা সুন্দর মাদী ঘোড়ায় চেপে সাঁই সাঁই করে চাবকাচ্ছে আর ঘোড়াটি তারস্বরে চিঁহি চিঁহি করে চিৎকার ছাড়ছে। কিন্তু যুবকের কি অমানুষিক খেলা! গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে ঘোড়াটাকে সে একটানা বেদম প্রহার করেই চলেছে। উঃ কী নৃশংস!

একটুক্ষণের মধ্যেই সাদা ঘোড়াটার গা ফেটে লাল রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকলো, কিন্তু তবুও ছেলেটি ক্ষান্ত হতে চায় না।

খলিফা নিজে এক অশ্বপ্রিয় ব্যক্তি। ঘোড়াকে কেউ কষ্ট দিচ্ছে দেখলে তিনি ঠিক থাকতে পারেন না। পথচারীদের অনেককে ডেকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপারটা কী? সাহেব এতো ক্ষেপে গেছেন কেন?

কিন্তু খলিফার প্রশ্নের কেউই জবাব দিতে পারে না। বলে, খোদা জানেন, আমরা কি করে বলবো? তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, এই যুবক নিয়ম করে প্রতিদিন ঠিক এই সময় ঘোড়ায় চেপে এখানে আসেন এবং এলোপাতাড়ি পিটাতে পিটাতে রক্তের বন্যা বইয়ে দেন। কেন, কী কারণে তা কেউ জানে না।

খলিফা মাসরুরকে বললেন, যাও ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর কেন সে এইরকম ভাবে এক নিরীহ জানোয়ারের ওপর অত্যাচার করে। যদি সহজ কথায় জবাব না দেয় ওকে গ্রেপ্তার করে কাল দুপুরে আমার দরবারে হাজির করবে।

এরপরে হারুণ অল রসিদ প্রাসাদে ফিরে এলেন।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো একষট্টিতম রজনী। আবার সে বলতে থাকে ঃ

পরদিন দুপুরের নামাজ শেষে খলিফা দরবারে এলেন। জাফর সুলতানের সামনে ঐ পাঁচজনকে হাজির করলেন। সকলে যথাবিহিত কুর্ণিশ জানিয়ে সুলতানের মসনদের সামনে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকলো। খলিফা ইশারায় তাদের বসতে আদেশ করলেন।

তখন খলিফা সেই সাদা ঘোড়ার সওয়ার যুবককে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি কাল বিকেলে নিজের চোখে দেখেছি তুমি একটি বোবা জানোয়ারের পিঠে চেপে নির্মমভাবে তাকে প্রহার করছিলে। কিন্তু কেন, কারণ কী? তুমি তোমার ঘোড়ায় চাপবে তাতে কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু একটা অসহায় জানোয়ারকে ঐ ভাবে প্রহার করা অমানুষিকতা। সহ্য করা যায় না। আমি এও লক্ষ্য করেছি সেখানে যারা উপস্থিত ছিলো তারা সকলেই তোমার ত্রাসে আতঙ্কিত। কেউ কিছু জানে কি না জানি না, কিন্তু আমরা বারবার জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও তারা মুখ খুলতে সাহস করলো না। এরই বা কারণ কী? আমার এমনই ক্রোধ জন্মেছিলো, নিজের ছদ্মবেশের কথা ভুলে গিয়ে তখুনি তোমাকে সমুচিত শিক্ষাদানের কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সে যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে কোনও রকমে ঘটনাস্থল থেকে চলে এসেছি। কিন্তু তা বলে ব্যাপারটা আমি ভুলতে পারিনি আদৌ। আজ তোমাকে ডাকা হয়েছে তার উপযুক্ত কারণ দর্শাবার জন্য। তোমার সব কথা শোনার পর আমি যদি সন্তুষ্ট হই তবেই তুমি রেহাই পাবে; নচেৎ যোগ্য সাজা তোমার

জন্য অপেক্ষা করছে। নাও, দেরি কোরো না তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে দ্বিধাহীন চিত্তে তা পেশ করতে পার এখানে।

খলিফার ফরমান শুনে ঘোড়সওয়ার বাবাজীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। ঘাড় গুঁজে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। দু'গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা।

যুবককে কাঁদতে দেখে খলিফা কিছুটা নরম হয়ে বললেন, তোমার কিছু ভয় নাই। তুমি ভুলে যাও, তোমার সামনে স্বয়ং খলিফা বসে আছেন। নাও, খোলসা করে বলো দেখি কাহিনীটা কী? ঠিক আছে, আমি তোমাকে জবান দিচ্ছি, তোমাকে কোনও সাজা দেব না। অবশ্য যদি সত্যি কথা সব খুলে বলো।

জাফরও ভরসা দেয়, ভয় নাই, জাঁহাপনা যখন অভয় দিচ্ছেন তখন নির্ভয়ে সত্যি কথা বলতে পার তুমি।

এরপর যুবকটি চোখের জল মুছে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসে।

শুনুন ধর্মাবতার, আমার নাম সিদি নুমান। আজ যে কাহিনী বলার জন্য আপনি আমাকে অদেশ করেছেন তা আমাদের পরিবারের ধর্মবিশ্বাসের কাহিনী।

অল্পক্ষণের জন্য যুবকটি নীরব হলো। হয়তো বা সে কাহিনীটা মনে মনে একবার ঝালাই করে নিতে চাইলো।

আমার বাবা যখন ইন্তেকাল করলেন, তাঁর বিশাল বিত্তের আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী হলাম। যে-কোনও মানুষের কাছে সে ধনসম্পদ কেবলমাত্র যথেষ্ট নয়—প্রচুর। এক কথায় অতুলনীয়ও বলা চলে। আমাদের এলাকায় আমার চেয়ে ধনীমানুষ আর কেউ নাই।

ছোটবেলা থেকেই, আমাদের বংশমর্যাদা বা আভিজাত্য অহঙ্কারের জন্যেই বোধহয় আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একা। পাড়া প্রতিবেশী কারো সঙ্গে মেলামেশা করা নিষেধ ছিলো। তাই ছোট থেকেই আমি নির্বান্ধব অবস্থায় মানুষ হয়েছি। এবং বড় হয়েও সে অভ্যাস কাটাতে পারিনি। কোনও বাধা নিষেধ অবশ্য ছিলো না তখন, কিন্তু আমার নিজেরই ভালো লাগতো না কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে। নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত একা একা থাকতেই আমার বেশি ভালো লাগে।

এবং বোধহয় এই কারণে এখনই আমি অবিবাহিত। কাউকে শাদী করে আমার জীবন-সঙ্গিনী করবো, সেকথা ভাবতেই পারি না আমি। আমিই আমার একমাত্র মালিক, তার ওপর কেউ ভাগ বসাতে আসবে সে আমি সইতে পারবো না। সেই কারণে আজও আমি অকৃতদার। বিবি বন্ধু ইয়ারবিহীন একা একা থাকায় যে কী মজা তা কী করে বোঝাবো আপনাকে। যে যাই বলুক, আমার মতে নিঃসঙ্গ মধুর জীবনের চেয়ে আর কিছুই সুন্দর হতে পারে না।

এই ছিলো আমার আজন্মের ভাবনা। কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে আমার এতোকালের ধ্যান ধারনার অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটে গেলো। ভাবতে শুরু করলাম, এই একঘেয়ে জীবনের গতি ফেরাতে হবে। শাদী করে নতুন ভাবে জীবন শুরু করবো। জগতে এতো ভোগের সামগ্রী আছে তা যদি সময়কালে আস্বাদ করেই না দেখলাম তবে তো জীবনটাই সেই 'আঙুর ফল কি' শৃগালের মতো হয়ে যাবে।

কিন্তু শাদী কী করে সম্ভব? আমাদের যা বংশমর্যাদা, তার সমকক্ষ অভিজাত পরিবারই বা তামাম আরব দুনিয়ায় ক'টা আছে? আর দু' চারটে থাকলেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগই বা ঘটতে পারবে কী উপায়ে? এছাড়া অন্য নিচু বংশের কোনও মেয়েকে ঘরের বিবি করার প্রশ্নই উঠতে পারে না আমাদের পরিবারে।

কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, যার কড়া শাসনে কেটেছে এতকাল সেই বাবা তো গত হয়েছেন। এবার আমার পরিবারের আমিই তো মাথা। আমি যদি ঐ সব নীল রক্তের বাধা না মানি কে আমার গর্দান নেবে?

তাই ঠিক করলাম, বাঁদী-হাট থেকে পরমাসুন্দরী দেখে একটি মেয়ে কিনে আনবো আমার জন্য। তারপর যদি মনে ধরে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শাদী করে বিবি বানাবো। না হলে, যেমন বাঁদী তেমনি বাঁদীই সে থেকে যাবে। ক্ষতি কী?

পরদিন সকালে আমি বাঁদীবাজারে গেলাম। খবর পেয়েছিলাম সম্প্রতি নানা দেশ থেকে পরমাসুন্দরী মেয়েরা সব এসেছে। আমাকে দেখেই দালাল এবং নিলামদাররা ছেঁকে ধরলো। এক এক করে অনেক মেয়েকে দেখালো তারা। আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেলো। যাকেই দেখি তাকে ডানাকাটা পরী বলে মনে হতে লাগলো। এক সঙ্গে এতোগুলো পরমাসুন্দরী মেয়ে জীবনে দেখিনি কখনও। তাই বাঁশবনে ডোম কানার মতো দিশাহারা হয়ে পড়লাম।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো বাষট্টিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরেও আমি ঠিক করতে পারলাম না কাকে কিনবো। অথচ বাড়ি থেকে পণ করে বেরিয়েছি, খালি হাতে ফিরবো না। একটি বাঁদীকে আনবোই ঘরে। তাই শেষমেশ সব চেয়ে বয়সে ছোট যে মেয়েটি তাকেই পছন্দ করে দাম জিজ্ঞেস করলাম। তার রূপের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার নাই তবে বলতে পারি অমন রূপসী কন্যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

যাই হোক তারই হাত ধরে আমি ঘরে ফিরে এলাম। ওর শান্ত বিনয় নম্রতা আমাকে মুগ্ধ করেছিলো।

কিন্তু অসুবিধায় পড়লাম, সে আমার ভাষা বোঝে না, আমিও তার ভাষা জানি না। তাই আমি তাকে কোনও প্রশ্ন করতে পারি না, সেও কিছু বলতে সমর্থ হয় না। তবুও আমার বেশ ভালো লেগেছিলো। নাই বা বুঝলো সে আমার মুখের কথা, মনের ভাষা পড়তে তো শুধু ভালোবাসার দরকার হয়। আমরা যদি দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসতে পারি তবে মুখের ভাষা কোনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না।

মেয়েটি কিন্তু আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায় না। আকারে প্রকারে নানা ভাবে তাকে কাছে টানার চেষ্টা করতে থাকলাম। কিন্তু কিছুতেই সাড়া দেয় না সে।

আমার স্বভাব প্রকৃতি জন্মগত ভাবেই একটু ভিন্ন ধাঁচের। জোর জুলুম গায়ে পড়ে ভাবসাব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিশেষ আর বিরক্ত করলাম না তাকে।

সে নিজের খেয়ালেই চলাফেরা করে। বলতে গেলে আমার সামনেই আসতে চায় না সে। আমিও ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাই না।

এইভাবে দিন দশেক কেটে গেলো। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমার বাঁদী পাশের ঘরে শোয়। ভাবলাম দেখে আসি তো কেমন সে ঘুমাচ্ছে।

কিন্তু অবাক হলাম, পাশের ঘরের সামনে যেতেই বুঝতে পারলাম, মেয়েটি এই নিশুতি রাতেও বিছানায় শোয় নি। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি অস্থির পায়ে পায়চারী করে চলেছে।

মনে হলো, মেয়েটিকে কিনে আনা আমার উচিত হয় নি। কেনার আগে ওর মত জানা উচিত ছিলো।

যাই হোক, কতক্ষণ সে ঐ ভাবে না ঘুমিয়ে কাটায়, আমার দেখা দরকার। হয়তো এই গৃহ ওর কাছে কয়েদখানার মতো মনে হয়েছে। তা যদি হয় তবে তো ওকে আর এখানে বন্দী করে রাখা ঠিক হবে না।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি দরজা খুলে বাইরে বেরুলো। আমি নিজেকে আড়াল করবার জন্য অন্য পাশে সরে গেলাম। মেয়েটি ধীর পায়ে চলতে চলতে বাড়ির সদর ফটক ছাড়িয়ে পথে নামলো। আমি অবাক হয়ে তাকে অনুসরণ করে চললাম। সে বুঝতে না পারে সেইভাবে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ওর পিছনে পিছনে যেতে থাকলাম।

আমাদের বাড়ির অদূরে একটি কবরখানা। মেয়েটি সোজা গিয়ে প্রবেশ করলো ঐ গোরস্থানে। বেশ সহজ এবং সাবলীল গতিতে এমন ভাবে ঢুকলো যা দেখে আমার মনে হলো, এ জায়গা যেন তার কতকালের চেনা।

মেয়েটি কবরখানার মাঝখানে গিয়ে একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটু পরে দেখলাম, একটি ছায়ামূর্তি উঠে এলো ঐ কবর থেকে। তারপর মেয়েটিকে হাতে ধরে একটা বেদীর ওপর বসে পড়লো।

আমি একটু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দু'জনকে দেখতে থাকলাম। ছায়া মূর্তি কবরের তলা থেকে একটি মানুষের মাথা তুলে মেয়েটির হাতে দিলো। আমি শিউরে উঠলাম।

মেয়েটি মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগলো! এই দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। আমার চিৎকারে ওরা দু'জন তেড়ে এলো আমার দিকে। আমি তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেছি।

মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় বিড় বিড় করে কি যেন সব বলতে থাকলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম আমি একটি কুকুরে রূপান্তরিত হয়ে গেছি।

এরপর ঐ ছায়ামূর্তি আর মেয়েটি আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল চড় লাথি মারতে মারতে কবরখানা থেকে বাইরে বের করে দিলো। আমি প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

কিন্তু শহরের যে পথেই যাই অন্য সব কুকুররা আমাকে দেখামাত্র মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে। আমি আরও জোরে ছুটে পালাতে থাকি। কিন্তু পালাবো কোথায়, শহরের সব পথেই নেড়ি কুত্তার দল। তারা আমায় দেখামাত্র তাড়া করতে থাকলো।

অবশেষে এক কষাইখানায় এসে ঢুকে পড়লাম। আমার পিছনে পিছনে কুকুরগুলোও ঢুকতে চেষ্টা করলো। কিন্তু দোকানীর ডাণ্ডার তাড়া খেয়ে পিছু হটে গেলো তারা।

বাকী রাতটুকু ঐ দোকানেরই এক কোণে কুঁকড়ে পড়ে রইলাম আমি। দোকানী হয়তো বুঝেছিলো ঐ রাতে আমাকে বের করে দিলে কুকুরগুলো আমাকে ছিঁড়ে খাবে। তাই সে-রাতের মতো সে আর আমাকে কিছু বললো না। কিন্তু পরদিন ভোর হতে না হতেই আমাকে পথে বের করে দিলো সে।

অন্য কুকুরের চোখ ফাঁকি দিয়ে গুটি গুটি চলতে চলতে এক সময় এক রুটির দোকানের সামনে এসে পৌঁছলাম। দোকানের মালিক ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ এক শেখ। সকালের নামাজ সেরে সবে সে তখন নাস্তা করতে বসেছে। আমাকে দেখে বোধ হয় প্রাণে দয়া হলো তার, তাই এক টুকরো রুটি একটু বেগুনের কোপ্তা জড়িয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলো।

সারারাত ধরে অনেক ছুটাছুটি করতে হয়েছে, ক্ষিদেও বেশ পেয়েছিলো। তাই আর দ্বিধা না করে বেশ সাগ্রহেই খেলাম সেই রুটিখানা।

পথে অন্য কুকুর আসছে দেখে আতঙ্কিত হয়ে আমি বৃদ্ধের দোকানের এক কোণে ঢুকে কুঁকড়ে রইলাম। দোকানী বুঝতে পারলো, আমার অসহায় অবস্থা। পথের কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিলো সে।

দুপুরে দোকান বন্ধ করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে তার বাড়িতে এলো। বৃদ্ধের একমাত্র কন্যা আমাকে দেখামাত্র বোরখার নাকাবে মুখ ঢেকে ফেললো। বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস

করলো, কী ব্যাপার বেটি, সঙ্গে তো আমি বাইরের কোনও পুরুষ মানুষকে নিয়ে আসিনি, তা এতো শরম করছো কেন?

মেয়েটি বললো, দাঁড়াও আব্বাজান, আমি আসছি।

এই বলে সে পাশের ঘরে চলে গেলো। একটু পরে একট ছোট্ট পাত্রে খানিকটা জল এনে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতে দিতে কি যেন সব মন্ত্র আওড়াতে থাকলো। আর কী আশ্চর্য, আমি তখনি, আবার আমার নিজের রূপ ফিরে পেলাম। বৃদ্ধ অবাক হলো ততোধিক। বললো, এসব কী ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, মা?

মেয়েটি বললো, তুমি যাকে কুকুর বলে ঘরে এনেছো আব্বাজান, আসলে সে এক খানদানী ঘরের নওজোয়ান। এক মায়াবিনীর যাদুতে ঐ অবস্থা ঘটেছিলো ওর।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আগাগোড়া ব্যাপারটা বৃদ্ধকে খুলে বললাম আমি। শুনে মর্মাহত হলো সে। মেয়েটি বললো, ঐ শয়তানীটা এখনও তোমার বাড়িতে আস্তানা গেড়ে আছে। আবার দাঁও পেলেই তোমাকে যাদু করে অনেক তখলিফ্ দেবে। তুমি এক কাজ কর, এই মন্ত্রপুত পানির খানিক আমি তোমাকে দিচ্ছি। বাড়িতে গিয়ে ঐ মেয়েটাকে দেখামাত্র সে কিছু করার আগেই তার গায়ে ঐ পানিটুকু ছিটিয়ে দিয়ে বলবে, 'আল্লা এই শয়তানীকে তুমি একটা মাদী ঘোড়া বানিয়ে দাও।' দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সে একটা সফেদ মাদী ঘোড়া বনে গেছে। এর পর তোমার কাজ হবে প্রতিদিন ঐ ঘোড়ায় চেপে তুমি তাকে নৃশংস ভাবে চাবকাতে থাকবে। তোমার চাবুকে ওর গা থেকে দর দর করে ঝরতে থাকবে খুন। মুখে ফেনা উঠবে। তখন তাকে বাড়ি ফিরিয়ে এনে আস্তাবলে আটকে রাখবে। এইভাবে একটানা অত্যাচার চালাতে থাকবে নিয়ম করে। যাতে ঐ শয়তানী হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে সে কি করেছিলো।

যুবকটি একবার খলিফার দিকে তাকিয়ে বললো, সেইদিন থেকে আমি ঐ মেয়েটির হুকুম তামিল করে চলেছি, ধর্মাবতার। জানি না, আপনি আমাকে কি সাজা দেবেন এসব শুনে।

খলিফা বললেন, বড় অদ্ভুত তোমার কাহিনী, বেটা। আমি এখন দেখছি, বেইমানকে শায়েস্তা করার জন্য মেয়েটি তোমাকে যা করতে বলেছে তার মধ্যে একটুও বাড়াবাড়ি নাই। ঠিকই করছো তুমি।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো ছেষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

দুনিয়াজাদ বলে, এবার ঐ চীন-সম্রাটের জামাতা ভারত রাজপুত্রের কাহিনীটা শোনাও দিদি।

শাহরাজাদ বলে, হ্যাঁ এবার তো খলিফা তাকেই উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

রাজকুমার, তোমাকে দেখে আমার প্রত্যয় হয়েছে অতি সদ্বংশ জাত তুমি। আমার এই শহরে কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন যদি বলো, আমি খুশি হয়ে শুনবো।

যুবরাজ যথাবিহিত কুর্ণিশাদি জানিয়ে অতি বিনয় সহকারে বলতে শুরু করে ঃ

ধর্মাবতার আমি কোনও রাজদূত হয়ে আসিনি আপনার মুলুকে। অথবা কোনও কৌতূহল চরিতার্থের বাসনা নিয়েও আমার আগমন নয় এখানে। শুধু আর একবার আমার জন্মভূমিকে দু'চোখ ভরে দেখার জন্যই আমি এসেছি আপনার শহরে। আমার কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ। বুঝতে পারছি শোনার জন্য চিত্ত আপনার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ঠিক আছে আমি আর বিলম্ব করবো না।

এই বাগদাদ শহরে আমার জন্ম। এক দরিদ্র কাঠুরিয়া পরিবারে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও আমার বিবি আর আমার গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারতাম না।

একে অভাবের তাড়না তার ওপর আমার দজ্জাল স্ত্রীর অষ্টপ্রহর লাঞ্ছনা গঞ্জনা জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলো। বৌটার না ছিলো রূপ, না ছিলো এক ফোঁটা গুণ। কিন্তু যত রকম বজ্জাতি এবং শয়তানিতে সে ছিলো মহা ওস্তাদ।

সারাদিন খেটেখুটে ঘরে ফিরে এসে যে একটু শান্তি পাবো তার জো ছিলো না। প্রতি মুহূর্তেই সে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসতো।

প্রতিদিন বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে তল্লাশী করে দেখে নিত কাঠ বেচার সব পয়সা তাকে দিয়েছি না দু একটা আধলা কোথায় লুকিয়ে রেখেছি।

একদিন বৌকে ভয়ে ভয়ে বললাম, কিছু পয়সা দাও তো, একগাছা দড়ি কিনতে হবে?

পয়সার কথা শোনামাত্র ক্ষেপে গেলো সে।

—পয়সা? দড়ি কেনার জন্য পয়সা? কেন দড়ি কি হবে, গলায় দিয়ে ঝুলবে নাকি? তোমার মতলব আমি বুঝি না বলতে চাও। যেই পয়সাটি হাতে পাবে অমনি তো বাগদাদের বেবুশ্যে মাগীদের পাড়ায় ছুটবে। তোমাকে চিনতে আমার বাকী আছে?

আমি বলি, আরে না না, ওসব ভাবছো কেন? একটা মোটা রশি কেনা দরকার। তা না হলে বড় গাছ কেটে নামানোর খুব অসুবিধে হচ্ছে। আর বড় গাছপাট করতে না পারলে পয়সা কড়িই বা রোজগার হবে কি করে?

আমার কথা শুনে খানিকক্ষণ গুম মেরে থাকলো সে। তারপর বললো, তোমার চালাকী আমি বুঝি, ওসব ভড়কি দিয়ে আমার কাছ থেকে পয়সা বের করতে পারবে না। তা বেশ তো বাজারে চলো, আমি নিজে পছন্দ করে তোমার দড়ি কিনে দেব। কিন্তু উঁহু, তোমার হাতে একটি কানাকড়ি দেব না।

আমাকে প্রায় হিড় হিড় করে টানতে টানতে সে বাজারে নিয়ে গেলো। আমি চেয়েছিলাম একটা মোটা রসি কিনতে। কিন্তু তার দাম একটু বেশি, সে বললো, অত পয়সা খরচ করতে পারবো না।

এই বলে সে আমার মতামত অগ্রাহ্য করে একগাছি সরু দড়ি কিনে বাড়ি ফিরে এলো।

আমি বললাম, দড়িটা কিনলে বটে কিন্তু কোনই কাজে লাগবে না।

—কাজে লাগবে না? কেন কাজে লাগবে না?

—অত বড় ভারি গাছ-এর ভার কি টেনে রাখতে পারবে ঐ দুবলা দড়ি? ফালতু পয়সা নষ্ট করলে তুমি?

খাণ্ডারনি বৌটা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, মেলা ব'কো না তো। আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। চলো আজ তোমার সঙ্গে যাবো আমি। দেখবো তোমার গাছ কত মোটা।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, তুমি যাবে পাহাড়ের জঙ্গলে?

—কেন? যাবো না কেন? তোমার আপত্তি কিসের? না, সেখানে মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করার ব্যবস্থা সব পাকা আছে, আমি গেলে সব ভেস্তে যাবে?

মেয়েছেলেটার কথার প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্তি হলো না। বললাম, ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে করতে পার।

গাধার পিঠে চেপে বসলো সে। আমি পিছনে পিছনে হেঁটে চললাম।

পাহাড়ের দুর্গম পথ, পুরুষমানুষই উঠতে নামতে হাঁপিয়ে যায়, কিন্তু আমার বিবি মরদের বাড়া, দিব্যি সে গটমট করে উঠে গেলো পাহাড়ের মাথায়।

আমার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিলো। বাড়িতে যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ এই মেয়েছেলেটার জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আবার এই কাজের স্থলেও যদি সে এসে আমার

কর্মসঙ্গিনী হয় তা হলে তো পাগল হয়ে যাবো।

পাহাড়ের মাথায় ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মাঝখানে একটি শুখা কূয়ো ছিলো। আমার মাথায় বদ বুদ্ধি খেলে গেলো একটা।

বৌকে বললাম, শোনো বিবিজান, আসল কথাটা সত্যিই তোমাকে বলিনি। তা তুমি যখন নাছোড়বান্দা হয়ে সঙ্গেই এলে তখন আর লুকিয়ে রেখে ফয়দা ওঠাতে পারবো না।

বৌটা বিজ্ঞের হাসি হাসতে হাসতে বললো, হুঁ হুঁ বাবা, সে কি আমি বুঝতে পারিনি ভেবেছো? চোখ দেখলে আমি পুরুষমানুষের বজ্জাতি ধরতে পারি।

আমি বললাম, আহা বজ্জাতির কথা বলছো কেন? এই কূয়োটার মধ্যে অনেক ধনরত্ন আছে, শুনেছি। সেই জন্যে একটা দড়ি কিনতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কূয়োটার তলা থেকে অনেক ধনরত্ন তুলে নিয়ে গিয়ে তোমাকে হঠাৎ তাক লাগিয়ে দেব।

—আহা থাক, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে ধনদৌলত তুলে নিয়ে গিয়ে তোমার পেয়ারের মাগীর ঘরে তুলতে। সে কি আর আমি বুঝি না? যাক, ওসব ছেঁদো কথা রাখ, তোমাকে আমি একদম বিশ্বাস করি না। আমি নিজে নামবো এই কূয়ার নিচে। ধনরত্ন যা পাবো নিজে হাতে তুলে আনবো। তুমি আমাকে দড়িতে বেঁধে নিচে নামিয়ে দাও।

আমিও তাই চেয়েছিলাম। ওর কোমরে দড়ি বেঁধে কূয়ার নিচে নামিয়ে দড়িটা কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে বললাম, আমার সঙ্গে যে ব্যবহার তুমি করেছ এতকাল, এই তার সাজা। থাক এইখানে, আমি চললাম।

আমি আর দাঁড়ালাম না সেখানে। বনের অন্য প্রান্তে চলে গেলাম কাঠ কাটতে।

দু'টো দিন বেশ শান্তিতেই কাটলো।

কিন্তু মনটা কেমন খচ খচ করতে লাগলো। তিন দিনের দিন সকালে বাজার থেকে আর একটা দড়ি কিনে নিয়ে পাহাড় জঙ্গলে গেলাম।

পুরো দু'টো দিন মেয়েটা না খেয়ে শুকিয়ে মরছে। এবার ওকে ওপরে তুলতে হবে। না হলে মরে যাবে নির্ঘাৎ।

কূয়ার ধারে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলতে থাকলাম, শোনো ও ভালো মানুষের মেয়ে, আশা করি তোমার যোগ্য শিক্ষা হয়েছে। এর পর হয়তো আর আমার সঙ্গে ঐ রকম দুর্ব্যবহার করবে না।

কিন্তু নিচে থেকে কোন সাড়া এলো না। ভয় হলো, তবে কি মেয়েটা মরে গেছে? দড়িটা নামিয়ে দিলাম। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম সে আঁকড়ে ধরেছে! প্রাণপণ শক্তিতে আমি টেনে তুলতে থাকলাম।

কিন্তু বিবির বদলে উঠে এলো বিশালকায় এক আফ্রিদি দৈত্য। ভয়ে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার দাখিল হলো, কিন্তু আফ্রিদি আমাকে অভয় দিয়ে বললো, ভয় করো না! আজ যে উপকার তুমি করলে আমার, জীবনে তা ভুলবো না কখনও। এক দৈত্যের শাপে আমি আকাশে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়েছি। কিন্তু পায়ে হেঁটে বায়ু বেগে চলতে পারি! অনেক কাল আগে এক দৈত্য এই কূপে ফেলে দিয়ে গেছে আমাকে। সেই থেকে মুক্তির দিন গুনছিলাম। আজ তুমি আমাকে উদ্ধার করলে। আমি অকৃতজ্ঞ নই, এর পুরস্কার তোমাকে দেব আমি।

দৈত্যর কথা শুনে খানিকটা ধাতস্থ হতে পারলাম আমি। সে বলতে থাকলো, হিন্দুস্তানের এক পরমাসুন্দরী কিশোরী কন্যা আছে। তার সঙ্গে আমি তোমার শাদী করিয়ে দেব।

আমি হাসলাম, বাগদাদের এক দরিদ্রতম কাঠুরে আমি। সে হবে হিন্দুস্তানের সুলতানের জামাতা?

আফ্রিদি বললো, ভরসা রাখ, আমার অসাধ্য কিছুই নাই। ফিকিরটা আমি বাতলে দিচ্ছি শোনো।

আমি ভারত শাহজাদীর দেহে প্রবেশ করে তার মুখ দিয়ে এমন সব কথবার্তা বলাতে থাকবো যাতে তাকে পাগলী বলে মনে করবে সবাই। সুলতান কন্যার চিকিৎসার জন্য দেশ বিদেশের নানা হাকিম বদ্যিকে ডেকে আনবে। কিন্তু আসলে তো আর শাহজাদী পাগলী নয়, তাই তাদের দাওয়াই পত্রে কিছুই সুরাহা হবে না। তখন প্রাণ-প্রতিম কন্যার রোগমুক্তির জন্য সম্রাট যে-কোনও শর্তের ফরমান জারি করবেন। মেয়ের জন্য তিনি তাঁর সাম্রাজ্যও ছেড়ে দিতে কুণ্ঠা করবেন না। কিন্তু তাতেও কেউ তাকে রোগমুক্ত সুস্থ করে তুলতে পারবে না। সুলতান আবার ঘোষণা করবেন, যে তাঁর কন্যাকে সারিয়ে তুলতে পারবে তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব এবং শাহজাদীর সঙ্গে শাদী দিয়ে দেবেন। এইবার তুমি সুলতানের দরবারে হাজির হয়ে বলবে, আমি সারিয়ে দিতে পারি আপনার কন্যাকে।

আমি দৈত্যকে বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু আমি কি করে সারাবো? আমি তো হেকিমির কিছুই জানি না?

সে বললো, সে সব জানার কোনই দরকার নাই। শুধুমাত্র এক পাত্র পানি হাতে নিয়ে শাহজাদীর সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকবার ঐ পানি ছিটিয়ে দিতে দিতে বিড় বিড় করে মুখে যাহোক একটা কিছু আওড়াবে। ব্যস, বাজীমাত হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ শাহজাদীর অঙ্গ থেকে বেরিয়ে যাবো। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। রাজদরবারে, দেশে বিদেশে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে তোমার নামে। সুলতান তোমাকে জামাতা করে মসনদে তাঁর নিজের পাশে বসিয়ে রাখবেন।

আফ্রিদি বললো, আমি আজই হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাচ্ছি। তুমিও তৈরি হয়ে আজই বেরিয়ে পড়। আমার যেতে একদিনও লাগবে না। কিন্তু তোমার পৌঁছতে পুরো দু'মাস সময় লাগবে।

আমি বললাম, কিন্তু আমার বিবি যে এই কূয়ার নিচে ছিলো, তার কি হয়েছে?

আফ্রিদি বললে, তোবা তোবা ঐ নষ্ট খাণ্ডারনিটা তোমার বিবি ছিলো। সে আমার ওপর জোর জুলুম আরম্ভ করেছিলো। মানুষের মেয়ে যে এতো কামুক হয় আমার জানা ছিলো না, আমি তাকে বার বার প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও সে আমাকে ছাড়তে চায় না। কিল চড় ঘুষি মেরে মেরে আমাকে নাস্তানাবুদ করতে লাগলো সে। তাও আমি মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম। কিন্তু গত রাতে আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম সেই সময় সে আমার কোমরের ওপরে বসে পড়েছিলো, তখন আর সহ্য করতে পারিনি, মেয়েছেলেটাকে এক হাতে ধরে আছাড় দিয়েছি। আর সে ওঠেনি।

মনটা খারাপ হয়ে গেলো। হাজার হলেও শাদী করা বউ তো। আমার মনের অবস্থা আঁচ করে অফ্রিদি বললো, দুঃখ করো না। ভ্রষ্টা নারীর চেয়ে শূন্য ঘর অনেক ভালো। আমি তাকে মেরে ফেলার জন্য আছাড় দিইনি, কিন্তু কি করবো, আমার ছোট্ট আছাড়টাও সে সহ্য করতে পারেনি।

আফ্রিদি অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমিও ঘরে ফিরে এসে সেইদিনই হিন্দুস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

এর পরের ঘটনা যথারীতিই সংঘটিত হয়েছিলো। শাহজাদীর ভূয়া ব্যাধি সারাতে আমার একদিনও সময় লাগেনি। সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ওয়াদা পুরণ করলেন। সেই থেকে আমি সুলতান-কন্যাকে শাদী করে হিন্দুস্তানের ভাবী উত্তরাধিকারী হয়েছি।

অনেক কাল দেশ ছাড়া। জন্মভূমিকে দেখার জন্য মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। তাই গতকাল আপনার শহরে এসেছি, জাঁহাপনা। এতোকালের পিতৃপুরুষের ভিটেয় পা দিতে পেরে জীবন সার্থক হয়ে গেছে আমার।

যুবকের কাহিনী শেষ হলে খলিফা মসনদ ছেড়ে নেমে এসে নিজে হাতে ধরে তাকে নিয়ে গিয়ে পাশে বসালেন।

তারপর খলিফা দরবারের সমবেত আমির উজিরদের উদ্দেশ্য করে বললেন, কাল সন্ধ্যায় এক ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধকে মুক্ত হস্তে দান করতে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আজ সে-ও এখানে হাজির আছে, এবার তার জবানী থেকে কিছু শোনা যাক।

সেই বৃদ্ধ শেখ উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো খলিফাকে।

—জাঁহাপনা, ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে বলবো।

খলিফা হাত তুলে বললেন, নির্ভয়ে বলো।

বৃদ্ধ বললেন, আপনার অভয় রুমাল একখানা চাইছি, জাঁহাপনা।

খলিফা একখানা মোহরাঙ্কিত রেশমী রুমাল ছুঁড়ে দিলেন।

বৃদ্ধ বলতে শুরু করলো ঃ

ধর্মাবতার, আমাদের জাত ব্যবসা দড়ির। আমার বাবা তার বাবা বংশপরম্পরায় দড়ি বানিয়ে বিক্রি করে এসেছে, আমিও তাই করি। সারাদিন খেটে যা রোজগার হয় তাতেই আমাদের বেশ ভালোভাবে চলে যায়। সংসারে আমি আর আমার বিবি এই দু'টি মাত্র প্রাণী। প্রয়োজন সামান্যই। সেইটুকু রোজগার হলেই আমরা সন্তুষ্ট। তার বেশি আমাদের প্রয়োজন নাই। যদি বাড়তি কিছু পাই তা দানখয়রাত করে দুস্থজনের মধ্যে বিলিয়ে দিই। আল্লাহর এই নির্দেশ।

একদিন আমি আমার দোকানে বসে আছি, দেখলাম দু'জন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি এসে আমার দোকানের বাইরে বারান্দায় এসে বসলেন। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়। হামেশাই অনেক মানুষ এসে সেখানে বসে কিছু সময় কাটিয়ে যায়। খোলা মেলা জায়গা, মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যেও অনেকে আসে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো ঊনসত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ওরা খুব দু'জনে দু'জনের জিগরী দোস্ত। আমারও বিশেষ পরিচিত।

কাছে এসে সালাম সাবুদ জানালেন। আমিও তাদের সাদরে বসতে বললাম। একজনের নাম সাদ আর এক জনের নাম সাদী। সাদ সাদীকে বললেন, দেখ দোস্ত, আমার বিশ্বাস মানুষের দু'টো হাত আছে। এক ধনী আর এক গরীব। ধনীরা বুদ্ধিমান, তারা বুদ্ধি খাটিয়ে ধন রোজগার করে এবং সংরক্ষণ করতে পারে। কিন্তু গরীবরা মূর্খ। তারা যেমন রোজগারও করতে পারে না তেমনি রোজগার করলেই তা যত্ন করে সঞ্চয় করতে পারে না। সেই কারণে বংশগতভাবে তারা নিরন্ন দরিদ্র। এবং সেইটাই তাদের ভাগ্য।

সাদী বলে, শোনও ভাই সাদ, তোমার কথার আমি প্রতিবাদ করতে চাই না, তা বলে তোমার অভিমত আমার অভিমত নয়। এ কথা সবাই জানে দারিদ্রের চেয়ে সচ্ছলতা ঢের ভালো। কিন্তু ধনীর অর্থগৃধনুতা খুবই জঘন্য। আমার অপর্যাপ্ত আছে। অথচ তার এককণা আমি আমার গরীব প্রতিবেশীদের দেব না, এ মহা অপরাধ। এই যে আমাদের এই দোস্ত হাসান এর কথাই ধর না? সারাদিন সৎপথে দড়ির কারবার করে পয়সা রোজগার করে। কিন্তু নিজের প্রয়োজন

ছাড়া সে কিছুই যখের ধনের মতো জমিয়ে রাখে না। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই এই শিক্ষা নেওয়া উচিত। মোটকথা, আল্লাহ যাকে দয়া করে দেন তা কখনও ফুরায় না। তা না হলে শত চেষ্টা করেও তিল মাত্র সঞ্চয় করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই শোনাই জাঁহাপনা ঃ

আমি সামান্য দড়ির কারবার করে সংসার চালাই। এমন কিছু রোজগার হয় না যা দিয়ে আমি বড়লোক হতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, সে সাধও আমার ছিলো না কোনও কালে। স্বচ্ছলভাবে সংসার চলে যাবে এর চেয়ে বেশি কি আর দরকার হতে পারে মানুষের? তাই অর্থের প্রতি লোভ ছিলো না আমার, আজও নাই। যদিও আল্লাহর দোয়ায় আজ আমি শহরের সেরা ধনী। সামান্য ছোবড়ার দড়ির কারবার করি, তাতে কিই বা রোজগার হতে পারে, ভাবছেন, কেমন করে আমি শহরের সব চেয়ে বিত্তবান হলাম।

তা হলে শুনুন জাঁহাপনা ঃ

জীবনে সৎভাবে থেকেছি চিরটাকাল, কাউকে কখনও ঠকাইনি জ্ঞাতসারে। জীবনে অনেক অভাব অনটনের মধ্যে অনেক দিন কাটিয়েছি। কিন্তু তা নিয়ে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করিনি কখনও। যা পেয়েছি তাই নিয়ে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি। তাই বুঝি খোদাতালা আমাকে পরীক্ষা করার জন্য অগাধ অর্থ ঢেলে দিলেন আমার ঘরে।

একদিন সন্ধ্যায় দোকানপাট বন্ধ করে ঘরে ফিরছি, চলতে চলতে রাতের অন্ধকারে কি যেন শক্ত মতো একটা বস্তু পায়ে ঠেকলো। হাতে তুলে দেখলাম একটা সীসার তৈরি জালের কাঠি। যদি কোনও জেলের কাজে লাগে এই ভেবে কোমরে গুঁজে ঘরে এলাম।

খানা-পিনা সেরে শুতে যাবার আগে সাজ-পোশাক ছাড়তে গিয়ে ঐ সীসার বস্তুটা ঠক করে মেঝেয় পড়ে গেলো। এতক্ষণ এই তুচ্ছ কাঠিটার কথা স্মরণেই ছিলো না। যাই হোক কুলুঙ্গীতে রেখে দিলাম ওটা।

রাত তখনও বেশ বাকী। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে অবাক হলাম। এই রাতে কে আবার কড়া নাড়ে। বিরক্ত হয়ে সদরে গিয়ে দরজা খুলে দেখি আমার প্রতিবেশী এক জেলে।

—কী ব্যাপার, এই রাত দুপুরে তুমি?

জেলে বলে, শেখ সাহেব, বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি। মাছ ধরতে যাওয়ার সময় হয়ে গেলো। জালখানা কাঁধে নিতে গিয়ে দেখি একটা কাঠি খোয়া গেছে। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এক টুকরো সীসা পেলাম না। কিন্তু না পেলেও তো জাল ফেলতে পারবো না। ঘরে আমার অনেকগুলো বালবাচ্চা, আমি একমাত্র রোজগেরে মানুষ, একদিন জাল না ফেললে ওরা না খেয়ে থাকবে। তাই বাধ্য হয়েই এই নিশুতি রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। যদি মেহেরবানী করে একটু খুঁজে পেতে দেখেন, যদি এক টুকরো সীসে বা লোহা একটা কিছু ভারি বস্তু পাওয়া যায় তবে জালখানা জলে ফেলতে পারি—

আমি বললাম, তুমি একটু দাঁড়াও।

কুলুঙ্গী থেকে জালের কাঠিখানা এনে তার হাতে দিয়ে বললাম, দেখ তো চলবে?

জেলে যেন হাতে চাঁদ পেলো; চলবে মানে? এই তো আসল জিনিস। আচ্ছা শেখ সাহেব, বহুত শুক্রিয়া, এখন আমি চলি আর দেরি করবো না। আল্লাহর কাছে আমার নামে দোয়া মাঙ্গুন, আজ যেন আমার জালে ঢাই ওঠে। তবে কথা দিয়ে যাচ্ছি শেখ সাহেব, যে মাছই উঠুক, তার মধ্যে যে মাছটা সব চেয়ে স্বাদের সেইটেই আপনাকে নিবেদন করে যাবো। আপনার এ উপকার কি আমি জীবনে ভুলবো কোনও দিন।

আমি বললাম, আচ্ছা আচ্ছা সে সব পরে হবে। এখন ঘাটে যাও তো, মন দিয়ে মাছ ধর গিয়ে।

লোকটি বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে বিদায় নিলো। আমি বিছানায় ফিরে এসে ভাবলাম, ওরা গরীব, কত সামান্য কারণে ওরা কি দারুণ খুশি হতে পারে। কত সহজে ওরা নিজেদের দরাজ দিল খুলে মেলে ধরতে পারে। একখণ্ড তুচ্ছ জালের কাঠি। সীসার তৈরি। এক আধলায় এক কুড়ি পাওয়া যায়। সেই বস্তু আমার কাছ থেকে পেয়ে সে কেমন কৃতার্থ হয়ে চলে গেলো।

আবার বলে গেলো, জালের সেরা মাছটা আমার বাড়িতে দিয়ে যাবে। আহা, গরীব মানুষ মাছটা বাজারে বেচলে দু'টো দিরহাম পেতে পারবে কিন্তু এক কথায় সে এতো বড় একটা খয়রাতির ওয়াদা করে গেলো! ওর তো কিছুই নাই, তবু সে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা রেখে যায়। কিন্তু আমরা মুঠি ভরে পেয়েও তো কাউকে প্রাণে ধরে কণামাত্র দিতে কুণ্ঠাবোধ করি। সেই নিদ্রা নিশুতি অন্ধকার রাতে দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আকুতি জানালাম, খোদা ওকে কী ধাতুতে গড়েছ তুমি—কত সুন্দর ওর হৃদয়খানা। আমাকেও যদি ঐ রকম করে বানাতে—

পরদিন সকালে জেলেটা এসে একটা বেশ লাগসই মাছ দিয়ে গেলো। বলে গেলো, টাইগ্রীসের সেরামাছ শেখ সাহেব। শুধু ভাজা খেয়ে দেখবেন, কি সোয়াদ?

আমি বলতে গেলাম, তা এতো দামের মাছ দিতে গেলে কেন জেলের পো?

—কী যে বলেন, মালিক। আপনি দয়া না করলে আজ আমাদের উপবাসে থাকতে হতো। বিশ্বাস করেন, আজ যা মাছ উঠেছে, একদিনে এতো মাছ জীবনে আমি ধরতে পারিনি কোনও দিন।

জেলে চলে গেলে, বিবিকে ডেকে বললাম, সামান্য একটা জালের কাঠির দৌলতে কত বড় মাছ জুটে গেলো, দেখ বিবিজান। কিন্তু সমস্যা হলো এতো বড় মাছটা রাঁধবে কি করে।

বিবি বললো, টুকরা টুকরা করে না কাটলে তো কড়াইএ চাপানো যাবে না।

আমি বললাম, দাঁড়াও আমার ভোজালীখানা দিয়ে কেটেকুটে বানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।

মাছটাকে প্রথমে দুখণ্ড করতে গিয়েই দেখতে পেলাম, ওর পেটের মধ্যে একটা রঙিন পাথরের নুড়ি। বেশ ঝকমক করছিলো। ভাবলাম, সমুদ্রের মাছ এসে ঢুকেছে নদীতে। আর সামুদ্রিক মাছরা অনেক সময় নাকি খাদ্যভ্রমে পাথরের টুকরো গিলে ফেলে।

যাই হোক, পাথরটা দেখতে সুন্দর, ঘর সাজানোর কাজে লাগতে পারে ভেবে ধুয়ে ঘরের টেবিলে এনে রেখে দিলাম।

সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসতেই বিবি উৎফুল্ল হয়ে ছুটে এসে আমাকে একটা আজব খবর শোনালো।

হ্যাঁ গো, যে পাথরটা মাছের পেট থেকে পাওয়া গিয়েছে ওটা দিয়ে রোশনাই বেরুচ্ছে।

—কী রকম?

—তুমি তো টেবিলে রেখে গিয়েছিলে! দিনের আলো শেষ হতে আমি ঘরে ঢুকে দেখি আলোয় আলোয় ঘরখানা ভরে গেছে।

আমি ছুটে গেলাম শোবার ঘরে। সত্যিই তাই। পাথরটা থেকে আলোর ছুরি ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর সেই আলোয় আলোময় হয়ে গেছে সারা ঘর।

আমার বিবির দৌলতে সারা পাড়ায় খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। দলে দলে কৌতূহলী প্রতিবেশীরা এসে সেই আশ্চর্য প্রদীপ প্রত্যক্ষ করে গেলো।

পরদিন সকালে ইহুদী জহুরীর বিবি এলো। শুনতে পেলাম আমার বিবির সঙ্গে সে ভাব জমাচ্ছে। একথা সে কথার পর সে আসল কথা পাড়লো, আমার বেটার বৌর ন'মাস চলছে। এই আমাদের ঘরে প্রথম নাতি আসবে। এক গণৎকার এসেছিলো আমাদের বাড়িতে।

সে একটা পাথরের মাদুলী দিয়ে গেছে। বলেছে ঐ রকম আর একটা পাথর দরকার। দু'টো এক সঙ্গে কার-এ বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে, যতদিন না প্রসব হয়। তাহলে আর শয়তানের নজর লাগবে না। শুনলাম ভাই, তোমার বাড়িতে ঐ রকম একটা পাথর আছে। তা যদি কিছু দাম নিয়ে দাও তবে বৌটা ভূতের ভয় থেকে রক্ষা পায়। জিনিসটা কেমন একবার দেখাতে পার শেখের বিবি?

আমার স্ত্রী ইহুদী ঘরণীকে সঙ্গে করে আমার শোবার ঘরে নিয়ে গেলো। একটু পরে বাইরে এসে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এই রকমই একটা রঙিন পাথর সে দিয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে এটা তার জোড়া হতে পারবে। কী দাম নেবে বলো? আমি এখুনি নগদ কিনে নিয়ে যাবো।

আমার বিবি বলে, কী করে বলবো বলো, কত দাম হবে। আমরা তো পয়সা দিয়ে কিনিনি। মাছের পেটে পেয়েছি। তুমিই বলো, কী দাম দেবে?

আমি স্বকর্ণে শুনলাম, ইহুদী বৃদ্ধা বললো, দশ দিনার দেব।

এক কথায় দশ দশটা সোনার মোহর? ইহুদীর মেয়ে একটা আধলা দিরহাম প্রাণে ধরে খরচ করে না। সে কিনা ছেলের বৌ-এর গলায় তক্তি ঝোলাবার জন্য দশটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করবে?

তখুনি আমি বিবিকে ডেকে বললাম, তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি। যাক, আমি এখন দোকানে বেরুচ্ছি, ঐ বুড়ি তোমাকেই যতই লোভ দেখাক আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনও দামের বদলে ওটাকে হাতছাড়া করো না। মনে হচ্ছে পাথরটা অনেক দামী।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে দেখি ইহুদী বিবি আবার এসেছে। আমাকে দেখে সে বারবার সালাম সওগাত জানিয়ে বললো, শেখ সাহেব আপনার জন্যেই বসে আছি।

আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম, আমার জন্যে? কেন, কী দরকার।

—ঐ পাথরটা যদি বিক্রি করেন, আমার বৌটার একটু উপকার হয়। বেচারী ভূতের ভয়ে রাতে ঘুমায় না।

—তা কত দাম দেবেন!

—একশো দিনার নিন, আমি সঙ্গে করে এনেছি।

আমি বললাম, না। ওটা সামুদ্রিক রত্ন, ওর অনেক দাম।

ইহুদী বিবি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, না, ওটা একটা রঙচঙে খেলনা পাথর মাত্র। নেহাত আমার বেটার বৌর জন্য দরকার তাই আপনাকে এতো সাধাসাধি করতে এসেছি। আমার বৌটার মুখের দিকে চেয়ে মেহেরবানী করে ওটা আমাকে দিয়ে দিন, শেখ সাহেব।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, অবশ্যই দেব, তবে এক লাখ দিনারের কমে দেব না। আমি জানি ওর দাম দশলাখেরও বেশি।

বৃদ্ধা কেমন মিইয়ে গেলো। আমি তো জহুরী নই, ওসব কারবার আমার স্বামী করে। তা হলে ওকেই পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে, এখন আসি?

—হ্যাঁ আসুন। আর আপনার স্বামীকে বলবেন যদি কিনতেই হয় তবে যেন তিনি লক্ষমুদ্রা সঙ্গে করে আনেন।

বৃদ্ধা চলে যাওয়ার স্বল্পক্ষণ পরেই ইহুদী জহুরীর আবির্ভাব ঘটলো। লোকটা একেবারে বিনয়ের অবতার। কথায় কথায় আব্রাহাম জ্যাকবের নাম উচ্চারণ করে দু'হাত কপালে ঠেকায়।

সেও আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, আসল রত্ন আর নকল কাঁচের মধ্যে দৃশ্যত বিশেষ কোনও ফারাক বোঝা যায় না। আমরা বেশির ভাগ সময়ই নকল কাঁচকে আসল রত্ন বলে ভ্রম করি। তা অত মূল্যবান বস্তু কি পথেঘাটে গড়াগড়ি যায়? ওটা ঝুটামাল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

লোকটার কথা শুনে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে গেলো। ঘরে ছেড়ে বেড়িয়ে আমার শোবার ঘরে গিয়ে পাথরটা নিয়ে এলাম। দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়ে পাথরটাকে ইহুদীর সামনে টেবিলের ওপর রাখতে লোকটার লোভাতুর চোখ দু'টো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। আলোর বিচ্ছুরণে সারা ঘর আলোকিত হয়ে গেছে ততক্ষণে। ইহুদীর মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, ওরে বাবা, এ যে সাতরাজার ধন। এতো বড় বৈদুর্যমণি সারা দুনিয়ায় নাই!

—কী বললেন? সারা দুনিয়ায় এর জুড়ি নাই।

সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে সে কথাটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে, না, মানে না—বৈদুর্যমণির মতোই দেখতে। আসলে ঝুটা মাল—

আমি আর রাগ সামলাতে পারলাম না। পাথরখানা কামিজের পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালাম, ঝুটা মাল বেচে আপনাকে ঠকাতে চাই না। আপনি আসুন—

আমার আচরণে ইহুদীটা কাঁচুমাচু মুখ করে বলতে থাকে, আহা রাগ করছেন কেন, শেখ সাহেব। আমি তো সে কথা বলিনি, বাজারে আজকাল ঝুটা মালের আমদানী বেশি; দাম কম বলে তার কদরও বেশি। আসল চীজ আর ক'জনে উচিত মূল্য দিয়ে কিনতে চায় বলুন? তাই বলছিলাম যদি একটু বিবেচনা করেন—

—বেশি বিবেচনা করে বললে তো দশ লাখ দিনার বলতে হয়। কিন্তু তা তো চাইনি। আমার দাবি এক লাখ। একবার যখন মুখ থেকে জবান বের করেছি তার নড়চড় হবে না। তবে এই মুহূর্তে এখুনি যদি আপনি সওদা শেষ না করে চলে যান, পরে ফিরে এলে কিন্তু এ দাম থাকবে না। তখন দশ কেন বিশ লাখও চাইতে পারি।

ইহুদী নিরুপায় হয়ে বলে, না না, আমি এখুনি সওদা শেষ করে নিয়ে যেতে চাই। এই ঘরের ভিতরে নিয়ে আয় বস্তাটা।

বাইরে ইহুদীর নফর গাধার পিঠে একটা বস্তা চাপিয়ে অপেক্ষা করছিলো। মনিবের সাড়া পেয়ে সে বস্তাটা ভিতরে এনে ঘরের মেঝেয় ঢেলে দিলো। সোনার মোহরে ভরে গেলো ঘর। উফ্ এতো সোনা জীবনে দেখিনি কখনও।

সেইদিনই রাতারাতি আমি বড় লোক হয়ে গেলাম। ওকে আপনি আল্লাহর দান ছাড়া আর কী বলতে পারেন, ধর্মাবতার। সারা জীবন ধরে সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এতো অর্থ তো মানুষে রোজগার করতে পারে না। সেই কারণে আমার বিশ্বাস একমাত্র দেনেওলা তিনিই। এবং আমরা যারা তার করুণায় বিত্তবান হয়ে অহঙ্কারের অহমিকায় ধরাকে সরাজ্ঞান করি তারা সকলেই মূর্খ। একথা ভুলেও ভাবি না। আমার বাক্সে যে ধন-দৌলত ভরা আছে তার আসল মালিক তিনিই। আমি শুধু রক্ষক মাত্র।

তাই প্রতিদিন নিয়ম করে আল্লার দান আমি তারই সৃষ্ট দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করি। এতে আমার নিজের কোনও গৌরব নাই। তাঁর জিনিস তাঁরই ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করি!

খলিফা বললেন, এতক্ষণে বুঝলাম তোমার ঐ মুক্তহস্তে দানের আসল কারণ। খুব খুশি হলাম তোমার কথা শুনে। সব কাহিনী আমি মন দিয়ে শুনেছি। তোমার ধর্মমতি দেখে খুব আনন্দ হলো আজ। চিরকাল যেন এইভাবে আল্লাহর বান্দা মনে করতে পার, নিজেকে সেই প্রার্থনা জানাই।

তারপর খলিফা বললেন, ঐ ইহুদী তোমার কাছ থেকে পাথরখানা লক্ষ মুদ্রায় কিনে সেই দিনই আমার কাছে দশলক্ষে বিক্রি করেছে। এখনও আমার কোষাগারে রাখা আছে ওটা।

খলিফা এবার খঞ্জ মাদ্রাসা শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা, মৌলভী সাহেব এবার তোমার পালা। শোনাও তোমার কাহিনী।

লোকটি কুর্ণিশ জানিয়ে বলতে শুরু করে ঃ

ধর্মাবতার, আমি ছিলাম এক দরিদ্র মাদ্রাসা-মৌলভী। চব্বিশটি ছাত্রকে নিয়ে চালাতাম আমার বিদ্যালয়টি। এই ছেলেদের নিয়েই আমার কাহিনী।

শিক্ষক হিসাবে আমি ভীষণ কড়া মানুষ ছিলাম। ছেলেরা আমাকে দেখে ভয়ে কাঁপতো। সারাদিনের মধ্যে এক দণ্ডও বিশ্রাম দিতাম না তাদের। সেই সকালে আসতো তারা। আর সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে যেত। তার মধ্যে ছুটি বলে কিছু থাকতো না।

একদিন সবে আমি মাদ্রাসায় এসে ছাত্রদের নিয়ে পাঠ শেখাতে বসেছি, এমন সময় একটি ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে বললো, মৌলভী সাহেব, আপনার মুখখানা কেমন হলুদবর্ণ হয়ে গেছে কেন?

আমি তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিই, আর ডেঁপোমি করতে হবে না। চুপ করে বসো।

ছেলেটি মাথা হেঁট করে বসে পড়লো কিন্তু আমার সহকারী এক শিক্ষক এগিয়ে এসেও ঐ একই কথা বললো, সত্যিই মৌলভীজী, আপনার সারা মুখে কে যেন হলুদ বেটে লাগিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে আপনার কোনও অসুখ হয়েছে। আপনি ঘরে চলে যান, আজ আমিই আপনার ছাত্রদের পাঠ শিখিয়ে দেব।

এরপর প্রতিটি ছাত্রই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এমন আঁৎকে উঠতে লাগলো তা দেখে সত্যি সত্যি আমি ঘাবড়ে গিয়ে অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম।

মনে ভয় ধরে গেলো, তবে কি আমার ন্যাবা হয়েছে? দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে এলাম। বিবিকে বললাম, আমার জন্য একটু শরবত বানাও তো। তবিয়তটা ভালো ঠেকছে না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো বাহাত্তরতম রজনী

আবার সে বলতে থাকে ঃ

একটু পরে আমার সহকারী শিক্ষক এলো। চব্বিশটা দিরহাম তুলে দিলো আমার হাতে, আপনার ছাত্ররা চাঁদা তুলে পাঠিয়েছে। আপনার ভালো পথ্যের যাতে ব্যবস্থা করা হয় তা দেখতে বলেছে আমাকে।

আমি ওদের এই সহৃদয় বদান্যতায় বড় স্পর্শকাতর হয়ে উঠলাম। আহা, ওরা কত ভালো আর ঐ দুধের বাচ্চাগুলোর ওপর কি নির্দয় অত্যাচারই না করি আমি। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে গেলো।

—কাল ওদের সারাদিন ছুটি দিয়ে দিও। আচ্ছা একটা দিন ওরা ছুটি পায় না, এক দম খেলাধুলোর সময় পায় না।

পরদিন সকালে আমার সহকারীটি আবার এলো আমার বাসায়।

—একি আজ যে আপনি আরও বেশি হলুদ বর্ণ হয়ে গেছেন? না না, একদম নড়া চড়া করবেন না। একটানা বিশ্রাম করুন। ছাত্রদের নিয়ে কোনও দুর্ভাবনা করবেন না, সে আমি সামলাবো।

ওর কথা শুনে আমি আরও কাহিল হয়ে পড়ি। আমি নিজে এখনও তেমন কিছু বুঝতে পারছি না কিন্তু রোগের প্রকাশ যখন হয়েছে তখন ভিতরে ভিতরে ঝাঁঝরা করে দেবে সে। আমি বললাম, ছেলেদের পড়াশুনাটা একটু দেখো। মনে করো আমি মাদ্রাসার কুর্শিতেই বসে সবাইকে লক্ষ্য করছি।

এইভাবে একটা সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। আমার সহকারী নিত্য এসে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। সপ্তাহান্তে আবার সে চব্বিশটা দিরহাম দিয়ে গেলো আমার হাতে। আমার ছাত্ররা চাঁদা তুলে পাঠিয়েছে। খুশিতে মন ভরে উঠলো। আহা, ওরা কত ভালো।

দিন কাটে। কিন্তু নিজেকে একটুও অসুস্থ মনে হয় না আমার। ভাবলাম এইভাবে আর রুগীর মতো বিছানায় পড়ে থাকবো না। ঘরে বসে ঐ সব ভালো ভালো খানাপিনা কি আর রোজ মুখে রুচে। সত্যি কথা বলতে কি অত সব ভালোমন্দ খাবার-দাবার খাওয়ার অভ্যাস আমার কোনও কালে নাই। তাই, প্রথম প্রথম দু-একদিন চর্ব্য চোষ্য করে খেলেও পরে আর আদৌ ভালো লাগলো না।

কিন্তু ছাত্ররা আমার কথায় কর্ণপাত করলো না। তাদের ধারণা আমি ওঠা হাঁটা করলেই মরে যাবো।

এরও কয়েকদিন পরে একদিন সকালে আমার তাবৎ ছাত্ররা দেখতে এলো আমাকে। আমি সবে ঘুম থেকে উঠেছি তখন। ছেলেরা আমার মুখের দিকে কতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে। তারপর একজন বললো, একি চেহারা হয়েছে আপনার? মুখখানা কেমন ফোলা ফোলা লাগছে। শুনলাম আপনি নাকি চোয়াল নাড়াচাড়া করতে পারছেন না?

এই সময় আমার বিবি দু'টো সিদ্ধ ডিম আর কয়েক টুকরো রুটি রেখে গেলো সামনে। আমার নিত্যকার প্রাতরাশ। আমি বাধা দিয়ে বললাম, কারা এসব গুজব রটায়? কে বললে আমি চোয়াল নাড়তে পারি না?

এই বলে ওদের সামনে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে দু দু'টো ডিম একই সঙ্গে মুখে পুরে ফেললাম। কিন্তু সদ্য সিদ্ধকরা খোসা ছাড়ানো প্রচণ্ড গরম ডিমের ভাপ মুখের অভ্যন্তরের নরম মাংসল মণ্ডল সইতে পারবে কেন? মনে হলো সারা মুখের ভেতরটা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো। কিন্তু তখন সেই অবস্থায় ছেলেদের সামনে মুখ থেকে ডিম দু'টোকে আবার বের করে ফেলি কিরূপে। তাতে যে সপ্রমাণ হয়ে যাবে, তারা যা শুনেছে তা তাহলে সত্যিই।

কিন্তু দু' দু'টো আস্ত ডিম এক সঙ্গে মুখে পুরে এগাল ওগাল করা সম্ভব কী? আর জাবর কাটতে না পারলে গিলবোই বা কি করে. তাই সদ্যসিদ্ধ ধোঁয়াওঠা ডিমজোড়া অনড় অচল হয়েই রয়ে গেলো আমার মুখগহ্বরে।

এরপর যা অবশ্যম্ভাবী ফল ঘটতে পারে তাই ঘটেছিলো। গরম ডিমের স্যাঁকা লেগে দু' গালের নরম মাংস পুড়ে ঘা হয়ে গেলো। এবং সে ঘা আর শত চেষ্টা করেও সারাতে পারলাম না। তারই পরিণতি আজ এই রকম হয়েছে। দুপাশের চোয়াল পচে পচে খসে খসে পড়ছে এখন। বিশ্রী দুর্গন্ধে কোনও মানুষ আমার কাছে ভিড়তে পারে না।

মুখের ঘা নিয়েও আমি কিছুদিন মাদ্রাসা চালিয়েছিলাম। কিন্তু অনেকদিন শাসন না করার ফলে ছেলেগুলো বড় বেয়াড়া হয়ে পড়েছিলো। আগে যেমন আমাকে জুজুর মতো ডরাতো তখন কিন্তু আর তেমনটা করতো না।

যাই হোক, কোনও রকমে দিন কাটছিলো, কিন্তু নসীবে যা লেখা আছে তা খণ্ডন করবে কে? গোদের ওপর বিষফোঁড়া হলো। একে দু'গালের দুরারোগ্য ক্ষত তারপর একখানা পা খোঁড়া হয়ে গেলো।

একদিন দুপুরে প্রচণ্ড দাবদাহে দুনিয়া জ্বলছে। ছেলেরা বললো,' তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পানি খাব।

মাদ্রাসায় যেটুকু পানি ছিলো খতম হয়ে গেছে অনেক আগেই। বড় মায়া হলো, আহা এইটুকু কচি কচি বাচ্চারা পানি পান করতে না পেয়ে কষ্ট পাবে? ওদের বললাম,

ওপাশে গাছতলায় একটা কূয়া আছে কিন্তু পানি তোলার পাত্র তো কিছু নাই এখানে। ঠিক আছে, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে চলো, দেখা যাক কি করে ওঠানো যায় কূয়ার পানি।

আমার দারুন বুদ্ধি ছিলো। ছেলেদের বললাম, তোদের সব টুপিগুলো নিয়ে এই পাগড়ীর একপ্রান্ত ধরে আমি কূয়ার নিচে নেমে যাবো। তারপর টুপিগুলো ভরে পানি নিয়ে আসবো। কিন্তু সাবধানে নামিয়ে দিবি, আবার টেনে তুলবি আমাকে।

যথারীতি ওরা আমাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিচ্ছিল নিচে। আর খানিকটা নামালেই পানি স্পর্শ করতে পারতাম। কিন্তু তা আর হলো না। কূয়ার নিচে থেকে বুঝতে পারলাম, ওপরে কিসের যেন সোরগোল পড়েছে। ঘোড়া কিংবা গাধা কিছু একটা তাড়া করেছিলো ছেলেদের। এবং সেই ভয়ে তারা হাতের পাগড়ী ছেড়ে দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেছে। আর আমি পড়ে গেছি তলায়।

কূয়াতে বেশি গভীর পানি ছিলো না। সে দিক থেকে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো না। কিন্তু আচমকা আছাড় খাওয়ায় এই পা-টায় বিষম চোট পেলাম। তখন অবশ্য অতটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরে মালুম হলো। প্রচণ্ড ব্যথা হলো, পা-খানা ফুলে ঢোল হয়ে গেলো। পরে ফোলাটা কমলেও ব্যথাটা চির সঙ্গী হয়ে থেকে গেলো আমার কাছে।

তারপর থেকে লাঠি ভিন্ন চলাফেরা করতে পারি না, জাঁহাপনা।

মাসরুর লোকটিকে ধরে বসতে সাহায্য করলো।

এরপর উঠে দাঁড়ালো সেই অন্ধ ভিখিরি।

যথাবিহিত কুর্নিশাদি জানিয়ে সে বলতে শুরু করলো।

যৌবনে আমি এক তুখোড় উট চালক ছিলাম। আমার নিজের গুণেই আমি একটা থেকে পরপর আশীটা উটের মালিক হতে পেরেছিলাম। এই সব উটগুলো আমি ভাড়া খাটিয়ে রোজগার করতাম। লাভের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে উট কিনতাম। এইভাবে অল্পকালের মধ্যেই আমার সমব্যবসায়ীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী বলে পরিচিত হলাম।

একবার বাগদাদ থেকে এক ব্যবসায়ীর মাল নিয়ে বসরায় গিয়েছিলাম। যথাসময়ে মালপত্তর খালাস করে দিয়ে দেশে রওনা হলাম।

চলতে চলতে বেলা বেড়ে গেলো। তখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড খর তাপে দুনিয়া দগ্ধ হচ্ছে। মাঠের মধ্যেই এক গাছতলায় দুপুরের খানা-পিনা সারবো বলে উটগুলোকে শোয়ালাম।

এই সময় এক দরবেশ এলো সেখানে। আলখাল্লা পরনে, আজানু-লম্বিত শুভ্র দাড়ি, সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় আল্লাহর পায়ে সর্বস্ব নিবেদন করে মুক্তপুরুষ হয়েছেন তিনি।

সাদর অভ্যর্থনা করে বসালাম তাঁকে। এক সঙ্গে বসে খানা-পিনা করলাম। তিনি আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন, আমিও করলাম।

বেলা পড়ে এলো। রোদের ঝলক অনেকটা হালকা হয়ে আসছিলো। দরবেশ বললেন বাবা আবদাল্লাহ, তুমি সংসারী মানুষ আর আমি ফকির। তুমি শুধু অর্থের ধান্দাতেই দেশ বিদেশ চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছো। আমি দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াই, তবে অর্থের নয়, পরমার্থের সন্ধানে।

কথাটার মর্ম বুঝতে পারলাম না, আপনার হয়তো অপ্রতুল অর্থ সঞ্চিত আছে, তাই আর তার পিছনে ছুটতে হয় না। কিন্তু আমি তো এখন সে অর্থ সঞ্চয় করতে পারিনি, ফকির সাহেব। তাই আমাকে তারই জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়।

দরবেশ বললেন, টাকা চাও তুমি? কত টাকা? কত টাকা পেলে তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটবে, বাবা আবদাল্লাহ?

আমি বললাম, ফকির সাহেব সংসারে বাঁচতে গেলে বেশ কিছু অর্থ চাই।

—তার পরিমাণ কত? কত পেলে তুমি খুশি হবে? দুশো-পাঁচশো —হাজার কোটি মোহর?

আমি ঢোক গিলে বলি, অত টাকার কি দরকার? লাখপতি হলেই আমি সন্তুষ্ট থাকবো।

দরবেশ বললেন, তা হলে এখুনি আর তোমার বাগদাদ রওনা হওয়া হলো না বাবা আবদাল্লাহ, আমার সঙ্গে এসো তুমি। আমি তোমাকে এক গুপ্ত ধনাগারে নিয়ে যাবো। সেখান থেকে তোমার প্রয়োজন মত ধনরত্ন বোঝাই করে নিও তোমার উটের পিঠে! তারপর তুমি চলে যেও তোমার দেশে, আমি চলে যাবো বসরাহয়।

দরবেশের কথায় লুব্ধ হয়ে উঠলাম। আমার আশীটা উটকে তাড়িয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকলাম।

অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর এক পর্বত পথের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম আমরা। দরবেশ বললেন, এই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এই যে দেখছো, এই পথ দিয়ে তুমি আর আমি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবো, কিন্তু তোমার উটগুলো যেতে পারবে না। সুতরাং ওদের ওখানেই এই পাহাড়ের পাদদেশে শুইয়ে রেখে চলো।

তাঁর কথামতো একটা সাফ জায়গা দেখে উটগুলোকে শুইয়ে দিলাম। দরবেশ বললেন, শুধু হাতে গিয়ে কি ফয়দা হবে। ধনরত্ন আনবে কিসে, বস্তাটস্তা কিছু সঙ্গে নাও!

আমি একখানা বস্তা হাতে করলাম। দরবেশ হাসলেন, ব্যস একখানাতেই সন্তুষ্ট হবে?

আমি বললাম, এই একটা বস্তাতেই লাখ টাকার সোনাদানা আঁটতে পারে। আর বেশি কি দরকার, ফকির সাহেব?

দরবেশ বললেন, পাগল ছেলে, বার বার তো আর এখানে আসা হবে না, আজই যতটা পার নিয়ে নিতে হবে। তুমি এক কাজ কর, তোমার প্রত্যেকটা উটের পিঠের জন্য একটা করে বস্তা নাও।

আমি অবাক হলে বললাম, আশী বস্তা ধনদৌলত পাওয়া যাবে সেখানে?

দরবেশ হাসলেন, যাবে। তারও বেশি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু অত নেবার অনেক অসুবিধে, তুমি আশীখানাই নাও। যা উদ্ধার করে আনা হবে তার অর্ধেক তুমি নেবে আর বাকী অর্ধেক আমি নেব, কী, রাজী?

আমি বললাম, অত ধনে আমার কাজ কী? তবে আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।

পার্বত্য সরু পথ পেরিয়ে ওপারে চলে গেলাম আমরা।

আর একটা পাহাড়। খাড়া আকাশের দিকে উঠে গেছে। কোথাও পা রাখার জায়গা নাই। উপরে ওঠার জো কী? সেই মুহূর্তে আমি ভেবে পেলাম না এই দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পাদদেশে এসে কি লাভ হলো?

দরবেশ তাঁর ধূপদানীতে এক মুঠো সুগন্ধি দ্রব্য ছিটিয়ে দিতেই গল গল করে ধূম্রকুণ্ডলী ওপরের দিকে উঠতে থাকলো। একটুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেলো সামনেটা। পাহাড়টা আর নজর করতে পারলাম না তখন।

একটু পরে ধোঁয়া কেটে গেলে দেখলাম, পাহাড়ের নিচে একটা গুহামুখ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। দরবেশ আমাকে সঙ্গে নিয়ে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

আমার দু'চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। বিশাল বিস্তৃত এক ময়দান ক্ষেত্র। যে দিকে তাকাই রাশি রাশি মোহর, তাল তাল সোনা রূপা স্তূপাকার হয়ে আছে চারদিকে।

আমি দিশাহারা হয়ে একটা বস্তায় সোনার মোহর ভরতে লেগে গেলাম। দরবেশ আমাকে বাধা দিলেন, ওসব তুচ্ছ সোনার মোহর ভরে বস্তাগুলো শেষ করে কী লাভ। এমন বস্তু ভরে নাও, যা ওজনে হালকা অথচ মূল্যে সহস্রগুণ হতে পারে। এদিকে দেখ, কত মূল্যবান মণিরত্ন। এর এক এক টুকরো লক্ষ লক্ষ মোহরের সমান। এগুলো না ভরে তুমি আহম্মকের মতো ঐ সোনার মোহরগুলো বস্তা বন্দী করতে লেগেছ।

আমি লজ্জিত হলাম, তাইতো, যেখানে অফুরান নেবার মতো সেখানে বাছাই করে সেরাগুলো নেওয়াই সঙ্গত।

এক এক করে আশীটা বস্তায় হীরে জহরত মণিমুক্তায় বোঝাই করে উটের পিঠে এনে চাপালাম। রত্ন গুহা ত্যাগ করার আগে লক্ষ্য করলাম দরবেশজী একটি সোনার জালার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট একটি সোনার কৌটো বের করে বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। আমার কৌতূহল হলো, চারদিকে এতো রত্ন সম্ভার কিন্তু কোনও কিছু তিনি স্পর্শ করে দেখলেন না। শুধু এই ছোট্ট কৌটায় তাঁর কি দরকার পড়লো? জিজ্ঞেস করলাম, কী আছে ওতে দরবেশজী।

দরবেশ হাসলেন, ও কিছু না। খানিকটা মলম আছে ওতে।

মনের খটকা গেলো না। যাই হোক আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস হলো না। উটের দল নিয়ে আবার আমরা সেই মাঠের মাঝে গাছতলায় এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে পথটা একদিকে বসরাহ অপরদিকে বাগদাদ চলে গেছে। আমি যাবো বাগদাদে আর তিনি বসরাহর যাত্রী।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো পঁচাত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ফকির সাহেব বললেন, এবার তাহলে, বাবা আবদাল্লাহ আমার ভাগেরটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি বসরাহয় চলে যাই।

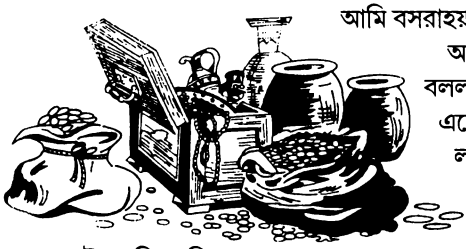

আমার তখন মনের অবস্থা অন্যরূপ। বললাম, দেখুন দরবেশজী, আপনি ফকির মানুষ, এতো ধনরত্ন নিয়ে আপনার কি কাজে লাগবে।

—তুমি সত্য কথাই বলেছ, তুমি সংসারী লোক, ধনরত্ন তোমার প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। তুমি যা নিয়ে যাবে, তা তোমার এবং তোমার আত্মীয়-পরিজনদের ভোগে লাগবে। কিন্তু আমি ফকির, আমার নিজের জন্য কোনও অর্থের প্রয়োজন নাই। তবে যারা দুস্থ অসহায় তাদের মুখে আহার্য যোগানোই আমার ব্রত। তুমি যা দেবে তা আমি আল্লাহর দরিদ্র ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করবো। তুমি শুধু তোমার পরিবারের প্রিয়জনদের মুখে হাসি ফোটার জন্য ধনরত্ন সংগ্রহ কর। আর আমি করি খোদতালার বিরাট দুঃস্থ পরিবারের অন্ন যোগাবার জন্য।

এতেও কিন্তু আমি ওঁকে ওয়াদা মতো ওঁর প্রাপ্য অংশ দিতে কুণ্ঠিত হলাম। তিনি আমার মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন, ঠিক আছে, আধাআধি যদি দিতে প্রাণ না চায় তবে যতটা দিতে চাও তাই দাও।

আমি বললাম, আপনি কুড়িটা বস্তা নিন। বাকি ষাটটা আমি নেব।

দরবেশ হাসলেন, বেশ তাই হোক, তবে আমার তো বইবার উট নাই। কুড়িটা বস্তা দিলে কুড়িটা উটও দিতে হবে আমাকে।

আমি প্রসন্ন চিত্তে না হলেও রাজী হলাম।

দরবেশ কুড়িটা উট নিয়ে রওনা হয়ে গেলো, আমি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, শুধু শুধু অত গুলো ধনরত্ন হাত ছাড়া হয়ে গেলো।

ছুটে গেলাম দরবেশের সামনে। বললাম, দেখুন ফকির সাহেব, এই কুড়িটা উট বাগে আনা আপনার মতো পীরের কাজ নয়। এরা আমাকে না দেখে বেগড়বাই করে আপনাকে অনেক নাজেহাল করবে। আপনি বরং সংখ্যাটা কমিয়ে দশ করুন।

দরবেশ হেসে বললেন, বুঝেছি, প্রাণে ধরে দিতে পারছো না এতটা। ঠিক আছে তাই কর, দশটা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

দশটা উট আমাকে দিয়ে বাকী দশটা নিয়ে তিনি রওনা হলেন। কিন্তু তাতেও আমার চিত্ত প্রসন্ন হলো না। মনে হলো ঐ ফকির কোনও পরিশ্রমই করেনি। যা কিছু খাটুনি আমিই খেটেছি। তাছাড়া এই দুর্গম পথে উটের বাহন না থাকলে এ বোঝা কে বয়ে নিতে পারতো!

আবার আমি ছুটে গিয়ে দরবেশকে ধরলাম।

—দরবেশজী আপনি তো ইচ্ছে করলেই তামাম দুনিয়ার ধনভাণ্ডার উজার করে আনতে পারবেন। কিন্তু আমি তো আর এ সুযোগ পাবো না কোনওদিন।

—তুমি কি বলতে চাও?

আপনি সবটাই আমাকে দিয়ে দিন। আপনার দরকার হলে আর একবার গিয়ে নিয়ে আসবেন সেখান থেকে।

দরবেশ বললেন, তুমি যদি এতেই সন্তুষ্ট হও, তাই হোক। এই দশটাও নিয়ে যাও। কী, খুশি তো?

আমি তখনও লোভীর মতো দরবেশের হাতের সোনার রেকাবীটার দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বোধহয় আমার মনের অভিপ্রায় উপলব্ধি করলেন। থালাখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নাও।

আমি এতই হীনমনা যে একবারও বলতে পারলাম না, না থাক, ওটা আপনার খাবার থালা, ওটা রাখুন আপনি। নির্লজ্জের মতো হাত পেতে নিলাম।

দরবেশের মুখে মিষ্টি মধুর হাসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এবার তো সব পেয়েছ? তা হলে খুশি মনে ঘরে ফিরে যাও?

আমার চোখ তখন দরবেশের বুকের ওপর নিবদ্ধ হয়েছে। মুখ ফুটে বলেই ফেললাম, আপনার বুকের মধ্যে ঐ ছোট্ট কৌটোটা আমাকে দেবেন?

তৎক্ষণাৎ তিনি কৌটোটা বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আর তো কিছু নাই আমার কাছে, কী বলো?

আমি বললাম, এই কৌটোয় এক প্রকার মলম আছে বলেছেন। নিশ্চয়ই সে বস্তু মহা মূল্যবান। কী কাজে লাগে এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হয় একবার বলে দিন।

এতক্ষণ আমি বিনয়ের মুখোশ এঁটে ওঁর সঙ্গে গদগদ হয়ে কথা বলছিলাম। কৌটোটা হাতে পাওয়ার পর কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমার গলার স্বরটা ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠলো।

দরবেশ বললেন, অবশ্যই বলে দিচ্ছি। তা না হলে এই কৌটোটা নিয়ে তুমি করবে কী? এর ভেতরে কিছুটা মলম আছে। একটুখানি আঙ্গুলে নিয়ে বাঁ চোখে সুর্মা কাজলের মতো করে লাগাবে তাহলেই বিশ্বের যত গুপ্ত ধনের দেখা পেয়ে যাবে তুমি। তবে সাবধান ভুলেও কখনও ডান চোখে লাগাবে না—তা হলে দুচোখই অন্ধ হয়ে যাবে।

আপনার কথা শুনে আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না, মেহেরবানী করে আমার চোখে লাগিয়ে দিন একটু।

দরবেশ আমার হাত থেকে কৌটোটা নিয়ে ঢাকনা খুলে বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে করে খানিকটা মলম তুলে নিয়ে আমার বাঁ চোখে লাগিয়ে দিয়ে বললেন, ডান চোখটা বন্ধ কর।

ডান চোখ বন্ধ করতেই আমি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। দুনিয়ার পাহাড় পর্বত সমুদ্রতল এবং মাটির তলায় যেখানে যত ধনরত্ন আছে এক এক করে সব ছবি ভেসে উঠতে লাগলো আমার চোখের সামনে। সে সব দেখে আমি আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়লাম। দুনিয়াতে এতো ধনদৌলত থাকতে পারে কল্পনাও করা যায় না।

আমি ভাবলাম, একটা চোখে লাগাতেই যদি এই গুপ্তধনের হদিশ মেলে তবে দু' চোখে লাগালে না জানি কি হবে।

আমার মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই এই দরবেশ আমাকে পুরো সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। বেশ রুষ্ট ভাবেই বললাম, আপনি আমার সঙ্গে চালাকী করছেন। ডান চোখে লাগালে আমি দুনিয়ার তামাম ধনরত্নের মালিক হতে পারবো।

দরবেশ শিউরে উঠলেন, সর্বনাশ অমন কাজটি করো না। তা হলে জন্মের মতো অন্ধ হয়ে যাবে তুমি।

—মিথ্যে কথা। আপনি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছেন। আমি আরও বেশি ধনদৌলতের মালিক হই তা আপনি চান না।

দরবেশ আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার ভালোর জন্যই আমি বলছি, এ মলমটা ভুলেও ডান চোখে লাগাবে না। তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সেই সর্বনাশই আমার হলো। দরবেশের সে কথা আমি না শুনে তাকেই বাধ্য করালাম আমার ডান চোখে মলমটা লাগিয়ে দিতে।

আপনি আমার কথা যদি না শোনেন আপনার ভালো হবে না ফকির সাহেব। আপনি যত পুণ্যবান পীরই হোন, দেহ-বলে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী বলবান। সোজা কথায় যদি কাজ না হয় আমি আপনার ওপর জুলুম করবো। এখনও বলছি ভালোয় ভালোয় লাগিয়ে দিন আমার ডান চোখে।

দরবেশ আর একটি কথাও বললেন না, আমার হুকুম মতো আমার ডান চোখে ঐ মলমের কাজল পরিয়ে দিলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার দু'চোখে ঝাপসা, এবং একটু পরে ঘন অন্ধকার নেমে এলো। আমি আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। কিন্তু দরবেশ আর কোনও সাড়া দিলেন না। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করলাম, কিন্তু কোনও ফল হলো না। শুধু বুঝতে পারলাম, আমার উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

আমি অসহায়ভাবে পড়ে রইলাম সেখানে। তারপর একদিন বাগদাদের এক সওদাগরের করুণায় দেশে ফিরে আসতে পারলাম। সেই থেকে আমি ভিক্ষে করে খাই। এ ছাড়া আমার আর অন্য কোনও গতি নাই। তাই রোজ সকালে গিয়ে বসি ঐ পুলের ওপর। হাত পেতে বসে থাকি, যদি কোনও মহান দাতা দু একটা দিরহাম দান করেন। যারা আমাকে কিছু দেন আমি তাদের সবাইকে অনুরোধ জানাই তারা যেন আমার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে যান। আসলে দয়ার বদলে থাপ্পড়টাই আমার একমাত্র পাওনা।

অন্ধের কাহিনী শেষ হলে খলিফা বললেন, তোমার জীবনের দুঃখজনক ঘটনার জন্য তুমিই একমাত্র দায়ী। সীমাহীন লোভই তোমার এই দশা ঘটিয়েছে। যাক, আমি দপ্তরে নির্দেশ দিচ্ছি তোমার এবং খাজা মাদ্রাসা শিক্ষকের জন্য প্রতিদিন দশ দিরহাম করে খয়রাতি দেওয়া হবে।

এবং এছাড়া খলিফা সাদা ঘোড়ার সওয়ার যুবক, ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ, হাসান এবং হিন্দুস্তান সুলতানের জামাতাকে তাদের পদমর্যাদা অনুসারে যথাযোগ্য ইনাম প্রদান করলেন।

শাহরাজাদ বললো, জাঁহাপনা, এরপর আপনাকে আর এক কিস্‌সা শোনাবো।

কোন এক সময়ে এক গ্রামে ঈশ্বর-বিশ্বাসী এক ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ বাস করতো। সংসারে তার বিবি এবং দু'টি পুত্র কন্যা ছিলো! ছেলেটি একেবারে আহাম্মক গবেট। মেয়েটির দেহের তুলনায় পাদু'খানা ছিলো খুব ছোট।

মৃত্যুকালে বৃদ্ধ তার স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলে গেলো, আজ বাদে কাল আমি মরে যাবো। আমার সংসারের সব ভার তোমার ওপরেই দিয়ে যাচ্ছি। কারণ ছেলেটি একেবারে একগুঁয়ে এবং নির্বোধ। একটা কথা, আমার মৃত্যুর পর ছেলেটার কোনও কাজে তুমি বাধা দিও না। ওর যা প্রাণ চায় করবে, তাতে যদি মহা অনিষ্টও ঘটে, মুখ বুঁজে সহ্য করো তুমি।

স্বামীর শেষ ইচ্ছা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পালন করে একদিন বিবিও দেহ রাখলো। মৃত্যু শয্যায় সে মেয়েকে কাছে ডেকে স্বামীর শেষ ইচ্ছার কথা শোনালো, মা, তোমার ভাই বুদ্ধিতে খাটো এবং ভীষণ একরোখা। তোমার বাবা মারা যাবার সময় আমাকে দিয়ে হলফ করিয়ে নিয়েছিলেন যাতে আমি তোমার ভাই-এর কোনও কাজে বাধা না দিই। তিনি গত হয়েছেন আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। যাবার অগে তাই তোমাকেও বলে যাচ্ছি মা, সে যত অন্যায়ই করুক, তার কোনও কাজে তুমি বাধা দিও না। মেয়েটি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করলো, সে তার দাদাকে মান্য করে চলবে। তার কোনও কাজে বাধা দেবে না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো একাশিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মায়ের মৃত্যুর পরে গবেটচন্দর বোনকে বললো, জানিস বহিন, এই যে আমাদের ঘরবাড়ি বিষয় সম্পদ যা কিছু দেখছিস আমি সব আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেব ঠিক করেছি।

দাদার কথা শুনে বোন শিউরে ওঠে, সে কি কথা রে দাদা! মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞার কথা সে ভুলে গেলো সেই মুহূর্তে, তা হলে আমরা বাঁচবো কি করে, খাবো কী?

গবেটচন্দর গোঁ ধরে বললো, ওসব আমি জানি না, আমার ইচ্ছে হয়েছে করবো। তাতে যদি তুই বাধা দিতে চাস, আমি মানবো না।

এই বলে সে তখুনি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলো। এবং লেলিহান অগ্নি শিখা নিমেষে ছড়িয়ে পড়লো বাড়ির সর্বত্র। গরু বাছুর, দানাশস্য পোশাক আশাক আসবাব বিছানা যা কিছু ছিলো সব ছাই হয়ে গেলো।

মেয়েটি দাদার চোখে ধূলো দিয়ে কিছু দামী জিনিসপত্র পাড়া-পড়শীদের কয়েকটি বাড়িতে সরিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু গোঁয়ার গবেট সে খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশিদের ঘরেও আগুন লাগিয়ে দিলো—সেইদিনই মাঝ রাতে।

পাড়ার তাবৎ লোক মারমুখী হয়ে ছুটে এলো ভাইবোন দু'টোকেই সাবাড় করে ফেলবে বলে। মেয়েটি বিপদ বুঝে দাদাকে এক রকম প্রায় জোর করে হিড়হিড় করে টানতে টানতে, সেই রাতেই চোরের মতো গা ঢাকা দিয়ে গ্রামের বাইরে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে থাকলো।

একটানা সারারাত ধরে ছুটার পর সকালবেলায় তারা এসে পৌঁছলো এক নতুন অচেনা মুলুকে। চলতে চলতে তারা এক চাষীর খামারবাড়ি দেখতে পেলো। মেয়েটি গৃহস্বামীকে বললো, আমরা দুই ভাইবোন অনেক দূর দেশ থেকে আসছি। আমাদের বাবা মা কেউই বেঁচে নাই। ঘরবাড়ি বিষয়সম্পদ যা ছিলো সব আগুনে পুড়ে গেছে। এখন একেবারে সহায়-সম্বলহীন অবস্থা। যদি দয়া করে আপনি আশ্রয় দেন আমাদের, আমরা দুই ভাইবোন গায়ে গতরে খেটে আপনাদের কাজ উঠিয়ে দেব।

ওদের অসহায় অবস্থার কথা শুনে এবং দু'জনের ভদ্রবংশজাত চেহারা ও আদব-কায়দা প্রত্যক্ষ করে চাষী বললো, ঠিক আছে, তোমরা আমার বাড়িতে থাকো। তোমাদের কিই বা এমন বয়েস, কাজ-কাম বিশেষ কিছুই করতে হবে না, আমার নিজের তিনটি ছেলে আছে তোমাদেরই বয়েসের, তাদের সঙ্গে খেলাধূলা করবে, লেখা-পড়া শিখবে, কেমন?

মেয়েটি বললো, আপনি পরম দয়ালু, তাই একথা বলতে পারলেন।

চাষীর আশ্রয়ে দুই ভাইবোন তোফা দিন কাটাতে থাকলো। মেয়েটি নিজে থেকেই সেধে কিছু কাজ-কাম করে কিন্তু তার দাদা গবেটচন্দর খায় দায় আর গুলতানী করে বেড়ায়।

একদিন সে চাষীর তিন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বললো—চল আমরা মাঠে যাই। ঐ বাগানের মধ্যে আমরা লড়াই লড়াই খেলবো। তোরা তিন ভাই একদিকে আর আমি একাই একদিকে।

লড়াই-লড়াই খেলাতে কোন্ ছেলের না উৎসাহ থাকে। চারজনে লাঠিসোটা সঙ্গে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেলো।

ঘণ্টা দুই পরে মেয়েটির কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। তার দাদাকে সে হাড়ে হাড়েই জানে। তিনটি কচি দুধের বাচ্চাকে নিয়ে মাঠের বাগানে গেছে অনেকক্ষণ, এখনও ওরা ফিরলো না কেন?

অজানা ভয়ের আশঙ্কায় মেয়েটি প্রায় ছুটতে ছুটতেই বাগানের দিকে চলে গেলো।

ভাই-এর কাণ্ড দেখে আর্তনাদ করে ওঠে মেয়েটি, একি সর্বনাশ করেছিস দাদা? একেবারে জানে মেরে ফেলেছিস তিনজনকে!

গবেটচন্দরের হাতে ধরা একটা মোটা লাঠি, হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, মারবো না, ওরা যে আমার শত্রুপক্ষ, আমাকে আক্রমণ করেছিলো। আমি যদি না ওদের খতম করতাম, ওরা কি আমাকে সোহাগ করতো? তুমি একটা আস্ত উজবুক, লড়াই-এর এই তরিকা, হয় মারো নয় তো মর।

মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, দেখ দাদা, ওসব বুজরুকি থামা। এবার যদি জানে বাঁচতে চাস তো চলো আর দেরি নয়, এখান থেকেই পালাই। না হলে এখুনি ওর মা-বাবা খবর পেয়ে যাবে। তারপর আমাদের দু'জনকে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটবে।

গবেটচন্দর তখন সাফাই দিতে চায়, কেন কাটবে আমাদের? আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো লড়েছি। হারা জেতা বাঁচা মরাই তো বড় কথা নয় সেখানে—

—তুই থাম দাদা, আর মস্করা করতে হবে না। ঐ শোন্ ওরা বোধ হয় খবর পেয়ে গেছে, গাঁ শুদ্ধু লোক বোধ হয় তেড়ে আসছে এইদিকে। কেমন হৈ হৈ রব শুনতে পাচ্ছিস না?

গবেটচন্দর এতক্ষণে বুঝতে পারে বিপদ ঘনায়মান। আর তিলমাত্র দেরি না করে সে বোনকে সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে।

গ্রামবাসীরাও তীর ধনুক সড়কী বর্শা নিয়ে পিছনে পিছনে তাড়া করে চলে ওদের। কিন্তু মেয়েটি ভীষণ বুদ্ধিমতী, সে সোজা পথে না গিয়ে বন বাদাড় জঙ্গল ভেঙ্গে দাদাকে নিয়ে পালাতে থাকে।

সারাটা দুপুর বিকেল ধরে দৌড়তে দৌড়তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওরা দু'জনে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর পেরিয়ে একটি বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

ছোট বড় নানা জাতের অনেক গাছপালার বাগান। মেয়েটি বলে, দাদা, রাত হয়ে আসছে। এখন অন্ধকারে পথ চলা যাবে না। আর এই জঙ্গলের এখানে সেখানে সাপ খোপ জন্তু জানোয়ার থাকতে পারে, তাই মাটিতে থাকা নিরাপদ হবে না, এসো

আমরা ঐ বড় গাছটার ওপরে উঠে যাই! ওর ডালগুলো বেশ মোটা মোটা। আর তাছাড়া বেশ ঝাঁকড়াও আছে। ঐ ডালে বসে থাকলে চট করে কেউ নজরও করতে পারবে না।

গবেটচন্দর বোনের বুদ্ধির তারিফ করে, তোর তো দারুণ মাথা রে! ঠিক আছে, চলো ওই গাছটারই উপরে ওঠা যাক। রাতটা কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে রওনা দেওয়া যাবে।

একটু পরেই আরও ঘন আঁধার ঘনিয়ে এলো। গাছের ডালে বসে বুঝতে পারলো ওরা, গাছতলায় কারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি দাদার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললো, চুপ্ একটি কথাও আর বলবি না এখন। মনে হচ্ছে, আমাদের খুঁজতে খুঁজতে ওরা এই গাছের তলাতেই এসে পড়েছে।

সকালবেলায় দিনের আলোয় মেয়েটি পরিষ্কার দেখলো, সেই গৃহস্বামী এবং তারই কয়েকজন প্রতিবেশী সহচর গাছতলায় শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। তাদের পাশে রাখা তীর ধনুক বর্শা বল্লম প্রভৃতি নানা মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র।

মেয়েটি গবেটচন্দরকে জাগিয়ে নিচের দৃশ্যটি দেখিয়ে ফিস ফিস করে বললো, ওরা এখন ঘুমে অচৈতন্য। চলো দাদা, গাছ থেকে নিঃশব্দে নেমে চুপিসারে কেটে পড়ি।

গবেটচন্দরের মাথায় তখন অন্য বদ-বুদ্ধির খেলা শুরু হয়ে গেছে। বললো, তুই থাম দিকিনি, ঐ শয়তানগুলোর মুখে আমি পেচ্ছাব করে দেব।

বোনটি অনেক কাকুতি মিনতি করেও দাদাকে নিরস্ত করতে পারলো না। গবেটচন্দর কল কল করে জল ছেড়ে দিলো তাদের মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে ধড় মড় করে উঠে পড়ে সবাই। ব্যাপারটা কি হতে পারে কিছুই ঠাওর করতে পারে না কেউ। একজন বলে, এ নিশ্চয়ই শয়তানের কাণ্ড। এই বাগানে হয়তো ওরা থাকে।

আর একজন তীর ধনুক হাতে তুলে নিয়ে বলে, শয়তানই হোক, আর জীন আফ্রিদিই হোক, আমার তীরের ফলার কাছে কেউই জ্যান্ত থাকবে না।

মেয়েটি ফিস ফিস করে গবেটচন্দরকে বলে, গাছটা আকাশ ছোঁয়া উঁচু আছে, দাদা, যদি বাঁচতে চাস আরও উপরে উঠি চলো। তা না হলে ওরা আমাদের তীরে গেঁথে ফেলবে।

গবেট বললো, ঠিক আছে তাই ওঠ পারবি তো?

মেয়েটি বলে, গাছের ডালে ডালে চড়ে বেড়ানো আমার ছোটোবেলার অভ্যেস, তুই কি জানিস না?

ওদের ওপরে উঠে যাওয়ার সময় স্বভাবতই খস্ খস্ আওয়াজ ওঠে। নিচের একজন-এর চোখে পড়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে, ওই যে ওরা গাছের মাথায় উঠে গেলো। চালাও তীর।

কিন্তু গ্রাম্য চাষীর ধনুকের তীর অত ওপরে উঠতে পারলো না। আমরা গাছে উঠে ধরবো। ওদের গৃহস্বামী বললো, তাতেও বিপদ হতে পারে। আমরা জানি না, ওদের সঙ্গে কী কী অস্ত্র আছে। ওরা ওপরে আমরা নিচে। আঘাত করার সুযোগ ওদেরই বেশি। সুতরাং তার দরকার নাই, এসো আমরা গাছটাকেই কেটে মাটিতে ফেলে দিই। তারপর ওরা পালাবে কো ায়?

সঙ্গে সঙ্গে গাছের গোড়ায় কুড়ুলের ঘা পড়তে থাকলো। মেয়েটি দাদাকে বললো, এবার আর বাঁচবার কোনও পথ নাই দাদা একটু পরেই গাছটাকে ওরা মাটিতে শুইয়ে দেবে। নে, এবার খোদার নাম কর, মউৎ সামনে এসে গেছে আমাদের।

গবেটচন্দর গম্ভীর হয়ে খুব ভারিক্কি চালে বললো, হুম্ আমার জন্যেই দেখছি তোর জানটাও খতম হয়ে গেলো।

কুড়ুলের ঘায়ে ঘায়ে গাছের গুঁড়ির অর্ধেকের বেশি কাটা হয়ে গেছে ততক্ষণে। আর একটু পরেই পাহাড় প্রমাণ গাছটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে যাবে নির্ঘাৎ। মেয়েটি হাউ মাউ

করে কাঁদতে কাঁদতে দাদাকে জড়িয়ে ধরে এ তুই কি করলি দাদা, এইভাবে জান হারাতে হলো?

গাছটা হেলে গেছে। পলকেরই মধ্যে মাটিতে পড়ে যাবে। এমন সময় বিরাট এক বকপাখী আকাশ থেকে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেলো গবেটচন্দর আর তার বোনটিকে। এবং সেই মুহূর্তেই বন-কাঁপানো আওয়াজ তুলে পড়ে গেলো গাছটা।

বকের থাবায় দুই ভাইবোন আকাশ পথে উড়ে যেতে থাকলো। মেয়েটি ভয়ে কুঁকড়ে গেছে, কিন্তু গবেটচন্দরের ভয়ডর বলে কিছু নাই। বকপাখীর বুকে সুড়সুড়ি দিয়ে মজা অনুভব করতে লাগলো সে। বোনটি আঁৎকে উঠলো, সর্বনাশ, একি করছিস দাদা, পাখীটা যদি এই আকাশ থেকে ফেলে দেয় আমাদের, তা হলে যে একেবারে ছাতু হয়ে যাবো। দোহাই দাদা, ওসব করিসনে।

গবেটচন্দর সে কথা কর্ণপাত করে না। বলে, কিন্তু আমার যে ভারি মজা লাগছে। দেখছিস না, সুড়সুড়ি খেয়ে পাখীটা কেমন ছটফট করে উঠছে!

একটা পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে উড়ছিলো পাখীটা। মনে হলো একটা জায়গায় বসবে সে। কিন্তু কী খেয়াল হলো বসতে বসতেও সে বসলো না। আবার মহাশূন্যে উঠে তীরবেগে ছুটে চললো।

প্রাণে বাঁচার ক্ষীণ একটু আশা হয়েছিলো কিন্তু তাও নিমেষে মিলিয়ে গেলো। পাহাড় ছাড়িয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে উড়তে থাকলো পাখীটা।

এই সময় গবেটচন্দর এমনভাবে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করলো যে, পাখীটা আর থাবায় ধরে রাখতে পারলো না ওদের। একেবারে ঝপাত সমুদ্রজলে।

তবে রক্ষে এই, তীর থেকে বেশি দূরে নয়। দুই ভাইবোনই সাঁতার জানতো, তাই প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেলো। সাঁতরাতে সাঁতরাতে একসময় কূলে এসে ভিড়লো ওরা।

তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। দুই ভাইবোন সমুদ্র-সৈকতে বসে শীতে কাঁপতে লাগলো। বোনটি বললো এভাবে ভিজা জামাকাপড়ে সারারাত কাটাতে হলে নিমুনিয়া ধরে যাবে দাদা, একটা উপায় বাৎলা।

গবেটচন্দর বললো, দাঁড়া ব্যবস্থা করছি। এই বলে সে এক রাশি শুকনো ডালপালা নিয়ে এসে জড়ো করলো সেখানে। তারপর দু'খানা পাথরের নুড়ি হাতে নিয়ে ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালালো।

সেই আগুনের তাপে জামা কাপড় শুকিয়ে ফেললো ওরা। মেয়েটি বললো, বারে দাদা, তোরও মাথায় কিছু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে দেখছি!

সারাটা রাত আগুনের ধুনী জ্বালিয়ে রাখার জন্য গবেটচন্দর গাছের মোটা মোটা ডালপালা এনে ধুনীর ওপরে ফেলতে লাগলো। ফলে, রাত্রির ঘন তমসা কেটে গিয়ে সেই সমুদ্রবেলার অনেকটা অঞ্চল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

রাত তখন এক প্রহর, হঠাৎ বিকট গর্জন কানে এলো। মনে হলো, হাজার হাজার মোষ তাড়া করে আসছে তাদের দিকে।

একটু পরে এক বিশাল কালো দৈত্য এসে দাঁড়ালো ওদের ধুনীর সামনে। এই দৈত্যটা আলো সহ্য করতে পারে না। সারা দেশটাকে এতকাল ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে। এখানে বহুকাল সূর্য ওঠে না। ঐ দৈত্যটা সূর্যকে পিঠ দিয়ে আড়াল করে রেখে দেয়।

দৈত্যটা আগুনের কুণ্ডটাকে নিভিয়ে দেবে আর গবেটচন্দর তা কিছুতে হতে দেবে না। এই নিয়ে বেধে গেলো তুমুল লড়াই। অগ্নিদগ্ধ জ্বলন্ত গাছের ডাল নিয়ে বার বার আক্রমণ করতে থাকলো সে! কিন্তু প্রতিবারই দৈত্যটা তা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গবেটেরই জিৎ হলো। একবার সে অতর্কিতে একটা জ্বলন্ত ডাণ্ডা

সোজা ঢুকিয়ে দিলো তার হায়নার মতো মুখগহ্বরে। মেদিনী কাঁপিয়ে আওয়াজ তুলে সে লুটিয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো। গবেট এবার আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে অন্ধ করে দিলো ওর চোখ দু'টো। তারপর পিটাতে পিটাতে সাঙ্গ করে দিলো ওর ইহলীলা।

বোনটা অদূরে পাহাড়-এর কন্দরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। দৈত্য নিধন করার পর সে পাহাড়-কন্দরে এসে বোনের দেখা পেয়ে বললো, কিরে খুব ভয় পেয়েছিলি?

মেয়েটি বিস্ফারিত চোখে তাকায় দাদার দিকে, তোর গায়ে এতো শক্তি তাতো জানতাম না দাদা! অত বড় একটা বাঘা দানব, তাকে খতম করে দিতে পারলি!

গবেটচন্দর বুক ফুলিয়ে বলে, ওসব দৈত্য দানব আমার কাছে নস্যি! নে সর একটু শোয়া যাক। উফ্, খুব একটা ধকল গেছে আজ।

সকালে সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়লো কোন এক মহাবীর দুষমন দৈত্যকে নিধন করে ফেলেছে! সম্রাট তাঁর সেনাপতিদের বললেন, যে দৈত্যের অত্যাচারে আমরা এতকাল ঘন তমসার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছিলাম সেই দুরাচারকে যে বীর নিহত করেছে সে নিশ্চয়ই দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিধর। তোমরা যাও তার অনুসন্ধান করে মহা সম্মানে নিয়ে এসো তাকে আমার প্রাসাদে। আমি স্বহস্তে তাকে জয়তিলক পরিয়ে বরণ করবো!

সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের চর এবং সৈন্যসামন্ত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে খুঁজতে একসময় তারা সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছায়। একজন সেনাপতি এক পায়ের চটি দেখতে পেয়ে হাতে তুলে নেয়।

—নিশ্চয়ই এই চটি যাঁর, তিনিই নিহত করেছেন এই দৈত্যকে। নিশ্চয়ই তিনি আশেপাশেই কোথাও আছেন, খুঁজে দেখ তোমরা।

খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের সেই কন্দরে দু'টি কিশোর-কিশোরীকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে পেলো ওরা।

সৈন্যদের পদশব্দে মেয়েটির ঘুম ভেঙ্গে যায়! সৈন্যরা তাকে জিজ্ঞেস করে এ চটি কার?

মেয়েটি ভীত চকিত হয়ে বলে, আমার। দৈত্যের সাড়া পেয়ে ভয়ে ছুটে আসার সময় খুলে পড়ে গিয়েছিলো।

—দৈত্যটাকে নিধন করেছে কে?

—মেয়েটি তার দাদাকে দেখিয়ে বলে, এই আমার দাদা।

এরপর গবেটচন্দর আর তার বোনকে মহা সমাদরে সম্রাটের দরবারে হাজির করলো তারা।

সম্রাট গবেটচন্দরকে বাদশাহী মর্যাদায় বীরোচিত অভ্যর্থনা করলেন।

আপন কন্যার সঙ্গে শাদী দিলেন; এবং অর্ধেক সলতানিয়তের সুলতান করে দিলেন তাকে। এবং গবেটের বোনকে শাদী করে হারেমের বেগম-এর মর্যাদা দিলেন তিনি।

এরপর শাহরাজাদ তার কাহিনী শুরু করলো ঃ

কোনও এক শহরে তিন বোন বাস করতো। ওরা সবাই একই পিতার সন্তান। কিন্তু মা ভিন্ন ভিন্ন।

তিন বোন একই সঙ্গে থাকতো। শনের কাপড় বুনে অন্ন সংস্থান করতো।

তিনজনেই দেখতে শুনতে অপরূপ ছিলো। বিশেষ করে ছোটটির রূপের জেল্লার কোনও তুলনা হয় না। হাতের কাজও তার নিখুঁত। অন্য দুই বোনের কাপড় বোনার সঙ্গে তার বোনার আকাশ পাতাল তফাত ছিলো। ফলে ওদের বোনা কাপড় যে দামে বিকাতো তার

অনেক বেশি দামে বিক্রি হতো ছোটর বোনা কাপড়। এই সব কারণে বড় দুই বোন প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার চোখে দেখতো তাকে।

একদিন ছোট বোন বাজার থেকে একটা ছোট্ট চিনেমাটির ফুলদানী কিনে নিয়ে এলো। জিনিসটা দেখতে সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু মেহনতের সীমিত পয়সা খরচ করে এমন শৌখিন বস্তু আবার কেউ কিনে নাকি! বড় বোন ঠোঁট উল্টে চোখ নাচিয়ে মেজকে বলে যতসব আদিখ্যেতা। মেজ বলে ঢং দেখে আর বাঁচি না। পেটে খেতে কুলায় না, এদিকে ফুলে সাজাবেন ঘর!

ছোট বোন ওদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে আহত হলো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না। নিজের ঘরে গোলাপ ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখলো ফুলদানীটি।

আসলে এই ফুলদানীটি একটি অভিনব যাদু বস্তু। ফুলদানীর সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম মুখরোচক খানাপিনা বা সুন্দর সুন্দর জমকালো সাজ-পোশাক বা অন্য যা কিছু চাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে সে সব এসে হাজির হয়। কিন্তু ছোট বোন ফুলদানীর এই আশ্চর্য ক্ষমতার কথা সযত্নে গোপন করে রাখে। ওরা জানতে পারলে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে।

রাতে যখন অন্য দুই বোন ঘুমিয়ে পড়ে তখন সে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে, ফুলদানীর কাছে ভালো ভালো খাবার-দাবার, সাজ-পোশাক গহনা চায়। এবং তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হয় সব। তৃপ্তি করে খানাপিনা করে সে। তারপর সেই বন্ধ ঘরে একা একাই বাহারী সাজে অলঙ্কারে সেজে-গুজে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে পুলকিত হয়। আবার সকাল হতে না হতে অন্য দুই বোন ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই সাজ-পোশাকটি ছেড়ে ফেলে ফুলদানীকে বলে, ছোট ফুলদানী, ছোট ফুলদানী, এ সবগুলো এখন তুমি নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে সাজ-পোশাক অলঙ্কারাদি অদৃশ্য হয়ে যায়। সুতরাং দুই বোন ঘূণাক্ষরেও কিছু টের পায় না।

এইভাবে কয়েকটা মাস কেটে যায়, বড় দুই বোনের সামনে সে নিতান্ত গরীব-সরীবের মতো থাকে। কিন্তু রাতের বেলায় নিজের ঘরে সে শাহজাদী বনে যায়।

একদিন সুলতানের পেয়াদা বরকন্দাজরা ট্যাঁড়া পিটিয়ে সারা শহরবাসীকে শাহজাদীর শাদীর নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলো। বড় দুই বোন ছোটকে বললো, তুই আর গিয়ে কি করবি, বাড়িটা পাহারা দে, আমরা দু'জনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসি।

ছোট আহত হলো, কিন্তু মুখে কোনও প্রতিবাদ করলো না।

ওরা নিজেদের সেরা সাজ-পোশাক যা ছিলো তাই বের করে সেজে-গুজে সুলতানের প্রাসাদে রওনা হয়ে গেলো। ছোট তখন ফুলদানীকে বললো, আমার জন্য এমন সাজ-পোশাক এনে দাও যা দেখে প্রাসাদের বেগম বাঁদীরাও ভিরমি খেয়ে যায়। আমার দু'হাতের জন্য চাই দশটা হীরে চুনী পান্না মুক্তোর সুন্দর সুন্দর আংটি, তুরস্কের রংদার বাজুবন্ধ এবং পায়ের জন্য ছোট ছোট হীরেখচিত মল।

ফুলদানীটা তখুনি ছোটবোনের চাহিদা পূরণ করে দিলো। খুব সুন্দর করে শাহজাদীর মতো সেজেগুজে সে প্রাসাদে এসে হাজির হলো। তার সাজের বাহারে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো আমন্ত্রিতরা। এ ওর কানে ফিসফিস করে বলাবলি করতে লাগলো, নিশ্চয়ই কোনও আমীর বাদশাহর কন্যা হবে।

সাজ-পোশাক এবং অলঙ্কার আভরণের চাকচিক্যে ছোটর চেহারা এতই চমৎকার দেখাচ্ছিল যে নিজের বোনরাও তাকে চিনতে পারলো না সেখানে।

খানাপিনা শেষ হতেই শুরু হলো জলসা, নাচ গানের আসর যখন জমজমাট, সবাই যখন আনন্দে আত্মহারা, সেই সুযোগে সবার অলক্ষ্যে ছোট প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে। গান-বাজনা শেষ হলেই তার বোনরা

বাড়ি ফিরে আসবে। তাই তার আগেই সাজ-পোশাক গহনাপত্র আবার ফুলদানীর কাছে জমা করে দেবে, সেই জন্যে ত্বরিতপদে ঘরে ফিরে এলো সে। কিন্তু গহনাপত্র খুলতে গিয়ে দেখলো বাঁ পায়ের মলখানা কোথায় খুলে পড়ে গেছে! মনটা ঈষৎ খারাপ হয়ে গেলো, তা যাক, ফুলদানীর কাছে চাইলে তো আর অভাব হবে না কিছু!

প্রতিদিন সকালবেলায় শাহজাদা প্রাতঃভ্রমণে বেরোয়। সেজেগুজে তার তাজি ঘোড়াটায় চাপবে বলে আস্তাবলে আসতেই দেখে সহিসরা কী একটা বস্তু দেখতে ভিড় জমিয়েছে। শাহজাদাকে দেখে তারা শশব্যস্ত হয়ে ছুটে পালাতে থাকে। শাহজাদা দেখতে পায় একজনের হাতে একটি রত্নালঙ্কার।

—এই—এদিকে শোন্; তোর হাতে ওটা কি রে?

লোকটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, আমার কোনও গুণাহ নাহী হুজুর, এটা আমি আস্তাবলের দরজার সামনে কুড়িয়ে পেয়েছি, বিশ্বাস করুন।

এই বলে সে অলঙ্কারটি শাহজাদার হাতে তুলে দেয়। শাহজাদা দেখে বুঝতে পারে কোনও বাদশাহজাদীর সাধের মল। চলতে চলতে চরণ থেকে স্খলিত হয়ে গিয়ে থাকবে। মলটি মহামূল্যবান হীরকতারকা খচিত বলে নয়, আশ্চর্য হলো সে এতো ক্ষুদ্রাকৃতির মল যে চরণে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছিলো, না জানি সে সুন্দরী দেখতে কেমন অপরূপ! নানা ভাবে সে কল্পনায় তার মুখচ্ছবি আঁকতে চেষ্টা করে। কিন্তু বার বারই ব্যর্থ হয়। বুকের মধ্যে এক অদম্য বাসনা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অদর্শনাকে দেখার জন্য, প্রাণের প্রিয়তমা রূপে একান্ত আপন করে পাওয়ার জন্য বুকের মধ্যে উথাল পাথাল শুরু হয়ে যায়।

শাহজাদার এই প্রেম-জ্বরের কাহিনী সুলতানের কর্ণগোচর হতে বেশি সময় লাগে না। একমাত্র পুত্রের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য সুলতানের চেষ্টার অন্ত নাই। শাহজাদার অভিপ্রায় জানার পর উজিরদের ডেকে বললো, সারা শহর তোলপাড় করে খোঁজার ব্যবস্থা কর। একটি মূল্যবান হীরের মল পাওয়া গেছে আমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে। অনুমান করছি শাহজাদীর শাদীর সময় আমন্ত্রিত হয়ে যারা এসেছিলো তাদেরই কারো হবে সেটি। যারই হোক, সেই মালকিনকে হাজির করো আমার প্রাসাদে।

সুলতানের হুকুমে সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে সিপাই সান্ত্রীরা সন্ধান করতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু বাদশাহের পেয়াদা বরকন্দাজের সামনে মুখ খুলবে কে? সুলতানের লোকেরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। মল-মালকিনের সন্ধান পাওয়া গেলো না। এই সংবাদে শাহজাদা বিরহ-বেদনায় কাতর হয়ে শয্যা নিলো। পুত্রের মুখ চেয়ে শাহবানু সুলতানকে প্রস্তাব দিলেন, অলঙ্কারটি একটি মেয়ের সুতরাং তাকে খুঁজে বের করতে গেলে প্রতিটি বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

সুলতান বললেন, বেশ তাই কর। ঘরে ঘরে মেয়েদের পাঠাও। তারা প্রতিটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে জেনে আসুক।

খুঁজতে খুঁজতে সুলতানের নারীচররা অবশেষে তিন বোনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। পায়ের গোড়ালীর সরু গোছ দেখে তারা বুঝতে পারে ঐ ছোট্ট মলটির মালকিন তিন বোনের ছোটজন ছাড়া আর কেউ নয়! জেরার মুখে পরে সে স্বীকার করতেও বাধ্য হয়, হ্যাঁ মলটা তারই। প্রাসাদে নিমন্ত্রণ সেরে ফেরার পথে তার পা থেকে খসে পড়ে গেছে।

শাহবানুর চররা মহা সমাদরে ছোট বোনকে প্রাসাদে নিয়ে যায়। শাহবানু তাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে বলে, বাঃ কি সুন্দর দেখতে তুমি, আমার ছেলের সঙ্গে তোমার শাদী দেব।

সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। শাদীর উৎসবে মুখর হয়ে উঠলো সারা শহর।

ঈর্ষা-কাতর বড় দু'বোন জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে ছোটর সৌভাগ্যে খুব যেন

খুশি হয়েছে এমনি ভাব দেখাতে থাকে। ছোট সরলমতি মেয়ে, সে ওদের মনের কুটিলতা ধরতে না পেরে খুশির বন্যায় গা ভাসিয়ে বলে, সুলতানের অতবড় প্রাসাদে আমি একা-একা দিন কাটাবো কি করে দিদি, তোমরা চলো আমার সঙ্গে।

ওরা পা বাড়িয়েই ছিলো, তখুনি রাজি হয়ে গেলো দু'জনে। মহা ধুমধামে শাদী পর্ব সমাধা হয়ে গেলো। একটানা চল্লিশ দিন আনন্দে উৎসবে উত্তাল হয়ে কাটালো সারা শহরবাসী।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো তিরাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চল্লিশটা দিনের আনন্দমুখর সুখ-সম্ভোগে ছোট বোন আত্মহারা হয়ে বড় দুই বোনকে সেই আশ্চর্য যাদু ফুলদানীর গুপ্ত রহস্য বলে ফেলে। এখন সে সুলতানের পুত্রবধু, সুতরাং ঐশ্বর্যের আর অভাব কী? সুতরাং ঐ ফুলদানীটা তার দিদিরাই নিক।

কিন্তু কাল হলো সেই। চল্লিশ দিনের শেষ দিনে সে হামাম থেকে গোসলাদি সেরে ঘরে ফিরে এসে দিদিদের সামনে চুল বাঁধতে বসে। বড় বোন সযত্নে পরিপাটি করে কেশ পরিচর্যা করে একটা খোঁপা বেঁধে তার চার পাশে সোনার কাঁটা গুঁজতে থাকে। একটা একটা করে আটখানা কাঁটা গোঁজা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট বোনটি, কি আশ্চর্য হঠাৎ একটি ঝুঁটি বাঁধা বুলবুলি পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দু' বোন তখন হাতের তুড়ি বাজিয়ে পাখিটিকে প্রাসাদকক্ষের বাইরে তাড়িয়ে দেয়। ছোটবোন পাখি হয়ে মনের দুঃখে জানালার ফাঁক দিয়ে উড়ে গিয়ে সামনের বাগিচার একটা ফুলগাছের ডালে গিয়ে বসে।

এর পর দুই বোন আনন্দে নাচতে নাচতে প্রাসাদ ছেড়ে নিজেদের ঘরে ফিরে আসে।

সন্ধ্যায় শাহাজাদা শয্যাকক্ষে এসে দেখে তার প্রান-প্রতিমা অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রথমে সারা প্রাসাদ, তারপর সারা শহর তোলপাড় করেও কোনও সন্ধান করতে পারা গেলো না। বড় দুই বোন শোকের ভান করে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে বসে, ওরে বাবারে, এ আমাদের কি হলো গো! এতো আদরের পিয়ারের বোন তুই কেন বা তুই শাহাজাদার বেগম হতে গেলি—

শাহাজাদা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নিজের ঘরে পড়ে থাকে। আর পাখিটা জানলার ওপর এসে বসে কিচির মিচির আওয়াজ তুলে কত কী বলে। প্রথম প্রথম শাহাজাদা বিশেষ নজর দেয়নি। কিন্তু দিন কয়েক পরে, রোজ দেখে দেখে পাখিটার ওপর কেমন মায়া বসে যায় তার।

আদর করার জন্য সে জানলার পাশে এসে দাঁড়ায়। ভাবে,ভয় পেয়ে বুঝি পালিয়ে যাবে পাখিটা।

কিন্তু না, ভয় সে পায় না, বরং শাহাজাদার হাতের স্পর্শ পেয়ে আদরে গলে যায় সে।

অনেক শোক তাপের মধ্যে এই পাখিটাকে পেয়ে শাহাজাদা মনটাকে একটু হালকা করতে পারে। নিজে হাতে করে সে তাকে খাওয়ায়, আদর করে।

পাখিটার মাথায় সুন্দর একটি খোপার মতো ঝুঁটি। শাহাজাদা ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে হাতে শক্ত কী যেন অনুভব করে কৌতূহলী চোখে ঝুঁটিটার দিকে বিশেষ ভাবে নজর করে।

আশ্চর্য তো! পাখির মাথায় ঝুঁটিতে সোনার কাঁটা! একটা একটা করে কাঁটাগুলো ওঠাতে থাকে সে। সাতটা কাঁটা তোলার পর অষ্টম কাঁটাটি টেনে তুলতেই বুলবুলিটা তার আসল রূপ ফিরে পেয়ে শাহাজাদাকে সালাম করে দাঁড়ায়!

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত।

তার সৌভাগ্যের ঈর্ষায় কাতর হয়ে বড় দুই বোন, তারই কাছ থেকে উপহার পাওয়া যাদু ফুলদানীর কাছ থেকে ঐ যাদুকরী সোনার কাঁটাগুলো চেয়ে নিয়েছিলো।

এর পরে অনন্ত সুখ-সম্ভোগের সায়রে গা ভাসিয়ে ওরা দু'জনে সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছিলো। অনেক সুন্দর সুন্দর সন্তানের জনক-জননী হতে পেরেছিলো ওরা। আর ঐ দুষ্টপ্রাণ দুই বোন হিংসার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে মরেছিলো।

সে রাত শেষ হতে তখনও অনেক বাকী। তাই শাহরাজাদ অন্য একটি কাহিনী শুরু করলো ঃ

এক সময়ে ভারতের এক প্রদেশে এক মুসলমান সুলতান দারুণ দক্ষতার সঙ্গে প্রজা পালন করতেন। তার কোনও পুত্র-সন্তান ছিলো না। কিন্তু সে জন্য সুলতানের কোনও ক্ষোভ ছিলো না। কারণ তিনটি পরমাসুন্দরী কন্যা-সন্তান লাভ করেছিলেন তিনি।

দিনে দিনে দল মেলে ওরা কোমল কুঁড়িটি থেকে সুবাসিত প্রস্ফুটিত কুসুম হয় ওঠে। আরও সহজ করে বলা যায়, কচি কাঁচা আপেল তিনটি ক্রমশঃ রসালো ডাগর হতে থাকে।

একদিন সুলতান শাহবানুকে বললেন, মেয়ে তিনটির শাদীর বয়েস হলো, এবার ওদের একটা বিধিব্যবস্থা করতে হয়? যথাযোগ্য পাত্র সন্ধান করে তাদের হাতে সমর্পণ করাই তো এখন বিধেয়, কি বলো?

শাহবানু বলেন,এ তো খুবই ভালো কথা, মেয়েদের সময়কালে শাদী দেওয়া মা বাবার একান্ত কর্তব্য। কিন্তু আমার মতে বংশমর্যাদার কোনও কথা নয়, মেয়েদের নিজেদের পছন্দই প্রধান হওয়া উচিত। ওরা যাকে পেয়ে জীবনে সুখী হতে পারবে বলে মনে করবে, তাকেই শাদী করুক। তোমার কী মত?

সুলতান বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে একমত। ওরা নিজেরাই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করে নিক।

সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হবে। যে সব পাত্র আগ্রহী তারা যথা নির্দিষ্ট দিনে প্রাসাদ- প্রাঙ্গণে সমবেত হতে পারে।

যথা দিনে দেশ-বিদেশের শতশত আমীর বাদশাহজাদারা সুলতানের প্রাসাদ- প্রাঙ্গনে এসে জড়ো হলো। প্রাসাদের ওপরতলায় বাতায়ন-কক্ষে বসেছে শাহজাদীরা। উপস্থিত পাত্রদের পর্যবেক্ষণ করে বড় দুইবোন তাদের রুমাল নিক্ষেপ করলো দু'জনের গায়ে। অর্থাৎ ঐ দু'জন শাদীর পাত্র বলে নির্বাচিত হলো বড় দু'জনের জন্য।

এরপর ছোটজন রুমাল নিক্ষেপ করলো। কিন্তু হাওয়ার টানে রুমালখানা উড়তে উড়তে প্রাসাদের আঙ্গিনার বাইরে অবস্থানরত একটি রামপাঠাঁর গায়ে গিয়ে পড়লো।

এমন অশুভ সূচনায় সুলতান বিষণ্ন হলেন। কন্যাকে পুনরায় তিনি রুমাল নিক্ষেপ করতে আদেশ করলেন। কিন্তু কপালের এমনই ফের, পরপর তিনবারই রুমাল গিয়ে পড়লো ঐ রামপাঁঠারই গায়ে। সুলতান বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ হলেন। ছোট কন্যা বললো, বাবা,এই বোধহয় বিধাতার ইচ্ছা। সুতরাং একে অস্বীকার করে কোনও লাভ নাই।

সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, তা বলে একটা রামপাঁঠা? এর চেয়ে তোর মরা মুখ দেখাও ভালো।

সুলতানের ক্ষোভে শাহজাদী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, বাবা তুমি বৃথাই রাগ করছো, এই আমার অদৃষ্টের লিখন, একে এড়াবো কি করে। তার চেয়ে বিধাতার বিধান মেনে নিয়ে ঐ রামপাঁঠার সঙ্গেই আমার শাদী দিয়ে দাও। আমি অখুশি হবো না।

বড় দুই বোন ছোটর এই দুর্ভাগ্যে পুলকিত হয়ে ওঠে। ছোট তাদের চেয়ে রূপবতী বলে সহজাত হিংসা ছিলো তার ওপর। আজ অদৃষ্টের পরিহাসে একটি রামপাঁঠাকে পতিত্বে বরণ করতে হচ্ছে শুনে তারা মনে মনে বেশ খুশিই হলো।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত সুলতান ছোট কন্যার কথা মেনে নিয়ে সাড়ম্বরে তিন কন্যার শাদী দিয়ে দিলো।

সন্ধ্যায় তিন কন্যার বাসরঘর গুলো সুন্দর করে সাজানো হলো। যথাসময়ে পাত্ররা উপস্থিত হলো বাসরঘরে।

রামপাঁঠা পাত্রকে বাসরঘরে ঢুকিয়ে দিতেই ছোট কন্যা দরজা বন্ধ করে দিলো। রামপাঁঠাটি এক অদ্ভুত কায়দায় গা ঝাড়া দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সে এক সুঠামদেহী সুকুমার নওজোয়ান পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। শাহজাদী হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। যুবকটি শাহজাদীকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, আসলে আমি পাঁঠা নই শাহজাদী, কপালদোষে আজ আমি শাপগ্রস্ত। কিন্তু তোমার কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ এই গোপন সংবাদ তুমি দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করো না কখনও। তাহলে আমাকে হয়তো চিরকালের মতো হারাবে তুমি।

শাহজাদী বলে, না, একথা কাউকেই বলবো না আমি? কিন্তু তুমি কে? কী তোমার আসল পরিচয়? আর কেনই বা এমন দশা হয়েছে তোমার?

যুবক বলে, আমি কে, জানতে চেও না প্রিয়তমা। কেন আমার এই দশা সে কথাও এখন বলতে পারবো না তোমাকে। তবে এটুকু জেনে রাখ, বিত্তে এবং বলে আমি তোমার প্রবল পরাক্রান্ত পিতার চেয়েও অনেক বড়। যাদের সঙ্গে তোমার অন্য দুই বোনের শাদী হয়েছে কোনও দিক দিয়েই তারা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।

অনেক দিন ধরেই আমি তোমাদের এই প্রাসাদের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আসল কারণ, তোমাকে দেখার পর থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। অহর্নিশ আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছি, তোমাকে যেন জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাই। তা খোদা আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। আমি তোমাকে লাভ করেছি। এখন আমাদের এই বন্ধন যাতে চিরস্থায়ী হয় সেজন্য তোমাকে একটি হলফ নিতে হবে।

—কী সে হলফ?

তুমি ছাড়া দুনিয়ার আর সব মানুষ জানবে, আমি একটি রামপাঁঠা, জন্তু মাত্র। যত সাংঘাতিক ব্যাপারই ঘটুক, যে অবস্থাতেই পড় না কেন, আমার প্রকৃত পরিচয় কোনও ক্রমেই তুমি প্রকাশ করে দেবে না এই আমার একমাত্র অনুরোধ। তা যদি কর, সে যে কারণেই হোক, আমাকে আর খুঁজে পাবে না।

শাহজাদী আল্লাহর কসম খেয়ে শপথ করলো, কোনও কারণেই সে তার আসল পরিচয় ফাঁস করে দেবে না। তার জন্যে যদি মৃত্যুকে বরণ করতে হয়, দ্বিধা করবে না সে।

এরপর ওরা দু'জনে গভীর প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে সারাটা রাত সুখ-সম্ভোগে কাটিয়ে দিলো।

সকাল হতেই শাহাজাদা আবার রামপাঁঠায় রূপান্তরিত হয়ে বাসরকক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

রীতি অনুসারে সকালে শাহবানু এলেন কন্যার খোঁজ খবর নিতে। শাদীর প্রথম রাতে কন্যা কীভাবে পাত্রদ্বারা গৃহীত হয় তা প্রত্যক্ষ করার জন্যই পাত্রীর মা বাসরঘরে আসেন।

শাহবানু ঘরে ঢুকেই কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল কণ্ঠে বলেন, তুই এখনও জিন্দা আছিস, মা? আমরা তো সারারাত কেঁদে ভাসিয়েছি ঐ জানোয়ারটা বোধহয় তোকে আর আস্ত রাখেনি।

মেয়ের মুখে হাসির খৈ ফুটে, তুমি যে কি বলো, মা। জিন্দা থাকবো না কেন? এই দেখো তোমার মেয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে এখনও বেঁচে আছে।

শাহবানু অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকায়, কী যেন বোঝার চেষ্টা করে, কিন্তু মেয়েকে খুশির বন্যায় উচ্ছ্বসিত দেখে কেমন যেন সে ঘাবড়ে যায়।

—তা হলে, তুই সুখী হয়েছিস মা?

বাঃ রে, সুখী হবো না কেন? তোমার জামাই কত আদর সোহাগ জানে মা, কী করে তোমাকে বোঝাবো সে কথা। মোট কথা এর চেয়ে ভালো বর আমি কল্পনা করতে পারিনি মা।

মা কেমনে চুপসে গিয়ে বললেন, তা তুই যখন সুখী হয়েছিস, তার বাড়া তো আর কিছু নাই। তোর মুখে হাসি দেখলেই আমাদের দিল খুশ হবে মা। আচ্ছা তুই সুখে থাক, আমি এখন চলি?

মাস কয়েক পরে সুলতান এক বিরাট পোলো প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করলেন। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় দুই জামাই অংশ নিতে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু সুলতান তাঁর ছোট জামাতা রামপাঁঠাকে আর হাজির করলো না পোলো মাঠে। কারণ, তিনি জানতেন, তাতে উপস্থিত দর্শকদের হাসির খোরাকই জোগানো হবে মাত্র!

বড় দুই জামাই ঘোড়ার পিঠে চেপে ইয়া পেল্লাই পেল্লাই লাঠি হাতে নিয়ে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছুটাছুটি করে পাঁয়তারা ভাঁজছিলো। কে কাকে কেমন করে ঘায়েল করবে তারই কায়দা কসরত কষছিলো। এমন সময় এক তৃতীয় বীরপুরুষের আবির্ভাব ঘটলো সমরক্ষেত্রে।

বীরপুরুষই বটে! সুঠাম সুন্দর চেহারার এক নওজোয়ান। লাঠি হাতে ঘোড়ার পিঠে চেপে বিশ্ব-বিজেতার মতো এসে উপস্থিত হলো সে। তড়িৎ বেগে বনবন করে ঘুরিয়ে লাঠির দু'টি ঘায়ে দুই জামাতা-পুঙ্গবকে ধরাশায়ী করে সে বুক ফুলিয়ে এসে দাঁড়ালো সুলতানের বাতায়ন সম্মুখে।

উপস্থিত দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে নওজোয়ানকে বীরোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে থাকলো। সুলতানও মুগ্ধ হলেন যুবকের অসামান্য বীরত্বে। শুধু বীর্যে কেন, এমন অলোক-সামান্য রূপবান পুরুষই বা কে কোথায় দেখেছে?

বড় দুই বোন তাদের স্বামীদের পরাজয়ে যুবকের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু কনিষ্ঠার মুখমণ্ডল খুশির আলোয় উদ্ভাসিত হয়। মাথার খোঁপায় গোঁজা একটি গোলাপ নিক্ষেপ করে দেয় সে যুবকের দিকে।

আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কে এই নওজোয়ান। আমাদের কনিষ্ঠা কন্যার বর রামপাঁঠাই নিজের স্বরূপ ধারণ করে আজকের এই লড়াই-এর বাজীমাত করেছে।

কন্যার এই অশোভন আচরণ সুলতান এবং শাহবানুর নজর এড়ায় না। মনে মনে বিরক্ত হলেও তার বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখের কথা বিবেচনা করে মুখে কিছু বলেন না তাঁরা।

দ্বিতীয় দিনেও ঐ যুবক পোলো ক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় গৌরবের উল্লাস অভিনন্দন আদায় করে সুলতানের বাতায়ন-পথে এসে কুর্নিশ জানায়।

সে দিন সুলতান কনিষ্ঠা কন্যার অভব্য আচরণ দেখে ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। হতচ্ছাড়ি সাধ করে একটা জানোয়ারকে শাদী করে নিজের জিন্দেগী বরবাদ করে এখন পরপুরুষকে দেখে বেহায়া নির্লজ্জের মতো ঢলাঢলি করতে আরম্ভ করেছে!

তৃতীয় দিনের লড়াই শেষে আবার যখন সে বিশ্ব-বিজেতার মতো এসে দাঁড়ালো তখন ছোট মেয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না। বিরাট একটি ফুলের মালা সূতোয় বেঁধে নামিয়ে দিলো তার গলায়।

—শয়তানীটা কামের তাড়নায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আজ আমি ওকে নিজের হাতে খুন করবো।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সুলতান তেড়ে গেলো ছোট মেয়ের দিকে। চুলের মুঠি ধরে আছাড় মেরে মেঝেয় ফেলে দিলেন, বল বেয়াদপ দুশ্চরিত্রা, কেন তুই এইভাবে আমার মুখে চুনকালি দিলি। আজ তোকে আমি শেষ করে ফেলবো। হাজার বারণ সত্ত্বেও একটা রামপাঁঠাকে শাদী করে আমার এই বাদশাহী খানদানীতে কলঙ্ক লেপে দিয়েছিস, তাতেও তোর সাধ মেটেনি। এখন প্রকাশ্যে পরপুরুষকে ঘরে টেনে কামনা মেটাতে চাস এতো বড় সাহস তোর। না, ঢের হয়েছে আর তোর এই বেলেল্লাপনা সহ্য করবো না আমি। আজই এখুনি নিজের হাতে তোকে গলা টিপে খতম করে দেব।

সুলতান দু'হাত দিয়ে কন্যার গলাটা চেপে ধরেন। উদ্দেশ্য শ্বাসরোধে মেরে ফেলবেন তাকে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে মেয়েটি কাতর কাকুতি করে বাবার কাছে, বাবা আমাকে ছেড়ে দাও, জানে মেরো না। আমি কোনও দোষ করিনি, কোনও পাপ করিনি—

—চোপ রও, পরপুরুষকে লুব্ধ করার চেষ্টা করে যে নারী, সে দোজকের কীট!

—না বাবা, না, আমি স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের দিকে কখনও নজর দিই না। তুমি যাকে পরপুরুষ মনে করেছ সে তোমার জামাই। বলছি, সব তোমাকে খুলে বলছি বাবা। আমাকে তুমি জানে মেরো না, আমি সব খুলে বলছি তোমাকে। আসলে সে কোনও জন্তু জানোয়ার নয়। কোনও কারণে আজ সে ঐ রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই সে তার নিজের রূপ ফিরে পেতে পারে। প্রতিদিন রাত্রে সে আমার সঙ্গে মানুষ হয়ে মিলিত হয়। আবার সকাল হতে না হতেই, কেউ দেখে ফেলার আগে, আবার ঐ জন্তুর রূপ ধরে। আসলে সে বিরাট শাহেনশাহর পুত্র সুন্দর সুপুরুষ নওজোয়ান।

সুলতান শাহবানু এবং বোনরা একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়! এমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কথা কে শুনেছে কবে?

সেইদিন থেকে রামপাঁঠাকে আর কেউ দেখতে পেলো না। রাতের পর রাত কেটে যায়, ছোট কন্যা বাসর সাজিয়ে বসে বসে বিনিদ্র রজনী কাটায়, কিন্তু তার স্বামী আর আসে না।

সুলতান চারদিকে চর পাঠালেন। তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালানো হলো সর্বত্র। কিন্তু কোনও সন্ধান পাওয়া গেলো না ছোট জামাতার!

এইভাবে দিনে দিনে মাস বয়ে যায়। মাসে মাসে বৎসরও অতিক্রান্ত হয়ে চলে। ছোট কন্যা বুঝতে পারলো, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে বলে আর তার স্বামী ফিরে আসবে না। কিন্তু স্বামী-সোহাগে বঞ্চিত হয়ে জীবন ধারণের বা কি প্রয়োজন? তাই সে ঠিক করলো, আত্মঘাতী হয়ে মরবে।

কিন্তু মরার আগে তার দেখতে সাধ হলো, এই দুনিয়ায় তার চেয়ে হতভাগী মেয়ে আর কেউ আছে কিনা। সকলের অলক্ষ্যে একদিন সে প্রাসাদ ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লো।

চলতে চলতে একসময় ক্লান্ত হয়ে আবার প্রাসাদেই ফিরে এলো। পথ চলা আর জনে জনে জিজ্ঞেস করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না ভেবে আপাতত গৃহ ত্যাগের পরিকল্পনা বাতিল করে শহরাভ্যন্তরে এক অনিন্দ্যসুন্দর সুরম্য হামাম গৃহ বানাবার বাসনা করলো।

বহু অর্থব্যয়ে একদিন সে হামাম গৃহ তৈরিও হয়ে গেলো। লোকে দেখে শত মুখে প্রশংসা ছড়াতে লাগলো, এ রকম স্নানাগার তামাম হিন্দুস্তানে আর দু'টি নাই।

ঘোষণা করে দেওয়া হলো, সর্বস্তরের নারীদের জন্য ঐ হামামের দ্বার অবারিত থাকবে। কোনও পয়সাকড়ি লাগবে না। তবে একটি মাত্র শর্তে। যে নারী গোছল করতে আসবে

সেখানে তাকে তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখ বেদনার সত্য কাহিনী বিবৃত করতে হবে। সুলতান-দুহিতা সকর্ণে তা শুনবেন। যাদের জীবনে কোনও দুঃখ বেদনা ছায়াপাত করেনি, হামামে তাদের প্রবেশ অধিকার নাই। সারা দেশের ভাগ্য-বিড়ম্বিত শোক দুঃখ তাপে দগ্ধ নারীর সংখ্যা অগণিত। সেই সব মেয়েরা দলে দলে আসতে থাকলো শাহজাদীকে তাদের দুঃখ বেদনার কাহিনী শোনাতে।

কেউ তার স্বামীর অত্যাচারের কাহিনী শোনায়, কেউ বলে কী ভাবে তার স্বামী অন্য মেয়ের পাল্লায় পড়ে তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে, আবার কেউ বা প্রতারক স্বামীর খপ্পরে পড়ে নিজের যথাসর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারী হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের দুঃখ বেদনাকে অনেক বড় করে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু শাহজাদী নিজের দুর্ভাগ্যের চেয়ে কারো কাহিনীই আরও বেশি বেদনাদায়ক বলে মনে করতে পারে না।

একদিন এক অশীতিপরা লোলচর্ম দীনাতিদীন বৃদ্ধা হামামে প্রবেশ করলো। শাহজাদীর হাতে চুম্বন করে সে বললো, মা জননী, আমার বয়সের গাছপাথর নাই, এবং আমার দুঃখের কাহিনীরও সীমা সংখ্যা নাই। সে-সব কাহিনী শোনাতে শোনাতে জিভ আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। অত কথা বলতেও পারবো না, শোনার মতো ধৈর্যও তোমার হবে না। তার চেয়ে আমার জীবনের সবচেয়ে শেষ দুঃখের কাহিনীটা তোমাকে শুনিয়ে যাই। এবং আমার মনে হয়, এইটেই আমার জীবনের সব চাইতে দুঃখজনক কাহিনী, কারণ এর ফলে দুঃখের কোনও অনুভূতি আমি বোধ করতে পারিনি। দেহ মন সব অসাড় হয়ে গেছে একেবারে। ঘটনাটা সবে গতকাল ঘটে গেছে। তাই এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না, কী আমার ঘটেছে! এবং তাতে কতটা আমার দুঃখ পাওয়া উচিত। সে যাই হোক, হুবহু যা ঘটেছে সেই কাহিনীই বলিঃ

মা জননী, এই যে আমার গায়ে কামিজটা দেখছো, এই একটিমাত্র নীলরঙের জামাই আমার সম্বল, গরীব মানুষ আর একটা বানাবো তার পয়সা জোটাতে পারি না। কামিজটা ময়লায় তেল-চিটচিটে হয়ে গেছে, গায়ে যখন আর রাখতে পারি না, তখন পুরুষমানুষের নজর এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে নদীর কোনও কিনারে বিবস্ত্রা হয়ে তড়িঘড়ি জামাটা সাবান-কাচা করে তখুনি গায়ে পরে নিই।

গতকালও কামিজটা সাবান-কাচা করতে সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারে গিয়েছিলাম। একটা নির্জন ঘাটে নেমে জামাটা কেচেকুচে একটা পাথরের চাঁই-এর ওপর মেলে দিয়ে তার আড়ালে লুকিয়ে বসেছিলাম। হাওয়াতে খানিকটা শুকিয়ে গেলেই গায়ে চাপিয়ে চলে আসবো, এই রকমই মতলব ছিলো, কিন্তু খানিকটা দূরে একটা খচ্চরকে ঝিমুতে ঝিমুতে এগিয়ে আসতে দেখে আমি খপ করে কামিজটা তুলে নিয়ে গায় গলিয়ে দিলাম। ভয় হয়েছিলো, গাধাটার পিছনে নির্ঘাৎ তার সহিসও আছে! সে যদি আমার উদোম অবস্থা দেখে ফেলে—ছিঃ ছিঃ কি শরম-কি-বাত?

কিন্তু আশ্চর্য, দেখলাম গাধাটার পিঠে বোঝাই একগাদা ছাগল ভেড়ার কাঁচা ছাল। দিব্যি গজেন্দ্রগমনে মাথা দুলাতে দুলাতে সে আমার সামনে দিয়ে পার হয়ে গেলো। বেশ কিছুক্ষণ সহিসের প্রতীক্ষা করলাম। কিন্তু না, গাধাটার পিছনে কোনও মানুষজন কেউ নেই। ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত মনে হলো। কৌতূহল এড়াতে না পেরে গাধাটার পিছু ধাওয়া করলাম। কেশ কিছুটা পথ আসার পর নদীর ধারেই একটা ছোট্ট টিলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো গাধাটা। তারপর একখানা পা দিয়ে একটা জায়গায় আচড়াতে থাকলো। একটু পরে অবাক হয়ে দেখলাম জায়গাটার মাটি দু ভাগ হয়ে সরে গেলো খানিকটা। এবং সেই ফাঁক দিয়ে গাধাটা ভিতরে ঢুকে গেলো। আমিও কৌতূহল চাপতে না পেয়ে ঐ ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

একটু এগোতেই দেখি একটা গুহামুখ। গাধাটা তেমনি হেলতে হেলতে সেই গুহার ভিতরে চলে গেলো। আমি তাকে লক্ষ্য করে পিছু পিছু চলতে থাকলাম।

কি বিশাল গুহাপ্রাসাদ। কত সুন্দর সুন্দর দামী দামী আসবাবপত্র ঝকঝক-তকতক করে সাজানো গোছানো সব। চোখ জুড়িয়ে যায়।

পায়ে পায়ে আরও ভিতরে এগিয়ে গেলাম। সুন্দর খানার খুশবু ভেসে এলো নাকে। এক-পাশে তাকিয়ে দেখি থরে থরে সাজানো সব পেয়ালা পিরিচ, কাঁটা চামচে এবং নানা ব্যঞ্জনের ঢাকা দেওয়া হরেক রকমের ছোট বড় সব পাত্র। একটি পাত্রের ঢাকা খুলে দেখি মাংসের কাবাব। আমার তখন জিভে জল এসে গেছে। লোভ লামলাতে না পেরে একটুখানি নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছি মাত্র। অমনি একটা গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো ঃ হাত ওঠাও। এ খানা আমাদের মালকিনের জন্য। খবরদার ছুঁয়েছো কি মরেছো! আমি তৎক্ষণাৎ সশব্দে ঢাকনাটা নামিয়ে রাখি। তারপর আর ওখানে না দাঁড়িয়ে অন্য দিকে, অন্য একটা ছোট্ট কুঠরীতে ঢুকে পড়ি। সেখানে দেখলাম চমৎকার সব গরম গরম রুটি তাওয়ায় বসানো হয়েছে। তন্দুরীগুলো ধীরে ধীরে ফুলছে, কোনটা বা বেশ তৈরি হয়ে এসেছে। আরও কতকগুলো রুটি স্যাঁকা শেষ হয়ে গেছে। সেগুলো, মনে হলো সদ্য তণ্ডুর থেকে তুলে টেবিলে সাজানো হয়েছে। একখানা রুটির দিকে হাত বাড়াতেই আবার সেই গুরুগম্ভীর স্বর ভেসে এলো ঃ খবরদার হাত ওঠাও। এ সব খানা আমাদের মালকিনের জন্য। হাত দিয়েছ কী মরেছো।

ভীত চকিত হয়ে আমি ছুটে পালালাম সেখান থেকে। ছুটতে ছুটতে অনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে এলাম এক শ্বেত পাথরের বিশাল মহলে। আমার মনে হয়, সে ধরনের জমকালো ঘর একমাত্র তোমার বাবার প্রাসাদেই থাকা সম্ভব। সেই দরবারকক্ষের ভিতরে পর পর চল্লিশটা তখত্—প্রতিটি সোনার তৈরি। প্রাসাদের মনোহর দৃশ্যাবলী দেখে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম সেখানে।

একটু পরে দেখলাম ঘরের ভিতরে চল্লিশটা রামপাঁঠা এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যে তাগড়াই সে মাঝখানের সবচেয়ে বড় মসনদটিতে চেপে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে বাকী পাঁঠাগুলো বাদশাহী কেতায় কুর্ণিশ জানিয়ে এক এক আসনে এক একটি উঠে বসলো।

এর পর ওরা সবাই একসঙ্গে গা ঝাড়া দিতেই, আমি হতবাক হয়ে দেখলাম, ঐ চল্লিশটি পাঁঠা ফুলের মতো সুন্দর সুন্দর সব নওজোয়ান হয়ে গেলো। ওদের শরীর থেকে যুঁইফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরময়।

তারপর দেখলাম, সবচেয়ে বড় মসনদে যে ছেলেটি বসেছিলো, হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো সে। এবং তার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে অন্য ছেলেরাও একই ভাবে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে লাগলো ঃ কোথায় গেলে গো, আমাদের মালকিন, কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে। তোমার বিরহে আজ আমরা ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছি। তুমি এসো-আমাদের কাছে এসো। তুমি না এলে আমরা তো তোমার কাছে যেতে পারবো না। আমাদের একান্ত আবেদন, তুমি আমাদের কাছে চলে এসো।

এর পর ওরা সিংহাসন থেকে নেমে তিনবার গা ঝাড়া দিতেই আবার সকলে রামপাঁঠায় রূপান্তরিত হয়ে দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এই সব দেখে আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলাম। আর সেখানে দাঁড়ালাম না। এ সিঁড়ি সে সিঁড়ি ভেঙ্গে এ ঘর ও ঘর ডিঙিয়ে অবশেষে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে সোজা তোমার হামামের দিকে ছুটে আসছি। আমার মনে হয় এইটেই আমার জীবনের সব চাইতে দুঃখজনক কাহিনী। কারণ, ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও সামনে নানারকম সুস্বাদু খানাপিনা পেয়েও তা স্পর্শ করতে পারিনি। তা ছাড়া যে সব দৃশ্য দেখে এলাম তার এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না কিছু। এর চাইতে দুঃখের আর কি হতে পারে, বলো মা জননী?

বৃদ্ধার কাহিনী শুনতে শুনতে শাহজাদীর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিলো। বলা শেষ হতে না হতে ওর বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকলো, হাত পা অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। তার আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, ঐ প্রধান রামপাঁঠাই তার প্রিয়তম স্বামী। বৃদ্ধাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে বলতে লাগলো, তুমি আমার মা, তোমার কাছে আমি চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবো। তুমি যা চাও, দু'হাত ভরে দেব তোমাকে। শুধু একটিবার, আমাকে ঐ গুহার ভিতরে নিয়ে চলো, মা। আমি তোমার কেনা হয়ে থাকবো সারা জীবন।

বৃদ্ধার পিছনে পিছনে সেই নদীর ধারে টিলাটার সামনে এসে পৌঁছলো শাহজাদী। একটুক্ষণ পরে একটি খচ্চর পিঠে কাঁচা-চামড়ার ডাই নিয়ে হেলতে দুলতে এসে দাঁড়ালো সেখানে। তারপর পা দিয়ে একটা জায়গা আঁচড়াতেই একটা গর্ত হয়ে গেলো এবং সেই গর্তের ভিতরে ঢুকে গেলো সে। বৃদ্ধা শাহজাদীকে সঙ্গে করে খচ্চরের পিছনে পিছনে গর্তের নিচে নেমে গেলো। আবার সেই গুহামুখ। ওরা দু'জনে খচ্চরকে অনুসরণ করে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গেলো অনেকটা। বৃদ্ধা আঙুল দিয়ে দেখালো, ঐ দ্যাখো মা, কত সব জিভে জল আসা খানা-পিনা ঢাকা দেওয়া আছে ওখানে। কিন্তু খবরদার ওদিকে যেও না, এখুনি মেরে ফেলবে তোমাকে।

শাহজাদী বলে, তা মারুক, দেখাই যাক না কি বলে।

একটা পাত্রের ঢাকনা খুলতেই কাবাবের সুগন্ধে প্রাণ মন ভরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বিনয়-বিগলিত কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো, মালকিন, মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন, আপনার জন্যেই তো সাজিয়ে বসে আছি আমরা।

শাহজাদী কিন্তু গ্রহণ করলো না কিছু। পাশের ঘরটায় গিয়ে দেখলো—সুন্দর সুন্দর সব তন্দুরী থরে থরে সাজানো। আবার সেই কণ্ঠ ভেসে আসে, একটু কিছু আস্বাদ করে আমাদের কৃতার্থ করুন, মালকিন। আমরা কতকাল ধরে খাবার সাজিয়ে আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।

এরপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে এলো ওরা। সেই সুরম্য শ্বেতপাথরের দরবার মহল। চল্লিশটি সোনার সিংহাসন। যেমনটি বৃদ্ধা বর্ণনা করেছিলো অক্ষরে অক্ষরে একই দৃশ্য দেখতে পেলো শাহজাদী।

বৃদ্ধা বললো, এরপর মা, তুমি এখনই ঐ মহলে যাও। আমি আড়াল থেকে তোমাকে লক্ষ্য রাখবো।

এরপরে যা ঘটতে পারে তাই ঘটলো। অনেক দিন বাদে স্বামীকে ফিরে পেয়ে শাহজাদী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো।

বেশ কিছুদিন সেই পাতালপুরীতে সু বিহার করার পর ওরা দু'জনে একত্রে ফিরে এলো সুলতানের প্রাসাদে। কন্যা এবং জামাতাকে ফিরে পেয়ে আনন্দ হাসি গানে আবার মুখর হয়ে উঠলো প্রাসাদ। সুলতান ও শাহবানু প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন ওদের।

এরপর ওরা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে একটুক্ষণ থামলো। তারপর আর এক কাহিনী বলতে শুরু করলো ঃ

এক সময়ে কাইরো শহরে এক ফেরিওয়ালা বাস করতো। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে সে মুরগীর ডিম বিক্রি করে বেড়াতো।

ফেরিওয়ালার তিনটি কন্যা। তিনজনেই ফুটফুটে সুন্দরী। তার মধ্যে ছোট জাইনাহ শুধু রূপে নয়, বিদ্যাবুদ্ধিতেও চৌকস।

ফেরিওয়ালা কষ্ট করেও মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে ভালো পাত্রের যোগ্য করে

তুলেছিলো। সূক্ষ্ম সূচীশিল্প শেখার জন্য প্রতিদিন সকালে ওরা এক বৃদ্ধার বাড়িতে যেত। ওদের যাওয়ার-আসার পথের মাঝে সুলতানের প্রাসাদ। প্রতিদিন তিন বোন লক্ষ্য করে সুলতানের একমাত্র পুত্র জানলার ধারে বসে তাদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়, এই যে ফেরিওয়ালার মেয়েরা, ভালো আছ তো?

বড় এবং মেজ বোন মৃদু হেসে ঈষৎ ঘাড় নেড়ে শাহজাদাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়। কিন্তু ছোট বিন্দুমাত্র সাড়া না দিয়ে অন্যদিকে তাকাতে তাকাতে প্রাসাদ-চত্বর পার হয়ে যায়।

ছোটর অবজ্ঞা অবহেলার ভাবভঙ্গীতে শাহজাদা মনে মনে ক্ষুব্ধ ও কিছুটা রুষ্ট হয়। যতই দিন যায় ক্রমশ সে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভাবে, মেয়েটার তো জব্বর সাহস! সে কিনা সুলতানের পুত্র। তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এক সামান্য ফেরিওয়ালার মেয়ে? ঠিক আছে এমন শিক্ষা দিতে হবে তাকে, যাতে জিন্দগী ভর ইয়াদ থাকে তার। সে শাহজাদা—তার যে কতখানি ক্ষমতা থাকতে পারে ঐ মূর্খ মেয়েটার কোনও জ্ঞান নাই। একবার ওকে মজাটা দেখিয়ে দিতে হবে।

একদিন সে ফেরিওয়ালাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলো, যে তিনটি মেয়ে রোজ আমার প্রাসাদের সামনে দিয়ে যায় আসে ওরা কি তোমার মেয়ে?

—জী হুজুর।

ভয়ে ফেরিওয়ালার গলা কাঠ হয়ে যায়।

—হুম্, শাহজাদা গম্ভীর চালে হুকুম জারি করে, কাল সকালে নামাজের সময় তোমাকে হাজির হতে হবে এখানে। আমি তোমার সাজ-পোশাক খুলতে আবার পরতে, মুহূর্তে হাসতে এবং পর-মুহূর্তেই কাঁদতে, ঘোড়ার পিঠে উঠে বসতে এবং সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়তে—যখন যেমন হুকুম করবো পলকের মধ্যে সে-সব তামিল করতে হবে তোমাকে? যদি এক তিল এদিক ওদিক হয়, এক পল দেরি হয় তবে তোমার গর্দান যাবে, মনে থাকে যেন।

শাহজাদার এই রকম ক্রোধান্বিত ফরমাস শুনে ফেরিওয়ালার হৃদকম্প শুরু হয়ে যায়। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ কেতা জানিয়ে বলে, জো হুকুম মালিক।

বিষণ্ণবদনে ঘরে ফিরে আসে ফেরিওয়ালা। মেয়েরা বাবাকে দারুণ চিন্তিত দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে বাবা, তোমাকে এমন দেখছি কেন?

ফেরিওয়ালা শাহজাদার উদ্ভট হুকুমের কথা সব খুলে বললো মেয়েদের।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো ঊননব্বইতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

সে বলতে থাকেঃ

ছোট কন্যা জাইনাহ বাবার কাছ থেকে সব শোনার পর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, ও হো হো, এই সব বলেছে শাহজাদা তোমাকে, বাবা? যাক্ তোমার একটুও ঘাবড়াবার কিছু নাই, আমার কথা শোনো—আমি যা বলি সেইভাবে কাজ করে যাবে, দেখবে তোমার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। এক কাজ কর, জেলেপাড়া গিয়ে একখানা মাছধরা জাল নিয়ে এসো। আমি তোমাকে অনেক কায়দা করে জালখানা পরিয়ে দেব। শাহজাদার সামনে দাঁড়ালে সে বুঝবে তুমি একই সঙ্গে পোশাক পরে আছ আবার উলঙ্গ হয়েও আছ। আর সঙ্গে নিয়ে যাবে একটা পেঁয়াজ। শাহজাদার সামনে দাঁড়াবার আগে পেঁয়াজটার রস চোখে লাগিয়ে দেবে। তাহলেই তুমি একই সঙ্গে হাসতেও পারবে, কাঁদতেও পারবে। একটা খুদে গাধার ওপর চেপে তুমি হাজির হবে সেখানে। তোমার পা দু'খানা নিচে নামালেই মাটিতে ঠেকে যাবে। তা হলে একই সঙ্গে গাধার পিঠে চড়াও হবে আবার মাটিতে ঠেকে যাবে। এরপর খোদা ভরসা, নসীবে যা থাকে হবে।

জাইনাহর বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যায় ফেরিওয়ালা। মেয়েকে আদর করে তার যথা পরামর্শ মতো সেজেগুজে গাধার পিঠে চেপে প্রাসাদের দিকে রওনা হয় পরদিন প্রত্যুষে।

শাহজাদা ফেরিওয়ালার বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা দেখে অবাক হয়। মনের ক্ষোভ মনেই চেপে গজরাতে থাকে। ফেরিওয়ালার কোনও খুঁতই ধরতে পারে না সে।

ঘরে ফিরে এসে কন্যাকে আদর করে চুমু খেয়ে বলে, মা, তোর বুদ্ধির জোরে আমি আজ মস্ত ফাঁড়া কাটিয়ে জান নিয়ে আসতে পারলাম।

জাইনাহ ভাবে, কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই ইতি হবে না। এর পরে শাহজাদা তার ওপর প্রতিশোধ তোলার চেষ্টা করবে। যাই হোক, আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। বাবাকে সে বলে, আমার জন্য লোহার বর্মপোশাক বানিয়ে দাও, তুমি। মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে যে ধরনের বর্ম পরে ঠিক সেই রকম। আর দেরি করো না, আজই তুমি কামারকে বায়না করে এসো, যেন সে কালকের মধ্যেই বানিয়ে দিতে পারে।

পরদিনই বর্ম তৈরি হয়ে এলো! জাইনাহ রণরঙ্গিনী সাজে সাজালো নিজেকে। হাতে নিলো একখানা কাঁচি, একখানা ক্ষুর আর একখানা ইয়া বড় কাঁটাচামচ। গট গট করে রওনা হলো প্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

প্রাসাদের সদরে প্রহরীরা চমকিত হয়ে ফটক ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। জাইনাহ বীরাঙ্গনার মত সদর্পে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলো। সোজা চলে এলো সে শাহজাদার কক্ষে।

জাইনাহর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে শাহজাদার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হবার দাখিল। কি করবে সে কিছুই ঠিক করতে না পেরে জাইনাহর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে ওঠে, দোহাই ইফ্রিত সাহেবা, আমাকে জানে মেরো না আমি কোনও দোষ করিনি।

জাইনাহ গম্ভীর স্বরে হুকুম করে, ঠিক আছে সোজা হয়ে বস। আমি তোমার মাথার চুল আর গোঁফ কামিয়ে দেব। একটু নড়া-চড়া বা বেয়াদপি করবে না। তাহলে এই দেখছো কাঁটা-চামচে একেবারে গেলে দেবো তোমার চোখ দু'টো।

শাহজাদা তৎক্ষণাৎ সুবোধ ছেলের মতো বসে বসে মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, না না, এক চুল নড়বো না আমি। দোহাই তোমায় আমাকে অন্ধ করে দিও না।

জাইনাহ কাঁচি দিয়ে মাথার আধখানা এবং ক্ষুর দিয়ে ভুরু আর গোঁফের আধখানা কামিয়ে দিলো শাহজাদার। তারপর মুখে লেপে দিলো গাধার গোবর।

তারপর শাহজাদা এবং তার কম্পমান চেলা-চামুণ্ডা খোজা নফরদের সামনে থেকে আবার বীরাঙ্গনার মতো প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে ফিরে এলো সে।

পরদিন সকালে আবার যথারীতি তিন বোন সেজেগুজে সেলাই শিখতে বেরিয়ে পড়ে। এদিন আর ওরা বোরখার নাকাব তুলে রাখে না। একেবারে ঢেকে ঢুকে মাথা নিচু করে প্রাসাদের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যায়।

শাহজাদা সেদিনও বসেছিলো তার ঘরের জানলার পাশে। তিন বোন সামনে আসতেই গলায় মধু ঢেলে সে জিজ্ঞেস করে, কি গো তোমরা কি সেই ফিরিওয়ালার মেয়েরা?

এবার ছোটজন নাকাব তুলে শাহজাদার দিকে তাকিয়েই ফিক করে হেসে বলে, হ্যাঁ। কিন্তু আপনার আধখানা ভুরু আর আধখানা গোঁফ কে কামিয়ে দিয়েছে, শাহজাদা?

জাইনাহর এই বাক্যবাণে মুষড়ে পড়ে শাহজাদা। কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। মাথাটা আপনা-আপনি ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে। জাইনাহ খিল খিল করে হেসে

ওঠে, আহা অত শরম হচ্ছে কেন, শাহজাদা? তা গাধার গোবর খেতে কেমন স্বাদের? ভালোই হজম হয়েছিলো তো?

তিনজনের উচ্চকিত হাসির অট্টরোলে শাহজাদার মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। ব্যাপারটা এতক্ষণে তার কাছে কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। দাঁত কড়মড় করে সে সিংহনাদ করতে চায়। কিন্তু ততক্ষণে পাখিরা অনেক দূরে পার হয়ে গেছে।

ক্রোধে সারা অঙ্গ জ্বলতে থাকে শাহজাদার। কিন্তু নিরুপায় হয়েই নিজের ঘরে বন্দী-জীবন কাটাতে হয় তাকে। অপেক্ষা করতে হয় ততদিন, যতদিন না তার গোঁফ, ভুরু, চুল গজিয়ে বাকী অর্ধেকের সমান হয়ে ওঠে।

আবার একদিন ফেরিওয়ালাকে ডেকে পাঠালো শাহজাদা।

—শোনো ফেরিওয়ালা, আমি তোমার ছোটকন্যাকে শাদী করতে চাই। আশা করি তোমার অমত হবে না? তাকে দেখা অবধি আমি মহব্বতে মজে গেছি। আমার কথায় যদি সায় না দাও, তবে তোমার গর্দান যাবে, ফেরিওয়ালা—হুঁশিয়ার!

ফেরিওয়ালা বললো, এ তো খুবই আনন্দের কথা, তবে কি জানেন মালিক, মেয়ে বড় হয়েছে, তার তো মতামত বলে একটা কথা আছে। আপনি যদি আমাকে কিছু সময় দেন তবে তার মতামত জেনে আপনাকে জানাতে পারি, হুজুর।

শাহজাদা বলে, শুনে সুখী হলাম। একশোবার, তোমার মেয়ের মতামতই তো সব। ঠিক আছে আমি তোমাকে তিন দিনের সময় দিলাম। কিন্তু একটা কথা ইয়াদ রেখ, তোমার মেয়ে যদি রাজি না হয় তাহলে তুমিও বাঁচবে না, তোমার কন্যাও কোতল হবে।

বেচারা ফেরিওয়ালা প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে ঘরে ফিরে আসে। জাইনাহকে কাছে ডেকে শাহজাদার বাসনার কথা বলে।

—তুই যদি অমত করিস মা, বাপ বেটি দু'জনকেই সে কোতল করবে।

জাইনাহ খিল খিল করে হেসে ওঠে, তুমি কি ভীতু, বাবা। মন থেকে ওসব বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলো তো, দেখো, কিচ্ছু বিপদ হবে না আমাদের। এরকম শাদী তো তোমার মেয়ের পরম ভাগ্যেরই কথা, বাবা! আমি রাজি। তুমি তাকে কথা দিয়ে এসো গে।

ফেরিওয়ালা শাহজাদাকে জানিয়ে এলো তার কন্যার সম্মতি। শাহজাদা তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে নৃত্য করতে লাগলো।

বাবা প্রাসাদের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলে জাইনাহ বাজারের এক মিঠাইওলার দোকানে গিয়ে একটা চিনির পুতুল বানাবার বায়না দিয়ে এলো। পুতুলটা হবে একটি সুন্দরী কিশোরীর মাপের। দেখতে হওয়া চাই অবিকল জাইনাহর মতো।

ময়রা বললো, আমার নিজের হাতের কাজের প্রশংসা নিজে করবো না, মালকিন। তবে চিনির পুতুলটা যখন আপনার পাশে দাঁড় করিয়ে দেব তখন আপনার জন্মদাতা বাবাও ঠিক চিনে নিতে পারবেন না কোনটি তার আসল মেয়ে।

পরদিন শাদীর রজনী। বাসর ঘরে বড় দুই বোন জাইনাহর চিনিনির্মিত প্রতিমূর্তিটাকে সোনার পালঙ্কে মখমলের শয্যায় সযত্নে শুইয়ে দিয়ে আবক্ষ চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো। শাহজাদা বাসরঘরে এলে বড় দুই বোন বললো, আমাদের ছোট বোনটির শরীর চিনির পুতুলের মতো। সারাদিনের ধকল সইতে না পেরে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শাহজাদা নিজগুণে তার গোস্তাকি মাফ করবেন।

এই বলে তারা দুইবোন ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেলো। শাহজাদার সুপ্ত ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। কোটিবন্ধ থেকে তলোয়ারখানা খুলে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বসিয়ে

দিলো সে চিনির পুতুলের গলার ওপর। মুহূর্তে মুণ্ডুটা ছিটকে গিয়ে পড়লো মেঝেয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, এতো জাইনাহর মুণ্ড নয়!

চিনির মুণ্ডুটা মেঝেয় পড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে ততক্ষণে।

শাহজাদা আর একবার বুদ্ধু বনলো জাইনাহর কাছে। রাগে ক্ষোভে সে দিশাহারা হয়ে নিজের তলোয়ার দিয়ে নিজেকেই শেষ করে দিতে উদ্যত হলো।

কিন্তু সেই মুহূর্তে—পর্দার আড়াল থেকে পিছনে ছুটে এসে শাহজাদার হাতের তরবারি চেপে ধরে জাইনাহ, ক্ষমা কর আমাকে। মারতে হয় আমাকে মেরে ফেলো, কিন্তু দোহাই তোমার, নিজে আত্মঘাতী হয়ো না। তা হলে সে পাপ আমি রাখতে পারবো না!

আবার চমক লাগলো শাহজাদার। নতুন করে জানলো জাইনাহকে। এ যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মেয়ে। সব ক্রোধ, সব ক্ষোভ মুহূর্তে উবে গেলো কোথায়। তলোয়ার ফেলে দিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো জাইনাহকে বুকের মধ্যে।

এইবার বুঝি দু'টি হৃদয়ে নতুন করে ভালোবাসার জন্ম হলো।

এক সময়ে দামাসকাস শহরে এক পরম রূপবান নওজোয়ান সওদাগর সারা শহরের তাবৎ কূলকন্যা বিবিবেগমদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়েছিলো। দোকান খুলে বসা মাত্র নানা কারণে অকারণে সওদা করার ছল-ছুতোয় কুমারী তরুণী বিবাহিতা বিবি বাঁদীরা এসে ভীড় জমাতে থাকতো।

এমনি একদিন সকালে সে দোকান খুলে বসেছে, এমন সময় এক রমণী এসে প্রবেশ করলো। উদ্দেশ্য কিছু কেনা-কাটা করা।

যথাবিহিত সৌজন্য স্বাগত জানিয়ে সে তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে বসতে দিলো।

মেহেরবানী করে আদেশ করুন, বান্দা আপনার কি কাজে লাগতে পারে।

মেয়েটি কেমন চঞ্চল বিহ্বল হয়ে বললো, না না, তেমন বিশেষ কিছু না। এই নিন টাকার তোড়া, আজকের মতো যাহোক কিছু একটা দিন, আসল সওদা করতে কাল আসবো আমি। আশা করি আমাকে খুশি করতে পারবেন।

এই বলে সে তাড়াহুড়ো করে দু-একটা তুচ্ছ জিনিসপত্র টেনে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে হনহন করে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

পরদিন আবার ঠিক একই সময়ে দোকানে এসে দাঁড়ালো। এবার সে একা নয়। সঙ্গে একটি খুব অল্পবয়সী ডাগর ডাসা মেয়ে, পরমাসুন্দরীই বলা যায়। সওদাগর যুবকের চোখ এই ষোড়শীর দিকেই নিবদ্ধ হয়ে রইলো। আগের দিনের খদ্দের তার সঙ্গিনীর দিকে সে ফিরেই তাকালো না আর।

একটুক্ষণ পরে বয়স্কা রমণী সওদাগর যুবকের কানে কানে ফিস-ফিস করে বললো, তোমার কি একে পছন্দ? বল, কোনও সঙ্কোচ নাই। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব, এ আমার নিজের মেয়ে।

সওদাগর যুবক কৃতার্থ হয়ে বলে, সবই আপনার হাতে বিবিসাহেবা। আমি আপনার কন্যাকে দেখামাত্র আসক্ত হয়ে পড়েছি। এখন আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তবেই আমার দেহমন তৃপ্ত হতে পারে। তবে এও ঠিক আপনার কন্যার যা রূপ তাতে আমার সঙ্গে ঠিক মানায় না। আর তা ছাড়া ওর যোগ্য দেনমোহরই কি দিতে পারবো?

বিবিসাহেবা বললো, না না, সে জন্য তোমার চিন্তা করার কোনও কারণ নাই। ও আমার মেয়ে, আমি যা বলবো তাই হবে। দেনমোহর? সেজন্য কিচ্ছু আটকাবে না।

টাকা-পয়সার দিকে খাঁই নাই আমাদের। তোমার যা খুশি তাই দিয়ে ওকে ঘরে তুলে নাও, বাবা। তাও যদি তোমার সাধ্যে না কুলায়, বল, আমি শাদীর সব খরচা তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। শুধু আমি দেখতে চাই, আমার আত্মজা তোমার ঘরে গিয়ে সুখের নীড় খুঁজে পেয়েছে। আল্লার কুদরতে আমার অঢেল আছে। তবে এও ঠিক, শুধু অর্থ দিয়েই সব পাওয়া যায় না। সুখ অন্য বস্তু, শান্তি আরও দুর্লভ এবং মহব্বত শুধুমাত্র ভাগ্যবান পুণ্যাত্মারা লাভ করে। তোমাকে দেখা মাত্র আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি, বাবা। ভেবেছি, তোমার কাছে থাকলে আমার মেয়েটি সুখে শান্তিতে ভালোবাসায় দিন গুজরান করতে পারবে।

সওদাগর যুবক বললো, ঠিক আছে, আমি রাজি।

এই সময় রজনী প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো নব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

তখুনি ঠিক হয়ে গেলো কোনও রকম জাঁকজমক না করে খুব শিগ্গিরই এক শুভলগ্নে শাদীপর্ব সমাধা হয়ে যাবে।

যথানির্দিষ্ট তারিখে কাজী এসে শাদীনামা তৈরি করে দিয়ে গেলো। মা কন্যার হাত ধরে পাত্রের বাসরঘরে পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

তোমাদের জীবন সুখের হোক, বেটা।

সে দিন দামাসকাস শহরে এক নিভৃত কক্ষে দুই তরুণ-তরুণী কপোত-কপোতীর মতো আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে বাসররাত্রি অতিবাহিত করলো।

পরদিন সকালে শয্যাত্যাগ করে সওদাগর যুবক যথাসময়ে দোকানে চলে গেলো। সারাদিন কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখলো, তার সদ্য পরিণীতা বিবি পর্দার আড়ালে অন্য এক তরুণের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে প্রেমালাপ করছে।

নিমেষে সারা দুনিয়া আঁধার হয়ে এলো তার চোখের সামনে। তড়িতাহতের মতো ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

দরজার সামনে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা হলো। জামাইকে উদ্ভ্রান্ত দেখে সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, কি হয়েছে, বাবা?

—কী হয়েছে? ঘরে ঢুকে নিজের চোখেই দেখুন—

ক্রোধে ফেটে পড়তে চায় সওদাগর।

শাশুড়ী খুব শান্ত সহজ গলায় বলে, ও তুমি ঐ ছেলেটির কথা বলছো? যে ছেলেটি তোমার বিবির পাশে শুয়ে আছে? তা বাবা, কী করবে বলো, শাদী তো বিনা দেনমোহরে সমাধা হয়েছে। কিন্তু সুন্দরী বিবিকে ষোলআনা পেতে গেলে কি মুফতে হয়? তার চেয়ে বরং দু'জনে ভাগাভাগি করে নাও ওকে। কী, আমি খারাপ বললাম কিছু?

এ কথার জবাব দেবে কি সে। ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তিন তালাক উচ্চারণ করে বললো, আমি ওকে বয়ান তালাক দিলাম। অমন বিবিতে আমার দরকার নাই।

বাইরে দারুণ বাকবিতণ্ডা শুনে ততক্ষণে মেয়েটি বিছানা ছেড়ে উঠে দোরগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যেই সে তার স্বামীর মুখ থেকে বয়ান তালাক শুনলো অমনি বোরখার নাকাব দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। কারণ এখন আর সে তার স্বামী নয়, পরপুরুষ মাত্র।

পলকের মধ্যেই ঘটে গেলো এই সব ব্যাপার। কিন্তু সওদাগর যুবক হতবাক হয়ে

তাকিয়ে দেখলো, তার বিবির পাশে আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে! তার অঙ্গের সাজাপোশাক বিলকুল এক নওজোয়ান যুবকের মতো!

সওদাগর হতবুদ্ধি নির্বোধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বয়স্কা রমণী হাসতে হাসতে বললো, তোমাকে বোকা বানিয়ে তিন তালাক করিয়ে নেবার জন্য আমি দুঃখিত, বাবা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিলো না।

সওদাগর তরুণ আরও অবাক হয়ে বলে, মানে?

—মানে আর কিছু নয়, আমার এই মেয়েটির কয়েকদিন আগে একটি যোগ্য খানদানী পাত্রের সঙ্গে যথাবিহিত জাঁকজমক করেই শাদী হয়েছিলো। কিন্তু এমনই নসীব, শাদীর পরদিনই ঠিক একই ভাবে সেও ভুল বুঝে তাকে বয়ান তালাক দেয়। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। এর একমাত্র কারণ আমার এই ছোট কন্যা। ওরা দু'জনে পিঠেপিঠি বোন। কিন্তু ছোটটির শখ সব সময় ছেলে সেজে থাকা। আজকের মতো সে দিনও সে তার বোনের পাশে শুয়েছিলো ছোকরা সেজে। তার স্বামী দেখা মাত্র ক্রোধে অন্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বয়ান তালাক দিয়ে দেয়। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে কি তার কান্নাকাটি। কিন্তু হাদিসের বিধান কী করে অগ্রাহ্য করা সম্ভব। তাই তোমাকে একটি রাতের জন্য বর সাজাতে হয়েছিলো বাবা।

সওদাগরের মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে, বর নয়, বর্বর বলুন!

এই বলে সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না সেখানে। ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়লো।

এরপর শাহরাজাদ আর একটি কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

এক সময়ে বাগদাদ শহরে দু'টি প্রায় সমবয়সী তরুণ-তরুণী গভীর প্রেমে দিন কাটাচ্ছিল। সম্পর্কে তারা খুড়তুতো ভাইবোন। তাদের মা বাবারও খুব ইচ্ছে ওদের দু'টির শাদী হোক। ওরা হেসে খেলে এক সঙ্গে মানুষ হচ্ছে ছোট থেকে। ওদের দু'জনের মধ্যে খুব ভাব সাব। শাদী দিলে সুখেই থাকবে ওরা।

এইভাবে আরও বছরখানেক কেটে গেলো। ইতিমধ্যে সময়ের ফেরে ছেলেটির বাবা ব্যবসায় সর্বস্ব খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লো। মেয়ের বাবা মেয়ের শাদীর জন্য পয়সাওলা পাত্রের সন্ধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সে ভুলে গেলো তার জবানের কথা।

অবশেষে বাগদাদের এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ সওদাগরের সঙ্গে পাকাও হয়ে গেলো শাদীর কথা। কিন্তু কন্যা হাবিবা তার প্রিয় হাবিবের সঙ্গে একবার শেষ বারের মত দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। প্রিয়তমের বিরহে দু'নয়নে অবিরত অশ্রু ঝরতে থাকলো তার। নিভৃত কক্ষের বন্দীশালায় সে তার দয়িতের উদ্দেশে আকুতি জানাতে লাগলো, তুমি তো জান, হাবিব, জন্মাবধি তোমাকে বই অন্য কাউকে আমি ভাবতে শিখিনি। আমার বাবা মাও তোমার হাতেই তুলে দেবেন, কথা ছিলো। কিন্তু আজ তারা সে-সব কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে অন্য এক অজানা পাত্রের সঙ্গে আমাকে শাদী দিতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। ওরা যাই করুক, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না সোনা। জীবনে মরণে আমি তোমারই।

হাবিবার আকুল আহ্বান বুঝি শুনতে পেয়েছিলো হাবিব। শাদীর আগের দিন সে গোপনে হাবিবার সঙ্গে দেখা করলো। তার অন্তরের বাসনা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লো হাবিব। কিন্তু এই মুহূর্তে কীই বা উপায়। হাবিবাকে সে বললো, শাদী যেমন ঠিক হয়েছে হয়ে যাক। তারপর আমি তোমার স্বামীর ঘরে গিয়ে দেখা করবো। তারপর কি করে আমরা আবার মিলিত হতে পারি তার ফিকির করবো।

শাদীর রাতে বাসরঘরে ঢুকে বৃদ্ধ সওদাগর দেখলো তার সদ্য শাদী করা বিবি হাপুস নয়নে কাঁদছে।

আহা বেচারী লাজুক মেয়ে। মা বাবাকে ছেড়ে এসে মন খারাপ করছে বোধহয়। তাই কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। যাই হোক, এরকম হয়, দু'দিনেই সব সয়ে যাবে। তখন স্বামী ছেড়ে বাপের ঘরে যেতে চাইবে না আর। আদর আর ভালোবাসার মলম দিলে সব আপসে মোলায়েম হয়ে আসবে।

একি নয়নতারা কেঁদে কেঁদে তোমার সুন্দর ডাগর ঐ চোখ দু'টো যে ফুলিয়ে ফেলেছ! ছিঃ কাঁদে না মণি! দুঃখের কি আছে। এই তো তোমার ঘর, আসল জায়গা। এখানেই তো তোমাকে থাকতে হবে চিরকাল, আপন করে নিতে হবে সব। দেখবে কত ভালো লাগবে তোমার। আর আমি? আমি কি তোমার ভালোবাসার পাত্র হবো না? বাজি রেখে বলতে পারি, বিবিজান, এমন দিন খুব শিগ্গিরই আসবে, এক দণ্ড তুমি আমাকে চোখের আড়াল করতে চাইবে না।

সওদাগরের কথা শুনে আরও উচ্চৈস্বরে কেঁদে ওঠে হাবিবা! বৃদ্ধা বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে তাকে, তুমি যদি চাও তোমার মা বাবার সঙ্গে দেখা করবে, এখুনি আমি তাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, চলো।

হাবিবা মাথা নেড়ে বলে, না না সেজন্য নয়।

—তবে? তবে তোমার ভাইবোন কারও জন্য মন খারাপ করছে?

হাবিবা আবার মাথা নেড়ে বলে, না সে জন্যও নয়।

বৃদ্ধ সওদাগর আবার বলে, তা হলে কি তোমাদের বাড়ির কোনও পোষা পাখি বা কোনও জন্তু জানোয়ারের জন্য মন খারাপ করছে?

হাবিবা এবারও আগের মতো নাথা নেড়ে বলে, না ওসব কিছুর জন্যে নয়।

তবে কিসের জন্য? এই ঘর সংসার নতুন বলে তোমার মন বসতে চাইছে না? না আমি বুড়ো হাবড়া বলে তোমার মন বিরূপ হয়েছে। তা আগে কেন তোমার মা বাবার কাছে বলো নি মণি, আমি জানতে পারলে তোমাকে কি জোর করে শাদী করতাম!

হাবিবা বিচলিত হয়ে বলে, দোহাই আল্লাহ, সে জন্যে নয়। আপনার মতো সদাশয় স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

—তা হলে কি কারণে কাঁদছো, সোনা? আমাকে খুলে বলো, আমার কাছে সঙ্কোচ করার কোনও কারণ নাই, তোমার। এটুকু বিশ্বাস কর কোনও কারণেই আমি তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না।

হাবিবা কুণ্ঠিত হয়, সে কথা আপনাকে বলতে পারবো না আমি। আপনি ক্রুদ্ধ হবেন।

—খোদা কসম, তোমার কোনও কথাতে বিন্দুমাত্র রুষ্ট হবো না আমি। বরং যদি প্রাণ খুলে বলো, তার একটা সহজ সমাধান করে দিতে পারবো।

হাবিবা ভরসা পেয়ে বলতে থাকে, আমার চাচার ছেলে হাবিবের সঙ্গে ছোট থেকে হেসে খেলে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি আমি। আমাদের দু'জনেরই মা বাবারও ইচ্ছে ছিলো দু'জনের শাদী হবে। কিন্তু নসীবের ফেরে হাবিব আজ বড় গরীব হয়ে গেছে। তাই আমার মা বাবা আর তাদের ওয়াদা পূরণ করলেন না। আপনার সঙ্গে শাদী দিয়ে দিলেন আমার। এখন আপনিই বলুন, এতটা বয়স পর্যন্ত যাকে ধ্যান জ্ঞান করে এসেছি স্বামী হিসেবে পাবো বলে, তাকে যদি হারাতে হয় তা হলে কেমন লাগে? হাবিব ছাড়া আমার জীবনে দ্বিতীয় কোনও পুরুষ আমি কল্পনাও করিনি।

হাবিবার কথা শুনে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বসে রইলো বৃদ্ধ। তারপর বললো এসব কথা তো আমার জানা ছিলো না হাবিবা। যাই হোক, আমি জীবনে কখনও কোনও অধর্ম করিনি। আজ তোমাকে শাদী করে ঘরে এনেছি বলে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে এখানে কয়েদ করে রাখবো না। তাতে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না।

একটু থেমে আবার সে বললো, আজ থেকে তুমি আমার আর বিবি নও, হাবিবা। এখন থেকে তোমাকে আমি নিজের কন্যা বলে গ্রহণ করলাম। আমি অপুত্রক। আমার মৃত্যুর পর আমার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির একমাত্র তুমিই মালিক হবে। যদিও শাদী করেছি তবু তুমি অপাপবিদ্ধ; আমি তোমাকে স্পর্শ করিনি। আমার ইচ্ছা এই রাত ভোর হবার আগেই সকলের অলক্ষ্যে তুমি এ বাড়ি ছেড়ে তোমার প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে। তোমাদের মিলনেই প্রকৃত ধর্মরক্ষা হবে আমার।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। পরদিন প্রত্যুষে হাবিবা বৃদ্ধ সওদাগরের ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে।

হাবিব শোকে দুঃখে কেঁদে কেঁদে নিজেকে শেষ করতে উদ্যত হয়েছিলো। হাবিবাকে ফিরে পেয়ে আবার সে নতুন করে বাঁচার আশায় আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।

এর পর শাহরাজাদ আর একটা গল্প বলতে শুরু করে ঃ

এক সময়ে কাইরো শহরে এক সুদর্শন মেধাবী যুবক জন্মেছিলো। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তথাকার এক পুলিশ বাহিনীর সর্দারের বিবি তাকে ভালোবাসা করে রেখেছিলো। এই পুলিশ সর্দারের বীর্য এবং বিক্রম ছিলো অনন্যসাধারণ। তার পৌরুষ দেখে কাইরোর বিবি বেগমরা পাগল হয়ে উঠতো। কিন্তু সর্দারের নষ্টচরিত্রা বিবি এ হেন স্বামীসঙ্গ পেয়েও তৃপ্ত ছিলো না। উঠতি বয়সের জোয়ান ছেলে দেখলেই সে খলখল করে উঠতো। এবং যেন তেন প্রকারে তাকে শয্যাসঙ্গী করে নিত।

একদিন পুলিশ সর্দার গুজবাসি তার বিবিকে বললো, শোনও আজ আমরা কয় ইয়ার দোস্ত মিলে এক বাগানবাড়িতে বনভোজন করতে যাচ্ছি, ফিরতে কিছু রাত হতে পারে, সাবধানে থেক। যদি বিশেষ কোনও কারণে আমাকে তোমার প্রয়োজন হয় তবে চাকরটাকে বলো। সে জানে আমি কোথায় যাচ্ছি, আমাকে খবর দেবে।

গুজবাসি-বিবি এক গাল হাসি ছড়িয়ে বললো, তুমি যাচ্ছ ফূর্তি করতে, ঘরের ভাবনা মাথায় রেখ না, আমি তোমাকে কোনও কারণেই বিরক্ত করবো না, তাতে তোমার আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে তুমি যদি খানিকটা আমোদ আহ্লাদই কর সে তো আমারই করা হবে।

বিবির সোহাগে গদগদ হয়ে গুজবাসি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এবং প্রায় তক্ষুণি ভ্রষ্টা রমণীটি বাচ্চা নফরটাকে বললো, যা ছুটে যা, ওকে ডেকে নিয়ে আয় শিগ্গির। উফ্ঐ বুনো শূয়ারটার হাত থেকে একটা বেলাও অন্তত নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে।

খুদে খোজা নফরটা মালকিনের বাধ্য ছিলো। হুকুম পাওয়া মাত্র ছুটলো ছেলেটির বাড়িতে। কিন্তু সেখানে তাকে পেলো না সে। চাকরটা কিন্তু দমলো না। শহরের সম্ভাব্য জায়গাগুলো তল্লাশ করে করে ফিরতে লাগলো। অবশেষে তার দেখা পেলো সে এক নাপিতের দোকানে।

যুবক তখন মাথাটা বাড়িয়ে দিয়েছে নাপিতের ক্ষুরের নিচে। চাকরটাকে দেখেই তার সারা শরীরে এক শিহরণ খেলে যায়। সে বুঝতে পারে সংবাদ শুভ।

—আপনি আর দেরি করবেন না সাহেব, বাড়ি খালি। মালকিন আপনাকে এখুনি যেতে বলেছেন।

চাকরটা কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলো। যুবক অধীর হয়ে নাপিতকে বললো, আজ থাক শেখ, এখন আমাকে যেতে হবে।

নাপিত বলে, কিন্তু এ যে আধা খ্যাচড়া হয়ে রইলো!

যুবক বলে, তা থাক, কাল আসবো—কাল বেশ মিল করে দিও। আজ আর দেরি করতে পারবো না, এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে।

এই বলে সে গোটা একটা দিরহাম গুঁজে দিলো নাপিতের হাতে। তারপর আর এক মুহূর্ত দেরি না করে নফরটাকে সঙ্গে নিয়ে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

না কামিয়েই গোটা একটা দিরহাম পেয়ে নাপিত-এর চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। ওরে বাস্, এ কোন আমির বাদশাজাদা এসেছিলো তার দোকানে। এমন মক্কেলকে তো হাতছাড়া করা চলে না। খদ্দেরটাকে খুশি রাখতে পারলে অনেক ইনাম মিলতে পারে।

সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে নাপিতটা দোকান ফেলে যুবকের পিছু ধাওয়া করলো। উদ্দেশ্য তার বাড়িটা চিনে আসা। সময় মতো তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। খদ্দেরটা বাঁধা হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে যুবকটি গুজবাসির বাড়িতে এসে পৌঁছলো। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গুজবাসি-বিবি আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার হাত ধরে ভিতরে টেনে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হলো।

কেউ দেখে ফেলতে পারে এই ভেবে যুবকটি কিছুটা বিব্রত হয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই ঐ নাপিতটাকে রাস্তার ওপারে দণ্ডায়মান দেখে তাজ্জব হয়ে গেলো! এখানে সে এলো কী করে? কেনই বা এলো?

নাপিতটা কিন্তু হাত তুলে তাকে আদাব জানালো, খুদা হাফেজ, গরীবকে ইয়াদ রাখবেন মালিক। আমার দোকানে যাবেন আমি আপনাকে শাহজাদার মতো কামিয়ে দেব।

— নিশ্চয়ই যাবো। কালই যাবো। তোমার হতের কাজ তো সারা শহরের লোক প্রশংসা করে। নিশ্চয়ই যাবো। তোমার দোকান ছাড়া আমি আর অন্য কোথাও কামাবোই না শেখ।

নাপিত বলে, পণ্ডিত ব্যক্তি বলে গেছেন, 'যে জায়গাটা তোমার মনের মতো হয়েছে সেটা ফেলে অন্য একটার ধান্দায় বেরিও না।' আশা করি আপনি আমার দোকানটা চিনতে ভুল করবেন না।

যুবক তখন কাম-যন্ত্রণায় কাতর, কোনও রকমে নাপিতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। গলা চড়িয়ে বলে, তোমার দোকান তো আমার নখদর্পণে। আঁধার রাতেও চলে যেতে পারি। যাক, এবার তুমি এসো, কেমন?

নাপিতের মুখের সামনে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে।

দোকানে ফিরে না এসে নাপিতটা ঐখানে বসে পড়লো। এমন আমিরি খদ্দের কি হাত ছাড়া করতে পারে সে! আমার দোকানে ঢুকবে বলে হঠাৎ যদি আর-কোনও নাপিতের দোকানে ঢুকে পড়ে? তবে কি সে বান্‌চোৎ ওকে ছেড়ে দেবে আর?

গুজবাসি যথাসময়েই বাগানবাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো। তার বন্ধু তাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করে বসিয়ে বললো, এমন দিনে তোমাকে ডাকলাম—একটু আমোদ-প্রমোদ করতে পারলাম না, দোস্ত। কিছুক্ষণ আগে আমার মা ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর কবরের কাজে যেতে হবে আমাকে, তোমাকে তখলিফ দিলাম বলে অত্যন্ত দুঃখিত।

গুজবাসি বলে, এ তুমি কি বলছ ইয়ার, ফুর্তির দিন তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না। মায়ের শেষ কাজটাই এখন সবচেয়ে বড়। যাও, সব যাতে নিখুঁতভাবে সমাধা হয় তার ব্যবস্থা কর তো। তোমার বৃদ্ধ মা-এর আত্মার শান্তি হোক, ভাই! আচ্ছা এবার তাহলে আমি ঘরে চলি—

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো তিরানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

বাড়ির সামনে এসে গুজবাসি দেখলো একটা নাপিত জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে আছে তার ঘরের জানালার দিকে।

—এ্যাই কুত্তা কা বাচ্চা অমন হাঁ করে কী দেখছিস ওদিকে।

গুজবাসিকে দেখে নাপিতটা আভূমি আনত হয়ে সালাম ঠুকে।

— সালাম হুজুর,সালাম বড় সাহেব—সালাম— সালাম।

—থাক থাক অত ভণ্ডামীতে দরকার নাই। এখন সাফ সাফ বল্, এখন এখানে আমার বাড়ির জানলার দিকে কেন তাকিয়ে আছিস? বেয়াদপ বাঁদর কাঁহিকা—এক গোত্তায় তোর কাল্লা ফাটিয়ে দেব, শয়তান—

নাপিত করজোড়ে কাকুতি করে, অপরাধ নেবেন না হুজুর, নেহাতই আমার রুটির ব্যাপার। তা না হলে এখানে কেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।

—রুটির ব্যাপার মানে? এখানে তোকে খাওয়াবে কে?

—জী আমার এক শাঁসালো মক্কেলকে চোখে চোখে রাখছি। যা ছুলুপনা চলছে আমাদের কারবারে হুজুর। এর খদ্দের ও ভাগাচ্ছে, ওর খদ্দেরকে আর একজন টানাটানি করছে। তাই এমন আমিরি মক্কেলকে আমি চোখের আড়াল করতে পারি না, বড় সাহেব।

এবার গুজবাসি সাহেব ক্রোধে ফেটে পড়ে, উজবুকের মতো কী সব বলছিস? তোর শাঁসালো মক্কেলের খোঁজে আমার বাড়ির জানলায় ওৎ পেতেছিস কেন?

—জী উনি তো অন্দরেই আছেন—

—চোপরাও বেতমিজ বদমাশ। মুখ সামলে কথা বল, দাঁত খুলে নেব তোর।

দোহাই হুজুর, অমন করে ধমকাবেন না, আমার পিলে চমকে যাচ্ছে। আপনার বিশ্বাস না হয় ভিতরে ঢুকে নিজের চোখেই যাচাই করে দেখুন, আমি ঝুট বলছি কিনা। আপনি পুলিশের বড় সাহেব, আপনার সঙ্গে চালাকি করে আমি কি জানে বাঁচবো। আপনি কি আমাকে এমনই বুড়বাক ভাবলেন হুজুর। ভিতরে গেলে দেখতে পাবেন এক খুবসুরৎ নওজোয়ান একেবারে আমির বাদশাহর ছেলের মতো।

গুজবাসি নাপিতটার ঘাড় মটকে ধরেছিলো, ঘুসি চালাবে বলে। কিন্তু না মেরে ছেড়ে দিয়ে দরজায় গিয়ে জোরে জোরে ঘা মারতে লাগলো।

গুজবাসি আর নাপিতের মধ্যে যখন কথা চালাচালি চলছিলো তখন জানলার ফুটোয় চোখ রেখে সবই প্রত্যক্ষ করেছিলো বৌটা। বিপদ আসন্ন দেখে সে চটপট যুবকটিকে পায়খানার সানকীর মধ্যে বসিয়ে শিকল তুলে লুকিয়ে রাখলো।

একটু পরে স্বামীর করাঘাতে দরজা খুলে অবাক হওয়ার ভান করে বললো এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলে, তবিয়ৎ ঠিক আছে তো?

গুজবাসি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, আমার শরীর ভালোই আছে। তোমার হাল কি রকম. অন্দরে কি অন্য কোনও লোক আছে?

এই কথা শোনামাত্র ছলনাময়ী দু' কানে আঙ্গুল দিয়ে বলে, তোবা তোবা, একি বেশরমকা বাত! একি তোমার বিবির ইজ্জতের কথা হলো। তুমি কি এই সাতসকালে নেশাভাঙ্গ করে বেহেড হয়ে গেছ নাকি?

গুজবাসি কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে গটগট করে অন্দরে ঢুকে গেলো। এ ঘর ওঘর এদিক ওদিক কি যেন তলাশ করলো। কিন্তু অভিনব কিছুই; নতুন কোনও মানুষকেই

দেখতে না পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো। পরমুহূর্তেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গেলো বাইরে। শয়তান নাপিতটাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—ওরে ছুঁচো বেল্লিক, একটা খানদানের ওপর ঐ রকম নোংরা কথা বললি কি করে তুই? তোকে আমি আজ জ্যান্ত কবর দিয়ে দেব।

গুজবাসি নাপিতটার টুটি চেপে ধরে। লোকটা ঢোক গিলে বলে, কিন্তু বড় সাহেব, খোদা কসম, আমি মিথ্যে বলিনি। নিজের চোখে দেখেছি আমার, এক সুপুরুষ নওজোয়ান খদ্দের এই দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে! তারপর আমি একভাবে এই দিকে তাকিয়ে আছি। দরজাও খোলেনি, সেও বেরোয় নি। জানি না আপনার বাড়ির অন্য কোন খিড়কী দরজা আছে কি না।

বেসক্ নাই। দরজা এই একটাই। বুঝতে পারছি, তুই আমার সঙ্গে দিল্লাগী করছিস। কিন্তু আমাকে তুই চিনতে পারিস নি। এর পরিণাম অনিবার্য মৃত্যু। তা থেকে কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু তোকে জানে মারার আগে আর একবার ভালো করে খানাতল্লাসি করে দেখতে হবে। আমার বিচারে কোনও ভুল রাখবো না আমি। ঠিক আছে, আমার সঙ্গে চল্।

প্রায় ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই নাপিতকে বাড়ির ভিতর ঢোকালো গুজবাসি। বাড়িটার আদ্যপান্ত খানাতল্লাসি করে দেখতে থাকলো। এক এক করে সব ঘরদোর আঙ্গিনা বারান্দা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কিন্তু অন্য কোনও পুরুষের সন্ধান মিললো না। গুজবাসির চোয়াল কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে আসে চোখ। নাপিত বুঝতে পারে, এখনই গর্জে উঠবে গুজবাসি! কিন্তু নাপিত নিশ্চিত তার মক্কেল এই বাড়ির কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে।

—সবই দেখা হয়েছে বড়সাহেব, কিন্তু পায়খানার সানকীটা পরীক্ষা করা হলো না!

বৌটা দেখলো বিপদ ঘনায়মান। পাশের ঘর থেকে সে মারমুখী হয়ে তেড়ে এলো, তুমি কি গো, একটা বেজন্মা বজ্জাত তখন থেকে তোমার খানদানে চুনকালি মাখাবার চেষ্টা করছে আর হাবার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই তুমি হজম করে যাচ্ছ। তোমার শরীরের খুন কী টগবগ করে উঠছে না ওর যাচ্ছেতাই নোংরা কথাগুলো শুনে। লোকটাকে তুলে একটা আছাড় দিতে পারছো না? তুমি পুলিশের বড় সাহেব? ছোঃ।

গুজবাসি ঘাড় নেড়ে বলে, তুমি ঠিকই বলেছ, বিবিজান। লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার, নাঃ, আর সহ্য করা যায় না এসব।

শোন রে খানকির বাচ্চা, তোর জন্যই আজ আমার খানদানে বদনাম হলো। আমার সতীসাধ্বী বিবির চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেবার চেষ্টা করেছিস, আমি তোকে রেয়াৎ করবো না কিছুতেই।

বৌটা রসুইঘরে গিয়ে একখানা ছুরি উনুনে পুড়িয়ে কাছে নিয়ে এলো। গুজবাসি নাপিতটাকে এক ঘুষিতে মাটিতে ফেলে দিয়ে সেই ছুরি দিয়ে ওর বিচি দু'টো কুচ করে কেটে নিলো।

লোকটা ত্রাহিত্রাহি ডাক ছেড়ে ককিয়ে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে যথাকর্তব্য সমাধা হয়ে গেছে। নাপিতটার অধঃ অচৈতন্য দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে রাস্তার একপাশে ফেলে দিয়ে এলো গুজবাসি।

এরপর হয়তো কোনও পথচারী দয়াপরবশ হয়ে ওকে ওর দোকানে পৌঁছে দিয়েছিলো একসময়।

এদিকে গুজবাসি দপ্তরে চলে গেলে বৌটা তার নাগরকে সানকী থেকে বের করে বাড়ির বাইরে পার করে দিয়েছিলো সুযোগ বুঝে।

একদিন এক সুলতান তার দোতলার খোলা ছাদের উপর বসে মুক্তবায়ু সেবন

করেছিলেন। উপরে নীল আকাশ। সামনে বাগিচা—সহস্র ফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

হঠাৎ অন্য বাড়ির ছাদের অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান এক অলোক-সামান্যা সুন্দরীকে দেখতে পেয়ে সুলতান অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন রূপসী নারী ইতিপূর্বে তিনি কখনও দেখেন নি। আশে পাশের তাঁবেদারদের জিজ্ঞেস করলেন সুলতান, ও বাড়িটা কার হে?

জী হুজুর, আপনার দাসানুদাস নফর ফিরুজের। আর ঐ রমণীটি ওর বিবি।

সুলতান টলতে টলতে নিচে নেমে গেলেন। যেন এক মদমত্ত মাতাল। ফিরুজকে ডেকে বললেন, তোমাকে আজই এক্ষুণি আমার খৎ নিয়ে পাশের কয়েকটা দেশে যেতে হবে, তৈরি হয়ে নাও।

ফিরুজ তৎক্ষণাৎ কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, বান্দা প্রস্তুত, জাঁহাপনা।

চিঠিপত্র বুঝে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলো ফিরুজ। সে রাতটা সে বিবিকে নিয়েই ঘুমালো। তারপর পরদিন খুব সকালে উঠে বিদেশ রওনা হয়ে গেলো।

ফিরুজ চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই সুলতান ছদ্মবেশ ধারণ করে ফিরুজের দরজায় এসে করাঘাত করলেন।

—কে?

অন্দর থেকে ফিরুজের বিবির প্রশ্ন আসে। সুলতান জবাব দেন, দরজা খোলো। আমি তোমার স্বামীর মনিব।

দরজা খুলে দেয় ফিরুজ বিবি। সুলতান ঘরে ঢুকে একখানা কুর্শিতে বসলেন।

—আমি বেড়াতে এলাম তোমাদের বাড়িতে।

সুলতানের কথায় ফিরুজ বিবি প্রসন্ন হতে পারে না। বলে, আমার স্বামীর অবর্তমানে আপনার আগমনে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি। আমার আশঙ্কা এর দ্বারা কোনও শুভ হতে পারে না।

সুলতান আকুল হয়ে বলে, তুমি বুঝতে পারছ না কেন সুন্দরী, আমি তোমার স্বামীর মনিব, তোমাদের অন্নদাতা! মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে আন্দাজ করতে পারছো না বোধহয়!

মেয়েটি কিন্তু এবার কঠিন কণ্ঠে জবাব দিলো, না হুজুর, আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনতে পেরেছি। সেদিকে আমার একবিন্দু ভুল হয়নি। কিন্তু কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কেন আপনি এসেছেন আমার ঘরে? কী আপনার অভিপ্রায়? জাঁহাপনা, আপনি ঝরনার এঁটো পানি গণ্ডুষ ভরে পান করতে অভিলাষী?

সুলতান হতবাক হয়ে গেলেন ফিরুজবিবির কথায়। আর একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। যেমন এসেছিলেন তেমনই ক্ষিপ্রবেগে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। পায়ের জুতোজোড়াও পরে নিতে ভুল হয়ে গেলো তাঁর।

কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ ফিরুজের খেয়াল হলো রাত্রে শোবার সময় সুলতানের চিঠিপত্রগুলো সব বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলো, তাড়াহুড়ো করে বেরুবার সময় সেগুলো সঙ্গে নিতে সে ভুলে গেছে।

সুতরাং আবার তাকে ফিরতে হলো।

বিদেশযাত্রার ইনাম স্বরূপ একশো স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন সুলতান। ফেরার পথে বাজার থেকে ঐ মুদ্রায় একটি সুন্দর জড়োয়া হার কিনে নিলো সে বিবির জন্য। গহনাটা দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। বিবির গলায় পরিয়ে দিলে নিশ্চয়ই সে আহ্লাদে ঢলে পড়বে তার বুকে।

এই রকম নানা সুখচিত্র আঁকতে আঁকতে সে একসময় বাড়িতে ফিরে এলো। বিবির গলায় হারটা পরিয়ে দিয়ে বললো, ওহো, বেহেস্তের পরীর মতো লাগছে তোমাকে

বিবিজান। কিন্তু এমন দামী গহনা আর তোমাকে এ বাড়িতে একা রেখে বিদেশ যেতে আমার সাহস হচ্ছে না গো। তুমি এক কাজ কর, আমি যদ্দিন না ফিরি তোমার বাবার কাছে গিয়ে থাক। সরকারী কাজ, ফিরতে কত দেরি হবে কে জানে। অতদিন তুমি এ বাড়িতে একা থাক, আমি চাই না। চারদিকে লোভী কুকুরের দল ঘুরঘুর করছে।

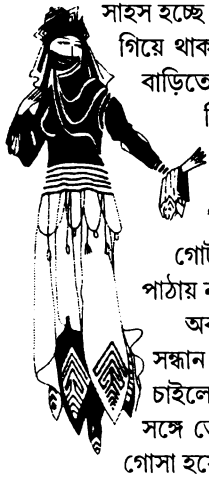

ফিরুজ বিবি বলে তা মন্দ বলনি। বাবাকে অনেক কাল দেখিনি। এই সুযোগে তার কাছে ক'দিন বেড়িয়ে আসা যাবে।

যাবার পথে ফিরুজ বিবিকে তার বাবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিদেশ রওনা হয়ে গেলো।

গোটা একটা মাস কেটে যায়। কিন্তু ফিরুজ ফিরে আসে না এবং কোনও খবর পাঠায় না।

অবশেষে ফিরুজের শ্যালক সন্ধান করতে করতে এক শহরে ভগ্নিপতির সন্ধান পেলো। কিন্তু ফিরুজ তখনও ঘরে ফিরতে নারাজ দেখে সে জানতে চাইলো, আসল ব্যাপারটা কি বলতো, ভাইসাব। মনে হচ্ছে আমার বহিনের সঙ্গে তোমার যেন বনিবনাও-এর অভাব ঘটেছে? কেন, কী কারণে তোমার গোসা হয়েছে, আমাকে খুলে বলবে?

তবু তাকে নিরুত্তর দেখে আবার শ্যালক বললো, ঠিক আছে আমাকে বলতে না চাও বলো না। কিন্তু দেশে ফিরে চলো, সুলতানের দরবারে পেশ কর তোমার আর্জি। তিনি ন্যায্য বিচার করে দিতে পারবেন।

ফিরুজ বলে, তোমাদের যদি অভিপ্রায় জাগে তোমরা এ নিয়ে সওয়াল করতে পার। কিন্তু আমি কোনও জবাব দিতে পারবো না।

এবার শ্যালকটি রাগে ফেটে পড়ে। ঠিক আছে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে যদি তোমার অহঙ্কারে বাধে, আমি কোনও প্রশ্ন করবো না তোমাকে। কিন্তু কী কারণে আমার নিরীহ নিরপরাধ বোনটিকে পরিত্যাগ করবে, সুলতানের দরবারে তার জবাবদিহি তোমাকে করতেই হবে, ফিরুজ।

সুলতান সভা পরিষদ পরিবৃত হয়ে দরবারে বসেছিলেন। এমন সময় শালা ভগ্নীপতি হাজির হলো সেখানে। আভূমি অবনত হয়ে কুর্নিশ জানালো দু'জনে।

শ্যালকটি যখন জানালো, তার বোনের প্রতি অকারণে বিরূপ হয়েছে ফিরুজ। তার জন্য সে সওয়াল জবাব প্রার্থনা করছে, তখন সুলতান বললেন, দরবারে কাজী হাজির আছে, তোমাদের অর্জি তার কাছে পেশ কর।

তখন শ্যালকটি যুক্তকরে কাজীকে উদ্দেশ্য করে নিবেদন করলো। আপনি আমাদের পুণ্যাত্মা জাঁহাপনার ন্যায়াধিকার। অধীনের বিনীত নিবেদন এই ঃ

আমাদের এক সুন্দর ফুলবাগিচা ছিলো। চারদিক ঘেরা, সুদৃঢ় সুরক্ষা ছিলো। সযত্নে লালন করেছি তাকে। বহু বিচিত্রবর্ণের ফুলের সুবাসে সদাই ভরপুর হয়ে থাকতো। কিছুকাল আগে এই যুবকের হাতে সে বাগিচা রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করা হয়েছিলো। কিন্তু অতি অল্প কালের মধ্যেই ঐ বাগিচার সব ফুল আহরণ করে নিয়েছে এ। সব ফল ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। এখন তা বলতে গেলে, নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পড়ে আছে। দেখে মনে হয় কোনও এক কালবৈশাখীর তাণ্ডবে সব যেন বিধ্বস্ত তছনছ হয়ে গেছে। এখন এই যুবক তার শর্ত ভেঙ্গে ফেলে ঐ রিক্ত বাগিচা ফেরত দিতে উদ্যত হয়েছে। আমাদের দাবি ফেরত দাও আপত্তি নাই। কিন্তু যেমন কচিকাঁচা সুন্দর সবুজটি দিয়েদিলাম ঠিক তেমনটি চাই।

কাজী জিজ্ঞেস করে, এবার তোমার কী বলার আছে যুবক?

ফিরুজ জবাব দেয়, আমি রাজি হুজুর। ফুলবাগিচাটি যে অবস্থায় পেয়েছিলাম, তারও চেয়ে ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে দেব আমি।

কাজী প্রশ্ন করলো, তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কি তুমি স্বীকার কর?

—বিলকুল না, হুজুর। আমি ফিরে তাকে প্রশ্ন করতে চাই, কেনই বা সে ঐ বাগিচা ওয়াপশ নিতে চায়। আমি ঐ বাগিচায় প্রবেশ করতে এখন ভীত শঙ্কিত। কারণ একদা এক অসতর্ক মুহূর্তে এক প্রবল বিক্রম সিংহ সেখানে প্রবেশ করেছিলো। আমার আশঙ্কা, আবার সে কখনও বা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি সামান্য হীনবল মানুষ, সিংহের থাবার সঙ্গে লড়বো কি করে? সেই কারণে নিজের অধিকার আঁকড়ে না থেকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ওটা ফিরিয়ে দিতে চাই।

এই সময় রাত্রি ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

আটশো চুরানব্বইতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয় ঃ

এতক্ষণ সুলতান সবই শুনে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ফিরুজ আমি তোমাকে ইসলামের নামে শপথ করে বলেছি, তোমার বাগিচা নির্মল পবিত্র। আজ পর্যন্ত কেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। অমন সুরক্ষিত সুরভিত ফুলবাগিটা আমার সারা সলতানিয়তে আর দু'টি নাই। মনে কোনও সন্দেহ অবিশ্বাস পুষে রেখ না। ও বাগিচার ফুল ফল লতাপাতায় একমাত্র তোমারই অধিকার। অন্য কেউ শত চেষ্টা করেও তার একটি পাপড়ি ছিঁড়তে পারবে না। আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি, নিঃশঙ্ক নির্ভয়ে তুমি তোমার বাগানের মালী হয়ে থাকতে পার।

সুলতানের ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় না ফিরুজের। খুশি মনে সে বিবির কাছে ফিরে যায়।

কিন্তু না কাজী, না উজির আমির কেউই আসল ঘটনা আঁচ করতে পেরেছিলো। শুধু জেনেছিলো সুলতান, ফিরুজ আর শ্যালক এই তিন ব্যক্তি মাত্র।

এ কাহিনীর এখানেই ইতি। কিন্তু শাহরাজাদ অন্য এক নতুন গল্প ফেঁদে বসলো!

আল্লাহর কি অপার লীলা, তিনি যেমনটি ইচ্ছা করেছেন তেমনটি বানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষকে। কিন্তু একটা কথা ভাবলে অবাক হতে হয়, সিরিয়ার প্রতিটি নরনারীকেই তিনি নীচ প্রকৃতির হিংসুটে লোভী পরশ্রীকাতর এবং ভ্রষ্ট চরিত্রের করে সৃষ্টি করেছেন। সারা সিরিয়া ঢুঁড়লে একটি মানুষকেও পাওয়া ভার যে দোষের চেয়ে গুণে বেশি মহীয়ান।

কাইরোর অধিবাসীরা অত্যন্ত ভদ্র বিনয়ী এবং ধর্মপরায়ণ। আর ইরাকের তো তুলনাই নাই। তাদের মতো আদর্শ চরিত্রের মানুষ আর কোন্ দেশে আছে। যে সব সৎগুণ থাকলে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলতে পারি তার সবই তাদের আছে। তা ছাড়া শিক্ষা দীক্ষা মেধায় তাদের মতো পারঙ্গম আর কোন্ দেশের মানুষ?

কিন্তু সিরিয়াবাসীরা হীনমন্য, নীচ অর্থগুধ্নু। তারা অতিথির সম্মান জানে না। প্রতারণা ছল চাতুরী জালিয়াতি জোচ্চরীতে তাদের সমকক্ষ আর কেউ নাই। শয়তানী বদমাইশিতে তাদের জুড়ি নাই তামাম দুনিয়ায়।

একদিন কাইরো শহরে এসে হাজির হলো এই ধরনের এক সিরিয়াবাসী। শহরের মধ্যভাগে বড় বাজারের পাশে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে তার বাণিজ্যের সামানপত্র গুদামজাত করলো। দামী দামী রেশমী সাজ-পোশাকের পণ্যসম্ভার সঙ্গে এনেছে সে। উদ্দেশ্য চড়া দামে কাইরোর বাজারে বিক্রি করে মোটা মুনাফা লুটে নিয়ে যাবে।

পরদিন সকালে উঠেই সে বড় বড় সওদাগরী দোকানে হানা দেয়। নানাভাবে তার পণ্যের গুণ-কীর্তন করে সওদাগরদের কাছে।

দিন কয়েক পরে।

একদিন সে একটা পথ ধরে চলছিলো। কিন্তু চোখ ছিলো তার রাস্তার দু'পাশের বাড়ির দরজা জানালার দিকে। চলতে চলতে একসময় সে দেখলো তিনটি প্রিয়দর্শনা তরুণী কলহাস্য মুখরিত হয়ে পথ চলছে। ওদের উজ্জ্বল যৌবনের মাদকতায় বিদেশীর রক্তে তুফান ওঠে। নিজেকে সে আর সামলে রাখতে পারে না। মেয়েগুলোর সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে, ওগো সুন্দরীরা, আমি বাজারের পাশের বড় সরাইখানায় উঠেছি। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তবে এসো না, আজ সন্ধ্যায়। একটু খানাপিনা মৌজ করা যাবে? অথবা যদি বলো তোমাদের বাড়িতে যেতে হবে—তাও যেতে পারি আমি।

মেয়েগুলো হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে, না না আমাদের বাড়িতে নয়, আমরা তোমার সরাইখানাতেই যাবো সন্ধ্যায়। আমাদের বাড়িতে গেলে, তুমি কি ভেবেছ, আমাদের স্বামীরা তোমাকে মুসাফির মেহেমান ভেবে যত্ন-আত্তি করে খেতে-শুতে দেবে? ঠিক আছে আমরাই যাবো তোমার ঘরে।

মেয়েগুলো চলে গেলে লোকটা বাজার থেকে নানারকম দামী দামী খানা এবং দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন কিছু মদ্য কিনে সরাইখানায় ফিরে গেলো।

সন্ধ্যা নামতে না নামতে মেয়ে তিনটি এসে হাজির হলো সরাইখানায়। সারা অঙ্গে রংদার সাজ-পোশাক দামী রেশমী বোরখায় আপাদমস্তক মোড়া!

কিন্তু বিদেশীর ঘরে ঢুকেই ওরা মুহূর্তে বে আব্রু উলঙ্গ হয়ে সাজ-পোশাকগুলোকে একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে লোকটার সামনে এসে পা ছড়িয়ে বসে পড়লো!

বিদেশী তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেলো। দামী মদ আর মাংসের খানাপিনা সাজিয়ে দিলো সে ওদের সামনে। মেয়েগুলো গোগ্রাসে উদরস্থ করতে থাকলো সব।

ক্রমশঃ মদের নেশায় মদির হয়ে উঠলো সকলে। তারপর শুরু হলো ঢলাঢলি গলাগলি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সরাবের নেশায় উত্তাল হয়ে উঠলো ওরা। সমানে চললো নাচন-কুদন, চেঁচামেচি চিৎকার শীৎকার। তারপর আরম্ভ হলো জড়াজড়ি কামড়া-কামড়ি।

লোকটিও সমানে তাল দিতে থাকলো ওদের সঙ্গে। একসময় সে জিজ্ঞেস করলো এর আগে কখনও তোমরা আমার মতো এতো আমুদে লোকের সঙ্গ পেয়েছ?

তিনজনেই একসঙ্গে সোর তোলে, না না, কক্ষণো না। তুমি অপরূপ, অদ্ভুত সুন্দর। এমনটি আর কখনও দেখিনি।

তিনটি উলঙ্গ তরুণীকে এপাশে ওপাশে নিয়ে সারা মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে থাকলো লোকটা। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সে মদের পেয়ালা পূর্ণ করে এনে ধরে মেয়েগুলোর মুখে। আর ওরা এক এক চুমুকে এক এক পেয়ালা নিঃশেষ করে দেয়।

রাত গভীর হতে থাকে। লোকটা বদ্ধ মাতাল হয়ে গেছে তখন। মেয়ে তিনটি ওর মাথার পাগড়ী খুলে নিয়ে গাধার টুপি বানিয়ে মাথায় পরিয়ে দেয়। তারপর ওর ঘরের সোনা-দানা এবং যা কিছু মূল্যবান ধরনত্ন পেলো সব হাতিয়ে নিয়ে এক সময় কেটে পড়লো ওরা।

পরদিন সকালে বেশ বেলা হলে বিদেশীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে পায় সারা ঘর লণ্ডভণ্ড-তছনছ হয়ে আছে। কিন্তু মেয়েগুলো নেই।

একটু পরেই সে বুঝতে পারলো মেয়েগুলো তাকে সর্বস্বান্ত করে চলে গেছে। তার সমস্ত টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, হীরে-জহরত সব লোপাট করে নিয়ে গেছে তারা। কপাল চাপড়ে সে ডুকরে উঠলো, ইয়া আল্লাহ, একি হলো আমার? আমি যে একেবারে পথের ভিখিরি হয়ে গেছি।

লোকটা আর এক মুহূর্ত মিশরে অপেক্ষা না করে সেইদিনই নিজের দেশ সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলো।

শাহরাজাদ হাসতে হাসতে বললো, অপরিণামদর্শী সিরিয়া সওদাগরের সমুচিত শিক্ষাই হয়েছিলো সেদিন। বিদেশে এসে যে লোক বেলেল্লাপনায় মত্ত হয়ে ওঠে তার এইভাবেই শিক্ষা হওয়া দরকার। যাক, ছোট ছোট গল্প অনেকগুলো শোনালাম, এবার আপনাকে একটি বড় কিসসা শোনাবো জাঁহাপনা, যাদু কিতাবের কাহিনী বলছি শুনুন ঃ

ছোট বোন দুনিয়াজাদ নিচে থেকে উঠে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, যাদু কিতাব? সে কী, দিদি।

শাহরাজাদ বলে, সেই কাহিনীই তো বলছি, শোনো ঃ

একদিন গভীর রাতে খলিফা হারুন অল রসিদের হঠাৎ নিদ্রা টুটে গেলো। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। তারপর ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। কিন্তু বুকের বোঝা হালকা হলো না। চোখে আর ঘুম নেমে এলো না। দেহরক্ষী মাসরুরকে তলব করলেন।

মাসরুর হাজির হলে তাকে বললেন, শোন্ বান্দা, আজ আর ঘুম আসবে না মনে হচ্ছে। বুকে যেন পাষাণ চেপে বসেছে। যাহোক একটা উপায় বের কর।

মাসরুর বললো, তাহলে আর প্রাসাদে থেকে কাজ নাই। চলুন পথে বেরিয়ে পড়ি। মুক্ত বাতাসে হয়তো হাল্কা হতে পারবেন কিছুটা।

কিন্তু হারুন অল রসিদ মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন, না, আজ রাতে আর বাইরে বেরুতে ইচ্ছে করছে না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন আটশো পঁচানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মাসরুর বলে, জাঁহাপনা, আপনার হারেমে তিনশো ষাটটি বাঁদী আছে। আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তাদের কারো ঘরে গেলে হয় না?

কিন্তু হারুন অল রসিদ তাতেও সায় দিলেন না, না না, তুই এক কাজ কর। ছুটে যা, জাফরকে নিয়ে আয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জাফর এসে হাজির হলো। খলিফা বললেন, জাফর, বড়ই অস্বস্তি বোধ করছি, ঘুম আসছে না। একটা কিছু ব্যবস্থা কর, যাতে আমার কষ্টের লাঘব হয়।

জাফর বলে, জাঁহাপনা, যখন নারীসঙ্গ বা প্রাকৃতিক শোভা মনকে প্রফুল্ল করতে পারে না তখন একটি মাত্র পথই খোলা থাকে—কিতাব পাঠ।

সুলতান ঘাড় দুলিয়ে বলেন, তুমি যথার্থই বলেছ, জাফর। কিন্তু কোন্ কিতাব পড়বো? কোথায় আছে সে বই যা পড়ে মনের ক্লেদ দূর হবে? নিয়ে এসো সে কিতাব।

মাসরুর আলো ধরলো, আর জাফর বইয়ের আলমারীতে বই খুঁজতে লাগলো। অনেকগুলো তাক খুঁজেপেতে কতকগুলো বই বের করে এনে খলিফার সামনে

রাখলো জাফর। সুলতান এক একখানা বই হাতে নিয়ে দু'চার পাতা ওলটাতে থাকেন, দু'চার ছত্র পড়েন। পড়তে পড়তে কখনও হো হো করে হেসে ওঠেন, কখনও বা পড়তে পড়তে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখে ভরে আসে অশ্রু। বই-এর পাতা ঝাপসা হয়ে যায়। আর পড়া হয় না। পড়া যায় না! কিতাব বন্ধ করে আবার শয্যায় ফিরে আসেন।

জাফর বুকে সাহস এনে জিজ্ঞেস করে, জাঁহাপনা, এইমাত্র আপনি অমন করে হাসলেন আবার এখনই আপনার চোখে দেখছি পানি—কী ব্যাপার?

জাফরের এ কথায় খলিফা রুষ্ট হলেন।

—তুমি তো দেখছি ভারি বেয়াদব হে! আমি হাসি বা কাঁদি তাতে তোমার কী কুত্তার বাচ্চা?

একটুক্ষণ থেমে আবার তিনি বললেন, শোনো এখন তোমার একমাত্র কাজ হচ্ছে এমন একজন লোককে এখানে হাজির করা যে বুঝিয়ে বলতে পারবে কেন আমি একই সময়ে হেসেছি এবং কেঁদেছি। কী আছে ঐ বই-এ যা একই সঙ্গে কাঁদাতে এবং হাসাতে পারে মানুষকে? যাও, নিয়ে এসো সেই সূত্রধরকে—যে বুঝিয়ে দিতে পারবে আমাকে সে কথা। কিন্তু শোনও জাফর, তেমন গুণী ব্যক্তিকে যদি হাজির না করতে পার তবে তোমার গর্দান যাবে নির্ঘাৎ—এ আমি আগাম বলে রাখলাম।

জাফর আনত হয়ে বলে, বান্দার গোস্তাকি মাফ করবেন, জাঁহাপনা।

খলিফা বললেন, মাফ করার কোনও প্রশ্ন নাই। আমার সামনে সেই লোককে হাজির কর, নতুবা তোমার গর্দান যাবেই।

জাফর বিনয়ের অবতার হয়ে বলে, সর্বশক্তিমান খোদাতালা ইচ্ছে করলে এক লহমায় এই তামাম দুনিয়া পয়দা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, সারা বিশ্ব সৃষ্টি করতে পুরো দু'টি দিন সময় অতিবাহিত করেছেন। আর আমি এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ নর, এতো বড় বিশ্বে কোথায় কোন প্রান্তে তেমন গুণীজন আছে খুঁজে বের করতে অন্তত তিনটি দিন সময় দিন আমাকে।

হারুন অল রসিদ বললেন, মঞ্জুর। ঠিক আছে তিন দিনই সময় দিলাম তোমাকে।

জাফর বললো, তাহলে আমি আর বিলম্ব করবো না হুজুর, আজ্ঞা করুন এখনই তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।

হারুন অল রসিদ বললেন, অবশ্যই যেতে পার।

জাফর বিষণ্ণ বদনে ঘরে ফিরে এসে তার বৃদ্ধ বাবা ইয়াহিয়া এবং ভাই অল-ফাদল্‌কে তার সঙ্কটের কথা জানালো।

—যারা শুধু হাতে তীক্ষ্ণ তরবারীর সঙ্গে লড়তে যায় তাদের হাতই কাটা যায়। আর যারা ক্ষীণবল হয়ে সিংহের সঙ্গে যুঝতে দুঃসাহসী হয় তারা নিজেদের তাল হারায়। তোমরা জান খলিফার সিংহবিক্রম। তাকে সামাল দেওয়া আমার অসাধ্য। সুতরাং আমার বুদ্ধিতে বলে একমাত্র পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

কিন্তু জাফরকে বাবা এবং ভাই দু'জনেই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে বারণ করলো।

—তোমার অত ভয় পাওয়ার কিছু নাই। দু'দিন বাদে খলিফা নিজগুণেই তোমাকে মার্জনা করে দেবেন।

জাফর বললো, না না, তোমরা বুঝতে পারছ না, তিনি কসম খেয়েছেন। তাঁর জবান দু'রকম হয় না। ভেবে দেখ, তাঁর যা বায়নাক্কা তা পূরণ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং মৃত্যু অনিবার্য।

বাবা বললো, তুমি ঠিক বলেছ, জাফর। আর দেরি না করে সোজা দামাসকাসে চলে যাও।

—কিন্তু বাবা, আমার বিবি বাচ্চাদের কী হবে?

—সেজন্যে তুমি চিন্তা করো না, বাবা। তাদের নসীবে যা লেখা আছে তা কেউ খণ্ডন করতে পারবে না। ওসব ভেবে লাভ নাই। তুমি আর কালবিলম্ব না করে এখুনি বেরিয়ে পড়।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

আটশো ছিয়ানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

বাবার উপদেশ শিরোধার্য করে জাফর দামাসকাস রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। সঙ্গে নিলো হাজারখানেক স্বর্ণমুদ্রা। কোমরে বেঁধে নিলো তলোয়ার। সঙ্গে কোনও চাকর নফর না নিয়ে একাই একটা খচ্চরে চেপে রওনা হয়ে গেলো সে।

একটানা দশ দিন ধরে নানা শহর, মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে অবশেষে একদিন দামাসকাসের কাছে মার্জনামক এক শস্যশ্যামল গ্রামে এসে পৌঁছলো জাফর।

মার্জপল্লীর অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো সে। সুন্দরী সব দেহাতি মেয়েরা পানি ভরতে নদীর ঘাটে যাচ্ছে। গাছে গাছে কতরকম নাম না জানা পাখির নাচানাচি। যে দিকে তাকায় শুধু সবুজের মেলা; নানা রঙের ফুলের কি বিচিত্র সমারোহ।

আরও কিছুটা এগোতে একটি ছোট্ট প্রাচীন শহর। এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জাফর আচ্ছা ভাইসাব, এ শহরটার কী নাম?

—এর নাম পুরানা জিল্লিক। এইটেই আদি দামাসকাস। আরও আদি নাম শাম—সারা দুনিয়ার সেরা সুন্দর দেশ।

যে দিকে তাকায় চোখ জুড়িয়ে যায় জাফরের। সত্যিই সুন্দরী শাম; তুলনা হয় না এ রূপের। মনের সব বোঝা নিমেষে হালকা হয়ে যায় ওর। খচ্চর থেকে নেমে শহরের পথ ধরে হাঁটতে থাকে সে। দু'পাশে সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি, মসজিদ।

চলতে চলতে একসময় সে দেখতে পেলো, কুয়ো থেকে জল তুলে রাস্তা ভেজাচ্ছে কিছু লোক। কিছুটা দূরে একটা বিরাট বাগান। আর সেই বাগানের ঠিক মাঝখানে একখানি মনোহর তাঁবু পাতা। আরও কাছে যেতে নজরে পড়লো তাঁবুর ভিতরটা দামী খুরাসনের গালিচায় মোড়া। নানারকম বাহারী আসবাব পত্রে ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো গোছানো।

তাঁবুটার ভিতরে একটি প্রিয়দর্শন যুবক সঙ্গী-সাথী পরিবৃত হয়ে মৌজ করে মৌতাত করতে বসেছে। যুবকের প্রায় গা ঘেঁষে বসেছে একটি ডানাকাটা তরুণী! তার হাতে এক বাদ্যযন্ত্র, সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছে। সে গানের মূর্চ্ছনায় আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে।

জাফর তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে সেই সুমধুর সঙ্গীত। পায়ে পায়ে আরও দু'চার কদম এগিয়ে যায় তাঁবুর দিকে।

হঠাৎ একবার যুবকের নজরে পড়ে যায় জাফর। সে তার এক সঙ্গীকে বলে, দেখ তো বাইরে মনে হচ্ছে এক বিদেশী মুসাফির এসে দাঁড়িয়েছে। যাও, ওকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো এখানে।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ছুটে বাইরে এসে জাফরকে বললে, গোস্তাকি মাফ করবেন মালিক, আমাদের সাহেব আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। মেহেরবানী করে যদি একবার তাঁবুর ভিতরে চলেন—

তাঁবুর ভিতরে যেতেই যুবক উঠে দাঁড়িয়ে জাফরকে স্বাগত জানিয়ে বললো, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন, মালিক। আমার কি পরম সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন আমাদের তাঁবুতে।

নানারকম খাদ্য ও পানীয়ে পরিতৃপ্ত করলো সে জাফরকে। বিনয় করে বললো; আপনি হঠাৎ এসে পড়েছেন গরীবের আস্তানায়। তাই যোগ্য সমাদর করতে পারলাম না

আপনার। আগে যদি জানতাম আপনি আসবেন তবে নিজের কলিজা অথবা আমাদের সন্তানের মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করতাম আপনাকে।

খানাপিনা শেষ হলে নিজে হাতে জল ঢেলে দিলো সে জাফরের হাতে। তারপর মদের পেয়ালা পূর্ণ করে এগিয়ে দিলো সামনে।

আবার শুরু হলো গান বাজনা। একটানা অনেকক্ষণ চললো।

আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো জাফর। মনের বোঝা অনেকটা লাঘব হয়ে এসেছিলো। কিন্তু মাঝে মাঝে খলিফার সেই কথা স্মরণ করে কেমন যেন মুষড়ে পড়তে লাগলো সে।

যুবকের দৃষ্টি এড়ালো না কিছুই। সে নানাভাবে জাফরকে উৎফুল্ল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকলো।

—মালিক, আমাদের অক্ষমতা, দীনতা আমি স্বীকার করছি। এমন কোন আয়োজন এখানে নাই যা দিয়ে আপনাকে তৃপ্ত করতে পারি। তবু আমার একান্ত অনুরোধ, সব দোষত্রুটি ক্ষমা করো আপনি একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠুন।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন আটশো সাতানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে করে ঃ

সব গান শেষ হলে যুবকটি জাফরকে সঙ্গে নিয়ে দামাসকাসের সুলতানের প্রাসাদে এলো। জাফর দেখলো বেহেস্তের মতো অনুপম এক উদ্যান। তাঁর মাঝখানে এক মনোরম প্রাসাদ।

যুবক বললো, এই প্রাসাদ আপনার নিজের প্রাসাদ জ্ঞান করবেন, মালিক। আপনার এ শহরে আগমনের কি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে জনাব? আপনার নামটা কি জানতে পারি।

জাফর বলে, আমি খলিফা হারুণ অল রসিদের এক সেনাপতি। থাকি বসরাহয়। সম্প্রতি খলিফার সঙ্গে আমার কিছু মতের অমিল হওয়ায় তার কাছে ইস্তফা দিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি। অন্য কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আমার নাই। আমার নাম আর আপনার নাম একই।

যুবক বললো, তা হলে আপনার নামও হাসান অল দিন! বাঃ চমৎকার হলো। এরপর থেকে আপনাকে মিতা বলেই ডাকবো! নিন এখন বিশ্রাম করুন, কোনও অসুবিধে বোধ করলে তুড়ি বাজাবেন, বান্দা হাজির থাকবে আপনার পাশেই।

পরদিন সকালে জাফর শয্যাত্যাগ করে ওঠেনি দেখে যুবক এসে দাঁড়ালো ওর পালঙ্কের পাশেই।

কাল রাতে কি আপনার ঘুম হয়নি মালিক?

জাফর বললো, না, কেন জানি না অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে বুকে, কিছুতেই ঘুম আসেনি।

যুবক উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, সে কি! আমি এখুনি হাকিমকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

নামকরা হাকিম এলো। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলো সে। তারপর বললো, না, দেহে কোনও ব্যাধি নাই। যা কিছু সবই দুশ্চিন্তার জন্য। মন থেকে চিন্তা ভাবনা সরিয়ে ফেলে হাসিখুশির মধ্যে থাকতে হবে। সুন্দরী রমনী সঙ্গ, মদ্যপান এবং আনন্দ বিহারই এর একমাত্র দাওয়াই। অন্য কোনও দাওয়াই-এ কোনও কাজ হবে না।

হাকিমের ব্যবস্থাপত্র শুনে যুবক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। যাক্ বাবা বাঁচা গেলো, আমি তো ভয়ে মরি, না জানি কি কঠিন অসুখে পড়লেন আপনি!

জাফর ভাবে, না, আর লুকিয়ে রাখা উচিত নয়, এমন পরম সুহৃদের কাছে অন্তরের সব গোপন কথা খুলে বলা দরকার।

—শোনও মিতা, আমি তোমাকে আজ আমার মনের কথা খুলে বলছি। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার মতো বন্ধু পাওয়া পরম ভাগ্যের। তাই কিছুই লুকাবো না তোমার কাছে।

জাফর নিজের পরিচয় জানালো হাসানকে। কিন্তু অন্য কাউকে জানাতে বারণ করে দিলো।

হাসানের একমাত্র চেষ্টা কী উপায়ে জাফরকে উৎফুল্ল রাখা যায়। প্রায় সব সময়ই সে তার সঙ্গে সঙ্গে কাটায়। খানাপিনা নাচ গান হৈ-হল্লার মধ্যে ভুলিয়ে রাখতে চায় সে জাফরকে।

একদিন বাগানের একপাশে বসে দুই বন্ধু বাক্যালাপ করছিলো, এমন সময় এক পরমাসুন্দরী তরুণী জলের ঝারি হাতে বাগানে ঢুকে ফুলগাছের গোড়ায় জল সিঞ্চন করতে লাগলো। মেয়েটিকে দেখামাত্র জাফরের সারা অঙ্গে এক শিহরণ খেলে গেলো। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে তরুণীর দিকে।

হাসান বললো, কী দেখছেন মিতা?

—বাঃ কি সুন্দর, যেন বেহেস্তের পরী।

—আপনার খুব পছন্দ ওকে?

জাফর বলে, পছন্দ হলেই বা কী? আমি পরদেশী। আমার হাতে দেবে কেন এমন মেয়েকে?

হাসান বলে, সে আমি ব্যবস্থা করে দেব। আপনি রাজি কিনা বলুন।

জাফর বলে, এ নারীর সঙ্গ সহবাস পেলে দুনিয়ার সব দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ মনে হবে আমার।

হাসান বলে, আপনি কোনও খেদ করবেন না, মালিক। আমি কথা দিচ্ছি ঐ নারী আপনারই অঙ্কশায়িনী হবে।

জাফর অবাক হয়ে বলে, এমন জোর দিয়ে একথা বলছেন কি করে দোস্ত? ও আপনার কে?

হাসান বলে, ঐ রূপসী আমার নিজের বিবি। কিন্তু আপনি আমার মেহেমান। দুনিয়াতে তার চেয়ে বড় বস্তু আর কিছু নাই। আমি ওকে তিন তালাক দিয়ে দেব। আমার চাচাকে বলে রাজি করাবো, সে যাতে আপনার হাতে তুলে দেয় তাকে। আপনি নিকা করে দেশে নিয়ে যাবেন তাকে।

জাফর কেমন আড়ষ্ট, অপ্রস্তুত হয়ে যায়, এ কেমন কথা হলো দোস্ত, তোমার শাদী করা বিবিকে তালাক দেবে তুমি? কেন? কী তার অপরাধ?

—অপরাধ? সে কোন অপরাধ করতে পারে না মালিক। অপাপবিদ্ধ সে, আমাকে জান প্রাণ দিয়ে মহব্বত করে।

—তবে তাকে কেন পরিত্যাগ করবেন?

হাসান হাসে, অতিথি সৎকারের চেয়ে বড় কাজ কিছু থাকতে পারে না কোনও মুসলমানের। আপনি আমার পরম প্রভু। আপনার আত্মা অতৃপ্ত হলে দোজকেও ঠাঁই হবে না আমার। এই মাত্র ঠিক করলাম, বিবিকে তালাক দিয়ে আমি সংসার ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে যাবো চিরদিনের মতো। সেখানে কাবাহ আশ্রয় করে পড়ে থাকবো। আল্লাহ যদি প্রসন্ন হন, আমাকে কোলে টেনে নেবেন।

জাফর বাধা দিয়ে বলে, তা হয় না হাসান। তুমি ক্ষান্ত হও।

—এ ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয় মালিক। আপনাকে তৃপ্ত করতে পারাই একমাত্র লক্ষ্য আমার। আপনি আর 'না' করবেন না। আমি আপনার শাদীর ব্যবস্থা করছি।

জাফর বলে, আমি মুসাফীর। শাদীর দেনমোহর কোথায় পাবো এখানে?

হাসান বলে, সে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার প্রচুর অর্থ আছে, আমি দেব আপনাকে। ঋণ নয়, দান নয় এ আমার অতিথি সৎকারের দক্ষিণা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।

হাসান তার শ্বশুরকে সমস্ত খুলে বললো। সব শুনে সে জামাতাকে নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু হাসান তার সিদ্ধান্তে অবিচল হয়ে রইলো।

সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে শ্বশুর রাজি না হয়ে পারলো না। সেইদিনই হাসান তার বিবিকে তিন তালাক দিয়ে দিলো। তার তিনদিন পরে সকলের অগোচরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে তার তালাক দেওয়া বিবির সঙ্গে জাফরের শাদী হয়ে গেলো।

হাসান বললো, আপনার বিবিকে নিয়ে আপনি কি এখানেই থাকবেন, না বাগদাদে ফিরে যাবেন।

জাফর বললো, আমি খলিফার উজির, এখানে বসে থাকলে তো চলবে না ভাই। আমাকে এখনি দেশে ফিরতে হবে।

হাসানই যাত্রার সব ব্যবস্থা করে দিলো। নতুন বিবিকে সঙ্গে করে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে গেলো সে।

কয়েকদিনের মধ্যে বাগদাদে এসে পৌঁছলো জাফর। সংবাদ পেয়ে খলিফা স্বয়ং নিজে দেখা করতে এলেন জাফরের সঙ্গে। বিলম্বের কারণ কী, জানতে চাইলেন। তখন জাফর তার দামাসকাস সফরের আদ্যোপান্ত কাহিনী শোনালো খলিফাকে। সব শুনে হারুন অল রসিদ গম্ভীর হয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, না-না, জাফর কাজটা ভালো করনি মোটেই। যে তোমাকে এতো আদর অভ্যর্থনা করেছে, তার ঘরের বিবিকে বেহাত করে নিয়ে আসা তোমার মত বিচক্ষণ বিবেচক ব্যক্তির উচিত হয়নি জাফর। আমার ইচ্ছা যার জিনিস তাকে তুমি ফেরত পাঠিয়ে দাও।

জাফর বললো, আপনার হুকুম শিরোধার্য, জাঁহাপনা। কিন্তু এখনই আমি আবার দামাসকাসে যাবো কি করে? তার চেয়ে বরং হাসানকে আমি ডেকে পাঠাই। ও এলে ওর হাতে তুলে দেব ওর বিবিকে। যতদিন সে এসে না পৌঁছয় ততদিন মেয়েটি আমার হেফাজতেই থাক।

এদিকে জাফরকে বিদায় দেবার পর সারা দামাসকাস শহরে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো, যিনি এসে হাসানের মেহেমান হয়েছিলেন তিনি আর কেউ নয় স্বয়ং খলিফার উজির জাফর। জাফরের সঙ্গে হাসানের যা দোস্তি হয়েছে তাতে নায়েবের নায়েবী আর বেশি দিন থাকবে না। খুব শিগ্গিরই বাগদাদ থেকে ফরমান আসবে হাসানকে নায়েব করার। সে-ই পরবর্তী নায়েব হবে, সে বিষয়ে কারো আর সন্দেহ রইলো না।

কথাটা ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে নায়েবের কানে গেলো। রেগে আগুন হয়ে সে সিপাইদের হুকুম করলো, লোকটাকে বেঁধে নিয়ে এসো আমার সামনে।

হাসানকে দেখামাত্র নায়েব গর্জে উঠলো, শয়তান বদমাইশ, তোমার পেটে এতো বুদ্ধি। আমাকে গদি থেকে নামাতে চাও? তোমার নায়েব হওয়ার সাধ হয়েছে। দাঁড়াও সাধ তোমার মিটিয়ে দিচ্ছি।

নায়েব হুকুম দিলো, লোকটার গর্দান নাও।

নায়েবের সিপাইরা হাসানের অঙ্গবাস ছিঁড়ে-খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলো। কালো কাপড় দিয়ে চোখ দু'টো কষে বেঁধে দিলো ওরা। তারপর তরবারী উদ্যত হলো হাসানের ধড়মুণ্ডু আলাদা করার জন্য। এই সময় এক আমির নায়েবকে পরামর্শ দিলো, আমার মনে হয় তাড়াহুড়ো করে এখনি এ কাজটা না করাই ভালো। হাজার হলেও সে উজির জাফরের দোস্ত। এর ফল কী শুভ হবে আপনার পক্ষে? আপনাকে যারা একাজে উৎসাহ দিচ্ছে, আপনি ভেবে দেখুন, তারা আপনার বন্ধুরূপী শত্রু ছাড়া কিছু নয়। এও ঠিক, আজ হোক কাল হোক আপনার এই কার্যকলাপ জাফরের কর্ণগোচর হবেই। তখন তার ঠেলা কি সামলাতে পারবেন আপনি? সেদিন যদি আপনার ঘাড় থেকে মাথা নেমে যায় তখন কি আপনার এইসব শুভানুধ্যায়ীরা ঠেকাতে পারবে?

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো দুইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

আমিরের কথায় চৈতন্য হলো ক্রোধ-উন্মত্ত নায়েবের। তৎক্ষণাৎ সে জহ্লাদকে অসি সংবরণ করতে বললো, থাক, এখন থাক। ওকে বরং ফাটকে আটক রাখ।

হাসানের পায়ে শিকল বেঁধে শহরের পথ দিয়ে হিড়হিড় কর টানতে টানতে নিয়ে চললো সিপাইরা। সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ তুললো হাসান। কিন্তু কে শোনে তার কান্না? অন্ধকার কারাকক্ষে হাসানকে নিক্ষেপ করলো তারা।

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় কয়েকটা শুকনো রুটি আর খানিকটা জল দিয়ে যায় প্রহরী। তাই খেয়ে হাসান দিন কাটায়। আর আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে আবেদন জানায়, তুমি তো জান প্রভু, জীবনে কখনও আমি কারো অনিষ্ট চিন্তা করিনি। তবে—তবে কেন এ শাস্তি বিধান করলে আমার জন্য।

খোদাতালা বোধহয় নিরপরাধ হাসানের আবেদন শুনছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় যথারীতি খানাপিনা রেখে গেছে। হাসান লক্ষ্য করলো লোকটা রোজকার মতো ফটকের দরজায় তালা লাগাতে ভুলে গেছে।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। সবাই যে যার মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু হাসানের চোখে ঘুম নাই। সদরের প্রহরীটা এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করে পাহারা দিচ্ছে। সুযোগ বুঝে, পাহারাদার অন্য প্রান্তে চলে যেতেই টুক করে সে দরজা ঠেলে বেরিয়ে পড়েই গুটি গুটি এপাশ ওপাশ কাটিয়ে বেমালুম সটকে পড়তে পারলো।

বাকী রাতটা গা-ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে দিলো হাসান। তারপর ভোরে শহর প্রান্তের প্রধান ফটক খোলামাত্র আর পাঁচজন পথচারীর ভিড়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

এরপর আর পিছনে নয়, সোজা সে আলেপ্পোর পথে ছুটে চলতে থাকলো! বহু কষ্টে অনেক পথ পার হয়ে এক সময় আলেপ্পীতে এসে পৌঁছাল হাসান। সেখানে একদল বাগদাদ যাত্রীর দেখা পেয়ে তাদের দলে ভিড়ে গেলো সে।

একটানা কুড়িটা দিন চলার পর অবশেষে বাগদাদ শহরে এসে পৌঁছতে পারলো। যাক, এতদিনের দুঃখ-কষ্টের অবসান হবে তার। এখানকার খলিফার দরবারের প্রধান উজির তার প্রাণের বন্ধু। সে নিশ্চয়ই হাসানকে বুকে টেনে নেবে।

পথচারীদের জিজ্ঞেস করে করে জাফরের প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালো হাসান। ফটকের প্রহরী হাসানের দীন ভিখিরির মতো ছিন্ন-ভিন্ন সাজ-পোশাক দেখে তাকে দূর করে দিতে চাইলো, এই ব্যাটা কে তুই? সদরে ঢুকতে চাস কোন সাহসে? জানিস এটা কার প্রাসাদ।

হাসান বিনীত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ ভাই জানি, উজির জাফর বারমাচীর প্রাসাদ।

তবে? কী মতলবে ঢুকতে চাস? ভাগ—

হাসান বলে, বিশ্বাস কর, কোনও বদ মতলব আমার নাই। শুধু একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—বামন হয়ে চাঁদে হাত! তুই একটা রাস্তার ভিখিরি, খলিফার পেয়ারের উজির সাহেব তোর সঙ্গে দেখা করে ধন্য হয়ে যাবে ভেবেছিস নাকি? যা ভাগ শিগ্গির, নইলে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।

শুধু মুখের কথা নয়, সত্যি সত্যিই লোকটা একটা গোত্তা বসিয়ে দিলো হাসানের পিঠে। নিরুপায় হয়ে হাসান আবার পথে নামলো। সামনেই একটা কাগজের দোকান দেখতে পেয়ে দোকানীর কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম চেয়ে নিয়ে জাফরকে উদ্দেশ করে একখানা চিঠি লিখলো সে ঃ

জাফর ভাই, নসীবের ফেরে আজ আমি সর্বহারা। অত্যাচারিত হয়ে তোমার দরজায় এসোছ। যদি মেহেরবানী করে একটিবার দর্শন দাও বড় ভালো হয়।

তোমার ভাই

এরপর আবার সে ফিরে এলো জাফরের প্রাসাদ-প্রহরীর সামনে। চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বললো, যদি একবার তাঁর কাছে পৌঁছে দাও ভাই, খুব উপকার হয়।

চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে রাগে ফেটে পড়লো প্রহরী, কী এতবড় সাহস তোর, উজীর সাহেব তোর ভাই?

এই বলে সে বেদম প্রহার করতে লাগলো হাসানকে। মারের চোট সামলাতে না পেরে হাসান লুটিয়ে পড়লো পথের ধুলোয়। সারা অঙ্গ কেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগলো।

এই দৃশ্য দেখে অন্য এক প্রহরী ছুটে এলো ফটকে, আহা বেচারাকে অমন করে মারছো কেন? মরে যাবে যে—

—মারবো না, এই রাস্তার ভিখিরিটা বলে কি না সে উজির জাফরের ভাই, এতবড় আস্পর্ধা—

দ্বিতীয় প্রহরী বলে, তাতে দোষ কী, সব মানুষই সব মানুষের ভাই। এই তো খোদার বিধান!

তারপর হাসানকে হাতে ধরে তুলে দাঁড়িয়ে সে বললো, কী তোমার প্রয়োজন, বলো তো ভাই।

হাসান বলে, এই চিঠিখানা শুধু জাফর ভাই-এর হাতে পৌঁছে দাও, আর কিছু চাই না আমি।

দ্বিতীয় প্রহরী বলে, ঠিক আছে তুমি দাঁড়াও এখানে, আমি এখুনি তাকে দিচ্ছি তোমার চিঠি।

লোকটা অন্দরে চলে গেলো।

জাফর তখন তার ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে বসে মৌতাত করছিলো। সাকী ঢেলে দিচ্ছিল সরাব। সুন্দরী বাঁদী সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে চলেছে। আর জাফর জাঁকিয়ে জীবনের পরম অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাচ্ছে বন্ধুদের। সেই দামাসকাস বাসের সুখস্মৃতির দিনগুলোর কাহিনী।

জাফর বলছিলো, হাসান আমার ভাই, হাসান আমার বন্ধু, তার মতো সৎ মহান মানুষ সারাজীবনে আমি আর দু'টি দেখিনি। আমি কেন, বাজি রেখে বলতে পারি, কেউই দেখেনি। হাসানের মতো উদার মহৎ প্রাণ তামাম দুনিয়ায় আর দু'টি আছে কিনা সন্দেহ।

জাফর কথা শেষ করে বেশ বিরক্ত হয়েই প্রহরীর দিকে তাকালো, কী, কী ব্যাপার! তোদের কি সময় অসময় জ্ঞান নাই। যখন তখন এসে মৌতাতটা মাটি করে দিবি।

প্রহরী চিঠিখানা বাড়িয়ে দিলো জাফরের দিকে। জাফর চিঠিখানা হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলালো। কিন্তু মদের নেশায় তখন সে অন্য জগতের মানুষ, অতটা তলিয়ে দেখতে পারলো না। চাইলোও না। চিঠিখানার অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে এক রকম প্রায় ক্ষিপ্তই হয়ে উঠলো সে।

—কী খাতা নিয়ে এসেছিস, মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। হাতের পেয়ালাটা সে ছুঁড়ে মারলো দেওয়ালে। মুহূর্তে টুকরো হয়ে গেলো। একখানা টুকরো ছিটকে এসে লাগলো জাফরের কপালে। কেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। হাতের চিঠিখানা ছুঁড়ে দিয়ে কপালটা দু'হাতে চেপে ধরলো জাফর। ক্রোধ এবার শতগুণ হয়ে গর্জে উঠলো, এই ঘোড়ার ডিমের চিঠিখানার জন্যই এমনটা ঘটলো। যা ঐ লোকটাকে এখুনি গিয়ে পাঁচশো ঘা বেত লাগিয়ে কোতোয়ালের হাতে তুলে দে। কয়েদ করে রাখুক ওকে।

উজিরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো। বেত্রাঘাতে জর্জরিত হলো

হাসানের দেহ। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেলো সারা অঙ্গ। কোতোয়াল তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো।

দু'টি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। হাসান কারাগারে পচছিলো। হঠাৎ একদিন কোতোয়াল এসে কয়েদখানার সমস্ত বন্দীকে খালাস করে দিয়ে বললো, যা তোদের বরাত ভালো ছাড়া পেয়ে গেলি। খলিফা পুত্রসন্তান লাভ করেছে। সেই উপলক্ষে তোদের রেহাই করে দিয়েছেন তিনি।

ছাড়া পেয়ে হাসান আরও সমস্যায় পড়লো। সে এখন কোথায় যাবে কী খাবে? নিজের দেশ বিশ দিনের পথ। সেদিকে রওনা হলে পথেই মরে পড়ে থাকবে সে। কিন্তু এই বিদেশী শহর বাগদাদে সে বাঁচার মতো রুটি জোগাড় করবে কী করে? ভিক্ষা? কিন্তু সে পরদেশী, তাকে তো এ শহরে ভিক্ষে করতে দেবে না কেউ। তবে? তবে কী উপায় হবে।

সারাটা দিন সে শহরের এক মসজিদ-প্রাঙ্গণে বসে নানাভাবে প্রাণে বেঁচে থাকার উপায় উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনুই কূল কিনারা করতে পারলো না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

মসজিদে রাত্রিবাস নিষিদ্ধ। একমাত্র আল্লাহর উপাসকরাই সেখানে অবস্থান করতে পারে। সুতরাং রাতের মতো কোনও একটা ডেরায় চলে যেতে হবে তাকে।

হাসান মসজিদ থেকে বেরিয়ে শহর-প্রান্তের একটা পোড়ো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। বাড়িটায় কোনও জনমানুষ বাস করে না। একেবারে পরিত্যক্ত। সে ঠিক করলো রাতটা এই বাড়ির মধ্যে কোনও রকমে কাটাবে।

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা মানুষের দেহে হাত ঠেকতে চমকে উঠলো, হাসান। একি, একটা লোক, সারা দেহে রক্ত কেন এতো? তবে কি কেউ একে খুন করে রেখে গেছে? একখানা রক্তমাখা ভোজালী পায়ে ঠেকলো। ভয়ে শিউরে উঠলো হাসান।

ইতিমধ্যে হাসানের হাত রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। সেই হাত সে তার অঙ্গের পোশাকে মুছলো।

এ অবস্থায় কী করা উচিত ভাবতে থাকে হাসান। শেষে ঠিক করলো ঝামেলায় জড়ানোর চেয়ে পথে বেরিয়ে পড়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু পথে আর বেরুনো হলো না তার। মশালের আলো দেখে চমকে উঠলো সে!

কয়েকজন সিপাই ঢুকে পড়েছে সেখানে। হাসানের রক্তমাখা পোশাক, মৃত মানুষের লাস এবং ভোজালীখানা দেখে তাদের বুঝতে অসুবিধে হলো না খুনী কে?

—এ্যাই বদমাশ, বল, কেন একে খুন করেছিস?

হাসানের পিঠে ডাণ্ডার বাড়ি পড়লো। একথার কী জবাব দেবে হাসান? আর দিলেই বা বিশ্বাস করবে কে? বিশ্বাস করার মতো ব্যাপার তো নয়।

আবার কারাগার। কিন্তু মাত্র একটি রাতের জন্য। পরদিন সকালে কোতোয়াল উজির জাফরের সমীপে গত রাতের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিলো। এবং বললো মুজরিমকে আমি ধরে ফাটকে রেখেছি, হুজুর। এখন আপনি বিচার করে বলুন কী করতে হবে।

জাফর দ্বিধা না করে বললো, গর্দান নেবে লোকটার।

দরবারের সময় হয়ে এসেছে। জাফর প্রাসাদ অভিমুখে চলেছে। চৌমাথার কাছে আসতে হাজার লোকের জমা দেখে জাফর অবাক হয়ে ভিড়ের কাছে এগিয়ে গেলো। কোতোয়াল তখন ঘাতককে হুকুম দিচ্ছিল মুজরিমকে দাঁড় করিয়ে তার চোখ বেঁধে দাও, তারপর আমার ইশারা পাওয়া মাত্র মুণ্ডু নামিয়ে দেবে এক কোপে।

হাসানের চোখ বাঁধা শেষ, এবার জল্লাদ তরবারী বাগিয়ে ধরে কোতোয়ালের

ইশারার অপেক্ষায় অপলক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এমন সময় জাফর এগিয়ে এসে কোতোয়ালকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, এখানে এতো জমায়েত কেন?

কোতোয়াল কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, কালকের রাতের ঐ খুনীটাকে কোতল করা হচ্ছে হুজুর।

জাফর বললো দাঁড়াও একটুখানি সবুর কর। আমি লোকটাকে একবার দেখতে চাই।

জাফর এগিয়ে যেতেই উৎসুক জনতার ভীড় সরে গেলো। আসামীকে প্রত্যক্ষ করলো জাফর।

—কে তুমি? মনে হচ্ছে পরদেশী?

হাসান নয় কোতোয়াল জবাব দেয়, জী হুজুর, লোকটা দামাসকাস থেকে এসেছে! কাল রাতে এই লোকটাই একটি যুবককে খুন করেছে। হাতে নাতেই ধরেছে আমার লোক। কিন্তু ব্যাটার মুখ থেকে একটি বাতও বের করতে পারা যায়নি! বলবে কী, বলার আছেই বা কী। সাক্ষী প্রমাণ তো ওর পোশাক-আশাকেই দেখতে পাচ্ছেন, হুজুর।

জাফর কিন্তু হাসানকে চিনতে পারলো না। কি করেই বা পারবে। যে হাসানকে দেখেছিলো সে, এ হাসান তো তার প্রেতাত্মা। এমন দীনহীন ক্লিষ্ট চেহারা তার হতে পারে জাফর ভাববে কী করে?

—তোমার দেশ কোথায়?

জাফর প্রশ্ন করে। হাসান বলে, দামাসকাস।

—সদর শহরে, না গ্রামাঞ্চলে?

—শহরেই।

—আচ্ছা সেখানে হাসান নামে কোনও ব্যক্তিকে তুমি চেন? সেখানকার প্রতিটি মানুষ হাসানকে চেনে। তার মতো উদার মহৎ অতিথিপরায়ণ দয়ালু ব্যক্তি খুব একটা জন্মায় না জগতে।

আপনি যখন দামাসকাসে তার আতিথ্যে কাটিয়েছিলেন তখন আমি তাকে চিনতাম বই কি। যখন আপনারা দু'জনে প্রাণের দোস্ত হয়ে তার বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন তখন আমি তাকে চিনতাম। যখন সে আপনাকে খুশি করার জন্য তার নিজের বিবিকে তালাক দিয়ে আপনার সঙ্গে শাদী দিয়েছিলো তখন আমি তাকে ভালো করেই চিনতাম। সে যখন আপনাকে বিদায় জানাতে আলেপ্পো পর্যন্ত সঙ্গে এসেছিলো তখন আমি তাকে অবশ্যই চিনতাম। আর সেই সব স্মৃতি সুখকর মধুর মুহূর্তগুলি যা একই মদের পেয়ালার চুমুক দিয়ে মূর্ত হয়েছিলো তখন আমি হাসানকে ভালো করেই চিনতাম।

জাফর বলে, আচ্ছা বলতে পার, আমি চলে আসার পর হাসান ভাই কেমন ছিলো বা এখন সে কেমন আছে, কোথায় আছে।

হাসান বলে, মালিক, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ সে অত্যাচারিত। প্রাণভয়ে সে স্বদেশ পরিত্যাগ করে এই বাগদাদ শহরে এসেছিলো একটু আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু বিধি বাম, তার কপালে আর সুখ ছিলো না, তাই সে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আজ ফাঁসীর আসামী হয়েছে। নিয়তির লেখা কে খণ্ডন করতে পারে বলুন।

এর পরও জাফর যখন চিনতে পারলো না, তখন হাসান চিৎকার করে উঠলো, জাফর ভাই এখনও কি তুমি আমাকে ইয়াদ করতে পারছ না?

এতক্ষণ সংশয়ে দোলায় দুলছিলো জাফর। হাসানের চিৎকারে সব স্বচ্ছ হয়ে গেলো তার চোখের সামনে। হাসানকে সে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিতে থাকলো।

সে কি অভূতপূর্ব দৃশ্য। কে বর্ণনা দিতে পারে তার?

এই সময় একটি প্রৌঢ় লোক জাফর-এর সামনে এসে স্বীকার করলো, গত রাত্রে যে

ছেলেটি খুন হয়েছে তার জন্য সেই একমাত্র দায়ী। এই ব্যক্তির কোনও অপরাধ নাই। সুতরাং একে ছেড়ে দিয়ে যা সাজা দেবার আমাকে দিন, হুজুর।

জাফর বললো, এমন নৃশংস কাজ করেছ, তোমার কী ধর্মের ভয় মনে জাগেনি।

প্রৌঢ় বলে, ঐ ছেলেটি প্রতিদিনই আমার যা-কিছু রোজগার কেড়ে-কুড়ে নিয়ে নিত। তা নিক, তাতেও আমার তেমন দুঃখ ছিলো না। কিন্তু হুজুর ঐ পয়সা নিয়ে সে জুয়া খেলতো, মদ খেত, মেয়েমানুষের কাছে যেত। এসব আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না। কিন্তু কিছুতেই দাঁও পাচ্ছিলাম না। কাল সন্ধ্যায় ওকে বেকায়দায় পেয়ে আমি আমার জ্বালা জুড়িয়েছি হুজুর। এতো বড় পাপ জিন্দা থাকা উচিত নয় বলে আমার মনে হয়েছিলো, তাই আমার নিজের ঔরসের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আমি ওর জান খতম করেছি।

জাফর ভাবলো ক্ষণকাল। তারপর বললো, যাও তোমাকে রেহাই দেওয়া হলো। কারণ মামলা শুনে আমার মনে কিছু সংশয় জেগেছে। সন্দেহবশে কাউকে সাজা দেওয়া উচিত মনে করি না। সত্যিই যদি তোমার কিছু অপরাধ ঘটে থাকে, আল্লাহ তার নিখুঁত বিচার করবেন।

প্রৌঢ় চলে গেলে হাসানকে সঙ্গে নিয়ে জাফর হামামে গেলো। খুব ভালো করে গোসলাদি করিয়ে নতুন সাজ-পোশাক পরিয়ে খলিফার সামনে এনে হাজির করলো।

ধর্মাবতার, এই সেই মহানুভব হাসান। এর কথাই আপনাকে আমি বলেছিলাম।

খলিফা হাসানের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু তোমাকে এমন কৃশ এবং অসুস্থ মনে হচ্ছে কেন?

এই কথায় কেঁদে ফেললো হাসান। তার ভাগ্য-বিড়ম্বনার আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বিবৃত করলো সে। খলিফা এবং জাফর হতবাক হয়ে শুনলো সব। খলিফা বললেন, ঐ নায়েবটাকে গ্রেপ্তার করে হাজির কর আমার সামনে। আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেব।

উজিরকে উদ্দেশ করে বললেন, এর কি বিষয়-আশয় দেনা-পাওনা ছিলো সেখানে?

জাফর বললো, আমি ব্যক্তিগতভাবে এর কাছে তিরিশ লক্ষ দিনার ঋণী। সে টাকা অমি ওকে দিয়ে দিচ্ছি আজই। আর ওর প্রিয়তমা বিবি যে আমার কাছে অক্ষত অবস্থাতেই আছে তাকেও তুলে দেব এর হাতে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো চারতম রজনী। আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

খলিফার আদেশে দামাসকাসে এক সেনাপতিকে পাঠানো হলো। নায়েবকে বন্দী করে হাজির করা হলো তার সামনে। খলিফা হুকুম দিলেন, লোকটাকে কারাগারে নিক্ষেপ কর।

এরপর বহুদিন বাগদাদে সুখ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত করার পর হাসান তার নিজের দেশ দামাসকাসে নায়েবের পদে বহাল হয়ে চলে গেলো।

বিচারে আগের নায়েবের প্রাণদণ্ড হলো।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে বললো, এরপর, জাঁহাপনা, আপনাকে শাহজাদা হীরার কাহিনী শোনাবো।

শাহরাজাদ বলতে থাকে ঃ

এক সময়ে এক দেশে এক ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। তার নাম সামস শাহ। তার একটি মাত্র পুত্র সন্তান। আচারে ব্যবহারে তার তুল্য শাহজাদা খুব কমই ছিলো সে সময়।

একদিন শাহজাদা হীরা সুলতানকে বললো, আব্বাজান মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে, আমি দু' একদিনের জন্যে শিকারে যাবো ভাবছি।

প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, তার ইচ্ছা পূরণের কোনই ত্রুটি করলেন না সুলতান। লোকলস্কর সঙ্গে দিয়ে দিনক্ষণ দেখে ছেলেকে শিকারে পাঠিয়ে দিলেন।

শাহজাদা হীরা তার দলবল নিয়ে এক পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলো। একটা বিশাল বটবৃক্ষের নিচে ছাউনি গাড়লো সে। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, সামনে কল্লোলিনী ঝরণা অবিরত ঝরে চলেছে।

এক সময় একটি খরগোশ তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপান করতে এলো সেখানে। শাহজাদার ইশারায় তার দলের লোকেরা খরগোশটিকে ধরবার মতলব করলো। কিন্তু খরগোশটি ওদের চাতুরী বুঝতে পেরে পানি পানের আশা পরিত্যাগ করে প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো। হীরাও ছুটলো তার পিছনে। কিন্তু খরগোশের গতি রুদ্ধ করতে পারলো না শাহজাদার তাজি ঘোড়া। পিছু পিছু ধাওয়া করতে করতে এক সময় শাহজাদা এসে পৌঁছলো এক জনমানব শূন্য মরুপ্রান্তরে।

এক সময় এক বালির পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো খরগোশটি। হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো শাহজাদা। শেষ চেষ্টা করার জন্য সে বালি-পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলো। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পরও কোনও হদিশ করতে পারলো না খরগোশের।

পাহাড়ের ওপারে শস্যশ্যামল প্রান্তর দেখে শাহজাদা নিচে নেমে যায়। নানারকম গাছপালার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এক সময় সে এক মনোরম উদ্যানে এসে উপস্থিত হয়। একটা গাছের নিচে একটি সিংহাসন দেখে সেই দিকে এগিয়ে যায়। সিংহাসনে আসীন ছিলেন এক মুকুটধারী নরপতি। তার অঙ্গে মূল্যবান সাজ-পোশাক, কিন্তু কি আশ্চর্য তার পা দু'খানা নগ্ন।

শাহজাদা হীরা-সম্রাটকে সালাম জানায়।

সম্রাট জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কোনও সুলতান বাদশাহর সন্তান তুমি। কিন্তু এই জন-মানুষের অগম্য স্থানে কী করে এলে তুমি। এখানে তো বনের পাখিও কখনও উড়ে আসার সাহস করে না।

শাহজাদা তার খরগোশ অভিযানের কাহিনী বললো তাকে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু মহারাজ আপনি এই সিংহাসনে একা একা বসে আছেন কেন এখানে? মনে হচ্ছে আপনার কাহিনী আরও বিচিত্র।

সম্রাট বললো, হ্যাঁ, সত্যিই বড় অদ্ভুত সে কাহিনী। আমাকে সে সব কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করো না। তোমার তা শোনা উচিত হবে না, বাবা। শুধু শুধু তুমি মনে দুঃখ পাবে।

শাহজাদা বললো সেজন্য আপনি বিচলিত হবেন না সম্রাট, মেহেরবানী করে বলুন, আমি শুনতে ইচ্ছা করি।

সম্রাট ক্ষণকাল মৌন থেকে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, তা হলে শোনো, বাবা ঃ

এই মরুদ্যানে আসার আগে অগণিত পাত্রমিত্র সভাসদ এবং হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রবল পরাক্রমে ব্যাবিলনে রাজত্ব করতাম আমি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সাত পুত্র-সন্তানের জনক হতে পেরেছিলাম। বিপুল বিত্ত-বৈভব ধনদৌলতের মালিক হয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে রাজত্ব করছিলাম।

সবই সুন্দর যথাযথভাবে চলছিলো। কিন্তু বিপর্যয় ঘটলো, যখন আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বহু দূর দেশ সিন মাসিনের রাজকুমারীর সাহচর্যে এলো। তার পিতা সম্রাট তামুজের পুত্র সম্রাট

কামুস। সে সময়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ নরপতি হিসাবে বিশ্ববিদিত ছিলেন তিনি। রাজকুমারীর রূপের জেল্লার কাছে আকাশের চাঁদ ম্লান হয়ে যেত।

একদিন এক পর্যটক এসে উপস্থিত হলো আমার দরবারে। তার বিবরণ থেকে জানতে পারলাম সম্রাট কামুস-কন্যা বিয়ে করবে, সেই নিমিত্ত পর্যটক পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরিয়েছে। দেশে দেশে ঘুরে সে সমস্ত রাজা বাদশাহদের কাছে এই শুভ বার্তা বিতরণ করে বেড়াচ্ছে।

রাজকুমারী বিবাহ করবে। কিন্তু পাত্র তার মনের মতো হওয়া চাই। মনের মতো বলতে কি বোঝাতে চায় পর্যটক, জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, না কোনও পরম রূপবান বীরপুরুষ বা অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক সে চায় না; তার যে স্বামী হবে তাকে একটি মাত্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাতলে দিতে হবে।

—কী সে প্রশ্ন?

পর্যটক জানালো রাজকুমারীর প্রশ্ন ঃ

সাইপ্রাস এবং ফারকোনের মধে সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নের যিনি প্রকৃত উত্তর করতে পারবেন রাজকুমারী তাঁর গলায় মালা দেবেন। কিন্তু একটা শর্ত, যদি কোনও যুবরাজ তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন তবে তিনি তাঁর শিরশ্ছেদ করবেন।

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বললো, আমি রাজি বাবা। রাজকুমারীর প্রশ্নের জবাব আমার জানা আছে। আপনি আমাকে সিন মাসিনে যাত্রা করার অনুমতি দিন।

পুত্রের নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, তা না হলে সে এই ধরনের শর্তে রাজি হয়ে মৃত্যুর দিকে হাত বাড়াতে চায়! হাকিম বদ্যিদের ডেকে এনে তাকে পরীক্ষা করালাম। কিন্তু কেউই তাকে সুস্থ করে তুলতে পারলো না। আমি পুত্রকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার একই গোঁ, সিন মাসিনে সে যাবেই এবং সেই উদ্ভট প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়ে সম্রাট-দুহিতাকে বিবাহ করে আনবে। কোনও ভাবেই যখন তাকে বিরত করা গেলো না তখন আমি তাকে পাল্টা প্রস্তাব দিলাম শোনো বাবা, সেই রাজকুমারীকে বিয়ে করার বাসনা যদি তুমি পরিত্যাগ করতে না পার তবে এক কাজ কর। সিন মাসিনে তুমি যাত্রা কর আমি তাতে বাধা দেব না কিন্তু একা তুমি যেও না সেখানে। আমি আমার এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। বীরের মতো গিয়ে সম্রাট কামুসের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যাকে দাবী কর। তাতে যদি সে সম্মত হয় ভালো রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু সে যদি রাজি না হয় তা হলে যুদ্ধ করে তাকে বন্দী করবে। তাতে প্রয়োজন হলে আমার সমস্ত শক্তি আমি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবো না। ভেবে দেখ এই-ই হচ্ছে রাজধর্ম।

কিন্তু আমার পুত্র এ কথায় সম্মত হলো না।

—আপনি ঠিক বলছেন না বাবা। সিন সম্রাট তো আমাদের মর্যাদার কোনও হানি করেন নি। তাঁর প্রস্তাব যথেষ্ট সম্মানজনক। এখানে যুদ্ধের কথা আসে কি করে। না বাবা, আপনি বাধা দেবেন না, সিন মাসিনে আমি একাই যাবো। এ পরীক্ষা তো শৌর্যের বীর্যের না, এ প্রমাণ হবে আপনার পুত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। আমাকে সেই শিরোপা আদায় করে নিতে অনুমতি দিন, বাবা।

আমি বুঝতে পারলাম নিয়তি তাকে টানছে। বাধা দিতে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। আমি তার যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলাম। যথাসময়ে সে সিন মাসিনে রওনা হয়ে গেলো।

যথা সময়ে খবর পেলাম, আমার পুত্র রাজকুমারীর প্রশ্নের সঠিক উত্তর করতে

পারেনি বলে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। শোকে কাতর হয়ে শয্যা নিলাম আমি। সারা রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে এলো।

এরপর আমার দ্বিতীয় পুত্রের মাথাতেও সেই এক ভূত ভর করলো। আমার হাজার বারণ সত্ত্বেও তাকে বিরত করতে পারলাম না। সেও গেলো সিন মাসিনের সম্রাট-কন্যার আশায়। কিন্তু অনিবার্য কারণেই তারও একই পরিণতি ঘটলো।

এইভাবে এক এক করে আমার বাকী পাঁচ পুত্রেরও জীবনান্ত ঘটলো ঐ সিন মাসিন সম্রাটের তরবারীর আঘাতে।

এ আঘাত আমি সহ্য করতে পারলাম না। সাম্রাজ্যের দম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে গেলো, বিত্ত বৈভব বিক্রম সব তুচ্ছ মনে হলো আমার কাছে। তাই সব পরিত্যাগ করে বিবাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। চলতে চলতে অবশেষে একদিন জনমানবশূন্য এই মরুদ্যানে এসে আশ্রয় নিলাম। আজ আমি রিক্ত নিঃস্ব একা—বাদ্যবিহীন সম্রাট।

শাহজাদা হীরা সম্রাটের এই হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনে চোখের জল রোধ করতে পারলো না।

ব্যাবিলন সম্রাটের কথা এখনকার মতো থাক, এবার শাহজাদা হীরার কাহিনী শুনুন ঃ

খরগোশটি তাড়া করার সময় শাহজাদা হীরা তার সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে নিতে চায়নি। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো, তবু শাহজাদা ফিরে এলো না দেখে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। এদিক ওদিক সন্ধান করতে করতে এক সময় তারা বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তরে এসে উপনীত হলো। কিন্তু শাহজাদার সন্ধান করতে না পেরে প্রাসাদে ফিরে সুলতানকে সংবাদ জানানো প্রয়োজন মনে করলো।

এদিকে শাহজাদ হীরা ছাউনিতে ফিরে এসে তার দল-বলের কাউকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে প্রাসাদের উদ্দেশে ফিরে চললো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো ছয়তম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

সুলতান সামস শাহ পুত্রকে ফিরে পেয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন বারংবার। কিন্তু শিকারে গিয়েও তার মনের দুঃখ এতটুকু লাঘব হয়নি দেখে চিন্তিত হলেন।

হীরা বাবার কাছে সেই মর্মান্তিক কাহিনীটি খুলে বললো। শাহ বললেন, তুমি শান্ত হও বাবা, এমন কাহিনী শুনলে স্বভাবতই মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আমি আজই আমার দূত পাঠাচ্ছি সিন মাসিন সম্রাট কামুসের কাছে। আমি তাঁর কন্যাকে এখানে পাঠানোর জন্য দাবী জানিয়ে খৎ লিখছি। আমার ইচ্ছা ঐ রাজকন্যার সঙ্গে তোমার শাদী দেব। তার যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি বহু মূল্যবান রত্ন মণি-মাণিক্য উপঢৌকণ পাঠাচ্ছি এই সঙ্গে। সে যদি আমার উপহার গ্রহণ করে তার রাজকন্যাকে সমর্পণ করতে সম্মত হয় তবে কোনও ঝামেলাই থাকবে না। কিন্তু তা না হলে যুদ্ধ অনিবার্য। আর সে যুদ্ধে সম্রাট কামুসের লাশ লুটিয়ে পড়বে মসনদের নীচে। সে যদি সত্যিই বিচক্ষণ হয় তবে আমার প্রস্তাবে অমত করবে না।

শাহাজাদা হীরা বললো, না বাবা দূত পাঠিয়ে দরকার নাই। আমি নিজেই যাবো সম্রাট কামুসের সামনে। আমার বুদ্ধির জোরে রাজকুমারী মুরাকে জয় করে আনবো আমি। আপনি আমাকে অনুমতি করুন।

সুলতান গুম হয়ে থাকলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, তুমি আমার বংশের একমাত্র সলতে, আমার নয়নের মণি। তোমাকে আমি ঐ পর্যন্ত রাজার সামনে যেতে দিতে

ইচ্ছা করি না। ঐ অসম্ভব আজগুবি প্রশ্নের জবাব দিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। সেধে মৃত্যুর কাছে মাথা নুইয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

শাহজাদা হীরা কিন্তু বাবার এ কথায় নিবৃত্ত হলো না। তার একচোখা মনোভাবের কিছুতেই পরিবর্তন করতে পারলেন না তিনি। বাধ্য হয়ে তিনি ছেলেকে সিন মাসিনে রওনা করে দিলেন।

তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শাহজাদা সিন মাসিনে এসে উপস্থিত হলো একদিন। রাজার প্রাসাদ বহু দূর থেকে নজর আসে। পাহাড়ের চেয়েও উঁচু তার চূড়া।

প্রাসাদের সিংহদরজায় প্রবেশ করতে গিয়ে সোনার হরফে লেখা একটি সতর্কবাণী দেখলো শাহাজাদা। যদি কেউ রাজকুমারীকে লাভ করতে চায় তবে তাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতে হবে।

প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ ছিলো। সিংহদরজার সামনে বাঁধা ছিলো বিশাল একটা দামামা। শাহজাদা দামামায় আঘাত করে আকাশ বাতাস কাঁপানো আওয়াজ তুললো। এবং সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো দরজাটা। সশস্ত্র প্রহরী নমস্কার জানিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করে তাকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলো।

সম্রাট বসেছিলেন সিংহাসনে। শাহজাদা হীরাকে দেখে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কত শত যুবরাজ নিজের প্রাণ বলি দিয়ে গেলো তাতেও তুমি চৈতন্য লাভ করতে পারলে না, প্রাণ দিতে এলে বাবা? আমার কথা শোনো, তোমার ঐ অসম্ভব আশা পরিত্যাগ কর। তোমাকে দেখে প্রত্যয় হচ্ছে তুমি খুবই অভিজাত কোনও শাহবংশের সন্তান। আমি তোমাকে আমার দরবারের উচ্চপদে বহাল করছি। তুমি সানন্দে তা গ্রহণ করে নিজের প্রাণ রক্ষা কর! আমার কন্যা কি ধাতুতে গড়া আমি নিজেও জানি না বাবা, ঈশ্বর তাকে এতো জ্ঞান, এতো বুদ্ধি দিলেন কেন তাও বুঝতে পারি না। কয়েক শ' রাজপুত্র তার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমে নিজেদের প্রাণ খোয়ালো, এ তো আমার ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু কি করবো, আমার কন্যার এক পণ, তাকে যে তর্কে হারাতে পারবে শুধু তাকেই সে বরণ করে নেবে স্বামীত্বে।

শাহজাদা হীরা বললো, আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি এখানে তা থেকে বিচ্যুত হবো না কিছুতেই। আপনি রাজকুমারীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধের আয়োজন করে দিন, আমি তাকে পরাস্ত করবো।

সম্রাট কামুস বললেন, পথশ্রমে এখন তুমি ক্লান্ত, উত্তেজিত। এখানে তিনদিন বিশ্রাম কর, খুব ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা বার বার চিন্তা করে দেখ। তারপরও যদি তোমার মত না পালটায় অবশ্যই আমাকে তর্কযুদ্ধের আসর বসাতেই হবে।

সম্রাটের কথামতো শাহজাদা হীরা প্রাসাদে অতিথি হয়ে রইলো তিনদিন। রাজসিক আদর আপ্যায়নের ত্রুটি রাখলেন না সম্রাট। শাহজাদা হীরা বিকালে প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে পায়চারী করে বেড়ায়। প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে যায় তার।

উদ্যানের এক প্রান্তে একটি সুন্দর ঝরণা দেখে সেইদিকে এগিয়ে যায় হীরা। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সে। ঝরণার জলে ভিজিয়ে দেয় তার সারা অঙ্গ।

অনেকক্ষণ ধরে ঝরণাধারায় সিক্ত হয়ে এক সময় সে উঠে এসে বসে এক খোলা জায়গায়। গায়ে রোদ লাগিয়ে পরনের সাজ-পোশাক শুকাতে থাকে। যেদিকে তাকায় শুধু ফুল আর ফুল। কত শত বিচিত্র বর্ণের ফুলে ফুলে ভরা সারা বাগিচাটা। আর কত না নাম না জানা সুন্দর পাখি। গাছের ডালে ডালে নাচানাচি করে খেলে বেড়াচ্ছে। দেখে দেখে মন প্রাণ পূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক পরে এক সময় হীরা উঠে প্রাসাদের দিকে পা বাড়ায়। হঠাৎ তার চোখ পড়ে ঝরণার পাশে এক গালিচায় অর্ধশায়িতা এক বেহেস্তের হুরীর মতো পরমাসুন্দরী এক তরুণীর ওপর। তার চারপাশে বসে আছে তার প্রিয়সখিরা।

হীরা নিজেকে একটা গাছের গুঁড়ির আড়াল করে লুকিয়ে লুকিয়ে সুন্দরীর রূপ-সুধা পান করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলো। এমন সময় সম্রাট-নন্দিনীর এক সখি তাকে দেখে ফেললো।

—দেখুন রাজকুমারী, ঐ গাছের আড়ালে যেন এক যুবককে দেখতে পাচ্ছি।

সবাই চমকে ওঠে। রাজকুমারী মুরা নিজেকে আড়াল করার জন্য ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সখিদের সামনে দাঁড় করায়।

রাজকুমারী মুরার সবচেয়ে পেয়ারের সখি মতিয়া। সে বলে, আমার মনে হচ্ছে, এই অপরূপ সুন্দর যুবক ইহজগতের কেউ নয়। হয়তো স্বর্গ থেকে ধরায় নেমে এসেছে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো সাত রাত্রিতে আবার সে বলতে শুরু করলো ঃ

মুরা উঁকি দিয়ে দেখলো হীরাকে! মতিয়া বাড়িয়ে বলেনি, সত্যিই এমন রূপবান পুরুষ এর আগে সে দেখেনি কখনও।

প্রথম দর্শনেই ভালোবাসো—কথাটার অর্থ বুঝতে পারতো না সে এতকাল। আজ হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করলো এই মুহূর্তে। এক পলকের মধ্যে তার সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেলো। বুকের মধ্যে কেমন যেন আকুপাকু করতে থাকলো। এরই নাম কি প্রেম?

মুরা ক্রমশঃ অস্থির অশান্ত হয়ে ওঠে। কাটা মুরগী যেমন ছটফট করতে থাকে সেই রকম আর কি।

হীরার দিক থেকে সে চোখ ফেরাতে পারে না। মতিয়া ঠাট্টা করে বলে, তাহলে রাজনন্দিনীর পণ এতদিনে ভাঙ্গলো?

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পায় মুরা। প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, না না না, তা কিছুতেই হবে না, হতে পারে না। আমার দাবী পূরণ না হলে কেউ আমাকে পাবে না। কারো নিছক প্রেমে নিজেকে হারিয়ে দেবার পাত্রী আমি নই, মতিয়া। দাঁড়া, তোরা এখানে দাঁড়া, আমি নিজেই ওর সামনে যাচ্ছি।

রাজকুমারী মুরা শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে হীরার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। ধীর অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে, আপনি আমাদের পরম আরাধ্য অতিথি। আপনার জন্য সমাদর মঞ্চ ব্যবস্থা করা আছে। অনুগ্রহ করে সেখানেই আপনি সুখ-বিলাসে সময় অতিবাহিত করুন, ভদ্র। এ উদ্যানে আমরা বিহার করছি। এখানে আপনার থাকা শোভা পায় না।

রাজকুমারী মুরাকে কাছে পেয়ে হীরা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। খপ করে ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বলে, অতসব কি হিসেব করে চলে, জীবনটা অঙ্ক নয়, রাজকুমারী—

রাজকুমারী মুরা জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কষে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয় হীরার গালে। তারপর হনহন করে হেঁটে বাগান থেকে বেরিয়ে চলে যায় প্রাসাদের অন্দরমহলে।

হীরা ব্যর্থ বিষণ্ন হয়ে নিজের কক্ষে ফিরে আসে। সেখানে কিন্তু প্রায় সারা দিন-রাত রাজকুমারীর সখীরা তার পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকে নিয়ত। তার পালঙ্কে শয্যা রচনা করা, নানা উপচারে খানাপিনা সাজিয়ে দেওয়া, সুমধুর সঙ্গীত-বাদ্যে মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলা প্রভৃতিতে কোনই ত্রুটি রাখলো না তারা।

পরদিন একসময় মতিয়া হীরাকে একা পেয়ে প্রেম-নিবেদন করলো তার কাছে,

আমি জানি, আমি তোমার যোগ্য নই, তবু তোমাকে দেখা মাত্র আমি ভালোবাসার আগুনে জ্বলছি। শুধু একটু দয়া কর, তোমার প্রেমের ভিখারিণী আমি, আমাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিও না তুমি। অবশ্য তার বদলে আমি তোমার অনেক উপকার করবো। তুমি যে ফাঁদে এসে পা রেখেছ, এ ফাঁদে কত শত রাজা-বাদশার ছেলে প্রাণ দিয়ে গেছে এর আগে জানো বোধ হয়। তোমারও সেই একই দশা হবে! এ অনিবার্য! একমাত্র আমিই পারি তোমাকে বাঁচাতে!

হীরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, কী ভাবে?

হীরার কিন্তু সন্দেহ জাগে, হয়তো রাজকুমারী মুরাই মেয়েটিকে পাঠিয়েছে চর হিসাবে। মতিয়া বলে, রাজকুমারী মুরার দুঃসাধ্য প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে বহু শত প্রাণ বলি হয়েছে। আমি জানি ঐ কঠিন প্রশ্নের জবাব তুমিও দিতে পারবে না, এবং তোমারও ঐ একই দশা হবে। আমাকে বিশ্বাস কর শাহজাদা, আমি তোমাকে বাঁচার উপায় বাৎলে দেব। কিন্তু একটা শর্ত—আমাকে বিয়ে করে তোমার অঙ্কশায়িনী করতে হবে। আমি হবো তোমার বেগমদের প্রধান। বলো, রাজি?

হীরা তৎক্ষণাৎ মতিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বললো, আমি রাজি।

মতিয়া বলে, আমাদের রাজকুমারীর পালঙ্কের তলায় একটা হাবশী আছে। লোকটা এসেছে ওয়াকাক থেকে। ঐ লোকটার মাথা থেকে বেরোয় যতসব উদ্ভট প্রশ্ন। সবই ফিরকোন এবং সাইপ্রাস সম্বন্ধে। সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না কেউ। দেওয়া সম্ভবও না। যদি তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর করতে চাও তোমাকে আগে যেতে হবে সেই ওয়াকাক দ্বীপে। সেখানে গেলেই তুমি তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে। কিন্তু সে পথ বড় দুর্গম। তবু তোমাকে যেতেই হবে সেখানে।

মতিয়ার কাছ থেকে পথ-নির্দেশ নিয়ে হীরা ওয়াকাকের পথে ঘোড়া ছুটালো।

চলতে চলতে এক মরূদ্যানে এসে এক গাছের তলায় এক দরবেশের দেখা পেলো হীরা। তার পরিধানে সবুজ আলখাল্লা, পায়ে হলুদ রঙের চপ্পল। ঘোড়া থেকে নেমে যথাবিহিত সালাম সম্মান জানিয়ে হীরা জিজ্ঞেস করলে, মেহেরবানী করে আমাকে ওয়াকাকের পথ বলে দিন, পীরসাহেব।

পুণ্যাত্মা দরবেশ ক্ষণকাল মৌন হয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, বেটা, তুমি শাহেনশাহর পুত্র, ঐ মানুষের অগম্য স্থানে তুমি যেতে পারবে না, অত দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারবে না তুমি। ওপথে গেলে কেউ আর ফিরতে পারে না, প্রাণ হারাতে হয়। তাই বলছি, বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

হীরা যুক্তকরে মিনতি করে, আপনি মহানুভব পীর, আপনার আজ্ঞা আমি শিরোধার্য করেই বলছি, ফিরে যাওয়ার জন্য আমি পথে বেরোইনি। আপনি আমাকে পথ বলে দিন।

দরবেশ বুঝলেন শাহজাদাকে নিরস্ত করা যাবে না। তাই বললেন, শোনো বাছা ওয়াকাক দুস্তর কাফ পর্বতমালার ঠিক মাঝখানে। আমি জানি না ঐ দুর্গম গিরিসঙ্কুল পথ পারি দিয়ে কি করে সেখানে পৌঁছতে পারবে তুমি। তুমি কি জান, ঐ কাকে একমাত্র জিন পরীরাই বসবাস করে? সেখানে কোনও মানব-সন্তান অদ্যাবধি পৌঁছাতে পারেনি। এখান থেকে যাওয়ার তিনটি পথ আছে। কিন্তু তার মধ্যে একটিমাত্র পথ কিছুটা চলার উপযোগী। আর দু'টি একেবারেই দুর্লঙ্ঘ্য। যদি তুমি যাবেই ঠিক করে থাক তবে কাল অতি প্রত্যুষে এই ডানদিকের পথ

ধরে এগিয়ে যাবে। যেতে যেতে একসময় এক পাহাড়-পাদদেশে পৌঁছে একখণ্ড শিলালিপি দেখতে পাবে। লেখাটা কিউফিস কায়দায় প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করা আছে। সহজেই পড়তে পারবে সে লেখা। তা থেকেই তুমি যথাযথ নির্দেশ পেয়ে যাবে।

পরদিন সকালে যাত্রা শুরু করে যথাসময়ে সে এক পাহাড়-পাদদেশে পৌঁছে সেই প্রস্তরফলক দেখতে পেলো। পাথরে খোদাই করে তিনটি কথা লেখা ছিলো ঃ

যদি তুমি বাঁদিকের পথ ধরো, তবে তোমাকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যদি তুমি ডানদিকের পথ ধরে চলো, তবে পরিশেষে অনুতাপ করতে হবে। আর যদি মাঝের রাস্তায় যাও তবে দেখবে সে কি দুর্গম ভয়াল ভয়ঙ্কর পথ।

শিলালিপি পাঠান্তে শাহজাদা হীরা মাঝের দুর্গম পথই বেছে নিলো। এক মুঠি ধরণীর মাটি বুকে করে নিয়ে সোজা ওপরের দিকে উঠতে লাগলো। আল্লা যদি চান ঐ পাহাড়চূড়ায় ওঠার আগেই ভূপতিত হয়ে রেণু রেণু হয়ে যাবো।'

পুরো একটা দিন আর রাত্রি পার হয়ে গেলো। ভোরের আলো ফুটতেই চোখে পড়লো এক বেহেস্তের মনোরম দৃশ্য। লতাপাতা তরুশাখায় পল্লবিত কুসুমিত এক অনিন্দ্যসুন্দর উদ্যান। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আরও কাছে এসে বুঝতে পারলো বাগানের প্রবেশদ্বার এক বিশাল পাথরের চাঁই-এ অবরুদ্ধ করা আছে। এবং তার পাশেই প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে এক দৈত্যাকৃতি বিকট বিশাল নিগ্রো। তার মাথায় শিরস্ত্রাণ, দেহে লৌহবর্ম বুকে ঢাল এবং হাতে শাণিত খড়্গ। লোকটা চিৎপাত হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

শাহজাদা হীরা নির্ভয়ে ঘোড়া থেকে নামলো। ঘোড়াটাকে নিগ্রোর মাথার কাছে খুঁটো করে পাথরের চাঁই বেয়ে ওপরে উঠে বাগানের মধ্যে নেমে গেলো সে।

খানিকটা এগিয়ে যেতে হীরা দেখতে পেলো একটি সুন্দর কুটীর। দরজা হাট করে খোলা। ঘরের ভিতরে এক রূপসী কন্যাকে দেখে বিমুগ্ধ হয়ে গেলো হীরা।

মেয়েটিও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কে গো তুমি সুন্দর, এখানে এই বাগানে একটা পাখি পর্যন্ত উড়ে এসে বসতে সাহস পায় না, আর তুমি একজন মানুষ হয়ে কী করে প্রবেশ করলে?

এই কন্যার নাম লতিফা। হীরা আভূমি আনত হয়ে অভিবাদন জানালো ওকে।

—কে তুমি অনিন্দ্যসুন্দরী, জানি না। আমার নাম শাহজাদা হীরা। আমার বাবা...

নাম ধাম বংশ পরিচয় এবং তার আগমনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি একটানা সব গড় গড় করে বলে গেলো হীরা।

সব শোনার পর লতিফা শাহজাদা হীরার হাত ধরে নিজের পাশে বসালো।

—কী ভীষণ কাজে তুমি পা বাড়িয়েছ সুন্দর, এতে যে তোমার প্রাণসংশয় হবে। এমন মরণফাঁদে পা দিতে গেলে তুমি? হায় হায়, এখন কী করে এ সর্বনাশা পথ থেকে রেহাই পাবে তুমি? এ যে কী সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর কাজ কী করে বোঝাবো তোমাকে। যদি তোমার নিজের জীবনের প্রতি এতটুকু দরদ থাকে তবে তুমি আর এগিও না, এখানেই বিরত হয়ে আমার দেহ-মনের একমাত্র মালিক বনে থাক আমার কাছে। আমাকে সুখের সায়রে ভাসিয়ে রাখ, এই আমার কামনা। আমার মনে হয় এক ভয়াল ভয়ঙ্কর কালোছায়ার কবলে পড়ে জান কবুল করার চেয়ে আমার মতো এক সুন্দরী মদালসার বুকে আশ্রয় নিয়ে সুখ-সম্ভোগে জীবন পরিপূর্ণ করাই শ্রেয়ঃ তোমার পক্ষে।

হীরা বললো, তোমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখতে চাই না সুন্দরী, কিন্তু সবই সম্ভব হতে

পারে যদি আমি ঐ ওয়াকাক দ্বীপে গিয়ে ফিরকোন আর সাইপ্রাস সম্বন্ধীয় কঠিন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরতে পারি। এবং আমার বিশ্বাস আমি সে কাজ সমাধা করে সশরীরে ফিরে আসবোই। তারপর তোমাকে সুখ দিতে আমার বাধা থাকবে না, সুন্দরী। কিন্তু এখন আমার চলার পথে তুমি আমাকে বাধা দিও না। কথা দিচ্ছি, ফিরে এসে তোমাকে হৃদয়ের মণি করে রাখবো আমি। তোমার সব কামনা বাসনা চরিতার্থ করবো।

লতিফা আর্তনাদ করে ওঠে, না-না সে হবে না, হতে পারে না, ঐ মৃত্যুর গহ্বরে তোমাকে প্রবেশ করতে দেব না আমি—কিছুতেই না।

লতিফার ডাকে তার সখী-সাথীরা এসে বসলো চারধারে। মদের পেয়ালা পরিপূর্ণ করে নিজে হাতে তুলে ধরলো লতিফা, নাও তৃষ্ণা নিবারণ কর, সোনা।

হীরা একচুমুকে নিঃশেষ করে দিলো পাত্রটি। আবার লতিফা ভরে দিলো পেয়ালা।

সঙ্গীতে বাদ্যে মুখর হয়ে উঠলো কুঞ্জবন। লতিফা হীরার কণ্ঠলগ্ন হয়ে লাস্যময় কণ্ঠে মিনতি করলো, এতো সুন্দর বেহস্ত ছেড়ে কোথায় যেতে চাও, সোনা?

হীরা এতক্ষণ সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলো। লতিফাকে ছাড়িয়ে দিয়ে বললো, এবার আমাকে যেতে হবে সুন্দরী। বিদায় দাও। আর যদি কিছুক্ষণ এখানে আমি থাকি তবে মহব্বতের যে-আগুন জ্বালিয়ে দিতে চাইছ আমার বুকে, তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আমার সব প্রতিজ্ঞা শপথ ছাই করে দেবে। সুতরাং আর নয়, এবার বিদায় দাও শাহজাদী। খোদা যদি ইচ্ছা করেন, তবে আবার আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে। সেদিন তুমি আমাকে যেমন ভাবে চাও প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেও, আমি 'না' বলবো না।

লতিফা ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো ফণা মেলে রুখে দাঁড়ালো, না, তা হবে না। আমি তোমাকে ছাড়বো না কিছুতেই।

এই বলে সে বিড় বিড় করে কী যেন সব মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে সামনে এগিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে এক ঘুষি বসিয়ে দিলো হীরার বুকে।

এই অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে হীরা চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেলো ঘাসের ওপর। গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে দু' তিনবার গড়াগড়ি খেলো। ব্যস, তার পরই সে সুন্দর একটি হরিণ শাবকের আকার ধারণ করলো। লতিফা ওর শিং-এ একটি মহামূল্যবান রত্নবলয় পরিয়ে দিয়ে বললো, কী কেমন লাগছে সখা? ঐ দ্রাক্ষাবনে তোমার মতো আরও অনেক হরিণ-শাবকরা চরে বেড়াচ্ছে, যাও তাদের সঙ্গে গিয়ে খেলা করগে, সোনা।

পিঠে মৃদু করাঘাত করে হরিণ-শাবক হীরাকে আঙুরক্ষেতের দিকে পাঠিয়ে দিলো লতিফা।

হীরা কিন্তু অন্য হরিণদের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলো না। সুযোগ বুঝে টুক করে এক সময় বাগানের দেওয়ালের দিকে চলে গেলো। এক জায়গায় প্রাচীরটা বেশ নিচু দেখে এক লাফে বাগানের বাইরে গিয়ে পড়লো হীরা। তারপর দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলতে থাকলো সে।

কিন্তু হায় একটানা বহুক্ষণ তীরবেগে ছোটার পরও সে বুঝতে পারলো, যেখান থেকে পালিয়েছিলো ঘুরে ফিরে আবার সেই বাগানেই গোলকধাঁধায় এসে পড়েছে সে।

আবার সে বাগান টপকে বাইরে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য সেবারও সে ফিরে আসে ঐ বাগানেরই খাঁচায়। এইভাবে পর পর সাতবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বাগানের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এক জায়গায় এসে সে প্রাচীরের গায়ে একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি মতো দেখতে পেয়ে তার মধ্যে দিয়ে শরীরটাকে চালান করে দিলো।

এবার সে দেখতে পেলো এক সুরম্য প্রাসাদ।

প্রাসাদের এক গবাক্ষে বসেছিলো এক পরমাসুন্দরী শাহজাদী। হরিণরূপে হীরাকে দেখতে পেয়ে সে আনন্দে নেচে ওঠে। হাতে নেড়ে নেড়ে আদর জানিয়ে কাছে ডাকতে থাকে হীরাকে।

হীরা জানলার দিকে এগিয়ে যায়। সুন্দরী তখন বাইরে বেরিয়ে এসে হীরার সামনে এক মুঠো ঘাস ধরে ডাকে, আয় আয়।

হীরা ক্ষুধার্তের মতোই শাহজাদীর কাছে ছুটে যায়। হাতের নাগালের মধ্যে আসতেই শাহজাদী জামিলা খপ করে চেপে ধরে হরিণটাকে।

এই জামিলা শাহজাদী লতিফার কনিষ্ঠা। ওদের দু'জনের বাবা এক কিন্তু মা আলাদা।

একগাছি রেশমি রশিতে বেঁধে হরিণ-হীরাকে সে প্রাসাদের অন্দরমহলে নিয়ে গেলো। সেখানে সে হীরাকে নানারকম মিষ্টি মিষ্টি ফলমূল খাওয়ালো। এবং হীরা যতটা পারলো পেটপুরে খেয়ে নিলো সব।

খাওয়া শেষ হলে হরিণ-হীরা তার মাথাটা জামিলার কাঁধের ওপর রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। শাহজাদী ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো খুব।

এর পর হীরা তার মাথাটা শাহজাদীর পায়ের ওপর রেখে আবার কাঁদতে লাগলো।

—কী? কী হয়েছে, অমন করে কাঁদছো কেন তুমি? না না, অমন করে কেঁদ না সোনা, তোমার চোখে পানি আমি সইতে পারছি না। আমি তোমাকে জান দিয়ে ভালোবাসবো, আদর যত্ন করবো। আমাকে ছেড়ে পালাবে না তো?

হীরার কান্না আরও বেড়ে যায়। নানা ভাবে সে মনের ভাষা ব্যক্ত করে বোঝাতে চেষ্টা করে জামিলাকে। জামিলার কেমন খটকা লাগে, বনের পশু এমন মানুষের মতো আচরণ শিখবে কী করে? নিশ্চয়ই এ কোন যাদু করা মানব-সন্তান। কেউ তাকে মন্ত্র দিয়ে হরিণ বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু লতিফা ছাড়া এ যাদু তো এখানে আর কেউ জানে না। তবে কি তারই দিদির অপকর্ম এটা।

লতিফাকে সে বাঘের মতো ভয় করে, তবু সব ভয় তুচ্ছ করে জামিলা তার দিদির ছোট্ট রত্ন-কৌটোটাকে তার ঘরের কুলুঙ্গী থেকে হাতিয়ে নিয়ে এলো। তারপর প্রথামতো মুখ হাত ধুয়ে নতুন সাজ-পোশাকে খুব সুন্দর করে সাজগোজ করলো সে।

কৌটোটা খুলে তার ভেতর থেকে খানিকটা মন্ত্রপূত মণ্ডা তুলে নিয়ে হরিণটার মুখের মধ্যে পুরে দিলো জামিলা। আর কি আশ্চর্য সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা গা ঝাড়া দিয়ে হীরা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো দশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আভূমি আনত হয়ে জামিলাকে কুর্ণিশ জানায় হীরা। বলে, তুমি আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছ সুন্দরী, কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো, কী ভাবে তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো, বুঝতে পারছি না।

জামিলা বললো, ও সব থাক, এখন এসো তোমাকে মনের মতো করে সাজাই।

শাহজাদার সাজে পরিপাটি করে সাজালো সে হীরাকে।

—কেনই বা তুমি এদেশে এসেছিলে, আর কেনই বা তুমি আমার যাদুকরী দিদির জালে ধরা দিয়েছিলে?

শাহজাদা হীরা আদ্যোপান্ত সব কাহিনীই খুলে বললো জামিলাকে।

সব শোনার পর জামিলা আতঙ্কিত হয়ে বললো, না না, ও মতলব তুমি ত্যাগ কর সোনামণি। অমন মরণফাঁদে ঝাঁপ দিতে যেও না তুমি। তোমার মতো এমন সুন্দর মূল্যবান প্রাণ এভাবে নষ্ট করে দিও না। তার চেয়ে বরং এখানেই তুমি সুখে সম্ভোগে সারাটা জীবন কাটিয়ে দাও। আমি তোমার পেয়ারের বাঁদী হয়ে থাকবো চিরকাল। তোমার জীবনের কোনও সাধই অপূর্ণ রাখবো না আমি। আমি যা বলছি সুবোধ ছেলের মতো কান পেতে শোনো। এর চেয়ে ভালো আর কিছুতেই হবে না তোমার।

হীরা বললো, তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না কোনও দিন। তুমি অনুগ্রহ করে আবার আমাকে মানুষ না করে দিলে হয়তো যতদিন বাঁচতাম হরিণ-শাবক হয়েই বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হতো। তারপর হয়তো কোনও দিন কোনও এক হিংস্র বন্য জানোয়ারের পেটে চলে যেতাম। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি তোমার কাছে কয়েকটা দিনের ছুটি প্রার্থনা করছি, সুন্দরী। তুমি আমাকে খুশি মনে বিদায় দাও। ওপরে মেহেরবান আল্লাহ আছেন, তার দোয়ায় আবার আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে। তুমি আমাকে বাধা দিও না, ওয়াকাক দ্বীপে আমাকে যেতেই হবে। সেখান থেকে আনতে হবে ফিরকোন আর সাইপ্রাস সম্পর্কের জটিল সূত্র। ওয়াকাক থেকে ফিরে আসার পর আমি তোমাকে বুকে করে সারাটা জীবন সুখে কাটাবো; কথা দিচ্ছি।

শাহজাদী জামিলা বুঝতে পারলো হীরাকে কিছুতেই বিরত করা যাবে না। সুতরাং বাধা দিয়ে কোনও লাভ নাই।

—শোনো সোনা, নিয়তিকে কেউই এড়াতে পারে না। তোমার নিয়তি তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় জানি না। যাবে যখন পণ করেছ, আমি তোমাকে আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তিনটি বস্তু উপহার দেব। ওগুলো সঙ্গে রাখলে অনেক বিপদ এড়াতে পারবে তুমি।

একটা সিন্দুক খুলে একখানা সোনার তীরধনুক বের করলো জামিলা। আর বের করলো চীনা ইস্পাতের তৈরি একখানা শাণিত তলোয়ার এবং ঝকঝকে একটি তীক্ষ্ণ ফলা ভোজালী।

জামিলা বললো, এই যে সোনার তীরধনুক দেখছো, এটা ব্যবহার করতেন পয়গম্বর সালিহ্। এই তলোয়ারখানার নাম বজ্রবিছা—এটা ছিলো সুলেমানের। এর এমন ধার পাথরের চাঁইও এক কোপে সাবানের মতো কেটে নেমে যেতে পারে। আর এই ভোজালীখানার মালিক ছিলেন পরমাত্মা তামুজের। এর ফলা পূত পবিত্র মন্ত্রে শোধন করা আছে। তাই, এই অস্ত্র হাতে থাকলে সম্মুখসমরে কেউই পরাজিত করতে পারবে না তোমাকে। এগুলো তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। ভালোয় ভালোয় ফিরে এসে আবার আমাকে ফেরত দিও। কিন্তু সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে ঐ ওয়াকাক দ্বীপে তুমি পৌঁছবে কি করে। ওখানে কি কোনও মানব-সন্তান পৌঁছতে পারে কখনও? তবে হ্যাঁ, আমার চাচা সিমুর্গ যদি তোমাকে সাহায্য করেন তবে তুমি যেতে পারবে। একমাত্র তাঁরই জানা আছে ঐ পথঘাট। শোনো তোমাকে কানে কানে একটা কথা বলছি, খুব খেয়াল করে শুনবে।

এখান থেকে একটানা একদিন চলার পর একটা ঝরণা দেখতে পাবে। সেই ঝরণার পাশে দেখবে এক বিশাল প্রাসাদ। সেখানকার নরপতি এক নিগ্রো সম্রাট। তাঁর নাম টাকটাক। তার চারপাশে চল্লিশটি দৈত্যাকৃতির লালমুখো ইথিওপিয়ার জাঁদরেল সেনাপতিরা ঘিরে আছে। তাদের প্রত্যেকের অধীন নিগ্রো-সম্রাটের পাঁচ হাজার সৈন্যের এক একটি বাহিনী আছে।

তোমাকে দেখে নিগ্রো-সম্রাট তোমার বন্ধু হয়ে যাবেন। তার কারণ যে সব মহাস্ত্র তোমাকে আমি দিলাম সেগুলো দেখে তিনি মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়ে যাবেন।

অবশ্য তুমি তাঁর আতিথ্যে দু'টো দিন কাটাবে সেখানে। তারপর তিনি তোমাকে আমার চাচার প্রাসাদে পাঠিয়ে দেবেন। আমার এই চাচাই একমাত্র মানুষ যিনি ওয়াকাকের সঠিক রাস্তা বাৎলে দিতে পারবেন। কিন্তু সোনা, যা বললাম তার এক চুল এদিক ওদিক কিছু

করবে না, তাতে প্রাণ সংশয় ঘটতে পারে। কিন্তু আল্লা না করুন, সে রকম যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে তবে আমার এ জীবন আমি আর রাখবো না। আমার দেহ মন প্রাণ সব তোমাকে সঁপে দিয়েছি। এখন থেকে তুমি ছাড়া আমার কোনও দ্বিতীয় চিন্তা থাকবে না। যতদিন তুমি না ফিরে আস, তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবো আমি। মুখে খানাপিনা রুচবে না, চোখে নিদ আসবে না ! দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটবে আমার দিবস-রজনী। শুধু এইটুকু ভেবে তুমি খুব সাবধানে সতর্কভাবে আমার কথামতো চলবে।

জামিলা হীরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমায় চুমায় ভরে দিতে থাকলো।

জামিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চেপে পুরো একটা দিন চলার পর টাকটাক সম্রাটের প্রাসাদে এসে পৌঁছলো হীরা।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো এগারোতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে ঃ

প্রাসাদের দ্বাররক্ষী ইথিওপিয়ার হাবসী পালোয়ানদের একজন শাহজাদা হীরাকে দেখে দাঁত বের করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, যাক বাবা এতদিন বাদে একটা ফলার হবে মনে হচ্ছে। একেবারে নধরকান্তি শাহজাদা, তেল চকচকে শরীর, ওহো বেড়ে স্বাদের হবে মাংস—

অন্য এক প্রহরী বলে, আর দেরি নয়, চটপট ওকে কাঁধে তুলে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া যাক, কি বলো?

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দশ-বারজন প্রহরী ঘেরাও করে ফেললো হীরাকে। শাহজাদা বুঝতে পারলো বিপদ আসন্ন। তৎক্ষণাৎ সে তরবারী কোষমুক্ত করে বাঁই বাঁই করে চালাতে লাগলো চতুর্দিকে। এবং সুলেমানের আশ্চর্য তরবারীর এক এক কোপে কচুকাটা হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলো সেই সব বীরপুরুষা।

এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে ছুটে গিয়ে একজন সম্রাটকে ঘটনার বিবরণ জানালো।

সম্রাট তো ক্ষেপে আগুন হলেন। প্রধান সেনাপতি মাকসাককে হুকুম করলেন, এই মুহূর্তে পাকাড়াও করে নিয়ে এসো তাকে আমার সামনে।

এই মাকসাক বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা। তাকে পরাস্ত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রাসাদ-ফটকে ছুটে এসে সে হীরাকে দেখতে পেয়েই বিকট আওয়াজ তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। কিন্তু হীরা তৈরিই ছিলো! পলকের মধ্যে সে তামুজের ভোজালীখানা সোজা ঢুকিয়ে দিতে পারলো মাকসাকের কলিজায়। একটা পাহাড় যেন খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেলো, গগন বিদারী আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো প্রধান সেনাপতি সাহেব। আর উঠলো না।

প্রধান সেনাপতির পতন দেখে তার সাঙ্গপাঙ্গরা যে যার প্রাণ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু হীরা পিছু ধাওয়া করে তাদের জনাকয়েককে কোতল করে ফেললো পলকের মধ্যে।

মাকসাক নিহত হয়েছে শুনে সম্রাট টাকটাক ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তাঁর তাঁবৎ সেনাপতিদের হুকুম করলেন, তোমরা এখনও এখানে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছ? যাও, এক্ষুণি লোকটার মুণ্ডু এনে হাজির কর আমার সামনে।

সম্রাটের হুকুম সত্ত্বেও একটি সেনাপতিও কিন্তু এক পা নড়লো না সেখান থেকে। ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকলো সকলে।

শাহজাদা হীরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বাইরের ফটকে। আশা করেছিলো আবার হয়তো কোনও বীরপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু তা হলো না দেখে সে পায়ে পায়ে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলো।

একটি দরজায় টোকা দিতেই একটি মেয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো। হীরা প্রবেশ করলো ঘরের মধ্যে। মেয়েটি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো।

সম্রাট টাকটাক রুখে এলেন হীরাকে খতম করে দেবার জন্য। তাঁর হাতে উদ্যত খড়্গ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হীরা বুঝতে পারলো ঐ বিশাল অস্ত্রের সঙ্গে সম্মুখসমরে লড়াই করা তার পক্ষে শক্ত। তাই সে হাতে নিলো সালিহর তীরধনুক।

অব্যর্থ লক্ষ্য। একটি মাত্র বাণে সম্রাট টাকটাক ধরাশায়ী হলেন। মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠলো, বাবা—

হীরা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, কেঁদ না রাজকুমারী, কেঁদ না! ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না। এইভাবে আমার হাতে তোমার বাবা নিহত হবেন এই তাঁর লিখন ছিলো। সেই কারণেই তা ঘটেছে। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। মৃত্যু তাঁর হতোই আজ, ইহজগতের মেয়াদ তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছিলো, তাই তাঁকে চলে যেতে হলো। এ তো আনন্দের কথা, সুখের কথা তুমি বৃথা শোক করো না, সুন্দরী।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী, সুন্দর?

ইসলামই আমার একমাত্র ধর্ম, রাজকুমারী।

—আপনার ধর্মের মূল মন্ত্র কী, শাহজাদা?

হীরা বললো, এককথায় বলতে গেলে আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর বাণী ঃ আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি। যারা মনে প্রাণে ইসলামে বিশ্বাস করে তারাই প্রকৃত মুসলমান। এছাড়া বিধর্মীরা কাফের। তাদের অনন্তকাল দোজকবাস হয়!

রাজকুমারী আজিজা ইসলামে অনুরক্ত হয়ে পড়লো। বললো, তোমার ধর্মই আমার ধর্ম, তোমার পথই আমার পথ, শাহজাদা। আজ থেকে আমি ইসলামধর্মে দীক্ষা নিলাম।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো বারোতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এবার আপনি আমাকে আপনার বেগম করে নিন, শাহজাদা। আমি আপনার সঙ্গে চলে যেতে চাই।

হীরা বললো, রাজকুমারী তোমার প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করে ধন্য হবো! কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব না। তার কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি এখানে, আগে সেই কাজ সমাধা করতে হবে। তারপর অবশ্যই তোমাকে আমি শাদী করে দেশে নিয়ে যাবো। আমার মা এবং বাবা শাহেনশাহ সামস শাহ আমার পথ চেয়ে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছেন। সুতরাং আগে কাজ সমাধা করে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। ওয়াকাক দ্বীপ না পৌঁছানো পর্যন্ত আমার অন্য কোনও চিন্তা নাই। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর। আমি কথা দিচ্ছি, আমার কাজ শেষ হলে তোমাকে শাদী করে সঙ্গে নিয়ে যাব। বলতে পার কোথায় আমি দেখা পাবো

জামিলার চাচা সিমুর্গ-এর। একমাত্র তিনিই আমাকে দুর্গম ওয়াকাকের পথ-নির্দেশ দিতে পারেন।

রাজকুমারী আজিজা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো! কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না শাহজাদা হীরা। আজিজা বুঝতে পারলো চোখের জল ফেলে শাহজাদার শপথ ভঙ্গ করা যাবে না। তাই সে বললো, ঠিক আছে, আমার সঙ্গে আসুন আমি সিমুর্গ-এর কাছে নিয়ে যাবো আপনাকে।

প্রাসাদের পিছনে বিশাল বাগিচা। আজিজার পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চলে হীরা।

বাগানের মাঝখানে এক বিশাল বটবৃক্ষ। তার নিচে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে এক বিশাল-বপু ঈগল। হীরার কানে কানে ফিস ফিস করে আজিজা বললো, এই সেই সিমুর্গ, জামিলার চাচা। ঐ বিরাট বিরাট ডানা মেলে অবাধে আসমান পথে উড়ে উড়ে চলে। ঘুম ভাঙ্গার পর ও যদি প্রথমে ডান চোখ খুলে তোমাকে দেখে তবে তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। তুমি যা বলবে অবাধে তাই সে করে দেবে। কিন্তু যদি কপাল মন্দ হয় তবে ঘুম ভাঙ্গলে প্রথমে বাঁ চোখ মেলে দেখবে তোমাকে এবং তোমার সব আশা-ভরসা ইতি হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। আর হাজার চেষ্টা করেও ওকে আকাশে ওড়াতে পারবে না। এখন দেখো, আল্লাহ তোমার ভাগ্যে কী লিখে রেখেছেন।

এই বলে আজিজা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাগান থেকে প্রাসাদের দিকে ফিরে চললো। হীরা একাই সেখানে দাঁড়িয়ে সিমুর্গের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সিমুর্গ আড়মোড়া ভেঙ্গে ডান চোখ খুলে তাকালো হীরার দিকে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে সে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো। তুমি এক মানব-সন্তান, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না, এই নিষিদ্ধ দেশে এসে পৌঁছলে কী করে?

তখন শাহজাদা হীরা তার সব কাহিনী খুলে বললো সিমুর্গকে। সিমুর্গ বললো, জামিলা যখন তোমাকে পাঠিয়েছে তবে আর কথা নাই। ঠিক আছে, অপেক্ষা কর, দানাপানির আগে বন্দোবস্ত করে নিই তারপর তোমাকে নিয়ে আকাশে উড়বো! অনেক দিনের পথ, তাই গোটাসাতেক বন্য গাধা মেরে তার মাংসের কাবাব বানিয়ে নিচ্ছি আমি। ঐ কাবাব আর খানিকটা পানি সঙ্গে নিলে আর কোনও ভাবনা থাকবে না।

তখুনি সে উঠে গিয়ে জঙ্গল থেকে সাতটা বুনো গাধা শিকার করে আনলো। আচ্ছা করে পুড়িয়ে কাবাব বানানো হলো। এক জ্বালা জল আর কাবাবগুলো গলায় বেঁধে হীরাকে বললো সে, এসো, আমার পিঠে চেপে বস। তোমাকে নিয়ে আমি উড়ে যাবো ওয়াকাক দ্বীপে।

হঠাৎ এক লাফ দিয়ে ওপরে উঠতে থাকলো সিমুর্গ। শোঁ শোঁ করে একটানা উঠে গেলো মেঘের ওপরে। তারপর দিক্-নির্ণয় করে বায়ুবেগে ছুটে চলতে থাকলো। পাখির মত উড়তে উড়তে অবাধে অনেক সমুদ্র পর্বত হ্রদ নদী প্রান্তর পার হয়ে চললো ওরা। চলতে চলতে ক্ষুধার্ত হলে এক সময় ক্ষণকালের জন্য ধরায় নেমে আসে, খানাপিনা শেষ হলে আবার আকাশ পথে যাত্রা শুরু হয়।

রাত্রির অন্ধকার কেটে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো চৌদ্দতম রজনীতে

আবার সে বলতে থাকে ঃ

এইভাবে সাতটা দিনরাত্রি অতিক্রান্ত হয়। হঠাৎ ওদের নজরে পড়লো এক ঝাঁক উজ্জ্বলে পায়রার মতো একটি চমৎকার শহর। নানারকম তরু বৃক্ষ লতাপাতায় ঘেরা একটি রাজ্যপাট।

সিমুর্গ বললো, তুমি আমার পুত্রতুল্য হীরা। তোমার জন্য এই পথশ্রম আমার কাছে আনন্দেরই হয়েছে। এবার তোমাকে আমি এক বিশাল প্রাসাদের ছাদের ওপর নামিয়ে দেব। এই হচ্ছে সেই ওয়াকাক শহর। রাজকুমারী মুরার পালঙ্কের নিচে যে হাবশীটি অবস্থান

করছে, এই তার স্বদেশ, জন্মভূমি। এখান থেকেই তুমি ফিরকোন আর সাইপ্রাস সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে।

প্রাসাদের ছাদে নামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ সিমুর্গ তার মাথার একগাছি চুল ছিঁড়ে হীরার হাতে দিয়ে বললো, যদি কখনও খুব প্রয়োজন হয় এই চুলে আগুন ধরিয়ে দিও। যেখানেই থাকি বায়ুবেগে ছুটে আসবো তোমার কাছে।

এই বলে সে আবার শূন্যলোকে উঠে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ছাদের ওপর বসে বসে একমনে ভাবছিলো হীরা। হঠাৎ তার ভাবনায় ছেদ পড়লো এক মধুর কণ্ঠস্বরে।

—কে আপনি নরবর, আমার এই প্রাসাদে পদার্পণ করে ধন্য করেছেন আমাকে? আপনার মতো রূপবান মানুষ আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। জানি না মানব-সন্তান এমন নিখুঁত সুন্দর হতে পারে কিনা। আপনি কি বেহেস্তলোকের কোনও জীন?

শাহজাদা হীরা বলে, না না আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি ধরারই মনুষ্যসন্তান। নিয়তিই আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে।

নওজোয়ান যুবক হীরার হাতে ধরে সিঁড়ি বেয়ে প্রাসাদের নিচে নেমে গেলো।

অতিথিশালার এক সুসজ্জিত মনোরম কক্ষ। হীরা মুগ্ধ চোখে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো। যুবক বললো, এই আপনার থাকবার ঘর। যদি আদর-যত্নের কোনও ত্রুটি ঘটে নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন।

দু'জনে বসে একত্রে আহারাদি সমাধা করলো। পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হতে থাকে।

যুবকের নাম ফারাহ, ওয়াকক সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।

কথায় কথায় হীরা বলে, দোস্ত ফারাহ, তোমার কথায় বুঝতে পারলাম সম্রাট তোমাকে বিশেষ নেকনজরে দেখেন। তাহলে এও নিশ্চয়ই সম্ভব, তাঁর সাম্রাজ্যের বহু গোপন বিষয়ও তোমার গোচরে এসেছে।

ফারাহ বললো, অবশ্যই। তোমার কী কী জানা প্রয়োজন, বলো। আমি যেভাবেই পারি তা সংগ্রহ করে দেব তোমাকে।

হীরা বললো, মাত্র একটি প্রশ্নেরই সঠিক জবাব আমি জানতে চাই, ফারাহ। তা হলো ঃ ফিরকোন এবং সাইপ্রাসবাসীদের প্রকৃত সম্পর্ক কী? শুধু এই উত্তরটুকু পেলেই আমার এতো শ্রম সার্থক হবে। এই সঙ্গে তুমি আমাকে আর একটি রহস্যের সন্ধান করে দাও, এখানকার এক নিগ্রো যুবক কেনই বা সিন মাসিন সম্রাট-দুহিতা মুরার শয্যাকক্ষে পালঙ্কতলায় অবস্থান করছে?

হীরার এই কথা শুনে ফারাহর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। ভূত দেখার মতো দু-পা পিছিয়ে গেলো সে।

—না না, ও কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, দোস্ত। অন্য যে কোনও কথা জানতে চাও আমি এখুনি তোমাকে বলে দিচ্ছি। কিন্তু দোহাই তোমার, এই গোপন তথ্য তুমি জানতে চেও না আমার কাছে! আমাদের সম্রাটের ফরমান যদি কোন বিদেশীর কাছে কেউ সাইপ্রাস বা তার সম্রাজ্ঞী ফিরকোন সম্বন্ধে কোনও কথা উচ্চারণ করে তার ফাঁসী হবে।

নিগ্রো এবং রাজকুমারী মুরার ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। যদি তুমি ইচ্ছা কর আমি তোমাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যেতে পারি। তিনি যদি তোমার আচরণে মুগ্ধ হয়ে কিছু বলেন সে কথা আলাদা।

হীরাকে সঙ্গে করে যুবক সাইপ্রাস সম্রাটের সামনে এসে অভিবাদন জানালো। হীরাকে দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। অনেকক্ষণ তিনি অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন হীরার দিকে। হীরা তার গলা থেকে লাল মুক্তোর মহা-মূল্যবান হারটা খুলে সম্রাটের হাতে তুলে দিলো। এ তার ভেট। সম্রাট বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, হারটা অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য অমূল্য রত্ন দিয়ে তৈরি। তাঁর সারা ওয়াকাক সাম্রাজ্যের তাবৎ সম্পদের চেয়েও দামী। সম্রাট হীরার উপহার সানন্দে গ্রহণ করে বললেন, এর প্রতিদানে তুমি যা চাও, তাই আমি দিতে পারি যুবক, বলো কী চাও?

হীরা বললো, আপনি মহানুভব সম্রাট, আপনি আপনার নিজগুণে মহিমান্বিত। যদি অভয় দেন তবে আমার আর্জি পেশ করতে পারি।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো পনেরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সম্রাট অভয় দিলে বললেন, কোনও ভয় নাই, দ্বিধা না করে নির্ভয়ে তুমি বলো। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

হীরা মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ক্ষণকাল। তারপর বললো, মহারাজাধিরাজ, অন্ধ ও বধিররাই এ জগতে সুখী। কারণ দুনিয়ার যা কিছু দুরাচার তা তারা দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। আমি আপনাকে আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করছি, আপনি নিজগুণে আমাকে মার্জনা করবেন।

এই বলে হীরা তার ওয়াকাক আসার আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলো সম্রাটের সামনে।

—বলতে পারেন, আমার নিয়তিই আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে আপনার সামনে। এবার আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন নরপতি, এই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আপনি বলুন, আমাদের মহানুভব সম্রাটের সঙ্গে মহিয়সী সাম্রাজ্ঞী ফিরকোনের প্রকৃত সম্পর্ক কী? আর রাজকুমারী মুরার শয্যাকক্ষে অবস্থান করছে সেই নিগ্রোটাই বা কে?

সাইপ্রাস-সম্রাট ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন। পলকে পরিবর্তিত হয়ে গেলো তাঁর মুখমণ্ডল। সে অতি ভয়াল ভয়ঙ্কর। মনে হলো এখুনি বুঝি সে চিৎকার করে গগন ফাটিয়ে দেবে। থর থর করে কাঁপতে লাগলো তাঁর সারা শরীর। ঘেমে নেয়ে উঠলেন তিনি।

—কে তুমি পরদেশী যুবক! নেহাতই আজই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, না হলে যে কথা তুমি উচ্চারণ করেছ, তারপর এতক্ষণ তোমার ঘাড়ে মাথাটা থাকতো না।

প্রচণ্ড জোরে তিনি একটা ঘুষি বসিয়ে দিলেন সিংহাসনের হাতলে।

হীরা যুক্ত করে মিনতি জানায়, অধমের ঔদ্ধত্য মার্জনা করুন, প্রভু। আপনি আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাই প্রশ্ন তুলতে সাহস করেছি আমি। আপনি কথা দিয়েছেন আমার অভিলাষ অপূর্ণ রাখবেন না।

নিরূপায় সাইপ্রাস-সম্রাট হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি। এখন কিছুতেই মুক্তি নাই তাঁর।

সম্রাট বললেন, শোনো শামস শাহজাদা, কেন তুমি এ কথা জানতে চেয়ে আমাকে

কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে চাইছ? তার চেয়ে এ প্রশ্ন তুলে নিয়ে অন্য কোনও কিছু যাচ্ঞা কর আমার কাছে। আমি তোমাকে আমার রাজত্বের অর্ধেকও দিয়ে দিতে পারি খুশি মনে। কিন্তু ঐ প্রশ্নের উত্তর জানতে চেও না আমার কাছে।

হীরা বললো, আপনার ধন-দৌলত, নারী, সাম্রাজ্যে কোনও অভিলাষ নাই আমার। আমি শুধুমাত্র ঐ দু'টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রার্থনা করি আপনার কাছে।

সম্রাট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বেশ, তাই হবে। আমি যখন তোমাকে কথা দিয়েছি, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। কিন্তু শুনে রাখ শাহজাদা, আমার গুপ্ততথ্য শোনার পর তোমার মৃত্যু অবধারিত হয়ে যাবে। তাকে অতিক্রম করা তোমার পক্ষে সম্ভব না কিছুতেই।

হীরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে, তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ অনুতাপ থাকবে না আমার মহারাজাধিরাজ। আমি ঐ গোপন তথ্য জানার পর এ মাথা নিজেই আমি পেতে দেব আপনার ঘাতকের খড়্গতলে। যে কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য এতো দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ করে আপনার দরবারে এসেছি সেই কৌতূহল চরিতার্থ হলেই আমি ধন্য হবো। জীবনের প্রতি আমার কোনও মোহ নাই। আজ হলেও মরতে হবে, কাল হলেও মরতে হবে। এ দুনিয়ায় কেউ চিরকালের জন্য আসেনি।

সম্রাট গভীর মর্মবেদনায় কাতর হয়ে পড়লেন। মাথা নিচু করে নীরব হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর ইশারা করে সবাইকে দরবারকক্ষ ত্যাগ করে বাইরে যেতে নির্দেশ করলেন।

দরবারকক্ষ খালি হয়ে গেলো নিমেষে। একটু পরে বারজন ইথিওপিয়ার লালমুখো সশস্ত্র ফৌজ-এর সঙ্গে পরমাসুন্দরী তরুণী এসে দাঁড়ালো সেখানে। তার হাত দু'খানা পীছমোড়া করে বাঁধা।

একটি বিরাট গালিচার এক প্রান্তে বসেছিলো হীরা। মেয়েটি গিয়ে বসলো তার অপর প্রান্তে। একটি সোনার রেকাবীতে করে একটি নিগ্রোর কাটামুণ্ড এনে স্থাপন করা হলো তরুণীর সম্মুখে। দেখে মনে হয় নরমুণ্ডুটি সদ্য কেটে আনা হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়, এক ধরনের লবণের আরক দিয়ে জারিত করে রাখা হয়েছে মাথাটা। তার ফলে কোনও বিকৃতি ঘটেনি বা পচে যায়নি।

সাইপ্রাস সম্রাট বললো, এই আমার রাণী ফিরকোন।

হীরা বললো, মহারাজ, মহামান্যা সম্রাজ্ঞীকে এখানে উপস্থিত না করলেও কোনও ক্ষতি ছিলো না। আম তার দর্শন প্রার্থনা করিনি। আপনার কাছে শুধু জানতে চেয়েছি আমার প্রশ্নের উত্তরটুকু মাত্র।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হলে এলে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো ষোলতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

হীরার কথা শুনে মহারাণী ফিরকোন হাসলেন একটু, এর পরক্ষণেরই কেঁদে ফেললেন। আর কী আশ্চর্য, তার কান্নার অশ্রু পান্না হয়ে ঝরে পড়লো, এবং হাসির সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি গোলাপ ফুলে ভরে গেলো তার সামনেটা।

সাইপ্রাস সম্রাট বলতে থাকেন ঃ একদিন আমি শিকারে বেরিয়ে এক ধূ ধূ করা মরুপ্রান্তরের মধ্যে দারুণ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিলাম। এদিক ওদিক হন্যে হয়ে ছুটতে থাকলাম এক গণ্ডুষ জলের জন্য। কিন্তু ঐ তপ্ত বালির মধ্যে জল কোথায় পাবো? ক্রমশঃ আমি ভীত

আতঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত যদি তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে না পারি তবে নির্ঘাৎ বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে এই মরুভূমির মধ্যে।

খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় এসে একটা বিরাট ইন্দারা মতো দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম বহু প্রাচীন এক কূপ। অতীত কালে কোনও প্রবল পরাক্রান্ত শাহ বাদশা বহু জনবল প্রয়োগ করে এই মরুভূমির তলদেশে জল সন্ধান করেছিলেন।

দেখে আন্দাজ করতে পারলাম, জল আছে। কিন্তু সে প্রায় পাতালের কাছাকাছি। অত নিচে থেকে ওপরে জল তোলার সরঞ্জাম বলতে তো আমার সঙ্গে নেই কিছু!

অবশেষে আমার মাথার শিরস্ত্রাণ খুলে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিলাম কূয়ার নিচে। ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণ জল স্পর্শ করলো বুঝতে পারলাম, আশায় দুলে উঠলো বুক। যাক, এবার পিপাসার জল পাবো, প্রাণে মরবো না এই মরুদেশে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এই ছোট একটি ধাতুর পাত্র প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওপরে আর ওঠাতে পারলাম না। তুচ্ছ জলের ভার এর কারণ নয়, খটকা লাগলো, নিশ্চয়ই অন্য কোনও বিপত্তি ঘটেছে!

এদিকে ক্রমশই তৃষ্ণায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে গলা, ছাতি ফেটে যায় যায় প্রায়। আমি তার-স্বরে চিৎকার করে উঠলাম, কে আছ কূয়ার তলায়, তুমি জিনই হও আর দৈত্য-দানবই হও, দয়া কর আমাকে। আমার তৃষ্ণার জলটুকু ছেড়ে দাও। না হলে এখনই আমার প্রাণ যাবে।

বার বার আবেদন করার পর সাড়া মিললো। কূয়ার নিচ থেকে আর্তকণ্ঠ ভেসে এলো, মৃত্যুর চেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভালো। শোনো খোদার বান্দা, যদি এই কূপ থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করতে পার, আমরা তোমাকে তার উপযুক্ত পুরস্কার দেব। মৃত্যুর চেয়ে বেঁচে থাকা শ্রেয়ঃ, সুতরাং কোসিস্ কর, আমাদের বাঁচাও।

সেই মুহূর্তে তৃষ্ণার কষ্টের কথা ভুলে গেলাম আমি। জানি না, কোথা থেকে অত শক্তি আমি আহরণ করতে পারলাম, প্রাণপণ চেষ্টায় দড়ি টেনে টেনে আমার শিরস্ত্রাণ আঁকড়ে থাকা দু'টি বৃদ্ধা অন্ধ নারীকে টেনে তুলতে পারলাম ওপরে।

—তোমরা এখানে আটকা পড়েছিলে কীভাবে?

বৃদ্ধারা জানালো, তারা তাদের সম্রাট জীনের কোপে পড়েছিলো। তাই শাস্তি হিসাবে তাদের অন্ধ করে এই কূপে নিক্ষেপ করেছেন তিনি। তুমি আমাদের উদ্ধার করে মহা উপকার করেছ। এবার যদি আমাদের চক্ষুদান করতে পার তাহলে আরও খুশি হবো।

আমি বললাম, কিন্তু আম কী করে তোমাদের চক্ষুদান করতে পারবো?

—পারবে, একজন বৃদ্ধা বললো, এখান থেকে সামনের দিকে খানিকটা এগোলে এক নদী পাবে। সেই নদীর ধারে একটি গাভী দেখতে পাবে। ঐ গাভীর গোবর যদি আমাদের চোখে মেখে দিতে পার তবে আমরা চক্ষুষ্মান হতে পারবো। কিন্তু সাবধান, ঐ গাভী যেন কোনক্রমেই তোমাকে দেখে না ফেলে। তা হলে তা তোমার পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হবে।

ওদের কথামতো খানিকটা পথ এগোতে একটা নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু এদিক ওদিক খুঁজেপেতেও কোন গরুর সন্ধান পেলাম না। যাই হোক বৃদ্ধাদের কথামতো একটি গুপ্ত স্থান বেছে নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে জল থেকে ওপরে উঠে এলো ধবধবে সাদা একটি গরু। গরুটা সবুজ ঘাসের ওপর চলে বেড়ালো খানিকক্ষণ, তারপর গোবর ছেড়ে আবার নদীর জলে নেমে তলিয়ে গেলো।

তক্ষুণি আমি ঐ গোবরের খানিকটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেলাম সেই ইন্দারার

কাছে। বৃদ্ধা দু'টির চোখে কাজলের মতো লাগিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা দৃষ্টি ফিরে পেলো।

—মালিক, আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা আমার হাত জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো, আজ তোমার দয়ায় আমরা জান ফিরে পেলাম, ফিরে পেলাম আমাদের চোখের দৃষ্টি। কী বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো তার ভাষা নাই। কী দিয়ে তোমার এই উপকারের প্রতিদান দিতে পারি, বলো মালিক! ধনদৌলত চাও? অথবা কোনও রূপসী পরী?

আমি বললাম, ঈশ্বরের কৃপায় শৌর্য বীর্য বা সম্পদের অভাব নাই কিছু। কিন্তু ঐশ্বর্য বা বল-বিক্রমই জীবনের সব অভাব পূরণ করতে পারে। হৃদয় পরিপূর্ণ হতে পারে একমাত্র নারীর ভালোবাসায়। তা যদি দিতে পার, আমি সানন্দে গ্রহণ করতে পারি, মাসী। অন্য কিছু চাই না।

বৃদ্ধারা এমন এক রূপসী কন্যার বর্ণনা দিলো যা চোখে না দেখা পর্যন্ত আমি বিশ্বাসই করতে পারলাম না—তেমন কোনও নারী আদৌ কোথাও থাকা সম্ভব কিনা।

—ও আমাদের জিন-সম্রাটের কন্যা। তার রূপের কাছে পূর্ণচাঁদ ম্লান হয়ে যায়। তাকে দেখলে সূর্য নিজের দীপ্তির দৈন্য ঢাকতে মেঘের আড়ালে মুখ লুকায়। মা বাবার মাথার মণি সে। সেই কন্যাকে তোমার হাতে তুলে দেব আমরা। আমরা আশা করি, তাকে পেয়ে তোমার জীবন-যৌবন ধন্য হয়ে যাবে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো সতেরতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হলো ঃ

—কিন্তু একটা কথা, কোনক্রমেই যেন জিন-সম্রাট তোমাকে না দেখে ফেলে। তা হলে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবে তোমায়। যাই হোক তেমন কোনও বিপদ যাতে তোমার না ঘটে তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। তোমার সারা অঙ্গে একপ্রকার তেল মালিশ করে দেব আমরা। তার ফলে হাজার বছর ধরে যদি তুমি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে শুয়ে থাক, তোমার একগাছি লোমও পুড়বে না, কোনও তাপ লাগবে না। বরং মনে হবে ইরানের কোনও শাহেনশাহর বিলাসবহুল হামামে বসে সুগন্ধী আতরখনির মধ্যে বসে গোসল করছ?

এইভাবে প্রলুব্ধ এবং সতর্ক করে ওরা আমাকে জিন-সম্রাটের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তুললো।

প্রাসাদের অন্দরে সম্রাট-নন্দিনীর মহলে এনে হাজির করলো আমাকে। সত্যিই আমি অবাক হলাম। পালঙ্কে নিদ্রিতা স্বল্পবাস সুন্দরীকে প্রত্যক্ষ করে জীবন ধন্য হয়ে গেলো আমার। উদগ্র কামনার বহ্নিতে দগ্ধ হতে লাগলো দেহমন। মনে হতে লাগলো এই-ই পুরুষের একমাত্র ইপ্সিত বস্তু। এ মেয়েকে অঙ্কশায়িনী করতে না পারলে জীবনে বেঁচে থাকার আর কোনই মানে থাকবে না।

ওর ফুলের মতো সুন্দর মুখশ্রীর দিকে একভাবে অপলক চোখে কতক্ষণ তাকিয়েছিলাম জানি না—সম্বিত ফিরে পেলাম সুন্দরীর সুমধুর ভর্ৎসনায়, তুমি তো দেখছি মনুষ্য-সন্তান। কিন্তু এখানে আসার দুঃসাহস তোমার কী করে হলো, সুন্দর? কে তোমাকে নিয়ে এসেছে এখানে? তোমার কী জীবনের ওপর এতটুকু মায়া নাই? জান কি, একটু পরেই তোমার দেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?

তার কথায় আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত বা শঙ্কিত না হয়ে বললাম বিলক্ষণ জানি সুন্দরী। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার যে রূপসুধা পান করলাম তার বিনিময়ে অবহেলায় দিতে পারি এ জীবন। খোদা হাফেজ, তুমি আমারই জন্য জন্মেছ প্রিয়া। আমিও তোমারই জন্য জন্মেছি।

তোমার কাজল-কালো চোখের মণিতে সে কথা লেখা আছে, পড়ে দেখ। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে আমার সঙ্গে চলো, সুন্দরী।

হঠাৎ মেয়েটি শয্যাত্যাগ করে ছুটে এলো আমার বাহুবন্ধনে। দারুণভাবে জড়িয়ে ধরলো বুকের মধ্যে। চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিলো আমাকে। তারপর প্রায় টেনে হিঁচড়েই নিয়ে এসে ফেললো আমাকে তার পালঙ্কশয্যায়।

এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তাৎক্ষণিক বিচার-বুদ্ধিই আমাকে সব বলে দিলো কী ভাবে কী করতে হবে।

সেই নির্জন কক্ষে আমি সে আর ঈশ্বর ছাড়া চতুর্থ কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিলো না। সারাটা দিন, সারাটা রাত অমৃতসুধা পান করতে থাকলাম আমরা। আমার দেহ মন প্রাণ তার মধ্যে লীন করে দিয়ে অমর্ত্যলোকের আনন্দসায়রে ভেসে বেড়াতে থাকলাম।

এইভাবে পুরো একটা মাস সুখ-সম্ভোগের দিবস-রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। অবশেষে দুঃখের দিন সমাগত হলো। একদিন অতি প্রত্যুষে জিন সম্রাট কন্যা-সন্দর্শনে তার কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন।

এর পরের ঘটনা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছো শাহজাদা। জীন-সম্রাটের প্রহরীরা আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলো এক কাঠের গাদার সামনে। আমি বুঝতে পারলাম, ঐ কাঠের চিতায় আমাকে পোড়ানো হবে।

ইতিমধ্যে সারা প্রাসাদে খবর চাউর হয়ে গেছে। বৃদ্ধা দু'টি আমার কাছে এসে বললো, ভয় নাই। এখুনি তোমার সারা দেহে ঐ তেল মালিশ করে দেবে এক নফর।

এবং তাই করে দিলো একটি নিগ্রো বান্দা। একটু পরে কাঠের গাদায় আগুন দেওয়া হলো। লেলিহান শিখা মেলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো অগ্নিকুণ্ড। আমাকে নিক্ষেপ করা হলো তার মধ্যে।

মুহূর্তের মধ্যে গনগনে আগুনের শয্যায় শুয়ে পড়লাম আমি। আর কী আশ্চর্য, দেহে কোনও উত্তাপ অনুভব করলাম না। তার বদলে মনে হতে লাগলো আমি যেন কোনও এক শাহেনশাহর হামামে স্নান করছি।

সারাদিন রাত ধরে চুল্লীতে কাঠ ফেলা হলো। সম্রাট হুকুম করলেন এবার চিতা নিভিয়ে দিয়ে লোকটার হাড়গুলো এক জায়গায় জড়ো করে আবার তা চিতায় চাপিয়ে দে। প্রহরীরা চিতা নিভিয়ে অবাক হয়ে গেলো, আমি পুড়ে তো ছাই হই-ই নি বরং তাজা ফুলের মতো আরও সরেস, সজীব হয়ে উঠেছি।

আমার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে জিন-সম্রাট হতবাক হয়ে গেলেন। এমন কাণ্ডও যে ঘটতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। এমন এক পাত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিয়ে দিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি। যখন তিনি আমার বংশপরিচয় শুনলেন তখন আর কোনও আপত্তি রইলো না।

এইভাবে আমি জিন সম্রাট-কন্যাকে বিবাহ করে প্রাসাদে নিয়ে এলাম।

শাহজাদা হীরা তুমি যাকে তোমার সামনে দেখছো এখানে এই সেই জিন-সম্রাট-নন্দিনী, আমার প্রিয়তমা রানী।

আমার প্রাসাদে আসার পর, কেন জানি না সম্রাট-কন্যা ফিরকোন অসুস্থ হয়ে পড়লো।

—তোমাকে খুব অসুস্থ দেখছি, রানী?

রানী ফিরকোন বললো, ও কিছু নয়, মহারাজ। আমি বেশ ভালো আছি।

সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়লো। হাত মুখ ধুয়ে এসে আমার পাশে শুয়ে পড়লো, এবং যথারীতি আমার দেহ কামনা প্রশমিত করলো।

এর কয়েকদিন বাদে আবার সেই একই ঘটনা। ঘরে ঢুকে দেখলাম, প্রায় নেতিয়ে পড়া একটা ঠাণ্ডা সাপের মতো বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছে সে। সে দিনও আমি বললাম, কী শরীর খারাপ নাকি?

সে ধরমড় করে উঠে বসলো শয্যায়। বললো, কই না তো!

তারপর মুখহাত ধুয়ে এসে যথারীতি আমার সঙ্গে রতিরঙ্গ করলো সে! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন কিন্তু আর পুরোপুরি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না সে।

আমার মনে কেমন খটকা লাগলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে শাহরাজাদ।

নয়শো ঊনিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আমার রানী ফিরকোনকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। এমন ঠাণ্ডা মেয়ে তো সে ছিলো না! হঠাৎ এই রকম নিরাসক্ত হয়ে গেলো সে কি করে?

একদিন রাতে ঘরে এসে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এই রকম ভান করে শয্যায় ঢলে পড়লাম। ফিরকোন আমাকে কাছে টানার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমি ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে বললাম, আজ আর শরীর বইছে না রানী, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

ফিরকোন আর বিরক্ত করলো না আমাকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার নাসিকা গর্জন শুরু হলো। ইচ্ছে করেই এমনটা করেছিলাম সে রাতে।

একটু পরে বুঝতে পারলাম শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ফিরকোন। ঘাপটি মেরে দেখতে থাকলাম, পরিপাটি করে সাজগোজ করলো ফিরকোন। সুরমা কাজল পরলো চোখে, দাঁতে ঘষলো হিন্দুস্তানের মিসি। হীরা চুনী পান্না মুক্তোর রত্ন আভরণ পরলো অঙ্গে। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো পা টিপে টিপে।

আমিও উঠে পড়লাম। খুব সন্তর্পণে ওকে অনুসরণ করে চললাম।

ঘোড়াশালে ঢুকলো সে! এবং একটু পরে একটা তাজা ঘোড়ায় চেপে প্রাসাদ ছেড়ে সড়কের পথ ধরলো। আমিও আর কাল-বিলম্ব না করে আমার প্রিয় ডালকুত্তাটাকে সঙ্গে নিয়ে এক সাধারণ ফৌজের ছদ্মবেশ পরে অন্য একটা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চেপে বসলাম।

ফিরকোন ছুটে চলেছে বায়ুবেগে, আমিও চলেছি তার পিছনে পিছনে।

একটানা দুঘণ্টার পথ অতিক্রম করে এক নিগ্রো মহল্লায় এসে ঘোড়ার গতি ঈষৎ শ্লথ করলো ফিরকোন। অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা জায়গায় বস্তি ধরনের একটা জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো সে। আমিও বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ফিরকোন ঘোড়া থেকে নেমে সটান ঢুকে গেলো বাড়িটার অন্দরে। আমিও হন-হন করে ছুটে গেলাম দরজার দিকে। কিন্তু হায়! ততক্ষণে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু ভাঙ্গাচোরা বাড়িটার একটা নড়বড়ে জানলার ফুটোয় চোখ রেখে সব কাণ্ডকারখানাই দেখতে পারলাম।

ঘরের ভিতরের নারকীয় দৃশ্য দেখে গা গুলিয়ে গেলো। চারপাশে ছড়ানো পচা মাংসের হাড় আর হাড়িয়ার দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাকে রুমাল চাপা দিলাম আমি। কিন্তু

অবাক কাণ্ড আমার ফুল-সোহাগী রানী ফিরকোনকে এতটুকু নাক সিটকাতে দেখলাম না। ঘরে ঢুকেই সে কাঁচুমাচু হয়ে কৈফিয়ত দিতে শুরু করলো, আজও দেরি হয়ে গেলো মালিক, কিন্তু কি করবো বলো, আমার স্বামী হতচ্ছাড়াটা কিছুতেই ঘুমোতে চায় না। তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবে তো আসবো।

—চুপ কর হারামজাদী, তোর অমন বাহানা আমরা রোজই শুনি।

ঘরের ভিতরে সাতটা আবলুস কালো মহিষাকৃতির নিগ্রো। প্রত্যেকের হাতে হাড়িয়ার পাত্র। ফিরকোনকে এলাপাতাড়ি পিটতে লাগলো সকলে মিলে, বল্ শালী, আর কোনও দিন দেরি করবি?

আমি হতবাক হয়ে দেখলাম, যে মেয়েকে দেখে মনে হয়েছিলো ফুলের আঘাত সহ্য করতে পারবে না সে যে আজ সাত-সাতটি নিগ্রোর বেদম প্রহার হাসিমুখে সয়ে গেলো? ফিরকোনের মুখ দেখে মনেই হলো না যে নির্দয়ভাবে প্রহৃত হয়েছে এই মাত্র।

নিগ্রোরা এবার ওর সুন্দর সাজ-পোশাক পাশবিক হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেঁড়ে বিবস্ত্রা উলঙ্গ উদোম করে মাটিতে ফেলে দিয়ে এক সঙ্গে সবাই মিলে রতিরঙ্গে লিপ্ত হলো। ফিরকোন একা মেয়ে আর তার দেহের ওপর চেপে বসেছে সাত-সাতটা মহিষাসুরের মতো নিগ্রো দানব। আমি তো শিউরে উঠলাম, ফিরকোনের হাড়গোড় বুঝি সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে এক ঘুষিতে জানলাটাকে ভেঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের ওপর।

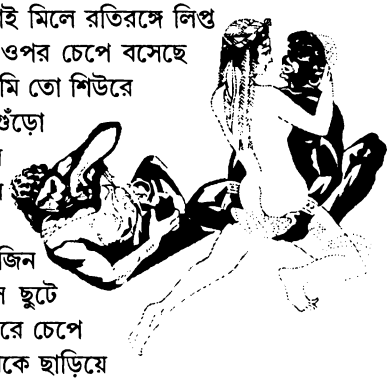

আমাকে ঐভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে পাঁচজন জিন জিন বলে চিৎকার তুলে দরজা খুলে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেলো। বাকী দু'জনকে আমি গড়মড় করে চেপে ধরেছিলাম। তার মধ্যে একজন আমার কব্জা থেকে ছাড়িয়ে ছুটে পালালো কিন্তু অন্য জনকে প্রচণ্ড এক ঘুষিতে কাবু করে মাটিতে ফেলে দিলাম আমি। এরপর ফিরকোনকে তোলবার জন্য হাত বাড়ালাম। কিন্তু বজ্জাত মেয়েছেলেটা ততক্ষণে আমার তলপেটে এক লাথি বসিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথায় ক'কিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। সেই মওকায় নিগ্রোটা আমার বুকের ওপর চেপে বসে দু'হাতে গলাটা চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে আমাকে খতম করতে মরিয়া হয়ে উঠলো। সেদিন আমার এই ডালকুত্তাটা না বাঁচালে ঐ নিগ্রোর হাতেই আমার জীবন শেষ হয়ে যেত। কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ে নিগ্রোটার টুটি চেপে ধরলো তৎক্ষণাৎ। আত্মরক্ষার জন্য সে তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে কুকুরটাকে ঠেকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু পারলো না।

ক্ষত-বিক্ষত নিগ্রোটা মরার মতো নেতিয়ে পড়লো। আমি ওকে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রাসাদে নিয়ে এলাম। ঘোড়ার পিঠে চড়বার আগে ফিরকোনকে এইভাবে পিছ-মোড়া করে বেঁধে আমার সামনে বসিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। সেই থেকে ওর হাতের বাঁধন আর খুলে দিইনি। নিগ্রোটাকে আমি নিজে হাতে কোতল করেছি! এই যে তোমার সামনে রেকাবীতে কাটা মুণ্ডু দেখছো—এটা তারই। লবণের আরক দিয়ে জারিয়ে রেখেছি, তাই দেখে মনে হচ্ছে, সদ্য বুঝি কাটা হয়েছে ওকে।

যে নিগ্রোটা আমার কব্জা থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে পেরেছিলো সে এখন আছে সিনমাসিনে সম্রাট কামুসের প্রাসাদে। সে এখন তাঁর রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়ে তাঁর

কন্যা মুরার শয্যাকক্ষে অবস্থান করছে। রাজকুমারী মুরার সে এখন পেয়ারের নাং। তার কথাতেই সে ওঠে বসে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো বিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এই হলো আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত গোপন কাহিনী। এ রাজ্যে দ্বিতীয় কোনও মানুষ এ কাহিনী জানে না। এবং আমার কড়া হুকুম আছে যদি কোনও ভাবে কেউ জানতে পেরে থাকে এ ঘটনা, তাকে কোনও মতেই জিন্দা রাখা হবে না। তোমার কাছে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে গোপন তথ্য বললাম। এরপর তো আমি তোমাকে সশরীরে এই দরবার-কক্ষের বাইরে যেতে দিতে পারি না, শাহজাদা হীরা। তোমার শির এখানে রেখে যেতেই হবে। কারণ আমি চাই না, আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত কেচ্ছা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ুক।

হীরা অবিচলিত কণ্ঠে বললো, আমি আপনার দণ্ড মাথা পেতে নেব, মহারাজ। কিন্তু তার আগে আমাকে খোলসা করে বুঝিয়ে দিন, ঐ সপ্তম নিগ্রোটা দুনিয়ার এতো জায়গা থাকতে ঐ সিনমাসিন সম্রাটের কাছেই বা আশ্রয় ভিক্ষা করতে গেলো কেন? এবং কী করেই বা সে রাজকুমারী মুরার অত নেক নজরে পড়তে পারলো—যাতে সে তাকে সোজা নিয়ে গিয়ে তুললো তার শোবার ঘরে? এই ব্যাপারটায় কেমন একটু ধাঁধা লাগছে আমার। দয়া করে এই ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বলে আমার সংশয় দূর করুন, নরপতি। তারপর আমি আপনার খড়্গতলে মাথা পেতে দেব হাসিমুখে।

শাহজাদার এই অদ্ভুত কৌতূহল দেখে সাইপ্রাস-সম্রাট অবাক হয়ে বললেন, তোমারই বা এতসব খুঁটিনাটি জানার এতো আগ্রহ কেন যুবক? পৃথিবীতে কত আজব ঘটনাই নিত্য ঘটে। তা নিয়ে ক'জনই বা নিজের মাথা ঘামায়? তোমার এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ নয়, শাহজাদা। এটা আমার সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য একান্ত গোপনীয়। একথাটা বলা হলে আমার তথা আমার সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে পারে। সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না তোমাকে। তার বদলে আমি তোমাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিলাম। এ দরবার, এদেশ ছেড়ে যেখানে খুশি তুমি চলে যেতে পার, আমি তোমার কোনও স্বাধীনতাতেই বাধা দেব না।

হীরা কিন্তু সম্রাটের কথায় দরবার ত্যাগ করার কোনও ইচ্ছাই প্রকাশ করলো না। সম্রাট অধৈর্য হয়ে বললেন, এখন এই মুহূর্তে আমি তোমাকে মার্জনা করেছি, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে বিদায় নাও। কি জানি হয়তো পরে আবার আমার মতের পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

এবার আর চুপ করে বসে থাকতে সাহস করলো না হীরা। সম্রাটকে যথাবিহিত অভিবাদন করে দরবার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

আসল কাজ সমাধা হয়েছে এবার ফিরে যাবার পালা। সিমুর্গের দেওয়া চুলটায় আগুন ধরিয়ে দিতেই অল্পক্ষণের মধ্যে সে এসে হাজির হলো তার সামনে। হীরা বললো, আপনার অনুগ্রহে আমি কার্যোদ্ধার করতে পেরেছি। এবার আমাকে দয়া করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।

সিমুর্গ তাকে পিঠে চাপিয়ে আকাশপথে উড়ে আজিজার প্রাসাদে এনে নামিয়ে দিলো। হীরার বিরহে আজিজা কাতর হয়ে পড়েছিলো। প্রিয়তমকে ফিরে পেয়ে আবার তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

কয়েকটা দিন আজিজার সঙ্গে মধুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকে চাঙ্গা হয়ে উঠলো হীরা। সিমুর্গের কাছে গিয়ে বললো, কাকা, আপনি আমাদের দু'জনকে আপনার ভাতিজার

গৃহে নিয়ে চলুন দয়া করে।

সিমুর্গের পিঠে চেপে ওরা জামিলার প্রাসাদে এসে নামলো। জামিলাও হীরার শোকে মুহ্যমান হয়েছিলো। হীরার সঙ্গ পেয়ে আবার সে হাসি গানে উচ্ছল উদ্দাম হয়ে উঠলো।

সিমুর্গ বললো, কিন্তু লতিফা তোমার সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা ক্ষমা করা যায় না বেটা। তার উপযুক্ত সাজা দেওয়া দরকার। শয়তান মেয়েটাকে গাছের ডালে উল্টো করে ঝুলিয়ে শকুনি দিয়ে খাওয়ান দরকার।

আজিজা বললো, না ওসব করে দরকার নাই। যা করেছে তার জন্য সে যদি অনুতপ্ত হয় তবে তাকে এবারের মতো মার্জনা করে দেওয়া দরকার।

আজিজার কথায় জামিলাও সায় দিলো, ঝোঁকের মাথায় একটা ভুল সে অবশ্যই করেছে। তা বলে ঐ ভাবে তাকে জানে মেরে ফেলাটা উচিত হবে না।

দুই বেগমের ইচ্ছায় হীরা লতিফার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকেও শাদী করে সঙ্গে নিলো।

এবার তারা যাবে সিনমাসিনে কামুসের সাম্রাজ্যে। তার কন্যা মুরার সঙ্গে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে তাকে।

সিনমাসিন শহরে প্রবেশ দ্বারে তাঁবু গেড়ে সেখানে তিন বেগমকে রেখে হীরা একাই সম্রাট কামুসের প্রাসাদে চলে এলো।

খবর পেয়ে মতিয়া ছুটে এলো দেখা করতে। হীরা বললো, শহরের বাইরে আমি তাঁবু গেড়েছি। সেখানে আমার আরও তিন বেগমকে রেখে এসেছি। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি তোমাকে এখুনি সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

মতিয়া তক্ষুণি এক বস্ত্রে হীরার সঙ্গে তাঁবুতে চলে এলো। অন্যান্য বেগমদের সঙ্গে মতিয়ার আলাপ করিয়ে দিলো।

এরপর আসল কাজের উদ্দেশ্যে হীরা প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে এসে সেই দামামায় আঘাত করলো।

যথারীতি সিংহদরজা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। সশস্ত্র প্রহরী অভিবাদন জানিয়ে শাহজাদা হীরাকে সম্রাট-সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য অভ্যর্থনা জানালো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো একুশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সম্রাট কামুস শাহজাদা হীরাকে দেখা মাত্র চিনলেন।

—ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, বেটা। এখনও কি তুমি আমার কন্যার প্রশ্নের মুখোমুখি হবার বাসনা ত্যাগ করতে পারনি?

হীরা বললো, আল্লাহর দোয়ায় আমি তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারবো মহারাজা। আপনি চিন্তিত হবেন না। যে গোপন তথ্য একমাত্র আপনার কন্যাই জানেন বলে অহঙ্কার করছেন তার সে অহঙ্কার আমি চূর্ণ করে দেব। আসল চাবিকাঠির আমি হদিশ পেয়েছি। আপনি আসরের আয়োজন করে দিন, সম্রাট।

সম্রাট কামুস হতাশ হয়ে বললেন হায় বেচারা! মউৎ তোমার সামনে হাজির হয়েছে। নিয়তিরই নির্দেশ, কী করে তুমি তাকে এড়াবে, বলো?

যথাসময়ে মঞ্চাসরে উপস্থিত হলো মুয়া। হীরা পূর্বাহ্নেই সেখানে আসন দখল করে

রাজকুমারীর আগমন প্রতীক্ষা করছিলো।

আড়চোখ একবার দেখে নিলো তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। চমকে উঠলো মুরা। এই না সেই শাহজাদা, এর আগে একবার এসেছিলো এ প্রাসাদে, তার আতিথ্যের সময় ফুলবাগিচায় মোলাকাতও হয়েছিলো একবার। সেবার সে কায়দা করে সটকে পড়েছিলো। কিন্তু এবার? এবার সে এসেছে প্রাণ খোয়াতে? এবার সে বাঁচবে কী করে?

শাহজাদা হীরার প্রতি সে তীক্ষ্ণ প্রশ্নবান হানলো, আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছ? সাইপ্রাস সম্রাট আর ফিরকোনের আসল সম্পর্কটা কী? জান এর উত্তর?

হীরা নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলো, অবশ্যই জানি। ওদের সম্পর্ক খুবই খারাপ। সম্রাটের মহারানী কতকগুলো নিগ্রোর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলো, এই অপরাধে সে আজ বন্দিনী। তার দু'হাত পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছেন সাইপ্রাস সম্রাট।

রাজকুমারী মুরা শিউরে উঠলো। সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই জোর করে নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করে বললো, তুমি মিথ্যা বলছ না, তার প্রমাণ কী?

হীরা বললো, যদি তুমি আমাকে বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করতে বাধ্য কর, অবশ্যই আমি তা বলবো। তার আগে বলো, তুমি এক কুমারী কন্যা হয়ে এই তথ্য কোথায় কার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছ। নিশ্চয়ই, ওয়াকাক শহরের এমন কোনও মানুষের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে, যে তোমাকে এই একান্ত গোপন বার্তা জানিয়েছে?

এরপর হীরা সম্রাট কামুসকে উদ্দেশ্য করে বললো, মহামান্য সম্রাট আপনি আপনার এবং আপনার কন্যার ইজ্জতের জন্য রাজকুমরী মুরাকে সব সত্য ঘটনা অকপটে খুলে বলতে আজ্ঞা করুন!

সম্রাট কামুস মুরাকে খবরের উৎস জানাবার জন্য ইশারা করলেন। কিন্তু রাজকুমারী নিরুত্তর হয়ে রইলো।

হীরা তখন উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাটের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, আপনি মেহেরবানী করে আমাকে রাজকুমারীর শয়নকক্ষে নিয়ে চলুন, সম্রাট। আমিই সব ধাঁধার অবসান ঘটিয়ে দিচ্ছি।

হীরাকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাট মুরার শোবার ঘরে এলেন। হীরা পালঙ্কের তলা থেকে নিগ্রোটাকে টেনে বের করে সম্রাটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলো, এই সেই শয়তান, সাইপ্রাস সম্রাটের কব্জা থেকে পালিয়ে এখানে এসে আপনার কন্যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। এরা সাতটি নিগ্রো মিলে সাইপ্রাস সম্রাটের মহারানী ফিরকোনকে উপভোগ করতো।

লজ্জায় অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইলেন সম্রাট কামুস। মৃদু কণ্ঠে হীরাকে বললেন, আর কোনও প্রমাণের দরকার নাই বাবা। আমি সব বুঝতে পেরেছি। মুরাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। এখন থেকে তুমিই তার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ইচ্ছা করলে ওকে জিন্দা রাখতে পার, ইচ্ছা করলে ওকে জ্যান্ত কবরও দিতে পার। আমার কোনও আপত্তি থাকবে না। তবে এই আমার শেষ কথা, ঐ রকম ব্যভিচারী মেয়ের জীবনে আর মুখদর্শন করবো না। তার কোন কণ্ঠস্বর যেন না আমার কাছে পৌঁছয় কখনও। বাবা হীরা, তোমার কাছে আমার আবেদন, এই মুহূর্তে তুমি তাকে আমার প্রাসাদ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা!

সেইদিনই নিগ্রোটাকে শূলে চাপানো হলো।

শাহজাদা হীরা রাজকুমারী মুরার হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে তার তাঁবুতে নিয়ে এলো।

সিমুর্গ ওদের ছয়জনকে পিঠে করে উড়ে চললো শাহেনশাহ শামস শাহর শহর অভিমুখে এবং যথাসময়ে এসে নামিয়ে দিলো শহরের প্রবেশ দ্বারে। এরপর সিমুর্গ চিরদিনের মতো বিদায় জানিয়ে আবার আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সারা শহরে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তে। পুত্র হীরা ফিরে এসেছে শুনে শামস শাহ আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

হাজার হাজার সৈন্যসামন্ত কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে নগরপ্রান্তে এসে হাজির হলো শাহজাদা হীরাকে স্বাগত জানাবার জন্য।

রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো বাইশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

শাহজাদা হীরা তার অভিযানের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলো পিতার কাছে। সব শুনে শামস শাহ বলেন, যাকে লাভ করার জন্য মন-প্রাণ আকুল হয়েছিলো তোমার, সে আজ তোমার করায়ত্তে এসেছে। এতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি বেটা!

—কিন্তু বাবা, হীরা বললো, ঐ ব্যভিচারিণীকে পেয়ে আমার কী ফয়দা হবে? তার চেয়ে আপনি আদেশ করুন, আমি ওকে চরম সাজা দিই।

শাহেন শাহ জানতেন হীরা রাজকুমারী মুরা সম্পর্কে কতখানি দুর্বল, বললেন, তোমার কথা ঠেলে ফেলবার নয় বাবা। তবু বলবো, অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে জীবন বিপন্ন করে যাকে ঘরে এনেছ হঠাৎ কোনও উত্তেজনাবশে তাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত কর এখনি, তা আমি চাই না। অনেক কষ্টে সমুদ্রমন্থন করে যে মুক্তো হাতে পেলে তা যদি প্রথম বিচারে ঝুটা বলেও প্রমাণিত হয় তাকে তখুনি পানিতে নিক্ষেপ করো না ঃ এই আমার অভিমত। তাছাড়া, আরও একটা কথা তোমার মনে রাখা উচিত, তুমি যখন তার বাগিচায় প্রবেশ করে তার হাত চেপে ধরেছিলে তা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম হয়েছিলো। তোমার কৃতকর্মের জন্য রাজকুমারী তখনি তোমাকে প্রাণদণ্ডের সাজা দিতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। সে কথা ভেবেও তার অনেক দোষ ক্ষমার চোখে, দেখতে পার তুমি।

পিতার এই পরামর্শে শাহজাদা হীরার চৈতন্য হলো। তখনি সে মনস্থির করলো মুরাকে সে শাদী করে বেগমের মর্যাদা দেবে।

এরপর হীরা পাঁচটি বেগম নিয়ে সুখে সম্ভোগে দিন কাটাতে থাকলো।

গল্প শেষ হলো। শাহরাজাদ থামলো। সুলতান শারিয়ার বললেন, চমৎকার—চমৎকার তোমার কিসসা শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ বলে, এরপরে আরও চমৎকার কাহিনী আপনাকে শোনাবো, জাঁহাপনা।

এক সময়ে কাইরো শহরে গোহা নামে এক মজার লোক বাস করতো। কাজ-কাম বলতে সে কিছুই করতো না। সারাদিন রাত পড়ে পড়ে শুধু সে ঘুমাতো। একদিন তার ইয়ার-বন্ধুরা এসে বললো, ওহে গোহা, সারাটা জীবন এই অলসভাবে শুয়ে শুয়ে কাটাবে নাকি?

গোহা বললো, কেন কাজ তো আমি করি মাঝে মাঝে। এই তো সেদিন বিরাট একটা বককে ধরেছিলাম আমি। বেচারা ডানা মেলে নীল আকাশে মনের আনন্দে উড়ে বেড়াতো। তার ডানা দু'খানা কেটে দিয়ে আমি ওকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু পাখীটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল!

গোহা দাঁত বের করে খিক খিক করে হাসতে লাগলো।

বন্ধুরা বললো, আল্লা তোমার গুনাহ মাফ করবেন না। তোমার এই নিষ্ঠুরতার হেতু কী?

গোহা বললো, বকটা দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিলো ও আমার চোখ উপড়ে নিয়ে পালাবে।

আর একদিন গোহা তার বন্ধুদের বললো, জান ভাই, আল্লাহ কেন উট আর হাতিদের পাখা দেননি?

বন্ধুরা বললো, না, জানি না তো! কেন, বলো দেখি।

গোহা বললো, ঐ রকম ভারী জন্তুদের যদি পাখা থাকতো তবে তারা উড়ে গিয়ে অন্যের বাগানের গাছপালা ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দিত।

একদিন এক বন্ধু এসে গোহাকে বললো, তোমার গাধাটা একবার ক'দিনের জন্য দেবে ভাই, আমি একটা শহরে যাবো!

গোহা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো, নিশ্চয়ই দিতাম ভাই। কিন্তু ক'দিন আগে তো গাধাটাকে আমি বেচে দিয়েছি।

ঠিক তখুনি পাশের আস্তাবল থেকে গাধাটার মধুর কণ্ঠ-সঙ্গীত ভেসে এলো।

বন্ধু বললো, কিন্তু ভাই, গাধা তো দেখছি তোমার আস্তাবলেই আছে।

গোহা বললো, তুমি যদি একটা গাধার কথা শুনেই বিশ্বাস করে বসলে, তাহলে আমার কিছু করার নাই।

একদিন এক সন্ধ্যায় গোহা গিয়েছিলো এক প্রতিবেশীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। একটা গোটা মুরগীর তন্দুরী তাকে খেয়ে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু মুরগীটা এতই বুড়ো যে, মাংস আর টেনে ছিঁড়তে পারলো না সে। তখন সে মুরগীটাকে উদরস্থ করার বায়না ত্যাগ করে তাকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম জানাতে থাকলো।

গৃহস্বামী অতিথির এই আচরণে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো কী হলো, এতো বস্তু থাকতে একটা রান্না করা মুরগীকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রার্থনা করছো কেন বাবা?

গোহা বললো, না চাচা, আপনি ভুল করছেন। এই মুরগীটাকে একটা সাধারণ মুরগী ভেবে আপনি জবাই করেছিলেন। আসলে সে খোদার পেয়ারের পুণ্যাত্মা ভক্ত জীব। তাই আপনি তাকে কেটে মসলাপাতি মেখে ঠিকমতো গনগনে আগুনে পুড়িয়েও এতটুকু দগ্ধ করতে পারেন নি। এর দেহের মাংস রান্না করার আগে যেমনটি ছিলো পরেও ঠিক তেমনি অবিকৃত রয়ে গেছে। পাপীরা দগ্ধ হয়, কিন্তু আগুনের উত্তাপ পুণ্যাত্মা ভক্তদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না।

গোহা একবার এক কাফেলার সহযাত্রী হয়েছিলো। কিন্তু পথের মধ্যে তাদের দানাপানি প্রায় ফুরিয়ে গেলো! গোহা স্বভাবত একটু পেটুক মানুষ। কিন্তু খাবার সময় সে তার ভাগের একটা পুলি আর একটিমাত্র সিদ্ধ ডিম পেলো। গোহা তা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, খোদা কসম, এ আমি খেতে পারবো না বরং আপনারা কেউ পেটপুরে খান।

গোহা একদিন কসাইয়ের দোকানে গিয়ে বললো, আজ আমাদের বাড়িতে কিছু লোকজন খাবে, খুব ভালো দেখে কিছু মাংস দাও তো, ভাইসাব। কসাই তাকে বেশ খানিকটা মাংস ওজন করে বেঁধে দিলো।

মাংসের মোড়কটা বাড়িতে এনে বিবির হাতে দিয়ে বললো খুব ভালো করে কাবাব বানাও তো। আমি একটু বেরুচ্ছি, ঘুরে এসে খাব।

সন্ধ্যা হতে না হতে গোহা ঘরে ফিরে এলো কাবাবের টানে। কিন্তু খেতে বসে রুটি সবজি আর কিছু পনির ছাড়া কিছুই সে দেখতে না পেয়ে বিবিকে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার কাবাব কোথায়?

বৌটা বললো, আর বলো না, কাবাবগুলো বানিয়ে আমি গোসল করতে গেছি। ফিরে এসে দেখি মুখপোড়া বেড়ালটা সব সাফ করে দিয়েছে।

রাগে ফেটে পড়লো গোহা। কোথায় সে বেড়াল। এঘর ওঘর খুঁজে একটা বেড়ালকে ধরে নিয়ে এসে সে বললো, এতটুকু বেড়াল অতগুলো মাংসের কাবাব খেয়েছে? মাংসের তো বেশ ওজন ছিলো, কিন্তু বেড়ালটা তো দেখছি পলকা পাখীর মতো হাল্কা। তা হলে মাংসগুলো গেলো কোথায়?

একদিন গোহা-বিবি তার তিন মাসের বাচ্চাটাকে গোহার কোলে তুলে দিতে দিতে বললো, ছেলেটাকে একটু ধরতো, গো। আমি খানাটা পাকিয়ে নিয়েই নিচ্ছি!

এই সব মেয়েলী কাজ গোহার একদম পছন্দ নয়। কিন্তু উপায় কী? ছেলেটাকে নিয়ে সে নাচাতে লাগলো, একটু পরে বাচ্চাটা বমি করে তার সদ্য কাচানো কাফ্‌তানটা ভাসিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে বাচ্চাটাকে ধপাস করে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে তার মাথায় থুথু ছিটাতে লাগলো।

মা ছুটে এসে ছেলেকে কোলে তুলে স্বামীকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো, একি তোমার ব্যবহার, কত আদরের ধন আমাদের এই বাছা, তার গায়ে তুমি থুথু দিলে!

গোহা তখনও রাগে গরগর করছে, আদরের ধন না হাতি! ও সব ছেলেই নয়। দেখগে অন্য কারো হয়তো হবে।

এই বলে আর সে দাঁড়ালো না, হনহন করে বেরিয়ে গেলো।

একদিন গোহার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাই বলতে পার, দ্বিতীয়ার চাঁদ অমন ক্ষীণ হয় কেন?

গোহা খুব বিজ্ঞের মতো বললো, মাদ্রাসায় দেখছি কিছুই তোমাকে লেখা পড়া শেখায়নি। আরে বোকা এও জান না, যে ক'দিন চাঁদ সরু থাকে সে কদিন আল্লাহ চাঁদের দেহ দিয়ে আসমানের তারা গড়েন!

গোহা একদিন তার এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে ভেড়ার কাল্লা সিদ্ধ করার জন্য একটা পাতিল ধার চাইলো। প্রতিবেশী শেখ তাকে হাঁড়িটা দিয়ে বললো, মনে করে কাল সকালে দিয়ে যেও ভাই।

পরদিন সকালে কথামতো হাঁড়িটা ফেরত দিতে এলো। গৃহস্বামী অবাক হয়ে দেখলো তার হাঁড়ির মধ্যে অন্য একটা ছোট্ট হাঁড়ি বসানো আছে।

—কী ব্যাপার, এটা কার?

গোহা বললো আমি তো ভাই বলতে পারবো না। নির্ঘাৎ তোমার হাঁড়িটাই কাল রাতে বাচ্চা পেড়েছে!

গৃহস্বামী মাথা নেড়ে সায় দিলো গোহার কথায়, হুঁ, তা অবশ্যই হতে পারে। এই বলে সে পাত্র দু'টি তাকে সাজিয়ে রেখে দিলো।

পরদিন গোহা আবার এলো পাত্রটি ধার করতে! প্রতিবেশি ভাবলো একটা দিলে দু'টো পাওয়া যায়, দু'টো দিলে নিশ্চয়ই চারটে ফেরত পাওয়া যাবে। সে দু'টো হাঁড়ি এনে গোহার হাতে দিয়ে বললো, একটাতে নাও হতে পারে, ব্যাপারের বাড়ি, দু'টোই নিয়ে যাও ভাই।

গোহা নির্বিবাদে দু'টো হাঁড়ি বগলদাবা করে চলে এলো।

এক এক করে অনেকদিন পার হয়ে গেছে। গোহা আর হাঁড়ি দু'টো ফেরত দিতে আসে না। কিন্তু প্রতিবেশি ভাবে গোহার মতো সাচ্চা মানুষ হয় না, সে নিশ্চয় অন্য কাজে কর্মে ব্যস্ত আছে। সময় পেলেই দিয়ে যাবে।

প্রতিবেশি ও নিয়ে বিশেষ চিন্তা করে না। কিন্তু দেখতে দেখতে অনেক মাস কেটে গেলো দেখে একদিন শেখসাহেব গোহার বাড়িতে এসে একথা সেকথার পর হাঁড়ি দু'টোর কথা তুললো, আমার হাঁড়ি দু'টো ফেরত দাও ভাই।

গোহা যেন আকাশ থেকে পড়লো, হাঁড়ি? কোন্ হাঁড়ি বলো তো ভাইসাব।

প্রতিবেশি বলে কেন, মাস কয়েক আগে আমার বাড়ি থেকে দু'টো হাঁড়ি ধার নিয়ে এলে, মনে নাই?

—ও হো হো, সে কথা বুঝি তোমাকে বলিনি। এই দ্যাখো একেবারে ভুলো মন আমার, কিছুই মনে থাকে না আজকাল। তোমার হাঁড়ি দু'টোর বদহজম হয়েছিলো ভাইসাব। পরদিন ভোর রাতেই কলেরায় মারা গিয়েছিলো।

শেখসাহেব অবাক হয়ে বললেন, বলো কী, হাঁড়ি পাতিলের কলেরা—তারা আবার মারা যায় না কি?

—বারে! আল্লাহর পয়দা-করা বস্তু চিরকাল দুনিয়ায় থাকবার জন্যে আসে নাকি। মেয়াদ ফুরালেই তাকে মারা যেতে হবে না। জন্মিলেই মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে, ভাই?

একদিন এক খামারের মালিক গোহাকে একটা মোটা-সোটা মুরগী উপহার দিলো। গোহা খুশি হয়ে তাকে তার সঙ্গে খানা-পিনা করতে আমন্ত্রণ জানালো। খামার-মালিক সানন্দে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো। এবং সেইদিন রাতে তারা দু'জনে বসে খুব তৃপ্তি করে মুরগীকে উদরস্থ করলো।

এর কয়েকদিন পরে গোহার দরজায় করাঘাত হলো। দরজা খুলে এক অপরিচিত মেহেমানকে দেখে গোহা স্বাগত জানালো, আসুন আসুন, আমার কী সৌভাগ্য! তা আপনার পরিচয়টা জানতে পারি ভাইসাব!

লোকটি বললো, আমি হচ্ছি ঐ খামার-মালিকের দোস্ত। আপনার আতিথেয়তার তিনি খুব প্রশংসা করছিলেন, তাই চলে এলুম, ভাবলাম আমার বন্ধুর ভাগ্যে যখন জুটেছে, আমার ভাগ্যেও কি কিছু জুটবে না!

গোহা হেসে বলে, তা বেশ করেছেন, বসুন।

গোহা সেদিন অচেনা অতিথিকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করে খানাপিনা দিলো। খেয়েদেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে করতে সে চলে গেলো।

এর কয়েকদিন পরে আবার কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিলো গোহা।

—আপনি কে ভাইসাব?

আগন্তুক বললো, আমি—আমি হচ্ছি আপনার খামার চাষী-বন্ধুর বন্ধু। শুনলাম আপনি খুব অতিথিপরায়ণ মানুষ, তাই চলে এলাম—

—ওঃ, তা আসুন আসুন ভিতরে এসে বসুন।

লোকটিকে বাইরের ঘরে বসিয়ে গোহা অন্দরে চলে গেলো। একটু পরে এক বাটি ধোঁয়া ওঠা গরম জল এনে বসিয়ে দিলো তার সামনে। জলের ওপরে কয়েক ফোঁটা তেল ভেসে বেড়াচ্ছিল শুধু। লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইলো গোহার মুখের দিকে।

—এ বস্তুটি কী ভাইসাহেব?

গোহা বললো, ও, বুঝতে পারছেন না? এ হচ্ছে সেই পানি, যে পানিতে ঐ মুরগীটাকে সিদ্ধ করা হয়েছিলো তার খুড়তুতো বোনের মাসতুতো বোন।

একবার গোহার বন্ধুরা গোহাকে নিয়ে একটু মজা করতে উদ্যোগী হয়েছিলো। সকলে একটা একটা ডিম সঙ্গে নিয়ে গোহার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব করলো, চলো দোস্ত আজ সবাই মিলে একসঙ্গে গোসল করে আসা যাক।

গোহা বললো, বেশ চলো।

দল বেঁধে একটা হামামে ঢুকলো ওরা। সাজ-পোশাক খুলে রেখে উলঙ্গ হয়ে সবাই একসঙ্গে স্নানের ঘরে প্রবেশ করলো। একজন প্রস্তাব করলো, আচ্ছা বলো, আমাদের

মধ্যে কে কে ডিম পাড়তে পারে এখানে। এক গোহা ছাড়া সবাই বললো, তারা ডিম বের করতে পারবে। গোহা বললো, অসম্ভব। গুল ঝাড়ার আর জায়গা পেলে না।

অবশেষে সাব্যস্ত হলো যে, যে ডিম দিতে পারবে তাকে হামাম খরচা দিতে হবে না। যে দিতে পারবে না, তাকে সে ভার বহন করতে হবে। গোহা বললো, আমি রাজি।

এরপর গোহা ছাড়া আর সবাই একটা একটা করে ডিম বের করে দিলো যথাস্থান থেকে।

এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে গোহা প্রথমে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো খানিকটা। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে কঁক্ কঁক্ কঁক্ করতে করতে এক একজনকে তাড়া করে করে নাস্তানাবুদ করতে থাকলো।

একজন বললো, কী ব্যাপার দোস্ত, অমন ক্ষেপে গেলে কেন, হলো কী তোমার?

গোহা বললো, একা আমি মোরগ, তোমরা সবাই মুরগী। এতগুলো মুরগীকে এক জায়গায় পেয়ে কি আর মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব, বলো?

প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গোহা ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ রুজু করে নামাজে বসে। নামাজান্তে আল্লাহর কাছে প্রতিদিনই সে একটিমাত্র প্রার্থনা জানায়, খোদা আমাকে তুমি একশোটি দিনার পাইয়ে দাও। গোনাগুনতি একশোটি—একটা বেশিও চাই না, একটা কম হলেও চলবে না আমার। ও আমি নেব না।

এক ইহুদী পড়শি প্রতিদিন গোহার ঐ রকম বায়না শুনে শুনে একদিন মনে মনে ঠিক করলো, লোকটাকে একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

পরদিন সকালে গোহা যখন মুদিত-নয়নে প্রার্থনায় বসেছে, সেই সময় ইহুদীটা একটা তোড়ায় নিরানব্বইটা দিনার ভরে ঘরের জানলা গলিয়ে তার সামনে ছুঁড়ে দিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইলো।

চোখ খুলে গোহা তোড়াটা দেখে আনন্দে নেচে উঠলো। কিন্তু এক এক করে দিনারগুলো গোনার পর মুখ কালো করে ওপরের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি যে আমার প্রার্থনা শুনেছ আল্লাহ, এ জন্য আমি ধন্য। কিন্তু তোড়াতে তো একশো দিনার নাই। একটা কম আছে। এতে তো আমার কাজ হবে না। সুতরাং তোমার এ দান আমি গ্রহণ করতে পারছি না, খোদা। আমাদের পাশের বাড়িতে এক গরীব ইহুদী বাস করে। বেচারার বড় কষ্টের সংসার। অনেকগুলো বালবাচ্চা, সবাইকে ভালো করে খাওয়াতে পারে না। আমি ভাবছি তোমার এই নিরানব্বইটা দিনারের তোড়াটা ওকেই দিয়ে দেব! লোকটা বড় সৎ, বড় ভালো।

এই বলে সে তোড়াটা ইহুদীর বাড়ির জানলা গলিয়ে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে হাওয়া হয়ে গেলো।

ইহুদী তাজ্জব হয়ে গেলো মুসলমানটার সত্যনিষ্ঠায়।

পরদিন সকালে আবার সে গোহাকে পরীক্ষার করার জন্য আর একটা দিনার ভর্তি তোড়া ছুঁড়ে দিলো তার ঘরে। এবার সে একশো একটা দিনার ভরেছিলো। গোহা দিনারগুলো গুনে-টুনে সকৃতজ্ঞভাবে আল্লাকে প্রণিপাত জানালো, তোমার দান আমি খুশিমনে গ্রহণ করে ধন্য হলাম, আল্লাহ।

এই বলে সে তোড়াটা কোমরে বেঁধে পথে বেরুলো। ইহুদী ছুটে গিয়ে গোহার পথ আগলে দাঁড়ালো, আমার তোড়া ফেরত দাও।

গোহা বললো, তোমার তোড়া? কীসের তোড়া?

—দিনারের তোড়া, দাও ফেরত, একশো একটা দিনার আছে ওতে।

গোহা বললো, দেখ ইহুদী-সন্তান, ভালো চাও তো পথ ছাড়। তুমি কি ভেবেছ আল্লাহর কাছ থেকে রোজ যা পাবো সবই তোমাকে দেব? এই নাও, একটা দিনার বেশি আছে, এটা তুমি পেতে পার!

একটা চকচকে স্বর্ণমুদ্রা ইহুদীর নাকের ডগায় ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে নিজের কাজে চলে গেলো।

একদিন গোহা মসজিদে বসে ইমামের উপদেশ শুনছিলো ঃ প্রত্যেক প্রকৃত ইসলামী স্বামীর প্রতিরাতে যথাকর্তব্য পালন করা উচিত। তাতে খোদার কাছে ভেড়া কোরবানীর পুণ্য লাভ হয়! দিবসকালে ধর্মপত্নীর সঙ্গে সহবাসের ফলে বান্দা মুক্তিদানের পুণ্য সঞ্চয় হয়। আর যে ব্যক্তি মধ্য রাত্রে বিবির সঙ্গে সহবাস করে একটি উট কোরবানীর সুফল পায় সে।

ঘরে ফিরে এসে বিবিকে ইমামের উপদেশের বাণী শোনায়। সেইদিন রাতে যথারীতি গোহা বিবিকে পাশে নিয়ে শুয়েছে। একটু পরে বৌটা দেখলো গোহা রতি-সঙ্গ করতে এগিয়ে আসছে না। তখন সে নিজে গোহাকে দু'হাতে কাছে টানতে টানতে বলে, কী নেতিয়ে পড়লে কেন, এসো, ওপরে এসো। ভেড়া কোরবানীর পুণ্য লাভ কর।

গোহা বিবির ডাকে সাড়া দিয়ে যথাকর্তব্য সম্পাদন করে আবার শুয়ে পড়লো পাশে।

মাঝ রাতে বৌটা আবার গোহাকে টেনে তুললো, এসো ওপরে এসো। উট কোরবানীর পুণ্য করবে না?

ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো গোহার চোখ। কিন্তু নাছোড়বান্দা বিবি। অগত্যা ঐ অবস্থাতেই কাজকাম সেরে বিছানায় ঢলে পড়লো সে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো চব্বিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সকাল হতে না হতে বৌটা গোহাকে জাগিয়ে দেয়, দেখ দেখ, কত বেলা হয়ে গেছে। এখন তো রোদভরা সকাল। এসো, এসো ওপরে এসো, একটা বান্দা মুক্ত করার পুণ্য কি কম? এসো, পুণ্য সঞ্চয় করে নিই আমরা!

গোহা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

মুখে সম্মতি জানালো, কিন্তু কাজে ব্রতী হলো না। যেমনটি পড়েছিলো তেমনি পড়ে রইলো বিছানায়।

বৌটা ততক্ষণে কামার্ত হয়ে চড়া সুরে হুকুম করছে, কই, কাপ মেরে পড়ে রইলে কেন, এসো? বান্দা মুক্ত করার পুণ্য লাভ কর?

গোহা হাই তুলে বললো, আজকের মতো পুণ্যটা তুমি একাই সঞ্চয় কর সোনা! এ বান্দাকে মুক্তি দাও।

একদিন জগৎ বিখ্যাত তৈমুরলঙ তার সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে শহর উপান্তে এসে তাঁবু গাড়লো। শহরবাসীরা তটস্থ হয়ে উঠলো। তখন গোহা বললো, হতে পারে সে প্রবল পরাক্রমশালী, কিন্তু তা বলে আমি ডরাই না। তার কাছে যাবো আমি।

সাজ-পোশাক সেরে মাথায় মসলিনের পাগড়ী বাঁধলো একটা ইয়া মস্ত বড়। বাজারের সমস্ত দোকানে যত মসলিন ছিলো একত্র করে পাগড়ী জড়ালো সে মাথায়।

তাতার-সম্রাট অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, কীসের এই পাগড়ী, এতো বিরাট।

গোহা বিনয়ের অবতার হয়ে বললো, জী, এটা আমার রাতের সাজের ছোট টুপী, দুনিয়া মালিক। আসল টুপিটা তাড়াহুড়ায় পরে আসতে পারলাম না। ওটা ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে আসা হচ্ছে।

প্রবল প্রতাপ তৈমুরলঙ ভাবলো, এ তো সাধারণ মানুষ নয়। এতো বড় পেল্লায় টুপিটা যার রাতের সংক্ষিপ্ত সাজ, না জানি আসল জাঁকজমক তার কেমন!

আর ক্ষণকাল সেখানে অবস্থান করা সঙ্গত মনে করলো না তৈমুর। তাঁবু খুলে লোকলস্কর সঙ্গে করে সেইদিনই সে সেদেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলো।

একদা গোহা সস্ত্রীক নদীর ধারে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় পা পিছলে বৌটা স্রোতের মধ্যে তলিয়ে গেলো। গোহা আর কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণপণে উজানে যাবার চেষ্টা চালাতে থাকলো। পথচারীরা এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, ও সাহেব, উজান-সাঁতার দিয়ে ওদিকে যাচ্ছ কেন, তোমার বিবিজান তো স্রোতের টানে উল্টোদিকে চলে গেছে।

গোহা বললো, সাধারণতঃ কোন মানুষ ডুবে গেলে অতি স্বাভাবিক কারণেই স্রোতের টানে ভাটার দিকে চলে যায়, কিন্তু আমার বিবিকে তো আমি হাড়ে হাড়ে জানি; সব সময় সে উল্টোদিকে ছাড়া চলতে পারে না।

গোহার চুটকীগুলো শোনাবার পর শাহরাজাদ একটু থেমে সুলতান শারিয়ারের দিকে তাকিয়ে সপ্রশ্ন চোখে জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো জাঁহাপনা?

—চমৎকার—চমৎকার তোমার বলার কায়দা শাহরাজাদ। ভারি আনন্দ পেলাম শুনে।

এরপর শাহরাজাদ আবার নতুন কাহিনী বলতে শুরু করলো।

সুলতান হারুন অল রসিদের সভা-গায়ক ছিলো সঙ্গীতের যাদুকর-মণ্ডলের স্বনামধন্য ওস্তাদ ইশাক অল নাদিম। খলিফার প্রিয়পাত্র ছিলো সে। হারুণ অল রসিদের হারেমের জন্য পরমাসুন্দরী বাঁদীদের সংগ্রহ করে এনে প্রথমে ইশাকের কাছে গান-বাজনার তালিম নিতে পাঠানো হতো। যে সব মেয়েরা ইশাকের শিক্ষার গুণে সঙ্গীত-সুধাকরী হতে পারতো তাদের সে খলিফার সামনে হাজির করতো গান শোনাবার জন্য। সুলতান সন্তুষ্ট হলে তারা হারেমে প্রবেশের অধিকার পেত। কিন্তু যে সব বাঁদীরা গান শুনিয়ে সুলতানের মন ভোলাতে সমর্থ হতো না আবার তাদের ফিরে যেতে হতো ওস্তাদ ইশাকের প্রাসাদে।

একদিন খলিফার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিলো। কিছুতেই কিছু ভালো লাগছিলো না। তখন তিনি উজির জাফর, ওস্তাদ ইশাক, দেহরক্ষী মাসরুর, জাফরের ভাই অল ফাদল এবং ইউনুসকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে পথ-পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন। সকলেরই একই রকম বেশবাস। কাউকে দেখে চেনার উপায় ছিলো না, কে বাদশা, কে বান্দা আর কে বা উজির অমাত্য।

চলতে চলতে তাঁরা এক সময় টাইগ্রিস উপকূলে উপস্থিত হলেন। এবং একখানা ছোট পানসী ভাড়া করে আল-তাকের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

আল-তাকে পৌঁছে নৌকা ছেড়ে তীরে নেমে আবার ওঁরা এক অলক্ষ্য অভিযানের যাত্রী হয়ে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পথ চলতে থাকলেন।

চলতে চলতে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ওদের। ইশাকের সামনে দাঁড়িয়ে সে সঙ্গীতগুরুকে অভিবাদন জানিয়ে বললো, আমার কি পরম সৌভাগ্য, আপনার দর্শন পেলাম। এই বান্দা প্রাসাদের কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখায়। আপনাকে আমি দূর থেকে দেখেছি অনেকবার। কিন্তু সামনে যাবার সুযোগ পাইনি কখনও।

বোঝা গেলো বৃদ্ধ মৌলভী একমাত্র ইশাক ছাড়া আর কাউকেই চিনতে পারেনি। বৃদ্ধ বলতে থাকে, আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে, মালিক।

ইশাক বলে, বেশ তো, বলো না—

—আমার বাড়িতে একটি পরমাসুন্দরী কিশোরী বাঁদী আছে। তাকে আমি গান-বাজনা শিখিয়ে সুলতানের হারেমের যোগ্যা করে তুলতে চাই। আপনি যদি মেহেরবানী করে আপনার ঘরানায় তাকে ভর্তি করে নেন তবে আমি ধন্য হয়ে যাই। আর যদি আপনি না করেন তা হলে আর কী করবো। ও মেয়েকে তো আমার গরীবখানায় মানাবে না। অগত্যা কোনও সওদাগরের কাছেই বেচে দিতে হবে। যদি আপনার এক পল ফুরসত হয় তবে মেয়েটাকে একবার আপনি স্বচক্ষে দেখুন, মালিক, এই আমার আর্জি।

ইশাক একবার অপাঙ্গে খলিফার দিকে তাকালো। এবং খলিফার ইশারা বুঝতে পেরে বৃদ্ধকে বললো, বেশ তো কোথায় তোমার ঘর, চলো যাওয়া যাক। আমার সঙ্গে এই বন্ধুরা রয়েছেন এঁরাও যাবেন।

বৃদ্ধের আনন্দ আর ধরে না। সে যেন হাতে চাঁদ ধরে ফেলেছে। বললো, এই কাছেই। ঐ যে দেখছেন গিরিমাটি রঙের বাড়িটা—ওটাই আমার গরীবখানা। মেহেরবানী করে আপনারা সকলেই চলুন।

বাড়িটা নেহাত ছোটখাট নয়। বেশ ঝকঝকে তকতকে। পরিপাটি করে সাজানো গোছানো।

একখানা সুসজ্জিত বড় ঘরে বসালো সে। একটুক্ষণ পরে তানপুরা হাতে এসে বসলো একটি নবযৌবন-উদ্ভিন্না অলোক-সামান্যা সুন্দরী তরুণী। আভূমি আনত হয়ে অভ্যাগত অতিথিদের সালাম জানালো সে। তারপর গালিচার ওপর বসে একটি গান ধরলো।

কেমনে তরাবো বলো, এ অকুল দরিয়া।
যৌবন বিফলে গেলো, তোমারে স্মরিয়া।।

কী অপূর্ব সুললিত কণ্ঠ। খলিফা ছটফট করে ওঠেন। কিন্তু নিজের ছদ্মবেশের কথা ভেবে মুখ ফুটে বাহবা জানাতে পারেন না। মনে মনে তারিফ করতে থাকেন, সুন্দরী, যেমন তোমার রূপ তেমনি তোমার গুণ। এমন কোকিলকণ্ঠ কোথায় পেলে তুমি? খোদাতালার তুমি এক অপূর্ব সৃষ্টি।

ইশাক পঞ্চমুখে মেয়েটির মধুর কণ্ঠের গুণগান করতে থাকে। আত্মপ্রশংসা শুনে আরক্ত হয়ে কানে হাত চাপা দিয়ে উঠে আসে সে ইশাকের সামনে। গড় হয়ে পায়ের ওপর মাথা ঠেকায়।

—আপনি দুনিয়ার সেরা ওস্তাদ, আপনার সামনে বসে আপনাকে গান শোনাবো এ যে আমার কল্পলোকের বাসনা ছিলো এতকাল। বাস্তবে তাই আজ ঘটে গেলো দেখে নিজেকে আর সহজভাবে ধরে রাখতে পারছি না, ওস্তাদ। সারা শরীর আমার টলমল করে কাঁপছে যেন। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসছে। আজ এই মুহূর্তে আমি বুঝি আর একটাও গান শোনাতে পারবো না। আপনারা আমাদের ঘরে মেহেমান হয়ে এসেছেন। আমার গান শুনতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি, একি হলো আমার, আর এখন গান শোনাতে পারবো না আপনাদের।

এই বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো মেয়েটি।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো সাতাশতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মেয়েটার মর্মবেদনায় ইশাক বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে।

—তুমি আল্লাহর আশীর্বাদ নিয়ে জন্মেছ মেয়ে, এতে দুঃখ করার কী আছে। তোমার প্রকৃত পরিচয় কী সুন্দরী?

মেয়েটি লজ্জায় মাথা নত করে বসে থাকে। একটিও কথা বলে না। ইশাক বুঝতে পারে, এতো মানুষের সামনে হয়তো সে মুখ খুলতে চায় না।

—তোমার যদি সকলের সামনে বলতে আপত্তি থাকে তবে চলো আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি, কেমন?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

পাশের ঘরে ইশাককে একা পেয়ে মেয়েটি সহজ হয়ে বোরখার নাকাব সরিয়ে দেয়। মেয়েটির নিখুঁত মুখাবয়ব দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে ইশাক। এমন অলৌকিক রূপলাবণ্য সে খুব কমই দেখেছে জীবনে।

—এবার তুমি নির্ভয়ে বলো বাছা, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ এখানে? আর কেনই বা তোমার চোখভরা অশ্রু আর মুখ এমন বিষণ্ন বেদনা-মধুর?

মেয়েটি বলে, আমার দীর্ঘসময়ের প্রতীক্ষা আজ সফল হয়েছে। আপনার পথ চেয়েই আমি দিন গুনছিলাম। অবশেষে আজ আপনার দর্শন পেয়ে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারিনি, ওস্তাদ। কান্না আমার নিত্য সঙ্গী। নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে রোজ আমি শুয়ে শুয়ে কাঁদি। কেঁদে কেঁদে চোখের কোলে হয়তো আমার কালি পড়েছে। মুখের লাবণ্য ঝরে যেতে বসেছে।

ইশাক বাধা দিয়ে বলে, ওকথা সত্যি নয়, বাছা। তোমার রূপের জেল্লার কাছে চাঁদও হার মানবে। এমন অপরূপ রূপ-লাবণ্য এর আগে আমি কোথাও দেখিনি। নিজের দেহ-সৌন্দর্যকে এতো ছোট করে ভাব কেন তুমি? তোমার মতো ফরসা সুন্দরী কন্যা ক'টা আছে দুনিয়ায়?

মেয়েটি বলে, সত্যিই আমি সুন্দরী ছিলাম ওস্তাদ। কিন্তু দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যে মাসের পর মাস কাটছে আমার। এতো চিন্তা ভাবনা মাথায় থাকলে কী মানুষ বাঁচে? হরবখত আমাকে নীলামে দাঁড়াতে হয়। কত দালাল সওদাগর দর দিয়ে যায়। কবে কোথায় যে বিক্রি হয়ে যাবো তার ঠিক নাই। কার হাতে গিয়ে যে পড়বো শেষ পর্যন্ত কিছুই জানি না। সে মানুষ কেমন হবে, কী ভাবে আমাকে গ্রহণ করবে কে জানে?

আমার জীবনের একমাত্র সাধ আপনার সঙ্গীত-পাঠশালায় আমি গান শিখবো। তার জন্যে যে-কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি আমি। যে-কোন কষ্ট স্বীকার করতে সম্মত আছি। আপনি আমাকে দয়া করে আপনার পায়ে আশ্রয় দিন, ওস্তাদ।

এই সময় বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করলো। ইশাক তাকে জিজ্ঞেস করলো, কত দাম নেবে এর? তার আগে বলো, এর নামটা কী?

বৃদ্ধ বলে, ওর নাম তুফা অল কুলুব। কিমত অন্ততপক্ষে দশ হাজার দিনার। এই দাম অনেকেই দিয়ে গেছে। কিন্তু দামটাই সব নয়। মেয়ের সম্মতিই আসল। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই মেয়েকে রাজি করাতে পারিনি। ওর একমাত্র বায়না আপনার কাছে গান-বাজনা শিখবে। আপনি যদি সম্মতি হন তবে ঐ দশ হাজারেই আমি দিয়ে দেব আপনাকে। টাকাটাই এখানে বড় নয় ওস্তাদজী। ওকে মানুষ করতে আমার তার চেয়ে বেশিই খরচ পড়েছে।

ইশাক হেসে বললো, ঠিক আছে, দশ হাজার কেন, বিশ হাজারই দেব তোমাকে। আমি জেনেছি, এ মেয়ের মূল্য আরও অনেক বেশি হতে পারতো। ঠিক আছে, তা হলে ঐ কথাই রইলো, একে আমার প্রাসাদে পাঠিয়ে দাও। টাকাটা হাতে হাতেই দিয়ে দেব!

এরপর ইশাক ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে এসে খলিফাকে সব জানালো। খলিফা শুনে পুলকিত হলেন। তারপর তাঁরা বৃদ্ধের বাড়ি ছেড়ে নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ তুফা অল কুলুবকে ইশাকের প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে নগদ বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে এলো।

ইশাকের খুদে খোজা-নফররা তুফাকে হামামে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে ঘষে মেজে সুগন্ধী আতরজলে গোসল করালো। তার মূল্যবান সাজ-পোশাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলো। পরিয়ে দিলো নানারকম রত্ন আভরণ।

ইশাক ফিরে এসে তুফাকে বাদশাহী সাজ-পোশাকে সজ্জিতা দেখে প্রথমে যেন চিনতেই পারে না। আহা এমন ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটি মাত্র কয়েকটা মাস থাকবে তার কাছে। তার পাঠশালায় গান বাজনা শিখবে। তারপর যথাস্থানে সুলতানের হারেমে পাঠিয়ে দিতে হবে!

ভাবতেও মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায় ইশাকের। দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা এই সুগন্ধী পুষ্পটি লালন করে প্রস্ফুটিত করারই শুধু দায় আছে তার। ওকে আঘ্রাণ করার অধিকার একমাত্র খলিফা হারুন অল রসিদের, আর কারুর নয়।

ইশাক তার খোজা-নফরদের নির্দেশ দিলো তুফাকে খুব আদর-যত্নের মধ্যে যেন লালন করা হয়।

একদিন বিকালে তুফা প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে আপন মনে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় সেখানে ইশাক এসে উপস্থিত হলো। তুফা কিন্তু ইশাকের উপস্থিতি বুঝতে পারলো না।

সঙ্গীতের সুললিত সুরে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ইশাক। এমন গান যার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে পারে নিশ্চয়ই সে কোনও মানবী নয়! তার পাঠশালায় এসেছে, সে গানের পাঠ নিতে। কিন্তু এ সঙ্গীত যার কণ্ঠে, তাকে সে কী শেখাবে, কী শেখাতে পারবে? সঙ্গীতের উচ্চমার্গে যে বিচরণ করছে তাকে সে আর কী শেখাতে পারবে?

হঠাৎ ইশাককে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তুফা ছুটে যায় তার কাছে, কী ব্যাপার, আপনি এমন মনমরা হয়ে শুকনো মুখে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ওস্তাদ? শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?

ইশাক সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, এমন গান তুমি কোথায় শিখেছ, তুফা?

তরুণী তুফা লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। কোনও জবাব দিতে পারে না। ইশাক বলে, তোমার গলায় যাদু আছে, বাছা। এ বস্তু শুধু তালিম নিয়ে রপ্ত করা যায় না।

তুফা বলে, আপনি আমার ওস্তাদ। আপনার আশীর্বাদেই যা কিছু সম্ভব হয়েছে।

—ও কথা বলো না, তুফা। তুমি যে সঙ্গীত-সুধার অধিকারিণী আমি আজ তা সংগ্রহ করতে পারিনি। তোমার সঙ্গীতের মূল্য যদি দিনার হয়, আমার সঙ্গীতের দাম হতে পারে মাত্র একটি দিরহাম। তুমি নিজেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ, তোমাকে শেখাবার মতো স্পর্ধা আমার নাই। চলো আর কালবিলম্ব না করে এখুনি তোমাকে খলিফার হাতে তুলে দিয়ে আসি। তাঁর অনুগ্রহে তুমি হারেমের সেরা বাঁদী হয়ে দিন কাটাতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার হয়েছে। কিন্তু তখন এই অধম ইশাককে তুমি ভুলে যেও না, তুফা।

তুফা কেঁদে আকুল হয়ে ওঠে, এ কি কথা মুখে আনছেন ওস্তাদ, আপনিই আমার ঝর্ণার একমাত্র উৎস। তাকে আমি ভুলে যাবো?

ইশাক একখানা কোরান এনে তুলে দিলো তুফার হাতে। কোরানখানা মাথায় ঠেকিয়ে তুফা শপথ করলো, জীবনে যতদিন বাঁচবো, কোনও দিন আপনাকে ভুলবো না, ওস্তাদ।

ইশাক বললো, তোমার অদৃষ্টের লিখন অপূর্ব। এবং তারই ফলে আজ তুমি খলিফার অঙ্কশায়িনী হতে চলেছ। আমি প্রার্থনা করি, তুমি চিরসুখী হও। এবার আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ কর তুফা। এইমাত্র যে গানটি তুমি গাইছিলে, যাবার আগে, আর একবার ঐ গানটি

আমাকে শুনিয়ে দাও। আর একটা কথা, খলিফার সামনে যখন তুমি উপস্থিত হবে এই গানটাই তাকে শুনিয়ো প্রথমে।

তুফা আবার ধরলো গানটি। শেষও করলো এক সময়। ইশাক কিন্তু মুদিত-নয়নে তন্ময় হয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বললো, এবার তোমার জীবনের কাহিনী শোনাবে না, তুফা? আমি জানি যেখানে তুমি ছিলে এতকাল, সে তোমার প্রকৃত জায়গা নয়। কিন্তু কী করে কক্ষচ্যুত হয়ে তুমি অমর্ত্যলোক ছেড়ে অতি সাধারণ এক দরিদ্র ঘরে এসে উঠেছিলে?

তুফা মৃদু হেসে বলতে থাকে, আপনি আমার মালিক, প্রভু, ওস্তাদ। আপনার কাছে লুকাবার আমার কিছুই থাকতে পারে না। তবে আমার জীবনের কাহিনী বড়ই বিচিত্র—পুঁথির পাতায় লিখে রাখার মতো। তবে আজ নয়, সময় মতো আর একদিন, শোনাবো আপনাকে। এখন চলুন সুলতানের প্রাসাদে যাই আমরা।

একটু পরে জমকালো সাজপোশাক পরে ইশাকের সামনে এসে দাঁড়ালো তুফা।

সুলতানের প্রাসাদে এসে বিরাট একটা সুসজ্জিত কক্ষের মাঝে তুফাকে বসিয়ে ইশাক বললো, এখানে তুমি বসো। আমি খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি।

খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে ইশাক নিবেদন করলো, বেহেস্তের এক ডানাকাটা পরীকে নিয়ে এসেছি জাঁহাপনা।

খলিফা বললেন, যাকে আমরা সেই বৃদ্ধের বাড়িতে দেখেছিলাম? যার মধুর গান শুনেছিলাম?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা, আপনার স্মরণ আছে দেখছি!

—তাকে কি ভোলা যায় ইশাক? সে যে সকালবেলায় শিশির, সন্ধ্যাকালের শুকতারা। তার গান একবার যে শুনেছে, সে কি কখনও তাকে ভুলতে পারে? যাও যাও, শিগ্গির তাকে নিয়ে এসো এখানে। তার গান শুনে জীবন সার্থক করি।

এই সময় রাত্রিও প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো ঊনত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

একটু পরে ইশাক তুফাকে সঙ্গে করে খলিফার সামনে এসে দাঁড়ালো। খলিফার চোখ প্রজ্জ্বল হলো। হৃদয় নেচে উঠলো। খলিফা দেখলেন সুন্দরী তাকে কুর্ণিশ জানাচ্ছে। তিনি আশীর্বাদ জানালেন, খোদা তোমাকে চিরসুখী করুন, সুন্দরী।

মসনদ ছেড়ে নেমে এসে তুফার হাত ধরলেন খলিফা। তারপর তার বোরখার নাকাবটা নামিয়ে দিলেন নিজের হাতে। এর অর্থ এখন থেকে সে সুলতানের হারেমের বাঁদী হলো।

এরপর হাতে ধরে মসনদে নিয়ে গিয়ে তুফাকে তার পাশে বসালেন খলিফা। গান শুরু হলো। সেই গান।

সঙ্গীতের অপূর্ব মুর্ছনায় খলিফা বিমোহিত হয়ে পড়লেন।

—এমন সঙ্গীত তুমি কোথায় পেয়েছ, সুন্দরী?

খলিফার প্রশংসায় অন্তর নেচে ওঠে তুফার। কিন্তু লজ্জায় মাথা তুলে তাকাতে পারে না।

খলিফা বলতে থাকেন, তুমি হলে আল্লার শ্রেষ্ঠ অবদান।

তারপর ইশাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, একি হে ইশাক, এ যে গুরুমারা বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছ তোমার ছাত্রীকে! আমার তো মনে হয় এ গান তুমিও এমন করে গাইতে পারবে না।

—আপনি যথার্থই বলেছেন জাঁহাপনা, এমন মধুর গান আমার কণ্ঠ থেকে বেরুবে

না। আল্লাহর দোয়ায় যা কিছু আমি পেয়েছি, শিখেছে তার সবটাই, তুচ্ছ হয়ে গেছে এই সঙ্গীতের কাছে। এখন ভাবছি, এতো যে আমার দেশ জোড়া নাম, তার কিই বা মূল্য আছে।

খলিফা বললেন, বহুত আচ্ছা। এতদিন পরে তোমার দম্ভ ভাঙ্গলো, তাহলে, ইশাক। স্বীকার করলে, তুমি যা জান তাই শেষ কথা নয়?

—এ গান শোনার পর সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠা নাই আমার ধর্মাবতার। সত্যিই আমি এতকাল ধরে সঙ্গীত-সাগরে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম মাত্র।

তুফা আর একটি গান গেয়ে শোনালো. খলিফা মাসরুরকে বললেন, যা, একে হারেমে নিয়ে যা। দেখিস যেন আদর যত্নের কোনও রকম ত্রুটি না হয় কখনও।

তুফা মাসরুর সঙ্গে অন্দরমহলে চলে গেলে খলিফা বললো মেয়েটি অসাধারণ রূপ-গুণেরই অধিকারিণী নয়, রুচিও বড় সুন্দর। কেমন সুন্দর করে সেজেছে। আর অত জমকালো সাজ-পোশাকই বা কোথায় পেলো সে?

ইশাক বললো, এই বান্দাই পছন্দ করে কিনে দিয়েছিলো জাঁহাপনা। তবে পোশাক যতই মূল্যবান হোক তা মানানসই করে পরতে না জানলে মোটেই সুন্দর দেখায় না। আর সবার ওপরে জাঁহাপনার প্রসন্ন দৃষ্টিই তাকে আরও সুন্দর করে তুলতে পেরেছে।

খলিফা জাফরকে ডেকে বললেন, ইশাক আজ আমাকে যা দিয়েছে, কড়ির মূল্যে তা কেনা যায় না জাফর, এক লক্ষ মোহর ওর প্রাসাদে বকশিস পাঠিয়ে দাও। সেই সঙ্গে দশটি মূল্যবান সাজ-পোশাকও দিও।

সন্ধ্যা সমাগত হলে খলিফা সুন্দরী তুফার কক্ষে এলেন। দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নতুন রোমাঞ্চে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলেন তুফা আজ পর্যন্ত অনাঘ্রাতা অপাপবিদ্ধা একটি ফুল। তারই ভোগের পাত্রী হয়ে অপেক্ষা করছিলো সে এতদিন।

সেইদিন থেকে তুফা খলিফার হৃদয়-সিংহাসনে সর্বোচ্চ সমাদর ও ভালোবাসায় অধিষ্ঠিতা হয়ে রইলো। খলিফা তুফার শিক্ষা দীক্ষা বুদ্ধি বিচক্ষণতা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলতে গেলে তার হাতেই সরকার পরিচালনার চাবিকাঠি তুলে দিলেন। মাসে দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মাসহারা বন্দোবস্ত করা হলো! এবং তার পরিচর্যার জন্য পঞ্চাশটি নফর চাকর পরিচারিকা দাসী বাঁদীর ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি।

ভালোবাসার আকর্ষণ দিনে দিনে এমনই ভাবে বাড়তে থাকলো যে, খলিফা আজকাল বড়ো একটা অন্য কোনও বাঁদী বেগমের ঘরে রাত কাটান না। দরবার শেষে সোজা চলে যান তিনি তুফার মহলে। সেখানেই তাঁর সর্বাধিক সময় কাটে।

অন্য কোনও খোজার প্রহরাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। তুফার মহল ছেড়ে চলে আসার সময় তিনি নিজ হাতে দরজায় কুলুপ এঁটে দেন। আবার ফিরে এসে নিজে হাতেই সে তালা খুলে তুফার ঘরে প্রবেশ করেন।

একদিন খলিফা তুফার ঘরে প্রবেশ করে ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে আদর জানিয়ে চুম্বন করলেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত, ক্ষোভে ফেটে পড়লো তুফা। রাগের মাথায় কী করবে ভেবে না পেয়ে সাধের তানপুরাটাই দু'খানা করে ভেঙ্গে ফেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। খলিফা হতভম্ব তুফার গোসার কারণ কি কিছুই আন্দাজ করতে পারলেন না।

—কী হলো মনি, কী করলাম আমি? অমন করে কাঁদছো কেন? তোমার চোখে পানি দেখলে যে আমি আর ঠিক থাকতে পারি না। বলো আমার কী দোষ হয়েছে?

—দোষের কথা নয় জাঁহাপনা, তুফা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলে, আপনি আর আগের মতো আমাকে ভালোবাসেন না।

—হায় আল্লাহ, এই তুমি আবিষ্কার করলে? তুমি তো জান না সোনা, তোমার জন্য আজকাল আমি সরকারী কাজেও গাফিলতি আরম্ভ করেছি। তোমাকে চোখের আড়াল করে একদণ্ড আমি সুস্থির থাকতে পারি না। আর তুমি কিনা বললে, আমার ভালোবাসায় ভাটা পড়েছে।

তুফা বলে, তা নয় তো কী? আপনি একটা নিয়ম রক্ষার জন্য শুধু আমার হাতখানা নিয়ে চুমু খেলেন কেন? আমি কী রূপ-যৌবন সব খুইয়ে ফেলেছি এর মধ্যে। আমার অধরে কি কামনা নাই? আমার বুকে কি আর মধু পান না আপনি? শুধু শুকনো একখানা হাত টেনে ঠোঁট ছুইয়ে কর্তব্য শেষ করতে চাইছেন।

উষ্মার আসল কারণ অনুধাবন করতে পেরে সুলতান দু'হাতে তুফার দেহখানা টেনে নেন বুকের মধ্যে, চুম্বনে চুম্বনে আরক্ত করে দেন ওর অধর, স্তন, নাভিস্থল, জঙ্ঘা।

—ও, এই জন্য তুমি রাগ করেছ মনি। তুমি জান না আমি তোমায় কত ভালোবাসি। আমার চাচার মেয়ে জুবেদা আমার খাস বেগম—তাকেও আমি এতো ভালোবাসি না সোনা। তুমি আমার সারা হৃদয় মন অধিকার করে বসে আছ।

একদিন খলিফা শিকারে বেরিয়ে গেছেন, তুফা একা একা তার ঘরে বসে একখানা বই পড়ছিলো, এমন সময় সেখানে বেগম জুবেদা এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ নাকে একটা সুমধুর সুগন্ধ ভেসে আসতে চোখ তুলে তাকাতেই জুবেদাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে আভুমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে কাচুমাচু মুখে বলতে লাগলো, আপনি অপরাধ নেবেন না বেগমসাহেবা। এ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুবার আমার অনুমতি নাই, তাই আপনার সঙ্গে ইচ্ছা থাকলেও, সাক্ষাৎ করতে যেতে পারিনি। বাঁদীর ঘরে আপনি নিজেই যখন এসেছেন, মেহেরবানী করে আসন গ্রহণ করে ধন্য করুন।

জুবেদা তুফার প্রায় গা ঘেঁষে বসে পড়লেন। তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলো আমি শুনেছি তুমি খুব উঁচুমানের মেয়ে। তোমার মধ্যে দয়া, মায়া, মমতা, স্বার্থত্যাগের কোনও অভাব নাই। আজ তোমার সামনে এসে তোমার বিনয়াবনত ব্যবহার দেখে আমারও সে কথা মনে হচ্ছে। সহজাত মহত্ত্বই তোমার ভূষণ। আমার স্বামীর দিব্যি নিয়ে বলছি, তার পেয়ারের বাঁদীদের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ানো আমার স্বভাব নয় তুফা। তা সত্ত্বেও তোমার কাছে কেন এলাম? শোনও তাহলে বলি ঃ যে দিন থেকে এই হারেমে তুমি এসেছ, সেইদিন থেকে আমার সুখের দিন শেষ হয়েছে তুফা। একদিকে সুলতানের কাছে তোমার সমাদর, আদর সোহাগ যেমন বেড়েছে, অন্যদিকে আমার বেলায় তেমনি ভাটা পড়েছে। আজকাল বলতে গেলে, সুলতান আর আমার মহলে পা-ই রাখেন না। আমি যেন প্রায় অবহেলিত হয়ে এই প্রাসাদের এক কোণে পড়ে আছি এক নগণ্যা নারীর মতো। এই হারেমে একদা সুলতান-সোহাগিনী অনেক বাঁজা বাঁদী পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। আমার ভয় হচ্ছে, অবশেষে আমাকেও কি তাদের দলে নাম লেখাতে হবে! না হলে আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী, ভুলেও তিনি একবার আমার খোঁজ করেন না আজকাল!

জুবেদা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বেগমসাহেবার দুঃখে তুফাও চোখের জল ধরে রাখতে পারলো না। সেও কাঁদতে লাগলো।

কিন্তু জুবেদা শুধু কাঁদতেই থাকলেন না, কাঁদার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলাও অব্যাহত রাখলেন তিনি।

—আমি তোমার কাছে একটি আর্জি নিয়ে এসেছি বোন, তুমি এই বড় বোনের মুখের দিকে চেয়ে মাসে অন্তত একটি রাতের জন্য—সুলতানকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও! শুধু একটি মাত্র রাত—এক মাসের মধ্যে। কী পারবে না তাকে ছেড়ে দিতে? যত যা ঘটুক আমি তো তাঁর কেনা বাঁদী নই—কোরান ছুঁয়ে শপথ করে ধর্মমতে শাদী করেছেন তিনি আমাকে।

জুবেদার করতলে অধর রাখলো তুফা, অব্যক্ত বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে অস্ফুট স্বরে বলতে পারলো না না শুধু একরাতের জন্য নয় বেগমসাহেবা, সারা মাসের প্রতিটি রাত্রি তিনি আপনার কাছে অতিবাহিত করবেন। আপনার চোখে পানি—না না, সে মহাপাপ আমার পক্ষে। আমি না জেনে যে গোস্তাকি করেছি আপনি নিজগুণে আমাকে তা ক্ষমা করুন বেগমসাহেবা। আমি আপনার চিরকাল দাসী বাঁদী হয়ে থাকতে চাই।

এই সময় জুবেদা দেখলেন সুলতান শিকার শেষ করে প্রাসাদে ফিরেই তিনি সোজা তুফার ঘরের দিকে ছুটে আসছেন। জুবেদা আর তিলমাত্র অপেক্ষা করলেন না তুফার ঘরে। বললেন, তা হলে আজ চলি, ভাই।

সুলতান ঘরে ঢুকেই তুফাকে কোলে টেনে নিয়ে সোহাগ করতে থাকলেন, জান মনি, শিকারে গিয়ে আর কিছুই ভালো লাগে না। তুমি পাশে নাই, শিকারে মন বসে! একটা খরগোশও মারতে পারলাম না।

দু'জনে সরাবের পাত্র পূর্ণ করে নিলেন। খানা-পিনা শেষ করে বিবস্ত্র হয়ে শয্যায় যাওয়ার জন্য সুলতান তুফাকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। তুফা খলিফাকে সোহাগ জানাতে জানাতে বললেন, আজ আমার একটা কথা রাখতে হবে জাঁহাপনা।

—তোমার কোন্ কথা আমি রাখিনি, সোনা। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই. বলো কী করতে হবে?

তুফা বললো, আপনি বেগমসাহেবার প্রতি প্রসন্ন হোন, আজ রাতটা তার মহলেই কাটিয়ে আসুন, এই আমি চাই জাঁহাপনা।

খলিফা একটু হকচকিয়ে গেলেন তুফার কথায়, বেশ তো, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। হ্যাঁ, অনেক দিন তার কোনও খোঁজখবর নিতে পারিনি, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু মনি, আমি যখন তোমার ঘরে এলাম তখন না বলে যখন সাজ-পোশাক খুলে নগ্ন নাগা হয়ে শুতে যাবো সেই সময় একথা বললে কেন?

তুফা বললো, মহাজন বলেছেন, যখন তুমি কিছু প্রার্থনা করবে তখন তুমি অবশ্যই নগ্ন বিবস্ত্র থাকবে।

তুফার মুখে উপদেশের বাণী শুনে ওকে দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন সুলতান। তারপর যা ঘটার তাই ঘটেছিলো।

তুফার মহলে তালা এঁটে জুবেদার মহলে চলে এলেন সুলতান।

এরপর তুফার জীবনে যা ঘটেছিলো তা বড়ই বিচিত্র—এক কথায় অনন্য সাধারণ বলা যায়। যাই হোক সেই কাহিনীই ধীরে ধীরে শোনাবো আপনাকে, জাঁহাপনা—

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো তিরিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সুলতান চলে গেলে তুফা একখানা বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারলো না। বইখানা রেখে দিয়ে তানপুরাটা তুলে নিয়ে গান ধরলো।

সঙ্গীত-মূর্ছনায় বিভোর হয়ে গেছে তুফা, এমন সময় সে দেখল ঘরের মধ্যে এসে

দাঁড়িয়েছে এক বৃদ্ধ। তুফার সারা শরীর ভয়ে কেঁপে উঠলো, এমন সুরক্ষিত হারেমে পরপুরুষ প্রবেশ করলো কী উপায়ে? সে কি স্বপ্ন দেখছে জেগে জেগে?

বৃদ্ধটা কাছে এলো না কোনও কথা বললো না। তুফা আর সেদিকে তাকালো না, গানও থামালো না। যেন কিছুই ঘটেনি, কেউই আসেনি সেখানে এমনই ভাব করে আপন মনে গাইতেই থাকলো।

আড়চোখে লক্ষ্য করে দেখতে থাকলো তুফা; লোকটা গানের তালে তাল মিলিয়ে অপূর্ব ছন্দে নেচে চলেছে।

এক সময় সে গান থামায়। বৃদ্ধের নাচও বন্ধ হয়ে যায়। এবার সে কাছে এগিয়ে এসে বলে, আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ? ভয়ের কিছু নাই তুফা। আমি তোমাকে অনেক আগে থেকেই জানি। আমার দ্বারা কোনও রকম অনিষ্ট তোমার হবে না।

বুকে সাহস টেনে তুফা বলে, কে তুমি? সুলতানের এই হারেমে তো কোনও পুরুষের প্রবেশ অধিকার নাই। তুমি এলে কি করে এখানে?

বৃদ্ধ বললো, আমার গতি অবাধ, আমাকে কেউ রুখতে পারে না।

তুফা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, তবে কি তুমি কোনও জিন?

বৃদ্ধ বলে; তোমার অনুমান সত্য, আমি জিনিস্তান থেকে আসছি। আমার নাম ইবলিস।

—ইয়া আল্লাহ! তুফা আর্তনাদ করে ওঠে, একি করলে তুমি? আমি তো কখনও বিধর্মের কথা চিন্তা করিনি?

বৃদ্ধ ইবলিস আরও কাছে এসে তুফার হাতে চুম্বন করে বললো, আমাকে ভয় করো না, বাছা। হতে পারি জিন, কিন্তু বিশ্বাস কর আমি তোমার ক্ষতি করতে আসিনি এখানে। বরঞ্চ, বহুদিন ধরে তোমাকে আমি আড়াল করে রেখেছি, যাতে কেউই তোমার কেশাগ্র স্পর্শ না করতে পারে। আমাদের মহারানী জিন-সম্রাজ্ঞী কামারিয়াহ তোমাকে প্রাণাধিক ভালোবেসে ফেলেছেন। আমি তারই আজ্ঞাবহ, সকল বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি আমার ঘাড়ে দিয়েছেন। তুমি জান না, কত দিন গভীর রাতে আমাকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন এখানে। আমি দেখেছি, সারাটা রাত তিনি অপলকভাবে তোমার নিদ্রিত দেহের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার রাতের অন্ধকারেই স্বরাজ্যে ফিরে গেছেন। তোমাকে দেখে দেখে তাঁর যেন আর আশ মেটে না।

কিন্তু আজ আমি একাই এসেছি তার দূত হয়ে। যদি তুমি আমার ওপর ভরসা রেখে আমার সঙ্গে এই রাতে জিনিস্তানে চলো তবে তোমাকে মাথায় করে রাখবেন মহারানী। আজ একটা পরম শুভদিন। আজ আমার কন্যার বিয়ে হচ্ছে, আর ছেলের হচ্ছে ছুন্নত। দারুণ আনন্দ উৎসবের বান ডেকেছে সারা জিনিস্তানে। এই শুভদিনে মহারানী তোমাকে একান্তভাবেই কামনা করছেন। তুমি উপস্থিত থাকলে, আমাদের উৎসব আনন্দ আরও দশগুণ বেড়ে যাবে। আমার অনুরোধ, তুমি না করো না, চলো আমার সঙ্গে। সেখানে তুমি যতদিন বা যতক্ষণ থাকতে চাও থেক, তারপর যদি না ভালো লাগে, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব এখানে।

ইবলিসের এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার সাহস হলো না ভয়ার্ত তুফার। সে জানতো 'না' বললে হিতে বিপরীত হবে। তখন সে জোর করেই তাকে নিয়ে যাবে।

ঘাড় নেড়ে সে সম্মতি জানালো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইবলিস তুফাকে পিঠে বসিয়ে কী এক আশ্চর্য যাদুবলে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে উর্ধ্বাকাশে উড়ে চলতে থাকলো।

নিচের দিকে তাকিয়ে তুফা বুঝতে পারলো সে কত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে

ইবলিসের পিঠে চেপে। মাথাটা কেমন বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। তারপর কখন যে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, আর বুঝতে পারেনি।

যখন জ্ঞান ফিরলো, চোখ মেলে সে দেখলো এক স্বপ্নে দেখা সোনার প্রাসাদপুরীতে এসে পৌঁচেছে। যেদিকে তাকায় চোখ জুড়িয়ে যায়, হীরা চুনী, পান্না, মুক্তোর ছড়াছড়ি। প্রাসাদের দেওয়াল মহামূল্যবান মনি ও রত্ন দিয়ে কারুকার্য করা। আলোর ছটায় ঝলমল করছে চতুর্দিক।

জিন-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তুফাকে দেখা মাত্র সহাস্যে নেমে এলেন তিনি। তার পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ালো তিনটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। সকলেই তুফাকে স্বাগত জানিয়ে অভিবাদন করলো। মহারানী এগিয়ে এসে একখানা হাত টেনে নিয়ে চুম্বন করলেন।

তুফার বুঝতে অসুবিধে হলো না এই সেই মহারানী কামারিয়াহ।

তুফাকে হাতে ধরে মহারানী তাঁর সিংহাসনে নিয়ে গিয়ে পাশে বসালেন। দু'হাত বাড়িয়ে বুকে চেপে ধরে আদর সোহাগ করলেন অনেকক্ষণ।

এমন সময় বৃদ্ধ ইবলিস আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে আমিই বাদ পড়ে গেলাম শুধু।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো একত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সঙ্গে সঙ্গে হাসির তুফান উঠলো। সে হাসিতে তুফাও যোগ না দিয়ে পারলো না।

মহারানী কামারিয়াহ বললেন, আমি তোমাকে কি যে ভালোবাসি বোন, কি করে বোঝাবো তোমাকে! তোমাকে কাছে পাবো বলে আমার আকুতির অন্ত নাই।

তুফা বললো, আপনাকে দেখে আমি মোহিত হয়ে গেছি মহারানী। আপনার এই আদর সোহাগ আমার চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

এই বলে তুফা কামারিয়াহর সামনে গড় হয়ে নমস্কার জানালো। মহারানী দু'হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিলেন তুফাকে। আদর চুম্বন করে বাকী তিন নারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, এরা আমার বোন, সম্রাটের অন্য তিন পত্নী।

তুফা ওদেরও অভিবাদন জানালো।

পরিচারিকারা নানারকম খানাপিনার থালা সাজিয়ে দিলো সামনে। মহারানী বললেন, নাও খেয়ে নাও ভাই।

সিংহাসনের দুই পাশে দু'টি দৈত্যের মতো বিরাট এবং কুৎসিত কদাকার দুই জিন দানব দণ্ডায়মান ছিলো। ওদের দেখে তুফার অন্তরাত্মা শুকিয়ে উঠছিলো। খিদে তেষ্টা সব উঠে গিয়েছিলো ওর। তুফা সাহস করে মহারানী কামারিয়াহর কানে কানে ফিসফিস করে বললো, আচ্ছা মহারানী, ওরা অত ভয়ঙ্কর কুৎসিত কেন?

মহারানী অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, ভয় নাই, ভাই, ওদের একজনের নাম অল শিসবান, আর একজন স্বনামে ধন্য মাইমুন, আমার দেহরক্ষী। ওরা দেখতে অসুন্দর হলেও ভয়ের কিছু নাই। তোমার কোনও অসম্মান যাতে না ঘটে, তাই ওরা সতত প্রস্তুত।

—আমি যে ওদের দিকে চাইতে পারছি না, মহারানী! ঐ মাইমুন যেন আরও বেশি ভয়ঙ্কর। আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

তুফার কথায় আবার হো হো করে হেসে উঠলেন কামারিয়াহ। হাসির কারণ বুঝতে না পেরে শিসবান জিজ্ঞেস করলো, কি হলো, অমন হাসছেন কেন, মহারানী? এমন কি মজার ব্যাপার ঘটলো?

জিনেদের দুর্বোধ্য ভাষায় মহারানী ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো ওদের। তা শুনে রুষ্ট হওয়ার বদলে দু'জনেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আর কি?

তুফার মনে আর সংশয় রইলো না। ভয়-টয় উবে গেলো তৎক্ষণাৎ। হাসি গল্প কথার মধ্য দিয়ে আহারাদি শেষ করলো সে।

এরপর ইবলিস মদের একটা পাত্র এনে হাজির করলো তুফার সামনে। বললো, অবশ্য এই ঝারির মদের আর তেমন প্রয়োজন নাই, তোমার রূপের মদিরাতেই আমরা সবাই মাতাল হয়ে উঠেছি এরই মধ্যে।

আবার হাসির গমকে ফেটে পড়লো মহারানীর মহল।

বৃদ্ধ বললো, তোমার সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত একমাত্র আমিই শুনেছি! সে যে কি বস্তু তা ব্যক্ত করে বোঝাবার ভাষা আমার নাই। তাই মালকিন, আমার অনুরোধ সেই অলৌকিক সঙ্গীত একবার এখানে শুনিয়ে দাও মহারানীদের।

তুফা গান ধরলো, আর তার তালে তালে নাচতে থাকলো বৃদ্ধ ইবলিস।

গানের গমকে চন-মন করে ওঠে সকলে। মহারানী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, আজকের আনন্দের তুলনা নাই। একি শোনালে ভাই? এ কণ্ঠ তুমি কোথায় পেয়েছ? তোমার গান শুনে আমার দেহের রক্তও তার পথে চলতে ভুলে গেছে। হাত দিয়ে দেখ আমার বুকের কলিজাও তার কাজ বন্ধ রেখে তোমার গান শোনার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে। আহা। কি মধুর গানই শোনালে, মন প্রাণ জুড়িয়ে গেলো! আর একখানা শোনাবে ভাই?

তুফা বললো, সে আর বেশি কি কথা। আমার গান আপনার ভালো লেগেছে তাতেই আমি ধন্য। আপনার যতক্ষণ ভালো লাগে শুনুন, আমি গাইছি।

গানে গানে উদ্দাম হয়ে উঠলো জিন হুরী। স্থান কাল পাত্র ভুলে ছোট বড় সকলে থৈ থৈ করে নাচতে লাগলো।

এইভাবে একটানা গানের মাইফেল চললো অনেকক্ষণ। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে এক সময় থামলো তুফা। মহারাণী কামারিয়াহ ওকে জড়িয়ে ধরে অন্তরের সোহাগ জানালেন।

—আমার মুখে ভাষা নাই বোন, যে তোমার গানের উপযুক্ত প্রশংসা করতে পারি। তুমি আমাদের যে আনন্দ দিলে তার কোনও তুলনা হয় না। শুধু শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাকে খাটো করতে চাই না।

তুফা আহ্লাদে ফেটে পড়ে, আপনারা খুশি হয়েছেন এই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। আজ আমি এখানে পৌঁছনোর পর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। না হলে এতক্ষণে আরও অনেক রকমের গান শোনাতে পারতাম আপনাদের। আবার যদি কখনও সুযোগ হয় আমি আসবো আপনার কাছে। তখন দেখবেন কত গান শোনাই। কিন্তু আজ আর নয়, রাত শেষ হয়ে আসছে, এবার ইবলিস দাদু আপনি আমাকে মেহেরবানী করে আমার প্রাসাদে রেখে আসুন। আমার মালিক ধর্মাবতার খলিফা যদি আমাকে ঘরে না দেখেন তবে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে। আমি দাঁড়িয়ে থেকে কন্যার শাদী এবং পুত্রের ছুন্নত দেখে যেতাম কিন্তু আজ আর এখানে অবস্থান করার শক্তি এবং সাহস আমার নাই।

বৃদ্ধ ইবলিস বললো, এখনি চলে যাবে শুনে ব্যথায় বুক ফেটে যেতে চাইছে। কিন্তু কীই বা উপায়, তোমাকে তো ফিরতে হবে সেখানে। যাই হোক, আরও একটু সময় কাটিয়ে যাও, এই আমাদের ইচ্ছা তুফা। কী, পারবে না? সবে আমরা মদের পাত্র অধরে রেখেছি। এমন সময় তুমি পেয়ালা নামিয়ে রেখে মৌতাত ভেঙ্গে দিতে বলছো ভাই? আর একটু সময় কি তুমি যাওয়াটা পিছিয়ে দিতে পার না তুফা?

তুফা বললো, আর আমাকে ধরে রাখবেন না দাদু। আমার হাত পা বাঁধা, আপনি অবশ্যই জানেন। এখুনি আমাকে খলিফার হারেমে ফিরে যেতে হবে। আমি মাটির সন্তান, মাটিতেই আমার সুখ শান্তি। এই জিন হুরী যতই সুন্দর হোক, এ জায়গা মানুষের জন্য নয়। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি আর আমাকে এখানে ধরে রাখবেন না। অবশ্য আপনারাও নিশ্চয়ই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আটকে রাখতে চান না।

—তোমার কথা শিরোধার্য সুন্দরী, ইবলিস বললো, তবে যাবার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আমি জানি তোমার ওস্তাদ স্বনামধন্য ইশাক ইবন ইবরাহিম। তিনি আমাকে বেশ ভালো করেই জানেন। এক শীতের সন্ধ্যায় একটা ব্যাপার ঘটেছিলো। সময়মতো তোমাকে সব বলবো। আজ শুধু এইটুকু জেনে যাও, তোমার গুরু ইশাক আজ জগৎ বিখ্যাত হতে পেরেছে আমারই কল্যাণে। আর তুমি? তুমিই বা এই কোকিল কণ্ঠ পেলে কী করে? সেও আমারই দেওয়া! ইশাকের ওপর আমি যতটা প্রসন্ন, তোমার ওপর তার চাইতে অনেক বেশি। তুমি যখন গান গাইতে শুরু কর আমি তোমার কণ্ঠে ভর করি। তাই তোমার গান শুনে সবাই পাগল হয়ে ওঠে। এরপর আমি তোমাকে যে সুর দেব তা শুনে সারা দুনিয়া অবাক হয়ে যাবে। খলিফা তোমাকে মাথার মণি করে রাখবেন চিরকাল। সুতরাং ভেবে দেখ, কী করবে, তুফা?

ইবলিস তুফার তানপুরাটা তুলে নিয়ে গান ধরলে তুফা চমকে উঠলো, এমন নতুন সুর তো কখনও সে শোনেনি কোথাও? মুহূর্তের মধ্যে সে বুঝতে পারলো, এতদিন ওস্তাদ ইশাক তাকে যা শিখিয়েছে তা এর কাছে নেহাতই ভুলে ভরা।

ইবলিসের হাত থেকে তানপুরাটা নিয়ে সে ঐ গানটা হুবহু গেয়ে দিলো। মহারাণী এবং তার সঙ্গীনিরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। চমৎকার—চমৎকার তুফা, জবাব নাই! তুমি একেবারে উচ্চমার্গে পৌঁছে গেছ, আমি তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধিতে বরণ করলাম। আজ থেকে তুমি সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী হলে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো ছত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

একখানা সুদৃশ্য মোরগের চামড়ার ওপর ইবলিস নিজ হাতে মানপত্র রচনা করে তুফার হাতে তুলে দিয়ে বললো, এ সম্মান পৃথিবীর কোনও মানুষ আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারেনি তুফা, তুমিই শুধু পারলে?

এর পর তুড়ি বাজাতেই বারটি সুন্দরী মেয়ে প্রত্যেকে একটা করে সোনার বাক্স মাথায় করে প্রবেশ করলো সেখানে। বাক্সগুলি মহামূল্যবান রত্ন অলঙ্কারে ভরা ছিলো। ইবলিস খুলে খুলে দেখালো বাক্সগুলো, এই সবই তোমার। মহারানী তোমাকে উপহার দিলেন।

মহারানী কামারিয়াহ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসে তুফাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে

থাকেন, আমি জানি কোনও কিছু দিয়েও তোমাকে ধরে রাখতে পারবো না এখানে। তবে এই বড় বোনকে মনে রেখ। আবার তুমি সময় মতো এসো আমাদের মাঝখানে, দু'দণ্ডের আনন্দ ভালোবাসায় আবার আমার মহল মুখর করে তুলো, এই আমার অনুরোধ, বোন! প্রতি রাতেই আমি তোমাকে দেখতে যাই তোমার প্রাসাদে। আজও ইবলিসের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারনি। কারণ আমি অশরীরি হয়েছিলাম তখন। তাই তুমি আমাকে দেখতে পাওনি। এরপর আমি সশরীরে একটি ছোট মেয়ের রূপ ধরে তোমার ঘরে গিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে জাগাবো তুফা। তুমি রাগ করবে না তো?

তুফা বলে, কি যে বলেন, না না, আমি খুব খুশি হবো মহারানী, আপনি যাবেন আমার ঘরে! আপনার হাতের স্পর্শে যদি আমার ঘুম ভাঙ্গে তার চেয়ে আর আনন্দের কি হতে পারে, মহারানী?

শেষ বারের মতো কামারিয়াহ তুফার কপোলে চুম্বন এঁকে দিয়ে বিদায় জানান।

ইবলিস হামাগুড়ি দিয়ে বসে তুফাকে পিঠে বসিয়ে আবার উড়ে চলে আকাশ পথে। চলার গতি বিদ্যুতের প্রায়। এবার কিন্তু তুফার ভয় করে না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে না।

উড়তে উড়তে প্রাসাদে এসে অতি সন্তর্পণে তুফাকে তার পালঙ্ক-শয্যায় নামিয়ে দেয় ইবলিস। তারপর কুর্নিশ জানিয়ে নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

তুফার চোখে ঘুম আসে না। তানপুরাটা তুলে নিয়ে সে গান ধরে।

গানের আওয়াজে অবাক হয়ে উঁকি দেয় খোজা প্রহরী সাবাব। একি ভুতুড়ে কাণ্ড রে বাবা। যে মেয়েকে সারা প্রাসাদ তোলপাড় করেও খুঁজে পাওয়া যায়নি, হঠাৎ আবার সে তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো কী করে? চারদিকে সতর্ক পাহারা ফাঁকি দিয়ে একটা পতঙ্গেরও তো ঢোকার উপায় নাই এই হারেমে। সেক্ষেত্রে তুফা বাঁদী কি করেই বা রাতারাতি অদৃশ্য হতে পেরেছিলো, আবার কি করেই বা সে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আবার নিজের ঘরে প্রবেশ করতে পারলো?

কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে সে খলিফার খাস দেহরক্ষী মাসরুরের কাছে ছুটে গেলো।

সব শুনে মাসরুর বললো, 'কী, আজ বুঝি মাত্রাটা বেশি হয়ে গেছে? খলিফা শুনলে তোর গর্দান নেবে।

সাবাব বললো, কিন্তু নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারছি না মাসরুরজী। বিশ্বাস না হয়, আপনি চলুন, স্বচক্ষে দেখবেন তাকে।

অবশেষে সাবাবের কথার অসারতা প্রমাণ করার জন্যেই মাসরুর এলো তুফার কামরার সামনে।

তাজ্জব ব্যাপার! এ কি করে সম্ভব? ছুটে গেলো সে খলিফার কক্ষে। সুলতান হারুন অল রসিদ তখন ঘুমে বিভোর। সে সময় তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করা মহা অপরাধ। কিন্তু হতবুদ্ধি মাসরুর তখন সে সব নিয়ম-কানুন বেমালুম ভুলে গিয়ে খলিফাকে ডেকে তুললো।

স্বভাবতই সুলতান ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ওরে পাষণ্ড, তোর এতো সাহস, আমার ঘুম ভাঙ্গালি? কী, কী ব্যাপার, কোন্ সরকারী কার্য রসাতলে যেতে বসেছে যে, এই রাত দুপুরে তুই আমার ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস করলি? জানিস এর সাজা কী?

মাসরুর বলে, জানি ধর্মাবতার, মৃত্যু। কিন্তু এদিকে যা দেখে এলাম, এই মুহূর্তে আপনাকে তা না জানাতে পারলে তাতেও আমাকে মৃত্যুদণ্ডই নিতে হতো। সেই কারণে জানের মায়া ত্যাগ করে এখুনি আপনাকে জানাতে বাধ্য হয়েছি।

—কী এমন আজব খবর?

—জী, মহামান্য মালকিন তুফা ফিরে এসেছেন।

সুলতান হো হো করে হেসে উঠলেন, ব্যাটা নচ্ছার, কুত্তাকা বাচ্চা, চরস টেনেছিস্? এই অপরাধে তোকে শুলে চড়াবো কাল।

—তা আপনার যা অভিরুচি করবেন, জাঁহাপনা। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখে এলাম তিনি তাঁর পালঙ্কে বসে গান ধরেছেন।

সুলতান বললেন, দ্যাখ মাসরুর, এই দুপুর রাতে আমাকে তুই আবার তুফার ঘরে দৌড় করাবি? কিন্তু মনে থাকে যেন, তোর কথা যদি মিথ্যে হয় তবে নির্ঘাৎ ফাঁসী দেব তোকে। আর যদি সত্যি,সত্যিই তুফাকে আমি দেখতে পাই তবে দু' লক্ষ দিনার ইনাম পাবি তুই। আর সেই সঙ্গে আজই তোকে আমার গোলামী থেকে খালাস করে দেব।

মাসরুরকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান তুফার মহলে চলে এলেন। সত্যিই অবাক কাণ্ড, অপূর্ব সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত ভেসে আসছে তুফার কক্ষ থেকে। এবং এ কণ্ঠ তো তার বহুৎ চেনা—তুফা ছাড়া এমন মধুর করে কেই বা এ গান গাইতে পারে?

সুলতানকে দরজার সামনে দেখামাত্র গান থামিয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে তুফা। ভূত দেখার আতঙ্কে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে নিজেকে তুফার বাহুপাশ মুক্ত করে নেন, কে তুমি?

—সে কি জাঁহাপনা, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনার সোহাগের তুফা।

—কিন্তু তুমি তো জিনের কবলে পড়েছিলে? একবার যার ওপর জিনের নজর পড়ে, সে তো আর ফিরে আসতে পারে না! এলে কী করে?

তখন তুফা আদ্যোপান্ত পুরো ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করলো। বললো, এই দেখুন ধর্মাবতার এই সেই মানপত্র। স্বয়ং ইবলিস দিয়েছেন আমাকে। আর এই দেখুন বারটি সোনার তৈরি রত্নালঙ্কারের বাক্স। সবগুলো বাক্সই মহামূল্য মণি-রত্নে ভরা আছে।

এই বলে সে কেশের ভিতর থেকে সেই মানপত্রখানা বের করে দিলো সুলতানের হাতে। এবং বাক্সগুলোর ডালা খুলে বিপুল ঐশ্বর্য আভরণ দেখাতে থাকলো।

এরপর সুলতান হারুন অল রসিদ সব বিশ্বাস করলেন তুফার কথা। এবার তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে তুফাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

সুলতান হারুন অল রসিদের আনন্দের আর অবধি রইলো না। সারা শহর প্রাসাদ আলোকমালায় সজ্জিত করতে বললেন তিনি।

উৎসবের ধূম পড়ে গেলো। ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো গরীবদের জন্য। একমাস ধরে চললো দরিদ্র-সেবা।

কাহিনী শেষ করে শাহরাজাদ থামলো।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেছেন সুলতান শারিয়ার। ভাবলেন, উজির-কন্যা শাহরাজাদকে আর হত্যা করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে তার জীবনে আল্লাহর আশীর্বাদের মতো এসে উপস্থিত হয়েছে। তার মত অসাধারণ গুণবতী মেয়েকে হত্যা করা সঙ্গত হবে না। ওকে বাঁচিয়ে রাখলে ওর কাছ থেকে হয়তো আরও অনেক চমৎকার গল্প কাহিনী শুনতে পাওয়া যাবে।

শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন সুলতান শারিয়ার। চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন, তুমি আল্লাহর বরপুত্রী, তোমার কিস্সা আমার সুব দুঃখ বেদনা ভুলিয়ে দিতে পেরেছে, শাহরাজাদ। আর যদি কিছু কাহিনী শোনাতে চাও, শুরু করে দাও। তোমার কিস্সা শোনার জন্য আমি অধীর হয়ে বসে আছি।

শাহরাজাদ বলে, আমি আপনার বাঁদী জাঁহাপনা, আপনার চিত্ত-বিনোদন করাই

আমার একমাত্র ব্রত। আপনি যদি শুনতে ইচ্ছা করেন, অফুরন্ত কাহিনী শোনাতে পারি আপনাকে। কিন্তু সে সব গল্প আপনাকে খুশি করতে পারবে কিনা জানি না।

সুলতান শারিয়ার বললেন, যে সব কাহিনী তুমি আমাকে শুনিয়েছ, তাতে প্রত্যয় হয়েছে, তুমি এরপর যা শোনাবে তা আমার ভালো লাগবে, বলো। আমার বেগমের বিশ্বাসঘাতকতার পর নারীজাতি সম্পর্কে আমার একটা তীব্র ঘৃণা জন্মেছিলো। কিন্তু তোমার সান্নিধ্যে আসার পর থেকে ধীরে ধীরে সে ভাব আমার গেছে। এখন বুঝতে পারছি সব নারীই একই প্রকৃতির নয়।

শাহরাজাদ বললো, এবার জাঁহাপনাকে অল-মালিক অল-জাহির রুক অল-দিন বাইবারস অল বুন্দুকদারি এবং তার সিপাইসর্দারের কিস্‌সা শোনাবো আমি।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

এক সময়ে মিশরের কাইরো শহরে তুরস্কের এক স্বনামধন্য সুলতান অল মালিক অল জাহির রুক অল-দিন বাইবারস অল বুন্দুকদারি শাসন করতেন। তাঁর শাসন সময়ে ইসলাম আপন মহিমায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করে ফেলেছে। পূর্ব পশ্চিম যে দিকেই যাও না কেন, ইসলামধর্মী ছাড়া আর কিছুর০ই অস্তিত্ব ছিলো না তখন।

সুলতান বাইবারস নিজে যেমন প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন, প্রজারাও তেমনি তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। প্রজারা কীভাবে দিন গুজরান করে তা তিনি নজর রাখতেন সর্বদা।

সুলতানের যে ক'জন সিপাই-সর্দার ছিলো তারা সকলেই তাঁর একান্ত অনুগত এবং বিশ্বস্ত। তাদের মারফতেই তিনি প্রজাদের সুখ দুঃখের সংবাদ সংগ্রহ করতেন নিত্য। সারাদিন কাজের শেষে সুলতান সমীপে হাজির হতেন তারা। সুলতান ওদের নিয়ে গল্পের মজলিস বসাতেন। এক একদিন এক একজন সিপাইসর্দার তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করতো। আজ সেইসব কাহিনীই এখানে শোনাবো জাঁহাপনাকে।

শাহরাজাদ বলতে থাকে, সুলতানের সামনে মুইন অল দিন নামে তাঁর অন্যতম এক সর্দার তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে শুরু করলো :

প্রথম সর্দারের কাহিনী ঃ

আমি যখন প্রথম কাইরোয় এসে সিপাই দলে ভর্তি হই তখন আমাদের সর্দার ছিলেন আলম অল দিন মঞ্জার। তার আগেই অবশ্য আমি বেশ নাম কিনেছিলাম এই কাজে।

শহরের যত সব চোর ছ্যাঁচোড়, মেয়েমানুষের দালাল, লোচ্চা, বদমাইশ, ইতর, বেল্লিকরা আমার নাম শুনলে ঠকঠক করে কাঁপতো। আমি যখন ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের পথে চলি তখন ভয়ে কুঁকড়ে গর্তে ঢুকে যেত যতসব চোর, বদমাইশ, বেতমিজরা। আড়াল থেকে তারা আমাকে উঁকি দিয়ে দেখতো আর তাদের সঙ্গীদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলতো, ঐ দ্যাখ সাক্ষাৎ যম যাচ্ছে।

আমি কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করি না। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে প্রবল প্রতাপে শহর পরিক্রমা করে বেড়াই।

একদিন আমি আমার কোতোয়ালীতে একটা আরাম-কেদারায় বিশ্রাম করছি, এমন সময় হঠাৎ আমার কোলের ওপর এসে পড়লো একটা তোড়া। খুলে দেখি শ'খানেক দিরহাম মাত্র। হঠাৎ কী করে আমার কোলে এসে পড়লো ওটা আন্দাজ করতে না পেরে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক খুব তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করতে লাগলাম। কিন্তু ধারে কাছে তেমন কাউকেই নজরে পড়লো না! কেমন খটকা লাগলো, তবে কি এটা আল্লাহর পাঠানো ইনাম! আমার সুকর্মের পুরস্কার!

পরদিন সকালে কাজ কাম সেরে আবার আমি বিশ্রাম করতে বসেছি আরাম কেদারাটায়, আবার একটা তোড়া এসে পড়লো আমার কাঁধের ওপর। খুলে দেখে অবাক হলাম। একই ব্যাপার, প্রায় শ'খানেক দিরহাম। এদিক ওদিক ভালো করে দেখলাম, না, কোথাও কেউ নাই তার কাছে।

আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম, আমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খোয়াব দেখছি? কিন্তু না, আমি তো ঘুমিয়ে নেই? তবে? একি তাজ্জব ব্যাপার?

যাই হোক, ভিতরে তোলপাড় হতে থাকলেও বাইরে সে ভাব চেপে যেন কিছুই ঘটেনি এমন সহজ মেজাজে সামনের আঙ্গিনায় আমি পায়চারী করতে থাকলাম।

কিন্তু পরদিন সকালে কাজ সেরে আমি খুব সজাগ হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দেখি সে দিনও সে ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি হয় কিনা।

আমার শ্যেন দৃষ্টির বাণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই কারো। আজ যদি আসে সে নির্ঘাৎ তাকে ধরবো।

এই সব ভাবতে ভাবতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের ক্লান্তিতেই বোধ হয় কিছুটা তন্দ্রা এসেছিলো।

হঠাৎ অনুভব করতে পারলাম, কুসুম-পেলব কোমল একখানি হাত যেন আমার নাভিকুণ্ডলীর চারপাশে কি যেন সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

চোখ মেলে দেখলাম, নানা রত্নাভরণ-ভূষিতা সালঙ্কারা পরম রূপবতী এক কিশোরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে লাস্য হেনে হাসছে।

আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, কে তুমি সুন্দরী? কোন্ বাগানের বুলবুলি?

আমার সোহাগ সম্বোধনে কিছুমাত্র লজ্জা পেলো না সে। মুখে কোনও কথা বললো না, ইশারায় জানালো, ওঠ, চলো আমার সঙ্গে।

আমি কেমন ঘাবড়ে গেলাম, কে তুমি?

সে সপ্রতিভ ভাবে বললো, আমি কে যদি জানতে চাও তবে আমার সঙ্গে চলো, মুইন।

আমি আর দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ উঠে ওকে অনুসরণ করে চলতে থাকলাম। এমন সহজ নিঃশঙ্কভাবে তার পিছনে পিছনে আমি চলছিলাম যে, যে কেউ দেখলে ভাবতে পারতো সে যেন আমার কত কালের চেনা আপনজন।

চলতে চলতে এক সময় আমরা একটা অন্ধ গলির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আমাকে বললো, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে মুইন।

আমি গদগদ হয়ে বললাম, বান্দা প্রস্তুত মালকিন, বলো কী করতে হবে?

মেয়েটি বললে, এই শহরের কাজীর মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব। এক দণ্ড না দেখলে আমি থাকতে পারি না। আমরা দু'জনে একসঙ্গে গল্প করি, খেলা করি, খাই, বেড়াই এবং এক বিছানাতেই রাত কাটাই। ও আমার চোখের মণি, বুকের কলিজা, ওকে ছাড়া আমি জানে বাঁচবো না! ওকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাবো। আমরা দু'জনে দু'জনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, জীবনে কোনও পুরুষকে শাদী করবো না আমরা।

এইভাবে আমাদের অনেকদিন কেটেছে। কিন্তু কাজী সাহেব আমাদের এই মাখামাখি সুনজরে দেখতে পারলেন না। প্রথমে তিনি তাঁর কন্যাকে নিষেধ করলেন আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে। কিন্তু তাতেও যখন ফল হলো না, তখন তিনি ঘরে তালা দিয়ে রেখে দিলেন তাকে। আমাকে শাসালেন তিনি, ফের যদি তাঁর দরজা মাড়াই, মেরে ঠ্যাং

খোঁড়া করে দেবেন আমার। সেই থেকে আমার ভালোবাসাকে আর আমি দেখিনি। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে তার অদর্শনে। একমাত্র তোমার দ্বারাই আবার তার সঙ্গে আমার মিলন ঘটতে পারে সর্দারজী। সেই কারণে আজ আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।

কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগলো আমার। মেয়েটা বলে কী? সেও একটা মেয়ে, কাজীর মেয়েও একটা মেয়ে। মেয়েতে মেয়েতে এ কি রকম মহব্বত? না—তবে কি এ মেয়ে আসলে কোনও মেয়ে নয়—ছেলে?

অস্থির এক যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম, কিন্তু আমি তো তোমার কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না সুন্দরী, কী বলতে চাইছো তুমি? ভালো করে বুঝিয়ে বলো তো। একটা মুরগী কি আর একটা মুরগীর পিছনে ছোটে কখনও?

ধৈর্য ধর, মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলে, সব খোলসা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। তুমি একটা হাঁদা, ভালোবাসার এমন গুঢ় রহস্যের খোঁজ রাখ না কিছু! অবশ্য তোমাকে কি দোষ দেব, ক'জনই বা রাখে?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো সাঁইত্রিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এরপর আমাকে মোটামুটি প্রকৃত ব্যাপারটা খুলে বললো সে।

—আশা করি আর বেশি খুঁটিনাটি না শুনলেও আমাদের দু'জনের সম্পর্কটা অনুমান করতে পারছো? এবার বলো, কী ভাবে আমি তাকে পেতে পারি, এবং এ ব্যাপারে তুমিই বা আমাকে কতটুকু সাহায্য করতে পার? তবে মনে রেখ, উপকারের প্রতিদান দিতে আমি কার্পণ্য করি না।

আমি মনে মনে পুলকিত হলাম; ওঃ কি তোফা! দু'জনের যাকে পছন্দ তাকে আমি অঙ্কশায়িনী করবো। দুনিয়াতে অনেক রকম মাগীর দালালীর কাহিনী শুনেছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত দালালী এবং তার ইনামের কথা কি কেউ ভাবতেও পেরেছে?

বলতে কি, এর জন্যে নির্দিষ্ট কোনও আইনের বিধান নাই। সুতরাং ভয় কি, এগোনো যাক। গলা খাঁকারী দিয়ে আমি বললাম ওকে, মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা বড় গোলমেলে। যাই হোক, আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করছি। জানি না কতটা সফল হতে পারবো।

মেয়েটি কাকুতি মিনতি জানাতে থাকলো, শুধু একবারের তরে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দাও, তারপর আর তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। যা করার আমরাই ঠিক করে নেব।

ঠিক আছে, সুন্দরী, তাই হবে। তবে একটা কথা, কাজীর বাড়িতেই কাজীর মেয়ে থাকবে। আমি আমার দপ্তরেই বসে থাকবো—তোমাদের মিলন ঘটিয়ে দেব।

—বহুৎ আচ্ছা সর্দারজী। কিন্তু আমার মাথায় একটা ফিকির এসেছে, তুমি মন দিয়ে শোনো, তারপর বলো কোনও ফাঁক আছে কিনা।

এরপর মেয়েটি তার মতলবের কথা আমাকে শোনালো ঃ আজ সন্ধ্যায় আমি খুব ঝলমলে সাজে সেজেগুজে কাজীর বাড়ির পাশের রোয়াকটায় বসে থাকবো। তুমি যাবে তোমার সিপাই-সান্ত্রী সঙ্গে নিয়ে। আমার পোশাকে আতরের উগ্র গন্ধ থাকবে। তার ফলে অতি সহজেই আমার অবস্থিতি বুঝতে পারবে তুমি। তারপর আমার কাছে এসে বলবে, কে তুমি? এতো রাতে এখানে কেন?

আমি অসহায় ভাব দেখিয়ে বলবো, আমার বাবা সুলতানের এক আমির। বাজারে কেনা-কাটা করতে বেরিয়েছিলাম, তাই ফিরতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমাদের প্রাসাদের সদর ফটকে তালা পড়ে গিয়েছে। আজ রাতের মতো সে প্রাসাদে আর ঢুকবার কোনও উপায় নাই। তাই হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি। ভাবলাম, যদি কোনও চেনা আপনজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় পথে। কিন্তু নসীব খারাপ, তেমন কারুরই সাক্ষাৎ পেলাম না। তাই কাজীর বাড়ীর সামনে এসে বসে আছি। এ জায়গাটায় বোধহয় চোর ডাকাতরা আসতে সাহস করবে না।

তখন তুমি বলবে, তোমার ভুল ধারণা মেয়ে। চোর ডাকাতরা এইসব জায়গাতেই বেশি ঘোরাফেরা করে। এই রাতে তোমাকে এমনভাবে রাস্তায় রেখে তো যেতে পারি না আমি।

তখন আমি বলবো, 'তাহলে আমাকে আপনার কোতোয়ালীতে নিয়ে চলুন, অথবা আপনার বাড়িতে, রাতটা সেখানে কাটিয়ে কাল সকালে ঘরে ফিরে যাবো।

তাতে তুমি বলবে, সে হয় না, রাতের বেলা কোতোয়ালী চোর বদমাশে ভরে যায়, সেখানে তোমার মতো সুন্দরী অভিজাত মেয়ের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি হতে পারে। এবং তা যদি হয়, তুমি আমির কন্যা—আমার চাকরী যাবে। তার চেয়ে বরং এই কাজী সাহেবকে বলে কয়ে এঁর বাড়িতেই রাতটা কাটাবার চেষ্টা দেখছি।

তুমি যদি কাজী সাহেবকে আমার বিপদের কথা বুঝিয়ে বলো, তিনি না করতে পারবেন না। আর একবার তাঁর হারেমে ঢুকতে পারলে আমি কাজ হাসিল করে নেব।

মেয়েটির বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে। যথাসময়ে আমি কাজীর বাড়ীর সামনে দলবল নিয়ে হাজির হবো।

সন্ধ্যা গড়িয়ে বেশ রাত হয়ে গেলো। আমি আমার সিপাইদের নিয়ে শহরে টহল দিতে বেরুলাম।

চলতে চলতে এক সময় কাজী-বাড়ির সামনে এসে দেখলাম একটি দামী রেশমী বোরখা পরা মেয়ে রোয়াকের একপাশে বসে আছে। চিনতে অসুবিধা হলো না, এই-ই সেই মেয়ে। কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি বাছা, এতো রাতে এখানে কেন?

মেয়েটি প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে জবাব দিলো, আমার বাবা এখানকার সুলতানের আমির। কিছু কেনাকাটার জন্য বাজারে বেরিয়েছিলাম। ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিলো। প্রাসাদের সামনে গিয়ে দেখি সদরে তালা পড়ে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। তালা যখন একেবারে পড়েছে শত চেষ্টা করেও আজ রাতে সে তালা কেউ খোলাতে পারবে না। পথে অন্য কোন চেনালোকের সঙ্গেও দেখা হলো না যে, তাদের বাড়িতে গিয়ে রাতটা কাটাই, তাই এখানে এসে বসে আছি।

আমি বললাম, কিন্তু এ শহর চোর বদমাশদের আড্ডা—বিশেষ করে রাতের বেলায়। তোমার গায়ে তো অনেক মূল্যবান গহনা দেখছি। ওরা একবার সন্ধান পেলে তোমাকে তো রেয়াত করবে না বাছা।

—তা হলে আপনার বাড়িতে নিয়ে চলুন আমাকে আজকের রাতের মতো। কাল সকালে উঠে চলে যাবো?

আমি আঁৎকে উঠলাম, ওরে ব্যস, তোমার মতো রূপসী মেয়েকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে আমাকে ঝাঁটাপেটা করবে যে।

—তা হলে আপনার কোতোয়ালীতেই নিয়ে চলুন আমাকে।

—না তাও হয় না। রাতের বেলায় ও জায়গাটা মাতাল আর চোর ডাকাতে ভরে যায়। ওখানে তোমার ইজ্জত রাখতে পারবো না!

মেয়েটি হতাশ হয়ে করুণ চোখে আমার দিকে তাকালো—তা হলে?

আমি বললাম, দাঁড়াও দেখছি, কি করা যায়। কাজী সাহেবকে একবার বলে দেখি, তিনি যদি রাজি হয়ে যান, তা হলে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারবে তুমি।

কাজী সাহেব অতি সদাশয় মানুষ। সমস্ত শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, যাও মা, অন্দরে যাও। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। আমার মেয়ে আছে, তারসঙ্গে দিব্যি রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

মেয়েটি কাজীর হারেমে প্রবেশ করলো। আমি ফিরে গেলাম আমার কাজে।

পরদিন সকালে পায়ে পায়ে কাজীর বাড়িতে এসে হাজির হলাম। উদ্দেশ্য মেয়েটির খবরাখবর নেওয়া। আমাকে দেখেই কাজী সাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, সব তোমার দোষ, তোমার জন্যেই এই সর্বনাশটা আমার ঘটলো। একটা চোরকে আমার ঘরে ঢুকিয়ে গিয়েছিলে তুমি! সে আমার যথাসর্বস্ব ফাঁক করে নিয়ে গেছে।

—বলেন কী, চুরি করে পালিয়েছে, কত টাকা?

কাজী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, চুরি করে পালিয়েছে? আহা নেকা, কিছুই যেন জান না? দাঁড়াও, তোমায় আমি মজাটা দেখাচ্ছি। এখুনি সুলতানের কাছে তোমার নামে নালিশ ঠুকে দেব আমি। ওহো, ছয়টি হাজার দিনার নিয়ে সে চম্পট দিয়েছে।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এমনভাবে একটা মেয়ে আমাকে ধোঁকা দিতে পারে ভাবতেও পারিনি।

কাজীকে বিনীতভাবে বললাম, যা ঘটার তো ঘটবে বলেই ঘটে গেছে। যাই হোক, আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে পার পাবে না।

কাজী বললেন, ওসব ছেঁদো কথা আমি শুনতে চাই না। সুলতানের কাছে মামলা করবো তোমার নামে। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা! তোমার গর্দান যাবে।

আমি করজোড়ে বললাম, মেহেরবানী করে আমাকে তিনদিনের সময় দিন হুজুর। তার মধ্যে মুলজিমকে হাজির করবো আমি।

কাজী মৌন হয়ে ভাবলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, ঠিক আছে, তিন দিনের সময় দিলাম তোমাকে। কিন্তু ঐ তিনদিনই। তারপর তিন পলকও দেরি করবো না। সুলতানকে জানিয়ে দেব, মনে থাকে যেন।

ঘরে ফিরে এসে মহা ভাবনায় পড়লাম। এতো বড় শহরে কোথায় খুঁজে পাব তাকে? সে যদি পুরুষ-মানুষ হতো তা হলে না হয় কথা ছিলো, একটা বজ্জাত মেয়েমানুষকে খুঁজে বের করবো কি করে? আইনের কোন বিধান নাই কোনও সিপাই-সান্ত্রী কারো হারেমে তল্লাশি চালাতে পারে। সুতরাং এ তো অকুল দরিয়া সামনে!

পথে ঘাটে বৃথা খোঁজাখুঁজি করে কোনও ফয়দা হবে না নিশ্চিত জেনে ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলাম তিনদিন। ভাবলাম মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু কি করা যাবে। নিজের বোকামীর কুফল তো নিজেকেই ভোগ করতে হবে।

সময়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলো। আর ঘরে বসে থেকে বা পালিয়ে বেড়িয়ে কোনও লাভ নাই। তাতে আরও খারাপ হবে আখেরে। তাই কাজির বাড়ির দিকে রওনা হলাম। মনে মনে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, কাজীর কাছে প্রাণ ভিক্ষা করে দেখবো, তিনি যদি নিজগুণে এ যাত্রা মার্জনা করে দেন তবে প্রাণটা রক্ষা পাবে।

কাজী সাহেবের বাড়িতে ঢুকতে যাবো এমন সময় নারীকণ্ঠের ডাকে পিছন ফিরে তাকালাম। তাজ্জব ব্যাপার! নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। যাকে আমি একান্তভাবে চাইছিলাম সেই মেয়ে নিজেই এসে হাজির হয়েছে আমার সামনে?

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেলো। যাক, প্রাণদণ্ডটা আর হবে না এ যাত্রা। আসামীকে আল্লাহর আশীর্বাদে বিনা চেষ্টায় কব্জায় পেয়ে গেছি। এবার তাকে কাজীর হাতে তুলে দিলেই আমি দায়মুক্ত হয়ে যাবো।

আমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে খুব মোলায়েম সুরে বললাম, তোমার কি কাণ্ড বলতো, সকালবেলায় আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে তো? তা না, কাজ হাসিল করেই একেবারে কেটে পড়লে? আমি তোমাকে তামাম শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর তুমি দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে রয়েছ? তুমি আন্দাজ করতে পেরেছ তোমার জন্যে আমাকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলতে হতো?

মেয়েটি একেবারে আমার মুখোমুখি এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। বেশ অনুভব করতে পারলাম, ওর ভুঁড়িটা আমার ভুঁড়ির সঙ্গে লেপটে গেছে। মুখে ওর দুর্বোধ্য দুষ্টুমির হাসি। ভুরু নাচিয়ে বললো, কাপ্তেন সাহেবের ভয় লেগেছে বুঝি? যাই হোক ওসব কেচ্ছা আর শুনিয়ে লাভ নাই, সবই আমি জানি। আমাকে সশরীরে ধরে কাজীর সামনে হাজির করার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, এবার তোমার ফাঁসী অবধারিত। কেউ তা রদ করতে পারতো না, কিন্তু আমি এখনও পারি, মুইন সাহেব।

আমি ওকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম। সত্যিই তো ও যদি নিজে থেকে এসে আমার হাতে ধরা না দিত তবে সারা জীবন ধরে তল্লাশ করেও তো ধরতে পারতাম না আমি। আমি ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে চুম্বন এঁকে দিয়ে বললাম, তোমার মতো এমন অপূর্ব মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।

—আহা অমন উতলা হচ্ছো কেন! আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না! আমি তো কথা দিচ্ছি, কোনও অনিষ্ট তোমার হবে না। ছাড়, হাত ছাড়, চলো আমার সঙ্গে চলো।

আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চললাম। অনতি দূরে একটি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলো সে। আমিও ঢুকলাম।

একটি সুসজ্জিত কক্ষ। এক ধারে পাশাপাশি দু'টি সিন্দুক। দু'টিরই ডালা খুলে ফেললো সে। আমি তো দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম। ও বললো, কী দেখছো মুইন কাপ্তেন? এই সব এক একটা হীরে জহরতের গয়নার দাম কত জান? ছয় হাজার নয়, ছত্রিশ হাজারের বেশি। তা আমার এই সিন্দুক দু'টোয় কত টাকার হীরে জহরত আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে?

আমি আমতা আমতা করে বলি, কী করে বলবো? এ সব জিনিষ তো চোখে দেখিনি কখনও, দাম আন্দাজ করবো কী করে?

মেয়েটি বললো, এর মধ্যে যা দেখছো, ফেলে ছড়িয়েও এর দাম পাঁচ লাখ দিনার হতে পারবে। আর জান, এগুলোর মালিক কিন্তু আমি একা। কোনও ভাগীদার নাই। তা হলে এবার তোমার প্রত্যয় হচ্ছে কি কাজীর ঐ তুচ্ছ ছয় হাজার টাকার তোড়া চুরি করার জন্য আমি যাইনি সেখানে?

আমি কোনও রকমে বলতে পারি, তো তো বটেই, তা তো বটেই। এতো যার ধন-দৌলত, সে কেন সামান্য ছয় হাজার দিনারের তোড়া চুরি করবে?

—কাজী যাই ভাবুক, তুমি তো জান কাপ্তেন, কেন আমি তার বাসায় সে রাত কাটিয়েছিলাম?

—বিলক্ষণ জানি? কিন্তু কাজী সাহেবের টাকার তোড়াটা গেলো কোথায়?

—অবশ্যই আমি সঙ্গে করে এনেছি। কেন এনেছি তারও কারণ আছে। তবে এটা তো ঠিক চুরি করার জন্য আনিনি। তাহলে শোনো আমার ফিকির।

ঐ টাকাটা চুরি না করে আনলে আমার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না। সে রাতের ব্যাপার সেখানেই ইতি হয়ে যেত। কিন্তু আমি তো তা চাইনি। আমার ভালোবাসাকে আমি চিরকালের করে পেতে চাই। এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই ফন্দী আঁটতে হয়েছিলো আমাকে।

আমি বুঝতে না পেরে বললাম, কিন্তু এতে তো ব্যাপারটা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে!

—জট ভালোভাবে না পাকালে তা কি ছাড়াবার প্রয়োজন হয়? ওসব থাক, এবার আমার মতলব শোনো ঃ

এখান থেকে সোজা তুমি কাজীর কাছে যাও।

আমি শিউরে উঠলাম, একা?

ও হেসে বললো, হ্যাঁ একা, ভয় নাই আমি পালিয়ে যাবো না। আর কাজীও তোমাকে শূলে চাপাতে পারবে না।

কাজীর সামনে দাঁড়ালেই ক্রোধে সে ফেটে পড়বে! লোকটা ভীষণ কঞ্জুস। অতগুলো টাকা খোয়া গেছে, সে শোক সে ভুলতে পারছে না। তোমাকে বলবে, কোথায় সে আসামী? কোথায় আমার তোড়া? জানি তুমি আনতে পারবে না। তবে এবার তোমার রক্ষা নাই। এখনি আমি সুলতানের কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে।

তখন তুমি তার অনেক মহত্ত্বের গুণগান করে বলবে, আমি সারা শহর তোলপাড় করেছি আপনার তোড়াশুদ্ধ আসামীকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু না কোথাও সে নাই। আমি নারী-গুপ্তচরকে পাঠিয়ে অনুসন্ধান করেছি শহরের সব বাড়ির অন্দরমহল। না সে কোথাও নাই। অবশেষে এই সন্দেহই আমার মনে মাথা চাড়া দিয়েছে। ওই মেয়েটি আপনার গৃহেরই কোনও গোপন স্থানে অবস্থান করছে। আপনিই ভেবে দেখুন হুজুর, আপনার গৃহে যা সুরক্ষা তাতে এখান থেকে কোনও মানুষ চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে সক্ষম হবে না। আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি আমার দলবল দিয়ে আপনার বাড়িটা একবার তল্লাশি করে দেখি।

তোমার কথা শুনে কাজী সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, কী এতো বড় কথা! আমি ন্যায়-বিচারের প্রতিমূর্তি, আমাকে তুমি সন্দেহ করছো?

তখন তুমি আরও বেশি বিনীত ভাব দেখিয়ে বলবে, আমায় সর্বদা মার্জনা করবেন হুজুর। কিন্তু আমি কর্তব্যের দাস মাত্র। খানা-তল্লাশি আমাকে করতেই হবে। আমি বলছি না, আপনি জেনে-শুনে কিছু গোপন করতে চাইছেন আমার কাছে। এমন তো হতে পারে, এর মধ্যে আপনার গৃহের অন্য ব্যক্তির কারসাজি আছে।

কাজী সাহেব চীৎকার করে উঠবেন, বলবেন, বেশ, কর তল্লাশি। কিন্তু ইয়াদ রেখো, আমার বাড়িতে যদি কিছু না পাওয়া যায় আরও গুরুতর সাজা পাবে তুমি।

তুমি বলবে, আমি জানি হুজুর, মৃত্যুই আমার একমাত্র দণ্ড। তার অধিক আর কী সাজা হতে পারে?

তখন তুমি সিপাইদের নিয়ে কাজীর ঘরদোর তল্লাশ করতে করতে কিছু না পেয়ে অবশেষে রসুইঘরে পৌঁছবে। সবশেষে তুরুপের তাসটা ওল্টাবে। ঐ ঘরে একটা বিরাট জালা বসানো আছে। আগে তেল রাখা হতো, এখন খালিই পড়ে থাকে। ওটার মধ্যে হাত দিয়ে তুমি কতগুলো সাজ-পোশাক টেনে তুলবে। দেখবে ওগুলো রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। ভয় নাই, কোনও নরহত্যা নয়। একটা কুকুর কেটে তার রক্ত মাখিয়ে একটা মোড়কে ভরে সে দিন আমি কাজীর গৃহে নিয়ে গিয়েছিলাম। কাজী সাহেবের মনে কোনও সন্দেহ জাগেনি। কারণ তাকে বলা হয়েছিলো, আমি কেনাকাটা করতে বাজারে বেরিয়েছিলাম। তারপর আর বাড়ি ঢুকতে পারিনি।

এই সময় আমি বললাম, কিন্তু আমিও তো বুঝতে পারিনি, ঐ মোড়কে তুমি খুন মাখানো কাপড়-চোপড় মুড়ে নিয়ে এসেছিলে?

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বললো, তোমরা মাথা মোটা সেপাই। বরকন্দাজ মানুষ, এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকলে কোৎকা ঘুরিয়ে বেড়াও? যাক এসব, এবার আমার মোক্ষম প্যাঁচের কথাগুলো মন দিয়ে শোনো।

ঐ রক্তমাখা শেমিজ, কাঁচুলি, ইজের, বোরখা প্রভৃতি দেখে বুঝতে অসুবিধা হবে না, সেগুলো কোনও নারীর।

এরপরে কাজীর আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। হয়তো সে অজ্ঞান হয়েও অক্কা পেতে পারে। লোকটা যদি তখুনি মারা যায় তাহলে তো পোয়াবার। আর যদি না মরে তবে তুমি বলবে, আপনি সাক্ষাৎ ন্যায়মূর্তি আর আপনার ঘরে এই কাণ্ড! এসব দেখলে সুলতান কী করবেন, আপনার কী হবে সে আমি জানি না, হুজুর। কিন্তু আমার কর্তব্য তো আমাকে করতেই হবে।

এরপর দেখবে কি হয়? একটু আগে তোমার প্রাণ যায় যায় হয়েছিলো, এবার তার প্রাণ তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তুমি যদি কঞ্জুস কাজি সাহেবের সমস্ত সঞ্চিত সম্পদও দাবী করো তাও সে দিতে বাধ্য হবে।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠে শুধু বলতে পারলাম, সা-বা-স!

আমাকে দেখেই কাজী সাহেব গর্জে উঠলেন, হুম্, তাহলে খালি হাতে এসেছ দেখছি! কোথায় সে আসামী? আর কোথায়ই বা আমার ছয় হাজার দিনারের তোড়া?

কাজী সাহেবের তড়পানীতে মুহূর্তের জন্য আমি ভড়কে গেলাম। মুখে কোনও কথা সরলো না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, সারা কাইরো শহর আমি তোলপাড় করে ফেলছি হুজুর। মেয়েছেলে গুপ্তচর পাঠিয়েছি প্রত্যেক বাড়ির হারেমে। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মেলেনি! কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, আমার চৌকস সিপাই-বাহিনীর চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে থাকবে এমন আসামী তো জীবনে দেখিনি? তবে সে গেলো কোথায়?

কাজী বললো, ওসব ছেঁদো কথায় আমি ভুলবো না মুইন। যে-কোনও কারণেই হোক, তুমি যখন তাকে বামাল শুদ্ধ হাজির করতে পারলে না, তখন তার ফল তোমাকে পেতেই হবে। ফাঁসীর দড়ি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি বললাম, মরতে আমি ভয় পাই না হুজুর। তবে তদন্ত আমাকে শেষ করতে দিন আগে।

—তদন্ত? কাজী প্রশ্ন করে, আবার কিসের তদন্ত?

—আমার গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর, আমার সন্দেহ হচ্ছে মুলজিম আপনার গৃহেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

কাজী ক্রোধে ফেটে পড়লেন, কী? এত বড় কথা? আমি সুলতানের কাজী, ন্যায় বিচার আমার ধর্মকর্ম, আর কিনা তুমি বলতে চাইছো, আমি তাকে বাড়িতে লুকিয়ে রেখে তোমার ঘাড়ে মিথ্যে অভিযোগ চাপিয়েছি?

আমি জিভ কেটে বললাম, না, হুজুর, অতবড় স্পর্ধা আমার হতে পারে না। আমার সন্দেহ, আপনার গৃহের অন্য কোনও ব্যক্তি আপনাকে চুপিয়ে মেয়েটিকে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। আমাকে একবার তল্লাশি করতে অনুমতি দিন আপনি।

কাজী বললেন, এভাবে আর কতটুকু কালক্ষয় করতে পারবে কাপ্তেন? বেশ, কর তল্লাশি। কিন্তু মনে রেখ, আমার বাড়িতে যদি কিছু না পাওয়া যায়, তবে তোমার সাজা আরও কঠিন হবে।

আমি হেসে বললাম, মৃত্যুর বড় সাজা আর কী হতে পারে হুজুর। আমি তার জন্যে মাথা বাড়িয়েই বসে আছি। কিন্তু তাই বলে তো কর্তব্যে অবহেলা করতে পারি না!

এই বলে সিপাইদের সঙ্গে নিয়ে কাজীর বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়লাম আমি।

বাড়ির প্রতিটি ঘর তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না।

কাজী সাহেব ক্রমশঃই উত্তেজিত ক্রুদ্ধ হতে থাকলেন। অবশেষে রসুইঘরে এসে দাঁড়ালাম আমরা। আমার সিপাইরা হাঁড়ি পাতিল উল্টে পাল্টে দেখতে থাকলো। আমি কিন্তু তখন বড় জালাটার মধ্যে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছি। কাজী সাহেব বিদ্রূপ করে বললেন, আরে হাত ঢুকিয়েই দেখ না, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন! ওটা আজ কয়েক বছর ধরে খালি পড়ে আছে এঘরে। সেই থেকে ওটা ইঁদুর আরশোলাদের দুর্গ হয়ে উঠেছে।

আমি সত্যিসত্যিই হাত ঢুকিয়ে টেনে তুললাম এক পোঁটলা রক্তমাখা সাজপোশাক। সায়া, শেমিজ, কাঁচুলি, ইজের, বোরখা ইত্যাদি। অর্থাৎ যা যা একটি মেয়ের অঙ্গে থাকতে পারে সব।

কাজী সাহেব দু'হাতে মুখ ঢেকে ধপাস করে বসে পড়লেন। তারপর অস্ফুট আওয়াজ তুলে মেঝের ওপর ঢলে পড়লেন।

তাঁকে ধরাধরি করে শোবার ঘরে নিয়ে গেলো আমার সিপাইরা। শুইয়ে দিলো পালঙ্কে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য ফিরে এলো। চোখ মেলেই তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমার একটা কথা রাখবে ভাই?

আমি সবিনয়ে বললাম, আজ্ঞা করুন হুজুর।

—বিশ্বাস কর, প্রকৃত ঘটনা কী আমি জানি না। তবে এভাবে নিজের দোষ-ক্ষালন করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এ খবর যদি একবার বাইরে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে তবে আত্মহত্যা করে মরা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না। মরতে আমিও ভয় পাই না ভাই, তবে কি জান, সারাটা জীবন উচ্চ সম্মানের আসনে বসেছিলাম আমি। দেশবাসী আমাকে ন্যায় এবং সুবিচারের প্রতীক বলে মনে করে। তারা তো ভাবতে পারে না, আমার দ্বারা কোনও সামান্যতম অপরাধও হতে পারে। সেই বিশ্বাস শ্রদ্ধা সম্মান ভক্তি সব নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তার বদলে ঘৃণা অবজ্ঞা অপমান অসম্মানের জুতোর মালা পরতে হবে গলায়। না, না সে আমি সইতে পারবো না। তার আগে এ জীবন শেষ করে দেব আমি নিজের হাতে।

আমি আনত মস্তকে বললাম, এক্ষেত্রে আমাকে কী করতে বলেন হুজুর।

কাজী সাহেব হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন, তুমি আমার ইজ্জত বাঁচাও ভাই। তোমার হাতেই আমার বাঁচা মরা নির্ভর করছে। আমার যা কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে সব তোমাকে দিচ্ছি, নিয়ে যাও, শুধু তার বদলে এই খবরটা যেন চিরকালের মতো চাপা পড়ে যায়।

আমি বললাম, ঠিক আছে—তাই হবে হুজুর।

এরপর অর্থের শোকেই হোক আর আতঙ্কেই হোক, তিন রাত্রি পর্যন্ত কাজী সাহেব টিকে থাকলেন না।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যাকে নিয়ে ঐ মেয়েটি নীলের উপকূলে এক প্রাসাদে গিয়ে উঠেছে।

কাপ্তেন মুইন তার কাহিনী শেষ করলে দ্বিতীয় কাপ্তেন উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, শাহেনশাহ মহানুভব, এরপর আমি আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাচ্ছি, জাঁহাপনাকে ঃ

দ্বিতীয় কাপ্তেন বলতে শুরু করে ঃ

জাঁহাপনা, আমার চাচার মেয়ের সঙ্গে আমার শাদীর প্রস্তাব হলো। তাতে সে সম্মতি দিয়েছিলো তিনটি শর্তে।

—তোমার সঙ্গে সাদী আমার হতে পারে, কিন্তু সারাটা জীবন তিনটি শর্ত মেনে চলতে হবে তোমাকে।

আমি জানতে চাইলাম, কী শর্ত?

—এক, জীবনে কখনও তুমি চরস খেতে পারবে না। দুই, কখনও তরমুজ ছোঁবে না, আর তিন, কখনও কোনও চেয়ারে বসবে না।

আমি বললাম এ বড় বিদঘুটে শর্ত। যাই হোক, আমি রাজি।

ব্যস, তারপর যথানিয়মে ধুমধাম করে আমাদের দু'জনের শাদী হয়ে গেলো।

এরপর অনেককাল কেটে গেছে। তার ভালোবাসায় আমার জীবন ভরে উঠেছে। কিন্তু মাঝে-মাঝেই বিবির ঐ শর্তের কথাগুলো আমাকে হনন করতে থাকে। কেন সে আমাকে চরস আর তরমুজ খেতে বারণ করেছে, আর কী কারণেই বা চেয়ারে বসতে দিতে চায় না সে?

অনেকবার কথার ছলে তার কাছ থেকে এর প্রকৃত কারণ—জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিবারই সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছে, ওসব কথায় তোমার কী দরকার? শর্ত করেছ, শর্ত রাখবে।

এরপর চুপসে যাওয়া ছাড়া আমার আর কি করারই বা থাকে। কিন্তু একদিন আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, ওসব শর্তফর্ত গুলি মারবো আমি।

সেইদিনই দোকানে গিয়ে একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়লাম। একটা পাকা দেখে তরমুজ আনিয়ে গোটা তরমুজটা গোগ্রাসে খেয়ে পেটটা জয়ঢাক বানালাম। তারপর দোকানীকে বললাম, এক ছিলিম চরস সাজ তো ভাই।

চরসের গোলাপী নেশাটা বেশ জমে উঠলো। আমার প্রাণটা ফুরফুরে হাওয়ায় ডালিমগাছের ডালে বসে শিস দিয়ে উঠলো বহুকাল পরে।

ঘরে ফিরে আসতেই আজব ব্যাপার ঘটে গেলো মুহূর্তে। আমার শাদী করা বিবি বোরখার নাকাব মুখে ঢেকে রাগে ফেটে পড়তে চাইলো।

—তুমি একটা কুত্তার বাচ্চা, যার জবানের ঠিক থাকে না সে আবার মানুষ নাকি! কি দরকার ছিলো কসম খেয়ে শর্ত করার? শর্ত করেই শাদীই যখন করেছিলে আজ তা ভাঙ্গলে কোন্ আক্কেলে? চলো, এক্ষুণি কাজীর কাছে চলো। আমি আর তোমার ঘর করবো না, তালাক চাই।

আমার মেজাজটা তখনও বেশ শরিফ ছিলো, বিবিকে শান্ত করার জন্য মিথ্যে করেই বললাম, কেন বাজে বকছো, বাওবা, আমি তো শর্তের খেলাপ করিনি।

—মিথ্যে কথা, ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো সে, এই তো দেখছি নেশায় বেশ কথা জড়িয়ে আসছে তোমার। আর তরমুজ তুমি যে খেয়েছ তা তোমার কাপড়-চোপড়ে রসের দাগ দেখেই দিব্যি বোঝা যাচ্ছে। পিছনে নজর করে দেখ, তোমার কুর্তার ঝুলটা কেন কুঁচকে রয়েছে। অমনটা তো চেয়ারে বসলেই হতে পারে!

নেশার ঘোরে তবু আমি স্বীকার করলাম না বিবির অভিযোগ। বললাম, ভুল—সব ভুল ধারণা তোমার।

এবার বিবি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো, কী, আমি মিথ্যে বলছি? ঠিক আছে চলো, কাজীর কাজে যাই। এখনি ফয়সলা হয়ে যাবে। মোটকথা তোমার মতো বাজে বেজন্মা লোকের সঙ্গে আমি আর ঘর করবো না।

কাজী সাহেব বিশেষ সদাশয় সুবিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। সব শুনেটুনে তিনি আমার বিবিকে নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগলেন, স্বামীর ঘর হুট করে ছাড়বো বললেই কি ছাড়া যায়? কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। সমানে সে কাজীর সঙ্গে তর্ক করে যেতে লাগলো। তার এক কথা, কেন আমি আমার কথার খেলাপ করেছি।

অবশেষে আমার বিবি কাজীকে বললো, আপনি যদি আমার তিনটি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন তবে আপনার উপদেশ আমি মেনে নিতে পারি।

কাজী সাহেব বললেন, বেশ বলো, কী তোমার প্রশ্ন?

আমার বিবি বললেন, প্রথমে থাকে হাড়ের মতো দড়, পরে হয় শক্ত পেশী তারপর একেবারেই থলথলে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে যায়। কেন? এবং কি কারণে?

বড় অদ্ভুত প্রশ্ন। কাজী সাহেব তো মহা ফাঁপরে পড়লেন। অনেক ভেবে চিন্তেও কোনও জবাব দিতে পারলেন না তখন। বললেন, সারাদিনে অনেক জটিল মামলা চালিয়েছি। এখন তোমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারছি না, ভালো মানুষের মেয়ে। তবে কাল সকালে আদালত বসার পরে এর জবাব তুমি পেয়ে যাবে।

সেদিনের মতো আদালতের কাজ শেষ করে বাসায় ফিরে গেলেন কাজী। প্রশ্ন তিনটি নিয়ে সারাক্ষণ নাড়াচড়া করতে থাকলেন মনে মনে। কিন্তু কিছুতেই সুরাহা করতে পারলেন না।

খেতে বসে ভালো করে খেতেও পারলেন না তিনি। কাজীর কিশোরী কন্যা বাবার চিন্তান্বিত মুখ দেখে কাছে এগিয়ে এসে বললো, তোমাকে আজ ভীষণ চিন্তিত দেখছি, আব্বাজান! কী হয়েছে?

মেয়েকে আদর করে কাজী সাহেব বললেন, সে বড় কঠিন প্রশ্ন মা, কিছুতেই উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না।

—কী প্রশ্ন আব্বাজান, বলই না আমাকে। দেখি তার জবাব দেওয়া যায় কিনা।

তখন কাজী সাহেব আগাগোড়া সমস্ত খুলে বললেন মেয়ের কাছে। মেয়ে সব শুনে হাসতে হাসতে বললো, এইজন্য তুমি এতো দুর্ভাবনা করছো? এতো পানির মতো পরিষ্কার। পুরুষদের পনের থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষাঙ্গ হাড়ের মতো কঠিন থাকে। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীর্যের তেজে ভাটা আসতে থাকে। পঁয়ত্রিশ থেকে ষাট অবধি আর হাড়ের মতো শক্ত হতে পারে না, মাংসপেশীর মতো মনে হয়। এবং ষাটের পর একেবারেই থলথলে মাংসপিণ্ড হয়ে যায়।

ঐটুকু মেয়ের বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যান কাজী।

পরদিন আদালতে এসে আমার বিবির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন কাজী সাহেব।

কাজী সাহেবের জবাবে তুষ্ট হয়ে আমার বিবিজান সে যাত্রা আমার গুনাহ মাফ করে দিয়ে ঘরে টেনে নিয়ে এসেছিলো।

দ্বিতীয় কাপ্তেনের কাহিনী শেষ হলো। এবার অন্য এক কাপ্তেনের পালা।

তৃতীয় কাপ্তেন বলতে শুরু করে ঃ

তা হলে শুনুন জাঁহাপনা, গল্পটা আমার মা-র কাছে শোনা।

এক সময় এক লবণ হ্রদের তীরে এক ধীবর-দম্পতি বাস করতো। মোটামুটিভাবে তাদের কোনও অভাব ছিলো না। স্বামী রোজ সকালে জাল চুপড়ি নিয়ে হ্রদের তীরে মাছ ধরতে যায়। সারাদিনে সে বেশি মাছ ধরার চেষ্টা করে না। যতুটুক প্রয়োজন তার বেশি কিছুতেই না। ওতে ওদের বেশ ভালোভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু অসময়ের জন্য সঞ্চয় হচ্ছিল না কিছু। অবশ্য তা ওরা চায়ও না কখনও।

একদিন জেলের অসুখ হলো। জেলেনী বললো, ঘরে খানাপিনা বাড়ন্ত। মাছ না ধরলে তো খাবার জুটবে না গো!

জেলে বলে, কিন্তু আমি সেরে না উঠলে মাছ কী করে ধরবো?

জেলে-বৌ বললো, এক কাজ কর, আমি জাল আর চুপড়ি মাথায় নিচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে আস্তে আস্তে হ্রদের ধারে চলো তো। শুধু জাল ফেলার প্যাঁচটা আমাকে হতে ধরে দু'একবার শিখিয়ে দেবে, দেখবে আমিই মাছ ধরতে পারবো।

জেলে বললো, ধ্যুৎ তাও কি হয়? তাছাড়া তোমার মতো রূপসী মেয়ে ঘাটে গিয়ে জাল ফেললে হাজার লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়বে না?

জেলে-বৌ হেসে বলে, ওগো ভয় নাই, ওগো ভয় নাই, তোমার বৌ হাত ছাড়া হয়ে যাবে না। তা এক কাজ করা যাক, ঐ যে সুলতানঘাট—যার পাশে সুলতানের প্রাসাদ গো, চলো ঐ ঘাটে যাই। ওখানে উট্‌কো লোকের ঝামেলা নাই। কেউ নজর দেবে না তোমার সুন্দরী বিবির দিকে।

সুলতান জানালার পাশে বসে হ্রদের মনোহর শোভা দেখছিলো। হঠাৎ তার নজর পড়লো জেলে-বৌয়ের দিকে। আহা, কী খাসা রূপ! এমন মেয়ে জেলের ঘরে শুকিয়ে মরছে!

জেলে-বৌয়ের জ্বলন্ত যৌবনের লেলিহান শিখা সুলতানের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। নিজেকে আর কিছুতেই সংযত রাখতে পারে না সে। উজিরকে ডেকে বলে, দেখ উজির ঐ জেলেটার বিবির কি রূপ আর যৌবন! আমি তো কিছুতেই আর ঠিক থাকতে পারছি না। জেলেটাকে খুন করে মেয়েটাকে এক্ষুণি আমার সামনে হাজির কর।

উজির বিচক্ষণ ব্যক্তি, একটু ভেবে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, সে কাজটা কি ভালো হবে, ধর্মাবতার? আপনি ন্যায়ধর্মের ধ্বজা ধরে প্রজা পালন করছেন। বিনা অপরাধে একটা লোককে খুন করলে প্রজাদের মনে বিষক্রিয়া ঘটবে না? তারা ভাবতে পারে এ রাজ্যে জীবনে বেঁচে থাকার কোনও স্থিরতা নাই। সুলতানের খেয়ালে যে-কোনও মানুষের যে-কোনও সময় জান চলে যেতে পারে। আপনার সম্পর্কে তারা একবার অনাস্থার কথা চিন্তা করলে দেশের শান্তি বজায় রাখা শক্ত হবে।

সুলতান বললো, তুমি যথার্থই বলেছ উজির। বিনা দোষে কাউকে প্রাণদণ্ড দিলে প্রজাদের মনে বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। কিন্তু ঐ জেলে-বৌটাকে যে আমার চাই-ই। ওকে দেখা মাত্র আমার রক্তে তুফান শুরু হয়ে গেছে।

উজির বললো, সে আর এমন বেশি কি কথা জাঁহাপনা! আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে না, সে পথ আমার জানা আছে ঢের।

তখুনি উজির সিপাই পাঠিয়ে দিলো জেলের কাছে, যাও লোকটাকে এখানে হাজির কর।

দুরু দুরু কম্পিত বুকে জেলে এসে সুলতানের সামনে দাঁড়ালে উজির বললো, তোমাকে তিনদিন সময় দেওয়া হচ্ছে। এই তিনদিনের মধ্যে ওই দরবারের মেঝেটা একখানা মাত্র গালিচা দিয়ে মুড়ে দিতে হবে তোমাকে। কোনও রকম জোড়াতালি দেওয়া চলবে না। তা যদি না পার তোমার গর্দান যাবে। এই সুলতানের হুকুম।

জেলে বিনীতভাবে বলে, আমি জেলের পো, মাছ ধরে খাই। মাছের ব্যাপারে আদেশ করুন, আমি সাধ্যমতো তামিল করবো। কিন্তু তাঁতীর কাজ আমার দ্বারা হবে কী করে? আস্ত একখানা গালিচা চোখেই দেখিনি জীবন ভোর। তা আবার বানাবো আমি! এ অসম্ভব কাজ আমার ঘাড়ে চাপাবেন না হুজুর।

উজির ধমক দিয়ে ওঠে, চুপ কর, মেলা বকো না। যা হুকুম হয়েছে তা তোমাকে করতে হবে। সে কাজ তুমি জান কি জান না, সে সব আমার জানার দরকার নাই। এই ধর চুক্তিনামা, টিপসই দাও একটা।

—জী টিপসই চান, একটা কেন হাজারটা দিচ্ছি কিন্তু ঐ গালিচা-ফালিচা বানানো আমার কর্ম নয়।

উজির বললো, তোমার এসব ফালতু কথা শোনার সময় নাই আমার। ধর টিপ ছাপ দাও এখানে।

দলিলে টিপসই দিয়ে ঘরে ফিরে এলো জেলে। স্বামীকে বিষণ্ণ দেখে কাছে এগিয়ে এসে বৌটা জিজ্ঞেস করলো, কী হলো গো, সুলতান কেন তলব করেছিলেন তোমাকে?

জেলে বললো, কী করি বলতো বিবিজান? আমি জেলের ছেলে, মাছ বই অন্য কিছু জানি না। আমাকে বানিয়ে দিতে হবে একখানা এমন গালিচা যা দিয়ে আগাগোড়া সুলতানের দরবারের মেঝে মোড়া হয়ে যাবে। জোড়াতালি চলবে না; ছোটবড় হলে হবে না; একেবারে মাপে মাপে চাই। না না, বিবিজান এ অসম্ভব কাজ তো আর আমাদের দ্বারা হবে না। সুতরাং নির্ঘাৎ আমার গর্দান যাবে। চলো, আর দেরি না করে আজ রাতেই আমরা এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে অন্য কোনও দেশে চলে যাই।

জেলে-বৌ স্বামীকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললো, এই সামান্য কাজের ভয়ে তুমি দেশত্যাগী হবে? কোনও ভয় ভাবনার কারণ নাই। তুমি খেয়ে-দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাও গে, যা করার যথাসময়ে করে আমি সামাল দেব।

জেলের পো বলে, কিন্তু এই অসম্ভব কাজ তুমি করবে কি করে?

বৌটা বলে, আমাদের বাড়ির পিছনে যে বুড়ো বটগাছটা আছে, তার নিচে দাঁড়িয়ে আর্জি জানাবে, 'ও বটবৃক্ষ, তোমার বন্ধু আজ বিশেষ বিপদে পড়েছে। সুলতানের হুকুম হয়েছে তার দরবার-মহলটা একটা মাত্র গালিচায় ঢেকে দিতে হবে। তুমি ছাড়া এ কাজ তো উদ্ধার হবে না, বৃক্ষ বাবা।' তখন দেখবে সে তোমাকে একটা সুতোর গুলি দেবে। সেই গুলিটা জেবে ভরে তুমি উজিরের কাছে গিয়ে বলবে, আমাকে একটা লোহার গজাল দিন। গজালটা তুমি ঘরের চারপাশে ঘোরাতে থাকবে। ব্যস আর কিছু করতে হবে না, দেখবে সুন্দর একখানা ঘরজোড়া গালিচা তৈরী হয়ে যাবে।

তিনদিন পরে চারদিনের দিন ভোরবেলায় জেলে ঐ বুড়ো বটগাছের তলায় এসে দাঁড়ায়। দু'হাত জোড় করে প্রার্থনা জানায়, ওগো বৃক্ষপতি আজ বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। সুলতানের হুকুম তার দরবারের আগাগোড়া মেঝে একখানা মাত্র গালিচায় ঢেকে দিতে হবে। এই অসম্ভব কাজ করে দিতে না পারলে আমার গর্দান যাবে। তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাও বৃক্ষবাবা!

একটা দমকা বাতাস বয়ে গেলো। জেলে তাকিয়ে দেখলো তার পায়ের কাছে এসে পড়েছে একটা সুতোর গুলি।

গুলিটা কামিজের জেবে ভরে সে সুলতানের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো। উজির বললো, এই যে জেলের পো, এসেছ দেখছি। তা তোমার চুক্তি কেমন করে রক্ষা করবে? তা না হলে এখুনি তোমার গর্দান যাবে।

জেলে বলে, আমার ওয়াদা আমি পূরণ করবো। তার আগে আমাকে একটা বড় লোহার গজাল এনে দিন।

উজির প্রশ্ন করে, গজাল দিয়ে কি করবে?

—এই সুতোর গুলি দিয়ে আমি গালিচা বুনে দেব এখনই।

উজির সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললো, লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, জাঁহাপনা। এতো বড় দরবারের মেঝে ঢাকার জন্য একটা সুতোর গুলি জেবে ভরে এনেছে।

সুলতান বললো, ঠিক আছে, ওকে একটা গজাল এনে দাও, দেখা যাক কী করে।

সঙ্গে সঙ্গে গজাল এসে গেলো। জেলে ওটাকে ঘরের একপাশে পুঁতে সুতোর প্রান্তটা বেঁধে দিয়ে গুলিটাকে ঘরের চারপাশে ঘোরাতে থাকলো।

উজির ততক্ষণে জল্লাদকে নির্দেশ দিয়েছেন, খাঁড়া হাতে এসে দাঁড়াতে।

শাণিত অস্ত্র কাঁধে করে ঘাতক এসে দাঁড়ালো দরবারের দ্বারদেশে। উজিরের ইশারা পাওয়া মাত্র সে জেলেকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। সেইভাবে সে প্রস্তুত হতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে একখানা ঘরজোড়া সুন্দর গালিচা বানিয়ে ফেললো জেলে। উজিরের মুখ চুন হয়ে গেলো। জেলে বললো, দেখুন হুজুর, গালিচাটা পছন্দসই হয়েছে কিনা?

উজির বললো, তা হয়েছে। কিন্তু তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে। সুলতানের হুকুম। আজ থেকে ঠিক আটদিন বাদে এই দরবারে হাজির হতে হবে তোমাকে। সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে একটি আটদিনের শিশু। সে বাচ্চা অনর্গল গুলতাপ্পির গল্প শোনাতে পারবে সুলতানকে।

জেলে বললো, এমন গাঁজাখুরি কথা শুনেছে নাকি কেউ কখনও, মাত্র আটদিনের কোনও মানব-শিশুর মুখে কথা ফোটে?

—ওসব অজুহাত শুনতে চাই না আমি। যেমন করে পার সংগ্রহ করে আনতে হবে সেই শিশুকে। এই ধর চুক্তিপত্র, একটা টিপ ছাপ দাও।

জেলে বললো, একটা কেন হাজারটা টিপসই আমি দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আটদিন কেন, আমার জিন্দগীভর চেষ্টা করলেও অমন আজব বস্তু আমি জোগাড় করতে পারবো না, হুজুর।

—আঃ অবাধ্য হয়ো না। ভুলে যেও না এ হুকুম স্বয়ং সুলতানের। যথা সময়ে তামিল করতে না পারলে তোমার গর্দান যাবে।

প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে আসে জেলে। উৎকণ্ঠিত হয়ে বিবি কাছে আসে, কি গো, গালিচা বুনে দিতে পারলে?

—না না, সে কাজ অতি চমৎকার ভাবেই হয়ে গেছে। কিন্তু এক নতুন ফরমাস হয়েছে। আটদিনের একটা কচি বাচ্চাকে যোগাড় করতে হবে—যে অনর্গল গুলতাপ্পির গল্প শোনাতে পারবে সুলতানকে। তা-না হলে আমার গর্দান যাবে। এবার আর বাঁচার কোনই উপায় নাই বিবিজান। চলো আমরা দেশত্যাগ করে পালিয়ে যাই আজই রাতে।

রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো একচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

জেলে-বৌ বললো, সুলতানের শয়তানীর আর শেষ নাই, দেখছি। নচ্ছারটার নজর পড়েছে আমার দিকে। কোনও একটা ছলছুতোয় তোমাকে মেরে ফেলে আমাকে হারেমে তোলার সাধ হয়েছে মুখপোড়ার। ঠিক আছে, তুমি কোনও চিন্তা করো না, ওর সাধ আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। এখন তুমি বিশ্রাম করগে, আটদিন বাদে যথাসময়ে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

নয়দিনের দিন সকালে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে জেলে-বৌ ঐ বটবৃক্ষের নিচে এসে দাঁড়ালো।

—ও বাবা বটবৃক্ষ, তোমার দয়াতে একবার আমার স্বামীর জীবন রক্ষা হয়েছে, সেজন্য তোমাকে শতকোটি সালাম জানাই। কিন্তু আবার এক নতুন বিপদ এসেছে। সুলতান হুকুম করেছে একটা আটদিনের বাচ্চাকে নিয়ে যেতে হবে তার সামনে। সে বাচ্চা অনর্গল গুলগল্প শোনাতে পারবে সুলতানকে। সুলতানের এই অসম্ভব বায়না যদি মেটাতে না পারে তবে আমার স্বামীর গর্দান যাবে। আপনি আমাদের পরিবারের হিতৈষী বন্ধু, আপনার সাহায্য না পেলে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো না।

সঙ্গে সঙ্গে শোঁ-শোঁ আওয়াজ করে একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেলো। এবং পরক্ষণেই ওরা দেখতে পেলো একটা প্রায় সদ্যজাত শিশু ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে পায়ের কাছে।

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে ফিরে এলো ওরা। জেলে হতাশ হয়ে বললো, কিন্তু বিবিজান, এ বাচ্চা তো শুধু কাঁদতেই জানে, কথা বলবে কী করে?

জেলে-বৌ বলে, তোমার কোন ভাবনা নাই গো, দেখো ঠিক সময়ে এর মুখে খৈ ফুটবে!

ছেলেটাকে কোলে করে জেলে সুলতানের দরবারে আসে। উজির বলে, এনেছ? কই দেখি? এই বাচ্চা কথা বলে?

এই বলে সে শিশুটির গাল টিপে দিয়ে বলে, তোমার নাম কি খোকা?

বাচ্চাটা কিন্তু উজিরের প্রশ্নের জবাব দেয় না, শুধু ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে ওঠে।

উজির বলে, এ তো দেখছি এর মুখে এখনও বোল ফোটেনি, সুলতানকে গুলগল্প শোনাবে কী করে এ?

জেলে রাগতভাবে বলে, ও দিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার দরকার নাই হুজুর, আপনি আমাদের বসার ব্যবস্থা করে দিন।

উজিরের নির্দেশে সেখানে একখানা নরম গদীর বড় ডিভান এনে বসানো হলো। ছেলেটাকে কোলে করে জেলে বসে পড়লো তার ওপর।

সুলতান তখুনি তাঁর পার্শ্বচর আমির ওমরাহ এবং শহরের গণ্যমান্যদের উপস্থিত হতে ফরমান দিলো। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা উপস্থিত হয়ে যে যার যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করে বসলো। সুলতান ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললো, এই কি তোমার সেই বাচ্চা, যে আমাকে গুলগল্প শোনাবে?

জেলে সবিনয়ে বললো, জী হ্যাঁ; জাঁহাপনা?

সঙ্গে সঙ্গে সারা দরবারমহলে কৌতূহলের স্তব্ধতা নেমে এলো। জেলের কোলে বাচ্চা হঠাৎ কথা বলে উঠলো, সুলতান মহানুভব।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো সকলে। একটা প্রায় সদ্যজাত শিশু সুলতানকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানালো?

সুলতান বললো, ওহে গুণধর, আমি তোমার কাছে কিছু গুলতাপ্পির গল্প শুনতে বাসনা করি!

সকলে তাজ্জব হয়ে শুনতে লাগলো, ছেলেটি বলছে ঃ কোনও এক সময়ে—তখন সবে আমি প্রথম যৌবনে পা দিয়েছি—একদিন শহরের বাইরে ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড দাবদাহে প্রায় দগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। মনে বাসনা হলো একটা রসালো তরমুজ উদরস্থ করি। একটুক্ষণের মধ্যে সংগ্রহও করলাম একটা বেশ বড়সড় গোছের পাকা তরমুজ। দু'ভাগ করার জন্য ছুরি বসিয়ে দিলাম, কিন্তু জাঁহাপনা কী বলব্যে, তরমুজটা কেটে দেখি তার মধ্যে একটা গোটা শহর—কত ঘরবাড়ি, প্রাসাদ, মসজিদ বাগ-বাগিচা—কত মানুষজন তার আর ইয়ত্তা নাই. আমি তো তাজ্জব! এমনটা যে ঘটতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি আমি। যাই হোক আর কালক্ষেপ না করে তরমুজটার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বড় চমৎকার শহর। যতদূরে যাই সুন্দর সুন্দর সব ইমারত, ফুলবাগিচা হাটবাজার—আরো কত কী? একটা বাগানে ঢুকে দেখি গাছে গাছে কত রং-বেরঙের পাকাপাকা ফল। দু'চারটা পেড়ে খেলাম। কি মিষ্টি! প্রাণ ভরে গেলো। এরপর আমি আবার চলতে থাকি। চলতে চলতে এক সময় শহর ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম। চারদিকে সবুজ শস্যের মেলা। একটা চাষীর বাড়ির সামনে তরকারীর চাষ হয়েছে। লাউ, কুমড়ো, শশা, বরবটি নানারকম তরকারি! একটা বরবটি ছিঁড়ে নিয়ে তার বিচি খাব বলে খুললাম। দেখি বরবটিটার মধ্যে চাষীরা লাঙ্গল গরু নিয়ে জমি চাষ করছে। অদ্ভুত লাগলো। বরবটির মধ্যে ঢুকে পড়লাম! মাঠের আল ধরে চলেছি। চলতে চলতে একটা

খামারবাড়ি পেলাম। সেখানে দেখি মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানছে, কেউ বা যবের ছাতু বানাচ্ছে চাকী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আবার কিছু লোককে শস্য মাড়াই করতে দেখলাম। আরও একটু এগোতে দেখি একটা লোক ঘরের দাওয়ায় বসে আছাড় দিয়ে দিয়ে ডিম ফাটাচ্ছে। এক একটা করে ডিম আছাড় দিয়ে খানিকক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকছে! আর কী আশ্চর্য, ডিমের ঐ কুসুম থেকে কুঁক কুঁক করে ডাক ছেড়ে এক একটা মোরগ মুরগী বেরিয়ে চোঁচা দৌড় মেরে পালাচ্ছে এদিক ওদিক। আরও একটু এগিয়ে দেখলাম একটা গাধা পিঠে করে বয়ে চলেছে এক বোঝা ডালের রুটি। লোভ আর সামলাতে পারলাম না। খানকতক তুলে নিয়ে একখানা রুটিতে সবে একটা কামড় বসিয়েছি হঠাৎ দেখলাম আমি তরমুজটার বাইরে বেরিয়ে এসেছি। আমার সামনে গোলগাল অর্থাৎ তরমুজটা যেমন রেখেছিলাম কাটার আগে ঠিক তেমনি আস্তই পড়ে আছে, দেখতে পেলাম। এই হচ্ছে আমার কাহিনী, জাঁহাপনা।

সুলতানি হাসি আর চাপতে পারে না; হো হো হো করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আর কি! হ্যাঁ বাবা, গুলেরও একটা সীমা থাকা দরকার। এ যে দেখছি গুলের বাদশা। আচ্ছা, হে গুণধর গুলবাজ! তুমি যে বললে ডিম আছাড় দিতে মোরগ মুরগী ডাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো, একি কোন যুক্তির কথা হলো?

বাচ্চাটা বললো, গোস্তাকি, মাফ করবেন জাঁহাপনা! আজকালকার জগতে যুক্তিবহ কিছুই চলে না। মিথ্যা, জালিয়াত, প্রবঞ্চনা, অসম্ভব এবং অবাস্তবতার দাপটেই নিরীহ শান্ত সৎ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে আজ! আপনি নিজেকে দিয়েই এর বিচার করুন জাঁহাপনা। আপনার কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য এই নিরপরাধ নিরীহ জেলের পো-কে আপনি অসম্ভব অবাস্তব কাজের বায়না চাপিয়েছেন। না পারলে তার গর্দান নেবেন আপনি। এটা কি কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তির কথা? আসলে আপনার উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারে জেলের-পোকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে তার সুন্দরী বৌটাকে উপভোগ করা। এটা কি কোনও সঙ্গত ব্যাপার, ধর্মত আপনি বলুন, জাঁহাপনা?

দরবারে উপস্থিত আমির ওমরাহরা অবাক হয়ে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে।

আচমকা এমনটা ঘটতে পারে ভাবেনি সুলতান। নিজের লজ্জা ঢাকতে সে তখন চটপট দরবার সমাপ্ত ঘোষণা করে উঠে দাঁড়ালো।

এরপর বাচ্চাটা বললো, চাচা আর এখানে নয়, চলো আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

শিশুটিকে কোলে করে জেলে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলো! কেউ তাকে আর বাধা দিতে এগিয়ে এলো না।

তৃতীয় কাপ্তেন তার গল্প শেষ করলে সুলতান বাইবারস বললেন, চমৎকার—চমৎকার তোমার কিস্‌সা।

এরপর সুলতানের চতুর্থ কাপ্তেন মুহী অল দিন এগিয়ে এসে যথাবিহিত কুর্নিশাদি জানিয়ে বললো, এবার আমার কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

চতুর্থ কাপ্তেনের কাহিনী ঃ

আমার এ কাহিনী আগের কাহিনীরই শেষাংশ জাঁহাপনা।

কালক্রমে ঐ জেলের একটি চাঁদের মতো ছেলে হয়েছিলো। ঠিক মায়েরই মতো।

সুলতানেরও এক পুত্রসন্তান জন্মেছিলো। কিন্তু সে দেখতে হয়েছিলো ঠিক বাঁদরের মতো। গায়ের রঙও কালিপড়া হাঁড়ির মতো!

সুলতানের ছেলে আর জেলের ছেলে একই পাঠশালায় পড়াশুনা করে। প্রতিদিন পাঠশালায় এসেই সুলতানের ছেলে জেলের ছেলেকে জেলে গরীব ভিখিরি বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। জেলের ছেলেও ছেড়ে কথা কয় না, সে বলে, এই যে শাহাজাদা, তা ভাই তোমার শরীরটা একটু ভালো করে ডলাইমলাই কর না কেন? ঘষতে ঘষতে, দেখবে, চামড়া একদিন সফেদ হয়ে গেছে—

এইভাবে প্রায় দু'টো বছর কেটে গেলো। একদিন সুলতান-তনয় এসে বাবার কাছে নালিশ করলো, আমি আর ঐ পাঠশালায় যাবো না আব্বাজান। জেলের ছেলে আমার চেহারা নিয়ে রোজ ঠাট্টা তামাশা করে।

ক্রোধে জ্বলে ওঠে সুলতান। এতো বড় স্পর্ধা জেলের ছেলের। এখুনি এনে ওকে কোতল করবো।

কিন্তু আগের সেই বে-ইজ্জতের ঘটনা স্মরণ করে আপাতত সে পরিকল্পনা মুলতুবি রাখতে হলো তাকে। ভাবলো, ছেলেটাকে এনে ফাঁসী দিলে প্রজাদের মনে অসন্তোষ বাড়তে পারে। তারা হয়তো ভাবতে পারে, সেদিনের দরবারে জেলেকে কোতল না করতে পারার ঝাল মিটিয়েছি আমি।

পাঠশালার মৌলভীকে ডেকে তিনি বললেন, শোনও শেখ, আমার কথা মতো কাজ করতে হবে। তাহলে অনেক ইনাম দেবো তোমাকে। সেই সঙ্গে পাবে সুন্দরী সুন্দরী গুটিকয়েক রক্ষিতা। তোমার পাঠশালায় জেলের ছেলে পড়তে যায়। তাকে খতম করতে হবে, যে ভাবে পার।

মৌলভী কুর্নিশ জানিয়ে বললো, এ আর এমন কঠিন কী কাজ জাঁহাপনা। আমার মা'র দুনিয়ার বা'র। কয়েকদিনেই ওকে আমি পিটিয়ে শেষ করে দেব।

পরদিন পাঠশালা শুরু হতে না হতেই জেলের ছেলেকে মোটা লাঠি দিয়ে বেমক্কা পেটাতে লাগলো মৌলভী। মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো সে এক সময়। সারা দেহ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। মৌলভী দেখলো ছেলেটা আর সাড়া শব্দ করে না। ভয়ে সে সরে গেলো, কিন্তু মুখের বোলচাল ঠিকই চলতে থাকলো, যত্তোসব অপগণ্ড। একেবারে মাথায় কিছু ঢোকে না। আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল আবার পেটাবো।

বিকেলে রক্তাক্ত দেহে বাড়ি ফিরে এসে জেলের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে মা-বাবাকে মৌলভীর অহেতুক মারের কাহিনী বললো।

—কাল থেকে আর আমি ঐ পাঠশালায় যাবো না, বাবা।

বাবা বললো, ঠিক আছে, লেখাপড়া করে আর কাজ নাই, চলো কাল থেকে আমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবি।

পরদিন সকালে সে জাল চুপড়ি মাথায় নিয়ে বাবার সঙ্গে হ্রদের তীরে মাছ ধরতে আসে।

প্রথম জালে কোনও ভালো জাতের মাছ উঠলো না। উঠলো একটা চ্যাং। ছেলেটি বললো, এটা দিয়ে আমি নাস্তা করবো।

এই বলে সে চুপড়িতে ফেলে রাখলো। চ্যাংটা মুখ হাঁ করে কথা বলে উঠলো, আমাকে খেয়ে ফেলো না জেলের পো। আমি সত্যিই কোনও মাছ নই। স্থানভ্রষ্ট এক জিন কন্যা। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। দেখো, সময়কালে আমি তোমার যথেষ্ট উপকার করবো।

জেলের ছেলে বললো, ঠিক আছে ; তোমাকে যেখান থেকে তুলেছিলাম সেখানেই আবার ফেলে দিচ্ছি!

এই বলে সে হ্রদের জলে চ্যাংটাকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার জাল ফেললো।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো বিয়াল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

দুইদিন পরে। সুলতান মৌলভীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী? জেলের ছেলেটাকে খতম করতে পেরেছ?

মৌলভী ভীত চকিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলে, না হুজুর, প্রথম দিন আমার মার খেয়ে বাড়ি চলে গেলো ; এই দু'দিন আর সে পাঠশালায় আসেনি। খবর পেলাম, সে আর লেখাপড়া করবে না, ওর বাবার সঙ্গে মাছ ধরবে।

ক্রোধে জ্বলে উঠলো সুলতান, দূর হ খানকির ছেলে, আমার সামনে থেকে ভাগ্।

তারপর সে উজিরকে ডেকে বললো, ছোঁড়াটা এখনো বেঁচে আছে। এখন আমাদের কী কর্তব্য, উজির?

উজির মাথা চুলকে বলে, একটা পথ আমি বের করছি, হুজুর।

—বলো, শুনি।

উজির বলতে থাকে, সবুজ শহরের সুলতানের এক পরমাসুন্দরী রূপবতী কন্যা আছে। তার সঙ্গে আমাদের শাহজাদার শাদী হলে চমৎকার মানাবে। কিন্তু মুশকিল হলো সবুজ শহরের সুলতান বড় একরোখা বদমেজাজী মানুষ। যে সব শাহজাদারা তার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে গেছে এ যাবৎ, তারা আর ফিরে আসতে পারেনি। সুলতান তাদের সকলকে শূলে চড়িয়েছেন। এখন আমার মতলব হলো, ঐ জেলের ছেলেকে সেখানে পাঠানো। তাকে আপনি হুকুম করুন, যেভাবেই পার ঐ সবুজ দেশের শাহজাদীকে এনে হাজির করতে হবে এখানে, তার সঙ্গে আমার ছেলের শাদী হবে।

সুলতান বললো, আশ্চর্য তোমার বুদ্ধি উজির। চমৎকার হবে। ডাক তাকে এখানে—এক্ষুণি।

সুলতানের পেয়াদা জেলের বাড়িতে এসে এত্তেলা দিলো।

জেলেপুত্র মহম্মদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরবারে এসে হাজির হলো। উজির বললো, শোনও সুলতানের হুকুম, তোমাকে একটা কাজ করে আসতে হবে। সবুজ শহরের সুলতানের কাছে যাবে তুমি। তার পরমাসুন্দরী কন্যাটিকে আমাদের চাই। শাহজাদা তাকে শাদী করবে।

মহম্মদ বললো, কিন্তু সবুজ শহর কোথায় কোন্ দিকে কিছুই তো জানি না আমি।

উজির উত্তেজিত হয়ে বলে, ওসব কিছুই শুনতে চাই না আমি। এ সুলতানের হুকুম। যদি অগ্রাহ্য কর গর্দান যাবে তোমার।

মহম্মদ সাশ্রুনয়নে ঘরে ফিরে এসে মায়ের কাছে সব বললো। মা বললো, বিপদে ধৈর্য হারাতে নাই, ভয় পেতে নাই বাবা। খোদা ভরসা, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের এই নদীটা যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে সেই মোহনায় গিয়ে তুমি দাঁড়াও—দেখবে, সব পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।

মায়ের কথামতো মহম্মদ সমুদ্র-মোহনায় গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু এদিক ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোনও জনমানুষের সন্ধান পেলো না। হতাশ হয়ে ফিরে আসবে এমন সময় জল থেকে লাফিয়ে একটা চ্যাং মাছ ডাঙায় উঠে এসে মানুষের মতো বলতে লাগলো, আমাকে চিনতে পারছো মহম্মদ, আমি তোমাদের জালে ধরা পড়েছিলাম একদিন। সেদিন তোমার দয়াতেই প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলাম। আজ তোমাকে মনে হচ্ছে খুব চিন্তিত। কিন্তু কী ব্যাপার বলো তো বন্ধু?

মহম্মদ বলে, ব্যাপার গুরুতর, আমার ওপর সুলতানের হুকুম হয়েছে, সবুজ দেশের শাহজাদীকে নিয়ে এসে দিতে হবে তার ছেলের জন্য। কিন্তু সে দেশটা কোথায়, কী ভাবেই বা যাবো, কিছুই আমার জানা নাই।

চ্যাং বললো, মাত ঘাবড়াও। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো সেই দেশে। কিন্তু সবুজ দেশের সুলতান বড় কড়া মেজাজের মানুষ। তার সামনে দাঁড়ালেই শূলে চড়াবে তোমাকে। যাই হোক, আমি যখন সঙ্গে থাকবো তখন তোমার ঘাবড়াবার কিছু নাই। সব পথ বাতলে দেব। তার আগে তুমি উজিরের কাছে বলো, সে দেশের শাহজাদীকে আনতে হলে সোনার তরী চাই। সে নৌকো ভোগবিলাসের যাবতীয় সামগ্রীতে ঠাসা হতে হবে। তা না হলে শাহজাদীর মন উঠবে কেন?

মহম্মদের ফরমাশ মতো সোনার পানসী-নৌকা বানিয়ে দিলো উজির। নানা রত্ন-মাণিক্যে সাজিয়ে দিলো সুন্দর করে।

মহম্মদ মা-বাবার কাছে বিদায় নিয়ে নৌকো ছেড়ে দিলো।

চ্যাং বন্ধু আগে আগে পথ দেখিয়ে চলে। মহম্মদের আর কোনও অসুবিধা হয় না। আটদিন পরে সবুজদ্বীপের ঘাটে এসে নৌকো ভিড়ে। সোনার নৌকো দেখার জন্য শহরবাসীরা ভেঙ্গে পড়ে। আজব বস্তু, এমন জিনিস না দেখে কি থাকা যায়।

চ্যাঙের পরামর্শে নৌকো ছেড়ে ডাঙ্গায় নামলো না মহম্মদ। দলে দলে শহরবাসীরা এসে নৌকোর চমৎকারিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে চলে যায়।

এইভাবে একটা সপ্তাহ কেটে গেলো, মহম্মদ চ্যাংকে জিজ্ঞেস করলো, এভাবে আর একা একা এখানে কতদিন বসে থাকবো বন্ধু?

চ্যাং বললে, সবুর কর বন্ধু, সময়ে মেওয়া ফলবে।

সারা সবুজ শহরে লোকের মুখে সোনার তরী ছাড়া আর কোনও কথা নাই। শাহজাদী সুলতানের কাছে আব্দার ধরলো, আব্বাজান, শুনেছি আমাদের ঘাটে এক সোনার নৌকো এসে ভিড়েছে। সে নাকি চমৎকার দেখার মতো জিনিস। তুমি আমাকে অনুমতি দাও বাবা, আমি একবার দেখে আসি।

সুলতানের ততটা ইচ্ছা নয়, কিন্তু প্রাণাধিক্য কন্যার কোনও কথা ঠেলতে পারেন না তিনি। তাই বললেন, ঠিক আছে, কাল সকালে গিয়ে তুমি দেখে এসো। আমি ঢ্যাঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, কেউ কাল বাড়ি থেকে পথে বেরুতে পারবে না।

পরদিন প্রত্যুষে জনহীন রাজপথ ধরে শুধুমাত্র সখী পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে শাহজাদী ঘাটে এসে পৌঁছলো। মহম্মদ তাকে স্বাগত জানালো নৌকোর ভিতরে এসে সবকিছু দেখার জন্য।

শাহজাদী তার প্রধান পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় উঠলো।

আহা, কী সুন্দর করে সাজানো গোছানো! কত মূল্যবান হীরে জহরতের নিখুঁত মনোহর কাজ চারধারে! চোখ জুড়িয়ে যায়।

দেখতে দেখতে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলো শাহজাদী। খেয়ালই ছিলো না, সে এক নৌকোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটা দোলা লাগাতে চমকে উঠে ছই-এর বাইরে এসে দেখলো, নৌকোটা তীর ছেড়ে অনেকটা ভিতের এসে তরতর করে বয়ে চলেছে। শাহজাদী বুঝতে পারলো সবুজ দ্বীপ ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছে। মহম্মদকে সে জিজ্ঞেস করলো, এমনটা করলে কেন?

—তা না হলে সহজ পথে তোমাকে তোমার বাবার দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারতাম না।

—কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে?

—ভয় নাই, দোজকে নয়। এক সুলতানের প্রাসাদে। তার পুত্রের সঙ্গে তোমার শাদী হবে।

শাহজাদী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে। কিন্তু সে শাহজাদা দেখতে কেমন? তোমার মতো রূপবান?

মহম্মদ বলে সে আমি বলতে পারবো না। চলো, গিয়ে নিজের চোখেই দেখতে পাবে তাকে।

শাহজাদী তার হাতের একটা আংটি জলে ফেলে দিলো। কিন্তু চ্যাং বন্ধু নিচে তলিয়ে যাওয়ার আগেই গপ করে গিলে ফেললো সেটা।

—শাহজাদী বললো, না আমি অন্য কোনও সুলতান বাদশাহর ছেলেকে শাদী করতে চাই না। তোমাকে আমার মনে ধরেছে। তুমিই হবে আমার স্বামী। এসো, আর দেরি করে লাভ নাই, নিচে এই দরিয়ার পানি আর ওপরে ঐ আসমানের চাঁদ সাক্ষী রেখে তোমার আমার শাদী হয়ে গেলো আজ।

শাহজাদীকে বুকে জড়িয়ে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে আটটা দিন কেটে গেলো। নৌকো এসে ভিড়লো তার নিজের দেশে সুলতানের প্রাসাদ ঘাটে।

মহম্মদ সুলতানকে গিয়ে বললো, আপনার আদেশ মতো সবুজ দেশের শাহজাদীকে সঙ্গে করে এনেছি, জাঁহাপনা। এবার তাকে যথা মর্যাদায় বরণ করে প্রাসাদে নিয়ে আসতে হবে। ঘাটের সিঁড়ি থেকে প্রাসাদের হারেম পর্যন্ত সারাটা পথ সবুজ রেশমের গালিচায় মুড়ে দিতে হবে। তার ওপরে পা রেখে শাহজাদী হাঁটবেন।

সুলতান উজিরকে নির্দেশ দিলেন, যত অর্থের প্রয়োজন হয় হোক, যেমনটি দরকার ঠিক তেমনি সমাদরে তাকে প্রাসাদে নিয়ে আসতে হবে।

সুলতানের হুকুমে দেশ-বিদেশের মহা-মূল্যবান সবুজ গালিচা সংগ্রহ করে এনে পেতে দেওয়া হলো। শাহজাদীকে বরণ করে নিতে এলো শাহজাদা।

—আমি তোমাকে আমার বেগম করে রাখতে চাই। তুমি রাজি তো?

শাহজাদী বললো, রাজি হতে পারি, একটা শর্তে।

—কী শর্ত?

পথে আসতে আসতে দরিয়ার পানিতে আমার হাতের একটা আংটি পড়ে গেছে, সেই আংটিটা আমার চাই, ওটা এনে দিতে হবে।

মহা-সমস্যা ; সমুদ্রের জলে যে আংটি পড়ে গেছে তাকে কখনও উদ্ধার করা সম্ভব?

উজির বললো, জাঁহাপনা আপনি কিছু ভাববেন না, এই মওকায় জেলের ছেলেকে খতম করে দেব।

মহম্মদকে ডেকে সে বললো, শোনও জেলের ছেলে, এই শাহজাদীর হাতের আংটি সমুদ্রের পানিতে খোয়া গেছে। ওটা তোমাকে খুঁজে এনে দিতে হবে। না হলে শাহজাদী শাদীতে মত দিচ্ছে না।

চ্যাং বন্ধু আংটিটা যথাসময়ে মহম্মদের হাতে দিয়ে বলেছিলো, এটা শহজাদীর হাতের আংটি। ভালো করে রাখ, সময়ে কাজ দেবে।

মহম্মদ বললো, সে আংটি আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।

আংটির সমস্যা মিটে গেলো। এবার শাহজাদী কোন্ ছলনার আশ্রয় নেবে?

রাজকুমারী বললো, আমাদের দেশে যে নিয়ম চালু আছে সেই নিয়মেই শাদীর অনুষ্ঠান হতে হবে।

সুলতান তাতেই সম্মত হয়ে বললো, বেশ তাতেই আমি রাজি। বলো তোমাদের দেশের কি প্রথা?

শাহজাদী বলতে থাকে ঃ বাসরঘর থেকে ঘাট পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ কাটতে হবে। সেই সুড়ঙ্গপথ ধরে পাত্র আসবে গোসল করতে। কিন্তু আসার সময় তাকে সারা সুড়ঙ্গপথ

গনগনে কাঠের আগুনে পা রেখে আসতে হবে। এই ভাবে আগুন-পানিতে শুদ্ধ হয়ে তবে সে আমাকে গ্রহণ করতে পারবে। আমি নৌকোতেই অবস্থান করবো তার জন্য।

সুলতান শঙ্কিত হলো। সুড়ঙ্গ কাটা হলো প্রাসাদকক্ষ থেকে ঘাট পর্যন্ত। এবং সারা সুড়ঙ্গে কাঠের ডালপালা ভরে দেওয়াও হলো। কিন্তু ঐ আগুনের হলকার মধ্যে ছেলেকে নামিয়ে দিতে তাঁর মন সরলো না। রাজকুমারী অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিলো, আমাদের দেশে শাদীর মতো পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। সেই কারণে আল্লাহর আশীর্বাদে পাত্রের দেহে আগুনের আঁচ লাগে না এতটুকু।

তবু সুলতানের ভরসা হলো না। উজির বললো, এক কাজ করা যাক। সুড়ঙ্গের ধুনিতে আগুনি দিয়ে আগে মহম্মদকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। সে যদি অক্ষত শরীরে ঘাটে গিয়ে পৌঁছতে পারে তবে বুঝতে হবে সত্যিই খোদার মাহাত্ম্য আছে। তখন আমরা শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে সদলবলে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে ঘাটে গিয়ে শাহজাদীকে বরণ করে নিয়ে আসবো।

সুলতান বললো, আহা কি চমৎকার তোমার বুদ্ধি, উজির!

চ্যাং বন্ধু জল থেকে লাফিয়ে উঠে মহম্মদকে বললো, এবার তোমাকে সুড়ঙ্গের মধ্যে পাঠাবে উজির। তবে তোমার কোনও ভয় নাই, আগুন তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি শুধু দু'কানে হাত রেখে এই মন্ত্রটা আওড়াতে থাকবে ঃ আল্লাহ তোমার দোয়াতেই আমি বেঁচে আছি।' ব্যস্ দেখবে তোমার দেহে কোনও উত্তাপ লাগবে না।

সুলতানের আদেশে মহম্মদকে হাজির করা হলো। উজির বললো, মহম্মদ এই সুড়ঙ্গের পবিত্র আগুনের মধ্যে দিয়ে তোমাকে সব আগে ঘাটে গিয়ে পৌঁছতে হবে। আমরা দেখবো, তোমার গায়ে যদি আঁচ না লাগে তা হলে আমরা শাহজাদাকে নিয়ে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করবো।

মহম্মদ বললো, ঠিক আছে! সুড়ঙ্গে আগুন দেওয়া হোক। আমি নেমে যাচ্ছি নিচে।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সুড়ঙ্গের কাঠ।

মহম্মদ আল্লাহর নাম স্মরণ করে কানে হাত চাপা দিয়ে নিচে নেমে গেলো। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অক্ষত দেহে এসে পৌঁছলো ঘাটে।

সুলতানের ভরসা হলো! শাহজাদাকে সঙ্গে করে সদলবলে সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নেমে গেলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটার তাই ঘটে গেলো। সুলতান সপরিবারে অঙ্গার হয়ে গেলো নিমেষে।

এর পরের কাহিনী আর না বললেও নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, জাঁহাপনা?

চতুর্থ কাপ্তেন তার কাহিনী শেষ করলো।

পঞ্চম কাপ্তেন এগিয়ে এলো সুলতান বাইবারসকে গল্প শোনাবার জন্য।

—তাহলে শুনুন জাঁহাপনা।

সে বলতে থাকে ঃ

একদা এক সুলতান তাঁর উজিরকে বললেন, দেখ উজির, আমি এমন একটা আংটি চাই যা পরলে আমার ইচ্ছামতো ক্রুদ্ধ বা আনন্দিত হতে পারি।

উজির বাজারে গিয়ে প্রতিটি স্যাঁকরাকে বললো সুলতানের অভিপ্রায়। কিন্তু কেউই বানিয়ে দিতে পারে বলে জানালো না।

সুলতান শুনে রুষ্ট হলেন। বললেন, কী আশ্চর্য, এই সামান্য একটা বস্তু আমার সলতানিয়তে সংগ্রহ করা যাবে না? যাও, তুমি শহর ছেড়ে দূর দেশে চলে যাও। যেখান থেকে পার নিয়ে এসো ঐ রকম একটা আংটি।

সুলতানের হুকুম তামিল করতে শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যায় উজির।

এক বৃদ্ধ শেখ তার খামারবাড়িতে গম ঝাড়াই করছিলো। উজির তার কাছে গিয়ে বললো, আচ্ছা শেখ সাহেব, এমন কোনও গুণী লোকের সন্ধান দিতে পার, যে একটা আংটি বানিয়ে দিতে পারে। সে আংটি পরলে ইচ্ছামত ক্রোধ বা পুলক জাগতে পারে?

বৃদ্ধ চাষী বললো, আপনি একটু অপেক্ষা করুন জনাব, আমি আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করে আসি।

বৃদ্ধের কিশোরী কন্যা অসাধারণ রূপগুণবতী। সব শুনে সে বললো, হ্যাঁ বাবা, আমি পারি। আমি বানিয়ে দেব। তুমি মেহেমানকে এখানে খানাপিনা করতে বলো। আমি তার মধ্যে তৈরি করে দিচ্ছি আংটিটা।

সুলতান আংটিটা পেয়ে আনন্দিত হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আংটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে বুঝলেন, প্রকৃতই আংটিটির দৈব ক্ষমতা আছে। উজিরকে তিনি বললেন, এমন যে গুণবতী কন্যা, তাকে আমি শাদী করতে চাই। তুমি ব্যবস্থা কর, উজির।

পরদিনই মহাধূমধামে সুলতানের সঙ্গে কৃষক-কন্যার শুভ পরিণয় হয়ে গেলো। চাষীর মেয়ে এসে উঠলো সুলতানের হারেমে।

কিন্তু কয়েকদিন পরে চাষী-কন্যা যুঁই অসুস্থ হয়ে পড়লো। হাকিম ডাকা হলো। তিনি বললেন, গ্রামের মেয়ে, খোলামেলা জায়গায় থাকা অভ্যেস। হারেমের বদ্ধঘরে এসে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এ ছাড়া অন্য কোনও রোগ নাই তার। ওকে একটু নির্মল বায়ু সেবন করানো দরকার।

সুলতান উজিরকে বললেন, নদীর ধারে আমার প্রমোদ-প্রাসাদে বেগমকে রাখা হবে, তুমি সব ব্যবস্থা কর।

সুলতানের ইচ্ছায় সেইদিনই নদীতীরের প্রাসাদে যুঁই-এর থাকার ব্যবস্থা হলো।

জানলা খুললেই সামনে স্রোতস্বিনী। ঝিরঝির করে সুশীতল হাওয়া বয়ে চলে সারাক্ষণ। সুন্দরী যুঁই জানলার পাশে বসে নদীর মনোহর দৃশ্য দেখে দেখে পুলকিত হয়।

একদিন সে জানলার পাশে বসে এক জেলের মাছ ধরা দেখছিলো। লোকটা এক একবার জাল ফেলে গুটিয়ে আনছে আর এক এক ঝুড়ি রুপোলী মাছ তুলছে।

জেলেটাকে ডেকে সে বললো, এই শোনো, আমার জন্য একবার জাল ফেলতো। আমি তোমায় একটা মোহর দেব। তবে যা উঠবে সব আমার।

জেলে বললো, তোমার মতো সুন্দরীর হাত থেকে পয়সা নেব না। আমি এমনিই তোমার জন্য একবার জাল ফেলেছি।

সেবারে জালে কোনও মাছ উঠলো না। উঠলো একটা তামার কৌটো। ঢাকনা দিয়ে মুখটা ঢাকা। যুঁই একটা দিনার দিতে গেলো জেলেকে। ওটা আমাকে দিয়ে দাও, এই নাও তোমার মোহর।

জেলে তাম্রপাত্রটি সুন্দরীর হাতে তুলে দিতে দিতে বললো, পয়সা আমি নেব না।

যুঁই বলে, সে কি, তা কি করে হয়? তুমি আমাকে শুধু শুধু দেবে তা হয় না।

জেলের ছেলে বলে, তা যদি দেবার এতই ইচ্ছে তবে সোনা-দানা কিছু চাইনে, তোমার অধরে ছোট্ট একটা চুম্বন করবো, এই অনুমতি দাও।

যূঁই শিহরিত হয়ে ওঠে। জেলের ছেলের লৌহ-কঠিন বলিষ্ঠ বাহুপেশীর দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে সে। ওর প্রার্থনা একেবারে নামঞ্জুর করতে পারে না। জানলা দিয়ে মুখখানা সে বাইরে বাড়িয়ে দেয়। ছেলেটাও এগিয়ে আসে চুম্বন বাসনায়। কিন্তু মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটে যায়। সুলতান স্বয়ং সব শুনে ফেলেছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসে তরবারীখানা আমুল বসিয়ে দেন তার বুকে।

তারপর যূঁই-এর দিকে অগ্নিবাণ হেনে বলে, আমার হারেম তোমার জন্য নয়। তোমার যেখানে খুশি চলে যেতে পার।

যূঁই পথে নেমে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে সে এক সময় এসে পৌছয় শহরের অপর প্রান্তে। এক দোকানের দাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে।

পরদিনও দোকানদার যূঁইকে একই জায়গায় একইভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে, কে গো বাছা, কাল থেকে দেখছি তুমি এইখানে বসে আছ?

যূঁই বলে, আমি পরদেশী। আজ দু'দিন আমার খাওয়া হয়নি কিছু।

—আহা, তা বলনি কেন? চলো আমার বাড়িতে চলো। সেখানে খেয়ে দেয়ে একটু জিরিয়ে নেবে।

যূঁইকে সঙ্গে করে দোকানদার তার বাড়িতে এসে বৌকে বলে, দেখ, এই মেয়েটি আজ দু'দিন অনাহারে আছে। একে কিছু খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ কর।

দোকানীর বৌ যূঁই-এর রূপে ঈর্ষান্বিতা হয়ে নিগ্রো নফরটাকে বলে, এই আঁটকুড়িটাকে মুরগীর ঘরে নিয়ে গিয়ে তালা দিয়ে রাখ।

সারাটা দিন কেটে গেলো, কিন্তু খানাপিনা কিছুই দিয়ে গেলো না কেউ। যূঁই খিদেয় ছটফট করে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যেতে থাকে। কিন্তু এক বিন্দু জলও ওরা পাঠালো না।

অবশেষে তামার কৌটোটার ঢাকনা খুলে ফেলে সে। নদীর তলায় পড়েছিলো, হয়তো একটুও জল থাকতে পারে ওতে।

কিন্তু ঢাকনাটা খুলেই সে অবাক হয়ে গেলো। কৌটোটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা সুন্দর জলের ঝারি। আর বেরুলো খানকয়েক রেকাবী। সেগুলো মেঝেয় বিছিয়ে পাততেই নানারকম মুখোরচক খানায় পূর্ণ হয়ে উঠলো।

যূঁই-এর ক্ষুধাও ছিলো ভীষণ। কী করে সে সব সংঘটিত হলো তখন আর ভাববার সময় নাই যূঁই-এর। গোগ্রাসে সে খেয়ে নিলো সব।

খাওয়া শেষ করে কৌটোটার দিকে লক্ষ্য করতে সে দেখতে পেলো তার ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট কতকগুলি সুন্দর সুসজ্জিত পুতুল। ওগুলো বের করে সামনে রাখতেই পুতুল-সুন্দরীরা পলকে পরমাসুন্দরী কিশোরীর আকার ধারণ করে নানা ছন্দে নাচতে থাকলো।

দশজন নাচুনীর হাতে দশটি তোড়া ছিলো।

নাচতে নাচতে এক সময় তারা সেগুলো যূঁই-এর পায়ের কাছ নামিয়ে রাখলো। তারপর নাচ শেষ করে এক সময় আবার তারা ঢুকে পড়লো ঐ কৌটোর ভিতরে।

যূঁই-এর মনে আর দুঃখ নাই। সারাদিনে রাতে যখনই প্রয়োজন কৌটোটা খুললেই খানাপিনা পেয়ে যায় সে। তার সঙ্গে প্রতিবারই ঐ দশটি সুন্দরী নাচ শেষ করে প্রণামী রেখে যায় দশটি মোহরের তোড়া।

কয়েকদিন পরে নিগ্রো নফরটা মালকিনকে জিজ্ঞেস করে, মালকিন, ঐ মেয়েটি যাকে মুরগী ঘরে তালা দিয়ে রেখে এসেছিলাম তাকে তো খানাপিনা কিছু দেওয়া হয়নি?

দোকানীর বৌ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে তুই থামতো, ও বিদেয় হয়েছে।

নিগ্রোটার কিন্তু বিশ্বাস হয় না সে কথা। মুরগী-ঘরে গিয়ে দেখে মেয়েটা সেইখানেই শুয়ে আছে।

চাকরটা দোকানীর কাছে ছুটে গিয়ে খবর দেয়। দোকানদার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বন্ধ করে বাড়িতে বৌকে গালমন্দ করে মুরগীর ঘরে যায়!

যুঁই বলে, আল্লাহর দোয়ায় পেট ভরেই খেয়েছি এতদিন।

দোকানী বলে এবার তুমি কী করবে, বাছা? কোথায় যাবে বলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

যুঁই টাকার থলেগুলো দোকানীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, এই শহরে আমি একখানা চমৎকার বাড়ি বানাতে চাই। এই নিন টাকা—দরকার হলে আরও অনেক দেব। আপনি আমাকে একখানা সুরম্য প্রাসাদ বানিয়ে দিন।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিশাল প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেলো যুঁই-এর জন্য। ইতিমধ্যে যুঁই-এর মুরগী -ঘর মোহরের তোড়ায় ভরে গেছে।

বাজারের সবচেয়ে সেরা সেরা জিনিসে প্রাসাদের কক্ষ সাজানো হলো। যুঁই এক যুবক সুলতানের ছদ্মবেশ পরে এসে উঠলো তার প্রাসাদে।

সুলতান উজিরকে সঙ্গে নিয়ে শহর-পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন ছদ্মবেশে। চলতে চলতে তিনি যুঁই-এর মনোহর প্রাসাদের সামনে এসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। উজিরকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা উজির, এখানে তো এই প্রাসাদটা ছিলো না। কী ব্যাপার, এ তো দেখছি আমার প্রাসাদের চেয়েও সুরম্য। মনে হচ্ছে, অন্য কোনও দেশের সুলতান আমার শহরে ঢুকে পড়েছে, আমার অনুমতি ছাড়াই।

উজির বললো, আপনি কাল শহরে ঢ্যাঁড়া দিয়ে জানিয়ে দিন জাঁহাপনা, কাল রাতে কেউ আলো জ্বালাতে পারবে না। যদি দেখেন এই প্রাসাদও অন্ধকার হয়ে আছে তবে বুঝবেন সে আপনার অনুগত এক প্রজামাত্র। কিন্তু আপনার নির্দেশ অমান্য করে সে যদি আলো জ্বালায় তবে বুঝতে হবে সে অন্য কোনও পরাক্রমশালী সুলতান বাদশাহ আপনার সলতানিয়ত জবরদখল করে বসেছে।

সুলতানের ফরমান শহরবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হলো পরদিন সকালেই! সন্ধ্যায় সুলতান এবং উজির আবার পথে বেরুলেন ছদ্মবেশে। পথ ঘাট ঘর-বাড়ি সারা শহর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শুধু ঐ প্রাসাদটি আলোয় ঝলমল করছে। সুলতানের আর বুঝতে অসুবিধা হলো না। কোনও এক যুদ্ধবাজ আক্রমণকারী বাদশাহ তার শহরে অনধিকার প্রবেশ করেছে।

পরদিনও একই ফরমান জারী করা হলো। সে রাতেও কেউ আলো জ্বালালো না। কিন্তু ঐ প্রাসাদ আলোয় আলোময় হয়ে রইলো।

সুলতান বললেন, আর দেরি করে লাভ নাই উজির, চলো আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। জানতে চাইবো, কেন সে আমার শহরে প্রবেশ করেছে?

উজির বাধা দিয়ে বললো, আগেই আপনার পক্ষে যাওয়া সহজ হবে না জাঁহাপনা। ব্যাপারটা কী আমি গিয়ে পরখ করে আসি প্রথমে, তারপর আপনি যাবেন।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে আজ তাহলে তুমিই দেখে এসো। আমি প্রাসাদে ফিরে যাচ্ছি।

দ্বাররক্ষীর কাছে বলতেই সে উজিরকে এক বিশাল দরবার-মহলে নিয়ে এলো। ঘরের মাঝখানে একটি সোনার সিংহাসনে যুঁই তরুণ সুলতানের ছদ্মবেশে আসীন ছিলো। উজিরকে দেখা মাত্র সে তাকে চিনতে পারলো। আদর করে বসতে দিলো পাশের আসনে। সঙ্গে সঙ্গে নানারকম খানা-পিনা এলো। যুঁই উজিরকে অনুরোধ করলো, আপনি অতিথি, মেহেরবানী করে আহারাদি সমাধা করুন।

উজির গোগ্রাসে উদরস্থ করলো সব। যুঁই তাকে একটা মোহরের তোড়া উপহার দিয়ে বললো, আপনার সাজ-পোশাক দেখে মনে হচ্ছে আপনি অতি গরীব-সরীব মানুষ। দয়া করে এই তোড়াটা রেখে দিন।

উজির ফিরে এসে সুলতানকে ঐ প্রাসাদ এবং তার প্রিয়দর্শন তরুণ সুলতানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো, আপনি বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, অত ঐশ্বর্য্য আমি জীবনে দেখিনি কখনও। টাকা যেন তার কাছে খোলামকুচি। দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছে। এই দেখুন, না চাইতে আমাকে কত মোহর দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, বিপদ আসন্ন। তার অর্থ এবং পরাক্রম আমাদের তুলনায় ঢের বেশি বলে আমার মনে হয়েছে। সুতরাং আত্মরক্ষার উপায় দেখতে হবে আমাদের।

সুলতান বললেন, কাল সন্ধ্যায় আমি নিজে যাবো সেখানে। স্বচক্ষে দেখে এসে তারপর যা করার করা যাবে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সুলতান এক বণিকের ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন। প্রহরীকে বলতেই সে সসম্মানে সুলতানকে যুঁইএর সিংহাসন সম্মুখে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলো।

যুঁই অলক্ষ্যে মৃদু হেসে সাদর অভ্যর্থনা জানালো তাকে। খানা-পিনায় আপ্যায়ন করলো যথোচিত। তারপর কৌটোটা থেকে দশটি ছোট ছোট পুতুল সামনে দাঁড় করাতেই চোখের পলকে তারা এক একটি পরমাসুন্দরী কিশোরীতে রূপান্তরিত হয়ে সুললিত ছন্দে নৃত্য করতে লাগলো। পরিশেষে প্রত্যেকে তাদের হাতের তোড়া যুঁই-এর পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে আবার কৌটোর কোটরে ঢুকে পড়লো।

সুলতান বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

—এ বস্তু আপনি কোথা থেকে কিনেছেন সুলতান?

যুঁই বললো, না, কিনিনি। একজন আমাকে দিয়েছে।

—দিয়েছে? এমন জিনিস কেউ শুধু শুধু হাতছাড়া করে?

—শুধু শুধু নয়, অর্থের বিনিময়ে আমি তার কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিলাম প্রথমে। কিন্তু সে রাজি হয়নি। তার দাবী ছিলো অন্য। অবশেষে সেই দাবীই পূরণ করে এটা পেতে হয়েছে আমাকে।

—কী ছিলো তার দাবী?

যুঁই লজ্জারক্ত হয়ে বলে, সে কথা খোলাখুলি আপনাকে কী করে বলি? তবে জেনে রাখুন একটা মোরগ একটা মুরগী দেখলে যা করতে চায় তাই সে একটি বার দাবী করেছিলো আমার কাছে। এবং বুঝতেই পারছেন, আমি তা পূরণ করেছিলাম।

যুঁই এখানে কিছুটা মিথ্যা ভাষণ করলো।

সুলতান উত্তেজিত হয়ে বললো, ঠিক আছে আমি একবার নয় দু' দুবার সে কর্মে রাজি আছি। আপনি আমাকে ওটা দিন।

যুঁই আর হাসি চেপে রাখতে পারে না। কিন্তু এখনই হেসে ফেললে সব মাটি হয়ে যাবে। সে বললো, দু'বারে তো আমার সুখ হবে না, সাহেব? অন্ততঃ চারবার চাই।

সুলতান তৎক্ষণাৎ বললো, আমি তাতেই রাজি। কিন্তু ওটা আমার চাই-ই, সুলতান। আমাকে ফেরাবেন না আপনি।

যুঁই বলে, না ফেরাবো না। তবে এই দরবার-মহলে তো সে কাজ হবে না। আপনি পাশের শয়নকক্ষে চলুন।

সুলতানের আর তর সয় না। সে তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, চলুন তা হলে—

পাশের ঘরে এসে সুলতান হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। যুঁই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—আপনি এই সলতানিয়তের বাদশা। আপনার বিত্ত বৈভব পরাক্রমের অন্ত নাই। কিন্তু সামান্য একটা তাম্র-পাত্রের জন্যে একি আপনার লালসা! তার জন্য অতি জঘন্যতম কাজে লিপ্ত হতেও পিছ-পা হন না আপনি। অথচ এই আমি আপনার বেগম এই বস্তু এক ধীরব-সন্তানের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম ছোট্ট একটি চুম্বনের প্রতিশ্রুতিতে। আহা বেচারা, তার মনের সাধ মনেই রয়ে গেলো। এ জীবনের মতো আর কোনও দিন কোনও নারীকে চুম্বন করতে পারবে না সে। আপনার শাণিত তরবারী তার জীবনের সব সাধ ঘুচিয়ে দিয়েছে সেদিন।

সুলতান স্তব্ধ, বিস্মিত, বিমূঢ়!

এই সেই যুঁই—তার বেগম। একে তিনি একদিন প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন পরকীয়া প্রেমের অপরাধে!

সুলতান দু'হাত বাড়িয়ে যুঁইকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তার মুখের ভাষা হারিয়ে গেছে। শুধু তাকে বুকে চেপে হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করার চেষ্টা করতে থাকেন।

কাপ্তেন গল্প শেষ করে থামে। সুলতান বাইবারস মুগ্ধ হয়ে বলে, চমৎকার তোমার কাহিনী নূর অল দিন।

এরপর ষষ্ঠ কাপ্তেন এগিয়ে এসে তার কাহিনী শুরু করে।

এক সুলতানের পরম রূপবতী এক কন্যা জন্মেছিলো। যখন তার বয়স সবে সাত, সেই সময় সে একদিন মাথায় চিরুণী দিতে দিতে একটা ঢাউস উকুন খুঁজে পেলো। উকুনটাকে সে এক তেলের শিশিতে পুরে মুখে ছিপি এঁটে ভাঁড়ার ঘরের তাকে রেখে দিলো।

এরপর অনেক কাল কেটে গেছে। শাহজাদীর আর স্মরণে নাই কবে ছোটবেলায় সে একটা শিশিতে ভরে রেখেছিলো।

শাহজাদী এখন প্রায় ষোড়শী। আরও সুন্দরী, আরও চমৎকার হয়েছে দেখতে।

একদিন সে সুলতানের পাশে দাঁড়িয়েছিলো দরবারে। এমন সময় উন্মত্ত মোষের মতো দাপাতে দাপাতে সেখানে এসে হাজির হলো কিম্ভূত কিমাকার এক জানোয়ার।

শাহজাদী শিউরে উঠলো, সর্বনাশ বাবা, ঐ জানোয়ারটা আসলে একটা উকুন। ওকে আমি খুব ছোটবেলায় একটা তেলের শিশিতে পুরে রেখেছিলাম।

সুলতান উজিরকে বললেন, ওটাকে মেরে ওর ছাল ছাড়িয়ে প্রাসাদের সদর ফটকে ঝুলিয়ে রাখ। ঘোষণা করে দাও, যে ঐ ছালটা দেখে বলতে পারবে কিসের, কোন্ প্রাণীর চামড়া, তার সঙ্গে আমার কন্যার শাদী দেব। কিন্তু যদি কেউ বলতে এসে ঠিক ঠিক বলতে না পারে তবে তার মুন্ডু কেটে ঝুলিয়ে রাখা হবে ফটকে।

সুলতানের হুকুমমতো উজির জল্লাদকে নির্দেশ করতে সে খাঁড়ার এক কোপে ঐ বিশালাকৃতি উকুনটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো। এবং সেই দিন তার ছালটা ছাড়িয়ে প্রাসাদ-ফটকে লট্‌কে দিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হলো সুলতানের ফরমান।

দেশ-বিদেশ থেকে কত সুলতান বাদশাহর ছেলেরা এসে প্রাণ বিসর্জন দিলো। কেউ বললো, ওটা একটা বুনো মোষ, কারো বা ধারণা, ওটা এক ধরনের রামছাগল। প্রায় চল্লিশটি শাহজাদার নরমুণ্ড প্রাসাদ-ফটকে ঝুলতে লাগলো।

অবশেষে একদিন অপূর্ব সুন্দর শাহজাদা এসে বললো, আমি নিশ্চয় করে বলতে

পারি ওটা একটা বৃহদাকার উকুনের চামড়া। উকুনটা বহুকাল তেলের শিশিতে আবদ্ধ ছিলো। কিন্তু একদিন সে বিরাট আকার ধারণ করে তৈলপাত্র ভেঙ্গে-চুরে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সুলতান আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, ঠিক—ঠিক বলেছ তুমি! তাহলে তুমিই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করবে।

সেইদিনই কাজীকে ডেকে শাদীনামা তৈরি করা হলো। মহা আড়ম্বরে সমাধা হয়ে গেলো শাহজাদীর শাদী।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো ছেচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

একটানা চল্লিশ দিন ব্যাপী উৎসবে মুখর হয়ে থাকলো সারা শহর-প্রাসাদ।

তারপর জামাতা এসে সুলতানকে বললো, এবার অনুমতি করুন জাঁহাপনা, আমার বেগমকে আমি দেশে নিয়ে যাই। আমার মা বাবা সবাই অধীর হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমিও বাদশাজাদা, সুতরাং চিরকাল তো শ্বশুরালয়ে পড়ে থাকা আমার শোভা পায় না!

সুলতান বললেন, সে তো একশোবার। তোমার শাদী করা বেগম—তাকে স্বদেশে নিয়ে যাবে, এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে! ঠিক আছে, কালকের দিনটা অপেক্ষা কর, তোমার দানযৌতুক সব গুছিয়ে দিক আমার নফর চাকররা।

জামাতা বললো, ওসবের কিছু প্রয়োজন নাই, জাঁহাপনা। ঐশ্বর্য আমার অগাধ আছে। আমি শুধু আপনার কন্যাকেই নিয়ে যেতে চাই।

সুলতান বললেন, বেশ তাই হবে। তবে কনের সঙ্গে তার মাকেও নিয়ে যাও। সে দেখে আসুক তোমাদের দেশ। চিনে আসুক পথঘাট—যাতে সময়ে অসময়ে আমাদের সে পথ নির্দেশ করে নিয়ে যেতে পারবে তোমার শহরে।

—শাশুড়ীকে আবার কেন, জামাতা আপত্তি জানায়, তিনি বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। পথের ধকল তাঁর সইবে না। বরং আমিই মাঝে মাঝে এনে দেখিয়ে যাব আপনাদের কন্যাকে।

সুলতান বললেন, অতি উত্তম। তবে তাই হোক, আজই তুমি যাত্রা কর।

এই শাহজাদা জামাতাটি আসলে কোনও সুলতান বাদশাহ-পুত্র নয়। একটি বহুরূপী দানব।

পর্বত-চূড়ায় তার আবাস। সে শাহজাদীকে সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুললো।

শাহজাদী দু-একদিনেই স্বামীর অন্য পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠলো। সারাদিন সে বাইরে বাইরে কাটায়। রাতের বেলায় যখন সে ফিরে আসে তখন সারা অঙ্গ রক্তমাখা হয়ে থাকে। শাহজাদী আন্দাজ করতে পারে তার স্বামী অনেক হত্যাকাণ্ড সমাধা করে এসেছে।

একদিন সে একটা নরমুণ্ড হাতে ঝুলিয়ে ঘরে ফিরে এসে বললো, এটাকে বেশ ভালো করে পাকাও দেখি।

শাহজাদী আতঙ্কে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, একি বলছো তুমি? আমি কি নরমাংস খাবো?

দানব আর জুলুম করলো না। আবার বাইরে বেরিয়ে গেলো তখুনি। এবং ক্ষণকালের মধ্যে একটা নাদুস-নুদুস ভেড়া মেরে নিয়ে এলো।

সারাদিন দানবটা নানা জন্তু-জানোয়ারের ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে সারা দেশ তছনছ করে বেড়ায়। তার আতঙ্কে কত গর্ভবতী নারী অকালে মৃতাবৎসা হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগে না। বনের সিংহের সঙ্গে লড়াই করে অবলীলাক্রমে প্রাণ সংহার করে তার। অথচ সে যখন ঘরে ফিরে আসে

তার বিবির কাছে, তখন সে একেবারে অন্যরকম। শান্তশিষ্ট নিরীহ প্রিয়দর্শন এক যুবকের রূপ ধরে হাজির হয় সে শাহজাদীর সামনে।

একদিন মায়াবী দানবটা শাহজাদীর মায়ের রূপ ধারণ করে নিজের বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়লো। শাহজাদী জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো তার মা এসেছে। ছুটে গিয়ে সে দরজা খুলে জড়িয়ে ধরলো দানবকে, মা, মা তুমি এসেছ? কিন্তু এই দুর্গম পথ একা একা এলে কি করে মা?

মায়াবী দানব বলে, ভালোবাসার টানে মা, ভালোবাসার টানে। পেটে তো এখনও ধরিসনি, যদি তাঁর দয়ায় দুটি-একটি হয় তখন বুঝবি, সন্তান কি বস্তু!

—তা মা শুনলাম, তোর স্বামী একটা মায়াবী দানব? সে নাকি তোকে নরমাংস খেতে বলে? এই কথা শুনে আমি তো আর রাতে ঘুমাতে পারি না, মা। না না—দৈত্যদানবের কাছে তোকে আর রেখে যাব না আমি। এখন সে ঘরে নাই, এই ফাঁকে চলো আমরা কেটে পড়ি এখান থেকে।

মায়ের কথায় প্রসন্ন হতে পারে না শাহজাদী। বলে, কে তোমাকে এই আজগুবি কথা জানিয়েছে, মা। আমার স্বামী মানুষ নয় মায়াবী দানব, সে আমাকে নরমাংস খাওয়াতে চায়, এসব তো ডাহা মিথ্যা কথা মা। আমি খুব সুখে আছি আমার স্বামীর কাছে। তার আদর সোহাগ রাখবার জায়গা নাই আমার। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরে যাও মা, আমার জন্য কোনও দুশ্চিন্তা করো না।

মায়াদানব নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। যাক, তার বিবি তাকে সত্যিই ভালোবাসে প্রাণ দিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে সে আবার তার মানব রূপ ধারণ করে একটা ভেড়া কাঁধে করে ফিরে আসে। দল-অল স্বামীকে বলে, জান, আজ মা আমাকে দেখতে এসেছিলো। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে চাইলো না।

—ইস্, আজই ফিরতে আমার দেরি হয়ে গেলো। তোমার মা-এর সঙ্গে দেখা হলে বড় আনন্দ পেতাম। তোমার এক মাসী আছে না? তাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

দল-অল লাফিয়ে ওঠে, করে না আবার! কিন্তু কে তাকে নিয়ে আসবে?

মায়াদানব বলে, কাল আমি তাকে খবর দিয়ে আসবো।

কয়েকদিন বাদে মায়াদানব দল-অল-এর মাসীর মূর্তি ধারণ করে এসে দরজায় করাঘাত করলো।

মাসীকে দেখে দল-অল-এর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু মাসী হা-হুতাশ করে কেঁদে আকুল। বলে, হায়-হায়-হায়, একি সর্বনাশ হলো! শেষ পর্যন্ত তোর ভাগ্যে লেখা ছিলো এক মায়াদানব!

আনন্দে উদ্ভাসিত দল-অল মুহূর্তে ক্রোধে ফেটে পড়ে চুপ কর মাসী। আমার স্বামীর সম্বন্ধে যা তা কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। কে বলেছে, কোথা থেকে শুনেছ এইসব আজগুবী খবর? আমার স্বামী এক বাদশাহর ছেলে। আমার বাবার চেয়ে ঢের ঢের বেশি তার ঐশ্বর্য সম্পদ। আর তার মতো রূপবান পুরুষ কেই বা কটা দেখেছে, মাসী?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে! শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো সাতচল্লিশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মাসী-বেশী মায়াদানবকে অল-দল ভেড়ার মাংস দিয়ে ভুরিভোজন করালো।

—খেলে তো মাসী, কীসের মাংস আমরা খাই তা নিজেই বুঝতে পারলে?

তোমার তো ধারণা আমরা নরমাংস ছাড়া আহার করি না। ছি, ছি, এতো নীচ তোমাদের ধারণা!

মাসী বললো, আমি না হয় বুঝলাম, বাছা। কিন্তু কত লোকে কত কী বলে যাচ্ছে তোর বাবার কাছে। একবার তিনি এসে চক্ষে দেখে গেলে ভালো হতো।

—বেশ তো মাসী, বাবাকে একবার আসতে বলো না আমার বাড়িতে। তার প্রাণাধিক কন্যা কি নিদারুণ দুঃখ কষ্টে কাটাচ্ছে নিজের চোখেই তিনি দেখে যান।

মাসী বললো, বেশ তাই বলবো, এখন চলি বাছা।

একটু পরে মায়াদানব আবার মানুষরূপ ধরে একটা ভেড়া কাঁধে করে ঘরে ফিরে আসে। সব শুনে বলে, আমার বরাতটাই খারাপ, একটুর জন্য মাসীর সঙ্গে দেখা হলো না।

কয়েকদিন পরে সে দল-অল-এর পিতা সুলতানের রূপ ধরে এসে উপস্থিত হলো। বাবাকে পেয়ে কন্যা আকুল হয়ে ছুটে গেলো। সুলতানরূপী মায়াদানব দল-অলকে আদর করে সাশ্রু নয়নে বললেন, মা, এই তোর ভাগ্যে ছিলো! শেষে আমি তোকে একটা মায়াবী দানবের হাতে তুলে দিলাম।

বাবার চোখের জল দেখে সব গোলমাল হয়ে গেলো দল-অল-এর! ফিসফিস করে বললো, চুপ, বাবা, আস্তে। হয়তো সে এখুনি এসে পড়বে। জান বাবা, সে সত্যিই কোনও সুলতান বাদশাহর ছেলে নয়। দানবই বটে। প্রথম প্রথম সে আমাকে নরমাংস খাওয়াবার অনেক চেষ্টা করেছিলো। আমি খেতে অস্বীকার করায় সে অবশ্য আমাকে জোর-জুলুম করেনি। তারপর থেকে রোজ একটা করে ভেড়া নিয়ে আসে সে আমার জন্য। কিন্তু নিজে খায় মানুষের মাংস। আমার ভয় হয় বাবা, একদিন না সে আমাকে মেরে খেয়ে ফেলে!

দল-অল-এর শেষ কথাটা তার মুখেই রয়ে গেলো, মায়াদানব তার ভয়াল ভয়ঙ্কর দানবের রূপ ধারণ করে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এলো। বলা বাহুল্য আতঙ্কে শিউরে উঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলো দল-অল।

—হুম্, এবার বুঝেছি, তুমি আমার নামে কি রকম নিন্দে করেছ তাদের কাছে।

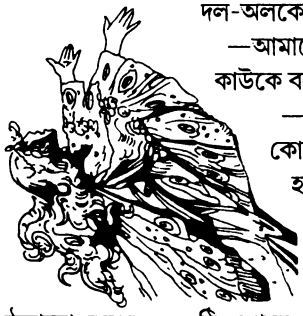

দল-অলকে এক হাত দিয়ে তুলে আবার ছুঁড়ে দিলো সে।

—আমাকে বাঁচাও, প্রাণে মেরো না। কসম খাচ্ছি, আর কক্ষণো কাউকে বলবো না।

—তোমাকে আর বিশ্বাস করি না। তোমার যখন ধারণাই হয়েছে কোন্‌দিন তোমাকেই আমি খেয়ে ফেলবো, সে ধারণা আমি মিথ্যে হতে দিতে পারি না। আমি তোমাকে খাব? কিন্তু বলো, কোন্‌দিক থেকে শুরু করবো?

দল-অল আর্তনাদ করে ওঠে, এই আমার নিয়তি। এইভাবে তোমার হাতে আমাকে মরতে হবে, আমি তা ঠেকাবো কেমন করে। ঠিক আছে, তোমার যখন ইচ্ছে, খেও, আমাকে। কিন্তু আজ আমার শরীর নোংরা হয়ে আছে। এই অবস্থায় আমার দেহের মাংস খেতে তোমার আস্বাদ লাগবে না। আমাকে হামামে নিয়ে চলো, আগে আমি ঘষে মেজে গোসল করে সাফ হয়ে উঠি তারপর আমি নিজে থেকেই তোমার খাবার টেবিলে বসবো। তখন তুমি আমার শরীরের যেখান থেকে শুরু করতে ইচ্ছে কর, করো ; তখন তোমার রুচিও হবে, খেতেও ভালো লাগবে আমাকে।

দল-অলের কথা মায়াদানবের মনে ধরলো। বললো, ঠিক আছে তাই হবে।

তৎক্ষণাৎ সে স্নানের কাপড়-চোপড় এবং একটা বড় সোনার গামলা সঙ্গে নিয়ে তার একটা অনুচর ভৃত্যকে যাদুবলে গাধায় রূপান্তরিত করে এবং নিজে একটা রাখাল বালকের রূপ ধরে দল-অলকে ঐ গাধার পিঠে চাপিয়ে গ্রামান্তরে এক হামামের উদ্দেশে রওনা হলো।

কিছুক্ষণ পরে সে হামামের কাছে এসে পৌঁছলো। হামামের নারী-প্রহরীর হাতে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিয়ে মায়াদানব বললো, শোনো মেয়ে, ইনি হচ্ছেন এক শাহজাদী। একে অন্দরে নিয়ে গিয়ে খুব ভালো করে শাহী কেতায় গোসল করিয়ে তারপর আমার কাছে দিয়ে যাবে, কেমন?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বললো, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি ওকে দামী আতর-পানীতে গোসল করিয়ে দিচ্ছি। আপনি এই দরজার পাশে বসুন।

এই বলে দ্বার-রক্ষিণী দল-অলকে নিয়ে হামামের ভিতরে চলে গেলো।

হামামঘরের বৈঠকখানায় অপেক্ষমান অন্য মেয়েদের পাশে দল-অলকে বসিয়ে দ্বার-রক্ষিণী চলে গেলো। একে একে অন্য মেয়েরা স্নানের ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু দল-অল আর ওঠে না। বিষণ্ণ বদনে বসে সে নিজের নসীবের কথা ভাবতে থাকে। আর একটু বাদেই সে মায়াদানবের পেটে চলে যাবে! উফ্ ভাবতেও কাঁটা দিয়ে ওঠে শরীর? চোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে।

একদল মেয়ে হাসিতে উচ্ছল হয়ে হামামে ঢোকে। দল-অলকে কাঁদতে দেখে ওরা বলে, সে কি কাঁদছো কেন গো? গোসল করবে তো? চলো, আমাদের সঙ্গে চলো, একসঙ্গে মজা করে গোসল করা যাবে।

দল-অল ঘাড় নাড়ে, না ভাই তোমরা যাও। আমি আর গোসল করে কী করবো? এ জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ আমার শেষ হয়ে গেছে!

মেয়েগুলো আর ওকে ঘাঁটালো না। হামামের ভিতরে ঢুকে গেলো!

একটু পরে এক বুড়ি মাথায় একটা চুপড়ি নিয়ে প্রবেশ করলো। এই হামামে সে নিত্য চিনেবাদাম ও পানিফল বিক্রি করতে আসে। যারা এখানে গোসল করতে আসে তাদের কাছে বিক্রি করে এক আধলা পায়। তাই দিয়ে সে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করে। বুড়িটার নিজের কোনও গৃহ নাই। সারাদিন ফিরি করার পর এই হামামেরই এক কোণে সে পড়ে থেকে রাত কাটায়।

বুড়িটাকে ইশারায় কাছে ডাকে দল-অল। বলে, হ্যাঁগো বুড়িমা, আমাকে খানিকটা চিনেবাদাম দাও তো।

বুড়ি একটা ঠোঙায় চিনেবাদাম ভরে দল-অল-এর হাতে দেয়।

—কত দাম?

বুড়ি বলে আধ দিরহাম, মা।

নিজের গলার মূল্যবান জড়োয়ার হারটা খুলে সে বুড়ির হাতে দেয়, এটা রাখ, তোমার বালবাচ্চারা সুখে থাকবে।

বুড়ি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দল-অল-এর দিকে। দল-অল বলে, আচ্ছা বুড়ি মা, তোমার এই ঝুড়ি আর পরনের সাজপোশাকগুলো আমায় দিতে পার? যদি দাও তবে তোমাকে এই সোনার গামলাটা এবং আমার গায়ে যত গহনা আছে সব দেব।

বুড়ি এবার রেগে ওঠে। গরীব বলে কি আমি মানুষ নই মা? এইভাবে তামাশা অপমান করবে?

দল-অল বলে, সত্যি, বিশ্বাস কর বুড়ি মা, আমি তোমার সঙ্গে একবিন্দু রঙ্গতামাশা করছি না। যদি সত্যি সত্যিই তোমার সাজপোশাক আর ঐ ঝুড়িটা আমাকে দাও, আমি কথা দিচ্ছি, আমার বলতে এখানে যা আছে সব তোমাকে দেব।

বুড়ি তার ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় ছেড়ে দিলো। দল-অল সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ থেকে মূল্যবান সাজপোশাক খুলে দিলো বুড়িকে। বুড়ির ময়লা ছেঁড়া সাজপোশাক এবং

বোরখা পরে চিনেবাদাম আর পানি-ফলের ঝুড়িটা মাথায় তুলে নিয়ে গুটি গুটি সদরের দিকে এগিয়ে গেলো অল-দল।

হামামের দরজার পাশে বসেছিলো রাখাল-বেশী মায়াদানব। দরজা পার হয়েই অল-দল হাঁক শুরু করলো, চিনেবাদাম পানিফল নেবে গো—

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় হয়। মায়াদানব দ্বার-রক্ষিণীকে তাগাদা দিলো, কই গো মেয়ে, আমার মালকিন এখনও বেরুচ্ছে না কেন? যাও না একবার দেখে এসো।

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তুমি বাপু অত অধৈর্য হচ্ছে কেন? একি যেমন তেমন গোসল নাকি। পুরো বাদশাহী কেতায় আতর গোলাপ-পানিতে নাহাতে হবে। তারপর পরিপাটি করে সাজপোশাক পরাতে হবে। গায়ে খুশবু ছড়াতে হবে, সময় লাগবে না?

মায়াদানব ঘাড় নেড়ে বলে, তা বটে, তা বটে।

রাত ঘনিয়ে আসে। এবার দ্বাররক্ষী হামামের সদর বন্ধ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মায়াদানব রুখে দাঁড়ায়, এ্যাই, এটা কি হচ্ছে? আমার মালকিন রয়ে গেলো অন্দরে, আর তুমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছ যে?

মেয়েটি বলে, সে কি! হামামের ভিতরে তো কোনও খদ্দের নাই। সবাই গোসল করে চলে গেছে। শুধু মাত্র এক ফিরিওলি বুড়ি শুয়ে আছে এক কোণে। তা সে তো রোজই এখানে রাত কাটায়।

মায়াদানব এবার লাফিয়ে এসে মেয়েটির টুঁটি চেপে ধরে, তোমার ওসব বুজরুকী আমি শুনতে চাই না। আমার মালকিনকে বের করে দাও। না হলে গলা টিপে শেষ করে দেব!

মেয়েটি প্রাণপণে মায়াদানবের হাত ছাড়াতে ছাড়াতে চিৎকার তোলে, ওগো কে কোথায় আছ বাঁচাও-বাঁচাও, আমাকে মেরে ফেললো।

চেঁচামেচি চিৎকারে নিমেষে হাজার লোক জমায়েত হয় সেখানে। মায়াদানব বেগতিক দেখে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়।

দল-অল ফেরিওলির ছদ্মবেশে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে কয়েকটা গ্রাম পিছনে ফেলে ঘন্টা-কয়েকের মধ্যে এক খর-স্রোতা নদীর কূলে এসে দাঁড়ায়।

পথশ্রমে সে অত্যন্ত ক্লান্ত। সবুজ ঘাসের ওপর এলিয়ে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে অঞ্জলিভরে নদীর জল পান করে সে। তারপর আবার শুরু হয় পথ চলা।

চলতে চলতে একদিন সে এসে উপস্থিত হয় এক শহরে। সেখানকার সুলতানের প্রাসাদে গিয়ে প্রহরীকে বলে, আমি এক সুলতান-কন্যা, তোমাদের বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

খবর পেয়ে সুলতান তাঁর পুত্রকে পাঠালেন অতিথিকে স্বাগত জানাতে। শাহজাদা দল-অলের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার পাণি-প্রার্থনা করলো।

দল-অল সম্মত হলো। সেইদিনই কাজী-সাক্ষী ডেকে শাদীনামা তৈরি করালো সুলতান।

সারা শহরে প্রাসাদে উৎসবের ধূম পড়ে গেলো। বিকেলের দিকে এক শেখ এলো সুলতান-সমীপে। তার সঙ্গে ছিলো একটা তাগড়াই ভেড়া। সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে সে ভেড়াটা ভেট দিলো সুলতানের পুত্রের শাদী উপলক্ষে। বললো, এই ভেড়াটাকে অনেক আদর যত্ন করে লালনপালন করেছি আমি, জাঁহাপনা। আজ শাহজাদার শাদী উপলক্ষে এটা আপনাকে প্রদান করে ধন্য হতে চাই আমি।

সুলতান প্রীত হয়ে বললেন, ঠিক আছে, এই ভেড়ার মাংস বড় উপাদেয় হবে মনে হচ্ছে। কাল সকালে একে জবাই করা হবে।

শেখ বললো, কিন্তু জাঁহাপনা একটা কথা, ভেড়াটাকে আমার বিবি সবসময়

হারেমের মধ্যে রেখে পালন করতেন। তাই নারীসঙ্গ ছাড়া সে শান্ত থাকতে পারে না। আমার অনুরোধ, আজকের রাতটা একে আপনার হারেমে বেঁধে রাখবেন। না হলে এ ব্যাটা মহা অশান্তি করে সকলের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে।

সুলতান হারেমের খোজাকে বললেন, আজ রাতটা এই ভেড়াটাকে হারেমে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখবে। কাল সকালে জবাই করা হবে।

অনেক রাতে ভেড়ারূপী মায়াদানবটা তার আসল মূর্তি ধরে দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দল-অল-এর বাসরকক্ষের দিকে ধাবমান হলো। কিন্তু ঐ সময় দল-অলকে পাহারা দিচ্ছিল বেহেস্তের এক জিন। মায়াদানবের উগ্র রূপ দেখে সে বুঝতে পারলো, এই শয়তান রাক্ষসটা নিশ্চয়ই শাহজাদীকে অপহরণ করবে। তৎক্ষণাৎ সে রাক্ষসটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুমদাম গোটাকতক কিল ঘুষি বসিয়ে দিতেই সে অক্কা পেয়ে লুটিয়ে পড়লো মেঝেয়।

পরদিন সকালে সবাই দেখলো, ভেড়াটা বাসরঘরের দরজার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দল-অল বিপদ মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে।

এরপর সপ্তম কাপ্তেন এগিয়ে এলো তার কাহিনী শোনাতে।

সে বলতে থাকে ঃ

আমি যে জেলায় বাস করতাম সেই জেলায় এক চাষীর বাড়িতে এক রাতে এক আরব দস্যু হানা দিয়েছিলো। সে যখন গমের বস্তা ধরে টানাটানি করছিলো, তখন গৃহস্বামী জেগে উঠে চোর চোর বলে সোরগোল তুলে পাড়াপড়শীদের জাগিয়ে তুললো। চোরটা এমনভাবে নিজেকে লুকিয়ে ফেললো যে, আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার টিকি দেখতে পেলাম না! নিরাশ হয়ে চলে যাবো ভাবছি, এমন সময় গমের বস্তার গাদা থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিও ছুটে গেলাম সেইদিকে। দেখলাম একটা লোক বুকের ওপর একটা আড়াই-মণি গমের বস্তা নিয়ে শুয়ে আছে ঘাপটি মেরে।

লোকটিকে টেনে বের করে দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার, অমন আওয়াজ করে ধরা দিলে কেন?

লোকটা বললো, আওয়াজ আমি ইচ্ছে করে করিনি, মালিক। গমের বস্তাটা পেটের ওপর এমনভাবে চেপে বসেছিলো যে পেটের বায়ু সশব্দে বেরিয়ে গেছে।

সপ্তম কাপ্তেন বললো, তারপর চোরটাকে আমি বেদম প্রহার দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

সপ্তম কাপ্তেনের এই অতি ক্ষুদ্র কাহিনী শুনে সুলতান সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি অষ্টম কাপ্তেনকে ডাকলেন।

অষ্টম কাপ্তেন বলতে শুরু করে ঃ

এক বাঁশী-বাদকের বৌ একদা একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিয়েছিলো। স্বামীটার কোনই সঙ্গতি ছিলো না! ধাইকে তার পাওনা-গণ্ডাও দিতে পারলো না। প্রসূতির জন্য পথ্যও সংগ্রহ হলো না।

অগত্যা সে ঘর ছেড়ে পথে বেরুলো ভিক্ষা করতে।

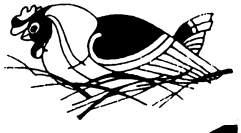

সে মাঠের পথে চলতে চলতে এক সময় লক্ষ্য করলো, একটা খামারবাড়ির খাঁচার ওপর বসে একটা মুরগী আজান দিচ্ছে।

খাঁচার মধ্যে মুরগীর গোটাকয়েক ডিম দেখে সে আর লোভ সামলাতে না পেরে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে টুক করে ডিমগুলো তুলে নিলো এক হাতে এবং অন্য হাত দিয়ে খপ করে ধরে ফেললো মুরগীটাকে।

ঘরে ফিরতে ফিরতে সে ভাবলো, যাক, আল্লাহর দোয়ায় আমার বাবাকে মুরগার ঝোল খাওয়াতে পারবো। আর এই ডিম কটা দিয়ে ধাই-এর ঋণ শোধ করা যাবে।

বাজারে ঢুকে বাঁশী-বাদক এক স্যাকরার দোকানের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ইহুদী জহুরীর ডাকে থমকে দাঁড়ালো সে।

—কি গো বাছা, তোমার হাতে কী?

বাঁশী-বাদক বলে, একটা মুরগী আর কয়েকটা ডিম।

জহুরী জিজ্ঞেস করে, ডিম কটা বেচবে?

—হ্যাঁ।

—কত নেবে?

বাঁশী-বাদক ভাবছে কত চাইবে। ইহুদী আবার বললো, খুব বেশি হলে দশ দিনারের বেশি হওয়া উচিত নয়, কী বলো?

এবার বাঁশী-বাদক বুঝতে পারে ইহুদীটা তার সঙ্গে মস্করা করছে। না হলে কয়েকটা ডিমের দাম দশ দিনার বলে কেউ?

—আপনি তো ভালোই জানেন জহুরী সাহেব, এই ডিমের ও দাম হতে পারে না। তবু আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন কেন? আমি গরীব বলে?

জহুরী ভাবলো, লোকটা বুঝি আরও বেশি কিছু চায়, তাই সে বললো, ঠিক আছে, পনের দিনার নিও?

বাঁশী-বাদক চিৎকার দিয়ে ওঠে। ইয়া আল্লাহ, এ কি মসিব্বতে ফেললে আমাকে।

জহুরী অন্যরূপ ভাবলো। সে বললো, আচ্ছা কুড়ি দিনারই দেব।

বাঁশী-বাদক দেখলো লোকটা রসিকতাই করুক আর যাই করুক, ডিমগুলো সে ছাড়বে না। বাঁশী-বাদক ডিমগুলো ওর সামনে নামিয়ে দিয়ে বললো, কই দামটা দিয়ে দিন।

জহুরী গুণে গুণে কুড়িটি স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিলো বাঁশী বাদকের হাতে। টাকাগুলো পকেটে পুরে সে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে চললো ঘরের দিকে। জহুরী তার পিছনে ছুটতে ছুটতে এসে বললো, হ্যাঁগো, এমন ডিম কি আরও আছে তোমার ঘরে? যদি থাকে কাল আবার নিয়ে এসো। এইরকম দামই দেব।

বাঁশী-বাদক বলে, মুরগীটা যদি পাড়ে তবে কাল সকালে তোমাকে বেচে যাবো।

জহুরী বললো, না না, তোমার আর কষ্ট করে আসার দরকার নাই। তার চেয়ে তোমার বাড়িটা আমাকে চিনিয়ে দাও, কাল থেকে রোজ সকালে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসবো। আর শোনো, এবার থেকে প্রতিটির জন্য কুড়ি দিনার করে দেব।

বাঁশী-বাদক সম্মত হয়ে জহুরীকে বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে বিবির জন্য বাজার থেকে অন্য একটা মুরগী কিনে বাড়ি ফিরলো।

পরদিন সকালে উঠে বাঁশী-বাদক তার বিবিকে বললো, দেখো, ভুলেও যেন কখনও ঐ মুরগীটাকে জবাই করে খেও না। ওর এক একটা ডিম কুড়ি দিনারে বিকাবে। এইভাবে কিছুদিন যদি সে ডিম দেয় তবে দেখে নিও, আমরা আর এইরকম গরীব থাকবো না।

এইসময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো ঊনপঞ্চাশতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

ইহুদী প্রতিদিন সকালে আসে। বাঁশী-বাদক একটা করে ডিম দেয় তাকে। সে খুশি মনে কুড়িটি স্বর্ণমুদ্রা গুণে দিয়ে যায়।

এইভাবে কালক্রমে বাঁশী-বাদকের হাতে বেশ মোটা টাকা জমে ওঠে। একদিন সে বাজারে একটা দোকান কেনে।

এখন আর সে গরীব বাঁশী-বাদক নয়, শহরের বেশ গণ্যমান্য পয়সাওলা সওদাগর। তার পুত্রের পাঠশালা যাওয়ার বয়েস হলো। সে এক অবৈতনিক পাঠশালা খুলে দিলো তার বাড়ির পাশে। মাইনে করে মৌলভী রাখলো। পাড়ার অন্য সব গরীব ছেলেদের সঙ্গে তার ছেলেও লেখাপড়া শিখতে থাকলো।

বাঁশী-বাদকের এখন অনেক পয়সা। মক্কায় গিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে আসবে এই বাসনায় সে তীর্থযাত্রীদের দলে ভিড়ে গেলো। যাবার আগে বিবিকে সাবধান করে গেলো, জহুরীটা হয়তো তোমাকে অনেক টাকার লোভ দেখাবে। কিন্তু খবরদার, কোনও দামেই মুরগীটা তাকে বেচে দিও না কিন্তু!

পরদিন সকালে ইহুদীটা একটা বাক্স কাঁধে নিয়ে বাঁশী-বাদকের বিবির কাছে এলো। বাক্সের ডালা খুলে সে বললো, এই যে বাক্সভর্তি মোহর দেখছো, এগুলো সব তোমাকে দেব, তার বদল তুমি আমাকে তোমার মুরগীটা বিক্রি করে দাও।

এক বাক্স চকচকে স্বর্ণমুদ্রা দেখে বাঁশী-বাদকের বিবির চোখ নেচে ওঠে। কিন্তু স্বামীর সতর্কবাণী স্মরণ করে সঙ্গে সঙ্গে চুপসে যায়। না গো, সে পারবো না। সে যাওয়ার সময় বলে গেছে, আমি যেন তোমাকে শুধু ডিমই বিক্রি করি। মুরগী বেচতে বারণ করে গেছে।

জহুরী বাক্সটা মেঝের উপর উপুড় করে ফেলে দেয়। একরাশ সোনার দিনার। জহুরী বলে, কতগুলো মোহর, একবার তাকিয়ে দেখ, এতো টাকা পাওয়া যাবে ঐ একটা মাত্র মুরগীর জন্যে, তা কি তোমার স্বামী ভাবতে পেরেছিলো কোনও দিন?

বাঁশী-বাদকের বিবি বলে, ঠিক আছে মুরগীটা তাহলে বেচেই দিচ্ছি তোমাকে। নিয়ে যাও।

ইহুদী বলে, না গো মেয়ে, ও মুরগী আমি নিয়ে যাবো না সঙ্গে করে। তুমি কেটেকুটে আচ্ছা করে বানাও আমার জন্য। আমি একটা কাজে যাচ্ছি ফিরে এসে খাবো। কিন্তু একটা কথা, আমার মুরগীর একটুকরো মাংসও যেন গ্যাঁড়া মেরো না। যত চালাকী করেই কাট আমি খেতে বসে সব বুঝতে পারবো কোন মাংসটা নাই। আমার মাংসের একটা টুকরো যদি পেটে পুরো তবে আমি পেট চিরে তা বের করে নেব, বলে দিলাম।

বাঁশী-বাদকের বিবি বলে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার মাংস কেউ মুখে দেবে না।

দুপুরে মাদ্রাসা থেকে ফিরে আসে ছেলে। খিদেয় সে চনমন করছিলো। রসুইঘরে এসে বলে, মা খেতে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

মা বলে, একটু দাঁড়া বাবা, বানিয়ে দিচ্ছি। এখন তো কিছু তৈরি হয়নি।

ঘরের একপাশে রাখা সদ্য রান্না করা মুরগীটার সুগন্ধ পেয়ে সে বলে, ঐ তো দেখছি মুরগী রেঁধেছ, আমাকে দাও আমি খাব।

—সর্বনাশ! ও মুরগীর দিকে নজর দিসনি। ইহুদী জহুরী এক বাক্স মোহর দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনেছে খাবে বলে। বলে গেছে, একটা টুকরো কম হলে সে ধরে ফেলবে। তুই একটু বস বাবা, আমি এখুনি তোর খানা পাকিয়ে দিচ্ছি।

মা ছেলের খানা বানাতে ব্যস্ত ছিলো, এই ফাঁকে ক্ষুধার্ত পুত্র গামলার ঢাকনা খুলে মুরগীর একটা টুকরো তুলে মুখে পুরে দেয় অলক্ষ্যে।

জিভে স্বাদ লাগে, আরও একটুকরো তুলে নেয় সে মায়ের অজান্তে। এই ভাবে এক এক করে পুরো মুরগীটাই সাবাড় করে ফেলে সে।

হঠাৎ মায়ের নজর পড়ে শূন্য গামলার দিকে। সে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। এ কি

করলি বাবা? লোকটা বিধর্মী, ধূর্ত ইহুদী। আমার সঙ্গে শর্ত হয়েছে, তার মাংস কেউ খেলে তার পেট চিরে সে বের করে নিবে সেই মাংস। এখন কী উপায় হবে বাবা?

ছেলেটি বলে, আমি সটকে পড়লাম। ইহুদীটা এলে বোলো, আমি চুরি করে খেয়ে পালিয়েছি। তারপর দেখা যাবে সে ব্যাটা কেমন কাপ্তেন।

যথাসময়ে ইহুদীটা এসে বললো, কই আমার মাংস দাও।

বাঁশী-বাদকের বৌ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বলে, খোদা হাফেজ, আপনার জন্য মাংসটা বানিয়ে আমি ঢেকে রেখেছিলাম যত্ন করে। কিন্তু, কি বলবো, আমার ছেলেটা মাদ্রাসা থেকে ফিরে আমাকে না বলেই সবটা খেয়ে ফেলেছে।

ইহুদী হুঙ্কার ছাড়ে, কোথায় সে? আমি তার পেট চিরে বের করবো আমার হকের মাংস। একি মাঙনা চাইছি নাকি? নগদ এক বাক্স সোনার মোহর দিয়েছি তোমাকে ঐ একটা মুরগীর জন্য। তোমার সঙ্গে আমার যা ওয়াদা তা পূরণ করতেই হবে তোমাকে।

বৌটা বলে, কিন্তু ছেলে তো ঘর ছেড়ে পালিয়েছে!

কোথায় পালাবে? আমি তাকে ধরবোই।

এই বলে উন্মত্তের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

শহর ছেড়ে প্রান্তর, প্রান্তর ছেড়ে গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে আবার প্রান্তর গ্রামে অনুসন্ধান করে বেড়াতে লাগলো ইহুদী। অবশেষে এক বাগানের মধ্যে দেখতে পেলো ছেলেটিকে। কাছে এসে বললো, তুমি আমার মুরগী খেয়েছ, তোমার পেট চিরে আমি ঐ মাংস বের করবো।

এই বলে ছুরিটা বাগিয়ে ধরলো সে ছেলেটির পেটের দিকে। কিন্তু অসামান্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে ইহুদীর হাত থেকে কেড়ে নিলো অস্ত্রখানা। বললো, তোমার লজ্জা করে না? একটা তুচ্ছ মুরগীর মাংসের জন্য তুমি আমার পেট চিরতে এসেছ? যাও এখান থেকে। না হলে তোমার ঐ ছুরি তোমারই বুকে বসে যাবে।

ইহুদী তখন ক্রোধে হিতাহিত বোধ হারিয়ে ফেলেছে। ছেলেটির ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা ঘটা সম্ভব তাই ঘটে গেলো পলকে।

ছেলেটির হাতের ছুরি বিদীর্ণ করে দিলো ইহুদীর বুক। প্রাণ-হীন দেহটা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

এরপর ছেলেটি বাড়ি ফেরার জন্য ছুটতে লাগলো। কিন্তু পথ ভুলে সে বাড়ির বদলে এসে পৌঁছলো এক সুলতানের প্রাসাদ-ফটকে। সেখানে সশস্ত্র প্রহরীরা দামামা পিটিয়ে ঘোষণা করছিলো, তামাম দুনিয়ার জাঁদরেল নওজোয়ানদের · দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছেন শাহজাদী। যদি কারো তেমন তাগদ থাকে তবে তিনি এগিয়ে আসতে পারেন। শাহজাদীকে যিনি পরাস্ত করতে পারবেন তার গলাতেই মালা দেবেন তিনি। কিন্তু খেয়াল থাকে যেন, যদি লড়াই-এ পরাজয় ঘটে, তবে কোতল হতে হবে তাকে।

ছেলেটি সুলতানের সামনে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি আপনার কন্যার সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত, জাঁহাপনা।

সুলতান বললেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবে বাছা! আমার কন্যা অপরাজেয়। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে হারাতে পারেনি। কত শত শাহজাদার প্রাণবলি হয়েছে, এ পর্যন্ত তা কি তুমি জান?

ছেলেটি বলে, ওসব জেনে আমার লাভ নাই। আমি তার সঙ্গে লড়তে এসেছি। তাকে হারিয়ে আমি শাদী করবোই। আর তা'মি যদি হারি, তবে তো আপনি আমার গর্দান নেবেন, তাও আমার অজানা নয়।

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, তা হলে এই চুক্তিনামায় সই কর। চুক্তির শর্ত সব এতে পরিষ্কার করে লেখা আছে।

কুস্তির লড়াই শুরু হলো।

দরবার-প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে গালিচা বিছানো হলো। ছেলে আর মেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উভয়ে প্রস্তুত হতে লাগলো।

এরপর দু'জনে দু'জনকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে প্রবল বিক্রমে একে অন্যকে কাবু করার কসরৎ ভাঁজতে থাকলো।

সে এক অভূতপূর্ব মল্লযুদ্ধের দৃশ্য। একবার ছেলেটি মেয়েটিকে চ্যাংদোলা করে তুলে আছাড় মারতে উদ্যত হয়। আবার কখনও বা মেয়েটি সাপিনীর মতো আশেপাশে জড়িয়ে ধরে ছেলেটিকে।

এইভাবে একটানা দু'ঘণ্টা চলতে থাকে ওদের লড়াই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই কাউকে গালিচায় ফেলে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

সুলতান ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠেন। বুঝতে পারেন, তাঁর কন্যা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করতে পারছে না কিছুতেই। চিৎকার করে ওঠেন তিনি, থাক থাক খুব হয়েছে, আজ থাম তোমরা। কাল আবার দেখা যাবে।

সুলতান তাঁর কক্ষে চলে গেলেন এবং সেরা হাকিমকে তলব করলেন।

—শোনও হকিম, আজ রাতে ঐ ছেলেটিকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে ওর সর্বাঙ্গ ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে। আমি বুঝতেই পারছি না, যে কন্যাকে এর আগে ঊনচল্লিশ জন জাঁদরেল জোয়ান ছেলে কাবু করতে না পেরে প্রাণ হারিয়েছে, তাকে কি করে এই ছেলেটা আজ সামাল দিতে পারলো? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই সে এমন কোনো বস্তু অঙ্গে ধারণ করেছে, যার অমিত বিক্রমকে পরাস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না আমার কন্যার পক্ষে। তুমি আজ রাতে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখ ছেলেটিকে! তার দেহাভ্যন্তরে নিশ্চয় কোনও অলৌকিক বস্তু লুকানো আছে। সন্ধান করে আজ রাতেই তা বের করে ফেলতে হবে তার শরীর থেকে! এ কাজ যদি যথাযথ সমাধা করতে পার যথাযোগ্য ইনাম পাবে তুমি। কিন্তু যদি ব্যর্থ হও, তা হলে তোমার মুণ্ডুহীন ধড়খানা কুকুর দিয়ে খাওয়াবো আমি।

সুতরাং রাত্রি গভীর হলে হাকিম নিদ্রিত ছেলেটির পাশে এসে কড়া-জাতের একটা ওষুধ ওর নাকের সামনে ধরলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি অসাড় হয়ে এলিয়ে পড়লো বিছানায়। হাকিম পরীক্ষা করে বুঝতে পারলো, ছেলেটির পেটে একপ্রকার মুরগীর মাংস আছে। এবং ঐ মুরগীর মাংসের বলেই সে মহা বলবান হতে পেরেছে।

নিপুণ হাতে পেটে ছুরি বসিয়ে ঐ মুরগীর মাংসখণ্ডগুলি এক এক করে সব বের করে দিলো হাকিম। তারপর সূক্ষ্মভাবে সেলাই করে ওষুধ লাগিয়ে দিলো। সে ওষুধের এমন গুণ কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে নিখুঁতভাবে জোড়া লেগে যায় কাটা চামড়া। এরপর নাকে ভিনিগার ঘষে দিয়ে সে বেরিয়ে গেলো।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই ছেলেটি বুঝতে পারলো তার দেহের অসাধারণ শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে। তখন সে বেশ বুঝতে পারলো, গতকাল তার দেহে অমিত বিক্রম এসেছিলো ঐ মুরগীর মাংস ভক্ষণের জন্য। পেটে হাত বুলিয়ে সে

শিউরে উঠলো। না, আজ তো তার পেট প্রায় খালি। এই অবস্থায়, কোন্ সাহসে সে ঐ শাহজাদীর সঙ্গে কুস্তি লড়ার দুঃসাহস করবে।

প্রাসাদ ছেড়ে সে পালালো সেই মুহূর্তে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একসময় সে এসে থামলো বিবদমান তিন বন্ধুর এক আড্ডায়। ওরা ভীষণ রকম চেঁচামেচি করে ঝগড়া-ঝাটিতে মত্ত হয়ে উঠেছে।

—কী ব্যাপার, কেন তোমরা এমন ঝগড়া করছো? কিসের এতো গোল?

ছেলেটির প্রশ্নের জবাবে ওরা বললো, একটা জিনিস নিয়ে।

—কী এমন বস্তু?

একজন বললো, এই গালিচাটা। এটা যাদুমন্ত্র করা। এই গালিচায় চেপে তুড়ি বাজিয়ে তুমি যেখানে যেতে ইচ্ছে কর যেতে পারবে। তা সে কাফ পর্বতমালার উত্যুঙ্গ চূড়াতেই হোক না কেন, নিমেষে তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেবে।

ছেলেটি বললো, এই মূল্যবান বস্তুখানি নিয়ে টানাটানি না করে এসো আমি তোমাদের বিরোধের একটা সুসঙ্গত সমাধান করে দিই।

ওরা বললো, ঠিক আছে, আমরা রাজি। তুমিই এর মীমাংসা করে দাও।

ছেলেটি বললো, আগে গালিচাখানা মাটিতে বিছাও। আমি দেখি কতটা লম্বা, কতটা চওড়া।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা ধরাধরি করে গালিচাখানা বিছিয়ে দিলো সামনে। এবার ছেলেটি ছোট্ট একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ঐ গালিচার ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর বললো শোনো, আমি এক দুই তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে এই ঢিলটা ছুঁড়ে দেব! তোমাদের মধ্যে যে আগে ছুটে গিয়ে এটা কুড়িয়ে আনতে পারবে সেই এই গালিচার মালিক হবে। কী, রাজি সবাই?

তিনজনেই সমস্বরে লাফিয়ে উঠলো, রাজি, আমরা রাজি।

ছেলেটি এক দুই তিন গোনা মাত্র প্রাণপণে জোরে ঢিলটা ছুঁড়ে দিলো অনেক দূরে। সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে ছুটে গেলো ওরা তিনজন। আর সেই ফাঁকে ছেলেটি তিনবার তুড়ি বাজিয়ে বললো, ওহে গালিচা, যেখান থেকে আজ সকালে আমি পালিয়ে এসেছি এবার আমাকে ঐ প্রাসাদের সেই কক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।

ছেলেটির মুখের বাক্য শেষ হতে না হতে শোঁ শোঁ করে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গেলো গালিচাখানা, তারপর বায়ুবেগে উড়ে চলতে থাকলো।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ছেলেটি দেখলো গালিচাখানা এসে নামছে সেই প্রাসাদের দরবার-প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে—গতকাল যেখানে সে শাহজাদীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধে মেতেছিলো।

ছেলেটি বুকে চাপড় মেরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালো, কই, কে কোথায় আছ, লড়বে এসো আমার সঙ্গে। আমি এবার এক প্যাঁচে কাত করে দেব।

শাহজাদী এই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না। তাকে পরাজিত করে যাবে এমন লড়াকু জোয়ান সে আজও দেখেনি।

গালিচার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালো মেয়েটি, ছেলেটির একেবারে মুখোমুখি। এই সময় ছেলেটি তিনবার তুড়ি বাজিয়ে বললো, সোজা নিয়ে চলো কাফের চূড়ায়।

মুখের কথা শেষ হতে না হতে গালিচাখানা উপরে উঠে নিমেষে উধাও হয়ে গেলো। সুলতান তথা উপস্থিত হাজার দর্শক হতবাক নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইলো শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে।

পলকে কাফের চূড়ায় এসে নামলো ওরা। ছেলেটি প্রশ্ন করলো, এবার কে

জিতলো, সুন্দরী? তোমরা কায়দা করে আমার পেট থেকে মুরগীর মাংসগুলো বের করে নিয়ে অসদুপায়ে নির্জীব করার জঘন্য কৌশল তো করেছিলে! এবার আমিও শঠে শাঠ্যং করেছি। কুস্তির লড়াই করবো বলে ছল করে তোমাকে এই গালিচায় দাঁড় করিয়ে লোপাট করে এনেছি। এখন বলো তোমাদের ফন্দীর তুলনায় আমার চাতুরী কতটা বেশি দোষের?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো পঞ্চাশতম রজনী ঃ

পরদিন আবার সে বলতে থাকে ঃ

মেয়েটি মিনতি জানিয়ে বললো, যা হয়ে গেছে সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর তুমি। এখন আমি তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করছি। যদি মেহেরবানী করে আমাকে আমার বাবার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, কথা দিচ্ছি, আমার বাবাকে দিয়ে ঘোষণা করিয়ে দেব, তুমিই হবে আমার একমাত্র স্বামী।

ছেলেটি বললো, সে তো অতি উত্তম কথা। কিন্তু একটা প্রবাদ আছে জানতো, লোহা যখন তেতে লাল হয়ে থাকে তখনই তাকে পিটিয়ে প্রয়োজন মতো আকারের জিনিস বানাতে পারা যায়। সুতরাং এসো এই মুহূর্তেই তোমার কুমারীত্ব আমার হাতে খতম হয়ে যাক।

মেয়েটি বললো, বেশ তাই হোক।

মেয়েটিকে গালিচার ওপর চিৎ করে শোয়ালে সে। তারপর যথাকর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কটিদেশ স্থাপন করার পূর্বে মেয়েটি প্রচণ্ড জোরে ছেলেটির তলপেটে একটা লাথি বসিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে পড়লো সে। আর সেই মওকায় মেয়েটি তিনবার তুড়ি বাজিয়ে গালিচাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আমাকে আমার প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।

পলকে গালিচা উড়ে চলে গেলো। ছেলেটি একা পড়ে রইলো, সেই নির্জন কাফ পর্বত-চূড়ায়।

পাহাড়ের শিখরে অসংখ্য গাছপালা। সবই অজানা অচেনা। কত গাছে কত রকমের বিচিত্র সব ফুল ফল। কিন্তু ছেলেটির কিছুই ভালো লাগে না। সে ভাবে এই দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-চূড়া থেকে কীভাবে কতদিনে সে মাটির সমতলে নামতে সক্ষম হবে।

দু'টি দিন অনাহারেই কেটে গেলো। গাছে গাছে অনেক ফল, কিন্তু ভরসা করে খেতে পারে না। কে জানে সে সব ফল খাদ্য কি অখাদ্য।

কিন্তু খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। আর সহ্য করা যায় না, যাই ঘটুক, ঐ গাছের ফল সে খাবেই। যদি সে ফলের বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটে, তবু তাকে খেতে হবে।

হলুদ আর লাল রঙের দুই রকমের ফল দেখতে পেলো সে পাশাপাশি দু'টি গাছে। একটা হলুদ বর্ণের ফল ছিঁড়ে নিয়ে কামড় বসাতেই সারা শরীর রি রি করে উঠলো মুহূর্তে। ছেলেটি দিশাহারা হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ফলটি। কিন্তু ততক্ষণে তার ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো তার মাথা দিয়ে শিং গজাচ্ছে। এবং একটা দু'টো নয়, ষোলটা।

তখন শিংগুলো বড় হতে হতে বিশাল আকার ধারণ করে তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো। আরও কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রত্যেক শিং থেকে অসংখ্য ডালপালা গজিয়ে সে এক বীভৎস আকার ধারণ করলো।

মৃত্যু অবধারিত জেনে মরিয়া হয়ে সে একটা লাল ফল ছিঁড়ে নিয়ে কামড় দিলো। আর কি, এক আশ্চর্য অলৌকিক মন্ত্রবলের ন্যায় মুহূর্তে শিংগুলো আবার মাথার মধ্যে ঢুকে মিলিয়ে গেলো।

তৎক্ষণাৎ ছেলের মাথায় ফন্দী খেলে গেলো। দুই পকেটে হলুদ আর লাল ফলে ভরে নিয়ে পায়ে পায়ে সে নিচের দিকে নামতে থাকলো।

পাহাড়ের দুর্গম উতরাই পথ। একটু পা হড়কালে হাজার হাজার হাত নিচে গড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে সে। যাই হোক আল্লাহর দোয়ায় অবশেষে একদিন সে সুস্থ দেহে সমতল মাটিতে নামতে পারলো।

তারপর পায়ে হেঁটে প্রায় মাসাধিক কাল পরে একদিন সে ঐ সুলতানের প্রাসাদ-সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো।

হলুদ ফলগুলো একটা চুপড়িতে নিয়ে ফিরিওলার বেশ ধরে সে প্রাসাদের সামনে দিয়ে হাঁক দিতে দিতে চলতে লাগলো ঃ ফল নিবে গো, বহুত মজাদার পাহাড়ী ফল। একবার খেলে বার বার খেতে হবে। এ ফল যে খাবে সেও পস্তাবে, যে না খাবে সেও পস্তাবে। ফল নেবে গো, বড় আজব পাহাড়ী মিষ্টি ফল—

শাহজাদী জানলার পাশে বসে লোকজনদের পথচলা দেখছিলো। ফেরিওয়ালার মাথায় অদ্ভুত ধরনের ঐ ফল দেখে সে খোজা বান্দাকে বললো, যা তো কিছু ফল নিয়ে আয়।

খোজাটা ছেলেটার কাছ থেকে গোটাকয়েক হলুদ ফল কিনে এনে শাহজাদীর হাতে দিলো।

—বাঃ কি সুন্দর দেখতে—

এই বলে একটা ফলে কামড় বসাতেই শাহজাদীর সারা শরীরে রি রি করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মাথার চারপাশ দিয়ে ষোলটা শিং ফুঁড়ে বেরুতে লাগলো। মুহূর্তের মধ্যে শিংগুলো বাড়তে বাড়তে বিশাল প্রাসাদকক্ষ ভরে গেলো। অসংখ্য ডালপালা বেরিয়ে এক ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করলো ক্রমশঃ।

সারা প্রাসাদে হৈ চৈ পড়ে গেলো। হাকিমকে ডেকে আনা হলো। কিন্তু অনেক ভাবে পরীক্ষা করেও সে ব্যাধির কারণ বুঝতে পারলো না। তখন সুলতান সারা দেশে ট্যাঁড়া পিটে ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর কন্যার ব্যাধি যে সারিয়ে দিতে পারবে তার সঙ্গে তার শাদী দিয়ে দেবেন তিনি।

এই মওকাতেই দিন গুনছিলো ছেলেটি। সুলতানের সামনে এসে জানালো, শাহজাদীর অসুখ সারিয়ে দিতে পারবে সে।

লাল ফলের একটা ছোট্ট টুকরো সে শাহজাদীর ঠোঁটে ঘঁষে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার বহু শাখা-বিস্তৃত শিংগুলি সুড়সুড় করে মাথার মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখেই সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

সুলতান বিশ্বাস করলেন, এই ছেলের দ্বারাই তাঁর কন্যার রোগ নিরাময় হতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করে দিলেন, এর সঙ্গে শাহজাদীর শাদী হবে।

কাজী ও সাক্ষীকে ডাকা হলো। শাদীনামা তৈরি করে দিলেন তারা। সেই দিনই শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলো।

সুলতান জামাতাকে সাদর স্বাগত জানালেন। দেশবাসী আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে উঠলো।

বাসরঘরে ছেলেটি শাহজাদীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, তা হলে শেষ পর্যন্ত কার জিত হলো শাহাজাদী?

শাহজাদী চোখ মেলে দেখলো, সেই ছেলেটি, যাকে কুস্তিতে হারাবার জন্য তার পেট চিরে মুরগীর মাংস বের করা হয়েছিলো, যাকে সে একদা অত্যুচ্চ কাফ পর্বতচূড়ায় একা ফেলে যাদু গালিচায় চেপে উড়ে পালিয়ে এসেছিলো।

লজ্জায় সে ছেলেটির বুকে মুখ লুকিয়ে ফেললো।

এরপর নবম কাপ্তেন এগিয়ে এসে তার কাহিনী শুরু করে ঃ

একটা বাঁজা মেয়ের কাহিনী শুনুন জাঁহাপনা। মেয়েটির যৌবন ছিলো ডগমগে। স্বামী-সহবাসও সে নিত্যই করতো। কিন্তু হায়রে কপাল! একটা সন্তানও সে পেটে ধরতে পারলো না।

মেয়েটি এতকাল আল্লাহর কাছেই পুত্র-সন্তানই কামনা করে এসেছে, কিন্তু তাতে তিনি সদয় হলেন না দেখে এবার সে নিদেনপক্ষে একটি কন্যাই প্রার্থনা করলো।

খোদা এবার প্রসন্ন হলেন। যথাসময়ে একটি ফুটফুটে সুন্দর কন্যা-সন্তান প্রসব করলো সে। আদর করে মেয়ের নাম রাখলো সে সিত্তুখান।

যখন তার দশ বছর বয়স, সেই সময় একদিন সে তার ঘরের জানলার পাশে বসেছিলো। এমন সময় সুলতান-পুত্র সেই পথ অতিক্রম করার সময় তার নজর গিয়ে পড়লো সিত্তুখানের ওপর। এবং প্রথম দর্শনেই যাকে বলে মূর্চ্ছা—প্রায় সেই দশা হলো শাহজাদার।

অনেক হাকিম বদ্যি এলো। অনেক দাওয়াই কবচ দিলো তারা। কিন্তু শাহজাদার অসুখ আর সারে না।

অবশেষে একদিন এক বৃদ্ধা এসে শাহজাদাকে পরীক্ষা করে বললো, এ তো কোন বিমার নয়। হয় আপনি কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। নয়তো কোনও মেয়ে আপনাকে গভীরভাবে প্রেম-নিবেদন করেছে।

শাহজাদা বললো, আমি প্রথম দর্শনেই প্রেমে মজে গেছি। কিন্তু কে সে? আমি তো তাকে চিনি না, জানি না, তার কী নাম? পার তুমি? পার তুমি তার পরিচয় জেনে দিতে?

বৃদ্ধা মৃদু হেসে বললো, আমি সেইজন্যেই এসেছি আজ। তার নাম সিত্তুখান, দশ বছরের চাঁদের মতো সুন্দর একটি মেয়ে—জানলার ধারে সে বসেছিলো। আপনার চোখ ওর চোখে পড়ে গিয়েছিলো। কী, তাই না?

শাহজাদা বৃদ্ধার হাত চেপে ধরে, তুমি ঠিকই ধরেছ, বুড়িমা। ঐ সেই মেয়ে। ওকে দেখামাত্র আমি পাগল হয়ে উঠেছি। উঃ, কী যে যন্ত্রণা এই বুকে, কী করে তোমাকে বোঝাবো।

বৃদ্ধা বললো, শান্ত হোন, ধৈর্য ধরুন বেটা। তার সঙ্গে যাতে দেখা-সাক্ষাৎ হয় তার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

এই বলে সে সেদিনের মতো শাহজাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সটান চলে এলো সিত্তুখানের বাড়িতে।

—সুখবর আছে মা, তোমার মতো ভাগ্যবতী আর কে? স্বয়ং সুলতানের ছেলে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তোমাকে না দেখতে পেলে সে আর বাঁচবে না।

সিত্তুখান বলে, কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে বুড়িমা? সে বাদশাহর ছেলে, আর আমি এক গরীবের মেয়ে?

বুড়ি বলে, সে ব্যবস্থা আমি করবো। তুমি এক কাজ কর, তাঁতীর বাড়ি গিয়ে শনের কাজ শেখো।

সিত্তুখান মা-এর কাছে গিয়ে বায়না ধরে, মা আমি শনের তাঁত বোনা শিখবো। ও পাড়ার তাঁতী-বৌর কাছে বলে তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

মা বলে ওসবের দরকার নাই মা। শনের গন্ধ নাকে গেলে তুই সহ্য করতে পারবি না—সে বড় কঠিন কাজ।

মেয়ে তবু নাছোড়বান্দা। বলে, না, আমার কিছু হবে না। তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

অগত্যা বাধ্য হয়ে মেয়ের জন্য মা তাঁতীর বাড়ি যায়।

পরদিন থেকে সিত্তুখান তাঁতে কাজ শিখতে থাকে। কিন্তু দিন দুই পরে মাকু চালাতে চালাতে হঠাৎ এক সময় শনের ধারালো সুতো বিঁধে যায় সিত্তুখানের নখের ভিতরে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

অনেক চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরে আসে সিত্তুখানের। কিন্তু শরীর বড় দুর্বল হয়ে পড়ে। হাকিম বলে যায়, মেয়েকে নদীর মুক্ত বাতাসে রাখতে পারলে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে।

সিত্তুখানের বাবা একটা বজরা ভাড়া করে মেয়েকে নদীর নির্মল বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করে।

এদিকে ঐ বৃদ্ধা শাহজাদাকে গিয়ে খবর দেয়, আপনার ভালোবাসাকে দেখার এক চমৎকার সুযোগ এসেছে। সিত্তুখান এখন নদীর কিনারে এক বজরায় বাস করছে।

সেইদিনই বিকালে শাহজাদা উপস্থিত হলো নদীর ঘাটে। বৃদ্ধা আগে থেকেই হাজির ছিলো সেখানে।

সিত্তুখান দু'হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানায় শাহজাদাকে। শাহজাদা সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে না।

আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দু'জনে দু'জনকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে।

এইভাবে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসে। বৃদ্ধা বলে আজ রাত হলো। এখন আপনি প্রাসাদে ফিরে যান শাহজাদা। কাল আবার আসবেন।

পরদিনও এলো শাহজাদা : তার পরদিনও।

প্রেমের বন্যায় দুকুল ছাপিয়ে যেতে চায় দু'জনের। জীবনে এতো ভালোবাসা থাকতে পারে, এর আগে কেউই অনুভব করতে পারেনি।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে সিত্তুখানের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে শাহজাদা বলে, আমার বোধহয় আর আসা হবে না তোমার কাছে।

—কেন, কেন?

মেয়েটি শঙ্কিত হয়ে আবার জড়িয়ে ধরে শাহজাদাকে।

—আমি সুলতানের ছেলে, তুমি অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে। তোমার সঙ্গে আমার এই মাখামাখি আমার মা বাবা উজির আমির কেউই ভালো চোখে দেখছেন না।

সিত্তুখান কেঁদে আকুল হয়, তা হলে? তা হলে কী করে আমি বাঁচবো?

ছেলেটিও কেঁদে সারা হয়। আমারও তো সেই কথা সিত্তু? তুমি ছাড়া তামাম দুনিয়া আমার কাছে অন্ধকার হয়ে আসবে।

পরদিন শাহজাদা আর এলো না। তারপর দিনও না। সিত্তুর বিরহে গাছের পাখিরা কাঁদে। ফুল শুকিয়ে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে।

বিকেল হলেই সিত্তু বজরা ছেড়ে নেমে নদীর ঘাটের পাশে শ্যামল দূর্বাদল শয্যায় লুটিয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু পড়ে থাকাই সার হয়। বৃথা চোখের জল চোখে শুকিয়ে যায়, সে আর আসে না।

একদিন বিকেলে সিত্তুখান ঘাসের শয্যায় শুয়ে বিরহের গান গাইছিলো। হঠাৎ তার নজরে পড়লো, অদূরে ঘাসের ওপর পড়ে আছে একটা পাথর-বসানো আংটি! বেশ চকচক করছিলো।

আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে সিত্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে থাকে। অতি সাধারণ ধাতুর তৈরি। কানাকড়িও দাম হবে না। কিন্তু পাথরটা বড় চমৎকার। ঘোরাতে ঘোরাতে তারার আলোর ঝিলিক হানে। বাঁ হাতের মধ্যমাতে পরে নিলো সিত্তু। ডান হাতের তালুতে একটু ঘষে ধুলো ময়লা পরিষ্কার করতে গেলো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তার সামনে এসে উপস্থিত হলো

এক বিশালাকার দৈত্য। আভূমি আনত হয়ে সে সিত্তুখানকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো, বান্দা হাজির মালকিন। আজ্ঞা করুন, কী করতে হবে?

প্রথমে ভয়ে তো শিউরে উঠেছিলো সিত্তুখান। কিন্তু দৈত্যের বিনয়াবনত ভাবভঙ্গী দেখে ধড়ে প্রাণ পেলো সে। বুকে সাহস এনে বললে, শোনও দৈত্য ঐ যে সুলতানের প্রাসাদ দেখছো, ঠিক ঐ রকমই আর একখানা প্রাসাদ আমাকে বানিয়ে দিতে হবে ওরই ঠিক পাশে।

দৈত্য সেলাম জানিয়ে বলে, জো হুকুম মালকিন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই সিত্তুখান দেখলো সুলতানের প্রাসাদের পাশে আর একখানা তাদৃশ ইমারত গর্বিত মাথায় দাঁড়িয়ে আছে।

দৈত্য এসে বললো, আপনার হুকুম তামিল করেছে বান্দা। আর কোনও আজ্ঞা আছে মালকিন?

সিত্তু বলে, না। এখন শুধু আমাকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে যাও। তারপর আবার যখন দরকার হবে ডাকবো।

শাহজাদা মা-এর কাছে এসে বললো, মা, ওটা কাদের প্রাসাদ? আমাদের চেয়েও তো বাহারী দেখছি।

—কী জানি বাবা, হয়তো কোনও পরদেশী সুলতান বাদশাহর হবে।

পুত্র বলে, মা তুমি একবার গিয়ে আলাপ-সালাপ করে এসো না ওদের শাহজাদীর সঙ্গে।

মা বললো, ও প্রাসাদে শাহজাদী আছে, কে বললো তোকে!

—আমি যে ওকে দোতলার বারান্দার জাফরীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, মা!

মা হাসলেন, ও , আচ্ছা এখন তুই যা আমি খোঁজ নিচ্ছি।

সেইদিনই বেগমসাহেবা সিত্তুর বাড়ি এলো। সিত্তুর অসামান্য রূপ লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। বললেন বেটি, এখনও তুমি শাদী করনি কেন?

কোন সুযোগ-সুবিধা হয়নি বেগমসাহেবা।

সিত্তু নিরুত্তাপ কণ্ঠে কথাগুলো বলে। বেগমসাহেবা অবাক হলো, সে কি! তোমার মতো এমন রূপবতী কন্যাকে মাথার মণি করে নিয়ে যাওয়ার বাদশাহজাদার অভাব আছে নাকি। তুমি যদি রাজি থাক মা, তবে আমার ছেলের সঙ্গে তোমার শাদী হতে পারে।

সিত্তু বলে, আপনার ছেলেকে আমি শাদী করতে পারি। তবে একটা শর্ত আছে।

—কী শর্ত, বেটি?

আপনার ছেলের মৃত্যু হয়েছে এটা চাউর করে দিতে হবে। এবং সেও সত্যিই মরার মতো পড়ে থাকবে। তারপর তাকে পর পর সাতখানা শব আচ্ছাদনে ঢেকে সারা শহরের পথ ধরে শোক-মিছিল করে ঘুরিয়ে এনে আমার এই বাগানে নামাতে হবে!

বেগমসাহেবা বললেন, বেশ ঠিক আছে। তোমার শর্তের কথা গিয়ে বলি আমার ছেলেকে।

প্রাসাদে ফিরে এসে বেগমসাহেবা পুত্রকে সব বললেন। শাহজাদা তখুনি মরার মতো ভান করে পড়ে রইলো। মা কেঁদে ভাসাতে লাগালেন!

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট এক শোক-মিছিল বের হলো শহরের পথে। শাহজাদার অকাল-মৃত্যুতে সারা শহরবাসী চোখের জল ফেললো। তারপর এক সময় শবাধার এনে নামানো হলো সিত্তুখানের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে।

সবাই বিদায় নিলে সিত্তুখান নিচে নেমে এসে এক এক করে শবাচ্ছাদনগুলো সরিয়ে দেখলো। সে এরই জন্যে এতদিন দিন গুনছিলো।

—আরে তুমি?

সিত্তুখান বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকায়। শাহজাদাও লাফিয়ে ওঠে আরে তুমি? আমি যে তোমার জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলাম মণি!

গল্প এখানেই শেষ।

সুলতান বাইবারস প্রীত হয়ে বললেন, চমৎকার তোমার কাহিনী জালান অল-দিন। এর আগে এমন কাহিনী শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

এরপর দশম কাপ্তেন এগিয়ে এলো তার কাহিনী শোনাতে।

এক সময়ে এক বাদশাহ ছিলো। তার একমাত্র পুত্র। নাম মহম্মদ। একদিন শাহজাদা বাদশাহকে বললো, বাবা আমি শাদী করবো।

বাদশাহ বললেন, অতি উত্তম কথা। তবে কিছুদিন সবুর কর, আগে তোমার মাকে জিজ্ঞেস করি, হারেমের কোনও সঙ্গীকে সে পছন্দ করে রেখেছে কিনা তোমার জন্য।

শাহজাদা বললো তার চেয়ে বাবা, আমি নিজেই পছন্দ করে ঠিক করে নিই?

বাদশাহ বললো, আমার তাতেও আপত্তি নাই।

এরপর শাহজাদাকে সুন্দর একটা তাজি ঘোড়ায় চাপিয়ে বিদায় দিলেন বাদশাহ।

একটানা দুইদিন চলার পর এক মাঠের ধারে এসে শাহজাদা দেখতে পেলো, এক চাষী পিঁয়াজকলি কাটছে আর তার পাশে এক যুবতী কন্যা সেগুলো গুছিয়ে আঁটি বাঁধছে।

শাহজাদা ওদের পাশে গিয়ে সালাম জানিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে মেয়েটিকে বলে, আমাকে একটু পানি খাওয়াও তো?

মেয়েটি জল এনে দেয়। শাহজাদা নিঃশেষ করে ফিরিয়ে দেয় পাত্রটি। তারপর চাষীর দিকে তাকিয়ে বলে, শেখসাহেব, আপনার কন্যাটি আমার হাতে দেবেন?

চাষী কৃতার্থ হয়ে বলে, আমি আপনার বান্দা। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে?

শাহজাদা বলে, তা হলে ওই কথাই রইলো। এখন আমি আমার শহরে ফিরে যাচ্ছি। শাদীর সব উৎসব আয়োজন করে আবার ফিরে আসবো?

শাহজাদা প্রাসাদে ফিরে এসে বাদশাহকে বলে, বাবা পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি। এক চাষীর মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ওকেই আমি শাদী করবো।

বাদশাহ বললেন, এক চাষীর কন্যাকে তোমার মনে ধরলো? ঠিক আছে, তোমার মাকে সেখানে পাঠাচ্ছি। সে সব জেনে আসুক, দেখে আসুক।

শাহজাদা বললেন, বেশ তাই পাঠান।

যথাসময়ে নফর-চাকর-দাসদাসী সমভিব্যাহারে বেগমসাহেবা চাষীর খামারে পৌঁছলেন!

চাষী-কন্যা আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখলো না। মেয়েটির রূপলাবণ্য এবং বিনীত ব্যবহারে প্রীত হয়ে বেগমসাহেবা প্রস্তাব রাখলেন, তোমাকে দেখে আমার বড় পছন্দ হয়েছে মা, আমার ইচ্ছা তুমি আমার পুত্রবধূ হও।

মেয়েটি বললো, কিন্তু তা তো হতে পারে না। আমি কোনও সুলতান বাদশাহব ছেলেকে স্বামী বলে বরণ করবো না।

বেগমসাহেবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেন মা, কী কারণ?

মেয়েটি সপ্রতিভভাবে জবাব দেয়, আমার স্বামী হাতে-কলমে কাজ-কাম করবে এই আমি চাই! কিন্তু আপনার পুত্র সোনার চামচ মুখে করে জন্মেছেন, তিনি কি কুটোগাছটা হাতে ধরতে পারবেন?

ক্রোধে আরক্ত হয়ে ফিরে এলেন বেগমসাহেবা। স্বামীকে বললেন, একেবারে বাজে। এতো বড় স্পর্ধা! মেয়েটা বলে কিনা বাদশাহর ছেলেকে সে শাদী করবে না।

—কারণ?

বাদশাহ প্রশ্ন করেন।

কারণ, মেয়েটি তাকেই স্বামীত্বে বরণ করবে, যে তারই মতো চাষবাসের কাজে মেতে থাকবে।

বাদশাহ বললেন, সে তো ঠিকই বলেছে।

কিন্তু শাহজাদা একথা শুনে শয্যা গ্রহণ করলো।

সুতরাং বাদশাহ সমস্ত চাষী এবং কারিগরদের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হতে ফরমান জারি করলেন। সুলতানের আদেশ অমান্য করে সাধ্য কার! যথা সময়ে দেশের তাবৎ কলাকুশলীরা হাজির হলো।

প্রথমে এক সূত্রধরকে প্রশ্ন করলেন বাদশাহ, তুমি আমার পুত্রকে কতদিনে তোমার কাজ শিখিয়ে দিতে পারবে?

সূত্রধর বলে, অন্তত দু'টি বছর সময় লাগবে, জাঁহাপনা।

সুলতান তাকে পাশে দাঁড়াতে বলে এক কর্মকারকে প্রশ্ন করলেন। তুমি কতদিনে পারবে তোমার জাতব্যবসার কাজ শেখাতে?

কর্মকার বললো, তা হুজুর বছরখানেক লাগবে।

তাকেও পাশে সরিয়ে দিলেন বাদশাহ। কিন্তু এক এক করে যাকেই প্রশ্ন করেন সেই বলে এক বছর কিংবা দু বছর। আবার কেউ তারও বেশি সময় প্রার্থনা করে।

বাদশাহ হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।

এমন সময় একটা বেঁটে বাঁটকুল দুবলা লোক ল্যাং প্যাং করে লাফাতে লাফাতে বাদশাহর সামনে এগিয়ে আসতে থাকে।

বাদশাহ ঈষৎ বিরক্ত হয়েই তাকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার তুমি অমন করে বাঁদর নাচ নাচছো কেন?

—জী হুজুর, আমিও এক কারিগর। জাঁহাপনার তলব পেয়ে এসেছিলাম এই সভায়। তা আমার সুরৎ আকার দেখে বুঝি শাহেনশাহর নজরেই ধরলো না। তাই ঐ রকম অঙ্গভঙ্গী করে বান্দা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো, গুপ্তাকী মাফ করবেন জাঁহাপনা।

—তা তুমি কি কর?

—জী আমি তাঁতী। কাপড় বুনে খাই।

—বেশ, এখন বলতো, তোমার তাঁতের কাজ আমার ছেলেকে কতদিনে শেখাতে পারবে?

—মাত্র এক ঘণ্টায় জাঁহাপনা!

বাদশাহ অবাক হয়ে তাকায় লোকটার দিকে? পাগল নাকি?

—এক ঘণ্টায় শেখাবে তোমার বিদ্যা, একি সম্ভব?

—আলবত সম্ভব, জাঁহাপনা।

—ঠিক আছে, শাহজাদাকে আমি তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। তাকে নিয়ে যাও তোমার বাড়িতে।

শাহজাদাকে সঙ্গে করে তাঁতী তার নিজের ঘরে ফিরে এলো। এবং তাঁতের পাশে

বসিয়ে সে তাকে বললো, আপনি শুধু আমার হাতের দিকে লক্ষ্য করুন, হুজুর। এই মাকুটা আমি এদিক থেকে চালিয়ে দেব আর ওদিক দিয়ে ধরে নেব।

শাহাজাদা এক মনে তাঁতীর তাঁত বোনা দেখতে থাকে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মোটামুটি সুন্দর একখানা রুমাল বুনে ফেলে সে।

এরপর তাঁতী বলে, এবার আপনি তাঁতে এসে বসুন হুজুর। যেমনটি দেখলেন ঠিক তেমনিভাবে মাকু চালিয়ে আপনিও একখানা রুমাল বুনুন দেখি।

শাহজাদা অতি সহজেই একখানা চমৎকার কাজকরা রুমাল বুনে ফেলতে পারে।

দু'খানা রুমাল হাতে করে শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসে তাঁতী। রুমাল দু'খানা বাদশাহর হাতে দিয়ে বলে, এই দু'খানার মধ্যে একখানা আপনার পুত্র বুনেছে। এখন আপনি বলুন দেখি, জাঁহাপনা, কোনখানা আপনার পুত্রের বোনা?

অপেক্ষাকৃত নিরেস রুমালখানা দেখিয়ে বাদশাহ বলেন, এইখানা মনে হচ্ছে!

—না হুজুর, ওখানা আমার হাতের।

বাদশাহ অবাক হয়ে বলেন। এতো চমৎকার আমার ছেলের হাতের কাজ?

তখুনি তিনি বেগমের কাছে গিয়ে বললেন, এই দ্যাখো, তোমার ছেলে পাকা তাঁতী হয়ে গেছে। যাও, গরীব চাষীর মেয়েকে বলে কয়ে রাজি করাও গে!

চাষী কন্যা শাহজাদার হাতের বোনা দেখে মুগ্ধ হয়ে বললো, এরপর আমার আর অমত নাই। আপনি শাদীর ব্যবস্থা করতে পারেন বেগমসাহেবা।

গল্প শেষ হলো।

সুলতান বাইবারস বললেন, চমৎকার হিতোপদেশের কাহিনী শোনালে হে কাপ্তেন!

এরপর একাদশ কাপ্তেন সালা অল-দিন কাহিনী শোনাবার জন্য এগিয়ে এলেন।

এক সুলতানের বেগম এক শুভ নক্ষত্রে একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলেন। ঠিক সেইদিনই সেই ক্ষণে সুলতানের আস্তাবলের এক গর্ভবতী ঘোড়া একটি বাচ্চা প্রসব করলো।

সুলতান বললেন, আল্লাহ আমার পুত্রের জন্যই বুঝি তাকে একই-সময়ে দুনিয়ায় পাঠালেন!

শাহজাদার তরুণ বয়সকালে বেগমসাহেবা দেহ রাখলেন একদিন। আর কি আশ্চর্য, সেইদিনই আস্তাবলের ঐ ঘোড়াটারও মৃত্যু হলো।

যাই হোক, দিন কাটছিলো! বাদশাহ হারেমের এক বাঁদীকে বেগম করলেন। নব-পরিণীতা বাঁদী-বেগমের মোহে সারা দিনরাত আচ্ছন্ন হয়ে কাটান সুলতান। তাঁর একমাত্র পুত্র অনাদরে অবহেলায় কোনও রকমে বাড়তে থাকে প্রাসাদে। একা একাই বিদ্যালয়ে যায়। একা একাই ফিরে আসে। এতবড় প্রাসাদপুরীতে একমাত্র ঐ ঘোড়া ছাড়া তার আর পেয়ারের বলতে কেউ ছিলো না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহারাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো বাহান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

শাহজাদার সৎমাটি ছিলো একটি অসৎ মেয়ে। প্রাসাদের হাকিমের সঙ্গে তার ছিলো অবৈধ প্রণয়।

একদিন তারা যুক্তি করলো পথের কাঁটা ঐ ছেলেটাকে দুনিয়া থেকে সরাতে হবে। হাকিম বললো, ঠিক আছে, আমি বিষ এনে দেব, তুমি ওর খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিও!

বিদ্যালয় থেকে ফিরেই শাহজাদা সোজা গিয়ে ঢোকে আস্তাবলে। তার একমাত্র বন্ধু ঘোড়াটাকে আদর সোহাগ করে দানাপানি খেতে দেয়। সেদিন সে বিদ্যালয় থেকে ফিরে আস্তাবলে গিয়ে দেখে ঘোড়াটা অঝোরে কাঁদছে। কাছে গিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করে সে, কি দোস্ত, কাঁদছো কেন? তোমার কি কোনও অসুখ করেছে?

ঘোড়াটা ঘাড় নেড়ে বলে, না সেজন্য নয়। আমি কাঁদছি তোমার জন্য?

—আমার জন্য? কেন?

ঘোড়া বলে, তোমার সৎমা যে তোমাকে আজ রাতে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবে। দোহাই তোমার, ও খাবার তুমি খেও না।

শাহজাদা সোহাগ জানিয়ে বলে, তুমি আমাকে এতো ভালোবাস? ঠিক আছে, ও খাবার আমি খাব না।

সন্ধ্যা হতে না হতে সৎমা নিজের হাতে খাবার সাজিয়ে শাহজাদাকে ডেকে বলে, খেয়ে নাও বাবা।

শাহজাদা খেতে বসে খাবারে একটা পোকা পড়েছে বলে রেগে মেগে থালাগুলো সব উল্টে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। টেবিলের নিচে যে পোষা বিড়ালটা প্রসাদের আশায় বসেছিলো, আস্ত ফলারটা পেয়ে সে গোগ্রাসে খেতে খেতে তখনি মেঝেয় ঢলে পড়লো।

এই দৃশ্য শাহজাদার নজর এড়ায় না। কিন্তু সে যেন কিছুই দেখেনি, এমনি ভাব দেখিয়ে নিজের ঘরে শুতে চলে গেলো।

বাঁদী-বেগম তার প্রণয়ীকে প্রশ্ন করলো, কী ব্যাপার ছেলেটা আগে থেকে সব টের পেলো কি করে?

হাকিম বললো, ঐ ঘোড়াটা সর্বজ্ঞ। দৈব ক্ষমতাবলে সব ও দিব্য চক্ষুতে দেখতে পায়। ওই সাবধান করে দিয়েছে শাহজাদাকে।

বাঁদীটার হিংস্র চোখ জ্বলে উঠলো, তা হলে আগে ঐ ঘোড়াটাকেই খতম করতে হবে।

হাকিম বললো, হ্যাঁ, তাছাড়া আর উপায় নাই। তুমি অসুখের ভান করে পড়ে থাক। সুলতান আমাকে ডাকবেন। তখন আমি তাঁকে বলবো, এ অসুখ একটিমাত্র দাওয়াই-এ সারতে পারে। তা আপনার সবচেয়ে প্রিয় অশ্বের বুকের কলিজা দিয়েই কেবল তৈরি করা সম্ভব।

হাকিমের পরামর্শমতো বাঁদী-বেগম শয্যা নিলো। সুলতান চিন্তিত হয়ে হাকিমকে ডাকলো।

সব শুনে সুলতান বললেন, ব্যাপারটা একটু মুশকিলের। ঘোড়াটা ছেলের বড় আদরের। যাই হোক, সে পাঠ শেষ করে ফিরে আসুক, তাকে বুঝিয়ে রাজি করাচ্ছি।

বিদ্যালয় থেকে ফিরে এলো শাহজাদা। সুলতান তাকে কাছে ডেকে বললেন, তোমার মা অসুস্থ। একমাত্র তোমার ঘোড়ার কলিজার বিনিময়ে তার রোগ নিরাময় হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তির কথা ভেবে আমি তোমাকে ঘোড়াটার মায়া ত্যাগ করতে বলছি, বাবা।

শাহজাদা ক্ষণকাল মৌন থেকে বললো, ঠিক আছে বাবা, আমি সম্মত আছি। তবে আমার জন্মের পর থেকে ওর পিঠে আমি চড়িনি কোনও দিন। ও তো চিরদিনের মতো চলেই যাবে আমার কাছ থেকে, তাই শেষ বিদায় দেবার আগে আজ আমি ওকে নিয়ে একটু বাইরে ঘুরে আসি।

সুলতান বললেন, বেশ যাও, শেষ বারের মতো তোমার মনের সাধ মিটিয়ে এসো।

আস্তাবলে গিয়ে উত্তম সাজে সজ্জিত করলো সে ঘোড়াটিকে। তারপর বাইরে এসে পিঠে চেপে বসলো। পক্ষীরাজ তীরবেগে ছুটে গেলো, পোলো মাঠের ওপ্রান্তে। আবার চোখের পলকে ফিরে এলো প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে। আবার সে বাঁক নিয়ে বায়ুবেগে ছুটতে থাকলো শহরের সদর রাস্তা ধরে।

ছুটতে ছুটতে এক সময় সে শহরের শেষ প্রান্ত ছাড়িয়ে ফাঁকা মরু-প্রান্তরে গিয়ে পড়লো।

এরপর আর পিছন দিকে ফিরে তাকালো না শাহজাদা। ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে বিশাল প্রান্তরও অতিক্রম করে অন্য এক গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করলো।

একটানা তিনদিন ছুটার পর এক নতুন সলতানিয়তের শহরে এসে উপনীত হলো ওরা।

সুলতানের প্রাসাদ-সংলগ্ন একটি মনোহর উদ্যান। সেই উদ্যানের ওপারে একটা জলের কূয়া। একটা লোক জোড়াবলদের ঘানি ঘুরিয়ে কপিকলের সাহায্যে জল তুলছিলো।

শাহজাদা ঘোড়া থেকে নেমে লোকটির কাছে গিয়ে বললো, আমি পরদেশী। সঙ্গে কোনও রেস্ত নাই। আমাকে যদি একটা কাজ-কামের ব্যবস্থা করে দাও তবে খুব ভালো হয়।

লোকটি বললো, আমার এই ঘানির বলদ দু'টোকে চালাতে হবে, পারবে?

শাহজাদা বলে, খুব পারবো।

এরপর সে ঘোড়াটার কাছে গিয়ে বলে, এবার বিদায় বন্ধু, তুমি চলে যাও। এখানেই আমার একটা হিল্লে হয়ে গেলো।

ঘোড়াটা বললো আমার ঘাড়ের একগাছি লোম ছিঁড়ে রাখ বন্ধু। যখনই প্রয়োজন হবে একটা লোমে আগুন ধরালে সঙ্গে সঙ্গে আমি হাজির হবো তোমার সামনে।

কূয়ার ওপাশে ফুলবাগিচা। সেই বাগিচায় প্রতিদিন বিকালে সুলতানের সাতটি কন্যা বেড়াতে আসে। হঠাৎ সেদিন ওরা এক প্রিয়দর্শন তরুণকে ঘানির রাখালের কাজ করতে দেখে অবাক হয়ে যায়। এক বোন বলে, দ্যাখ দ্যাখ, ছেলেটি কি সুন্দর। মনে হয় বড় ঘরের আদরের দুলাল।

ছোট বোন বলে, রাখালই হোক আর যেই হোক ওকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে শাদীই করবো না।

সুলতান মেয়েদের ডেকে বললেন, আমি ঠিক করেছি পছন্দমতো পাত্রের সঙ্গে তোমাদের শাদী দিয়ে দেব।

সুলতান ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর সাতটি কন্যার শাদী দেবেন তিনি। দেশে অবিবাহিত যুবকরা ইচ্ছা করলে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সমবেত হতে পারে। কন্যারা যে যাকে পছন্দ করবে তার সঙ্গেই সেই কন্যার শাদী দেওয়া হবে।

যথাসময়ে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার তরুণ যুবক এসে সমবেত হলো। কন্যারা রুমাল হাতে বসলো অলিন্দে। তারপর নিজের নিজের পছন্দসই পাত্রের দিকে ছুঁড়ে দিলো সেগুলো।

সুলতান দেখলেন, ছ'খানি রুমাল ছ'জন ভাগ্যবান যুবকের মাথায় গিয়ে পড়েছে।

যথাসময়ে ঐ ছয়টি পাত্রের সঙ্গে ছয়টি কন্যার শাদী হয়ে গেলো। কিন্তু ছোট কন্যা তার রুমাল নিক্ষেপ করেনি। সে কারণে তার শাদী আর হতে পারলো না।

সুলতান ছোট কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বড় বোনরা সবাই যে যার মতো স্বামী পছন্দ করে নিলো, কিন্তু তুমি করলে না কেন?

ছোট কন্যা বললো, আমি যাকে শাদী করতে চাই, সে আপনার আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়নি, বাবা।

—কে সে?

—আমাদের বাগানের পাশে যে কূয়াটা আছে তার ঘানির রাখালকে আমি স্বামী হিসেবে পেতে চাই বাবা।

—বেশ তো, তাই হবে, আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সেইদিনই রাখালবেশী শাহজাদার সঙ্গে ছোটকন্যার শাদী হয়ে গেলো মহা ধুমধামে।

এরপর বাদশাহী জামাই-আদরে বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। একদিন শাহজাদা খবর পেলো যে তার বাবা ইন্তেকাল করেছেন। এবং শূন্য সিংহাসনে চেপে বসেছে সেই হাকিম। ঘোড়ার একটি লোমে আগুন ধরিয়ে দিলো শাহজাদা। আর তক্ষুণি এসে হাজির হলো এই ঘোড়াটি। শাহজাদা বললো, বন্ধু, বাবা দেহ রেখেছেন। এখন আমার সিংহাসন অধিকার করে বসেছে ঐ হাকিম। চলো, আর দেরি নয়, এখুনি আমাকে দেশে ফিরতে হবে।

শ্বশুরের এক বিশাল সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে সে সেইদিন নিজের শহরে রওনা হয়ে গেলো।

এরপর ঐ শয়তান হাকিমের কি দশা হয়েছিলো নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন জাঁহাপনা।

গল্প শেষ হলো।

সুলতান বাইবারস বললেন, চমৎকার!

এরপর দ্বাদশ কাপ্তেন এগিয়ে এসে তার গল্প শুরু করলো ঃ

এক সুলতানের এক বন্ধ্যা বেগম ছিলো। দেশ-বিদেশের কত হাকিম বদ্যি এসে দাওয়াই বড়ি দিয়ে গেছে কিন্তু বেগম সন্তান-সম্ভবা হতে পারেননি।

একদিন এক মূর এলো। নিজের পরিচয় দিয়ে সে বললো, আমি আপনার বেগমের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।

সুলতান জিজ্ঞেস করেন, কী শর্ত?

—আপনার বেগমের গর্ভে প্রথম যে সন্তান উৎপাদন হবে তা আমাকে দিয়ে দিতে হবে।

সুলতান তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই দেব!

মূর তখন দু'টি মণ্ডা বের করে সুলতানের হাতে তুলে দিলেন। তার একটি সবুজ আর একটি লাল রঙের।

—এই সবুজটা আপনি নিজে খাবেন, জাঁহাপনা। আর এই লাল মণ্ডাটি খেতে দেবেন বেগমসাহেবকে। এরপর যা করার তিনিই করবেন।

এই বলে মূর বিদায় নিলো।

যথাসময়ে বেগম একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করলেন। সুলতান তার নাম রাখলেন মহম্মদ।

অপরিসীম আদর-যত্নের মধ্যে লালিত হতে লাগলো মহম্মদ। তার লেখা-পড়ার জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হলেন সুলতান।

এরপর বেগমসাহেবা দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম দিলেন। তার নাম রাখা হলো আলী। আলী কিন্তু মহম্মদের মতো প্রিয়দর্শন বা মেধাবী হলো না। এরপর আরও একটি পুত্রসন্তানের মা হলেন বেগমসাহেবা। তার নাম মাহমুদ। এই ছেলেটি একেবারে গবেট হাঁদা।

দশ বছর পরে।

একদিন ঐ মূর এসে সুলতানকে বললেন, আপনার ওয়াদা পূরণ করুন, জাঁহাপনা। আমার প্রাপ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে আমার হাতে দিয়ে দিন।

সুলতান বেগমের কাছে গিয়ে মূরের দাবীর কথা জানাতে বেগম প্রবল আপত্তি করে বললো, না না, সে হতে পারে না। আপনি বরং আলীকে দিয়ে দিন ওর হাতে।

আলীকে সঙ্গে নিয়ে মূরটি বিদায় হলো। হাঁটতে হাঁটতে দুপুর গড়িয়ে গেলো। প্রচণ্ড সূর্যতাপে দুনিয়া তখন ঝলসে যাচ্ছে। এক জায়গায় থেমে মূর আলীকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার খিদে-তেষ্টা পায়নি।

আলী বললো, পাক্কা আদ্ধেক দিন ধরে একটানা হাঁটছি, এখনও আপনি জিজ্ঞেস করছেন, খিদে পেয়েছে কিনা? আশ্চর্য!

মূর গম্ভীর হয়ে শুধু একটা আওয়াজ করলো, হুম!

তারপর সে আলীকে নিয়ে আবার ফিরে এলো সুলতানের প্রাসাদে।

—এ ছেলে তো আমার নয়, জাঁহাপনা? তিনজনকেই একসঙ্গে এনে দাঁড় করান এখানে, আমি নিজে চিনে নেব কোনটা আমার।

সুতরাং নিরুপায় সুলতান তিন পুত্রকেই এনে পাশাপাশি দাঁড় করালেন। মহম্মদকে দেখিয়ে মূর বললেন, এটা হচ্ছে আমার।

মহম্মদকে সঙ্গে নিয়ে আবার সে হাঁটাপথে রওনা হলো। প্রায় আধখানা দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। সূর্যের খরতাপে দগ্ধ হচ্ছে দুনিয়া। একসময় মূর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মহম্মদকে জিজ্ঞেস করলো, খাবে কিছু? খিদে-তেষ্টা পায়নি তোমার?

মহম্মদ বিনয়াবনত হয়ে বললো, আপনি যদি তৃষ্ণার্ত হন তবে আমিও তৃষ্ণার্ত। আপনি যদি ক্ষুধার্ত বোধ করেন, তবে আমি ক্ষুধার্ত সন্দেহ নাই।

যাদুকর বুকে জড়িয়ে ধরলেন মহম্মদকে। আদর সোহাগ করে বললেন এই তো বুদ্ধিমান বিনয়ী ছেলের কথা। তুমি জ্ঞানে গরিমায় শ্রেষ্ঠ হবে। তুমিই আমার সন্তান।

মহম্মদকে হাতে ধরে সে মরোক্কো শহরে এসে উপস্থিত হলো। একটি উদ্যানের সুশীতল ছায়ায় বসে দু'জনে খানাপিনা করলো। তারপর মহম্মদের হাতে একখানা কিতাব তুলে দিয়ে মূর বললো, খুলে পড় দেখি!

মহম্মদ বইটার পাতা ওলটাতে থাকলো। কিন্তু একটা বর্ণও বুঝতে পারলো না কিছু। একেবারে দুর্বোধ্য ভাষা।

ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলো মূর, তোমাকে আমি নিজের পুত্র বলে গ্রহণ করেছি। অথচ এই বই তুমি পাঠ করতে পারছো না? দেখ চেষ্টা কর, এর পাঠোদ্ধার তোমাকে করতেই হবে। তা না হলে গগ এর ম্যাগগের নামে শপথ করে বলছি, একমাস পরে তোমার ডান হাতখানা আমি কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেব। এই আমি চললাম। ঠিক একমাস পরে আবার আমি ফিরে আসবো তোমার কাছে। এই সময়ের মধ্যে যেভাবে পার এর পাঠোদ্ধার করবে।

এই বলে মহম্মদকে ঐ বাগানে ফেলে রেখে সে হন হন করে বেরিয়ে গেলো।

এরপর ঊনত্রিশটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। মহম্মদ ঐ বইখানা নিয়ে সারাদিন রাত নাড়াচাড়া করে। কিন্তু বইটার যে কোন্ দিক সোজা আর কোন্ দিক উল্টো—তাই সে আন্দাজ করতে পারে না। বইটাকে ফেলে রেখে সে উঠে দাঁড়ালো, না, মরতে যখন হবেই তখন ঐ দুর্বোধ্য পুঁথির পাতায় মুখ থুবড়ে পড়ে থেকে কী লাভ? তার চেয়ে সে খোলামেলা মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবে বাকী দিনটা। দেখবে প্রকৃতির শোভা, গাইবে গান প্রাণভরে।

পায়ে পায়ে সে বাগানের অপর প্রান্তে চলে যায়। কতরকম ফুলে ফলে ভরা বাগানটি। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় মহম্মদের।

হঠাৎ একটা গাছের ডালের দিকে নজর পড়তে আঁৎকে ওঠে সে। একটি পরমাসুন্দরী কিশোরী। তার মাথার দু'টি বেণী দিয়ে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে গেছে কেউ! মহম্মদ কাছে গিয়ে মেয়েটিকে মুক্ত করে নিচে নামালো। কৃতজ্ঞতায় অশ্রু ভরে এলো মেয়েটির চোখে। দু'হাত বাড়িয়ে মহম্মদকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, কে তুমি? এখানে এলে কী করে?

মহম্মদ বললো, তার কাহিনী।

ঊনত্রিশটা দিন চলে গেছে। সে বইএর একবর্ণও আমি উদ্ধার করতে পারিনি। আগামীকাল মূরের আসার তারিখ। আমি জানি, কালই আমার এই ডান হাতখানা কেটে ফেলবে সে।

মেয়েটি বললো, অমন বিচলিত হয়ো না। আমি জানি ঐ পুঁথি পাঠ করতে। বলবে কী করে কার কাছে শিখেছি? কারো কাছে শিখিনি, আমার অন্তর থেকেই আমি শিক্ষা পেয়েছিলাম। ঐ মূর আমাকেও বলেছিলো, পুঁথিখানা পাঠ করতে। আমি গড় গড় করে পড়ে দিতেই সে রাগে ফেটে পড়লো। তারপর চুলের বেণী ধরে নিয়ে এলো এই গাছতলায়। তারপর একটা ডালে ঝুলিয়ে রেখে চলে গেলো। সেই থেকে আমি এখানে এইভাবে ঝুলছিলাম। যাক, সে সব কথা, এখন চলো তোমাকে আমি পুঁথিটার পড়া শিখিয়ে দিই।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মহম্মদ গড়গড় করে পড়ে যেতে পারলো গোটা বইটা। মেয়েটি বললো কাল যখন মূর এসে তোমাকে পড়তে বলবে, তুমি কিন্তু ভুলেও পড়ে দিও না। তাহলে সে তোমাকেও গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখবে।

মহম্মদ বললো, কিন্তু তা না হলে ও যে আমার ডান হাতখানা কেটে ফেলবে?

—সেজন্য তুমি ভেব না। আমি সব ঠিক করে দেব। এবার আর দেরি করো না। আমি যেমনটি গাছের ডালে ঝুলছিলাম তেমনি করে আমাকে আবার ঝুলিয়ে রেখে এসো ঐ ডালে।

পরদিন যাদুকর মূর এসে উপস্থিত হলো।

—এবার নিশ্চয়ই পুঁথিখানা পড়ে শোনাবে আমাকে?

মহম্মদ আমতা আমতা করে বলে, তা কি করে সম্ভব, বলুন! আমি তো ঐ ভাষার একটি বর্ণও চিনি না।

মূর রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বললো, ওসব কোনও ওজর আমি শুনতে চাই না।

এই বলে সে তলোয়ারটা খুলে এক কোপে নামিয়ে দিলো মহম্মদের ডান হাতখানা।

—এই আমি চললাম, কিন্তু আবার আসবো একমাস পরে। তখনও যদি দেখি তুমি পড়তে পারছ না তা হলে তোমার গর্দান নেব আমি।

মূর আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না সেখানে। মুহূর্তে উধাও হয়ে গেলো কোথায়।

কাটা হাত নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মহম্মদ এসে দাঁড়ালো মেয়েটির সামনে।

—তোমার কথামতো কাজ করে এই আমার লাভ হলো।

মেয়েটি মৃদু হেসে বললো, আমাকে আগে নামাও, তারপর আমি তোমার হাত জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি।

ছেলেটি ওকে নিচে নামালে সে একটা গাছের তিনটি পাতা ছিঁড়ে এনে রস করে কাটা হাতে লাগিয়ে দিতে হাতখানা জোড়া লেগে গেলো।

মহম্মদ অবাক হয়ে বললো, এমন অলৌকিক দাওয়াই তুমি পেলে কার কাছে? ঐ মূর শিখিয়েছে?

মেয়েটি ঠোঁট ওলটায়, মূর? ঐ মূর শেখাবে আমাকে? ও কি জানে যে শেখাবে?

এই বিদ্যেটা আয়ত্ত করার জন্য আজ চল্লিশটা বছর হন্যে হয়ে ঘুরছে সারা দুনিয়া। কিন্তু চল্লিশ বছর ঘুরলেও, আমি জানি, এ বিদ্যা সে শিখতে পারবে না কারো কাছে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসেই রইলো।

নয়শো তিপ্পান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

এরপর মেয়েটি পুঁথিখানার কয়েকটা ছত্র আবৃত্তি করে পাঠ করলো। এবং অন্য একটা লতার পাতা হাতে নিয়ে তুলতেই বায়ুবেগে ধেয়ে এসে দাঁড়ালো দু'টি উট। মাথা মাটিতে নুইয়ে ওরা সালাম জানালো মেয়েটিকে।

সে বললো, এই উট দু'টো কোনও সাধারণ উট নয়। এরা তীববেগে ছুটে চলতে পারে। এসো আমরা দু'জনে দু'টোর পিঠে চেপে বসে নিজের দেশে পালিয়ে যাই। পরে যথাসময়ে তুমি আমার বাবার কাছে এসে আমার পাণিপ্রার্থনা করো। আমার বাবার সলতানিয়ত তোমার অজানা নয়। পথঘাট সব বলে দিচ্ছি।

মহম্মদ প্রাসাদের এক খোজা নফরকে বললো, এই উটটা আজই হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আয়। কিন্তু খবরদার, এর লাগামটা যেন বেচে দিসনি।

হাটে গিয়ে এক চরসখোর দালালের পাল্লায় পড়ে দারুণ জমে গেলো খোজাটা। কারণ সেও চরসের এক ভক্ত। ঝোঁকের মাথায় গল্প জমাতে জমাতে দালালটা খোজাকেও একটু প্রসাদ দিয়েছিলো। আর তাতেই সে বেলালুম সব গুলে খেয়ে শাহজাদার কথা অমান্য করে লাগাম সুদ্ধ উটটা প্রায় জলের দরে বেচে দিয়ে গেলো তার কাছে।

দালালটা উটকে তার দোকানের সামনে বেঁধে একটা কাঠের গামলায় খানিকটা পানি এনে ধরলো তার সামনে। লাগামটা খুলে দিলো। উটটা পানিতে মুখ না দিয়ে এক এক করে চারখানা পা ডুবিয়ে দিলো গামলার মধ্যে। আর কী আশ্চর্য্য, ঐ অত বড় পাহাড় সমান উটটা নিমেষে এতটুকু ইঁদুর ছানার মতো হয়ে গিয়ে জলের মধ্যে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

চরসখোর দালালটা 'গেল গেলো ধর ধর' আওয়াজ তুলে পাড়া-পড়শীদের হত-চকিত করে দিলো। মুহূর্তে ছুটে এলো সবাই চারদিক থেকে।

—কী, কী হলো শেখ?

—আমার উটটা ঐ পানির গামলার মধ্যে ডুবে গেছে। ওকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রতিবেশিরা মুচকি হেসে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। একেই না বলে চরসখোর! এ তো গরুকেও গাছে তুলে দিতে যাচ্ছে।

এদিকে যখন এই ঘটনা ঘটছে তখন ওদিকে সেই যাদুকর মূর, পাখিরা পালিয়েছে দেখে ক্রোধে জ্বলতে থাকে। হুম্ আমাকে ধাপ্পা দিয়ে কোথায় পালাবে বাছারা? পৃথিবী বা যে-কোন গ্রহনক্ষত্রেই তোমরা থাক, খুঁজে আমি বের করবোই।

আর তিল মাত্র সময় বিলম্ব না করে সে তখুনি মহম্মদের শহরে রওনা হয়। এবং চোখের পলকে এসে পৌঁছয় সেই উটের দালালের দোকানের সামনে! দালালটা তখন উট হারানোর শোকে কপাল চাপড়িয়ে হা-হুতাশ করছিলো। যাদুকর ওকে আশ্বাস দিয়ে বললো, তোমার উট আমি খুঁজে এনে দেবো, শেখ। কিচ্ছু চিন্তা করো না। এখন একটা কাজ কর, উটের এই লাগামটা আমাকে দিয়ে দাও। তার বদলে আমি তোমাকে উটের কেনা দামের চেয়ে আরও একশো দিনার বেশি দিচ্ছি।

দালালটা এক কথায় সম্মত হয়ে লাগামটা দিয়ে দিলো মূরকে। খুশির আনন্দে নেচে

উঠলো যাদুকর। ঐ লাগামটা মন্ত্রপুত। ওটার সাহায্যে আবার উটটা ফিরে পাওয়া সম্ভব ছিলো। এ ছাড়াও ঐ লাগামটা ইচ্ছামতো যেকোনও মানুষকে যেকোনও স্থান থেকে পাকড়াও করে এনে হাজির করতে পারে।

লাগামটা ধরে তাকে আদেশ করা মাত্র প্রাসাদ থেকে মহম্মদকে টেনে বের করে আনলো সে। যাদুকরের সামনে এসে মহম্মদ মন্ত্র-চালিতের মত হাঁটু গেড়ে বসে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালো। যাদুকর তাকে পলকের মধ্যে একটি উটে রূপান্তরিত করে লাগামটা তার মুখে পরিয়ে দিয়ে পিঠের ওপর চেপে বসলো।

এবার যাদুকর যাবে ঐ শাহজাদীর শহরে।

উট হয়ে মহম্মদ যাদুকরকে পিঠে করে সারাটা পথ বয়ে নিয়ে এলো। এবং সারাক্ষণ ধরে সে দাঁত দিয়ে লাগামের দড়িটা কুট কুট করে কাটতে কাটতে আসছিলো। শাহজাদীর প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানের মধ্যে এসে থামলো যাদুকর। নিচে নামার জন্য উটকে হাঁটু গেড়ে নিচু হওয়ার জন্য নির্দেশ করলো সে। উট মহম্মদ তখন লাগামের দড়িটা প্রায় কেটে শেষ করে এনেছে। হঠাৎ মাথায় ঝাঁকানি দিতে লাগামের দড়িটা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে লাগামের দৈবগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মহম্মদ শাপমুক্ত হয়ে একটা ডালিম গাছের অত্যুচ্চ শাখায় একটা বিরাট ডালিম হয়ে ঝুলতে থাকলো। অনেক চেষ্টা করেও আর তাকে নাগালের মধ্যে পেলো না যাদুকর।

শাহজাদীর বাবা সুলতানের দরবারে উপস্থিত হয়ে মূর তার পরিচয় দিয়ে প্রার্থনা জানালো, আপনার উদ্যানের একটি ডালিম যদি আমাকে দান করেন প্রভু, তবে আমার অন্তসত্ত্বা বিবির মনোবাসনা পূরণ করতে পারি। আপনি তো জানেন জাঁহাপনা, গর্ভবতী নারীর কামনা-বাসনা অপূর্ণ রাখলে স্বামীকে দোজকে যেতে হয়।

সুলতান বললেন, কিন্তু দরবেশ জী, এখন তো ডালিমের সময় নয়, কী করে আপনাকে সে ফল দেব? আপনি বরং অন্য কোনও ফল যাঞ্চা করুন। আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করতে চাই।

যাদুকর বললো, কিন্তু অন্য ফলে আমার কাজ হবে না ; প্রভু আপনার বাগানে যে একটি মাত্র ডালিম হয়েছে সেইটিই আমার আবশ্যক।

সুলতান বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার উদ্যানে একটি ডালিম ধরেছে এখন? আপনি কি অন্য ফলকে ডালিম ভ্রম করেননি ফকিরসাহেব?

যাদুকর বলে, না শাহেনশাহ।

তখুনি বাগানের প্রধান মালিকে সুলতান হুকুম করলেন, যাও, বাগানের ডালিম গাছগুলোর মধ্যে একটায় নাকি একটা ডালিম ধরেছে। ওটা পেড়ে নিয়ে এসে এই দরবেশজীকে দিয়ে দাও।

মালি বললো, একি অসম্ভব সংবাদ শোনাচ্ছেন জাঁহাপনা! সূর্য পশ্চিমে উদয় হতে পারে কিন্তু অকালে কখনও ডালিম গাছে ফল ধরে না।

—তবু আমার আদেশ, একবার বাগানের গাছগুলো পরীক্ষা করে এসো।

মালি অবিশ্বাস নিয়ে দরবার ছেড়ে চলে গেলো। এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললো, না হুজুর, আপনি যে সংবাদ পেয়েছিলেন তা যথার্থ নয়।

এবার যাদুকর বেশ কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলে, এই মালি সত্য ভাষণ করছে না জাঁহাপনা। আমি এখনও বলছি আপনার উদ্যানে একটি মাত্র ডালিম ধরে আছে। ও ভালো করে না দেখেই আপনাকে ধোকা দিচ্ছে। আমার সঙ্গে সে চলুক, আমি দেখিয়ে দেব ডালিমটা। আর যদি দেখাতে না পারি শাহেনশাহ যেন আমার গর্দান নেন।

সুলতান বললেন, আপনার কথাই মেনে নিলাম ফকিরসাহেব। আপনি মালির সঙ্গে বাগানে যান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মালি বিরাট আকারের একটা ডালিম এনে সুলতানের হাতে দিলো। অত বড় ডালিম সুলতান জীবনে দেখেননি কখনও। খুশিতে তিনি ডগমগ হয়ে উঠলেন। উজিরকে বললেন, এমন একটা আশ্চর্য ফল আমি অন্যকে দান করতে চাই না উজির।

উজির বললো, কিন্তু আগেই তো আপনি শর্ত করেছেন জাঁহাপনা! যদি এই ফলটি সত্যিই বাগানে না পাওয়া যেত, তবে তো আপনি এই ফকিরের গর্দান নিতেন।

—অবশ্যই। কারণ শর্ত তাই ছিলো।

উজির বলে, তা হলে শর্তের অন্য দিকটাও আপনাকে রক্ষা করতে হবে, না হলে অবিচার হবে হুজুর।

সুলতান ঘাড় নেড়ে বললেন, তুমি যথার্থ বলেছ উজির। তাহলে ঘোরতর অধর্ম হবে।

এই বলে সুলতান ডালিমটা যাদুকরের হাতে অর্পণ করতে গেলেন। কিন্তু কি কারণে বোঝা গেলো না, ডালিমটা হাত ফসকে শ্বেত পাথরের মেঝেয় পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে সব দানাগুলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর দু' হাত দিয়ে দানাগুলো খুঁটে খুঁটে কোচড়ে ভরতে লাগলো।

এইভাবে একটি বাদে সব কটি দানাই সে সংগ্রহ করে নিতে পারলো। কিন্তু যেটি নাগালের বাইরে একটি গর্তের মধ্যে ঢেকে গেছে সেটাকে আর কিছুতেই কব্জা করতে পারলো না। অথচ যাদুকর নিশ্চিত জানে, ঐ দানাটির মধ্যে মহম্মদ অবস্থান করছে।

গর্তটার মধ্যে মুখ নামিয়ে সে হাত বাড়িয়ে দিলো দানাটিকে তুলে আনবার জন্য। হঠাৎ প্রচণ্ড এক আর্তনাদ করে উল্টে পড়ে গেলো যাদুকর! সুলতান এবং দরবারের সবাই লক্ষ্য করলেন, একখানা তরবারীর আমূল বিদ্ধ হয়ে গেছে যাদুকরের বক্ষদেশ। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে মুহূর্ত মধ্যে যাদুকর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। আর তখুনি ঐ গর্ত থেকে নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এলো প্রিয়দর্শন শাহজাদা মহম্মদ।

সুলতানের পাশেই দাঁড়িয়েছিলো শাহজাদী, সে বাবাকে বললো, এই সেই শাহজাদা মহম্মদ। এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম আমি।

এরপর সুলতান মহম্মদকে আদর করে পাশে বসালেন। সেইদিনই কাজী সাক্ষী ডেকে নিজের কন্যার সঙ্গে শাদী দিয়ে দিলেন মহম্মদের।

দ্বাদশ কাপ্তেন নাসর অল দিনের কাহিনী শেষ হলে সুলতান বাইবারস প্রীত হয়ে প্রত্যেক কাপ্তেনকে একশত দিনারের অতিরিক্ত মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শাহরাজাদ মুচকি হেসে কাহিনী শেষ করে থামলো।

সুলতান শাহরিয়ার প্রীত হয়ে বললেন, শাহরাজাদ আজ সত্যিই মনে হচ্ছে রাতগুলো কত ছোট ছোট। অথচ একদিন ছিলো যখন বিনিদ্র রাত্রির প্রহর গুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। তখন মনে হতো ওরা যেন অশেষ অনন্ত, কিছুতেই ফুরোতে চাইতো না। আজ এই অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছে—সে শুধু তোমার এই সব মধুর গল্পের জন্য।

শাহরাজাদ বলে, তাই যদি মনে করেন জাঁহাপনা, তবে আরও অনেক কাহিনী আপনাকে শোনাতে পারি।

—সে তো শুনবোই, শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ আবার এক নতুন কাহিনী শুরু করে ঃ

সারকাস্তেন দেশের এক শহরে এক প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রজা শাসন করতেন। তাঁর নাম জাইন অল মুলুক। তাঁর তিনটি পুত্র-সন্তান জন্মেছিলো। তারাও সবাই বাপ-কা-বেটা। লক্ষজনের মাঝে থাকলেও যে কেউ তাদের একনজরে চিনে নিতে পারতো। অমন সুন্দর রূপ-যৌবন আল্লাহর আশীর্বাদ।

বাদশাহ জাইন অল মুলুক কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রকে ঈষৎ নেকনজরে দেখতেন। একদিন তিনি গণকদের ডেকে পুত্রের ঠিকুজী তৈরি করতে বললেন।

গণকরা অনেক গুণে পড়ে বললো, আপনার এই পুত্রটি পরম শুভক্ষণে জন্মেছে। তার সুখ ও সম্ভোগের তুলনা নাই। কিন্তু একটা ব্যাপারে জাঁহাপনা আপনি নিজে সতর্ক থাকবেন। এই পুত্রের দিকে আপনার বিশেষ পক্ষপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু তা থেকে আপনি বিরত হওয়ার চেষ্টা করবেন। না হলে আখেরে আপনার চক্ষুরত্ন নষ্ট হবে।

গণকদের কথায় বাদশাহ বেশ রুষ্ট এবং চিন্তিত হয়ে উজিরকে হুকুম দিলেন, এই ছেলেকে আমার চোখের সামনে থেকে চিরদিনের মতো দূরে রাখবে। এক কাজ কর, একে আর এর মাকে দূরে কোথাও নির্বাসনে দিয়ে এসো। এ পাপ আমি আর প্রাসাদেই রাখতে চাই না।

সুলতানের হুকুম তামিল করা হলো।

এক নির্জন বনে তাদের জন্য একটি প্রাসাদ বানিয়ে সেখানে মা এবং ছেলেকে রেখে এলো উজির।

এরপর বহুকাল কেটে গেছে। কনিষ্ঠ পুত্র নূরজিহান ঘোড়ায় চেপে সারা বন-প্রান্তর ছুটে বেড়ায়।

একদিন ঐ বনে বাদশাহ জাইন অল মুলুক শিকারে গেলেন। এবং এক সময় আত্মজের মুখোমুখি হয়ে পড়লেন। কিন্তু কি নিষ্ঠুর নিয়তি, পুত্রের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হলেন। শিকার মাথায় উঠলো, তখুনি তিনি ফিরে এসে নিজের প্রাসাদে বন্দী হয়ে রইলেন। বাদশাহর আর বুঝতে বাকী রইলো না, ঐ ঘোড়সওয়ার যুবকই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র! কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি, ইয়া আল্লা! একি হলো আমার, সব সন্তানের পিতাই পুত্রদের দেখে পুলকিত হয়, কিন্তু আমার ভাগ্যে এই আঁধিয়া জুটলো?

দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা হাকিম বদ্যি এলো। তারা পরীক্ষা করলো বাদশাহর চোখ। এবং সবাই এক মত হয়ে রায় দিলো, কোন সাধারণ দাওয়াই-এ এ ব্যাধি সারবার নয়। তাঁর অন্ধত্ব সারাবার একটি মাত্র উপায় আছে, কিন্তু সে বড় দুঃসাধ্য কর্ম, অবশ্য সে পরামর্শ আমরা জাঁহাপনাকে দিতে পারি না।

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, কি এমন দুঃসাধ্য কর্ম?

—চিনের এক সমুদ্রকন্যা!

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো! শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো পঞ্চান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

হাকিমরা বললো, চীনের এক অভ্যন্তর-প্রদেশে সে মেয়ে বাস করে। তার পিতা প্রবল পরাক্রান্ত শাহেনশাহ ফিরোজশাহ। শাহ-কন্যার ফুল-বাগিচায় একটি সমুদ্র-গোলাপ গাছ আছে। সেই গাছের ফুল যদি সংগ্রহ করে আনা যায় তবে তা দিয়েই শুধু সুলতানের চোখের ব্যাধি সারানো সম্ভব হবে। ঐ গোলাপ দৈবগুণ-সম্পন্ন। যে-কোনও জন্মান্ধ তার দৃষ্টি ফিরে পাবে তার গুণে।

তৎক্ষণাৎ বাদশাহ জইন অল মুলুক ঘোষণা করে দিলেন, চীনদেশ থেকে যে ঐ সমুদ্র-গোলাপ এনে দিতে পারবে তাকে তিনি তাঁর সারা সলতানিয়তের অর্ধেক দিয়ে দেবেন।

কিন্তু এমন দুঃসাধ্য কাজে অপরে এগিয়ে আসবে কেন? বাদশাহর বড় দুই পুত্র জাহাজে পাল তুলে যাত্রা করলো চীনের উদ্দেশ্যে। ছোট ছেলে নূরজিহানও আলাদা ভাবে যাত্রা করলো চিনদেশে। তার একমাত্র পণ, পথ যত দূর্গমই হোক, যত প্রাণ-সংশয় বিপদই সামনে আসুক, সে কিছুতেই ডরাবে না! যেন তেন প্রকারে সে ঐ সমুদ্র-গোলাপ সংগ্রহ করে আনবেই আনবে। অর্ধেক সলতানিয়তের লোভে নয়, তার জন্মদাতা পিতার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

জাহাজে পাল তুলে সমুদ্রের হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া নয়, সে বেছে নিলো মাটির পথ। তার প্রিয় অশ্বে জিন লাগাম চাপিয়ে সেইদিনই সে ছুটে চললো বন মরুপ্রান্তর শহর গ্রাম গঞ্জ অতিক্রম করতে করতে।

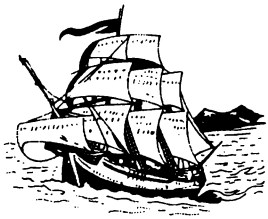

একদিন দু'দিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অবিরামভাবে সে চলতে থাকে। অবশেষে একদিন সে গভীর অন্তহীন বিশাল অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলো। কোথায় পথ, কীভাবে তার মধ্য থেকে বাইরে বেরুনো যেতে পারে, কিছুই তার জ্ঞাত নয়। গাছের নিবিড় ডালপালায় উপরের আকাশের কণামাত্র সূর্যালোক প্রবেশ করতে দেয় না। ঘন মসীময় অন্ধকার। দিন কি রাত কিছুই বোঝা যায় না। তার মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ করে চলতে থাকে সে। যত পথই অতিক্রম করে, এক বিন্দু আশার আলো দেখতে পায় না, তবু সে অকুতোভয়, উন্নতশির হয়ে পথ চলে। কত রকম পশু-পাখীর ভয়াল ভয়ঙ্কর আওয়াজ, কিন্তু নূরজিহান ওসব কানে তোলে না। বুঝতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে কোনও এক হিংস্র জন্তুর মুখ-গহ্বরে সে ঢুকে যেতে পারে, কিন্তু তাতেও তার পথ চলার বিরাম নাই।

সামনে ঘন কালো অন্ধকার। হঠাৎ নূর দেখলো দু'টি সোনার রঙের গোলক তার দিকে এগিয়ে আসছে। নূর বুঝতে পারলো কোনও ভয়ঙ্কর শিকারী জানোয়ারের চোখ। মৃত্যু অবধারিত, পালাবার পথ নাই, পালাবার চেষ্টাও সে করলো না।

ক্রমে ক্রমে স্বর্ণগোলক দু'টি আরও নিকটবর্তী হলো। এবার সে বুঝতে পারলো ছোটখাটো পাহাড়ের মতো একটা দৈত্য-দানব তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

নূর আল্লাহর নাম করে সালাম ঠুকলো দৈত্যটাকে। নূর-এর সুন্দর চেহারা দেখেই বোধহয় দৈত্যটা বেশ খুশি-খুশি ভাব নিয়ে কাছে এসে বসে পড়লো। নূরও ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। এবং ঝোলা থেকে একখানা তন্দুরী রুটি বের করে দৈত্যটার দিকে বাড়িয়ে দিলো। রুটিখানা নিয়ে মুখে পুরে দিয়েই দৈত্যটা প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে উঠলো।

—বাঃ, তোমার খাবার তো বড় চমৎকার খেতে? মানুষরা কী করে এতো সুন্দর খাবার বানাতে পারে?

নূর বলে, এ আর এমন কি ভালো খাবার। আমাদের দেশে হলে তোমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর খানা-পিনা খাওয়াতে পারতাম।

দৈত্য অবাক হয়ে বলে, এর চাইতেও ভালো! সে কেমন খাবার? কৈ দেখি আর একখানা দাও তো ভাই!

নূর আর একখানা রুটি বের করে দৈত্যের হাতে দেয়। দৈত্যটা খুব খুশি হয়ে বলে, এমন অপূর্ব জিনিস তুমি আমাকে খাওয়ালে বন্ধু, কি করে তোমার এ উপহারের প্রতিদান দিহ বলতো?

নূর বলে, না না, তার কী দরকার! সামান্য দু'খানা রুটিই তো দিতে পেরেছি আপনাকে!

—সামান্য বলছো এই খাবারকে? আমার শরীর জুড়িয়ে গেছে তোমার রুটি খেয়ে। যাক, এখন বলো কী কাজে লাগতে পারি তোমার? এরপর যদি তোমার কোনও কাজে না লাগতে পারি, তবে দিল আমার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

নূর বললো, সত্যিই যদি আমার কিছু উপকার করতে চান তবে একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে।

—কী কাজ বলো? তিন ভুবনের যেখান থেকে যা এনে দিতে বলবে, এক্ষুণি তা হাজির করে দেব আমি।

নূর বললো, না, আপনাকে এনে দিতে হবে না। আমাকে নিয়ে যেতে হবে এক জায়গায়।

—কোথায়?

শাহেনশাহ ফিরুজের কন্যার ফুল-বাগিচায়। সেখানে শুনেছি, সমুদ্র-গোলাপ গাছ আছে। ঐ গোলাপ ফুল আমার দরকার। আমি নিজে হাতে তা চয়ন করবো।

নূরের কথা শুনে দৈত্যের মুখমণ্ডল সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেলো মুহূর্তে। বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে তারপর বললো, এ অসম্ভব! ঐ বাগানে বেহেস্তের জিন পরীরা পাহারা দেয়। ওখানে তো আমার যাওয়া সম্ভব নয়, বন্ধু।

নূর বলে, আপনি আমাকে বাগানের কাছে পৌঁছে দিন। তারপর কী করে কার্যোদ্ধার করতে হয় আমি দেখবো।

দৈত্য বললো, ঠিক আছে, চলো আগে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই তো! তারপর ভাবা যাবে কি ভাবে কি করা যায়। এসো, আমার কাঁধে এসে বসে পড়। আমি তোমাকে নিয়ে বায়ুবেগে উড়ে যাবো চীনদেশে।

বায়ুর বেগই বটে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নূরকে নিয়ে দৈত্যটা বাদশাহ ফিরুজের কন্যার প্রমোদ-উদ্যানে এসে উপনীত হলো। বাগানের অদূরে নূরকে নামিয়ে দিয়ে সে বললো, ঐ দ্যাখো, দেয়ালে ঘেরা সেই বাগান। একটু এগোলেই সদর ফটক দেখতে পাবে। তুমি চলে যাও। আমি এখানে অপেক্ষা করবো তোমার জন্য। কাজ শেষ করে ফিরে এসো, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব তোমার মুলুকে।

বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে নূর-এর দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। চারদিকে বহু বিচিত্র বর্ণের কত না ফুলের সমারোহ। নূর ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে।

বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা পুকুর। শান-বাঁধানো তার ঘাট। সেই পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা ফুলের গাছ। গাছে ফুটে আছে একটি মাত্র লাল রঙের ফুল। সে ফুলের মদির গন্ধে সারা বাগান আমোদিত হয়ে আছে। নূর বুঝতে পারলো এই সেই সমুদ্র-গোলাপ।

তখুনি জলে নেমে পড়লো। সাঁতরে গিয়ে ছিঁড়ে আনলো ডালসমেত ফুলটা। পুকুরের পাড়ে উঠে ফুলটাকে অতি সযত্নে কুর্তার নিচে কোমরে গুঁজে নিলো সে। তারপর বাগানটার চারপাশ ভালো করে দেখতে লাগলো।

এক জায়গায় এসে নূর দেখতে পেলো এক পরমাসুন্দরী কিশোরী কেশ এলায়িত করে ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মুগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ সুন্দরীর রূপ-সুধা পান করতে থাকলো সে। আশা করতে লাগলো, হয়তো একটুক্ষণ পরেই ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু না, অনেকক্ষণ পাশে বসে থাকার পরও ওর ঘুম ভাঙ্গলো না।

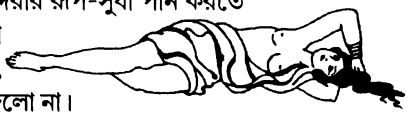

এদিকে দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে, আর অপেক্ষাও করা যায় না, নূর তার হাতের একটা আংটি খুলে কিশোরীর আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে বাগানের বাইরে বেরিয়ে এলো।

দৈত্যটা হাসিমুখে স্বাগত জানালো নূরকে, কী, কাজ হয়েছে?

নূর বললো, হ্যাঁ। যে জন্যে এসেছি তা পেতে কিছু বেগ পেতে হয়নি।

—তা হলে আর একখানা রুটি ছাড়, বন্ধু।

নূরও হাসলো, এই নাও, একখানা নয় দু'খানা দিলাম। বাব্বা এই সামান্য রুটি তোমার এতো ভালো লেগেছে?

নূরকে কাঁধে চাপিয়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই দৈত্যটা জাইন অল মুলুকের প্রাসাদে এনে নামিয়ে দিলো।

সমুদ্র-গোলাপের গন্ধ নাকে শুঁকতেই সুলতান জাইন দিব্যদৃষ্টি মেলে তাকালেন। আনন্দে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, আমি সব দেখতে পাচ্ছি নূর, সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

এরপর সুলতান উজির আমির ওমরাহদের ডেকে ঘোষণা করে দিলেন, এখন থেকে আমার সারা সলতানিয়তের অর্ধেক মালিক হবে আমার কনিষ্ঠ পুত্র নূরজিহান।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহারাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো সাতান্নতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

নূরজিহান একটা বিরাট বাগিচা বানিয়ে তার ভিতরে একটা পুকুর তৈরি করে সেই পুকুরের মাঝখানে গোলাপের ডালটাকে পুঁতে রাখলো।

বড় দুই পুত্র শূন্য হাতে ফিরে এলো। সুলতান দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন এবং তাঁর পুরস্কারস্বরূপ ছোট ভাই অর্ধেক সলতানিয়তের মালিক হয়েছে দেখে তারা বিমর্ষ এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে বললো, ওসব সমুদ্র-গোলাপ টোলাপ কিছু নয়, সবই শয়তানের যাদু।

পুত্রদের এবম্বিধ আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে সুলতান তাদের ডেকে যাচ্ছেতাই ভাবে বকলেন, তোমরা কি আল্লাহর সৃষ্টি গাছ-গাছড়ার গুণাগুণও স্বীকার করতে চাও না? তাঁর অপার মহিমা কে বুঝতে পারে? তবে শোনো একটা গল্প বলি :

এক সময়ে হিন্দুস্থানের এক বাদশাহ ছিলেন। তাঁর হারেমে ছিলো শতাধিক পরমাসুন্দরী বাঁদী। সারা দুনিয়া থেকে বাছাই করে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর একটিও সন্তান হলো না। সেই দুঃখে বাদশাহ কাতর হলেন।

যাই হোক অবশেষে তাঁর সর্বকনিষ্ঠা বাঁদী একসময় গর্ভবতী হলো, এবং যথাসময়ে ফুটফুটে সুন্দর একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করলো। মেয়ের মা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলো। বাদশাহ মনে-প্রাণে কামনা করেছেন, তাঁর যেন একটি পুত্র সন্তান হয়। এখন যদি তাঁকে বলা হয় কন্যা জন্মেছে, তবে তিনি সে দুঃখ হয়তো সহ্য করতে পারবেন না। তাই সুলতানকে সে খবর পাঠালো যে পুত্র-সন্তানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু গণৎকার বলেছে পুত্রের বয়স দশ বছর পুরো না হওয়া পর্যন্ত সুলতান যে তার মুখদর্শন না করেন। তাতে ভয়ানক অনিষ্ট হবে।

মেয়েটি যখন দশে পা দিলো, সেই সময় থেকে তার মা তাকে ছেলের সাজে সাজিয়ে রাখতে লাগলো। শুধু সাজে-পোশাকেই নয়, শিক্ষা-দীক্ষা চাল-চলনও তার ছেলের ধাঁচে বদলে দিতে লাগলো সে। এইভাবে মেয়েটি দিনে দিনে একটি বালকের ন্যায় আচার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো।

সারাদিন সে শাহজাদার বেশে সেজে-গুজে থাকে। ঘোড়ায় চড়ে ছুটে বেড়ায়। তলোয়ার খেলে, শিকার করতে বেরোয়।

সুলতানের আনন্দ আর ধরে না! পুত্র-গর্বে গর্বিত তাঁর বুক। তাঁর ভবিষ্যতের

উত্তরাধিকার-এর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন সুলতান। ভাবেন, এতো বড় বিশাল সলতানিয়ত, কিন্তু এই পুত্রটি নাহলে সবই ছারখার হয়ে যেত একদিন! খোদা বহুত মেহেরবান, তাঁকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তিনি।

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে থাকেন সুলতান।

আরও পাঁচ বছর কেটে গেলো। পাশের দেশের এক সুলতান-কন্যার সঙ্গে পুত্রের শাদীর কথা পাকা করলেন তিনি এবং সে কথা সগর্বে ঘোষণা করে দিলেন সারা দেশে।

শাহজাদী একদিকে শিহরিত, অপরদিকে আতঙ্কিত হলো। অস্থির মনে সে একা একা ঘুরে বেড়ায় মাঠ প্রান্তরে বনে জঙ্গলে। এমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে সে রেহাই পাবে কি করে?

একদিন সন্ধ্যায় সে এক বনের মধ্যে বিচরণ করছিলো। এমন সময় এক গাছের নিচে এক জিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো শাহজাদীর! পরম রূপবান সে।

শাহজাদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে জিন তাকে শুভেচ্ছা জানায়। শাহজাদীও জিনের অসামান্য রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়ে তার কাছে এগিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের দু'জনের বেশ ভাব জমে ওঠে। শাহজাদী তার আসন্ন বিবাহ এবং তার সমূহ বিপদের কথা তাকে বলে।

জিন তাকে তার নিজের পুরুষত্ব প্রদান করে শাহজাদীর নারীত্ব নিজের দেহে বদল করে নিয়ে বলে, প্রথম দর্শনেই তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। তাই আমার পুরুষত্ব তোমাকে দিয়ে তোমার নারীত্ব গ্রহণ করলাম আমি। কিন্তু একটা শর্ত, অতি সঙ্গোপনে রাখবে এ সংবাদ, কেউ যেন না জানতে পারে। তোমার কাজ সমাধা হয়ে গেলে আবার তুমি আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেবে!

এরপর যথাসময়ে শাহজাদী বরের সাজে সেজে-গুজে পালকীতে বসলো। মহা ধুমধামে শাদীপর্ব সমাধা হয়ে গেলো। এবং সেই রাতেই পাত্রী গর্ভবতী হলো। এর ঠিক নয় মাস পরে একদিন একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলো সে। স্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বামী বললো, যাক, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। তুমি আমাদের বংশ রক্ষা করেছ। এবার আমার দায়িত্ব মোটামুটি শেষ। তুমি এখন থেকে নিজের পুত্রকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে এই হারেমে বাস কর। আমি আমার কাজে ব্যস্ত থাকবো এখন থেকে।

সেইদিনই সে বনে প্রবেশ করলো জিনের সন্ধান করতে। দেখাও পেলো তার। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে তার! শরীর শীর্ণ, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কিন্তু পেটটা বিরাট একটা ধামার আকার ধারণ করেছে।

শাহজাদী বললো, আমার ওয়াদা পূরণ করতে এসেছি। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, তোমার দয়ায় আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। সবদিকে আমার কূল মান রক্ষা হয়েছে। যাক্, এবার তোমার জিনিস তুমি ফেরত নিয়ে আমার নারীত্ব আমাকে ফিরিয়ে দাও।

জিন কেঁদে ফেললো, তুমি তোমার কথা ঠিকই রাখতে পেরেছ, কিন্তু আমি পারিনি।

—কেন, কি হয়েছে?

জিন বলতে থাকে ঃ তোমার নারীত্ব নিয়ে আমি অতি সযত্নে সাবধানে লালন করছিলাম। কিন্তু কাল হলো আমার কামনা। একদিন নিশি রাতে দল বেঁধে কয়েকটা জিন উড়ে যাচ্ছিল আকাশ পথে। ওরা আমাকে দেখতে পেয়ে নিচে নেমে আসে। ওদের মধ্যে একটি উঠতি বয়সের ছোকরা জিনকে দেখে আমি পাগল হয়ে উঠি। সেই রাতে সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তার সঙ্গে রতিরঙ্গ করি। আঃ, সে কি পরমানন্দ তোমাকে কি করে বোঝাবো! যদিও তুমি

জন্মগতভাবে নারী, তবুও নারীত্বের আস্বাদ তুমি পাওনি কখনও। আমি পুরুষ ছিলাম যখন তখন অনেক মেয়ের সঙ্গে সহবাস করেছি। তাতে যে সুখ পেয়েছি, সে সুখের তুলনায় রমণীরূপে পুরুষকে উপভোগ করার সুখ অনেক গুণ বেশি।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত, লজ্জিত, তোমার বহু যত্নে লালিত এই নারীত্ব আমি অক্ষত রাখতে পারিনি। এখন কথা হচ্ছে, এই পাপবিদ্ধ নারীদেহ ফিরিয়ে নিয়ে তুমি কি করবে? তার চেয়ে আমার পুরুষত্ব নিয়েই তুমি সারাজীবন কাটাও।।

শাহজাদী বললো, আমার তাতে ভালোই হবে, কিন্তু তোমার কোনও খেদ থাকবে না?

জিন বলে খেদ? কি বলছো তুমি? নারীদেহ ধারণ করে যে অমৃতের স্বাদ আমি পেয়েছি, পুরুষের পক্ষে তা আহরণ করা কি সম্ভব? তুমি কিচ্ছু ভেবো না, তোমার এই নারীদেহ আমাকে অনন্ত সুখের সন্ধান দিয়েছে। এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না।

সুলতান জাইন অল মুলুক বললেন, এই গল্প থেকেই বুঝতে পারছ তোমরা আল্লাহর এই জগতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর ইচ্ছাতে একটা মেয়েও ছেলেতে রূপান্তরিত হতে পারে। সুতরাং আজ আমার ছোট ছেলের চেষ্টায় আল্লাহর করুণায় আমি আমার অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি, একথাই বা শয়তানের যাদু বলে ব্যঙ্গ করছো কেন? তাঁর করুণা থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে। সুতরাং তোমরা এবার বিদায় হও। আমি আমার প্রতিশ্রুতি মতো নূরজিহানকে সলতানিয়তের অর্ধেক ছেড়ে দিয়েছি।

এবার আমরা বাদশাহ ফিরুজের কন্যা সুন্দরী লিলির দিকে চোখ ফেরাই ঃ

প্রতিদিন বিকালে শাহজাদী লিলি তার শখের উদ্যানে বেড়াতে যায়। ঘুরে ঘুরে প্রতিটি ফুলগাছের পরিচর্যা করে নিজের হাতে।

সেদিনও সে বাগানে গিয়েছিলো। গাছগুলো দেখাশুনা করতে করতে এক সময় সে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের ওপর এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর শাহজাদা নূরজিহানের আবির্ভাব ঘটে। এবং সে তার হাতের আঙ্গুলে একটি আংটি পরিয়ে দিয়ে চলে যায়।

ঘুম ভাঙ্গতেই শাহজাদী লিলি তার সাধের গোলাপ গাছটা দেখতে না পেয়ে আঁৎকে ওঠে। তারপর নিজের আঙ্গুলে অচেনা এক আংটি দেখে বিস্মিত হয়। এ কি করে সম্ভব? তার ফুলবাগিচায় বাইরের মানুষ প্রবেশ করলো কি করে? এমন সুরক্ষিত স্থানে তো কারো পক্ষে আসা সম্ভব নয়?

শাহজাদী হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। সমুদ্র-গোলাপ তার চোখের মণি, বুকের কলিজা। তাকে ছাড়া সে বাঁচবে কি করে? কে সেই দুর্বৃত্ত, যে তার যথা সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে?

শাহজাদী বাদশাহ ফিরুজের কাছে সব কথা জানালো।

—বাবা, ঐ সমুদ্র-গোলাপ ছাড়া আমি বাঁচবো না। ও আমার চোখের মণি। ওকে দেখতে না পেয়ে আমার চোখের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। যদিও আমি নাজুক এবং নাবালিকা তবু বাবা ঐ চোরটাকে আমি খুঁজে বের করবোই।

সেইদিনই শাহাজাদী তার সশস্ত্র নারী-বাহিনী সঙ্গে নিয়ে পিতার মুলুক ছেড়ে সারকাস্তানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলো। এবং যথাসময়ে সে এসে পৌঁছলো সুলতান জাইন অল মুলুকের শহরে।

সে সময় সারা শহর আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে হাসছিলো। যুবকের ছদ্মবেশধারী

শাহজাদী লিলি পথচারীদের জিজ্ঞাসা করে জানলো, সুলতান জাইন অল মুলুক অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দুঃসাধ্য সাধন করে চিন দেশ থেকে সমুদ্র-গোলাপ এনে পিতার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। তারই আনন্দে আজ মেতে উঠেছে সারা দেশ। সুলতান মুক্তহস্তে দান ধ্যান করছেন। গোটা বছর ধরে চলবে এই উৎসব।

শাহজাদী লিলি আনন্দে নেচে ওঠে। যাক, তাহলে তার হারানিধির হদিশ পাওয়া গেলো।

খুব ভালো করে শাহাজাদার ছদ্মবেশে সেজেগুজে সে সুলতানের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো।

প্রাসাদের চত্বরে একটা ফুলের বাগিচা, শাহজাদী দেখতে পেলো তার সমুদ্রগোলাপ ফুটে আছে একটা বিরাট চৌবাচ্চার মাঝখানে।

সকলের অলক্ষ্যে অনায়াসেই সে তার গোলাপ গাছটাকে লোপাট করে পালিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু ঐ চোরটাকে সে একবার নিজের চোখে দেখতে চায়। তাই একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

কিছুক্ষণ পরে শাহজাদা নূর তার বাগানে এলো। শাহজাদার অলোকসামান্য রূপ-যৌবন দেখে শাহজাদী লিলি বিমুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেলো। ভুলে গেলো সে তার প্রতিহিংসা। অপলক চোখে সে তাকিয়ে রইলো নূরের মুখের দিকে।

বেশ কিছু পরে সম্বিত ফিরে পায় লিলি। হাত দিয়ে চোখ দু'টো রগড়ে আবার তাকায় সামনে। কিন্তু কোথায় সেই চোর? নিমেষে উধাও হয়ে গেছে সে।

—ওঃ, চোরটা দেখছি শুধু আমার গোলাপ-চারাটাই চুরি করেনি, এখন দেখছি আমার বুকের ভালোবাসাও নিঙড়ে নিয়ে পালিয়েছে। ইয়া আল্লাহ! একি হলো আমার? এর জন্যে আমি কার কাছে নালিশ জানাবো?

বিরহ-বেদনায় হৃদয় কাতর হলো শাহজাদীর। ঐ বাগিচার ঘাসের ওপরেই সে বসে পড়লো।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন সে দেখলো চোর-চূড়ামণি আর ফিরে এলো না, তখন সে হতাশ হয়ে নিজের বাহিনীর মধ্যে ফিরে এলো।

এক টুকরো কাগজ আর দোয়াত কলম নিয়ে নূরজিহানকে একখানা খৎ লিখলো সে। তারপর তার পরিয়ে দেওয়া আংটিটাসহ চিঠিখানা সে পাঠিয়ে দিলো এক পরিচারিকার হাতে।

শাহজাদা নূর তার আংটি দেখে চমকে উঠলো। এক অজানা আনন্দে দুলে উঠলো বুক। তবে কি সে এসেছে? তবে কি তার দেখা পাবো? চিঠিখানা সে খুলে পড়তে থাকলো ঃ

পরমপিতা আল্লাহর অশেষ করুণায় তোমার দর্শন পেলাম। তিনিই তোমাকে নিপুণ হাতে নিখুঁতভাবে গড়েছেন। আহা! কি নির্দয় তিনি। আমাদের অঙ্গের মতো তোমার দেহেও তো তিনি একটু আধটু খুঁতটুত রেখে দিতে পারতেন। একে একপেশে ছাড়া আর কি বলবো, বলো? তোমাকে যে দেখবে, প্রথম দর্শনেই তার সব অহঙ্কার, গর্ব আভিজাত্য লুটিয়ে পড়বে তোমার পায়ের উপর।

তোমার চোখের ঐ যাদু আমাকে নিয়ত আকর্ষণ করছে কেন? আমার কী হবে বলতো? আমি কি তোমার রূপের আগুনে পতঙ্গের মতো পুড়ে ছাই হয়ে যাবো? তাই কি তুমি চাও? যে তুষের অনল জ্বলছে আমার বুকে তা কি কোনদিন নিভবে? আর সেই শাশ্বত বাণী কি মিথ্যে হয়ে যাবে ঃ এক হৃদয়ের অব্যক্ত ভাষা আর এক দরদী হৃদয় ছাড়া কেউ শুনতে পায় না।

আজ আর নয়, এখানেই ইতি করছি।

নূরজিহান চিঠিখানা বন্ধ করে আবিষ্ট হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর কাগজ কলম নিয়ে জবাব লিখতে থাকলো।

শোনও রজত-শুভ্রা, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকে আমার সব চেতনা তোমাতেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, জগতে যা কিছু অপরূপ সুন্দর দেখি তার মধ্যেই তোমার মুখ দেখতে পাই আমি। আকাশের তারারা তোমাকে সুনজরে দেখে না। তার কারণ তুমি ওদের সব জ্যোতি কেড়ে নিয়েছ যে!

তোমার চিঠির শব্দগুলো তীর হয়ে আমার কলিজা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফেলছে। তোমাকে দেখার জন্য, কাছে পাওয়ার জন্য আমার হৃদয়ের কান্না কি তুমি শুনতে পাচ্ছো না প্রিয়তমা! আর অহেতুক বিলম্বে কি বা প্রয়োজন? মিলনের সুতবন্ধ তো তৈরি হয়ে গেছে। তুমি পায়ে পায়ে চলে এসো না আমার বাগানে? দেখবে কত ফুল, কত ফল, ঝরনা, কত কোয়েল রঙে রঙে গানে গানে মুখর করে রেখেছে। এসো না?

বিরহের যে কি যন্ত্রণা সে তো ভুক্তভোগী বিরহিণী ছাড়া বুঝতে পারে না। তবে কি তোমার বুকে কোনও কষ্ট নাই? আমার দশা তো জবাই করার পর দাপানো মোরগের মতো! দিন রাত ছটফট করছি। সুতরাং আর দেরি নয়, শীঘ্র চলে এসো।

আমার কলম আর সরছে না। হাত কাঁপছে, বুক কাঁপছে। সর্বাঙ্গ থরথর করছে।

চিঠিখানা ভাঁজ করে নূরজিহান পরিচারিকা দূতীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, তোমার মালকিনকে বুঝিয়ে বলো আমার অসহায় অবস্থা।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো ঊনষাটতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চিঠিখানা পেয়ে লিলির দেহ মনে শিহরণ জাগে।

—ওরে, তোরা আমায় সাজিয়ে দে। আমি তার অভিসারে যাবো।

সখীরা অপরূপ সাজে সাজিয়ে দিলো শাহজাদী লিলিকে। তারপর সে এসে উপস্থিত হলো নূর-এর ফুল-বাগিচায়। সেখানে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলো শাহজাদা।

দু'জনের মিলন হলো।

এরপর ওরা অমর্ত্য প্রেমের সায়রে গা ভাসিয়ে সুখে সম্ভোগে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলো।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামে। দুনিয়াজাদ দিদিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলে, ওঃ, কি চমৎকার গল্প দিদি? আর কি সুন্দর করেই না বলতে পার তুমি? এই রকম আর একটা শোনাও না?

শাহরাজাদ মুচকি হেসে বলে, নিশ্চয়ই শোনাবো বোন। অবশ্য মহামান্য জাঁহাপনা যদি আজ্ঞা করেন—

সুলতান শারিয়ার বলে, আমার অনুমতির কোনোও প্রয়োজন নাই। শাহরাজাদ তুমি তো জান, একটা রাতও তোমার গল্প না শুনলে আমি ঘুমোতে পারি না।

শাহরাজাদ বলে, তাহলে শুনুন জাঁহাপনা, এবার আপনাকে আরও একটা মজার কাহিনী শোনাচ্ছি।

কাইরো শহরে এক সময়ে এক নিষ্ঠাবান দরিদ্র মুচি বাস করতো। পুরোনো জুতো মেরামত করে কোনরকম কায়-ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করতো। তার পয়সা ছিলো না সত্যি, কিন্তু সততা ও সারল্যের জন্য বহু বিত্তবানরাও তাকে হিংসে করতো।

কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এ রকম এক নিরীহ মানুষের ভাগ্যে জুটেছিলো এক খাণ্ডারণী বৌ। তার মতো পরশ্রীকাতর কুচুটে মুখরা নীচ প্রকৃতির নারী বড় একটা দেখা যায় না। তার অমানুষিক অত্যাচারে অসহায় স্বামীটি সদাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো।

মুচির নাম মারুফ। তার বৌ ফতিমা।

একদিন ফতিমা এসে স্বামীকে বললো, শোনো, আজ সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় আমার জন্যে খানিকটা 'কুনাফা' হালওয়া নিয়ে এসো। হ্যাঁ, হালওয়াটা যেন মধু দিয়ে মাখিয়ে আনতে ভুলো না। আমি আবার চিনির রসফস পছন্দ করি না।

মারুফ বিনীতভাবে বলে, শোনো চাচার মেয়ে! হাতে এখনও একটা দিরহাম নাই। তবে আশা করছি আল্লাহ আজ দেবেন। যদি পাই তবে তোমাকে কুনাফা খাওয়াবো আজ।

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ফতিমা, তোমার ঐ সব বুজরুকির বাক্যি আমি শুনতে চাই না। রোজগার করতে পারবে কি পারবে না, সে আমার দেখবার নয়! আমি তোমাকে যা হুকুম করলাম তা আমার চাই-ই। তা সে তুমি চুরি করে আন বা রোজগার করে আন আমার জানতে ইচ্ছে নাই। কিন্তু কুনাফা না নিয়ে যদি খালি হাতে ঘরে ফেরো তবে তোমার বরাত খুব খারাপ হবে, এই বলে দিলাম। তোমার ঐ আল্লাহ-ফাল্লাহর দোহাই আমি শুনবো না তখন।

মারুফ মৃদু প্রতিবাদ করতে যায়, আহা অমন করে বলো না বিবিজান, আমরা সবাই তো তাঁরই করুণায় বেঁচে আছি। তিনি না জোটালে কার সাধ্য জোটাতে পারে।

—ও সব ফালতু কথা রাখ, অক্ষম অপদার্থরাই ও সব বলে। যাই হোক, আমার সাফ কথা, কুনাফা আমার চাই—

এই বলে সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে।

মারুফ বাজারে গিয়ে তার ছোট্ট দোকানটা খুলে খদ্দেরের প্রত্যাশায় বসে রইলো। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল, সারাটা দিনে কেউ এলো না তার কাছে। একটা দিরহামও রোজগার হলো না।

ফতিমার লাঞ্ছনার ছবি মনে ভাসতেই আতঙ্কে অ্যাঁৎকে উঠলো সে। কুনাফা দূরে থাক রাতের রুটি-সব্জীই বা জোগাড় হবে কি করে?

বাড়ির পথে চলতে থাকে, কিন্তু পা আর চলে না। এক সময় সে বাজারের বড় মেঠাই-এর দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। হতাশ হয়ে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে থাকে দোকানের সাজানো মিঠাই মণ্ডার থালাগুলোর দিকে।

দোকানী বৃদ্ধ সদাশয় ব্যক্তি। মুচি মারুফকে সে বিলক্ষণ জানে। তার মতো সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ এ শহরে খুব বেশি নাই, সেকথা কেই বা না জানে? কাছে এগিয়ে এসে দোকানী মারুফকে জিজ্ঞেস করে, কি মারুফভাই, কিছু নেবে ভাবছো?

মারুফ আরও মুষড়ে পড়ে, হ্যাঁ বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বিবি বলেছিলো কুনাফা নিয়ে যেতে। কিন্তু আল্লাহ আজ একটি আধলাও আমার জন্যে বরাদ্দ করেননি। তাই খালি হাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে।

দোকানী আরও কাছে এগিয়ে এসে বলে, সে কি কথা, না হয় নাই হয়েছে রোজগার, তা বলে ঘরের বিবি সাধ করে একটা জিনিস খেতে চেয়েছে তা সে খেতে পাবে না, তা কি হয়? আমি যখন জেনেছি, তখন আর তোমার ও নিয়ে দুর্ভাবনা করার কারণ নাই, মারুফভাই।

তোমার বিবিজান কতটা খেতে পারবে কুনাফা—নিয়ে যাও আমার দোকান থেকে। পয়সার জন্য খুঁতখুঁত করো না। সে তুমি যে দিন বাড়তি রোজগার করতে পারবে দিয়ে যেও। তোমার মতো মানুষকে একটু খুশি করতে পারাও তো সৌভাগ্যের কথা মারুফভাই।

একটা ভারি বোঝা মাথা থেকে নেমে গেলো, মারুফ দোকানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালো।

—আমাকে এক পোয়া কুনাফা দাও তাহলে।

দোকানী হালওয়ার রেকাবীতে জমানো কুনাফার চাকে ছুরি বসিয়ে একটা চাই কেটে তুলে পাল্লায় চাপিয়ে দেয়।

মারুফ বলে, কুনাফাটুকু মধু মাখিয়ে দাও ভাইসাব।

দোকানী বলে, মধু আজ ফুরিয়ে গেছে, যাই হোক ঘন চিনির সিরায় ডুবিয়ে দিচ্ছি। খেতে মধুর চেয়ে খারাপ লাগবে না। আমার বেশির ভাগ খদ্দেরই তো মধু ছেড়ে চিনির সিরাই পছন্দ করে।

মারুফ আমতা আমতা করে বললো, বেশ তাই দাও।

বাড়ির দরজায় পা রাখতেই ছুটে আসে জাঁহাবাজ ফতিমা।

—কই, কই আমার কুনাফা কই?

হালওয়ার মোড়কটা বাড়িয়ে ধরতেই বাজের মতো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে সে ঘরে ঢুকে যায়। এবং একটুক্ষণ পরে আবার সে গাঁক গাঁক করে তেড়ে আসে মারুফের দিকে।

—এই তোমার মধুর কুনাফা! আমি না তোমাকে বলেছিলাম মধু মাখিয়ে আনবে? কিন্তু তা না এনে এই ছাইপাঁশ চিনির সিরায় চুবিয়ে এনেছ কেন? এ কি কোনও মানুষে মুখে দিতে পারে?

এই বলে সে কুনাফাসুদ্ধ রেকাবীখানা ছুঁড়ে মারে মারুফের মাথায়। এবং এতেও সে ক্ষান্ত হয় না, বাঘিনীর মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর ওপর। এক হাতে চুলের মুঠি ধরে আর এক হাতে কিল চড় ঘুষি চালাতে থাকে বেপরোয়াভাবে।

রেকাবীর আঘাতে মারুফের একটা দাঁত ভেঙ্গে যায়। ঠোঁট বেয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই সেও কিঞ্চিৎ ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। স্ত্রীকে মুক্ত করার জন্য ঈষৎ বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয় মারুফ। এর ফল আরও মারাত্মক হয়। ফতিমা প্রতিহত হয়ে ক্রোধে ফেটে পড়ে, ওগো কে কোথায় আছ গো, রক্ষা কর এই শয়তানটা আমাকে মেরে ফেললো—

নারী-কণ্ঠের আর্তনাদে পাড়া-পড়শীরা ছুটে এসে স্বামী-স্ত্রীর ইত্যাকার লড়াই দেখে লজ্জাহত হয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মারুফ স্ত্রীর আঘাত সামলাবার জন্য ফতিমার হাত মুষড়ে ধরেছিলো। তার ফলে ওর হাতের একটা আঙ্গুল গেছে ভেঙ্গে। আর ফতিমার রেকাবীর আঘাতে মারুফ হারিয়েছে একট দাঁত। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার মুখ ও বুক।

পাড়া-পড়শীরা এই রকম একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কিভাবে মোকাবিলা করবে ভেবে পায় না।

বিবাদের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রতিবেশীরা জানতে পারে মধুর বদলে চিনির রসের কুনাফা আনা হয়েছে বলেই এমন অঘটন ঘটেছে।

প্রতিবেশীরা ফতিমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, মধুর চেয়ে চিনির সিরা মাখানো কুনাফা খেতেই বেশী ভালো। এতে মারুফের কসুর কিছু হয়নি। আমরা তো সবাই চিনির রসের

কুনাফাই খাই। এতে এতো ক্রোধের কি কারণ হতে পারে? আর কি জন্যে বা তুমি তার একটা দাঁত ভেঙ্গে দিলে, ভালো মানুষের মেয়ে? ছিঃ ছিঃ এ তোমার দারুণ অন্যায়—দারুণ অন্যায়!

এই বলতে বলতে পড়শীরা বিদায় নিলো।

আগন্তুকরা চলে যাওয়ার পর ঘরের দাওয়ার এক পাশে বসে গজরাতে থাকে ফতিমা, হুম্, পাড়ার লোককে তুমি আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছো? ঠিক আছে, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি!

হিংস্র বাঘিনীর মতো রক্তচক্ষু মেলে সে তম্বি করতে থাকে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুনাফার টুকরোগুলো কুড়িয়ে জলে ধুয়ে একটা রেকাবীতে সাজিয়ে আবার মারুফ স্ত্রীর সামনে ধরে সোহাগ জানিয়ে আস্তে আস্তে বলে, আহা, রাগ করে কি হবে, নাও খেয়ে নাও। কাল তোমাকে আমি আবার মধু মাখা কুনাফা এনে দেব।

কিন্তু ফতিমা এক লাথি মেরে মারুফকে নিচে ফেলে দেয়, দূর হও আমার সামনে থেকে। তুমি কি ভেবেছ তোমার এই অখাদ্য হালওয়াটা আমি বসে বসে গিলবো? আমার নাম ফতিমা, এই তোমায় আমি বলে রাখলাম, কালকের মধ্যেই তোমাকে আমি শেষ করবো।

মারুফ আর ঘাঁটাতে সাহস করলো না ফতিমাকে। নিজেই সে হালওয়ার টুকরোগুলো বেশ তৃপ্তি করে গলাধঃকরণ করলো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মারুফ তৈরি হয়ে দোকান খুলতে চলে গেলো তাড়াতাড়ি। আল্লাহ আজ হয়তো তাকে বঞ্চিত করবেন না। সে মনে মনে ভাবলো, আজ যা পয়সা পাবে তার সবটা দিয়ে সে বিবির জন্য মধুর হালওয়া কিনে নিয়ে যাবে।

কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও কোন খদ্দের এলো না দোকানে। খদ্দের এলো না, কিন্তু দু'জন সিপাই এসে দাঁড়ালো যম-দূতের মতো।

—চলো, কাজী সাহেবের এজলাসে যেতে হবে তোমাকে।

সিপাই দু'টো মারুফকে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে কাজীর আদালতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো। মারুফ দেখতে পেলো পূর্বাহ্নেই তার বিবি ফতিমা হাজির হয়েছে সেখানে। তার একখানা হাত ন্যাকড়া জড়িয়ে বাঁধা। তাতে খানিকটা লাল লাল ছোপও দেখা যাচ্ছিল। ফতিমার অন্য হাতের আঙ্গুলে ধরা একটা ভাঙ্গা দাঁত।

ভীত চকিত মারুফকে দেখে গর্জে উঠলেন কাজী সাহেব, ওই বেশরম বেতমিজ এদিকে এসো, তোমার কি প্রাণে একটুও ডর নাই? এই অসহায় দুর্বল নারীর ওপর তুমি নির্মম নির্যাতন চালিয়েছ? তার হাত ও দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছ? এতো বড় স্পর্ধা তোমার?

অভিযোগ শুনে মারুফ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এমন ডাহা মিথ্যার সে কি জবাব দেবে? ঐ ভাঙ্গা দাঁতটা তো তারই নিজের! অথচ ফতিমা সেটাকে তার নিজের বলে চালিয়েছে কাজীর কাছে?

মারুফকে নিরুত্তর থাকতে দেখে কাজীসাহেব ভেবে নিলেন, অভিযোগ পুরোপুরি সত্য, স্বামীটারই এই সব কাণ্ড!

তৎক্ষণাৎ তিনি জহ্লাদকে হুকুম করলেন, লোকটা বদমাইশ, ওকে একশ, ঘা বেত লাগাও।

কাজীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে তালিম করা হলো তখুনি। এই নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়ে অসহায় আর্তনাদে লুটিয়ে পড়লো মারুফ। আর সেই দুষ্ট শয়তান মেয়েছেলেটার চোখ দু'টো খুশিতে লক-লক করে নাচতে থাকলো।

আদালত থেকে বেরিয়ে ব্যথা-বিষ-জর্জরিত নিজের দেহটাকে কোনও রকমে টানতে টানতে এক সময়ে সে নীল নদের উপকূলে এক পোড়োবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে আশ্রয় নিলো। দেহের ক্ষতগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখের জল আর রোধ করতে পারে না সে।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, না না, আর কখনও সে ঘরে ফিরে যাবে না ঐ জল্লাদ মেয়েছেলেটার কাছে। তার জন্যে যদি বেঘোরে পড়ে তাকে মরতেও হয় মরবে সে।

এই পোড়োবাড়িতেই সে দু'দিন পড়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে উঠে নদীর ঘাটে গিয়ে একটা সালানী নৌকোয় চেপে বসলো। এবং যথাসময়ে নৌকোখানা তাকে পৌঁছে দিলো দামিয়েত্তায়। সেইখানেই সে বন্দরের মুটের কাজ করে কোনও রকমে দিন গুজরান করতে থাকলো।

এরপর জাহাজের কাপ্তেনের সুনজরে পড়ে একদিন সে খালাসীর চাকরী পেলো। তখন থেকে শুরু হলো তার সমুদ্র-জীবন।

জাহাজের খালাসী হয়ে সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। কত নতুন নতুন শহর বন্দর, কত না বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে।

বড় সুখেই কাটছিলো দিন। কিন্তু একদিন সব বিপর্যস্ত হয়ে গেলো। ঘূর্ণী ঝড় উঠলো সমুদ্রে। সেই ঝড়ের দাপটে কাঠের জাহাজখানা খান খান হয়ে গেলো পলকে। সমুদ্র তখন উত্তাল। সঙ্গী-সাথীরা কে যে কোথায় তলিয়ে গেলো কিছুই হদিশ করতে পারলো না মারুফ! অবশ্য তখন আত্মরক্ষা ছাড়া অন্যদিকে খেয়ালই বা কে রাখতে পারে?

মারুফের বরাতের জোর, সে প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেলো কোনও ক্রমে। ঐ প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যেও সে ভাঙ্গা জাহাজের এক খণ্ড কাঠ ভাসতে দেখে আঁকড়ে ধরতে পারলো। এবং সেই কাঠের সাহায্যে ভাসতে ভাসতে অবশেষে একদিন এসে পৌঁছলো এক সমুদ্র উপকূলে।

যতক্ষণ তীরের সন্ধান মেলেনি ততক্ষণ মারুফ প্রাণপণে পা চালিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছিলো। আহার নিদ্রা নাই, অথচ অমিত শক্তি সাহস এবং সহনশীলতার কোনও ঘাটতি ঘটেনি এই ক'দিন। কিন্তু কি আশ্চর্য! তীরে পৌঁছানোমাত্র কোনও রকমে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সে তরীভূমিতে বালির বিছানায় ঢেলে দিতে পেরেছিলো মাত্র। তারপর আর তার কিছুই মনে নেই।

ঘুম ভাঙ্গলো মারুফের। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো তার সামনে দাঁড়িয়ে এক জমকালো সাজ-পোশাকে সজ্জিত এক প্রিয়দর্শন যুবক।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো বাষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

—খোদা মেহেরবান, আপনি কে মালিক, এইখানে এইভাবে পড়ে রয়েছেন?

যুবকের প্রশ্নের উত্তরে মারুফ তার দুঃখের কাহিনী শোনায় তাকে। সে বলে, আপনি চলুন আমাদের শহরে। আমাদের বাড়িতে। সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করে সুস্থ হতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার দেশ কোথায় জনাব? দেখে মনে হচ্ছে আপনি মিশরের মানুষ।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন, মালিক। কাইরো শহরে আমার বাড়ি।

—কাইরো? কাইরোর কোন মহল্লায়?

মারুফ বলে লাল পথ জানেন? ঐ লাল পথে আমার ঘর।

—আপনি কি করতেন সেখানে? ওখানকার কাকে কাকে চেনেন?

—আমার জাত-ব্যবসা জুতো তৈরি করা। অতি দরিদ্র সাধারণ মানুষ আমি। আমার যারা পরিচিত তারা সবাই সাধারণ মানুষ, কেউ-কেটা নয় কেউ। যদি জানতে চান তাদের অনেকের নামই আমি বলতে পারি আপনাকে।

এই বলে সে তার পাড়া-পড়শীদের অনেকের নামই গড়গড় করে বলে গেলো।

যুবক প্রশ্ন করলো, আচ্ছা শেখসাহেব, আপনি ওখানকার শেখ আহমেদকে জানেন? আতর বিক্রি করেন?

—খুব চিনি। তিনি তো আমারই প্রতিবেশী! একেবারেই পাশাপাশি বাড়ি। বলতে গেলে ওদের বাড়ি আমার বাড়ির মধ্যে একটা মাত্র দেওয়ালের ফারাক।

যুবক জানতে চায়, তিনি কি ভালো আছেন?

—খোদার কৃপায় ভালোই আছেন মালিক।

—এখন তার কটি ছেলেপুলে?

—এখন পর্যন্ত তিনটি, খোদা তাদের সুখে রাখুন।

যুবক এবার জানতে চায়, আচ্ছা, মুস্তফা মহম্মদ আর তার ভাই আলী কেমন আছে?

মারুফ বলে, বড় ভাই মুস্তফা সাহেব ওখানকার মাদ্রাসার শিক্ষক। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সকলেই শ্রদ্ধাবান। আগাগোড়া কোরাণ তার কণ্ঠস্থ। নানা সুরে ছন্দেও নানা ভাবে তিনি তা লোককে শুনিয়ে মুগ্ধ করেন। ছোটজন আলীর একটা ডাক্তারখানা আছে। আতরের কারবারও করেন তিনি। ওদের বাবাও এই কারবার করতেন। তিনিই তাঁর দোকানের পাশে ছোট ছেলের জন্য আর একটা দোকান করে দিয়েছেন। আলীর ছেলে মহম্মদ আমার বাল্যকালের বন্ধু। এক সঙ্গে খেলাধূলা করে আমরা বড় হয়েছি। আল্লাহ ওকে সুখে রাখুন। কিন্তু জানি না সে আজ কোথায়? বেঁচে আছে কি নাই, তাও কেউ বলতে পারে না।

ছোটবেলায় আমাদের খেলার সঙ্গী ছিলো একটি খ্রিস্টান ছেলে। ওর বাবা পয়সা এবং প্রতিপত্তিতে ডাকসাইটে ছিলো। একদিন মহম্মদ ঐ ছেলেটাকে নিয়ে মজা করতে গিয়ে ফ্যাসাদ বাধলো। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে তার বাবার কাছে নালিশ করলো। বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে কোতোয়ালের কাছে এজাহার দিয়ে এলো তখুনি। সিপাইরা মহম্মদকে পাকড়াও করার জন্যে মহম্মদের বাড়ি চড়াও হলো। কিন্তু ধরতে পারলো না। মহম্মদ খিড়কীর দরজা দিয়ে সেই যে পালালো আর ফিরলো না কোনও দিন। আজ বিশটা বছর পার হয়ে গেছে মহম্মদের কেউ কোনও সন্ধান দিতে পারেনি!

মারুফ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলো।

যুবক আকুল হয়ে মারুফকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। মারুফ, মারুফ আমাকে চিনতে পারছো দোস্ত? আমিই সেই মহম্মদ!

এর পর মারুফকে সঙ্গে নিয়ে মহম্মদ তার প্রাসাদোপম ইমারতে এসে পৌঁছলো। নফর চাকর খোজা নিগ্রো দারোয়ান পাহারাদারে সরগরম হয়ে আছে সারা প্রাসাদ। দামী দামী আসবাব গালিচায় জমকালো সব ঘর-দোর! মহম্মদ বললো, এই আমার গরীবখানা।

পুরোনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে মহম্মদ সব কাজকর্ম ভুলে মারুফকে নিয়ে মেতে রইলো কয়েকটা দিন।

মহম্মদ জানালো, এই শহরটায় এসে ইকতিয়ান অল খাতানের দাক্ষিণ্যে সে আজ বহু ধনদৌলতের মালিক হতে পেরেছে। এখন সে এই শহরের সবচেয়ে সেরা ধনী ব্যক্তি।

মহম্মদ বললো, মারুফ, আল্লাহর কৃপায় আমি অনেক পেয়েছি। এতো অর্থের আমার প্রয়োজন নাই। যদি তুমি আপত্তি না কর তবে আমার সম্পদের কিছু তোমাকে দিয়ে ধন্য হতে চাই আমি।

সে একটা থলেয় এক হাজার সোনার দিনার ভরে মারুফের হাতে তুলে দিলো, বন্ধুকে বন্ধুর উপহার, নাও বন্ধু। কাল সকালে তুমি আমার সবচেয়ে সেরা খচ্চরে চেপে

আমার দোকানে যাবে। ঐ সময় বাজারের অনেক গণ্যমান্য সওদাগররা আমার পাশে থাকবে।

তোমাকে দেখামাত্র আমি ছুটে যাবো তোমার কাছে। খচ্চরের লাগাম ধরে তোমাকে নামতে সাহায্য করবো। এবং এমন স্বাগত সম্ভাষণ জানাবো যাতে তোমার মর্যাদা বেড়ে যাবে সওদাগর-মহলে। তারা বুঝবে, তুমি যে-সে ব্যক্তি নও। তারাও তোমাকে খাতির অভ্যর্থনা জানাবে। এর পর বাজারে একটা সেরা দোকান কিনে দেব তোমাকে। তুমি মালিক হয়ে বসবে সেখানে। খুব শিগ্গিরই দেখবে দারুণ পয়সা জমে যাবে তোমার ব্যবসায়। কত গণমান্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে তোমার। অচিরে তুমিও আমার মতোই এই শহরের সম্ভ্রান্ত এক সওদাগর হয়ে অতীতের সব দুঃখ তাপ ভুলে যেতে পারবে। তোমার খাণ্ডারণী স্ত্রীর দুর্ব্যবহার নিয়ত তোমাকে দহন করছে জানি। কিন্তু হাতে পয়সা হলে সে সব আঘাত তুমি ভুলে যেতে পারবে, বন্ধু।

এ মহত্ত্বের তুলনা কোথায়, মারুফ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।

পরদিন সকালে মারুফ সাজগোজ করে খচ্চরে চেপে বাজারে এসে উপস্থিত হয়। মহম্মদ তখন তার সওদাগর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে খোশ-গল্পে মেতেছিলো, মারুফকে দেখামাত্র সে ছুটে গিয়ে স্বাগতম জানায়। খচ্চরের লাগামটা চেপে ধরে বলে, মেহেরবানী করে আমার দোকানে পায়ের ধুলো দাও দোস্ত। আমার কী সৌভাগ্য, আজ তুমি আমার দোকানে এলে।

এর পর পূর্ব-নির্দিষ্ট নাটকটি যথাযথভাবে অভিনীত হয়ে গেলো।

উপস্থিত সওদাগররা পরদেশী এক সওদাগরকে যথাবিহিত মর্যাদা সহকারে আদর আপ্যায়নের ত্রুটি রাখলো না। মারুফ গম্ভীর চালে মাথা হেলিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানালো।

সওদাগররা পরস্পরে ফিস ফিস করে আলোচনা করতে থাকলো। ইনি নিশ্চয়ই কোনও বিশাল ধনী সওদাগর। তা না হলে মহম্মদ সাহেব স্বয়ং অত খাতির সম্মান করেন?

মহম্মদ একবার গলা খাটো করে তার সওদাগর বন্ধুদের উদ্দেশ করে বলে, জান তো ইনি কে? তামাম দুনিয়ার সেরা ধনী সওদাগর। টাকার কুমীর! কেউ জানে না ওঁর কত টাকা। উনি নিজেও বোধ হয় মাপ করতে পারবেন না ওঁর ধন-দৌলতের পরিমাণ। সারা পৃথিবী জুড়ে ওঁর কারবার। সব দেশে ওঁর দোকানপাট আছে। এখানে আসার উদ্দেশ্যই তাই—একটা জমকালো দোকান খোলা। এতো যে বিত্ত, কিন্তু মানুষ হিসেবে ওঁর তুলনা বিরল।

একেবারে মাটির মানুষ বলতে যাকে বলে, তাই। ধীরে ধীরে ওঁর আরও অনেক গুণের পরিচয় পাবেন আপনারা। তবে নিজের ঢাক তো নিজে পেটান না কখনও, তাই জানতে একটু সময় লাগবে।

সওদাগররা মারুফের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হতে আগ্রহী হয়ে উঠলো। প্রত্যেকে তার বাড়িতে খানাপিনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকলো। মারুফ মধুর হাসি হেসে সবারই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো মাথা পেতে। কিন্তু আপাতত কিছুদিন তা রক্ষা করার অক্ষমতা জানিয়ে বললো, আপনারা আমার গোস্তাকি মাফ করবেন মালিক। আমি আপনাদের এদেশে এসেছি আমার দোস্ত মহম্মদের অতিথি হয়ে। তিনি যতদিন না আমাকে ছাড়বেন ততদিন আমি এঁর সঙ্গেই খানাপিনা করবো। তারপর ছাড়া পেলে অবশ্যই মিলিত হবো আপনাদের সঙ্গে।

এইভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মারুফের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো তার ঐশ্বর্যের কথা। স্বয়ং মহম্মদ লোককে বলতে লাগলো, ওরে বাবা, মারুফ—সে তো ধনকুবের, তার কাছে আমি নস্যি।

একদিন এ সংবাদ সেখানকার সুলতানের কানেও পৌঁছলো। উজিরকে ডেকে সুলতান বললেন, দেখতো উজির, আমার শহরে কে এক জগৎবিখ্যাত ধনী সওদাগর নাকি এসেছে, তার এতো ধন-দৌলত, কোন সুলতান বাদশাহরও নাই! সে নাকি অনেক মূল্যবান সওদাপত্র সঙ্গে এনেছে। এবং পরে নাকি আরও কোটি কোটি দিনারের অমূল্য সব হীরে জহরত নিয়ে আসছে তার সহচররা। আমার বিশ্বাস এই শহরের অর্থগৃধ্নু শকুনী সওদাগররা ওকে চুষে খাওয়ার জন্য ওৎ পেতে আছে। তুমি একবার খোঁজ নাও তো, কে সেই লোক? তাকে নিয়ে এসো আমার সামনে। অমন একজন বিত্তবান মানুষ আমার মুলুকে এসে যাতে প্রতারিত না হতে পারে সেটা তো দেখা দরকার আমার। হয়তো এমনও হতে পারে তার দ্বারা আমার বা আমার বাচ্চাদেরও কিছু উপকার হতে পারবে!

উজির বিচক্ষণ ব্যক্তি, সব শুনে সুলতানকে বোঝাবার চেষ্টা করে, আপনি একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, জাঁহাপনা। সবুরে মেওয়া ফলে। ধনপতি সওদাগর সাহেবের হীরে জহরতের লটবহরগুলো এসে পৌঁছাক, তারপর না হয় তাকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

একথায় সুলতান রুষ্ট হলেন, তোমার কি মাথায় গোবর পোরা আছে উজির? সোজা সরল কথাটা বুঝতে পারছ না? তুমি ভাবছো, ওর মালপত্র এসে পৌঁছানর পর ঐ শকুনীরা তাকে আস্ত রাখবে? না না, তোমার বুদ্ধিতে চললে আমি সব হারাবো, তুমি আর দেরি না করে আজই এক্ষুণি তাকে সসম্মানে নিয়ে এসো আমার প্রাসাদে।

মুচি মারুফ এসে যথাবিহিত কুর্নিশাদি করে সুলতানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলো।

মারুফের নম্র বিনয়ী আদব-কায়দায় প্রীত হলেন সুলতান।

—শুনেছি আপনি শ্রেষ্ঠ ধনী সওদাগর। জগৎ জোড়া আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের খ্যাতি। তা আমার মুলুকে কি অভিপ্রায়ে এসেছেন, বণিক।

—ব্যবসাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য জাঁহাপনা। আপনার শহরেও এসেছি ব্যবসা করবো বলে। তা আমার লটবহর এখনও এসে পৌঁছয়নি। না হলে দেখাতে পারতাম, কি কি ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য আমি করবো এখানে। আসেনি, তবে দু-একদিনেই পৌঁছে যাবে মালপত্র। অনেক মূল্যবান হীরে জহরৎ আছে তার মধ্যে। আপনার কন্যা বা বেগমের নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

তখন সুলতান তাঁর সঞ্চিত সব মণি-রত্নাদি বের করে একটা বিরাট মুক্তো মারুফের হাতে তুলে দিয়ে বললো, দেখুন তো এটা কেমন জিনিস?

মুক্তো হতে নিয়ে একবার পরীক্ষা করার ভান করেই মেঝেতে ফেলে দিয়ে জুতোর গোড়ালী ঠুকে গুঁড়িয়ে দিলো।

সুলতান শিউরে উঠলেন, সর্বনাশ এ কি করলেন আপনি? ও যে মহামূল্য রত্ন! প্রায় হাজার মোহর দাম হবে?

মারুফ বিজ্ঞের মতো মাথা দুলিয়ে বললো, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি, হাজারখানেকই দাম হবে। কিন্তু আমার লটবহরের মধ্যে এক বস্তা মুক্তো আছে তার একটাও এতো ছোট এতো কম দামী নয়, জাঁহাপনা। সেগুলোর প্রত্যেকটি দেখতে যেমন বাহারী তেমনি দামেও অনেক বেশি মূল্যবান।

এতে সুলতানের লোভ শতগুণ হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, মনে মনে স্থির করে ফেললো, এমন ধনকুবেরকে তো হাত ছাড়া করা যায় না, আমার কন্যার সঙ্গে শাদী দিয়ে সম্পর্কের জালে জড়িয়ে ফেলতে হবে একে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো তেষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

সুলতান মারুফকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনার সঙ্গে কথা বলে প্রীত হলাম, বণিকসাহেব। এখন আমার অভিলাষ, আপনি আমার কন্যাকে শাদী করুন। আপনি আমার দেশের মাটিতে পা রেখে আমাকে ধন্য করেছেন। আমার কন্যাকে আপনার বাঁদী করে দিয়ে আমি আমার অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছা করি। আপনি যদি অমত না করেন তবে শাদীর আয়োজন করি। আমার পুত্র-সন্তান নাই। তাই আমার মৃত্যুর পর আপনিই আমার মসনদে বসার অধিকারী হবেন।

মারুফ ক্ষণকাল নিরাসক্তভাবে মৌন হয়ে কি যেন ভাববার ভান করলো। তারপর বললো, জাঁহাপনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস আমার নাই। কিন্তু এতো তাড়াহুড়োর কি দরকার? আমার লটবহর পৌঁছতে দিন, তারপর না হয় শাদীর দিনক্ষণ ধার্য করা যাবে। তাছাড়া, শাদী বলে কথা, অনেক খরচপত্রের ব্যাপার রয়েছে। আমার

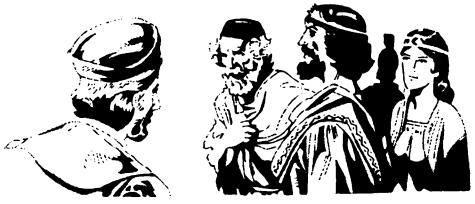

ধনরত্ন এসে না পৌঁছলে কি করে এখনি সম্ভব, জাঁহাপনা? আমার যিনি বেগম হবেন তাঁকে তো হাজার মোহর করে দু' লক্ষ তোড়া উপহার দিতে হবে আমাকে! এসব তো আর সঙ্গে করে আনা যায় না। আমার লোকজনরাই তা নিয়ে আসছে! এছাড়া গরীবদের মধ্যে দান ধ্যানও তো করতে হবে। তাতে হাজার টাকা করে হাজারটা তোড়া অন্তত দরকার। শাদীর রাতে এটা আমাদের বংশের অবশ্য করণীয় কর্তব্য। এ না হলে আমি বাসরঘরেই ঢুকবো না। এছাড়া যাঁরা আমার শাদীতে উপঢৌকন দেবেন তাঁদের জন্যও ঐ রকম আরও হাজারটা তোড়া চাই। আর খানা-পিনার জন্যও বরাদ্দ রাখতে হবে এক হাজার তোড়া। এরপর হারেমের অন্য সব বাঁদী বেগমদের জন্য উপহার আছে। প্রত্যেক বাঁদী-বেগমকে হাজারটা মুক্তো বসানো সাতনরী জড়োয়ার হার অবশ্যই দেব আমি। এইসব যথাযথভাবে করতে গেলে আমার লোক-লস্কর এসে না পৌঁছান পর্যন্ত কী করে এ শাদী সম্ভব হতে পারে জাঁহাপনা?

এইসব শুনে সুলতানের বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকে। ওরে বাপ, এ যে দেখছি বিরাট ব্যাপার! এমন পাত্র তো হাতছাড়া করা সম্ভব নয়।

—সে জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, মারুফ সাহেব। জাঁকজমকের একটু ত্রুটি রাখবো না আমি। যেমনটি আপনি বলবেন, বর্ণে বর্ণে মিলিয়ে নেবেন, ঠিক ঠিক তেমন হবে সব। আপনার লটবহর যখন এসে পৌঁছবে তখন না হয় আপনি আমার মেয়ের দেনমোহর দেবেন। এখন শুভ কাজ সম্পন্ন হতে দিন। এ নিয়ে দুর্ভাবনা করবেন না। আপনার নগদ যা দরকার বলুন, আমি আমার ধনভাণ্ডার থেকে দিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া শাদীর উৎসবের জন্য যা খরচ হবে সব আমি করবো। তবে শুভ কাজে আমি বিলম্ব করতে চাই না। যত শীঘ্র সম্ভব শাদী হয়ে যাক, এটাই আমার ইচ্ছা। আপনি আর দ্বিধা সঙ্কোচ করবেন না। আমার যা সবই তো আপনার হবে একদিন।

সুলতান তখনই উজিরকে ডেকে পাঠালেন।

—শোনো উজির, আমীর মারুফের সঙ্গে শাহজাদীর শাদী পাকা করে ফেলেছি। এখন তুমি শেখ অল ইসলামকে একবার খবর দাও, আমি তার সঙ্গে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

সুলতানের সিদ্ধান্ত শুনে উজির গম্ভীর হয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

সুলতান অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? কিছু বলবে কী?

—জাঁহাপনা, উজির করজোড়ে মিনতি জানায়, আপনি আর কটা-দিন অপেক্ষা

করুন। শাহজাদীর শাদী, এ তো চাট্টিখানি কথা নয়! ভালো করে কুলশীল না জেনে যে-কোনও লোকের হাতে তো তুলে দেওয়া যায় না তাকে।

সওদাগরটির কথাবার্তা শুনে আমি বিশেষ প্রীত হতে পারিনি, তার কারণ তার আদব-কায়দার মধ্যে কোথায় যেন একটা খানদানী মেজাজের খামতি আছে। আপনি আর কটা-দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, জাঁহাপনা। ওর লটবহর পৌঁছতে দিন এখানে।

সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলেন, তুমি একটা বিশ্বাসঘাতক। আমার সর্বনাশ করতে আছ এখানে, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি। তুমি ভেবেছ তোমার মতলব আমি টের পাইনি? আমার কন্যাকে শাদী করে তুমিই আমার মসনদে চেপে বসতে চাও। কিন্তু সে আমি হতে দেব না কিছুতেই। শোনও উজির, আর যদি কোনও ভাবে আমার কাজে বাগড়া দেবার কোশিস কর তবে তোমাকে খতম করে ফেলবো আমি। এ পর্যন্ত যত পাত্রই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, তারা কেউ শাহাজাদীর যোগ্য নয় এই অজুহাতে তুমি তাদের বাতিল করে দিয়েছ। তখন আমি তোমার ফিকির বুঝতাম না, তাই বাধা দিইনি। কিন্তু এখন দেখছি, এইভাবে তুমি আমার কন্যাকে বুড়িয়ে দিতে চাইছো। যাতে আর কেউ না তার দিকে হাত বাড়ায়। পরে তার যোগ্য পাত্র যখন আমি সংগ্রহ করতে পারবো না, তখন তুমিই তার পাণি প্রার্থনা করবে, এই তোমার ফন্দী! সে গুড়ে বালি, তা আমি হতে দেব না। মারুফকে হাতছাড়া করলে তার মতো যোগ্য পাত্র কোথায় পাব আর? তাছাড়া, সে আমার জামাই হলে তার ধন-সম্পদ সবই তো আমার ভাণ্ডারে জমা হবে। তখন আমিই হবো তামাম আরব দুনিয়ার সেরা ধনবান বাদশাহ। আর আমি ঐশ্বর্যবান হলে তোমাদেরও লাভ হবে। যাক ওসব কথা, এখন আর দেরি না করে তুমি শেখ অল ইসলামকে খবর দিয়ে এসো।

কাজী শেখ অল ইসলাম এসে শাদীনামা তৈরি করে দিয়ে গেলো। সুলতানের আদেশে সারা শহর প্রাসাদে সাজসাজ রব ছড়িয়ে পড়লো তখুনি। আলোর মালায় সাজানো হলো প্রতিটি গৃহ ইমারত প্রাসাদ। নৃত্য গানে মুখর হয়ে উঠলো পূরবাসীরা।

মারুফ প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের তখতে বসে চোখে সর্ষের ফুল দেখতে থাকলো। এ কি কাণ্ড সে করে বসলো? এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তো সে জানে—মৃত্যু! কিন্তু এখন পালাবারও তো পথ নাই। সে চেষ্টা করতে গেলেও মৃত্যু!

দল বেঁধে দলে দলে মেয়েরা এসে ভরে ফেলেছে প্রাসাদ-আঙ্গিনা। একদল গাইছে, একদল বাজনা বাজাচ্ছে, আর একদল সুললিত ছন্দে নেচে চলেছে।

এসব কিন্তু মারুফের বিষবৎ মনে হতে লাগলো তখন। শুধু ভাবতে লাগলো, কি করে এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এইভাবে তিন দিন কেটে গেলো।

এরপর শাহজাদীকে অপূর্ব সাজে সাজিয়ে বাসরঘরে এনে হাজির করলো সখী বাঁদীরা। মারুফের বুক কাঁপতে লাগলো। এখন সে কী করবে? হায় আল্লাহ! নিয়তি তাকে কোথায় ঠেলে দিলো?

শাহজাদীকে বাসরঘরে রেখে সবাই চলে গেলো। পালঙ্কের এক পাশে বসে মারুফ ভেজা-বেড়ালের মতো কাঁপতে লাগলো। শাহজাদী এসে পাশে বসে তার একখানা হাত নিজের কোলে তুলে নিলো।

—তুমি অমন মুখ গোমড়া করে জবুথবু হয়ে বসে আছ কেন প্রাণনাথ? এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো চৌষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

মারুফ কোনও রকমে উচ্চারণ করতে পারলো, একমাত্র খোদা ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাকে।

—এ কথা কেন বলছো গো? আমাকে দেখে কি তোমার পছন্দ হয়নি। আমি কি এতই কুৎসিত?

মারুফ বলে, না না, তোমার কী দোষ? এর জন্য দায়ী একমাত্র তোমার বাবা।

—কেন, কি করেছেন তিনি?

মারুফ বললো, আমি তখনই বার বার বলেছিলাম, আপনি এতো তাড়াহুড়ো করবেন না, আগে আমার সব লটবহর পৌঁছতে দিন। কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। আমাদের শাদীর প্রথম রাত, তোমাকে প্রাণভরে সাজাবো। সাতনরী মুক্তোর মালা পরাবো নিজের হাতে। কিন্তু সে সাধ আমার পূর্ণ হলো না। আমার ইচ্ছে ছিলো, হারেমের সব বাঁদী-বেগমকে মূল্যবান উপহার পাঠাবো। কিন্তু তাও পারলাম না। এ দুঃখ আমি রাখবো কোথায়?

শাহজাদী আশ্বস্ত হয়ে বললো, ও, ওই কথা। ছাড়তো ওসব, ভেবো না। এখন সাজ-পোশাক খুলে কাছে এসো। এ মধুযামিনী ঐ সব ছুটো চিন্তায় নষ্ট করো না, সোনা। আমি তোমার সোনাদানা বিষয়-সম্পদ কিছুই চাই না। তোমার মতো স্বামী পেয়েছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য। তোমার লটবহর আসুক না আসুক, তার জন্যে আদৌ আমি লালায়িত নই। তুমি যদি একান্তভাবে আমার হও তার চেয়ে বেশি আর কি প্রয়োজন? আমার ধনদৌলতের কোনও বাসনা নাই। ওতে কি মন ভরে? আমি বাদশাহজাদী, ঐশ্বর্যের অভাব কিছু নাই, কিন্তু বিশ্বাস কর, চিরকাল ধন-দৌলতকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করে এসেছি। ওতে আমার কোনও আসক্তি নাই। থাক ওসব কথা, আজকের এই মধুর রাত্রি তোমার আমার দেহ মন প্রাণ এক সঙ্গে মিশে যাক, এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে! এসো সাজ-পোশাক খোলো, আর দেরি করো না। আমার সারা দেহ মন কামনায় জর-জর হয়ে উঠছে, এসো সোনা, দেরি আর আমি সইতে পারছি না।

—তা হলে তাই হোক, মারুফ ক্ষিপ্র হস্তে সাজ-পোশাক খুলে খুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো মেঝের ওপর।

পরদিন সকালে উঠে হামামে গিয়ে বেশ ভালো করে গোসল করলো মারুফ। তারপর দারুন সাজে সেজে-গুজে গিয়ে বসলো দরবারে। উজিরকে বললো যারা উপস্থিত আছে তাদের সবাইকে যথাযথ মর্যাদার সাজ-পোশাক উপহার দিন।

সকলে নতুন জামাই-এর বদান্যতায় ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

এইভাবে কুড়িটা দিন পার হয়ে গেলো। শাহজাদী স্বামীসুখে গর্বিতা হয়ে উঠলো। মারুফের কথা আর কী বলবো?

এদিকে উজির চিন্তিত হলো, এলাহী খরচের ধাক্কায় ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে পড়েছে। অথচ জামাই-এর লটবহরও এসে পৌঁছলো না। সুলতানের কাছে গিয়ে সে করজোড়ে বললো, জাঁহাপনা কোষে আর কোনও অর্থ নাই। এদিকে জামাতার লটবহরও এসে পৌঁছায়নি। এখন কী হবে আমি বুঝতে পারছি না!

সুলতান ঈষৎ বিচলিত বোধ করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললেন, পৌঁছতে হয়তো কিছু বিলম্ব ঘটছে। কিন্তু তা নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নাই, সবুর কর, ঠিকই এসে পৌঁছবে।

উজির তিক্ত হাসি হেসে বললো, আপনার কথাই যেন সত্য হয় জাঁহাপনা। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে আমি চিন্তিত না হয়ে পারছি না। ভাঁড়ার শূন্য হয়ে পড়েছে। অথচ শাহাজাদীর শাদী হয়ে গেছে এক অজ্ঞাত-কুলশীলের সঙ্গে। জানি না নসীবে কি আছে।

—তোমার কথায় আমিও চিন্তিত হচ্ছি, উজির! তবে শুধু দোষারোপ না করে আমাকে কিছু উপায় বাতলাও। যদি প্রমাণ করতে পার আমার জামাতা একজন ঠগ প্রতারক মিথ্যাবাদী তবে তারও আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো। কিন্তু তার আগে তো আমি কিছু করতে পারি না।

উজির বলে, আপনি যথার্থই বলেছেন জাঁহাপনা, বিনা প্রমাণে কারো সাজা হওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে আর কেউ নয়, শুধু মাত্র আপনার কন্যাই আপনাকে আলোকপাত করতে পারেন। আমার কথা শুনুন, তাকে একবার আপনি ডাকুন এখানে। আমি নিজে তাকে দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই। অবশ্য শাহজাদীর কোনও রকম অমর্যাদা না ঘটে সেদিকে আমি সজাগ থাকবো।

—ঠিক আছে, তাই হোক, গর্জে উঠলেন সুলতান, যদি প্রমাণ হয় মারুফ জালিয়াত, সে আমাদের প্রতারণা করেছে, তবে জামাতা হয়েও সে মউৎ এড়াতে পারবে না।

সে সময় মারুফ প্রাসাদে ছিলো না। সুলতানের নির্দেশে শাহজাদী দরবারে এসে পর্দার আড়ালে বসলো। সুলতান-কন্যাকে উদ্দেশ করে বললেন, দরবারে এখন শুধু আমরা তিনজন, আর কেউ উপস্থিত নাই. উজির তোমাকে দু-একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চায়, তুমি তার জবাব দিলে আমি খুশি হবো।

শাহজাদী ফুঁসে উঠলো, কী তোমার মতলব, উজির? বলো, কী জানতে চাও?

উজির নম্র কণ্ঠে বললো, মালকিন, ধনভাণ্ডার প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। আমীর মারুফের লটবহর এখনও এসে পৌঁছয়নি। এবং কবে পৌঁছবে তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। সেই কারণে আপনার পিতা আমাদের মহামান্য জাঁহাপনা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার অধিকার দিয়েছেন। এখন বলুন, এই পরদেশী সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? এই কুড়ি দিন ব্যাপী আপনি তাকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, আপনার মনে কী কোনও সন্দেহ দানা বেঁধেছে?

—আল্লাহ মারুফকে দীর্ঘায়ু করুন, আল্লাহ আমার স্বামীর প্রতি সহায় থাকুন, আপনি জানতে চান তাঁর সম্বন্ধে আমার কী ধারণা? তবে শুনুন, একটুও খারাপ নয় বরং অত্যন্ত ভালো। অমন মানুষ হয় না। তাঁর সঙ্গে শাদী হওয়ার পর থেকে রূপে রসে আনন্দে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমার জীবন-যৌবন। আমার স্বামীর মধ্যে যে সব সৎগুণ আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তা খুব কম মানুষেরই থাকে। এক কথায় সে আমার সুধাপাত্র, এবং আমিও তার কাছে তাই।

সুলতান উজিরকে উদ্দেশ করে বললেন, কী শুনলে তো? ঘুচলো তোমার সন্দেহ? আমার জামাতার মতো মানুষ সত্যিই আমি দেখিনি কখনও।

উজির কিন্তু সে কথায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা ঐ লটবহরে কি কি সামানপত্র আছে তিনি বলেছেন?

—ওসব দিয়ে আমার কী দরকার? আমাদের ভালোবাসার মধ্যে বিষয় সম্পদের কথা উঠবেই বা কি করে? আর তুচ্ছ ঐ হীরে জহরতের বাক্স-প্যাঁটরা এলো কি এলো না, তাতেই বা আমার কী? ওসবে আমার কোনও দিন কোনও রকম আসক্তি ছিলো না, আজও নাই।

উজির বলে, তথাপি যদি আদৌ সেগুলো কখনও এসে না পৌঁছয় তাহলে আমাদের খানাপিনা চলবে কি করে মালকিন? আপনি তো শুনলেন ভাঁড়ার খালি হয়ে গেছে।

খোদা মেহেরবান, তাঁর ওপর ভরসা রাখুন, তিনিই সব চালিয়ে দেবেন!

উজির কি যেন বলতে যাচ্ছিল, সুলতান তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো শাহজাদী যা বলেছে এর পরে আর কথা চলে না, উজির। তুমি থামো। আমার কন্যা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক কথা বলেছে।

তারপর তিনি শাহজাদীকে উদ্দেশ করে বললেন, শোনো বেটি, তুমি কথায় কথায় তার কাছ থেকে জেনে নেবার চেষ্টা করো, কবে নাগাদ তার মালপত্র সব এসে পৌঁছবার সম্ভাবনা আছে। কারণ বুঝতে তো পারছো, শাদীর জন্যে প্রচুর খরচ হয়ে গেছে। ভাঁড়ার শূন্য হয়ে গেছে, অথচ পাওনাদারের অনেকের দেনাই মেটানো হয়নি। তারা তাগাদা দেবে, সে তো সহ্য হবে না। আমি যদি বুঝতে পারি কোন সময় নাগাদ এসে পৌঁছবে সেই মতো তাদের তারিখ দেব, পাওনা নিয়ে যাওয়ার জন্য। তা না হলে দেনা মেটাবার জন্য অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য আমাকে কোনও নতুন কর ধার্য করতে হবে।

শাহজাদী পর্দার আড়াল থেকে কুর্নিশ জানিয়ে বলে, জো হুকুম জাঁহাপনা! আজ রাতেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করবো। তারপর কাল সকালে আপনাকে জানাবো।

সেইদিন রাতে দু'জনে পাশাপাশি শুয়েছিলো, শাহজাদী তার একখানা হাত রাখলো মারুফের কাঁধে, কাছে টেনে নিয়ে এলো তাকে। অধরে অধর রাখলো। গভীর আবেশে চুম্বন করলো দু'জনে। তারপর শাহজাদী স্বামীকে সোহাগ করতে করতে কথাটা পাড়লো, তুমি আমার বুকের কলিজা, চোখের মণি, তোমাকে ছাড়া একটি দিনও আমি বাঁচবো না সোনা, তোমার উদ্দাম ভালোবাসার জোয়ারে আমি হালভাঙ্গা পালছেঁড়া দিশাহারা নাবিকের মতো ভেসে চলেছি। কোথায় কতদূরে কোন নিরুদ্দেশের অজানা ঠিকানায় তুমি আমাকে নিয়ে যাবে আমি জানি না, জানতে চাইও না। তবে একথা ঠিক, এক সূত্রে বেঁধেছি জীবন, তোমার যা হবে আমারও তাই হবে। আমাদের দু'জনের একই নিয়তি। কেউ তা বদলাতে পারবে না।

তাই তোমার কাছে আমার যেমন লুকাবার কিছু নাই, আমি বিশ্বাস করি আমার কাছেও গোপন করার মতো কিছুই থাকতে পারে না তোমার। আচ্ছা বলতো সোনা, তোমার লোক ঐ সব লটবহর নিয়ে কবে নাগাদ এসে পৌঁছবে এখানে? আমার বাবা এবং উজির বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এই ব্যাপারে। অবশ্য তার কারণও আছে। শাদীর জন্যে অত্যধিক ব্যয়ের চাপে ভাঁড়ার প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছে। তোমার কিন্তু কিন্তু করার কোনও কারণ নাই, সোনা। যদি আশঙ্কা কর, তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে, এখানে আসতে হয়তো আরও অনেক দেরি হতে পারে, তবে অসঙ্কোচে আমাকে সব বলো। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমি সব দিক বজায় রেখে সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো পঁয়ষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

এই বলে সে মারুফকে আরও বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলো।

হো হো করে হেসে উঠে মারুফ শাহজাদীকে আদর জানিয়ে বললো, এই একটা সহজ সরল প্রশ্ন করতে ভূমিকা করতে হলো কেন, সোনা?

মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেলো মারুফ। তারপর খাঁকারী দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো, শোনো সোনা, আসলে আমি কোনও সওদাগর নই। আমার কোনও

ধন-দৌলত কিছু নাই। স্বদেশে আমি এক অতি সাধারণ দরিদ্র চর্মকার ছিলাম। লোকের পায়ের জুতো সারিয়ে দিয়ে আমার জীবিকা চলতো। ফতিমা নামে এক দজ্জাল খণ্ডারণী মেয়েকে শাদী করেছিলাম সেখানে। সে আমার জীবনে চরম অভিশাপ হয়ে দাঁড়ালো। তার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে একদিন ঘর ছেড়ে পথে নামতে হলো আমাকে। তারপর নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তোমাদের এই শহরে এসে পৌঁছলাম ভাগ্যচক্রে।

এইভাবে মারুফ তার জীবনের সব খুঁটিনাটি কাহিনী তুলে ধরলো শাহজাদীর সামনে।

সব শুনে শাহজাদী হেসে লুটিয়ে পড়ে মারুফের বুকে, ওঃ, তুমি কী সুন্দর! তোমার বৌটা অমন দজ্জাল ছিলো বলেই না আজ তোমাকে আমি আমার বুকের কলিজা করে পেয়েছি। সত্যিই তোমার মতো মজার মানুষ আমি দেখিনি কখনও। এমন করে তুমি ভালোবাসতে জান, অথচ তোমার বোকা বৌটা তোমাকে বুঝতে পারলো না? যাক্ পারেনি সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এখন মুশকিল হলো, বাবা এবং উজিরকে কি বলা যাবে। তারা যদি আসল ব্যাপার শোনেন তবে তো তোমার নির্ঘাৎ গর্দান যাবে। ও, না না, সে আমি সইতে পারবো না সোনা। তোমার এক মুহূর্তের অদর্শন আমাকে অধীর করে তোলে। তোমাকে যদি ওরা ফাঁসী দেয় তবে আমিও আত্মঘাতী হবো।

তারপর একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে আবার বলতে থাকে, শোনো আর দেরির কাজ নাই। আজ ভোরেই তুমি প্রাসাদ থেকে এ শহর মুলুক ছেড়ে অন্য কোনও দূর দেশে রওনা হয়ে যাও। আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার মোহর আর আমার কিছু গহনাপত্র দিচ্ছি। আমার একান্ত বিশ্বস্ত এক নফরকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। তুমি যেখানে অবস্থান করবে সে ঐ ঠিকানাটা জেনে এসে জানাবে আমাকে। আমি তোমাকে মাঝে দূত পাঠিয়ে এখানকার হালচাল জানাবো। তার পরে যা করার, দরকার হবে তাই করবো। আমার আশা, বাবাকে আমি এমনভাবে বোঝাতে পারবো যাতে তোমার কোনও মান ইজ্জত একটুও খোয়া না যায় তাদের কাছে।

মারুফ কৃতজ্ঞ হয়ে বললো, আমি যদি বাঁচি তোমার কল্যাণেই বাঁচবো সোনা। এ ছাড়া আর কোনও পথ নাই।

এরপর সে রাতে আর কোনও কথা হলো না ওদের। প্রাত্যহিক রতিরঙ্গ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লো দু'জনে।

শেষ রাতে শাহজাদীর ঘুম ভাঙ্গতেই মারুফকে জাগিয়ে তুললো সে। নিজে হাতে সাজিয়ে গুজিয়ে দিলো এক বান্দার সাজ-পোশাকে। বললো, সাবধানে থেকো। তোমার জন্যে আমি বড় চিন্তায় থাকলাম। মাঝে মাঝে আমার লোক যাবে তোমার কাছে। তার মারফত সব জানতে পারবে।

সকালে দরবারে বসে সুলতান শাহজাদীকে ডেকে পাঠালেন, পাতলা পর্দার আড়ালে এসে বসলো সে। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, কাল রাতে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, বেটী?

শাহজাদী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, আপনার ঐ বুড়ো উজিরের মনস্কামনাই পূর্ণ হয়েছে বাবা।

সুলতান উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন, কী হয়েছে?

শাহজাদী কান্না-বিজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, কাল রাতে খানা-পিনা সেরে আমরা শোবার আয়োজন করছি, এমন সময় এক প্রহরী এসে দরজায় করাঘাত করলো। দরজা খুলতেই সে বললো, প্রাসাদের বাইরে এক দূত এসেছে। সে জামাতা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি বললাম, নিয়ে এসো তাকে এখানে।

দূত এসেছিলো আমার স্বামীর দলের লোকজনদের কাছ থেকে। একখানা চিঠি সে বাড়িয়ে দিলো আমার স্বামীর দিকে। আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। চিঠিখানা পড়া শেষ করে সে একটু হেসে বললো, ও কিছু নয়, পথের মধ্যে বাদাবী ডাকাতরা আক্রমণ করে

আমার পাঁচশো সিপাই বরকন্দাজের চারশোকে ঘায়েল করে হীরে জহরতের প্রায় চল্লিশটা বস্তা এবং কয়েক শো গাঁট কাপড়-চোপড় লুট করে নিয়ে গেছে।

—আমি আঁৎকে উঠলাম, সর্বনাশ!

তিনি কিন্তু মৃদু হেসে চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে বললেন, সর্বনাশ কেন হতে যাবে, সোনা? যা গেছে তার পরিমাণ সাকুল্যে নয় দশ লাখের বেশি হবে না। তার জন্য আমাদের এই মধুরাত্রি বিষাদ করে তুলতে চাই না। তোমার মুখের এক কণা হাসির দাম তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি। ও নিয়ে তুমি ভাবনা করো না। এসো আমরা শুয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি। কাল ভোরে আমাকে একটু সকাল সকাল ডেকে দিও। আমি দূতের সঙ্গে রওনা হয়ে যাব। আমাকে না দেখলে, আমার মুখ থেকে ভরসার কথা না শুনলে আমার লোকজনরা স্বস্তি পাবে না।

তারপর দূতকে বললেন তিনি, তুমি প্রাসাদের ফটকে অপেক্ষা কর। কাল ভোরে তোমার সঙ্গে যাব আমি।

খুব সকালেই তিনি রওনা হয়ে গেছেন। জানি না নসীবে কি আছে। কবে তিনি ফিরতে পারবেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার উজির প্রতিনিয়ত আমার স্বামীর অমঙ্গল কামনা করে এসেছে। আমার বিশ্বাস এ বিপর্যয় তারই অভিশাপে ঘটেছে।

এই বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো না শাহজাদী। দরবার ছেড়ে হারেমে চলে গেলো কাঁদতে কাঁদতে।

সুলতান গর্জে উঠলেন উজিরের ওপর, যত নষ্টের গোড়া তুমি। তোমার অমঙ্গল কামনার জন্যেই এমন বিপদ ঘটতে পারলো, ছিঃ ছিঃ, একি তোমার নীচ প্রকৃতি উজির, অন্যের ভালো একটুও দেখতে পার না তুমি?

মারুফকে পিঠে নিয়ে সুলতানের তাজি ঘোড়া বায়ুবেগে ছুটে চলতে থাকে। মুচির ছেলে মারুফ, জীবনে কখনও ঘোড়ায় চাপেনি। সে কেন তাজির উদ্দামতা সহ্য করতে পারবে? ধীরে ধীরে শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো। অনুতাপ করতে থাকলো, কেনই-বা শাহজাদীকে সে আসল কথা সব খুলে বলতে গেলো? তা না হলে তো প্রাসাদের সুখ-বিলাস ছেড়ে আজ আবার তাকে পথে নামতে হতো না।

এই সব কথা চিন্তা করতে করতে এক সময় সে এক গ্রামের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। তখন সূর্য উঠে গেছে। খিদেও বেশ পেয়েছে। কিন্তু খেয়াল হলো তাড়াহুড়োর মধ্যে আসার সময় সে খানাপিনা কিছু সঙ্গে নিতে বেমালুম ভুলে গেছে।

একটা বাড়ির আঙ্গিনায় দু'টো গরু বাঁধা ছিলো। আর ঘরের দাওয়ায় বসে গৃহস্থ জাবনা তৈরি করছিলো। মারুফ এগিয়ে গিয়ে ডাকলো, এই যে শেখ সাহেব—

গৃহস্থ এগিয়ে এসে সালাম জানিয়ে বললে, খোদা হাফেজ। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি সুলতানের বরকন্দাজ!

মারুফ বললো, হ্যাঁ ঠিকই বুঝেছেন আপনি।

—আমার গরীবখানায় আপনার পায়ের ধুলো দিতে আজ্ঞা হোক!

মারুফ বললো, না শেখসাহেব, খুব তাড়া আছে। সুলতানের জরুরী কাজ নিয়ে বেরিয়েছি। কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। একটু কিছু খাবার দিতে পারেন আমাকে?

শেখ বিশেষ লজ্জিত হয়ে বললো, গোস্তাকি মাফ করবেন মালিক, ঘরে খানা বাড়ন্ত, আপনি যদি মেহেরবানী করে নেমে ঘরে একটু বিশ্রাম করেন তবে আমি ছুটে গিয়ে

পাশের গ্রামের হাট থেকে এক্ষুণি কিছু নিয়ে আসতে পারি। ততক্ষণে আপনার ঘোড়াটাও কিছু দানাপানি খেয়ে জিরিয়ে নিতে পারবে।

মারুফ ঘোড়া থেকে নেমে দাওয়ায় গিয়ে বসলো। গৃহস্থ ছুটলো পাশের গ্রামে হাটে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খানাপিনা কিনে নিয়ে এলো সে। অতিথিকে আদর আপ্যায়ন করে খাওয়ালো। মারুফ খুব খুশি হয়ে তাকে একটা দিনার উপহার দিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো।

চলতে চলতে দুপুর গড়িয়ে গেলো। এক মাঠের মধ্যে এসে এক চাষীকে মাঠে হাল চালাতে দেখে তার কাছে এসে বললো, আমি বড় তৃষ্ণার্ত, একটু পানি খাওয়াতে পারো ভাইসাব।

সুলতানের পাইককে দেখে চাষী সসম্ভ্রমে তাকে স্বাগত জানিয়ে বললো, আপনি মেহেরবানী করে এই গাছতলায় একটু বিশ্রাম করুন মালিক, কাছেই আমার ঘর, যাবো আর আসবো, এই ভর দুপুরবেলায় আপনি এলেন, শুধু পানি তো আর আপনাকে দিতে পারি না, একটু কিছু মুখে দিলে আমি খুব খুশি হবো।

মারুফ বলতে যায়, না না, তার কী দরকার, শুধু একটু পানি পেলেই আমার যথেষ্ট হবে।

চাষী বলে, আপনার যথেষ্ট মনে হলেও আমার তো হবে না জনাব। আপনি একটু বসুন, আমি যাবো আর আসবো।

চাষী হাল রেখে গ্রামের দিকে চলে যায়। মারুফ ভাবে এরা কত ভালো, অতিথি এদের কাছে পীরের মতো। আহা, লোকটা তার চাষের কাজ কামাই করে আমার আহারের জন্য ছুটলো।

মনটা বড় খুঁত খুঁত করতে লাগলো মারুফের। ভাবলো লোকটা যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ সে একটু চাষ করে দেবে ওর জমি।

হালের কাছে গিয়ে বলদ জোড়াকে চালিয়ে সে লাঙল চালাতে থাকলো। এক পাক ঘুরতে না ঘুরতে এক জায়গায় এসে লাঙ্গলের ফলাটা আটকে গেলো। অনেক লাঠি পেটা করেও গরু দু'টোকে এক পা এগোনো গেলো না।

মারুফ বুঝলো মাটির তলায় কোনও পাথরের চাঁই-এ আটকে গেছে লাঙ্গলের ফলাটা। জমির আলে কোদাল রাখা ছিলো। মারুফ সেই কোদাল দিয়ে মাটি কেটে লাঙ্গলের ফলাটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে একটা তামার মোটা পাত্র টেনে তুললো। কৌতুহলী হয়ে আরও দু'চার কোদাল মাটি কেটে তুলতে গিয়ে খন্ খন্ করে একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে অবাক হলো।

একটা শ্বেত পাথরের চাঙ্গড়। অনেক কসরৎ করে পাথরটাকে সরাতেই দেখতে পেলো একটা সুড়ঙ্গ। উঁকি দিয়ে বুঝতে পারলো, একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

সভয়ে সে সিঁড়ি বেয়ে সুড়ঙ্গের নিচে নামতে থাকলো। বিস্ময়ে মারুফের চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। একি অসম্ভব কাণ্ড! সুড়ঙ্গের নিচে প্রকাণ্ড একটা কক্ষ। তার চারপাশে থরে থরে সাজানো অনেকগুলো জালা! সবগুলো সোনার মহরে ভর্তি।

মারুফ একটা দরজা দিয়ে পাশের আর একটা ঘরে প্রবেশ করে। সে ঘরেও অনেকগুলো জালা। সেগুলো কিন্তু সব মুক্তোয় ভরা।

পাশের আর একখানা ঘরে সে দেখতে পেলো জালা জালা ভর্তি সব হীরে চুনী পান্না এবং বহু মূল্যবান সব মণি-মাণিক্য।

পাশে আর একখানা ঘর। সে ঘরে কিছু নাই। একেবারে শূন্য ফাঁকা। শুধু একটি ছোট টুলের ওপর রাখা আছে অতি ক্ষুদ্র পাতিলেবু আকারের একটি স্ফটিকের কৌটো।

এক অজানা আশায় দুলে উঠলো মারুফের বুক। সে অনেক গল্প কাহিনী শুনেছে। এই ধরনের ছোট্ট কৌটোর মধ্যেই নাকি এমন দৈব বস্তু থাকে যার দ্বারা সারা দুনিয়ার ধনরত্ন পলকে হাতের মুঠোয় চলে আসতে পারে।

কৌটোর ঢাকনাটা খুলে সে একটা আংটি পেলো। মীনায় কাজ করা। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন সব লেখা আছে তার ওপর। কিছুই পড়তে বা বুঝতে পারলো না মারুফ। বাঁ হাতের কনিষ্ঠাতে আংটিটা পরে নিলো সে। তারপর হাতের তালু দিয়ে ঘষে মসৃণ করতে চাইলো।

তৎক্ষণাৎ একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এলো মারুফের কানে, আমি এখানেই আছি। দোহাই আপনার, অত জোরে জোরে আর ঘষবেন না আংটিটা। আমার বড় ব্যথা লাগছে। আপনার যা প্রয়োজন মেহেরবানী করে হুকুম করুন, বান্দা তামিল করার জন্য সদাই প্রস্তুত আছে মালিক। যদি বলেন, কোনও বাদশার সারা মুলুক ছারখার করে জ্বালিয়ে দিতে হবে তাও যেমন পারি আবার যদি হুকুম করেন, এক রাতে সাতমহলা প্রাসাদ বানিয়ে দিতে, তাও করে দিতে পারি।

আমার অসাধ্য কিছুই নাই, শুধু আপনি একবার হুকুম করে দেখুন। আমি আপনার দাসানুদাস, এই বিশ্ব-সংসারে যত জিন দৈত্য আছে আমি তাদের সম্রাট। আপনি যা ইচ্ছা করেন আমি তা পলকে পূরণ করে দেব। কিন্তু আপনার কাছে বহুৎ মিনতি অত জোরে ঘষবেন না। বড় ব্যথা লাগে।

মারুফ বুঝতে পারলো তার আঙ্গুলের আংটির ভেতর থেকেই ঐ আওয়াজটা বের হচ্ছে।

—আল্লাহ তুমি এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, কিন্তু কে তুমি?

মারুফের প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, আমি ভাগ্যবিধাতা। এই আংটির ক্রীতদাস। এই আংটি যার কাছে থাকে আমি তারই আজ্ঞাবহ হই। এখন আপনিই আমার একমাত্র প্রভু। আমার অসাধ্য বলে কিছুই নাই। আমি জিন সম্রাট, আমার অধীনে বাহাত্তর জন সেনাধ্যক্ষ, তাদের এক একজনের সেনাবাহিনীতে এককোটি বিশ লক্ষ করে জিন সৈন্য আছে। তারা প্রত্যেকে সহস্র হাতির শক্তি ধরে। এখন আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন কী অসাধারণ আমার ক্ষমতা! তবে বলতে পারেন, তা হলে কেন আমি আপনার কাছ এমন দাসত্ব স্বীকার করছি কাতর ভাবে। তার উত্তর—আপনার হাতেই আমার জীবন। এই আংটি আমার হৃৎপিণ্ড। এটাকে যদি আপনি নষ্ট করে ফেলেন, আমার মৃত্যু ঘটবে। সেই কারণে এখন যে আপনিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা। আপনাকে প্রসন্ন রাখাই আমার একমাত্র কাজ। আপনি আজ্ঞা করুন, প্রভু আমি আপনাকে সন্তুষ্ট রাখতে চাই। তবে একটা কথা, আপনি কিছুতেই দ্বিতীয়বার ঘর্ষণ করবেন না এই আংটির মীনা। তাতে আমার দেহে আগুন ধরে যাবে এবং চিরকালের মতো আপনি আমাকে হারাবেন। আমি দেহত্যাগ করবো তৎক্ষণাৎ।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো সাতষট্টিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মারুফ বলে, শোনও ভাগ্যবিধাতা, তোমার সব কথাগুলো আমি মন দিয়ে শুনেছি। মগজে তা গাঁথা হয়ে থাকবে। আচ্ছা একটা কথা বলতে পার, কে তোমাকে এই পাতালপুরীতে এই কৌটোর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলো?

আংটি-দৈত্য বললো, এখন আমরা যেখানে আছি এটা সাদ্দাত ইবন আদেবের সেই

বিখ্যাত রত্নাগার। তার আমি পেয়ারের বান্দা ছিলাম। এই আংটিটা তিনি হাতে ধারণ করতেন সব সময়।

মারুফ বললে, আচ্ছা বান্দা, তুমি কি এই সুড়ঙ্গের সমস্ত ধনরত্ন আমার নির্দেশমতো এখান থেকে অনত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পার?

—কেন পারবো না মালিক? আপনি হুকুম করুন।

—তা হলে তাই কর। এখুনি এখানকার সব ধনরত্ন উপরে নিয়ে চলো। এককণাও কিছু রেখে যাবে না। আমার পরে যারা আশায় আশায় আসবে তারা যেন কিছুই না পেতে পারে।

মারুফ দেখলো বারটি তাগড়াই জোয়ান ছেলে এসে দাঁড়ালো তার সামনে তাদের প্রত্যেকের মাথায় বিরাট বিরাট বাক্স। তিনটি ঘরের জালা থেকে ঢেলে সমুদয় হীরে চুনি পান্না মুক্তো মোহর মণিমাণিক্য বোঝাই করলো ঐ বাক্সগুলোয়। তারপর মারুফকে অভিবাদন জানিয়ে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আংটিকে উদ্দেশ করে মারুফ বললো, চমৎকার! এবার আমার অনেকগুলো গাধা খচ্চর উট চাই। আর চাই পাইক বরকন্দাজ, নফর চাকর এবং সহিস। এই সব সামানপত্র ইকতিয়ান অস খতানে নিয়ে যেতে হবে।

আংটির দৈত্য একটা হাঁক ছাড়তে এক পাল উট খচ্চর ও নফর চাকর পাইক বরকন্দাজ সহিসরা এসে হাজির হলো সেখানে।

মারুফের নির্দেশে বাক্সগুলো উটের পিঠে চাপানো হলো। তারপর তারা যাত্রা করলো ইকতিয়ানের পথে।

মারুফ বললো, শোনও বান্দা, এবার আমার আরও হাজারখানেক জানোয়ার চাই। তাদের পিঠে বোঝাই থাকবে দামী দামী রেশমী কাপড়ের গাঁট। সে সব কাপড় সংগ্রহ করতে হবে সিরিয়া, মিশর, গ্রীস, পারস্য, হিন্দুস্তান এবং চাইনা থেকে। সেখানকার সবচেয়ে সেরা সেরা জিনিস ছাড়া চলবে না।

মারুফের মুখের কথা শেষ হতে না হতে হাজার খানেক উট গাধা খচ্চরের একটা পাল আবির্ভূত হলো সেখানে। তাদের পিঠে ভারি ভারি কাপড়ের গাঁট।

মারুফ এই বিশাল লটবহর নিয়ে ইকতিয়ানের পথে রওনা হয়ে যাবে, এমন সময় ঐ চাষী দু'খানা রুটি একটু নুন লঙ্কা পেঁয়াজ নিয়ে উপস্থিত হলো সেখানে। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এলাহী ব্যাপার কি করে সংঘটিত হতে পারলো, কিছুতেই সে আন্দাজ করতে পারলো না।

মারুফ হাসতে হাসতে চাষীকে বললো, কী খুব অবাক হয়ে গেছ না? তা অবাক হওয়ার মতোই তো ব্যাপার।

চাষী কুণ্ঠিত হয়ে বললো, আপনি যে স্বয়ং সুলতান, তা তো আমি বুঝতে পারিনি জাঁহাপনা। তা হলে এই আধপোড়া রুটি আর পেঁয়াজ আপনার জন্য না এনে আমার ঘরের দু'টো পোষা মুরগী মেরে খানা পাকিয়ে এনে দিতাম।

মারুফ বলে, তাতে কি হয়েছে। তোমার এই শুকনো রুটি পেঁয়াজই আমি বড় তৃপ্তি করে খাবো ভাইসাব। কই দাও আমার হাতে।

মারুফ দু'খানা রুটি আর একটা পেঁয়াজ নিয়ে মুখে পুরে দিলো।

—তোমাদের এই আন্তরিকতা কোনও পয়সা দিয়ে কেনা যায় না, দোস্ত! পোলাও মাংস তো রোজই খাই, কিন্তু আজ যা খেলাম তা অমৃত ; মনে থাকবে অনেক কাল।

মারুফ বিদায় নেবার সময় বললো, আচ্ছা চলি ভাইসাব। আমি নিজে সুলতান নই এখনও, তবে সুলতানের জামাতা বটে। ভবিষ্যতে তাঁর অবর্তমানে হয়তো আমিই সুলতান হয়ে

মসনদে বসবো একদিন। তখনও তোমার এই আতিথ্যের কথা মনে থাকবে আমার। আমি সুলতান বা সুলতানের জামাতা সে কথা তো তুমি জানতে না। তা সত্ত্বেও তো এক অচেনা অজানা পরদেশী পথচারীকে আপ্যায়ন করার জন্য তোমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো. হাতের কাজ ফেলে তার সেবার জন্য ছুটে গিয়েছিলে ঘরে! এমনটা ক'জনে করে আজকাল? মানুষ হিসেবে তুমি অনেক অনেক বড়। তোমার মতো দাতার প্রাণ ক'জনের হয়?

—এবার তোমাকে আমি ভালোবেসে কিছু উপহার দিয়ে যেতে চাই চাষীভাই। এই যে যত লটবহর দেখছো সামনে—সব আমার। আমিই তার একচ্ছত্র মালিক। এখন বলো, কী তোমার চাই? এক জোড়া উট, এক জোড়া গাধা আর এক জোড়া খচ্চর তুমি নাও। তোমার জমি-খামারের কাজে লাগবে! আর এদের পিঠে যে সব গাঁট দেখছো তার মধ্যে আছে মূল্যবান সব রেশমী কাপড়। এগুলোও তোমাকে দিয়ে গেলাম। এ দ্বারা তুমি তোমার জমিজমা কিছু বাড়াতে পারবে। চাই কি ব্যবসা বাণিজ্য করেও মুনাফা করতে পারবে।

এরপর যাত্রা শুরু হলো ইকতিয়ানের পথে।

যথাসময়ে শহর সীমান্তে এসে পৌঁছলো মারুফ। দূত খবর বয়ে নিয়ে গেলো সুলতানের দরবারে। মারুফ সেখানে দল-বল নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

দূত যখন দরবারে প্রবেশ করলো তখন উজির আর সুলতানের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা চলছিলো ঃ

উজির বলছিলো, জাঁহাপনা আর কতকাল অলীক চিন্তায় বসে বৃথা কালক্ষয় করবেন? আপনার জামাতা মহামান্য আমীর প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করেছে। আগাগোড়াই সে আপনাকে ধাপ্পা দিয়ে গেছে। লোক-লস্কর লটবহর কিছুই তার নেই—কিছুই এসে পৌঁছবে না। আমরা তাকে সন্দেহ করেছি এটা বুঝতে পেরেই সে প্রাসাদ থেকে কৌশলে কেটে পড়েছে।

উজিরের কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না সুলতান। বলেন, হুম, আমাকে এমনভাবে ধোকা দিয়েছে সে? কিন্তু কোথায় পালাবে? কোথায় গিয়ে বাঁচতে পারবে? এখুনি দিকে দিকে সৈন্য পাঠাও। যেখানেই সে পালিয়ে যাক ধরে নিয়ে আসতে বলো!

এই সময় মারুফের দূত যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে সুলতানকে উদ্দেশ করে বললো, আমি আমীর মারুফের বান্দা! তার বার্তা বহন করে এনেছি আপনার কাছে। তিনি লোক-লস্কর ও লটবহর নিয়ে আমার পিছনে পিছনে আসছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই শহর সীমান্তে এসে পৌঁছবেন। আপনাকে এই সংবাদ জানাবার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

সুলতান আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন উজিরের ওপর।

—এই তুমি—তুমিই যত নষ্টের গোড়া! তোমার বুদ্ধিতেই আমি বিভ্রান্ত হয়ে তাকে ধরে আনবার জন্য সৈন্য পাঠাতে যাচ্ছিলাম। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা!

হারেমে কন্যার মহলে এলেন সুলতান।

—মা জননী, সুখবর আছে। মারুফ তার দলবল নিয়ে এসে পৌঁচচ্ছে একটু পরেই। আমি জানতাম সে আসবেই। তার মতো সৎ মানুষ সত্যিই আমি দেখিনি। যাই তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি গে।

এই বলে সুলতান দ্রুতপায়ে মহল ছেড়ে চলে গেলেন। শাহজাদীর মুখে চোঁখে দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে এলো। এ আবার কী হলো? মুচির ছেলের মাথায় আবার কি নতুন ফন্দি গজালো? কিন্তু যত নতুন চালই সে দিক তাতে তো কোন কাজ হবে না। ঐ শয়তান উজিরের জেরার মুখে পড়ে তার সব ফিকিরই ফাঁস হয়ে যাবে। উফ্, তারপর যে কী ঘটবে তা আর ভাবতে

চায় না শাহাজাদী। লোকটা আসলে অত্যন্ত ভালো মানুষ, সহজ সরল। কিন্তু তার নিজের ধারণা, তার মতো চালাক আর কেউ নয়।

শাহজাদী ভেবে পায় না, তাকে বার বার বারণ করা সত্ত্বেও কেন সে আবার আসছে। শাহজাদী তো তাকে বলেছিলো সবদিক ব্যবস্থা করে সে-ই তাকে খবর পাঠাবে। সেই সময় পর্যন্ত সে ধৈর্য ধরে থাকতে পারলো না।

আবার সে ভাবে, ধৈর্য্য ধরে সে থাকবেই বা কী করে? সে নিজেও তো পাগলিনী-প্রায় হয়ে উঠেছে। ভালোবাসা এমন বস্তু যা কোনও বাধাকেই বাধা মনে করে না, কোনও বিপদকেই বিপদ জ্ঞান করে না। সেও এখন বোধ হয় উদভ্রান্ত প্রেমিক হয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটে আসছে এখানে।

কিন্তু এখানে এলে তো তার মৃত্যু অবধারিত। না, সে কি ভেবেছে, বাবার কাছে সে অকপটে সব কথা খুলে বলে নিজের দৈন্য তুলে ধরে প্রাণ ভিক্ষা করবে? তা যদি করতে যায় সে, তবে তার চেয়ে আহম্মকীর আর কিছুই হবে না। সরল সত্যকথা বলে সুলতানের ক্রোধ প্রশমিত করা যাবে না। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কী যে ঘটতে পারে তা বোধহয় ঐ বোকাটা আন্দাজ করতে পারেনি, তাই ছুটে এসেছে আবার।

সুলতানের নির্দেশে প্রাসাদ এবং সারা শহর আলোর মালায় সাজানো হলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তোরণ-দ্বার স্থাপন করা হতে লাগলো। শহরের সবাই উন্মুখ হয়ে রইলো আমীর মারুফকে দেখবার প্রত্যাশায়।

মারুফের বন্ধু মহম্মদ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। সর্বনাশ, এ তো আত্মঘাতী ব্যাপার ঘটাতে চলেছে মারুফ। সে সামান্য মুচির সন্তান। অথচ চালবোল দিয়ে সুলতানকে বুঝিয়েছে সে জগৎ বিখ্যাত বণিক সওদাগর। সত্য ঘটনাটা যখন উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে তখন বেচারার কী দশা হবে। ও কি জানে না সুলতানের সঙ্গে প্রতারণা করার কী কঠিন সাজা?

কিন্তু মহম্মদ হতভম্ব হয়ে গেলো যখন দেখলো সত্যি সত্যিই মারুফ বিশাল এক বাহিনী নিয়ে শহরের পথ দিয়ে এগিয়ে চলছে। সুলতানের উজির আমীর সেনাপতিরা স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে বরণ করে প্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছে। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারে না মহম্মদ।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে বসে রইলো চুপ করে।

নয়শো ঊনসত্তরতম রজনী ঃ আবার সে বলতে থাকে ঃ

প্রাসাদে পৌঁছলে সাদর অভ্যর্থনা করে সুলতান তাঁর পাশে এনে বসালো মারুফকে।

মারুফ তার নফরদের বললো, প্রথমে হীরে জহরতের বাক্সগুলো এনে এখানে খোলো।

সুলতানসহ দরবারের সবাই তাজ্জব হয়ে দেখতে থাকলো সেই অভাবনীয় ঐশ্বর্য।

মারুফ সে সব দু'হাতে বিতরণ করতে লাগলো উপস্থিত আমীর উজির এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে। সুলতান রাগে ফুঁসতে লাগলেন, ইস্ জামাইটা কী আহম্মক! এমন সব অমূল্য মণিরত্ন এইভাবে নয় ছয় করে বিলোচ্ছে সে। কিন্তু মুখ ফুটে কথাটি বলার সাহস হলো না তাঁর।

কিন্তু এক এক করে যখন প্রায় গোটা পাঁচেক বাক্স উজাড় হয়ে গেলো তখন আর মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে পারলেন না তিনি।

—থাক থাক অনেক হয়েছে বাবা, আর বিলিয়ে কাজ নাই। এভাবে দানছত্র করলে শেষ পর্যন্ত আমাদের থাকবে কী?

কিন্তু মারুফ হাসতে হাসতে বললো, আপনি উতলা হবেন না আব্বাজান, আমার ভাঁড়ার শেষ হবার নয়।

কিছুক্ষণ পরে উজির এসে জানালো, জাঁহাপনার কোষাগার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আর তিল ধারণের স্থান হবে না।

সুলতান বললেন, প্রাসাদের অন্য একটা মহল খালি করে নিয়ে তাতে রাখবার ব্যবস্থা কর।

মারুফ বললো, শুধু একটাতে হবে না জাঁহাপনা, আপনি আরও চার পাঁচটা বড় বড় কামরা খালি করার হুকুম দিন। আমার সব সামানপত্র তাতেও ধরবে কিনা সন্দেহ আছে।

রাত্রে শাহজাদীর ঘরে এসে মারুফ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়লো। একদিনে কেঁদে কেঁদে মুখ চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে সে। স্বামীর অদর্শন বিরহ তাকে কাবু করে ফেলেছিলো খুবই। এখন তার অভিমান প্রতিহত হয়ে বর্ষার মতো ঝরে পড়তে লাগলো।

—তুমি আমার সঙ্গেও ছলনা করতে পেরেছ, সোনা? এটা কি তোমার উচিত হয়েছিলো।

মারুফ অবাক হয়ে বলে, তোমার সঙ্গে ছলনা? হায় আল্লাহ, একি কথা শোনালে আমায়? খোদা কসম তোমার কাছে কোনও কথা লুকাইনি আমি?

—লুকাওনি? মিথ্যেবাদী কোথাকার। কেন তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়ে বলেছিলে, তুমি এক দীন দরিদ্র মুচির ছেলে? কেন বলেছিলে, তুমি আমার বাবাকে ধাপ্পা দিয়ে আমাদে শাদী করেছ? উজির যখন বাবাকে বিষিয়ে দিচ্ছিল তখন তুমি কোনও প্রতিবাদ করলে না কেন? কেন আমার পরামর্শে প্রাসাদ থেকে পালাবার ছল করে সরে পড়লে? কেন? কেন?

দু হাতে এলোপাতাড়ী কিল বসাতে লাগলো সে মারুফের বুকে পিঠে।

মারুফ হাল্কা হাতে ঠেকাবার চেষ্টা করতে করতে বলে, আহা শোনই না আমার কথা!

—না না, আমি শুনবো না, কিছুতেই শুনবো না। তুমি একটা ঠগ্ প্রতারক্ ধাপ্পাবাজ।

মারুফ এবার শাহাজাদীকে শান্ত করার জন্য একটু শক্ত হাতে বুকের সঙ্গে লেপ্টে ধরে অধরে অধর রাখে। মুহূর্তে সব দাপাদাপি শেষ হয়ে যায় শাহজাদীর। সেও দু'হাতে জড়িয়ে ধরে স্বামীকে।

তারপর শান্ত নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়।

তারপর আবার ঝড় ওঠে। সে ঝড়ের দাপাদাপিতে কোথায় যে কিভাবে তছনছ ছিন্ন ভিন্ন ছত্রাকার হয়ে যায় সব, তার আর খেয়াল থাকে না কারো।

প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে গেলে মারুফ শাহজাদীকে নিজের হাতে জড়োয়ার গহনা পরিয়ে দিতে থাকে। গলায় সাতনরী মুক্তোর মালা। নাকে হীরের নাকছাবি, কানে চুণী পান্নার মাকড়ী, কোমরে রত্নবিছা, পায়ে হীরে বসানো মল, হাতে বাজুবন্ধ, বাহুতে সাপের মাথার মণি বসানো তাগা, মাথায় টায়রা, আর কত কী?

মারুফ বলে, আমার যত আছে রোজ এক প্রস্থ করে নতুন নতুন গহনা এবং সাজ-পোশাক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরতে পারবে। কোনওটা ঘুরিয়ে পরার দরকার হবে না, মণি।

শাহজাদী বলে, এ সবে আমার তেমন আসক্তি নাই, সে তো আমাকে ভালো করেই পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছ। সোনা, আমি চাই তুমি আমার বুকে থাকবে জিন্দগী ভর। আমি তোমার বাঁদী হয়ে সেবা করবো—এই আমার একমাত্র সাধ!

পরদিন খুব ভোরে সুলতান এসে করাঘাত করলেন দরজায়।

দরজা খুলে সুলতানকে উদভ্রান্ত পাণ্ডুর অবস্থায় দেখে শাহজাদী বিস্ময়াহত হয়ে বাবাকে হাতে ধরে একটা কুর্শিতে বসায়।

—কী হয়েছে বাবা, তোমাকে এমন উদ্বিগ্ন দেখছি কেন?

একটা বাটিতে করে খানিকটা জল এনে সে সুলতানের চোখে মুখে ছিটিয়ে দেয়। সুলতান হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে বলে, বড়ই দুঃসংবাদ বেটী। ভাবছি, তোমাদের এই সুখ-মিলনের মুহূর্তে তা বলা ঠিক হবে কিনা।

মারুফ এগিয়ে এসে বলে, আপনি কোনও রকম দ্বিধা সঙ্কোচ না করে খুলে বলুন বাবা, কী হয়েছে?

সুলতান বলে, তোমার লোকজন যারা লটবহর সঙ্গে করে এনেছিলো তারা সংখ্যায় হাজারেরও বেশি হবে। এই এক রাতের মধ্যে তারা কীভাবে কোন দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেছে আমার সদা জাগ্রত প্রহরী কেউই কিছু বলতে পারছে না। শহরের কোনও লোকেরও চোখে পড়েনি তাদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়া। এ তো একেবারে ভুতুড়ে কাণ্ড! কিছুই আমি বুঝতে পারছি না, এমন এক অসম্ভব কাণ্ড ঘটলো কি করে? আমি ভয়ে মরছি, তোমার কাছে এর কৈফিয়ৎ নেব।

মারুফ হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—আপনি ও নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করবেন না, বাবা। ওরা যথাস্থানেই চলে গেছে। এবং হঠাৎ ওদের এই অন্তর্ধানে মোটেই আমি অবাক হইনি। আবার আমি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে আবার তারা এসে হাজির হবে এখানে। ওদের কোনও অনিষ্ট হয়নি, বেশ বহাল তবিয়তেই সবাই স্বদেশে ফিরে গেছে।

একথা শুনে সুলতান কৌতুক বোধ করলেন। এমন মজার ব্যাপার উজিরকে না বলে কি পারেন তিনি?

—এ সব শুনে তোমার কী মনে এখনও সন্দেহ জাগছে উজির, আমার জামাতা যে সে লোক নয়! তার ওপর আল্লাহর অশেষ করুণার দৃষ্টি আছে। না হলে এমন অসম্ভব কখনও সম্ভব হতে পারে?

উজির মনে মনে বললো, এইবার মওকা পেয়েছি। কি করে প্রতিশোধ নিতে হয় এবার দেখিয়ে দেব বাছাধনকে।

সুলতানকে উদ্দেশ করে সে বলে, জাঁহাপনা, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে। আপনি যদি শোনেন তবে আমার ধারণা, আপনার মনের আঁধার কেটে যাবে।

— বলো কী বলতে চাও?

—এতো ধন-দৌলতের উৎস কোথায়, তা যদি জানতে চান তবে আমীর মারুফকে মাতোয়ারা করে দিতে হবে। তাহলে তিনি নিজেই আপনাকে বলে দেবেন এর গুপ্ত রহস্যের কথা। যখন তিনি সরাবের নেশায় নাচতে থাকবেন তখন আপনি তাঁকে কায়দা করে প্রশ্ন করবেন। এবং দেখবেন তখনই সে গড় গড় করে বলে দেবে সত্যি কথাটা।

সুলতান লাফিয়ে উঠলেন, বাঃ চমৎকার মতলব এঁটেছো তো উজির!

সেইদিনই সন্ধ্যাকালে, সুলতান মারুফ এবং উজিরকে সঙ্গে নিয়ে পানাহারে বসলেন।

একে একে অনেকগুলো পাত্র উজাড় করে দিলো মারুফ। ক্রমে নেশা জমে উঠলো। এবং একটু পরে কথা জড়িয়ে আসতে লাগলো তার। কারণে অকারণে হাসির গমকে গড়িয়ে পড়তে থাকলো সে। সুলতান সুযোগ বুঝে মারুফকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বেটা, তোমার জীবনের বিচিত্র অভিযানের কোনও কাহিনীই শোনা হয়নি এতদিন। আজ শোনাবে?

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো সত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

নেশার ঘোরে আগাগোড়া সব কাহিনী বলে গেলো মারুফ। কাইরোত এক দরিদ্র মুচির ঘরে তার জন্ম, তার দজ্জাল বৌ, তার অমানুষিক অত্যাচার, বাড়ি থেকে পলায়ন—ইত্যাদি ইত্যাদি। সব শেষে কীভাবে তার ভাগ্য পরিবর্তন ঘটলো—কী করে সে দৈব আংটি পেয়ে রাতারাতি বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হতে পারলো—সব কাহিনীই আদ্যোপান্ত বলে গেলো সে গড় গড় করে।

সুলতান এবং উজির উন্মুখ হয়ে তাকালেন মারুফের হাতের দিকে। উজির বললো, আমীর সাহেব, ঐ আংটিটা একবার দেখিয়ে আমাদের চোখকে ধন্য করবেন?

মারুফ বলে, অবশ্যই।

এই বলে নির্বোধ মারুফ সেই মহামূল্য আংটিটা খুলে শত্রু উজিরের হাতে তুলে দিলো।

—এই নিন, এই আংটির মধ্যেই বাস করে ঐ জিন দৈত্য।

প্রায় ছোঁ মেরে আংটি মারুফের হাত থেকে তুলে নেয় উজির। নিজের আঙ্গুলে পরে নিয়ে ঘর্ষণ করে।

সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীর সেই কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—এই তো আমি এখানে, আদেশ করুন মালিক, কী করতে হবে? যদি বলেন কোনও এক সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিতে পারি, অথবা গড়ে দিতে পারি এক বিশাল শহর সলতানিয়ত। অথবা যদি হুকুম করেন এনে দিতে পারি কোনও সুলতান বাদশাহর শির।

উজির বললো, শোনও আংটির বান্দা, এই খানকীর ছেলে সুলতান আর এই মুচিটাকে এখুনি নিয়ে গিয়ে রেখে এসো এক উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে সুলতান এবং মারুফ শোঁ শোঁ করে ওপরে উঠে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

উজির দরবারে গিয়ে তখতে বসলো। উপস্থিত আমির ওমরাহ সৈন্যধ্যক্ষদের বোঝাতে লাগলো, ঐ অপদার্থ সুলতান এবং তার জামাই এই দেশটাকে রসাতলে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। আমি তাদের ঊষর মরুভূমিতে নির্বাসন দিয়েছি। এখন থেকেই আমিই তোমাদের সুলতান। আমাকে যদি তোমরা সহজভাবে মেনে নাও অতি উত্তম। কিন্তু যদি কেউ বিদ্রোহ করার চেষ্টা কর তবে জেনে রেখ মউৎ, তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দরবারের কেউই একথার প্রতিবাদ করতে সাহস করলো না। এরপর উজির শাহাজাদীর কাছে সংবাদ পাঠালো, আমাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও, শাহজাদী। এতদিন ধরে তোমাকে পাওয়ার জন্যই আমি আকুল হয়ে আছি।

শাহজাদী পূর্বাহ্নেই খবর পেয়েছিলো, উজির বিদ্রোহ করে তার বাপ এবং স্বামীকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। সে বুদ্ধিমতী মেয়ে, খোজা নফরকে দিয়ে খবর পাঠালো, আমি আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আপনি এই বাঁদীকে পায়ে আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ করুন। কিন্তু একটা কথা বলতে শরম হচ্ছে, এখন আমি রজস্বলা হয়েছি। এই অপবিত্র দেহ ক'টা দিন আপনার ভোগে লাগবে না। আমি যখন শুদ্ধ হবো তখন আপনাকে খবর দেব।

উজির বলে পাঠালো, ওসব মাসিক-ফাসিক আমি জানি না, জানতে চাই না, আজই এক্ষুনি আমি তোমাকে সম্ভোগ করতে চাই। আমি যাচ্ছি, তুমি প্রস্তুত থেক।

শাহজাদী জানালো, বেশ আপনার যদি অরুচি না হয় আমার আর আপত্তি কিসের? আসুন, নিজের চোখেই দেখে যান।

খুব দামী সাজ-পোশাকে নিজেকে সাজালো সে। দুষ্প্রাপ্য আতরের খুশবু মেখে নিলো সারা অঙ্গে।

উজির এলো। লাস্যময় বিলোল কটাক্ষ হেনে হাসিমুখে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে কোনও ত্রুটি রাখলো না শাহজাদী।

—আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য! এই মধুময় রাত্রিটির জন্য আমি কত কাল ধরে প্রত্যাশা করে বসেছিলাম। এতদিনে সে সাধ আমার আজ পূর্ণ হবে—এ আনন্দ আমি রাখবো কোথায় প্রভু!

এরপর সে ধীরে ধীরে তার অঙ্গবাস ছেড়ে ফেল্বতে আরম্ভ করে।

হঠাৎ শাহজাদী আর্তনাদ করে উঠে বোরখা টেনে নিয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। উজির উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী? কী ব্যাপার অমন চিৎকার দিয়ে উঠলে কেন?

—আপনি কী? একটা অচেনা পরপুরুষের সামনে আমাকে বিবস্ত্রা হতে বলছেন?

উজির ঘরের এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করতে থাকে।

—কই কাউকেই তো দেখছি না, শাহজাদী। তুমি আমি ছাড়া ঘরে তো তৃতীয় প্রাণী কেউ নেই?

শাহজাদী বললো, নেই মানে? আপনার ঐ আংটির ভিতরে একটা আস্ত দৈত্য বসে আছে, আর বলছেন কেউ নেই?

উজির লজ্জিত হয়ে বললো, ইয়া আল্লাহ, একথা তো আমার খেয়ালই ছিলো না একেবারে। হুঁ, তাইতো, এই বান্দাটা চুরিয়ে চুরিয়ে সব দেখে ফেলতে পারতো আমাদের কাজ কারবার? ছিঃ ছিঃ, কি বে-শরম ব্যাপার হতো বলতো, শাহজাদী? ভাগ্যে তুমি খেয়াল করেছিলে! দাঁড়াও, এটাকে খুলে বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রাখছি। তা হলে তো আর দেখতে পারবে না ব্যাটা।

শাহজাদী বললো, তা বটে। বালিশের নিচে চাপা পড়ে থাকলে আর দেখবে কি করে?

আংটিটা খুলে বালিশের নিচে চাপা দিয়ে রেখে উজির উদগ্র কামনা নিয়ে শাহজাদীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ঠিক এই সময় তাক বুঝে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি বসিয়ে দেয় শাহজাদী। একেবারে উজিরের বিচির উপর। অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে যায় সে মেঝের উপর। এবং সেই সুযোগে বালিশের তলা থেকে টুক করে আংটিটা তুলে নিয়ে নিজের হাতের আঙ্গুলে পরে নিয়ে আস্তে একবার ঘর্ষণ করে শাহজাদী।

—বান্দা আপনার সামনেই আছে, হুকুম করুন মালকিন!

শাহজাদী বললো, এই শয়তানটাকে অন্ধকার কূপ-কারাগারে নিক্ষেপ কর। তারপর আমার বাবা এবং স্বামীকে নিয়ে এসো এই প্রাসাদে। দেখো, তাদের যেন কোনও তখলিফ না হয়।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো একাত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

তৎক্ষণাৎ উজিরকে দলা পাকিয়ে তুলে নিয়ে যায় অদৃশ্য দানব। এবং পর মুহূর্তেই শাহজাদী দেখলো, তার বাবা এবং স্বামী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—তোমার খুব কষ্ট হয়েছে না?

শাহজাদী বাবা এবং স্বামীর কাছে এগিয়ে আসে।

সুলতান বলে, হ্যাঁ তা বেশ হয়েছে। ধূ ধূ করা উত্তপ্ত মরুপ্রান্তরে কোথাও একবিন্দু পানির চিহ্ন নাই। তবে অনেক ভাগ্য যে অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়ে আনতে পেরেছ তুমি। না হলে দু-একদিনের মধ্যেই মরতে হতো সেখানে। কিন্তু মা, এমন অসাধ্য সাধন কী করে করলে তুমি। উজিরের হাত থেকে তোমার হাতে এলো কী করে ঐ আংটিটা?

শাহজাদী বললো, সে সব কথা পরে বলছি বাবা, আগে তোমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে খানাপিনা করে নাও।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে উজিরের বদমাইশির সব কাহিনী সবিস্তারে বললো শাহজাদী। সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলেন। ওকে আমি ফাঁসী দেব, আগুনে পুড়িয়ে মারবো। কী বলো, মারুফ?

—তাই করুন বাবা, ও লোকের আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নাই।

তারপর শাহজাদীর দিকে হাত বাড়িয়ে সে বললো, কই আমার আংটিটা আমাকে দিয়ে দাও, মণি।

শাহজাদী ভ্রুকুটি হেনে বললো, না, এটা আমার কাছেই থাকবে। তোমার হাতে থেকেই তো এই বিপত্তি ঘটলো। তোমাকে দিলে আবার কখন কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে কে জানে। তার চেয়ে আমার কাছেই থাক।

মারুফ বললো, তা যা বলেছ। আমি তো ছাই অত প্যাঁচ পয়জার বুঝি না। কখন কে ঠকিয়ে হাতিয়ে নেবে কে জানে। থাক, ওটা তোমার কাছেই থাক।

পোলো মাঠে উজিরের ফাঁসীর মঞ্চ তৈরি করা হলো! তার নিচে সাজানো হলো কাঠের লকড়ি। এবং তাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো আগুন। হাজার হাজার শহরবাসীর উপস্থিতিতে উজিরের জীয়ন্ত দেহটা লেলিহান অগ্নিশিখায় পুড়ে আংরা হয়ে গেলো মুহূর্তে।

সুলতান মারুফকে সিংহাসনে বসিয়ে শাসনভার তুলে দিলেন তার হাতে। আংটিটা শাহজাদীর হেফাজতেই রয়ে গেলো। এরপর মারুফ সুখে শান্তিতেই বেশ কিছুকাল কাটালো।

কিন্তু বিপদ ঘটলো একদিন রাত্রে।

প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে নিজের কামরায় এসে সবে শুয়ে পড়েছে, এমন সময় অতর্কিতে এক আধবুড়ো মেয়ে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার গায়ের ওপর। বাঘিনীর মতো সে হুঙ্কার ছাড়লো। মারুফের দাড়িগুচ্ছ মুঠি করে ধরে বেদম ঘুষি চালাতে লাগলো। ফলে, তার আরও দু'খানা দাঁত ভেঙ্গে পড়ে গেলো তক্ষুণি।

এই অর্ধ বুড়িটা যে কে তা নিশ্চয়ই আপনাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি?

মারুফের বৌ ফতিমা খুঁজতে খুঁজতে এতো দূর দেশ অবধি চলে এসেছে।

—হুম, তুমি ভেবেছ, দেশ ছাড়া হয়ে পালিয়ে বাঁচবে? আমাকে না বলে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুবার কী করে তোমার সাহস হলো সেই কৈফিয়ত আমার চাই। ওরে কুত্তার বাচ্চা, তুই কি ভেবেছিলি পালিয়ে নিস্তার পাবি আমার হাত থেকে? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব তোর, শয়তান, বেল্লিক কোথাকার!

মারুফ কোনও প্রকারে ফতিমার কব্জা থেকে নিজেকে মুক্ত করে চোঁচা দৌড় দিয়ে শাহজাদীর ঘরে এসে ঢুকে পড়ে। মাথার টুপী উড়ে গেছে গায়ের কামিজ আধখানা ফতিমার হাতের মুঠোতেই রয়ে গেছে। পায়ে চটি নাই।

শাহজাদী মারুফের এই উদভ্রান্ত, আতঙ্কিত মূর্তি দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, কী হয়েছে? তোমার এ দশা হলো কী করে?

—আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও সোনা। এই বলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো শাহজাদীর পায়ের তলায়।

একটা বাটিতে করে জল এনে স্বামীর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতে থাকে শাহজাদী। একটু পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকায় মারুফ। ঠিক এই সময় দজ্জাল ফতিমা রণমূর্তি ধরে শাহজাদীর কামরায় ঢুকে পড়ে চড়া গলায় জিজ্ঞেস করে, কোথায় সেই খানকীর বাচ্চা, আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন দেখে নেব আমি।

তারপর শাহজাদীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে দাঁত কড়মড় করে চোখ পাকিয়ে তাকায়, হুম, তাহলে তুমিই সেই মেয়েমানুষ। দাঁড়াও তোমারও ওষুধের ব্যবস্থা করছি।

শাহজাদী বুঝতে পারলো উন্মাদ মেয়েছেলেটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেই মুহূর্তে সে আংটিটা ঘষে দৈত্যকে হুকুম করলো, ঐ মেয়েটাকে পাকড়াও কর যেন সে আমার ওপর চড়াও হতে না পারে।

ফতিমা প্রাণপণে কসরৎ করেও নিজের হাত পা এক চুল এদিক ওদিক করতে পারে না। ক্রোধে দাঁত কড়মড় করতে পারে শুধু। চোখ দু'টো ভাটার মতো জ্বলতে থাকে।

মারুফ এগিয়ে আসে ফতিমার কাছে। কিন্তু তার সেই বীভৎস ভাবে দাঁত মুখ খিঁচানো দেখে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

শাহজাদী আংটির দৈত্যকে বলে, ওকে এবার বাগানে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে দাও।

এরপর ফতিমার কি হয়েছিলো জানি না, তবে মারুফ আর শাহজাদী সুখে সম্ভোগের মধ্যে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলো দু'জনে।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে থামলো।

সুলতান শারিয়ার বললো, রাত তো এখনও অনেক বাকী। আর একটা আরম্ভ কর শাহরাজাদ। তোমার গল্প শোনার নেশা আমায় পেয়ে বসেছে।

শাহরাজাদ বলে, সে তো আমার সৌভাগ্য, জাঁহাপনা! আপনি যত দিন শুনতে চাইবেন ততদিনই তো আমি বেঁচে আছি। আমি যেদিন আপনার মনমতো কিস্‌সা শোনাতে পারবো না সেইদিনই তো আমার দিন শেষ হয়ে যাবে।

থাক ওকথা। এবার নতুন কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

আলেকজান্দ্রা শহরে একটি যুবক বাস করতো। উত্তরাধিকারী সূত্রে পিতার কাছ থেকে সে প্রচুর ধনরত্ন এবং বিষয় সম্পত্তি লাভ করে। এর মধ্যে ছিলো পর্যাপ্ত জলের সরবরাহযুক্ত অপর্যাপ্ত জমি, অগুনতি পাকা ইমারত ইত্যাদি। শিশুকাল থেকে সে স্নেহ-ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়, তা সত্ত্বেও পবিত্র ধর্মগ্রন্থে মানুষের যে কটি গুণের কথা বলা হয়েছে তার সব কটিই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। ঈশ্বর প্রেরিত মানুষকে সে ভালোবাসতো, প্রয়োজনে মানুষকে সাহায্য করতে পারলে সে আর কিছু চাইতো না।

এই বিপুল ধনসম্পত্তি পেয়ে যুবকটি চিন্তায় পড়ে গেলো, কেমন করে এই বিষয় সম্পত্তি সবচেয়ে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যায়! অবশেষে সে স্থির করলো, একজন সত্যকার জ্ঞানী লোকের পরামর্শ নেবে। জানাশোনার মধ্যে তার পিতার এক শেখ বন্ধু ছিলেন, যুবকটি তার কাছেই যাবে বলে মনস্থ করলো।

যুবকটি শেখের কাছে তার বক্তব্য পেশ করে। শেখ ঘন্টাখানেক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকেন, তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন,—আবদুর রহমানের পুত্র! আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। শোনো, ধনরত্ন দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে পুণ্যকর্ম, আল্লাহ

এতে খুশী হন। কিন্তু একাজ তো যে-কোন ব্যক্তিই করতে পারে! নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পত্তি অন্যকে বিলিয়ে দিতে গেলে মস্ত বড় গুণের অধিকারী হতে হয় না, এ অত্যন্ত স্বাভাবিক কাজ। দান আরো এক রকমের আছে, সে হলো নিজের বুদ্ধি শক্তি, নিজের জ্ঞান অন্যকে বিতরণ। পৃথিবীতে যারা চির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে তাদের যে আলোর পথ দেখাতে পারে সেই আমার মতে সবচেয়ে পুণ্যবান ব্যক্তি। আর মনে রেখো, একমাত্র সত্যিকার জ্ঞানী ব্যক্তিই এই পুণ্যের অধিকারী। প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে হলে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হয়, গভীর ধ্যানে নিজেকে নিমজ্জিত রাখতে হয়। বৎস! সম্পদে নয়, তুমি তোমার মনকে সত্যকার ধনী করে তোলো, তুমি একজন দানবীর হয়ে ওঠ, মানুষকে আলোর পথ দেখাও, এই আমি চাই। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, এর চেয়ে ভালো পরামর্শ আমি তোমায় দিতে পারবো না।

ধনী যুবকটি আরো ব্যাখ্যা জানতে চাইবার ইচ্ছা করলো কিন্তু শেখকে দেখে তার মনে হয় শেখ আর কিছু বলতে রাজী নন। অগত্যা সে ফিরে আসে। শেখের সুপরামর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে একদিন বই-এর বাজারে খোঁজ করতে গেলো। সমস্ত পুস্তক বিক্রেতাকে সে একত্রিত করে, (এদের মধ্যে কিছু কিছু সত্যকার দুর্লভ বই ছিলো, এগুলি সেই বিশেষ লাইব্রেরীর বই যেগুলি খৃষ্টানরা পুড়িয়ে ফেলে, যখন আমরু বিন অল অস আলেকজান্দ্রিয়া শহরে প্রবেশ করেন।) এবং তাদের কাছে যত দ্রুত দুষ্প্রাপ্য-মূল্যবান গ্রন্থ ছিলো সবগুলিকে তার গৃহে পৌঁছে দিতে অনুরোধ জানায়। পুস্তক ব্যবসায়ীরা বই নিয়ে এলে সে সকলকে প্রকৃত মূল্য দিয়ে খুশী করে। কিন্তু মাত্র এই কটিতে তার অনুসন্ধিৎসা পূর্ণ হলো না, সে তখন কায়রো, দামাস্কাস, বাগদাদ, পারস্য, মরক্কো এবং হিন্দুস্তানে দূত প্রেরণ করলো, এমন কি খ্রিস্টানদের দেশেও সে লোক পাঠাতে ভোলে না। প্রত্যেককে সে নির্দেশ দিয়ে দিলো যে, যে কোন মূল্যে সত্যিকার কোনো সুগ্রন্থ তারা যেন ছেড়ে না আসে। দূতরা একে একে বই-এর বোঝা সাথে নিয়ে ফিরে আসে। যুবকটি প্রতিটি গ্রন্থ সযত্নে সাজিয়ে রাখে একটি প্রকাণ্ড গম্বুজের অভ্যন্তরে। গম্বুজের প্রধান ফাটকের মাথায় সে নীল আর সোনালী অক্ষরে সুন্দর করে লিখে দেয়—"গ্রন্থ-গম্বুজ"!

ভোর হয়ে আসে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকলো।

নয়শত বাহাত্তরতম রজনী ঃ

সে আবার বলতে শুরু করে ঃ

যুবকটি যত্ন ও মনোযোগ সহকারে বই-পাঠে মনোনিবেশ করে। সুন্দর স্মৃতিশক্তি থাকায় সে সহজেই জ্ঞান আহরণ করতে থাকে। অল্প কিছুদিনেই সে সমসাময়িক যে-কোন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিকে আপন মেধায় অতিক্রম করে যায়। সমৃদ্ধ চিন্তাশক্তি অন্যের সাথে সমানভাগে ভাগ করে নেবার জন্য সে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ক্রীতদাস, অতিথি সকলকে আমন্ত্রণ করতে থাকে তার গ্রন্থ-গম্বুজে। ভিক্ষুকরা তার দরজায় সমাগত হলে, সে সকলকে প্রথমে পানাহারে তৃপ্ত করে তুলতো, তারপর তাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে বলতে শুরু করতো—আমার প্রিয় মেহেমান, এসো আজ রাতে শুধুমাত্র নাচগানে মন না দিয়ে আমরা কিছু জ্ঞান আহরণ করি! একজন সুধী ব্যক্তি বলে গেছেন ঃ তোমার জ্ঞানের বাণী বিতরণ করে সকলের কানকে তৃপ্ত কর। যে সত্যিকার জ্ঞানকে আহরণ করতে পারে সেই প্রকৃত ধনী। ঈশ্বরকে যে খুশী করতে চায়, তাকে সত্যিকার জ্ঞানী হয়ে উঠতেই হবে, কারণ তার বাণীই সকল জ্ঞানের উৎস। কিন্তু দুঃখের কথা তার খুব কম সন্তানই এই সত্যকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছে।

এছাড়া আল্লাহ তার পয়গম্বর বা দেবদূতদের মুখ দিয়ে অনেকবার বলেছেন যে,

—সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তোমার যে বস্তু, দান করলে তাই দান কর। দান করে কখনও গর্ব বোধ করো না, কারণ একজন দাম্ভিক দাতা একটি পাথরের পাহাড়ের মতো, যে পাথরের ওপর মাটির আবরণ খুবই সামান্য। যখন বৃষ্টি হয় তখন খুব সহজেই তার মাটির আবরণ ধুয়ে মুছে যায়, পড়ে থাকে শুধুমাত্র নিঃসার পাথরের টুকরো। এই সমস্ত লোক দান করে কোনই পূণ্য সঞ্চয় করতে পারে না। কিন্তু যারা নিজেদের আত্মাকে তৃপ্ত করার জন্য দান করে থাকে তারাই সত্যকার দাতা। তাদের জ্ঞানে পাহাড়ে প্রতিটি দান যেন এক একটি বৃক্ষ রোপণের মত। যখন বৃষ্টি হয় প্রতিটি বৃক্ষ ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। একমাত্র এরাই আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশের রাস্তা খুঁজে পায়।

এইজন্য আজ আমি তোমাদের এখানে ডেকে এনেছি। এতদিন আমি যা কিছু শিখেছি, তা আমি নিজের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে চাই না, তোমাদের সবার সাথে আমি তা সমান ভাগে ভাগ করে নিতে চাই। কতটুকু আমার জ্ঞান এতে শুধু তারই পরীক্ষা হবে, আর কিছু নয়।

এসো বন্ধুগণ, আজ আমরা ইতিহাস উদ্যানের মধ্য দিয়ে একটুখানি বাইরের দিকে চেয়ে দেখবো। অতীতের সুন্দর সমৃদ্ধশালী দিনগুলি আমাদের চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাবে, আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করে নিয়ে যাবে তাদের মধুর রসে। আমাদের সেই জ্যোতির্ময় আলোর পথে পা পা করে এগিয়ে যেতে পারবো। আমেন।

সমগ্র অতিথিবৃন্দ তাদের হাত তুলে জবাব দেয়, 'আমেন'।

যুবকটি নিঃশব্দে বসে পড়ে, কিছুক্ষণ সুগভীর চিন্তার পর সে আবার বলতে শুরু করে।

—বন্ধুগণ. কি ভাবে বলতে শুরু করবো জানি না। সেই মহান বীরত্বপূর্ণ যুগে আমাদের পিতা-প্রপিতামহরা কেমন জীবন যাপন করতেন আমি তারই দু'একটা নমুনা তুলে ধরতে চাই তোমাদের সামনে। তাঁরা ছিলেন তাঁদের মাটি মায়ের সুযোগ্য আরব-সন্তান! কত শক্তিশালী কবি ছিলেন তখন, যাঁরা না জানতেন লিখতে, না জানতেন পড়তে। অদম্য প্রেরণাই ছিলো তাঁদের একমাত্র সম্পদ। তাঁদের না ছিলো কালি, না ছিলো ছিলো কলম, না ছিলো সমঝদার শ্রোতা, অথচ তাঁরাই দিনে দিনে গড়ে দিয়ে গেছেন আমাদের এই আরব-ভাষা, যে ভাষা আল্লাহ নিজে বেছে নিয়েছেন। পয়গম্বরের বাণী পাঠাতে তিনি তো এই ভাষাই ব্যবহার করেন! আমেন।'

অতিথি সমবেত স্বরে হাত তুলে জবাব দেয়, 'আমেন।'

যুবকটি তখন বলে, সেই মহান বীরত্বপূর্ণ যুগের সহস্র গল্পের মধ্যে একটি গল্প আমি আজ তোমাদের বলছি।

যুবকটি গুছিয়ে বসে গল্প শুরু করে।

কবি দরাইদ বিন সিমাহ ছিলেন বানী জুশাম উপজাতির একজন শেখ। সেই মহান বীরত্বপূর্ণ যুগের প্রথম আমলের লোক ছিলেন তিনি। যোদ্ধা হিসেবে তাঁর যত সুনাম ছিলো, কবি হিসাবে তাঁর যশ ছিলো ততোধিক। অগুনতি তাঁবুর মালিক ছিলেন তিনি। তাছাড়া তাঁর ছিলো প্রচুর তৃণাচ্ছাদিত জমি ও গৃহপালিত পশুর পাল।

বানী-ফিরাস উপজাতির সাথে তাদের চির অসন্তোষ লেগেই ছিলো। রাবিয়াহ মরুভূমিতে অমন নামজাদা যোদ্ধা আর জন্মায়নি। একদা দরাইদ সেই বাণী-ফিরাসদের আক্রমণ করবেন স্থির করলেন। বাছা বাছা কিছু যোদ্ধা বেছে নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করলেন। যেতে যেতে তাঁরা একটা উপত্যকায় এসে পৌঁছলেন, এটি ছিলো তাঁদের শত্রুপক্ষের দখলে। হঠাৎ দূর দিগন্তে তাঁর চোখে পড়লো একটি লোক পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছেন, তার পিছনে একটি উট, উটে চেপে বসে আছে একটি মহিলা। দরাইদ তার একজনকে ডেকে বললেন,—ঐ লোকটিকে আক্রমণ কর।

ঘোড়সোয়ার যোদ্ধাটি ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যায়। লোকটির কাছাকাছি পৌঁছতে

চিৎকার করে ওঠে,—বাঁচতে চাও তো মেয়েটিকে ফেলে এখনই পালাও। তিনবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে যোদ্ধাটি। বিজ্ঞ লোকটি তাতে কর্ণপাত করে না, শান্ত পদক্ষেপে হেঁটে যেতে থাকে। যোদ্ধাটি খুব কাছাকাছি এসে পড়তেই তিনি উটটিকে থামিয়ে একটি সুমধুর গান ধরলেন ঃ

চলরে ছুটে ঘোড়সোয়ার
চিত্ত রেখে ভাবনাহীন।
প্রশান্ত দিন সামনে তোমার
গর্ব তোমার আকাশে লীন।
দেখাই যখন হলো মাঝে
বন্ধু এমন অকস্মাৎ
তলোয়ার কেন খাপে ঢাকা থাকে
যুদ্ধ হোক না আজ একহাত!

বলতে বলতে চকিতে তিনি বর্শা চালান, মুহূর্তে দরাইদের সেই যোদ্ধার মৃতদেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়ে। চালকহীন ঘোড়ায় তিনি তখন চেপে বসেন। মহিলাটির প্রতি ঈষৎ কুর্ণিশ করে তিনি আবার এগিয়ে যেতে থাকেন, পিছনে পিছনে অনুসরণ করতে থাকে উটটি। লোকটির মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে, গল্প থামিয়ে শাহরাজাদীও চুপ করে বসে থাকে।

নয়শত তিয়াত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

দরাইদ যখন দেখতে পেলেন তাঁর যোদ্ধাটি আর ফিরে এলো না, তখন তিনি আরো একজনকে পাঠালেন। দ্বিতীয় যোদ্ধাটি ঘোড়া চালিয়ে ছুটতে ছুটতে দেখতে পায় তার বন্ধুর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে, তখন সে সেই খুনী লোকটিকে ধাওয়া করে। প্রথম যোদ্ধার মত সেই একই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে তিনবার, কিন্তু লোকটি কিছুতেই কর্ণপাত করেন না, শান্তভাবে তাঁর নতুন পাওয়া ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে যেতে থাকেন। কাছাকাছি আসতেই তিনি উটটিকে থামিয়ে দেন এবং এই গানটি গাইতে গাইতে ঘোড়া চালিয়ে যোদ্ধাটির দিকে ছুটে আসেন ঃ

নিয়তি যখন এই পথে আজ
পাঠাল তোমায় বন্ধু মোর
সত্য কথাটি জেনে যাও শুধু
যেমন সত্য এ মরুভূমি ধু-ধু
রবিয়াহ্‌র হাতে বর্ষা যখন
হেসে ওঠে তাতে অনেক জোর!

রবিয়াহ্‌র বর্শা আবার চকিতে ঝলসে ওঠে, দ্বিতীয় যোদ্ধার মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মুহূর্ত মধ্যে, আত্মরক্ষার কোন সুযোগই সে পায় না। রবিয়াহ্‌ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, শান্তভাবে ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন।

দ্বিতীয় যোদ্ধাটিও যখন ফিরে এলো না দরাইদ তখন চিন্তায় পড়ে গেলেন। তৃতীয় এক যোদ্ধাকে তিনি তখন পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। এই লোকটিও কিছুদূর গিয়ে তার বন্ধুদের মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পেলো। মৃতদেহ দু'টি

ডিঙিয়ে সে এগিয়ে যায়, দেখতে পায় উটে চেপে একটি মহিলা চলেছেন, তার সামনে ঘোড়ায় চেপে একটি পুরুষ, তার হাতে তাচ্ছিল্যের সাথে ধরা রয়েছে একটি বর্শা।

—শয়তান কুকুর, তোর যোগ্য শাস্তি এবার নে। যোদ্ধাটি চিৎকার করে তার দিকে ছুটে আসতে থাকে। রবিয়াহ্ বিচলিত হন না, উটটি থামিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ান, মুখে তাঁর এখনও গান ঃ

ফিরে দেখ ভাই সাথিরা তোমার
ধূলায় লুটায় শকুনীর আশে
শিক্ষা যখন হলো না তোমার
ঠাঁই হোক তব সাথিদেরই পাশে!

দরাইদের তৃতীয় যোদ্ধার বুক তিনি বার বার বিদ্ধ করে দিতে থাকেন, তাঁর আক্রমণের আকস্মিকতায় তৃতীয় যোদ্ধাও হাত তোলার অবসর পায় না। কিন্তু এই বারবার আক্রমণে রবিয়াহ্র বর্শাটি ভেঙে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর নিজস্ব উপজাতির তাঁবু খুব কাছেই এসে পড়েছে। একটুও বিচলিত না হয়ে তিনি তাই এগিয়ে চললেন, মৃত শত্রুর অস্ত্রটি খুলে নেবার কথা তিনি চিন্তাও করলেন না।

দরাইদ যখন দেখতে পেলেন তাঁর কোন যোদ্ধাই ফিরে এলো না, তখন তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন পর পর তিনজন যোদ্ধার মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। দরাইদ তাঁর সাথীদের মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। এদিকে রবিয়াহ্ ততক্ষণে একটি টিলার আড়ালে চলে গেছিলেন, তিনি আড়াল থেকেই জুশাম-কবিকে চিনতে পারলেন। বাণী-ফিরাসের শেখের তখন হাত কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কেন তিনি তাঁর মৃত শত্রুর দেহ থেকে অস্ত্রটি খুলে নিলেন না! কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না, বর্শার কাঠের হাতলটি হাতে নিয়েই তিনি দরাইদের মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

দরাইদ যখন দেখতে পেলেন রবিয়াহ্ নিরস্ত্র, তখন তাঁর শত আক্রোশ সত্ত্বেও তাকে আক্রমণ করতে পারলেন না। চিৎকার করে রবিয়াহ্কে জানালেন, বন্ধু ঘোড়সোয়ার! তোমার মত একজন নিরস্ত্র লোককে আমি খুন করতে পারবো না। কিন্তু আমার দল প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। তারা তোমাকে একা নিরস্ত্র অবস্থায় দেখতে পেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। তুমি আমার এই বর্শাটি নিয়ে যাও, আমি আমার লোকদের মাঝে ফিরে যাচ্ছি, ওদের আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব কথা দিচ্ছি।

বর্শাটি রবিয়াহ্র দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি ফিরে চললেন। তাঁর দলের লোকদের তিনি বোঝালেন, লোকটির অসীম সাহস! আমাদের তিনজন যোদ্ধাকেও পরাস্ত করেছে, তাদের মৃতদেহ এখন বালিতে লুটিয়ে পড়ে আছে, আমার সাথে তীব্র যুদ্ধের পর আমার অস্ত্রও ওর আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। এমন শক্তিশালী শত্রুকে আক্রমণ করে কাজ নাই। চলো, আমরা ফিরে যাই।

লোকজন নিয়ে তিনি নিজেদের অঞ্চলে ফিরে এলেন, রবিয়াহ্কে তিনি সেবারের মত অব্যাহতি দিলেন।

বছর ঘুরে যেতে লাগলো, রবিয়াহ্ একদিন মৃত্যুবরণ করলেন। একজন বীর যোদ্ধার মতই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন। দরাইদের উপজাতির সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারালেন।

তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ফিরাস-যোদ্ধাগণ বাণী-জুশামদের ওপর নতুন এক আক্রমণ শুরু করলো। রাত্রির অন্ধকারে তারা তাঁবু আক্রমণ করে, হঠাৎ আক্রমণে শত্রুকে

পর্য্যুদস্ত করে ফেলে সহজেই। বেশ কিছু সংখ্যক যোদ্ধাকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়। সাথে নেয় কিছু লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ আর কয়েকটি মহিলা। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন শেখ দরাইদ।

শত্রুদের মধ্যে এসে পড়ে দরাইদ নিজের নাম প্রকাশ পেতে দিলেন না, সযত্নে গোপন করে রেখে দিলেন। শত্রুরা জানলো না যে, তারা কাকে বন্দী করে এনেছে। শক্ত প্রহরায় তাদের রেখে দেওয়া হলো। ফিরাস-রমণীরা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো, কেউ কেউ তাকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করলো। দরাইদ অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তখন একজন মহিলা চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, ফিরাসের বোকা যোদ্ধারা, তোমরা কাকে ধরে এনেছো জান? ইনি একদিন তোমাদের সাহায্যেই এগিয়ে এসেছিলেন। নিরস্ত্র রবিয়াহ্‌কে হাতের মুঠোয় পেয়েও খুন করেননি, অথচ তার অল্পক্ষণ পূর্বে রবিয়াহ্ এদের দলের তিনজনকে হত্যা করেন, নিরস্ত্র রবিয়াহ্‌কে ইনি বর্শা দান করে ফিরে যান।

মহিলাটি তার বোরখার একাংশ দরাইদের দিকে ছুঁড়ে দেন, অর্থাৎ দরাইদকে তিনি রক্ষা করতে চান। তারপর দলের যোদ্ধাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করেন, ফিরাসের যোদ্ধারা, তোমাদের এই বন্দীটিকে তোমরা আমায় দিয়ে দাও।

যোদ্ধারা তখন কবি দরাইদকে ঘিরে ধরে, তার নাম জানতে চায়।

—আমি দরাইদ বিন সিমাহ্, তিনি উত্তর দেন,—কিন্তু এই মহিলাটি কে?

মহিলাটি নিজেই উত্তর দেন, —আমি রেয়তা, গিজ্‌ল অল তিয়নের কন্যা। সেদিন সেই উটের পিঠে আমিই চেপেছিলাম। রবিয়াহ্ আমার স্বামী।

তিনি তাঁর দলের যোদ্ধাদের প্রতিটি তাঁবুতে গিয়ে বললেন,—ফিরাসের যোদ্ধারা, সিমাহ্-পুত্রের সেই মহানুভবতার কথা স্মরণ আছে তো? রবিয়াহ্‌কে খুন না করে ইনি তাঁর নিজের বর্শা দান করেছিলেন। আজ তোমরা সুযোগ পেয়েছ, এর যোগ্য উত্তর দিতে ভুল করো না। নয়তো ফিরাসদের নামে লোকে একদিন থুতু ছুঁড়বে।

দরাইদকে তারা মুক্ত করে দেয়, রেয়তা তখন তাঁর মৃত স্বামীর অস্ত্রটি কবি দরাইদকে ফিরিয়ে দিলেন।

দরাইদ তাঁর নিজের উপজাতির মধ্যে ফিরে আসেন, কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ বাণী ফিরাসদের তিনি আর কোনদিন আক্রমণ করেননি। বছরের পর বছর কেটে যেতে থাকে, দরাইদের বয়সও বেড়ে চলে, কিন্তু তার কবিত্ব শক্তি কমে না, উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

বানী-সোলাইম উপজাতিদের মধ্যে আম্‌র কন্যা সুন্দরী তুমাদির অল খানসা বাস করতো। তুমাদির ছিলো সুবিখ্যাত কবি। মরুভূমির চারদিক তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিলো। একদিন দরাইদ ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে ঘুরতে সোলাইমদের তাঁবুর কাছে এসে পড়েন। এক টিলার আড়াল থেকে তিনি দেখতে পান নির্জনে বসে তুমাদির তার পিতার একটি উটকে পরিচর্যা করছে। গ্রীষ্মের দুর্দান্ত দাহ থেকে মুক্তি পেতে সে যৎসামান্য পোষাকে নিজেকে আবৃত করে রেখেছে। চারিদিক সম্পূর্ণ নির্জন, সে আপন মনে তার প্রিয় উটের পরিচর্য্যা করতে থাকে সযত্নে। দরাইদ আড়াল থেকে এই অপরূপ স্বর্গীয় রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েন। তার মনে সুমধুর সংগীত গুঞ্জরন করতে থাকে। সময় বয়ে চলে, দরাইদ বিমোহিত চিত্তে সংগীত রচনা করে চলেন....।

পরদিন দরাইদ তাঁর দলের কয়েকজন লোককে সাথে নিয়ে তুমাদিরের পিতার সাথে দেখা করলেন। তিনি বিনীতভাবে তুমাদিরের পাণি প্রার্থনা করলেন। বৃদ্ধ আম্‌র উত্তর দেন,—'মহান দরাইদ! আপনার এই প্রস্তাবে আমি গর্বিত বোধ করছি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার তুমাদির যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও চিন্তাশক্তি সম্পন্ন মেয়ে।

রাত ভোর হয়ে আসে। আম্‌রের ভাষা অসমাপ্ত রেখেই শাহরাজাদ চুপ করে যায়।

নয়শত চুয়াত্তরতম রজনী ঃ

সে আবার বলতে শুরু করে ঃ

আম্‌র বলতে থাকেন, আপনি তো জানেন, মেয়েদের মধ্যে এই গুণগুলি সচরাচর দেখা যায় না। আমি তাই তুমাদিরের স্বাধীন চিন্তায় কোন বাধা দিই না। আপনার এই প্রস্তাব আমি ওকে জানাবো চাই কি তাকে অনুরোধও করতে পারি। কিন্তু ওর প্রাণ যা চায়, আমি তার বিরুদ্ধে যেতে পারবো না।

দরাইদ তাকে ধন্যবাদ জানায়। আম্‌র তখন তুমাদির অল খানসার তাঁবুতে এসে তাকে বললেন, খানসা, বানী জুশামের সুবিখ্যাত বীর মহানুভব দরাইদ এসেছেন আমাদের কাছে। তিনি এসেছেন তোর জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। যদিও আজ তার বয়স হয়ে গেছে, তবুও তার বীরত্বের গল্পও তুই জানিস, আবার তার কবিত্ব শক্তির কথাও তোর অবিদিত নয়। তোরা একত্রিত হলে আমি গর্ব অনুভব করবো, কিন্তু তোর আপন ইচ্ছার ওপর আমি জোর খাটাতে চাই না, তোর কি মত তুই আমাকে নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারিস।

তুমাদির উত্তর দেয়, বাবা আমাকে সময় দিন, আমি ভালো করে ভেবে দেখি তারপর জবাব দেব।

আম্‌র দরাইদের কাছে ফিরে এসে জানান,—খানসাকে আপনার প্রস্তাব জানিয়েছি, সে কিছু সময় চেয়েছে। আমার মনে হয় ও শেষ পর্যন্ত মত দেবেই।

দরাইদকে তার লোকজন সমেত বিশ্রামের জন্য একটি তাঁবু দেওয়া হয়। যোগ্য সম্মানের সাথে তাদের আপ্যায়ন করা হতে থাকে।

দরাইদ তার উত্তরের জন্য ফিরে এলে আম্‌র পুনরায় কন্যার তাঁবুতে এলেন, পাশেই সেই তাঁবু। তুমাদির আম্‌রকে জানায়,—আমি চিন্তা করে দেখলাম পিতা! সোলাইম জাতির বাইরে আমি বিয়ে করতে রাজি আছি কিন্তু ঐ বৃদ্ধ দরাইদকে কোনমতেই পতিত্বে বরণ করে নিতে পারবো না। কাল কিম্বা পরশু হয়তো ওর পেচক সদৃশ বৃদ্ধ আত্মাটি দেহমুক্ত হয়ে চলে যাবে! না, না আমি বরং বাঁদী হয়ে দিন কাটাতেও রাজী আছি কিন্তু ওর মত একজন লোলচর্ম বৃদ্ধকে সহ্য করতে পারবো না।

পাশের তাঁবুতে বসে দরাইদ সবই শুনতে পেলেন। তুমাদিরের এই ঘৃণাভরা উক্তিতে তার পৌরুষবোধ আহত হলো। কিন্তু বানী সোলাইমদের সামনে তিনি মুখ খুললেন না, শান্ত সৌজন্যের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখলেন। তারপর স্বজনদের মধ্যে ফিরে এসে তুমাদিরের সেই নিষ্ঠুর ভাষ্যের জবাব দিলেন একটি সুন্দর ব্যঙ্গাত্মক গাঁথা রচনা করে ঃ

বৃদ্ধ হয়েছে দরাইদ আজি
একথা প্রথম শুনি তোর কাছে!
আমি কি বলেছি, গতকাল আমি
এসেছিনু এই পৃথিবীর মাঝে?
তুই যে কি চাস, সে আমি বুঝেছি
চাস তুই এক নবীন ভৃত্য ;
বিগলিত ভাঁড়, দোলাবে চামর,
সেবা পেলে তব করিবে নৃত্য!
দরাইদ সম বীর যুবা যদি
পথ ভুলে কভু আসে তোর দ্বারে ;

সম্মান দিস, ভয় পাস তারে!
মালা দিস নাকো, ফিরাস তাহারে।
কুসুম কোমল বিছানাই শুধু
সার কথা নয় পুরুষের কাছে ;
সত্য সাহসী বীর হলে তার
পৃথিবীতে আরো বড় কাজ আছে।
তাই ফের বলি, বেছে নিস কোনো
বিগলিত ভাঁড়, পরম ভৃত্য।
পদসেবা করে পূজিবে সে তোরে,
সেবা পেলে তব করিবে নৃত্য!
বৃদ্ধ হয়েছে দরাইদ আজি
একথা প্রথম শুনি তোর কাছে।
আমি কি বলেছি, গতকাল আমি
এসেছিনু এই পৃথিবীর মাঝে?

দরাইদ-এর এই গাথাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে! লোকমুখে তা ক্রমশঃ বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে তা বাণী সোলাইমদেরও কানে এসে পৌঁছয়। সকলে তুমাদিরকে পরামর্শ দেয় দরাইদকে পতিত্বে বরণ করে নিতে। কিন্তু তুমাদির তাতে বিচলিত হয় না, সে একবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতেই অচল হয়ে থাকে।

তুমাদিরের ভাই মোরাইয়া একজন বীর যোদ্ধা ছিলো। কিন্তু মুরিদ উপজাতির সাথে এক ভয়ানক যুদ্ধে সে প্রাণ হারায়। ভাই-এর মৃত্যুতে তুমাদির একটি সুদীর্ঘ গাথা রচনা করে। এই গাথাটি তাকে সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ করে তোলে।

সুবিখ্যাত কবি নাবিগাহ্ অল ধোবিয়ানী এবং আরবের অন্যান্য খ্যাতনামা সকল কবিই তার এই গাথাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ওফাজের এক বাৎসরিক কবি-সম্মেলনে নাবিগাহ্ বলেন, তুমাদির তার কবিতায় বিশ্বের সকল কবিকে জড়িয়ে গেছেন।

তুমাদির আরবে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পরও বেঁচেছিলো। হিজরতের অষ্টম বর্ষে তুমাদির তার পুত্র আব্বাসকে নিয়ে মুহম্মদের নিকট দীক্ষা নিতে আসে। পুত্র আব্বাস তখন বানী সোলাইমদের প্রধান পদে আসীন। মুহম্মদ তাকে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং তার মুখে স্বরচিত বিভিন্ন গাথা শুনে তৃপ্ত হন।

কবি দরাইদ ও কবি তুমাদিরের গল্পটি এখানেই শেষ। সেই যুবকটি তখন তার অতিথিদের একটি নতুন গল্প শোনাতে শুরু করে।

বানী জিমন উপজাতির দল-নায়ক কবি ফিন্দের দুইটি কন্যা ছিলো। বড়টির নাম ওফাইরাহ্ অর্থাৎ সূর্য্য এবং ছোটটির নাম হোজাইলাহ্ অর্থাৎ চন্দ্র। ফিন্দের বয়স যখন একশত বৎসর তখন বেকরাইদের উপজাতিবৃন্দ থালাবিদদের সাথে এক নিদারুণ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। থালাবিদরা সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।

বয়সে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ফিন্দ এখনও বেশ শক্তিমান পুরুষ। সত্তরজন ঘোড়সোয়ার যোদ্ধার এক দলকে অসম্ভব তৎপরতার সাথে নেতৃত্ব দিতে পারতেন তিনি। এই যুদ্ধেও তিনি তাঁর দল নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন, সাথে গেলো তাঁর দুই কন্যা। একজন দূত মারফত তিনি তাঁর উপজাতির যুদ্ধে যোগদানের সংবাদ প্রেরণ করলেন, তিনি জানালেন, আমরা বানী

জিমনেরা এক সহস্র যোদ্ধা এবং সত্তরজন ঘোড়সোয়ারের এক দল প্রেরণ করছি। এই উক্তির মাধ্যমে ফিন্দ বোঝাতে চাইছিলেন যে, তিনি একাই এক সহস্র যোদ্ধার সমান এবং এছাড়াও সত্তরজন ঘোড়সোয়ার যোদ্ধা তাঁকে অনুসরণ করবে।

তুমুল কথার বেগে বেকরাইদ সেনাবাহিনী এই যুদ্ধ শেষ করে। তাদের এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের ফল এখনও লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। থালাবিদরা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হয় এবং সকল বন্দীকে মস্তক মুণ্ডন করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফিন্দের দুই বীরাঙ্গনা কন্যা এই যুদ্ধে তাদের অসীম সাহসীকতার জন্য লোকের স্মৃতিতে আজও অমর হয়ে আছে।

রাত ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে যায়।

নয়শত পঁচাত্তরতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

যুদ্ধ যখন চরমে, উভয় পক্ষই ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, ফিন্দের দুই বীরাঙ্গনা কন্যা হঠাৎ তাদের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে! তারা অতিরিক্ত পোষাক-পরিচ্ছদের ভার সবেগে মুক্ত করে দেয়, ভারী ভারী পোষাকে তারা মুক্ত যুদ্ধ করতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলো। সামান্য কটি বন্ধনী ও বক্ষ-বন্ধনীতে নিজেদের আচ্ছাদিত রেখে তারা বেকরাইদের দুই পার্শ্ববাহিনীর সাহায্যে ছুটে যায়। যুদ্ধের এই ভয়াবহতার মধ্যেই তারা উভয়েই একটি করে রণসংগীত রচনা করে নেয় মুখে মুখে। মাদল এবং চার তারের এক বাদ্যযন্ত্রের রণদামামার তালে তালে ওফাইরাহ্ তার রণ-সংগীত গেয়ে ওঠে ঃ

রক্তপিপাসু তরবারী খোল
বেকরাইদের সৈনিক দল।
তপ্ত শলাকা লোহিত যখন,
হান রে আঘাত বাজিয়ে মাদল!
মুক্ত স্বাধীন সৈনিক কভু
পেছু ফেরে নাকো যুদ্ধক্ষেত্রে।
বিচূর্ণ কর থালাবিদ সেনা
চিনে নিক ওরা জিমন গোত্রে!
বেকরাইদের বীর সেনাদল
রাঙিয়ে নে আজ শাণিত কৃপাণ!
ওফাইরাহ্ বলে আমি তারি দলে
যার অসি পেলো শোণিতের ঘ্রাণ।।

হোজাইলাহ্ ছুটে যায় বাম পার্শ্ব বাহিনীর দিকে। সেদিকে তার পিতা ফিন্দ মহা বিক্রমে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শত্রুপক্ষও বিপুল উদ্যমে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে! জিমন গোত্রের রণক্লান্ত সেনাদল ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে পড়তে থাকে, হোজাইলাহ্ তখন বিপুল উদ্যমে তার রণসংগীত শুরু করে ঃ

বানী-জিমনের বীর সেনাদল
রাখো উন্নত কৃপাণ খড়গ।
শত্রুশোণিতে স্নান করে আজ
জিনে নিতে হবে জয়ের স্বর্গ!
কার অসি কত

রুধিরে সিক্ত
তাই দিয়ে বীর হবে সনাক্ত ;
ওরে দুই বাহু
থালাবিদ লোহু
রণ-প্রাঙ্গণ কর আরক্ত!
ঝঞ্ঝার বেগে
মত্ত আবেগে
শত্রু সবেগে
বিচূর্ণ কর নির্মম তেজে!
হোজাইলাহ বলে,
আমি তারি দলে
যার অসি বলে
রণ-বিজয়ের দুন্দুভি বাজে!

তাদের রণসংগীতে বেকরাইদের অবসন্ন সেনাদল আবার উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নবীন উদ্যমে তারা শত্রুনিধনে মেতে ওঠে। থালাবিদবাহিনী তাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে পারে না, বেকরাইদবাহিনীর যুদ্ধে জয়লাভ ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে।

সেই মহা বীরত্বপূর্ণ যুগে আমাদের পিতা-প্রপিতামহরা এইভাবেই যুদ্ধ করতেন, সে আমলের নারীজাতিও এই ভাবেই তাদের সাহায্যে ছুটে যেত।

কবি ফিন্দ আর তার দুই বীরাঙ্গনা কন্যার গল্প এখানেই শেষ। যুবকটি এখন তার অতিথিবৃন্দকে এক নতুন গল্প শোনাতে শুরু করে।

ইরাকের হিরাহ্ সম্রাট নেমানের ফতিমা নাম্নী এক কন্যা ছিলো। সে ছিলো যেমনি সুন্দরী, তেমনি বদরাগী। তার স্বভাবের জন্য সম্রাট নেমান তাকে এক নির্জন প্রাসাদে অন্তরীণ করে রাখেন, প্রাসাদের বাইরে সম্রাট শক্ত প্রহরার ব্যবস্থা করেন। একমাত্র ফতিমার নিজস্ব দাসদাসীবৃন্দ ছাড়া অন্য কারো সে প্রাসাদে প্রবেশের অধিকার নাই। কন্যার সম্মান রক্ষা ও তার চরিত্রের পরিবর্তনের জন্যই সম্রাট এতো সব আয়োজন করেন। নির্জনে বসে রাজকন্যা সময়ে অসময়ে বিষণ্ন হয়ে পড়তো, তখন সে দেওয়াল বেয়ে প্রাসাদের চূড়ায় উঠে বসে থাকতো। উন্মুক্ত রাস্তায় লোকজন দেখতে দেখতে এক সময় তার বিষণ্নতা দূর হয়ে যেত।

একদিন প্রাসাদ-চূড়ায় সময় কাটাতে কাটাতে সে দেখতে পায় ইবনাত ইজলান নাম্নী তার এক দাসী এক আকর্ষণীয় পুরুষের সাথে আলাপে রত। পরে দাসীটির কাছে অনুসন্ধান করে সে জানতে পারে পুরুষটি সুবিখ্যাত কবি মুরাকিশ।

দাসী ইবনাত সুন্দরী এবং প্রাণবন্ত মহিলা। মুরাকিশের দেহসৌষ্ঠব ও কাব্যপ্রতিভার কথা বলতে গিয়ে সে উচ্ছ্বল হয়ে ওঠে। ইবনাতের প্রশংসা বাক্যে রাজকন্যা ফতিমা মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই আকর্ষণীয় বাগ্মী পুরুষকে দেখবার জন্য, তার সান্নিধ্য লাভের জন্য সে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত রাজকন্যা হয়ে সে এমন হটকারীর মত কাজ করতে ইতস্ততঃ করে। কবি মুরাকিশের বংশ-মর্যাদা তার রুচিবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজখবর না নিয়ে সে কিছু করতে অক্ষম। তখনকার দিনে আরবদের আচরণই ছিলো এই রকম, প্রতি পদক্ষেপে তারা বংশ-মর্যাদা মেপে কাজ করত।

রাজকন্যা তাই কৌশলে কবি মুরাকিশের বংশ-মর্যাদা ও রুচির পরিমাপ নিয়ে ব্রতী হয়। ইবনাত ইজলানকে সে বলে,—আগামী কাল তুমি তার সাথে আবার দেখা করবে। এই সুগন্ধী কাঠের তৈরী দাঁত-কাঠিটি সাথে রাখো আর এই নাও একটি ধুনুচি। কাল যখন তাঁর সাথে দেখা করবে তখন এটিতে কিছু সুগন্ধী ধূপ প্রজ্জ্বলিত করে নিয়ে যেও। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবে দাঁত-কাঠিটি ব্যবহার করার পূর্বে তিনি এর ডগাটি ভেঙে ছুঁচলো করে নেন কিনা। আর ধূপের ধোঁয়াতে তিনি তাঁর পোষাকের অভ্যন্তরভাগ সুগন্ধী করে নিতে চেষ্টা করেন কিনা তাও লক্ষ্য করে দেখবে। তাই যদি করেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি নিচ বংশজাত। যতই বাগ্মী কবি হোন না কেন, একজন ভদ্রবংশীয়া রাজকন্যার যোগ্য তাকে বলা চলবে না কখনই।

পরদিন প্রাতে দাসীটি কবির বাসভবনে যায়। কবির বাসভবনে গিয়ে সে ধুনুচিটিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, তারপর সুগন্ধী ধূপ ছিটিয়ে দেয়। কবি মুরাকিশ কাছেই ছিলেন। দাঁতকাঠিটি তাকে উপহার দিয়ে ইবনাত ধূপের সুগন্ধটি কেমন তা পরখ করে দেখতে অনুরোধ করে। কবি জানান, ধুনুচি এখানে নিয়ে এসো।

ইবনাত ধুনুচিটি তার সামনে এনে রাখে, সুগন্ধী ধোঁয়া ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কবি মুরাকিশ তার লম্বা দাড়ি ও দীর্ঘ চুল ধোঁয়ায় সিক্ত হয়ে উঠলে সেগুলির ঘ্রাণ নেন যত্নে। তারপর সেই দাঁতকাঠিটা তুলে নিয়ে সেটির প্রান্তভাগ ভেঙ্গে ফেলেন এবং একটি ব্রাশের আকৃতিতে সেটিকে কেটে নিয়ে নিজের দন্ত মার্জন করেন। সবশেষে তিনি তার দাঁতের ঘ্রাণ নিতে প্রবৃত্ত হন।

বাঁদী ইবানত সোৎসাহে তার এই দ্বৈত পরীক্ষার বিশদ বিবরণ জানায় রাজকন্যাকে। রাজকন্যা ফতিমা উত্তেজিত স্বরে জানান,—এই অভিজাত কবিকে যেমন করে পার নিয়ে এসো আমার কাছে।

কিন্তু প্রহরী-বেষ্টিত রাজপুরীতে সে কেমন করে নিয়ে আসবে মুরাকিশকে? শেষ পর্যন্ত সে একটি উপায় আবিষ্কার করে। রাত্রের অন্ধকারে সে মুরাকিশকে নিজের পিঠে তুলে নেয়, তারপর একটি ভারী চাদরে উভয়কে আচ্ছাদিত করে সে রাজপুরীতে প্রবেশ করে। কবির সাহচর্যে রাজকন্যা বিমোহিত হয়ে পড়ে সহজেই। সুন্দরী ফতিমার কোমল উষ্ণ আবেষ্টনীতে কবি মুরাকিশের রাত কেটে যায়। ভোর রাতের অন্ধকারে ইবনাত তাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসে।

সকালে সম্রাট নেমানের প্রহরীরা ফিরে এসে দেখতে পায় বালিতে মাত্র এক জোড়া পায়ের ছাপই ফুটে আছে, সে ছাপ তাদের চেনা। সম্রাটকে সংবাদ দিতে গিয়ে তারা জানায়,—জাঁহাপনা, ইবনাত ইজলান ছাড়া আর কারো পায়ের ছাপ চোখে পড়লো না। তবে সে বোধহয় ভারী কিছু বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কারণ তার পায়ের ছাপ বেশ গভীর হয়ে বসে গেছে বালির মধ্যে।

রাজকন্যা ফতিমা ও কবি মুরাকিশের প্রেম ক্রমশঃ মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠতে থাকে। এইভাবে দিন কেটে সপ্তাহ যায়, মাসের পর মাসও কেটে যেতে থাকে।

মুরাকিশের এক অন্তরঙ্গ দোস্ত ছিলো, সুন্দরী ফতিমার গল্প শুনে সে তাকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। কবি মুরাকিশ কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন। সুপ্রিয় বন্ধুর ক্রমাগত অনুরোধে অবশেষে সে একদিন মত না দিয়ে পারে না। রাত্রের অন্ধকারে ইবনাতের পিঠে কবির বদলে তার বন্ধু চেপে বসে। রাজকন্যা ফতিমার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ইবনাত তাকে নামিয়ে দেয়।

সুন্দরী ফতিমা বুদ্ধিমতী মহিলা, আপন স্পর্শবোধের সাহায্যে সে সমস্ত ছলচাতুরী ধরে ফেলে। বুঝতে পেরেই সে বিছানা থেকে ছিটকে নেমে যায়, ঘৃণা-পূর্ণ পদাঘাতের সাহায্যে আগন্তুককে বিতাড়িত করে। ইবনাত ইজলান তাকে ঘাড়ে চাপিয়ে ফেরত দিয়ে আসে। ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে, গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ চুপ করে রইলো।

নয়শত ছিয়াত্তরতম রজনী ঃ

সে আবার বলতে শুরু করে ঃ

মুরাকিশের বিশ্বাসঘাতকতায় ফতিমা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কবিকে সে আর এক মুহূর্তের জন্য কাছে আসতে দিতে অস্বীকার করে। মুরাকিশ অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন। রাজকন্যা কিন্তু তার প্রতিজ্ঞায় অটল, কিছুতেই সে আর কবির মুখ দর্শন করবে না। ফতিমার বিরহে কবি মুরাকিশ একটি গাথা রচনা করেন, এমনই সে গাথার আবেদন যে, যুগ যুগ ধরে লোকমুখে তা অমর হয়ে আছে।

ফতিমার বিরহে শোকতপ্ত কবি অবশেষে একদিন মৃত্যু বরণ করেন। ইতিহাস বলে, তিনি প্রেমের জন্যই অবশেষে একদিন আত্মাহুতি দিয়েছেন।

যুবকটি তার অতিথিবৃন্দের দিকে ফিরে চেয়ে বলে, বন্ধুগণ কবি মুরাকিশ আর সুন্দরী ফতিমার গল্প এখানেই শেষ হলো। এবার আমি তোমাদের বলবো কিণ্ডাইটের সম্রাট হুজুর ও তার স্ত্রী হিন্দের গল্প।

সে তার নতুন গল্প শুরু করে ঃ

কিন্ডাইট সম্প্রদায়ের সম্রাট হজর ছিলেন অসীম সাহসী ও দুর্দান্ত হিংস্র যোদ্ধা। তার পুত্র ইমরু অল কেয়স ছিলো সে যুগের সুবিখ্যাত কবি। সম্রাট হজর এতো নৃশংস প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, তার নিজস্ব পরিবারের লোকেরাও তার নির্দয়তার হাত থেকে মুক্তি পেতো না। পিতার নির্যাতনে রাজকুমার ইমরু ঘর ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। তার পিতার বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে কবিত্ব শক্তির জন্ম কাপুরুষতা থেকে।

একদা সম্রাট হজর তার নিজস্ব অঞ্চল ছেড়ে অনেক দূরে বানী-আসাদ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার চিরন্তন শত্রু কোদেইদে সম্প্রদায় এই সুযোগে তার অঞ্চল আক্রমণ করে। বীর জিয়াদের নেতৃত্বে তারা কিণ্ডাইট সম্প্রদায়কে সহজেই নৃশংসভাবে পরাজিত করে। কারণ হজর তার বাহিনী নিয়ে তখন অনুপস্থিত ছিলেন। জিয়াদ তার বাহিনী সমেত কিণ্ডাইটদের সঞ্চয় থেকে প্রচুর শুকনো খেজুর, অশ্ব, উট অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু এবং কিছু অল্পবয়সী সুন্দরী মহিলা ছিনিয়ে নিয়ে যান। এদের মধ্যে ছিলেন সম্রাটের প্রিয়তমা পত্নী, কিণ্ডাইটের রত্ন-প্রতিম সুন্দরী রানী হিন্দ।

এই দুঃসংবাদ কানে যেতেই সম্রাট হজর তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দ্রুত ফিরে এলেন এবং কোদেইদে বাহিনীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। শত্রু সম্প্রদায়ের তাঁবুর কাছাকাছি এসে পড়তেই তিনি তার দু'জন বিশ্বস্ত গুপ্তচর সালিহ্ এবং সাদুসকে পাঠিয়ে দিলেন জিয়াদের বাহিনী সম্পর্কে গোপন খোঁজ-খবর নিতে।

গুপ্তচরদ্বয় অনেক চেষ্টার পর কৌশলে শত্রু শিবিরে ঢুকে পড়ে। সেখানে তারা শত্রুবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্র শস্ত্র, রসদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে। কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হলে সালিহ্ তার সঙ্গীকে জানায়,—জিয়াদ বাহিনী সম্পর্কে আমরা অনেক তো সংবাদ সংগ্রহ করলাম, এখন চলো আমরা নিজেদের শিবিরে ফিরে যাই। সুলতানকে আমরা জিয়াদের বুদ্ধি, পরিকল্পনা কি হতে পারে, এখন তা সহজেই বুঝিয়ে বলতে পারবো।

কিন্তু সাদুস উত্তর দেয়—না, আমি কিন্তু আরো সংবাদ সংগ্রহ করতে চাই। সালিহ্ ফিরে যায়, সাদুস একাই থেকে যায় শত্রু শিবিরে।

রাত্রি সমাগত হতেই জিয়াদের বাহিনী তাদের নেতার শিবিরে কড়া পাহারা মোতায়েন করে। সাদুস এতে বেশ মুশকিলে পড়ে যায়। অনেক চিন্তার পর সহসা সে এক অদ্ভুত সাহসের কাজ করে ফেলে। জিয়াদ বাহিনীর একজন রক্ষীর পিঠে সে অকস্মাৎ পদাঘাত করে বলতে চায়,—কে তুই গুপ্তচর! এখানে কি চাস?

লোকটি শঙ্কিত স্বরে নিজের বিশদ পরিচয় দিতে শুরু করে। এরপর আর সাদুসের পক্ষে মুক্তভাবে বিচরণ করতে কোন অসুবিধা হয় না। সকলে তাকে জিয়াদ বহিনীর রক্ষী বলেই ধরে নেয়।

জিয়াদের তাঁবুর সামনে সে কান পেতে রেখে অপেক্ষা করতে থাকে। তাঁবুর অভ্যন্তর থেকে জিয়াদ ও সম্রাজ্ঞী হিন্দের অন্তরঙ্গ ভাষ্যালাপ ও চুম্বনের শব্দ ভেসে আসে। জিয়াদের স্বর শোনা যায়—আমাদের এই অন্তরঙ্গ মিলনের সংবাদ পেলে তোমার স্বামী কি করতেন বলো?

হিন্দ উত্তর দেন,—আমি শপথ করে বলতে পারি, সে নেকড়ে বাঘের মত ছুটে এসে তোমাদের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। উন্মত্ত রাগে ও প্রতিহিংসায় সে পাগল হয়ে উঠতো, মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে থাকতো।

জিয়াদ তার জবাব শুনে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন, হিন্দের গালে একটি চাপড় মেরে বলেন, —বুঝতে পারছি, ঐ বনমানুষটাকে এখনও তুমি ভালোবাস। ওর হাতে আমি পরাস্ত হই নির্যাতিত হই, তাই তুমি চাও।

হিন্দ সরবে প্রতিবাদ করতে শুরু করেন,—মোটেই না! আমি লাত এবং ও জাতের নামে শপথ করে বলতে পারি। আমার স্বামীকে যতদূর আমি ঘৃণা করি এমনটি আর কাউকেই কখনও করিনি। কিন্তু সেই সাথে আমি তোমাকেও সতর্ক করে দিতে চাই যে, কি শুতে, কি বসতে তার মত এমন সতর্ক আর বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক আমি দু'টি দেখিনি।

জিয়াদ প্রশ্ন করেন,—কী রকম?

হিন্দ বলতে থাকেন, হজ্‌র যখন নিদ্রা যায়, তখনও বোধ হয় ওর এক চোখ খোলা থাকে এবং মন থাকে অর্ধ জাগ্রত। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একদিন রাত্রে হজ্‌র আমার পাশে ঘুমিয়েছিলো, আমি শুয়ে শুয়ে ওকে দেখছিলাম। এমন সময় দেখি একটা বিষধর সাপ ওর দিকে এগিয়ে আসছে। আমি রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে থাকি। সাপটি সোজা ওর মুখ লক্ষ্য করে হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হজ্‌র পাশ ফিরে শোয়, সাপটি তখন ওর খোলা হাতের পাতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমি দেখতে পেলাম এবারেও ও ঘুমের মধ্যেই হাতটি সরিয়ে নিলো। সাপটি তখনও সোজা এগিয়ে যাচ্ছে ওর পা লক্ষ্য করে। হজ্‌র এবারেও ঘুমের মধ্যেই পা মুড়ে শোয়। আমি বিস্মিত নেত্রে দেখে যেতে থাকি। সাপটি ততক্ষণে হজ্‌রের বিছানা অতিক্রম করে চলে গেছে। কাছেই এক পাত্র দুধ রাখা ছিলো, হজ্‌রের জন্য। সাপটি লোভীর মত সেই দুধ পান করে তারপর সেই পাত্রেই সেই দুধটুকু বমি করে রেখে যায়। আমি মনে মনে খুশি হয়ে উঠি। এতদিন পর আমি ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চলেছি। কারণ ঘুম থেকে উঠে এই বিষাক্ত দুধটুকু পান করলেই তো ওর মৃত্যু অনিবার্য! খানিকক্ষণ পর হজ্‌রের ঘুম ভেঙে যায়, তৃষ্ণার্ত বোধ করায় দুধের পাত্র সে হাতে তুলে নেয়, মুখে দিতে গিয়েও কি মনে হতে সে হাত নামিয়ে নেয়, দুধের গন্ধ শুঁকতেই তার হাত কাঁপতে থাকে। অবশেষে হাত থেকে পাত্রটি পড়ে যায় এবং চারদিকে সেই বিষাক্ত দুধটুকু ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত ব্যাপারেই ও এমন সতর্ক। বিপদ এসে পড়লেও বোধহয় আগে থাকতেই বুঝতেই পারে।

গুপ্তচরটি এরপর আর কোন বাক্যালাপ শুনতে পায় না। শুধু কিছু শ্বাস-প্রশ্বাস ও চুম্বনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই ভেসে আসে না ভেতর থেকে। সাদুস সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায়, তারপর সবার অলক্ষ্যে ফিরে আসে নিজেদের শিবিরে।

হজ্‌রকে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে, সাদুস তার ভাষ্য শেষ করে এই বলে, আমি যখন জিয়াদের শিবির ত্যাগ করে আসি সে তখন সাম্রাজ্ঞী হিন্দের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এখনও পর্যন্ত ওরা কোন সংবাদই পায়নি।

সম্রাট হজ্‌র এই কথা শুনে এক নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেললেন, অবিলম্বে কোদেইদের শিবির আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন তিনি।

ভোর হয়ে আসে। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে যায়।

নয়শত সাতাত্তরতম রজনী ঃ

সে আবার বলতে শুরু করে ঃ

কিন্ডাইটবাহিনী তাদের অনুসরণকারীদের অকস্মাৎ আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। তাদের তাঁবুগুলি টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তাতে। প্রচুর লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো, কেউ কেউ অর্ধমৃত অবস্থায় পলায়ন করতে সক্ষম হলো।

পলায়নপর বাহিনীতে হজ্‌র জিয়াদকে খুঁজে পান। উন্মত্ত আক্রোশে তিনি ঘোড়া থেকেই জিয়াদকে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে নেন। সমস্ত শক্তি বাহুতে জড় করে তিনি জিয়াদকে খেলনার মত শূন্যে ছুঁড়ে দেন। মাটিতে পড়ে যেতে জিয়াদের হাড়গোড় ভেঙ্গে যায়। তার মাথাটি বিচ্ছিন্ন করে নিজের ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে দেন হজ্‌র।

আপন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে হজ্‌র হিন্দের সন্ধানের প্রবৃত্ত হন। দু'টি ঘোড়াকে দু'দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হিন্দকে বেঁধে দেওয়া হয় তাদের মাঝখানে। তীক্ষ্ণ চাবুকের আঘাতে ঘোড়া দু'টিকে ছুটিয়ে দিতেই হিন্দের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হজ্‌র চিৎকার করে তাকে জানিয়ে দেন,—তোমার মুখ ছিলো খুব মিষ্টি, কিন্তু বুকের মাঝখানটিতে বড় তিক্ত কথা লুকিয়ে ছিলো!

এই বন্য প্রতিহিংসার গল্প শেষ করে যুবকটি আবার বলতে শুরু করে ঃ

আরব সাম্রাজ্যে তখন ইসলামের প্রবর্তন সবে শুরু হয়েছে। তখনকার দিনের আরব মহিলাদের সম্পর্কে এবার আমি তোমাদের একটি গল্প শোনাবো। গল্প বলা হয়েছে আমাদের প্রিয় নবীর স্ত্রী আয়েশার মুখ দিয়ে। তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রথম যুগের রমণীদের মধ্যে সুন্দরতমা এবং সত্যিকার মহিয়সী মহিলা। তিনি যেমনি নম্র স্বভাবের, তেমনি সাহসী। আবার তাঁর মত এমন পণ্ডিত ও বাগ্মী মহিলাও সেকালে দুর্লভ ছিলো।

যুবকটি তখন আয়েশার ভাষ্যতেই পরবর্তী গল্পটি বলতে শুরু করে ঃ

একদা ইয়েমেনের কয়েকজন অভিজাত মহিলা আমার সাথে দেখা করতে আসেন। কথায় কথায় তাঁদের স্বামীদের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তাঁরা শপথ নিয়ে জানান, স্বামী সম্পর্কে প্রত্যেকেই নির্বিচারে সত্য কথা বলবেন।

প্রথমজন বলতে শুরু করেন,—আমার স্বামী! সে তো একজন চূড়ান্ত নোংরা লোক। যেন একটা খাড়া পাহাড়ের গায়ে উটের মাংসের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে আছে। কোন রস কষ নাই লোকটির মধ্যে। তুলনা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, যেন একটা ছেঁড়া খড়ের মাদুর, কোনই কাজে আসে না।

দ্বিতীয় মহিলাটি শুরু করেন,—স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে আমার গা শিউরে ওঠে! একটা বুনো পশুর মত লোক। ওর একটি কথার প্রতিবাদ জানালে মুখ খিঁচিয়ে আমায় বিচ্ছেদের ভয় দেখাবেন আবার চুপ করে থাকলেও মহা গোলমাল হৈ চৈ বাধিয়ে বসবেন।

তৃতীয়জন তখন বলতে থাকেন—আমার স্বামী দেবতাটির কথা বলি তাহলে! এমনই লোক যে, খেতে শুরু করবে তো পাত্রের তলানীটুকুও চেটেপুটে শেষ করবে। আর পান করতে শুরু করলো তো শেষ বিন্দুটিও মহাযত্নে নিঃশেষ করে ফেলবে। যখন বসবে তো একটা ভারী বোকার মত বসেই থাকবে আবার খাবারের জন্য কোন জন্তুকে বেছে নেবে তো জানবেন সেটিই হলো সবচেয়ে শুকনো, রোগা, মৃতপ্রায় জন্তু। এছাড়া তিনি আর কোন কর্মেরই নন!

চতুর্থজন বললেন,—আমার থেকে কাছে বা দূরে যেখানেই থাকুক, দিবা-রাত্রি ও আমার কাছে একটি বোকা। খুঁত খুঁজে বার করতে গেলে দেখবেন ওর সবেতেই খুঁত। সবকিছুতেই বোকার মত বাগাড়ম্বর করবে! দেখা হলেই মাথায় একটি চাটি মারবে প্রথমে অথবা পেটে একটি খোঁচা মারবে সজোরে। মারধরের আর শেষ নাই। একটা বদমেজাজী জন্তু যেন! আল্লাহ্ ওকে ধ্বংস করুন।

পঞ্চম জন তখন বলেন,—আমার স্বামীটি কিন্তু যেমন ভালো মানুষ তেমনি মিষ্টি স্বভাবের লোক। তিহামার সেই রূপকথার রাত্রের মত মিষ্টি লাগে ওর সঙ্গ। উনি নিঃসন্দেহে একজন মহৎ লোক, আমাদের প্রতিটি যোদ্ধা ওকে যেমন ভয় পান আবার তেমনই সম্মান করেন। চলমান সিংহের মত ওর শান্ত গাম্ভীর্য্য এক দর্শনীয় বস্তু। চারপাশের প্রত্যেক লোককেই উনি ভালোবাসেন। বিপদের দিনে উনি নিজে থেকে এগিয়ে এসে সারারাত মহল্লা পাহারা দেবেন, ভোজের দিনেও অন্যদের কথা ভেবে পেট পুরে খাবেন না। মহল্লার একদম সামনের দিকে উনি বাড়ী করেছেন, যাতে যে-কোন পথিক প্রথমেই ওঁর দরজায় অতিথি হয়ে এসে ওঠে। যেমন তাঁর মহত্ত্ব আবার তেমনই তাঁর দেহ-সৌষ্ঠব। ওঁর ত্বক যেন খরগোশের চামড়ার মত রেশম কোমল। ওঁর নিঃশ্বাসে যেন জার্নরের সৌরভ ভাসে!

ষষ্ঠ মহিলা তাঁর স্বামীর কথা বলতে গিয়ে মিষ্টি হাসি হেসে ফেলেন,—আমার স্বামী হলেন মালিক আবু জার, সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে তাকে ভালোবাসে। শৈশবে তিনি আমাকে এক গরীব ঘর থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। আমাকে উনি আদরে, সোহাগে, অলঙ্কারে ভরিয়ে রেখে দিয়েছেন। উনি আমাকে যেমন সম্মান করেন তেমনই ভালোবাসেন। সামহারের উজ্জ্বল বর্শা আর জীবন্ত সংগীতের মত উনি আমাদের বাড়ীটিকে সব সময় প্রাণবন্ত করে রাখেন। এখানে বসেও আমি যেন আমাদের উঠানে উট ঘোড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমার কানে এখন দুধ দোওয়ার শব্দ ভেসে আসছে! এমন মধুর ওনার সাহচর্য যে, আমি ঠিক ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারবো না! আমাকে উনি একটি কি সুন্দর সন্তান দিয়েছেন! শিশুটি যখন হেলে-দুলে পা-পা করে হাঁটতে চেষ্টা করে তখন ওকে দেখলে আপনি ভালো না বেসে পারবেন না। আমাকে একটি কন্যা সন্তান দিয়েছে উনি! এমন স্বাস্থ্যবতী আর নম্র স্বভাবের মেয়েটি যে, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ওকে সকলে একটি রত্ন বলে ভাবে। বিশাল আয়ত ঘন কালো চোখ ওর, নাকটি যেন একটি বাঁকা বাঁশী। কি সুন্দর মেয়েটির মুখশ্রী! ওর মিষ্টি কথা শুনলে নির্মল সুখে আপনার মন ভরে উঠবে। ওদের দু'জনকে নিয়ে আমার ঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আল্লাহ ওদের সুখে রাখুন, আবু জারের মঙ্গল করুন তিনি।

ষষ্ঠজন তার ভাষ্য শেষ করতেই আমি আমার সকল অতিথিকে ধন্যবাদ জানাই।
রাত প্রায় ভোর হয়ে আসে, গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ হঠাৎ চুপ করে যায়।

নয়শত আটাত্তরতম রজনী ঃ

সে আবার বলতে শুরু করে ঃ

আমি তখন তাদের বলি—প্রিয় বোনেরা আমার! আল্লাহ্ আমাদের আশীর্বাদ করুন। তাঁর প্রেরিত মহান নবী আমাদের মেয়েদের সম্পর্কে কি বলেন তাই শুধু আমি আপনাদের জানাতে চাই। আমরা নারীরা যেন নরকের অগ্নিকুণ্ডের জ্বালানী এক একটি। একদিন আমি তাঁর কাছে উপদেশ চাইতে গেছিলাম। তিনি আমায় বললেন—আয়েশা, আমার হৃদয়ের টুকরো! মুসলমান রমণীদের নিজেদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বিপদের দিনে তাদের ধৈর্যশীল হতে হবে আবার সুখের দিনে তারা যেন উদাসীন না হয়ে পড়েন! পুত্র-কন্যারা তাদের সংসার পূর্ণ করে তুলবেন, স্বামীকে সম্মান এবং যত্ন করবেন সুশীলা রমণীর মত। এবং আল্লাহর দয়ার কথা তারা যেন উপেক্ষা না করেন কোনদিন! আল্লাহর দোয়া থেকে তারা তাহলে বঞ্চিত হবেন চিরতরে। যে রমণী তার স্বামীকে ঘৃণা করবেন, বলবেন, 'কি কদাকার লোক! শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ তার একটি চোখ মুচড়িয়ে খুলে নেবেন। তিনি তার শরীর বিকৃত করে দেবেন। যে রমণী কথায় কথায় তার স্বামীকে প্রতিবাদ জানাবেন, তাকে অনর্থক বিরক্ত করবেন আল্লাহ্ তার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন।

কিন্তু একজন কল্যাণী রমণী, যিনি স্বামীর শান্তি কখনও বিঘ্নিত করেন না, যিনি স্বামীর আদেশ ব্যতীত কখনও বাড়ির বাইরে যান না, যিনি মূল্যবান অলঙ্কারে কখনও শোভিত করেন না, যিনি চারু ভাষিণী, যিনি স্বামী পুত্রকে স্নেহ ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে রাখেন, একমাত্র তাকেই আল্লাহ স্বর্গের প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবেন। তার প্রেরিত দেবদূত আর অনুসরণকারীদের সাথে সেই রমণীই শুধু স্বর্গে প্রবেশের অধিকার পাবেন।

আমি তখন বলে উঠি,—নবী আমার! তুমি তো আমার কাছে আমার পিতামাতার চেয়েও বেশি আপন।

যুবকটি আবার বলতে শুরু করে,—এইবার আমি ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের আমলের কয়েকটি গল্প বলবো। প্রথমে খলিফা ওমর ইবন অল-খাতাবের জীবন থেকে কয়েকটি আকর্ষণীয় ঘটনার কথা বলি।

যুবকটি তার নতুন গল্প শুরু করে ঃ

খলিফা ওমর ইবন অল-খাতাব ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক। এমন খাঁটি চরিত্রের সত্যনিষ্ঠ মানুষ সে যুগে আর হয়নি। তাকে অনেকে অল-ফারুক বা বিচ্ছেদবাদী বলতেন। কারণ যে ব্যক্তি নবী মুহম্মদের দণ্ডাদেশ মানতে বিন্দুমাত্র আপত্তি জানাতো, তিনি একটি তরবারীর সাহায্যে মুহূর্তে তার শিরচ্ছেদ করে ফেলতেন।

তিনি অতিশয় সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। ইয়েমেন সাম্রাজ্যের রাজভাণ্ডারের অধিকর্তা হয়ে তিনি সকল মুসলমানের মধ্যে তা সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন ; ছোট-বড়, গরীব-দুঃখী কিছুই বাছ-বিচার করলেন না। অন্যান্য জিনিসের সাথে প্রত্যেকের ভাগে পড়লো এক খণ্ড করে ডোরাকাটা কাপড়ের টুকরো। ওমর তার নিজের টুকরোটুকু দিয়ে একটি পোষাক তৈরী করলেন। সেই পোষাকে তিনি মদিনায় তার প্রচার বেদীতে উঠে দাঁড়িয়ে তার অনুসরণকারীদের ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। নাস্তিকদের কিভাবে দমন করতে হবে

তিনি তাই বোঝাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বাঁধা দিয়ে বললো, আমরা আপনাকে আর মানবো না।

ওমর জানতে চাইলেন,—কেন?

লোকটি তখন উত্তর দেয়,—কারণ, আপনি যখন ইয়েমেনের এই ডোরা কাটা কাপড় সকলকে ভাগ করে দিয়েছিলেন, তখন আপনি বলেছিলেন যে, সকলকেই সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো। কিন্তু আপনি যা লম্বা, মাত্র সেইটুকু কাপড়ে আপনার পোষাক তৈরী হতে পারে না। অর্থাৎ আপনি আমাদের ঠকিয়েছেন। আপনি চুরি করে নিজের জন্য বেশি কাপড় রেখেছেন, আপনি অধার্মিক!

ওমর তার পুত্র আবদাল্লার দিকে চেয়ে বললেন,—তুমি এ কথার উত্তর দাও, কারণ লোকটি ঠিকই বলেছে।

আবদাল্লা তখন উঠে দাঁড়ায়, সমবেত জনসাধারণকে চিৎকার করে জানায়,—মুসলমান ভাইগণ, আমাদের খলিফা যখন তাঁর পোষাক তৈরী করাতে গেলেন, তখন দেখা গেলো যে, তার ভাগের সেই সামান্য কাপড়টুকু তাঁর শরীরের তুলনায় নিতান্তই কম। আমি তখন আমার ভাগ থেকে একটু অংশ ছিঁড়ে দিলাম তাঁকে, না হলে আজ আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াবার মত তাঁর কোন পোষাকই থাকতো না।

তখন সেই বাধাদানকারী ব্যক্তি চিৎকার করে জানায়, আল্লাহ অবিনশ্বর! ওমর, আমায় মাপ করুন, আমরা আপনার সমস্ত কথা শিরোধার্য্য করে নেব।

আর একদিনের কথা, ওমর তখন সিরিয়া, মিশর, পারস্য, রাউমের সমগ্র ভূখণ্ড এবং ইরাকের বাসোরা ও কুফা জয় করে মদিনা ফিরছেন, তাঁর শরীরের পোষাক তখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে, চারদিকে শুধু খণ্ড-খণ্ড কাপড়ের টুকরো ঝুলছে। তিনি সেই ছেঁড়া পোষাকেই মসজিদের সিঁড়িতে বসে পড়লেন, বসে বসে তিনি সকলের অভিযোগের সুবিচার করতে থাকলেন। একজন আমীর থেকে একজন সামান্য উট চালক, প্রত্যেককেই তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতেন।

সীজার হিরাক্লিয়স কনস্টান্টিনোপলের খ্রিস্টানদের শাসন করতেন। একদা তিনি আরব-সম্রাটের আচার-ব্যবহার ও তাঁর শক্তি সম্পর্কে গোপনে তথ্যানুসন্ধানের জন্য একজন দূত নিযুক্ত করলেন। লোকটি মদিনায় এসে একে ওকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো, তোমাদের সম্রাট কই?

লোকে তখন তাকে জবাব দেয়, আমাদের তো কোন সম্রাট নেই! তবে একজন নেতা আছেন। তিনি হলেন পরম ধার্মিক ওমর ইবন অল-খাতাব, ঈশ্বর প্রেরিত খলিফা।

লোকটি তখন জানতে চায়,—কোথায় থাকেন তিনি? তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চলো।

লোকে তখন মসজিদের দিকে আঙুল দেখিয়ে জানালো,—ঐ যে ঐখানেই থাকেন তিনি। উনি যতক্ষণ জেগে থাকেন ততক্ষণ জনসাধারণের সুবিচার করেন, বাকী সময় ঘুমান।

সিজার-প্রেরিত দূতটি তখন মসজিদের সামনে এসে দেখে দুপুরের কড়া রোদে ওমর মসজিদের সিঁড়িতে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, মাথার চারদিকে স্বেদ-বাষ্পের একটি বর্তুলাকার পিণ্ড তৈরী হয়েছে।

লোকটি হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে যায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে চিৎকার করে ওঠে,—পৃথিবীর সমস্ত সম্রাট এই ভিক্ষুকের পায়ের নিচে মাথা নোয়াবে। ইনিই গোটা ধরিত্রীর মালিক।

পারস্য বিজয়ের সময় ইস্তাকার নগরীতে অবস্থিত সম্রাট জেডেজার্ডের রাজপ্রাসাদ থেকে কিছু সম্পদ নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে ছিলো একটি কার্পেট, যাটটি বৃহৎ বর্গাকার

প্রস্তরখণ্ড, সেগুলিতে একটি বাগানের ছবি খোদিত, যার প্রতিটি ফুল-পাতাই স্বর্ণ বা কোন দুষ্প্রাপ্য পাথর দ্বারা প্রস্তুত। মুসলমান নেতা সাধ বিন আবু-ওয়াকাস দেখেই বুঝতে পারেন যে, এগুলি দুর্লভ বস্তু। তিনি তাই এইগুলি ওমরকে উপহার দেবার জন্য আলাদা করে রাখেন। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা এইগুলি গ্রহণ করতে ভয় পেলেন, পাছে সম্পদ ও জাঁকজমকের উপর তাঁর লোভ জন্মে যায়! ইয়েমেন দখলের পর থেকে তিনি একটুকরো মোটা ডোরাকাটা কাপড় ছাড়া অন্য কিছুই ব্যবহার করতেন না। তিনি কার্পেটটিও নিজে গ্রহণ করলেন না। মদিনার গোষ্ঠীপ্রধানদের মধ্যে সমানভাবে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে দিলেন। কার্পেটটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলায় এর মূল্য নিঃসন্দেহে কমে গেলো! কিন্তু তা সত্ত্বেও আলী শুধুমাত্র তাঁর খণ্ডটিই সিরিয়ার এক বণিকের কাছে কুড়ি হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করেন।

পারস্য বিজয়ের সময় স্যাট্র্যাপ* হারমোজান ছিলেন সর্বশেষ যারা নতি স্বীকার করেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আত্ম-সমর্পণের সময় শর্ত করে নিলেন যে, একমাত্র খলিফা ওমরই তাঁর বিচার করতে পারবেন। ওমর তখন মদিনায় ছিলেন। দু'জন সাহসী এবং বিশ্বস্ত আমীরের সাথে তাঁকে প্রেরণ করা হলো।

আমীরদ্বয় ভালোমানুষ, রক্ষীর মর্য্যাদা যাতে খলিফা ওমর বুঝতে পারেন সেজন্য তার হারমোজানকে তার রাজকীয় পোষাক পরে খলিফার সামনে উপস্থিত হতে অনুমতি দিলেন। হারমোজান স্বর্ণখচিত একটি টিলা এবং একটি উজ্জ্বল কিরীট পরিধান করে মসজিদের সামনে এলেন। কিন্তু ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পরা লোকটিকে তিনি খলিফা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

খলিফা ওমর চোখ তুলে দেখতে পান যে, যে জাঁক-জমকপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, তাই পরে একজন বন্দী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তিনি চিৎকার করে উঠলেন,—আল্লাহর মহিমা বৃদ্ধি পাক! তোমার মত দাম্ভিকদের শান্ত করবার জন্যই তিনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছেন।

তিনি বন্দীটির সেই রাজকীয় পোষাক টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে বাধ্য করেন। সেভালিতে মরুভূমির বালিতে নিক্ষেপ করে তিনি জানতে চান,—তুমি কি বিশ্বাস কর যে, একমাত্র আল্লাহই সর্বশক্তিমান?

হারমোজান সাথে সাথে উত্তর দেন,—হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। কারণ সেকথা সত্য না হলে আমাদের পরাজয় ঘটতে পারতো না। ঈশ্বর নিরপেক্ষ থাকলে আপনাদের বাহিনীকে সহজেই পরাস্ত করতে পারতাম। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আপনাদের পক্ষ নিয়ে লড়েছেন।

বন্দীর এই তীক্ষ্ণ সত্যভাষ্য উপলব্ধি করে ওমর কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তার দিকে। হারমোজান তাঁর দৃষ্টি দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে যান ভাবেন এই রকম বাক্যালাপ করলে ওমর হয়তো তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবেন। তিনি তাই শঙ্কিত দৃষ্টিতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ার ভান করলেন। তিনি তাই জল পান করতে চাইলে তাঁকে এক মাটির পাত্রে জল দেওয়া হলো। পাত্রটি হাতে নিয়ে ওমরের দিকে চেয়ে তিনি ইতস্ততঃ করতে থাকেন। ওমর তখন জানতে চান, —এতো ভয় কিসের?

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে। গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ হঠাৎ চুপ করে যায়।

* প্রাচীনকালে পারস্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে স্যাট্র্যাপ বলা হত।

নয়শত ঊনআশিতম রজনী ঃ

সে আবার বলতে শুরু করে ঃ

স্যট্র্যাপ উত্তর দেন,—ভয় হচ্ছে, জল পান করা কালীন কেউ আমায় খুন না করে ফেলে!

ওমর এখন বলেন,—এ রকম সন্দেহের হাত থেকে আল্লাহ আমায় রক্ষা করুন। তৃষ্ণা নিবারিত না হওয়া পর্যন্ত তোমার কোন ভয় নেই।

সাথে সাথে পারস্য বন্দীটি জল ভরা মাটির পাত্রটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেন। শপথে আবদ্ধ থাকায় ওমর তাকে কোন শাস্তি দিতে পারলেন না। হারমোজান তার করুণায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ওমর তাকে দুই সহস্র দিরহামের ভাতা মঞ্জুর করে দেন।

জেরুজালেম শহর দখলের সময় সেখানকার ধর্মযাজক সফরোনিয়স শর্ত দেন যে, খলিফা সশরীরে উপস্থিত হলে তবেই তিনি আত্মসমর্পণ করতে রাজী। ওমর সম্পূর্ণ একাকী একটি উটে চেপে মদিনা শহর থেকে জেরুজালেমের পথে রওয়ানা হলেন। মাত্র দু'টি বোঝা সম্বল করে তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে প্রবৃত্ত হন। তার একটিতে ছিলো উটের জন্য কিছু শুকনো খাদ্য আর অন্যটিতে তাঁর নিজের জন্য কিছু শুকনো খেজুর। শুধুমাত্র প্রার্থনার জন্য বা পথে কেউ তাঁর কাছে বিচার প্রার্থনা করলে তিনি উট থামাচ্ছিলেন, এছাড়া দিবারাত্র তিনি পথ অতিক্রম করতে থাকেন। শহর দখলের সন্ধিপত্রে সাক্ষর করার পর জেরুজালেমের দ্বার তাঁর সামনে খুলে দেওয়া হলো। খ্রিস্টানদের গীর্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর প্রার্থনার সময় ঘনিয়ে এলো। কোথায় প্রার্থনা করা যায় জানতে চাইলে সফরোনিয়স তাঁকে তার গীর্জায় আসতে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু ওমর তখন বলেন,—যদিও তোমাদের বিশ্বাস ভূয়ো, তবু আমি এখানে প্রার্থনা করবো না। কারণ খলিফা যেখানে প্রার্থনা করেন, মুসলমানেরা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের দখল গ্রহণ করে।

প্রার্থনা শেষে তিনি খ্রিস্ট-ধর্মযাজককে প্রশ্ন করেন—কোথায় এখানকার মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদ স্থাপন করা যায়। আমাকে দেখিয়ে দিন।

সফরোনিয়স তাঁকে সুলেয়মানের ধর্মস্থানের দিকে নিয়ে গেলেন। এই স্থানে আব্রাহামের পুত্র ইয়াকুব তাঁর দেহরক্ষা করেন। ওমর দেখতে পান যে, এই স্থানে শহরের সমস্ত আবর্জনা জড় করা হয়। তিনি তখন নিজে হাতে কিছু আবর্জনা তুলে তাঁর কাপড়ের ভাঁজে করে দুরে ফেলে দিয়ে আসেন। তাঁর এই কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো অনেকে কাজে হাত লাগান, ফলে দ্রুত স্থানটি পরিষ্কৃত হয়ে যায়। এই স্থানে নির্মিত মসজিদটি বিশ্বের অন্যতম সুন্দর মসজিদ, এর সাথে তাঁর স্মৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

ওমর মক্কা ও মদিনার রাস্তায় সাধারণতঃ একটি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে একটি লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করতেন। যে সব বণিকরা লোক ঠকাতে চেষ্টা করতো, তিনি এই রকম ছদ্মবেশ ধারণ করে তাদের হাতে হাতে ধরে ফেলতেন। কখনও তিনি উপদেশ দিয়েই অপরাধীকে ছেড়ে দিতেন, কখনও বা অপরাধের গুরুত্ব বুঝে তাকে বেত্রাঘাত করতেন।

একদিন তিনি দুধের বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধা কয়েকপাত্র দুধ বিক্রয় করছে। বৃদ্ধাটিকে দুধে জল মেশাতে দেখে তিনি বলে উঠলেন,—শোনো, আর কখনও এইভাবে লোক ঠকিও না। তুমি দুধে জল মিশিয়ে বিক্রী কর কেন? কখনও এমন কাজ করো না।

মহিলাটি উত্তর দেয়, আপনার কথা আমি মাথা পেতে নিলাম, আর কখনও করবো না।

পরদিন তিনি আবার দেখা করলেন বৃদ্ধা দুধ-বিক্রেতাটির সঙ্গে,—গতকালই না তোমায় আমি সাবধান করে দিলাম যে, দুধে জল মিশিও না! আবার তুমি সেই কাজ করেছ!

—না, শপথ করে বলছি, আমি আজ জল মেশাইনি। মহিলাটি চিৎকৃৎ নিনাদে প্রতিবাদ করে।

ভেতর থেকে একটি মেয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,—মা, তুমি খলিফা ওমরের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বললে কেমন করে? একে তো অন্যায় করেছ, তার ওপর আবার মিথ্যা কথা বলে পাপ বাড়াচ্ছো? আল্লাহ্ তোমায় মাফ করুন!

মেয়েটির সৎসাহস ও সত্যবাদিতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। বৃদ্ধাটিকে শাস্তি না দিয়ে তিনি অবিলম্বে বাড়ি ফিরে এলেন, দুই পুত্র আবদাল্লা ও আকিমকে সমস্ত জানিয়ে বললেন,—এই গুণবতী মেয়েটিকে তোমাদের কে বিয়ে করতে চাও বলো? আল্লাহ্ এই মেয়েটির নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন।

—আমি ওকে বিয়ে করতে রাজী আছি, আব্বা! ছোট ছেলে আকিম উত্তর দেয়।

খলিফা পুত্র আকিমের সাথে সেই বৃদ্ধার দুগ্ধ-বিক্রেতা কন্যাটির বিবাহ হয়ে যায়। তাদের এই বিবাহে আল্লাহর সত্যকার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিলো, কারণ তাদের কন্যা আবদ্ অল আজিজ বিন্ মারোয়ানকে বিবাহ করে এবং ওমর বিন আবদ্ অল আজিজের জন্ম দেয়। কালক্রমে এই পুত্র ওমিয়াদ সিংহাসনে আসীন হন। তিনি ইসলামের সুমহান পাঁচজন খলিফাদের একজন ছিলেন।

ওমর বলতেন,—কোন মুসলমান খুন হলে আমি তার সত্যকার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বো না।

একদিন তিনি মসজিদের সিঁড়িতে বসেছিলেন, এমন সময় কয়েকজন লোক একটি মৃতদেহ নিয়ে আসে তার কাছে। তারা জানায়, এটিকে তারা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছে।

ওমর অনেক চেষ্টা করে এ হত্যার রহস্যের মীমাংসা করতে পারেন না। তাঁর সুবিচারক মনে এই ঘটনা গভীরভাবে রেখাপাত করে। প্রায়ই তাঁকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে দেখা যেত, মহান্ আল্লাহ, আমি যেন ঐ লোকটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারি।

উক্ত ঘটনার প্রায় একবছর পরে কয়েকজন লোক তাঁর কাছে একটি শিশুকে নিয়ে আসে। তারা জানায়, শিশুটিকে সেই দুর্ঘটনাস্থলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ওমর উত্তেজিত স্বরে বলে ওঠেন,—আল্লাহ্ করুণাময়। আমি বুঝতে পারছি যে, সেই হত্যা-রহস্যের মীমাংসা এবার করতে পারবো।

তিনি তাঁর বিশ্বস্ত একটি মহিলার হাতে শিশুটিকে তুলে দিয়ে বললেন, —একে তুমি পালন কর, আমি এর যাবতীয় ব্যয় বহন করবো। একে সযত্নে আগলে রাখতে হবে, যদি এর সম্পর্কে কাউকে কিছু বলতে শোনো, সাথে সাথে, আমায় খবর দেবে। আর শিশুটিকে অপরিচিত কেউ যদি বুকে চেপে ধরে, আদর করে বা চুমু খায়, তাও আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাবে।

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসে। গল্প থামিয়ে শাহরাজাদ হঠাৎ চুপ করে যায়।

নয়শত আশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

দিনে দিনে শিশুটি বেড়ে উঠতে থাকে। শিশুটির যখন দুই বছর বয়স তখন একজন ক্রীতদাসী সহসা সেই মহিলার কাছে এসে জানায়,—আমার মনিব এই শিশুটিকে

একটু দেখতে চান! তিনি অন্তঃসত্তা; আল্লাহর কাছে তিনি প্রার্থনা করবেন এই রকম সুকোমল গড়নের একটি স্বাস্থ্যবান পুত্র হয় যেন তার।

—ঠিক আছে, ওকে নিয়ে যেতে পার, তবে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

শিশুটিকে নিয়ে ওরা ক্রীতদাসীটির মনিবের বাড়ী যায়। দূর থেকে শিশুটিকে দেখতে পেয়েই সাশ্রুনয়নে ছুটে আসে মনিবটি, কোলে তুলে নিয়ে তাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে থাকে।

ধাত্রীটি ছুটে এসে ওমরকে খবর দেয় যে, মহিলাটি শ্রদ্ধেয় নগররক্ষী সালের কন্যা সালেহা।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ওমর একটি তরবারী তাঁর পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নগররক্ষীটির বাড়ী পৌঁছে তিনি দেখতে পান সদর দরজার পাশেই সালে প্রার্থনায় রত। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি জানতে চাইলেন,—তোমার কন্যাটির খবর কি?

আল্লাহ্ ওর মঙ্গল করুন! দয়া, দাক্ষিণ্য এবং ধর্মপ্রিয়তার জন্য ওর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ওর মত এমন সুচরিত্রের মেয়ে ক'টা হয়?

—বাঃ খুব ভালো কথা! আমি ওর সাথে দেখা করবো।

—আল্লাহ্ আপনাকে দোয়া করুন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ওকে আগে খবর দিয়ে আসি।

অন্দরে প্রবেশ করে ওমর সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেন, সালেহার সাথে তিনি একাকী কথা বলতে চান। সবাই চলে গেলে ওমর তাঁর তরবারীটি মুক্ত করে বলেন ঃ

—রাস্তায় যে মৃতদেহটি পাওয়া গেছিলো, তার সম্পর্কে তুমি কি জান বলো? যদি কোন সত্য গোপন করতে চেষ্টা কর তো এই তরবারীটি দেখতেই পাচ্ছ।

—মহান্ খলিফা! আপনি ঠিক জায়গাতেই খবর নিতে এসেছেন। আমি আল্লাহ্র নামে শপথ নিয়ে বলছি যে, আমি আপনার কাছে কিছুই লুকাবো না। তারপর গলা নামিয়ে আবার সে বলতে শুরু করে, আমার কাছে একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা থাকতেন। তাঁকে আমি মায়ের মত ভালোবাসতাম। অনেকদিন ছিলেন তিনি আমার কাছে। আমাকে উনি যেমন স্নেহ করতেন, আমিও ওনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম।

একদিন তিনি আমায় জানালেন, আমি এক আত্মীয়ের বাড়ী যেতে যাই কয়েকদিনের জন্য। আমার একটি কন্যা আছে, সে তোমার কাছে এসে থাকবে। আমি অনুমতি দিতে তিনি চলে গেলেন। পরদিন তাঁর কন্যাটি আমার বাড়ী এলো। মেয়েটিকে যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি দীর্ঘ সুস্থ চেহারা তার। ওকে আমার বেশ ভালো লেগে গেলো। আমি ওকে আমার ঘরেই শুতে দিলাম।

একদিন বিকালে আমি হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, ঘুমের মধ্যে একটি পুরুষ আমার উপর চড়াও হয়েছে। লোকটি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে আমাকে ততক্ষণে পর্য্যুদস্ত করে ফেলেছে। ওর হাত থেকে মুক্তি পাবার আগেই লোকটি আমাকে অসম্মান যা করার করে ফেললো। লজ্জায়, রাগে উন্মত্ত হয়ে আমি তখন ওর বুকে একটি ছুরি বসিয়ে দিলাম! তারপর ভালো করে দেখি, সে একটি মাকুন্দ পুরুষ এবং এই লোকটিই মেয়ে সেজে এসেছিলো আমার কাছে, আমিও বিশ্বাস করে তাকে গ্রহণ করেছিলাম।

খুন করার পর কি করি, আমি ওকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কিন্তু বলাৎকারের ফলশ্রুতি হিসাবে আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লাম। একটি পুত্র-সন্তান হলো আমার। এই অসম্মানের সন্তানকে গ্রহণ করতে মন চাইলো না আমার, আমি তখন এর পিতাকে যেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, সেইখানেই এককেও ছেড়ে দিয়ে এলাম। আল্লাহ্ জানেন, আমি আপনার কাছে কিছুই গোপন করিনি।

—তুমি সত্যি কথাই বলেছ লক্ষ্মী মেয়ে, আল্লাহ্ তোমাকে আশীর্বাদ করুন।

মেয়ের সাহস ও সত্যবাদীতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে যান, আল্লাহর কাছে তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন।

কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে ধনী যুবকটি আবার বলতে শুরু করে ঃ

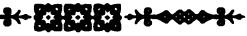

এইবার আমি তোমাদের একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গল্প শোনাবো। সে তার নতুন গল্প শুরু করে ঃ

কুফার বিখ্যাত কবি গায়ক মহম্মদ এই কাহিনীটা বলেছিলো ঃ

যারা আমার কাছে গান শিখতো তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিলো সলমা। শুধু দেখতেই সে অপরূপা ছিলো না, গানের সময় তার কণ্ঠে মধু ঝরতো। অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলো সে। অতি সহজেই কঠিন সুরও আয়ত্ত করে ফেলতো।

এই শশাঙ্ক-শুভ্র সুন্দরীকে আমি আদর করে নীলা বলে ডাকতাম। তারও অবশ্য একটা কারণ ছিলো। মেয়েটির ওপর ঠোঁটের উপরে গোঁফের জায়গাটা ঈষৎ নীলাভ দেখাতো। ঠিক কৈশোর কাটিয়ে তারুণ্যে পা রাখার আগে ছেলেদের যেমনটা হয়, তেমনি। মনে হতো, কেউ যেন ওর নাকের নিচে খানিকটা জলকালি মাখিয়ে দিয়েছে।

আমি যখন ওকে গান শেখাতাম তখন ও কুমারী কিশোরী। তবে কুঁড়ি ফুটবো ফুটবো করছে। বুঝতে পারতাম, ওর কামিজের নিচে ছোট ছোট স্তন দু'টি দিনে দিনে সুগঠিত এবং তিলে তিলে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে।

কেন জানি না, ওর দিকে চোখ পড়লেই আমার হৃদয় মথিত হয়ে যেত। বুকের মধ্যে এক তুফান উঠতো। চোখ দু'টো ধক ধক করে জ্বলতে থাকতো, মাথাটা কেমন যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরে যেত।

যদিও সে সময় নীলার সতীর্থা ছিলো কুফার সেরা সেরা সুন্দরী কন্যারা, তবু আমার কিন্তু ওকে ছাড়া আর কাউকেই তেমন মনে ধরেনি। আমার কেন কোনও পুরুষই ওর দিকে তাকিয়ে বুকের তড়ফানী চেপে রাখতে পারতো না। একবার যারা দেখতো তারাই মনে-প্রাণে কামনা করতো সলমার সঙ্গ-সুখ।

জানি সে আমার ছাত্রী। গুরু শিষ্যার সম্পর্কের মধ্যে কাম-গন্ধ থাকতে নাই। তবু অকপটে বলবো, সলমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। শুধু নির্ভেজাল নিরামিষ মহব্বৎ নয়, কামনার শরে জাগরিত ছিলো সেই উত্তপ্ত প্রেম। ওর একটি ইশারায় কিনা অসাধ্য সাধন করতে পারতাম আমি! যদি সে বলতো, একটা জ্যান্ত মানুষের শির কেটে মগজ এনে দাও, ভেজে খাবো, তাও আমি অনায়াসে এনে দিতে পারতাম তাকে। যদি সে হুকুম করতো, ঐ দুর্লঙ্ঘ্য গিরিচূড়ায় উঠে পেড়ে আনতে হবে বকপাখীর ডিম, তাও আমার পক্ষে অসাধ্য ছিলো না। কিন্তু হায়, আমার পোড়া কপাল, তেমন কোন আজ্ঞাই তার কাছ থেকে পেলাম না কখনও।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো একাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

ওস্তাদ ইবন ঘানিমের সঙ্গে সলমা মক্কায় গিয়েছিলো, তখন আমি তার বিরহে একটা গান লিখেছিলাম। কিন্তু সে গান একান্তই আমার ব্যক্তিগত বিরহের অভিব্যক্তি।

আমার চেয়ে হতভাগ্য ছিলো আর একজন। তার নাম ইয়াজিদ ইবন আয়ুফ। সেও নীলার প্রেমাকাঙ্ক্ষী ছিলো।

একদিন ওস্তাদ ঘানিম সলমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা নীলা, এখানে কী তোমাকে কখনও কেউ ব্যর্থ প্রেম নিবেদন করেছে? সত্যি কথা বলতো?

সলমা বললো, না, তেমন কেউই কিছু করেনি। তবে একদিন ইয়াজিদ ইবন আয়ুফ আমাকে একটিমাত্র চুম্বন করেছিলো।

ওস্তাদ ঘানিম অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, কী রকম? তোমার অমতে জোর জবরদস্তি করে?

—না তা নয়, তবে লোভ দেখিয়ে। সে আমাকে দু'টো সুন্দর মুক্তো দেখিয়ে বলেছিলো, এ দু'টো তোমাকেই দেব, কিন্তু হাতে হাতে নয়। আমার মুখে থাকবে, তুমি মুখ দিয়েই তা বের করে তোমার মুখে পুরে নেবে।

সত্যি কথা বলতে কি ঐ মুক্তো দু'টো দেখে আমার ভারি লোভ হয়েছিলো! ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। পরে ঐ মুক্তো দু'টো বিক্রি করে আমি আশি হাজার দিরহাম পেয়েছিলাম।

ওস্তাদ ঘানিম গম্ভীর হয়ে বললেন, হুম, এই কাণ্ড!

এর পর ইয়াজিদের কপালে কি জুটেছিলো বুঝতেই পারছেন। বেতের ঘায়ে ঘায়ে জর্জরিত হয়ে ব্যাচারা শয্যাশায়ী হয়ে থেকে একদিন মারা গেলো। একটি চুমুর জন্য তাকে এইভাবে মূল্য দিতে হয়।

একদিন আমি ওস্তাদ ঘানিমের বাড়িতে যাচ্ছিলাম সলমাকে গানের তালিম দেবার জন্য। পথে দেখা ইয়াজিদের সঙ্গে। খুব রংদার জমকালো পোষাকে সেজে-গুজে সেও যেন কোথায় যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, এতো সেজে-গুজে চললে কোথায়?

ইয়াজিদ বললো, তুমি যেখানে চলেছ, আমিও সেইখানেই যাচ্ছি।

আমি বললাম, তা হলে তো ভালোই হলো, চলো এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

আমরা ঘানিমজীর বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। একটু পরে সলমা এলো। চুমকী বসানো হলুদ রঙের বাহারী শালোয়ার আর পায়ে টকটকে লাল রঙের কাতান। ওকে দেখে আমার মনে হলো এক জ্বলন্ত সূর্যের গোলা যেন। সলমার পিছনে এসে দাঁড়ালো একটি সুন্দরী বাঁদী। হাতে তারের বাদ্যযন্ত্র।

আমি ওকে যে গানটা শেখাচ্ছিলাম সেটা একবার গাইতে বললাম। বড় মধুর করে গেয়ে শোনালো সে।

ওস্তাদ্‌জী আমাদের বসিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে গেলেন দুপুরের খানাপিনার বায়না দিতে। সেই সুযোগে ইয়াজিদ আরও কাছে ঘেষে বসলো সলমার। সলমা যাতে একটিবার তার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টি মেলে তাকায়, সেই আশাতে অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু সলমা তখন গানে বিভোর।

ইয়াজিদ কোমরের থলে থেকে দু'টো সুন্দর মুক্তো বের করে নাচাতে লাগলো। এবং সলমা দেখে প্রলুব্ধ হলো। গান শেষ হলে ইয়াজিদ বললো, এ দু'টো আমি ষাট হাজার দিরহামে কিনেছি। যদি তোমার পছন্দ হয় নিতে পার।

সলমা বললো, তার বদলে আমাকে কী করতে হবে?

—কিচ্ছু না, শুধু একটি গান শুনিয়ে দাও—

সলমা একটা গান শোনালো ইয়াজিদকে, তারপর বললো, কই দাও এবার?

ইয়াজিদ বললো, কথা যখন দিয়েছি আলবাৎ দেব। কিন্তু আমি মনে মনে একটা পণ

করেছি। এ দু'টো আমার মুখে থাকবে। আর তুমি তা বের করে নেবে তোমার ঠোঁট দু'টো দিয়ে।

সলমার গা গুলিয়ে গেলো। ঐ হতচ্ছাড়া লোকটার মুখে মুখ ঠেকাতে হবে? কিন্তু মুক্তো দু'টো কী দামী? একটি মাত্র চুম্বনের বদলে অমন জিনিস সে দিয়ে দেবে তাকে! কী বোকা হাঁদা?

অবশেষে লোভ সামলাতে না পেরে সলমা সম্মত হয়ে গেলো।

এই হচ্ছে ওদের চুম্বন বৃত্তান্ত।

এর পর আর একটা সত্য ঘটনা শোনাচ্ছি ঃ

একদিন খলিফা ওয়ালিদ রবাহুত নবান্নভোজী তুফেনের সঙ্গে খানাপিনা করছিলেন। যেখানেই ভালোমন্দ খানাপিনার গন্ধ পেত সেখানেই সে হাজির হতো। সারা কুফা শহরে তার এই গায়ে পড়ে সেধে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়ার ব্যাপারটা তখন লোকের মুখে মুখে মুখরোচক গল্প হয়ে ফিরতো।

খেতে সে ভীষণ ভালোবাসতো, এক কথায় পেটুক বলা যায়। কিন্তু গোগ্রাসে গিলতে সে পারতো না। মজার মজার রঙ্গ-রস করে মজলিস মাতিয়ে তুলতেও সে অদ্বিতীয় ছিলো।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো বিরাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

একদিন এক সম্ভ্রান্ত আমিরের বাড়িতে ভোজসভায় শহরের তাবৎ গণ্যমান্য ব্যক্তি সমবেত হয়ে আহারে বসেছে। এমন সময় দরজার কাছে দরোয়ানদের সঙ্গে বচসা করতে শোনা গেলো তুফেনকে।

তুফেনের গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্র নিমন্ত্রিতরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো।

—এই সেরেছে, তুফেন যখন হানা দিয়েছে, তখন আর কাউকে পেট ভরে খেতে হবে না। ও একাই সেরা সেরা খানাগুলো সাবাড় করে দেবে।

একজন বললো, এক কাজ করা যাক, বড় মাছটাকে ঘরের ওপাশে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও। আর সামনে সাজিয়ে রাখ ছোটখাটো চুনো-পুঁটিগুলো। খেয়ে যখন সে বিদায় নেবে, তখন আমরা বের করবো ঐ বড় মাছটা।

তার কথায় সকলেই সায় দিলো। বড় মাছটাকে একটা বারকোষের ওপর রেখে ঢাকা চাপা দিয়ে একটু দুরে এক পাশে সরিয়ে রাখা হলো। আর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হলো ছোট মাছের থালাগুলো।

তুফেন ঘরে ঢুকেই সবাইকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে খাবারের টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো।

সকলে তাকে শুকনো অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো, আরে, এসো এসো তুফেন সাহেব, তোমার জন্যেই আমরা হাত তুলে বসে আছি। এসো এসো, তুলে নাও একটা থালা।

তুফেন টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে চুনোমাছের বেকাবী সাজানো আছে কয়েকখানা। একজন বললো, খুব ভালো মাছ, একটু মুখে দিয়ে দেখ।

তুফেন ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমার বাবা সমুদ্রের পানিতে ডুবে মরার পর থেকে মাছে আর তেমন কোনও আসক্তি নাই। তোমরাই খাও, ভাই সাব।

অন্য একজন বললো, সে কি কথা! এ যে ভুতুড়ে কথা শুনছি তোমার মুখে! একবার একটা তুলে চেখেই দেখ না, বড় ভালো হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বে একটা ছোট চারাপোনা দু' আঙ্গুলে তুলে সে নাকের কাছে ধরে। তারপর আবার যথাস্থানে নামিয়ে রেখে দেয়।

—কী হলো, খাবে না?

সকলে অবাক হয়ে সমস্বরে প্রশ্ন করে। তুফেন অনাসক্তের মতো বলে, নাঃ।

—কারণ?

তুফেন বলতে থাকে, এই খুদে মাছটাকে খাবো বলে মুখের কাছে ধরতেই ও কি বললো জানো? বললো, আমাকে কেন খাচ্ছো মালিক, তোমার বাবাকে তো আমরা কেউ খাইনি। যে খেয়েছিলো সেও অবশ্য আমাদের সঙ্গেই উপস্থিত আছে এই ভোজসভায়। তাকে যদি উদরস্থ করতে পার, তবে তোমার বাবার হন্তার প্রতি যোগ্য প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু তেমন বড় মাপের মাছ তো এখানে নজরে পড়ছে না?

ঐ মাছটাই আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো, ঐ—ঐ যে বারকোষটায় ঝুড়ি চাপা রয়েছে, ঐ রাঘব বোয়ালটাই তোমার বাবাকে আস্ত গিলে খেয়ে ফেলেছিলো। এখন আমার গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। ব্যাটাকে পেলে আমি আস্ত গিলে খাবো।

এই বলে তুফেন দ্রুতপায়ে কোণে ঢাকা দিয়ে রাখা বারকোষের কাছে এগিয়ে যায় এবং লেজাটা ধরে টেনে তুলে ধরে নাকের সামনে।

—ওঃ, তোফা, খেতে হবে, কী বলো? তবে শয়তান তুই আমার বাবাকে খেয়েছিলি? আর আজ কী হবে? তোকে আমি খেয়ে ফেললে তোর কোন বাপ ঠেকাতে আসবে এখানে? উঁ-হুঁ-হুঁ, ওসব নাকি কান্না আমার ঢের শোনা আছে। না, কিছুতেই না, তোকে আস্ত আমার পেটে ঢোকাতে না পারলে আমার গায়ের ঝাল যাবে না।

এই বলে ঐ বিরাট মাছটাকে তুফেন একাই খেয়ে সাবাড় করে দিলো।

উপস্থিত অভ্যাগতরা তার এই অভিনব ফিকির দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লো সকলে।

—আরে তুফেন ভাই। অমন গোগ্রাসে খেও না, গলায় আটকে যাবে যে!

এর পর যুবকটি আর এক কাহিনী বলতে শুরু করলো ঃ

শোনা যায়, আব্বাসের তৃতীয় বংশধর খলিফা মাহদী তাঁর মৃত্যুকালে প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র অল হাদীকে মসনদের উত্তরাধিকারী করে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি একটি শর্ত রেখে গিয়েছিলেন। তা হলো, অল হাদী মারা যাবার পর মাহদীর কনিষ্ঠ পুত্র হারুণ অল রসিদ মসনদ পাবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অল হাদীর মৃতদেহে তার কোনও অধিকার বর্তাবে না।

অল হাদী ধর্মাবতার হয়ে মসনদে বসার পর থেকে সে অনুজ অল রসিদের ওপর দারুণ হিংসুটে হয়ে উঠলো। দিনে দিনে মিথ্যা সন্দেহের দানা বাঁধতে লাগলো তার মনে। নানা ছল ছুতো খুঁজতে লাগলো, কী উপায়ে রসিদকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়।

কিন্তু হারুনের মা খাইজারান অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বিচক্ষণ রমণী ছিলেন। প্রতি পদেই তিনি হারুনকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে আগলে রাখতেন। খলিফা মা-সুদ্ধ ছোট ছেলেকে সাবাড় করে দেবার মতলব ভাঁজতে লাগলো।

একদিন খলিফা অল হাদী তার নন্দন-কাননে প্রিয়তমা বাঁদী ঘদিরকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ বিহার করছিলো।

ঘদিরকে আজ মাত্র চল্লিশ দিন হলো হারেমে আনা হয়েছে। এই চল্লিশ দিনের মধ্যে একটা মুহূর্তের জন্য খলিফা তাকে চোখের আড়াল করতে পারেনি। তার রূপ-সুধা পান করে করে অলস দিন কাটাচ্ছে সে।

বাগানের ঠিক মাঝখানে গালিচা পাতা হয়েছে। বিখ্যাত ওস্তাদ ইশাক এসেছে গান শোনাতে।

প্রথমে ঘদির গান গাইলো। যে গানের মূর্ছনায় তন্ময় হয়ে রইলো ইশাক। অল হাদীও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে সুন্দরী বাঁদী ঘদিরের মুখের দিকে।

হঠাৎ যেন কি ঘটে গেলো, খলিফা অল হাদী আর্তনাদ করে উঠলো। নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, প্রত্যেকেরই সময়সীমা বাঁধা আছে। তার এক মুহূর্ত বেশি এখানে কাটাতে পারবে না কেউ। একদিন সময় ফুরালে সবাইকে সেখানে চলে যেতে হবে।

এরপর একটুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকলো খলিফা। তারপর চিৎকার করে হাঁকতে লাগলো, মাসরুর। জলদি মাসরুরকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

তক্ষুণি খলিফার দেহরক্ষী মাসরুর এসে হাজির হলো, বান্দা হাজির জাঁহাপনা।

এই যে মাসরুর, তুমি এসেছ, হাঁপাতে হাঁপাতে অল হাদী বললো, এক্ষুণি যাও, অল রসিদের কাটা মুণ্ডু এনে হাজির কর আমার সামনে।

মাসরুর অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ। ছোটবেলা থেকে অল রসিদকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে সে। এ দুনিয়ায় তার চেয়ে প্রিয় বস্তু আর কিছু নাই। সেই প্রাণাধিক প্রিয় অল রসিদকে নিজের হাতে হত্যা করতে হবে আজ? ইয়া আল্লাহ, এ কি অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিলে আমায়। অল হাদী এখন স্বয়ং ধর্মাবতার। তার হুকুম অমান্য করা শুধু ঘোরতর অপরাধ নয়, মহা অধর্ম, মহা পাপও বটে। কিন্তু জগতে পাপ ও পুণ্য, ধর্ম ও অধর্মর চেয়ে বড় কি আর কিছুই নাই। নফর মাসরুর এ প্রশ্নের উত্তর পাবে কোথায়?

কী দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার হুকুম শুনতে পাওনি?

গর্জে উঠলো অল হাদী।

—জী হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

এই বলে সে হারেমের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে স্বগতভাবে শুধু বললো, আমরা সবাই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি। আবার মেয়াদ ফুরালে তার চরণেই ফিরে যাবো। তারপর এক বদ্ধ মাতালের মতো টলতে টলতে গিয়ে হাজির হলো সুলতান জননী খাজিরানের মহলে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো তিরাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

মাসরুরকে অস্বাভাবিক ভাবে টলতে টলতে আসতে দেখে খাইজারান অবাক হয়ে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার, অমন টলমল করছিস কেন মাসরুর?

মাসুরুর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না, মা জননী! আপনার গর্ভের সন্তান আমার প্রভু খলিফা হুকুম করেছেন তাঁর সহোদর ভাই অল রসিদের শির কেটে নিয়ে যেতে।

এই কথা শোনা মাত্র বিধবা বেগমসাহেবার চোখে অন্ধকার নেমে আসে।

—সর্বনাশ, কী উপায় হবে? সে আমার গর্ভজাত সন্তান হতে পারে, কিন্তু এখন তো সে বাগদাদের খলিফা ধর্মাবতার। তার হুকুম অমান্য বা রদ করার সাধ্য তো ইহ দুনিয়ায় কারো হতে পারে না। পুত্রের এই আক্রোশ থেকে রসিদকে সে কী করে প্রাণে বাঁচাবে?

কিন্তু বিপদে অধীর হলে চলবে না। মাসরুরকে বললেন, যা শিগ্গির, হারুনকে আমার কাছে নিয়ে আয় এক্ষুণি।

হারুন অল রসিদ নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলো। মাসুরুর ছুটে গিয়ে তাকে ঠেলে তুললো, মালিক, শিগ্গির চলুন, মা জননী আপনাকে তলব করেছেন।

হারুন কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। তাড়াতাড়ি সে সাজগোজ করে মায়ের মহলে এসে দাঁড়ায়। খাইজারান আকুল হয়ে ছুটে এসে পুত্রকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। মুখে কোনও কথা বলতে পারেন না।

একটু পরে একটা ছোট্ট কুঠরীতে গিয়ে ছেলেকে নিয়ে বসেন তিনি।

—শোনো বাবা, তোমার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, এক্ষুণি তোমার গর্দান যাবে। তোমার বড় ভাই এই হুকুমই দিয়েছে মাসরুরকে। তোমার কাটা মুণ্ডু সে দেখতে চায় আজই। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এই গুপ্ত কুঠরিতেই লুকিয়ে থাক। কিছুতেই বাইরে বেরুবে না।

এরপর সুলতান-জননী বাইরে এসে মাসরুরকে বললো, যাও, এখনও হয়তো সবাই ঘুম থেকে ওঠেনি, দরবারের আমিরদের বাড়িতে গিয়ে খবর দাও আমি তাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা করতে চাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে খাইজারানের মহলে আমিরদের দরবার বসলো। বিধবা বেগমসাহেবা সকলকে উদ্দেশ করে বলতে থাকলেন, আপনারা তো হারুনকে ভালো করেই জানেন। সে কি করে, কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে কিছুই আপনাদের অজানা নয়। আপনারাই বলুন, আজ পর্যন্ত সে কখনও তার বড় ভাই-এর বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে? অথবা প্রজা ক্ষেপিয়ে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছে কোনও অঞ্চলে?

সকলে সমস্বরে বললো, না না, এ সব কী বলছেন, মহামান্য বেগম সাহেবা? শাহজাদা হারুন অল রসিদের মতো ভালো ছেলে হয় না। তার মনে কোনও পাপ নাই। সে জ্ঞানত কারো বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করতে পারে এ আমরা বিশ্বাস করি না।

—তবে কোন্ অপরাধে খলিফা তার কনিষ্ঠ ভাই-এর গর্দান নেবার হুকুম করেছে? সে মাসরুরকে পাঠিয়েছে হারুনের শির কেটে নিয়ে গিয়ে তার সামনে হাজির করতে। কিন্তু কেন এই প্রাণদণ্ড? কী তার অপরাধ? আপনারা এর বিহিত করুন।

আমির অমাত্যরা হতবাক হয়ে মাথা নত করলো সকলে। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগলো সারা শরীর।

এই সময় উজির রাবিয়াহ উঠে দাঁড়িয়ে মাসরুরকে ইশারায় ডেকে কাছে এনে ফিসফিস করে বললো, খলিফা তোমাকে হুকুম তামিল করতে পাঠিয়েছেন, অথচ তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কালক্ষেপ করছো, তাতে তো কোনও সুরাহা হবে না।

মাসরুর সাশ্রুনয়নে বলে, কিন্তু কী করবো হুজুর! এ হুকুম আমি তামিল করবো কী উপায়ে? তার চেয়ে আমারই গর্দান নিক খলিফা।

উজির বললো, বিপদে অধৈর্য্য হতে নাই, কথা শোনো, তুমি খলিফার সামনে গিয়ে বলো, সুলতান-মাতা সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছেন, সেই কারণে তুমি তাকে বধ করতে পারছো না।

মাসরুর অল হাদীর সামনে হাজির হতে সে হুঙ্কার ছাড়ে, কই, কোথায় তার কাল্লা? আমার হুকুম অমান্য করার সাজা কি জানিস না নরাধম?

—জানি জাঁহাপনা, আমার গোস্তাকি মাফ করবেন, আমি ধর্মাবতারের গোলাম, তাঁর আজ্ঞাবহ দাস, কিন্তু কি করবো মালিক, হারুন অল রসিদকে মাজননী বুকে জড়িয়ে

ধরে রেখেছেন। তাকে বার বার মিনতি করে বলেছি, ওকে ছেড়ে দিন মা, আমাকে খলিফার হুকুম তামিল করতে দিন। কিন্তু তাঁর এক কথা, আমাকে হত্যা না করে হারুনকে হত্যা করতে পারবি না তোরা।

মাসরুরের কথা শুনে ক্রোধে আরক্ত হয়ে মাইফিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে অল হাদী। বাঁদী ঘদির আর ওস্তাদ ইশাককে বলে তোমরা যেও না, অপেক্ষা কর, আমি এখুনি ফিরে আসছি।

গট-গট করে সে সোজা মায়ের মহলে ঢুকে পড়ে। এপাশে ওপাশে তারই দরবারের আমির অমাত্যরা সকলে দণ্ডায়মান। অথচ সেদিকে ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করলো না সে। সোজা মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত তলব করলো, তোমার এতবড় স্পর্ধা, আমার শাসন কার্যে ব্যাঘাত ঘটাতে চাও?

মা বলে, না ধর্মাবতার, আমি পাপিষ্ঠা নই। বাগদাদের খলিফা ন্যায়মূর্তি, ধর্মাবতার। তাঁর বিচারের সমালোচনায় মহাপাপ হয়।

শুধু আমি জানতে ইচ্ছা করি বাবা, কেন তুমি তোমার কনিষ্ঠ সহোদরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছ? কী তার অপরাধ, সে কী তোমাকে গদীচ্যুত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছে? অথবা প্রজা ক্ষেপিয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে?

—না। সে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নাই।

—তবে? তবে আর এমন কী গুরুতর ব্যাপার ঘটতে পারে, যার জন্য তাকে খাঁড়ার নিচে মাথা পেতে দিতে হবে?

খাইজারানের প্রশ্নবাণে কাবু হয়ে পড়ে অল হাদী। একটুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলে, সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু নাই, তবে আজ রাতে স্বপ্নের ঘোরে তাকে আমি এক অপকর্ম করতে দেখেছি। আমি দেখলাম, হারুন আমার প্রাণাধিক প্রিয়া বাঁদী ঘদিরকে নিয়ে আদর সোহাগ করছে। এরপরই আমার তন্দ্রা ছুটে যায়। আমি মাসরুরকে ডেকে পাঠিয়ে বলি, এখুনি হারুনের শির কেটে আন। আমার কাছে আমার বাঁদী ঘদির আর আমার মসনদ দুই-ই সমান প্রিয়। কোনওটাকে ছেড়েই আমি জীবন ধারণ করতে পারবো না। সেই প্রিয়তমাকে যে ভাগিয়ে বেহাত করে নিতে চায়, তার চেয়ে বড় শত্রু আমার আর কেউ নয়, মা।

—অবাক করলে বেটা, তোমার মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান নরপতির মুখে এহেন অবোধ বালকের মতো বাক্য শোভা পায় না। স্বপ্নের কতটুকু সত্য হয়ে ফুটে ওঠে মানুষের জীবনে? আমরা অবচেতন মনে যা চিন্তা ভাবনা করি তারই কিছু কিছু স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়ে সামনে ধরা দেয়। কিন্তু তার মধ্যে সত্য কতটুকু? ছিঃ ছিঃ, এই তুচ্ছ মিথ্যা কারণে তুমি তোমার আদরের ভাইকে হত্যা করতে চাইছো?

আমির অমাত্যরাও খলিফাকে বোঝালো, স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে কোনও কাজ করা কোনও বুদ্ধিমানের উচিত নয়।

এবার অল হাদী নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ লজ্জিত হয়ে হারেম ত্যাগ করে বাগানে চলে যায়।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় জলকেলী করতে নেমে অল হাদী বাঁ পায়ে একটু চোট পায়। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ফুলেও ওঠে। এবং আবের মতো একটা ঢিবি বেঁধে যায়। তারপর শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

এই সংবাদ মাসরুর নিয়ে আসে খাইজারানের কাছে। পুত্রশোকে তিনি শোকাতুর না হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, যাক, আল্লাহর অসীম কৃপা, তাকে এই পাপকর্ম থেকে

অব্যাহতি দিয়েছেন। এখুনি তুই হারুনকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়। ওকে কিছু বলার দরকার নাই।

মাসরুর অল রসিদের ঘরে গিয়ে দেখে সে ঘুমে বিভোর হয়ে আছে। ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলে সে বলে, মালিক, শিগগির চলুন, মা জননী আপনাকে ডাকছেন।

—কেন রে বান্দা, কী ব্যাপার? আবার কোনও নতুন পরোয়ানা এসেছে নাকি বড় ভাই-এর কাছ থেকে?

মাসরুর বলে, সে আমি বলতে পারবো না, হুজুর। আপনি আর দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন।

খাইজারান পুত্র হারুনের মাথায় হাত রেখে বলেঁ, বাবা ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। অধর্ম সয় না, তাই তার নিধন হয়েছে। তোর বড় ভাই আজ দেহ রেখেছে। এখন তুই-ই হবি আইনতঃ খলিফা। শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে এখনি মসনদে গিয়ে বোস্। আমি উজির আমির সবাইকে এত্তেলা পাঠাচ্ছি। আজই তোর অভিষেক হবে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো চুরাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

একদিকে শোকের মিছিল, অন্যদিকে বর্ণাঢ্য অভিষেক উৎসব। দেশবাসীরা খলিফার অকাল বিয়োগে যেমন শোকাহত হলো অন্যদিকে হারুন অল রসিদকে নতুন খলিফা রূপে পেয়ে আনন্দে নেচে উঠলো। সেইদিন থেকেই শুরু হলো সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সুলতানের হুকুমত কাল।

এবার আসুন আমরা ঘদিরের কথা বলি।

সাড়ম্বরে মসনদে আরোহণ করার পর সন্ধ্যাবেলায় খলিফা হারুন অল রসিদ হারেমে ঘদিরের কাছে সংবাদ পাঠালেন, ঘদির যেন অবিলম্বে বিলাস সজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাকে সঙ্গদান করার জন্য নন্দনকাননের প্রমোদ বিহারে চলে আসে।

ঘদির এই রকমই একটা আশঙ্কা করছিলো। খলিফার নির্দেশ অমান্য করার শক্তি কারো নাই। ঘদির শোকের কালো পোশাক খুলে জমকালো সাজপোশাক পরে তৈরি হয়ে প্রমোদ বিহারে এসে হাজির হয়।

খলিফা এগিয়ে এসে ঘদিরকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমি আশা করবো, প্রতিদিন তুমি যেমন এখানে এসে বড় ভাইকে তোমার মধুর সঙ্গীত শোনাতে সেই রকম আমাকে শোনাবে আজ থেকে!

ঘদির কুর্ণিশ জানিয়ে বলে, ধর্মাবতার আমি আপনার আজ্ঞাবহ বাঁদী। আপনি যা হুকুম করবেন আমি তাই করবো।

ঘদির অতি সহজেই বশ্যতা স্বীকার করবে তা কিন্তু ভাবেননি খলিফা। সে যে ভাবে অল হাদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো তাতে হারুন অল রসিদের ডাকে সাড়া না দিলেও তিনি বিস্মিত হতেন না। বরং এতো সহজে পোষ মেনে গেলো দেখেই তিনি অস্বস্তির মধ্যে পড়লেন।

—তোমার গান শুনে নাকি বনের হিংস্র জানোয়াররাও পোষ মানে। তা আমাকে শোনাবে একখানা?

ঘদির লাস্য হেসে বলে, কেন নয়, জাঁহাপনা? এখন থেকে শুধুমাত্র আপনাকেই তা শোনাবো আমার গান।

পর পর দু'খানা গান গাইলো ঘদির। বলা বাহুল্য, গান দু'খানির সুর ছিলো বেহাগ করুণ রসের। তা হোক, বড় ভালো গায় সে। সুরের মূর্ছনা ঝঙ্কৃত হতে থাকে সারা দেহের রক্তকণিকায়। মথিত করতে থাকে হৃদয়।

আসরটাকে বেশ জমজমাট করার জন্য হারুন অল রসিদ বলেন, সঙ্গীতের সঙ্গে সুরা না হলে কী জমে ঘদির? তুমি কি বলো?

—কিন্তু জাঁহাপনা, এই মাইফিলে ওস্তাদ ইশাক না থাকলে শুধু সুরায় কিছু জমবে না।

খলিফা বলেন, তার জন্য চিন্তা কী! এক্ষুনি তাকে হাজির হতে বলছি এখানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইশাক এসে কুর্ণিশ জানিয়ে আসন গ্রহণ করে।

মদের পাত্র পূর্ণ করে দেওয়া হয়। সন্ধ্যা গড়িয়ে না যাওয়া অবধি সমানে সুরাপান চলতে থাকে। এক সময় ইশাক মাতোয়ালা হয়ে ওঠে।

—এই চাঁদিনী রাত, ঝর্ণার কলতান, পাখীর কূজন, ফলের সৌরভ—সব মিলে এক অপূর্ব পরিবেশ তৈরি হয়েছে জাঁহাপনা। এখন তো গান ছাড়া আর কিছুই মানায় না।

অল রসিদ বলেন, তা হলে গানই হোক।

ইশাক বলে, মহামান্যা মালকিনই গান ধরুন আগে।

ঘদির গাইতে শুরু করে। চোখ বুজে তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে খলিফা আর ইশাক। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে ওঠে দু'জনে। ঘদির গাইতে গাইতে পড়ে গেছে মেঝের উপর।

সুলতান ছুটে গিয়ে ধরে তোলেন ঘদির-এর নিষ্প্রাণ দেহখানা।

কী ভাবে ঘদির মারা গিয়েছিলো সে কথা কোনদিনই জানা যায়নি।

অল হাদীর কবরের পাশে ঘদিরের মৃতদেহকে সমাহিত করা হয়েছিলো।

এরপর যুবকটি আর এক কাহিনী বলতে আরম্ভ করে ঃ

মস্ত বড় সঙ্গীতসাধক হাসিম ইবন সুলেয়মানের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তখন। খলিফা হারুন অল রসিদ তাকে একদিন ডেকে পাঠালেন।

হাসিমের একখানা গান শুনে খুশিতে নেচে উঠলেন খলিফা।

—এমন সঙ্গীত আপনি কীভাবে কণ্ঠে ধারণ করলেন, ওস্তাদজী?

এই বলে তিনি তাঁর কণ্ঠের মহামূল্য রত্নহার পরিয়ে দিলেন হাসিমের গলায়।

এমন উপহারে উল্লসিত না হয়ে বিষাদ-বিষণ্ন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এ মণিহার আমাকে সাজে না, ধর্মাবতার!

দু-ফোঁটা অশ্রু জরে পড়লো তার কপোল বেয়ে।

—কেন? আর কেনই বা এই অশ্রু ওস্তাদজী? আমার উপহার কী আপনার পছন্দ হয়নি?

—খোদা হাফেজ! আল্লাহ আপনাকে আরও মহান করুন ; আমার এই অন্তর বেদনা ওসব কোনও কারণে নয়। যদি অনুমতি করেন তবে এই হতভাগ্য তার জীবনের এক বেদনার কাহিনী শোনাতে পারে জাঁহাপনাকে।

খলিফা বলে, বেশ তাই শুনি—। নিশ্চয়ই সে কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ। তা না হলে আপনার চোখ অশ্রু-সজল হবে কেন?

হাসিম তার স্মৃতিকথা বলতে থাকে ঃ

তখন আমি বয়সে নবীন। কিন্তু সেই যৌবনকালেই আমার গান মানুষের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করেছিলো।

একদিন আমি চলতে চলতে এক মনোহর উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে দেখলাম সুলতান ওয়ালিদ তাঁর দলবল নিয়ে মৃগয়া করতে এসেছেন।

বাগানের মাঝখানে একটা বিশাল দীঘি। তার পাড়ে ঘাসের শয্যার ওপর মখমলের গালিচা বিছিয়ে মাইফেলের আসর বসেছে। সুলতানের দু'পাশে দু'টি পরমাসুন্দরী কিশোরী। তাদের হাতে তারের বাদ্যযন্ত্র। একজন গান গাইছে। কান পেতে শুনলাম, আমারই একখানা বহু প্রচলিত সঙ্গীত যথাসাধ্য দরদ দিয়ে গাইবার চেষ্টা করছে। কিন্তু গায়িকার দক্ষতার অভাবে মাঝে মাঝে বেসুরো হয়ে যাচ্ছে গানখানা।

কৌতূহল নিয়ে আরও একটু এগিয়ে যেতে সুলতান ওয়ালিদ তাঁর এক সহচরীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখ দেখ, তোমার গান শুনে লোকটা কেমন মাতোয়ালা হয়ে উঠেছে। ওকে এখানে ডেকে একটু মজা করা যাক্ কী বলো?

সুলতান ওয়ালিদ আমাকে কাছে আসতে ইশারা করলেন। আমি সামনে গিয়ে আভূমি আনত হয়ে যথাবিহিত কুর্নিশ জানালাম তাঁকে।

তিনি আমাকে বসতে বললেন. বস, গান শুনবে?

আমি সবিনয়ে মাথা নুইয়ে বললাম, শুনবো জাঁহাপনা।

সুলতান এবার সেই সহচরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, শুরু কর।

গানের সুর কেটে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় আমার। আমি আর মুখ বুজে সহ্য করতে পারলাম না।

—কিছু অপরাধ নেবেন না মালকিন, গানটা কিন্তু যথাযথ গাওয়া হচ্ছে না। মাঝে মাঝে সুর কেটে যাচ্ছে।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠলো, লোকটার কী মাথাটা খারাপ, জাঁহাপনা? আমার গানের তালে ভুল ধরছে?

সুলতান ওয়ালিদ বললেন, কী হে, তুমি কী ভেবেছ, তোমাদের রাখালদের কাছ থেকে শিখে এসেছে সে।

—না জাঁহাপনা, সে কথা আমি বলিনি। উনি নিশ্চয়ই নামী ওস্তাদের কাছেই তালিম পেয়েছেন। তবে ঠিকমতো রপ্ত করতে পারেননি এখনও। কিন্তু মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করবো, গলাটা ভালো আছে, মন দিয়ে শিখলে ভালো গান গাইতে পারবেন ভবিষ্যতে।

আমার কথায় বোধহয় কৌতূক বোধ করলেন সুলতান। বললেন, তা তুমিই সে তালিম দেবার ভারটা নাও না!

—তা মহামান্য শাহেনশাহ যদি সেরূপ আদেশ করেন, মাথা পেতে নিতে পারি!

এবার তিনি বেশ রুষ্ট হয়েই বললেন, তোমার ঔদ্ধত্ব দেখে অবাক হচ্ছি! ঠিক আছে, একটা গান শোনাও তো দেখি।

আমি আরও একটু এগিয়ে বসে বললাম, জো হুকুম জাঁহাপনা!

তারপর ঐ মেয়েটিকে বললাম, তানপুরার তার আরও চড়া পর্দায় বেঁধে নিন।

মেয়েটি ক্রুদ্ধ এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো আমার দিকে। যেন ছোবল মারবে এই রকম ভাবে।

আমি ঐ গানটাই গেয়ে শোনালাম।

এর পরের দৃশ্য বড় মধুর। মেয়েটি লুটিয়ে পড়লো আমার পায়ের ওপর।

গোস্তাকি মাফ করবেন ওস্তাদজী, আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনার গান আমি আমার গুরুর কাছ থেকে শিখেছি। তিনি আপনার গান ছাড়া আর কিছু শেখান না কাউকে।

সুলতান ওয়ালিদ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, আপনিই ওস্তাদ হাসিম! আজ আমার মৃগয়া করতে আসা সার্থক হলো। এমন মানুষকে দেখেও আনন্দ।

মেয়েটি তার গলা থেকে একটি মহামূল্যবান রত্নহার আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললো, আমার এই দীন উপহার, মেহেরবানী করে গ্রহণ করে ধন্য করুন আমাকে, ওস্তাদজী।

মালাটা আমি হাতে নিয়ে বললাম, কিন্তু এ যে অত্যন্ত মূল্যবান হার?

সুলতান বললেন, টাকা পয়সার দামের চেয়েও আরও অনেক বেশি দামী বস্তু। এক বিশেষ মুহূর্তে আমার গলা থেকে খুলে নিজের হাতে ওকে পরিয়ে দিয়েছিলাম আমি। ওর কাছে এর চেয়ে দামী জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। সেই সবচেয়ে সেরা অমূল্য ধন দিয়ে গুরু-দক্ষিণা দিলো। এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে ওস্তাদজী! আপনি গ্রহণ করে ওকে কৃতার্থ করুন।

এরপর সুলতান বললেন, আপনাকে যখন পেয়েছি, আজকের দিনটা স্মরণীয় করে রাখবার জন্য আজ আমরা নৌকোয় চেপে মাইফেলের আসর জমাবো। এই দীঘির কালো পানিতে ভাসতে থাকবে আমাদের নৌকোখানা। আর আমরা আপনার গান শুনে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেব।

আমি বললাম, চমৎকার হবে, জাঁহাপনা।

ঘাটে বাঁধা ছিলো একখানা ময়ূরপঙ্খী নৌকো। প্রথমে সুলতান উঠলেন। তারপর আমি উঠলাম, আমার পিছনে সেই কিশোরী। একখানা পা পাটানে রাখতেই দুলে উঠলো নৌকোটা। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেলো সেই চরম বিপর্যয়। পা হড়কে পড়ে গেলো সে কালো দীঘির পানিতে। মাঝি-মল্লারা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো দীঘির পানিতে। কিন্তু নিমেষে কোথায় যে সে তলিয়ে গেলো আর হদিশ করা গেলো না!

সারা রাত ধরে তল্লাসী চালানো হলো দীঘিতে, তোলপাড় করে ফেলা হলো তার পানি। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না তাকে।

সুলতান কাঁদতে লাগলেন। আমিও অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো ছিয়াশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

সুলতান ওয়ালিদের সে মর্মবেদনা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না জাঁহাপনা। তিনি সাশ্রুনয়নে আমাকে বললেন, ওকে আমি বড় পেয়ার করতাম, ওস্তাদজী। ঐ রত্নহার আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম। ওরকম খানদানী বস্তু কেউ অন্যের হাতে তুলে দেয় না। কিন্তু ওকে আমি একান্ত আপন বলে গ্রহণ করেছিলাম। তাই দিতে আর দ্বিধা হয়নি এতটুকু।

একটু থেমে আবার তিনি বলতে থাকেন আজ ও আমাকে শোকসাগরে ভাসিয়ে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলো। এখন কী নিয়ে থাকবো আমি। ওর কোনও স্মৃতিই আমার কাছে নাই। এই মালাটি ওর গলায় দুলতো, আর তার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো ওর সারা মুখ। চোখ বন্ধ করে সে মুখচ্ছবি এখনও আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারছি। কালের কবলে সবই তো একদিন ধুয়ে মুছে ঝাপসা হয়ে আসবে। তখন হয়তো আর আজকের প্রিয়ার এই ছবি ধরা দেবে না। সেই কারণে আপনাকে উপহার দেওয়া ঐ মালাটি আমি কাছে রাখতে বাসনা করছি ওস্তাদজী। কিন্তু এ মালা যে সে গুরুদক্ষিণা দিয়ে গেছে আপনাকে। আমি তো তা ওয়াপস করে নিতে পারি না।

আপনি যদি আমার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে হারটা উচিত মূল্যে আমার কাছে বিক্রি করেন, চির কৃতজ্ঞ থাকবো আমি। মূল্য হিসেবে আমি আপনাকে তিরিশ হাজার দিরহাম দেব, আপনি ওটা আমার কাছে বিক্রি করে দিন।

বলা বাহুল্য, তক্ষুণি সে মালা আমি সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

তারপর কত কাল কেটে গেছে। বয়সের ভারে আমার দেহ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। সারাটা জীবনের অসংখ্য ঘটনা একটি মাত্র মালায় গাঁথা হয়ে গেছে। আজ আর ওদের সবগুলোকে আলাদা আলাদা করে ইয়াদ করতে পারি না।

আজ আপনার দেওয়া এই রত্নহারটি দেখে আমার যৌবনকালের এই শোকাবহ ঘটনাটা মনে পড়ে গেলো। বিধাতা-পুরুষের এমনই যে পরিহাস, সেদিনের সেই মালাটাই আজ আবার আমার হাতে ফিরে এলো। সুলতান ওয়ালিদ গত হয়েছেন। তাঁর সলতানিয়ত এখন আপনার অধিকারে। বুঝতে পারলাম, সুলতানের অন্যান্য ধনরত্নের সঙ্গে এই মালাটিও আমার হাতে এসেছিলো। আপনি যে আমাকে এই মহামূল্য রত্নহারটি উপহার দিয়েছেন সে আমার পরম পাওয়া সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরনো স্মৃতির ক্ষতটায় আবার নতুন করে দারুণ ব্যথার প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে গেলো। স্মৃতি সতত সুখের হয় না জাঁহাপনা, কখনও কখনও সে নতুন করে বুক ভেঙ্গে দিয়ে যায়।

এরপর যুবকটি আর এক কাহিনী শুরু করে ঃ

মশুলের বিখ্যাত গায়ক ইশাকের দিনলিপি থেকে উদ্ধার করে এই গল্পটা আজ শোনাবো আপনাদের ঃ

একদিন আমি খলিফা হারুন অল রসিদের দরবারে প্রবেশ করে দেখলাম খলিফা মসনদে বসে আছেন। তাঁর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে উজির ফাদল এবং অল হিজাজের এক শেখসাহেব। দেখতে সে বেশ সুপুরুষ এবং সম্ভ্রান্ত।

যথাবিহিত কুর্নিশাদি জানিয়ে আমি উজিরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফিস-ফিস করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই পরদেশীটি কে? এর আগে এঁকে তো কখনও দেখিনি।

উজির জানালো, উনি হচ্ছেন অল হিজাজের মাবাদের নাতি। গায়ক এবং কবি। নামটা নিশ্চয়ই তোমার বিশেষ পরিচিত।

আমি চিনতে পারলাম! তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে খাটো গলায় বললেন, ওস্তাদজী, আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি আপনাকে আমার নানার বিখ্যাত গানগুলো গেয়ে শোনাতে পারি। আমার স্মৃতির পটে আজও সেই সব কথা অম্লান হয়ে আছে।

শেখের প্রস্তাবে আমি বিশেষ প্রীত হয়ে বললাম, আচ্ছা শেখসাহেব, আপনার নানা কতগুলো গান বেঁধেছিলেন আপনার ইয়াদ আছে?

—ষাটখানা।

—তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা গানগুলো কি কি আপনার মনে আছে?

—অবশ্যই আছে ইশাকজী। তাঁর সবচেয়ে সেরা গান ঃ ও আমার বুকের নিধি, ও আমার মুলেখা—

তানপুরাটা তুলে নিয়ে তিনি পুরো গানটা গেয়ে শোনালেন তখুনি। সত্যিই, অপূর্ব গান আর তার গলা! গান শেষ হয়ে গেলেও গানের রেশ অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগলো দরবারের সর্বত্র। খুশির আনন্দে ভরে গেলো আমার মন। শেখসাহেবকে অভিনন্দন জানিয়ে ফিরে এলাম আমার ঘরে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো সাতাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

মনের মধ্যে তখন গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছিলো সেই সঙ্গীত। তানপুরাটা তুলে নিয়ে গাইতে আরম্ভ করলাম! কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও ওই অল হিজাজ ঘরানার পুরো সুরটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারলাম না। গানের একটা জায়গায় এসে স্বরলিপিটা আর কিছুতেই ইয়াদ করতে পারলাম না। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যেতে লাগলো। জানা জিনিস যদি মন থেকে হারিয়ে যায়, তবে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করে। যে গান একবার আমি শুনি জীবনে কখনও বিস্মৃত হই না। কিন্তু আজ একি হলো আমার! কিছুতেই পুরো গানটা তুলতে পারছি না।

সারা দিন সারা রাত ধরে আমি মনের মধ্যে আওড়াতে থাকলাম সেই সুরটা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

শুধু একদিন দু'দিন নয়, দিনের পর দিন কেটে গেলো, কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে সঙ্গীতের সুর আমি স্মরণে আনতে পারলাম না। সে যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা কি করে বোঝাই। একদিন ঐ গানের হারানো সুর আমাকে ঘর ছাড়া করে পথে নামালো। বাগদাদ, মশুল, বসরাহর বড় বড় ওস্তাদের কাছে গেলাম। কিন্তু কেউই উদ্ধার করে দিতে পারলো না অল হিজাজ ঘরানার সেই বিখ্যাত সঙ্গীতটির স্বরলিপি।

শেষে ঠিক করলাম, মরুপ্রান্তর পার হয়ে মদিনায় চলে যাবো। সেখানে কবির নাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবার ঐ গানখানা শুনবো তাঁর মুখ থেকে।

সে সময় আমি বসরাহতে ছিলাম। মন স্থির করেই আমি যাত্রী-নৌকোয় চেপে বসবো বলে ঘাটের দিকে রওনা হলাম। পথের মধ্যে দু'টি সম্ভ্রান্ত তরুণী আমার পথরোধ করে দাঁড়ালো।

আমি বিরক্ত হলাম মনে মনে। দেশে বিদেশে আমার অনুরক্ত ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাদের হাতে পড়ে অনেক সময়ই আমাকে নিগ্রহ হতে হয়। সেইরকমই কিছু একটা হতে পারে ভেবে শঙ্কিত হলাম।

কিন্তু মেয়ে দু'টির কেউই আমার গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সাদর অভিনন্দন জানালো না।

আমি ঈষৎ রুষ্ট হয়ে বললাম, পথ ছাড়ুন, এখন আমার দাঁড়াবার সময় নাই।

মেয়ে দু'টি খিলখিল করে হেসে উঠলো, ওস্তাদজী, এরই মধ্যে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। যে গানের সুর আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না, তার জন্য সব উদ্যম এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেলো আপনার?

আমি ভীষণ রেগে উঠলাম, মিথ্যে কথা! একটা গানের কলির জন্য আমি দশটা বছর কাটিয়ে দিতে পারি। একটা কলিতে সুর দিতে গিয়ে আমার এক যুগ কেটে গেছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। কী করে আপনারা ভাবলেন যে, সুর খোঁজার উৎসাহে ভাটা পড়েছে আমার? আর তাছাড়া কোন গানের সুরের কথা বলছেন আপনারা?

অন্যতমা বললো, সেদিন দরবারে আপনি যখন শেখসাহেবের কাছে অল হিজাজ ঘরানার গান শুনতে চাইলেন, তখন আমি পর্দার পিছনে হারেমে বসেছিলাম। আপনাদের সঙ্গে আমিও যে সঙ্গীতসুধা পান করেছি সেদিন। আমি জানি ও আমার বুকের নিধি, ও আমার মুলেখা এই গানটি গাইতে গিয়ে আপনি সুর হারিয়ে ফেলেছেন। এবং হৃত সুর ফিরে পাওয়ার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু না পেয়ে এরই মধ্যে আপনি নিরাশ হয়ে পড়লেন?

আমি আর্তনাদ করে উঠি, দোহাই আপনাদের, আপনারা আমাকে পাগল করে দেবেন না। গানের সুর খুঁজতে খুঁজতে আমি যত না উন্মাদ হয়েছি, আপনাদের এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপে

তার চেয়ে বেশি হবো, আশঙ্কা হচ্ছে। আপনাদের কাছে আমার করজোড়ে মিনতি, এ নিয়ে আর আমাকে আঘাত করবেন না। মেহেরবানী করে পথ ছাড়ুন। এখন আমি মদিনায় যাত্রা করবো। ঐ সুর আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

মেয়েটি আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো।

—আমি যদি আপনাকে গানটা শুনিয়ে দিই, তবু আপনাকে মদিনায় যেতে হবে?

—দোহাই আপনাকে, এভাবে আমার ওপর অত্যাচার চালাবেন না। আমি তো আগেই বলেছি, এই ব্যাপারে প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়েছি।

হঠাৎ যুবতীটি গাইতে শুরু করলো। ইশাক স্তম্ভিত হয়ে গেলো তার সুরেলা কণ্ঠ শুনে। শেখসাহেব যে ভাবে গেয়েছিলো এ সঙ্গীত তার চেয়ে সহস্রগুণ শ্রুতিমধুর।

এতদিনে আমার মনের ঝড় থামলো। হারানিধিকে খুঁজে পাওয়ার সে যে কী আনন্দ, কী করে বোঝাবো!

গাধার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মেয়েটির পায়ের ওপর।

—কে আপনি গুণবতী আমি জানি না, কিন্তু আপনার গান আমার হৃদয়ের সকল সন্তাপ জুড়িয়ে দিতে পেরেছে। এ অমূল্য রত্ন আপনি কী ভাবে আহরণ করেছেন? যদি আপনি মেহেরবানী করে আমার ঘরে পায়ের ধূলো দেন তবে আমি ধন্য হবো। আপনি শুধু আমাকে মুলেখার গানই শেখাবেন, তার বদলে আমি আপনাকে অজস্র অন্য গান শেখাবো।

মেয়েটি হাসলো, ইশাকজী, আপনার নিজের চরিত্র আপনি ভালো করেই জানেন। আজ পর্যন্ত কেউ আপনার কাছ থেকে একটির বেশি দু'টি গান পায়নি। ঐ একটি ছাড়া আপনার ছাত্রছাত্রীরা অন্য যে সব গান গায়, তা অন্য ওস্তাদের কাছে শেখা। আমার আশঙ্কা আপনি আমাকেও একটির বেশি দু'টি গান শেখাবেন না। তার চেয়ে ও শর্ত থাক, আপনি যতক্ষণ না মুলেখার গানখানা ভালোভাবে রপ্ত করতে পারবেন ততক্ষণ আমি গেয়ে শোনাবো আপনাকে। তারপর আপনার শেখার পর্ব শেষ হয়ে গেলে আমি খুশি মনে বিদায় নেব।

ইশাক অধীর হয়ে বলে, আপনি বিশ্বাস করুন ভালো মানুষের কন্যা, যদি চান আমি আপনাকে আমার খুন দিতে পারি। কিন্তু কে আপনি, কী আপনার পরিচয়?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো অষ্টাশিতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

—আমি এক অতি সাধারণ গায়িকা। লোকের মুখে শুনে শুনে আমি গান শিখি। ঝরনার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তার কলতানের মধ্যে আমি সঙ্গীতের সুর খুঁজে পাই। কখনও তরুশাখার পাখীর কূজন কান পেতে শুনি। তার মধ্যেও সুমধুর সঙ্গীত শুনি। আমার নাম ওয়াহবা।

ওয়াহবা আর তা অনুজাকে সাদর আমন্ত্রণ করে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম। সারাটা দিন সারাটা রাত্রি ব্যাপী চললো গানের আসর!

সঙ্গীত এবং সুরা স্বল্পসময়ে সম্পর্কের ব্যবধান ঘুচিয়ে ঘনিষ্ঠ করে তোলে।

সে রাতে ওয়াহবা আমাকে অনেক দিয়েছিলো, আমিও কম দিইনি। শুধু গানে নয়, দেহ মন প্রাণেও আমরা দু'জনে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম সে রজনীতে।

ইশাকের কাহিনী শেষ করে যুবকটি অন্য একটি কাহিনী বলতে শুরু করে ঃ

আপনারা জানেন মহম্মদ অল আমিন এবং অল মামুন এরা দু'জনে বৈমাত্রেয় ভাই। অল আমিন বেগম জুবেদার এবং অল মামুন খলিফার এক বাঁদী মারজিনের গর্ভে জন্মেছিলো।

দু'জনের মধ্যে ছিলো আজন্মের বৈরিতা।

এক মওকায় অল মামুনের সৈন্যবাহিনী প্রাসাদ আক্রমণ করে খলিফা অল আমিনকে নৃশংসভাবে নিহত করে। এরপর প্রাণভয়ে অল আমিনের সুবাদাররা একে একে অল মামুনের সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

অল মামুন নতুন খলিফা হয়ে মসনদে বসলো।

শাসনভার হাতে নিয়েই সে ঘোষণা করে দিলো, কারো ভীত হওয়ার কোনও কারণ নাই। সকলে নির্ভয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর। আমি তোমাদের রক্ষা করবো। এজন্য কাউকে তাদের পূর্ব অপকর্মের জন্য কোনও রকম সাজা দেওয়া হবে না।

এইভাবে সে সকল বাধা অতিক্রম করে প্রজাদের প্রিয় বাদশাহ হতে চাইলো। যতদিন অল আমিন জীবিত ছিলো ততদিন সে কিছুতেই খলিফা হারুন অল রসিদের মন ভেজাতে পারেনি। তার উপর ছিলো বেগম জুবেদার কড়া দৃষ্টি।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে বেগম জুবেদা ভেঙ্গে পড়লেন। এবার তাঁর সৎ ছেলে মামুনের হাতে তাঁকে হেনস্তা হতে হবে সন্দেহ নাই। কোনও দিনই তাকে তিনি সুনজরে দেখতে পারেননি, সে সব কথা কি অল মামুন বিস্মৃত হতে পারে? এবার মওকা মিলেছে। যথাযোগ্য প্রতিশোধ নিতে সে কসুর করবে না। সুতরাং এ প্রাসাদে না থেকে তিনি মক্কায় গিয়ে বাকী জীবন কাটাবেন ঠিক করলেন।

নতুন খলিফাকে একখানা চিঠি লিখলেন তিনি ঃ

ধর্মাবতার, যদিও প্রমাদবশতঃ আপনি আমার প্রাণাধিক পুত্রকে হত্যা করেছেন, তবু আমি জানি আমার মতো আপনারও কোমল হৃদয় এই কারণে দগ্ধ হচ্ছে নিয়ত। আপনার মহত্ত্বের কাহিনী সুবিদিত। সুতরাং এই একটি মাত্র ভুল আপনার জীবনে কালিমা লেপে দিতে পারবে না। সে আজ নাই, জানি তার অপরাধ অসীম ছিলো, কিন্তু আপনি নিজগুণে তাকে মার্জনা করে দেবেন, এই আমার প্রার্থনা।

আপনি যদি আমার প্রতি একটু অনুকম্পা দেখান, ধন্য হবো আমি। যদিও আপনার করুণা পাওয়ার অধিকারিণী আমি নই, তবু প্রার্থনা করবো আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনার পিতার কথা স্মরণ করুন, তিনি আমাকে মাথার মণি করে রেখেছিলেন, তাঁর প্রতি কিছু সম্মান প্রদর্শনের জন্যও আপনি আমার প্রতি নির্মম হবেন না, এই প্রার্থনা করি।

বেগম জুবেদার এই কাকুতি-ভরা পত্রখানি পাঠ করে অল মামুন করুণায় আর্দ্র হয়ে কাঁদে। আহা, তিনি বড়ই অভাগিনী। একদিন যাঁর প্রতাপে সমস্ত সলতানিয়ত টলমল করে কাঁপতো, তিনি আজ ভিখারিণী হয়ে গেছেন।

মাগো, আপনার চিঠির কথাগুলো আমাকে শূলের মতো বিদ্ধ করেছে। আপনি মা, আপনার আদেশই এতকাল মান্য করে এসেছি সভয়ে। আজ একি কথা লিখেছেন মা? আপনার কোন অসম্মান, সে তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আপনার অসীম ক্ষমতার একবিন্দু তো আমি হরণ করিনি? তবে আপনি কেন এমন দীন দরিদ্রের মতো আমার কৃপা প্রার্থনা করছেন। আপনি মহিয়সী মা, আপনার সঙ্গে অন্য কারো কোনও তুলনা হয় না, আপনি আপনার

স্বীয় সম্মান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন আজীবন। আপনি আমাকে আদেশ করবেন মা, পুত্র সব সময়ই জননীর আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। আপনি আমার গর্ভধারিণী নন, কিন্তু আমার পিতা আপনার স্বামী। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার মা-এর চেয়ে আপনাকে কখনও আমি ছোট নজরে দেখিনি।

মানুষ নিয়তির দাস। যা ঘটে গেছে তা ঘটবে বলেই অনিবার্য ভাবে ঘটেছে। এ নিয়ে শোকতাপ করে আর কী হবে! তার আত্মার মঙ্গল কামনা ছাড়া এখন আর করণীয় কিছু নাই। আপনার বুকভাঙ্গা দুঃখ বেদনা আমি অনুভব করতে পারি মা। আমাকে দিয়ে যদি সে দুঃখের কিছুটাও লাঘব হয়, আমি প্রাণপণ করে তা করার চেষ্টা করবো।

আপনার যে সব সম্পত্তি, ঘর বাড়ি প্রাসাদ ইমারত এবং জমি-জমা আমার দপ্তর বাজেয়াপ্ত করেছিলো, সেগুলো আবার যাতে আপনি ফিরে পান তার জন্য আগেই আমি হুকুম পাঠিয়ে দিয়েছি।

আপনি যদি সব সংশয় ভুলে আমাদের মধ্যে এসে বসবাস করেন তার চেয়ে আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। আপনি জেনে রাখুন মা, আপনার একটি পুত্রের ইন্তেকাল হয়েছে, কিন্তু আরও এক পুত্র জীবিত, সে আপনার দাসানুদাস হয়েই থাকতে চায়। তার মুখের দিকে চেয়ে কি মৃত পুত্রের শোক কিছুটা ভুলতে পারবেন না? মা গো, এই অধম পুত্রকে অন্ততঃ একবার সুযোগ দিন, সে প্রমাণ করবে আপনার গর্ভজাত পুত্রের চেয়ে সে কোন অংশে কম মাতৃভক্ত নয়!

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো চুরানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

চিঠি পেয়ে বেগম জুবেদা এসে অল মামুনের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলেন। অল মামুন দু'হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে ধরে কর-চুম্বন করে বললো, ছিঃ মা, আপনি এ কি করলেন! আমি আপনার সন্তান, এতে কি আমার পাপ হবে না? আপনার কোনও রকম অমর্যাদা আমি হতে দেব না মা। এতে আমার মৃত পিতার আত্মা শান্তি পাবে না।

কিন্তু অল মামুনের ভরসা বাক্যেও আশ্বস্ত হতে পারে না জুবেদা বেগম। কেবলই তার মনে হতে থাকে শৈশবে কৈশোরে সে আপন গর্ভজাত পুত্র অল আমিনকে প্রাণভরা আদর ভালোবাসা দিয়েছে আর অল মামুনকে দিয়েছে ঘৃণা অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা। তার এই ব্যবহার বৈষম্য কি হঠাৎ আজ অল মামুন ভুলে যাবে? বিশ্বাস করা শক্ত।

এ ব্যাপারে খলিফা হারুন অল রসিদও জুবেদাকে বহুবারই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। দুই পুত্রকে সম দৃষ্টিতে দেখাই তার উচিত। কিন্তু জুবেদা সে তিরস্কারও গ্রাহ্য করেনি কখনও।

এরপর একদিন খলিফা অল মামুন বেগম জুবেদার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে নজর করলো। বেগমসাহেবা অনুচ্চ কণ্ঠে বিড়বিড় করে কি যেন আওড়ালেন।

অল মামুন বললো, মা, আপনি আমাকে দেখে কি অভিশাপ দিলেন? কিন্তু বিশ্বাস করুন মা, আপনার ছেলের মৃত্যুর জন্য আমার কোনও হাত ছিলো না। পার্শিরা তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার পুত্রকে নিহত করে আমাকে মসনদে বসিয়েছে।

জুবেদা জিভ কেটে বললেন, না বাবা না, ওসব কথা ঘুণাক্ষরেও আমার মনে আসেনি। তুমি আমার সন্তান, তোমাকে শাপ-শাপান্ত করবো আমি? সে কি করে ভাবলে বেটা?

—তা হলে বিড়-বিড় করে কী বলছিলেন মা?

থতমত খেয়ে গেলেন জুবেদা। ঠিক সেই মুহূর্তে মুখে কোনও জবাব জোগালো না। মাথাটা নিচু করে বললেন, সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, বাবা।

কিন্তু অল মামুন তখন ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। না শুনে সে ক্ষান্ত হবে না। বার বার সে জুবেদাকে বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলো।

অবশেষে জুবেদা ফেটে পড়লেন, নিতান্তই যদি শুনতে চাও তবে শোনো বাবা, হ্যাঁ, আমি তখন অভিশাপই দিচ্ছিলাম। তবে তোমাকে নয়—আমি নিজেকে। সেদিনের একটিমাত্র নির্বুদ্ধিতার জন্য আজ এতো বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেলো আমার জীবনে। ঐ অভিশপ্ত ঘটনাটা যদি না ঘটতো সেদিন, তবে আজ আমার বুকের পাঁজর অল আমিনকেও হারাতে হতো না।

—কী সে ঘটনা মা?

অল মামুন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে জুবেদাকে।

—তবে শোনো, জুবেদা অশান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, সেদিন কি তিথি নক্ষত্র ছিলো জানি না, আমার স্বামী খলিফা হারুন অল রসিদ এলেন আমার ঘরে। এসেই আমার সঙ্গে দাবায় বসলেন। তুমি অবশ্যই জান, দাবাখেলার ওপর ওর একটা বিশ্রী রকমের ঝোঁক ছিলো। তবে ও খেলাটা তিনি অত্যন্ত আপনজন ছাড়া কারো সঙ্গে খেলতেন না।

খলিফা আমাকে হারাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আমি ছেড়ে দেবার পাত্রী নই। কিন্তু আমি হেরে গেলাম। হারুন অল রসিদ আমাকে বললেন, তুমি হেরে গেছ যখন তোমাকে তার সাজা পেতে হবে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে এই প্রাসাদ থেকে হেঁটে বাগানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তোমাকে।

তখন প্রায় শেষ রাত। আমি লজ্জায় মরে যাই, একি খলিফার খামখেয়াল! তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করলাম কিন্তু তিনি আমার সব আবেদন নিবেদন এক কথায় খারিজ করে দিয়ে বললেন, না, না, আমি যা বলেছি তার নড়-চড় হবে না।

সুতরাং আমি বাধ্য হয়ে তাঁর খেয়াল চরিতার্থ করলাম সেই রাতে। যখন আমি বাগান থেকে ফিরে এলাম তখন আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছি। সারা শরীর আমার হিম হয়ে আসতে লাগলো। ঘরে এসে আধমরা হয়ে পড়ে রইলাম পালঙ্কশয্যায়।

পরদিন আবার দাবার আসর বসলো। সেদিন কিন্তু আমি জিতলাম। প্রতিশোধ-স্পৃহা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। বললাম, আজ আমি সে সাজা দেব, তাই মাথা পেতে নিতে হবে আপনাকে। খলিফা বললেন, বান্দা প্রস্তুত। হুকুম করুন বেগমসাহেবা।

প্রতিহিংসায় তখন আমি দিশাহারা, বললাম, হারেমের রসুইখানায় ঐ কালো কুৎসিত নোংরা নফরাণী মারজিলকে জড়িয়ে ধরে আজকের রাতটা কাটাতে হবে আপনাকে।

খলিফা শিউরে উঠলেন, কিন্তু বুঝলেন আমার মত পালটানো যাবে না, তাই তিনি মুখে আর কিছু বললেন না। সোজা চলে গেলেন রসুইখানায়।

পরদিন সকালে খলিফার মুখের দিকে আর তাকাতে পারা গেলো না। সারা রাত ধরে যে অসহ্য যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছেন, তা তাঁর চোখে-মুখেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছিলো। খুব গম্ভীর মুখে একটিও কথা না বলে, আমার সামনে থেকে চলে গেলেন তিনি।

সেই আমার কাল হলো। ঐ জঘন্য নোংরা সহবাসের ফলে জন্ম হলো তোমার।

আমি কি আহাম্মক, নিজে ডেকে আনলাম আমার সর্বনাশ, সেই রাতেই আমার প্রিয় পুত্র অল আমিনের ঘাতকের ভ্রূণ সৃষ্টি হলো।

আমার গোঁ ছাড়া এমনটা কিছুতেই ঘটতে পারতো না।

আমাকে যদি না তিনি উলঙ্গ করে বাগানে পাঠাতেন, তাহলে আমিও নিশ্চয়ই ঐ নীচ সহবাস করার জন্য তাঁকে রসুইঘরের এক নোংরা চাকরাণীর ঘরে পাঠাতাম না।

এজন্য নিজেকে ছাড়া আর কাকে দোষ দেব বাবা। এজন্য অভিশাপ যদি দিতে হয়, নিজেকেই দেব, তোমাকে নয়।

অল মামুন আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াতে পারলো না। ছুটে বেরিয়ে গেলো জুবেদার সামনে থেকে।

নিজের মনেই সে ভাবতে থাকে আজ যদি বার বার করে বেগমসাহেবার কাছ থেকে জানতে না চাইতাম, তবে তো আমার নিজের জন্ম ইতিহাস অজ্ঞাতই থেকে যেত আমার কাছে।

কাহিনী শেষ করে ধনী যুবক, বন্ধুগণ, আমার মনে হয় আল্লাহর দোয়ায় আমি আপনাদের কিছু আনন্দের বিধান করতে পেরেছি এই গল্পগুলো শুনিয়ে। আজ আর নয়, অন্য একদিন আবার আপনাদের আরও ভালো কাহিনী শোনাবো।

এরপরে উপস্থিত প্রত্যেকের হাতে এক স্বর্ণমুদ্রা এবং অন্যান্য মূল্যবান উপহার সামগ্রী তুলে দিলো।

শাহরাজাদ গল্প শেষ করে অধোবদন হয়ে রইলো। সুলতান শাহরিয়ার খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, শাহরাজাদ, অপূর্ব তোমার কাহিনী। এসব গল্পের সার কথা জীবনের চলার পথের পরম পাথেয়। যাই হোক, এবার উজির জাফর সম্বন্ধে কিছু শোনাও। অনেক দিন ধরেই তার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী শোনার জন্য আমার খুব বাসনা। তার মতো বুদ্ধিমান বিচক্ষণ একজন প্রধান উজিরই আমি সন্ধান করছি বহুকাল যাবৎ। কিন্তু ঐ রকম গুণবান ব্যক্তি কি ভুরি ভুরি মেলে?

শাহরাজাদ মাথা হেঁট করে বললো, আপনি জাফরের জীবনের সব কাহিনী শোনার জন্য আমাকে হুকুম করবেন না, জাঁহাপনা, সে বড়ই মর্মান্তিক বেদনাদায়ক। চোখের পানিতে ভেসে যাবে বুক, ব্যথায় ভেঙ্গে যাবে পাঁজর।

সুলতান শাহরিয়ার বললেন, তা হোক, তুমি বলো, আমি শুনতে চাই।

শাহরাজাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে খোদা আমাকে রক্ষা করুন।

তারপর শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

এই দুঃখদায়ক রক্তঝরা কাহিনী বলতে আমার বুক কেঁপে উঠছে। খলিফা হারুন অল রসিদের সময় কালের কাহিনী এটা। যত রক্তপাতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো তাতে চারটি নদীতে বান ডেকে যেতে পারতো।

আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন জাঁহাপনা, উজির জাফররা চার ভাই। তার বাবা ইয়াহিয়া ইবন খালিদ ইবন বারমাকও সুলতানের উজিরপদে বহাল ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

জাফরের বড় ভাই অল ফাদল ও অল রসিদ একই স্তন্যে পালিত হয়েছিলো। তার কারণ খলিফার পরিবারের সঙ্গে বারমাকী পরিবারের বহুকালের বন্ধুত্ব সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিলো। অল রসিদের মা খাইজারান এবং ফাদল-এর মা-এর মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিলো। সেই সূত্রে শিশুকাল থেকে কৈশোর পর্যন্ত অল রসিদের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ইয়াহিয়ার বাড়িতে। অল ফাদলের সঙ্গে একই মায়ের স্তন্য পান করে ওরা দু'টিতে মানুষ হয়েছিলো। এই কারণে অল রসিদ ইয়াহিয়াকেও বাবা বলে ডাকতেন।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো পঁচানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এই বারমাকীরা খুরাসনের বলখ্ শহরে বাস করতেন। সেখানে তাঁরা যশ খ্যাতি

প্রতিপত্তির শিখরে উঠেছিলেন। হজরত মহম্মদের প্রবর্তিত হিজরা সনের কম বেশি একশো বছরের মধ্যে এই খ্যাতি তাঁরা লাভ করতে পেরেছিলেন।

এরপর বারমকীরা দামাসকাসে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তখন বাদশাহ উমর মসনদে আসীন ছিলেন।

সুলতান হাসিমের শাসনকালে বারমাকী পরিবারের প্রধান মাজিয়ান ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

কিন্তু আব্বাস-বংশই সর্বপ্রথম বারমাকীদের বাদশাহী সম্মানে ভূষিত করেছিলো। খালিদ ইবন বারমাকই সর্বপ্রথম আবুল অল আব্বাসের প্রধান উজির পদে বহাল হয়েছিলেন। এবং আব্বাসের তৃতীয় পুরুষ সুলতান মহেদী বারমাকী ইয়াহিয়াকে অল রসিদের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। অল রসিদের জন্মের মাত্র সাত দিন আগে ইয়াহিয়া-পুত্র অল ফাদলের জন্ম হয়েছিলো।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অল হাদীর আকস্মিক মৃত্যুতে অল রসিদ খলিফা হয়েই প্রথমে ইয়াহিয়াকে প্রধান উজিরে বহাল করলেন। ইয়াহিয়া তাঁর দুই পুত্র অল ফাদল এবং জাফরকে তাঁর সহকারী উজির করে পাশে পাশে রেখে শিক্ষাদান করেছিলেন। এর ফলে খলিফার শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে লাগলো। প্রজারা খলিফার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

এই সব কারণে বারমাকীরা সুলতান-পরিবারে একান্তভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো। এবং ইয়াহিয়া ও তাঁর পুত্ররা কালক্রমে অসীম ক্ষমতার অধিকার অর্জন করতে পেরেছিলো। সারা সলতানিয়ত তাঁদের আঙ্গুলের ইশারায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছিলো। এবং হারুন অল রসিদের কালেই খলিফা বংশ খ্যাতি ও শৌর্যবীর্যের শীর্ষে পৌঁছতে পেরেছিলো।

কবি আবু নবাস তাই লিখেছেন ঃ

যতকাল চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা জ্বলবে।
তোমাদের কীর্তিকথা মুখে মুখে চলবে।।

ওঁরা সকলেই স্বনামধন্য, জনপ্রিয়, জ্ঞানবান বিচক্ষণ উজির হতে পেরেছিলেন। ওঁরা ছিলেন দেশের ও দশের গর্বের বস্তু। ওঁরা ছিলেন দেশের মহামূল্য রত্ন। কর্তব্যে বজ্রাদপি কঠোর এবং বাৎসল্যে কুসুমের মতো কোমল ছিলো তাঁদের হৃদয়। অমন জ্ঞানবৃদ্ধ এবং সৎ পরামর্শদাতা আর জন্মাবে না। ওঁদের উদারতা এবং মহত্ত্ব হাতিমতাইকে মনে করিয়ে দেয়। ওঁরা শান্তির পারবার ছিলেন।

শুধু এই-ই সব নয়, ওঁদের অসামান্য সমর-কুশলতায় খলিফা অল রসিদ তাঁর সলতানিয়তের পরিধি একদিকে মধ্য এশিয়ার সমতল থেকে সুদূরে উত্তারঞ্চলের অরণ্যভূমি, অন্যদিকে মরোক্কো এবং আন্দালুসিয়া থেকে চীন সীমান্ত এবং তাতার অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এরপর হঠাৎ একদিন বারমাক-সন্তানরা চরম খ্যাতির চূড়া থেকে ধপাস করে পড়ে গেলেন একেবারে মরণ-খাদে। ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস, একদিন যাঁরা এক বিশাল সলতানিয়তের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়েছিলেন, যাঁরা এক সময়ে সুলতানের প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা সব খুইয়ে বসলেন।

একদিন অল রসিদ মক্কা থেকে ফিরে এসে নৌকোয় চেপে আনবার শহর অভিমুখে যাত্রা করলেন। এবং পথের মাঝখানে তিনি অল উমরের এক সেনাবাসে রাত্রি কাটালেন। তাঁকে আদর আপ্যায়নের জন্য খানাপিনার এলাহী ব্যবস্থা করা হয়েছিলো সেখানে।

কিন্তু এই সময়ে খলিফার নিত্য সহচর জাফর সঙ্গে ছিলো না। দিনকয়েক আগে সে শিকারে গিয়েছিলো নদীর ধারের এক জঙ্গলে। খলিফা বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতে

লাগলেন। তখুনি তাঁর নির্দেশে বনে জঙ্গলে দূতবাহিনী পাঠানো হলো। যেখানেই থাক, আজ রাতের মধ্যেই তাকে নিয়ে আসতে হবে খলিফার কাছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জাফর এসে খলিফাকে সঙ্গ দান করেছিলো সে রাতে।

সেদিন খলিফার সঙ্গে ছিলো তাঁর একান্ত হেকিম জিব্রিল বখচিয়াসু, প্রিয় অন্ধ কবি আবু জাফর। খলিফা ওদের বললেন, জাফর অসুস্থ। তোমরা ওকে নিয়ে একটু আমোদ প্রমোদ কর।

তখন রাত বেশি হয়নি, সান্ধ্য আহার শেষ করে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন জাফর। অন্ধ গায়ক ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে হাল্কা রসের গানে বেশ জমিয়ে তুলেছে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো ছিয়ানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

হঠাৎ খলিফার দেহরক্ষী উদ্যত খড়্গ হাতে এসে জাফরের সামনে উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়ালো! চোখে মুখে তার ক্রোধের ছাপ।

জাফর বেশ অবাক হয়ে তাকালো, মাসরুরকে সে আশৈশব থেকে জানে। কখনও তার বিনয় নম্র ব্যবহারে এমন ঘটনা ঘটেনি আজ পর্যন্ত। হঠাৎ একি হলো? বলা নাই কয়া নাই, হুট করে সে ঢুকে পড়লো তার তাঁবুতে! মাসরুর তো কখনও এমনটা করে না। উজিরের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সালাম কুর্নিশ জানাতে কখনও সে ভুল করে না। কিন্তু আজ একি তার অবিনয়ী উদ্ধত মেজাজ? একবার সে মাথা নোয়ালো না?

জাফর নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে মাসরুরকে স্বাগত জানায়, এই যে মাসরুর, এসো এসো। তোমাকে দেখলেও আহ্লাদ হয়! কিন্তু মাসরুর ভাই, ব্যাপার কী আজ তোমাকে যেন কেমন উদ্ভ্রান্ত দেখছি? এই প্রথম দেখলাম, তুমি আগে খবর না পাঠিয়ে সোজা ঢুকে পড়েছ আমার কামরায়।

মাসরুর বললো, ব্যাপার বড় খারাপ, ওসব আদব কায়দা দেখাবার মতো সময় নাই আমার। সুলতানের হুকুম, এই মুহূর্তে তোমার শির নিয়ে গিয়ে হাজির করতে হবে তাঁর সামনে। না, আর দেরি নয়, জাফর, ওঠ, চলো বাইরে চলো।

জাফর উঠে দাঁড়ালো।

—একমাত্র খোদা ছাড়া আর ভরসা নাই। তাঁর কাছ থেকে আমরা এসেছি এ দুনিয়ায়, আবার তাঁর চরণেই ফিরে যেতে হবে সময় হলে, চলো।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে জাফর মাসরুরকে বললো, আমার কি মনে হয় জান মাসরুর, জাঁহাপনা মাত্রাধিক সুরাপান করে বেহেড হয়ে গিয়ে তোমাকে এই সব বলেছেন। কাল সকালেই দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এখন খলিফার কাছে ফিরে যাও, দেখবে একটু আগে তিনি যা হুকুম করেছেন এখনই তা আর স্মরণ করতে পারবেন না।

মাসরুর বললো, সে হয় না। হয় তোমার শির নিয়ে যাবো, না হয় আমার শির দিতে হবে। কাজ অসমাপ্ত রেখে আমি ফিরে যেতে পারবো না। তোমার যা শেষ কথা বলার আছে তুমি একখানা খতে লিখে দাও, আমি অবশ্যই সেখানা পৌঁছে দেব তাঁর হাতে। তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের বন্ধুত্ব। সেই কারণে তোমার এইটুকু উপকার আমি করতে পারি, জাফর।

জাফর বললো, দেখ আমরা আল্লাহর বান্দা। আমাদের শেষ ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে নাই। সুতরাং লেখারও কোনও প্রশ্ন আসে না। আল্লাহ খলিফাকে দীর্ঘজীবি করুন, এই আমার শেষ বাসনা জাফর! আর কিছু বলার নাই। এবার তোমার কাজ তুমি সমাধা কর।

তাঁবুর বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ঠেকালো জাফর। আর সেই মুহূর্তে মাসরুরের শাণিত খড়্গের একটি আঘাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো তার মুণ্ডটা।

এরপর আজ্ঞাবহ মাসরুর জাফরের কাটা মুণ্ডটা একখানা রেকাবীতে করে বয়ে এনে খলিফার সামনে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিলো। খলিফা উঠে এসে একটু নিচু হয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন জাফরের ছিন্ন মস্তকটি। তারপর থু থু করে থুথু ছিটিয়ে দিলেন তার মুখের উপর।

এতেও তিনি ক্ষান্ত হলেন না! তখনই হুকুম জারী করে দিলেন, জাফরের দেহটাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে বাগদাদের বড় সেতুর এক প্রান্তে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। আর অন্য প্রান্তে ঝুলতে থাকবে তার এই মুণ্ডটা।

অপরাধের সাজা হিসাবে প্রাণ দিতে হয়েছে অনেক অপরাধীকেই। কিন্তু এমন মর্যাদা হরণ খুব কম হতভাগ্যেরই জীবনে বা মরণে হয়েছে এর আগে।

সুলতান আরও হুকুম-নামা জারি করলেন ; ছয় মাস কাল ধরে জাফরের ধড় আর মুণ্ড বড় সেতুর এপার ওপারে ঝুলতে থাকবে। তারপরও যদি কোনও দেহাবশেষ থেকে যায় তবে তা গাধার গোবরের ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করবে। এবং সেই ছাই পায়খানার চাড়িতে চাড়িতে ছুঁড়ে দেবে।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! খাজাঞ্চীখানার তহবিলদার তার হিসাবের খাতায় বারমাকী পরিবারের পাতায় যেখানে একবার লিখেছিলো, ধর্মাবতারের নির্দেশে মহামান্য উজির জাফরকে জমকালো শাহী সাজ-পোশাক ও অন্যান্য উপহার দেওয়া বাবদ খরচ চার লক্ষ স্বর্ণ দিনার, ঠিক তার নিচেই আর এক ছত্রে সে লিখলো সেদিন, কাঠ খড় এবং গাধার গোবর দিয়ে জাফরের দেহ পুড়িয়ে ছাই করা বাবদ খরচ দশ দিরহাম।

এইভাবে জাফরের জীবনান্ত ঘটেছিলো। প্রায় সারাটা জীবন সে খলিফার একমাত্র পরম প্রিয় বন্ধু, পথপ্রদর্শক, সৎ পরামর্শদাতা রূপে উচ্চাসনে আসীন ছিলো। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে কোথায় উবে গেলো সেই প্রেম মহব্বৎ ভালোবাসা? এমন মহৎ প্রাণের কি এইভাবেই শেষ পরিণতি ঘটে?

পরদিন প্রত্যুষেই পেয়াদারা জাফর পিতা ইয়াহিয়া এবং অল ফাদলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো। খলিফার নির্দেশে তাদেরও হত্যা করা হলো। বারমাকী পরিবারের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন খলিফা। এই ইয়াহিয়া তাঁর শৈশবের শিক্ষক। তাকে তিনি পিতা সম্বোধন করে ডাকতেন। আর অল ফাদল—তার সঙ্গে তো তিনি এক মায়ের বুকের দুধ ভাগ করে খেয়েছেন।

ইয়াহিয়া পরিবারের বাকী সকলকে বন্দী করে এনে অন্ধকার কূপ-কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। এদের সংখ্যাও সহস্রাধিক। সবাই নিষ্পাপ নিরীহ মানুষ। কারো বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ ছিলো না।

আর যারা পড়ে রইলো তারা গৃহ সম্পদ-হারা ভিখারী হয়ে পথে পথে ফিরতে লাগলো। তাদের অনেকেই অনাহারে মারা গেলো, কেউ বা আত্মসম্ভ্রম বাঁচাতে গলায় দড়ি দিতে আত্মহত্যা করলো। কিন্তু ইয়াহিয়া, তার পুত্র অল ফাদল এবং মহম্মদকে নির্মম নিপীড়ন করে হত্যা করা হয়েছিলো।

শাহরাজাদ এক মুহূর্ত থেমে আবার বলতে শুরু করলো। জাঁহাপনা, আপনার নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ডের কারণ জানতে ইচ্ছে করছে! তা হলে শুনুন ঃ

এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে একদিন অল রসিদের কনিষ্ঠ ভগ্নী আলিয়াহ বড় ভাইয়ের কাছে এসে বললো, ধর্মাবতার, অনেক দিন ধরে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো করবো ভাবছি, কিন্তু সাহস পাই না।

খলিফা হারুন অল রসিদ ভগ্নীকে কাছে বসিয়ে প্রশ্ন করলেন, কী কথা বোন, নির্ভয়ে বলো।

আলিয়াহ বললো, জাঁহাপনা, জাফরের মৃত্যুর পর একটা দিনও তোমাকে সুস্থির শান্ত হতে দেখলাম না। এমন কী সে করেছিলো যার জন্য আজও তোমার ক্রোধ প্রশমিত হলো না?

অল রসিদের সারা মুখে কালো মেঘ নেমে আসে। ভগ্নীকে দুরে ঠেলে দিয়ে বলে, ওসব কথা জেনে তোমার কী ফয়দা হবে? সে কথা মনে হলেই আমার মন অশান্ত হয়ে ওঠে। যাও অন্দরে যাও।

এই বলে খলিফা বোনকে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ পর্যন্ত যত ঐতিহাসিক গবেষক এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে যে সব তথ্য দাঁড় করিয়েছেন, তাদের একজনের সঙ্গে অন্য জনের বড় একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকের বক্তব্যই আলাদা ধরনের।

এখানে তার দু একটা নমুনা তুলে ধরছি ঃ

কেউ বলেন, খলিফা হারুন অল রসিদ শেষ পর্যন্ত জাফরের স্বেচ্ছাচারে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। শেষের দিকে নাকি জাফরই বকলমে সুলতানদের কার্যভার পরিচালনা করতো। বাইরের কোনও ব্যক্তি সরাসরি খলিফার কাছে তাদের আর্জি পেশ করতে পারতো না। যা কিছু বক্তব্য আগে জাফরের কাছে পেশ করতে হতো। সাধারণতঃ সেই ফরমান দিয়ে দিত। কখন সখনও সে খলিফার কাছে দু-একজনের অভাব অভিযোগ পাঠাতো মাত্র। খলিফা বুঝতে পেরেছিলেন, জাফর তাঁকে কোণ-ঠাসা করে ফেলছে।

দরবারের সমস্ত উচ্চপদে জাফর তার পরিবারের আপনজনদের নিয়োগ করেছিলো। শুধু দরবারে বা দপ্তরেই নয়, সেনাবাহিনীর প্রধান খুঁটিগুলোতেও ছিলো তার নিজের লোক। এছাড়া সরকারী অর্থ আত্মসাতেরও নাকি অনেক তথ্য পাওয়া যায়। জাফরের সময়কালে বারমাকী পরিবারের বিষয় সম্পদের পরিমাণ নাকি সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছিলো।

অল রসিদের ব্যক্তিগত হকিম জীবরিলের জবানবন্দী থেকে এই তথ্য জানা যায়ঃ একদিক আমি অল রসিদের টাইগ্রীস তীরের প্রমোদ-ভবনে আহুত হয়েছিলাম। বারমাকী পরিবার বাস করতো নদীর অপর তীরে। মাঝখানে শুধুমাত্র নদীটির ব্যবধান।

কথা প্রসঙ্গে খলিফা আমাকে বললেন, এখন আমি আর শাসন কাজ বড় একটা নিজে দেখা শুনা করি না। সবই তুলে দিয়েছি জাফরের হাতে। ওরা আমাদের বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র নয়, আমাদের আব্বাস বংশের বহুকালের পরম সুহৃদও বটে। ওরা আমার কাঁধ থেকে সব বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছে। আমি এখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো নীলাকাশে পাখা মেলে ঘুরে বেড়াই। কোনও চিন্তা ভাবনা দায় দায়িত্ব আমার এখন নাই।

কিন্তু অন্য আর একদিন এই খলিফাই আমাকে বললেন, বারমাকীদের বাড়াবাড়িতে আমি বিশেষ বিচলিত বোধ করছি হকিম। ইয়াহিয়া আর তার পুত্ররা আমার সলতানিয়তের শাসন পরিচালনার ভার নিজেদের হাতে নিয়ে আমাকে যেন দিন দিন দূরে ঠেলে দিতে চাইছে। আমার যেন কেবলই মনে হচ্ছে ওরাই আসল শক্তি, আমি যেন ওদের হাতের পুতুল মাত্র।

খলিফার মুখ থেকে শোনার পর থেকে নিশ্চিত বুঝতে পারলাম বারমাকী পরিবারদের অধঃপতন অনিবার্য হয়ে এসেছে।

অন্যত্র ঐতিহাসিক বলেন, বারমাকী পরিবারের সৌজন্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে

জাফরের তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীরাই খলিফার কানে বিষ ঢালতে শুরু করেছিলো। কারণে অকারণে তারা মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে খলিফার কাছে গিয়ে বারমাকীদের সম্বন্ধে লাগান ভাঙ্গান করতো।

আবার অন্য এক গবেষকের অভিমত ঃ একদিন খলিফা জাফরকে নির্দেশ করেছিলেন, অতি গোপনে মহম্মদের কন্যা ফতিমা ও আলীর একমাত্র বংশধর সাঈদ ইয়াহিয়া ইবন আবদাল্লা অল হুসেনকে খতম করে ফেলতে হবে। জাফর নাকি খলিফার সে আদেশ পালন না করে আলি বংশধরকে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করতে সহায়তা করেছিলো। খলিফা এই লোকটিকে আব্বাস বংশের বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে মনে করতেন।

খলিফা যখন জাফরের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর হুকুম তামিল করা হয়েছে কিনা, তখন জাফর মিথ্যা ভাষণ করেনি তার কাছে।

—আমি যা করেছি তা আমার প্রভুর মঙ্গলের জন্যই করেছি, জাঁহাপনা।

—বাঃ চমৎকার, বেশ ভালোই করেছ, জাফর।

সুলতান মনের ক্রোধ চেপে মুখে হাসি ফুটিয়ে জাফরকে মিথ্যা বাহবা দিলেন। কিন্তু সেইখানেই মনে মনে বললেন, তোমার এতো বড় স্পর্ধা, মরবার পাখা গজিয়েছে?

আর এক ঐতিহাসিক বলেছেন ঃ বারমাকীদের পতনের আসল কারণ ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামীর মূলে তাদের কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হওয়া। বারমাকীরা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগে বলখ্-এ বসবাস করতো। তখন ওরা মাজিয়ান ধর্মী ছিলো। মাজিয়ানরা পুতুল পূজায় বিশ্বাস করতো।

খুরাসান অভিযানের সময় জাফর তার সৈন্যবাহিনীকে মাজি মন্দির এবং দেবদেবীদের ধ্বংস না করতে নাকি নির্দেশ দিয়েছিলো। এ সংবাদ খলিফা হারুন অল রসিদের কানে পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। এরপর থেকে ইসলামে বারমাকীদের আস্থা সম্বন্ধে খলিফার মনে গভীর সংশয় জাগে।

বারমাকীদের পতনের আরও কিছু কিছু যুক্তিবহ তথ্য তুলে ধরেছেন ইবন খিলিকান এবং ইবন-অল আখির। তাঁরা বলেছেন—

খলিফা হারুন অল রসিদের এক ভগ্নী ছিলো। তার নাম আব্বাসা। তার মতো রূপবতী রমণী যে সময়ে আর দু'টি ছিলো না। বড় হয়ে খলিফা স্বয়ং এই নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। আব্বাসাকে না দেখে তিনি এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারতেন না। দরবারে অথবা বিশ্রাম কক্ষে যেখানেই থাকতেন খলিফা সব সময় আব্বাসাকে কাছে কাছে রাখতেন। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। আব্বাস বংশের এক কন্যা সব সময় নিজের স্বামী ছাড়া অন্যের সাথী হয়ে দিন কাটাবে—তা হয় না।

অবশেষে খলিফা একদিন জাফরকে তার হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনার কথা জানালেন।

—আমি ইচ্ছা করি জাফর, তুমি আব্বাসাকে শাদী কর। কিন্তু একটা শর্ত তোমাকে পালন করতে হবে। আব্বাসার সঙ্গে তোমার কোনও দৈহিক সম্পর্ক থাকবে না। একমাত্র আমার উপস্থিতিতে তোমরা একত্র হতে পারবে।

জাফর সুলতানের একান্ত অনুরক্ত উজির। সে বললো, আপনার অভিলাষ আমি পূরণ করবো, জাঁহাপনা।

শাদীর পর প্রতিদিন আব্বাসার সঙ্গে জাফরের সাক্ষাৎ হয় খলিফার দরবারে বা বিশ্রামকক্ষে।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো সাতানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

এই ব্যবস্থায় অল রসিদ পুলকিত হলেও নব পরিণীতা দম্পতি বিশেষ প্রসন্ন হতে পারলো না। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম প্রণয়ের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি একেবারেই অবাঞ্ছিত। যদিও জাফর সুলতানকে খুশি রাখার জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারছিলো, কিন্তু নব-যৌবন-উদ্ভিন্না আব্বাসা এ অত্যাচার বরদাস্ত করতে চাইলো না। একদিন সে গোপনে চিঠি লিখে পাঠালো জাফর-মাতা ইতাবার কাছে।

—মা, আজ আমি আপনার পুত্রবধূ। আপনার পুত্র জাফর বিধিসম্মত ভাবে আমাকে গ্রহণ করেছেন। এরপর আমি আর এই প্রাসাদে অবস্থান করতে চাই না। আপনি আমাকে বরণ করে ঘরে নিন, এই আমার একমাত্র সাধ। তাঁর আর দশটা বাঁদীর পাশে আমাকেও একটু জায়গা করে দিন।

ইতাবা কিন্তু গোপন বিবাহ মঞ্জুর করলো না। আব্বাস বংশের কন্যা তাদের ঘরে বাঁদী হয়ে আসবে, সে কী কথা? এতে যে সারা দেশে ঢি ঢি পড়ে যাবে। এবং খলিফার রুদ্ররোষে পড়তে হবে তাদের! তাই সে জবাব লিখে পাঠালো, আমার এখানে পুত্রবধূ হয়ে আসা এবং থাকা তোমার পক্ষে উচিত হবে না।

এতে ভীষণক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো আব্বাসা। সে হুমকী দিয়ে লিখলো, আমি যাবোই, তাতে যদি দুনিয়া রসাতলে যায় যাবে। কিন্তু আমার বিধিসম্মত বিবাহিত স্বামীর দাবি আমি কিছুতেই ছাড়বো না। তার জন্যে যদি আমাকে ফাঁসীতেও ঝুলতে হয় ঝুলবো।

সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি জানাতে বাধ্য হলো ইতাবা।

আব্বাসাকে সে গোপনে নিয়ে এলো নিজের বাড়িতে। রঙ চঙ মাখিয়ে একেবারে নতুন একটি বাঁদী সাজিয়ে হাজির করলো জাফরের সামনে। জাফর তখন নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলো, আব্বাসাকে দেখেও চিনতে পারলো না। ইতাবা বললো, আজকের বাঁদী বাজার থেকে তোর জন্যে পছন্দ করে কিনে এনেছি, বাবা।

জাফর বললো, বেশ তো শাদীর পাট চুকিয়ে ফেলো তাড়াতাড়ি। আজই মধু-যামিনী যাপন করা যাক।

সেই রাতে বাসরঘরে জাফর আব্বাসাকে বিবস্ত্রা হয়ে কাছে আসতে বললো।

আব্বাসা বললো, আচ্ছা মালিক, শাহজাদীদের সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? তাদের কেউ আপনার বাঁদী হয়ে এলে আপনার জিন্দগী একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে? সুলতান-তনয়ারা কী বাজারে কেনা বাঁদী থেকে আলাদা কিছু?

—শা-হ্-জা-দী?

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আব্বাসার দিকে তাকালো জাফর, তুমি কী কোনও সুলতান্ বাদশার কন্যা নাকি?

—শোনো জাফর, আমি শাহজাদীও বটে, তোমার বাঁদীও বটে। আব্বাসের বংশে আমার জন্ম।

সব মনের নেশা মুহূর্তে উবে গেলো জাফরের। শয্যার ওপরে সোজা হয়ে বসলো সে। তারপর চীৎকার করে উঠলো, এ তুমি কী করেছ আব্বাসা? নিজেও মরবে, আমাকেও মারবে?

ছুটে গেলো সে মায়ের কাছে, মা এ তুমি কী সর্বনাশ ডেকে এনেছ?

মা কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে বললো, বাবা এ ছাড়া কোনও উপায় ছিলো না আমার।

এরপর সে আব্বাসার চিঠিপত্রের সব কথা জাফরকে শোনালো।

যথাসময়ে প্রাসাদের হারেমে আব্বাসা একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলো। পুত্রটিকে সে তার একান্ত বিশ্বাসভাজন এক নফর বিয়াসের হাতে তুলে দিয়ে বললো, একে গোপনে মানুষ করবে। এর দেখা-শোনার জন্য আমার পরিচারিকা বারাহ্ তোমাকে সাহায্য করবে। একে নিয়ে আজই তোমরা দু'জনে মক্কায় চলে যাও। এখানে থাকলে, যত সাবধানেই থাক, লোক জানাজানি হয়ে যাবে।

কিন্তু যত গোপনতাই অবলম্বন করুক, এমন মুখরোচক সংবাদ চাপা রইলো না হারেমে।

ইয়াহিয়া অবশ্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেনি। তিনি প্রাসাদ তথা হারেমের রক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সন্ধ্যা হতে না হতেই তিনি প্রাসাদের সব মহলের দরজা তালা বন্ধ করে দিতেন। এতে বেগম জুবেদা ক্ষুব্ধ হয়ে একদিন ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে নালিশ জানালো খলিফার কাছে।

খলিফা ইয়াহিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আব্বাজান, জুবেদা আপনার নামে নালিশ করছে কেন, কী করেছেন আপনি?

ইয়াহিয়া বললেন, কেন, সে কি আমার কাজের কোনও গাফিলতি দেখেছে? আমি কি ঠিকমতো হারেম দেখা শোনা করছি না?

—না সে সব কিছু নয়, আব্বাজান।

—তাহলে, ওর কথায় কান দিও না, ধর্মাবতার। আমি আমার কর্তব্যে কখনও অবহেলা করি না।

এরপর থেকে ইয়াহিয়া আরও সকাল সকাল হারেমের দরজায় কুলুপ লাগাবার ব্যবস্থা করেন।

জুবেদা আবার এলো খলিফার কাছে। অল রসিদ সেবার বেশ কড়া ভাবেই জানিয়ে দিলেন জুবেদাকে, ইয়াহিয়া আমার পিতৃতুল্য। তিনি আমাকে শৈশবকালে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, তারই ফলে আজ আমি এতবড় বিশাল সলতানিয়তের শাসন কার্য চালাতে সক্ষম হচ্ছি। তাকে আমিই নিয়োগ করেছি হারেম দেখাশুনার জন্য। আমি জানি, তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আদেশ মোতাবেকই তিনি কর্তব্য করে চলেছেন। আমার এখনও স্মরণ আছে আমার পাঠ শেখার সময়ই তিনি এমনি কঠোর হাতে আমাকে শাসন করেছিলেন। এবং তার ফলেই আমি সত্যিকারের মানুষ হতে পেরেছি।

জুবেদা বিদ্রুপের বাণ ছুঁড়ে বলতে থাকে, তা তিনি আপনাকে যেমন কঠিন শাসন মানুষ করেছিলেন তেমনি করে নিজেরটাকে শিক্ষা দিতে পারেন নি কেন? সেটা তো একটা অমানুষ হয়েছে।

—তুমি কী বলতে চাও, বেগমসাহেবা? কে অমানুষ?

অল রসিদ ভীষণ রেগে গেলে জুবেদাকে বেগমসাহেবা বলে সম্বোধন করতেন।

জুবেদা তখন জাফর আর আব্বাসার সমস্ত গোপন কাহিনী শুনিয়ে দিলো খলিফাকে।

খলিফা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এর কোনও প্রমাণ আছে?

—এই প্রাসাদ হারেমের একটি অবোধ শিশুও যে কথা জানে, তা আবার প্রমাণের অপেক্ষা রাখে নাকি? আর তাছাড়া সে ছেলে তো এখনও জীবিত।

খলিফা জানতে চাইলেন, কোথায় আছে সে?

—মক্কা তীর্থে সে এখন লালিত হচ্ছে।

—তুমি ছাড়া আর কে কে জানে এ কথা?

—হারেমের সব বাঁদীই জানে।

অল রসিদ আর একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না।

সেইদিনই তিনি জাফরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন।

এদিকে আব্বাসা তার এক গুপ্তচরের মারফতে মক্কায় বিয়াসের কাছে বার্তা পাঠালো, অবিলম্বে পুত্রকে নিয়ে ওখান থেকে পালাও। স্বয়ং খলিফা সেখানে যাচ্ছেন তার সন্ধানে। তোমরা অতি শীঘ্র শহর ত্যাগ করে ইয়ামিনে চলে যাবে।

মক্কায় পৌঁছে খলিফা দিকে দিকে চর পাঠালেন। তারা দু'একদিনের মধ্যে খবর এনে দিলো, শাহজাদী আব্বাসার পুত্রকে ইয়ামিনের এক গৃহে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সে বেশ সুস্থ আছে।

কয়েকদিনের মধ্যে ছেলেটিকে উদ্ধার করে খলিফা বাগদাদে নিলে এলেন।

এর পরের ঘটনাটা ইউফ্রেট নদী-তীরে অল উমরের সেনা-ছাউনিতে সংঘটিত হয়েছিলো। এবং সে যে কী নিদারুণ হৃদয়-বিদারক ঘটনা তা তো আপনারা শুনেছেন।

আব্বাসা এবং তার শিশু পুত্রকে গোবরের গাদায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলেছিলেন খলিফা।

এরপর রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

নয়শো আটানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে থাকে ঃ

এবার খলিফা হারুন অল রসিদ সম্বন্ধে শুনুন, জাঁহাপনা ঃ

সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড শেষ করে খলিফা বাগদাদে ফিরে এলেন। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই অনুভব করতে পারলেন, যে বাগদাদ তাঁর কৈশোরের ক্রীড়াভূমি এবং যৌবনের উপবন ছিলো, আজ এই বিকেল বয়সে তা বিষবৎ হয়ে উঠেছে।

সুলতান বাগদাদ পরিত্যাগ করে রাখাতে চলে গেলেন। এরপর আর কখনও তিনি ফিরে আসেননি। চির সুখের আবাসস্থল বাগদাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে কবি আব্বাস ইবন অল আহনফ্ লিখেছিলেন ঃ

যাবার সময় ওরা আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করেছিলো,
আবার ফিরে এসো, ফিরে এসো এই নন্দনকাননে
কিন্তু আমরা বেশ বুঝেছিলাম, এ শুধু বিদায় অভিনন্দন।
তাই তো আমরা হাত নেড়ে বলেছিলাম, বিদায় বাগদাদ
চির বিদায় তোমাকে।

বন্ধু-বিয়োগের যে জ্বালা, খলিফা তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন। শেষের দিকে তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। যাকে তাকে ডেকে বলতেন, তোমরা কেউ আমার জাফরকে ফিরিয়ে দিতে পার? তার বদলে আমার গোটা সলতানিয়ত দিয়ে দেব, পার কেউ আমার এ দুঃখ ঘোচাতে?

বারমাকীদের সম্বন্ধে যদি কেউ কখনও একবিন্দু নিন্দা অপবাদ দিত খলিফা ক্রোধে ফেটে পড়তেন, খবরদার, জিভ কেটে ফেলবো।

যদিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর বিশাল সলতানিয়তের একমাত্র নিয়ামক ছিলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তাঁর হাতে তেমন কোনও ক্ষমতাই ছিলো না। তাঁর

চারপাশে মাছির মতো ভনভন করতো যারা, তারা ছিলো সবাই ছদ্মবেশী শয়তান। মুখে তোষামদ করতো খলিফাকে, কিন্তু আড়ালে আড়ালে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতো।

খলিফা সব সময় শঙ্কিত থাকতেন, নিজের ঔরসজাত পুত্ররাই হয়তো তাঁকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলবে। তাদের ধারণা অল রসিদ অনেক কাল তখতে বসে আছেন। এখন আর সেটা আঁকড়ে থাকা তাঁর পক্ষে উচিত নয়।

খলিফা স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। একান্ত অনুরক্ত বিশ্বস্ত নফর চাকররা দিন দিন কেমন বিগড়ে যাচ্ছে। এই সব তাঁর দুই পুত্রের কারসাজী। মাসরুরের মতো অনুগত নফর তাঁর প্রিয় পুত্র অল মামুনের গুপ্তচর হয়ে খলিফার পাশে পাশে থেকে নজর রেখে চলে। খলিফার ব্যক্তিগত হাকিম জিবরিল—সে আবার অল আমিনের দূত হয়ে সকাল সন্ধ্যা সব খবর পাচার করে দেয়।

এ সবই খলিফার জানা। তিনি জানতেন, তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে, কোনদিন তাঁর ছেলেদের হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে।

একদিন খলিফা একটি স্বপ্ন দেখলেন ঃ কে যেন তাঁর মাথায় খানিকটা রাঙা মাটি ছড়িয়ে দিয়ে বলছে এই মাটিতেই তোর শান্তি হবে। আবার যেন প্রশ্ন করলো, কোথায় পাওয়া যাবে এ মাটি? উত্তর শোনা গেলো তুস-এ।

খলিফা আর বিলম্ব করলেন না। পরদিনই তাঁর তাজি ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন। তুস-এ যেতে হবে তাঁকে।

কয়েকদিন একটানা চলার পর তুস-এ প্রবেশ করেই খলিফা মাসরুরকে বললেন, যা দেখতো এখানে কোথায় পাওয়া যায় সেই রাঙা মাটি—নিয়ে আয় খানিকটা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এলো মাসরুর। তার হাতে টকটকে লাল রঙের এক চাঁই মাটি। খলিফা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, পেয়েছি, পেয়েছি। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে মাসরুর! এই লাল মাটিই স্বপ্নে দেখেছিলাম। আর কোনও চিন্তা নাই, এবার আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তিনি আমাকে ডেকেছেন, যেতে হবে।

এরপর আর তাঁর ইরাকে ফেরা হয়নি।

পরদিনই খলিফার দেহ-মন দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর পার্শ্বচরদের তিনি বললেন, সেই পরম লগ্ন সমাগত। আমি সারা দুনিয়ার ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু জানি, আজ তারাই আমার জন্য দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলতে দ্বিধা করবে না।

জামাদা মাসের তৃতীয় দিবসে খলিফা তুস ভূমিতে দেহ রাখলেন। সনটা ছিলো একশো তিরানব্বই হিজরী। আবুল ফিদার হিসেব মতো সাতচল্লিশ বছর পাঁচমাস পাঁচদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন খলিফা হারুন অল রসিদ।

আল্লাহর তাঁর সকল ভুল ভ্রান্তি মার্জনা করে দয়াপরবশ হোন।

তিনি ছিলেন এক ধর্মান্ধ গোঁড়া সুলতান।

শাহরাজাদ দেখলো, তার কাহিনী শুনতে শুনতে সুলতান শাহরিয়ার গভীর বেদনাহত হয়ে চোখের জল মুছছেন। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে শাহরাজাদ একটি মিষ্টি মধুর প্রেম উপাখ্যান শুরু করে দিলো ঃ

এক সময়ে কোনও এক মুসলমান মুলুকে নুমানশাহ নামে এক বৃদ্ধ সুলতান প্রজা পালন করতেন। তাঁর মতো দিলদরিয়া মেজাজের বাদশাহ বড় একটা দেখা যায় না। তিনি ছিলেন আফলাতুনের তুল্য বিজ্ঞ বিচক্ষণ। তাঁর স্বভাব প্রকৃতি ছিলো সাধু-সন্তদের মতো। তাঁর

মহিমা গরিমা ফরিদুনের মহিমা গরিমাকেও ম্লান করে দিয়েছিলো। তাঁর রাশিচক্র ছিল আলেকজাণ্ডারের অনুরূপ। তিনি ছিলেন পারস্যের অনসিরবানের চেয়েও সৌভাগ্যবান।

সুলতানের সাত পুত্র। সাতজনই পরম রূপবান। এদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা নওজোয়ান ছিলো কনিষ্ঠ পুত্র জুঁই। তার রূপ-যৌবনের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার নাই।

সাত ভাই-এর মধ্যে সুলতান জুঁইকে নিযুক্ত করলেন তাঁর বিশাল গো-মহিষাবাথানের রাখাল হিসেবে।

একদিন জুঁই পাহাড়ের পাদদেশের সবুজ ঘাসের মাঠে গরু মহিষগুলোকে ছেড়ে দিয়ে উপলখণ্ডের উপর বসে মনের আনন্দে বাঁশী বাজিয়ে চলছিলো, এমন সময় এক দরবেশ এসে দাঁড়ালেন ওর সামনে।

—খোদা মেহেরবান, বেটা, আমি বড় ক্ষুধার্ত, আমাকে একটু দুধ খাওয়াও তুমি।

শাহজাদা জুঁই বললো, আপনি আমাকে মুশকিলে ফেললেন পীরসাহেব। এই মাত্র এদের দোহন করে সমস্ত দুধ আমি প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলাম। এখন আর দুধ পাওয়া যাবে না।

দরবেশ বললো, কিন্তু আমি যে বড় আশা করে এসেছি, তোমার গরুর দুগ্ধ পান করে ক্ষুধার নিবৃত্তি করবো। তুমি আর একবার দুয়ে দেখ, হয়তো কিছু মিলতে পারে।

জুঁই বললো, আপনি মুসাফীর, আপনি অতিথি, আপনাকে তুষ্ট করতে পারলে আমি ধন্য হবো। আপনি আদেশ করছেন অবশ্যই, আমি দোহন করে দুগ্ধ সংগ্রহের চেষ্টা করছি। জানি না কতটুকু কী পাব।

একটা সুন্দর গাভীকে ডেকে তার দুধ দুইতে লাগলো শাহজাদা জু'ই। কী আশ্চর্য, বাঁট ধরে দু'চারটে টান দিতেই দুধে-ফেনায় পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠলো।

জুঁই অবাক হয়ে তাকালো ফকিরের দিকে। এ তো সাধারণ সাধু নন। নিশ্চয়ই কোনও পীর পয়গম্বর হবেন।

দুধের ভাঁড়টি বাড়িয়ে ধরলো জুঁই। আর হাত পেতে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিলো সে। তারপর ঢেকুর তুলে বললো, তোমার এ আতিথেয়তা বিফলে যাবে না, বেটা। যে দুধ তুমি আমাকে খাওয়ালে তা অমৃত। এই অমৃত দানের সুফল পাবে তুমি।

আজ আমি তোমার কাছে এক শুভ সন্দেশ বয়ে নিয়ে এসেছি। এক ভালোবাসার সংবাদ।

শোনো বাবা, আমি দিব্যচক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি, তার মতো তোমার হৃদয় ভালোবাসার জন্য কাঙাল হয়ে উঠেছে। মহব্বত জীবনকে মহৎ করে। তবে যোগ্য পাত্রের সঙ্গে যোগ্য পাত্রীর মিলন হওয়া দরকার। আমি সেই সন্ধানই দিতে এসেছি তোমাকে।

এই মরুপ্রান্তরের ওপারে এক শস্য-শ্যামল দেশ আছে। সেখানকার সুলতান আকবরের কন্যা সুন্দরী বাদাম তার ফুলবাগিচায় বিহার করছিলো। আমি তাকে দেখে তার যোগ্য পাত্র অনুসন্ধানে বেরিয়েছি। তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি বিশেষ প্রীত এবং মুগ্ধ হয়েছি। একথা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি ঐ শাহজাদীই হাতে পারবে তোমার যোগ্য পত্নী। তার মতো রূপ-লাবণ্যবতী একালে বিরল। তোমার সঙ্গে যথার্থই মানাবে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

নয়শো নিরানব্বইতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

আমি জানি, সে তোমারই পথ চেয়ে দিন গুনছে। আমি তোমার হৃদয়ে মহব্বতের বীজ অঙ্কুরিত করে গেলাম। এখন তুমি দেখ, কী করে তাকে লাভ করতে পার।

এই বলে দরবেশ চলে গেলেন।

শাহজাদা জুঁই সত্যি সত্যিই প্রিয়া-মিলন আশায় অধীর হয়ে উঠলো। মজনু যেমন লাইলার জন্য আকুল হয়েছিলো একদিন, সেই রকম আকুল হলো তার দেহ মন প্রাণ।

গো-মহিষ ফেলে রেখে সে মাতালের মতো ছুটে চলতে লাগলো।

একদিন রাতে শাহজাদী প্রাসাদের ছাদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখলো, একটি পরম রূপবান যুবক তার কাছে এসে অধরে চুম্বন এঁকে দিচ্ছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে সেই সুন্দর সুপুরুষ যুবক অদৃশ্য হয়ে গেলো। শাহজাদী আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো, কোথায় গেলো, কোথায় গেলো সে?

সকাল না হওয়া পর্যন্ত সারা রাত ধরে সে ফুঁপিয়ে ফাঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো।

সুলতান এবং বেগম এ সংবাদ শুনে ছুটে এলেন কন্যার কাছে, আলুলায়িত চুলে শাহজাদী তখন অসংবৃত বেশ-বাসে শয্যায় বসে খাটের বাজুতে মাথা কুটছিলো।

মা-বাবাকে দেখে সে ক্ষিপ্র হাতে নিজেকে সংবৃত করে নেয়। এক এক করে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন ওরা! সবগুলোর যথাযথ জবাব দেয় সে। কখনও বা সোচ্চার হয়ে আবার কখনও বা ঘাড় নেড়ে।

ওরা ভাবলেন, কন্যা দুঃস্বপ্ন দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তখুনি হকিম ডাকা হলো। কিন্তু তাতে উপকারের বদলে আরও খারাপ হয়ে পড়লো বাদামের অবস্থা। হকিম বললো, দেহে বদরক্ত জমা হয়েছে। ওটা বের করে দিতে হবে।

হাতের শিরা কাটা হলো, কিন্তু কী আশ্চর্য, এক ফোঁটা রক্তও ঝরে পড়লো না হাত থেকে।

হকিম হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, না, আশা নাই।

এর দিনকয়েক পরে।

হাসি গান হৈ-হল্লার মধ্যে ভুলিয়ে রাখার জন্য শাহজাদীর সখী, সহচরীরা সব সময় তাকে ঘিরে বসে থাকে।

একদিন বিকালে ওরা শাহজাদী বাদামকে সঙ্গে করে বাগানের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো। এমন সময় বাদামের দৃষ্টি পড়লো একটি যুবকের ওপর। হঠাৎ ওর বুকের মধ্যে ঘ্যাঁৎ করে উঠলো।

যুবকটি কিন্তু একমনে সুমধুর তানে বাঁশী বাজাতে বাজাতে দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলো।

এরপর একদিন শাহজাদীর এক বশংবদ নফর এসে খবর দিলো, মালকিন, হাজারো থেকে এক পরম রূপবান রাখাল বালক এসেছে, এখানে। তার বাঁশী শুনে সবাই পাগল হয়ে উঠেছে।

নফরের কথা শুনে শাহজাদীর মুখে হাসি ফোটে। জিজ্ঞেস করে কোথায় আছে রে সে?

—আমাদের বাগানের এক পাশে ডেরা গেড়েছে।

—তার নাম কী জানিস?

—জানি মালকিন, শাহজাদা জুঁই!

শাহজাদী একখানি প্রেমপত্র লিখে নফরের হাতে দিয়ে বললো, যা, ওকে দিয়ে জবাব নিয়ে আয়।

শাহজাদা জুঁই প্রিয়ার পত্র পড়ে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেই রাতে যথানির্দিষ্ট সময়ে শাহজাদী বাদাম এসে দাঁড়ায় বাগানে। তার অনেক আগেই জুঁই বাগানে প্রবেশ করে এক গাছের ডালে আত্মগোপন করেছিলো।

বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাদাম চকিত হরিণীর মতো এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। এমন সময় জুঁই বৃক্ষশাখা থেকে নেমে পড়ে নিচে। ঠিক একেবারে শাহজাদীর সামনে।

জুঁই ভাবলো, দরবেশ একটুও বাড়িয়ে বলেনি শাহজাদীর রূপের কথা।

সেই রাত্রির অমল ধবল জ্যোৎস্নালোকে দু'জনে আরও কাছে সরে এলো। আরও কাছে। তারপর গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করতে থাকলো ওরা। চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত হয়ে ওঠে অধর। দু'জনেরই অশান্ত অন্তরে দল মেলে বিকশিত হয়ে ওঠে দু'টি রক্তগোলাপ।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

এক সহস্রতম রজনী ঃ

আবার সে বলতে শুরু করে ঃ

পরদিনই শাহজাদী বাদাম বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি আর্জি পেশ করলো।

বাবা কন্যাঅন্ত প্রাণ; তার কোনও বাসনাই অপূর্ণ রাখতে চান না তিনি।

শাহজাদী বাদাম বললো, বাবা, প্রতিদিন বিকালে মাঠে বেড়াতে যাই আমি। সঙ্গে থাকে আমার সখী সহচরীরা। মুক্ত বাতাস আর তরুলতার শ্যাম শোভা দেখে আমার চিত্ত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এই ক'দিনে এরই মধ্যে দেখ বাবা, আমার শরীর কেমন বেশ তাজা হয়ে উঠেছে।

একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি বাবা, মাঠে আমাদের যেসব গরু মহিষ চরে বেড়ায় সেগুলো বড়ই দুর্বল, রোগা পটকা। আমার মনে হয় রাখালরা একদম নজর দেয় না ওদের দিকে। না খেতে পেয়ে ওদের ঐ দশা হয়েছে। আহা, অবোধ পশু ওরা, মুখে তো ভাষা নাই, তাই আপনার কাছে নালিশ জানাতে পারে না ওরা। মাঠে বেড়াতে বেড়াতে কাল একটি চমৎকার রাখাল ছেলেকে দেখেছি। ভেবেছি ওকে তোমার কাছে নিয়ে আসবো। তুমি তাকে সব ভার দিয়ে একবার পরখ করে দেখো, হয়তো সে আমাদের গরু মহিষগুলোকে আদর যত্ন করে পালন করতে পারবে।

কন্যার এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে সুলতান বিস্মিত হয়ে বলেন, এটা কী একটা আর্জি হলো তোমার! এই তুচ্ছ কথাটা বলতে তুমি সাত সকালে ছুটে এসেছ আমার কাছে। বেশ তো, তুমি যদি তাকে পছন্দ করে থাক, এক্ষুণি ধরে এনে রাখালের পদে বহাল করে দিচ্ছি।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় শাহজাদী বাদাম জুঁইকে সঙ্গে করে বাবার কাছে এসে বললো, এই সেই রাখাল ছেলে বাবা। শুনেছি দারুণ চৌকস।

সুলতান আকবর বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ব্যক্তি। রাখাল বালকের অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্য ও দেহ-সৌষ্ঠব দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। এমন ছেলে রাখাল হলো কী করে?

বাবাকে সন্দিহান হতে দেখে শাহজাদী বাদাম বললো, বুঝেছি বাবা, তোমার মনে সংশয় জেগেছে, এমন সুন্দর ছেলে সাধারণ রাখাল-পরিবারে জন্মালো কী করে? কিন্তু বাবা নিয়মের কী ব্যতিক্রম ঘটে না। সুলতান বাদশাহর ঘরে কী অসুন্দর সন্তানের জন্ম হয় না কখনও? তুমি ওর বাইরেটা দেখে বিচার করো না বাবা। ওকে কাজে বহাল করে দেখ, সে প্রমাণ করবে, রাখালের কাজে তার জুড়ি নাই।

সুলতান আকবর কন্যাকে খুশী করার জন্যই এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন তুললেন না। হাত নেড়ে তিনি তাঁর সম্মতি জানিয়ে দিলেন।

এই সময় রাত্রি শেষ হলে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো। দুনিয়াজাদ উঠে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বললো, কি সুন্দর তোমার গল্পগুলো দিদি, আর কি মিষ্টি করেই না বলো তুমি।

এই তিন বছরে বালিকা দুনিয়াজাদের দেহে ভরা যৌবনের বান এসেছে। বোনকে আদর করে বুকে জড়িয়ে বলে, দুনিয়া, এখন তুই বড় হয়ে উঠেছিস। প্রাণে তোর বসন্ত জেগে উঠছে। এখন তো এই সব গল্পই তোর ভালো লাগবে। তবে এ আর এমন কী প্রেম-কাহিনী! কাল রাতে মহব্বতের এমন কিস্‌সা শোনাবো, দেখবি বুকে তুফান উঠবে। অবশ্যই সবই নির্ভর করছে মেহেরবান জাঁহাপনার মর্জির ওপর। তিনি যদি সদয় থাকেন তবেই প্রাণে বাঁচবো, না হলে আজকের রাতই শেষ রাত হয়ে যাবে।

শাহরাজাদের কথার প্রতিবাদ করে সুলতান শাহরিয়ার আর্তনাদ করে ওঠে, আঃ কী হচ্ছে, শাহরাজাদ। আমি কি এখনও আগের মত অশান্ত উন্মত্ত আছি নাকি? এই দীর্ঘ তিন বছর ধরে তোমার কাছে নানা ভিন্ন স্বাদের কাহিনী শুনে একদিকে যেমন অনাবিল আনন্দ পেয়েছি, অন্যদিকে তেমন আমার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন বেশ বুঝতে পারি শাহরাজাদ, ক্রোধ মানুষকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়। ষড়রিপুর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এই ক্রোধ। তোমার যাদুস্পর্শে আমি আজ ক্রোধ পরিহার করতে শিখেছি। আমার হৃদয়ে প্রশান্তির পদ্ম ফুটিয়েছ তুমি।

তুমি যদি ইচ্ছা কর, আজই অথবা কালই তোমার কাহিনীর শেষ করতে পার, শাহরাজাদ। আমার চিত্তে আর কোনও ক্ষোভ জ্বালা নাই। তবে জুঁই আর বাদাম-এর কিস্‌সার শেষটুকু অবশ্যই শুনতে সাধ হচ্ছে। আজ না হোক, কাল শুনিয়ে দিও, কী বলো?

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনার যা অভিরুচি।

এরপর সুলতান শাহরিয়ার শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নেন। যুবতী দুনিয়াজাদ লজ্জায় মুখ ঢেকে পাশ ফিরে শোয়।

পরদিন যথাসময়ে দরবারে আসেন সুলতান। প্রতিদিনের মতো সেদিনও উজির-কন্যার মৃতদেহ সৎকারের জন্য শবাচ্ছাদন সঙ্গে করে এনেছে। প্রতিদিনই সে শঙ্কিত হয়ে দরবারে প্রবেশ করে। আজ হয়তো তার কন্যার মুণ্ডচ্ছেদের সংবাদ ঘোষণা করবেন সুলতান। কিন্তু না, আজ তিন বছরের মধ্যে তার সে আশঙ্কা—আশঙ্কাই থেকে গেছে। কার্যতঃ কিছু ঘটেনি।

সেদিনও উজিরের হাতে কফিনের কাপড় দেখে সুলতান শাহরিয়ার বললেন, কাল থেকে ওটা আর আনবেন না। আর দরকার হবে না।

এরপর দরবারের অন্য কাজে মন দিলেন তিনি।

দিন শেষে সন্ধ্যে হতে না হতে সুলতান হারেমে চলে আসেন। তারপর শাহরাজাদের সঙ্গে তাঁর প্রাত্যহিক খানাপিনা রতিরঙ্গ-আদি সমাধা করে শয্যার এক পাশে বসে বলেন, এবার শেষটুকু শুনিয়ে দাও শাহরাজাদ। আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বো আমরা।

এক সহস্র একতম রজনী ঃ আবার শাহরাজাদ বলতে শুরু করে ঃ

এরপর শাহজাদা বাইরের জীবনে সুবোধ রাখাল ছেলে এবং রাতের অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে শাহজাদী বাদামের বক্ষলগ্ন হয়ে এক দুর্দান্ত দামাল ছেলের মতো দিন কাটাতে থাকে।

দিনের বেলায় গরু মহিষগুলোকে সে মাঠে মাঠে ছড়িয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সন্ধ্যের আগেই বাঁশী বাজিয়ে ডেকে এনে আবার তাদের খোয়াড়ে ভরে ফেলে। তারপর শুরু হয় তার অভিসার।

বাগানে ঢুকে গাছের ডালে লুকিয়ে শাহজাদীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে। যথাসময়ে বাদাম এসে উপস্থিত হয়। তারপর সারারাত ধরে চলে ওদের মান অভিমান, রাগ অনুরাগ এবং পরিশেষে রতিরঙ্গের রমণীয় পালা। এইভাবে ওরা জীবনকে রূপে রসে প্রেমে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলে।

কিন্তু এই নিষিদ্ধ প্রেমপর্ব গোপনে গোপনে আর কতকাল চালানো সম্ভব? একদিন ওদের এই নৈশ মিলনের দৃশ্য দেখে ফেলেছিলো সুলতানের এক দূর সম্পর্কের ভাই। লোকটি তার নিজের ছেলের জন্য শাহজাদীর শাদী দেবার জন্য সারাক্ষণ সুলতানের পাশে পাশে ঘুরঘুর করতো। কিন্তু পাত্র হিসাবে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের কোন যোগ্যতাই ছিলো না। তাই সুলতান তাকে বড় একটা আমল দিতেন না।

মওকা পেয়ে সুলতানের কাছে গিয়ে লোকটা শাহজাদী বাদামের নৈশ বিহারের কাহিনী বেশ ফলাও করে তুলে ধরলো। সুলতান ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন। বাদামকে তিনি ডেকে পাঠালেন তখুনি। শাহজাদী অধোবদনে এসে পড়লো বাবার সামনে।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা! তুমি বাদশাহর ঘরে জন্মেছ, একি নোংরা আচরণ তোমার! আমি স্নেহে অন্ধ হয়ে তোমাকে অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। এখন দেখছি মহা ভুল করেছি। পয়গম্বর মহম্মদ তাঁর উপদেশ বাণীতে এক জায়গায় বলেছেন, আমার অনুরক্তরা শোনো, সংসারে বেগম, বাঁদী এবং কন্যারাই তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাদের কোনও বিবেক বা বিচারবুদ্ধি বলে কিছু থাকে না। ওরা জন্মগতভাবেই পঙ্গু। তোমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, তাদের কড়াভাবে কয়েদ করে রাখা। দড়ি ছাড়া পেলেই তারা অপকর্ম করে বসবে। কঠিন হাতে শাসন করবে তাদের। অবাধ্য হলে প্রহার দিয়ে ঠাণ্ডা করবে।

এখন তুমি আমাকে বলো বাদাম, এ অবস্থায় তোমাকে কী প্রহার করবো? তুমি একটা অচেনা অপরিচিত নাম-গোত্রহীন রাখাল ছেলের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ। এমন জঘন্য কাজে নামতে তোমার একটু আত্মমর্যাদায় বাধলো না? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই তলোয়ারের এক কোপে তোমার মুণ্ডুটা কেটে নামিয়ে দিই। অথবা তোমাদের দু'জনকে জ্বলন্ত চিতায় তুলে জীবন্ত দগ্ধ করে মারি।

শাহজাদী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। কন্যাপ্রাণ সুলতান বললেন, থাক থাক, আর চোখের পানি ফেলে আমাকে কাবু করতে হবে না। ঢের হয়েছে, এবার হারেমে চলে যাও। আমার হুকুম ছাড়া আজ থেকে আর তুমি বাইরে বেরুতে পারবে না। তারপর ঐ রাখাল ছোঁড়াটাকে কী ভাবে বাঘ-ভালুক দিয়ে খাওয়াতে হয় তার ব্যবস্থা আমি করছি।

সুলতান তাঁর পুত্রদের ডেকে বললেন, ঐ রাখাল ছেলেটাকে পাহাড়ের ওধারের গভীর জঙ্গলে রেখে আসতে হবে। ওই বনে এমন হিংস্র জানোয়ার আছে যে, এক রাতেই ওকে সাবাড় করে দেবে।

ঐ বনের ত্রিসীমানার কাছে যায় না কেউ। শোনা যায় মাঝে মাঝে ঐ জঙ্গল থেকে বাঘ-সিংহরা বাইরের মাঠ থেকে আস্ত আস্ত গরু মোষ ধরে নিয়ে যায়।

শাহজাদা জুঁইকে সুলতানের সশস্ত্র প্রহরীরা ঐ গভীর অরণ্যের ঠিক মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে চলে এলো।

রাত বাড়ছিলো। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিলো সমগ্র বনাঞ্চল। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আপন মনে বাঁশী বাজাতে থাকে জুঁই। এক এক করে বনের জন্তু-জানোয়াররা জড়ো হতে লাগলো জুঁই-এর আশেপাশে। বাঁশীর সুরে ওরা সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জুঁই ওদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর জানাতে থাকলো।

এইভাবে রাত্রি শেষ হয়ে গেলো। একটি বাঘ-সিংহও তাকে আক্রমণ করলো না। বরং সকালে তখন সে তাদের বিদায় জানিয়ে বন থেকে বাইরে চলে এলো। দু'টি সিংহশাবক তার সঙ্গ ছাড়লো না কিছুতেই।

রাখাল ছেলেকে সশরীরে ফিরে আসতে দেখে সুলতান তো থ'। এমন অসম্ভব কাণ্ড সে ঘটালো কী করে!

জুঁই সুলতানকে কুর্নিশ করে সিংহশাবক দু'টি উপহার দিলো। এরপর সুলতান আর কী করেন, খুশী হয়ে তিনি তাঁর প্রাণদণ্ড মকুব করে দিলেন।

সুলতানের পুত্ররা কিন্তু পিতার এই আচরণে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারলো না। তারা ঠিক করলো, সেইদিন সন্ধ্যাকালেই শাহজাদী বাদামের শাদী দিয়ে দেবে তারা। কিন্তু পাত্র কোথায়? এমন সময় সেই চাচাটা এসে বললো, কেন, আমার ছেলেই তো আছে। তার সঙ্গেই শাদী দিয়ে দাও।

সেই রকমই ব্যবস্থা হতে লাগলো। সারা প্রাসাদে উৎসবের আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু যথাসময়ে পাত্রীকে আর হারেমে খুঁজে পাওয়া গেলো না। পাওয়া গেলো না সেই রাখাল ছেলেকেও।

সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে সারা দেশে গুপ্তচর সৈন্য পাঠানো হলো। তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করলো তারা সারা মুলুক। কিন্তু কোনই হদিশ করা গেলো না তাদের।

তারপর কতকাল কেটে গেলো, শাহজাদী বাদাম আর ফিরে এলো না তার বাবার প্রাসাদে।

ধরণীর এক কোণে কোথায় যে গিয়ে ওরা সুখের নীড় রচনা করেছিলো কেউ জানতে পারেনি কোনও দিন।

শাহরাজাদ বললো, এই হচ্ছে শাহজাদা জুঁই আর শাহজাদী বাদামের অবিস্মরণীয় প্রেম-উপাখ্যান। যেমনটি আমি শুনেছিলাম ঠিক তেমনি ভাবেই শোনালাম আপনাকে। জুঁই আর বাদাম নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় চলে গিয়েছিলো কেউ তা বলতে পারেনি। তারা যেখানেই যাক আল্লাহ তাদের সুখে সম্ভোগে রেখেছিলেন এটাই আমরা আশা করবো।

এরপর শাহরাজাদ থামলো।

সুলতান শাহরিয়ার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, গল্পটা কিন্তু বড়ই চমৎকার! এমন প্রেমের প্রতিমূর্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মৃতির পটে চিরদিনই ভাস্বর হয়ে থাকবে।

শাহরাজাদ, তুমি আমাকে শুধু গল্পই শোনাওনি এতদিন ধরে। তোমার কাছ থেকে অনেক শিক্ষাই আমি লাভ করেছি। তুমি আমাকে অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়েছ। আমার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে জ্ঞানের চিরাগ বাতি জ্বেলে দিয়েছ।

এক এক করে এক সহস্র একটি রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তোমার পবিত্র সাহচর্য্যে। আমার সন্দিগ্ধ কলুষিত চিত্ত পূত-পবিত্র করে তুলেছ তুমি। দু'চার কথায় তোমার মহিমা প্রকাশ করবো কী করে?

আজ আমি সকল কলুষমুক্ত আনন্দের ঝর্নাধারা হয়ে উঠেছি। এজন্য একমাত্র তুমিই দায়ী।

দুনিয়াজাদ উঠে এসে বড় বোনকে জড়িয়ে ধরে বলে, সত্যিই দিদি, তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। তোমার বিদ্যা বুদ্ধি বিচক্ষণতার তুলনা মেলে না। কী সুন্দর সুন্দর সব কিস্‌সা তুমি আমাদের শুনিয়েছ। আর সেগুলো তোমার মুখে মধু হয়ে ঝরেছে। আমরা অমৃত সুধা পান করেছি তোমার গল্পকথা শুনে।

শাহরাজাদ অনুজার কানে কানে কি যেন ফিস ফিস করে বললো। দুনিয়া উঠে পাশের ঘরে চলে গেলো। এবং প্রায় তক্ষুণি ধাই দু'টি যমজ শিশু পুত্রকে কোলে কাখে নিয়ে প্রবেশ করলো! তার পিছনে পিছনে আর একটি ফুটফুটে ছেলেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটাতে হাঁটাতে নিয়ে এলো দুনিয়াজাদ।

শাহরাজাদ তাঁর তিন পুত্রকে আদর চুম্বন করে সুলতান শাহরিয়ারের দিকে এগিয়ে দিলো।

শাহরাজাদ সাশ্রুনয়নে সুলতানকে সম্বোধন করে বলতে থাকলো, জাঁহাপনা

এদের একটু আদর সোহাগ করুন। এরা আপনার ঔরসের সন্তান। এই বড়টিকে দেখছেন, এর বয়স দু'বছর। আর এই জমজ দু'টির শিগ্গিরই এক সাল পূর্ণ হবে। আল্লাহর দোয়ায় ওরা সুস্থ সবলই আছে এখনও। আপনার স্মরণ থাকতে পারে জাঁহাপনা, ছয়শো ঊনআশীতম রজনী থেকে সাতশোতম রজনী পর্যন্ত আমি আপনাকে কোনও গল্প শোনাতে পারনি। ঐ সময় আমি এই জমজ শ্রীমানদের জন্মদানের জন্য সুতিকাগারে ছিলাম। বড় ছেলের চেয়ে এরাই আমাকে বেশি পীড়া দিয়েছিলো। বড়টির সময় আমি মাত্র কয়েকটি রজনী গল্প শোনাতে পারিনি। কিন্তু এই যমজ প্রসবের ধকল সহ্য করতে আমার বেশ কিছুটা সময় লেগেছিলো। এছাড়া ছোট খাটো অসুখে বিসুখে আরও কিছু রজনী আপনার কাছে উপস্থিত থাকতে পারিনি আমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা ঠিক, প্রায় একটানা তিনটি বছর আপনাকে গল্প শোনাতে পেরেছি। জানি না, সে সব গল্পের কতটা আপনার মনে দাগ কাটতে পেরেছে। যদি কোনও কাহিনী ভালো না লেগে থাকে তবে সে দোষ গল্পের নয়, আমার। হয়তো বলার অক্ষমতাতেই ভালো লাগাতে পারিনি। আর যদি কোনও গল্প আপনার হৃদয়ে কিছুমাত্র দাগ কেটে থাকে তার পুরস্কার আমার প্রাপ্য নয়। সে সব কাহিনী যাঁরা রচনা করে গেছেন, সে ইনাম তোলা থাক তাঁদের জন্য।

শাহরাজাদ থামলো।

দুনিয়াজাদ শিশু তিনটিকে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিতে থাকলো। আড়চোখে সুলতান শাহরিয়ারের দিকে তাকিয়ে বাক্যবাণ ছুঁড়লো, তা হলে জাঁহাপনা, এবার তো আমার দিদির মুণ্ডুচ্ছেদ করবেন আপনি? এই যে ফুলের মতো আপনার তিনটি শিশু, এদের মাকে তো হত্যা করবেন আজ? এই অবোধ শিশু শাহজাদাদের মাতৃহারা করবেন না জাঁহাপনা?

সুলতান শাহরিয়ার দুনিয়াজাদের বিদ্রুপ-বাণে জর্জরিত হয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন, ঢের হয়েছে দুনিয়া, এবার ক্ষান্তি দেবে? আমি তো আমার ভুল স্বীকার করেছি, তবুও কেন এতো যাতনা দিচ্ছ?

তারপর শাহরাজাদের দিকে তাকিয়ে বললো, এরা তোমার কোলে আসার অনেক আগে থেকেই তুমি আমার হৃদয়ে পাকাপাকিভাবে আসন পেতে নিতে পেরেছ শাহরাজাদ। ভেব না, এই শিশুপুত্রদের মুখ চেয়ে আমার মন কোমল হয়েছে।

ওরা আমার পরম আদরের সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি ওদের অধিক।

তোমাকে পেয়ে আজ আমি পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছি, শাহরাজাদ। তোমার অদর্শন আমি আর সইতে পারবো না। আমি যতদিন বাঁচবো, তুমি আমার জীবনে ধ্রুবতারার মতো জ্বলবে চিরদিন। আমি তোমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি, তার কারণ তোমার মত নম্র বিনয়ী বিদুষী বিচক্ষণ সত্যাশ্রয়ী পবিত্র মধুরভাষিণী সচ্চিদানন্দা জ্ঞানী রসবতী নারী আমি এর আগে কখনও পাইনি আমার জীবনে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করবেন প্রিয়তমা। তোমার মাতা পিতা ভগ্নী এবং তোমাদের পরিবারের সকলকে তিনি সুখে শান্তিতে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা জানাই। শাহরাজাদ এক সহস্র একটি বিনিদ্র রজনী আমরা অতিবাহিত করেছি। কিন্তু সে রাত্রিগুলো প্রকাশ্য দিবালোকের চেয়ে আরও আলোময় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমাদের জীবনে।

সুলতান শাহরিয়ার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে সস্নেহে শাহরাজাদের মাথাটা টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। শাহরাজাদ সুলতানের একখানো হাত অধরে ঠেকিয়ে মিনতি জানিয়ে বললো, জাঁহাপনা আজকের এই আনন্দের মুহূর্তে আপনার দুঃখকাতর বৃদ্ধ উজিরকে এ খবর শুনালে তিনি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন।

সুলতানের ইশারায় প্রহরী তক্ষুণি উজিরকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো সেখানে। তখনও তার হাতে ধরা একখানা কফিন। সারা দিনরাত সে ঐ কফিনখানা বয়ে বেড়াতো।

সুলতান উজিরকে আলিঙ্গন করে বললেন, আপনার কন্যাকে আমি আমার হারেমে শুধু নয় হৃদয়-আসনে বসিয়েছি চিরদিনের মতো। আপনি আর মনে কোনও সংশয় দ্বিধা রাখবেন না, আপনার কন্যা আমার কাছে সুখেই থাকবে চিরকাল।

বৃদ্ধ উজির আনন্দে অধীর হয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেললো। দুনিয়াজাদ গোলাপজল এনে বাবার চোখে মুখে ঝাপটা দিতে থাকলো।

একটু পরে জ্ঞান ফিরে পেলো উজির। ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে পারলো, আজ তিনটি বছর ধরে আমি চোখের দু'পাতা এক করতে পারিনি, মা। প্রতিটি রাত্রি আমার সামনে দারুণ এক বিভীষিকার রূপ ধরে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুলতান শাহরিয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহজামানকে সংবাদ পাঠালেন। সে সমরখন্দের অল আজমের সুলতান। কয়েকদিনের মধ্যেই সে এসে উপস্থিত হলো বড় ভাই-এর কাছে।

সারা শহর আনন্দে মুখর হয়ে উঠলো। আতর ধুপের গন্ধে মেতে উঠলো আকাশ বাতাস।

খানাপিনার মহোৎসবে সুলতান শাহরিয়ার শাহজামানকে শাহরাজাদের অসাধারণ গুণকীর্তন করতে লাগলেন। প্রায় তিন বছর গল্প শুনিয়ে কীভাবে সে তার চণ্ডভাব বিতাড়িত করে আদর্শ মানুষ করে তুলতে পেরেছে সে সব কথা বলতে বলতে সুলতান গদগদ হয়ে উঠলেন।

—সে এখন আমার নিত্যসঙ্গী, আমার বেগম, আমার সন্তানের জননী।

এরপর সুলতান শাহরিয়ারের অনুরোধে শাহজামান দুনিয়াজাদকে শাদী করে বেগমের মর্যাদা দিলো।

শাহরাজাদ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতে থাকলো, জন্মাবধি দুনিয়া আমার কাছ ছাড়া হয়নি কখনও! আজ ও অন্য দেশে চলে যাবে, এ বিরহ আমার পক্ষে সহ্য করা শক্ত হবে জাঁহাপনা।

শাহজামান বললো, আমি বড় ভাই-এর কাছেই বাকী জীবনটা কাটাতে ইচ্ছা করি, কিন্তু কি করবো, সমরখন্দের মসনদ রক্ষা করতে হবে তো? যাই হোক, কথা দিচ্ছি, দুনিয়া বেশির ভাগ সময় এখানে থাকবে। আমিও থাকবো এখানে এসে।

সুলতান শাহরিয়ার কলমচীদের ডেকে শাহরাজাদের কাহিনীগুলো সোনার জলে লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন।

এরপর তিরিশটি খণ্ডে লেখা হয়েছিলো সে গ্রন্থ। তার নাম দেওয়া হয়েছিলো আলিফ লায়লা'। [আমরা বাংলায় একেই সহস্র এক আরব্য রজনী নাম দিয়েছি।] আজও সে গ্রন্থ পৃথিবীর এক মহান্ সাহিত্য-সম্পদ হয়ে আছে।